

বৈশাখ, ১৩৬৩

মাসিক বসুমতী

(বীনাদেবী সেনের সৌজন্যে)

(অপ্রকাশিত আলোকচিত্র)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—বৈশাখ, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ১ম সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "স্ত্রীলোক গায়ে ঠেকলে অসুখ হয়, যেখানে ঠ্যাকে সেখানটা ঝন্‌ঝন্‌ করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধলো।"

"এরা কামিনীকাঞ্চন না হলে চলে না বলছে। আমার যে কি অবস্থা তা জানে না। মেয়েদের গায়ে হাত লাগলে হাত আড়ষ্ট, ঝন্ ঝন্ করে। যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে যাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, সে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই। ঘরে একলা বসে আছি, এমন সময় যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে; আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে।"

"পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি মাটিই টাকা, সোনা মাটি মাটিই সোনা, এই বলে বিচার করতে করতে মাটি ও টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম।"

"হ্যাগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্ছে কেন বল দেখি? ধাতুর কোন জিনিষে হাত দিবার যো নাই। একবার একটা বাটিতে হাত দিছিলাম, তা হাতে শিঙি মাছের কাঁটা ফোটার মত হলো। হাত ঝন্ ঝন্ করতে লাগলো। গাড়ু না ছুঁলে নয় তাই মনে করলাম গামছাখানা ঢাকা দিয়ে তুলতে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি অমনি হাতটা ঝন্ ঝন্ কন্ কন্ করতে লাগলো—খুব বেদনা! শেষে মাকে প্রার্থনা করলাম,—মা! অমন কর্ম করবো না, মা!, এবার মাপ করো!"

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনীকাঞ্চন অনিত্য, ঈশ্বরই একমাত্র সত্যবস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয় এই পর্য্যন্ত। ভগবান্ লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার—বস্তু বিচার। এই দেখ টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেতেই বা কি আছে। বিচার কর,—সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চর্ব্বী মল মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?"

"ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়-বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে, এই ব্রহ্মজ্ঞান হত না। ঋষিরা কত খাটত! সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। একলা সমস্ত দিন ধ্যান, চিন্তা করতো। রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফলমূল খেত। দেখা শুনা ছোঁয়া এসব বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাখতো,—তবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ করতো। এ সাধনে একেবারে বিষয়-বুদ্ধির লেশ মাত্র থাকলে হবে না। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এ সব বিষয় মনে আদপে থাকবে না, তবে তত্ত্বজ্ঞান। সেই তত্ত্বজ্ঞানও যা তত্ত্ব-আস্বাদও তা। মনেতে কামিনীকাঞ্চন একেবারে [illegible] না। কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি গেলেই তত্ত্বজ্ঞান আর ব্রহ্মবুদ্ধি হয়।"

হর্ষবর্দ্ধনের যুদ্ধযাত্রা

বাসবদত্তা

[বাণভট্টের হর্ষচরিতের সপ্তম উচ্ছ্বাস থেকে এই বিবরণ অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধন শশাঙ্কের হাতে নিহত হওয়ার পর হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন। চীনা পরিব্রাজক ইয়ুয়ান্ চুয়াংএর বিবরণে এই যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা পাওয়া যায়—হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গে বিরাট সৈন্যবাহিনী ২০,০০০ হাতি ও অনুরূপ সংখ্যায় ঘোড়া ও উট। অনেক শহর ও গ্রামের মধ্য দিয়ে এই বিশাল বাহিনী গৌড় জয় করতে চলেছে।]

রাজা সসৈন্যে চলেছেন। তীক্ষ্ণ তূর্যধ্বনিতে দিগন্তরাল পূর্ণ হয়ে উঠল। চারিদিকে শব্দ শোনা যেতে লাগল—"একটু সর বাছা, ঘোড়া আসছে যে! খোঁড়ার মত চলেন কেন মশাই! ওই সামনের ওরা হুড়মুড় করে মাথার ওপর এসে পড়ছে। উটে চড়ে যাচ্ছ নাকি; টিয়াপাখির ছানাটাকে দেখতে পাও না?—আচ্ছা নিষ্ঠুর লোক ত, মাড়িয়ে চলে গেলে যে বড়? বাছা রামিল, ধূলোর মধ্যে যেন হারিয়ে যাসনে, দেখছিস না, ওই হাতুখোর চাকরটা কত দূরে ছাড়িয়ে গেল। এত তাড়াহুড়ো কিসের গৌরভের? ওলো মেছুনি, রাস্তা ছেড়ে ঘোড়াগুলোর পাশে ছুটিস কেন? মাতঙ্গি, তুই কি হাতির দলে ঢুকবি নাকি? হায় হায়, জানোয়ারগুলোর ছোলার থলিটা পড়ে গেল। চেঁচাচ্ছি, শুনতে পাস না? পথ ছেড়ে চলতে গিয়ে খানায় পড়বি নাকি? সৌবীরক, কলসীটা ভাঙল। আখ চিবোতে চিবোতে চলেছিস, মন্থরক উটটাকে শান্ত কর। ওরে আর কতক্ষণ ধরে গাছ থেকে কুল পাড়বি? অনেক রাস্তা হাঁটতে হবে। কি আজই যেতে হবে নাকি? দ্রোণক, যুদ্ধযাত্রা হল দীর্ঘপথের যাত্রা, একটা ভাল মত যুদ্ধ না হলে কি এত কষ্টের শোধ হয়? ঘপূটক, এলোমেলো ঘুরে বেড়াচ্ছিস কেন? রাস্তা ত সামনে। দেখো স্থাবরক, বাতাসার বারকোশটা যেন ভেঙে ফেলো না আবার। সামান্য কটা চালের বস্তা, দম্য তাও বইতে পারছে না যেন। দাসক, দা নিয়ে ঐ মাষকলাইয়ের ক্ষেত থেকে অল্প কিছু শীসের গোছা কেটে নিয়ে এস তো? এই জানোয়ারগুলো, যেন না খেয়ে এক মুহূর্ত চলতে পারে না তা কে জানত! মশাই, বলদগুলোকে আটকান, [illegible] যেন না ঢোকে, মালিক আছে, মুস্কিল হবে। ছোট গাড়িটা যে রাস্তা [illegible] নিচে গড়িয়ে যাচ্ছে, ঐ জোয়া বলদটা জুতে দাও, টেনে তুলুক। বক্রপালিত, মেয়ে মানুষকে মাড়িয়ে চলে যাচ্ছ, চোখের মাথা খেয়ে বসেছ নাকি? এই মাহুত, হাতির শুঁড় নিয়ে খেলা হচ্ছে নাকি? ওরে পাগল সম্বর্, পিছলে কাদায় গিয়ে পড়লি! ও ভাই, ও ভাল মানুষের পো, পাঁক থেকে ষাঁড়টাকে তুলে দাও না। এই ছেলেটা, এদিকে আয়, এই পেল্লায় হাতির দলের মধ্যে একবার গিয়ে পড়লে বেরোবার রাস্তা আর থাকবে না।"

এই রকম নানা আলাপের মধ্যে দিয়ে সৈন্যদল ধীরে ধীরে এগোচ্ছে। কোথাও সঙ্গে সঙ্গে চলেছে একদল নীচ চাটুকার। তাদের মধ্যে ছিল অপদার্থ, কুৎসিত, বেঁটে, মূর্খ কতকগুলো গাধার সহিস, সাধারণ চাকর, চোর, এক চণ্ডালের দল। তারা শস্যভরা ক্ষেত ইচ্ছে মত দলে মাড়িয়ে শস্য ও তৃণ প্রচুর পরিমাণে এনে দিত সৈন্যদল এবং পশুদের জন্যে। বিনিময়ে সৈন্যদের কাছ থেকে তারা খাবার পেত, কাজেই এরা সর্বদা সৈন্যদের যশ ধন্য করত। আবার কোথাও বা নিন্দাও শোনা যেত। উঁচুঘরের একদা ধনী বর্তমানে গরিব যে-সব পরিবার তারা এসে নিন্দা করে গেল। গাঁয়ে সবাই গরিব, ভিক্ষে করে বেশি কিছু জোটানো মুস্কিল। না খেয়েও আর থাকা যায় না। তাই নিজেরাই বাড়ি থেকে খাট বিছানা কাপড় গয়না ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বিনিময়ে, সৈন্যদের সঙ্গে যে কুকুর এসেছে তাদের জন্যে তৈরি খাবার কিছু নিয়ে যাবে। এরাই অভিসম্পাত দিয়ে গেল। বললে, "এই যুদ্ধযাত্রাই তবে চলুক, আমাদের আশা ভরসাও পাতালের তলায় যাক, সংসার থেকে সমৃদ্ধি স্বচ্ছলতা একেবারেই লুপ্ত হোক। শুধু চাকর হয়ে থাকলে তবে বাঁচবার আশা আছে। বেঁচে থাক সর্বদুঃখের মূল এই যুদ্ধ!"

খরস্রোতা নদীর জলে নৌকো যেমন দ্রুত অসম গতিতে ছুটে চলে, তেমনি সারে সারে অসংখ্য লোক অতি দ্রুত চলে যাচ্ছে। তাদের পেশীবহুল কালোকঠিন কাঁধে বাঁক ঝোলানো, তাতে রয়েছে যুদ্ধযাত্রী রাজার সোনার পা-দান, পানের বাটা, কলসী, নিষ্ঠীবন পাত্র ও স্নানজলের ঘট। কাছাকাছি আছেন রাজা, তাঁরই ব্যবহারের উপকরণ বয়ে নিয়ে চলেছে বলে এদের গর্ব যেন আর ধরে না, আর সবাইকে যেন এরা তাচ্ছিল্যভরে দূরে সরিয়ে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে পাকশালার উপকরণ ও ভোজ্যসম্ভার বয়ে নিয়ে চলেছে আর একদল ভৃত্য। বনশূয়োরের চামড়ায় তৈরি দড়িতে ঝোলানো বক্তীয় ছাগ, হরিণের সামনের দিকটা, চড়াই পাখির ঝাঁক, কচি খরগোস, শাক তরকারি, বাঁশের কোঁড় ইত্যাদি সংগ্রহ করে আর একদল চলেছে। দুধের ভাঁড়গুলির ওপর শাদা কাপড় ঢাকা, তার একধারে শিলমোহর করা। লোহার চুল্লি, পেতলের তাওয়া, মাংস রান্নার শিক, পায়স রান্নার তামার কড়াই, ছোট ছোট ভাঁড়, বাটি—বাঁকে করে ভারে ভারে এই সব চলেছে। রাস্তার সামনে যারা পড়েছে তাদের হাঁক দিয়ে সরিয়ে এরা চলেছে।

বংশানুক্রমে যারা রাজভৃত্য তারা বলদগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বলদগুলো কেবলই হুমড়ি খেয়ে পড়তে যায়, ভৃত্যেরা কোনো মতে সামলে চালাচ্ছে আর বক বক করছে, "কষ্টের বেলায় আমরা, আর বকশিশের বেলা কোত্থেকে সব ঠক-জোচ্চোরের দল এসে হাজির হবে।" যে রাস্তায় সৈন্যরা যাচ্ছিল তার দু'পাশের ক্ষেত থেকে যে লোকগুলো পাহারা দিচ্ছিল, তারা দলে দলে রুদ্ধশ্বাসে ছুটে আসতে লাগল, রাজাকে দেখার কৌতূহলে। সামনে যারা এগিয়ে আসতে পেরেছে তাদের মধ্যে বুড়োরাও জলভরা কলস উঁচু করে তুলে ধরছে [illegible] আশীর্বাদ জানিয়ে। অনেকে তাড়াতাড়ি ছুটে আসছে ভাঁড়ে ভাঁড়ে দই গুড় বাতাসা নিয়ে, কোঁচায় নানা

সামগ্রী ভরে নিয়ে। বেত হাতে রাজপুরুষদের হুংকার অগ্রাহ্য করে বহু দূর থেকে লোক পড়ি-কি-মরি করে ছুটে আসছে, একাগ্র ভাবে শুধু রাজারই দিকে দৃষ্টি রেখে। (রাজা হর্ষ কত ভাল তা প্রমাণ করতে হবে) কেউ বা আগেকার রাজাদের যে-সব দোষ ছিলই না তাও উদ্ভাবন করে তাদের শত শত অন্যায় কাজের উল্লেখ করে ঘোষণা করছে।

গৌড় দেশে হর্ষবর্ধনের সৈন্য গিয়ে যুদ্ধ করবে। যুদ্ধ যখন চলবে তখন খাদ্যশস্য দুর্লভ হবে, এই আশঙ্কায় জনপদবাসীরা প্রচুর শস্য সংগ্রহ করেছে। এদিকে অশ্বারোহী সৈন্য দল ইচ্ছে মত সেই শস্য তুলে নিয়ে চিবোতে চিবোতে চলেছে।

অবশ্য, এক দল এমন লোক ছিল যাদের বিষয়ে রাজার হুকুম ছিল তাদের গায়ে যেন আঁচড় না লাগে। তারা রাজপুরুষদের এ রকম ব্যবহার সত্ত্বেও তুষ্ট, তাদের মুখে রাজার স্তুতির আর বিরাম নেই, তারা বলে বেড়াচ্ছে, 'দেব্তা (রাজা) সাক্ষাৎ ধর্ম'।

আবার অনেকে নিন্দেও করছে। চোখের সামনে পাকা ফসলের ক্ষেতে শস্য নিশ্চিহ্ন হয়ে শুধু পাতায় এসে ঠেকছে, দুঃখী চাষী যেন মৃত্যুমুখে এসে দাঁড়িয়েছে—ফসলই যে তার প্রাণ—ফসলের জন্তে গভীর শোকে তার রাজভয় গেছে ভেঙে। বিহ্বল হয়ে সে বলে উঠছে, কোথায় রাজা, কোথাকার রাজা, কেমনই বা সে রাজা!

খরগোসেরা দলে দলে ছুটোছুটি করে পালাবার চেষ্টা করছে। তাদের পিছনে পিছনে ধাওয়া করছে বল্লম হাতে নিষ্ঠুর সৈন্যের দল। পাথরের মত, খোলামকুচির মত এদিকে ওদিকে আছড়ে মারছে তাদের। কোনো কোনোটাকে বা আরও পালোয়ান শিকারী ধরে তিলে তিলে টিপে মেরে ফেলছে। ছোট ছোট জীবগুলি কোথাও বা ত্বরিত, বক্রগতি... কুকুর আর অশ্বারোহীদের এড়িয়ে তাদের পায়ের ফাঁকে গলে পালাচ্ছে কোথাও বা তাদের পিঠের ওপর এসে পড়ছে ঢিল মুগুর বল্লম কুড়ুল বর্শা কোদাল খোন্তা দা লাঠি। তবু তা এড়িয়ে এক-আধটা আয়ুর জোরে কোনো মতে পালিয়ে কোলাহল করছে।

কোথাও দলে দলে ঘেসেড়া ধুলো উড়িয়ে তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে। ঘাসের ধুলোয় মলিন দেহ, ঘাসের বোঝায় ঢাকা তাদের পিছন দিকটা ঘাসের বোঝার মতই দেখাচ্ছে। পুরনো ঘোড়া এক দিকে ঝোলানো দা। গায়ে একটা ধোঁয়াওঠা ময়লা ছেঁড়া থোঁড়া কম্বল। পরনের কাপড়খানা কোনও এক সময় কর্তাদের প্রসাদে পাওয়া, এখন তার দশা শতছিন্ন, টুকরো টুকরো হয়ে চার দিকে ঝুলছে, কোনো মতে গায়ে জড়ানো।

কোথাও বা পাঁকে-ভরা মাঠের মধ্য দিয়ে সৈন্যদলের চলতে অসুবিধে হবে বলে হুকুম হয়েছে নিচু জমি ভরাট করে তুলতে হবে। সমস্ত লোক তাই ব্যস্ত হয়ে গোছা গোছা ঘাসের চাপড়া তুলে আনছে।

কোথাও বা গাছের নিচের রাজার অনুচরেরা বেত হাতে শাসাচ্ছে, আর বগড়াটে বামুনের দল ভয়ে ভয়ে গাছের আগায় চড়ে বসছে।

কোথাও কুকুর-বাঁধা দড়িতে গ্রামবাসীকে বেঁধে শাসন করা হচ্ছে।

এরই মধ্যে দিয়ে চলেছে সৈন্যদল। বহু অশ্বারোহী রাজকুমার জাঁকজমকে পাল্লা দিয়ে সারে সারে চলেছে। এই যুদ্ধযাত্রার নানা ব্যাপারে হৈ-চৈতে সমস্ত মানুষ কৌতূহলী হয়ে অবাক্-বিস্ময়ে এক-দৃষ্টে সেই দিকে তাকিয়ে আছে।

আপনি কি?

মানুষকে সংসারে বসবাস করতে হ'লে অনেক নিয়ম, রীতি, কানুন আর সংস্কারকে পালন করতে হয়। নীচে যে ক'টি রীতি উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলি যদি আপনি না পালন করেন, তবে আপনি নিশ্চয়ই অসামাজিক এবং—

১। আপনি কি আড়ালে লুকিয়ে থেকে অন্যের কথোপকথন শুনতে চেষ্টা করেন?

২। আপনি কি অন্যের চিঠিপত্র গোপনে প'ড়ে থাকেন?

৩। আপনি কি আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ যেখানে সেখানে ফেলে ছড়িয়ে রাখতে ভালবাসেন?

৪। আপনি কি 'অভিভাবক? তাই যদি হন, তবে কি আপনার শিশু-সন্তানদের গুরুজনের সমুখে গালমন্দ বা মারধর করেন? এই অভ্যাস থেকে সূচিত হয় যে, আপনি আপনার সন্তানকে শাসন করা অপেক্ষা তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চান।

৫। আপনি কি ধূমপান করেন? যদি ধূমপায়ী হন, আপনি কি অন্যের সমুখে ধূম্রজাল সৃষ্টি করেন, যিনি আদপেই ধূমপান করেন না?

সমালোচনা-সাহিত্য

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে অদ্যাবধি অনেক নবীন সমালোচক রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী প্রবর্ত্তিত সমালোচনার ধারাটি মোটামুটি ভাবে অনুসরণের পক্ষপাতী, একথা বোধ হয় স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। সমসাময়িক কালের বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সাহিত্য বিষয়ক পত্র-পত্রিকা পাঠান্তে এ সিদ্ধান্তই অধিকতর যুক্তিযুক্ত যে, রবীন্দ্রনাথ এবং প্রমথ চৌধুরী সমালোচনার যে আধুনিক রীতির পরিবর্দ্ধন সাধন করে গিয়েছেন, তার প্রভাব শুধু যে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে নতুনত্ব এনেছে তাই নয়, রসিকজনকেও নতুন কালের নতুনতর তত্ত্ব ও তথ্যের ভিত্তিতে রস-বিচারের নানা সম্ভাবনা সম্পর্কে সচেতন করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে, এই অতি-আধুনিক কালের নব্য সমালোচক প্রাচীন আলঙ্কারিক ও শাস্ত্রকারদের রসসূত্রের ব্যাখ্যাকেই একমাত্র ও অদ্বিতীয় মনে ক'রে চর্ব্বিত চর্ব্বণের মাধ্যমে ইতিকর্ত্তব্য সমাধা করার প্রয়াস পান না, যথাসম্ভব নিজের দৃষ্টিভঙ্গী জনিত নতুন মন্তব্য প্রয়োগেরও অবকাশ খোঁজেন। সমালোচনার একটি প্রধান উদ্দেশ্য যে, পাঠকমনে সৌন্দর্য্যবোধের সঞ্চার করা, এটা রবীন্দ্রনাথই বিশেষ ভাবে দেখিয়ে দিয়েছেন। প্রাচীন ও আধুনিক কালের পণ্ডিতদের রচনাবলী থেকে ঘন-ঘন উদ্ধৃতি উপস্থিত করে সমালোচনায় নামলে তা' হবে মল্লযুদ্ধের নামান্তর মাত্র, তাতে সাধারণ পাঠককে বিস্মিত করাও সহজ, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সে-আলোচনায় কোথাও প্রাণের গভীর স্পর্শ পাওয়া সম্ভব হবে কি না সন্দেহ। প্রাচীন কালের আলঙ্কারিকদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ গ্রহণ করেছেন অনেকখানি কিন্তু নিছক সে-কালের সাহিত্য-মীমাংসার সূত্রগুলোর দ্বারা আগে থেকেই দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন হ'তে দিলে যে, প্রকৃত সমালোচনা সম্ভব হয় না একথা তিনি অনেক ক্ষেত্রেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো কোন্‌টা মন্দ বিচার-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-মীমাংসার পূর্ব্ব-প্রচলিত সূত্রগুলোকে যথাসম্ভব এড়িয়ে গিয়েছেন এবং সরাসরি মূল রচনার অভ্যন্তরে প্রবেশ ক'রে নব নব তথ্য উদ্‌ঘাটনের ভিত্তিতে আধুনিক সমালোচনার নতুন সূত্র, আদর্শ স্থাপন ক'রে গিয়েছেন। সৎ সমালোচনা যে নিছক পাণ্ডিত্য-প্রকাশের ভূমিকা মাত্র নয়, সৃজনী সাহিত্যের মতোই তা' যে আপন স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হতে পারে রবীন্দ্রনাথই সেটা তাঁর অপূর্ব্ব সমালোচনাগুলোর মারফৎ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন।

প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনা-পদ্ধতি আরও ঘরোয়া ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনায় রয়েছে সৌন্দর্য্যবোধের অভিব্যক্তি। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনায় প্রকাশ পেয়েছে ফরাসী দেশসুলভ লঘু-চপল ব্যঙ্গপ্রিয়তা। তাঁর আলোচনায় গুরুগিরির আভাস নেই; উচ্চ সিংহাসনে বসে নীচের আসনে উপবিষ্ট এক দল লোককে উপদেশ বিতরণের মতোও মুখভঙ্গী তিনি কখনোই করেন নি; সমালোচক হলেও তিনি পাঠক-সম্প্রদায়ের সামনে এসেছেন বন্ধুর বেশে; পাঠকের সঙ্গে কথা বলেছেন সেই ভাবে যে-ভাবে বন্ধু বন্ধুর সঙ্গে কথা বলেন। প্রমথ চৌধুরীর আলোচনা কোনো ক্ষেত্রেই অযথা [illegible] নয়, কোনো দিকেই অনাবশ্যক বিস্ফারিত নয়; অল্প কথায় যথাযথ ভাবে বক্তব্যকে উপস্থিত করার তিনি পক্ষপাতী ছিলেন বলেই তাঁর কৃত সমালোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও তথ্যবহুল, অনেক সময় মার্জিত রসিকতার রেশ তাতে থাকলেও সে রচনায় সঞ্জীবনীশক্তির প্রভাব বড়ো অল্প নয়। গুরু-গম্ভীর বিষয়ে লিখতে বসে গুরু-গম্ভীর ভাষার আশ্রয় না নিয়েও যে সুষ্ঠু ও পরিণত সমালোচনার প্রকাশ সম্ভব হতে পারে, প্রমথ চৌধুরীই তা' চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে গিয়েছেন। কেউ কেউ অবশ্য বলে থাকেন যে, প্রমথ চৌধুরীর অনেক রচনাই আসলে সমালোচনা নয়, আলোচনা মাত্র; তাঁর বক্তব্যও অনেক স্থলে কথার কথা মাত্র। একথা একেবারে অস্বীকার করবার উপায় নেই; অনেক স্থলেই চৌধুরী মহাশয়ের সমালোচনার বৈঠকী ভঙ্গীটাই সাধারণ পাঠকের ভালো লেগেছে, কথাবার্ত্তার মেজাজটাই যেন অভিভূত করেছে অত্যধিক, কিন্তু মূল বক্তব্য যে পাঠকমনে গভীর ভাবে রেখাপাত করেছে এরূপ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা যুক্তিযুক্ত মনে হবে কি না সন্দেহ! কিন্তু মনে রাখা দরকার, প্রমথ চৌধুরীর অনেক উল্লেখযোগ্য রচনা লেখা হয়েছিল এখন থেকে প্রায় চল্লিশ বছর আগে—১৩২০ সালে কিংবা তারও বেশ কয়েক বছর পূর্ব্বে। চলতি কথ্য-ভাষায় সাহিত্যচর্চ্চার আন্দোলন তখন নতুন করে শুরু হয়েছে; কথ্যভাষার সম্পূর্ণতা তখন আশা করা সম্ভব ছিল না বলেই তাঁর রচনায়ও সর্ব্বত্র শব্দের ওজন এবং জোর সর্ব্বদা প্রকাশলাভের সুযোগ পায়নি। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় চল্লিশ বছর আগেই প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, কথ্য-ভাষায় সৃজনী-সাহিত্য তো বটেই, ধর্ম্মনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, রাজনীতি-সংক্রান্ত আলোচনাও অনায়াসে সম্ভব হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ও অপ্রতিহত দীর্ঘকালীন সাহিত্য-জীবনের গোড়ার দিকে সাধুভাষার সাহায্যেই বাংলাসমালোচনার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করেছিলেন। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অতুলনীয় রচনাগুলো এখন থেকে অর্দ্ধশতাব্দী কালেরও অধিক আগে লেখা হয়েছে অথচ এই বইয়ের রবীন্দ্রসমালোচনার সমস্ত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য বর্ত্তমান। এই বইয়ে বাণভট্টের কাদম্বরীচিত্র সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ সমালোচনা শুধু যে রবীন্দ্র-সমালোচনা পদ্ধতির গুণগত দিকটাকেই পাঠক সমাজের চোখের সামনে উন্মোচিত করেছে তাই-ই নয়। সমালোচনার ক্ষেত্রেও যে সাধু-ভাষায় গদ্যকাব্যের প্রাণসঞ্চার করা অসম্ভব নয়, সেটাও রবীন্দ্রনাথই প্রমাণ করেছেন। পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যেমন সৃজনী-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তেমনি সমালোচনা-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কথ্যভাষাকেই একমাত্র বাহন করে তুলেছিলেন। প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনায় চাপা রসিকতা, মার্জ্জিত রহস্যপ্রিয়তার অসদ্ভাব নেই; আর সেই সঙ্গে এখানে-সেখানে ছড়িয়ে রয়েছে মনন-সাধনার আশ্চর্য্য ফসল। কিন্তু তবু তাঁর সমালোচনায় কোথায় যেন একটা সমগ্রতার, সম্পূর্ণতার অভাব শেষ পর্য্যন্ত অনুভব করা যেতো, এখানে-সেখানে একটি কি দু'টি পংক্তিতে অথবা একটি কি দু'টি স্তবকে তিনি এমন অনেক কথা বলেছেন যার তুলনা আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে বিরল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্ত্তিত সমালোচনার ধারার সঙ্গে তুলনা করলে এটাই মনে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় গদ্যভঙ্গী তাঁর সমালোচনা-সাহিত্যে যে সমগ্রতা এনেছে প্রমথ চৌধুরীর সমালোচনায় তা' অনুপস্থিত; কিন্তু তা' হ'লেও এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, আধুনিক সমালোচনা-সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর অবিসংবাদী নেতৃত্ব

শুধু বাংলা সমালোচনাতেই নবীন কালের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে যায় নি, অনেক নবীন সাহিত্যিকের সমালোচনা-পদ্ধতিকেও প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছে। তাঁর 'হালখাতা'র অনেক প্রবন্ধই যে আধুনিক কালের অনেক নবীন লেখককে নানা দিক থেকে প্রভাবিত করেছে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। এই দিক থেকেই তিনি আধুনিকতার গুরু।

আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন ব্যক্তিরও অভাব নেই যাঁরা সমালোচনা-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন ধারাটির অনুগমন অধিকতর রুচিকর মনে ক'রে এসেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর সমসাময়িক কালের সাহিত্যসেবীদের সমালোচনার পদ্ধতি এ যুগেও যে অনেকের রচনাশক্তির শ্রীবৃদ্ধি-সাধনের সহায়ক হতে পারে, তা' এই প্রাচীনপন্থী সমালোচকদের কেউ-কেউ সপ্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সম্ভবত মোহিতলাল মজুমদারকে এই রক্ষণশীল সমালোচকগোষ্ঠীর পুরোধা বলে অভিহিত করা যেতে পারে। মোহিতলাল আধুনিক কালের সমালোচক হলেও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে ছিলেন খাঁটি বঙ্কিমপন্থী, বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর অনতিকাল পরবর্ত্তী গদ্যলেখকদের কাছ থেকেই তিনি অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে মনে হয়। কথ্যভাষায় সমালোচনা-সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টাকে তিনি কখনোই প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ সমালোচনা গ্রন্থগুলো তিনি লিখেছেন বিশুদ্ধ সাধু-ভাষায়ই। বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁর বঙ্গদর্শনকেই মোহিতলাল আদর্শ বলে মেনে নিয়েছিলেন অনেক দিক থেকে। বাংলাসাহিত্যে বঙ্কিমের কাল এবং ইংরেজি সাহিত্যে অষ্টাদশ ও নবম শতক (জনসন-ড্রাইডেন-কোলরিজ-আরনল্ড ও ওয়াল্টার প্যাটার) তাঁর মনকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। অষ্টাদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যের দিকপাল জনসনের মতো মোহিতলালও ধ্রুপদী (classical) লেখকের আদর্শে আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ব্বলতা এইখানটায় যে, তিনি মোটেই পরমতসহিষ্ণু ছিলেন না এবং যে উদার মনোভাব প্রকৃত সুষ্ঠু সমালোচনার সহায় তা' তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ! তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' এবং 'সাহিত্য-কথা' পড়বার পর একথাই মনে হবে যে, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অনুরাগ ছিল আন্তরিক,—ধ্রুব আদর্শ অনুযায়ী সমসাময়িক কালের সাহিত্য-সমালোচনাকে সমৃদ্ধ করার জন্যে উদ্যোগ-আয়োজন ও পরিশ্রমের ত্রুটি তিনি করেন নি,—দেশী ও বিদেশী গ্রন্থপাঠ জনিত অধ্যবসায় তাঁর বক্তব্যকে অনেক স্থলেই সমৃদ্ধ করেছে। কিন্তু তবু শেষ পর্য্যন্ত তাঁর সাহিত্য-সমালোচনা পাঠক-মনে গভীর রেখাপাত করতে সমর্থ যে হয়নি এর একটি প্রধান কারণ এই যে, তাঁর প্রচেষ্টা কোথাও সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন মেটায়নি, বরং রক্ষণশীলতার বিশেষ একটি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণকেই যেন উন্মোচিত করে এসেছে। আর সে কারণেই মোহিতলালের রচনাবলীতে 'Some admirable Critcal appreciations' থাকলেও সেই সঙ্গে এই সব সমালোচনায় 'Incompleteness and occsionally glaring Insensibilites' (স্যামুয়েল জনসনের কি লাইভস্ অব পোয়েটস্' সম্পর্কে একজন সমালোচক এ কথার উল্লেখ করেছিলেন)। অনেক সজাগ পাঠকেরই নজরে পড়বে, বলা বাহুল্য।

সমালোচক মোহিতলাল ষ্টাইল ও রীতির মধ্যে বরাবরই একটি মূল পার্থক্য দেখিয়ে এসেছেন। বাঙলায় style-এর অর্থে 'রীতি' শব্দটির ব্যবহার তিনি সমর্থন করেননি। তাঁর অভিমত এই যে, ষ্টাইলে লেখকের ব্যক্তিত্ব-লক্ষণ প্রকাশ পেয়ে থাকে, কিন্তু 'রীতি' বস্তুটি প্রকৃত প্রস্তাবে লেখকের একটি ভঙ্গীমাত্র। অতএব প্রমথ চৌধুরী কথ্যভাষায় যে-সব প্রবন্ধ লিখেছেন মোহিতলাল তার ভেতর ষ্টাইলের প্রকাশ খুঁজে পাননি। খুঁজে পেয়েছেন 'রীতি'-মাত্র—যাকে তিনি অভিহিত করেছেন একটা অতিশয় প্রকট বচন-ভঙ্গিমা বলে। তাঁর মতে 'রীতি যেমন ভাষার বহিরঙ্গ-সৌষ্ঠব মাত্র, তেমনই তাহা লেখকের আন্তর-অনুভূতির গভীরতা ও মৌলিকতার পরিপন্থী। ...অনেক লেখক ভাষার নবত্ব সম্পাদনের জন্ত নানাবিধ কৌশল করিয়া থাকেন। ভিতরের ভাববস্তুর কোনও বৈশিষ্ট্য থাকে না বলিয়াই ভাষার এইরূপ ভঙ্গিমাই তাঁহাদের একমাত্র কৃতিত্ব। এইরূপ রচনাভঙ্গি বা ভঙ্গিমাযুক্ত ভাষায় যে ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠে তাহা খাঁটি ষ্টাইলের লক্ষণ নয়—তাহা অতিশয় Superficial idiosyncracy—সে যেন ভাষার মধ্যে লেখকের নিজ নামের মুদ্রাচিহ্ন।' (সাহিত্য-কথা—২৭৬ পৃষ্ঠা।) কিন্তু ষ্টাইল ও রীতির মধ্যে এই পার্থক্য নির্ণয়ের প্রচেষ্টা অনেকের কাছেই অহেতুক ঠেকবে। আসল কথা নিশ্চয়ই এই যে, ইংরেজিতে যাকে ষ্টাইল বলে, বাংলায় তাকেই আমরা রীতি বলে থাকি এবং রীতি কখনোই লেখায় একটি বিশেষ ভঙ্গীমাত্র নয়, ষ্টাইলের মতো রীতিও প্রকৃত প্রস্তাবে লেখকের ব্যক্তি-মানসকেই উন্মোচিত করে থাকে, বাক্-পদ্ধতি ও প্রয়োগনৈপুণ্যের সামঞ্জস্তেই তা' সাধারণ পাঠক-সমাজকে অভিভূত করে। প্রমথ চৌধুরী যে-ভাবে লিখেছেন সেটা কষ্টকল্পিত ব্যাপার নয়, তাঁর মন ও মেজাজ অনুযায়ীই তিনি লিখে গিয়েছেন। তিনি জটিল সাধু ভাষায় গতানুগতিক ভাবে লিখলে সেটাই হ'তো তাঁর পক্ষে ব্যতিক্রম এবং সেক্ষেত্রে তাঁর প্রকৃত ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন সম্ভব হ'তো কি না সন্দেহ! শক্তিমান লেখক মাত্রেরই একটি নিজস্ব রীতি থাকে, এই রীতি নিশ্চয়ই লেখকের ব্যক্তি-সত্তার সঙ্গে দৃঢ় সংপৃক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী এঁদের সবারই নিজস্ব রীতি রয়েছে। কোনো না কোনো দিক থেকে এঁরা পাঠক-সমাজকে গভীর ভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছেন, অন্ততঃ রীতির ক্ষেত্রে এঁরা কেউ-ই রক্ষণশীল ছিলেন না।

সমসাময়িক কালে সাহিত্য-সমালোচনায় রক্ষণশীল ধারাটি মোহিতলাল ছাড়াও আরো কেউ-কেউ অব্যাহত রেখেছেন। আমাদের দেশের অধ্যাপক-সমালোচকরা যে-ধরণের সমালোচনায় উৎসাহী তার প্রকাশ এখন থেকে আরো তিরিশ বছর আগে হ'লেই বোধ হয় অধিকতর শোভন হ'তো। সুবোধচন্দ্র সেন-গুপ্ত, প্রিয়রঞ্জন সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত—এঁরা যে আধুনিক কালের সমালোচক, এঁদের রচনাবলী পড়ে' তা' অনুমান করা শক্ত। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও ইংরেজি সাহিত্যে এঁদের দখল সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ নেই। এঁদের পাণ্ডিত্যও নিশ্চয় স্বীকৃত। কিন্তু এঁদের সমালোচনায় এমন কোনো নতুন উক্তি নেই, এমন কোনো অভাবিত বিশ্লেষণ নেই, যা পাঠক-মনকে

নাড়া দিতে পারে। বাঙালী অধ্যাপকেরা যখন সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তখনো একথাই তাঁরা বারংবার মনে করিয়ে দেন যে তাঁরা অধ্যাপক আগে, সমালোচক পরে। দেশ-বিদেশের পণ্ডিতজনের উদ্ধৃতির সাহায্যে তাঁরা অবলীলাক্রমে সমালোচনার ব্যাপ্তি ঘটান বটে, কিন্তু নিজস্ব মন্তব্য প্রয়োগ তেমন নিরাপদ মনে করেন কি না সন্দেহ। প্রাচ্যের ভট্টনায়ক, অভিনব গুপ্ত, ব্যাস, কালিদাস, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, পাশ্চাত্যের ভলটেয়ার, রুশো, ক্রোচে শ' পর্যন্ত সকল দিকপালই যেন এঁদের সমালোচনার সূত্রপাতেই অবলীলাক্রমে হাজির হন। ফল এই দাঁড়ায় যে, সাধারণ পাঠক পৃথিবীর নানা সাহিত্যের কতকগুলো শ্রেষ্ঠ উদ্ধৃতির সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হ'য়ে অভিভূত হন, সমালোচকের জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি সম্পর্কে সজাগ হন, কিন্তু সমালোচনার মূল সূত্রটাকে খুঁজে পান কি না সন্দেহ। অথচ অ্যারিসটটল, দান্তে, হোমার, ক্রোচে, বার্গস, হেগেল বা শোপেনহাওয়ারের প্রভাব আমাদের মনে যতোই গভীর হোক না কেন, সমালোচনা প্রসঙ্গে এঁদের বচন বৃত্তান্তের উল্লেখ যে সর্ব্বদা অনিবার্য্য নয় এই সত্যও হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। বইয়ের ভেতরকার সাহিত্য পদার্থকে প্রাধান্ত না দিয়ে তার আনুষঙ্গিক নীতি অথবা অন্ত কোনো তত্ত্বকথার অবতারণা যে পাঠক-মনকে যথার্থ সাহিত্য পথ থেকে ভ্রষ্ট করে, এ কথার উল্লেখ রবীন্দ্রনাথই বহুকাল আগে করেছিলেন। যাই হোক, অধ্যাপক হ'য়েও সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন এরূপ ব্যক্তি যে আধুনিক কালে নেই, একথা বলাও নিশ্চয় নিরাপদ নয়। 'বাংলা উপন্যাসের ধারা'র লেখক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অধ্যাপক হয়েও সমালোচনা সাহিত্যে নতুন অধ্যায় যোজনা করতে পেরেছেন, আর অধ্যাপক হয়েও প্রমথনাথ বিশী (ইনি এক সময়ে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনা করতেন) তাঁর কয়েক বছর আগেকার লেখা 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহে' নিজস্ব একটি নতুন চিন্তার ছাপ রাখিতে পেরেছিলেন। অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর বহুকাল আগের লেখা 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা'য় অবশ্য তেমন নতুন কোনো বক্তব্য পেশ করতে পারেননি কিন্তু পরবর্তীকালের সাহিত্য-সমালোচনায় তিনি যে স্বাতন্ত্র্য আনতে পেরেছেন তা স্বীকার করে নিতে বাধা নেই।

সমালোচনা-সাহিত্যের সাম্প্রতিক অধ্যায় অবশ্য আরো বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। একেবারে আধুনিক ধরণের সমালোচনায় বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর 'স্বগত' গ্রন্থের প্রবন্ধাবলী ভাষার গঠনপ্রণালীর দিক থেকে অনেকের কাছে কিঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য বিবেচিত হ'লেও আধুনিক কালের সমালোচনা-সাহিত্যের একটি বিশেষ দিককে তিনি পাঠক-সমাজের সামনে উপস্থিত করেছেন। 'স্বগত' বইটিতে ইঙ্গ-মার্কিণ সাহিত্য এবং সমকালীন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও তিনি নানা নতুন ধরণের আলোচনা করেছেন। এক দিকে পাউণ্ড, এলিয়ট, জয়েস, ইয়েটস্, ভার্জিনিয়া উলফ এবং অন্ত দিকে ধূর্জটিপ্রসাদ, বিষ্ণু দে, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি নতুন আলোকসম্পাত করতে পেরেছেন বলে মনে হয়। সুধীন্দ্রনাথ সংস্কৃত, ইংরেজি ও বাঙলা সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং শব্দসম্ভার (vocabulary) আশ্চর্য্য রকমের ব্যাপক। তাছাড়া, ভারতীয় ও য়ুরোপীয় সমালোচনা-পদ্ধতির সঙ্গে তাঁর পরিচয় সুনিবিড়। সবার ওপর, তাঁর সংস্কৃত-সমৃদ্ধ মন নব্য শিক্ষিত সমাজের জলবায়ু এবং আলো-বাতাসে এমন ভাবে লালিত হয়েছে যে সঙ্কীর্ণতা ও একদেশদর্শিতা কোনো সুড়ঙ্গ পথেই প্রবেশ লাভ করে তাঁর রচনার ভারসাম্য বিনষ্ট করতে পারেনি। দুঃখের বিষয়, সুধীন্দ্রনাথ ইদানীং আর তেমন লিখছেন না, তাঁর সমালোচনার বিশিষ্ট রীতি সম্পর্কে এখনকার দিনে অনেক পাঠকই আর সজাগ নন।

'স্বগত' বইটির অনেক প্রবন্ধ পাঠান্তে একথা স্বাভাবিক ভাবেই মনে হবে যে, সমসাময়িক পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাধারা বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের নিবিড় ভাবে প্রভাবিত করেছে তো বটেই, আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকেও নানা দিক থেকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের দীর্ঘকালের আচারলুপ্ত সংস্কার, অনভ্যাস ও জড়তাকে দীর্ণ ক'রে দৃষ্টিভঙ্গীকে উদার ও মনকে বিস্তৃত করার জন্তে এই ধরণের সমালোচনা সাহিত্যের যে বিশেষ প্রয়োজন ছিল, এ সত্য স্বীকার ক'রে নিতে বাধা নেই। দৃঢ়, সুসংবদ্ধ ও প্রাণবান কথ্যভাষায় যে উৎকৃষ্ট সমালোচনা সম্ভব 'স্বগত' গ্রন্থপাঠে আশা করি আমার মতো আরো কেউ-কেউ তা' উপলব্ধি করতে পারবেন। আরো একজন গদ্যলেখক কথ্যভাষায় সমালোচনা শক্তির উল্লেখযোগ্য পরিচয় দিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর রায়ের সমালোচনা-পদ্ধতির মূলে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব রয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর রচনার নিজস্ব দীপ্তির দিকটাই সর্ব্বাগ্রে নজরে পড়বে। অন্নদাশঙ্করের সমালোচনার বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা' আশ্চর্য্য রকম সংক্ষিপ্ত অথচ বুদ্ধি ও সুবিবেচনার সমন্বয়ে চাপা আলোর মতো বিচ্ছুরিত।

সাম্প্রতিক সমালোচনার ক্ষেত্রে আরো কয়েক জন শক্তিমান লেখকের নাম প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে। বাঙলা সাহিত্যের যে আধুনিক যুগ সম্পর্কে এতো কাল পাঠক-সমাজের অতি অস্পষ্ট ধারণা ছিল, সে-যুগের কয়েক জন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু ('কালের পুতুল') বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার প্রধান সহায় তাঁর ভাবপ্রবণ ভাষা, তাছাড়া, নিজের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাকেই তিনি সবার উপরে স্থান দিয়ে থাকেন। তাঁর গদ্য রচনা প্রাণবান ও বেগমুখর, তাই সমালোচনায়ও তিনি কবিত্বের আমেজ আনতে পেরেছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে সমালোচক বুদ্ধদেব তাঁর সমসাময়িক আরো অনেকের মতোই রসবাদী,—কিন্তু সমালোচনায় তিনি পরমতসহিষ্ণুতার পক্ষপাতী।

বুদ্ধদেব বাবুর সমালোচনার দুর্ব্বলতা এইখানটায় যে, একবার তিনি যে-কথা যে-লেখকের সম্পর্কে বলবেন, তথ্যনির্ভর বলে প্রমাণিত না হ'লেও সে-মন্তব্য তিনি প্রত্যাহার করতে প্রস্তুত থাকেন না। ফলে, মাইকেল মধুসূদনের মতো দিকপাল সম্পর্কে তিনি প্রমাদক মন্তব্য করেন, আবার আধুনিক কবি সমর সেন সম্পর্কে অত্যন্ত অতিশয়োক্তি করতেও কুণ্ঠিত হন না। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই যে সমালোচনা সার্থক মূল্য-বিচারের সমার্থক তার প্রমাণ জীবনানন্দ দাশ, নিশিকান্ত ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কিত আলোচনা থেকেই নির্ণয় করা সম্ভব। এদিকে বিষ্ণু দে কাব্য রচনায় বুদ্ধদেব বাবুর সমকালীন হ'লেও নিছক রসবাদীর দৃষ্টি নিয়ে শিল্পকর্মকে বিচার করতে নারাজ। তাঁর সমালোচনা গ্রন্থ 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' তাই সমসাময়িক সমাজ-জীবনের পটভূমিকায় সাহিত্য-বিচারের উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টাকে পাঠক সমাজের সামনে উপস্থিত করেছে।

করিবে বলিয়া প্রস্তুত হইতেছে, এখনো দিনস্থির করা সম্ভবপর নহে। - ছুটির কিছু পূর্ব্বে অভিনয় হইতে পারিবে এইরূপ অনুমান করি। বোধ হয় আশ্বিন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অভিনয় হইবে।

এবার কলিকাতায় গিয়া তোমাকে সঙ্গে লইয়া তোমার শ্বশুর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাতের চেষ্টা করিব, তাঁহাকে আমার ভক্তিপূর্ণ অভিবাদন জানাইবে। ইতি—

১৮ই ভাদ্র ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৫)

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু—

তোমার পত্র অনেক ঘোরাফেরার পর আজ এখানে আসিয়া পাইলাম। আমি কিছুকাল রাজসাহী ও পাবনা ঘুরিয়া অবশেষে এখানে আসিয়াছি। সেইজন্য তোমার পত্র যথাসময়ে আমার নাগাল পায় নাই। তোমার শ্বশুর মহাশয়ের স্মরণ-সভার কাজও অনেক দিন হইল বাড়ীতে হইয়াছে, তাহার নিমন্ত্রণ পত্রও আমার হস্তগত হয় নাই। তোমার শ্যালক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যখন আসিয়াছিলেন তখন নিশ্চয়ই আমি কলিকাতায় ছিলাম না।

আমি যখন কলিকাতায় যাইব তোমার অবসর মত আমার সহিত দেখা করিতে আসিলে আনন্দিত হইব।

ইতি—

২৯শে ভাদ্র ১৩২২

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৬)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

জ্বরে পড়িয়াছিলাম বলিয়া তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হইল। এখানকার অভিনয় ১৪।১৫ আশ্বিনে হইবার সম্ভাবনা আছে, এখনো নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিতেছি না, তুমি সেই সময়ে আসিতে পারিলে আনন্দিত হইব। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি—

২রা আশ্বিন ১৩২৭

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কুষ্টিয়া

কল্যাণীয়েষু—

৬ই মাঘে পিতৃদেবের স্মরণার্থ সভা—সেদিন আমি উপস্থিত থাকিব, অতএব সেদিন নিঃসন্দেহই তোমার সঙ্গে দেখা হইতে পারিবে। ইতি—

২৯শে পৌষ

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৮)

ওঁ

কল্যাণীয়েষু—

তোমার শ্বশুর মহাশয়কে আমার সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইবে। ঈশ্বর তাঁহাকে নিরাময় করুন। আমি সম্ভবত ৪।৫ মাঘের পূর্ব্বে কলিকাতায় যাইতে পারিব না। মাঘোৎসবের সময় যখন যাইব তখন তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া কেদার দাদার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবে।

৭ই পৌষ উৎসব উপলক্ষে যদি আসিতে পারিতে আনন্দিত হইতাম। তোমার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি।

ইতি—

৫ই পৌষ ১৩১৭

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু— বোলপুর

তোমার শ্বশুরের মৃত্যু সংবাদে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হইলাম। আমি অনেক দিন হিমালয় পর্ব্বতে রামগড় নামক স্থানে ছিলাম, সেই কারণে তোমাদের সংবাদ পাই নাই।

[illegible] এই শোকে তোমার চিত্তে যে অবসাদ উপস্থিত হইয়াছে তাহা হইতে তুমি মুক্তিলাভ কর এই আমি কামনা করি। ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর রাখিয়া নিজের পূর্ণ শক্তিতে সংসারের সমস্ত বিঘ্নবাধার সহিত সংগ্রাম করিবার উৎসাহ তোমার মনের মধ্যে সঞ্চারিত হউক। শোকের মধ্য দিয়া শান্তি এবং আঘাতের মধ্য দিয়া শক্তিলাভ কর—বেদনার মধ্য দিয়া তোমার অন্তর্যামীর কল্যাণহস্তের স্পর্শ অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি কর, এই আমার আশীর্ব্বাদ। ইতি

১৩ই আষাঢ় ১৩২১

শুভাকাঙ্ক্ষী

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যুগপুরুষ

বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

তেরো

কর্মজীবনের সূচনা—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ

লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্র, ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর, বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদারের (প্রধান পণ্ডিতের) পদে নিযুক্ত হলেন। গোলদীঘির বিত্তালয়ে অধ্যয়নের পর্ব শেষ হবার কয়েক দিনের মধ্যেই লালদীঘির কলেজে তিনি চাকরি পেলেন। গোলদীঘির দ্বাদশ বছর ছাত্রজীবনের পর, কর্মজীবনের শুরু হল লালদীঘিতে।

লালদীঘির পরিপার্শ্ব তখন কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শী লিখেছেন: 'ট্যাঙ্ক স্কয়ারের উত্তর দিকে হ'ল রাইটার্স বিল্ডিং নামে 'সুন্দর সারবন্দী গৃহশ্রেণী। দক্ষিণদিকে হ'ল পাবলিক এক্সচেঞ্জ এবং কয়েকটি সদাগরী আফিস, পশ্চিমদিকে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কাষ্টম হাউস এবং পূব দিকে বেঙ্গল ক্লাব হাউস ও ম্যুর হিকি অ্যাণ্ড কোম্পানীর নিলামঘর। এদেশী লোকেরা ট্যাঙ্ক স্কয়ার অঞ্চলকে লালদীঘি বলে। লালদীঘির দক্ষিণে হেষ্টিংসের একটি মর্মর মূর্তি আছে। স্কয়ারের পূবদিকে ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট। রাইটার্স বিল্ডিং-এ আগে কোম্পানীর রাইটাররা থাকতেন। এখন তার একটি অংশে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়েছে।'(১)

১৮৪২-৪৩ সালের লালদীঘির বর্ণনা—যে সময় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র নিয়মিত ভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াত করতে আরম্ভ করেন, সেই সময়ের কথা।

•

নবযুগের বাংলার ইতিহাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ একটি আলোকস্তম্ভের মতন দাঁড়িয়েছিল একদিন। চারিদিকে তখন অন্ধকার ও বিশৃঙ্খলা। বণিকের মানদণ্ডটিকে রাতারাতি রাজদণ্ডে পরিণত করার পথে অন্তরায় অনেক। কোন দিকে, কোন পথে চলতে হবে, তা নির্ণীত হয়নি, অথচ বিদেশী হঠাৎ-শাসকরা দুর্নীতির জোয়ারে গা-ভাসিয়ে চলেছেন। এই সময় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তাঁদের দিকনির্ণয়ের জন্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, ১৮০০ সালে।

বিদ্যাসাগর যখন সেরেস্তাদারের পদে নিযুক্ত হলেন, তখন তাঁর বয়স বাইশ বছর। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বয়স তখন বিয়াল্লিশ। এতদিন ধ'রে কলেজের হলঘরে ইংরেজ সিবিলিয়ানদের সঙ্গে এদেশী পণ্ডিতদের প্রত্যক্ষ পরিচয় ঘটেছে। পণ্ডিত ও মুনসীরা যে কেবল সিবিলিয়ানদের বাংলা ফারসী হিন্দী ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন, তা নয়, নিজেরাও অনেকে ইংরেজী শিখেছেন। কেবল ভাষার বিনিময় হয়নি, ভাবেরও বিনিময় হয়েছে। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় জীবনের ভাবধারা ও সামাজিক আদর্শের আদান-প্রদান হয়েছে। কেবল গোলদীঘির হিন্দু কলেজে হয়নি, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও হয়েছে।

যে বাংলা গদ্যভাষায় আজ আমরা বিচার-বিতর্ক করি, সাহিত্য রচনা করি, তারও জন্মস্থান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার অনেক আগে থেকেই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাশ্চাত্ত্য ভাবধারার আমদানি আরম্ভ হয়েছে এবং এদেশের তরুণ ছাত্রদের আগে পণ্ডিত মশাইরা সেই ভাবধারার সংস্পর্শে এসেছেন। বাংলা দেশের এই কলকাতা শহরের লালদীঘির তীরে, সদাগরী পরিবেশের মধ্যে, পূর্ব-পশ্চিমের 'উপহার' দেওয়া-নেওয়ার পালা প্রথম শুরু হয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শেষ পর্বে, অপরাহ্ণকালে বলা চলে, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। তা পেলেও, হ্যালিডে, সিটন-কার, বিডন প্রমুখ এমন একদল আদর্শোদ্দীপ্ত সিবিলিয়ানের প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যলাভ তিনি করেছিলেন, যাঁদের বলিষ্ঠ উদারনীতি ও বিচারবুদ্ধি তাঁকে বিশেষ ভাবে কর্মজীবনে অনুপ্রাণিত করেছিল। কর্মজীবনের প্রারম্ভের এই প্রেরণা তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের দিকনির্ণয়ে যে কতকটা অন্ততঃ সাহায্য করেছিল, তা অস্বীকার করা যায় না।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। রেভারেণ্ড হাটন তাঁর ওয়েলেসলি-জীবনীর প্রথমেই

---

(১) Sketches of Calcutta, or Notes of a Late Sojourn in the City of Palaces : By A Griffin [redacted]lasgow, 1843), P. P. 36—40.

লিখেছেন :(২) On the roll of British Rulers of India there is no greater name than that of Richard Marquess Wellesley...if it was Clive who warned Hastings who preserved the English foothold in the great peninsula, it was Wellesley incontestably who founded the British Empire in the East." ভারতের বৃটিশ শাসকদের মধ্যে ওয়েলেসলির মতন কৃতী পুরুষ অল্পই ছিলেন। ক্লাইভ সাম্রাজ্য জয় করেছিলেন, হেষ্টিংস তা রক্ষা করেছিলেন, আর ওয়েলেসলি তার পাকাপোক্ত ভিৎ পত্তন করেছিলেন বলা চলে। হাটনের কথা মিথ্যা নয়। ওয়েলেসলির মতন দূরদর্শী ও দৃঢ়চিত্ত শাসক, উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে, আর কেউ এদেশে আসেন নি।

মহীশূর-বিজয়ী ওয়েলেসলির আভিজাত্যবোধ ও মেজাজ খুব সজাগ ছিল। উপেক্ষিত বণিকের স্তর থেকে তিনি ইংরেজদের প্রকৃত শাসকের স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিলেন এবং করেছিলেনও। উইলিয়ম হিকি তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন যে, ওয়েলেসলি যে রকম বিলাসিতার মধ্যে বাস করতেন, তা কল্পনাতীত। তাঁর আসবাবপত্র, উৎসব, খানাপিনা, ভোজসভা, চালচলনের জমক দেখে কলকাতার লোক স্তম্ভিত হয়ে যেত। সর্বব্যাপারে যেমন তিনি রাজকীয় চালে চলতেন, তেমনি রাজকীয় ভঙ্গিতে চিন্তাও করতেন। মধ্যযুগের নোংরা অবিন্যস্ত বন্দর-নগর থেকে, কলকাতা শহরকে আধুনিক মহানগরীতে রূপান্তরিত করার পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন। বৃটিশ শাসকদের নতুন রাজধানীর আভিজাত্য ও স্বাতন্ত্র্য কলকাতা শহরের বাইরের রূপের মধ্যে ফুটে উঠুক, এই ছিল তাঁর কাম্য। কলকাতার রাস্তাঘাট, ড্রেণ, স্কয়ার ও নতুন নতুন গৃহনির্মাণের পরিকল্পনা তিনিই করেন। অভিজাত মহানগরীর কেন্দ্রস্থলে থাকবে ভারতের বড়লাট বাহাদুরের প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা। এও ওয়েলেসলির পরিকল্পনা। তার জন্য পুরনো গবর্ণমেন্ট হাউস ভেঙে, তার সঙ্গে কাউন্সিল হাউস এবং আরও ষোলখানা প্রাইভেট ম্যানসান দখল ক'রে (সব ক'টি নতুন গৃহ, পাঁচ বছরের বেশী তৈরী হয়নি), সেগুলি সব ধূলিসাৎ ক'রে দিয়ে নতুন লাট সাহেবের অট্টালিকা নির্মাণ করার পরিকল্পনা করেন ওয়েলেসলি।(৩) পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বিশাল প্রশস্ত উদ্যান ও স্কয়ারের মধ্যে 'লাটসাহেবের বাড়ী' কলকাতা শহরের হাজার হাজার অট্টালিকার সভায় সভাপতির মতন বিরাজ করবে। তবেই তো ইংরেজ শাসকের মর্যাদা বজায় থাকবে। ওয়েলেসলির সব পরিকল্পনাই ছিল এইরকম রাজকীয় পরিকল্পনা।

রাজকীয় হলেও, অথবা মধ্যযুগের মতন জমকবহুল হলেও, ওয়েলেসলির চিন্তাধারার মধ্যে যে প্রশস্ততা ছিল, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ফলাফল একদিক থেকে ভালই হয়েছিল। হাটন তাই মন্তব্য করেছেন : "Of a piece with his magnificence in entertainment was the attitude which Wellesly assumed towards public works, the arts and learning."(৪) কেবল লাটপ্রাসাদ নয়, কলকাতা মহানগরীতে ঠিক অক্সফোর্ড কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করতে হবে, এও তাঁর পরিকল্পনা ছিল। এই বিদ্যায়তনে নতুন ইংরেজ সিবিলিয়ানরা এদেশের ভাষা, সাহিত্য, লোকাচার, সামাজিক রীতি-নীতি ইত্যাদি শিক্ষা করবেন। শিক্ষা দেবেন এদেশের পণ্ডিতরা। এই ভাবে শিক্ষা পেলে তাঁরা শাসনযোগ্যতা অর্জন করবেন। তা নাহ'লে তরুণ বয়সে স্বদেশ (ইংল্যাণ্ড) থেকে কেবল কয়েকটি বাণিজ্যের সূত্র মুখস্থ ক'রে এসে, সদাগরী সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি নিয়ে অন্য দেশের শাসক হওয়া যায় না। শিক্ষার অভাবে তাঁরা উচ্ছৃঙ্খল, স্বেচ্ছাচারী ও অনুদার হ'তে বাধ্য হন। দেশের লোক তাঁদের শ্রদ্ধা করতে পারে না। ইংরেজ শাসকরা এখন আর কোম্পানীর আমলের বণিকদের এজেন্ট নন, তাঁরা ইংরেজ জাতির প্রতিনিধি। ইংরেজদের শিক্ষাদীক্ষা, সংস্কৃতি ও জাতীয় ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক যদি তাঁরা না হতে পারেন, তা হ'লে 'সাত সমুদ্দুর তের নদী' পার হয়ে এসে, পরদেশে শাসন করার কোন অধিকার তাঁদের নেই। যে দেশ শাসন করতে হবে, সে-দেশের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ও সমাজ-জীবন সম্বন্ধেও যথেষ্ট জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তার জন্য একটি বিদ্যায়তন স্থাপন করা প্রয়োজন, যেখানে এদেশের পণ্ডিতরা ভাবী ইংরেজ শাসকদের শিক্ষা দেবেন। কোম্পানীর ডিরেক্টরদের এই সব সবিস্তারে জানিয়ে ওয়েলেসলি একটি 'নোট' পাঠান (১০ই জুলাই, ১৮০০)। (৫) কলেজের কাজ আরম্ভ হয় ১৮০০ সালের ২৪শে নবেম্বর থেকে।

ওয়েলেসলির ইচ্ছা ছিল, অক্সফোর্ড-কেম্বিজের মতন একটি আবাসিক বিদ্যায়তন স্থাপন করা। সেই উদ্দেশ্যে তিনি গার্ডেনরীচ অঞ্চলে পাঁচখানি ভাল বাগানবাড়ী কিনেছিলেন এবং নতুন ক'রে গৃহনির্মাণের পরিকল্পনাও করেছিলেন। যতদিন তা না হয়, ততদিনের জন্য মধ্য-কলকাতায় ম্যাকডোনাল্ড নামে একজন ড্যান্সিংমাষ্টারের প্রকাণ্ড অট্টালিকা (পাবলিক এক্সচেঞ্জ) তিনি লীজ নেন।(৬) পরে রাইটার্স বিল্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থানান্তরিত হয় এবং কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পোষকতার অভাবে গার্ডেনরীচের পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শে প্রেট্রন, ভিজিটার, প্রোভোষ্ট প্রভৃতি নিযুক্ত হন। আরবী ফারসী হিন্দুস্থানী ও বাংলা ভাষা-সাহিত্য শিক্ষা দেবার জন্য এদেশী অনেক পণ্ডিত ও মৌলবীও নিযুক্ত হন। বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত হন পাদ্রি উইলিয়ম কেরী। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথ বাচস্পতি, এবং

---

(২) Lord Wellesley : By Revd. W. H. Hutton (Rules of India Seins) : P. I.

(৩) Memoirs of William Hickey, Vol IV, 1790-1809 : ch. XIV.

(৪) Hutton : Lord Wellesley : P. 201.

(৫) Wellesley Despatches, Vol. 2, P. 325 Sqq.

(৬) Memoirs of W. Hickey : Vol IV, ch. XIV

সহকারী পণ্ডিত শ্রীপতি রায়, আনন্দচন্দ্র শর্মা, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, কাশীনাথ তর্কালঙ্কার, পদ্মলোচন চূড়ামণি, রামরাম বসু। পণ্ডিতদের মাসিক বেতনও তখনকার দিনের বিচারে, ভালই ছিল। প্রধান পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয়ের বেতন ছিল মাসিক ২০০৲, দ্বিতীয় পণ্ডিত রামনাথের ১০০৲। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তখন স্বর্ণযুগ।

বিদ্যাসাগরের আমলে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এ-অবস্থা ছিল না। তখন তার দীনাবস্থা। গোড়া থেকেই কোম্পানীর বণিক-বুদ্ধিসর্বস্ব ডিরেক্টররা ওয়েলেসলির এই শিক্ষাদীক্ষার সাড়ম্বর আয়োজনকে সুনজরে দেখছিলেন না। কলেজের কাজ আরম্ভ হবার অল্পদিন পরেই, ১৮০২ সালের ২৭ জানুয়ারীর একটি পত্রে তাঁরা কলেজ বন্ধ ক'রে দিতে বলেন। পত্র পেয়ে ওয়েলেসলি ক্ষুব্ধ হ'ন বটে, কিন্তু কলেজ বন্ধ না ক'রে পত্রোত্তরে আবার তার আবশ্যকতার কথা উল্লেখ করেন। বিলাতের 'ইণ্ডিয়া আফিসের' দলিলপত্রের মধ্যে একটি ঐতিহাসিক পত্র আছে এই শিরোনামে :—"Mr. Hasting's observations on Lord Wellesley's minute relative to the College at Fort William."(৭) ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন ক'রে হেষ্টিংস যা মন্তব্য করেন তার মর্ম এই :

"প্রায় বছর পঁয়ত্রিশ আগে আমি এ-বিষয়ে একটি পরিকল্পনা খসড়া করি। তাতে আমি প্রস্তাব করি যে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ফারসী অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করা হোক এবং ফারসী শিক্ষার ব্যবস্থা হোক। প্রস্তাবটি মুদ্রিত ক'রে আমি কোম্পানীর ডিরেক্টরদের পাঠাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার আমার প্রস্তাব সমর্থন করেন। স্বর্গীয় ডক্টর জনসন বলেন যে প্রস্তাব গৃহীত হ'লে তিনি অন্যান্য সব ব্যবস্থা ক'রে দেবেন। কিন্তু তা হয় না এবং প্রস্তাবটিকে চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, হঠাৎ আমি কোন সাময়িক ইচ্ছার বশে লর্ড ওয়েলেসলির প্রস্তাব সমর্থন করছি না। এ-সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধ'রে আমি নিজেও চিন্তা করেছি এবং ওয়েলেসলির প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। তাঁর প্রস্তাব আরও বিস্তৃত এবং তিনি বাংলাদেশে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করতে চান। এদিক দিয়েও তাঁর বক্তব্য আমি যুক্তিসঙ্গত ও প্রণিধেয় মনে করি।"

ওয়েলেসলির নিজের যুক্তি এবং তাঁর সমর্থকদের যুক্তির চাপে কোম্পানীর কর্তারা তাঁদের পূর্বমত সংশোধন ক'রে, ১৮০৩ সালের ২রা সেপ্টেম্বর জানান যে, কলেজ রাখা হোক, কিন্তু মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের রাইটারদের জন্য নয়, কেবল বাংলাদেশের রাইটারদের জন্য রাখা হোক। ১৮০৭ সাল থেকে তাই করা হয়, প্রোভোষ্ট, ভাইস-প্রোভোষ্টের পদ তুলে দেওয়া হয়, পণ্ডিত-মুনসীদের সংখ্যাও অনেক কমিয়ে দেওয়া হয়। কলেজের পূর্বপ্রাধান্য রীতিমত ক্ষুণ্ণ হয়। এর মধ্যে আবার ১৮০৬ সালের ২১শে মে কোম্পানীর ডিরেক্টররা জানান যে হেলিবেরিতে তাঁরা সিবিলিয়ানদের শিক্ষার জন্য একটি কলেজ স্থাপনের সঙ্কল্প করেছেন এবং সেখানে কেবল ইয়োরোপীয় বিদ্যালয়, প্রাচ্য বিদ্যা ও ভাষা তাঁরা শিক্ষা করবেন। অবশ্য হয়ত হেলিবেরি কলেজে তাঁদের প্রাচ্যবিদ্যা ও ভাষাশিক্ষা সম্পূর্ণ হবে না এবং তার জন্য তাঁদের ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে আরও কিছুদিন শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন হবে। যথাসম্ভব অল্প ব্যয়ে সেই উদ্দেশ্যে কলেজের কাজ চালাতে হবে। হেলিবেরির এই কলেজ স্থাপিত হবার পর স্বভাবতঃই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গুরুত্ব অনেক কমে যায়। উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কের আমলে কলেজের কাজকর্ম আরও সঙ্কুচিত হয়। একজন সেক্রেটারী, তিনজন পরীক্ষক ও কয়েকজন মাত্র পণ্ডিত ও মুনশী ছাড়া বাকি সব অধ্যাপক ও তাঁদের সহকারীদের কর্মচ্যুত করা হয়।

১৮৪১-৪২ সালে বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হন, তখন নতুন নিয়মকানুন প্রবর্তন ক'রে কলেজের কাজ আরও সঙ্কুচিত করা হয়। ১৮৪১ সালের ২৩ জুন এই নিয়মাবলী প্রবর্তিত হয় (Rules and Regulations of the College of Fort William, 1841)। বিদ্যাসাগর তার ছ' মাস পরে কলেজে যোগদান করেন। কলেজের সিবিলিয়ান-ছাত্রদের জীবনযাত্রার দিকে আরও সতর্ক দৃষ্টি দেবার জন্য সেক্রেটারীকে অনুরোধ করা হয়। সেক্রেটারীর সম্মতি ও অনুমোদন ভিন্ন ছাত্ররা কলেজগৃহের বাইরে কোন স্থানে বাস করতে পারবেন না। অকর্মণ্য ও অলস ছাত্রদের যত শীঘ্র সম্ভব দেশে ফিরে যেতে হবে। এক বছরের মধ্যে কোন ছাত্র যদি দু'টি ভাষা শিখতে না পারেন, তাহলে আলস্য না অক্ষমতা, কি কারণে তিনি তা পারেননি, সেক্রেটারী সে বিষয়ে তদন্ত করবেন। আলস্যের জন্য হ'লে তৎক্ষণাৎ সেই ছাত্রকে স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। আর অক্ষমতার জন্য হ'লে তাঁকে আরও তিন মাস সময় দেওয়া হবে। যদি তার মধ্যেও তিনি শিখতে না পারেন, তাহ'লে দেশে ফিরে যেতে হবে। ১৮৪২ সালের ২০ জুলাই থেকে, বাংলা ও ফারসী শিক্ষার বদলে বাংলা ও উর্দু ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের এই নতুন পরিবেশে বিদ্যাসাগরের কর্মজীবন শুরু হয়।

কলেজের পরিবেশের ও সিবিলিয়ান ছাত্রদের জীবনযাত্রায় এই পরিবর্তন সম্বন্ধে সমসাময়িক কোন সমালোচক 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকায় লেখেন (১৮৪৬ সালে) : "কলেজের কেবল নামটিই আছে এখন, আর কিছুই নেই। তার লক্ষ্য, তার শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ, ত্রিশ বছর আগে যা ছিল, এখন আর তা নেই। সিবিলিয়াম ছাত্রদের মনোবৃত্তির বা জীবনযাত্রায় একটা যে মৌলিক পরিবর্তন কিছু হয়েছে, তা নয়। খেলোয়াড়, পড়ুয়া ও সেরা জেণ্টলম্যান হবার বাসনা এখনও তাঁদের উগ্র। ভল্লুক-শীকার ও বাঘ শীকারে কৃতিত্ব দেখানো এখনও তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। মাথায় গবর্ণমেণ্টের সরকারী নিয়ম-কানুন ছাড়া আর কোন বস্তুর স্থান নেই। লেখাপড়াটা গৌণ ব্যাপার। এখনও চৌরঙ্গীর সালোঁতে তাঁদের দৈনন্দিন জীবনের বেশীর ভাগ সময় কেটে যায়। তবে আগেকার সিবিলিয়ান ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের তফাৎ এই যে, বিলাসিতার বহর তাঁদের অনেক কম, এবং তার কারণ আর্থিক। এখনও যে তাঁরা ঋণগ্রস্ত হন না, তা নয়। তবে আগে ঋণের বহর লাখ টাকা পর্যন্ত ছাড়িয়ে যেত, এখন সেটা পাঁচ হাজারে এসে দাঁড়িয়েছে।"(৮)

(৭) Fisher Papers, 170 (1014)

(৮) Calcutta Review, Vol V, no IX, 1846 : P. P. 86-123

শাসকসুলভ উদ্ধত বেপরওয়া মনোভাব নবীন সিবিলিয়ানরাও ছাড়তে পারেননি। হেলিবেরি কলেজের ছাপ নিয়ে যখন তাঁরা এদেশে আসতেন, তখন তাঁরা তাঁদের ভাবী পদমর্যাদা ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই আসতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁদের গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক কোন কালেই স্থাপিত হ'ত না। শ্বেতাঙ্গ শাসকের সজাগ কৌলীন্যবোধ তাঁরা কৃষ্ণাঙ্গ এদেশী পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে এসে ত্যাগ করতেও পারতেন না। শিক্ষার্থী থাকা কালেও তাঁরা সিবিলিয়ানী জীবনের রিহার্সাল দিতেন কলকাতা শহরে। কিন্তু তা সত্ত্বেও, উনিশ শতকের গোড়ার দিকের রাইটারদের সঙ্গে চতুর্থ দশকের নবীন সিবিলিয়ানদের শিক্ষা-দীক্ষার ও মনোবৃত্তির যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। শিল্পবিপ্লবোত্তর ও সংস্কার-পরবর্তী যুগের এই নবীন ইংরেজ সিবিলিয়ানদের এমন কতকগুলি চারিত্রিক গুণ ছিল যা প্রশংসনীয়। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে তাঁরা অগ্রণী ছিলেন। উইলিয়ম গ্রে, জর্জ ক্যাম্পবেল, রিচার্ড টেম্পল প্রভৃতি ছিলেন বিদ্যাসাগরের আমলের নবীন সিবিলিয়ান। হ্যালিডে, জন পিটার গ্র্যাণ্ট, ও সিসিল বীডনের সঙ্গেও কর্মজীবনে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত ছিলেন তখন হ্যালিডের ও পিটার গ্র্যাণ্টের বয়স পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ, বীডনের বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশ, উইলিয়ম গ্রে'র বয়স তেইশ-চব্বিশ, ক্যাম্পবেলের বয়স সতের-আঠার এবং রিচার্ড টেম্পলের বয়স ষোল-সতের। বিদ্যাসাগরের নিজের বয়স একুশ-বাইশ।

ইতিহাসের এক শুভক্ষণে, এক দল তরুণ ইংরেজ সিবিলিয়ানের সঙ্গে বাংলাদেশের এক তরুণ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যোগাযোগ হয়েছিল। কর্মই ছিল সেই যোগাযোগের একমাত্র ভিত্তি। লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নকালে আবার গোলদীঘির সংস্কৃত কলেজে ফিরে গিয়েছিলেন। কোন সময়ই তাঁর কর্মজীবনে 'পূর্ব-পশ্চিমের' এই মিলনের যোগসূত্র ছিন্ন হয়নি। নবীন আদর্শোদ্দীপ্ত সিবিলিয়ানরা তরুণ বাঙালী পণ্ডিতের শীর্ণ পাঁজরে যে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের আভাস পান, পরে তার বিচিত্র বহ্নিলীলায় তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান। কেবল জীর্ণ পরিত্যাজ্যকে ভস্ম করেই তা ক্ষান্ত হয়নি, বিশ্বকর্মার মতন বিচিত্র নির্মাণ-সাধনায় তা নির্বাণলাভ করেছে।

তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী ছিলেন ক্যাপটেন জি, টি, মার্শাল। ১৮৩৮ সালের জুন মাস থেকে মার্শাল, মাসিক এক হাজার টাকা বেতনে, কলেজের সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। সংস্কৃত কলেজের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বৃত্তিপরীক্ষার পরীক্ষক ছিলেন এবং কিছু দিন কলেজের সেক্রেটারীও ছিলেন। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের কথা তিনি আগে থেকেই জানতেন। তাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার মধুসূদন তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্র যখন উক্ত পদের প্রার্থী হন, তখন মার্শাল সাহেব তাঁকে নিয়োগ করার জন্ত সরকারের কাছে বিশেষ সুপারিশ করেন। তারই জোরে ঈশ্বরচন্দ্র সহজেই চাকরিটি পান।

ঈশ্বরচন্দ্র 'বিদ্যাসাগর' উপাধি পেয়ে সংস্কৃত কলেজের পাঠ শেষ করেছেন। তার অল্প কদিনের মধ্যেই সরকারী চাকরীও পেলেন। পিতা ঠাকুরদাসের মনে সেদিন যে কি ভাবের উদয় হয়েছিল, তা কেউ জানে না। না জানলেও বোঝা যায়। বাগবাজারে সিংহ মহাশয়ের বাড়ী ব'সে এক দিন আট বছরের বালক ঈশ্বরচন্দ্রের শিক্ষা নিয়ে তর্কবিতর্ক হয়েছিল। দরিদ্র অসহায় পিতার পুত্রটিকে তাঁর আত্মীয়-স্বজন এমন কোন শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, বাইরের নির্মম জগতে যার বিনিময়-মূল্য আছে, যার দৌলতে সহজে কোন সাহেবের হৌসে চাকরি পাওয়া যায়। সে বিদ্যা সে দিন ইংরেজী-বিদ্যা হলেই চলত। ঠাকুরদাসের ইচ্ছা ছিল ঈশ্বরচন্দ্র গ্রামে গিয়ে চতুষ্পাঠী খোলেন এবং অধ্যাপনা করে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতবংশের সন্তানের কর্তব্য পালন করেন। স্বপ্নবিলাসী তিনি ছিলেন না, তাঁর পুত্রও ছিলেন না। ভাল চাকরি ক'রে ঈশ্বর তাঁর সংসার স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করবে, এ রকম কোন বাসনা কোন দিন তাঁর মনে বাসা বাঁধেনি। তবু যেদিন ঈশ্বরচন্দ্র সসম্মানে সরকারী চাকরিতে নিযুক্ত হলেন, সেদিন নিশ্চয় ঠাকুরদাসের মন খুশীতে ভ'রে উঠেছিল। শহর থেকে দূরে বীরসিংহ গ্রামেও এই আনন্দের বার্তা রটে গিয়েছিল।

পিতা ছিলেন মাসিক দশ টাকা বেতনের চাকরিজীবী। সারা দিন টাকা আদায় ক'রে ঘুরে ঘুরে, ত্রিশ দিন পরে তিনি নিজে দশটি টাকা মজুরি পেতেন। এখন ঈশ্বরচন্দ্রের মাসিক বেতন হ'ল পঞ্চাশ টাকা, পিতার বেতনের পাঁচ গুণ। বয়সও ঠাকুরদাসের পঞ্চাশ হয়েছে, প্রৌঢ় হয়েছেন তিনি। দেহ-মনে ক্লান্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছে। দশ টাকা বেতনের চাকরি করার এখন আর তাঁর প্রয়োজন কি? একদিন ঠাকুরদাসকে ঈশ্বরচন্দ্র বললেন: "বাবা, এখন আর আপনার এরকম হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে দশ টাকা রোজগার করার দরকার নেই। আমি তো পঞ্চাশ টাকা বেতন পাব, তাতেই কোন-রকমে কুলিয়ে যাবে। আপনি এখন দেশে ফিরে গিয়ে বিশ্রাম নিন।, পঞ্চাশ টাকা থেকে কুড়ি টাকা ক'রে প্রতি মাসে আপনাকে পাঠাব, বাকি ত্রিশ টাকায় কলকাতার বাসা খরচ চালিয়ে নেব।"

পুত্র আর সেই দশ-বারো বছর আগেকার একগুঁয়ে একরোখা 'ঈশ্বর' নন শুধু, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাইশ বছর তাঁর বয়স হয়েছে, বিবাহিত তিনি, নাবালক বালক নন। তাঁর কথা সহজে ফেলা যায় না। ঠাকুরদাস প্রথমে আপত্তি করেন। সেকালের পিতাদের আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ এত প্রবল ছিল যে সহজে তাঁরা পুত্রনির্ভর হতে চাইতেন না। দশ টাকা বেতনের সামান্য চাকরি হলেও, ঠাকুরদাস তাই দিয়ে অসামান্য কাজ করেছেন। কেবল সংসার প্রতিপালন করেননি, ঐ দশ টাকা দিয়ে তিনি বাংলাদেশের একজন 'বিদ্যাসাগরকে' গ'ড়ে তুলেছেন, মানুষ করেছেন। সরকারী পঞ্চাশ টাকার চাইতে এই বেসরকারী দশ-টাকার দাম অনেক বেশী।

শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদাসের আপত্তি টিকল না। কেউ কেউ বলেন, এই সময় তিনি একদিন কলকাতার পথে অশ্বের পদাঘাতে আহত হন। তার জন্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে দেশে পাঠাবার জন্ত আরও ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কথাটা মিথ্যা না-ও হতে পারে। কলকাতা শহরে তখন আধুনিক 'মোটর-ট্র্যাফিক' না থাকলেও, ঘোড়ার গাড়ী

ও ঘোড়ার উৎপাত ছিল যথেষ্ট। পথে দুর্ঘটনাও কম ঘটত না। সেকালের সংবাদপত্রে এরকম দুর্ঘটনার অনেক কৌতুককর বিবরণ পাওয়া যায়। ঘোড়ার-গাড়ীর চাকার তলায় পড়ে, অথবা ক্ষিপ্ত ঘোড়ার পদাঘাতে কলকাতার পথচারীরা তখন আজকের মতনই আহত ও নিহত হতেন। ঠাকুরদাসকে পথে পথে চাকরির কাজে ঘুরে বেড়াতে হ'ত। একদিন দুর্ঘটনা ঘটা আশ্চর্য নয়। যাই হোক, চাকরি ছেড়ে শেষ পর্যন্ত তিনি দেশে ফিরে যেতে রাজী হন। পনের বছর বয়সে তিনি কলকাতা শহরে চাকরি করতে এসেছিলেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র জন্মাননি। প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধ'রে তিনি একটানা একঘেয়ে চাকরি করছেন। কৈশোর থেকে প্রৌঢ়ত্বে পা দিয়েছেন। এখন তাঁর বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

চাকরি ছাড়ার সময় ঠাকুরদাসের মনিব তাঁকে সদুপদেশ দেন: "বৃদ্ধ বয়সে চাকরি ছেড়ে পুত্রের মুখাপেক্ষী হবেন না। শহরের চাকরি, ছেলে বয়সে তরুণ, কখন কি মতিগতি হয় ঠিক নেই, শেষজীবনে বিপদে পড়বেন।" ঠাকুরদাস বলেন: "আমার ছেলেকে আমি চিনি। আপনার উপদেশ শিরোধার্য করতে পারলাম না।" অবশেষে তিনি চাকরি ছাড়লেন।

ঠাকুরদাস শহর ছেড়ে গ্রামে ফিরে গেলেন। ঈশ্বরচন্দ্র প্রতি মাসে তাঁকে কুড়ি টাকা ক'রে পাঠাতেন, বাকি ত্রিশ টাকায় অতি-কষ্টে কলকাতার বাসা-খরচ চালাতেন। বাগবাজার ছেড়ে তখন তিনি বহুবাজার অঞ্চলে বাসা করলেন। বাগবাজারে সিংহ-পরিবারে তার আগে থেকেই তাঁদের স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। দুই ভাই দীনবন্ধু ও শম্ভুচন্দ্র বাসায় থাকতেন। চারজনের পক্ষে দয়েহাটার বাড়ীতে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো ছিলই, বাসেরও কষ্ট হচ্ছিল। শেষদিকে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে রান্না ক'রে, সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে, কলেজে পড়তে যেতেন। এই সময় ঠাকুরদাস ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। সিংহ-পরিবারের অবস্থাও খুব খারাপ হয়। তাঁরা বাড়ীর খানিকটা অংশ ভাড়া দিতে বাধ্য হন। তখন ঠাকুরদাস তাঁর পুত্রদের নিয়ে দয়েহাটায় সিংহদের এক প্রতিবেশীর গৃহে একটি পরিত্যক্ত কক্ষে কোনরকমে রাত্রিযাপন করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের শেষকালটা এই দুরবস্থার মধ্যে কেটেছিল। সুতরাং চাকরি পাবার পর প্রথমেই বাসা বদল করার প্রয়োজন হ'ল। বাগবাজার ছেড়ে তাঁরা বহুবাজারে গেলেন।

বহুবাজারে পঞ্চাননতলায় নিতাই সেনের বাড়ীতে প্রথমে ঈশ্বরচন্দ্রের বাসা ছিল। বাড়ীর বাইরের দু'টি ঘর ভাড়া নিয়ে তিনি থাকতেন। একটি ঘরে তিনি ও তাঁর ভাইরা থাকতেন, আর একটি ঘরে অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনরা থাকত। কলকাতা শহরের বাসা তখন গ্রাম্য আত্মীয়কুটুম্বের কাছে তীর্থস্থানের মতন ছিল। পরিবারের মধ্যে একজন কারও বাসা হ'লে, অন্যান্য সকলে যে যখন সুযোগ পেতেন সেখানে এসে কিছুদিন বাস ক'রে যেতেন। কেউ লেখাপড়া শিখতে আসতেন, কেউ আসতেন চাকরির ধান্দায়, কেউ কালীঘাট তীর্থদর্শনে, কেউ বা গঙ্গাস্নানের পুণ্যার্জনের আশায়। রুগ্ন আত্মীয়রা আসতেন রোগমুক্ত হ'তে, কন্যাদায়গ্রস্তরা আসতেন শহরে পাত্রের সন্ধানে। যৌথপরিবারের ডালপালাগুলি তখনও অবিচ্ছিন্ন ছিল। পরিবারের কর্তাপুরুষরা স্নেহকরুণা, দয়াদাক্ষিণ্য থেকে সহজে কাউকে বঞ্চিত করতেন না। এই অবস্থায় ঈশ্বরচন্দ্রের মতন দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান সরকারী চাকরী পেয়ে বাসা করলে, সেই বাসাটি যে আত্মীয়জনের অবশ্যগম্য তীর্থস্থান হয়ে উঠবে, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই।

নিতাই সেনের বাড়ী ছেড়ে কিছুদিন পরে হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানা বাড়ীতে তিনি নতুন বাসা ক'রে উঠে যান। বাসায় তখন ঈশ্বরচন্দ্র ও তাঁর দুই সহোদর ভাই ছাড়াও, দু'জন খুড়তুতো ভাই, দু'জন পিসতুতো ভাই, একজন মাসতুতো ভাই ও শ্রীরাম নামে ভৃত্য বাস করত। মোট ন'জন। বাসা ভাড়া দিয়ে, এই ন'জনের আহারাদির খরচ ত্রিশ টাকায় চালাতে হ'ত। রান্নাবান্না পালাক্রমে নিজেদেরই করতে হ'ত, ঈশ্বরচন্দ্রও করতেন। রান্নাবান্না ক'রে খেয়েদেয়ে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতে যেতেন। বহুবাজার থেকে কলেজে যাতায়াতের সুবিধা হ'ত। বহুবাজারে বাসা করার অন্যতম কারণও বোধ হয় তাই ছিল। তা ছাড়া আরও একটি কারণ ছিল যা অনেকেরই অজ্ঞাত। বহুবাজারে 'জেলিয়াপাড়া' ও অন্যান্য পাড়ায় চন্দ্রকোণা ক্ষীরপাই ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের লোকের বাস তখন বেশী ছিল। বীরসিংহের আশপাশের গ্রামের অনেক লোকজন এই অঞ্চলে বসবাস করতেন। এ অঞ্চলের প্রাচীন পরিবারের মধ্যে এখনও অধিকাংশই ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের লোক। তাঁরা নানাজাতির লোক হলেও এবং ভিন্ন বৃত্তিজীবী হলেও, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের অনেকের পরিচয় ও বন্ধুত্ব ছিল। বহুবাজার অঞ্চলের স্থায়ী বাসিন্দাদের মধ্যে অনেকে এই কারণে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রায় স্বগ্রামবাসী ব'লে মনে করতেন। তখনও যদিও তিনি স্বনামধন্য 'বিদ্যাসাগর' হননি, তাহলেও দরিদ্র ব্রাহ্মণের ছেলে লেখাপড়া শিখে পণ্ডিত হয়েছেন, সরকারী কলেজে পণ্ডিতের চাকরি পেয়েছেন, এখবর অনেকেই রাখতেন এবং সেজন্য তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। বহুবাজার অঞ্চলে বাসা করার এও একটি কারণ হ'তে পারে।*

বহুবাজারের বাসা থেকে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাতায়াতের সুবিধা ছিল সবচেয়ে বেশী। সোজা পথ ধরে মাইল খানেক হাঁটলেই রাইটার্স বিল্ডিং। অধিকাংশ সময় ঈশ্বরচন্দ্র হেঁটেই কলেজে যেতেন মনে হয়। কারণ ত্রিশ টাকায় কলকাতার বাসা খরচ কুলিয়ে, পালকি বা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া ক'রে কলেজে যাতায়াত করার মতন উদ্বৃত্ত অর্থ থাকত না। অতএব হেঁটেই চাকরি করতে যেতে হ'ত। তা ছাড়া, বহুবাজার থেকে রাইটার্স বিল্ডিং পর্যন্ত তাঁর পক্ষে হেঁটে যাওয়া আদৌ কষ্টকর বোধ হত না। স্বচ্ছন্দে তিনি হেঁটে যেতেন। বহুবাজার ছাড়িয়ে টিরেটা বাজার, কসাইখানার পাশ দিয়ে লালবাজার পার হয়ে তিনি লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিংএ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পৌঁছতেন এবং ছুটির পর আবার হেঁটেই ফিরে আসতেন বাসায়।

---

* বীরসিংহের পার্শ্ববর্তী গ্রামে, চন্দ্রকোণা, ক্ষীরপাই, ঘাটাল ও আরামবাগ অঞ্চলের একাধিক প্রবীণ ব্যক্তির মুখে একথা আমি শুনেছি। বহুবাজারের জেলিয়াপাড়া অঞ্চলের প্রাচীন বাসিন্দারাও একথা সত্য ব'লে স্বীকার করেন।—লেখক

কোর্ট উইলিয়ম কলেজে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অনেক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ইংরেজ কর্মচারীর পরিচয় হবার সুযোগ হ'ল। ক্যাপটেন মার্শাল ক্রমেই এই বাঙালী পণ্ডিতের কাজকর্মে, ব্যবহারে ও চরিত্রগুণে মুগ্ধ হলেন। শিক্ষা-পরিষদের (Council of Education) সেক্রেটারী ডক্টর ময়েটের সঙ্গে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মার্শাল সাহেবের পরামর্শেই তিনি ইংরেজী ও হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেন। সিবিলিয়ান ছাত্রদের পরীক্ষার কাগজপত্র তাঁকে দেখতে হ'ত। ছাত্রদের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শেও আসতে হ'ত। তার জন্য ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষার প্রয়োজন হ'ল।

একজন হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের কাছে তিনি নিয়মিত হিন্দী শিখতে আরম্ভ করেন। তাঁকে তিনি মাসিক দশ টাকা বেতন দিতেন। সকালে যতক্ষণ সময় পেতেন, তিনি এই পণ্ডিতের কাছে হিন্দী শিখতেন। ইংরেজীর শিক্ষক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের পিতা, তালতলানিবাসী ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন অবশ্য তিনি ডাক্তারী পাশ করেননি। হেয়ার সাহেবের স্কুলে দুর্গাচরণ শিক্ষকতা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর গভীর সৌহার্দ্য ছিল। প্রায় প্রত্যেক দিন বিকেলবেলায় দুর্গাচরণ বেড়াতে আসতেন ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায়। তালতলা থেকে বহুবাজার খুব দূর নয়। বিকেলে এসে দুই বন্ধুতে ব'সে নানাবিষয়ে তর্কবিতর্ক ও গল্প করতেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষার কথা উঠলে, দুর্গাচরণ বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে ইংরেজী শেখাতে রাজী হন। কিছুদিন পরে দুর্গাচরণের এক ছাত্র নীলমাধব মুখোপাধ্যায়ের উপর তাঁর ইংরেজী শিক্ষার ভার পড়ে। তার পর হিন্দু কলেজের ছাত্র রাজনারায়ণ গুপ্তের কাছে তিনি ইংরেজী শেখেন। রাজনারায়ণ প্রতিদিন ঈশ্বরচন্দ্রের বাসায় আহার ক'রে হিন্দু কলেজে পড়তে যেতেন এবং যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকও পেতেন। এই ভাবে ঈশ্বরচন্দ্রের ইংরেজী শিক্ষা চলতে থাকল। আশৈশব তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ ছিল একগুঁয়েমি। যখন যা করব ব'লে তিনি মনে করতেন, তা সমস্ত বাধাবিপত্তি ঠেলে শেষ পর্যন্ত করতেন। তা না করতে পারলে, কিছুতেই তিনি স্বস্তি পেতেন না। ইংরেজী ও হিন্দী শিক্ষাও তাই আরম্ভ ক'রে, শেষ না করা পর্যন্ত তিনি ক্ষান্ত হননি।

এদিকে সংস্কৃত চর্চারও তাঁর বিরাম ছিল না। কোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করার সময় তিনি আবার ভাল ক'রে সাংখ্য ও পুরাণ অধ্যয়ন করেন। বাড়ীতেও তখন সংস্কৃত চর্চার ধুম পড়ে যায়। অনেকে তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখতে আসতেন। তাঁদের মধ্যে শ্যামাচরণ সরকার, রামরতন মুখোপাধ্যায়, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। সহজ প্রণালীতে সংস্কৃত শিক্ষা দেবার কৌশল তিনি জানতেন। অনেক চিন্তা ক'রে এই নতুন প্রণালী তিনি উদ্ভাবন করেছিলেন। শিক্ষার্থীরা বিস্মিত হয়ে যেতেন। এত সহজে যে দুরূহ দেবভাষা মর্ত্যের মানুষের পক্ষে শেখা সম্ভব, তা এর আগে কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারতেন না। সকলেই তাঁর কাছে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। গণ্যমান্য পরিচিত ব্যক্তিরা তাঁর কাছে পাঠ নেবার জন্য বাসায় আসতে আরম্ভ করলেন। একদিকে তিনি নিজে ইংরেজী শিখছেন, আর একদিকে অন্যদের সংস্কৃত শিক্ষা দিচ্ছেন সহজ প্রণালীতে। এই ভাবে কোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকুরি জীবনের অবসর সময়টুকু কাটতে লাগল।

রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বহুবাজার-নিবাসী বিখ্যাত বেনিয়ান হৃদয়রাম ব্যানার্জির পৌত্র। বিদ্যাসাগরের বাসার সামনেই তাঁর বাড়ী ছিল এবং তখন হৃদয়রামের বাড়ীর বৈঠকখানা ভাড়া নিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় থাকতেন। রাজকৃষ্ণ বাবুর বয়স তখন পনের-ষোল বছর। তিনি দুবেলা ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে আসতেন এবং আলাপ-পরিচয় করতেন। ক্রমে উভয়ের পরিচয় অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। রাজকৃষ্ণ বাবু তাঁর সংস্কৃত পড়ানো দেখতেন ও শুনতেন। সংস্কৃত কাব্যপাঠও তিনি অনেকদিন শুনে মুগ্ধ হয়েছেন। ক্রমে তাঁর সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা প্রবল হয়েছে। হিন্দু কলেজে তিনি কিছুদিন প'ড়ে, অল্প বয়সেই পড়াশুনা ছেড়ে দেন। সংস্কৃত শিক্ষার ইচ্ছা হলেও তাই তিনি প্রকাশ করতে সঙ্কোচবোধ করেন। একদিন হঠাৎ তাঁর মনোবাসনা তিনি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে প্রকাশ ক'রে ফেলেন। কিন্তু সংস্কৃত মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ আয়ত্ত করা কঠিন ভেবে তিনি মুষড়ে পড়েন। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলেন: "মুগ্ধবোধের দুর্লঙ্ঘ্য গিরিশৃঙ্গ তোমাকে সহজেই পার করিয়ে দেব, চিন্তা ক'রো না। একদিন সমস্ত বোধশক্তি বিসর্জন দিয়ে এই মুগ্ধবোধের দুর্বোধ্য সূত্র মুখস্থ করেছি। পরে যখন সাহিত্যের রসসমুদ্রে অবগাহন ক'রে ভাষা সম্বন্ধে বোধোদয় হয়েছে, তখন বুঝেছি ব্যাকরণের মহিমা কি এবং তা হৃদয়ঙ্গম করার কৌশল কি। তোমার কোন ভয় নেই, ব্যাকরণ-আতঙ্ক থেকে তোমাকে নিষ্কৃতি দেব। সংস্কৃত শিখতে তোমার কষ্ট হবে না।"

রাজকৃষ্ণ আশান্বিত হয়েও, ঠিক ভরসা পাচ্ছিলেন না। পরে একদিন এসে তিনি দেখেন যে, কয়েক দিস্তা কাগজে বাংলা অক্ষরে নতুন এক ব্যাকরণ লেখার কাজ ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় শেষ ক'রে ফেলেছেন। উদ্দেশ্য, রাজকৃষ্ণ ও তাঁর বাসার অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া। এই প্রণালী থেকেই পরে বিদ্যাসাগর মহাশয় 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণকৌমুদী' রচনায় প্রেরণা পান। মুগ্ধবোধের আতঙ্ক থেকে তিনি দেবভাষাশিক্ষার্থী সাধারণ মানুষকে মুক্ত করেন।

এই সময় সংস্কৃত কলেজে জুনিয়র ও সিনিয়র পরীক্ষার প্রচলন ছিল। ঈশ্বরচন্দ্র রাজকৃষ্ণকে সিনিয়র পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হ'তে বলেন। "আমি কি পরীক্ষায় পাশ করতে পারব?" বলে রাজকৃষ্ণ বাবু প্রায় হাল ছেড়ে দেন। ঈশ্বরচন্দ্র বলেন: "ঠিক পারবে। রোজ খাওয়া-দাওয়া ক'রে আমার সঙ্গে কোর্ট উইলিয়ম কলেজে যাবে। কলেজের কাজের ফাঁকে আমি তোমায় পড়াব। তারপর আবার বাড়ীতে এসে পড়বে। একটু পরিশ্রম করতে হবে। পারবে না করতে?"

এর পর না পারার কথা ওঠে না। না পারলেও পারতে হয়। তাই তাঁকে করতে হ'ত। রোজ সকাল খেয়েদেয়ে বেলা ন'টায় সময় তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে কোর্ট উইলিয়ম কলেজে যেতেন। সেখানে কাজের ফাঁকে পড়াশুনা হ'ত। বেলা তিনটার পর কলেজের কাজ শেষ ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁকে পড়াতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত। তারপর বাসায় ফিরে আবার পড়া ও পড়ানো চলত। অনেক দিন তাঁর বাসাতেই রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ক'রে রাজকৃষ্ণ বাবু ঘুমিয়ে থাকতেন।

এইভাবে চার-পাঁচ বছরের পাঠ বছর দুই আড়াইয়ের মধ্যে শেষ ক'রে, রাজকৃষ্ণ বাবু সংস্কৃত কলেজের সিনিয়র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শহরময় এ বার্তা রাষ্ট্র হয়ে যায়। ঈশ্বরচন্দ্র এক অসাধ্য-সাধন করেছেন। রাষ্ট্র হবারই কথা। ধনিক বেনিয়ানবংশের নন্দনকে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ক'রে তোলা সহজ কাজ নয়। তিনি যেমন হিন্দু কলেজের ছাত্রের কাছে ইংরেজী শিখতেন, তেমনি ইংরেজীশিক্ষিত অনেক হিন্দু কলেজের ছাত্রও তাঁর কাছে সংস্কৃত শিখত।

ঈশ্বরচন্দ্রের বহুবাজারের বাসাবাড়ীর বৈঠকখানা ক্রমে ছোটখাট একটি বিদ্যায়তনে পরিণত হ'ল। ইংরেজী হিন্দী সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ হ'ল সেখানে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, একসঙ্গে দু'জনেরই কর্তব্য তিনি করতে লাগলেন। কর্মজীবনের শুরু হ'ল শিক্ষা দিয়ে। তখনও তার সীমানা বহুবাজার থেকে লালদীঘি পর্যন্ত বিস্তৃত। আধুনিক যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুরু, বহুবাজার থেকে লালদীঘির এই সঙ্কীর্ণ সীমানার মধ্যেই, শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষানবীশি করেন।

[ক্রমশঃ।

মাতৃ-বিসর্জনী

(প্রাপ্ত)

[স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল স্বপ্নে দিয়ে গেছেন। বেশ বোঝা যাচ্ছে যেমন পার্থিব কংগ্রেসী জমিদারিতে তেমনি আশমানী স্বর্গে সীমানা-ভাগ নিয়ে তুমুল তোলপাড় উঠেছে।]

বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার!
আমার দেশ!
ফাঁসি কাঠে তোরে লটকে দিতেই হাই কমাণ্ড
দিল আদেশ!
ভিখ-সম্বল আমরা কেবল দিল্লিওলা (১) যা
বলেন 'বেশ!
আহা বেশ! বেশ!' না ব'লে কি শেষ প্রাণে মারা যাব,
মা তুই বল্!
মধু-বঙ্কিম-রবি-বন্দিতা! আঁখি হতে মোছ
অশ্রুজল!
নগণ্য(২) কোটি সন্তান তোর মানুষ আমরা
নহি তো, মেষ!
ভারতসাগরে(৩) ডুবে যা অভাগী! যবনিকাপাত!
বিদায়! শেষ!
বঙ্গ আমার! জননী(৪) আমার! ধাত্রী আমার!
আমার দেশ!

(১) দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা। অবশ্য প্রশ্ন হতে পারে পাঠান, মোগল ও ইংরাজ এবং শাহজাদারা গেল কোথা বা কাল কি বলবস্তু?

(২) বঙ্কিমের সময় ছিল সপ্তকোটি। অতঃপর বংশবৃদ্ধির হার কিছু কমেনি। তবে, কিছু পূর্ববঙ্গে, (তোবা! পূর্ব পাকিস্তানে) কিছু বিহারে, কিছু গণনায় দুষ্ট কারসাজিতে হারিয়ে ও হড়িয়ে গেছে। অতএব 'নগণ্য' পদের সর্ববিধ অর্থই সার্থক।

(৩) বাস্তবে ভারত মহাসাগরে ডুবে যাওয়া কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী হলেও, তথাকথিত ভারত ঐক্যসাগরে এখনি দমবন্ধ হয়ে মরার অসুবিধা নেই।

(৪) 'জননী' ছাপার ভুল বা স্বর্গীয় কবির slip of tongue ব'লে মনে হয়। 'বিমাতা' হওয়া উচিত—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ, যে মাতা আর মাতা নয় বা যে মা মারা গেছেন। অথবা প্রচলিত অর্থেও রায়-ঘোষ পরিবার যে মা'কে হয়তো মা ব'লে স্বীকার করেন না—এক কালে নাকি বাপুজির স্তন্যধারায় মানুষ (?) হয়েছেন—আর আজ?

নেহেরু-পদ্মের শুষ্ক চুচুকে তৃষিত ওষ্ঠাধর যোগে চুক্ চুক্ করে টান দিয়ে জীবন ধারণের ইচ্ছা করেন।* বলা বাহুল্য, নেহেরু-পদ্ম ভারতমাতারই প্রতীক মূর্তি।

---

* "কোলে তুলে নে মা, আমায়
কালতরঙ্গে দিস্‌নে ফেলে"—ইতি
পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস। কালতরঙ্গ অবশ্যম্ভাবী
বিপ্লব আবর্তে ফেনিল-তরঙ্গ।

চারজন

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

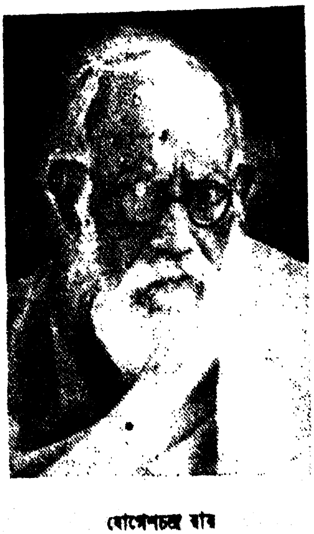
বাঙলার প্রবীণতম মনীষী আজ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাহিত্যে 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত হলেন—তাও এমন সময়ে, যখন তিনি বার্দ্ধক্যের জরাভারে গমনাগমন শক্তিরহিত, সর্বাঙ্গ শিথিল, চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, শ্রবণশক্তি হীনতর। এত বেশী বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকা বাঙলার মনীষীদের মধ্যে খুবই কম দেখা যায়। আর বেঁচে থাকলেও যে সৃজনীশক্তি সম্পূর্ণ অবলুপ্তির কোলে আশ্রয় লয়—ইহাই সাধারণত দেখা যায়। কিন্তু আমি আজ যাঁর কথা বলতে বসেছি—তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেও বাণীর চরণ বন্দনায় যে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে চলেছেন—তা' আজও পর্যন্ত শেষ হয় নাই। কারণ, বাণীর বরপুত্র তিনি—তিনিই আচার্য যোগেশচন্দ্র, আমাদের প্রিয়তম দাদু।

আজ যোগেশচন্দ্রের ভাগ্যে যে সম্মান জুটেছে—বহু পূর্বেই তাঁর তা' পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আমাদের এই এক দোষ—নিকটস্থ যে বৃহত্তম প্রতিভা তা' আমরা অতি নিকট বলেই এড়িয়ে যাই—এবং দূরাগতদের সন্ধানে নিজেদের ব্যাপৃত রাখি। এই কারণেই—বাঙলার এমন কয়েক জন মনীষী—বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্মান উপেক্ষা করে এ মরজগৎ ত্যাগ করে গেছেন—যার প্রায়শ্চিত্ত জাতি আজ অনুশোচনার দ্বারা অহরহ: তর্পণ করে। এবারেও যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ ত্রুটি না হয়—তার জন্য পত্রিকার মাধ্যমে সমালোচনা করতে হয়—একটা জনমত গড়ে তুলতে হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্রের বেলায়ও তা' করতে হয়েছে এইটাতেই আমাদের ক্ষোভ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৌভাগ্য যে, আচার্যদেব তাঁর এই দীর্ঘজীবন নিয়ে এখনো পর্যন্ত বেঁচে আছেন—এর ব্যতিক্রম ঘটলে জাতির আফশোষের অবধি থাকত না, বিশ্ববিদ্যালয়ও একটি বিরাট ত্রুটি বুকে ধরে রাখত চিরদিন। এই ত্রুটির সংশোধনে আজ যে বিশ্ববিদ্যালয় বাঁকুড়ায় বিশেষ সমাবর্তন করে গেলেন—তার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। এ ত সমাবর্তন নয়, যেন প্রবীণতম মনীষীর চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে সমগ্র জাতির আগমন। যে জাতির শিক্ষাভাণ্ডার তিনি ফুলে ফলে ভর্তি ক'রে দিয়ে মালা গেঁথে দেবী বঙ্গ-ভারতীর অঙ্গন সাজিয়েছেন, আজো সাজাচ্ছেন।

আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার পূর্বেই যোগেশচন্দ্রের মনীষার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' দিয়ে সম্মানিত ক'রেছেন। যে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ের সোপান নির্মাণে তিনি প্রায় সমগ্র জীবন অতিবাহিত ক'রেছেন সেও আজ এ ঋণ স্বীকার ক'রতে এগিয়ে এসেছে আচার্যদেবের চরণ সন্নিধানে। উৎকল এসেছে বাঙলার কাছে শ্রদ্ধার ডালি নিয়ে। কারণ, যোগেশচন্দ্র শুধু আচার্যই নন তিনি বিদ্যানিধি। আর এই 'নিধি' তিনি প্রদেশ হ'তে প্রদেশান্তরে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

'দেশবন্ধু' বলতে যেমন আমরা এক জনকেই বুঝি, কিন্তু আচার্যদেব বলতে বুঝি দুই জনকে। একজন প্রফুল্লচন্দ্র আর অপর জন যোগেশচন্দ্র। আর কী আশ্চর্য! এই দুই জনের জীবনযাত্রা, চালচলন হুবহু প্রায় এক রকম। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের মত যোগেশচন্দ্রও সাদাসিধে নিরহঙ্কার মানুষ সর্বদাই নিজেকে যেন গোপনে লুকিয়ে রাখতে চান। জাতির জন্য জাতির ব্যবসা-বিমুখতা প্রফুল্লচন্দ্রকে ব্যথিত ক'রেছিল, তিনি একজন জাতিকে ভৎর্সনা ক'রবার জন্য কলম ধরেছিলেন। আর আচার্য যোগেশচন্দ্র ব্যবসার সীমারেখা এক সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে বাঙালীর মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা ক'রেছিলেন। কুমারের ছেলে কেবল মাটির হাঁড়ি গড়বে, বামুনের ছেলে জুতোর দোকান ক'রবে না, এ কী কথা! ইহার প্রতিবাদস্বরূপই আচার্য যোগেশচন্দ্র নিজের আত্মীয়-স্বজনদের দিয়ে প্রায় সব রকম ব্যবসাই করিয়েছেন। এমন কী জুতোর দোকানও বাদ যায়নি। এর জন্য আচার্যদেবকে সামাজিক প্রতিকূলতা সহ্য ক'রতে হ'য়েছে কী কম! কিন্তু তিনি নির্বিকার অচল-অটল। যেটা শ্রেষ্ঠ, যেটা সত্য, তা' বলতে বা ক'রতে আচার্যদেব কোন দিন ভয় পাননি।

আচার্য যোগেশচন্দ্রের বর্তমান বয়স ৯৭ বৎসর। এই দীর্ঘ দিন প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর থেকে বেঁচে থাকা কী যে অসম্ভব ব্যাপার তা' সকলেই অনুমান ক'রতে পারবেন। আচার্য যোগেশচন্দ্রের এই দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসের পিছনে লুকিয়ে রয়েছে তাঁর প্রাত্যহিক অদ্ভুত নিয়মানুবর্তিতা। অতি প্রত্যূষে তিনি শয্যা ত্যাগ করেন। তার পর প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে গৃহের প্রাঙ্গণে একটু মুক্ত হাওয়ায় বেড়িয়ে নেন। তার পর একটু লঘু জলযোগ ক'রে নিত্য আরম্ভ করেন কর্মমুখর জীবনযাত্রা। এই সময় কত লোক তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসেন—কত চিঠি-পত্রের উত্তর তাঁকে লেখাতে হয়। এই সময়ের মধ্যে তাঁর সাহিত্যসাধনাও চলে। বর্তমানে যোগেশচন্দ্র তাঁর অতীতের রচিত বাঙলা ভাষার একটি শব্দকোষ পরিমার্জিত ক'রে তাহা নতুন ভাবে প্রকাশ ক'রবার জন্য ব্যস্ত আছেন। বাঙলা ভাষায় এরূপ বৃহৎ শব্দকোষ নেই বললেই চলে। এই শব্দকোষের সম্পাদন যদি আচার্যদেব শেষ করিয়া যাইতে পারেন,



যোগেশচন্দ্র রায়

তাহা জাতির এক পরম সম্পদ বলিয়া চিরকাল গণ্য হইবে। আর ইহা শেষ করিবার জন্ত আচার্যদেবের চেষ্টার অন্ত নাই। তিনি রাত্রি-দিন সমানে ইহার পিছনে সময় অতিবাহিত ক'রে চলেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে যোগেশচন্দ্র হাস্যপ্রিয় সদালাপী। কথায় ফাঁকে ফাঁকে তাঁর কৌতুক, রঙ্গ, পরিহাস সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা ছাড়া যে কেহই তাঁর কাছে যান না কেন—তাঁকেই তিনি নানা শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করেন। আর সে প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ হ'লে, নিজেই তাঁকে উত্তর শিখিয়ে দেন। এই শিক্ষাদান তাঁর রাত্রি-দিন অহরহঃ চলছে। কারণ, তিনি যে আচার্য। এই সব প্রশ্ন-উত্তর শুনতে শুনতে অবাক হ'য়ে যেতে হয়—এই পৃথিবীর গ্রহ, নক্ষত্র, দেশ, মহাদেশ, সাগর, উপসাগর, সম্বন্ধে কী অদ্ভুত তাঁর জ্ঞান—কী অদ্ভুত তাঁর অভিজ্ঞতা! তাঁকে নিজ চোখে না দেখলে এ কথা বিশ্বাস ক'রতে পারা যায় না যেন।

জীবনের সমগ্র মূল্যবান সময় আচার্য যোগেশচন্দ্র উৎকল প্রদেশের কটকে কাটিয়েছেন। তার পর কার্যশেষে বাঙলায় ফিরে এসে বাঁকুড়ার পশ্চিম দিকের শেষ প্রান্তে নতুন চটিতে বাস ক'রছেন। তাঁর ভবনটির নাম 'স্বস্তিক'। আজ সমগ্র দেশের দৃষ্টি বাঁকুড়ার এই ক্ষুদ্র গৃহ-কোণটির উপর নিপতিত হ'য়েছে—কারণ এইখানেই সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণতি জানাতে এসেছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমরা বাঙলার এই প্রবীণতম মনীষীকে প্রণতি জানাই। আচার্য যোগেশচন্দ্র দীর্ঘজীবী হউন।

ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য্য (শাস্ত্রী)

[আশুতোষ-অধ্যাপক (সংস্কৃত বিভাগ) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়]

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার রামমোহন লাইব্রেরীতে সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদের প্রথম অধিবেশন হইতেছে। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন সেই অধিবেশনে পৌরোহিত্য করিতেছেন। সংস্কৃত ভাষায় ঐ সভায় ভাষণ প্রদত্ত হইতেছে। বাঙালী পণ্ডিতমণ্ডলী সংস্কৃত ভাষণে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অ-বাঙালী পণ্ডিতগণের সংস্কৃত ভাষণের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সাহস তাঁহারা মোটেই পাইতেছেন না, সভায় সমবেত বাঙালীদের মন লজ্জায় ভরিয়া যাইতেছে। বাঙালীদের সংস্কৃত ভাষায় জ্ঞান অবাঙালীদের তুলনায় কিছুই নহে। অবাঙালীরা যদি এই কথা বলে তাহা হইলে বাঙালীদের ত' প্রতিবাদ করিবার কোন উপায় নাই। ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি থাকিতে পারে—বাঙালীদের এই লজ্জা কি দূর হইবে না? সভামধ্যে মৃদু গুঞ্জন উঠিতে লাগিল। বাগবাজারের অধ্যাপক চণ্ডীচরণ কাব্যতীর্থ একজন একুশ-বাইশ বৎসরের যুবকের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সেই যুবক সকলেরই অপরিচিত। সেই যুবক যে বাঙালীদের সম্মান রক্ষা করিবে ইহা কেহই ভাবিতে পারিল না। চণ্ডীচরণের অনুরোধে ঐ অপরিচিত যুবককে বক্তৃতা দিবার সুযোগ দেওয়া হইল। বক্তৃতা মঞ্চে উঠিয়া যুবক প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। 'সকলেই ভাবিল বাঙালীর সম্মান বুঝি রহিল না। ধীরে ধীরে যুবকটি তাঁহার ইতস্ততঃ ভাব কাটাইয়া উঠিলেন। বক্তৃতা আরম্ভ হইল। যুবকের অনর্গল সংস্কৃত ভাষণে বাঙালীদের মন আনন্দে ভরিয়া গেল। সভাপতি তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কে,এই যুবক? সকলের মনে এই প্রশ্ন উঠিতে লাগিল। এই যুবকই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের বর্তমান আশুতোষ-অধ্যাপক আশুতোষ শাস্ত্রী।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ইদিলপুর পরগণার সিঙ্গারডাঙ্গা গ্রামে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাশ্চাত্য বৈদিক পণ্ডিত বংশে আশুতোষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম অভয়াচরণ ভট্টাচার্য্য এবং মাতার নাম শান্তমণি দেবী। আশুতোষ তিন বৎসর বয়সে মাতাকে এবং নয় বৎসর বয়সে পিতাকে হারান। তাঁহার জ্যাঠামহাশয় তারিণীচরণ ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে পুত্রবৎ পালন করিতে থাকেন। গ্রাম্য পাঠশালায় আশুতোষের বিদ্যারম্ভ হয়। পরে তিনি প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ শিবচরণ সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়নের জন্ত ত্রিপুরা জেলার বাজাপতি গ্রামে গমন করেন। এইখান হইতে মাত্র পনের বৎসর বয়সে আশুতোষ ব্যাকরণতীর্থ পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। দুই বৎসর পরে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বরিশাল জেলার গৈলা গ্রামের 'কবীন্দ্র কলেজ' নামক টোল হইতে আশুতোষ কাব্যের উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পর তিনি মূলগাও গ্রামের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গুরুদাচরণ তর্কবাগীশের নিকট নব্যন্যায় অধ্যয়ন ক'রতে আরম্ভ করেন। সংসারের অর্থ-কৃচ্ছ্রতার জন্ত এই সময় অর্থোপার্জন করা বিশেষ প্রয়োজন হওয়ায় তরুণ আশুতোষ মাত্র আঠার বৎসর বয়সে ইদিলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের হেড-পণ্ডিতের কর্ম গ্রহণ করেন। এত দিন পর্য্যন্ত আশুতোষের ইংরাজী ভাষায় অক্ষর পরিচয়ও হয় নাই। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শক ষ্টেপলটন সাহেব (পরবর্তী জীবনে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এবং তার পর বাংলা দেশের ডি, পি, আই) ইদিলপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসেন। অত্যন্ত অল্পবয়স্ক ও ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ বলিয়া আশুতোষের নিয়োগ তিনি বিশেষ সমর্থন করিলেন না। এক বৎসরের মধ্যে ইংরাজী না শিখিতে পারিলে আশুতোষকে কর্মচ্যুত করিবার নির্দেশ ষ্টেপলটন সাহেব দিয়া গেলেন। অধ্যবসায়ী আশুতোষ ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। অবিলম্বে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, ইহাই হইল তাঁহার জেদ। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে তাঁহার মনে সাময়িক সঙ্কোচ হইয়াছিল। তদানীন্তন ডি, পি, আই হর্ণেল সাহেব কবীন্দ্র কলেজ পরিদর্শনে আসিয়া আশুতোষের অনর্গল সংস্কৃত ভাষণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে উৎসাহ দেন। মাত্র এক বৎসর তিন মাস অধ্যয়ন করিয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অর্থাভাব ও অন্যান্য সুযোগের অভাবে আশুতোষ ঐ বৎসর কলেজে ভর্তি হইতে পারিলেন না। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ কলিকাতায় আসেন এবং ফ্রি ষ্টুডেণ্টশিপ পাইয়া সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। এই তরুণ আশুতোষই রামমোহন লাইব্রেরীতে বাঙালীর মুখ রক্ষা করিয়াছিলেন।

রামমোহন লাইব্রেরীতে সংস্কৃত ভাষণ দিবার ফলে আশুতোষের জীবনে একটি বিরাট পরিবর্তন আসে। তাঁহার বক্তৃতায় কলিকাতার হাটখোলার (২৩, কাশীদত্ত ষ্ট্রীট) শ্রীক্ষিতীশনাথ দত্ত-চৌধুরী মুগ্ধ

হন। অর্থাভাবে আশুতোষের প্রতিভার বিকাশ না হইতে পারে, এই ভাবিয়া রুক্মিণীনাথ আশুতোষের সমস্ত সাংসারিক ব্যয়ভার বহন করিতে থাকেন। রুক্মিণীনাথের কথার উল্লেখে এখনও আশুতোষের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠে। রুক্মিণীনাথ আশুতোষের ব্যয়ের জন্ত ধার করিয়াও টাকা দিতেন। রুক্মিণীনাথের মত বিদ্যানুরাগী সহৃদয় মানুষ সত্যই দুর্লভ।

কলেজের তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় আশুতোষ সাংখ্যের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় তিনি বেদান্তের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম হন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এম. এ, পরীক্ষায় সংস্কৃতে তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেন। বেদান্ত ছিল তাঁহার বিশেষ পাঠ্য। এই সময় সংস্কৃত কলেজ হইতে তিনি 'শাস্ত্রী' উপাধি লাভ করেন। এত দিন পর্য্যন্ত রুক্মিণী দত্ত আশুতোষকে নিয়মিত ভাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে আশুতোষ বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের সংস্কৃতের অন্যতম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ঐখানেই থাকিতে থাকিতে ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে 'Shankara's Theory of knowledge' সম্বন্ধে আশুতোষ পি, আর, এস এর জন্ত থিসিস দেন এবং ঐ বৃত্তি লাভ করেন। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে 'Post-Shankara Dialectics' সম্বন্ধে তিনি 'পি, এইচ, ডি.'র জন্ত থিসিস দেন এবং পি, এইচ, ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক কোকিলেশ্বর শাস্ত্রী অবসর গ্রহণ করায় ডক্টর শ্যামাপ্রসাদের সহায়তায় আশুতোষ বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তদবধি আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেছেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ১লা মে আশুতোষ সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও ঐ বৎসর অক্টোবর মাসে আশুতোষ-অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদান্তের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলে পর রুক্মিণীনাথ আশুতোষকে বলেন, "পরীক্ষাপর্ব ত শেষ হইল, এখন কিছু লেখাপড়ার কাজ কর। বাংলা ভাষায় যাঁহারা দর্শন পড়িতে চান, তাঁহাদের উপযুক্ত কোন গ্রন্থ নাই। আমার নিজের দর্শনশাস্ত্র পড়িবার ইচ্ছা থাকিলেও সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি না থাকায় আমার ইচ্ছা পূরণ হইল না। আমার মত লোকেদের জন্ত ভারতীয় দর্শনগ্রন্থমালা রচনা কর।" রুক্মিণীনাথের নির্দেশে আশুতোষ বাংলা ভাষায় দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে তাঁহার 'বেদান্তদর্শন—অদ্বৈতবাদ' নামক গ্রন্থের 'বেদান্তচিন্তার ইতিবৃত্ত' নামক প্রথম খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড 'বেদান্তপ্রমাণ পরিক্রমা' বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বর্ত্তমানে আশুতোষ ঐ গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড 'বেদান্ততত্ত্বসমীক্ষা' রচনায় নিযুক্ত আছেন।

প্রিয়তম ছাত্র রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে আশুতোষ গীতার উপর কতকগুলি প্রবন্ধ মাসিক বসুমতীতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করেন। 'ভারতবর্ষ', 'শিবম্' প্রভৃতি পত্রিকায়ও তাঁহার বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে।

আশুতোষ অল্ ইণ্ডিয়া ফিলসফিক্যাল কংগ্রেসে কয়েক বার



আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

যোগদান করেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের পাটনার অধিবেশনে রাধাকৃষ্ণণের উপস্থিতিতে অদ্বৈত-বেদান্তের অবিদ্যার প্রমাণ সম্পর্কে সমগ্র বিহার প্রদেশের পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আশুতোষ বাংলা দেশের পক্ষে একক ভাবে সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত বিতর্ক সভায় যোগদান করেন এবং তাহাতে জয়লাভ করেন। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে পাটনায় 'সংস্কৃত রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত' এই বিষয়ে সংস্কৃত ভাষায় আশুতোষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। আসাম সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের সমাবর্ত্তন উৎসবে আশুতোষ একবার অনর্গল সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার ভাষণ দেন।

অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ছাড়া আশুতোষ আর কিছুই জানেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা দুরূহ বিষয় বুঝিবার জন্ত প্রায় তাঁহার কাছে আসে এবং তাঁহাদের সাহায্য করিতে তিনি বড়ই আনন্দ পান।

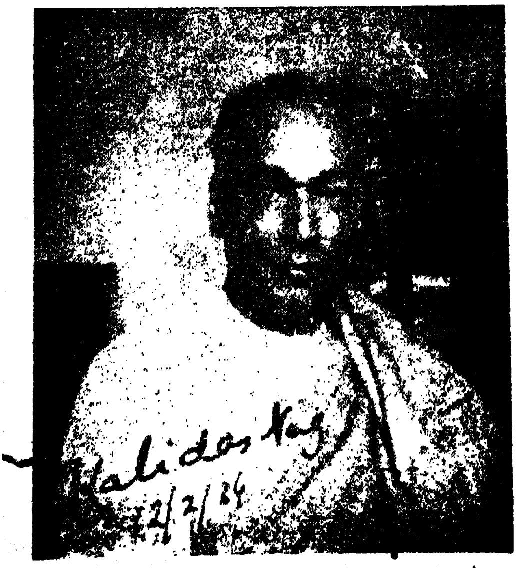
আচার্য কালিদাস নাগ

[বহির্বিশ্বে ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিক্ষাবিদ্]

বিশ্বকবির বিশ্ববন্দিত আত্মার ডাকে সাড়া দিল সেদিন অনেকেই। এগিয়ে এল তরুণ নওজোয়ানেরা, মিশিয়ে দিল নিজেদের কবিগুরু নির্দেশিত পথের মধ্যে. তারা ঝাঁপিয়ে পড়ল ইতিহাস-সাগরে আর সেই সাগরের অন্তরতম তল থেকে তুলে নিয়ে এল মুঠো মুঠো সোনা-জহরৎ-রত্ন। ভারতের হারিয়ে যাওয়া রাজ্যের প্রবেশপথের চাবিকাঠি। পট হোল পরিবর্তিত। সেদিনকার সেই অভিযাত্রী তরুণদের মধ্যে একজনের কথাই আজ বলতে বসেছি, আলোচনা করতে চলেছি স্বাধীন ভারতের অন্যতম বিশ্ববন্দিত সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত সুধীবর ডক্টর কালিদাস নাগ

মহাশয়ের কথা। ত্রিবেণীর স্বর্গীয় মতিলাল নাগ মহাশয়ের বড় ছেলে কালিদাস ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে জন্মগ্রহণ করেন। মতিলাল ছিলেন কলকাতার বিখ্যাত অক্রুর দত্তের দৌহিত্র-বংশীয়। ভাগ্যের নিদারুণ পরিহাস কালিদাসকে বেশী দিন পিতৃস্নেহ ভোগ করতে দিলে না, বালক কালিদাসের হোল পিতৃবিয়োগ, মাতুলদের যত্নে কালিদাসরা তিন ভাই গড়ে উঠতে লাগলেন, এঁর বড় মামা ছিলেন আলীপুর পশুশালার প্রথম ভারতীয় তত্ত্বাবধায়ক বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়।

বাল্যকাল থেকেই কালিদাসের মনে স্বদেশের প্রতি অনুরাগ লক্ষ্যণীয়। ১৯০৫ সালের অগ্নিবর্ষী দিনগুলিতে তেরো বছরের কালিদাসের পিঠে পড়েছে বৃটিশের বেতনভুক পুলিশ কর্মচারীদের লাঠি। সেদিনকার দেশনায়ক শ্রদ্ধেয় বিপিনচন্দ্র পালের সান্নিধ্যে আসেন কালিদাস নাগ। বাঙলা কথ্যভাষার ভগীরথ প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজ পত্র' এর সঙ্গেও গড়ে ওঠে কালিদাসের যোগাযোগ। রবীন্দ্রনাথের কথা তো পূর্বাহ্নেই বিবৃত করা হয়েছে। তাঁর প্রসঙ্গে ডঃ নাগ বলেন, বিশ্বকবির একটি অপূর্ব ক্ষমতা ছিল, ছোটদের সঙ্গে সমান তাল রেখে তিনি চলতে পারতেন। বড় মামার কাছে থাকা কালীন কালিদাস রবীন্দ্রনাথের যে চিঠি পেতেন তাতে লেখা থাকত—"Alipur Zoological garden,—Human Section, Calcutta" রবীন্দ্রনাথের পথনির্দেশই কালিদাসের মনে সোনার কাঠির স্পর্শ জাগায়। আজকের দিনের ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বব্যাপী প্রচারক জীবনের অনুপ্রেরণাই পান রবীন্দ্রনাথের ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা থেকে। কবিগুরুর সঙ্গে ত্রিশ বছর অতিবাহিত করেছেন ডঃ নাগ, গান্ধীজীর সঙ্গেও কেটেছে তাঁর পঁচিশ বছর, রোম্যাঁরোল্যাঁর সঙ্গেও তিনি কাটিয়েছেন কুড়িটি বছর।



কালিদাস নাগ

ফিরে যাওয়া যাক আবার তাঁর যৌবনের উষা-লগ্নে, তাঁর ছাত্র-জীবনে। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করলেন। (১৯১৫-১৯), এর পর এক বছরের জন্যে তাঁকে দেখা গেল সিংহলের মহীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষের আসনে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কালিদাস প্যারীর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জন করেন সাহিত্যে 'ডক্টরেট' উপাধি। এঁর গবেষণার বিষয় ছিল 'প্রাচীন ভারতের কূটনৈতিক তত্ত্ব'। এই সময়ে এঁরই পরিপূর্ণ সহযোগিতায় রোম্যাঁরোল্যাঁ ফরাসী ভাষায় প্রকাশ করতে সমর্থ হন তাঁর 'মহাত্মা গান্ধী', 'রামকৃষ্ণ' ও 'বিবেকানন্দ' প্রভৃতি অনবদ্য জীবনী রচনাগুলি (১৯২৩-২৭)। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করলেন আচার্য নাগ। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের জেনেভার আন্তর্জাতিক শিক্ষা-কংগ্রেস ও ১৯২২ খৃষ্টাব্দের লুগানোর নারী-কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক শান্তি ও মুক্তিসংঘে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করলেন কালিদাস নাগ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি প্রতিনিধিত্ব করলেন প্যারীতে অনুষ্ঠিত গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিকদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৯২৩)। ১৯২১ থেকে ১৯২৩ এর মধ্যে গ্রেটব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানী, অষ্ট্রীয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, বল্কান রাজ্যসমূহ, গ্রীস, ইতালীয়া স্পেন, পর্তুগাল, মিশর ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি দেশগুলির নানা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে যোগদান করলেন (১৯২৩), পরের বছরই কবিগুরুর আহ্বান এলো তাঁর নেতৃত্বে সাংস্কৃতিক অভিযানে যেতে হবে চীন ও জাপানের উদ্দেশে। সাড়া দিলেন আচার্য নাগ। ফিরতিপথে আচার্য নাগ ঘুরে এলেন জাভা, বলি, মালয়, বর্মা ও ইন্দোচীন। ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করলেন পিকিং, নানকিং, কেফিং, হ্যানকাউ, সাঙহাই, কিয়োটো, টোকিও, ব্যাটাভিয়া, সুরাবায়া, হ্যানয়, সায়গন প্রভৃতির বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। এখানে প্রতিষ্ঠা করলেন 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (আজকের মহাএশীয় সম্মেলনেরই পূর্বাভাষ) এর সম্পাদকরূপে প্রকাশ করলেন Greater India a study in Sudian Internationalism (১৯২৭) [অস্থায়ী সহযোগীরূপে তাঁকে আহ্বান জানালেন League of Nations (১৯৩০)। নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক শিক্ষা-সংস্থার ভ্রাম্যমান অধ্যাপকরূপে পাড়ি দিলেন মার্কিণ দেশে ১৯৩০-৩১ খৃষ্টাব্দে। সেখানে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও শিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা দিলেন—Metropoliton Museum of New York এ Boston Museum of Fine Arts এ, দিলেন হার্ভার্ড, ইয়েল কোলাম্বিয়া, পেনসিলভ্যানিয়া, সিকাগো ইভেনটন, পিটস্‌বার্গ, মিন্নেসোটা, লস অ্যাঞ্জেলস্‌, দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া-বার্কলি, ওরেগন, মণ্টানা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে আমন্ত্রিত হলেন গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ দানের জন্যে। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে আর্জেন্টিনায় রাজধানী বুয়েনস্‌ এয়ারসে অনুষ্ঠিত পৃথিবীর লেখকদের 'পি-ই-এন কংগ্রেসে ভারতের করলেন প্রতিনিধিত্ব, ফেরবার সময় ঘুরে এলেন আর্জেন্টিনা, উরুগুয়ে, ব্রেজিল, গ্রেটব্রিটেন, আয়ার্ল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি

দেশসমূহ। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমান অধ্যাপকরূপে আমন্ত্রিত হলেন তার ইণ্ডিক বিভাগটির উদ্বোধন করতে (১৯৩৭), এখানেও তিনি ভারতের চিন্তাধারা, প্রত্নতত্ত্ব, সামাজিকতা সম্বন্ধেও কয়েকটি বক্তৃতা দেন। অষ্ট্রেলিয়ার Commonwealth Relations Confce. এ ভারতের প্রতিনিধিরূপে দেখা দিলেন ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে সিডনিতে।

১৯৪০-৪১ খৃষ্টাব্দে India and the Pacific World প্রকাশ করলেন, ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম Asian Relation Confce. এ অংশ গ্রহণ করলেন এবং প্রকাশ করলেন 'New Asia'. শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত (১৯৪৯) World Pacifists Confce. এ কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হলেন। ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে দিগ্বিজয়ী বীর আবার যাত্রা করলেন ভারতীয় রত্নকোষ সঙ্গে নিয়ে তার কিছুটা রেখে এলেন তেহেরাণ, বাগদাদ, আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি দেশে। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হোল এঁর 'ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য' গ্রন্থটি। ভারতীয় মন্ত্রিসভা শিক্ষাদপ্তর থেকে নিযুক্ত হলেন সাংস্কৃতিক যোগাযোগ পরিষদের ও বিশ্ব-পরিস্থিতির ভারতীয় পরিষদের সদস্য ইণ্ডিয়ান য়্যাকাডেমীর হলেন প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য (১৯৫১)। শ্রীঅরবিন্দ আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনে অংশ গ্রহণ করতে ডাক আসে ডক্টর নাগের কাছে (পণ্ডিচেরী, ১৯৫১) কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে নিযুক্ত করেছেন আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থার (রাষ্ট্রপুঞ্জ) প্রতিনিধি (প্যারী)। মিন্নেসোটার হ্যামলিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমান অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন ১৯৫০-৫৪ খৃষ্টাব্দে। কলকাতার পোয়েট্রি সোসাইটির তিনি সভ্য, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় ও ভাণ্ডারকর প্রাচ্য গবেষণা মন্দিরের (পুণা) তিনি আজীবন সদস্য, বিশ্বভারতীর কর্মপরিষদেরও তিনি সদস্য ছিলেন (১৯২৩-৪৩) বর্তমানে রাজ্যপাল কর্তৃক ঐ পদেই তিনি আবার মনোনীত হয়েছেন, Ramkrishna Iuste of culture, East West Fraternityরও তিনি কর্ম-পরিষদের অন্যতম সভ্য। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের বর্তমানের (দি এশিয়াটিক সোসাইটি) তিনি সাধারণ সম্পাদক ছিলেন (১৯৪২-৪৬), বর্তমানে Asia-Africa Relation Insteএরও ইনি সাধারণ সম্পাদক, এছাড়া য়্যামেরিকার য়্যালুম্নি ফেলোশিপ, (ভারতীয় মধ্যপ্রাচ্য সমিতি য়্যালায়েঁ ফ্রাঁসে প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলির তিনি সভাপতি। ফরাসী সরকার তাঁকে 'অফিসিয়ার দি' য়্যাকাদেমী' সম্মানে সম্মানিত করেছেন। কলকাতার বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতীয় পার্লামেন্টেরও ইনি একজন সদস্য। আর্ট য়্যাণ্ড আর্কোলজি য়্যাব্রডআর্চ (কলি-বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৭), টেগোর ইন চায়না য়্যাণ্ড সিলোন (১৯৪৪-৪৬), ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্রি য়্যাণ্ড সিভিলিজেশান (ছাত্রদের জন্যে পাঠ্য স্বদেশ ও সভ্যতা), টলষ্টয় য়্যাণ্ড গান্ধী প্রভৃতি গ্রন্থগুলি তাঁরই সৃষ্টির এক একটি উদাহরণ, এর আর একটি গ্রন্থ ডিস্কভারি অফ এশিয়া। কবিগুরুর শততম জন্মোৎসব উপলক্ষে সম্পাদিত 'Golden Book of Tagore' প্রকাশ করেছিলেন কালিদাস নাগ। স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, পোর্তুগিস, ল্যাটিন, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষাগুলিতে আচার্য কালিদাস নাগের দক্ষতা সুধীসমাজে স্বীকৃত। পণ্ডিত নাগের মতে আজ সারা বিশ্ব চেয়ে আছে ভারতের দিকে।

দেশের শিক্ষাধারার বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি শিক্ষাব্রতী কালিদাস নাগকে—উত্তরে আচার্য নাগ বলেন, বর্তমানে এর আমূল পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনে কালিদাস ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে শান্তা দেবীর পাণিগ্রহণ করেছেন। কালিদাসের অনুজ ছিলেন 'কল্লোল' এর প্রতিষ্ঠাতা, পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার বাঙলা সাহিত্যের দুর্গম বিপ্লবপথের বিদ্রোহী তরুণ অভিযাত্রীদের অগ্রনায়ক পরলোকগত সুশিল্পী গোকুল নাগের নাম ভোলবার নয়।

নাগের প্রিয় পত্রিকা 'মাসিক বসুমতী' সম্বন্ধে তিনি বলেন, তথাকথিত গল্প-কবিতায় ঘেরা মাসিক পত্রের পর্যায়ে বসুমতীকে কোন রকমেই ফেলা যায় না, তার স্থান অনেক উঁচুতে, আজ জাতীয় জীবনে শিক্ষা-দীক্ষা-সংস্কৃতির জ্ঞানের পূর্ণ বিকাশের পথের প্রয়োজনীয় সমস্ত পাথেয় নিয়ে দেশবাসীর জন্যে নিজের দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন মাসিক বসুমতী। বর্তমান দিনের জাতির জাগরণের গুরুদায়িত্ব মাসিক বসুমতী পরমতম নিষ্ঠা সহকারেই পালন করে চলেছেন। বিশ্ব আজ চেয়ে আছে ভারতের দিকে আর ভারতও আজ চেয়ে আছে তোমারই দিকে। হে জ্ঞানতপস্বী পথিক, তুমি আমাদের প্রণাম গ্রহণ কর।

কথাশিল্পী শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

কথাশিল্পী শৈলজানন্দের আবির্ভাব একদা বাংলা সাহিত্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বর্দ্ধমান জেলার অণ্ডাল গ্রামে ১৩০৫ সালে শৈলজানন্দের জন্ম হয়। তাঁর পৈতৃক বাসস্থান বীরভূম জেলার রূপসীপুর গ্রাম। অণ্ডালে মাতুলালয়ে তাঁর জন্ম হয়। শৈশবে মাত্র তিন বছর বয়সে শৈলজানন্দের মা মারা যান। তাই মাতুলালয়েই তিনি মানুষ হন। তাঁর দাদামশাই ছিলেন রায় সাহেব। তাঁর কড়া শাসনের মধ্যে শৈলজানন্দের বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হয়।



শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

অশিক্ষা এবং কুসংস্কারের অন্ধকারে আচ্ছন্ন অণ্ডাল গ্রামে তখন না ছিল একটা বড় স্কুল, না ছিল পোষ্ট-অফিস, না ছিল লাইব্রেরী। ছোট একটা মাইনর স্কুলের কয়েকটা পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাইরের বই বলতে ছেলেবেলায় শৈলজানন্দ দেখেছেন শুধু পি. এম. বাগচির পঞ্জিকা আর সারা গ্রামের মধ্যে চাঁদা করে কেনা একখানা রামায়ণ আর একখানি মহাভারত।

এক কথায়, এমন একটি গ্রামের আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছেন। তিনি যে, বহু দিন পর্যান্ত জানতেই পারেননি যে মানুষের জীবন নিয়েও গল্প লেখা চলতে পারে, সাহিত্য বলে মানুষের জীবনের একটি অতি প্রিয় এবং অন্তরঙ্গ বস্তুও আছে পৃথিবীতে। প্রতি বছর বৈশাখ মাসে শুধু দেখা যেত তাঁর মামার বাড়ীর দরদালান পাড়ার মেয়েরা সারি বেঁধে হাত জোড় করে বসেছে, আর গ্রামের বৈকুণ্ঠ মুখুজ্জ্যে প্রতিদিন সুর করে রামায়ণ পাঠ করছেন। বালক শৈলজানন্দ কত বার সেদিক দিয়ে যেতেন, রামায়ণ পাঠের সুর তাঁর কানে এসে বাজতো, কিন্তু কোন দিন শুনেও শুনতেন না।

একদিন বাইরে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে, এমন সময়; শৈলজানন্দ ছুটতে ছুটতে এসে সেই দরদালানেরই এক কোণে নিতান্ত অপরাধীর মত আশ্রয় নিলেন। সেখানে রামায়ণ পাঠ চলছে তখন। তাঁর দিদিমাও বসেছিলেন দরদালানের এক পাশে। তাঁর ভয় হল, শৈলজানন্দ যদি এখানে গোলমাল করে তবে পবিত্র রামায়ণ পাঠে বাধা পড়বে, পাপ হবে তাঁর। তাই তিনি তাড়াতাড়ি চুপি চুপি তাকে সাবধান করে দিলেন কোন রকম গোলমাল না করতে, হাত জোড় করে চুপ করে বসে থাকতে।

অবশ্য চুপ করে বসে থাকা ছাড়া উপায়ও ছিল না তখন শৈলজানন্দের। বাইরে তখন বৃষ্টি পড়তে সুরু করেছে। বৈকুণ্ঠ মুখুজ্জ্যের রামায়ণ পাঠ শোনায় মন দিলেন শৈলজানন্দ।

ভিখারীর বেশ ধরে রাবণ তখন এসে দাঁড়িয়েছে সীতার পর্ণকুটীরের দুয়ারে। রাম গেছেন স্বর্ণমৃগের সন্ধানে; সহসা রামের কাতর ক্রন্দন শুনে লক্ষ্মণও চলে গেলেন। সীতা একাকিনী। রাবণ তাঁকে হরণ করে পুষ্পক রথে চড়িয়ে উড়ে চলে গেল আকাশ-পথে। বিপদে পড়ে সীতা ডাকেন রামকে, চোখ বুজে ভাবেন সেই দূর্ব্বাদল শ্যামকে।

কতক্ষণ যে শুনলেন শৈলজানন্দ তা আর মনে নেই। তাঁর শুধু মনে হল, এই তো মানুষের লেখা মানুষের গল্প! মনে তাঁর দুর্ব্বার আকাঙ্ক্ষা জাগলো যেমন করেই হোক, এই রামায়ণ বইখানি তাঁকে পড়তেই হবে।

কিন্তু তাতে বাধাও অনেক। হলুদ-রাঙা কাপড় দিয়ে সযত্নে মুড়ে রামায়ণ ও মহাভারত বইখানিকে লক্ষ্মীর বেদীর ওপর তুলে রাখা হয়। একমাত্র বৈকুণ্ঠ মুখুজ্জ্যে ছাড়া কারও অধিকার নেই সেই বই স্পর্শ করবার।

অতএব মুখুজ্জ্যেকে একদিন চার আনা পয়সা ঘুষ দিলেন শৈলজানন্দ। নিতান্ত গরীব ব্রাহ্মণ, তার ওপর গলাটি ঠিক রাখবার জন্য প্রায়ই একটু গাঁজা খান। পয়সা পেয়ে খুসী হলেন। বললেন, জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁর রামায়ণ পড়া শেষ হবে, বর্ষাকালে মহাভারত ধরবেন। তখন রামায়ণখানি তিনি দিতে পারেন দিন [illegible]। তবে একটি টাকা দিতে হবে!

রাজী হলেন শৈলজানন্দ। কিন্তু তিন বার টাকা সংগ্রহ করলেন, তিন বারই খরচ হয়ে গেল, জ্যৈষ্ঠ গেল, আষাঢ়ও গেল। শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে রামায়ণখানি হাতে পেলেন শৈলজানন্দ। তার পর বিপুল আগ্রহে এই মহাকাব্যখানি পড়ে শেষ করলেন তিনি। আর সেই ছিল তাঁর প্রথম গল্প পড়া!

তারপর মাইনর স্কুলের পড়া শেষ করে শৈলজানন্দ রাণীগঞ্জ সহরে এলেন হাইস্কুলে পড়বার জন্য। এখানেই কবি নজরুল ইসলামের সংগে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। পাশাপাশি দুই স্কুলে পড়তেন তাঁরা দুজনে।

ছেলেবেলায় শৈলজানন্দের আসল নাম ছিল শ্যামলানন্দ। শৈল ছিল তাঁর ডাক-নাম, স্কুলে সবাই শৈল বলে ডাকত। সেই থেকে কি করে যে শৈলজা হয়ে গেলেন নিজেও জানতে পারলেন না। পরে 'শৈলজা'র সংগে যোগ হল 'আনন্দ', হলেন শৈলজানন্দ। শ্যামলানন্দ তখন কোথায় গেল হারিয়ে!

রাণীগঞ্জ হাইস্কুলে পড়বার সময় থেকেই শৈলজানন্দ সাহিত্য-চর্চ্চা সুরু করেন। অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের মত তাঁরও সাহিত্যজীবন আরম্ভ হয় কাব্যলক্ষ্মীর প্রাঙ্গণে। নানা রকম ছন্দে কবিতা লিখতে সুরু করে দেন তিনি।

একদিন এমনি একটি কবিতা নজরুলকে পড়ে শোনাতে গেছেন শৈলজানন্দ। বালিসের তলা থেকে নজরুলও তখন খাতা বের করলেন একটা। তিনটে ছোট ছোট গল্প লিখেছেন তিনিও। দু'জনে ভাব হতে তার পর আর দেরি হল না। নজরুল গল্প লেখেন, শৈলজানন্দ কবিতা। শৈলজানন্দের কবিতা শোনেন নজরুল, নজরুলের গল্প শোনেন শৈলজানন্দ।

এমনি করেই চলছিল তাঁদের। রবিবার দিন ছুটি পেলেই দুই বন্ধু খাতা হাতে চলে যেতেন বহু দূরে। রাণীগঞ্জ কয়লাকুঠির দেশ। একদিন এক কয়লাখাদের পাশে সাঁওতাল কুলি-ধাওড়ার কাছে দুজনে বসে গল্প করছেন। দূরে প্রকাণ্ড চিমনির মুখে ধোঁয়া উঠছে, চাণকের মুখে হেড গিয়ারের চাকা ঘুরছে, তার ওপর পড়ন্ত সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে, ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজছে, মাটির নিচে থেকে কয়লাবোঝাই টবগাড়ী উঠছে, দূরে একটা আম-বাগানের পাশে হঠাৎ কোথায় যেন মাদল বেজে উঠেছে। সব মিলিয়ে শৈলজানন্দের মনের মধ্যে এমন একটা অপূর্ব্ব ভাব জাগলো যে, তিনি কিছুতেই তা আর ভুলতে পারলেন না। বাড়ী ফিরে এসেই গল্প লিখতে বসলেন।

চার দিন লাগলো তাঁর গল্পটা শেষ করতে। আর এই গল্পই তাঁর অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'কয়লাকুঠি', তার পর নজরুলকে গিয়ে শোনালেন তিনি সেই গল্প। এই চার দিন নজরুলও চুপ করে বসেছিলেন না। তিনিও লিখেছিলেন দু'টি কবিতা। একটি নাম 'রাজার গড়' আর একটির নাম 'রাণীর গড়'। কবিতা দু'টো এত ভাল লাগল শৈলজানন্দের যে, লজ্জায় তিনি এর পর কবিতা লেখাই ছেড়ে দিলেন।

দু'জনেই তাঁরা ভুল পথে চলছিলেন এত দিন। হঠাৎ এমনি করেই একদিন তাঁরা তাঁদের পথ খুঁজে পেলেন। সেদিন থেকেই শৈলজানন্দ হলেন গল্প-লেখক আর নজরুল হলেন কবি। কাব্য-লক্ষ্মীর কাছে বিমুখ হয়ে কথা-সাহিত্যের অঙ্গনে প্রবেশ করলেন তিনি। স্বল্পকালের মধ্যেই তাঁর প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠলো।

কিন্তু ইতিমধ্যে শৈলজানন্দের জীবনে দুঃখের দিনও ঘনিয়ে এসেছিল। 'বাঁশরী' পত্রিকায় তাঁর একটা গল্প প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের নাম ছিল 'আত্মঘাতীর ডায়রি'। গল্প আত্মকাহিনী হতে পারে না। কিন্তু কড়া প্রকৃতির রায়সাহেব দাদামশাই

তা' বুঝলেন না। শৈলজানন্দকে বিদায় দিলেন তিনি বাড়ী থেকে।

হাইস্কুল থেকে পাশ করবার পর যথারীতি কলেজে ভর্ত্তি হয়েছিলেন শৈলজানন্দ। কিন্তু অর্থাভাবে তাঁকে কলেজ ছাড়তে হল। জীবিকার উপায়ের জন্য এর পর তিনি শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখে কয়লাকুঠিতে চাকরি নেন।

কিন্তু চাকরি তিনি বেশি দিন করতে পারলেন না। ফলে নিদারুণ দুঃখ-কষ্টের দিন সুরু হল তাঁর এর পর। তার ওপর আবার অল্প বয়সেই বিয়ে দিয়েছিলেন অভিভাবকেরা। অবস্থা তাই আরও করুণ হয়ে উঠলো। দারিদ্র্যের সংগে এক ঘরে বাস সুরু হল শৈলজানন্দের। কলকাতায় খোলার বস্তিতে থাকতে আরম্ভ করলেন তিনি, পানের দোকান দিলেন ভবানীপুরে। সে এক নিদারুণ অর্থকষ্ট। দুঃস্থতা, দীনদশা, প্রায় নিঃস্ব ভিখারীর দিন যাপন আরম্ভ হল তাঁর, সামান্য একটু আশ্বাসের বাণী পর্য্যন্ত জুটলো না কারো কাছ থেকে।

কিন্তু সর্ব্বক্ষণ দারিদ্র্যের সংগে এই তীব্র সংগ্রামের মধ্যেও সাহিত্য সাধনা থেকে বিরত থাকেন নি শৈলজানন্দ। আর সাহিত্যই তখন হয়ে উঠেছে তাঁর জীবিকার প্রধান উপায়।

কয়লাকুঠির ছোট ছোট কাহিনী লিখে অল্পকালের মধ্যেই প্রভূত খ্যাতি অর্জ্জন করলেন তিনি। বাংলা গল্প-সাহিত্যে নতুন পটভূমি আনলেন। দরিদ্র পল্লীবাসী আর অরণ্যচারী সাঁওতাল আর কয়লা-কুঠির কুলিমজুরদের তিনিই সর্ব্বপ্রথম সাহিত্যের আনন্দের ভোজে ডাক দিলেন। তাঁর এই সব গল্প বাংলা সাহিত্যের এক অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য। মাটির উপরকার শোভন শ্যামল আস্তরণ ছেড়ে শৈলজানন্দ একেবারে তার নিচে অন্ধকার গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করলেন, বাঙালী পাঠককে উপহার দিলেন 'কয়লাকুঠি', 'খুনিয়ারা', 'বন্দিদান' ইত্যাদি অপূর্ব্ব গল্প।

গল্প রচনায় প্রভূত খ্যাতি ও সম্মান অর্জ্জন হবার পর প্রকাশিত হল শৈলজানন্দের প্রথম উপন্যাস 'বোড়ো হওয়া।' তাঁর এই প্রথম উপন্যাস একদা ঝড়ের মতই বয়ে গিয়েছিল বাংলার সাহিত্যাকাশে।

খুব অল্পকালের মধ্যেই শৈলজানন্দ প্রচুর গল্প ও উপন্যাস রচনা করেন, অভাবের সংগে তখনও তাঁকে তীব্র সংগ্রাম করতে হচ্ছে। অর্থ এবং খ্যাতির জন্য তিনি তখন লেখার পর লেখা লিখে চলেছেন, কিন্তু তবু সব সময়েই কেমন একটা অস্বস্তিকর অতৃপ্তি ছিল তাঁর মনে। ক্রমাগতই তাঁর মনে হয়েছে এর চেয়ে ভাল লিখতেন তিনি, আরও ভাল। বাংলা সাহিত্যে শৈলজানন্দের মত এত অল্প সময়ের মধ্যে এত গল্প-উপন্যাস খুব কম লেখকই লিখেছেন। মাত্র আটত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে তিনি যে সব গল্পগ্রন্থ ও উপন্যাস রচনা করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য অতসী, নারীমেধ, মাতৃঋণ, নন্দিনী, বধূবরণ, দিন-মজুর, মহাযুদ্ধের ইতিহাস, অভিশাপ, নীহারিকা ওয়াচ-কোম্পানী, অনাথাশ্রম, হোমানল ও লহ প্রণাম।

গল্প ও উপন্যাস রচনা ছাড়াও শৈলজানন্দ তাঁর সাহিত্য-জীবনে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকার সংগে বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 'কালিকলম' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি। 'কল্লোল' পত্রিকার সংগে প্রথম থেকে এবং পরবর্ত্তী কালে 'সাহানা,' 'ছায়া' প্রভৃতি পত্রিকার সংগেও যুক্ত ছিলেন তিনি।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সুচেতা গুপ্ত, সুখেন্দু দত্ত, নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় সংগৃহীত।]

জনপ্রিয়তা অর্জ্জনের উপায়

১। এমন কথা বলবেন যা শুনে লোকে খুসী হয়। তবে তোষামোদের চেয়ে মানুষের প্রকৃত গুণের প্রশংসা করাই ভাল।

২। দেখা লোকের নাম এবং মুখ ভুলবেন না। একটু চেষ্টা করলেই এটা অভ্যাস হয়ে যাবে। চেনা লোককে দেখে চিনতে না পারা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়।

৩। কেউ যদি আপনাকে বিশ্বাস করে সে বিশ্বাস ভঙ্গ করবেন না, আর বাজে কথা কইবেন না।

৪। কখনো নিজেকে জাহির করতে চেষ্টা করবেন না। অহংকার ভাল নয়। বরং অপরকে তুলে ধরবার চেষ্টা করবেন।

৫। কাউকে বিদ্রূপ করবেন না। বিদ্রূপ না করেও হাসি-তামাসা চলে। অপরকে হেয় না করে তাদের প্রশংসা করতে চেষ্টা করবেন—যাতে তারা মনে করতে পারে যে, তাদেরও যোগ্যতা কম নয়।

৬। সঙ্কটের সময় উদ্ধার পাবার ঠিক পথের সন্ধান দেবার যোগ্যতা অর্জ্জন করতে হবে। যারা নিজেদের যোগ্যতা সম্বন্ধে ঠিক অবহিত নয়, তাদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার সাহায্য করতে হবে।

৭। ভুল করলে তৎক্ষণাৎ তা স্বীকার করবেন।

৮। কথা শুনবেন বেশী, কইবেন কম। মুখ বাঁকাবেন কম, হাসবেন বেশী, কিন্তু কাউকে হেসে উড়িয়ে দেবেন না।

৯। অজান্তে করে ফেলেছি, একথাটি বলে নিজের অপরাধ লঘু করতে যাওয়া ঠিক নয়। না জেনে আইন ভঙ্গ করাও অপরাধ এবং এটা বুদ্ধির পরিচায়ক নয়। নির্ব্বোধ ব্যক্তিরা অবশ্য না জেনে লোককে আঘাত দেয় আর স্বার্থপর ব্যক্তিরা জেনে-শুনে ইচ্ছে করেই তা করে—কিন্তু উভয়ের ফল একই।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো চুয়াল্ল

একমাত্র নরেনই পারে। নরেনই পারে সমস্ত হজম করতে। সে একাধারে জাগ্রত বহ্নি আর তুহিন-তুষার। সেই পারে জ্বালিয়ে দিতে পুড়িয়ে দিতে, গলিয়ে দিতে তলিয়ে দিতে। সূর্যের দীপ্তি আর চন্দ্রের শৈত্য একসঙ্গে। একসঙ্গে অপ্রমেয় অপরাজিত জ্ঞান আর মাধুর্যধৈর্যসুভগা ভক্তি। এক দিকে মৃদঙ্গ-ডিণ্ডিম-বাদ্য-বিলক্ষণ, অন্য দিকে মধুর-পঞ্চমনাদ-বিশারদ। নরেনই তো সেই ভস্মভূষণ ভাস্বর কন্দর্প-দর্পনাশন শিব। ওই তো পারে সেই বিষ ধারণ করতে।

'যখন ও বুঝবে ও কে,' বললেন ঠাকুর, 'তখন দেহ ছেড়ে চলে যাবে।'

সেই আত্মনিরীক্ষণ করবার জন্যেই তো নরেন যেতে চায় সমাধিভূমিতে। ঠাকুর তাকে ঠেকিয়ে রাখেন। বলেন, চাবি রেখে দিলাম আমার হাতে, আমি না খুলে দিলে সেই বন্ধ ঘরে তুই ঢুকতে পারবিনে।

মনের সপ্তম ভূমিই সমাধি।

ঠাকুর সমাধির বিশ্লেষণ করছেন। প্রথম তিন ভূমি লিঙ্গ গুহ্য আর নাভি। যতক্ষণ মনের কামকাঞ্চনে আসক্তি ততক্ষণ এই তিন ভূমিতেই ঘোরাফেরা করে, কিছুতেই পারে না ঊর্ধ্বে উঠতে। কিন্তু যদি একবার ছাড়া পায় মন উঠে আসে চতুর্থভূমিতে, হৃদয়ে। তখন একটা আলো দেখে, নূতন দেশের আলো। অবাক হয়ে যায় এ আভা কোথায় ছিল, কোথায় ছিল এত অব্যক্ত ব্যঞ্জনা! তখন মন আর নিচে নামতে চায় না। বলে, দেখেছি ঢের দেখেছি তোমাদের জারিজুরি, তোমাদের চটুকে রঙ। আর ও-সবে ভুলছিনে। আস্তে-আস্তে শেষে পঞ্চমভূমি, কণ্ঠে উঠে আসে। মন যার কণ্ঠে উঠেছে ঈশ্বরের কথা ছাড়া অন্য কথা বলতে বা শুনতে তার ভালো লাগে না। যদি কেউ অন্য কথা বলে সেখান থেকে উঠে যায়।

তার পর, ষষ্ঠভূমি?

ষষ্ঠভূমি কপাল। সেখানে গেলে মন নিরন্তর ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। কিন্তু সর্বক্ষণ ধরি-ধরি করেও ধরতে পারে না সেই নিরাকারকে, নিরবয়বকে। তখনও একটু থেকে যায় আমিত্বের পরদা। যেন লণ্ঠনের ভিতরে আলো বাইরে তার কাচের আবরণ। এই বুঝি ছুঁয়ে ফেললাম, আলিঙ্গন করলাম সেই দিব্যজ্যোতিকে, কিন্তু না, এখনো একটু বাধা আছে।

বাধা-ব্যবধান সব দূরে গিয়েছে, উড়ে গিয়েছে, সপ্তমভূমিতে। সেই ভূমিই সমাধিভূমি। তার স্থান শিরোদেশে। সেখানে উঠলেই ঈশ্বরের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎ। নিত্য আলিঙ্গন। সেই অবস্থায় একুশ দিনে মৃত্যু।

'কিন্তু এ সব জ্ঞানের পথ, কঠিন পথ।' বললেন ঠাকুর সংসারী ভক্তদের। 'তোমাদের ভক্তি পথ। ভালোবাসার পথ। ভালোবাসায় কি হয়? মন প্রাণ লীন হয়ে যায়। স্ত্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা তেমনি নিষ্ঠা আনো ঈশ্বরে। সেই ভালোবাসার থেকেই ভাব হবে—ক্রমে মহাভাব।'

ভাব হলে কি হয়? মানুষ অবাক হয়ে যায়। বায়ু স্থির হয়, সেই বায়ু স্থির হওয়ার নামই কুম্ভক। বন্দুকের গুলি ছোঁড়বার সময় যে গুলি ছোঁড়ে সে বাক্‌শূন্য হয়, তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। তেমনি প্রেমের জিনিসের প্রতি স্থিরলক্ষ্য হও, অমনিতেই যোগ হয়ে যাবে।

মা ঠাকরুণ বললেন, 'আমি একবার তারকেশ্বর যাব।'

'কেন?' ঠাকুর তাকালেন আকুল চোখে।

'সেখানে গিয়ে হত্যে দেব। বলো, যাব?'

'যেতে চাও তো যাও। কিন্তু কিছু কি হবে?'

কেন হবে না? একবার সিংহবাহিনীকে জাগিয়েছিলাম, এবার পারব না পশুপতির ঘুম ভাঙাতে? সে বার নিজের অসুখে এবার তোমার অসুখে। আর, তুমি তো জানো, তোমার অসুখেই আমার অসুখ।

হে তারকেশ্বর, জাগো, ত্রাণ করো।

তুমি কাশীতে বিশ্বনাথ, কৈলাসে কৈলাসেশ্বর। কামরূপে বৃষধ্বজ, মণিপুরে মহারুদ্র। হরিদ্বারে গঙ্গাধর, নেপালে পশুপতিনাথ। চিত্রকূটে চন্দ্রচূড়, নর্মদায় বাণলিঙ্গ। উৎকলে জগন্নাথ, নীলাচলে ভুবনেশ্বর। সেতুবন্ধে রামেশ্বর, পুষ্করে পুরুষোত্তম। ঝাড়খণ্ডে বৈদ্যনাথ আর রাঢ়ে তারকেশ্বর।

যাচ্ছ যে, পারবে জাগাতে?

কেন পারব না? সাবিত্রি পারেনি?

সত্যবান বললে, সাবিত্রি, আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না, ইচ্ছে করছে ঘুমুই।

সাবিত্রী মাটিতে বসে পড়ল। স্বামীর মাথা কোলে টেনে নিল। খানিক পরেই দেখতে পেল কে একজন রক্তবসন রক্তনয়ন পুরুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শ্যামবর্ণ, বদ্ধমৌলি, সাক্ষাৎ সূর্যের মত তেজস্বী।

আস্তে আস্তে স্বামীর মাথা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সাবিত্রী সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। কম্প্রবক্ষে হাত জোড় করে বললে, 'আপনাকে দেবতা বলে মনে হচ্ছে। সত্যি, আপনি কে, কেন এসেছেন?'

'সাবিত্রি, তুমি পতিব্রতা ও তপোনুষ্ঠানসম্পন্না,' বললে সেই অভ্যাগত, 'তাই তোমাকে আত্মপরিচয় দিচ্ছি। শোনো, আমি যম। তোমার স্বামীর আয়ু শেষ হয়েছে। এই দেখ, আমার হাতে পাশ। আমি তাকে এই পাশে বেঁধে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'আপনার অনুচরদের না পাঠিয়ে আপনি নিজে এসেছেন কেন?' সাবিত্রী একটুকু ভয় পেল না।

'তোমার স্বামী পরমধার্মিক, রূপবান, গুণসাগর। তাই দূত না পাঠিয়ে আমি নিজে এসেছি।' এই বলে যম সত্যবানের দেহের মধ্য থেকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষকে পাশবদ্ধ করে সবলে আকর্ষণ করে নিষ্কাশিত করল। মুহূর্তে সত্যবানের দেহ শ্বাসহীন, প্রভাহীন, চেষ্টাহীন হয়ে গেল।

যম চলল দক্ষিণ দিকে।

ব্রতসিদ্ধা সাবিত্রী দুঃখার্তচিত্তে চলল তার পিছু পিছু।

কৃতান্ত বললে, 'এ কি, তুমি চলেছ কোথায়? তুমি ফিরে যাও, তোমার স্বামীর পারলৌকিক কাজ সমাধা কর। তুমি তোমার ভর্তার ঋণ শোধ করেছ, তোমার আর ভয় কি?'

'স্বামী যে স্থানে নীত হন বা স্বয়ং যেখানে যান সেখানে স্ত্রীরও গতি, এই নিত্যধর্ম। তপস্যা গুরুভক্তি, ভর্তৃস্নেহ ও ব্রতবলে ও সবার উপরে আপনার প্রসাদে আমার গতি অপ্রতিহত। আপনার সঙ্গে সপ্তপদ ভ্রমণ করা হয়ে গিয়েছে, তাই আপনি আমার মিত্র। সেই মিত্রভাব থেকে আপনাকে যা বলছি শুনুন। গার্হস্থ্য ধর্মই সর্বধর্মের প্রধান। পতিহীনা হয়ে বনে বাস করে আমি কি করে সেই ধর্মাচরণ করব?'

'অনিন্দিতে, তোমার সুব্যক্ত ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে আমি তুষ্ট হয়েছি। তুমি বর চাও।' যম ফিরে দাঁড়াল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া যা চাইবে তাই পাবে। বর নিয়ে ফিরে যাও।'

'আমার শ্বশুর অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হয়ে অরণ্যবাসী হয়েছেন। আপনি তাঁকে চোখ দিন। চোখ পেয়ে অগ্নি আর দিবাকরের মত তিনি বলবান হোন।'

'তথাস্তু। এবার তবে নিবৃত্ত হও।' যম বললে, 'তুমি পথশ্রান্ত হয়েছ। আরো যাবে তো আরো তোমার ক্লান্তি বাড়বে।'

আমি যখন আমার স্বামীর কাছে-কাছে আছি তখন আর আমার ক্লান্তি কি? যেখানে তিনি যাবেন আমিও সেইখানে যাব। তিনিই আমার যাত্রা, তিনিই আমার গতি। সুতরাং আমার জন্যে চিন্তা করবেন না, দিগন্তরেখা উত্তীর্ণ হয়ে আমি হেঁটে যাব। তা ছাড়া আপনার মত সজ্জনসঙ্গ পাব কোথায়? সাধু ব্যক্তির সঙ্গে কিঞ্চিৎ সমাগমেই মিত্রতা, তাই সাধু সমাগমও কখনো নিষ্ফল হয় না। তারই জন্যে সাধু সংসর্গেই বাস করা বিধেয়।'

যম উৎসাহিত হল। বললে, 'ভামিনি, তোমার বাক্যবিন্যাস হৃদয়রঞ্জন, হিতকর ও বুধগণেরও বোধবর্ধন। তুমি আরেক বর, দ্বিতীয় বর চাও। সত্যবানের জীবন ছাড়া যে কোনো প্রার্থনা।'

'আমার শ্বশুর তাঁর হৃতরাজ্য ফিরে পান ও তাঁর ধর্মে অবিচ্যুত থাকুন।' সাবিত্রী দ্বিতীয় বর চাইল।

'তথাস্তু।' যম দ্রুতক্ষেপে পা চালাল। 'কিন্তু এ কি, এখনো আসছ কেন? আর যে পারবে না চলতে, তোমার পা টলে-টলে পড়ছে।'

'পড়ুক।' যমকে থামতে দেখে সাবিত্রীও থামল। বললে, 'আপনারই নিয়মে জীবজগৎ নিগৃহীত, কর্মের নিয়মে আবার যার যা যাতায়াত। সর্বত্রই এই নিয়মের বিধান-শাসন। তাই আপনার যম-নাম সুবিখ্যাত। কিন্তু আমার আরো কথা শুনুন। কায়-মনোবাক্যে সকলের প্রতি অদ্রোহ, অনুগ্রহ আর দান এই সাধুদের সনাতনধর্ম। শত্রু হলেও সে যখন মর্তের লোক তখন নিশ্চয়ই সে দুর্বল ও অল্পজীবী, তাই সাধুরা শত্রুকেও দয়া করেন।'

'কি সুন্দর তোমার কথা সাবিত্রি!' যম গদগদ ভাবে বললে, 'যেন পিপাসিতের কাছে শীতল জল। তুমি সত্যবানের জীবন ছাড়া তৃতীয় বর যাচ্ঞা কর।'

'আমার পিতার পুত্র নেই, তাঁর যেন বংশকর শত পুত্র জন্মে, এই আমার তৃতীয় প্রার্থনা।'

'তথাস্তু।' যম আবার চলতে সুরু করল। 'এবার তো তুমি কৃতকার্য হলে, এখন প্রতিনিবৃত্ত হও। দেখ কত দূর পথে চলে এসেছ।'

'আমি যখন স্বামীর সন্নিধানে আছি তখন কোন পথই আমার দূর পথ নয়।' সাবিত্রী স্নিগ্ধমুখে বললে, 'আমার মন দূরতর পথে ধাবমান। বেশ তো, আপনি চলতে চলতেই আমার কথা শুনুন। আপনি বিবস্বানের পুত্র, তাই আপনি বৈবস্বত। প্রজাদের পক্ষপাতরহিত ধর্মশাসন করেন বলে আপনি ধর্মরাজ। সুতরাং আপনি সজ্জন। সজ্জনের উপর যেমন বিশ্বাস হয় তেমন নিজের উপরেও হয় না।'

'ভদ্রে, এমন চারুবাণী আর কোথাও শুনিনি।' যম হাত তুলল। 'সত্যবানের জীবন ছাড়া চতুর্থ বর প্রার্থনা করো।'

'সত্যবানের ঔরসে আমার গর্ভে বলবীর্যশালী কুলবর্ধন এক শত পুত্র হোক—এই আমার চতুর্থ প্রার্থনা।' সাবিত্রী দৃঢ় হয়ে দাঁড়াল।

'তথাস্তু। তোমার বলবীর্যবান আনন্দবর্ধন শত নন্দন হোক। এবার তবে প্রত্যাবর্তন করো।'

সাবিত্রী আবার যমকে অনুগমন করতে লাগল। বলতে লাগল, 'সাধুদের ধর্মবৃত্তি চিরকালই সমান। সাধুরা কখনো অবসন্ন হন না, ব্যথিত হন না, সাধুর সঙ্গে সাধুর সমাগম চিরকাল ফলান্বিত। সাধুরাই সত্য দ্বারা সূর্যকে চালিত করছেন, তপস্যা দ্বারা ধারণ করছেন পৃথিবীকে। প্রত্যুপকার অপেক্ষা না করে আর্যগণের পূজনীয় জেনেই চিরকাল পরোপকার করে থাকেন। তাঁদের প্রসাদ কখনো ব্যর্থ হয় না, তাঁদের কাছে কারু প্রার্থনা বা সম্মানের হানি হয় না। তাই সাধুরাই সকলের রক্ষাকর্তা।'

যম বললে, 'তোমার সুবিন্যস্ত ধর্মসংহত বাক্য যত শুনছি ততই তোমার প্রতি আমার ভক্তি উচ্ছলিত হচ্ছে। অতএব আবার তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা করো।'

'হে মানদ! আপনি আমাকে শতপুত্রের বর দিলেন কিন্তু আমার স্বামী কোথায়? আমি স্বামিবিনাকৃত সুখ, স্বামিবিনাকৃত স্বর্গ, স্বামিবিনাকৃত শ্রীর অভিলাষিণী নই। স্বামী ছাড়া জীবন আমার মৃত্যুতুল্য। সুতরাং আমাকে শতপুত্রতা বর দিয়ে কি করে নিয়ে যাচ্ছেন আমার স্বামীকে? অতএব আমার স্বামী জীবিত হোন, এই আমার পঞ্চম, আমার পরম প্রার্থনা।'

সানন্দচিত্তে যম বললে, 'তথাস্তু। কুলনন্দিনি, এই তোমার

স্বামীকে পাশমুক্ত করে দিচ্ছি। ইনি নীরোগ, কৃতার্থ ও তোমাতে বশীভূত হয়ে চারশো বছর জীবিত থাকবেন আর যজ্ঞ ও ধর্ম দ্বারা খ্যাতিলাভ করে তোমাকে শত পুত্রের জননী করবেন। এবার যাও, স্বামীর কাছে ফিরে যাও।'

দ্রুত পায়ে সাবিত্রী ফিরে গেল, যেখানে তার স্বামীর মৃত কলেবর পড়ে আছে। ভূমি-নিপতিত ভর্তাকে আলিঙ্গন করে তার মাথা নিজের কোলের উপর নিয়ে বসল। সত্যবান চোখ খুলে সপ্রেমে তাকাল সাবিত্রীর দিকে, প্রবাসাগত লোক যেমন তাকায় তার প্রণয়িনীর দিকে। বললে, 'কি কষ্ট। অনেকক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম, আমাকে জাগাওনি কেন এতক্ষণ? যিনি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সেই শ্যামবর্ণ পুরুষ কোথায়?'

'জীবিতনাথ,' সাবিত্রী আনন্দরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, 'যাঁর কথা জিগগেস করছ তিনি লোকসংহর্তা যম। তিনি এখন ফিরে গিয়েছেন স্বস্থানে। যদি শরীরে শক্তি ফিরে পেয়ে থাকো তো ওঠবার চেষ্টা করো। রাত ঘোর অন্ধকার হয়ে এসেছে।'

সত্যবান উঠে বসল। সমুদায় দিক আর অরণ্যানী নিরীক্ষণ করতে লাগল। বললে, 'সুমধ্যমে, এখন বেশ মনে করতে পারছি। কাষ্ঠপাটন করতে এসেছিলাম তোমার সঙ্গে। শিরঃপীড়ায় কাতর হয়ে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়েছিলাম, তোমার বাহুবন্ধনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তার পর। তার পর স্বপ্ন কি সত্য কিছুই জানি না, ঘোর তিমিরবর্ণ মহাতেজা পুরুষকে দেখলাম। সে কে? যদি তুমি কিছু জানো তো বলো।'

'কাল বলব। এখন তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল। তোমার মা বাবা উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছেন।'

'কিন্তু ভয়ঙ্কর বন অন্ধতমসে আচ্ছন্ন। কি করে পথ দেখবে?'

'তবে থাক, আজকের রাত এখানে বসেই কাটিয়ে দিই। তুমি পীড়িত, দুর্বল, পথ চলতে অসমর্থ। ঐ দেখ, এখানে-ওখানে শুষ্ক তরু জ্বলছে, ওখান থেকে আগুন এনে কাঠ জ্বালাই, সে আগুনে তুমি তোমার শরীরগ্লানি অপনোদন করো।' সাবিত্রী উঠে পড়ল।

'না, না, এখানে রাত কাটাব না। মা-বাবার কাছে ফিরে যাব।' সত্যবান অস্থির হয়ে উঠল, 'এখনো বাড়ি ফিরিনি, না জানি কতই ব্যাকুল হয়েছেন আমার জন্যে। দু'জনেই বৃদ্ধ হয়েছেন, তা ছাড়া আমার বাবা নয়নহীন। আমিই তাঁদের যষ্টি-স্বরূপ। তাঁদের জীবনেই আমার জীবন। তাঁদের ভরণপোষণ ও প্রিয়ানুষ্ঠানই আমার একমাত্র ধর্ম।'

গুরুপ্রিয় ধর্মাত্মা সত্যবান পিতামাতার উদ্দেশে কাঁদতে লাগল। সাবিত্রী তার অশ্রুমার্জনা করে রাত্রির উদ্দেশে বললে, 'যদি আমি কোনো তপশ্চর্যা করে থাকি তা হলে হে শর্বরি, আমার শ্বশ্রূ শ্বশুর ও স্বামীর পক্ষে কল্যাণকারিণী হও। আমি যে স্বৈর ব্যবহারেও কখনো মিথ্যা বলিনি, আজ সেই সত্য তাঁদের অবলম্বন হোক।'

'আমাকে শীগগির তাঁদের কাছে নিয়ে চল। যদি দেখি তাঁদের কিছু অমঙ্গল হয়েছে তা হলে এ জীবন আর রাখব না। আমি এখন সুস্থ ও প্রকৃতিস্থ হয়েছি, বরারোহে, তুমি এখন অগ্রসর হও।'

কেশপাশ দৃঢ়বদ্ধ করে দু' বাহু দিয়ে সবলে স্বামীকে টেনে তুলল সাবিত্রী। ফলের থলে আর কাঠ কাটবার কুঠার তরুশাখায় ঝোলানো ছিল, তুলে নিল। নিজের কাঁধে সত্যবানের বাহু নিবেশিত করে দক্ষিণ হাতে তাকে আলিঙ্গন করে ধীরে ধীরে এগুতে লাগল।

এগুতে লাগল মৃত্যুত্তীর্ণ হয়ে। নবাবির্ভাবের প্রাণলোকে।

ঠাকুর বললেন, 'এই তোর দুই দেবতা, মা আর বাবা। এদের ছেড়ে তুই কোথায় যাবি? কোন বনে, কিসের সন্ধানে?'

'বাবা-মা কত বড় গুরু।' আবার বললেন ঠাকুর। 'রাখাল আবার জিগগেস করে যে, বাবার পাতে কি খাব? আমি বলি সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে বাবার পাতে খাবি না? তবে কি জানো? যারা সৎ তারা উচ্ছিষ্ট কাউকে দেয় না। এমন কি কুকুরকেও না।'

রাম এসে নালিশ করল ঠাকুরের কাছে। 'বাবা গোল্লায় গেছেন।'

বাবার অপরাধ দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন।

'শুনলে?' ঠাকুর ভক্তদের দিকে তাকালেন। 'বাবা গোল্লায় গেছেন আর উনি ভালো আছেন।'

বিমাতার এখন বয়স হয়েছে তবু রামের রাগ পড়েনি। বলে, 'একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে। বলি, বাপের বাড়িতে গিয়ে থাকুন, তা নয়!'

'তোমার স্ত্রীকেও অমনিধারা বাপের বাড়িতে থাকতে বলো না।' কে এক জন টিটকিরি দিয়ে উঠল।

'এ কি হাঁড়ি-কলসী গা?' ঠাকুর সহাস্য প্রতিবাদ করলেন: 'হাঁড়ি এক জায়গায় সরা আরেক জায়গায়? এ যে শিবশক্তি। এদের তো একত্র স্থিতি। বেশ তো, বাপের বাড়ি কেন, আলাদা বাড়ি করে দাও না। মাস-মাস খরচ দেবে।'

'কিন্তু বাপ-মা যদি কোনো গুরুতর অপরাধ করেন, তাহলেও কি তাঁদের ত্যাগ করা যাবে না?' কে আরেক জন জিগগেস করল।

'কখনো না। মা দ্বিচারিণী হলেও ত্যাগ করবে না মাকে।' ঠাকুর বললেন, 'গুরু-পত্নীর চরিত্র নষ্ট হওয়াতে শিষ্যরা বললে, ওঁর ছেলেকে গুরু করা যাক। আমি বললুম, সে কি গো? ওলকে ছেড়ে ওলের মুখী নেবে! নষ্ট হল তো কি হল। তুমি তাঁকেই ইষ্ট বলে জেনো।'

যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি-বাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।

'মা-বাপ কি কম জিনিস গা?' বললেন আবার ঠাকুর। 'তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম-টর্ম কিছুই হয় না।' যেই বাবা-মা মানুষ করল, তাদের ফাঁকি দিয়ে ছেলে-মাগ নিয়ে যে বেরিয়ে আসে, হলই বা না বাউল-বৈরাগী, আমি বলি ধিক।'

প্রাণ ফিরে পেয়েই সত্যবান চলল তাই তার গৃহে, তার বাপ-মার কাছে। তার যুগ্মদেবতা দর্শনে। কিন্তু প্রাণ ফিরে পেল কার তপস্যায়? কে সে মহীয়সী, কৃতান্ত-নিবৃত্তিনী?

দুদিন নিরম্বু উপবাসে কাটালেন শ্রীমা। তারকেশ্বর মুখ তুলে চাইল না। তবু ছাড়ব না তোমার চৌকাঠ। ঠায় পড়ে রইলেন। তাঁর ব্যাধি সারিয়ে দাও। তাঁকে অক্লেশ-অব্রণ করো।

তৃতীয় দিনের মধ্যযামে, হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন শ্রীমা, হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পেলেন। যেন পর পর বসানো আছে মাটির হাঁড়ি, তা যেন একটার পর একটা কে লাঠির বাড়ি মেরে ভেঙে দিচ্ছে। ঐ শব্দে জেগে উঠলেন শ্রীমা। কই, কিছু নেই তো!

এর তবে মানে কি?

হৃদয়ের গভীরে উত্তর পেলেন শ্রীমা। এ জগতে কে কার স্বামী, কে কার স্ত্রী? যিনি গড়বার গড়েছেন, যিনি ভাঙবার ভাঙবেন। সব সেই কুমোরের দোকানের হাঁড়িকুঁড়ি!

মায়ার মেঘ সরে গেল এক মুহূর্তে। যা হবার হবে যা করবার করবেন, আমি কেন আত্মহত্যা করি? আমার আত্মনিধন নয়, আত্মনিবেদন।

অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে মন্দিরের পিছনে এসে পৌঁছুলেন। হাতড়ে-হাতড়ে পেলেন স্নানকুণ্ড। অঞ্জলি করে জল তুললেন। পিপাসায় কণ্ঠ কাঠ হয়ে আছে। তাই দিয়ে শুষ্ক কণ্ঠ সিক্ত করলেন। দেহে যেন একটু বল এল। হ্যাঁ, এবার ফিরতে পারবেন কাশীপুর।

'দু-ভাই রামলক্ষ্মণ সশরীরে লঙ্কায় যাবে ঠিক করেছে।' ঠাকুর গল্প বলছেন। 'কিন্তু সামনে সমুদ্র, দুস্তার বাধা। লক্ষ্মণের ভীষণ রাগ হয়ে গেল। কি, এত বড় কথা? সমুদ্র আমাদের বাধা দেবে? ধনুর্বাণ উত্তোলন করল। বললে, বরুণকে এক্ষুণি বধ করব। রাম তাকে বুঝিয়ে বললে, ভাই লক্ষ্মণ, চোখের সামনে যা দেখছ সব মায়া, স্বপ্নবৎ। সমুদ্রও মায়া, তোমার রাগও মায়া। একটা মায়া দিয়ে আরেকটা মায়ার বিনাশ করবে, সেটাও মায়া।

সেই নবৎখানার সাধুর কথা মনে নেই? কারু সঙ্গে কথা কইত না, শুধু এক মনে ঈশ্বরের ধ্যান করত। একদিন হঠাৎ আকাশ কালো করে মেঘ এল আর দেখতে-দেখতে সর্বনাশা ঝড় এল হুড়মুড় করে। ঝড়ে উড়িয়ে নিল মেঘ। দেখা গেল আবার সেই আকাশ-ভরা রোদের ঝিকিমিকি। সাধু ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় নাচতে সুরু করল। হাততালি দিতে লাগল আনন্দে।

ঠাকুর বললেন, 'আমি তাকে জিগগেস করলুম, তুমি ঘরের মধ্যে চুপচাপ থাক, হঠাৎ বাইরে বেরিয়ে এসে আনন্দে নৃত্য করছ কেন? তোমার হল কি?'

হল কি! সাধু বললে, মায়ার খেলা হল। চোখের সামনে মায়ার খেলা দেখলুম। এই দিব্যি পরিষ্কার আকাশ ছিল, হঠাৎ কালো মেঘে ছেয়ে গেল দিকদিগন্ত। কোত্থেকে ঝড় এসে উড়িয়ে নিল মেঘ। আবার সেই পরিষ্কার আকাশ।

মায়া শব্দের আসল অর্থ কি? আসল অর্থ হচ্ছে ভগবদিচ্ছা।

শ্রীমা ম্লান মুখে ঠাকুরের পাশটিতে এসে দাঁড়ালেন। ঠাকুর উৎসুক হয়ে জিগগেস করলেন, 'কি গো, কিছু হল?' পরে বুড়ো আঙুল নেড়ে বললেন, 'কিছুই হবার নয়।'

জানো? আমিও সেদিন স্বপ্ন দেখলাম ওষুধ আনতে হাতি গেল। মাটির নিচে ওষুধ পোঁতা, মাটি খুঁড়তে শুরু করেছে হাতি। দিব্যি খুঁড়ছে, ওষুধ এই বেরুলো বলে, এমনি সময় গোপাল এসে ঘুম ভেঙে দিল।

'আচ্ছা, তুমি স্বপ্নটপ্ন দেখ?' ঠাকুর জিগগেস করলেন শ্রীমাকে।

'সেদিন দেখেছিলাম।'

'কি দেখলে?'

'দেখলাম কালী-মা দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু তাঁর ঘাড় কাৎ।'

'মাকে কিছু জিগগেস করলে?'

'বললাম, মা তোমার ঘাড় কাৎ কেন?'

'মা কি বললেন?'

'বললেন, আমার গলায় ঘা।'

'কিছু বুঝলে?'

স্থির নয়নে প্রশান্ত আস্তে তাকিয়ে রইলেন শ্রীমা।

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শন করে ফিরেছে বিবেকানন্দ। বাগবাজারের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। সমস্ত দেহ চাদরে ঢেকে মা এককোণে দাঁড়িয়েছেন। বিবেকানন্দ প্রণাম করল সাষ্টাঙ্গ। বললে, মা, তোমার ঠাকুর কিছু নয়।'

'কেন বাবা, কি হল?'

'একেবারে কিছু নয়! কোনো কিছু শক্তি ধরে না। নিজের অসুখ তো সারাতে পারলই না, আমাদেরও না। একেবারে বাজে ঠাকুর।'

মা ক্ষীণ একটু হাসলেন। কি হয়েছে তাই বল না?

'কাশ্মীরে এক ফকিরের চেলা আমার কাছে আনাগোনা করত।' বললে স্বামীজী। 'তাতে সেই ফকিরের খুব আক্রোশ হল আমার উপর। নিজের চেলাকে ঠেকাতে পারে না, যত রাগ আমার উপর। শেষে ফকির আমাকে শাপ দিল। বললে তিন দিনের মধ্যে তোমার পেটের অসুখ হয়ে এখান থেকে সরে পড়তে হবে। আমি ঠাকুর ভরসা করে নিশ্চিন্ত মনে আছি, ঠাকুরের কাছে কিসের ঐ পাহাড়ী ফকির! কিন্তু কি আশ্চর্য, ঠিক তিন দিনের মধ্যে আমার ঘোরতর পেটের অসুখ শুরু হল আর আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে এলুম। তোমার ঠাকুর কিছুই করতে পারলেন না। সামান্য একটা ফকিরের কাছে হেরে গেলেন।'

'ছিঃ! ছিঃ! মানতে হয় বই কি বাবা!' মা বললেন স্নিগ্ধ স্বরে। 'আমাদের ঠাকুর তো কিছুই ভাঙতে আসেন নি, সব মেনে গিয়েছেন। শঙ্করাচার্যও শুনেছি নিজের দেহে ব্যাধি অংসতে দিয়েছিলেন। তুমি তো জানো সেই ঠাকুরের খুড়তুতো দাদাকে—'

'কে, হলধারীকে?'

'তিনি একবার ঠাকুরকে শাপ দিয়েছিলেন তোর মুখ দিয়ে রক্ত উঠবে। তা উঠেছিল সেই রক্ত। তোমার শরীরে অসুখ আসা আর ঠাকুরের শরীরে অসুখ আসা একই কথা।'

'ও সব কিছুই মানি না। তুমি তোমার ঠাকুরের দিকে টেনে কথা কইছ। আসলে তোমার ঠাকুর কিছুই নয়। যাই কেন না বলো আমি আর মানতে রাজি নই।'

মা বললেন, 'না মেনে থাকবার জো আছে কি বাবা!' তোমার টিকি যে তাঁর কাছে বাঁধা।'

নরেন হাসতে লাগল।

একশো পঞ্চান্ন

সিদ্ধাই দেখিয়ে কি হবে? হরিপদ তাপহরণেরই নাম, সেই দিকে এগুতে পারবে এক পা? জাগাতে পারবে কুলকুণ্ডলিনী?

মূলাধারে সেই সর্পীতুল্য শক্তি ? পদ্ম-মৃণালের মধ্যবর্তী তন্তুর মত অতি সূক্ষ্মা, শঙ্খাবর্তসমা নবীন চপলার মত দেদীপ্যমানা। ভ্রমরমালার গুঞ্জনের মত আবার অস্ফুট মধুর শব্দ করছে। সেই কুণ্ডলকারিণী জীবনদায়িনী শক্তিকে জাগাতে পারবে ?

ঠাকুর বললেন, সেই সমুদ্রপারের সাধু ঝড় থামাতে গিয়ে জাহাজডুবি করেছিল। জানো না সেই কাহিনী ?

সাধু সিদ্ধ হয়েছে। একদিন বসে আছে সমুদ্রের ধারে, ঝড় উঠল। ঝড়ে তার খুব অসুবিধে হচ্ছে দেখে সে বলে উঠল, ঝড়, থেমে যা। তার কথা মিথ্যে হবার নয়। বলা মাত্রই ঝড় থেমে গেল। তাতে ফল হল এই, পাল তুলে একটা জাহাজ যাচ্ছিল, হাওয়া বন্ধ হওয়ামাত্রই জাহাজ টুক করে ডুবে গেল। অনেক লোক ছিল জাহাজে, মারা পড়ল। তার জন্তে যে পাপ হল তা বর্তাল এসে সেই সিদ্ধপুরুষে। সিদ্ধাই তো গেলই, নরকবাসের থেকেও রেহাই পেল না।

চিনু শাঁখারির কথা মনে আছে ? কামারপুকুরের সেই বুড়ো সাধক, পরম বৈষ্ণব। ছেলেবেলায় যার পায়ে পড়ে বলেছিল রামকৃষ্ণ, ওরে তোদের পায়ে পড়ি, একবার তোরা হরিবোল বল। দেখা হলেই রামকৃষ্ণকে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করত আর বলত, ওরে গদাই, তোকে দেখে আমার গৌরকে মনে হয়।

একবার হল কি শোনো।—কতকগুলি সাধু ঘুরতে-ঘুরতে কামারপুকুরে একদিন চিনুর বাড়ীতে গিয়ে অতিথি হল। তখন আমের সময় নয়, তবু সাধুদের কি বেয়াড়া সাধ, তারা মৌরলা মাছ দিয়ে আমের টক খাবে। চিনু তো মাছ যোগাড় করল কিন্তু আম কোথায় ? অতিথি নারায়ণ, তাদের ইচ্ছা তো আর অপূর্ণ রাখা যায় না ? চিনু বিমূঢ়-বিহ্বল হয়ে পড়ল। কেমন করে মুখ রাখি, কেমন করে ধর্মহানি থেকে রক্ষা পাই ? কাতর হয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চিনু শেষকালে একটা আমগাছের তলায় এসে দাঁড়াল। গলায় কাপড় দিয়ে মাথা কুটতে কুটতে বললে, আমার ভিটের আজ ছলনা করতে অতিথিরূপে নারায়ণ এসেছেন। এসে বলছেন আম দিয়ে মাছের টক খাবেন। আমি দীনহীন পথের কাঙাল, অসময়ে আম কোথা পাব ? কেমন করে তুষ্ট করব তাঁদের ? দেবতার যদি দয়া না হয় আমি কি করতে পারি ?

আশ্চর্য, সত্যি-সত্যি গুটিকতক কাঁচা আম ঝরে পড়ল গাছ থেকে।

ঠাকুর শুনতে পেলেন সেই কাহিনী। চিনুকে বললেন, 'ছি দাদা, বিভূতি সিদ্ধাই, থাক থুঃ। অমন আর কোরোনি। তা হলে বেটা-বেটিরা তোমার মাথা খাবে। খবরদার ও-সব আর করতে যেওনি, ও সবে মন দিলে মন নেমে যাবে।'

হীনবুদ্ধি লোকেই সিদ্ধাই চায়। ব্যারাম ভালো করা, মোকদ্দমা জেতানো, নদীর উপর দিয়ে চলে যাওয়া, আগুনের উপরে দাঁড়িয়ে থাকা, আরেক দেশে কে কি বলল তাই ঠিক বলতে পারা—এই সব ইন্দ্রজাল। এই সবে আছে কি !" প্রতিষ্ঠা আর লোকমান্য হতে পারে, কিন্তু সে বন্ধনে পড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে সরে পড়ে। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া আর কিছু চায় না।

সত্যিকারের সাধুর লক্ষণ কি ?

কৃপালু অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু। সত্যই যার বল, যার চিত্ত সর্বজীবে অসূয়াহীন। সর্বোপকারক। বিষয়ে অক্ষুব্ধ, সংযত, মৃদু, শুচি আর অকিঞ্চন। অনিচ্ছুক, মিতভোগী, শান্ত, স্থির আর শরণাগত। অপ্রমত্ত, গভীরাত্মা আর যে ষড়গুণ জয় করেছে। নিজে মানাকাঙ্ক্ষী নয়, বরং অমানী মানদ দক্ষ, অবঞ্চক, কারুণিক আর কবি অর্থাৎ সম্যকবোদ্ধা।

আর ভক্তের লক্ষণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণ বললেন, আমার বিগ্রহ ও আমার ভক্তকে দর্শন স্পর্শন অর্চন আর পরিচর্যা। স্তুতি আর গুণকর্মের অনুকীর্তন। আমার কথা শুনতে শ্রদ্ধা, আমাকে অনুধ্যান। আমাতে লব্ধ বস্তুর সমর্পণ, দাস্যভাবে আত্মনিবেদন। আমার জন্মকর্মকথন, আমার পর্বানুমোদন। অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব আর কি করেছি তার পরিকীর্তনে অস্পৃহা।

এই ভক্তি লাভ হবে কি করে ?

একমাত্র সাধুসঙ্গে।

সর্বমঙ্গলনাশক সাধুসঙ্গ।

যোগ সাংখ্যধর্ম স্বাধ্যায় তপস্ত্যাগ, পূর্ত, দান, ব্রত, যজ্ঞ, ছন্দ, মন্ত্র, তীর্থ নিয়ম কিছুই আমাকে বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে সাধুসঙ্গ। তুমি শুধু সাধু হও, আমি তোমার সঙ্গী হব। তুমি শুধু মধুর হও আমার সঙ্গে তোমার অপরিচ্ছিন্ন মৈত্রী।

বৃত্র, প্রহ্লাদ, বৃষপর্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ সুগ্রীব, হনুমান, জাম্ববান, জটায়ু, আর কুব্জা—এদের কি ছিল ? এরা বেদ পাঠ করেনি, উপাসনা করেনি, এদের ব্রত ছিল না। তপস্যা ছিল না, শুধু নিজ সঙ্গ দ্বারা, শুধু সাধুসঙ্গ হেতু পেয়েছিল আমাকে।

[ক্রমশঃ।

বাংলা কীর্তন

"বাংলায় একদিন বৈষ্ণবভাবের প্রাবল্যে ধর্মসাধনায় ও ধর্মরস-ভোগে একটা ডিমোক্রেসির যুগ এল। সেদিন সম্মিলিত চিত্তের আবেগ সম্মিলিত কণ্ঠে প্রকাশ পেতে চেয়েছিল। সে প্রকাশ সভায় আসরে নয়, রাস্তায় ঘাটে। বাংলার কীর্তনে সে জন-সাধারণের ভাবোচ্ছ্বাস গলায় মেলাবার খুব একটা প্রশস্ত জায়গা হল।"—রবীন্দ্রনাথ

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

১

সোয়ান-লেক নাচ—'সোয়ান-লেকের' বাংলা নাম কি দেবেন, হংসবাপী? চুলোয় যাকগে, নাম খুঁজে কি হবে? এই নাচটার ভারি নামডাক। সে-বার কলকাতায় এসে এই নাচ ওরা দেখিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বলশই থিয়েটারের ব্যাপারই আলাদা। অত বড় স্টেজ আর অমন তোড়জোড় দুনিয়ার আর কোথায় পাবেন? বাইরে যত আয়োজন করেই দেখাক, বলশইর কাছে দাঁড়াতে পারবে না।

কাল রাত দুপুর অবধি বলশই থিয়েটারে পালা দেখে এসেছি, সকালবেলা ব্রেকফাস্ট সেরে আবার চলেছি। ঠিক দশটায় শুরু—পালার সেরা পালা সোয়ান-লেক নাচ। রবিবার আসবে, তারিখটা সতেরোই অক্টোবর। ছুটিছাটা পেলে সকাল বেলাটাও বাদ দেয় না। ঐ যা দেখলাম দেশটা জুড়ে—খাটে মানুষ অসুরের মতো, খায় যেন এক এক রাক্ষস। হাসবে তো কানে তালা লেগে যাবে আপনার, সভয়ে ছাতের দিকে তাকাবেন—ফাটল ধরে গেল কি না। আর আমোদে মজবে, দেখবেন, মধুপায়ী পিঁপড়ের সারির মতন লাইন দিয়ে আছে। ভাবনাচিন্তার পোকামাকড় মগজে ঢুকবে, তার জন্য দু-দণ্ড ঠাণ্ডা হয়ে বসতে হবে তো মানুষটাকে—কিন্তু সে ফুরসৎ মাটি নেবার আগে বড় একটা ঘটে ওঠে না।

এই থিয়েটারে কাল এসে গেছেন—ঘরবাড়ির কথা বলতে হবে না, দু-কথায় পালাটার একটু আঁচ দিয়ে যাই। প্রোগ্রাম দিয়ে গেল নিতান্ত সাদামাঠা—না ছবি, না বুরুশের বাহার, বাজে কাগজে পাতা দুই ছাপা রুশীয় হরপে। পাকিয়ে কান চুলকানো ছাড়া আমাদের কোন কাজে আসবে না। অতএব পালা দেখে যা বুঝি, টুকে রাখছি তাড়াতাড়ি। আলো-নেবানো হল—একাগ্র দৃষ্টি আমার এবং সর্ব মানুষের ঐ স্টেজের দিকে বিশেষ মাত্র দৃষ্টি ফেরাবার জো নেই, সেইটুকুর মধ্যেই না জানি কোন কাণ্ড ঘটে যাবে। স্টেজের দিকে চোখ, এবং হাতের কলম অন্ধকারে নিজের তাগিদে কাজ করে যাচ্ছে। প্রামচেট ধরেছেন কখনো, খানিকটা সেই কায়দা। পরের সারির লেখা বেঁকে এসে আগের সারির উপর দিয়ে চলে গেছে, পাঠোদ্ধার করতে বসে আজ এখন জান বেরিয়ে যাচ্ছে।

রাজার প্রমোদোদ্যান। রাজপুত্র বড় হয়েছে, বিয়ে দিতে হবে। পাত্রী পছন্দ হবে কাল। আসন্ন শুভ ব্যাপারে রাজা রাণী ও পুরনারীদের আনন্দের অবধি নেই। রাজপুত্রের কিন্তু ভাল লাগে না—কি জানি কেন, উৎসাহ নেই মনে। বিষাদের বাসনা। হঠাৎ এক হংস এলো উড়ে। ছুটে গিয়ে রাজপুত্র তীরধনু নিয়ে এলেন। ধোঁয়া হয়ে গেল চারিদিক, কুয়াশায় ঢেকে গেল। লীলায়িত ভঙ্গিতে হংস উড়ে চলল, রাজপুত্র পিছু পিছু ছুটেছেন।

নাচে নাচে পালা এগিয়ে চলেছে। আর বাজনা—সে কী অপরূপ বাজনা! কথা দিয়ে কতটুকু আর অনুভূতি জাগানো যায়। সে হল নিতান্তই সীমানায় ঘেরে বাঁধা। বাজনা পাত্র-পাত্রীর মধুময় মনখানি মেলে ধরে দর্শকের সামনে; হল-ভরা মানুষ কাঁদে, হাসে, স্ফূর্তিতে ডগমগ হয়।

তার পরে আবার পর্দা উঠল। দ্বিতীয় দৃশ্য। ঘন অরণ্য—তার ভিতর প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। পিছন দিকে লতা পাতা জঙ্গল-আগাছার ভিতরে লেক। ধীর বাতাসে লেকের জলে অল্প অল্প ঢেউ দিয়েছে। জঙ্গলের কোন অলক্ষ্য অংশ থেকে শত হংসীরা সাঁতরে আসছে—একের পিছনে এক। সগর্ব গ্রীবাভঙ্গিতে হংসীদল মন্থর ভাবে ভেসে ভেসে জলকেলি করছে। রাজপুত্র তীরধনু নিয়ে শিকল ভেঙে শিকারে এসে দাঁড়াল। তীর ছুড়বে কি—দেখেই তাজ্জব। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হল; বনভূমি আঁধার হয়ে আসছে। হংসীর দল জল থেকে উঠছে। ডাঙায় উঠে আর হংসী নয়, হয়ে গেল এক এক লাবণ্যমতী মেয়ে। নাচছে তারা, আনন্দ করছে।

সেই ভাঙা দুর্গের ভিতর শয়তান থাকে—নীল পোষাক, নীল চেহারা, বড় বড় পাখনা। বেরিয়ে এসে সে শ্যাওলা-ধরা এক দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়াল। মিশে গেছে একেবারে দেয়ালের সঙ্গে, বড় বজ্জাতি ঐ শয়তানের—মায়ামন্ত্রে মেয়েগুলোকে সে হংসী করে দিয়েছে।

এক রাজহংসী এলো সকলের পরে। জল থেকে উঠে এলো ডাঙায়। তার আশ্চর্য রূপ আর নয়ন ভুলানো নাচ দেখে রাজপুত্র পাগল হল। রাজপুত্র বলে কি—আপনি আমি, এবং যত লোক বসে আছে সবাই। পার্টে নেমেছে গোলোক কিনা, স্ট্যালিন প্রাইজ পাওয়া ব্যালেরিনা—পাগল না হয়ে উপায় আছে? স্ট্যালিন প্রাইজ পাওয়া আরো সব আছে—তারাও এই পার্টে নামে। একজন হয় মায়া—সে আমাদের ভারতে এসেছিল।

নাচছে কন্যা ও সখিবৃন্দ—রাজপুত্র মুগ্ধ হয়ে দেখছে। নিজেই শেষটা ভিড়ে গেল নাচের মধ্যে। হংসকন্যা ও রাজপুত্র যুগলে নাচছে। প্রেমের কত ছলাকলা! রাজপুত্র বলল, ওই মেয়ে ছাড়া কোনদিন কাউকে সে ভালবাসেনি; ভালবাসবে না কাউকে আর এ জীবনে। দেয়ালের সঙ্গে পাখনা মিলিয়ে দেয়ালের গায়ে লেপ্টে থেকে শয়তান চেয়ে চেয়ে সমস্ত দেখছে। ক্রুর দৃষ্টি থেকে আগুনের হল্কা বেরুচ্ছে যেন। চলছে নাচ—নাচের পর নাচ। সারা রাত্রি ধরে এই নাচের উৎসব। ভোর হয়ে এলো, আকাশে অরুণ-আভা। মেয়েগুলো চক্ষের পলকে অমনি যেন হাওয়ায় মিশে যায়। দেখতে পাচ্ছি, হংসীর দল লেকের জলে ভেসে ভেসে অদৃশ্য আস্তানায় চলেছে। একের পর এক অদৃশ্য হয়ে গেল—শুধু অরণ্য আর লেকের জল। আর আধ-অন্ধকারে বিদীর্ণ ভয়াল দুর্গ।

পরের দৃশ্যে রাজবাড়ির এক প্রকাণ্ড হল। রূপকথায় রাজবাড়ি ঠিক যেমনটি হতে হয়। সেই কনে পছন্দর উৎসব। তা-বড় তা-বড় অতিথিরা আসছে—কত দেশের মানুষ, কত বিচিত্র সাজ সজ্জা। ক্লাউনেরা এসে জুটেছে—মেয়ে ক্লাউন, পুরুষ ক্লাউন। নেচে নেচে তারা অতিথিদের স্ফূর্তি দিচ্ছে। কনেরা আসছে এইবার একটি-ছটি করে—এদের ভিতর থেকে রাজপুত্র পছন্দ করবে। নাচছে কনেরা—স্পেনের নাচ, হাঙ্গেরির নাচ, ইরাণের নাচ, পোলিশ নাচ। কনেরা নিজ নিজ দেশের নাচ দেখাচ্ছে। রাজপুত্র মুখ বাঁকাচ্ছে, কাউকে পছন্দ নয়। রাজা, রাণী ও অতিথিরা ম্রিয়মান—এত বড় আয়োজন পণ্ড হয়ে যায় বুঝি!

হয়েছে—কনে পছন্দ হয়েছে এবার। এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, অবিকল সেই হংসকন্যা। রাজপুত্র হাত ধরে নিয়ে এলো। চারি-দিকে উল্লাস, নাচে নাচে ছয়লাপ। মেয়েটা কিন্তু ছদ্মবেশিনী। শয়তানের মেয়ে—বাপের হুকুমে হংসকন্যার মূর্তি ধরে এসেছে। রাজপুত্রের সঙ্গে নাচছে—অপূর্ব নাচ, হাততালি পড়ছে বারবার চতুর্দিকে। শয়তান-কন্যার পার্টও গোলোবকিনা নিয়েছে।

হঠাৎ দেখা যায়, সেই আসল হংসকন্যা। শোকাহত মূর্তি। মুখের কথা নয়, কিন্তু আকুল দৃষ্টির মধ্য দিয়ে বলছে—তুমি যে বলেছিলে আর কাউকে ভালবাসবে না জীবনে। সেই কন্যা রাজহংসী হয়ে দূরে দূরে ভেসে চলে গেল।

শেষ দৃশ্য। অন্ধকার অরণ্য, মেঘভরা আকাশ। দেয়া ডাকছে কড়কড় আওয়াজে। হংসকন্যা মারা গেছে—শোক-ব্যাকুল সখীরা। কান্নার নাচ—নাচের মধ্যে ভেঙে ভেঙে পড়ছে। রাজপুত্র ছুটে এলো। লড়াই শয়তানের সঙ্গে—শয়তান ও তার দলবল মারা গেল। বেঁচে উঠল হংসকন্যা। দয়িতের সঙ্গে চির-মিলন, তারই মনবিমোহন নাচ। প্রেম ও জীবন অবিনাশী; শয়তান হারবেই শেষ অবধি, ধ্বংস হয়ে যাবে। পালার মর্মকথা এই।

বেরিয়ে এসে দেখি, একটা বাজে। নাকে-মুখে নাক গুঁজে এখনই ছুটবো হাসপাতালে। পাঁচুগোপাল ভাদুড়িকে দেখতে যাবো। এক বছরের উপর আছেন, দেশে হৃদযুদ্ধ দেখে শেষটা এখানে পাড়ি দিয়েছেন। মস্কোয় পা ছোঁয়ানো অবধি খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছে; চাক্ষুষ দেখবার ব্যবস্থা করেছে আজ।

হাসপাতাল জায়গা—মিছিল করে যাওয়া চলে না, সাকুল্যে চার জন। আমি, ধীরেন সেন, জ্ঞান মজুমদার—এবং যাচ্ছেন এলাহাবাদের প্রকাশ গুপ্ত। গুপ্ত মশায় য়ুনিভার্সিটির অধ্যাপক, উদার ও অমায়িক—লেখাটেখারও অভ্যাস আছে। বিশেষ ভাবে তাঁকে নেওয়া হচ্ছে—নয় তো একেবারে বাঙালি জাতের ঘরোয়া ব্যাপারের মতো দাঁড়ায়। অনেক পথ ঘুরে একটা খালি মতন জায়গায় গাড়ি থামল। প্যাচপেচে বৃষ্টি—এই সময়টা মস্কোর বা প্রতিক। গাড়ি থামিয়ে দোভাষি সরে পড়ল কোন দিকে। আর জনহীন পথের উপর মোটরের গর্ভে আমরা বসে আছি তো আছিই। চুরি-ডাকাতির কাজে এসেছি যেন, চর হয়ে আগে-ভাগে গুলুক-সন্ধান নিতে গেল।

ফিরে এসে দোভাষি গাড়ি এগিয়ে নিতে বলল। গলি ছাড়িয়েই বড় রাস্তা, এবং হাসপাতালের সদর দরজা। যথারীতি ওভারকোট খুলছি। তাতেই রেহাই নয়—জুতো খুলে ওদের ঘরের জুতো পরতে হল। হাতের কোলিও-ব্যাগ কেড়ে নিল এক টানে। পরনের কোট-পাৎলুন দয়া করে ছাড়তে বলল না, তার উপর সাদা আলখেল্লা চড়িয়ে আগা-পাস্তলা ঢেকে দিল। অপারেশনের সময় ডাক্তারে যে বস্ত্র পরে। এই আজব সজ্জায় সাজিয়ে সিঁড়ি দেখিয়ে উপরে নিয়ে চলল। মতলব বুঝলেন তো—রোগ-বীজাণু যদি এসে ধরে, যে ওদেরই জুতো-আলখেল্লায় লেপটে গিয়ে হাসপাতালের চৌহদ্দির মধ্যে থেকে যাবে, বাইরে বেরুবার কায়দা পাবে না।

রুগ্ন বিশীর্ণ মুখে আগুনের মতন প্রদীপ্ত হাসি—পাঁচুগোপাল তাড়াতাড়ি বিছানার উপর উঠে বসলেন। ভিন্ন ঘর থেকে আর এক বাঙালি রোগি এসে বসে আছেন—মুঙ্গেরের দিকে বাড়ি। এবং কি আশ্চর্য—অধমের লেখা পড়ে পরিচয়ের জন্য এসেছেন তিনি। আর আছেন দক্ষিণ-ভারতের এক তরুণী। আমরা এদিকে চার, এবং ওঁরা তিন—হাসপাতালের ঘরে দিব্যি এক ভারতীয় বৈঠক শুরু হল।

জমে গেল এর পরে কম্যুনিষ্ট পার্টির সেক্রেটারি অজয় ঘোষ এসে পড়লেন যখন। রোগি তিনিও—হাসপাতালের নন—মস্কোর কাছাকাছি শহরতলী জায়গায় তাঁকে বাসা দিয়েছে। আমাদের মধ্যে ডক্টর ধীরেন সেন হলেন রাষ্ট্রনীতির ধুঁদে অধ্যাপক, আর ওদিকে অজয় ঘোষ—'কেমন আছেন' 'ভাল আছি,' থেকে তর্কাতর্কি অচিরে তুমুল হয়ে উঠল।

অলক্ষ্যে চোখ ইসারা ইত্যাদি হয়েছে কিনা বলতে পারিনে—নার্স মেয়েটি চা বানিয়ে আনল, তৎসহ ফল ও কেক-বিস্কুটের বিপুল সম্ভার। আরে মশায়, রোগি দেখতে এসেছি—মেয়ে দেখতে এলেও তো এত দূর করে না। পাঁচুগোপাল না-না—করেন। এমন-কিছু নয়—আমাদের জন্য যা সব আসে, তাই থেকে অতি-সামান্য এই দিয়ে দিয়েছে।

ওরে বাবা, এই নাকি পথ্যের যৎসামান্য নমুনা! রোগি না রাক্ষস, কি ভেবেছে কে জানে! আরও দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে চতুর্দিক। তকতকে ঘর ঝকঝকে আসবাবপত্তোর—মায় রোগির মনোরঞ্জনের জন্য ঘরে ঘরে একটা করে টেলিভিসন! সর্বক্ষণের জন্য নার্স মোতায়েন আছে—হুকুমের তোয়াক্কা রাখে না—আগে থাকতেই দরকার জুগিয়ে যাচ্ছে। ঐ নিরীশ্বর দেশের হাসপাতালের ঘরে বসে মন আমার হঠাৎ গাঁয়ের হরিতলায় উড়ে চলে গেল। গ্রামে ঢোকবার মুখে দেখতে পাবেন দু-খানি বাজুর মতো দু-দিকে অতিকায় দুই শাখা বিস্তার করে বহু প্রাচীন এক বট-অশ্বত্থ। আহা, গাছ বলি কেন,—গাছ কখনো নন—জাগ্রত গ্রামদেবতা গ্রাম রক্ষা করছেন চিরকাল ধরে। ছোট বয়স থেকে কত কি দেখেছি ঠাকুরের কাছে—আমি ভুলে গেছি, ঠাকুরেরও খেয়াল নেই নিশ্চয়। সেই হরিতলায় মনে পড়ে মাথা খুঁড়ে আজ বলছি, থাকগে—এদিনে জোগান দিয়ে উঠতে পারলে না তো কাজ নেই সে ঘরের। নিদেনপক্ষে একটা অনুগ্রহ করো—খুব এক আচ্ছা অসুখে ফেলে দাও আজকালের মধ্যে। যে অসুখ দু-চার বছর না সারে। তবে সে এইখানে এনে তুলবে, এনে জামাই আদরে রাখবে...

পাঁচুগোপালও অকস্মাৎ আমার ঐ প্রবন্ধের কথা তুললেন। আপনি মস্কোয় এসেছেন, হাসপাতালে আমাদের কাছে

আসছেন খবর দিন—তখন থেকে আপনার গাঁয়ের কথা মনে আসছে। আপনি অবশ্য জানেন না—

খুব জানি আজ্ঞে। জেনে-শুনে বোবা সাজতে হল। একেবারে বোবা হয়ে ছিলাম সে আমলে—

ঘোরতর ইংরেজি আমল তখন। আমার এক ভাইপো স্বদেশি করত। পাঁচুগোপাল ফেরারি, ভাইপোর বন্ধু পরিচয়ে আমাদের গাঁয়ের বাড়ি গিয়ে উঠলেন তিনি। ভারি দুর্গম জায়গা, রেল লাইন থেকে বিশ পঁচিশ মাইল। খুদ যমরাজেরও তো নিশানা পাওয়ার কথা নয়, ইংরেজদের সি-আই-ডি, অতএব কি করতে পারে। পাঁচুগোপাল থাকতেন বাইরের একখানা খোড়ো ঘরে—সমস্তটা দিন ঘরের মধ্যে শুয়ে বসে কাটাতেন। গাঁয়ের লোক কেউ কেউ জেনেছিল, কলকাতার এক ভদ্রলোক এসে অসুখ হয়ে পড়েছেন। কি অসুখ তা কেউ জানে না, ডাক্তার কবিরাজের আনাগোনা নেই, ঠিক দুপুরে এদিক ওদিক তাকিয়ে বাড়ির মেয়েরা খুড়ুৎ করে ঘরের ভিতর ভাত দিয়ে আসেন। ক'দিনের ছুটিতে আমিও বাড়ি গিয়ে শুনলাম অসুস্থ মানুষটির কথা। তার পর চোখেচোখি হয়ে গেল এক রাত্রিবেলা। রাত্রি গভীর হলে রোগটা বোধ করি সাময়িকভাবে আরোগ্য হয়ে যেত—বিলের ধারে তিনি ঘুরে বেড়াতেন, কখনো কখনো গ্রামান্তরে চলে যেতেন। ভোর হবার আগে ফিরে আসতেন আবার। সেই বেরুবার মুখে দেখা হয়ে গেল, শ্রীরামপুর অঞ্চলে তার আর আগে দেখেছি আমি তাঁকে। কিন্তু চিনলাম না, চিনতে গেলে চলে না। অজানা অচেনার পদে মানুষের বেলা যেমন করি—অবহেলায় ঘাড় ফিরিয়ে সরে এলাম। এমন আরো কত দেখেছি! বাল্য বয়স থেকে দেখে আসছি। দেশে দেশে যুগে যুগে ইতিহাস পড়েন এঁরা, জন্ম থেকে সর্ব মানুষের কোন দায় কাঁধে নিয়ে এসেছেন, নির্যাতনের অবশেষে ভঙ্গুর দেহটুকু চিতার আগুনে সমর্পণ করার আগে যে দায় থেকে মুক্তি নেই। আমার লেখা চীনের বইটি দিলাম পাঁচুগোপালকে—শুয়ে শুয়ে বিচরণ করুন। আবার আসব, যাওয়ার আগে নিশ্চয় দেখা হবে—বারম্বার বলে বিদায় নিয়ে এলাম। ভুয়ো প্রতিশ্রুতি, তিনি বুঝেছিলেন বোধ হয়। জেনে বুঝে একটু হাসলেন।

হোটেলে এসে খুসার মিলল। আকাশ সাফ হয়েছে। পিছনের ওঁরা তাসখন্দে এ ক'দিন বন্দী হয়েছিলেন কাল উড়বেন। সন্ধ্যা নাগাদ পৌঁছে যাচ্ছেন তাতে আর ভুল নেই। অতএব মস্কো-বিহার আপাতত ইতি। সকলে একত্র হলেই বেরিয়ে পড়া যাবে। যাবেন কোন দিকে এবারে ভাবতে লাগুন। নেমন্তন্ন এসেছে পাকিস্তান থেকে। মুসলমানি দেশ।—জারের তাঁবেদারিতে বোখারার আমির মধ্য এশিয়ার তামাম অঞ্চল জুড়ে রাজত্ব করতেন। বিপ্লবের গুঁতোয় পালিয়ে আমির মশায় এই তল্লাটে ভর করলেন শেষটা। বিস্তর লড়ালড়ি চলল। সমস্ত ঝামেলা চুকে বুকে ১৯২১ অব্দের ১৬ অক্টোবর নতুন রাষ্ট্রের পুরোপুরি চালু হল এখানে। এবারে পঁচিশ বছর পুরছে—রজতজয়ন্তী উৎসব। উৎসব দেখতে ভারতীয়দের ডেকেছেন ওঁরা।

কেউ কেউ আমাদের নাক সিঁটকাচ্ছেন। বদ্ধি জায়গা—এই সেদিন অবধি অশিক্ষা ও ধর্মের গোঁড়ামি নিয়ে সকলের পিছনে পড়ে ছিল। তা ছাড়া ধর্ম করে এক দূর এসে পত্রপাঠ ফিরতি হতে

যাব কেন? পৃথিবীর ছাদ পামির—সেই পামিরের পায়ের গোড়ায় ঠিক দক্ষিণে আফগানিস্থান; এবং পূর্ব দক্ষিণে সরু একটুকু ফালি পার হয়ে কাশ্মীর ও পশ্চিম-পাকিস্তান। ভিন্ন রাষ্ট্র হলেও এখনো অনেক প্রাচীন তাজিক আফগান এলাকায় মাজার শরীফে তীর্থ করতে আসেন। অতএব বলছেন ওঁরা মিছা নয়—প্রায়তো বাড়ির উঠোন। তার চেয়ে চলুন দেখচি—কৃষ্ণ সাগরের উপরে প্রমোদনগরী। ইউরোপের ঐ প্রান্তটি চষে বেড়াইগে চলুন।

আমরা না না করে উঠি, এবং দলে ভারী আমরাই। যাঁরা সোবিয়েতে আসেন, ভাল ভাল কয়েকটা জায়গা ঘুরে উত্তম আহারাদি করে ফিরে চলে যান। কপালক্রমে দুর্গম অঞ্চলের নিমন্ত্রণ এসেছে তো এ মওকা ছেড়ে দেবো না। দুর্গম আর বলি কেন, ফূর্তিতে আকাশে আকাশে উড়ে বেড়াব। সে ছিল বছর ত্রিশ আগেরও বটে, পলায়িত আমির বহাল তবিয়তে তাই ঠাঁই পেয়েছিলেন। ব্যবস্থা করুন মশাই, আমরা যাবো—আলাদা দল হয়ে যাবো আমরা। এ আর কি বলছেন—শীতের মরশুম না হলে সাইবেরিয়ায় ধাওয়া করতাম।

পাকাপাকি হচ্ছে না সকলে না এসে পড়া পর্যন্ত। ওঁরা তো কবুল জবাব দিয়ে বসে আছেন, আশা বাড়িয়ে কিছু করতে পারবেন না। হুকুম করব আমরা, যথাসম্ভব তামিল করে যাবেন।

যাই হোক, সন্ধ্যাটা কেন বরবাদ যাবে, সিনেমায় চলুন। সিনেমার নামে কেউ গা করে না, ও বস্তু আমাদের অলিগলিতে। তার চেয়ে শীতের দেশে খাটের উপর কম্বল জড়িয়ে পা দোলানো মন্দ হবে না। আজ্ঞে না—সে বস্তু নয়, থ্রি-ডাইমেনসন ছবি। আপনারা যা দেখেন, সে হল চ্যাপটা ছবি, পর্দার গায়ে লেপটে থাকে। এ ছবি রীতিমতো গায়ে-গতরে আছে। সিনেমা নয়, জ্যান্ত মানুষের থিয়েটারই দেখছেন যেন। মেরু অঞ্চলও আজব সাজ-পোশাকের মানুষদের নিয়ে এক গল্প, রঙে রঙে ছয়লাপ। পর্দার উপরে নয়, পর্দা ছেড়ে মানুষগুলো যেন বেরিয়ে এসেছে। অন্ধকার হলের মধ্যে, মনে হচ্ছে, আপনার গা ঘুঁষে আমার কোল ঘেঁষে তাদের অবাধ নিঃশব্দ চলাচল। বল খেলছে, গুলি করছে—মাথা কাত করি, এই রে আমারই ঘাড়ে এসে পড়ল বুঝি! তিন দিক দিয়ে তিনটে যন্ত্রে একসঙ্গে ছবির প্রক্ষেপ—পর্দার ঠিক সামনাসামনি বসেছেন তো খুব ভাল দেখবেন; এপাশ-ওপাশ একটু বেয়াড়া লাগবে। মোটের উপর এই জেনে বুঝে এসেছি, আগামী দিনের ছবি ঐ। পর্দার উপরে লেপ্টে-যাওয়া ছবি আর ভাল লাগবে না। সেকালের বোবা ছবি এখন যেমন নজরে ধরে না। বিমল রায় কে—আজ্ঞে হ্যাঁ, সিনেমা ডিরেক্টর আপনাদের বড় আদরের বিমল রায়, পরদিন এই মস্কো শহরেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল—তাঁকে বললাম তখন এই কথা।

১০

সৌরাষ্ট্রের এক মেয়র—শান্তি শাহ। সকালবেলা শাহ মশায় আমার ঘরে ফোন করছেন, ভারতীয় সিনেমা দল নানা অঞ্চল ঘুরে মস্কো'য় ফিরেছেন কাল রাত্রে। ব্রেকফাস্ট সেরে যাওয়া যাক চলুক। জানাজানি না হয়, দু-জনে টুক করে চলে যাবো। সিনেমা-দলের সেক্রেটারি রায়ের জানাশোনা লোক, তিনি খবর পাঠিয়েছেন। বাপুরে, হয়তো আজ রাত্রেই চলে যাবেন ওঁরা, দেশের দিকে পাড়ি জমাবেন। সিনেমার অনেককে আমি জানি। তাঁদের কিঞ্চিৎ আলাপ-পরিচয়ের ইচ্ছা—আমার সঙ্গে দেখতে দল জোটাচ্ছেন।

সোবিয়েত আমাদের এসে উঠেছেন ওঁরা সদ্য বানানো অতি-আধুনিক হোটেল, একেবারে ভিন্ন পাড়ায়। ফোনে খবরটা অতএব যাচাই করে নেওয়া যাক। ডায়াল ঘুরিয়ে অচিরে সাড়া মিলে গেল। কত ঘর জানি নে, কোথায় দিতে বলব? ফোনের এ প্রান্তে আমি বলছি ইংরেজি ও প্রান্তে হড়হড় করে রুশ বলছে। ইংরেজি জানে না বোঝা যাচ্ছে, উপায় কি এখন বলে দিন। আমার রুশ ভাষার বুলি ঝেড়ে বার কয়েক 'ইণ্ডিস্কি ডেলিগাৎসি' ইত্যাদি বলা গেল, কিন্তু কাজে আসে না। বলেই চলেছে ওদিকে, তার মধ্যে কমা সেমিকোলনও নেই। ফোন ছেড়ে দিয়ে তখন বাঁচি।

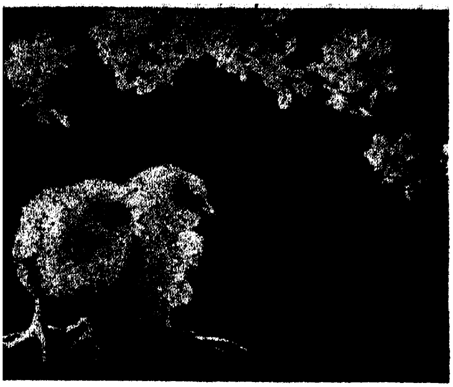
গিয়েই পড়ি, অতএব দেখা না পেলে ফিরে আসব। একটা মোটর গাড়ি চাই—ভোকসের যে মেয়েটি খবরদারি করেন, তাঁকে বললাম গাড়ির কথা। ফিসফিস করে কথাটা বলেছি কি না বলেছি—উঃ মশায়, কত সেয়ানা আমাদের ভারতের লোক, 'চাচা' ডাকতেই ওঁরা 'কাস্তে হারিয়েছে' বুঝে ফেলে দেন। গাড়ির কথা বলে ঘরে ফিরবার ঐ টুকু পথের মধ্যেই ধরাধরি হচ্ছে—'আমিও যাবো, শুধু এই একলা আমি' 'আমায় নেবেন, একজন বাড়তিতে কি আর হবে।' ফিরে গিয়ে তখন দুটো গাড়ির ব্যবস্থা করতে বলি। যাত্রার সময় সেই দুটো গাড়িতে দেখি, গুড়ের ভাঁড়ের মতো মানুষ বোঝাই হয়েছে। ললনা দলেরই ভিড় বেশি, সিনেমা স্টার সম্পর্কে তাঁরাই অধিক ওয়াকিবহাল।

হোটেলে ঢুকলাম। ঝকমকে বাড়ি, মেজের পা পিছলানোর গতিক। মেট্রোন জিজ্ঞাসার চোখে তাকাচ্ছে। হাত-মুখ ঘুরিয়ে উঁ-আঁ করে আমার দু-গণ্ডা রুশ বাক্যের বুলি ঝেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি, কত দূর কি বুঝল খোদায় মালুম—হেন কালে দেখি, হৃষীকেশ মুখুজ্জে এদিক পানে আসছে। আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন—বম্বের সিনেমা রাজ্যে হৃষী কেও-কেটা ব্যক্তি। বিমল রায়ের ডান হাত, ছবির সম্পাদনায় ভারি নাম। একদা ইস্কুল মাস্টারি করতাম, হৃষী তখন আমার কাছে পড়েছে। এবং পরমাশ্চর্য ব্যাপার, বড় হয়ে ও সিনেমা লাইনে গিয়ে এখনো খাতির করে। মাথায় নিশ্চয় ছিট আছে, নইলে এমন হয় না। বলতে পারেন, সেই ইস্কুল মাস্টারই নাকি আমি থাকতাম এবং তৎ সত্ত্বেও চিনে ফেলত, পরীকাটি পুরোপুরি হত তা হলে।

হৃষীকেশ আমায় দেখে মেজের উপর গড় হয়ে প্রণাম করল। অমন মেজের প্রথম এই মানুষের মাথা ঠেকল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সঙ্গীরা, দেখতে পেলাম, ড্যাব-ড্যাব করে তাকালেন। বাদর বনে গেল নির্ঘাৎ তাঁদের কাছে। লেখক জেনে বসে ছিলেন—অর্থাৎ কাজ কর্ম নেই, কি করবে, কলম পিষে টাকাটা সিকেটা রোজগার করে। কিন্তু সিনেমার মানুষ পদধূলি নিচ্ছে, তবে তো লোকটা লেখকের উপরেও আরো—কিছু।

হৃষীকেশ বলে, আপনাকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম মাস্টার মশায়। মেট্রোপোলে আছেন, খবর নিয়েছি। সেখানে দিদিন থেকে আমার নামে চিঠি দিয়েছিলেন, তাসখন্দে পৌঁছেই আমি তার শোধ নিলাম কলকাতায় আপনাকে লিখে। পান নি নিশ্চয়, পাবার কথাও নয়। কেমন করে বুঝব, আপনিও সঙ্গে সঙ্গে রওনা হয়ে পড়েছেন।

[ক্রমশঃ।



পাখার ছা

—সুখেন্দু মিত্র

আলোকচিত্র

পুরানো কাগজ

—পরিমলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়





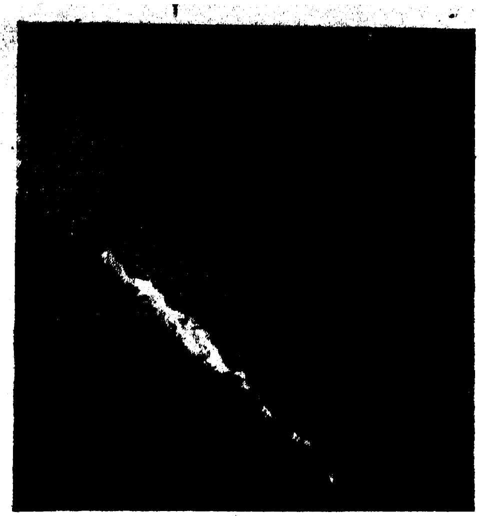
বোম্বাই যাদুঘর —শ্যামল সেন



পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তা —বিমলকুমার চট্টোপাধ্যায়



পাহাড়িয়া —যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



দৃষ্টিকোণ
—মিহিরপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়



বুদ্ধ
—ভবদেব মুখোপাধ্যায়

লৌহস্তম্ভ (দিল্লী)

—ধীরেন অধিকারী





মূর্তি (রামকিঙ্কর, শান্তিনিকেতন)
—নীরেন্দ্রপ্রসাদ



জলের ধারে — প্রকৃতি মুখোপাধ্যায়

অশোক স্তম্ভ (সারনাথ)
—সুধাবিন্দু বিশ্বাস





জাহাঙ্গীরের পানাধার (আগ্রা দুর্গ) —কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

নামায়ণ

নীলকণ্ঠ

যিনি বলেছিলেন, তিনি ভুল বলেছিলেন যে মানুষ চিরকাল বেঁচে থাকে না, বেঁচে থাকে শুধু কীর্তি ; কিন্তু না ; কীর্তিও বেঁচে থাকে না। বেঁচে থাকে শুধু কীর্তিমানের 'নাম'। কালিদাস, তিনিও বেঁচে আছেন তাঁর নামেই ; কালিদাসের কাব্য কীর্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় আজ ক'জনের? লিওনার্দো দা ভিঞ্চি অশেষ কৃতিত্বের ক্ষেত্রে প্রথম কীর্তিমান পুরুষ! তাঁর ক'টি কীর্তির কথা সাধারণ লোকে জানে আজ? কিন্তু 'নামে' জানে তাঁকে অনেকেই। অত দূরে যাওয়ারই বা দরকার কী? হাতের কাছেই পাওয়া যাবে এর প্রচুর প্রমাণ ; কলকাতার রাস্তা-ঘাটের দু'ধারে দু'হাতে তার নজির ছড়ানো ; রাস্তার নাম জানে সবাই ; কিন্তু যাঁর নামে রাস্তা তাঁকে জানে ক'জন?

বই-এর পাড়ায় যাদের নিত্য-যাতায়াত ; বই-এর পাড়ায় যাদের ব্যবসা ; বই-বিক্রেতা যারা আর যারা বই এর ক্রেতা ; শহরে নয় শহর থেকে অনেক দূরে, ভি. পি-তে যারা করে বই-এর লেন-দেন ; এ-দেশেও নয়, বিদেশে যাদের বাস নয় শুধু, বই-এর জগতেই বিশেষ বসবাস, তাদের মধ্যে কে না জানে, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীটের নাম? কিন্তু এই শ্যামাচরণ দে কে? ক'জন জানে তা? ভবানীপুরে বিখ্যাত বাজারে সকাল সন্ধ্যে লোকে যায় হাজারে-হাজারে ; বাজারটাকে জানে সবাই ; কিন্তু বাজার যাঁর নামে তাঁকে জানা দূরে থাক, তাঁর আসল নাম যে 'জগু'-বাবু নয়, 'যদু'-বাবু, এ-কথা জগুবাবুর বাজারের বাঁধা খদ্দেরদের কাছেও, তারা ক'জন জানে? যা ঘটে তা সব সত্য নয় ; কবি যা ঘটান তাই হচ্ছে আসল সত্য! কিন্তু নামের ক্ষেত্রে কবির ঘটানোর চেয়ে লোকের রটানো অনেক বেশি কার্যকরী সত্য ; তাই যদু-বাবুর নয় জগুবাবুর বাজারই চলবে ; শাস্ত্রসম্মত যতদিন বব আছে ততদিন অমলেট নয়, 'মামলেট'-ই বেঁচে রইবে অক্ষয়-অব্যয় হয়ে!

এ-কথা মানুষের মাথায় না ঢুকলেও, মানুষ-সৃষ্টির মত মারাত্মক কাজে যিনি হাত দিয়েছিলেন, তাঁর মাথায় ছিল ; তাই 'এক' হয়েও তিনি একাধিক নামে বিরাজমান ; সেই 'তাঁকে' নিয়ে নেই ঝগড়া ; বিবাদ তাঁর নাম নিয়ে। একাধিক নাম বলেই একাধিক ধারায় আরাধনা ; ফলে একাধিক ধর্ম এবং ধর্মগ্রন্থ ; এবং কুরুক্ষেত্র থেকে কম্যুনাল দাঙ্গা পর্যন্ত Holy এবং un-Holy একাধিক ধর্মযুদ্ধ! পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ বুঝেছিলেন নামের মহিমা ; তাই এক নামে তাঁর কুলোয়নি ; একশ' আট নামে সম্ভব হয়েছিল লীলা!

আর বুঝেছিলেন শ্রীচৈতন্য। তিনি বলেছিলেন কলিতে নামই সব ; পাঁচশ' বছর আগে এসেছিলেন তাই তিনি বলেছিলেন : 'হরি'-নাম করতে। আজকের পরিবর্তিত পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গে তাঁর আবির্ভাব হলে তিনি নিশ্চয়ই বলতেন ; শুধু হরি-নাম নয় ; হর-নামও নিতে হবে ; শুধু হরি এবং হরের নাম নিলেও হবে না। হরি-হরদের সঙ্গে যারা হরিহরাত্মা তাদের নামও নিতে হবে বৈ কি! কারণ শুধু 'স্বামী'-দের দিন গেছে ; এখন হ'ল 'ভিপ'-স্বামীদের দিন। যাঁরা সংখ্যায় বেশি ; শক্তিতে প্রবল। বয়সে তরুণ ; কান্তিতে দ্বিগুণ ; এবং খবর কাগজের পাতায় নাম ঘষে ঘষে খ্যাতির পরিধিতে আপনাকে পরাস্ত করে প্রভাব বিস্তার করেছেন বহুদূর!

প্রথম সত্য হচ্ছে তাই নাম ; নামের পরেই সব চেয়ে বেশি শক্তি ধরে প্রণাম ; নাম করে দেখুন, কার্যোদ্ধার যদি না হয়, তাহলে প্রণাম করে দেখুন ; কার্যোদ্ধার হবেই। নামে যিনি শুধু কাৎ ; প্রণামে তিনি নিশ্চয়ই কুপোকাৎ!

এ-যুগ, বিজ্ঞানের যুগ বলে আমরা যতই না কেন আত্মপ্রসাদ লাভের অপচেষ্টা করি, আসলে এ-যুগ বিজ্ঞানের যুগ নয়, বিজ্ঞাপনের যুগ! Big Gun-দের বিজ্ঞাপন—আজকের সংবাদপত্রের আবির্ভাব, অধিষ্ঠান এবং তিরোধান,—এই তিন অবস্থাই প্রথম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করবার কারণে ; অথবা সম্পূর্ণ করতে না পারার ব্যর্থতায়! নিজেকে বিশেষ ভাবে জ্ঞাপন করবার আর্ট এবং সায়েন্সই হল বিজ্ঞাপন ; বিজ্ঞাপন হ'লে তবেই নাম হবে, নাম হলে তবেই বিজ্ঞাপন হবে! চৌষট্টি কলার প্রত্যেকটিতে পারদর্শী হয়েও আপনার কিছু না হ'তে পারে, যদি শুধুমাত্র বিজ্ঞাপন-বিস্তার না হয়ে থাকে আপনার অধিকার। আবার চৌষট্টি কলার কোনটিই করায়ত্ত না করে আপনি সব কটিতেই সাফল্যের সার্থক ভাণ করতে পারেন, যদি শুধু বিজ্ঞাপন কলায় হয়ে থাকে আপনার হাতেখড়ি। কারণ বিজ্ঞাপন শুধু 'কলা' মাত্র নয় ; কলার ওপর আরেক কাঠি ; বিজ্ঞাপন হচ্ছে সর্বপ্রধান 'কলা' নয় শুধু, সেই সঙ্গে লোককে কলা দেখানোও বটে!

বিজ্ঞানের যুগ আদৌ না হওয়া সত্ত্বেও এ-যুগকে বিজ্ঞানের যুগ বলে যে ভ্রম হয়, তার মূলেও ওই বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞানের বিজ্ঞাপন ; বিজ্ঞানেরও যেমন বিজ্ঞাপন, তেমনি বিজ্ঞাপনের আছে বিজ্ঞান ; বিজ্ঞাপন তাহলে শুধু কলা নয় ; বিজ্ঞাপন হচ্ছে একাধারে কলা এবং বিজ্ঞান, দুই-ই! এবং এই বিজ্ঞান অধিগত না হয়ে এ বিদ্যার প্রয়োগে হয় পরিণামে হিতে বিপরীত। যেমন নাকি ক্ষুর ; কায়দা করতে পারলে দাড়ি-কাটা যায় অনায়াসেই ; কায়দা না করে বেকায়দা করলে কিন্তু তক্ষুণি নিজের ক্ষুরে নিজেরই কখনও গাল, কখনও বা গাল এবং গলা-কাটা দুই-ই!

আগেই বলা হয়েছে বাঁচতে চাইলে নাম করতে হবে। হয় নিজে নাম করতে হবে, নয় পরের নাম করে পার হতে হবে বৈতরণী! এখন কী তাতে করতে হবে নাম তারই জন্যে বিজ্ঞান,—বিজ্ঞাপনেরও বিজ্ঞান জানা চাই শুধু সেই কারণেই। কারণ বিজ্ঞাপনই হচ্ছে 'নাম'-এর জন্মদাতা। সেই বিজ্ঞাপনের বিজ্ঞান কি বলছে, তাই হচ্ছে জানবার কথা।

সে বিজ্ঞান বলছে : শুধু নাম নিলেই চলবে না। কার কাছে কার নাম নিতে হবে, জানা চাই তা'। তাও নয় শুধু। কার কাছে কার নাম নেওয়া চলবে না, জানা চাই তা'-ও। 'চণ্ডীদাস' কোন সময়কার লোক, পরীক্ষার খাতায় তা লেখবার আগে, জানতে হবে পরীক্ষকের নাম। এ বিষয়ে তাঁর মত এবং এ বিষয়ে তাঁর নিজের কোন বই থাকলে নিতে হবে সেই বই-এর নামও। তবেই আপনার নাম মার্ক-লিস্টের প্রথমেই। পরীক্ষার খাতায় যা',—জীবনের

খাতাতেও তাই। পূর্ববঙ্গের ওপর যাঁর প্রীতি অত্যধিক, তার কাছে গেলে বাঙালী হলেই চলবে না বাঙালও হতে হবে! পশ্চিমবঙ্গকেই যিনি বাংলা দেশ মনে করেন শুধু, তাঁর কাছে মোহন-বাগান থেকে মোহনবাগান রো পর্যন্ত সব কিছুর করা চাই গুণ-কীর্তন।

নাম করার প্রথম সুযোগ হল, 'নামকরণ' করা। বাপ-পিতাম'র দয়ার এই নামকরণ যদি আপনার যুৎসই না হয়ে থাকে, তাহলেই আপনার নাম করাও আর হয়েছে। ঘোষ বংশে যদি জন্ম হয়ে থাকে আপনার এবং নাম রেখে থাকেন আপনার মা-মাসীমা, রাসবিহারী কি অরবিন্দ বলে, অথবা দাশ বংশে হলে চিত্তরঞ্জন, তাহলেই হয়ে গেল আপনার। নামের সঙ্গে রফা করতে করতেই নাম করার দফা-রফা হয়ে যেতে তখন বাধা কোথায় আবার, আপনি কি করেন, তারই ওপর নির্ভর করে আপনার নামকরণের সাফল্য কি ব্যর্থতা; ধরুণ আপনার পদবী ঢোল এবং নাম গোবিন্দ; আপনি যাই হ'ন এ-নামে আপনার কবি হওয়া অসম্ভব কিন্তু কমেডিয়ান হ'লে খুবই কার্যকরী! সিনেমার অভিনেতা হলে আপনি যত অধমই হ'ন, উত্তম একটি নাম চাই প্রথমেই; বাঁচতে হ'লে নাম করা চাই; তার আগে চাই ভালো ভাবে নামকরণ করা।

আগেকার কালে যেমন তেমন নাম হলেই চলে যেত, কিন্তু আসলে হওয়া দরকার হত ভালো; এখন আসলে যেমন-তেমনই হ'ক, ভালো হওয়া চাই নাম-টা: আগে শুধু ডাইং-ক্লিনিং হলেই চলে যেত এখন 'মলিন মুক্তি' না-হলে অচল; তাই মনোহারী দোকানের মনোহরণকারী নাম, 'রকমারী' 'টুকিটাকি'; জুতোর দোকানের নাম; শ্রীচরণে shoe; চা-য়ের দোকানের নাম আড্ডাঘর!

ফুলের বেলায় ফুলের নামে কাজ দেয় কি না জানি না, কিন্তু ফুলের দোকানের নামের ওপর অনেক কিছু করে নির্ভর; রাস্তার ধারের দোকানের গাঁদার গায়ে ফ্লোরিষ্টের কার্ড: মেরিগোল্ড; ফুল এক; কিন্তু foolএর কাছে এর দাম এক নয়; তারই ফলে এক ডজন গাঁদার দাম বারো আনা না হয়ে, আধ ডজন মেরিগোলড বিকয় তিন টাকায়; নাম যাই দিন তাতে ফুলের গন্ধ এক থাকে; কিন্তু দাম এক থাকে, এ-কথা সেক্সপীয়রের পক্ষেও বলা শক্ত! আর ফুলের বেলায় যাই হ'ক; বিউটিফুলের বেলায় নামের ওপরই দাম। না-হলে বিগতযৌবনা নর্তকীর সজলাভে যে সত্তযুবক সর্বস্বসর্বস্ব হয়েও হার মানে না, সে কি রূপের জন্তে? না, কারণ তার চেয়ে রূপবতী ভরাযৌবন মেয়ের অভাব নেই সে জানে; শুধু বলতে পারার গৌরব যে অমুকের সঙ্গে কাটিয়েছি এতক্ষণ, এরই দামে নর্তকী সঙ্গের দাম। বহু কাল আগে দেখা ছায়াছবির কোন নায়িকাকে কোনও আবেদন-আগুন দৃশ্যে দেখা,—তার পর সেই স্মৃতি ভুলতে না-পারা; তার বদলে ভুলে যাওয়া যে সেই অভিনেত্রীর এত দিনে নিশ্চয়ই বয়সের গাছ-পাথর নেই; এই চরম বাস্তব সত্য ভুলে এবং সেই আবেদনের দৃশ্য না ভুলতে পেরে বৃদ্ধ বয়সে হওয়া মতিভ্রম! পৃথিবী-জুড়ে কামিনী নিয়ে যতবার হয়েছে কুরুক্ষেত্র, তত বারই হয়েছে 'অমুক'-এর জন্তে; অপরূপের জন্তে নয়, 'নাম'-রূপের জন্তেই রূপোর হয়েছে হস্তান্তর চিরকাল!

এখন, আপনার নাম হয়েছে কি না, কেমন করে তা বুঝবেন। অসুখের যেমন চিহ্ন আছে কতগুলো; সুখেরও তেমনি আছে নিরিখ। নামের চেয়ে সুখ আর কিসে? নাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার আগে ছড়ায় তার সেই 'প্রমাণ'। নাম ডাক হলেই লোকেরা আদর করে আপনাকে নিশ্চয়ই দেবে একটি ডাক-নাম; অর্থাৎ যে-প্রথায় উইনষ্টন চার্চিল হয়েছেন উইনী, আইসেনহাওয়ার হয়েছেন আইক, আমাদের রাজ্যপাল হয়েছেন 'হরেন'-দা!

নামের প্রথম প্রমাণ পদবী-ত্যাগে; শুধু নামেই যথেষ্ট হয় যখন, তখনই বুঝতে হবে যথেষ্ট 'নাম' হয়েছে কারুর! নামের দ্বিতীয় প্রমাণ; লোকের দেওয়া বিশেষণে; এবং সেই বিশেষণের চল, যখন পারিবারিক নামের চেয়ে বেশি, তখনই সত্যিকারের দেশবিশ্রুত হয়েছেন আপনি। যেমন দেশবন্ধু, যেমন নেতাজী!

আগে যে ডাক-নামের কথা বলা হয়েছে, সে ডাক-নাম কিন্তু দেশের লোকের দেওয়া, এবং সে-ডাক-নাম, সাঙ্ঘাতিক নাম ডাক না হলে হয় না কারুর প্রাপ্য! কিন্তু তার বদলে যদি দেখা যায় কারুর নামের পাশে ব্র্যাকেটে বড় হরফে বসেছে তার ডাক-নাম, তার পারিবারিক ডাক-নাম, তাহলে তার দেশ-ব্যাপী খ্যাতি না হলেও, পাড়ায় তার নাম হয়েছে, এ-কথা মানতেই হবে; উত্তর-পাড়ায় তারাশঙ্করের কালিন্দীতে ননীগোপাল দে রামেশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন বলে পোষ্টার দিলে কাজ হবে না; কিন্তু ননীগোপালের নামের পাশে ব্র্যাকেটে যেই ঘেঁটু-বাবু বসানো, অমনি উত্তরপাড়া ভেঙে পড়া 'কালিন্দী' দেখতে; এবং এ-ব্যাপারে উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিম, সব পাড়ারই এক রি-এ্যাকশন!

নামের সব চেয়ে বড় প্রমাণ কিন্তু এগুলির কোনটিই নয়; নাম-হবার সব চেয়ে বড় প্রমাণ হচ্ছে বদনাম হওয়া। বয়স হলে যেমন দাড়ি-গোঁফ হবেই, নাম হলে তেমনি বদনাম হবেই; এ-কথা না বলে বরং এ-কথা এ-ভাবে বলাই হয়ত ঠিক যে ভোট না দিতে পারলে যেমন প্রমাণ হয় না আপনার সাবালকত্বের, তেমনি বদনাম না হলে মনে করে নিতেই হবে যে আপনার নামও হয় নি; এবং কারা আপনার বদনাম করে বেড়াচ্ছে তারই ওপর নির্ভর করছে আপনার কতটা নাম হয়েছে, সে-প্রশ্নের উত্তর; আজে-বাজে লোক যদি আপনার বদনাম করে বেড়ায় তাহলে বুঝতে হবে আপনার নাম দূরে থাক, বুঝতে হবে আপনার কিছুই হয় নি; কাজের লোক করে যদি আপনার বদনাম, তাহলে আপনার আত্মপ্রসাদের কারণ আছে; শত্রুপক্ষ যদি জলগ্রহণ না করে দিনান্তে একবার আপনার নামের আদ্যশ্রাদ্ধ না করে, তাহলে আপনার শুধু নাম নয়, দামও হয়েছে জানবেন; কিন্তু যতক্ষণ আপনার এক গেলাসের ইয়ার বা জীবনের মত আপনার শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ আপনার সে-নাম হয় নি যে-'নামের' জন্তে রথী-মহারথীরা পর্যন্ত লালায়িত; বন্ধুর বদনাম হল খ্যাতির সব চেয়ে বড় লেবেল; আপনার পরম বন্ধু যতক্ষণ না চরম শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে ততক্ষণ বসে থাকলে চলবে না; ততক্ষণ নাম করে যেতে হবে; নাম করতে করতে যখন আপনার বন্ধুর পর্যন্ত সে-নামে বুক ফেটে যাবে, তখন বুঝবেন, শুধু নাম হয় নি, কাজও হয়েছে; অর্থাৎ নাম করবার পর বাকী যে কাজ, মানে সেই 'নাম'-কে টিকিয়ে রাখা, সে-কাজ আপনার

হয় আপনার বন্ধুই করছেন দেখবেন ; আপনার নামকে চিরস্থায়ী করে রাখবার সব চেয়ে বড় মশলা হচ্ছে আপনার বন্ধুর মুখে আপনার বদনাম ; তাকেই বলে এ-যুগের বন্ধুকৃত্য !

নাম হচ্ছে প্রেমের মতন ; সুখও যেমন জ্বালাও তেমনিই। নাম করা হয়ত যায় ; কিন্তু সেই নাম-কে জিইয়ে রাখা হয়ত অত সহজে যায় না। নামের অমরত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হয়ে মরেও নেই স্বস্তি। প্রথমে পাড়ায়, তারপর দেশে, তারপর বিদেশে ; তারপর ইতিহাসে, নাম করার ধাপে ধাপে এগুনো, প্রত্যেকটি ধাপ পিছল, প্রত্যেকটি ধাপ আলেয়ার মত,—ধাপ কি ধাপপা তাই ধরা যায় না অনেকক্ষণ। মরবার পর অমর হওয়া, নাম-করা লোকদের প্রত্যেকের দুশ্চিন্তা তাই নিয়ে। সেজন্যে মরতেও ভয় পায় খ্যাতনাম'রা, আবার ঠিক যে-সময়ে মরা দরকার তার চেয়ে বেশিদিন বাঁচলে, অমর হওয়া দূরে থাক, মরবার আগেই নামের দিক থেকে তখন আপনি জীবন্মৃত ছাড়া আর কী ? প্রচুর প্রতিশ্রুতির মুহূর্তে লোকান্তরিত হলে লোকেই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখবে, দীর্ঘদিন বেঁচে আপনি যা দেবেন তার চেয়ে ঢের বেশি দরকার অসময়ে মারা গিয়ে বেঁচে থাকলে আপনি আরও কত দিতে পারতেন সেই জিজ্ঞাসাকে যুগে-যুগে জাগিয়ে রাখা ! অকালে মরুন, ক্ষতি নেই। শুধু মরা চাই ঠিক তালে। তাহলেই কালে আপনি চিরকালের মত থেকে যাবেন।

প্রাণরক্ষার মতই নামরক্ষারও আছে নিয়ম-কানুন ; সেগুলি অবশ্য পালনীয়। নাম-করা কেউ গতায়ু হওয়া মাত্র, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদকের তালিকায় আপনার নামটি অতি অবশ্যই থাকা চাই ! যিনি গেলেন তিনি ত' গেলেনই ; কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে লাগসই কিছু যদি আপনি সঙ্গে সঙ্গে না বলতে পারলেন ত' আপনিও গেলেন ; হয়ে গেলেন আর কি ! সেই জন্যে তাঁর প্রাণ উঠবার আগে থেকেই আপনাকেও নিঃশ্বাস বন্ধ করে তৈরী থাকতে হবে, যাতে তাঁর 'মরা' এবং আপনার 'মার দিয়া' এক যোগে দুই-ই সমাধা হয় ; যিনি মারা যাচ্ছেন, তাঁর পক্ষে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ ; কিন্তু আপনার পক্ষে তা' নয় ; তাঁর শ্বাস বন্ধ হলে তবেই আপনার আশ ; অর্থাৎ আপনার আসল কাজ আরম্ভ ! আরম্ভ, শেষ নয় কিন্তু ; কারণ শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবার সঙ্গে সঙ্গে, ওই প্রসঙ্গেই চুট করে ঢুকিয়ে দেওয়া চাই যে, পরলোকগত মহাপ্রাণের ওপর দৃঢ়-বিশ্বাস শেষ-মুহূর্ত পর্যন্ত অবিচল ছিল ; এবং তাঁর যত গোপনখবর তার একমাত্র উত্তরাধিকারী রইলেন আপনিই ; প্রাণের সমস্ত কথা আপনাকেই তিনি উজাড় করতেন, তাঁর প্রাণ বেরুবার পর, এ-কথা বলতে আপনার বাধাই বা তখন কোথায় ?

'মৃত'দের কাজে লাগাবার পর, জীবন্মৃতদেরও বাগানো দরকার কাজে-অকাজে। অর্থাৎ খ্যাতনামাদের সমস্ত অনুষ্ঠানে ; খ্যাত-অখ্যাত সমস্ত সভায় আপনার উপস্থিতি দরকার অনিবার্য ; কিন্তু শুধু উপস্থিত হলেই চলবে না ; তার সঙ্গে চাই উপস্থিত-বুদ্ধি ; সেই বুদ্ধিই বাতলে দেবে যে আপনার উপস্থিতির কথা খবর-কাগজে উপস্থিত ব্যক্তিদের ছাপা তালিকায় থাকা চাই-ই চাই। উপস্থিতির চেয়ে সেই তালিকায় অবস্থিতির দাম বেশি ! 'মামেকং শরণং ব্রজ' ; এ-যুগে শরণ নিতে হবে শুধু খবর কাগজের। তেমন ভাবে শরণ নিতে পারলে দরকার নেই আপনার কষ্ট করে উপস্থিত থাকারও ; তখন আপনার নাম বেরুচ্ছে, 'উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতির' তালিকায় ; উপস্থিতির চেয়ে অনুপস্থিতিরই দাম তখন। কাজেই জেনে রাখুন যে দান থেকে মাল্যদান, এবং আপনার জীবনের যা কিছু খুঁটিনাটি, সবই 'খবর' হওয়া দরকার ; খবর কাগজের 'খবর' ! প্রপার অথবা ইম্প্রপার যাই হ'ক খবর কাগজই সেই একমাত্র চ্যানেল যা ধরতে পারলে, ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম না করেও, অতিক্রমকারীদের চেয়ে বেশি হল্লা আনতে পারেন আপনি ; কি এ-দেশে, কি বিদেশে !

এত করেও যদি নাম না করতে পারেন ত' বদনাম করুন। 'নাম' না হ'য়ে 'বদনাম' হলেও চলবে ! 'নাম' করতে সময় লাগে ; প্রতিভা লাগে ; পরিশ্রম লাগে ; 'বদনাম' করতে শুধু সাহস লাগে। যে যা বলছে তার উল্টা বলুন ; যে যা করছে তার পাল্টা কিছু করুন ! যারা 'নাম'-করা তাদের বদনাম করুন ; তাতেও আপনার 'নাম' হবে ; হয় গলাগলি, নয় গালাগালি ; বাঁচবার দু'টা মাত্র রাস্তা ! গালাগালি করলে যদি কাজ হয়, দরকার নেই 'গলাগলির' ; ভালোবাসায় লোকে না আপনাকে স্মরণ করবে। যতই না কেন আমরা কামনা করি, কোনও 'একজন'-কে পৃথিবীর সকল জন মানবে,—এ কোনদিন হবার নয় ; পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় তার কোনও নজীর নেই ; তাই বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে, স্বীকৃতি এবং সন্দেহের মাধ্যমে, আপনাকে নিয়ে পৃথিবী জুড়ে 'হল্লা'কে সর্বদাই জিইয়ে রাখা !

পৃথিবী জুড়ে ঘাতকের পর ঘাতক এসেছে গেছে ; কিন্তু বেঁচে আছে শুধু বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ! বেঁচে আছে ইতিহাসের অসীম ঘৃণায় ; কিন্তু তবুও বেঁচে আছে আজও মানুষের মনে ; বই-এর উপমায় ; দ্বিতীয় দৃষ্টান্তাভাবের অদ্বিতীয়তায় ! মহাত্মাজীকে যতই শ্রদ্ধা করি আর নাথুরামের নামে যতই 'খুন' চাপুক আমাদের, এ-কথা অস্বীকার করবার আর উপায় কী, যে ইতিহাসের মালায় গান্ধীজী আর গডসের নাম গাঁথা হ'য়ে রইলো একই সূত্রে। নামের চেয়ে বদনামের গ্ল্যামারও বেশি ! যুধিষ্ঠিরের চেয়ে দুর্যোধনের ; অর্জুনের চেয়ে কর্ণের, কৃষ্ণের চেয়ে কংসের জেল্লা চিরকালই বেশি !

এক হাতে তালি না বাজার মতই শুধু রামে হয় না রামায়ণ ; রাম-রাবণে মিলে তবেই যেমন রামায়ণ রচনা ; তেমনি শুধু 'নামে' নামায়ণ অসম্ভব। 'নাম' এবং 'বদনাম' দু'য়ের গাঁটছড়ায় তবেই 'নামায়ণে'র জন্ম !

এর পরেও যদি প্রমাণ হয় যে, না, সেক্সপীয়রের কথাই ঠিক : 'নামে কি এসে যায়।' তাহলে বলব, নামে যদি কিছু নাও এসে যায়, তাহলেও ছদ্ম নামে এসে যায় নিশ্চয়ই ; আসলের চেয়ে ছদ্মেরই প্রতিপত্তি এ-যুগে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ! নামের-বেলাতেই বা তার ব্যতিক্রম কেন ? তাই নামের চেয়ে ছদ্মনামেরই ভিড় নামের চেয়ে ছদ্মনামে যে কাজ দেয় বেশি, অত্যন্ত হাল-আমলের বাংলা সাময়িক পত্র তারই প্রমাণ পরিচয়ে প্রদীপ্ত ! অত্যন্ত-অসাধারণ রচনাও যদি কারুর স্বনামে বেরয় ত' তার প্রতি লোকে করে না ভুলক্রমেও দৃষ্টিপাত ; কিন্তু অতি অসাধারণ রচনা যদি ছদ্মনামে আত্মপ্রকাশ করে, তাহলে তার প্রতি লোকের এবং বিশেষ করে স্ত্রীলোকের স্বাভাবিক পক্ষপাত !

রচয়িতার ক্ষেত্রেই শুধু ছদ্মের আবির্ভাব নয় আজ আর! সত্যি-কারের রচনার অভাবে আজ রম্যরচনার প্রাদুর্ভাব। না উপন্যাস, না গল্প, না প্রবন্ধ, কিছুতেই যাদের না আছে দখল তারাই রচয়িতার বদলে রম্য রচয়িতার ছদ্মবেশে চিরকালের শখও তামুস করতে চায় বেদখল; কবিতায় মিল দিতে না পেরে, ছন্দের গোঁজামিলও না, যারা একদিন গদ্য-কবিতার মারফৎ গদ্য চালিয়েছিল স্বচ্ছন্দে; তারাই দেখা দিয়েছে আবার ছদ্মনামের আড়ালে এই ছদ্ম-সাহিত্যের ভেজাল নিয়ে; 'No Beef' এই সাইনবোর্ড দেওয়ালে ঝুলিয়ে যখন যে-কোনও মাংস চালানো যায় রেস্তরাঁয়, ঘি ছাড়া অন্য কিছু ব্যবহার করা হল না', লিখেই যখন খুসী করা যায় খাইয়েদের; তখন 'রচনা-লেবেল দিয়ে রমণীদেরও পাঠের অযোগ্য এই রম্য-রচনাকেই সাহিত্যের জাতে তুলতে বাধা কোথায়? 'ঘি'এর বদলে ডালডাই যদি চলে, তাহলে রচনার অভাবে রম্যরচনাই চলবে! অতএব বাংলা সাহিত্যের এক বালতি দুধে, এক ফোঁটা চোনার মত, রম্য রচনারই জয় হোক।

'নাম'-প্রসঙ্গে এতক্ষণ যে আলোচনা করলাম এ-সবই 'এহ বাহ্য'; গূঢ়-তত্ত্বে প্রবেশ করা যাক অতঃপর! মার্কসের চেয়ে যেমন অনেক ঘোলাটে মার্কসিষ্টরা 'গান্ধী'র চেয়ে যেমন অনেক কাজের হ'ল 'গান্ধী ক্যাপ'; তেমই নামের চেয়ে মূল্যবান হ'ল: নামাবলী।

নাম আপনার যাই হ'ক নামাবলী উড়নো চাই যখন যেদিকে হাওয়া বইছে, সেই দিকে আসলে আপনার বিশ্বাস যাই হ'ক নামাবলীর 'রং' তার ওপর নির্ভর করে না মোটেই; পৃথিবী আজকে প্রধান দুই শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে; সেই দু'শিবিরের দু'রকম ধ্যান-ধারণাই যদি আপনার 'wrong' মনে হয় তবুও ওই দু'রঙেই ছোপাতে হবে আপনার নামাবলী! নামাবলীর বাইরের দিকটা এক শিবিরের রং; ভেতরের দিকটা আরেক শিবিরের! যখন যে-শিবিরে যাবেন তখন সেই শিবিরের রং নামাবলীর বাইরের দিক করে বেরুতে হবে!

কিন্তু খবরদার! যদি বাঁচতে চান তাহলে কোনও এক শিবিরেই নাম লেখাবেন না! কোন শিবিরেই নাম না লিখিয়ে; দু'শিবিরের রং-এ ছোপান নামাবলী গায়ে জড়িয়ে; লেফট-রাইট কোন ইষ্টের দিকেই না ভিড়ে, একবার লেফট, একবার রাইট, এই ভাবে লেফট-রাইট লেফট-রাইট করতে করতে মার্চ করে এগিয়ে চলুন; তাতেই সিদ্ধি; তাতেই ইষ্ট! তাতেই মোক্ষলাভ!

তাই বলি নিজের নাম-কে বলি দিতে না চাইলে সর্বপ্রধান পরিধেয় হচ্ছে সেই 'নামাবলী'!

সাধের প্রতিমা

শ্রীরমা বন্দ্যোপাধ্যায়

আকাশে পুঞ্জ-পুঞ্জ মেঘের ভারে
মনে পড়ে মোর সাধের প্রতিমারে;
চোখে তার ছিল জল, মনে ছিল আশা,
সবটুকু তার পায়নি প্রকাশের ভাষা,
এসেছিল বুঝি মোর অভিসার-রাতে,
তবু পায় নাই এতটুকু স্থান
সে দিন দিতে পারিনি কোন মান;
আজও তাই বারে বারে মেঘের ভারে
মনে পড়ে আমার সাধের প্রতিমারে।
সেদিন যে ছিল না আমার কোন ভাষা,
জীবনের কাছে মোর ছিল না জিজ্ঞাসা।
শুধু দুইটি পায়ে চলার তালে
এগিয়েছি আমি পথের মাতালে,
দিয়েছি মোর জীবনেরে পরম গতি,
সেদিন খুঁজেছি আমি শুধু লাভ ক্ষতি;
আজ তাই সব বেচাকেনা শেষে
এ সন্ধি যখন মনের দেশে
দেখি শুধু আজো আমি কিছু পাই নাই;
মূল্যের অঙ্ক মোর শূন্য হ'য়ে গেছে তাই!
হায়, মোর সোনার প্রতিমা নাই,
চোখে আজ মোর জল ঝাড়ে তাই!

প্রাচীন মুসলমানদের উদারতা ও ভারতবর্ষের প্রতি সম্মান ও প্রীতি

মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকী

মোসলমানগণ যেরূপ অনুরাগ ও অধ্যবসায়ের সহিত হিন্দুদের ভাষা ও বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে যেরূপ অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তাহা স্পষ্ট অক্ষরে লিখিত আছে।

আবু মাআশার কালাকী ১০ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া যেরূপে সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দুশাস্ত্র শিক্ষা করেন, আবু রায়হান বেরুনী যেরূপে ১৬ বৎসর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে থাকিয়া সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অভিজ্ঞতা লাভ করেন, এবং হিন্দুদের জ্যোতিষ ও দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে বিশ্ববিশ্রুত "কেতাবুল হিন্দ" রচনা করেন, ফিরোজ শাহ যে সকল হিন্দু পুস্তকের অনুবাদ করিতে আদেশ করেন, আকবরের দরবার হইতে সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের জন্য যেরূপ উৎসাহ প্রদত্ত হয়, রাজকুমার দানিয়াল হিন্দু ভাষার প্রতি যেরূপ অনুরাগী ছিলেন, আজাদ বেলগ্রামী হিন্দুদের অলঙ্কার-শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, কাসেম ফেরেস্তা 'এখতিয়ারাতে কাসেমী' গ্রন্থ লিখিয়া হিন্দু আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রকে যেরূপে ফারেসী ভাষায় অনূদিত করেন, সে সকল অতি পুরাতন কাহিনী। অনেকের ধারণা যে, ভারতবর্ষের মোসলমান অধীশ্বরদিগের মধ্যে সম্রাট আকবরই সর্ব্বপ্রথম হিন্দু পণ্ডিতদিগকে দরবারে স্থান দেন; এবং সংস্কৃত ভাষার গ্রন্থাবলী অনুবাদ করিতে উৎসাহিত করেন। কিন্তু সম্রাট আকবরের শত বৎসরেরও পূর্ব্বে, কাশ্মীরাধিপতি সোলতান জায়েন-উল আবেদীন ইহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। হিন্দুদের নিকট হইতে জিজইয়া গ্রহণ করাও তিনিই সর্ব্বপ্রথম রহিত করিয়াছিলেন, গো হত্যাও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

"তারিখে ফেরেস্তা"তে সোলতান জায়েন-উল-আবেদীন সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে:—

"জায়েন-উল আবেদীন হিন্দুদের দেবালয়ের জন্য দেবোত্তর (ওয়াক্ফ) দান করেন, জিজইয়া উঠাইয়া দেন, গোহত্যা নিবারণ করেন। ফারেসী হিন্দি তিব্বতি ইত্যাদি ভাষায় তাঁহার বিশেষ দখল ছিল। এই সকল ভাষায় তিনি অনর্গল ভাবে কথোপকথন করিতে পারিতেন। তাঁহার আদেশে আরবী ও ফারেসী ভাষার বহু গ্রন্থ হিন্দি ভাষায় অনূদিত হয়, এইরূপ হিন্দুদের পুস্তকের ফারেসী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। ভারতের বিখ্যাত গ্রন্থ 'মহাভারত'ও তাঁহারই আদেশে অনুবাদিত হয়। কাশ্মীর রাজগণের ইতিহাস "রাজতরঙ্গিণী" তাঁহারই সময় লিখিত হইয়াছে। মহাভারতের অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল হয় নাই বলিয়া আকবর বাদশাহের সময় পুনরায় বিশুদ্ধ ভাষায় তাহার অনুবাদ করা হয়। কাশ্মীরের ইতিহাস (রাজতরঙ্গিণী) ও ফারেসীতে ভাষান্তরিত হয়।"

হিন্দুদিগকে উচ্চতম রাজকার্য্যে নিযুক্ত করাও আকবরের 'আবিষ্কার' নহে। দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত বাদশাহ এব্রাহিম আদেল শাহ, সম্রাট আকবরের ২০।২২ বৎসর পূর্ব্বে (৯৪২ হিঃ) সিংহাসনারোহণ করেন। এব্রাহিম আদেল তাঁহার রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই হিন্দুদের হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন, এমন কি আফিস-আদালতের ভাষাও ফারেসীর পরিবর্ত্তে হিন্দি করিয়াছিলেন। ফেরেস্তা বলিতেছেন:—"রাজ সেরেস্তা হইতে ফারেসী ভাষাকে বিতাড়িত করিয়া হিন্দু ভাষা প্রচলিত করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে কর্ত্তাকর্ত্তা করিয়া তুলেন।" স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এব্রাহিম আদেল আকবরের ন্যায় ছিলেন না, পরন্তু খুব গোঁড়া মোসলমান ছিলেন বলিয়া তাঁহার খ্যাতি আছে।

জায়েন-উল-আবেদীন, এব্রাহিম আদেল আকবর, ফিরোজশাহ, আবুমাআশার কালাকী, আবুরায়হান বেরুনী, ফয়েজী, গোলাম আলী, আজাদ প্রভৃতি হিন্দুদের ভাষা ও সাহিত্যের যে সেবা করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে অতুলনীয়—হিন্দুগণ মোসলমানদের ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাহার শতাংশের নয়—সহস্রাংশের এক অংশও করেন নাই।

মোসলমানগণ কেবল হিন্দুদের সাহিত্য এবং দর্শন ইত্যাদিকেই সমাদর ও সম্মান করিতেন না, হিন্দুদের দেশ—ভারতবর্ষকেও তাঁহারা বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

'মসালেকুল আব্সার' নামক পুস্তকে লিখিত হইয়াছে:—

"ভারতভূমি এক বিরাট মহিমান্বিত দেশ। তাহার বিস্তৃত সীমা, বিপুল ঐশ্বর্য্য, বিশাল বাহিনী এবং অতুলনীয় শাসন-প্রণালীর সহিত কোন দেশেরই তুলনা হইতে পারে না।

"যে দেশের জলে মুক্তা, স্থলে স্বর্ণ, পর্ব্বতে হীরক ও পদ্মরাগ, অধিত্যকায় অগুরু ও কর্পূর, উপত্যকায় জাফ্রান, খনিতে পারদ লৌহ ও সীসক, অরণ্যে হস্তী ও গণ্ডার এবং লৌহে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তরবারি, যে দেশের উৎপন্ন অফুরন্ত, সৈন্য অসংখ্য এবং এবং রাজা ন্যায়পরায়ণ সে দেশ সম্বন্ধে অধিক কি বর্ণনা করা যায়। ভারতবর্ষের বিবরণ বিস্তৃতরূপে লিখিতে হইলে বহু খণ্ড গ্রন্থ রচনা করিতে হইবে।" হাজিরাতুল কোদস্, ৩৭৮, ৩৭৯ পৃঃ।

যাঁহারা মোসলমানদের লেখা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জ্ঞাত আছেন যে, মোসলমানগণ কেবল নিজে ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়া ও সম্মান করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। পরন্তু ভারতভূমির গৌরব ও সম্মান সপ্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা হাদিস পর্য্যন্ত রচনা করিয়া তফসীর ও হাদিসের গ্রন্থে যত্নের সহিত সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

আজাদ বেলগ্রামী তাঁহার 'সেজ্‌দাতুল হেন্দ' নামক পুস্তকের উপক্রমণিকায়, রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিতেছেন:—

"স্বর্গাদপি গরীয়ান হিন্দুস্তানের বর্ণনা তফ্সীর ও হাদিসের গ্রন্থাবলীর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।"

আল্লামা জালালুদ্দীন সায়ূতী তফসীর দুরে মন্সুরে এবনজারীর হাকেম, বয়হাকী এবং এবন আসাকের হইতে, হজরত আলীর এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন, "সর্ব্বাপেক্ষা নির্ম্মল বায়ু ভারতভূমির।"

তফসীর দোরেরি মনসুর রদ্‌-উল্‌খালক্ তারিখুল ওয়ামে ওয়াল মলুক সেজদাতুল হেন্দ, শমামতুল আম্বার ফিম আয়ারাদা ফিলহিন্দে সৈয়দ লই রেজিল বশর, সাবহাতুল মরজান ফি আসারে হিন্দুস্তান, এবং হাজীরাতুল কোদস্ ইত্যাদি গ্রন্থে বহু রেওয়ায়াৎ (Tradition) উদ্ধৃত করা হইয়াছে যে, হজরত

আদম বেহেশৎ হইতে বহির্গত হইয়া, ভারতবর্ষেই আগমন করিয়াছিলেন; সুতরাং ভারতের গগনেই সর্ব্বপ্রথম নবুওয়াতের সূর্য্য উদিত হইয়াছিল।

মীর গোলাম আলী ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই, তিনি বলিয়াছেন :—ভারতবর্ষেই নূরে মোহাম্মাদীর বিকাশ হইয়াছে। কারণ বিশ্বস্ত হাদিস সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, নূরে মোহাম্মদী হজরাত আদমের নিকটে গচ্ছিত ছিল। হজরাত আদম সর্ব্বপ্রথম ভারতবর্ষে আগমন করেন ; সুতরাং নূরে মোহাম্মাদীর প্রথম বিকাশ ভারতবর্ষে—তৎপরে আরবদেশে। ইহা অপেক্ষা সম্মানের ও গৌরবের বিষয় আর কি হইতে পারে ?"

হজরাত আদম সর্ব্বপ্রথম ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, এই রেওয়ায়াত অবলম্বন করিয়া জনৈক কবি বলিয়াছেন :—

"এ ভারত স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম বিনিময়। দেখ, আদম স্বর্গ হইতে এই ভারতেই নিপতিত হইলেন।"

অন্য একজন বলিতেছেন :—

"ভারতের উদ্যান যদি স্বর্গাপেক্ষা অধিকতর মনোরম না হইত, তবে আদম স্বর্গের সুখ ও ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিলেন কেন ?"

যদিও এই সকল হাদিস এবং রেওয়ায়াৎ মাওজু ও প্রক্ষিপ্ত, কিন্তু ইহা দ্বারা অনুমান করা যায় যে, মোসলমানগণ ভারতবর্ষকে কি চক্ষে দেখিতেন।

হিন্দুদের বিদ্যা ও শাস্ত্র সম্বন্ধে মোসলমানদের মনের ভাব কিরূপ ছিল ?

খায়েশ আলী রমী তাঁহার 'মোহাজেরাতুল আওয়ায়েল' নামক গ্রন্থে বলিতেছেন :—

"সর্ব্বপ্রথমে যে দেশে গ্রন্থাদি লিখিত হয়, এবং যে স্থান হইতে জ্ঞানের উৎস-সমূহ প্রবাহিত হয়, তাহা ভারতবর্ষ।"

দার্শনিক জামাল উদ্দীন কেফ্‌তী 'আখবারুল হোকামা' গ্রন্থে লিখিতেছেন :—"ভারতবর্ষকে চিরকাল সকল জাতি জ্ঞানের খনি এবং ন্যায় ও রাজনীতির প্রস্রবণ বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিয়াছে।"

আজাদ বেল্‌গ্রামী 'গেজলাহুল্‌হেন্দ' পুস্তকে লিখিতেছেন :—

"অঙ্ক এবং সঙ্গীত শাস্ত্রে ভারতবাসীরাই অগ্রণী। তাঁহারা এই দুই বিষয়ের এরূপ উন্নতি করিয়াছেন যে, তাহার অধিক সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। অন্য দেশবাসিগণ অঙ্কশাস্ত্রের অধিকাংশ নিয়ম ভারতীয়দের নিকটে শিক্ষা করিয়াছেন।"

এই গ্রন্থেরই অন্য স্থানে লিখিত হইয়াছে :—"ভারতীয় পণ্ডিত-গণ অলঙ্কার-শাস্ত্রের উদ্ভাবনায় আরবদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন নাই, পারসীকদের নিকটও কৃপা-ভিখারী হন নাই। ইহার কারণ এই যে, ভারতবর্ষে যে যুগে জ্ঞানচর্চ্চা আরব্ধ হইয়াছিল, ইতিহাস তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম।"

ভারতবিখ্যাত তাপস মির্জ্জা জানেজা (র) হিন্দু পণ্ডিত-দিগের সম্বন্ধে বলিতেছেন :—"সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা, যোগ, ধ্যান এবং দার্শনিক জ্ঞান ও গবেষণায় হিন্দুদের বিশেষ কৃতিত্ব আছে।"

আজাদ বেলগ্রামী গেজলাহুলহেন্দ পুস্তকের ভূমিকায় গ্রন্থের যে সকল উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়াছেন তন্মধ্যে দুইটি উদ্দেশ্য নিম্নরূপ—

"৩য় কারণ এই যে—ভারতীয় সাহিত্যের কোন কোন ভাব ও অলঙ্কার-শাস্ত্র আরব্য ভাষায় অনূদিত করিতে হইবে। ৪র্থ এই যে—'নায়িকা ভেদ' বিষয়টি আরবীতে ভাষান্তরিত করিতে হইবে, এবং ভারতীয় সাহিত্যের এই অপূর্ব্ব ভাবটি আরবী-ভাষীদিগকে উপহার দিতে হইবে।"

মোসলমান আলেমগণের মতে হিন্দু শাস্ত্রকারগণই কাফের নহেন, পরন্তু তাঁহাদের অনেকেই জ্ঞানী, কবি, মোজতাহেদ এবং নবী ও রসুল। মোসলমানদের অন্যতম ধর্ম্মনেতা মহাত্মা মজহার জানেজাঁ তাহার মকতুবাতে লিখিতেছেন :—

"কোরআন মজিদের এবং এমন কোন জাতি নাই যাহাদের মধ্যে সতর্ককারীর (নবীর) আবির্ভাব হয় নাই 'এবং প্রত্যেক জাতির জন্য রসুল প্রেরিত হইয়াছেন' ও অন্যান্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে ভারতবর্ষের নবী ও রসুল প্রেরিত হইয়াছেন। তাঁহাদের অবস্থা হিন্দুদের গ্রন্থে নিখুঁতরূপে বর্ণিত আছে। ভারতীয় নবীদের গ্রন্থাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহাদের জ্ঞান অতি গভীর এবং শিক্ষা খুব সম্পূর্ণ ছিল।" ৪১২ পৃষ্ঠা।

সোলতান ফিরোজ শাহ হিজরী ৭৭৫ সালে সিংহাসন আরোহণ করেন। তিনি যে সময় কাংড়া অধিকারের জন্য অভিযান করিয়াছিলেন, সেই সময় জ্বালামুখীতে উপস্থিত হইয়া তথাকার পুস্তকালয় পরিদর্শন করিয়াছিলেন। সিয়ারউলমোতা-আক্খেরীন ইতিহাসে এই ঘটনার বিবরণে লিখিত হইয়াছে :—

তথায় (জ্বালামুখীতে) প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক রচিত বহু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। [ফেরেস্তা বলিয়াছেন, গ্রন্থের সংখ্যা ১৩০০, তন্মধ্যে কতগুলির অনুবাদ করা হয়। ২য় অধ্যায় ১৪৮ পৃঃ।] সোলতান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের দ্বারা তাহা পাঠ করাইয়া শ্রবণ করেন এবং গ্রন্থের ভাব ও বিষয় অবগত হইয়া অতিশয় পরিতুষ্ট হন। ঐ ভাবগুলি সহজে সকলের বোধগম্য হয় এই উদ্দেশ্যে, তন্মধ্য হইতে কতিপয় পুস্তক ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিতে আদেশ করেন। মাওলানা আ'আজ্জুদ্দীন তদনুযায়ী, একখানি দর্শন-শাস্ত্রের পুস্তক নির্ব্বাচন করিয়া পদ্যে তাহার অনুবাদ করেন। এই অনুবাদের নাম "কেতাবে ফিরোজ-শাহী" রাখা হয়। সোলতান ইহা পাঠ করিয়া আনন্দিত হন; এবং অনুবাদককে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা ও জায়গীর (ভূসম্পত্তি) দান করেন। এই গ্রন্থের বিষয়গুলি লইয়া সোলতানের সভায় অনেক সময়ে আলোচনা হইত।"

হিন্দু সাহিত্য এবং শাস্ত্রের চর্চ্চা করিলে মোসলমানগণ রাজ অনুগ্রহ, সম্মান, অর্থ এবং ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইতেন, ধর্ম্মদ্রোহী (কাফের) বলিয়া লাঞ্ছিত হইতেন না।

লালবাঈ

রমাপদ চৌধুরী

৩২

খবর অজ্ঞাত রইলো না লালবাঈয়ের কাছে।

শুনলো সে, দরবারে হিন্দু প্রজা আর রাজকর্মচারীদের কাছে চন্দ্রপ্রভা নিজেই দর্শন দিয়েছে, জানিয়েছে তার বিপদ সম্ভাবনার কথা। শুনলো, হিংস্র উত্তেজনায় প্রজারা চন্দ্রপ্রভার জয়ধ্বনি তুলে, তার শিশুপুত্রের জয়ধ্বনি তুলে প্রতিজ্ঞা করেছে, লালবাঈকে হত্যা করে বিষ্ণুপুরকে নিষ্কণ্টক করবে।

নিঃশব্দে শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো লালবাঈ। ফিরে তাকালো রঘুনাথের দিকে। দেখলে, সুরার নেশায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে রঘুনাথ।

ঘৃণার দৃষ্টিতে রঘুনাথের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাচ্ছিল্যের হাসি খেলে গেল লালবাঈয়ের চোখে।

ধীরে ধীরে মর্মর জাফরির পাশে ঝরোকার সামনে এসে দাঁড়ালো লালবাঈ।

আকাশে দু'-একটি তারার ঝিকিমিকি। লালবাঁধের জলে রাজহংসের মত জলবিহার নৌকার সারি। আর অদূরে বিষ্ণুপুর-রাজের অতিথিশালার কক্ষে স্তিমিত আলো।

সুলেমান! হাবসী সুলেমানের কথা চকিতে মনে পড়লো লালবাঈয়ের।

আজীবন যাকে ঘৃণা করে এসেছে, জীবনের অদম্য উচ্চাশাকে সার্থক করে তুলতে হলে তার কাছেই ছুটে যেতে হবে।

সুলেমান খাঁ আজ তার একমাত্র ভরসা। ছলে বলে, যে কোন উপায়ে তাকে বন্ধুত্বের পাশে আবদ্ধ করতে হবে। প্রণয়পাত্র আজ ঘৃণার পাত্রে পরিণত হয়েছে, কার্যসিদ্ধির জন্যে ঘৃণার পাত্রকে আজ প্রণয়পাত্রে রূপান্তরিত করতে হবে।

নিজের মনেই হাসলো লালবাঈ।

দুর্বলচিত্ত কামগ্রস্ত রঘুনাথের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বিরক্ত বোধ করলে লালবাঈ।

ঘৃণা নয়, সুলেমান খাঁর সঙ্গে আজ প্রেমের অভিনয় করতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় আত্মদান করতেও ভয় পাবে না।

তোষাখানায় বেশ বদল করতে ঢুকলো লালবাঈ।

রক্তলাল রেশমী ঘাগরায় নতুন করে সাজালে সে নিজেকে। বুকের উল্লাস প্রলুব্ধি জাগালো লাল মখমলের কাঁচুলির বন্ধনে। সোনালী জরি আর হীরে জহরতে ফুলদার লাল কাঁচুলির আগুন ঠিকরে পড়লো দেয়ালের আয়নায়। সলমা আর চুমকি চমক দিলো আবরোয়ানের ওড়নায়। বেণীতে বাঁধলে চম্পা চামেলী। সুর্মা টানলে চোখের কোণে। সীঁথি বেয়ে কপালে নামলো হীরের টায়রা। অধরে ওষ্ঠে কুঙ্কুম। কানে কস্তুরীর সুগন্ধি ছিটিয়ে দিলে, বেশবাসে উগ্র আতর। নাকে পরলে বেশর, বাহুতে গজদন্তের বাজুবন্ধ। মণিবন্ধে নীলাচুড়ি, গণ্ডারশৃঙ্গের কঙ্কণ। গলায় দুলিয়ে দিলে মুক্তার কণ্ঠমালা। পায়ে পাসুলি পাঁয়জোড়, কটিতে কিঙ্কিণি।

আসমানি আলপাকার বোরখায় সারা শরীর ঢেকে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলো লালবাঈ।

সমস্ত পৃথিবী নিঃঝুম। দু'-একটা রাতপাখির ডাক। লালবাঁধের পাড়ে ঝিঁঝির ঝিল্লিরব।

অতিথিশালার সামনে এসে দাঁড়ালো লালবাঈ, একটা থামের আড়ালে। দ্বাররক্ষী মোগল বরকন্দাজ ঘুমে ঢুলছে তখন সিদ্ধির নেশায়।

এক ফাঁকে তাকে দ্রুত অতিক্রম করে গেল লালবাঈ।

দেখলে, ভিতরের প্রাঙ্গণে টহল দিচ্ছে আরেকজন রক্ষী।

হঠাৎ যেন চমকে ফিরে তাকালো রক্ষী, টহল দিতে দিতে। এপাশ ওপাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজলে। তার পর নিঃসন্দিগ্ধ হয়ে এগিয়ে গেল।

সুযোগ পেয়েই কিংখাবের পর্দা সরিয়ে সুলেমান খাঁর কক্ষে প্রবেশ করলো লালবাঈ।

শ্বেতশুভ্র শয্যায় অর্ধশয়ান অবস্থায় বসে বসে একমনে তরোয়াল পরিষ্কার করছিলো হাবসী সুলেমান।

লালবাঈয়ের মনে হ'ল বিরাটকায় একটা দৈত্য যেন পালঙ্কের শিথানে পিঠ আর মর্মরের মেঝেতে পা রেখে আয়েশে বসে আছে। মসীকৃষ্ণ অসুরের হাতে ধারালো তরবারি।

মুহূর্ত্তের জন্যে আতঙ্কে বুক কেঁপে উঠলো লালবাঈয়ের।

মনে পড়লো, বিবিবাজারের সেই ঘটনা।

ফকির সাহেবের চবুতরা থেকে নসীব জেনে ফিরে আসছিলো লালী। বাঁদী জন্নাটের তাঁবুতে প্রবেশ করার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে আসুরিক শক্তিতে দুটি হাত সেদিন এই জিনের বুকে বন্দী করেছিল লালীকে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছিল লালী।

নিলামদার মনিবের আদেশে সেদিন চাবুকের পর চাবুক পড়েছিল হাবসীর পিঠে, রক্তের রেখা ফুটে উঠেছিল।

তার পর নিলামদারের আদেশেই বাঁধন খুলে দিয়েছিল তার খোজা বান্দার দল। আর অদ্ভুত এক বিকৃত কুটিল হাসি হেসে তর্জ্জনী তুলে লালীকে শাসিয়েছিল হাবসী সুলেমান।

নিয়তির বিচিত্র পথ সেই সুলেমানকেই বারংবার এনে দিয়েছে লালীর জীবনে।

রহিম খাঁর মজলিসের দৃশ্যটা মনে পড়লো লালীর।

হঠাৎ নাচ থেমে গিয়েছিল সেদিন, তাল কেটে গিয়েছিল এই হাব্সী সুলেমান পর্দা সরিয়ে রহিম খাঁকে কুর্ণিশ করে দাঁড়াতেই।

ভীরু কবুতরের মত সেদিন নাচ থামিয়ে ধীরে ধীরে হীরাবাঈয়ের কাছে এসে বসে পড়েছিল লালী। আর তার চোখে আতঙ্ক দেখে হাবসী সুলেমানের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসে হেসে উঠেছিল রহিম খাঁ আর শোভা সিংহ।

আশ্চর্য্য! নিয়তির নির্দ্দেশেই বুঝি জীবনের সবচেয়ে বড়ো আতঙ্কটা আজ জীবনের সবচেয়ে বড়ো আকাঙ্খার মানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়ালো লালবাঈ।

এক ফালি আলো এসে ঠিকরে পড়লো সুলেমানের তরবারিতে।

চমকে চোখ তুললো সুলেমান। আসমানি বোরখায় ঢাকা রহস্যের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কে?

উত্তর দিলো না লালবাঈ। ধীরে ধীরে মুখের ওপর থেকে বোরখার আবরণ তুলে ধরলো।

বিস্ময় ফুটলো সুলেমানের কণ্ঠে। অস্ফুটে বললে, লালবাঈ?

দুটি ঠোঁটের ওপর তর্জ্জনী তুলে লালবাঈ ইশারায় চুপ করতে বললে সুলেমানকে।

তারপর বোরখা খুলে রেখে কাছে এগিয়ে গেল।

সুলেমান চাপাগলায় বললে, লালবাঈ, তুমি?

দ্বাররক্ষী টহল দিতে দিতে সুলেমানের গলা শুনতে পেলো। পর্দার আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখলে।

সারা শরীরে শিহরণ খেলে গেল তার।

পর্দাটা ভালো করে টেনে দিয়ে চঞ্চল ভাবে টহল দিতে শুরু করলো সে আবার।

আর লালবাঈ সুলেমান খাঁর শরীর স্পর্শ করে বসলো পালঙ্কের বাজুতে ঠেস দিয়ে।

সুর্মাটানা চোখে দিল্ কবুল করার দৃষ্টি হেনে কামনার মৃদু হাসি দোলালে সে ঠোঁটের কোণে।

বললে, আর্জি আছে খাঁ বাহাদুর!

—আর্জি?

উত্তর এলো, বিষ্ণুপুরের তক্তে আমার সন্তানকে বসাতে চাই খাঁ বাহাদুর!

হেসে উঠলো সুলেমান। বললে, আর রঘুনাথের হিন্দুরাণীর ছেলেকে গোপনে হত্যা করতে চাও, এই তো?

লালবাঈ ঢলে পড়লো সুলেমানের বুকে। ফিসফিস করে বললে, না খাঁ সাহেব। চন্দ্রপ্রভার পুত্রকে হত্যা করলেও মুসলমানী বাঈজীর ছেলেকে সিংহাসন দেবে না হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুর।

—তবে?

হাসলো লালবাঈ। বললে, বিষ্ণুপুররাজ্যকে মুসলমান রাজ্য করতে চাই আমি। হিন্দু আমীর ওমরাহদের নিমন্ত্রণ করে গোপনে নিষিদ্ধ মাংস ভোজন করাতে চাই। ধর্ম্মই হিন্দুর মেরুদণ্ড, ধর্ম্ম হারালে আমার পুত্রকেই রাজসিংহাসনে বসাবে তারা।

মোহময় দৃষ্টিতে সুলেমানের দিকে তাকিয়ে দুটি কোমল বাহুর আলিঙ্গনে হাবসী মনসবদারের কণ্ঠলগ্না হ'ল লালবাঈ।

সুলেমান প্রশ্ন করলে, কিন্তু রাজা বাহাদুর?

—আমার ইচ্ছাই রাজা বাহাদুরের ইচ্ছা। সুরাসক্ত রঘুনাথ আমার বাসনা চরিতার্থ করবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে। আমার নির্দ্দেশই রঘুনাথের নির্দ্দেশ।

সুলেমান ধীরে ধীরে লালবাঈয়ের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করে প্রশ্ন করলে, কিন্তু আমার কি স্বার্থ লালবাঈ? কি চাও তুমি আমার কাছে?

—ধর্ম্মের স্বার্থ খাঁ বাহাদুর, বিষ্ণুপুরকে মুসলমান রাজ্য করতে চাও না তুমি? আর, একবার ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হলে আমাদের পথও নিষ্কণ্টক হবে, রঘুনাথ নামেমাত্র রাজা থাকলেও, তোমার আর আমার নির্দ্দেশেই চলবে রাজ্যশাসন। কামমদির চোখে অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো লালবাঈ।

উঠে দাঁড়ালো সুলেমান। বললে, ফিরে যাও লালবাঈ, আমাকে ভাবতে দাও, ভাবতে দাও আমাকে।

৩৩

বারে বারে নিজের মূল্য যাচাই করেছে লালবাঈ। অনুরোধে অনুরাগে যা কিছু কামনা জানিয়েছে সে, রঘুনাথ আদেশ বলেই গ্রহণ করেছে।

চন্দ্রপ্রভার পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সমস্ত বিষ্ণুপুরবাসীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল ভোজনশালায়। উৎসবে অনুষ্ঠানে সপ্তাহব্যাপী উল্লাস ধ্বনিত হয়েছিল গোপাল সিংহকে কেন্দ্র করে। দেবদারু পাতায়, আমের শাখায়, লতায় কুসুমে সাজানো হয়েছিল সারা নগর। সিংহ দরোজায় রোশনচৌকি নানা বর্ণের রেশম বস্ত্রে, রঙিন আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সেদিন। নহবৎ সুর ধরেছিল সুখের, আনন্দের। আর এই দৃশ্য দেখে ঈর্ষায় জ্বলেছিল লালবাঈ। আদরে ঢলে পড়ে অভিমানের সুরে বলেছিল, চন্দ্রপ্রভাকেই তুমি ভালবাসো রাজা বাহাদুর, তোমার কাছে কানাকড়িরও কিম্মৎ নেই লালবাঈয়ের।

সোহাগের স্পর্শে লালবাঈকে কাছে টেনে নিয়ে রঘুনাথ মৃদু হেসে বলেছিল, কেন লালী?

—আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনেও কি এমনি উৎসবের ব্যবস্থা হবে? প্রশ্ন করেছিল লালবাঈ।

—হবে, এর চেয়েও অনেকগুণ বেশি হবে লালী।

—কিন্তু আজ তোমার প্রজারা যে উৎসাহ নিয়ে এসে জমা হয়েছে ভোজনতলায়, মুসলমানীর নিমন্ত্রণও কি তারা সেদিন এভাবে রক্ষা করবে?

রঘুনাথ ক্রোধের স্বরে বলেছিল, লালবাঈয়ের অসম্মান ঘটলে কোন প্রজা রঘুনাথের কাছে ক্ষমা পাবে না লালী, তোমার অপমানে আমার অপমান। নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করার দুঃসাহস দেখালে প্রাণদণ্ডের শাস্তি দিতেও কুণ্ঠিত হবো না আমি।

সেদিনের এই প্রতিশ্রুতিই স্মরণ করিয়ে দিলো লালবাঈ। আর রঘুনাথ বললে, তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা লালী।

ঢোলসহরৎ খবর ছড়িয়ে দিলো চতুর্দ্দিকে। হিন্দু রাজকর্ম্মচারী আর বিশিষ্ট প্রজাদের নামে নিমন্ত্রণ পাঠালো রঘুনাথ। লালবাঈয়ের পুত্র সন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে ভোজনতলায় আমন্ত্রণ জানালো। প্রজারা অসন্তুষ্ট হ'ল, রাজকর্ম্মচারীরা অসন্তুষ্ট হ'ল। মল্লবংশ কোনদিন উপপত্নীর সন্তানের জন্য রাজকোষ উন্মুক্ত করেনি এভাবে, প্রকাশ্যে আমন্ত্রণ জানায় নি প্রজাবর্গকে। আর রঘুনাথ বিষ্ণুপুর রাজ্যের সব সম্মান ধূলোয় মিশিয়ে দিতে চায় এক যবনী উপপত্নীর নির্দ্দেশে।

তবু নিমন্ত্রণ অস্বীকার করার সাহস হল না কারও। সুরাসক্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত রাজা রঘুনাথের অত্যাচার বড়ো নৃশংস, যুক্তিহীন। নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করার শাস্তি প্রাণদণ্ড।

কেউই জানলো না রাজপ্রাসাদের নিমন্ত্রণের পিছনে লালবাঈয়ের কি অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে।

হাবসী সুলেমান খাঁ কিন্তু চুপ করে থাকতে পারলো না। লালবাঈ বিদায় নিতেই সারা ঘর কাঁপিয়ে অট্টহাসে হেসে উঠেছিল সুলেমান। ঢোলসহরতের খবর শুনে চিন্তিত হয়ে উঠলো। অবিলম্বে হাতে গোপনে সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলো চন্দ্রপ্রভার। যে লালবাঈকে পাবার বাসনায় সারা জীবন ছুটে চলেছিল সুলেমান, আজ তাকে হাতের মুঠোয় পেয়েও বুঝি বা ছুঁড়ে ফেলতে চায়। সুলেমান নিজেই বুঝতে পারে না কেন এই আকস্মিক পরিবর্ত্তন ঘটে গেল তার মনে। বাসনা চরিতার্থ করার আগ্রহেই বড়ো হতে চেয়েছে বাঁদীবাজারের হাবসী প্রহরী; ঐশ্বর্য্যের পুরস্কারকে তুচ্ছ করেছে, রহিম খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিয়েছে, নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রে। আর এই বহুলালিত কামনা পূরণের আশাতেই মুর্শিদকুলির পরোয়ানা নিয়ে ছুটে এসেছে সে।

কিন্তু এমন অযাচিত ভাবে উপযাচিকার অর্ঘ্য নিয়ে লালবাঈ নিজেই ধরা দিতে চাইবে তার লালসার বন্ধনে, কোনদিন কল্পনাও করে নি সুলেমান। আপন শক্তিতে অধিকার করা নয়, যেন আপন আত্মাকে শয়তানের হাতে বেচে দেওয়া। এমন ভাবে তো লালবাঈকে চায় নি সে? উপযাচিকা লালবাঈ যেন তার অহঙ্কারের গায়ে আঘাত হেনে দিয়ে গেছে। যেন তাচ্ছিল্যের হাসিতে বলে গেছে, লালবাঈ আপন ইচ্ছায় ধরা না দিলে কোন শক্তি দিয়েই তাকে অধিকার করা যায় না, কেনা যায় না তাকে রাজঐশ্বর্য্য দিয়েও।

হতাশা দেখা দিলো সুলেমানের চোখে। এই মিথ্যা মরীচিকার পেছনেই কি সারাজীবন ছুটে চলেছে সে!

লালবাঈয়ের মনেই হাসলো সুলেমান। নারীর সুন্দর মুখের আড়ালে অবিশ্বাসিনীর মূর্ত্তি এমন ভাবে লুকিয়ে থাকে জানতো না। কল্পনাও করে নি, আকাঙ্খার সর্পিল দৃষ্টিতে এভাবে প্রণয়পাত্রের জীবন বিষাক্ত করে তুলতে চাইবে রঘুনাথের প্রণয়িনী।

হঠাৎ তাই কর্ত্তব্য বড়ো হয়ে দেখা দিলো সুলেমানের চোখে। গোপনে চন্দ্রপ্রভার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে সুলেমান। বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় নত হয়ে তরবারি রাখলে সে পদপ্রান্তে। লালবাঈয়ের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সুলেমান, আর এই রূপ দেখে শ্রদ্ধায় নত হল সে।

বীরাঙ্গনার মূর্ত্তি যেন। মুখে মাতৃস্নেহের অপূর্ব হাস্য, সুধাবর্ষী চোখে কমনীয় রূপ।

লালবাঈয়ের সমস্ত চক্রান্তের কথা শুনে ক্রোধের দৃষ্টি ফুটে উঠলো চন্দ্রপ্রভার চোখে।

দৃঢ় গলায় জ্যোতিষাচার্যকে উদ্দেশ্য করে বললে, আর নয়, অনেক সহ্য করেছি আমি। বিহিত করুন গুরুদেব।

সুলেমান বললে, রাজা বাহাদুর রঘুনাথও এ চক্রান্তে লিপ্ত রাজমহিষী! আপনার পুত্রকে বঞ্চিত করে লালবাঈয়ের সন্তানকে সিংহাসনে বসাতে চাইছেন তিনি। সেই কারণেই প্রবঞ্চনা করে সমগ্র বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের ধর্ম্মনাশ করতে চান রঘুনাথ।

জ্যোতিষাচার্য বললেন, মিথ্যা নয় মা সুলেমান খাঁর কথা। শত্রু আজ লালবাঈ নয়, শত্রু রঘুনাথ।

চুপ করে রইলো চন্দ্রপ্রভা, উত্তর দিতে পারলো না জ্যোতিষাচার্যের অনুচ্চারিত প্রশ্নের।

জ্যোতিষাচার্য পুনরায় বললেন, গোপালকে স্বহস্তে বিষপ্রয়োগ করে রঘুনাথ হত্যা করতে চান, গুপ্তচরের কাছে এ-সংবাদ পেয়েছি মা।

উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টি তুলে তাকালো চন্দ্রপ্রভা জ্যোতিষাচার্যের মুখের দিকে, দু' ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো তার চোখ বেয়ে।

পরমুহূর্তেই ছুটে পালিয়ে এলো চন্দ্রপ্রভা।

কক্ষে ফিরে এসে নিদ্রিত গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। না, না, সব অভিশাপের হাত থেকে বাঁচাতে হবে তাকে, বাঁচাতে হবে তাকে পুত্রহন্তা পিতার হাত থেকে।

বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদের প্রতি পাথরে যেন সেই পুরানো দিনের অভিশাপ বিষনিঃশ্বাস ফেলছে।

বীর সিংহের অভিশপ্ত বংশে পুনরায় বুঝি সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে।

নৃশংস বীর সিংহ আপন ভ্রাতাকে বিষপ্রয়োগ করেই ক্ষান্ত হয় নি। একটির পর একটি সন্তানকে হত্যা করেছিল রাজসিক অহঙ্কারে। জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্জ্জন সিংহকেও হত্যা করার আদেশ দিয়েছিল সামান্য কারণে। রাণী শিরোমণির কাতর অনুনয়ে কর্ণপাত করেনি সেদিন।

জল্লাদের মায়া মমতাই গোপনে রক্ষা করেছিল দুর্জ্জন সিংহকে। সেই দুর্জ্জন সিংহের পুত্র রঘুনাথের জীবনেও আজ বীর সিংহের নৃশংসতা নেমে এসেছে।

শিশুপুত্র গোপালকে কোলে নিয়ে সজল চোখে গবাক্ষে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা। দেখলে, নবাবী সিপাহী অশ্বারোহীরা নগরদ্বার অতিক্রম করে চলে গেল বিদায় নহবৎ বাজিয়ে। ধীরে ধীরে ঘোড়ার খুরের শব্দ আর ধূলোর ঘূর্ণি মিলিয়ে গেল বাতাসে।

হঠাৎ যেন নিজেকে বড়ো সহায়সম্বলহীন মনে হ'ল চন্দ্রপ্রভার। উদাসভাবে রাজোদ্যানের দিকে তাকিয়ে রইলো। দেখলে, প্রাসাদের শবরী দেহরক্ষী নারীর দল তীরধনুক হাতে লক্ষ্যভেদ অভ্যাস করছে।

সুরঞ্জাক্ষীকে ডেকে তার হাতে পুত্রের ভার দিয়ে শয্যাকক্ষ থেকে তীরধনুক নিয়ে চন্দ্রপ্রভাও উদ্যানে নেমে এলো। শবরী দেহ-রক্ষীদের সঙ্গে লক্ষ্যভেদ ক্রীড়ায় নিজেও মেতে উঠলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। মনের মধ্যে তবু একটি কথাই বারংবার ঘুরে বেড়ায়। জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যৎবাণী।—পতিঘাতিনী রেখা মা তোমার হাতে, বড়ো ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট তোমার!

না, ভয়ঙ্কর নয়। শুভচিহ্ন। স্বামিহত্যাকে আজ আর ভয় পায় না চন্দ্রপ্রভা।

ক্লান্তদেহে উদ্যানের খেলা সাঙ্গ করে ফিরে এলো চন্দ্রপ্রভা, হাতে তীর-ধনুক। কিন্তু শয্যাকক্ষে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই থমকে দাঁড়ালো।

দেখলে, সুরঞ্জাক্ষী অদূরে অপেক্ষা করছে, আর রঘুনাথ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে শয্যায় জাগ্রত গোপালের দিকে। শিশু গোপাল সহাস্যমুখে তাকিয়ে আছে রঘুনাথের দিকে। হঠাৎ দুটি ছোট ছোট হাত বাড়ালো শিশু রঘুনাথের দিকে।

রঘুনাথের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিলো। শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ যেন ভুল বুঝতে পেরেছে রঘুনাথ।

এ কি করতে চলেছে সে! এমন সুন্দর দেবতুল্য শিশুকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করে উপপত্নীর সন্তানকে উত্তরাধিকার দিতে চলেছে?

অনুশোচনা দেখা দিলো রঘুনাথের মনে।

বললে, অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই সুরঞ্জাক্ষী! চন্দ্রপ্রভার ওপর, আমার সন্তানের ওপর যে অবিচার করেছি তার কি কোন প্রায়শ্চিত্ত নেই সুরঞ্জাক্ষী?

ভুল ভুল।

দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে এলো রঘুনাথ, শিশুকে বুকে জড়িয়ে ধরার আগ্রহে।

আর দূরে দাঁড়িয়ে আশঙ্কায় শিউরে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্রপ্রভা বুঝলো না। দূর থেকে রঘুনাথকে লক্ষ্য করতে করতে শিউরে উঠলো চন্দ্রপ্রভা। ভাবলে, দু'হাতে কণ্ঠরোধ করে পুত্রকে হত্যা করতে চলেছে রঘুনাথ।

সেই মুহূর্ত্তেই লক্ষ্যস্থির করে তীর ছুঁড়লো চন্দ্রপ্রভা।

বিষাক্ত তীর এসে বিঁধলো রঘুনাথের বুকে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে শয্যাপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লো রঘুনাথ।

ছুটে এলো চন্দ্রপ্রভা।

বিষের যন্ত্রণায় কাতরোক্তি করতে করতে রঘুনাথ অস্ফুটে বললে, চন্দ্রা, তুমি? তুমি হত্যা করলে আমাকে?

বিচিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত হ'ল চন্দ্রপ্রভার মুখ। বললে, যে পিতা আপন পুত্রের জীবন নাশ করতে উদ্যত হয় তাকে হত্যা করা পাপ নয়।

সুরঞ্জাক্ষীর চোখের কোণে অশ্রু দেখা দিলো।

বললে, ভুল করেছো চন্দ্রা, ভুল। রাজা রঘুনাথ ক্ষমা চাইতে এসেছিলেন তোমার কাছে, নিজের ভুল বুঝতে পেরে গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরতে এসেছিলেন।

বিস্ময়ের চোখে উদাস ভাবে সুরঞ্জাক্ষীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো চন্দ্রপ্রভা। দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর বন্যা নামলো।

হঠাৎ চিৎকার করে কেঁদে উঠে রঘুনাথের মৃতদেহের ওপর লুটিয়ে পড়লো চন্দ্রপ্রভা।

৩৪

বার্ত্তা ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দ্দিকে।

ধর্ম্মের জন্ত পতিঘাতিনী হয়েছে চন্দ্রপ্রভা, প্রজার স্বার্থের জন্যে আপন হাতে মুছে ফেলেছে তার সীমন্তের সিঁদুর। ধর্ম্ম রক্ষা পেয়েছে, রাজ্য রক্ষা পেয়েছে রাজা রঘুনাথের অনাচারের হাত থেকে।

উল্লাসের ধ্বনি তুলে ছুটে এলো বিষ্ণুপুর অধিবাসীরা। ভিড় করে এলো। রাজপ্রাসাদের প্রাচীরের পাশে জয়ধ্বনি উঠলো রাণী চন্দ্রপ্রভার, শিশু গোপাল সিংহের।

আনন্দের উন্মত্ত চিৎকারে চন্দ্রপ্রভার দর্শন পাবার ব্যাকুলতা প্রকাশ পেলো জনতার মধ্যে।

'রাজদর্শন' গবাক্ষে অশ্রুসিক্ত চোখে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা।

প্রত্যূষে রাজদর্শন অতীব শুভকর বলেই প্রজারা ভিড় করে আসতো এই দর্শন-ঝরোকার নিচে। বীর হাম্বির আর রাণী সুদক্ষিণা, বীর সিংহ আর রাণী শিরোমণি, দুর্জন সিংহ আর তাঁর পত্নী প্রতিদিন এসে দাঁড়াতেন এই গবাক্ষে, এসে দাঁড়াতো রাজা রঘুনাথ আর রাণী চন্দ্রপ্রভা। রাজদর্শন লাভ করে হৃষ্টচিত্তে ফিরে যেত প্রজারা।

কিন্তু এই প্রাচীন রীতিকেও বিনষ্ট করেছিল রঘুনাথ। লাল-বাঈয়ের প্রমোদভবনে সুরার নেশায় ডুবে থেকে ভুলে গিয়েছিল কত আন্তরিক আগ্রহে প্রজার দল এসে ভিড় করে রাজদর্শনের লোভে।

বহুদিন পরে আজ আবার নতুন করে দর্শন-গবাক্ষে এসে দাঁড়ালো চন্দ্রপ্রভা, কোলে তার শিশুপুত্র গোপাল সিংহ।

চন্দ্রপ্রভার অশ্রুসিক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে, শিশু গোপালের মুখচন্দ্রিমায় মুগ্ধ হয়ে হিংস্র উত্তেজনায় লালবাঈয়ের মৃত্যুকামনা করে চিৎকার করে উঠলো জনতা। পরমুহূর্ত্তে হাতের সড়কি, বর্শা, বিষাক্ত তীর আর ধনুক তুলে ধরে ছুটে গেল তারা লালবাঁধের দিকে। লালবাঈয়ের অট্টালিকার দিকে।

লালবাঁধের নামকরণ সার্থক করে তুলতে চায় তারা। লাল-বাঈয়ের রক্তে রাঙিয়ে তুলতে চায় লালবাঁধের স্ফটিকস্বচ্ছ জল।

আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠলো লালবাঈ।

রাজা রঘুনাথকে হত্যা করেছে রাণী চন্দ্রপ্রভা—এ খবর শুনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল লালবাঈ!

মনি বান্দু ছুটতে ছুটতে এসে খবর দিলো, উন্মত্ত আক্রোশে জনতা ছুটে আসছে লালবাঈকে হত্যা করবার জন্যে, লালবাঁধের জলধারা লালবাঈয়ের রক্তে রাঙিয়ে তুলতে।

আপন শিশুকে দু'হাতে বুকে জড়িয়ে ধরলো লালবাঈ। ভয়ে কেঁপে উঠলো উচ্ছৃঙ্খল জনতার হিংস্র উত্তেজনার দিকে তাকিয়ে।

তার বিমূঢ় বিভ্রান্ত চোখের সামনে যেন পথ নেই, উপায় নেই। তবু বাঁচতে চায় লালবাঈ, বাঁচাতে চায় তার আপন শিশুকে।

হঠাৎ যেন ভরসার কূল খুঁজে পেল লালী।

সিপাহসালার সৈন্যদের বিদায় দিয়ে রাজ-অতিথিশালায় অপেক্ষা করছে সুলেমান খাঁ। রাজা রঘুনাথের কাছে বিদায় নেবার জন্যে।

বিষ্ণুপুরের গৃহবিদ্রোহে নিজেকে জড়িয়ে ফেলতে চায় নি সুলেমান। কিন্তু এমন আকস্মিক ভাবে রঘুনাথের মৃত্যুর সংবাদ এসে পৌঁছবে কল্পনাও করে নি।

সুলেমান দেখতে পেল সমস্ত জনতা ছুটে আসছে লালবাঈয়ের প্রমোদভবনের দিকে।

জীবনের একমাত্র আকাঙ্খা ছিল লালবাঈ। বিবিবাজারের একশো মোহর কিস্মতের এই বাঁদীকে বেগম করার দুঃস্বপ্নে সারা জীবন ছুটে বেড়িয়েছে হাব্সী সুলেমান। প্রতিবারেই লালবাঈয়ের চোখে দেখেছে ঘৃণা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি।

কাঞ্চনী লালবাঈয়ের প্রেম চেয়েছে সুলেমান। ভালবাসতে চেয়েছে তাকে। পরিবর্তে উপযাচিকা হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে লালবাঈ। ভালবাসা নয়, তার দেহরূপ উপঢৌকন দিতে চেয়েছে চক্রান্তের বিনিময়ে। তাই সারাজীবনের অন্ধ কামনায় যাকে স্বপ্ন দেখেছিল সুলেমান, তাকেই ঘৃণা করেছে সে, ফিরিয়ে দিয়েছে তাচ্ছিল্যের অট্টহাসে।

অতিথিশালার ঝরোকায় দাঁড়িয়ে সশস্ত্র জনতার আক্রোশধ্বনি শুনে হঠাৎ উল্লাসে সশব্দে হেসে উঠলো সুলেমান। মসীকৃষ্ণ দৈত্যচেহারার হাবসী সুলেমান খুশিতে হেসে উঠলো সাদা সাদা দাঁত বের করে।

পরক্ষণেই পদধ্বনি শুনে ফিরে দাঁড়াতে হ'ল।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলো সে লালবাঈয়ের দিকে।

যাকে আজীবন ঘৃণা করেছে লালবাঈ, তারই কাছে আজ ছুটে এসেছে সে শেষ ভরসায়।

হাব্সী সুলেমান একদিন লালবাঈকে ইনাম চেয়ে তাকে অপমানিত করেছিল রহিম খাঁর জলসামহলে। আর এই অপমানের প্রতিশোধ চেয়ে লালবাঈ কোতল করতে চেয়েছিল হাবসী সুলেমানকে।

যার জীবন নিতে চেয়েছিল একদিন রহিম খাঁর আসরে, তারই কাছে জীবন ফিরে পাবার আগ্রহে ছুটে এসেছে লালবাঈ।

দু'হাতে শিশুপুত্রকে বুকে জড়িয়ে লালবাঈ কান্নার স্বরে ভেঙে পড়লো। কথা নয়, শুধু দৃষ্টি দিয়েই যেন জীবন ভিক্ষা চাইলে।

মুহূর্তের মধ্যে প্রলয় ঘটে গেল হাবসী সুলেমানের মনের গভীরে। দু'টি মসীকৃষ্ণ সবল হাত বাড়িয়ে লালবাঈয়ের সন্তানকে কোলে তুলে নিল সুলেমান।

বললে, ভয় নেই, ভয় নেই লালবাঈ! নিজের জীবন দিয়েও তোমাকে রক্ষা করবো।

দ্রুত নেমে এলো সুলেমান, ঘোড়ার পিঠে লাফিয়ে উঠলো। শিশুপুত্রকে কোলে নিয়ে সুলেমানের বিস্তৃত পিঠের আড়ালে ভয়ে লুকোলো লালবাঈ।

আর ঘোড়া ছুটিয়ে দিলো সুলেমান।

কিন্তু তার আগেই খবর পৌঁছে গেল জনতার কাছে।

নাকাড়ায় সঙ্কেত বেজে উঠলো। নগরদ্বার সিংহদরোজা বন্ধ হয়ে গেল সুলেমানের ঘোড়ার সামনে। জনতা ছুটে এলো পলাতকা লালবাঈয়ের দিকে।

তরোয়াল উঁচিয়ে ফিরে দাঁড়ালো সুলেমান। জীবন্ থাকতে লালবাঈয়ের অঙ্গ স্পর্শ করতে দেবে না সে জনতাকে।

কিন্তু তীরের বিরুদ্ধে তরবারি অসহায়।

এক ঝাঁক বিষাক্ত তীর এসে বিঁধলো সুলেমানের বুকে।

লালবাঈয়ের প্রাণ রক্ষা করতে গিয়ে নিজের প্রাণ উৎসর্গ দিলো সুলেমান। রক্তাক্ত একটি অসুরের শরীর লুটিয়ে পড়লো রূপময়ী লালবাঈয়ের পায়ের কাছে।

লৌহশৃঙ্খলে বন্দী হ'ল লালবাঈ।

লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন জ্যোতিষাচার্য।

প্রজার রক্ত শোষণ করে তৈরী হয়েছে এই লালবাঁধ, এক কাঞ্চনীর নৌবিলাসের ক্ষণিক আকাঙ্খাকে পরিতৃপ্ত করার জন্যে আজীবন দারিদ্র্য, অনাহার, মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে শত শত অধিবাসীকে। ঘাতকের অস্ত্রে নয়, তিল তিল করে যেভাবে বন-বিষ্ণুপুর অত্যাচারিত হয়েছে লালবাঈয়ের অদম্য উচ্চাশা আর রাজসিক বিলাসব্যসন চরিতার্থ করে, তেমনি তিল তিল করে দুঃসহ যন্ত্রণায় মৃত্যুবরণ করতে হবে লালবাঈকে।

যে সুসজ্জিত ময়ূরপঙ্খীতে রঘুনাথের সঙ্গে নৌকাবিহারে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'ত লালবাঈয়ের, সেই সুখস্মৃতি বিজড়িত ময়ূরপঙ্খীতে নিয়ে যাওয়া হ'ল বন্দিনী লালবাঈকে।

লোহার শৃঙ্খলে বাঁধা রূপময়ী যবনীর দু' চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়লো।

জনতা উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো গরবিনীর লাঞ্ছনায়।

ধীরে ধীরে ময়ূরপঙ্খী এসে থামলো লালবাঁধের মাঝ দরিয়ায়।

জ্যোতিষাচার্যের আদেশে পাটাতনের নির্দিষ্ট ছিদ্র খুলে দেওয়া হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ আক্রোশে যেন লালবাঁধের জলস্রোত ঝাঁপিয়ে পড়লো লালবাঈয়ের দিকে।

শৃঙ্খলের বন্ধন থেকে মুক্তি পাবার জন্যে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠলো লালবাঈ। অনুনয়ের কাতরোক্তি ভেসে এলো—আমাকে যে শাস্তি দিতে চাও, মাথা পেতে নেবো। নিরপরাধ এই শিশুকে বাঁচাও।

কিন্তু কেউ কর্ণপাত করলো না তার অনুরোধে।

সহানুভূতি দেখালো না কেউ।

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে নিমজ্জমান বজরা ত্যাগ করে চলে গেল তারা।

ধীরে ধীরে লালবাঁধের গভীরতায় ডুবে গেল শৃঙ্খলিত লালবাঈয়ের যৌবনরূপ, তার উদ্দাম কামনা, বিষাক্ত বিলাস।

অদৃশ্য হ'ল বহুমূল্য ময়ূরপঙ্খী। লালবাঁধের অতলে তলিয়ে গেল একটি অসামান্যা নারীর দেহ। এক অতি সামান্যা নারীর অদম্য আকাঙ্খা।

৩৫

নৃশংস উল্লাসে আত্মহারা জনতা ফিরে এল দরবার-ভবনে।

শান্তিস্তোত্র পাইলেন সভাপণ্ডিত। "যস্মিন্ সর্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্ বিজানতঃ। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ।" সর্বভূতই যখন আত্মার সঙ্গে এক ও অভিন্ন হয়ে যায় তখন সেই একত্বদর্শী জ্ঞানীর শোকই বা কি, আর মোহই বা কি?

রঘুনাথের মৃত্যুশোক আর ধর্ম্মরক্ষার আনন্দ—দুটি অনুভূতির সমন্বয়ে সমাহিত হবার জন্যে জনতাকে উপদেশ দিলেন সভাপণ্ডিত।

নিষ্কণ্টক হয়েছে বিষ্ণুপুর, শান্তি ফিরে পেয়েছে। শূন্য সিংহাসনে বসাতে হবে শিশু গোপাল সিংহকে। তৈরী হতে হবে অভিষেক উৎসবের জন্যে।

তাই তৎপর হয়ে উঠলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, গোপাল সিংহের আড়ালে থেকে শাসনকার্য্য চালাবেন রাণী চন্দ্রপ্রভা—যিনি বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেছেন যবনাচারের হাত থেকে।

দেওয়ানজী এবং অমাত্যের দল সম্মতি জানালেন জ্যোতিষাচার্যের অভিমত শুনে। উল্লসিত হ'ল প্রজাবর্গ।

অভিষেকের সুর বেজে উঠলো নহবৎখানায়।

প্রজারা ছুটে গেল রাজপ্রাসাদে রাণী চন্দ্রপ্রভার কাছে, শুভ সংবাদ জানিয়ে জয়ধ্বনি করতে করতে।

কিন্তু প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে চিৎকার থেমে গেল তাদের।

হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে আকাশ বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে।

শ্যামবাঁধের পাড়ের শ্মশানভূমিতে রঘুনাথের মৃতদেহ বহন করে নিয়ে এলো প্রজারা।

আর পিছনে পিছনে সম্রাজ্ঞীর বস্ত্রভূষণে অলঙ্কৃতা চন্দ্রপ্রভা। চোখের কোণে অশ্রু নেই, অনুশোচনার চিহ্ন নেই মুখে।

চন্দন কাঠে চিতা সাজানো হ'লো। জরিয়া দাসীর দল সুগন্ধি আতর অগুরু অঙ্গরাগ ঢেলে দিলো চন্দনের শয্যায়।

ক্রমে ক্রমে মৃদু মধুর তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো চন্দ্রপ্রভার মুখে। সম্রাজ্ঞীর বসনে-ভূষণে সজ্জিতা রাণী চন্দ্রপ্রভা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা রাণী চন্দ্রপ্রভা। সীমন্তে সিন্দুর, হাতে শঙ্খবলয়। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ রেশমবস্ত্রের ঈষৎ অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখচন্দ্রমায় হঠাৎ যেন তৃপ্তির হাসি দেখা দিলো।

সুরজাক্ষীর দিকে ফিরে তাকিয়ে অপাঙ্গের ইশারায় হাতছানি দিলো চন্দ্রপ্রভা।

শিশু গোপালকে চুম্বন করে সুরজাক্ষীর কোলে তুলে দিলো তাকে। বললে, আজ থেকে গোপালের সব ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম সখী!

দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো সুরজাক্ষীর। বললে, কিন্তু আমি যে তোমারই সঙ্গে যেতে চাই চন্দ্রপ্রভা!

—না, না, তা হয় না সুরজাক্ষী! বাধা দিয়ে উঠলো চন্দ্রপ্রভা।

তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো রঘুনাথের চিতাশয্যার সামনে।

ভিড় ভেঙ্গে পড়লো শ্মশানভূমিতে। মুহূর্ত্তের মধ্যে খবর রটে গেল চতুর্দ্দিকে। বালবৃদ্ধবনিতার দল ছুটে এলো এই স্বর্গীয় দৃশ্য দেখার লোভে।

সতী হবে চন্দ্রপ্রভা। সহমৃতা হবে পতিঘাতিনী এক নারী।

সতীদাহ নয়, সহমরণ নয়। জন্মজন্মান্তরের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা পতি আর পত্নীর পুনর্বিবাহ যেন। তাই নববধূর বেশে নিজেকে সাজিয়ে তুলেছে চন্দ্রপ্রভা, মুখে টেনেছে লাজনম্র তৃপ্তির আবেশ।

জ্যোতিষাচার্য বাধা দিতে এগিয়ে এলেন।—এ কি ভুল করতে চলেছো মা! বিষ্ণুপুরের শাসনভার হাতে নিতে হবে তোমাকে, মানুষ করে তুলতে হবে শিশু গোপালকে।

হাসলো চন্দ্রপ্রভা। বললে, আপনারা তো রইলেন গুরুদেব, সে ভার আপনাদের ওপরই দিয়ে গেলাম।

বিস্ময়ে নিশ্চুপ হলেন জ্যোতিষাচার্য্য, নিশ্চুপ হলেন সভাপণ্ডিত আর দেওয়ানজী। যে নারী নিজের হাতে পতিহত্যা করতে পারে, স্বেচ্ছায় সে এগিয়ে যেতে পারে স্বামীর চিতায়?

বোঝাবার চেষ্টা করলো প্রজারা, দাসদাসীর দল।

তবু সঙ্কল্পে দৃঢ় চন্দ্রপ্রভা। কৌতুকের হাসিতে যেন স্তব্ধ করে দিতে চায় সব অনুরোধ, সব বাধা নিষেধ।

হরিদ্রা চন্দনের প্রলেপ দিলো চন্দ্রপ্রভা নিজের কপালে। মন্ত্রপাঠ করতে করতে চক্র দিতে সুরু করলে রঘুনাথের চিতার চতুষ্পার্শ্বে। দু'হাতের ধীর স্থির মুষ্টিতে ফুলমালা।

শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে স্তোত্র উচ্চারণ করে চন্দ্রপ্রভা:

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।

ওঁ ক্রতো স্মর, কৃতং স্মর, ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।

আমার প্রাণবায়ু মহাবায়ুতে এবং এই শরীর ভস্মেতে মিলিত হোক। হে চিন্তাশীল মন, তুমি তোমার কৃত ও কর্ত্তব্য বিষয় স্মরণ কর।

অগ্নে নয় সুপথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুযোধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো
ভূয়িষ্ঠাং তে নম-উক্তিং বিধেম।

হে অগ্নি, তুমি আমাকে সুপথে নিয়ে চলো। হে দেব, তুমি আমাদের সমস্ত কর্ম্মই জানো। আমাদের পাপ বিদূরণ করো। তোমাকে নমস্কার।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

মন্ত্রপাঠ শেষ করে ধীরে ধীরে করধৃত ফুলমালা রঘুনাথের কণ্ঠে পরিয়ে দিলো চন্দ্রপ্রভা।

তারপর যজ্ঞকুণ্ডে ফিরে এলো।

যজ্ঞপুরোহিতের হাত থেকে আম্রশাখা নিয়ে দৃঢ় সংবদ্ধ পায়ে চিতায় আরোহণ করলো চন্দ্রপ্রভা। রঘুনাথের মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে চিতায় শয়ন করলো সহাস্য মুখে।

যজ্ঞপুরোহিতের নির্দ্দেশে অগ্নি সংযোগ করা হ'ল। চন্দনকাঠের চিতাশয্যা দাউ দাউ করে শত শিখায় জ্বলে উঠলো। উচ্চনিনাদে বেজে উঠলো সতীশঙ্খ, বাদ্যধ্বনি হ'ল চতুর্দ্দিকে।

চন্দ্রপ্রভার প্রিয় জরিয়া দাসীর দল পরস্পরের হাত ধরে চিতার চতুষ্পার্শ্বে অগ্নি পরিক্রমা সুরু করলো নৃত্যের তালে তালে।

ঘৃত হরিদ্রা চন্দন আহুতি দিলো প্রজারা।

লেলিহান শিখার আগুনে নিষ্প্রভ হয়ে গেল রূপবতী চন্দ্রপ্রভার হাস্যোজ্জ্বল মুখ।

আতঙ্কে চিৎকার করে কেঁদে উঠলো শুধু শিশু গোপাল সিংহ।

আর সুরজাক্ষীর দু'চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

অনিমেষ দৃষ্টিতে জ্বলন্ত চিতার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠলো সুরজাক্ষী। তার শরীরেও যেন এক বিচিত্র উন্মাদনা জেগে উঠেছে। অন্য এক দাসীর কোলে শিশু গোপালকে রেখে অকস্মাৎ জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়লো সুরজাক্ষী।

চিৎকার করে উঠলো বিভ্রান্ত জনতা।

ভস্মীভূত হ'ল সুরঞ্জাক্ষীর জীবন্ত দেহ, ভস্মীভূত হ'ল পতিঘাতিনী সতী চন্দ্রপ্রভার যৌবনশরীর।

বজ্রপুরোহিতের উদাত্ত কণ্ঠস্বরে তখনও বেজে চলেছে :

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

উপসংহার

মুঠো মুঠো করে সেদিন সতীকুণ্ডের ছাই নিয়ে গিয়েছিল পুরাঙ্গনার দল। পতিঘাতিনী সতীর ভস্মাবশেষ দূর দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও তা রূপ নিয়েছিল দেববিগ্রহের, কোথাও বা ধর্মঠাকুর হয়ে বেঁচে আছে তা আজও।

কে জানে, বহু অতীতে হয়তো এমনই কোন গরীয়সী সতীর ভস্মাবশেষই ছড়িয়ে পড়েছিল ভারতের দিকে দিকে, দক্ষকন্যা সতীর পীঠস্থান হয়ে তা আজও বেঁচে আছে। ভক্তের কল্পনা কোন পতিপ্রাণা নারীকে গড়ে তুলেছে দেবীর মহিমায়।

শ্যামবাঁধের জোয়ার জলে, বৃষ্টিতে ধুয়ে মুছে গেছে সেই সতীকুণ্ডের চিতাবশেষ। কিন্তু মানুষের মনে চিরস্থায়ী হয়ে আছে তার স্মৃতি।

যুগের পর যুগ কেটে গেছে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কত না উত্থান-পতন।

মৃত্যু হ'ল দিল্লীশ্বর আওরংজেবের। দিল্লীর সিংহাসনে বসলেন সম্রাট ফেরোকসায়ের। বিবাহ স্থির হ'ল তাঁর রাজসিংহকন্যা রাজপুতনন্দিনীর সঙ্গে।

ইতিহাসই বুঝি বারে বারে সুযোগ এনে দিয়েছে বণিক ইংরেজের কাছে। বাণিজ্য নয়, বাহুবল নয়, নয় কোন রাজনৈতিক কৌশল।

সুবিস্তৃত ভারত সাম্রাজ্যে ইংরেজের আধিপত্য এনেছে ইংরেজের চিকিৎসাশাস্ত্র, আওরংজেবের জেহাদ আর হিন্দু ভূস্বামীদের গৃহবিদ্রোহ।

সম্রাট ফেরোকসায়েরের বিবাহ উৎসবের নহবৎ বেজে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর পীড়ায় শয্যাশায়ী হতে হ'ল তাকে। অস্ত্রোপচার করে সম্রাটকে বাঁচিয়ে তুললো ডাক্তার হ্যামিলটন।

খুশি হয়ে সম্রাট বললেন, কি চাও তুমি ইংরেজ বন্ধু, তোমার প্রার্থনাই আমার মঞ্জুরী।

হ্যামিলটন টুপি খুলে কুর্ণিশ করে বললে, ইংরেজ কোম্পানীকে বাণিজ্যশুল্ক থেকে রেহাই দিন সম্রাট, আর ডিহি কলিকাতার সংলগ্ন ৩৮টি নগর কেনবার অধিকার দিন।

সাজাহান কন্যাকে সারিয়ে তুলে স্বাধীন ব্যবসার অনুমতি পেয়েছিল গ্যাব্রিয়েল বাউটন, কেল্লা প্রতিষ্ঠার সুযোগ মিলেছিল ইব্রাহিম খাঁ আর আজিমুশ্বানের ব্যর্থতায়, শক্তিবৃদ্ধি ঘটলো সম্রাট ফেরোকসায়েরের বাদশাহী উপঢৌকনে।

ভিন্ন ধর্মীর প্রতি বিদ্বেষ আর অত্যাচার, নারীর প্রতি অসম্মান। দুটি মাত্র অভিশাপে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তিম নিঃশ্বাস ঘনিয়ে এলো।

নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ, নবাব সুজাউদ্দীন, নবাব সরফরাজ খাঁ। আলিবর্দি আর সিরাজ।

মোগল নবাবের দল জানতো না বাইরের ব্যক্তিত্বের বিষাক্ত নিঃশ্বাস অন্দরমহল প্রবেশের পথ খুঁজে নেয়। জানতো না, ইতিহাসের গতিকে আওরংজেব যে পথে চালিত করে গেছেন সেই আত্মহত্যার পথ থেকে ভিন্নপথে যাত্রা সুরু করতে হ'লে প্রয়োজন ছিল ত্যাগের, মহত্ত্বের, দৃঢ়তার।

দুর্বলচরিত্র বিলাসলুব্ধ সিরাজের শক্তি ছিল না ইতিহাসের গতিকে ভিন্নপথে নিয়ে যাওয়ার। তাই অনাচারের প্লাবনগতিতেই নিজেকে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

তারপরও বহু যুগ কেটে গেছে। নির্বিষ হয়েছে মোগল শক্তি, থেমে গেছে বর্গী দস্যুর নৃশংসতা। কালের কলঙ্ক থেকে সরে থাকতে পারে নি হিন্দু ভূস্বামীরা।

ধীরে ধীরে রাজ্য বিস্তার করেছে ইংরেজ। প্রজাপালনের পরিবর্ত্তে সুরু হয়েছে প্রজাশাসন। শোষণের অভিশাপ নিয়ে এসেছে, নতুন করে বুনে দিয়েছে বিভেদের বীজ। কিন্তু জ্ঞানকে নিষেধের অন্ধকারে ঠেলে দেয় নি।

তাই সুদূর বনবিষ্ণুপুরের ধ্বংসাবশেষেও একদিন ইতিহাস খুঁজে বের করতে এসেছে ইংরেজ প্রত্নতাত্ত্বিক।

এসে থেমেছে লালবাঁধের পাড়ে।

১৮১৬ সাল।

লালবাঁধ দীঘি খনন করে পাওয়া গেল কয়েকটি মুসলমানী ভোজন পাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নূরজাহান লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দু'শো বছর পরে পৃথিবীর হাল্কা বাতাসে নিঃশ্বাস নিলো।

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এ কাহিনী।

একদিন বুঝি রামশঙ্করের বজরাও এসে থেমেছিল এই বনবিষ্ণুপুরের বিড়াই নদীর ঘাটে। সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধির গৌরব নিয়ে ফিরে এসেছিল রামশঙ্কর।

এই সতীকুণ্ডের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিল সেই গৌরবর্ণ দীর্ঘ

বলিষ্ঠ পুরুষকান্তি। আকাশে ছিল জ্যোৎস্নার প্লাবন, শ্যামবাঁধের নিথর কালো জলে চাঁদের ছায়া।

আর সঙ্গীতগুরু রামশঙ্করের খোঁজে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল এক রহস্যময়ী। কণ্ঠে তার সুমধুর সঙ্গীত, হৃদয়ে উজ্জ্বল সাধনা।

মুখের দিকে বিস্ময়ে ফিরে তাকিয়েছিল রামশঙ্কর।

প্রশ্ন করেছিল, কে তুমি?

—আপনার শিষ্যা, সঙ্গীতগুরু! উত্তর দিয়েছিল সেই ছায়াশরীর।

—তোমার ধর্ম?

—সঙ্গীত।

মৃদুহাস্যে রামশঙ্কর বলেছিল, না শিষ্যা, সঙ্গীত নয়। রাগরাগিণী শুধুই পথ দেখায়। ধর্ম এক, ধর্ম মানবতা—প্রেম প্রীতি অনুরাগ।

তারপর উদাত্ত কণ্ঠে গেয়েছিল :

মূঢ়ানামেব ভবতি ক্রোধা জ্ঞানবতাং কুতঃ।
হন্যতে তাত কঃ কেন যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্।

হায় মূঢ়, যে দিব্যজ্ঞান লাভ করেছে তার শরীরে হিংসা দ্বেষ ক্রোধ নেই। কেউ কাউকে হত্যা করে না, হিংসা করে না অন্যকে। সকলেই কৃতকর্ম ভোগ করে চলেছে।

কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে বাঁধা এই পৃথিবীর প্রতিটি ঘটনা, প্রত্যেক মানুষের মন। মুসলমানের হিন্দু বিদ্বেষ অকারণ জন্ম নেয় নি, আর হিন্দুর মুসলমান বিদ্বেষও অকারণ নয়। ক্রিয়া আর প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষে ভেদবিচ্ছেদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আগুন ছড়িয়েছে চতুর্দ্দিকে, বঞ্চিতা নারী সম্মান খুঁজেছে ধর্ম্মের আড়ালে, বিধর্মীর অন্যায়কে বিচার করেছে সমাজ-নীতির নিয়মে নয়, ধর্ম্মের যূপকাষ্ঠে।

ভুল বুঝেছে মানুষ। ভুলে গেছে, ধর্ম্মের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের প্রয়োজনেই ধর্ম্ম।

রঘুনাথ বুঝি সে-সত্য দেখতে পেয়েছিল। সমাজের সঙ্কীর্ণতা তুচ্ছ করে তাই সঙ্গীতকেই সাধনা করেছিল। সঙ্গীতের জন্যই লালবাঈকে ভালবেসেছিল রঘুনাথ, তারপর একদিন লালবাঈয়ের মোহেই ডুবে রইলো, ভুলে গেল সঙ্গীতকে। সন্ন্যাসী যেমন গন্তব্য ভুলে পথকেই ভালবাসে, সমাজ যেমন মানুষকে ভুলে আঁকড়ে ধরে ধর্ম্মকে, প্রেম যেমন অনুরাগকে ভুলে যায় ইন্দ্রিয়সুখের আকর্ষণে।

সতীকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে রামশঙ্কর বললে, রঘুনাথও ভুল করেছিলেন, আর এই ভুলটাই হয়তো বেঁচে থাকবে মানুষের মনে।

কিন্তু ভগীরথের মতই যে গঙ্গাকে তিনি ডেকে এনেছেন বাংলার মাটিতে, একদিন এই গঙ্গার স্রোতধারায় সারা ভারতের পাপ ধুয়ে যাবে। নতুন করে বেঁচে উঠবে ভারতীয় সঙ্গীত, বাংলাকে গৌরবান্বিত করবে বিষ্ণুপুর ঘরোয়ানা। আর এই ঐতিহ্যময় বনিয়াদের ওপর গড়ে উঠবে বাংলার নিজস্ব গীতধারা। যা শুধু বাংলার নয়, ভারতের নয়, সারা পৃথিবীর মনে জাগিয়ে তুলবে উপনিষদের আলো আর পদাবলীর প্রেমমাধুর্য।

রহস্যময়ী বললে, আমাকেও সেই সাধনার পথ দেখান সঙ্গীতগুরু।

হাসলো রামশঙ্কর। বললে, সেই পথই খুঁজে চলেছি সারা জীবন, সেই সাধনার পথেই ছুটে চলেছি।

ছায়াশরীর বললে, সাধনাকে অনুসরণ করলেই তো তাকে পাওয়া যায় সঙ্গীতগুরু!

সাধনার পথেই এগিয়ে গিয়েছিল দু'জনে।

ধীরে ধীরে জ্যোৎস্নায় মিলিয়ে গিয়েছিল রামশঙ্করের ছায়া। মিলিয়ে গিয়েছিল সেই নারীর ছায়াশরীর!

কে সেই রহস্যময়ী? সুলেখা? না। কিংবদন্তী বলে, শিষ্যার রূপ নিয়ে সঙ্গীত-সরস্বতী স্বয়ং নাকি পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রামশঙ্করকে।

সতীকুণ্ডের ধারে সেদিন বেজে উঠেছিল একটি করুণ সুর। পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে আজও নাকি এক অবোধ্য চাপা কান্না গুমরে মরে। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক অনিন্দ্য-সুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

লালবাঈ! বিষ্ণুপুর ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর চরিত্র। আর রাজা রঘুনাথ সিংহের নিষিদ্ধ প্রেমের স্মৃতিচিহ্ন—লালবাঁধ।

আজো বোধ হয় বিষ্ণুপুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্নপ্রাকারে, অলিন্দে, পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্তনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন যবনকন্যার প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়!

সমাপ্ত

একটি সনেট

চিত্ত সিংহ

এখানে আমরা যারা, আয়ুর তর্পণে
পরাজয়ে, ব্যর্থতায়, বিপদে আপদে
ক্ষয় করি প্রতিদিন। আমরা দেখিনি
কভু আমাদের মুখ, সম্মুখ দর্পণে।
তাই তো মরণ গানে, আমরা হারাই,
বাঁচার আশ্চর্য-গান ; আমরা মাড়াই,
প্রতিক্ষণে সত্যপথ, মিথ্যার ইংগিতে।

শুধুই শুধুই ভুলি, কামনা সংগীতে।
তাই তো আমরা ভাবি, প্রতিটি প্রত্যহ,
এর চেয়ে মাঠ বন, ঢের ঢের ভালো
সেখানে বেদনা নেই, আশ্চর্য সুন্দর,
মনে হয়, সেখানের পৃথিবী উর্বর।
এ-সব কিছুই নয়, কল্পনা শুধুই,
তার চেয়ে মুক্তি খোঁজ এপার-ওপার।

মৎস্য

(দেশ-বিদেশের কথা-কাহিনীতে)

অনিলধন ভট্টাচার্য্য

মৎস্য জলজ জীব—মানুষ স্থলের অধিবাসী। এ দু'এর সৃষ্টিকালের মধ্যেও কোটি কোটি বৎসরের ব্যবধান। বিবর্তনবাদ অনুসারে সৃষ্টির প্রথম পর্য্যায়েই মাছ—আর শেষতম পর্য্যায়ের সৃষ্টি ও শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি মানুষ। মৎস্য থেকে শেষ অবধি মানুষ—ভাবলে বিস্ময় লাগে। অথচ এ সত্যি বলেই বোধ হয় এ দুই প্রাণীর ভেতর আজও লক্ষ্য করা যায় একটা নিগূঢ় সম্পর্ক—একটা কী আত্মীয়তার বন্ধন !

শুধু রসনায় তৃপ্তি মেটানই নয়, মাছ মানুষের চিন্তা বা মনের খোরাকও যুগিয়ে এসেছে স্মরণাতীত কাল থেকে। কত পৌরাণিক কাহিনী, কত রকমারী রূপকথা, কিংবদন্তী ও ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠলো এ মাছকে নিয়ে, তার ইয়ত্তা নেই। কেবল এ দেশের সীমারেখায় মধ্যেই কেন, দূর দেশান্তরেও। মানুষের কাছে বলতে কি, জলজ এ জীবটি নিছক মাছই থাকেনি—বন্দিত ও চিত্রিত হয়েছে সে নানা ভাবে যুগে যুগে।

আমাদের এ দেশে মৎস্যের আদর খুব বেশী, বিশেষ করে পল্লী-বাংলায়। মৎস্য-পূজার রীতিও চলতি দেখা যায় স্থানে স্থানে। অবশ্য এটা ঠিক অস্বাভাবিকতা দোষ-দুষ্ট নয়। কারণ, সৃষ্টিরক্ষার জন্যে ভগবান বিষ্ণু এ মাটির পৃথিবীতে নাকি নেমে আসেন প্রথম মৎস্যরূপেই। এইটি ভারতের পুরাণ শাস্ত্রেরই লিপিবদ্ধ কথা। অষ্টাদশ পুরাণের অন্যতম মহাপুরাণের নামও আমরা পাই মৎস্যপুরাণ। সুতরাং মাছের ভেতর এখানে দেবতাকে লক্ষ্য করলে নিন্দা করা নিশ্চয়ই চলে না। মৎস্য-পূজার মৎস্যরূপী বিষ্ণুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রেরও ব্যবস্থা রয়েছে—'ওঁ নমো ভগবতে মং মৎস্যায়।'

ভারতের পুরাণাদিতে মৎস্য প্রসঙ্গে বহু বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত আছে। মৎস্যপুরাণে নারায়ণের মৎস্যাবতার বিষয়ক একটি উপাখ্যান এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। মনু (আদি-মানব বা মানব সমাজের প্রতিভূ) নামে এক রাজা সিংহাসন ছেড়ে আরম্ভ করেন একবালে তপস্যা। মহাপ্রলয়ের হাত থেকে সৃষ্টিকে রক্ষা করা চাই, এই ছিল তাঁর অন্তরের সুকঠিন দাবী। দুশ্চর এ তপস্যা কত যুগ-যুগান্ত কাল ধরে চলল। শেষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মা এসে উপস্থিত হন তাঁর কাছে অভিপ্রেত বর দেবেন বলে। বর চাইলেন তপস্বী মনু—জগৎকে যেন রক্ষার ক্ষমতা হয় তাঁর। 'তথাস্তু' বলে চক্ষের নিমিষে অন্তর্হিত হন ব্রহ্মা।

তপস্যা-শেষে মনু আশ্রমে বসে পিতৃতর্পণ করছিলেন একদিন। এমনি মুহূর্তে কোথা থেকে এসে একটি মৎস্য লাফিয়ে পড়ল তাঁর ঠিক হাতের উপর। দয়ার বশবর্ত্তী হয়ে মনু মৎস্যটিকে রাখলেন একটি জলাধারে। মৎস্যটি ক্রমে অনেক বড় হয়ে উঠল—কোন জলাধারেই আর ধরে না। মনু তখন নিক্ষেপ করলেন এটিকে সমুদ্রমধ্যে। নিক্ষিপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৎস্য-মুখে উচ্চারিত হল—'মনু, প্রলয় শেষে তোমার ধ্যানেই নয়া জগৎ সৃষ্টি হবে এবং খ্যাত হ'বে তুমি ত্রিভুবনে প্রজাপতি নামে। আমিই ভগবান বিষ্ণু—মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে বিশ্বের কল্যাণে তোমায় রক্ষা করলুম।'

আলোচনার ফাঁকে মহাভারতে উল্লিখিত মৎস্যগন্ধার কথা-কাহিনীটিও আপনি এসে যায়। পৌরাণিক এ মৎস্যগন্ধা কিন্তু মাছ নয়, নশ্বর মত মানবী বা মানবাকৃতি। মৎস্য-গর্ভজাত (মীনরূপা অভিশপ্তা অদ্রিকা অপ্সরার গর্ভজাতা) বলেই বোধ হয় তার সর্ব্বগাত্রে ছিল মৎস্যগন্ধ। একটি মহাভারতের বর্ণনা অবশ্য এইরূপ—"মৎস্যঘাতী সনে কন্যা থাকিয়া নিয়ত, 'মৎস্যগন্ধা' নামে হৈল জগতে বিখ্যাত।" মোটের উপর, পরে যতই 'পদ্মগন্ধা' বা 'যোজনগন্ধা' নাম হোক্, মানুষরূপ পেয়েও মৎস্যগন্ধা নামেই পরিচিত ছিল প্রথমে—দ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জননী সত্যবতী। এর জন্য নিশ্চয়ই কাউকে দোষ বা কলঙ্ক দিয়ে লাভ নেই। মৎস্যের সঙ্গে মানুষের অবিচ্ছেদ্য নাড়ীর সম্পর্কটাই এখানে বড় হয়ে থাক্ !

দশাবতারের প্রথম অবতার বলেই নয়, আরও বহু কারণে মৎস্যের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজে নিয়েছে মানুষ। জীবের উপর গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রভাব আছে, এরূপ বিশ্বাস চলতি প্রায় সকল দেশেই। লক্ষ্য করবার বিষয়, এ প্রভাব বিস্তারকারী বারোটি রাশির মধ্যেও একটির নাম মীন (মৎস্য) রাশি। মাৎস্য-ন্যায় বা মাৎস্য নীতির প্রচলনও সমাজে রয়েছে প্রায় সর্বত্র। বড় মাছ চিরদিনই ছোট মাছকে গ্রাস করে, এ থেকেই এই নীতিটির উদ্ভব। মানব-সমাজে এসে উহাই 'জোর যার মুলুক তার'—এই ব্যবস্থায় দাঁড়িয়েছে। দুর্বলের উপর প্রবলের শাসন বা অত্যাচার যত দিন থাকলো, মাৎস্য-ন্যায়ের নাম মানুষের রাজ্যে একেবারে ডুবতে পারলো কৈ ?

আমাদের দেশাচার ও লোকাচার রক্ষার ব্যাপারে এবং ধর্মীয় আচরণের মধ্যেও মাছের প্রয়োজন কম নয়। দৈনন্দিন আহার্য্যের কথা ছেড়েই দিলুম। বিবাহের তত্ত্ব বা অধিবাসে আজও বিশেষ জাতীয় মাছ না হ'লে চলে না। সে মাছে তেল-সিঁদুর পরিয়ে, খিলি-করা পান মুখে দিয়ে তবে পাঠাতে হয় যথাস্থানে। বাংলার বিভিন্ন স্থানে বিজয়া দশমী যাত্রারও মাছ অপরিহার্য। কথায় বলাও হয়, যাত্রার মাছ পুঁটি মাছ, রুই (মীনরাজ) মাছ। বিক্রমপুর প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে জোড়া ইলিশ (মৎস্য-রাণী) ঘরে এনে তেল-সিঁদুর পরান হয়, ধান্য-দূর্ব্বা দেওয়া হয় এবং সে কুলবধূদের হুলুধ্বনির সঙ্গে। সংস্কারের পূর্ব্বে মৎস্য-বন্দনায় এ একটি অপূর্ব্ব ব্যবস্থা চলে এসেছে সমাজে বহুদিন থেকেই। শুভ উদ্দেশ্যে যাত্রাকালে মৎস্য দর্শনও শুভ ফলপ্রদ বলে দাবী করা হয়। এ ছাড়া পূজা-পার্ব্বণ এবং শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়াতেও মৎস্যোৎসর্গের রীতি প্রচলিত দেখা যায় অনেক স্থলে।

বিশ্বের অন্যান্য দেশের দিকে তাকালেও আমরা দেখব, সভ্যতার অগ্রগতিতে অনেকখানি স্থান জুড়ে আছে মৎস্য। সর্ব্বত্রই কোন না কোন গল্প কাহিনী লোকাচার বা রীতি চলতি আছে একে ভিত্তি করে। সূর্য্যোদয়ের দেশ জাপানের কথাই ধরা যাক্। সেখানে বহু প্রাচীন কাল থেকেই মাছকে দেখা হয় ধৈর্য্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রতীকস্বরূপ। প্রতি বছরই ৫ই মে তারিখে 'টং-গো-সেক্-কু' উৎসব বা শিশু-উৎসব সেখানে পালিত হয়। এ উৎসবের দিনে একটি করে বাঁশের খুঁটি দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয় প্রতি বাড়ীর বহির্ভাগে।

তার পর ঝুলান হয় ঘুড়িগুলোর উপর রঙীন কাগজ বা কাপড়ের তৈরী বিভিন্ন ধরণের মাছ। বাড়ীতে যে-কয়টি ছেলেই থাকুক, প্রত্যেকের জন্যেই হয়ে থাকে এই অভিনব ব্যবস্থা। নির্দিষ্ট দিনে মাছ-ঘুড়ি উড়াবার প্রথাও সেখানে চলিত আছে বলে জানা যায়।

ককেসাসেও মৎস্যকে কেন্দ্র করে এই প্রকার বহু লোকাচার বা রীতি প্রচলিত আছে। সেখানে একটি প্রাচীন লোক-কাহিনী বা উপাখ্যান শুনতে পাওয়া যায়। এ কাহিনীর সূত্র ধরেই তরুণ বয়স্ক ছেলেরা সব উপহার দিয়ে থাকে তাদের পছন্দসই মেয়েদের নানা রঙীন বা সোনালি-মাছের ছবি।

মৎস্য সম্পর্কে ল্যাপল্যাণ্ডবাসীদের ধারণা অত্যন্ত বড় রকমের। আমাদের দেশের লোকদের ন্যায় জন্মান্তরবাদে তারাও বিশ্বাসী। তারা মনে করে যে, মাছ হয়ে জন্মান অপেক্ষা মহত্তম জন্ম আর নেই। মৎস্যের সঙ্গে মনুষ্যের সম্পর্ক বিষয়ে একটি সুন্দর গল্প সে দেশে শোনা যায়।

এক কালে এক বৃদ্ধ ল্যাপ ধীবর তার ছেলেকে ডেকে বলে যে, সে যেন নদীতে যেয়ে মাছ না ধরে। ছেলে একথা শুনতে চাইবে কেন? মৎস্য শিকার অন্য দেশের ছেলেদের ন্যায় ল্যাপ ছেলেদের কাছেও কম প্রিয় হতে পারে না। পিতার নিষেধ সত্বেও পুত্র চলে যায় নদীতে—যেয়ে বর্শাবিদ্ধ করলে একটি 'স্যামন' জাতীয় মৎস্যকে মুহূর্তমধ্যেই। মাছটি কিন্তু ছিল আসলে প্রকাণ্ড ও বিশেষ শক্তি-সম্পন্ন। বর্শাবিদ্ধস্ত হয়েও রক্তাক্ত কলেবরে শেষ পর্যন্ত পালিয়ে যায় সে গভীর জলে। ছেলেটিকে রিক্ত হস্তে ও বিষণ্ণ মনে বাড়ীতে ফিরে আসতে হ'ল। এসে দেখলে সমধিক দুঃখ ও বিস্ময়ের সঙ্গে পিতার মস্তকে একটি মস্ত আঘাত—রক্ত ক্ষরিত হচ্ছে অবিরাম তা থেকে। পিতা অবাধ্য পুত্রকে কাছে ডাকলেন এবং পরিতাপের স্বরে বললেন এই মাত্র—তোমাকে নিষেধ করেছিলুম, মাছ ধরতে যেও না। শুনলে কৈ? এই দেখো তার দুঃসহ পরিণতি। নদীর জলে তুমি অমনি করে আমাকে বর্শাবিদ্ধ করেছ।

অতীত যুগে চীনা বৌদ্ধদের মৎস্য বিষয়ে ধারণা ছিল কিন্তু অন্যরূপ অর্থাৎ ল্যাপদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা মনে করত, একমাত্র দুষ্কৃতকারীরাই পরজন্মে মৎস্যরূপ গ্রহণ করে। আবার অনেক এশীয় উপকথায় মাছকে ভগবানের অবতার বলেই বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে দেখা গেছে, বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়ে মৎস্য তার শিকারীর হাতে তুলে দিচ্ছে প্রচুর পুরস্কার। পূর্ব ইউরোপের স্লাভদের মধ্যেও মৎস্য কর্তৃক মৎস্যশিকারী (ধীবর) পুরস্কৃত হবার নানা কথা-কাহিনী জানতে পারা যায়। ভারতেও এ ধরণের রম্য কাহিনী বা উপাখ্যান যে কোথাও চলতি নেই, এমন নয়। এ সব থেকে স্বতঃই মনে হয়, প্রাগ্-ঐতিহাসিক যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কোন না কোন ধরণের সামুদ্রিক সভ্যতা বিরাজ করতো।

পূর্ব-এশিয়ায় মৎস্যরাজকুমারীর একটি চমৎকার রূপকথা প্রচলিত আছে। পদ্মপত্র থেকে উৎক্ষিপ্ত রাজতনের সঙ্গে সকাশগত একটি মৎস্যের আকস্মিক মিলনের ফলেই নাকি এ মৎস্যকন্যা বা মৎস্যকুমারীর জন্ম হয়। তার গাত্রময় ছিল চিরকাল একটা সামুদ্রিক (মৎস্য) গন্ধ। পৌরাণিক সিণ্ডেরেলার ন্যায় এই রাজকুমারীকেও এক প্রকার দাসত্ব বন্ধনেই আবদ্ধ থাকতে হয়েছিল প্রথমাবস্থায়। তারপর আপন রূপ ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ করে সে একজন রাজপুত্রকে। তাদের যে কয়টি সন্তান হয়েছিল, সেগুলো দেখতে নাকি ছিল এক একটি অদ্ভুত রকমের। মহাভারতোক্ত মৎস্যগন্ধার কাহিনীর সঙ্গে এ কাহিনীটির যেন একটা সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

সমুদ্রে মৎস্যকন্যা জলপরী বা জলদেবী থাকার কাহিনীও সুদূর প্রাচ্য থেকে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সর্বত্র চলতি ছিল এক কালে। গ্রীক পৌরাণিক কাহিনীগুলোও অনুরূপ জলদেবী ও জলপরীদের নিয়েই রচিত। সে দেশে কথিত আছে—এক শ্রেণীর সাগরকুমারী বা সাগরিকারা (সাইরেন)[*] নাবিকদের ভুলিয়ে নিয়ে [illegible] নিজেদের মায়াময় সুর ও সঙ্গীতে—তার পর বধ করতো [illegible] নিতান্ত নিষ্ঠুর ভাবে।

প্যালেষ্টাইনবাসী ফিলিস্তাইনদের ধর্ম্মাচরণের ক্ষেত্রে 'ডাগন' নামে একটি মৎস্য-দেবতা ছিল। এই দেবতার দেহের উপরিভাগ ছিল মানবাকার এবং নিম্নার্দ্ধ ঠিক মৎস্যাকৃতি। ভারতের পুরাণানুসারে ভগবান বিষ্ণু মৎস্যাবতারে যে রূপ গ্রহণ করেছিলেন, 'ডাগন' দেবতার আকৃতি অনেকটা সেই ধরণের। মিশরীয়রাও মাছকে [illegible] পবিত্র জ্ঞান করে আসছে বহুকাল থেকেই। বেবিলিয়নের প্রাচীন চালদিয়েনদেরও একটি মৎস্য দেবতা ছিল এবং এ দেবতাটির নাম ছিল 'ওয়ানেস।' তারা বিশ্বাস করতো একদা—পৃথিবীর প্রথম মনুষ্য গোষ্ঠীকে জ্ঞান বিতরণ করেন এই দেবতাই। সিরিয়ায় আজ অবধি ফিলিস্তাইনদের মত 'ডাগন' মৎস্য-দেবতার পূজা প্রচলিত।

অষ্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের মধ্যে একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী চলতি আছে। ভেক, চাঁদ ও সমুদ্র—এই তিনটি হচ্ছে উক্ত উপাখ্যানের প্রধান উপজীব্য। অষ্ট্রেলীয় আদিম অধিবাসীদের ধারণা ছিল—চাঁদটা একটা মানবাকৃতি ভেকবিশেষ। সমগ্র সমুদ্র নাকি লুকায়িত ছিল এই ভেকের প্রকাণ্ড উদর গহ্বরেই। সমুদ্রের জলে 'ইল' মৎস্যের অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গী দেখে ভেকটি নাকি হেসে ফেটে পড়ে একদিন। এরই পরিণতিতে সমুদ্র নেমে এলো এই ভূতলে এবং সেই সঙ্গে এল মৎস্যকুলও।

অতীতের ন্যায় আধুনিক কালেও আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তা, ছড়া ও প্রবাদাদিতে মৎস্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় অনেকখানি। সিঙ্গী বা কৈ মাছের জান (জীবন), পুঁটি মাছের প্রাণ, শফরী ফরফরায়তে, জোনাক পর্দা—বাংলা দেশে বিশেষ করে বাংলার পল্লী-অঞ্চলে এ সব কথা যথেষ্ট চলতি। ইহা ছাড়া 'এক অক্ষরে নাম তার ঐ-কার মাত্র সার, দুর্যোধন (কর্ণ) তার দিয়ে গমন তাহার' (কৈ মাছকে লক্ষ্য করে রচিত)—মৎস্যের উপর এ জাতীয় হেঁয়ালীপূর্ণ ছড়াও শোনা যায় লোকমুখে স্থানে স্থানে। 'ম্যাকারিল' বা জল,সে মাছ তো বাঙালী কবির লেখনীতে অপরূপ রূপই পেয়েছে। 'কহিত কনক-কান্তি কমনীয় কায়, গালভরা গোঁফ-দাড়ি তপস্বীর প্রায়।' বিদেশে অনেক মানুষের প্রাত্যহিক কথাবার্তা ও বিভিন্ন রচনাদিতে মাছের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ফ্রান্সে তো 'এপ্রিল ফুল' হাসি-তামাসার অনুষ্ঠানটি 'এপ্রিল ফিস' নামেও অভিহিত হয়ে আসছে। মৎস্যের সঙ্গে মানুষের এই সব বিচিত্র সম্পর্ক, তা কালস্রোতে কখনই বুঝি বিলীন হবার নয়।

পদচিহ্নের দেশ চিত্রকূট

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রয়াগে ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে মাত্র আশী মাইল দূরে চিত্রকূট। চারি দিকে পাহাড়, বন-জঙ্গলে ভরা বেশ খানিকটা দুরধিগম্য ও শ্বাপদসঙ্কুল দেশ। মন্দাকিনী নাম্নী নাতিপ্রশস্ত ছোট নদী পাহাড় থেকে বা'র হয়ে এর উচ্চাবচ ভূমি বেষ্টন করে এঁকে-বেঁকে দূর বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়েছে। সুতরাং তপোবনের গৌরবসাম্পদ শ্রী এই ভূমির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। এর বনে-পাহাড়ে বনচারীর জীবন ধারণোপযোগী ফল বা বন্যমূলের অভাব নেই। বনবাস কালে শ্রীরামচন্দ্র কিছু দিন এখানে আত্মগোপন করেছিলেন।

দশরথের মৃত্যুর পর শ্রীরামচন্দ্রকে অন্বেষণ করতে করতে ভরত পৌঁছেছিলেন এখানে। দু'টি মহৎ চরিত্রের কীর্তিকথা চিত্রকূটের কামদ গিরিমূলে আজও উৎকীর্ণ রয়েছে। পিতৃসত্য পালনের কথা—ভ্রাতৃভক্তির কথা। হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেছে—এই মহৎ কীর্তি ও শাশ্বত প্রাণপ্রকাশের স্মৃতি মানুষের মনে অক্ষয় হয়ে আছে। আজও দলে দলে যাত্রী ছুটে আসে চিত্রকূটে—জীবনের পরম তীর্থ সন্দর্শনে। সন্ত তুলসীদাসও একমনে কাশীধাম থেকে এই তীর্থে এসেছিলেন ইষ্টদেব অন্বেষণে। রাম-চরিত মানসের প্রথম অঙ্কুর এই পুণ্যভূমি স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়েছিল। অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী জড়িয়ে আছে সন্ত-চরিত গ্রন্থের পাতায় পাতায়।

ত্রেতার দুরধিগম্যতা নিয়ে চিত্রকূট আজ বিরাজ করছে না, তবু শহরের সুখলালিত জনের পক্ষে ত কিছু পরিমাণে দুরধিগম্যই। প্রয়াগ থেকে পাঁচ ঘণ্টার মেয়াদ হলেও আকণ্ঠ-বোঝাই বাসে ঝাঁকানি আর ধুলো খেতে খেতে পথ অতিবাহন করা আরামপ্রদ নয়। ট্রেনের ব্যবস্থাও তথৈব চ। মানিকপুর জংশন থেকে ঝাঁসি পর্যন্ত যে শাখা-লাইনটি মধ্যভারতীয় রেলপথে পড়ে, তার মাঝখানে চিত্রকূট। মানিকপুর থেকে মাত্র কুড়ি মাইল, তবু এইটুকু পথের দূরত্ব চার-কুড়িং আশী মাইলের মত। সারা দিনে-রাতে মাত্র দু'খানি গাড়ী ছাড়ে মানিকপুর জংশন থেকে। সকাল ন'টায়, আর রাত বারোটায়। দু' নম্বর অসুবিধা চিত্রকূট গ্রাম—রেল-ষ্টেশন থেকে তিন মাইল। সেটাও এমন মারাত্মক নয় যদি পদযান ছাড়া বিকল্প ব্যবস্থা থাকে। ছোট ষ্টেশন, মাথা গোঁজার স্থান নেই। লটবহর বইবার মানুষ মেলে না, গাড়ী-ঘোড়া তো স্বপ্নবৎ। কাজেই চিত্রকূট নাম নিয়েও ষ্টেশনটি যাত্রী আকর্ষণ করতে পারে না—যেমন এর আগের ষ্টেশন করবী চিত্রকূটযাত্রীদের কাছে প্রিয়। করবী বড় ষ্টেশন, তিন-চারশো যাত্রীর আশ্রয়স্থল মুসাফিরখানা আছে। ভাল পাকা রাস্তা আছে, দোকান-পসার আছে, আর আছে মোটর বাস। যাত্রী নিয়ে এগুলি চার-পাঁচ মাইল দূরের চিত্রকূটে বহবার পাড়ি দেয়। ভাড়া মাথা-পিছু পাঁচ আনা। করবী মহকুমা শহর—আদালত ইস্কুল আছে—লোক-জনে জমজমাট জায়গা, রাত বারোটা একটায় পৌঁছুলেও কোন অসুবিধা ঘটে না।

আমরাও রাত বারোটায় করবীতে নামলাম। সঙ্গে দু'-তিনশ' যাত্রী। চারি দিকে তখন অন্ধকারের রাজত্ব। রাজপথে এবং ষ্টেশনে দু'-একটি ধূমমলিন কেরোসিন বাতি জ্বলছে। আবছা মানুষ দেখা যায়—পথ চেনা দুষ্কর। ভরসার মধ্যে একা নষ্ট এবং অজানা দেশের দিশারী পাণ্ডারও দেখা মিলল। সত্যই দিশারী তিনি। তাঁকে অনুসরণ করে মুসাফিরখানায় পৌঁছলাম। সেখানে একটি নিরিবিলি কোণ বেছে দিলেন তিনি। একটা হ্যারিকেন লণ্ঠন জ্বেলে সামনে রাখলেন। এক বালতি জল দিলেন আনিয়ে। জানালেন বিছানা বিছিয়ে অনায়াসে খানিকটা ঘুমিয়ে নিতে পারি। ভোরবেলায় তাঁর লোক এসে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে বাসে তুলে দেবে—কোন চিন্তা নাই।

একটা কাঠের পার্টিশনের আড়ালে আমরা বিছানা পাতলাম—ওধারে তিনশো যাত্রীর কলরব। ভজন গান, বচসা, কচি ছেলের কান্না, বালতি-বর্তন সরানোর ঝন্‌ঝন্ শব্দ, তার সঙ্গে দূরে সারমেয়-কুলের চীৎকার। এ ভাবে রাত্রিযাপন এই প্রথম। ঘুম আসছে না—তবু অস্বস্তিও হচ্ছে না একটুও। নগর-জীবনের কৃত্রিমতার বন্ধন্ কোথাও নাই—কোথাও নাই অন্তরাল। রামভজন গান ধুলোভরা মেঝের শোওয়া সব যাত্রীকেই নিকট-আত্মীয় করে তুলেছে। বাইরে আকাশের একাংশ দেখা যাচ্ছে। হিম-হাওয়া আসছে উত্তর থেকে। গায়ের কম্বলখানা মাথা পর্যন্ত টেনে নিয়ে কি আরামই না বোধ করছি। এরই মধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ভোরবেলায় ছড়িদার এসে ডাকছে, বাবু উঠুন। এই বেলা না উঠলে বাসে জায়গা মিলবে না।

চেয়ে দেখি রাতের অন্ধকার কেটে গেছে। একটু ঘোর লেগে রয়েছে—তারই মধ্যে রেল-লাইন স্পষ্ট হয়েছে। টিনের প্রকাণ্ড ছাউনিতে তখন বেশীর ভাগ যাত্রী ঘুমিয়ে। মালগাড়ির চলাচল সুরু হয়েছে—শব্দ হচ্ছে ঘট-ঘটাং। রাত্রিতে আরও যাত্রী এসেছে ঝাঁসির দিক থেকে—যাত্রীতে ভর্তি মুসাফিরখানা।

তাড়াতাড়ি হাত-মুখ ধুয়ে বাসে চাপলাম। পাশাপাশি খান দশেক বাস। দেখতে দেখতে সেগুলি ভর্তি হয়ে গেল। সৌভাগ্য-ক্রমে আমাদের বাসখানাই প্রথম যাত্রা করল চিত্রকূট উদ্দেশে।

জয় জয় সীতারাম! চেঁচিয়ে উঠল যাত্রীদল।

চিত্রকূট গ্রাম বাঁদা জেলার অন্তর্গত। পাকা সড়ক এলাহাবাদ থেকে বাঁদার দিকে গেছে। ঝাঁসির সঙ্গেও এর যোগসূত্র রয়েছে। এই দীর্ঘপথে বাস-মোটরের চলাচল যথেষ্ট। ষ্টেশন-সীমানা পেরিয়ে আমাদের মোটর বাস সেই রাস্তায় পড়তেই একটা আশ্চর্য দৃশ্য চোখে পড়ল। দু'ধারে খোলার এবং খড়ের চালার মাথায় রাশি রাশি সেয়াকুল কাঁটার পালা চাপানো। একটু পরেই বুঝলাম এর অর্থ। প্রভাতের আলো ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাঠ-গাছ এবং নানান দিক থেকে বামাছুচরের দলও ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে। এক হাত পুরু সেয়াকুল কাঁটার বিভীষিকা যে ওদের নেই—তা স্পষ্টই দেখা গেল ওই চালাগুলির মধ্যে চলাচলের রাস্তা দেখে। ওরা অবলীলাক্রমে এক চালা থেকে অন্য চালায়—চালা থেকে গাছে এবং

ঘরের দেওয়াল বেয়ে চালায় ওঠানামা করছে। রামচন্দ্রের পুত্তর ভক্ত, এ দেশে বাস্তবয়েছে।

গ্রাম-প্রান্তে বাস থামল। সামনে সরু পথ—দু'ধারে চালাঘর আর কোঠাঘর। শ্রীহীন গ্রাম। চারি দিকে গিরিবেষ্টনী—বন-জঙ্গলে ভরা অসমতল পথ—প্রকৃতি সর্ব্বত্রই নিরাবরণ। তপোবনের সৌন্দর্য্যের মাঝে বাড়ীঘর ভর্ত্তি জায়গাটা কেমন যেন বেমানান। শ্রী বা মন্দাকিনীর ধারে। ঢালু পাথর-বাঁধানো পথ নেমে গেছে নদীগর্ভে। শান-বাঁধানো ঘাটের নীচের কাকচক্ষু জল আর জলভর্ত্তি মহাশোল মাছের ঝাঁক। স্রোতস্বিনী ক্ষীণা না হলে অনায়াসে হায়াবতীকে মনে পড়ত।

ঘাটের ধারে ধারে চলেছি পাণ্ডার বাড়ীতে। চারটে ধর্ম্মশালার কোনটাতেই আশ্রয় পাইনি।

মন্দাকিনীর ধারেই হাট-বাজার দোকান-পসার সব কিছু। খাবারের দোকান থেকে গীতার দোকান পর্য্যন্ত। মাত্র পঞ্চাশ ঘর পাণ্ডার বাস বলে যাত্রী নিয়ে মারামারি কাড়াকাড়ির ধুম নেই।

রামঘাটের কাছ বরাবর তিন-চার তলা উঁচু টিলার ওপর পাণ্ডার বাড়ী। খানিক বিশ্রাম নেওয়ার পর ছড়িদার চুন্নিলাল এসে চিত্রকূটের দ্রষ্টব্য স্থানগুলির পরিচয় দিতে লাগল। পরিচয় জেনে বেশ খানিকটা চিন্তিত হলাম। শহরের মানুষ যাঁরা অর্থবা পদযানের উপর যাঁদের ভরসা কম—তাঁদের পক্ষে চিন্তার কথাই। যে পাঁচটি দিকে চিত্রকূটের অতীত স্মৃতির বস্তুগুলি ছড়িয়ে আছে—তাদের দর্শন স্পর্শন মনে হল কষ্টসাধ্যই।

যেমন পহেলা দর্শনের তালিকায় আছেন কামদগিরি ওরফে কামদানাথ। এই কামদগিরি মূলে ইষ্টপূজা করে—অচলে প্রাণ-সঞ্চার করেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। এই গিরি প্রদক্ষিণ কার্য্যটি পুণ্য-কৃত্যের প্রথম অঙ্গ। পরিক্রমার পথটি পাথর-বাঁধানো—সামান্য উঁচু-নীচু। সব শুদ্ধ দু' মাইল। এই দু' মাইলের মধ্যে আছে অসংখ্য মন্দির। প্রায় সবগুলিতেই রামসীতার মূর্ত্তি। আর আছে ভরত মিলনের মনোরম অঙ্গনটি। একটু দূরে লক্ষ্মণ-টিলা।

এত মন্দির কেন? ছড়িদার চুন্নিলালকে জিজ্ঞাসা করলাম।

চুন্নিলাল জানালে, এখানকার একমাত্র দেবতা এই কামদানাথ—কামনা পূর্ণ করেন সকলের। আর সব মন্দির পেট-কা-ওয়াস্তে।

দেখে মনে হয় না সব মন্দিরই পেট-কা-ওয়াস্তে স্থাপিত হয়েছে। সেবাপূজার অব্যবস্থার জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে—তবু অধিকাংশ মন্দিরের ব্যবস্থা ভালই লাগল। সুসংস্কৃত দেউলও পরিপাটি করে সাজানো-গোছানো, দেবস্থান বা বিগ্রহ দেখে প্রতিষ্ঠাতার সেবা-নিষ্ঠা-ভক্তির পরিচয় পাওয়া গেল।

পরিক্রমার দু' মাইল পথ বাদ দিলে কাউকেই আরও দু' মাইল পথ ভাঙতে হবে। পাণ্ডার বাড়ী থেকে কামদগিরি যাতায়াতের পথ।

এই পথের প্রথমে পড়ে অক্ষয় বট। তিন রাত্রির অশৌচান্তে রাম-লক্ষ্মণ দু'ভাই মিলে বাদিয় পিণ্ড দিয়ে পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করেছিলেন ওর তলায়। এখন এখানে মন্দির রয়েছে—বটগাছও আছে। তবে তিনযুগের পুরাপ্রাচীন বট আজও অক্ষয় থাকবে—এমন প্রত্যাশা কেউ করবে না। কালের প্রহার সহ্য করেও যা অটুট রয়েছে—তা অন্য জিনিষ। পূজা-অর্চ্চনার বিধি-বিধানে ত্রেতার পুণ্য-স্মৃতিটি অম্লান রয়েছে। এই মন্দিরের পুরোহিত নাকি অলোভী—হিতকাম—সাধুব্যক্তি। যাত্রী দোহনের কলাকৌশল তো দূরের কথা,—যাত্রী বাড়লে তিনি ঘরের মধ্যে আত্মগোপন করেন।

এই মন্দির ছাড়িয়ে একটা ছোট মত বস্তি আর বাজার পাড়া। বেশীর ভাগ পেঁড়া মিঠাই লাড্ডুর দোকান—কিছু ফলমূলের, মালা আর খেলনার দোকান। পরিক্রমার পূর্ব্বে কামদানাথের পূজার জন্য ভোগরাগের জিনিস কিনে নেয় যাত্রী এবং পরিক্রমা অন্তে লাড্ডু মিঠাই জলযোগ করে ক্ষুৎপিপাসা দূর করে।

যেখান থেকে সুরু হয় পরিক্রমা, সেখানে এক মহাবীর মূর্ত্তি আছে—আর আছে নকল কামদানাথের মূর্ত্তি। চুন্নিলাল পূর্ব্বাহ্নে সাবধান করে দিয়েছিল—ইনি আসল কামদানাথ নন। ওখানে যেন পুজো দেবেন না।

বাঁ ধার থেকে সুরু হয় পরিক্রমা—সেটা পাহাড়ের পূর্ব্ব দিক; ঠিক মাঝামাঝি কামদানাথের দেউল। অনাড়ম্বর ছোট মন্দির—তার মধ্যে বিগ্রহ। পাহাড়ের গায়ে লম্বা মত পাথরের একটি মুখ। এ মুখ কোন শিল্পীর তৈরী নয়—পাথরের সহজাত আকার। শিল্পী শুধু চোখ-মুখ এঁকেছেন। এটি কামদানাথের মুখ—সারা পাহাড় তাঁর দেহ। এই দেহের পরিক্রমা করা পুণ্যকৃত্যের মুখ্য অঙ্গ।

পরিক্রমা-পথে আরও বহু দেবতা আছেন। আছেন সাক্ষী-গোপাল—বদরীনারায়ণজী। আছে ভরত-মন্দির, মহাবীর মূর্ত্তি, লক্ষ্মণ-টিলা, জানকী নিবাস। রাম-সীতা-লক্ষ্মণের ত্রিমূর্ত্তি তো সর্ব্বত্রই। চিত্রকূটের গ্রাম পাহাড় অরণ্য প্রান্তর সমস্তই রামময়। যাত্রীরাও মুখে রামভজন গান করতে করতে পথ চলছেন।

পরিক্রমার পথে সব চেয়ে মনোরম ভরত-মিলাপের স্থানটি। উন্মুক্ত প্রান্তরে চাঁদোয়ার তলায় শ্বেতশিলার বুকে কয়েকটি পদচিহ্ন। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা নির্ণয় করতে পারেন এর জাতিতত্ত্ব ও বয়ঃক্রম—ভক্তের চোখে রামায়ণ-কাহিনী কায়া লাভ করে। গোলাকার লোহার রেলিঙে মাথা রেখে ও দু' চোখ বন্ধ করে সম্ভাব্য অসম্ভাব্যের সীমা পার হয়ে তারা অনায়াসে পৌঁছতে পারে রামায়ণের যুগে। মনের রাজ্যে কালস্রোত তো যে কোন সময়ে উজান বইতে পারে—চিন্তা-ভাবনার অনুকূল পরিবেশটি সৃষ্টি হতে যেটুকু বিলম্ব।

পাণ্ডার বাড়ী থেকে ন'টায় যাত্রা করে বারোটায় শেষ হ'ল পরিক্রমা। পাহাড়ের পাদমূলে পৌঁছতে এক মাইল, অক্ষয় বট দর্শন আর পূজার জিনিষ কেনা প্রভৃতির সময়টুকু বাদ দিলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা লাগে। শীতকালে ক্লান্তিবোধ হয় না—চারি দিকের নিসর্গ দৃশ্যও মনোরম।

চোখ ক্লান্ত হ'ল না, মনও রইল সজীব। কিংবা রামায়ণ কাহিনী রোমন্থন-জনিত আনন্দে দীর্ঘপথ বিনা ক্লেশে নিঃশেষ হয়ে গেল। বুঝতেই পারিনি কখন শেষ হ'ল পরিক্রমা।

চুন্নিলাল বলল, বাবু শেষ হল পরিক্রমা।

চেয়ে দেখি মহাবীরজীর মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে।

চুন্নিলাল বলল, এখন বাসায় ফিরবেন—না জানকী-কুণ্ডে যাবেন?

কাছেই কি জানকী-কুণ্ড?

বনের পথে এক মাইল। বাসা যেতেও সেই এক মাইল। বিকেলে বাসা থেকে যদি ওদিকে যান আরও এক মাইল বেশী পড়বে।

ক্লান্তি যখন আসেনি সেরে ফেলাই যাক না পুণ্যকৃত্য।

"মাথার উপরে মধ্যাহ্নসূর্য্য। প্রখর না হলেও কোমল নয়। তবু ঝোঁক চাপল সেরেই ফেলি কাজটা। এদিকে তেমন ক্ষুধার উদ্রেকও হয়নি।

একটু এগিয়ে পরিক্রমার পথ থেকে নেমে বনের পথ ধরলাম। একটু পরেই বুঝলাম হিসাবে বেশ খানিকটা ভুল করেছি। সরু এক ফালি পথ বনকুলের জঙ্গলে না চিরে এঁকে-বেঁকে গেছে কোথায় দূরান্তরে। উঁচুনীচু জমি, টিলার মাথায় অজানা গাছের ঝোপ। একটু পরেই বনের গহ্বরে আমরা হারিয়ে গেলাম। বনের মাঝে দু'-একটি গরু-ছাগল চরছে, নেপথ্য থেকে ভেসে আসছে রাখাল ছেলেদের গলার স্বর—আর মাথার উপর অবারিত আকাশে কয়েকটি চিল পাক মেরে চলেছে—জীবজগতের ওইটুকু যা নমুনা। উঁচু টিলা থেকে নামলাম নীচে—তিন তলার নীচে একটা শুকনো নদীর খাত। আবার উঠলাম তিন তলার মাথায়। ওঠাই কি সুসাধ্য! আলগা মাটির সরু পথে কোনরকমে পা রেখে সন্তর্পণে উঠতে গেলেই মাটির চাপ ঝর-ঝর করে ধ্বসে পড়ে। সেই পথের দু'ধারে অনেক গর্ত্ত। গর্ত্তের বাসিন্দারা একটু মুখ বাড়ালেই অনায়াসে আমাদের পাদস্পর্শ করতে পারে। সেই বাসিন্দাদের পরিচয় আমরা জানি,—ভাগ্যিস এটা শীতকাল। মনে উদ্বেগ ছিল না—শরীরে জমছিল ক্লান্তি। সুযোগ বুঝে মাথার উপরে দিননাথ হয়েছেন নিদয়। ঘড়িতে দেখলাম একটা—আরও কতটা পথ বাকি কে জানে!

শুধোলাম চুন্‌নিলালকে, এক মাইল পথই তো—না কিছু বেশী?

চুন্‌নিলাল্ অপ্রতিভ ভাবে বলল, থোড়া দূর হায়।

উপায় কি—চলতেই হবে।

আরও পনেরো মিনিট ওঠা-নামা করার পর চুন্‌নিলাল আঙুল বাড়িয়ে ভরসা দিল, ওহি জান্‌কী মায়ীকি মন্দির হ্যায়।

দেখলাম নিতান্ত কাছে নয়, অন্ততঃ বিশ মিনিট লাগবে ওখানে পৌঁছতে।

অবশেষে শেষ হল বন—চওড়া পথে নামলাম। মানুষ জন চলেছে পথে—সবই উদাসীন আর সন্ন্যাসীর দল। চওড়া পথ বেয়ে এবং মানুষ-জন দেখেও বিশেষ উৎসাহ বোধ করলাম না—তখন পরিশ্রান্তির প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছেছি।

এই শ্রান্তি শেষ হ'ল জানকী-কুণ্ডে পৌঁছে। নদীর ধার ঘন অর্জ্জুনবীথিতে ছায়াশীতল। মন্দাকিনী এখানে কলস্বনা—তিন-চারটে প্রকাণ্ড পাথরের বাধা ঠেলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঢালু জমিতে। স্রোত এবং শব্দ দুই-ই—প্রবল। পাড়ে পাথরের রাশি।

তার মধ্যে পৃথক করা একখানি সাদা পাথর। মাথার উপর সামান্য আচ্ছাদনী এবং পাথরের বুকে দুটি পদচিহ্ন। কোমল দু'টি পায়ের ছাপ স্পষ্ট। কোন যুগের পাথর কে জানে! এক সময় হয়তো নরম-কাদার মত তলতলে ছিল—রোদে জলে কালের প্রহারে কঠিন হয়েছে। মৃত্তিকা রূপান্তরিত হয়েছে শিলায়।

শুধু ওই একখানি পাথরে নয়—আশে-পাশে বহু পাথরে আছে—সবেতেই পদচিহ্ন। অস্পষ্ট—ভাঙা মোছা। কোনটাতে গোড়ালির কোনটায় বা অঙ্গুষ্ঠের—পায়ের অগ্রভাগের ছাপ এলো-মেলো ভাবে ছড়ানো। নির্জ্জন পরিবেশ। নদীর ধারে ধারে অর্জ্জুন-গাছের শ্রেণী—শাখাপল্লবে রচনা করেছে সামিয়ানা। পাশে স্রোতময়ী মন্দাকিনী—ওপারে ঘন অর্জ্জুন-অরণ্য। অরণ্যের মাথায় মধ্যাহ্নের অকূঘন্ত আকাশ। ওই আকাশে আর অরণ্যে অনায়াসে পাখা মেলে দিতে পারে মন। দিনও পাখা মেলে।

কতক্ষণের জন্যই বা ত্রেতার চিত্রকূট আশ্রমে কাটল। পাশে চেয়ে দেখি মধ্যাহ্ন আহার-পর্ব্ব সেরে সন্ন্যাসীরা নদীর ধারে বসে বর্ত্তন ধোয়া-মোছা করছেন। আহার্য্যের সঙ্গে জলে জমেছে মাছের ঝাঁক—তীরে জমেছে বানর দল। জলে-স্থলে আহার্য্য সংগ্রহের চাঞ্চল্য।

শ্রান্তি দূর হল—ফিরে চললাম ছায়া-ভরা অর্জ্জুন-বীথি পথে। কয়েক হাত দূরে গান গেয়ে চলল মন্দাকিনী, মাথায় আতপত্র মেলে অর্জ্জুন অরণ্য। আর অনুসরণ করল দু'-একটি কপি।

এইখানে সাড়ে এগারো বছর ছিলেন রামচন্দ্র। কামদানাথ পূজারীর কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

সাড়ে এগারো বছর? ঠিক মনে পড়ছে না। তবে এর মনোরম পরিবেশ শ্রীরামচন্দ্রকে নিঃসন্দেহে মুগ্ধ করেছিল—কিছুদিন তিনি এখানে বাস করেছিলেন। যে উদ্দেশ্যে তাঁর নরদেহ ধারণ তা সিদ্ধ না হওয়ার আশঙ্কায় গন্ধর্ব্ব ও দেবতারা বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁরাই যুক্তি-পরামর্শ করে শ্রীরামচন্দ্রকে দণ্ডকারণ্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের বাসায় ফিরতে বেলা আড়াইটা হল।

দুসরী দর্শন হল দশ মাইলের পাল্লা। কোটতীর্থ, সীতারসুই হয়ে হনুমান ধারা। আমরা দুসরীকে পহেলী করেছিলাম—এবং সংক্ষেপও করেছিলাম শুধু হনুমান ধারা দেখে।

সকালে চিত্রকূট পৌঁছে পাওয়ার মুখে দ্রষ্টব্য স্থানগুলির পরিচয় নিয়ে বুঝলাম—অন্য তীর্থের সঙ্গে এই তীর্থের বেশ খানিকটা প্রভেদ। তীর্থস্থান মাত্রেই সাধারণতঃ একটি মন্দির থাকে—মুখ্য দেবমন্দির। সেই মন্দিরস্থ প্রধান দেবতাকে অর্থাৎ তীর্থেশ্বরকে দর্শন করে যাত্রীরা সফলকাম হন। প্রধান দেবতাকে ঘিরে অবশ্য বহু পার্শ্বদেবতা বিরাজ করেন—তাঁরাও ভক্তি-অর্চ্চনা ভোগ-পূজা যে লাভ না করেন তা নয়, কিন্তু অবশ্যপাল্য বিধি-বিধান নেই সেই অর্চ্চনা বা বন্দনায়। চিত্রকূটে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মন্দিরে দেবতাকে দর্শন করলেই তীর্থকৃত্য সুসম্পন্ন হয় না। এমন যে প্রধান দেবতা কামদানাথ—তাঁকে দর্শন করেও অভীষ্ট সিদ্ধ হল না বলে মনে হবে—যতক্ষণ না দু' মাইল পথ পরিক্রমাটি শেষ করতে পারা যায়।

যাই হোক, এই পদচিহ্নের দেশে পায়ে হেঁটে তীর্থ করাটাই রীতি। দশ-বিশ মাইলের পাল্লায় দ্রষ্টব্য স্থানগুলি। সব চেয়ে কম হ'ল দু' মাইল পথ হনুমান ধারা। কিন্তু কোটধারা আর সীতারসুই মিলিয়ে দশ। "পহেলী দর্শনে আমরা শুধু হনুমান ধারাটিকে বেছে নিলাম। হিসেব করে দেখা গেল—বেলা দু'টোয় বা'র হয়ে সন্ধ্যের পর ফিরে আসা চলবে।

মন্দাকিনীর অপর পারে বিন্ধ্যগিরির কোলে একটি [illegible]

এসেছে—হনুমান ধারা। হাঁটতে হবে তিন মাইল, পাহাড়ে উঠতে হবে তিনশো যাট সিঁড়ি ভেঙ্গে; সে-ও কোন্ না এক মাইলের ধাক্কা?

সঙ্কীর্ণ নদী। পারের নৌকা অনবরত যাতায়াত করছে। পারানি মাত্র দু' পয়সা। ওপারে নয়া গাঁ। জমিদারের প্রাসাদ আছে, জাঁকজমক নাই। নিতান্ত ধুলো-ভরা পায়ে-চলা পথ, খোলার বস্তি। গরীব বাসিন্দা নিয়ে গ্রাম—বন আর পাহাড়ের মাঝে অত্যন্ত বেসামাল। মাইল খানেক চলার পর দু'ধারে পাতলা বন দেখা দিল। তবু যা হোক—পথের শ্রী ফিরল।

মাটি কেটে তৈরী হচ্ছে পথ—মোটরবিলাসীর জন্য। মাঝে মাঝে যাত্রী দল আসা-যাওয়া করছে। পাহাড়ের নিকটবর্ত্তী হতে বন ঘন হল। অধিকাংশই নাতি-উচ্চ গাছ—তেঁতুল পাতার মত শাখাপল্লব। তার মধ্যে পরিচিত বেল ও কয়েৎ বেল গাছ দু' একটি। চুনিলাল জানাল—তেঁতুল-পাতার মত পাতা যে গাছের—সেগুলি খয়ের গাছ। এর কাঠ বেশ শক্ত। যতই এগুতে থাকি—খদিরবন ততই ঘন হতে থাকে।

মাঝ-রাস্তায় পড়ল বন-দুর্গার ছোট মন্দির। মন্দিরে মূর্তি ও পূজারী আছেন। মন্দিরমধ্যস্থ মূর্তি কিন্তু প্রধান নয়। খোলা গাছতলায় পাতা আছে শিলাসন—শিলাসনে একজোড়া পায়ের ছাপ। বছর দুই হ'ল, মন্দাকিনী গঙ্গা থেকে পাওয়া গেছে। এমন হয়তো আরও অনেক পদচিহ্নিত শিলা মন্দাকিনী গর্ভে অথবা বনে-প্রান্তরে লুকানো আছে। দেশটাই যেন পদচিহ্নে পবিত্র—শুদ্ধ। এমন সাধু সন্ন্যাসীর মেলাও অন্যত্র চোখে পড়ে না। বহু রামাইৎ সন্ন্যাসীকে দেখলাম পথে। স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল দেহ—দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ ভূমিলুণ্ঠিত জটাজাল—গলায় তুলসী মালা, কপালে বৈষ্ণবীয় তিলক, হাতে করঙ্ক কমণ্ডলু, মুখে রামসীতা ভজন-গান। ধূলিধূসর অসমতল পথে, অরণ্যে, পর্বতে ওঁরা সর্ব্বক্ষণই ঘুরে বেড়াচ্ছেন, অন্বেষণ করছেন ত্রেতার প্রাণসত্তাময় পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে। যিনি পূর্ণব্রহ্ম সনাতন হয়েও আত্মবিস্মৃত। প্রজানুরঞ্জনে যাঁর কায় মন উৎসর্গীকৃত, দুষ্কৃত দলনের জন্য অবনীতে যাঁর আবির্ভাব।

এই পর্ব্বতে মহাবীর এলেন কোথা থেকে?

ছড়িদার তার জ্ঞানবুদ্ধি মত জবাব দিল, গন্ধমাদন পর্ব্বত নিয়ে যাবার সময় এই পর্ব্বতে বিশ্রাম করেছিলেন হনুমান।

রামায়ণে অবশ্য এত খুঁটিনাটি বিবরণ নাই। তবে শ্রীরামের স্মৃতিপূত তীর্থে শ্রীহনুমানের স্মৃতি জড়িয়ে থাকবে না—এটা কল্পনাতীত ব্যাপার। লঙ্কা বিজয়ান্তে অযোধ্যা প্রত্যাবর্ত্তনের সময় চিত্রকূট কি পথিমধ্যে পড়েনি?

যাই হোক, পাহাড়ে উঠতে তো প্রাণান্ত ব্যাপার! প্রথমটা বেশ ছড়ানো সিঁড়ি—খাটো খাটো ধাপ। তার পর যেমন খাড়াই—তেমনি উঁচু ধাপ। ছড়িদারের হাত থেকে লাঠি নিয়ে কোনমতে তো উঠলাম উপরে। কোন মতে উঠলাম! হায় রে প্রাক্-বার্দ্ধক্য দশা! পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে হাজার সিঁড়ির চন্দ্রনাথ পাহাড় অনায়াসে উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। দিনে চার বার ওঠা-নামা করেছি কামাখ্যা পর্ব্বত। বালির চড়া ভেঙ্গে সাবিত্রী পাহাড় 'কিছুই না' মনে হয়েছে। দার্জ্জিলিং কার্সিয়াংএ কোন পাহাড়ে নেমেছি—চা বাগান ছাড়িয়ে ভুটিয়া বস্তী পার হয়ে লেবাং এর বন পথে উপলচ্যুত ঝরণার জলপড়ার গান শুনতে শুনতে পথ হারানোর নেশায় মেতে একটু ক্লান্তি বোধ করিনি।

ওখানে পাহাড়ের গায়ে একটু সঙ্কীর্ণ স্থান—সেখানে একটুখানি পাহাড়েরই চন্দ্রাতপ—তার মধ্যে মহাবীরজীর মূর্তি। ঠিক তার পাশেই একটি প্রবলস্রোতা ঝরণা এসেছে নেমে। পাহাড়ের গায়ে জলাধারে সামান্য জল আটকে রাখার ব্যবস্থা আছে। জলাধার ছাপিয়ে কাচস্বচ্ছ সলিল উপচে পড়ছে নীচে। এই জল পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে। গ্রাম থেকে অনেকে এসেছে জল নিতে।

দর্শন হল, পূজা হল, পাথরের চাতালে বসে শ্রান্তি দূর করলাম। সামনে প্রসারিত চিত্রকূট গ্রাম, তার কোলে সূতার ধারার মত চক্রগামিনী মন্দাকিনী, কিছু দূরে কামদ-গিরি। বিস্তীর্ণ মাঠে-জঙ্গলে স্বল্পমাত্র বাড়ী-ঘর মঠ-মন্দির। অরণ্যের গাছপালা ঘাসের মতই ভূমিলগ্ন, উচ্চাবচ ভূমির চিহ্ন মাত্র নাই। আকাশের আশমানী চাঁদোয়ার তলায় সবুজ বুটিদার একখানি জাজিম বিছিয়ে দিয়েছে কে যেন!

পাহাড়ের সঙ্কীর্ণ অংশে দু'-একখানি ঘর আছে—আর দরদালানের মত খানিকটা আচ্ছাদন। একজন সাধু এক মনে শাস্ত্রগ্রন্থ পড়ছেন।

এখানে হিংস্র জন্তু জানোয়ার আছে বই কি। এই পাহাড়ের জঙ্গলে অজস্র চিতা আছে, আর আছে ভালুক। চিতার চেয়ে ভালুককেই বেশী ভয় মানুষের। মানুষকে নাগালের মধ্যে পেলে দৃঢ় মৈত্রীবন্ধনে না বেঁধে এরা ক্ষান্ত হয় না। আর আছে বিষধর সাপ। শীতের আমেজ পড়লে এরা নিস্তেজ। হরিণও কিছু আছে। পাহাড়ে কিছু কন্দমূল পাওয়া যায়। ওষধিবৃক্ষও বহু প্রকারের। সাধারণ মানুষ তার জাতি নির্ণয় করতে পারে না।

চুনিলাল বলল, যে কন্দমূল খেয়ে শ্রীরামচন্দ্র জীবনধারণ করতেন তা সতী অনসূয়ার বনপথে প্রচুর পাওয়া যায়। শকরকন্দ জাতীয় খাদ্য আর কি। ওই পাহাড় ওষধির জন্যও বিখ্যাত। এইখান থেকেই বেরিয়েছে মন্দাকিনী গঙ্গা। তিনটি ধারা পাহাড়ের রন্ধ্র পথে তিনটি বেণী রচনা করে সমতল ভূমিতে নেমে এক হয়েছে এবং প্রশস্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত। এরই নাম মন্দাকিনী গঙ্গা।

ওখানে যাবার সুগম পথ আছে?

পথ ভালই, তবে সবটা গাড়ী চলে না। গাড়ী যাবার পথ তৈরী হচ্ছে।

ঠিক দশ মাইল?

পাহাড়ে মাইল তো, মাপজোক বেশ লম্বা-সই।

অর্থাৎ খাটি বাংলায় 'ডাকভাঙা ক্রোশ।'

সতী অনসূয়া দর্শনের কোন্ পর্য্যায়ে পড়ে?

তিম্বরী যাত্রার প্রথমে সীতাকুণ্ড, পরে স্ফটিকশিলা হয়ে সতী অনসূয়াজী।

ব্যস, এইখান থেকে প্রণাম করি সতী অনসূয়াজীকে।

তাহলে কাল কি চেঁঠি দর্শনে যাবেন?

সে আবার কোথায়?

যেন মোরধ্বজ আর গুপ্ত 'গোদাবরী। ওখানে যাবার মেঠো রাস্তা আছে, গরুর গাড়ী যায়।

কতখানি পথ ?

যেতে-আসতে বিশ মাইল। সকালে যা'র হয়ে সন্ধ্যায় ফেরা যায়।

গোযানে বিশ মাইল। সারাদিনের খেয়া। প্রণাম করি গুপ্ত গোদাবরীকে।

কিন্তু ভারি চমৎকার জায়গা বাবু! দু'টি পাহাড়ের মাঝখানে গুহা, তার মধ্যে নদী। জল কোথা থেকে আসছে, কোথায় যাচ্ছে কেউ দেখতে পায় না। কল-কল করে স্রোত বইছে। ওখানে খানা বানায় লোকে। অর্থাৎ চড়ুই ভাতি।

কিন্তু হৈ হৈ করে চড়ুই ভাতি তো দু'-তিনটি লোকে জমবে না। গরুর গাড়ীতে বিশ মাইল—সূর্যোদয় থেকে সূর্য্যাস্ত, ভাবতেই কল্পনার রং ফিকে হয়ে আসছে।

পঞ্চমী যাত্রার ভরত-কূপ আর রামসৌয়র। ভরতের স্নানের ইচ্ছা হওয়াতে—লক্ষণ ধনুতে করে সমস্ত তীর্থের জল এনে নাকি এই কূপটি পূর্ণ করেন। আমরা তো স্নান করব না—কাজেই পঞ্চমী যাত্রার দশ মাইল পথ ভেঙ্গে কি লাভ।

লাভ-ক্ষতি আমরা পথ ক্লেশ, নিদ্রা আহার আশ্রয় সুখ সুবিধার নিরিখেই নির্ণয় করে থাকি। তীর্থে মন্দিরটি যদিও লক্ষ্যে থাকে—পথটা লক্ষ্যের চেয়েও বেশী। চলতে চলতে পা দু'খানি পরিশ্রান্ত হয় না শুধু একটি কারণে—শ্রোত্র চক্ষু নাসিকা ত্বক প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-দ্বার দিয়ে মন টেনে নেয়—ধ্বনিরূপ সৌরভ আর সান্নিধ্যকে। অনুভূতি রসে মুগ্ধ হয়ে যায় মন। চারি দিকে যা দেখে—যা শোনে যা আমন্ত্রণ করে—স্পর্শ করে—তারই রূপ উপাদান নব নব চেতনায় ও বৈচিত্র্যে আত্মনিবেদনের ভূমিটিকে তৈরী করে। সেই ভূমিতে পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে ওঠে একটি রূপাতীত সৌন্দর্য—হৃদয়-বৃন্তের ভক্তি-কুসুম—যার সার্থকতা দেবদর্শনে—ও দেবচরণে উৎসর্গীকরণে। তেমন দর্শন বা পূজা আমরা করি না। করিতে পারি না। দু' ধারের নিসর্গ-সৌন্দর্য্য আমাদের মনে সেই অগাধ রসানুভূতির আভাস মাত্র এনে দেয়। ক্ষুৎপিপাসা শ্রান্তি আমাদের ভ্রূকুটি করে, পথ হারাই আমরা, এবং ভয় করি পথ অতিবাহনের পরিশ্রমকে।

যে ফেরে দেশান্তর থেকে—ফেরে তীর্থ থেকে—আমরা কয়েকটি অবোধ প্রশ্ন তুলে ধরি তার সামনে।

কেমন লাগল জায়গাটা? জল-হাওয়া? সিনারি? জিনিষ পত্রের যে দর—সব পাওয়া যায় তো? থাকার কষ্ট নেই? গাড়ীঘোড়া মেলে?

ঘর ছেড়ে এসেও ঘরের আরাম মনে লেগে থাকে।

কিন্তু এদেশের তীর্থযাত্রী? এই তো দেখছি চোখের সামনে—একদল তীর্থযাত্রী এলো। মেয়ে-পুরুষ মিলিয়ে দশ-বারো জন। এসেই অতিকায় গাঁঠরিগুলি ধপাস করে ফেলল ধূলোভরা উঠোনের উপর—তার পাশে লাঠিটা রাখল সন্তর্পণে। মাথার পাগড়ী খুলে কম্বলটা বিছিয়ে নিল সেই ধূলোয়। হাঁটুভর ধূলোমাখা পা শুদ্ধ কম্বলের উপর মিনিট দুই চিৎ হয়ে গড়িয়ে নিল। তার পর কেউ ছুটল বাজারে, কেউ সংগ্রহ করল কাঠ, কেউ জ্বালল উনুন, কেউ কূয়ো থেকে তুললো জল, কেউ বা কয়লা আটা আনতে—চাল ধুতে। বাজার থেকে তরকারি যা এলো চেয়ে দেখবার মত নয়। সের টাক ঢ্যাঁড়স। ব্যস্, গোটা দুই-তিন চুন্নী ফেলে কেউ লোটায় করে দিল ডাল চাপিয়ে—কেউ হাঁড়ীতে করে খিচুড়ি। তার মধ্যে ফেলে দিল—বোঁটা না-কাটা আধোয়া ঢ্যাঁড়স। আটা মেখে বড় বড় লেচি পাকিয়ে ছেড়ে দিল ওই খিচুড়ির মধ্যে। ওই আহার্য্যই পরিতৃপ্তি করে খেয়ে সারি সারি শুয়ে পড়ল উঠোনে। রাত্রিতে অবশ্য উঠোনে রইল না (থাকলেই বা কি অসুবিধা হতো!) গরুর গোয়ালঘরে কম্বল মুড়ি দিয়ে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ভজন গান চালাল। একবার মেয়েরা গায়—একবার পুরুষরা ধুয়ো ধরে। পাল্লা দিয়ে চলল গান।……শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল সেই দ্বৈত সঙ্গীতে।

আমরা সকাল বেলায় যখন ঘুম ভেঙ্গে উঠে মুখে-হাতে জল দিচ্ছি—ওদের পিঠে তখন গাঁঠরি উঠেছে—হাতে নিয়েছে লাঠি।

কোথায় চললে ভাই এত সকালে?

অনসূয়াজী।

আহারাদির কথা জিজ্ঞাসা করলাম না, সে ব্যবস্থা কাল কামদ সিঁড়ি প্রদক্ষিণের সময় দেখেছি। একটি ইঁদারা ঘিরে বসেছে একদল যাত্রী। জল তুলে ভরে নিয়েছে লোটা, গায়ের ময়লা উত্তরীয়ে ঢেলেছে খানিকটা সাত্তু (ছাতু)। অতঃপর লোটার জলে ছাতু ভিজিয়ে তাল পাকিয়ে নিয়েছে। তার পর সেই আহার্য্য। এক লোটা জল উদরস্থ করে—ইঞ্জিনে ষ্টীম তৈরী করতে এর চেয়ে বেশী উপকরণের প্রয়োজনটা কি? পিঠে বোঝা, হাতে লাঠি—মুখে জয় সীতারাম,…এদের কাছে দশ-বিশ মাইল পথ আর কতটুকু? আহার আশ্রয়, যানবাহন, পর্ব্বত, অরণ্য, কণ্টকবন, দুরারোহ দুর্গম ভয়-সঙ্কুল স্থান—কোন বাধাটা প্রবল এদের কাছে? জয় সীতারাম বলে শুধু পথ চলা, শুধু প্রণাম করা, শুধু ঠাকুর দেখা আর মাটিতে অষ্টাঙ্গ হওয়া। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন।

রাত বারোটায় অজানা দেশের মুসাফিরখানায় ধূলোয় বিছানা পেতে কয়েক ঘণ্টা চোখ বুজে এই পরম নির্ভরতাকে আভাসে ধরতে পেরেছিলাম। জনতার মাঝে জনকে উপলব্ধি করার একটি পরম মুহূর্ত্ত। শ্রীরামচরণচিহ্নিত ভূমিতে তাঁর পদপঙ্কজ ভজনার অভিলাষ হয়তো বা সার্থক হয়েছিল ওই ক্ষণস্থায়ী পরম মুহূর্ত্তটিতে।

"ক্ষণে ক্ষণে এ রাগিণী ও রাগিণীর আভাস পাই, কিন্তু ধরতে পারা যায় না। অনেক কীর্ত্তন ও বাউলের সুর বৈঠকী গানের একেবারে গা ঘেঁষে গিয়েও তাকে স্পর্শ করে না। ওস্তাদের আইন অনুসারে এটা অপরাধ, কিন্তু বাউলের সুর যে একঘরে, রাগ-রাগিণী যতই চোখ রাঙাক সে কিসের কেয়ার করে!"

—রবীন্দ্রনাথ

রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম

অনুবাদক—নির্মল গুপ্ত

তোমাকে আজকে চুপি চুপি বলি, 'জীবনের যাত্রাতে
দ্যুলোক ছাড়ায়ে আসিয়াছি কোন প্রান্তে
গ্রহ-তারা-রবি পথের দু'ধারে ছিল
সাথে ছিল মোর জীবন-নাট্য ধূলি আর আস্বাদে।'

দ্রাক্ষার দেহ-বল্লরী-মূলে জড়ানো আমার দেহ
সুফী-বাদীদের রহস্য-ঘন যাই থাক সন্দেহ
আমার দেহের ধাতুর আধারে যেই কুঞ্চিকা গড়া
দ্বারের বাহিরে থাক সেই পীর—খুলবেই মোর গেহ।

এই কথা জানি ভাস্বর আর অম্লান আলো-শিখা
জ্বাল্‌বেই ধ্রুব ঘৃণার কিংবা প্রেমের বহ্নি-শিখা
পান্থ-শালার আলোর শিখায় ক্ষণেক নেত্রপাত
অনেক শ্রেয়ান্—দূরে থাক্ শত মন্দির যবনিকা

যে-পথ আমার নিত্য-নিয়ত ভ্রমণের সহচর
বিছায়েছ সেথা মদিরার ধারা, মৃত্তিকা-গহ্বর—
বাঁধিবে না মোরে অন্ধ বিধির বাহুবন্ধন পাশে ?
দুষবে কি শুধু পতনে আমার পাপেরে নিরন্তর ?

তুমিই গ'ড়েছ মানুষের ধারা পংকিল মৃন্ময়,
তুমিই এনেছ স্বর্গোদ্যানে সর্পের সঞ্চয়
ঘৃণা-জর্জর মানুষের মুখ হয়েছে কালিমা-মাখা
মানবের সাথে ক্ষমা লেন-দেনে দাও তুমি বরাভয়।

কুজা নামা

কান পেতে শোন রমজান অবসানে
নব-চন্দ্রমা হেসেছিল বুঝি আকাশের কোনোখানে
মৃৎ-শিল্পীর বিপণিতে আমি গিয়েছিনু বুঝি একা
মাটির জনতা অস্ফুট কথা ব'লেছিল কানে কানে।

বিস্ময় মানো নেই যে হাজার মৃৎপাত্রের দল
কেউ বুঝি তারা বাঙ্ময় ছিল, কেহ বা অচঞ্চল
সহসা একটি মাটির ভাণ্ড ধৈর্যের বাঁধ ভাঙি
শুধাইল উঠে 'স্রষ্টা কোথায় ? কোথা বা স্রষ্টি বলো ?

আবার আর এক মাটির ভাণ্ড উঠেছিল উচ্চারি
আমিও আমার স্রষ্টার হাতে একই মৃত্তিকা সারই।
এই পৃথিবীর দেহাপুঞ্জে করো মোরে একীভূত
ভঙ্গুর দেহ ভেঙ্গে দাও আজি হে মোর স্রষ্টিকারী।

আবার আর এক গুঞ্জনি ওঠে "কবে কোন ক্রোধাতুর
আপন গলিত দ্রাক্ষা-পাত্র ক'রেছিল ভঙ্গুর—
আপন মনের মাধুরী মিশায়ে অমৃত-ভাণ্ড গড়া
দুর্জয়-ক্রোধে তারে কি স্রষ্টা করিয়াছে কচুচুর ?"

তার পর সব নির্বাক্ ছিল সহসা মৌন ভাঙি
কুৎসিত এক মাটির ভাণ্ড ক্রোধেতে উঠিল রাঙি
"কুব্জ আমার দেহেরে বিঁধিয়া শুধু বিদ্রূপ-বাণ—
বেপথু ছিল কি শিল্পীর হাত ? উত্তর এর মাগি।

আবার আরেক পাত্র বলিল—শয়তান তারে বলে
মুখমণ্ডলে শুধু তার নাকি নরক-বহ্নি জ্বলে
তাদের বিচার তাদের দণ্ড তাদের কাছেই থাক্
সাধু-সজ্জন সেই লোক থাকু অতিমানুষের দলে।

আরেক পাত্র মর্মরি ওঠে গভীর হতাশ্বাসে
মৃত্তিকা মোর শুকায়ে গিয়াছে ঘন-তমিস্রা-গ্রাসে
পুরাতন সেই দ্রাক্ষার সারে ভ'রে দাও মোর বুক—
জীর্ণ হিয়ার হয় ত' যদি বা প্রাণ-উচ্ছ্বাস আসে।

পাত্রেরা যবে বাঙ্ময় ছিল চুপি চুপি কোন বনে,
একজনা দেখে দ্বিতীয়ার চাঁদ আকাশের অংগনে
তার পরে সব হুটোপুটি করে উত্তাল উদ্বেল
কৌতুকে বলে, "মত্ত-বাহীরা বুঝি বা প্রমাদ গণে।"

• • • •

বন্ধু আমার খলিত জীবনে গলিত দ্রাক্ষা ঢালো
অবসিত হিয়া ফেন-উচ্ছল মদিরার প্রক্ষাল'।
দ্রাক্ষার নব-বল্লরী আর পত্রের আস্তরণে
সমাধিতে নিও মম-দেহ-মোর সেই হবে ঢের ভালো

এই যে আমার সমাহিত দেহ-শেষ
বায়ু-হিল্লোলে তাহাতেও জাগে সুরভির উন্মেষ
আস্তিক্যের ধ্বজা নিয়ে নয়, তবু—
অন্যমনা কোন পথিক-হৃদয়ে জাগায় সুরের রেশ

যে-প্রতিমা আমি পূজিয়াছি অনুখন
আমার খ্যাতিরে করিয়াছে আজ কলংক-বিমগন
সম্ভ্রম মোর ডুবিয়া গিয়াছে মদিরা-পাত্রে আজ
সুরম্যাংকারে বিকায়ে দিয়েছি খ্যাতির এ-অংগন।

অনুতাপ আমি অনেক ক'রেছি অনেক বার—
অস্থির হিয়া আশ্রয় নেয় শপথ অনুজ্ঞার
তার পরে যেই ঋতুরাজ এলো গোলাপের উপবনে
চুরমার হ'ল ছিন্ন-ভগ্ন যত শপথের ভার।

মদিরার ধারা ফকিরের মত অনেক দিয়েছে দাগা
খুলিয়াছে মোর যত সাজ ছিল খ্যাতির কিরীটী লাগা—
তবু ভাবি মনে, কি ক'রে যে-জন সুধার বেসাতি করে
সুধার বদলে যাহা কেনে তাহা কোন সে অমৃত মাখা।

গোলাপের সাথে ঋতুরাজও করে নিশ্চিত প্রয়াণ
নব-যৌবন পাণ্ডুলিপিও হ'য়ে যাবে অবসান,
যে পাপিয়া ছিল কিশলয়-ছায় গোলাপের শাখে শাখে
কোথা থেকে এল কোথা গেল সেই কুসুমিত উদ্যান!

প্রেয়সি আমার, বাহু-ডোরে এসো ভাগ্যেরে নিয়ে হাতে
বহস্তে হাত প্রসারিত করি সৃষ্টি-কল্পনাতে
ভাগ্যেরে মোরা খান্ খান্ করিব যে
গড়িব আবার মাধুরী মিশায়ে হৃদয়ের বাসনাতে।

ওগো মধু-চাঁদ তোমার হৃদয়ে নেই ত' অবক্ষয়
নভঃ-অংগনে আজকে যে হেরি অবাক্ চন্দ্রোদয়
হয়ত' আবার করিবে আকাশ আলোর ধারায় স্নান
এই প্রাংগণে তখন আমার কোথা র'বে পরিচয়?

তুমি যবে ফের আসিবে হেথায় আলোর চরণ-পাতে,
শুভাকাংক্ষীরা যেথায় রয়েছে তারা-খচা দূর্বাতে
তোমার প্রমোদ-ভ্রমণের শেষে শূন্য আমার কোণে
শূন্য পাত্র রেখে দিও এক—উজ্জ্বল তব হাতে।

সমাপ্ত

সভ্যতার সঙ্কট

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সেন

মানুষ আপনার বুদ্ধিবলে ও উদ্ভাবনী শক্তিতে প্রকৃতিকে অবজ্ঞা করে নিজের বসবাস ও চলাফেরা করবার এক কৃত্রিম রাজ্য রচনা করেছে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে তার অপ্রতিহত গতি। আকাশে তার রথ চলেছে প্রচণ্ড বেগে, শব্দের গতিকে স্পর্দ্ধা ক'রে। ভূতলে মাইলের পর মাইল খুঁড়ে চলেছে আকাঙ্ক্ষীয় খনিজ দ্রব্য আহরণ করবার জন্যে। কল-কারখানায় লোহার অগ্নিময় স্রোত বইয়ে দিচ্ছে সভ্যতার ঠাট বজায় রাখবার মালমশলা তৈরী করতে। পাথর ও ইস্পাতে গঠিত জনপদ নির্মাণ করছে, যেখানে নানা প্রকার জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে, যা কয়েক সহস্র বছর আগেও আদিম মানুষের অজ্ঞাত ছিল। চোখে এমন সব দৃশ্য দেখছে এবং কানে এমন সব শব্দ শুনছে যা তার স্নায়ুগুলোকে আহত করছে। যে ক্ষুদ্র মানব উলঙ্গ হয়ে পৃথিবীতে এসেছিল তার কত বিচিত্র চমকপ্রদ সাজসজ্জা! কত বিভিন্ন চোখ-ধাঁধানো আলোর মালা—যা দিনের আলোকেও ম্লান করে দেয়। নিজেকে উত্তপ্ত রাখবার জন্যে কত বাষ্পীয় ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সরঞ্জাম। নিজের রসনাকে পরিতৃপ্ত করবার জন্যে কত বিচিত্র লোভনীয় দুষ্পাচ্য খাদ্যদ্রব্যের সমাবেশ। থিয়েটার সিনেমা প্রভৃতি আমোদ-প্রমোদের জায়গায়, হোটেলে, গাড়ী-জাহাজ-এরোপ্লেন প্রভৃতিতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রকোষ্ঠ। এমনি করেই কৃত্রিম পারিপার্শ্বিক অবস্থার সৃষ্টি করে কৃত্রিম জীবন যাপন করছে। কয়েক সহস্র বছর আগেও যে আদিম অসভ্য মানুষ জীবনধারণ করতো বনের পশুকে ফাঁদে ফেলে এবং জলের মাছকে বশীভূত করে, সে কি নিজের রচিত এই যন্ত্রসভ্যতার স্নায়ুপেষণকারী আঘাত সহ্য করতে পারবে?

নানা প্রকার আবিষ্কারের ফলে নানা প্রকার কাজ একসঙ্গে করবার সুযোগ হয়েছে। যেমন, খাওয়া-পরা রেডিও শোনা প্রভৃতি। এতে শরীর ও মনের ক্লান্তি হয়। পরিণামে উচ্চ-রক্তের চাপ, হৃদরোগ ও নানা প্রকার স্নায়ুর ব্যাধিতে ভুগতে হয়।

মানসিক শক্তিই মানুষের গৌরব ও অভিশাপ। বুদ্ধিবলেই মানুষ পশুপাখীর চেয়ে এত উন্নত। কিন্তু উন্নত মন শরীরের সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে না পারলে মানুষ জাতি হিসাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তার মস্তিষ্ক হয়েছে অতি উন্নত ও অসাধারণ। নব নব যন্ত্রপাতি তার কায়িক শ্রম ও অপূর্ণ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের জায়গা দখল করছে। সামাজিক জীবন হয়েছে অভিনব ও অতি জটিল। সামাজিক ও বৈজ্ঞানিক এত দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে ক্ষুদ্র শরীর আর খাপ খাইয়ে চলতে পারছে না। দেহ রয়েছে বহু যুগ অতীতে আর আধুনিক মন রয়েছে তার সৃষ্ট অন্য এক জগতে।

বহু যুগ ধরে কত প্রাণী এ পৃথিবী অধিকার করলো। এক এক শ্রেণীর জীবের এক এক অঙ্গের বৈশিষ্ট্য হলো। কেউ হলো বেগবান, কেউ হলো অতিকায়, আবার কেউ হলো অতি শক্তিশালী। পারিপার্শ্বিক অন্য জন্তুর উপর প্রাধান্য করে কিছু কাল জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়ে রইলো। কিন্তু সবই বৃথা। আবার একে একে অদৃশ্য হয়ে গেল। টেরোডাকটাইলের মত অতিকায় জীব একদিন উড়ে বেড়াতো। ডাইনোসরের পদভরে একদিন ধরণী কম্পিত হতো। এক লক্ষ বছর আগেও মানুষের অপরিণত আদিম পুরুষ জঙ্গলে আধিপত্য করতো।

পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায়, যারা সহজ ও সরল জীবন যাপন করে তারাই বেশী দিন টিকে থাকে। এক কোষের জীবাণু যারা

তারাই এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। এরা প্রতিভাবান নয়, বিশেষজ্ঞও নয়, কিন্তু এরাই জীবজগৎ গঠিত করে। এই নিকৃষ্টতম জীবাণুরা যেন সুসমঞ্জস এবং স্বয়ংসিদ্ধ। যদি এদের ভিতর এমন বিশেষ প্রবৃত্তি ঢুকিয়ে দেওয়া যায় যাতে ওরা নানা প্রকার খাদ্য আহরণ করবে ও গ্রাস করবে, এবং এদের স্নায়ুমণ্ডলী যদি এরূপ হয় যে পারিপার্শ্বিক বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে, তা হলে ওদের পূর্বের সামঞ্জস্য ব্যাহত হয়ে ধ্বংসের রাস্তা পরিষ্কার হবে।

বিবর্তনের গতিতে নানা প্রকার পশু-পাখী মাছ প্রভৃতির পর বানর এবং তারপর মানুষের উদ্ভব হলো। বানর মানুষের আদি-পুরুষ হলেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ও চলাফেরায় অনেক তফাৎ। মানুষ চার পায়ের বদলে প্রথমে দু'পায়ে চলতে আরম্ভ করেই পৃথিবীর সবচেয়ে জটিলতম যন্ত্র এই মস্তিষ্কের বিবর্তন সুরু হলো। স্নায়ু-মণ্ডলীর শীর্ষে যে মস্তিষ্ক তারই উন্নতি হলো সব অঙ্গের চেয়ে বেশী। এই বিশেষত্বের জন্যে মানুষ বুদ্ধিতে অন্য জন্তুর চেয়ে অনেক এগিয়ে গেল। এখনও ওই অগ্রগতির শেষ হয়নি।

বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারের ফলে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন যানবাহন হবে আরও দ্রুত। রেডিও টেলেভিসনের চেয়ে আরও উন্নত যন্ত্র প্রস্তুত হবে, যার ফলে পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষ প্রত্যেকের আরও নিকটতর হবে। সমাজ সংসারের অবস্থা হবে আরও জটিলতর। এই অতিচেষ্টা শরীরকে পেষণ করবে। মস্তিষ্কজনিত এই অসামান্য উন্নতিই পরিশেষে মানুষের জাতি হিসাবে বিলুপ্ত হবার কারণ হতে পারে।

দেহ ও মনের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। শরীরের অবস্থার সামান্য পরিবর্তন হলে মনের উপর প্রতিক্রিয়া হয়। রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা এবং তার ভিতর কোন রাসায়নিক দ্রব্যের সামান্য তারতম্য হলে মনের উপর কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দ্বারাই বিষয়টি শারীর বিজ্ঞান দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

রক্তের উত্তাপ খুব বেশী হলে মানুষ পাগলের মত হয়। খনির ভিতর এবং জ্বলন্ত চুল্লীর সামনে অতি উত্তপ্ত আবহাওয়ায় তাকে কাজ করতে হয়। রক্তের ভিতর অক্সিজেন না থাকলে বিচারশক্তি হারায়। ক্যালসিয়ামের পরিমাণ অর্ধেক হলে খেঁচুনি, অজ্ঞান অবস্থা ও তৎপর মৃত্যু হবে। পরিমাণ দ্বিগুণ হলে রক্ত গাঢ় হয়ে চলাচল বন্ধ হতে পারে—পরিণামে শরীর ভার বোধ হবে, ঔদাসীন্য আসবে এবং অজ্ঞান হতেও পারে। চিনির ভাগ একটুও কমালে মনে অসহায় ভাব আসবে। আবার একটুও বাড়ালে মনে সামান্য কারণে ভীতির ভাব আসবে, কথা জড়িয়ে আসবে এবং নানা প্রকার ভ্রান্ত দৃশ্য দেখবে। সভ্যতার আনুষঙ্গিক যে সব ব্যাধির আবির্ভাব হয়েছে, যেমন বহুমূত্র, এতে রক্তের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন করে। আজ-কাল অনেক রোগেই রক্ত পরীক্ষা অবশ্য কর্তব্য। এই ভাবে শরীরে গ্লানি হলে মনের উপর প্রতিক্রিয়া হয়।

দেহ ও মনের সামঞ্জস্য না থাকলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চাও বৃথা। তবে কি মানুষ তার প্রতিভাকে ও বুদ্ধিকে সংযত করে এককোষ জীবাণুর মত এবং পিঁপড়ের মত সরল ও সহজ জীবন যাপন করবে? ষোল কোটি বছর আগে এই পৃথিবীতে পিঁপড়ের আবির্ভাব হয়েছে। এখনও তারা এক ভাবেই চলাফেরা করছে। যেন ওই পৃথিবীর বিবর্তনের মাঝখানে ওরা স্তব্ধ হয়ে আছে। এই কি মানুষের জীবনের মহৎ উদ্দেশ্য হবে? তার জ্ঞান বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা, নৃত্যগীত এবং নব নব অত্যাশ্চর্য উদ্ভাবনী কি পরিশেষে বিস্মৃতির অতলে বিলুপ্ত হয়ে যাবে? তারা কি আবার পূর্বতন অসভ্যতায় ফিরে যাবে?

প্রকৃতির পরীক্ষাগারে কত পাখী, মাছ ও চতুষ্পদ প্রাণী নিয়ে পরীক্ষা হলো, আবার প্রকৃতির খেয়ালে তারা অন্তর্হিত হলো। মানুষও কি পরিণামে তার অসীম ঐশ্বর্য নিয়ে এইরূপ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে? মানুষের মহৎ ঐশ্বর্য নিয়ে প্রকৃতির এ কি পরিহাস! প্রকৃতির গবেষণাগারে এ কি বহুমূল্য পরীক্ষা!

বিবর্তনের গতিতে মানুষের মস্তিষ্কের বহু উন্নত ধারা যদি অব্যাহত থাকে, তবে হয়তো আগামী কালের বহু উন্নত সভ্যতার উদ্ভাবক অতি বুদ্ধিমান ও বহু উন্নত আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন এক অতি-মানবের উদ্ভব হবে, যার ভূমিকা এই আধুনিক মানুষ।

কোপাই নদী

অসীম সেনগুপ্ত

কোপাই নদী কোপাই নদী
মেঘলা দিনে হঠাৎ যদি
তোমার বুকে নরম ঘাসে
স্বপ্ন-ভেজা বৃষ্টি আসে।

ভিজবে তবে নাম-না-জানা
শংখ-বকের শুভ্র ডানা;—
গভীর বনে: জলার কাছে,
কাম্‌রাঙা আর বাদাম গাছে,
একলা বসে কাঠ-বিড়ালী
ঘুমের ঘোরে ঢুলবে খালি।—
তিতুটে শালিক উড়বে ঘুরে
মেঘলা ভিজে আকাশ জুড়ে।

বটের ঝরি দুলবে তবে
চাপার কুঁড়ি ক্লান্ত হবে;—
অনেক আরও অনেক দূরে
বাঁকের মুখে ঢেউয়ের সুরে,
সন্ধ্যা হলে দেবেই সাড়া
তন্দ্রাহারা সিক্ত তারা।...
তখন তুমি একলা থেকো:
দূর মোহনার স্বপ্ন এঁকো;
রূপকাহিনী সঙ্গোপনে
বুলিয়ে দিও নিঃঝুম মনে।

'চেরো'

হস্তরেখাবিদ

শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিখ্যাত সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ড তখন খ্যাতির শীর্ষদেশে—তাঁর বিখ্যাত পুস্তক picture of Dorian Grey সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রচুর আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

এমনি সময় অস্কারকে এক জন হস্তরেখাবিদ ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে, কয়েক বছরের মধ্যেই তাঁর জীবনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসবে এবং অপবাদ ও কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে নিতান্ত সামান্য অবস্থার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হবে।

অস্কার হেসে উঠলেন। হাসবারই ত' কথা। জনপ্রিয়তার উচ্চচূড়ায় তিনি তখন অধিষ্ঠিত। সুতরাং এমন কথা শুনলে বুজরুকি ভেবে হেসে উঠাই ত' স্বাভাবিক।

কিন্তু হস্তরেখাবিদের উক্তি কয়েক বছরের মধ্যেই বর্ণে বর্ণে সত্য হ'লো, দুর্নীতির জন্য অস্কার আদালতে অভিযুক্ত হলেন এবং তাঁর কারাবাসও হ'ল। অবশেষে কারামুক্ত হয়ে ফ্রান্সে নিতান্ত দারিদ্র্যাবস্থায় অস্কারের মৃত্যু হ'ল।

অস্কার সম্বন্ধে এত বড় ভবিষ্যদ্বাণী যিনি করেছিলেন, কে সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হস্তরেখাবিদ?

সেই অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হস্তরেখাবিদের নাম চেরো। এক সময় সারা পৃথিবীতে চেরো হস্তরেখাবিদ হিসাবে অপরিসীম আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। হস্তরেখা বিচার ক'রে চেরো এমন সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করতেন যে, সারা পৃথিবীতে চেরো হয়ে উঠেছিলেন একজন অলৌকিক রহস্যময় পুরুষ।

চেরোর নাম সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই প্রশ্ন করতে লাগলেন, কে এই চেরো? চেরো কি যাদুকর? চেরো কি অলৌকিক শক্তিময় মহাপুরুষ? সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চেরো সম্পর্কে নানা বিবরণী প্রকাশিত হতে লাগল।

চেরো কিন্তু নিজেকে রহস্যের অন্তরালে এমন ভাবে আবৃত রেখেছিলেন যে, কেউ তাঁর সঠিক পরিচয় পেতেন না। প্রশ্ন করলে চেরো বলতেন: তাঁর নাম কাউন্ট লুই হামন। তিনি ইংলণ্ডে শিক্ষালাভ করেছেন। হাত দেখা শিখেছেন ভারতবর্ষে।

অনেকে চেরোকে প্রতারক ও ধাপ্পাবাজও বলতেন। যাই হোক, হাত দেখায় চেরোর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে তখন বিভিন্ন প্রকার কৌতূহল ও জল্পনা-কল্পনার অন্ত ছিল না। হাজার হাজার লোক চেরোর কাছে আসতেন হাত দেখাতে। চেরোর আশ্চর্য্য উক্তি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বিস্ময়-বিমোহিত ক'রে দিত।

১৮৯৩ সালে চেরো এলেন নিউইয়র্কে। এখন তিনি হস্তরেখাবিদ হিসাবে জনপ্রিয় ও খ্যাতিমান। নিউইয়র্কেও তাঁর সম্পর্কে কৌতূহল ও জল্পনা-কল্পনার অন্ত নেই।

একদিন নিউইয়র্কের ওয়ার্ল্ড কাগজ থেকে একজন প্রতিনিধি কতকগুলি হাতের ছাপ চেরোর কাছে নিয়ে এলেন এবং চেরোকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে বললেন যে, হাতের ছাপ দেখে মালিকদের সম্পর্কে চেরোকে বলতে হবে। চেরো যদি বলতে না পারেন, তবে বুজরুক বলে চেরোকে প্রচার করা হবে।

চেরো হাসিমুখে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। প্রতিনিধির কাছ থেকে একটি হাতের ছাপ তুলে নিয়ে বললেন: এই হাতের ছাপ একজন মহিলার। মহিলাটি বিবাহিত জীবনে সুখী ন'ন। মহিলাটির নিজস্ব শক্তি বলতে কিছু নেই, তিনি ভাগ্যের হাতে অসহায় একটি পুতুল।

প্রতিনিধি স্তব্ধ ও হতবাক্। চেরোর উক্তির সঙ্গে হাতের অধিকারিণী মহিলার জীবন সম্পূর্ণ ভাবেই মিলে গেছে। দ্বিতীয় ছাপ তুলে নিয়ে চেরো বললেন: এই ব্যক্তি একজন পুরুষ। বর্তমানে সামান্য অবস্থায় থাকলেও ইনি পরে কিছু নাম করবেন। সম্ভবতঃ একজন সুরশিল্পী। চতুর্থ হাতের ছাপ তুলে নিয়ে চেরো বললেন: ইনি একজন পুরুষ। এঁর শরীর খুব বলশালী এবং ইনি একজন সুবক্তা ও ব্যবসায়ী।

প্রতিনিধির মুখে আর কথা সরে না। সমস্ত উক্তিই হুবহু মিলে গেছে। পঞ্চম হাতের ছাপ তুলে নিয়ে চেরো বললেন: এই ব্যক্তি একজন খুনী। কারাগারে উন্মাদ অবস্থায় এর মৃত্যু হবে।

বিস্ময়-বিমোহিত, অভিভূত প্রতিনিধি এগিয়ে এসে চেরোকে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন: আপনি অলৌকিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি। আমাদের কাগজে আপনার কৃতিত্বের কথা সবিস্তারে প্রকাশিত হবে।

ওয়ার্ল্ড কাগজে চেরোর আশ্চর্য্য ক্ষমতার কথা সবিস্তারে প্রকাশিত হয় এবং নিউইয়র্কে চেরো সম্পর্কে প্রচুর আগ্রহ ও উত্তেজনার সঞ্চার হয়। নিউইয়র্ক ছাড়িয়ে সকল দেশেই চেরোর শক্তির কথা ছড়িয়ে পড়ে। এই জনপ্রিয়তার ফলে চেরোর উপার্জন লক্ষ লক্ষ পাউণ্ডের পর্য্যায়ে উঠে এবং তিনি নানা দেশে ঘুরে বেড়াতে থাকেন।

রাশিয়াতে যখন চেরো বেড়াতে যান, তখন রাশিয়ার জার দ্বিতীয় নিকোলাস্ চেরোর সঙ্গে দেখা করেন ও হাত দেখান। জার অবশ্য স্বপরিচয়ে আসেন নি, ছদ্মবেশে এসেছিলেন। ছদ্মবেশী জারের হাত দেখে চেরো লিখিত ভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করেন: এই ব্যক্তির শেষ জীবন শোচনীয় ও দুঃখময়। রক্তাক্ত বিপ্লবের সঙ্গে এঁর জীবন থাকবে জড়িত এবং ইনি ও এঁর প্রিয়জনেরা নিতান্ত হতভাগ্যের মত তরবারির আঘাতে নিহত হবেন।

সকলেই জানেন, জারের পরিণামের সঙ্গে চেরোর উক্তির এতটুকু প্রভেদ নেই।

সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড সিংহাসনে যখন আরোহণ করেন তখন তিনি ৬০ বছরের বৃদ্ধ। রাজারূপে ঘোষিত হ'লেও তখনও তাঁর অভিষেক হয়নি—এমন সময় তিনি কঠিন অসুখে পড়লেন। মনে হ'ল যে, তিনি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচবেন না। অভিষেকের পূর্ব্বেই হয়ত জীবনান্ত হবে।

দারুণ শঙ্কিত হয়ে রাণী আলেকজান্ড্রা চেরোকে ডেকে পাঠালেন এবং অনুরোধ করলেন সম্রাটের আয়ু সম্পর্কে সঠিক ভাবে বলতে। চেরো বললেন যে, কোন ভয় নেই। অভিষেক পর্য্যন্ত সম্রাট বেঁচে থাকবেন।

সপ্তম এডওয়ার্ড সরকারী ভাবে সম্রাট ঘোষিত হওয়া পর্য্যন্ত বেঁচে ছিলেন।

হাত দেখায় চেরোর অলৌকিক শক্তি নিয়ে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। জগতের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিকে এমন সব ভবিষ্যদ্বাণী চেরো করেছিলেন যে, প্রত্যেকটি বর্ণে বর্ণে সফল হয়েছে।

হাত দেখায় চেরো একটি নিজস্ব পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন এবং সেই পদ্ধতি তাঁর বিভিন্ন পুস্তকে আছে।

চেরোর জীবন-রহস্যময়। নিজের সম্পর্কে তিনি কিছুই প্রকাশ করেন নি। সব সময়ে তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রাখতেন। তার উপর চেরোর শেষ জীবনের কার্য্যকলাপও ছিল অদ্ভুত ও রহস্যময়।

শেষ জীবনে হঠাৎ চেরো হাত দেখা ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা করতে সুরু করেন। প্রথমে একটি আঙুরের ক্ষেত ক্রয় করে শ্যাম্পেন তৈরী করতে থাকেন, তার পর 'আমেরিকান রেজিষ্টার' নামে একটি সংবাদপত্র প্রচার করেন। সেই সংবাদপত্রে ধনী আমেরিকানদের কেচ্ছা কাহিনীই প্রধানতঃ স্থান পেত।

এই সব নানা খামখেয়ালীমূলক কাজে চেরোর নিন্দা হতে সুরু হয় এবং চেরোর বিরুদ্ধে নানা প্রকার প্রচার সুরু হয়।

তার পর কি খেয়াল হ'ল, হঠাৎ চেরো সব ছেড়ে দিয়ে একটি ব্যাঙ্ক খুলে বসলেন। ১৯০১ সালে দু' জন আমেরিকান চেরোর বিরুদ্ধে কয়েক হাজার ডলার প্রতারণার এক মামলা দায়ের করেন। সেই সময়, অর্থাৎ মামলা দায়ের হবার পর চেরো আত্মগোপন করলেন। খবরের কাগজে চেরোর এই আত্মগোপনের ব্যাপার নিয়ে দারুণ আলোড়ন সুরু হ'ল—চেরো সম্পর্কে নানা কাহিনী পল্লবিত হয়ে কাগজে ছাপা হতে লাগল।

চেরো হঠাৎ পুনরায় লণ্ডনে আত্মপ্রকাশ করলেন এবং অভিযোগকারীদের সঙ্গে আপোষে মামলা মিটিয়ে ফেললেন।

কিন্তু দুর্ভাগা চেরোর! পুনরায় একজন হাঙ্গেরীয় চেরোর বিরুদ্ধে প্রতারণার মামলা দায়ের করলেন। চেরোর বিরুদ্ধে অভিযোগ সপ্রমাণিত হ'ল এবং ১৩ মাস কারাদণ্ডে চেরো দণ্ডিত হ'ন। এর পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কারামুক্তির পর নিউইয়র্কে ফিরে চেরো পুনরায় হাত দেখার ব্যবসা সুরু করেন, কিন্তু পূর্ব্বের প্রতিষ্ঠা আর ফিরে পাননি। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ৭০ বছর বয়সে হলিউডে চেরোর মৃত্যু হয়।

খেয়াঘাটে

বিষ্ণু বন্দ্যোপাধ্যায়

এতো ভালো হ'ল এই কালো রাত্তিরে,
এই খেয়াঘাটে তোমাতে আমাতে দেখা—
এই খেয়াঘাটে তুমি একা, আমি একা…
সন্ধ্যেবেলায় দেখা হয়েছিল
                নদী আর কালবোশেখীতে,
ছিঁড়ে উড়ে গেছে আঁট কাঁচলিটা,
                চিলে হয়ে গেছে চুলের ফিতে…
ঢেউ, ঢেউ, সাদা বুকভরা ঢেউ,
                চেয়েছিল যেতে আকাশ পানে,
নদী আর ঝড়, আর নেই কেউ,…
                বাকীটুকু ওরা দু'জনে জানে।
আমাদের কথা আমরা জানি—
কতো ধূ ধূ পথ ঘুমোয় পেছনে পড়ে,
কতো চাঁদ, কতো কালো কালো ছায়া মড়ে,
ঘন নিঃশ্বাসে কতো কি না রাহাজানি
উঁচু তর্জনী ঠোঁটের ওপরে চাপা।

দেয়ালে দেয়ালে লাল কালি দিয়ে ছাপা,
কড়া হুমকিতে মিথ্যের জয়বাণী।
এখন হয়তো ঝিম-ঝিম করে গা,
এখন থিতিয়ে-নেতিয়ে পড়েছে নদী—
কে জানে, আমরা এখানেই থামি যদি।
খেয়াতরী নেই, ওপারে যাবার,
এপারেতে নেই ফেরার পাবার,
ধূ ধূ করে শুধু পায়ের তলায় জড়ো বালি—
ধুঁকে-ধুঁকে মেঘে তালি-দেওয়া আকাশেতে,
কালি চাঁদ দিয়ে অমাবস্যার কালি
ঘর নেই এই বালির ওপরে,
আশা নেই ঘর বাঁধবার—
এখানে কি বল কাঁদবার?
সমুখের পথ নদীর গভীরে ডুবে,
ভোরের শিশির কখন গিয়েছে শুবে,
মুছে মুছে যায় বালির ওপরে লেখা—
এ তো ভালো হ'ল এই কালো রাত্তিরে,
এই খেয়াঘাটে তুমি একা, আমি একা।

পোরবন্দর

পীযূষকুমার সিংহ-রায়

সৌরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল পোরবন্দরে যখন এসে পৌঁছুলাম রাত তখন ন'টা।

কুচো-কুচো পাথর-ছড়ানো নীচু প্ল্যাটফর্ম, তার ওপর টিম্‌টিম করে জলছে কাচ-লাগানো ঝোলানো বাতি। প্ল্যাটফর্মে এখনও বিদ্যুৎ দেওয়া হয়নি। আমাদের স্বাগত করল "ষ্টেশন বিল্‌ডিংয়ের" সুউচ্চ চূড়াটুকু। তার শুভ্রগম্ভীর স্থাপত্য ঘন-অন্ধকারে এক অলৌকিক প্রশান্তির সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

মালপত্তর নামাতেই দৌড়ে এল একদল "লাইসেন্সড কুলি"—হাতে পেতলের তকমা-আঁটা, পরনে ঘাগরা, মাথায় উড়নী। মোট বওয়ার মত এত সহজ কাজ পুরুষেরা এখানে করে না; তারা করে আরও শক্ত কাজ—উটের সাহায্যে লাঙল টানা, পাথর-কাটা ও আরো কত কি। আমার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুর সঙ্গে বেশ খানিকটা ঝগড়া লাগল দর নিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হল 'বে-আনায়' (দু' আনায়) তারা এক একটা মাল ষ্টেশনের বাইরে ধরমশালায় পৌঁছে দেবে।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরুতেই ধরমশালা। কুচো-কুচো পাথর-ছড়ানো রাস্তাটুকু পার হয়েই ধরমশালায় পৌঁছে গেলাম। প্রৌঢ় ম্যানেজারের কাছে বন্ধুবর মুকুন্দলাল আমাদের ঘর-বাড়ী, নাম ইত্যাদির ফিরিস্তি দিল। মিটমিটে হ্যারিকেনটা দেখিয়ে ম্যানেজার বাবু আমাদের থাকবার জায়গাটিতে পৌঁছিয়ে দিলেন, দুটো পাশাপাশি বহু পুরোনো ঘর—সামনে একটা দালান, পিছনে কুয়া ও পায়খানা। চারি দিকে নিশুতি অন্ধকার—টিমটিমে একটা লম্ফ আমাদের আলো দেখাল যতক্ষণ তার সাধ্য। রাত দশটা বেজে গেছে তখন। গুজরাটি বন্ধুর কাছে জায়গা নতুন, আমার কাছে নতুনতর। খিদের পেট জলে যায়; কিন্তু এমন জায়গায় অত রাতে খাওয়ার চিন্তা করাও যেন হাস্যকর। তিন দিনের পুরোনো পুরী রয়েছে বন্ধুদের সঙ্গে, আর তার সঙ্গে আম-লঙ্কার আচার। দেশে থাকলে যাকে আমরা গরুর খাবার ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না, আজ সেই খাবারই যেন অমৃত মনে হল! দু'-একটা খেতেই অমৃতের স্বাদ ছুটে গেল—মুখ ধুয়েই শুয়ে পড়লাম বারান্দায়-বিছানো বিছানায়।

ঘরের মধ্যে ভয়ঙ্কর গরম—বারান্দায় কিন্তু আরব সাগরের স্নিগ্ধ হাওয়া। রাত কেমন করে কেটেছে কিছুই টের পেলুম না। ঘুম ভাঙল মুকুন্দের ডাকে। আকাশ সবে একটু ফর্সা হয়েছে। বন্ধুর ঘড়িতে বাজে প্রায় সাতটা। ভারত সরকারের কৃপায় সৌরাষ্ট্রে আর বাংলাদেশে সময় একই; কিন্তু সূর্য্যের উদয়াস্ত হয় প্রায় দু'ঘণ্টার তফাতে। মুখ ধুয়ে তাড়াতাড়ি সকলে স্নান করে ফেললাম। এখুনি যেতে হবে "আর্য্যকন্যা গুরুকুল"—বন্ধুর দুই বোন রুক্মিণী ও শকুন্তলা ভর্ত্তি হবে সেখানে। নরম দেশ, বাংলা ছেড়ে পাথরের দেশে এসে আনন্দ তাদের চারগুণ বেড়ে গেছে। হাবভাবে মনে হয়, বাংলা তারা ভুলেই গেছে। আমার সঙ্গেও কথাবার্তা কইছে গুজরাটিতে আর আমার গুজরাটি বলায় অনিপুণ গ্রাম্য বেশে ঠাট্টা করতে আরম্ভ করে দিয়েছে পদে পদে।

টাঙ্গায় ওঠার আগে পথে এক দোকান থেকে কিছু পুরী ও শুকনো 'শাক' (তরকারী) গলাধঃকরণ করলাম। সৌরাষ্ট্রে দুধ পর্য্যাপ্ত—গরুগুলো বিরাট বড়। আমাদের দেশের গরুগুলোকে ঠাট্টা করে মুকুন্দের ছোট বোন শকুন্তলা বলেছিল—"তোমাদের গরুগুলো আমাদের 'বথরী'র (ছাগল) মত।" সৌরাষ্ট্রে গেলে একথা আপনিও হয়ত বলবেন। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, এখানকার লোকেরা দুধের চেয়েও চা বেশী ভালবাসে। এক কাপ চায়ের দাম দু'আনা—এক কাপ দুধের দামও তাই। কিন্তু সারি দিয়ে বসে বসে লোকেরা এখানে ভাঙা কাপের চায়েই চুমুক দেয়; দুধের দিকে একটুকুও আকর্ষণ নেই তাদের।

পোরবন্দরের প্রধান রাস্তাগুলো কংক্রীটের—বাড়ীগুলো সবই পাথরের। নরম মাটি পাওয়া যায় না সৌরাষ্ট্রের কোন জায়গায়। তাই পাথরের ওপর কুঁদে কুঁদে অদ্ভুত স্থাপত্য নির্ম্মাণে অভ্যস্ত হয়ে গেছে এখানকার "করীগার"রা (মিস্ত্রী)। কংক্রীট, পাথর ও বালিমাটির রাস্তা পার হয়ে টাঙ্গা চলে এল একটা ব্রিজের কাছে। বৃটিশ সরকারের সাহায্যে গণ্ডালের রাজা তৈরী করে দিয়েছিলেন এই সেতুটি প্রায় ষাট বছর আগে। বাঁ দিকে একটু দূরেই সাগরের সঙ্গে নদীর মোহানায় আকাশ মিশে গেছে—তার কাছে তীরের ওপর অনেকগুলো চিম্‌নি দেখা যায়—সেটা হচ্ছে পোরবন্দরের সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী। ডান দিকেই দেখা গেল তিনটে বিরাট চূড়া আর পাশাপাশি অনেকগুলো হলদে পাথরের বাড়ী—নদীর ধারে এক বিরাট আশ্রম বলেই মনে হয় সেটা। টাঙ্গাওলা জানিয়ে দিল—"আবাছু গুরুকুলছে"—ঐ আগেই গুরুকুল।

রুক্মিণী ও শকুন্তলা এখন থেকেই আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বাংলা দেশে এত দিন মানুষ হয়েছে তারা—বাংলা স্কুলেই পড়েছে "ক্লাস ফোর" অবধি। কিন্তু দেশের ভাষা, দেশের সংস্কৃতি এটাও শেখা চাই। আর তার জন্যে সারা ভারতে সব চেয়ে সেরা গুজরাটি বালিকা বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে পোরবন্দরের এই আর্য্য-কন্যা গুরুকুল। ওদের বাবা শুধু পাঠাবার কথাটুকুই তুলেছিলেন—কারণ নিজেদের দেশ হলেও অত দূর পাঠাবার ইচ্ছে হয়ত তাঁর খুব বেশী ছিল না। কিন্তু কথা তোলায় প্রথম দিন থেকেই ওরা লাফিয়ে উঠেছে পোরবন্দরে যাবার জন্যে। ভয়ের জন্যে মন কেমন করে থাকে, তাদের রক্ত সেই ওদের ধমনীতে। দেশ ওদের নির্ম্মম, মাটি ওদের পাথর—তাই অন্নের অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছে ওদের পূর্ব্বপুরুষ বাংলায়, বিহারে, উড়িষ্যায়, আসামে, মালয়ে যেখানিকে।

টাঙ্গা এসে থেমে গেল গুরুকুলের দরজায়। অটুট গাম্ভীর্য্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাথরের এক সুউচ্চ গম্বুজ, আর তার দু'পাশে ছোট ছোট আরো দুটো চূড়া। প্রশান্ত পরিবেশে তারা নীরব আমন্ত্রণ জানাচ্ছে দেশী-বিদেশী সমস্ত আগন্তুককে।

ফটকের সামনেই হিন্দী ও গুজরাটিতে লেখা "আর্য্যকন্যা গুরুকুল—স্থাপিত ১৯৩৭।" ফটকের গায়ে লেখা আছে প্রতিষ্ঠাতার নাম—নানজী ভাই কালিদাস। মস্ত বড় ব্যবসায়ী ইনি, আফ্রিকার ও সৌরাষ্ট্রে অনেকগুলো চিনির কল ও সিমেণ্ট ফ্যাক্টরী ছাড়া জাহাজ কোম্পানীতেও এঁর অংশ আছে। গুরুকুল নির্ম্মাণের জন্যে ইনি সাতচল্লিশ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। তা ছাড়া প্রতি বছর এটি চালাবার

জন্যে তিনি অনেক টাকা দিয়ে থাকেন। গেটের পাশেই গুরুকুলের অফিস। পরিচয় বিনিময় হল অফিসের কর্মচারীদের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই কর্মাধ্যক্ষ এলেন। নাম-ধাম জানার পর আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন আমাকে দেখে। জিজ্ঞেস করলেন—'অন্যের দেশের লোক আপনারা। এ অচেনা দেশ কেমন লাগছে?' বাংলা দেশ ছেড়ে কেউ যে ওদিকে যায় এ কথা যেন তারা ভাবতেই পারেন না। আগমনের হেতু শুনে বললেন,—'সঙ্গে মেয়ে দেখে আগেই বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কলকাতাতেও ত গুজরাটি স্কুল আছে। অমন জায়গা ছেড়ে এত দূর আসার কি দরকার ছিল?' দরকার সত্যি কিছু ছিল না। অনেক গোঁজামিল দিয়ে বোঝালেন আমার বন্ধুবর, এমন জায়গায় লেখাপড়া করার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে বটে। আমরা যখন গেছি তার দু'মাস আগে নতুন 'সেশন' সুরু হয়ে গেছে। ট্রেণ ছাড়ার পূর্ব্বমুহূর্ত্তে গুরুকুলের টেলিগ্রামও পেয়েছিলাম,—"ডোন্ট সেন্ড গার্লস্"। তা সত্ত্বেও আমরা বেরিয়ে এসেছি। আমি এসেছি ভবঘুরের নেশায় আর ওরা এসেছে নিজেদের দেশ দেখবার নেশায়। প্রৌঢ় কর্মাধ্যক্ষ প্যাটেল সাহেবকে সবই বোঝানো হল—টেলিগ্রাম আমরা পাইনি, হয়ত আমরা বেরিয়ে আসার পর বাড়ীতে পৌঁছেছে। খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী আর একটা গান্ধীটুপি তাঁর পরনে। আমাদের এ অদ্ভুত আগমন ও বিচিত্র মিশ্রণ দেখে তিনি ক্রমশঃই আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছিলেন।

মাত্র দুটি সীট এখনও খালি আছে গুরুকুলে—আফ্রিকা থেকে দুটি গুজরাটি বালিকা আসছে, তাতে ভর্ত্তি হবার জন্যে। উপমন্ত্রী চতুর্ভাই প্যাটেল অনেক যুক্তি দিয়ে বোঝালেন—ক্লাসে ত জায়গা আছে, কিন্তু হষ্টেলে জায়গা নেই।

রুক্মিণী আর শকুন্তলা অধীর আগ্রহে কথাগুলো শুনছে। হয়ত তাদের ভর্ত্তি হওয়া আর হল না। আমাকে বলল—"জলপিপাসা পেয়েছে।" অফিসঘরের সংলগ্ন একটা ঘরে জলের কুঁজো রয়েছে। তাকে কুঁজো না বলে হাঁড়ি বলাই ভাল। তার অত বড় মুখটা দিয়ে একটা লম্বা পেতলের হাতা ঢোকালাম। হাতার মুখে একটা গেলাস আঁটা রয়েছে। অদ্ভুত মিষ্টি জল। ছোট্ট মেয়ে দুটো জল খেয়ে ঠাণ্ডা হল। শকুন্তলা বলল—'আমাদের বাড়ীতেও ঐ রকম জল তোলার গেলাস আছে, তুমি দেখোনি।' যেন ও জিনিষটা দেখা খুবই স্বাভাবিক। বললাম,—'তাই নাকি! কই তুমি ত আমায় ঐ রকম কুঁজো থেকে একদিনও জল খাওয়াওনি?' বাংলার বাইরে বাংলা ভাষা যেন আরো মিষ্টি হয়ে গেছে। শকুন্তলা বলল—'এইবার ত আমরা বাংলা ভুলে যাব।' গুজরাটির মেয়ে গুজরাটি শিখবে, বাংলা ভুলে যাবে, এতে আর আছে কি! কিন্তু একথা শুনে আমার সত্যি দুঃখ হয়েছিল। এমনই দেশ আমাদের দেশের লোককেও আপন করে ধরে রাখা যায় না।

প্যাটেল সাহেব এবার শকুন্তলা ও রুক্মিণীকে ডাকলেন।

'তমারু নাম শুঁ?'—তোমার নাম কি?

রুক্মিণী বড়। সে উত্তর দিল—'রুক্মিণী।'

(গুজরাটি ভাষায় 'ণ'-এর উচ্চারণ অনেকটা বাংলা 'ড়'-এর মত হয়।)

শকুন্তলা ছোট। সে খিল খিল করে হেসে ফেলল। উত্তর দিতে পারল না।

'তমনে গুজরাটি আওড়েছে?'—তুমি গুজরাটি বলতে পার?—দু'জনেই ঘাড় নাড়ল।

প্যাটেল সাহেব বললেন, 'এখন আপনারা যান। আমাদের অতিথিভবন পাশেই রয়েছে—ওখানেই থাকুন। আবার বিকেলে এসে মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন।'

ধরমশালা থেকে মালপত্তর আনার জন্যে লোক চলে গেল। আমরা অতিথি-ভবনে এলাম। গোটা রাস্তার ওপর পাথরের কুচি আর বালি ছড়ানো। লম্বা অতিথি-ভবনের ছাদ 'ম্যাঙ্গালোর টাইল' দিয়ে ছাওয়া, তার মধ্যে পার্টিশান দিয়ে এক একটা ফ্লাট করা হয়েছে বিদেশী অতিথিদের থাকবার জন্যে। দুটো ঘর, সামনে ছোট্ট একটু খোলা বারান্দা, পিছনে বাথরুম ও একটা রোয়াক এই নিয়ে এক একটা স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট। মৌসুমের সবে সুরু তখন সৌরাষ্ট্রে—সারাদিন হাওয়া বয়ে আসে আরব সাগরের ওপর দিয়ে।

কর্মাধ্যক্ষ জিজ্ঞেস করে পাঠালেন—'গুরুকুলের ভেতরে যাবেন কি না।'

'নিশ্চয়ই।' সঙ্গে এক কর্মচারী দিয়ে তিনি আমাদের গুরুকুলের ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন। সদর রাস্তার ওপর প্রধান ফটক দিয়ে গুরুকুলে প্রবেশ করলাম। বিশেষ আমন্ত্রিত অতিথি ছাড়া এখানে পুরুষের প্রবেশ নিষেধ। মাঝখানে মস্ত বড় এক মাঠ। তার ধারে ধারে ব্যায়াম করার নানা রকমের খুঁটি। আর সেই মাঠটাকে ঘিরে চার দিকে গুরুকুলের দোতালা বাড়ী। বিরাট হলঘরে শিক্ষার্থিনীদের স্তোত্র পাঠ করানো হচ্ছে। চার দিকে বসে আছে শুভ্রবসনা বালিকা আর মাঝখানে একটা গোল জায়গায় এক সংস্কৃত পণ্ডিত। তিনি এক লাইন পাঠ করছেন আর বালিকারা তা অনুসরণ করছে। হলঘরের প্রবেশপথে নবাগত আগন্তুকদের দেখে তাদের মধ্যে একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। স্তোত্রপাঠের মধ্যেই তারা একবার আমাদের দিকে চেয়ে দেখল।

প্রার্থনাঘর থেকে বেরিয়ে একতলার ক্লাসরুমে ঢুকলাম, ক্লাসরুম সর্ব্বত্রই সমান—সেখানে অভিনব কিছুই নেই, তার পাশেই 'হষ্টেল'—এক একটা ঘরে চারটে থেকে আটটা করে খাটিয়া, গুরুকুলের বেশভূষা সবই শুভ্র। কর্মচারীদের পোষাক সাদা—মাথায় গান্ধী টুপি। শিক্ষার্থিনীদের পরনে সাদা হাফপ্যান্ট ও সার্ট। বিছানাপত্র সমস্তই সাদা, গুরুকুলের মধ্যেই নিজস্ব দর্জ্জি ও ধোবা আছে। অতিথি-ভবনের পাশেই তাদের আস্তানা।

দোতালায় পাঠাগার, মিউজিয়াম, ল্যাবরেটারী ইত্যাদি। পাঠাগারে ইংরিজি ও গুজরাটি বই রয়েছে প্রচুর। লম্বা এক টেবিলের ওপর দেশের প্রসিদ্ধ গুজরাটি পত্রিকাগুলো ছড়ানো রয়েছে। পাঠাগারের পাশেই মিউজিয়াম। সেখানে দেশের বড় বড় মহাপুরুষের ছবি টাঙানো। রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, নেতাজী, বিবেকানন্দ, সর্দার প্যাটেল ও শ্রীঅরবিন্দ—এই ক'খানা ছবি বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। মিউজিয়ামের মধ্যে একটা নরকঙ্কাল রয়েছে শিক্ষার্থিনীদের শরীর-তত্ত্ব শিক্ষা দেবার জন্যে। এ ছাড়া বহু প্রাণীর ছবি, মডেল ও অস্থি সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। আর সামনের দেওয়ালে ভারতবর্ষের একটা প্রকাণ্ড মানচিত্র। সেখানে বিভিন্ন প্রদেশের মানবগোষ্ঠীর ছবি রয়েছে। বাঙালী, গুজরাটি, মারাঠী, ওড়িয়া, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, তামিল, তেলেগু ইত্যাদি প্রধান প্রধান

সমস্ত ভারতবাসীদেরই ছবি দেখানো হয়েছে মানচিত্রের যথোপযুক্ত জায়গায়। এটার প্রয়োজন হয় নৃতত্ত্ব শেখাবার সময়। এ ছাড়া সেলায়ের কল আছে অনেকগুলো, সেলাই শেখানোর জন্যে। পাশের ঘরটি 'সঙ্গীত-ভবন'। সেখানে সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়া হয়। সেতার, তবলা, তানপুরা, হারমোনিয়াম ইত্যাদি ছাড়া একটা রেডিয়োও আছে সেখানে, অবসর সময়ে গান শোনানোর জন্যে।

গৃহিণীর নিত্যপ্রয়োজনীয় সমস্ত কাজই এখানে শেখানো হয়। তাছাড়া ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক, ব্যবহারিক বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, জীবতত্ত্ব ও ভাষা—এসব ত আছেই। চারটি ভাষা শেখে এরা—গুজরাটি, সংস্কৃত, হিন্দী ও ইংরেজি। প্রথম দুটি শেখানো হয় সমস্ত ক্লাসে—পরের দুটি কেবল উঁচু ক্লাসে।

গুরুকুল একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়। এখানকার শিক্ষার্থিনীরা প্রবেশিকা, স্নাতিকা—ইত্যাদি মানপত্র পেয়ে থাকে। সৌরাষ্ট্র ও বোম্বায়ের সর্বত্র এ মানপত্র স্বীকার করা হয়।

দয়ানন্দ সরস্বতীর 'আর্য্য সমাজ' আন্দোলনেরই একটি অংশ এই গুরুকুল আন্দোলন। এ পর্য্যন্ত গুজরাটে চারটি প্রসিদ্ধ গুরুকুল স্থাপিত হয়েছে—ছেলেদের জন্যে সুপায় ও চৌখিতে এবং মেয়েদের জন্যে বরোদায় ও পোরবন্দরে।

গুরুকুল দেখে যখন ফিরে এলাম তখন এগারোটা বেজে গেছে। একটু পরেই খাবারের ঘণ্টা পড়ল।

ভোজনশালায় এক পরিচারিকা এসে আমাদের খাবারের আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। বলা বাহুল্য, এখানকার অতিথি-ভবনে থাকার বা খাবার—কোন কিছুর জন্যেই একটা পয়সাও লাগে না। ছাত্রীদের গুরুজনেরা এখানে তিন দিন অবধি থাকতে পারেন।

অতিথি-ভবনের সামনের দরজা দিয়ে আবার গুরুকুলে ঢুকলাম। ছাত্রীদের জন্যে মস্ত বড় একটা হলঘর। আর অতিথি ও শিক্ষকদের জন্যে পাশেই একটা ছোট ঘর। ছাত্রীরা সমস্বরে এক গান গাইল—তারপর হৈ-চৈ করে খেতে বসে গেল। আমরা পাশের ঘরে ঢুকে পড়লাম। মাঝখানে লম্বা এক শ্বেত পাথরের টেবিল—তার ওপর সারি দিয়ে এক একটা করে বাটি—বাটির ওপর মস্ত বড় একটা থালা উপুড় করা। পরিবেশিকা এলেন মাথায় একটা বড় থালার ওপর ঘটি সাজিয়ে। তার পরনে খাঁটি সৌরাষ্ট্রের বেশ—ঘাগরা, 'কাপড়' আর উড়নী। তিনি এক একটা ঘটি আমাদের এক একজনের থালার পাশে বসিয়ে দিলেন। তার ওপর দু-হাতা খিচুড়ি, ছোট বাটি করে এক এক বাটি গাওয়া ঘি, মুগ ও কড়াই-সিদ্ধ আর কতকগুলো 'ভাজি'—শাক, উচ্ছে, পটল ইত্যাদি ভাজা। এবার এল গমের রুটি ও বজরার "রোটলী"। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আম-লঙ্কার আচার। গাওয়া ঘি দিয়ে মাখিয়ে এরা আম-লঙ্কার আচার দিয়ে রুটি খায়। আমরাও খেলাম। কিন্তু 'রোটলী' মোটেই খাওয়া গেল না। ওরা বলে বজরার রুটি মিষ্টি। কিন্তু আমার গুজরাটি বন্ধুরাও রোটলী খেতে পারল না। পরে শুনেছিলাম 'রোটলী' গরীব লোকের খাবার এবং অধিকাংশ গুজরাটির মুখেই এ রুটি তেতো লাগে। সব শেষে এল এক গ্লাস করে 'ছাস', অনেকটা আমাদের দেশের ঘোলের মত, তবে ভয়ঙ্কর টক। সমস্ত লোকেই এখানে দিনে বহুবার করে 'ছাস' খায়। গরীব লোকেরা যেটুকু দুধ পায় তা' থেকে সার পদার্থ বের করে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে জল মিশিয়ে দেয়। এ থেকেই যে 'ছাস' তৈরী করা হয় তা তারা সারাদিন পান করে থাকে। আমার গুজরাটি বন্ধু বলেছিল, উত্তর গুজরাটের উগ্র গরমে 'ছাস' শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। বাঙালীদের জাতীয় খাদ্য যেমন ভাত, মাছ, ডাল, গুজরাটিদের তেমনি ঘি, রুটি, খিঁচুড়ি, ছাস। মাছ, মাংস, ডিম এদের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। তবে 'ডুংরি' বা পেঁয়াজ খেতে এদের কোন আপত্তি নেই।

পরের দিন গুরুকুলের 'বিশেষ আহার'। সুতরাং উন্নত ধরণের ভোজনের আয়োজন সেদিন, শাক, বা তরকারী এরা তেমন পছন্দ করে না। তাই তরকারী সেই একরকমই 'ভিন্ডা (ঢ্যাঁড়শ)' 'রিংড়া' (বেগুন) ও 'ডুংরি' (পেঁয়াজ) দিয়ে অদ্ভুত এক সমাহার। এদেশে শুকনো খাবার সহজপ্রাপ্য। তাই শুকনো ভাজি শুকনো ফল শুকনো মিঠাই পাতে পড়ল প্রচুর পরিমাণে। ফল বলতে 'খারকু' (খেজুর), 'পাড়েলা' (কুল) ইত্যাদি। একমাত্র রসালো ফল পাওয়া যায় আম—যেটা বোম্বাই অঞ্চল থেকে রপ্তানী হয়ে এখানে আসে। খাবারের শেষের দিকে এক গ্লাস আমের সরবৎ ও শুকনো 'মণ্ডা' এল। আমাদের রসগোল্লার স্বাদ মেটায় তারা এই মিষ্টি দিয়ে। অফিসের এক কর্মচারী আমাদের খাবারের তদারক করছিলেন। আমার পাতে আরো গোটাদুই মিঠাই দিয়ে বললেন, 'শেঠ্‌জী, আপ বাঙালকে আদ্‌মি। এক মিঠাইমে আপ্‌কো ক্যেয়া হোগা ?' বলা বাহুল্য, বাংলায় 'বাবু'ও যা, গুজরাটে 'শেঠ্‌জী'ও তাই !

এ অঞ্চলে একটা প্রবাদ আছে, বাঙালীর তিনটি বৈশিষ্ট্য—ঘরের আটচালা, মাথার চুল আর গলার গান। অবশ্য গানের ক্ষেত্রে গোটা উত্তর-ভারতেই বাঙালীর একটা সুনাম আছে; আমাদের আটচালা সম্বন্ধেও ঘরে বাইরে অনেক সুখ্যাতি শুনেছি। কিন্তু বাঙালীর চুলেরও যে বাহার আছে, সেটা আজ এখানে এসে নতুন করে জানলাম।

কুচো পাথর আর বালি মিশিয়ে এখানকার মাটি। ভূমিতলে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়। তাই প্রকৃতির সঙ্গে কঠিন যুদ্ধ করে এদের বাঁচতে হয়, দু'মুঠো বাজুরা (বজ্‌রা) আর গেঁও চাষ করতে করতে বলদও হার মেনে যায়। তখন আসে উট। মরুভূমির জাহাজও যে, আর জীবনতরীর জাহাজও সে! এদেশে উট বোধ হয় গরুর চেয়েও উপকারী জন্তু!

সাধারণ লোকেরা অদ্ভুত কষ্টসহিষ্ণু, সরল ও শান্ত। পরদেশীর প্রতি হিংসা নেই, তবে কৌতূহল আছে। গান্ধীজির প্রতি আমাদের যেমন ভক্তি, তাদেরও তেমনি। তার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত লোকের মনে আরেকটি মহাপুরুষের স্থান—নেতাজী। এ দুই মহাপুরুষের আদর্শের ভিন্নতা নিয়ে আমরা শহরে কতই কোলাহল করি! কিন্তু এদের কাছে দুজনেই সমান! দুজনেই নমস্য! গুরুকুলের রথযাত্র্যাম্পের মধ্যে একটি নেতাজীর মূর্তির ষ্ট্যাম্প চোখে পড়েছিল। আমাদের বাংলাদেশেরও কোন বিদ্যালয় নেতাজীকে হয়ত এতখানি সম্মান দেয় নি!

এমন অদ্ভুত জায়গাতেই যে আজ থেকে প্রায় পঁচাশী বছর আগে মহাত্মা গান্ধীর জন্ম হয়েছিল, এ ... ভাবলে আজও সর্বাঙ্গে শিহরণ জাগে! গান্ধীজির পৈতৃ... তখন একবারে

বাজারের মধ্যে। চারিদিকে ক্রেতা-বিক্রেতার চিৎকার. আর তার মাঝখানে একান্ত অপাঙক্তেয়ের মত নীরবে বিরাজ করছে বিশ্ববরেণ্য মহাপুরুষের জন্মস্থান। গান্ধীজির নিজস্ব বাড়ীকে ঘিরে আছে এখন কীর্ত্তি-মন্দির। পোরবন্দরের ধনী শেঠ নানজীভাই প্রচুর অর্থব্যয়ে শ্বেতপাথরের এই সুন্দর মন্দিরটি তৈরী করে দিয়েছেন। কীর্ত্তিমন্দিরের উন্নত দরজা দিয়ে বিরাট চত্বরে প্রবেশ করলেই সামনের বারান্দায় চোখে পড়ে মোহনদাস ও কস্তুরবার বিরাট তৈলচিত্র দুটি সুন্দর ফ্রেমে পাশাপাশি আঁটা। তার দু'পাশে দুটি বিরাট স্তম্ভ। তার ওপর গান্ধীজির জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলো হিন্দী ও গুজরাটিতে লেখা। বিরাট চত্বরটির চার দিকে আরও কতকগুলি স্তম্ভ। প্রত্যেকটি স্তম্ভের গায়ে গান্ধীজির সত্য ও অহিংসার বাণী একে একে উৎকীর্ণ করা আছে। চত্বর পার হলেই পাওয়া যায় এক সুপ্রশস্ত বারান্দা; সেটি চত্বরকে চারি দিকে ঘিরে আছে। সেই বারান্দা পার হয়েই আসল মন্দিরের বাঁদিকে গান্ধীজির পৈতৃক বাসভূমি। এক তলার মেঝে নবনির্ম্মিত মন্দিরের সঙ্গে এক করে দেওয়া হয়েছে। সেই একতলায় এখন গান্ধী-পাঠাগার। তাতে গান্ধীজির লিখিত ও গান্ধীজির সম্বন্ধে লিখিত সকল ভাষার পুস্তক রয়েছে। এই রকম পাশাপাশি কয়েকটি ছোট ছোট অন্ধকার ঘর। তারই একটি থেকে একটি মই লাগানো রয়েছে দোতালায় উঠবার জন্যে। খুব সাবধানে মই দিয়ে ওপরে উঠলাম। ছোট এক ফালি বারান্দার পরেই পাশাপাশি কতকগুলো ছোট ছোট ঘর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা—সবেতেই ঘরগুলো অত্যন্ত ছোট। এদের মধ্যে একটি চরকা ও খানিকটা কাটা সুতো ছাড়া গান্ধীজির আর কোন চিহ্নই পাওয়া যায় না। ঘরের দেওয়ালে খুপরির মত ছোট ছোট জানলা ও দরজা,—সে দরজা দিয়ে উন্নত মস্তকে প্রবেশ করা যায় না;—দরজা জানলায় খিলানে বাইরে ও ভিতরে বিচিত্র কারুকার্য্য। গান্ধীজির পৈতৃক বাড়ী প্রাচীন সৌরাষ্ট্রের খাঁটি 'বেনিয়া'র বাড়ী—বর্ত্তমান কচ্ছদেশেও এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত মেলে।

এই কীর্ত্তিমন্দিরটুকু বাদ দিলে পোরবন্দরে গান্ধীজি সম্বন্ধে আর কিছুই পাওয়া যায় না। স্থানীয় লোকেরা গান্ধীজি সম্বন্ধে আমাদের তুলনায় এমন কিছু বেশী আগ্রহশীলও নয়। এখানে কোন গান্ধী-আশ্রমও নেই।

স্থানীয় লোকেরা অধিকাংশই কৃষ্ণভক্ত। জিজ্ঞেস করলে বলে—বৈষ্ণব। দ্বারকা সমুদ্রপথে পোরবন্দর থেকে পঞ্চাশ মাইল। আমরা যখন এখানে আসি, সমুদ্র তখন ভয়ঙ্কর রুক্ষ। মাথার ওপর শুকনো রোদ আর কংক্রীটের রাস্তার ধারে সমুদ্রের তীর, তার ওপর সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ সূর্য্যের কিরণে ঝলসে ওঠে। অনেক দূরে একটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে—সেটা নাকি আফ্রিকা যাবে। সমুদ্রতীরে পাশাপাশি জায়গায় মুসলমানের কবরস্থান ও হিন্দুদের শ্মশান। গোটা ভারতে হিন্দু-মুসলমানে প্রচুর দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়ে গেছে, কিন্তু সৌরাষ্ট্রে কখনও হয়নি।

মুসলমানেরা অধিকাংশই খোজা সম্প্রদায়ের লোক আর হিন্দুদের মধ্যে আছে 'কডীয়া' (মিস্ত্রী), 'কন্‌বী' (ক্ষেতী), 'ভয়োয়ারো', 'রবারী' (মেষপালক), 'ঠক্‌রাই' (রাজপুত), 'বারোঠ' (বাউল)

ইত্যাদি। এদের পরিধান মোটামুটি তিন রকমের। এক রকমের কোট-প্যাণ্ট যেটা অত্যন্ত কম লোকে পরে। আর এক রকম পায়জামা ও সামিজ; আর সব চেয়ে দেশীয় যেটি, সেটি হচ্ছে ব্রীচেসের মত 'চোয়নো' একটা, যেটায় কোমরের কাছে অত্যন্ত জড়ানো, আর গায়ের ওপর ফতুয়ার মত একটা ফুলহাতা 'কিরিয়া'—তার বুক থেকে পেট অবধি ও নীচের হাত অবধি জামা ভয়ঙ্কর রকম কুচোনো, আর এর সঙ্গে মাথায় একটা পাগড়ী। সৌরাষ্ট্রের মাঠে ঘাটে 'পুছরু'র (লাঙল) পিছনে পিছনে এ দৃশ্য অতি সাধারণ। এরা সবাই গ্রামে থাকে—কাছাকাছি কোন শহরে আসে জিনিষপত্তর কেনবার জন্তে কিংবা পাথর কাটবার জন্তে যখন চাষের কোন কাজ থাকে না; আর সূর্য্য যখন আরব সাগরে চলে পড়ে, তখন তাদের ছোট্ট কুড়ুলের ডগায় কাপড়ের পুঁটলীতে বাঁধে শহরের সওদা আর এগিয়ে চলে দল বেঁধে, হয় খালি পায়ে নয় উটের পিঠে। কালো মাটির দেশ সৌরাষ্ট্র বাকী সব পাথর। দিনান্তে যদি কখনও ঝড় ওঠে 'ডুঙ্গরের' (পাহাড়ের) কোলে, তখন পথযাত্রীর প্রাণ শঙ্কাকুল হয়ে ওঠে—বালুর ঝড় এখানে বহু জীবন নিয়ে যায় প্রতি বছর।

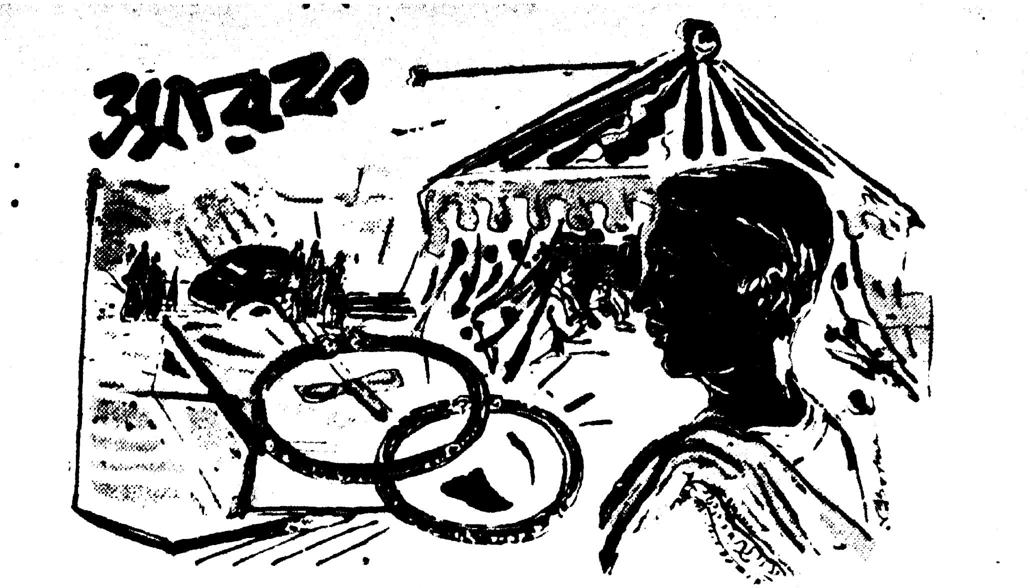
পোরবন্দরে ছিলাম চার দিন। তৃতীয় দিনে ডাক পড়ল 'মন্ত্রী'র কাছে। মন্ত্রী সবিতাবাহন-এর কাছে রুক্মিণী আর শকুন্তলাকে নিয়ে হাজির হলাম আমি আর মুকুল, প্রথমে সেই একই কথা—কলকাতা থেকে এখানে আসার দরকার কি!···ক্লাসে ত জায়গা আছে কিন্তু হষ্টেলে জায়গা নেই···ইত্যাদি। কিছুক্ষণ পরে তিনি একজন শিক্ষয়িত্রীকে ডাকলেন মেয়ে দুটিকে পরীক্ষা করার জন্তে। তারা পাশের ঘরে চলে গেল। বাংলা স্কুলের সার্টিফিকেট অনুযায়ী তাদের ক্লাস ফাইভে পড়ার কথা। কিন্তু তিনি এসে বলেন—'ওদের গুজরাটি জ্ঞান তেমন ভালো নয়, ছোটটি তৃতীয় ও বড়টি চতুর্থ শ্রেণীর উপযুক্ত।' আমরা রাজী হয়ে গেলাম। ওরা ভর্ত্তি হয়ে গেল।

পরের দিন ওদের ছেড়ে দিয়ে আমাদের চলে যেতে হবে। মনটা এখন থেকেই ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। বিকেলে সবাই মিলে নদীর ধারে বেড়াতে বেরুলাম। শক্ত শক্ত পাথুরে মাটি চার দিকে কেটে বেরিয়ে রয়েছে আর তার মাঝে মাঝে কাঁটা গাছ। একটু দূরেই রাস্তার ওপারে দুটো গাছের ওপর দুটো ময়ূর—তাদের কেকাধ্বনি নিতান্তই অশোভন শোনায় এ পরিবেশে। রুক্মিণী আর শকুন্তলাকে জিজ্ঞেস করলাম—'তোদের বাড়ীর জন্তে মন কেমন করবে না?' সটান উত্তর দিল, 'না।'

পরের দিন দুপুরে একটা স্যুটকেশে জিনিষপত্তর ভর্ত্তি করে ওদের গুরুকুলে পাঠিয়ে দিলাম। একটা পরিচারিকার সঙ্গে ওরা সানন্দে চলে গেল। যাবার সময় আমাদের দিকে একবার ফিরেও তাকাল না! দেশের মাটির সঙ্গে মানুষের মনের নাকি এক অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ থাকে। কিন্তু কৈ মন ত শুধু আমারই খারাপ হল না। মরুভূমির দেশের লোক মুকুন্দেরও চোখ দুটো ছল্ ছল্ করে উঠল। বললাম—'চল আর দাঁড়িয়ে কি হ'বে। টাঙা এসে গেছে'।

যতক্ষণ গুরুকুল দেখা যায় ততক্ষণ চেয়ে রইলুম সেই দিকে। আস্তে আস্তে সব মিলিয়ে গেল আকাশের কোলে। ষ্টেশন এসে গেল। ঢোলা-পোরবন্দর প্যাসেঞ্জার এখনি ছাড়বে। চেপে পড়লাম তাতেই। জেতলসর ও রাজকোটে গাড়ী পালটিয়ে ওয়াকনীর পৌঁছুলাম সকালে। সেখান থেকে আর, এম, সি, ট্রলী করে মোর্ভি পৌঁছুলাম দুপুরে। ট্রলীতে মাত্র দুটো কামরা আর তার সামনের কামরায় মোটর বসানো আছে গাড়ী চালানোর জন্তে। প্যাসেঞ্জারের ভিড় অত্যন্ত এবং ট্রলিতে ভাড়া দিতেও হয় বেশী। তবু ট্রলীর বদলে একখানা পুরো গাড়ী দিলে রেল কোম্পানীর নাকি ক্ষতি হয়—তাই এই ব্যবস্থা। বিরমগাম থেকে টানাগাড়ী এল আমাদের নৌলখী নিয়ে যাবার জন্তে। হাওয়া এবার সাংঘাতিক গরম; বাইরের লু এসে গায়ের চামড়া পুড়িয়ে দিয়ে যায়। দু'ধারে লবণের সমুদ্র আর তার পাশে পাশে ফাটা ফাটা শক্ত পাথর। এত অনুর্ব্বর রুক্ষতা বোধ হয় আর কখনও চোখে পড়েনি! আস্তে আস্তে উত্তাল সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার চোখে এল, ভূভাগের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল, নৌলখী ষ্টেশন। লাইনটুকু পার হয়েই ষ্টীমারে উঠে পড়লাম—প্রায় চল্লিশ মাইল পাড়ি দিয়ে এ আমাদের নিয়ে যাবে কচ্ছদেশে, নৌলখীর ওপারেই কাণ্ডলা পোর্টে। ভারত সরকার এখানে প্রচুর অর্থব্যয়ে এক অতি-আধুনিক বন্দর তৈরী করছেন করাচীর স্থান পূর্ণ করার জন্তে।

আসল সমুদ্র বাঁদিকে রেখে ছোট ছোট খাড়ির মধ্যে দিয়ে ষ্টীমার চলতে লাগল হেলে দুলে। ডেকের ওপর কাঠ-দিয়ে-ঘেরা ছোট একটি কেবিনে বসে আছেন ফার্ষ্ট ক্লাস যাত্রী মগনভাই ভুজের মস্ত বড় ব্যবসায়ী। বোম্বে ক্যানসার হাসপাতাল থেকে ক্যানসার দেখিয়ে তিনি দেশে ফিরছেন, আর এরই নীচে কচ্ছের বিচিত্র মানবকুল! মন্থর ষ্টীমার পাড়ের পা দিয়েই যাচ্ছে! ওপারে কাঁটা আর জ্বালানী কাঠের বনে দু'একটা দেশী ডিঙ্গি লেগে আছে। সেদিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কচ্ছের কোন কুলবধূ। তার পাশে আলখাল্লা পরা একটি লোক খুব চীৎকার করে গান গেয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের 'ভাওয়াইয়া' গাইয়ের মত। আর নীচে ষ্টীমারের রেলিং বেয়ে বেয়ে চা বিক্রী করছে ষ্টীমারেরই খালাসী এক এক কাপ তিন আনা। মুকুল দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়ল। ডেকের রেলিংয়ে হেলান দিয়ে আমিও ভাবতে লাগলাম দেশের কথা, গুরুকুলের কথা, রুক্মিণীর কথা, শকুন্তলার কথা; ওরা এখন কি করছে ভগবানই জানেন।



শ্রীরাসবিহারী মণ্ডল

সুবোধের বিয়ের বৌভাত।

আজ-কাল আর বৌভাত বলে না। প্রীতিভোজন কথাটাই চলতি হয়েছে। যুগের হাওয়ায় সবই বদলাচ্ছে।

ফুলশয্যা এবং প্রীতিভোজন একসঙ্গে।

সুবোধের আত্মীয়-কুটুম্ব অনেক। বন্ধুবান্ধবও অনেক। বনেদী ঘরের ছেলে। এক সময় বোল-বোলাও ছিল।

কন্যাপক্ষেরও অনেক লোকজন এসেছে। ভিড় হয়েছে। বাড়ি উজিয়ে উপচে পড়ছে লোকের ঢেউ। হৈ-হুল্লোড়। হাসি-গান। সানাই লাউড-স্পিকার। কোলাহল কলরব। রিক্সা-ট্যাক্সি। যেন তাণ্ডব চলেছে! রকমারি রান্নার গন্ধে পাড়া মেতে উঠেছে। বাঙালীর বিয়ে নয়তো যেন সমুদ্র-মন্থন।

উপরে একখানা সাজানো হলঘরে ক'নে বসেছে উঁচু আসনে। লতা-পাতা ফুলে-সাজানো মখমলের সিংহাসনে। সাজানো মাটির মূর্তির মতো। আগেকার দিনে দেবী প্রতিমার মতো রূপসজ্জা দিয়ে ক'নে সাজাতো। এখন অবিকল ফিল্‌ম্ তারকার বেশবাসই চলতি হয়েছে।

নির্জীব নিস্পন্দ কাঠের পুতুলের মত বউটি ব'সে আছে রুদ্ধশ্বাসে। নিমন্ত্রিতেরা আসছে কনে দেখতে। দর্শনী হাতে নিয়ে। সওগাৎ। উপহার। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন উপহার। কত রকমের।

আত্মীয়-স্বজনরা এনেছে ছোটখাটো সোনার গয়না। কানের দুল। পাশা। আংটি। খোঁপার ফুল। এরা বেশীর ভাগ আশীর্বাদক। গুরুজনস্থানীয়।

বন্ধুর দল এনেছে রসসাহিত্য। ফুল। কেউ এনেছে একখানা শাড়ি। কেউ এনেছে চায়ের সেট্। ফুলদানি। ভ্যানিটি ব্যাগ। সিঁদুর কৌটো। হরেক রকমের জিনিষ। রসের সম্বন্ধ যাদের তারা রসিকতা করে দিয়েছে বেবীর চুষিকাঠি। দোলনা। ঝুমঝুমি।

হাসির তরঙ্গ ওঠে। হাসবার কি আছে? বিয়ে হলেই পুত্র-কন্যা। আশায় মানুষ বেঁচে থাকে। বিশ্বাস হারাতে কেউ চায় না।

নববধূর পেন্ট-করা রঙের উপর আর এক পোঁচ রঙ লাগে। মাথা হেঁট করে বেচারা। তবু হাত বাড়িয়ে, হাত পেতে তাকে নিতে হয়। চোখ তুলে তাকাতে পারে না। তবু হাত দু'টি কপালে ঠেকিয়ে নমস্কার করতে হয়। ক'নে বউ-এর নাম বীরা।

ধীর, নম্রস্বভাব মেয়েটির। লজ্জা বাঁচিয়ে করণীয় যা ক'রে যায়। সবিনয়ে, সসম্ভ্রমে উপহারগুলো হাত পেতে নিয়ে এক পাশে নামিয়ে রাখে।

রাশীকৃত উপহার! ঢেউ-এর মত আসছে। প্রচুর এসেছে। আরো আসছে। একটি বাক্স হাতে নিয়ে একটি ছোকরা ঘরের দোরে দাঁড়িয়ে আছে। খুঁজছে বরকে। সুবোধ বাবুকে। বললে, কাশী থেকে আসছে। সুবোধ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চায়।

সুবোধের ডাক পড়ে। ছোকরা সুবোধের অপরিচিত। সুবোধের হাতে একখানা চিঠি আর বাক্সটা দিয়ে-বলে, আপনি নিজের হাতে বউমণিকে পরিয়ে দিন। ওতে সব লেখা আছে।

সুবোধ একাগ্রমনে চিঠিখানা পড়ে। বাক্স খুলতেই ভেতর হ'তে বেরুল একটা ভেলভেটের কেস। কেসের ভেতর একজোড়া জড়োয়া মকর-মুখ বালা। বালার নিচে ছোট্ট একখানি স্লিপ। স্লিপে লেখা:

বাবা সুবোধ, বউমাকে নিজের হাতে পরিয়ে দিও। আমার অন্তরের আশীর্বাদ।
—'কাশী'র মা।

দামি বালা, উজ্জ্বল আলোর নিচে বালার পাথরগুলো ঝক্-ঝক্ ক'রে জ্বলছে। চোখ ঝলসে দেয়। সুবোধের চোখ দুটোও জ্বলে উঠেছে অগাধ বিস্ময়ে। বুকের নিচেটা থর-থর ক'রে কাঁপছে।

সুবোধের মুখের ভাব দেখে সকলে উৎসুক দৃষ্টি মেলে তার পানে তাকায়। সকলে স্তম্ভিত। মেয়েরা বিস্ময়ভরা চোখে চেয়ে দেখে গয়নাটা। বালার সুন্দর ডিজাইন্। হীরে-পান্নার সেটিং। কে পাঠালো? কে উপহার দিল এই বহুমূল্য অলঙ্কার? সবার চোখে ঐ এক প্রশ্ন।

সুবোধ এগিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে ধীরার হাত দুটি ধরে বালা দু'গাছি পরিয়ে দিল। বললে, উদ্দেশে প্রণাম করো মাকে।

সুবোধের গলার স্বর বিষাদ-নম্র। কালো বড় বড় চোখ দুটি জলে সাঁতার দিচ্ছে। সে নিঃশব্দে ছেলেটিকে সঙ্গে নিয়ে নিচে নেমে গেল। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। মেয়ের দল হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধীরার হাতের ওপর। বালা দেখবার জন্যে। অপূর্ব! মূল্যবান্ বালা। কমসে কম আড়াই হাজার তিন হাজার টাকা দাম।

কে এই সুবোধের মা? কাশীর মা? সকলের চোখ জিজ্ঞাসু হ'য়ে ওঠে।

সুবোধের বুকের নিচেটা ফেনিয়ে উঠেছে। তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে পুরোনো দিনের এক দুর্যোগময়ী অন্ধকার রাত্রি। বিস্মৃতির আকাশে রক্তাক্ত ক্ষতের মত। বিদ্যুৎ-বিদারিত। জল্-জল্ করছে।

কাশীর হরিশ্চন্দ্র শ্মশানঘাটের নামাল। সামনে ভরা গঙ্গা। থৈ-থৈ করছে। মাথার ওপর কালোমেঘের বুকে সবুজ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। লিকলিকে চাবুকের মত। ভরাট স্তব্ধতা। জমাট অন্ধকার। কোলের মানুষ দেখা যায় না।

মানুষের মুখ দেখতে সে চায় না।

জীবন দেখতে তো সে আসেনি এখানে? এসেছে জীবনকে ভুলতে। জীবনে বিস্মরণ আনতে। মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করতে। নিরুপায় নৈরাশ্যের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্যে সে মরণকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

সুবোধ এসেছে আত্মহত্যা করতে। মাত্র বাইশ বছর বয়সে। আশা, উত্তম, শক্তি, সাহস সব হারিয়ে এসেছে আত্মহত্যা করতে। তা ছাড়া কোন পথ ছিল না লজ্জামোচনের। বেনারস্ য়ুনিভার্সিটির ছাত্র সে। অসৎ সঙ্গে পড়ে জুয়া খেলতে আরম্ভ করলে। আরম্ভটা নতুন রকমের। শেষটা ভয়াবহ।

ঋণের দায়ে মাথা ভারি হ'য়ে উঠল। আকণ্ঠ নিমজ্জিত হলো দেনার সমুদ্রে। অপরিমিত ঋণের তালিকা দেখে সে শিউরে উঠল। ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেল।

কোন উপায় নেই। সমাধানের কোন পথ নেই। নিরুপায় হ'য়ে দেশে মাকে চিঠি লিখল। তার চিঠি পৌঁছুবার আগেই সে তার মায়ের মৃত্যু-সংবাদ পেল। তাকে দেশে ফিরতে লিখেছে।

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল সুবোধের। ফিরে যাবার পয়সা পর্যন্ত কাছে নেই। তার ওপর এই ঋণের বোঝা! ঋণ শোধ না করে সে এখান থেকে যাবে কেমন করে? পাওনাদারেরা তাকে যেতে দেবে কেন?

লজ্জায়, অপমানে, দুঃখে, শোকে সে ম্রিয়মাণ। নিরাশ। নিরুৎসাহ। নিরুপায়।

সম্মান বাঁচানোর কোন উপায় নেই। মার শোক আরো গভীর হয়ে ওঠে। মনে হয় হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গেল। ঋণের বোঝা আর পাওনাদারের হুমকি জীবনকে বিষিয়ে তোলে। নিজেকে মিথ্যে মনে হয়। জীবন অনর্থক মনে হয়। সত্য হয়ে ওঠে তার কাছে মায়ের মৃত্যুর জগৎ।

সে মার কাছে যেতে চায়। মৃত্যুর শীতল হাতের সান্ত্বনা পেতে চায়। তুচ্ছ বিড়ম্বিত জীবন থেকে সে মুক্তি পেতে চায়।

মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। মা তাকে ডাকে। জীবন তাকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সে মরণের পানে এগিয়ে যাচ্ছে।

মানুষের সংস্পর্শ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যই পরিচিত পৃথিবী থেকে এখানে চলে এসেছে। মরণের ডাকে।

নিজের কাছে নিজেই যেন সে ধূসর অস্পষ্ট হয়ে গেছে। পেছনের জগৎ আর তার চেতনাকে স্পর্শ করতে পারে না। মৃত্যুর অসীমতায় সে মিশে যেতে চায়। অন্ধকার আকাশের তলায় উত্তরঙ্গ নদীর দিকে চেয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। দেখছে শুধু গঙ্গার পানে চেয়ে। অন্ধকারের গভীরতায় একখানা সাদা চাদরের মত নদী দুলছে। আর কিছুই তার চোখে পড়ে না। মনের ভেতরে-বাইরে সর্বত্র অন্ধকার।

আর কিছুই সে ভাবতে পারে না। ভাববার শক্তি পর্যন্ত তার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কতক্ষণ যে সে এমনি ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, তাও তার খেয়ালের মধ্যে নেই। মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগে যেন দু'চোখ ভরে মায়ের রূপ দেখছে।

পেছন থেকে জীবিতের স্পর্শ পেয়ে সে চমকে ওঠে। তার ঘুম ভেঙে যায়। তার কাঁধের ওপর হাত রেখে পেছনে দাঁড়িয়ে আছে এক ছায়ামূর্তি। হিমশীতল কোমল স্পর্শ। মুখ ঘুরিয়ে সুবোধ ফিরে দাঁড়ায়।

প্রৌঢ়া নারী। দীন-হীন মলিন বেশ। অসংযত। আগোছালো।

—এ কি করতে যাচ্ছো তুমি? ছিঃ? তুমি কেন এ কাজ করবে?

উদ্বেগাকুল কণ্ঠস্বর। আতঙ্কের আভাস। ঝাপসা আলোয় দু' জনে চোখোচোখি হয়।

নারীর চোখ দুটি চক্-চক্ করছে। অসহিষ্ণুতার জ্বালায় প্রদীপে তেল নেই। বুক পুড়ছে। তবু জ্বলছে।

সমস্ত শক্তি দিয়ে নারী সুবোধের একখানা হাত চেপে ধরেছে। অপর হাতে মুখের ওপর হ'তে নিজের এলোমেলো চুলগুলো সরিয়ে দিতে দিতে বলে, তুমি কেন এ সর্বনাশ করতে এসেছো বাবা? তোমার এই বয়স। কাঁচা গাছে ঘুন ধরল কেমন করে? কিসের জ্বালা?

তার গলার স্বর বড় মিষ্টি লাগে সুবোধের কানে। মমতার এ স্বর সে শোনেনি অনেক দিন।

সুবোধ কাঁপছে। একটা হিমপ্রবাহ তার শরীরটাকে কাঁপিয়ে তুলছে। সে যেন ধীরে ধীরে চেতনা ফিরে পাচ্ছে। তার মূর্চ্ছার ঘোর কাটছে। মৃত্যুর দেশ হ'তে ফিরে আসছে, মায়া-মমতাভরা জীবন্ত পৃথিবীতে।

নারীর মুখে উর্দ্ধশ্বাস ব্যাকুলতা। অনন্ত রিক্ততা। সে নিজের কথা ভুলে গেছে, নিজে কেন এখানে এসেছিল। কী সংকল্প নিয়ে। নিজের অগোচরে সে সংকল্প তার বিস্ময়কর ভাবে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। ভুলে গেছে নিজের অপমানের তীব্র জ্বালা। যে অপমান, যে নৈরাশ্য তার জীবনকে বিষিয়ে তুলেছিল। যে অপমানের প্রচণ্ড

ধাক্কায় সে জীবনকে প্রত্যাখ্যান ক'রে মৃত্যুর দুয়ারে এসেছিল, সান্ত্বনা খুঁজতে।

এই ছেলেটির হাত ধ'রে সে সব ভুলে গেল। সান্ত্বনা পেল অলক্ষ্যে। নিজেকে নিজের দায়মুক্ত মনে হ'ল। এই ছেলেটির জীবনের দায়িত্ব এসে পড়েছে তার ওপর। একে বাঁচাবার জন্যেই যেন কে তার হাত ধরে টেনে এনেছিল এখানে। নিজে মরতে আসেনি।

—নিজের এ সর্বনাশ কেন করতে চাও, বাবা?

সুবোধ ফ্যাল-ফ্যাল করে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তার মুখের পানে। চোখে করুণা। গলায় মিনতির স্বর। ভারি মিষ্টি লাগে তার 'বাবা' ডাক।

অজানতে সুবোধের গা শিউরে ওঠে। মুখ নিচু ক'রে বলে, অপমানের জ্বালায়। অসম্মানের ভয়ে।

নির্জীব অন্ধকারের মত নির্জীব তার গলার স্বর।

নারীর বুক দুলে ওঠে। মনে মায়া জাগে। জিজ্ঞেস করে, কিসের অপমান? অসম্মান কেন?

সুবোধ উত্তর দেয়, ঋণের তাড়না। পাওনাদারের অপমান।

—তার জন্যে এই মহাপ্রাণটা নষ্ট করবে? এত বড়ো পাপ করবে? পুরুষ মানুষ। জোয়ান, বুদ্ধিমান।

—কিন্তু নিরুপায়।

—উপায় নিজেকে করতে হবে।

অগাধ অসহায় দৃষ্টি দিয়ে সুবোধ তার মুখের পানে তাকায়।

নারী জিজ্ঞেস করে, কতো টাকা?

—জেনে কি হবে?

—উপায় করতে হবে।

মাথা নেড়ে সুবোধ উত্তর দেয়, কোন উপায় নেই। উপায় থাকলে করতুম।

নারীর মুখে ভেসে ওঠে হাসির ঝাপসা রেখা। অন্ধকারে সুবোধ দেখতে পায়। সে হাসি যেন তাকে মৃত্যুলোক থেকে জীবনে উত্তীর্ণ ক'রে দিতে চায়।

নারী তার হাতে ঝাঁকানি দিয়ে জিজ্ঞেস করে, এটা কোন্ ঘাট জানো?

—হরিশ্চন্দ্র ঘাট।

—ঐ শ্মশানে রাজা হরিশ্চন্দ্র ঋণমুক্ত হয়েছিলেন।

সুবোধের সমস্ত শরীর থর-থর ক'রে কেঁপে ওঠে। সে একদৃষ্টে তার মুখের পানে চায়।

নারী তার হাতে টান দিয়ে বলে, আমার সঙ্গে এসো। তুমি আমায় বাঁচিয়েছো মহাপাতকের হাত থেকে। আমি বাঁচাবো তোমাকে।

যেতে যেতে অস্ফুটকণ্ঠে সুবোধ বলে, প্রাণ না হয় বাঁচালেন আপনি। মান বাঁচাবো কেমন ক'রে?

—যাঁর দয়ায় দু' দুটো প্রাণ বাঁচলো, তিনিই তোমার মান বাঁচাবেন। কতো টাকা বললে না তো?

—দু' হাজারের মতো। একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সুবোধের বুকের অতল থেকে।

বাড়ি ফিরে নারী তাকে গুণে আড়াই হাজার টাকা দিল। ঋণ শোধ ক'রে তাকে দেখে যেতে বললে।

সুবোধ বিস্ময়ে পঙ্গু হ'য়ে গেল। অন্তরের কৃতজ্ঞতা অশ্রু হ'য়ে ঝরে পড়ল।

—কী ক'রে শোধ দেব মা তোমার এই ঋণ?

নারী তার চিবুক স্পর্শ ক'রে বললে, এমনি 'মা' ব'লে ডেকে। সুবোধকে সে বুকে জড়িয়ে ধরলে।

সুবোধ একখানা খৎ লিখে দিতে চায়। নারী রাজি হয় না।

—যখন সুবিধে হবে দিও। ছেলে আবার মাকে লিখে দেবে কি?

সুবোধ এই নারীর মাঝে নিজের মাকে খুঁজে পায়।

আর নারীর স্তিমিত হয়ে আসে বঞ্চনার ক্ষোভ। মিটে আসে মাতৃত্বের ক্ষুধা। একজনের কাছে বঞ্চিত হয়েছে সে। পুত্রজ্ঞানে যাকে প্রতিপালন করেছিল, ক্ষুধার্ত মাতৃত্ব দিয়ে। স্নেহের সুধাভাণ্ড উজাড় করে দিয়ে। সে তার মাতৃত্বকে মর্মান্তিক পরিহাস করে তাকে ছেড়ে চলে গেছে!

তার দুর্বল স্নায়ুর পক্ষে অসহনীয় হয়ে ওঠে সেই তীব্র আঘাত। মানুষকে সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করে। একটা কুৎসিত ইতরতার আভাস পেয়ে মানুষের সংস্পর্শকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। পারে না সে নিজেকে খাড়া রাখতে। ভেঙে পড়ে দুঃখে, লজ্জায়, পরাজয়ে। জীবনে বিতৃষ্ণা আসে।

সংসারে সবচেয়ে যা পবিত্র সেই মাতৃত্বের অনুভূতি তার অপমানিত। পরাজিত। লাঞ্ছিত।

সে বাঁচবে কেমন করে?

বাঁচতে সে তাই চায়নি। থিতায় এসেছিল জীবনে।

সুবোধ তাকে বাঁচিয়েছে। মহাপাতকের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। তার মাতৃত্বের দুর্নিবার ক্ষুধা মিটিয়েছে।

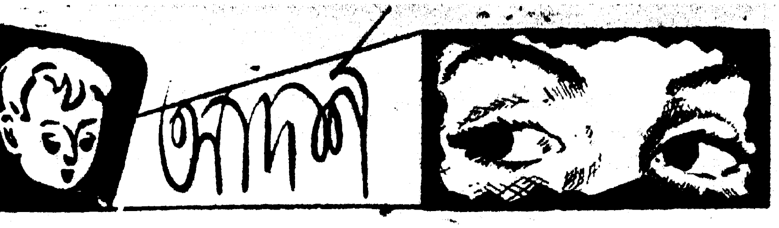
সুবোধের জীবন থেকে ঝড়-ঝঞ্ঝা কেটে গেছে। আবার সে জীবনের আলো দেখেছে। নতুন আকাশের চেহারা দেখেছে। আঁকড়ে ধরেছে নতুনের সম্ভাবনাকে। আবার সুন্দর বলে মনে হয়েছে পৃথিবীটাকে।

তাই ভুলতে পারেনি সেই অভাগিনী মাকে যে তার জীবনে আনল নবজন্মের সূচনা। নতুনের সম্ভাবনা। ভুলতে পারেনি মায়ের মুখের স্নিগ্ধ হাসি আর বেদনাময় আহত চোখের সজল দৃষ্টি। তার মনের পাতায় খাঁজে খাঁজে ঝরা গোলাপের শুকনো পাপড়ির মত লুকোনো আছে। মাঝে মাঝে পাতা উলটে সে দেখে। দেখে আর ভাবে। অঘটনও জীবনে ঘটে। দীর্ঘশ্বাসে বুকের তলাটা তার ফেনিয়ে ওঠে।

মনে হয় এ জীবন তারই দান। কিছুদিন আগে সুবোধ মায়ের টাকাটা ফেরৎ দিয়েছিল। তার পর নিজের বিয়ের সংবাদটা পাঠিয়েছিল নেমন্তন্ন চিঠির মারফতে। মা তাকে ভোলেনি। এই দীর্ঘ দিন পরেও সেই দূর-দূরান্তর থেকে আশীর্বাদ পাঠিয়েছে এই বালা।

সুবোধের দু'চোখ ভরে জল আসে। ঐ বালার মধ্যে দিয়ে সে স্পর্শ পায় মায়ের স্নেহ-মনের। তার অনাবিল মাতৃত্বের।

বীরার কাছে সেই বালাজোড়াটা সুবোধের জটিল জীবন-আবর্তের রক্ষাকবচ হয়ে রইল। আজো যখন সেই বালা হাতে দেয় সে উদ্দেশে এক অজানা নারীর মাতৃত্বকে প্রণাম করে। আর ভাবে, তাঁরি করুণায় সুবোধের জীবনে আসা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে।



মিতা দাস

তখনো অজয়ের ধ্যান ভাঙেনি। সবুজ ঘাসের আমেজ লেগে রয়েছে মনে। অসীম আকাশের উদাসতা নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইল অজয়। কেন জীবনে এত বড় ভুল করল অজয়—যাকে সম্মান দিতে পারবে না জগতের কাছে? তার সম্ভ্রম নষ্ট করার কি অধিকার ছিল তার? নিষ্ঠুর বিধাতা, নিষ্ঠুর তোমার বিধান! ভাবল অজয়।

ঝড়ের মত রত্নার ঘরে ঢুকে পড়লো অজয়। রত্না জানালার ধারে দাঁড়িয়ে হয়তো জীবনটাকে নিয়ে বোঝাপড়া করছিল। ভুল ত সে-ও করেছে। পুরুষ তো চিরকাল নারীকে কামনা করবে, কিন্তু সে কেন এই কামনার ইন্ধন যোগাল? সমস্ত মান-মর্যাদা পেছনে পেছনে ফেলে সে কেন চলে এল বিবাহিত অজয়ের সাথে? এড়াবার পথ কি তার ছিল না?

"রত্না, অনাগত শিশুর ভবিষ্যৎ ভেবে আমি তোমাকে বলছি—তুমি আমাকে বিয়ে কর।"

চীৎকার করে রত্না হেসে উঠল।

"দায়িত্ববোধের বড়াই করছ? আমার সম্ভ্রম আমার মর্য্যাদা রক্ষা করার দায়িত্ব কি তোমার? তোমার সমাজে প্রতিষ্ঠা, তাকে ধূলিসাৎ করবে কেমন কোরে?"

স্তব্ধ হয়ে গেল অজয়, বলে কি রত্না, এত-বড় স্বার্থত্যাগ সে কেমন করে করবে, তবে কি সে অজয়কে ভালবাসে না?

অজয় বললো—"বোঝানোর দায়িত্ব আমার আর বুঝে দেখবার পালা তোমার। তুমি যখন এই ঠিক করলে তখন আমার বলার আর কিছু নেই।"

অজয় ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল, রত্না পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল জানলার ধারে। কি করে সে বোঝাবে অজয়কে সে ভালবাসে? ভাল যদি নাই বাসবে, কেন চলে এল সে সব ছেড়ে? অজয়ের স্ত্রী রত্নাকে অনুরোধ জানিয়েছে এই বিয়ে বন্ধ করতে। নারী হয়ে সে নারীর সর্ব্বনাশ কেমন করে করবে? একটা অনাগত ভবিষ্যৎকে বাঁচাতে গিয়ে সে আরেক জন নারীর ক্ষতি করবে? না, তা সে পারবে না। হোক্ ক্ষতি তার শিশু সন্তানের, বুঝুক ভুল তাকে অজয়। তার আদর্শ থেকে কিছুতেই সে সরে যাবে না।

তুমি সারা রাত কাল ঘুমুতে পারনি অজয়, কি এমন ক্ষতি তুমি আমার করেছ শোন। ফিরে যাও তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে, তোমার ছেলেমেয়ের কাছে, তোমার আনন্দ-মুখরিত জীবনে।

সুখে-দুঃখে আট বছর কেটে গেল—রত্নাকে আমরা দেখতে পেলাম এক শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের সর্ব্বময়ী কর্ত্রীরূপে। দুঃস্থ ছেলে-মেয়েদের জন্য সে অনেক করেছে, আরও অনেক করবে, এই আশাতেই সে বেঁচে আছে।

ঝন ঝন করে টেলিফোন বেজে উঠল, ওপার থেকে কথা ভেসে এল—টালীগঞ্জের শিশুমঙ্গল সমিতির রত্না দেবীর ছেলে আঘাতপ্রাপ্ত—মেডিকেল কলেজে আছে।

রত্না বেরিয়ে পড়ল মেডিকেল কলেজের উদ্দেশে, ইমারজেন্সী ওয়ার্ডে। দেবাশীষ—রক্তময় তার দেহ—রত্না কাছে গিয়ে দাঁড়াল। মাকে চিনতে পারল—"মা মণি, আজ সকালে তোমাকে লুকিয়ে সোনাদের বাড়ী বল্ খেলতে গিয়েছিলুম। আমি দেখতে পাইনি সোনাদের বুড়ি ঝিয়ের মাথায় বল্ লেগেছিল, বুড়ি রেগে গিয়ে বলল—যার বাপের ঠিক নেই সে ত এরকম বজ্জাত হবেই। ও ভেবেছে, আমি ইচ্ছে করেই বল্ মেরেছি। আমি ছুটে তোমার কাছে বলতে আসছিলুম, এই ভদ্রলোকের গাড়ীর তলায় আমি পড়ে গেলুম।" অজয়! চীৎকার করে উঠল রত্না—স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল অজয়।

রত্না বলল, "অজয় বাড়ী যাও, পুলিশের হাঙ্গামা আছে"—এ কি ব্যঙ্গ করছে রত্না? দেবাশীষ যে তারও ছেলে! দুই দিন পরে দেবাশীষ মারা গেল। শেষ কাজ শেষ হল।

রত্না ভাবছে এ কি করল সে—একটা আদর্শ বজায় রাখতে গিয়ে দেবাশীষের মৃত্যুর জন্য দায়ী হ'ল?

চলে গেল—ভালই হ'ল। ঘরের কোণের অন্ধকারের দিকে, চেয়ে ভাবছে রত্না তার দীর্ঘ অতীতের অতিক্রান্ত দিন। সেদিনের ধ্যান স্বপ্ন সৌন্দর্য্যের আকুতি, ভালবাসা, জীবন—দীর্ঘকাল ধরে সে যা ভেবেছে নানা ভাবে। বাঙ্গালীর মেয়ে সে, এই সুন্দর পৃথিবীতে দেবাশীষকে মর্য্যাদা নিয়ে বাঁচবার অধিকার কি সে দিতে পারত?—কোথায় স্থান করে দিত সে তার দেবাশীষকে? সমাজ নাগিনীর মত চারি দিক থেকে ফণা তুলে গর্জ্জন করছে। মর্য্যাদাহীন জীবন তো মৃত্যু। ভালই করেছে বিধাতা।

রত্না এমন করে হেসে উঠল যে পৃথিবীর সমস্ত অশ্রুজল এক করলেও বোধ করি তার তুলনা হয় না—তার পর কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

আজ তার মনে পড়ল অজয়কে সে বলেছিল—"আমার দায়িত্ব থেকে তোমাকে মুক্তি দিলাম"—

আজ একই কথা সে তার জীবনদেবতার কাছে নিবেদন করল—"ঠাকুর! এই ভাল, পৃথিবীতে আর কারও কাছে আমার জবাব দেবার কিছু নেই।"

শিশুমঙ্গলের মেয়েরা বলে—"মা, আমাদের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে কি তোমার দেবাশীষের মুখ দেখতে পাও না? এরা যে সব তোমারই ছেলে।"

ভুলতে চায় রত্না, কিন্তু ভুলতে চাইলেই তো আর ভোলা যায়

না ? রাত তিনটে বাজে, রত্নার চোখে ঘুম নেই। আজ এক বছর হতে চলল না ঘুমিয়ে রত্না রাত কাটাচ্ছে। মা! শুনতে পেল জানলার বাইরে দেবাশীষ ডাকছে রত্নাকে।

রত্না চীৎকার করে উঠল।

খোকন, যাচ্ছি। কিন্তু এ কি! এ কার গলা? নিজের চীৎকারে নিজের সর্বাঙ্গ যেন হিম হয়ে গেল রত্নার। প্রেতের কণ্ঠ শুনছে সে—সে শুনছে অশরীরীর স্বর। মৃত্যু যন্ত্রণায় টেবিলের একটা প্রান্ত আঁকড়ে ধরল রত্না, জানলার বাইরে অন্ধকার। আকাশের এক কোণে দেখতে পেল একটা রক্তাভা, মনে হ'ল যেন দেবাশীষের চিতা জ্বলছে।

অজয়ের স্ত্রী সতী রাঁচী যাবার ইচ্ছা প্রকাশ কোরল, সদলবলে অজয় স্ত্রী ছেলেমেয়ে নিয়ে রাঁচী গেল। রাঁচীর দর্শনীয় জিনিষের মধ্যে 'মেন্টাল হসপিটাল' একটি দর্শনীয় বস্তু।

ভগবানের এই নিষ্ঠুর লীলাক্ষেত্র দেখতে অজয় স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে নিয়ে গেল।

৭ নম্বর ঘরের কাছে গিয়ে অজয়রা দেখতে পেল, একটি আধবয়সী মেয়ে চীৎকার করছে আর বলছে, "দেবতার আশীর্বাদের ফুল—কলঙ্কের বোঝা সে ত বইতে পারত না, তাই সে চলে গেল।"

চমকে উঠল অজয়, স্ত্রীকে বলল "সতী বাড়ী ফিরে চল, আরেক দিন এসে সব দেখে যাব, আজ শরীরটা ভাল লাগছে না।"

সারা রাস্তা অজয় ভাবল, কেন রত্নাকে সে জোর করে বিয়ে কোরল না, কেন সে চুপ করে রইল? সমাজে মিথ্যে সম্মানের মোহে দু'টি জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার কি অধিকার তার ছিল?

কিন্তু মানুষের জীবন তো এ ভাবেই চলে, প্রত্যেক মানুষের জীবনের শেষ—শান্ত-শীতল মৃত্যু হয়তো একদিন আস্তে আস্তে এই পাগলা গারদেই নিবে রত্নার জীবন-প্রদীপ—রোগীর লিষ্টের খাতা থেকে রত্নার নাম কাটা যাবে এইটুকু যা তফাৎ আর অজয় মারা যাবে হয়তো তার কোলকাতার প্রাসাদোপম অট্টালিকায়। পরের দিন কাগজে নাম বেরুবে "অজয় মিত্র বিখ্যাত ব্যবসায়ী মারা গিয়াছেন" এইটুকু শুধু আমরা বলতে পারি, তিনি মঙ্গলময়, তিনি যা করেন সেখানেই মঙ্গল।

দামোদর

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

দামোদর! তোমায় দেখলুম নতুন করে
পাঁচ বছর পরে।
ঝড় নয়, তুফান নয়, বন্যাও নয়
এ শুধু অপার বিস্ময়!
রুদ্ধ করল, তোমার অপ্রতিহত হৃদয়াবেগ,
পাথরে গাঁথা লৌহ-কপাট,
আর কংক্রীটের সেতুর বন্ধনীতে
এখনও রয়েছো নিরুদ্বেগ।
অপ্রমেয় উদার গৈরিক তোমার ললাট।
পঞ্চকোট পাহাড়ের সবুজ মমতা,
এখনও ছুঁয়ে আছে তোমার মন।
তাই বুঝি এত সুন্দর, এত মনোরম এত মমতা,
তোমার জলে এত রূপায়ন।
যদিও পাথরভাঙা কলের আওয়াজে
কুলি-কামিনের কোলাহলে আর কলরবে,
স্তূপীকৃত পাথরের অগৌরবে,
কাজে আর অকাজে,
তোমার বিঘ্ন ঘটছে পদে পদে।
তবু তুমি সকল উদারে স্থিতধী সহিষ্ণু-ধারক।
প্রগতির অগ্রনায়ক।
দামোদর তুমি সুন্দর বিপদে ও সম্পদে।
নতুন দিনকে নিজের মধ্যে
তুমি সাদরে করেছ ধারণ।
তার সাফল্যের বেদীমূলে তোমার ত্যাগ অসাধারণ।

তুমি ভয়ঙ্করের শুরু রুদ্র প্রলয়
মানুষের জীবন-মরণ এত দিন পাক খেয়েছে—
তোমার খেয়ালী খেলায়।
মানুষ আজ নেবে তার প্রতিশোধ
অনেক দিন গেছে দুর্ভাবনায়
অনেক ক্ষতি হয়েছে আর নয়।
মানুষ এবার বাঁচাবে তার প্রাণ, বাড়াবে সম্পদ
তোমাকে পাথরে পাথরে চূর্ণ করে।
তোমার সবুজ সুষমা শূন্য করে।
দামোদর তুমি কি ভুলেছ।
মহুয়া ফুলের সেই মিষ্টি গন্ধ।
শালমঞ্জরীর মৃদুল শিহরণ,
বন্য ময়নার গানের ছন্দ,
আর পিয়ালশাখায় গুঞ্জরণ।
সেই বনের মধু আমি, তুমি জল,
পাপড়ীর ঘোমটা ঢাকা ফল।
তোমার প্রেমে সোনা রং আমার পরাগে
আমার সবুজ সুন্দর তোমার সোহাগে।
সেই পঞ্চকোটের ভালোবাসা,
দামোদর তুমি কি ভুলেছ?
আজ তুমি নতুন উন্নত প্রশংসনীয়;
বিদ্যুৎ আর শস্যের প্রাচুর্যে সম্মানীয়
দেশ-দেশান্তরে তোমার সুনাম।
দামোদর! তোমায় ভালোবেসে কি পেলাম?



শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

"লক্ষ্মীটি গার্ল, এখনও শুয়ে আছ কেন? ওঠ হাত-মুখ ধুয়ে কলেজের পোষাক ছেড়ে খেতে এস।"

সিপ্রা পালঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে কি ভাবছিল, তার জুতোশুদ্ধ দুটো পা খাটের বাইরে ঝুলছে, এক দিককার লম্বা চুলের বেণীর রিবণ মাটিতে লুটাচ্ছে, বইগুলো চেয়ারের উপর অবিন্যস্ত ভাবে ছড়িয়ে আছে। হঠাৎ মাসীর আচমকা ডাকে সিপ্রা ত্রস্তে উঠে বসল, বললে, "মাসীমা তুমি যাও, আমি এক্ষুণি আসছি।"

মাসী অসহিষ্ণু ভাবে বললেন, "না, না ওঠ শীগগির, সব কাজে পাংচুয়েল হতে চেষ্টা কর। চায়ের টাইম হয়ে গেছে, তোমার ড্যাডি এক্ষুণি এসে যাবেন।"

কনভেন্টে পড়া মাসী হাইহিলের জুতো পায়ে গট্‌-গট্‌ করে ড্রইংরুমের দিকে অগ্রসর হলেন। মাসীটির বয়স হবে ত্রিশের কাছাকাছি, বেঁটে-খাটো ছোট্ট মানুষটি, ক্ষীণাঙ্গী, একরাশ লম্বা চুল খোঁপা করে বাঁধতে ভাল লাগে না, তাই কলেজ গার্লের মত দুদিকে দু'টি বেণী করে ঝুলিয়ে দিয়েছেন। মাসী পরেছেন একখানা সরু সোনালী পাড়ের কালো ক্রেপের শাড়ী, গায়ে সোনালী শাটিনের ব্লাউস। দেহের গড়ন ভাল, রূপলাবণ্যে দেহশ্রী ঢলঢলে না হলেও আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে। চোখ দুটো খুব বড় নয়, তবে উজ্জ্বল, নাকটা ধারাল, চাপা পাতলা ঠোঁট, একদৃষ্টে দেখলে সুন্দরীই বলতে হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় চোখে-মুখে কেমন একটা দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে, যাতে মুখের কমনীয় কান্তি ঢেকে গেছে।

ষোড়শী সিপ্রা জোর করে আলস্য দূর করে এক লাফে খাট থেকে নেমে পড়ল, তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে হাত-মুখ ধুয়ে এসে নিজের শোবার ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসল, রিষ্টওয়াচে টাইম দেখেই ত্রস্তে শাড়ী কাপড় বদলে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি চুলটা আঁচড়ে চায়ের টেবিলে ছুটল। সিপ্রার ছোট বোন শীলা অবুঝ, সে সিপ্রার চেয়ে বছর দুয়েকের ছোট, বড় অভিমানী, একটু কিছু হলেই কান্নাকাটি, মান-অভিমান সুরু করে দেয় মাসীর সঙ্গে। কিন্তু সিপ্রার কেন জানি না, মাসীর কাছে এলেই মনটা যেন হিম হয়ে যায়, সিপ্রা কারণ বোঝে না।

মাসী আদর-যত্ন খুবই করেন, খাওয়া-দাওয়া, আরাম-বিশ্রাম সব কিছুর উপরই তার নজর আছে। ছুটিছাটার দিনে মাঝে মাঝে সিপ্রাকে নিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে ম্যাচ করে শাড়ী-ব্লাউজ-জুতো কিনে দেন। সিপ্রা যাতে নিখুঁত সোসাইটি গার্ল হতে পারে সে জন্য মাসীর যত্ন-চেষ্টার অবধি নেই, তবু কেন যে সিপ্রার মন ভরে না, সিপ্রা বুঝতে পারে না

সিপ্রার মুখখানা বড় সুন্দর, লাবণ্যে ভরা, কিন্তু মুখশ্রী আনন্দে উচ্ছ্বসিত নয়, দেখলে মনে হয় যেন মার্বেলে খোদাই একটি বিষাদ-

সিপ্রা শীলাকে নিয়ে চায়ের টেবিলে বসে গেল, ততক্ষণে তাদের ড্যাডিও এসে গেছেন। ড্যাডি বাস্তুসম্পন্ন মধ্যবয়স্ক বিজনেস-ম্যান, সারাদিন মোটর নিয়ে কাজকর্মে ঘোরেন, সন্ধ্যের অবসর বিনোদন করেন শ্যালীকে নিয়ে। আজ এক বছর হল ভদ্রলোক বিপত্নীক, কনভেন্টে-পড়া তরুণী শ্যালিকাই তাঁর সংসার নিখুঁত ভাবে চালিয়ে নিচ্ছে, মাতৃহীনা কন্যা দু'টিকে মানুষ করছে, এজন্য সিপ্রার ড্যাডি সিপ্রার মাসীর কাছে কৃতজ্ঞ।

চা জলখাবার খেতে খেতে ড্যাডি মেয়েদের সঙ্গে দু'চারটে কথাবার্ত্তা বলে উঠে পড়লেন, ক্লাবে চললেন মাসীকে নিয়ে। সিপ্রা শীলাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বারান্দায়। মাসী গাড়ীতে উঠে হাত বাড়িয়ে "বাই বাই" করতেই হুস করে মোটর ফটকের বাইরে চলে গেল, সিপ্রা খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, মনটা যেন উদাস হয়ে গেছে। ড্যাডি আজকাল দূরে, বহু দূরে যেন সরে যাচ্ছেন, তাদের সঙ্গে দু'-চারটে কথা বলেন, শুধু মাসীর সঙ্গেই হেসে কথা বলেন, গল্প করেন। সিপ্রা আর ভাবতে পারে না, তার চিন্তাধারা এলোমেলো হয়ে যায়।

সেদিন কলেজ-ফেরতা সিপ্রা তার বন্ধু লীলাকে নিয়ে বাস থেকে নেমে হেঁটে বাড়ী ফিরছিল। কলেজে নবাগতা লীলার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে এখন ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। সিপ্রার বাড়ীর খানিক দূরেই লীলাদের বাড়ী।

লীলা বললে, "কি রে সিপ্রা, আজ মুখে আষাঢ়ের মেঘ নেমে এসেছে কেন?"

সিপ্রা উত্তর দিলে, "সত্যি ভাই, আজ মনটা ভাল লাগছে না, কে জানে বার বার মার কথা মনে পড়ছে। এক বছর আগে এমনি দিনে মাকে হারিয়েছি।" বলতে বলতে তার গলার স্বর ভারী হয়ে গেল, চোখ ছলছলিয়ে এল।

সিপ্রার কথায় লীলার মনটাও বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললে, "তা তোর মাসী ত আছেন। তিনি ত তোর খুব আদর যত্ন করেন।"

সিপ্রা গম্ভীর ভাবে বললে, "হাঁ"।

লীলা বললে, "আচ্ছা ভাই, তোর মাসীর বিয়ে হয়নি বুঝি? তা তিনি কি বিয়ে না করে সারাজীবন তোদের ওখানেই কাটিয়ে দেবেন?"

"সে কি করে জানি, বলো?"

"তোর মাসীকে দেখে ত খুব সৌখীন মেয়ে মনে হয়। পোষাক পরিচ্ছদে একেবারে টিপটপ, প্রায়ই ত দেখতে পাই, আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে বিকেলে তোদের মোটরখানা চলে যায়, তোর ড্যাডি মোটর চালান, পাশে মাসী। হাঁ রে সিপ্রা, তুইও ত' মোটর চালাতে জানিস্?"

সিপ্রা উদাস ভাবে বললে, "তা জানি বৈ কি।"

তারা ততক্ষণে বাড়ীর গেইটে পৌঁছিয়েছে, সিপ্রা বিদায় নিয়ে নিজ কক্ষের অভিমুখে চললো। ভারী মনে ধীরে ধীরে ভিতরে ঢুকলো। ঘরগুলির প্রতি চোখ বুলাতে বুলাতে সিপ্রার মনে হল, মা থাকতে সংসার কত আনন্দের ছিল। এখন যেন তা প্রাণহীন। বাগান, ঘর দুয়ার, জিনিষপত্র, সবতাতেই মার স্মৃতি কত গভীর ভাবে জড়ানো। ফটকের সামনের যুঁইএর লতা ফুলে ফুলে ছেয়ে আছে। মা যুঁইফুল খুব ভালবাসতেন, তাঁর বিছানার কাছে ছোট্ট সিল্কের থালাতে রোজ একরাশ যুঁই তোলা থাকতো। [illegible]

পড়ে ঘর ছেয়ে থাকত। যার আমলে সৌরাষ্ট্য করে যাকে কত কষ্ট দিয়েছি, ভাবতে ভাবতে শিপ্রার চোখে জল এসে গেল।

সন্ধ্যের সময় স্বামী ভ্যাজিকে নিয়ে বন্ধুর বাড়ীতে চলে গেলেন। শিপ্রা লীলার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে লীলাকে পড়তে বসিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল। আজ আর সে পড়বে না, ভাল লাগছে না কিছুতেই। শিপ্রা তার টেবিলের বই-খাতা নতুন করে গোছাতে লাগল। তারপর ড্রয়ার টেনে শাড়ী-কাপড় গোছাতে বসে গেল।

ড্রয়ারের নীচের তাকে তার মার অনেকগুলো শাড়ী আর ব্লাউস পড়ে ছিল, শিপ্রা সেগুলো বের করে নেড়ে-চেড়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ একটা শাড়ীর ভিতর থেকে একটা মোটা সাদা বন্ধ খাম মাটিতে পড়ল, শিপ্রা তাড়াতাড়ি সেখানা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেল। সে কৌতূহলী হয়ে ধীরে ধীরে খামটা ছিঁড়লো। তার মার হাতের লেখা একটা বড় চিঠি বের হল। শিপ্রা অবাক হয়ে পড়তে সুরু করল—

"মনে পড়ে আঠারো বছর আগেকার কথা, আমি বাবার অফিস-ঘরে বাবার কাগজপত্র গুছিয়ে রাখছিলাম, এমনি সময় তুমি ঘরে ঢুকলে। দুজনেই থতমত খেয়ে গেলাম। তুমি জিজ্ঞেস করলে, মিঃ চৌধুরী কোথায়?

"আমি বললাম, বাবা ত বাড়ী নেই, টুরে গেছেন। তুমি ওঃ! বলে তোমার ব্যাগ খুলে তোমার নামের কার্ডখানা দিলে, তার পর আমাকে একটি ছোট্ট নমস্কার করে বিদায় নিলে। আবার দু'জনে দু'জনের দিকে চাইলাম। আমার মুখ লাল হয়ে উঠল, তুমি চলে গেলে। একে যদি বল প্রথম দর্শনেই প্রেম, তবে আমার তাই হল। তোমার চোখের মাদকতাপূর্ণ দৃষ্টি আমাকে অভিভূত করে দিল। আরো ত' কত লোক আসে আলাপ করি, কিন্তু কারো দৃষ্টি বা কথাতে ত এমন চিত্তচাঞ্চল্য হয়নি?

"তার পর বাবার সঙ্গে তোমার আলাপ-পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। তুমি অন্দরমহলে প্রবেশ করলে, তোমার মধুর স্বভাবে তুমি মার পুত্রের স্থান দখল করলে। আর ধীরে ধীরে আমার মনে তোমার মোহজাল বিস্তার করতে লাগলে। আমি নিজেকে হারিয়ে ফেললাম তোমার মধ্যে। আমার জীবনের অষ্টাদশ বসন্ত মুকুলিত হয়ে উঠল তোমার প্রেমের স্পর্শে। মা-বাবা আনন্দে সম্মতি দিলেন, কতো ধূমধামে বিয়ের উৎসব শেষ হল।"

এ পর্য্যন্ত পড়তেই হঠাৎ লীলার ডাকে চমকে উঠে শিপ্রা, ত্রস্তে চিঠিটা কাপড়ের নীচে লুকিয়ে ফেলল।

লীলা বললে, "শিপ্রা, তোর মন ভাল নেই বলে আমারও ভাল লাগল না। তাই আমি আবার তোর কাছে ফিরে এলাম।"

শিপ্রা করুণ ভাবে বললে, "ভালই করেছিস, আয় বোস।"

লীলা বললে, "এসব শাড়ী কাপড় কার রে, তোর মায়ের বুঝি?"

সিপ্রা বললে, "হ্যাঁ ড্রয়ারে মার কতকগুলো শাড়ী কাপড় ছিল তাই গুছিয়ে রাখছিলাম, আজ কিছুতেই পড়াতে মন বসাতে পারছিনে।"

লীলা ড্রয়ারের উপর থেকে সিপ্রার মার ফটোখানা তুলে বললে, "তোর মা তো খুব সুন্দরী ছিলেন দেখছি! তোর মা কি করে মারা গেলেন রে সিপ্রা?"

"একসিডেন্টে।"

"সে কি রকম?"

"এক বছর আগেকার কথা। আমি তখন ইস্কুলে পড়ি। সেদিন আমার খুব মাথা ধরেছিল বলে আমি ছুটি নিয়ে বাড়ী চলে আসি। মা আমাদের জন্তে জলখাবার তৈরী করতে বসেছিলেন, হঠাৎ মার একটা তীব্র আর্ত্তনাদ শুনে আমি ছুটে যাই, তখন গিয়ে যা দৃশ্য দেখলাম, এ জীবনে ভুলব না। বাবাও বাড়ীতে নেই, অন্তত্র কাজে গেছেন, আমি দেখতে পেলাম, মার শরীরের চার দিকে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, আর সেই লকলকে অগ্নিশিখার মধ্যে মার সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখ ঝলসে গেছে। তীব্র যন্ত্রণায় মার গলা থেকে অব্যক্ত গোঙানি শব্দ বের হচ্ছে, আমি হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ কখন নিজের অজ্ঞাতে ছোট মাসী বলে চেঁচিয়ে উঠেছি বলতে পারি না। আমি সংজ্ঞাহীনের মত কতক্ষণ ছিলাম জানি না। ছোট মাসীর হায় হায় আর্ত্তনাদে আমার হুঁস হল, দেখলাম বহু লোক ভিড় করে উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে আমার মার অর্দ্ধদগ্ধ মৃতদেহ ঘিরে। বলাবলি করছে, অতর্কিতে কি করে ষ্টোভ থেকে মার সাড়ীতে আগুন লেগে গিয়েছিল, আর মা সে আগুনের হাত থেকে নিস্তার পান নি। আমার স্নেহময়ী মায়ের অমন সুন্দর মুখ আগুনে পুড়ে বিকৃত হয়ে গেছে, আমি চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলুম। মার সেই অর্দ্ধদগ্ধ দেহকে সাজিয়ে কপালে চন্দন কুঙ্কুম লেপে চিরদিনের জন্তে আমার সামনে থেকে নিয়ে গেল। সারাটা রাত আমি শুধু কেঁদেছি আর মার সেই মুখ মনে করে শিউরে, উঠেছি।" বলতে বলতে সিপ্রা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। লীলারও দু' চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে তার সাড়ীর আঁচল দিয়ে সিপ্রার চোখ মুছিয়ে দিয়ে শুধু বলতে পারল "কাঁদিস নে সিপ্রা।"

নীচে মোটরের হর্ণ বেজে উঠল, সিপ্রার ড্যাডির গলা শুনা গেল, "লীলা, সিপ্রা!"

সিপ্রা সচকিত হয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছে চট্ করে সাড়ী কাপড়গুলো ড্রয়ারে বন্ধ করে বললে, "চল লীলা, ড্যাডি ডাকছেন।"

চাকর নানা রকম ফল ও তরকারী ভিতরে নিয়ে যেতে লাগল। ড্যাডি লীলার হাতে এক প্যাকেট টফী দিলেন। মাসী লীলাকে দেখতে পেয়ে বললেন, "এই যে লীলা, অনেক দিন পর এলে, ভাল আছ তো?"

লীলা স্মিতমুখে বললে "হ্যাঁ।"

"চলো, চলো, ঘরে বসবে এসো," বলে মাসী সবাইকে নিয়ে ড্রইংরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। লীলা টফী পেয়ে খুব খুসী, সবাইকে একটা দুটো করে পরিবেশন করতে লাগল।

—ড্যাডি বললেন "সিপ্রা, আজ কি চমৎকার তরকারী আর ফল এনেছি দেখেছিস? কাল আমার কয়েক জন বন্ধুকে খেতে ডেকেছি।"

সিপ্রা গম্ভীর ভাবে বললে, "আচ্ছা।"

—ড্যাডি আর মাসী লীলার সঙ্গে নানা কথাবার্ত্তা বলতে লাগলেন। সিপ্রা অসহিষ্ণু ভাবে কৌচে বসে রইল। তার মনে শুধু মার চিঠির কথাগুলো ভাসছিল। সে চিঠিখানা পড়ে শেষ করবার জন্ত তার মন অস্থির হয়ে উঠল।

ড্যাডি নিজের কাজে অফিসরুমে চলে গেলেন। মাসী বললেন "সিপ্রা, তোর পছন্দ হবে কি না জানিনে। আজ একখানা সাড়ী দেখে এসেছি মিহি বোনার সুতী শাড়ী, বোম্বে প্রিন্ট।"

লীলা বললে, তাহলে ত সাড়ীখানা সুন্দরই হবে।

সিপ্রা ভাবনার সমুদ্রে তলিয়ে গেছে। চোখের সামনে মার চিঠির লেখাগুলো ভাসছে, "কত ধুমধামে বিয়ের উৎসব শেষ হল," তারপর, তারপর কি? কেন মা এত দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন? মাসী কি সত্যি ভালবাসেন আমাদের?

এবার আমি উঠি, বলে লীলা দাঁড়াল, সিপ্রাও সচকিত হয়ে উঠল। লীলা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও নিজের ঘরে গিয়ে ধীরে ধীরে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর ড্রয়ার খুলে সাড়ীর ভাঁজ থেকে তৃষ্ণার্ত্ত দৃষ্টির সামনে চিঠিখানা তুলে ধরল।

"উৎসব শেষ হল, তারপর দু'জনের প্রেমের নীড়, কত সুন্দর কত নিবিড় হয়ে গড়ে উঠেছিল সুদীর্ঘ আঠার বৎসর ধরে। ফুলের মত শিশু দুটি এসে আমাদের সাজানো বাগান আলো করে রেখেছে। তারপর আমার মাতৃপিতৃহীনা বোনকে আমার কাছে নিয়ে আসি। আমাদের কাছে রেখে তাকে পড়াই, তোমার উদারতায় আমার হৃদয় লুয়ে পড়েছে তোমার কাছে। রেখা, আমার ছোট বোন, তাকে কত ভালবেসেছি, আর আজ তারই কাছে আমার সর্ব্বস্ব হারাতে বসেছি, এ বেদনা রাখবার স্থান নেই। আমি বহু চেষ্টা করেছি নিজেকে মানিয়ে নিতে, কিন্তু পারলাম না, সেটা অসম্ভব, অসহ্য, তাই আমি আজ বিদায় নিচ্ছি।

"প্রিয়তম, সেই বাসর ঘরের স্মৃতি তোমার মনে পড়ে কি? পালঙ্কের উপর সুবাসিত শয্যায় ফুলসাজে বসে আছি, বেলী চামেলীর সুগন্ধে মাদকতা-ভরা বাতাস, তুমি একরাশ ফুল এনে আমার মাথার উপর ছড়িয়ে দিলে; মুখের গুণ্ঠন সরিয়ে আমার মুখ তুলে ধরলে, মোহভরা চক্ষে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলে, তারপর ধীরে ধীরে তোমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে আমার ওষ্ঠে প্রথম প্রণয়-চিহ্ন এঁকে দিলে, আমি প্রথম প্রেমস্পর্শে বিহ্বল হয়ে উঠলাম, আত্মহারা হয়ে গেলাম—আজ অন্তিমক্ষণে জীবনের সেই মনোরম মুহূর্ত্তটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

"ভাবছি তুমি কেমন করে তোমার এত আদরের বস্তুকে ঠেলে দিতে পারলে? তোমার ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি বেঁচে থাকতে পারব না, আমাকে মরতেই হবে।

"বিদায়, বিদায়, ওগো, চিরদিনের মত বিদায়—"

সিপ্রার চক্ষু অন্ধকার হয়ে এল, হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়ল, মনের ভিতর আগুনের মত জ্বলে উঠল একটি যুগল চিত্র, মাসী, ড্যাডি।


সৌন্দর্য্যের রানীর কান্তি আপনারও হতে পারে!
দিনে দিনে সুন্দর
হয়ে উঠুন...
হ্যাঁ, আপনারও উজ্জ্বল সুন্দর কান্তির স্বপ্ন সফল হয়ে উঠতে পারে! প্রতিবার স্নানের অথবা মুখ ধোয়ার সময় রেক্সোনার ক্যাডিল সমৃদ্ধ ফেনা গায়ে মুখে ভাল করে মেখে ধুয়ে ফেলুন। আপনার কান্তি দিনে দিনে আরও সতেজ আরও মসৃণ লাবণ্যে ভরে উঠবে।
...রে ক্সো না র
সাহায্যে স্বাভাবিকভাবে—
• একমাত্র ক্যাডিল* যুক্ত সাবান
"মিস রেক্সোনা"
১৯৫৫ সালের রেক্সোনা
সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতার
শ্রেষ্ঠ সুন্দরী
* ত্বকপোষক ও কোমলতাপ্রদ তৈলসমূহের এক বিশেষ সংমিশ্রণের মালিকানী নাম।
বড় সাইজেও পাওয়া যায়

চিত্রলেখা



[উপন্যাস]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মা

["এ্যানাটোল ফ্রান্স এর 'থায়া' আর আমার 'চিত্রলেখা'র ভিতর সেইটুকু প্রভেদ, যেটুকু প্রভেদ আছে আমার ও এ্যানাটোল ফ্রান্সের ভিতর। 'চিত্রলেখা'র ভিতর আছে এক গভীর সমস্যা। মানব-জীবনের ভাল ও মন্দ দেখবার এক নূতন দৃষ্টিভংগী আমার নিজের, আমার আত্মার নিজস্ব সংগীত।"—লেখক]

শ্বেতাংক জিজ্ঞেস করে, "তাহলে পাপ কি?"

মহাপ্রভু রত্নাম্বর যেন এক গভীর নিদ্রা থেকে চমকে ওঠেন। শ্বেতাংকের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন, "পাপ কি? খুব-ই কঠিন প্রশ্ন বৎস! কিন্তু সংগে সংগে খুব স্বাভাবিক! তুমি জিজ্ঞেস করছ পাপ কি।" এর পর কিছুক্ষণের জন্য রত্নাম্বর কোলাহলময় পাটলিপুত্রের দিকে তাকালেন যেখানে উঁচু-উঁচু আকাশ-ছোঁয়া প্রাসাদগুলো আবছা আলোর রক্তিম আভায় তখনও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। "হ্যাঁ, আমি পাপের অর্থ করবার চেষ্টা বহু বার করেছি কিন্তু কোন সময়েই সফল হ'তে পারিনি। পাপ কি, তার স্থিতিই বা কোথায়, এ সত্যিই খুব কঠিন সমস্যা—যার সমাধান আজ পর্যন্ত করতে পারলাম না। অক্লান্ত পরিশ্রম করে চিন্তার অতল সাগর পাড়ি দিয়েও যার সমাধান করতে পারলাম না, তোমাকে তা কি করে বোঝাব?"

একটু থেমে রত্নাম্বর আবার বলেন, "কিন্তু শ্বেতাংক, যদি তুমি পাপকে জানতেই চাও তাহলে এই মাটির পৃথিবীতেই তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এর জন্য যদি প্রস্তুত থাকো তবে পাপের খোঁজ পেলেও পেতে পার।"

শ্বেতাংক রত্নাম্বরকে প্রণাম করে উত্তর দেয়, "আমি প্রস্তুত আছি, প্রভু!"

রত্নাম্বর বিশালদেবকে জিজ্ঞেস করেন, "আর তুমি—তুমিও কি পাপকে খুঁজে বার করতে চাও?"

বিশালদেব রত্নাম্বরকে প্রণাম করে বলে, "মহাপ্রভুর অনুমান ঠিক!"

রত্নাম্বরের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। "সর্বাগ্রে আমি তোমাদের সারা পৃথিবীতে ঘুরে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার জন্য পাঠাব। পরিস্থিতির সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এই নগরের দু'জন মহানুভব ব্যক্তির সংগে আমি পরিচিত এবং এই কাজে তাঁদের সহায়তা তোমাদের প্রয়োজন। একজন যোগী ও আর একজন ভোগী। যোগীর নাম কুমারগিরি আর ভোগী বীজগুপ্ত নামে পরিচিত। এঁদের জীবন-প্রবাহের সংগে সংগে তোমাদের নিজেদের জীবনও পরিচালিত করতে হবে। দু'জন শিষ্যই একসংগে বলে ওঠে, "আমরা প্রস্তুত।"

"বিশালদেব! তুমি ব্রাহ্মণ এবং পূজা ও আরাধনার প্রতি তোমার আসক্তি আছে, এজন্য কুমারগিরির শিষ্য হওয়াই তোমার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। আর শ্বেতাংক! তুমি ক্ষত্রিয়, পার্থিব জগতের প্রতি তুমি অনুরক্ত, তোমাকে বীজগুপ্তের দাস বা সেবক হ'তে হবে।"

দু'জন শিষ্যই এক সংগে উত্তর দেয়, "আমরা প্রস্তুত।"

"তোমাদের দু'জনার পথই নির্দ্ধারিত হ'ল, এখন ছুটলাম আমি। 'তোমরা আমার জন্য কোন চিন্তা কোর না। জীবনে উপাসনার যতখানি প্রয়োজন হয় ততখানি প্রয়োজন থাকে অভিজ্ঞতার। তোমরা অভিজ্ঞতা আহরণ কর, আমি তপস্যায় রত থাকি। আজ থেকে এক বছর পর ঠিক এই স্থানে তোমরা আমার সংগে দেখা করবে। ঐ সময় আমরা আমাদের নির্দ্ধারিত কার্য্যসূচি অনুসারে চলতে শুরু করব।"

"কিন্তু একটা কথা মনে রাখবে। মনে রাখবে যে অধ্যয়ন দ্বারা যা জানা যায় না, সেই কথা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানবার জন্যই আমি তোমাদের পৃথিবীতে পাঠাচ্ছি। কিন্তু অভিজ্ঞতা অর্জন করতে গিয়ে নিজেদের ভ্রষ্ট করে দিও না। জগতের গতির সংগে সমান তালে পা ফেলে তোমাদের চলতে হবে। ঐ চলার পথে হঠাৎ-আসা কোন আলোর ঝলকানিতে পথভ্রষ্ট না হয়ে পড়, সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবে।"

শ্বেতাংক ও বিশালদেব দু'জনা দু'জনার দিকে তাকায়।

কিছুক্ষণ মৌন থেকে রত্নাম্বর আবার বলতে শুরু করেন, "যে পরিস্থিতির মধ্যে তোমরা যাচ্ছ, তার সংগে আগেই তোমাদের পরিচয় করিয়ে দিই। কুমারগিরি যোগী, তার ধারণা ও অহংকার যে, পৃথিবীর সমস্ত বাসনাকে সে জয় করেছে। সংসারে তার বৈরাগ্য এবং তার মতে সে জাগতিক সুখের আস্বাদ পেয়ে গেছে। তার ভিতর তেজ ও গৌরব আছে, শারীরিক ও মানসিক বলে সে বলীয়ান। লোকেদের মতে আমিত্বকেও সে জয় করে নিয়েছে। কুমারগিরি যুবক কিন্তু যৌবন ও বৈরাগ্য মিলে তার ভিতর এক অলৌকিক শক্তি উৎপন্ন

করেছে। সংযম তার অবলম্বন ও স্বর্গ তার লক্ষ্য। বিশালদেব! এই কুমারগিরি তোমার গুরু হবে।"

"আর শ্বেতাংক! বীজগুপ্ত ভোগী, তার হৃদয়ে যৌবনের উচ্ছ্বাস ও চোখে মত্ততার আবেশ। তার বিরাট অট্টালিকায় ভোগ-বিলাসের প্রাচুর্য্য; রত্নখচিত সুরাপাত্রেই সে জীবনের প্রকৃত সুখ অনুভব করে। ঐশ্বর্য্য ও আনন্দের প্রবাহে সে নিজের জীবনকে দিয়েছে ভাসিয়ে, অর্থের অভাব সে কোন দিনই উপলব্ধি করেনি। এর ওপর তার সৌন্দর্য্য আছে এবং হৃদয় সংসারের কামনা-বাসনা ভরা। তার প্রাসাদের সৌন্দর্য্য লাস্যময়ী নর্ত্তকীর নৃত্যে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ভগবানে কোন বিশ্বাস নেই, বোধ হয় ভগবান সম্বন্ধে কোন দিন কোন চিন্তা সে করেনি। স্বর্গ বা নরকের কল্পনা তার মনে আসে না। ভোগ-বিলাস, আনন্দ-প্রাচুর্য্যই তার জীবনের পাথেয় ও উদ্দেশ্য। শ্বেতাংক, সেই বীজগুপ্তের সেবক তোমাকে হ'তে হবে, রাজী আছ তো?"

"মহাপ্রভুর আদেশ মাথা পেতে নিলাম।" শ্বেতাংক একবার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের কল্পনা করতে থাকে।

"বিশালদেব, তুমিও তো রাজী?"

"মহাপ্রভুর আদেশ মাথা পেতে নিলাম।" যৌবন ও বৈরাগ্যের সংমিশ্রণে যে শক্তির অধিকারী হয়েছে, কুমারগিরি বিশালদেব সেই শক্তির যথার্থ রূপকে জানবার চেষ্টা করে।

"তাহলে তাই হ'ক।" এই বলে রত্নাম্বর উঠে দাঁড়ালেন। পরের দিন কুটীরে কা'কেও দেখা গেল না। গুরু তখন সাধনার শুক ভূমিতে আর শিষ্যেরা বেরিয়ে পড়েছে অসীম জগতের মাঝে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপছে-ওঠা সুরার পাত্র চিত্রলেখার অধরে ছুঁইয়ে নিয়ে বীজগুপ্ত বলে, "চিত্রলেখা! বলতে পারো জীবনের সুখ কি?"

চিত্রলেখার অর্দ্ধনিমীলিত নয়ন তখন মাদকতায় ছিল ভরা আর রক্তিম কপোলে ছিল আনন্দের ছটা। যৌবনের উচ্ছ্বাসে তার সৌন্দর্য্য আরও পড়েছিল ছড়িয়ে। আলিংগন-পাশে সারা দেহ কামনায় হয়ে উঠেছিল উন্মুখ। চিত্রলেখা সুরাপাত্রে একটি চুমুক দিয়ে মৃদু হাসতে থাকে। এক মুহূর্ত্তের জন্য তার অধর বীজগুপ্তের অধরের সংগে মিলে মৌন ভাষায় কিছু বলে নেয়, তার পর কোমল স্বরে উত্তর দেয় 'মাদকতাই জীবনের প্রকৃত সুখ।"

ঐ সময়ে প্রায় অর্দ্ধরাত্রির সমাপ্তি হয়েছে। বীজগুপ্তের প্রাসাদ শত শত আলোকে উদ্ভাসিত আর দ্বারে সানাই এক-টানা বাজিয়ে চলেছে বেহাগের সুর। প্রমোদ-ভবনে সেনাপতি বীজগুপ্ত নগরের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর সংগে যৌবনোন্মাদনার ক্রীড়ায় রত এবং বাইরে সমস্ত পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

বীজগুপ্ত হেসে ওঠে—"ভাবছি, যৌবনের শেষে কি আছে?"

চিত্রলেখাও হেসে ওঠে কিন্তু সে হাসি অল্পক্ষণ পরেই মিলিয়ে যায়। হঠাৎ-ই সেই মধুর ও আনন্দে-ভরা হাসি-বেদনায় ভরা গভীরতায় পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়। বোধ হয় সে-ও এক দিন এই একই প্রশ্নের উত্তর পাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু এখন এই ভীষণ প্রশ্ন সম্বন্ধে মুহূর্ত্ত চিন্তা করাও তার পক্ষে অসম্ভব। চিত্রলেখার মাথা ঘুরে ওঠে এবং তার পর দুঃখের একমাত্র সান্ত্বনাদায়ক সুরাপাত্রে নিজেকে নিবিষ্ট করে সে সব কিছু ভুলে যায়। আজ হঠাৎ আবার সেই প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে—"জীবন থেকেও সে হবে মৃত্যুর সমান!"

"জীবন থেকেও হবে মৃত্যু! না: এ একেবারে অসম্ভব। যৌবনের শেষ হবে এক অজানা অন্ধকারে, আর সেই অজ্ঞাত অন্ধকারে যে কি লুকিয়ে আছে তা আমি জানি না, জানবার কোন ইচ্ছেও আমার নেই। অতীত এবং ভবিষ্যৎ এ দুই কল্পনা-সাপেক্ষ, আমাদের কোন প্রয়োজন নেই এতে, বর্ত্তমান আমাদের সামনে, আর সে......" বলতে বলতে বীজগুপ্ত হঠাৎ থেমে যায়। বোধ হয় পরের শব্দগুলোকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে।

"আর সে হ'ল আনন্দ-বিলাস, পৃথিবীর সমস্ত সুখ এইখানে, যৌবনের মূলতত্ত্বও এইখানে নিহিত।" চিত্রলেখা হাসতে হাসতে বাক্য সম্পূর্ণ করে দেয়।

বীজগুপ্ত চিত্রলেখাকে আলিংগন-পাশে আবদ্ধ করে বলে, "তুমি আমার মাদকতা!"

চিত্রলেখা উত্তর দেয়, "আর তুমি আমার উন্মাদনা!"

চিত্রলেখা একজন নর্ত্তকী, কোন বারাংগনা নয়। পাটলিপুত্রের একজন অসামান্যা সুন্দরীর পক্ষে গণিকাবৃত্তি গ্রহণ না করা সত্যই অসম্ভব কিন্তু এর কারণ ছিল এবং সে কারণের সংগে তার গত জীবনের গভীর সম্বন্ধ নিহিত।

চিত্রলেখা ব্রাহ্মণ-বিধবা। আঠার বছর বয়সেই সে বিধবা হয়। বিধবা হবার পর সংযম করা তার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ রকম ভাবে সে বেশী দিন কাটাতে পারলে না। একদিন তার জীবনে কৃষ্ণাদিত্য এসে উপস্থিত হ'ল। কৃষ্ণাদিত্য ক্ষত্রিয় কিন্তু এক শূদ্রার গর্ভে তার জন্ম হয়েছিল। নবযুবক কৃষ্ণাদিত্যের পৌরুষের ভিতর এক আকর্ষণ ছিল। চিত্রলেখার তপস্যা ভেঙ্গে দিল এই কৃষ্ণাদিত্য।

চিত্রলেখার পিষ্ট যৌবন বিকশিত হয়ে ওঠে, বৈরাগ্যের শক্তি উল্লাসের দীপ্তির কাছে পরাজিত হয়। তার জীবনের ধারাই যায় বদলিয়ে। কৃষ্ণাদিত্য চিত্রলেখার কাছে প্রতিজ্ঞা করে "যত দিন পর্য্যন্ত আমরা বেঁচে থাকব দু'জনা একসংগে থাকব, কোন শক্তি আমাদের দু'জনাকে পৃথক করতে পারবে না।" চিত্রলেখা কৃষ্ণাদিত্যের অঙ্গীকারপূর্ণ বিশ্বাস মেনে নেয়। এর পর যা হয়ে থাকে তাই হ'ল।

চিত্রলেখা সন্তানসম্ভবা হয়। গোপন প্রেমের কথা সবাই জেনে যায়। কৃষ্ণাদিত্যের পিতা কৃষ্ণাদিত্যকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দেন এবং চিত্রলেখাও ঘর থেকে হয় বিতাড়িতা। ধনীর সন্তান কৃষ্ণাদিত্য গর্ভবতী সুন্দরী স্ত্রী নিয়ে ভিখিরীর মত সংসার-প্রাংগনে বেরিয়ে পড়ে। পরিত্যক্ত যুবকের পক্ষে সমাজের এই ভৎর্সনা এই রূঢ় ব্যবহার অসহ্য মনে হয়, একদিন এই লাঞ্ছিত অপমানিত জীবনের অপেক্ষা শ্রেয়ঃ মৃত্যুকে সে বরণ করে নেয়। চিত্রলেখা বেঁচে থাকে, এক নর্ত্তকীর কাছে সে কোনও রকমে একটু আশ্রয় পায়।

চিত্রলেখার একটি ছেলে হয় কিন্তু জন্মাবার সংগে সংগে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। তার গলা ছিল মিষ্টি আর দেহের গঠনও ছিল অদ্ভুত সুন্দর। যে নর্ত্তকী তা'কে আশ্রয় দেয় সেই

তা'কে নৃত্য ও সংগীতকলা শেখায়। এর পর সে নর্তকীর জীবন গ্রহণ করে। ভোগ-বিলাসে তার কিন্তু মন লাগে না, কারণ সে আর একবার বৈধব্যের সংযম পালন করতে চেষ্টা করে। কৃষ্ণাদিত্য ও কৃষ্ণাদিত্যের ছেলে দু'জনাই চিত্রলেখার জীবনে এসে মুক্তি নিয়ে চলে যায় কিন্তু তাদের স্মৃতি চিত্রলেখা কিছুতেই ভুলতে পারে না।

পাটলিপুত্রের অধিবাসিগণ এই সুন্দরীকে পাবার জন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত কিন্তু সে আপন সংযম-শক্তির দ্বারা সবাইকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। নগরের বড় বড় কর্মচারিগণ তাকে প্রেমিকার রূপে পাবার জন্ত পাগল হয়েছিল কিন্তু কেউ-ই তাকে পায়নি। সেই অসামান্তা সুন্দরী সবার সামনে দিয়ে বিদ্যুতের মত এক ঝলক দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেত। তার এমনই সৌন্দর্য্য ছিল যে, যে একবার তাকে দেখত, তার মনে তাকে আর একবার দেখবার বাসনা জেগে থাকত।

একদিন বীজগুপ্ত চিত্রলেখার নাচ দেখতে যায়। নৃত্যরত অবস্থায় চিত্রলেখা বীজগুপ্তকে দেখতে পায়—বীজগুপ্তকে দেখে সে চমকে ওঠে। তার মনে হয় যেন কৃষ্ণাদিত্য স্বর্গ থেকে তার নাচ দেখতে নেমে এসেছে। চিত্রলেখা নাচ বন্ধ করে দিয়ে নিজের ও চারিপার্শ্বের জনতার কথা ভুলে গিয়ে বীজগুপ্তের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। বীজগুপ্ত যুবক, বয়স বছর পঁচিশের বেশী নয়। চিত্রলেখার অনুপম সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে সে-ও তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। এ রকম আচমকা নাচ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সমস্ত জনতার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে বীজগুপ্তের ওপর, হঠাৎ তারা বলে ওঠে, "আরে, এ যে বীজগুপ্ত!"

এই কথা শুনে চিত্রলেখা নিজের ভুলে অনুতপ্ত না হয়ে রাগে জ্বলতে থাকে। বীজগুপ্তের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে আবার নাচতে শুরু করে। নাচ শেষ হবার পর বীজগুপ্ত চিত্রলেখার কাছে গিয়ে বলে, "আবার কি কখনও আপনার দেখা পেতে পারি?"

নর্তকী বীজগুপ্তের দিকে তাকিয়ে হেসে ওঠে—"না, আমি কারুর সংগে দেখা করি না। আমি শুধু জনতার সামনে এসে দাঁড়াই, কোন বিশেষ ব্যক্তির সংগে আমার কোন সম্বন্ধ নেই।"

এক মুহূর্তে বীজগুপ্তের আশা যেন কোথায় উড়ে যায়, আনন্দ-ভরা মুখে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসে। তবুও সাহস করে আবার

জিজ্ঞেস করে, "ব্যক্তির থেকেই তো সমষ্টির সৃষ্টি, সমষ্টির পিপাসা প্রত্যেক ব্যক্তির পিপাসা থেকে উদ্ভূত, তাহলে এ প্রভেদ কেন ?"

"প্রভেদের কথা যখন বললেন, তাহলে" শুনুন। যাকে জন-সমাজের উল্লাস বলে থাকি-আমরা, সেটা ব্যক্তিদের ক্রন্দনের পুঞ্জীভূত দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। যারা দুর্বল তাদেরই হতাশ্বাস একত্রিত হয়ে জনসমুদায়ের বিদ্রোহের রূপ দিতে পারে। এবং সংগে সংগে যেখানে সমষ্টি থেকে কোন ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই সেখানে ব্যক্তিবিশেষের আমিত্ব শুধু উৎপন্ন করে।

বীজগুপ্ত নর্তকীর কাছে প্রেমের কথা বলতে গিয়েছিল, দর্শন-শাস্ত্রের তর্ক করতে নয়—কাজেই সে বলে "তাহলে ধরে নেব যে আমার জন্ত আপনার দরজা বন্ধ, কেমন ?"

নর্তকী আগের মত গম্ভীর ও শুষ্ক ভাবে উত্তর দেয়, "ব্যক্তির জন্ত ? হ্যাঁ ! কিন্তু ব্যক্তি যদি সমষ্টির এক অংশ হয় তবে কোন মানা নেই !"

নিরাশার হাল্কা হাসি বীজগুপ্তের মুখের ওপর দেখা যায়, "জীবনে ব্যক্তিত্বই আসল জিনিষ এবং সমষ্টির সৃষ্টি ব্যক্তি থেকেই হয়।" এই বলে সে তীরবেগে ওখান হতে প্রস্থান করে। বীজগুপ্ত চিত্রলেখার হৃদয়ে একটা আলোড়ন তুলে দিয়ে চলে যায়।

তারপর কত দিন কেটে যায় কিন্তু নর্তকী সেই যুবকটিকে আর দেখতে পায় না। কৃত্রিম উপেক্ষা ধীরে ধীরে মন থেকে দূর হয়ে যায় এবং বীজগুপ্তের স্মৃতি চিত্রলেখার হৃদয়ে প্রবল হয়ে ওঠে। প্রতিদিন নৃত্য-ভবনে বসে সে জনতার মাঝখানে বীজগুপ্তকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে কিন্তু প্রতিবারই শেষ পর্য্যন্ত তাকে নিরাশ হতে হয়।

কত চেষ্টা করেও সে মনের ইচ্ছাকে কোন মতেই দমন করে রাখতে পারলে না। একদিন দাসীকে জিজ্ঞেস করে বসে, "এই নগরে বীজগুপ্ত নামে কোন ব্যক্তি থাকে ?"

দাসী উত্তর দেয় "বীজগুপ্তকে কে না জানে ? সে তো এই নগরের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও প্রতাপশালী যুবক সেনাপতি।"

চিত্রলেখা একখানি চিঠি দাসীর হাতে দিয়ে সেনাপতি বীজগুপ্তের কাছে পৌছিয়ে দিতে বললে।

দাসী সেনাপতিকে চিঠিখানি দিয়ে আসে। চিঠিতে লেখা

ছিল "অনেক ভাববার পর চিত্রলেখা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে শুধু একজন ব্যক্তি তার সংগে দেখা করতে পারে আর সে হচ্ছে বীজগুপ্ত।" চিঠি পড়ামাত্র আনন্দে বীজগুপ্তের সারা দেহ একবার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। সেই দিন থেকেই বীজগুপ্ত ও চিত্রলেখার মিলন হয়—কিন্তু তবুও চিত্রলেখা কোন বারাংগনা ছিল না।

বীজগুপ্ত হেসে বলে "মাদকতা ও উন্মাদনা কখনও কি একে অপরকে ছেড়ে থাকতে পারে? চিত্রলেখা, আমরা দু'জনা কত সুখী।" ঐ সময় চিত্রলেখাও হাসছিল।

হঠাৎ সানাই বাজা বন্ধ হয়ে যায়, প্রহরী উচ্চৈঃস্বরে বলে, "দ্বারে অতিথি উপস্থিত, তাদের কি ভিতরে নিয়ে আসব?"

বীজগুপ্ত আলিংগন-পাশ শিথিল করে দেয়, চিত্রলেখা সামলিয়ে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে বসে। বীজগুপ্ত পরিচারিকাকে বলে "হ্যাঁ, অতিথিদের এখানে নিয়ে এসো।" এই বলে সুরাপাত্রের শেষ বিন্দুটুকু নিঃশেষ করে দেয়।

অর্দ্ধরাত্রিতে কে এমন অতিথি আসতে পারে, বীজগুপ্ত তাই চিন্তা করছিল। শ্বেতাংককে সংগে নিয়ে বীজগুপ্তের প্রমোদগৃহে রত্নাম্বর প্রবেশ করলেন। রত্নাম্বরকে দেখে বীজগুপ্ত সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত করে, চিত্রলেখা মাথা নীচু করে নেয়।

প্রমোদগৃহের চারি দিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে রত্নাম্বরের দৃষ্টি চিত্রলেখার ওপর গিয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ থেমে রত্নাম্বর বলেন, "নগরের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী ও পবিত্র নটী অর্দ্ধরাত্রিতে বীজগুপ্তের প্রমোদ-ভবনে? আশ্চর্য্য লাগছে।" এই বলে রত্নাম্বর আসনে উপবেশন করলেন। শ্বেতাংক দাঁড়িয়ে থাকে।

বীজগুপ্ত রত্নাম্বরকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, সে জিজ্ঞেস করে "এই দীন ভৃত্যের ঘরে মহাপ্রভুর আগমন?"

রত্নাম্বর হেসে ওঠেন, "বীজগুপ্ত! আজ তোমাকে সব কথা স্পষ্ট করেই বলব। আজ আমার এই শিষ্য প্রশ্ন করে যে, পাপ কি? আমি এর উত্তর দিতে অক্ষম! তুমি আমাকে সাহায্য কর। তুমি একদিন আমার শিষ্য ছিলে, কখনও গুরু-দক্ষিণা চাইনি। পাপের খোঁজ করবার জন্য ব্রহ্মচারীর কুটির উপযুক্ত স্থান নয়, সংসারের ভোগ-বিলাসের মধ্যে পাপের খোঁজ পাওয়া যাবে। তাই আমি তাকে তোমার সেবকরূপে উপস্থিত করছি। আমার ইচ্ছা যে তুমি ওকে তোমার সেবকরূপে গ্রহণ কর। হ্যাঁ, তুমি ওকে তোমার গুরুভাই বলেও স্বীকার করতে পার।"

বীজগুপ্ত মাথা নত করে বলে, "মহাপ্রভুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য।"

"আচ্ছা! আমি তবে যাই, আমার কর্ত্তব্য শেষ হয়েছে। শ্বেতাংক, মনে রেখ যে, বীজগুপ্ত তোমার প্রভু এবং তুমি তার সেবক। এই ঐশ্বর্য্য ভোগ কর ও তার মাঝে পাপকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা কর। ভাল-মন্দ সব কিছুরই সম্মুখীন হবে তুমি, কিন্তু শুধু মনে রেখ যে, যা তোমার কাছে ভাল হবার সংগে সংগে অপরের কাছেও ভাল সেই তোমার জন্য ভাল। আর বীজগুপ্ত! তোমাকে শুধু এইটুকু বলবার আছে যে শ্বেতাংকের সব দোষ ক্ষমা করে দিও, ও এখন অনভিজ্ঞ, সংসারে ওর এই প্রথম পদার্পণ।" এই বলে বীজগুপ্তের প্রমোদ-গৃহ থেকে রত্নাম্বর প্রস্থান করলেন।

রত্নাম্বর চলে যাবার পর বীজগুপ্ত শ্বেতাংককে নিবিষ্ট ভাবে দেখতে থাকে। "তোমার নাম শ্বেতাংক? আর আজ থেকে তুমি আমার সেবক হলে।" বীজগুপ্তের মুখে হাসি খেলে যায়। চিত্রলেখার দিকে ইংগিত করে বীজগুপ্ত বলে, "শ্বেতাংক, ইনি কে জান?"

রাত্রির আলোয় ঝলমল সুসজ্জিত প্রমোদ-ভবনে চিত্রলেখার মোহিনী রূপ দেখে শ্বেতাংক স্তব্ধ হয়ে যায়। সে নম্র ভাবে বলে, "না!"

"তাহলে শোন! এঁর নাম চিত্রলেখা, পাটলিপুত্রের সর্বাপেক্ষা সুন্দরী এবং আমার পত্নীর সমান। তাই ইনি তোমার প্রভুপত্নী।" বীজগুপ্ত হেসে ওঠে। "তোমার বোধ হয় খুব আশ্চর্য্য লাগছে! কিন্তু আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই। এখানে থাকতে থাকতে এখানকার পরিস্থিতি তোমার সহ্য হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই সুরাপাত্র তোমার প্রভুপত্নীকে দাও।" এই বলে সুগন্ধ মদিরায় পূর্ণ স্বর্ণপাত্র শ্বেতাংকের হাতে তুলে দেয়।

শ্বেতাংক পানপাত্রটি চিত্রলেখার দিকে এগিয়ে দেয়। পানপাত্র নেবার সময় চিত্রলেখার হাতের সংগে শ্বেতাংকের হাত ছুঁয়ে যায়। এই স্পর্শে শ্বেতাংকের সমস্ত শরীর কেঁপে ওঠে। চিত্রলেখা শ্বেতাংকের দিকে তাকায়। "নবযুবক, এই সুন্দর জগতে তোমার প্রথম বার আগমন হেতু অভিনন্দন জানাচ্ছি।" এই বলে সে পানপাত্রটি নিঃশেষ করে ফেলে।

ঐ সময় প্রহরী উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠে—"শয়নের সময় উপস্থিত।" বীজগুপ্ত চিত্রলেখাকে জিজ্ঞেস করে, "এখানেই থাকবে না নিজের ঘরে ফিরবে?"

চিত্রলেখা উঠে দাঁড়ায়। দরজার দিকে এগিয়ে এসে বলে, "এ-হেন সময় নিজের বাড়ী যাওয়াই সমীচীন। কিন্তু বোধ হয় একলা যেতে পারব না—" ঐ সময় চিত্রলেখার পা টলছিল।

পরিচারিকা প্রমোদ-ভবনে প্রবেশ করে। বীজগুপ্ত উঠে দাঁড়ায়, "হ্যাঁ, এখন সত্যি একলা যাওয়া উচিত হবে না।"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে বীজগুপ্ত শ্বেতাংককে বলে, "দ্বারে রথ প্রস্তুত আছে। তুমি তোমার প্রভুপত্নীকে তার নিজের গৃহে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস। ঐ সময়ের ভিতর তোমার শোবার ঘরের বন্দোবস্ত হয়ে যাবে।"

শ্বেতাংক চিত্রলেখার সংগে চলে যায়। পরিচারিকাকে শ্বেতাংকের শোবার ঘরের বন্দোবস্ত করে দিতে বলে বীজগুপ্ত শুতে চলে যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কুমারগিরি যোগী।

যোগী? হ্যাঁ, কেন না সে সংসারের সব কিছু ত্যাগ করেছে। কিন্তু কেন? বোধ হয় কোন কাল্পনিক জগৎ পাবার জন্য আর সে শুধু এই আশায় যে, সেই জগতে থাকবে প্রকৃত সুখ ও আনন্দ। কোলাহলময় প্রাঙ্গণ তার ভাল লাগে না, কল্পনা তার বিচরণের একমাত্র ক্ষেত্র। সংযম ও নিয়ম—এই দুই-এর ওপর তার আস্থা, ইচ্ছার ওপর তার পূর্ণ অধিকার।

যোগী কুমারগিরি শক্তিরও অধিকারী। কিন্তু শক্তি-প্রয়োগ অপেক্ষা শক্তি-সঞ্চয়ের ভিতর সে পায় বেশী আনন্দ। নির্জনকে সে বেশী ভালোবাসে, কেন না সেখানে তার মন স্থির থাকে ও একাগ্রচিত্তে কোন বিষয়ে চিন্তাও করতে পারে। বাসনা-কামনাকে সে পূর্ণ ভাবে জয় করেছে। কারণ তার মতে বাসনার পূর্তির জন্যই মানুষ পাপ করে।


প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY
BRAND
PEARL
BARLEY
LILY BARLEY MILLS LIMITED
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY
BRAND
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

যোগী কুমারগিরি সুখী। চিন্তাসাগরে সে ডুবে থাকে, ইচ্ছার পূর্ত্তির জন্ত তার কোন চেষ্টা নেই বা কোন অনুতাপ করে না। জীবনের অসারতা সে জ্ঞান ও বিচার দ্বারা উপলব্ধি করে। সুখ কেবলমাত্র এক কল্পনা—এক তৃপ্তি! পিপাসা না থাকার কারণে তৃপ্তির বাস্তবিক রূপ হয়ত নেই কিন্তু এমন অবস্থায় হৃদয়ে কোন স্বাদ থাকে না এবং বেদনায় আঘাতকে না জানাই যেন সে সময় মর্মান্তিক হয়ে দাঁড়ায়। তার কারণ দুঃখই শূন্ত বা হাল্কা মনকে কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে পারে। তাই বিস্মৃতির জগতে কুমারগিরি তার বাসস্থান নির্মাণ করেছে। আত্ম-বিস্মৃতি ও প্রাণবন্ত কল্পনার ভুল—এই দুইএর ভিতর এক অদ্ভুত আনন্দের অনুভব হয়। একটা কাল্পনিক ইচ্ছা এবং একটা কাল্পনিক তৃপ্তি—এই দুই কল্পনা-প্রসূত সুখেতেই যোগী কুমারগিরি বিভোর! মধুপাল যোগী কুমারগিরির শিষ্য। মধুপাল কুমারগিরির শক্তির সংগে পরিচিত ও সেই শক্তিকে যথেষ্ট সম্মান করে।

মধুপাল জিজ্ঞেস করে, "প্রভু, সংযমের লক্ষ্য কি?"

কুমারগিরি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, "শান্তি। এবং শান্তি-জনিত আনন্দ।

মধুপাল আবার জিজ্ঞেস করে, "প্রভু সংসারের সত্যিকারের গতি কি?"

"বাইরের দৃষ্টিতে পরিবর্ত্তন ও অন্তরের দৃষ্টিতে শূন্ত। শূন্ত এবং পরিবর্ত্তন এদের বিচিত্র যোগাযোগ তোমার হয়ত আশ্চর্য্য লাগবে—এরা দুই এক কি প্রকারে হতে পারে এ প্রশ্নও স্বাভাবিক! কিন্তু ঐ অবস্থান জ্ঞানের শেষ সোপান যেখানে মানুষ পরিবর্ত্তন ও শূন্তের ভেদাভেদের ঊর্দ্ধে চলে যায়। সংসার কি? এক শূন্ত, মহাশূন্ত। পরিবর্ত্তন সেই শূন্তের গতি। পরিবর্ত্তন এক কল্পনা, এবং কল্পনা স্বয়ং এক শূন্ত। বুঝতে পারলে?"

এই উত্তরে মধুপাল সন্তুষ্ট হ'ল না। "প্রভু, আপনি বললেন যে সংসার শূন্ত। এই কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। যে বস্তুকে আমরা প্রত্যক্ষ দেখতে পাই তাকে কি ভাবে শূন্ত আখ্যা দেওয়া যায়?"

কুমারগিরি হেসে ওঠে, "তাই তো যোগের প্রয়োজন হয়। যে সময় যোগী চোখ বন্ধ করে নেয় তখন এক অখণ্ড শূন্ত ছাড়া সে আর কিছুই দেখতে পায় না। সেই মহাশূন্তে সুখ-দুঃখ, অনুরাগ-বিরাগ, দিন-রাত, ব্রহ্ম-মায়া সব লুপ্ত হয়ে যায়। এক আলোকময় শূন্তে সে বিচরণ করে এবং তার ভিতরই সে লীন হয়ে যায়। যেখান থেকে তার সৃষ্টি হয়েছে এই কাল্পনিক জীবনের কয়েক মুহূর্ত্তের জন্ত সেখানেই সে মিশে যায়। এবং ব্রহ্মের সংগে যুক্ত এই শূন্তেতে চিরকালের মত মিশে যাওয়াকেই মুক্তি বলে। এই ভাবে যোগী এই শরীরের সংগে মুক্তিকে অনুভব করতে পারে।"

গুরুর প্রতি মধুপালের ভক্তি বেড়ে যায়। ভাবে গদগদ হয়ে সে গুরুকে প্রণাম করে। গুরুর অখণ্ড জ্ঞানে সে গর্ব অনুভব করে এবং অত্যাত্মবাদী গুরুর ওপর তার বিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। ঠিক সেই সময় বিশালদেবকে সংগে নিয়ে রত্নাম্বর কুমারগিরির কুটিরে প্রবেশ করলেন।

রত্নাম্বরকে সামনে দেখে কুমারগিরি উঠে দাঁড়ায়। দু'জনা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। তারপর রত্নাম্বরকে উপবেশন করতে বলে জিজ্ঞেস করে, "এই দরিদ্রের কুটিরে আচার্য্যের পদার্পণের কারণ জানতে পারি কি?"

গম্ভীর ভাবে রত্নাম্বর উত্তর দেন, "প্রচণ্ড তেজোদীপ্ত কুমারগিরির নিকট আমার শিষ্যকে দীক্ষিত করবার জন্তই আমার এখানে আসা!"

কুমারগিরি উত্তর দেয় "আচার্য্য, এই তুচ্ছ সেবককে আপনি এক মহান স্থান প্রদান করছেন এবং আমি তার একেবারে অযোগ্য।"

"না, যোগী কুমারগিরি! এ তোমার বিনয়। তুমি সত্য-সত্যই শ্রেষ্ঠ। তুমি এখন পার্থিব জগতের অনেক ঊর্দ্ধে এবং আমি এখনও সংসারের সংগে জড়িত। যেখানে কোন সমস্যার সমাধান করা শুধু তর্কের দ্বারা সম্ভব হয়'না, সেখানে অনুভূতি ও কল্পনার প্রয়োজন হয়। তোমার মধ্যে জ্ঞান ও কল্পনা দুই আছে, আমার মধ্যে কেবল অনুভূতি। তাই তোমার কাছে আমাকে আসতে হয়েছে। তোমার সংগে থেকে মানব-জীবনের কঠিন ও কঠিনতর প্রশ্নের সমাধানে আমার শিষ্য নিশ্চয় সফল হবে। বিশালদেবকে তুমি তোমার শিষ্যরূপে গ্রহণ কর। যোগী কুমার-গিরি, তুমি আমার অনুরোধ নিশ্চয় রাখবে ও আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করবে।"

কুমারগিরি বিশালদেবের দিকে তাকিয়ে বলে, "জীবনের কোন সমস্যার সমাধানের জন্ত আমার কাছে আসার প্রয়োজন হ'ল?"

অভিবাদন করে শান্তস্বরে বিশালদেব উত্তর দেয়, "দেব! আমি জানতে চাই যে পাপ কি?"

কুমারগিরি এক মধুর হাসি হেসে বলে, "তুমি জানতে চাইছো পাপ কি! কিন্তু পাপ কি, এ প্রশ্নের উত্তর কেবল অনুভূতির দ্বারা পাওয়া যেতে পারে এবং আমার সংগে থেকে তো তুমি পাপকে অনুভব করতে পারবে না। আমার কর্মক্ষেত্র সংযম ও নিয়মের গণ্ডীতে আবদ্ধ। তুমি তো জানো যে পাপ সংযম ও নিয়মের বহুদূরে অবস্থান করে। আচার্য্য অনুরোধ জানিয়েছেন যে, তোমাকে যেন শিষ্যরূপে গ্রহণ করি। শিষ্যরূপে গ্রহণ করার পূর্বে তোমাকে ও আচার্য্যকে আমার বলে দেওয়া কর্ত্তব্য যে, তোমাকে আমি পুণ্যের সত্যিকারের রূপ দেখাব ও পুণ্যের সম্যক উপলব্ধি দ্বারাই তুমি পাপকেও জানতে পারবে।"

কুমারগিরির কথাগুলো শুনে রত্নাম্বর মনে মনেই হাসতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন, "যোগী কুমারগিরি! তুমি এইমাত্র যা কিছু বললে সবই ঠিক। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ বিষয়ে দ্বিমত হবে না।"

"তাহলে আচার্য্যের অনুরোধ স্বীকার করছি?"

রত্নাম্বর উঠে দাঁড়ান। "আচ্ছা, যোগী কুমারগিরি, এবার তাহলে আমি যাই। তোমা'র বোধ হয় আশ্চর্য্য লাগবে যে আমি নিজেই জানি না যে পাপ কি। বছরের পর বছর এ বিষয়ে কত অধ্যয়ন করেছি, কত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি কিন্তু এর পূর্ণ জ্ঞান আজও পর্য্যন্ত লাভ করতে পারলাম না। আপন শিষ্যদের যোগ্য ব্যক্তির হাতে সমর্পণ করে গেলাম, এখন আমি কিছুদিন তপস্যা করবার বাসনা করি। আমি দেখতে চাই যে, যে বিষয় জ্ঞান অধ্যয়ন বা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানতে সক্ষম হইনি, তাকে আরাধনা ও সাধনা দ্বারা জানা যায় কি না।"

এই বলে রত্নাম্বর সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। মহাপ্রভু রত্নাম্বর চলে গেলে কুমারগিরি বিশালদেবকে বসতে ইশারা করলে।

"বৎস! তুমি আজ থেকে আমার শিষ্য হলে। এখন তোমার নিকটে কিছু প্রশ্নের উত্তর আশা করি। তুমি জানো বাসনা কি?"

বিশালদেব উত্তর দেয়—"প্রভু, ইচ্ছার অপর নাম বাসনা"।

"ঠিক! তুমি ঠিক উত্তর দিয়েছ। কিন্তু মানুষের জীবনে বাসনার স্থান কি"? কুমারগিরি জিজ্ঞেস করে, "বোধ হয় জান না! সেই কথা আজ তোমাকে বলব। বাসনাই পাপ, জীবনকে কলুষিত করার একমাত্র অবলম্বন। বাসনার তাড়নায় মানুষ ঐশিক নিয়ম ভংগ করে এবং তার ভিতর ডুবে গিয়ে নিজেকে ও নিজের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ব্রহ্মাকে পর্য্যন্ত ভুলে যায়। তাই বাসনা সর্বথা পরিত্যাজ্য। যদি মানুষ ইচ্ছাকে ত্যাগ করতে পারে তাহলে সে অনেক উর্দ্ধে উঠতে পারে। ঈশ্বরের তিনটি গুণ—সৎ, চিৎ ও আনন্দ। বাসনা-রহিত মন-ই এই তিন গুণের অধিকারী হতে পারে। কিন্তু বাসনা থাকা সত্ত্বেও আমিত্বে তার প্রভাব সবচেয়ে প্রধান, আমিত্বরূপী মায়াজাল থাকবার জন্ত এই দুইএর কোনটির ওপরেই অধিকার প্রাপ্তি সম্ভব হয় না। বিশালদেব! আমার শিষ্যরূপে তোমার প্রথম কাজ হবে বাসনা ত্যাগ করা ও মনকে শুদ্ধ করা। এ এক তপস্যা, কিন্তু এ তপস্যাতে দুঃখ নেই। ইচ্ছাকে দমন করা উচিত নয়, মনে কোনরূপ ইচ্ছা জাগানোই অন্যায়। যদি একবার মনে কোন ইচ্ছা জাগে তো সে ক্রমেই প্রবল-রূপ ধারণ করে। এজন্ত চিরকালের মত ইচ্ছাকে মেরে ফেলাই উচিত। বল, পারবে তো"?

বিশালদেব উত্তর দেয়, "প্রভু! আপনার আদেশ মত চলবার চেষ্টা করবো। পারব কি না বলতে পারি না। আপনার প্রদর্শিত পথ খুবই সুগম, কিন্তু, একটা কথা বলতে চাই। বাসনাকে মেরে ফেলা জীবনের সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে নয় কি? মানুষ জন্মায় কেন? কাজ করবার জন্ত। কাজ করবার অবলম্বনকে সরিয়ে দেওয়া ভগবানের বিধানের বিপরীত যাওয়া নয় কি? প্রভু, যখন এ বিষয়ে আপনি আমার ভ্রম দূর করে দেবেন সেই সময়ে আপনার প্রদর্শিত পথে চলব"।

সম্ভবতঃ বিশালদেবের কাছ থেকে এরকমই একটা উত্তর পাবার জন্ত কুমারগিরি অপেক্ষা করছিল। সে বললে, "তুমি সত্যই বলেছ বিশালদেব, এখন তোমার ওপর অন্য এক গুরুর প্রভাব আছে। সেই প্রভাব দূর করে আমাকে আমার নিজের প্রভাব বিস্তার করতে হবে তোমার ওপর। আমি তোমার ভ্রম দূর করে দেব, কিন্তু আজ নয়। ভ্রান্ত গুরু-শিষ্যের ভ্রান্তি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিশালদেব, একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি। আচার্য্য রত্নাম্বরের চিন্তাধারা কিছু পরিমাণে নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকে আছে। আমি একজন আস্তিক। তুমি যাতে আমার কাছ থেকে কিছু শিখতে পার তার জন্ত তোমাকে দুটো জিনিষ মনে রাখতে হবে। প্রথম হ'ল যে 'ব্রহ্ম' আছে এবং দ্বিতীয়টি হ'ল যে 'কর্ত্তব্য' জীবনের প্রধান অংগ।" বিশালদেব উত্তর দেয় "প্রভু, এ দু'কথাই আমি মানি"। কুমারগিরি উঠে দাঁড়াল। "এবার নিশ্চিন্ত হলেন। আমি তোমাকে দীক্ষা দেব ও মুক্তির পথ দেখিয়ে দিয়ে পাপের সংগে পরিচয় করিয়ে দেব"।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বেতাংক ব্রহ্মচারী। অনুভব-হীন অধ্যয়ন তার জীবনের মার্গ জ্ঞানই ও একমাত্র লক্ষ্য। তার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি কিন্তু এই বয়সেই দর্শন ও স্মৃতির অধ্যয়ন তার শেষ হয়ে গেছে, ব্যাকরণ ও সাহিত্যের অধ্যয়নও তার প্রায় শেষ। কাব্যেতে প্রেমের বর্ণনা সে বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়েছে, বোঝবার চেষ্টাও করেছে কিন্তু বুঝতে পারেনি। স্ত্রীলোককে সে বুঝতে পারে না, যৌবনের মাদকতার সংগেও তার পরিচয় নেই।

ব্রহ্মচারী শ্বেতাংক বীজগুপ্তের প্রাসাদে প্রথম নর্ত্তকী চিত্রলেখাকে দেখে যে সময় বীজগুপ্ত শ্বেতাংকের সংগে চিত্রলেখার পরিচয় করিয়ে দেয় তখন বীজগুপ্ত শুধু হেসেছিল। অবস্থার পর্য্যালোচনা করে বীজগুপ্তের মনে কৌতূহলের উদ্রেক হয়। এক দিকে ব্রহ্মচারী আর এক দিকে নর্ত্তকী—এই বিচিত্র মিলনে সেনাপতি সেদিন হেসেছিল।

কিন্তু শ্বেতাংকের জীবনে বীজগুপ্তের হাসি একটা আলোড়ন জাগিয়ে দেয়। প্রায় রোজ-ই রাত্রে শ্বেতাংককে চিত্রলেখার সংগে তার বাড়ী পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসতে হয়। ঐ সময় চিত্রলেখা নেশায় বিভোর থাকে। চিত্রলেখার পাগলকরা চোখ শ্বেতাংকের হৃদয়ে এক প্রকারের কম্পন জাগিয়ে দেয়। স্ত্রী আর সুরা—নর্ত্তকী যেন তৈলপূর্ণ প্রদীপের প্রজ্বলিত শিখা—যার চার পাশে পতংগরূপী শ্বেতাংক ঘুরে মরছে। শ্বেতাংক যখনই চিত্রলেখাকে দেখে তখনই এক বিচিত্র সুখ অনুভব করে; কিন্তু কিসের সে সুখ? না-জানা চাওয়ার এক অজানা কম্পন! যখন চিত্রলেখার নেশায়-মাখা অর্দ্ধ-নিমীলিত চোখ শ্বেতাংকের চোখের সংগে গিয়ে মেলে তখন শ্বেতাংক পাগলের মত সমস্ত দুনিয়াকে ফেলে হারিয়ে!

বীজগুপ্তের প্রাসাদে সবাই শ্বেতাংককে বীজগুপ্তের ছোট ভাই-এর মতই দেখে। তারা শ্বেতাংককে নিজেদের পর্য্যায়ভুক্ত করে নি, বীজগুপ্তের মত শ্বেতাংককেও প্রভুর সম্মান দেয়। ভোগ-বিলাসের সমস্ত সামগ্রী শ্বেতাংকের সামনে বিরাজমান। সহরের সমস্ত বড় বড় ব্যক্তিদের সংগে তার পরিচয়। শ্বেতাংক এক গহন অন্ধকার থেকে আলোকময় জগতে এসে পৌঁছেচে। তাই আপন অস্তিত্বের ওপর তার বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ধীরে ধীরে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংগে সামঞ্জস্য রেখে চলবার চেষ্টা করে। তার মনে হয়, সে এই জগতের মধ্যেই পাপ ও পুণ্যের মাঝখান দিয়ে চারি দিকে কামনার ভীড় ঠেলে সে এগিয়ে চলেছে। সে বেশ বুঝতে পারে যে, সে বাসনাময় সংসারের স্রোতে ব'য়ে চলেছে।

একদিন বীজগুপ্তকে বাইরে যেতে হয় এবং একটা জরুরী কাজে আটকা পড়ে সে সন্ধ্যার ভিতর বাড়ী ফিরে আসতে পারলে না। নির্দ্ধারিত সময়ে চিত্রলেখার রথ বীজগুপ্তের দ্বারে এসে পৌঁছায়। শ্বেতাংক চিত্রলেখাকে রাস্তা দেখিয়ে ভিতরে নিয়ে যায়। দু' জনাই বীজগুপ্তের বাইরের ঘরে গিয়ে বসে। বীজগুপ্তকে না দেখে চিত্রলেখা জিজ্ঞেস করে, "তোমার প্রভু কোথায়?"

নর্ত্তকীর মুখ থেকে "তোমার প্রভু কোথায়" প্রশ্নটি ব্রহ্মচারী শ্বেতাংকের ভাল লাগে না। কথাটা তার মনে তীরের মত গিয়ে

বেঁধে—হয়তো অন্য কোন সাধারণ স্ত্রীলোকের মুখ থেকে যদি এই কথাগুলো বার হত, সে নিশ্চয় তাকে ভাল-মন্দ কিছু শুনিয়ে দিত।

এই প্রথম বার সে তার নিজের অবস্থা ও সে যে কত তুচ্ছ ও নগণ্য, তা বুঝতে পারে এবং সঙ্গে সঙ্গে অনুতাপের আগুনে জ্বলতে থাকে। কিন্তু মনোভাব গোপন ক'রে উত্তর দেয়, "দেবি, তিনি কার্য্যোপলক্ষে বাইরে গেছেন!"

চিত্রলেখা জিজ্ঞেস করে, "তিনি কখন আসতে পারেন?"

"বোধ হয় এখুনি এসে পড়বেন।"

"শ্বেতাংক! বড় পিপাসা পেয়েছে।"

শ্বেতাংক উঠে দাঁড়ায়। নিজের অবস্থা তো সে আগেই বুঝতে পেরেছে, এখন বীজগুপ্তের কথাগুলো তার মনে পড়ে, "শ্বেতাংক, চিত্রলেখা তোমার প্রভুপত্নী।" সে নিজে স্বর্ণপাত্রে জল নিয়ে আসে।

চিত্রলেখা জলের দিকে তাকিয়ে হাসে। "শ্বেতাংক! তুমি নেহাৎ-ই বালক!" শ্বেতাংক নর্ত্তকীর ব্যঙ্গ বুঝতে পারে না। "শ্বেতাংক! তুমি এখনও বুঝতে পারলে না? পিপাসা কি এতে কখনও মেটান যায়? আগুনের জলের প্রয়োজন হয় না, ঘৃতের প্রয়োজন হয়; যার দ্বারা সে আরও জ্বলে উঠতে পারে। পিপাসার নিবৃত্তি করার অর্থ হ'ল জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটান। জলের কোন প্রয়োজন নেই, আমি চাই সুরা!"

এই উত্তরে শ্বেতাংক চমকে ওঠে। কথাগুলো ভয়ানক হলেও যুক্তিপূর্ণ। শ্বেতাংকও হেসে ওঠে। "দেবি, আমাকে বোধ হয় পাটলিপুত্রের সেরা সুন্দরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে হবে।" এই বলে সুরাপাত্র চিত্রলেখার দিকে এগিয়ে দেয়।

এক ঢোক খেয়ে নর্ত্তকী পানপাত্রটি শ্বেতাংকের সামনে রেখে তাকিয়াতে হেলান দিয়ে বসে। মাথায় কাপড় নেই আর পিঠের ওপর অন্ধকারের মত কালো কেশরাশি ছড়িয়ে পড়েছে এবং কেশদামে মুক্তার মালা আলোর মত ঝলমল্ করছে। পরিধান-বস্ত্র অতীব সুন্দর—এমন অপরূপ সুন্দরীর কল্পনা পর্য্যন্ত শ্বেতাংক কখনও করেনি। চিত্রলেখার যৌবন উন্মাদনার প্রতিচ্ছবি, অরুণ কপোল রক্তিম আভায় রাঙা এবং মৃদু হাসির কোমল পরাগে তার অধর সিক্ত। নয়ন মধুর হাসিতে ভরা!

নির্বাক-নিস্পন্দ হয়ে শ্বেতাংক নর্ত্তকী চিত্রলেখার রূপসুধা পান করতে থাকে। চিত্রলেখা জিজ্ঞেস করে, "শ্বেতাংক, দেখছি তুমি সুরা পান কর না। তোমার সামনে আমি পাত্রটি এগিয়ে দিয়েছি কিন্তু তোমার হাত পাত্রটিতে মুখে লাগাতে সাহস করছে না। তোমাকে একটা প্রশ্ন করব, ঠিক ঠিক উত্তর দিও।"

শ্বেতাংক মাথা নত করে নেয়।

"তুমি ব্রহ্মচারীরূপে থেকেছ এবং তোমার গুরু তোমায় মদ্যপান করতে নিষেধ করেছেন। এর কারণ আমি জানি।"

শ্বেতাংক আর্দ্রস্বরে বলে, "দেবি! সংযম জীবনের একটি আবশ্যক অংগ এবং সুরা ও সংযমে ঘোর বিরোধিতা আছে।"

"কিন্তু সংযমের লক্ষ্য কি?"

"সুখ ও শান্তি।"

পানপাত্রটি অধরে ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে চিত্রলেখা জিজ্ঞেস করে, "জীবনের লক্ষ্য কি?"

মদ্যপানের জন্য চিত্রলেখার চোখ কিছু লাল হয়ে উঠেছিল। চিত্রলেখার স্বরে শ্বেতাংক এক প্রকার সংগীতের সুর ও কথায় কবিতার ভাব অনুভব করতে থাকে। সে উত্তর দেয়, "জীবনের লক্ষ্য? সুখ ও শান্তি।"

"কিন্তু এখানে তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ, নবযুবক!" চিত্রলেখা নিজেকে সামলিয়ে নেয়। "সুখ তৃপ্তি এবং শান্তি অকর্মণ্যতা। কিন্তু জীবনের রূপকর্মে, এক অতৃপ্ত পিপাসার মধ্যে। জীবন একটা আলোড়ন, একটা পরিবর্ত্তন এবং এই আলোড়ন বা পরিবর্ত্তনের মধ্যে সুখ ও শান্তির কোন স্থান নেই।" এই বলে সে সুরাপাত্রটি শ্বেতাংকের অধরে ছুঁইয়ে দেয়।

শ্বেতাংক একবার ভাবলে যে, পাত্রটি সরিয়ে দেয় কিন্তু হাসিতে-মাখা চিত্রলেখার চোখের বিচিত্র যাদুর সামনে সে পরাজিত হয়। সে চিত্রলেখার অনুরোধ অস্বীকার করতে পারে না, নিজেকে সংবরণ করতে পারে না। সে ধীরে ধীরে সুরাপান করতে থাকে।

ঠিক এই সময়ে পিছন থেকে বীজগুপ্ত হাসতে হাসতে বলে ওঠে "ব্রহ্মচারী, আজ নর্ত্তকী তোমাকে দীক্ষাদান করেছে, এই উপলক্ষে আমি চিত্রলেখাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

মোহ-নিদ্রা থেকে শ্বেতাংক চমকে ওঠে। বীজগুপ্তের হাসি বলে দেয় যে, সে আজ কত বড় ভুল করে ফেলেছে। সে একবার চিত্রলেখার দিকে তাকায় একবার বীজগুপ্তের দিকে। তার পর সে লজ্জায় মাথা নীচু করে নেয়। কাপড় বদলাবার জন্য বীজগুপ্ত হাসতে হাসতে সেখান থেকে প্রস্থান করে। বীজগুপ্ত চলে যাবার পর শ্বেতাংক চিত্রলেখাকে বলে, "দেবি, আজ তুমি আমার সমস্ত সাধনা ভেঙ্গে চুরমার করে দিলে! বল, তুমি কেন এমন করলে? তুমি আমার হৃদয়ে এক আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছ। কিন্তু কেন? দেবি, কেন তুমি আমার জীবনে দাবানলের মত আবির্ভূত হলে?" বলতে বলতে শ্বেতাংক চিত্রলেখার হাত সজোরে চেপে ধরে।

চিত্রলেখা হাসতে হাসতে উত্তর দেয়, "শ্বেতাংক, তুমি ভুল করছ। যা'কে তুমি সাধনা বলছ, আমার মতে সেটা আত্মাকে হত্যা করার উপাদান ছাড়া কিছু নয়। আমি তোমায় শুধু দেখাতে চেয়েছিলাম যে মাদকতাই জীবনের প্রধান অঙ্গ। আমি তো তোমাকে জীবনের সত্য রূপ দেখাবার চেষ্টা করেছি, তোমার হৃদয়ে যে আগুন জ্বলে উঠেছে সে একেবারে ভিন্ন ব্যাপার!" চিত্রলেখা হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায়। শ্বেতাংকের হাত সরিয়ে দিয়ে বলে, "শ্বেতাংক, মনে রেখ যে তোমার জীবনে আমার আসা অসম্ভব। সব কিছু থাকতেও আমি আমার মনকে ভাল রকম জানি। আমি পৃথিবীতে শুধু একটি মানুষকে ভালবাসি আর সে হ'ল বীজগুপ্ত। ভুলেও কখনও এ কথা মনে এন না যে আমি তোমাকে ভালবাসতে পারি। আচ্ছা, এখন তুমি যেতে পার।"

শ্বেতাংকের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। সে আজ জানে, কর্ত্তব্যে ও ব্যক্তিত্বে এক নর্ত্তকীর কাছে হেরে গেছে। সে বলে "যেমন আজ্ঞা, দেবি!" এই বলে অপমানিত ও পরাজিত ব্রহ্মচারী ফটকের দিকে এগিয়ে যায়।

দ্বারের বাইরে এসে চিত্রলেখা শ্বেতাংককে ডেকে বলে, "শ্বেতাংক! তোমায় আরও কিছু বলবার আছে, এখানে শোন।"

শ্বেতাংক থেমে যায়। সে ফেরে না, ঘুরে দাঁড়িয়ে উত্তর দেয় "দেবি! তিরস্কারের এখনও কি কিছু বাকী রয়ে গেছে, 'আপন

আত্মার দুর্বলতার যথেষ্ট শিক্ষা কি হয়নি? দেবি, তুমি আমার প্রভুপত্নী আর সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনেরও……। না, ক্ষমা কর। তুমি শুধু আমার প্রভুর পত্নী, এজন্ত তোমার আদেশ আমার শিরোধার্য্য। বল, কি আজ্ঞা?" ঐ সময়ে শ্বেতাংকের চোখ জলে ভরে গিয়েছিল।

শ্বেতাংকের কথাগুলো চিত্রলেখার হৃদয় স্পর্শ করে এবং অবোধ শ্বেতাংকও নর্ত্তকীর কথাগুলোতে আঘাত পায়। চিত্রলেখা বলে, "শ্বেতাংক, আমি ভুল করেছি। তোমার সংগে রূঢ় ব্যবহারের জন্ত আমি ক্ষমা চাইছি। শ্বেতাংক! তোমার প্রতি আমার দুর্বলতা আছে, তুমি আমার ভাই-এর মতন, তোমার দুঃখে আমারও দুঃখ হয়। হয়ত না জেনে তোমাকে আমি অপমানও করেছি, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

চিত্রলেখার ক্ষমা চাওয়াতে শ্বেতাংকের সমস্ত দুঃখ ও ক্ষোভ কোথায় দূর হয়ে যায়, এক নিমেষে হৃদয়ের সব যন্ত্রণা তুষারকণার শীতল স্পর্শে অন্তর্হিত হয়। চিত্রলেখার মধ্যে শ্বেতাংক এক দেবীর মূর্ত্তি দেখতে পায়, এক নূতন রূপে নর্ত্তকী ধরা দেয়—তার দৃষ্টিতে চিত্রলেখা আর নর্ত্তকী থাকে না, তার মনে হয় যে, কোন এক স্বর্গীয় বন্ধনে চিত্রলেখা তাকে বেঁধে ফেলেছে। সে বলে, "দেবি, ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন নেই। ভুল আমারই আর সে ভুলের শাস্তি আমার পাওয়া উচিত। কিন্তু দেবি! তুমি শাস্তি না দিয়ে আমায় দয়া করেছ! আমাকে বাঁচানোর জন্ত তুমি যা করেছ তা কোন দিনই ভুলতে পারব না।" এই বলে শ্বেতাংক প্রাসাদের বাইরে চলে যায়। চিত্রলেখা নিশ্চল মূর্ত্তির ন্তায় দাঁড়িয়ে থাকে। অজ্ঞাত ভাবে এক অবোধ বালককে আপন যৌবনের উন্মাদনায় আকৃষ্ট করে তার কষ্ট হচ্ছিল।

শ্বেতাংক সোজা বীজগুপ্তের কাছে উপস্থিত হয়। বীজগুপ্তের পা জড়িয়ে ধরে কেবল বলে—"প্রভু, আমাকে শাস্তি দাও!"

শ্বেতাংকের এই রকম ব্যবহারে বীজগুপ্ত অবাক! শ্বেতাংকের হাত ধরে তুলে জিজ্ঞেস করে, "শ্বেতাংক, কেন? কি হয়েছে?"

শ্বেতাংক ভীত-ত্রস্ত ভাবে উত্তর দেয় "প্রভু, আমি আপনার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করার অপরাধ করেছি। আমি সেই নারীকে ভালবাসার অপরাধ করেছি, যে নারী আপনাকে ভালবাসে ও যে নারীকে আপনি ভালবাসেন ও যিনি আমার প্রভুপত্নী!"

বীজগুপ্ত এতক্ষণে সব বুঝতে পারে। মনে মনেই হাসে, "শ্বেতাংক, তুমি কি করে জানলে যে সেই নারী আমাকে ভালবাসে?"

"সে নিজে আমাকে বলেছে!" শ্বেতাংককে সুরার নেশা বেশ চেপে ধরেছে। শরীরে সে একটা বেশ হাল্কা আনন্দ অনুভব করে। "তার হাত থেকে আজ সুরা পান করে আমি আমার সংযম ভেংগে দিয়েছি। এ কাজ কেন করলাম জানেন প্রভু! কেন না, যে নারীকে ভালবাসি তার হাতের সুরামৃতকে অস্বীকার করতে পারি নি!"

কৃত্রিম গম্ভীরতা ধারণ করে বীজগুপ্ত বলে "শ্বেতাংক, যদি সেই নারী না বলত যে সে আমায় ভালোবাসে এবং যদি সে তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করত তাহলে তুমি কি করতে?"

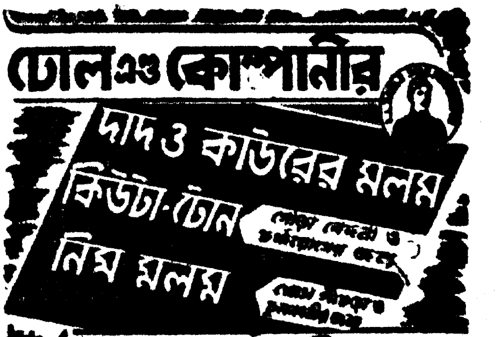
কিছুক্ষণ চিন্তা করে শ্বেতাংক বলে, "তাহলে হয়ত প্রভুর কাছ থেকে ক্ষমাও চাইতাম না এবং প্রভুর সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করে এক গুরু অপরাধ করে বসতাম না।"

পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বীজগুপ্ত শ্বেতাংককে বলে, "শ্বেতাংক, আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি যা কিছু করেছ তোমার অবস্থায় পড়লে অন্ত কেউ তার বিপরীত কিছু করতে পারত বলে মনে হয় না। তুমি যা কিছু করেছ ঠিকই করেছ আর যা কিছু করতে ঠিকই করতে। এতে তোমার বিন্দুমাত্র দোষ হয় নি, যদি কারুর দোষ হয়ে থাকে তবে সে পারিপার্শ্বিক অবস্থার। কিন্তু আমি তোমার ওপর সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি অপরাধ করেছ কিন্তু যার কাছে তুমি অপরাধ করেছ তা'কে সেই অপরাধের কথা বলে নিজের সমস্ত কালিমা মুছে নিয়েছ। তুমি আমার কাছে সত্য বলেছ আর আমি তোমার কাছে এই আশা করেছিলাম। এখন থাকল আমার সংগে যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তার কথা। কিন্তু শ্বেতাংক, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে তুমি সন্ত সংসারে প্রবেশ করেছ, সংসার সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতা খুবই কম। তুমি হয়ত জান না যে এইরকম কত বার তোমাকে অভিজ্ঞতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে হবে, ঐ সময় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা তোমার স্মরণ রাখতে হবে। ইচ্ছা প্রবলরূপ ধারণ করে তোমাকে কষ্ট দেবে কিন্তু ইচ্ছাকে দমন করতে হবে। এবং এইখানেই তোমার আত্মশক্তির পরীক্ষা হবে। বিষয় ও পরাজয়ের ক্ষেত্রই তো এই সংসার, নির্জ্জনে কি এর বিচার হয়?

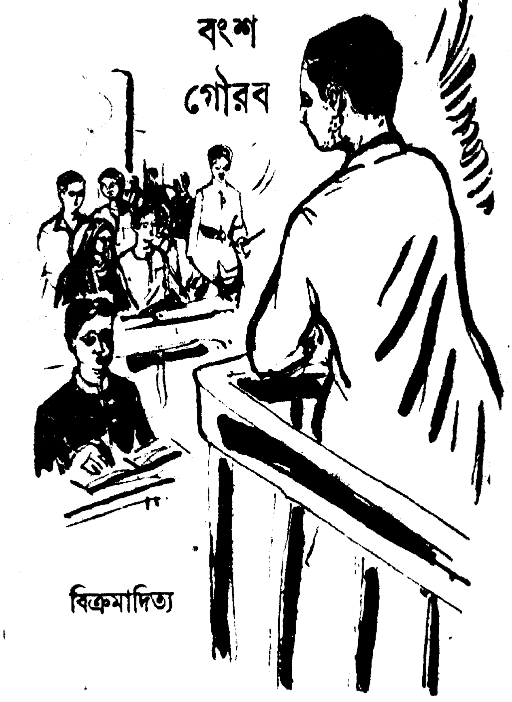
শ্বেতাংক কাঁদছিল। সে উত্তর দেয়, "প্রভু, সে সমস্তই আমি করব, কিন্তু যে অপরাধ করেছি তার শাস্তি আমার পাওয়া উচিত।"

বীজগুপ্ত শ্বেতাংকের মাথার ওপর হাত রেখে বলে, "তুমি কাঁদছ কেন? এই অপরাধের দণ্ড চাও? কিন্তু তুমি তো কোন অপরাধ করোনি, শাস্তি কি করে দিই? কর্ম্মেতে অপরাধ হয়, বিচারে নয়। বিচার হ'ল কর্ম্মের সাধন মন্ত্র! তবুও তুমি যদি শাস্তি চাও, তাহলে তোমাকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেব। তোমার শাস্তি হ'ল যে তুমি ঠিক আগের মত প্রতিদিন চিত্রলেখাকে বাড়ী পৌঁছিয়ে দিয়ে আসবে।" [ক্রমশঃ।

অনুবাদক : শ্রীঅমল সরকার।



বংশ গৌরব



বিক্রমাদিত্য

আমি সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে।

কলকাতা শহরে আমার পরিবারের যথেষ্ট সুনাম, সুখ্যাতি আছে। বাবা ব্যারিষ্টার, কাকা ব্যবসায়ী—আমার ভাই উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী। সংক্ষেপে, আমাদের পরিবারকে সবাই এক-ডাকে চেনে।

আমার মা গর্ব্ব করে বলেন : আমার পূর্ব্বপুরুষেরা এককালে বাংলায় রাজত্ব করেছিলেন। একথা শুনে বাবা হাসেন। বলেন : আহা কী করছ! আজকাল কি আর বংশ নিয়ে গর্ব করার দিন আছে! বংশপরিচয় এ যুগে অচল। একথা শুনে মা একটু রেগে যান। বলেন : কী বাজে বকছ। আমি কী আর বংশ দিয়ে পরিচয় দিই? শুধু ছেলেদের বলি, বংশের নাম ডোবাস নি। ওরা যদি কোন কেলেঙ্কারী করে, তবে লোকে কী বলবে, জান? বলবে মুকুল রায়ের ছেলেরা বংশের মুখে কালি দিয়েছে।

মা'র কথা শুনে বাবা চুপ করে যান। নিজের মনে একটু আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন। কথাটি অতীব সত্যি। আজ অবধি তাঁর বংশের নাম কেউ ডোবায় নি। এই তো সেদিন হাইকোর্টের প্রবীণ ব্যারিষ্টার মিঃ বাসু বাবাকে ডেকে বললেন : মুকুল, আমি তোমার উন্নতিতে গর্ব অনুভব করছি, কিন্তু আশ্চর্য্য হইনি। হাজার হোক বনেদী বংশের ছেলে তুমি, তোমার উন্নতি হবে না তো কার উন্নতি হবে?

বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে এসে বাবা মা'কে বললেন : বুড়ো ব্যারিষ্টার বাসু কী বলছিল জান?

মা একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন : কী?

বাবা বাসু সাহেবের কথাগুলো বললেন।

মা এবার একটু হেসে বললেন : আমি কিন্তু ভেবেছিলাম বুড়ো বাসু সাহেব স্নব। যাক্ ম্যাদ্দিনে আমার ভুল ধারণাটা ভাঙল।

এর কয়েক দিন বাদে বাসু সাহেব এসেম্বলীর মেম্বার হবার জন্ত উমেদার হলেন। হাইকোর্টে এ নিয়ে রীতিমত সোরগোল পড়ে গেল। বাবা-মা বাসু সাহেবের হয়ে অনেক তদ্বির করলেন। নির্ব্বাচনে বাসু সাহেবের জয় হলো।

নির্ব্বাচন-জেতা উপলক্ষে বাসু সাহেব তাঁর বাড়ীতে এক বড়ো পার্টি দিলেন। বাবা-মা আমাকে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখে সবাই কী খুশি। মিঃ বাসু আমার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন : হাউ লাভলি চাইল্ড। মুকুল, তোমার এ ছেলে বংশের নাম রাখবে, এ তোমায় আমি হলপ করে বলছি।

এ কথা শুনে বাবা-মা'র মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ফেরার পথে মা বাবাকে বললেন : যাই বলো না কেন, বাসুর মত লোক হয় না। অমন উদার প্রকৃতির যুগ্যি লোকই এসেম্বলীর মেম্বার হয়েছে। বাবা বললেন : ঠিক বলেছ। লোক চিনবার ক্ষমতা আছে বাসুর। নইলে বললে কি না রতন বংশের নাম রাখবে!

• • • •

এর কয়েক দিন বাদে আমি স্কুলে ভর্ত্তি হলাম।

স্কুলে যাবার আগে মা আমাকে পই-পই করে বললেন : দেখিস বাজে ছেলের সঙ্গে মেলামেশা করিস নে কিন্তু।

মার উপদেশ আমি ভুলিনি। আমার তীক্ষ্ণ নজর। অতএব ক্লাসের সব চাইতে সেরা ছেলে প্রবীরের সঙ্গেই শুধু বন্ধুত্ব পাতালাম।

প্রবীর মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ওর মা-বাবা নেই।

আমার মুখে প্রবীরের পরিচয় পেয়ে মা'র ভারি দুঃখ হয়। তিনি বললেন, আহা বেচারা! হ্যাঁরে রতন, তুই যখন টিফিন খাস প্রবীরকে ভাগ দিস তো?

: না, আমি জবাব দিই।

: উঁহু, ওকে ডাকিস তোর টিফিন খেতে। বেচারা, টিফিন কিনে খাবার মত ওর হয়ত সামর্থ্য নেই।

তার পর বাবাকে উদ্দেশ করে বললেন : ছেলেবেলায় বাবা মা হারান যে কী কষ্টের তা আর কী বলব!

: দেখবার কেউ থাকে না। এই জন্যেই তো এই সব ছেলেরা বড্ডো বখে যায়। বাবা মা'কে সমর্থন করলেন। আমাকে বললেন : গরীবদের কক্ষণো ঘৃণা করো না। সহানুভূতি দেখিও।

'আমি একটু বিস্মিত হয়ে বললাম : গরীব কে বাবা?

মা হেসে জবাব দেন : ঐ তোর বন্ধু প্রবীর।

আমি আবার জিজ্ঞেস করি—গরীবরা কী বাবা?

বাবা বলেন : ছেলের বুদ্ধি দেখেছ। জানবার কী আগ্রহ। আরে গরীব হলো তারা যাদের গাড়ী, ঘোড়া, বাড়ী, টাকা-পয়সা নেই।

এ কথা শুনে আমার প্রবীরের জন্যে ভারি দুঃখু হলো। ভাবলাম, আহা বেচারা!

পরদিন আমি প্রবীরকে টিফিন খেতে ডাকলাম। প্রথমে ও একটু ইতস্ততঃ বোধ করলে। আমি বললাম : আয় না, লজ্জা কিসের? অবশেষে প্রবীর আমার টিফিন খেতে রাজী হলো। আমরা দু'জনে খাবার ভাগ করে খেলাম।

আমাদের বন্ধুত্ব দৃঢ়তর হলো।

• • • •

এর পর বহু দিন কেটেছে।

আমি অনেকটা বড়ো হয়েছি। সংসারের অনেক কিছু দেখেছি শিখেছি, কিন্তু আমার ও প্রবীরের বন্ধুত্বের ভাঙন ধরেনি। আমরা একসঙ্গে স্কুলে যাই, টিফিন খাই, গল্প করি। একটা দিনের কথা আমার আজও স্মরণ আছে। আমার বাবা-কাকা সবাই সিগারেট খেতেন, আমার দাদাও বাবার কাছ থেকে নিয়ে খান। প্রথমটায় আমার একটু বিস্ময় হতো, কারণ আমার বন্ধু-বান্ধবদের দাদারা সব সময় লুকিয়ে সিগারেট খেতেন। একদিন দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম : তুমি বাবার সামনে সিগারেট খাও কেন? মন্টুর দাদা তো লুকিয়ে সিগারেট খায়।

দাদা হেসে আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন : মন্টুর দাদা কী আর সিগারেট খায় রে, ও-তো বিড়ি খায়। তাই লুকিয়ে খায়।

কিছুদিন পরে দেখলাম, দাদার কথা সত্যি। মন্টুর দাদা লুকিয়ে লুকিয়ে বিড়ি খায়।

দু'দিন বাদে আমি স্কুলে এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে গেলাম। টিফিন খাবার পর প্রবীরকে সিগারেটের প্যাকেট দেখিয়ে বললাম : খাবি?

বিস্মিত হয়ে প্রবীর বললে : বলিস কী রে?

: হ্যাঁ, বাবা, কাকা দাদা সবাই খান। খারাপ জিনিষ হলে কী তাঁরা খেতেন? বড়লোকেরা তো সবাই খায়।

আমার যুক্তি যে অকাট্য, এ-কথা প্রবীরকে মানতে হলো। কিন্তু তবু সে গম্ভীর হয়ে বললে : না ভাই, আমি খাবো না, তুই-ই খা।

আমি আর কিছু বললাম না। এমনি করে রোজ টিফিনের সময় আমি সিগারেট খেতুম। আমরা যে জায়গায় বসতাম সেটা ছিল স্কুলের এক প্রান্তে, নির্জন। অতএব কারু নজরে পড়বার সম্ভাবনা ছিল না।

হঠাৎ প্রবীর একদিন আমায় বললে : দে না একটা সিগারেট। একটা টান দিয়ে দেখি।

আমি হেসে বললাম : এই তো বুদ্ধিমানের মত কথা বলেছিস। প্রবীর একটা সিগারেট ধরালে।

তারপর রোজ-রোজ আমরা দু'জনে টিফিনে সিগারেট খেতাম।

• • • •

আমরা সিগারেট খাচ্ছি, এ-কথাটা হঠাৎ একদিন সারা স্কুলময় রাষ্ট্র হয়ে গেল। কথাটা হেডমাষ্টার মহাশয়ের কানে যেতেই তিনি আমাদের তাঁর ঘরে তলব করলেন।

প্রবীরের ভয় হলো। আমি ওকে সাহস দিয়ে বললাম, ভয় পাচ্ছিস কেন? বড়লোকেরা সবাই সিগারেট খায়। হেডমাষ্টার মহাশয় নিজে খান।

আমার কথায় যথেষ্ট যুক্তি থাকলেও প্রবীর যেন আশ্বস্ত হলো না।

হেডমাষ্টার মহাশয় একটু রাসভারী লোক। একটু সুযোগ পেলেই বেত মারেন। যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালাম আমার সমস্ত সাহস যেন উড়ে গেল। তার পর কর্কশ কণ্ঠে যখন তিনি প্রশ্ন করলেন: রতন, তুমি রোজ-রোজ সিগারেট খাও? আমি স্পষ্ট জবাব দিলাম না স্যর।

: মিথ্যে কথা—হেডমাষ্টার মহাশয়ের কণ্ঠস্বর এবার সপ্তমে উঠল।

: না স্যর, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলতে পারি—আমি জবাব দিই।

হেডমাষ্টার মহাশয় ঈশ্বরভীরু লোক। তাঁর মনের এই দুর্ব্বলতা আমি জানতাম। অতএব আমার কথা শুনে তিনি একটু শান্ত হলেন। এবার প্রবীরকে জিজ্ঞেস করলেন: তুমি সিগারেট খাও?

প্রবীরটা বোকা। ও সহজকণ্ঠে জবাব দিলে: হ্যাঁ স্যর।

: হ্যাঁ স্যর, বলতে লজ্জা করে না, হতভাগা, ডেঁপো ছেলে কোথাকার। দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি।

এই বলে তিনি প্রবীরকে পাঁচ বেত লাগালেন। আমার শাস্তি হলো সবার সামনে 'নীল ডাউন' হয়ে থাকা।

* * * *

পরদিন প্রবীর আর আমার কাছে টিফিন খেতে এলো না। আমি নিজেই ওকে খুঁজে বার করে জিজ্ঞেস করলাম: টিফিন খেতে এলি না কেন?

: যদি হেডমাষ্টার মহাশয় বকেন, প্রবীর জবাব দেয়।

: মুখ্যু কোথাকার। টিফিন খেতে হেডমাষ্টার মহাশয় বকবেন কেন? চল খেয়ে নিই গে।

খেতে খেতে প্রবীর আমায় জিজ্ঞেস করল: হ্যাঁরে রতন, কাল তুই হেডমাষ্টার মহাশয়ের সামনে মিথ্যে কথা বললি কেন?

আমি হেসে উঠলাম। বললাম: মিথ্যে আবার কী বললাম রে?

: বা রে, তুই যে বললি সিগারেট খাস না।'

আমি জবাব দিই: আমি সিগারেট খাই না খাই সে দিয়ে হেডমাষ্টার মহাশয়ের কী দরকার বলতে পারিস? ওঁর পয়সা দিয়ে তো আর সিগারেট খাই না। আর মিথ্যে কথা বলছি কেন জানিস? বাবার কাছে রোজ কত মক্কেল আসে। বাবা তাদের বলেন: খবরদার জজ সাহেবের কাছে সত্যি কথা বলেছ তো মরেছ। পরাজয় নিশ্চিন্দি। এ সংসারে সত্যি কথা বলার না কি অনেক বিপদ। আইন-কানুন সব সত্যি কথার বিরুদ্ধে। আর বাবার ঐ মক্কেলগুলো মিথ্যে কথা বলে বলেই তো বাবার অত পসার।

প্রবীর কী ভাবলে জানি না। সে চুপ করে রইলে। আমি ওকে সাহস দিয়ে বলি: ঠিক আছে, ভয় পাচ্ছিস কেন? আজ থেকে আমরা স্কুলের বাইরে সিগারেট খাবো।

* * * *

তার পর স্কুল ছেড়ে কলেজে এলাম।

ম্যাট্রিক ভালো ভাবেই পাশ করেছি। প্রবীর স্কলারশিপ পেয়েছে। আজকাল আর লুকিয়ে সিগারেট খাই না। বুক ফুলিয়ে সিগারেট মুখে দিয়ে চলন্ত ট্রামে উঠি। মর্ক রা সবেমাত্র সিগারেট খেতে শিখেছে; দেশলাই দিয়ে সিগারেট ধরাতে ওদের হাত কাঁপে।

আমি ও প্রবীর ওদের বিদ্রূপ করি। বলি: বোকারাম। সিগারেট খাওয়া যখন ঠিকই ধরেছিস্ তখন বুড়ো বয়েসে ধরলি কেন? ওরা আমাদের কথা শুনে বোকার মত তাকিয়ে থাকে। কলেজে এসে আমার ও প্রবীরের বন্ধুত্ব গাঢ় হলো।

আমরা সব সময় একসঙ্গে থাকি। সিনেমা, ফুটবল ম্যাচ, একসঙ্গে যাই।

একদিন মোহনবাগানের খেলা দেখে বাড়ী ফিরতে গিয়ে ভিজে চুপসে গেলাম। শীতে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছিলাম। প্রবীরদের বাড়ীতে এসে দুজনে জামা-কাপড় পাল্টে নিলাম। প্রবীর বললে: দাঁড়া, দু' কাপ চায়ের অর্ডার দিই।

: পাগল আর কী। এই বৃষ্টিতে ভেজার পর চা খেলে কী আর শরীরের ম্যাজ-ম্যাজ কমবে?

: তাহ'লে? প্রবীর জিজ্ঞেস করে।

: শোন্, বৃষ্টির দাওয়াই খেয়ে নিইগে।

: বৃষ্টির দাওয়াই, সে আবার কী?

: আয় না।

আমরা দুজনে সোজা চৌরঙ্গীর এক রেষ্টুরেণ্টে এলাম। প্রবীর জিজ্ঞেস করলে ... রেষ্টুরেণ্ট!

: ... ...ই এখানেই মেলে—আমি বলি।

: কী নাম রে?

: 'ব্রাণ্ডি।'

: মদ! চোখ দুটো গোল গোল করে প্রবীর বললে।

: যারা মুখ্যু, লেখাপড়া জানে না তারাই একে মদ বলে। ডাক্তার বাবু সেদিন আমার মা'কে ব্রাণ্ডি খেতে বললেন। আমার মা বুঝি মদ খান?

এর পরে আর তর্ক চলে না। প্রবীর শুধু ভয়ে ভয়ে বললে: কেউ যদি দেখে তাহ'লে কিন্তু কেলেঙ্কারী হবে।

আমি জবাব দিই, সেই জন্যেই তো চৌরঙ্গীর এই রেষ্টুরেণ্টে এসেছি।

বয়কে ডেকে দুটো ব্রাণ্ডির অর্ডার দিলাম।

এর পরে রোজ রোজ সেই রেষ্টুরেণ্টে আসতাম।

প্রথমে ব্রাণ্ডি, তার পর শেরী, হুইস্কি ও সর্ব্বশেষে 'রাম' খেতে শুরু করলাম।

ইতিমধ্যে মামাবাড়ী ছেড়ে প্রবীর এসে কলেজের হোষ্টেলে ঠাঁই নিয়েছে। অতএব বাড়ীর কোন ভয় নেই। যেদিন মদের মাত্রা একটু বেশী হতো সেদিন আমিও বাড়ী ফিরতাম না। বাড়ীতে টেলিফোন করে বলতাম যে, পড়াশুনায় ব্যস্ত। অতএব, আজ বাড়ী ফিরব না।

মদ খাওয়ার কথাটা অবশ্যি বেশী দিন লুকিয়ে রাখা গেল না। হঠাৎ একদিন বেশী মাত্রায় মদ খেয়ে প্রবীর হোষ্টেলে বমি করলে। ব্যস্, আর যায় কোথায়? হোষ্টেল থেকে ওকে বের করে দেয়া হলো। প্রবীর এসে হ্যারিসন রোডের হোটেলে ঠাঁই নিলে।

আমার বাড়ীতেও একদিন মা-বাবা সন্দেহ করলেন। আমার চেহারা খারাপ দেখে মা বাবাকে ... করলেন: রতনের চেহারাটা


সবাই জানেন —
সীলকরা প্যাকেটে পাওয়া যায় বলে ব্রুক বণ্ড চা নির্ভেজাল ও একেবারে খাঁটি থাকে
দামের তুলনায় ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা পাবেন
রোজ ২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চা লোকে কেনেন
এই জন্যেই
অন্য যে কোনও মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান !

দিন-দিন কী রকম খারাপ হচ্ছে দেখেছ? পরীক্ষাও এসে পড়ল, পড়ার চাপ নাকি আজকাল বেড়েছে। বাবা বললেন: না, আমার সন্দেহ রতন আজকাল মদ খেতে শিখেছে।

: কী বাজে বকছ—ধমকের স্বরে মা বলেন।

: হ্যাঁ, সেদিন রতন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে এসেছিল, ওর মুখে মদের গন্ধ পেলাম।

: তোমার ভীমরতি ধরেছে। নিজে সব সময় ঐ ছাইভস্মগুলো খাও কি না, তাই আজকাল ছেলের নামে দোষ চাপাতে এসেছ। রতন আমার বাজে ছেলে নয়।

বাবা ভাবলেন, কথাটা তুলে তিনি ভালো করেননি। তাই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলেন। বললেন: আহা ওর শরীর যদি সত্যিই খারাপ হয়ে থাকে, তবে কয়েক দিনের জন্য মুসৌরীতে চেঞ্জে যাক্ না। মা রাজী হলেন।

অতএব আমার মুসৌরী যাবার প্ল্যান ঠিক হয়ে গেল।

আমি মুসৌরী যাবো, একথা শুনে প্রবীর মহাখুশি। বললে: যাক কিছুদিনের জন্তে, এই নরকের মায়া কাটাতে পারবি।

: পাগল হয়েছিস। আমি কোথাও যাবো না, আমি বলি।

প্রবীর অবাক! বলে: তুই বলছিস কী রে রতন!

: সত্যি বলছি। মুসৌরী যাবো না। তোর এই হোটেলে এসে এই কয়েকটা দিন কাটাব।

: কেন?

: এই ভাখ—আমি পকেট থেকে সবুজ চিঠি বের করে প্রবীরকে দিলাম।

: কার চিঠি? প্রবীর জিজ্ঞেস করে।

: সৌদামিনীর।

: সে কে রে?

কেন তোর ঐ পাশের বাড়ীর ছাদে একটি মেয়ে রোজ চুল শুকোতে আসে। সেই তো সৌদামিনী, তার নাম জানিস না? ন্যাকা সাজিস আর কী!

প্রবীর বললে: জানিস, ও পরিবারের বিশেষ সুনাম নেই।

: ও পরিবারের না থাকতে পারে, সৌদামিনীর আছে। সৌদামিনী আমায় ভালবাসে—আমি ওকে ভালবাসি।

: তুই ওকে বিয়ে করবি? প্রবীর জিজ্ঞেস করে।

: মুখ্যু কোথাকার। প্রেম করলেই বুঝি বিয়ে করতে হয়?

সত্যি বলিহারি বুদ্ধি তোর! এত বয়স হলো এখনও সংসারকে চিনতে শিখলি নে?

প্রবীর চুপ করে গেল।

• • • •

মুসৌরীর নাম করে দিনগুলো প্রবীরের হোটেলেই কাটালাম।

রোজ সন্ধ্যাবেলা আমি সৌদামিনীর বাড়ীতে যেতাম, দু'-এক দিন বাদে প্রবীরও আমার সঙ্গ নিল।

সৌদামিনীর বাড়ীতে আমার রুস্তম জাভেরীর সঙ্গে পরিচয় হয়। রুস্তম জাভেরী ঘোড়ার রাজা, অর্থাৎ রেস-ময়দানের একচ্ছত্র অধিপতি। তার কাছ থেকে আমরা নিত্যি-নতুন ঘোড়ার খবর পেতাম। সৌদামিনী বলত: রুস্তম জাভেরীর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও মিথ্যে হয় না।

এর প্রমাণ আমরা হাতে-হাতে পেলাম। একদিন আমরা দুজনে রুস্তম জাভেরীর নির্দেশমত ঘোড়ার উপর বাজী রেখে প্রচুর বাজী জিতলাম।

রেস খেলা এবার থেকে আমাদের আর এক নতুন নেশা হয়ে দাঁড়াল।

দিন কুড়ি বাদে আমি যখন বাড়ী ফিরে এলাম, তখন মা আমার শরীর দেখে বললেন: এ কী রে রতন, তোর চেহারা যে একটুও পালটায় নি?

আমি হেসে জবাব দিলাম: পাহাড়ে পাহাড়ে ঘোরা কী চাট্টিখানি কথা! রোজ কতো হেঁটেছি জানো?

মা হাসেন। তার পর জিজ্ঞেস করেন, বেশী মদ খাসনি তো?

আমি হেসেই জবাব দিই: কী যে বল। উত্তরপ্রদেশে যে মদ্যপান নিষেধ।

এর পরে আর কোন কথা চলে না। মা চুপ করে গেলেন।

• • • •

সৌদামিনীর বাড়ী ও রেসকোর্স-আমার নেশা হয়ে দাঁড়াল।

প্রতি শনিবার প্রবীরকে নিয়ে আমি ময়দানে যেতাম। রুস্তম জাভেরীর দয়ায় আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন কাজেই বেশ কাঁচা টাকা আমাদের হাতে আসতে লাগল।

কিন্তু এমনি ভাবে আমাদের বেশী দিন কাটল না। আমাদের ভাগ্যবিপর্যায় শুরু হলো শীগগির। রুস্তম জাভেরী হঠাৎ এক দিন বোম্বাই চলে গেল আর সেই থেকে আমাদের পরাজয় শুরু হয়ে গেল। প্রবীর আমায় বললে: রেস খেলা ছেড়ে দে। আমি ধমক দিয়ে বলি: অতো ভয় করিসনে। আমার কথা শুনে সৌদামিনী হেসে ওঠে। বলে: প্রবীর বাবু, আপনি বরং 'ডগ' রেস খেলুন। লাভও নেই লোকসানও নেই। আরে বাপু, টাকা না হারলে কী টাকা আসে! টাকার প্রয়োজন হয় ধার করলেই হবে। বাজী জিতলে পর শোধ করে দে'য়া যাবে।

এর পরেও রেস খেললাম সত্য কিন্তু ভাগ্যের পরিবর্তন হলো না। রুস্তম জাভেরী থাকতে যা টাকা পেয়েছিলাম তার অর্দ্ধেকই সৌদামিনীকে গয়না কিনে দিয়েছিলাম। বাকী টাকা উড়িয়েছিলাম স্ফূর্তিতে। বাধ্য হয়ে এবার কাবুলিওয়ালার শরণাপন্ন হ'লাম।

• • • •

জীবন ক্রমেই দুর্বিষহ হয়ে উঠল। কাবুলিওয়ালার তাগিদে রাস্তায় বেরুন যায় না। কলেজে যাওয়া প্রায় বন্ধ হলো।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম যে রুস্তম জাভেরী আবার ফিরে এসেছে। মনটা আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠল।

রুস্তম জাভেরী আমায় দেখে বললে: কিসমৎ নতুন ঘোড়া। কাল সারপ্রাইজ হবে। খেলুন কাল।

প্রবীরকে জিজ্ঞেস করলাম: কী করা যায় বলতে পারিস?

কী? প্রবীর জবাব দেয়।

রুস্তম জাভেরী নতুন ঘোড়ার কথা বলছে। বাজী তো সুনিশ্চিত কিন্তু টাকা কোথায়?

: বাড়ীতে ধার চা' না।

আমি গম্ভীর হয়ে জবাব দিই : সেখানে কী আর হাত যো আছে ?

: তাহলে উপায় ? প্রবীর প্রশ্ন করে।

: উপায় একটা আছে।

: কী ?

: সৌদামিনীর কাছে হাত পাতব। বাজী যখন সুনিশ্চিত, তখন টাকা পেয়ে ধার শোধ করে দিলেই হবে।

: যদি না দেয় ?

আমি প্রবীরের কথা শুনে হেসে উঠলাম। বললাম : দেবে না কি রে। ওর সব গয়না তো আমার টাকাতে তৈরী। যদি না দেয়, গয়না ছিনিয়ে নিয়ে আসব। যেমনি ভাবা তেমনি কাজ। প্রবীরকে সঙ্গে নিয়ে সৌদামিনীর বাড়ীর পানে রওনা হলাম।

তখন প্রায় সন্ধ্যা। বাসগুলোতে মানুষে ভর্তি। কোন প্রকারে একটা বাসে ঠাঁই পেলাম। কতোক্ষণ বেশ কষ্ট করে দাঁড়িয়ে থাকার পর হঠাৎ বাসের লেডীজ সিটের উপর আমার নজর গেল।

আমি দেখলাম বাসু সাহেবের মেয়ে জয়া, আরো তিনটি মেয়ে বসে আছে। প্রবীরকে ডেকে বললাম : ঐ মেয়েটি কে জানিস ?

: কোন মেয়েটির কথা বলছিস ?

: ঐ যে লেডীজ সিটে বসে আছে। বাসু সাহেবের মেয়ে জয়া, আমার পরিচিত।

দু'জনেই এগিয়ে গেলাম। কিন্তু কোথাও বসবার একটু জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে জয়াদের সিটের পিছনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জয়া আমায় দেখেছিল কি না জানি না, আমিও বিশেষ প্রথমটায় নজর দিইনি। হয়ত একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। ভাবছিলাম কী করে টাকাটা যোগাড় করা যায়। সত্যিই সৌদামিনী যদি টাকা না দেয়, তাহ'লে ?

হঠাৎ পাশের লোকজনের চীৎকারে আমার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো।

: বলি ম'শায়, মেয়েদের হাত ধরেছেন কেন ? পাশের এক জন কর্কশ কণ্ঠে আমায় বললে।

: আমায় বলছেন ? আমি বলি।

: হ্যাঁ স্যর, আপনাকেই—আবার কর্কশ কণ্ঠে জবাব আসে। বলি ভদ্রলোক ন'ন আপনি ?

হঠাৎ আমার খেয়াল হলো। জয়ার পাশের মেয়েটির হাত ধরে ফেলেছিলাম। অন্যমনস্ক হয়ে টাকার কথা ভাবছিলাম, তাই খেয়াল করিনি।

নিজেই একটু লজ্জা বোধ করলাম। তার পর ভাবলাম, আমি তো ইচ্ছে করে হাত ধরিনি, ভুল হয়ে গেছে।

বাসে তখন এই নিয়ে সোরগোল শুরু হয়ে গেছে। কেউ বা হাত ওঠাচ্ছে, কেউ বা ধমক শুরু করেছে !

এমনি সময় প্রবীর আমার কাছে এগিয়ে এলো।

: কী ব্যাপার ? প্রবীর জিজ্ঞেস করে।

: কী ব্যাপার ? জিজ্ঞেস করতে লজ্জা করে না ? ছোটলোক, বদমাস কোথাকার—পাশের একজন তরুণ বলে উঠলেন।

প্রবীর বললে : দেখুন, সমস্ত ব্যাপার না জেনে চোখ রাঙাবেন না।

: বদমাইসি করে আবার ইয়েকি হচ্ছে—এক যাত্রী মন্তব্য করলেন।

: কয়েক ঘা লাগিয়ে দাও, তাহলেই ঠিক হয়ে যাবে—আর এক জন বলেন। তর্কটা এবার আমাকে ছেড়ে প্রবীরকে নিয়ে শুরু হলো। গোলমালটা যখন বেশ ভাল ভাবে বেধে উঠেছে তখন আমি প্রবীরের হাত ধরে টান দিলাম। বললাম : চল, এখানে থেকে শুধু শুধু বিপদ বাড়বে।

একটা ষ্টপ এসে পড়েছিল, প্রবীরকে টানতে টানতে আমি নেমে পড়লাম।

প্রবীর বললে : লোকগুলো কী পাজি দেখেছিস ?

: তা আবার বলতে ? আমি সমর্থন করে বলি।

• • • •

সৌদামিনীর বাড়ীতে যখন এলাম তখন রাত্ত হয়ে গেছে।

সৌদামিনী আমায় বললে, রুস্তম জাভেরী ঘোড়ার খবর নিয়ে এসেছে। খেলবে নাকি কাল ?

: টাকা নেই। দেবে কিছু ধার—আমি বলি।

: ও মা, মিন্‌সে কী বলছে গো ! আমি টাকা পাবো কোথায় ?

: কেন তোমার ঐ গয়নার দু'-একটা তো আমাদের দিতে পারো। এবার যদি বাজী জিতি, তাহলে হীরের সেট দেব।

ঘাড় দুলিয়ে সৌদামিনী বললে : হীরের সেটের দরকার আমার নেই। গয়না আমি দেবো না।

আমি আস্তে আস্তে প্রবীরকে বললাম : সোজা উপায়ে টাকা বের হবে না।

: তাহ'লে ?

: লুকিয়ে নিয়ে যাব।

: চুরি ! বিস্ময়ে প্রবীর বলে।

: একে ঠিক চুরি বলে না। আমাদের টাকায় এই গয়না তৈরী, আমরা যদি নিয়ে যাই তাহ'লে কার কী ব'লবার অধিকার ? তুই দাঁড়া, আমি সব বন্দোবস্ত করছি।

: আমি আর দেরী করলাম না। বড়ো রাস্তার উপরে একটা ওষুধের দোকান ছিল, সেখান থেকে একটা ঘুমের ওষুধ কিনে আনলাম। ফিরে এসে দেখি প্রবীর নেই।

সৌদামিনী বললে : তোমার বন্ধুর নাকি মাথা ধরেছে। আসলে কী জান, লোকটার মাথায় ছিট আছে। আমি কতো বার তোমায় বলেছি একথা। আমি সৌদামিনীর কথার কোন জবাব দিলাম না। শুধু মনে মনে বললাম : কাপুরুষ !

তারপর সৌদামিনীর সঙ্গে প্রেমালাপ চলতে লাগল। সুযোগ বুঝে ওর মদের ভেতর ওষুধটা ঢেলে দিলাম। সৌদামিনী টেরও পেলে না।

ওষুধের ফল ফলতে বেশী দেরী হলো না। কিছুক্ষণ বাদে সৌদামিনী যখন ঘুমে বিভোর, তখন আমি ওর সব গয়না কাপড়ে বেঁধে নিলাম। রাত প্রায় তখন একটা।

• • • •

প্রবীরের হোটেলে এসে দেখি ওর ঘর ফাঁকা। বুঝতে পারলাম ও ঘরে ফেরেনি। ওর ঘরের চাবি আমার কাছেই ছিল। আমি ঘর খুলে গয়নার পুঁটুলি ওর সুটকেশে রেখে দিলাম। গয়নাগুলো কাল বিক্রী করে নিলেই হবে। একটা দিনের তো ব্যাপার। যদি সৌদামিনী চীৎকার হল্লা করে তাহ'লে কাল বাজীর টাকা জিতে আর এক সেট গয়না গড়িয়ে দিলেই হবে।

আমি যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন রাত প্রায় দেড়টা। বাবা অফিসঘরে বসে তখনও কাজ করছিলেন। আমাকে দেখে বললেন : এত রাত্তিরে ? আমি ভেবেছিলাম মদ খাওয়া ছেড়েছ কিন্তু দেখছি স্বভাবচরিত্রের কোন বদলই হয়নি ! এমনি সময় মা এসে উপস্থিত। মা বললেন : অনেক রাত হয়েছে। আজ তর্ক করে লাভ নেই ! বরং কাল সকালে…

• • • •

পরদিন সকালে মা'র ডাকে আমার ঘুম ভাঙল। মার মুখ দেখলাম গম্ভীর। মা বললেন, বাবা নাকি আমার জন্যে দেরী করছেন। আজ কোর্টে যাননি।

বাবার ঘরে ঢুকে দেখি আর এক ভদ্রলোক বসে আছেন। আমাকে দেখে বাবা জিজ্ঞেস করলেন : এ দোষ আবার কবে থেকে হলো ?

কিসের কথা বলছেন ? আমি বলি।

: ন্যাকামো করতে হবে না। সৌদামিনী কে ?

আমার বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। তবে কী সব ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে ! নিশ্চয় প্রবীর সব বলে দিয়েছে। আমি তখনই জানতাম যে প্রবীরের সাহস নেই।

বাবা এবার কর্কশ কণ্ঠে বললেন : লুকিয়ে লাভ নেই। আমরা সব জানি। ইনি পুলিশের লোক, মিঃ মিত্র। মা মিঃ মিত্রকে প্রশ্ন করলেন : ব্যাপারটা কী, খুলেই বলুন না ?

মিঃ মিত্র এবার বললেন : ব্যাপারটা একটু লজ্জাকরই বটে মিসেস রায় ! কাল রাত্তিরে হ্যারিসন রোডের সৌদামিনী বলে এক বেশ্যাকে অজ্ঞান করে সমস্ত গয়না চুরি করে। আজ ভোরে পুলিশ চোরাই সমেত আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে। আসামী আপনার ছেলের বিশেষ বন্ধু। আর শুধু তাই নয়, কাল ঐ পতিতার বাড়ীতে আপনার ছেলেও ছিল।

: আমার ছেলে ! রতন গিয়েছিল বেশ্যাবাড়ীতে ? আপনি কী বলছেন মিঃ মিত্র !

: মা সত্যি কথাই বলছি। পুলিশের রিপোর্টে সেই খবর জানতে পারা গেছে।

: তাহলে কী হবে ? মা ব্যাকুল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেন।

: কী আর হবে, অমন অপদার্থ ছেলে এবার জেল যাবে, বাবা জবাব দেন।

: রতনকে বাঁচাবার কী কোন উপায় নেই ? মা বলেন।

মিঃ মিত্র চুপ করে রইলেন। বাবা এবার বললেন : আচ্ছা ও বাড়ীতে যে কাল রতন ছিল তার একমাত্র সাক্ষী সৌদামিনী। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে কী সৌদামিনীকে টাকা দিয়ে কেনা যায় না ? ওর কথার উপরই তো সব কেস নির্ভর করে।

মা বললেন : আপনি এর একটা বিহিত করুন মি: মিত্র। আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকব। আমার বংশের নাম কোর্টে উঠতে পারবে না—এ ব্যবস্থা আপনাকে করতেই হবে।

মি: মিত্র শুধু স্মিত হাসি হাসলেন। আর কিছু বললেন না।

কোর্টে বিচার শুরু হয়ে গেল। তদন্তের সময় আমি মি: মিত্রের পরামর্শানুযায়ী কলকাতার বাইরে গিয়েছিলাম। বিচারের শেষের দিন মি: মিত্র এসে বললেন যে আমার কোর্টে একবার যাওয়া প্রয়োজন। মা বললেন : সে কী কথা! আপনি যে বললেন রতনকে কোর্টে দাঁড়াতে হবে না?

: এখন অবধি তাই ত মনে হয়। তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না। আসামী এখনও তার কথা বলেনি। যদি রতনের কথা কিছু বলে তা'হলে একবার রতনকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতে পারে।

: কোন প্রকারেই কী এর হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না?

: না, দৃঢ় কণ্ঠে মি: মিত্র বললেন।

: কিন্তু আমার ছেলে তো আর গয়না চুরি করেনি—মা বলেন।

: সেইটে প্রমাণ করার জন্যেই তো এ বিচার—মি: মিত্র জবাব দেন।

দশটার সময় আমরা সবাই কোর্টে এলাম। আসামীর কাঠগড়ায় প্রবীর। আমায় ও দেখতে পেয়েছিল কি না জানিনে কিন্তু ওকে দূর থেকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম, মনে হলো ওর শরীর ভেঙে পড়েছে, চোখ বসে গেছে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সৌদামিনী বললে : ঘটনার দিন রাত্রে ওর ওখানে প্রবীর গিয়েছিল টাকা চাইতে। তার পর টাকা না পেয়ে ওষুধ খাইয়ে ওর আলমারী থেকে সমস্ত গয়না নিয়ে যায়। তারপর ইত্যাদি···ইত্যাদি···

প্রবীরের দোষ প্রমাণ করতে বেশী দেরী হলো না। রুস্তম জাভেরীও সাক্ষী দিয়ে বলে এলো প্রবীর ওর কাছে ঘোড়ার তথ্য নিতে আসত। তারপর কাবুলিওয়ালার ধার ইত্যাদি খবর যখন প্রকাশ পেল তখন আদালতের রায় সম্বন্ধে কোন সন্দেহই রইল না।

বিচার শেষে জজ প্রবীরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বলবার কিছু আছে?

শান্ত কণ্ঠে প্রবীর জবাব দিলে : না, শুধু আমি নির্দোষ।

সরকারী উকীল বললেন : সাক্ষী-সাবুদ আছে কিছু তোমার?

: না, আমি নির্দোষ।

একথা প্রবীর যখন বলছিল তখন আমার মনে হলো ও যেন আমার পানে তাকিয়ে আছে। বিচার বেশীক্ষণ চললো না। জজসাহেব প্রবীরকে এক বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিলেন। বয়সটা অল্প বলেই সাজাটা বেশী দিলেন না, এই তাঁর বক্তব্য। রায় শুনে প্রবীর শুধু একটা কথা বললে : আমি নির্দোষ।

কোর্টের সবাই একথা শুনে হেসে উঠলে।

• • • •

বিচার শেষে আদালতের বাইরে এসে মা-বাবা মি: মিত্রকে ধন্যবাদ জানালেন।

মা বললেন : আপনি যা করলেন, তা চিরকাল মনে থাকবে।

বাবা আমার পানে তাকিয়ে বললেন : বাজে ছেলের সঙ্গে মিশে ক্যারিয়ার নষ্ট করে লাভ নেই। তৈরী হও, বিলেতে যাবে।

মি: মিত্র এবারও শুধু হাসলেন। আমরা যখন কথা বলছি তখন হঠাৎ মি: বাসু এসে হাজির। বাবাকে দেখে বললেন : মুকুল, তোমাকেই খুঁজছিলাম যে।

: কী ব্যাপার বোস সাহেব? বাবা জিজ্ঞেস করেন।

: বলছি হে!

তার পর মার দিকে তাকিয়ে বললেন, মিসেস্ রয়, আপনি রত্নগর্ভা। ছেলে আপনার কী করেছে জানেন?

একথা শুনে সবাই মি: বাসুর পানে তাকালেন। মা উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কী?

মি: বাসু আমার হাত ধরে [illegible] দিয়ে বললেন, বাবা রতন, তোমার উপকার আমি কোন দিনই ভুলব না। সেদিন বাসে তুমি যদি জয়া ও তার বন্ধুকে ঐ স্কাউণ্ড্রেল বদমাস প্রবীর ছোকরার হাত থেকে উদ্ধার না করতে আর যদি না প্রবীরকে টেনে নিয়ে যেতে, তাহলে সারা শহর কী কেলেঙ্কারীই না হ'তো! আমি তো আগেই বলেছিলাম মিসেস রয়, আপনার ছেলে বংশের নাম রাখবে।

মার্কিণ প্রেসিডেণ্টদের প্রথমবার

জন টাইলার যখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট হন তখন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ওয়াশিংটন যাবার জন্য টাকা ধার করতে হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে বলনাচ হয় এবং এই প্রথা প্রথম প্রবর্তন হয় প্রেসিডেণ্ট ম্যাডিসনের সময়। মার্কিণ প্রেসিডেণ্টদের যাতায়াতের খরচ আগে দেওয়া হত না। প্রেসিডেণ্ট থিওডোর রুজভেল্টই প্রথম এই ভাতা পান। ১৯০৭ সালে কংগ্রেস এজন্য বৎসরে ২৫ হাজার ডলার বরাদ্দ করে। পরে এর সঙ্গে ঘরোয়া খরচ মিলিয়ে বরাদ্দের পরিমাণ ৩০ হাজার ডলার করা হয়।

প্রেসিডেণ্ট টেডি রুজভেল্ট প্রথম সরকারী খরচায় প্রমোদ ভ্রমণের জন্য 'ইয়ট' নৌকা প্রাপ্ত হন, তবে প্রেসিডেণ্ট ম্যাককিন্লি এজন্য প্রথম একখানি জাহাজ পেয়েছিলেন এবং সেই জাহাজের নাম ছিল "ডলফিন।"

বেতারে প্রথম বক্তৃতা করেন প্রেসিডেণ্ট কুলিজ ১৯২৫ সালে।

ওয়াশিংটনের সরকারী দপ্তরখানা প্রথম চূণকাম করান প্রেসিডেণ্ট এণ্ড্রু জ্যাকসন এবং তখন থেকেই লোকে একে হোয়াইট হাউস বলতে থাকে। কিন্তু সরকারী ভাবে হোয়াইট হাউস নামকরণ হয় থিওডোর রুজভেল্টের সময়।

হার্ডিংএর আগের পর্যন্ত মার্কিণ প্রেসিডেণ্টরা তাঁদের বক্তৃতা নিজেরাই লিখতেন। হার্ডিংই প্রথম বক্তৃতা ও বাণী লেখাবার জন্য জাডসন ওয়েলিভারকে নিযুক্ত করেন।



বিবেকানন্দ-স্তোত্র

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

৪

ঠিক পাকা দু'বছর পরে
রায়পুর থেকে
ফিরে এলো ফের সেই পুরোনো সহরে।
রায়পুরে নরেনের কেটেছিল বেশ।
শস্য-সবুজ পরিবেশ
ধূসর সহরে মনে
রেখে গ্যাছে সবুজের ছোপ।
রায়পুরে দিনগুলো
স্যাঁতসেঁতে ভিজে মনে
ঠিক যেন দুপুরের রোদ!

ওখানে আকাশ নীল-নীল।
সহরের আকাশের মত
চিমনির ধোঁয়া খেয়ে নয় সে শ্রীহীন।
ওখানে সুনীল ব্যাপ্তি
সহরের মলিন দৃষ্টিকে
নিয়ে যায় সুদূরের কাছে।
অসীমের পাণিপ্রার্থী নরেনের মন
বাধাহীন বিস্তারে
দু'দণ্ড হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।
সহরে দিগন্ত নেই,
ওখানে তা' রীতিমত আছে;
যেখানে সবুজ সীমা মিশে যায় অসীমের কাছে।

• • •

আর সেই পথে যেতে যেতে
নির্বাক পাহাড়ের শ্রেণী?
নরেন ওদের কাছে ঋণী।
ওরা অবিকল
ধ্যানী-বুদ্ধের মত ঋজু, নিশ্চল!
কি দারুণ অন্তর্মুখী!
বিন্ধ্যকে না দেখলে
সমাধির ধারণা হোতো কি?
নিয়ত-চঞ্চল এই আমাদের মত
ওরা তো মারে না উঁকি-ঝুঁকি!
ওরাই বুঝেছে যেন জীবনের মানে,
একাসনে ঐ ভাবে কত কাল আছে তা' কে জানে!

• • •

আর সেই মৌচাকখানা?
পাহাড়ের বিরাট ফাটলে?
নরেন কি আর তাকে কোনো দিন ভোলে?
এত মধু রেখে গ্যাছে নরেনের মনে,
জীবনের কলকোলাহলে
থেকে থেকে আজো তার গুঞ্জন শোনে।
সহরের যান্ত্রিক মনে
যেখানে যা' ফুটো-কাটা-ফাঁক।
কোত্থেকে কুসুমস্তরে
উড়ে এসে জুড়ে বসে সেদিনের সেই মৌচাক!
অমনি হঠাৎ
মনে পড়ে সমাধির সেই মিঠে স্বাদ!
কল্পনা পাখা ম্যালে স্মৃতির আকাশে,
ফিরে পেতে চায় সেই মধুমাখা অনুভূতিটাকে!

৫

সবাই তা' চায়।
রক্তের স্বাদ পেয়ে সিংহ কি মাঠে ঘাস খায়?
জীবনে যা' পেয়ে থাকি সবচেয়ে দামী,
ফের যে চাইবো তাকে—এটা কেনা জানি?
একবার যে খেয়েছে মিছরির পানা,
তার মুখে চিটেগুড় কিছুতে রোচে না।
দানাদার-খেকো যদি রাজভোগ খায়,
আজীবন আর কি সে দানাদার চায়?
রাজভোগ না-পেলেও চাইবে সে তাকে,
মন থেকে ফেলে দেবে দানাদারটাকে।
অতএব যা' পেয়েছি সবচেয়ে খাসা,
স্মৃতির সড়ক দিয়ে করে যাওয়া-আসা,
পেয়ে যা' ফস্‌কে গ্যাছে—তাকে চাওয়া, আর
না-পেয়ে যা' চাই, তার অনেক ফারাক্।
এ-চাওয়ার ভারী তেজ, ভারী একগুঁয়ে।
দুরাশার কাঁটাবনে খাবি খায় না এ।
ফুল-ফল-মালা নিয়ে শবরীর মত
আজীবন বসে থাকে—সদাজাগ্রত!

৬

কর্মচক্রে বাঁধা এই আমাদের যান্ত্রিক জীবনে
শিশিরের মত স্বল্পায়ু
এক একটা স্নিগ্ধ অবকাশ
হঠাৎ না-বোলে-কোয়ে
আচম্‌কা উঁকি মেরে যায়।
কেউ তাকে সমাদরে অন্তরে ডাকি,
কেউ বা মলিন বুদ্ধি নিয়ে
কবাট বন্ধ কোরে
মোহেতে অন্ধ হোয়ে থাকি।
সে-সময়টিতে
নির্ভয়ে যদি দোর পারি খুলে দিতে,
তা'হলে হঠাৎ
নিজের এ-জীবনের আগা-পাশ-তলা
চোখের সামনেটাতে পাই,
বহির্জগৎ থেকে
মনটাকে টেনে তুলে
বিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়াই!

• • •

—জীবনের মূল সুর থেকে
জীবনটা কতখানি কোথা গ্যাছে বেঁকে,
আদর্শ ভুলে গেছি কতটা কখন,
নির্জনে ব'সে ব'সে একমনে খতাই তখন।
—কেন আসি পৃথিবীতে
কেন চলে যাই?
মাঝখানে কেন এত
মিথ্যে লড়াই?
কর্মের জাল বুনে
নিজেকে জড়াই কেন?
ঘূর্ণির মত কেন ঘুরপাক্ খাই?
আজকে যা' ভালো লাগে
কাল তাকে কেন যাই ভুলে!
এ-বেলার বিশ্বাস
ও-বেলায় কেন ভুল তোলে?
সকালের যূথী-ফুল
বিকেলে বুড়িয়ে যায় কেন?
একগাল হাসি কাল
ফুঁপিয়ে কাঁদতে বসে কেন?

• • •

স্বল্পায়ু সে-সময়টিতে
আমরা সুযোগ পাই
জীবনকে সুরে বেঁধে নিতে,
আদর্শ ভেঙে-চুরে মনোমত ফের গড়ে নিতে।

• • • • •

এমন মধুর অবকাশে
পাশ ফিরে যে ঘুমোয়,
এ-জীবনে আর জাগে না সে!

৭

পৃথিবীতে যারা বড় হন,
এই শুভক্ষণ
গুঞ্জরিত মৌচাকের মত
যৌবনের উপকূলে এসে
হঠাৎ হাজির হয় একগাল হেসে।
বহুদিন পরে
সুদূর বাপের বাড়ি থেকে
দিদিরা যেমন করে ছোটভাই এলে,
তারা তাকে দেখে
খুশিতে ফেনিয়ে উঠে গান গেয়ে ওঠে;
হৃদয়ের ফুলঝরি জেলে
মুখোমুখি ব'সে থাকে সব কাজ ফেলে।

• • •

তার পর সেও চ'লে যায়।
তবু তার ছায়া-ঘন স্মৃতি
জীবনের শ্বশুরবাড়িতে
প্রাণ-শক্তি রেখে দিয়ে যায়।
লাথি-ঝাঁটা-গঞ্জনা খেয়ে
বেঁচে থেকে বেড়ে উঠি
একদিন সেই শক্তি পেয়ে।

৮

রায়পুরে যাওয়া থেকে ফিরে আসা তার,
মাঝখানে কলরবহীন অবকাশ,
ঘটনার কোলাহলে ঠাসা না-হোলেও,
চেতনার গুঞ্জনে ভারী সুমধুর।
নরেনের হৃদয়ের সহস্রদল
রায়পুরে যেতে যেতে নীরবে যেদিন
বিন্ধ্যের পাদদেশে স্নিগ্ধ ছায়ায়
নির্জনে খুলেছিল একটি পলাশ,
সেই দিনই জীবনের চারা গাছটায়
প্রচণ্ড বিবেকের প্রথম বিকাশ।
তাই দেখি নরেনকে কলেজে যখন
পশ্চিমী-থিওরির কাঠ-ফাটা রোদে
দারুণ অভাববোধে খাবি খাচ্ছেন,
তখনো হৃদয়ে তার সত্যের তৃষা
যুক্তির সাহারাতে হারায়নি পথ।
তখন কি স্মরণের ছায়াপথ দিয়ে
সেদিনের সেই শ্যাম-ছায়া-ঘন দিন
রুক্ষ আকাশে তার ফ্যালেনি কি ছায়া?
প্রশান্তি আনেনি কি তার মরু-মনে?

নইলে ও-শক্তি সে পেলো কোথা থেকে
হতাশার মরুভূমি টপকে যাওয়ার ?
ঠাকুর তো নরেনের জীবনে তখন
সুদীর্ঘ ছায়া নিয়ে উপনীত নন।

৯

জীবন-দেবতা যিনি ঘাড় ধ'রে তাকে
নিয়ে যান অসীমের মৌচাকটাতে,
যতদূর মনে হয় তাঁরই ইশারায়
রায়পুরে পাঠশালা ছিল না কোথাও।
অতএব পড়াশুনো সযত্নে ওর
শিকেতেই তোলা ছিল পাকা দু'বছর।

• • •

অন্তর্মুখী মন সেই অবকাশে
নির্জনে বেঁধেছিল জীবনের তার।
নিজেকে ছায়ার মত কাছে কাছে রেখে
ঘুরে-ফিরে দেখেছিল চেহারাটা তার।
হৃদয়ের গুহাতলে ঢুকে রোজ-রোজ
ঘুমন্ত সিংহের নিত সন্ধান।
হাই-তোলা দেখে তার লোভ হোতো মনে
কেশর ফুলিয়ে কবে দেবে হুংকার।

• • •

পড়াশুনো না করুক, চিন্তা কোরেছে,
বুদ্ধিটা বেড়ে গ্যাছে বয়েসের চেয়ে।
বাবার আলাপীদের জ্ঞানের গলায়
দেখেছে পরখ কোরে বুদ্ধির ধার।

১০

"ভালো কথা, আমাকে কি ভাবেন মশাই ?
চেহারায় ছোটো বোলে বুদ্ধিতে তাই ?
না-বোলে উপায় নেই, এটা আপনার
দারুণ স্পর্ধা ছাড়া আর কিছু নয় !"

• • •

বাবার বন্ধুগণ ডেঁপো ছেলেটিকে
মনে মনে নির্ঘাত কান মুলে দ্যান।
মেজাজ ঠাণ্ডা হোলে হয়তো ভাবেন—
কথা ক'য়ে নরেনকে কাত করা দায় !
ওর কথা যেন ঠিক অ্যাসিডের মত,
গায়ে যার লাগে সেই জানে মোক্ষম !

তা-সে-যত-যাই-হোক, তাই ব'লে তবু
আমাকে ধমক দেওয়া উচিত কি ওর ?
এমন গোঁত্তা খেয়ে তেড়ে-ফুঁড়ে এলো,
আমি ভাবি এই বুঝি গালে মারে চড় !
যাক্ বাবা এই দানে খুব বেঁচে গেছি,
বেসামাল কোনো কথা বোলবো না ভুলে।

কিংবা এখুনি গিয়ে কাপড়-গলায়
ক্ষমা চেয়ে কাছে ডেকে করি কোলাকুলি।

• • • •

নরেনের বাবা শুনে ধমকানি দ্যান,
মনে মনে অবিশ্যি পিঠ চাপড়ান !
এ-বয়েসে যার এত বুদ্ধির ধার,
বড় হোলে না-জানি সে হবে কি বিরাট !
এত লেখাপড়া এত বুদ্ধি আমার,
তবু ওর কথা শুনে বোবা মেরে যাই !
ওর তেজ যেন ঠিক সূর্যের মত !
খুব বেশি চেয়ে থাকা সঙ্গত নয়।
এত 'অরিজিন্যালিটি' আছে চিন্তায়,
একদিন দুনিয়াতে হবে 'ফার্স্ট'বয়'।

• • •

তর্কের ঝড় তুলে নরেন যখন
তীরের ফলার মত যুক্তি ওঁচায়,
বাপ ও ছেলের সেই বিতর্ক শুনে
নরেনের মা'র মনে ধোঁকা লেগে যায়।
অবিশ্যি, যুদ্ধের ফলাফল যদি
স্বামী-সৌভাগ্যের বিপরীত হয়,
ভুবনেশ্বরী দেবী ভারী খুশি হন।
পুলকে বুকের পাল ফুলে ওঠে তাঁর
খুশিটা ঘন-ঘন তোলে ঝঙ্কার !

১১

রায়পুরে বাপ-মাকে কাছাকাছি পেয়ে
তাঁদের বিরাট ছায়া প'ড়েছিল মনে।
বাবার উদার মত, প্রশান্ত মন,
ঝকঝকে মেধা আর দীপ্ত জীবন ;
মায়ের পবিত্রতা, সত্যের খাঁটি,
হৃদয়ের নম্রতা, আগুনের ঝাঁঝ,
নরেনের কাঁচা মনে ঘুরে-ফিরে এসে
আজীবন অসংখ্য রেখে গ্যাছে দাগ।

• • • •

রায়পুরে নরেনের বেশি কথা নেই,
জমকালো ঘটনার ঘনঘটা নেই।
দু-একটা কাকলি বা মৃদুগুঞ্জন,
—রায়পুরে জীবনের এই মূলধন।

• • • •

কুঁড়ি কি পাপড়ি খোলে ভীমগর্জনে ?
নির্জন না হোলে কি দই ভালো জমে ?
ঘটনার কোলাহল ছিল না বোলেই
জীবনের মূল সুর শুনেছিল সে।
নীরবতা বেড়া দিয়ে ঘিরেছে ব'লেই
বিবেকের বটবীজ বিকশিত যে।

[ক্রমশঃ।


বাড়ী যেতে
রমেশের ভয় হ'ল...
কাপড় আমার ময়লা করে ফেলেছি রাম। এখন মায়ের কাছ থেকে বকুনি খেতে হবে।
আমার কাপড়ও তো প্রায়ই ময়লা হয়ে যায় ভাই, কিন্তু মা আমাকে কখনও বকেননা। আয় আমার সঙ্গে।
ও কাঁদছে কেন ?
কাপড় ময়লা হয়ে গেছে বলে ও বাড়ী ফিরতে ভয় পাচ্ছে।
রমেশের বাড়ী
আবার নোংরা হয়ে বাড়ী ফিরেছো! আর কোনদিন তোমায় বাড়ীর বাইরে খেলতে যেতে দেবোনা!
আহা বাছাকে বোকোনা-খেলতে গেলে সব ছেলেই অমন কাপড় ময়লা করে ফেলে।
ওর কাপড় আছড়ে কাচতে রোজই আমায় গলদঘর্ম হয়-আর সেইজন্যেই তো ওর কাপড় অতো তাড়াতাড়ি ছেঁড়ে!
সে তো বটেই, আছড়ে কাচলে কাপড়ের সুতো ছিঁড়ে যাবেই তো, তারজন্যেই অতো তাড়াতাড়ি কাপড় ছেঁড়ে!
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে
কিন্তু সানলাইট সাবানে কাচলে আছড়াবার দরকার করেনা। এর প্রচুর ফেনায় অতি সহজেই সমস্ত ময়লা বার করে দেয়, তার সেইজন্য আপনার জামাকাপড় টেঁকেও বেশীদিন।
এ কথা সত্যি! দ্রুত ফেণাযুক্ত সানলাইট সাবান না আছড়ে কাপড়চোপড়কে সত্যিই সাদা ও ঝকঝকে করে তোলে। তার মানে-কাপড়চোপড় টেঁকেও বেশীদিন আর আমার পয়সাও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
সান্‌লাইট সাবান কাপড়কে আরও টেকসই করে।
ভারতে প্রস্তুত

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



পাগল

শ্রীসুনীলিমা ঘোষ

ছোট ছোট শিশুদের উচ্ছ্বাসের কলরোলে ও হাততালিতে আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এলাম বাইরে। ভাবলাম, ভালুক নাচ বা বাঁদর নাচ হবে। বাঙলা দেশের লোক আমরা, কাজেই বাঁদর বা ভালুকের সঙ্গে নেই নিত্যকার সম্বন্ধ, তাই ওদের নাচ দেখতে ছুটে আসি শিশুরই আনন্দে। কিন্তু ছুটে এসে যা দেখলাম, তাতে হয়ে গেলাম নিশ্চল, আনন্দের বদলে জাগলো দুঃখ, আনন্দের শিহরণ উঠলো না বুকে, ব্যথায় হৃদয় হলো মথিত। সেটা নাচই বটে, তবে বাঁদর বা ভালুকের নয়। মানুষের—পাগলের। দেখলাম, গোটা পঁচিশেক ছেলে মিলে হট্টগোল করতে করতে ও চার-পাঁচটা কুকুর ঘেউঘেউ করে ছুটে চলেছে কারো পেছনে তাড়া দিতে দিতে। চোখ পড়লো তাদের হাত দশ দূরে শতছিন্ন ও শততালি দেওয়া একটি কাপড়ের টুকরো গায়ে, কোমরে ও মাথায় জড়িয়ে এদের অত্যাচারে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে চলেছে সে। হাতে একটা ইট। মাঝে মাঝে ফিরে তেড়ে এসে কুকুর তাড়াচ্ছে আবার তাড়া খেয়ে ছুটে চলেছে সামনে—কতটা রাস্তা এই দারুণ লু-চলা তপ্ত মধ্যাহ্নে ওরা ওকে তাড়িয়ে এনেছে, কে জানে?

কে জানে কেন হলো ও পাগল! একদিন ঐ ছেলে-পিলেদের মত সে-ও হয়তো তাড়া করেছে পাগলকে। তার পর? তার পর—হয়তো ও ছিল বেশ সচ্ছল ঘরের ছেলে—কোন অভাবই ছিল না সংসারে। হঠাৎ দেশ হলো ভাগ, সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যও হলো ফাঁক। তবু কাটছিলো দিন কোন রকমে। একদিন কতগুলো গুণ্ডা মত লোক এসে বাড়ি করলো ঘেরাও—কাটলো মা, বাবা, ভাই, ছেলে, মেয়ে, গরু নিয়ে গেল টেনে টেনে, সঙ্গে নিয়ে গেল বৌ ও বোন। খড়ের গাদায় লাগালো আগুন, ধানের গোলা জিনিষপত্র নিমেষে হলো উধাও,—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে দেখলো এ সব। দেখলো মা বাবার অনেক দিনের গঙ্গাস্নানের সাধ ভগবান পূরণ করেছেন, নিজেদেরই রক্তগঙ্গায় স্নান করছে তারা। বৌ, বোনের রাত-দিন ঘরের কোণে আবদ্ধ থাকবার অনুযোগের হলো অবসান। কিন্তু ওর ওপর ভগবান এত সদয় কেন? হয়তো ওদের কাউকে উপভোগ করতে এক জনকে রেখে গেল গুণ্ডারা, এতক্ষণ ও হতভম্ব হয়ে ছিল—তিন চার ঘণ্টা পর ছিন্নমস্তা মা, বাবাকে দেখে কেঁদে উঠলো হু-হু করে। পর মুহূর্তেই তার ওপর ঈশ্বরের অসীম কৃপার কথা স্মরণ করে ভীত-সন্ত্রস্ত প্রতিবেশীর হৃৎকম্প করিয়ে হেসে উঠলো হাঃ, হাঃ, হাঃ! তার পর থেকেই ওর এমনি ভাবে দিন যাচ্ছে, কখনো বুক-কাঁপানো হাঃ, হাঃ হাসিতে, কখনো বা বুকভাঙ্গা কান্নায়।

আদর করে ডেকে খেতে দেবার লোক ইহজগতে তার নেই, তাই মিষ্টির দোকানের আশে-পাশে, ডাষ্টবিনে, নালিতে কুকুরের সঙ্গে কুকুরের মত চেটে যায় পাতার সঙ্গে লেগে থাকা অবশিষ্টাংশ। তার অংশে ভাগ পড়াতে সারমেয় আসে ঘেউ-ঘেউ করে আর সুস্থ মানুষ আসে ইট নিয়ে তেড়ে। কোন দিন যদি কোন সহৃদয় লোক খাবার দেয় নিজে না খেয়ে যার সঙ্গে চিরকালের বিরোধ সেই কুকুরকে খাওয়ায় পরম তৃপ্তির সঙ্গে, নইলে তক্ষুণি ফেলে দেয় ডাষ্টবিনে। নিজে থাকে অভুক্ত।

পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব চমৎপ্রদ ঘটনা বিনা রক্তপাতে ভারতের স্বাধীনতা লাভ! বাঙালী! স্বদেশসেবায় তোমার দান অস্বীকার্য্য, নইলে বহু সাধনার এ দিনে তুমি সমৃদ্ধিশালী বাঙালী তুমি আঁস্তাকুড়ের জীব! তুমি কাপুরুষ! তাই তুমি ছেড়ে এসেছ তোমার আত্মীয়-স্বজন, ঘর-বাড়ি, পুকুর—চোদ্দ পুরুষের ভিটে! তুমি কাঙ্গাল বাঙাল—তাই অন্যের বাড়া ভাতে ভাগ বসাও, পাও অবজ্ঞা! তোমার রক্তে-ভেজা মাটিতে শক্ত হয়ে দাঁড়ালো তিন-রঙা স্বাধীনতা ঝাণ্ডা। কিন্তু তোমার কি হলো, তুমি যে তিমিরে ছিলে সেই তিমিরেই রইলে। তোমার মনোবেদনা কতটুকু পরিণতি লাভ করলো? ইতিহাসের পাতায় ভারতের গৌরবের স্বর্ণাক্ষরের পাশে রক্তাক্ষরে কি লেখা থাকবে তোমার এ দুঃখের ইতিকথা?

হয়তো বা ও ছিল কোন বড়লোকের একমাত্র ছেলে, বিদ্বান কিন্তু নিরহঙ্কার, বুদ্ধিমান কিন্তু সংসারে অনভিজ্ঞ। গাড়ি ছাড়া মাটিতে পা পড়ে না, বড় আদরের একমাত্র ছেলে। উচ্চশিক্ষার জন্য গেল বিদেশে—কিছুকাল পর শুনলো, বাবা মারা গেছেন। মা আগেই গিয়েছেন। বাবাই একাধারে মা ও বাবা। কাজেই আঘাত লাগলো প্রচণ্ড। ত্বরিতে এলো ফিরে। দেখলো ওরই পোষ্য ওর জ্ঞাতি-ভাইরা কায়েমি ভাবে জুড়ে বসেছে ওদের ভাল ভাল ঘরগুলোতে। প্রথমে ওরও হলো রাগ। বহুদিনের পুরান চাকর উইলের প্রশ্ন তুলেছিলো—ও করুণ হেসে উড়িয়ে দিল সে কথা। কে না জানে ওর বাবাই এসব করেছেন। কিন্তু জানাটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়, আদালত আছে তো? সেখানে আইন যেমন আছে, আইনের ফাঁকও আছে তেমনি। সর্ব্বোপরি আছে টাকার খেলা। কাজেই দিনের পর দিন কামরা বদল হতে হতে শেষে এসে ওর জায়গা ঠেকলো চাকরের কোয়াটার্সে—বাবার শোক ভুলতে না ভুলতে এসব হয়ে গেল আলাদিনের করস্পর্শে। আসতে লাগলো চাকরেরই বরাদ্দ লাপসি আর মোটা চালের ভাত। তার মধ্যে আর কিছুর স্নেহস্পর্শ ছিল কি নইলে এতদিন পরও বাবার জন্য রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে ডুকরে ডুকরে কাঁদে কেন? খানিক পর চার দিকে আতঙ্কিত দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে আসে বেরিয়ে। ওর সম্পূর্ণ বিদ্যাও অবলুপ্ত হয়নি বিস্মৃতির তলে, তাই জোর দিয়ে দিয়ে উচ্চারণ করে, a b c d e f g h i j ইত্যাদি। এর থেকে থিসিস্ লিখবার জন্য জড়ো হয় জ্ঞানী-গুণী লোক, দেয় বাহবা।

রাতের অন্ধকারে আরেকটি মূর্ত্তিও অতি সন্তর্পণে বেরিয়ে আসে প্রাসাদ থেকে। ছোট্ট টিমটিমে আলো উঁচু করে খুঁজে ফিরে তাকে। অনেক খোঁজার পর হয়তো সন্ধান মেলে, কোন দিন বিড় বিড় করে

আপন মনে চলতে থাকে, কোন দিন নিশ্চুপ হয়ে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে সামনে। বৃদ্ধ পরম স্নেহভরে তার হাত দিয়ে ভুলিয়ে দিতে চায় ওর দুঃখ। তার কোটরগত চোখ থেকে তুবড়ানো গাল বেয়ে অঝোরে ঝরে অশ্রু। ওপরে তাকিয়ে নিঃশব্দে জানায় নালিশ। তার পর হাত ধরে নিয়ে চলে নিজের ঘরে। ঘরে এসে মুছিয়ে দেয় ঘর্মাক্ত সারা শরীর। কোন দিন শিহরিয়ে ওঠে ক্ষতস্থান দেখে। পরম যত্নে মুছে বেঁধে দেয় ওষুধ। এমনি ভাবে কাটে ওর জীবন। যেদিন এই বৃদ্ধের হবে মৃত্যু, সেদিন থেকেই হবে ওর সব স্নেহের ইতি।

হয়তো বা ও ছিল প্রেমিক। কত মধুর সন্ধ্যা গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে ওদের প্রেমগুঞ্জরণে। কত বার চাঁদ-তারা থেকেছে সাক্ষী তাদের উৎসব-মিলনের। দিবস-রজনী কেটেছে স্বপ্নের মত মধুর ভাবে। ওরই নিরুপমার স্বর ঝঙ্কৃত হয়েছে সুরে সুরে, 'তোমাতে সমস্ত লীন তুমি আছ একা।' বহু আকাঙ্ক্ষিত সানাইর সুর বেজে উঠলো তার প্রিয়ার আঙ্গিনায়। শুভ লগ্নে মাল্যদান করে বললে তারই প্রিয়তমা—'যদিদং হৃদয়ং তব তদিদং হৃদয়ং মম।' কিন্তু সে তাকে উদ্দেশ্য করে নয়, সে অন্য কেউ।

এর পর থেকেই ওর পরিবর্ত্তন হলো সুরু। ঘরে ওর মন বসে না, রাস্তায় ঘুরে ঘুরে ফেরে। ভাল জামা-কাপড় ভাল লাগে না, ছেঁড়া টুকরো লাগে যতটা, পথের আবর্জ্জনা তার পরম আকাঙ্ক্ষিত, আঁস্তাকুড়ের নালির খাদ্য না খেলে তার পেট ভরে না। বিড়-বিড় করে সারা দিন কথা বলে, কেউ না বুঝলেও ওর কিছু এসে যায় না। তার ভেতর এক-আধ লাইন কবিতা গানও শোনা যায় কখনো কখনো—সব পাঠোদ্ধার করা যায় না, কিন্তু তিনটি লাইন প্রায়ই সে বলে করুণ কিন্তু স্পষ্ট ভাবে—

'সই কেমনে ধরিব হিয়া
আমার বঁধুয়া আন্ বাড়ি যায়
আমারি আঙ্গিনা দিয়া।'

মনে পড়ছে কিছু দিন আগের দেখা আর একটি করুণ দৃশ্য। সুস্থ সবল যুবতী—পাগলের কোন লক্ষণ-ই নেই। নিজের মনে চুপচাপ বসে থাকে, কিন্তু ছোট শিশু দেখলেই হয়ে ওঠে চঞ্চল, করুণ সুরে ডাকতে থাকে, আয় খোকন আয়, মাণিক আমার সোণা আমার আয়। আয় আমার বুকজোড়া ধন, সঙ্গে সঙ্গে দু' হাত বাড়িয়ে ছুটে যায়। বলা বাহুল্য, তৎক্ষণে খোকনের বাড়ির দরজা-জানলা যায় বন্ধ হয়ে, পায় না তার নাগাল। তার পর পথের ধুলো-কাদা দিয়ে পরম যত্নে ছত্রিশ ব্যঞ্জন রেঁধে

ধুলো দিয়েই চমৎকার আলপনা কাটে, আসন পাতে। নিজে স্নান করে, সিঁদুর পরে পথেরই ধুলোয়, তার পর আঙুল স্পর্শ করায় লোহায়। এবার স্বামি-পুত্রকে ডেকে বসায় খাওয়াতে। পরম তৃপ্তিভরে খাওয়ায় তাদের, তার পর আবার সব চুপ। দেখে মনেই হয় না এর সবটাই কাল্পনিক, সামনে নেই কারো উপস্থিতি, ছত্রিশ ব্যঞ্জন তার ধুলোয় রাঁধা। প্রতিদিন বিকেলে পথের ছেঁড়া কাপড় কুড়িয়ে তা দিয়ে পরিপাটি করে চুল বাঁধে, ঘাস ছিঁড়ে, কাগজ কুড়িয়ে চার দিকে ঘুরে ঘুরে সূর্য্য প্রণাম করে, হাত দিয়েই বাজায় শাঁখ, কাল্পনিক তুলসীতলায় প্রণাম করবার আগে হাতের শাঁখাকেও প্রণাম করতে ভোলে না। খেয়াল থাকে তার চারপাশের কৌতূহল জনতার দিকে। ওষুধের দোকান থেকে ফেলে দেওয়া তুলোয় জড়ানো টিনচার বা লাল ওষুধ নালির জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে নির্বিকারচিত্তে আলতা পরে। অর্থাৎ গৃহস্থ বধূর কর্ত্তব্যে কোনখানেই ফাঁক নেই। কিন্তু দিনের আলোয় সে শুধু করে বিড়-বিড়, অন্ধকার গভীর হতেই রাতের নিস্তব্ধতা খান্ খান্ করে তার অমানুষিক করুণ কণ্ঠ ভেসে ওঠে, "আমার খোকন বাবা আমার, আমার বুকে ফিরে আয়, তুই তো জানিস আমি তোকে ছেড়ে এক মুহূর্ত্ত থাকতে পারি না তবে কেন আমার বুক খালি করে চলে গেলি? কোন পাপে আমায় ছেড়ে গেলি—আয় আমার বুকজোড়া ধন ফিরে আয়, ফিরে আয়। আয় বাবা আয়, আয় সোনা আয়।" প্রহরের পর প্রহর ধরে চলে ওর বিলাপ। বিলাপেও আছে সুস্থ মানুষের স্পর্শ, এক অমানুষিক কণ্ঠস্বর ছাড়া।

ঐ যে ছুটে চলেছে ভীত-সন্ত্রস্ত অত্যাচারে জর্জ্জরিত, ক্ষুধার্ত্ত, অর্দ্ধ-উলঙ্গ, কে জানে কেন হলো ও পাগল—সর্বস্ব, ধন সম্পদ, প্রিয়জন ঘর, বাড়ি সব এক সাথে খুইয়ে? পরম আত্মীয়ের স্বার্থপরতার স্নেহস্পর্শে? ব্যর্থ প্রেমে? না অপত্যস্নেহে বঞ্চিত হয়ে—কে জানে কেন? হয়তো এর একটা ওর পাগলামীর জন্য দায়ী, হয়তো এর কিছুই নয়, হয়তো ওরা বংশানুক্রমিক পাগল—কে জানে ওর জীবনে কোনটা সত্যি!

আমরা অস্বাভাবিক কিছু দেখলেই করি ঠাট্টা, বিদ্রূপ—জানি না সহানুভূতি দেখাতে, পারি না এতটুকু সান্ত্বনা বা স্নেহ দিতে। তাই রাস্তায় চলতে গিয়ে কেউ পা হড়কে পড়ে প্রচণ্ড আঘাত পেলে ও তাকে ধরবার আগে হাসির রোল ওঠে চারদিকে। তাই পাগলের পেছনে ছুটে চলে ছেলে বুড়ো সমান আনন্দে। শুনেছি এক জাহাজ তুলো দেখে তা কাটবে কে এই সামান্য কারণে প্রচণ্ড শক্ পেয়ে যেমন সুস্থ লোক হয়ে যায় পাগল। তেমনি সামান্য একটি মনোমত উত্তর, সব তুলো কাটা হয়ে গেছে এতেই সে হয় সুস্থ। শোনা যায় সুস্থ ছেলের পাগলামির কারণ ছোট একটু জিজ্ঞাসা, 'সাদা ধবধবে, লাল টুকটুকে, কালো কুচকুচে, হলদে কি?' নাই বা পারলাম আমরা সোনার কাঠির স্পর্শে এদের সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে, নাই বা পারলাম মনস্তত্ত্বের মস্ত বড় ফরমুলা আবিষ্কার করতে, কিন্তু ক্ষ্যাপাকে আরো ক্ষেপিয়ে সুস্থ মানুষের আনন্দের উপকরণ যোগাবার যুক্তিকে কোনক্রমেও বরদাস্ত করা যায় কি?

কবিতা শেষের

মিতা সেন

শিলং-এর পথে নয়া ডালহৌসীর মোড়ে
তোমার আমায় দেখা হঠাৎ।
হয়তো কোন এক এক্সিডেন্টে,
তুমি হয়তো আবদ্ধ "বক্তা,"
কোন অফিসের টেলিফোন গার্ল।
চোখে তোমার কাজল আর ক্লান্তির ছাপ
খোঁপাটা ভেঙ্গে পড়েছে পিঠে।
কম দামী সাড়ীটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প'রেছ,
হাতে লেডিজ ব্যাগ আর ছাতা।
চোখ তুললে আমার প্রতি,
শিউরে উঠলো আমার রুক্ষচুলগুলি,
লজ্জিত হ'লো ছেঁড়া পাঞ্জাবীটা।
সেদিন ঐ পর্য্যন্তই।

হয়তো জান্তে তবু যেন অজান্তেই
আবার দেখা হয়, আলাপও।
দুজনায় বেড়াতে চলি
কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে, মনুমেন্টের ধার-ঘেঁষে
আরও পশ্চিমে—।
মেসে ফিরে নিবারণকে ডাকি
কিন্তু সে আসে না
খুঁজে খুঁজে পাই না মোম বাত্তির টুকরোটা
দোয়াত উপুড় ক'রে এক কৌটা কালি।
ভেতরের জন্তুটার কামড়ে আর্তনাদ ক'রে উঠি
মনে পড়ে—
সারা দিন কিছুই খাওয়া হয়নি
তবু তোমার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছি।

একদিন
বেড়াতে বেড়াতে অনেক দূর চ'লে এসেছি
ফোর্ট পেরিয়ে গংগার ধারে
সন্ধ্যার সিঁদুরে-আলো আকাশে
গংগার চঞ্চল ঢেউ। আর
আমার পাশে তুমি।
নিবারণ চক্রবর্তী দৌড়ে আসছে
আমিও প্রস্তুত। হঠাৎ তুমি আমার—
মুখোমুখি দাঁড়ালে, বললে—
"চাকরি ছেড়ে দিয়ে এলুম।"
নিবারণ তক্ষুণি পালিয়ে গেল,
আর্তনাদ ক'রে উঠলাম আমি—
"তাহ'লে উপায়?"
মধুর করে হাসলে তুমি আমার দিকে চেয়ে,
"উপায়? কেন তুমি।
তুমিই তো আমায় বন্ধ করেছ মিতা।

পারবে না আটকে রাখতে ?
আমি অনেক শান্ত হয়ে যাবো।"
উত্তর দিতে পারলাম না
মেসে এসে মনে পড়লো হঠাৎ
দেশের বৌটার কথা।
দেয়ালের হাড় ঠেলে বেরিয়েছে
ম্যালেরিয়া আর সূতিকার আজন্ম প্রেয়সী
তবু তার একমাত্র ভরসা আমিই।
তাই আজও সে স্নানের পরে
আরশীতে মুখ দেখে, কপালেতে আঁকে
মস্ত বড়ো লাল এক সিঁদূরের কোঁটা।
শোভনলালই শেষে জয়ী হ'লো।
হয়তো আজও তুমি
যখন বিকেল নামে ডালহৌসীর মোড়ে
আয়ত চক্ষু মেলে খুঁজে ফেরো কাহার আশায়
তারপর রাত্রি নামে। চলে যাও নীরব ভাষায়—
চাকুরি পেয়েছি আমি মোটা মাইনেতে,
আরও শোন, অফিসের সাহেবের সাথে
আমার বিয়ে। আসছে ২৫শে তারিখ।
সব ঠিক।
আর একটি দীর্ঘশ্বাস, আর একটি কথা,
শুধু ভেসে যায়—
হে বন্ধু বিদায়!

নন্দিতার নন্দন কানন ভ্রমণ

নন্দিতা

ব্যাপারগুলির মধ্যে নতুনত্ব কিছুই নেই। অতি স্বাভাবিক নিত্য-নৈমিত্তিকের ঘটনাবলী। তবু নিতান্ত দৈনন্দিন ব্যাপারও যে উল্লেখযোগ্য—এটা তারই নিদর্শন ছাড়া আর কিছুই নয়। কোন্‌টির কি তাৎপর্য্য, সে অবশ্যই ব্যক্তিগত মতবাদের কথা। আমি যে ঘটনাগুলি বলছি, সেগুলি খুবই সাধারণ নিত্যকার ব্যাপার, আগেই বলেছি। সেগুলি কেন উল্লেখযোগ্য বোধ হল, তার বিশ্লেষণ আপনারাই করুন।

Quit Indiaর পর অনেক বিদেশীয়রাই ভারত ছেড়ে গেছেন ও সেই সব স্থানে ভারতীয়রা প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এ রকম একটি ধাক্কা সামলানো কি সহজ ? ভারতবাসীর সুদিন এল এত দিন পরে। যোগ্যতা ও মেধার কদর এবার হবে। দু'-চারজন ভারতীয় যাও বা ছিলেন—দেশের জন্যে বড়ো একটা হিত তাঁরা করে উঠতে পারেননি। তখন দিন-কাল ছিল আলাদা। এখন ভারতীয়ের হাতে ভারত সম্পূর্ণ ভাবে। ওপর থেকে বড়ো সাহেবরা যাওয়াতে ছোট সাহেবরা বড়ো সাহেব হলেন এবং তার নীচে ও পর পর প্রত্যেকেই তাদের কাজের Record ও Seniority হিসাবে এবং যাদের কাজ পাবার যোগ্যতা আছে তাদের মধ্যেও বহু লোকের Promotion হ'ল। কিন্তু Technical Postগুলি তো সে ভাবে ভরানো সম্ভব নয় ? সেগুলির জন্যে Advertise করা হ'ল।

আমার বন্ধু সুধাংশু সেই ভাবে ঢুকে পড়ল এই আপিসের এক সাহেবের পদে। Technologyর কৃতী ছাত্র ছিল—কলকাতার একটি কলেজে বছর পনেরো নির্বিবাদে অধ্যাপনা করবার পর হঠাৎ যে আমাদের অধ্যাপক ঘোষ "সাহেব" হ'তে গেল কেন, কি জানি! অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ও স্বাধীনচেতা ও তাঁর মত Idealist প্রকৃতির মানুষের পক্ষে আপিসের সাহেব হওয়া ঝকমারী বলেই তো জানতাম। ছাত্র-মহলে তাঁর মত শ্রদ্ধাভাজন হওয়া অধ্যাপকের জীবনে সত্যিই কাম্য। কলেজের কর্তৃপক্ষরাও তাঁর যোগ্যতা ও বেপরোয়া ভাবটিকে খাতির না করে পারতো না। সুধাংশু আমার বাল্যবন্ধু। তাদের পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারে আত্মীয়তা না থাকলেও ঘনিষ্ঠতা অটুট আছে সুধাংশুর ঠাকুরদাদার আমল থেকে। কাজেই সুধাংশু সম্বন্ধে কিছু বলা আমার পক্ষে অনধিকার চর্চা নয়।

মনে পড়ে কলেজে চাকরী পাবার পর আমরা সবাই মিলে কতো ভালো ভালো মেয়ের সম্বন্ধ নিয়ে তার মতের অপেক্ষা করতাম। সে হাসতো—কথা বলতো না। তার সেই মৌনতা যে সম্মতির লক্ষণ নয়, সেটা সে তার মৌনতা দিয়েই বুঝিয়ে দিত। কী যে চায় তা বলেনি—Intellectual companionship উপযুক্ত হবে মনে করে পাশকরা মেয়েদের সম্বন্ধ নিয়ে গিয়েও তার মত পাইনি। শেষটা প্রায় আমরা রেগেমেগেই চুপ করে গেলাম। তার পর বছর কয় পর টুক্ করেই সে নন্দিতাকে বিয়ে করে ফেলল। নন্দিতা সুন্দরী নয়—বিদুষীও নয়—অগাধ সম্পত্তিশালী পিতার একমাত্র কন্যাও নয়। সবাই বলল ওর মতি-গতি বোঝা দায়! বিয়ের পর যত দেখছি সুধাংশুর পারিবারিক জীবন ততই নন্দিতা দেবীর শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সহজ ভাব আমাকে মুগ্ধ করছে। সেকেলে ও একেলের উপযুক্ত মিশ্রণে আমার বন্ধুপত্নীটির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখি—সহজে তা চোখে পড়ে না। নন্দিতার কথায়-বার্ত্তায়, আড়ম্বরহীন পোষাকে-পরিচ্ছদে প্রকাশ পায় তাদের বংশের আভিজাত্য।

তাই কৌতূহল হ'ল যে, এই মাণিকজোড়টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকের মধ্যে কি ভাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলছে তাই জানবার। বিশেষত নন্দিতা দেবীর বিষয়। (মাপ করবেন, নন্দিতা দেবীকে দেখলে কোনও ইঙ্গিত নিশ্চয় মনে উঠতো না আপনাদের—নন্দিতা দেবী আমার বৌঠান্ সম্বন্ধে জ্যেষ্ঠ।) গত গ্রীষ্মের ছুটিতে এই ঘোষ-দম্পতির আতিথ্য গ্রহণ করবার সুযোগটা হাতছাড়া করিনি। আমার গল্পের যে সব ঘটনাবলী সে সেই গ্রীষ্ম-আবাসের ফল।

ভারতমাতার একটি সত্যোজাত stateএর অঞ্চল। নতুন সহর যেমন হয় এ জায়গাটিও ঠিক সেই রকম। পাশাপাশি বাংলো বাড়ী—Democratic Govt-এর পল্লী—status ও আয় হিসাবে বাড়ী ছোট-বড় হওয়া সঙ্গত হ'লেও নিউ দিল্লীর মত মার্কামারা রাস্তা করা এঁরা সঙ্গত মনে করেন নি। কাজেই Secretary থেকে পিয়ন পর্য্যন্ত একই অঞ্চলে কোয়ার্টার তৈরী হয়েছে। আমার এই ideaটা খুবই মনে লাগলো। সত্যিই তো Official status-এর সঙ্গে Social status কেন affected হবে—নয় কি ? ছেলেমানুষ আর বলে কাকে! মা-বাবা তো কতো নীতি কথাই শুনিয়ে থাকেন—ছেলেরা যদি ওকেই

মেনে চলবে তবে আর ভাই-ভাইতে লাঠালাঠি বাধে কেন ? তাই বলুন।

পরস্পর কাছাকাছি থাকবার সুবিধা যতো, অসুবিধাও ততো। যতো কিছু ভালো-মন্দ যতটা চোখে পড়ে ততোধিক কানে আসে। নন্দিতার সামনের বাংলোতে থাকেন Mr. Singh—একজন secretary, তাঁর চলন থেকেই কতকটা অনুমান করেছিলাম এবং স্ত্রীটির বলন শুনে আর মুহূর্ত্তের জন্যেও ভোলবার উপায় রইল না। নন্দিতারই বয়সী হবেন ভদ্রমহিলা—কিন্তু লোকাচারে জ্যেষ্ঠ বলেই হয়তো নন্দিতার সঙ্গে পরিচয়ের পর আলাপ জমেনি।

নন্দিতার পাশের বাড়ীতে থাকেন under Secretary Gupta. অল্প বয়স—এদের, ভারি মানিয়েছে স্বামি-স্ত্রীতে। ছোট ছোট দু'টি ছেলে-মেয়ে—বাগানে নেচে নেচে খেলে বেড়ায়, মি: ও মিসেস গুপ্তার বাগান পরিদর্শন এ সব নন্দিতার বাড়ী থেকে স্পষ্ট দেখা যায়,—দেখতেও বেশ লাগতো। দেখতাম এরা Sing-এর বাড়ী ছেড়ে বড়ো একটা আর কারও বাড়ীতে যাবার সময় পায় না। Singhএর বেয়াড়া ছেলে-মেয়েগুলির শত অসহ্য আবদার সব হাসিমুখে সহ্য করেন তাদের Gupta uncle ও aunt শুনলাম, Mr. Singhএর departmentএরই Under Secretary Mr. Gupta এবং সম্প্রতি departmentএ কাজের ভার বেড়ে যাবার ফলে আর একজন Deputy Secretary না হলে আর Mr. Singh পেরে উঠছেন না।

Mr. & Mrs. Sahaniর সঙ্গে এক দিনের পরিচয়ের সৌভাগ্যটুকু হারাইনি। ভদ্রলোকটিও আমার বন্ধুটির মত emergency recruit. বয়স অনুমানিক বছর পঞ্চাশ হ'বে—এদের মধ্যে ইনিই প্রবীণ। এঁরা নাকি অল্পবয়সীদের সঙ্গই বেশী পছন্দ করেন শুনলাম। এঁদের মধ্যে বন্ধুভাবের চেয়ে সন্তানভাবটাই প্রবল।

নন্দিতা বলে, সমান সমান লোকের সঙ্গে মিশতে জানা শিক্ষার প্রয়োজন। অদ্ভুত মানুষ ! নিজের মতই আর এক জনকে উপযুক্ত সম্মান দিতে চায় না, অথচ আরেক জনের কাছ থেকে সম্মান চায়। এমন কি সুবিধা বুঝলে গায় পড়ে মিশতেও সংকোচ হয়নি। কারণ বুঝলেও তার মন সেটা মানতে রাজী হয়নি—ভাবে সাদা ব্যবহার অবশ্যই মানুষকে স্পর্শ করবে। এই জন্যেই তো তাকে সবাই বোকা ভাবে।

নন্দিতার কাছে শুনলাম Singhরা ও Sahaniরা অভিন্ন-হৃদয় ছিল প্রথমটায় কিন্তু নন্দিতার চোখের সামনেই সেই অভিন্নহৃদয় ছিন্ন হয়েছে। কি এক Committeeর election নিয়ে এঁদের মনোমালিন্য এবং এদের স্ত্রীদের মধ্যেও মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এমন কি অন্য কোথাও একসঙ্গে হ'লেও কথাটি নেই।

নন্দিতার কাছে এগুলি বীভৎস ঠেকে। সুধাংশুর গায়ে কিছুই লাগে না। সারা দিন তার কাজ ও কাজের চিন্তা। এত দিন যা পুঁথিগত ছিল আজ সে সব হাতে-কলমে করবার সুযোগ এসেছে। তাই সে নানা কল্পনায় মগ্ন। নন্দিতার সমস্যা তাই আরও বেশী। যেটি সুধাংশুর উচিত বোধ হবে সেটি সে চিরকাল করে দেখেছি, কিন্তু সরকারী চাকুরীতে এসেও যে তার স্বভাব অক্ষুন্ন থাকবে তা আর ভাবিনি।

এক এক সময় নন্দিতা নানা আলোচনা তুলতো তার স্বামীর কাছে দুঃখিত হয়ে। তার ভারি একলা বোধ হ'ত। সুধাংশু হেসে বলতো—তুমি ছেলেমানুষই রয়ে গেলে, যখন তোমায় বিয়ে করেছিলাম তার চেয়ে আর একটুও তোমার বুদ্ধি বাড়েনি দেখছি। এ-সব গায়ে মাখতে নেই, তবে আর যাই করো নন্দিতা out of the way গিয়ে মেশবার চেষ্টা করো না, তাতে বন্ধু পাবে না আর Popularity-র আশায় নিজেকে খেলো করো না।

সুন্দর ছোট পাড়াটি—মুষ্টিমেয় প্রাণী। এর মধ্যে প্রাণ আনবার চেষ্টা যে নন্দিতা করেনি তা নয়। সবাই ভাবলেন নন্দিতা বুঝি তার যোগ্যতা দেখাতে চায়—কাজেই পূর্ণ অসহযোগ।

ওখানে Miss Misra স্বনামধন্যা। Mr. Misra-র দিদি। ভাই-বোন দু' জনেই বয়স কালে নিজেদের বিবাহ প্রতিজ্ঞা থেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এমন একটা বয়সে এসে পড়েছেন যে ও সব প্রশ্ন আর এখন মনে ওঠে না। Mr. Misra এখন Secretary তাঁর বাবাও ইংরেজ আমলের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। Miss Misra বাবার খাতিরের সঙ্গে ভাইয়ের তুলনা করে মর্মাহত হন এবং পূর্বস্মৃতির নানা প্রসঙ্গ প্রায়ই তুলে থাকেন। Miss Misra প্রসন্ন না হলে তাঁর ভাইয়ের কাছে কেউই এগুতে পারেন না। ভাই তাঁর অনুগত। Mr. Misra বুদ্ধিমান হলেও কাজে বড় একটা সুনাম নেই। তাঁর স্বর্গগত পিতার যোগ্যতায় তাঁর প্রমোশন কখনও বাধা পায়নি—Deputy Secretary পর্য্যন্ত। তার পর ওপর থেকে সাহেবেরা যাওয়াতে সহজেই আজ Secretary হয়েছেন।

নন্দিতা যেন হংস মধ্যে বক যথা। সেদিন তুমুল আলোচনা offlicer-দের স্ত্রীদের মধ্যে। বিষয় যে—যে সব postএ তাদের স্বামীরা এসেছেন ইংরেজ আমলে, তাদের ঢের মান ও খাতির ছিল। এদের এই বুদ্ধির ভ্রম দেখে নন্দিতার হাসি পেল, দুঃখও হ'ল। সে বলল—আমি তো তা মনে করি না,—মাহিনা কমে গেছে সত্যি কথা কিন্তু সে জন্যে সম্মান কমবার কারণ তো পাই না, বরং স্বাধীন ভারতে এঁদের কাজ বিদেশী গভর্মেণ্টের কাজের চেয়ে আমার তো সম্মান বেশীই মনে হয়।

নন্দিতা খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে, কারণ চুপচাপ থাকবার মেয়ে সে নয়। মানুষের মনও সে বোঝে কিন্তু বোধ করি তারা যা চায় নন্দিতার কাছে তা ছিল না।

বই পড়া সম্বন্ধেও তার রুচি ছিল অন্য রকম। সে বই পড়তে খুবই ভালোবাসে কিন্তু নির্বিচারে বই শেষ করা তার স্বভাব নয়। তার সঙ্গিনীরা যখন আধুনিক ইংরেজ ও আমেরিকান লেখকদের নামকরা বইগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে থাকেন, সে মতামত দেয় না। আরেক দল যখন crimes ও thrillersএর আলোচনা করেন তখনও সে চুপ করেই থাকে। সেদিন এক ভদ্রমহিলা তাঁর সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের কথা জানালেন। বললেন—আধুনিক লেখকদের চেয়ে প্রাচীন লেখকদের চিন্তাধারা ঢের গভীর ছিল ইত্যাদি। তিনি সকলের প্রশ্নই এড়িয়ে একটানা নিজেই বলে চললেন। পাশ থেকে হঠাৎ সুধাংশু আস্তে আস্তে জিগ্যেস করলো,


লুপ্ত ঐশ্বর্য্যের পুনরাবিষ্কার—
কেয়ো-কার্পিন
অপূর্ব ভেষজ কেশতৈল
ঘন কালো কেশ ভারতের নিজস্ব, তাই যুগে যুগে বহু সাধনায় গড়ে উঠেছিল কেশচর্চ্চার নানা প্রণালী। ভারতের দুর্দিনে এই সব প্রণালী যায় হারিয়ে। বহু চেষ্টায় এই রকম একটি লুপ্ত প্রণালী উদ্ধার করে প্রস্তুত করা হল "কেয়ো-কার্পিন"। কেশ ও মস্তিষ্কের পক্ষে ইহা অত্যন্ত উপকারী। ইহার গন্ধ মনোরম।
Keo-Karpin
প্রস্তুত কারক :
দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা ১৬ * বোম্বাই * দিল্লী * মাদ্রাজ
।ও

প্রাচীন লেখকদের এত ভক্ত আপনি—Scott. নিশ্চয় আপনার আদর্শ লেখক—Scott's Emulsionটা আপনার কেমন লাগল? ঘাড়ের কাছে কাঁপানো চুল আরও কাঁপিয়ে রং করা ঠোঁট বেঁকিয়ে ভদ্রমহিলা সমান উৎসাহের সঙ্গে বললেন—Is'nt it an exquisite piece of scott's work?' নন্দিতা কাছেই বসেছিল, তার কান লাল হয়ে উঠেছিল—সে তার স্বামীর এরকম দুষ্টুমীকে ভয় পায়—কখন যে কি করে বসে ঠিক নেই। সে কিছুতেই তার স্বামীকে সামলাতে পারে না এ বিষয়ে।

একদিন এক artist তাঁর একগাদা ছবি এনে উপস্থিত। One man's show করতে চান। ভদ্রলোক মহা উদ্‌যোগী। কর্তাদের উপস্থিতি প্রতিশ্রুত করিয়ে মহা আয়োজনের সঙ্গে তাঁর অতি আধুনিক ছবিগুলি সাজিয়ে ফেললেন। যথাসময়ে সবাই উপস্থিত হলেন। নন্দিতারাও গিয়েছিল। সবাই ছবির প্রশংসায় মুখরিত। নন্দিতা তার স্বভাব বশতঃ বেফাঁস স্বীকার করে ফেলল যে অতি আধুনিক ছবির কিছুই সে বোঝে না, অতএব তার এ সব দুর্বোধ্য ঠেক্‌ছে—কিছুই গ্রহণ করতে পারছে না। নন্দিতার মত বেরসিককে artist এড়িয়ে রইলেন। অন্যরা নন্দিতার বোকামী দেখে কৌতুক অনুভব করলেন। Mrs. Kapur ধনী পাঞ্জাবী ব্যাবসায়ীর কন্যা—শ্বশুরকুলও সঙ্গতিপন্ন, স্বামী Deputy Secretary হ'লেও Kapur দম্পতির হাব-ভাব Deputy Secretaryর চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে। আজকালকার দিনে সম্ভ্রান্ত ঘরের দু'-চারখানা হাতে আঁকা পট, চিত্রিত মাটির হাঁড়ি কলসী, খড়ের কুসান—বহু মূল্যে সজ্জিত বসবার ঘরের মাঝে এমন দু'-চারটি দেশীয় সভ্যতা ও শিল্পের প্রমাণ না রাখাটা গৃহকর্ত্রীর রুচির পক্ষে লজ্জাকর। বেচারী Mrs. Kapur কোন্‌টি কিনবেন শেষ অবধি বুঝে উঠতে না-পেরে বুদ্ধিমতীর মত artistএর পরামর্শ চাইলেন। বললেন তাঁর বসবার ঘরের বিস্কুট রংয়ের distemperও মত রংয়ের পর্দা ও সোফা কৌচের কাপড়ের সঙ্গে সে ছবিটি মানাবে সেই ছবিটিই তিনি কিনতে রাজী। সুধাংশু কিন্তু Mrs. Kapurএর সরলতার প্রশংসাই করেছিল।

নন্দিতা তাদের এই নতুন সমাবেশের শূন্যতা অল্পদিনের মধ্যেই অনুভব করেছিল। দুঃখই হ'ল তার এই নিঃসঙ্গতা দেখে। ফেরবার দু'দিন আগে বন্ধুকে ডেকে বললাম—'ওহে যস্মিন্ দেশে যদাচার' বলে গেছেন মনীষী। তোমার পণ্ডিতির গোঁড়ামীগুলো ছাড়ো,—ভেসে পড় বন্ধু, তোমাদের এই নির্বান্ধব দশা আমার অসহ্য। বলি, না-ই বা করলে কারুর কোনও সুবিধা, করতে পার জানাতে ক্ষতি কি? মৌচাকে মধু যতক্ষণ থাকবে মৌমাছির অভাব হবে না, এই তো সংসার!

সুধাংশু ও নন্দিতা দু'জনেই খুব খানিকটা হাসলো, আমিও প্রাণ খুলে তাদের হাসিতে যোগ দিলাম!

জাহানারা

মালবিকা দত্ত

হায় জাহানারা হায় প্রেম-পাগলিনী কবি
কোথা তুমি কাঁদিতেছ বসি দুলেরার লাগি।
সারাটা জীবন শুধু ধরা আর না ধরা খেলায়
কাটালে জীবন উষা মর্ম্মরিত বেদনায়।
সেই পথ সেই কবর আজও আছে চাহি তব লাগি
সে প্রিয়র উদ্দেশ্যে, যে প্রিয় বারে বারে
এসে যায় ফিরি—তারে লাগি, তব অতৃপ্ত হৃদয়
যেন সেই মৌন ধরিত্রীর অভিশাপ
কুড়ায়েছে আপনার মাঝে।
ওগো শাহাজাদী সেই তব জীবনের বড় অভিশাপ
এলো ফুল নিয়ে মালা শুকাতে আপনার উষ্ণ নিঃশ্বাসে।
এ প্রাচীর দৈত্যের গড়া দেবতার নয়
তাই ত একটি ফুল সারাটি জীবন
পড়ে গেল আপনার ইতিহাস আনমনে
জগতের একটি নিরালা কোণে বন্দী বাসরে।
তোমার সে অভিশাপ মিলে গেল ধরিত্রীর
মহা একতানে জাগাল একটি গান সে যেন মরীচিকা
আশাহীন অন্তহীন আলেয়া আর মরীচিকা
সবে মিলি নতুন আশা প্রেমের বাসরে।
ব্যথা আর বেদনার একটি কোরক শুধু
আপনার উদ্ধত আশে বিকশিল তন্দ্রিত
মরুর বুকে। তাই তব অতৃপ্ত হৃদয়
নিয়ে এলো বিশ্বের ভাণ্ডার উজাড়ি
এ জগতের মাঝে। আজ শূন্য সব
নেই তার কিছু। কি যে চেয়েছিলে আর
কি যে চাহ নাই, জানি নাই আজ তাই।
জীবনের অতৃপ্ত আশা পেলে নাক' একটি বাসা,
আপনার বেদনায় ভরে দিলে জগতের প্রতি কন্দর।
প্রিয় তব গেল ছাড়ি দূর অজানাতে,
আপনি বসি আছি জগতের চিরন্তন
অন্তর দোলাতে। কোথা তব প্রিয় আজ
তুমিই বা কোথা—যারা ছিল সে দিনের
তারা নেই আজ—নেই সে কান্না তব হারেমের,
কালের অতল তলে গেছে সব চলি।
শুধু তব "প্রিয় প্রিয়" আজ বুঝি ফেরে পথে পথে,
দিল্লীর পথে পথে পিয়ালা-দোয়েল বুঝি
ভুলে গেছে কান্না—পৃথিবী ভুঁজিবে একদিন।
শুধু একটি অতৃপ্ত হিয়া রাখিল প্রণতি তব লাগি।

তুমি অমিতায়ু

ইন্দিরা দেবী

অসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ একটি নিটোল মুহূর্ত্ত।

দীর্ঘ আড়াই হাজার বছরেরও বেশী পুরোনো ইতিহাসের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করলে দেখা যাবে, এক ঘুমন্ত রাজপুরীর অন্দরমহল থেকে রাত্রির দ্বিতীয় যামে বেরিয়ে এলেন সৌম্যদর্শন গৌরকান্তি এক যুবক। তাঁর চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে এক দিকে দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা, অপর দিকে ভাববিহ্বল স্বপ্নাবেশ। ধীর নির্ভীক পদসঞ্চারে

তিনি এসে দাঁড়ালেন মুক্ত প্রাঙ্গণ-তলে। প্রাঙ্গণের বাইরে রথ সজ্জিত করে বিশ্বস্ত অনুচর ছন্দক প্রভুর অপেক্ষা করছিল। যুবক রথে আরোহণ করলেন। ঘুমন্ত রাজধানীর নিস্তব্ধতা ভেদ করে রাত্রির অন্ধকারে এগিয়ে চললো রথ। পিছনে পড়ে রইল ঘুমন্ত রাজপুরী, রাজধানী, আত্মীয়-পরিজন।

সেদিনের সেই মহাভিনিষ্ক্রমণের সাথী হয়ে রইলো কপিলাবস্তুর রাতের আকাশের তারা। পিছনে ফেলে-আসা রাজপ্রাসাদ আর নিস্তব্ধ পথপ্রান্তর। কিন্তু নিষ্ক্রমণের সেই পরম মুহূর্তটি শাশ্বত হয়ে বেঁচে রইলো ইতিহাসের পাতায় আর মানুষের মনে।

সত্য সন্ধানের পথে মানবাত্মার এই অভিযান মানুষের ইতিহাসে রচনা করেছে এক বিস্ময়কর দুঃসাহসিক অধ্যায়। কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত এর দুর্বার প্রভাব। দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে মহাভিনিষ্ক্রমণের সেই পরমক্ষণটি অনির্বাণ দীপশিখার মত জেগে রইল মানুষের মনে। তার অমৃতসরস স্পর্শে কেটে গেল শতাব্দীর জড়িমা, আশাহত, দুঃখতাড়িত মানুষের চোখে ভেসে উঠলো নতুন জীবনের স্বপ্ন।

অমৃতপথের যাত্রী। সারা রাত ধরে চললো তাঁর পরিক্রমা। ছন্দক নিবৃত্ত করতে চাইলো তাঁকে। মুক্তিসন্ধানী বললেন: 'হে ছন্দক, আমি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি কাম্যবস্তু ইহলোকে এবং দেবলোকে অনন্তকল্পকাল ধরে ভোগ করেছি। কিন্তু কিছুতেই আমার তৃপ্তি হয়নি। আমি গৃহত্যাগ করবো বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎপ্রভার মত প্রজ্বলিত লৌহ, আগ্নেয়, গিরিশিখর যা কিছুই আমার মস্তকে পতিত হোক না কেন, গৃহস্থাশ্রমে আমি কিছুতেই ফিরে যাবো না।'

তাঁর দুর্জ্জয় সঙ্কল্পের কাছে ছন্দকের অনুনয় ব্যর্থ হলো।

ক্রমে শাক্য, কোড্য, মল্ল, মৈনেয় প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করে রথ এগিয়ে চললো। তার পর প্রাকৃতিক নিয়মে রাতের অন্ধকার কেটে গিয়ে ভোরের আলো দেখা দিল। অমৃতসন্ধানী তাঁর শরীর থেকে আভরণ খুলে ফেললেন, তার পর তা ছন্দকের হাতে তুলে দিলেন। ছন্দক চোখের জল মুছতে মুছতে রথ নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এল। যুবক পদব্রজে এগিয়ে চললেন। কিছুদূর যেতেই অরণ্যপথে এক ব্যাধের সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। তিনি তাঁর কৌষিক বস্ত্র পরিত্যাগ করে ব্যাধের কাষায় বস্ত্র পরিধান করলেন।

পরিক্রমার প্রথম পর্য্যায়ে যুবক এলেন বৈশালীতে। সেখানে আবাড় কালাম নামে এক শাস্ত্রবিদ্ উপাধ্যায়ের কাছে তিনি বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করলেন। কিন্তু অনেক শাস্ত্র পড়েও তাঁর মন পরিতৃপ্ত হলো না। বৈশালী থেকে তিনি এলেন রাজগৃহে। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে ভিক্ষালব্ধ অন্ন দিয়ে তিনি ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন—আর অবসর সময়ে বিভিন্ন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে করতেন ধর্মালোচনা। কিন্তু তাতেও অমৃতলোকের সন্ধান পেলেন না তিনি। তার পর তিনি রাজগৃহ ছেড়ে এলেন গয়া প্রদেশের উরুবিল্ব গ্রামে। গ্রামের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে নৈরঞ্জনা নদী। ঘন বনের ছায়ায় ঢাকা লোকবিরল একটি প্রান্তর বেছে নিয়ে তিনি নদীতীরে বোধিদ্রুমতলে দুশ্চর তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হলেন। এবার

তৃষ্ণাজয় সঙ্কল্পের প্রেরণায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে তাঁর অন্তর। যোগাসনে আসীন হবার কালে তিনি বললেন :—

'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।'

'এই আসনে আমার শরীর শুষ্কতা লাভ করুক, আমার ত্বক, অস্থি, মাংস এই স্থানে বিলীন হোক, কিন্তু সুদুর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করা পর্য্যন্ত আমার দেহ এই আসন থেকে বিচলিত হবে না।'

দিনের পর রাত—রাতের পর দিন ধরে চললো তাঁর ষড়বর্ষব্যাপী গভীর তপশ্চর্য্যা। দেহ শুষ্ক, শ্বাসপ্রশ্বাস নিরুদ্ধপ্রায় হলো। তবু তপশ্চর্য্যার বিরাম নেই। অবশেষে এলো বহু প্রতীক্ষিত সেই পরম মুহূর্ত্ত। রাত্রির প্রথম যামে ধ্যানমগ্ন সিদ্ধার্থের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হলো। তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলেন। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁর পূর্বতম বিষয় সমূহ মনে পড়লো। শেষ যামে তিনি জানতে পারলেন জগতের দুঃখের কারণ। কার্য্য কারণ ভাব দুঃখ থেকে নিবৃত্তি লাভের উপায়—বাসনা বন্ধন থেকে মুক্তি—বহু ঈপ্সিত নির্ব্বাণ।

রাজপুত্র সিদ্ধার্থ রূপান্তরিত হলেন ভগবান বুদ্ধে।

বোধিলাভ করার পর তিনি প্রথম সপ্তাহ কাটালেন বোধিদ্রুমতলে। তার পর কিছু দিন মুচিলিন্দ নাগরাজ ভবনে এবং ন্যগ্রোধমূলে অতিবাহিত করে তিনি বিশ্বজনের মঙ্গলের জন্য তাঁর তপস্যালব্ধ সত্য জ্ঞান প্রচার করতে উদ্যত হলেন। আজীবকের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ জানালেন— "বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীং।
ধর্ম্মচক্রং প্রবর্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্।"

'আমি বারাণসী গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে অপ্রতিহত ধর্ম্মচক্রে প্রবর্ত্তন করিব।'

যথাকালে গঙ্গা নদী অতিক্রম করে বুদ্ধ এলেন মহানগরী বারাণসীতে। সেখানে তিনি মহাকাশ্যপ, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌণ্ডিন্য প্রভৃতি পাঁচ জন শিষ্যের কাছে তাঁর নির্ব্বাণ ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করেন। যে সত্য তিনি দীর্ঘকালব্যাপী—জ্ঞানানুশীলন এবং সুদুঃসহ তপশ্চর্য্যার সাহায্যে নিজের অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন—সেই মহাসত্যকে তিনি আজ পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। মানুষ ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তের সন্ধান পেলো। বোধিলাভ করার পর মুহূর্ত্তে বুদ্ধদেবের মুখে স্বগত বাণী উচ্চারিত হয়েছিল, তাতে তাঁর অন্তরের আনন্দলোক প্রতিফলিত দেখতে পাওয়া যায়—

'অনেকজাতি সংসারং সন্ধাবিসমং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো, দুক্খা জাতি পুনপ পুনং।
গহকারক দিট্ঠোঽসি, পুন গেহং ন কাহসি,
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্গা, গহকূটং বিসঙ্খিতং,
বিসঙ্খারগতং চিত্তং, তণ্হানং খয়মজ্ঝগা।'

'দেহরূপ গৃহনির্ম্মাতাকে অন্বেষণ করতে করতে, কিন্তু তাকে না পেয়ে, কতবার ভ্রমণ করলাম। কতবারই সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করলাম; পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ দুঃখকর। হে গৃহকারক, এইবার তোমায় দেখেছি, আর গৃহনির্মাণ করতে পারবে না। তোমার সকল কাষ্ঠদণ্ড ভগ্ন হয়েছে, গৃহচূড়া নষ্ট হয়ে গেছে, নির্ব্বাণগত আমার চিত্তে সকল তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েছে।'

বুদ্ধ এই তৃষ্ণাজয়ের বাসনা মুক্তির বাণী বিশ্ববাসীর জন্য রেখে গিয়েছেন। বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ লাভের পর আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, কিন্তু তাঁর বাণীর প্রয়োজনীয়তা এই দীর্ঘকালের ব্যবধানে এতটুকু হ্রাস পায়নি। একের পর এক কর্ম্মের শৃঙ্খল রচনা করে চলেছে মানুষ। বাসনাতাড়িত মানুষের মনে শান্তি আজ অন্তর্হিত, তাই মানুষের অন্তরাত্মা মুক্তিসন্ধানী। আজকের যুগের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে শান্তির ছায়া নেমে আসতে পারে বুদ্ধ-নির্দ্দেশিত পথে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বপ্রান্ত থেকে বুদ্ধের যে বাণী একদা উচ্চারিত হয়েছিল, তারই প্রতিধ্বনি জেগেছিল সমগ্র ভারতবর্ষে—ভারতবর্ষের সীমানা অতিক্রম করে যে বাণী জয় করেছিল কোটি কোটি নরনারীর উদ্বোধিত চিত্ত—চীন, জাপান, তিব্বত, সুবর্ণদ্বীপ, সিংহল, মিশর গ্রীসে পৃথিবীর সর্ব্বত্র।

বুদ্ধের বাণী হলো ভারতের বাণী। স্বাধীন ভারত আজ অশোকচক্র, অশোকস্তম্ভ, পঞ্চশীল গ্রহণ করে বুদ্ধদেবের প্রতি তার অবিচলিত নিষ্ঠা প্রকাশ করেছে। ভারতবাসীর একান্ত কাম্য—

বোধিদ্রুমতলে তব সেদিনের মহাজাগরণ
আবার সার্থক হ'ক মুক্ত হোক মোহ আবরণ
বিস্মৃতির রাত্রিশেষে এ ভারতে তোমার স্মরণ
নবপ্রাতে উঠুক কুসুমি।'

দু'টি রাত

শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায়

এক একটি রাত আসে, তখন এমন হয়
ঘুমের ঢল নামে না চোখে; হায়, এ হৃদয়
ভরে ভিজে বকুলের হাওয়া; শুদ্ধ সেই যামে
জ্যোৎস্নার শাখায় ভর দিয়ে আকাশ-পরীরা নামে।

আকাশ-পরীরা নামে গাছের পাতায়
জলে স্থলে বনতলে বনানীর ছায়।
সেই এক ঘুম-ভাঙা রাত এ হৃদয়ে আনে
ভুলে-যাওয়া কোনো সুর বহু দিন শোনা কোনো গানে।

কী যেন পড়ে মনে, কী যেন পড়ে না বুঝি মনে,
কী যেন হারিয়ে গেছে, কী যেন খুঁজি অকারণে।
চোখে নামে না ঢল ঘুমের। এই এক ঘুম-ভাঙা রাতে
হৃদয় উদাস হয়, জেগে থাকে একা চাঁদ সাথে।

আর একটি রাত আসে যখন বাতাস
আগুনের হল্কা হানে, যখন আকাশ
খর-রোদ্দুরের রোদে পুড়ে নিঃঝুম,—
সেই দিনের বেলার রাতে চোখ জুড়ে নেমে আসে ঘুম।

নিঃঝুম আকাশ বাতাস, চুপচাপ গাছের পাতারা,
থেমে গেছে চারি দিকে সবটুকু প্রাণের ইশারা।
এই এক রোদ্দুরের রাতে মন যায় অতলে তলিয়ে,
থেমে-যাওয়া গান যেন সুরের গভীরে দেয় মন ডুবিয়ে।

এই এক দুপুরের রাতে মন বুঝি স্বপ্ন-মধুর,
বুঝি সে আভাস পায় অপরূপ মৃত্যু-বধূর।
কোনোখানে খেদ নেই, এই রাত স্তব্ধ নিঝুম
দুটি আঁখিপাতে শুধু নেমে আসে ঘুম, ঘুম, ঘুম।



ডি. এচ. লরেন্স

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মিরিয়ামকে ছেড়ে পল সোজাসুজি গেল ক্লারার কাছে। যেদিন মিরিয়ামের সঙ্গে বিচ্ছেদ হ'ল, তার পরের সোমবারই পল মেয়েদের কারখানা-ঘরে গিয়ে ঢুকল। ক্লারা ওকে দেখতে পেয়ে একবার হাসল শুধু। অজান্তে দু'জনেই দু'জনার অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল তারা। ক্লারা দেখল, পলকে ঘিরে আজ যেন একটা নতুন ধরণের দীপ্তি।

পলও হাসল। বলল, 'এই যে পরীর দেশের রাণী!'

ক্লারা অবাক হয়ে বলল, 'এ আবার কি নাম?'

'নামটা খুব মানাবে কিন্তু। নতুন জামাটা পরে এসেছেন আজ।'

ক্লারার মুখে ছোপ লাগল। সে বলল, 'তা'তে কি হ'ল?'

'বা রে, জামাটাতে কেমন মানিয়েছে আপনাকে। আমি হলে আরও মানানসই একটা জামার নমুনা দিতে পারতাম।'

'সেটা কী ধরণের হ'ত?'

পল গিয়ে দাঁড়াল ওর সামনে; জামার নমুনাটা বুঝিয়ে দিতে দিতে ওর চোখ যেন জ্বলে উঠল। ক্লারার দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলিয়ে রাখল পল। তার পর হঠাৎ ক্লারাকে সে স্পর্শ করল। ক্লারা চমকে সরে যাচ্ছিল, পল ওর ব্লাউজের কাপড়টা টেনে বুকের উপর আরও আঁট করে দিতে দিতে বুঝিয়ে বলল, 'এমনই—আরও এমনই করে।'

কিন্তু তখন দু'জনেই হৃদয়ের বহ্নিজ্বালার শিহরণ অনুভব করছে। পল লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গেল। এই ক্ষণিকের স্পর্শ, তারই সাড়া লেগে তার দেহ তখন থর-থর করে কাঁপছে।

এরই মধ্যে ওদের মনে মনে গোপন বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। পরদিন সন্ধ্যাবেলা ট্রেণের সময় খানিকটা হাতে ছিল, পল ওকে নিয়ে কয়েক মিনিট সিনেমা দেখতে গেল। পাশাপাশি বসেছে দু'জনে। পল দেখল, ওর হাতখানা রয়েছে খুবই কাছে, কিন্তু ছুঁতে তার সাহস হ'ল না। পর্দার গায়ে ছবি আসছে আর যাচ্ছে। হঠাৎ পল ওর হাতখানা তুলে নিল নিজের হাতে। হাতখানি বেশ বড়, পলের মুঠি জুড়ে রইল ওর হাত। ক্লারা নড়ল না, কিম্বা কোন ইঙ্গিতও করল না। পল চেপে ধরে রইল হাতখানা। যখন বেরিয়ে এল তখন ট্রেণের সময় হয়ে গেছে। পল দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ক্লারাই বিদায় দিল'ওকে। বলল, 'শুভরাত্রি!' তখন পল চমক ভেঙে ষ্টেশনের দিকে যাত্রা করল।

তার পরদিন পল আবার এল ওর সঙ্গে গল্প করতে। আজ ক্লারা একটু দূরত্ব বজায় রেখে কথা বলল যেন। পল জিজ্ঞেস করল, 'সোমবার বেড়াতে যাবেন নাকি?'

ক্লারা মুখ ফিরিয়ে নিল। ঈষৎ ব্যঙ্গের সুরে বলল, 'গিয়ে মিরিয়ামকে খবরটা দেবেন ত?'

পল বলল, 'আমি ওর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি।'

—'সে কি! কবে?'

—'গত রবিবার।'

—'ঝগড়া করেছিলেন দু'জনে?'

'না। এবার মন স্থির করে ফেলেছি আমি। স্পষ্ট ক'রে ওকে বলে এসেছি ওর প্রতি আর কোন দায়িত্ব আমার রইল না।'

ক্লারা কোন জবাব না দিয়ে চুপ-চাপ বিজ্ঞের মত বসে রইল। পল ফিরে গেল নিজের কাজে।

শনিবার সন্ধ্যায় পল ওকে কারখানার ছুটির পর কফি খেতে নিমন্ত্রণ করেছিল একটা রেস্তরাঁতে। ক্লারা অত্যন্ত গম্ভীর আর ভারিক্কি চালে এল নিমন্ত্রণ বজায় রাখতে। পলের ট্রেণের তখনও তিন কোয়ার্টার বাকী। সে বলল, 'চলুন খানিকটা হেঁটেই যাওয়া যাক।'

ক্লারা আপত্তি করল না। দু'জনে রাজবাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে পার্কের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। পলের আজ ভয় করছে ক্লারাকে। ও যে তার পাশে হেঁটে চলেছে, তাও যেন কেমন অন্যমনস্ক, যেন অনিচ্ছুক চরণে, বিরক্ত মনে ও হেঁটে চলেছে, আজ ওর হাত নিজের হাতে তুলে নিতে পলের সাহস হ'ল না।

অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে পল এক সময়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ দিকে যাবেন এখন?'

'যে দিকে খুশি চলুন।'

'তা'হলে এই সিঁড়ি দিয়ে উঠে চলুন।'

হঠাৎ একবার পল পিছন ফিরে তাকাল। তখন পার্কের সিঁড়ি পার হয়েছে দু'জনে। ক্লারার রাগ হচ্ছে এই ভেবে যে, পল ওকে ছেড়ে হঠাৎ এমন করে এগিয়ে চলেছে কেন। পল ওর জন্যেই ফিরে দাঁড়াল। ক্লারা সরে রইল দূরে। তখন পল এগিয়ে এসে ওকে বাহুর মধ্যে টেনে নিল, এক মুহূর্ত বুকে জড়িয়ে রেখে চুম্বন করল ওকে। তার পর বাহুর বন্ধন শিথিল করে দিয়ে অনুতপ্ত সুরে বলল, 'চলুন আমার সঙ্গে।'

ক্লারা ওকে অনুসরণ করে চলতে লাগল। পল তার হাতখানা উঠিয়ে নিয়ে আঙুলের ডগায় একটি চুম্বন এঁকে দিল। নীরবে পথ চলেছে দু'জনে। আলোতে এসে পল ওর হাত ছেড়ে দিল। ষ্টেশনে পৌছবার আগে পর্য্যন্ত আর একটিও কথা হ'ল না দু'জনার। ষ্টেশনের আলোতে এসে তারা একে অন্যের দিকে চাইল। ক্লারা বলল, 'শুভরাত্রি!'

আর পল গেল ট্রেণ ধরতে। দেহটাকে সে যন্ত্রের মত চালিয়ে নিয়ে গেল শুধু। লোকে তার সঙ্গে কথা বলতে আসে, সে তার জবাব দেয়, নিজের কথাগুলো যেন তার নিজের কানেই এসে বাজে অস্পষ্ট প্রতিধ্বনির মত। বিকারের রুগীর মত অবস্থা হ'ল তার। মনে হ'ল, সোমবার যদি এখনই না এসে পড়ে, তা'হলে সে আর বাঁচবে না। সোমবার না এলে ত' ক্লারার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তার সমস্ত সত্তা যেন সেই আগামী শুভদিনের কল্পনার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। মাঝখানে রবিবারের ব্যবধান। ধৈর্য্য রক্ষা করা কঠিন হয়ে উঠল তার পক্ষে। প্রতিটি ঘণ্টা তার কাছে অসহ্য উদ্বেগে কাঁটার মত খচ-খচ ক'রে বিঁধতে লাগল।

রবিবার সারাদিন সে সাইকেলে ছুটোছুটি করল, ক্লান্তিতে হাত-পা অবশ হয়ে না আসা অবধি। কোথায় গেল, কোন্ দিক দিয়ে গেল, সে সব কোন বোধই তার রইল না। শুধু মনে জাগতে লাগল যে কাল—কালই সোমবার।

সেদিন তার ঘুম ভাঙল ভোর চারটেয়। শুয়ে শুয়ে সে চিন্তা করতে লাগল। আস্তে আস্তে তার চেতনা আবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল—আবার নিজের আসল রূপ দেখবার জন্যে সে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। আজই বিকেলে, আজই বিকেলে ক্লারা বেড়াতে যাবে ওর সঙ্গে। বিকেল! আরও কত দূর, যেন কত যুগের ব্যবধান!

প্রহরগুলি কি মন্থরগতিতে চলেছে! শুয়ে শুয়ে পল শুনতে পেল বাপ বিছানা ছেড়ে উঠে ঠুক-ঠুক করে বাড়িময় হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার পর ভারী বুটের শব্দ আঙিনা কাঁপিয়ে সে গেল খনির মজুরগিরি করতে। মায়ের ঘুম ভাঙল। উঠে উনুনে আঁচ দিলেন মা। তার পর এসে আস্তে আস্তে ওকে ডাকলেন। পল ঘুমোবার ভাণ করল, সাড়া দিল যেন ঘুমের মধ্যে থেকে। এই ছলনার ফল ভালই হ'ল।

পল হেঁটে ষ্টেশনে চলেছে, এক মাইল পথ যেন আর ফুরোয় না। ট্রেণখানা নটিংহাম্-এর কাছে এসে থেমে পড়বার উপক্রম করল কেন? যাই হোক, দুপুরের আগে পৌঁছতে পারলেই হ'ল। অবশেষে জর্ডনের দোকান—আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ক্লারা এসে পৌঁছে যাবে। আর কিছু না হোক, কাছাকাছি পাওয়া যাবে ওকে। চিঠিগুলো লিখে শেষ করল পল। তার পর ক্লারার খোঁজে দৌড়ে নীচে গেল। হয়ত ও এসেছে, হয়ত আসেনি।
...বাঁচা গেল। কাচের দরজা দিয়ে পল দেখল ওকে। দেখল টেবিলে উপর ঝুঁকে পড়ে ও কাজে মন দিয়েছে। তখন ওর সামনে যেতে পলের ভরসা হ'ল না। মনে হ'ল সে নিজেকে সামলে রাখতে পারবে না। তবু ঘরে গিয়ে ঢুকল পল। তার সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠে গেছে, নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল আর নিরুপায় বলে মনে হচ্ছে, হাত-পা ঠাণ্ডা হবার উপক্রম হয়েছে। ক্লারা কি ওকে ভুল বুঝবে? তার এই বাইরের খোলোসটাকে দিয়ে ভিতরের আবেগকে হয়ত সে প্রকাশ করতে পারবে না। অতি কষ্টে পল গিয়ে বলল, 'আজ—আজ বিকেলে আপনি আসবেন ত'?'

ক্লারা অস্ফুট স্বরে বলল, 'তাই ত' ভাবছি।'

'আপনি দু'টোর সময় 'ফাউণ্টেন' বলে যে জায়গাটা আছে, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।'

—'আমি ত' আড়াইটের আগে গিয়ে পৌঁছতে পারব না?'

—'যেতেই হবে আপনাকে।'

ক্লারা দেখল ওর রক্তাক্ত চোখে উদ্‌ভ্রান্তের দৃষ্টি। সে বলল, 'পনের মিনিটের মধ্যে যেতে চেষ্টা করব।'

তাই নিয়েই খুশি হতে হ'ল পলকে। দোকানে গিয়ে সে কিছু খেয়ে নিল। তখনও তার অবস্থা ক্লোরোফর্ম-করা রুগীর মত। প্রতিটি মুহূর্তের বিস্তার মনে হচ্ছে যেন অনন্তকাল ধরে। তার পর বেরিয়ে রাস্তা ধরে সে নিরুদ্দেশের মত হেঁটে বেড়াতে লাগল। সে যখন 'কাউন্টেন'-এ গিয়ে পৌঁছল তখন দুটো বেজে পাঁচ মিনিট। এর পরের কয়েক মিনিট সে যে কী মর্মান্তিক যন্ত্রণা তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

তার পর পল দেখল ওকে। ও আসছে। আসছে তারই অভিমুখে।

'দেরি হয়ে গেল তোমার।' পল বলল।

'মোটে ত' পাঁচ মিনিট।' ক্লারা জবাব দিল।

পল হেসে বলল, 'আমি হলে তোমাকে এটুকু কষ্টও দিতুম না।'

ক্লারা মুখ নীচু করে পথ চলতে লাগল। পথে কার সঙ্গে দেখা হয়ে যায় এই ভয়ে সারাক্ষণ সে কুণ্ঠিত হয়ে উঠল। দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। মাঝে মাঝে পল চোখের কোণ দিয়ে ওকে দেখে নিচ্ছে। হঠাৎ নিঃশব্দতা ভঙ্গ ক'রে ক্লারা প্রশ্ন করল, 'তুমি মিরিয়ামকে ছেড়ে এলে কেন?'

পল ভ্রূকুটি ক'রে জবাব দিল, 'ছেড়ে আসতেই আমি চেয়েছিলাম —তাই।'

—'কিন্তু কেন?'

—'কারণ ওর সঙ্গে চলা আমার ধাতে সইছিল না। আর বিয়ে করবার ইচ্ছেও আমার ছিল না।'

এক মুহূর্ত ক্লারা নীরব হয়ে কি ভাবতে লাগল। কাদায় ভর্তি পথ, 'এলম' গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে, তারই মধ্যে দিয়ে হেঁটে চলতে লাগল ওরা। ক্লারা প্রশ্ন করল, 'আচ্ছা, তুমি কি মিরিয়ামকে বিয়ে করতে চাওনি, না একেবারেই তুমি বিয়ে করতে চাও না?'

দুটোই পল বলল, 'কোনটাই চাইনি আমি।'

বাগানের ফটকে গিয়ে পৌঁছতে অনেক কসরৎ করতে হ'ল দু'জনকেই। চারি দিকে জল জমে গেছে। ক্লারা বলল, 'আচ্ছা, ও কি বলল?'

—'কে, মিরিয়াম? বলল যে আমি একটি চার বছরের শিশু, আর বলল আমি নাকি বরাবরই ওকে জোর করে দূরে ঠেলে দিতে চেয়েছি।'

ক্লারা খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, 'কিন্তু তুমি ত' ইদানীং কিছু দিন ধরে ওর কাছেই যাতায়াত করছিলে?'

—'হ্যাঁ।'

—'তবে কি এখন আর তুমি ওকে চাও না?'

—'না। ওতে আর আমার মন ভরে না।'

ক্লারা আবার খানিকক্ষণ ভাবতে লাগল। তার পর বলল, 'তোমার কি মনে হয় না ওর সঙ্গে বেশ একটু খারাপ ব্যবহার করেছ তুমি?'

'হ্যাঁ। আরও বছর কয়েক আগেই ওকে ছেড়ে আসা আমার উচিত ছিল। কিন্তু তাই বলে এখন এ ভাবে চলতে দেওয়াও উচিত হ'ত না। তাতে একটা অন্যায়ের উপর শুধু আর একটাকে চাপানো হ'ত।'

'তোমার বয়স এখন কত?' ক্লারা জানতে চাইল।

'পঁচিশ।'

'আর আমার ত্রিশ।'

'আমি জানি তা।'

'ক'দিন বাদেই আমার বয়স একত্রিশ হবে—নাকি হয়েই গেছে জানি না।'

'হোক না। আমি জানতেও চাই না। কী এসে-যায় তাতে?'

বলতে বলতে দু'জনে বাগানের ফটকে এসে দাঁড়াল। লাল সুরকির তৈরি ভেজা-রাস্তাটি ঝরাপাতায় আকীর্ণ হয়ে উঠেছে। দু'পাশের ঘাসের মধ্য দিয়ে এঁকে-বেঁকে উঠে গেছে উপরের দিকে। রাস্তার দু'ধারে 'এলম' গাছগুলো যে গির্জ্জার প্রকাণ্ড থামের মত মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেই উঁচু ছাদ থেকে শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে পথের বুকে। চারি দিক ফাঁকা, শব্দহীন; সব কিছু বৃষ্টি-ভেজা। ক্লারা বাগানের ফটকে উঠে দাঁড়াল, পল ধরে রইল ওর হাত দু'টি। হাসিতে ওর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। পলের চোখে চোখ রেখে এক মুহূর্ত সে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওর বুক মিশে গেল পলের বুকে। পল দুই বাহু মেলে ওকে জড়িয়ে ধরল, চুমায় চুমায় ক্লারাকে আচ্ছন্ন করে তুলল সে।

আবার লাল রাস্তাটি ধরে খাড়া বেয়ে উঠতে লাগল দু'জনে। এবার ক্লারা পলের হাতটি নিজের বাহু থেকে খুলে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল। বলল, 'তুমি এমন শক্ত করে ধরো, যে আমার হাতের রগ টিপ-টিপ করতে থাকে।'

দু'জনে এগিয়ে চলল। পলের আঙুলের ডগায় এসে লাগছে ক্লারার স্পন্দিত বুকের শব্দ। চারি দিক নিস্তব্ধ, যেন খাঁ-খাঁ করছে। বাঁ দিকে ভিজে, লাল চাষের জমি গাছের শাখার ফাঁক দিয়ে এসে চোখে পড়ে। ডান দিকে নীচের গাছপালা আর নদীর কুলুকুলু শব্দ। কখনও বা 'ট্রেন্ট'-এর মসৃণ ধারা চোখে এসে লাগে, কিম্বা নদীর ধারের জলা মাঠ, অসংখ্য গরু চরছে সেখানে, তাদের মনে হয় কতকগুলো বিন্দুর মত।

পল বলল, 'একটুও বদলায়নি জায়গাটা। ছোটবেলার কথা বলতে বলতে পল দেখছিল ওর কানের নীচে গলার জায়গাটুকু যেখানে ওর মুখের অরুণ আভা এসে মিশেছে ওর গ্রীবার শ্বেত শোভার সঙ্গে ওর মুখখানা যেন কিসের অতৃপ্তিতে ম্রিয়মাণ। হাঁটবার সময় বার বার ওর দেহে এসে লাগছিল, আর উত্তেজনায় পলের দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠছিল।

'এলম'-গাছে ছাওয়া পথের আধখানা পেরিয়ে গেল ওরা। যেখানে নদীর বুক থেকে বাগানের খাড়াই সবচেয়ে বেশী, সেইখানে এসে তাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে গেল। পথের ধারে গাছের নীচে সবুজ তৃণভূমি, ক্লারাকে নিয়ে পল সেই দিকে চলল। লালমাটির পাহাড় ঢালু হয়ে নদীর তীরে গিয়ে মেমেছে, গাছ, বন আর ঘন পাতার অন্তরালে নদীর তরঙ্গচ্ছটা মাঝে মাঝে হঠাৎ চোখে পড়ে। অনেক নীচের জলা জমিগুলো গাঢ় সবুজ। ওরা দু'জনে একে অন্যের

উপর ভর দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। দু'জনেই যেন কী এক উদ্বেগে ব্যাকুল। একের দেহ অন্যের দেহকে স্পর্শ করে রয়েছে। আর নদীর মৃদু কল-কল ধ্বনি আচমকা ভেসে আসছে নীচে থেকে।

অবশেষে পল কথা কইল, 'আচ্ছা, বাস্তটার ডয়েসকে তুমি অমন খারাপ চোখে দেখতে কেন?'

ক্লারা একটি মনোরম ভঙ্গী করে ওর দিকে ফিরে দাঁড়াল। ওর মুখ পলের দিকে ফেরানো, ওর গলাটি পলের উদ্দেশ্যেই যেন সমর্পিত। চোখ দু'টি ঈষৎ নিমীলিত। উন্নত বক্ষ দু'টি যেন পলের প্রতি নীরব আহ্বান। পল ছোট্ট একটি হাসি হেসে উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠল, চোখ বুজে একটি দীর্ঘ চুম্বনের মধ্যে ওর সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেল। ক্লারার মুখখানা মিলে গেল পলের মুখের সঙ্গে—ওদের দু'জনের দেহ নিবিড় আলিঙ্গনে যেন একত্রিত হয়ে গেল। কয়েক মিনিট কেটে গেল এই ভাবে। তার পর দু'জনেরই চৈতন্য হ'ল যে এটা লোক চলাচলের পথ। তখন দু'জনেই সরে গেল। পল বলল, 'নীচের দিকে যাবে? নদীর ধারে?'

ক্লারা নীরব হয়ে ওর দিকে চাইল শুধু, নিজেকে সে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল ওর হাতে। পল খাদের ধারে গিয়ে এক পা ক'রে নীচে নামতে শুরু করল। বলল, 'বড্ড পিছল রাস্তাটা।'

ক্লারা বলল, 'তাতে কী।'

আস্তে আস্তে দু' জনে ক্রমশ: নদীর কিনারায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল। সেখানে আবার আর এক বিপদ। জলের বেগে পথের মাটি ক্ষয়ে গিয়ে পথটা ঢালু হয়ে সোজাসুজি নদীর মধ্যে নেমে গেছে। পলের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। কোন রকমে নিজেকে পড়ার মুখ থেকে সামলে নিল সে। বিরক্ত হয়ে বলল, 'কী জ্বালাতন!' তার পর হেসে উঠল। ক্লারা আসছে, সন্তর্পণে নেমে আসছে নীচে।

নদীর জল প্রবল বেগে ব'য়ে চলেছে। ওপারে নির্জন গোচারণের ভূমিতে গরু চরে বেড়াচ্ছে। ডান দিকে পাহাড় খাড়া হয়ে উঠে গেছে। দু'জনে গাছের উপর ভর দিয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। শুধু জলস্রোতের শব্দ অবিশ্রান্ত শোনা যেতে লাগল।

পল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারি দিক চেয়ে দেখছিল। ঠিক সামনেই দুটো ছোট চরের মত জায়গা, বুনো আগাছায় ঢাকা। কিন্তু যাবার কোন পথ নেই, পাহাড় সোজা খাড়া হয়ে উঠে গেছে। পেছনে মাছ ধরছে দু'টি লোক। নদীর ওপারে গরুর পাল চরে বেড়াচ্ছে ম্লান বৈকালীর আলোতে।

'তুমি দাঁড়াও ত' এক মিনিট।' ব'লে পল হঠাৎ সেই লাল মাটির খাড়া চড়াই বেয়েই উঠতে শুরু করল। সবগুলো গাছের শুঁড়ির দিকে চেয়ে দেখতে লাগল সে। অবশেষে ঠিক যা চাইছিল তাই পেল। দু'টো বীচ গাছ পাশাপাশি খাড়া হয়ে রয়েছে, তাদের শুঁড়ির মাঝখানটায় খানিকটা সমতলের সৃষ্টি করে, ভেজা পাতায় ঢাকা জায়গাটা। তা' হলেও এতেই চলবে।

এখান থেকে লোক দু'টি অনেকটা দূরে। পল গায়ের বর্ষাতিটা ছুঁড়ে দিল ক্লারার দিকে, ক্লারা তাই ধরে অতি কষ্টে উপরে উঠে এলো।

উপরে উঠে এসে ক্লারা অনন্ত চোখে চাইল পলের দিকে, তার পর নিঃশব্দে পলের কাঁধের উপর তার মাথার ভার এলিয়ে দিল। পল চার দিকে একবার দেখে নিয়ে ওকে নিজের দেহের সঙ্গে সংলগ্ন করে নিল। কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই, শুধু নদীর ওপারের জনহীন প্রান্তরে গরুগুলো চরে বেড়াচ্ছে। পল নিজের মুখ নামিয়ে রাখাল ক্লারার গলার উপর, তার ঠোঁটের নীচে ক্লারার ধমনীর রক্ত উদ্দাম তালে বাজতে লাগল। চারি দিক নিস্তব্ধ। আজ অপরাহ্নের শূন্য খেলাঘরে শুধু তাদের দু'জনেরই খেলার পালা। ক্লারা যখন মাটি ছেড়ে উঠল, তখন 'কার্ণেশন' ফুলের লাল পাপড়িগুলো লাল রক্ত-বিন্দুর মত ওর বুক থেকে ঝরে বীচের ভেজা শিকড়ের উপর মাটিতে ছড়িয়ে পড়েছে। পল বলল, 'তোমার ফুলগুলো একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেছে।'

ক্লারা চুল ঠিক করতে করতে নীরব, চিন্তাকুল চোখে ওর দিকে চাইল। পল হঠাৎ আঙুল দিয়ে ওর চিবুক তুলে ধরে প্রশ্ন করল, 'এত ভার ভার দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?'

ক্লারা ম্লান হাসি হাসল। নিজেকে কত যেন অসহায় বলে মনে হচ্ছে তার। পল ওর গাল ধরে আদর করে চুম্বন করল। ওকে বলল, 'না, না অমন মনমরা হয়ে থেকো না তুমি।'

ক্লারা শক্ত করে ধরল ওর আঙুলে, দ্বিধাগ্রস্তের মত হাসল একবার। তার পর হাত ছেড়ে দিল। পল ওর কপালের চুল সরিয়ে হাত বুলিয়ে দিল কপালে, চুম্বন করল স্নেহভরে। মিনতি করে বলল, 'অত কিছু ভেবো না তুমি।'

'কই ভাবছি না ত', ক্লারা মধুর হেসে নিজেকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিল ওর কাছে। পল আদর করে বলল, 'হ্যাঁ, তুমি ভাবছ। কিন্তু কেন এত ভাবছ বলো ত'?'

'আর ভাবব না।' ক্লারা সান্ত্বনা জানাল চুম্বনের মধ্যে।

আবার খাড়াই বেয়ে উপরে উঠতে হ'ল। সওয়া ঘণ্টা লাগল তা'তে। উপরে উঠে এসে পল টুপি ছুঁড়ে ফেলে দিল মাটিতে, কপালের ঘাম মুছে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আবার ফিরে এলাম রোজকার মাটিতে।'

ক্লারা হাঁপাচ্ছিল, হাঁপাতে হাঁপাতে নরম ঘাসের উপর বসে পড়ল। ওর গাল গোলাপী আভায় রক্তিম হয়ে উঠেছে। পল ওকে চুম্বন করল. ক্লারা উচ্ছল হয়ে উঠল আনন্দে। পল বলল, 'দাঁড়াও, তোমার জুতো সাফ করে ভদ্র-সমাজের উপযুক্ত করে দিচ্ছি।'

ওর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে পল কাঠি আর ঘাস নিয়ে জুতো সাফ করার কাজে লাগল। ক্লারা নিজের আঙুল রাখল পলের চুলে, পলের মাথা ধরে নিজের দিকে এনে ওকে চুম্বন করল। পল হেসে বলল, 'আমার কাজটা কি বল ত'? জুতো সাফ করা না প্রেমলীলায় মেতে থাকা, কোনটা?'

ক্লারা বলল, 'আমার যখন যেমন খুশি হবে তাই।'

'তা'হলে আগে জুতো-সাফের কাজটাই শেষ হোক।'

তবু দু'জনে হাসিমুখে চেয়ে রইল দু'জনের চোখের দিকে, তারপর নিজেদের বিলিয়ে দিল উদগ্র চুম্বনের মধুর আবেশের মধ্যে। অবশেষে পল তার মায়ের অনুকরণে জিভের শব্দ করে বিরক্তি প্রকাশ করল, বলল, 'ইস্, মেয়েলোক কাছে থাকলে কোন কাজ হবার জো নেই।' বলে গুন গুন করে গান করতে করতে সে আবার জুতো সাফ করার কাজে মন দিল। ক্লারা ওর ঘন চুল স্পর্শ করল আঙুলে। কিন্তু পল কাজ করে যেতে লাগল না থেমে। অবশেষে জুতো-জোড়া আবার বেশ চকচকে হয়ে উঠল। পল বললে, 'দেখলে ত' তোমাকে আবার জাতে তুলে দিলাম কি না?'

নিজের জুতোজোড়াও পল খানিকটা পরিষ্কার করে নিল, তার পর একটা ডোবায় গিয়ে হাত ধুয়ে এল। সারাক্ষণ ওর মুখে গান লেগেই আছে। এবার দু'জনে ক্লিফটন গাঁয়ের দিকে যাত্রা করল। আজ ক্লারার প্রেমের উন্মাদনা পলকে পাগল করে তুলেছে। যতবার ওর দিকে ফিরে চাইছে ততবারই যেন আগুনের হল্‌কা বয়ে যাচ্ছে ওর বুকের মধ্যে।

পথ চলতে চলতে ক্লারা যেন উস্‌খুস্ করতে লাগল। আর ভারী চুপচাপ। পল বলল, 'নিজেকে গুরুতর অপরাধী ব'লে মনে হচ্ছে নাকি তোমার?'

ক্লারা চকিত-চোখে তাকাল ওর দিকে। বলল, 'অপরাধী! কেন?'

—'মানে, একটা খারাপ কাজ ক'রে ফেলেছ বলে মনে হচ্ছে যেন তোমার।'

—'না, তা নয়। শুধু ভাবছি, লোকে যদি জানে।'

—'লোকে যখন জানবে, তখন আর কোন কিছু বুঝবার চেষ্টাও করবে না। এখন ওরা আমাদের বোঝে, তাই ওদের ভালো লাগে। কিন্তু লোকেদের কথা নিয়ে এত ভাবনা কেন? এইখানে এই গাছপালার সামনে আর আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলো ত' একটুও খারাপ কাজ করে ফেলেছ বলে অনুতাপ হচ্ছে কি না?' নিজের বাহুবন্ধনে পল টেনে নিল ওকে, মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে চেয়ে রইল ওর চোখে চোখ রেখে। কী একটা ভাবনা অনবরত খোঁচাচ্ছিল ওকে। ভুরু কুঁচকিয়ে ব ল, 'আমরা কিছু পাপ করিনি, কেমন?' অস্বস্তির আভাস ওর কথায়।

ক্লারা বলল, 'কই, মনে হচ্ছে না ত'?'

পল হাসিমুখে ওকে চুম্বন করল। বলল, 'এটুকু দুষ্টুমি নিশ্চয়ই অপছন্দ নয় তোমার? আমি ভাবি কি জানো? ঈভকে যখন স্বর্গ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল তখনও হয়ত ব্যাপারটা উপভোগ করতে তার বাধেনি।'

আজ ক্লারার মুখে যে উজ্জ্বল, উদার প্রসন্নতা তাতেই পলের খুশির সীমা রইল না। বাড়ি ফেরার পথে একা-একা রেলগাড়ির কামরায় বসে অপরিমেয় আনন্দে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল, আশ-পাশের লোকজনকে ভারী ভাল লাগতে লাগল, রাত্রির শোভা তার মনে রঙ ধরিয়ে দিল, চারি দিক যেন মায়ামন্ত্রে মোহন হয়ে উঠল তার কাছে।

বাড়ি ফিরে পল দেখল মা বসে বসে বই পড়ছেন। মায়ের স্বাস্থ্য ইদানীং খুব ভাল যাচ্ছে না। অনুজ্জ্বল পাণ্ডুর মুখ, পলের সেদিকে নজর দেবার অবকাশ কম, কিন্তু একবার চোখ পড়লে আর সে ভুলতে পারে না। মা-ও নিজের অসুখের কথা ঘুণাক্ষরে ছেলের কাছে উল্লেখ করেন না। ভাবেন, ও কিছু নয়, এমনিই। ছেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এত দেরি যে?'

পলের চোখ দু'টি জ্বলছিল, মুখে কী এক অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা! মায়ের দিকে চেয়ে সে হাসল। বলল, 'হ্যাঁ, দেরি হয়ে গেল। আজ ক্লারাকে নিয়ে ক্লিফ্‌টন্‌-এর বাগান-বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

মা আর একবার ভাল ক'রে চাইলেন ছেলের দিকে। বললেন, 'কিন্তু লোকে কি বলবে?'

—'কেন? লোকে জানে ও স্বাধীনচেতা মেয়ে। আর বলবেই বা কি?'

—'আমি বলছি না এতে দোষের কিছু আছে। কিন্তু লোকের ঐ স্বভাব, যদি একবার মেয়েটিকে নিয়ে কোন কথা ওঠে'—

—'উঠলই বা। লোকের মুখ চাপা দেবার কোন প্রয়োজন দেখি না। কী দাম আছে লোকের কথার?'

—'আমি ভাবছি মেয়েটির দিক থেকে জিনিষটিকে দেখা উচিত তোমার।'

—'তাই দেখি আমি। লোকে কী বলবে শুনি। বড় জোর বলবে ওরা দু'জনে বেড়াতে গিয়েছিল। তুমিই শুধু নানা কথা ভাবছ—তোমার মন খুঁৎখুঁৎ করছে, তাই বল।'

—'কিন্তু ওর যে একবার বিয়ে হয়েছিল। তা' না হলে বরং খুশিই হতাম এতে।'

—'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, জানি। ও এখন স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়েছে, সভায়-সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ায়। কাজেই ও একটু আলাদা ধরণের, কিছু হারাবার ভয় ওর নেই। জীবনেরই কোন মূল্য নেই ওর কাছে, হারাবার ভয় ওর কী করে থাকবে? ও যদি নিজের ইচ্ছায় আসে আমার সঙ্গে, তা'হলেও একটা কিছু হ'ল ওর জীবনে। তার জন্যে ওকেও দাম দিতে হবে, আমাকেও দিতে হবে। কিন্তু

দাম দিতে হবে, এই ভয়ে সাধারণ মানুষের মত উপোস করে মরে থাকব নাকি ?'

—'বেশ ত' বাছা, দেখি শেষ পর্য্যন্ত কী দাঁড়ায়।'

—'হ্যাঁ, তাই দেখো। আমিও শেষ পর্য্যন্ত দেখে তবে ছাড়ব।'

—'দেখাই যাক্!'

—'তুমি জানো না মা, ওর স্বভাব কী চমৎকার—সত্যি, ভারী চমৎকার ওর স্বভাব।'

—'তাতেই ওকে বিয়ে করা চলে না।'

—'নয় কেন? এমনি থাকার চেয়ে বিয়ে করাটাই বোধ হয় ভালো।'

খানিকক্ষণ চুপচাপ করে কাটল। পলের ইচ্ছে হ'ল দু'-একটা কথা মাকে জিজ্ঞেস করে, কিন্তু সাহস হ'ল না। অনেক ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করল, 'ওকে দেখতে চাও তুমি?'

মা বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললেন, 'মন্দ কী। দেখতাম কী রকম মেয়েটি।'

—'তাহ'লে নিয়ে আসব ওকে? বাড়িতে নিয়ে আসব ত'?'

—'সেটা তোমার খুশি।'

—'বেশ। রবিবারে চায়ের সময় নিয়ে আসব একদিন। ওকে দেখে যদি তোমার মনে না ধরে, তাহ'লে আর আমার কাছে রক্ষে নেই তোমার।'

ওর কথা শুনে মায়ের হাসি পেল। বললেন, 'তাতে আমার ভারী বয়েই গেল।' কিন্তু পল বুঝতে পারল এ যাত্রায় ওরই জিত হয়েছে। সে বলল, 'তুমি যদি ওকে দেখ মা তাহ'লে আর ভুলতে পারবে না। ও যেখানে থাকে, সেখানটায় থাকতেও ভাল লাগে। ও যেন রাণীর মত মহিমময়ী।'

মাঝে মাঝে গির্জ্জা থেকে বেরিয়ে পল আগের মতই মিরিয়াম আর এডগার-এর সঙ্গে খানিক দূর অবধি বেড়িয়ে আসত। ওদের বাড়ি অবধি আজ কাল আর সে যেত না। কিন্তু মিরিয়ামের ব্যবহারে এটুকুও পরিবর্ত্তন দেখতে পেত না পল—ওর সামনে এসে একটুও বিব্রত বোধ করতে হ'ত না তাকে। একদিন সন্ধ্যায় মিরিয়াম একাই ছিল, পল আর সে দু'জনে পাশাপাশি হেঁটে চলেছে। তাদের কথা শুরু হয়েছিল পুঁথিপত্র নিয়ে—এ তাদের বরাবরের গল্প। মিসেস মোরেল ত' বলতেনই যে পুঁথিপত্রই হ'ল পল আর মিরিয়ামের প্রণয়ের ইন্ধন—বইয়ের কথা বাদ দিলে সে আগুন কোন্‌দিন নিবে যেত। মিরিয়ামের মনে গর্ব্ব ছিল পলকে সে পড়া পুঁথির মত নিঃশেষে জেনে নিয়েছে, ওর জীবনের প্রতিটি অনুচ্ছেদ আর পঙক্তি ওর কণ্ঠস্থ। আর পলও সহজেই মেনে নিয়েছিল সে কথা। তার ধারণা হয়েছিল, মিরিয়াম ওকে যেমন জানে তেমন ভাল করে ওকে আর কেউ জানে না। সুতরাং মিরিয়ামের কাছে নিজের কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলতে ওর ভাল লাগত। অতি সহজেই কথাবার্ত্তার মোড় ফিরে যেত পলের নিজের কাজকর্ম্মের দিকে। নিজের গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে পেরে পলের আত্মপ্রসাদের সীমা থাকত না।

—'আজ-কাল কি নিয়ে কাজ করছ তুমি?'

—'আমি? কই, বিশেষ কিছু নয়। বাগানে বসে সেদিন বেন্টউডের একটা নক্সা এঁকেছিলাম। সেইটিকেই সারবার চেষ্টায় আছি। এই নিয়ে প্রায় শ'খানেক বার হ'ল—এখন প্রায় ঠিক হয়ে এসেছে।'

এই নিয়েই কথা চলল খানিকক্ষণ। পরে মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল, 'তাহ'লে এর মধ্যে আর বেড়াতে যাওনি কোথায়ও?'

—'গিয়েছিলাম। সোমবার বিকেলে ক্লারার সঙ্গে গিয়েছিলাম ক্লিফ্‌টন-এর বাগান-বাড়িতে।'

—'সে দিন ত' দিনটা খুব সুবিধের ছিল না! তাই নয়?'

—'তবু ইচ্ছে হ'ল কোথাও বেরিয়ে পড়ি, তাই বেরিয়ে পড়লাম। অন্ততঃ ট্রেণ্ট নদী ত' কানায় কানায় ভরা।'

—'তোমরা কি তা'হলে বারটন্‌-এও গিয়েছিলে?'

—'না। আমরা চা খেলাম ক্লিফটন-এই।'

—'বা, বেশ মজা হয়েছিল বলো?'

—'মজা নয়? এমন চমৎকার মেয়ে, আমাকে অনেকগুলো ডালিয়া ফুল উপহার দিয়েছিল, ভারী সুন্দর দেখতে!'

মিরিয়াম মুখ নীচু করে ভাবতে লাগল। এই মেয়েটির কাছ থেকে কোন কিছু লুকোবার প্রয়োজন পল কোন দিনই অনুভব করতে পারেনি, আজও পারল না। মিরিয়াম প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ ও তোমাকে ফুল উপহার দিতে গেল কেন?'

পল হাসল। বলল, 'বোধ হয় ভাল লেগেছিল বলে—দু'জনারই মন সেদিন খুশি ছিল হয় ত'।'

মিরিয়াম মুখে আঙুল দিয়ে ভাবতে শুরু করল। জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রে বাড়ি ফিরতে দেরি হ'ল সে দিন?'

ওর প্রশ্নের ধরণে পল বিরক্ত না হয়ে পারল না। বলল, 'সাড়ে সাতটার গাড়িতে ফিরলাম আর কি।'

মিরিয়াম অব্যক্ত বিস্ময়ের শব্দ করল। চুপচাপ হেঁটে চলল দু'জনে, পল তখন মিরিয়ামের উপর রেগে ফেটে পড়ছে। মিরিয়ামই আবার প্রশ্ন করল, 'ক্লারা আছে কেমন ?'

—'বেশ ভালই আছে ত' দেখলাম।'

—'ভাল হলেই ভাল।' মিরিয়াম গলার স্বরে বিদ্রূপ মিশিয়ে বলল, 'তার পর ওর স্বামী বেচারার খবর কি ? আজকাল তার কথা আর বড় একটা শুনতে পাই না।'

—'সে'ও বেশ ভালই আছে। আর একটি মেয়ে মানুষ জুটিয়ে নিয়েছে, কাজেই ভাল না থাকার হেতু নেই।'

—'তা'হলে তুমি নিশ্চিন্ত ক'রে বলতে পারছ না। কিন্তু মেয়েটার অবস্থা একবার ভেবে দেখ। কী অসুবিধায় ওকে পড়তে হয়েছে দেখ দেখি ?'

—'জঘন্য অবস্থা।'

—'কী অন্যায়! পুরুষ মানুষ যা খুশি তাই করবে, আর—'

—'বেশ ত,' মেয়েটিও তাই করুক না কেন ?'

—'তা কি আর হয় ? তা'হলে ওর অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠবে না ?'

—'হোক না, ক্ষতি কি ?'

'—তুমি যে অসম্ভব কথা বলছ। বুঝতে পারছ না মেয়েটার কত বড় ক্ষতি হবে এতে ?'

'সত্যি আমি বুঝতে পারছি না। একটি মেয়ের যদি ওই সতীপনা ধুয়েই খেতে হয়, তা'হলে ঐটুকু খোরাকে কত দিন ও বাঁচবে ?'

মিরিয়াম বুঝতে পারল পলের মনের ভাব। বুঝল ওর নীতিবোধের রীতি একটু স্বতন্ত্র। বুঝল ও তার নিজের পথ ধরেই এগিয়ে যাবে।

এর পর পলকে আর কোন দিন সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞাসা করতে তার মন সরত না, কিন্তু আভাসে-ইঙ্গিতে অনেক কথাই তার জমা হয়ে যেত।

আর একদিন পলের সঙ্গে মিরিয়ামের দেখা হ'ল, সেদিন প্রসঙ্গক্রমে বিয়ে এবং ক্লারার সঙ্গে ডয়েসের বিয়ে নিয়ে তাদের কথা উঠল। পল বলল, 'তুমি বুঝতে পারছ না মিরিয়াম! ক্লারা কোন দিনই জানত না যে বিয়ে ব্যাপারটা এমনি একটা ভয়ানক গুরুতর ব্যাপার। ক্লারা ভেবেছিল একটা নৈমিত্তিক ব্যাপার মাত্র, একদিন হতেই হবে। আর ডয়েস পাত্র হিসাবে এমন কিছু ফেলনা নয়—অনেক মেয়েই ওর জন্যে ব্যস্ত ছিল—কাজেই ক্লারাই বা ওকে গ্রহণ করবে না কেন ? তারপর একদিন ওর মধ্যের অশান্ত মেয়েটি জেগে উঠল, জেগে উঠে ডয়েসের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার আরম্ভ করল। আমি বাজি রেখে বলতে পারি আসল ঘটনাটা অনেকটা এই রকম।'

'আর ডয়েস ওকে ঠিক বুঝতে পারল না বলেই ছেড়ে চলে এল ?'

—'ঠিক তাই। ছেড়ে আসা ছাড়া ওর উপায় ছিল না। এ শুধু বোঝার ব্যাপার নয়, এ বাঁচার ব্যাপার। ডয়েসের সান্নিধ্যে ওর বাঁচাটা ছিল আধ-বাঁচা; ওর বাকী অংশটা ছিল ঘুমন্ত, নিঃসাড়। সেই ঘুমন্ত অংশটার মধ্যেই লুকিয়ে ছিল ওর অশান্ত নারীত্ব, তাকে জাগাবার সুযোগ ওকে দিতেই হ'ত।'

—'আর ওর স্বামীর কী হ'ল ?'

'—তা জানি না। সে হয়ত ওকে যথেষ্টই ভালবাসে, কিন্তু সেটা নির্বোধের ভালবাসা।'

—'অনেকটা তোমার বাবা আর মায়ের মত ওদেরও।'

—'হ্যাঁ। কিন্তু আমার মনে হয় প্রথম অবস্থায় মা সত্যিকার আনন্দ আর তৃপ্তি পেয়েছেন বাবার কাছ থেকে। বাবার দিকে ওঁর গভীর টান ছিল, তাই রয়েই রয়ে গেছেন উনি। ছেড়ে যান নি কোন দিন।'

'বুঝলুম।'

'আমার নিশ্চিত ধারণা, প্রথম দিকে বাবার কাছ থেকে সত্যিকারের জিনিসটি উনি পেয়েছেন। মা নিজে জানেন সে খবর। তাঁকে দেখেই তুমি বুঝতে পারবে। বাবাকে দেখেও বুঝতে পারবে। আর রোজ যে সব লোক তোমার আমার চোখে পড়ে তাদের মধ্যেও একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে। সেই আসল জিনিসটি যে একবার পেয়েছে, তাকে যত বিভ্রাটের মধ্যে দিয়েই আসতে হোক না কেন, তার পক্ষে পূর্ণতা লাভ করা আর অসম্ভব নয়।'

'কিন্তু সেই আসল জিনিসটি কি, তা ত' বলছ না ?'

'—সেটা বলা খুব শক্ত। একটি মানুষ যখন আর একটি মানুষের সত্যিকারের সংস্পর্শে আসে, তখন একটা কিছু বিপুল আর প্রগাঢ় পরিবর্তন দেখা দেয় তার জীবনে। যেন তার মনের গোড়ায় সার দেওয়া হয়েছে, এখন আর ফুলে-ফলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে তার বাধা নেই।'

—'তুমি বলছ তোমার মা আর বাবার মধ্যে সেই সত্যিকারের সংযোগ ছিল ?'

—'হ্যাঁ। সেই জন্যেই আজ যদিও দু'জনে বহু দূর চলে এসেছেন, তবু সেদিনের সেই দানটুকুর জন্যে মা আজও বাবার কাছে কৃতজ্ঞ।'

—'আর ক্লারা কোন দিনই সে জিনিস পায়নি ?'

'আমার তাই বিশ্বাস।'

মিরিয়াম অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে লাগল। আজ সে বুঝতে পারল পল কি চায়, কামনার বহ্নির মধ্যে সে খোঁজে জীবনের অগ্নিদীক্ষা। ওইটুকু না পেলে সে আর কিছুতেই শান্ত হবে না। বেশীর ভাগ পুরুষের জীবনেই অন্ততঃ একবারের জন্যে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠা বড় প্রয়োজন, তা না হ'লে তারা স্থির হতে পারে না। পলের বেলায়ও ঠিক তাই। একবার মনের সাধ মেটাতে পারলে তখন আর এই চিত্তবিক্ষেপ ওর থাকবে না, স্থির হয়ে মিরিয়ামের হাতে নিজের জীবনকে সে তুলে দিতে পারবে। বেশ, তাই হোক; তবে, একবার সাধ মিটিয়ে আসুক, ওর সেই বিপুল আর প্রগাঢ় জিনিসটার কামনা পূর্ণ হোক। একবার সে জিনিস পেলে আর সে চাইতে যাবে না—তখন আবার তাকে মিরিয়ামের কাছেই ফিরে আসতে হবে অন্য জিনিসের জন্যে। কারো হাতে নিজেকে তুলে দিতে না পারলে সে কাজ করতে পারবে না। অবশ্য এখন ওকে ছেড়ে থাকা মিরিয়ামের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু ও যদি আজ সরাইখানায় এক গ্লাস মদ খেতে যায় তা'হলে ত' মিরিয়াম ওকে বাধা দেবে না। ঠিক তেমনি ক্লারার কাছে যেতেই কেন বা ওকে সে বারণ করবে ? গিয়ে একবার

নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে আসুক, তখন মিরিয়াম সম্পূর্ণ ভাবে ওকে অধিকার করতে পারবে, তাতে ভাগ বসাবার আর কেউ থাকবে না। মিরিয়াম জিজ্ঞেস করল, 'তোমার মাকে বলেছ ক্লারার কথা?' ভাবল-এতে বোঝা যাবে ক্লারার প্রতি ওর আকর্ষণের গভীরতা কতটুকু। সত্যি কি ও ক্লারার কাছে কোন গভীর বস্তুর সন্ধানে যায়, নাকি শুধু ক্ষণিক মোহের আকর্ষণে—সেটা বোঝা যাবে যদি মায়ের কাছে ও ক্লারার কথা বলে থাকে।

পল বলল, 'হ্যাঁ, বলেছি। রবিবার বিকেলে ও চা খেতে আসছে।'

—'তোমাদের বাড়ি?'

—'হ্যাঁ। ও এলে মায়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হবে। অনেক দিন থেকে ভাবছি মায়ের সঙ্গে ওর পরিচয় হোক।'

—'বেশ ত'।'

একেবারে নীরব হয়ে গেল দু'জনে। মিরিয়াম ভাবল, ঘটনা-স্রোত বড় দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। পল যে এত তাড়াতাড়ি. এমন সম্পূর্ণ ভাবে ওকে দূরে সরিয়ে দেবে সে-কথা ভাবতেও তার মনের মধ্যে টনটন্ করে উঠতে লাগল। পলের বাড়ির লোক কি এত সহজেই ক্লারাকে গ্রহণ করবে? তা'হলে তার দিকে ওরা এত বিরূপ ছিল কেন? সে বলল, 'আমিও হয়ত যেতে পারি, গির্জ্জেয় যাবার পথে। অনেক দিন দেখিনি ক্লারাকে।'

'বেশ ত' যেও।' পল বলল আশ্চর্য্য হয়ে। তার অবচেতন মন মিরিয়ামের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল।

রবিবার বিকেলে পল গেল কেস্‌টন ষ্টেশনে ক্লারাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে। প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়িয়ে নিজের মনেই সে ক্লারা আসবে কি না তার পরখ করতে লাগল। কিছু মনে হচ্ছে কি? মন যেন আজ ভারী সঙ্কুচিত, অদ্ভুত লাগছে সব কিছু। এ কি ক্লারা আসবে না, তারই আভাস? যদি ও না আসে তা'হলে ত' সব কল্পনাই বৃথা, মাঠের পথ ধরে দু'জনার আর চলা হ'ল না—একাকী বাড়ি ফিরে যেতে হবে তাকে। গাড়ি আসতে দেরি হচ্ছে। এমন বিকেলটা নষ্ট হবে, সন্ধ্যাও হবে ব্যর্থ। ক্লারার উপর ভয়ানক রাগ হতে লাগল তার। যদি নাই আসতে পারবে, তবে কথা দিয়েছিল কেন? হয়ত বা সময় মত গাড়ি ধরতে আসতে পারেনি, কিন্তু এই বিশেষ গাড়িটাই বা সে ধরতে পারল না কেন? মনে মনে ক্লারার না আসার কথা কল্পনা করে সে প্রচণ্ড আক্রোশে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল।

হঠাৎ দেখা গেল, ট্রেণখানা এঁকে-বেঁকে এগিয়ে আসছে। ট্রেণ ত' এলো, কিন্তু ও নিশ্চয়ই আসেনি। সবুজ ইন্‌জিনটি হস্‌হস শব্দ করতে করতে প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করল, গাড়ির গতি মন্থর হয়ে এলো, কয়েকটা কামরার দরজা খুলল। কিন্তু, কই ক্লারা! না ও আসেনি। কিন্তু ও কে? ঐ যে ক্লারা দাঁড়িয়ে। প্রকাণ্ড কালো টুপি মাথায়। মুহূর্ত্তে পল গিয়ে দাঁড়াল ওর পাশ ঘেঁষে। বলল, 'আমি ত' ভাবলাম তুমি বুঝি এলেই না।'

ক্লারা হাসতে হাসতে হাত বাড়াল ওর দিকে। চোখাচোখি হ'ল দু'জনার। পল আর দেরি না করে ওকে নিয়ে গেল প্ল্যাটফর্ম্মের বাইরে, মনের আবেগ গোপন করবার জন্যেই আজ ওকে অনবরত

কথা বলতে হচ্ছে। আশ্চর্য্য সুন্দর দেখাচ্ছে ক্লারাকে। ওর পাশে চলাও যেন গৌরব। পলের মনে হ'ল ষ্টেশনের যে সব লোক তাকে চেনে, সবাই বিস্ময় আর শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে তার দিকেই চেয়ে আছে। বলল, 'আমি ত' এক রকম ধরেই নিয়েছিলাম যে তুমি এলে না।' মোহগ্রস্তের মত হাসি কেঁপে গেল ওর ঠোঁটে।

ক্লারাও হাসল, তার হাসিতে যেন কান্নার আবেগ। বলল, 'আর আমি—আমি ট্রেণে বসে ভাবছিলাম তোমাকে ষ্টেশনে না পেলে তখন কি করব।'

পল আবেগ ভরে টেনে নিলো ওর হাত, দু'জনে সরু বাঁকা পথ ধরে হেঁটে চলল। মিঠে রোদ উঠেছে ঘন নীল আকাশ জুড়ে। পাটল পাতা ঝরে পড়ছে পথের ধুলোয়। বনের ধারে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে থেকে মাথা উঁচিয়ে আছে টকটকে লাল 'হিপ' ফুলের গাছ। পল কয়েকটা ফুল কুড়িয়ে নিলো ওকে পরাবার জন্যে।

ক্রমশঃ কলিয়ারীর কাছাকাছি এসে পড়ল দু'জনে। চারি দিকে বিস্তীর্ণ শস্যক্ষেত্র, তার মধ্যে কালো কয়লাখনি মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্লারা বলল, 'আহা, এই সুন্দর জায়গাটার মধ্যিখানে এমন একটা কালো কুৎসিত কয়লাখনি।'

পল বলল, 'তাই মনে হচ্ছে নাকি তোমার? আমার ত' যেন এটা না থাকলেই বরং খারাপ মনে হ'ত, দেখে দেখে এমনি অভ্যেস হয়ে গেছে।'

বাড়ির কাছাকাছি এসে ক্লারার কথা বন্ধ হয়ে গেল, পা যেন আর চলতে চাইল না। পল হাতের আঙুল দিয়ে ওর আঙুলে চাপ দিল একটুখানি। ক্লারা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল, সাড়া দিল না। পল বলল, 'বাড়ি যেতে মন নেই নাকি তোমার?'

ক্লারা বলল, 'তা কেন, আসতে চাই বলেই ত' এসেছি।'

বাড়িতে গেলে ওর অবস্থাটা যে বেশ একটু শক্ত আর জটিল হয়ে দাঁড়াবে, সে কথা পলের মনেই হ'ল না। যেন একটি পুরুষ-বন্ধুকে মায়ের কাছে নিয়ে যাচ্ছে—হয়ত সে অন্যান্য বন্ধুদের চেয়ে ভালো, কিন্তু তবু শুধু বন্ধুই।

পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে একটা চওড়া রাস্তা নেমে গেছে। মোটেই সুন্দর নয় দেখতে। সেই রাস্তায় মোরেলদের বাড়ি। রাস্তাটা সুদর্শন না হলেও, বাড়িটা এ পাড়ার মধ্যে অনেক বাড়ির চেয়েই ভালো। পুরোনো, চুণখসা বাড়ি, তায় ঝোলানো বারান্দা; আশপাশের বাড়িগুলো থেকে অনেকটা আলাদা ক'রে তৈরি হয়েছে এ বাড়িখানা। তবু কেমন নিষ্প্রাণ দেখায় বাড়িটাকে। কিন্তু পল বাগানের দিকের দরজাটা খুলে দিতে সমস্ত দৃশ্যটা একেবারে বদলে গেল। বাইরে বৈকালী রোদের ঝিলিক, সে যেন আর একটা আলাদা রাজ্য! বাগানের সরু পথের দু'ধারে ছোট ছোট চারাগাছ, তাতে ফুল ধরেছে। জানালার সামনে ঘাসের উপর রোদের আলো ঝিকমিক করছে, তার চারি দিকে সারি সারি 'লাইল্যাক' ফুলের গাছ।

মিসেস মোরেল দোলন-চেয়ারটায় বসেছিলেন। কালো সিল্কের ব্লাউজ গায়ে, মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলো কপালের উপর থেকে টেনে নিয়ে শক্ত করে বেঁধেছেন, মুখে বিষণ্ণ পাণ্ডুরতা। ক্লারা মনের চাঞ্চল্য চেপে পলের পেছনে রান্নাঘরে এসে প্রবেশ করল। মিসেস মোরেল উঠে দাঁড়ালেন। প্রথম দৃষ্টিতেই ক্লারার মনে হ'ল মহিলাটি ভদ্র, যদিও একটু রুক্ষ প্রকৃতির। চিত্তচাঞ্চল্য ক্লারাকে অস্থির করে তুলেছিল। তার চাউনিতে ছিল অসহায় কাতরতা।

পল পরিচয় করিয়ে দিল, 'এই মা—আর এই ক্লারা।'

মিসেস মোরেল হাত মেলে দিলেন হাসি মুখে। বললেন, 'ওর কাছে অনেক শুনেছি তোমার কথা।'

ক্লারার গাল দু'টি রক্তিম হয়ে উঠল। জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'আজ নিজেই এসে পড়লুম—আপনি কিছু মনে করলেন না ত'?'

'আমি বরঞ্চ খুশিই হলুম। ও যখন বললে তোমাকে নিয়ে আসবে তখন ভারী আনন্দ হ'ল আমার।'

পল এদিকে চোখ মেলে দেখছিল। সহসা তার মন বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠতে লাগল। ক্লারার সমৃদ্ধির পাশে তার মা কত ছোট, কত মলিন, কত বিবর্ণ। ওর হয়েছে শুষ্ক, আর এঁর সারা। সে বলল, 'আজ দিনটিও ভারী চমৎকার, নয় মা?'

মা ফিরে চাইলেন ওর দিকে। আজ কী সুপুরুষই না দেখাচ্ছে ওকে! কালো পোষাকটি চমৎকার মানিয়েছে গায়ে। ওর মুখে বিষাদের বর্ণহীন প্রলেপ, ও যেন সবভোলা বিবাগী। কোন মেয়ে কি ওকে বেঁধে রাখতে পারবে? মায়ের মন একবার মুহূর্তের জন্যে জ্বলে উঠল—তার পর ক্লারার কথা ভেবে তাঁর দুঃখ হতে লাগল। ক্লারাকে ডেকে বললেন মিষ্টি করে, 'তোমার জামাকাপড় তাহ'লে বাইরের ঘরেই এনে রাখ, কেমন?'

—'তাই হবে।' ক্লারা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করল ওঁকে।

পল বলল, 'এসো। এই দিক দিয়ে'—ব'লে বাইরের বসবার ঘরে ওকে নিয়ে গেল। একটা পুরোনো পিয়ানো, কয়েকটা মেহগনি কাঠের আসবাব, আর শ্বেত-পাথরে বাঁধানো তাক—এইটুকুই ঘরের সজ্জা। ঘরে আগুন জ্বালানো ছিল—বই আর ছবি আঁকার শক্ত কাগজ ছিল ঘর জুড়ে ছড়ানো। পল বলল, 'আমি এমনি করেই ছত্রাকার করে রাখি আমার জিনিসপত্র। গুছিয়ে রাখার চেয়ে এ ঢের বেশী সহজ।'

ওর শিল্পি-জীবনের এই সব উপকরণ, ওর বই, আর লোকজনের ফটো—সব কিছুই ক্লারার ভাল লাগল। পল সমস্ত বুঝিয়ে দিতে লাগল ওকে—এই হ'ল উইলিয়ম, এই উইলিয়মের পাত্রী, এরা দু'জন হ'ল এ্যানি আর তার বর, এরা হ'ল গিয়ে আর্থার, তার বৌ আর কচি ছেলেটি। ক্লারার মনে হ'ল যেন এই পরিবারে প্রবেশ করার পথ তাকে কেউ দেখিয়ে দিচ্ছে। পল তার সমস্ত ফটো, বই, তার নিজের আঁকা ছবি, সব কিছু দেখাল ওকে। দু'জনে কিছুক্ষণ গল্প করল বসে। তার পর আবার ফিরে গেল রান্নাঘরে। মিসেস মোরেল হাতের বইখানা নামিয়ে রাখলেন। ক্লারা পরেছে একটা পাতলা সিল্কের ব্লাউজ, তার উপর সাদা আর কালো টান। চুলগুলো জড়ো করে অতি সাধারণ ভাবে মাথার উপর পাকিয়ে রেখেছে। দেখতে ভারী গম্ভীর আর মহিমময়ী বলে মনে হচ্ছে তাকে।

মিসেস মোরেল কথা শুরু করলেন। বললেন, 'তোমরা বুঝি স্নিন্টন্-এর রাস্তায় থাকো? আমি যখন খুব ছোট ছিলাম—তখন আমরা থাকতাম মিনার্ভা টেরাস-এ।'

ক্লারা বললে, 'তাই নাকি। ও মা, ছ' নম্বরে ত' আমার এক বন্ধু থাকে এখন।'

এমনি করে কথাবার্ত্তার পত্তন হ'ল। দু'জনেই নটিংহ্যামের মেয়ে। নটিংহ্যামের লোকজনের কথা বলতে আর শুনতে দু'জনেরই ভাল লাগছিল। ক্লারা এখনও সম্পূর্ণ আত্মস্থ হতে পারেনি। মিসেস মোরেলও নিজের উঁচু আসন ছেড়ে নীচে নেমে ওর সঙ্গে মিসে যেতে পারেন নি—খুব মেপে মেপে ওজন করা কথা বলছেন ওর সঙ্গে। তবু পলের বুঝতে বাকী রইল না যে ওদের দু'জনের মিল হতে বেশী দেরি হবে না।

মিসেস মোরেল মনে মনে নিজের সঙ্গে ক্লারাকে তুলনা করছিলেন, নিজের মাপে যাচাই করে নিচ্ছিলেন ওকে। সহজেই মনে হ'ল তাঁর সামনে এ মেয়েটি দাঁড়াবার যোগ্য নয়। ক্লারাও ছিল সন্ত্রস্ত। পল মাকে কী বিপুল শ্রদ্ধার চোখে দেখে সে কথা আগে থেকেই জানা ছিল তার। দেখা করতে আসবার আগে ভেবেছিল, হয়ত উনি খুব রাসভারি আর কড়া-মেজাজের লোক হবেন। এখানে এসে দেখল ছোটখাট একটি চেহারা, সব কিছুতেই কৌতূহল, কথা বলতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা নেই। দেখে সে আশ্চর্য্য হ'ল, মুগ্ধ হ'ল। যেমন পলের বেলায়, তেমনি ওঁর বেলায়ও ক্লারার মনে হ'ল যে, এঁদের গতিরোধ করবার চেষ্টা বৃথা। পলের মা যেন ঠিক হাতুড়ির মত শক্ত, ইস্পাতের মত অব্যর্থ, যেন জীবনের কোন ক্ষেত্রেই কোন দিন তাঁকে সন্দেহ-দোলায় দুলতে হয়নি।

একটু পরে মিঃ মোরেল এসে প্রবেশ করল। উস্কখুস্ক, অন্যমনস্ক ভাব। বিকালের ঘুম থেকে উঠে ক্রমাগত হাই তুলছে। খালি পায়ে মোজা পরে, আর শার্টের উপর দিয়ে ওয়েষ্টকোট ঝুলিয়ে সে মাথা চুলকাচ্ছিল বসে, অদ্ভুত লাগছিল ওকে। পল বলল, 'বাবা এ হ'ল মিসেস ডয়েস।'

শুনে মোরেলের চৈতন্যোদয় হ'ল। ক্লারা শুধু দেখল পলের মাথা নোয়ানো আর হাত ঝাঁকানোর ভঙ্গী। মোরেল বলল, 'কী আশ্চর্য্য! ভারী খুশি হলুম তোমার আসাতে, সত্যি খুব খুশি হলুম তোমাকে দেখে। না, না, উঠতে হবে না তোমাকে। দিব্যি বসে থাক, গল্প কর, আর কি।'

এই বুড়ো খনি-মজুরটির পক্ষ থেকে অতিথি সৎকারের এই অপরিমিত প্রচেষ্টা দেখে ক্লারা মনে মনে আশ্চর্য্য না হয়ে পারল না। ভাবল, লোকটি বেশ ভদ্র, বেশ সপ্রতিভ। ভারী মজার লোক উনি।

মোরেল আবার জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি অনেক দূর থেকে আসছ?'

—'না। এই ত' নটিংহ্যাম থেকে।'

—'মোটে? তা বেশ, খাসা দিনটি পেয়েছিলে আসার পথে।' ব'লে তার পর সে চলে গেল হাত-মুখ ধুতে স্নানঘরের দিকে। আর ফিরে এলো তোয়ালে দিয়ে গা মুছতে মুছতে ঘরের আগুনের সামনে। এই ওর চিরকালের অভ্যেস।

এ বাড়ির পরিপাটী রুচি আর স্বচ্ছ জীবনধারার সঙ্গে ক্লারার সম্পূর্ণ পরিচয় হ'ল চায়ের সময়টিতে। মিসেস মোরেল নিতান্ত স্বচ্ছন্দ ব্যবহার করলেন, কথাবার্ত্তা বলতে বলতে চা-ঢালা, কার কী দরকার জেনে নেওয়া, সব যেন নিজের অজ্ঞাতেই করে চলেছেন উনি। গোল টেবিলটিতে হাত-পা ছড়িয়ে বসার জায়গা আছে। ধবধবে শাদা চাদরের উপর ঘন নীল চিনামাটির বাসনগুলি চমৎকার দেখাচ্ছিল। মাঝখানে ছিল একগুচ্ছ কেশরচাঁপা। ক্লারার মনে হ'ল আজকের আসর পূর্ণ হয়েছে তার উপস্থিতিতে, নিজেকে তাই বড় সুখী বলে মনে হতে লাগল। তবু মোরেলদের এই চাঞ্চল্যহীন, পরিতৃপ্ত জীবন দেখে খানিকটা ভয়ও যেন হচ্ছিল তার। এরা যেন নিজেদের ভারসাম্য খুঁজে পেয়েছে, তাই এত স্বচ্ছ ওদের বাড়ির আবহাওয়া, সেখানে সবারই স্বকীয়তা আছে, সবারই মিল আছে সকলের সঙ্গে। জিনিসটাকে উপভোগ করল ক্লারা। কিন্তু একটা ভয় গোপনে তার মনে বাসা বাঁধল।

মা ক্লারার সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন, পল চায়ের টেবিল পরিষ্কার করতে লাগল। ওর বলিষ্ঠ দেহ বার বার আসছে আর যাচ্ছে, দমকা হাওয়ায় যেন একবার ঝরাপাতার মত ওকে আচমকা উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এই অনুভবটি সর্ব্বক্ষণ ক্লারার মনকে উন্মুখ করে রাখল। তার মনের বড় অংশটা রয়ে গেল পলের দিকে।

কাজ শেষ করে পল বাগানে বেরিয়ে গেল, এঁদের দু'জনে রইলেন গল্প নিয়ে। কিছুক্ষণ পরে মিসেস মোরেল চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

ক্লারা বলল, 'চলুন, আপনার সঙ্গে আমিও বাসনকোসন ধুয়ে ফেলি।'

'এ আর এমন কি।' মিসেস মোরেল বললেন, 'এই ত' কয়েকটা বাসন, এক মিনিটের ব্যাপার।' তবু ক্লারা বাসনগুলিকে ঘষে মুছে সাজিয়ে রাখতে লাগল, পলের মায়ের সঙ্গে এইটুকু সদ্ভাব স্থাপন করতে পেরে তার মন খুশি হয়ে উঠছিল। কিন্তু পলের পিছন-পিছন বাগানে যেতে না-পারাও যে মর্ম্মান্তিক। শেষ পর্য্যন্ত যাওয়ার ইচ্ছাটাই জয়যুক্ত হ'ল। ক্লারার মনে হ'ল যেন তার পায়ের বন্ধনরজ্জু হঠাৎ কেউ খুলে দিয়েছে।

[illegible] পাহাড়গুলোতে সেদিন সন্ধ্যার সোনালী মেলা বসেছে। পল দাঁড়িয়েছিল সামনের বাগানটাতে, তার চার পাশে রঙঝরা ডেইজি ফুলের গাছ। দেখছিল শেষ মৌমাছির দল রিক্ত ফুল ছেড়ে যাত্রা করেছে মৌচাকের দিকে। ক্লারার আসার আওয়াজ পেয়ে পল এদিকে ফিরল। স্বচ্ছন্দ, সাবলীল ভঙ্গীতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এবারকার পালা এদের ফুরোল।'

ক্লারা দাঁড়াল ওর গা-ঘেঁষে। সামনে লাল পাথরের নীচু পাঁচিল, তার ওপারে মাঠ আর দূরের ঝাপসা পাহাড়, ঝাপসা সোনার রঙ।

ঠিক সেই সময়টিতে মিরিয়াম বাগানের দুয়ার ঠেলে ঢুকছিল। দেখল ক্লারা যাচ্ছে পলের দিকে, পল ঘুরে দাঁড়াল, তার পর দু'জনে দাঁড়াল পাশাপাশি। এই নির্জ্জনে ওদের দু'জনকে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মিরিয়ামের মনে আর সন্দেহ রইল না যে ওদের বোঝাপড়ার কিছুই আর বাকী নেই। বুঝতে পারল, এদের বিয়ে হয়ে গেল বলতে আর বাধা নেই। কোন মতে পা চালিয়ে বাগানের লম্বা পথ ধরে সে এগিয়ে চলল।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও ধীরেশ ভট্টাচার্য্য



ভণ্ড-জাতক

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

৫

পাহাড়ে-ঘেরা সম্পূর্ণ নূতন জায়গা ; বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অবাক হইয়া ভাবি,—কোন্ পথে এই অদ্ভুত দেশে আসিয়া পৌঁছিলাম ! উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিম চারি দিকেই পাহাড় । তাহার মাঝখানে বিরাট সমতল ভূমির চত্বর—গাছপালা, বাড়ীঘর ! উত্তরে সারি সারি পাহাড়ের পর পাহাড়, যেন ঢেউ খেলিতেছে ; সেই ঢেউগুলি ক্রমশঃ উঁচু হইয়া আকাশ স্পর্শ করিয়াছে ।

বেশ বুঝা যায়, সাদা-কালো মেঘ পাহাড়ের গায়ে নামিয়াছে ; মাঝে মাঝে তাহারা আবার সরিয়া যায় ; না, না, সকলগুলি ত মেঘ নয় ! ওই সাদা রঙেরগুলি ভাসমান অভ্র ; বুড়ো পিসীমা বলেন, "আকাশের আত গাছের পাতা থেকে পাহাড়ে নেমে আসে ; আর পাহাড়ী লোকেরা তখন গাছের উপর লুকিয়ে থাকে ; যেমি ওরা পাতা থেকে আরম্ভ করে, তেমি লাঠি মেরে আতগুলিকে ফেলে দেয় ; সেই আতই আমরা পেয়ে থাকি হাটে-বাজারে ।"

বড় রহস্যময় এই পাহাড় ! মাঝে মাঝে মেঘমালা ধুঁয়ার মত পাহাড়গুলিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে ; তখনই বুঝা যায়, বৃষ্টি নামিবে । রাত্রিকালে পাহাড়ের গায়ে আবার আগুন জ্বলিয়া উঠে ; পাহাড়ে আবার মানুষ বাস করে ! কিন্তু কই, কাহাকেও দেখা যায় না ! শুনিয়াছি, পাহাড়ে ভীষণ বনজঙ্গলে বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ প্রভৃতি জন্তু জানোয়ার আছে ; কিন্তু কিছুই বুঝার উপায় নাই ; কালো কালো ছোঁপের মত দাগ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না । ওই উঁচু-নীচু খাড়া জায়গায় মানুষ কি করিয়া থাকিবে ? পাহাড়ের ঢেউ আকাশের গায়ে গিয়া ঠেকিয়াছে ; এইখানেই কি পৃথিবীর শেষ ? মনে মনে কত প্রশ্ন জাগে !

বাড়ীর কাছেই দক্ষিণে বিরাট নদী, যেন পাহাড়ী অজগর । বর্ষাকাল, কূল-কিনারা ঠাউরাইবার উপায় নাই ; ওই যে, কিছু দূরে দক্ষিণ আর পশ্চিম হইতে সারি সারি পাহাড় নদীতে আসিয়া যেন নামিয়াছে,—ছোট বড় হাজার হাজার হাতী ! তাহার মাঝখান দিয়া নদী চলিয়াছে । আর দুই পাশ হইতে হাতীর পাল যেন সত্যই জলে নামিয়াছে : এমনই সুন্দর সেই দৃশ্য ! পড়ন্ত রৌদ্রে পশ্চিম দিকে তাকাইলে নদী আর পাহাড়ের এই মিলনদৃশ্য অপরূপ লাগে ; নদীর ভিতর ঠেলিয়া আসিয়াছে যেন মস্ত বড় একটা হাতী, তাহার মাথার উপর ঝকমক করিতেছে একটি মন্দির ; সিদ্ধেশ্বর শিব ! অগণিত নরনারী মিলিত হয় বারুণী মেলার উৎসবে । শিববাহী হাতীর পশ্চাতে আর একটা মেরুপৃষ্ঠে স্বর্ণপ্রতিমা দেবী দুর্গা ।

পাহাড়ের বিচিত্র শোভা আমাকে মুগ্ধ করিয়া তুলিল ; সিদ্ধেশ্বর শিবের আসন স্থাপন করিয়াছেন কোন এক কপিল মুনি, হাজার হাজার বছর আগে । ওই সারি সারি পাহাড়ের শ্রেণী তাঁহারই আদেশে নাকি হরগৌরীকে মাথায় তুলিয়া লইতে বরাক নদীর ওই বাঁকের মোড়ে আসিয়া মিলিত হইয়াছে !

বাড়ীর সম্মুখ দিয়া বড় সড়ক চলিয়াছে পশ্চিম দিকে । সড়কটা গিয়াছে ওই সিদ্ধেশ্বরের কাছে । হাতীর সারি আর সিদ্ধেশ্বরের আকর্ষণ আমাকে চঞ্চল করিয়া তুলিল ; এই নূতন জায়গার সঙ্গী-সাথীরা কত গল্প করে বারুণী মেলার ! মণিপুরী মেয়েরা নৃত্য করে ; গান গাহিয়া অপরূপ সাজে সাজিয়া নাচিয়া নাচিয়া যায়—মণিপুরী যুবক-যুবতী ! একদিন বড় সড়ক ধরিয়া পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিলাম ; মনে মনে ভাবি, যদি সুব্রতা সঙ্গে থাকিত ! কিন্তু ভাবনা কেন ? এই সোজা সড়কটা দিয়াই ত' ফিরিতে পারিব !

পথে পড়ে ছোট ছোট গ্রাম, বাজার, মাঠ, জলা আরো কত কি ! গ্রামের ভিতরে ঢুকিলে আর পাহাড় দেখিতে পাই না ; মনটা বিচলিত হইয়া উঠে । এই দিকে রৌদ্রের রঙ পাল্টাইয়াছে ; মিঠা মিঠা হলুদ রঙের রৌদ্রে গাছের পাতা চিক্‌চিক্ করিয়া উঠে ! ক্লান্তির আমেজ দেখা দিল ; আমিও ক্লান্ত । পথ আর শেষ হয় না ! কত লোক চলাফেরা করিতেছে ; কাহাকেও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভয় হয় ; আমাকেও কেহ কিছুই জিজ্ঞাসা করে না । পথের মানুষ, পথের সঙ্গেই তাহার পরিচয় । আশে-পাশে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা খেলা করিতেছে । কই, আমাকে ত' কেহ ডাকে না ! কোমরে গামছা-জড়ানো আট-নয় বছরের একটি মেয়ে প্রকাণ্ড একটা কালো মহিষকে তাড়া করিয়া ছুটিতেছে, অদ্ভুত লাগে এই দৃশ্য !

একটা বড় গ্রাম পার হইয়া যখনই বাহিরে আসিলাম, তখন বিস্ময়ের আর সীমা রহিল না ; ওই যে, দু'ধার থেকে হাতীরা জলে নেমেছে ; উঁচু হয়ে উঠেছে নদীর বুক, হাতীর মত নদীর বুকের ভেতরে অনেকখানি বেরিয়ে এসেছে একটা পাহাড় । তার মাথার উপর সাদা মন্দির ধবধব করছে, তার পায়ে কোঁস-কোঁস করে আছড়ে পড়ছে নদীর ঢেউগুলো । বড় কাছে কিন্তু নদীর ওপারে ! বিস্মিত হইয়া সেই দৃশ্য দেখিতে লাগিলাম, সম্মুখের দিকে আর অগ্রসর হইতে পারি না । আর দরকারও নাই । কালো কালো পাথর—কি ভীষণ আর ভয়াল ! ফাঁকে-ফাঁকে ঝোপঝাড় আর দুই-একটি গাছ ।

"তুমি কে ভাই ?"

প্রায় আমারই বয়সী একটি ছেলে ; ফুটফুটে দুধে-আলতায় তাহার গায়ের রঙ ; হাসিমাখা মুখখানি । আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি বুঝি এখানে নতুন এসেছ ?"

তাহার কথায় আমার চমক ভাঙে । আমি কোথায় আসিয়া

পড়িয়াছি; বেলা যে শেষ হইতে চলিল; সূর্য্য যে ওই পশ্চিমের কালো রেখার কাছে পৌঁছিয়াছে! ছেলেটিকে যেন কত আপনার জন মনে হইল! আমিও তাহার হাত জড়াইয়া ধরিলাম। আমার দৃষ্টি তখন সিদ্ধেশ্বর শিব হইতে ফিরিয়াছে; মুগ্ধ হইয়া ছেলেটির মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলাম।

সে আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় এসেছ? এখানে কাদের বাড়ীতে?"

আমি উত্তর দিলাম, "কারো বাড়ীতে নয়, আমি পাহাড় দেখতে এসেছি!"

এইবার সে হাসিয়া উঠিল, "পাহাড় দেখতে?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, পাহাড় দেখতে। বড় সুন্দর লাগে, ওই—ওই দিকে আমাদের বাড়ী নদীর ধারে; সেখান থেকে রোজ দেখি হাতী নেমেছে নদীতে! তাই আজ এদিকে চলে এসেছি।"

বালকটি বলিল, "বেশ, আমারও ভাল লাগে। কত দূর তোমার বাড়ী?"

আমি বলিলাম, "কত দূর কি করে বলব? ওই—ওই পূব দিকে বাজার ছাড়িয়ে ইস্কুলের ধারে!"

বালকটি আমার হাত ধরিয়া বলিল, "চল, এই যে আমাদের বাড়ী। রোজ আসবে, আমার সঙ্গে খেলা করবে। একা-একা আমার ভাল লাগে না।"

এই কি বাড়ী? না, পুলিশের থানা? লাল পাগড়ী মাথায় ষণ্ডা ষণ্ডা লোকগুলি চলাফেরা করিতেছে। একটা বাংলো-গোছের ঘরের সম্মুখে আবার বন্দুক কাঁধে সিপাহী ঘুরিতেছে! আমারও ভয় হইল। নূতন সঙ্গীকে বলিলাম, "এটা ত' পুলিশের থানা!"

সে হাসিয়া বলিল, "না, পুলিশের থানা নয়; নদীর ঘাটোয়ালের অপিস; এখান থেকে নদী পাহারা দেওয়া হয়; আমরা অনেক দিন এখানে এসেছি; চল আমাদের বাসায়।"

সে প্রায় টানিতে টানিতে পাঁচিল-ঘেরা এক বাংলোঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া ঢুকিয়া পড়িল; "মা, মা, দেখ, দেখ, কা'কে নিয়ে এসেছি!"

বাহির হইয়া আসিলেন একজন মহিলা। সম্ভবতঃ ছেলেটির মা। তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "কি রে সুধীর, কা'কে নিয়ে এসেছিস?"

সুধীর বলিল, "আমার খেলার সাথী নূতন বন্ধু। জান মা, অত দূর থেকে পাহাড় দেখতে এসেছে; রাস্তায় দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে ওই সিদ্ধেশ্বরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে ছিল!"

মহিলাটি সকল কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন বলিয়া মনে হইল। সুধীর আমাকে লইয়া ব্যস্ত হইল; বুঝিলাম, সত্যই সে বড় একা! বল, ব্যাট, ডাণ্ডাগুলি সকল উপকরণই আছে, কিন্তু খেলার সঙ্গী কেহই নাই; ছোট ছোট আর দুইটি ভাই-বোন। তাহারা তাহার সমকক্ষও নয়। তাহাদের উঠোনে অনেকক্ষণ খেলা করিলাম; সুধীরের মা খই, মুড়কী, দই ও নাড়ু কত কি খাইতে দিলেন। সন্ধ্যা হয় দেখিয়া আমি বলিলাম, "এবার আমি বাড়ী যাব।"

সুধীর বলিল, "কাল একটু শীগ্‌গির এসো কিন্তু।"

সুধীরের মা বলিলেন, "বেশ, বেশ, আসবে।"

ইতিমধ্যে সুধীরের বাবা আসিয়া আমাকে দেখিয়া কয়েকটি কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। বুঝিলাম, তিনি আমার বাবাকে চিনেন; আমিও তাঁহাকে দুই-এক দিন আমাদের পাশের জমিদার-বাড়ীতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হইল। কিন্তু সাহেবী-পোষাকে।

সন্ধ্যার একটু আগে সুধীরের মা বলিলেন, "খোকা, তোমাকে নৌকো ক'রে পৌঁছে দেবে আমাদের লোক। সাত দাঁড়ের ছিপে আধ ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছে যাবে। একা চলে এসেছ! তোমার বাড়ীতে সবাই কত ভাবছে! সাইকেলে করে একটা পেয়াদা চলে গেছে তোমার বাড়ীতে খবর দিতে।"

সুধীরের মায়ের কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল। বাড়ীতে সকলে কত খোঁজাখুঁজি করিতেছে। বিশেষ করিয়া আমার বড় দাদা ত' কাঁদিয়া পাগল হইয়া পড়িবেন। আমি কোথায় আসিয়া পড়িলাম!

আমাকে ছিপে তুলিয়া দিতে সুধীর আর তাঁহার বাবা নিজে আসিলেন; সাত দাঁড়ের ছিপ তীরের মত বেগে উজান বাহিয়া চলিল। বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। লোকে লোকারণ্য হইয়া গিয়াছে! পুকুরে জাল ফেলা হইয়াছে, চারিদিকে লোক ছুটিয়াছে, ঘাটালের পেয়াদা কিছুক্ষণ আগে খবর না দিয়া গেলে আরো তুমুল ব্যাপার কিছু ঘটিত!

সেই দিন হইতে বাড়ীর বাহিরে একাকী যাওয়া প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিল। দিবারাত্রি সেই সিদ্ধেশ্বরের চূড়া আর নূতন বন্ধুর কথা মনে তোলপাড় তুলিল। কিন্তু সেই নূতন বন্ধুকে ষোল বৎসর পরে আরো ঘনিষ্ঠ ভাবে পাইয়াছিলাম; সুধীরও ছোটবেলার সেই কথা তখনও ভুলিয়া যায় নাই।

আমাদের পাশেই বড়লোক জমিদারের বাড়ী। সেইখানে কত সাধু-সন্ন্যাসী আসেন! দিব্যকান্তি গৈরিকধারী এক সুপুরুষ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম! কি সুন্দর তাঁহার চুল! দুই জন শিষ্য তাঁহার মাথায় গন্ধ-তৈল মাখাইতেছেন। গদীর উপরে বাঘের ছালের উপর তিনি বসিয়াছেন। কত লোক আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। দাদার সঙ্গে গিয়া আমিও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। ভাবিলাম, সন্ন্যাসী-জীবন ত' মন্দ নয়! কত আরামে থাকেন এঁরা! ইঁহাদের অনুগ্রহ পাইলে নাকি সংসারের সকল দুঃখ দূর হইয়া যায়। কিন্তু অনুগ্রহ পাওয়া বড় সহজ নয়। সহজে ইঁহারা ভুলেন না। কত দামী দামী জিনিষ লোকে উপহার দেয়,—সোনাদানা, রেশমী-পশমী কাপড়-চোপড়, টাকা, পয়সা, মোহর! কত মিষ্টি, কত ফলমূল দিয়া যায়। সন্ন্যাসী আশ্রমবাসী, সিদ্ধপুরুষ তিনি! দেবতার সঙ্গে কথা বলেন। বড়ঘরের কত মেয়ে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে; কেহ বা মাথার চুল দিয়া পা দু'খানি মুছাইয়া দেয়! সন্ন্যাসী অনড়, অটল, মুখে তাঁহার মৃদু হাসি।

সন্ন্যাসী হইবার সংকল্প মনে জাগিয়া উঠে। কিন্তু সন্ন্যাসী হওয়া ত' সোজা কথা নয়? বাড়ী ঘরদুয়ার ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া সাধন-ভজন করিতে হইবে। বড় কঠিন সে কাজ; তাহার উপর আবার গুরু চাই! গুরু ত' সকলকে অনুগ্রহ করেন না? গুরুর সন্ধানে হিমালয়ে যাইতে হইবে; ওই যে সারি-সারি পাহাড়; ওই পাহাড়গুলি হিমালয়ে গিয়া পৌঁছিয়াছে। হিমালয়ের গুহায় আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া ধ্যানমগ্ন রহিয়াছে কত সাধু-সন্ন্যাসী! তাঁহাদের কৃপালাভ করিলে ত' তারপর এখন সাধু হওয়া যায়! গায়ের রঙ পালটাইয়া যাইবে; দিব্যজ্যোতিঃ দেহ হইতে বাহির হইবে। বুদ্ধদেবের কথা সেই দিন বইতে পড়িয়াছি। সাধু হওয়ার গোড়ার ধাপটা বড় জটিল ও বড় কঠিন, তাহা হইলে কি করা যায়?

তারা পণ্ডিতের পোষ্যপুত্র জগাই। ভারি ষণ্ডামার্ক ছেলে! সে একদিন বলিল, "জানিস ভৃগু, কালাদীঘির পাড়ে পাগলা ফকির থাকে; লাথি চাপড় মেরে ফকির লোকের রোগ ভাল করে। যাবি তাঁর কাছে?"

জগাইকে বলি, "তুই দেখেছিস? কত দূর?"

জগাই বলে, "দূর কিসের, ওই যে গণির গাঁ দেখা যায়, তারই পাশে কালাদীঘি; সোনার কই-মাগুর ভাসে সে দীঘির জলে; আমি একদিন দেখে এসেছি!"

আমি বলিলাম, "ভয় করে ভাই, লোকটা পাগল! শুনেছি মারধোর করে লোককে।"

জগাই বলে, "মারধোর করলে ত' বরাত ফিরে যাবে রে! পাগলা ফকির মাটিকে সোনা করতে পারে।"

জগাইয়ের কথায় লোভ বাড়ে; একদিন রবিবারে জগাই, দত্তদের শম্ভু আর প্রবীর আমাকে লইয়া কালাদীঘির উদ্দেশে যাত্রা করিল; বাড়ীতে ভয় পাইবার মত কিছুই ঘটিল না। কারণ, সেই দিনের ঘটনার পর জগাই আমার সঙ্গী হইয়াছে। প্রায় মাইল খানেক রাস্তা পার হইয়া কালাদীঘি; জল টলটল করিতেছে; সত্যই দীঘির জল কালো—নীল। জলে লোকে খই-মুড়ি ছড়াইয়া দিয়াছে; সোনালী রঙের কই আর মাগুর মাছ মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতেছে। দীঘির পূর্ব্বদিকের এক কোণে প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থগাছ; তাহারই তলায় পাগলা ফকিরের আস্তানা। একচালা একটা ঘরে তক্তাপোষের উপর ফকির সাহেব শুইয়া আছেন; কালো দৈত্যের মত চেহারা, চোখ দুইটি ঘোর লাল। চুল-দাড়ি লম্বা লম্বা, আর বীভৎস! দেখিলে ভয় হয়! এক পাশে চুল্লীতে ধুনী জ্বলিতেছে! কয়েকটি লোক তাঁহার কাছে মাটিতে বসিয়া আছে।

আমরা দূর হইতে দেখিতে লাগিলাম; একটা জোয়ান গোছের লোক ফকিরের পায়ে মাথা রাখিয়া কাঁদিতেছে! "বাবা, বাঁচাও; আমার যে সর্ব্বস্ব যাবে।" হঠাৎ পাগলা লোকটির নাকে-মুখে এক লাথি মারিল; "বাবা রে!" বলিয়া লোকটি উল্টাইয়া পড়িয়া গেল। তাহার নাক-মুখ দিয়া দর-দর করিয়া রক্ত পড়িতেছে।

পাগলা ফকির গালি দেয়, "ব্যাটা, শূয়োর, এখন এসেছিস বাবার কাছে! যা, যা, পালা, এখান থেকে দূর হয়ে যা।"

লোকটা ভয়ে ভয়ে উঠিয়া ছুটিয়া পলাইল; পাগলার সহচরেরা বলিল, "বেটার কাজ হয়ে গেল!"

কৌতূহল থাকিলেও ফকিরের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া আমার ভয় হইতে লাগিল; এক জন ভক্ত কল্কেতে গাঁজা সাজাইয়া পাগলার হাতে দিল; সে কি দম! ফকির ধুঁয়া ছাড়িল; সেই ধুঁয়ার কুণ্ডলীর মধ্যে যেন কালো এক ভয়াল দৈত্য বসিয়া রহিয়াছে; ঘোর লাল বড় বড় চোখে আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিল, "হেই বাচ্ছারা, এদিকে আয়।"

আমরা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। ফকিরের একজন অনুচর বলিল, "বাবা, তোমাদের ডাকছেন; ভয় কি? এদিকে এসো।"

অগত্যা আমাদিগকে ফকিরের নিকটে যাইতে হইল। জগাই আগাইয়া গিয়া ফকিরের পায়ের ধূলা লইল। তাহার দেখাদেখি আমরা তিন জনেও তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। ফকির মাথায় হাত দিয়া বলিলেন, "যাও বেটা, লেখাপড়া করোগে; এখানে কেন? এখানে যত সব কুত্তার বাচ্ছা, বখাটে ছেলে আসে। তোমরা কি করতে আসবে?"

জগাই বলিল, "না বাবা, আমরা আপনাকে শুধু দেখতে এসেছি।"

ফকিরের মুখে অট্টহাসি—"হাঃ—হাঃ—হাঃ, বড়লোক হবে! সাধু হবে! সোনাদানা হাতীঘোড়া পাবে! হাঃ—হাঃ—হাঃ।"

সেই হাসি আর কথার বিকট আওয়াজ এখনও আমি ভুলি নাই; সেই দিন এক চিত্রশিল্পী বন্ধুর বাড়ীতে ধুঁয়ার কুণ্ডলীর মাঝে দৈত্যের ছবি দেখিয়া পাগলা-ফকিরের কথা মনে পড়িয়া গেল; আর সেই রক্তারক্তি ব্যাপার!

আমরা ভয়ে ভয়ে ফকিরকে সেলাম করিয়া বাড়ী ফিরিলাম। দুরারোগ্য ব্যাধি নাকি তিনি ভাল করেন! জেলের দরজা খুলিয়া যায় ফকির সাহেবের ইঙ্গিতে! বুঝিলাম, কেন কাহারা যায় ফকিরের কাছে! লাখপতি কনট্রাকটার মণ্টি দত্ত এই ফকির সাহেবেরই শিষ্য। প্রথম মহাযুদ্ধে চালানী কারবার করিয়া বড়লোক হইয়াছে মণ্টি দত্ত। সে-ই তাহার কাকার বাক্স ভাঙ্গিয়া টাকা চুরি করিয়াছিল; পাগলা ফকির তাঁহাকে বাঁচাইয়া দিয়াছে। কত কি গল্প শুনি লোকের মুখে।

তারা পণ্ডিতের পাঠশালা জমিদার-বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপে বসে। কলাপাতায় শরকাঠির কলমে কেশুর আর ভূষিতে মিশানো কালীতে লিখিতে শিখিয়াছি; মধ্যবঙ্গ-বিদ্যালয়, তিন-চারি জন পণ্ডিত। মাঝে মাঝে কানে আসে তারা পণ্ডিতের গলা; প্রথম শ্রেণীর ছেলেদের ব্যাকরণ পড়াইতেছেন—"ঋ ধাতু ণ্যৎ প্রত্যয় করে আর্য্য।" পড়াশুনা আমার বিশেষ ভাল লাগিত না। পাঠশালায় বসিয়াই উত্তরের দিকে তাকাইয়া থাকি—ওই যে তুলোর মত সাদা সাদা আভ ছুটে চলেছে পাহাড়ের দিকে পাতা খেতে। আচ্ছা, এরা এত দূরে যায় কেন? এখানে একবার পাতা খেতে নামে না কেন? তাহলে বেশ মজা হয়।

একদিন নয়ানচাঁদ ঠাকুর শনিপূজা করিতে চলিয়াছেন। পাশেই থাকেন তিনি, আমরা বলি পিশেমশায়! আমাকে বলিলেন, "যাবি খোকা, পুজো দেখতে?" তাঁহার কথায় রাজী হইয়া গেলাম। তিনি আমার মাকে বলিয়া আমাকে সঙ্গে লইলেন। নদীর পাড়ে নলখাগড়ার বনের মাঝখানে একখানি ছোট কুঁড়ে ঘর তৈরী হইয়াছে। মাটির গড়া শনির প্রকাণ্ড মূর্ত্তি, শকুন তাঁহার বাহন। ষোড়শ উপচারে পূজা হইতেছে। যাদুমণি দাস পূজার আয়োজন করিয়াছেন। ঠিক সন্ধ্যার সময় পূজা আরম্ভ হইল। দশ-বারো জন লোক পূজার নানা কাজে ব্যস্ত রহিয়াছে।

নয়ানচাঁদ ঠাকুর পূজায় বসিলেন, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। জঙ্গলের মধ্যে শনিঠাকুরের পূজা, ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে সকল দিক ছাইয়া ফেলিয়াছে! লোকের বিশ্বাস, নয়ানচাঁদের পূজা সার্থক হইয়া থাকে। ঠাকুরমশাই হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "শিবাবলির জায়গা হয়েছে ত'?" উদ্যোক্তাদের মধ্যে এক জন বলিলেন, "হ্যাঁ, ঠাকুর-মশাই হয়েছে।" ঠাকুর বলিলেন, "চল, তাহলে।" প্রকাণ্ড থালায় নৈবেদ্য সাজাইয়া নয়ানচাঁদ ঠাকুর বাহির হইলেন; নিকটেই কি একটা গাছের তলায় পরিষ্কার জায়গায় শিবাবলির স্থান হইয়াছে। এক জন লণ্ঠন লইয়া অগ্রসর হইল; ঠাকুরমশাই নৈবেদ্যের থালা নামাইয়া রাখিয়া ডাকিলেন, "ভোঃ ভোঃ শিবা আগচ্ছন্তু!" আশ্চর্য্য কাণ্ড! পালে পালে শিয়াল আসিয়া জড় হইল; নিমেষের মধ্যে নৈবেদ্যের থালা পরিষ্কার হইয়া গেল। নয়ান-চাঁদ তিনবার হাততালি দিলেন; শিয়ালগুলি অদৃশ্য হইয়া গেল। সে দেশের আদিবাসীরা নয়ানচাঁদের পরম ভক্ত। তাহাদের অনেকে পাদ্রীদের লোভে খৃষ্টান হইয়াছে; কিন্তু নয়ানচাঁদ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা তাহাদের হিন্দু করিতেছেন! সেই জন্য নয়ানচাঁদ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা সেই দেশে পতিত হইতেছেন। শেষ।

সূর্য্য প্রতীক্ষা

জয়ন্তী সেন

কুজ্ঝটিকার ধূমেল জগতে কৃষ্ণপক্ষ আসে
নামে রাত্রির নিবিড় নীলিমা পৃথিবীর সীমানায়
দিবসের দাবী মিটেছে তবুও অজানার আশ্বাসে
শুধু চেয়ে রব দিগন্ত পানে সূর্য্য প্রতীক্ষায়।

জানি সন্ধ্যার অবসানে আনে সুদূর আলোর তৃষা
তারা স্বৈরিণী বৃথায় আকাশে সযতনে দীপ জ্বালে
স্বপ্ন-জগতে অবচেতনায় হারাল পথের দিশা
তবু মাগে মন আলোর প্রসাদ মোর বঞ্চিত ভালে।

আছে কি অজানা নূতন স্বর্গ দিক্-ভ্রান্তের তরে
চির-রাত্রির মৃত্যু ঘোষিত প্রখর পূর্ব্বাশায়
ললিতের সুর ওঠে কি মূরছি সন্ধ্যারাগের মীড়ে
স্বপ্নিল মন তবু দিগন্তে সূর্য্য প্রতীক্ষায়।

সে প্রতীক্ষা মম নূতন ছন্দ কবির কল্পনাতে
বর্ণচ্ছটা শিল্পী নয়নে, সুর-জাল বীণা তারে
তাহারে করেছি স্বপ্নমধুর স্বপ্নবিহীন রাতে
পথের পাথেয় সারা-জীবনের আলোয় অন্ধকারে।

মৃগতৃষ্ণা মোর পাবে কি পরম পাওয়ার লগ্ন ফিরে
তৃপ্ত হবে কি বিধুত হৃদয় মিলন প্রত্যাশায়
মেঘ গুণ্ঠিকা আবরিয়া রাখে আলোক বর্ত্তিকারে
তৃষিত পরাণে তবু চেয়ে রব সূর্য্য প্রতীক্ষায়।


সুচিত্রা সেন পছন্দ করেন লাক্স
টয়লেট সাবান
এর
শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার
জন্য।
সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্য্যের উৎস
LUX
TOILET SOAP
বিমল রায়ের "দেবদাস"
এর মনোমোহিনী অভিনেত্রী
চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান



নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

ষোলো

সেই ও-বাড়ি থেকে অরুন্ধতীর শেষ বিদায়।

রাগে সমরেশ কমলেশের বিবাহে যোগদান করেননি। রামপ্রসাদ যথারীতি করযোড়ে নিবেদন করেছিলেন, সমরেশই এখন উভয় বাড়ির কর্তা। তিনি না দাঁড়ালে ভালো দেখায়? দেখা যাবে, বলে সমরেশ তাঁকে বিদায় করেছিলেন। কিন্তু যাননি। বিয়ের কাজকর্ম চুকে গেলে সমরেশ প্রতিদিন প্রত্যাশা করতেন, এবারে অরুন্ধতী আসবে বুঝি। তার পরে দিনের পর দিন যায় অথচ অরুন্ধতী আসে না, তখন হয়তো একটুখানি বিচলিত হলেন এবং আরও কিছু দিন গেলে পালকি পাঠালেন।

বাইরে থেকে খবর এল অরুন্ধতীর কাছে: পালকি এসেছে।

অরুন্ধতী হয়তো নয়, সে মনঃস্থির করেই বাড়ি থেকে বার হয়েছিল,—কিন্তু মণিমালা দুর্বল দুরু-দুরু বক্ষে যেন এমনি একটা দিনের প্রতীক্ষা করছিলেন।

ও-বাড়ি থেকে আসার দিনই নিরিবিলি এক সময় অরুন্ধতী বলেছিল: তোমার এই মস্ত খাটের এক পাশে আমার একটু জায়গা হবে না?

হাসতে হাসতেই বলেছিল সে। কিন্তু মণিমালা চমকে উঠেছিলেন। শুষ্ক মুখে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন রে? ওকথা বলছিস কেন?

অরুন্ধতী তেমনি হাসতে হাসতেই বলেছিল, কেন আবার কি? ছেলের বিয়ে দিচ্ছি বলে কি আহার-নিদ্রাও ত্যাগ করেছি? শুতে হবে না?

—তা শুস।

—অনেক দিনের জন্যে কিন্তু।

—কত দিনের জন্যে?

—যত দিন বাঁচব তত দিনের জন্যে।

ভয়ে দুশ্চিন্তায় মণিমালা বিছানায় সোজা হয়ে উঠে বসেছিলেন। অরুন্ধতীর একখানা হাত ধরে পাশে বসিয়ে বলেছিলেন, সমস্ত কথা আমাকে বল্ বড়দি! কি হয়েছে? কি ক'রে এসেছিস?

অরুন্ধতী একে একে সমস্ত কথা বলেছিল।

শুনতে শুনতে মণিমালার সর্ব দেহ ভয়ে ঠক ঠক করে কেঁপে উঠেছিল। বলেছিলেন, কী সর্বনাশ! তোকে আর আমি ও-বাড়ি পাঠাব না বড়দি! মা তোকেই এ-বাড়ির সমস্ত কর্তৃত্ব দিয়ে গেছেন। তুই এ-বাড়িরই কর্ত্রী হয়ে থাকবি।

অরুন্ধতী বলেছিল, তুমি যতটা ভয় পাচ্ছ, আমি ততটা পাই না ছোটদি! উনি আমাকে সত্যি সত্যি খুন করতে পারেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।

—আমি করি। এখানকার সমস্ত লোক, যে শুনবে, সেই করবে। ও-বাড়ি তোর যাওয়া হবে না।

অরুন্ধতী সাড়া দেয়নি।

মণিমালা আবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তুই যে ও-বাড়ি চিরদিনের জন্যে ছেড়ে এলি, বটঠাকুর জানেন?

—আমার সঙ্গে আর দেখা হয়নি তো?

—যদি তিনি নিজে পালকি পাঠান?

—যাব না।

যত সহজে অরুন্ধতী যাব না বলেছিল, না-যাওয়া ঠিক তত সহজ কি না এ বিষয়ে মণিমালার সংশয় ছিল। স্বভাবতই তিনি ভীরু প্রকৃতির। তাঁর কাছে প্রবলের আদেশ অমান্য করার চেয়ে মৃত্যু সহজ।

সুতরাং অনেক দিন পরে সত্যসত্যই যখন একদিন পালকি এল, তিনি সভয়ে দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে অরুন্ধতীর দিকে চাইলেন। সে মুখে কিন্তু ভয় বা দ্বিধার চিহ্নমাত্রও দেখতে পেলেন না।

অরুন্ধতী সোজা পাল্‌কি ফিরিয়ে দিলে।

বলে পাঠালে: আমাকে এখনও কিছুদিন এখানেই থাকতে হবে। কত দিন বলতে পারি না। তবে পাল্‌কি পাঠাবার আর দরকার নেই। এ বাড়িতেও পাল্‌কি আছে। যেদিন যাব, পাল্‌কির অসুবিধা হবে না।

সেই যে পালকি ফিরে গিয়েছিল, বলা বাহুল্য, আর তা কোনো দিন আসেনি।

অরুন্ধতী রয়ে গেল। পরম সম্মানের সঙ্গেই।

হরসুন্দরী লাখে একটা জন্মায়! তাঁর সঙ্গে সাধারণ মেয়ের তুলনা চলে না। অরুন্ধতীরও না। অরুন্ধতী জমিদারী চালাবার ক্ষমতা রাখে না। সে বয়সও তার নয়, সে অভিজ্ঞতাও নেই। কিন্তু এই মস্ত বড় সংসার সে নিপুণ ভাবেই চালায়।

কমলেশ্ বেঁচে গেল অরুন্ধতীকে পেয়ে।

মণিমালা সকল সময়ই অসুস্থ। বিছানাতেই তার দিন-রাত্রি কাটে। কমলেশ নিজে কলকাতায় চাকরী করে। সপ্তাহান্তে শনিবার রাত্রে বাড়ি আসে, রবিবার রাত্রে চলে যায়। বধূ সুমিতা নিতান্তই ছেলেমানুষ। এ অবস্থায় অরুন্ধতীকে না পাওয়া গেলে তাকে মহা বিপদেই পড়তে হত।

বড় মাকে সে মাথায় করে রাখলে।

কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই বোঝা গেল, ব্যাপারটা কমলেশের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।

সমরেশের ক্রোধ এমনিতেই প্রবল ছিল। এখন তা প্রবলতর হল। প্রতি পদে সমরেশ ওদের অনিষ্টের চেষ্টা করতে লাগলেন। রামপ্রসাদ অবশ্য পাকা লোক। কিন্তু সমরেশের মতো আরও একজন পাকা লোক ঈর্ষায় উন্মত্ত হয়ে যদি প্রতি পদে ক্ষতি করার চেষ্টা করেন, তাঁর সাধ্য নেই সমস্ত ক্ষেত্রে সেই ধাক্কা সামলান।

কমলেশকে সেই কথা তিনি বললেন। কমলেশ চিন্তিত হল। দেনায় আকণ্ঠ সে নিমজ্জিত। যাকে বলে পড়ন্তি অবস্থা। এই সময় সমরেশ যদি তার বিরুদ্ধে লাগেন, তাহলে রীতিমত চিন্তার কথা সন্দেহ নেই।

কমলেশ বললে, কি করা যাবে বলুন ?

রামপ্রসাদ বললেন, রাগের কারণ বড়-মা। তিনি যে এ-বাড়িতে রয়ে গেলেন, এটা বড় বাবু সহ্য করতে পারছেন না।.

সে তো কমলেশও বোঝে। কিন্তু তার জন্তেই বা করা যায় কি ?

রামপ্রসাদ বললেন, বড়-মা ও-বাড়ি ফিরে গেলে, আমার মনে হয়, বড় বাবুর রাগ পড়তে পারে।

কমলেশ এমনি একটা প্রস্তাবই প্রত্যাশা করছিল। এ-কথা সে যে ভাবেনি তা-ও নয়। বস্তুত, এ বিষয়ে তার সংকল্প সে স্থির করেই রেখেছিল।

বললে, দেখুন, আপনাকে বলি জ্যাঠামশাই, যদি এ-বাড়ির ইট একখানা একখানা করে খুলে নেন, বড়মাকে নিয়ে আমি গাছতলায় দাঁড়াব, সে-ও স্বীকার,—কিন্তু ও-বাড়ি কিছুতেই পাঠাব না।

কিন্তু রামপ্রসাদের মন যত অরুন্ধতীর দিকে তার চেয়ে ঢের বেশি জমিদারীর দিকে। জমিদারীর কাজে ছেলেবেলায় তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তার পর থেকে এই সুদীর্ঘ কাল এই জমিদারীরই সেবা করে আসছেন। এই জমিদারী তাঁর প্রাণ।

কমলেশের কাছে সুবিধা না হওয়ায় তিনি প্রথমে মণিমালার কাছে এবং তার পর অরুন্ধতীর কাছে সমরেশের কাহিনী একটু হয়তো অতিরঞ্জিত করেই পৌঁছে দিলেন। মণিমালা উপেক্ষা ভরে একটু হাসলেন মাত্র। কিন্তু অরুন্ধতী ও-বাড়ি ফিরে যাওয়ার জন্তে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

তখন মণিমালা তাকে কাছে ডাকলেন।

হেসে বললেন, তুই তো খুব বুদ্ধিমতী, স্বয়ং কর্ত্রী সে কথা বলে গেছেন। আমি তো তার কিছুই দেখছিনে।

অরুন্ধতী হেসে বললে, বুদ্ধি থাকলে তো দেখবে। নেই, আর দেখবে কি ?

—তাই বটে। তুই ও-বাড়ি ফিরে যেতে চাচ্ছিস কেন ?

অরুন্ধতী উত্তর দিলে না।

—বটঠাকুর আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছেন, সেই ভয় ?

—সেটা কি কম ভয় ?

—কম কি বেশি, সে কথা জিগ্যেস করছিনে। কিন্তু তুই ও-বাড়ি গেলেই কি ভয় কেটে যাবে ?

অরুন্ধতীর চোখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। বললে, কিছুটা নিশ্চয় যাবে। ওঁর ধারণা, সবাই ওঁকে ভয় করে। অনেকে করে কিন্তু সবাই যে করে না, ও-বাড়ি ফিরে গিয়ে সেইটে আমি বুঝিয়ে দিতে চাই।

মণিমালা খিল-খিল করে হেসে উঠলেন : কী ছেলেমানুষ রে তুই ! ও-বাড়ি ফিরে না গিয়ে কি সেটা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না ?

—কি করে ?

—সেইটেই দেখাচ্ছি, সবুর কর না। বেয়াই মশাইকে আসতে লিখেছি। তিনি এলেই কি করি দেখতে পাবি।

বেয়াই মশাই এলেন সামনের ছুটিতেই। উভয় বেয়ানকে করযোড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হুকুম ?

মণিমালা বললেন, আমরা সবাই খুব ভয় পেয়ে গেছি। সেই ভয় থেকে আমাদের ত্রাণ করতে হবে।

—সর্বনাশ ! আমি কেরাণীগিরি করি। পুঁটি মাছের প্রাণ। আপনারা মহারাণী। আপনাদের ত্রাণ করার ক্ষমতা রাখি, এমন বীর আমাকে ঠাওরালেন কেন ?

—ঠাওরাব কেন ? আপনি স্বয়ং মহাবীর, এ কে না জানে ?

বেয়াই গালে হাত দিলেন : তাই নাকি ! আমার মুখও পোড়া, লেজও পোড়া। কিন্তু সেটা এতখানি জানাজানি হয়েছে ?

—অন্তত এ অঞ্চলে তো হয়েছে বেয়াই মশাই ! গুণ কখনও ঢাকা থাকে ?

—তাই বটে। এখন বলুন, কোন বিপদের সমুদ্র আমাকে ডিঙুতে হবে ?

—বলি।

রসিকতা নয়, গম্ভীর ভাবে মণিমালা সমরেশের কাহিনী এবং তাঁর জন্তে এই পরিবারের বিপদের কাহিনী সবিস্তারে বিবৃত করলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করলেন, এখন বলুন, কি করে আপনার মেয়ে-জামাই নিরাপদ হবেন।

বৈবাহিক মহাশয় চিন্তিত ভাবে রামপ্রসাদের দিকে চাইলেন।

রামপ্রসাদ মাথা চুলকে বললেন, চেষ্টা তো করছি।

বাধা দিয়ে মণিমালা বললেন, কিন্তু খুব সুবিধে হচ্ছে না। সুবিধা হবেও না। কারণ, ধনবল এবং জনবল দুই-ই আমাদের কমে

গেছে। ওই দুটো যথেষ্ট পরিমাণে না থাকলে জমিদারী চালানো সুবিধে হয়ও না। না কাকাবাবু ?

রামপ্রসাদকে সায় দিতে হল।

কিন্তু অরুন্ধতী অবাক হয়ে মণিমালার দিকে চেয়ে রয়েছে। অবাক হবারই কথা। মণিমালা কোনো দিনই, জমিদারী দূরের কথা, সাংসারিক ব্যাপারেও কথা বলেন না। কেউ বলতেন, মণিমালা চাকুরীয়ার মেয়ে, জমিদারীর বোঝেন কি যে, কথা বলবেন ? কেউ বলতেন, মণিমালা আয়েসী মেজাজের মেয়ে, ঝামেলায় থাকতে ভালোবাসেন না। যাই কেন না হোক, অরুন্ধতী দেখেছে, মণিমালা কথাই কম বলেন।

সেই মণিমালার হয়েছে কি !

অনর্গল কথা তো বলেই চলেছেন, সে কথাও নির্বোধ কিংবা অজ্ঞের মতো নয়। যেন জমিদারী সম্বন্ধে কত অভিজ্ঞ ব্যক্তি ! রামপ্রসাদের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তিকেও মাথা চুলকোতে হচ্ছে।

অরুন্ধতী অবাক !

তার মনে পড়ল আর একদিনের কথা, যেদিন মণিমালা তাকে সুদীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন, কমলেশকে বাঁচাবার জন্যে। হয়তো সেই একই তাগিদে স্বল্পবাক মণিমালা আজও বাচাল হয়েছেন।

বেয়াই মশাই মণিমালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি করতে চান ?

মণিমালা হেসে উঠলেন। বললেন, এই দেখুন ! আমি মুখ্যু মেয়েমানুষ। আমি কি করতে পারি ? বলবেনও আপনারা, করবেনও আপনারা।

ওঁরা দু'জনেই বলারও কিছু পেলেন না, করারও কিছু পেলেন না, চুপ করে রইলেন।

অরুন্ধতী জানে, ওঁর মাথায় একটা কিছু মতলব আছে। তাকে অন্ততঃ মণিমালা একদিন এই রকম একটা আভাস দিয়েছিল। বেয়াই মশাইকেও সেই জন্যেই আজ তিনি আনিয়েছেন।

বললে, কিন্তু তুমি তো একটা কিছু ভেবেছ ছোটদি ! সেটাও এঁদের বল না।

বেয়াই মশাই এবং রামপ্রসাদ উভয়েই উৎসাহের সঙ্গে সায় দিলেন : হ্যাঁ, সেটাও বলুন না।

রামপ্রসাদের দিকে চেয়ে মণিমালা তখন বললেন, বলতে পারি যদি আপনি অভয় দেন।

—বেশ তো। বলুন।

মণিমালা বললেন, আমি ভাবছিলাম, বটঠাকুরের রাগ আমাদের ওপর যতই হোক, সেই সঙ্গে তাঁর লোভও রয়েছে আমাদের জমিদারীটার ওপর। নয় কি ?

রামপ্রসাদ সায় দিলেন : ঠিক।

—জমিদারীটা না থাকলে তাঁর লোভেরও মুখ বন্ধ হবে, রাগও মেটাবার পথ বন্ধ হবে।

কাতর কণ্ঠে রামপ্রসাদ বললেন, আপনি কি জমিদারী বেচে দেবার কথা বলছেন বৌমা ?

—এই দেখুন ! এখনও বলিনি, শুধু বলব বলে ভাবছি। তাতেই আপনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন !

—কিন্তু জমিদারী বেচে দিলে এ গ্রামে আর আমাদের থাকবে কি বৌমা, সেটা ভেবেছেন ?

—ভেবেছি। আমরা নিজেরাই থাকব। বরং শান্তিতে থাকব। খালি মিথ্যে মর্যাদাটাই নষ্ট হবে মাত্র। জমিদারীর বাইরে যদি আমাদের কোনো সত্যিকার মর্যাদা থেকে থাকে, তা ঠিক ঠিকই থাকবে।

রামপ্রসাদ বিরস-বদনে চুপ করে রইলেন।

মণিমালা বলতে লাগলেন : তা ছাড়া উপায়ই বা কি বলুন ? এক দিকে বটঠাকুর, অন্য দিকে ঋণ ! তার সুদ বেড়েই চলেছে। তার চেয়ে জমিদারী সুবিধা মতন দরে বেচতে পারলে ঋণ শোধ করেও কিছু টাকা আমাদের হাতে থাকবে। একসঙ্গে টাকা দিলে মহাজনেও অনেক টাকা ছেড়ে দেবে। মিথ্যে মর্যাদার মোহে যত অশান্তির মূল এই জমিদারী রেখেই বা লাভ হচ্ছে কি ?

অনেকক্ষণ পরে রামপ্রসাদ বললেন, তার পরে এ গ্রামে কি বাস করতে পারবেন ?

—কেন পারব না ? আমাদের তো বাড়ি থেকে কেউ তাড়াতে পারবে না ?

—তাড়াবার কথা নয়। কিন্তু বাইরে মাথা উঁচু করে বেরুতে পারবেন ?

মণিমালা অবলীল ক্রমে জবাব দিলেন, কেন পারব না ? আমরা কারও চুরিও করিনি, কোনো অন্যায় কাজও করিনি। তা'ছাড়া বেরুবার আছেই বা কে ? আমরা তিনটি মেয়েমানুষ,—বাইরে কোথাও বেরুই না। ছেলেটা বাইরে চাকরী করে, যখন আসে ক' ঘণ্টাই বা থাকে ! আমার কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবেন না। একটু ভেবে দেখুন।

জমিদারী পরিচালনায় রামপ্রসাদ বুনো লোক। কিন্তু মণিমালার প্রস্তাবে তিনিও না করতে পারেননি। জমিদারীটাই সমরেশের লোভ, ক্রোধ এবং বিদ্বেষ চরিতার্থ করার ক্ষেত্র। সেটা না থাকলে সমরেশ আঘাত হানবেন কোথায় ? তার পরে হরসুন্দরী নেই। কমলেশের একমাত্র ভরসা রামপ্রসাদ। কিন্তু তাঁরও বয়স হয়েছে। হঠাৎ একদিন তিনিও যদি চোখ বোজেন, সমরেশের আক্রমণ থেকে কে তাকে বাঁচাবে ? এ ছাড়াও বিবেচ্য বিষয় আছে। দেনা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। সেই বিপুল দেনা শোধ করা সহজ নয়। হয়তো দেনার দায়েই সমস্ত সম্পত্তি একদিন ন'কড়া-ছ'কড়ায় বিক্রি হয়ে যাবে। এমন অবস্থায় ধীরে-সুস্থে ভালো দামে যদি একখানা একখানা করে জমিদারী বিক্রি করা যায়, তাহলে ঋণমুক্ত হয়ে কমলেশ বেঁচে যাবে।

তাই হতে লাগল। অত্যন্ত গোপনে অনেক দূরের একজন ক্রেতার কাছে রামপ্রসাদ দু'খানা তৌজি বিক্রি করলেন। ভদ্রলোক ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ করেছেন। এখন জমিদার হবার বাসনা। দাম বেশ ভালোই পাওয়া গেল। তাতে করে সেই জমিদারী যে টাকায় বাঁধা ছিল তা তো শোধ হলই, আরও কিছু ঋণ শোধ হল।

খবরটা অনেক বিলম্বে যখন সমরেশের কাছে পৌঁছল, রাগে

তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল। ওই দু'টি তৌজির দিকেই তিনি সকলের অলক্ষ্যে কেবল হাত বাড়াচ্ছিলেন। একটু সময় পেলে কাজ হাসিল হয়ে যেত বলেই তাঁর বিশ্বাস। সুচতুর রামপ্রসাদ বাদ সাধলেন।

খবরটা যথাসময়ে মণিমালার কাছেও পৌঁছুল। অন্ত একটা উপলক্ষে তিনি সেই দিনই হরির লুঠ দিলেন।

অরুন্ধতী কিন্তু হাসলও না, কাঁদলও না। তার চিন্তা মণিমালার জন্তে। মণিমালার স্বাস্থ্য অত্যন্ত দ্রুত বেগে অবনতির পথে ছুটেছে। আগে একটুখানি ঘোরাঘুরি করতে পারতেন। এখন একেবারেই শয্যাগত। চিকিৎসার ত্রুটি হচ্ছে না। কিন্তু তেল ফুরিয়ে গেলে প্রদীপ কতক্ষণ জ্বলতে পারে?

কমলেশ প্রতি শনিবার বাড়ি আসে। প্রতি শনিবার মাকে আগের শনিবারের চেয়ে খারাপ দেখে। শুকমুখে কাছে এসে দাঁড়ায়। অরুন্ধতী তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে নিজেই কেঁদে ফেলে।

এমনি করে ছয়টা মাস কোনো মতে কাটিয়ে মণিমালা একদিন চোখ বন্ধ করলেন। ত্রিশ বছর আগে এই ঘরখানিতেই একদিন তিনি বধূবেশে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই গৃহকোণেই নিঃশব্দে, সুখে-দুঃখে তাঁর ত্রিশটা বছর কেটেছে। ত্রিশ বছর পরে আর একদিন সেইখান থেকেই তিনি নিঃশব্দে চলে গেলেন।

মণিমালা হরসুন্দরী নয়। হরসুন্দরী ছিলেন স্বপ্রকাশ। এ বাড়িতে চোখ বন্ধ করে থাকলেও তাঁর অস্তিত্ব বোঝা যেত। মণিমালা নিতান্তই মাটির প্রদীপ। ঘরের এক কোণে সকলের চোখের আড়ালে তাঁর বাস। কেউ তাঁর অস্তিত্ব টের পেত, কেউ পেত না। তবু সেই আড়ালে তিনি যে নিজের আগুনেই জ্বলতেন, তা বোঝা গেল মাত্র একবার,—জমিদারী বিক্রির প্রস্তাবের সময়।

তাঁর মৃত্যুতে চারিদিকে সাড়া পড়ে গেল না। কোনো সমারোহও হল না। লোকে বুঝলে, যিনি গেলেন তিনি দুর্দান্ত জমিদার শৈলেশ গোবিন্দের গৃহিণী নন, চাকুরীয়া কমলেশের জননী।

দাহান্তে কমলেশ এসে অরুন্ধতীর কাছে বসল। শান্ত বিষণ্ণ ভাব। বরং হরসুন্দরীর মৃত্যুতে সে যেন এর চেয়ে বেশি কাতর হয়েছিল। হয়তো উপর্যুপরি কয়টি শোকের আঘাতে মৃত্যু তার কাছে তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলেছে।

অরুন্ধতীর মুখের দিকে চেয়ে নিজেই বললে, মা বেশ গেছেন। না বড়মা?

—হ্যাঁ বাবা। তিনি বেশ গেছেন। তাঁর জন্তে শোক কোর না।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কমলেশ বললে, শিশুকাল থেকে মাকে আমি অল্পই পেয়েছি। ঠাকমার কাছেই আমি মানুষ। সকলের থেকে দূরে, একা, মায়ের দিন কেটেছে, এই ঘরে। তাঁর বন্ধু ছিল না, সঙ্গী ছিল না। যখনই এ-ঘরে এসেছি, দেখেছি পড়ছেন। তাঁর কাছে কারও কোনো দরকার ছিল না। কারও কাছে তাঁরও কোনো দরকার ছিল না। তিনি ছিলেন সংসারে থেকেও সন্ন্যাসিনী। জীবিত কালে মায়ের কথা আমার মনে কখনই উঠত না। কিন্তু কি আশ্চর্য দেখ বড়মা, কাল থেকে আজ পর্যন্ত সমস্ত সময় শুধু তাঁরই কথা মনে হচ্ছে। আর কারও নয়, ঠাকমার কথাও নয়।

অরুন্ধতী নিঃশব্দে শুনে যাচ্ছিল।

কমলেশ বললে, আমি কোথায় আছি, কি করছি, কি খাচ্ছি, কোনো দিন তিনি জিগ্যেস করেছেন বলে মনে পড়ে না।

—তার তো দরকার ছিল না বাবা! তোমার ঠাকমা তোমাকে পাখায় ঢেকে রেখেছিলেন।

—তাই বটে। আমি ভাবতাম, মা আমাকে মোটেই ভালোবাসেন না। শুধু রোগের সময় যখন আমার বিছানায় এসে বসতেন, তাঁর পদ্মফুলের মতো নরম হাতখানি আমার তপ্ত গায়ে বুলোতেন, সমস্ত যন্ত্রণা যেন দূর হয়ে যেত।

—আমি জানি বাবা, তোমার জন্তে তাঁর চিন্তার শেষ ছিল না। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি তোমার কথাই শুধু ভেবে গেছেন।

—কিন্তু সব কাজে তিনি পিছনে থাকতেন কেন বড়-মা?

—সব কাজে সামনে মা থাকতেন যে কমল! ছোটদি তাঁকে ডিঙিয়ে কিছু করতে চাইতেন না। সাহসেরও অভাব ছিল, ইচ্ছারও অভাব ছিল।

—মা খুব দুর্বল ছিলেন, না বড়-মা?

—দুর্বল ঠিক নয়। তবে মাকে সবাই ভয় করত, ছোটদি'ও করত। এ-বাড়িতে তাই তো দস্তুর। তাছাড়া ঝামেলা তার ভালোও লাগত না।

—কিন্তু ঠাকমার মৃত্যুর পর? তখনও তো তোমাকে সামনে রেখে তিনি পিছনে রইলেন।

—তখন তো আর তার সময় ছিল না কমল! তিনি বুঝেছিলেন সে কথা। তাই আর সামনে আসতে চাননি।

বলেই হঠাৎ অরুন্ধতী উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল: একটা কথা তোকে বলি, মায়ের ওপর ছোটদির রাগও ছিল। কি রকম রাগ জানিস? বৈশাখের সূর্যের ওপর আমাদের রাগ হয়, অথচ

কোনো প্রতিকার করতে পারি না। তেমনি রাগ। কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর বুদ্ধির ওপর ছোটদির শ্রদ্ধাও ছিল প্রচুর। মা যে বলে গেলেন, তাঁর পরে আমি এ-বাড়ির কর্ত্রী, বাস। আর কোনো কথা নয়। তৎক্ষণাৎ তিনি নিজে সেই হুকুম মেনে নিয়ে অন্ত সবাইকেও মানতে বাধ্য করলেন।

—তোমাকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন, না বড়-মা?

মণিমালার মৃত্যুর পর থেকে অরুন্ধতী এখন পর্যন্ত শান্ত, শুব্ধ হয়েই ছিল। এই প্রথম একটা প্রচণ্ড আবেগে তার সমস্ত দেহ থর-থর করে কেঁপে উঠল। সে উত্তর দিতে পারলে না। তাড়াতাড়ি যেন সেই আবেগটা সামলাবার জন্তেই অন্ত দিকে মুখ ফেরালে।

কমল সেটা লক্ষ্য করলে। তার ভয় হল, অরুন্ধতীর না ফিট হয়। তাড়াতাড়ি, অরুন্ধতীর মন অন্ত দিকে ফেরাবার জন্তে বললে, তোমার কি মনে হয় বড়-মা, সাংসারিক ব্যাপারে মায়ের যোগ্যতার অভাব ছিল?

অরুন্ধতী হাসলে। অত্যন্ত বিষণ্ণ, ম্লান হাসি।

বললে, জমিদারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর বুদ্ধির কোনো পরিচয় পেলে না?

—পেলাম। কমল তাড়াতাড়ি বললে,—সেই জন্তেই জিগ্যেস করলাম। ম্যানেজার বাবু অমন যে পাকা লোক, তিনি পর্যন্ত জবাব দিতে পারলেন না। এইটেই তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রথম এবং শেষ পরিচয়।

কমল, কি ভেবে জানি না, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

অরুন্ধতী বললে, জানিস কমল, তোদের এই জমিদারীর ওপরও ছোটদির প্রচণ্ড রাগ ছিল।

—কেন?

—আমাকে অনেক বার বলেছে, জমিদারীর মিথ্যে মর্যাদা এদের আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, এমন কি বুদ্ধি পর্যন্ত অস্বাভাবিক করে তুলেছে। এদের সংস্পর্শে, এদের মধ্যে যারা আসে তারা পর্যন্ত স্বাভাবিক হতে পারে না।

—তার মানে?

—মানে, তার নিজের কথাই বলতে চেয়েছিল আর কি।

কমল জিজ্ঞাসা করলে, নিজের কি কথা?

কথাটা চাপা দিয়ে অরুন্ধতী বললে, সে তুমি বুঝবে না বাবা! এইটুকু শুধু জেনে রাখ, এই জমিদারবাড়ির বউ হয়ে এসে তার অনেক গেছে। অনেক দুঃখ তাকে পেতে হয়েছে।

—বাবার হাত থেকে?

—শুধু তাঁর হাত থেকেই নয় কমল, এখানকার হাওয়ার কাছ থেকেও। কত বড় হৃদয়, কত বড় প্রাণ, কত বড় বুদ্ধি নিয়ে তিনি এসেছিলেন, সে শুধু আমিই জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। তোমরাও তাঁকে পেলে না, তিনি নিজেও নিজেকে পেলেন না।

—নিজেও নিজেকে পেলেন না বলছ কেন?

অরুন্ধতী বললে, অনেক দুঃখেই বলছি বাবা! তিনি যা হতে পারতেন, তোমাদের মধ্যে পড়ে তা হতে পারলেন না। কুঁড়ি আর ফুটলই না। সেই অবস্থাতেই একদিন ঝরে গেলেন।

একটুক্ষণ চিন্তা করে কমলেশ বললে, শুনেছি দুঃখই নাকি বড় হওয়ার রাস্তা। বলছ সেই দুঃখ তিনি প্রচুর পেয়েছিলেন। তাহলে বড় হলেন না কেন?

কথাটা অরুন্ধতীও শুনেছে। মণিমালা মৃত্যুর কিছু দিন আগে গুরুদেবকে দেখতে চেয়েছিলেন। এঁরা বহুকাল থেকে এই পরিবারের গুরুবংশ। দীর্ঘকালের সম্পর্ক। খবর পেয়ে গুরুদেব এসেছিলেন। এ-বাড়িতে অরুন্ধতীকে দেখে এবং মণিমালার কাছে তার সমস্ত কথা শুনে একদিন নিরিবিলি তিনি অরুন্ধতীকে ডেকেছিলেন।

বলেছিলেন, দুঃখকে ভয় পেও না মা! দুঃখকে যারা ভয় পায় তারা শ্রেয়ঃকে চায় না। আমি তোমাকে বলি মা, দুঃখের পথেই তোমার শ্রেয়ঃ আসবে।

কমলেশের কথায় তার মনে প্রশ্ন জাগল: মণিমালা কি তাঁর শ্রেয়ঃকে পেয়েছেন? সকলের দৃষ্টির আড়ালে তিনি কি ফুটতে পেরেছিলেন? অরুন্ধতীর তো মনে হয় না।

বললে, কি জানি বাবা! যাঁরা বড় হয়েছেন তাঁরা সেই কথা বলেন বটে। কিন্তু ছোটদির বেলায় তা তো মনে হয় না?

কমলেশ বললে, আমারও মনে হয় না। বোধ হয় সব দুঃখ এক নয়। সব দুঃখের পথেই বড় হওয়া যায় না। অনেক দুঃখ আছে, যার তাপে কুঁড়ি শুকিয়ে যায়,—ফুটতে পারে না।

—তাই হবে হয়তো!

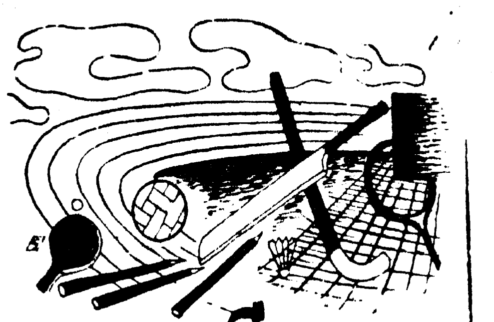
সেদিন এর বেশি আর ওদের কথা হয়নি। নতুন বৌমা সুমিতা জোর করে হবিষ্যান্ন রাঁধতে গেছে। অরুন্ধতীর ইচ্ছা ছিল না, ছেলেমানুষের হাতে এই ভার দিতে। কিন্তু এমন কাকুতির সঙ্গে সে বললে যে, অরুন্ধতী আর বাধা দিতে পারলে না। কিন্তু তার মন পড়ে রয়েছে সেইখানে।

বললে, আমি এইবার রান্নাঘরে যাব কমল! বৌমা রাঁধছেন হবিষ্যি। কিছুতে আমাকে যেতে দিলেন না। দেখি, আবার হাত-পা পোড়ালেন কি না! বলে রান্নাঘরে চলে গেল। [ক্রমশঃ।

রান্নাঘর ও সাজঘর—কোনটা আগে?

বিশ্ববিখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী মার্লিন ডিয়েট্রিচ একবার জনৈক সংবাদপত্র প্রতিনিধিকে এক শতটি প্রশ্ন করবার সুযোগ দিয়েছিলেন—যাতে তিনি খবরের কাগজে সেই বিবরণ ছাপিয়ে নাম জাহির করতে পারেন। সংবাদপত্রের প্রতিনিধিটি প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, "স্ত্রীলোকের পক্ষে কোনটার প্রয়োজন বেশী? রান্নাঘরের না সাজঘরের?"

মিস ডিয়েটিচ উত্তর দিলেন: "সমগ্র পৃথিবীতে রান্নাঘরের মূল্যই সর্বাপেক্ষা অধিক।"



খেলাধুলা

ক্রিকেট

গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপের মাঝে রণজি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা হয়ে গেছে। এবারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে বোম্বাই আর বাংলা। বোম্বাই দল এবারে বিজয়ী হয়েছে। বোম্বাইয়ের মত আর অন্য কোন প্রদেশ এত বার রণজি ট্রফি লাভ করতে পারেনি। এইবার নিয়ে বোম্বাই আট-বার এই প্রতিযোগিতায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করল।

মানকড়, রামচাঁদ, গুপ্তে ও মঞ্জেরকার ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে খেলতে চলে যাওয়ায় বোম্বাই দলের শক্তি যেমন কমে গেল তেমনই বাংলা দলের কাদকার চলে গেছেন ল্যাঙ্কাশায়ারে। পঙ্কজ রায় অসুস্থ আর পি, বি, দত্ত দৈনন্দিন জীবনের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য কর্ম ছেড়ে আসতে পারেন নি। তাই বাংলা দলও শক্তিহীন হয়ে পড়লো।

এবারের ফাইন্যাল খেলা তেমন জমেনি। আশানুরূপ দর্শক-সমাগম হয়নি, কারণ গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের জন্য অনেকেই আসে নি। বোম্বাইয়ের অধিনায়ক উম্রিগড়ের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রশংসনীয়। এবারকার ফাইন্যালে একমাত্র উম্রিগড় শতাধিক রাণ করেছেন। আর প্রশংসা পাবার দাবী রাখেন কামাথ। তাঁর সুন্দর মারগুলি দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছে। আটটি উইকেট পেয়েছেন হারদিকার ৩১ রাণের বিনিময়ে।

বাংলার খেলোয়াড়দের চ্যাটার্জির বোলিং ও অধিনায়ক পি সেন ও শিবাজী বসুর ব্যাটিং প্রশংসনীয়। শেষ পর্যন্ত বোম্বাই দল ৮ উইকেটে বিজয়ী হয়।

বাংলা ১ম ইনিংস—২৫৫ (পি সেন ৫৫, বি, চন্দ ৫৫ শিবাজী বসু ৪০, পি চ্যাটার্জি ২৪, এস ঘোষাল ২২, হারদিকার ৩১ রাণে ৮ উইকেট)

বোম্বাই ১ম ইনিংস—৩০৮ (উম্রিগড় ১১২, মন্ত্রী ৬৮, কামাথ ৬১, কেনী ২৪, পি চ্যাটার্জি ১০১ রাণে ৭ উইকেট)

বাংলা ২য় ইনিংস—১৭১ (শিবাজী বসু ৬৮, খান্না ২১, এস সোম ২০ উম্রিগড় ৩১ রাণে ৪ উইকেট গুপ্তে ৮০ রাণে ৫ উইকেট)

বোম্বাই—২য় ইনিংস—(২ উইকেট) ১২১ (কেরেল ৪১ নট আউট, উম্রিগড় ২১ মন্ত্রী ২৫ নট আউট)

[বোম্বাই ৮ উইকেটে বিজয়ী]

হকি

কলকাতা মাঠের হকির মরশুম শেষ হয়ে এলো। শেষ হয়ে এলো বলছি এই কারণে যে, চ্যাম্পিয়ান ও রাণার্স আপ ঠিক হলেও এখনও কয়েকটি খেলা বাকি। তবে এবারের হকি মরশুম তেমন জমে ওঠেনি। অন্যান্য বারের তুলনায় এবারে হকি খেলার উন্মাদনা যেন অনেক কম।

কলকাতার হকির এই দৈন্য-দশা হয়েছে ১৯৫৪ সাল থেকে। কারণ, বহিরাগত খেলোয়াড়দের উপর বিধিনিষেধ জারি হয়েছে বি, এইচ-এর পক্ষ থেকে। তবু এরই ফাঁক গলে কয়েকটি বহিরাগত খেলোয়াড়কে খেলতে দেখা গেলেও তাদের সেইরূপ কোন উন্নত ধরণের খেলা দেখা যায়নি।

লীগের দ্বিতীয় চ্যারিটি খেলায় মোহনবাগানের কাছে ভবানীপুরের পরাজয়ের পর একমাত্র মোহনবাগানই দল অপরাজিত থেকে এবারের হকি লীগের চ্যাম্পিয়ানসিপ পেল। এবারের লীগে মহামেডান স্পোর্টিং, কাষ্টমস আর পাঞ্জাব স্পোর্টস তাদের শক্তি অনুযায়ী খেলছে। হকি-লীগের নিয়ম অনুসারে এবারেও দু'টি দল হকি-লীগ থেকে নেমে যাবে।

বাইটন কাপ

বাইটন কাপের খেলা শেষ হয়ে গেছে। এবারে বাইটন কাপের ফাইন্যালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কলকাতার জনপ্রিয় মোহনবাগান দল ও সার্ভিসেস হকেটস দল। এই খেলায় মোহনবাগান দল ৩-১ গোলে পরাজিত হয়েছে।

অগণিত দর্শকের উপস্থিতিতে ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইন্যালে যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা দর্শকদের মধ্যে দেখা গিয়েছে, এবারের হকি মরশুমে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

মোহনবাগান দল প্রথমার্দ্ধে তিন গোলে পরাজিত হইতে থাকিলেও কোন ক্রমেই নিরাশ হয় না। তাহারা দ্বিগুণ উৎসাহে খেলা আরম্ভ করিয়া একটি গোল পরিশোধ করে। বিরতির পর মোহনবাগানের অপর একটি গোল পরিশোধ করিবার সুযোগ শান্তারাম অন্যায় ভাবে বাধা দেওয়ায় মোহনবাগানের পক্ষে পেনাল্টি বুলি পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু আম্পায়ার পেনাল্টি কর্ণারের নির্দেশ দেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান দল ৩-১ গোলে পরাজয় বরণ করে।

আন্তঃরাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতা

আন্তঃরাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে বাঙলা ও বোম্বাইয়ের খেলা দু'দিন অমীমাংসিত ভাবে শেষ হইলে দুই দলকে বিজয়ী বলিয়া ঘোষণা করা হয়। প্রথম ৬ মাস বোম্বাই ও শেষ ৬ মাস বাংলা ট্রফিটি রাখিবে।

কলকাতায় অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য মহিলা হকি প্রতিযোগিতায় ৮টি দল অংশ গ্রহণ করিয়াছিল কিন্তু ভূপাল দল শেষ পর্যন্ত যোগদান করতে পারেনি। ফলে বাংলা, বোম্বাই, মহীশূর, মাদ্রাজ, মহারাষ্ট্র, হায়দারাবাদ, দিল্লীর মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়। শেষ পর্যন্ত বোম্বাই ও বাংলা ফাইন্যালে ওঠে।

আন্তঃরাজ্য মহিলাদের হকি খেলার নৈপুণ্য ক্রীড়ামোদীদের আনন্দ দান করিয়াছে। আশা করা যায়, ভারতের মহিলারা হকিতে পুরুষদের সংগে পাল্লা দেবার চেষ্টা করবে।

টেবিল টেনিস

টেবিল টেনিসে জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৫২ সালে টেবিল টেনিসের প্রতিযোগিতায় জাপান যোগদান করে আপন প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের পরাজিত করে জাপানের হীরাজী স্যাটো হন চ্যাম্পিয়ান। আর জাপানের মেয়েরাও পিছিয়ে থাকেনি। নিশিমুরা ও নারহারা অসামান্য দক্ষতায় জিতে নেয় কার্বলিন কাপ। বিশ্বপ্রতিযোগিতায় চারটি পুরস্কার লাভ করে।

১৯৫৩ সালে জাপান খেলায় অংশ গ্রহণ করেনি।

১৯৫৪ সালে জাপান আবার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। কিন্তু তাদের খেলায় নানারূপ সমালোচনা হতে থাকে যেমন ১৯৫৩ সালে হয়েছিল।

১৯৫৫ সালে জাপানের এক তরুণ খেলোয়াড় তোশিয়া তানাকার কৃতিত্বের কথা গত বছর আলোচনা করেছি। তার শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই।

১৯৫৬ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতার ভার পড়ে জাপানের উপর। এবারে ১৯৫৪ সালের চ্যাম্পিয়ান ইচিরো ওগিমুরা গতবারের চ্যাম্পিয়ান তোশিয়া তানাকাকে পরাজিত করে।

রুমানিয়ার টেবিল টেনিস পটীয়সী এঞ্জেলিকা রোজেন্যুকে পরাজিত করে জাপান দুহিতা মিসেস কিয়োকা। তবে চ্যাম্পিয়ান-দিগের গৌরব অর্জন করেন মিস টোমী ওকাওয়া।

মিসেস তানাকা যেমন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মহিলা খেলোয়াড়কে পরাজিত করে দর্শকদের আশ্চর্যান্বিত করেন তেমনি ভারতের খেলোয়াড় নাগরাজের কাছে প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান জনি লীচের পরাজয়। জাপানের স্কুল ছাত্র আকিও নাহিরার কাছে পরাজয় বরণ করেন চতুর্থ রাউণ্ডে চেকোশ্লোভাকিয়ার ল্যাডিস্লাভ ষ্টিপেক। ভারতের নাগরাজ ছাড়া আর কেউ তেমন উল্লেখযোগ্য খেলা প্রদর্শন করতে পারেন নি।

মোট ১৬টি দেশকে দুইটি গ্রুপে ভাগ করা হয়। লীগ প্রথায় আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয় ভারত 'বি' গ্রুপে স্থান লাভ করে, ভারত চারটি খেলায় পরাজিত হয় ও তিনটি খেলায় বিজয়ী হয়। চেকোশ্লাভাকিয়া 'বি' গ্রুপে এবং জাপান 'এ' গ্রুপে চ্যাম্পিয়ান হয়। এবং চ্যাম্পিয়ানসিপ নির্ণয়ের জন্ত যে খেলা হয় তাতে জাপান ৫—১ খেলায় চেকোশ্লোভাকিয়াকে পরাজিত করে।

কার্বলিন্ কাপের খেলায় আটটি দেশের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলা হইলে রুমানিয়া অপরাজিত থাকিয়া কার্বলিন কাপ লাভ করে।

সিঙ্গলস ফ্যাইনাল—সেণ্ট বাইড ভেস

ইচিরো ওগিমুরা (জাপান) ২১—১৩, ২২—২৪, ২১—১৮, ১৮—২১ ও ২১—১৩ পয়েণ্টে তোশিয়ো তানাকাকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ফ্যাইনাল—গিষ্ট প্রাইজ

মিস টোসি ওকাওয়া (জাপান) ২১—১৫, ১৩—২১, ২৩—২১, ৯—২১ ও ২১—১৬ পয়েণ্টে মিস কিইকো ওয়াতানাবেকে (জাপান) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস—ইরাণ কাপ

ইচিতো ওগিমুরা ও যোশিও তামিতো (জাপান) ২১—১৩, ২১—১০, ২১—১১ পয়েণ্টে আইভান আন্দ্রিয়াডিস ও ল্যাডিস্লাভ ষ্টিপেনকে (চেকোশ্লাভাকিয়া) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—পোপ কাপ

মিসেস এঞ্জিলিকা রোজন্যু ও মিস এলা জেলার (রুমানিয়া) ২১—১৪, ১৪—২১, ১৫—২১, ২১—১৯ ও ২১—১ পয়েণ্টে মিস কিইকো ওয়াতানাকে ও মিস ফুজি এগুচিকে (জাপান) পরাজিত করেন।

মিক্স ডাবলস—হেডুসেক কাপ

মিসেস এল রুবার্জার ও এডউইন ক্লিন (যুক্তরাষ্ট্র) ২১—১৮ ১৭—২১, ২১—১৮, ১৭—২১ ও ২১—১৫ পয়েণ্টে মিস এ্যান হেডেন (ইংলণ্ড) ও আইভান আন্দ্রিয়াডিসকে (চেকো-শ্লাভাকিয়া) পরাজিত করেন।

টুকরো খবর

এপ্রিল মাসের ২৮শে তারিখ থেকে জলন্ধরে আরম্ভ হয়েছে জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা। ২০টি রাজ্য এতে যোগ দিয়েছে।

* * *

আন্তর্জাতিক হকি উৎসবে ভারতের মহিলা হকি দল অষ্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছে।

* * *

ইংলণ্ড সফরের পর অষ্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল পাকিস্থান ও ভারতে পাঁচদিনব্যাপী ৪টি টেষ্ট ম্যাচ খেলবে।

মাদ্রাজ বিধান সভার সদস্যদের জন্ত প্রতিষ্ঠিত হোটেলের দ্বি-বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হয়। রাজ্যপাল থেকে সকল সদস্য এতে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। 'ফ্যান্সি ড্রেস' প্রতিযোগিতায় মাদ্রাজের রাজ্যপাল তীর্থযাত্রী রূপ গ্রহণ করার পুরস্কার লাভ করেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা উল্লেখ করা যায় মোহনবাগান দলের দাদু মোহনবাগান স্পোর্টসে 'দিদিমার' রূপসজ্জায় "ফান্সি ড্রেস" প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভ করেন। দাদুর বয়স ৭২ বৎসর। দাদুকে চেনে না খেলার মাঠে এমন কোন দর্শক নেই!

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যায় প্রচ্ছদে নেপালের বুদ্ধমন্দিরের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে বুদ্ধ-জয়ন্তী উপলক্ষে। চিত্রটি শ্রীঅজয় ঘোষ কর্তৃক গৃহীত।

ছোটদের আসর



জলে ডাঙায়

সৈয়দ মুজতবা আলী

২১

আজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স পুরো-পাক্কা এক হাজার বৎসর। অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, প্যারিস, বার্লিন এর চেয়ে কয়েক শ' বছরের ছোট। তবু আজ যে সব গুণীজ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এঁরা ঐ-সব ইয়োরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। অজহর থেকে যাঁরা বেরোন তাঁদের নাম তো শুনতে পাইনে। হ্যাঁ, মনে পড়ল, মিশরের গাঁধী বলতে যাঁকে বোঝায় সেই সা'দ জগলুল পাশা ছিলেন অজহরের ছাত্র। কিন্তু আর কারো নাম শুনতে পাইনে কেন?

আশ্চর্য! মুসলমানরা যখন স্পেন দখল করল তখন তারা সেখানে অজহরের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ল। প্যারিস য়ুনিভার্সিটির গোড়াপত্তন যাঁরা করেন, তাঁদের অনেকেই লেখা-পড়া শিখেছিলেন স্পেনের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। এবং প্রথম দিককার পাঠ্য-পুস্তকগুলো পর্যন্ত আরবী বই থেকে লাতিনে অনুবাদ করা। আজ আর অজহরের নাম কেউ করে না, করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের!

কিন্তু আশ্চর্য হই কেন? একদা এই ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল। গ্রীকরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল। পরবর্তী যুগে ইয়োরোপীয়েরা আমাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শিখল (লক্ষ্য করেছ বোধ হয় রোমান হরফে যখন I, II, X, XII, C. M. লেখ তখন শূন্যের ব্যবহার আদপেই হয় না) এবং তারই ফলে তাদের গণিত-শাস্ত্র কী অসাধারণ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলল। আরবরা চরক সুশ্রুতের অনুবাদ করলে, আরো কত কী। একাদশ শতকে ভারত আক্রমণকারী সুলতান মাহমূদের সভাপণ্ডিত অল্-বীরূণী সংস্কৃত শিখে ভারতবর্ষের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা পড়ে সে যুগের মুসলিম জগৎ অবাক হয়ে ভারতবর্ষের গুণগান করেছিল। তারও পরবর্তী যুগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দারা শীকূহ্ উপনিষদ সম্বন্ধে ফার্সী বই লাতিনে তর্জমা হয়ে যখন ইয়োরোপে বেরলো তখন সে-বই নিয়ে ইয়োরোপে কী তোলপাড়ই না হয়েছিল। সে যুগের সেরা দার্শনিক শোপেনহাওয়ার তখন বলেছিলেন, 'এ-বই আমার জীবনের শেষ ক'টা দিন শান্তিতে ভরে দেবে।' ঐ সময়েই বিশ্বকবি গ্যোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে ঘন ঘন 'সাধু, সাধু' বলেছিলেন।

এখনো ভারতবর্ষের, অজহরের পুরনো সম্পদের সম্মান ইয়োরোপীয়রা করে কিন্তু আজকের দিনে যাঁরা শুধু সংস্কৃত কিম্বা মিশরে আরবীর চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাঁদের নাম কেউ করে না কেন? তাঁরা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিশ্বজন বিমোহিত হয়ে পুনরায় 'সাধু, সাধু' রবে হুঙ্কার তোলে?

হায়, এঁদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে। কেন ফুরলো? তার একমাত্র কারণ, এক বিশেষ যুগে এসে এঁরা ভাবলেন, এঁদের সব-কিছু করা হয়ে গিয়েছে, নূতন আর কিছু করবার নেই, পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে খেলেই চলবে।

এবং তার চেয়েও মারাত্মক কথা,—এঁরা অন্যের কাছ থেকে আর কিছু শিখতে চান না। এঁদের দম্ভ দেখে তাই স্তম্ভিত হতে হয়।

অজহরের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিসিক্স, কেমিস্ট্রি বট্‌নি পড়ানো হয়?'

সে শুধালে, 'এ-সব কি?'

অনেক কষ্টে বোঝালুম।

সে বললে, 'ধর্মশাস্ত্রে যা নেই, তা জেনে আমার কি হবে?'

আমি বললুম, 'অতিশয় হক্ কথা। ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই, কিন্তু ভ্রাতঃ, তোমার পা যদি আজ আছাড় খেয়ে ভেঙে যায় আর ডাক্তার বলে, এক্সরে করে দেখতে হবে কোন্ জায়গায় ভেঙেছে, তখন কি ধর্মশাস্ত্রে এক্সরে'র কল বানাবার সন্ধান পাবে?'

উত্তরে কি বলেছিল মনে নেই। 'ধর্ম রক্ষা করবেন' এই জাতীয় কিছু একটা। কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি, পল পার্সী অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। তত্ত্বালোচনা পার্সিকে বিকল করে সে-কথা পূর্বেই বলেছি, কিন্তু এ-স্থলে পল পর্যন্ত বিচল হয়ে পড়লো। আমি যখন একটু থেমেছি তখন দেখি তারা এক দোকানীর সঙ্গে দরদস্তুর করছে।

কি ব্যাপার? মিশরের পিরামিডের ভিতর যে সব টুকি-টাকি জিনিস পাওয়া গিয়েছে তারই কিছু কিছু এখানে বিক্রী হচ্ছে। আমি বললুম, 'এ-সব তো মহামূল্যবান জিনিস, ওগুলো কেনার কড়ি আমাদের কাছে আসবে কোত্থেকে, আর মিশরী সরকার সেগুলো যাদুঘরে সাজিয়ে না রেখে বাজারে বিক্রী করার জন্য ছাড়বেই বা কেন?' দোকানী বললে, 'একই জিনিস এত অসংখ্য পিরামিডে এত বেশী পাওয়া গিয়েছে যে, সেগুলো সরকার বাজারে ছেড়েছে—ভালোগুলো অবশ্য যাদুঘরে সাজানো আছে—এবং দামও তাই বেশী নয়।'

আমি কিনি কিনছি, কিনি কিনছি করছি, এমন সময় সেই আজহরের ছেলেটি আমার কানে কানে বললে, 'তাই যদি হবে, তবে

ওর দোকানের পিছনের কারখানাতে কি সব তৈরী হচ্ছে? চলুন না, কারখানাটা দেখে আসবেন।'

আমি বললুম, 'কি আর হবে দেখে? জর্মানিতে তৈরী কাশ্মীরী শাল, জাপানে তৈরী 'খাঁটি' 'অতিশয় খাঁটি'। ভারতীয় খদ্দর, কলকাতায় তৈরী জর্মন ওষুধ এসব তো বহু বার দেখা হয়ে গিয়েছে। ওর থেকে নূতন আর কি তত্ত্বলাভ হবে?'

পাশ পার্শিকে বললুম, 'পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকলি করা আর এই জাল মাল তৈরী করাতে কোনো তফাৎ নেই।'

পাশ বললে, 'মাষ্টার ধরতে পারলে কান মলে দেন।'

আমি বললুম, 'সরকারও মাঝে মাঝে এদের কান মলে দেয়।'

তখন হঠাৎ খেয়াল হল, অজহরী ছেলেটি যে ফিস ফিস করে কানে কানে কথা বলেছিল, সেটা বাঙলায়। তৎক্ষণাৎ তাঁকে শুধালুম, 'আপনি কি বাঙালী?'

সে বললে 'হাঁ'।

তার পর শুনলুম, বর্ধমানে বাড়ী, দশ বছর বয়সে এখানে সে এসেছে। বাঙলা প্রায় ভুলে গিয়েছে। আরো চার বছর অর্থাৎ সবশুদ্ধ বারো বছর এদেশে কাটিয়ে ফের বর্ধমানে ফিরে যাবে।

সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে? এই আরবী বিদ্যের কদর তো ভারতবর্ষে নেই? তাতে আশ্চর্য হবারই বা কি? কাশী থেকে বারো বছর সংস্কৃত শিখে বর্ধমানে ফিরলে তার পাণ্ডিত্যেরই বা মূল্য দেয় কে? তাকেও তো সেখানে উপোস করতে হয়। একেও তাই করতে হবে। আজ আর প্রাচীন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে কেউ সম্মান করে না।

কিন্তু ছেলেটির দেখলুম তাই নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই। বাপ ধার্মিক লোক, ছেলেকে ধর্মশিক্ষা করতে পাঠিয়েছেন, তাই শিখে সে দেশে ফিরে যাবে, তার পর যা হবার তাই হবে।

দলের কেউ এ দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে, কেউ ও দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে। কেনাকাটা হচ্ছে অতি সামান্য। টুকি-টাকি নাড়া-চাড়াতে আনন্দ অনেক বেশী—খরচাও তাতে নেই। এই করে করে আমরা সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম, কিন্তু হঠাৎ দলের এক জন স্মরণ করিয়ে দিলেন, আমাদের পোর্ট সঈদের ট্রেন ধরতে হবে আটটায়। আবুল আসফিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন, 'চলুন।' কিন্তু তাঁর হাবভাবে কোনো তাড়া নেই।

অতি অনিচ্ছায় ট্রামে উঠতে হল। অজহরের ছেলেটি আমার সঙ্গে বাঙলা কথা কইতে পেয়ে আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না। সে'ও চললো আমাদের সঙ্গে। আরবী ভাষা এখন তার জীবনের মূল মন্ত্র, কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভাষা বাঙলার মায়া এত সহজে কাটানো যায়?

ঘ্যাচাঙ করে ট্রাম দাঁড়ালো। কি ব্যাপার? আগের একটা ট্রাম মোড় নিতে গিয়ে লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে। বাদ বাকি সব ট্রাম তার পিছনে গড্ডালিকায় দাঁড়িয়ে। লোহার ডাণ্ডা দিয়ে জনকয়েক লোক ছিটকে-পড়া ট্রামটাকে লাইনে ফেরৎ নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চেষ্টার চেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে বেশী। লম্বা লম্বা আলখাল্লা উড়িয়ে রাস্তার ছেলে বুড়ো ট্রামটার চতুর্দিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। আর কত প্রকারেরই না উপদেশ, আদেশে অনবরত ট্রামের ভিতর বাহির দু' দিক থেকেই উপচে পড়ছে। দেশের হরির লুঠ এর কাছে লাগে কোথায়?

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাটা রসিয়ে রসিয়ে দেখছি, এমন সময় দলের এক জনের হুঁশ হল, আটটায় যে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে। আমার দেহ-মন কিন্তু ঐ রণাঙ্গন থেকে তখন কিছুতেই সরছিল না। কারণ, ইতিমধ্যে দেখি, ট্রামটা কি পদ্ধতিতে ফের লাইনে তোলা যায় তাই নিয়ে দুটি দলের সৃষ্টি হয়েছে। যারা ডিপো থেকে এইক্ষণে এসে পৌঁছেচে তারা বাতাচ্ছে এক প্রকারের রণকৌশল, আর সব কটা ট্রামের ড্রাইভার, কণ্ডাক্টরের দল সে রণকৌশলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করছে জঙ্গ জিহাদ। ব্যাপারটা তখন এমনি চরমে পৌঁছেচে যে উভয়পক্ষ তখন লোহার ডাণ্ডা হাতে করে মুখোমুখি হয়ে সদম্ভে সগর্বে সর্বপ্রকারের আস্ফালন কর্ম সুষ্ঠু পদ্ধতিতে শনৈঃ শনৈঃ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। দুই দলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামের যাত্রী এবং রাস্তার লোক। আর রাস্তার ছোঁড়ারা আলখাল্লা উড়িয়ে তাদের চতুর্দিকে পাঁই-পাঁই করে ঘুরছে, বোঁ করে মধ্যিখান দিয়ে ইস্পার উস্পার হয়ে যাচ্ছে, ধরা পড়ে কখনো বা দু'-একটা চড়ও খাচ্ছে।

একটা 'ফাস্টো কেলাস্' লড়াইয়ের পূর্বরাগ কিম্বা পূর্বাভাস!

কিন্তু হায় পৃথিবীর কত সৎকর্মই না অসম্পূর্ণ রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়। এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নিধিরামকে একদিন মোকা-মাফিক আচ্ছাসে উত্তম-মধ্যম দেব, তার পূর্বেই তো মাট্রিক পাশ করে ইস্কুল ছাড়তে হল! আর নিধে রাস্কেলটা ফেল মেরে পড়ে রইল ইস্কুলে। কী অন্যায় অবিচার! নিধেটা লেখাপড়ায় একটা আস্ত বিদ্যাসাগর, সে কথা জানি, কিন্তু আরো কত খাটাশও তো ম্যাট্রিক পাশ করে। ও করলেই বা কোন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত? আমিও তো দু'টো কিল মারার সুযোগ পেতুম। এই সব অবিচার দেখে সংসারের প্রতি আমার তখন ঘেন্না ধরে গিয়েছিল।

আজও তাই হল। দলের লোকের তাড়ায়। তখন আর বেশী সময় হাতে নেই। ট্যাক্সি নিতে হল।

বুকিং আপিসের সামনে যাত্রার দলের হনুমানের ল্যাজের মত প্যাঁচ পাকানো কিউ—Q—কেউ কেউ ওটাকে U. বলে বলে Wও বলে থাকেন, কারণ জায়গার অভাব থাকলে কিউ সচরাচর এই রকম শেপ-ই নিয়ে থাকে। অথচ গাড়ি ধরার সময় তখন মাত্র পাঁচ মিনিট। আবুল আসফিয়া কিউ-এতে দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে বললুম, 'ট্রেন মিস্ নির্ঘাৎ।' তিনি বললেন, 'আপনারা ষ্টেশনে যান।'

ষ্টেশনে যখন কোন্ প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তার খবর নিয়ে সেই প্ল্যাটফর্মের মুখে দাঁড়ালুম, তখন গেট-চেকার ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে শোধালে,—

'আপনারা যাবেন কোথায়?'

'পোর্ট সঈদ।' (সমবেত সঙ্গীতে)

'তবে ট্রেনে গিয়ে আসন নিচ্ছেন না কেন ?'

তাই শুনে পড়ি-মরি হয়ে এক দল দিল ছুট ট্রেনের দিকে, আরেক দল যাবে কি যাবে না এই ভাবে ন যযৌ ন তস্থৌ হয়ে রইল দাঁড়িয়ে; নড়লুম না আমরা তিন জন, পল, পার্সি আর আমি।

পল বললে, 'আমাদের টিকিট এখনো কাটা হয় নি।'

চেকার ছোকরা বললে, 'আপনারা যান।'

মনে হল ছোকরাটি বুদ্ধিমান। আমাদের চেহারা-ছবি দেখে এঁচেছে, আমরা ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চড়ার তালে নই। আমরা যখন পয়সা দেবার জন্য তৈরী তখন আমাদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমার মন তখন যাব যাব করছে। তখন পলের কথাতে বুঝলুম, সে কতখানি ভদ্র ছেলে। আমাকে বললে 'আবুল আসফিয়াকে ছেড়ে আমরা যাবো না।'

সেই উৎকট সঙ্কটের সময়ও আমার মনে পড়ল, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিশেষ অবস্থায় স্বর্গে যেতে রাজী হননি।

আমাদের চোখের সামনে ষ্টেশনের বিরাট ঘড়ি। সেটা তখন দেখাচ্ছে, ৭.৫১।

কলাপ্‌সিবল্ গেটের ভিতর দিয়ে দেখছি, আমাদের ট্রেনের গার্ড বীরোচিত ধীর পদে টহল দিচ্ছে, আর মাঝে মাঝে ট্যাঁকঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে।

মিশর তো প্রাচ্য দেশ, আরামের দেশ, অন্‌পন্‌কচুলাম্বিটর দেশ। ওরা আবার সময় মত গাড়ি ছাড়ার যাবনিক পদ্ধতি শিখল কোথা থেকে? সংসারের অবিচারের প্রতি আবার আমার ঘেন্না ধরলো। ট্রেন তো বাবা, সর্বত্রই নিত্যি নিত্যি লেট যায়। এই যে সোনার মুলুক ইংলণ্ড, যার প্রশংসায় এ পোড়ার দেশের সবাই পঞ্চমুখ দশানন, সেই দেশ সম্বন্ধেই শুনেছি, এক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন রোজ লেট যেত এবং বেচারী তাই নিয়ে অনেক আবেদন-ক্রন্দন করার পর এক দিন সত্যি সত্যি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময়ে ট্রেন ষ্টেশনে এল। লোকটি উল্লাসভরে ষ্টেশন-মাষ্টারকে কন্‌গ্রাচুলেট করাতে মাষ্টার বিমর্ষ বদনে বললে, 'এটা গত কালের ট্রেন; ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা লেট।'

সেই পরানের জান বিলেতেই যদি এই ব্যবস্থা তবে এই খানদানী গেয়েমভারী মিশরে মানুষ কি শুদ্ধমাত্র আমাদের দলকে ভ্যাংচাবার জন্য কণ্টকে কণ্টকে ট্রেন ছাড়তে চায়?

দেখি, গার্ড সায়েব দোদুল্যমান গতিতে আমাদের দিকে আসছে। চেকারকে কি যেন শুধালে, তার পর উত্তর শুনে আমাকে বললে, 'আর তো সময় নেই, গাড়িতে উঠুন।'

লোকটির সৌজন্যে আমি সম্মোহিত হয়ে গেলুম। কে আমরা? আমাদের জন্য ওর অত দরদ কিসের? স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, আমরা মার্কিণ টুরিষ্ট নই যে তাকে কাঁড়া কাঁড়া সোনার মোহর টিপস্ দেব। মিশরের ট্রেন লোহা-লক্কড়ের বটে, কিন্তু মিশরীয় গার্ডের দিল খুন মহব্বতে তৈরী।

আমি পাগল-পারা খুঁজছি সৌজন্য ভদ্রতার আরবী, তুর্কী ফার্সী বাক্য, যা দিয়ে আমি তাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি। ইংরিজিতে তো আছে শুধু, হাই, 'থ্যাঙ্কু' ফরাসীতে মের্সি', জর্মণে শুনাকি 'ডঙ্কি' না 'ডাঙ্কে' কি যেন একটা আছে কিন্তু ঐ সামান্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে গার্ড-সায়েবের সৌজন্য-সমুদ্রে আমার হাল পানি পাবে কেন?'

তবুও তেরিয়া হয়ে বলে গেলুম, 'আনা উশকুরুকুম', 'চোক তশক্কুর এদরং এফেন্দং', 'খৈলী তশকুকুর মিদমহতাম্, কুরবান্' আরো কত কী, উল্টা সুল্টা। তার মোদ্দা অর্থ, 'মহাশয় যে সৌজন্য দেখাইলেন, তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগ-যুগান্তব্যাপী অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কিন্তু হাল্‌ফিল্ আমরা লৌহবর্ত্মশকটে আরোহণ করিতে অক্ষম, যেহেতুক আমাদের পরমমিত্র চরম-সখা শ্রীশ্রীমান আবুল আসফিয়া নূরুদ্দীন মহম্মদ আব্দুল কাদিম সিদ্দীকীকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম।'

সঙ্গে সঙ্গে আরবী, তুর্কী, ফার্সী তিন ভাষাতেই বিস্তর ক্ষমা ভিক্ষা করলুম।

আর মনে মনে মোমাম চটছি আবুল আসফিয়ার উপর। লোকটার কি কণামাত্র কাণ্ডজ্ঞান নেই? দলের নেতা হয়ে কোনো রকম দায়িত্ব বোধ নেই? সাধে কি ভারতবর্ষ স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত!

হঠাৎ পল পার্সি দিল ছুট। তারা আবুল আসফিয়াকে দেখতে পেয়েছে। এবং আশ্চর্য, লোকটা তখন নিশ্চিন্ত মনে রেলের এক কর্মচারীকে ষ্টেশনের বড় ঘড়িটা দেখিয়ে দেখিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে। বোঝাচ্ছে কচু! নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে, ওদের ঘড়ি ফাস্‌ট্ যাচ্ছে। তা যাচ্ছে তো যাচ্ছে, সে কথা বুঝিয়ে কি তোমার টাকেতে চুল গজাবে—ওদিকে ট্রেন মিস করে?

কথার মাঝখানেই পল আর পার্সি পিছন থেকে তাঁকে দু'হাতে ধরে দিলে হ্যাঁচকা টান। তার পর দিল ছুট গাড়ির দিকে। আমিও পড়ি-মরি হয়ে সেদিকে। দলের যারা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়েছিল তারাও জয়োল্লাসে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে। আবুল আসফিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছেন। ষ্টেশনের আন্তর্জাতিক জনতা যে যার পথ ভুলে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। পুলিস দিয়েছে হুইস্‌ল। তবে কি দিনে-দুপুরে কিডন্যাপিং! কিন্তু এতো,

> 'উল্টো বুঝলি রাম, ওরে উল্টো বুঝলি রাম,
> কারে করলি ঘোড়া, আর কার মুখে লাগাম?'

এখানে তো বুড়ো-ধাড়িকে পাকড়ে নিয়ে চলেছে দু'টো চ্যাংড়া!

গাড়ি ঠিক সময়ে ছেড়েছিল না লেটে, আবুল আসফিয়ার ঘড়ি ঠিক না রেলের ঘড়ি ঠিক এ সব সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান হল না। গার্ডসায়েব যে ভাবে পিছন থেকে পাকা হাতে আমাদের ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গাড়িতে ওঠালে তার থেকে অনুমান করলুম, এ প্রকারের কর্ম করে করে তার হাত পাকা হয়ে গিয়েছে।

আবুল আসফিয়া তখনো পলকে বোঝাবার চেষ্টা করছেন, তাঁর ঐ ঘড়িটাই সুইটজারল্যাণ্ডের ক্রনোমিটার পরীক্ষায় পয়লা প্রাইজ পেয়েছিল। মিশরীদের সময়-জ্ঞান নেই। আমরাও অতিশয় সরল। চিলে কান নিয়ে গেল শুনেই—

['ক্রমশঃ।

[চাকামুখো মূর্ত্তি তালে-তালে পা ঠুকছে। দাঁতওয়ালা চাকা-মুখ ঘুরছে আর পাইপমুখো নলওয়ালা বুড়ো সেও কাঁপছে ঠক্-ঠক্ করে। রাজু ভাবলো বেগতিক। এখান থেকে সরে পড়াই ভাল। স্যুট ক'রে সে ঢুকে পড়লো পাশের একটা ঘরে।]

সেখানে গিয়ে দেখে বিরাট একটা বাক্সর মত লোহার চৌকো পাত্রের সঙ্গে জোড়া একটা মস্ত গোলকের মত ঢাকা দেওয়া কড়াই। তার তলার দিকে যেন কত কি রয়েছে। সেই বাক্স থেকে ওপর দিকে উঠেছে কয়েকটা ফাঁপা মোটা নল। কতকগুলো ওপর দিকে চোঙার মত চওড়া হয়ে রয়েছে। নানান আকারের ছোট-বড় বহু চাকা এদিক-সেদিক জোড়া।

ওপর দিকে তাকাতে রাজু দেখলো, ছাদটা গম্বুজের মত গোল। আশে-পাশে কত বিচিত্র রকমের যে পাত্র পড়ে আছে তার ঠিক নেই। কোনোটা বালতির মত, কোনোটা ডেকচির মত, কোনোটা হাঁড়ির মত।

রাজু অবাক না হয়ে পারলো না। রাজ-বাড়ীতে এ-সব কোন কাজে লাগে। এত কলকব্জা আর অদ্ভুত রকমের জিনিসপত্র সে জীবনে দেখেনি। কিন্তু মন্দ লাগছে না, এটা-সেটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগলো সে। হাত দিতে ভয় করে। কিন্তু হাত না দিয়ে কি দেখা যায়। আহা, এগুলোর যদি সে নাম জানতো! আর কার কি মানে যদি জানতো সে!

ডান দিকে একটা মস্ত বড় ঘড়ি। পেণ্ডুলামটা দুলছে, টকং-টকং করে শব্দ হচ্ছে। ঘড়ির কাঁটা দুটো কিন্তু অদ্ভুত! দুটোই ঘুরছে। একটা বড় একটা ছোট। কিন্তু বড়টা অতিরিক্ত বড় এবং তার প্রান্তটা ঠিক হাতের মত। হঠাৎ সেটা ইস্প্রিংয়ের মত এগিয়ে এল রাজুর হাতের কাছে।

হাতে হাত দাও···টকং-টকং।

ঘড়িটা যেন বলে ওঠে। অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে রাজু। একবার ছুঁলে আর হয়েছে কি?

হাতে হাত দাও···টকং-টকং-টকং রাজু হাত বাড়িয়ে ধরে বেশ একটা ঝাঁকানি দিল। ছেড়ে দিতেই কাঁটা দুটো বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগলো। খুব তাড়াতাড়ি ঘুরছে। কয়েক পাক ঘুরেই তারা থেমে পড়লো—আর সেই সঙ্গে ঢং-ঢং-ঢঢং-ঢং করে এক বিরাট ঝনৎকার বেজে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে হুস্ করে কোথায় যেন আগুন জ্বলে উঠলো। কোথা থেকে সেই ফায়ারম্যান এসে হাজির।

ঘাঁসর-ঘাঁসর করে সে কয়লা ঢালতে থাকে আগুনে।

সময় হয়েছে!

সময় হয়েছে!

চার দিক থেকে রব উঠলো। ছুটপাটি করে যেন সবাই কাজে লেগে গেল। সময় হয়েছে···সময় হয়েছে!

ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে রাজু একটা কোণে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এক রাশ পাইপ যেখানে এঁকে-বেঁকে জালের মত হয়ে আছে, রাজু লুকিয়ে পড়লো তার আড়ালে।

একটু পরেই তার কানে এল ফুটন্ত জলের শব্দ। -বগ টগ্-বগ্···



[পূর্বানুবৃত্তি]

(আধুনিক কালের এক দৈত্যকাহিনী)

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

কয়েক জন পগ্গড় মাথায় লোক এসে বলে উঠলো, রাজা আসছেন! রাজা আসছেন!

একটা নল থেকে ভস্-ভস্ ক'রে সাদা ধোঁয়া বেরুতে লাগলো। আসলে সেটা ধোঁওয়া নয়—জলীয় বাষ্প বা ষ্টীম।

মেঘের মত সেই বাষ্পের মধ্য হ'তে দেখা গেল বিরাট আকার এক জনের চেহারা বেরিয়ে আসছে। রাজু বুঝলো এই সেই দৈত্যরাজ। তার মস্ত বড় মাথায় সাদা পালকের মুকুট। মোটা পেশীবহুল হাত। গায়ে পাতলা সিল্কের মত জামা। হাত দুটি এদিক-ওদিক সঞ্চালিত করতে করতে সে হাই তুলতে লাগলো। তার দু'পাশে সেই চৌকোমুখ ও গোলমুখ এসে দাঁড়ালো। ঠিক অনুচরের মত।

ভারী গলায় গভীর আওয়াজ ধ্বনিত হ'ল তার গলা থেকে···

ঘড়ি বলে হা
হুস্ হাস্ হু-উ-স্
সময় বলে না
হুস্ হাস হু-উ-স?
তোমরা কিছু জানো?
হুস হাস হু-উ-স?

গোলমাথা এগিয়ে এসে বললে, 'জানি, জানি, জানি, মহারাজ! ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়েছে কেউ···টুং-টাং-টুং।'

চৌকোমাথা এগিয়ে এসে শুধরে দেয়, বলে—'একটি ছেলে, একটি ছেলে—সেই দিয়েছে ঘড়ির হাতে হাত।'

'অ্যাঁ'! বিস্মিত হয়ে দৈত্যরাজ হুস্-হাস্ করতে লাগলো। 'ছেলে!—এখানে মানুষ?'

গোলমাথা বললে, 'হ্যাঁ মহারাজ, এখানেই আসে সে। ঐ যে ঐ পাইপগুলোর আড়ালে।'

'ওঃ তাই না কি?' দৈত্যরাজ নিজেকে সামলে নিল।

'ওহে দেখ তো, আমি কি ভয় পেয়েছি নাকি? আমাকে কি ভীতু মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, মানুষকে দেখলে, মানে, মানুষকে ভয় করার যথেষ্ট কারণ আছে কি না। শূ—শূ—শাস— আচ্ছা, আমাকে রাজকীয় ভাবে ঘোষণা করে দাও—শাস—শাস—শা—

রাজু ভাবলো এই সময়ই তার হাজির হওয়া উচিত। তা না

হলে রাজা ভাববে আমিই ভয় পেয়ে লুকিয়ে আছি। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল।

'এই যে আমি রাজু, মানুষের পুত্র।' ব'লে দাঁড়াল সে রাজার সামনে, কিছু দূরে।

রাজা হাত দু'টি বুকের ওপর রেখে নাটকীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল। দুটি অনুচর এগিয়ে এসে তারস্বরে বললে, : 'এই আমাদের রাজা—মহা-প্রতাপান্বিত শ্রীল শ্রীযুক্ত বাম্পরাজ মহানুভব বাহাদুর!'

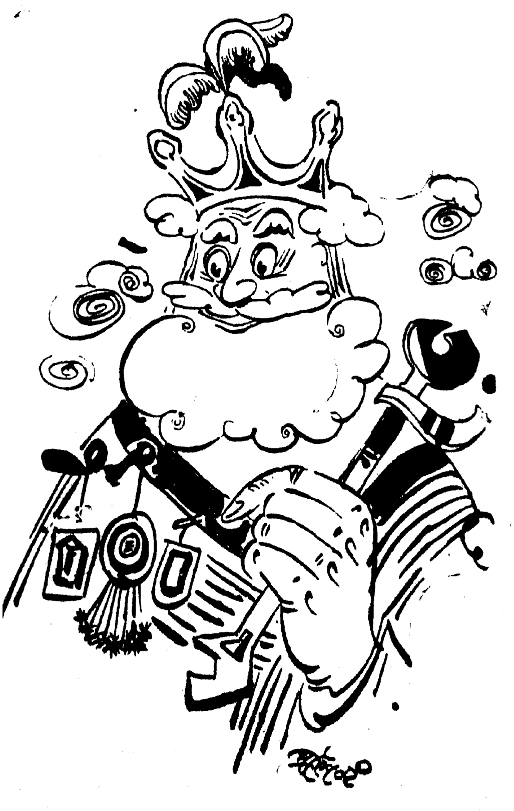
'হাঃ হাঃ হাঃ'...বিরাট অট্টহাসি হেসে রাজা বললে। 'পৃথিবীর ওপর সবচেয়ে শক্তি ধরি আমি।'

রাজু সাহস সঞ্চয় করে বললে, 'দেখুন, আমি অনেক রাজার গল্প পড়েছি এবং অনেক দৈত্যের গল্প শুনেছি, কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে আপনি তাদের চেয়ে অনেক ভালো।'

হাঃ হাঃ হাঃ...হু-উ-প রাজা হাসিতে ফেটে পড়লো। সমস্ত ঘরটা গম্-গম্ ক'রে ওঠে।

'একথা তোমাকে বলতেই হবে।' খুশি হ'য়ে রাজা বলে ওঠে। 'কিন্তু, তোমাদের হাতে কলম থাকলেই তোমরা দৈত্যদের গল্প লিখবে। বুঝলে খোকা! আর দৈত্যদের গল্প লিখতে গেলেই তোমরা দৈত্যকে যার-পর-নেই বদখত করে লিখবে। দৈত্যরা বদ, মারাত্মক, স্বার্থপর—তাদের কুৎসিত যত রকম ছবি আছে তাই আঁকবে তোমরা। তাই নয় কি?'

রাজু বলে, 'তা সত্যি। আমি যতগুলো গল্প পড়েছি তাতে যত বিদ্ঘুটে মারমুখো দৈত্যের কথাই আছে। অবশ্য দু'-একজন খারাপ থেকে পরে ভাল হয়ে গেছে।'



রাজা বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, তুমি সেই স্বার্থপর দৈত্যের গল্পের কথা বলছ। ঐ গল্পটা আমারও ভাল লাগে। কিন্তু, আমরা কি সব এতই বোকা? বুদ্ধি ব'লে কোনও পদার্থ যেন আমাদের নেই; শুধু বিরাট চেহারা আর গায়ে মত্তহস্তীর বলই কি আমাদের সব? ছি! ছি! ছি—আমার নিজেরই লজ্জা হয় ঐ সব গল্প পড়ে।'

'আমার ভীষণ ভয় করে।' বললে রাজু। 'সব ছেলেমেয়েরাই ভয় পায় দৈত্যদের। কিন্তু তাদের কথা শুনতে ভাল লাগে খুব। শক্তিটাই ভাল লাগে আর মস্ত চেহারাটাও বেশ মজার। মড়মড় করে তালগাছটা উপড়ে নেওয়া, পাহাড় থেকে লাফ দেওয়া। ঘরের মত বিরাট একখানা পাথর ছুঁড়ে মারা'—

'থামো থামো থামো!' রাজা বাধা দেয়। 'ভালো লাগে কেন জানো? তার একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, ঐ বিরাট হোঁতকা দৈত্যরা, শেষ পর্যন্ত তোমাদের হাতে মারা পড়ে ব'লে। মনে নেই, তোমার মত ফুঁচকে একটি ছেলে জ্যাক্ কতগুলো দৈত্যকে মেরেছিল?'

—'হ্যাঁ, ওটা বেশ মজার গল্প। সে দৈত্যটার নাম কর্মোরান্। বকাসুরের গল্পটাও বেশ মজার, যাকে ভীম বধ করেছিল।

—'তোমাদের ভীমটাকে আমার পছন্দ হয় না। নেহাৎ গোঁয়ার গোছের ছিল লোকটা। মানুষের কুলে ওকেও দৈত্য বলা যায়।'

—'তা হোক, কিন্তু কত অসুরকে যে ভীম জব্দ করেছে, তার ঠিক নেই। ভীম না থাকলে পাণ্ডবদের কি হোত বলুন তো?'

—'পাণ্ডবদের পাত্তা পাওয়া যেত না। একা অর্জুন ক'জনকেই বা সামলাতো? তোমাদের শ্রীকৃষ্ণও কি কম অসুরকে শেষ করেছে! তাদের একটা স্মৃতিস্তম্ভও নেই আজ।'

—'ছ্যাঃ, পুতনা বকাসুর, ওদের আবার স্মৃতিস্তম্ভ! একের নম্বরের পাজি আর শয়তান ছিল ওরা। মানুষ-খাবার যম।'

—'কথাটা কিছু সত্যি। কেন না ওদের ঠিক দৈত্য বলা যায় না। ওরা ছিল খানিকটা রাক্ষস জাতের। অসুর আর রাক্ষস একই বংশের মামাতো-পিসতুতো ভাই। বুদ্ধি-টুদ্ধির বালাই নেই—কেবল খাই-খাই। বড় হ্যাংলা ওরা। আরব্য উপন্যাসে কিছু কিছু দৈত্যের দেখা পাবে।'

একটু থেমে রাজা আবার বলে ওঠে—'আমার কি মনে হয় জানো? তখনকার মানুষদেরও বুদ্ধি কম ছিল।'

—'কেন?'

—'এই সব দৈত্য অসুরদের বধ না ক'রে কাজে লাগাবার কোনও চেষ্টা কেউ করেনি। মনে কর আজ যদি গজাসুর বকাসুরের মত কাউকে মানুষ বশে রাখতে পারতো—তাহ'লে কত কাজ হ'তে পারতো। এক দিনে তিনশ' বিঘে জমি চাষ করাই বল আর এক মিনিটে দিল্লী যাওয়া আর ফিরে আসা কিছুই শক্ত হতো না। দরকার হলে একটা পাহাড়কে মাঠ ক'রে দেওয়া আর রাতারাতি একটা দীঘি বানিয়ে ফেলা তাদের দিয়ে অনায়াসে হ'তে পারতো।'

রাজু বললে, 'সত্যি এ কথা আমিও ভাবিনি। আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি বেশ খুশিই হলুম। আপনাদের ভয়ের দিকটাই আমরা দেখেছি। আচ্ছা, আমি কথা দিচ্ছি, আমি যখন গল্প

লিখবো, দৈত্য সম্বন্ধে আমি অল্প কথাই লিখবো। আপনাদের নিয়ে ভালো কথা, গুণের কথা এই সব লিখবো। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত যদি আমার এই ধারণাই থেকে যায়।'

হাঃ হাঃ হাঃ রাজা আবার হাসিতে ফেটে পড়ে। বলে, 'থাকবে, থাকবে। মানুষকে আমিও বিশ্বাস করি। আচ্ছা, এখন কি আমরা একটু এখান থেকে ছাদে যেতে পারি?'

রাজু বললে—'নিশ্চয়, মহারাজের হুকুম যদি হয়।' রাজা বললে, 'মহারাজ হুকুম দেবে না, কেন না সে এখন একটি ছোট বন্ধু পেয়েছে কি না!'

সিঁড়ি বেয়ে দু'জনে ছাদে উঠলো। চার দিকে নানা রকম গম্বুজের মত উঁচু হয়ে আছে। মাঝখানে প্রকাণ্ড ছাদ।

'চেয়ে দেখ আমার দিকে।' হঠাৎ রাজার কণ্ঠ শোনা গেল। রাজু পাশে তাকিয়ে দেখে রাজা নেই। আশে-পাশে তাকিয়ে তার টিকিও দেখা গেল না। একি, ভোজবাজি নাকি? ভাবছে রাজু।

হঠাৎ আবার শব্দ এল—'ওপরে, ওপরে, আকাশের দিকে তাকাও।'

সত্যিই তো, আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ ভেসে যাচ্ছে। কোনওটা গোল কোনওটা চ্যাপ্টা—পেঁজা তুলোর মত ধীরে ধীরে ভেসে চলেছে। তাদেরই একটা বড় মেঘের স্তূপের মধ্যে রাজার অস্পষ্ট ছবি। ছবি নয় সত্যিই রাজা বসে আছে কাত হয়ে, যেন সিংহাসনে হেলান দেওয়া।

'এই যে আমি এখানে—মেঘের মধ্যে।' আকাশ থেকে ভেসে এল রাজার কণ্ঠস্বর।

বাঃ, বেশ মজা তো! আমিও যদি ঐ রকম চড়তে পারতাম মেঘে। মনে হ'ল রাজুর। নীল আকাশের গা বেয়ে কত দূরে যাওয়া যায় কে জানে? পৃথিবী ছাড়িয়ে সেই সুদূরে পাড়ি দেওয়া যায় না কি? ঐ যে পশ্চিম দিগন্ত থেকে একটা সজল কালো মেঘের পাহাড় ঠেলে উঠছে আকাশের কেন্দ্র লক্ষ্য করে, ওর পিঠে চড়া যেত! চূড়োর পর চূড়ো, গোল-গাল যেন পালিশ করা, অথচ তুলোর মত নরম বলেই যেন মনে হয়। চূড়োর মাথায় মাথায় রূপোলি রোদ···

হাঃ হাঃ হাঃ···

হাসিতে চমকে ওঠে রাজু। মুখ ফিরিয়ে দেখে, রাজা তার পাশেই দাঁড়িয়ে।

'একটু অবাক হয়েছো নিশ্চয়? আমি একটু মেঘের মধ্যে বেড়িয়ে এলুম।' বললে রাজা।

'আচ্ছা মেঘ খুব হাল্কা, না?' জিগ্যেস করে রাজু।

'তা তো বটেই, না হ'লে শূন্যে ঝুলে থাকবে কেমন ক'রে?'

'আমরা উঠতে পারি না ওখানে?' আবার সে প্রশ্ন করে।

'উঁ হুঁ! ঐটা হয় না। কোনও ভার সইতে পারে না ওরা। আমি ওখানে গেলে আর ভারি থাকি না, মেঘের মতই হয়ে যাই। আসলে আমিই মেঘ।'

'বেশ মজা আপনার? কত দেশ-দেশান্তরের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যান কেমন।'

'তোমরা যাকে বল ম্যাজিক কারপেট, মেঘ হলো আমার তাই।' রাজা হাসতে হাসতে বলে। কতো কতো দূর, সেই যে প্রশান্ত মহাসাগর—লোক নেই জন নেই সেখানে। দেখবার কোনও চোখ নেই, শোনবার কোনও কান নেই—শুধু ঢেউ আর ঢেউ। কয়েকটা সী গাল পাখী সমুদ্রের ফেনার সঙ্গে খেলা করছে। সেইখান থেকে সেদিন ওরা রওনা হয়েছে।'

'কারা?' বলে ওঠে রাজু।

'ঐ যে মেঘগুলো। সূর্য্যতাপ মহাসাগরের জলকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দেয় আকাশে—বুঝলে? তার পর নানান হাওয়ার ঢেউ কাটিয়ে কাটিয়ে দানা বেঁধে জমাট হয়ে ঐ টুকরোগুলো আসছে দিনের পর দিন ধরে। কতো হাওয়ার নেকড়ে আছে, তারা ওদের নখ দিয়ে ছিঁড়ে-খুঁড়ে লোফালুফি করে ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু মেঘের অনেক কথা আছে—এখন আর সময় কই। চলো, আমরা নীচে নেমে যাই। আমার সময় খুবই কম। তবে একটা কথা কানে কানে বলি, আমাদের এখানে ঘড়ি বলে কিছু নেই। একটা ঘড়ি যা তুমি দেখেছো, সেটা নিতান্ত খেয়ালী আর তার ছোট কাঁটার সঙ্গে বড় কাঁটার সদ্ভাব নেই—প্রায়ই ওদের ঝগড়া থামাতে হয় আমায়।'

চার

রাজু নীচে নামতে যে ঘরের দিকে তার বাঁ হাত পড়ে সেই ঘরের দরজায় পর্দা হাওয়ায় তখন উড়ছিল।

ভিতরে চোখ পড়া খুবই স্বাভাবিক এবং রাজুর চোখ গিয়ে পড়লো একটা চেয়ারের ওপর। লোহার শিকের ওপর কাঠ মেরে আঁকাবাঁকা একটা চেয়ার। চেয়ারের মালিক একজন আছে মনে হ'লো। কিন্তু তার নড়াচড়া নেই—ঘাড় গুঁজে একটা মোটা বই পড়ছে বলে মনে হয়।

রাজু দরজার কাছে দাঁড়াতেই খুট ক'রে একটু শব্দ হলো। আর সেই মুহূর্তে চেয়ারে-বসা লোকটি ধড়মড়িয়ে উঠে সোজা দরজার কাছে এসে হাজির।

লোকটি বৃদ্ধ, মাথায় কাঁচা-পাকা এক রাশ চুল এলোমেলো



উড়ছে। মোটা মোটা ভ্রূ, মস্ত গোঁফ, চোখে চশমা। বুকে দড়ি, বাঁধা একটা চীনে কোট গায়ে।

'আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।' লোকটি রাজুকে বললে। 'এখানে অনেক দেখবার জিনিষ আছে, মানে যা আছে সবই দেখবার। কিন্তু—আপনি দেখতে চান না শুনতে চান?'

রাজুকে এ পর্য্যন্ত কেউ আপনি বলে কথা বলেনি। মনে মনে তার ইচ্ছা ছিল কেউ যদি তাকে আপনি বলে তাহলে বেশ হয়। বড়দের ত' সব সময়ই আপনি আপনি করে সকলে। যাই হোক-সে পা বাড়লো আর বললে 'আমি দেখতেই পছন্দ করি।'

'ঠিক, ঠিক। মানে কথা, দেখার তুল্য কিছু নেই। হ্যাঁ, মানে কথা, আমি হচ্ছি প্রফেসর ঘণ্টেশ্বর। বিজ্ঞান নিয়েই আমার, মানে কথা, যা কিছু। সব সময়ই রিসার্চ করি। মানে কথা, আমি আপনাকে সব দেখাবো। মানে কথা শুধু···হ্যাঁ, কি বলছিলাম?'

রাজু বললে, 'শুধু'।

প্রোফেসর—'না না, তার আগে কি বলছিলাম?

রাজু—'সব দেখাবো।'

প্রোফেসর—হ্যাঁ, মানে কথা, সব দেখাবো, শুধু আমার একটা কাজ করে দিতে হবে।'

রাজু—'আমার দ্বারা যদি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই করবো।'

প্রোফেসর—'ধন্যবাদ, মানে কথা আমার সময় নেই বলেই ত' আমি পারি না। পৃথিবীতে যা কিছু হয় আমি সবই জানি। মানে কথা, সব কিছুর অর্থ আমি জানি।'

রাজু—'কি কাজ করতে হবে?'

প্রোফেসর—'শুধু, মানে কথা, আমার চুলটা এই চিরুণি দিয়ে আঁচড়ে দিতে হবে আর কিছু না। দেখুন না, এইটাই শুধু আমি পারি না। পারি না মানে কথা, সময়ের অভাব, সময় নেই বলেই পারি না।'

রাজু টেবিলের ওপর থেকে চিরুণিটা নিয়ে বুড়োর চুল আঁচড়ে দিল। মাথার মাঝখানে মস্ত টাক, তার চার পাশে চুলের প্রাচুর্য রাজু ছোটবেলায় নিজের মাথাতেই চিরুণি দেয়নি কোনও দিন বড় হয়েও চুলের সঙ্গে চিরুণির যোগাযোগ কমই হোত। যাই হোক, পরের মাথায় চিরুণি দিতে মন্দ লাগলো না তার। কী কড়া শক্ত চুল!



প্রোফেসর ঘণ্টেশ্বর খুব খুশি। গগলসের মধ্যে থেকে তার চকচকে ছুটো চোখ জলজল করে উঠলো। সে একটা মোটা বই নিয়ে তার পাতা ওল্টাতে লাগলো।

রাজু এমন সময় বললে, 'আপনি যে বললেন, আমাকে কী সব দেখাবেন?'

'ও-হোঃ, দেখেছো। মানে কথা, হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিই ত বলেছিলাম। কত কথাই যে আমি বলতে পারি তার ঠিক নেই। পৃথিবীর যত অদ্ভুত কথা সব আমার মুখে এসে যায়। এইমাত্র আমার মাথায় এক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ঘুরছিল। সেটা অবশ্য মানে কথা, এক গলদা চিংড়ির গল্প। সূক্ষ্মতত্ত্বে পৌঁছানো মানে কথা খুবই সহজ। স্থূলে আসাটাই শক্ত। যেমন গলদা চিংড়ির গোঁফ-দাড়ীটা আর মাথায় করাতের মানে কথা, কি প্রয়োজন ছিল একথা কেউ ভেবে দেখেছে কি? তাও নয়, মানে কথা সূক্ষ্মতত্ত্বে সিন্ধুঘোটকের পিঠে চেপে সহজে ভ্রমণ করা যায়, কিন্তু মানে কথা, স্থূলতত্ত্বে তার কাছে ঘেঁষা, সহজ নয়—হ্যাঁ ইতিপূর্বে কি বলছিলাম যেন?'

রাজু মাথা চুলকে ভাবতে লাগলো। কিছুই তার মনে পড়লো না। তখন সে আগের কথাটা খুঁচিয়ে তুললো—'কি দেখাবার আছে, বলছিলেন না?'

প্রোফেসর—'ও হ্যাঁ, সে ত অনেক পূর্বে বলেছি, মানে কথা তার পূর্বেও আরও কিছু বলেছিলাম। কত কথাই যে বলতে পারি আমি। তোমার মাথা ভর্ত্তি ক'রে দিতে পারি কত অদ্ভুত কথায়।' এই কথা বলে প্রোফেসর উঠে রাজুর মাথায় হাত দিল, তার পর অন্যমনস্ক হয়ে চলতে লাগলো।

এমন সময় একটা তারে পা আটকে হঠাৎ উল্টে পড়ে প্রোফেসর। রাজু গিয়ে ধরে তোলে। 'এই দেখুন, মানে হচ্ছে এটা একটা কল। আমিই তৈরী কচ্ছি এটা। বেকায়দায় মানে কথা, পা লাগিয়ে আমিই পড়লাম—কিন্তু এটা কি জানেন? চাঁদে যাবার কল—সোজা সরল রেখায় চলবে এ ঘণ্টায় মানে কথা যত মাইলই হোক। একেবার চাঁদের দিকে ঐ শুঁয়ো পোকার মত নাকটা ঘুরিয়ে রাখলেই হলো। মানে কথা, এটা আমারই আবিষ্কার। হ্যাঁ, তার পর মানে কথা, অন্য গ্রহেও যাওয়া যাবে, চাঁদ সেরেই যাবো শুক্রে।'

রাজু সেই জটিল দড়ি-দড়া লোহা-লক্কড়ের কলটা দেখে জিগ্যেস করলে, 'এরোপ্লেনেও ত ওড়া যায়, এটায় কি দরকার?'

'আহা হা, এরোপ্লেনে কি চাঁদে যাওয়া যায়? মানে কথা, আমার আবিষ্কার হবে আরও অদ্ভুত, যা কেউ ভাবতে পারে না। সবই ঠিক ঠাক হয়ে গেছে, কেবল মানে কথা, একটা জায়গায় আটকে গেছি। কলকব্জা সবই ঠিক হয়ে গেছে, মানে কথা চালালেই হয়, কেবল একটা নাট নিয়ে হয়েছে মুস্কিল। চৌকো নাট দেব না ছ'কোণা নাট দেবো, মানে অনেক জরুর ব্যাপার। তোমার মানে কথা, আপনার কি মনে হয়?'

রাজু মনে মনে রেগে যাচ্ছিল বুড়োর কাণ্ড দেখে। সে বললে, 'আমার মনে হচ্ছে, চৌকো আর ছ'কোণা দুটোই বাদ দিন। তার বদলে আট কোণা লাগালে হবে।'

'গুড গুড, সত্যিই একটা ভাল বুদ্ধি মানে কথা, আইডিয়া! খুব পরিষ্কার ব্রেণ আপনার।'

'একটা কথা!' রাজু না বলে পারলো না। 'আমাকে আপনি আপনি করছেন কেন? আমি ত' অনেক ছোট!'

'ও, এই কথা? মানে কথা, ছোটদের সম্মান না দিয়ে আমরা ভুল করেছি। তাই—যদি কিছু মনে না করেন তাহ'লে তুমিই বলবো। ওঃ, মনেই ছিল না, আমাদের ষ্টীম-বয়েলড চা এসে গেছে—এসো···না না আসুন!'

রাজু বললে 'আপনি আমাকে তুমিই বলবেন।'

তার পর দু'জনে চা খেতে বসলো।

[চলবে]

ম্যাজিক আংটি

যাদুকর এ, সি, সরকার [লণ্ডন]

সম্প্রতি লণ্ডনের বিশিষ্ট ক্লাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলাম অতিথি হিসাবে। চা পানের পরে যখন নিমন্ত্রিত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাদের সঙ্গে ক্লাবের সভাপতি আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন, তখন সবাই ধরে বসলেন ম্যাজিক দেখাতে হবে। কিন্তু সঙ্গে তো আমার তেমন কোন যন্ত্রপাতি বা সাজসরঞ্জাম নেই। কেমন করে ম্যাজিক দেখাই! ম্যাজিক না দেখালেও আবার মুখ থাকে না। সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধি খাটিয়ে একটা উপায় বের করে ফেললাম। যে খেলাটা দেখালাম সেটা অবাক করলো সবাইকে।

এক জন ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা কলম আর অন্য আরেক জন ভদ্রলোকের কাছ থেকে একটা আংটি চেয়ে নিলাম। এর পরে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম,—সমবেত ভদ্রমণ্ডলী, আমার হাতে এখন আছে একটি সাধারণ Fountain pen ও একটি সাধারণ আংটি। এইবার এই কলমটিকে বাঁ হাতে উঁচু করে ধরে আমি তাতে গলিয়ে দিলাম আংটিটা—বলা বাহুল্য, কলমটাকে খাড়া করে ধরেছিলাম। এর পরেই সুরু হল আমার ম্যাজিক। যাদুমন্ত্র প্রভাবে এই আংটিটা উপরের দিকে উঠতে লাগলো কলমের গা বেয়ে। দেখে তো সবাই অবাক!

এবার শোন খেলাটার কৌশল। আমার সঙ্গে ছিল এক খণ্ড সরু কালো সুতো। এই সুতোর এক প্রান্ত আমি আটকে নিয়েছিলাম কোটের বোতামের সঙ্গে। সুতোর অন্য প্রান্তে লাগানো ছিল একটু মোম [মৌচাকের মোম] কলমটা হাতে নিয়েই এর এক প্রান্তে আমি সুতাটার খোলা মাথাটা লাগিয়ে দিয়েছিলাম মোমের সাহায্য [ছবি দেখলেই বুঝবে কেমন করে] আংটিটা যখন কলমের মধ্যে গলিয়ে দিই তখন এই সুতোর উপর দিয়েই তা' গিয়েছিল।' এই কারণেই শরীর থেকে যখন আমি কলমটার দূরত্ব বাড়িয়ে দিচ্ছিলাম হাত দূরে সরিয়ে নিয়ে, আংটিটাও উপরের দিকে উঠছিল সঙ্গে সঙ্গে সুতোর টানে। সুতোটা খুব সরু আর কালো ছিল, আমার পরনে ছিল কালো গলাবন্ধ কোট—এই কারণেই সুতোটা কারও নজরে পড়েনি। খেলার শেষে সাবধানে মোমের ঢেলাটা চিমটি কেটে সরিয়ে ফেলতে সঙ্গে সঙ্গে সুতোও খুলে গিয়েছিল কলম থেকে। যখন কলম আর আংটিটা ফেরৎ দিলাম তখন কোনই কৌশল খুঁজে পেলেন না দর্শকেরা।

গল্প হলেও মিথ্যে নয়

স্বপন দাস

শিল্পী। তরুণ। এ পৃথিবী তারুণ্যের সৌন্দর্যে মহীয়ান তার চোখে। কাকচক্ষু জলের স্বচ্ছতা তার মনে। সুন্দর পৃথিবীর বর্ণালি বর্ণে রঞ্জিত শিল্পীর হৃদয়। শিল্পী যে দিকেই মেলে দু'চোখ—চোখে নামে তার মাধুরিমার অঞ্জন। পৃথিবীর সারা দেহে অরূপরতনের ঝলকানি। কবির মন ডুব দেয় রূপসাগরে। সবুজ গাছ—সোনালী ধান—লাল আকাশ—নীল আকাশ—অনেক রঙে রাঙানো আকাশ—হলুদ, বেগুনী, কালো, আসমানী, সাদা, লাল, গোলাপী সহস্র রঙের ফুল আর পাখি, জীবজন্তু। মানুষের শরীরও নিখুঁৎ রঙে যেখানে যেমনটি মানায় তেমনি করেই রাঙানো, সাজানো। শিল্পী বিস্মিত!

শিল্পী! যখন সুখী মন তার আঁকতে চাইলো অদ্ভুত সুন্দর এক দেবদূত। কিন্তু কে হবে তার আদর্শ? এ পৃথিবীতে অপাপবিদ্ধ কে! সে হলো শিশু। যার হাসিতে ঝরে স্বর্গের সুধা ফুলঝুরি হয়ে। আলোর মতো সুন্দর এক শিশুকে দেখে শিল্পী আঁকে ছবি। নিখুঁৎ হলো ছবি। প্রতিটি রেখায় ফুটলো ফুলের পবিত্রতা। ছবি যে দেখে বলে—"হাঁ এই বটে দেবদূত।"

ঘুরেচে কালের চক্র। শিল্পীর বয়স চলেছে অস্তাচলে। শিল্পী হারিয়েছে তার তারুণ্যের চঞ্চলতা। সে এখন বিজ্ঞ। জীবনপথে সে হয়েছে কঠিন বাস্তবের সম্মুখীন। রূপ বদলেছে পৃথিবীর—তার চোখে। পৃথিবীর নিষ্ঠুর পাশবতা শিল্পী করেছে উপলব্ধি—দেখেছে পৃথিবীর ভয়ঙ্কর রূপ। শিল্পী ভাবে আঁকবে—শয়তানের ছবি। আঁকা হলো 'ছবি। জীবন্ত ছবি। দুর্দান্ত শয়তানের পৈশাচিক দৃষ্টি উঠলো ফুটে তুলির আঁচড়ে আঁচড়ে।

জেলখানায় শৃঙ্খলাবদ্ধ। থেকে থেকে গর্জে ওঠে জীবন্ত পাপ। চোখে তার সাত নরকের আগুনের দৃষ্টি। মুখের প্রতিটি রেখায় দানবের কুশ্রীতা। অপরাধে অপরাধে মনে তার পঙ্কের দুর্গন্ধতা—মুখে তারই প্রতিচ্ছবি।

শিল্পী চিত্রটির নাম দিল শয়তান। শয়তানের ছবিই বটে। কি বীভৎস তার রূপ! বুকের রক্ত জমাট বাঁধে ভয়ে!

ছবির কাজ শেষ হতে শিল্পী জানতে চাইলো তার নাম ঠিকানা। চমকে ওঠে শিল্পী: এই সেই শিশু!

আর এক দিনের দেবদূতই আজকের শয়তান!

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

সতের

কাছারীঘর রাজশেখর রায়ের।

যেমন দৈর্ঘ্যে তেমনি প্রস্থে ঘরখানি। ঘরের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে চৌকীর উপরে ফরাস বিছানো। ইতস্তত ছড়ানো রয়েছে কয়েকটি তাকিয়া। অন্য দিকে খান দুই বেঞ্চ পাতা। সম্মানিত অতিথি-অভ্যাগতরা এলে ফরাসের উপরেই বসেন, অন্যথায় বেঞ্চ দু'টির উপর বসতে দেওয়া হয় বা দাঁড়িয়েই থাকতে হয়।

ঘরের দেওয়ালে খানকয়েক তৈলচিত্র। রায়েদের পূর্বপুরুষদের প্রতিকৃতি। আর রয়েছে দেওয়ালে ঢাল, বর্শা ও তরবারি।

ঘরে ঝাড়-বাতি ও দেওয়ালগিরিতে আলোর ব্যবস্থা আছে। উৎসবে কর্মে বা প্রয়োজনে ঝাড়বাতি জ্বালানো হয়, অন্য সময় সারা রাত ধরে দেওয়ালগিরিই জ্বলে।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রাজশেখর নিজেই দেওয়ালগিরির শিখাটা একটু উস্কে দিলেন, কিন্তু তাতেও ঘরের অনুপাতে আলো কিছু পর্যাপ্ত না হওয়ায় সমস্ত ঘরখানির মধ্যে একটা আলো-ছায়ার যেন থমথমে ভাব দেখা দেয়।

সূর্যকান্ত যতই ধূর্ত হোক না কেন, সে জানত না রাজশেখর রায় তার চাইতে অনেক ধূর্ত ও কৌশলী। তাই সে যে দাবার চালে ভুল করেছে, প্রথমটায় বুঝতে পারে নি।

বুঝতেও তার দেরি হলো না, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।

ঘরের সেই স্বল্প আলোর থমথমে রহস্যের মধ্যে সূর্যকান্ত এক প্রকার নিঃশঙ্ক চিত্তেই রাজশেখরকে অনুসরণ করে প্রবেশ করল।

কয়েকটা মুহূর্ত রাজশেখর রায় নিঃশব্দে ঘরের মধ্যে ঢুকে পায়চারী করতে লাগলেন, হাত দু'টি তাঁর পশ্চাতে নিবদ্ধ। রাজশেখরের প্রকৃতির সঙ্গে যারা পরিচিত ছিল তারা জানত, কোন বিশেষ সংকল্প নেবার পূর্বমুহূর্তে ঠিক এই ভাবে হাত দু'টি পশ্চাতে মুষ্টিবদ্ধ করে পায়চারী করাই তাঁর স্বভাব।

অত্যাসন্ন ঝড়ের পূর্বে আকাশ যেমন থমথম করে নিঃশব্দতায়, ঠিক তেমনিই রাজশেখরের মুখখানি সংকল্পের দৃঢ়তায় যেন থমথম করছিল।

হঠাৎ একসময় পায়চারী থামিয়ে সোজা একেবারে সূর্যকান্তকে মুখোমুখী করে দাঁড়ালেন, হাঁ, এবারে বল সূর্যকান্ত, কি তুমি বলছিলে—

আপনি কি জানেন রায়মশাই, আপনার একমাত্র পুত্র শশাঙ্ক-শেখরের গতিবিধির কথা?

বিস্মিত রাজশেখরের কণ্ঠ হতে আপনা হতেই যেন একটা প্রশ্ন বের হয়ে এলো, শেখরের গতিবিধি! তার অর্থ?

নিষ্ঠুর বিষাক্ত চাপা-হাসিতে সূর্যকান্তর ওষ্ঠপ্রান্ত কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। বললে, হাঁ, আপনার পুত্রের গতিবিধি। জানেন কি প্রতি রাত্রে নিঃশব্দে প্রাসাদ থেকে বের হয়ে সে কোথায় যায়?

কোথায় যায়? রাজশেখরের বিস্ময় যেন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। শয়তানটা কি বলতে চায়!

আপনি কি জানেন প্রতি রাত্রে সবাই যখন ঘুমে অচেতন থাকে শশাঙ্ক আরাম-কুটিরে যায়?

সূর্যকান্ত! বাঘের মতই যেন থাবা বসালেন রাজশেখর।

হাঁ, প্রতি রাত্রে আরাম-কুটিরে বন্দিনী চন্দ্রার ঘরেই আপনার পুত্রের অভিসার।

চোপরাও হারামজাদা! গুলী-খাওয়া বাঘের মত গর্জিয়ে উঠলেন রাজশেখর।

সত্য কি মিথ্যা, আপনি যাচাই করলেই জানতে পারবেন। আজও রাত্রে শশাঙ্ক আরাম-কুটিরে গিয়েছিল। এবং শুধু আজ নয়, দীর্ঘ তিন মাস ধরে প্রায়—বলতে গেলে প্রতি রাত্রেই শশাঙ্ক চন্দ্রার ঘরে যাচ্ছে। দু'জনের প্রেম, আপনিই হয়েছে। শশাঙ্ক আর চন্দ্রা!

রাজশেখরের পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছিল। এ কি সর্বনাশ ব্যাপার! শেষ পর্যন্ত কি না তারই পুত্র! গত তিন মাস ধরে শশাঙ্ক ও চন্দ্রার মধ্যে জানাজানি হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, প্রতি রাত্রে শশাঙ্কর সেখানে যাতায়াত অথচ ঘুণাক্ষরেও তিনি কিছু জানতে পারেননি?

বাইরে আরাম-কুটিরে সদাজাগ্রত প্রহরী কুম্ভ সর্দার। অন্দরে সরযূ। তারা কি এ ব্যাপার তাহলে জানে না? না, জানা সত্ত্বেও তারা তাঁর কাছে সব গোপন করে রেখেছে? কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে ত কি স্পর্ধা তাদের? আর সত্যিই যদি না হবে ত' এই লোকটারই বা এত বড় দুঃসাহস হবে কেন?

কিন্তু সে পরের কথা। আগে এই লোকটার একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দরজার দিকে তাকিয়ে রাজশেখর হাঁক দিলেন, শম্ভু!

হুজুর! সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর এলো বাইরের বারান্দা থেকে।

ভিতরে আয়।

নিঃশব্দে যেন একটা ছায়া দৈত্যের মত রাজশেখরের লেঠেল-পাইক সর্দার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল।

মাঝারী আকারের লোকটা, কালো কষ্টি পাথরের মত গায়ের বর্ণ। মাথায় বাবরী চুল। ওষ্ঠের উপরে একজোড়া পাকানো কাঁচা-পাকা গোঁফ। দেহের প্রত্যেকটি পেশী যেন সজাগ। নিটোল সজাগ দেহপেশী দেখলেই বুঝতে কষ্ট হয় না, সেই পেশীতে লৌহ-শক্তি ঘুমিয়ে আছে। নির্দেশ মাত্র যা হয়ত বিষাক্ত সরীসৃপের মতই কিলবিল করে উঠবে। পরিধানে হাঁটু পর্যন্ত খাটো ধুতি মালকোছা দিয়ে পরা।

শম্ভু! এই লোকটাকে আমার গুমঘরে নিয়ে গিয়ে বন্দী করে রাখ।

বিহ্বল চকিত কণ্ঠে একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার করে ওঠে সূর্যকান্ত, রায় মশাই!

নিষ্ঠুর হাসিতে রাজশেখরের ওষ্ঠ দ্বিধা বিভক্ত হলো। কঠিন চাপা কণ্ঠে তিনি বললেন, হাঁ, সূর্যকান্ত! রায়েদের গুমঘরেই তোমাকে যেতে হবে। অনেক কথাই দেখছি তুমি জেনে ফেলেছো—অনেকখানি অনধিকার চর্চা করেছো। এর পর আর তোমাকে ত' আমি ছেড়ে দিতে পারি না সূর্যকান্ত।

কিন্তু রায়মশাই! আপনার প্রতিশ্রুতি ছিল।

হাঁ তা ছিল বৈ কি সূর্যকান্ত! কিন্তু বাপু দুর্ভাগ্য তোমার, তুমি যে রাজশেখর রায়ের ইজ্জতের গায়ে আঁচড় দিয়েছো? এর পর কি

আর তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে? তা ছাড়া বেচা-কেনার ব্যবসা যে তোমার। আবার কোথায় বেশী দরে কি বিক্রি করে বসবে। না—তা আর হয় না—শম্ভু!

মুহূর্তে যেন কালো কষ্টি পাথরে-গড়া দেহটা সজীব ও সক্রিয় হয়ে উঠলো। এগিয়ে এসে সূর্যকান্তর ডান হাতের কবজীটা লৌহমুষ্টিতে চেপে ধরে শান্ত কণ্ঠে বললে, চল।

ব্যাপারটা বুঝতে সূর্যকান্তর তখন আর কিছুই বাকী ছিল না। পাগলের মতই সে তাই যেন চিৎকার করে উঠলো, না। না—রায়মশাই! ক্ষমা করুন আমাকে, ক্ষমা করুন। চন্দ্রাকে আমি চাই না। চিরদিনের মত প্রতিজ্ঞা করছি আপনার এলাকা ছেড়ে চলে যাবো। আর কখনো আমার মুখ দেখতে পাবেন না।

দেখতে যাতে আর না হয় সেই ব্যবস্থাই ত' আমি করছি সূর্যকান্ত! রায়েদের গুমঘরে প্রবেশেরই মাত্র একটা পথ আছে। নির্গমের কোন পথই নেই। যাও সেখানে তোমার মত প্রকৃতির আরো অনেকে যারা ইতিপূর্বে গুমঘরে গিয়েছে তাদের বায়ুভূত আত্মার সঙ্গে যে ক'টা দিন বেঁচে থাকো সচ্ছন্দে কেটে যাবে। যাও। শম্ভু! যা নিয়ে যা। এই নে চাবি! বলে একটা বড় লোহার চাবি ঘরের দেওয়াল থেকে নিয়ে শম্ভুর দিকে ছুড়ে দিতেই শম্ভু সেটা হাত পেতে লুফে নিল মুহূর্তে। রাজশেখরের শেষের উচ্চারিত ডাকটা শম্ভুর এবারে বুঝতে আর কষ্ট হয় না। সে আর দ্বিরুক্তি না করেই একটা হেঁচকা টান দিয়ে সূর্যকান্তকে ধরে খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

বৃথাই সূর্যকান্ত শম্ভুচরণের লৌহমুষ্টি থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না।

সূর্যকান্ত চেঁচাতে যাচ্ছিল, কিন্তু শম্ভু প্রচণ্ড একটা থাবড়া বসিয়ে দিল সূর্যকান্তর মুখে, এই শালা চুপ! বোঁ করে মাথাটা মুহূর্তের জন্ত ঘুরে উঠবার সঙ্গেসঙ্গেই যেন আপনা হতেই সূর্যকান্তর কণ্ঠ রোধ হয়ে গেল।

শম্ভু সূর্যকান্তকে টানতে টানতে গুমঘরে নিয়ে চলে যাবার পরও আবার রাজশেখর ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগলেন পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মতই। সমস্ত কিছুই যেন তাঁর কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

এ কি হলো! শেষ পর্যন্ত তাঁর একমাত্র বংশধর শেখর কি না চন্দ্রার প্রেমে পড়ল? এ কি তবে রায়বংশের উপর ভানুমতীর অভিশাপ?

মিত্রাস্তই মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন সে রাত্রে রাজশেখর রায়। নইলে ত প্রস্তুত হয়েই ছিলেন সেদিন তিনি অপর্ণার আত্মজাকে গলা টিপেই শেষ করে ফেলবেন। তার পর আবার নূতন করে অপর্ণার সন্ধান করে তাকেও শেষ করবেন। কিন্তু অসহায় ঘুমন্ত সেই শিশুকে গায়ের কাপড় দিয়ে সযতনে জড়িয়ে বুকের মধ্যে করে শম্ভুচরণ যখন তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল, এবং বস্ত্র উন্মোচনের পর নিদ্রিত সেই শিশুর চাঁদের মত মুখখানির দিকে রাজশেখর যখন তাকালেন, হত্যার দৃঢ় সংকল্পে দু'টি উদ্যত হাত যেন আপনা থেকেই গুটিয়ে এলো। সহসা মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গেল বহুকাল আগেকার ঠিক অমনি একখানি নিষ্পাপ ঢল ঢল কমনীয় মুখ। তাঁরই আত্মজের, তাঁর শশাঙ্কশেখরের। চাঁদের মত মুখখানি ছিল বলেই আদর করে ছেলের নাম রেখেছিলেন শশাঙ্ক। জমিদারের আভিজাত্য আত্মাভিমান ও সমস্ত দৃঢ় সংকল্প, এত দিনকার সঞ্চিত আক্রোশ যেন মুহূর্তে চিরন্তন অপত্যস্নেহের তাপে দ্রবীভূত হয়ে গেল। নির্নিমেষ নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন ঘুমন্ত অসহায় নিষ্পাপ সেই মুখখানির দিকে। পারলেন না তিনি অপত্যস্নেহকে অস্বীকার করতে। সেদিন মনে হয়েছিল বুঝি অদৃশ্য কি মায়াতেই না তিনি অপর্ণার আত্মজাকে হত্যা করতে পারেন নি, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে তা নয়। নিষ্ঠুর নিয়তিই সেদিন অলক্ষ্যে বুঝি তাঁর উদ্যত হাত দুটিকে পশ্চাৎ থেকে টেনে ধরেছিল। এবং সেই নিষ্ঠুর নিয়তিই আজ তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আজকের এই অবশ্যম্ভাবী ভাঙ্গনের মুখে নিয়তিই তাঁকে টেনে নিয়ে এসেছে বুঝি? রায়বংশের উচ্ছৃঙ্খলতাই ছিল তাঁর শরীরের প্রতি ধমনীতে, প্রতি রক্তকণিকায়। প্রথম যৌবনে তাকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি। পিতামহ রত্নেশ্বর রায়ের রক্তের ঋণ শোধ করেছিলেন পিতা শশিশেখর এবং শশিশেখরের রক্তের ঋণ শোধ করেছিলেন একদা তিনি নিজে এবং তার ঋণ বুঝি শোধ করতে চলেছে আজ তাঁরই একমাত্র পুত্র শশাঙ্কশেখর! কুক্ষণেই রাজপুতানী নটী লক্ষ্মীবাঈ পা দিয়েছিলেন রত্নেশ্বর রায়ের বড় সাধের স্বৈরী আরাম-কুটীরে এসে।

কক্ষদেওয়ালে প্রলম্বিত রত্নেশ্বর রায়ের তৈলচিত্রের দিকে

তাকালো রাজশেখর। যদিও রত্নেশ্বর রায়ের বয়স তখন পঞ্চাশের ঊর্দ্ধে এবং অত্যন্ত সংযমী ও সচ্চরিত্র লোক ছিলেন তিনি। কিন্তু কি কুক্ষণেই যে নটী লক্ষ্মীবাঈকে এনে সেদিন মধ্যযামিনীতে তাঁর বড় সাধের তৈরী আরাম-কুটীরে এনে তুলেছিলেন! দীর্ঘ দিনের চরিত্র সংযম সব ভেসে গেলো সেই নর্তকী নারীর যৌবন-মদিরায়। সমস্ত পারিপার্শ্বিককে ভুলে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন তিনি। পিতা শশিশেখরের বয়স তখন বত্রিশের ঊর্ধে হবে না। তার পর আরো অনেক দিনের পরে তাঁর নিজের বয়স যখন আঠার কি উনিশ মাত্র। দেহ রক্তে সবে যৌবনের মাদকতা দেখা দিয়েছে। নবীন বয়স, নবীন যৌবন। সেই সময়ই অকস্মাৎ তাঁর যৌবন স্বপ্নে রঙিন চোখের সামনে জ্বলন্ত পাবকশিখারূপিণী সর্বনাশা সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল। এবং তিনি নিজেও সে দিন সেই পাবকশিখার প্রতি পতঙ্গের মতই আকৃষ্ট হয়েছিলেন হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে। কিন্তু পিতা শশিশেখর ছিলেন তাঁর চাইতেও ধূর্ত ও বিবেচক, অঙ্কুরেই সমস্ত সম্ভাবনাকে সেদিন তিনি মূল সমেত উৎপাটন করে তারই ভুলের জালে তার পুত্রও যাতে জড়িয়ে না পড়ে সেইজন্য মাত্র সাত দিনের মধ্যে আশ-পাশের দশ বিশ ক্রোশের মধ্যে খুঁজে অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী উভিন্নযৌবনা কিশোরী সুরেশ্বরীর সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন। হয়ত নিজের ও পিতার দুর্বলতার কথা বুঝতে পেরেই পুত্রের ভবিষ্যৎকে তিনি কঠিন রূপের শৃংখলে বেঁধে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিলেন। পুরুষকারে গঠিত মানুষ সবই করতে পারে, কিন্তু পারে না অবশ্যম্ভাবী নিয়তিকে লঙ্ঘন করতে। তাই তিন বৎসরও অতীত হোল না, এক রাত্রে আরামকুটীর থেকে মত্ত অবস্থায় ফিরবার পথে অশ্বপৃষ্ঠ হতে মাটিতে ছিটকে পড়ে মাথার খুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। মাত্র একুশ বৎসর বয়সে রাজশেখর মৃত পিতার শূন্য আসনে জমিদার—সর্বময় কর্তা হয়ে বসলেন।

হঠাৎ চম্‌কে উঠ্‌লেন রাজশেখর। তাঁর চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল সম্মুখের দেওয়ালে একটি সঞ্চরণশীল ছায়া দেখে।

কে? চকিতে খোলা দরজার দিকে ফিরে তাকালেন রাজশেখর।

ঘরের দেওয়ালগিরির অনুজ্জ্বল আলোতে চিনতে কষ্ট হলো না রাজশেখরের, স্ত্রী সুরেশ্বরী।

বহির্মহলে কাছারীঘরে বিশেষ করে এত রাত্রে স্ত্রী সুরেশ্বরীর পদার্পণ শুধু আকস্মিকই নয়, চিন্তারও অতীত।

বিস্ময়ে কয়েকটা মুহূর্ত রাজশেখরের কণ্ঠে যেন শব্দ পর্যন্ত বের হয় না। এবং বিস্ময়ের সেই চরম মুহূর্ত কেটে যাবার পর অস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তুমি?

দু' পা এগিয়ে এলেন এবারে সুরেশ্বরী এবং অত্যন্ত শান্ত মৃদু কণ্ঠে জবাব দিলেন, হাঁ, আমি।

বহির্মহলে কাছারীঘরে এত রাত্রে হঠাৎ এ ভাবে আসবার তোমার কি প্রয়োজন ঘটল? রায়বাড়ির বৌ, তোমার যে একটা ইজ্জৎ, একটা আভিজাত্য আছে!

চকিতে সুরেশ্বরীর ওষ্ঠপ্রান্তে ক্ষীণ একটা হাসির রক্তিম-রেখা জেগেই যেন মুহূর্তে আবার মিলিয়ে গেল। এবং পূর্ববৎ শান্ত কণ্ঠেই কতকটা যেন স্বগতোক্তির মতই বললেন, রায়বাড়ির বৌ, ইজ্জৎ—

হাঁ, তোমার সেটা ভোলা উচিত হয়নি।

না, ভুলিনি সে কথা। আর ভুলবোও না কোন দিন, এক্ষুণি আমি চলে যাবো, কেবল একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছিলাম।

জিজ্ঞাসা যা করবার সে ত অন্দরে গেলেও জিজ্ঞাসা করতে পারতে, তার জন্য এখানে আসবার কি প্রয়োজন ছিল? যাও, ভিতরে যাও। এখুনি আমি আসছি, যা জিজ্ঞাসা করবার ভিতরে গেলেই জিজ্ঞাসা করো।

কিন্তু ভিতরে ফিরে যাবার কোন উৎসাহই দেখালেন না সুরেশ্বরী। এবং যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনিই দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করলেন, ছাতের উপর দাঁড়িয়েছিলাম, হঠাৎ দেখলাম, শম্ভু কে একটা লোককে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে। আর লোকটা প্রতিবাদ জানাচ্ছে। কে লোকটা? কা'কে অমন করে টানতে টানতে বাইরের আঙ্গিনা দিয়ে গুমঘরের দিকে নিয়ে গেল শম্ভু?

ঘরের বধূ তুমি, রাজনীতির মধ্যে মাথা গলাতে এসো না বড়বৌ।

কিন্তু অকস্মাৎ প্রত্যুত্তরে আজ বড় বৌ সুরেশ্বরীর কণ্ঠস্বর ও জবাব দেবার ভঙ্গীতে যেন চম্‌কে উঠলেন রাজশেখর রায়।

না। আজ আর আমি চুপ করে থাকবো না। আজ তোমাকে আমার কথার জবাব দিতেই হবে।

চিরদিনের শান্ত নিঃশব্দ প্রকৃতির সুরেশ্বরী। বিবাহের পর হতে আজ পর্যন্ত যে রাজশেখরের ইচ্ছাকেই ইচ্ছা বলে মেনে এসেছেন। জীবন-সঙ্গিনী নয়, চিরদিন যাকে রাজশেখর রায় জেনে এসেছেন তাঁর ছায়াসঙ্গিনী হিসাবে। ন্যায় অন্যায়ে আনন্দে বেদনায় যে মূক নারী এত কাল তাঁরই সত্যকে সত্য বলে মেনে এসেছেন, তাঁরই মুখে আজ ঐ ধরণের কথা শুনে চম্‌কে উঠেছিলেন বৈ কি রাজশেখর রায়! বিস্ময়ের আকস্মিকতায় নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন।

ঘরের দেওয়ালগিরির আলোর খানিকটা সুরেশ্বরীর মুখের একাংশে এসে প্রতিফলিত হয়েছে। সুরেশ্বরীর চিরদিনের শান্ত নির্লিপ্ত চোখের তারা দু'টি যেন কি এক অস্বাভাবিক দ্যুতিতে ঝক্‌-ঝক্ করছে!

বড় বৌ!

হাঁ, ভুলে যেও না, এ-বাড়ির বৌ আমি, এ-বাড়ির গৃহিণী! এ সংসারের ভাল-মন্দ হিতাহিত জানবার তোমারই মত আমার সমান অধিকার আছে।

সুরেশ্বরীর শেষের কথায় রাজশেখরের দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠপ্রান্ত যেন মুহূর্তের জন্য কুঞ্চিত হয়ে উঠলো। তার পরই চাপা দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তাই না কি! তাহলে এত দিনে রায়বাড়ির গিন্নীর চেতনা হয়েছে! বেশ, তবে তোমাকেই আমি একটা প্রশ্ন করি, তোমার ক্ষণপূর্বের প্রশ্নের জবাব দেবার পূর্বে রায়গিন্নী! এতই যদি তুমি আত্ম-সচেতন এই রায়বাড়ির ইজ্জৎ আর মঙ্গলামঙ্গলের জন্য, তবে নিশ্চয়ই জেনেছিলে একমাত্র পুত্র তোমার শশাঙ্ক প্রতি রাত্রে আত্মগোপন করে কোথায় নিশি যাপনে, অভিসারে যায়?

স্বামীর কথায় সুরেশ্বরী যেন ভূত দেখার মতই চম্‌কে উঠলেন।

পুত্রের নিশি অভিসারের ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ ভাবেই সুরেশ্বরীর অজ্ঞাত ছিল, তা নয়। কন্যা মাধবীই একদিন শেখরের বিবাহের মাত্র কয়েক দিন পূর্বে তাঁর কর্ণগোচর করেছিল। কারণ, সুরেশ্বরী না দেখলেও মাধবীর দৃষ্টি শশাঙ্ক এড়াতে পারেনি। এবং যেদিন

প্রত্যুষে জ্যেষ্ঠকে নিদ্রা হতে তুলতে এসে মাধবী শশাঙ্কর ওষ্ঠে ও গালে সিন্দুরের দাগ দেখেছিল এবং বাহুমূলের ক্ষতস্থানে দামী রঙিন রেশমী শাড়ীর অংশ জড়ানো দেখেছিল, সেই দিন তার মনে সন্দেহ আরো দৃঢ়বদ্ধ হওয়াতেই মায়ের কাছে মাধবী তার সন্দেহের কথা ব্যক্ত করতে চিরন্তন নারী কৌতূহলীতে তিল মাত্রও বিলম্ব করেনি। তাই ত' তিনি পুত্রের বিবাহ দেবার জন্ত ব্যস্ত আরো বেশী হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি জ্যোতিষের গণনাকেও মানতে চাননি।

জ্যোতিষের গণনার চাইতেও বড় রকমের যে একটা আশঙ্কা তাঁর মনের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছিল!

ভীরু স্নেহকাতর জননীর মন পুত্রকে যেমন সোজাসুজি এবং স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন নি, তেমনি এই রায়বাড়ির চিরন্তন ঐতিহ্য, রক্তিতার মোহের কথাটা ভেবেই শঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ভেবেছিলেন বোধ হয় কোন মতে শেখরের বিবাহটা দিয়ে দিতে পারলেই প্রথম যৌবনের কোন চিত্তচাঞ্চল্য যদি এসেই থাকে ত' ঝিমিয়ে আসবে। অবশ্যম্ভাবী অমঙ্গলকে তিনি প্রতিরোধ করতে পারবেন।

ঘুণাক্ষরেও তিনি বুঝতে পারেননি বা হয়ত বুঝতে চাননি, তাঁর পুত্র শেখরের ধমনীতে শিরায় শিরায় রত্নেশ্বর রায়েরই রক্তধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

সে রক্তকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা শেখরেরও নেই। নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য বিধানে সেই রক্ত-ঋণকেই শোধ করতে শনৈঃ শনৈঃ আপনার অজ্ঞাতেই এগিয়ে চলেছিল শেখরও। বুঝতে পারেননি সুরেশ্বরী যে, ভানুমতীর চোখের জলের অভিশাপের ঋণ শোধ তখনও শেষ হয়নি।

তথাপি স্বামীর শেষের কথায় চমকে উঠেছিলেন সুরেশ্বরী। ঘুণাক্ষরে কারও কাছেই ত' একথা তিনি প্রকাশ করেননি। তাই নির্বাক বিস্ময়েই বুঝি তাকিয়ে ছিলেন সুরেশ্বরী স্বামীর মুখের দিকে।

কি রায়গিন্নী, জবাব দাও, একেবারে চুপ করে গেলে যে! বাক্যহারা! এই গত কয় মাস ধরে এবারে এখানে আসা অবধি প্রতি নিশি রাত্রে কোথায় যায় সে?

জানি না।

জানো না? ব্যঙ্গের সুর ফুটে ওঠে রাজশেখরের কণ্ঠে। বলেন, জান না, কিন্তু পুত্রের জননী তুমি, জানবার কথা ত' তোমারই, তা ছাড়া এইমাত্র উঁচু গলায় রায়বাড়ির গিন্নীর দম্ভ করছিলে না তুমি?

যদি গিয়েই থাকে কোথাও, রায়বাড়ির ইতিহাসে সেটা ত' নতুন নয়? কঠিন শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন এবারে সুরেশ্বরী।

চাপা তর্জনে প্রত্যুত্তর দিলেন এবারে রাজশেখর রায়। না, নতুন নয় রায়-বাড়ির পুরুষদের রাত্রে বাইরে কাটানোর ব্যাপারটা কিন্তু ভুলে যাচ্ছো। ঐ সঙ্গে একটা কথা তুমি রায়-গিন্নী, সেই বাইরেটা বরাবর ছিল এই প্রাসাদেরই চৌহদ্দির মধ্যে জলসা-ঘরে।

তাই নাকি! সুরেশ্বরীও যেন এবারে ক্ষেপে ওঠেন। বলেন, শুধুই কি জলসা-ঘর? আরাম-কুটীরটা? সেটাও কি এই বাড়িরই চৌহদ্দির মধ্যে?

এবারে যেন কয়েকটা মুহূর্ত রাজশেখর রায়ের কণ্ঠেও ভাষা ফোটে না। তার পর আবার বলেন, হাঁ, আরাম-কুটীর, ভুল করেছিলেন রত্নেশ্বর রায়। পূর্বপুরুষদের চিরদিনের জলসা-ঘরের সীমানাটাকে দূরে সেদিন আবার নতুন করে আরাম-কুটীরের মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে।

বাইরে দরজার ওধারে এমন সময় শম্ভুচরণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, হুজুর!

দাঁড়া, আমি আসছি।

বের হয়ে গেলেন রাজশেখর।

শম্ভুচরণ সসম্ভ্রমে এগিয়ে দিলো গুমঘরের ভারী লোহার চাবিটা।

চাবিটা হাতে নিয়ে রাজশেখর প্রশ্ন করলেন, সব ঠিক আছে?

হাঁ হুজুর!

শম্ভুচরণ চলে যাচ্ছিল। তাকে ডাকলেন, শম্ভু!

হুজুর।

রাঘবকে এ-ঘরে একবার পাঠিয়ে দে এখুনি।

শম্ভু নিঃশব্দে অলিন্দে ছায়ার মতই মিলিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলেন রাজশেখর, তার পর আবার ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। সুরেশ্বরীর সঙ্গে কথাটা তাঁর এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু দেখলেন ঘর শূন্য। ঘরের মধ্যে কোথায়ও সুরেশ্বরী নেই। যেমন তিনি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে ঘরে এসে প্রবেশ করেছিলেন তেমনি কখন যেন নিঃশব্দে প্রস্থান করেছেন।

পায়চারী করছিলেন ঘরের মধ্যে রাজশেখর রায়।

চন্দ্রা ও সরযূর ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব তাকে সম্পূর্ণ করতেই হবে। যত শীঘ্র পারেন সরযূ ও চন্দ্রাকে আরামকুটীর থেকে সরিয়ে ময়নামতীর প্রান্তরে পরিত্যক্ত নীল-কুঠীতে স্থানান্তরিত করে তার পর খোঁজ নিতে হবে অপর্ণার।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় একখানি মুখ। তাঁরই আত্মজ শশাঙ্কর। রায়-বংশের সমস্ত আশা, ভবিষ্যৎ। একমাত্র বংশধর।

সত্যিই কি আশ্চর্য! নিয়তির হস্তে ঘূর্ণায়মান একচক্রের চক্র-পথের মধ্যেই যেন ঘুরছে রায়-বংশের সমস্ত পুরুষগুলোর ভাগ্যফলটা। পাকচক্রে তিনি সেই চক্রপথ থেকে ছিটকে বাইরে এসে পড়লেও শেষ পর্যন্ত তাঁর সন্তান শশাঙ্ককে সেই চক্রপথেই গিয়ে পড়তে হলো বুঝি।

তাঁর মা সুধাময়ী একদিন নাকি আক্ষেপ করে বলেছিলেন, অভিশাপ! এ সেই আমার শাশুড়ীর চোখের জলের অভিশাপ।

অযোধ্যায় নবাবের দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে রত্নেশ্বর গিয়েছিলেন অযোধ্যায়। ফিরে এলেন আট মাস পরে এক মধ্যরাত্রির অন্ধকারে।

ঘোড়ায় চেপে আসছিলেন আগে আগে রত্নেশ্বর রায়, আর পশ্চাতে আসছিল বলিষ্ঠ অসুর সদৃশ ছয় কাহার-বাহিত একখানা পাল্কী। লাল সাটিনের কিংখাবে মোড়া ও রেশমী ঝালর দেওয়া। সেই পাল্কীকে ঘিরে আসছিল ষোল জন বাগদী লেঠেল। এবং সকলের পশ্চাতে ছিল আর একটি ঘোড়ার 'পরে আসীন উনত্রিশ-ত্রিশ বৎসর বয়স্ক এক সুদর্শন মুসলমান যুবক। মেহেদী-রাঙানো দাড়ি, পায়জামা ও চুড়িদার পাঞ্জাবীর উপরে সবুজ সাটিনের কুর্তা। মাথায় চুমকী-বসানো ফেজ।

পাল্কী ও পশ্চাতের ঘোড়সওয়ার রত্নেশ্বর রায়ের ইংগিতেই সোজা গিয়ে একেবারে আরাম-কুটীরের দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করল।

আনন্দ-বিহারের জন্য অনেক অর্থব্যয় করে কৃষ্ণসায়রের তীরে প্রাসাদ থেকে কিছু দূরে রত্নেশ্বর রায় আরাম-কুটীরটি তৈরী করিয়েছিলেন। এবং অযোধ্যা যাত্রার কয়েক দিন পূর্বেই মাত্র আরাম-কুটীরটি নির্মাণ শেষ হয়েছিল।

আরাম-কুটীরটি তৈরী করবার সময় রত্নেশ্বর তাঁর আদরিণী স্ত্রী ভানুমতীকে মধ্যে মধ্যে বলতেন, কুটীর তৈরী হয়ে গেলে দু'জনে গিয়ে মধ্যে মধ্যে সেখানে নির্জন অবসর যাপন করবেন।

নিজের নয়, তাই ভানুমতীর পছন্দ মতই আরাম-কুটীরটি রত্নেশ্বর সাজিয়েছিলেন। নবাবের আমন্ত্রণে অযোধ্যায় গিয়েছেন রত্নেশ্বর রায়, তাই এই কয় মাস আরাম-কুটীরটি তালা দেওয়াই ছিল।

এ গল্প শোনা রাজশেখরের তার মায়ের কাছেই!

সুধাময়ীই ছেলের কাছে গল্প করেছিলেন।

সুধাময়ী তখন রায়বাড়ির বধূরাণী। বয়স ষোল কি সতের।

রত্নেশ্বর দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর পত্র মারফৎ সংবাদ পেয়ে ভানুমতী অপেক্ষা করছিলেন সামনের রাখী পূর্ণিমার রাত্রে স্বামি-স্ত্রী দু'জনে তারা আরাম-কুটীরে গিয়ে রাত্রিটা কাটাবেন এবং রত্নেশ্বরের এসে পৌঁছাবার দিন সকাল থেকেই বার-বার তিনি দাসীর মারফৎ নায়েব কৃষ্ণলালের নিকট থেকে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন, রত্নেশ্বর আর কত দূরে।

সন্ধ্যার দিকে সংবাদ পাওয়া গেল অবশেষে রত্নেশ্বর রায় আসছেন। তারপর সত্যি সত্যিই এক সময় রত্নেশ্বর রায় কৃষ্ণসায়রে এসে পৌঁছালেন বটে, কিন্তু প্রাসাদে এলেন না।'

সংবাদ পাওয়া গেল তিনি সোজা গিয়ে উঠেছেন আরাম-কুটীরে। আর সঙ্গে এসেছে সাটিনের কিংখাবে মোড়া রেশমী ঝালর দেওয়া ছয় কাহার-বাহিত একটা পাল্কীও। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে সংবাদটা শুনলেন রত্নেশ্বর-স্ত্রী ভানুমতী।

প্রাসাদে এলেন রত্নেশ্বর পরের দিন সূর্য ওঠার পর।

তখনও দুটি চক্ষু তাঁর রঙিন নেশায় ঢুলু-ঢুলু! জড়িত পদবিক্ষেপ। এসেই সোজা একেবারে নিজের শয়নকক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

বাড়ি ভর্তি আত্মীয়-স্বজন দাস-দাসী সকলে স্তম্ভিত হয়ে রইলো, কারো মুখে একটি কথা নেই। সবাই যেন বোবা হয়ে গিয়েছে!

মা সুধাময়ীই গল্প করেছিলেন।

ভানুমতী গিয়ে স্বামীর ঘরে প্রবেশ করলেন। রত্নেশ্বর শয্যার উপরে গা ঢেলে দিয়ে অর্দ্ধমুদ্রিত চক্ষে আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করছিলেন। পদশব্দে চোখ মেলে তাকিয়ে বললেন, এস ভানুমতী!

ফিরতে এত দেরি হলো যে?

নবাব সাহেবের আমন্ত্রণ বোঝই ত'! ওদের বৎসরে মাস। মাসে দিন।

ভানুমতী স্পষ্টাস্পষ্টি সব কথা না জিজ্ঞাসা করলেও সপ্তাহকাল মধ্যে তাঁর জানতে কিছুই বাকী রইলো না। কারণ, তার পর থেকে প্রতি সন্ধ্যায় সেজে-গুজে বের হয়ে যেতেন রত্নেশ্বর। তার পর সারাটা রাত্রি আরাম-কুটিরে কাটিয়ে মত্ত অবস্থায় সকালে প্রাসাদে ফিরে আসতেন।

সারা রাত ধরে আরাম-কুটিরে শোনা যেতে লাগল মিঠে ঘুঙুরের বোল আর দরাজ-কণ্ঠে গজল গান ও সুরবাহারের ঝঙ্কার।

চারি দিকে শুরু হলো ফিস-ফিস কানাকানি।

নায়েবের কাছ থেকেই সংবাদ এলো গোপনে ভানুমতীর কাছে। আরাম-কুটিরে এসে নাকি উঠেছে এক অপরূপ সুন্দরী রাজপুতানী নর্তকী—লক্ষ্মীবাঈ আর এক মধুকণ্ঠ গায়ক দবীর খাঁ!

জমিদারী গেল, সংসার গেল, স্ত্রী-পুত্র সব ভেসে গেল সেই নর্তকীর রূপের মদিরায়।

লজ্জায় দুঃখে অপমানে অবশেষে একদিন সন্ধ্যার দিকে আরাম-কুটিরে যাবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে ভানুমতী এসে রত্নেশ্বরের ঘরে প্রবেশ করলেন।

কি চাও?

আমি একটা কথা তোমার কাছে জানতে এসেছি।

কী?

এমনি করে আমাদের সকলের গায়ে কালি ছিটাচ্ছ কেন?

পথ ছাড় ভানুমতী! বাজে কথা বলবার এখন আমার সময় নেই।

না। পথ ছাড়বো না। আরাম-কুটিরে তুমি আর যেতে পারবে না।

পথ ছাড় ভানু!...

না।

ছাড়বে না? পথ ছাড়বে না?

না। এভাবে তোমাকে আর আমি কলঙ্কিত হতে দেবো না।

নটীর রূপের নেশায় অন্ধ রত্নেশ্বর মুহূর্তে যেন হিতাহিত জ্ঞান হারালেন, প্রচণ্ড এক লাথি বসিয়ে স্ত্রীকে মাটিতে ফেলে দিলেন।

দরজার কপাটে লেগে ভানুমতীর কপাল কেটে গিয়ে একটা রক্তের ধারা নেমে এলো।

তুমি! তুমি আমাকে লাথি মারলে! আর কথা বলতে পারলেন না ভানুমতী। চোখের জলের ধারার সঙ্গে রক্তের ধারা মিশে গেল।

রত্নেশ্বর বের হয়ে গেলেন।

রাত্রি তখনও শেষ হয়নি।

মখমলের মত নরম গালিচার উপরে গা ঢেলে দিয়ে বেলোয়ারী সুরার পাত্র হাতে নেশায় ঢুলু-ঢুলু রত্নেশ্বর দবীর খাঁর মুখে দরবারী কানাড়া শুনছিলেন।

তার পাশেই গা এলিয়ে দিয়ে পড়েছিল নর্তকী লক্ষ্মীবাঈ। যৌবন ঢল-ঢল দেহখানি যেন তার এক স্তবক পদ্মের মতই মনে হচ্ছিল, লক্ষ্মীবাঈয়ের বয়স তখন চব্বিশও উত্তীর্ণ হয়নি।

নায়েব কুঞ্জলাল ছুটতে ছুটতে এসে আরাম-কুটিরের দরজায় দাঁড়ালেন এবং দ্বারীর কোন বাধা না শুনে সোজা একেবারে যে ঘরে রত্নেশ্বর ছিলেন সেই ঘরে এসে প্রবেশ করলেন। হুজুর!

একি! কুঞ্জ তুমি এখানে কেন?

সর্বনাশ হয়েছে হুজুর! বৌরাণীকে প্রাসাদের কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না।

যেখানে খুশী সে যাক! যাও বিরক্ত করো না।

দবীর খাঁ গান থামিয়ে-দিয়েছিলেন।

তাঁকে লক্ষ্য করে রত্নেশ্বর বলে উঠলেন, তুমি থামলে কেন? গাও—

দবীর খাঁ একটু ইতস্তত করে আবার গান ধরলেন। কিন্তু সে রাত্রে গান আর জমল না।

আর কেন না জানি পাশের ঘরে লক্ষ্মীর এক বৎসরের শিশু কন্যা কেঁদে কেঁদে উঠছিল সে রাত্রে। দাই কিছুতেই তাকে সামলাতে পারছিল না।

পরের দিন ভোরবেলা রত্নেশ্বর ফিরে এসে শুনলেন বৌরাণী ভানুমতীর তখনও কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি।

ভানুমতীর সন্ধান পাওয়া গেল তার পরের দিন। কৃষ্ণসাগরের জলে তার দেহটা ভেসে উঠেছিল। কিন্তু এতেও শিক্ষা হলো না রত্নেশ্বরের। বরং তার পর থেকে দিবা-রাত্র তিনি আরাম-কুটিরেই পড়ে থাকতে লাগলেন।

এমনি করেই আরো দশটা বছর কেটে গেল।

তার পর অকস্মাৎ একদিন সংবাদ পাওয়া গেল, অধিক মদ্য-পানের ফলে রত্নেশ্বর রায়ের মৃত্যু ঘটেছে আরাম-কুটিরেই!

পুত্র শশিশেখরের বয়স তখন চল্লিশ হবে। তিনি হলেন জমিদার।

কিন্তু দুর্ভাগ্য রায়বংশের! ছয়টা মাসও গেল না, শশিশেখরও গিয়ে ঢুকলেন আরাম-কুটিরে।

রাজশেখর তখন তরুণ যুবা—মাত্র উনিশ বৎসর বয়স। সেই সময়ই একদিন গোপনে আরাম-কুটিরে গিয়েছিলেন রাজশেখর।

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়লো। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শোনা গেল।

কে?

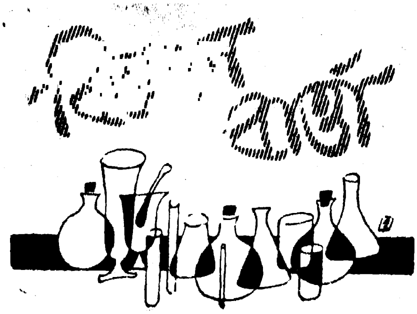
হুজুর আমি রাঘব।

রাঘব?

হাঁ আমাকে আপনি ডেকেছিলেন?

হাঁ। কোন কথা আছে জরুরী। দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে আয়।

ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে এসে রাঘব প্রভুর সামনে দাঁড়াল। [ক্রমশঃ।



পক্ষধর মিশ্র

নতুন একটি এ্যানটিবায়োটিকস্ নাম তার নিসটাটিন, আবিষ্কার করেছেন দু'জন আমেরিকান মহিলা ডাক্তার। এটি একটি নতুন এ্যানটি-ফাঙ্গাল ওষুধ যা রোগীর ওপর নিরাপদে প্রয়োগ করা চলে। এ্যানটি-ফাঙ্গাল ওষুধ যে সব এনটিবায়োটিকস্ মানুষের জানা আছে, জীবদেহে প্রয়োগ নিরাপদ না হওয়ার জন্য তাদের ব্যবহারের ঔষধিমূল্যের কোন সার্থকতাই ছিল না, সেই দিক দিয়ে নিসটাটিনের আবিষ্কার এক বিশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ মনে হয়। এর আবিষ্কর্ত্রীদ্বয় ডাঃ এলিজাবেথ হাজান এবং ডাঃ রচেল ব্রাউন নিউইয়র্ক ষ্টেটের স্বাস্থ্য বিভাগের গবেষণাগারের সঙ্গে সংযুক্ত এবং তাঁরা এই বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ আবিষ্কারের জন্য ৫০০০ ডলার মূল্যের স্কুইব পুরস্কার লাভ করেছেন। নিসটাটিন—কৃমিরোগ এবং মুখগহ্বরের ঘা সংক্রান্ত নানা প্রকার রোগ নিরাময়ের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

* * *

মহাকালের বুকে অতি উচ্চ বায়ুমণ্ডলে যে অসাধারণ মহাশক্তি বিরাজ করছে তাকে কাজে লাগাবার জন্য বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাঁরা আশা করছেন, আগামী ভবিষ্যতে হয়তো অসীম শক্তির এই বিরাট ভাণ্ডারের সহায়তায় মানুষ উচ্চাকাশে রকেট অথবা অন্য যে কোন শূন্য যান চালনা করতে সক্ষম হবে।

নিউ মেক্সিকোর "হলোম্যান এয়ার ডেভলাপমেণ্ট সেণ্টারের" বিজ্ঞানিবৃন্দ পরীক্ষা করে দেখেছেন, নাইট্রিক অক্সাইডের একটি বিশেষ গুণাগুণ আছে—যার দ্বারা এই পদার্থ দুইটি অক্সিজেন পরমাণুকে একীভূত করে একটি অক্সিজেন অণুর সৃষ্টি করে এবং তৎসঙ্গে উচ্চাকাশে সূর্য্যালোক থেকে সঞ্চিত যে শক্তি অক্সিজেন পরমাণুর মধ্যে রাসায়নিক শক্তিরূপে বিরাজ করছিল তা মুক্তি পায়। বিজ্ঞানীরা উচ্চাকাশে এই তথ্য পরীক্ষা করবার জন্য একটি রকেট প্রায় ৬০ মাইল উঁচুতে পাঠান এবং সেখানে ঐ রকেটের সাহায্যে উচ্চ চাপে নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস ছড়িয়ে দেন। ফলে সেই স্থানে একটি উজ্জ্বল আলোর বন্যা পরিলক্ষিত হয়, তার পর ধীরে ধীরে সেই আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে মহাকাশের বুকে—যতক্ষণ পর্য্যন্ত নাইট্রিক অক্সাইড গ্যাস আকাশের বুকে একেবারে পাতলা হয়ে যায়। গ্যাস ছড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলোও আসে নিষ্প্রভ হয়ে। উচ্চাকাশে নাইট্রিক অক্সাইডের সঙ্গে অক্সিজেন পরমাণুর এই প্রক্রিয়ার বিষয়ে নানা বিজ্ঞানী নানা প্রকার মত প্রকাশ করছেন। যাই হোক, এ বিষয়ে আরো গবেষণার পরে আশা করা যায়, এই সঞ্চিত মহাশক্তির ব্যবহার উচ্চাকাশ বিষয়ক গবেষণায় নতুন আলোকপাত করবে।

* * * *

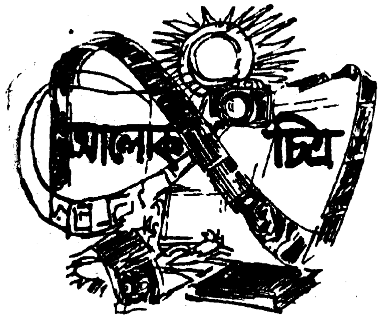
পরমাণুর যুগে বাস করছি আমরা কিন্তু পরমাণু বিষয়ক অতি সাধারণ জ্ঞান আজও সাধারণ লোকের মনে দানা বেঁধে ওঠেনি। কেবল আমাদের দেশই নয়, এ বিষয়ে পৃথিবীর অনেক অগ্রগামী দেশও পেছিয়ে আছে। আমরা পরমাণু বোমার নামে আতঙ্কে নীল হয়ে যাই—পরমাণু শক্তির ব্যবহারের দ্বারা নিজেদের সমৃদ্ধিশালী করবার আশা রাখি কিন্তু পরমাণুর সামান্যতম পরিচয়ও আমাদের জানা নেই! পরমাণুর সঠিক পরিচয়, তার শক্তির প্রকাশের কারণাকারণ, কি ভাবে তার ব্যবহার জগতের কল্যাণ আনতে পারে তার সাধারণ জ্ঞান এই বিংশ শতাব্দীর যে কোন মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। বিদেশের বিজ্ঞানীরা তাই এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন। কেবলমাত্র পত্রিকা মারফৎ প্রবন্ধ লিখে নয়, জনসাধারণের সঙ্গে বিজ্ঞানীরা ব্যক্তিগত সংযোগ স্থাপন করে এ বিষয়ে সাধারণ ধারণা মানুষের মনে প্রচার করতে চান। এই বিষয়ে আমেরিকার ন্যাশনাল ইনসাটিয়াল কনফারেন্স বোর্ডএর উত্তম প্রশংসনীয়। তাঁরা ব্যবসায়ী মহলের প্রত্যেক কর্ম্মচারীকে পরমাণু বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের জন্য "পরমাণুকে চেন"—শীর্ষক এক আন্দোলন সুরু করেছেন। পরমাণুর সঙ্গে তাঁদের কর্ম্মচারীদের পরিচয় সুরু হয়ে গেছে। নিউ-ইয়র্ক এ্যে ওয়েষ্টচেষ্টার ক্লাবে ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৩রা মার্চ্চ পর্য্যন্ত পরমাণু শক্তি বিষয়ক জ্ঞান বিতরণের জন্য তাঁরা আন্তর্জ্জাতিক তালিকা অনুযায়ী বক্তৃতামালা ও আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলেন, শিল্প-জগতের উন্নতির সঙ্গে পরমাণু শক্তির সম্বন্ধ এই সভার বিশেষ আলোচ্য ছিল। এই ধরণের বক্তৃতামালার দ্বিতীয় পর্য্যায়ের উদ্বোধন হয় ৩০শে এপ্রিল থেকে ৫ই মে পর্য্যন্ত। মৌলিক তথ্যাদি যার উপর নির্ভর করে মানুষের পরমাণু বিষয়ক জ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে, তাই অতি সহজ ভাবে সমবেত সকলকে পরিবেশন করা হয়।

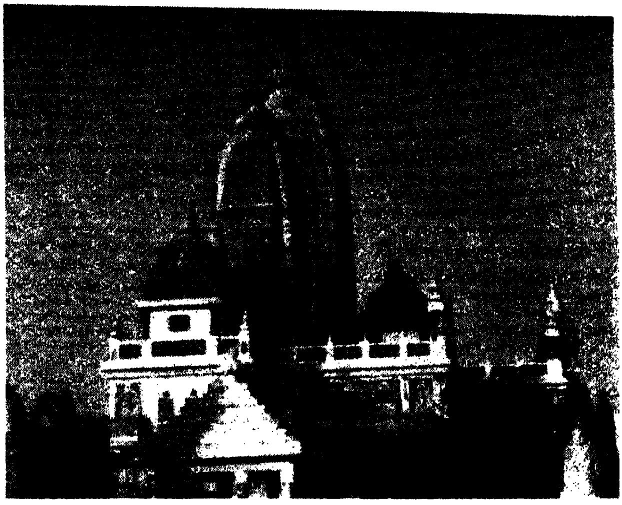
ইংল্যাণ্ডের সিভিল ডিফেন্স অর্গানাইজেসনের ডিরেক্টর জেনারেল সার সিডনে কিরক্ম্যান-এর মতে এই শিক্ষার প্রচার সর্ব্বদেশে আরও ব্যাপক ভাবে হওয়া উচিত। কেবলমাত্র জ্ঞান আহরণের জন্যই নয়, পরমাণু যুগে আত্মরক্ষার্থেই এই বিষয়ে সাধারণ জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের থাকা উচিত। যাই হোক, ব্রিটেনের পরমাণু শক্তি বিষয়ক কর্ত্তৃপক্ষ বিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় আমেরিকার মতো সক্রিয় ভাবে পরমাণু পরিচিতি সমগ্র দেশে প্রচারের কথা চিন্তা করছেন।

* * * *

রবার্ট বয়েল

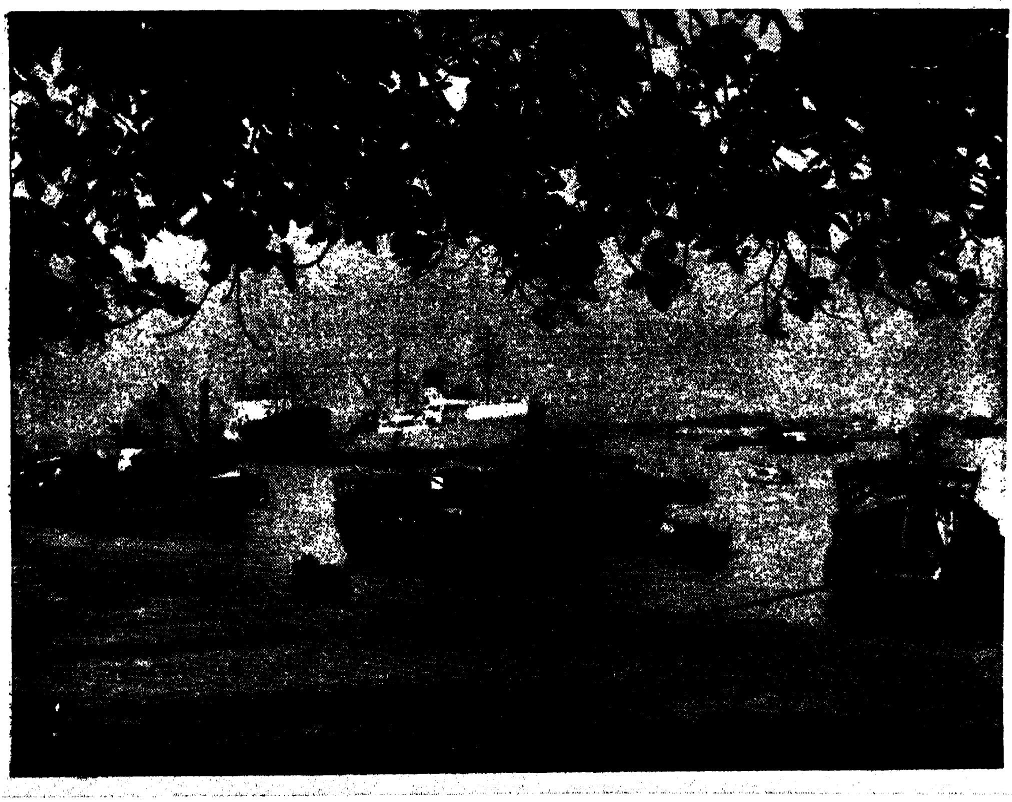
নব্যবিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ বিজ্ঞানী রবার্ট বয়েল ১৬২৭ সালের ২৫শে জানুয়ারী আয়ারল্যাণ্ডের লিসমোর দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আর্ল অব কর্ক রিচার্ড বয়েলের তিনি ছিলেন চতুর্দ্দশ সন্তান। স্বর্ণ-সন্ধানী প্রাচীন বিজ্ঞানের অবসান ঘটিয়ে ঐ মধ্যযুগে যে স্বল্প কয়েক জন মহামানব যুক্তি ও পরীক্ষামূলক সত্যানুসন্ধানের পথ নির্দ্দেশ করেছিলেন, বিজ্ঞানী সার রবার্ট বয়েলকে তাঁদের প্রধানতম বলা যায়, এবং এই কারণে





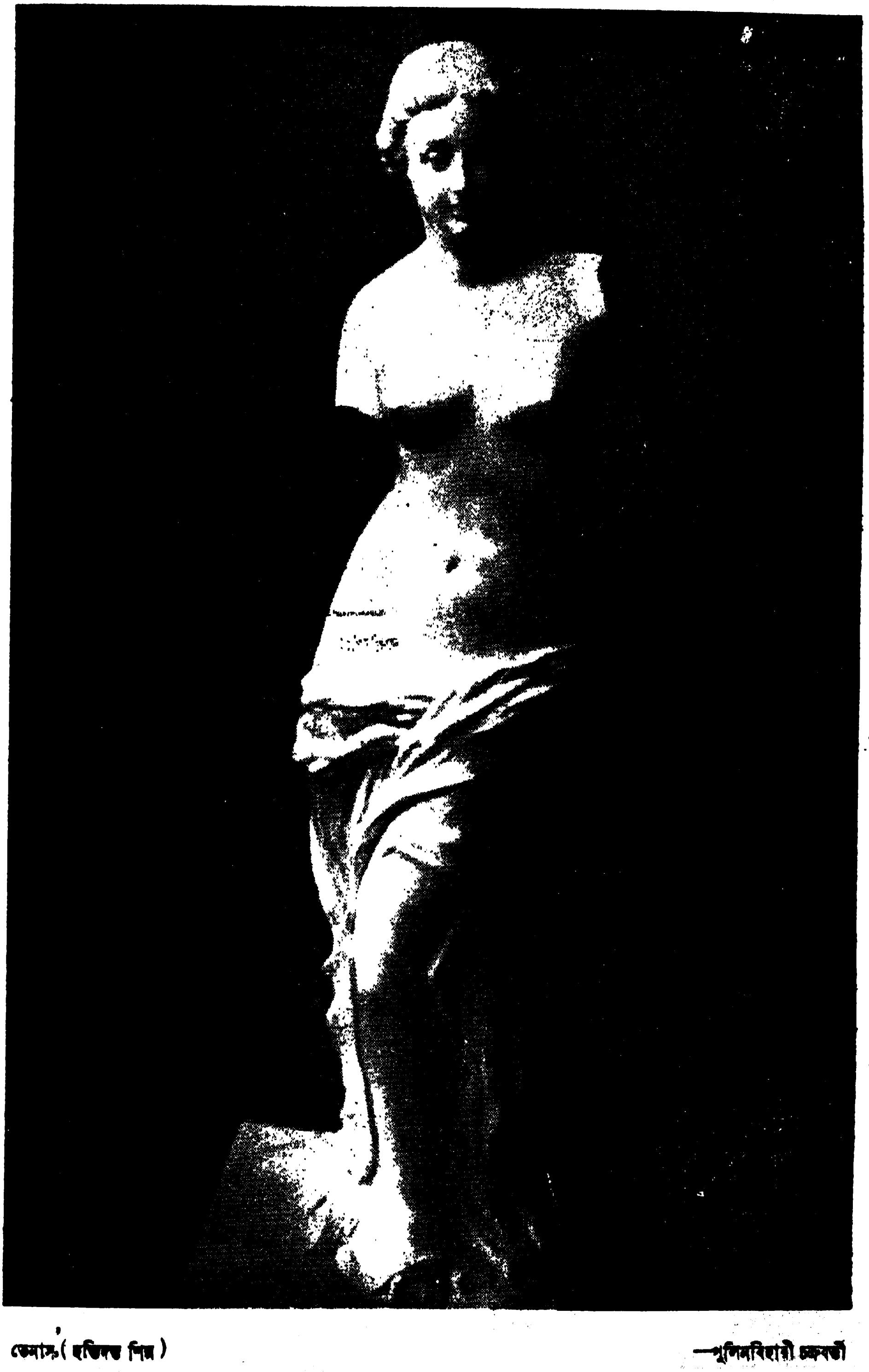
বিড়লা-মন্দির —অরুণ মুখোপাধ্যায়

বোম্বাই বন্দর —রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী

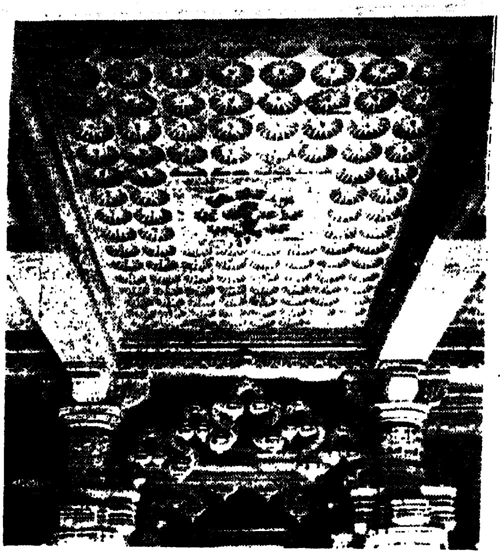




ঝুমঝুম ঝর্ণা —রামকিংকর সিংহ



ভেনাস্ (হেলিনিক শিল্প) —পুলিনবিহারী চক্রবর্তী



দিলওয়ারা, চন্দ্রাতপ —শ্রীহরি গঙ্গোপাধ্যায়
(মাউন্ট আবু)



লক্ষ্মীপেঁচা —শ্রীউষা ঘোষ

ফুলদানি —সুপ্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়





কাঠবিড়ালী —অরূপ চৌধুরী

বিজ্ঞানী বয়েল আধুনিক বিজ্ঞানের স্রষ্টা বলে সমগ্র বিশ্বে সম্মানিত হন। সাধারণ ভাবে বয়েলের সময় থেকে আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা হয়েছে সুরু।

অভিজাত বংশের সন্তান, তাই তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শিক্ষা তিনি পেয়েছিলেন। অত্যন্ত অল্প বয়সেই কয়েকটি ভাষায়, যেমন ল্যাটিন এবং ফরাসী ভাষায় অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠেন এবং তার পরে বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত করেন 'ইটনে'। ১৪ বছর বয়সে তিনি ইউরোপের কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং ১৭ বছর বয়সে ১৬৪৪ সালে ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসে যুক্তিমূলক বিজ্ঞানের সাধনায় করেন আত্মনিয়োগ। কিছুদিনের মধ্যেই এই অসাধারণ মেধাবী ছাত্র সে সময়কার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানচর্চ্চাকারী সমিতি "ইনভিজিবল কলেজ" বা অদৃশ্য কলেজের এক জন প্রতিষ্ঠাবান সভ্যরূপে পরিগণিত হন। বিজ্ঞানী অটো ভন গুয়েরিকস্ নির্ম্মিত 'এয়ার পাম্প'এর সংশোধন করে বয়েল 'মেসিনা বয়েলিয়ানা' নামক একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করেন এবং তার দ্বারা ১৬৫৯ সালে বাতাসের প্রকৃতি বিষয়ক গবেষণা করেন সুরু। এর কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হলো বিখ্যাত বয়েল'স্ 'ল' অর্থাৎ বয়েল পরীক্ষিত সত্যের মাধ্যমে জানালেন গ্যাসের আয়তন চাপের উপর নির্ভর করে। চাপ বাড়ালে আয়তন কমবে, চাপ কমালে আয়তন বাড়বে। ১৬৬৩ সালে 'ইনভিজিবল্ কলেজ' রাজা দ্বিতীয় চার্লসএর অনুমোদন লাভ করে 'রয়েল সোসাইটী অফ লণ্ডন' এতে পরিণত হলো এবং সার রবার্ট বয়েল তার একজন সভ্য মনোনীত হলেন। ১৬৮০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভাপতিও নির্ব্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু শপথ বিষয়ক এক দ্বিধায় ফলে তিনি ঐ সম্মান গ্রহণ করেন না। লণ্ডন সহরে ১৬৯১ সালের ৩০শে ডিসেম্বর সার রবার্ট বয়েল ৬৪ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

প্রাচীন বিজ্ঞান থেকে আধুনিক বিজ্ঞান। এই যুগপরিবর্ত্তনের কালে সার রবার্ট বয়েলের দান বিজ্ঞান জগৎ চিরকাল স্মরণ করবে। তিনি বিখ্যাত বয়েলস্'লএর প্রতিষ্ঠাতা, এ ছাড়াও তাঁর শব্দের প্রচারে বাতাসের দায়িত্ব, বিভিন্ন পদার্থের স্ফটিকের ঘনত্বের পরিমাপ, আলোর গতিপথের ওপর প্রভাব বিষয়ক গবেষণাও উল্লেখযোগ্য। এই কৃতী বিজ্ঞানী আরও নানা দিক দিয়ে পরীক্ষামূলক সত্যের ভিত্তিতে নব্য বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেছেন, তাঁর প্রথম পুস্তক The Sceptical Chemist ১৬৬১ সালে প্রকাশিত হয় এবং এই পুস্তকে তিনি বহু প্রাচীন ভিত্তিহীন মতবাদের তীব্র সমালোচনা করেন।

নব বর্ষ

শ্রীশান্তি পাল

হে বৈশাখ!
তব খর-সূর্য্য হোমানলে
অতীতের পতিত কঙ্কালে,
বসন্তের উৎসব-জঞ্জালে,
পুড়াইয়া কর সবে খাক্।
মাটি হ'তে হরিতের গৌরব ঘুচাও,
লক্ষ ওষ্ঠপুটে তার বারি শুষে নাও,
কুসুমের রঙীন দুকূল
লও তুমি হরি,
ফলে তারে কর পরিণত
রসে দাও ভরি।
যা' কিছু মলিন
করস্পর্শে তব হোক্ লীন,
পূরবীর তন্দ্রা ভেদি ভৈরবীর সুর
বিশ্বে ভেসে যাক্।
হে বৈশাখ!
তব শুভ আগমনে ধন্য হোক্ ধরা,—
বরাভয়করা!
মধ্যাহ্নের মাঠে বহ্নি ঢালো—
দারুণ নিরাশায় জ্বালো আশা-আলো,
বটবৃক্ষ তলে রাখো শ্রান্তিহরা ছায়া,
চূত বকুলের কুঞ্জে রাখো বিছাইয়া
সুরভিত মায়া;
চৈতালীর বিদায়ের সাথে,
তব বৈতালিক দল মাতে;
উড়িতেছে চাতকের ঝাঁক।
হে বৈশাখ!
অতীতের যত কিছু ক্ষোভ
যত কিছু হিংসা দ্বেষ লোভ,
যত কিছু দুরন্ত কামনা,
ঝঞ্ঝা-বাত বেগে
ওই তব ঈশানীর মেঘে
নাহি যেন বাঁচে এক কণা।
ওগো সর্ব্বত্যাগী!
তব পথ চেয়ে আছি জাগি;
ভাঙো আর গড়ো,
পিপাসায় কণ্ঠ ভরি দিয়া
ভয়ার্ত্ত করিয়া
নভ হতে করুণায় অশ্রুরূপে পড়ো;
হানো তব অগ্নিবাণ টঙ্কারিয়া ভয়াল পিনাক।

অন্তর্নিবেশ

[উপন্যাস]

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২১

বগলাপদ এদিন খুবই ব্যস্ত। স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকলে এ বয়সেও তিনি কঠোর পরিশ্রমে কুণ্ঠিত নন। সতীনাথ রায় ও শরদিন্দু চক্রবর্তী নামে দুই জন বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর সঙ্গে আফিসে এ সম্পর্কে আলোচনার কথা থাকায়, বেলা দশটার আগেই আহারাদি সেরে বগলাকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। সেখানেই কথা-বার্তায় প্রকাশ পায়, আগন্তুকরা প্রশান্তর মাতুল অরবিন্দ বাবুর আত্মীয়-স্থানীয় বিশিষ্ট বান্ধব। মৃত্যুর পূর্বেই তিনি বগলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এবং তাঁর কন্যা দেবীর সঙ্গে ভাগিনেয় প্রশান্তর বিবাহের প্রসঙ্গ কথাটাও পত্রযোগে জানিয়েছিলেন। এঁরা সে সময় ব্যবসায়সূত্রে গুর্জর প্রদেশে ছিলেন। সেখানে সোমনাথ মন্দিরকে কেন্দ্র করে যে সব বিরাটায়তনের হর্ম্যাদির নির্মাণকার্য চলছিল, এঁরাও কনট্রাক্টর রূপে সেই বিরাট ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। উভয়েই দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার এবং স্থপতি-বিজ্ঞানে শিক্ষিতপটু বিচক্ষণ ব্যক্তি। আত্মীয়-বন্ধু অরবিন্দ বাবুর পারিবারিক দুর্ঘটনা ও অবশেষে তাঁরও আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরা যেমন আঘাতপ্রাপ্ত হন, পক্ষান্তরে তাঁরই উত্তরাধিকারী প্রশান্তকুমার বোগলা সাহেবের মত ভাগ্যবান ও সম্ভ্রান্ত শিল্পপতিকে শ্বশুর ও অভিভাবকরূপে পাওয়ায় বিশেষ উৎফুল্ল ও আশান্বিত হয়ে ওঠেন। অরবিন্দ বাবু যে ভাগিনেয় প্রশান্তকে বিলাতে শিক্ষানবিশ রূপে স্থপতি-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা লাভের সুযোগ দেন এবং কলকাতায় স্থপতি শিল্পায়ন সম্পর্কে একটা বড় রকমের প্রতিষ্ঠান গঠনের আশা পোষণ করতেন, এমন কি সে-সম্পর্কে আত্মীয়স্থানীয় দুই অভিজ্ঞ বন্ধুর সহযোগিতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত ছিলেন—তাঁরই লিখিত পত্রগুলি পাঠ করে বগলাপদ শুধু যে নিঃসন্দেহ হলেন, তা নয়, এ হেন কৃতবিত্ত, কর্মসিদ্ধ ও অর্থশালী শিল্পপতিদের সহযোগিতায় সেই প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানটির গঠন-ব্যাপারে আগ্রহান্বিত হয়ে নিজেই প্রস্তাব করলেন: তাহলে আসুন, আমরা চার জনে মিলে প্রতিষ্ঠানটির পত্তন করি। প্রশান্ত দু-চার দিনের জন্যে বাইরে গেছে, ফিরে এলেই কাজটা সুরু করা যাবে। উপস্থিত আমরা তিন জনে মিলেই খসড়াটা তৈরী করে ফেলি।

সতীনাথ ও শরদিন্দু সম্মত হয়ে বললেন: তাহলে শুভস্য শীঘ্রম্—পরিকল্পনার কাজ আজ থেকেই আরম্ভ করা যাক।

আফিসে বসেই তিন অভিজ্ঞ শিল্পপতি বহুক্ষণ ধরে যুক্তি-পরামর্শের পর মূল পরিকল্পনাটির তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ করলেন।

আফিসেই কাজের মধ্যে বৈকালী চা ও জলযোগের প্রথম পর্ব শেষ হলো বোগলা সাহেবের সুব্যবস্থায়। এর পর আরো কিছুক্ষণ ধরে খসড়ার অবশিষ্ট সূত্রগুলি সংগ্রহের কাজ শেষ হতেই ঘড়িতে তিনটে বাজল। বগলাপদ সচকিত ভাবে বললেন: অনেক দিন একাসনে বসে একনাগাড়ে এ ভাবে কাজ করিনি। দেহ মন শ্রান্ত হলেও ভারি আনন্দ পাওয়া গেল। এখন গা তোলা যাক—খসড়াটা বাড়ীতে আমার প্রাইভেট চেম্বারেই টাইপ করা হবে। তার পরেই কুটুম্বিতা—

সতীনাথ বাবু সহাস্যে বললেন: তার মানে?

বগলাপদ বললেন: এতক্ষণ ত বিজনেস অর্থাৎ নতুন বাণিজ্যের গোড়াপত্তন হলো। কিন্তু যে মধুর সম্বন্ধটাকে উপলক্ষ করে বাণিজ্যের ভিৎ তৈরী করা গেলো, সে দিকটা চোখেও দেখেননি। তাহলে বলি শুনুন—মিষ্টিমুখের পরেই আপনাদের ভাবী বধূর মুখখানাও দেখতে হবে। ততক্ষণে কলেজ থেকে সে ফিরে আসবে। প্রশান্তও আজ ফিরতে পারে। আপনারা দু'জনেই যখন অরবিন্দদা'র পরমাত্মীয়, প্রশান্তর পক্ষ থেকে আমার কন্যা দেবীকে আপনারাই পাকা দেখার দিন আশীর্বাদ করবেন।

উভয়েই প্রসন্নমনে কথাগুলি শুনলেন। শরদিন্দু বাবু হাসতে হাসতে বললেন: খুব ভালো কথা, যদি দয়া করে ও-ভার দেন, আমরা সত্যই ভারি আনন্দ পাব।

বগলাপদ বললেন: এই দিকটা মনে হলে আমি বড়ই কষ্ট পেতাম। ভাবতাম, প্রশান্তর পক্ষে বরকর্তা হয়ে দাঁড়াতে কেউ নেই। নিজেই সে বর, নিজেই বাড়ীর কর্তা। এটা বড়ই দৃষ্টিকটু হোত। কিন্তু আমার কষ্ট বুঝে ভগবান ঠিক সময়ে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটালেন। আমরাও দু'ঘর বড় রকমের কুটুম্ব পেলাম।

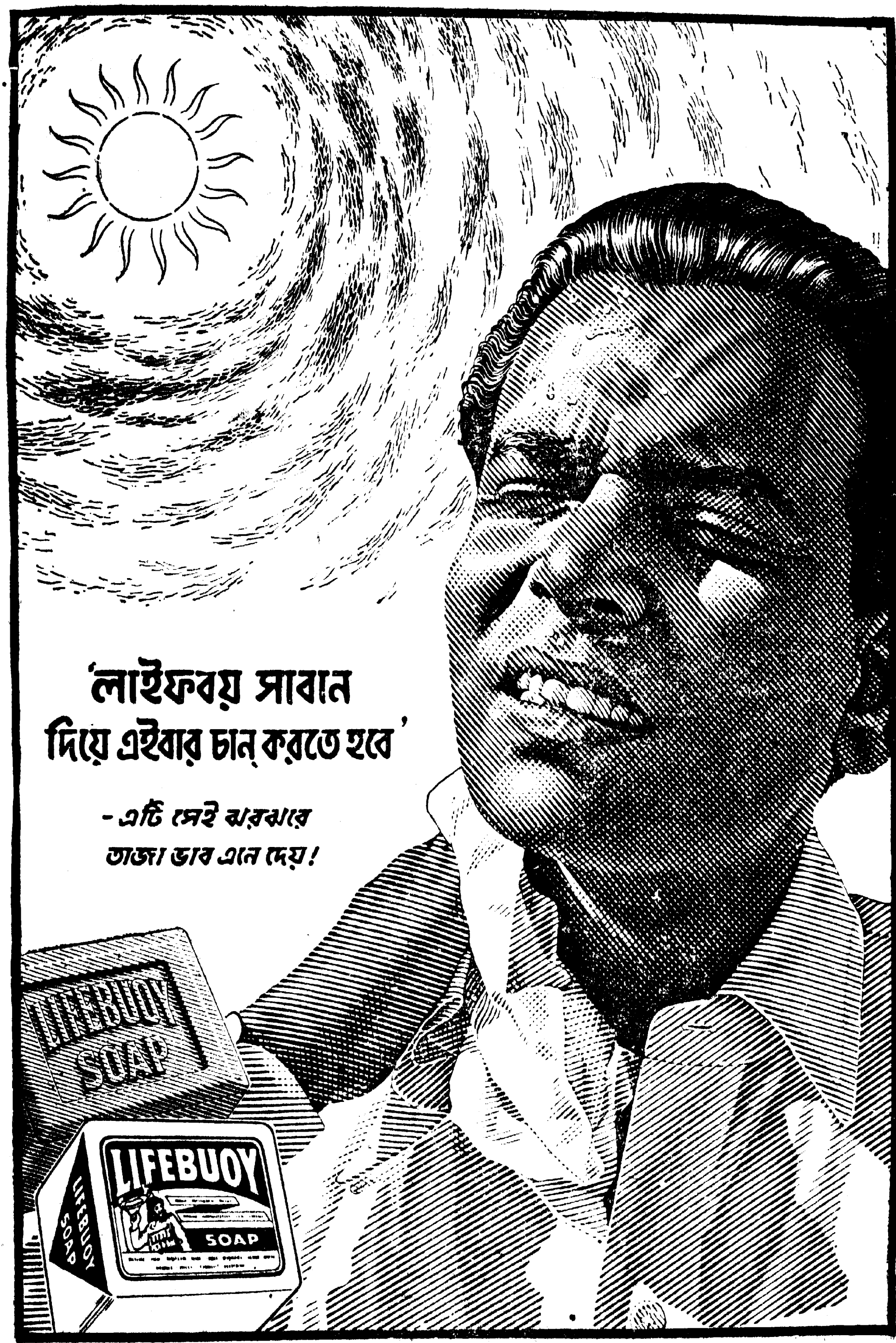
সতীনাথ বাবু বললেন: অর্থের দিক দিয়ে অরবিন্দ মস্ত ভাগ্যবান হলেও সাংসারিক ব্যাপারে, তার দুঃখের কথা মনে হলে বুকখানা যেন দমে যায়। অন্তর্যামী সেটা বুঝেছিলেন, তাই তারই উত্তরাধিকারীর পিছনে আমাদের টেনে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

এই ভাবে আলোচনা করতে করতেই তাঁরা উঠে পড়লেন। সোফার গাড়ী বার করে প্রতীক্ষা করছিল, তিন জনেই উঠে বসলেন। বোগলা ভিলা লক্ষ্য করে গাড়ী ছুটল।

দেউড়ীর ভিতর দিয়ে গাড়ী বারাণ্ডার নীচে থামতেই উর্দীপরা চাপরাশি সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে গাড়ীর দরজা খুলে দিল। গাড়ী থেকে নেমেই বগলা তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: বড় দিদিমণি কলেজ থেকে ফিরেছে?

চাপরাশি পুনরায় অভিবাদন করে বলল: না হুজুর, এখনো তিনি ফেরেননি।

বন্ধুদের অভ্যর্থনা করে বগলা সোপান-পথে উপরে উঠতে লাগলেন। উপরের বেয়ারা তাঁকে দেখেই ছুটে / । অভিবাদন


'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
- এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP

করতেই বগলা তাকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে চুপি চুপি করযাস করলেন আবদুলের উদ্দেশে। আর এক দফা অভিবাদন করে সে বাবুর্চিখানার দিকে ছুটল। নিজের চেম্বারে সবান্ধব প্রবেশ করে এবং উভয়কে বসিয়ে বগলা তাঁর রিভলভিং কেদারায় বসতে বসতে বললেন : লোকজন আসবার আগেই আমরা খসড়ার কাজটা সেরে ফেলব।

সতীনাথ ফাইলটা খুলতে খুলতে বললেন : পয়েণ্টগুলো আইটেম বাই আইটেম টাইপ করাতে পারলে—

এখনি সে ব্যবস্থা করছি।—বলেই বগলা কলিং বেল টিপে দিলেন।

পর্দাঢাকা পাশের কামরা থেকে তাঁর কেরাণী অবনী ছুটে এসে মাথা নীচু করে বলল : ইয়েস স্যার!

বগলা সতীনাথ বাবুর কাছ থেকে প্রাপ্ত লেখা কাগজগুলি অবনীকে দিয়ে বললেন : শীগ্‌গির টাইপ করে আনো। এর পর একটা প্রসপেক্টাস্ টাইপ করতে হবে।

মাথা নীচু করে সম্মতি জানিয়ে কাগজগুলি নিয়ে অবনী পাশের ঘরে প্রবেশ করল। সঙ্গে সঙ্গে টাইপরাইটিং মেশিনের শব্দে পাশাপাশি নিস্তব্ধ ঘর দু'টি মুখর হয়ে উঠল।

বগলাপদর এই খাস কামরাটি আধুনিক কায়দায় পরিপাটিরূপে সাজানো। এক দিকে রিভলভিং চেয়ার ও মেহাগনি কাঠের পালিস করা দামী টেবল—বগলার বসবার স্থান। টেবিলের দু' পাশে চারখানা করে সুদৃশ্য হাতল দেওয়া কেদারা। একটু তফাতে শুভ্র আস্তরণ দেওয়া একখানা গোল টেবিল, উপরে ফুলদানি—সব সময় কোন না কোন মরশুমি ফুলের গুচ্ছে ভরা থাকে। এই টেবিলের চার দিকে এক একখানি একানে সোফা। কাজের সুবিধার জন্ত বগলাপদ বন্ধুদের নিয়ে আগের আসন ছেড়ে এদিকে এসে বসলেন। এবং টেবিলের উপর তাঁদের পরিকল্পনার পাণ্ডুলিপি রেখে পাশে টাইপ সম্পর্কে নির্দেশগুলি রঙিন পেনসিল দিয়ে টুকে দিতে লাগলেন।

খানিক পরেই আবদুল বাবুর্চি আর একটি ছেলেকে নিয়ে চপ কাটলেট ডিমের পোচ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক উপকরণ সহ ডিসে ডিসে সাজিয়ে এনে গোল টেবিলে প্রত্যেকের কাছে কাছে এগিয়ে দিল। হঠাৎ এ ভাবে প্রচুর আহার্য দেখে দুই বন্ধু চমকে উঠে মৃদুস্বরে আপত্তি তুললেন : এ কি কাণ্ড! এত সব কেন?

বগলা বললেন : কি আর এমন। সারা দিনটা ধরে খাটুনি গেছে, শরীরটাকে চাঙ্গা না করলে মাথা খুলবে কেন? চলুক—

কথাগুলি বলতে বলতে আবদুলের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে বললেন : সোডা বরফ, আর—

কেতা দুরস্ত ভাবে সেলাম করে আবদুল বলল : এখনি হাজির করছি হুজুর!

হুজুরের ইশারা বুঝেই সেই ভাবে জবাব দিয়ে আবদুল তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং মিনিট পাঁচেক পরেই সোডা, বরফ ও গ্লাসগুলি একটা কিনারা উঁচু ট্রের উপর সাজিয়ে দু' হাতে ধরে বিশেষ সন্তর্পণে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করল। সোডার বোতল ও গেলাসগুলির মাঝখানে বিশেষ ধরণের আর একটি বোতলের মাথার দিকটা অনেকখানি উঁচু হয়ে যেন সগর্বে আত্মপরিচয় দিয়ে দুই বন্ধুর মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলল।

সতীনাথ সহাস্যে বললেন : কিছুই বাকি রাখেন নি দেখছি?

শরদিন্দু বাবুও স্মিতমুখে বললেন : সন্ধ্যার পরে হলেই ঠিক হোত—

বগলাপদ বললেন : সন্ধ্যার পরের ব্যবস্থাও আছে—আর একটা নতুন কোয়ালিটির চীজ! ওয়ারের পর এই প্রথম এসেছে।

আবদুলকে ইশারা করতেই লম্বা বোতলটির ছিপিটা সশব্দে খুলে ফেলে ভিতরের তরল পদার্থ গেলাসে গেলাসে ঢেলে দিতে আরম্ভ করল। সঙ্গের ছেলেটাও সোডার জল ও বরফ যোগান দিল। ডিসের ওপর কাঁটা-চামচগুলিও সক্রিয় হয়ে উঠল—সুপাচ্য আহার্য-সম্ভারের সুবাসের সঙ্গে গ্লাসের তরল পদার্থের ঝাঁঝালো তীব্র গন্ধে ঘরখানা ভরে গেল।

ঠিক এই সময় ঘরের রুদ্ধ কক্ষটির দরজা দু'টি সবলে ঠেলে দিয়ে প্রবেশ করলেন পশুপতি। খালি গা, পায়ে জুতা নেই, কাঁধে একখানা গামছা, মাথার পিছনে সুপুষ্ট এক গোছা শিখা, হাতে একখানা খবরের কাগজ।

স্বল্প দিবানিদ্রার পরে বিছানায় উঠে বসে এদিনের কাগজখানি পড়ছিলেন তিনি। আহারাদির পরও কৈলাস নামে যে ভৃত্যটি তাঁর তদ্বির ও পরিচর্যা করে, পশুপতি তাকে বলেছিলেন যে, কর্তা বাবু বাইরে থেকে এলেই যেন তাকে খবর দেয়। নিদ্রাভঙ্গের পর তিনিও গাত্রোত্থান করে সংবাদপত্রে মনোনিবেশ করেছেন, এমন সময় কৈলাস তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল—'বাবু এসেছেন, বাইরের ঘরেই আছেন।'

খবরটা শুনেই পশুপতি সানন্দে উঠে পড়লেন। গায়ে জামাটা দিবার, বা জুতা-জোড়াটা খুঁজে নিয়ে পায়ে গলাবারও ফুরসৎ পেলেন না। বগলা—এ বাড়ীর কর্তা বগলা এসেছেন। বারো বছর পরে তার সঙ্গে এখনি দেখা হবে! এ কি বড় সাধারণ উল্লাসের কথা। মনে পড়ে গেল—গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে সামনাসামনি মুখোমুখি বসে কত সুখ-দুঃখের কথা, কত গুজব, কত আলোচনা! বারো বছর পরে আজ আবার—

সমস্ত অন্তরটা তখন উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে, বুকের ভিতরটা টিপ টিপ করছে—বগলা এসেছে! সেই বগলার সঙ্গে তিনি দেখা করতে চলেছেন। তিনি যে এসেছেন, দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন, বগলা তার কিছুই জানে না, তাকে দেখেই বিস্ময়ে-আনন্দে-হর্ষে সে একেবারে—

কৈলাস তফাত থেকে দরজাটি দেখিয়ে চলে গেল। পশুপতির মনেও তখন একটা কৌতূহল অদম্য হয়েছে যে, এই অবস্থায় তাঁকে অকস্মাৎ দেখে ও তাঁর মুখে সম্ভাষণ শুনে প্রিয় বন্ধু বগলাও কি ভাবে হতচকিত হয়ে ওঠেন—সেটা দেখবার জন্তে। প্রায় এক যুগ পরে দেখা—একটা আনন্দময় পরিস্থিতির উদ্ভব হবারই কথা, এবং সেটি কি বড় সাধারণ উপভোগ্য বস্তু!

কিন্তু বগলার কক্ষে এভাবে প্রবেশ করে পশুপতিও হতচকিত হয়ে গেলেন—কেউ ত সেখানে নেই, আসনগুলি শূন্য অবস্থায় যেন তাঁকে ব্যঙ্গ করছে। কিন্তু সেই অবস্থায় একটা মিশ্র স্বর ও তীব্র গন্ধ অনুসরণ করে অন্ত'দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে বৈদেশিক পরিচ্ছদে পান-ভোজনে ব্যস্ত অবস্থায় যে তিন ব্যক্তির মূর্তি তাঁর সমক্ষে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল—তন্মধ্যে বারো বছর পরেও বন্ধুবর বগলার

মুখখানা তাঁকে বিভ্রান্ত করতে পারল না। এমন একটা অস্বাভাবিক পরিবেশের মধ্যেও তিনি অপ্রতিভ ভাবে অপদস্থ না হয়ে পূর্বের পল্লীসুলভ অবাধ সৌহার্দের মোহে একান্ত অসংকোচেই উচ্ছ্বসিত উল্লাসে সম্ভাষণ করলেন: এই যে বগলা—চিনতে পারছ হে?

বগলা তখন উপর্যুপরি কয়েক পাত্রের পর আর এক পাত্র পানীয় মুখসংলগ্ন করেছেন, সহযোগী বন্ধুদ্বয়েরও একই অবস্থা—এমনি সময় এই কাণ্ড! এক যুগ পূর্বের সম্বন্ধটাকে পাথেয় করে পল্লীগ্রামের সেই অবাঞ্ছিত লোকটাই এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ দিনে অতি সাধারণ ও নিতান্ত বিশ্রী বেশে তাঁর প্রাইভেট চেম্বারে পরমাত্মীয়ের মত সম্ভাষণ করছে! একেই তাঁর মস্তিষ্কের ভিতরটা তপ্ত হয়ে উঠেছে এবং সেই প্রতপ্ত স্নায়ুপুঞ্জের মধ্যে বাণিজ্যগন্ধ পরিকল্পনায় পটভূমিকায় পারিবারিক যে সম্ভাবনাটিও ফুটি ফুটি করছে—উপস্থিত দুই বিশিষ্ট অতিথির রীতিমত সংযোগ রয়েছে তার সঙ্গে। অথচ একেবারে আসন্ন শুভ পরিস্থিতিটির একেবারে প্রতিকূল এই পরিচিত অসভ্যটা অতীতের একটা সম্পর্কের ধুয়া ধরে উপদ্রবের মত উপস্থিত। মানসিক উগ্র পরিপ্রেক্ষিতেই বগলা আরো উগ্র ভাবে এই আগন্তুক উপদ্রবটির অবসান ঘটাবার উদ্দেশে কৃত্রিম, উদ্ধত ও ক্রুদ্ধভাবে রূঢ় স্বরে বলে উঠলেন: যাও, যাও—বাইরে গিয়ে ব'স।

পশুপতির মনে হতে লাগল, তাঁর পায়ের তলা থেকে এত বড় ঘরখানার কার্পেটমণ্ডিত মেঝেটা সরে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। অতি কষ্টে নিজের বিক্ষুব্ধ চিত্তটাকে সামলে নিয়ে তিনি এবার কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ ও উঁচু করে বললেন: বাইরে বসব? কাকে বলছ তুমি এ কথা? চিনেছ আমাকে—হরগৌরীপুরের পশুপতি হালদার! চিনেছ?

হাতের পানীয় ভরা গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে বগলা তেমনি উপেক্ষা ও উদ্ধত স্বরে উত্তর দিলেন: হ্যাঁ—চিনেছি বলেই ত' ও কথা বলতে হয়েছে। মরবার বয়স হতে চলল, অথচ এখনো এটিকেট শেখনি? ভদ্রলোকের প্রাইভেট চেম্বারে খবর না দিয়ে হুট করে কোন ভদ্রলোক সেঁধোয় না—এ ভদ্রতাও তোমার জানা নেই!

পশুপতির তখন সর্বাঙ্গ কাঁপছে, মাথার মধ্যে জ্বালা ধরেছে। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে কোন দিনই তাঁকে এমন এক কদর্য অবস্থার সম্মুখীন হতে হয় নি; কেউ এমন উদ্ধত ভাবে তাঁর নিজস্ব ভদ্রতাবোধকে আঘাত দিয়ে অপদস্থ করতে সাহস পায়নি। মনে সংশয় জাগল, তিনি জেগে আছেন ত'? এ অবস্থায় কণ্ঠস্বর কিঞ্চিৎ বিকৃত ও শীর্ণ করেই তিনি পুনরায় বললেন: চমৎকার! গৃহাগত পূর্বপরিচিত আত্মীয়-বন্ধুর প্রতি তোমার ব্যবহার দেখে মনে হচ্ছে, তুমি সত্যিই মিষ্টার বোগলা সাহেব—বগলা সমদ্দার নও। সে বগলা মরে গেছে, তুমি তার প্রেতাত্মা!

তর্জনের ভঙ্গিতে বগলা এবার হুমকী দিলেন: বাইরে যাও তুমি—তোমার উচ্ছ্বাস শোনবার আমার এখন সময় নেই! কে তোমাকে এখানে—বেয়ারা, বেয়ারা—

সে চীৎকারের ধ্বনি বায়ুতরঙ্গে মিশতে না মিশতেই পূর্বের সেই বেয়ারা ক্ষিপ্র পদে কক্ষে এসে সসম্ভ্রমে কুর্নিশ করতেই বোগলা সাহেব উগ্র স্বরে কৈফিয়ৎ চাইলেন: হুঁস নেই বেয়াদপ—বিনা এত্তেলায় পাকড়াগেঁয়ে এই অসভ্যটাকে—

বগলার কথায় বাধা দিয়ে গর্জন করে উঠলেন পশুপতি হালদার, তাঁর পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার এবং সেই সঙ্গে আচারনিষ্ঠ সত্যাশ্রয়ী পরিশুদ্ধ অন্তরের অভিব্যক্তি যুগপৎ আগ্নেয়গিরির গলিত তপ্ত ধাতু নিঃস্রাবের মত সবেগে নির্গত হলো: বৃথা ওকে ধমক দিচ্ছ—ওর কোন দোষ নেই। আমিই জোর করে তোমার ঘরে আসি। ভেবেছিলুম—আমাকে দেখে তুমি ধন্য হবে—সানন্দে গ্রহণ করবে। এখন বুঝেছি, তোমার অন্তঃপুরে আর তোমার এই চেম্বারে কত ব্যবধান! সেখানে মা লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হলেও, এখানে অনাচার, মিথ্যা আর শাঠ্য। হতে পারে—বোগলা সাহেব মস্ত লোক, অতুল তার ঐশ্বর্য, প্রকাণ্ড বাড়ী, বিরাট কারবার, অনেক লোকজন, কিন্তু আমি দেখছি—সব ভুয়ো, এর তলায় শুধু বালি, বগলা সমদ্দারের যে মূলধনটুকু ছিল, তাও নেই—খুইয়ে ফেলেছে। তাই—আমারো স্থান এখানে নেই।

কৈলাস বেচারী অবাক হয়ে গিয়েছিল, একই লোকের প্রতি বাড়ির গিন্নী ও কর্তার পৃথক ব্যবহার দেখে। তবে কি কসুর হয়েছে তার কাছে। পশুপতি সেটা বুঝতে পেরেই যেন তাকেও নিশ্চিন্ত করে দিলেন। সহসা তার দিকে চেয়ে কণ্ঠস্বর নরম করে তাকে বললেন: তুমি বাপু আমাকে বাইরে যাবার পথটা দেখিয়ে দেবে চল।

পরক্ষণে রুদ্ধ দরজার হাতলটা টেনে নিজেই দরজা খুলে সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কৈলাসও প্রভুর দিকে একবার তাকাল, এবং তাঁর দৃষ্টিতে বাধার কোন কারণ নেই বুঝে সেও বেরিয়ে গেল।

কক্ষের বাইরে এসে বেহারার সাহায্যে শয়নকক্ষ থেকে নিজের জামা, চাদর, পাদুকা, ছাতা ও ব্যাগটি আনিয়ে পশুপতি নীচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। বেয়ারা বেচারী এই মানুষটির প্রতি বাড়ীর গৃহিণীর বিপুল শ্রদ্ধাভক্তির সমারোহ কাণ্ড লক্ষ্য করেছিল কয়েক ঘণ্টা পূর্বে। অথচ সাহেবের কামরায় সেই সম্মানিত মানুষটির লাঞ্ছনারও সে প্রত্যক্ষদর্শী। তথাপি এভাবে গৃহত্যাগের পূর্বে গৃহিণীর সঙ্গে যাতে তাঁর আর এক বার সাক্ষাৎকার হয়, সে সম্বন্ধেও বেচারী ব্যগ্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এদিন অনেক বেলায় গৃহিণীর আহারাদির পাট শেষ হওয়ায় অনেকটা অবেলাতেই অভ্যাস মত তিনি শয়নকক্ষে বিশ্রাম করতে যান। তখনও তাঁর কক্ষদ্বার রুদ্ধ দেখে কৈলাস বেচারী তাঁকে জাগ্রত করে খবরটা দিতে আর সাহস করে নি।

বগলার কক্ষে এভাবে যে একটা অপ্রীতিকর ঘটনার উদ্ভব হবে, পশুপতির পক্ষে সেটা একেবারে কল্পনারও অতীত। গৃহিণীর আদর আপ্যায়ন তাঁকে মুগ্ধ করে। বগলার কাছেও এমনি আত্মীয়সুলভ মধুর ব্যবহারই তিনি প্রত্যাশা করেছিলেন। বহুকাল পরে আবার দুই বন্ধুর আলাপে অতীতের দিনগুলি এবং তাঁদের প্রতিশ্রুতি চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, সে সম্বন্ধে পশুপতির মনে সন্দেহের কোন অবকাশই ছিল না। বগলার বড় মেয়ে—ললিতের উদ্দেশে বাগ্দত্তা—দেবীকে দেখবার জন্য তাঁর আগ্রহই ছিল! কিন্তু এক মুহূর্তে সবই ওলট-পালট হয়ে গেল।

সিঁড়ি অতিক্রম করে নীচের গাড়ীবারান্দার সামনে পশুপতি সবে মাত্র এসেছেন, ঠিক সেই সময় দেবীকে নিয়ে বাড়ীর মোটরখানা সেখানে দাঁড়াল। সেখানকার পরিচারক গাড়ীর দরজা খুলে দিতেই কয়েকখানি বাঁধানো বই ও খাতা হাতে করে দেবী

নেমে এল। পশুপতিও গাড়ীবারান্দা থেকে নীচে নামছিলেন, কিন্তু এই অপরূপা মেয়েটিকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। দুজনেই প্রায় মুখোমুখী—উভয়েই যেন আকৃষ্ট হয়ে পরস্পরের দিকে অপলক নয়নে ক্ষণকাল তাকিয়ে রইলেন।

পশুপতিই এ-অবস্থায় আগেই সস্নেহে শুধালেন; তুমি দেবী না?

দেবীর চোখের পাতাগুলি এই প্রশ্নে কেঁপে উঠল, সেই সঙ্গে ভিতরের দু'টি তারাও যেন বড় হয়ে এই স্নেহপরায়ণ সৌম্যমূর্তি মানুষটিকে আগাগোড়া দেখে নিল। সঙ্গে সঙ্গে সবিনয়ে দেবী উত্তর দিল: আজ্ঞে হ্যাঁ, আমিই দেবী।

মনের বিক্ষোভ বিস্মৃত হয়ে পশুপতি সহর্ষে বললেন: আমি তাহলে ঠিক ধরেছি? ও! কত ছোটটি তোমাকে দেখেছিলাম, আর এখন কত বড়টি হয়েছ! আমাকে বোধ হয় চিনতে পারছ না মা? আচ্ছা—মনে করে দেখ দেখি—খুব ছোটটি তখন তোমরা! এ রকম সহর নয়—অজ পাড়াগাঁ···সেখানে থাকতে, কত খেলতে! ললিত দা'কে তোমার মনে পড়ে না? আমি তার বাবা।

দেবী একেবারে তন্ময় হয়ে গেছে। নূতন দেখা লোকটির কথাগুলি কি মিষ্টি! কানে যেন সুধাবর্ষণ করে। তার পর তিনি যেই বললেন—ললিতদা'কে মনে পড়ে? অমনি কে যেন কথাগুলো সঙ্গে সঙ্গে মিষ্টি সুরে একটা বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে দিল তার দু'টি কানের ওপর। দেবীর কান থেকে সেই নামটা মনের মধ্যেও যেন জায়গা করে নিল। 'ললিত দা'—নামটি খুব মিষ্টি না? কিন্তু কে তিনি? মনে ত পড়ছে না?···মনে মনেই ভাবতে থাকে বইখানি হাতে করে একই ভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে সেখানে। কিন্তু তার মুখ থেকে একটি কথাও বেরিয়ে আসে না, কোন প্রশ্নও না। আর, কি প্রশ্নই বা সে করবে? যা দেখছে, যা শুনছে—সবই যে নতুন। তার জানা নেই, সে কি বলবে?

একই ভাবে দেবীকে তাঁরই দিকে বিচিত্র এক ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, পশুপতিও ভাবলেন—মেয়েটার কি আগেকার কথা কিছুই মনে নেই, না—লজ্জায় চুপ করে আছে? পরক্ষণেই নিজের মনে বললেন—আমিও যেমন, আবার মিছিমিছি মায়া বাড়াচ্ছি! পরক্ষণেই একটু শক্ত হয়ে দেবীকে লক্ষ্য করে বললেন: আমি তোমাদের বাড়ীতেই এসেছিলুম, তোমার মা'র কাছেই সব শুনবে। তিনি আমাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা যত্ন করেছেন। তাতে মা কিন্তু তার পর তোমার বাবার কাছে যে ব্যবহার পেলাম—যাক্ সে কথা। হ্যাঁ, তোমার মা'কে ব'লো যে, আমি বড় আঘাত পেয়েই চলে যাচ্ছি, তাঁর সঙ্গে দেখা করতেও পারলাম না—মনের এই অবস্থায়। তবে এ অবস্থায় তোমাকে মা দেখতে পেয়ে, আর তুমি দেবী জেনে, বড় আনন্দ পেলাম। হ্যাঁ, মাকে বলবে—আমি চিঠিতে সব জানাব।

উপরের বারান্দা থেকে এই সময় কর্কশ কণ্ঠের একটা স্বর উঠল: দেবী, দেবী, কোথায় দেবী?

কার কণ্ঠস্বর সেটা চিনতে কারো বিলম্ব হলো না। পশুপতি তৎক্ষণাৎ নীচে নেমে দেউড়ীর দিকে চললেন। দেবীও ক্ষিপ্রপদে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে লাগল।

ওদিকে নিজের চেম্বারে পান-ভোজনের সময় পূর্বোক্ত অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হওয়ায় বগলা পশুপতির সম্বন্ধে একটা কল্পিত উপাখ্যান শুনিয়ে বন্ধুদের কৌতূহল নিবৃত্ত করে কথঞ্চিৎ শান্তি পেলে। এর পর পূর্ণোদ্যমে টাইপের কাজ চলতে থাকে। তারই অবসরে বগলা কক্ষের বাইরে আসেন। পশুপতির ব্যবহারে তিনি উত্তেজিত হলেও, এখন তাঁর মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পল্লী-অঞ্চলের এককালে বন্ধু নিরীহ মানুষটির সম্বন্ধে এতটা কঠিন হয়ে তিনি ভাল করেন নি।

বাহিরে এসে বেয়ারার মুখেই শুনলেন, পশুপতি তাঁর জিনিসপত্র নিয়ে চলে গেছেন। এই সময় আর এক জন ভৃত্য এসে খবর দিল—বড়দিদিমণি গাড়ী থেকে নামতেই সেই ঠাকুর মশাই তেনারে শুধোতে লেগেছেন হুজুর!

বগলাপদর মস্তিষ্কের রক্ত পুনরায় উষ্ণ হয়ে উঠল। তবে আরো কোন অপ্রীতিকর ব্যাপার সৃষ্টির সুযোগ না দিয়ে উচ্চ কণ্ঠে বার বার ডাকতে লাগলেন। তাঁর এ চাল সার্থক হলো। পশুপতি চলে গেলেন, দেবীও উপরে এসে বগলাপদর সামনে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে প্রশ্ন সূচিত হচ্ছিল।

বগলা সেটা উপলব্ধি করে কন্যাকে শুধাবার আগেই কন্যা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেই জিজ্ঞাসা করল; উনি কে বাবা? আপনি ওঁকে—

দেবীর মুখে কথাটা আটকে গেল। বগলা তার কথাটার অর্থ তৎক্ষণাৎ বুঝেই বললেন: তাড়িয়ে দিয়েছি আমার চেম্বার থেকে। লোকটা স্রেফ পাগল। কবে কোন কালে গাঁয়ে কি কথা হয়েছিল, তাই মনে করে আকাশে প্রাসাদ তৈরী করেছে। খবর না দিয়েই আমার ঘরে গিয়ে—

কি ভেবে বগলা কথাটা চাপা দিলেন, শেষ না করে। এর পরই কন্যার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন: তুমি ভিতরে যাও মা, ও সব কথা নিয়ে আলোচনা করবে না। ভাল কথা, প্রশান্তর জন দুই আত্মীয় এসেছেন, খুব সম্ভ্রান্ত আর বড় লোক। তাঁরা তোমাকে দেখবেন। আমিও একটু পরে ভিতরে যাচ্ছি।

নীরবেই দেবী ভিতরে চলে গেল। অবেলায় শুয়ে সুলোচনা দেবী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। বিলম্বে ওঠায় লজ্জিত অবস্থায় তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে সংসারের কাজ নিয়ে পড়লেন। বৈকালী জলখাবারের ব্যবস্থা এখনি করা চাই; তাড়াতাড়ি খাবারের ডিস সাজাতে বসলেন। তাঁর ধারণা, ললিতের বাবা এখনো শুয়ে আছেন; দেবী এলে তাকে দিয়েই জলখাবার পাঠাবেন। বাইরের গোলযোগের কোন কথাই ভিতরে আসেনি; সুতরাং তিনি সে সম্বন্ধে অন্ধকারেই রয়েছেন এ পর্যন্ত।

দেবী উপরে এসে পড়ার ঘরে বই-খাতা রেখে হাতমুখ ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে মায়ের সামনে এসে দাঁড়াল। কলেজ থেকে বাড়ী ফিরে এই ভাবেই সে শুদ্ধাচারে মায়ের কাছে আসে। খাবারগুলি সাজাতে সাজাতেই মা মেয়েকে লক্ষ্য করলেন, মেয়ের মুখখানা ভার-ভার। কিন্তু সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না করে সহজ ভাবেই বললেন: তোমার এক জ্যেঠামণি এখানে আজ এসেছেন দেশ থেকে। ও-ঘরে ঘুমাচ্ছিলেন, বোধ হয় এতক্ষণ উঠেছেন; তুমিই তাঁর খাবারটা নিজে নিয়ে যাও, আমিও যাচ্ছি। তোমাকে দেখলে ভারি খুশি হবেন। হ্যাঁ, খাবারের ডিস আর জল রেখেই পেন্নাম করো তাঁকে।

মায়ের কথাগুলি শুনতে শুনতেই বাইরে গাড়ীবারান্দার কাছে সেই সৌম্যমূর্তি মানুষটির কথা দেবীর মনে আরো সুস্পষ্ট হলো। সে তৎক্ষণাৎ ভারাক্রান্ত মনেই জিজ্ঞাসা করল : তুমি দেখেছ মা—তিনি এখনো ঘুমাচ্ছেন ও ঘরে ?

কন্তার মুখের পানে অপাঙ্গে একটি বার চেয়ে মা বললেন : এ কথা জিজ্ঞাসা করলি যে বড় ?

দেবী বলল : এমনি। আচ্ছা মা, যে জ্যেঠামণির কথা বললে এইমাত্র, তাঁর মাথায় কি মস্ত একটা শিখা আছে ? পণ্ডিতমশাইদের মতন জামা-কাপড় পরেন, সঙ্গে আছে ক্যাম্বিসের ব্যাগ, আর ছাতার ওপর সাদা কাপড়ের ঘেরাটোপ ?

সবিস্ময়ে মুখ তুলে কন্তার মুখের দিকে চেয়ে গৃহিণী বললেন : তুই বুঝি তাহলে ও-ঘরে উঁকি দিয়ে তোর জ্যেঠামণিকে দেখে এসেছিস ? তাঁর ব্যাগ, ছাতি আর টিকিতেও নজর পড়েছে তাহলে ?

দেবী সহজ ভাবেই বলল : তুমি বলছ, তিনি এখনো ও ঘরে শুয়ে আছেন। কিন্তু আমি ত' গাড়ী থেকে নামবার সময় তাঁকে দেখিছি —ব্যাগ আর ছাতি নিয়ে চলে যাচ্ছেন !

কথাটা শুনেই চমকে উঠে আহতকণ্ঠে গৃহিণী বলে উঠলেন : চলে যাচ্ছেন ! সে কি রে ? তুই ঠিক দেখিছিস ?

দেবী শান্ত কণ্ঠে বলল : হ্যাঁ মা, আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি দেবী না ? তার পর দুঃখ করে যে সব কথা বললেন, তাতে মনে হলো—বাবার সঙ্গে কি হয়েছে।

আর্তকণ্ঠে সুলোচনা দেবী আক্ষেপ করে উঠলেন : তবে বুঝি যে ভয় আমি করেছিলুম, তাই হয়েছে ! কাল হয়েছিল আমার ঘুমিয়ে পড়া ! হালদার মশায়ের জন্তে নিজের হাতে রান্নাবান্না করতে—

দেবী জিজ্ঞাসা করল : কেন মা ? উনি কি ঠাকুরের হাতের রান্না খান না ?

সুলোচনা দেবী বললেন : না। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত বাইরেটা ওঁর নয় রে, ভিতরটাও আচার-নিষ্ঠায় ভরা, সবই সব মেনে চলেন। সেইজন্তেই ত ওঁর জন্তে নিজে রাঁধতে বসি, তাতে অনেক বেলা হয়ে যায়। অবেলায় খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিয়েছিলুম, তাতেই এই কাণ্ড ! উনি ফিরেছেন শুনে, হয় ত নিজেই দেখা করতে যান, তাতেই—

সেই নূতন ধরণের মানুষটির সঙ্গে দেখা ও তাঁর মুখের কথাগুলি শুনে অবধি দেবীও মনে মনে কেমন একটা অস্বস্তিবোধ করছিল। এর পর সেই মানুষটির সম্বন্ধে পিতার কঠিন ও রূঢ় কথার আঘাতে তার সে অস্বস্তি হ্রাস পায়নি, বরং আরো বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে। সেই থেকেই মুখখানা রীতিমত ভার করে দেবী মায়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। মায়ের কথাতেই সে বুঝতে পারে, তিনি সযত্নে যে লোকটির জন্ত জলখাবার সাজাচ্ছেন, সে গাড়ী থেকে নেমেই তাঁর সঙ্গে কথা বলেছে এবং অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ভাবেই তাঁকে চলে যেতে দেখেছে। অথচ, সেই লোকটির সম্বন্ধে সে যেমন এখনো পর্য্যন্ত অন্ধকারে পড়ে আছে, তার মাও তেমনি তারই মুখে তাঁর চলে যাবার কথা শুনে ব্যথায় ভেঙে পড়েছেন। এ থেকেই দেবী বুঝতে পেরেছে যে, ঐ আশ্চর্য্য মানুষটির সম্বন্ধে তার মায়ের পক্ষেই এখন তার মনের অন্ধকার দিকটায় আলোকিত করা সম্ভব।

দেবী লক্ষ্য করল, কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই সুলোচনা দেবী সহসা আঁচলের দিকটা টেনে নিয়ে উভয় চোখের উদ্গত অশ্রু মুছে ফেললেন। একটু পরেই ধরা গলায় বললেন : মনের কি ভ্রান্তি ! হালদার মশাই একে ক্লান্ত হয়ে এসেছেন, তার ওপর অনেক বেলায় খাওয়া দাওয়ার পর অভ্যাসমত এখনো ঘুমুচ্ছেন ভেবে, আমি নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁর জন্তে জলখাবার সাজাচ্ছি, আর—এরই মধ্যে সব চুকে বুকে গেল ? তুই একবার কৈলেসকে ডেকে আনত মা—সে সব জানে, তাকে জিজ্ঞাস করি—কি হয়েছিল ?

দেবী তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বার মহলে বগলার চেম্বারের দিকে গেল। কৈলাস নামক বিশ্বাসী ভৃত্যটিকে এইখানে উপস্থিত থেকে নবাগত ব্যক্তিদের সঙ্গে অন্দরমহলের গৃহিণী এবং বার মহলের সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে হয়। এই কৈলাসই পশুপতিকে অন্দরমহলের পরিচারিকার তত্ত্বাবধানে সুলোচনা দেবীর কাছে পাঠিয়ে দেয়। গৃহিণীর প্রয়োজনে আহূত হলে কৈলাসের পক্ষে এ মহলে যেতে বাধা নেই। স্নানের সময় পশুপতির পরিচর্যার জন্তও কৈলাসকে ভিতর মহলে যেতে হয়েছিল, এবং সেইজন্তই নবাগত নিষ্ঠাবান মানুষটিকে বিশেষ সম্মানীয় ভেবেই সে সাহেবের চেম্বারে বিনা এত্তেলায় প্রবেশ করবার সুযোগ দিয়েছিল। এই প্রবীণ পরিচারকটি বহুদিন ধরেই পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্যরূপেই এ বাড়ীতে বাহাল আছে।

বোগলা সাহেবের চেম্বারে তখন টাইপ করা পরিকল্পনাটি নিয়ে

গভীর আলোচনা চলেছে। কৈলাসের এখন যথেষ্ট অবসর। তথাপি বাহিরের দিকে কান দু'টিকে সতর্ক রেখে সে দেবীর সঙ্গে গৃহিণীর সমক্ষে এসে তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পশুপতি সংক্রান্ত অপ্রিয় সংবাদগুলি সবই সবিনয়ে নিবেদন করল।

শুনতে শুনতেই ভাবাবেগে কপালে করাঘাত করে সুলোচনা দেবী আর্তস্বরে বলতে লাগলেন: কাল ঘুমই আমার এই সর্বনাশ ঘটালে রে। ঠিক করে রেখেছিলুম, কর্তাকে সব বলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এখনকার মত দু'দিক সামলে নেব, কিন্তু নিজের গড়িমসিতেই অনর্থ হলো! এখন কি হবে? তিনি হয়ত—

দেবীর মনের মধ্যেও কিন্তু সেই সৌম্যমূর্তি প্রবীণ মানুষটির মিষ্ট কথাগুলিই এক একটা প্রশ্নের মত হোয়ে তাকে বুঝি অস্থির করে তুলছিল। তাই সে মায়ের কথার উপরেই জিজ্ঞাসা করল: আচ্ছা মা, উনি যে বললেন—

চোখ তুলে মেয়ের দিকে চেয়ে মা শুধালেন: কি আবার বললেন?

দেবী বলল: বললেন—ললিত দা'কে তোমার মনে পড়ে? আমি তার বাবা। ললিত দা' কে মা?

মেয়ের প্রশ্নে মায়ের বুকের ভিতরটা ঢিপ-ঢিপ করে উঠল। চালদার মশাই তাহলে ললিতের কথাও বলেছেন! কিন্তু তিনি এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবেন? তাঁর মুখ যে বন্ধ! মনে মনে তিনি ইষ্টদেবীকে স্মরণ করলেন—এ সম্পর্কে তুমিই মুখ রাখো মা!

কিন্তু মা নীরব থাকলেও দেবীর জিজ্ঞাসার জবাবটা দিতে দিতে ক্রুদ্ধভাবে বগলাপদই সেখানে এগিয়ে এলেন: সেই লোকারটা বুঝি তার ক্ষ্যাপা ছেলের কথা বলে তোমার মন ভারি করে গেছে? মুছে ফেল, মুছে ফেল, মন থেকে সব মুছে ফেল মা—এই মাত্র ঐ গেঁয়ো ইতরটার মুখে যা কিছু শুনেছ।

মা ও মেয়ে উভয়েই বুঝলেন, এঁদের অগোচরে বাড়ীর কর্তা নিজেই আড়াল থেকে কথাগুলো শুনেছেন, আর সেজন্য ক্রুদ্ধও হয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্য এই যে, এ পর্যন্ত পিতার মুখের উপর তাঁর আপত্তি বা অনভিপ্রেত কোন কথাই কন্যাটি কোন দিনই বলতে অভ্যস্ত ছিল না। আজকের এই অবস্থায় তাঁর সেই কথাটার উত্তরে তাকেই তিনি অসঙ্কোচে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলতে শুনলেন: কিন্তু ওঁর কথাগুলো যেন মন্ত্রের মতন আমার মনের সঙ্গে মিশে গেছে বাবা—কিছুতেই যে মুছতে পারছি না?

এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলেই একরকম ছুটেই সে আরো ভিতরে ঠাকুরঘরের উদ্দেশে চলে গেল।

সুলোচনা দেবী স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন: শুনলে ত' মেয়ের কথা! আর বোধ হয় বুঝেছ—আমি ওকে ওখানকার সম্বন্ধে কিছুই বলিনি। এর জন্যে তুমিই দায়ী।

বগলাপদও স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন দেবীর মুখে এ রকম কথা শুনে। স্ত্রীর কাছেও কথার আঘাত পেয়ে বললেন: হ্যাঁ, পাকে প্রকারে তাই হয়ে দাঁড়াচ্ছে বটে! দেবীর সঙ্গে সেই হামবাগটার দেখা হবে ওভাবে, আর ঝাঁ করে ছেলের কথাটা বলবে, সে ত ভাবিনি। কিন্তু তুমিই ত গোড়াতে গোল পাকিয়ে রেখেছিলে!

শান্ত কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন: সংসারের গিন্নীর যা উচিত, আমি তাই করেছিলুম। দুপুর বেলায় বাড়ীতে অতিথি এলে গৃহস্থ মাত্রই তাঁকে সৎকার করে। ভেবেছিলুম, তুমি ফিরে এলে পরামর্শ করে এমন ভাবে ওঁর সঙ্গে কথা বলব, যাতে কিছু মনে না করেন। কিন্তু তুমি নিজেই গোল পাকিয়েছ। এখন আবার আমাকে দোষ দিচ্ছ? যে ব্যাভার ওঁর সঙ্গে করেছ, সহজ অবস্থায় থাকলে কেউ সে কাজ করতে পারে না। আগেকার কথা সব ভুলে, তুমি কি না তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছ?

পত্নীর কথাগুলো তীক্ষ্ণ হলেও বগলাকে সহ্য করতে হলো; বুঝলেন, স্ত্রীর প্রতি কথাটিই সত্য। আস্তে আস্তে অপরাধীর মতই বললেন: হ্যাঁ—এখন ভাবছি, কাজটা ভাল করিনি। তবে কি জানো, লোকটা হঠাৎ ঘরে ঢুকে—তাও এলো গায়ে, খালি পায়ে, মাথায় একটা ইয়া টিকি নিয়ে—যে ভাবে কথা বলল, মেজাজটাকে আর ধরে রাখতে পারিনি। কিন্তু যা হবার, তা হয়ে গেছে, এখন দেবী যাতে—

সুলোচনা দেবী একথা শুনে মুখখানা শক্ত করে বললেন: তুমি দেবীকে চেনো নি, ও তোমার রাণী নয়। ও-কথা যখনি শুনেছে, ওর মনের ভাব—মুখের ভাব সব বদলে গেছে। হোতে পারে ব্যামোর জন্যে আগেকার কথা ওর মনে নেই, কিন্তু ও যা মেয়ে, ওর নিজের মনের কাছ থেকেই সে কথা আদায় করে নেবে জেনো, আর—সেটা না পাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ও থামবে না। তার পর—যদি কোন রকমে ও জানতে পারে, তাহলে—

কিন্তু স্বামীর মুখ ও চক্ষুর রুক্ষ ভঙ্গি দেখে তিনি কথাটা না বলেই চুপ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বগলাপদ ঝাঁঝিয়ে বললেন: ও জানবে কি করে, যদি না কেউ জানিয়ে দেয়! আমার শুধু ভয় তোমাকে—

এ কথা শুনেই সুলোচনা দেবীর দুই চক্ষু যেন জ্বলে উঠল। প্রখর দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে তিনি বললেন: তোমার মন দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছে, চোখের দৃষ্টিও কমে এসেছে, তাই আমাকে তুমি সন্দেহ করছ। কিন্তু যে কোন ঠাকুর দেবতার নামে বলবে, আমি শপথ করে বলতে প্রস্তুত আছি—তুমি বারণ করার পর, ও সম্বন্ধে দেবীকে আমি কোন কথাই বলিনি, আর সে-ও জানতে চায় নি। সেই অসুখ থেকে সেরে ওঠবার পর ওর সেই ভাবের সমস্ত আবেগ মনের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু আজ তুমিই সেখানে ঘা দিয়েছ। এর পর দেবীর মনের ভাব যদি জেগে ওঠে, আমি যেমন একটুও আশ্চর্য হব না, তেমনি—এও তোমাকে বলছি, তার আগে আমার কাছ থেকে কিছুই ও জানতে পারবে না, ও সম্বন্ধে ওর কাছে আমি মুখে ছিপি এঁটে থাকব। আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, মা আর মেয়ে দু'জনকে তুমি দুটো আলাদা ঘরে তালা বন্ধ করে রাখতে পার—কেউ তাতে আপত্তি করবে না, বাধাও দেবে না।

কথাগুলো বলেই সুলোচনা দেবীও ভিতরে চলে গেলেন। বগলাপদ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তার পর বিকৃত স্বরে বলে উঠলেন: হুঁ! ভাবের আবেগ···বিবেক···যত সব—আমি মানি না, বিশ্বাস করি না।

পরক্ষণেই তিনি বাইরের ঘরের উদ্দেশে পদচালনা করলেন।

[শেষাংশের দীর্ঘতা বশতঃ আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]



আমাদের দেশে বিয়ের প্রথা আজও অতীত যুগের ধারাকেই বহন করে চলেছে। সানাইয়ের ঐক্যতান, ফুলের সৌরভ এবং নতুন জামাকাপড়ের সম্ভার আজও আমাদের বিবাহবাসরকে এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে ভরে তোলে। আর এই আনন্দময় পরিবেশে বিবাহ হয়ে ওঠে একটী স্মরনীয় ঘটনা। বিয়ের ভোজ এই শুভ অনুষ্ঠানের একটী অপরিহার্য্য অঙ্গ। সেইজন্যেই আজ হাজার হাজার পরিবার, যাঁরা নিমন্ত্রিতদের সবচেয়ে ভালধরনের খাবার পরিবেশন করতে চান—নানারকম লোভনীয় খাবারদাবার রান্না করে থাকেন ডালডা মার্কা বনস্পতি দিয়ে। তাঁরা জানেন ডালডা কত ভাল এবং বিশুদ্ধ। এছাড়াও ডালডার খরচ কত কম!

যে কোন জায়গায় ডালডা হচ্ছে বিবাহভোজ এবং আনুসাঙ্গিক আনন্দ চঞ্চলতার নিত্যসঙ্গী।

ডালডা মার্কা বনস্পতি



নাচ গান বাজনা



মেয়েলী গান

নানা শ্রেণীর মেয়েলী গান বাঙলা দেশের সর্বত্রই গাওয়া হয়। মাঘমঙ্গলের গান, ভাঁজোর গান, নীলের গান, পাল-পার্বণের গান প্রভৃতি মেয়েদেরই রচিত। গৃহস্থ ঘরে তাহারাই সেগুলি গায়। পৌষ মাসে ধান-কাটার গানের সঙ্গে আনন্দে-উৎফুল্লা গৃহস্থ-বধূরা রচনা করে নবান্নের গান, নতুন চালের পায়সের সঙ্গে প্রতি বৎসরই নূতন নূতন ভঙ্গীতে পরিবেশিত হয়।

পৌষ মাসে বাঙলার অন্তঃপুরের লক্ষ্মীমাস। ঋতুচক্রের আবর্তনে পিঠাপার্বণ উৎসবের সঙ্গে সঙ্গে এই শুভমাসের অবসান হয়। বৎসরান্তে পুনরাগমনের আশা পোষণ করিয়া গৃহলক্ষ্মীরা অশ্রু মুছিয়া কৃষি-লক্ষ্মীকে বিদায় দিতে ছড়া গায়—

এমনি ক'রে এসো পৌষ জনম জনম
আমরা যেন উপোস না যাই কোন বছর।
এসো পৌষ বড় ঘরে, এসো পৌষ খামারে
এসো পৌষ আমার ঘরের মেঝের চেপে বোস।
এমনি ক'রে এসো পৌষ এমনি ক'রেই এসো।

মাঘ মাসে শীতের আবাহনীতেও গান রচিত হয়, ব্রতপূজার অনুষঙ্গরূপে সেগুলি গীত হয়, যেমন—

এবার বড় মাঘ মাস তাতে বড় শীত।
পূর্ণিমাযা পূবের চালে উঠলে যাব শীত।
আঁচলভরা রক্তজবা সাদা ভাটির ফুল,
শিশির-ভেজা দূর্বোগুলো মুক্তা সমতুল।
ভাঙ্গাকুলো বাসি ছাই নিয়ে বসে আছি,
ঝোপের মাঝে ডাকলে পাখী রোদ পুইয়ে বাঁচি।

ব্রতকথার ছড়াগান যে সারা দেশে কত ছড়ানো আছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এই সকল ছড়ার মধ্যে পল্লীললনাদের সংস্কৃতি প্রচ্ছন্ন আছে।

আজ হেমরীর এদিক-ওদিক, কাল হেমরীর বিয়ে।
হেমরীকে নিয়ে যাবে ঢাকের বাড়ি দিয়ে।
মা কান্দবেন, মা কান্দবেন ধূলায় লুটিয়ে।
বাপ কান্দবেন, বাপ কান্দবেন দরবার বসিয়ে।
সেই যে বাপ টাকা দেছেন পেটরাটি ভরিয়ে।
ভাই কান্দবেন ভাই কান্দবেন আঁচল ধরিয়ে।
সেই যে ভাই কাপড় দিয়াছে আলনাটি সাজিয়ে।

এ ছাড়া নপুংসকদের (হিজড়ে) রচিত এক শ্রেণীর গানেরও উল্লেখ করিতে হয়। এগুলির রচয়িতা যে কে সঠিক জানা যায় না, তবে তাহাদের মুখে এগুলি চিরকালই শোনা যায়। ইহাদের মধ্যে অশ্লীলতা যথেষ্ট থাকিলেও সাহিত্যিক মূল্যও হয় ত' কিছুটা আছে। আর যাই হোক, এগুলি বাঙলা দেশের একদম ঘরোয়া গান—

খোকা দেখা লো, ছোট বউ, খোকা দেখা লো মোকে।
শাক দিয়ে মাছ ঢাকলে এখন, কি হবে বল লুকে।
হাটে যাই, বাজারে যাই, কিনে আনি শশা;
আর খাবার বেলা গাপুর গুপুর, শোবার বেলা গোসা।

সাপুড়ে বেদিনীদের গানের সুর আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীর, গীতবিদ্যায় তাহাদের একটি স্বাভাবিক শক্তি থাকে—

সাপে বাঁদরে খেলা করে ওগো নয়া নয়া সাপ।
ঢোঁড়া বোড়া জোড়া জোড়া বিশ হাত লম্বা চক্রছাড়া।
কোঁস কোঁস গোখ্‌রো, কোঁস কোঁস কেউটে,
দু'মুখো সাপ দেখ্‌নে আও, আউর কেরামতী, দাদা।

তাহাদের সাধারণ কথাবার্তার ন্যায় গানের মধ্যেও হিন্দী শব্দের বাহুল্য রহিয়াছে। ঐ গানের সুর কিন্তু সাধারণ গ্রাম্য সুরে রচিত নয়, একটি বিখ্যাত হিন্দী ঠুংরি গানের অনুকরণে রচিত। সাপুড়েরা এক বিচিত্র ঢঙে পাকানো বাঁশীর সহযোগে এ সকল গান গাহিত।

পল্লীললনাদের মন ভুলাইবার জন্য বেদেনীরা নানা ঢঙে রঙ্গরসিকতার গান অঙ্গভঙ্গী করিয়া গাহে—

নদীর কূলে ধুতুরা গাছে ধুতুরা বড় ধরে।
সেই ধুতুরার ফলটা খেলে প্রাণটা কেমন করে।
প্রাণটা করে আকুলবিকুল চক্ষু হইল নাটা।
নাটা চোখে পাগলী নাচে হাতে পানের বাটা।

বলা বাহুল্য, মনসামঙ্গল ও বেহুলার ভাসান গানই তাহাদের অধিকাংশ গানের মূল উপজীব্য। বীরভূম জেলায় এই শ্রেণীর বেদেনীদের বহু উপনিবেশ আছে—

জয় বিষহরী গো, জয় বিষহরী
চাঁদ বেনে দণ্ড দিল, তোমার কৃপায় তরি গো।
চম্পাই নগরের ধারে সাঁতালী পাহাড়
ধন্বন্তরি মন্ত্রে বাঁধা সীমেনা তার।
বিরিখ্যে মোর বৈসে গর্তে গর্তে নেউল।
বিষবৈদ্য বৈসে সেথায় বাগুলা বাউল গো।

মনসামঙ্গলের কাহিনী তাহারা নিজেদের মনোমত করিয়া গড়িয়া লইয়াছে। কালনাগিনী বেহুলার কোন ত্রুটি না পাইয়া লখীন্দরকে দংশন করিতে পারিতেছে না। শেষ রাতে বাসরঘরের প্রদীপ নিভিয়া আসিল, অতন্দ্রা, শঙ্কিতা বেহুলা ঘুম-জড়ানো চোখে ব্যস্ত

হইয়া প্রদীপের সলতেটি কনিষ্ঠ আঙুলের সাহায্যে উস্কাইয়া দিল। সন্তপর্ণা সীঁথির সিঁদুরের দিকে সে তো সতর্ক ছিল না, স্বভাববশেই তেলটুকু সে মাথায় মুছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার দোষ পাইয়া কালনাগিনী লখীন্দরকে দংশন করিল—

পিরদিমখানা নিবু নিবু মিটমিটিয়া জ্বলে,
বেউলা বাড়ায় সইলতাটিরে কনিষ্ঠ আঙুলে।
সেই যে তৈল মোছে বেউলা সীঁথির উপরে,
কালনাগিনী বলে এবার দোষ পেয়েছি ওরে।
যে বিধির কি হৈল।

অশিক্ষিতা বেদেনীরা কাহিনীর কি অপূর্ব স্বাভাবিক চরম পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছে তাহা রীতিমত লক্ষণীয়।

ইংরেজীতে যাহাকে Professional Song বা 'পেশাদারী গান' বলা হয়, বেদিয়া এবং পটুয়াদের গান তাহারই একটা রূপ। এই শ্রেণীর গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এ গানে জনসমাজের সকলের অধিকার নাই। কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের ব্যবসায়বৃত্তির সঙ্গেই এগুলি জড়িত, তাহাদের ব্যবহারিক সঙ্গীত-রূপেই এ গানগুলি রচিত ও গীত হইয়া থাকে।

বেদেদের গান তাহাদের সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা বাঁদর নাচাইবার সময়, সাপ খেলাইবার সময় নৃত্য সহযোগে গাহিয়া থাকে। গৃহস্থ ঘরের কন্যা-বধূরা সাগ্রহে উপভোগ করিলেও অন্যান্য স্ত্রীলোকদের এ সকল গান পল্লীর মহিলারা কখনো গাহে না—

সাপ খেলা দেখবি যদি আয় লো সোনা বউ।
সাপ খেলা দেখবি যদি আয়!
সাপে যখন ফণা ধরে
আলকাতরায় মায় চিকরাইয়া মরে।
মোড়াইতে মোড়াইতে সাপ গর্তে চইলা যায়।
লো সোনা বউ আমরাও যাই চইলা
মাইয়াদের মনে রাখিস নায়।
(হা কপাল)

বীরভূম জেলায় ভাঁজো গান এবং মানভূমের টুসু গান ও ভর্জা-যুদ্ধের ন্যায়ই বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যে দিয়া মেয়েরা আড়াআড়ি করিয়া গাহে। মানভূম জেলার ভাদু গান বীরভূম-বর্ধমান জেলায় ভাঁজো গানে পরিণত হইয়াছে।

এই ভাঁজো গানও ভাদ্র মাসে কৃষিজীবী সমাজের স্ত্রীলোকেরা গাহিয়া থাকে। এই ধরণের গানে দরিদ্র গৃহস্থ ঘরের স্ত্রীলোকদের দুঃখ দুর্দশাময় জীবনের ছায়াপাত হইয়াছে—

শুষনীর শাক তুলতে গেলেম শাকে ধ'রেছে পোকা।
ঢেঁকশেয়ালীর ঢেঁক শুনে, বোন, ফেলে এলেম টোকা।
ভাঁজোর লোলোক বলব কি, ভাই, জোয়ায় না ক' কথা।
কাল গিয়েছে জ্বরের পালা, আজ ধরেছে মাথা।

শ্রীজয়দেব রায়।

রেকর্ড-পরিচয়

সুপরিচিত গায়ক-গায়িকাদের অনেক নতুন রেকর্ড সম্প্রতি বেরিয়েছে, এখানে আমরা তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিচ্ছি :—

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82694—সতীনাথ মুখোপাধ্যায় দু'খানি আধুনিক গান তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভাবগম্ভীর কণ্ঠে গেয়েছেন—"বনের পাখী গায়" এবং "কে গো গাগরী ভরণে যায়"। ভাষার লালিত্যে, সুরের মাধুর্যে ও শিল্পীর নৈপুণ্যে গান দু'খানি সত্যই মনোরম হ'য়েছে।

N 82695—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ দু'খানি জনপ্রিয় আধুনিক গান গেয়েছেন "চাঁদ ডুবে গেল" এবং "তোমার কথাই মনে পড়েছে"। চমৎকার লাগলো।

N 82696—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় আধুনিক গানে প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রেছেন। বর্তমান গান দু'খানিতেও তাঁর বৈশিষ্ট্যের ছাপ পরিস্ফুট—"ওই দূর দিগন্ত কোলে" এবং "অনেক দূরের নির্জনে"।

N 82697—কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়—তরুণ শিল্পীদের মধ্যে অতি অল্প দিনেই খ্যাতিলাভ ক'রেছেন। তাঁর বর্তমান গান দু'খানি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের রচনা—"আকাশ আর এই মাটি" এবং "শিয়রে দীপ যদি"।

কলম্বিয়া

GE 24785—স্বনামধন্য ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য নতুন দু'খানি আধুনিক গান উপহার দিয়েছেন "যে রাতে বাসর জাগার" এবং "সুরে সুরে ভরা মোর"—সবারই ভালো লাগবে।

GE 24786—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের নতুন পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। তাঁর সুরেলা দরদী কণ্ঠের চমৎকার দু'টি আধুনিক গান—"মন ছুটেছে আজ" এবং "জীবনের এই বালুবেলায়"।

GE 24787—শ্রীমতী বাণী কোনার গেয়েছেন—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ রচিত ও পরিচালিত রাগপ্রধান গান "আনন্দভরা এই সুন্দর" এবং "আজি দুখ নিশি ভোর"—স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে দু'টি ভাস্বর রাগ-সংগীত।

GE 24788—কুমারী ইলা চক্রবর্তীর দু'টি ঘুমপাড়ানি গান। সত্যি ভালো লাগলো—"আয় চাঁদ আয়" এবং "ডিম ডিমা ডিম বাজি"।

এ ছাড়াও "দেবী মালিনী" এবং "শুভরাত্রি" চিত্রের গানগুলিও রেকর্ডে বেরিয়েছে।

২৫শে বৈশাখের স্মরণীয় বরণীয় দিনটিকে গীতিমুখর ক'রে তুলতে এবার "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়ায়" মোট আটখানি রেকর্ডে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রবীন্দ্র-সংগীত পরিবেশিত হ'য়েছে :—

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

N 82698—শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র—"পথে যেতে ডেকেছিলে" ও "হৃদয় আমার প্রকাশ হলো"।

N 82699—শ্যামল মিত্র—"যুগে যুগে বুঝি আমায়" ও "আমার জীবনপাত্র উছলিয়া"।

N 82700—কুমারী শ্রীলা সেন—"আমার মনের কোণের বাইরে" ও "বিরহ মধুর হলো আজি"।

কলম্বিয়া

GE 24789—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়—"জড়ায়ে আছে বাধা" ও "আর রেখো না আঁধারে"।

GE 24790—সুশীল চট্টোপাধ্যায়—"ওহে সুন্দর মরি মরি" ও "কবে আমি বাহির হলেম"।

GE 24791—কুমারী পূরবী চট্টোপাধ্যায়—"আমার বনে বনে" ও "আমার দোসর যে জন"।

GE 24792—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—"যেতে দাও গেল যারা" ও "ওগো তোরা কে যাবি পারে"।

GE 24793—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—"মিলন রাতি পোহালো" ও "যাবার বেলা শেষ কথাটি"।

প্রত্যেকটি শিল্পী তাঁদের সু-নির্বাচিত গানগুলিকে মূর্ত ক'রে তুলেছেন অন্তরের দরদ দিয়ে।

সাঙ্গীতিকী

ভবানীপুরে আশুতোষ মেমোরিয়াল হলে গীত-বিতানের পাঁচ দিবসব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসবের উদ্বোধন হয় কবিগুরুর "নটীর পূজা" গীতিনাট্যের সার্থক রূপায়ণের মধ্য দিয়ে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীযুক্ত নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করেন। ডাঃ কালিদাস নাগ, গীত-বিতানের সভাপতি হিসাবে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। শ্রীযুক্ত সিদ্ধান্ত বলেন যে, গীত-বিতানের ন্যায় প্রতিষ্ঠান কবিগুরুর লেখার মর্মার্থ সার্থক ভাবে নৃত্য, গীত, অভিনয় ও আলোচনার মাধ্যমে সাধারণের জন্য পরিবেশন করিতে পারেন। ডাঃ নাগ কলিকাতার মেয়র ও পশ্চিম বাঙ্গলার রাজ্যপাল মহাশয়কে অনুরোধ করেন যেন গীত-বিতানের প্রস্তাবিত রবীন্দ্র-স্মৃতি মন্দির গড়িয়া তুলিবার জন্য এক-খণ্ড জমির ব্যবস্থার জন্য সহায়তা করেন। ডাঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মঙ্গলাচরণের পর শ্রীনীহারবিন্দু সেনের পরিচালনায় গীত-বিতানের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক কবিগুরুর "নটীর পূজা" অপূর্ব সুর মূর্চ্ছনার সহিত পরিবেশিত হয়। শ্রীমতী কনক দাস সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এবারে লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সঙ্গীত বিশারদ' পরীক্ষায় সারা ভারতের মধ্যে প্রথম বিভাগে প্রথম হইয়াছেন শ্রীনিতাইদাস সান্যাল (নিতাই সান্যাল)। ইনি শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া কলিকাতাস্থ আর্যসঙ্গীত বিদ্যাপীঠ হইতে এই পরীক্ষা দিয়াছিলেন। ইনি একজন বেতার শিল্পী। বর্তমানে ওস্তাদ সরাফত হোসেন খাঁ এবং আতা হোসেন খাঁর নিকট ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহার পিতা শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সান্যাল একজন প্রধান সঙ্গীতশিল্পী এবং স্বর্গত রাধিকা গোস্বামীর ছাত্র। গত ২৫শে এপ্রিল বৈদ্যবাটি 'গীতমন্দির ভবনে' সঙ্গীতাচার্য গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর মৃত্যু-বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই স্মৃতিসভা স্বর্গীয় গিরিজাশঙ্করের প্রিয় ছাত্র শ্রীজগন্নাথ দাসের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ওস্তাদ কাদের বক্স ও উদ্বোধন করেন শ্রীবরদাশঙ্কর ঠাকুর। সভায় সহরের বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী ও যন্ত্রশিল্পী গান-বাজনা দ্বারা স্বর্গীয় সঙ্গীতাচার্যের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীসঙ্গীত রত্নাকর অঘোর চক্রবর্তীর ১০১তম স্মৃতি উৎসবের আয়োজন করিয়াছেন সঙ্গীত শিল্পীসঙ্ঘ (দক্ষিণ চব্বিশপরগণা, সোনারপুর) এই মে সন্ধ্যা ছয় ঘটিকায় রাজপুর বিদ্যানিধি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। উক্ত উৎসবে পৌরোহিত্য করিবেন শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিবেন শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। বাংলা দেশের বহু খ্যাতনামা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী উক্ত উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তুলিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সালিখার অন্যতম সংস্কৃতি সংস্থা 'গোবর্ধন সঙ্গীত ও সাহিত্য সমাজের' পরিচালনায় গত ২১শে এপ্রিল 'সালকিয়া হাউসে' বাংলার প্রখ্যাত শিল্পীদের লইয়া একটি সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন উল্টোরথ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅরূপ। সভাপতি মহাশয় কর্তৃক নৃত্যের পুরস্কার প্রদানের পর সঙ্গীতানুষ্ঠান আরম্ভ হয়। সঙ্গীতানুষ্ঠানে যে সকল সঙ্গীত-শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সর্বশ্রী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, উৎপলা সেন, ডাঃ ভূপেন্দ্রকুমার হাজারিকা, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণতি মুখোপাধ্যায়, দিলীপ সরকার, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন গুপ্ত, বিনয় অধিকারী, সুপ্রভা সরকার, জহর রায় এবং শ্যামল মিত্র, শ্রীকুমুদ, শ্রীদেবনাথ, পবিত্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তলাই দাস। শ্রীপুলক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমাজের সভ্যগণের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্মেলনটি সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। গত ১লা বৈশাখ সুবিখ্যাত পিয়ানো-শিল্পী ও মেসার্স আর সি দাস এ্যাণ্ড কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅনুকূলচন্দ্র দাস হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার বহুবাজারস্থিত বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার ৭৪ বৎসর বয়স হইয়াছিল। শুধু সুমিষ্ট পিয়ানো বাদনে নহে, প্রীতিপূর্ণ ও বিনম্র ব্যবহারে তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়াছিলেন। তিনি এক পুত্র, এক কন্যা, বহু আত্মীয় স্বজন, গুণমুগ্ধ বন্ধু ও ছাত্র-ছাত্রী রাখিয়া গিয়াছেন। ১১ই বৈশাখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে তাঁহার বাসভবনে তাঁহার পারলৌকিক ক্রিয়াদি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সঙ্গীত শিক্ষার বিশ বৎসরাধিক কালের সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র বাণী বিদ্যাবীথির বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব গত ৩০শে এপ্রিল থিয়েটার সেন্টার হলে সুসম্পন্ন হয়। ভারতের প্রবীণতম সঙ্গীতশিল্পী চুরানব্বই বৎসর বয়স্ক সঙ্গীতাচার্য শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটির প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপনার্থে উৎসবে উপস্থিত হন এবং সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রবীণ শিল্পীকে বাণী বিদ্যাবীথির পক্ষ থেকে মানপত্র সহ ১০১৲ টাকার তোড়া দিয়ে শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। এই উপলক্ষে যে সঙ্গীতানুষ্ঠান হয় তাতে যোগদান করেন ভরতনাট্যম ও কথক নৃত্যে কৃষ্ণা মজুমদার, পদাবলী কীর্তনে বাণী দাশগুপ্তা, ধ্রুপদ ও ধামার গানে হিমানী দাশগুপ্তা, খেয়াল গানে কল্পনা দাস ও সেতার বাজনায় রেখা সেন। সুরলোকের প্রথম বর্ষের প্রথম অধিবেশন সম্প্রতি ৫নং কালীপ্রসন্ন ব্যানার্জি রোডস্থিত শ্রীললিতমোহন

সিংহের ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সমবেত উদ্বোধন সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন বেলা সিংহ, মঞ্জুলা সিংহ, শুক্লা সেন ও ঊষা সিংহ। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন বেচু মুখোপাধ্যায়, নির্মল সরকার, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পরেশনাথ চ্যাটার্জি, মায়া মিত্র, ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যন্ত্রসঙ্গীতে কিশোর ভড়। সঙ্গতে বিশ্বনাথ দাস, কেদারশঙ্কর ও শুকদেব গোস্বামী। রাণাঘাট নগেন্দ্র সঙ্গীত পরিষদের উদ্যোগে সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের "স্মৃতি স্মরণ" উৎসব ২৮শে এপ্রিল রাণাঘাট সিনেমা হলে রাত্রি ১০টায় অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে রাণাঘাটে বাংলার খ্যাতনামা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পিগণের উপস্থিতিতে একটি সারারাত্রিব্যাপী সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করা হইয়াছে।

'সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষামন্দিরের" দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে আদর্শ শিক্ষায়তনগৃহে (বিবেকনগর) গত ১৪ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডাঃ বিমলচন্দ্র চন্দ মহাশয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সঙ্গীতাচার্য শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয়। বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক "বৈশাখ আবাহন" উদ্বোধন সঙ্গীতের পরে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ের সম্পাদক শ্রীযুক্ত মণিমোহন মুখোপাধ্যায় লিখিত দ্বিতীয় বার্ষিক বিবরণীতে বলেন যে, সঙ্গীতের ভাবাদর্শ আধুনিকতার বিকৃতিতে আজ আক্রান্ত। ব্যক্তিকেন্দ্রিক, মুনাফা প্রণোদিত সমাজ ব্যবস্থায় কল্যাণে শিক্ষা আজ ইতরজনের বেসাতিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। ইহার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী সুস্থ চেতনাসম্পন্ন শিক্ষানুরাগীদের ব্যাপক প্রয়াস প্রয়োজন। এই অঞ্চলে এই ভাবাদর্শকে উপযুক্ত অধ্যাপনার মাধ্যমে বহু বিচিত্র সঙ্গীতকলার বিভিন্ন ধারার মধ্য দিয়া বিস্তার করার উদ্দেশ্যে দুই বৎসর পূর্বে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। সংস্কৃতি অনুরাগী সঙ্গীতপিপাসু মানুষের আনুকূল্যে ও সহযোগিতায় আজ ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত। শিক্ষণীয় বিষয় সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় জানান যে, "ভাতখণ্ডে অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইতেছে। গত বৎসর হইতে সুপরিচিত সঙ্গীতশিল্পী শ্রীযুক্ত সুনীল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবনানী চ্যাটার্জি পরিচালন ব্যবস্থার সহিত জড়িত আছেন। শিক্ষণীয় বিষয় সম্পূর্ণ হইলে ডিপ্লোমা ও ডিগ্রী দিবার ভিত্তিতে সকল প্রকার কণ্ঠসঙ্গীত, যথা,—ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী, ভজন, গজল, গীত, কীর্ত্তন, শ্যামাসঙ্গীত, পল্লীগীত, রাগপ্রধান, আধুনিক প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। তিনি আরও জানান যে, এই বৎসর হইতে উদয়শংকরের সুযোগ্য ছাত্রী শ্রীসবিতা সেন এবং শ্রীকবিতা সেনের পরিচালনায় নৃত্যবিভাগ উদ্‌ঘাটিত হইবে। শ্রীযুক্ত ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আমার কথা (১৭)

গোপেন মল্লিক

[বিশেষ প্রতিনিধি লিখিত]

বাংলার স্বনামধন্য সুরকার শ্রীগোপেন মল্লিক—বয়সে হয়তো এখনও প্রবীণের পর্য্যায়ে পড়েন না, কিন্তু সুর ও সঙ্গীত সম্পর্কে আজকের দিনে তিনি এক জন 'অথরিটি'। চলচ্চিত্র জগতে সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তিনি প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন বহু দিন থেকেই! এত গুণের অধিকারী কিন্তু এ মানুষটির ভেতর অহঙ্কারের ছাপ নেই এতটুকু, সেটাই আশ্চর্য্য! 'আমার কথা' যখন ব'লতে যাবেন, দেখলুম সঙ্কোচ ও বিনয়ে তিনি একান্ত জড়সড়!

উত্তর-ক'লকাতার বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীটে আমার জন্ম। ধীরে ধীরে ব'লতে থাকেন গোপেন বাবু: আমি যখন কমলা হাই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, সে সময় থেকেই সঙ্গীতের উপর আমার ঝোঁক যায়। বয়স ছিল তখন আমার মাত্র আট কি দশ বছর। আমার বাবা ছিলেন একজন সুগায়ক। সঙ্গীত শিক্ষায় প্রথম উৎসাহ পাই আমি তাঁর কাছে। বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট ছেড়ে আমরা যখন জেলেটোলায় উঠে এলাম সে সময় কাজী নজরুলকে পেয়েছিলাম প্রতিবেশীরূপে। এটা আমার একটা সৌভাগ্যই বলতে হবে—কাজী সাহেবের সান্নিধ্যে যেয়ে সুর ও সঙ্গীতচর্চ্চায় মস্ত সুযোগ ঘটে গেল আমার। বাংলার এ বিদ্রোহী কবি ও সুর-সাধকের কাছে সে দিন যে প্রেরণা পেলুম, তা আজও ভুলতে পারিনি।

মনে পড়ে, কাজী সাহেবের বাড়ীতে বড় বড় ওস্তাদ সব গাইতে আসতেন—গোপাল সেনগুপ্ত, ইন্দুবালা, পঙ্কজ মল্লিক, কৃষ্ণচন্দ্র দে (অন্ধ গায়ক) তাঁরা। এ সকল বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাদের কাছাকাছি থেকে প্রচুর উৎসাহ পাই আমি সঙ্গীত জগতে ঢুকবার।

জেলেটোলা ষ্ট্রীটে অবিশ্যি বেশী দিন থাকা হলো না। বাবার



গোপেন মল্লিক

কাজের সুবিধের জন্যে আমাদের চলে যেতে হয় সাউথ-এ। সে অঞ্চলের সত্যভামা ইনষ্টিটিউট থেকে ১৯৩৪ সালে পাশ করলুম ম্যাট্রিক। স্কুলে যখন পড়তুম তখনই গান গাওয়ার অভ্যাস আমার ছিল। স্কুলের একটি অনুষ্ঠানে আমার গান শুনে শ্রীযুক্তা বেলা হালদার মুগ্ধ হলেন। কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে তৎকালে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। একদিন তিনি আমাকে স্বেচ্ছায় বেতার কেন্দ্রে নিয়ে গেলেন, সে দিনই আমি তাঁদের আর্টিষ্ট তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ি।

এ ভাবে যখন আমার জীবন গড়ে উঠতে লাগলো, হঠাৎ ডাক এলো একদিন সেনোলা রেকর্ড কোম্পানীর। সবে মাত্র খোলা হয়েছে তখন এ কোম্পানীটি, আমি তাঁদের এক জন শিল্পী নির্ব্বাচিত হলুম। আমাদের এ লাইনে ট্রেনিং দিতেন সে সময় শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত। ক্রমে সুরকার শ্রীসুবল দাশগুপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। তাঁর কাছ থেকেও আমি সঙ্গীত বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেছি অনেক। তার পর সঙ্গীত পরিচালক শ্রীরামচন্দ্র পালের কাছে ক্লাসিকেল গান শিখবার সুযোগ হয় আমার। সুরের আকর্ষণে সুবল বাবুর বাড়ীতে যখন যাতায়াত করতুম, সে সময় শ্রীদুর্গা সেনের (সুরশিল্পী) সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় জন্মায়।

১৯৪০ সালে আমি চলে আসি গ্রামোফোন কোম্পানীতে। আমি তখন সেখানকার হিন্দি বিভাগে কাওয়ালী গানের শিক্ষক। সে বছরই টুইন রেকর্ডে বাংলা গানের সুর দিতেও আরম্ভ করি। বহু ইসলামি গানেরও সুর দিয়েছি আমি সে দিনে। আমার সুর দেওয়া যে রেকর্ডখানি বাজারে বের হয় সেটি ছিল কাজী সাহেবের গান। এখান থেকেই শুরু হয় আমার সঙ্গীত পরিচালকের জীবন-অধ্যায়।

রেকর্ড টুইন কোম্পানী, এইচ, এম, ভি (হিজ মাষ্টারস ভয়েস) কলম্বিয়া এ সকল কোম্পানীতেও আমি কাজ করেছি সুর-শিক্ষক হিসেবে। আমার কাছ থেকে বেরিয়ে যেয়ে আজকে বহু শিল্পী আত্মপ্রতিষ্ঠ। তাঁদের ভেতর শ্রীসত্য চৌধুরী, শ্রীজগন্নাথ মিত্র, শ্রীসতীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅপরেশ লাহিড়ী, শ্রীশচীন গুপ্ত, শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তালাদ মামুদ, শ্রীগৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীমতী রেখা মিত্র (মল্লিক)—এঁদের নাম না করে পারবো না। এঁরা সকলেই আমার সুরকেই গ্রহণ করে রেকর্ড করেছেন।

সঙ্গীত পরিচালকের জীবন এখনও আমার চলেছে। এ পর্য্যন্ত ৩০ খানার অধিক ছবিতে আমি সুর ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছি। প্রথম দিকে অল্প কিছু দিন সহকারী হিসেবে অবিশ্যি কাজ করি, তার পরই পুরোপুরি চলেছে সঙ্গীত পরিচালকের ভূমিকা। ১৯৪০ সাল থেকে কয়েক বছর শ্রীকমল দাশগুপ্তের সহকারী হিসেবে কাজ করেছি। এর ভেতর 'শহর থেকে দূরে', 'নীলাঙ্গুরীয়', 'নোতুন বউ' এই কয়েকটি ছবি তৈরী হয়।

পুরোপুরি পরিচালক হিসেবে প্রথম যে ছবিতে আমি সঙ্গীত পরিচালনা করি, মনে পড়ছে সে ছবিটির নাম 'মৌচাকে ঢিল'। এর আগে অবিশ্যি 'এই তো জীবন' ছবিতে আমি ছিলুম অন্যতম সঙ্গীত পরিচালক। সম্প্রতি কয়েক বছরের মধ্যে 'ভাঙ্গাগড়া', 'মরণের পরে', 'জ্যোতিষী', 'অপরাধী', 'শুভরাত্রি', 'পরাধীন' এ কয়টি ছবির সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব আমাকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। বর্ত্তমানে নির্ম্মীয়মান 'দানের মর্য্যাদা' ছবিখানিতেও সঙ্গীত পরিচালনা করছি আমিই। এ ছবির পরিচালনা করছেন বিখ্যাত পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার।

আমার গীত বহু সঙ্গীতই অবিশ্যি রেকর্ড হয়েছে স্বনামে বা ছদ্ম নামে। একটির কথা উল্লেখ করবো, সেটি ডুয়েট রেকর্ড। 'গান্ধী প্রয়াণে' নামক এ রেকর্ডখানি আমি এবং আমার স্ত্রী শ্রীমতী রেখা মল্লিকের গাওয়া। একান্ত দরদ দিয়ে আমরা গেয়েছিলুম এ গানখানি সেদিনে।

নিবেদন

পত্রিকার একান্ত স্থানাভাব বশতঃ এবং পত্রিকার কলেবর স্ফীত হওয়ায় গত সংখ্যায় বিজ্ঞাপিত "রূপালী পর্দার কাহিনী" ও "টাকা আনা পাই" নাটক এই সংখ্যায় প্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আমাদের এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন পাঠক-পাঠিকারা।



কেনা কাটা

বাণিজ্য ও অগ্নিবিষয়ক বীমা—প্রথম কবে ?

বীমার ইতিহাস আমাদের দেশে খুব বেশী পুরাতন নয়। ব্যাঙ্ক বা সঞ্চয় ভাণ্ডার স্থাপিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় সর্ব্বপ্রথম বীমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। বর্ত্তমানে বীমা সরকারের অধীনে পরিচালিত হওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত হয়েছে। এই প্রচেষ্টা যে অত্যন্ত শুভ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের টাকায় বীমা কোম্পানীগুলি এ যাবৎ নিজেদের ব্যবসায়ে নিয়োগ ক'রতেন এবং যথেচ্ছা ব্যবহার করতেন। বীমা জাতীয়করণ হওয়ায় এই পথ রুদ্ধ হয়েছে। বাঙলা দেশে জীবনবীমা প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে বাণিজ্য এবং অগ্নিবিষয়ক বীমার ব্যবসা শুরু হয়। সওদাগরী দ্রব্যাদি দেশ-বিদেশে রপ্তানীর কাজ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে জন্য আমাদের দেশবাসীও ইংরাজ কোম্পানী সমূহের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এখানে আমরা বীমা বিষয়ক দু'টি সংবাদ পরিবেশন করছি। এই সংবাদ পাঠে পাঠক-পাঠিকা বাঙলায় বীমা ব্যবসার প্রাথমিক ইতিহাস জ্ঞাত হবেন। যথা :—

"আমরা আহ্লাদ পূর্ব্বক প্রকাশ করিতেছি যে গেজেসরিবর ইন্সোরেন্স কোম্পানি নামক এক নূতন বীমা করিবার আপিস ১লা আগষ্ট তারিখে ওলড কোর্ট ইষ্ট্রিটে শ্রীযুত পামর কোম্পানীর দপ্তরখানার বাটীর লাগাও উত্তরে ৫১ নং বাটীতে খোলা যাইবেক তৎকর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুত এন আলেক্সান্দর টি আলপোর্ট ডবলিউ এ লিবিংষ্টোন ই মেণ্ডিস সাহেবেরা আগামি বার মাহার অর্থাৎ হালসালের ১ পহিলা আগষ্ট অবধি ১৮২৭ সালের জুলাই মাহা পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মে স্থির থাকিবেন এবং ঐ বিমা কর্ম্ম কি প্রকার করিবেন তাহার ধারা এই যত্তপি কোন ব্যক্তি নৌকা যোগে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত মূল্য কলিকাতা হইতে শ্রীযুত কোম্পানি বাহাদুরের অধীন সকল দেশে নানা নদীর দ্বারা পাঠাইতে ও সে দেশ হইতে এ দেশে আনাইতে ইহার উপর বিমা করিতে বাঞ্ছা করিলে পূর্ব্বোক্ত সাহেবেরা এক পালিস অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্যাদির ঝুঁকি লইলেন এমত লিখিত এক রসিদের ন্যায় দস্তাবেজ দিবেন। আরো শুনা যাইতেছে যে সওদাগরী জিনিসের বিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত ঝুঁকি লইবেন এবং নগদ টাকা রূপা-সোনার বাসন কিম্বা গহনা এই সকলের ত্রিশ হাজার টাকা পর্য্যন্ত বিমা করিবেন অর্থাৎ ঝুঁকি লইবেন। এই সকল দ্রব্যাদির উপর বিমা করিবেন কোন মাস অবধি কোন মাস পর্য্যন্ত কোন কোন স্থানে কি হার বিমায় দাম লইবেন ঐ সাহেবেরদিগের স্থানে ইহার নিরিখের কাগুজ আছে তত্ত্ব করিলে জানিতে পারিবেন, এই কর্ম্মে শ্রীযুত হেনরি মোক চাইল্ড সাহেব কর্ম্মনির্ব্বাহক হইয়াছেন তাঁহাকে অনেকে জানিতে পারেন তাঁহার পিতা চাং চাইল্ড সাহেব অতি ধনবান এবং খ্যাত লোক ছিলেন ইহাতে বোধ হয় যে কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারিবেক এই কর্ম্ম সুন্দররূপে চলিলে আহ্লাদের বিষয় বটে যেহেতুক নৌকাযোগে নানাদেশে দ্রব্যাদি পাঠাইতে অথবা আনাইতে পথে ক্ষতি হওনের কোন সম্ভাবনা নাই, অনায়াসে অল্পব্যয়ে নিরুদ্বেগে দ্রব্যাদি পঁহুছিবে।"—২২ শ্রাবণ ১২৩৩ বঙ্গাব্দ।

বাণিজ্যবিষয়ক বীমার ব্যবসা প্রচলিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই অগ্নিবিষয়ক বীমা প্রচলনের সংবাদটি এই :—

"গত ৭ জুলাই তারিখে কলিকাতাস্থ শ্রীযুত ক্রস এলোন কোম্পানি এই ঘোষণা দিলেন যে তাঁহারা লণ্ডন নগরের এক প্রধান বীমার কুটীর পক্ষে কলিকাতা নগরে অগ্নির বিষয়ে বীমা করিবেন বিশেষত: কলিকাতাস্থ গুদাম ও কারখানা ইষ্টকাদি নির্ম্মিত গৃহ ও জাহাজ প্রভৃতির উপরে বীমা করিবেন তাঁহারা সেই গৃহ প্রভৃতির উপরে উপযুক্ত মূল্য লইবেন। পশ্চাৎ যদি সেই গৃহ প্রভৃতি অগ্নিতে দগ্ধ হয় তবে তাঁহারা বীমার আমানতী টাকা দৃষ্টে তাঁহার মূল্য দিবেন।"—৫ শ্রাবণ ১২৩৫

উপরিউক্ত দুটি সংবাদই সমাচার দর্পণ নামক সংবাদপত্র থেকে উদ্‌ধৃত হয়েছে।

ভারতীয় চা—প্রথম যুগের কথা (২)

আমাদের বহু অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকার অনুরোধে ভারতীয় চা ব্যবসায়ের প্রথম যুগের ইতিহাসের দ্বিতীয় কিস্তীর বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছে। ১৩৬২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক বসুমতীর কেনা-কাটা বিভাগ দ্রষ্টব্য। আমরা উক্ত সংখ্যায় ধর্ম্মযাজক বিশপ হেবার ও চার্লস আলেকজাণ্ডার ব্রুশ কর্ত্তৃক যথাক্রমে ভারতে চা গাছের অস্তিত্ব এবং চা শিল্প বিষয়ে গবেষণার কথা জানিয়েছি। এই ব্যবসা প্রথমে ছিল তদানীন্তন সরকারের হাতে। সরকারের আওতায় রাখলে ব্যবসা উন্নত হবে না এই ধারণায় ইংরাজ সরকার "আসাম টি কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করেন। তৎসত্ত্বেও চায়ের ব্যবসা তখনও পর্য্যন্ত জ'মে উঠলো না।

ইং ১৮২৭ অব্দে তৎকালীন ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল (রাষ্ট্রপতি !) আর্ল এ্যামহার্ষ্টকে চা চাষ এবং ব্যবসার ক্রমোন্নতির প্রতি আকৃষ্ট করলেন ডাঃ জন ফরবেশ রয়লী নামে বিখ্যাত কৃষিতাত্ত্বিক। রয়লী বৈদেশিক হ'লেও ভারতের অন্যতম নগর কানপুরে জন্মগ্রহণ করলেন ইং ১৭৯৯ অব্দে। তিনি প্রথমে বাঙলা

দেশে এ্যাসিষ্টান্ট সার্জ্জনের পদলাভ করেন। ১৮২৩—৩১ অব্দ পর্য্যন্ত সাহারাণপুরের বোটানিকাল গার্ডেনের পরিচালকের কাজ করেন। ভারতীয় বৃক্ষ ও কৃষিতত্ত্বের গবেষণায় যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। ডাঃ রয়লীর বিখ্যাত কীর্তি: Illustrations of the Bot.ny and Natural History of the Himalaya Mountains.

যাই হোক, রয়লী একটি তথ্যবহুল বিবরণ সরকার সমীপে পেশ করা সত্বেও আমহার্ষ্ট ততটা নজর দেন না। ততঃপর লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক যখন সাহারাণপুরের বোটানিকাল গার্ডেন পরিদর্শনে গেলেন ইং ১৮৩১ অব্দে, তখন ডাঃ রয়লী আবার বেণ্টিঙ্ককে এই বিষয়ে অবগত করালেন এবং তাঁর কাছেও একটি লিখিত বিবরণ পেশ করলেন। এই বিবরণে বহু কথা লিখেছিলেন তিনি। লিখেছিলেন: to attempt the cultivation of the tea plant, of which the geographical distribution is extended, and the natural sites sufficiently varied, to warrent its being easily cultivated.

ডাঃ রয়লী তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা পেলেন ডাঃ ন্যাথানিয়েল ওয়ালীচ্-এর। এই ব্যক্তি ছিলেন জাতিতে ডেন। ড্যানিস মেডিকাল সার্ভিসের কাজে বহাল হয়ে প্রথমে তিনি শ্রীরামপুরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কার্য্যালয়ে যোগদান করেন। ইং ১৮১৭—৪৬ অব্দ পর্য্যন্ত শিবপুরস্থিত কলকাতা বোটানিকাল গার্ডেনে পরিচালকের কাজ করেন। ঐতিহাসিকের মতে তিনি ছিলেন: an able and most enerjetic botanist. ডাঃ ওয়ালীচ কুমায়ুন, শ্রীহট্ট, নেপাল, পেনাং, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি স্থানগুলিতে গাছ-গাছড়া আর ওষধি সম্পর্কে প্রচুর গবেষণা চালিয়েছিলেন। ডব্লিউ ক্যারীকে তাঁর "Flora Indica" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ রচনায় ওয়ালীচ প্রচুর সাহায্য করেন। বিশেষতঃ নেপাল এবং আসামের বহু অঞ্চলে চা-গাছের বিভিন্ন নমুনা সংগ্রহের জন্ত তিনি অমানুষিক পরিশ্রম করেন। ডাঃ ওয়ালীচ ইং ১৮৩২ অব্দে হাউস অব কমন্স-এর কমিটির নিকট আবার একটি লিখিত বিবরণ পেশ করলেন। এই বিবরণে তিনি স্পষ্ট জানালেন যে, "কুমায়ুন, গাড়োয়াল, এবং শিরমুরে চা-গাছের চাষ করলে প্রচুর অর্থোপার্জ্জন সম্ভব হ'তে পারে।"

সরকারী নির্দ্দেশে তখনই একটি "টি কমিটি" স্থাপিত হয়েছিল। কমিটি তথ্যানুসন্ধানের পর জানায়: the experiment may be made with great probablity of success in the lower hills and valleys of the Himalayan range.

পরীক্ষাকার্য্যের জন্ত দু'টি স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল আলমোড়া, কুমায়ুনে। এই স্থান যথাক্রমে সমুদ্র থেকে অন্ততঃ ৪৫০০ এবং ৫০০০ ফীট উচ্চে অবস্থিত। ইং ১৮৩৪ থেকে '৪০ অব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান দু'টিতে চায়ের আবাদ চলতে থাকে পুরাদমে—বহির্বিশ্ব তখনও জানতে পারেনি এই পরীক্ষার কথা। যে চায়ের ব্যবসা থেকে ভবিষ্যতে ইংরাজ সরকার কোটি কোটি টাকা লাভ করবে সেই চায়ের চাষের কথা কি সাধারণ্যে ফাঁস করা যায়?

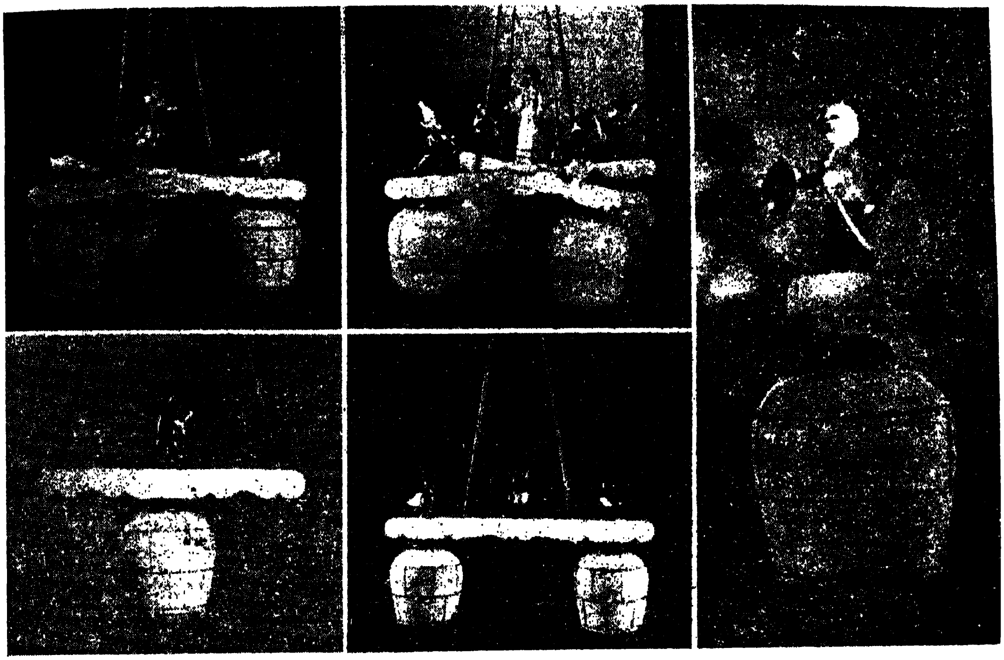
ভারতীয় চা ব্যবসার ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। আরও আছে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য—যা ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হবে আমাদের এই বিভাগে।

পশ্চিমবঙ্গে কুটিরশিল্প

শিল্পের নাম	শিল্পে নিযুক্ত কর্মীর সংখ্যা	আনুমানিক বার্ষিক উৎপাদন (হাজার টাকা)
হস্তচালিত তাঁতশিল্প (সুতী)	৩,৭৫,০০০	৮,৪০,০০
ঐ (রেশম)	১৮,০০০	১,৮০,০০
ঐ (নকল রেশম)	১,৮০০	৫,০০
ঐ (পশম)	১,৫০০	৫,০০
ঐ (পাট)	৫০০	১০,০০
তামা ও কাঁসা শিল্প	৩০,০০০	৩,০০,০০
চাষের যন্ত্রপাতি, ছুরি-কাঁচি ও লৌহজাত বাসন শিল্প	২০,০০০	৪,০০,০০
মাটির বাসনপত্র ও মূর্তি তৈরী শিল্প	২০,০০০	৭৩ ০০
কাঠের কাজ ও আসবাব শিল্প	১১,০০০	৬৪,৮০
মার্বেল ও পাথর খোদাই শিল্প	৫০০	৭,২০
মোমবাতি প্রস্তুত শিল্প	৪০০	১০,৮০
বাঁশ ও বেতের কাজ	২,৫০০	৩,৩০
হোসিয়ারী শিল্প	২৫,০০০	৩,২০,০০
ক্যালিকো ছাপা	৬০০	১৩,৫০
চর্মশিল্প	৩০,০০০	৮,০০,০০
তৈল ও সাবান শিল্প	৫,০০০	১,২৬,০০
তালা ও চাবি শিল্প	২,০০০	২৮,৮০
খেলার সরঞ্জাম শিল্প	১,০০০	১১,২০
বোতাম শিল্প	২০০	১,৩০
হাতে তৈরী কাগজ	২০০	১,৫০
হাতির দাঁতের কাজ	৫০	১,০০
চিকণ কাজ	১০০	১,২০
শিল্পের কাজ	৩,৫০০	১০,০০
বিড়ি তৈয়ারী শিল্প	৩৫,০০০	৩,০০,০০
গুড় তৈয়ারী শিল্প	৬,০০০	৭৫,০০
লবণ শিল্প	১৫,০০০	১,২৫
শাঁখা শিল্প	১২,০০০	৬০,০০
ছোবড়া শিল্প	১,০০০	১৮,০০
মাদুর শিল্প	৩০,০০০	৭০,০০

আলোর সেডে পুতুলের আশ্রয়

'আলোকের এই ঝরণাধারায় ধুইয়ে দাও', গেয়েছেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। দীপ আর দীপালীর 'পরে কত কবি কত কি লিখেছেন আজ পর্যন্ত। আগুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রদীপ আবিষ্কার হয়েছে আমাদের দেশে। এখনও এই বিজলীর যুগেও শুভক্ষণে প্রদীপ জালিয়ে দেওয়া এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান। তুলসীতলায় বাঙলায় বধূরা প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ হাতে সন্ধ্যা দিতে যান আজও।

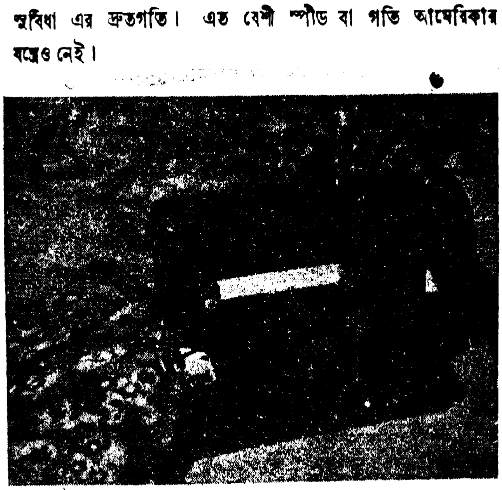


আলোর সেডে পুতুলের আশ্রয়

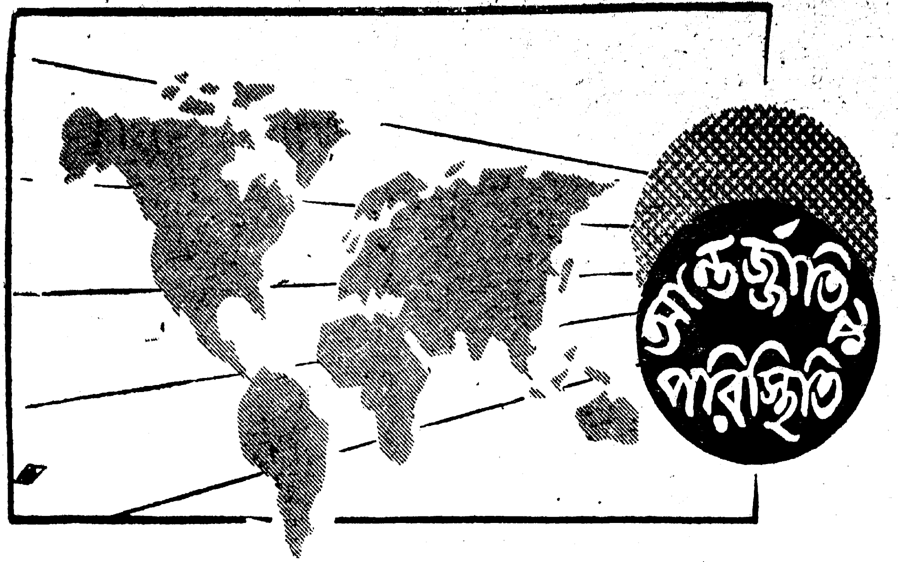
কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আজ এত বেশী আলোর প্রয়োজন হয়েছে যে, শুধু মাত্র প্রদীপ আর হ্যারিকেন জ্বালিয়ে আমাদের কাজ মেটে না। বিজলীর কৃপায় এই অসুবিধা দূর হয়েছে। বিরাট একখানি হলঘরে একটি মাত্র প্রদীপের আলো টিমটিমে ঠেকবে না কি? আলোর চেয়ে বেশী আঁধারের সৃষ্টি করবে নিশ্চয়ই। তাই সাজঘর, বৈঠকখানা, শয়নকক্ষের জন্য নিত্য নতুন আলোর সেডের ডিজাইন আবিষ্কৃত হচ্ছে সমগ্র দুনিয়ার। আমরা এই সঙ্গে এমন সব আলোর সেডের নমুনা ছেপেছি, লক্ষ্য করবেন, সেগুলি শুধু সেই মামুলী সেড নয়। সেডের সাজ-সজ্জার জন্য পুতুলদের পর্য্যন্ত ডাক প'ড়েছে। কাচের আর প্ল্যাষ্টিকের হরেক রকম পুতুলদের আশ্রয় দিয়ে সেগুলির কি অপূর্ব্ব রূপ খুলেছে বলুন তো? আমাদের দেশীয় কাচ ব্যবসায়ীরা এই ধরণের আলোর সেড অনায়াসে বাজারে বিক্রী করতে পারেন।

সেলাই যন্ত্রের একটি নমুনা

একটি সেলাই কল না থাকলে চলে না মেয়েদের ঘরকন্না। কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কোমল করকমল হার মানবে। মহিলাদের নরম হাত এক ঘণ্টায় যতটা সেলাই করবে, তার দশগুণ বেশী সেলাই করবে হাতে কিংবা পায়ে-চালানো সেলাই কল। সিঙ্গারের সেলাই যন্ত্রের নাম আজ মুখে মুখে পরিচিত হ'লেও আমরা অধুনা (দেশের শিল্প দেশেতে রাখতে।) দেশী সেলাই যন্ত্র নির্ব্বিচারে কিনছি এবং ব্যবহারে সুফল লাভ করছি। সিঙ্গার আমেরিকার তৈরী কিন্তু উষা, রাণী আর মল্লিকের সেলাই যন্ত্র এই বাঙলা দেশেই তৈরী হচ্ছে। এই সঙ্গে প্রকাশিত সেলাই যন্ত্রের ছবিখানি জার্ম্মাণ দেশের সেলাই-কলের। এ যন্ত্রটিতে দেখুন, যান্ত্রিক ঝামেলাগুলি বেমালুম ঢাকা দেওয়া হয়েছে। এই যন্ত্রের বিশেষ সুবিধা এর দ্রুতগতি। এত বেশী স্পীড বা গতি আমেরিকার যন্ত্রেও নেই।



একটি সেলাই কলের নমুনা



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

রুশ নেতৃদ্বয়ের বিলাত ভ্রমণ—

রুশ প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন এবং রুশ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রথম সেক্রেটারী মঃ ক্রুশেভের বিলাত ভ্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে, একথা অবশ্যই বলা চলে না। কিন্তু ব্যর্থ হইয়াছে, একথাও বলা যায় না। কথাটা অবশ্য স্ববিরোধী বলিয়াই মনে হয়। এই স্ববিরোধিতার অন্তরালে যে কিছু না কিছু সত্য নিহিত রহিয়াছে, একথাও অনস্বীকার্য্য। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বাদ দিয়া বৃটেন একাকী আন্তর্জ্জাতিক সকল সমস্যা সম্পর্কে রাশিয়ার সহিত বুঝাপড়া করিয়া একটা মতৈক্যে উপনীত হইবে, এই প্রত্যাশা কেহই করেন নাই। গত জুলাই মাসে (১৯৫৫) জেনেভায় বৃহৎ চারিরাষ্ট্র-প্রধান সম্মেলনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এবং রুশ দেশরক্ষা মন্ত্রী মঃ জুকভের মধ্যে বেশ একটু ঘনিষ্ঠতার ভাব দেখা গিয়াছিল এবং তখন রুশ সামরিক নেতাদিগকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আমন্ত্রণ করা হয়। সেই সময় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন রুশ রাষ্ট্রনায়কদ্বয়কে বৃটেন সফরের জন্য আমন্ত্রণ করেন। এই আমন্ত্রণ যে তাঁহারা গ্রহণ করেন, সে কথা বলাই বাহুল্য। সেই সময়ই রুশ রাষ্ট্রনায়কদ্বয়কে আমন্ত্রণ করাকে অনেকে স্যার এণ্টনী ইডেনের একটি কূটনৈতিক কৌশল বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। অনেক আমেরিকাবাসীও এই আমন্ত্রণের মূলে দুইটি উদ্দেশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে দ্বৈত বুঝাপড়া গড়িয়া উঠার অগ্রগতি রোধ করা একটি উদ্দেশ্য। আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বৃটেনের প্রাধান্য যে যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, বিশ্ববাসী সকলেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বৃটেনের প্রাধান্য যে এখনও অটুট রহিয়াছে তাহা প্রমাণ করাই ছিল এই আমন্ত্রণের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, এই আমন্ত্রণের ফলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনে যাহাতে কোন সন্দেহ বা আশঙ্কা সৃষ্টি না হয়, সেই উদ্দেশ্যে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৬) প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। বস্তুতঃ, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে এবং রুশ নেতাদের বৃটেন সফরের ফলে বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বৈত আলোচনার অগ্রগতির যে সম্ভাবনা নাই সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া এবং প্রেঃ আইসেনহাওয়ারকে নিশ্চিন্ত করাই ছিল এই সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্য। রুশ নেতাদের সহিত বৃটেন কি কি বিষয়ে আলোচনা করিবে এবং এই আলোচনা দ্বারা কতটুকু অগ্রসর হইবে স্যার এণ্টনী ইডেন সে-সম্পর্কে প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত আগাম আলোচনা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

আমেরিকার মনে যাহাতে কোন সন্দেহ বা আশঙ্কার সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য স্যার এণ্টনী ইডেন সমস্ত ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও ওয়াশিংটনে এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে যে, রুশ নেতৃদ্বয় বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে পারে। রুশ নেতৃদ্বয় এইরূপ চেষ্টা করিলেও তাহা সাফল্যলাভ করিবে, আমেরিকার এইরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ ছিল না। তথাপি এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করার কারণ যে বৃটেনকে পুনরায় সতর্ক করিয়া দেওয়া, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বৃটেনও বিশেষ সতর্কতার সহিত রুশ রাষ্ট্রনায়কদ্বয়ের বৃটেন সফরের ভ্রমণসূচী রচনা করিয়াছিল। রুশ নেতাদের যে ভ্রমণসূচী সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৫৫) প্রথম রচিত হয় এবং রুশনেতৃদ্বয় তাহাতে সম্মতি দেন, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনীর প্রেঃ আইসেনহাওয়ারের সহিত সাক্ষাৎকারের পর ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৬) তাহা সঙ্কুচিত করা হয়। রুশনেতৃদ্বয় এই সঙ্কুচিত ভ্রমণসূচীর সমালোচনাও করিয়াছিলেন। এই সমালোচনার উত্তরে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরের জনৈক মুখপাত্র ৯ই এপ্রিল (১৯৫৬) বলিয়াছিলেন যে, এই ভ্রমণসূচী "not too restrictive" অর্থাৎ ভ্রমণসূচী অত্যধিক সঙ্কুচিত করা হয় নাই। রুশনেতাদের বৃটেনের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থাকে সঙ্কুচিত করার অর্থ তাঁহারা যাহাতে বৃটিশ জনগণের সহিত যত কম মিশিবার সুযোগ পান তাহারই ব্যবস্থা করা, ইহা মনে

করিলে ভুল হইবে না। রুশনেতাদের বৃটেন সফর সম্পর্কে বৃটেনের জনগণের বিশেষ আগ্রহ যাহাতে সৃষ্টি না হয়, বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর তাহার জন্ম ব্যবস্থা করিতে ত্রুটি করে নাই। বৃটিশ সংবাদপত্র সমূহও এ ব্যাপারে পররাষ্ট্র দপ্তরের সহিত সহযোগিতা করিয়াছিল। রাইট অনারেবল আর্ল এট্‌লী ৮ই এপ্রিল (১৯৫৬) সালে এক্সপ্রেস পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, বৃটেনের বৃহত্তর জনগণ রুশনেতাদের আগমনকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইতেছে, কেবল পাঞ্চ পত্রিকার সম্পাদকের নেতৃত্বে অল্প সংখ্যক লোক তাঁহাদের বৃটেন সফরকে সমর্থন করিতেছে না। রুশনেতৃদ্বয়ের বিলাত ভ্রমণ যাঁহারা সমর্থন করেন নাই, তাঁহারা সংখ্যায় কি না তাহাতে সন্দেহ আছে। নিউইয়র্ক টাইমসের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছিলেন, "British weleome of Russian visitors will be official not national." অর্থাৎ রুশ অতিথিদের বৃটিশ অভ্যর্থনা সরকারী ভাবে হইবে, জাতীয় ভাবে হইবে না।

রুশ রাষ্ট্রনায়কদ্বয় ভারতে জনগণের নিকট যেরূপ বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন, বৃটিশ জনগণের নিকটেও সেইরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা অবশ্য কেহ-ই করেন নাই। কিন্তু বৃটিশ জনগণের দিক হইতে তাঁহাদের অভ্যর্থনায় উৎসাহের এত অভাবও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই উৎসাহের অভাবকে উপলক্ষ করিয়াই মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস ২৪শে এপ্রিল (১৯৫৬) ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, মার্শাল বুল্‌গানিন এবং মঃ ক্রুশেভ ইংলণ্ডে যেরূপ অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শনে তাঁহাদের আগ্রহ না-ও থাকিতে পারে। রুশনেতৃদ্বয়ের সফর উপলক্ষে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট খুব কঠোর ভাবে নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইহাও রুশনেতাদের ইংলণ্ডে উপনীত হওয়ার সময় জনসমাবেশ না হওয়ার একটা কারণ বলিয়া মনে হয়। রুশ-বিরোধী বিক্ষোভ নিরোধের জন্ম কড়া পুলিশ-পাহারার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এই যুক্তি সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করা কঠিন। রুশনেতাদের লণ্ডন সফর শেষ হওয়ার পর এই মর্ম্মে এক সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, লণ্ডনে রুশ নেতাদের হত্যা করিবার জন্ম এক ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে এবং পুলিশের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উহা ব্যর্থ হয়। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের সাফাই স্বরূপ এই হত্যার ষড়যন্ত্রের কাহিনী প্রকাশ করা হইয়াছে কি না সে-কথা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, রুশনেতাদের লণ্ডনে উপনীত হওয়ার দুই দিন পরে জনগণের এই আগ্রহের অভাব অনেকখানি দূর হয়। কড়া পুলিশ পাহারা সত্ত্বেও রুশনেতৃদ্বয় কয়েক বার প্রত্যক্ষ ভাবে জনগণের সম্মুখীন হইয়াছেন। জনগণের এই উৎসাহে কি বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, কি বৃটিশ সংবাদপত্র সমূহ কেহই বিস্মিত না হইয়া পারেন নাই। সুতরাং জনগণের অভ্যর্থনার দিক হইতে রুশনেতৃদ্বয়ের সফর একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে একথাও বলা যায় না। রুশনেতৃদ্বয়ের এই সফরের কিছু দিন পূর্ব্বে রাশিয়ার পদচ্যুত প্রধান মন্ত্রী মঃ মালেনকভ ইংলণ্ডে আসিয়া বৃটিশ জনসাধারণের নিকট বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছিলেন, একথাও আমরা স্মরণ না করিয়া পারি না।

ইঙ্গ-রুশ আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে রুশনেতৃদ্বয়ের সফর-সম্পর্কে আরও দুই-একটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন। বার্ম্মিংহামে বৃটিশ-শিল্পমেলার উদ্বোধন দিবসে মঃ ক্রুশেভ বলেন, তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন যে, বৃটেনে সকলে তাঁহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জানায় নাই। এই প্রসঙ্গে এক ব্যক্তির তাঁহাকে মুষ্টিপ্রদর্শনের কথা তিনি উল্লেখ করিয়া বলেন, "আমরা উভয়েই পরস্পরকে বুঝিতে পারিয়াছি।" মুষ্টির সাহায্য বাক্য-বিনিময় যে গ্রহণযোগ্য নয়, সে কথা উল্লেখ করিয়া ক্রুশেভ বলেন, "হিটলার ঘুষি বাগাইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আজ কবরে গিয়াছেন।" বার্ম্মিংহামের বক্তৃতায় মঃ ক্রুশেভ রাশিয়ার সামরিক শক্তির অগ্রগতি সম্বন্ধেও ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, "এরোপ্লেন হইতে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ একমাত্র রাশিয়াই ঘটাইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শুধু উহা ঘটাইতে ইচ্ছা করিতেছে।" রুশ নেতৃদ্বয় তাঁহাদের বৃটেন সফরের সময় রাশিয়ার সহিত বৃটেনের বাণিজ্য বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা পুনঃপুনঃই উল্লেখ করিয়াছেন। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বৃটিশারদিগকে "A nation of shopkeepers", দোকানদারদের জাতি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। বাণিজ্যের ভাষাই তাহাদের কাছে সহজবোধ্য ইহা মনে করিয়াই বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রস্তাবের ভিতর দিয়া অন্যান্য সমস্যার সমাধানে রুশনেতৃদ্বয় অগ্রসর হইতে চাহিয়াছেন, বলিয়া অনেকের কাছে মনে হইতে পারে। এ সম্বন্ধে পরেও আমরা আলোচনার সুযোগ পাইব। বার্মিংহামের বক্তৃতায় ক্রুশেভ বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করা সত্ত্বেও রাশিয়া পিছনে পড়িয়া নাই। বর্ত্তমানে গাইডেড মিসিলের উপর যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে তাহার কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "এখানেও আমরা প্রতিযোগিতা করিতে সমর্থ। হাইড্রোজেন বহনকারী এমন গাইডেড মিসিল আমরা নির্ম্মাণ করিব যাহা পৃথিবীর যে কোন স্থানে পতিত হইতে পারে।" বিমান নির্ম্মাণের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, এ বিষয়েও রাশিয়া বৃটেনের পিছনে পড়িয়া নাই। বার্ম্মিংহামের বক্তৃতায় মঃ ক্রুশেভ এই কথাটার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন যে, বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণে রাশিয়ার অগ্রগতি এতটুকুও প্রতিহত করিতে পারে নাই। কাজেই এইরূপ বিধি-নিষেধ যুক্তিসঙ্গত নয়।

রুশ বৃটিশ বাণিজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া ক্রুশেভ আরও বলেন যে, রাশিয়া যদি বৃটেনে শুধু কাঁকড়া রপ্তানী করে এবং তাহার পরিবর্ত্তে বৃটেন যদি রাশিয়ায় রপ্তানি করে শুধু হেরিং মাছ, তাহা হইলে বৃটেন ও রাশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না। সেই সঙ্গে তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে বেশ একটু রস সঞ্চার করিয়া তিনি বলেন "although your Herrings are wonderful particularly with a drop of Vadka" অর্থাৎ "যদিও বিশেষ করিয়া ভোডকা মদের সহিত আপনাদের হেরিং মাছ অতি চমৎকার। ক্রুশেভের বক্তৃতায় হেরিং মাছের উল্লেখ 'রেড হেরিং' কথাটির প্রয়োগের তাৎপর্য্য স্মরণ করাইয়া দিলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। মঃ ক্রুশেভ ইহাও স্মরণ করাইয়া দেন যে, বৃটেন যদি রাশিয়ার নিকট কলযন্ত্র বিক্রয় করিতে অস্বীকার করে তাহা হইলে রাশিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে বাধ্য

হইবে। ফলে যন্ত্রপাতির জন্ত রাশিয়া আর বৃটেনের উপর নির্ভরশীল হইবে না।

বৃটেনে মার্শাল বুলগানিন যে সকল বক্তৃতা দিয়াছেন সেগুলির ভাষা অত্যন্ত কৌশলপূর্ণ। কিন্তু মঃ ক্রুশেভ সরল ভাবে স্পষ্ট কথা বলাই সঙ্গত মনে করিয়াছেন। তাঁহার সরল স্পষ্টবাদিতা যে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে, ইহা মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না। ইহার ব্যতিক্রমও যে ঘটে নাই তাহা নয়। রুশ নেতৃদ্বয়ের সম্মানার্থ বৃটিশ শ্রমিকদল কমন্স সভাগৃহে যে ভোজ দিয়াছিলেন সেখানে মঃ ক্রুশেভের স্পষ্টবাদিতা বৃটিশ শ্রমিকনেতাদের মধ্যে বিক্ষোভ সৃষ্টি না করিয়া পারে নাই। বেশ কিছু কথাকাটাকাটি হইয়াছে। এমন কি, একটা ঝগড়ার অবস্থাও সৃষ্টি হইয়াছিল। মঃ ক্রুশেভ প্রাকযুদ্ধ-যুগের সোভিয়েট নীতি সমর্থন করেন এবং প্রাকযুদ্ধ যুগের বৃটিশ নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া বলেন যে, বৃটেন এবং ফ্রান্স রাশিয়া আক্রমণ করিতে হিটলারকে প্ররোচিত করিয়াছে। বৃটিশ শ্রমিকদলের পশ্চিম জার্ম্মাণীকে অস্ত্রসজ্জিত করার বর্ত্তমান নীতিরও তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। ইহার পরেই কথাকাটাকাটির সূত্রপাত হয়। কম্যুনিষ্ট-শাসিত রাষ্ট্রগুলিতে যে-সকল সোশ্যাল ডেমোক্রাট বন্দী আছেন, শ্রমিক নেতাদের পক্ষ হইতে তাঁহাদের মুক্তি দাবী করা হয়। মঃ ক্রুশেভ এই দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রমিকনেতাদের পক্ষ হইতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইহুদী-বিরোধী নীতির যে অভিযোগ করা হয় মঃ ক্রুশেভ উহাকে বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দেন।

রুশ নেতৃদ্বয়কে বৃটেনে আমন্ত্রণ করার এবং তাঁহাদের বৃটেন সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল আন্তর্জ্জাতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে বৃটেন ও রাশিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানদের স্তরে আলোচনা করা। যে পরিপ্রেক্ষিতে এই আলোচনা হইয়াছে তাহা এই প্রবন্ধের প্রথমেই আমরা আলোচনা করিয়াছি। আলোচনার ফল বিস্ময়কর কিছু হইবে, এই প্রত্যাশা কেহই করেন নাই। আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে একটি ঘোষণাপত্র সহ যে চূড়ান্ত যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝা যায়, কোন বিষয়েরই কোন মীমাংসা, কোন বিষয়েই তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই, কোন একটি বিষয়েও এমন কি বাণিজ্যের ব্যাপারেও কোন চুক্তি হওয়া সম্ভব হয় নাই। ডেইলী টেলিগ্রাফ পত্রিকা এই ইস্তাহারকে "A catalogue of hopes" অর্থাৎ কতগুলি আশার একটি তালিকা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এক দিক হইতে কথাটা হয়ত ঠিক বলিয়াই মনে হইবে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র অস্ত্রসজ্জার প্রতিযোগিতা বন্ধ করিতে উভয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অস্ত্রসজ্জা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী হ্রাসের জন্য উপযুক্ত আন্তর্জ্জাতিক সংস্থা গঠনের উদ্দেশ্যে কার্য্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মতৈক্য হইয়াছে। অস্ত্রশস্ত্র হ্রাসের কাজটি বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চক হইতে সুরু করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও তাঁহারা একমত হইয়াছেন। নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাব কমিটির যে অধিবেশন চলিতেছে তাহাতে বুঝাপড়ার উন্নতির জন্ত চেষ্টা করা হইবে, এ কথাও ইস্তাহারে বলা হইয়াছে। ইউরোপে নিরাপত্তা রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কেও ইঙ্গ-রুশ নেতারা একমত হইয়াছেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। নিকট ও মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্ত তাহাদের সাধ্যানুযায়ী সব কিছু করিতে তাঁহারা সুদৃঢ় ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে শান্তি শক্তিশালী করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রচেষ্টা সমর্থন করিতে এবং নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করিতে তাঁহারা একমত হইয়াছেন। ইসরাইল রাষ্ট্র এবং আরব রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে শান্তি স্থাপনের জন্ত সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্যোগ সমর্থন করিতেও তাঁহারা রাজী হইয়াছেন। রাশিয়া বৃটেনের নিকট হইতে পাঁচ বৎসরে ১০০০ মিলিয়ন পাউণ্ড পর্য্যন্ত মূল্যের পণ্য ক্রয় করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। পণ্যের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে এমন সব পণ্যও আছে যেগুলি কম্যুনিষ্ট দেশে রপ্তানী করা নিষিদ্ধ। বৃটেন এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারে নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া বৃটেন একাকী এই বাধা-নিষেধ তুলিয়া দিতে অসমর্থ, ইহা-ই উহার একমাত্র কারণ। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, ২৭শে এপ্রিল (১৯৫৬) স্যার এণ্টনী ইডেন এক টেলিভিশন বেতার বক্তৃতায় রাশিয়ার সহিত বৃটেনের বাণিজ্য প্রসারিত হওয়ার যথেষ্ট স্থল থাকার কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, রাশিয়ার সহিত বাণিজ্যের বর্দ্ধিত সুযোগ বৃটেনের গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, এই ধরণের বাণিজ্য শান্তি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করিবে।

ইঙ্গ-রুশ যুক্ত ইস্তাহার হইতে ইহা বুঝা যাইতেছে যে, উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি পরিষদের বাহিরে ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন করিতে পশ্চিমী শক্তিবর্গ তথা বৃটেন যেমন রাজী নয়, তেমনি রাশিয়াও ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণীকে তাহার বিরুদ্ধে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তির সশস্ত্র অংশীদারে পরিণত করিতে সম্মত হইতে পারে নাই। ইউরোপে যুদ্ধ বাধিয়া উঠে, ইহা বৃটেনও চায় না, রাশিয়াও চায় না। ইউরোপের নিরাপত্তা উভয়েরই কাম্য হইলেও জার্ম্মাণ সমস্যা সম্পর্কে তাহাদের পক্ষে একমত হওয়া সম্ভব নয়। প্যারী চুক্তি জার্ম্মাণীকে দ্বিধাবিভক্ত রাখিবার পথ প্রশস্ত করিয়াছে। অতঃপর পশ্চিম জার্ম্মাণী ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের জন্ত আপোস আলোচনা আরম্ভ করিবে কি না তাহা বলা কঠিন। যুক্ত-ইস্তাহারে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে যে শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। পশ্চিমী শক্তিবর্গ এক দিকে সামরিক জোট গঠন করিতেছেন আর এক দিকে চালাইতেছেন নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনা। এই অবস্থায় নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আলোচনার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ মলে নিরস্ত্রীকরণকেই অগ্রাধিকার দিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রের মনঃপূত হয় নাই। একমাত্র আরব-ইসরাইল বিরোধের ব্যাপারে যুক্ত ইস্তাহারে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে তাহা ফলপ্রসূ হইলেও হইতে পারে। রুশ নেতৃদ্বয়ের বৃটেন যাত্রার প্রাক্কালে মধ্যপ্রাচ্য সম্বন্ধে সোভিয়েট গবর্ণমেণ্ট যে বিবৃতি প্রকাশ করেন তাহাতেও অনুরূপ আশ্বাসই দেওয়া হইয়াছে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্ত রাশিয়া সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি সমর্থন করিতে রাজী আছে, ইহাতেই সমস্যার সমাধান সহজ হইয়া যায় নাই। কয়েকটি আরব রাষ্ট্রকে কম্যুনিষ্ট দেশ অস্ত্র সরবরাহ করার বিরুদ্ধে পশ্চিমী শিবির হইতে তীব্র প্রতিবাদ উত্থাপিত হইয়াছে। রুশ নেতৃদ্বয়ের

বৃটেন হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মঃ ক্রুশেভ যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। জনৈক মার্কিণ সাংবাদিক প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা রাশিয়া বন্ধ করিবে কি না। উত্তরে মঃ ক্রুশেভ বলেন, "রাশিয়া কোন দেশকেই অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে না। যদি মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা না হইত তবে আমরা উহা সমর্থন করিতাম। কিন্তু অস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে।" তিনি আরও বলেন যে, "কোন রাষ্ট্র আমাদের নিকট হইতে অস্ত্র ক্রয় করিতে চাহিলে আমরা বিক্রয় করিব না, যদি একথা বলি তাহা হইলে ভুল উত্তর দেওয়া হইবে। কারণ অন্যান্য দেশ হইতে অস্ত্র সরবরাহ করা হইতেছে।" তাঁহার বক্তব্য এই যে, পশ্চিমী রাষ্ট্রবর্গ যদি মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে তবে রাশিয়াও করিবে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইহাতে রাজী হইবে কি? রাজী হইলে বাগদাদ চুক্তি যে মাঠে মারা যাইবে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতি ছাড়া বাণিজ্য সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাবে বৃটেন রাজী হইতে পারে না এবং রাজী হয়ও নাই। কিন্তু দশ বৎসর ধরিয়া ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলার ফলে সমরোপকরণ নির্ম্মাণ এবং মার্কিণ সাহায্যের উপর বৃটেনের নির্ভরতা একান্ত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। বৃটেনে এবং পশ্চিম ইউরোপে উৎপন্ন ব্যবহার্য্য পণ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানী করা অসম্ভব। উহার প্রধান বাজার পূর্ব্ব-ইউরোপ ও রাশিয়া। বৃটেন ও পশ্চিম ইউরোপকে যদি অর্থনৈতিক দুর্গতি ও মার্কিণ সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরতা হইতে মুক্তি পাইতে হয়, তবে রাশিয়া ও পূর্ব্ব-ইউরোপে ব্যাপক বাণিজ্য সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বৃটেন ইহা ভাল করিয়াই বুঝিতে পারিয়াছে। বুলগানিন বলিয়াছেন, বাণিজ্য সম্পর্কে বাধানিষেধ ঠাণ্ডাযুদ্ধের-ই ফল। স্যার এণ্টনীও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করিতে যাইয়া তিনি একক বাধানিষেধ প্রত্যাহার করিতে পারেন নাই। তথাপি ইঙ্গ-রুশ আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে, একথা বলা যায় না। স্যার এণ্টনী ইডেন এই আলোচনাকে 'beginning of a beginning' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। টাইমস পত্রিকা বলিয়াছেন, "Frankness and hard discussion have opened several new lines of inquiry". রক্ষণশীল সাপ্তাহিক পত্রিকা ইকনমিষ্ট ইঙ্গ সোভিয়েট আলোচনাকে বলিয়াছেন, "the beginning, not the end of negotiations". সুতরাং লণ্ডন আলোচনা রাশিয়া ও পশ্চিমী শক্তিবর্গের মধ্যে আরও দ্বৈ-পাক্ষিক এবং বহু পাক্ষিক আলোচনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এই সকল ভাবী আলোচনার ফল কি হইবে, তাহা লইয়া এখনই আলোচনা করিয়া লাভ নাই। অনেকে মনে করেন, জেনেভায় বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলন যে আশাবাদপূর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ইতিমধ্যেই ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। ইঙ্গ-সোভিয়েট আলোচনা জেনেভার মনোভাবকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছে! স্যার এণ্টনী ইডেন রাশিয়া ভ্রমণের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

কমিনফর্ম্মের বিলোপ—

রুশ নেতৃদ্বয়ের বৃটেন যাত্রার প্রাক্কালে কমিনফর্ম্ম অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট ইনফরমেশন ব্যুরোর বিলোপের সংবাদ ঘোষিত হইয়াছে। ১৭ই এপ্রিল (১৯৫৬) বুদাপেষ্টের সংবাদে এই বিলুপ্তির কথা প্রকাশিত হইয়াছে। রাশিয়ার ডেপুটী প্রধান মন্ত্রী মঃ মিকোয়ান মস্কোতে সরকারী ভাবে কমিনফর্ম্মের বিলুপ্তি হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিতে কমিনফর্ম্মের বিশেষ কোন সার্থকতা ছিল কি না তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তথাপি উহার বিলুপ্তিকে রাশিয়ার মনোভাবের পরিবর্ত্তনের একটি দ্যোতক বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু যখন রাশিয়া গিয়াছিলেন, তখন রুশরাষ্ট্র-নায়কদের কাছে কমিনফর্ম্ম বিলোপের প্রস্তাব করিয়াছিলেন কি না, করিয়া থাকিলে তাঁহারা এ সম্পর্কে কি বলিয়াছিলেন, তাহা কিছুই জানা যায় না। জেনেভায় বৃহৎ চারি রাষ্ট্রপ্রধানের সম্মেলনেও কমিনফর্ম্মের প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নাই। যাহার অস্তিত্বের কোন সার্থকতা নাই, অথচ যাহার কোন অস্তিত্ব পশ্চিমী শিবিরে সন্দেহ সৃষ্টি করে, তাহার বিলোপ হওয়াই রাশিয়া বাঞ্চনীয় মনে করিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক।

১৯৪৩ সালের জুন মাসে কমিন্টার্ণ বা কম্যুনিষ্ট ইণ্টার নেশনেল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার চারি বৎসর পর ১৯৪৭ সালে ইউরোপের নয়টি দেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি মিলিত হইয়া কমিনফর্ম্ম গঠন করে। উহার উদ্দেশ্য ছিল, এই প্রতিষ্ঠানের মারফৎ বিভিন্ন কম্যুনিষ্টপার্টি তাহাদের অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান করিবে এবং প্রয়োজন হইলে পারস্পরিক চুক্তির ভিত্তিতে তাহাদের কার্য্যপদ্ধতির মধ্যে সংযোগ বিধান করা হইবে। ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন ও মার্শাল পরিকল্পনার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবেই কমিনফর্ম্ম গঠন করা হইয়াছিল। পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইউরোপে কম্যুনিজমের অগ্রগতি নিরোধ করিয়া উহাকে শুধু রাশিয়ায় আবদ্ধ রাখিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিল। কম্যুনিজম যাহা অর্জ্জন করিয়াছে তাহা রক্ষা ও সংহত করাই ছিল কমিনফর্ম্মের উদ্দেশ্য। মার্শাল পরিকল্পনা ফ্রান্স ও ইটালীর কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট হইতে কম্যুনিষ্টদিগকে বিতাড়িত করিতে সমর্থ হইয়াছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা কমিনফর্ম্মের একটি সাফল্য বলিয়া অবশ্যই অভিহিত করিতে পারা যায়। সেই সঙ্গে উহার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য যুগোশ্লাভিয়াকে কম্যুনিষ্ট শিবির হইতে বহিষ্কৃত করা যে কমিনফর্ম্মের একটি বৃহৎ ব্যর্থতা তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই হিসাবে কমিনফর্ম্ম নিজেই তাহার উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করিয়াছে। গত বৎসর রুশ রাষ্ট্রনায়করা যুগোশ্লাভিয়ায় গিয়াছিলেন মার্শাল টিটোকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য। ইহা দ্বারাও কমিনফর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা যে শেষ হইয়াছে তাহা বুঝা যায়।

মধ্য প্রাচী—

এপ্রিল মাসের (১৯৫৬) মাঝামাঝি রুশনেতাদের বৃটেন যাত্রার প্রাক্কালে তেহরাণে বাগদাদ চুক্তি পরিষদের অধিবেশনে প্যালেষ্টাইন ও কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের উপর জোর দেওয়ায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্যটা ক্রমেই এক দিকে অস্পষ্ট এবং আর এক দিকে জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে! চুক্তিটা প্রধানতঃ রাশিয়ার বিরুদ্ধেই। এই চুক্তিকে অবলম্বন করিয়া বৃটেন মধ্যপ্রাচ্যে তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে চায়। আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র

ইরাক এই চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে। সেই ইরাক প্যালেষ্টাইন সমস্যা আলোচনার দাবী করে। পাকিস্তান মধ্যপ্রাচ্যের কোন রাষ্ট্র না হইলেও বোধ হয় মুসলিম রাষ্ট্র হিসাবেই বাগদাদ চুক্তিতে স্থান পাইয়াছে। পাকিস্তান দাবী করে কাশ্মীর সমস্যা আলোচনার জন্য। ইরাক ও পাকিস্তানের আবদার রক্ষা না করিলে বাগদাদ চুক্তিই বানচাল হওয়ার আশঙ্কা। কিন্তু বাগদাদ চুক্তিকে ইরাক প্যালেষ্টাইনের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তান কাশ্মীর তথা ভারতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে চেষ্টা করার জন্য বৃটেনের পক্ষে অস্বস্তিকর হইয়া উঠাই স্বাভাবিক। কারণ, ইহাতে মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সহজ না হইয়া জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। বাগদাদ চুক্তির মত আঞ্চলিক জোটে যোগদান করিয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক কি কি সুবিধা হইবে, তেহরাণ বৈঠকে তাহার উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। অর্থনৈতিক সুবিধা দিতে হইলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রয়োজন। সম্ভবতঃ বৃটেনের চাপেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তির অর্থনৈতিক কমিটির সদস্য হইয়াছে। অর্থনৈতিক সুবিধার প্রলোভন দেখান হইয়াছে, যাহাতে অন্যান্য আরব রাষ্ট্র বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করিতে প্রলোভিত হয়। কিন্তু আরব রাষ্ট্র ও বাগদাদ চুক্তির মধ্যে ব্যবধান ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে।

তেহরাণে বাগদাদ চুক্তি পরিষদের বৈঠক শেষ হওয়ার দুই তিন দিন পরেই ২১শে এপ্রিল জেদ্দায় মিশর, সৌদী আরব এবং ইয়েমেনের মধ্যে এক সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। সৌদী আরবের রাজা, ইয়েমেনের ইমাম এবং মিশরের প্রধান মন্ত্রী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই চুক্তিতে তিনটি রাষ্ট্রের সৈন্য-বাহিনীর জন্য যৌথ কম্যাণ্ড গঠনের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। চুক্তির ২নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, এই স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রত্রয়ের যে কোন একটি রাষ্ট্র আক্রান্ত হইলে অপর দুই রাষ্ট্র নিজেরা আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবে। যৌথ কম্যাণ্ড যেমন গঠন করা হইবে তেমনি গঠিত হইবে একটি সুপ্রিম কাউন্সিল ও একটি সামরিক কাউন্সিল। এই চুক্তির মেয়াদ পাঁচ বৎসর। কোন সদস্য রাষ্ট্র চুক্তি অবসানের জন্য এক বৎসরের নোটিশ না দিলে উহা ৫ বৎসর পরেও বলবৎ থাকিবে। এই চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পর গত ৬ই মে (১৯৫৬) মিশর ও জর্ডানের মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই দুই দেশের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সামঞ্জস্য ও ঐক্য বিধান করাই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপূর্ব্বে মিশর সিরিয়া ও সৌদী আরবের সহিত বাগদাদ চুক্তি প্রতি-রক্ষা চুক্তি করিয়াছে।

বাগদাদ চুক্তি-বহির্ভুক্ত আরব রাষ্ট্রগুলি যে-সামরিক জোট গঠন করিতেছে, তাহা যে ইসরাইল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি গাজা সীমান্তে মিশর ও ইসরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে এবং আরব-ইসরাইল সীমান্তে যে উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি হয় তাহার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ড মধ্যপ্রাচীতে গিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টা আপাততঃ সাফল্যলাভ করিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের নিকট তিনি যে রিপোর্ট দিয়াছেন তাহাতে তিনি জানাইয়াছেন যে, ইসরাইল এবং তাহার চারিটি প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রের (মিশর, সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডান) মধ্যে বিনাসর্ত্তে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি সম্পাদন করিতে তিনি সমর্থ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, মিশরের প্রধানমন্ত্রী কর্ণেল নাসের মিঃ হ্যামারসিল্ডের সহিত তাঁহার বৈঠকে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ইসরাইল জর্ডান নদীর জল অন্য দিকে প্রবাহিত করার ফলে যদি সিরিয়া ও ইসরাইল রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে, তাহা হইলে সিরিয়ার তাহার এবং সামরিক দায়িত্ব মিশর প্রতিপালন করিবে। কিন্তু রুশ রাষ্ট্রনায়কদের বৃটেন যাত্রার প্রাক্কালে সোভিয়েট পররাষ্ট্র দপ্তর হইতে মধ্যপ্রাচী সম্পর্কে যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাহাতে আরব রাষ্ট্রগুলির উৎসাহ কিছু দমিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই বিবৃতিতে সোভিয়েট রাশিয়া প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলির দাবী সমর্থন করে, এমন কিছুই নাই। বরং উহাতে বলা হইয়াছে যে, ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতাকে সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টায় রাশিয়ার সহানুভূতি ও সমর্থন আছে। উক্ত ইস্তাহারে পারস্পরিক গ্রহণযোগ্য ভিত্তিতে আরব-ইসরাইলের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে। ইহাতে আরব রাষ্ট্র সমূহ অসন্তুষ্ট হইলে বিস্ময়ের বিষয় হয় না। মিশর সহাবস্থানের পঞ্চনীতি সমর্থন করিলেও ইসরাইল রাষ্ট্র সম্পর্কে উহা প্রযোজ্য বলিয়া মনে করে না। মস্কোস্থিত ইসরাইল রাষ্ট্র দূতাবাসে ইসরাইলের স্বাধীনতা দিবস পালনের যে আয়োজন করা হয় মঃ মিকোয়ান এবং মঃ মলটভ তাহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং ইসরাইল রাষ্ট্রের শান্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধি কামনা করিয়া-ছেন। এই ব্যাপারটিও আরব রাষ্ট্রসমূহ লক্ষ্য না করিয়া পারে নাই।

প্যারীতে উত্তর আটলাণ্টিক চুক্তি পরিষদের অধিবেশনের শেষে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রিত্রয় এক আলোচনা বৈঠকে সমবেত হইয়া স্থির করেন যে, ইসরাইল ও আরব রাষ্ট্রগুলিকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থাটি পুনরায় বহাল করা হইবে। ফ্রান্স মধ্যপ্রাচীতে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করা সম্পর্কে রাশিয়ার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছে। ফরাসী পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ পিনে সাংবাদিকদিগকে বলিয়াছেন যে, মধ্যপ্রাচীতে অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ করিবার জন্য নিরাপত্তা পরিষদ প্রস্তাব করিলে ফ্রান্স তাহা সমর্থন করিবে। কিন্তু বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে ফ্রান্সের সহিত একমত নহে। ইরাক ও জর্ডানকে অস্ত্র সরবরাহ করিতে বৃটেন চুক্তিবদ্ধ। তারপর আছে বাগদাদ চুক্তি। কাজেই মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্রসরবরাহ নিষিদ্ধ করিতে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সম্মত হওয়া সম্ভব নয়। অস্ত্র সরবরাহ নিষিদ্ধ করার পরিবর্ত্তে অস্ত্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা পুনরায় বহাল করাই তাহারা পছন্দ করে। রাশিয়া এই প্রস্তাবে সহযোগিতা করিবে না বলিয়া মনে হয়। কারণ, উহা দ্বারা বাগদাদ চুক্তিকেই শক্তিশালী করা হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানে মধ্যপ্রাচীতে শান্তিরক্ষা করা রাশিয়ার সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভবও নয়।

১০ই মে, ১৯৫৬।

রাজায় রাজায়



উদয়ভানু

প্রাচীরঘেরা রাজগৃহের সঙ্গে বহির্বিশ্বের যেন কোন যোগ নেই। বাইরে থেকে কেউ ঠাওরাতে পারে না, উঁচু পাঁচিলের অন্তরালে কি আছে, কারা আছে। লোহার ফটকের ফাঁক-ফোকর থেকে যা যতটুকু চোখে পড়ে। কিন্তু কে যাবে সেই সিংহদ্বারের কাছে? উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখবে এমন সাধ্যই বা কার। ফটকে পাহারা যারা দেয় তাদের চোখে ঘুম নেই। সদাজাগ্রত, দাঁড়িয়ে থাকে দিবারাত্র। বিনা পরোয়ানায় যে আসবে সেই বাধা পাবে। প্রহার খাবে, ফিরতে হবে হয়তো রক্তাক্ত দেহে। বর্শার একটি আঘাতে বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে যাবে। নবাব সরকারে নালিশ চলবে না রাজার নামে। স্বয়ং দিল্লীর বাদশাহ রাজাকে অধিকার দিয়েছেন; অস্ত্র ব্যবহার আর সৈন্য প্রতিপালনের। বিপদে-আপদে নবাব যদি ডাক পাড়েন, তখন ধার দিতে হবে ঐ অস্ত্র আর সৈন্যবল। বাতাস শুধু বাধা মানে না, ভয় করে না অস্ত্রাঘাতকে; বৈশাখের ক্ষেপা হাওয়া আসে ছুটতে ছুটতে, রাজগৃহের আঙিনায় দাপাদাপি নাচানাচি করতে থাকে। বাতাসে কথা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। গোপনকথা ছড়িয়ে দেয় চতুর্দ্দিকে।

দ্বিতীয় প্রহরের থমকানো খররৌদ্র চমকে চমকে ওঠে যেন কি এক বিকট শব্দে! প্রতিবেশী বাসিন্দারা বিস্ময়দৃষ্টিতে রাজপ্রাসাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মুক্ত বাতাসও যেন ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে। রাজাবাহাদুরের সখের চিড়িয়াখানায় পশু আর পাখীরা সভয়ে চিৎকার করছে। দরবারকক্ষের এক অলিন্দে দাঁড়িয়ে রাজাবাহাদুর কি যেন লক্ষ্য করছেন, আর মৃদু মৃদু হাসছেন। কালীশঙ্করের দু'পাশে দু'জন পাখাবরদার, হাওয়া খেলিয়ে খেলিয়ে নিদাঘতাপ দূর করছে। রাজাবাহাদুরের হাতে পানপাত্র, সোনার পেয়ালায় টলমল করছে উগ্র পানীয়। তাঁর আশপাশে জড়পুতুলের মত নিশ্চুপ ইয়ার-মোসাহেবের দল। রাজার ছায়া যেন তারা। কেনা-গোলাম বললেও অন্যায় হবে না। কৃপাপ্রার্থী, তাই বোধ করি কারও কারও যুক্তকর, বুকের 'পরে ন্যস্ত হয়ে আছে।

রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। বিশেষ ক্ষমতা লাভ ক'রেছেন দৈববলে। পৃথিবীর যত অন্যায় আর অনিয়মের প্রতিকার রাজার হাতে। রাজা দীর্ঘজীবী হোন, রাজার জয় হোক! রাজপুরীর সদরের এখান সেখান থেকে জয়ধ্বনি উঠছে সমস্বরে। সিপাই আর পাইকরা দলে দলে মঙ্গল প্রার্থনা করছে। জয়ঢাকে ঘা পড়ছে ঘন ঘন। সিপাহী-শালার মিনারে থেকে ঘন ঘন ভেরী বাজিয়ে চলেছে প্রহরী-সান্ত্রী।

দু'পাশে দু'জন পাখাবরদার, তবুও বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে রাজার কপালে।

কালীশঙ্করের দেহ-গঠন অতি সুন্দর। আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ, বৃহৎ নেত্র। মুখের ডান ভাগে একটি অতি ক্ষুদ্র কৃষ্ণতিল। মুখশ্রী দেখে যাঁরা ভাগ্য অবধারণ করেন, তাঁরাই বলেন, ঐরূপ চিহ্ন প্রচুর বিভবের আর বর্দ্ধিষ্ণু সৌভাগ্যের অগ্রবর্তী লক্ষণ। কালীশঙ্করের স্বর গম্ভীর, যদিও বাকপটুতা অসাধারণ। কৌতুকী আমোদী তিনি, তাই যেন মৃদু-মৃদু হাসছেন পশু আর মানুষের লড়াই দেখতে দেখতে।

দরবার-গৃহের নীচের আঙিনায় আসল লড়াই চলছে!

একটা নেকড়ে ইদিক থেকে সিদিকে ছোটাছুটি করছে ঊর্দ্ধশ্বাসে। রাজাবাহাদুর দূরে থেকেও দেখতে পেয়েছেন নেকড়ের চোখে পাশব দৃষ্টি ফুটেছে। রক্ত আর মাংসের লোভে মুখ থেকে তার প্রচুর লালা যেন ঝরছে। তীক্ষ্ণধার দন্তপংক্তিতে সামান্য রক্তরেখা। শুভ্র দাঁতগুলি লাল হয়ে গেছে তাজারক্তে। হিংস্র বাঘ ঈষৎ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে শ্রমযন্ত্রণায়। এধারে সেধারে তাসা আর জয়ডাক বেজে চলেছে অবিরাম, তাই বুঝি কেমন বিভ্রত হয়ে পড়েছে শব্দভয়ে। এক নাগাড়ে ছোটাছুটি করছে।

লড়াই চলেছে নেকড়ের সঙ্গে মানুষের। জগমোহন লেঠেলের সঙ্গে খাঁচার পশুর।

রাজা শাস্তিদান করেছেন জগমোহনকে! নেকড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে যদি জয় হয়তো বাঁচোয়া, নয়তো রক্তদানের সঙ্গে সঙ্গে জীবন দান করতে হবে! জীবন আর মরণের যুদ্ধে জগমোহনও যেন বেপরোয়া হয়ে পড়েছে। হাতে আর পায়ে বর্ম এঁটেছে। গায়ে তেল মেখেছে। ঘাম আর তেলে পিচ্ছিল হয়ে আছে তার সর্ব্বশরীর।

সপ্তগ্রাম থেকে গড় মান্দারণে গিয়েছিল রাজকুমারীর সন্ধানে। হদিশ মিলেছে নির্ব্বাসিতা রাজকন্যার। দেখা হয়েছে, কথা হয়েছে। বিদায়ের ক্ষণে স্মরণচিহ্ন দিয়ে দিয়েছেন বিন্ধ্যবাসিনী। একটি রত্নাঙ্গুরীয় জগমোহনের হাতে তুলে দিয়ে রাজকুমারী ব'লে দিয়েছিলেন,—রাজমাতাকে দিও, অন্য কারও হাতে না পড়ে!

গড় মান্দারণ থেকে আবার সুতানুটিতে ফিরতে হয়েছে। খানিক পথ গোযানে অতিক্রম করেছে জগমোহন। খানিক নৌকায়। বাকীটুকু পায়ে হেঁটে শেষ করেছে। দীর্ঘ এক লাঠিতে দেহের ভর রেখে লাফাতে লাফাতে এসেছে। এক এক লাফে দশ থেকে পনেরো হাত পথ পেরিয়েছে।

রাজগৃহে পৌঁছতে না পৌঁছতেই গিরিফতার হয়েছে। লোহার কড়া প'রেছে তার হাতে আর পায়ে। রাজাবাহাদুর আদেশ

দিয়েছিলেন, যেন এই ব্যবস্থাই পাকা করা হয়। তার পর তিনি যেমন বলবেন তেমনই হবে।

হস্তপদ বদ্ধ অবস্থায় রাজসমীপে তাকে হাজির করলে, রাজা বললেন,—অপরাধ গুপ্তচরবৃত্তি! অপরাধ রাজ-অন্দরে রাজমাতার মহলে বিনা অনুমতিতে গমনাগমন। অপরাধ—

রাজার কথা শেষ হ'তে না হ'তে কথা ধরেছিল জগমোহন। দুই কর একত্র ক'রে বলেছিল,—অপরাধ হুজুর বহুৎ! রাজমাতার হুকুম অমান্য করি কোন্ ভরসায়? রাজমাতা যখন হুকুম করলেন ডেকে পাঠিয়ে তখন—

দরবারে ব'সেছিলেন তখন কালীশঙ্কর। ক্রোধে আর উত্তেজনায় থর-থর কাঁপছিলেন যেন। সম্মানের কিছু হানি হয়েছে তাঁর, জমিদার কৃষ্ণরামের কাছে। উপরিপড়া হয়ে জগমোহন গেছে রাজগৃহের পক্ষ থেকে। শালমন্দ মিলেছে হয়তো জগমোহনের কপালে! দেখা না দিয়ে কৃষ্ণরাম হয়তো দূর ক'রে দিয়েছে কুকুর-বেড়ালের মত!

আবার কথা বললেন কালীশঙ্কর। দরবার কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বললেন,—অপরাধ, আমার শত্রুর শিবিরে গিয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা?

—ভিক্ষা আমি চাই নাই রাজাবাহাদুর!

জগমোহনও বললে জোরালো কণ্ঠে। বললে,—সাতগাঁর জমিদার-বাড়ীর মাটিও হুজুর মাড়াইনি।

রাজাবাহাদুর যেন কর্ণপাত করতে চাইলেন না লেঠেলের আকুল আবেদনে। বাম হাতের তালুতে ডান হাতে ঘুঁষি মেরে বললেন,—শাস্তি লও জগমোহন! বৃথা বাক্য ব্যয় কর কেন?

—যা দেবেন তাই লেবো রাজাবাহাদুর। কথা বলতে বলতে মাথা নুইয়ে বললে,—এই মাথা নামিয়ে শাস্তি লেবো। তবে জানে হুজুর না মারেন! ঘরে মাগ-ছেলে রয়েছে, খেতে না পেয়ে মারা পড়বে।

কণ্ঠ সপ্তম থেকে মৃদুতে নামলো যেন। গোঁফের এক প্রান্ত পাকাতে পাকাতে রাজা বললেন,—লড়াই হোক, তোমার জয় হয়তো আমার কি! বেঁচে যদি যাও তো তোমার সৌভাগ্য!

—কার সাথে লড়বো হুজুর? হুকুম করেন খুশী মনে।

—বাঘ-ভাল্লুকের সনে নয়, ভয় নাই তোমার। একটা নেকড়ের সঙ্গে লড়' তবে!

—সে-ও তো হুজুর ঐ বাঘই হ'ল! বাঘে-মানুষে লড়াই?

হেসে ফেললেন রাজাবাহাদুর! তাঁর হাসির সঙ্গে সঙ্গে বুকের এক খণ্ড হীরা ঝলমলিয়ে উঠলো। সুবসন পরেছেন কালীশঙ্কর, রাজবেশ প'রেছেন মাঙ্গলিক। শ্বেতরেশমের উষ্ণীষ শিরে ধারণ ক'রেছেন। উষ্ণীষের আঁচলার কিনারায় সোনালী জরি ঝলমল করছে। টানাপাখার হাওয়ায় উষ্ণীষের 'পরে সাদা পালখ নেচে নেচে উঠছে। নবরত্নের একটি কলকা এঁটেছেন মুকুটের বদলে। কলকার শীর্ষে সাদা পালকগুচ্ছ। রাজাবাহাদুর বললেন,—নেকড়ে আবার বাঘ হয়েছে কবে? নেকড়ে তো দো-আঁসলা! বাঘ আর কুকুরের ঔরসে—

—হাতে অস্তর দেবেন না হুজুর! জগমোহন চোখ ছোট ক'রে শুধোয়। বলে,—ছোরা-ছুরি শড়কি-বল্লম একটা কিছু যা হয়?

আবার হাসলেন রাজাবাহাদুর। তাঁর সর্বাঙ্গ হেসে উঠলো যেন। কণ্ঠহারের হীরার খানিখানা আকাশের তারার মত যেন। পলকি হীরা, তাই লম্বা দ্যুতি ছড়ালো। রাজা বললেন,—শক্তির পরীক্ষা, অস্ত্রের পরীক্ষা নয় জগমোহন। তুমি প্রস্তুত হও। সিপাহীশালার!

শেষের কথাটি কালীশঙ্কর সজোরে বললেন। ডাকলেন উচ্চ-কণ্ঠে।

তারপর আর কোন কথায় কর্ণপাত করেননি রাজা। অন্য কাজে মন দিয়েছিলেন। দরবারের কাজে।

দুই যোদ্ধাকে আঙিনায় ছেড়ে দিয়ে খবর দেওয়া হয় রাজাকে। পানপাত্র হাতে ধরেই রাজা দরবারের অলিন্দে এসে দাঁড়িয়েছেন। মৃদু-মৃদু হাসির সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করছেন নেকড়ে আর মানুষের মরণ-বাঁচনের যুদ্ধ।

হাতে আর পায়ে বর্ম এঁটে নিয়েছে জগমোহন। নেকড়ে যখন লাফ দিয়ে আক্রমণ করছে, তখনই পা চালাচ্ছে। জানুতে এসে লাফিয়ে পড়ছে হিংস্র জানোয়ার, তখন প্রতিপক্ষকে রামঘুঁষি মারছে বুকের পাঁজরায়। তারপর পিছু হ'টে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে জগমোহন। নেকড়েটাকে ছোটাচ্ছে। ছুটিয়ে ছুটিয়ে যদি দম নষ্ট করা যায়!

চিৎকার করছে একেক বার। হুঙ্কার ছাড়ছে ঘুঁষি-খাওয়া নেকড়ে। বুকের পাঁজরাগুলো যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে একেক ঘায়ে! জগমোহনও চিৎকার করছে। গর্জ্জন করছে যেন থেকে থেকে।

দ্বিতীয় প্রহরের থমকে-থাকা খর রোদ যেন চমকে-চমকে ওঠে নেকড়ে আর মানুষের চিৎকারে। প্রাচীর-ঘেরা রাজগৃহের সঙ্গে বাহির বিশ্বের কোন যোগ নেই। বাতাস শুধু বাধা মানে না, এমনই নির্ভীক! বৈশাখের তপ্ত আর মত্ত হাওয়া ছুটতে ছুটতে আসে কোথায় কোন্ বনবাদাড় থেকে। রাজগৃহের আঙিনায় দাপাদাপি নাচানাচি করতে থাকে। বাতাসে কথা ভাসিয়ে নিয়ে যায়, প্রাচীরের অবরোধের ধার ধারে না।

সুতানুটির সকল মানুষ জানতে পারে, রাজপুরীতে অত্যাচারের তাণ্ডবলীলা চলেছে। কে যেন আর্ত্ত স্বরে চিৎকার করছে। রাজার আদালতে কোন' আসামীকে শাসন করা হচ্ছে হয়তো!

ফটকের কাছে দর্শনার্থীর ভিড় জমেছে, কিন্তু কড়া পাহারার ফলে কেউ যেন এগোতে সাহস পায় না! শিউরে-শিউরে ওঠে তারা পশু আর মানুষের আকুল কণ্ঠ শুনে।

রাজা কালীশঙ্কর শুধু হাসছেন থেকে থেকে। পানপাত্র মুখে তুলছেন কখনও। নেকড়েটা লড়াই করতে করতে কেমন যেন কাহিল হয়ে পড়েছে। একটা পা তার হয়তো ভেঙ্গে গেছে আছাড় খেয়ে, তাই চলাফেরা করছে খুঁড়িয়ে। জগমোহনের জানু থেকে তাজা লাল রক্ত ঝরছে। নেকড়ের থাবা না দাঁতের আঘাতে কেটে ছিঁড়ে গেছে। আর একটি বার বাগিয়ে ধরতে পারলেই জয় হয় জগমোহনের। পায়ের তলায় ফেলতে পারলে পিশে মারা যায়। পেটে পা দিয়ে দাঁড়ালেই পেট ফেটে যাবে। তারপর নেকড়ের দু'টো পা দু'ধার থেকে টেনে ধরে ছিঁড়ে ফেলা যায়। ছাল-চামড়া ছাড়িয়ে ফেলতে আর কতক্ষণ!

রাজমাতার গুপ্তচরী আছে। তারাই কানে তুলে দেয় বিলাসবাসিনীর, জগমোহন লেঠেল সপ্তগ্রামে ফিরতেই শাস্তি ভোগ করছে রাজার আদেশে। নেকড়ের মুখে তাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনে কানে আঙুল দিলেন রাজমাতা। কুঠরী থেকে বেরিয়ে পড়লেন। পরিচারিকাদের বললেন,—চল', আমি যাবো দরবারে! জগমোহনের প্রাণ ভিক্ষা করবো রাজার কাছে হাত পেতে।

—এতক্ষণে বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে!

—লড়াই চলছে যে বহুক্ষণ ধরে!

রাজমাতা কপালে করাঘাত করলেন। বললেন,—বাঘে মানুষে লড়াই? শাস্তি যদি দিতে হয় আমাকে দিক। কাপড়ে আগুন ধরিয়ে মরবো! মরতে ভয় করি না আমি। আমাকে তোমরা সদরে নিয়ে চল'!

—সে কি কথা রাজমাতা! ক্রোধে অন্ধ হয়েছো তুমি?

বিলাসবাসিনী যেন ঠিক শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। মনের বাঁধ যেন তাঁর ভেঙ্গে গেছে। দরদর অশ্রু ঝরছে গণ্ড বেয়ে। কান্নার সুরে বললেন,—সদরে ব'লে পাঠাও আমি ভিক্ষা চাইছি রাজার কাছে। জগমোহনকে রেহাই দেওয়া হোক! আমার হুকুমে গিয়েছিল সে, শাস্তি যদি দিতে হয় আমাকে দিক। ছোটকুমার কোথায়? তাকেই না হয় ডাকতে পাঠাও।

কথা বলতে বলতে বিলাসবাসিনী দ্রুত অগ্রসর হন। তাঁর পিছু নেয় ব্রজবালা। বলে,—রাজমাতা, অধীর হন কেন এত?

—জগমোহন যে আর বাঁচে না ব্রজবালা কি করি আমি? কোথায় যাই?

—ধৈর্য্য ধারণ করুন, আপনি শান্ত হোন।

—কুমারবাহাদুরও কি মন্ত পানে জ্ঞান হারিয়েছেন! কাশীশঙ্কর কোথায়? এত্তেলা পাঠাও না তার কাছে। সে এসে রক্ষে করুক গরীব-মানুষকে!

খাসমহলের এক দরদালানে রাজমাতার কাতর কণ্ঠ আছড়ে আছড়ে পড়ে। পরিচারিকা ব্রজবালা বিলাসবাসিনীর দুই পা আঁকড়ে ধ'রে আছে।

—ব্রজ আমাকে ছাড়ো, মিথ্যে মিথ্যে ধ'রে রাখো কেন? আমি যাই কাশীশঙ্করের দুয়োরে। মা হয়ে ভিক্ষে চাইতে যাই!

কথার শেষে আবার কেঁদে ফেললেন রাজমাতা। রক্তচাপের রোগিণী, রাঙা চোখ থেকে যেন রক্ত ঝরছে জলের বদলে। শুধু চোখ নয়। সারা মুখখানি যেন তাঁর ভীষণ লাল হয়ে আছে। চোখ যেন কপালে উঠে গেছে!

কুমারবাহাদুরেরও জানতে আর বাকী নেই।

কাছারীতে ব'সে খাতার কাজ দেখছিলেন কাশীশঙ্কর। চালের আড়ত তুলতে কি কত খরচাপত্র হয়েছে সেই সব হিসাব-পরীক্ষার কাজ করছিলেন। ঘরামির রোজ কষছিলেন। কয় শত বাঁশ লাগলো! শালের গুঁড়ি কতগুলো! ক' গাড়ী খড় এসে পৌঁছেছে! নারকেল দড়ি এলো কত কত গাঁট!

ক'জন নায়েব সেরেস্তার কাজে লেগেছে কুমারের সঙ্গে। খাতা লেখার কাজ করছে। কাছারীর খোলা জানলা থেকে কাশীশঙ্কর বারে বারে দেখছেন কি যেন, আর হিসাব ঠিক করছেন নিজে কলম ধ'রে। জানালার বাইরে ঝটপটে সাদা আকাশের তলায়, সবুজ ঘাসের আড়াল থেকে ঘর উঠেছে অনেক উঁচুতে। খড়ের চালা উঠেছে। চালের আড়ৎ। দেখতে দেখতে প্রসন্ন হাসির অস্ফুট রেখা উঁকি মারে কুমারের অধরকোণে। স্বাধীন ব্যবসার সুখস্বপ্ন দেখেন হয়তো জেগে জেগে। বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।

এক জন পাইক গিয়ে ঢিপ ক'রে একটা প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—ছোটরাজা, ওদিকে যে রক্তারক্তি হচ্ছে দরবারের সমুখে।

কানে কলম তুললেন কাশীশঙ্কর। কপালে রেখা ফুটলো। বললেন,—রক্তপাত কেন?

—নেকড়ের সঙ্গে ল'ড়ছে জগমোহন বাগ্‌দী রাজাবাহাদুর শাস্তি দিয়েছেন।

কান থেকে কলম নামিয়ে নিয়ে স্বল্প হাসলেন কাশীশঙ্কর। তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন,—ছোঃ! নেকড়ের সঙ্গে আবার লড়াই কি! বাঘ-সিংহ হ'লেও না হয় কথা ছিল! একটা নেকড়ে তো একটা কুকুরের সামিল!

—বাগ্‌দীপাড়া থেকে যত দুলে আর বাগ্‌দী লেঠেল এসে ঘিরে ফেলেছে রাজবাড়ী। জগমোহনকে অক্ষত শরীরে ফেরৎ চায় তারা।

—তাই না কি?

—উঁচু পাঁচিল, তাই বাইরে থেকে দা-ভল্ল ছুঁড়ছে এলোপাথাড়ী!

—সত্য না কি?

কলম রেখে উঠে পড়লেন কুমারবাহাদুর। কোঁচানো কাপড়ের কোঁচা খুলে কোমরে বাঁধতে বাঁধতে বললেন,—আমার বন্দুক আর কার্ত্তুজের থলিখান চাই যে!

কুমারের অস্থিমজ্জায় বীরের রক্ত বইছে। হঠাৎ যেন সেই রক্তপ্রবাহ প্রতি ধমনীতে টগবগিয়ে ফুটে উঠলো। দেহের পেশীগুলো যেন জেগে উঠলো নেচে নেচে। হাত দু'খানি যেন নিশপিশ করছে থেকে থেকে। বন্দুকের ব্যবহার জানতেন না কুমার, এই সম্ভ সম্ভ শিখেছেন। গৃহলগ্ন ভূমিতে মাটির বাঁধ বাঁধিয়ে টিপ দাগার অভ্যাস আয়ত্ত করেছেন। সট্‌গান, রাইফেল আর ডবল ব্যারেল ছুঁড়তে শিখেছেন!

কার্ত্তুজের থলি কোমরে ঝুলিয়ে নিয়ে খানসামার হাত থেকে যেন ছোঁ মেরে তুলে নিলেন গুলীভর্ত্তি ডবল ব্যারেল একটি। ওলন্দাজদের তৈরী বন্দুক। ডাচ ছাপমারা।

ঝড় উঠেছে কোথায়, বান এসেছে, বাঁধ ভেঙ্গেছে যেন!

কাতারে কাতারে মানুষ আসছে ইদিক-সিদিক থেকে। কালো রঙের জনস্রোত আসছে যেন। মানুষের জোয়ার আসছে। সামাল সামাল রব প'ড়ে গেছে চতুর্দ্দিকে। মানুষগুলির হাতে হাতে অস্ত্র চক-চক করছে প্রখর সূর্য্যালোকে। রূপালী ঝলকে চোখে ধাঁধা লাগছে।

বাইরে থেকে রাজপুরীর আঙিনায় দা আর ভল্ল এসে পড়ছে ঝাঁকে-ঝাঁকে। ফটকে তালা পড়ে গেছে, ভেতর থেকে।

ছাদে উঠেছেন কুমারবাহাদুর। সদরের এক ছাদের চিলে-কোঠায় উঠে দোনলা বন্দুক দাগছেন দুষ্কৃতিকে কাঁপিয়ে।

বজ্রপাত হচ্ছে যেন অবিরাম। পাখীর ঝাঁক উড়ে পালিয়ে যায় ভয়ে ভয়ে। কাকের ঝাঁক ডাকাডাকি ক'রে ভয়-কাঁপা সুরে! বন্দুকের গগনভেদী আওয়াজ শুনে জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়! যে যে দিকে পারে পালিয়ে যায়।

বা আর ভল্লের তুলনায় আগ্নেয়াস্ত্র! মৌচাকে ঢিল পড়ছে যেন। ভয়ার্ত্ত মানুষের পাল ছুটে পালিয়ে যায় যে যেদিকে পারে। তাদের কলরোলে বন্দুকের শব্দ যেন ম্লান হয়ে যায়।

ক্ষান্ত হন না কাশীশঙ্কর। বিরতি নেই যেন। মৃদু-মৃদু হাসির সঙ্গে পর-পর গুলী দেগে চলেছেন তিনি। খোলাছাদ, তাই দরদর ঘামছেন দ্বিপ্রাহরিক সূর্য্যতেজে।

পশু আর মানুষের যুদ্ধে পশু পরাস্ত হয় ওদিকে। দরবারের ঘাসমাটিতে প'ড়ে আছে নেকড়ে। তার বুকের ক'খানা পাঁজরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গেছে। তাকে পায়ের তলায় চেপে ধ'রে উঠে দাঁড়িয়েছিল রক্তাক্ত জগমোহন। নেকড়ের দাঁত আর নখরের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত সে। পায়ের তলায় পিষে ধরায় পশুর হৃৎপিণ্ড ফেটে গেছে চৌচির হয়ে! মুখের দু'পাশের কষ বেয়ে রক্তপাত হ'য়েছে।

ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে। হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে উঠছে যেন জগমোহন। হাঁ হ'য়ে আছে মুখ। টসটসিয়ে ঘাম পড়ছে চিবুক থেকে। পরিশ্রান্ত জগমোহন। তার দেহের সকল শক্তি যেন লুপ্ত হয়েছে। তবুও হাসছে জগমোহন, হননের নেশায়।

—রাজাবাহাদুর! কথা বললে জগমোহন। হাঁপাতে-হাঁপাতে ডাকলো। বললে,—একটি বার রাজমাতার দর্শন চাই, আপনি অনুমতি দিন।

—কেন? কি কারণ?

কপালে রেখা ফুটিয়ে বললেন কালীশঙ্কর।

—রাজকুমারী একটি আঙটি দিয়েছেন। জগমোহন কথা বলে আর হাঁপায়। বলে,—ব'লে দিয়েছেন এই আঙটি যেন রাজমাতার শ্রীচরণে প্রণাম দিই।

—প্রণাম না প্রমাণ জগমোহন?

সহাস্যে বললেন কুমার কাশীশঙ্কর। হাতে দোনলা বন্দুক, কোমরে কার্তুজের থলি। তিনি কখন এসে উপস্থিত হয়েছেন খেয়াল হয়নি রাজাবাহাদুরের।

—যাই বলুন ছোটকুমার। রাজকুমারী যেমন ব'লে দিয়েছেন, আমিও সেই কথাই কইছি।

কথা বলতে বলতে জগমোহন নিজের ট্যাঁকে হাত দেয়। কোমরের ইদিক-সিদিক হাতড়ে গেঁজে বের করলো। সরু লম্বা থলি একটি।

—কুমার, তুমিই আজ রক্ষা করলে আমার সম্মান! তুমি যদি বন্দুক না দাগতে, ঐ দুলে আর বাগ্দীদের হটানো সম্ভব হ'তো না। সোল্লাসে কথা বলছেন রাজা। হেসে হেসে বললেন,—এই লও তোমার পুরস্কার।

কথার শেষে কালীশঙ্কর নিজের কণ্ঠ থেকে হীরার মালা খুলে পরিয়ে দিলেন সহোদরকে।

জগমোহন বললে,—কুমারবাহাদুর নেকড়েটাকে ঘায়েল করেছি আমি। এক বার দেখেন চোখ ফিরিয়ে।

কাশীশঙ্কর অগ্রজের পদদ্বয় স্পর্শ করলেন। প্রণাম করলেন। বললেন,—দেখেছি জগমোহন। এখন কও আমাদের অনুজা বিন্ধ্যবাসিনী কেমন আছে?

—ভালই আছেন তিনি। বেশ হাসিমুখেই আছেন। গন্ড মান্দারণে বসবাস করছেন।

—আর কে কে আছে তার কাছে?

—একজন দাসী আছে। আর আছে একজন বন্দুকধারী প্রহরী।

—ব্যস! আর কেহ নাই?

—না হুজুর, আর তো কাকেও দেখি নাই!

কথায় কথায় কুমার যেন কেমন চিন্তাকুল হয়ে পড়লেন। বললেন,—রাজাবাহাদুর, তবে তো খুবই ভাল। আমিই যাবো মান্দারণে, বিন্ধ্যবাসিনীকে উদ্ধার ক'রে আনবো। ঐ জগমোহন আমার সঙ্গে থাকবে।

—তথাস্তু! তথাস্তু!

রাজাবাহাদুর কথার শেষে পানপাত্র নিঃশেষ ক'রে ফেললেন এক চুমুকে। বললেন,—সঙ্গে আরও দু'-চার জন লেঠেলকে যদি লও তো ক্ষতি কি! সাবধানের মার নাই।

কাশীশঙ্কর অল্প হাসির সঙ্গে বললেন,—একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর! কি বল' জগমোহন?

—হুজুর আপনারা যেমন ইচ্ছা করেন। কেমন যেন মনমরার মত কথা বলে লেঠেল। বলে,—আমাগোর জাতভাইদের তো ছোটকুমার গুলী মেরে মেরে ছত্রভঙ্গ করলেন! তাদের ঠাণ্ডা করি কোন্ উপায়ে! ক'জনকে হত্যা করলেন কুমার?

হো হো শব্দে হাসলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—ফাঁকা আওয়াজ করেছি জগমোহন! দু' কুড়ি কার্তুজ শূন্যে দেগেছি। ফাঁকা আওয়াজ শুনেই পালিয়েছে তোমার জাতভাইরা, তাদের এতই সাহস!

—ফাঁকা আওয়াজ হুজুর?

—হাঁ গো হাঁ।

—তবে পায়ের ধূলা দেন আপনি। প্রার্থনা করি শতায়ু হোন। একটা জান গেলে আর রাজপুরীতে আসতে পেতাম না। জাতভাইরা একঘরে করতো আমাকে। খেতে পেতাম না।

—রাজকুমারীর আঙটি কৈ দেখি?

হাত পাতলেন কালীশঙ্কর। সাগ্রহে, অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে। কুমারের হাতে পড়লো একটি স্বর্ণাঙ্গুরীয়। হীরা আর পান্না বসানো। আঙটি হ'তে নিয়ে কালীশঙ্কর বলেন,—এই আঙটি রাজমাতার হাতের। অত্যন্ত সুলক্ষণযুক্ত। বিন্ধ্যার বিবাহের পরে রাজমাতা উপহার দিয়েছিলেন রাজকুমারীকে।

—হাঁ ঠিক তাই।

রাজাবাহাদুরও সায় দিলেন ভাইয়ের কথায়।

কালীশঙ্কর বললেন,—এটি আমার কাছেই থাক। আমি দেবো রাজমাতাকে।

জগমোহন কাতর সুরে বললে,—একবার রাজমাতার দর্শন মিলবে না রাজাবাহাদুর? কত ব্যস্ত হয়ে রয়েছেন তিনি!

রাজা বললেন,—আজ এখনই নয়, পরে অন্য সময়ে এসো জগমোহন! সর্বাগ্রে তুমি তোমার ক্ষতে মলম লাগাও। নেকড়ের নখে আর দাঁতে যে বিষ আছে!

—তাই হবে রাজাবাহাদুর। আপনি যেমন হুকুম করবেন তেমন হবে। আমি কিছু পাবো না রাজাবাহাদুর? সান্তর্গা আর গড়মান্দারণে গেছি আর এসেছি। নেকড়ের সঙ্গে লড়াই করেছি কত রক্তপাত হয়েছে।

—গুপ্তচরবৃত্তি পরিহার করো তো দিই দু'-চার মোহর।

রাজাবাহাদুর কথা বললেন। দরবারে যেতে উদ্যোগী হলেন।

—মা কালীর দিব্য বলছি রাজাবাহাদুর, আর কখনও এমন গর্হিত কাজ হবে না।

কালীশঙ্কর ইতি-উতি দেখলেন। ডাকলেন,—দেওয়ানজী! দেওয়ানকে দেখি না কেন?

কাছাকাছি কোথায় ছিলেন দেওয়ানজী। সাড়া দিলেন না, রাজার সমুখে এসে দাঁড়ালেন।

রাজা বললেন,—পাঁচখান মোহর দেওয়া হোক জগমোহনকে। এক জোড়া ধুতি আর একখান পেতলের তৈজস।

—জয় রাজা কালীশঙ্করের জয়!

জয়ধ্বনি দেয় একা জগমোহন। কণ্ঠ সপ্তমে তুলে কথাগুলি বলে।

রাজাবাহাদুর সহোদরের উদ্দেশ্যে বললেন,—কুমারবাহাদুর, তুমিই যাও রাজমাতার নিকট। সকল বৃত্তান্ত তাঁকে জানা[ও]। আমি আর দাঁড়াতে পারি না। নেশা লাগছে! পায়ে বল প[াই] না যেন আর!

অন্দরমহল যেন থম-থম করছে।

কেউ কোথাও নেই যেন। কারও দেখা মেলে না। তিন রাণী একজনেরও দেখা নেই। দাস-দাসী খানসামা, তারাও যেন কোথা আত্মগোপন করেছে। শুনেছে কুমারবাহাদুর এসেছেন অন্দরে তাঁর হাতে আছে দোনলা বন্দুক, টোটা-ভরা!

পাটরাণী উমারাণী এক কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন লাল অধরে স্নিগ্ধ হাসি মাখিয়ে। বললেন,—কুমারবাহাদুর, শিকার কি অন্দরে এসে লুকিয়েছে?

—না গো বড়রাণী। মৃদু হেসে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন, —রাজমাতার কাছে চলেছি।

—হাতে অস্ত্র কেন তবে? মুখে মিষ্টি হাসি ফুটিয়ে উমারাণী বলেন,—রাজমাতার অপরাধ কি? পরশুরাম হবেন না কি মহাশয়?

—কি যে বল' বড়রাণী! এমন কথা চিন্তা করাও যে পাপ!

উমারাণী বলেন,—পাপ-পুণ্যের বিচার থাকে হাতে অস্ত্র ধরলে? অনেক তো গুলী ছোঁড়াছুঁড়ি করলেন, মরলো ক'জন তাই শুনি?

—একজনও নয়। ফাঁকা আওয়াজ গো বড়রাণী! বুঝেও বোঝ' না কেন?

কথা শুনে ঠোঁট ওল্টালেন উমারাণী। রাঙা অধর বেঁকিয়ে বললেন,—ফাঁকা আওয়াজ! এমনই মুরোদ?

এক মুহূর্ত নিশ্চুপ থেকে কুমার বললেন,—ফাঁকাতেই এই, না জানি টিপ দেগে দু'চারটাকে ধরাশায়ী করলে—

কথা শেষ করতে দেন না বড়রাণী। বলেন,—জগমোহন লেঠেলের কি পরিণাম হয়েছে কুমারবাহাদুর?

—নেকড়ের সঙ্গে লড়াইয়ে তার জয় হয়েছে। নেকড়ে পঞ্চত্ব পেয়েছে। কথায় যেন কাতরতা ফুটলো কুমারের। বললেন,—বড়ই তৃষ্ণার্ত হয়েছি বড়রাণী। এক পাত্র শীতল জল খাওয়াতে পারো?

—অপেক্ষা করুন কুমার, আমিই পানীয় জল দিই আপনাকে। কথার শেষে পুনরায় কক্ষে প্রবেশ করলেন উমারাণী। চকিতের মধ্যে ফিরে এলেন স্বর্ণপাত্র হাতে। জলের সুগন্ধ ছড়ালো যেন! কেয়া ফুলের গন্ধ।

আকণ্ঠ পান করলেন কালীশঙ্কর। পাত্র নিঃশেষিত ক'রে বললেন,—এই উচ্ছিষ্ট পাত্র রাখি কোথায়?

—ঐটি আপনাকে আমি দিলাম। জলপান করবেন আপনি। সঙ্গে লয়ে যান। মিষ্টি হাসির সঙ্গে উমারাণী বলেন। বললেন,— রাজার সম্মান বাঁচিয়েছেন, তাই।

—যথা লাভ!

সহাস্যে কালীশঙ্কর বললেন। পাত্রটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন। পাত্রটির গায়ে নানাবিধ নক্সা। যেমন সুদৃশ্য তেমনিই ওজনে ভারী। বললেন,—রাজা কি দিয়েছেন দেখো বড়রাণী! এই দেখো।

কথার শেষে কণ্ঠে ঝলন্ত হীরার মালাটি দেখালেন।

তামাসাভরা হাসি হাসলেন উমারাণী। বললেন,—আজ প্রাতে কি আপনার ঘুম ভেঙেছে রাজরাণীর মুখ দেখে?

—হাঁ ঠিক তাই। মিথ্যা বল' নাই তুমি।

—রাজরাণীর সীঁথির সিঁদুর অক্ষয় হোক।

—আমাদের মহামান্যা পাটরাণীও এয়ো থাকুন জন্মজন্মান্তরে।

—না কুমারবাহাদুর, প্রার্থনা করো যেন মরতে পারি শীঘ্রি শীঘ্রি।

—কেন গো বড়রাণী? মরণে স্পৃহা কেন এই অকালে?

—নারীর মৃত্যুই মঙ্গলের, বেঁচে থাকায় অনেক যন্ত্রণা।

কুমারবাহাদুর লক্ষ্য করলেন, কথা বলতে বলতে উমারাণীর মুখবিম্বে যেন দুঃখের ছায়া ফুটলো। হতাশ দৃষ্টি ফুটলো চোখে। লাল অধর যেন কেঁপে-কেঁপে উঠছে। এত সুখ আর এত ঐশ্বর্য্য, তবুও কেন যে কষ্টের সুর রাণীর কথায়, বুঝলেন না ছোটকুমার।

কাশীশঙ্কর বললেন,—যাবে কোথায় এখনই, কুমার শিবশঙ্করকে মানুষ করবে না? দেখো, তোমার রাজপুত্তুর খুবই বুদ্ধিমান হবে, আমি তাকে দেখে দেখে বুঝেছি।

—আশীর্ব্বাদ করুন কুমারবাহাদুর। আমার একমাত্র সন্তান সে। যেন মানুষের মত মানুষ হয়। কথার শেষে খানিক থেমে আবার বললেন বড়রাণী,—রাজমাতার কাছে কেন এমন অসময়ে? ডাক পড়েছে?

—না গো বড়রাণী। কাশীশঙ্কর বললেন। হাতের মুঠো খুলে ধরলেন। বললেন,—এই দেখো রাজকুমারীর হাতের অঙ্গুরীয়।

—কোথায় মিললো? কে দিলো? এ তো দেখি তার হাতের আঙটি!

উমারাণী কথায় কথায় বিস্ময় প্রকাশ করলেন। খুঁটিয়ে দেখলেন হীরা-পান্নার আঙটি। কুমারের শুভ্র লাল হাতের তালুতে ঝল ঝল করছে যেন।

—লেঠেল জগমোহন গিয়েছিল মান্দারণে। সেই এনেছে এই স্মারকচিহ্ন। রাজমাতাকে দিতে হবে।

—আমাদের ননদিনীর শরীরগতিক ভালো? সুখে আছেন তো রাজকন্যা? উমারাণীর কণ্ঠে যেন ব্যগ্র আগ্রহ ফুটলো। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁর চোখে।

—আছে, ভালই আছে বিন্ধ্যবাসিনী। তবে নির্ব্বাসনভোগে কে আর সুখ পায়! মান্দারণ দেশও তেমন সুখপ্রদ নয়, বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ।

—আর কতকাল থাকতে হবে মান্দারণে? কবে যে মুক্তি পাবেন রাজকুমারী! আহা, তার নরম শরীর। দুঃখকষ্ট কাকে বলে কখনও জানিতো না।

—আর বেশীদিন কষ্ট ভোগ করতে হবে না বড়রাণী!

—তবে কি জমিদার কৃষ্ণরাম মত বদল ক'রেছেন? বিন্ধ্যর প্রতি দয়া হয়েছে তাঁর? ভগবান তাঁকে সুমতি দিন।

ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসি হাসলেন কাশীশঙ্কর। বললেন,—কৃষ্ণরাম মত পরিবর্ত্তন করবে, তেমন মানুষই সে নয়! বৃশ্চিকের কামড়, মেঘ না ডাকলে ছাড়ান-ছোড়ন নেই।

—তবে কে মুক্তি দেবে রাজকন্যাকে? কষ্টভোগ কে ঘুচাবে?

নিজের বক্ষে হাত রাখলেন কুমারবাহাদুর। সদম্ভে বললেন,—এমন ভাই থাকতে রাজকুমারীর ভাবনা কি? আমি যাবো মান্দারণে। চুপ চুপ, কেউ যেন না জানতে পারে। কাকে-বকেও নয়। আমি বিন্ধ্যকে উদ্ধার ক'রবো। তাকে বাঁচাবো ঐ স্বেচ্ছাচারীর কবল থেকে!

আশার আলো দেখতে পেয়েছেন যেন উমারাণী। খুশীর মৃদু হাসি ফুটলো তাঁর রাঙা ঠোঁটের কোণে। টানা টানা চোখ দু'টিও যেন হেসে উঠলো বারেক। স্বস্তির শ্বাস ফেললেন।

—ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন কুমারবাহাদুর! কথা বলতে বলতে সভয়ে স'রে গেলেন বড়রাণী। কক্ষে প্রবেশ করলেন। বললেন—ছোটকুমার, ঐ দেখুন রাজমাতা, এই দিকেই হয়তো আসছেন।

লম্বা দালানের অপর প্রান্তে বিলাসবাসিনীর আবির্ভাব হয়। অসংলগ্ন পদক্ষেপে তিনি ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন। তাঁর মুখাকৃতিতে যেন শ্রাবণের মেঘ নেমেছে; এমনই গম্ভীর। দালান কাঁপিয়ে তিনি ডাকলেন উচ্চ কণ্ঠে,—কাশীশঙ্কর!

—কি আদেশ রাজমাতা?

—হাতে দোনলা কেন তোমার? জগমোহনকে হত্যা করলে না কি?

হেসে ফেললেন কুমারবাহাদুর। জননীর পদধূলি মাথায়

ছুঁইয়ে বললেন,—জগমোহনকে হত্যা করতে কি গুলীবারুদের প্রয়োজন হয় রাজমাতা ?

বিলাসবাসিনী বললেন,—বাঘের মুখে লেলিয়ে দিতে হয় ?

আবার হাসলেন কুমার। হো-হো শব্দে হাসলেন। হেসে হেসে বললেন,—বাঘ তো নয় নেকড়ে, যা একটা কুকুরের সামিল। রাজাবাহাদুর তাকে এ শাস্তি দিয়েছেন গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধে।

—এই শাস্তি তো আমারই পাওনা। গরীব বেচারী আর অহেতুক মরে কেন ?

—জগমোহনের জয় হয়েছে রাজমাতা। নেকড়েটাকে পরাস্ত করেছে, পিষে মেরে ফেলেছে। জগমোহন আহত হয়েছে নামমাত্র, যৎসামান্য।

—তোমাদের রাজাবাহাদুর দিন-দিন যেন নৃশংস হয়ে উঠছেন! এমন শাস্তি কি মানুষে দেয়! আমার বিন্ধ্যবাসিনী কেমন আছে, জানো কি তুমি? লেঠেলের সঙ্গে রাজকুমারীর সাক্ষাৎ হয়েছে ?

—এই নেন রাজমাতা। দেখেন চিনতে পারেন কি না এ কার অঙ্গুরীয়।

—এ যে আমার বিন্ধ্যবাসিনীর! কে তোমাকে দিলো ?

—লেঠেল এনেছে সাতগাঁ থেকে। রাজকুমারী পাঠিয়েছেন আপনার তরে।

আঙটি হাতে নিয়ে মুঠোয় ধ'রে বুকে চাপলেন বিলাসবাসিনী। চুমু খেলেন ওষ্ঠে ছুঁইয়ে। বিশাল আঁখিদ্বয়ে অশ্রুর চিকণ খেললো যেন। বহুক্ষণ ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলেন, রাজকন্যার ব্যবহারের আঙটি। যেন এখনও বিন্ধ্যবাসিনীর স্পর্শ মাখানো রয়েছে!

—আমাকে সাতগাঁয়ে পাঠিয়ে দাও কুমারবাহাদুর। মেয়েকে এক বার দেখে আসি আমি।

কাঁপা-কাঁপা সুরে কথা বললেন রাজমাতা। আকুল প্রার্থনার সুরে যেন বললেন।

—আপনি কেন যাবেন কুটুমের দেশে? অপ্রত্যাশিত যাওয়ায় যদি সম্মানের হানি করে কেষ্টরাম, তখন ?

—মেয়ে দিয়েছি যখন, তখন আর মান-অপমানের কথা ওঠে না। আমাকে তোমরা পাঠিয়ে দাও। সঙ্গে ঐ জগমোহন লেঠেল যাবে'খন।

—না না, তা হয় না। আমি তো যাবোই। আমি যদি যাই তো আপনার আর চিন্তার কি আছে ?

হঠাৎ প্রসন্ন হাসি হাসলেন রাজমাতা। বললেন,—ছোটকুমার, তুমি যাবে? সত্য না মিথ্যা? না স্তোকবাক্য ?

—আমি মিথ্যা বলি না রাজমাতা!

—তা আমি জানি, আমার অজানা নেই। কিন্তু, তুমি কেন যাবে ?

—বিন্ধ্যকে সঙ্গে লয়ে আসবো। তোমার আদরের মেয়ে আসবে, তোমার কাছে থাকবে। জলাঞ্জলিতে যাক তার শ্বশুরালয় বাস!

—কোন্ উপায়ে কুমারবাহাদুর? রাজকন্যার সন্ধান পাবে কোথায় ?

—আর কোন প্রশ্ন নয় রাজমাতা। আর যেন ব্যস্ত না হও। আমি যখন কথা দিয়েছি, তখন রক্ষা করবো আমার মুখের কথা।

—শতায়ু হও তুমি। এসো আশীর্ব্বাদ করি। তোমাদের রাজা তো গ্রাহ্য করলেন না, তুমি যদি এখন শান্তি দিতে পারো আমাকে।

—রাজাকে দুষবে না অযথা। তাঁর দোষ কি? রাজার মত মানুষ দেখা যায় না সচরাচর। তিনি শান্তিকামী, কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই।

—আমার পেটে-ধরা মেয়েকে তবে আমি ফিরে পাবো ছোটকুমার ?

—হাঁ নিশ্চয়ই পাবে। আকাশের ধ্রুবতারার মত এ কথা সত্য জানবে।

—তবে আমি নিশ্চিন্ত। আর আমার কিছু বলার নেই।

কথার শেষে বিলাসবাসিনী পিছন ফিরলেন। যে-পথে এসে-ছিলেন সেই পথে চললেন।

মা আর ছেলে চললেন দুই বিপরীত পথে। কক্ষমধ্যে নীরবে থেকে উমারাণী শুনেছেন আদ্যোপান্ত। ঘর থেকে চুপি চুপি বেরিয়ে ধীরে ধীরে ডাকলেন,—কুমারবাহাদুর! জলপাত্রটি সঙ্গে লয়ে যান। আমার দেওয়া উপহার।

কাশীশঙ্কর গ্রহণ করলেন সেই স্বর্ণপাত্র। সম্ভ্রমের সঙ্গে। এক ঝলক হেসে আবার এগিয়ে চললেন তড়িৎ গতিতে। [ক্রমশঃ

সাহিত্য পরিচয়

ভাষাভিত্তিক রাজ্যবিন্যাস

ফাল্গুন ও চৈত্র মাসের (১৩৬২) 'মাসিক বসুমতীতে' আমরা সংযুক্তি-বিরোধী যুক্তি ও বক্তব্য সুস্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছিলাম। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয়ও করিয়ে দিয়েছিলাম। গত মাসে আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম, প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করতে। অবশেষে ডক্টর রায় প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেছেন এবং এই সৎসাহসের জন্য তাঁকে আমরা আন্তরিক সাধুবাদ জানাচ্ছি। বিহারের বড়-মেজ সকল স্তরের কর্তারা স্বভাবতঃই মর্মাহত হয়েছেন। কারণ তথাকথিত সংযুক্তির ধাপ্পাবাজিতে তাঁরা নিজেদের চিত্তদৈন্য ও দুরভিসন্ধিকে চাপা দেবার যে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, তা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গেল। ডক্টর রায়ের প্রতি (যাঁকে তাঁরা কিছুদিন আগে এযুগের 'শিব' বলেছিলেন) উষ্মা-প্রকাশে তাই তাঁরা তৎপর হয়েছেন। আমরা আশা করব, ডক্টর রায় পাটনা বা নয়াদিল্লীর বুদ্ধি বা হুমকি, কোনটার কাছেই নিজের বুদ্ধি ও পৌরুষকে বিসর্জন দেবেন না। সীমানা কমিশন পশ্চিমবঙ্গের যেটুকু দাবী স্বীকার করেছিলেন, হাইকম্যাণ্ড তাও খণ্ডন করেছেন। ডক্টর রায়ের কর্তব্য, এই কারসাজির ও চক্রান্তের বিরুদ্ধে সাহস ক'রে দাঁড়ানো। জীবনের এই শেষ কর্তব্যটুকু তিনি যদি পালন করতে অগ্রসর হন, সমগ্র বাঙালী জাতি কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর অনুগামী হবে। বাঙালী জাতির অস্তিত্বই যদি লুপ্ত হয়ে যায়, বাঙালীর ভাষা ও সংস্কৃতিই যদি খণ্ডিত হয়, তাহ'লে একাধিক 'ইকনমিক প্ল্যানিং' বাঙালীকে রক্ষা করতে পারবে না। এমনিতেই ধড়মুণ্ড আলাদা হয়ে, দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় আমরা ধুকধুক করছি। এক দিকে উর্দু, আর একদিকে হিন্দীর টানাটানিতে প্রাণ আমাদের ওষ্ঠাগত। উর্দুর জবাব পূর্ববঙ্গ দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গকে দিতে হবে হিন্দীর জবাব। সব রকমের সংযুক্তির যুক্তিকে কুযুক্তি ব'লে বর্জন ক'রে, ভাষাভিত্তিক রাজ্য-পুনর্বিন্যাসের দাবী নিয়ে বাঙালীকে প্রাণপণ সংগ্রাম করতে হবে। অযোধ্যার দশরথ-নন্দনরা নিজেদের প্রদেশটির গায়ে আঁচড় কাটতে না দিয়ে, বাংলা মহারাষ্ট্র উড়িষ্যা ইত্যাদি প্রদেশ নিয়ে বালখিল্যের 'এক্সপেরিমেণ্ট' আরম্ভ করেছেন! তাঁদের প্রকৃতিস্থ করবার জন্য যে কোন সংগ্রামই পবিত্র সংগ্রাম। সংগ্রামকালে বাঙালীদের কর্তব্য মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যার ন্যায্য দাবীর কথা স্মরণ রাখা, বিশেষ ক'রে উড়িষ্যার কথা। উড়িষ্যার প্রতি অমার্জনীয় ঔদাসীন্য দেখানো হয়েছে। একটা জাতিকে এমন ভাবে উপেক্ষা করবার সাহস বর্তমান শাসকরা কোথা থেকে সঞ্চয় করলেন, তাঁরাই জানেন! আমরা মনে করি, তাঁরা আগুন নিয়ে খেলা করছেন। একথা আজ তাঁদের বুঝিয়ে দেওয়া উচিত। ভাষাভিত্তিক রাজ্যগঠনের আন্দোলনে আজ বাঙালীর ঐক্যের সমস্যাও জীবন-মরণের সমস্যা। রাজনৈতিক দলাদলিতে আন্দোলন দুর্বল হবে। একথা কংগ্রেসী ও বামপন্থী উভয়েরই মনে রাখা উচিত। আমরা তাই ঐক্যের জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করছি। আগে দেশ, তার পর দল। দলাদলি করতে হলেও বেঁচে থাকা প্রয়োজন। বেঁচে থাকাই যখন আজ সম্ভব হচ্ছে না, তখন বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী, উত্তরপন্থী, পশ্চিমপন্থী, এই ভাবে পন্থা ও পন্থীর সংখ্যা বাড়ালে, শেষ পর্যন্ত জাহান্নম-পন্থী হওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না। মহারাষ্ট্র একপন্থীর পথ দেখিয়েছে। একপ্রাণ একদল হয়ে, ভাষাভিত্তিক আন্দোলনে বাঙালীরও উচিত, সেই পথ অনুসরণ করা।

বাংলার আকাশে দুর্দিন

বছর কুড়ি-পঁচিশ আগে রবীন্দ্রনাথ বাঙালীর বর্তমান দুর্দিনের ইঙ্গিত করেছিলেন। বাংলা দেশে আজ রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নৃত্যগীত ও গতানুগতিক বক্তৃতায় আমরা সেই উৎসব পালন করছি। তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই 'প্রফেটিক' উক্তি আজ প্রত্যেক বাঙালীকে আমরা স্মরণ করতে অনুরোধ করছি।

"বাংলার আকাশে দুর্দিন এসেছে চারদিক থেকে ঘনঘোর করে। একদা রাজদরবারে বাঙালীর প্রতিপত্তি ছিল যথেষ্ট। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী কর্মে পেয়েছে খ্যাতি, শিক্ষা প্রসারণে হয়েছে অগ্রণী। সেদিন সেখানকার লোকের কাছে সে শ্রদ্ধা পেয়েছে, পেয়েছে অকুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতা। আজ রাজপুরুষ তার প্রতি অপ্রসন্ন, অন্যান্য প্রদেশে তার সম্বন্ধে আতিথ্য সংকুচিত, দ্বার অবরুদ্ধ। এদিকে বাংলার আর্থিক দুর্গতিও চরমে এল। অবস্থার দৈন্যে অশিক্ষার আত্মগ্লানিতে যেন বাঙালী নিচে তলিয়ে না যায়, যেন তার মন তুলতে পারে দুর্ভাগ্যের ঊর্ধ্বে, এই দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টা জাগাতে হবে তো। মানুষের মন যখন ছোট হয়ে যায় তখন ক্ষুদ্রতার নখচঞ্চুর আঘাতে সকল উদ্‌যোগকেই সে ক্ষুণ্ণ করে। বাংলাদেশে এই ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো-দেবার উত্তেজনা তো বরাবরই আছে···শেষকালে নিজের সর্বনাশ করবার জেদ এতদূর এগোল যে বাঙালী হয়ে বাংলা ভাষার মধ্যেও ফাটল ধরাবার চেষ্টা আজ সম্ভবপর হয়েছে।" (শিক্ষা—'শিক্ষার বিকিরণ' ১৯৩৩)।

এ বছরের রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে রবীন্দ্রনাথের এই বাণীই আমরা প্রচার করছি। "আজ রাজপুরুষ তাদের প্রতি অপ্রসন্ন"—একথা

রবীন্দ্রনাথ যখন লিখেছিলেন, তখন ইংরেজরা ছিলেন রাজপুরুষ। আজ ভারতীয়রাই রাজপুরুষ হয়েছেন। তাতে সেই তেত্রিশ সালের অপ্রসন্নতা, ছায়ার সাথে শতগুণ বেড়েছে ছাড়া কমেনি। বাংলা-দেশে যে "ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো-দেবার উত্তেজনার" কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তা বাঙালী চরিত্রের অন্যতম নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবে উল্লেখযোগ্য। এ-বৈশিষ্ট্য যেন প্রতিদিন বাড়ছে। পরিবার, সমাজ-জীবন, সাহিত্যক্ষেত্র, সংস্কৃতিক্ষেত্র, রাজনৈতিক ক্ষেত্র, সর্বত্র ঐ ভাঙন-ধরানো ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি এবং দুয়ো-দেবার উত্তেজনা ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। এই আত্মঘাতী কুবুদ্ধির জন্যই আজ একদল বাঙালী বাংলা দেশের ভাষাভিত্তিক রাজ্যের দাবীর বিরোধিতা করতে উৎসাহিত হচ্ছেন। এই ঈর্ষা নিন্দা দলাদলি ও দুয়ো-দেবার উত্তেজনাই আজ বাংলা সাহিত্য ও বাঙালী সাহিত্যিকের মর্যাদা পর্যন্ত ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত হয়েছে। ভাবুক বাঙালী, যাঁরা ভাবের ঘোরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করছেন, সভাপতি ও প্রধান অতিথি খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তাঁরা যদি মনের আনন্দে মশগুল হয়ে না থেকে, রবীন্দ্রনাথের এই সব উক্তির তাৎপর্য উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন, তাহলে রবীন্দ্রনাথ ও দেশের প্রতি অনেক বেশি অনুরাগের পরিচয় দেওয়া হবে।

গ্রন্থপার্বণের গোড়ার কথা

গ্রন্থপার্বণের একটা চাপা রব উঠেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা চাপা প'ড়ে গেল কেন? তার কারণ, কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না, এবং যদি থেকেও থাকে, তা প্রচার করা হয়নি ব'লে। বাংলা নতুন বছরের প্রথম বৈশাখ মাসটিতে গ্রন্থপার্বণ পালন করা যেতে পারে। বাঙালী পাঠকদের যদি বাংলা বই কিনতে ও পড়তে উৎসাহিত করাই গ্রন্থপার্বণের উদ্দেশ্য হয়, তাহ'লে বৈশাখ মাসে প্রত্যেক প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতার উচিত, প্রত্যেক পাঠককে অন্ততঃ টাকায় দু'আনা হারে কমিশন দেওয়া। যতদূর জানি, সর্বসম্মতিক্রমে সে-রকম কোন সিদ্ধান্ত করা হয়নি। কলকাতা শহরের বাইরের পাঠকদের বিনা ডাক খরচে বৈশাখ মাসে বই কেনবার সুযোগও দেওয়া উচিত। তার জন্য পুস্তক ব্যবসায়ীরা সরকারী বিবেচনার দাবীও করতে পারেন। যতদূর জানি, সে-রকম কোন চেষ্টাও করা হয়নি। 'গ্রন্থপার্বণে বই কিনুন' বললেই—পাঠকদের এমন কিছু দায় ঠেকেনি যে তাঁরা বই কিনতে হঠাৎ উৎসাহিত হবেন। তার জন্য তাঁদের পার্থিব প্রেরণা দেওয়া দরকার। সব চেয়ে বড় কথা, এই সময় পাঠকদের বাংলা বই এক জায়গায় দেখবার সুযোগ দেওয়া দরকার। তার জন্য প্রকাশক ও বিক্রেতারা মিলে একটি বইয়ের প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করতে পারতেন। এই বইয়ের মেলার আবশ্যকতার কথা আমরা এর আগেও বহু বার বলেছি। কলকাতা শহরের প্রধান গ্রন্থকেন্দ্র গোলদীঘিতেই এই বইয়ের মেলার আয়োজন করা উচিত। সিনেট হলঘরে, অথবা সংস্কৃত কলেজে স্বচ্ছন্দে খুব ভাল বইয়ের প্রদর্শনী ও মেলার আয়োজন করা যেতে পারে। এই ভাবে সমস্ত ব্যবস্থা করতে পারলে 'গ্রন্থপার্বণ' নাম সার্থক হ'ত এবং উদ্দেশ্যও অনেকটা সফল হ'ত। কিন্তু নাম ও উদ্দেশ্য কোনটাই সফল হয়নি। কারণ আমাদের ইচ্ছা ও পরিকল্পনাই আছে শুধু, তাকে বাস্তবরূপে দেবার মতন কর্মশক্তি বা উদ্যোগ কোনটাই নেই। তা ছাড়া, একাজ সকলে মিলেমিশে করার একান্ত প্রয়োজন। বাঙালীর পক্ষে তাও সহজে সম্ভব নয়। কিন্তু তা যত দিন না সম্ভব হবে, বাংলা বইয়ের প্রকাশক ও বিক্রেতারা সকলে মিলেমিশে যত দিন না গ্রন্থপার্বণের এই রকম কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করবার জন্য উদযোগী হবেন, তত দিন গ্রন্থপার্বণ কেবল 'মুখের কথাই' থাকবে। করতে পারলে বাংলা বইয়ের প্রসার ও প্রচার যে বাড়ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

টুনটুনির বই

স্বর্গত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীকে শিশুসাহিত্যের যাদুকর বলা চলে। ছাপাখানা, ছবিছাপা, ছবিআঁকা আর ছবিলেখায় এই লেখক ছিলেন অদ্বিতীয়। 'টুনটুনির বই' বহুকাল বাজারে মিলতো না; সম্প্রতি সিগনেট প্রেস এই বইয়ের সুসজ্জিত সংস্করণ প্রকাশ করলেন। পূর্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলের স্নেহরূপিণী মহিলাগণ এই গল্পগুলি শিশুদের শোনাতেন, যখন সন্ধ্যাবেলায় শিশুরা আহার না ক'রে ঘুমিয়ে পড়তো। লেখকের আঁকা ছবিগুলি বাঙলা 'লাইন' ব্লকের প্রায় আদি নিদর্শন। 'টুনটুনি' বাঙলার ঘরে ঘরে উড়ে যাক আবার। সিগনেট প্রেস; কলিকাতা—২০। মূল্য দু'টাকা চার আনা।

ক্ষীরের পুতুল

আচার্য্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যসৃষ্টির শ্রেষ্ঠকীর্তি "ক্ষীরের পুতুল"। শিশুদের জন্য লেখা কিন্তু সকলেই ক্ষীরের পুতুলের আস্বাদ পেতে পারেন। বাঙলার অতীত গৌরবকথা, মিষ্টি কথায় ভ'রে আছে যেন বইয়ের প্রতিটি পৃষ্ঠা। সমর ঘোষ ছবি এঁকেছেন অনেকগুলি—অপূর্ব্ব রেখাচিত্র। সিগনেট প্রেস। কলিকাতা—২০। মূল্য দেড় টাকা।

বিচিন্তা

রাজশেখর বসুর নাম আমাদের সাহিত্যে অবিস্মরণীয়। গল্প, প্রবন্ধ রচনা, অভিধান সঙ্কলন, কাব্য লেখা—বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি। 'বিচিন্তা' তাঁর সাম্প্রতিক রচিত কয়েকটি গুরু এবং লঘু রচনার সমাবেশ। 'চিন্তার আলোড়ন' তুলবার মত খোরাক বিচিন্তায় প্রচুর আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় প্রবন্ধগুলির সার্থক পরিণতি ও পরিচ্ছন্ন ভাষা। 'পরশুরাম' আরও লিখুন, বাঙলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হোক। বিচিন্তার মুদ্রণ-পারিপাট্য অনবদ্য। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড; ১৩, হ্যারিসন রোড কলিকাতা। মূল্য দু'টাকা চার আনা।

অশোকলিপি

'দেবগণের প্রিয়', মৌর্যবংশীয় সম্রাট অশোক সম্বন্ধে দু'-একখানি বই বাংলাভাষায় থাকলেও, 'অশোকলিপি' সম্বন্ধে কোন বাংলা

প্রামাণ্য বই নেই। ভারত-ইতিহাসের প্রত্যেক ছাত্রই জানেন, অশোকের লিপিগুলির (inscriptions) ঐতিহাসিক মূল্য কত বেশী। তাঁর জীবন, আচরিত ধর্ম ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের কথা, ঐতিহাসিকরা এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করেই পুনরুদ্ধার করেছেন। গিরিগাত্রে (Rock Edicts), শিলাফলকে (Minor Rock Edicts), স্তম্ভগাত্রে (Pillar Edicts) ও গুহাগাত্রে (Cave Inscriptions) সম্রাট অশোক যে-সব অনুশাসন লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন, সেগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ ক'রে, মূলসহ বাংলা অনুবাদ ক'রে, পাঠভেদ সহ ডক্টর অমূল্যচন্দ্র সেন প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে অশোকের জীবনকথা জানার আগ্রহও নিশ্চয় অনেকের হবে। এই আগ্রহ পরিতৃপ্তির জন্য বাংলা ভাষায় লেখা এরকম প্রামাণ্য ও পূর্ণাঙ্গ বই আর নেই।—প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি, ২১ বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৪। মূল্য ছয় টাকা।

কবিতার কথা

স্বর্গত জীবনানন্দ দাশকে আমরা প্রধানত কবি হিসেবেই জানি। স্বর্গীয় জীবনানন্দ বাবু কবিতা ছাড়াও কবিতা বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধগুলি এতদিন বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মধ্যে ছড়িয়ে ছিল, সেগুলি একত্রিত করে গ্রন্থের রূপ দিয়েছেন প্রকাশক 'সিগনেট প্রেস'। 'কবিতার কথা'য় কবি জীবনানন্দের পনেরটি প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধগুলি পড়লে কাব্য বিষয়ে স্বর্গত দাশের সুগভীর জ্ঞান, অভিনিবেশ ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কাব্য বিশেষত আধুনিক কাব্যের পাঠক-পাঠিকার কাছে 'কবিতার কথা' গ্রন্থখানি যে বিশেষ সমাদর লাভ করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দাম আড়াই টাকা।

নরেশ গ্রন্থাবলী

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বিশিষ্ট পথ-প্রদর্শক। বাস্তব দৃষ্টিতে জীবন দেখার প্রচলনে তিনিই প্রথম। গ্রন্থাবলীতে তাঁর বিখ্যাত তিনটি উপন্যাস আছে—সতী, রাঙ্গী, কাঁটার ফুল। নরেশচন্দ্র বর্তমানে রীতিমত লিখছেন না। উক্ত উপন্যাস ক'খানি সর্বকালীন। উত্তরায়ন লিমিটেড; কলিকাতা ৬। মূল্য তিন টাকা বারো আনা।

লালবাঈ

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সার্থক এবং পূর্ণাঙ্গ উপন্যাসের অভাব নেই। কিন্তু এমন গ্রন্থ অতি অল্পসংখ্যকই রচিত হয়েছে যা পরবর্তীকালের সাহিত্যধারায় নতুন যুগ প্রবর্তন করে সাহিত্যের রাজপথকে বিস্তৃত করেছে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার এই ধারা রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত পৌঁছে 'রাজর্ষি' ও 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' নিবন্ত প্রদীপের শেষ দীপ্তি দিয়ে অকস্মাৎ মরুপথেই গতি হারিয়ে ফেলেছিল। বিংশ শতাব্দীতে এই ঐতিহ্যময় গৌরবময় সাহিত্যধারা বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল সম্ভবত: এই কারণে, যে তথ্যের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে কল্পনা, ইতিহাস চেতনা ও ও শিল্পদৃষ্টির সমন্বয় সাধন করা অতিশয় পরিশ্রমসাধ্য ও অতুলনীয় প্রতিভাসাপেক্ষ তাই শুধুমাত্র অতীত রোমন্থনের রোমাঞ্চময় কাল্পনিক কাহিনীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস আখ্যা দেওয়ার বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছিল। ইতিহাসের মর্য্যাদা রক্ষা করেও, ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনাকে আশ্রয় করে রচিত 'লালবাঈ' উপন্যাস শুধু শিল্প সাফল্যের গৌরবেই গরবিনী নয়, সাহিত্যের এক পুনরুজ্জীবিত অধ্যায়ের প্রবর্তক হিসেবেও ভবিষ্যৎকালের ইতিহাসে স্বীকৃত হবে। স্কট হারসন ও ক্রয়েডীর প্রভাব থেকে বাংলা সাহিত্যকে 'পথের পাঁচালী' যে মুক্তি দিয়েছিল, কাহিনীকেন্দ্রিক বৃত্তচরিত্রের গতানুগতিকতা থেকে বাংলা উপন্যাসকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' যে নতুন পথ দেখিয়েছিল, অতীত পরিবেশের অবাস্তব কল্পনা বিচরণ থেকে 'লালবাঈ' বাংলা উপন্যাস সাহিত্যকে সেই মুক্তি দিয়েছে। ক্লাসিক রীতি, বিষয় ও গভীরতা রক্ষা করে 'লালবাঈ' যুগপ্রবর্তক এক মহৎ উপন্যাসের সার্থকতায় সম্পূর্ণ, এ সত্য মাসিক বসুমতীর বিদগ্ধ পাঠক মহলের কাছে অজ্ঞাত নয়। ডি, এম, লাইব্রেরী; কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

গঙ্গাবতরণ

চিরকাল সাহিত্যের জগতে এমন কয়েক জন থাকেন, যাঁরা খুব বেশী না লিখলেও সাহিত্যিক পর্য্যায়ে উন্নীত হন। আলোচ্য গ্রন্থের লেখক শ্রীউমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ঠিক সেই ধরণের লিখিয়ে, যিনি অধিক না লিখেও বাঙলার সুধী মহলে সাহিত্য শিল্পরসপিপাসু হিসাবে যথেষ্ট পরিচিত। তাঁর আলোচ্য গ্রন্থ 'গঙ্গাবতরণ' ভারত-ভ্রমণ সম্পর্কীয় একখানি পবিত্র গ্রন্থ। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী আর লেখার ভাষার গুণে, হিমালয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়তে পড়তে যেন এক অপূর্ব্ব অনুভূতি আসে পাঠকের মনে। লেখকের বর্ণনাশৈলী আর নিরহঙ্কার লিপিচাতুর্য্য বইটির ছত্রে ছত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। গঙ্গোত্রীর লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্য নিয়ে লেখকের হিমালয় তীর্থযাত্রা 'গঙ্গাবতরণ' পাঠককে উপহার দিয়ে লেখক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গ্রন্থে লেখকের তোলা ক'খানি সুন্দর আলোকচিত্র আছে। মূল্য তিন টাকা। প্রকাশক, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা।

নানা রঙের দিন

'নানা রঙের দিন' বহু প্রত্যাশিত গ্রন্থ সন্তোষকুমার ঘোষের। বলিষ্ঠ ভাষা আর তির্য্যক দৃষ্টি—এই দুইয়ের সমন্বয় লেখকের লেখার প্রতিটি ছত্রে। শিশুমনের বিচিত্র বিকাশ চিত্রিত হয়েছে নানা রঙের দিনে। পড়তে পড়তে মন যেন হারিয়ে যায় সেই ফেলে-আসা দিনে। দীর্ঘ উপন্যাস, আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের চরম বিকাশের লক্ষণ বলা যায়। এ বই উপহারের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড। ১৩, হ্যারিসন রোড। কলিকাতা।

জঙলা মাঠের ফসল

"জঙলা মাঠের ফসল" বাঙলার গ্রামজীবনের ছায়াচিত্র। ঝাপুর নদীর তীরে, আমাদের বরিশালের নদীবহুল এলাকায় দরিদ্র মুসলমান সমাজের নিখুঁত বর্ণনায় অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত অসাধারণ দক্ষতায় পরিচয় দিয়েছেন। জয়নাল, ওয়মাল আর বাসুর ভালবাসা; কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙলার লোকসঙ্গীতের

কলি—সাহিত্যরসিকদের অত্যন্ত সমাদরের জঙলা মাঠের ফসল। চরিত্রগুলি সজীব, বলিষ্ঠ। বইয়ের ছাপা বাঁধাই চমৎকার। নিরীক্ষা ; ৫৬/১এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা চার আনা।

যৌনমনোদর্শন

হ্যাভেলক এলিসের মহাগ্রন্থ "ষ্টাডিজ ইন দি সাইকোলজি অব্ সেক্স"এর বাঙলা অনুবাদ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশ করছেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। আলোচ্য গ্রন্থ অনুবাদের তৃতীয় খণ্ড। এই খণ্ডে 'প্রেম ও পীড়া' এবং "রমণীর কামাবেগ" এই দুই বিষয়ের ভিত্তিতে ঊনিশটি জীবনেতিহাস সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রেমের বিচিত্র ধারা এবং রমণীজীবনের যৌনসমস্যা—পড়তে পড়তে শুধু বিস্ময় জাগে না, অভিনব অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় বিভিন্ন জটিল তত্ত্বের। প্রত্যেক বিবাহিত নরনারীর অবশ্যপাঠ্য এই বই। অনুবাদক ত্রিদিবনাথ রায়। মূল্য তিন টাকা।

স্বর্ণমৃগয়া

উপন্যাসের বিশেষত: বৃহদায়তন উপন্যাসের প্রাথমিক প্রয়োজনীয় গুণ সুখপাঠ্যতা। দ্বন্দ্ব এবং ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পাঠকের মনকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখা, ভাষান্তরে আচ্ছন্ন করে রাখাই, ঔপন্যাসিকের প্রধানতম না হলেও প্রাথমিক লক্ষ্য ও কর্তব্য। শ্রীসুনীল ঘোষের সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাসটি ঔপন্যাসিকের এই প্রাথমিক গুণটির পরিচায়ক। কাহিনী-বিন্যাসের ক্ষমতায় সুনীলবাবুর কলম যে বিশিষ্ট এ বিষয়ে নিঃসংশয়। কাহিনীর কোথাও জড়তা বা আড়ষ্টতা নেই, পড়তে পড়তে কোথাও বিরক্তি আসে না, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠকের মন লেখকের হাত ধরে স্বচ্ছন্দগতিতে এগিয়ে চলে। ভাবারীতিও স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ; শোভন প্রচ্ছদে আচ্ছাদিত ও সুমুদ্রিত এই উপন্যাসের প্রকাশক হলেন—ন্যাশন্যাল পাবলিশার্স ; ১৪৫ বি, সাউথ সিঁথি রোড কলি—২ দাম ছ' টাকা।

আরও কয়েকখানি বই

মিষ্টিভাষায় গল্পলেখায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জন করেছেন লীলা মজুমদার। 'জোনাকি' লেখিকার একটি বড়গল্প—আধুনিক সমাজের কাহিনী। প্রকাশক সিগনেট প্রেস, কলি—২০। মূল্য দু'টাকা চার আনা। 'বাঙলা সাহিত্যের অভিধান' (১ম) বাঙলা সাহিত্যের গাইড বুক। অনেক তথ্য আছে। লেখকদের জীবনী। সঙ্কলক অভিনন্দনযোগ্য। প্রাপ্তিস্থান ৩০।৬ ১ মদন মিত্র লেন। মূল্য এক টাকা। 'রবীন্দ্র-দর্শন' হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত রবীন্দ্র দর্শন সম্পর্কীয় গ্রন্থ। জটিল বিষয়ের সহজ প্রকাশ। লেখকের ভাষা এবং পরিবেশন সমান কৃতিত্বপূর্ণ। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা—৯। মূল্য দুই টাকা।

ছোটদের মনের মতন করে সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে শ্রীইন্দিরা দেবী অদ্বিতীয়া। 'সোনার ছেলে' লেখিকার সর্বশেষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভেতর লেখিকা বিজয় সিংহ, রাজা শশাঙ্ক, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও কবি জয়দেবের কথা অতি সুন্দর ও সহজ করে লিপিবদ্ধ করেছেন। দাম : মাত্র দশ আনা। প্রকাশক : অরুণালোক প্রকাশনী, ৪০ চিত্তরঞ্জন এভিন্যু, কলকাতা-১২।

বুদ্ধদেবের মহাপরিনির্বাণ লাভের পর আড়াই হাজার বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ার জন্য সমগ্র দুনিয়ায় বুদ্ধ এবং বৌদ্ধতত্ত্ব বিষয়ে পুস্তক প্রকাশের হিড়িক প'ড়ে গেছে। যে যা পাচ্ছেন হাতের কাছে, তাই দিয়ে একেকখানি জীবনী রচনা করছেন বুদ্ধের। লেখক মণি বাগচীর "গৌতম বুদ্ধ" বুদ্ধের জীবনের বহু উপকরণের ডালি। বইখানি সচিত্র। প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী ; কলি—১২। মূল্য চার টাকা।

রহস্য রোমাঞ্চের কাহিনীকার হিসাবে নীহাররঞ্জন গুপ্ত আধুনিক লেখকদের মধ্যে সবিশেষ জনপ্রিয়। বোধ করি তাঁর মতো এত স্বল্প সময়ের মধ্যে সংখ্যায় এত অধিক বইও আর কেউ লেখেননি। তাঁর লেখনীর এ-হেন সজীব সচলতা বিস্ময়ের বস্তু। 'ময়ূর মহল' তাঁর সাম্প্রতিকতম রহস্যোপন্যাস। সাহিত্যভবন, ৮।১ বি শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট ; বইটির দাম তিন টাকা মাত্র।

১৩৬২-৬৩ সালের উল্লেখযোগ্য বই

অন্যান্য বৎসরে বৈশাখ সংখ্যায় আমরা এক বছরের উল্লেখযোগ্য এক শত বইয়ের তালিকা প্রকাশ করি। ১৩৬২-৬৩ সালের মধ্যে বাঙলা ভাষায় এত অধিক সংখ্যক ভাল বই প্রকাশিত হয়েছে যে, আমাদের এই তালিকা এক শত বইয়ে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব হয়নি। এই কারণে গত বছরের উল্লেখযোগ্য প্রায় অধিকাংশ গ্রন্থের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। এই তালিকায় গত ২৫শে বৈশাখ থেকে '৬৩ সালের ২৫শে বৈশাখ পর্যন্ত প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ সন্নিবেশিত হয়েছে।—স।

* কবিতা *

অরণ্য-মরাল	গোবিন্দ চক্রবর্তী	ক্যাল: পাবলিশার্স
উৎসের দিকে	অরুণ মিত্র	দীপঙ্কর প্রকাশনী
কৃষ্ণচূড়া	মণীন্দ্র রায়	ঐ
পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা	আবু সয়ীদ আইয়ুব সম্পাদিত	সিগনেট
পালা-বদল	অমিয় চক্রবর্তী	নাভানা
বসন্ত বাহার	গোপাল ভৌমিক	গ্রন্থজগৎ
যখন প্রথম ধরেছে কলি	কৃষ্ণ ধর	পদ্ম-ভবন
যখন যন্ত্রণা	রাম বসু	গ্রন্থজগৎ
লুইত পারের গাথা	অমলেন্দু গুহ	নতুন সাহিত্য ভবন
শ্রেষ্ঠ কবিতা	বিষ্ণু দে	নাভানা
বিষকন্যা	আশরাফ সিদ্দিকী	নওরোজ, ঢাকা
দুই হৃদয়ের তীর	আবুল কালাম শামসুদ্দীন	কোহিনুর লাইব্রেরী

* গল্পগ্রন্থ *

কিংশুক	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
গন্ধরাজ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	গুরুদাস

গল্পসংগ্রহ	বনফুল	বেঙ্গল পাবলিশার্স
জন্ম ও মৃত্যু	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
ঝুমরাবিবির মেলা	রমাপদ চৌধুরী	ক্যাল.পাবলিশার্স
খির বিজুরী	সুবোধ ঘোষ	এম সি সরকার
পশারিণী	সমরেশ বসু	নতুন সাহিত্য ভবন
পিয়াপসন্দ	রমাপদ চৌধুরী	বেঙ্গল পাবলিশার্স
বনহরিণী	ভবানী মুখোপাধ্যায়	নবভারতী
বিস্ফোরণ	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
মলাটের রঙ	নরেন্দ্রনাথ মিত্র	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
শুভরাত্রি	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়	সাহিত্য
শ্রেষ্ঠ গল্প	উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	গ্রন্থশ্রী
শ্রেষ্ঠ গল্প	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	বিহার সাহিত্য ভবন
সমারোহ	গজেন্দ্রকুমার মিত্র	মিত্র ও ঘোষ
সন্ন্যাসগড়	অবন্তী সান্যাল	চট্টগ্রাম
স্বনির্বাচিত গল্প	আশাপূর্ণা দেবী	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
ঐ	প্রমথনাথ বিশী	ঐ
ঐ	প্রেমাঙ্কুর আতর্থী	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো
ঐ	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	ঐ
ঐ	বুদ্ধদেব বসু	ঐ
ঐ	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	ঐ
স্বপ্ন-বাসর	গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য	সাহিত্য-ভবন
হুইসল	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	নবভারতী

*** নাটক ***

চতুরালি	অন্নদাশঙ্কর রায়	ডি এম লাইব্রেরি
টনসিল	বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়	এম সি সরকার

উপন্যাস

অনুষ্টুপ ছন্দ	সরোজকুমার রায়চৌধুরী	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
চার দেয়াল	সত্যপ্রিয় ঘোষ	নাভানা
জননী	গুণময় মান্না	বেঙ্গল পাবলিশার্স
জনসম্রাট	সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়	ইষ্টলাইট বুক হাউস
ঠিক ঠিকানা	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
নবাঙ্কুর	সুলেখা সান্যাল	
নির্জন পৃথিবী	আশাপূর্ণা দেবী	মিত্র ও ঘোষ
নিরঞ্জনা	বনফুল	ডি এম লাইব্রেরি
পরাধীন প্রেম	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	রীডার্স কর্ণার
পাকাধানের গান	অসীম রায়	
ব্যাকুল বসন্ত	সুনীল ঘোষ	ন্যাশনাল পাবলিশার্স
মণিকুন্তলা	লীলা মজুমদার	দিগন্ত
[illegible]	প্রাণতোষ ঘটক	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
রঙের বিবি	বারীন্দ্রনাথ দাশ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
লালবাঈ	রমাপদ চৌধুরী	ডি এম লাইব্রেরি
সবুজ চিঠি	মনোজ বসু	বেঙ্গল
সিন্ধুদের প্রহরী	প্রমথনাথ বিশী	ডি এম লাইব্রেরি
সূর্যদীঘল বাড়ি	আবু ইসহাক	ভারতী লাইব্রেরি
সৃষ্টি	সঞ্জয় ভট্টাচার্য	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
হলুদ নদী সবুজ বন	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	নিউ এজ

*** রম্যরচনা ***

এখন যাঁদের দেখছি	হেমেন্দ্রকুমার রায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
কত অজানারে	শঙ্কর	নিউ এজ
কমলাকান্তের আসর	কমলাকান্ত	সোয়ান বুকস
চিত্র ও বিচিত্র	নীলকণ্ঠ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
নিরীক্ষা	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	মিত্র ও ঘোষ
পরমরমণীয়	সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত	ইণ্ডিয়া অ্যাসো:
লৌহকপাট (২য়)	জরাসন্ধ	বেঙ্গল পাবলিশার্স
শুভদৃষ্টি	পত্রনবীশ	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
হাল্কা মেঘের মেলা	কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত	পুস্তক

*** অনুবাদ ***

উত্তরাশা (মোপাসাঁ)	প্রফুল্লকুমার গুহ	বুক এম্পোরিয়াম
কন্যাকাহিনী (জেন অস্টেন)	শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্ত ভাদুড়ী	নিওলিট পাবলিশার্স
ক্যাণ্ডিড (ভলটেয়ার)	অশোক গুহ	নিওলিট পাবলিশার্স
টনির স্বপ্ন (হাওয়ার্ড ফাস্ট)	প্রসূন বসু	সাহিত্যায়ন
দ্বন্দ্ব (শেখভ)	রাম বসু	ক্যালকাটা বুক ক্লাব
নানার মা (জোলা)	গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু	বসুমতী
পল ও ভির্জিনি (ব্যারনার দ্যাঁ দে সাঁ পীয়্যার)	রাজকুমার মুখো:	আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স
পেট্রিয়ট (পার্ল বাক)	পুষ্পময়ী বসু	নবভারতী
বৈদেহী (এমিল জোলা)	বিমান গাঙ্গুলী	আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স
লাফিং ম্যান (ভিক্টর হুগো)	মনীন্দ্র দত্ত	অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
লুই আরাগঁর কবিতা	দীপ্তিকল্যাণ চৌধুরী	নবভারতী
সান্তা লুসিয়া (গল্পসংগ্রহাদি)	নির্মল গঙ্গোপাধ্যায়	নবভারতী
সেই আশ্চর্য রাত (স্টিফান জাইগ)	শান্তিরঞ্জন বন্দ্যো:	বেঙ্গল পাবলিশার্স
স্তালিন (মিখাইল আরজিবাসেভ)	নির্মলকুমার ঘোষ	ক্লাসিক প্রেস
যৌনমনোদর্শন (এলিস)		বসুমতী

*** অভিধান ***

রত্নমালা বাংসমার্থাভিধান	প্রাণতোষ ঘটক	ইণ্ডিয়ান অ্যাসো:
সংসদ বাঙলা অভিধান	শৈলেন্দ্র বিশ্বাস	সাহিত্য সংসদ

*** বিবিধ গ্রন্থ ***

গঙ্গাবতরণ	উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	রঞ্জন
চীন দেখে এলাম (২য় পর্ব)	মনোজ বসু	বেঙ্গল পাবলিশার্স
দেবতাত্মা হিমালয়	প্রবোধকুমার সান্যাল	ঐ
পরিক্রমা	তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	আর্ট অ্যাণ্ড লেটার্স

রুতীর্থ হিংলাজ	অবধূত	মিত্র ও ঘোষ
উনবিংশ শতাব্দীর পথিক	ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার	ইণ্ডিয়ানা
কবিতার কথা	জীবনানন্দ দাশ	সিগনেট
কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়	ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত	এ মুখার্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ
কী লিখি	ডঃ যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
জনসভার সাহিত্য	বিনয় ঘোষ	সত্যব্রত লাইব্রেরী
বই পড়া	সরোজ আচার্য	ন্যাশনাল পাবলিশার্স
বাইশ কবির মনসামঙ্গল বা বাইশ	আশুতোষ ভট্টাচার্য	কলিকাতা বিশ্বঃ
বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা	তপনমোহন চট্টোঃ	বিশ্বভারতী
বাংলা সাহিত্য	মনোমোহন ঘোষ	ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি
বাঙালী সংস্কৃতি প্রসঙ্গ	গোপাল হালদার	ওরিয়েণ্ট বুক কোং
বিচিত্র সাহিত্য	ডঃ সুকুমার সেন	ইষ্ট এণ্ড কোং
বিভূতি ভট্টর গ্রন্থাবলী		বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী		ঐ
রামনাথ বিশ্বাসের গ্রন্থাবলী		ঐ
প্রভাবতী দেবীর গ্রন্থাবলী		ঐ
দীনেন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলী (২য়)		ঐ
ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি	শান্তিদেব ঘোষ	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোঃ
মধ্যযুগের কবি ও কাব্য	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	জেনারেল প্রিণ্টার্স
রবীন্দ্র-কথা	বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	গ্রন্থজগৎ
রবীন্দ্রনাথ : কথাসাহিত্য	বুদ্ধদেব বসু	নিউ এজ
রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী	অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়	শান্তি লাইব্রেরী
রবীন্দ্র-বিচিত্রা	প্রমথনাথ বিশী	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
সাহিত্য প্রকাশিকা (১ম খণ্ড)	প্রবোধ বাগচী সম্পাদিত	বিশ্বভারতী
সাহিত্যবীক্ষা	নীরেন্দ্রনাথ রায়	ন্যাশনাল বুক এজেন্সী
সাহিত্যে সঙ্কট	অন্নদাশঙ্কর রায়	এম সি সরকার
ছত্রপতি শিবাজী	সত্যচরণ শাস্ত্রী	বসুমতী
নবভারতের বিজ্ঞান-সাধক	যামিনীমোহন কর	গুরুদাস
পুরুষোত্তম রবীন্দ্রনাথ	অমল হোম	এম সি সরকার
বুদ্ধকথা	ডাঃ অমূল্যচন্দ্র সেন	ইণ্ডিয়ান পাবলিসিটি সোসাইটি
ভক্ত কবীর	উপেন্দ্রকুমার দাস	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	ভট্টাচার্য্য সন্স
মহারাজ প্রতাপাদিত্য	সত্যচরণ শাস্ত্রী	বসুমতী
উপাসনা মন্দিরে	মতিলাল রায়	প্রবর্তক
বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য	দুর্গাচরণ সেন	"
বৈভাষিক দর্শন	অনন্তকুমার ভট্টাচার্য্য, ন্যায়তর্কতীর্থ	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
ভারতীয় দর্শন, সাংখ্য ও যোগ	তারকচন্দ্র রায়	গুরুদাস
যা দেখেছি যা শুনেছি	শশিশেখর বসু	মিত্র ও ঘোষ
সাংবাদিকের স্মৃতিকথা	বিধুভূষণ সেনগুপ্ত	ডি এম লাইব্রেরী
স্মৃতির রেখা	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্যালকাটা পাবলিশার্স
শিকারী জীবন	ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোঃ
ইতিহাস	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	বিশ্বভারতী
ইরাণের শিল্প ও সংস্কৃতি	গুরুদাস সরকার	গ্রন্থজগৎ
প্রাচীন বাংলা ও বাঙালীর পরিচয়	অমূল্যকুমার চট্টোঃ	এন জি ব্যানার্জি
বিজ্ঞানের ইতিহাস	ডঃ সমরেন্দ্রনাথ সেন	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স
বৌদ্ধদের দেবদেবী	বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য	বিশ্বভারতী
রাজা গণেশের আমল	সুখময় মুখোপাধ্যায়	শৈলশ্রী
সঙ্গীতপ্রবেশ (৩য়)	সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী	ডি এম লাইব্রেরী
সঙ্গীতসোপান	কৃষ্ণদাস ঘোষ	মহাজাতি প্রকাশক
কথার কথা	সুভাষ মুখোপাধ্যায়	স্বাক্ষর
গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক	রাজকুমার মুখোপাধ্যায়	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
নবযুগের ধাতুচতুষ্টয়	ডাঃ জগন্নাথ গুপ্ত	বিশ্বভারতী
পশ্চিমবঙ্গের জনবিন্যাস	বিমলচন্দ্র সিংহ	বিশ্বভারতী
প্রাথমিক শিক্ষা	রেণু মিত্র	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
বিচিন্তা	রাজশেখর বসু	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোঃ "
রঙ ও রূপ	ডঃ সচ্চিদানন্দ কুমার	গ্রন্থজগৎ
শিশু পরিবেশ	সমীরণ চট্টোপাধ্যায়	ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী
হিন্দু আইনে বিবাহ	তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়	বিশ্বভারতী
হীরকের কথা	অমিয়কুমার দত্ত	"

* শিশু সাহিত্য *

আবিষ্কারের অভিযান	দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	বেঙ্গল পাবলিশার্স
কাদম্বরীর কথা	প্রবোধেন্দুনাথ ঠাকুর	ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প	আশাপূর্ণা দেবী	অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির
"	কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়	"
"	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	"
"	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়	"
"	মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়	"
"	মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য	"
"	লীলা মজুমদার	"
"	সুকুমার দে-সরকার	"
ছোটদের হিতোপদেশ	মনোরম গুহঠাকুরতা	বৃন্দাবন ধর অ্যাণ্ড সন্স
জগন্নাথ পণ্ডিতের খেয়ালখাতা		এম সি সরকার
বারোমাসের ছড়া	বুদ্ধদেব বসু	ঐ

র ঙ্গ প ট



'সেন্সর আরও কড়া হবে !'—শ্রীকেশকর

নয়াদিল্লীর লোকসভায় আমাদের বেতার ও প্রচারমন্ত্রী শ্রীকেশকর আবার "সেন্সর" সম্পর্কে তাঁর ভাষণ দিয়েছেন। বর্তমানে হিন্দী এবং বলতে বাধা নেই বাঙলা ছায়াছবির রুচি যেখানে পৌঁছেছে সেখানে দাঁড়িয়ে কেশকরের ভাষণ শুনলে যে কোন অসুস্থ মস্তিষ্কের লোকও না হেসে পারবেন না। কেশকর বলছেন, "অদূর ভবিষ্যতে ছবির সেন্সরকার্য্য আরও অনেক বেশী কড়াকড়ির আওতায় আনা হবে।" এমন কথা শুনলে আপনি নিশ্চয়ই মনে করবেন যে পূর্ব্বে যেন 'সেন্সর' কড়াই ছিল, ভবিষ্যতে হাঁড়ীতে পরিণত হবে। কংগ্রেসী রাজত্বে আমরা গত ক' বছরে যে সব বিদেশী আর দেশী ছবি দেখার সৌভাগ্য লাভ করেছি তন্মধ্যে শতকরা অন্ততঃ আশীখানি ছবিই আদিরসাশ্রিত অর্থাৎ নিছক প্রেমের কাহিনী। ইংরাজী আর হিন্দী ছবি বাদ দিয়ে ধরা যাক্ বাঙলা ছবিকে। বাঙলা ছবির সাম্প্রতিক নামকরণেই প্রমাণ পাওয়া যায় ছবির জগত কোন দিকে বাঁক নিচ্ছে টালিগঞ্জে আর বি, টি, রোডের পথে। ভালবাসা, দু'জনায়, শুভরাত্রি, মেজবৌ, ছোটবৌ, কালোবৌ, অর্দ্ধাঙ্গিনী, সাগরিকা নামগুলি শুনতে মন্দ লাগে না হয়তো, কিন্তু যখন দেখা যায় এই সব ছবির অধিকাংশই আবালবৃদ্ধ-বনিতাকে দেখানো হচ্ছে, তখন আমাদের সেন্সর বোর্ডের কর্তাদের প্রতি আস্থা রাখা মুস্কিল হয় না কি? সম্প্রতি বাঙলা ছবিতে নায়ক-নায়িকাদের জড়াজড়ির ছবি প্রকট হয়ে উঠেছে, অনেকেই দেখেছেন এবং দেখছেন এখনও। নায়ক-নায়িকারা চিরকালই একটু কাছাকাছি, ঘেঁষাঘেঁষি জড়াজড়ির পক্ষপাতী। তবে ছবির অর্থে যদি ঐ জড়ানো-টুকুই একমাত্র সারবস্তু হয়ে ওঠে, তখন স্পষ্ট ধরা পড়ে পরিচালক আর প্রযোজকদের নিম্নগামী মনোবৃত্তি। কোন কোন পরিচালক নিজমুখে ব্যক্ত করেন, ঠিক ঐ ধরণের জড়াজড়ির ছবি না দেখাতে পারলে বক্স-অফিসের গণেশ উল্টে যায়। সত্যিই কি তাই? আর তাই যদি হয় তবে পথের পাঁচালী, কালিন্দী, দৃষ্টি, টনসিল, ভোলা মাষ্টার সপ্তাহের পর সপ্তাহ চললো কোন্ উপায়ে? এই সব ছবিতে প্রেম আর ভালবাসা যে নেই তা আমরা বলতে চাইছি না—কিন্তু এই সব কাহিনীতে অসুস্থ রুচির পরিচয় নেই কোথাও। যে-দেশের ছায়াছবিতে মদ খাওয়া দেখালে দেশ আর দেশবাসী রাতারাতি উচ্ছন্নয় যায়, সেই দেশে যে কোথা থেকে 'সাগরিকা'র মত ছবি তোলা সম্ভব হয় তা একমাত্র 'সেন্সরের' হর্তাকর্তারাই বলতে পারেন।

যাই হোক, আমাদের মনে হয়, সেন্সরের কাজে যাঁরা নিযুক্ত আছেন তাঁদের সেন্সরের সীমানা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই। কিংবা জ্ঞান থাকলেও সেন্সরের ক্ষমতার ব্যবহার তাঁরা আদপেই জানেন না। বাঙলা দেশে রবীন্দ্রনাথের রচনা নয় অথচ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া রচনার নামের অনুকরণে বহু ছবি গৃহীত হয়ে চলেছে, খেয়ালই নেই সেন্সর বোর্ড আর শান্তিনিকেতনের। পরিশোধ, সাগরিকা, শাপমোচন, কথা কও, দুই বোন প্রভৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্য হাল আমলের বাঙলা ছবির তালিকায় খুঁজে পাবেন।

যে বাঙালী জাতি সমগ্র ভারতে সবচেয়ে বেশী রুচিশীল হিসাবে পরিচিত সেই বাঙালীর ছবির বাজারের যখন এই হাল তখন আর অন্য প্রদেশের কথা না তোলাই ভাল। কেশকরের ভাষণ এই কারণেই হাস্যকর।



এভা গার্ডনার ও ষ্টুয়ার্ট গ্র্যাঞ্জার লাহোর বিমানঘাঁটিতে

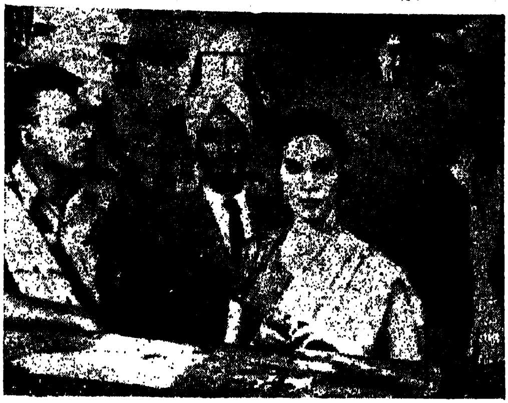
চিরকুমার সভা

যে কোন ছায়াছবি কিম্বা নাটক যদি পূর্ব্বে কখনও মঞ্চস্থ হয়ে যায়, তাতে ভবিষ্যতের পরিচালকদের সেই ছবি আর নাটকের পরিচালনার কাজে খুবই সুবিধা হয়। 'চিরকুমার সভা' দেখতে দেখতে বার বার আমাদের এই কথাটি মনে পড়েছে। মনে হয়েছে আমরা যেন সে-যুগের থিয়েটার দেখছি নাট্যমঞ্চে ব'সে। আরও মনে হয়েছে, থিয়েটারের হুবহু নকল এই ছবিটির অভিনয়ের নকলও যেন ব্যর্থ হয়েছে। যেন ঠিক ঠিক নকল হয় নি, কিম্বা নকল করতে গিয়ে আসল একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যাই হোক, পরিচালক দেবকীকুমারের মত বিজ্ঞজনও যে আমাদের প্রথমোক্ত সুবিধাটুকু এড়াতে পারলেন না, তাই আমরা অত্যন্ত বিস্ময় বোধ করছি।

'চিরকুমার সভা' সে-যুগের কৌলীন্যের প্রতি ব্যঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। এ নাটকের প্রধানতম আকর্ষণ নাটকের গতি আর গানগুলি। শ্রীবসু ছবিতে সেই গতি রক্ষা করতে পারেন নি, গানগুলিরও যথা ব্যবহার করতে পারলেন না। উপরন্তু 'রাজা' প্রভৃতি অন্যান্য রবীন্দ্র-সাহিত্যের গান ধরে-বেঁধে জুড়ে দিলেন অকারণে! বিশ্ব-ভারতীর বিচক্ষণরাও চোখে ঠুলী বেঁধে ব'সে রইলেন, মুখে তাঁদের কথা ফুটলো না আপত্তির। এ ছবিতে যাঁরা অভিনয় করেছেন তন্মধ্যে দু'-এক জন ব্যতীত এ ছবিতে অবতীর্ণ হওয়ার অধিকারই নেই তাঁদের! নাট্যাচার্য্য অহীন্দ্র চৌধুরীর দ্রুত বাচনভঙ্গীর জন্য তাঁর বহু কথা দর্শকদের কানেই পৌঁছয় না। অজয় গাঙ্গুলীর সেই একঘেয়ে 'ম্যানারিজম' অর্থাৎ সব কিছু জেনে ন্যাকা সেজে থাকা, অকারণ তোতলামি! নীতীশ মুখোপাধ্যায় অভিনয়ে উতরে গেলেও গানগুলি (গাইতে জানলেও) তাঁর মুখে অসহ্য লেগেছে যেন। বিশেষতঃ গানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ন্যাটুকেপনা! উত্তমকুমারকে (নাটকে যে পূর্ণ উচ্চশিক্ষিত?) দেখলে ধারণা হয় উত্তম বুঝি বা মস্তিষ্কবিকারের রোগী, বুদ্ধিভ্রষ্ট। জীবেন বসু (বিপিন) কি কুড়ি বছরের ছেলে? প্রশান্তকুমারের (শ্রীশ) মুখে গান হয়তো শোভা পায়, কিন্তু অমন মুখশ্রী কি ক্যামেরার উপযোগী? মহিলাদের মধ্যে অনীতা গুহের পরিবর্ত্তে স্মৃতিরেখা বিশ্বাসকে 'চান্স' দিলে আরও ভাল হ'তো। ভারতী, শোভা সেন আর তপতী ঘোষকে আমরা কি বলবো আর ভেবে পাচ্ছি না। শিল্পনির্দ্দেশনায় চিরকুমার সভায় কোথা থেকে সেক্সপীয়র, বায়রণ, কীটস, শেলী উড়ে এসে জুড়ে বসলেন কেউ বলতে পারেন? বায়রণ চিরকুমার ছিলেন নাকি? বোম্বাই ছবির সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন দৃশ্যে দৃশ্যে ক্রিশমাস বল, জাপানী ফানুষ, আর লুকানো আলোর স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করা হয়েছে এ ছবিতে। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় কবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতে দক্ষতা দেখিয়েছেন আমাদের জানা নেই! সব চেয়ে আকর্ষণীয় এ ছবির সমাপ্তি, যখন রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, এ ছবিতে রবীন্দ্রনাথকেই শেষ করা হয়েছে। ছবির আলোকচিত্র সঙ্গীত পরিচালনা আর প্রচারকৌশল শুধু সত্যিকার প্রশংসার যোগ্য।

একটি রাত

ছবির প্রথম থেকেই পরিচালনার বহর দেখে দর্শকরা হতাশ হয়ে পড়েন ও শিষ দেওয়ার পরিবর্তে ধিক্কারধ্বনিতে ভরিয়ে তোলেন সারা চিত্রগৃহ। একটি ট্রেন যখন প্রথম চলতে আরম্ভ করে তারপরও অনায়াসে অনেক সময় পাওয়া যায় দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরার, প্রথমেই সে হাজার মাইল গতিতে যায় না, এখানে ট্রেন অনীতাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল, সুশোভন গাধার মত সান্ত্বনাকে নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল। ক্ষ্যান্ত অনীতার বাপের বাড়ীর ঝি আর সে সুশোভনকে ডাকছে দাদাবাবু বলে। সুশোভন-সান্ত্বনা মোটরে করে যাচ্ছে মুচকুন্দপুরের উদ্দেশ্যে, আউটডোরে দেখানো হচ্ছে, একই জায়গা তিন-চার বার দেখানো হোল। একটা মজা ছবিতে রাজ্যশুদ্ধ লোকের (একমাত্র দিগ্বিজয় বাবু ছাড়া) গাড়ী কেবল খারাপ হতেই দেখলাম। যে কোন মহিলা ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে রাত্রে শোবার সময় একটি সাধারণ শাড়ী পরেই শোন—এতে দেখানো হোল স্বয়মপ্রভা ও সান্ত্বনা



লাহোরে গৃহীত 'ভবানী জংশন' কথাচিত্রে ষ্টুয়াট গ্র্যাঙ্গার ও এভা গার্ডনার

একটি দামী ভাল শাড়ী পরে শোন। সদারঙ্গের সঙ্গে বচসা করলে একটি ছেলে, পল্লীগ্রামের বেশ একটি চোস্ত ছেলে, পুলিশকে পর্য্যন্ত ভয় করে না কিন্তু একটি নারকোল নাড়ু পেয়ে সে চুপ হয়ে গেল আর অম্লানবদনে সান্ত্বনার 'লাটসাহেবের বাচ্ছা' মার্কা সারমেয়-নন্দনটিকে তুলে দিলে সদারঙ্গের হাতে। শেষের দিকে স্বয়মপ্রভা চীৎকার করে সারা বাড়ী মাথায় করে তুললেন আর বাড়ীতে অত লোক সেদিন উপস্থিত (মায় তাঁর মেয়ে অনীতা পর্য্যন্ত)—অথচ সেই বিশ্বগ্রাসী চীৎকার এক জনের কর্ণকুহরেও প্রবেশ করল না—এ আচ্ছা খেল. দেখলুম যা হোক! সুশোভনের সঙ্গে লোকচক্ষুর অন্তরালেও সান্ত্বনা যে রকম ভাবে কথা বলছিল তা মোটেই নিষ্পাপ নয় আর সেই সান্ত্বনা—সুশোভন ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার করে উঠে তাকে ধিক্কার দিল অতর্কিত ভাবে, একটি একা নিদ্রিতা মহিলার ঘরে প্রবেশ করার জন্যে,



অড্রে হেপবার্ণ ও মেল ফেরার টলষ্টয়ের 'ওয়ার এণ্ড পিস' কথাচিত্রে

আচ্ছা ব্যাপার তো? তবে সমগ্র বইটির মধ্যে ব্রজেশ্বর চরিত্রটি একটি সম্পদবিশেষ, ঐ একটি চরিত্রই ছবিটির কত বড় সম্পদ তা না দেখলে বোঝা যাবে না (তবে এ ছবি কাউকে দেখতে বলে পরে তাঁর অভিশাপ কুড়োতে আমরা প্রস্তুত নই)।

বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয়াংশে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন কেবলমাত্র একজন—তিনি কমল মিত্র, বেশী সুযোগ না পেয়েও অল্পের মধ্যে দিয়েই তিনি এত সাবলীল ও স্বচ্ছ অভিনয় করেছেন তা অনবদ্য। পাহাড়ী সান্যাল, চন্দ্রাবতী দেবী, জীবেন বসু, মেনকা দেবী, তুলসী মুখোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, প্রভৃতিও ভাল অভিনয় করেছেন। মলিনা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অতি-অভিনয়ে দর্শকমনে নৈরাশ্যের সঞ্চার করেছেন। নায়ক-নায়িকা উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেন ঠিক যে কি করেছেন তাই বোঝা গেল না, তাঁরা অভিনয় করলেন কি খানিকটা পাগলামি করলেন না চৈতন্য-লীলার অংশবিশেষ নৃত্য করে দেখালেন ঠিক বুঝতে পারলুম না।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

হোটেলের নামে প্রাচীনপন্থীরা অনেকেই নাক সেঁটকান। ওটার না কি ব্যবস্থার অনেক রকম ত্রুটি আছে ব'লে তাঁদের ধারণা। ব্যাঙের-ছাতার মত হোটেলও আছে শহরে মফঃস্বলে অনেক। এক সংসারের সব ছেলেগুলিই তো আর সমান হয় না। কোনোটা খুব ভাল, কোনোটা মাঝারি আবার কোনো কোনটি একেবারেই খারাপ। "আদর্শ হিন্দু হোটেল" নামে একটি হোটেলের ছবি তুলে আনছেন শ্রীলেখা পিকচার্স। হোটেলটি ভাল কি মন্দ আর সত্যিই আদর্শ হোটেল কি না, সে বিচারের ভার এখন দর্শকদের ওপর। ধীরাজ, ছবি, জহর, অসিতবরণ, কানু, রবীন, সন্ধ্যারাণী, দীপ্তি, শোভা, সাবিত্রী প্রভৃতি শিল্পীরাই হোটেলটি জমিয়ে তোলবার চেষ্টা কোরছেন। পরিচালনা কোরছেন অর্দ্ধেন্দু সেন। রূপকথার গল্প ভারি ভাল লাগে, বিশেষ কোরে ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের। রাস্তার ধারে চোখধাঁধানো রঙচঙে বইগুলো দেখে তাদের কম আনন্দ হয় না! মলাটের ওপর মুখরোচক নাম আর তাদের মন-ভোলানো অদ্ভুত ডিজাইনের ছবিগুলোই যে তাদের ভুলিয়ে রাখে, এ কথাটা খুবই সত্যি। জ্ঞানকুমার নৌলক্কার প্রযোজনায় পেত্তাকলারে তোলা হচ্ছে "স্বপনপুরী" নামে একখানা ছবি। ঘুমের ঘোরে স্বপনপুরীর সন্ধান পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সিনেমা হাউসে কৃত্রিম অন্ধকার কোরে জেগে ব'সে ব'সে সেই স্বপনপুরীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করা বড়ই কষ্টকর। তাই প্রযোজক আপ্রাণ চেষ্টা ক'রছেন ছবিখানিকে অদ্ভুত রূপ দিয়ে ফুটিয়ে তোলবার। "খোঁখী, তোমি সশুর বাড়ি কখুনু যাবে না?" ছোট্ট মিনিকে জিজ্ঞাসা করেছিল একদিন এক লম্বাচওড়া কাবুলিওয়ালা। কিন্তু খোঁখীর পরিবর্ত্তে কাবুলি-ওয়ালাকেই একদিন যেতে হোল শ্বশুরবাড়ী। কাবুলিওয়ালার শ্বশুরবাড়ী আর মিনির শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার ব্যাপারটুকু এবার ছবির পর্দ্দায় দেখা যাবে। রবীন্দ্রনাথের "কাবুলিওয়ালা" কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন চারুচিত্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান। নাম-ভূমিকায় নেমেছেন ছবি বিশ্বাস। ছেলের বিয়ের পর নতুন বৌ যখন ঘরে আসে সারা বাড়ী আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রবধূকে আদর কোরে ঘরে তোলেন। যার সঙ্গে হয়ত কোনদিনই পরিচয় ছিল না, সেই পুত্রবধূকে আপনার কোরে নেওয়ার দায়িত্ব ঘাড়ে এসে পড়ে তাঁদের। তাই প্রথমেই পুত্রবধূকে পাড়ার পাঁচজনকে দেখিয়ে, বৌ কেমন হ'ল, সেই অভিমতটা জানবার চেষ্টা করেন। সলিল সেনগুপ্তের ডায়েরীর পাতায় পাওয়া গেছে এক বংশের "পুত্রবধূ"র কাহিনী। ভেনাস ফিল্মস সকলের সামনে তুলে এনে দেখাবেন তার ছবি। কাহিনীটির মধ্যে প্রধানত জড়িয়ে প'ড়েছেন উত্তমকুমার ও মালা সিংহ। এ ছাড়া সবিতা, ছবি, চন্দ্রাবতী, আশীষকুমার প্রভৃতি শিল্পীরাও সেই সঙ্গে আছেন। ছবিখানি পরিচালনার ভার নিয়েছেন চিত্ত বসু। দিনের শেষে আকাশে জেগে ওঠে চাঁদ—আরও দূরে লক্ষ লক্ষ তারা। কিন্তু রাত্রিশেষে জেগে ওঠে প্রভাত-সূর্য্য। সঙ্গে সঙ্গে আলোর ঔজ্জ্বল্যে ঢাকা পড়ে আকাশের বুকে বিক্ষিপ্ত হীরের টুকরোগুলো। দুঃখ যখন আসে, অন্ধকার সৃষ্টি কোরে এমনি ভাবেই আসে কিন্তু সুদিনের স্পর্শ লেগে অতীতের সেই দুঃখময় দিনগুলির সাময়িক বিলুপ্তি ঘটে। "রাত্রিশেষে"র চিত্রনাট্য গড়েছেন জ্যোতির্ময় রায়। দুঃখের অথবা সুখের, দিনের অথবা রাত্রির, কিসের যে শেষ হবে, ছবি দেখলেই বোঝা যাবে। মণীন্দ্র সরকারের প্রযোজনায় প্রগতি চিত্র প্রতিষ্ঠান তারই ছবি তুলে দেখাবেন শহরে। "রাত্রিশেষে"র উপযোগী গানে সুর দেওয়ার



আগতপ্রায় "গোবিন্দ দাস" চিত্রে সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী

ভার নিয়েছেন সঙ্গীতজ্ঞ আলি আকবর খাঁ। আবার ছবির নাম বদলানোর হিড়িক। নাম দিয়ে যে ছবির প্রচার চলছিল এত দিন, আনন্দ পিকচার্স এবার তার নাম ঘোষণা কোরে-ছেন "অসমাপ্ত"। ছবি এখন সত্যিই অসমাপ্ত। সমাপ্ত হবার মুখে ঐ নাম আবার বজায় থাকলে হয়! তারপর আবার শোনা যাচ্ছে "মুচি" ছবিখানার নাম দেওয়া হ'য়েছে "শুভদৃষ্টি"। শুভমুক্তি দিনের বিজ্ঞাপন বা পোষ্টার না দেখা পর্য্যন্ত ছবির আসল নাম জানার সন্দেহ দূর হবে না। মূক ও বধির এক শিশুর জীবনী অবলম্বন কোরে প্রভাত প্রোডাকসন্স "মমতা" নামে একখানা ছবি তুলছেন। একে ত শিশু তার ওপর মূক ও বধির। যে শিশুর ব্যর্থ জীবনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় শৈশবে, তার প্রতি মমতায় হৃদয় ভরে ওঠে না কার? কাজেই ছবিখানি জনপ্রিয় হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় অভিনেতা বলরাজ সহানী অরুন্ধতীর সঙ্গে এই ছবিতে অভিনয় করছেন। হিন্দী ছবিতে যখন বাঙ্গালীরা নেমেছেন, বাংলা ছবিতে অবাঙ্গালীর অভিনয় কেমন লাগে দেখাই যাক্ না।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

প্রতিভাময়ী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী রেখা দেবী

অভিজাত শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে ইনি। চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি তাঁর ঝোঁক যায় যখন তখন তাঁর বয়স সবে চৌদ্দ কি পনের। সুরগত তাঁর প্রাণ, প্রকৃত শিল্পিসুলভ তাঁর মন—তিনি কি অমনি চুপ করে থাকতে পারেন? তাই দেখা গেল, কলেজের পড়া তাঁর তখনও আরম্ভ হয় নি, তিনি ছবি করছেন কাউকে না জানিয়ে লুকিয়ে। প্রতিভা, নিষ্ঠা ও দক্ষতা এ থাক্‌লো বলেই প্রতিষ্ঠা পেতে তাঁর বিলম্ব হ'লো না—যশ, অর্থ ও মর্য্যাদা ক্রমে সব এসে লুটিয়ে পড়লো তাঁর দ্বারে। রেখা দেবী—চিত্রজগতে আজ সত্যিই ইনি স্বনামধন্যা।

এর মাঝে দক্ষিণ-ক'লকাতার ভবানীপুরে তাঁর বাসভবনে গিয়ে হাজির হ'লুম আমি। ব্যাপার আর কিছুই নয়, চলচ্চিত্র শিল্প সম্পর্কে এ কুশলী অভিনেত্রীর চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। এই জন্যে এপয়েণ্টমেণ্ট যে দিন ছিল সে দিন যাওয়া হয়নি, গেলুম যেদিন, সেদিন না জানিয়েই। ভেবেছিলুম রেখা দেবী (মল্লিক) খানিকটা অপ্রস্তুত বোধ করবেন, কিন্তু গিয়ে দেখলুম আমার ধারণা ভুল। আমি এসেছি জানা মাত্র ড্রয়িংরুমে বসাবার ব্যবস্থা হলো আমার। নিতান্ত সাদাসিধে পোষাকেই মুখে সহজ সরল হাসি নিয়ে তিনি এসে বসলেন মেঝের উপর। শিল্পীর কোন অহঙ্কার বা আড়ম্বর দেখলুম না কোথাও—এতটুকু অনুযোগের সুরও প্রকাশ পেল না তাঁর কথায় বা হাব-ভাবে।

'—একটু চা-টা খেয়ে নিন, তার পরই আলোচনায় বসা যাবে।' বললেন শ্রীমতী রেখা দেবী অভ্যর্থনার প্রথম পর্ব্বতেই।

বলতে না বলতেই চা এসেও গেল অবিশ্যি—সঙ্গে টা-টাও বাদ পড়লো না। এর ভেতরই সুরু হলো আমাদের আলোচনা—আমার প্রশ্ন ও তাঁর উত্তর।

"নরেশ বাবুর (পরিচালক নরেশ মিত্র) 'বাঙ্গালার মেয়েতে' আমি সর্ব্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করি। সে ১৯৩৯ সালের অর্থাৎ সতের বছর আগেকার কথা।"—ধীর কণ্ঠে বললেন শ্রীমতী রেখা দেবী আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে।

—কোন ছবিতে এবং কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আপনি সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন?

"—এ পর্য্যন্ত বহু ছবিতেই অভিনয় করেছি। তার ভেতর 'উদয়ের পথে'তে সুমিতার চরিত্রে অভিনয় করে আমি সর্ব্বাধিক তৃপ্তি পেয়েছি, 'অভয়ের বিয়েতে' মায়ের ভূমিকায় অভিনয় করে।"

—এ লাইনে আস্‌তে প্রথম প্রেরণা আপনি কোথায় এবং কি ভাবে পেলেন? জানতে চাইলুম আমি।

সহজ গলায় উত্তর হ'লো—"এ লাইনে আসা আমার একটা সখ। হাঁ, সখ ছাড়া এ আর অন্য কিছুই নয়। এ'কে আমার একটা বিশেষ 'হবি'ও বল্‌তে পারেন। এ লাইনে আস্‌তে আমায় প্রেরণা দিয়েছিলেন সর্ব্বপ্রথমে শ্রীনিরঞ্জন পাল। ব'ল্‌তে কি, চলচ্চিত্রে যোগদানে আমার ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা আপত্তি কখনই ছিল না বা নেই। বাড়ীর গুরুজনেরাও এ লাইনে আস্‌তে আমায় বাধা দেন নি। সুতরাং ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আমার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে কি পরিবর্তন ঘটবে?"

দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী সম্পর্কে প্রশ্ন শোনা মাত্র রেখা দেবী নিঃসঙ্কোচে ব'ল্‌তে থাকেন—"সাধারণত বাঙ্গালী ঘরে মেয়ে-বউরা যে ভাবে চলেন আমার বেলাতেও এর ব্যতিক্রম নেই। ঘুম থেকে



শ্রীমতী রেখা দেবী

উঠে স্নান করার পর আমার প্রথম কাজ হচ্ছে, ঠাকুরঘরে যাওয়া। তার পর কিছুক্ষণ চলে আমার সঙ্গীতচর্চ্চা। এর শেষে সাংসারিক কাজকর্ম্মে আমায় মনোযোগ দিতে হয়। খাওয়া-দাওয়া সেরে আমার কাজ, কাগজ-পত্র পড়া। বিকেলেও সাংসারিক কাজ-কর্ম্মের পর ঠাকুরঘরে আমার যাওয়া চাই—সন্ধ্যেয় আবার চাই সঙ্গীতচর্চ্চা। অবসর সময়ে খেলাই করতে আমি ভালবাসি। যেদিন স্যুটিং থাকে, সেদিনেও দৈনন্দিন কাজকর্ম আমার ঠিকই চলে।"

'ছবি' সম্পর্কে বলতে যেয়ে শ্রীমতী রেখা প্রথমেই বললেন—"সঙ্গীতটাই আমার সব চেয়ে প্রিয়, বিশেষ 'হবি' একেই বলতে পারেন। তবে এটুকু বলবো যে সঙ্গীত সাধনার আমার গুরু হলেন শ্রীধীরেন্দ্র চন্দ্র মিত্র। যখন যেটুকু সময় আমি পেলুম, সঙ্গীতচর্চ্চাতেই কাটিয়ে দিই। সুগায়কদের ভাল ভাল গান শুনতেও আমার বেশ ভাল লাগে। আর বিশেষ 'হবি' হ'লো রান্না করা, দেশ ভ্রমণ, পশুপক্ষী পালন, আলপনা শিক্ষা নিয়ে সময় কাটানো এ-সব। খেলাধূলোয় আমার তেমন উৎসাহ নেই।"

পুঁথি-পুস্তক পড়াশুনোর কথা যেইমাত্র জিজ্ঞেস ক'রলুম—উত্তর ক'রলেন অমনি তিনি—"সাহিত্য পড়তে আমার ভাল লাগে, বিশেষ ভাবে ভাল লাগে শরৎচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলো। সাময়িক পত্র-পত্রিকাও আমি পড়ে থাকি। এর ভেতর মাসিক বসুমতীর নামটা করবো আর নাম করবো সচিত্র ভারত, রূপমঞ্চ, রূপাঞ্জলি, প্রবাসী, দীপালি প্রভৃতির। গল্প লেখার অভ্যাস আমার আছে এবং সে খুব ছোটবেলা থেকেই।"

—পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব মতামত কি ?

"—খুব সাদাসিধে সাধারণ পোষাকই আমার পছন্দ।"

আমার পরবর্ত্তী প্রশ্ন চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণের প্রয়োজন ?

দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর ক'রলেন রেখা দেবী—"এ'র জন্যে সর্ব্বাগ্রে চাই শিক্ষা, সংযম, ধৈর্য্য আর আত্মবিশ্বাস। চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে এগুলো চাই-ই। তার সঙ্গে চাই অভিনয়-দক্ষতা ও সঙ্গীত-জ্ঞান। শিল্পীদের স্বাস্থ্যের প্রতিও বিশেষ নজর রাখতে হবে গোড়া থেকেই। নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁদের পক্ষে একান্ত ভাবে অপরিহার্য্য।"

—চলচ্চিত্রে অভিজাত ও শিক্ষিত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

"—শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের এ লাইনে অবিশ্যি আসা উচিত। কারণ, অভিনয় একটা বড় শিল্প ও শিক্ষার ব্যাপার। সাঁতার কাটায়, ঘোড়ায় চড়ায়, গান গাওয়ায় যদি লজ্জা বা আপত্তি না থাকলো, তাহলে অভিনয়েও দোষের কিছু থাকতে পারে না ? অভিজাত পরিবারের ছেলেমেয়েরা না এলে এ শিল্পের উন্নতি সম্ভব নয়। প্রত্যেক শিক্ষিত ও মার্জ্জিত-রুচিসম্পন্ন ব্যক্তিরই অভিনয়-শিল্পকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা উচিত।"

মাসিক আয় সম্পর্কে একটি প্রশ্ন তুলতেই শ্রীমতী রেখা কোনরূপ দ্বিধা ভাব প্রকাশ না করে বললেন—"মাসিক আয়ের কোন স্থিরতা নেই। সবচেয়ে বেশী টাকা পেয়েছি নিউ টকিজের 'বেদুইন' আর 'বন্ধুপ্রিয়া' এ দুটো ছবি থেকে। সব চাইতে কম পেয়েছি আবার 'বাঙ্গলার মেয়ে' থেকে। কিন্তু, সে কথা আর বলে লাভ নেই।"

—বিবাহিত শিল্পীদের স্বামী অথবা স্ত্রী অভিনয়ে আপত্তি করেন কি ?

"—বহু জায়গায় আপত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃত শিল্পী-ভাবাপন্ন যাঁরা, তাঁরা সে বাধাকে মানতে পারেন না কখনই। আমার বেলাতেও আপত্তি উঠেছিল। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় বাধা যে আসবে, এ অনস্বীকার্য্য এবং এরই জন্যে আমাকে প্রায় দশ বছর কাল এ লাইন থেকে সরে থাকতে হ'য়েছিল। তার পর আমার আত্মীয় শ্রীতপনকুমার দে'র একান্ত আগ্রহে আমি বিশেষ উৎসাহিত হই এবং আবার আমি চিত্রজগতে ফিরে আসি।"

এ ভাবে আলোচনা অগ্রসর হয়ে চললো—আমার তখন দু'-একটি বিষয় জানতে বাকী। এবারে আমি সমাজজীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়, এ সম্পর্কে তাঁর কাছে মতামত জিজ্ঞেস করলুম।

"—আগে সমাজের যে অবস্থা ছিল এখন আর তা নেই। বর্ত্তমানে সমাজের বাঁধন অনেকটা সহজ হয়েছে। সমাজজীবনে চলচ্চিত্রের স্থান যে খুব উঁচু এ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই। আমাদের মত ঘরের ছেলে-মেয়েরা যদি এতে যোগদান করে, তবে এর উন্নতি হ'বে দিন-দিনই।"

—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে, ভবিষ্যৎ জীবনই বা কি ভাবে কাটাতে চান ?

ধীরে ধীরে উত্তর ক'রলেন শ্রীমতী রেখা দেবী—"প্রথম জীবনের খানিকটা আভাস তো প্রথমেই পেয়েছেন। বারাসাতের নলকুড়া গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে আমি। আমার বাবা শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মিত্র একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী। কলকাতা বাগ-বাজারে আমার জন্ম এবং বাপ-মায়ের আমিই একমাত্র সন্তান। লেখাপড়ায় আমি ভালই ছিলুম। বাবারও ইচ্ছে ছিল আমি উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করি। কিন্তু কার্য্যত: সে হলো কই ? বেথুন কলেজ থেকে আই, এ পাশ করলুম বটে, কিন্তু তার পর সিনেমার দিকে এমন ঝোঁক গেল যে আর পড়া হ'লো না। আর একটা দিকে আমার ঝোঁক ছিল আমার ছেলেবেলা থেকেই, সেটা হলো সঙ্গীত সাধনা। এ পর্য্যন্ত প্রায় ২০ খানা রেকর্ড আমার হয়েছে। এ গুলোর ভেতর :—

গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই,
যেথা সাগরতীরে,
মন নিয়ে শুধু মিছে জাগি,
যে গান শুনাবো প্রিয়,
মনে কি পড়ে প্রিয়—

এ রেকর্ড কয়খানি প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করেছে। এ ছাড়া এ পর্য্যন্ত বহু ছবিতে আমি গান করেছি। বর্ত্তমানে নির্ম্মীয়মান ছবি 'দানের মর্য্যাদা'য় বাণীর ভূমিকায় এবং 'দুর্নিবার' ছবিতে মাধবী চরিত্রে আমার অভিনয় চলছে। শিল্পী আমি—ভবিষ্যৎ জীবন শিল্পী হিসেবেই কাটাতে চাই ; এটাই আমার কাম্য।"

সাময়িক প্রসঙ্গ

আবদার ?

"আসলে ইঁহাদের দুরভিসন্ধিটা গণভোটের তথাকথিত দাবীর মধ্যেই বিশেষ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সীমানা কমিশন বিহারের সংলগ্ন বাঙ্গালী অঞ্চলগুলি পরিদর্শনের পর সেখানকার অধিবাসীদের মনোভাব অবগত হইয়াই তাঁহাদের সুপারিশ করিয়াছেন। বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী অঞ্চলের অধিবাসীরা দীর্ঘদিন ধরিয়া বাঙ্গালার অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবী করিতেছেন—এতথ্য কাহারও অজ্ঞাত নয়। বিহারী নেতারাও তাহা ভাল করিয়াই জানেন। তবু তাঁহারা গণভোটের জিগির তুলিয়াছেন কেন? কারণ এই ভাবে তাঁহারা সমস্যাটা ঘোরাল করিয়া তুলিতে চান এবং যদি শেষ অবধি গণভোট হয়, তবে সরকারী ক্ষমতার জোরে গণভোটের ফলাফলে প্রভাব বিস্তার করিবার আশা রাখেন। বিহারী নেতৃবর্গের স্বার্থপরতা যে কিরূপ নিম্নস্তরে আসিতে পারে, এই স্মারকলিপিই তাহার নিদর্শন। বিহারের এই নূতন চক্রান্ত সম্বন্ধে আমাদের এখনই বিশেষ সজাগ হওয়া প্রয়োজন। কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পণ্ডিত পন্থ কয়েক দিন আগে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা-বিহার সীমানা পুনর্গঠনে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সুপারিশ কার্য্যকরী করা হইবে। এই সিদ্ধান্ত যাহাতে দ্রুত কার্য্যে পরিণত হয় এবং বিহারের আবদার কেন্দ্রীয় সরকারকে যাহাতে কর্ত্তব্যচ্যুত করিতে না পারে, তাহার জন্য বিশেষ ভাবে বাঙ্গালীকে সক্রিয় হইতে হইবে"।

—দৈনিক বসুমতী।

সরকারী ব্যবস্থা নাই

"কলিকাতার বহু লোক অপরিস্রুত জল ব্যবহার করিয়া থাকে। কলেরা দেখা দেওয়ার পরেও—ঐ জল ব্যবহার হ্রাস পায় নাই। বস্তিবাসীরা বহুক্ষেত্রে অপরিস্রুত জল ব্যবহার করে। তাহা ছাড়া, আরও অনেক লোককে রাস্তার হাইড্রেণ্টের অপরিস্রুত জল নিয়মিত ব্যবহার করিতে দেখা যায়। বাসন ধোয়া, স্নান, মুখ ধোয়া প্রভৃতি কোন কাজই বাকি থাকে না। পরিস্রুত জল সরবরাহের অভাবের দরুণ লোকে অপরিস্রুত জল ব্যবহার করে—আবার কেহ কেহ ইহার অপকারিতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ও উদাসীন বলিয়া এবং হাইড্রেণ্টের জল প্রচুর—অঢেল পাওয়া যায় বলিয়া, ইহার সুযোগ গ্রহণ করে। কলেরার টিকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপরিস্রুত জল ব্যবহারের মারাত্মক পরিণাম সম্পর্কে লোককেও সচেতন করা উচিত। এদিকে উন্মুক্ত খাবার—কাটা ফল ইত্যাদির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতার রাস্তায় এমন কি খাস অফিস কোয়ার্টারের বড় রাস্তায় এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় হইতে দেখা যায়। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সরকারী নিষেধাজ্ঞা ষোল আনা কার্য্যকরী হইতেছে কি না—তাহা দেখিবার সরকারী ব্যবস্থা নাই।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

মূল্যবৃদ্ধির কারণ

"ভাগ্যান্বেষী ফাটকা ব্যবসায়ীদিগের কারসাজি, মজুতদারী ও মুনাফাবাজির সমন্বয়ই এরূপ অবস্থার মূল কারণ। সমাজবিরোধী এই সকল প্রবৃত্তি দমন না করা পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে মূল্যবৃদ্ধির অথবা আশু সমস্যার প্রতিকার দুঃসাধ্য। গত দুই বৎসর যাবৎ তুলা, পাট, তৈলবীজ ও চিনির ব্যবসায়ে যে রকম বে-পরোয়া ফাটকা-বাজি চলিয়াছে, গত ছয় মাসেরও অধিক কাল যাবৎ কাপড়ের ব্যবসায়ে যে অতি-মুনাফা সংগৃহীত হইয়াছে, গত পূজার সময় হইতে গমের ও অগ্রহায়ণ মাস হইতে চাউলের দর যেরূপ অন্যায় ভাবে চড়ানো হইয়াছে—সরকার সময় মত তাহাতে বাধা দেন নাই। মুখ্যতঃ ইহার ফলেই ফাটকাবাজার যেমন বে-পরোয়া হইয়া উঠিয়াছে, চাষীর ও প্রাথমিক উৎপাদকের পড়তা খরচ তেমনই চড়িয়া গিয়াছে। মূল উপসর্গগুলির উচ্ছেদ ব্যতীত এই সমস্যার সমাধান নাই। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের কথা যে, প্রতি সপ্তাহে পঁচিশ-ত্রিশ কোটি টাকার ফালতু নোট ছড়াইয়া (deficit finance) এবং ব্যাঙ্ক কর্তৃক অবাধ দাদনের সুযোগ-সুবিধা বলবৎ রাখিয়া স্বয়ং সরকারই ফাটকাবাজি ও মজুতদারীর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করিতেছেন! চালু মুদ্রার মধ্যে স্বাভাবিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত অংশ বাজার হইতে সরাইয়া লওয়ার সুনিশ্চিত ব্যবস্থা বলবৎ না করা পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষেও মূল্যবৃদ্ধির গতিরোধ করা সম্ভব হইবে না। অথচ সমস্যার এই মূল ভিত্তিটি তাঁহারা এখনও উপেক্ষা করিতেছেন।"

—যুগান্তর।

পাকভারত মৈত্রী

"পুনর্ব্বাসন মন্ত্রী শ্রীখান্নার বিবৃতির উদ্ধৃতি উল্লেখ করিয়াই বলা যায়: 'আমরা বার বার বসিব বলিয়া আশা করি। এই বৈঠক শেষ নহে: ইহা সবে শুরু'। যে বাস্তুত্যাগ দুই রাষ্ট্রের পক্ষেই ক্ষতিকর উহা প্রতিরোধের জন্য মতৈক্যে পৌঁছিতে হইবেই। তাই একবারে মতৈক্যের ভূমি যত সামান্যই আবিষ্কৃত হউক না কেন, তাহা উপেক্ষণীয় হইতে পারে না। দুই-রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের বারংবারই বৈঠক করিতে হইবে। এবিষয়টাও লক্ষ্য না করা ভুল হইবে যে, স্বয়ং পাক পররাষ্ট্রসচিবের অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুক্ত বৈঠক কর্ত্তৃক প্রচারিত যুক্ত বিবৃতিটিই সরকারী দলিল হইয়া থাকিল। ইহাতে এই একটি নূতন জিনিসও লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, অশুভ শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও পাকিস্তানে আপোস মীমাংসার শক্তি বাড়িতেছে। ভরসা এই খানেই"।

—স্বাধীনতা।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের কাজ

"পাবলিক সার্ভিস কমিশনে আজ-কাল কাজ কি ভাবে চলিতেছে তার সংবাদ জনসাধারণের পাওয়া দরকার। সার্ভিস কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত লোক উপযুক্ত হইবে ইহা লোকে বিশ্বাস করে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে বশম্বদ লোক বসাইয়া উহাকে কলুষিত করা ডাঃ রায়ের শাসন পদ্ধতি। এক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। সাব-ডেপুটি হইতে ডেপুটি প্রমোশনের নিয়ম প্রয়োজন মত বদলাইয়া পেয়ারের লোককে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে এবং সেই শুভসংবাদ কমিশনের কর্তা স্বয়ং প্রভুকে টেলিফোনে নিবেদন করিয়াছেন, এই সংবাদ আমরা আগেই দিয়াছি। আর একটি সুপারিশ সম্প্রতি হইয়াছে; কমিশনের একজনের বন্ধুর কুটুম্বকে বসাইবার জন্য অনেক কায়দা করা হইয়াছে। ইহা পরে বলিব। আপাততঃ আর একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। মেডিকেল কলেজের একজন স্পেশালিষ্ট আনেসথেটিষ্ট দরকার। যথারীতি বিজ্ঞাপন দেওয়া হইল। অভিজ্ঞতা চাওয়া হইল ৭ বৎসর। এই বিজ্ঞাপনের কিছুদিন বাদে ঐ পদেরই জন্য আবার বিজ্ঞাপন দিয়া বলা হইল অভিজ্ঞতা চাই ৪ বৎসর। প্রথম বিজ্ঞাপনের মাস চারেক পর প্রার্থীরা চিঠি পাইলেন যে, তাঁহারা ইন্টারভিউ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হন নাই। সাত বছর আট বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকেরা ইন্টারভিউ পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হইলেন না। কিন্তু চার বছরের প্রার্থীরা চিঠি পাইলেন। ইন্টারভিউ নিলেন কমিশনের সদস্য নগেশ চক্রবর্তী, এক্সপার্ট হিসাবে উপস্থিত রহিলেন দুই জন ধাত্রীবিদ্যাবিশারদ ডাঃ মণি সরকার এবং ডাঃ সুবোধ মিত্র। সমগ্র দেহবিজ্ঞানের জ্ঞান আছে এ রকম সার্জ্জারি অভিজ্ঞ লোক এক্সপার্ট হিসাবে নেওয়া উচিত ছিল। তাহা করা হয় নাই। প্রার্থীর উত্তর ঠিক হইল কি না প্রশ্নের পর এক্সপার্টের মুখ হাসি-হাসি অথবা গম্ভীর হইল, তাহা দেখিয়া চেয়ারে উপবিষ্ট চক্রবর্তী মহাশয়কে বুঝিতে হইয়াছে। ব্যবস্থা সাজানো হইয়াছে সুন্দর! কিন্তু দেশের স্বার্থে হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। এক্সপার্টদের মত বিরুদ্ধে গেলে উহা রেকর্ড করা হয় না। কিছুদিন আগে এই কমিশন একটি অধ্যাপিকা পদে নিয়োগের জন্য উপযুক্ত এক্সপার্ট আনিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সুপারিশ গ্রহণ না করিয়া মনোনয়ন দিয়াছেন এমন একজনকে, যিনি ভারত সরকারের এক পেয়ারের লোকের ভ্রাতৃবধূ।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

ডি, ভি, সি'র অপব্যয়

"আমরা দামোদর উপত্যকা অঞ্চলের অধিবাসী দৃঢ় কণ্ঠে বলিতে চাহি, দামোদরকে সংযত করিবার নামে তাহাকে সংহার করা হইয়াছে, নাব্য খাল কাটিয়া ভূমিহীন পশ্চিমবাংলার অজস্র জমি গিয়াছে, উহার উপর এক একটি সেতু নির্ম্মাণ করিতে লক্ষ লক্ষ টাকা জলের মত ব্যয় হইবে, কিন্তু তাহাতেও কৃষক সাধারণের অসুবিধা লাঘব হইবে না। বন্যা নিয়ন্ত্রণের পর দামোদরের দক্ষিণ তীরবর্তী বন্যাবিধ্বস্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা হইল না—দুই শতাধিক বৎসর বন্যায় ডুবিয়া হাজিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণের পর মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এত অর্থ ব্যয় করিয়া বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন হইতেছে, দামোদর উপত্যকার

দরিদ্র পল্লী অঞ্চল তাহার সুযোগ পাইবে না, যেটুকু পাইবে তাহাও কলিকাতা অপেক্ষা দ্বিগুণ মূল্যে সেচকর দিতে হইবে বর্ত্তমান হারের দুই গুণ। দামোদর পরিকল্পনার মহিমা প্রচারের ঢক্কা নিনাদে সরকার বিশ্বের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছেন, আর তাহার কর্ণবিদারী শব্দের মধ্যে দামোদর উপত্যকাবাসীদের শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইয়াছে! ডি-ভি-সি'র অপব্যয় ও অতিব্যয়ের মাশুল উপত্যকাবাসীদিগকে চিরদিন টানিয়া যাইতে হইবে"।

—দামোদর (বর্দ্ধমান)।

শোক-সংবাদ

রমাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিগত ১২ই বৈশাখ বুধবার চন্দননগর, গোঁদলপাড়া নিবাসী স্বর্গত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ



বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। বাঙলা দেশের বীরকুৎসার বিখ্যাত জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী রমাপ্রসাদ ছিলেন সকলের প্রিয় পাত্র। তিনি মৃত্যুকালে স্ত্রী ও পাঁচ কন্যা রাখিয়া যান। আমরা মৃতের আত্মার শান্তি কামনা করি।

উর্ম্মিলা দেবী

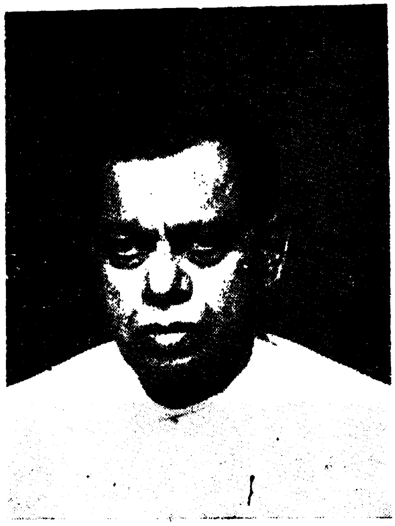
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভগিনী উর্ম্মিলা দেবী ৭৩ বৎসর বয়সে গত ১০ই মে বৃহস্পতিবার অপরাহ্নে তাঁহার বালীগঞ্জস্থিত বাস-ভবনে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র এবং এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। উর্ম্মিলা দেবী অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানকারিণী প্রথম মহিলা দলের একজন। ১৯২১ সালে খাদি বিক্রয়ের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী বাসন্তী দেবীর সহিত কারাবরণ করেন।

পূর্ণচন্দ্র দাস

গত ৪ঠা মে শুক্রবার অপরাহ্ণ আড়াই ঘটিকার সময় পুরাতন কংগ্রেস কর্ম্মী ও বিপ্লবী পূর্ণচন্দ্র দাস জনৈক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কর্ত্তৃক ছুরিকাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। দক্ষিণ-কলিকাতায় রাসবিহারী এভিনিউতে মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটে। মৃত অবস্থায় তাঁহাকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

জহরলাল চট্টোপাধ্যায়

হাওড়ার উত্তর-ব্যাঁটরা নিবাসী প্রসিদ্ধ লৌহব্যবসায়ী ৺যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র জহরলাল চট্টোপাধ্যায় গত ৮ই বৈশাখ দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬২ বৎসর। তিনি বিশিষ্ট সমাজসেবী ও দানবীর ছিলেন। তাঁহার স্বগ্রামে তাঁহার দানে ও আজীবন প্রচেষ্টায় "রাজলক্ষ্মী বালিকা বিদ্যালয়" গড়িয়া উঠিয়াছে। তাঁহার অন্যতম

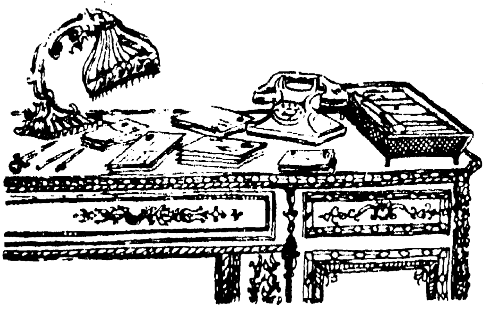


কীর্ত্তি হাওড়ার ছোট বড় কারখানাগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া "হাওড়া ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন" সংগঠন। তিনি হাওড়া "সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ" প্রমুখ বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষকরূপে সংযুক্ত ছিলেন। তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীভবতোষ ঘটক, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর, শ্রীআলামোহন দাস, শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সত্যেন্দ্রকুমার বসু

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিরাজস্ব ও বিচার বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী সত্যেন্দ্রকুমার বসু গত ৩রা মে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪-৫৪ মিঃ সময়ে মুর্শিদাবাদ, বহরমপুর হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পূর্ব্বদিন বুধবার সকালে কলিকাতা হইতে ৯০ মাইল দূরে নদীয়া জেলার পলাশী অঞ্চলে এক মোটর দুর্ঘটনার ফলে গুরুতররূপে আহত হন এবং উক্ত স্থান হইতে তাঁহাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। মৃত্যুর সময় পর্য্যন্ত তাঁহার সংজ্ঞা ফেরে-নাই।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চ্যাটার্জী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পাঠক পাঠিকার চিঠি

একটি হারানো সঙ্গীতের ইতিহাস প্রসঙ্গে

১৩৬২র মাঘ সংখ্যায় "পাঠক-পাঠিকার চিঠি"তে একটি 'হারানো-সঙ্গীতের ইতিহাস' বিষয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্য-সাংখ্যতীর্থ মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে দু'-চারটি কথা আপনার "মাসিক বসুমতী"তে "পাঠক-পাঠিকার চিঠি"তে প্রকাশ করিতে চাই, ইহা ছাপা হলে এ গানটি সম্বন্ধে আর কিছু আলোকপাত হবে আশায় লিখিতেছি।

ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়কে আমি বেশ ভাল ভাবেই জানি। তাঁর জীবনের উত্থান-পতন আনন্দ-নিরানন্দের খেলা অনেক কিছুই দেখিয়াছি এখন তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে, অর্থাৎ পরলোকে। শ্রদ্ধেয় কবি ডি. এল, রায় মহাশয়ও পরলোকে। রায় মহাশয়ের সমস্ত লিখাই এখন নানা জনে নানা ভাবে আলোচনা করিয়া তাতে আলোকপাত করিতেছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কেহই ঐ গানটি তাঁরই রচিত এমন কথা কোথাও লেখা দেখি নাই, যদি কেহ লিখিয়া থাকেন, তবে তাহা আমার অজ্ঞাত। এমনও তো হইতে পারে যে, ক্ষীরোদ বাবু লিখিয়া গানটি কেমন হইয়াছে জানিবার জন্য রায় মহাশয়কে দেখাইয়াছেন। ডি, এল, রায় মহাশয়কে ক্ষীরোদ বাবু যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন জানি। কারণ ক্ষীরোদ বাবুর বে-সুরা কণ্ঠে "যে দিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি ভারতবর্ষ" তার পর, "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" এ সব গান শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিয়াছি। সেই ক্ষীরোদ বাবু সর্ব্বজন-শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়ের রচিত গান নিজের নামে চালাইয়া দিয়া বাহাদুরী নিবেন, ইহা বিশ্বাস করিতে মন কিছুতেই রাজি হইতে চায় না।

তখনকার দিনে যে সব মহাপ্রাণ বিপ্লবী ছিলেন তার মধ্যে অন্নদা কবিরাজ অন্যতম। তিনিও একটি দলের দলপতি ছিলেন এবং তাঁর নেতৃত্বে তখনকার দুঃসাধ্য ও বিপদসঙ্কুল কাজগুলি সম্পন্ন হইত। তাঁকেও বিশেষ ভাবে জানি। তাঁর সম্পূর্ণ নাম অন্নদা-প্রসন্ন রায়-বিদ্যাভূষণ, কলিকাতায় তিনি কবিরাজি করিতেন, যথেষ্ট আয় ছিল, বাসা প্রায় হোটেলের মত ছিল, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সরোজিনী দেবী। এখন বাঁচিয়া আছেন কি না জানি না। কবিরাজ-শিরমণি শ্যামাদাস বাচস্পতির তখন নূতন কোন আয়ই বিশেষ ছিল না, তিনিও অন্নদা কবিরাজের বাড়ীতে বেশীর ভাগ সময় কাটাইতেন। তিনিও আজ পরলোকে। এই অন্নদা কবিরাজের বাড়ী পাবনা জেলায় স্থল বসন্তপুরের নিকট, মালীপাড়া গ্রামে। এঁর বড় ভাই বালুরঘাটে উকিল ছিলেন। নাম ভূতনাথ রায়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগিনী এখন জীবিত। নাম শ্যামাপদ রায় ও উমাতারা দেবী। অন্নদা কবিরাজ—স্বদেশী মামলাতে দেড় বৎসরের উপর হাজতবাস করেন, পরে বিচারে খালাস পাইয়া কলিকাতাতেই পুনরায় কবিরাজি আরম্ভ করেন, কিন্তু পুলিশী অনুগ্রহে সেখানে বাস করা কঠিন হইয়া পড়ে, বাধ্য হইয়া শেষে দিনাজপুর টাউনে পনেশতলা নামক স্থানে বাড়ী করিয়া কবিরাজি আরম্ভ করেন। সেখানে তাঁর যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এবং দুটি বন্ধু সেখানে পান, আজীবন তাঁরা সঙ্গী ছিলেন, এক জন মধুসূদন রায় অপর লালন চন্দ্র রায়, দুজনেই সেখানে বিশিষ্ট উকিল ছিলেন। তৎপর তিনি অরুণাচল মিশন-প্রতিষ্ঠাতা ঠাকুর দয়ানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং "সাধুবাবা গৌর দাস" নামে খ্যাত হন এবং ধর্ম্মজীবন আরম্ভ করেন, সাধক জীবনেও তিনি যথেষ্ট উন্নত ছিলেন। শেষ জীবনে নিজ ইচ্ছায় মহা-সমাধিতে প্রবেশ করেন—অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু। ভাগবতের কোন বিষয় নিয়া ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজীর সঙ্গে বিচার হয়, সে বিচারে সন্তদাসজী শেষে নিজ ত্রুটী স্বীকার করতে বাধ্য হন, এমনি তাঁর বিচার ও যুক্তিসম্পন্ন উক্তি ছিল।

সেই সময় ক্ষীরোদ বাবু ঢাকা—রায়পুরা স্কুলে হেডমাষ্টার ছিলেন। তখন তিনি অন্নদা কবিরাজ মহাশয়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন, দীক্ষান্তে তাঁকে "অভয়ানন্দন" নাম দেন এও জানি। সেই সময় নানা প্রসঙ্গ নিয়া গুরু-শিষ্যে নানা আলোচনা হইতে শুনিয়াছি। একদিন কথা প্রসঙ্গে ঐ গানের কথা উঠিলে—উহা যে ক্ষীরোদ বাবুর রচিত, তখন তাহা শুনিতে পাই, এবং এত দিন পর্য্যন্ত ইহা ক্ষীরোদ বাবুরই জানিয়া আসিয়াছি। শ্রদ্ধেয় যতিপ্রসাদই এখন প্রশ্ন জাগাইয়াছেন যে ইহা কাহার—অর্থাৎ মহাকবি ডি, এল, রায়ের না ক্ষীরোদ বাবুর? এরও সমাপ্তি আছে, তাহাও পরে বলিতেছি। ক্ষীরোদ বাবুর দুই স্ত্রী, প্রথমা এখনও বর্ত্তমান কিনা জানি না। দ্বিতীয়া কিছু দিন আগেও জানি, আছেন। নাম অমিয়া গাঙ্গুলী। তাঁর দুই পুত্র, একটির সঙ্গে বছর তিনেক আগে,—কলিকাতায় দেখিয়াছি। লেখাপড়া বিশেষ হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তারা এ সবের কোনও ধারও ধারে না। তার পর দুই স্থান হওয়াতে নানা অবস্থার ভিতর দিয়া চলিতে হইতেছে। বিয়েও করেছে জানি।

অনেক সময় দেখা যায় তারা কবিও নয়, সাহিত্যিকও নয়, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবকে লিখিত পত্রাদিতে এমন সব সুন্দর ভাব ও ভাষা থাকে, যাতে করে কবি বা যে কোন সাহিত্যিকের সঙ্গে তাদের তুলনা করা চলে। অথচ তারা এসবের ধারে-কাছেও যাইতে রাজি হন না। ক্ষীরোদ বাবুর

সে সবের কোন প্রমাণ না থাকিলেই যে তিনি লিখিতে পারেন না তা কি করে বলা যায়? তাঁর যদি সে ক্ষমতা না থাকিত তবে তখনকার "যুগান্তর" ও বাংলা কর্ম্মযোগিন সম্পাদনায় তার নাম থাকিত না। তার পর ক্ষীরোদ বাবুর গুরু এবং গুরুর গুরুকে লিখা পত্রাদিও যে না দেখিয়াছি এমন নয়। সে—ভাষায় ও ভাবের গভীরতায় অনুপম। ক্ষীরোদ বাবু তার গুরুর মহাসমাধির পর ছোট একখানা বই লিখেন, তাতে সমাধির বর্ণনা ও নিজের শ্রদ্ধা-ভক্তির নিদর্শনরূপে গদ্যে ও পদ্যে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন অতি সুন্দর ভাবে লিখিয়াছেন। যদি তাহাও কেহ দেখিতে চান, তবে এই ঠিকানায় লিখিয়া দেখিতে পারেন, থাকিলে অবশ্যই পাইবেন—প্রেসিডেন্ট অরুণাচল আশ্রম, পোঃ অরুণাচল, জেলা কাছাড়, আসাম।

শেষ প্রমাণ এরাই দিতে পারেন,

শেষে নিবেদন এই অন্নদা কবিরাজ মহাশয় সম্বন্ধে এত লিখার কারণ এই যে, তাঁর বিষয়ে অনেকেই জানেন না বলিয়া। তখনকার যে সব বন্ধুবান্ধব এখন রহিয়াছেন, তাঁদেরও যথেষ্ট সাহায্য হবে ভাবিয়াই পত্রটি দীর্ঘ হইয়াছে।

বাংলা ১৩১৮ সাল হইতে অন্নদা কবিরাজ মহাশয়দের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিয়াছি। ঐ সময় হইতে ক্ষীরোদ বাবুর সঙ্গেও পরিচয় হয়। ক্ষীরোদ বড়। এক ভাই ছিলেন—জ্যোতিষচন্দ্র গাঙ্গুলী, তিনিও মৃত। ক্ষীরোদ বাবু তাঁর গুরু সম্বন্ধে যে বই লিখেন তাহার নাম "সাধু বাবা গৌরদাসের মহাসমাধি:"—বীণা রাহা, চার্চ রোড, পোর্ট ব্লেয়ার, C/o এস, সি রাহা। আন্দামান। ৮।৪।৫৬

পত্রিকা সমালোচনা

চৈত্র মাসের 'বসুমতী'র বপু বেড়েছে ব'লে মনে হ'ল। এত খোরাক আর কোনো বাংলা মাসিকে নেই ব'লেই আমি নিয়মিত 'বসুমতী' কিনি। শারদীয়া সংখ্যার মত বিচিত্র বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। চৈত্র সংখ্যায় নির্ম্মল গুপ্তের 'ওমর খৈয়াম' বেশ ভাল লাগল। অনুবাদে যেটা প্রায়ই থাকে না 'এ ক্ষেত্রে সেটা আছে, অর্থাৎ মিষ্টতা আছে। জেমস্ জয়েস্ ও ইউলিসেস্ প্রসঙ্গে যেমন তথ্যপূর্ণ তেমনি সরস। এই ধরণের প্রবন্ধের প্রয়োজনয়ীতা বড় কম নয়। বিভাগটা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি সার্থক। 'রাজায় রাজায়' উপন্যাস কবে পুস্তকাকারে বের হচ্ছে বলতে পারেন? লেখাটা আমার খুবই ভাল লাগছে। স্বপ্নের রহস্য এবং বাস্তবের দীপ্তি দুটোই আছে ও-লেখায়।—শিখা মিত্র, শ্যামবাজার।

[রাজায় রাজায় পত্রিকায় সমাপ্ত হ'লেই এম, সি সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবে।—স]

আগামী বৈশাখ থেকে আপনারা 'বসুমতী'র কলেবর বৃদ্ধি করবেন জানতে পেরে খুবই সুখী হলুম। কোলকাতা থেকে অনেক রকম মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাই আমার নিকট আসে। কিন্তু 'মাসিক বসুমতী'র জন্য যতখানি উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করি তত আর কোনটির জন্য নয়। এর ভেতর কিছুমাত্রও উচ্ছ্বাস নেই। বাংলার শ্যামল সরসতার ভেতর বসে উচ্ছ্বাস করা সম্ভব কিন্তু রাজস্থানের রুক্ষ কঠিন প্রান্তরের ভেতর বসে থেকে উচ্ছ্বাসের মূল পর্য্যন্ত শুকিয়ে গেছে। কলেবর বৃদ্ধির জন্য যদি 'বসুমতী'র মূল্য বাড়াতে হয়—পাঠক সাধারণের একজন হয়ে আমি সে বিষয়ে পূর্ণ সম্মতি জ্ঞাপন করছি। 'লালবাঈ'এর আসর ভালোই জমেছে। কিন্তু শেষের দিকটা লেখক কেমন যেন তাড়াতাড়ি করে শেষ করবার চেষ্টা করছেন। লালবাঈ চরিত্রটিকে আরো স্পষ্ট করলে ভালো হোত। বইয়ের কোন চরিত্রই তেমন রেখাপাত করবার মত নয়। সুলতান চরিত্রটির অঙ্কন লক্ষণীয়। তবে লেখকের বলবার ভঙ্গীটি বেশ ভাল লেগেছে। 'রাজায় রাজায়' কে বাসর রাতের নববধূর সঙ্গে তুলনা করা চলে। বহুমূল্য অলঙ্কারে সুসজ্জিত, অথচ কি স্নিগ্ধ, কি মধুর। সমস্ত ব্যাপারটা মনের মধ্যে এক মধুর রোমাঞ্চ জাগিয়ে দেয়। প্রতীক্ষা আর সহ্য হয় না। তবে এক একটা জিনিষ লক্ষণীয়। 'রাজায় রাজায়'এর ভেতর নববধূর জড়তা নেই নিঃসন্দেহে, উদয় ভানু একজন শক্তিমান লেখক।... "কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী"কেও খুব ভালো লাগছে। লেখকের লেখবার কায়দাটি বেশ চমৎকার! "নীলাঞ্জন" উপন্যাসটি বলিষ্ঠ হাতের রচনা। চরিত্রগুলি সজীব আর আভিজাত্যের দাবী রাখে। তবে সমরেশের চরিত্রটায় অল্প একটু আতিশয্য আছে বলে মনে হয়। মোটামুটি "নীলাঞ্জন" পড়ে বেশ আনন্দ পাচ্ছি।..."সোবিয়েতের দেশে দেশে"কেও বেশ ভালো লাগছে। তবে মনোজ বাবু সেই পুরনো সুরেই নূতন কথা বলছেন। কারণ ওঁর "চীন দেখে এলাম"এর ভেতর যেমন ভাব আর ভাষা দেখতে পাওয়া গেছে এতেও ঠিক অনেকটা তাই। ভঙ্গীটা বদলালে আরও জমতো।..."যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর"কে প্রামাণ্য জীবন কাহিনী রূপেই গড়ে তুলেছেন বিনয় ঘোষ।...'উদয় ভানু' যেই হোন, আমার পক্ষ থেকে তাঁকে নমস্কার আর ধন্যবাদ জানাবেন। আর বোলবেন 'বসুমতী'র পাতায় তাঁর লেখা যেন বন্ধ না হয়। একটা কথা শুনলে আপনারা বোধ হয় খুশীই হবেন যে আমাদের ক্যাম্পে 'বসুমতী'র কয়েক জন অবাঙ্গালী ভক্ত আছেন। 'বসুমতী'র জন্য তাঁরাও আমার মত উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করেন। আসা মাত্রই আমাকে ছেঁকে ধরেন কাহিনীগুলির হিন্দী অনুবাদ শোনার জন্য। নমস্কার জানবেন। অলমিতি।—টি, রায়। গ্রাহক নং ৫০১৬২, অবধায়ক বি, এম, সাচন্দর, নিমবহেরা, রাজস্থান।

ভারতবর্ষে চা ব্যবসার ইতিহাস

আপনার ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক বসুমতী পাঠ করলাম। আপনাদের "ভারতীয় চা প্রথম যুগের কথা" পাঠ করিয়া বিশেষ interested হইলাম। আপনারা লিখিয়াছেন "ভারতবর্ষে চা ব্যবসার প্রথম যুগের একটি ধারাবাহিক ইতিহাস আছে। পাঠক-পাঠিকাদের যদি সেই ইতিহাস জানতে আগ্রহ থাকে, আমাদের জানাবেন।" সেই জন্য আপনাকে জানাইতেছি ভারতবর্ষে চা ব্যবসার প্রথম যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস জানবার জন্য আমি খুবই আগ্রহান্বিত। আপনি যদি দয়া করিয়া ঐ ইতিহাস আমাকে সম্পূর্ণ পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে বড়ই বাধিত হইব। ইহার জন্য যাহা কিছু খরচা হইবে তাহা বহন করিতে সম্মত আছি — বন্দ্যোপাধ্যায়। মকাইবারি, চা-বাগান; কার্শিয়াং

[চা ব্যবসার ইতিহাস বর্ত্তমান সংখ্যাতেও পাঠানো সম্ভব নয়, পত্রিকা দেখুন।—স]

চিত্র পরিচালক সম্পর্কে

১৩৬২ সালের মাসিক বসুমতীর চৈত্র সংখ্যায় "রঙ্গপট" বিভাগে ১০৭০ পৃষ্ঠায় ১৩৬২ সালের মোট বাহান্নখানি ছবিতে ১৪ জন নতুন পরিচালকের সন্ধান পাওয়া গেল বলে যে তালিকা দেওয়া হোয়েছে, তাতে সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকারের নাম দেখে বিস্মিত হোলাম। সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার আদৌ নতুন পরিচালক নন। ১৩৬২ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত "আত্মদর্শনের" বহু পূর্বে সুরেন্দ্ররঞ্জন সরকার "নতুন বৌ" ও "পরশ পাথর" চিত্র দুটি পরিচালনা করেছিলেন। সুতরাং এঁকে ১৩৬২ সালের নতুন পরিচালক বলে স্বীকার করা চলে না। নমস্কার। সনৎকুমার মৌলিক, (মেদিনীপুর)।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

বৈশাখ মাস থেকে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকাভুক্ত করে নেবেন।—শ্রীমতী অণিমা লাহিড়ী, C/o, New Lekrach & Co. পো: সাহারামপুর, সিন্ধ্রি।

১৩৬৩ সালের যাণ্মাসিক গ্রাহক হবার জন্য ৭।০ টাকা পাঠালাম।—আবদুল আলাম। বর্দ্ধমান।

মাসিক বসুমতীর ছ' মাসের চাঁদা ৭।০ পাঠালাম। মাসিক বসুমতী সত্বর পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।—লতিকা লাহিড়ী, C/o, Rever Bank Colony Lucknow. U. P.

Sending subscription for Monthly Basumati for a further period of six months. Sreemati Kamala Kar, C/o, D. C. Kar, Corramore T. E. Hospital, Darrang, Assam.

অনুগ্রহপূর্ব্বক আমাকে ১৩৬৩ সালের গ্রাহিকাভুক্ত করিয়া লইবেন।—শ্রীমতী রমা রায়-চৌধুরী, পুণা।

Remitting Rs. 7/8/- being the 6 monthly subscription for Masik Basumati—শ্রীমতী মায়া দাস। বোম্বাই।

মাসিক বসুমতীর নূতন বৎসরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। গ্রাহিকা করে নেবেন।—অসিতা দাস। C/o, এ, সি, দাস, পাটনা।

১৩৬৩ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম।—প্রীতিকণা গুপ্ত, নিউদিল্লী।

নূতন বছরের বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। নববর্ষের ... লইবেন।—শ্রীমতী রেণুকণা মুখার্জ্জি, এলাহাবাদ।

সময় কাটাই...

কবিরাজের বাড়ী পা...দা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। দয়া করিয়া নিয়মিত প্রাপে। এঁর বড় ভা...পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী অণিমা যদুনাথ রায়, কনিষ্ঠ ভ্রাতা ... সি, চক্রবর্ত্তী, সত্যলোক, বেনারস সিটি।

Herewith remitting the subscription for Monthly Basumati for 6 months Commencing the Baisak as contribution of my membership—Sreemati Bani Das Gupta, C/o, Dr. B. C. Das-Gupta A. M. O. Upper Assam.

মাসিক বসুমতীর এ বছরের চাঁদা পাঠালাম, প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন।—শ্রীউষা সেন, C/o, পি, সি সেন। কুচবিহার।

১৩৬৩র মাসিক বসুমতী বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী কমলা সরকার, C/o, শ্রী টি, সরকার, টি, ডি, এল, এসোসিয়েশন, উড়িষ্যা।

১৩৬৩ সালের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম এখন হইতে এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।—শ্রীমতী লীলাবতী দেবী C/o, মাণিকলাল মুখার্জ্জি, জলপাইগুড়ি।

যাণ্মাসিক চাঁদা ৭।০ টাকা পাঠালাম। নিয়মিত বসুমতী (মাসিক) পাঠাইবেন।—শ্রীমতী শেফালি সেনগুপ্তা। রামকিশোর রোড সিভিল লাইন, দিল্লী।

অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে মাসিক বসুমতীর সভ্য করিয়া লইবেন। এই বৈশাখ হইতে আমাকে মাসিক বসুমতী ভি: পি: যোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীমতী নীলিমা মিত্র, C/o Sri S. N. Mittra I. C. S. 17-D, Hastings Road, Allahabad.

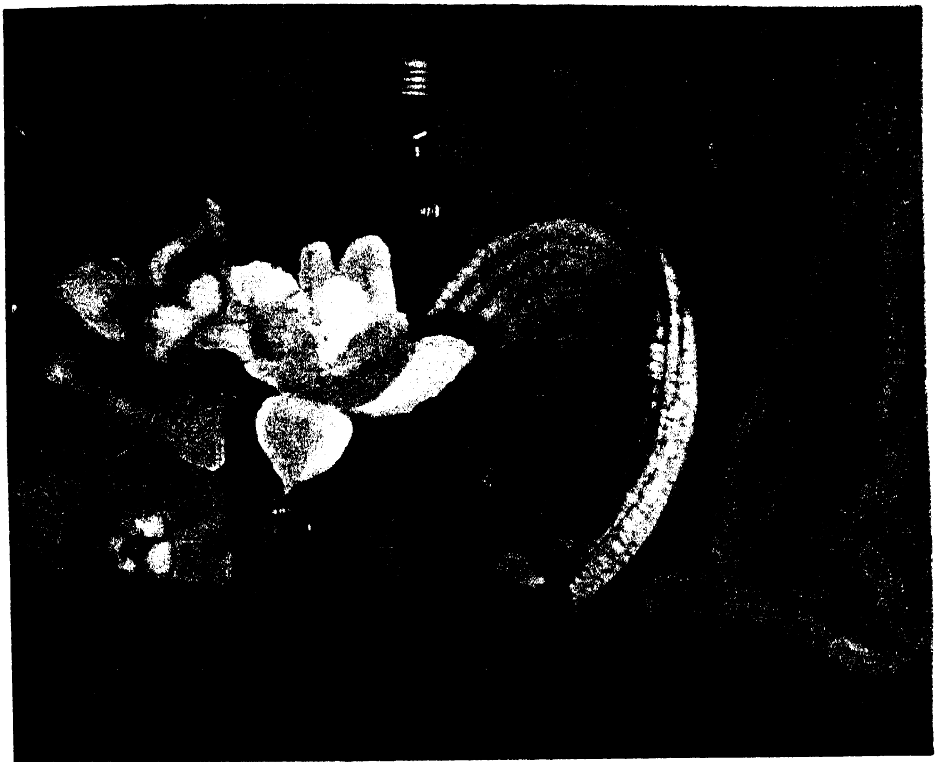
এই বৎসরের বৈশাখ হইতে আপনাদের মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। অনুগ্রহপূর্ব্বক ভি: পি: যোগে পাঠাইবেন।—শ্রীজয়া মিত্র, C/o এ, সি, মিত্র। উদয়পুর, রাজস্থান।

অনুগ্রহপূর্ব্বক আগামী বৈশাখ হইতে ৬ মাসের জন্য গ্রাহিকা করিয়া লইবেন। ভি: পি: যোগে বৈশাখ সংখ্যা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—জয়ন্তী দেবী। C/o Sri M. L. Chatterjee Gowalior R. S.

বৈশাখ মাসের পত্রিকাখানি ভি: পি: যোগে পাঠাইবেন। শ্রীমতী মায়া মুখোপাধ্যায়, C/o, J. N. Mukherjee, Bat park, Po, Balarampur. Gonda.

মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই, বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইতেছি। বৈশাখ ১৩৬৩ সাল হইতে মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন।—শ্রীমতী মঞ্জুষা মিত্র। Dr. R. N. Mitra, Civil Surgeon, Haripur U. P.

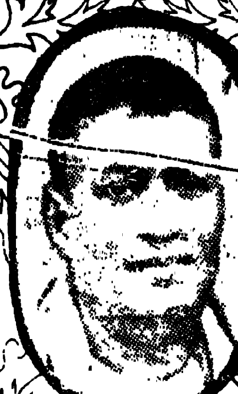
১৩৬৩ সালের বৈশাখ হইতে গ্রাহক হইতে চাই। সত্বর আমাকে নিয়মাবলী জানাবেন।—শ্রীমতী কমলা দত্ত-রায়। C/o, K. C. Dutt Roy, Patna.



ষ্টীল-লাইফ (তেলরঙ) —বিজয়কুমার রায় অঙ্কিত
(গভর্ণমেন্ট কলেজ অফ আর্টস্ এণ্ড ক্র্যাফ্‌টস্, কলিকাতা)



সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ২য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "কেউ হয়তো গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, সে সময় কোথা ভগবান চিন্তা করবে,—গল্প করতে বসে গেল। যত রাজ্যের গল্প।—তোর ছেলের বিয়ে হলো, কি গয়না দিলে?—অমুকের বড় ব্যাম,—অমুক শ্বশুরবাড়ী থেকে এসেছে কি না;—অমুক কনে দেখতে গিছলো, তা দেওয়া থোওয়া, সাধ আহ্লাদ খুব করবে,—হরিশ আমার বড় ন্যাওটো, আমায় ছেড়ে এক দণ্ড থাকতে পারে না;—এত দিন আসৃতে পারিনি মা,—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম। বিধবা পিসী বলছে,—মা, দুর্গা পূজা আমি না হলে হয় না,—শ্রীটি গড়া পর্য্যন্ত! বাড়ীতে বিয়ে-থাওয়া হলে, সব আমায় করতে হবে মা, তবে হবে। এই ফুল-শয্যার যোগাড়,—খয়েরের বাগানটি পর্য্যন্ত! দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গাস্নান করতে এসেছে, যত সংসারের কথা। বিশ্বাস নাই অথচ পূজা জপ সন্ধ্যাদি করছে, তাতে কিছু হয় না।"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "ছাদের উপর ঠাকুর ঘর, নারায়ণ পূজা হচ্ছে, পূজার নৈবেদ্য, চন্দনঘসা এই সব হচ্ছে,—ঈশ্বরের কথা একটি নাই! কি রাঁধতে হবে,—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক ব্যঞ্জনটি বেশ হয়েছিল,—ও ছেলেটি আমার খুড়তুত ভাই হয়,—হ্যাঁরে তোর সে কর্ম্মটি আছে?—আর আমি কেমন আছি,—আমার 'হরি নাই'! এই সব কথা। দেখ দেখি ঠাকুরঘরে পূজার সময় এই সব কথাবার্ত্তা!"

"অনেকে আহ্নিক করবার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে নাই, তাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা করতে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস,—হুঁ, উহুঁ, এই সব করে। আবার কেউ মালা জপ করছে, তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে,—জপ করতে করতে হয়তো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়,—ঐ মাছটা। যত হিসাব সেই সময়!"

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "ভগবানের আনন্দলাভ করলে সংসার আলুণি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।"

"যারা 'সংসারে ধর্ম্ম' 'সংসারে ধর্ম্ম' করছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায়, তাদের আর কিছু ভাল লাগে না,—কাজের সব আঁট কমে যায়,—ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে, কাজ আর করতে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ! একবার ভগবানের আনন্দের আস্বাদ পেলে সেই আনন্দের জন্ত ছুটাছুটি কোরে বেড়ায়, তখন সংসার থাকে আর যায়!"

"চাতক, তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে যাচ্ছে,—সাত সমুদ্র যত নদী পুষ্করিণী সব ভরপুর, তবু সে জল খাবে না! স্বাতী নক্ষত্রের বৃষ্টির জলের জন্ত হাঁ করে আছে,—বিনা স্বাতীকি জল সব ধূর।"

সংযুক্ত এশিয়া

[লেখকের ইংরাজী Faderated Asia পুস্তকের বঙ্গানুবাদ]

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতা ও তাহার প্রভাব

প্রাচীন মানুষের ইতিহাস পাঠ করে আমরা দেখি যে এশিয়াতেই প্রথমে আদি সভ্যতার বিকাশ ও সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছিল। ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, ভারতীয়েরা পৃথিবীর বিভিন্নাংশে ছড়িয়ে পড়ে উপনিবেশ ও সভ্যতা স্থাপন করেছিল। প্রাচীন স্থাপত্যের গঠন প্রণালী এশিয়ার বিভিন্নাংশের অধিবাসী তার আজও সাক্ষ্য বহন করে। বিভিন্ন দেশের আচার ব্যবহারের মধ্য থেকে ভারতীয় বৈশিষ্ট্য বেশ সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। প্রাচীন ভারতীয় পুস্তকে দেখা যায় যে ভারতীয়দের, পৃথিবীর বিভিন্নাংশের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগ ছিল। বৌদ্ধযুগে ভারতীয় পরিব্রাজক ধর্মপ্রচারকগণ সভ্যজগতের প্রায় সমস্ত দিকে বিচরণ করেছিলেন, তাঁরা জগতের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন, এবং সভ্যতাও বিস্তার করেছিলেন। ভারতীয়েরা এই ভাবেই জগতের বিভিন্নাংশে তাদের ভাবধারা ছড়িয়েছিল। চীনবাসীরা তাদের প্রথম আদি যুগে এশিয়ার বিভিন্নাংশে ছড়িয়ে পার্শ্ববর্তী জাতি সমূহের মধ্যে তাদের নিজস্ব সভ্যতা ও ভাবধারা বিস্তার করেছিল।

এশিয়া মাইনর ও ব্যাবিলন তখনকার সভ্যজগতের বিভিন্নাংশে তাদের প্রভাব বিস্তার করে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। মূর্ত্তি স্থাপত্য ও গার্হস্থ্য তৈজসপত্রের মধ্যে এশিয়া মাইনরের প্রভাব এখনও এশিয়ার অনেক জায়গায় দেখা যায়। ইজিপ্ট-বাসীর (যাদের রোমাক বলা হয়) পিরামিড মূর্ত্তিস্থাপত্য আজও পৃথিবীর পরম বিস্ময়! Phoeniciansদের—Utica ও Numedia এখন যাকে Tunis ও Morocco বলে, পারস্যের Cyrus এবং আরব—এরাও এক সময় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে এশিয়ার বিভিন্নাংশে তাদের সভ্যতার বিস্তার করেছিল। কিন্তু হায়! এরা সব এখন মহানিদ্রায় আচ্ছন্ন। আর অন্য দিকে যারা এশিয়ার অধিবাসী নয়, যারা ইউরোপের সেই পূর্ব্বযুগে—Pannonian বনে বাস করতো—তারা এখন প্রাধান্য লাভ করে এশিয়ার ওপর বর্ত্তৃত্ব করছে। এটা খুবই লজ্জাকর ও বেদনাদায়ক নয় কি?

এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলিকে এখন আমরা একই বংশ বলে ভাববো, না বিভিন্ন সংস্কৃতির লোক ও জাতি বলে ভাববো? আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি পোষাক পরিচ্ছদ, ঘরের তৈজসপত্র, রন্ধন প্রণালী ও মানসিক গঠনে এশিয়াবাসীদের এক সাধারণ যোগসূত্র আছে। প্রকৃতিতে বা মেজাজে কেবল উচ্চারণ বিধি ও ভাষায় তাদের পার্থক্য। তরিতরকারী এশিয়ার সর্ব্বত্র সমান। প্রাচীন ইতিহাস পড়ে এখন আমরা এশিয়াকে একই বংশ বলবো, আমরা যা বলতে চাইছি তা এই যে, এশিয়াবাসিগণ এশিয়ার বিভিন্নাংশে বাস করে। স্থানীয় জলবায়ুর প্রভাবে দেশাচারে বৈশিষ্ট্য থাকিলেও সাধারণ সংস্কৃতি তাদের একই, এক দেশ থেকে অন্য দেশের প্রকৃতির কোন ভৌগোলিক সীমা নির্দ্দেশ নেই। একই ভূমির বিভিন্নাংশে বাস করিলেও আবহাওয়ার জন্য তাদের ভাষার কিঞ্চিৎ পার্থক্য দেখা যায়। ভিন্ন ভিন্ন দেশের যে সীমানা তাহা কেবল রাজনৈতিক জন্য, নচেৎ এশিয়া একই বংশ, যখন আমি এশিয়ার বিভিন্নাংশে ভ্রমণ করি ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের সংস্পর্শে আসি, তখন চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া থেকে মরক্কো ও আবিসিনিয়া সমস্ত এশিয়াবাসীর মধ্যে আমি একই সংস্কৃতি, একই আচার-ব্যবহার এবং একই ধরণের প্রকাশভঙ্গি লক্ষ্য করেছি। পাশ্চাত্য দেশে যে সভ্যতা দৃষ্ট হয় তাহা হইতে প্রাচ্যের সভ্যতা পৃথক।

পাশ্চাত্য ভূগোলে উত্তর-আফ্রিকা সুদান ও আবিসিনিয়া এশিয়া থেকে পৃথক কিন্তু প্রাচ্যে এই সমস্ত দেশগুলি এশিয়ার অন্তর্গত হবে। জীবনযাত্রা প্রণালী স্থাপত্য, মানসিক গঠন এমন কি রন্ধনপ্রণালী পর্য্যন্ত তাদের একই প্রকার। আমাদের দেশের রান্নার মত তাদের রান্নাও আমি খেয়ে দেখেছি। আমি এই কথাই শুধু বলতে চাই যে, এশিয়াবাসিগণ বিভিন্ন দেশে বসবাস করলেও সংস্কৃতির দিক থেকে তাদের ঐক্য আছে। তারা একই জাতিভুক্ত।

সভ্যতা ও সংস্কৃতির পার্থক্য

সংস্কৃতি ও সভ্যতার পার্থক্য বলতে আমরা এই বুঝি যে, একটি চিরন্তন স্থায়ী এবং অপরটি অস্থায়ী, কোন দেশের বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাঁদের নিজেদের এবং অপরের কল্যাণের জন্য যে সমস্ত চিন্তা করেন তাহাকেই সভ্যতা বলে। শুধু যে মানুষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তা নয়, পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহের ওপরও প্রভাব বিস্তার করে।

নতুন চিন্তা পুরাতন চিন্তাকে বিতাড়িত করে। দুই শ্রেণীর ভাবের তাই সংঘর্ষ হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর ও জাতির যুদ্ধ এই কারণেই হয়ে থাকে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দুই শ্রেণীর ভাবের যুদ্ধ। এশিয়াবাসীর চিন্তাধারা পাশ্চাত্যবাসীর চিন্তাধারা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এখন সংস্কৃতি কাকে বলে? প্রাচীন লোকদের চিন্তাধারা এখন অনেক পরিমাণে অচল হয়েছে। সংস্কৃতি আবহাওয়া ও পারিপার্শ্বিকতার উপর নির্ভর করে, খাদ্য-সঞ্চয়ের সুবিধা ও স্বাভাবিক পারিপার্শ্বিকতা মানুষের অভ্যাস ও মানসিক গঠনের উপর আধিপত্য বিস্তার করে কিন্তু ইহাদের সংস্কৃতি একই অবস্থায় আছে। কারণ ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। অবস্থা ভেদে জাতীয় জীবনের খরস্রোতে সভ্যতার জোয়ার-ভাটা খেলে, কিন্তু সংস্কৃতি অচল, ও অপরিবর্ত্তনীয় সভ্যতার ভাবগুলি পরিবর্ত্তিত হতে পারে কিন্তু

সংস্কৃতির ভাবগুলির কখনও পরিবর্ত্তন হয় না, পাশ্চাত্যবাসিগণ আমাদের দেশের ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিতর এই জন্ত পার্থক্য ধরতে পারেন না। ধর্মতত্ত্বের পরিবর্ত্তন হয় কিন্তু সংস্কৃতির পরিবর্ত্তন হয় না। ধর্মতত্ত্ব জনসাধারণের মধ্যে বৃথাই প্রভাব বিস্তার করতে চায়।

এশিয়ার পশ্চাদপদ হওয়ার কারণ

এশিয়া আজ এতো পশ্চাতে কেন? এশিয়ার বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে মিশে আমি এই দেখেছি যে, ইহার একমাত্র কারণ, তারা মিলে-মিশে থাকতে পারে না। সমুদ্রের দ্বীপের মত সব পৃথক্ পৃথক্। বিচ্ছিন্ন ভাবের শক্তি ইহাদের মধ্যে অতি প্রবল, প্রত্যেকেই স্বার্থের জন্ত ব্যস্ত। সমস্ত এশিয়ার উন্নতি হোক, এইরূপ উদার দৃষ্টি ইহাদের একেবারেই নাই। পাশ্চাত্যবাসিগণ এশিয়ার এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে ব্যবসায় বা রাজ্য-জয়ে এক-একটি জাতিকে পদদলিত করে। পাশের দেশ তখন তাহা দেখেও দেখে না এবং সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকে। এমন কি স্বজাতি স্বজাতির শত্রু হয়ে বিদেশীর সঙ্গে যোগ দেয়, ইহাকে গোপন প্রতিশোধ নেওয়া বলে। এই স্বভাব ও বিচ্ছিন্ন ভাবের জন্ত এশিয়া বিদেশী কর্তৃক পরাজিত হয়, ইহা অতি লজ্জাকর ও বেদনাদায়ক। এশিয়ার অধিবাসিগণ যে সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে ইহা প্রবাদ বাক্যের মত জাতির কলঙ্ক।

এশিয়া কি ভাবে উঠবে ও জাগবে?

অন্ধ-ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে এশিয়াবাসীদিগকে আজ জগতের সামনে দৃঢ়ভাবে নিজের উপর দাঁড়াতে হবে। এশিয়ার প্রত্যেক জাতি তার নিজের নিজের কাঁচামালগুলি নিজেদের ব্যবহারে লাগিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি করতে হ'বে এবং পার্শ্ববর্ত্তী দেশসমূহের মধ্যে বন্ধুত্ব, বিশ্বাস ও উদারতা স্থাপন করতে হ'বে। কারণ কোন একক দেশ-বিদেশী কর্তৃক আক্রান্ত হ'লে পাশের দেশ সাধারণত নিরপেক্ষ থাকে, পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হলে আক্রান্ত দেশ বা জাতির পক্ষ নিয়ে অন্ত জাতি বা দেশ তখন বিদেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবে। মিলন ও বন্ধুত্ব এই সময় এশিয়ার দেশগুলি ও জাতিগুলির মধ্যে তাই অপরিহার্য্য। এই মিলন বা যোগসাধন মানে বশ্যতা স্বীকার করা বা অবনত হওয়া নয়। বন্ধুত্ব বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপনই এশিয়ার আজ উদ্দেশ্য। এশিয়ার অন্তর্বিবাদ ও সমস্যা এশিয়া নিজেই করবে। এশিয়ার কোন অংশকে কোন বিদেশী আক্রমণ করলে, সমগ্র এশিয়া তখন মিলিত হয়ে তাকে রক্ষা করবে, বর্ত্তমান এই যুগে ইহা এখন অতীব প্রয়োজন, আক্রমণ বা বিদ্রোহ করবার কোন চক্রান্ত প্রথমেই করা উচিত নয়, এশিয়া আজ সব দিক থেকে স্বাধীন থাকবে। সাধারণ মূলতত্ত্বগুলি আমার এই যে (১) মানুষের বাঁচবার অধিকার আছে। (২) মানুষের খাওয়ার ও মন খুলে কথা বলার স্বাধীনতা আছে, (৩) জাতি ধর্মতত্ত্ব হ'তে বড় (৪) ব্যক্তিত্ব, ধর্মমতের বিশ্বাসের চেয়ে বড়, এক সঙ্গে কাজ, সমান লাভ, সমান উন্নতি এবং সমান স্বাধীনতাই যে আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহা এশিয়ার প্রত্যেক ছেলেমেয়ে ও যুবকের অবশ্যই শিক্ষা করা উচিত। এশিয়ার দুর্ব্বল মনকে আজ এমন ভাবে গঠন করতে হ'বে যাতে একটা পুরান জাতি আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে। একটি সৎ ও শক্তিমান প্রতিবেশী মানুষের খুব উপকার। এশিয়া, সমস্ত অতীত সভ্যতার ও ভাবের ভাণ্ডার, এগুলি যথাসম্ভব রক্ষা করে ও সংস্কার করে মানুষের বর্ত্তমান ব্যবহারোপযোগী করা কর্ত্তব্য। শত্রুতা নয়, বন্ধুত্বই আমাদের মূলমন্ত্র। এশিয়ার প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এই সমস্যার অবশ্যই সমাধান করবেন—কি করে সমগ্র এশিয়ার উন্নতি হয়। এশিয়ার ইহাই আজ প্রধান সমস্যা।

বংশপরম্পরাগত শাসনকর্ত্তা ও গণতন্ত্ররাজ্য

এশিয়ার অধিকাংশ দেশের রাজা ও শাসনকর্ত্তা বলতে গেলে তাঁরা সব উত্তরাধিকার সূত্রে পদস্থ হয়েছেন। দেশের অন্যান্ত লোকের মত তাঁহারাও অতি সাধারণ মানুষ। উত্তরাধিকারসূত্রে উচ্চপদস্থ হয়ে তাঁহারা দেশের জনসাধারণের উপর কর্তৃত্ব করার গর্ব্ব অনুভব করেন এবং নিজেদের খুব বুদ্ধিমান ও পটু বলে মনে করেন। শ্রমিকদের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পয়সা তাঁরা একরূপ লুণ্ঠন করে বিলাসিতায় দিন কাটান। নিজেদের বিলাসিতার জন্ত তাঁরা প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। আর অন্ত দিকে দরিদ্র শ্রমিকেরা দুর্ব্বহ জীবন যাপন করে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে, নিজেদের খামখেয়ালী ও বিলাসিতার জন্ত দরিদ্র শ্রমিকের টাকা লুণ্ঠন করবার তাঁদের কি অধিকার আছে? হাতে প্রচুর অর্থ থাকায় ও নিজেদের রক্ষা করবার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকায় তাঁরা বেশ নির্ব্বিঘ্নে ও সুখে দিন অতিবাহিত করেন। দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাঁরা মোটেই নন বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁরা সব চেয়ে নিকৃষ্ট। ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, এই সমস্ত লোক অতি ভয়ঙ্কর! তাঁরা এক একজন অনেকগুলি করে সুন্দরী নারী কাছে রাখেন এবং সন্দেহ ও খেয়ালের বশে তাঁরা সুন্দরীদের এক একটিকে দম বন্ধ করে হত্যা করে অন্দর মহলের ঘরের দেওয়ালে কবর দিয়ে থাকেন। এশিয়ার কোনও অংশে ঐরূপ ভয়ঙ্কর স্থান আমি পরিদর্শন করেছি। এই সমস্ত খামখেয়ালী লোকদের সভাপতির আসনে না বসিয়ে অন্ত লোককে সভাপতির আসনে বসান উচিত।

মানুষের মনোভাব দেশের খুব শক্তিশালী জিনিষ। উত্তরাধিকার সূত্রে রাজাদের সমস্ত ক্ষমতা তুলে দেওয়া উচিত। তাঁদের খামখেয়াল চরিতার্থ করার জন্ত সাধারণের টাকা লুণ্ঠিত হতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁহাদের গুপ্ত ধনভাণ্ডার পরীক্ষা করা প্রয়োজন। অন্যান্ত নগরবাসীর মত তাঁহাদের একটা নির্দ্দিষ্ট ভাতা দেওয়া হবে। তাঁহাদের কোন বিশেষ ক্ষমতা ও টাকাকড়ি দেওয়া হবে না। "গণদাস"—হিসাবে তাঁহাদের জনসাধারণের টাকা হতে মাসিক কিছু টাকা দেওয়া হবে। রাজার অধিকার বা বিশিষ্ট কোন অধিকার তাঁহাদের দেওয়া হবে না। দেশের "গণদাস" হিসাবে কাজ করে তিনি খেটে খাবেন। গণদাস নির্ব্বাচন ব্যবস্থা রাজ্যের খুব ভাল ব্যবস্থা। উত্তরাধিকার প্রথা অনুযায়ী এই বংশের প্রতি লোকের সম্মান থাকবে। তবে খামখেয়ালী ও রাজার অধিকার হতে তিনি বঞ্চিত হবেন।

নগরবাসী তাদের স্বাধীন ইচ্ছায় প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করে দেশের মন্ত্রণাসভা গঠন করবে। এই নির্ব্বাচিত মন্ত্রণাসভায় রাজার সমস্ত

ক্ষমতা অর্পিত হইবে এবং রাজ্যের "গণদাস" সেই ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। বর্ত্তমান যুগে সভাপতি রাজা রায়বাহাদুর এই সব পুরাতন নাম বা খেতাব বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নয়। গণদাস এই নাম হওয়া আজকালকার দিনে বাঞ্ছনীয়।

দেশের কোথাও ধনবানদিগের শাসন, কোথাও অল্প সংখ্যক লোক দিয়ে শাসন, কোথাও গণ্ডগোলের শাসন, আবার কোথাও বা সৈন্ত দিয়ে শাসন দেখা যায়। কিন্তু মানব কল্যাণ শ্রীবৃদ্ধির জন্ত স্বাধীন ইচ্ছা কোথায়? ব্যক্তিগত এবং জাতির উন্নতির জন্ত উপযুক্ত ও উদার ব্যক্তিকে সভ্য নির্ব্বাচন করা উচিত। কোন রকম দলাদলির প্রশ্ন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা। একমাত্র দেশসেবা বা জনসেবাই প্রত্যেক সভ্যের আদর্শ হওয়া উচিত। মতভেদ জনিত অনৈক্য, অন্তর্বিবাদ ও কলহ পরিত্যাগ করতে হ'বে এবং অপর জাতির কাছে আমাদের দেশের মান ইজ্জতও রক্ষা করতে হবে। কারণ ইজ্জত রক্ষা না হ'লে মানুষ কোন উন্নতি করতে পারে না। মন্ত্রণাসভার এই দুটি কাজ হওয়া উচিত।

মন্ত্রণাসভায় ধর্মতত্ত্বের কোন আসন থাকা উচিত নয়। কারণ, ধর্মতত্ত্বে পরজগতের বা মৃত্যুর পরপারের উৎসাহহীন রুগ্ন ভাবের কথা থাকে। বর্ত্তমান সমাজের কথা, জাতির উন্নতির কথা এ সব কিছুই থাকে না। রুগ্ন ধর্মতাত্ত্বিকগণ মৃত্যুর পর যাতে সুখে দিন যাপন করতে পারেন অথবা কল্পিত জগতে যশঃশালী হ'তে পারেন, তাই মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করে থাকেন, কিন্তু রাষ্ট্রের ব্যাপারগুলি বর্ত্তমান জীবন নিয়ে সম্বন্ধ—কেমন করে সব লোক খেয়ে-পরে বাঁচবে ও উন্নতি করবে—এইটিই এখন প্রধান সমস্যা, ইহার সহিত মৃত্যুর পরপারের জীবনের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। অতএব ধর্মতত্ত্বকে রাষ্ট্র ও ব্যবসাবাণিজ্য হতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌ করতে হ'বে। জাতির অগ্রগতি ও উন্নতিতে ধর্মতত্ত্ব অত্যন্ত বাধা দেয়। এশিয়া আজ এই কারণে এতো পেছিয়ে আছে। এশিয়াবাসী শুধু ধর্মতত্ত্বের কথা বলেন, দৈনন্দিন জীবনের প্রকৃত ঘটনা অথবা সমগ্র দেশ কি করে উন্নতি করবে, সে সব কথা বলেন না। সেই জন্ত সমাজ ও রাজনীতি থেকে ধর্মতাত্ত্বিকদের সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা উচিত এবং জাতির ও প্রত্যেক ব্যক্তিরই উন্নতি মন্ত্রণাসভার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

পূর্ণবয়স্কপ্রাপ্তদের—সে ছেলে হোক অথবা মেয়ে হোক, প্রত্যেক নাগরিকেরই ভোট দেবার ক্ষমতা থাকবে। জাতি জন্ম, পদ বা পয়সার জন্ত ভোটের কোন পার্থক্য থাকবে না। প্রত্যেক নাগরিকই দেশের ভোটার এবং সে নাগরিকের পূর্ণ অধিকার ভোগ করবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, শ্রমিক ও নারী দেশের উন্নতির প্রধান বিষয় কি না? আমাদের দেখতে হ'বে যাতে দেশের সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীর লোকও দেশের সমস্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পায়। দেশের এই ব্যবস্থাকে দেশের সাধারণতন্ত্র বা গণতন্ত্র শাসন বলে। এশিয়ার স্বেচ্ছাচারী ও গোঁড়ামি ভাবগুলি ক্রমশঃ দূর করা প্রয়োজন, যেখানে জাতির উন্নতির সম্পর্ক সেখানে গোঁড়ামি চলা উচিত নয়, দেশের চিন্তানায়কগণের নব নব আবিষ্কার ও পরিকল্পনাগুলিকে জাতির উন্নতির জন্ত ব্যবহার করতে হ'বে এবং পুরাতন জীর্ণ মনোভাবগুলিকে ক্রমশঃ দূর করতে হ'বে

এবারে অন্ত প্রশ্ন এই যে, বিদেশীগণ নাগরিকের অধিকার পেতে পারেন কি না? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হতে এশিয়ায় আগত বিদেশীগণ জাতীয় উদ্দেশ্যের উপযোগী প্রচলিত শাসন প্রণালীর আনুগত্যের শপথ করে বিদেশী নাগরিকের অধিকার পেতে পারেন। কলহপ্রিয় বিপরীত ভাবাপন্ন লোকদের পরিত্যাগ করতে হবে এবং বিদেশী ধনী লোকদের এশিয়ায় বাস করতে দেওয়া হবে। কিন্তু যাদের কোন মূলধন নেই, সেই সমস্ত বিদেশীগণ যাতে দেশের দরিদ্র ও শ্রমিকের অশান্তি আর না বাড়ায় সেজন্ত তাদের আসা বন্ধ করা উচিত। কেবলমাত্র কর্মনিপুণ সুদক্ষ ও ধনী ব্যক্তিদের এশিয়ায় বাস করতে দেওয়া যেতে পারে। ধর্মের ভাই-ভাই সম্বন্ধ এখানে নয়—এখানে তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারের ন্যায় বাস্তবতা—কি করে জাতি সমৃদ্ধিশালী হ'বে। ভ্রাতৃবিশ্বাস ধর্মতাত্ত্বিকদের উদ্দেশ্য। রাজনীতিতে ভ্রাতৃসম্বন্ধ নাই। সামাজিক উন্নতিতে ভ্রাতৃবিশ্বাস চলে না। সমাজে পুরাতন ধর্মতাত্ত্বিকদের মনোভাব ও অনুশাসনের স্থান নেই।

এখন বিবেচনা করতে হ'বে যে, বিদেশী বণিকদের নাগরিক অধিকার থাকবে কি না? বিদেশীগণ এশিয়ার ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারেন কিন্তু তাদের পৃথক পৃথক থাকতে হ'বে। বিদেশী বণিক হিসাবেই তাঁরা বাস করবেন। নাগরিক অধিকার তাঁদের দেওয়া হ'বে না। যাঁরা দেশের উন্নতি করবেন ও জাতীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন হ'বেন—একমাত্র তাঁরাই নাগরিক অধিকার লাভ করবেন। বিদেশী বণিকদের অন্ত দেশের প্রতি তেমন দরদ থাকে না। স্বাধীন দেশে ধর্মতত্ত্বেরও স্বৈরশাসনের স্থান নেই। যেহেতু এগুলি অতিপুরাতন ও উন্নতির বাধা।

আত্মকেন্দ্রিক সভ্যতার যুগ

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশের ধর্মতাত্ত্বিকগণ মানুষের জীবনের সমস্যার কথা ভেবে গেছেন। মানুষের সমস্ত কল্যাণ-চিন্তা তাঁরা ধর্মের মধ্য দিয়ে অধ্যাত্ম, অর্থাৎ অধিবিদ্যা ভক্তি ও অনুষ্ঠান এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। কালের পরিবর্ত্তনে সামাজিক অনুষ্ঠান ও ভক্তি এই দুই বিভাগের পরিবর্তন হয়। ধর্ম সম্বন্ধীয় এই বিভাগ দুইটি সমাজ উন্নতির ক্ষতিকারক। ধর্মতাত্ত্বিকগণ সমাজের ধর্মভাবগুলির কল্পনা করেন এবং প্রত্যেক সমস্যাই তাঁরা কোন কাল্পনিক দেবতার আদেশ বলে মনে করেন। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজ আত্মকেন্দ্রিক। ধর্মতাত্ত্বিক ভাব বিভিন্ন জাতির বর্ত্তমান কার্য্যকলাপ হ'তে উঠে যাচ্ছে। ধর্মের প্রতিষ্ঠাতাগণ সমস্ত মনুষ্যজাতির মধ্যে দেবত্বভাবই শ্রেষ্ঠ ভাব এই চিন্তাই করে গেছেন। সেই সময় খাদ্যসমস্যা এবং নারী ও শ্রমিকের কোন সমস্যা ছিল না। পূর্বের খাদ্য যথেষ্ট ও প্রচুর ছিল এবং খাদ্য-সমস্যা তাঁদের মোটেই ছিল না। খাদ্যসমস্যার সঙ্গে নারী ও শ্রমিক-সমস্যা আসে। শ্রমিক বেশী চাকর কম। নারী ও শ্রমিকের তাই রাষ্ট্রে কোন সামাজিক পদ নাই এবং মুখও তাদের বন্ধ। নারীজাতির সম্মান না থাকায় বাঁচবার ও উপার্জ্জন করবার কোন স্বাধীন সত্তা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগে সমাজের এখন আত্মকেন্দ্রিক ভাব। সমাজ জীবনে ধর্মতত্ত্ব তুচ্ছ ব্যাপার। ধর্মবিশ্বাসী ও প্রাচীন ধর্মপ্রতিষ্ঠাতাগণ সমাজের বর্ত্তমান পরিবর্ত্তনশীল

উন্নত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারেন না। ধর্মতত্ত্ব মানুষের যেমন খুব উপকার করেছে তেমনি খুব খারাপও করেছে। পুরাতন প্রবাদবাক্যে আছে যে মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না, ভগবানের নাম নিয়ে বেঁচে থাকে। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার ঠিক বিপরীত দাঁড়িয়েছে। মানুষ শুধু ভগবানের নাম নিয়ে বাঁচে না, রুটিরও প্রয়োজন আছে। সমাজের পুরাতন ভাবের সঙ্গে বর্ত্তমান আত্মকেন্দ্রিক ভাবের ইহাই পার্থক্য। কেহ কেহ সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের শুষ্ক ও নিষ্ঠুর বলে দোষ দেন কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভুল। সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের অন্তঃকরণ মানবের দুঃখে গলে যায়, তাঁদের কাছে ছোট-বড়র বিচার থাকে না, সব সমান। তাঁরা সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষ।

ধর্মতাত্ত্বিকগণ নীচমনা হয়ে কেবল মৃত্যুর পরপারের কথা চিন্তা করেন। বর্ত্তমান জগতের খাওয়া-পরা ও বাঁচার কথা ভাবেন না। এই কারণে বলা হয় যে, ধর্মতত্ত্বকে এখন ধামাচাপা রেখে মানুষ যাতে এক মুঠো খেতে পায় ও সমস্ত জাতি যাতে উঠতে পারে সেই চেষ্টা করা দরকার। অধিবিদ্যার বিভাগটি কেবল ধরে রাখা হ'বে এবং অন্য বিভাগ দুটিকে বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হ'বে। ধর্মতত্ত্বকে রাজনীতি ব্যবসা ও সমাজজীবন থেকে দূরে রাখতে হ'বে—যেহেতু ইহা জাতির উন্নতির প্রধান অন্তরায়। ধর্মতাত্ত্বিকগণ নীচমনা হয়ে বৃত্তের ও উপবৃত্তের মধ্যে থেকে ভগবানের প্রতিনিধি বলে নিজেদের মনে করেন তাঁরা বলেন, পবিত্রতার আলোক ও লোচন একমাত্র তাঁরাই আর বাকি সব—অন্ধকার ও চক্ষুহীন, দুই ধর্মতাত্ত্বিকে কখনই মিল হয় না, এবং তাঁরা সর্ব্বদা পরস্পর কলহ করেন, অতএব সামাজিক উন্নতিতে—ধর্মতত্ত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হ'বে—এবং জনসাধারণের খেয়াল চরিতার্থ করবার জন্য পুরাতন কৌতূহলোদ্দীপক রূপে রাখতে হ'বে। বর্ত্তমানে খাদ্যসমস্যাই প্রধান সমস্যা, ধর্মতত্ত্ব নয়।

এবারে ধর্মের আতঙ্কের কথা বলা হবে। ভগবানের নামে জনসাধারণের কাছ থেকে কৌশলে টাকা নেওয়ার ফন্দি ধর্মতাত্ত্বিকদের এক ব্যবসা এবং এটা তারা উত্তরাধিকার সূত্রে করে আসছে। তারা বেশীর ভাগ বোকা লোকদের কাছ থেকেই টাকা ছিনিয়ে নেয় এবং ভীষণ সব গল্প বলে তাদের মনে আতঙ্ক জাগায়। এখন একমাত্র উপায় যে, সমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায় ধর্মের উৎসব ও কার্য্যকলাপ নিষ্পন্ন করার জন্য তাদের নিজেদের লোকবেই শিক্ষিত করা, ধর্মতাত্ত্বিকদের এই বংশপরম্পরাগত ধর্মব্যবসা থেকে বিচ্যুত করা দরকার, নির্ব্বোধ জনসাধারণকে নানা উপায়ে তারা এই ধর্ম বিক্রয় করেন, এটাই ধর্মের স্বেচ্ছাচারিতা কম বেশী ধর্মের এই ব্যবসা এশিয়ায় সর্ব্বত্র চলে, মানুষ যতই বোকা ও অশিক্ষিত থাকে, ধর্মতাত্ত্বিকদের ধর্মব্যবসায় ততই সুবিধা। সেই জন্য জনসাধারণের মধ্য থেকে যুবকদের ধর্মের অনুষ্ঠানের কার্য্যকলাপ শিক্ষা করিয়ে ধর্মতাত্ত্বিকদের বংশপরম্পরাগত একচেটে ব্যবসা উঠিয়ে দিতে হ'বে। এশিয়া ধর্মের এই সেঁকো বিষে জর্জ্জরিত। ধর্মতাত্ত্বিকগণ সমাজের প্রয়োজনীয় ও অবর্জনীয় ক্ষতি। তারা দেশের ঐশ্বর্য্য তো বাড়ান না উপরন্তু শিক্ষা ও খাওয়ার কোন সমস্যা-ও সমাধান করেন না, নারী ও শ্রমিক সমস্যা তাঁদের কাছে অতি অপ্রীতিকর, তাঁদের একমাত্র উত্তর যে, কাল্পনিক দেবদেবীগণই এ মানুষের দুঃখ-কষ্ট একমাত্র দূর করতে পারে। উহাদের কোন-কিছু করবার নেই। তবে ধর্মতাত্ত্বিকদের দান করলে মানুষের মঙ্গল হবে এবং দুঃখকষ্টেরও অবসান হ'বে। মানুষ এই জীবনে অথবা অতীত জীবনে পাপ করেছে তাই তাদের দুর্দ্দশা। নীচমনা এই সমস্ত ধর্মতাত্ত্বিকগণ বর্ত্তমান এই যুগের সামাজিক, শ্রমিক ও খাদ্যসমস্যার কথা কেন বললেন না? পুরাতন ঈজিপ্টের মমির মতন তাঁদের আশ্চর্য্য করে রেখে দেওয়া উচিত, একমাত্র পুরাতন মনোভাব, বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই এই সমস্ত অপদার্থ—ধর্মতাত্ত্বিকদের আঁকড়ে রেখেছেন। সমস্ত ধর্মতাত্ত্বিক সম্প্রদায়কে পরিত্যাগ করা উচিত নয়; তবে সমাজের কোন ব্যাপারে তাদের কোন কথা বলতে দেওয়া উচিত নয়।

হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে খাদ্যসমস্যা যখন সহজ ছিল এবং সামাজিক অবস্থাও যখন অন্য রকম ছিল, তখন উহাদের উল্লিখিত ও ক্ষমতাবিশিষ্ট প্রাচীন পুস্তকগুলি লেখা হয়েছিল। কাজেই বর্ত্তমান এই খাদ্যসমস্যা, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তনের যুগে এই সমস্ত পুস্তকগুলিকে ক্ষমতা দেওয়া যায় কিরূপে?

সমাজ রাষ্ট্র এবং মানুষ এগুলি এক শ্রেণীর নয়, বিভিন্ন প্রকার বস্তু, ভাব এবং আচার-ব্যবহারে গঠিত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ভাবধারাকে সম্মান দেওয়া উচিত কিন্তু বর্ত্তমান যুগে এই সমস্ত প্রাচীন পুস্তকগুলিকে বা শাস্ত্রগুলিকে ক্ষমতাবিশিষ্ট জীবন্ত আজ্ঞারূপে গ্রহণ করা যায় কিরূপে?

সমস্ত এশিয়ার আইনগুলি দেখতে গেলে ধর্মযাজকদের মূলতত্ত্ব বা কর্মনীতি হিসাবে গঠিত। সমস্ত সমাজের যাঁরা কর্ণধার, সেই সমস্ত ধর্মতাত্ত্বিকদের উপকারের ও সুবিধার জন্য আইনগুলি হয়েছে। সমস্ত এশিয়ায় এই একই নীতি ও ভাবধারা দেখা যায়, এই সমস্ত প্রাচীন নিয়মগুলিকে ধর্মতাত্ত্বিকদের নিয়ম বলা হয়। এখানে ধর্মকে প্রধান কেন্দ্র করে সামাজিক উন্নতিকে তুচ্ছ করা হয়। এখন লোকের চোখ খুলেছে এবং আত্মকেন্দ্রিক ভাব এসেছে। প্রত্যেক জিনিষ এখন জনসাধারণের কল্যাণের জন্য হওয়া উচিত—শুধু ধর্মতাত্ত্বিকদের উপকারার্থে নয়, প্রাচীন এই সমস্ত ধর্মতাত্ত্বিকদের আইনগুলি জাতির উন্নতির গতিরোধ করে। সমাজে ধর্মতাত্ত্বিক ভাবকে তুচ্ছ করে আত্মকেন্দ্রিক ভাবকে মূল কেন্দ্র করা উচিত। সমাজের উন্নতি, সমাজের কল্যাণ এবং সমাজের সুবিধাই আত্মকেন্দ্রিক নিয়মের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্তরের আজ এই প্রশ্নই জাতির উন্নতির সব চেয়ে বেশী সাহায্য করবে। ধর্মতাত্ত্বিক নিয়মগুলি লোকের বর্ত্তমান ভাবধারার বিরোধী এবং এইগুলি কোন ব্যক্তির বা জাতির উন্নতির স্বাধীনতা দেয় না, অতএব ধর্মতাত্ত্বিক নিয়মের প্রাচীন পন্থাকে পরিবর্ত্তন করে আত্মকেন্দ্রিক নিয়মগুলিকে লোকের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়ার জন্য স্থান দেওয়া উচিত।

কোন জাতির ধর্মভাব ভিন্ন দেশের লোকের কাছ থেকে নেওয়াকে অনেকেই ভ্রূক্ষেপ করেন না, ইহা অতীব অন্যায়। জাতীয় জীবন, জাতীয় ভাবধারা, জাতীয় ঐতিহ্য সংস্কার ও প্রথাকে সব সময় বজায় রেখে চলা উচিত। এবং বংশগত ভাবধারাগুলিকে জাগিয়ে রাখা উচিত। অন্য জাতির ধর্মভাব গ্রহণ করে তাদের ক্রীতদাস হওয়া কখনই উচিত নয়। বিদেশীর হাত থেকে জাতির সমাজ জীবন রক্ষা ও মুক্তির জন্য জাতীয় জীবন, প্রথা, উৎসব ও বংশগত আইনগুলি পূর্ণভাবে বজায় রাখা উচিত। বিদেশী

ধর্মের কেবল অধিবিদ্যার ভাগটি চিন্তা করা ও গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করে—লোকে তাদের খাওয়া পরা, নাম-ধাম, আচার-ব্যবহার, আদব-কায়দা—এমন কি চুল-দাড়ি পর্য্যন্ত সব বদলে ফেলে; জাতীয় জীবনের ইহা ঠিক যেন এক বৈদেশিক আক্রমণ। বিদেশী ধর্ম গ্রহণ করে জাতি ভাগ হয়ে যায়। জাতির সাবলীল গতি এই ভাবে বিশেষ বাধাপ্রাপ্ত হয়। জাতির অস্তিত্ব, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ সম্পূর্ণ ভাবে বজায় রাখা কর্ত্তব্য। জাতীয় ঐতিহ্য ও পূর্ব্বপুরুষদের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া কখনই উচিত নয়। জাতীয় জীবনকে অপ্রতিহত ভাবে রক্ষা করা সব সময়েই আমাদের কর্ত্তব্য। জাতীয় জীবন ও দৃঢ়তাই আমাদের উদ্দেশ্য। সমাজের চিন্তানায়কগণ ধর্মতন্ত্রকে এইজন্য দোষ দেয়। এবং তাকে কোণঠাসা করতে চেষ্টা করেন। রাজনীতি, ব্যবসায়, সভায় ও শিক্ষায় ধর্মের কোন স্থান থাকা উচিত নয়—যেহেতু ইহা অন্য সম্প্রদায়ের লোককে রূঢ় আঘাত দেয়। বর্ত্তমান যুগ ধর্মের যুগ নয়, আত্মকেন্দ্রিক যুগ। ধর্মতন্ত্রকে প্রয়োজনীয় ও অবজ্ঞনীয় ক্ষতিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। জাতীয়তা প্রথম, তারপর বিদেশের সমাজ, পোষাক, আচার ব্যবহার ও ভাষা।

শাসন পরিচালনা

বিভিন্ন দিক থেকে জাতির উন্নতি করতে হ'লে সমাজের সর্ব্বনিম্ন স্তরের সংস্কার করা প্রয়োজন। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ চিন্তানায়কগণ সমাজের মাথা থেকে সংস্কারের চিন্তা করে থাকেন। ইহাতে জনসাধারণ ও শ্রমিকদের ওপর ধনী ও ধর্মতান্ত্রিকদের জুলুম করার সুবিধা হয়ে যাবে। বর্ত্তমান যুগে ইহা অতি ঘৃণার্হ ও বীভৎস ভাব, দেশের উচ্চস্তর থেকে সংস্কারের আর একটি দিক এই যে মুখে ও কাগজে—রাজ শাসনের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হ'লেও জনসাধারণ, চাষা ও মজুর, যারা গ্রামে বাস করে তারা এই পরিবর্ত্তনের কিছুই জানতে পারে না। রাজকার্য্য পরিচালনার এমন কি সহজে পরিবর্ত্তন হলেও তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। এই অজ্ঞতা দূর করতে হ'লে সর্ব্বনিম্নস্তর হতে সংস্কার করা প্রয়োজন। শ্রমিক ও নারী সমাজের যারা ভিত্তি, তাদের সর্ব্বপ্রথম দেখা উচিত। প্রত্যেক গ্রামে অথবা কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে গণতন্ত্র শাসন প্রবর্ত্তন করা উচিত। অর্থাৎ আমি এই বলতে চাই যে, গ্রামের সৎ সক্ষম লোকদের নিয়ে সেই গ্রামের উন্নতি ও হিতের জন্য একটি শাসন পরিচালনার মন্ত্রণা-সভা করবে। এই সভা গ্রাম্য স্কুল পানীয় জলের সুবিধা, স্বাস্থ্য, হাসপাতাল, রাস্তা এবং সাধারণ লোকের জীবনের অন্যান্য সুবিধাগুলিও দেখবে ও কার্য্যকরী করবে। গণতন্ত্র শাসনের ইহা এক ছোট পরিকল্পনা।

রাজ্যের স্থায়ী সরকারী কর্মচারিগণ তাদের ছোটখাট কাজের দোষে কোন বাধা দেবে না। এই মন্ত্রণা-সভাই তাহার মীমাংসা করবে। কারণ স্থায়ী সরকারি কর্মচারিগণের হস্তক্ষেপে ঐ ছোট গণতন্ত্রশাসন ভেঙ্গে যাবে এবং দেশে স্বেচ্ছাচারী শাসন চলবে।

যাকে বিশ্বাস করা যায় এবং যার ক্ষমতা আছে, এরূপ লোককে মন্ত্রণাসভার সভ্য নির্বাচন করা দরকার। চাষী ও জনমজুররাও যাতে নির্ব্বাচিত হবার সুযোগ পায় সে চেষ্টাও করা দরকার। ধর্মের প্রশ্ন, ছোট-বড়র প্রশ্ন অথবা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন এসব কিছু থাকবে না, কারণ এগুলি জাতির খুব ক্ষতি করে। মানুষের গুণ অনুযায়ী স্বাধীন নির্ব্বাচন হওয়া উচিত। উচ্চঘরে জন্ম, অথবা প্রচুর অর্থ আছে এ সব প্রশ্ন চলবে না। আমি বলতে চাই যে, প্রত্যেক লোকের গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। গ্রাম্য পরিচালনার এই নির্ব্বাচনে পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকেরও সমান অধিকার ও আসন থাকবে, গ্রামের মেয়েদের অগ্রগামী করে রাজকার্য্য পরিচালনায় বিশেষ আসন দিতে হবে। কারণ গ্রাম্য মেয়েদের নির্ব্বাচন হ'তে জোর করে বাদ দিলে গণতন্ত্রের ক্ষতি হ'বে। মন্ত্রণাসভায় দেশের উন্নতির যত কিছু উপায় যত কিছু প্রয়োজন, সমস্ত কিছুই আলোচনা করতে হবে। এই ভাবে গণতন্ত্রের বীজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামেও ছড়াতে হ'বে। বালক-বালিকা, থেকে প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া পর্য্যন্ত সকলেই এই ভাবে জীবনের সব দিকে স্বাধীনতার নিশ্বাস নিতে পারবে। তারা যে স্বাধীন দেশের লোক এটা তারা নিশ্চয়ই জানুক, বুঝুক ও অনুধ্যান করুক। গ্রাম্য সম্পত্তি যে তাদের সাধারণ সম্পত্তি এবং এটা থেকে কেউ যে তাদের বঞ্চিত করতে পারে না, এটাও তারা জানুক ও বুঝুক। আত্মোপলব্ধির ও আত্মপ্রসারণের শক্তি কথায় ও কাজে করে দেশের তারা প্রকৃত বীর হয়ে উঠুক। অতীতের দাসত্ব ও খোসামুদি ভাব যেন মোটেই না থাকে। নতুন জীবন, নতুন উদ্যম, সমাজ পরিচালনা—নতুন চিন্তা ও স্বাধীনতা গ্রামের নির্ব্বাচিত সভ্যদের উদ্দেশ্য হবে। এই ভাবে দেশের মাথা থেকে সংস্কার না করে—তলা থেকে—সংস্কার করা হ'বে। এখন শ্রমিক ও নারীর যুগ,—স্বেচ্ছাচারী, অর্থশালী ও যথেচ্ছাচারীদের যুগ নয়, এই জন্যই আমি একেবারে তলা থেকে গণতন্ত্রের বীজ ছড়াতে বলি।

একটি অথবা কতকগুলি গ্রামের সমষ্টি নিয়ে একটি গণতন্ত্র সাবডিভিসন গঠন হবে। এই সাবডিভিসনের যত সব ভাল কাজ, স্থানীয় গণতন্ত্রের নির্ব্বাচিত সভ্য কর্ত্তৃক পরিচালিত হবে। গ্রামের চাষী-মজুর এমন কি বালক-বালিকাগণও সমাজের এই গণতন্ত্রের শক্তির বশবর্ত্তী হবে।

সাবডিভিসন থেকে জেলায় উঠবে। সমস্ত জেলাটি পরিশেষে সম্পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত হ'বে। যাকে টাউন বা সিটি-ষ্টেট বলে—যেমন গ্রীসে ছিল টাউন রিপাবলিক। এখানে ইহাকে জেলা গণতন্ত্রই বলা হবে। এই জেলা গণতন্ত্রের মন্ত্রণাসভাকে শুধু রাস্তা, খালকাটা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, শিক্ষা, হাসপাতাল,—এই সব দেখলেই চলবে না, দেশের শিল্পোন্নতির উপায়ও নিশ্চয়ই করবে। কারণ লোকের চাকুরী ছাড়া ও দেশের শিল্পছাড়া জেলা কখনও উন্নতি করতে পারে না। জেলা গণতন্ত্রে ব্যাঙ্ক, চেম্বার অফ কমার্স ও ইনডাষ্ট্রি এবং কারখানাও থাকা উচিত, organised ব্যবস্থাপক কুটীরশিল্প ছাড়া জেলা গণতন্ত্র কখনও সম্পূর্ণ গণতন্ত্রে পরিণত হ'তে পারে না। জেলা গণতন্ত্র তাহার প্রয়োজনীয় চাহিদা অন্য জেলা হ'তে পূরণ করবে। আমি বলি যে জেলায় পূর্ণ গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপিত হোক—এবং সেখানে নির্ব্বাচিত সভ্যগণের জেলার জনসাধারণের সুবিধার ও প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তনের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকবে। স্বাধীনতা, মুক্তি ও সকলের

সমান অধিকার—ইহাই উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জেলার কাজে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার।

তারপর কতকগুলি জেলা ও গণতন্ত্র নিয়ে একটি প্রদেশ গঠন হবে, এই প্রদেশ সরকার ও গণতন্ত্রে পরিণত হবে। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির প্রধান কাজ স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদিগের হাতে থাকবে, কিন্তু শাসন পরিচালনার কাজ নির্ব্বাচিত সভ্যগণের উপর থাকবে। অন্য কথায় কার্য্যনির্বাহকগণ নির্বাচিত-সভ্যগণের অধীনে থাকবেন। এই সমস্ত প্রাদেশিক গণতন্ত্র নিয়ে রাজ্য গঠন হবে। যেখানে সমস্ত দেশের চিন্তার উৎস থাকবে। প্রাদেশিক বা জেলার বিষয়গুলি নিজ নিজ গণতন্ত্রের হাতে থাকবে, কেবল মাত্র স্বদেশের ও বিদেশের ব্যাপারগুলি প্রাদেশিক গণতন্ত্রের সমষ্টির ওপর থাকবে, দেশের বা জেলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় স্থায়ী সরকারি কর্মচারীরূপে নিযুক্ত করা হ'বে। আমার মতে আদালতে ও অন্য সরকারী চাকুরীতে মেয়েদের বেশী নিযুক্ত করা প্রয়োজন। কারণ, মেয়েরা অধ্যবসায়ী, মিতব্যয়ী ও স্বচ্ছ মস্তিষ্ক, মেয়েদের পূর্ণ ক্ষমতা, সুযোগ ও সুবিধা দিয়ে দেশে পূর্ণ সভ্যতা আনা উচিত। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রণাসভার আদেশ পালন করবেন মাত্র। মন্ত্রণাসভার সহিত প্রধান মন্ত্রীর মতভেদ হ'লে মন্ত্রণাসভায় রাজ-আজ্ঞা দিতে পারবেন। রাজ্যের প্রধান নায়ক ভোট দ্বারা নির্ব্বাচিত হবেন এবং মন্ত্রণাসভা থেকে ক্ষমতা প্রয়োগের অনুমোদন পাবেন। ইহাকেই দেশের গণতন্ত্র রাজ্য বলে। রাজার ক্ষমতা দেশের মন্ত্রণাসভা পায়, প্রধান কর্মচারী পায় না। যিনি ট্যাক্স দেন তাঁর টাকা কি ভাবে খরচ হয় তাহা জানার অধিকার তাঁর আছে এবং যাঁরা জনসাধারণের টাকা নষ্ট করেন তাঁদের সংযত করার ক্ষমতাও তাঁর আছে, কর্মচারিগণের চেয়ে করদাতাগণ শ্রেষ্ঠ এবং মন্ত্রণাসভায় নারীগণই উপযুক্ত।

আমি আবার বলি যে, কাহারও স্বার্থে ঘা না দিয়ে দেশের সর্ব্বনিম্ন তলা থেকে সংস্কার করে পূর্ণ গণতন্ত্রের ভিত্তি গঠন করা উচিত। বর্ত্তমান যুগে প্রাচীন সেই স্বেচ্ছাচারী যথেচ্ছাচারী, ও ধর্মের গোঁড়ামি ভাব থাকা উচিত নয়। কোন এক নির্দ্দিষ্ট জাতি একা উন্নতি করলে আসলে কোন ফল হয় না। কারণ কোন বিদেশী তাকে ছোঁ মারবার জন্য যখন ব্যগ্র থাকে তখন পার্শ্ববর্ত্তী দেশ উদাসীন থাকে। এই জন্য বলি যে, সমস্ত এশিয়াবাসী একই বংশের অন্তর্ভুক্ত হোক এবং পার্শ্ববর্ত্তী প্রত্যেক দেশ এমন ভাবে বিশ্বাসী ও সততাপূর্ণ হোক—যাতে সে কোন বিদেশীর আক্রমণ হ'তে নিজেরা পরস্পর লোহার বর্মের ন্যায় রক্ষা পেতে পারে। রক্ষার দিক থেকে সৎ ও শক্তিশালী প্রতিবাসী প্রকৃত সম্পত্তি-বিশেষ।

এবারে আমি গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র কি ভাবে গঠন হয়, তার সাধারণ মূলতত্ত্বের কথা বলছি। এশিয়ার তুরস্কের গণতন্ত্র সবচেয়ে নতুন পরিকল্পনা। ইহা এশিয়ার মস্তিষ্ক প্রসূত এবং এশিয়ার পক্ষেই প্রযোজ্য। তুরস্ক গণতন্ত্রে কোন-রকম ধর্মের সাম্প্রদায়িকতা বা দলাদলি নেই। জাতির উন্নতি ও কল্যাণই প্রত্যেক লোকের সেখানে উদ্দেশ্য। বিদেশীর যে কোন পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা অপেক্ষা তুরস্কের গণতন্ত্র ব্যবস্থা তাই শ্রেষ্ঠ, বর্ত্তমানযুগে বিদেশীয় পার্লামেন্ট অলৌকিক নয়, অন্য কথায় ইহাকে একপ্রকার অর্থের শাসন Plutocracy বলে, এশিয়ার যে কোন দেশে এই শাসন ব্যবস্থা ব্যর্থ হ'বে। তুরস্ক ব্যবস্থা সব চেয়ে আধুনিক ও নতুন। ইহা এশিয়ার চিন্তানায়কগণের দ্বারা গঠিত এশিয়ার বিভিন্ন দেশের প্রয়োজনানুসারে—ইহাকে এখন পুনর্গঠন করা উচিত। পুরাতন ভারাক্রান্ত বিদেশীয় পার্লামেন্ট এশিয়ার উপযুক্ত নয়। ইহাকে অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

জাতীয় রাষ্ট্র বা মন্ত্রণাসভায় কোন রকম দলাদলির প্রশ্ন থাকবে না। একমাত্র জাতীয় উন্নতিই ইহার উদ্দেশ্য থাকবে এবং জাতীয় দলই একমাত্র দল থাকবে, কোন রকম রাজনৈতিক দল যারা অন্যায় কার্য্যে দ্বিধা করে না এবং যারা মতভেদজনিত রাজশাসনে হট্টগোল করে—এ সব কিছু থাকবে না, তুরস্কের মন্ত্রণাসভায় একটিমাত্র জাতীয়দল, সেখানে ভারতের বা ইউরোপের মত কোন বিপরীত দল নেই। ইউরোপের পার্লামেন্ট অতি পুরাতন এবং বর্ত্তমানযুগে ইহা প্রযোজ্য নয়, পুরাতন কৌতুক হিসাবে ইহাকে নেওয়া যায় কিন্তু কার্য্যকরী হিসাবে নয়, তুরস্ক পার্লামেন্টের আদর্শ অনুযায়ী আধুনিক এশিয়া তার প্রয়োজনানুসারে প্রতিনিধি নিয়ে নিজস্ব মন্ত্রণাসভা করবে। দলাদলি এবং কাজে বাধা দেয় এমন সদস্য এশিয়ার উপযুক্ত নয়। ইহা পুরাতন কল্পনা, প্রত্যেক নির্ব্বাচিত সদস্যের জাতীয় প্রশ্নই একমাত্র উদ্দেশ্য হবে—দলাদলি নয়।

গণতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র শাসনে এশিয়া কি ভাবে উন্নতি করতে পারে—আমি তার এক সুন্দর নক্সা দিয়েছি। সাধারণ মূলতত্ত্বটি কেউ যেন না ভোলেন যে, এটা এখন শ্রমিক ও নারীর যুগ। ধর্মতান্ত্রিক, অর্থবাদিক বা স্বেচ্ছাচারীর যুগ নয়, এশিয়ার সকল দেশে তুরস্ক ব্যবস্থাটি আদর্শ হওয়া উচিত—যেহেতু ইহা দেশের প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে সুযোগ সুবিধা দেয়। জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে হুমকি দেখানর পুরাতন ভাব এখন হাস্যকর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এশিয়ার প্রত্যেক ছেলে-মেয়ে ভবিষ্যৎ এশিয়ার শক্তিশালী একবংশ ও একজাতি হয়ে, নতুন এশিয়ার নতুন শক্তিতে, নতুন উদ্দীপনায়, নতুন শাসনপদ্ধতিতেও নতুন চিন্তায় জেগে উঠুক—মেতে উঠুক—এই আমার কামনা।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

অনুবাদক : লালবিহারী ঘোষ

হীরা

হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

সমস্ত মণিরত্নের মধ্যে হীরার মূল্য সকলের চেয়ে বেশী কেন? সামান্য এক খণ্ড উজ্জ্বল কাচের মত দেখতে বই তো নয়। আর শুনলে আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এই হীরা প্রকৃত পক্ষে এক টুকরো কার্বণ বা কয়লা মাত্র। ততোধিক আশ্চর্য্যের বিষয়, এই এক খণ্ড কার্বণের সঙ্গে কত সাম্রাজ্যের উত্থান-পতন জড়িত হয়ে আছে। কত ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যা, প্রণয়লীলা, নৃশংসতার কাহিনী যে এক-একটি হীরকখণ্ডের পিছনে আছে, তা শুনলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে!

যাঁরা হীরার অলঙ্কার ব্যবহার করেন তাঁরা কিন্তু এত কথা ভাবেন না। যত রকমের দুর্ভাগ্যই সেই হীরকখণ্ডের সঙ্গে জড়িত থাক না কেন, সেটা পরতে হবেই। পরার সময় কোন কথাই আর মনে উদয় হয় না। এমনই প্রচণ্ড এর আকর্ষণ! বিবাহের যে আংটির মধ্যে সামান্য এক টুকরো হীরা রয়েছে সেটা হয়তো কোন একটা বিখ্যাত এবং বৃহদাকার হীরকের অংশ এবং সেই হীরকখণ্ড নিয়ে হয়ত কত ষড়যন্ত্র এবং গুপ্তহত্যাই না অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু আঙুলে পরবার সময় সে কথা মোটেই মনে উদয় হয় না।

কিন্তু প্রণয়, ষড়যন্ত্র, গুপ্তহত্যার ইতিহাস ছাড়াও আর একটি চাঞ্চল্যকর কাহিনী এই হীরার সঙ্গে জড়িত আছে। সে কাহিনী তার জন্মবৃত্তান্ত। এক খণ্ড কার্বণ কি ভাবে ভূগর্ভের মধ্যে লক্ষ-লক্ষ বৎসরের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে হীরকে পরিণত হয়—সে এক অপূর্ব্ব ইতিহাস! মানুষের সৃষ্টি যেমন আকস্মিক ভাবে কতকগুলি প্রয়োজনীয় উপকরণের সংযোগে এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে সম্ভব হয়েছিল, হীরার সৃষ্টিও হয়েছে সেই রকম আকস্মিক ভাবে এবং লক্ষ লক্ষ বৎসরের বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে।

কোন বিশেষ শ্রেণীর এক প্রকার প্রস্তর লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শে এসে এক প্রকার কৃষ্ণ নীলাভ তরল পদার্থে পরিণত হয় এবং কোন কার্বণ খণ্ড এই তরল পদার্থের সংস্পর্শে প্রচণ্ডতম তাপ ও চাপের সহযোগে স্বচ্ছ পদার্থে পরিণত হয়। এই স্বচ্ছ পদার্থটিই হল হীরক। প্রথম অবস্থায় এর ঔজ্জ্বল্য বিশেষ প্রকাশ পায় না। এর ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পায় যথোচিত সংস্কারের পর। কার্বণ থেকে হীরকের বিবর্ত্তন কালে যে প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজন হয় সে শক্তি আধুনিক কালে অণুবিজ্ঞানের সাহায্যেও উৎপাদন করা সম্ভব নয়।

ভূগর্ভ থেকে হীরক আবিষ্কার করা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি খনি পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং এখানে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই খনি থেকে আধ ক্যারেট হীরা নিষ্কাশন করতে টন টন পাথর খুঁড়তে হয়। অনেক সময় সাড়ে তিন হাজার ফুট পর্য্যন্ত গর্ত্ত কাটার প্রয়োজন হয়। যে পরিমাণ পাথর খুঁড়ে বের করা হয় তার ওজন হয়ত নিষ্কাশিত হীরার চেয়ে ত্রিশ কোটি গুণ বেশী।

সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির কাছাকাছি জায়গায় হীরা পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞরা এক রকম নীলাভ মৃত্তিকা দেখলেই বুঝতে পারেন এখানে হীরা আছে। সেখানে খননকার্য্য আরম্ভ হয়। অনেক সময় এমন হয় যে, বহু পরিশ্রমের পরও কিছুই পাওয়া গেল না আবার পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখণ্ড সেখান থেকে আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়।

— দক্ষিণ-আফ্রিকার প্রিমিয়ার খনির অন্যতম ম্যানেজার ফ্রেডারিক ওয়েলস অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরক-খণ্ড আবিষ্কার করেছিলেন ১৯০৫ সালে। একদিন সন্ধ্যায় খনি পরিদর্শন করার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, কিছু দূরে কাচের মত একটা জিনিষ চকচক্ করছে। প্রথমে তিনি ভাঙ্গা কাচের টুকরো বলেই মনে করেছিলেন কিন্তু কৌতূহল বশে তিনি সেটা কুড়িয়ে নেন। এটা হ'ল পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখণ্ড এবং এর ওজন ৩১০৬ ক্যারেট অর্থাৎ আড়াই পোয়ার মত। কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট টমাস কুলিনানের নামানুসারে এই হীরকখণ্ডের নাম রাখা হয় কুলিনান হীরা। হীরকটি আফ্রিকা থেকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা হলে সেখানে এর মূল্য নিরূপিত হয় সাড়ে সাত কোটি ডলার। অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ কোটি টাকা (বর্ত্তমান হিসেবে)। ওয়েলস সাহেবকে এজন্য দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হয়। ট্রান্সভাল সরকার হীরকটি ক্রয় করেন এবং সপ্তম এডোয়ার্ডের ৬৬তম জন্মদিবসে তাঁকে উপহার দেন।

এখন এত বিরাট আকারের হীরা তো আর ব্যবহার করা যায় না? তাই কুলিনান হীরাকে কেটে পাঁচটা খণ্ড করার ব্যবস্থা হল। জে, এশ্চের নামে এক বিশেষজ্ঞ তিন মাস ধরে পরীক্ষা করার পর হীরকটি কাটবার আয়োজন করলেন। ১৯০৮ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি হীরকখানির উপর একখানা ছুরি রেখে তার ওপর ডাণ্ডা দিয়ে ঘা মারলেন। কুলিনান যেমন ছিল তেমনি রইল ছুরিখানা গেল ভেঙ্গে। এশ্চের ছাড়বার পাত্র নন। তিনি আবার চেষ্টা করলেন এবং তাঁর দ্বিতীয় বারের চেষ্টা সফল হল—যদিও তিনি এই কাজ সমাধা করতে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন। এর মধ্যে চারটি বড় খণ্ড এখনও ইংলণ্ডের রাজাদের মুকুটে শোভা পায়।

যে সব হীরকখণ্ডের পিছনে রোমান্টিক ইতিহাস রয়েছে, তার মধ্যে ভারতের কোহিনূর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। কোহিনূরের ওজন ১০৯ ক্যারেট। এইরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, কোহিনূর যাঁর শিরে শোভা পায় তিনি পৃথিবী শাসন করবেন। শোনা যায়, মোগল সম্রাট সাজাহানের একটি বিরাট হীরকখণ্ড ছিল এবং কোহিনূর নাকি তারই অংশবিশেষ। অন্য মতে বলা হয়, ১৩০৪ সালে ভারতের সুলতান আলাউদ্দীন খিলজী কোহিনূরের অধিকারী ছিলেন। তখন এর মূল্য নিরূপিত হয়েছিল সমগ্র পৃথিবীর দৈনন্দিন খরচের অর্দ্ধেক। এই কোহিনূর পরে মোগল সম্রাটদের হস্তগত হয় এবং বংশ-পরম্পরায় তা অধস্তন পুরুষদের হস্তগত হতে থাকে। শেষে ১৭৩৯ সালে পারস্যের নাদির শা দিল্লী আক্রমণ করার সময় কোহিনূর লুণ্ঠন করেন।

কিন্তু এই হীরার সঙ্গে দুর্ভাগ্য নাদির শাকে অনুসরণ করে। তিনি আততায়ীর হস্তে নিহত হন এবং তাঁহার পুত্রকেও সিংহাসনচ্যুত করা হয়। নাদির শার পুত্র কোহিনূর লুকিয়ে রাখেন এবং তার সন্ধানের জন্য ওমরাহরা তাঁর ওপর অকথ্য অত্যাচার করেন। কিন্তু তবুও তিনি কোহিনূরের সন্ধান দেননি। এই কোহিনূরের জন্যই হউক আর অন্য কারণেই হউক, নাদির শাহের পুত্র সিংহাসন ফিরে পান। তাঁর পৌত্র যখন কোহিনূরের অধিকারী হন তখন আবার কোহিনূর অপহরণের চেষ্টা হয় এবং তিনি তাঁর দুটি চক্ষু হারান।

পরে কোহিনূর পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের হস্তগত হয় এবং তাঁর কাছ থেকে বৃটিশরা ১৮৪৯ সালে এই হীরা ইংলণ্ডে নিয়ে যায়।

রাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এলবার্ট কোহিনূর থেকে ৮০ ক্যারেট হীরা কেটে বাদ দেন। এই কাজ সমাধা করতে ৩৮ দিন সময় লাগে এবং ৪০ হাজার ডলার খরচ হয়। ১৯১১ সালে রাণী মেরী ইহা স্বীয় মুকুটে ধারণ করেন।

ক্যাথরিণ দি গ্রেট যে হীরক ব্যবহার করতেন তার নাম অর্লফ। গ্রেগরী অর্লফ নামে এক 'হতাশ প্রেমিক এক দেবমূর্ত্তির চক্ষুরূপে ব্যবহৃত এই হীরকখণ্ড অপহরণ করে ক্যাথরিণ দি গ্রেটকে উপহার দেয়। শুনা যায়, নেপোলিয়ন যখন মস্কো লুণ্ঠন করেন তখন এই অর্লফ হীরক জনৈক ধর্ম্মযাজকের সমাধির নীচে লুকান ছিল। নেপোলিয়ন সেখানা হস্তগত করবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু উক্ত ধর্ম্মযাজকের প্রেতাত্মার বাধাদানের ফলে তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এক্ষণে এই হীরা সোভিয়েটের সম্পত্তি। হীরকখানির ওজন প্রায় দুই শত ক্যারাট।

রিজেন্ট নামে আর একখানি হীরার কাহিনীও অদ্ভুত! এর ওজন ৪১০ ক্যারাট। জনৈক ভারতীয় ক্রীতদাস কোনও ক্রমে এই হীরার অধিকারী হয়। সে নিজের পা ফুটো করে তার মধ্যে ঐ হীরা নিয়ে পলায়নের চেষ্টা করে। এক বৃটিশ জাহাজের কাপ্তেন তাকে তাঁর জাহাজে উঠিয়ে নেন। তিনি হীরকখানি হস্তগত করেন এবং ঐ ক্রীতদাসকে জাহাজ থেকে সমুদ্রের জলে ফেলে দেন। কিন্তু পরে অনুশোচনা হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করেন।

উইলিয়মের প্রপিতামহ টমাস পিট এক লক্ষ ডলার মূল্যে এই হীরা ক্রয় করেন কিন্তু পরে চুরির দায়ে অভিযুক্ত হন। পরে এই হীরা বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে নেপোলিয়নের হস্তগত হয় এবং তিনি সম্রাট হয়ে তাঁর তরবারির হাতলে হীরাখানি স্থাপন করেন।

আমেরিকার প্রসিদ্ধ হীরকের নাম হোপ অর্থাৎ আশা। ইহা ওয়াশিংটনের মিসেস ইভ্যালিন ওয়ালশ ম্যাকলীনের সম্পত্তি। এই হীরা দিয়ে তিনি একটি হার তৈরী করেছেন এবং অধিকাংশ সময়ই তিনি এই হার পরে থাকেন। এই হীরার বর্ণ নীলাভ এবং এই শ্রেণীর হীরা দুষ্প্রাপ্য। ইহা চতুর্দ্দশ লুইএর সম্পত্তি ছিল। এডোয়ার্ড ম্যাকলীন ১৯১১ সালে তিন লক্ষ ডলার মূল্য দিয়ে এই হীরা ক্রয় করেন। কিংবদন্তী আছে যে, এই হীরা দুর্ভাগ্য আনয়ন করে, কিন্তু তার কোন অকাট্য প্রমাণ নেই।

প্রায় প্রত্যেকটি হীরারই পূর্ব্ব-ইতিহাস আছে এবং অনেক ক্ষেত্রে তা রোমাঞ্চকর! কিন্তু হীরার প্রকৃত আকর্ষণ হ'ল এর সৌন্দর্য্য এবং ঔজ্জ্বল্য। দক্ষতার সঙ্গে হীরা কাটার ওপর এর ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে এবং এই মণির প্রভাব অন্য সকল অলঙ্কারের প্রভাবকে হার মানিয়ে দেয়। অলিভ অয়েল আর হীরকচূর্ণ দিয়ে হীরা পালিশ করলে ঔজ্জ্বল্য খুব বৃদ্ধি পায়।

হীরক সম্বন্ধে একান্ত বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, অলঙ্কারের চেয়ে শিল্পকার্য্যেই এর ব্যবহার বেশী। হীরার ক্ষয় নেই বললেই হয়। একখানি ছোট হীরার মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র তৈরী করে তার মধ্য দিয়ে তিন-চার শো টন তামার তার অর্থাৎ পৃথিবীকে বিশবার জড়িয়ে ফেলার মত দীর্ঘ তার টানা হলেও হীরকখণ্ডটির কোন ক্ষয় পরিলক্ষিত হবে না। ঘর্ষণ বা উত্তাপে কিছুতেই এর বিকৃতি হয় না। শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হীরার মূল্য অপেক্ষাকৃত কম; প্রতি ক্যারাট কুড়ি টাকা থেকে ষাট টাকার মধ্যে। আর অলঙ্কার হিসাবে ব্যবহৃত হীরার মূল্য প্রতি ক্যারাট গড়ে প্রায় পাঁচ হাজার টাকা। হীরার মূল্য অধিক হওয়ার আর একটি কারণ, বৃটিশ ও বেলজিয়ান ব্যবসায়ীদের একটি সঙ্ঘ পৃথিবীর শতকরা ৯৫ ভাগ হীরা কেনা-বেচা নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদেরই খেয়াল-খুশি মত হীরকের দাম নিরূপিত হয়।

রবীন্দ্র সঙ্গীত

কবি স্বয়ং তাঁহার সুরগুরুর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন, "তখন আমার অল্প বয়স, গান গাহিতে আমার কণ্ঠের ক্লান্তি বা বাধামাত্র ছিল না, তখন বাড়িতে দিনের পর দিন, প্রহরের পর প্রহর সঙ্গীতের অবিরল বিগলিত ঝরণা ঝরিয়া তাহার শীকর-বর্ষণে মনের মধ্যে সুরের রামধনুকের রঙ ছড়াইয়া দিতেছে; তখন নব যৌবনের নব নব উদ্যম নূতন নূতন কৌতূহলের পথ ধরিয়া ধাবিত হইতেছে···আমার সেই কুড়ি বছরের বয়সটাতে এমনি করিয়া পদক্ষেপ করিয়াছি। সেদিন এই যে আমার সমস্ত শক্তিকে এমন দুর্দ্দম উৎসাহে দৌড় করাইয়াছিলেন, তাহার সারথি ছিলেন জ্যোতিদাদা।" * * *

"আমাদের পরিবারে শিশুকাল হইতে গানচর্চ্চার মধ্যেই আমরা বাড়িয়া উঠিয়াছি। আমার পক্ষে তাহার একটা সুবিধা এই হইয়াছিল, অতি সহজেই গান আমার সমস্ত প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহার অসুবিধাও ছিল। চেষ্টা করিয়া গান আয়ত্ত করিবার উপযুক্ত অভ্যাস না হওয়াতে শিক্ষা পাকা হয় নাই। সঙ্গীতবিদ্যা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার মধ্যে কোনো অধিকার লাভ করিতে পারি নাই।" * * *

"বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়ীতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ছিলেন সঙ্গীতের আচার্য্য, হিন্দুস্থানী সঙ্গীত কলার তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে সব গান আমার শোনা অভ্যাস ছিল সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাট আপনা আপনি জমে উঠেছিল।" * * *

"তবে মনে পড়ে যে সরলা দিদিও আমার মত এক সময়ে লোরেটো ইস্কুলে যেতেন, কিন্তু কেবল বাজনা শেখবার জন্য, লেখাপড়ার জন্য নয়। আর ফিরে এসে এক একবার দুজনেই তেতলায় ছুটতুম (যে অংশে রবীন্দ্রনাথ থাকতেন) পিয়ানোর কাছে কে আগে পৌঁছবে, কে আগে টুলে ব'সে বাজাবে, সেই চেষ্টায়।" * * *

—রবীন্দ্রনাথ।

যুগপুরুষ

বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

চোদ্দ

সমাজ-জীবনের খরস্রোত (১৮৪১-'৫০)

দুস্তর কর্মজীবনের সামনে যখন ঈশ্বরচন্দ্র এসে দাঁড়ালেন, তখন বাইরের সমাজ-জীবনে বহুমুখী খরস্রোত বইছে। দশ বছর আগে ছাত্রজীবনের প্রারম্ভে, সমাজের যে-চিত্র তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে এ-চিত্রের পার্থক্য অনেক। তখন ডিরোজিওর শিষ্য-ছাত্র ইয়ংবেঙ্গল দলের সামাজিক প্রগতির অত্যুৎসাহ যেমন উদ্দাম, তেমনি উগ্র ও উচ্ছৃঙ্খল ছিল। কাঁচা কিশোর বয়সের প্রথম প্রেরণা চারিদিকের বাঁধ ভেঙে বাইরে সর্বত্র উপচে পড়ছিল। তাই একদিকে কেবল পূর্বপক্ষের 'ভাঙ, ভাঙ' রব, আর একদিকে প্রতিপক্ষের 'হায় হায়, সব গেল' আর্তনাদে মুখর হয়ে উঠেছিল সেদিনের সমাজ। কিশোর বালক ঈশ্বরচন্দ্র বিহ্বল হয়ে সে-দৃশ্য দেখেছিলেন, গোলদীঘির বিদ্যালয় থেকে।

তারপর দীর্ঘ দশ-বারো বছর কেটে গেছে। নদী-প্রবাহের পাললিক স্তরের মতন অনেক মাটি জমেছে মনের গভীরে। সেদিনের নিতান্ত বালকেরা এখন মানুষ হয়েছে। বিচারবুদ্ধি তাদের স্থির, ধীর ও শান্ত হয়েছে। ভাঙনের সঙ্গে যুগপৎ গড়নের আবশ্যকতাও সকলে বোধ করেছেন। ফেনিল আবর্তের পরিবর্তে সমাজের বুকে স্থির খাতবাহী খরস্রোত সঞ্চারিত হয়েছে। বিভিন্ন সভা-সমিতি ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের নানাবিধ সমস্যা লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরা হচ্ছে। সমস্যা সমাধানের পথেরও সন্ধান করছেন সকলে। নানাপথ ও নানামতের সংঘর্ষ চলছে। পথের সন্ধানই বড় কথা। কেবল আলোচনা ও সমালোচনা নয়, আঘাত ও প্রতিঘাত নয়, অথবা কেবল এগিয়ে চলার একটা অন্ধ আবেগসর্বস্ব আগ্রহ বা আকাঙ্খাও নয়। সেই আবেগ ও আকাঙ্খাকে একটা সুচিন্তিত কর্মপন্থার বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই আসল কথা।

উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের সামাজিক জীবনে এই সত্যের উপলব্ধি, বাইরের সমস্ত বিকৃতির মধ্যেও, যত ব্যাপক ও গভীর হয়ে ওঠে, তৃতীয় দশকে ততটা হয়নি। তৃতীয় দশকের আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল আবেগসর্বস্বতা। চতুর্থ দশকে সুচিন্তিত কর্মপন্থার অনুসন্ধানই প্রধান হয়ে উঠল। কেবল কথা নয়, কাজ করার প্রয়োজনও সকলে বোধ করলেন। আবেগ ও আতিশয্যকে সংযত ক'রে, প্রত্যেকটি অনাচার ও ব্যভিচারের বিরুদ্ধে পদে পদে সংগ্রাম ক'রে, প্রত্যক্ষ কর্মপন্থা গ্রহণ ক'রে, সামাজিক লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলাই হ'ল, এই যুগের সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবন-প্রসঙ্গে একথা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন। এইজন্য প্রয়োজন যে, অনেকের ধারণা তাঁর কর্মজীবনের প্রেরণার উৎস তাঁর মাতৃভক্তি এবং তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের উপলব্ধি। একদা ভগবতী দেবী কোন বালিকার বালবৈধব্যের বেদনার কথা তাঁকে বলেছিলেন এবং পণ্ডিত পুত্রকে মনের দুঃখে প্রশ্ন করেছিলেন : "এত শাস্ত্র প'ড়ে পণ্ডিত হয়েছিল ঈশ্বর, কিন্তু তোদের শাস্ত্রে কি এমন বিধান কোথাও নেই যাতে বালবৈধব্যের এই যন্ত্রণা থেকে হতভাগিনীদের মুক্তি দেওয়া যেতে পারে?" মাতৃভক্ত ঈশ্বরচন্দ্র সেইদিন থেকে শাস্ত্র ঘেঁটে, বিধবাবিবাহের সমর্থনে, শ্লোক খুঁজতে আরম্ভ করলেন। আন্দোলনের প্রেরণাও তিনি এইভাবে পেলেন। এইরকম আরও অনেক 'কাহিনী' আছে, যা সত্য নয়। সত্য হলেও, যা দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের সামাজিক আন্দোলনের ঐতিহাসিক তাৎপর্য, অথবা তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র, কোনটাই বিচার করা যায় না। মাতৃভক্তি, যে কোন ব্যক্তির মতন, ঈশ্বরচন্দ্রেরও ব্যক্তিগত চরিত্রের গুণ। সমাজ-জীবনের কর্মধারার সঙ্গে তার কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। সবচেয়ে বড় কথা, কেবল হৃদয়াবেগের বশীভূত হয়ে কর্মজীবনের কঠোর পথে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী ঈশ্বরচন্দ্র কোনকালেই ছিলেন না। তাই এত বড় মানবপ্রেমিক হয়েও তিনি কোন দিন সেই প্রেম বাইরে লোকচক্ষুর সামনে প্রকাশ বা জাহির করতে চাননি। নির্মম বাস্তবতাবোধ, গভীর সমাজচেতনা, সত্যনিষ্ঠা ও নির্মল যুক্তিবাদিতার অন্তরালে তাঁর হৃদয়াবেগ সবসময় অন্তঃসলিলার মতন প্রবাহিত হ'ত। বাইরের জীবনে তা তরঙ্গায়িত হয়ে উঠত না।

কর্মজীবনের প্রেরণা তো বটেই, তার প্রত্যেকটি নীতি, পন্থা ও পরিকল্পনা পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সমসাময়িক সমাজ-জীবন থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক, আর সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রেই হোক, কোন ক্ষেত্রে কোন আন্দোলনই তিনি কেবল আত্মোপলব্ধির প্রেরণায় করতে প্রবৃত্ত হননি। আরও পরিষ্কার

ক'রে বলা যায়, ব্রাহ্মসমাজ ও ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রগতিশীল আন্দোলনের ধারা থেকেই তিনি কর্মজীবনের প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং বিশেষ কোন দলভুক্ত না হয়েও তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ ক'রে সকলের সহযাত্রী হ'তে পেরেছিলেন। তাঁর নিজের চারিত্রিক সদ্‌গুণাবলী, এই স্বাতন্ত্র্য ও নেতৃত্ব অর্জনে তাঁকে সাহায্য করেছিল।

যে সময় ঈশ্বরচন্দ্র ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারের চাকরি নিয়ে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন, সেই সময় কলকাতার তথা বাংলার সামাজিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ কি রকম ছিল, তা জানা এইজন্যই প্রয়োজন। কি পরিবেশের মধ্যে তিনি ধীরে ধীরে পা ফেলে তাঁর কর্মজীবনের লক্ষ্যের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন, তা না জানলে তাঁর প্রকৃত ঐতিহাসিক ভূমিকার সুবিচার করা সম্ভব নয়।

১৮৪১ থেকে ১৮৫০ সাল পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবনের প্রস্তুতির পর্ব বলা যায়। এর মধ্যে ১৮৪১ সালের ২৯ ডিসেম্বর থেকে ১৮৪৬ সালের ৩ এপ্রিল পর্যন্ত, প্রায় চার বছর চার মাস কাল তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে একটানা সেরেস্তাদারি করেন। তারপর প্রায় এক বছর তিন মাস (৬ এপ্রিল ১৮৪৬—১৬ই জুলাই ১৮৪৭) সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। পরে আবার প্রায় এক বছর নয় মাস (১ মার্চ ১৮৪৯—৪ ডিসেম্বর ১৮৫০) ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষের কাজ করেন। একবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, একবার সংস্কৃত কলেজ, এইভাবে তাঁর প্রথম কর্মজীবন প্রধানতঃ চাকরির টানাটানিতেই কেটে যায়! অবশেষে ১৮৫০ সালের ৫ ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং তার একমাস কয়েকদিন পরেই (১৮৫১, ২২ জানুয়ারি) কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন। তখন তাঁর বয়স একত্রিশ বছর। এই সময় থেকেই তাঁর কর্মজীবনের মধ্যাহ্নের শুরু। মধ্যের একুশ থেকে একত্রিশ বছর পর্যন্ত দশটি মূল্যবান বছর তিনি যে কেবল সরকারী চাকরি ক'রে অপচয় করেছেন, তা নয়। বাইরের বৃহত্তর সমাজের পাঠশালায় তিনি তাঁর কর্মজীবনের শিক্ষানবীশী করেছিলেন। গোলদীঘির কলেজের শিক্ষার তুলনায় এ-শিক্ষার মূল্য বা গুরুত্ব অল্প নয়।

অগ্রগতির কথা বলবার আগে, সমাজের অবনতি ও অধোগতির লক্ষণ ঈশ্বরচন্দ্র যা দেখেছিলেন, তার কথা বলা থাক।

আধুনিক নাগরিক জীবনের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল, অজ্ঞাত-কুলশীলতা (Anonymity)। গ্রাম্যসমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে প্রত্যক্ষ মুখোমুখি পরিচয় থাকে, পরিবারের সঙ্গে পরিবারের যে কুলগত সম্পর্ক থাকে, নাগরিক সমাজে তা থাকে না। একজন নগরবাসী আর একজনের কাছে অজ্ঞাতকুলশীল ছাড়া কিছু নয়। (১) উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে, ঈশ্বরচন্দ্র যখন কলকাতার বৃহত্তর নাগরিক সমাজ-জীবনের সান্নিধ্যলাভ করতে আরম্ভ করেন, তখন তার এই বৈশিষ্ট্যটি বেশ পরিষ্কার ফুটে উঠেছিল। বৃত্তি ও ব্যবসায়ের ধাক্কায় গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে, সকলে তাদের বংশপরিচয় ও আত্মপরিচয় হারিয়ে ফেলত। একই অঞ্চলের লোক এক পাড়ায় বসবাস করলে হয়ত পরস্পরকে চিনত জানত, তা না হ'লে চেনা-জানার কোন সুযোগই হ'ত না! ঈশ্বরচন্দ্র যখন বহুবাজারে বাস ক'রে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকরি করতেন, তখন দু' একজন ঘাটালবাসী ছাড়া, তাঁর পাড়ার লোকে কেউ তাঁকে চিনত না। চেনবার মতন স্বনামধন্যও তিনি তখন হননি। যখন হয়েছিলেন তখনও খুব বেশি লোক তাঁকে চিনত জানত ব'লে মনে হয় না। হয়ত নামে জানত, আজও যেমন আমরা বহু স্বনামধন্য ব্যক্তিকে কেবল নামে জানি, তেমনি। সংবাদপত্রে বা সাময়িকপত্রে তখন ফটোগ্রাফও ছাপা হ'ত না, সুতরাং স্বনামধন্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গেও সাধারণ শহরবাসীর কোন রকম পরিচয় হবার সুযোগ হয়নি কোনদিন। অজ্ঞাতকুলশীলের সাধারণ শহুরে সমাজে অজ্ঞাত অবস্থাতেই তিনি যেমন ছাত্রজীবন কাটিয়েছেন, তেমনি কর্মজীবনও আরম্ভ করেছেন। শহরের নতুন ধনিক বণিক অভিজাত-সমাজে তাঁর কোন স্থান ছিল না। কুলকৌলিন্যের বদলে নতুন যুগের বিত্তকৌলিন্যও তিনি অর্জন করেননি। সবদিক দিয়েই তিনি ছিলেন অজ্ঞাতকুলশীল, শহরের অধিকাংশ সাধারণ মানুষের মতন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার যে তিনি, একথাও শহরের দু'চার দশ জন ছাড়া কেউ জানত না।

বহুবাজারের পথ দিয়ে লালদীঘির কলেজে যখন তিনি যাতায়াত করতেন, তখন হয়ত উড়িয়াপাড়া লেনের (বর্তমানে রমানাথ কবিরাজ লেন) শ্রীনাথ বিশ্বাসের মতন দু'জন প্রতিবেশী তাঁর দিকে আঙুল দেখিয়ে বলতেন: "বাঁড়ুজ্জের পো যাচ্ছে, আমাদের পাশের গাঁয়ের গরীব মানুষের ছেলে। লেখাপড়া শিখে কেমন বিদ্বান হয়েছে। সাহেবদের কলেজে পণ্ডিতের চাকরি পেয়েছে।" ক্ষীরসিংহের পাশের গ্রাম উদয়গঞ্জে শ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ী। ঈশ্বরচন্দ্রের সমসাময়িক তিনি এবং প্রায় একই সময়ে তিনি কলকাতায় এসে জেলিয়াপাড়ায় বসবাস করেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত পরিচয়ও ছিল! মৎস্য ব্যবসায়ী হলেও, শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল এবং প্রায়ই তিনি তাঁর ছেলেদের কাছে ঈশ্বরচন্দ্রের কথা বলতেন। শিক্ষাই যে মানুষকে এবং একটা জাতিকে বড় ক'রে তোলে, সামাজিক মর্যাদা দান করে, একথা তিনি সর্বদাই স্বজাতীয় ও স্বপরিবারের লোকজনদের বুঝাবার চেষ্টা করতেন। ঈশ্বরচন্দ্রই ছিলেন তাঁর আদর্শ দৃষ্টান্ত। (ক)

স্বগ্রামবাসী প্রতিবেশী শ্রীনাথ বিশ্বাসের মতন দু'চারজন

---

(১) Sorokin and Zimmerman; Principles of Rural-Urban Sociology (N. Y. 1929) P. P. 44-51

(ক) কলিকাতা কৈবর্ত সমিতির সভাপতি, খ্যাতনামা পাঁচালি-গায়ক জেলিয়াপাড়া নিবাসী শ্রীযতীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের পিতামহ শ্রীনাথচন্দ্র বিশ্বাস। যতীশবাবুর মুখে একথা শুনেছি। —লেখক

ছাড়া, বহুবাজার পাড়ার খুব বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকার কথা নয়। বহুবাজারে ব্যবসায়ীদেরই বাস ছিল বেশি, সুতরাং পরিচয় হবার সুযোগও ছিল না। হৃদয়রাম ব্যানার্জির বাড়ীর একাংশ তিনি ভাড়া নিয়ে থাকতেন এবং তাঁর পৌত্র রাজকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়েছিল তিনি তাঁকে সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন, একথা আগে বলেছি। (খ) সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পিতা তালতলাবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন তাঁর গৃহে ইংরেজী ও সংস্কৃত শিক্ষার ব্যাপারে যাতায়াত করতেন। এর বেশি লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকলেও, প্রাত্যহিক যোগাযোগ বিশেষ ছিল না। কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়ানো, নিজে ইংরেজী শেখা, এবং অন্তদের সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া, এই ছিল তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রধান কাজ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে শিক্ষার সমস্যা সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন তাঁর মনে জাগত, সমাজ সম্বন্ধেও অনেক কথা তিনি চিন্তা করতেন। চিন্তা করবার মতন বয়সও হয়েছিল তখন এবং সামাজিক জীবনধারায় চিন্তার উপাদানও তখন যথেষ্ট ছিল।

নিস্তরঙ্গ সমাজে ছাত্রজীবনে হঠাৎ যে প্রবল তরঙ্গবিক্ষোভ দেখেছিলেন তিনি, কর্মজীবনের প্রারম্ভে তা অনেকটা সংযত হলেও, একেবারে শান্ত হয়নি। কোন সামাজিক আলোড়নই তা হয় না। চতুর্থ দশকেও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যে সব উচ্ছৃঙ্খলতার লক্ষণ দেখা যেত, তা আগেকার তুলনায় কম উৎকট নয়। রাজনারায়ণ বসু এই সময় হিন্দু কলেজের ছাত্র ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "আমার সহাধ্যায়ীর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বসু, জগদীশনাথ রায়, ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরীশচন্দ্র দেব ও গোবিন্দচন্দ্র দত্ত প্রধান ছিলেন"। সকলেই রাজনারায়ণের সতীর্থ না হলেও, দু'এক ক্লাস উপর-নিচে সকলে একই সময়ে হিন্দু কলেজে পড়তেন। ঈশ্বরচন্দ্রও সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময়, অপরদিকে এঁদের অনেককে হিন্দু কলেজে যাতায়াত করতে দেখেছেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রামমোহনের কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ রায়ও, ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রাবস্থায় ১৮৩১—৩২ সালে, কিছু দিনের জন্য হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন। ছাত্রজীবনে এঁদের কারও সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। একই সীমানার মধ্যে সংলগ্ন বিদ্যালয়ে এঁরা সকলে লেখাপড়া করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন, প্যারীচরণ, কেউই তখন ছাত্রজীবনে ঈশ্বরচন্দ্রকে চিনতেন না, জানতেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র হয়ত হিন্দু কলেজের ছাত্র ধনিক-নন্দনদের কাছে উপেক্ষার পাত্রই ছিলেন। মধুসূদন বা তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মতন ঈশ্বরচন্দ্র ভৃত্যসহ পালকি চ'ড়ে কলেজে যাতায়াত করতেন না। পোশাক-পরিচ্ছদের নূতনত্বে ও পারিপাট্যে মধুসূদনের মতন তিনি সকলের দৃষ্টিও আকর্ষণ করতে পারেননি। সুতরাং কর্মজীবনে যাঁদের সঙ্গে নানাভাবে নানাকাজে তিনি মিলিত হয়েছেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গে ছাত্রজীবনে কাছাকাছি চলাফেরা করেও, তাঁর আলাপ-পরিচয়ের সুযোগ হয়নি। সে-সুযোগ পরে হয়েছিল কর্মজীবনে।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন: "তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান করা সভ্যতার চিহ্ন, উহাতে দোষ নাই। তখনকার কলেজের ছোকরারা মদ্যপায়ী ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্যাসক্ত ছিলেন না। তাঁহাদিগের একপুরুষ পূর্বের যুবকেরা মদ্যপান করিত না—কিন্তু অত্যন্ত বেশ্যাসক্ত ছিল; গাঁজা, চরস খাইত, বুলবুলের লড়াই দেখিত, বাজি রাখিয়া ঘুড়ি উড়াইত ও বাবরি রাখিয়া মস্ত পাড়ওয়ালা ঢাকাই ধুতি পরিত। কলেজের ছোকরারা এই সকল রীতি একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।"(২)

একপুরুষ আগেকার যে ছাত্রদের কথা রাজনারায়ণ বলেছেন, তাঁরা ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের সমসাময়িক হিন্দু কলেজের ছাত্র। দশ-বারো বছরে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের যে পরিবর্তন হয়েছিল, তার আভাষ পাওয়া যায় রাজনারায়ণের উক্তিতে। কিন্তু এ-পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য নয়। চতুর্থ দশকেও, বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রথম যুগে, কলকাতার বাঙালী উচ্চসমাজের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। নৈতিক পরিবেশ যেমন কলুষিত তেমনই ছিল প্রায়। আচার্য কৃষ্ণকমল বয়সে আরও নবীন। ১৮৪০ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৮ সালে সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হন। তাঁর স্মৃতিকথায় তিনি কলকাতার ধনিক সমাজের আচার-ব্যবহারের যে খণ্ড খণ্ড বর্ণনা দিয়ে গিয়েছেন, তা থেকেই বোঝা যায়, তাঁদের মনোভাবের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। অন্ততঃ উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। আচার্য কৃষ্ণকমল বলেছেন যে ইংরেজদের দেখাদেখি বাঙালীরাও তখন আলাদা রেসকোর্স করেছিলেন। ঘোড়দৌড় হ'ত কলকাতার উত্তরাংশে রাজা নরসিংহের বাগানে (পোস্তার রাজা)। তাতে অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না। starter ছিল, jockey ছিল, book-maker ছিল, betting ছিল। ছাতুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর পোষ্যপুত্র মন্মথবাবু, হাটখোলার দত্তবাবুরা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া আনতেন। শরৎবাবু নিজেই jockey হতেন। প্রত্যেক বছর শীতকালে ঘোড়দৌড় হ'ত। ছাতুবাবুর মাঠে হ'ত বুলবুলির লড়াই। এখন যেখানে ছাতুবাবুর বাজার, সেখানে বড় মাঠ ছিল। শীতকালে সেই মাঠে মহা ধুমধামের সঙ্গে বুলবুলির লড়াই

(খ) বহুবাজারনিবাসী শ্রীভোলানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (এঁরই বৃদ্ধপ্রপিতামহ হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়) আমাকে জানিয়েছেন: "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আমার প্রপিতামহ ৺অভয়চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (৺হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠপুত্র) মহাশয়ের সময় আমাদের বাড়ীতে ছিলেন। আমার মেজঠাকুরদাদা ৺রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীর ঠিকানা ৫৩বি, হিদারাম ব্যানার্জি লেন। এই বাড়ীর যে ঘরে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস করিতেন তাহা ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া মেরামত করা হইয়াছে। আমাদের সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতেও বিদ্যাসাগর মহাশয় বাস করিতেন।"

(২) রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত (কলিকাতা ১৩১৫) পৃষ্ঠা ৪২-৪৩।

হ'ত। মাঠের মধ্যে অনেক তাঁবু পড়ত। পোস্তার রাজা দেড়শ এবং ছাতুবাবু দেড়শ trained বুলবুলি আনতেন। দুই দলে লড়াই হ'ত। লড়াইয়ে হেরে গেলে একদলের পাখিরা যখন উড়ে যেত, তখন অন্যদলের লোকেরা 'বো-মারা' ব'লে উল্লাসে চীৎকার ক'রে উঠত।(৩)

গোলদীঘি থেকে তো বটেই, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকেও বিদ্যাসাগর কলকাতার আকাশে সখের বুলবুলিদের বহুবার উড়তে দেখেছেন এবং 'বো-মারার' ধ্বনি শুনেছেন।

বাঙালী সমাজের তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তখনও বিশেষ কিছু হয়নি। কেবল ছাত্র সমাজে নয়, ছাত্রদের অভিভাবক সমাজেও। ১৮৪২ সালে প্রকাশিত "বিদ্যাদর্শন" পত্রিকায় কলকাতার জনৈক বড়লোক এই সময় তাঁর কয়েক দিনের রোজনামচা প্রকাশ করেন। কলকাতার উচ্চসমাজের জীবনধারায় আভাষ এই রোজনামচা থেকে পরিষ্কার পাওয়া যায়:

"গত বৃহস্পতিবার—প্রাতঃকালে বেলা ৯ ঘণ্টার সময়ে নিদ্রাভঙ্গ হইল, ১০॥ ঘণ্টার সময়ে প্রাতঃক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া চা-পান করিলাম, পরে দুই চারিজন বন্ধু আসিলেন তাঁহারদিগের সহিত দুটো খোসগল্প করিয়া স্নান করিলাম, স্নান করিয়া আর কর্ম কি, বেলা যখন ১১॥টা তখন ভোজন করা গেল, ভোজনান্তে যেমন অভ্যাস আছে, কিঞ্চিৎ কাল নিদ্রাগত হইলাম, এবং বেলা যখন দুই প্রহর চারি ঘণ্টা তখন শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্বক দশজন বন্ধুর সহিত তাস খেলা এবং অন্য অন্য প্রকার আমোদ করা গেল, তাহাতে বড়ই উল্লাস হইয়াছিল, পরন্তু সন্ধ্যার পর রাত্রি দশ ঘণ্টাবধি গান বাদ্য করিয়া আহারান্তে স্থানান্তরে গমন করিলাম।

"শুক্রবার—৭ ঘণ্টার সময় বাটী আসিয়া একবার নিদ্রা গেলাম, ১০ টার সময়ে নিদ্রা ভঙ্গ হইল, সে দিন আর চা পান করিতে ইচ্ছা হইল না, স্নানভোজন করিতে দুই প্রহর অতীত হইল, পরে নিদ্রা গিয়া বেলা যখন ৩টা তখন একবার নীলাম দেখিতে গমন করিলাম, আমার চেরেটের জন্য একটা যুড়ি ক্রয় করিতে মানস ছিল, কিন্তু মনোমত প্রাপ্ত হইলাম না, সুতরাং নীলাম পরিত্যাগপূর্বক একবার সুপ্রীম কোর্ট এবং কার ঠাকুরের হৌস দেখিয়া বাটী আসিলাম, বস্ত্র ত্যাগ করিয়া জল পান করিলে আমি, হরিবাবু এবং শ্যামবাবু একত্র হইয়া বাগানে গমন করিলাম, সেদিন আর বাটী আসা হইল না, রাত্রি ১০টার সময়ে বাগান হইতে অমনি স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলাম।

"শনিবার—শুক্রবার কোন বিষয় উপলক্ষে অধিক রাত্রি জাগরণ প্রযুক্ত স্থানান্তরে অধিক বেলা অবধি নিদ্রা যাইতেছিলাম, পরে দুইজন বন্ধু সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বেলা ১০টার সময়ে আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন, তাঁহারদিগের সহিত অনেক পরিহাসও কথোপকথনপূর্বক স্থির হইল যে খড়দহে রাসযাত্রা দেখিতে যাইব, অনন্তর বাটী আসিয়া স্নান ভোজনান্তে খড়দহে যাত্রা করিলাম, দুইজন...লোকও সঙ্গে ছিল, তাহাতে যেরূপ আমোদ হইয়াছে তাহা বর্ণনা করা যায় না।

"রবিবার—অদ্য বেলা দুই প্রহরের সময়ে বাটী আসিয়াছি, আবার—বাবুর বাগানে নিমন্ত্রণ আছে, বৈকালে যাইব, সেখানেও অদ্য রাত্রিতে অত্যন্ত আমোদ হইবে।

কলিকাতা বড়মানুষ"

৬ অগ্রহায়ণ, রবিবার

১৮৪২ সালের (১২৪৮ সন) কথা। 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় এই রোজনামচাটি পত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছিল (৪) নিচে সম্পাদকীয় মন্তব্য ছিল এই: "বড়মানুষ মহাশয় যে সুখের পত্র লিখিয়াছেন, সকলেই তাহা পাঠ করিয়া অনেক আমোদ করিতে পারিবেন, আমরা তাঁহার প্রতি এই মাত্র উক্তি করি যে, তিনি যদি তাঁহার সমুদয় জীবনের এইরূপ বৃত্তান্ত প্রকাশ করেন, তবে জনসমাজে কি প্রকার পরিহাসের পাত্র হইবেন, তাহা বিবেচনা করুন।"

'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা পরিচালনা করতেন অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগরের সমবয়স্ক আর একজন বাঙালী কর্মী ও প্রতিভাবান পুরুষ। কর্মজীবনের অনেক ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যাসাগরের সহযোগী বন্ধু ছিলেন। ১৮৪২ সালে ঈশ্বরচন্দ্র যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারি করছেন, তখন অক্ষয়কুমার কলকাতার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা করছেন। এই সময় টাকীর প্রসন্নকুমার ঘোষের সহযোগিতায় তিনি 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। মাত্র ছয় সংখ্যা 'বিদ্যাদর্শন' প্রকাশিত হয়েছিল। তখনও, মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় নি। তার কিছুদিন পরেই, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সম্পাদনাকালে অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়।

অক্ষয়কুমার তাঁর নিজের পত্রিকায় ১৮৪২ সালে কলকাতার উচ্চসমাজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার যে বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তার সঙ্গে তাঁর নিজের এবং তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনযাত্রার যে পার্থক্য কতখানি, তা বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

"সম্বাদ ভাস্কর" পত্রিকা থেকে এই সময়কার সামাজিক অবস্থার আরও দু' একটি বিবরণ দিচ্ছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই কলকাতা শহরে প্রধানতঃ ধনিকদের উদ্যোগেই বারোয়ারী পুজার প্রচলন হয়। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে এই বারোয়ারী উৎসবের কি চরম বিকৃতি ঘটে, সেই প্রসঙ্গে 'সম্বাদ ভাস্কর' লিখেছেন: (৫)

"বারোএয়ারির উৎপত্তি কি পল্লীগ্রাম কি কলিকাতা সকল স্থানেই সমান, কলিকাতার মধ্যেও অকর্মণ্য অধম লোকেরা বারোএয়ারি ছলে পাড়ায় পাড়ায় বিস্তর অত্যাচার করে, পাড়ার

(৩) পুরাতন প্রসঙ্গ, প্রথম পর্যায় (১৩২০): পৃষ্ঠা ৪।

(৪) বিদ্যাদর্শন, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা (অগ্রহায়ণ ১৭৬৪ শকাব্দ)।

(৫) সম্বাদ ভাস্কর, ১৮৪৪ সাল, ২৭২ সংখ্যা।

মধ্যে দশ বিশ জন একত্র হইয়া চাঁদা ফাঁদিলে সকলকেই সে ফাঁদে পড়িতে হয়, বিশেষতঃ গরীব লোকেরা তাহার মধ্যে না গেলে পল্লীতে বসতি করিতে পারে না। পশুজ্ঞান পাণ্ডারা নানা প্রকারে তাহাদিগের উপর অন্যায় করে, দিন পরিশ্রমি দীন লোকেরদের এই বিশেষ ভয় পাণ্ডাদলের ক্রোধ হইলে স্ত্রীলোকদিগের মানের উপর কলঙ্ক হইবে, অতএব আপনারা দুঃখ পাইয়াও গরীবেরা বারোএয়ারির চাঁদা অগ্রে দেয়, ইহাতে কলিকাতার প্রায় প্রতি পল্লীর দরিদ্র লোকেরদের অতিশয় দুঃখ হইয়াছে, বারোএয়ারি পাণ্ডারা এইরূপে সকলের মাথায় হাত বুলায়, কিন্তু তাহারদিগের কর্ম এই যে দেবদেবীর এক এক প্রতিমূর্তি খাড়া করিয়া তদুপলক্ষে বোতলের ঘাড় ভাঙ্গে, আর···কবির আসরে উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে···"

বারোয়ারির যখন এই অবস্থা তখনও ঈশ্বরচন্দ্র বহুবাজারেই বাস করছেন এবং চাকরি করছেন লালদীঘির কলেজে। বহুবাজারে বাস করেও তাঁকে যে বারোয়ারির কোন উপদ্রব সহ্য করতে হয়নি, তা মনে হয় না। উপদ্রবের চেয়েও বড় কথা হ'ল, নাগরিক সমাজের লক্ষ্যহীন কেন্দ্রচ্যুত জীবনের যে বিকট রূপ তিনি এই বারোয়ারি উৎসবের মধ্যে স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তাতে তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্তে সেরেস্তাদারি করা সম্ভব হয়নি।

সমাজের বড়লোকদের কুৎসিত বিলাস-বৈচিত্রের অন্ত নেই যেন। জনৈক পত্রলেখক 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার উক্ত সংখ্যাতেই লিখেছেন: "···সম্পাদক মহাশয়, লজ্জার কথা কি কহিব গত শনিবার প্রাতে আমি গঙ্গাতীরে ভ্রমণ করিতেছিলাম তাহাতে দেখিলাম মাহেশ হইতে এক বজরা আসিতেছে, ঐ বজরাতে খেমটা নাচ হইতেছিল, তাহাতে আরোহি বাবুরা নর্ত্তকীদিগের নিতম্বের পশ্চাৎ পশ্চাৎ এমত নৃত্য করিলেন তাদৃশ নৃত্য ভদ্র সন্তানেরা করিতে পারেন না···শুক্রবার শেষ রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল, এই জন্য স্ত্রীলোকেরা অতি প্রাতে গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন, বাবুরা ঐ কুলবালাগণকে তাহা দেখাইয়া ত্রিকুল পবিত্র করিলেন···"

আঠারশ' চুয়াল্লিশ সালেও এসব পুরোদমে চলছিল। কেবল কুলবালারা ন'ন, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রকেও গঙ্গাতীরে কলকাতার বজরাবিলাসী বাবুদের এই খেমটানৃত্য দেখতে হয়েছে, কারণ সকাল-সন্ধ্যায় তখন ভ্রমণের অন্যতম স্থান ছিল গঙ্গার তীর।

১৮৪৫ সালে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" কলকাতার সামাজিক অবস্থার চরম বিকৃতির প্রতি ইঙ্গিত করে লেখেন: (৬)

"এই কলিকাতা নগরের প্রতি পল্লীতে এ প্রকার সমূহ ব্যক্তির অধিষ্ঠান আছে, যাহারা ক্রমাগত দলবদ্ধ হইয়া বিবিধ কুকর্মসূচক আমোদেই অজস্র লিপ্ত থাকে।···বিশেষতঃ বালকেরা যখন শাসনকর্তা পিতা-ভ্রাতা প্রভৃতিকে অহরহ দুষ্কর্ম পঙ্কে পতিত হইতে দেখে, তখন আপনারা তৎপথ অবলম্বন করিতে কেন শঙ্কা করিবে? ইহা কি শত স্থানে প্রত্যক্ষ হয় নাই, যে পিতার রক্ষিতাগণিকার গৃহে অতি বালক পুত্রাদি সঙ্গে গমনাগমন করিতেছে? তথায় তাহারা পরিপাটিরূপে লম্পট ব্যবহার শিক্ষা করিয়া বয়স্থ হইলে কণ্টক স্বরূপ যে তাহাদিগের পরিবারের পীড়াদায়ক হইবেক তাহাতে সন্দেহ কি?"

"অধুনা লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে। পল্লীগ্রামস্থ ভদ্র অথচ ধনহীন নবীন যুবারা অনেকে বিষয় কার্যের জন্য কলিকাতায় আগমনপূর্বক অনেক কৌশলে কোন এক স্বচ্ছন্দ ধনির আশ্রয় গ্রহণ করে; তাহাদিগের ভাগ্যবশতঃ যদি সেই বাবু কুচরিত্র এবং লম্পট হয়েন, তবে বিদ্যা, বুদ্ধি, যশ, বীর্য একেবারে তাহাদিগের নষ্ট হয়। তাহারা সেই বাবুর তুষ্টির জন্য তাঁহার প্রিয় কুকর্ম সকলের উৎসাহ প্রদান করিতে থাকে, বরঞ্চ তাহার সম্পাদন জন্য উদ্যোগি এবং নিপুণ হয়, এবং যে সকল ঘৃণিত ও গর্হিত আমোদের আস্বাদন পূর্বে অজ্ঞাত ছিল, তাহাতেও ঐ বাবুর নিকটে সুন্দর রূপে শিক্ষিত হয়।"

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেরেস্তাদার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দেখছিলেন: "অধুনা লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা স্বরূপ কলিকাতা হইয়াছে।" নবযুগের বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা সত্যিই কি আদর্শ জাগৃতিকেন্দ্র হয়ে উঠছে? কত বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে কলকাতায়, নতুন বিদ্বৎ-সমাজও একটা গড়ে উঠেছে। কিন্তু নেতৃস্থানীয় সেই বিদ্বৎ-সমাজ কোন নৈতিক প্রভাব কলকাতার জনসমাজে বিস্তার করতে পারেন নি কেন? বেকন, লক, হিউম, টম পেইনের নতুন দর্শন, নতুন পাশ্চাত্যবিজ্ঞান, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতি কতরকমের সব বিদ্যাই তো দান করা হচ্ছে কলকাতা শহরে, কিন্তু তবু কেন সব বিদ্যার উপরে লম্পটবিদ্যা বড় হয়ে উঠছে? কেন?

লালদীঘির কলেজে সিবিলিয়ান ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে, মধ্যে মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের মনে হত এই পাঠশালার কথা—"লম্পটবিদ্যা শিক্ষার পাঠশালা" কলকাতা শহর এবং তার চেয়ে অনেক বড় পাঠশালা বাংলাদেশের কথা, তার অগণিত শিক্ষার্থীদের কথা। এ পাঠশালায় হবে না। এ পাঠশালা ভেঙে ফেলে আবার নতুন ক'রে পাঠশালা গ'ড়ে তুলতে হবে দেশে।

আধুনিক ধনতান্ত্রিক যুগের আশীর্বাদ থেকে অনেকখানি বঞ্চিত হলেও, কলকাতা শহর তার অভিসম্পাতগুলি থেকে আদৌ বঞ্চিত হয়নি। উপর থেকে তলা পর্যন্ত সমস্ত স্তরের বিলাস-ব্যভিচারের মধ্যেই যে কেবল তা প্রকট হয়ে উঠেছিল তা নয়, নতুন বাণিজ্যনগর কলকাতার বাণিজ্যিক জীবনেও তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ১৮৪৫ ও ১৮৪৬ সালের "সমাচারচন্দ্রিকা" পত্রিকা থেকে তার দৃষ্টান্তস্বরূপ দু' একটি সংবাদ উদ্ধৃত করছি—(৭)

(৬) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা: ৩য় ভাগ, ২৬ সংখ্যা, ১ আশ্বিন ১৭৬৭ শকাব্দ।

(৭) সমাচার চন্দ্রিকা: ২১০৭ সংখ্যা, ২৭ নবেম্বর, ১৮৪৫ সাল।

"। তণ্ডুলে কৃত্রিমতা ।

অবগত হওয়া গেল যে বাজারের মহাজনেরা তণ্ডুল মহার্ঘ হওয়াতে কৃত্রিমতা প্রকাশ করিতেছে তাহার বিশেষ শুনা যাইতেছে যে তণ্ডুলের মহাজনেরা বালামের সহিত সবেদা মিলিত করিয়া আতপ তণ্ডুল কহিয়া তিন টাকা পাঁচ আনা মোণ দরে বিক্রয় করিতেছে ইহাতে আমরা তাহাদিগকে কহিতেছি যে তাহারা উক্ত কৃত্রিমতা ত্যাগ করুক নতুবা মহাবিপদ ঘটিবেক ।"

"। বাঙ্গাল বেঙ্ক চেকে কৃত্রিমতা ।

অবগত হওয়া গেল যে গত ১লা মার্চে বাঙ্গাল বেঙ্কে ২০০০ টাকার একখানি জাল চেক ধরা পড়িয়াছে তাহাতে যে ব্যক্তি ঐ কৃত্রিম কাগজ বদলাই করিতে গিয়াছিল সে তৎক্ষণাৎ পোলীসে প্রেরিত হইল ।"

সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতির এই সংক্রমণ দেখে ঈশ্বরচন্দ্র কেবল শঙ্কিত হয়ে ক্ষান্ত হননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, কর্মজীবনের সুচিন্তিত প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। কেবল উপর থেকে ছেঁটে ফেললে চলবে না, তলা থেকে উপড়ে ফেলতে হবে অনেক কিছু। কেবল শৌখিন শিক্ষার বাইরের চাকচিক্যে সামাজিক সুনীতি ও সুস্থ জীবনের গৌরব অর্জন করা সম্ভব হবে না। কেবল শহরের মুষ্টিমেয় ধনীর-দুলালদের শিক্ষা দিয়ে নতুন সমাজ গ'ড়ে তোলা যাবে না। শিক্ষার নতুন পরিকল্পনা ও ব্যাপক প্রসার প্রয়োজন। সমাজের ব্যাধির গোপন বীজাণুগুলিকে একটি একটি ক'রে প্রকাশ্যে ধ্বংস করা প্রয়োজন।

বাঙালী সমাজের বড় বৈশিষ্ট্য দলাদলি। নতুন শহরে সমাজে এ বৈশিষ্ট্যের বিচিত্র বিকাশ দেখেছিলেন বিদ্যাসাগর। তাঁর ছাত্র-জীবনে "ধর্মসভা", "ব্রাহ্মসভা", "ইয়ংবেঙ্গল" প্রভৃতি দলের যে দলাদলি শুরু হয়েছিল, কর্মজীবনে সেই দলাদলি আরও ডালপালা বিস্তার ক'রে জটিল হয়ে উঠল। দলের মধ্যে উপদলের সৃষ্টি হ'তে লাগল। 'ধর্মসভা'র মধ্যে আশুতোষ দেবের দল, রাধাকান্ত দেবের দল এবং এইরকম আরও অনেক দলের মধ্যে উপদল গজিয়ে উঠল। এইসব দল উপদলের, বিশেষ ক'রে 'ধর্মসভার', সমাজ-জীবনে কতখানি প্রভাব ছিল, তা একজন দলভুক্তের এই পত্রখানি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়: (৮)

"পোষ্টবর শ্রীযুত রাধাকান্ত দেব বাহাদুর মৎপ্রতিপালকেষু। পোষ্য শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্য—সবিনয় নিবেদনমিদং। আমি কিয়ৎকাল শ্রীযুত আশুতোষ দে সরকার বাবুজীর দলেতে ছিলাম এক্ষণে সে-দলের নানাপ্রকার গোলযোগ দেখিয়া সে-দল পরিত্যাগ করিয়া ধর্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম কিমধিকমিতি সন ১২৫০ সাল তারিখ ২৪ কার্তিক—শ্রীজয়চন্দ্র মিত্রস্য।"

"ধর্মভয়ে মহারাজার দলস্থ হইলাম" কথাটি লক্ষণীয়। আশুতোষ দেব মহাশয়ের কাছে লিখিত অনুরূপ আর একখানি আবেদনপত্রের বক্তব্য আরও বেশি ভয়াবহ। পত্রখানি এই: (১)

"পরম পোষ্টবর শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ দেব দলপতি মহাশয় পোষ্টবরেষু।

পোষ্য শ্রীমধুসূদন মিত্রস্য বিনয়পূর্বক নিবেদন মিদং। আমি বহু কালাবধি মহাশয়ের দলস্থ থাকিয়া সামাজিকতা ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, গত বৎসর আমার অজ্ঞাতসারে শ্রীযুত ঘটক সুধাকরের চাতুরীতে শ্যামবাজার নিবাসি শ্রীযুত ভৈরবচন্দ্র সরকারের কন্যার সহিত আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীশ্যামাচরণ মিত্র বাবাজীর দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ হয় তজ্জন্য মহাশয় আমাকে দোষী করিয়া স্বীয় দলে স্থগিত রাখিয়াছেন এক্ষণে যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তপূর্বক উক্ত পুত্রবধূকে আমার অনুমতিক্রমে আমার পুত্র পরিত্যাগ করিলেন, পরে যদ্যপি ঐ পুত্র আমার আজ্ঞানুরূপ না করেন তবে তাহাকে আমি পরিত্যাগ করিব ইহা ধর্মতঃ স্বীকার করিলাম এক্ষণে মহাশয় পূর্ববৎ স্বীয় দলে গ্রহণ করিয়া বিহিত আজ্ঞা করিবেন নিবেদনমিতি ৬ই জ্যৈষ্ঠ ১২৪৯ সাল।

শ্রীমধুসূদন মিত্র। সাং সিমুলিয়া।"

"বেঙ্গল স্পেক্টেটার" পত্রিকা পত্রখানি উদ্ধৃত ক'রে মন্তব্য করেছেন: "এতৎ পত্রাবলোকনে অমারদিগের মনোমধ্যে পত্রলেখক ও আশুতোষ বাবু এবং উক্ত নির্দয় ও নিষ্ঠুর কার্যের সহকারি ব্যক্তিদিগের প্রতি এতাদৃশ অবজ্ঞা ও ক্রোধ উপস্থিত হইয়াছে যে তাহা এস্থলে ব্যক্ত না করিয়া সম্বরণ করিতে পারিলাম না। হিন্দুধর্ম অথবা পৃথিবী মণ্ডলস্থ অন্য কোন ধর্মে উক্তরূপ কার্যের আদেশ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, হায়! দলবৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যে ব্যক্তি পিতা পুত্র ও স্ত্রী পুরুষের বিচ্ছেদের কারণ হয় তাহার কি কখন নিষ্কৃতি হইবে আর যে দুরাত্মা আপন পুত্রকে ধর্মদার পরিত্যাগ করিতে অনুমতি করে ও আশুতোষ বাবুর অনুগ্রহ প্রাপ্তির নিমিত্ত এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত আহার ব্যবহার করণার্থ আপন আত্মজকেও পরিত্যাগ করিতে উদ্যত তাহার কথাই বা কি কহিব···"।

হিন্দুধর্মের রক্ষক ও অভিভাবকরা এইভাবে নিজেদের দল রক্ষার জন্য কোনরকমের অধর্মাচরণ করতে কুণ্ঠিত হতেন না। অথচ এঁরাই ইয়ং বেঙ্গল দলের যুবকদের প্রথাবিরুদ্ধ আচরণে, 'ধর্ম গেল, জাত গেল, সমাজ গেল' ব'লে সব চেয়ে তারস্বরে হল্লা করতেন। সে-হল্লা ছাত্রজীবনেও ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট শুনেছেন। কর্মজীবনে তার আরও বিকৃত কঙ্কালটি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল। টাকার জোর থাকলে, ধর্মও যে হাতের মুঠোয় থাকে, প্রতিদিন ধর্মসভার দলাদলির মধ্যে তিনি তার অজস্র প্রমাণ পেতে থাকলেন। দল ও দলাদলি সম্বন্ধে তাঁর বিভীষিকা বাড়তে লাগল।

পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে দলাদলির আসল রূপটি যেমন ধরা পড়ে, এমন আর কিছুতেই পড়ে না। উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে পত্র-পত্রিকার জোয়ার এসেছিল কলকাতা শহরে। নানা দলের নানা মতের সব পত্র-পত্রিকা। তার মধ্যে একদিকে সাংবাদিকতার নতুন আদর্শধারা যেমন প্রবর্তিত হয়েছিল, তেমনি দলাদলির রুচি-হীনতা ও শালীনতাবোধশূন্যতাও প্রকট হয়ে উঠেছিল। সাংবাদিকতার সুস্থ ধারাটি ছিল ক্ষীণ, দলাদলির বিকৃত ধারাটি ছিল অনেক বেশি প্রবল। ১৮৪৭ সালের 'দুর্জনদমন মহানবমী' পত্রিকা থেকে

---

(৮) সমাচার চন্দ্রিকা: ১১০১ সংখ্যা, ৪ জানুয়ারি, ১৮৪৪ সাল।

(৯) The Bengal Spectator (দ্বিভাষিক পত্রিকা) Vol 1, No 7, September 1, 1842।

এই দলাদলিজনিত সাংবাদিক রুচিবিকৃতির একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি (১০):

"ঈশ্বরের অনন্ত গুণের পার নাই।
ঈশানাদি নানারূপে ব্যাপ্ত সর্ব ঠাঁই।
স্বরূপ জানিল যেই সেই জিত বিশ্ব।
স্বর্গ অপবর্গতুল্য ধনী আর নিঃস্ব।
রক্তশ্বেত পীতকৃষ্ণ চতুর্বর্ণ ধর।
রজস্তম সত্ত্বগুণে যুক্ত চরাচর।
গুণভেদে যে প্রভু কপিল ব্যাস ভৃগু।
গুণযোগে তিনিই যান মগপেশু।
পরতন্ত্র নন যিনি স্বতন্ত্র স্বরূপ।
পরম্পরাসিদ্ধ আছে তাঁর রূপারূপ।
তব ধ্যানে জ্ঞানে জীব যে হয় সংযত।
তত্ত্বমসি মন্ত্রে তারে তরাও সতত।
তোযযোষ তুলাতুল্য মায়ায় বিগতো।
তোমার মায়ায় মুগ্ধ চরাচর হতো।
রসগন্ধ শব্দ স্পর্শ রূপ পঞ্চাকার।
রচনা আশ্চর্য এই অখিল সংসার।
বায়ুপবি তেজাকাশ ভূমি সম্ভবা।
বাঙ্‌মনের অগোচর কিরূপ সম্ভবা।
পেষিরূপ ব্রহ্মাণ্ড প্রসবে লোমকূপে।
পেষণী সমান তুমি মহাকাল রূপে।
রত্নাকর জলশায়ী কভু যোগেশ্বর।
রতিমতি লজ্জারূপা বিশ্বের আকর।
গায়ত্রী প্রণবরূপা রুদ্রাণী শুভগা।
গাথারূপ নিগমের যোগসূত্রে যোগা।
লেখকের সাধ্য কি তোমার গুণ বলে।
লেহন করহ মাধ্বী সংস্রার দলে।
হাবভাব রসগর্ভা শক্তি স্বাধা স্বাহা।
হাল ধরি ভয়ে কাঁপাইলা সর্বসহা।
গীতাবেদ তোমার বর্ণনে অনুরাগী।
গিরীশ অলীয় যোগে সংসার বিরাগী।"

ইংরেজীতে যাকে 'অ্যাক্রস্টিক' (Acrostic) বলে, কবিতাটি হ'ল সেই শ্রেণীর। প্রত্যেক পংক্তির প্রথম বর্ণ একত্র করলে রচয়িতার উদ্দেশ্য বোঝা যায়। উদ্ধৃত কবিতাটিতে দু'টি ক'রে লাইন নিয়ে একটি পংক্তি করা হয়েছে। সেইজন্ত প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম লাইন এবং দ্বিতীয় চতুর্থ ষষ্ঠ লাইন এইভাবে লাইন ধরে প্রথম বর্ণ একত্র করতে হবে। পত্রিকায় সম্পাদকের উদ্দেশ্য 'সংবাদ প্রভাকর' সম্পাদক কবি ঈশ্বর গুপ্তকে গালাগালি দেওয়া। তার নমুনা হ'ল—"ঈ শ্ব র গু প ত তো র বা পে র—" ইত্যাদি। দলাদলির ফলে সাংবাদিকতা রুচিবিকৃতির কোন্ চরম সীমায় নেমেছিল, এই অ্যাক্রস্টিক কবিতাটি তার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত।

দল ও দলাদলির এই শোচনীয় পরিণতি দেখে যে-কোন সুস্থ ব্যক্তির মতন ঈশ্বরচন্দ্রও মনে মনে আতঙ্কিত হয়েছিলেন নিশ্চয়। আধুনিক সমাজে দল গঠন না ক'রে কোন কাজ, বিশেষ ক'রে কোন সামাজিক আন্দোলন যে করা যায় না, একথা তিনি বিলক্ষণ জানতেন। তাই যে-সব দলের নীতি আদর্শ ও কর্মপন্থার সঙ্গে তাঁর নিজের মতামতের ও পথের অনেকটা মিল ছিল, সেই সব দলের সঙ্গে তিনি সব সময় তাঁর কর্মজীবনে যোগাযোগ রক্ষা ক'রে চলেছেন। কিন্তু সে যোগাযোগ প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সম্পর্কের সূত্রে, অথবা কোন নির্দিষ্ট কাজের মাধ্যমে স্থাপিত হ'ত। তত্ত্ববোধিনী সভা, ব্রাহ্মসমাজ, ইয়ং বেঙ্গল প্রভৃতি প্রগতিশীল দলের সঙ্গে তিনি এইভাবে কর্মসূত্রে যোগাযোগ রাখতেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কোন দিন কোন দল গঠন করবার, বা কোন দলভুক্ত হয়ে দলপতিত্ব করবার ইচ্ছা তাঁর হয়নি।

কেন হয়নি? এ-প্রশ্ন তখন অনেকের মনে জেগেছে, আজও জাগে। প্রগতিশীল বা রক্ষণশীল যে দলই হোক, কোন দলেরই দলগত রূপকে তিনি ভাল চোখে দেখতেন না। ছাত্রজীবন থেকে আরম্ভ ক'রে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এ রকম অনেক দলের উত্থান-পতন ও উপদলীয় বিকৃত অবনতি দেখেছেন। তাই হয়ত তাঁর মনে 'দল' সম্বন্ধে বিরাগ ও বিতৃষ্ণা বদ্ধমূল হয়েছিল। কোন ধারণাই 'বদ্ধমূল' থাকা ঠিক নয়। নিরপেক্ষ বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিচার করলে হয়ত তাঁর এই দলবিরুদ্ধ অনমনীয় মনোভাব সম্পূর্ণ সমর্থন করা যায় না। যদি সকল দলের প্রগতিকামী নিঃস্বার্থ কর্মীদের নিয়ে তিনি একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করতে পারতেন, তাহলে বহু দলের মধ্যে আরও একটি দল বাড়ত বটে, কিন্তু তার ফলে হয়ত তাঁর সামাজিক আন্দোলনের রূপই বদলে যেত, তার বেগ ও ব্যাপকতা আরও অনেক গুণে বাড়ত। কিন্তু কি হ'ত আর কি হতে পারত, তা নিয়ে 'গবেষণা' করা বৃথা। যে ধাতু দিয়ে তিনি গড়া ছিলেন, তার ভালমন্দ দোষ-গুণ দুই-ই ছিল। ইস্পাত-তুল্য অনমনীয়তা যেমন তাঁর চরিত্রের বড় গুণ, তেমনি বড় দোষও। একটু নমনীয় হ'লে হয়ত জীবনে তিনি অনেক ব্যর্থতা ও বেদনার আঘাত থেকে মুক্তি পেতেন। কিন্তু নারীর মতন কোমল হৃদয় ছিল যাঁর, তিনি ইস্পাতের মতন মেরুদণ্ড নিয়ে বাংলার মাটিতে কি ক'রে জন্মেছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়।

'দল' তাই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গড়ে তুলতে পারেননি। তিনি একাই একটি 'দল' ছিলেন। যদি কোন দল তিনি গ'ড়ে তুলতেন, তাহলে দু'চার দিনের বেশি সে দলের অস্তিত্ব থাকত না। তাঁর পৌরুষপ্রধান স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় স্বভাব তার বিধিবন্ধন সহ্য করতে পারত না। দল দুদিনেই ভেঙে যেত। বিরোধী কোন মত পথ বা নীতি তিনি শুধু সমর্থন করতেন না যে তা নয়, মুহূর্তের মধ্যে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটত। একবার তাঁর ধারণার পরিবর্তন হলে, সারাজীবনেও তা টলানো বা বদলানো সম্ভব হত না। আত্মবিশ্বাস ও স্বাতন্ত্র্যবোধ যাঁদের মধ্যে এত প্রবল, তাঁরা কখনও কোন দলের গড্ডলিকা-প্রবাহে ভেসে যেতে পারেন না। বিদ্যাসাগরও পারেননি। সমাজ-জীবনের অগ্রগতি ও অধোগতির খরস্রোত তিনি আবক্ষ স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করেছেন, অনুভব করেছেন, কিন্তু কোনদিকেই তৃণখণ্ডের মতন ভেসে যাননি। মধ্যে দাঁড়িয়ে দুদিকের স্রোতকেই সংযত ক'রে, অগ্রগামী ইতিহাসের আসল ধারাটিকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছেন। [ক্রমশঃ।

(১০) দুর্জনদমন মহানবমী, ৬ সংখ্যা, ২২ জুন, ১৮৪৭ সাল।

লর্ড ক্লাইবের পত্র

[ইংরাজকে নবাব সিরাজদ্দৌলার ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। কলিকাতার ইংরাজদিগের সর্ব্বনাশ-সংবাদ মান্দ্রাজে ১৬ই আগষ্টের পূর্ব্বে নীত হয় নাই। এই সংবাদ পাইয়াই মান্দ্রাজের কর্ম্মচারিগণ ক্লাইবকে সেণ্ট ডেভিড হইতে মান্দ্রাজে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সেনানী লরেন্স এ সময় অসুস্থ থাকায় মান্দ্রাজের কর্ত্তৃপক্ষ ক্লাইবকে কলিকাতায় তাঁহাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের জন্য নির্ব্বাচন করেন। কলিকাতার কুঠিতে ইংরাজ-প্রাধান্য সংস্থাপনের জন্য যে পদাতিক দল সংগ্রহ হইল, ক্লাইব তাহার নায়ক হইলেন। নৌসেনানী ওয়াট্‌সন রণতরী সমূহের প্রধান হইয়া বাঙ্গালা অভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইব বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।]

"মুসলমান কর্ত্তৃক কলিকাতা জয় এবং তাহাতে বিশেষ করিয়া কোম্পানীর এবং সাধারণতঃ আমাদের দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখানকার প্রত্যেক অধিবাসীর হৃদয় শোকে ও দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই বর্ব্বরতার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি রণতরী-দলের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি বিবেচনা করি, এই অভিযান কলিকাতা গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হইবে না, কিন্তু যাহাতে চিরকালের জন্য কোম্পানীর স্বত্ব সুরক্ষিত হয়, তাহা করিব। নবাবের সৈন্যের কাছে পরাজয় অপেক্ষা তথাকার জলবায়ুর ভাবনাই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণায় এই অভিযানে সফলতার পক্ষে যদি কোন প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ফরাসীদিগকে চন্দননগরচ্যুত করিয়া কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিব। দেশের প্রতি ও কোম্পানীর প্রতি আমার কি করা কর্ত্তব্য, সে জ্ঞান আমার ভালই আছে। আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পূরণ করিতে আমার পক্ষে কোনরূপ ত্রুটি হইবে না। ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর) আর, ক্লাইব। মান্দ্রাজ ১১ই অক্টোবর ১৭৫৬।"

ক্লাইব এই সময় হইতেই চন্দননগর ধ্বংসের কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করেন।

নৌসেনাপতি ওয়াট্‌সন ও ক্লাইব তাঁহাদিগের জীর্ণ-শীর্ণ ও রুগ্ন সৈন্যগণ সহ ১৫ই ডিসেম্বর ফলতায় উপস্থিত হন। নিজেদের এবং ফলতায় বিপন্ন ইংরাজদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্লাইব অবসন্ন না হইয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত রাজা মাণিকচাঁদকে নিম্নলিখিত মর্ম্মের পত্রখানি প্রেরণ করেন :—

"মান্দ্রাজ হইতে এ দেশে আসিয়া শুনলাম, আপনি ইংরাজ কোম্পানীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব দেখান। এ জন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শুনিলাম, আপনি ইতিপূর্ব্বে কোম্পানীকে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে আপনার সেই সহায়তা আবশ্যক হইয়াছে। আশা করি, আপনি সেই ভাব রাখিবেন। ১৫ই ডিসেম্বর ১৭৫৭।"

[পাঠক, পত্রখানি পাঠ করুন। ৩১ বৎসরের একজন যুবক ধন-জন ও মান্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিরূপ ভাবে পত্র লিখিল! এই পত্র পাঠ করিয়া মাণিকচাঁদের বুদ্ধি ও বিবেচনা অন্তর্হিত হইল—তিনি বুঝিলেন, এ শ্বেতকায়েরা বড় সামান্য জীব নহে। আমা-হেন ব্যক্তিকে যখন এরূপ নায়েবীভাবে পত্র লিখিয়াছে, তখন না জানি তাহারা কত বড় পরাক্রান্ত, কত বড় বুদ্ধিমান জাতি। ক্লাইবের এই পত্র পাইবামাত্র মাণিকচাঁদ সম্মোহিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ মল্লিক নামক তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সদ্ভাবপূর্ণ পত্র সহ ফলতায় প্রেরণ করেন। ক্লাইব কেবল-মাত্র মাণিকচাঁদকে পত্র লিখিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। এখন খোদ নবাবকে যে পত্র লেখেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম দেওয়া গেল।]

"আমার এ দেশে আসিবার কারণ নবাব সালাবৎ জঙ্গ, অনারুদ্দীন খাঁ এবং গভর্ণর পিগটের পত্রে পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। বহু সৈন্যসহ আমি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছি, এ কথাও আপনি নিঃসন্দেহে অবগত হইয়াছেন।

"আপনার নিজের ও দেশের কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত, আপনার রাজ্যে—আপনার লোক কর্ত্তৃক ইংরাজদিগের কুঠি লুণ্ঠিত এবং কোম্পানীর বহু সংখ্যক কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অধিবাসী নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হইয়াছে। এই সকল অত্যাচার, আমার ধারণা, আপনার অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশা করি, অনুষ্ঠাতৃগণকে যথেষ্টরূপে দণ্ডিত করিবেন। আপনার ক্ষমতা ও সাহস বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবগত আছে। দশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে (ভগবানের কৃপায়) বিজয়শ্রী লাভ করায় আমি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস আছে, এ প্রদেশেও ঈশ্বর-কৃপায় সেইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিব। যদি যুদ্ধই একান্ত আবশ্যক হয়, তাহা হইলে কিন্তু আমরা উভয়েই বিজয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হইব না। রণলক্ষ্মী কিরূপ চঞ্চলা, সে বিষয় আপনি একটু চিন্তা করিবেন। এই বিপদ পরিহারে যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোম্পানীর এবং তাহার ভৃত্য ও প্রজাবর্গের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করুন, তাহাদিগের কুঠি ফিরাইয়া দিন এবং তাহাদিগের বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল ক্ষমতা ছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করুন। আপনি এইরূপ সুবিচার করিলে আমাকে অকৃত্রিম বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইবেন এবং আপনারও অনন্তকাল যশঃ ঘোষিত হইবে।

ইহাতে উভয় পক্ষের বহু সহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষিত হইবে, অন্যথা তাহারা বিনা অপরাধে নিহত হইবে। এ বিষয়ে আর কি বেশী বলিব? ১৭ই ডিসেম্বর ১৭৫৭।"

[পাঠক! ক্লাইবের এই নরম-গরম সুরের পত্রখানি একটু ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। ইংরাজের মুরুব্বী অনারুদ্দীন ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও, বুদ্ধিমান ক্লাইব তাহার নাম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।]

জগৎশেঠের চিঠি

[কিলপ্যাট্রিক যে সময়ে হুগলী অঞ্চলে নিরীহ প্রজাকুলের গৃহ দগ্ধ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছিলেন, সে সময় ক্লাইব জগৎশেঠকে মুরুব্বী ধরিয়া নবাবের কৃপাকণা লাভের জন্ম চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ ক্লাইবের পত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিলে ইংরাজদের অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।]

"আপনার পত্র পাইয়া সুখী এবং পত্রের বিষয়ও অবগত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন, নবাবকে আমি যাহা নিবেদন করি, তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন। আপনাদের এবং সাধারণতঃ দেশের কুশলের জন্ম আমাকে চেষ্টা করিতে কহিয়াছেন। আমি ব্যবসায়ী লোক, সম্ভবতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে তিনি বোধ হয় শুনিতে পারেন। আপনারা বড় উল্টা কাজ করিয়াছেন—জোর করিয়া কলিকাতা অধিকার এবং হুগলী গ্রহণ ও ধ্বংস করিয়াছেন। ইহাতে বোধ হয়, যুদ্ধ ব্যতীত আপনার আর কোন মতলব নাই। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে আপনাদের আবেদন নবাবের কাছে উপস্থিত করি? ঝগড়া করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। আপনাদের এরূপ আচরণ বন্ধ করুন; আপনাদের দাবী কি, আমাকে জানান। তাহা হইলে আপনাদের দুঃখ দূর করিবার জন্ম নবাবের উপর আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করিব। আপনারা এ দেশের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন, এ বিষয় নবাব কিরূপে উপেক্ষা করিবেন? এ বিষয় আপনি মনে মনে চিন্তা করিবেন।"

[নবাবের কাছে নিজেদের দুঃখের কথা জানাইবার ইচ্ছা যতদূর থাকুক বা না থাকুক, জগৎশেঠের মনের ভাব জানিবার ইচ্ছা ক্লাইবের অনেক বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। একটা দল গড়িতে না পারিলে ইচ্ছা-অনুরূপ কার্য্য হওয়া সুকঠিন বিবেচনা করিয়া ক্লাইব জগৎশেঠের মন জানিবার জন্ম পত্র লিখিয়াছিলেন।]

লর্ড ক্লাইবের চিঠি

[ক্লাইব প্রথম অবকাশে ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক, ইংরাজদিগের প্রধান সহায় জগৎশেঠকে পত্র লিখিতে বিলম্ব করিলেন না। তিনি জানিতেন, জগৎশেঠের কৃপাকণা না পাইলে ইংরাজ কখনও এ দেশে সূচির অগ্রভাগ-পরিমিত ভূমিতেও অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তাই ক্লাইব অত্যন্ত নম্রতার সহিত জগৎশেঠ মহাতব রায় এবং মহারাজ স্বরূপচাঁদকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একখানি পত্র প্রেরণ করেন।]

"এ দেশে শান্তি এবং কোম্পানীর বাণিজ্য পুনঃস্থাপন জন্ম আপনারা যে লালা রঞ্জিত রায়কে নবাবের সহিত পাঠাইয়াছিলেন, তাহা আমি উমিচাঁদের কাছে অবগত হইয়াছি। তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কোন কার্য্যই করি নাই। উভয় পক্ষ হইতেই সন্ধির কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এ দেশে কোম্পানীর বাণিজ্য পুনঃস্থাপন জন্ম আপনারা যথেষ্ট দয়া দেখাইয়া যে চেষ্টা করিয়াছেন, সে কথা আমি বিলাতের পত্রে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব।"

ওয়াটস্-এর চিঠি

[কলিকাতার নীচে গঙ্গার ধারে এক মাইলের ভিতর যেন নবাব কোন দুর্গ প্রস্তুত না করেন। কথাটা বড় দরকারী, কিন্তু খুব শীঘ্র বেশী জোর দিবার আবশ্যক নাই। সিলেক্ট কমিটিও ওয়াট্‌সকে এইরূপ কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহা ছাড়া শঠশিরোমণি শ্রেষ্ঠী উমিচাঁদ ওয়াট্‌সের সহিত গমন করিলেন। তাঁহার উপদেশ গ্রহণ বা পরিত্যাগ এবং কোম্পানীর স্বার্থের জন্ম ওয়াট্‌স যে কোনও কার্য্য করিবারও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এই পত্রের বলে ওয়াট্‌স ১৭ই তারিখে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। যাইতে না যাইতে ষড়যন্ত্র, ঘুষ, মিথ্যা প্রভৃতি তিনি অবাধে প্রচার করিতে লাগিলেন। বিপ্লবের এই সকলই উপাদান। এই সকল ব্যতীত বিপ্লব সাধিত হয় না। তাই ইংরাজকে স্বার্থসিদ্ধির জন্ম এই সকল বিষয় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ওয়াট্‌স হুগলীর দশ ক্রোশ দূর হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইবকে যে একখানি পত্র লেখেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।]

"উমিচাঁদ হুগলীর ফৌজদার দেওয়ান নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি খবর দিলেন যে, খোজা ওয়াজিদের দেওয়ান শিব বাবু এবং নারায়ণ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র (বা ভাগিনেয়) মথুরমল নবাবের নিকট হইতে ফরাসীদের জন্ম ১ লক্ষ টাকা ও ইংরাজ যদি চন্দননগর আক্রমণ করে, বা ফরাসীরা ইংরাজদিগকে আক্রমণ করে, তাহা হইলে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্ম নবাব নন্দকুমারকে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। নবাবের ধারণা, তাহা হইলে আর দেশে কলহ-বিবাদ থাকিবে না। উমিচাঁদ চন্দননগর শীঘ্র আক্রমণ করিতে কহে। নবাবের বিষয় ভাবিতে হইবে না। হুগলীতে এখন তিন শতের বেশী বন্দুকধারী নাই। আর নন্দকুমারের সহিত সে বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, তিনি কার্য্যে চিরকারিতা অবলম্বন করিবেন। নবাবের নিকট হইতে ফরাসীদের সাহায্য আসিলে, তাহাতে তিনি বাধা প্রদান করিবেন। ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে কেহই কোন পক্ষকে সাহায্য করিবে না। উমিচাঁদ নন্দকুমারের কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে, যদি তিনি মধ্যস্থতা অবলম্বন এবং ফরাসীদের নবাবের সাহায্য-প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ১০।১২ হাজার টাকা উপহার এবং হুগলীর শাসনকার্য্যে থাকিবার পক্ষে চেষ্টা করা যাইবে। আপনি যদি এই উপহার-প্রদানে সম্মত হন, তাহা হইলে এই পত্রবাহককে 'গোলাপফুল' এই কথা বলিয়া পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে নন্দকুমারের সহিত উমিচাঁদের যে বিষয় স্থির হইয়াছে, তাহা সম্পন্ন হইবে। উমিচাঁদের ও আমার এই মত যে, লোকটা যদি বিশ্বস্ত প্রমাণ হয়, তাহা হইলে উপরি-উক্ত টাকা দেওয়া যাইবে। আপনি যদি অন্যরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে 'গোলাপফুল' উল্লেখ না

প্রেরক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। উমিচাঁদ বলে, জগৎশেঠের কাছে ফরাসীরা ১৩ লক্ষ টাকা ঋণী, এ জন্ত আমার বোধ হয় যে, আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে শেঠজীরা ইতস্ততঃ করিবে। উমিচাঁদ বলে, মাণিকচাঁদ ও খোজা ওয়াজিদের ফরাসীদের প্রতি একটু টান আছে। আমার ধারণা, আমার শিবিরে উপস্থিত হইলে এ সকল বিষয়ের বিপর্য্যয় ঘটিবে। অনুগ্রহ করিয়া দ্রুতগামী হরকরা দ্বারা পত্র দিবেন, যদি আপনি উপরি-উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ পত্রবাহকের দ্বারা নন্দকুমারের নিকট হইতে পত্র আদান-প্রদান করিবেন। আপনি ব্যতীত আমি আর কাহারও কাছে এ সকল কথা লিখি নাই, এ বিষয়ে যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবেন। খোজা পেত্রুস ও আমার প্রেরিত দুই জন ভদ্রলোকের কাছে অবগত হইলাম যে, ফরাসীরা তাহাদের সম্পত্তি সকল নৌকা বোঝাই করিয়া চুঁচুড়ায় প্রেরণ করিতেছে—আপনি শূন্যগৃহ দেখিবেন। শুনিলাম, ডেন্সরাও ঐরূপ করিতেছে, আমি এ বিষয় ভাল খবর পাই নাই, আপনি লইবেন। প্রার্থনা করি, আপনি প্রত্যহ আমাকে আমার জ্ঞাতব্য পরামর্শ প্রদান করিবেন। উমিচাঁদ আপনাকে সেলাম জানাইয়াছে।"

[ষড়যন্ত্র-সুনিপুণ ওয়াট্‌স-এর উপযুক্ত বাহন উমিচাঁদ নবাবের কর্ম্মচারিগণকে ঘুষ—ভবিষ্যতের আশা প্রভৃতির প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী বণিকের পক্ষপাতী করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল।]

নবাবের চিঠি

[ফরাসীরা বুঝিয়াছিল যে, ইংরাজ-ফরাসী যুদ্ধ সমুদ্রবক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। তাই তাহারা স্থলপথে নবাবের সহিত মিলিত হইয়া ইংরাজের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হয় নাই। তাহাদের এই ভ্রম বা অতিশয় বুদ্ধির জন্ত তাহাদিগকে ইংরাজ-হস্তে নির্দ্দয়ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। চন্দননগর আক্রমণ জন্ত ইংরাজ ১৮ই গঙ্গা পার হইয়া বরাহনগরের অপর পারে শিবির সংস্থাপন করিল। ফরাসীদের উকীল এ সংবাদ অবগত হইয়াই নবাবকে ইংরাজদের দুরভিপ্রায়ের কথা নিবেদন করিল। নবাব বুঝিলেন, এ সময় ফরাসীকে রক্ষা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উচিত। ফরাসী রক্ষিত হইলে ইংরাজের ক্ষমতার সমতা সম্পাদনের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। তাই নবাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্লাইবকে একখানি পত্র লেখেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।]

"কল্য আমি আপনাকে পত্র লিখিয়াছি, আপনি পাইয়া থাকিবেন। ফরাসীদের পত্রে ও তাহাদের উকীলের মুখে শুনিলাম, সম্প্রতি আপনাদের ৫।৬ খানা জাহাজ আসিয়াছে এবং আরও আসিবার সম্ভাবনা আছে। আমার সহিত আপনারা যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহা কেবল নামমাত্র। বর্ষাকালেই না কি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। এ কিছু বীরোচিত কার্য্য নহে। তাহার কার্য্য ও হৃদয় একরূপ হওয়া উচিত। যদি আপনাদের সন্ধির প্রস্তাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে জাহাজগুলি সমুদ্রে পাঠাইয়া দিন, সন্ধিপত্রানুসারে কার্য্য করুন, আমিও তদনুসারে কার্য্য করিব। একবার শান্তি স্থাপন করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কোন ধর্ম্ম কর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় না। মহারাট্টাদের ঈশ্বর-প্রেরিত পুস্তক নাই, তবুও তাহারা যাহা বলে, তাহা করে; আপনাদের ঈশ্বর-প্রেরিত পুস্তক আছে, যদি কথা অনুসারে কার্য্য না করা হয়, তাহা হইলে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে।"

নবাব ওয়াট্‌সকে এই তারিখে অপর একখানি পত্র লিখিলেন, তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।

"আপনি নিজের হস্তাক্ষর ও শিলমোহর-অঙ্কিত পত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, আপনি এ দেশের শান্তিভঙ্গ করিবেন না। কিন্তু এখন শুনিতেছি, আপনি নাকি চন্দননগর অবরোধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আপনার দেশের বিবাদ আমার দেশে আনা, তাহা এ দেশের আইন-বহির্ভূত। বাদশার রাজ্যে ইউরোপীয়রা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তৈমুরের সময় হইতে এ কথা কেহ শুনে নাই। যদি ফরাসীদের কুঠী অবরোধ করা স্থির করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে অগত্যা ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্ত সৈন্ত প্রেরণ করিতে হইবে।"

[২০শে কুচক্রী ওয়াট্‌স্ অগ্রদ্বীপের কাছে উপস্থিত হইলেন। তিনি যত নবাবের নিকটবর্ত্তী হইলেন, তাঁহার চক্রের প্রসারও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি এরূপ নির্ভীকতার সহিত ঘুষের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন যে, তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নবাব ইহার অণুমাত্র অবগত হইলেও তাহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।]

ওয়াটস্-এর চিঠি

[ওয়াট্‌স নবাবের গুপ্তচর-বিভাগের প্রধান পুরুষকে উৎকোচ-মহিমায় মুগ্ধ করিলেন। পুরুষপ্রবরের নাম রাজারাম, ইহার কাছে ওয়াট্‌স নবাবের হৃদয়ের কথা অবগত হইলেন। প্রাণের মমতা, চামড়ার সুখ-দুঃখের কথা ভুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে না পারিলে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারা যায় না। কার্য্যকুশল ওয়াট্‌স অগ্রদ্বীপের কাছে ২১শে ফেব্রুয়ারী গাছের তলায় দিবা দুই ঘটিকার সময় যে পত্রখানি কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।]

"নবাব কাল উমিচাঁদকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'ইংরাজেরা শুনিলাম, সন্ধি অন্তথা করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।' উমিচাঁদ প্রত্যুত্তরে বলে, 'এ কথা কাহার মুখে শুনিলেন, এবং সন্ধির কোন্ অংশই বা অন্তথা করিয়াছে?' নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গঙ্গার উপর ইউরোপীয়েরা কি পূর্ব্বে কখন যুদ্ধ করিয়াছে? কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি কি তাহার প্রতীকার করেন নাই?' প্রত্যুত্তরে উমিচাঁদ পুনরায় বলিল, 'ইংরাজ খবর পাইয়াছে যে, নবাব ফরাসীদের হুগলী প্রদান, এক লক্ষ টাকা এবং টাকশাল প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আবার বড় উপাধি প্রদান করিবেন, এই কথা শুনিয়া ইংরাজ চিন্তিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে, ফরাসীরা নবাবের এমন কি কাজ করিয়াছে, যাহাতে তাহারা নবাবের এত অনুগ্রহভাজন হইয়াছে? বরং নবাব যখন তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। অপর পক্ষে ইংরাজেরা সাধ্যানুসারে নবাবকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে ও প্রস্তুত আছে। মুসে বুসী কি অভিপ্রায়ে এত অধিক সংখ্যক সৈন্ত লইয়া এ দেশে

আসিতেছেন ? সে বিষয় নবাব একটুও বিবেচনা করেন না, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের কথা।' তার পর উমিচাঁদ নবাবকে বলিল, 'সে প্রায় ৪০ বৎসর ইংরাজের আশ্রয়ে রহিয়াছে, কখন ইংরাজকে চুক্তিভঙ্গ করিতে দেখে নাই।' এ কথা উমিচাঁদ ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিয়াছিল। ইংরাজের মধ্যে কেহ মিথ্যা কহিয়াছে, এ কথা যদি প্রমাণ হয়, তাহা হইলে ইংরাজ তাহার গায়ে থুতু দেয় এবং কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। এ কথা শুনিয়া নবাব এরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে নবাব মীরজাফরকে ফরাসীদের সাহায্যের জন্ত গমন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, একণে তাহা প্রত্যাহার করিলেন। আপনাদিগকে লিখিবার জন্ত নবাব উমিচাঁদকে দিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, হুগলীতে যে সৈন্ত গিয়াছে, তাহা তথায় থাকিবার জন্ত, তাহারা আমাদের কোন অনিষ্ট করিবে না, এ আজ্ঞা তিনি প্রদান করিবেন।

পুঃ—নবাব এ স্থান হইতে অনেক দূরে। আমি গাছের তলায় তাড়াতাড়ি লিখিলাম, যদি কিছু ভুল হইয়া থাকে, ক্ষমা করিবেন।"

[পাঠক ! রাজদ্রোহী উমিচাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখিলেন ? নবাব আশ্রিতরক্ষার জন্ত উদ্যোগ করিতেছেন, পাষণ্ড উমিচাঁদ মধুর মিথ্যা কথায় নবাবকে ভুলাইয়া দিল !]

'কর্জ্জনা'র খেদ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কয়টা মানুষ মেরেছে ?—আমার
ঠেঙাড়ে ও মানস্থরে ?
দুর্নাম মোর রয়েছে ভারত জুড়ে।
ঘোর 'গদ্দান মারী'
কুখ্যাতি তার ভারি,
'মরজা'র সাথে 'ঘর ঘা' মিলয়ে
আজও ছড়া কাটে দূরে।

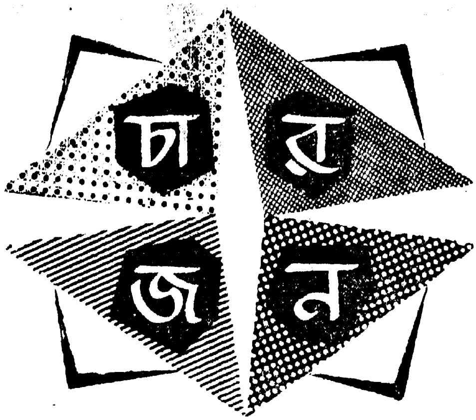
অতীতের দিন চলিয়া গিয়াছে—
বিভীষিকা তার নিয়ে,
মৃত্যুর হার একটু কমেছে কি হে ?
দিনে রেতে দুটি বেলা,
চলে মরণের খেলা,
'লছমন ঝোলা' নহে—যেতে যেতে
গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে।

হায় রে ঠেঙাড়ে, হায় মান্স্যুরে !
কোনখানে তোরা আজ ?
'লরী' 'জীপ' 'বাস' করিছে তোদের কাজ।
বদনাম নাই ক্ষীণ
মারিছে রাত্রি দিন
তোদের জন্ত মুখ দেখাইতে
এখনো আমার লাজ।

নাই বন বট, বিল খাল নাই,
আজ পিচঢালা পথে,
মরণ-কেতন উড়িছে মোটর রথে।
মরিতেছে জলে পুড়ে
নিকটেই—নহে দূরে,
গুণী জ্ঞানী ধনী হতেছে উজাড়
কি হবে ভবিষ্যতে ?

পথে বাহিরিলে সদাই চিন্তা
ফিরিবে কি ফিরিবে না,
মরণের সাথে দিন-রাত লেনা-দেনা।
মসীমসৃণ পথ
একান্ত নিরাপদ,
আপদ বিপদ দল বেঁধে ফেরে
দেখিলে যায় না চেনা !

তখন মানুষ মারিলে—ছাইত
হাহাকার দেশটিকে,
এখন শাস্ত কাগজের পিঠে লিখে।
কি বলিব আর বল্‌
মোর চোখে আসে জল,
জাতির গতিই এখন চলেছে
অপমৃত্যুর দিকে।



শিল্পী যামিনী রায়

বণ্ডেল রোড-এ নেমে সোজা পূর্বদিকে হাটতে শুরু করলাম। প্রায় দশ মিনিট হেঁটে ডিহি-শ্রীরামপুর লেনে পৌঁছানো গেল। বেশ ফাঁকা জায়গা, সবে বসতি গড়ে উঠ:ছে—কয়েক বছর পর এ-সব জায়গার চেহারাই বদলে যাবে।

সদর দরজা দিয়ে উঠে ২।৩টা সিঁড়ি পেরিয়ে বাঁ হাতি প্রথম ঘরটা বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের। কেউ নেই, ঘর খালি, সুন্দর সুন্দর ছবিগুলি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মুগ্ধ হয়ে প্রাণ ভরে দেখতে লাগলাম।

পাশের ঘরগুলা অন্ধকার, তবে দূরের জানালা দিয়ে কিছুটা আলো এসে পড়েছিল। সেই আলো-আঁধারিতে সে ঘরের ছবিগুলা দেখতে বেশ লাগছিল। দুয়ারে টোকা মারলাম। বাচ্চা একটা হিন্দুস্থানী ছোকরা বেরিয়ে এল ; বোঝা গেল এই ছোকরাই শিল্পীর অনুচর। যামিনী বাবুর খোঁজ করাতে সে বসতে বলে চ'লে গেল। একটু পরে যামিনী রায় এসে আমার সামনে হাজির হলেন। বেশ একটু বুড়ো হয়ে পড়েছেন।

যেন একটু কুঁজোও মনে হল। বললেন, 'কে, সুনীলমাধব না?' 'আজ্ঞে' বলে নমস্কার করলাম। 'বেশ বেশ'—পাশটিতে বসে পড়লেন, বললেন, 'অতুল প্রায়ই আপনার কথা বলে তা আর আপনার সাথে দেখাই হয় না। শরীর খারাপ, Low pressure একটু কষ্ট হয়। ১৬।১৭ বৎসর আর বাড়ী থেকে বেরুইনি। মাঝে মাঝে মনে হয় সকলের নিকট গিয়ে দেখা করি। কিন্তু ট্রাম-বাসে চড়তে পারি না। Taxi ক'রে যাওয়াতে বড় খরচ। কোথা থাকা হয়? সেই উত্তর কলকাতাতে? বললাম 'আজ্ঞে হাঁ জগদীশ রায় লেনেই থাকি।' একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'হরি ঘোষ ষ্ট্রীটের জগদীশ রায় লেন? ছোটবেলায় নিমাই বসু লেনে থেকে চৌরঙ্গীর Govt. art School এ পড়তাম, তখন ঐ সব অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতাম। তাই জগদীশ রায় লেন বেশ মনে আছে।' একটু থেমে আবার বললেন, 'এখন কি ছবি আঁকা হচ্ছে?' বললাম, 'ইম্প্রেসেনিজম সাররিয়ালিজম, এই সবই করছি।' বললেন 'তা বেশ, যার যে ভাব ওতে বলবার বা নির্দ্দেশ দেবার কিছু নেই। কারুর উপর কোনো জোর খাটে না। বলে নিজের উপরই জোর নেই, তা আবার অপরকে উপদেশ দেব কি?' মহাপ্রভু বলে গেছেন—

আপনি আচরি ধর্ম্ম—
পরেরে শিখায়।'

ইস্কুলে পড়ে বড় একটা কিছু হয় না। নিজের চেষ্টাই সব, তাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটা বজায় থাকে। এই ত আমার ছেলে পটল আর্টস্কুলে পড়েনি, সে আমার সাথেই কাজ করে। দেড় ঘণ্টায় আমার কেমন পোর্ট্রেট করেছে।' পাশের ঘরে গিয়ে ছেলের আঁকা ছবিটা দেখালেন। চমৎকার হয়েছে।

ঘরের মাঝখানে টাঙানো Vincent van gogh এর একটি প্রতিকৃতি Irving Stone এর dust for life বইটার মলাটে যে ছবিটা আছে তারই অনুকৃতি। জিজ্ঞাসা করলাম 'এটা কে করেছে?' উত্তরে নিজেকে দেখালেন, বললেন, 'খেয়াল মনে হল করি, তাই করলাম।' এই রকম বহু কথাই হ'ল তাঁর সাথে। প্রায়—দেড় ঘণ্টা। উঠলাম, বললাম, 'আজ আসি।' কিন্তু তিনি যেন কি বলবেন মনে হ'ল। আমিও একটু অপেক্ষা করলাম উত্তরের প্রতীক্ষায়, হঠাৎ বললেন, 'তবে শুধু ছবি নিয়ে থাকলেও প্রথমটায় কষ্ট হয় বটে, কিন্তু পরে এ থেকেই খাওয়া-পরার সংস্থান হতে পারে। আমারও খুব কষ্ট গেছলো, কিন্তু ছবি ছাড়া আমার আর কিছু মনে ছিলনা।' আমি বললাম, 'আপনার নিকট আসতে খুব ইচ্ছা হয়।' বললেন, 'তা তো হবেই, আমরা



যামিনী রায়

যে আত্মীয় অর্থাৎ আত্মার ঘনিষ্ঠ। আমরা জাতশিল্পী তাই একই জাত। এতে বামুন, বৈদ্য, কায়স্থ নেই, আমাদের কর্ম্ম এক, আমাদের ধর্ম্ম এক, আমরা এক গোষ্ঠীর। এক আত্মীয়'।

এরই দু'দিন পরে আমি সস্ত্রীক গেলাম, ডিহি-শ্রীরামপুর লেনে। যামিনী রায়ের আঁকা ছবিগুলি দেখতে দেখতে যীশুর "শেষ ভোজনের" ছবিখানির সামনে দাঁড়িয়ে স্ত্রী বললেন, 'এ ছবি কি সুন্দর! দা ভিঞ্চির পদ্ধতি একরকম। কিন্তু এ আর এক প্রকার কি সুন্দর! মনে বড় ছাপ দিয়েছে আমার।' বলতে উনি বললেন, 'যে ভাবের ছবি আঁকছি, সেই ভাবই আসল। আঙ্গিকটা কিছু নয়। যেমন কৃষ্ণলীলা গান কানে একরকম লাগে ও রামলীলার গানের সুর আর একরকম লাগে, দু'খানিই ভক্তিমূলক সেই ভগবানের উদ্দেশে। কিন্তু শোনবার সময়ই শুধু উপলব্ধি হয় দুখানি গান দু'রকমের। ভাল দুটোই লাগে।'

অনেক ছবি। সবগুলি লেখা এইটুকুর মধ্যে সম্ভব নয়। ছবির সামনে আমাদের দেশের সরা ও ইতুভাঁড় ইত্যাদিতে নক্সাগুলি বেশ লাগল। এমন কি মাটীর পিলসুজগুলিতেও সুন্দর নক্সা করা। সেগুলি যেখানটিতে যেমন মানায় সেখানটিতে তেমন রেখে দেওয়া আছে।

পর পর অনেকগুলি ঘর ও বারান্দা ছবি দিয়ে সাজানো। ঘুরে এসে আবার ওই ঘরে বসলাম। উনিও আমাদের সঙ্গে এসে বসলেন। নানান কথা প্রসঙ্গে হঠাৎ তিনি আমার স্ত্রীকে বললেন, 'তুমি তো সুনীলমাধবকে সব সময়ে উৎসাহ ও প্রেরণা দাও এটা বড় ভাল কথা। শিল্পীর সঙ্গে কেউ থাকে না। তারা বড়ই একা। তুমি বিশেষ করে আমাদের দেশের মেয়ে হয়ে শিল্পকে অনাদর করনি, শিল্পীকে চিনতে পেরেছো, এ বড় আনন্দের কথা, তাই করো মা! এ পথ বড় শক্ত, বড় কষ্টের। আমার জীবনে কত কষ্ট গেছে সবই তো শুনেছ।'

বললাম, 'মন আমার সব সময় শিল্পের মধ্যে ডুবে থাকতে চায়।' বললেন, 'তা হবেই তো। আমরা যে সব এক আত্মীয় এ পথে। আস্তে আস্তে ছবি সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। অরুণাকে বললেন, 'তোমাদের বড় ভাল লেগেছে বড় তৃপ্তি পেলাম তোমাদের সঙ্গে কথা কয়ে। সব মানুষের সঙ্গে ঠিক মিল হয় না। ভগবান মানুষ সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু এক একটি মানুষই হচ্ছে এক একটি জগৎ। বড় সুন্দর লাগছিল পরিবেশটা বড় বড় জানালাগুলি দিয়ে ছবিগুলির উপর আলো-আঁধারির জালবোনা, তার ওপরে শিল্পীর মনের দরদ কথা হয়ে ঝরে পড়ছে। বললেন, মানুষ কেন যে পরিষ্কার থাকতে পারে না। আজকাল যা মানুষের জীবনের নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাতে অল্প পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পরিসর, অথচ বৃহত্তম ভাবনার মধ্যে যারা নিজেদের বিলিয়ে দিতে পারবে, তারাই শুধু নিজেকে নয়, দেশকে পর্য্যন্ত উন্নত করতে পারবে। অরুণা বললেন, 'আমরা দুজনেও ঠিক এই জিনিষটি পছন্দ করি। আমার স্বামী শিল্পী। শিল্প তাঁর নেশা, এই নেশার ভাগ তিনি আমায় দিয়েছেন। ঐ নেশায় আমিও ডুবে থাকি। ঘর-সংসার সবের মধ্যেই ঐ জিনিষটির প্রভাব ছড়িয়ে থাকে। ওকে কেন্দ্র করেই আমারও রান্নাবান্না ঘরের কাজ। তাই আপনার কাছে এসে মনে হচ্ছে মনটা যেন খুলে গেল।'

'দৈনন্দিন জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, ঝঞ্ঝাট, ঝামেলা, দুশ্চিন্তা সব কিছুই যদিও সাময়িক ভাবে উত্যক্ত করিয়া তোলে, আবার ডুবে যাই এই নেশায়। এবং আমার এই ডায়েরী আমার বড় প্রিয়, আপনার কাছে আজ আসবার সময় আমার এই প্রিয় জিনিষটি না নিয়ে এসে থাকতে পারলাম না। এটি হচ্ছে আমার সুখ দুঃখের সাথী।'

বললেন, 'কই দেখি? আমাকে একটু পড়ে শোনাও।' খানিকটা পড়ে শোনালেন। ডায়েরীখানা নিয়ে লিখলেন।

শ্রীশ্রীহরি

আর্টস্কুলে ছেলে পড়ে, শুনলে মেয়ের বাপ মুখ বাঁকিয়ে চলে যান। স্বামী ছবি আঁকেন স্ত্রীর সঙ্গে কোন যোগাযোগ নাই ইহাই এদেশের বর্ত্তমান সমাজ। আজ এই শিল্পী-দম্পতীকে দেখে আনন্দ পেলাম।

কতখানি সাহায্য নানারকমে পান শিল্পী সুনীলমাধব, তাঁর স্ত্রী কল্যাণীয়া অরুণার কাছ থেকে। ইতি

শ্রীযামিনী রায়

বললেন, 'যখনই এদিকে আসবে এখানে এসো, বড় শক্ত পথ, মা, এই সাধনার পথ।'

তখন বেলা চড়ে এসেছে।—রৌদ্রবর্ষী সূর্য্য প্রায় আকাশের মাঝামাঝি উঠে এসেছে। পথ চলতে একটু কষ্ট হচ্ছিল। আর বার বার মনে পড়ছিল, শিল্পীর বাণী। "বড় কঠিন পথ। সাধনার পথ।" চিরজীবনের শিল্প-সাধনা আজ সার্থক হয়ে উঠেছে শিল্পীর মধ্যে। আজ দেশে, বিদেশে কত তাঁর নাম খ্যাতি। তাঁর যশঃরশ্মি ঐ সূর্য্যকিরণের মতই ছড়িয়ে গেছে পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে।

ইংরেজ গভর্ণর থেকে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত পর্য্যন্ত তাঁর কুটির-প্রাঙ্গণে এসে মুগ্ধ ভাবে দাঁড়িয়েছে। বহু অর্থের বিনিময়ে তাঁর ছবি কিনে নিজেদের কৃতার্থ মনে করেছে। কিন্তু প্রথম যৌবনে শিল্পী যখন তাঁর পথ বেছে নেন, তখন কি একবারও এত সফলতা আশা করতে পেরেছিলেন? তখন পদে পদে কত বাধা, পদে পদে কত অবহেলা, কত অন্যায় পরিহাস। সমস্ত দুঃখদহন তুচ্ছ করে একাকী পথিক চলেছিলেন আপন আদর্শের সন্ধানে, সাধনার পথে।

শিল্পী অতুল বসুকে যামিনী রায় সম্বন্ধে বলতে বলায় উনি বলছিলেন, প্রথমেই বলি, আমার পাঁচ বছরের ছেলে আমাকে বলেছিল, 'তোমার পাখীর ছবি ঠিক যেন সত্যি পাখী হয়। আর যামিনী বাবুর পাখী ঠিক যেন ছবি হয়।' দীর্ঘ ১৯১৮-১৯ সাল থেকে যামিনীদা'র সঙ্গে পরিচয়। যামিনীদা'র কথা বলতে গেলে কত আর বলব! তখন ডিহি-শ্রীরামপুর বাদাবন ছিল। যামিনীদা' কখনও টাইমটেবল দেখতেন না। সময় সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপ ছিল না। তাই যখন ট্রেনে কোথাও যাবার সময় বলতাম, 'অমুক সময় ট্রেন,' বলতেন, ও সবের কি দরকার? ট্রেনে যখন হোক চড়লেই হ'ল। কোন না কোন সময় তো ছাড়বে, সেজন্য টাইমটেবলের কি দরকার?' দিনের মধ্যে যদি বৃহস্পতিবার হত তো বলতেন, 'তুমি তো সঙ্গে রয়েছ একজন সঙ্গে থাকলে দোষ কেটে যায়। এর পর যামিনী বাবুকে অনুরোধ করায় তিনি

বললেন, 'আমি আর কি বলি, প্রথমেই বলি মানুষের সঙ্গে এই যে মনের আদান-প্রদান আন্তরিকতা, এটাই থেকে যায় আর কিছু থাকে না।'

শ্রীমোহিত মৈত্র, এম, পি

৫৮ বৎসর বয়স্ক স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ মোহিত মৈত্র সম্প্রতি উত্তর-পশ্চিম কলকাতার পার্লামেণ্টারী উপনির্বাচনে জয়লাভ করে এবার বঙ্গ-বিহার একীকরণের আয়োজন ব্যর্থ করেছেন। রাজসাহী (পূর্ব পাকিস্তান) জেলার নাটোরে এক দরিদ্র পরিবারে জন্ম মোহিত বাবুর। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি কলকাতার কলেজে এসে ভর্তি হন এবং তখনকার দিনের নানা রকম রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ফলে লাঞ্ছনাও কম সইতে হয়নি। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন করায় তিনি অক্সফোর্ড মিশন হষ্টেল থেকে বিতাড়িত হন এবং ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় তাঁকে জেল খাটতে হয়। ছাড়া পেয়ে যখন বাইরে বেরুলেন তখন স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা বার করছেন। সত্ত-কলেজত্যাগী মোহিত বাবুকে তিনি ফরওয়ার্ডের টাকে নিয়ে নিলেন। সে আমলে পেশা হিসাবে সাংবাদিকতার দিকে কেউ আকৃষ্ট হতেন না। কারণ মাইনেপত্র হিসাবে তাঁরা যা পেতেন, তাতে হাত খরচও কুলোতো না। সাংবাদিকরা সকলেই ছিলেন আসলে রাজনৈতিক কর্মী এবং সাংবাদিকতা ছিল রাজনৈতিক কর্মেরই অংশ। মোহিত বাবুও সেই ভাবেই সংবাদপত্রের জগতে প্রবেশ করেছিলেন কিন্তু অল্পদিনেই এই পেশার প্রেমে পড়ে গেলেন। 'ফরওয়ার্ড' উঠে যাবার পর তিনি কলকাতার অন্যান্য পত্রিকার বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন। ১৯৪৮ সালে 'নেশন' পত্রিকার সম্পাদনা গ্রহণের ঠিক আগেই তিনি অমৃতবাজারের স্পেশাল অফিসার ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট (বি-এ) শ্রীমোহিত মৈত্রের রাজনৈতিক জীবন সব চেয়ে বেশী প্রভাবিত হয়েছে নেতাজী সুভাষ বসু এবং স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসুর দ্বারা। ফরওয়ার্ডে কাজ করার সময় নেতাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তদবধি ইনি নেতাজীর অনুগামী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিণ্ডিকেটের সদস্য শ্রীমোহিত মৈত্র পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে একজন প্রধান উদ্যোক্তা। ১৯৫১ সালে কলিকাতা কর্পোরেশনে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার জন্য তাঁরই নেতৃত্বে সংযুক্ত নাগরিক সমিতি গঠিত হয় এবং নির্বাচনে ২২টি আসন অধিকার করে। বিগত ট্রামভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় তাঁকে কিছুকাল জেলে থাকতে হয় এবং সেই অবস্থাতেই গ্রাজুয়েটদের ভোটে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমানে মোহিত বাবু ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছেন।

আড্ডারসিক সদালাপী মোহিত বাবুর বড় নেশা চুরুট। অতি আকর্ষণীয়া পত্নী এবং স্কুল-পড়া একটি মাত্র পুত্র নিয়ে তিনি ছোট একটু সংসার পেতেছেন বাগবাজার ষ্ট্রীটের একটি ছোট দোতলা বাড়ীতে। বাইরের ঘর সকাল থেকে চায়ের গন্ধ, তামাকের ধোঁয়া এবং নানা ধরণের লোকের গাল-গল্পে সরগরম হয়ে আছে, মাঝে মাঝে মোহিত বাবুর ভারী গলায় আবৃত্তিও শোনা যায়। ভদ্রলোক ভাল অভিনয়ও করতে পারেন। পড়াশোনার ব্যাপারে মোহিত বাবুর কোন বাছবিচার নেই। তিনি মার্কসবাদী সমাজ-ব্যবস্থার সমর্থক হলেও শ্রীঅরবিন্দের দর্শন সম্বন্ধেও অজ্ঞ নন। বলাই বাহুল্য যে সাময়িক পত্রের মধ্যে তিনি 'মাসিক বসুমতী'কেই সব চেয়ে বেশী পছন্দ করেন। মাসিক বসুমতীর সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘকালের সৌহৃদ্য এবং



শ্রীমোহিত মৈত্র

মোহিত বাবু মনে করেন যে, মাসিক বসুমতীর বর্তমান জনপ্রিয়তার মূলে আছে সম্পাদক প্রাণতোষের অক্লান্ত প্রচেষ্টা। কিছুকাল পূর্ব্বেও মোহিত বাবু অধুনালুপ্ত "নববাণী" সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থাপনায় উক্ত পত্রিকার সম্পাদক প্রাণতোষ ঘটকের সঙ্গে প্রচুর সহযোগিতা করেন।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

[পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল]

পশ্চিমবঙ্গের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব এ শক্তিশালী মানুষটির হস্তেই ন্যস্ত এ রাজ্যের নাগরিকগণ যাতে নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রবে বসবাস ক'রতে পারেন, সে গুরুভারই বহন করে চলেছেন তিনি। এতটুকু ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই—শুধু কাজ, নিরবচ্ছিন্ন কাজই যেন তাঁর জীবনের ধ্যান ও স্বপ্ন এবং সে-কাজও মানুষের সেবা।

সত্যি, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের বর্তমান ইন্সপেক্টর-জেনারেল শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার একনিষ্ঠ কর্ম্মীর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর অসাধারণ কর্ম্মদক্ষতা ও কর্ম্মতৎপরতার পরিচয় আমরা বিশেষ ভাবে পেয়েছি, যেদিন ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে গেল। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগে—বিশেষ করে এ রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা বিভাগে দেখা দিয়েছিল দারুণ বিশৃঙ্খলা। যাবার মুহূর্ত্তে ইংরেজরা বিভাগীয় মূল্যবান নথিপত্র সব ধ্বংস করে গিয়েছিলো বলেই এ অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। তখন জাতীয় সরকার হীরেন্দ্রনাথের উপরই এ বিভাগটি পুনর্গঠনের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং সে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্বের সঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ বিভাগের ভেতর আজ যে শৃঙ্খলা ও কর্ম্মদক্ষতা দেখতে পাওয়া যায়, এটা প্রধানতঃ তাঁরই অবদান।

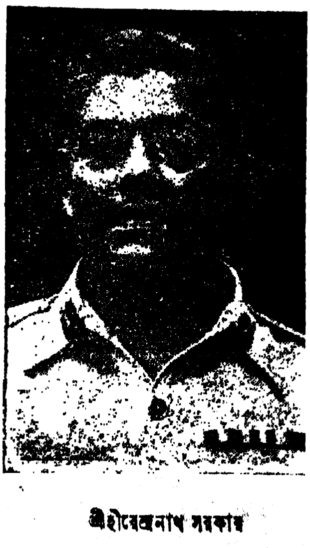
মানুষ হীরেন্দ্রনাথ পুলিশ-প্রধান হীরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাশাপাশি

হ'য়ে কাজ করছেন। দূর থেকে তাঁকে দেখে যথেষ্ট কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু তাঁর ভেতরে একটি দরদী প্রাণ সর্ব্বদা সজাগ, এটা যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন তাঁদের কাছে মোটেই অজানা নয়। ১৯৪৬ সালে ক'লকাতার নারকীয় হত্যাকাণ্ডের দিনে পুলিশ বিভাগের দায়িত্বশীল পদে থেকে সমাজ ও জাতির সেবায় তিনি যে ভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তার তুলনা কোথায়?

পুলিশ বিভাগে তিনি কি ভাবে এসে গেলেন, সেও একটি বিচিত্র ঘটনা। প্রতিভা বুঝি বিকাশের জন্যে এমনই আপন স্থান করে নেয়। শ্রীসরকার তখন আইন পড়ছিলেন। পিতা ডাঃ হীরালাল সরকার চেয়েছিলেন, পুত্র আই-সি-এস অথবা ইণ্ডিয়ান অডিট এণ্ড একাউণ্টস সার্ভিস, অন্তত: বি-সি-এস হন। যুবক হীরেন্দ্রনাথও সেভাবেই নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে সব ওলট-পালট হ'য়ে যায়। তাঁর এক বন্ধু আই, পি'তে প্রতিযোগিতা করছিলেন। সেই বন্ধুর অনুরোধেই তিনিও প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হলেন এবং শুধু অবতীর্ণ হওয়া নয়, সম্পূর্ণ কৃতকার্য্যও হলেন প্রচেষ্টায়।

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শ্রী সরকার জন্মগ্রহণ করেন কুষ্টিয়ায় মাতুলালয়ে। কুষ্টিয়া হাই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি চলে আসেন কলকাতায় এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। উক্ত কলেজ থেকেই ১৯২৫ সালে বি, এ, পরীক্ষায় অঙ্কশাস্ত্রে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ উত্তীর্ণ হন এবং এর পর আইন অধ্যয়ন শেষে তাঁর বৃহত্তর কর্ম্মজীবনের হয় সূত্রপাত। ১৯২৭ সালে আই, পি, পরীক্ষায় প্রতিযোগিতায় জয়যুক্ত হ'য়ে তিনি ১৯২৮ সালের মে মাসে কাজে যোগদান করেন জুনিয়ার পুলিশ অফিসার হিসেবে। বাঙ্গালার বিভিন্ন জিলায় পুলিশের অধিকর্ত্তারূপে তিনি কাজ করেছেন এবং সর্ব্বত্রই রেখে এসেছেন তাঁর নিষ্ঠা ও কর্ম্মশক্তির ছাপ।

কলকাতার আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বশীল পদে অবস্থান, হীরেন্দ্রনাথের কর্ম্মজীবনের একটি বড় অধ্যায়। ১৯৪০ সালে ইংরেজ আমলে তিনি কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের ডিপুটি কমিশনার পদে অধিষ্ঠিত হন। ভারতীয়দের মধ্যে এর পূর্বে আর কেউ এ দায়িত্ববহুল পদে নিযুক্ত হননি। ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত তিনি দক্ষতা ও কৃতিত্বের সঙ্গে এ গুরুভার বহন করেন এবং এ সময় মধ্যে কলকাতার গোয়েন্দা বিভাগটিকে পুনর্গঠিত করেন সুষ্ঠু ভাবে এবং বিভাগীয় কার্য্যের সুবিধার জন্য কয়েকটি নোতুন দপ্তর খোলেন।



শ্রীহীরেন্দ্রনাথ সরকার

গোয়েন্দা বিভাগের কাজে অধিকতর জ্ঞানলাভের জন্য শ্রীসরকার চলে যান বিলেতে ১৯৪৭ সালেই। সেখানে থাকা কালীন তিনি "স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড" ও "হেনডনে" শিক্ষা গ্রহণ করেন। দেশে ফিরে এসে তিনি এ শিক্ষা কাজে লাগিয়েছেন বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে।

স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার তাঁকে আহ্বান করে নিয়ে আসেন ইংলণ্ড থেকে এবং তিনি নিযুক্ত হন পশ্চিমবঙ্গের গোয়েন্দা বিভাগের সর্ব্বাধিনায়করূপে। ১৯৫০ সালে এ রাজ্যের প্রথম ভারতীয় পুলিশের ইন্সপেক্টর-জেনারেল শ্রীসুকুমার গুপ্তের মৃত্যুর পর তিনি এ দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত হন। আজও পর্য্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থেকেই রাজ্যের অধিবাসীদের সেবা করে চলেছেন। যোগ্যতার পুরস্কারস্বরূপ তিনি ইণ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল (১৯৪১), কিংস পুলিশ মেডেল (১৯৪৬) এবং আরও বহু সরকারী মর্য্যাদা লাভ করেছেন এরই ভেতর।

হীরেন্দ্রনাথের জীবনে কতকগুলো বিশেষ হবি রয়েছে, যেমন, মিস্ত্রীর কাজ, বাগান করা, পশু-পক্ষী পালন, মাছ ধরা এবং শিকার। তিনি এ যাবৎ বহু নরখাদক বাঘ শিকার করেছেন আপন বলিষ্ঠ হস্তে। খেলাধূলোর ব্যাপারে তিনি বরাবরই আগ্রহশীল। ছাত্র-জীবনে তিনি ক্রীড়াবিদ্ হিসেবে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করেন। বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকায় আইন ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখে আসছেন তিনি। অপরাধ নিরোধ ও ধরা সম্পর্কে একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তক ইনি প্রকাশ করেছেন, রাজ্য শাসন ক্ষেত্রে যার মূল্য হয়তো কোন দিনই কমবে না।

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

(পশ্চিমবঙ্গ বনৌষধি বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ ও ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্যানের ভূতপূর্ব অধিকর্তা)

মানুষের মতো তরুলতারও প্রাণ আছে, কিন্তু প্রাণ দিয়ে সেই তরুলতাকে ভালোবাসতে পারে এমন মানুষ বোধ করি সংখ্যায় নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু সেই নগণ্য সংখ্যকদের মধ্যেও কচিৎ-কদাচিৎ এমন দু'-একজনের সাক্ষাৎ মেলে, তরুলতার জীবনেতিহাস পর্য্যালোচনাতেই যাঁদের সারাজীবন অতিবাহিত দেখা যায়। বিরল-সংখ্যক এই উদ্ভিদপ্রেমী বিজ্ঞানীদের মধ্যে কালীপদ বিশ্বাসের নাম আজ বিশেষ ভাবে উল্লিখিত হবার যোগ্যতার ভাস্বর।

উদ্ভিদজগতের এই দরদী রূপকার শ্রীকালীপদ বিশ্বাসের জন্ম ১৮৯৯ সালের ৩রা ডিসেম্বর, কলকাতায়। শ্রীযুক্ত বিশ্বাসের ছাত্র-জীবন কৃতিত্বে প্রোজ্জ্বল। ১৯১৮ সালে আই-এ এবং আই-এস সি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে উদ্ভিদবিজ্ঞানে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে তিনি 'সারদাপ্রসাদ পুরস্কার' লাভ করেন এবং ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উদ্ভিদ-বিজ্ঞানে এম্-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হন। এম্ এ পরীক্ষার পরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানের তদানীন্তন প্রধান অধ্যাপক ডঃ পি, ব্রুলের অধীনে গবেষণা সুরু করেন এবং তিন বৎসর গবেষণার ফলে Algae, Limnology, Ecology এবং Systematic Botany-তে বিশেষ পারদর্শিতা অর্জ্জন করেন। জীববিজ্ঞানে (Biology) তাঁর পাণ্ডিত্য বিজ্ঞানীদের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং জীববিজ্ঞানে

তাঁর গবেষণাকার্য সর্বশ্রেষ্ঠ বিবেচিত হওয়ায় ১৯২৮ এবং পুনরায় ১৯৩৬ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' তাঁকে 'এলিয়ট স্বর্ণপদক ও পুরস্কার'-প্রদানে সম্মানিত করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির 'রাজ্যাভিষেক রৌপ্যপদক' (Coronation Silver Medal) এবং ১৯৫২ সালে এশিয়া বিশেষত ভারতবর্ষের উদ্ভিদ্‌জগৎ সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণার জন্যে ব্রুল স্মৃতিপদক (Paul Tohames Bruhl Memorial Medal) অর্জন করেন। ভারতবর্ষের উদ্ভিদ্‌জগৎ সম্পর্কে তাঁর অমূল্য অবদানের জন্যে ১৯৩৭ সালে এডিনবারা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-এস-সি উপাধি দানে সম্মানিত করেন। শুধু তাই নয়, পরবর্তী বৎসর তিনি 'রয়্যাল সোসাইটি অব এডিনবারা'র 'ফেলো'-ও নির্বাচিত হন। ১৯৫২ সালে 'ভারতীয় বনৌষধি' গ্রন্থটির জন্যে 'রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার' অর্জন করেন।

১৯৩৮ সালে সি, সি, ক্যালভার্টের অবসর গ্রহণের পর তিনি কলকাতার ভারতীয় উদ্ভিদ্‌-উদ্যানের (Indian Botanic Garden) সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন এবং সেই সংগে Herbarium-এ Botanical Survey of India-র সর্বাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্বও তাঁর ওপর অর্পিত হয়। কর্মজীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই সর্বাধ্যক্ষের গুরুদায়িত্ব নিষ্ঠা ও সাফল্যের সংগে বহন করে গেছেন। Herbarium-এর curator ও Botanic Garden-এর Superintendent-এর পদে সমাসীন থাকাকালে তিনি উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ (Pure) এবং ফলিত (Applied) উভয় দিকেই মনীষার পরিচয় দান করেছেন।

কর্মজীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহে বিশেষতঃ পূর্ব-তিব্বতের প্রত্যন্তভাগ ও দক্ষিণ-ব্রহ্মে পরিভ্রমণ ক'রে উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় অনেক নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন। দক্ষিণ-ব্রহ্ম, নাগা পাহাড়, মণিপুর, উড়িষ্যা, সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানসমূহ থেকে বিশিষ্ট লতা-পাতা সংগ্রহ ক'রে তিনি Herbarium-কে সুসমৃদ্ধ করেছেন। বহু বিদেশী লতা-পাতাকে বাংলার জলবায়ু সহনের উপযোগী ক'রে তিনি কলকাতার উদ্ভিদ্‌-উদ্যান শুধু নয়, দার্জিলিঙের Lloyd Botanic Garden-কেও যথেষ্ট সমৃদ্ধ করেছেন। দারজিলিঙের Lloyd Botanic Garden ও কলকাতার Indian Botanic Garden, Eden Garden ও অন্যান্য বাগান ও পার্ক এবং কুচবিহারের উদ্ভিদ্‌-উদ্যানের প্রভূত সংস্কার ও উন্নতি সাধনও তাঁর প্রশংসার্হ কীর্তিরূপে নিত্যনন্দিত।

ভারতবর্ষের বনৌষধি (Medicinal Plants) সম্পর্কিত গবেষণাও তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য কীর্তি। গত কয়েক বৎসর যাবৎ তিনি I. C. A. R-এর Medicinal Plants Scheme-এর Sub-Committee-র সদস্য হিসেবে বনৌষধি গবেষণায় নিরত। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকার হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে Ipecac, Ergot, Atropin, Enetine প্রভৃতি বনৌষধির বহুল উৎপাদনের জন্যে একটি কমিটি গঠন করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এই কমিটির সভাপতি এবং ডাঃ বিশ্বাস তার কর্মসচিব। Indian Botanic Garden-এর Superintendent-এর পদ থেকে অবসর গ্রহণ করার পর ডঃ বিশ্বাসের ওপর এই বনৌষধি বিভাগের সর্বাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে।

আলস্যকে ডঃ বিশ্বাস যতখানি ভয় করেন, কাজকে ঠিক ততই নিবিড় ভাবে ভালোবাসেন। উৎসাহ আর কাজের কাঁধে হাত দিয়ে চলতে না পারলে তাঁর যেন তৃপ্তি নেই। কলকাতা ও দার্জিলিঙের উদ্ভিদ্‌-উদ্যান যেমন তাঁর কর্মিষ্ঠ হাতের স্পর্শে প্রাণ-চাঞ্চল্যে মুখর হয়ে উঠেছে, তেমনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানও তাঁর কাছ থেকে পেয়েছে বহুল সাহায্য। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ্‌-বিদ্যা বিভাগের তিনি অবৈতনিক অধ্যাপক; All India Institute of Hygiene and Public Health-এ ও তিনি সময় সময় Limnology অধ্যাপনা করেন। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Fellow ছিলেন এবং ১৯৩৭ থেকে Societe Botanique de France-এর Fellow রূপে পরিগণিত। ১৯৩৮ সালে তিনি Royal Society of Edinburgh-র এবং ১৯৫০ সালে National Institute of Science-এর Fellow মনোনীত হয়েছিলেন। এ-ছাড়া ১৯২৩ সাল থেকে Botanical Society of India-র Fellow রূপে তাঁর প্রশংসনীয় কর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৫২ সালে তিনি Botanical Society of India-র এবং ১৯৪৮, ১৯৪৯ এবং ১৯৫০ সালে Botanical Society of Bengal-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। Asiatic Society of Bengal-এর সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত এবং দীর্ঘ দিন এর কোষাধ্যক্ষ, জীববিজ্ঞান-বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। I. C. A. R-এর 'Essential Oil Sub-committee'-র সদস্য হিসেবে তিনি গোলাপ-তৈল শিল্প (Rose Oil Industry) সম্পর্কে অনুসন্ধানের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। বলতে ভুলে গেছি, ১৯৪৩ সালে তিনি Indian Science Congress-এ উদ্ভিদ্‌ বিজ্ঞান-শাখার সভাপতির পদও অলংকৃত



শ্রীকালীপদ বিশ্বাস

করেছিলেন। গত ১৯৫৪ সালে মস্কোতে অনুষ্ঠিত All-Union Agricultural Exhibition-এ ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানীদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

সংখ্যায় ডঃ বিশ্বাসের প্রকাশিত গ্রন্থ প্রচুর না হলেও মূল্যমিতির দিক থেকে বিশিষ্ট রকমের গভীর। তাঁর প্রসিদ্ধ গবেষণা-গ্রন্থ হলো : 'Common Water and Marsh Plants of India and Burma.' সম্প্রতি বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সিকিম হিমালয় অঞ্চলের বনৌষধি এবং I. C. A. R এর উদ্যোগে সাধারণ উদ্ভিজ্জ সম্পর্কিত তাঁর দু'খানি বই শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। আর V. Narayanswami র সহযোগিতায় রচিত 'Rose Cultivation and Otto of Rose Industry' নামীয় একটি গ্রন্থও প্রকাশের অপেক্ষায় রয়েছে। বাংলা ভাষায়ও যে সুপাঠ্য বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ লেখা যায়, তার প্রমাণ তাঁর তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র পুরস্কার-প্রাপ্ত 'ভারতীয় বনৌষধি' বইটি। এ-ছাড়া আজ পর্যন্ত তিনি প্রায় দেড় শত প্রবন্ধ লিখেছেন এবং Botanical Survey of India-র বহু Recordও সম্পাদনা করেছেন। ১৯৩৮ সালে Indian Botanic Garden (ভূতপূর্ব Royal Botanic Garden)-এর দেড় শত বৎসর পরিপূর্তি-উৎসবে প্রকাশিত 'জয়ন্তী গ্রন্থ' (Anniversary Volume) সম্পাদনাতেও তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় প্রমূর্ত। Indian Botanic Garden-এর ইতিহাস এবং দেশ-বিদেশের প্রথিতযশা উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীদের রচনার গ্রন্থনায় প্রকাশিত এই সংগ্রহ-গ্রন্থ উদ্ভিদবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট ও মূল্যবান সম্পদ।

ডঃ বিশ্বাস আজ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনৌষধি পরিকল্পনা সমিতির সর্বাধ্যক্ষের (Director-in-charge of the Medical Plant's Scheme) পদে অধিষ্ঠিত। আমাদের মনে হয়, সরকারের এই নির্বাচন যথাযথ হয়েছে এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বিংশ শতকের এই কর্মযোগী বাঙালী বিজ্ঞান-মনীষী উদ্ভিদ-জগতের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন মানব-জগতের উপকারের বহু উপাদান, যার অজস্রতায় ও সার্থক ব্যবহারে মানুষের জীবন একদিন খুশি-টলটল স্বাস্থ্যের আলোয় স্নাত-শুভ্র হ'য়ে উঠতে পারবে।

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে সর্বশ্রী সুনীলমাধব সেনগুপ্ত, সুনীল ঘোষ, রমেন্দ্র গোস্বামী ও কল্যাণ দাশগুপ্ত সংগৃহীত।]

শুধুই খেলা

কয়েক বছর আগে বিলাতের কোনো এক অপেরায় এক ধনবতী বিধবা অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে জানতে পারলেন, তাঁর ঠিক পাশের আসনের দর্শকটি হলেন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক এলবার্ট আইনষ্টাইন। সেদিনের অনুষ্ঠানে আইনষ্টাইন একলা দর্শক হিসেবে উপস্থিত হননি, সঙ্গী হিসেবে এনেছিলেন আর একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ্যাবিৎকে।

অনুষ্ঠানের মাঝে বিরতি হলে দর্শকজনের অনেককেই আসন ত্যাগ করতে দেখা গেল, কিন্তু আইনষ্টাইন বা তাঁর সঙ্গীজনটি আসন ছেড়ে না উঠে পরস্পরের মধ্যে কথোপকথন করতে লাগলেন। মহিলাটির কানে তাঁর পার্শ্ববর্তী দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির কথোপকথনের কোনো কথাই প্রবেশ না করলেও, তিনি দেখলেন যে, তাঁরা দু'জন একটি খামের পেছন দিকে পেনসিল দিয়ে কী যেন লিখছেন আর বলছেন। দেখে মহিলাটির মনে হলো আইনষ্টাইন ঐ খামের শাদা পেছন দিকটায় অঙ্কের কোনো ফরমূলা লিখছেন। লেখা শেষ করে আইনষ্টাইন খামটি পাশের পদার্থবিদ্যাবিৎটির হাতে এগিয়ে দিলে তিনি সংক্ষেপে আবার কিছু লিখে আইনষ্টাইন-এর হাতে খামটি তুলে দিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবে যখন তাঁদের ভেতর দেওয়া-নেওয়া ও লেখালেখির পালা চলছে তখন মহিলাটি আর কিছুতেই স্থির থাকতে না পেরে একটু ঝুঁকে দেখতে ও জানতে চেষ্টা করলেন : আইনষ্টাইন 'Theory of relativity'র মত নতুন কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা করছেন কি না।

ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। আইনষ্টাইন ও তাঁর সঙ্গীটি খামের শাদা পেছন দিকে ঐ সময় 'tick-tack-toe' খেলছিলেন।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আর ব্রজাঙ্গনারা?

তাদের কিছু নেই। আছে একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ। একমাত্র ভগবদ্‌বিরহ থেকেই একান্ত ভক্তিলাভ হয়। মহাভাগ্যবতী বলে ব্রজাঙ্গনাদের তাই সম্বোধন করল উদ্ধব। বলল, বিরহে তোমরা শ্রীকৃষ্ণে সর্বাত্মভাবে অধিকৃত হয়েছ। অপবর্গসমুদ্রে মগ্ন আছ সর্বক্ষণ। তোমরা ছাড়া আর কার এমন মহাভাগ্য। মুনি দুর্লভা ভক্তির তোমরাই জনয়িত্রী।

শ্রীকৃষ্ণ বলছেন উদ্ধবকে, আমার সঙ্গকালে গোপবালারা এক রাত্রিকে ক্ষণার্ধ বলে মনে করেছে। আর অক্রূর এসে যখন আমাকে মথুরায় নিয়ে গেল, তখন আমার বিরহে তাদের এক রাত্রিকে মনে হয়েছিল এক কল্প। নদী যেমন সমুদ্রে মিশে পৃথক অস্তিত্ব হারায় তেমনি তারাও আমাতে মিশে নিজেদের হারিয়েছিল। পুত্র পতি দেহ স্বজন ভবন—কোনো দিকে তাকায়নি। কিন্তু কী তাদের সম্বল? তারা না বুঝেছে আমার তত্ত্ব, না বা আমার স্বরূপ। তাদের একমাত্র ধন ভক্তি। উদ্ধব, তুমি শ্রুতি স্মৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তি সব ছেড়ে একনিষ্ঠ ভক্তি নিয়ে আমার শরণ লও, তাহলে আর তোমার ভয় নেই।

'মহাত্মা শ্রীপতি আপ্তকাম পুরুষ', বলছে গোপিনীরা: 'বনবাসিনী আমাদের দিয়ে তাঁর কী প্রয়োজন? স্বৈরিণী পিঙ্গলার মত যদিও আমরা জানি, নৈরাশ্যই পরম সুখ, তবু শ্রীকৃষ্ণেই আমাদের দুরত্যয়া আশা। তাঁর বার্তার জন্যে কে নিরুৎসুক থাকতে পারে? তাঁর সেবা ধন্য সেই সরিৎ, শৈল, বনোদ্দেশ-গাভী, বেণুরব, তাঁর শ্রীনিকেতন স্বরূপ পদাঙ্ক বারে বারে তাঁকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। তাঁর সেই ললিত গতি, উদার হাস্য, লীলাবলোকন আর মধুর বচনে আমরা হৃতধী। তাঁকে ভুলি কি করে? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজগত, হে আর্তিনাশন, দুঃখনিমগ্ন গোকুলকে উদ্ধার করো।

কোথায় বনচরী গোপী, কোথায় বা শ্রীকৃষ্ণে নিশ্চল স্নেহ! কিন্তু বস্তুশক্তি বুদ্ধির অপেক্ষা করে না। ওষধিশ্রেষ্ঠ অমৃতকে যে জানে না সেও যদি তা আস্বাদ করে, পায় তার শ্রেয়োফল। তেমনি গোপীরা জানে না কার সঙ্গ করেছে, কিন্তু ফল পেয়েছে হাতে-হাতে।

আমাদের কিছু জেনে দরকার নেই। বলছে ব্রজবালারা, আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয় হোক। আমাদের কথা তাঁরই নামাভিধায়িনী হোক। আমাদের কায় ভূলুণ্ঠিত হয়ে তাঁকে প্রণাম করুক। মঙ্গলাচরিতে হোক, কর্মচক্রে ভ্রাম্যমাণ হতে হতেই হোক, যেখানেই থাকি তাঁর ইচ্ছায় তাঁর প্রতি আমাদের অনুরাগ যেন অচঞ্চল থাকে।

গোপীদের প্রণাম করল উদ্ধব। প্রার্থনা করল গোপীদের চরণরেণুসেবী বৃন্দাবনের গুল্ম-লতা ওষধির মধ্যে আমি যেন একটা কিছু হই। যাদের হরিকথাচরিত ত্রিলোক পবিত্র করেছে সেই নন্দব্রজস্ত্রীদের পদরেণু আমি বারে-বারে বন্দনা করি।

ভক্তিই মুখ্য।

কর্মমীমাংসক বলে, ধর্মই মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য। কাব্যালঙ্কারিক বলে, যশই উদ্দেশ্য। বাৎসায়ন বলে, কামই উদ্দেশ্য। যোগশাস্ত্রকার বলে, সত্য আর শম-দমই উদ্দেশ্য। দণ্ডনীতিকৃৎ বলে, ঐশ্বর্যই উদ্দেশ্য। চার্বাক বলে, আহার ও মৈথুনই উদ্দেশ্য। কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তি, যাকে আশ্রয় করলেই ঈশ্বরদর্শন।

'ভক্ত পারমেষ্ঠ্য চায় না, মহেন্দ্রলোক চায় না, কিছু চায় না, শুধু আমাকে চায়।' বললেন শ্রীকৃষ্ণ। 'যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, স্বাধ্যায়, তপস্যা, ত্যাগ, কিছুতেই আমাকে তত বশীভূত করতে পারে না, যেমন পারে ভক্তি, উর্জিতা ভক্তি।'

ভক্তের জাত নেই। তাদের শ্রেষ্ঠ বর্ণ।

'আরে আ যাও, আরে আ যাও!' গেঁড়াতলার মসজিদের সামনে দাঁড়িয়ে এক মুসলমান ফকির আর্তনাদ করছে।

এই আর্তনাদের সুরটি ভালোবাসার। মনস্তন্ময় ব্যাকুলতার।

কাকে ডাকছে অমন গলা বাড়িয়ে? কাকে বুকে ধরবার জন্যে মেলে ধরেছে দুই বাহু?

একটা ছ্যাকড়া গাড়ি এসে দাঁড়াল না? কে একজন যেন নামল গাড়ি থেকে! এ কি, শ্রীরামকৃষ্ণ না?

'আরে আ যাও, আরে আ যাও।' মুসলমান ফকির প্রেম-গদগদস্বরে অথচ তীক্ষ্ণ আর্তি নিয়ে ডাকতে লাগল।

ঠাকুর কালীঘাট থেকে ফিরছেন দক্ষিণেশ্বর। পথে এসেছেন মৌলালি। ফকিরকে দেখে যেতে। বুক ভরে নিতে তার ভক্তগাত্রস্পর্শ।

'আরে আ যাও, আরে আ যাও।'

মুসলমান ফকির আর শ্রীরামকৃষ্ণ পরস্পরের প্রেমালিঙ্গনে বাঁধা পড়লেন।

তপস্যায় কি দরকার? হরি যদি অন্তরে বাহিরে থাকেন তাহলে তপস্যা নিরর্থক, যদি না থাকেন তাহলে আরো নিরর্থক। তাই তপস্যা থেকে বিরত হও। শুধু ভক্তি লাভ করো, সুপক্কা ভক্তি। এই ভক্তি-কাটারি দিয়েই ভবনিগড় ছেদন হবে।

জীবকোটি আর ঈশ্বরকোটি।

জীবকোটি ভক্তি ধরে সমাধিতে আসে। আর ঈশ্বরকোটি নিত্যসিদ্ধ, নির্বিকল্প, সুসমাহিত। যেমন শুকদেব।

'বিষ্ণু পাঠালেন নারদকে, শুকদেবকে নিয়ে এস, পরীক্ষিতকে

ভাগবত শোনাতে হবে।' বলছেন ঠাকুর। 'নারদ এসে দেখে শুকদেব সমাধিস্থ, জড়ের মত বসে আছে বাহ্যশূন্য হয়ে। তখন বীণা বাজাতে সুরু করল নারদ। চারশ্লোকে বর্ণনা করতে লাগল হরির রূপ। প্রথম শ্লোকে শুকদেবের রোমাঞ্চ, দ্বিতীয় শ্লোকে অশ্রু, তৃতীয় আর চতুর্থ শ্লোকে একেবারে চিন্ময় রূপদর্শন'।

জন্মগ্রহণমাত্র ব্রহ্মচারী ও সমাহিতচিত্ত এই শুকদেব। সরহস্য বেদ ও বেদাঙ্গ সমুদায় তার হৃদয়ে দেদীপ্যমান, তবু গুরুরূপ বৃহস্পতির কাছে গেল ইতিহাস ও রাজশাস্ত্র পড়তে। সর্বলোকের মাননীয় হয়ে উঠল। কিন্তু কিছুতে শান্তি নেই। নিখিল যোগশাস্ত্রে পারঙ্গম হয়েও নয়। মোক্ষ ছাড়া শান্তি নেই কিছুতেই।

ব্যাসকে গিয়ে বললে, 'বাবা, আপনি মোক্ষধর্মকুশল, কিসে আমার চিত্ত প্রশান্ত হবে তার উপদেশ করুন'।

ব্যাস বললে, 'তুমি মিথিলাধিপতি জনকের কাছে যাও, তিনিই উপদেশ করবেন'। শুকদেব তক্ষুণি বেরিয়ে পড়বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল। ব্যাস তাকে বাধা দিয়ে বললে, 'স্বীয় প্রভাববলে অন্তরীক্ষ পথ দিয়ে যেওনা, সাধারণ মানুষের মত পায়ে হেঁটে উপনীত হবে। পথে কিছুমাত্র সুখ বা স্বসম্পর্কীয় লোকের খোঁজ করবেনা, করলেই বদ্ধ হবে সঙ্গপাশে। জনক আমাদের যজমান জেনে কিছুমাত্র অহঙ্কার দেখাবে না, সবসময়ে তাঁর বশবর্তী হয়ে থাকবে। দেখবে তিনিই তোমার সমস্ত সংশয় ছেদন করবেন'।

পায়ে হেঁটে যাত্রা করল শুকদেব। পাহাড় নদী তীর্থ সরোবর শ্বাপদাকীর্ণ অটবী পার হল একে একে। সুমেরুশৃঙ্গ থেকে সুরু করে চীন-হূন দেশ দেখে ইলাবৃতবর্ষ, হরিবর্ষ ও হৈমবতবর্ষ পেরিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করল। কত রমণীয় পত্তন, কত সমৃদ্ধিশালী নগরী, কত মনোহর উদ্যান-উপবন চোখে পড়ল, কিন্তু চিত্ত কিছুতেই সমাকৃষ্ট হলনা। কত অন্ন পানীয় আর ভোজন, ধান্য ও গোধূম, কত সুশোভিত ঘোষপল্লী, কত খেচর-জলচর পাখি, কত রূপবতী পদ্মিনী কামিনী, কিন্তু কিছুতেই চিত্তবিকার ঘটল না। মনে শুধু এক চিন্তা, মোক্ষচিন্তা। মিথিলার রাজভবনের প্রথম কক্ষায় প্রবেশকরা মাত্র দ্বারপালেরা কঠোর বাক্যে নিবারণ করল শুকদেবকে। অপমানেও কিছুমাত্র ব্যথা পেল না শুকদেব, মধ্যাহ্নকালীন সূর্যের মত দাঁড়িয়ে রইল একাকী। দারোয়ানদের মধ্যে একজন তাকে বন্দনা করে ঢুকিয়ে দিল দ্বিতীয় কক্ষায়। আগের মহলে ছিল রোদ এ মহলে ছায়া। কি রোদ কি ছায়া, শুকদেবের কাছে সমতুল।

মন্ত্রী এসে শুকদেবকে নিয়ে গেল তৃতীয় কক্ষায়। এখানে পুষ্পিত পাদপ আর কেলিসরোবর শোভা পাচ্ছে। এর নাম প্রমদাবন, মিথিলার অমরাবতী। মুহূর্তমধ্যে মন্ত্রী অদৃশ্য হয়ে গেল আর উপস্থিত হল পঞ্চাশজন বারাঙ্গনা। সকলেই তরুণবয়স্কা ও প্রিয়দর্শনা, আলাপকুশলা ও নৃত্যগীতনিপুণা। পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে পূজা করে সুস্বাদু অন্ন নিবেদন করল শুকদেবকে। মনে মোক্ষচিন্তা নিয়ে আহার করল শুকদেব। স্মরলজ্জা কামদক্ষা বারবিলাসিনীরা শুকদেবকে নিয়ে প্রমদাবন দেখিয়ে বেড়াতে লাগল আর সর্বক্ষণ মেতে রইল হাস্যগীতে নৃত্যক্রীড়ায়, কিন্তু জিতেন্দ্রিয় বিশুদ্ধাত্মা শুকদেব কিছুতেই হৃষ্ট বা বিরক্ত হল না।

সন্ধ্যা হলে বারবনিতারা শুকদেবকে আসন ও শয়ন দিলে। মহামূল্য আস্তরণ-সমাস্তীর্ণ রত্নজাল-ভূষিত আসনশয়ন। আসনে বসে ধ্যাননিরত হয়ে পূর্বরাত্র কাটিয়ে দিল শুকদেব। মধ্যরাত্রি সুশান্ত নিদ্রায় যাপন করলে। শেষ রাত্রে উঠে শৌচক্রিয়া সেরে আবার ধ্যাননিমগ্ন হল। ধ্যানে ও সুষুপ্তিতে সর্বসময়েই তাকে ঘিরে বসেছিল বারবনিতারা, কিন্তু শুকদেবের মন বিচলিত হল না।

পরদিন জনক নিজে এসে গুরুপুত্রের সৎকার করলে। মাটিতে বসে করজোড়ে জিগগেস করলে, 'কি হেতু আগমন?'

'আমি পিতার আদেশে সংশয় নাশের জন্যে আপনার কাছে এসেছি। মোক্ষতত্ত্ব কিরূপ আমাকে তা বলুন।'

'জ্ঞান ও বিজ্ঞান ছাড়া মোক্ষলাভ অসম্ভব। আবার গুরু ছাড়া জ্ঞান লাভের আশা নেই।' বললে জনক। 'আচার্যই সংসারসাগরের কর্ণধার আর জ্ঞান প্লবস্বরূপ। সুতরাং গুরুর থেকে জ্ঞান লাভ করে সংসারসাগর উত্তীর্ণ হয়ে জ্ঞান আর গুরু উভয়কেই পরিত্যাগ করবে। কর্মকাণ্ডের উচ্ছেদ যাতে না হয় তারই জন্যে ব্রহ্মচর্য গার্হস্থ্য বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। একে একে চার আশ্রমের ধর্ম পালন করে কর্মের শুভাশুভ ফল ত্যাগ করতে পারলেই মোক্ষপ্রাপ্তি।'

'কিন্তু ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই কি মোক্ষলাভ হতে পারে না?' অস্থির হয়ে জিগগেস করল শুকদেব।

'কেন পারবে না?' জনক তাকে আশ্বস্ত করল: 'বহু জন্মের সাধনায় ইন্দ্রিয় যার বশীভূত হয়েছে, যার চিত্ত-বিশুদ্ধি হয়েছে, তার ব্রহ্মচর্যাশ্রমেই মোক্ষলাভ হয়ে থাকে। আর একবার ব্রহ্মচর্যাশ্রমে মোক্ষলাভ হলে আর গার্হস্থ্যাদি আশ্রম গ্রহণের প্রয়োজন থাকে না।'

নির্ভয় হল শুকদেব।

জনক তার পর বলতে লাগল: 'জলচর যেমন জলে থেকেও জলে লিপ্ত হয় না, তেমনি সকল প্রাণীতে নিজেকে ও নিজের মধ্যে সকল প্রাণীকে অবস্থিত দেখেও নির্লিপ্ত ভাবে কালযাপন করবে। সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মাকে দর্শন করবে। যে অন্যকে ভয় দেখায় না, নিজেও ভীত হয় না, যে এককালে কাম ও ক্রোধ ত্যাগ করেছে, যে করেছে সম্পূর্ণ বৈরভাব বর্জন, যার মনে নেই আর মোহকারিণী ঈর্ষা, প্রিয়-অপ্রিয় কথা শুনে বা প্রিয়-অপ্রিয় বস্তু দেখেও যার আহ্লাদ বা শোক নেই, স্তুতি-নিন্দা, লোহ-কাঞ্চন, সুখ-দুঃখ শীত-গ্রীষ্ম অর্থ-অনর্থ জীবন-মরণ যার কাছে সমান, সেই পরমার্থ ব্রহ্মপদার্থ লাভ করে। যেমন দীপ দ্বারা অন্ধকার ঘর প্রকাশিত হয় তেমনি জ্ঞান দ্বারা লক্ষিত হয় পরমাত্মা। তোমার ভয় কি। তুমি ছিন্ন সংশয়, দেহাভিমানশূন্য। বিজ্ঞানসম্পন্ন স্থিরবুদ্ধি ও নির্মলনির্লোভ। সুখ দুঃখ লাভ ক্ষতি নৃত্যগীতে অনুরাগ বন্ধুস্নেহ শত্রুভয় ও ভেদবুদ্ধি তোমার অন্তর থেকে তিরোহিত হয়েছে। তুমি যে অনাময় পরম পথ আশ্রয় করেছ সে পথই একমাত্র পথ।'

আত্মসাক্ষাৎকার হল শুকদেবের। হিমালয়ের পূব দিকে পিতার কাছে সে ফিরে গেল। সেখানে নারদের সঙ্গে দেখা।

শুকদেব জিগগেস করল, 'দেবর্ষি, ইহলোকে কি হিতকর, আপনি আমাকে উপদেশ করুন।'

নারদ বললে, 'বৎস, বিদ্যার তুল্য চক্ষু নেই, সত্যের তুল্য তপস্যা নেই, আসক্তির তুল্য দুঃখ নেই, ত্যাগের তুল্য সুখ নেই। ক্রোধ থেকে তপস্যাকে, মাৎসর্য থেকে শ্রীকে মানাপমান থেকে বিদ্যাকে এবং প্রমাদ থেকে আত্মাকে সতত রক্ষা করবে। আনৃশংস্যই পরমধর্ম। ক্ষমাই পরম বল। আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান। আর সত্যের সমান পরম আর কিছু নেই। কিন্তু সত্যের চেয়েও হিতবাক্যই বেশি বলবে। আমার মতে, যে বাক্য দ্বারা জীবের সমধিক মঙ্গল হয়, তাই সত্যবাক্য। কোনো প্রাণীর হিংসা করবে না, সকলের প্রতি মিত্রতুল্য ব্যবহার করবে, এই দুর্লভ মানবজন্ম পেয়েছ, তবে আবার কার সঙ্গে শত্রুতা? অনৈশ্বর্য, নিত্যসন্তোষ, নিস্পৃহত্ব ও অচাপল্যই পরম শ্রেয়। যে মরেছে বা যা নষ্ট হয়েছে তার জন্যে শোক করা মানে দুঃখ থেকেই দ্বিগুণতর দুঃখ টেনে নেওয়া। সুতরাং চিন্তা না করাই দুঃখ নিবারণের মহৌষধ।

জ্ঞানতৃপ্ত হও। চারদিকে সুখাসক্ত জনতার মধ্যে একাকী অবস্থান করো। সংসার নদী অতি ভীষণ। রূপ এই নদীর কূল, মন এর স্রোত, স্পর্শ এর দ্বীপ, রস এর প্রবাহ, গন্ধ এর পঙ্ক আর শব্দ এর জলস্বরূপ। আর নৌকো তোমার এই শরীর, ক্ষমা তার ক্ষেপণী, দয়া তার বায়ু, ধর্ম্ম-স্থৈর্য আকর্ষণরজ্জু। এই শরীর-নৌকায় নদী পার হয়ে যাও। তপোবলে সংসারবন্ধ থেকে বিমুক্ত হয়ে অনন্ত সুখসংবর্ধনী সিদ্ধি লাভ করো।

আর দেখ, যখন দৈবপ্রভাবে লোকের দুঃখ আসে তখন কি পৌরুষ কি প্রজ্ঞা কি নীতিবল কিছুতেই তার নিবারণ করা যায় না। তবু স্বভাবত সর্বদা সাবধান থাকবে। জীবিততৃষ্ণাপরায়ণ দেহ, সর্বদাই তার ক্ষয় হচ্ছে। সূর্য নিজে অজর কিন্তু পর্যায়ক্রমে সমুদিত ও অস্তমিত হয়ে জীবের সুখদুঃখ জীর্ণ করছে, ইষ্টানিষ্টকে সহচর করে রাত্রিও পালিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। চেয়ে দেখ ক্রিয়াফল কিছুই তোমার হাতে নেই। তা যদি হত তোমার সব বাসনাই সব উদ্যোগেই তুমি সিদ্ধ করতে পারতে। কত নিয়মধারী কার্যদক্ষ মতিমান লোক সৎকর্ম থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে ফল লাভে বঞ্চিত হয়, আবার কত নির্গুণ নরাধম মূর্খও উৎকৃষ্ট ফল পায়। কত লোক সর্বদা হিংসা ও বঞ্চনা করেও পরম সুখে কালাতিপাত করে আর কত সাধু বিবিধ বিচিত্র সৎকর্মের অনুষ্ঠান করেও অসমর্থ ও অকৃতকাম।

লোকে রোগাক্রান্ত হয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়, আবার সে চিকিৎসকও কালক্রমে ব্যাঘ্রপীড়িত মৃগের মত রোগের কবলে গিয়ে পড়ে। ধন, রাজ্য বা তপস্যা দিয়েও কেউই স্বভাবকে অতিক্রম করতে পারেনা। শুধু কামনানিবন্ধনই যত ক্লেশ ভোগ। তুমি মোহবিহীন হয়ে প্রথমত জ্ঞানবলে ধর্ম ও অধর্ম, সত্য ও মিথ্যা পরিত্যাগ করে পশ্চাৎ জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করো।'

তথাস্তু। শুকদেব স্থির করলেন যোগবলে কলেবর ত্যাগ করে বায়ুভূত হয়ে তেজোরাশিপরিপূর্ণ অর্কমণ্ডলে প্রবেশ করব। তার আগে একবার পিতার সঙ্গে দেখা করে যাই।

ব্যাসকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে দাঁড়াল শুকদেব।

নিত্য-স্নানের উদ্দেশে যোগানুষ্ঠান করতে যাবে তখন ব্যাস চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'তুমি কিছুক্ষণ আমার কাছে থাকো, তোমাকে দেখে আমার চক্ষু চরিতার্থ হোক।'

স্নেহশূন্য সংশয়মুক্ত শুকদেব পিতার বচনমাধুর্যে বিচলিত বা বিগলিত হল না। পিতাকে ত্যাগ করে সিদ্ধনিষেবিত কৈলাস পর্বতে চলে গেল।

ব্যাকুল হয়ে পুত্রকে অনুসরণ করতে লাগল ব্যাস আর সরোদনে 'শুক' বলে আহ্বান করতে লাগল। সর্বগামী সর্বতোমুখ শুকদেব স্থাবরজঙ্গম অনুনাদিত করে প্রত্যুত্তর করল, 'ভোঃ' সেই অবধি সমুদয় বিশ্বমধ্যে এই একাক্ষর 'ভোঃ'। প্রচলিত হল। আজও গিরি-গহ্বর প্রভৃতি স্থানে শব্দ করলে ঐ একাক্ষর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

শব্দাদিগুণকেও অতিক্রম করল শুকদেব। ব্রহ্মপদে প্রবেশ করে অন্তর্হিত হয়ে গেল। হিমালয়প্রস্থ দেশে ব্যাস পুত্রের অনুধ্যান করতে বসল। কাছেই মন্দাকিনী তীরে স্নানরতা বিবস্ত্রা অপ্সরারা বিরাজ করছিল, ব্যাসকে দেখে ত্রস্ত ও লজ্জিত হয়ে কেউ জলে ডুবল, কেউ লতাগুল্মের অন্তরালে পালাল, কেউ কেউ বা ত্বরান্বিত হয়ে টেনে নিল ত্যক্ত বাস। ব্যাস বুঝল, তার পুত্রই মুক্ত আর তার নিজেরই বিষয়কলুষ। যুগপৎ হর্ষ ও লজ্জায় অভিভূত হল ব্যাস।

পুত্রশোকার্ত পিতার কাছে পিনাকপাণি শঙ্কর আবির্ভূত হল। বললে, মহর্ষি, তুমি আমার কাছে অগ্নি, বায়ু, জল, ভূমি ও আকাশের মত বীর্যসম্পন্ন পুত্র প্রার্থনা করেছিলে, আমি তোমার সে প্রার্থনা পূর্ণ করেছিলাম। তোমার সেই পুত্র দেবদুর্লভ পরমগতি লাভ করেছে, তবে তোমার কিসের দুঃখ? তোমার ও তোমার পুত্রের অক্ষয়কীর্তি চিরকাল ঘোষিত হবে। আর মহামুনি, তোমাকে এই বর দিচ্ছি, এই ভূমণ্ডল মধ্যে সর্বদা সর্বস্থানে তুমি তোমার পুত্রের ছায়া দেখতে পাবে। এই দেখ।

শুকদেবের ছায়া এসে দাঁড়াল।

'একমতে আছে, শুকদেব সেই ব্রহ্ম-সমুদ্রের একটি বিন্দুমাত্র আস্বাদ করেছিলেন।' বললেন ঠাকুর, 'সমুদ্রের হিল্লোল-কল্লোল দর্শনশ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু ডুব দেন নাই সমুদ্রে।'

হিমালয়ের ঘরে পার্বতীর জন্ম। পিতাকে তার নানারূপ দেখাতে লাগল পার্বতী। হিমালয় বললে, 'মা, এসব রূপ তো দেখলাম, কিন্তু তোমার যে একটা ব্রহ্মস্বরূপ আছে, সেইটি একবার দেখাও।'

পার্বতী পাশ কাটাতে চাইল। বললে, 'বাবা, যদি ব্রহ্মজ্ঞান চাও তাহলে সংসার ত্যাগ করে সাধুসঙ্গ করতে হবে।'

ঠাকুর বললেন, 'হিমালয় জানে না যে দর্শনের মানে কি।'

কিছুতেই ছাড়বে না হিমালয়। তখন পার্বতী একবার দেখাল। ঠাকুর হাসলেন। বললেন, 'দেখামাত্রই গিরিরাজ মূর্ছিত।'

ব্রহ্মজ্ঞানের পরেও শরীর রাখতে পারে কে? একমাত্র অবতার। তাও শুধু লোকশিক্ষার জন্যে।

একশো ছাপ্পান্ন

অত-শত দরকার কি? শুধু সরল হয়ে যাও।

'সরলের কাছে তিনি খুব সহজ।' বলছেন ঠাকুর।

কিন্তু সরল হওয়া কি সহজ কথা?

বঙ্কিম চাটুজ্জেকে বলছেন, 'কপট হয়েছ কি, তিনি দূরে সরে গিয়েছেন। সেয়ানাবুদ্ধি পাটোয়ারিবুদ্ধি বিচারবুদ্ধি করতে গিয়েছ —অমনি তিনি বেপাত্তা।'

সরলভাবে ডাকলে তিনি শুনবেন। একবার দেখনা ডেকে। ছেলে যেমন মাকে না দেখে দিশেহারা হয়, মেঠাই-সন্দেশে ভোলে না, কেবল মা-মা করে, তেমনি করে একটু ডাকো না। একবার আন্তরিক কাতর হও না মায়ের জন্যে। দেখ না মা আসে কি না ছুটে। একটি নিখুঁত সরলরেখার মত।

'তাই তো ছোকরাদের এত ভালোবাসি।' ডাক্তারকে বলেছেন ঠাকুর। 'যেন নতুন হাঁড়ি, দুধ নিশ্চিন্ত হয়ে রাখা যায়। আর বিষয়ী লোকেরা হচ্ছে দই-পাতা হাঁড়ি, দুধ রাখলেই নষ্ট। তা, তোমার ছেলেটি বেশ। এখনো বিষয়বুদ্ধি কামিনীকাঞ্চন ঢোকেনি।'

'বাপের খাচ্ছেন কি না তাই।' ডাক্তার পরিহাস করল। 'নিজের করতে হলে দেখতুম বিষয়বুদ্ধি ঢোকে কি না।'

'তা বটে।' বললেন ঠাকুর, 'তবে কি জানো, ঈশ্বর বিষয়-বুদ্ধির থেকে দূর, নইলে একেবারে হাতের মধ্যে।'

সরলভাবে ডাকলে তিনি দেখা দেবেনই দেবেন।

এক যাত্রাওয়ালা দেখা করতে এসেছে, তাকে বলছেন। 'শোনো, আরেকটি কথা। যাত্রাশেষে কিছু হরিনাম করে উঠো। তাহলে যারা গায় আর যারা শোনে সকলেই একটু ঈশ্বর ভাবনা করতে করতে যে যার বাড়ির দিকে রওনা হবে।'

যাত্রারম্ভে তো করোমি যাত্রাশেষে করো হরিনাম। পরিণামে হরিনাম। কিন্তু সমস্ত পথ ধরে করে না এলে কি শেষ কালে মনে পড়বে?

তাই সরল হয় শেষ জন্মে। 'শেষ জন্মে ক্ষ্যাপাটে ভাব।' বললেন ঠাকুর, 'বহু জন্মের তপস্যার পরেই সরল-উদার হওয়া চলে।'

তবে এ জন্মের উপায় কি?

খুব করে বালকদের সঙ্গে মেশ। বালক ভাব আরোপ করো নিজের মধ্যে। যতক্ষণ বালকদের সঙ্গে মিশবে ততক্ষণ তুমি নিজেও বালক, নিজেও আত্মভোলা। বালকের মতই তুমি সরল, বালকের মতই তুমি বিশ্বাসী। শিখবে কি করে আথলুটে হতে হয়, কান্না জুড়ে ছুঁড়তে হয় হাত-পা। কি করে মায়ের কোল পেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যেতে হয়।

দুটি সন্তানবতী গৃহস্থবধূ দর্শন করতে এসেছে ঠাকুরকে। দুটি জা, একই পরিবারের। এসেছে মাথায় ঘোমটা ফেলে। নম্রশ্রীতে বসেছে ঠাকুরের কাছে।

'শোনো, শিবপুজো করবে।' বললেন ঠাকুর।

সর্বভূতাত্মা সর্বলোককৃৎ সর্ববিগ্রহ শিব। সর্ববাসী সর্বচারী সর্বকালপ্রসাদ।

দেখবে স্ফটিকশুভ্র শিব বসে আছেন পদ্মাসনে। কাঁধে-গলায় সাপ গর্জন করছে, মাথার জটায় কুল কুল করছে গঙ্গা। চূড়ায় শশধরের মুকুট।

'ঠাকুর পুজোর কাজ অনেকক্ষণ ধরে করবে। অনেকক্ষণ ধরে।' তাদের বলতে লাগলেন ঠাকুর। 'এই প্রথম ফুল তুললে, পাতা বাছলে, মালা গাঁথলে, অনেকক্ষণ—অনেকক্ষণ ধরে। তার পরে ঠাকুরের বাসন মাজলে, চন্দন ঘষলে, ঠাকুরের জলখাবার সাজালে।

এ সব যে কাজ করছ এও ঠাকুর পুজো। ছুজায়ে যে কথা কইবে তাও ঠাকুরের কথা। তখন কোথায় সংসারের হীনবুদ্ধি, রাগদ্বেষ, ক্ষুদ্রতা-দীনতা! তখন শুধু তেলের ধারার মত আনন্দের ধারা।'

যখন বাসন মাজবে, মনে করবে চিত্তমার্জনা করছ। যখন চন্দন ঘষবে, মনে করবে নিজেকে নির্মল করে কোমল করে নিঃশেষ করে মিলিয়ে দিচ্ছ ঈশ্বরে।

পূজার আয়োজনও পূজা। প্রেমের আয়োজনই প্রেম।

'আমাদের কি একটু কিছু বলে দেবেন?' বড় বউটি জিগগেস করল।

'কি, মন্ত্র?'

দু চোখে সস্মিত সম্মতি ভরে তাকাল বউটি।

'কিন্তু আমি তো মন্ত্র দিই না। মন্ত্র দিলে শিষ্যের সব পাপ-তাপ নিতে হয়। মা আমাকে বালকের অবস্থায় রেখেছেন।'

বউদুটি কি একটু বিমর্ষ হল?

ঠাকুর আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'তোমাদের যে ভাবে পুজো করতে বলে দিলাম তাই কোরো, ভাবনা কি। তা ছাড়া হরিনাম যে করতে বলেছিলাম তা হচ্ছে?'

ঘাড় হেলিয়ে সায় দিল বউদুটি।

'তবে আর কথা নেই।'

সর্বদা নাম করবে। নামে ভাস'ব নামে ডুবে থাকবে। দেখবে নিশ্বাস-প্রশ্বাসে নাম হবে। দেখবে ঘুমেও নাম ছাড়া নও। নামে যদি একবার আনন্দ হয় তা হলে আর কিছু করতে হয় না! করবার দরকারও হয় না। শুধু নাম নিয়ে পড়ে থাকলেই যথেষ্ট। শুধু যথেষ্ট নয়, যথাতিরিক্ত।

'তোমরা উপোস করে এসেছ বুঝি?' ঠাকুর চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বউদুটি চুপ করে রইল।

'উপোস করে এসেছ কেন? মেয়েরা আমার মার এক-একটি রূপ। তাই তাদের একটু কষ্টও আমি দেখতে পারি না। খেয়ে আসবে, আনন্দে থাকবে। ওরে রামলাল'—

রামলাল এসে হাজির।

'ওরে বউদুটিকে বসা। একটু জল খাওয়া।'

ফলহারিণী পূজার প্রসাদ, লুচি আর নানারকম ফল মিষ্টি এনে দিল রামলাল। গ্লাশ ভরে এনে দিল চিনির পানা।

'আহা হা, তোমরা কিছু খেলে, আমার প্রাণটা শীতল হল।' ঠাকুর বললেন স্নেহশুনেত্রে। 'ওগো, মেয়েদের উপবাসী আমি দেখতে পারি না।'

আর্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী—আমি তো কিছুই নই। শুনেছি ঐ চাররকমই নাকি বৈধী ভক্তির চার উপায়। তা হলে আমার কী উপায় হবে? কিন্তু কী তুমি জিগগেস করি। আমি কাঙাল, দীনহীন। বটে? তা হলে তো আর ভাবনা নেই, তা হলেই তো তুমি প্রভুতবিত্ত। নিজেকে দীনহীন কাঙাল মনে করে ঈশ্বরের পা ধরে পড়ে থাকো, দেখবে কখন ভক্তি এসে গিয়েছে। শুধু ধরে থাকো, শুধু পড়ে থাকো। শুধু ভরে থাকো। শুকনো লাগছে কাঠ-কাঠ লাগছে, বিরস-বিস্বাদ লাগছে, তবু নাম করে যাও। যত বিরক্তির সঙ্গেই খাওনা ওষুধ তার কাজ করবেই। তেমনি নামের বস্তুগুণ সর্বাবস্থায় কার্যকর। বস্তুগুণ কি অবস্থার অপেক্ষা করে?

সংসার জলে-পুড়ে যাচ্ছে। সবাই মনমরা, হৃতসর্বস্বের মত চেহারা। মুখে হাসি নেই, প্রাণে স্ফূর্তি নেই। কেন, কিসের দুঃখ? নামের নেশা ধরো। দেখ আনন্দ আসে কিনা উজান ঠেলে। ধুয়ে-পাখলে যায় কিনা তোমার ঐ রোদজ্বলা মুখের চেহারা।

গন্নুর মার বাড়িতে এসেছেন ঠাকুর। রাস্তার উপরে একতলা বাড়ি। বৈঠকখানায় ছোকরাদের কনসার্ট পার্টির আখড়া, সেখানেই বসেছেন। ঠাকুরকে পেয়ে ছোকরারা বাজনা সুরু করে দিয়েছে। পাড়ার ছেলে-বুড়ো সবাই ভেঙে পড়েছে দলে-দলে।

জানলার উপর দাঁড়িয়েছে কেউ-কেউ। কতগুলি অপোগণ্ড শিশু।

'তোরা এখানে কেন? যা যা বাড়ি যা।' কেউ বুঝি ওদের তেড়ে গেল।

'না, থাক না। থাক না।' ঠাকুর বাধা দিলেন।

যা শুনছেন সব চমৎকার। আশে পাশে যত লোক সব বেশ লোক। আনন্দে যখন আছে তখন নিশ্চয়ই আছে ঈশ্বর সংশ্রবে।

তিন রকম আনন্দ। বিষয়ানন্দ, বিদ্যানন্দ, ব্রহ্মানন্দ। এক সিঁড়ির পরেই আরেক সিঁড়ি। উঠে যাও, শক্তির প্রমাণ দাও। যে শক্তিমান সেই ভক্তিমান।

'আপনি ভেতরে আসুন।'

'কেন গো?'

'ভেতরে জলখাবার দেওয়া হয়েছে।'

'এখানেই এনে দাওনা।'

'ঘরটায় পায়ের ধুলো দিন, তাহলে ঘর কাশী হয়ে থাকবে।' বললে গন্নুর মা। 'কখন ঘরে মরে পড়ে থাকব, আর তা হলে কোনো গোল থাকবে না।'

যেখানে তোমার পা দুখানি রেখেছ ঘরেই হোক আর অন্তরেই হোক, সেখানেই কাশী।

গন্নুর মার কি আছে? শুধু সরলতা। যারা ফ্লুট হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে তাদের বা কি আছে? ঐ সরলতা। জানলার উপরে ঐ শিশুর দল ঠাঁই পেয়েছে কেন? শুধু ঐ সরল বলে।

আর দেখ এই সরলের প্রতিমূর্তি, বিজয়কৃষ্ণকে।

ঠাকুর বললেন, 'আহা বিজয়কে দেখ। কেমন উদার-সরল। অধর সেনের বাড়ি গিয়েছিল, তা যেন আপনার বাড়ি, সব্বাই যেন আপনার লোক'।

ব্রাহ্ম সমাজে একদিন উপাসনা করছে বিজয়, বড় শুকনো-শুকনো লাগছে। মনে ভাবভক্তি কিছুই আসছে না। কি করে যাবে এ প্রাণের শুষ্কতা? কি করবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। তবে এই কাষ্ঠ উপাসনা যে ছাড়তে হবে, এ ঠিক। কিছু ঠিক করতে না পেরে রাস্তায় বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এসেই দেখতে পেল একটা কুলি। অমনি তার পায়ে পড়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করল বিজয়। সঙ্গে সঙ্গেই তার প্রাণ সরস হয়ে উঠল। চলে এল ভক্তির প্রবাহিনী। আবার উপাসনায় গিয়ে বসল। ভীষণ জমল উপাসনা।

'আরেকদিন' বলছে বিজয়। 'আরেকদিন শুষ্কতায় কিছুই ভালো লাগছেনা, মন বসছেনা উপাসনায়, উঠে গিয়ে দারোয়ানকে এক ছিলিম তামাক সেজে দিয়ে এলাম। তখন মনটি সরস হল। উপাসনাও খুব ভালো হল'।

[ক্রমশঃ।

বুদ্ধ দ্বাদশী

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী

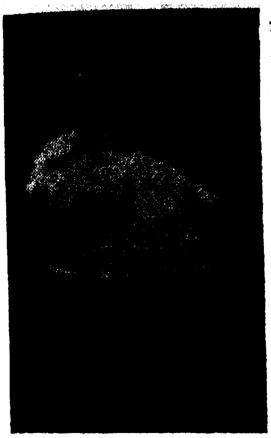
বুদ্ধ-প্রচারিত ধর্ম ও দর্শন যুগে যুগে নানাভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও দর্শনকে প্রভাবিত করিয়াছে। বুদ্ধদেব স্বয়ং ব্রাহ্মণ্য দেবমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন—তিনি বিষ্ণুর দশ অবতারের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত। হস্তীর দ্বারা নিপীড়িত হইবার আশঙ্কায় হিন্দুর পক্ষে বৌদ্ধমন্দিরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হইয়াছে সত্য, কিন্তু বিষ্ণুর অবতার হিসাবে বুদ্ধের পূজা নিষিদ্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ হিন্দুর ঘরে ঘরে কোন দেবতার পূজার পূর্বে বিষ্ণুর দশ অবতারের পূজা করা হইয়া থাকে। অবশ্য স্বতন্ত্র ভাবে বুদ্ধের পূজা বা তদুপলক্ষে কোন উৎসবের ব্যবস্থা সচরাচর প্রচলিত পাল-পার্বণের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ একটি অনুষ্ঠানের সন্ধান পাইয়াছি। বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে ইহার পরিচয় এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া এদিকে অনুসন্ধিৎসু জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

অনুষ্ঠানটির নাম বুদ্ধদ্বাদশী—ইহা একটি ব্রত। লক্ষ্মীধরকৃত কৃত্যকল্পতরু (১২শ শতাব্দী) এবং হেমাদ্রিকৃত চতুর্বর্গ চিন্তামণির (১৩শ শতাব্দী) ব্রত খণ্ডে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। মনে হয় বরাহপুরাণ হইতে এই বিবরণ সংকলিত হইয়াছে। কৃত্যকল্পতরুতে মৎস্য দ্বাদশী প্রসঙ্গে বরাহপুরাণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তবে মুদ্রিত বরাহপুরাণের বিবরণের সহিত লক্ষ্মীধর ও হেমাদ্রির বিবরণের মিল নাই। উঁহাদের বিবরণ হইতে জানা যায় যে, এই ব্রত শ্রাবণ মাসের শুক্লা দ্বাদশীতে অনুষ্ঠান করিতে হয়। ব্রতীকে ঐ দিন উপবাসী থাকিয়া স্বর্ণনির্মিত বুদ্ধ মূর্তি পূজা করিতে হয়। হিন্দুর অন্য দেব দেবীর পূজা যে ভাবে হয়, এই পূজাও সেই ভাবেই করিবার কথা। হেমাদ্রি পুরাণোক্ত বুদ্ধমূর্তির বর্ণনা উদ্‌ধৃত করিয়া বলিয়াছেন—এই মূর্তি হইবে দ্বিভুজ ও ধ্যানস্তিমিত লোচন। পূজার পর মূর্তিটি ব্রাহ্মণকে দান করিবার ব্যবস্থা আছে। বলা হয় যে, এই ব্রত অনুষ্ঠানের ফলে শুদ্ধোদন বিষ্ণুর অবতার বুদ্ধদেবকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছিলেন এবং বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। বরাহপুরাণের মতে নৃগ রাজা এই ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দস্যুদের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতার সম্পর্কেও এইরূপ ব্রতের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এই সব ব্রত বর্তমানে কোথাও প্রচলন আছে কিনা বা কবে কোথায় প্রচলিত ছিল বলিতে পারি না।

পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্র কোন্‌টি ?

১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশ বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত চীন দেশের Pekin Paoই পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্রের মর্যাদা লাভ করে এসেছে। মাত্র কয়েকটি মতবাদ ব্যতিরেকে এ কথা সর্বজনস্বীকৃত যে Pekin Paoর জন্ম হয়েছিল দেড় হাজার বছরেরও আগে। Su Kung নামধারী এক চৈনিক মুদ্রাকর ৪০০ খৃষ্টাব্দে এর প্রতিষ্ঠা করেন। অঙ্গসজ্জা ছিল এর চমৎকার। ছ' পাতার কাগজ ছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ থেকে এ দৈনিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দের পর অর্থাৎ এর প্রকাশ বন্ধ হওয়ার পর পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্রের সম্মান লাভ করে হল্যাণ্ডের De Oprechte Haarlemse Courant. ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে Weekelycke Courante van Europa নাম নিয়ে এর প্রথম প্রকাশ। ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে এর নাম হয় পরিবর্তন। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা মে জার্মাণীরা যুদ্ধগত ব্যাপারে এর প্রকাশ বন্ধ করে দেয়। যুদ্ধোত্তরকালে অন্য একটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ আবার প্রকাশলাভ করে। ইংরাজী সাপ্তাহিক Berrow's Worcester Journal বর্তমানে পৃথিবীর প্রাচীনতম সংবাদপত্রিকার স্থানাধিকারী। এর আগে নাম ছিল Worcester Post Man. ১৬৯০ খৃষ্টাব্দ থেকে এর অনিয়মিত প্রকাশ সুরু। ১৭০৯ খৃষ্টাব্দ থেকে এ নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এ ছাড়া বৃটেনে আরও ষোলটি সংবাদপত্র আছে, যাদের বয়েস দুশো বছরেরও বেশি।

ডেনমার্কের Berlingske Tidende রক্ষণশীল দলের মধ্যে প্রতিষ্ঠাবান সংবাদপত্র কিছুকাল আগে তার দুশো বছরের জন্মতিথি উদ্‌যাপিত করেছে। আয়ার্লণ্ডের Belfast News Letter-এর বয়েসও দুশো বছর পার হয়ে গেছে আজ থেকে কুড়ি-একুশ বছর আগেই।



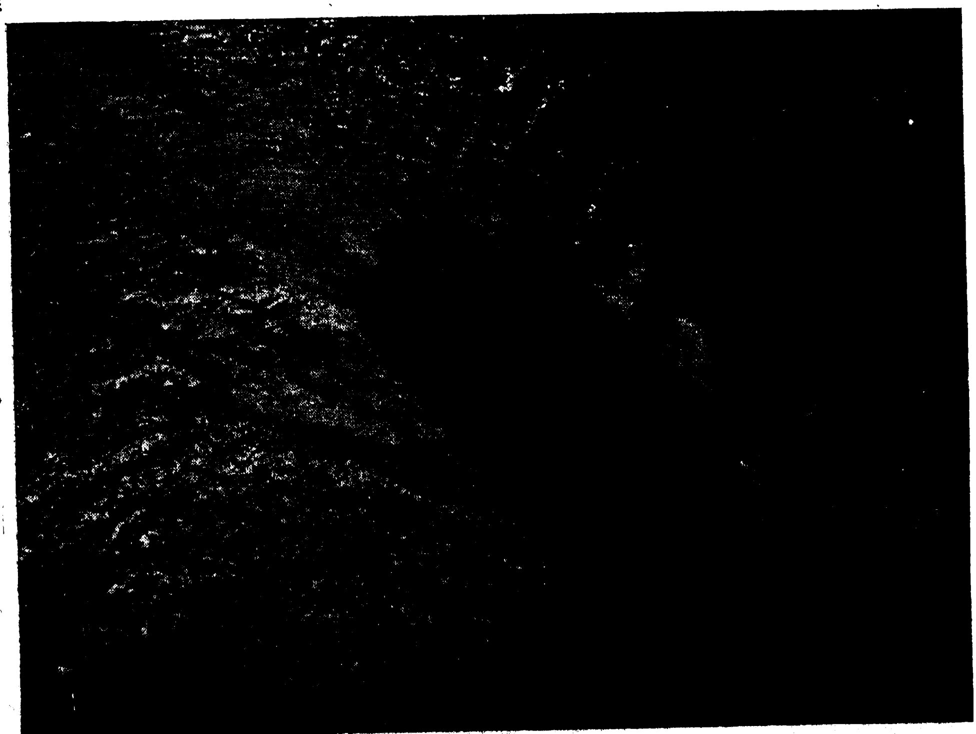
বিশ্রাম
—হারাধন মণ্ডল



শিল্পী (নেপাল)
—অসিতকুমার শ্রীমানি

আলোকচিত্র

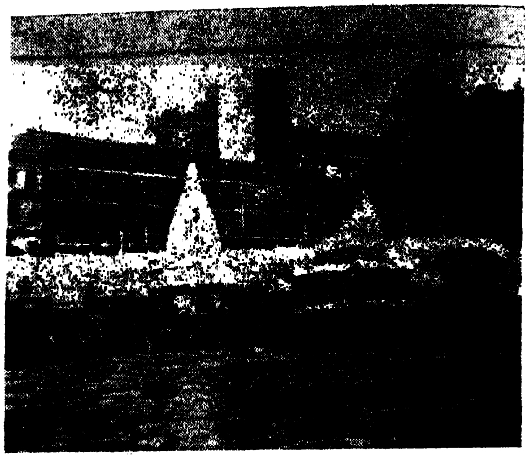
গতি
—জীবানন্দ চট্টোপাধ্যায়





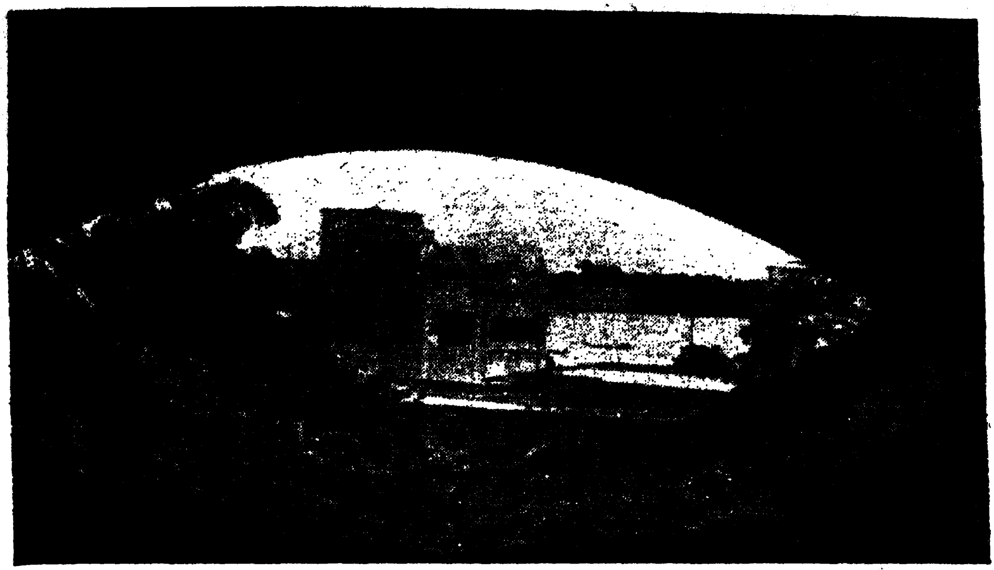
সাগরপারের মেয়ে
—সুধাংশু চক্রবর্তী

হর কি পিয়ারী (হরিদ্বার)
—শৈলেন্দ্রনাথ বিশ্বাস



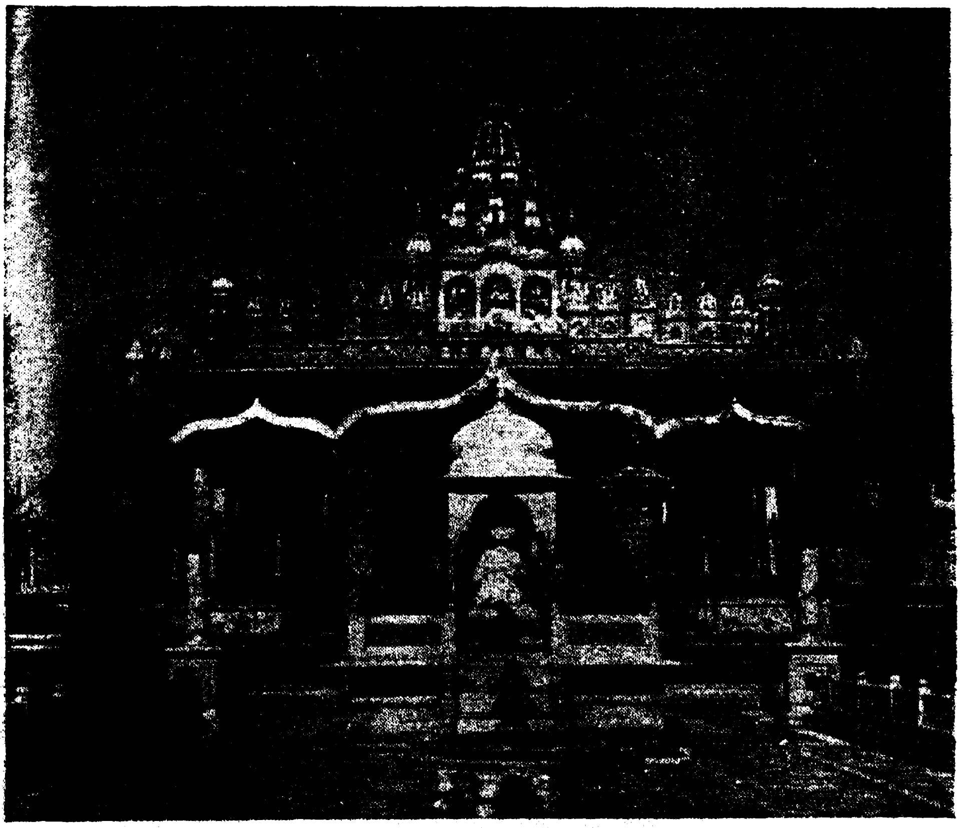
ধ্বংসাবশেষ
—শিবনাথ পাল





সাঁকোর তলায় —প্রশান্তকুমার ভাদুড়ী

পরেশনাথ (কলিকাতা) —মদন বসু





মাননীয়া

—গোবিন্দলাল দাস



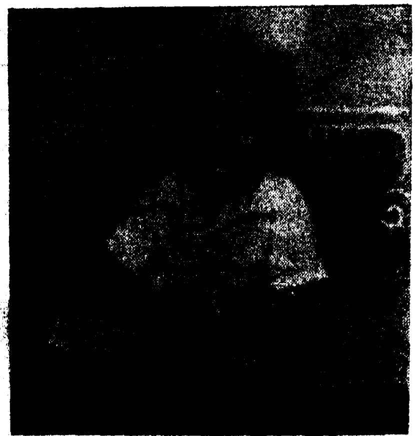
বৌদ্ধভক্ত

—সুধাবিন্দু বিশ্বাস

[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পিছনে নাম ধাম ও ছবির-বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।]

শৈশব

—উজ্জ্বলকুমার রায়





শূন্য দোলা

—নারায়ণপ্রসাদ

শির দাও

নৃপেন্দ্রনাথ রায়

(ক) গুরু নানক ১৫০০ শব্দ

মাতাপিতা-গুরুজন-পরিজন পরিবৃত কিশোরের উপনয়ন অনুষ্ঠিত হইতেছে। চতুর্দিকের আকাশ-বাতাস এক মহান সম্ভাবনায় পূর্ণ। দ্বিজত্বের দ্বারে উপনীত কিশোরের মনে যে সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়াছে—তাহার বিবৃতিতে দ্বিধার শেষ নাই, কিন্তু প্রকাশ না করিলেও ত্রাণ নাই। পুরোহিত পবিত্র যজ্ঞোপবীত ধারণ করাইতে হস্ত উঠাইয়াছেন—সত্যকাম কিশোর উপবীত-ধৃত পুরোহিতের হস্ত প্রতিরোধ করিয়া প্রশ্ন করিল—কেন এই উপবীত? কি হইবে এই উপবীত ধারণে? অধীর পুরোহিত ক্রোধরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—চিরাচরিত রীতি অনুসারে উপবীত গ্রহণ না করিলে দ্বিজত্ব লাভ হয় না, নহিলে বেদ-পাঠে, ধর্মক্রিয়ায় অধিকার জন্মে না। উচ্ছ্বসিত নানক বলিয়া উঠিলেন—আমার চাই সেই উপবীত—

দয়া কুপা সন্তোখ সূত জাট গণ্ডী সাত বাট
এ জনেউ জিয়া কা হৈ ত পান্দে ঘট
ন এ টুটে ন মল লাগে ন এ জলে ন জায়
ধন সো মানস মান্‌কো জো গল চলে পায়।

দয়া হোক কাপাস (তুলা), সন্তোষ হোক সূতা, সংযম ও সত্য হোক গ্রন্থি ও পাক, তবেই হইবে উপযুক্ত উপবীত। পারেন যদি দিন সেই উপবীত আমাকে। সে উপবীতের ধ্বংস নাই, পাতিত্য নাই, অগ্নির ভয় নাই, হারাইবার ভয় নাই। ও নানক, সেই উপবীতধারীই সার্থক মানুষ।

*　*　*　*

একদা নানক পুরীতে জগন্নাথের সন্ধ্যারতির কালে উপস্থিত ছিলেন। পূজারীরা তাঁহাকে আরতিতে যোগ দিতে আহ্বান করিলে তিনি বলেন—

গগন মৈ থাল রবি চাঁদ দীপক বনে তারকামণ্ডল
　　　　　　　　জনক মোতি
ধূপ মল্যাণ লো পবন চবরো করে সগল বনরাই
　　　　　　　　ফুলন্ত জোতি।
কৈসি আরতি হোত্র ভবখণ্ডনা তেরি আরতি
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী
সহস তব নয়ন নঁ নয়ন হৈ তোহে কোঁ
সহস মূরত ননা এক তোহি
সহস পাদ বিমল নঁ এক পাদ,
গন্ধ বিন সহস তব গন্ধ
ইব চলত মোহি।

হে প্রভু, তোমার আরতিতে গগন তোমার থালা, সে পাত্র তারার মুক্তায় খচিত, সূর্য-চন্দ্র সে আরতির দীপ, চন্দন-বন-সৌগন্ধ তাহার ধূপ, অগণ্য অরণ্যানী তাহার ফুল। হে ভবখণ্ডন, এ তোমার কি আরতি! অনাহত শব্দে তোমার ভেরী বাজে; তোমার নয়ন নাই, তবু তোমার সহস্র নয়ন, সহস্র তোমার মূর্তি, তবু তোমার মূর্তি নাই, গন্ধ নাই, তবু সহস্র তোমার গন্ধ—এমন করিয়াই তুমি মহীকে মোহিত করিয়াছ।

*　*　*　*

শোনা যায়, কপর্দকহীন অবস্থায় তিনি এসিয়ার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত ভ্রমণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি মক্কার রাস্তায় শায়িত ছিলেন। পথচারী একজন মোল্লা তাঁহার অবস্থান লক্ষ্য করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন—বেতমিজ! তোমার পা পূততম কাবা-মসজিদের দিকে। নানক উত্তর করিলেন—বন্ধু, বিস্মরণ মার্জনা কর। কোন্ দিকে পদ প্রসারিত করিব? উপদেশ দেও কোন্ দিকে আল্লা নাই। গুরু বলিতেছেন,

কাহে রে বন খোজন যাই
　স্রবব নিবাসী সদা অলেপা তোহি সংগ সমাঈ
পোহপ মধ জিও বাস বসত হৈ মুকর মাহে জৈ সে ছাঈ
তৈসে হি হর বসে নিরন্তর ঘট হি খোজো ভাই।

বনে কি খুঁজিবে? সর্বত্র যাঁহার নিবাস, অলিপ্ত যিনি, তোমার মধ্যেই আছেন তিনি। পুষ্পে যেমন গন্ধ থাকে, দর্পণে যেমন ছায়া থাকে—তেমনি তোমার মধ্যে তিনি নিরন্তর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। সেখানেই তাঁহার সন্ধান লও।

*　*　*　*

নানক ছিলেন কৃষক, শ্রমিক, দোকানদার, সরকারী ভৃত্য, জনসেবক, কবি। পিতার মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া রোজগার করা পয়সা দান করিয়া, পৈতৃক ব্যবসা বন্ধ করিয়া সর্বস্বান্ত হইয়া আবার নিজের মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তিনি নিজের উদরান্ন সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধারণ মানুষের দৈনিক জীবনের সহিত তাঁহার অন্তরংগ যোগ ঘটিয়াছিল। ইহলৌকিক জীবনের পথেই জীবনব্যাপী পারলৌকিক সাধনা করিয়াছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি উদাসীন, কিন্তু সংসার-বৈরাগ্যকে তিনি চরম ও পরম বলিয়া সাধনা করেন নাই। সাংসারিক জীবনের যে স্বীকৃতি শিখধর্মে দেখি—তাহা অনন্য। কথাটা একটু বুঝিতে হইবে। শিখধর্ম সাংসারিক জীবনে গড়িয়া উঠিয়াছে। পরিপূর্ণ ধর্ম সাধনার ক্ষেত্রে এরূপ ঘটনা দ্বিতীয় বার ঘটে নাই। গুরু সংসারেই বাস করিতেন, সাংসারিক জীবনকে তিনি নষ্ট করেন নাই; সংসারকে পারমার্থিক জীবনের প্রয়োজনে শূন্য বলিয়া উড়াইয়া দেন নাই। শিখধর্মের ইহা অতি-বিশেষত্ব। শিখধর্মে মৃত্যু নয়, জীবন লইয়াই সাধনা। শিখধর্মে মানুষের মানুষ-জীবনের যে মূল্য অংগীকৃত হইয়াছে ভারতীয় কোন সাম্প্রদায়িক ধর্মে তাহা বোধ হয় এমন করিয়া আর স্বীকৃত হয় নাই। এই জন্যই জীবন-সাধনার ধর্মে প্রয়োজনের দিনে স্বাভাবিক কারণেই শিখধর্মে বীর্য সাধনা, শক্তি-সাধনা অতি প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

দেশপ্রেমের যে দাবদাহ গুরুগোবিন্দ জালিয়াছিলেন, সে অগ্নির হোতা—গুরু নানক। গুরু নানকের রচনায় যাত্র উপনিষদোক্ত নির্গুণ, নিরঞ্জন, নির্বিকার, অনাদি, অগম্য পরম-পুরুষের কথা

নাই, তাঁহার সংগীত দেশের অসহ্য দুঃখের অপরিসীম বেদনায় অশ্রুসজল। 'বার'-গানগুলির দুইটি দিক আছে। সে গান তাঁহার কালের বেদনার মর্মন্তুদ বাণী। শিখেদের কণ্ঠে 'আসা-দি-বার' সকাল-সন্ধ্যায় গীত হয়। গুরু গোবিন্দ ও তৎশিষ্যদের ইহাই ছিল বিশেষ প্রিয় সংগীত। 'আসা-দি বার' যেমন তাৎকালিক ভারতবর্ষের নৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক দুর্গতির করুণ কাহিনী, তেমনই নানকের নব-ধর্মের তত্ত্বকথা উহাতে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। নানক ঘোষণা করিতেছেন, কোন বাক্যসমষ্টির মধ্যে ধর্ম নাই, কোন মন্ত্র উচ্চারণে ধর্ম নাই, কবরস্থান শ্মশানে বসিয়া সাধনায় ধর্ম নাই, যোগাসনে বসায় ধর্ম নাই, তীর্থযাত্রায় ধর্ম নাই, আচারে ধর্ম নাই, সকল মানুষকে মানুষ বলিয়া জানাই ধর্ম, এই তথ্যের স্বীকৃতি ও পালনেই ধর্ম। এই তথ্যের আংশিক প্রচার ও পালন বা সমন্বয় করিয়াই আধুনিক যুগের সকল মহাবিপ্লব সাধিত হইয়াছে।

এক দলের রাজ্যলোভ ও নূতন দলের রাজ্যস্থাপন, ইহার ইতিহাস রচনা হয় রক্তের অক্ষরে। 'খুনকে সহিলে গাবাহি নানক' 'বাবর-বাণী'তে পাঠান প্রভুত্ব ধ্বংস করিয়া বাবর কর্তৃক মোগল মালিকানা স্থাপনের পরিস্ফুট পরিচয় মিলে। 'বাবরবাণী' পড়িয়া মাত্র বুঝিতে বাকি থাকে না গুরু নানক পার্থিব জগতকে, ইহ-লৌকিক সত্যকে শূন্য বলিয়া কখনও উড়াইয়া দেন নাই, খৃষ্টের মত দীন সেবকদের ভগবানকে উদ্দেশ করিয়া শেষ কথা বলিয়া দেন নই— Vengeance is Mine 'বাবর-বাণী'তে দেখি দেশের দুর্গতির দৃশ্যে বৈরাগী গুরুর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতেছে, রক্ত চঞ্চল হইতেছে, ধিক্কারে অধীর আবেগে ভগবানের বিরুদ্ধে ভগবানের নিকট অভিযোগ করিতেছেন—'খুরাসান খসমনা কিয়া হিন্দুস্তান ডেরেয়া।' খোরাসানেরই তুমি বন্ধু, হিন্দুস্থানের কি তুমি কেহ নও?

'বাবর-বাণী' হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—নারকীয় সেনা লইয়া কাবুল হইতে আসিতেছে বাবর। মানুষের নিকট সে দান-উপহারের দাবী করে পাশব-শক্তির ভয় দেখাইয়া, ও লালো! (আমিনাবাদ-বাসী লালো গুরুর প্রথম শিষ্য)। সভ্যতা ও সত্যবুদ্ধি দেশ ছাড়িয়া পলাইতেছে; অসৎ, পাপের মূর্তি বিরাট হইয়া উঠিতেছে, ও লালো!

কাজীও নয়, ব্রাহ্মণও নয়—এখন মিলনের মন্ত্র পাঠ করায় শয়তান ও লালো!

মুসলমানীরও আজ রক্ষা নাই, সে-ও শাস্ত্রমন্ত্রে তারস্বরে ভগবানকে ডাকিতেছে, ও লালো!

উচ্চজাতির ও নিম্নজাতির সকল হিন্দুনারীর ক্রন্দন উঠিয়াছে, ও লালো!

নানকের মরণাহত হৃদয় হইতে রক্তধারা উচ্ছলিত হইতেছে, ও লালো!

শবের সহর আমিনাবাদে বড় ব্যথার কান্না কাঁদিতেছি, আগত ধ্বংস হইতে সাবধান হওয়ার বাণী আমি উচ্চারণ করিলাম, ও লালো!

জগৎ-স্রষ্টা যিনি, তিনি জগৎ-দ্রষ্টা। তাঁহার বিচারে কোন ভুল নাই। বস্ত্র যেমন খণ্ড খণ্ড করা হয়, মানুষের দেহ তেমনই টুকরা-টুকরা হইবে। হিন্দুস্তান আমার ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণ করিবে।

এমন একজন মানুষ জন্মিবে, আমার এমন একজন শিষ্য (মরদকা চেলা) আসিবে, যাহার সংসারে তুলনা নাই (গুরু গোবিন্দ সিংহ)।

নানক সত্য কথাই বলিতেছে, সর্বসাধারণের সমক্ষে তাহা ঘোষণা করিতেছে—কেন না, সে কথা প্রকাশ করাই আজ প্রয়োজন। (তিলঙ্গ রাগ)।

নানক এখানে ঐতিহাসিক তথ্য বর্ণনা করিয়াছেন। মোগল-হিন্দু ও মুসলিম পুরুষ, হিন্দু ও মুসলিম নারীতে পার্থক্য রাখে নাই। এই অভিযানকে নারকীয় বলিয়া প্রচার করিতে নানকের কোন ভীতি নাই। এই পাপের অবসান হইবে, ইহার জন্য কঠিন শাস্তি মিলিবে—বলদর্পিত বর্বরের সম্মুখে তাহা ঘোষণা করিতে নানকের কণ্ঠ কম্পিত হয় নাই। মনে হয়, সাধ্য থাকিলে তিনি নিজেই সশস্ত্র প্রতিরোধ করিতেন।

বিক্ষুব্ধ ব্যাকুল নানক বলিতেছেন—প্রভু, আজ খোরাসানের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন; খোরাসানের বিভীষিকা আজ হিন্দুস্তানে প্রবেশ করিল।

মোগলের বেশে মৃত্যু আজ হিন্দুস্তানে প্রবেশ করিল। ত্রুটি প্রভু তোমার নয়।

তবু এত যে বিপুল ব্যথা, এত যে করুণ কান্না—হে প্রভু, তোমাকে কি ব্যথা দেয় না!

হে প্রভু, তুমি তো সবাকার! যে প্রবল সে যদি অকরুণ হয়, করুণ কান্নার প্রতিবাদ শুধু ব্যর্থই নয় অশোভনীয়। যদি ক্ষুধিত সিংহ মেষপালে প্রবেশ করে, মেষপালককে বীর্য প্রকাশ করিতে হইবে। (রাগ আসা)

তাই মেষপালক গুরুগোবিন্দের বীর্য সাধনের একান্ত কারণ ঘটিয়াছিল। গুরু নানক মাত্র তাহার শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাই দেন নাই, তিনি তাহার জন্য নিশ্চিত আবেদন করিয়াছিলেন। গুরুগোবিন্দ সেই আকুতি অংগীকার করেন।

নানক আরও দেখিতেছেন—হিন্দুস্তানের নারীর সৌভাগ্য-সিন্দুর-সীমন্ত কেশদাম ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন। যে গ্রীবায় শোভা প্রণয়িগণের মায়া-শৃংখল ছিল, তাহা আজ ধূলি-ধূসরিত।

বিবাহের দিন তরুণীদের আলোক-সুন্দর দেখাইতেছিল। হস্তিদন্তখচিত শিবিকায় তাহারা পুরপ্রবেশ করে। সেদিন গন্ধবারির অভিষেক হইয়াছিল। দেহাবরণের ঔজ্জ্বল্যে চারি দিক উদ্ভাসিত হইয়াছিল।

নব গৃহপ্রবেশের দিনে লক্ষ মুদ্রায় প্রথম উপহার নিবেদন করা হয়।

গৃহিণীপদ-সমাবর্তনের দিনেও এই উপহারের পুনরাবৃত্তি ঘটে।

বিচিত্র শয্যা অপরূপ দেহস্পর্শে ধন্য হইয়াছিল।

সেই রমণীরা মুক্তামালা-লুণ্ঠিত, গলবদ্ধ রজ্জু।

একদিন যে সৌন্দর্য ও সম্পদ ছিল বিচিত্র মোহ-মায়া, আজ তাহাই হইল অতি কঠিন শত্রু।

অদূর অনাগত দিনের জন্য প্রস্তুত থাকিলে কি আজ এই অঘটন ঘটিতে পারিত?

কিন্তু, হিন্দুস্তানের রাজারা কামনার আগুনে জ্বলিয়া ছাই হইয়া গিয়াছিল।

জনহীন ধ্বংসস্তূপপুরী বাবরের জয়স্তম্ভ। সেখানে শিশুদের জন্ম মাতা অবশিষ্ট থাকে না।

হিন্দুকে পূজা করিবার সে অবসর দেয় না, মুসলমানও নমাজ পড়িবার জন্ম বাদ পড়িয়া থাকে না।

রামকে যাহারা হেলা করিয়াছে, রহিমকে ডাকিবে বলিয়া তাহারা রেহাই পায় না। (রাগ আসা)

কাতর, আকুল নানক বলিতেছেন—অশ্বশালায় চঞ্চল অধীর অশ্বের হ্রেষাধ্বনি কোথায় গেল, বিষাণ, শংখরব আজ নীরব কেন? দর্পণ কোথায়? সেই সব অপরূপ আনন কোথায়? হে প্রভু, চক্ষের পলকে যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা ঘটিবে। কোথায় তোরণ, কোথায় অট্টালিকা, কোথায় প্রাসাদোপম সরাইখানা? কোথায় গোলাপের শয্যা-সম্ভার, কোথায় প্রাসাদোপম সরাইখানা! কোথায় গোলাপের শয্যা-সম্ভার, কোথায় সেই নারীরা একবার যাহাদের চক্ষে দেখিলে নয়ন হইতে নিদ্রা নিত্য-পলাতক। ধন ছিল মোহ, তাহাতেই সকলের নাশ ঘটাইয়াছে। পাপ বিনা ধন পুঞ্জীভূত হয় না।

প্রভু যেদিন পুণ্যহীন করেন, দুঃখের আবির্ভাবে বিলম্ব ঘটে না।

বাবরের জয়যাত্রা অসংখ্য পীর (মন্ত্র পড়িয়া) থামাইতে গিয়াছিল। প্রাসাদে প্রাসাদে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। শিশুদের গাত্রত্বক্ উন্মোচন কালে তাহারা বড় ক্রন্দন করিয়াছিল। কোন মোগল পীরের মন্ত্রপাঠে স্তব্ধ হয় নাই।

হিন্দুস্তানের যাদুও খাটিল না। মোগল-পাঠানের রণে মোগলের ছিল আগ্নেয়াস্ত্র।

পুরুষত্বহীন হিন্দুস্তান প্রভুর দয়ার অধিকার নাশ করিয়াছে, মৃত্যু দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইতেছে।

হিন্দু, তুর্ক, ভট্টি, ঠাকুর, নারীরা হয় মোগল-কবলিত, নয় মৃত্যুশায়িত।

'বাবরানির' কবি গুরু নানক অতি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়াছেন—মোগল-পাঠানের যুদ্ধে বর্বর মোগলের ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। পুরুষত্বহীন, সভ্য হিন্দুস্তানের আগ্নেয়াস্ত্র সন্ধানের অবসর ছিল না। নানক ভাবমার্গে স্বপ্ন-প্রয়াণ করেন নাই। নিরুপায় বৈরাগ্যের ধুয়া তুলিয়া মানুষের প্রাণকে জীবন্মৃত করিয়া দেহ ও আত্মার বিশীর্ণতা ঘটাইয়া একটা কৃত্রিম আলো-অন্ধকারের কুহকলোকে যাত্রা করেন নাই। হিন্দুস্তানের পতনের জন্য ক্রুদ্ধ অভিযোগ আনিয়াছেন—আমাদের অশক্তি, দৌর্বল্য পুরুষত্বহীনতার বিরুদ্ধে। পরাধীনতার যুগে জীবনকে রক্তহীন স্তিমিত করিবার যে সাধন-পদ্ধতি চলিতেছিল, গুরু নানক সে পথের মোড় ফিরাইবার প্রয়াস করিয়াছিলেন।

* * * *

(খ) গুরু গোবিন্দ সিংহ

চরম যুগসন্ধিকালে নানকের মানসপুত্র গুরু গোবিন্দ নব যুগাবতাররূপে আবির্ভূত হইলেন।

গুরু তেগবাহাদুর ও নবমবর্ষীয় পুত্র গোবিন্দ।

ধূলিধূসরিত, মুহ্যমান একদল কাশ্মীরী ব্রাহ্মণপণ্ডিত শিখগুরুকে নিবেদন করিল, আলমগীরের তরবারি রাজ্যশাসন করিয়াই ক্ষান্ত হইবে না, ধর্মশাসনও প্রবর্তন করিবে।

ধর্মের নামে এই কঠিন অত্যাচারের কাহিনীতে যতই সে কাহিনী শুনিতে লাগিলেন—সন্ধ্যাতারার মত স্নিগ্ধ আঁখি বেদনায় করুণ হইয়া উঠিল। নিবেদন সাংগ হইয়াছে। বাক্যহীন গুরু অস্থির পাদচারণ করিতে লাগিলেন। নবমবর্ষীয় বালক সব শুনিল, এইবার অপাপবিদ্ধ নয়ন তুলিয়া প্রশ্ন করিল—পিতা, কি হইবে?

পিতা উত্তর করিলেন—বড় দুর্দিন, পুত্র। শাসক তাহার কর্তব্য ভুলিয়াছে। শাসিতকে সে আজ আর তাহারই মত মানুষ বলিয়া দেখিতেছে না। ইহা সহ্য করা আর চলিবে না। জোড়াতালির কাজ আর নয়, নাশ করিতে হইবে, এবার নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। চাই বলিদান—অকলংক শুভ্র, পবিত্র প্রাণের বলিদানে নূতন হোমানল প্রজ্বলন।

মুহূর্তমাত্র নীরব রহিয়া পুত্র স্পষ্ট স্বরে উত্তর করিল—গুরুর অপেক্ষা পবিত্র কে? গুরুর অপেক্ষা অকলংক কে?

গুরু কাশ্মীরী পণ্ডিতদের বলিলেন, বাদশাহকে জানাও, আমি ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেই সারা দেশ ইস্‌লামের আশ্রয় লইবে।

গুরু তেগবাহাদুর ধর্মান্তর গ্রহণের পরিবর্তে প্রাণদান করিলেন।

* * * *

বলিয়াছি, গুরু নানকের স্বদেশপ্রেমের স্বকীয়তাতেই গুরু গোবিন্দের আবির্ভাব সূচিত হইয়াছিল। দশম ও শেষ গুরু নির্বিশেষ বাধ্যতার দীক্ষা লন, গুরু অনঙ্গদেবের নিকট। দাস্যের শিক্ষাদান গুরু অমর দাসের নিকট, আত্মোৎসর্গের আদর্শ পান গুরু অর্জুনদাসের নিকট, ধর্মনীতি ও ক্ষত্রিয় নীতির মন্ত্র লন গুরু হরগোবিন্দের নিকট, নিজের প্রাণ দিয়া জাতির প্রাণ সঞ্চারের শিক্ষা লন গুরু তেগবাহাদুরের নিকটে। গুরু দশজন—শিখমতের এই কথাটির একটি বিশিষ্ট অর্থ আছে, গুরু-পরম্পরায় একই গুরুর নব নামে বা কলেবরে দশবার আবির্ভাব হইয়াছে। দশজন গুরুর মধ্য দিয়া একই সাধনধারার চরম সিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সাধনার পরম সিদ্ধিকালে কোন বিশিষ্ট মানুষকে উপলক্ষ না রাখিয়া সাধনলব্ধ বোধির আধার হইল—গ্রন্থ সাহেব।

গুরু গোবিন্দের স্বীয় কীর্তি অবদান—জাতিহীন এক শিখজাতি সৃষ্টি—ইতিপূর্বে শিখেরা অন্যতম হিন্দু সম্প্রদায় মাত্র ছিল। গুরু গোবিন্দের অমর কৃতিত্ব—একটি সম্প্রদায়ের জাতীয়তার সত্তা আরোপণ। গুরু গোবিন্দ অমৃত-সরোবরে সর্বজাতির শিখের অধিকার ঘোষণা করিলেন। গুরু আদেশ করিলেন—গুরুদ্বারে (মন্দিরে) দেওয়ানে (ধর্মসভায় যোগ দিলে গুরু লঙ্গরের (সাধারণ পাকশালার) প্রসাদ একত্র বসিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। পাচকের জাতি বিচার নাই, কিন্তু পবিত্রতার প্রাধান্য আছে। নানকের দার্শনিক তত্ত্বে প্রতিমা-প্রতীকের পূজা, ছুঁৎমার্গের বন্ধন হইতে মুক্তি-বাণী ঘোষিত হইয়াছিল। গুরু গোবিন্দ এই দার্শনিক তত্ত্বের প্রতি শিখকে অঙ্গীকৃত করিলেন। জাতিবাদের ছুঁৎমার্গ, আহারের ছুঁৎমার্গ, তীর্থের ছুঁৎমার্গ, পূজার ছুঁৎমার্গ, মন্দিরের ছুঁৎমার্গ দশম ও শেষ গুরুর নিকট কাহারও রেহাই রহিল না। বড় কম লোক পিছাইয়া গেল না। অবশিষ্ট জন লইয়া এক শিখ জাতি উদ্ভূত হইল।

জীবাণু আছে—যাহার একটি দ্বিখণ্ডিত করিলে দুইটি জীবাণু হয়। দুইটি দ্বিখণ্ডিত করিলে চারিটি হয়। ভারতবর্ষের জাতিবাদ এমনই এক জীবাণু। বহু মহাপুরুষ প্রাক-বৌদ্ধযুগ হইতে ব্রাহ্মসমাজ-আর্যসমাজের স্থাপনা পর্যন্ত জাতিবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছেন।

শাণিত অস্ত্র মর্মাঘাত করিয়াছেন। জাতিবাদের জীবাণুর কিন্তু মৃত্যু ঘটে নাই; সকল বিদ্রোহ মাত্র অন্যতম নব জাতির সৃষ্টি করিয়াছে। শিখধর্ম হিন্দু জাতিবাদ ধ্বংস করিতে যাইয়া অসংখ্য জাতির সহিত এক নব শিখ জাতির যোগ করিয়াছে।

ধর্মপ্রচারের গোড়ার দিকে সর্বপ্রকার প্রতীকের বিরুদ্ধে প্রায় গোঁড়ামি দেখা যায়। প্রতীকের বিরুদ্ধে, পূজা-প্রণালীর কাঠিন্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবেই নবধর্ম প্রবর্ত্তিত হয়। আবার অচিরকাল মধ্যে নবধর্মে, প্রবর্ত্তকের কোন দাবী না থাকিলেও, তাঁহাকে অবতার বা দেবতা করিয়া তোলা হয়। পূজা-প্রণালী কঠিন রীতিতে আবদ্ধ হয়। নানক বলিলেন—'তু হৈ নিরঙ্কার, নানক বান্দা তেরা।' তিনি বার বার বলিয়াছেন যে তিনি অবতার নন, তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ নন, তিনি ঈশ্বর-জানিত পুরুষও নন, তিনি সকল নীচ জাতির মধ্যে নীচতম জাতির লোক, যিনি উচ্চে আছেন তাঁহার সহিত প্রতিযোগিতার কোন প্রয়াস তাঁহার নাই। আদিগুরুর প্রতিধ্বনি করিয়াই শেষগুরু বলিলেন—আমাতে যাহারা ঈশ্বরত্ব আরোপ করিবে, তাহারা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। নানক বলিলেন—দেশভেদে, কালভেদে মানুষের তারতম্য ঘটিয়াছে, নহিলে হিন্দু ও মুসলমান, শ্বেত ও কৃষ্ণ সকল মানুষের এক পরিচয়—মানুষ। নানক সেই মানুষ। বাড়াইয়া বলিলে মাত্র এই বলা যায়—'হর যুগ যুগ ভগত উপৈয়া,' যুগে যুগে ভক্তের আবির্ভাব হয়, অবতারের নয়। গুরু-পরম্পরা কালেই নানককে প্রায় দেবতা-করণ করা হইয়াছিল। গোবিন্দ গুরু-পরম্পরা ধারা রোধ করিলেন। তিনি ব্যক্তিকে নয়, খালসা বা শিখ-সমাজকে গুরু বলিয়া নির্দেশ দিলেন।

* * * *

গোবিন্দ প্রিয়তম পিতার মৃত্যু দাবী করিয়াছিলেন।

আনন্দপুরের বৈশাখী মেলায় সমাগত শিখ বা শিষ্যদের সম্মুখে শাণিত তরবারি আস্ফালন করিয়া গুরু কঠিন কণ্ঠে দাবী করিলেন—প্রাণ কে দিতে পারে?

মৃদু গুঞ্জন স্তব্ধ হইল। নিষ্কম্প নীরবতা থমথম করিতে লাগিল।

সম্মুখে তরবারি চালনা করিয়া শান্ততর স্বরে গুরু বলিলেন—গুরুর আদেশে অকারণে এখনই কে প্রাণ দিতে পারে?

অধীর কণ্ঠে গুরু বলিলেন—আমি বলিদান চাই, সাচ্চা শিখ কেহ নাই!

লাহোরের ক্ষত্রি দয়ারাম অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিল—হে সত্যগুরু, আমার শির গ্রহণ করুন।

গুরু তাহাকে নিজ শিবিরের ভিতর হইয়া গেলেন; ক্ষণেক পরে সভায় যখন ফিরিয়া আসিলেন, দেখা গেল, তরবারি রক্তসিক্ত।

গুরু আবার দাবী করিলেন—আরও প্রাণ চাই আমার।

জনতা নির্বাক, স্তম্ভিত।

গুরু দ্বিতীয় বার বলিলেন—আরও বলিদান চাই আমার।

তৃতীয় বার বলিলেন—শিখ আর নাই?

এবার দিল্লীর ধর্মজাঠ অগ্রসর হইল—প্রভু, আমার শির গ্রহণ কর।

গুরু তাহাকে ভিতরে লইয়া গেলেন। ফিরিলে দেখা গেল, তরবারি হইতে রক্তবিন্দু ঝরিতেছে।

গুরুর মূর্তি আরও কঠিন। গুরু হুংকার করিলেন—আর কে মরিতে পারে?

দ্বারকাবাসী রজক মোহকাম স্বীয় জীবন অর্পণ করিলেন।

গুরু বুঝি উন্মত্ত হইয়াছেন। তরবারি রক্তাক্ত, হস্তমুষ্টি রক্তাক্ত। গুরুর দাবীর আর সীমা নাই চতুর্থ বার গুরু প্রাণদান দাবী করিলেন,

ক্ষৌরকার সাহেবচাঁদ প্রাণ উৎসর্গ করিলেন।

রক্তলালসা-মত্ত দানব বুঝি গুরুমূর্তি ধরিয়াছে। রণচণ্ডী-সাধক গুরু যেন আজ চণ্ডীরূপা হইয়াছেন।

গুরু সিংহনাদ করিলেন—আরও চাই, আরও প্রাণ চাই।

ভীত ক্ষুব্ধ জনতা পলাইতে লাগিল। তখন মশকবাহী জগন্নাথ গুরুর চরণে আত্মোৎসর্গ করিল।

ঈষৎ পরে গুরু যখন বাহিরে আসিলেন, তখন দেখা গেল সংগে—পঞ্চ পিয়ারে।

গুরুর তরবারির রক্ত ছাগবলির। শর্করার সরবতে গুরুর দ্বিমুখ শাণিত তরবারি স্পর্শ করিয়া জপজি, জপজি, আনন্দ খাস, ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গুরু পঞ্চ পিয়ারাকে নব দীক্ষা দিলেন। দীক্ষিত শিখের পদবী হইল সিংহ। পূর্বজাতি লোপ পাইল। বিরাট শিখ সমাজের প্রতি শিখ পরস্পরের ভ্রাতা। অস্ত্র তাহাদের নিত্যসংগী হইবে; শত্রুকে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন ধর্মহানি বলিয়া নির্দিষ্ট হইল; তামাকু ও অন্যান্য নেশার বস্তু রহিত হইল; একের বিপদে অন্যকে সংগী হইতে হইবে। যাহা অন্যায়, যাহা অ-সংগত তাহা শিখের পক্ষে অ-কর্তব্য; ভগবানের পুত্র সকল মানুষকে নিজের ভাই বলিয়া জানিয়া ও মানিয়া, দরিদ্র ও আতুরকে সাহায্য ও সেবা ও বিপন্নকে আশ্রয় দান শিখ ধর্মের ভিত্তি বলিয়া নির্ণীত হইল।

পঞ্চ পিয়ারার দীক্ষা হইলে স্বয়ং গুরুই তাঁহাদের নিকট দীক্ষা লইলেন। বলিলেন: এখন হইতে দীক্ষিত শিখসংঘের নাম হইল খালসা এবং আজ হইতে খালসাই গুরু, গুরুই খালসা। আজ হইতে দীক্ষিত শিখে ও গুরুতে কোন প্রভেদ রহিল না।

* * * *

মুঘল আনন্দপুর অবরোধ করিয়াছে। শিখেদের আর কোন আশা-ভরসা নাই। গুরুমাতা স্বয়ং বলিতেছেন—দুর্গ ত্যাগ কর, শত্রু তো শপথ করিয়াছে দুর্গ ত্যাগ করিলে শিখেদের প্রাণহানি করিবে না, যথা ইচ্ছা স্বাধীন ভাবে যাইতে দিবে।

একদল বহু পরীক্ষিত শিখ, সংখ্যায় চল্লিশ জন গুরুকে আসিয়া নিবেদন করিল—প্রভু, অনাহার অসহ্য। চলুন, আমরা দুর্গ পরিত্যাগ করি। গুরু বলিলেন—লিখিয়া দাও, তোমরা শিখ নও, গোবিন্দ তোমাদের গুরু নয়।

স্বীকৃতিপত্র লিখিয়া দিয়া তাহারা বিদায় লইল।

মুঘল তাহাদের যাত্রাপথে বাধা দেয় নাই।

দীর্ঘদিন প্রিয়জন-বিচ্ছেদ-কাতর সৈন্যেরা গৃহাভিমুখী হইল। সাদর স্বাগত সম্ভাষণের প্রত্যাশায় তাহাদের গতি দ্রুত হইল।

পথে মাতা ভাগো চলিত নারীদলের সহিত সাক্ষাৎ হইতে সম্ভাষণ হইল—কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, তোমরা পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে চাও? তোমরা পুরুষ নও, তোমরাই নারী, যাও তোমরা গৃহে যাইয়া রন্ধন কর, চরকা কাট। আমরাই যুদ্ধে যাইতেছি।

চল্লিশ জন সবাই যে পথে বাঁচিবার আশায় আসিয়াছিল মৃত্যুপণ করিয়া পাপের ক্ষালন করিতে সেই পথেই ফিরিল। কাহারও সাহস হইল না গুরুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে। চল্লিশ জন শিখ

মুঘল বাহিনীর পথ রোধ করিল। শুধু পথ অবরোধ করে নাই মুঘল বাহিনীকে প্রতিহত করিয়াছিল, গুরুর যাত্রাপথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। প্রত্যেকটি লোক এই মহাযুদ্ধে প্রাণ দিয়া 'মুক্ত' হইল। মৃত্যুশয্যায় গুরু-দর্শন ঘটিয়াছিল।

মরণোন্মুখী শিষ্যকে গুরু ডাকিলেন—মোহন সিং, পুত্র! গুরুর পদস্পর্শের অক্ষম প্রয়াস পাইয়া চরম চেষ্টায় শিখ আবেদন করিল, গুরু, আমরা বিশ্বাসঘাতক নই; মরিলেও আমাদের শান্তি নাই; প্রভু, আমাদের সেই কলংকিত স্বীকৃতি-পত্র ছিন্ন কর; আমাদের মুক্ত কর। বে-দাওয়া পত্র গুরু ছিন্ন করিলেন। পুণ্যতীর্থ মুক্তসর ভারতের ধার্মপলী।

* * * *

চমকৌরের অবরোধ চলিতেছে। গুরু প্রতিদিন ভক্ত-নিধন দেখিতেছেন। গুরু অবিচল। সংসার 'বিচিত্র নাটকের' তিনি গুরু। শিষ্যরা প্রত্যেকে যাহাতে নিজ অংশ নির্ভুল অভিনয় করে তাহার ব্যবস্থা করাই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য। গুরুর জ্যেষ্ঠ পুত্র অজিত সিংহ যুদ্ধে যাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। গুরু তাঁহার চতুর্দশ বর্ষ বয়স্ক পুত্র যুজহরকেও সংগে যাইতে বলিলেন। গুরু নিজের হাতে তাঁহার পাগড়ী বাঁধিয়া দিলেন। ক্ষুদ্র একখানা তরবারি তাঁহার হাতে দিলেন। অজিত সিংহ প্রাণপণ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন। বালক যুজহর সেই ভীষণ অসম যুদ্ধে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পিতার নিকট আসিয়া পানী প্রার্থনা করিল। পিতা বলিলেন—পুত্র, তোমার ভ্রাতা যেখানে আছে সেখানে যাও, অমৃতের পাত্র তাহার নিকটে আছে। যুজহরকে আর বলিতে হইল না।

পুত্রদের মৃত্যু সংবাদে গুরুর মুখ অপূর্ব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

গুরুর অপর দুই পুত্র নয় বৎসরের জোরাবার সিং ও সাত বৎসরের ফতে সিং শত্রুহস্তে পড়িল। ধর্মান্তর গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষার প্রস্তাব তাহারা অস্বীকার করায় তাহাদের প্রাচীরের মধ্যে গাঁথিয়া ফেলা হয়। রক্তাক্ষরের পত্রে এই সংবাদ পিতার নিকট পৌছে। গুরু নির্বাক রহিলেন। সহসা হস্তের কৃপাণাঘাতে নিকটস্থ একটি গুল্মের মূলোচ্ছেদ করিলেন।

রায়কল্লকে বলিলেন—আমার পুত্রেরা মরে নাই, মুঘল সাম্রাজ্যের তমোপিত ভবিষ্যৎ খালসারাজে তাহারা বাঁচিয়া রহিল। এই ক্ষুদ্র গুল্মের মূলোচ্ছেদের মত মুঘল সাম্রাজ্যের মূলোচ্ছেদ হইবে।

* * * *

১৭০৬ খৃষ্টাব্দ। গুরুর চার পুত্র মৃত, পিতা মৃত, মাতা মৃত, পত্নী বিচ্ছিন্ন। দিনের পর দিন বৃথা মৃত্যুবরণ করিয়া শিষ্যেরা স্বল্পসংখ্যক হইতেছে মাত্র। গুরুর এমন দুর্দিন আর আসে নাই। এই তিমিরান্ধকারে আশার ক্ষীণ রশ্মিও বুঝি কোথাও নাই। পরীক্ষার যদি শেষ না থাকে, মানুষের পরীক্ষা দিবার শক্তিরও কি সীমা নাই? সেই মহামুহূর্তে গুরুর তূর্যনাদ শোনা গেল জাফর-নামা বা জয়পত্রে, আলমগীর, আমার চারিপুত্র (ভুজংগ) হত্যা করিয়াছ, কিন্তু সর্পপিতা তো মরে নাই। জীবনের এই ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গ নিবাইয়া কি বীরত্ব দেখাইয়াছ? মাত্র প্রমত্ত অগ্নিকে আরও চঞ্চল করিয়াছে। কেন তুমি হজরতের সেবক বলিয়া দাবী কর? গৃহীত শপথ তুমি পালন কর নাই, ভগবানের বাক্য তুমি পালন কর নাই—ভগবান সে কথা ভুলিবেন না।

দমদমায় মুসলমান সর্দার দল্লা গুরুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। গুরুর চরণ স্পর্শ করিয়া দল্লা বলিলেন—আমার দল বহুযুদ্ধ প্রবীণ সৈন্য-সমৃদ্ধ; তাহাদের ভীষণ-খ্যাতি শত্রু-হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করে। আমরা আপনার প্রতি অধার্মিকের অত্যাচারের প্রতিকার করিব।

একজন শিষ্য প্রবেশ করিয়া গুরুকে প্রণাম করিয়া গুরুর চরণে একটি বন্দুক রাখিয়া বলিল, "বন্দুকটি আমার স্বহস্ত-নির্মিত, গুরু ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কৃতার্থ হইব।"

গুরু দল্লাকে বলিলেন, বন্দুকটা পরীক্ষা করিতে চাই। তোমার দলের একটি লোক দিতে পার?

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দল্লা উত্তর করিল—প্রভু, শুধু বন্দুকটা পরীক্ষার জন্য মানুষকে বন্দুকের নিশানা হইবে। এমন করিয়া বৃথা কে প্রাণ দিবে?

গুরুর আদেশে স্বীয় দলে লোকের সন্ধানে গেল।

অকৃতকার্যতার চিহ্নস্বরূপ দল্লা নতমস্তকে ফিরিয়া আসিল। গুরু একজন শিখকে বলিলেন যাও, কাহাকেও ডাকিয়া আন, নূতন বন্দুকটা পরীক্ষা করিতে চাই।

একটু পরেই কয়েক জন শিখ দৌড়াইয়া আসিল, কেহ নগ্নদেহ, কেহ শিরস্ত্রাণ বাঁধিতেছে। গুরু সামনের একজনকে ডাকিয়া বলিলেন—তোমার বড় মরিবার সখ। আচ্ছা, তুমিই এদিকে এস।

শিখ সোজা হইয়া বুক পাতিয়া দাঁড়াইল।

গুরু বন্দুক উঠাইলেন।

হঠাৎ একজন শিষ্য গুরুর দিকে দৌড়াইয়া আসিল—প্রভু, আমার নিবেদন গ্রহণ করুন।

—বল।

—প্রভু, আমি উহার সহোদর। পিতার সকল বস্তুতে আমাদের সমান অধিকার। আমি গুরু-পিতার দানের অংশ প্রার্থনা করি।

গুরুর ওষ্ঠে ঈষৎ হাসির রেখা দেখা গেল—ভাল, ভ্রাতার ঠিক পশ্চাতে দাঁড়াও। বন্দুকের গুলী দু'জনকেই ভেদ করিতে পারিবে।

গুরু বন্দুক তুলিলেন।

গুলী উভয়ের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গেল।

* * * *

গুরু গোবিন্দের ব্যক্তিত্বের ও ভাবধারার আর একটা দিক বুঝিতে হইবে। তিনি যে নানক পরম্পরায় শিখেদের আধ্যাত্মিক গুরু, ইহা সুনিশ্চিত সত্য।

গুরু গোবিন্দের নিজস্ব অনবদ্য সৃষ্টি আনন্দপুর। আনন্দপুরে কীর্তনের যে ঢেউ উঠিয়াছিল তাহার ঢেউ লাগিয়াছিল কাশ্মীর হইতে বিহারে। আনন্দপুরে স্বর্গ নামিয়া আসিয়াছিল। শিখধর্মের মূল অঙ্গ নামকীর্তনে গোবিন্দের জীবনে কোনদিনই কোন কারণে বাধা পড়ে নাই। গুরু গোবিন্দ তাঁহার স্বল্প ও অতি কর্মব্যস্ত ঘটনাবহুল জীবনে যে বিরাট পরিমাণ গাথা ও কীর্তনাবলী রচনা করেন, বর্তমান শিখ শাস্ত্রাবলী তাহার তুলনায় স্বল্পাংশ মাত্র। আনন্দপুর অবরোধ কালে এবং সেখান হইতে রোপারে পশ্চাদ্‌গমনের পথে বিংশ বৎসরের সৃষ্ট ও সংগৃহীত গ্রন্থাবলী প্রায় সবই নষ্ট হয়। দশম গ্রন্থে গুরুর বিরাট সৃষ্টির সামান্যাংশ মাত্র রক্ষা পাইয়াছে। তাঁহার সভায় নিত্য রাম ও কৃষ্ণ-কাহিনী কীর্তন হইত। গুরুর

জীবনে প্রথম ভাঙ্গানীর যুদ্ধজয়ের পর এক মুহূর্তও পররাজ্য জয়ে বা লুণ্ঠনে ব্যয়িত হয় নাই। যুদ্ধবিরতি মাত্র নাম দান মহোৎসব আরম্ভ হইত। মুক্তসরের মহাযুদ্ধের পরে লখী জঙ্গলে গুরুর অবস্থানকালে অতি দুর্দিনেও নামকীর্তনের সীমা ছিল না। এখানেই খ্যাত মুসলমান সাধু ইব্রাহিম শিখধর্ম গ্রহণ করেন। গুরুর কীর্তন অসংখ্য লোকের মনোহরণ করিয়াছিল :

প্রাণের গুরুর কীর্তন শ্রবণে মাঠের মহিষের অর্ধভক্ষিত তৃণ মুখ হইতে খসিয়া পড়িত ; তাহারা তৃষিত জিহ্বা বারি হইতে উঠাইয়া লইত।

সে কীর্তন ধ্বনি উঠিলে কেহ সঙ্গীর প্রতীক্ষা রাখিত না, একেলা একেলা দৌড়াইয়া আসিত।

তালবন্দী সাবোতে গুরুর বিশ্রামকালে সেখানে এক নব-আনন্দপুর সৃষ্টি হইয়াছিল। এখানেই গুরু আদিগ্রন্থ নিজ স্মৃতি হইতে আবৃত্তি করেন। দীর্ঘদিন পরে গুরুপত্নীর এখানে স্বামী-সাক্ষাৎ ঘটে।

—আমার চারিজন (পুত্র) কোথায় ?

সম্মুখের শিষ্য সমূহের প্রতি অঙ্গুলী সংকেত করিয়া গুরু উত্তর দিলেন—এই তো আমার সন্তানেরা : ইহাদের রাখিতে চারিজন গিয়াছে ! চারিজন গিয়াছে শত সহস্র আসিয়াছে।

তালবন্দীর আকাশ-বাতাস নাম-কীর্তনে এমন পুণ্যমধুর হইয়াছিল যে গুরু ইহার নামকরণ করিলেন—কাশী।

গুরু গোবিন্দের জীবনধর্মের আংশিক প্রতিফলন দেখি রাণা প্রতাপসিংহে, শিব ছত্রপতিতে ও বিবেকানন্দে।

* * * *

বস্তুবিচারে যাহা অতুলন, ভাববিচারে যাহা অনন্য, সেই সকল মূল্যের অতীত স্বাধীনতা আমাদের প্রাপ্তি হইয়াছে। এ-কথাও আমরা সকলে জানি, যাহা যোগ্য মূল্য না দিয়া পাই, তাহার যোগ্য মর্যাদা দান অতি বিরল দৃষ্টান্ত স্বাধীনতার মূল্য আমরা স্বেচ্ছায় কে কয়জনে কি দিয়াছি ? স্বভাবতঃই স্বাধীন হওয়ায় আমাদের প্রত্যেকের অধিকারের দাবী আকস্মিক ভাবে আত্যন্তিক বৃদ্ধি হইয়াছে কিন্তু, ব্যক্তিজীবনে স্বাধীনতায় দায়িত্বের লক্ষণীয় বাস্তব স্বীকৃতি ঘটিয়াছে কি ? ব্যক্তি-জীবনে আমরা যে স্বাধীনতার গৌরব অনুভব করি, সেই নিত্য স্বাধীনতা প্রবল ক্রিয়মাণ শক্তিস্বরূপে কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মৌলিক পরিবর্তন ঘটাইয়াছে ? নিত্য-কালের নাবালক কি আজ সত্যই সাবালক হইয়াছে ? স্বাধীন হওয়ার পরেও আমাদের পাপ ও দুঃখের জন্য অন্যকেই দায়ী করিব ? নিজেদের কাজ, দেশের কাজ বলিয়া কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে দৈনিক কর্ম গুণে ও পরিমাণে উচ্চ এক নূতন মান স্থাপন করিয়াছে ? ব্যক্তি-জীবনে স্বাধীনতাকে অঙ্গীকার করিয়া দিনে দিনে কোন মহৎ পরিবর্তন ঘটিতেছে কি ? আমাদের পর্যায়ের বা নব-পর্যায়ের উত্তর পুরুষদের জীবন অমৃত আস্বাদনে জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে ? অমূল্য স্বাধীনতার মূল্য আমরা দিব, ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে জাতি কি সেই দীক্ষা লইয়াছে ?

একদা দেশের যে কঠিন দুঃখ গুরু নানকের চক্ষে রক্তাশ্রু বহাইয়াছিল, দেশের প্রতি যে অন্ধ অত্যাচারের প্রতিরোধে গুরু গোবিন্দ পরম পণ করিয়াছিলেন, সে পাপের বর্বর মূর্তি অন্তর্হিত হইয়াছে কিন্তু, যুগ যুগান্তরের দাস-মনোবৃত্তির মধ্যে তাহার প্রেতাত্মা সবলে বাঁচিয়া আছে। স্বার্থের স্থিতিবান সত্তা যেন ঐতিহাসিক অমরতা পাইয়াছে। ব্যক্তিস্বার্থের নিকট জাতিস্বার্থ আজও বুঝি পূর্বেরই মত পরাভূতই আছে। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক অবস্থা মূঢ় প্রাচীনতার গৌরবেই পবিত্র অক্ষয় বটের ন্যায় পূজার্হ হইয়া রহিয়াছে। প্রতি মানুষের, মানুষের মত বাঁচিবার প্রাথমিক অধিকার স্বীকার করার ধর্ম ব্যষ্টিজীবনে স্বীকৃত হয় নাই। সুপ্রাচীন পাপ নব সভ্যতার ছলনার আবরণে ঈষদাবৃত থাকিয়া একটু মিহি, মোলায়েম বলিয়াই, বুঝি আরও কঠিন বিষাক্ত হইয়া জাতিকে জর্জরিত করিতেছে। সেদিন পুরুষত্ব-হীনতায় জাতির যে লজ্জাবোধ ছিল, আজ বুঝি তাহাও লোপ পাইতে বসিয়াছে। ঐতিহাসিক কারণে কাপুরুষের জীবনে বাস্তবানুভূতি নাই, দিব্যানুভূতি নাই। জড়ের সহিত সংঘর্ষে আত্মার সজীবতার আকুতি কোথায় ? আবার সংসারে থাকিব, অথচ সংসার একান্ত মিথ্যা এই সর্বনাশা বলহীন মনোবৃত্তি জাতিকে জীবন্মৃত করিয়াছে। এখনও মাত্র কাগজপত্রে আদর্শ সূত্র বলিয়া ছাপাইতেছি, সভা-সমিতিতে আওড়াইতেছি—নায়ম্ আত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

নিত্যকার জীবন দিয়া সাধন করিতে হইবে—নায়ম্ বলহীনেন লভ্যঃ। জড়—অধ্যাত্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, কাব্য-দর্শন, সকলের গোড়ার কথা শক্তিসাধন। তাহার জন্য জীবনের সহিত নির্ভীক সরল পরিচয় চাই। ভূতগ্রস্ত মনের সাধ্য কি, তাহা কি করে ? পদ্মপত্রে শয়ন করিয়া আর ভাব-বিলাস নয় ; পক্ত-চেতনার দুঃখ-বিলাস নয়। নিজ জীবনের মধ্যে প্রাণশক্তির উদ্বোধন ঘটাইতে হইবে, তখন অন্য জীবনের সহিতও পরিচয় স্থাপন সম্ভব হইবে। জীবন্ত মানুষ প্রাণ-ধর্মকে বহুরূপা শক্তির লীলা বলিয়া প্রত্যক্ষ করিবে। বঞ্চিত জীবনের হাহাকারে মরা হইতে তাহাকে বাঁচিতে হইবে—অন্যকে বাঁচাইতে হইবে। যে পথই তাহার পথ হোক তাহা যেন মানুষের প্রাণধর্মকে উপলব্ধি করার সাধনা হয়। তবেই ধর্ম সত্য হইবে, সাহিত্য, কলা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ব্যবসা-বাণিজ্য, যুদ্ধ-শান্তি, সকলই সত্য হইবে। কল্পনাবিলাসে নয়, মাত্র জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা নয়, জীবনের দ্বারাই জীবনকে বুঝিতে হইবে। জীবনসাধনা শূন্যোদ্যানে সৌন্দর্য-বিলাস নয়। ব্যক্তি তাহার স্বীয় জীবনধর্ম স্বীকার করিলে জাতি তাহার জীবনধর্ম সার্থক করিবে।

গুরু নানকের আধ্যাত্মিক সাধনা, দেশের প্রতি প্রবল প্রেম আমাদের কালের যুগগুরুর মধ্যেও কোথায় যেন রহিয়া গিয়াছে। সজ্ঞানে না হোক অজ্ঞাতেও বটে—মরিয়া বাঁচ। এ বাণীতে তো গুরুপরম্পরায় অবতীর্ণ হইবে না গুরু গোবিন্দ সিংহ। মনে হইয়াছিল, দেশের শতদল মানস-কমল বুঝি এইবার পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইবে ; গুরু নানকের আধ্যাত্মিক বিত্তাধর তাঁহার ও গুরু গোবিন্দের দেশ-প্রেমের মূর্ত্ত অবতার কিন্তু শিবমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন না, সংহারের ভিত্তিতে সৃষ্টির উদ্দীপনা আনিতে পারিলেন না।

হে সুদর্শনধারি মুরারি, জাতি নব-নানককে পাইয়া ধন্য হইয়াছে, নব-গোবিন্দকে পাইলে কৃতার্থ হইবে। সারা জাতির সজ্ঞানে অজ্ঞানে ব্যাকুল হতাশে আকাশ-বাতাস করুণ মর্মরিত হইতেছে—গুরু কোথায় ? সে গুরু কোথায় যিনি বজ্রবাণীতে বলিবেন—জীবন সত্য। সেই প্রাণ-দেবতার পূজারী ডাকিবেন শির দাও।

হেলেন কেলারের সঙ্গে কলকাতায় কয়েক দিন

শঙ্করচন্দ্র দাস

বুধবার, ৩০-এ মার্চ, ১৯৫৫। বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে। অফিসে বসে আছি; কেরবো বলে গোছগাছ করছি। এমন সময় ফিনান্স ডিপার্টমেণ্ট থেকে একজন লোক এলো, হাতে একটা টাইপ-করা কাগজ ও একটা পিয়ন-বুক। স্বাক্ষর দিয়ে কাগজটা পড়ে দেখি, ডঃ (মিস্) হেলেন কেলার নাম্নী জনৈকা আমেরিকান মহিলা আগামী বৃহস্পতিবার, ৩১-এ মার্চ কলকাতায় আসছেন রাজ্যসরকারের অতিথিরূপে। রাজভবনে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। কলকাতায় মিস্ কেলারের অবস্থান কালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার থেকে আমাকে ওঁর সংক্ষেপলেখক (ষ্টেনোগ্রাফার) হিসাবে কাজ করার জন্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মিস্ হেলেন কেলার আমেরিকার একজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ এবং অন্ধ, মূক ও বধিরদের সম্বন্ধে একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখিকা। ইনি নিজেও অন্ধ ও বধির এবং কিছুটা মূকও বটে। 'আমেরিকান ফাউণ্ডেশন ফর দি ওভারসীজ ব্লাইণ্ড' নামক নিউইয়র্ক স্থিত একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রাচ্য-এসিয়ার দেশগুলিতে অন্ধ, মূক ও বধিরদের বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্ত ইনি বেরিয়েছেন। ভারত সরকারও ভারত-সফরের জন্ত এঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আমি হেলেন কেলারের নাম এর পূর্বে কখনও শুনি নি, যদিও ছাত্রমহলের অনেকেই 'পাথ্‌স অব পীস' নামক পুস্তকখানির মারফৎ তাঁর পরিচয় পেয়েছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ, পুস্তকখানি আমাদের প্রবেশিকা পরীক্ষার সময় পড়তে হয়নি। যাই হোক, একজন বিশ্ববিখ্যাত বিদেশিনী মহিলার সঙ্গে কাজ করতে হবে জেনে যুগপৎ ভয় ও আনন্দ অনুভব করলুম। ভয়—পাছে নিপুণ ভাবে কাজ সম্পন্ন করতে না পারলে নিজের, সরকারের ও ভারতীয়দের অকর্মণ্যতার পরিচয় দেওয়া হবে। আনন্দ—কারণ, এই প্রথম বিদেশী, বিশেষতঃ একজন বিশ্ববিশ্রুত মহিলার সংস্পর্শে আসবো, নতুন অভিজ্ঞতা আহরণ করবো, বিদেশীর নিকট দেশের গৌরব বৃদ্ধি করার সুযোগ পাবো।

মোটামুটি ভাবে হেলেন কেলার সম্বন্ধে কিছু জেনে নিলুম। উপরিতন কর্মচারীদের নিকটও কিছু নির্দেশ পেলুম। শিক্ষা



গত ৩১এ মার্চ রাজভবনে অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ হেলেন কেলার সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সহিত আলাপরতা। (বাম হইতে দক্ষিণে) কৌচে উপবিষ্ট ডঃ হেলেন কেলার, তাঁর সেক্রেটারি মিস্ পলি টম্সন ও দণ্ডায়মান বর্তমান লেখক, সম্মুখে উপবিষ্ট সংবাদপত্র প্রতিনিধিগণ

অধিকারের অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী সরকার পক্ষ থেকে যোগাযোগকারী কর্মচারী (লিয়েজন্‌ অফিসার) নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পরদিন বৃহস্পতিবার, ৩১-এ মার্চ। ৩-১৫ মিনিটের সময় হেলেন কেলার দমদম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছবেন, সঙ্গে আছেন তাঁর সেক্রেটারি, মিস্‌ পলি টম্‌সন এবং ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পর্যটন পরিচালক (টুর ম্যানেজার) মিস্‌ অ্যান্‌ স্তামসন। বেলা আড়াইটের সময় শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, যোগাযোগকারী কর্মচারী ও আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একখানি মোটরগাড়িতে দমদম অভিমুখে যাত্রা করলুম। গাড়ি রাস্তায় বেরিয়ে বিভিন্ন রাজপথের ওপর দিয়ে তীরবেগে ছুটতে লাগলো, যেন সে-ও আমন্ত্রিত অতিথিকে অভ্যর্থনার জন্ম বেশ আগ্রহান্বিত। গাড়ির আরোহীরাও কিছু কম নয়—যথাসম্ভব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাকাদি দ্বারা দেহের ও মনের বিন্দুমাত্র মলিনতা প্রকাশের পথে কড়া পাহারা বসানো হয়েছে। অনভ্যস্ত আমি, বিশিষ্ট অতিথিকে কি করে অভ্যর্থনা করতে হয়, কি করে তাঁর সঙ্গে পরিচয়-বিনিময় করতে হয়—এই সব চিন্তায় এমন মগ্ন ছিলুম যে, পথের সৌন্দর্য উপভোগ করার সুযোগ হয়নি !

গন্তব্যস্থল যতই নিকটবর্তী হতে লাগল, গাড়ি যেন ততই রুদ্ধনিশ্বাসে এগিয়ে চলেছে, আমিও রুদ্ধনিশ্বাসে অজানার, অনিশ্চিতের অপেক্ষা করছি। বিমানঘাঁটির গাড়িবারান্দায় গাড়ি থামতেই, উর্দি-পরা চাপরাসী এসে দরজা খুলে দিলে। আমরা নেমে পড়ে বিশ্রামাগারের দিকে এগিয়ে গেলুম। সবই যেন তকতক ঝকঝক করছে, বসবার আসন, ঘরের আসবাবপত্র, লোকজন সবই যেন আধুনিক সভ্যতার কথা ঘোষণা করছে। রেলওয়ে ষ্টেশনের মতো লোকের ভিড়, চেঁচামেচি, গাড়ির আওয়াজ, কুলীদের ছুটোছুটি এখানে নেই ; সকলেই চুপচাপ, নিঃশব্দে অপেক্ষমান। যাই হোক, একটা কৌচে বসে পড়লুম। প্রথমটা একটু আড়ষ্ট বোধ করলেও একটু পরেই পরিবেশটি সহজ হয়ে উঠলো।

বিমান আসার সময় হলে, ভিতরের বারান্দা পেরিয়ে খানিকটা গিয়ে রেলিং-এর ধারে দাঁড়ালুম। বিভিন্ন অন্ধ, মূক ও বধির প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র-ছাত্রী, আলোক-চিত্রশিল্পী এবং সাধারণ দর্শকের সংখ্যা নেহাত কম ছিল না। নির্দিষ্ট সময়ের কিছু পরে ৩-২৫ মিনিটের সময় রূপালী বিমানখানি সূর্যের সোনালী আলোয় মেঘমুক্ত, নীল আকাশের গায়ে আমাদের দৃষ্টিপথে ঝলমল করে উঠলো। তারপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে নেমে যেন হাঁফ ছেড়ে দাঁড়ালো। বিমানক্ষেত্রের মধ্যে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে, আমরা অসাধারণের পর্যায়ভুক্ত, তাই প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল। আমরা তিন জনে বিমানখানির দিকে এগিয়ে গেলুম। হেলেন কেলার ও তাঁর সঙ্গীরা নামলেন সিঁড়ি দিয়ে। অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিলো মিস্‌ কেলারকে, কিন্তু এই পঁচাত্তর বছরের বৃদ্ধার মুখে লক্ষ্য করলুম, একটি শান্ত, সমাহিত ও প্রসন্ন ভাব সুপরিস্ফুট। আমাদের পরস্পরের মধ্যে পরিচয়-বিনিময়ের পর মিস্‌ কেলারকে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করা হলো। একটু পরে ডেপুটি সেক্রেটারি ও যোগাযোগকারী কর্মচারী একটি গাড়িতে এবং মিস্‌ কেলার ও তাঁর সঙ্গীরা আর একটি গাড়িতে চড়ে রাজভবন অভিমুখে চলে গেলেন। আমাকে হেলেন কেলারের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে যাবার জন্ম একটু অপেক্ষা করতে হলো। দুর্ভাগ্য বশতঃ, মালগাড়িতে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় একটু অসুবিধায় পড়লুম। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্‌স্‌ করপোরেশন-এর কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানবামাত্র আমাকে তাঁদের যাত্রিবাহী গাড়িতে এস্‌প্ল্যানেড পর্যন্ত পৌঁছে দেবার প্রস্তাব জানা'লেন। আমিও সানন্দে রাজী হলুম। বিমান বিভাগীয় কর্মচারীদের এরূপ ভদ্রোচিত ব্যবহারে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

যাই হোক, হিন্দুস্থান বিল্ডিংস্‌-এ পৌঁছে একটু হেঁটে রাজভবনে গেলুম। কিছু হাঙ্গামার পর প্রবেশাধিকার পাওয়া গেল। কারণ, প্রহরীদের নিকট আমি তখনও অপরিচিত। উর্দি-পরা চাপরাসী সিঁড়ির কাছে অপেক্ষা করছিলো, আমাকে সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে গেলো। ডাফরিন বেড রুম ও সিটিং রুম-এ অতিথিদের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিলো। গালচে-পাতা বারান্দা নিঃশব্দে অতিক্রম করে ঘরের দামী পরদা ঠেলে ভেতরে ঢুকলুম। ঘরের মাঝখানে খানতিনেক সোফা, ডান দিকে একটি বড় খাবার টেবিল, তারই পাশে একটি ড্রেসিং টেবিল ; বাঁ-দিকে একটি আলমারি, একটি পালঙ্ক, তাতে সুন্দর নরম বিছানা, সামনে একটি পড়বার টেবিল। এটা হলো ডাফরিন সিটিং রুম। এই ঘরের আর একটি দরজা দিয়ে পাশের ডাফরিন বেড রুম-এ যাওয়া যায়। এগিয়ে গেলুম সে-ঘরে। সেখানেও বহুমূল্য আসবাবপত্র।

যোগাযোগকারী কর্মচারী ম'শায় হেলেন কেলারের সেক্রেটারির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। রাজভবনের চিকিৎসক তখন মিস্‌ কেলারের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছিলেন। বার্ধক্যজনিত অবসাদ ছাড়া মিস্‌ কেলারকে বেশ শক্ত বলেই মনে হলো। মিস্‌ স্তামসন জিনিসপত্র গোছাবার পর, যোগাযোগকারী কর্মচারী, মিস্‌ স্তামসন ও আমি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেল-এ গেলুম। সেখানে মিস্‌ স্তামসনের থাকবার বন্দোবস্ত হয়েছিলো। হোটেলে কিছুক্ষণ থাকবার পর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ রাজভবনে ফিরে এলুম।

সন্ধ্যা ছ'টায় রাজভবনে সাংবাদিক সম্মেলন। সংবাদপত্র-প্রতিনিধিরা নীচুকার বড় ঘরটিতে অপেক্ষা করছিলেন। এই সময় একটি জটিল সমস্যার উদ্ভব হলো। মিস্‌ কেলার শারীরিক অসুস্থতার জন্ম নীচে যেতে রাজী নন, অথচ ওপরের কোন একটিমাত্র ঘরে সমস্ত সাংবাদিকদের বসবার মতো আসন নাই। সংবাদপত্রভীতি কর্তৃপক্ষকে বড় অসুবিধায় ফেললে। এক দিকে সাংবাদিকদের সম্মান, অপর দিকে বক্তের হোতার অসম্মতি। অবশেষে স্থির হলো, মিস্‌ স্তামসন স্বয়ং অপেক্ষমান সাংবাদিকদের সমস্ত ব্যাপার জানিয়ে ওপরে যেতে অনুরোধ করবেন। কথা কাজে রূপান্তরিত হলো। কার্জন সিটিং রুম-এ সম্মেলনের ব্যবস্থা হলো। মিস্‌ কেলার ও মিস্‌ টম্‌সন একটি বড় সোফায় বসলেন। সাংবাদিকেরা কেহ সোফায় উপবিষ্ট, কেহ গালচে-পাতা মেঝের উপবিষ্ট, কেহ দণ্ডায়মান। আমি মিস্‌ কেলারের সোফার পাশে হাতলের ওপর আমার খাতা রেখে দাঁড়ালুম।

সাংবাদিকগণ যে সমস্ত প্রশ্ন করলেন, মিস্‌ টম্‌সন সেগুলি মিস্‌ কেলারের মুঠোর মধ্যে নিজের অঙ্গুলিসঙ্কেত দ্বারা এক অদ্ভুত উপায়ে

প্রকাশ করলেন। হেলেন কেলারের উত্তর কিন্তু আমাদের বোধগম্য হলো না, মাত্র তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। তবে স্বরের ওঠানামা শুনে ভাবের অভিব্যক্তি কিছুটা বুঝলুম। দীর্ঘকাল সহকারীরূপে কাজ করার জন্য মিস্ টম্সনের কিন্তু বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হলো না। তিনি স্পষ্ট ইংরেজী ভাষায় আমাদের সব জানালেন। আর একটি উপায়েও কথাবার্তা হলো। সেটাকে বলে লিপ-রীডিং। মিস্ টমসনের কথা বলার সময়, মিস্ কেলার তাঁর ঠোঁটে আঙুল দিয়েই বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে কি বলা হচ্ছে। এই ভাবে কথাবার্তা চলতে লাগলো। কথা বলার সময় মিস্ কেলার শিশুসুলভ আনন্দের আতিশয্যে উৎফুল্ল হয়ে পড়েন—হাত, পা, মাথা সবই যেন একসঙ্গে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা করে। এই সভায় তিনি ভারতীয় মনীষীদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। অন্ধ লোকেরা বিষাদ অনুভব করে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, I really do not know, but they can see deeply ;১ অঙ্গহানি হেতু তাঁর দুঃখ হয় কি না, তার উত্তরে তিনি বলেন, Limitations do not make me anytime unhappy ; for, I believe that through them God is using me for his plan of good which I shall some day understand and be content. I feel better when I live alone.২ অনুষ্ঠানান্তে উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী চা-পানে আপ্যায়িত হন।

এই সূত্রে দু'জন ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হলো। একজন হলেন শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন সেন, ডেপুটি সেক্রেটারি টু দি গভর্ণর অ্যাণ্ড ডিরেক্টর অব হস্পিট্যালিটি, রাজভবন; আর একজন হলেন শ্রীঅমিয়কুমার মুখোপাধ্যায়, অ্যাসিষ্ট্যান্ট কম্পট্রোলার, রাজভবন। অতিথি সেবা বিভাগে এইরূপ মিষ্টভাষী কর্মচারীদের ভদ্র ব্যবহার, মার্জিত রুচি ও কর্মকুশলতা প্রকৃতই আনন্দদায়ক এবং বিশেষ প্রশংসনীয়।

পরদিন শুক্রবার, ১লা এপ্রিল। সকাল দশটায় রাজভবনে পৌঁছে মিস্ টম্সনের সঙ্গে অভিবাদন বিনিময়ের পর পাশের ঘরে গিয়ে বসলুম। এটা হলো কার্জন সিটিং রুম। আগের দিনের কাজগুলো টাইপ করে রাখলুম। বিকেল বেলা গেলুম গ্রেট ঈষ্টার্ণ হোটেলে। গাড়ি থেকে নেমে সোজা দরজা দিয়ে ঢুকলুম। দরজার দু'পাশে শান্ত্রী পাহারা। প্রবেশ-পথের দু'দিকে দেয়ালের গায়ে রুচিবিগর্হিত কয়েকটি ছবি টাঙানো দেখে মনে হলো, বিদেশী রুচিবর্জনের সময় কি এখনও হয় নি? যাই হোক, অনুসন্ধান কর্মচারীর নিকট মিস্ স্যাম্সনের ঘরে যাবার নির্দেশ জেনে নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলুম। ডান দিকে বেঁকে সঙ্কীর্ণ পথের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চললুম। পথের দু'দিকে সারি সারি দোকান, বহু মূল্যবান ব্যবহার্য ও সৌখীন দ্রব্যে পরিপূর্ণ; ক্রেতার সংখ্যা নিতান্তই অল্প। বৈদ্যুতিক আলোর রশ্মি দেয়াল থেকে বেরিয়ে কেমন একটা আলো-আঁধারির সৃষ্টি করেছে। পথের শেষে লিফ্ট। তার পর সিঁড়ি দিয়ে উঠেই প্রকাণ্ড সুসজ্জিত খাবার ঘর। লিফ্ট্-ম্যানকে কেবল ঘরের নম্বর৩ বলে দিলুম। অন্য জায়গার মতো ফার্ষ্ট ফ্লোর, সেকেণ্ড ফ্লোর প্রভৃতি বলতে হলো না। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে লিফ্ট থেমে গেলো। বেরিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে মিস্ স্যাম্সনের ঘরের নম্বর চোখে পড়লো। কয়েকটা টোকা দিতেই 'come in'৪ শব্দ শুনতে পেলুম। দরজা ঠেলে ভেতরে গেলুম। এখানেও সেই রাজসিক ব্যাপার—মূল্যবান আসবাবপত্র। যাই হোক, মিস্ স্যামসনের সঙ্গে চিঠিপত্র সংক্রান্ত কয়েকটি কাজ সেরে রাজভবনে ফিরে গেলুম।

রাত্রি পৌনে'আটটায় থিয়েটার রোডে অবস্থিত ব্রিটিশ কাউন্সিল অফিসে ইংলিশ স্পীকিং ইউনিয়ন কর্তৃক হেলেন কেলারের সম্বর্দ্ধনা সভা। সাড়ে সাতটায় আমরা যাত্রা করলুম—একটি গাড়িতে মহিলাত্রয় আর একটিতে যোগাযোগকারী কর্মচারী ও আমি। নির্দিষ্ট সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছনো হলো। সভায় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির সমাবেশ হয়েছিলো—কিছু য়ুরোপীয়, কিছু ইঙ্গ-ভারতীয় কিছু ভারতীয়। তবে, মোটামুটি ভাবে সকলেই যেন য়ুরোপীয় ছাঁচে ঢালা। কথাবার্তা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সভার সাজসজ্জা আমার চোখে কেমন লাগছিলো। পুরুষদের পরনে কোট, প্যান্ট, ও নেকটাই আঁটা, মহিলাদের পরনে পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদের ন্যায় গাউন, অথবা এতদ্দেশীয় শাড়িই, কিন্তু পরিধান-কৌশলের গুণে ভিন্নরূপ ধারণ করেছে। কাজ আমরা করি বটে—কারণ, কাজ ছাড়া মানুষ থাকতে পারে না—কিন্তু কাজের অনুপাতে আমাদের বাহ্যাড়ম্বর খুব বেশী বলেই মনে হয়। প্রতীচ্যের জীবনোপভোগের আদর্শই যেন আমাদের আকাঙ্ক্ষিত, প্রাচ্যের জীবনাদর্শ যেন আমাদের গৃহ হতে এখনও বহিষ্কৃত। এখানে মহিলাদের বসবার জন্য পৃথক আসন নাই। সকলেই কায়দাদুরস্ত। আমি মিস্ কেলারে পিছনে একটা চেয়ারে বসে লিখতে লাগলুম। ইউনিয়নের সভাপতি মহারাজাধিরাজ স্যর উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর ইত্যাদি কর্তৃপক্ষী ব্যক্তিদের ভাষণের পর মিস্ কেলার ইউনিয়নের কার্যকলাপ বিকলাঙ্গদের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করলেন। কথাবা পূর্বোল্লিখিত উপায়েই হলো। তাঁকে পুষ্পমাল্যে ভূষি করা হলে, তিনি আঙুল বুলিয়ে বললেন, I smell differe brogerance and bed loveliness.৫ ইউনিয়নের • থেকে সর্বসমেত ৬০১৲ তাঁকে উপহার দেওয়া হলো কলকাত বিকলাঙ্গদের সাহায্যার্থ ব্যয় করার জন্য। সভা শেষে উপা অনেকেই হেলেন কেলারের সান্নিধ্যে আসার ও তাঁর সঙ্গে কথা ব প্রয়াসে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। মনে পড়লো······। মিস্ কে

১। আমি সঠিক জানি না, তবে তারা গভীর ভাবে দেখতে পায়।

২। বাধা-বিপত্তিতে আমি কোন সময়েই দুঃখ বোধ করি না; কারণ, আমি বিশ্বাস করি যে, ঈশ্বর ওই সমস্ত বাধার মধ্য দিয়ে আমাকে তাঁর মঙ্গলকর্মে নিয়োজিত করছেন। আমি একদিন তা বুঝতে পারবো এবং তখন শান্তিলাভ করবো। আমি যখন একা থাকি, তখন আমার আরও ভাল লাগে।

৩। ৬১১, চারতলা।

৪। ভিতরে আসুন।

৫। আমি অন্তবিধ সুগন্ধ ঘ্রাণ করছি এবং সৌন্দর্য অ করছি।

হাত দিয়ে তাঁদের সকলের অঙ্গস্পর্শ করে অনুভব করতে লাগলেন। এস্থলে একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, মিস্ কেলার বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন, কিন্তু অনাবশ্যক বিলাসিতা বা সৌখিনতার চিহ্ন মাত্র তাঁর বেশভূষায় দেখিনি; অবশ্য তাঁর পোশাকের পারিপাট্য ও গাম্ভীর্য স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সভায় যে সমস্ত পুষ্পমাল্য মিস্ কেলারকে দেওয়া হয়েছিলো, তিনি সেগুলি হাসপাতালে শিশুদের জন্য পাঠিয়ে দিতে বললেন। শিশুদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার এ একটি নিদর্শন।

সভার কাজ শেষ হলে, আমরা রাজভবনে ফিরে গেলুম। তার পর শুভ রাত্রি জানিয়ে গাড়ি করে বাড়ি ফিরলুম।

পরদিন শনিবার, ২রা এপ্রিল। সকাল দশটার মধ্যে রাজভবনে গিয়ে আগের দিনের কাজকর্ম সেরে ফেললুম। সকালে যখন গেলুম তখন দেখি, মিস্ কেলার ব্রেল সিষ্টেম-এ লেখা একখানি বই আঙুল দিয়ে পড়ছেন। এই সমস্ত বই ছাপবার কাগজ, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি আলাদা রকম। এক পৃষ্ঠায় ছাপা হয়। অক্ষরগুলো কাগজের সমতল থেকে একটু ওপরে উঠে থাকে; দেখতে হয়, ঠিক যেন কাগজের পিছন থেকে আলপিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্ধ লোকেরা এই অক্ষরগুলোর ওপর আঙুল বুলিয়ে পড়তে পারে। বিকলাঙ্গ হলেও, মিস্ কেলারের কর্মক্ষমতা ও কর্মস্পৃহা কিছু-না-কিছু করছেন—কখন বই পড়ছেন, কখন জিনিসপত্র গোছগাছ করছেন, কখন-বা টাইপ করছেন নিজের একটি পোর্টেব্‌ল টাইপরাইটার-এ। কাজ করার জন্য তিনি সেটি আমাকে দিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে সুবিধা না হওয়ায় নীচুকার অফিসে গিয়ে কাজ করতুম। তাঁর আহার্যের মধ্যে কমলা লেবুর রস ও ফলমূলের ভাগই বেশী। হেলেন কেলার ও মিস্ টম্‌সন একসঙ্গে আহার করতেন। মিস্ টম্‌সন আহার্য দ্রব্যগুলি তাঁর হাতের কাছে এগিয়ে দিতেন। দুপুরে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম গ্রহণ করতেন, তখন কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন না। এ ছাড়া, শারীরিক অসুস্থতার জন্যও কোন সময়েই ব্যক্তিগত ভাবে বাইরের লোকের সঙ্গে দেখা করতেন না।

বিকেল সাড়ে চারটের ভবানীপুরে 'লাইট্‌হাউস ফর দি ব্লাইণ্ড' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে হেলেন কেলারের সম্বর্ধনা সভা। সওয়া চারটের সময় ওঁরা বেরিয়ে গেলেন। কোন কারণ বশতঃ ওঁদের সঙ্গে আমার যাওয়া হয় নি। পূর্ব ব্যবস্থামতো এই প্রতিষ্ঠানটিকে তিনি ১০০৲ দান করেন।

পাঁচটায় বেহালায় ক্যালকাটা ব্লাইণ্ড স্কুল-এ হেলেন কেলারের সম্বর্ধনা। ৩-এ বাসে চড়ে চললুম বেহালা। নির্দিষ্ট জায়গায় বাস থামতে নেমে পড়লুম, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলুম ফটকের দিকে। প্রবেশ করে দেখি, বেশ বড় বাড়ি, সামনে ঘন সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠ, তারই এক পাশ দিয়ে লাল সুরকির রাস্তা। কয়েকটি ফুলের গাছ পরিবেশটিকে আরও সুন্দর করে তুলেছে। ভেতরে-বাইরে বহু জনসমাগম। সভাকক্ষের মধ্যে ঢুকে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছি—কোথাও বসবার জায়গা নাই। সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলিও পূর্ণ। অবশেষে, যোগাযোগকারী কর্মচারী মশায়ের ইঙ্গিতে এক ভদ্রলোক মিস কেলারের ঠিক পিছনের আসনটি আমায় জন্য ছেড়ে দিলেন। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। তারপর শুরু হলো অনুষ্ঠান। স্কুলের অন্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা গীত, বাদ্য, নৃত্য, খেলাধুলা প্রভৃতি দ্বারা দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দান করলে। দেখে-শুনে মনে হলো, এই হতভাগা ভাইবোনেরা অনেক বিষয়েই আজ সুস্থ লোকের সমকক্ষ। আশ্চর্য মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, আশ্চর্য বিজ্ঞানের দান মানবকল্যাণে। তারপর স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীঅমলকুমার সাহা ইত্যাদির সুদীর্ঘ ভাষণের পর হেলেন কেলার বক্তৃতা করতে উঠলেন।

এখানে একটি বিষয়ের উল্লেখ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। আমাদের একটি দোষ যে, আমরা আমন্ত্রিত ব্যক্তির বক্তব্য অপেক্ষা আপনাদের গুণকীর্তনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকি, বিশেষতঃ তিনি যদি বিদেশী হন, তা হলে তো আর কথাই নাই। পরে জানা গেল যে, আমন্ত্রিত বিদেশী মহিলাদ্বয় উপরোক্ত পদ্ধতির মোটেই প্রশংসা করেন না। আমার বলার উদ্দেশ্য, শুধু বিদেশীর প্রতিই নয়, আমন্ত্রিত ব্যক্তি যিনিই হন না কেন, তাঁর প্রতি উপযুক্ত সম্মানপ্রদর্শন ও তাঁর বক্তব্যশ্রবণ অধিকতর বাঞ্ছনীয়। এতে জাতীয় জীবন পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে।

পূর্ব কথায় ফিরে আসা যাক। হেলেন কেলার প্রথমেই বললেন যে, তিনি যাদের জন্য ভারতবর্ষে এসেছেন, তাদেরকে সর্বাগ্রে এবং পৃথক্‌ভাবে সম্ভাষণ করবেন, তারপর জনসাধারণ। বিকলাঙ্গদের প্রতি তাঁর এই উক্তি প্রকৃত সমবেদনার নিদর্শন। তিনি যে ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার পক্ষপাতী তা বোঝা গেল যখন তিনি বললেন, Let every one win throngh his work independence৬ বক্তৃতা দ্বারা তিনি ছেলে-মেয়েদের বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করবার চেষ্টা করেন। অনুষ্ঠানান্তে তিনি স্কুলকে ১০০৲ দান করেন। স্কুলের পক্ষ থেকে তাঁকে কয়েকটি জিনিস উপহার দেওয়া হয়েছিলো। মিস্ কেলার তাঁকে সভায় প্রদত্ত পুষ্পমাল্যগুলি হাসপাতালের শিশুদের জন্য পাঠিয়ে দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। আমরা নিকটস্থ বালানন্দ ব্রহ্মচারী সেবায়তনে সেগুলি দিয়ে রাজভবনে ফিরে এলুম। তারপর বাকী কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরলুম।

পরদিন রবিবার, ৩রা এপ্রিল। সেদিন কোন অনুষ্ঠান ছিল না; ওঁরা ব্যক্তিগত কাজকর্ম করেন।

পরদিন সোমবার, ৪ঠা এপ্রিল। সকাল সাড়ে ন'টায় মিস্ টম্‌সনকে সঙ্গে নিয়ে রাজভবনে গেলুম। প্রতিদিনের মতো চিঠিপত্র টাইপ করা হলো। তার মধ্যে মিস্ কেলারের দু'খানি চিঠি ছিল। চিঠির ভাষাটি বেশ ভালো লাগলো। একটু পরে চিকিৎসক এসে মিস্ কেলারকে দেখে গেলেন। দু'বেলাই তিনি দেখে যান আর ওষুধপত্র দিয়ে যান।

বিকেল সওয়া পাঁচটায় আপার সার্কুলার রোড-এ অবস্থিত ক্যালকাটা ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ব স্কুল-এ মিস্ কেলারের সম্বর্ধনা। ঠিক পাঁচটায় বেরুনো হলো। একটি বিষয় বিশেষ করে নজরে পড়লো—ওঁদের সময়নিষ্ঠা। রওনা হবার নির্ধারিত সময়ে ওঁদেরকে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত দেখতে পেতুম, একদিনও এর ব্যতিক্রম দেখি নি। পঁচাত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধার পক্ষে এরূপ সময়ানুবর্তিতা

৬। প্রত্যেকেই আপন কর্মের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করুক।

রক্ষা করা বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এবং আমাদের অনুকরণীয়। নির্দিষ্ট সময়ে স্কুলে পৌঁছুলে, স্কুলের ছাত্রীরা ভারতীয় প্রথায় শঙ্খ, চন্দন ও পুষ্পমাল্য দ্বারা বরণ করবার পর, তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি বিশেষ চেয়ারে উপবেশন করবার জন্ত অনুরোধ করা হলো। তিনি আসন গ্রহণ করলে পর, স্কুলের অধ্যক্ষ মশায় প্রতিষ্ঠানটির একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত করলেন। তারপর তাঁকে স্কুল-প্রাঙ্গণে নিয়ে যাওয়া হলো। বহু বৃদ্ধ-বৃদ্ধা যুবক-যুবতী ও শিশুর সমাবেশ হয়েছিলো সেখানে। পরিবেশটি বেশ শান্ত ছিল। মিস্ কেলার প্রথমে শিশুদের সঙ্গে পৃথক ভাবে আলাপ করলেন। তারপর সভামঞ্চে গিয়ে বসলেন। আমি সামনে সাংবাদিকদের জন্ত নির্দিষ্ট আসনে গিয়ে বসলুম। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও অধ্যক্ষ মশায়ের ভাষণের পর হেলেন কেলার বক্তৃতা করতে উঠলেন। এখানেও প্রথমে ছাত্রছাত্রী, তারপর শিক্ষকবৃন্দ ও সর্বশেষে জনসাধারণকে পৃথকভাবে সম্ভাষণ করলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন যে কেবল সরকারের দ্বারা বিকলাঙ্গদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থান সম্ভব নয়; জনসাধারণকেও সাধ্যমতো চেষ্টা করতে হবে। উভয় পক্ষের সহযোগিতাতেই এইরূপ উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টা সফল হওয়া সম্ভব। মূক ও বধির ছেলে-মেয়েদের তৈরী কয়েকটি জিনিস উপহারস্বরূপ গ্রহণ করে তিনি বললেন, I would be proud to take them back to America and give them enough space in my room; ৭ এই উক্তিটি শিশুদের প্রতি তাঁর গভীর ভালবাসার আর একটি নিদর্শন। অপর একটি কথায় তাঁর মানবসেবার ভাব বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো—Deafness is a harder handicap for me than lack of sight......Always we know that the sure way to happiness is to serve others. ৮

এই সভায় অধ্যক্ষ মশায় মিস্ কেলারের ভাষা ও লিপ-রীডিং ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করেন। লিপ্-রীডিং সম্বন্ধে তিনি একটি ঘটনার উল্লেখ করেন। ঘটনাটি এইরূপ: একবার হেলেন কেলার ওয়াশিংটন-এ গ্যালোডেট কলেজ (Gallaudet College) পরিদর্শন করতে যান। এই কলেজে মূক ও বধিরদের উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়। ডঃ পোর্টার নাম্নী এই কলেজের জনৈকা অধ্যাপিকা, হেলেন কেলার এসেছেন শুনে, তাঁর লিপ-রীডিং পরীক্ষা করেন। দু'জনে কথাবার্তা চলছে। হেলেন কেলার ডঃ পোর্টারের ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আছেন। ডঃ পোর্টার যে সমস্ত প্রশ্ন করছিলেন, তিনি সেগুলির জবাব দিতে লাগলেন। প্রথমে ইংরেজী ভাষায় আলোচনা হচ্ছিলো। ডঃ পোর্টার হঠাৎ ফরাসী ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। হেলেন কেলারও সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষায় জবাব দিতে লাগলেন। শেষে, ডঃ পোর্টার জার্মাণ ভাষায় কথা শুরু করলেন। হেলেন কেলারও সঙ্গে সঙ্গে বললেন যে, তিনি জার্মাণ ভাষায় কথা বলছেন, কিন্তু জার্মাণ ভাষায় তাঁর (হেলেন কেলারের) বিশেষ দখল না থাকায়, ওই ভাষায় আলোচনা করা তাঁর পক্ষে অসুবিধাজনক। ডঃ পোর্টার তো তখন বড়ই অপ্রস্তুত।

এস্থলে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, হেলেন কেলার যদিও প্রায় মূক ছিলেন, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে তাঁর কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট বোঝা যেতো। সেই জন্ত, উপরোক্ত ঘটনার সময় যদিও তাঁর আবাল্য শিক্ষয়িত্রী ও সঙ্গিনী মিস্ সালিভান উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মারফত আলোচনা করার প্রয়োজন হয় নি। বার্ধক্য বশতঃ তাঁর কথা খুব অস্পষ্ট হয়ে পড়ায়, এখন সেক্রেটারির মারফত আলোচনা করতে হয়।

মিস্ কেলার সভাশেষে এই প্রতিষ্ঠানটিকে ২০০৲ দান করেন। সংগৃহীত অর্থের বাকী ১১১৲ লাইট্‌হাউস ফর দি ব্লাইণ্ডকে পরে পাঠিয়ে দেন। কন্‌ভেন্‌শন অব দি টিচার্স ফর দি-ডেফ ইন ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রীভূপতি মজুমদার মহাশয় এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। বেঙ্গল ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্ অ্যাসোসিয়েশন-এর পক্ষ থেকে মিস্ কেলারকে কয়েকটি জিনিস উপহার দেওয়া হয়। তিনি তাঁকে প্রদত্ত পুষ্পমাল্যগুলি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মেডিক্যাল্ কলেজ হস্‌পিট্যালস্, ক্যালকাটা ক্যাজুয়ালটি ব্লক-এর শিশুনিবাস-এ শিশুদের জন্ত দেওয়া হয়।

পরদিন মঙ্গলবার, ৫ই এপ্রিল। বিকেল সওয়া পাঁচটায় ইলিয়ট রোড-এ অবস্থিত অল্-বেঙ্গল উইমেনস্ ইউনিয়ন হোম-এ মিস্ কেলারের সম্বর্ধনা। পাঁচটার সময় বেরিয়ে যথাসময়েই গন্তব্য-স্থলে পৌঁছুনো হলো। মেয়েরা সঙ্গীত সহকারে মিস্ কেলারকে অভ্যর্থনা করলেন। তৃণাচ্ছাদিত উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সভার আয়োজন হয়েছিলো। শিশুরা ঘাসের ওপর ব'সে, মহিলারা তাদের পিছনে দাঁড়িয়ে। কেবল বিশিষ্ট অভ্যাগতদের জন্ত কয়েকখানি চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল। এক পাশে হোম-এর মেয়েদের হাতে তৈরী কতকগুলি সূতী ও পশমী পোশাক প্রদর্শনী হিসাবে রাখা হয়েছিলো। দর্শকবৃন্দের অধিকাংশই মহিলা ও শিশু। মাইক্রোফোন-এর ব্যবস্থা না থাকায় ষ্টেট্‌সম্যান-এর প্রতিনিধি ও আমি, মিস টমসনের ইঙ্গিতে, মিস কেলার যেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন, সেই দিকে একটু এগিয়ে গিয়ে বসলুম। মিস কেলার ও মিস টমসন তাঁদের আসন ছেড়ে শিশুদের দিকে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন। তার পর বক্তৃতা শুরু হলো। সমস্ত পরিবেশটির মধ্যে বেশ একটি ঘরোয়া ভাব, যেন কোন সভা-সমিতিতে আসা হয়নি। বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিস কেলার প্রতিষ্ঠানটির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর উচ্চ ধারণা। তিনি বললেন, Humanity is one of the finest expressions of India's soul. ১ নারী-অভ্যুত্থানের বিষয়েও তিনি সচেতন। তিনি বললেন, When women join hands in doing work of social betterment, nothing can stop their advance towards

---

৭। আমি এগুলি আমেরিকায় নিয়ে যেতে এবং আমার ঘরে এগুলিকে রাখবার জন্ত যথেষ্ট জায়গা করে দিতে গর্ব অনুভব করবো।

৮। দৃষ্টিশক্তি হীনতা অপেক্ষা শ্রবণশক্তি হীনতা আমার নিকট কঠিনতর বাধা। আমরা সর্বদাই জানি যে, অপরকে সেবা করাই হলোই আনন্দলাভের নিশ্চিত উপায়।

১। মানবতা ভারতের আত্মার একটি অতি সুন্দর বহিঃপ্রকাশ।

the goal.১০ অনুষ্ঠানশেষে তিনি শিশুদের পিঠ চাপড়ে বললেন, I love you all. ১১ অনুষ্ঠান পরিচালনা দেখে মনে হলো যে, আমাদের দেশের স্ত্রীজাতি এখনও বেশ কর্মকুশল হয়ে ওঠেন নি; তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, অদূর ভবিষ্যতে তাঁরা জাতীয় জীবনের বিভিন্ন শাখা নিজেদের দানে পরিপুষ্ট করে তুলবেন, সমাজের পুরোভাগে তাঁরা স্থানলাভ করবেন।

রাজভবনে ফিরে এসে সমস্ত কাজকর্ম সেরে মিস কেলার ও মিস টম্‌সনকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেছি, মিস টম্‌সন কিন্তু আমাকে পরদিন সকালে ওঁদের সঙ্গে বিমানঘাঁটিতে যাবার জন্ম অনুরোধ করলেন। অগত্যা রাজী হলুম।

পরদিন বুধবার, ৬ই এপ্রিল। ভোর ছ'টার মধ্যে রাজভবনে গিয়ে হাজির হলুম। একে একে শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটারি, যোগাযোগকারী কর্মচারী ও আর সকলে এসে উপস্থিত হলে, কম্পট্রোলার মশায় সকলের জন্ম চা-বিস্কুট আনিয়ে দিলেন। মিস কেলারের প্রাতরাশ তখন শেষ হয়ে গেছে। মিস টমসনের সঙ্গে বসে একটু কথা সেরে নিলুম। তিনি আমার নাম, ঠিকানা প্রভৃতি লিখিয়ে নিলেন। আমি মিস কেলারকে আমার ক্ষুদ্র হৃদয়ের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্ম ছোট একটি অভিনন্দনলিপি মিস টমসনের হাতে দিলুম। মিস কেলার তখন ব্যস্ত ছিলেন পাশের ঘরে।

সাড়ে সাতটায় বিমান ছাড়বে। আমরা সাড়ে ছ'টায় বেরলুম। বিমানঘাঁটিতে পৌছে মিস্ কেলার খানিকক্ষণ বিশ্রাম করলেন। কিছু দর্শকেরও সমাবেশ হয়েছিলো। নির্দিষ্ট সময় নিকটবর্তী হলে, আমরা নিষিদ্ধ সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে বিমানটির কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। করমর্দনের পালা শেষ হলে, মিস্ কেলার ও তাঁর সঙ্গীরা বিমানে উঠে বসলেন। বিমানখানি যাত্রীদের নিয়ে গর্বভরে উড়ে গেল দিল্লী অভিমুখে।

আমরাও গাড়ি করে গৃহাভিমুখে যাত্রা করলুম। মনের মধ্যে কেমন যেন ফাঁকা-ফাঁকা লাগছিলো, বিশেষ করে, আমার এক স্বর্গীয় আত্মীয়ার মুখচ্ছবি মনে পড়ছিলো। কারণ, হেলেন কেলারের মুখের সঙ্গে তাঁর মুখের অনেকটা সাদৃশ্য ছিল। মনে মনে শ্রদ্ধা জানালুম এই বিদেশিনী মহীয়সী নারীর অধ্যবসায় ও মানবসেবাকে উদ্দেশ করে, হৃদয়ে অধ্যবসায় ও সেবাভাবের একটি স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা অনুভব করলুম।

১০। স্ত্রীজাতি যখন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যে অংশ গ্রহণ করে, তখন কোন কিছুই তাহাদের অগ্রগতিকে রোধ করতে পারে না।

১১ আমি তোমাদের সকলকেই ভালবাসি।

প্রেমিকা চাঁদ

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

[গত বৎসর আমেরিকায় ফরাসী ও আমেরিকার বৈজ্ঞানিকদের এক বৈঠক বসে। আগামী দশ-পনের বছরের মধ্যে চন্দ্রলোকে অভিযান করবার একটি খসড়া পরিকল্পনাও প্রস্তুত হয়। কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ করে মহাশূন্যের আবহাওয়া জানা আর একটি ধাপ।]

কী প্রেমে টেনেছ তুমি বায়ুহীন বর্ণিল উৎসবে ?
মুঠো ভ'রে এনে দেবে অচল, নিশ্চল অন্ধকার ?
মহাশূন্যে পরিক্রমা হয়তো নিমেষে শেষ হবে
রূপমুগ্ধ পতঙ্গের, প্রতীক্ষার অগ্নি-শলাকার
পিছনে মিছেই ছোটা : কবে শেষ হবে যন্ত্রণার ?
লগ্নবেলা সমুত্তীর্ণ। তুমি চাঁদ, বিপুল গৌরবে
ছড়াও আশ্চর্য দীপ্তি আসমুদ্র আকাঙ্ক্ষার ; কবে
উন্মুখ জিজ্ঞাসা নিয়ে আমি-হই মহাকর্ষ পার ?

অমেয় নিষ্প্রাণ বৃত্ত ; তবু ছিলে স্বপ্নের কোরকে।
পাখির কাকলি-স্তব্ধ রাতের নায়িকা, প্রণয়ের
মণিদীপ। ঐশ্বর্যের জাদু স্পর্শে করো আকর্ষণ ;
গৃহের নিভৃত অগ্নি সুখস্পর্শ বায়ুর মোড়কে
ঘেরা ছিলো পৃথিবীর ; খুলে দ্বার দুর্গম স্বর্গের
আলো প্রাণ ; প্রেম-ক্লিওপাত্রা তুমি নেবে মৃত্যুপণ !

চিত্রলেখা



[উপন্যাস]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কুমারগিরির ভিতর বিশালদেব এক মহান আত্মার দর্শন পায়। কুমারগিরির জ্ঞান ও তেজের সামনে মাথা নত করে নেয়। কুমারগিরি যুক্তিপূর্ণ তর্কে পারদর্শী এবং এক মুহূর্ত্তে বিশালদেবের সমস্ত ভ্রম দূর করে দিতেন। বিশালদেব তাঁর শিষ্য-রূপে যোগাভ্যাস আরম্ভ করে। বিশালদেব কুমারগিরির উপযুক্ত শিষ্য ও কুমারগিরি বিশালদেবের সত্যিকারের গুরু।

একদিন কুমারগিরি বিশালদেবকে উপাসনার মহত্ত্ব বোঝাচ্ছিলেন। দিনের আলো শেষ হয়ে গেছে, নির্জ্জনে কুমার-গিরির কুটিরের প্রদীপ টিমটিম করে জ্বলছে। হঠাৎ দরজায় পদশব্দ শোনা যায়, সংগে সংগে কেউ বলে ওঠে "পথ-হারিয়ে-যাওয়া পথিক শুধু রাত্রের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছে।"

কুমারগিরি উত্তর দেন, "তাঁকে স্বাগত জানাচ্ছি। পথ-ভোলা সকল জীবের জন্য আমার কুটির উন্মুক্ত।" নিজের উত্তরে কুমারগিরি নিজেই হেসে ওঠেন।

ঠিক ঐ সময়ে একটি স্ত্রীলোককে সংগে নিয়ে এক পুরুষ কুটিরে প্রবেশ করে।

কুমারগিরি স্ত্রীলোক দেখে চমকে ওঠেন। তিনি পুরুষটিকে বলেন, "অতিথি! তুমি আমাকে প্রথমেই কেন বল নি যে তোমার সংগে একটি স্ত্রীলোক আছে? তোমার এটা জানা উচিত যে এ কুটির এক সংসারত্যাগী যোগীর?"

পুরুষটি উত্তর দেয়, "প্রভু, আমি জানি যে এটা একজন যোগীর স্থান কিন্তু এ কথা মনেই হয় নি যে ইন্দ্রিয়জয়ী এক যোগী শুধু রাত্রিটুকুর জন্য একজন স্ত্রীলোককে আশ্রয় দিতে সংকোচ বোধ করবেন এবং তাও এমন এক স্ত্রীলোককে, যে একজন পুরুষের সংগে আছে।"

এ-রকম উত্তরের জন্য কুমারগিরি প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রীলোকটি ইতিমধ্যে তাঁর সম্মুখে বসে পড়েছিল, আলোকে তার মুখ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। কুমারগিরি বলেন, "অতিথি! স্ত্রীলোককে আমার এই কুটিরে আশ্রয় দিতে শুধু এই জন্য আপত্তি—কারণ নারী হ'ল অন্ধকার, মোহ, মায়া ও বাসনার মূর্ত্ত প্রতীক। জ্ঞানের আলোকময় জগতে নারীর কোন স্থান নেই। কিন্তু সে যাই হোক, তোমরা দু'জনাই আমার অতিথি, তোমাদের দু'জনার অতিথি-সৎকার করা আমার কর্ত্তব্য।"

এতক্ষণ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য ও কৌতূহলের সংগে স্ত্রীলোকটি তাদের কথোপকথন শুনছিল। কুমারগিরির কথা শেষ হবামাত্র সে কুমারগিরির সামনে এসে নতমস্তক হয়ে বলে, "আলোর তৃষ্ণায় তৃষিত পতংগকে অন্ধকারের প্রণাম!"

তীরের মত ধারাল ও বেঁধান তার কথাগুলো কিন্তু স্বরে সংগীতের কোমলতায় ভরা। সৌন্দর্য্যের মধ্যে একটা কাব্যিক ভাব ও বাসনার মত্ততায় অহঙ্কার। এই অসামান্যা নারীর কাছ থেকে এক অসাধারণ অভিবাদন শুনে কুমারগিরি হতবিহ্বল। তিনি মনোনিবেশ সহকারে স্ত্রীলোকটিকে দেখতে থাকেন। এ-রকম অপরূপ রূপবতী নারী সত্যই তিনি পূর্বে আর কখনও দেখেন নি! তাই বোধ হয়, তার দিক থেকে তিনি চোখ ফিরিয়ে নিতে পারছিলেন না। স্ত্রীলোকটির কথাগুলির কোন উত্তর দেবার প্রয়োজন তিনি মনে করলেন না। কিছুক্ষণ পরে পুরুষটিকে জিজ্ঞেস করেন, "অতিথিগণের পরিচয় কি, জানতে পারি?" পুরুষটি উত্তর দেয়, "প্রভু! এ অধমের নাম বীজগুপ্ত, পাটলিপুত্রের একজন সেনাপতি এবং এই স্ত্রীলোকটি পাটলিপুত্রের সব চেয়ে সেরা সুন্দরী নর্ত্তকী চিত্রলেখা।"

"বীজগুপ্ত ও চিত্রলেখা!" এইবার কুমারগিরি চিত্রলেখার দিকে এগিয়ে যান, "নর্ত্তকী চিত্রলেখা, তোমার কবিত্বের কর্কশতার ভিতর উন্মাদনার আবরণ আছে, তোমার সৌন্দর্য্য তোমার কঠোরতাকে ঢেকে রেখেছে। তুমি আমার অতিথি এবং তুমি আমায় যথেষ্ট সম্মান দিয়েছ। আশীর্বাদ করা আমার ধর্ম, আশীর্বাদ করছি ভগবান যেন তোমায় সুমতি দেন।"

চিত্রলেখা হেসে ওঠে, তার মধুর হাসিতে ছিল মনকে আকৃষ্ট করবার এক অলৌকিক যাদু। "যোগী! সুমতির কিন্তু অর্থভেদ হয়, অনুরাগের কাছে যেটা সুখ, বৈরাগ্যের কাছে সেটাই দুঃখ। প্রত্যেক ব্যক্তি আপন আপন বিচার অনুসারে চলে এবং তাতেই তার বিশ্বাস থাকে, প্রত্যেক মানুষই মনে করে, সে নিজে ঠিকপথে চলেছে এবং অন্য বিচারে বিশ্বাসী লোকেরা ভুল পথে এগিয়ে যাচ্ছে"।

অনুরাগের সেবিকা নর্ত্তকী চিত্রলেখা বৈরাগ্য সাধনায় জয়ী যোগী কুমারগিরির সামনে এসে উপস্থিত হয়। বিদ্রোহ ও শান্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হবে, জীবন ও মুক্তির

মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। অবিচলিত ভাবে কুমারগিরি উত্তর দেন, "কিন্তু সত্য এক-বাস্তবিকতার জ্ঞান-প্রাপ্তি। সেই পথই ঠিক, যে পথে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়"। কুমারগিরির স্বর গম্ভীর, যোগীর সুন্দর বেশ তপস্যার শক্তিতে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কুমারগিরির বড় বড় চোখে শান্তি যেন আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে!

এক মুহূর্তের জন্য যোগী ও নর্তকীর চোখ পরস্পর মিলে যায়। বাসনা তপস্যার কাছে হার মানে, চিত্রলেখার মনে হয়, যে যোগীপুরুষের সামনে সে বসে আছে তিনি কত মহান! তবুও সাহস নিয়ে সে বলে, "শান্তি ও সুখ! অকর্মণ্যতার অপর নাম শান্তি এবং সুখের কোন একটি বিশেষ পরিভাষা হয় না"।

নর্তকী চিত্রলেখার মুখ থেকে দর্শনশাস্ত্রের তর্কপূর্ণ এইরূপ বিকৃত সিদ্ধান্ত শুনে যোগী স্তম্ভিত হয়ে যান। যে নারীর সংগে তিনি কথা বলছিলেন সে শুধু সুন্দরী নয়, সংগে সংগে বিদুষী। এই নারীর ভিতর বিচার-শক্তি ও প্রতিভা দুই আছে। প্রতিভাকে হারাতে পারে প্রতিভাই এবং জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রতিভা ও মৌলিকতার স্থান সর্ব্বোচ্চে। কুমারগিরি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন, তারপর ধীরে ধীরে দৃঢ়তার সংগে বলেন, "নারী! তুমি ঠিকই বলেছ, শান্তির অপর নাম অকর্মণ্যতা ও অকর্মণ্যতাই মুক্তি। যাকে সমস্ত পৃথিবী অকর্মণ্যতা বলে, আসলে কিন্তু সেটা অকর্মণ্যতা নয়। কেন না, এরকম অবস্থায় মস্তিষ্কই কাজ করে। যে বিরাট শূন্য থেকে আমরা উৎপন্ন হয়েছি তার ভিতর লীন হয়ে যাওয়াকেই অকর্মণ্যতা বলে। আর সেই শূন্যই জীবনের নির্দিষ্ট লক্ষ্য। তুমি সুখের পরিভাষা সম্বন্ধে যা বলেছ তা-ও মানি। কারণ, সুখ এক রকমই হয়, তার ভিতর কোন ভেদাভেদ নেই। মানুষ যখন সুখকে উপলব্ধি করতে পারে তখন সে সাধারণ অবস্থার অনেক উর্দ্ধে চলে যায়"।

চিত্রলেখা কুমারগিরির কথার মর্ম বুঝতে পারে। তার মনে হয় যে, আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সে নবযুবক যোগীর প্রতি আকৃষ্ট হ'তে আরম্ভ করেছে। আর একবার সাহস করে সে বলে, "শূন্য! কিন্তু যোগী! তোমার ঐ শূন্যকে বিশ্বাসই বা কে করে? যা কিছু প্রত্যক্ষ তাহাই সত্য ও নিত্য। শূন্য কল্পনার ... যোগী। তুমি শূন্যের মহত্ত্বের ওপর কেন জোর দিচ্ছ? তুমি কি আমার ও তোমার আমিত্বের মধ্যে কোন প্রভেদ দেখতে পাচ্ছ? যদি দেখ, তাহলে শূন্যকে তুমি বিশ্বাস কর না, আর যদি না দেখ তবে তোমার জ্ঞান ও অন্ধকার, সুখ ও দুঃখ, স্ত্রী ও পুরুষ এবং পাপ ও পুণ্যের প্রভেদ মিথ্যা। ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ও তিনিই তার কার্য্যক্ষেত্র নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন। তিনি শুধু এইজন্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যা'তে সে পৃথিবীতে এসে কাজ করে, সংসারের বাধা-বিপত্তি দেখে কাপুরুষের মত ভয়ে পালিয়ে না যায়। আর সুখ হ'ল তৃপ্তির অপর নাম। তৃপ্তিলাভ সেখানেই সম্ভব, যেখানে ইচ্ছা আছে, বাসনা আছে।"

যোগী গম্ভীর হয়ে ওঠে, কিন্তু চিত্রলেখা মৃদু হাসতে থাকে। ওদিকে বীজগুপ্ত নিজের শিষ্যা ও জীবনসংগিনীর মুখ থেকে নিজেরই সিদ্ধান্তের এরকম যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে আনন্দিত এবং বিশালদেব এক নর্তকীর মধ্যে এত জ্ঞান দেখে স্তম্ভিত হয়ে যায়। দু'জনাই কুমারগিরির উত্তরের প্রতীক্ষা করে।

কুমারগিরি কিছুক্ষণ মৌন থেকে গম্ভীর স্বরে বলেন, "ঈশ্বর! ঈশ্বর ও মানুষে কোন ভেদ নেই। শুধু বাইরের বা পার্থিব জগতের এই প্রভেদ। মায়া ও ব্রহ্মের সংযোগ থেকে জনতার উৎপত্তি কিন্তু যদিও মায়া ব্রহ্মেরই এক অংশ তবুও বাহ্যদৃষ্টিতে তার এক পৃথক অস্তিত্ব আছে। ব্রহ্ম যতক্ষণ মায়ার সংগে জড়িয়ে থাকে ততক্ষণ সে সংসাররূপী জালে আবদ্ধ থাকে কিন্তু মায়াকে পরিত্যাগ করবার পর সে নিজস্ব এক অস্তিত্ব পায়। বস্তুতঃ, তোমার ও আমার ভিতর কোন পার্থক্য নেই, যে ব্রহ্মের এক অংশ তুমি, সেই ব্রহ্মের থেকে আমারও উৎপত্তি হয়েছে। তফাৎ শুধু এইখানে যে তুমি মায়া মিশ্রিত ব্রহ্ম এবং আমি মায়াকে দিয়েছি মুক্তি। যাতে আমাকে কখনও পিছিয়ে না পড়তে হয়, সেজন্য আমি মায়াকে জীবন থেকে পৃথক রাখতে চাই। তৃপ্তিই যে সুখ, এখানেও তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। আনন্দলাভের একমাত্র উপাদান যদি তৃপ্তি হয়, তাহলে সেটা নিশ্চয় সুখ কিন্তু আমরা কর্মের আবর্ত্তে ঘুরে মরি বলেই তৃপ্তির সংগেই আমাদের পূর্ণ সন্তোষ লাভ হয় না। ব্রহ্ম মায়ার সংস্পর্শে এসে নিজেকে ভুলে যায় এবং কর্মের আবর্ত্তে ঘুরপাক খেতে থাকে। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে মায়াকে পরিত্যাগ করে ও নিজেকে অনুভব করতে পারে, সে তৃপ্তিও পায় এবং সংগে সংগে আনন্দও লাভ করে। দুঃখময় জগতকে পরিত্যাগ করাকেই সুখ বলে।"

কুমারগিরি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকেন। তারপর চিত্রলেখাকে উত্তর দেবার অবকাশ না দিয়েই বলেন, "হ্যাঁ, মনে রেখ। তর্কের শেষ হয় না, সত্য অনুভবের বস্তু। অনুভব ও বিশ্বাস ব্যতিরেকে জ্ঞান প্রাপ্তি অসম্ভব।" কুমারগিরি উঠে দাঁড়ান। "রাত অনেক হয়েছে, এবার আমাদের বিশ্রাম করতে যাওয়াই উচিত"

কুমারগিরির উত্তরে যে চিত্রলেখা সন্তুষ্ট হতে পারে নি, কুমারগিরি এ কথা বেশ বুঝতে পারেন। কিন্তু সংগে সংগে কুমারগিরির ব্যক্তিত্ব চিত্রলেখাকে তাঁর দিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। যোগী নর্তকীর ভিতর জ্ঞানের পরিচয় পান এবং নর্তকী যোগীর ভিতর দেখে এক সৌন্দর্য্য, এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ! কিন্তু বীজগুপ্ত কি তা সে নিজেই বুঝে উঠতে পারে না। কুমারগিরি ও চিত্রলেখার কথাবার্ত্তায় তার মন অশান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তাদের সিদ্ধান্তের সংগে এ অশান্তির কোন সম্বন্ধ ছিল না। তবে এ অশান্তি কিসের জন্য তা সে হাজার চেষ্টা করেও বুঝে উঠতে পারলে না। কুমারগিরির প্রতি চিত্রলেখার ক্ষীণ আসক্তির আভাস সে পেয়েছিল কিন্তু এ কথা তার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। কুমারগিরি বলেন, "আমার শিষ্য বিশালদেব আজ রাত্রে আমার কুটিরে বিশ্রাম করবে, তার কুটিরে অতিথিরা যেতে পারেন।"

বীজগুপ্ত ও চিত্রলেখা উঠে দাঁড়ায়। যেতে যেতে চিত্রলেখা বলে, "যোগী! তুমি কিন্তু জেনে রেখ যে তপস্যা জীবনের ভুল।" আত্মাকে হত্যা করাই তপস্যার প্রকৃত অর্থ। আচ্ছা, এবার নর্তকী শ্রীচরণে প্রণাম জানাচ্ছে।" এই বলে হাসতে হাসতে চিত্রলেখা কুটিরের বাইরে চলে যায়।

চিত্রলেখার চলে যাবার সময় কুমারগিরি হেসে বলেন, "ঠিক বলেছ! আত্মাকে হত্যা করাই তপস্যা এবং মায়া-ব্রহ্মের সংযোগ হ'ল আত্মা। যখন আত্মার মৃত্যু হয় তখন মায়ার বিকৃত রূপ লুপ্ত হয় এবং সৎ, চিৎ ও আনন্দময় ব্রহ্ম রয়ে যায়। কিন্তু নর্তকী,

তোমার যদি অনুভূতি থাকত, তোমার অবস্থা যদি অন্য রকম হ'ত, তাহলে তুমি বোধ হয় এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হতে। তোমার ভিতর জ্ঞান আছে। কিন্তু সেই জ্ঞানকে বিকাশ করবার কোন যোগ্য পথপ্রদর্শক নেই। তোমার জন্য সত্যিই আমার দুঃখ হচ্ছে।"

বীজগুপ্ত ও চিত্রলেখাকে নিজের কুটিরে পৌঁছিয়ে দিয়ে বিশালদেব গুরুর কুটিরে ফিরে আসে। শয়নের প্রাক্কালে বীজগুপ্ত বলে, "চিত্রলেখা!"

চিত্রলেখা উত্তর দেয়, "প্রিয়তম!"

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বীজগুপ্ত বলে, "হৃদয়ে এক বোঝার মত তার মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে যেন আমাদের দু'জনার জীবনে দুঃখের ঘনঘটা ছেয়ে আসছে। চিত্রলেখা! কুমারগিরি যোগী এবং হয়ত তার ভিতর আকর্ষণ করবার শক্তি আছে।"

এক মুহূর্ত্তের জন্য চিত্রলেখার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করে। কিন্তু সে সামলিয়ে নিয়ে বলে, "প্রিয়তম! কুমারগিরি যোগী কিন্তু মূর্খ। তার আত্মার মৃত্যু হয়ে গেছে।"

চিত্রলেখা বীজগুপ্ত ও নিজেকে প্রবঞ্চনা করবার চেষ্টা করে। "কুমারগিরি নির্জনের অধিবাসী এবং আমরা দু'জনা কর্মক্ষেত্রের অভিযাত্রী। কুমারগিরি বাসনাকে হত্যা করেছে, এদিকে বাসনার ওপর আমাদের দু'জনার পূর্ণ আস্থা। তার জীবনের লক্ষ্য হ'ল কাল্পনিক শূন্যতা এবং আমাদের দু'জনার লক্ষ্য হ'ল মত্ততা। প্রিয়তম! সংসারের কোন ব্যক্তি আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে পারে না।"

আনন্দে বীজগুপ্তের মুখ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, "ভগবান যেন সেই করেন।"

চিত্রলেখা বীজগুপ্তকে প্রবঞ্চনা করে কিন্তু নিজের মনের কাছে সে মিথ্যা কথা বলতে পারে না, সে মনে মনে বলে, "সে যাই হ'ক। কুমারগিরি সত্যই সুন্দর!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

মহাযজ্ঞের হোমানলের গন্ধে রাজপ্রাসাদ ভরে উঠেছে, আর তারই বিরাট প্রাংগণে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের অতিথিগণ উপস্থিত। রত্নখচিত সিংহাসনে মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত বিরাজমান, তাঁর দৃষ্টি পূর্বদিকে নিবদ্ধ। দক্ষিণ পার্শ্বে বিশাল সাম্রাজ্যের নিমন্ত্রিত সেনাপতিগণ এবং বামে রাজ্যের কর্মচারিগণ উপবিষ্ট। সম্মুখে কর্মরত ব্রাহ্মণ ও তপস্বীদের ভীড়।

প্রথা অনুসারে মহাযজ্ঞ সমাধানের পর দর্শন-শাস্ত্রে তর্ক-বিতর্কের জন্য এই সভার আয়োজন হয়েছে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত হেসে আপন প্রধান মন্ত্রী চাণক্যের দিকে তাকালেন, "নীতি-কুশল মন্ত্রিবর! আপনার নীতিশাস্ত্রে অনেক স্থানে ধার্মিক সিদ্ধান্তের কোন মূল্য দেয় না। মন্ত্রিবর, এ বিরোধের কারণ কি? নীতিশাস্ত্র ধর্মের অন্তর্গত কি না, আজ যদি এ বিষয়ে আলোচনা করেন?"

চাণক্য উঠে গিয়ে সম্মুখের উপস্থিত বিদ্বানগুলীকে নমস্কার জানালেন এবং সম্রাটকে অভিবাদন করে উপবেশন করলেন। উপবিষ্ট অবস্থায় তিনি উত্তর দেন, "মহারাজের প্রশ্ন খুবই স্বাভাবিক। আমার নীতিশাস্ত্রে যে কখন কখন প্রচলিত ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধে উল্লেখ থাকে তা আমি মানি। কিন্তু সংগে-সংগে আমি বলে দিতে চাই যে, সমাজ দ্বারাই ধর্মের নির্মাণ হয়। ধর্ম নীতিশাস্ত্রের জন্মদাতা হলেও নীতিশাস্ত্র থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে। সমাজকে জীবিত রাখবার জন্য সমাজ-নির্দ্ধারিত নিয়মগুলিকেই নীতিশাস্ত্র বলে এবং এই শাস্ত্রের আধার হ'ল তর্ক। ধর্মের অবলম্বন বিশ্বাস এবং প্রত্যেক মানুষকে বিশ্বাসের বন্ধনে বেঁধে রীতি বা নিয়ম অনুসারে চালালেই সমাজের পক্ষে মংগল। তাই এরকম অবস্থাও আসতে পারে, যখন ধর্মের বিরুদ্ধে চলাও সমাজের পক্ষে কল্যাণকর ও এমনি করে ধর্মের রূপ ধীরে ধীরে বদলিয়ে যায়।"

চাণক্যের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনে সবাই স্তব্ধ। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত গর্বিত ভাবে প্রথমে মন্ত্রীর দিকে, তারপর সম্মুখের বিদ্বানগুলীর দিকে তাকালেন। মন্ত্রীর কথাগুলি খুবই মূল্যবান ও সারবস্তু কিন্তু তাদের ভিতর এক নূতন দৃষ্টিভংগী, যা নির্দ্ধারিত সিদ্ধান্তের একেবারে বিপক্ষে। উপস্থিত মণ্ডলীর ভিতর কে এই নূতন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে, সবাই তারই প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বিদ্বানগুলীর ভিতর হ'তে এক যুবক যোগী শান্ত ভাবে উত্তর দেয়, "রাজন! ঈশ্বর মানুষের সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষ সৃষ্টি করেছে সমাজের। ধর্ম ঈশ্বরের সাংসারিক রূপ, ঈশ্বরের সংগে সমাজের সংযোগ স্থাপনের অবলম্বন। ধর্মকে অবহেলা করার অর্থ ঈশ্বরকে অগ্রাহ্য করা, সত্য থেকে দূরে সরে যাওয়া। সত্যের এক রূপ এবং সত্যেরই অপর নাম ধর্ম। যদি নীতি-শাস্ত্র ধার্মিক সিদ্ধান্তের প্রতিকূলে থাকে তাহলে তাকে নীতিশাস্ত্র না বলে অনীতিশাস্ত্র বলাই বাঞ্ছনীয়। উচিত ও অনুচিত, ন্যায় ও অন্যায় এ সবেরই মানদণ্ড ধর্ম—ধর্মের ভিতর রয়েছে সমস্ত বিশ্বের ব্যাপ্তি!"

বয়োবৃদ্ধ মন্ত্রী চাণক্য নবযুবক যোগী কুমারগিরির দিকে তাচ্ছিল্যভরে তাকিয়ে বললেন, "যোগী, ধর্মের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে ধর্মের দোহাই দিচ্ছ কিন্তু তুমি কি জান ধর্মের সৃষ্টিকর্ত্তা কে?"

"মানুষের অন্তরের আত্মা ঈশ্বর ধর্মের সৃষ্টি করেছেন!"

"কিন্তু ঈশ্বর কে? কে সৃষ্টি করেছে?"

চাণক্যের এই প্রশ্নে লোকেরা চমকিয়ে ওঠে। "ঈশ্বরকে কে সৃষ্টি করেছে?" এ প্রশ্ন সত্যই অদ্ভুত! উপস্থিত সকলের ভিতর চাঞ্চল্য দেখা যায়। কিন্তু কুমারগিরি শান্ত ভাবে উত্তর দেয় "ঈশ্বর অনাদি!"

"যোগী, তুমি ঠিক বলেছ যে ঈশ্বর অনাদি! কিন্তু এ কথা একেবারে নূতন নয়, প্রত্যেক মানুষ জানে যে ঈশ্বর অনাদি অর্থাৎ ঈশ্বরে কোন আরম্ভ নেই! কিন্তু তুমি ঈশ্বরকে কি জানো? এখানে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের ভিতর কেউ কি ঈশ্বরকে জানে?"

চাণক্যর স্বর গম্ভীর ও চক্ষু জ্যোতিষ্মান। কারুর উত্তরের প্রতীক্ষা না করেই চাণক্য আবার শুরু করেন, "হ্যাঁ, ঈশ্বর অনাদি, কিন্তু আমি জোর করে বলতে পারি যে, সেই ঈশ্বরকে কেউ জানে না, তিনি আমাদের কল্পনার বাইরে। তিনি সত্য কিন্তু এত আলোকময় তিনি যে তাঁর সামনে মানুষ চোখ মেলতে পারে না। সেই সত্যকে জানবার চেষ্টা কর, সেই ঈশ্বরকে পাবার জন্য কঠোর তপস্যা কর কিন্তু সব ব্যর্থ, সব নিষ্ফল হয়ে যাবে। যদি তুমি ঈশ্বরকে জেনেই ফেলবে, যদি অখণ্ড ও অসীমের সৃষ্টিকর্ত্তাকে তোমার

কল্পনার মধ্যে ধরেই আনবে, তাহলে তিনি ঈশ্বর হলেন কি করে ? যোগী, তোমার ও আমার ঈশ্বর যাঁকে আমরা পূজা করি তিনি সে ঈশ্বর থেকে ভিন্ন। আমার ও তোমার ঈশ্বর কল্পনা-সৃষ্ট। প্রয়োজন মিটাবার জন্তই সমাজ এই ঈশ্বরের সৃষ্টি করেছে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে চাণক্য চারি দিক একবার দেখে নেন, গভীর নিস্তব্ধতা ছেয়ে থাকে সভামণ্ডপে। যোগী কুমারগিরি তখনও গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে চোখ বন্ধ করে বসে ! এদিকে চাণক্যের দৃষ্টিতে গর্ব ও পূর্ণ আত্মবিশ্বাস। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যে, তিনি যেন সভার যে কোন ব্যক্তিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তাঁর যুক্তিকে খণ্ডন করবার জন্ত। উত্তরের জন্ত কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে চাণক্য আবার বলেন, "এখনও আমার কথা সম্পূর্ণ হয় নি। হ্যাঁ, আমি বলছিলাম যে আমার ও তোমাদের ঈশ্বর যাঁকে আমরা পূজা করি তিনি কল্পনার দ্বারা, আমাদের সমাজ দ্বারা সৃষ্ট হয়েছেন। বিভিন্ন সমাজের কল্পনা অনুসারে তাঁর বিভিন্ন রূপ। এখন আমাদের বুঝতে হবে অন্তরাত্মা কি বস্তু। এ ক্ষেত্রেও আমাদের যে সব ধারণা আছে তাদের বেশীর ভাগই ভ্রান্ত। অন্তরাত্মা সমাজের দ্বারা নির্মিত হয়েছেন, ভগবানের দ্বারা নয়। যদি সত্যই তার রচনা ভগবান করতেন তাহলে বিভিন্ন সমাজভুক্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন অন্তরাত্মা হ'ত না। ঈশ্বর এক আর বাস্তবিকই তিনি যদি ...মিক নিয়মের রচনা করে থাকেন তাহলে প্রত্যেক মানব একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হবে। কিন্তু বস্তুত: এ রকম হয় না, এক সমাজের ব্যক্তির অন্তরাত্মা অপর এক সমাজের ব্যক্তির অন্তরাত্মা অপেক্ষা ভিন্ন। সমাজ যা কিছু অন্যায় মনে করে মানবের অন্তরাত্মাও তাকেই অন্যায় বলে মেনে নেয়। এজন্য এটা জোর করে বলা যেতে পারে যে, অন্তরাত্মা সমাজ দ্বারা নির্মিত। মানুষের হৃদয়ে সামাজিক নিয়মের প্রতি অন্ধবিশ্বাস থাকে এবং পূর্ণ শ্রদ্ধাকেই অন্তরাত্মা বলে। সমাজ থেকে তার কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই।

চাণক্যের অকাট্য যুক্তির সামনে বিদ্বমণ্ডলীর অনেকেই মাথা নত করে নেয়। কুমারগিরি কিন্তু তখনও চিন্তা-সাগরে নিমগ্ন। তার প্রশস্ত ললাটে এক অলৌকিক তেজ বিদ্যমান কিন্তু সবাইয়ের মতে চাণক্যের যুক্তির কোন উত্তর দিতে না পারায় কুমারগিরি চাণক্যের নিকট পরাজিত। মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের ইশারায় তাঁর পার্শ্বচর সভামণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলে, "তর্ক-বিতর্কের শেষ হয়েছে, এবার নৃত্য আরম্ভ হবে।" নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে যায়, উপস্থিত সেনাপতিগণ হর্ষধ্বনি করে ওঠে।

শৃংগার-ভবন থেকে চিত্রলেখা সভামণ্ডপে প্রবেশ করে। তার সারা দেহের অলঙ্কার এক অপূর্ব সংগীতের ধ্বনি বাজিয়ে যায়। ধর্মের নীরস ও শুষ্ক বায়ুমণ্ডল পরাগ-ভরা সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে কেঁপে ওঠে, কল্পিত উষার আধো-আলো আধো-ছায়াকে ভেদ করে প্রভাত সূর্য্যের অরুণ-রশ্মি ছড়িয়ে পড়ে। হেমন্তের শীতল শুষ্ক বাতাস বসন্তের মৃদু-উত্তাপে জড়িত পাগল-করা গন্ধে ভরে যায়। সমস্ত পরিস্থিতিই যায় বদলিয়ে।

প্রাংগণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চিত্রলেখা সর্বপ্রথম সম্রাট চন্দ্রগুপ্তকে অভিবাদন করে। তার সৌন্দর্য্যে এক অদ্ভুত আকর্ষণ। পূর্ণশশির ন্যায় মুখের চার পাশে নাগিনীর মত কালো কেশরাশি ছড়িয়ে পড়েছে, মনে হচ্ছে যেন তারা বিষপানের ভয়ে চন্দ্রমার সুধারসে সিক্ত হ'বার জন্ত ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। কবরীর মুক্তা-জাল দেখে মনে হচ্ছিল যেন চন্দ্রমার এই বিপদ দেখে তারকারাজি সারি বেঁধে কালো নাগিনীদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে লেগে গেছে। দেহের ওপর রেশমী দোপাট্টার এক আবরণ। তার নীচে পাতলা জরীর কাঁচুলী, তার নীচে পাতলা জরির কাঁচুলীতে তার স্তনযুগলের শোভা আরও ফুটে উঠেছে। সোনালী তারার ওড়না রাত্রের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। বিবিধ অলঙ্কারে সারা দেহ ভরা। মনে হয় যেন সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সভামাঝে দাঁড়িয়ে। মহারাজকে অভিবাদন করবার পর নর্ত্তকী চিত্রলেখা সেনাপতিবৃন্দের দিকে তাকিয়ে একবার হাসে। তাদের আনন্দোচ্ছ্বাসে সমস্ত সভাগৃহ ধ্বনিত হয়ে ওঠে। হঠাৎ নর্ত্তকী উপস্থিত সেনাপতিদের ভিতর বীজগুপ্তকে দেখতে পায়। বীজগুপ্ত একটু হাসে, নর্ত্তকী চোখের মৌন ভাষায় তাকে অভিবাদন জানায়। নর্ত্তকী দেখে যে, যোগী কুমারগিরিও সেখানে উপস্থিত। তার ইচ্ছা যে যোগী যেন অন্তত: একবার তার দিকে তাকায়। কিন্তু কুমারগিরি তখন অন্য এক জগতে বিচরণে রত, চিত্রলেখার দিকে তাকাবার তাঁর তখন অবসর কোথায় ?

মৃদংগের গম্ভীর তালের সংগে কল্যাণের সুরে বেজে চলেছে সারংগী, নটীর আসবার সংগে সংগে যে মৃদু গুঞ্জন চারি দিকে শুরু হয়েছিল তা' এক মুহূর্ত্তে শান্ত হয়ে যায়। তার পদ্মের মত নরম পায়ে ঘুঁঘুরের শব্দ তালে তালে বাজতে থাকে। নৃত্য আরম্ভ হয়। চিত্রলেখার নৃত্য-ভংগিমায় বিদ্যুতের গতি—মৃদংগের তালে মেঘের গম্ভীর গর্জন। চারি পাশে গভীর নিস্তব্ধতা। প্রত্যেকে নর্ত্তকীর নৃত্যকলা মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখে চলেছে।

হঠাৎ কুমারগিরি চোখ মেলে চাইলেন। তাঁর চোখে সে সময় এক দৈবী জ্যোতি ! তিনি উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে বললেন, "মন্ত্রিবর চাণক্য ! আমি ঈশ্বরকে জানি, তোমাকে ও সমস্ত সভাকে বিশ্বাস করাবার জন্য আমি এই স্থানেই ঈশ্বরের দর্শন করাতে পারি।"

সভার নিস্তব্ধতা ভেংগে যায়। উপস্থিত জনতার মধ্যে কেউ কেউ তাঁর কথা আগ্রহ সহকারে শোনে কিন্তু নবযুবকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা যায়। কারণ, তারা পরম আনন্দে নর্ত্তকীর নৃত্য-কলা উপভোগ করছিল। তারা যোগীর কথায় ঘোর আপত্তি জানায়।

চিত্রলেখা যোগীর কথা শোনে কিন্তু নৃত্য বন্ধ করে না। সে তার নৃত্য মাধুর্য্যে সবাইকে আকৃষ্ট করতে ব্যস্ত। মহারাজা চন্দ্রগুপ্ত মন্ত্রী চাণক্যকে ইংগিত করলেন। কুমারগিরির কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করে চাণক্য বলেন, "সেনাপতি ও বিদ্বানগণ ! যোগী কুমারগিরি বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বরকে জানেন এবং এই মুহূর্ত্তে সমস্ত সভাকে সেই পরম পুরুষের দর্শন করাতে পারেন। মহারাজা তাঁকে এই অলৌকিক কার্য্য করতে সম্মতি দিয়েছেন, অতএব কিছুক্ষণের জন্য নৃত্য বন্ধ করা হ'ক।"

চাণক্যের কথায় চিত্রলেখা রেগে যায় কিন্তু কুমারগিরির ওপর তার আরও বেশী রাগ হয়। নিজেকে সংবরণ করে সে সভার এক কোণে বসে পড়ে। চাণক্য এবার যোগীকে লক্ষ্য করে বলেন, "যোগী কুমারগিরি, আমরা সবাই ঈশ্বরকে দেখবার জন্য প্রস্তুত।"

কুমারগিরি আসন পরিত্যাগ করে উঠে দাঁড়ান। সভা একেবারে

নিস্তব্ধ। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে নেবার পর বললেন, "উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী ও সেনাপতিগণ, আপনারা এবার আমার দিকে তাকান।"

সবাই দেখলে যে যেখানে কুমারগিরি দাঁড়িয়েছিলেন, ঠিক তারই পাশে যজ্ঞবেদী থেকে আগুনের এক শিখা বেরুচ্ছে আর সেই শিখা উপরের দিকে বেড়ে চলেছে। ক্রমে সেই শিখা আরও উপরে আকাশের দিকে ছুটে চলল। ধীরে ধীরে সেই ক্ষীণ অগ্নিশিখার আকৃতি বাড়তে থাকে এবং তেজ তার এত প্রখর হয়ে উঠল যে, কেউ আর সেই প্রচণ্ড আলোর সামনে চোখ মেলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না। কিন্তু সেই অগ্নিশিখার কোন উত্তাপ নেই, আছে শুধু আলোর তীক্ষ্ণতা। কুমারগিরি বললেন, "ইহাই সত্য!"

চাণক্য চিৎকার করে বলে ওঠেন, "যোগী, তুমি মিথ্যা বলছ! ওখানে তো কিছুই নেই?"

কুমারগিরি উত্তর দেন, "প্রধান মন্ত্রীর কি সত্যের আলো প্রত্যক্ষ করবার শক্তি নেই?"

চাণক্য বলেন, "আলো? কিসের আলো? এখানে তো কিছুই নেই?"

কুমারগিরি কোন উত্তর দেন না। তিনি শুধু বলেন, "আবার দেখ।"

এবারে অগ্নিশিখা কমতে কমতে একটি পুঞ্জে পরিণত হয়ে যায়। সেই অগ্নিপুঞ্জে সবাই নানা রকম দৃশ্য দেখতে থাকে—দৃশ্যগুলি এক দিক থেকে বার হয়ে অপর দিকে মিলিয়ে যাচ্ছিল। সবাই সেই পুঞ্জে এক বিরাট নগরের সৃষ্টি থেকে বিনাশ পর্য্যন্ত দেখলে, সমস্ত পৃথিবী, জল, বায়ু ও আকাশকে দেখলে। তার পর সেই সব কিছু লুপ্ত হয়ে গিয়ে, শুধু সেই অগ্নিপুঞ্জ থেকে যায়।

যোগী বলেন "এই হ'ল ঈশ্বর।"

চাণক্য পাগলের মত চিৎকার করে ওঠেন। "আমি কিছুই দেখতে পাইনি। যোগী, আমি আবার বলছি যে তোমার সমস্ত কথা মিথ্যা।"

কুমারগিরি চোখ বন্ধ করে নিতেই সব লুপ্ত হয়ে যায়। তখন যোগী হেসে চাণক্যের কথার উত্তর দেন, "মন্ত্রিবর! আমি বলব যে তুমিই মিথ্যা বলছ! আমার কথার সাক্ষী সভায় আহূত সমস্ত অতিথি। তাঁরাই তোমার প্রশ্নের জবাব দেবেন।"

সবাই চিৎকার করে বলে ওঠে, "মহামন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন, কারণ আমরা সত্য ও ঈশ্বর উভয়কেই দেখেছি।"

মর্মাহত চাণক্য মহারাজার দিকে তাকান। মহারাজও ঐ এক উত্তর দেন "মন্ত্রি! কুমারগিরি মিথ্যা বলেনি। সত্যই আমরা ঈশ্বর ও সত্যকে দেখতে পেয়েছি।"

"এই প্রথম বার আমার চোখ আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করলে! নবযুবক যোগী, তোমারই জিত, আমি পরাজিত!" এই বলে চাণক্য বসে পড়েন।

যোগী প্রস্থানের জন্য প্রস্তুত, এমন সময়ে নর্ত্তকী চিত্রলেখা বলে ওঠে, "যোগী, দাঁড়াও। আমার ভ্রম এখনও দূর হয়নি।"

চিত্রলেখার কথা শুনে সকলের কৌতূহল বেড়ে যায়। যোগী থমকে দাঁড়ান। সামনে এগিয়ে এসে চিত্রলেখা বলে "যোগী, তুমি যা কিছু দেখিয়েছ আমি কিন্তু দেখতে পাইনি। সকলে মন্ত্রী চাণক্যকে মিথ্যাবাদী মনে করতে পারেন কিন্তু আমি তাঁকে অবিশ্বাস করি না। তোমার কাছে আমার শুধু এই জিজ্ঞাস্য যে, যে সত্য ও ঈশ্বরের রূপ তুমি সমস্ত সভাকে দেখিয়েছ, তুমি নিজেও কি ঠিক তাঁদের ঐ রূপ দেখতে পেয়েছ?"

নর্ত্তকী ও যোগী দু'জনা দু'জনাকে দেখে। যোগীর নয়নে আত্ম-বিশ্বাসের অহঙ্কার ও তপস্যার শক্তি এবং নর্ত্তকীর দৃষ্টিতে আনন্দের হিল্লোল ও অবিশ্বাসের ছাপ। যোগী হঠাৎই বলে ফেলে "না।"

সবাই চমকে ওঠে। আনন্দে বিহ্বল হয়ে চাণক্য দাঁড়িয়ে পড়েন কিন্তু সেদিকে কোন লক্ষ্য না করে চিত্রলেখা বলে, "যোগী, এটাই কি ঠিক না যে আত্মশক্তির দ্বারা সবাইকে প্রভাবান্বিত করে তুমি আপন কল্পনা-প্রসূত সত্য ও ঈশ্বরের রূপ দেখালে? মিথ্যা বোল না, সত্য ও ঈশ্বরের নামে আমি তোমাকে এ প্রশ্ন করছি। মনে রেখ যে তুমি একজন যোগী!"

একটু চিন্তা করে কুমারগিরি উত্তর দেন, "তুমি ঠিকই বলেছ, নর্ত্তকী!"

চিত্রলেখার প্রশ্ন ও যোগীর উত্তর শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে যায়। নর্ত্তকী আবার জিজ্ঞেস করে, "হ্যাঁ, আর একটি প্রশ্ন আছে। এও কি ঠিক না যে যার আত্মশক্তি তোমার আত্মশক্তি অপেক্ষা প্রবল, কেবল তাকেই তুমি তোমার কল্পনায়-গড়া বস্তু দেখাতে পারলে না?"

সভায় আলোড়ন শুরু হয়ে যায়। আপন শক্তি যে কত সীমিত তা কুমারগিরি বুঝতে পারে, কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগী শান্ত ভাবে উত্তর দেয়, "ঈশ্বরের ওপর যার বিশ্বাস আছে তার ভিতরেই আত্মশক্তি থাকে, নাস্তিকের ভিতর কোন আত্মশক্তি নেই। যদি মানুষের ভিতর কল্পনা থাকে তাহলে কল্পনাও প্রভাবান্বিত হবে, কিন্তু যেখানে কল্পনা মরে গেছে সেখানে মানুষের পক্ষে ঈশ্বরকে জানা একেবারে অসম্ভব। আর যাঁরা সত্য ও ঈশ্বরকে দেখেন নি তাঁদের কল্পনা মৃত, তাঁরা নাস্তিক এবং নাস্তিক আত্মশক্তির অধিকারী হতে পারে না।"

মহারাজের ইংগিতে চাণক্য বিজয়-মুকুট নিয়ে নর্ত্তকী চিত্রলেখাকে পরিয়ে দেন। "নর্ত্তকী! আজ তোমার জয় হয়েছে। আত্মশক্তির অপব্যবহার করে সত্যের রূপকে ভ্রান্তির আবরণে ঢেকে ফেলবার যে চেষ্টা যোগী কুমারগিরি করছে তুমি আমাদের সামনে সেই রহস্যের উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছ।" তার পর কুমারগিরিকে বলেন "যোগী, এরূপ করা তোমার উচিত হয়নি। এর শাস্তি তোমার পাওয়া উচিত, কিন্তু তোমাকে শাস্তি দেবার অধিকার আছে শুধু এই নর্ত্তকীর। যার কাছে তুমি আজ পরাজিত।"

কুমারগিরি রাগে জ্বলতে থাকে। "এই সভায় কেউ আমাকে পরাজিত করতে পারেনি এবং আমাকে শাস্তি দেবার অধিকারও কারুর নেই।"

যোগীর ক্রোধ দেখে সবাই ভয়ে কাঁপতে থাকে কিন্তু নর্ত্তকী শুধু হাসে। সভামণ্ডপে বেশ একটু সাড়া পড়ে যায়। চিত্রলেখা এগিয়ে আসতে আসতে সাবংগী বাদককে কিছু সংকেত করে। কুমারগিরির একেবারে সামনে এসে বলে "যোগী! তোমাকে দণ্ড দেবার অধিকার আমার ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তোমাকে উচিত শাস্তি দেবার জন্য আমি তোমার অপরাধের ওপর বিবেচনাও করেছি।

দেখবে তোমাকে শাস্তি দেবার কেমন সাহস আমার আছে—" বলে নর্ত্তকী আপন স্বর্ণমুকুট যোগীর মাথায় পরিয়ে দেয়।

ঠিক ঐ সময়ে সারংগীতে ইমন-রাগ বেজে ওঠে, নর্ত্তকীর দেহ নৃত্যের তালে তালে দুলতে থাকে—নৃত্য শুরু হয়—জনতার আনন্দ ও উল্লাসে সমস্ত সভা ভরে ওঠে।

ওদিকে কুমারগিরি নিশ্চল—নির্বাক! সভার সকলে নর্ত্তকী চিত্রলেখাকে ধন্যবাদ দেবার জন্য ব্যস্ত। "শাস্তি ও পরাজয়! কেন এমন হ'ল বিচার করতে হবে!" বলে যোগী সভামণ্ডপ থেকে দ্রুতবেগে প্রস্থান করে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চিত্রলেখার কাছে অপমান ও পরাজয় যোগীর মনে এক নূতন অনুভূতি জাগিয়ে দেয়। সেই অনুভূতির প্রখরতায় তার সমস্ত তেজ [illegible] যায়। সে কল্পনাই করতে পারে নি যে, তাকে কেউ কখনও পরাজিত করতে পারে আর একজন স্ত্রীলোক! [illegible] স্ত্রীলোক [illegible] একজন সাধারণ-নগণ্য নর্ত্তকী! কুমারগিরির মন বিদ্রোহ করে ওঠে। কেন এমন হ'ল? জয়ী হয়েও সে পরাজিত কেন হ'ল? মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্যের সেরা বিদ্বানেরা তাকে জয়মালা পরিয়ে দিল কিন্তু তার পরাজয় হ'ল শেষে অন্ধকার-রূপী এক নারীর কাছে? হ্যাঁ, এও অবশ্য ঠিক যে অন্ধকার-রূপী নারীর কাছে পরাজিত হওয়া কিছুমাত্র [illegible] নয়—কত বড় বড় সাধককে হার মানতে হয়েছে এই সামান্য নারীর কাছে! কিন্তু তবুও জেনে-শুনে তাঁরা কেউই তো নারীর কাছে পরাজিত হ'ন নি?

"জয় ও পরাজয় পৃথিবীতে এ দুই স্বাভাবিক! কিন্তু আমার এই পরাজয় বড় অদ্ভুত, জ্ঞান দিয়ে হয়ত সেই সামান্য অপ্সরা আমাকে পরাজিত করতে পারে নি কিন্তু তার উদারতার কাছে আমাকে হার স্বীকার করতে হ'ল।" যোগীর মাথায় তখনও সোনার বিজয় মুকুট শোভা পাচ্ছিল, মুকুটের কথা মনে [illegible] সংগে সংগে যোগী ক্রোধে মুকুট খুলে দূরে ফেলে দেয়। যোগী ভাবতে থাকে—"তার পৃথিবীতে পরাজয় নামে কোন শব্দের চিহ্নমাত্র ছিল না। বিজয় প্রাপ্তির জন্য সে পৃথিবীর যাবতীয় সুখকে দিয়েছে বিসর্জন, জয়লাভের জন্য সে করেছে গভীর তপস্যা—তবে কেন তার পরাজয় হ'ল?" কুমারগিরি উঠে দাঁড়ায়—"না আমার পরাজয় অসম্ভব! আমি পরাজিত হ'তে পারি না। আমার এত সাধনার পরিণাম কি পরাজয়? না, এ কখনও হ'তে পারে না।"

ধূলায় লুণ্ঠিত স্বর্ণমুকুটের দিকে তাকিয়ে তার মনে হয় যে মুকুট যেন তাকে বলছে, "যোগী, তোমার পরাজয় হয় নি, তোমার জয় হয়েছে! যোগীর সারা দেহে রোমাঞ্চ খেলে যায়। ধীরে ধীরে মুকুটের দিকে এগিয়ে সে থমকে দাঁড়ায়। আমার জয়যুক্ত পরাজয়! কি অদ্ভুত সমস্যা! এই বিজয় উপহারের ওপর আমার কি কোন অধিকার আছে? সভায় যে নারীর কাছে আমি পরাজিত হয়েছি সেই নারীকেই এই মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাহলে এ মুকুট তো উচ্ছিষ্ট?" যোগী ওখান থেকে চলে যাবার চেষ্টা করে কিন্তু পা যেন তার ওঠে না। চাঁদের উজ্জ্বল ও শুভ্র-কিরণে মুকুটের শোভা সহস্র গুণ বেড়ে যায়। কুমারগিরি মুকুটের দিকে ফিরে তাকায়। "কিন্তু আমি কি করে এই মুকুট পেলাম? সমস্ত সভা যাকে বিজয়ী বলে জানলে সে নিজেই যদি আমার কাছে পরাজিত মনে করে তাহলে তার কিসের বিজয়? বিজয় তো আমার! নর্ত্তকী! তুমি আমার কাছে কেন পরাজয় স্বীকার করলে? কেন? কিসের জন্য?"

"কারণ, আমি তোমার কাছে পরাজিত হয়েছি।"

যোগী চমকে ওঠে! সম্মুখে চিত্রলেখা দাঁড়িয়ে, চোখে-মুখে হাসি। "যোগী, এ সত্যই বড় অদ্ভুত যে আজ যে পরাজিত তার আনন্দের সীমা নেই আর যে বিজয়ী সে গভীর চিন্তায় মগ্ন।" কুমারগিরি কোন উত্তর না দিয়ে মুকুটের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চিত্রলেখা গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, "এ কি? বিজয় মুকুট ধূলোয় পড়ে! তাহলে কি যোগী তোমার নিজের জয় স্বীকার করনি?"

প্রশ্ন খুব কঠিন। আত্মাভিমানী যোগীর পক্ষে নিজের পরাজয় স্বীকার করা সত্যই অসম্ভব! সে কোন উত্তর দেয় না।

নর্ত্তকী তখন মুকুট উঠিয়ে নিয়ে বলে, "উদ্ধত যোগী! বিশ্বাস কর যে আমার পক্ষে তোমাকে পরাজিত করা সত্যই অসম্ভব!" এই বলে সে কুমারগিরিকে আবার মুকুট পরিয়ে দেয়। একবার ফেলে-দেওয়া মুকুট আবার পরতে যোগী কোন ইতস্ততঃ করে না, একটু আপত্তি পর্য্যন্ত করে না।

"যোগী, কি ভাবছ?"

"নর্ত্তকী, তুমি বেশ ভাল করেই জানো যে তুমি আমাকে পরাজিত করেছ, তাই বার বার তুমি আমাকে এমনি ভাবে অপমান করছ; কিন্তু তোমার সব চেষ্টা ব্যর্থ, সব ধারণা ভুল! যোগী সংসারত্যাগী, মান অপমানের সংগে তার কোন সম্বন্ধ নেই!"

"যোগী, তোমার এরকম ধারণা করা সত্যি অন্যায়। আমি আবার বলছি যে, তোমাকে পরাজিত করার কোন ক্ষমতা আমার নেই, কোন শক্তিও আমার নেই।"

যোগী কিছুক্ষণ অবধি এই বিচিত্রময়ী নারীকে দেখতে থাকে, তার পাংশুবর্ণ মুখ লাল হয়ে ওঠে, নিস্পন্দ নিশ্চল শরীর কেঁপে ওঠে। নর্ত্তকীর কোমল হাতখানি সজোরে চেপে ধরে হঠাৎ বলে, "নটী! সত্যি করে বল তুমি কেন ছায়ার মত আমার অনুসরণ করছ? এভাবে আমাকে লজ্জা দিয়ে তোমার কি লাভ?" যোগীর সমস্ত শরীর তখনও কাঁপছে! নর্ত্তকীর দেহ যোগীর দেহের সংগে সংলগ্ন, দু'জনার চোখে মিলনের ইংগিত! নর্ত্তকী হেসে উত্তর দেয়, "কেন ঘুরছি জান? আমাকে যে পরাজিত করেছে তার কাছে দীক্ষা নেব বলে।"

সেই সময়ে গন্ধে ভরা বসন্ত চলেছে চারি দিক থেকে বাতাসের মৃদু কম্পন আর তারাভরা আকাশ থেকে চাঁদের আলো বাঁধ ভেংগে ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে! নির্জন প্রাংগণের গভীর নিস্তব্ধতার মাঝখানে যোগী কুমারগিরির সম্মুখে দাঁড়িয়ে নর্ত্তকী চিত্রলেখা!

যোগীর মোহাচ্ছন্ন ভাব কেটে গেছে। লজ্জায় বাধা পেয়ে সে পিছনে সরে গিয়ে গম্ভীর স্বরে বলে "সুন্দরি! আমার কাছে দীক্ষা নিলে যে পরিণামের বোঝা তোমাকে বইতে হবে, তার কথা কি একবার ভেবে দেখেছ?"

"হ্যাঁ, একবার নয়, বহু বার চিন্তা করেছি।"

অসামান্যা সুন্দরীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে যোগী বলে, "না, তুমি আমার কথার তাৎপর্য্য ঠিক বুঝতে পারলে না! আমার কাছে দীক্ষা নেওয়ার অর্থ হ'ল পৃথিবীর সমস্ত ভোগ-বিলাস, বাসনা-কামনাকে বিসর্জন দেওয়া। যে অকর্মণ্যতাকে তুমি ঘৃণা কর সেই অকর্মণ্যতাকেই নিজের করে নেওয়া, যে শুষ্ক তপস্যাকে তুমি হেসে উড়িয়ে দাও সেই শুষ্ক তপস্যাতেই তোমার কোমল শরীরকে নিয়োজিত করা।"

কোন কথা না বলে চিত্রলেখা ভাবতে থাকে, কি উত্তর তার দেওয়া উচিত। আর নর্ত্তকী হলেও দর্শনের বিকৃত সিদ্ধান্ত করতে কোন দিনই পরাঙ্মুখ নয়। কিন্তু মিথ্যা বলা তার স্বভাববিরুদ্ধ। আত্মা তার উত্তর দেয় "না", হৃদয় বলে "হ্যাঁ"। শেষ পর্য্যন্ত হৃদয়ের জয় হয়, আজ এই প্রথম বার হৃদয় তাকে সব চেয়ে বড় মিথ্যা বলতে বাধ্য করে, "যোগী, আমি তো সব কিছুর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি।"

কুমারগিরি বাধা পেয়ে উত্তর দেন, "প্রস্তুত হয়ে এসেছ? কিন্তু সুন্দরি, তুমি বোধ হয় ভুল করছ। যে-পথে চলবার জন্য তুমি এগিয়ে এসেছ সে-পথ বড় কণ্টকময়! অনেকেই এ কাজ পারে না। জানো, নিজেকে ভুলে যাওয়া কত কঠিন কাজ? আমি জানি, তুমি তা পারবে না।"

চিত্রলেখা উত্তর দেয়, "যোগী, তোমার কথা ঠিক, কাজটা সত্যি কঠিন কিন্তু তাই বলে কি অসম্ভব?"

যোগী নর্ত্তকীকে আপাদ-মস্তক দেখে নেয়। নর্ত্তকীর অংগে তখনও নৃত্য-বেশ, এবং চোখে অদ্ভুত আকর্ষণ ও উল্লাস! যোগী মনে মনেই বলে, "সত্যিই এ নারী অপরূপ সুন্দরী!" আজ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে যোগী কোন দিন কিছু ভাবেনি, প্রেম ও বাসনার ক্ষেত্র তার কাছে একেবারে নূতন। তাই বোধ হয় নর্ত্তকীর এই অপরূপ সৌন্দর্য্যে যোগীর মন অকারণে চঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই চঞ্চলতায় সে প্রথম বার জাগতিক সুখ অনুভব করে। সত্যি, কি বিচিত্র এই সুখের অনুভূতি! "সুন্দরী নর্ত্তকী! তোমাকে দীক্ষা দেওয়া কত দূর উচিত হবে, এর ওপর বিচার করা প্রয়োজন। আমি এখনি কিছু বলতে পারছি না।"

কুমারগিরির কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে নর্ত্তকী বলে, "এখনি তুমি কিছু বলতে পারছ না যোগী, তাই না? কিন্তু কেন? তোমার কি আমার ওপর বিশ্বাস নেই, না নিজেকেই বিশ্বাস করতে পারছ না? তোমার কাছে আমাকে দীক্ষা দেওয়া না-দেওয়া হয়ত তেমন মূল্যবান কিছু নয় কিন্তু আমার কাছে এক জীবন-মরণ সমস্যা, তুমি এবার নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে, আমি তোমার ওপর কতখানি নির্ভর করে আছি? মনে কর, একজনের কাছে জল আছে কিন্তু সে একজন পিপাসার্তকে তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করে মরে যেতে দেখেও তাকে যদি জল না দেয়, তাহলে সে এক বিরাট পাপের ভাগী হবে কি না! তার আত্মা কি কখনও সুখী হতে পারবে?"

নর্ত্তকীর এই উত্তরে যোগী লজ্জা পায়। "সুন্দরি! তোমাকে সব কথা তবে খুলেই বলি, শোন। তোমাকে দীক্ষা দিতে ইতস্ততঃ করছি, কারণ তোমার মনে দর্শনের সব সিদ্ধান্ত বিকৃতরূপে অবস্থান করছে। এই সিদ্ধান্তগুলি তর্কপূর্ণ এবং বিকৃত সিদ্ধান্ত বিশ্বাসিগণের অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। আমার ভয় যে, ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে তোমার ভিতরে থেকে দূর করতে গিয়ে আমি নিজেই মুহ্যমান তৃণের ন্যায় না ভেসে যাই।" যোগী এই প্রথম তার নিজের মনের দুর্বলতা বুঝতে পারে। অজ্ঞাতসারে সেই দুর্বলতা প্রকাশও করে ফেলে নর্ত্তকীর সামনে। যোগীর নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয়। "সুন্দরি! যা কিছু বলে ফেলেছি সবই হয়ত খেয়ালের বশে। এখন তোমার কাছে আমার শুধু এই প্রার্থনা যে, এখান থেকে তুমি চলে যাও পরিস্থিতি বিচার করবার জন্য আমাকে সময় দাও।"

"বেশ! আমার বর্ত্তমানে তোমার যদি কিছুমাত্র দুঃখ হয় তো আমি এখনই এখান থেকে চলে যাচ্ছি। তুমি হয়ত মনে করছ যে, যে নারী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে সে অন্ধকার ও মায়ার প্রতিমূর্ত্তি! আমার বিকৃত সিদ্ধান্তে তোমার ভয় কিন্তু তোমার এরকম ধারণা করার ভেতর কোন যুক্তি নেই। তোমার কাছে নিজের বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও সমস্ত সংস্কারই বিসর্জন দিতে দীক্ষা নিতে ছুটে এসেছিলাম। তুমি বলছ নারী অন্ধকার ও মায়ার আর এক রূপ! কিন্তু এখানেও তুমি ভুল বুঝ[illegible] হ'ল শক্তি! যদি তাকে পরিচালনা করবার মত যো[illegible] ব্যক্তি থাকে তবে সে সৃষ্টি করতে পারে এবং যদি [illegible] হয় তাহলে সে সব কিছু ধ্বংস করে [illegible]। এজন্য যে [illegible] স্ত্রীলোককে ভয় করে হয় সে অযোগ্য নয় সে কা[illegible]। [illegible] ও কাপুরুষ এই দু'জনার ভিতরই পূর্ণতা নেই।"

চিত্রলেখা চলে যায় কিন্তু কিছু দূরে গিয়ে সে থমকে দাঁড়ায় "হ্যাঁ, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, [illegible] কাছে আবার আসব। বিচার করবার জন্য তোমায় যথেষ্ট [illegible] দিচ্ছি। আমাকে দীক্ষা দেওয়া তোমার পক্ষে সম্ভব [illegible] কি না বলে দিও। আচ্ছা, আজ তবে অনুমতি দাও।"

নর্ত্তকীর স্বরের সংগীত ভবনও যোগীর কানে বেজে চলেছে, চোখের সামনে সুন্দরী নর্ত্তকীর চেহারা শুধু ঘুরে বেড়ায়। যোগী এক অতৃপ্ত মাতালের মত সুন্দরীকে দেখতে থাকে; তার [illegible] মনে হয় যেন এক মাতাল অজ্ঞান হবার ভয়ে ভীত অথচ তার সম্মুখে সুগন্ধি সুরাপাত্র থেকে সুরা একটু একটু করে [illegible] নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, গ্রহণ করবার তার কোন ক্ষমতা নেই, সা[illegible] নেই, ভরসা নেই। আত্মসংবরণ করা যোগীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, উচ্চৈঃস্বরে নর্ত্তকীকে ডেকে বলে, "সুন্দরি, একটু দাঁড়াও!"

যোগী নিজের ব্যবহারে নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়ে। তাঁর আত্মা এই উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করে কিন্তু এই নারীর কথার উত্তর দিয়ে নিজের অস্তিত্বের কথা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত। বলে, মন আত্মার তিরস্কারে বাদ সেধে বসে, নর্ত্তকী ফিরে দাঁড়ায়—তার অধরে সেই মধুর হাসি কিন্তু হৃদয়ে এক অদ্ভুত কম্পন!

"যোগী, মনে হচ্ছে তুমি নিজের ভুল বুঝতে পেরেছ! বল, কি বলবে?"

কুমারগিরি কোন উত্তর দেয় না। চাঁদনী রাতে নর্ত্তকীর সৌন্দর্য্যরস পানে সে আজ ব্যগ্র। শৃংগারে সাজান তার অপরূপ সৌন্দর্য্যে সে বিহ্বল। ইচ্ছা যে কি, যোগী তো বেশ অনুভব করে, সংগে সংগে ইচ্ছার মাধুর্য্যকেও সে বেশ বুঝতে পারে। হঠাৎ তার মনে প্রশ্ন জাগে "নারী কি আর সৌন্দর্য্য কি! ভগবান এই দুইএর সৃষ্টিই বা কেন করেছেন?" বিবেক বলে, "এ প্রশ্ন কর

আমার সাজে না, তাহলে আমি কি আমার পথ থেকে ভ্রষ্ট হতে চলেছি? কঠিন চেষ্টা দ্বারা যোগী এই চিন্তাকে দূরে ফেলে দিতে চায়।

"সুন্দরি, তুমি কি ভাবছ যে আমি কোন ভুল করেছি? কিন্তু জ্ঞাতসারে কোন ভুল করেছি বলে তো মনে হয় না?"

প্রতিবাদ করা উচিত নয় ভেবে চিত্রলেখা বলে, "দেব, আমাকে ক্ষমা কর। যাকে আমি গুরুপদে অভিষিক্ত করতে এসেছি, সে ভুল করবে কেমন করে? আমি যা বলেছি তার জন্য ক্ষমা চাইছি।"

"তুমি হয়ত জিজ্ঞেস করবে যে আমি তোমাকে কেন ডেকেছি। কিন্তু আমি নিজেই জানি না যে এ সব আমি করলামই বা কেন? সত্যি আমি এক বিরাট ভুল করেছি। তবুও যখন তোমাকে আবার ডেকেছি তখন শুনে যাও যে তোমায় দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। তোমাকে দীক্ষা দেওয়ার অর্থ নিজেকেই তোমা[illegible]ত করা। আমি তার জন্য প্রস্তুত নই।" অস্তাচলগামী চন্দ্রমার দিকে তাকিয়ে যোগী অপলক নেত্রে কা'কে যে খুঁজে পেতে চায়।

এই কথা শুনে নর্ত্তকী গম্ভীর হয়ে ওঠে। মুখে নিরাশার ছায়া নেমে আসে ও চোখে করুণার আবেশ যায় ছেয়ে। সে ধীরে ধীরে বলে, "দেব! তুমি আজ যে ভুল করলে তার জন্য তোমার চেয়ে আমার দুঃখ হচ্ছে বেশী! কিন্তু কি করব? আমি এখন ঠিক বলতে পারছি না যে তোমার এই না পাবার দরুণ আমার জীবনের কি গতি হবে। সে যাই হ'ক, তুমি জেনে রাখ যে তুমি আমার জীবনকে অনেক পরিমাণে প্রভাবান্বিত করে ফেলেছ। তুমি আমাকে দীক্ষা দেবে এই আশায় ভবিষ্যতে এক নূতন জীবন গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখেছিলাম। যাক্, এখন সে আশা নির্মূল হয়ে গেছে। তুমি বলেছিলে যে নারীর জীবন অন্ধকারময়, আমি তোমার আলো অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার অভিলাষ পূর্ণ হল না—তাই বলে তোমাকে আমি মোটেই দোষ দেব না। কারণ সব দোষ আমার ভাগ্যের।" এই বলে চিত্রলেখা যোগীর খুব কাছে এসে দাঁড়ায়।

যোগী নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ চিত্রলেখা যোগীর হাত ধরে ফেলে, যোগী এক অদ্ভুত কম্পন অনুভব করে, সে কম্পনে এক বিচিত্র আনন্দ ও সুখ! যোগী! তোমার ও আমার এক সংগে থাকা অসম্ভব! কারণ আমি এক নারী আর তুমি পুরুষ, আমি এক নর্ত্তকী আর তুমি যোগী; আমার পৃথিবী হ'ল বাসনাময় ও সাধনা নিয়ে হল তোমার জীবন! দু'জনার ভিতর এক তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা! ভালই হল, তুমি ঘূর্ণাবর্তের মত আমার জীবনে এসে মিলিয়ে গেলে! চেষ্টা করব যাতে ভবিষ্যতে তোমার সংগে আমার আর দেখা না হয়। কিন্তু বিদায় নেবার আগে তোমার চরণধূলি মাথায় নিতে বড় সাধ হচ্ছে।"

নর্ত্তকী যোগীর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। "সুন্দরি, এ ভাবে আমার পা ছোঁওয়া তোমার উচিত হয় নি।" নর্ত্তকীর দেহ তখন যোগীর দেহের সংগে সংলগ্ন। নর্ত্তকী তার মুখ কুমারগিরির মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বলে, "তুমি আমার ইষ্ট দেবতা।" দু'জনার দৃষ্টি পরস্পর আবদ্ধ। নটীর চোখের মাতিয়ে তোলা নেশায় বৈরাগী নিজেকে হারিয়ে ফেলে। নর্ত্তকী তার মুখ আরও এগিয়ে নিয়ে আসে। যোগী মুখ সরাতে পারে না, তারও নিঃশ্বাস বেশ গরম হয়ে ওঠে, সারা শরীর কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ কারুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, "গুরুদেব!"

যোগী চমকে ওঠে। নর্ত্তকীর কাছ থেকে সে এমন ভাবে সরে দাঁড়ালো যেন কোন ব্যক্তি সাপকে না দেখে তার কাছে এসে পড়েছিল এবং যখন সেই সাপ তাকে দংশন করতে উদ্যত, হঠাৎ দূরে দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তির সাবধান বাণী শুনে সে চমকে উঠে সরে দাঁড়ালো।

সম্মুখে বিশালদেব দাঁড়িয়ে। বিশালদেবকে দেখে কুমারগিরি লজ্জায় মাটিতে মিশে যায়। আজ আপন শিষ্যের সামনে সে এক নর্ত্তকীর কাছে পরাজিত।

বিশালদেবের ওপর চিত্রলেখার ভয়ানক রাগ হয়। এ সময়ে বিশালদেবের ওখানে আসার কি প্রয়োজন ছিল? দংশনোদ্যত সাপিনীর ন্যায় সে বিশালদেবের দিকে তড়িৎগতিতে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে "এ সময়ে তোমার এখানে আগমন কেন?"

"আমি গুরুদেবের শিষ্য—এত রাত্রিতে গুরুদেব না ফেরাতে আমি তাঁকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।"

চিত্রলেখা ধীরে বলে ওঠে, "হায় রে, আমার ভাগ্য!" কুমারগিরিকে বলে, "গুরুদেব, তাহলে আমি চললাম। কিন্তু মনে রেখ যে তোমার কাছে দীক্ষা আমি নিবই এবং দীক্ষা তোমাকে দিতে হবেই।"

নর্ত্তকীর মৃদু ও গম্ভীর স্বর শুনে মনে হয় যে, এ যেন কুমারগিরির প্রতি তার আদেশ। "এখন আমি কলরব-মুখরিত প্রাংগণ থেকে কোন নির্জন স্থানে যেতে যাই, মায়াকে পরিত্যাগ করে ব্রহ্মের উপাসনা করতে চাই। গুরুদেব, আমার বিষয় চিন্তা করবার সময় আমি তোমায় দিয়ে যাচ্ছি। তুমি সাধারণ মানুষের অনেক উর্দ্ধে, আমায় ভয় করবার কোন কারণ তোমার নেই; তুমি তো সব বাসনাকে জয় করেছ, তাই তোমার কাছে আমার এই প্রার্থনা। আচ্ছা, এবার দাসীর প্রণাম গ্রহণ কর।" এই বলে চিত্রলেখা চলে যায়।

বিশালদেবের হাত সজোরে চেপে ধরে কুমারগিরি বলে, "তুমি মূর্খ, মহামূর্খ!" তখন চন্দ্রমা অস্তাচলের পারে ডুবে গেছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

"শ্বেতাংক!"

"প্রভু!"

"বলো তো আজ তুমি কি দেখলে?"

"আজ্ঞে! আজ প্রভুপত্নীর কাছে কুমারগিরি পরাজিত হয়েছে। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।"

"তোমার আনন্দ হচ্ছে—বীজগুপ্ত হাসে—"চিত্রলেখা কুমারগিরিকে পরাজিত করেছে বলে তোমার আনন্দ হচ্ছে? কিন্তু শ্বেতাংক, আমার দুঃখ হচ্ছে। আমার কথা শুনে তোমার হয়ত আশ্চর্য্য লাগছে, কিন্তু আমি সত্যি বলছি। তুমি হাসছ, বাইরে আমিও হাসছি কিন্তু অন্তর আমার কাঁদছে।" শ্বেতাংক জিজ্ঞেস করে, "প্রভুর কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।"

বুঝতে পারলে না? তাও তো বটে, তুমি বুঝবেই বা কি

আছো জলছে। দাসী এসে বলে, "প্রভু তোমার জন্ত অপেক্ষা করছেন।"

শ্বেতাংক অধ্যয়ন-গৃহে প্রবেশ করে দেখে বীজগুপ্ত গভীর ভাবে কি যেন ভাবছে। আজ পর্য্যন্ত এত চিন্তামগ্ন অবস্থায় সে প্রভুকে আর কখনও দেখে নি। সম্মুখে সুরার শূন্য পাত্র। তার কল্পনার উদ্যানে এখন ভীতির উষ্ণ বাতাসের চঞ্চলতা, সুখের আকাশে কুজ্ঝটিকার মত্ততা! শ্বেতাংককে দেখে বীজগুপ্ত যেন ঘুম থেকে চমকে ওঠে, "তুমি এসে গেছ? কিন্তু, এত দেরী হ'ল কেন?"

শ্বেতাংক এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল গড়িয়ে নিয়ে নিমেষে নিঃশেষ করে ফেলে।

কিছুক্ষণ উত্তরের প্রতীক্ষা করবার পর বীজগুপ্ত আবার বলে, "শ্বেতাংক, তুমি আমার কথার জবাব দিচ্ছ না যে, কি ব্যাপার?"

"...র জন্ত অপেক্ষা করছিলাম তাই এত দেরী হয়ে গেল!"

"...লেখার জন্ত ...ভীক্ষা?" বীজগুপ্ত উঠে বসে, "তার মানে ... খুঁজে পেতে চায় ... পৌঁছলে সে বাড়ী ছিল না?"

এই কথা শুনে ...ক বিব্রত হয়ে পড়ে, নর্ত্তকীর কাছে প্রতিজ্ঞা ও ...খের কথা তার মনে পড়ে, "আজ্ঞে, প্রভু ঠিকই অনুমান করেছেন, দেবী সে সময় গৃহে ছিলেন না।"

...কে ইতস্তত: করতে দেখে সেনাপতি আবার জিজ্ঞেস করে, "সে নিশ্চয় তোমাকে বলেছে যে সে কোথায় গিয়েছিল?"

...কের মনে উপস্থিত হ'ল এক দ্বন্দ্ব, কিন্তু মীমাংসা করবার সময় তার হাতে বেশী নেই। ইতস্তত: না করেই সে উত্তর দেয়, "প্রভুপত্নী নিজে ... কিছুই বলেন না, তবে তার কথাবার্তায় মনে হ'ল যে তিনি মহামন্ত্রী চাণক্যের গৃহে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।"

বীজগুপ্ত অনেকখানি হাল্কা বোধ করতে লাগল। কে জানে, কেন তার কেবলি মনে হচ্ছিল যে চিত্রলেখা কুমারগিরির কাছে গিয়েছিল। শ্বেতাংকের উত্তরে সে সন্দেহ দূর হয়ে যায়। "হ্যাঁ, এবার ব'ল তাকে অভিনন্দন দিয়ে এলে কি না?"

"আজ্ঞে!" "কিন্তু তাঁর মতে তিনি অভিনন্দন পাবার যোগ্য ন'ন। এই জয়ে তিনি একটুও গর্ব অনুভব করছেন না, তার কিছুমাত্র আনন্দিত হয় নি। আমার বড় আশ্চর্য্য লাগছে যে আপন জয়ে দেবীর দুঃখ কেন?"

বীজগুপ্ত হেসে বলে, "আমি এই কথাই তোমাকে বলেছিলুম কি না? নিজের জয় স্বীকার না করাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয় যে তার পরাজয় হয়েছে।"

"প্রভুর কথা এবার কিছু কিছু বুঝতে পারছি।"

"কিছু বুঝতে পারার কোন অর্থই হয় না। যদি বুঝতে চাও তো সম্পূর্ণ বোঝ, নতুবা একেবারেই চেষ্টা কোর না।" শ্বেতাংক, মানুষ স্বাধীন ভাবে চিন্তা করবার অধিকারী হয়েও পরিস্থিতির দাস। এই পরিস্থিতি আসে তার পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলস্বরূপ। মানুষের জয় তখনই হয় যখন পরিস্থিতির আবর্ত্তে ঘূরপাক খেয়েও সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে না এবং আপন কর্ত্তব্য পথে অটল থেকে সে পরিস্থিতিকে জয় করতে পারে। চিত্রলেখা এখন পরিস্থিতির অধীনে; তার জীবনে কুমারগিরির আসা বা কুমারগিরির জীবনে তার যাওয়া এর অর্থ হ'ল তাদের দু'জনার জীবনের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত হওয়া। দুর্ভাগ্য বশত: দু'জনাই দু'জনার পথে এসেছে, একে অপরকে তার পথ থেকে ভ্রষ্ট করতে—এখন শুধু ভগবানই তাদের সাহায্য করতে পারেন।

[ক্রমশঃ।

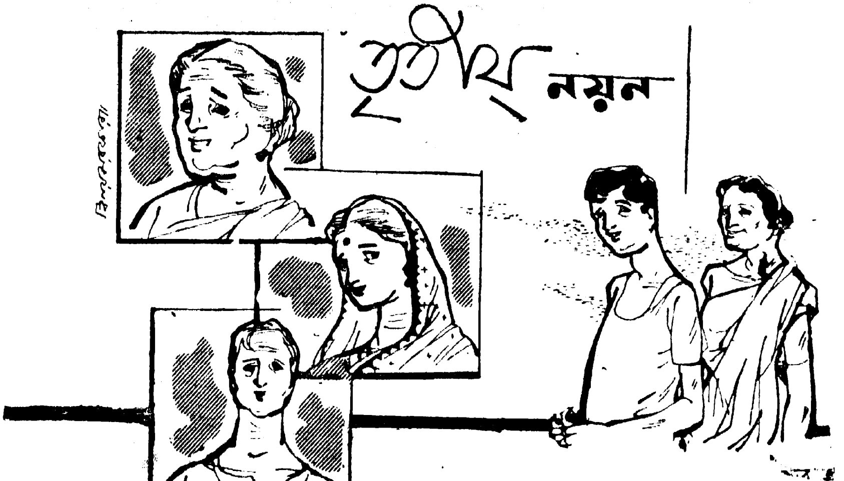
অনুবাদক : অমল সরকার

বিকেলের কাছে

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

বিকেলের কাছে কী চাও, কী পেলে খুশি হয় মন, বলো তো?
সে বলে, আমি তো জানি না, হৃদয় বাঁধি না রঙিন বিকেলে;
আলোর মেলায় আমি শুধু সেই আকাশের কাছে প্রণত।
তবু তৃষ্ণার নীল তরঙ্গে নদী বলে, মন কী পেলে?
হাওয়ার দু'হাতে হাল রেখে মাঝি পাল তুলে দিলো আকাশে,
জোয়ারের ঢেউ ভেঙে গুঁড়ো হয়, তবু জেগে রয় বাসনা;
সূর্যাস্তের ছায়াপথ দিয়ে দেখো যেন কেউ না আসে—
বিশ শতকের বুকের আগুনে এ যে যৌবন সাধনা!
অথৈ জলের এলোমেলো আভা, চিকণ-স্রোতের চিকুরে
ছায়া-ছলো-ছলো দু'চোখে এখন ঘুম-জাগানিয়া গোধূলি।
তুমি ব'সে আছো ধ্যানের ধুলায়, শুনেছো কি আজ কী সুরে
ইমন্ বেজেছে দূরের হাওয়ায়; দেখো যেন তাকে না ভুলি!
কার দিকে তুমি বাড়িয়েছো হাত, কা'কে পাবে এই প্রয়াণে,
ভাখো না কি তুমি এখানে এখন সাজানো কথায় সন্ধ্যা?
বিকেলের কাছে নদী ও আকাশ বাঁধা যেন বাহুবিতানে—
তুমি একা, আর চির-একাকিনী এখানে অলকনন্দা!

তৃতীয় নয়ন



শ্রীচরণদাস ঘোষ

সে কালে রামায়ণ রচিত হয়েছিল সংমায়ের কৃপায়, এ কালে যুগকাব্য রচনায় সংমাকে আর টানতে হয় না, কৃপাময়ী শাশুড়ী হলেই হয়। কেন হয়, তাই বলি—

আমরা দুই ভাই। আমি ছোট। দাদা মায়ের প্রথম সন্তান। শুনেছি, দাদার পর আমার আরও আট-দশটি ভাই-বোন হয়, কিন্তু এদের কেউই বাঁচেনি, এক জাগ্রত দেবতার মানত কোরে আমিই কেবল টিকে আছি।

দাদার চেয়ে বয়সে খুব ছোট বোলেই হোক্, আর এক মায়ের পেটের বোলেই হোক্, আমি ছিলাম যেন দাদার গলার হার। সত্যি, রামচন্দ্রের মতই দাদা পেয়েছিলাম আমি। খুব অল্প বয়সেই আমার জ্ঞানের অংকুর দেখা দেয়। তখনই আমি টের পেয়েছিলাম—আমাদের মত দরিদ্র ও নিঃস্ব গ্রামে আর কেউ নেই। সকল গৃহস্থেরই দু'-পাঁচ বিঘা কোরে জমি আছে—ভাতটা হয় কিন্তু আমাদের কিছুই নেই। বাবা কবে গত হয়েছিলেন, জানি না, দাদাই ছিলেন সংসারে অন্নদাতা। তিনি কলিকাতায় একটি ডাকঘরে চাকরী করতেন, বেতন পেতেন সামান্যই। মেসের টাকা দিয়ে তিনি মাকে যা পাঠাতেন, তা থেকে কি কোরে যে প্রতিদিন হাঁড়ি চড়তো, তা মা-ই জানতেন! একটা দিনের ঘটনা আজও আমার মনে পড়ে। সে দিন আমি চোখের জল রাখতে পারিনি। সে দিন কোনো বারব্রতও ছিল না বা একাদশীও ছিল না। দ্বিপ্রহরে মা আমাকে খাইয়ে-ধুইয়ে শুয়ে পড়লেন। জিজ্ঞাসা করলাম—"মা, তুমি খেলে না?"

মা হেসে জবাব দিলেন, "আমার যে জ্বর হয়েছে রে!"

মায়ের জ্বর? ভয়ে আমার মুখটা শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি কপালে হাত দিয়ে দেখি—নাঃ, বেশ তো ঠাণ্ডা! বললাম—"কৈ না তো! তবে, তুমি খেলে না কেন মা?"

মা এবার আর কিছুই বললেন না। উঠে অন্যত্র সরে গেলেন। বুঝতে পারলাম—হাঁড়িতে আর ভাত নেই। ভাবলাম, যদি আমাদের জমি থাকতো—

আর একদিন।

পৌষ মাস। পাড়ার ছেলেরা পৌশুলা করবে। সবাইকে ধরা হলো, কেবল বাদ পড়লাম আমি। প্রতিবাদ করলাম—"কেন?"

একজন বললে, "তুই চাল দিতে পারবি? তোদের জমি আছে?"

সত্যিই তো আমাদের [illegible] ড়ী এসে মাকে বললাম, "মা, আমাদের জ[illegible]

মা বললেন "হবে বোলেই নেই।"

মায়ের কথা শুনে বুকটা আনন্দে ভরে গেল। [illegible]লাম, "সত্যি হবে?"

"হবে বৈ কি! দাদার বিয়ে হোক্, লক্ষ্মী ঘরে আসুক—তবে তো!"

"লক্ষ্মী?"

হ্যাঁ—তোর বউদিদি।"

লক্ষ্মী! দাদার বিয়ে হবে, লক্ষ্মী ঘরে আসবেন, আমাদের জমি হবে—কি মজা। একদিন এলেন বউদিদি। ঘরে এলেন।

বউদিদিটি কি সুন্দর! লক্ষ্মীই বটে—ঠিক পটে-আঁকা ছবির মত লক্ষ্মী। বউদিদি আমার চেয়ে বেশ খানিক বড়। তা হোক্। বউদিদির সঙ্গে ভাব করাও চলে। আমাকে ভালোবাসেন খা! একদিন বললেন, "আচ্ছা বলো দিকিনি—কে তোমাকে বেশি ভালোবাসে? আমি, না, তোমার দাদা?"

বউদিদির কাছে ঠক্‌বো আমি? তা বৈ কি! বললাম—"তুমি।"

বউদিদি ভারি খুশি। তখন কাঁচা আমের দিন, বউদিদি তখখুনি কলাপাতায় বাঁধা বেশ ঝাল-ঝাল খানিকটা আম-ছেঁচা তক্তাপোষের নিচে থেকে বার কোরে এনে দিয়ে বললেন, "একদম ছুট—ছুটে বাইরে। মা যেন দেখতে না পান।" মা মানে আমার মা।

আর একদিন কে ঠকেছিল, তা বুঝতে পারিনি। আমার নাম চন্দন। সকলে আমাকে 'চন্নন' বোলেই ডাকতো। বউদিদি একদিন খামকা জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি রাঙা চন্নন, না সাদা চন্নন?"

একটু ভেবে-চিন্তেই আমি জবাব দিলাম, "রাঙা চন্নন।"

"রাঙা?"

"হ্যাঁ। যে-দিন তোমার পায়ের আলতা ফুরিয়ে যাবে, সেদিন পরবে তুমি !"—বলেই একটা জোর-হাসি হেসে ফেললাম।

বউদিদি তো রেগে খাপ্পা। বললেন "ও দুষ্টু ! তোমার পেটে-পেটে এই বুদ্ধি ?" আমার মুখে হাসির রেখা তখনো মিলিয়ে যায়নি। বললাম, "তুমি গুরুজন, তোমার পায়ে-পায়ে থাকবো—কত পুণ্যি হবে বলো দিকিনি ?"

বউদিদি রাগটা আর চেপে রাখতে পারলেন না। তুবড়ির খোলের মত ফেটে গিয়ে বলে উঠলেন, "তুমি সাদা চন্নন—টিপ কোরে তোমাকে কপালে পরবো—তুমি সাদা চন্নন—সাদা চন্নন—"

মা সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। থমকে দাঁড়িয়ে একটু হাসলেন ! পরক্ষণেই হাসি সামলে বউদিদিকে বললেন, "বউমা, চন্ননকে নাম ধরে ডেকো না—'ঠাকুর-পো' বোলো, নইলে এর পর আর পারবে না।"

বউদিদি অপ্রতিভ হয়ে বললেন, "আচ্ছা মা !"

এই বউদিদি। ইনি মাকে মা, দিদিকে দিদি, বন্ধুকে বন্ধু ! কত কথা যে হতো দু'জনের মধ্যে তার ঠিক নেই। বউদিদি যত বকতে পারতেন, আমিও তত। আবার 'আড়িও' হতো—দিনে পাঁচ বার। এই 'আড়ি' ভাঙাতে হতো মাকে—দু'জনকেই অনেক সাধ্যি-সাধনা কোরে। মা হেসে বলতেন—দু'টিতে যেন পিঠোপিঠি ভাই-বোন।

কিন্তু, কৈ ? জমি তো হলো না ! দাদার বিয়ে হলো। বউদিদি এলেন—জমি ? হলো কৈ ? এই প্রশ্নটা মনের ভেতর বড় বেশি উঁকি মারতে লাগলো। আজকাল বউদিদির কাছেই সব পরামর্শ করি। তাঁকে একদিন বললাম, "বউদি, জানো তো—আমাদের কিছু জমি নেই ?"

বউদিদিটা হুভো বোকা। কিছুই বুঝতে পারেন নি। মূঢ়ার মত আমার মুখে তাকাইতে আমি বললাম, "জমি গো—ধানের জমি। গাঁয়ের ভেতর, বুঝলে বউদি, আমরাই সবচেয়ে গরীব।"

বউদিদি এবার বুঝতে পেরেছেন কথাটা। কিন্তু আমি যেমন কোরে বুঝেছি, তেমন কোরে নয়। হেসে কথাটা উড়িয়ে দিয়েই জবাব দিলেন, "ভালোই তো, কেউ আমাদের বড়লোক বোলে হিংসা করবে না।"

"বেশ তো তুমি, ঠাকরুণ ! এক-একদিন হাঁড়িতে মায়ের ভাত থাকে না, তা জানো তুমি ?"

অম্লান বদনে বউদিদি বলে ফেললেন, "এইবার যেদিন থাকবে না, বোলো—আমার ভাতটি মাকে ধরে খাইয়ে দেবো।"

বউদিদিটা কে গো ! তবুও যদি আমাকে আমার বলবার কথাটা বলতে দেবেন ! মেজাজটা একটু কড়া করতে হলো। উচ্চকণ্ঠে বললাম, "তা হলে আমার বলবার কথাটা বলতে দেবে না তো ?"

বউদিদি যেন এবার আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন, "ও মা ! এর ভেতর তোমার আবার কথা আছে নাকি বলবার ?"

"তা নেই ?"

"তবে বলো বলো—"

"বলতো—বলতো কি জানো ? বলতো—জমি হবে, নিশ্চয়ই হবে। দাদার বিয়ে হোক, ঘরে লক্ষ্মী আসুক—তবে তো।" বউদিদির ঠিক চোখের ওপর চোখ রেখে বললাম, "লক্ষ্মী কে জা'না তা ?"

"না।"

"তুমি।"

"তাই নাকি !" বউদিদি খিল-খিল কোরে হেসে উঠলেন।

এত বড় একটা সত্যি কথাকে মিথ্যে ভেবে বউদিদি এমন হাল্কা করে ফেলছেন দেখে আমার রাগ হলো। তার মুখের ওপর তৎক্ষণাৎ বললাম "হাসি নয়—সত্যি ! মাকে না-হয় জিজ্ঞাসা করো।"

বউদিদি এবার গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন "না। দরকার নেই। জমি-যায়গার কথা আমাকে শুনতে নেই।"

"বা রে ! তবে শুনবে কে ?"

"তা জানিনে। তবে, আমি নই।" কথাটা বলেই বউদিদি একটু থামলেন, তারপর স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন, "তোমার দাদা আমাকে ঘরে এনেছেন, তুমি আমাকে 'লক্ষ্মী' বলেছ—শুধু এই কথাটাই আমি শুনে রাখবো, ঠাকুরপো ! আমার আয়পয়ে যদিই বা কিছু তোমাদের হয়—তা ভোগ করবে আগে তুমি, তারপর তোমার দাদা।" বলেই অন্যত্র সরে গেলেন। মনে হলো, তাঁর গলার স্বরটা ভারি হয়ে উঠেছে।

তখন ডাক-বিভাগ ছিল একই এলাকার ভেতর—বিহার ও বাংলার। বদলির চাকরী, দাদার বদলির নির্দেশ এলো। বিহারের এক প্রান্তে। দাদার সঙ্গে গেলেন দাদার শাশুড়ী আর বউদিদি। দাদার শাশুড়ী ছিলেন বিধবা। গৃহে সপত্নীপুত্র ও তার স্ত্রী। বাড়ী এক হলেও, সংসার স্বতন্ত্র—স্বতন্ত্র হাঁড়ি-হেঁসেল। লোকে বলতো—উনি সতীনপো ও সতীন-পোর বউকে নিয়ে ঘর করতে পারেন না। তাঁর তিনটি কন্যা। তিনটিরই বিবাহ হয়েছে। বড় ও মেজ জামাই—এঁদের কেউই শাশুড়ীর প্রতি প্রসন্ন নয়। শোনা যায়, বিবাহের পর কিছু দিন বেশ চলেছিল, তারপর কি হলো জানি না—মা ও মেয়ে, এদেরও ভেতর দেখা-সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। আমার বউদিদি ছিলেন কোলের মেয়ে। বউদিদির মা বলতেন, "সরো আমার চোখের কাজল।" বউদিদির ডাক নাম ছিল সরো।

যে দিন দাদা যাত্রা করেন, সে দিন শিশুর ন্যায় তাঁর কি কান্না ! ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কেঁদে চোখ রাঙা কোরে ফেললেন। দাদা দু'মাসের বেতন অগ্রিম পেয়েছিলেন, সেই টাকা থেকে তাঁদের খরচের জন্য কিছু রেখে বাকী টাকায় আমার জন্য যেন সারা কলিকাতাটাই কিনে আনলেন—কাপড়, জামা, ছাতা, জুতা—কত কি ! বলে গেলেন—"তোর ম্যাট্রিকটা হতে যা দেরি, তারপর তোদের কি এখানে আর রাখবো ?"

এই সময় আমার একটা খুব বড় কথা মনে পড়ে গেল। কথাটা দাদাকেই বলবার। কিন্তু তাঁকে বলতে পারলাম না। বললাম মাকে। অন্য দিন হলে মা হয়তো কথাটা কানেই তুলতেন না, কিন্তু আজ তুললেন। ভালো কোরেই তুললেন। মা-ও কাঁদছিলেন। নাক ঝেড়ে দাদাকে বললেন, "নন্দন, চন্নন কি বলছে, জানিস ?"

দাদার নাম নন্দন। দাদার গাল বয়ে তখনো বসুধারা নামছে। সপ্রশ্ন নেত্রে মায়ের মুখের দিকে চাইতেই মা বললেন, "আমাদের জমি

নেই, তাই ওর বড় দুঃখ! আমি একদিন বলেছিলাম—দাদার বিয়ে হোক, লক্ষ্মী ঘরে আসুক—তবে তো! সেই কথাই ও মনে করিয়ে দিচ্ছে।"

দাদার সেই অশ্রুবিকৃত মুখে একটু হাসির আভা দেখা দিল। আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ বললেন, "জমি? হবে বৈ কি, মাণিক! তোমার কোনো দুঃখই আমি রাখবো না। আমার প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডে তো টাকা জমছে—সেই টাকা তুলে দু'ভায়ের নামে জমি কিন্‌বো—কিন্‌বো বৈ কি।"

সকলের চেয়ে বেশি অধীর হয়ে পড়েছিলেন বউদিদি। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে তাঁর ভিজে বুকে আমার মুখটা চেপে ধরে বলে উঠলেন, "কেউ না দেয়, আমি দেব ভাই!"

এর পর আমি যেন কি রকম হয়ে গেলাম। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখলাম, কা'রা যেন অদূরে রাখা একখানা গরুর গাড়ীর দিকে এগিয়ে চলেছে। তারপর বুঝেছিলাম—ওঁদের একজন দাদা, একজন বউদিদি।

*　　*　　*　　*

দিন যায়। দাদা ও বউদিদি—উভয়েরই পত্র আসে। পত্র আসে নিয়মিত। মায়ের পত্র যেতে দেরি হলে দাদা টেলিগ্রাম করেন। আমাদের খরচ-পত্র—তাও ঠিক সময়েই আসে। মাসটি কাবার হতে যা দেরি! এই ভাবে এক বৎসর গেল। তারপর?

তারপর হঠাৎ এক মাস দাদার 'খরচ' এলো না। চিঠিপত্রও নেই। মা ভাবতে লাগলেন। অতঃপর একদিন চিঠি এলো—'এ মাসে বড়ই টানাটানি।' খুবই স্বাভাবিক কৈফিয়ৎ—বিদেশ-বিভুঁয়ে তিন-তিনটি প্রাণী! পরের মাসে টাকা এলো। কিন্তু, যা আসে তার অর্দ্ধেক। হেতু নির্দ্দেশ কোরে এবার আর কোনো পত্রাদি নেই। মা মুস্কিলে পড়লেন। কি করেন, ঠিক পান না! করবেন আর কি—ধার করলেন। যাদের কাছে করলেন, তাদের প্রতিশ্রুতি দিলেন—এইবার 'খরচ' এলেই ধার পরিশোধ করবেন। কিন্তু, 'খরচ' আর আসেই না। দিন যায়, মাস যায়, মনি-অর্ডার পিওন আর ডাকই দেয় না! অবশেষে আমিও বুঝলাম, মা-ও বুঝলেন, পাড়ার লোক, গ্রামের লোক—সবাই বুঝলো—'খরচ' বন্ধ হলো।

উপায়? স্কুলেও মাইনে বাকী পড়ে, দিনও যায় অনাহারে, অর্দ্ধাহারে। মায়ের দেহটা দেখতে-দেখতে জীর্ণশীর্ণ হয়ে এলো। কৃপা কোরে পাড়ার লোক যা এক মুঠা দিয়ে যায়, তা মা আমাকেই ফুটিয়ে দেন, তাঁর সব দিন হয় না। তত্রাপি তাঁর মুখে কি হাসি—হাসি আর হাসি!

অতঃপর এক বিপ্লব ঘটে গেল আমার কিশোরা-কচি জীবনের পটভূমিকায়। এক নবতম নাট্যমঞ্চের ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন আমাদের সংসারটাকে বিধাতা। স্কুলের মাহিনা দেবার সর্ত্তে বিবাহ হলো আমার। বিবাহে কিন্তু দাদারা এলেন না। চিঠি এলো—'ছুটি নেই।' অতঃপর পাশ করলাম ম্যাট্রিক। চাকরীও হলো কলিকাতায়। অল্প মাহিনা। বাড়ীতে রইলেন মা আর স্ত্রী।

*　　*　　*　　*

এর পর দীর্ঘ পনেরটি বৎসর অতীত হয়েছে। দাদার সংবাদ পাই পত্রে—মাঝে মাঝে। ছোট-ছোট পত্র—ভালো আছি। দাদার কোনো সন্তানাদি হয়নি। আমার হলো একটি পুত্র সন্তান—খোকা। খোকা বছর দু'য়েকের হতেই আমি একদিন মাকে বললাম, "মা, দাদারা তো আসেন না। চলো না, আমরাই না হয় একদিন যাই—খোকাকে দেখিয়ে নিয়ে আসি?"

কথাটা শুনে মা একটু বিমনা হয়ে পড়লেন। তারপর বললেন—"না।"

"না কেন?"

"সব কথা নাই বা শুন্‌লি?" একটু থামলেন, তারপর কি মনে কোরে মা বললেন, "তবে শুনেই রাখ। দেখ—বড় বউমার ছেলেপিলে হয়নি, ছোট বউমার হয়েছে। খোকাকে দেখে তোর দাদা-বউদিদির আনন্দ রাখবার জায়গা থাকবে না সত্যি! কিন্তু আমার মন বলছে—বেয়ানের এ-সব ভালো লাগবে না। সেই অশুভ সত্যিকে আমি ডেকে আন্‌তে চাইনে, বাবা!"

কথাটায় আমি প্রতিবাদ তুললাম। বললাম, "আমরা তো তাঁর ঘরে যাচ্ছিনে, মা! আমরা যাচ্ছি আমাদের আর এক ঘরে!"

হাসলেন মা। একটু পরে বললেন, "ও-ঘরের গিন্নি এখন বেয়ান, তাঁরই ওই ঘর—তোদের নয়!" কথাটা বলেই মা অন্যত্র চলে গেলেন।

আরও মাস ছয়েক অতিবাহিত হয়েছে। হঠাৎ দাদার কাছ থেকে একখানা টেলিগ্রাম এলো মায়ের নামে—"বড় পীড়িত। শীঘ্র আসুন।"

সেদিন শনিবার। বাড়ী গেছি। মা কেঁদেকেটে অস্থির। পরদিনই আমরা সকলে যাত্রা করলাম। কার ঘরে যাচ্ছি, সে ঘরের গিন্নি কে—সে সব প্রশ্ন আর কারুর মনেই উঠলো না। আজ মায়ের মন জুড়ে কেবল নন্দন আর নন্দন আর আমার মন জুড়ে দাদা আর দাদা।

গিয়ে দেখলাম—দাদার টাইফয়েড। প্রায় দেড় মাস বিছানায় পড়ে। যেন মিশে রয়েছেন বিছানায়। চেনা যায় না—এমনই কংকালসার! আমাদের দেখেই দাদার চোখ দিয়ে হু-হু কোরে জল পড়তে লাগলো। আমার কোলে খোকা ছিল, তাকে বুকে নেবার অভিপ্রায়ে হাত দু'টা ছড়াবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না—নেতিয়ে পড়লো হাত। আমি তাড়াতাড়ি দাদার পদস্পর্শ



নইলে এর পর আর পারবে না

কোরে সেই হাত খোকার মাথায় ছুঁইয়ে দিলাম। তারপর খোকাকে সরিয়ে এনে দাদার চোখের ওপর ধরে রইলাম। দাদার পলক আর পড়ে না, যেন আকাশের নীল পর্দাখানি ছিঁড়ে গেছে, তার ফাঁক দিকে মর্ত্যবাসীর একজন ও-পারে স্বর্গের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে আছে। আর মা?

মা যেন আর এক মূর্ত্তিতে রূপান্তরিতা। যে মা আমার ছিলেন, সে মাকে যেন আর দেখতে পাচ্ছি না। এ যেন কল্পান্তকারিণী এক ভীষণদর্শনা কালীমূর্ত্তি অট্টহাসিতে ভুবন ভরিয়ে দিচ্ছেন! সম্মুখে ঝাঁপিয়ে-পড়া ত্রিভুবনের পাহাড় পর্ব্বত যেন পদদ্বয় দিয়ে সরিয়ে ফেলতে ফেলতে এসে বললেন—আমি এসেছি! * * ধুলো পায়েই দাদার শিয়রে এসে মা বসলেন। সেই যে বসলেন আর সারা দিন ওঠেন নি।

ঘোড়ার গাড়ি থেকে নামতেই বউদিদি ও বউদিদির মা এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু সে মিনিট কয়েক মাত্র। আমার বড় অস্বস্তিবোধ হতে লাগলো। আমার দাদা, আমার বউদিদি, তাঁরা আমাদেরই এই বাড়ীঘর, তবু যেন মনে হতে লাগলো—না, এ সব আমাদের নয়! কিছুই নয়—কিছুই নয়। সেদিন মা-ও তো ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। তাই তো! বউদিদিকেও তো দেখলাম! আমার সেই বউদিদিই বা কৈ? এ যেন আর কেউ! এঁর মুখে সে-মুখও নেই, এঁর চোখে সে চোখও নেই। যেন বাজারে এক পসারিণীর কাছে মূল্য দিয়ে কিছু কিনতে এসেছি। চেয়ে দেখলাম, অদূরে আমার স্ত্রী ঘোমটায় মুখ ঢেকে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে এক পাশে বসে আছে—কে কখন ডাকবে, সেই ডাকে সে কৃতার্থ হবে—সেই প্রতীক্ষায়! কিন্তু কেউ তো ডাকে না। কোনো কণ্ঠই তো বলে না—'বউ উঠে এসো—তুমি কি কুটুম?' কিন্তু খোকা যেন হারিয়ে দিচ্ছে সবাইকে। একা সেই স্বীকার করে না—এ ঘরবাড়ী তার নয়। লাটুর মত ঘরময় ছুটে বেড়ায়, হাততালি দেয়, খল-খল কোরে হাসে—যেন এ তার অমৃতভূমি।

মুখ-হাত ধুতে হবে। কুয়োতলায় যেতে হয় রান্নাঘরের পাশ দিয়ে। যাচ্ছি, রান্নাঘরের ভেতর থেকে এক রোষতীক্ষ্ণ চাপা বুড়ো মেয়েলি-কণ্ঠ কানে এলো—'পই-পই কোরে বারণ করেছিলাম—করিসনে তার, করিসনে তার! ও হাজার বলুক! এখন ভোগ এই হাঁসের পাল নিয়ে!'

বুঝতে পারলাম, এ গলা বউদিদির মায়ের. আর যাকে এই ভর্ৎসনা হচ্ছে, সে বউদিদি। বউদিদির গলা এবার পেলাম। তিনি যেন মায়ের মুখে হাত চাপা দিতে চান। বেশ একটু বিব্রত হয়েই বলে উঠলো—'আঃ চুপ করো না, মা!'

আর যায় কোথা! বউদিদির মা ফোঁস কোরে উঠলেন—"ওঃ মা! মেয়ের আবার রোষ দেখো না! তোরই ভালোর জন্তে বলছি লো, তোরই ভালোর জন্তে বলছি। আমার আর কি।"

বউদিদির গলা আর পাওয়া গেল না। আমি আরেকটু দাঁড়িয়ে থেকে কুয়োতলার দিকে চলে গেলাম। এবং যেতে যেতে বুঝতে পারলাম, যে-পরিস্থিতির পাথর আমার বুকের ওপর এতক্ষণ ধরে চেপে বসেছিল, তা যেন অপসারিত হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এই দীর্ঘ পনের বৎসর ধরে যে প্রস্তর-যবনিকা এ-বাড়ী ও ও-বাড়ীর মাঝখানে বিলম্বিত ছিল, তাও যেন অল্প অল্প কোরে স্বচ্ছ হয়ে গেছে। এখন অনায়াসেই এপারের দৃষ্টি ওপারে বিকীর্ণ করা যায়।

কিন্তু স্তূপীকৃত যে বারুদ এত দিন ধরে এই গৃহে প্রস্তুত হয়েছিল, ত' এখনকার মত সাময়িক ভাবে চাপা থাকলেও, পরদিন সকাল হতেই এর বিস্ফোরণকে কেউ আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলো না। প্রত্যুষেই সময়োচিত একটা ব্যবস্থা রচিত হলো। শোনা গেল, ঝি আসেনি। এবং এই ঝিয়ের কাজটা নির্ব্বাহ করতে আমার স্ত্রীকে ডাক পড়লো। এঁটো বাসন-কোশন, রান্নাঘর পরিষ্কার, ঘরদোর ঝাঁটপাট—এসব পড়ে থাকলে তো চলে না!

কথাটা দাদার কানে যেতেই তিনি বললেন, "ঝি আসেনি?—তা' সেবকা একবার যাক্ না ঝিয়ের বাড়ী?"

সেবকা দাদার আপিসে কাজ করে আবার সকাল-সন্ধ্যায় দাদাদের বাসায় এসে হাট-বাজারটাও কোরে দেয়। সে নিকটেই ছিল। বললে, "ঝিকে বুড়িমাইজি তো ছোড়িয়ে দিয়েছেন।"

"কেন?"

বুড়ি-মাইজি অর্থাৎ বউদিদির মা দাদার কক্ষ-সংলগ্ন ভেতর দিকটার বারান্দায় বসে 'মালা' জপছিলেন, তাড়াতাড়ি মালাগাছটা কপালে ঠেকিয়ে বলে উঠলেন, "আমার জন্তে নয়—আমার জন্তে নয়। তোমাদেরই ভালোর জন্তে! সেই টাকায় তোমার ভাইপোর দুধটাও তো হবে!"

"নইলে হতো না বুঝি, মা?"

"হবে না কেন?—সেই তো, আমারই মেয়ের গলায় পা দিয়ে।"

"বলছেন কি মা?"—বিছানার ওপর লিকলিকে সরু-সরু কংকালসার হাত দুটোয় ভর দিয়ে উঠে বসলেন দাদা।

বউদিদির মা-ও আসন ছেড়ে উঠে দুয়ারের মুখে এসে দাঁড়ালেন—তাঁর মুখে-চোখে অগ্নিঝলক, যেন একটা আগুন অনেকক্ষণ ধরে তাঁর বুকে চাপা ছিল, এইবার গর্জ্জন করতে করতে বেরিয়ে পড়েছে। দাঁতে দাঁত ঘষে বলে উঠলেন, "তুমি জানো না, কি বলছি—মা-ভাইকে তো এই করতেই এনেছ।"

মা তখন বিপরীত দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক-চলাচল দেখছিলেন, বউদিদির মায়ের উচ্চকণ্ঠ কানে যেতেই তাঁর বুকটা যেন উড়ে গেল এবং বিবর্ণমুখে হাওয়ার মত উড়তে-উড়তে দাদার কাছে এসে বসে পড়লেন তাঁকে দু' হাতে আঁকড়ে ধরে। অতঃপর তাঁর যন্ত্রণাকাতর মুখখানা একবার বউদিদির মায়ের দিকে ওঠে ও একবার দাদার মুখে এসে যেন আছড়ে পড়ে। কি যেন বলতে চান, পারেন না—শুধুই দাদার কঙ্কালসার দেহটাকে বউদিদির মাকে দেখিয়ে জোড়হাত করেন। বউদিদি সে-সময় কোথায়, কে জানে!

শাশুড়ীর কথাটা শুনে দাদা একটু হাসলেন। বললেন, "তা হলে, আপনার পায়ের তলায় এই পনের বৎসর পড়ে থাকতাম না, মা।"

"আমার পায়ের তলায়?"

"হ্যাঁ, যেহেতু আপনার মেয়েকে আমি বিয়ে করেছি।"

"কি—কি বললে?"

"যা শুনতে আপনি চাইছেন—তাই।"

বউদিদির মা এবার মাত্রা অতিক্রম কোরে গেলেন। মুখের

এক প্রকার বিশ্রী ভঙ্গী করে বলে উঠলেন, "তোমার যত বড় মুখ, তত বড় কথা ?"

পুনরায় দাদার মুখে হাসি দেখা দিল। স্বাভাবিক কণ্ঠেই জবাব দিলেন, "না, তা নয় মা।" একটু পরেই মুখের ভাব গম্ভীর কোরে বলে উঠলেন, "ছিল বটে একদিন—আমার মুখও বড়, কথাও বড়। কিন্তু, আপনার জামাই হয়ে, সে-মুখও গেছে ছোট হয়ে, সে কথাও গেছে বন্ধ হয়ে।"

বউদিদির মা তেমনি কোরেই বলে উঠলেন, "তা' হলে, আমার মেয়েকে বিলিয়ে দাও তো"—

দাদা যেন হাঁপিয়ে পড়েছিলেন। নিজেকে একটু সামলে নিয়েই প্রশান্ত কণ্ঠে বললেন, "তা' কেউ পারে না, মা! তাই, আমিও পারি না! যা পেরেছি, তাই করেছি—মা-ভাইকে পরিত্যাগ করেছি! এ না করলে, আপনার কাছে থেকে এত দিন হয়তো আত্মহত্যা করতে হতো—কেন যে, তার কারণ আমার চেয়ে আপনিই জানেন বেশি।" বলেই দাদা পুনরায় শুয়ে পড়লেন।

উদ্যত ফণার ওপর হাতুড়ির ঘা পড়েছে। অধিকতর উত্তেজনায় বউদিদির মায়ের ভিতরকার অবশিষ্ট সুস্থ প্রকৃতিটা যেন উপুড় হয়ে পড়ে গেল। চোখ দু'টা কপালে তুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে বলে উঠলেন, "হে ঠাকুর, হে মধুসূদন! তুমিই এর বিচার কোরো। যাদের জোর পেয়ে উনি আমাকে এই রকম করছেন—তাদের যেন পুরীনাশ হয়, বংশে বাতি দিতে যেন কেউ না থাকে।"

মা এতক্ষণ যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। এইবার চমকে উঠলেন। তারপর উদ্‌ভ্রান্ত নেত্রে ঘরময় চাইতে লাগলেন এবং ঘরের এক কোণে ক্রীড়ারত খোকাকে দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে তাকে বুকে চেপে ধরলেন, তখন খোকার মা অঙ্গনের এক প্রান্তে কুয়োতলায় রাশীকৃত এঁটো বাসন নিয়ে মাজতে বসেছে। শীতকাল, পশ্চিমের শীত, হু-হু কোরে হাওয়া বইছে। সেই শীতে সে কাঁপছে—থর, থর, থর।

পরদিন সকাল। বাড়ীর বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কাজে ব্রতী হয়ে আছেন—বউদিদির মা আছেন 'মালা' নিয়ে, আমার মা আছেন দাদাকে নিয়ে, স্ত্রী আছেন উনুনের ছাই নিয়ে। আমি এসেছি কুয়োতলায় মুখ ধুতে। এমন সময় বউদিদি আমার কাছে এসে দাঁড়ালেন। সেই বউদিদি! চেয়ে দেখলাম—আজ আর সেই শুভ্র-স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সরল ক্ষীরের পুতুলটি নেই—এ যেন এক বজ্রপ্রচ্ছন্ন স্তব্ধ লৌহমূর্ত্তি! এসেই বললেন, "ঠাকুরপো, তুমি চাকরী করো, নয় ?"

বউদিদির এই প্রথম কথা কওয়া—পনের বৎসরের পর! কিন্তু হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন? ভাবছি কথাটা, বউদিদি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, "করো চাকরী ?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে, তোমার ছেলের দুধের টাকাটা তুমিই দিয়ো।"

"আচ্ছা।"

বউদিদি আর দাঁড়ালেন না।

এই ঘটনার কিছু দিন পর আমি কলিকাতায় চলে এলাম। রইলেন মা। দাদার ঐরূপ অবস্থা—তাঁকে বেশ সুস্থ না দেখে তিনি আসেন কি কোরে? মা যখন রইলেন, স্ত্রীকেও থাকতে হলো। আর স্ত্রী-ই যখন রইলো, খোকার আসাও প্রশ্নের বাইরে। কলিকাতায় এসে শুধু খোকার দুধের টাকাই নয়, আরও কিছু বেশি কোরেই পাঠাতে লাগলাম যাতে 'হাঁসের পাল'—তাদেরও খাই-খরচটা নির্ব্বাহ হয়।

* * * *

অতঃপর ছ'মাস অতীত হয়েছে। এখন দাদা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। একদিন পত্র পেলাম, দাদা ছুটি নিয়েছেন ও সকলকে নিয়ে বাড়ী আসছেন।

দাদা বাড়ী আসছেন! এ আনন্দ রাখবার আমার যেন জায়গা হয় না। আমি ছুটি নিয়ে এক দিন পূর্ব্বেই বাড়ী এসে বাড়ীঘর পরিষ্কার করে রাখলাম। দাদা আসছেন! আমার দাদা!

তিন মাসের ছুটি নিয়ে দাদা এলেন। যেদিন এলেন সেই দিন রাত্রেই দাদা বললেন, "দেখ, অতুল তিন বিঘে জমি বিক্রী করবে—আমাকে চিঠি লিখেছিল কেনবার জন্তে। আমি বলেছি—'হ্যাঁ, কিনবো'।"

অতুল হচ্ছে আমাদের গ্রামের লোক। কথাটা শুনে খুব আনন্দই হলো। বললাম—"বেশ তো! আমাদের তো জমি-জায়গা কিছুই নেই। ভালোই হবে"!

দাদা সাগ্রহে বলে উঠলেন, "তাই তো কিনছি রে! তোর এই আক্ষেপ সেই ছেলেবেলা থেকে—আমাদের জমি নেই, আমাদের জমি নেই"!

একটু হাসলাম।

দাদার উৎসাহ যেন বেড়ে গেল। বললেন, দর-দস্তুর সব ঠিক হয়ে গেছে। আমি প্রভিডেন্ট-ফাণ্ড থেকে লোন নিয়ে টাকাও এনেছি"।

এইবার আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠলো। বললাম, "বউদিদি, বউদিদির মা—এঁরা জানেন" ?

"ওদের আবার বেশি আগ্রহ। বলেন—ঘরে ভাত হচ্ছে, ভালোই হচ্ছে"। দাদার চোখের জ্যোতি যেন সুনিশ্চিত এক বার্ত্তা এনে দিল আমাকে। পরক্ষণেই আবার বলে উঠলেন, "তুই কাল ষ্ট্যাম্প-পেপার কিনে আনবি। কালই লেখাপড়া হবে"।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম—"আচ্ছা"।

দাদার কথা এখনো শেষ হয়নি। বললেন, "লেখাপড়া হবে তোর নামে আর আমার নামে"।

"আমার নামে? আমি তো টাকা দিতে পারবো না, দাদা! আমার টাকা কৈ" ?

"তুই একটা ষ্টুপিড! কে বলছে তোকে টাকা দিতে? আমার আর আছে কে? থাকবার মধ্যে তুই, আর তোর কুটোটা যদি বাঁচে—ওই"—দাদা রেগে উঠেছেন।

আর কিছু বলতে পারলাম না। দাদার নির্দ্দেশ মত পরদিন ষ্ট্যাম্প-পেপার কিনে নিয়ে এলাম।

সদর ঘরে দলিল-লেখক 'শ্রী'-টি কেঁদে কলমটি তুলেছেন, ভেতর বাড়ী থেকে দাদার ডাক এলো। দাদা দলিল-লেখককে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরে এলেন, আমিও এসে দাঁড়ালাম তাঁর পাশে। দাদাকে দেখেই বউদিদির মা বললেন, "দেখো নন্দন, দলিলে 'মাতৃদত্ত ধন'—এ-কথাটার যেন উল্লেখ থাকে"।

কথাটা যেন দাদা বুঝতে পারেননি, এমনি ভাবে অপর পক্ষের মুখের দিকে চাইতেই তিনি চটে উঠলেন। বললেন, "বটে কি তোমার এতটুকু বুদ্ধি নেই?" বলেই আর একটু কাছে সরে এলেন, তার পর আমার দিকে এক অগ্নিকটাক্ষ কোরেই দাদাকে বললেন, "আমার মেয়ের সন্তান হয়নি। ওই জমিই ওর সন্তান—আখেরের থিত্। আমার টাকায় ওই জমি কেনা হচ্ছে—এ-কথা দলিলে লেখা থাকলে দলিলখানি কায়েমী হবে। তোমার অবর্তমানে কেউ এসে আর 'নয়' কোরে দিতে পারবে না।"

দাদা মিনিট খানেক চুপ কোরে রইলেন। তার পর ধীর কণ্ঠে বললেন, "দলিল তো আপনার মেয়ের নামে হয়নি? দলিল হচ্ছে—আমার নামে আর চন্দনের নামে।"

"কেন?"

"সে আপনি বুঝবেন না।" দাদার কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

বউদিদির মায়ের চক্ষুর্দ্বয় ধ্বক্ ধ্বক্ কোরে জ্বলে উঠলো। রক্তমুখী হয়ে বিকৃত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "ওঃ! আমি বুঝবো না, বুঝবে তুমি? এইজন্যেই বুঝি মা-বেটায় পরামর্শ কোরে বাড়ী আসা হয়েছে? বলি, তোমার ভাই জমি কেনবার টাকা দিয়েছে?"

"না।"

"তবে, কার টাকায় ভাইকে জমি কিনে দেওয়া হচ্ছে? জানো, তুমি অবর্তমান হলে তোমার প্রভিডেন্ট-ফাণ্ডের টাকায় ওয়ারিশ হবে আমার মেয়ে—তোমার ভাই নয়!"

দাদার মুখখানা একবার কেঁপে উঠেই কঠিন হয়ে গেল। সংযত-কঠিন কণ্ঠে বললেন, "দেখুন মা! এ-বাড়ীতে আপনি কুটুম—কুটুমের মতই থাকবেন। আমার টাকার কে ওয়ারিশ, কে ওয়ারিশ নয়, সে আইন আপনি তৈরী করবেন না।"

"বটে!"—বউদিদির মায়ের কণ্ঠ দিয়ে যেন বজ্র নিক্ষিপ্ত হলো। বিকট চিৎকার করে বলে উঠলেন, "বেশ! আমিও এই কায়মনোবাক্যে বলছি—"

"আর শাপ দিয়ো না!" মা কোথায় ছিলেন, উল্কার মত উড়ে এসে পড়লেন। আতঙ্ক-কম্পিতকণ্ঠে একটি-একটি কোরে বলতে লাগলেন, "সেদিন আমাদের 'পুরীনাশ' করেছ, তাতেও কি তোমার হয়নি, বেয়ান?—'বংশে বাতি দিতে যেন কেউ না থাকে,' এ কামনাও করেছ—তাতেও কি তোমার মনকামনা পূর্ণ হয়নি?"—একটু থামলেন, থেমেই সুরু করলেন, "জমি বড়-বউমার নামেই হোক। আমার চন্দন দুঃখী মায়ের ছেলে, ও দুঃখী হয়েই থাকবে—জমির মানুষ হতে ও চায় না।" বলেই আমার দিকে ফিরে বললেন, "এখখুনি গাড়ি নিয়ে আয়, চন্দন—কলকাতায় চল। এ-বাড়ীতে আর নয়।"

দাদার মুখের দিকে তখন আর চাওয়া যায় না, যেন তাঁর চোখের ওপর এক-একটা গ্রহ-উপগ্রহ, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে! ব্যাকুল ভাবে কি বলতে যেতেই মা বাধা দিয়ে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বললেন, "ব্যবস্থায় তোমার ভুল হয়েছিল, বাবা!"

"তাই বোলে ভাই আমার বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে?"—বলেই দাদা হাউ-হাউ কোরে কেঁদে ফেললেন।

মায়ের চোখেও জল আর ধরে না। তাড়াতাড়ি দাদার কাছে সরে গিয়ে তাঁর হাত দু'টি ধরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, "তুমি আমার রাম! তোমার মত দাদা চন্দন যেন যুগে-যুগে পায়!" গলার স্বর আটকে এলো। নাক ঝেড়ে বললেন, "কিন্তু, এ-বাড়ীর অন্ন চন্দন আবার মুখে দেবে—তা তো আর হয় না, বাবা!" বলেই মা চোখে কাপড় তুলে সরে গেলেন।

একটু পরেই গরুর গাড়ি এলো। পাড়ার লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে। দাদা রোয়াকে দাঁড়িয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ঝর ঝর কোরে চোখের জল ফেলছেন। তাঁর সুমুখ দিয়ে সবাই গেল—মা, বউ, খোকা। দাদা উদভ্রান্তের ন্যায় খোকাকে একবার বুকে চেপে ধরেই ছেড়ে দিলেন—খোকা খলখল কোরে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে দাদা বসে পড়ে হাঁটুর ওপর মুখ গুঁজে ফুপিয়ে উঠলেন। ঠিক এমনিই সময়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন বউদিদি। সে এক পরমাশ্চর্য্য মূর্ত্তি! দু'হাতে দু'গাছি মাত্র শাঁখা, কপালে একটি সিঁদুরের টিপ, পরনে আধময়লা একখানি লালপেড়ে সাড়ি—শান্ত, প্রশান্ত, স্তব্ধ, স্থির প্রতিমা। সম্মুখেই দাদা—দাদাকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম কোরে উঠে দাঁড়াতেই বউদিদির মা ভয়ে ও বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুই কোথায় চললি?"

"ঠাকুরপোর সঙ্গে।"

"ওর সঙ্গে?"

"হ্যাঁ।"

"তার মানে?"

বউদিদি ধীর কণ্ঠে জবাব দিলেন, "কিছুই না। ঠাকুরপোর জমি হলো না, তাই আমার বুকটা ওকে দিয়ে দিতে হবে।" বলেই দ্রুত পদে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলেন। গাড়ি তখন ছাড়ে-ছাড়ে।

জীবনশিল্পীর জন্য

আনন্দ বাগচী

শরীর দুর্বোধ্য পুঁথি, যার প্রতি পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায়
যৌবনের ভয় লেখা, তাও তার একাগ্র নিষ্ঠায়
আঁকা হলো, সে আদিম অসংখ্য তৃষ্ণার ছবি নিয়ে
রাত্রির ইজেলে এসে ধরা দিল, ভেবো না বানিয়ে
অর্দ্ধেক গল্পও এর লিখেছে সে, যত বার দেখি
তোমারই আমৃত্যু ছবি নানা রঙে এঁকেছে সে এ কি!
মনের সম্পূর্ণ ছবি আঁকা তবু হয়নি এখনো

সব রঙ ব্যর্থ হয়, সব চিন্তা, তুলি তার কোনো
মনের গভীর বাক্য জাগাতে জানে না, তাই তার
কত জন্ম পার হলো, ইজেলে এখনো অন্ধকার।
না, তাকে পায়নি আজো, শীত আর গ্রীষ্মের দ্বৈরথ
ধুলো আর ঝরাপাতা দিয়ে ঢেকে দিয়েছে সে পথ।
কলমের লঘু রেখা রাতজাগা আলোর মতন
পাখির বিবর্ণ মৃত্যু দিয়ে তার ভ'রেতোলে মন।



ফিফটি-ফিফটি

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল।

তুবড়ির খোলে বারুদ ঠাসার মত অতিকায় পাইপের গহ্বরে তামাকের মশলা ঠাসতে লাগলেন কালোদা'। মুখে কাঁচা বয়সের লজ্জা-লজ্জা ভাব। রাশভারী কালোদা'র কালো বদনে এ ধরনের শ্যাম-শ্রী আর কখনো দেখিনি। মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন তিনি। তামাক-গাদানো পাইপে দেশলাইয়ের কাঠি খুঁচিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই বললেন, দেখলি?

সন্ধানী চোখ দু'টো তাঁর মুখের ওপর ফেলে রেখে মাথা নাড়লাম শুধু।

নতুন বয়সের কালে কেমন ছিল মনে হয়?…তোদের তো আবার অন্য রকম চোখ।

অন্য রকম কি না জানিনে, কিন্তু আপাতত অন্য রকম যে হয়ে উঠছে তাতে সন্দেহ নেই। ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন মহিলাটির কোন্ বয়েস কাল চলছে?

প্রশ্ন শুনে খুশি হলেন বোধ হয়। পাইপ দাঁতে চেপে বললেন, তুই-ই বল না।

আটাশ-ঊনত্রিশ? একটু বাড়িয়েই বললাম।

দশ বছর আগে তাই ছিল। মনোনিবেশ সহকারে পাইপে আগুন ধরাতে লাগলেন তিনি। মনোবিজ্ঞানী কালোদা' আমার বিস্ময়টুকু আঁচ করেই বোধ হয় আর মুখের দিকে তাকালেন না। শুনেছি মেয়েদের বয়েস নাকি যেমন দেখায় তেমন। সত্যি হলে কালোদা' সত্যি কথা বলেন নি। কিন্তু কালোদা' সত্যি কথাই বলেছেন। পাইপ-ধরানো দেশলাইয়ের আলোয় সেটা স্পষ্ট বোঝা গেল। যৌবনের বন্দিদশা চিরদিনই নয়নাভিরাম! রমণী-যৌবনের আরো বেশি। কিন্তু এ গবেষণায় কালক্ষেপ করলে আজকের এই অপ্রত্যাশিত স্বুবর্ণ মুহূর্ত হয়ত হারাব।

মহিলাটি কে কালোদা'?

পরিচয় করিয়ে দিলাম তো—মেয়ে কলেজের প্রফেসার।

সে তো শুনেছি। তারপর?

তারপর তোমার মনে ধরেছে দেখতেই পাচ্ছি। ভারী গলায় হেসে উঠলেন কালোদা'। তোকেও বোধ হয় মনে ধরেছে তার, যে রকম ঘন ঘন শুভদৃষ্টি হচ্ছিল তোদের—

মানুষটি হাসিখুশি হলেও সাধারণত স্বল্পভাষী। কিন্তু আজ বোধ হয় অদৃষ্ট প্রসন্ন আমার। তরল হাস্যে জবাব দিলাম, তা তো হচ্ছিল দাদা, কিন্তু বড় নিরাসক্ত শুভদৃষ্টি। ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। তৃতীয় কারো উপস্থিতি আশা করে আসেন নি, ওই শুভদৃষ্টি দেখে সেটা হাড়ে হাড়ে বুঝছিলাম।

হৃষ্টচিত্তে কালোদা' মোটা পাইপে মোটা রকমের গোটা দুই টান দিয়ে কিছুটা কৈফিয়তের সুরে বললেন, তা নয়, রোগী ছাড়া আর কারো সঙ্গে আমার তেমন আলাপ-পরিচয় আছে, সেটা কোন দিন দেখেনি বলেই তোকে ভাল করে দেখছিল।

বুঝলাম। তা কাল রোববার, তুমি ওঁর ওখানে মধ্যাহ্ন ভোজনের নেমন্তন্ন রাখতে যাচ্ছ?

যাব বলেছি যখন যেতে হবে, তোকেও তো বলল, তুই তো রাজি হলি নে।

গৌরবে বহুবচন হয়ে আর লাভ কি দাদা! সে কথা যাক, গত রোববারেও গেছলে?

একটু বিব্রত মুখেই কালোদা' ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, তোকে কে বললে?

কেউ না। আর, এর পরের রোববারও যাচ্ছ, কেমন না?

কালোদা' হেসে ফেললেন, খুব যে ফাজিল হয়েছিস, পালা এখন।

সোফায় গা এলিয়ে দিলুম। 'এর পরেও উঠে যাব সে মানুষ নই, সেটা কালোদা'ও ভালই জানেন। একটু থেমে বড় রকমের একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললাম, রবিবারের আড্ডাটা আজকাল এই জন্যেই বন্ধ

হয়েছে তাহলে। আমি ভেবেছিলাম কেস্‌ এর চাপে···যে রকম মানসিক বিভ্রাট সুরু হয়েছে আজকাল, সাইকো-অ্যানালিষ্টদেরই বাড়বাড়ন্ত। কিন্তু এখন দেখছি তোমারটা অন্ত কেস্‌।

জবাব না দিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানতে লাগলেন উনি। দুই চোখে প্রচ্ছন্ন কৌতুক। ঘুরে-ফিরে আর যথাসম্ভব মোলায়েম করে সেই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলাম আবার। সত্যিই মহিলাটি কে কালোদা'?

রোগিণী।

নড়ে চড়ে উঠে বসলাম।

এবারে ইতি গজ করে গলা নাবিয়ে বললেন, ছিলেন।

নিজের অজ্ঞাতে পাশের চেম্বারের দিকে চোখ গেল। মাঝের দরজাটা এখন খোলা। ওটি বন্ধ হলেই ঘরটা যেন গোটা বাড়ি থেকেই বিচ্ছিন্ন। শুধু তাই নয়, পরিবেশ সৃজনের ব্যবস্থা এমন যে, মনে হয় দুনিয়া থেকেই বিচ্ছিন্ন। বিচ্ছিন্ন, কিন্তু প্রশান্ত অনাবিলতায় পরম আকর্ষণীয়। ও-রকম পরিবেশেই বোধ করি শয্যায় বা ইজিচেয়ারে গা ছেড়ে দিয়ে আত্মবিস্মৃত শৈথিল্যে বিভ্রান্ত চিত্তের দুর্জ্ঞেয় কথা আর দুর্বোধ্য ব্যথা উজাড় করে দেওয়া সম্ভব। প্রশমনের যাদু আছে যেন ওখানে। ওই ঘরের প্রতি আমার অপরিসীম কৌতূহল। কিন্তু তার থেকেও অনেক বেশী কৌতূহল ওই ছোট টেবিলের পাশে বুক-সেলফ ঠাসা মোটা মোটা বাঁধানো খাতাগুলোর প্রতি। ওর প্রত্যেকটি বিস্মৃতি-বিলগ্ন রোগী বা রোগিণীর আত্মকথায় ভরা। মনোবিজ্ঞানীর নিজের হাতের নোট। রোগী কথা বলে, যেমন কথা খুশি। নিজেকে প্রকাশ করে, যেমন ভাবে খুশি। মনোবিজ্ঞানীর হাত চলতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে, পাতার পর পাতা। অনেকটা যন্ত্রের মত। মাথা নীচু করে ষ্টেনোগ্রাফারের নোট নেওয়ার মত নয়। কারণ, রোগী সেদিকে সচেতন হলে তার কথা বলার তন্ময়তায় ছেদ পড়ে যাবে। কিন্তু তবু ওই এক একটি খাতায় যে সর্বজ্ঞেয় জীবন চিত্র ফুটে আছে সেটা শুধু কল্পনা করতে পারি। ওই খাতার দিকে আমারও প্রবেশ নিষেধ। কখনো সখনো অবকাশ-আলাপনের মাঝে নিতান্ত সদয় হলে ওর থেকে কোন একটা খাতা বার করে কালোদা' হয়ত সকল পরিচয় গোপন করে কোন এক রোগিণীর কোন একদিনের একটুখানি বিবৃতি পড়ে শুনিয়েছেন। কিন্তু ওই পর্যন্ত। তার বেশি একটুও নয়। সে বেলায় কালোদা'র নিষ্ঠা অবিচল। সাইকোঅ্যানালিষ্ট এর এথিক্‌স-এ রোগীর গোপনতার আর দ্বিতীয় দোসর নেই। কালোদা'র পরে আর যে কোন ব্যাপারে আব্দারের অত্যাচারও চালিয়েছি। কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসক কালোবরণ চৌধুরী ভিন্ন মানুষ।

আমার দুই চোখের তৃষ্ণা উপলব্ধি করেই বোধ হয় কালোদা' মিটি-মিটি হাসছিলেন। নিরীহ মুখে জিজ্ঞাসা করলেন. ওই খাতা-গুলোর 'পরে তোর বেজায় লোভ, না?

দৃষ্টিটা যথাসম্ভব করুণ করে বললাম, আপাতত মাত্র একটি খাতার 'পরে, এই যে মহিলাটি এই মাত্র চলে গেলেন শুধু তাঁর খাতাটি। একটুখানি পড়ে শোনাও না কালোদা'। যেখান থেকে খুশি, যতটুকু খুশি, আমি একটি কথাও জিজ্ঞাসা করব না।

আবেদনে মন ভিজল বোধ করি। মুখের দিকে খানিক চেয়ে থেকে ঠক্‌ করে হাতের পাইপটা রাখলেন। উঠে গট-গট করে চেম্বারে গেলেন। সেল্‌ফ থেকে একটা মোটা বাঁধানো-খাতা হাতে করে ফিরে এলেন আবার।

নে, ধর।

আমি হতভম্ব! খাতাটা সত্যিই তিনি আমার সামনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। নির্বিকার মুখে।

আমি···মানে···আমি নিজে নিয়ে দেখব?

দাঁতের ফাঁকে আবার পাইপ চালান করে আর সোফায় মাথা এলিয়ে দিয়ে নিরাসক্ত কণ্ঠে বললেন, ইচ্ছে যখন হয়েছে দেখো।

ঠিক শুনছি তো কানে! কিন্তু বাঁধানো-খাতাটা যে সত্যিই আমার সামনে পড়ে আছে। কালবিলম্ব না করে তৃষিত হাতে টেনে নিলাম সেটা। ভারী মলাট ওলটাতেই রোগিণীর নাম চোখে পড়ল। মহিলাটির সাক্ষাতেই এই নামের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। অপর্ণা বসু। তার নীচে তারিখ। লক্ষ্য করলাম. আট বছর আগের কোন এক দিনের তারিখ সেটা। পাতা ওলটালাম। কিছু লেখা নেই, সাদা পাতা। তার পরেরটাও তাই। তার পরেরটাও। রুদ্ধশ্বাসে এবারে এক সঙ্গে প্রায় সব-গুলো পাতা উল্টে গেলাম। কোথাও একটি কালির আঁচড়ও পড়েনি। আগাগোড়া সাদা। ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকালাম কালোদা'র দিকে। আমার দুরবস্থা দেখে সশব্দে হেসে উঠলেন। বললেন, দেখলি?

দেখলাম। তুমি একেবারে নৃশংস। খাতা যখন হাতে দিয়েছ তখনি সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছু লেখনি কেন?

দরকার হল না।

তার আগেই রোগ সেরে গেল?

হুঁ।

এ রকমও হয় না কি?

কি জানি, আমার জীবনে তো আর হয়নি। তার রোগ সারার ব্যাপারেও আমার হাতযশ কিছু ছিল না, সে নিজেই আমায় বলে দিয়েছিল কি করলে তার অসুখ ভালো হবে।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম কালোদা'র মুখের দিকে। কিছুই বোধগম্য হল না। কালোদা' নিজেই কেমন আত্মবিস্মৃত হয়ে পড়লেন বোধ হয়। তাঁর কালো মুখে এত কোমলতা আর দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

এবারে দুর্নিবার হল লাগামছাড়া কৌতূহল। তার কারণ অধ্যাপিকা অপর্ণা বসু নন। তার কারণ, আটচল্লিশের ভাঁটায় দেড় যুগের বিপত্নীক কালোদা' হেন মানুষের জীবনেও. রেখাপাত করেছে এক নারীর জীবন রহস্য, তাই। 'এই আঠের বছর কালোদা' একনিষ্ঠ ভাবে কামিনী ছেড়ে কাঞ্চনের সাধনা করে এসেছেন। আমার নিজের ধারণা. এত অল্প বয়সে বিপত্নীক হওয়া সত্ত্বেও কালোদা'র এই পেশা-ই ক্রমশ তাঁকে নারী-বিমুখ করেছে। মেয়েদের প্রতি তাঁর দরদ দেখেছি, শ্রদ্ধা বড় দেখিনি। এই ব্যতিক্রম তাই এত বিস্ময়ের কারণ।

আমার এবারকার নাছোড় সঙ্কল্পটা চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল বোধ হয়। যাই হোক, মোটামুটি অপর্ণা বসুর একটু জীবন-চিত্র আহরণ করা গেছে। আর আশ্চর্য, সে জন্যে খুব একটা সাধ্য-সাধনাও করতে হয়নি কালোদা'কে।

মফ[illegible]রের এক স্কুল-মাষ্টারের একটি মাত্র মেয়ে অপর্ণা। শিশুকাল থেকে বাপের বুক দিয়ে গড়া মা-মরা মেয়ে। কলেজে পড়া [illegible] কি এক যোগাযোগের ফলে এক ইঞ্জিনিয়ার ছেলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইলেন। কোন্ এক বিদেশী ফ্যাক্টরীতে মস্ত কাজ করেন নাকি।

খুশিতে হেসে, ব্যথায় কেঁদে নিজের বুক খালি করে বাপ মেয়ে দিয়ে দিলেন। ছেলের হাত ধরে বললেন, বড় আদরের মেয়ে বাবা, আর বড় অভিমানী, দেখো···

বিয়ের পর ক্রমশ প্রকাশ পেল ইঞ্জিনিয়ার কথাটার অন্য অর্থও আছে। যন্ত্রকর্মী অর্থে স্বামী ইঞ্জিনিয়ারই বটেন। এমনি লেখাপড়ায় ইস্কুলের বেড়াও পার হতে পারেন নি। ছেলেবেলায় ফ্যাক্টরীতে ঢুকেছেন সাপ্তাহিক বেতন হারে। ডে-ডিউটি করেছেন নাইট ডিউটি করেছেন। এখনো তাই করছেন, তবে কর্মকুশলতার দরুণ উন্নতি করেছেন অনেকটাই। মাসকাবারি মাইনে এবং ভালো মাইনেই। গোটা একটা বিভাগের মেসিন চলছে তাঁর তত্ত্বাবধানে।

মনে মনে স্বামীটি নিজের এক দিকের দৈন্য অনুভব করতেন বলেই হয়ত আর একটা স্থূল দিক সগর্বে জাহির করতেন প্রায়ই। কবে কত প্রোডাকশন দিয়েছেন বলে কোন্ বিদেশী ফোরম্যান পিঠ চাপড়েছে, কোন্ অপারেটারের এক সপ্তাহ জরিমানা করে দিলেন এক কলমের খোঁচায়, কোন্ দুর্বিনীত তার হাতের এক চড়ে ছিটকে পড়ল সাত হাত দূরে, ইত্যাদি। কিন্তু সামান্য ইস্কুল-মাষ্টারের মেয়ের মন ওতে বিস্ময়াপ্লুত হচ্ছে না দেখে মেজাজ বিগড়েও যেত। একটা স্তব্ধতা নেমে আসতে লাগল অপর্ণার জীবনে। দেহ-মনে পুরুষের পরুষ কামনাটুকুই উপলব্ধি করলেন তিনি।··· আর কিছু নয়।

কিন্তু সমস্যা শুধু স্বামী নিয়েই নয়। চার ভাইয়ের সংসার। বড় তিন ভাই মাঝারি গোছের চাকরী করেন। অন্তঃপুরের কর্ত্রী [illegible] তাঁদের মিলও প্রচুর, অমিলও প্রচুর। রেষারেষিও আছে, গলাগলিও আছে। সংসার পরিচালনায় তাঁরা পরস্পরের নির্ভরশীল, কিন্তু কেউ কারো যে মুখাপেক্ষী নন, তার প্রকাশও খুব অস্পষ্ট নয়। আর প্রত্যেকেই তাঁরা নিজেদের প্রাধান্য সম্বন্ধে রীতিমত সচেতন। এ-হেন অন্তঃপুরবাসিনীদের সঙ্গেও অপর্ণার খাপ খেল না। আর বাকি তিনজনেই সেটা তাঁর শিক্ষার দেমাক বলে ধরে নিলেন। অপর্ণার প্রতি তাঁদের ব্যবহারে এবারে বেশ একটা মিল দেখা যেতে লাগল। টীকা-টিপ্পনী শুরু হল ক্রমশ।

"···ভাইদের মধ্যে তো ছোট ঠাকুর-পোরই রোজগার বেশি, এরকম ঘর সাজানো তোমারই সাজে।" ভাইদের মধ্যে যে আবার ছোট ঠাকুর-পোই লেখাপড়ায় দিগ্‌গজ প্রকারান্তরে সেটাও আর একজন বুঝিয়ে দেন।

"···থাক্ ভাই থাক, তুমি কলেজে-পড়া বিদুষী, এসব কাজ কি তুমি পারো? আমরা বাপের ঘরেও হাঁড়ি ঠেলে এসেছি, শ্বশুর ঘরেও হাঁড়ি ঠেলতেই এসেছি।" রান্নাঘরের প্রসঙ্গে।

"···তোমার বাপের বাড়ির রাজ্যি আলাদা, একেবারে মা সরস্বতীর রাজ্যি—তা ইস্কুলের পণ্ডিতই হোক আর যাই হোক, সংসারের সতের ঝামেলা সেখানে ব্যাকরণের ফুঁয়েই উড়ে-পুড়ে যায়।" অপর্ণার নিস্পৃহতা-প্রসঙ্গে।

কিন্তু তারপর অপর্ণারও মুখ খুলেছে। বাবা বলে দিয়েছিলেন বড় অভিমানী, কিন্তু বড় জেদীও যে, সেটা বলেন নি। সংক্ষিপ্ত দুই এক কথায় এমন কিছু বলে নিজের ঘরে এসে বসে থাকতেন যার জের সামলানো বাকি তিন জায়ের পক্ষেও খুব সহজ হত না। সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করলে তাঁরা বুঝতে পারেন। কিন্তু অপর্ণার জন্যে তাঁদের জ্বলুনি বাড়ে, অথচ মুখের ওপর তেমন কিছু বলতে পারেন না, বলতে গেলেও তাঁর মুখের দিকে চেয়ে কেমন থতমত খেয়ে যান।

স্বামী নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাঁড়িয়ে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন, সে চক্ষুলজ্জা কেটে যেতে তাঁর সময় লাগেনি খুব। তাঁর কর্ম-পরিবেশই তাঁকে রুক্ষ কঠিন করেছে। শালীনতাবোধের ধার ধারেন না বড়। স্বমূর্তি প্রকাশ হয়ে পড়ে যখন তখন। সেটা আরো নগ্ন হয় যখন স্ত্রীর তুলনায় ছোট মনে হয় নিজেকে। সামান্য কি একটা ব্যাপারে একদিন ক্ষিপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন, "কোথাকার লাট-সাহেবের মেয়ে তুমি যে এত দেমাক তোমার? তোমার বাবার মত ইস্কুল-মাষ্টারের অমন মাইনের পঁচিশ গণ্ডা লোককে রোজ নাকে দড়ি দিয়ে কাজ করাই আমি মনে রেখো।"

অপর্ণার ভিতরটা শুকিয়ে আসছিল বহু দিন ধরেই। কিন্তু প্রথম বিপর্যয় ঘটল ওই দিনই। শক্ত হয়ে খাটের বাজু ধরে বসেছিলেন আর নির্বাক নেত্রে স্বামীর কটূক্তি শুনছিলেন। সহসা দেখা গেল হাতের মুঠো শিথিল হয়ে গেছে। ধুপ করে মাটিতে আশ্রয় নিল দেহ। থর-থর কাঁপুনি সুরু হল। দাঁতে দাঁত লেগে গেল। সমস্ত শরীরের রক্ত বুঝি মুখে এসে জমতে লাগল।

হটগোল, চেঁচামেচি; জল, বাতাস, ডাক্তার, ডাকাডাকি সবই হল। অপর্ণার জ্ঞান ফিরল প্রায় ঘণ্টা তিনেক বাদে। বড় তিন ভাই লোক ভালো। বিশেষ করে সবার বড় যিনি, তিনিই সম্ভবত যথার্থ স্নেহ করতেন অপর্ণাকে। আগেও নিজের গিন্নিকে উপলক্ষ করে তিন গিন্নিকে শুনিয়ে বকাবকি করেছেন অনেক সময়। সেদিনও ভাইকে যতটুকু বকা চলে বকলেন। অন্য বৌদেরও প্রায় ধমকে দিলেন। বিলক্ষণ ভড়কে গিয়েছিলেন বলেই হয়ত আর টুঁ শব্দটি করলেন না কেউ।

কিন্তু সেদিন সবে শুরু। সেই একই পর্বের পুনরাবর্তন ঘটল আবারও। ঘটতে লাগল মাঝে মাঝে। কখনো স্বামীর কটূক্তি বর্ষণের ফলে কখনো বা জায়েদের। সেই প্রচণ্ড কাঁপুনি, সেই দাঁতে দাঁত লাগা, সেই ফীট হওয়া। ডাক্তার সতর্ক করলেন, মানসিক কারণে এরকম হচ্ছে, ভবিষ্যতে সাবধান হওয়া দরকার।

বৌয়েরা সাবধান হলেন। ভাইয়েদের বকাবকিতেই ভয়ে ভয়ে সাবধান হতে হল তাঁদের। আড়ালে তাঁরা অপর্ণার নামকরণ করলেন ফীট্-গিন্নি। কিন্তু পারত পক্ষে মুখের ওপর আর তাঁরা কিছু বলতেন না। যথাসম্ভব সাবধান হতে চেষ্টা করতেন স্বামীও। কিন্তু রাগের মাথায় ভুলেও যেতেন অনেক সময়েই। এক গিন্নি আর গিন্নিকে তখন দৌড়ে এসে খবর দিতেন, ফীট-গিন্নির ফীট হয়েছে, জল, পাখা নিয়ে ছোট শীগগির।

এমনিই চলছিল। হঠাৎ স্বামী একদিন ফ্যাক্টরী থেকে এসে খবর দিলেন, তাঁকে বদলি করা হয়েছে, পশ্চিমের কোন এক জায়গায় ফ্যাক্টরীর শাখা খোলা হয়েছে সেইখানে। এ বদলির অর্থ পদোন্নতি। অবিলম্বে যোগ দিতে হবে।

বিদায়ের আগে বড়-বৌ বললেন, যাও ভাই, এবারে সুখে থাকবে। মেজ, সেজ সায় দিলেন।

কিন্তু এ সুখও সইল না, অপর্ণার। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর মেজাজ বিগড়ালো আরো। অফিসারস্‌ ক্লাবে পাল্লা দিয়ে মদ খেতে সুরু করলেন মাঝে মাঝে। উচ্চপদস্থদের সঙ্গ পেয়ে তাঁদের মধ্যে নিজেকে জাহির করার এটাই উপায় বলে ধরে নিলেন। অপর্ণার ফীট হলে এখন জল-বাতাস করে চাকরে। এ ছাড়া কোয়ার্টারে স্বামীর সঙ্গ ধরে বন্ধু-বান্ধবেরও আনাগোণা শুরু হল। অফিসার বন্ধু। অপর্ণার রূপের খ্যাতিটা কি করে যেন অল্পদিনের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল সেই মহলে। ওদের দৃষ্টিতে বস্ত্রস্বল্পতার অনুভূতি জাগে অপর্ণার দেহে। সন্ধ্যায় গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতেও একদিন এলেন এঁদের একজন। যতক্ষণ ছিলেন, দুই চোখে অপর্ণার সর্বাঙ্গ লেহন করে গেলেন যেন।

বাড়ি ফিরে স্বামী এই আগমনবার্তা শুনলেন। শুনে হাসলেন। বললেন, "ক্লাবে আমায় বলেই তো এলো,—বলল, বাসু তোমার বৌয়ের হাতে চা খেয়ে আসি।···তা চা দিয়েছিলে তো এক পেয়ালা, না কি?"

"তোমাদের ক্লাবে চা পাওয়া যায় না?"

রসিকতা করে জবাব দিলেন, "চা পাওয়া যায়, চা দেবার জন্য বউ পাওয়া যায় না।" পরপুরুষের দৃষ্টি নিয়ে যেন খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন অপর্ণাকে। পরে বললেন, "সেজন্যে মেজাজ খারাপের কি আছে, দু' পাতা লেখাপড়াই শিখেছ, সোসাইটিতে মিশতে শেখনি।"

পরদিন স্বামী ফ্যাক্টরীতে গেলেন। একটা চিঠি লিখে রেখে অপর্ণা সোজা কলকাতার ট্রেনে উঠলেন।

জায়েরা জিজ্ঞাসাবাদ করেও কোন কথা বার করতে পারলেন না। বড় ভাসুরও নিষেধ করে দিলেন, ছোট বৌমাকে বিরক্ত করো না, আমি গাধাটাকে চিঠি লিখে জেনে নিচ্ছি কি হল।

যথাসময় চিঠির জবাব এলো। দাদার কাছেই। অপর্ণা যেন আর ফিরে যেতে না চান কোন দিন। খরচাপত্র যা লাগে, মাসে মাসে দাদার নামে পাঠানো হবে। অপর্ণার এত সাহস জায়েদের ভালো লাগল না। আবার তাঁদের গুলুনি শুরু হল। চার ভাইয়ের পৈতৃক-বাড়ি। কিন্তু জায়েদের মনে হল, অপর্ণা আবার তাঁর ঘরখানা দখল করে গোটা বাড়িটাই জুড়ে বসেছেন। কিছু বলারও উপায় নেই। তিন ভাই, বিশেষ করে বড় ভাই শাসিয়ে রেখেছেন, ছোটর অনুপস্থিতিতে আবার ফীট্‌-টিট্‌ শুরু হলে এবারে সকল দায় তাঁদের ঘাড়ে পড়বে। ইত্যাদি।

কিন্তু তবু এক-আধ সময় ফীট্‌ হ'ত অপর্ণার। বসে থাকতেন গুম্‌ হয়ে। বড় ভাসুর ডাক্তারও দেখাতেন।

প্রায় ছ' মাস কাটল।

তার পর হঠাৎ দেখা গেল, ফীট্‌-এর মাত্রা ঘন ঘন বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে রাগ বেড়েছে, অসহিষ্ণুতাও। অথচ জায়েরা পর্যন্ত তখন কেন জানি সদয় ব্যবহারই করতেন। কিন্তু তাতেও রেগে উঠতেন অপর্ণা। বাড়িতে এক মাসের একটা জ্ঞাতি-অশৌচ ছিল। সকলেই বেশ বিষণ্ন। অপর্ণা দেখেন নি, বাড়ির অন্তরঙ্গ একজন ছিলেন নাকি লোকটি। কিন্তু এর মধ্যেও আহারের সময় অপর্ণা ঘোষণা করে বসলেন, নিরামিষ আহার তাঁর পোষাবে না। সামনেই বড় ভাসুর দাঁড়িয়ে, সে খেয়ালও নেই। আবার অশৌচভঙ্গের দিন জায়েরা গে... ...দীক্ষা নিতে। অপর্ণা ঘাট থেকে একজন পুরুত ধরে দু'... টাকা দিয়ে খুশিমত দু'লাইন মন্ত্র নিয়ে নিলেন এবং সেদিন আহারের সময় ঘোষণা করলেন, তাঁর নিরামিষ আহারই চলবে।

বড়গিন্নি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন?"—

"মন্ত্র নিয়েছি।" পরক্ষণেই রেগে গেলেন, "মন্ত্র নিই বা না নিই—আমার খুশি, তোমার ইচ্ছে মত আমায় খেতে পরতে হবে নাকি?" দুম্‌-দুম্‌ পা ফেলে চলে গেলেন। সে বেলা খাওয়াই হল না। মেজগিন্নি, সেজগিন্নি সাধতে এসে দেখেন ফীট এর পূর্বলক্ষণ, সেই হাড়কাঁপানো কাঁপুনি।

এবারে মানসিক চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন বড় ভাসুর। ফ'ল কালোদা'র সঙ্গে যোগাযোগ। প্রথম দু'দিন অপর্ণাকে চেম্বারে আনা যায়নি।

তারপর এসেছেন। প্রথম দিনই কালোদা'র কেমন যেন লেগেছিল। অমন রূপ, অমন নিটোল স্বাস্থ্য, সীঁথি এবং কপালে জল-জলে সিঁদুর, সুবেশিনী, শান্ত দুই চোখে স্বচ্ছ দৃষ্টি···তবু কেমন যেন। পর পর তিন দিন একটি কথাও বলাতে পারলেন না। অনেক প্রশ্ন করলেন, অনেক কথা নিজে বললেন। কিন্তু অপর্ণা একেবারে নীরব। ইজিচেয়ারে মাথা এলিয়ে বসে থাকেন। চেয়ে থাকেন। চেয়ে চেয়ে দেখেন তাঁকেই। নীরব চাউনি। কিন্তু বোবা চাউনি নয়।

এক ঘণ্টার সিটিং। ঘণ্টা অতিবাহিত হয়ে যায়। চেম্বারের দরজা খুলে দেন কালোদা'। ঘরের সবুজ আলো নিবে যায়। সাদা আলো জ্বলে ওঠে। ধূপকাঠি দু'টো জ্বলে জ্বলে নিঃশেষ হয়েছে কিন্তু চন্দনগন্ধে তখনো ঘর ভরা। অপর্ণাকে উঠতে হয়। অনিচ্ছাসত্ত্বেই যেন। পাশের ঘরে বড় ভাসুর প্রতীক্ষারত। তাঁর ... দিকে চেয়ে থাকেন কালোদা'। ছোট টি-পয়ে রোগিণীর জন্য ঢাকা জলের গ্লাসটা তুলে নিজেই এক চুমুকে খালি করে ফেলেন ...।

চতুর্থ দিন কালোদা' অন্য পথ ধরলেন। ইজিচেয়ারে অপর্ণা তেমনি অর্দ্ধশয়ান। সবুজ আলো জ্বলছে। চন্দন-ধূপও। অনেকক্ষণ নীরব থেকে ঘরের স্তব্ধতা আরো বাড়িয়ে তুললেন কালোদা'। পরে শান্তকণ্ঠে বললেন, "কাল থেকে আপনি আর মিছিমিছি কষ্ট করে আসবেন না।"

তেমনি নিঃশব্দেই চেয়ে রইলেন অপর্ণা।

"কোন কথা যখন বলবেনই না ঠিক করেছেন, তখন মিথ্যে আর রোজ রোজ 'ফিস্‌' গুণছেন কেন?"

অপর্ণা চুপচাপ দেখছেন কালোদা'কে। যেন যাচাই করছেন।

"এই তিন দিন যে এত অজস্র কথা বললাম, আপনি শুনেছেন?"

অপর্ণা আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়লেন।

—তাহলে?

এবারে বাক্‌নিঃসরণ হল। "আপনারা কি আমায় পাগল বলে ধরে নিয়েছেন?"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে কালোদা' জবাব দিলেন, "পাগলের সঙ্গে তিন দিন ধরে এত কথা কেউ বলে না। পাগল মনে করলে আপনাকে অ্যাসিলামে পাঠানো হত, আপনাকে তো আগেও বলেছি নানা কারণে এক একজন অতি সুস্থ মানুষেরও মনের এক একটা দিকে এক এক রকমের জট পাকিয়ে যায়।"

[illegible] দুই চোখ কালোদা'র মুখের ওপর রেখে অপর্ণা প্রশ্ন করলেন, "আপনি সে জট ছাড়াবেন?"

"নিশ্চয়, অবশ্য আপনি যদি সাহায্য করেন। কিন্তু সেটাই যে আপনি করছেন না।"

অপর্ণা স্পষ্ট জবাব দিলেন, "করা সহজ নয়।"

"নয় কেন? মন খুলে বিশ্বাস করতে পারছেন না এই তো? কিন্তু একবার বিশ্বাস করে দেখুন, এই চারদেয়ালঘেরা এতটুকু জায়গার মত বিশ্বাসের এত বড় জায়গা আর কোথাও পাবেন না। নিতান্ত বন্ধু বলে ভাবুন, আর বিশ্বাস করুন—করবেন তো?"

কালোদা'র কণ্ঠে কি যেন আছে। সেটুকু কালোদা'রই বৈশিষ্ট্য। তবু তেমনি যাচাইয়ের চোখেই অপর্ণা চেয়ে রইলেন খানিক। পরে অস্ফুট স্বরে বললেন, "করব, কাউকে বিশ্বাস না করলেই নয়…।"

পর পর আরো দু'টো সিটিং-এ অনুকূল পরিবেশ সৃজনের জন্যে কালোদা'কে এক তরফাই কথা-বণিকের ভূমিকা নিতে হল। এর পর এক সময় রোগী-রোগিণী যখন কথা বলা শুরু করলেন, তখন আস্তে আস্তে তাঁর মুখ বন্ধ হবে। মোটা বাঁধানো খাতার পাতা একে একে ভরাট হতে থাকবে।

…কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটল। ইজি-চেয়ারে অপর্ণা আর দেহ ছেড়ে দিলেন না সেদিন। সোজা বসে যেন শেষ বারের মত কালোদা'কে নিরীক্ষণ করে আর যাচাই করে দেখে নিলেন। কালোদা' জিজ্ঞাসা করলেন, "বলবেন কিছু?"

"আপনি জট ছাড়াবেন বলেছিলেন মনের, সে কবে?"

পেশাদার হাসি হেসে কালোদা' জবাব দিলেন, "কবে যে জট ছেড়ে গেল সে আপনি জানতেও পাবেন না।"

"আমায় কি করতে হবে?"

"আপাতত অমন সোজা হয়ে বসে না থেকে শরীর মন শিথিল করে ইজিচেয়ারে মাথা রাখতে হবে। তারপর চোখ বুজে যা আপনার মন চায়, যা খুশি, যে কথা খুশি—কিছুক্ষণ বলে যেতে হবে। আজকের কাজ এইটুকুই"—

অপর্ণা তাঁর দিকে চেয়েই চুপচাপ ভাবলেন একটু। তারপর ধীর শান্ত মুখে বললেন, "এই করে সারা জীবনেও আপনি কিছু করে উঠতে পারবেন না।…তার থেকে আমি আপনাকে বলে দিতে পারি, কি করলে এ অসুখ ভাল হবে, মনের জট ছাড়বে।"

কালোদা' অবাক নেত্রে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, পরে বললেন, "জানেন যদি তাহলে করেন না কেন?"

"আমি নয়, আপনি চিকিৎসক, আপনি করবেন।"

"…ও, আচ্ছা বলুন।"

অপর্ণা নীরব কিছুক্ষণ। পরে চোখে চোখ রেখে বললেন, "সেদিন আপনি বলেছিলেন আপনাকে সব থেকে আপন জন, সব থেকে দরদী বন্ধু বলে ভাবতে। ও রকম কথা বোধ হয় সকলকেই বলে থাকেন আপনারা, তাই না?"

হঠাৎ এরকম প্রশ্নের জন্য কালোদা' প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই হালকা হেসে জবাব দিলেন, "বলি হয়ত…কিন্তু সকলের সঙ্গে আপনার একটু তফাৎ আছে…ঘরে আয়না থাকলে দেখাতে পারতুম।"

সবুজ আভাতেও অপর্ণার মুখ রক্তিম হতে দেখা গেল। মৃদু হেসে বললেন, "আচ্ছা বিশ্বাস করলাম।"

আবার চুপচাপ। অদ্ভুত রহস্যের মত লাগছে কালোদা'র। এরকম নারীচরিত্র বুঝি সত্যিই দুর্জ্ঞেয়! আবার তাঁর চোখে চোখ রাখলেন অপর্ণা। স্বচ্ছ, তীক্ষ্ণ।

"বড় ভাসুরের মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে সব কিছু শুনেছেন?"

"কি শুনব, বলুন?"—

অসহিষ্ণু কণ্ঠে অপর্ণা বলে উঠলেন, "যা জিজ্ঞাসা করছি জবাব দিন। শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"আমি বিধবা, সে কথা শুনেছেন?"

কালোদা' হতভম্ব, বিমূঢ়। জীবনে এত বিস্মিত আর কখনো হননি বোধ হয়। সীঁথি আর কপালে ঝকঝক্ করছে, জ্বল্‌জ্বল্ করছে রক্তিম সিঁদূর-চিহ্ন।

"শুনেছেন?"

"শুনেছি। কিন্তু আপনি কত দিন জেনেছেন?"

"প্রথম দিনই। দোতলা থেকে টেলিগ্রাম-পিওনকে আমার নামই ডাকতে শুনেছি আর বড় ভাসুরকে টেলিগ্রাম হাতে নিতেও দেখেছি। কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা সত্ত্বেও সে টেলিগ্রাম কেউ আমায় দিয়ে গেল না। পরে নীচে এসে দেখলাম সবারই মুখ কালো। আরো পরে শুনলাম, অ্যাকসিডেন্ট-এ কে একজন জ্ঞাতি মারা গেছেন তাঁদের, তাই এক মাসের জ্ঞাতি-অশৌচ। কিন্তু সত্যি ঘটনাটা কেন কেউ প্রকাশ করলেন না, জানেন বোধ হয়?"

কালোদা' নিজের অজ্ঞাতেই মাথা নাড়লেন। বললেন, "আপনার ফীটের রোগ আছে, পাছে আরো বিপদ ঘটে কিছু।"

"তাই। পাছে আরো বিপদ ঘটে, পাছে আমি পাগল হয়ে যাই, পাছে দুর্বহ বোঝার মত সারা জীবন তাঁদের টানতে হয় আমাকে। ভাসুরেরা এই ভয়ে বলতে দেননি, জায়েরাও ভয় পেয়ে বলেননি। নইলে বলতেন। যেদিন নিরাপদ বুঝবেন সেদিনই বলবেন। কিন্তু, এ ভয়টা তাঁদের ভাঙলে চলবে না, বরং সেটা আপনি যদি বাড়িয়ে দেন তো ভালো হয়। ও সংসারে আশ্রয় আর অনুকম্পা আর দয়া আমার সহ্য হবে না, তাহলে সত্যিই হয়ত পাগল হয়ে যাব।"

কালোদা' বাহ্যজ্ঞান রহিত যেন। প্রশ্ন করলেন, "আর আপনার ফীটের রোগ?"

—যেদিন দেখলাম সত্যিকারের নিরাশ্রয় হয়েছি সেদিন থেকেই ফীটের রোগ ছেড়েছে। কিন্তু ওই কাঁপুনিগুলো মিথ্যে নয়, ও এমনই হয়ে গেছে যে নিজেকে একটু উত্তেজিত করে তুলতে পারলেই ও আপনি শুরু হয়ে যায়।"

আত্মবিস্মৃতের মত কালোদা' বললেন, কিন্তু আপনি কি করবেন স্থির করেছেন?"

অপর্ণা প্রায় না ভেবেই জবাব দিলেন, "বড় ভাসুরকে বলে আপনি আমার পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিন। দীর্ঘ চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে একটা কিছুতে মন দেওয়া দরকার বললে তাঁরা অবিশ্বাস করবেন না। 'ফীস্' অবশ্য তাঁরা আর বেশি দিন দিতে পারবেন না।…কিন্তু যদি কখনো দাঁড়াই, আপনার ঋণ পরিশোধ করতে না পারলেও ওটুকু পারব হয়ত।"

স্তব্ধ নেত্রে নারীমূর্তির দিকে চেয়ে বসে রইলেন কালোদা'। কতক্ষণ ঠিক নেই।


এখন রেক্সোনায় নতুন একটা কিছু আছে
এটা অনেক...
অনেক...
বেশী সুগন্ধী!
রেক্সোনা সাবানে এখন
অনেক...অনেক
বেশী সুগন্ধ আছে
দীর্ঘস্থায়ী
সতেজতার গন্ধে
Rexona
RP 143-X52 BG
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরি লিঃ-এর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত।



ভৃগু-জাতক

শ্রীতারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

দ্বিতীয় পর্ব্ব

পাহাড়ের গায়ে এখানে-সেখানে ছড়ানো বস্তির খড়ো কুটিরগুলি। বাঁশ বেত আর উলুঘাসে তৈয়ারী। মাটির উপর অনেকখানি উঁচুতে কাঠ আর বাঁশ পাতিয়া মাচান তৈয়ারী হইয়াছে; সুতরাং ঘরের নীচের দিকটা একদম ফাঁকা। কাঠের সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে হয়, নীচের ফাঁকা জায়গাটা বড় বড় গাছের গুঁড়ি দিয়া ঘেরা। উপরে থাকে মানুষ, আর নীচে পশুর পাল—গোরু, মহিষ, ছাগল, শূকর, হাঁস আর মুরগী। বিচিত্র কোলাহল—থাঁ-থাঁ—ঘাঁ-ঘাঁ—ঘোঁৎ-ঘোঁৎ—হাম্বা-প্যাঁ-প্যাঁ। এই বুনো মানুষগুলি কিন্তু বেশ আরামে আছে ইহারই মাঝখানে।

ছোট-ছোট ছেলে-মেয়েরা দিব্যি উলঙ্গ থাকে। একটু বড়রা নেংটি পরে ঘুরিয়া বেড়ায়। জঙ্গলের মানুষ ইহারা; ভয়-ডর আছে বলিয়া মনে হয় না। গাছের মগডালে উঠিয়া বসে থাকে। বানরের মত লাফ দিয়া অনায়াসে এক ডাল হইতে অন্য ডালে চলিয়া যায়। পাহাড়ের আঁকে-বাঁকে কত রকমের গাছ, কত রকমের ফল। জামের মত অম্লমধুর ছোট ছোট ফল পিচণ্ডি; মুঠো মুঠো পিচণ্ডি খায় পাহাড়ীদের ছেলে-মেয়েরা। হলুদরঙের পাকা ফল ডুবি; ভিতরটা ঠিক লিচুর মত; থোকা-থোকা ফল ঝুলে গাছে।

আমার নূতন সঙ্গী জুটিয়াছে; সবাই সর্দারের মেয়ে ভাটি। গোলগাল সুঠাম চেহারা; গালে তাহার গোলাপের আভা। বয়সে আমার চেয়ে বড় বলিয়াই মনে হয়। বনে বনে ঘুরিয়া বেড়ায়; কত কি দেখায় আমাকে। খাড়া পাহাড়ে তর-তর করিয়া কেমন উঠিয়া পড়ে, বুঝিতে পারি না। খিল খিল করিয়া হাসে। "আয়, আয় ভৃগুয়া, ঐ উপুরে রাজার পাট দেখবি।" টানিয়া তুলে আমাকে পাহাড়ের উপর,—কালো পাথরে তৈয়ারী পুরাতন এক বাড়ী; তাহার উপরে বড় বড় গাছ জন্মিয়াছে। কি ভয়াল ও ভীষণ তাহার আকৃতি!

ভাটি বলে, "বাবার কাছে এর গল্প শুনবি! ঐ যে এঁকেবেঁকে সাপনালা গেছে, তার গল্প।"

আমি বলি, "তুই জানিস নে?"

ভাটি হাসিয়া বলে, "না রে না, জানি কিন্তু বলতে পারব না; চোখে জল আসে।"

ভাটির কানে চাঁপা ফুল দুলিয়া উঠে; হঠাৎ ভাটি আমায় জড়াইয়া ধরে,—"ভালবাসার গল্প রে ভৃগুয়া, ভালবাসার গল্প! রাজার ছেলেকে ভালবাসত এক চাষীর মেয়ে; রাজা তাকে দিয়েছিল অজগরের মুখে। আমি আর বলতে পারব না।"

পাহাড়ী মেয়ের আকর্ষণ প্রবল হয়। তাহার চোখের জলে আমার বুক ভাসিয়া যায়। ভাটির হাব-ভাব দেখিয়া আমি বিস্মিত হই। আবার সন্তর্পণে আমাকে ধরিয়া নীচে নামায় ভাটি, আমি যেন তাহার খেলার পুতুল।

পাহাড়ী ছড়ার জল সর্পিল গতিতে নামিয়া আসে তরতর বেগে। মাঝে মাঝে বড় বড় খাড়া পাথর মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ছড়ার জল সেই খাড়া পাথরে ধাক্কা খাইয়া লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া ফোঁস ফোঁস করে,—ফোয়ারার মত চারি দিকে জল ছড়াইয়া পড়ে। দূর হইতে মনে হয়, নিকষ কালো পাথরের শিবকে ঘিরিয়া শত শত দুধরাজ সাপ শিবের মাথায় শতধারায় দুধ ছড়াইয়া দিতেছে।

উলঙ্গ ছেলেমেয়ের দল সেই পাথরের ঢিবির উপর চাপিয়া বসে। শতধারায় ফোয়ারার জলে অবগাহন করে তাহারা। ভাটিকে দেখিয়া তাহারা পলাইয়া যায়, ভাটি আমাকে টানিয়া লইয়া গিয়া সেই পাথরের উপর বসে। ঝড়ু সর্দারের ছেলে মোহন ভাটিরই সমবয়সী। সে হাঁক দিয়া বলে, "হেই ভাটি, ঠাকুরদের ছেলে, তোর ভয়-ডর নেই। একসঙ্গে বসেছিস যে, হেই!"

ভাটি খিল-খিল করিয়া হাসে আর দুই হাতে ফোয়ারার জল ধরিয়া ছড়াইয়া দেয়। জলের ধারায় সূর্য্যের কিরণ পড়িয়া রামধনুর রঙ ফুটিয়া উঠে। ভাটির গায়ে রামধনু। তাহার হলুদ রঙের তামাটে দেহখানি বড় সুন্দর লাগে। জলের ধাক্কায় নিজেকে সামলাইতে না পারিয়া ভাটিকে জড়াইয়া ধরি।

উপর হইতে মোহন বড় বড় পাথরের চাঁই তুলিয়া জলে ছুড়িয়া মারে। তোলপাড় হয় জল। ভাটি হাঁক দিয়া বলে, "যা, যা, তোকে চাইনে।"

বনভূমির মায়া আর ভাটির আকর্ষণ আমাকে পাগল করিয়া তুলে। ছুটির দিনে পাহাড়ের বস্তীতেই আমার দিন কাটে। জগাই বলে, "পাহাড়ীরা মায়া জানে, বেশি যাসনি ভৃগু!"

পাহাড়ের আনাচে-কানাচে শূকর, ছাগল, গরু আর মহিষের রাখালী করিয়া বেড়ায় পাহাড়ী কিশোর-কিশোরী। বড়রা যায় নীচেকার মাঠে চাষবাস দেখিতে। পাহাড়ের গায়ে আখ আর আনারসের বাগানও রহিয়াছে। ভাটির সঙ্গে সারা দিন ঘুরিয়া বেড়াই। ক্ষেত্রদিদির কথা মনে পড়ে।

ক্ষেত্রদিদির সেই অমোঘ মন্ত্র আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল, পাহাড়ী অঞ্চলে নির্জনে কাটাইতে চাই, সর্ব্বত্রই কি এক রকমের শূন্যতা বোধ করি। পাহাড়ের যেখানটায় ছড়ার জল পাথরে ধাক্কা খাইয়া উচ্ছল ফোয়ারার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারই ধারে বড় একটা নাগেশ্বর ফুলের গাছ, সেই গাছের তলায় প্রায়ই বসিয়া থাকি। শৈশবের স্মৃতি মনকে তোলপাড় করে, ভাটি তখন ছিল, অনেক ছোট, বড় লাজুক ছিল সে। আমাদের মত উঁচু জাতের ছেলেদের সঙ্গে মিশিতে তাহাদের অনেক বাধা ছিল, একদিন ছড়ার ধারে পা

পিছলাইয়া গিয়া পড়িয়া গিয়াছিলাম, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া ভাটি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়াছিল, বুঝিয়াছিলাম, পাহাড়ী মেয়ের গায়ের জোর কত বেশী! সে ফিক্ করিয়া হাসিয়া পলাইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই হইতে প্রায়ই সে পাহাড় অঞ্চলে আমার খেলার সঙ্গী হইয়াছিল।

বহু দিনের ছেদ পড়িলেও ভাটি আমাকে ভুলে নাই। ছুটির দিনে বাড়ী আসিলে সে ছুটিয়া আসিত। সেই ভাটি আজ অনেকখানি বড় হইয়াছে। সাপনালা আর রাজার পাটের কাহিনী আজিও শুনা হয় নাই।

একাই পাহাড়ের চূড়ার দিকে উঠিতেছিলাম; কিন্তু আগাইয়া যাইতে কিছুতেই পারিতেছি না। দুই পা উঠিতে তিন পা নামিয়া আসি। ক্লান্ত হইয়া একটি পাথরের উপর বসিয়া আছি, ভাটি আমার দিকে আসিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের আলো পড়িয়াছে তাহার মুখের উপর, কানে তাহার সোনালী বনলতার কোরক দুলিতেছে, ছোট একখানি লাল শালুর কাপড় তাহার কোমরে জড়ানো, গায়ে ব্লাউজের ধরণের নীল রঙের একটা জামা। তাহাকে অপরূপ দেখাইতেছিল!

ভাটি আমার হাত ধরিয়া হেঁচকা একটা টান মারিল। প্রায় পড়িয়া যাইতেছিলাম, সে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া বলিল, "বড় না মুরোদ! উঠবি রাজার পাটে?"

আমি বলিলাম, "না সন্ধ্যে হয়ে যাবে। বাড়ী ফিরতে দেরী হবে।"

"হোক দেরী, চল।" আমাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়া ভাটি আমাকে টানিয়া লইয়া পাহাড়ে উঠতে লাগিল। রাজার পাটের কাছে আসিয়া পৌঁছিলাম। ভাটি বলিল, "ঐ দেখ, ঐ যে অনেক নীচে অন্ধকার গভীর গর্ত্ত-গুহা। ওখানে থাকত মস্ত বড় অজগর—রাজবাড়ীর রাখাল—বাস্তুদেবতা। সেই অজগরই ঐ পথ দিয়ে গাঙে নেমে গিয়েছিল। তারই দেহের আঁচড়ে হয়েছে এই সাপনালা।"

খাড়া পাহাড়ের উপর শ্যামল চত্বর; তাহারই উপর রাজার পাট। নীচেকার মাঠ ঘাট ও বাড়ীঘরকে সেই চত্বরে দাঁড়াইয়া ছবির মত লাগে। রাজার পাট আর সাপনালার সঙ্গে জড়িত আছে এক বিষাদময় প্রেমের কাহিনী। প্রতি বৎসর শারদীয় পূর্ণিমায় পাহাড়ীয়া শত শত পদ্মফুল উপর হইতে নীচেকার ওই গুহাগহ্বরে ফেলিয়া দেয়। সেই কাহিনীর নায়ক-নায়িকা রাজার ছেলে আর তাহার প্রণয়িনীর উদ্দেশে। সাপনালা পদ্মস্রোতে ভরিয়া উঠে।

ভাটি বলে, "তোরও বুঝি ঐ জায়গাটা ভাল লাগে?"

আমি বলিলাম, "হ্যাঁ, বড় সুন্দর!"

ভাটি বলে, "হাঁ রে, ভারি সুন্দর। আমি যদি এখান থেকে লাফিয়ে ওই গুহা-গহ্বরে পড়তে পারি, তাহলে আরো সুন্দর হয়।"

ভাটির কথায় আঁৎকাইয়া উঠি। পাহাড়ী মেয়েদের বিশ্বাস নাই। তাহাকে বলিলাম, "কেন, কোন দুঃখে?"

ভাটি হাসিয়া বলে, "দুঃখে কেন সুখে। দুঃখ ভুলবার জন্তেই লোকে নিশ্চিত মরণ জেনেও আগুনে ঝাঁপ দেয়, জানিস নে? এত লেখাপড়া শিখলি?"

আজ নূতন কথা শুনিলাম ভাটির মুখে। দুঃখকে ভুলিবার আনন্দে মানুষ মৃত্যুকে বরণ করিতে পারে। দুঃখে, রোগে, শোকেই মানুষ মরে, তাহাই জানি। আজ সত্যই নূতন কথা শুনিলাম। মানুষ ত সহজে মরিতে চায় না। বাঁচিতে চায়। ভাটির কথায় মনটা বিচলিত হইল।

ভাটিকে বলিলাম, "চল নীচে নেমে যাই।"

ভাটি হাসিয়া বলে, "কেন, ভয় পেয়েছিস? না, না, আমি মরব না।"

তাহার মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করি। পড়ন্ত রৌদ্রের সোনালী আভায় ভাটির মুখে বিষাদের ছায়া নামিয়াছে। কিছুই বুঝিতে পারি না।

ভাটি বলিল, "তোরা বুঝবি না ভুগুয়া, আমাদের মনের কথা তোরা বুঝবি না। লেখাপড়া শিখছিস, কত দূরে কোথায় চলে যাবি। আমাদের এই গুহাগহ্বরে বনজঙ্গলেই থাকতে হবে। মোহনটা বড় উত্যক্ত করে, আর ভাল লাগে না।"

মোহনের নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই ভাটির চোখে জল দেখা দিল। ভাটির রহস্যময় কথাবার্ত্তার কিছুই বুঝিতে পারি না। তাহাকে বলি, "আচ্ছা, মোহনকে বারণ করে দেবো।"

ম্লানমুখে ভাটি বলিল, "তাতে হিতে বিপরীত হবে। তুইও চিরটা কাল এখানে থাকবি নে!"

আমি উত্তরে বলি, "কেন রে? আমি কি বাড়ীঘর ছেড়ে চলে যাব?"

ম্লান হাসি ভাটির মুখে, "হ্যাঁ যাবি, তোর যে মা নেই!"

ভাটির কথায় সচকিত হইয়া উঠিলাম। মায়ের কথা মনে পড়িয়া গেল। পাঁচ বৎসর হইয়া গিয়াছে। মায়ের কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম; সত্যই বাড়ীর আকর্ষণ কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে! আজ অবধি দেখিতেছি, এইটুকু বয়সেই সঙ্গী-সাথী অনেকেই কোথায় দূরে সরিয়া গিয়াছে; কত দূরে চলিয়া আসিয়াছি; সেই সুব্রতা, ক্ষেত্রদিদি আর রমাপদ-উৎপল তাহারাও আজ বহু দূরে। জীবনের পথে আগাইয়া চলিয়াছি। নিত্য-নূতন খেলাঘর গড়িয়া উঠে আবার ভাঙ্গিয়া পড়ে।

কেন্দ্র ছিল বাড়ীঘর আর আমার মা; তাঁহার আকর্ষণও আর নাই। তাঁহার মুখখানি মাঝে মাঝে দেখিতে পাই বন্ধুদের মায়ের মুখে। বন্ধু সরোজের মা আর ওই ভাটির মায়ের মুখে যেন আমার মাকে আরও স্পষ্ট দেখিতে পাই।

ভাটিকে বলিলাম, "তোর ভয়টা কিসের শুনি?"

ভাটি বলিল, "মোহন আমায় ভালবাসে"।

আমি উত্তর দিলাম, "তোকে কে না ভালবাসে ভাটি! আমিও তোকে ভালবাসি।"

ভাটি আমার কথায় খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠে; তাহার গালে ও ঠোঁটে কে যেন আবির ছড়াইয়া দিয়াছে; সূর্য্যের রক্তিম মিঠা রৌদ্রে তাহাকে অপরূপ দেখাইতে লাগিল।

ভাটি বলিল, "বেশ, বেশ, তোরা সবাই আমাকে ভালবাসিস?"

আমি বলিলাম, "হাঁ, ভালবাসি।"

ভাটি বলিল, "আচ্ছা বল ত, আমি যদি তোদের কাউকে ভাল না বাসি তাহলে কি হয়?"

আমি বলিলাম, "ধ্যেৎ, নিশ্চয় তুইও সবাইকে ভালবাসিস; আমি জানি তুই আমাকে ভালবাসিস।"

আবার উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া ভাটি বলিল, "হাঁ, ভালবাসি, কিন্তু

যাকে চাইছে, যাকে ভালবাসি না, সে যদি হেংলার মত উত্যক্ত করে, তাহলে কি করি বল ত ?"

আমি কিছুক্ষণ ভাবিয়া বলিলাম, "এ তোর অন্যায় ভাটি, সবাইকে ভালবাসলে কত সুখ ! আর রেষারেষি থাকবে না ; সবাই খুশি হয়।"

ভাটি বলিল, "তুই ভালবাসার কিছুই বুঝিস না ভূগুয়া, ভালবাসা এত সোজা জিনিস নয়। ভালবাসার জন্যই রাজার ছেলে ওই গুহাগহ্বরে ঝাঁপ দিয়েছিল। চল বাবুয়ার কাছে ; আজ সে গল্প শুনবি।"

লবাই সর্দার গল্প করিতেছে ; লবাই পাহাড়ীদের সর্দার, তাহাদের মন্ত্রগুরুও বলা চলে। তুকতাক, যাদুবিদ্যা, বাণমারা অনেক কিছু জানে এই বুড়ো সর্দার ; লোহার শাবলের মত শক্ত তাহার হাত-পা ; হাতীর মত মন্থরগতিতে রাস্তা কাঁপাইয়া চলে। সকলেই তাহাকে মান্যি করে আবার ভয়ও করে ; রাজার পাট আর রাজবংশ এই লবাই সর্দারেরই কোন এক পূর্ব্বপুরুষের তুকতাকে বিনষ্ট হইয়াছে। তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ শঙ্খ সর্দার রাজবংশের উপর নির্ম্মম প্রতিশোধ লইয়াছিল ; রাজবংশ লোপ পাইয়াছে। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া এই প্রতিশোধ সেই কাহিনীর সূত্রপাত এই সাপনালা, চাষীর মেয়ে রত্না আর রাজার ছেলে মদনকে লইয়া।

লবাই সর্দার বলিতেছে : "ওই যে পাহাড়ের চূড়ায় চত্বরে রাজপাট দেখেছো বাবাঠাকুর ! এখানে ছিল আমাদের রাজা গম্ভীর সিংহের রাজপুরী। রাজার ছিল প্রবল প্রতাপ, উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব্ব-পশ্চিম অনেক দূর পর্য্যন্ত তার দখলে ছিল ; ওই কালো পাথরগুলি তখন জ্যোৎস্না রাত্রেও ঝিকমিক করে উঠত। আজ তার উপর বট ধরেছে, শ্যাওলা ধরে গেছে।

অর্জুনের কথা শুনেছো ? সেই মহাভারতের অর্জুন, পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যম পাণ্ডব, মস্ত বড় বীর ছিল সে। অর্জুন এদেশে বেড়াতে এসেছিল, এই পথেই সে মণিপুর আর নাগার দেশে গিয়েছিল ! রাজার অতিথি হয়েছিল অর্জুন ; তাঁহারই পরিচর্য্যা করে মহারাণী পেয়েছিলেন সুধন্বাকে। সেই সুধন্বার বংশের শেষ রাজা গম্ভীর সিংহ।

কৃষ্ণসখা অর্জুনের আদেশেই রাজবংশ বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। ওই যে রাধাকৃষ্ণজীর মন্দির ওটা সুধন্বারই। রাস আর ঝুলনে এখনও কত লোক আসে রাধাকৃষ্ণজীর মন্দিরে। আগে কত সমারোহ হত। কৃষ্ণলীলার পালা চলত দিনের পর দিন ; বেশী দিনের কথা নয় ; আমার ঠাকুরদার বাবাও দেখেছেন গম্ভীর সিংহকে।

রাজা ছিলেন পরম বৈষ্ণব। রাজার একটি মাত্র ছেলে, ঠিক কেষ্টঠাকুরের মত চেহারা, নাক-মুখ চোখ ! সুন্দর বাঁশি বাজাত রাজার কুমার মদন। রাজার ছেলে হয়েও, রাজার ছেলের মতন সে থাকত না। নেমে আসত আমাদের বস্তীতে। পাহাড়ী ছড়ায় জলকেলি করত আমাদেরই চাষাভূষার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে। যেখানটায় কালো পাথরের ঢিবির উপর ফোয়ারার মত জল ছড়াচ্ছে, ওখানটায় ঢিবির উপর বসে কখন কখন সে বাঁশি বাজাত।

আমার ঠাকুর্দার বাবার বোন ছিল চম্পা ; এগারো-বারো বছরের মেয়ে। সেও বাঁশি বাজাতে জানত। মদনকুমারের বাঁশির আওয়াজ শুনলেই সে ছুটে যেত ফোয়ারার কাছে। দু'জনে বসত একই ঢিবিতে, বাঁশি বাজাতে বাজাতে তন্ময় হয়ে যেতো দু'জন। চম্পার গায়ের রং ছিল ঠিক চাঁপাফুলের মতন। আমার মনে হয়, ঠিক আমার ভাটির মতন। সর্দারের কথা শুনিয়া ভাটির মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

সকলে অবাক্ হত তাদের বাঁশি শুনে। সবাই বলত—রাধা-কৃষ্ণ। মদনকুমার বারণ শুনে না। চাষাভূষার সঙ্গে মেলামেশা রাজা আর রাজবাড়ীর কেউ পছন্দ করে না। সত্যিই ত, যে একদিন এত বড় রাজ্য চালাবে, সে কি না বনে-জঙ্গলে বাঁশি বাজিয়ে চাষার মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে ?

ধনুর্বিদ্যা, মল্লবিদ্যা, বর্শা চালানো এই পনেরো বছরের ছেলের কিছুই শেখা হল না। রাজা বড় দুর্ভাবনায় পড়লেন। মহারাণী ছেলেকে কত বুঝান ! মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল সকলেই হার মানেন। শুধু বাঁশি আর বাঁশি।

পাহারা বসিল, রাজার কুমার মদনকে আর পাহাড়তলীতে নামিতে দেওয়া হইবে না। কিন্তু তবুও বাঁশির বিরাম নাই। ওই রাজার পাটের উত্তর দিকে একটা বকুল গাছ ছিল। সেই বকুলগাছে বসে মদনকুমার বাঁশি বাজাত। পাহাড়ী ছড়ার ফোয়ারার ঢিবির উপর বসিয়া চম্পা তার উত্তর দিত।

রাসলীলা আর ঝুলনের সময় রাজার কুমারের আর পাহারা থাকে না। রাধাকৃষ্ণজীর মন্দিরে যেতে হয়। সেখানে চলে রাধা-কৃষ্ণের লীলার পালা। রাজার কুমার হঠাৎ একদিন সেই আসরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাঁশিতে মুখ দিল। হাজার হাজার লোক মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যায়। কোথা থেকে ছুটে আসে চম্পা। তারও হাতে বাঁশি। দু'জনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বাঁশি বাজায় !

মুগ্ধা মহারাণীর চোখে জল ঝরে। রাজা কেঁদে উঠেন। সেনাপতি ও মন্ত্রীর চোখেও জল। কিন্তু কেন সে জল ? ভক্তিতে না রাগে ?

সেদিন থেকে আরো কঠোর হ'ল রাজার ছেলের পাহারা। কিন্তু চম্পাকে সামলায় কে ? চম্পা আপন মনে বাঁশি বাজায়। রাজবাড়ীর ছাদ থেকে তার প্রতিধ্বনি আসে আর আসে তার প্রত্যুত্তর !

গাঁয়ের লোকেরা বলাবলি করে, রাধা আর কৃষ্ণ নেমে এসেছে আবার ! রাধার প্রেমে পড়েছে কৃষ্ণ, রাধা কৃষ্ণকে চিনতে পেরেছে। ওদের বাধা দেবে কে ?

এমনি করে দিন যায়, রাজকুমার আরো বড় হয়ে উঠে, চম্পাও বড় হয়। কিন্তু তাদের কারো স্বভাব বদলায় না। রাজকুমারের মুখে একই কথা, বাঁশির একই সুর—রাধা, রাধা—রাধা।

চম্পার বিয়ের উদ্যোগ নষ্ট হয়ে যায়, বড় বড় সর্দারের ছেলে বিফল হয়, চম্পাকে সাধ্যসাধনা করে, চম্পার মুখে আর হাসি নেই। কিন্তু যখন বাঁশি মুখে ধরে, তখন যেন এক জ্যোতি বেরিয়ে আসে চম্পার মুখ থেকে।

চম্পাকে ছোটবেলা থেকে ভালবাসত রতন। চম্পাও হয়ত তাকে ভালবাসত, সকলেই আশা করেছিল, চম্পাকে নিয়ে রতন সংসারী হবে। রতন কাছে এলেই চম্পার চোখে জল ঝরে ; সে বলে, সরে যা রতন, আমার এখনও সময় হয় নি। দূরে বসে বাঁশি শোন, ঐ যে কালা কালিয়ার বাঁশি আমায় ডাকছে। চম্পা বাঁশিতে মুখ দেয়—করুণ সুর ভাসে বাতাসে, যেন বলে, "মরিব, মরিব, কালার জন্ত মরিব আমি।"

[ক্রমশঃ।

অনিলবরণ ঘোষ



আগুন-ছড়ানো দুপুর। শ্রাবণের আকাশে ভাদ্রের রদ্দুর। আগুনের হল্কা থেকে বাঁচার তাড়ায় রাস্তা ধরে প্রায় দৌড়ে চলেছি। হঠাৎ একটা ডাক কানে এল, থমকে দাঁড়োলাম।

: রাঙাকর্ত্তার বাড়ীর খোকাবাবু যায় না ঐ···

প্রশ্ন আসে তপ্ত ফুটপাথে পড়ে থাকা একটি কুষ্ঠরোগীর কাছ থেকে। চমকে যাই। স্বর্গত দাদামশাইর নাম ধরে যে ডাকছে লোকটা। কে সে? অচেনা নিশ্চয় নয়···

এগিয়ে গিয়ে ভাল করে তাকালাম লোকটির দিকে।

চিবুক, নাক ও কপালে দগদগ করছে ঘা। চোখের পাতা দু'টি অস্বাভাবিক ভাবে ফুলে গিয়ে প্রায় বুঁজে আছে। হাতের আঙুলগুলির ডগায় ক্ষয় সুরু হয়েছে। হাঁটু পর্য্যন্ত ঢেকে আছে নোংরা শতছিন্ন ঢলঢলে একটা জামা। পায়ের পাতাতেও কতকগুলি ন্যাকড়া জড়ানো।

পরিচিতের গণ্ডির মাঝে কাউকে স্মরণে আনতে পারিনে। এমনতর কুষ্ঠরোগী কারুর সাথে কখন কোথাও যে আলাপ হয়েছে মনে পড়ে না। হতাশ হয়ে জিজ্ঞেস করি, তুমি আমাকে চেন?

লোকটির বীভৎস রাঙা ঠোঁট দু'টিতে একটুখানি হাসি খেলে গেল। ঘামে জবজবে দেহ একটু নড়ে উঠল। দু'হাতে ভর করে শোয়া থেকে উঠে বসল সে। মিনমিনে গলায় হাসিমাখা কণ্ঠে বললে, সব ভুলে রয়েছ খোকাবাবু? জগা বৈরাগীর কথাটা মনেও আসে না,···দেখো ত মনে করে?

···জগা বৈরাগী!···এই কি সেই আমার মামার গাঁয়ের জগা বোষ্টম? কেষ্টলীলায় কৃষ্ণ সেজে যে গান গাইত, গাজনের দিনে শিবের সাথে যে গৌরী সাজত। রাঙাদাদু যাকে ডাকতেন বুলবুলি নামে, রাঙাদিদিমা যাকে আদর করে বলতেন কলির শ্রীকৃষ্ণ,···এই কি সেই জগাদা'···বলেকি লোকটা? এ-ও কি আমাকে বিশ্বেস করতে হবে!

—মমু ঠাকুরুণ ভাল আছে ত খোকাবাবু? আঃ—কত কাল হয়ে গেল দেখি না তারে, আর এ পোড়ারমুখ দেখিয়ে দুঃখ দেবার কাজও নেই—না দেখাই ভাল। সশব্দ দীর্ঘশ্বাসে থেমে যায় সে।

অবিশ্বাস আর করতে পারিনে। আমার মায়ের বাপের বাড়ীর আদরের নাম পর্য্যন্ত যে বলে দিয়েছে সে। কৌতুহলী বিস্মিতদৃষ্টি আমার বেদনায় ভরে ওঠে। ধীরে ধীরে দু'পাশে সরে যায় মনের রুদ্ধ দুয়ারের দু'টি পাল্লা। ভেসে ওঠে বাল্য কৈশোরের কতকগুলি আনন্দঘন দিন।

আমি তখন খুবই ছোট, তৃতীয় চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। আম কাঁঠালের ছুটিতে গিয়েছি মামাবাড়ী। মামাতো ভাই চুপি চুপি বললে দুপুরে, দখিণপাড়ের আমবাগানে যাবি নে খোকা? নবদ্বীপ থেকে বোষ্টমদা' বোষ্টমদি' এসে ঘর তুলেছে যেথায়? একতারা বাজিয়ে কেমন সুন্দর গান গায়, কত গল্প বলে, আসবার সময় আবার চিনি খেতে দেয়···লাড়ু খেতে দেয়—

শুনে লোভ সামলাতে পারিনে। দাদু-দিদিমার দৃষ্টি এড়িয়ে ভর দুপুরে বাগানে গিয়ে হাজির হ'লাম।

প্রকাণ্ড মিঠুরিয়া আমগাছের নীচে নতুন ঝকঝকে সোনার বরণ একটা খড়ের ঘর। নিকানো পোঁছানো তকতকে উঠানে পিটুলী-গোলা দিয়ে আলপনা আঁকছে বোষ্টমদি', দাওয়ায় বসে গুন গুন করে গান গাইছে বোষ্টমদা'। আমাদের দেখে ডাকল মিষ্টি করে, কাছে বসিয়ে বলল কত কথা, গাইল কত গান, কাটল কত ছড়া। মুগ্ধ হয়ে গেলাম তার ব্যবহারে···তার কথাবার্তায়। সমস্ত দুপুর কেটে গেল যেন স্বপ্নের মত। ফিরে আসবার মুখে বোষ্টমদা' বউকে ডেকে সিকেতে ঝোলান মাটীর হাঁড়ি থেকে নারকেলের রসপুলি বের করে খাইয়ে দিল অনেকগুলি।

সেই থেকে জগাদা' আমার প্রিয়জনদের একজন হয়ে গেল। তারপর কত আম-কাঁঠালের ছুটিতে···কত পুজোর দিনেতে মামার বাড়ী গিয়েছি। কিন্তু মামার ঘরে সময় কেটেছে খুবই কম। জগাদা'র গান শুনে, গল্প করে আর ঘুমিয়ে কেটে যেত দিনগুলি। ছুটি শেষে যখন ফিরে আসতাম সহরে, জগাদা' সাথে করে এসে আমাকে তুলে দিত নৌকায়। বোষ্টমদি'ও পুটলী করে দিত কত রকম নাড়ু আর মোয়া!

স্মৃতির রোমন্থনে বাধা পড়ে। জগাদা' বলছে ও খোকাবাবু! রদ্দুরে যে একেবারে লাল হয়ে গেছ। যেখানে যাচ্ছিলে এখন যাও সেখানে। এখানেই আমি বসে থাকি, দয়া করে মনে হলে সন্ধ্যের পর একদিন এসো।

কিন্তু তোমার এমন অবস্থা হ'ল কি করে বোষ্টমদা' ?

আমার প্রশ্নে জগাদা'র স্ফীত চোয়াল দু'টি যেন দু'পাশে একটু ঝুলে পড়ল। একটুখানি সে থেমে রইল। রাস্তায় গলে-যাওয়া পীচের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, আকালের বছর গ্রাম ছেড়ে এসেছিলাম কলকাতায়। লঙ্গরখানার খিচুড়ী খেয়ে আর ফুটপাথে পড়ে কাটাতাম দিন। সে সময়েই রাক্ষুসে ব্যায়রামটা সর্ব্ব অঙ্গ দিয়ে দেখা দিল। শুনেছিলাম, ঠাকুর্দ্দার নাকি শেষ বয়সে হয়েছিল ব্যায়রামটা, বাবার হয়নি মোটেই, আমারও তিরিশ বছর পর্য্যন্ত হয়নি কিছু। আকালের বছর কেন যে মরে যাইনি··· কেন যে বেঁচে রইলাম···

বোষ্টমদা'র ভাঙ্গা-ভাঙ্গা অস্পষ্ট কণ্ঠে কান্না ফুটে ওঠে। এদিকে রৌদ্রের তাপে সর্ব্বাঙ্গ ঘেমে জবজবে হয়ে গেছে আমার। মাথার দু'পাশের শিরা দু'টিতে দপদপানি সুরু হয়েছে। তবু অনেকটা যেন বিহ্বলের মত দাঁড়িয়েছিলাম···শুনছিলাম তার কথা। ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করি, বোষ্টমদি' কোথায় বোষ্টমদা' ?

এ্যাঃ···কি বললে, আমার বউ রাধার কথা জিজ্ঞেস করছো ? সে আছে আমার সাথেই, ভিক্ষে করতে বেরিয়েছে। রাত্তিরে আসবে এখানে, আমাকে নিয়ে যাবে বাসায়।

বাসা !···কোথায় বাসা পেলে তুমি ?

কাঁচুমাচু মুখ করে মাটির দিকে তাকায় বোষ্টমদা'। বলে, বাসা কোথায় পাবো, এমন ব্যায়রামে কি কোথাও বাসা পাওয়া যায় ? তবু রাধা একটা ডেরা জুটিয়েছে বুদ্ধি করে, ওখানেই মাথা গুঁজে আছি। সন্ধ্যের পর একদিন এসো এখানে, রাধার সাথে দেখা হবে, তোমাকে দেখে কত না খুশি হবে সে। আজ আর রদ্দুরে থেকো না ভাই !

তার কথায় কান না দিয়ে জিজ্ঞেস করি, অত দিন যাবৎ রোগে ভুগছ, ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাওনি কেন ? কতো ভাল ভাল ওষুধপত্র বেরিয়েছে আজ-কাল, রোগ ধরা পড়বার সাথে চিকিৎসা করালে কোন ভয়ই থাকে না। লুকিয়ে না রেখে প্রথম থেকে চিকিৎসা করান উচিত ছিল তোমার।

দু'পাশে মাথা ঝাঁকায় বোষ্টমদা'। নিরাশ কণ্ঠে বলে, নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মেরেছি গো ! ব্যায়রাম হবার পরই দেশে গিয়েছিলাম। গাঁয়ের দিগ্‌বিজয় গুণীনকে মনে নেই তোমার ? —সেই যে নদীর ধারে বকুলতলায় আশ্রম করেছিল, সব সময় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে থাকত, রামদা নিয়ে রাস্তার লোকদের তাড়া করত, তার কৃপাতেই যে ভাল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু সহরে এসেই যত সব্বোনাশ হ'ল—

কণ্ঠের বিদ্রূপ সামলাতে পারি নে। প্রশ্ন ছিটকে যায়। কেন তোমার গুণীর গুণপণা কি সহুরে হাওয়ায় কাজ করে না ?

বিদ্রূপটুকু মোটেই গায়ে মাখে না জগাদা'। অস্ফুটকণ্ঠে বলতে থাকে, পোড়ার সহরে যে সে চিকিৎসাই চলে না ভাই ! কি ওষুধ দিয়েছিল জান ?—কেউটের বিষ। অমানিশি পূর্ণিমায় তোমাদের বাঁশঝাড়ের নীচে গিয়ে বসে থাকতাম। এক জোড়া কালো কেউটের বাস ছিল সেখানে। গর্ত থেকে বেরোলেই হাত এগিয়ে দিতাম। প্রথম প্রথম আমাকে দেখেই রাগে ফণা তুলে লেজের উপর দাঁড়িয়ে উঠত বিস্ময়ে। নির্ম্মেষে বিষদাঁত বসিয়ে দিত প্রসারিত হাতে। অসহ্য যন্ত্রণায় হাত যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইত। কিন্তু অব্যর্থ ছিল ওষুধ। সাপের বিষ কুষ্ঠবিষকে কাবু করে ফেলত। সব জ্বালা জুড়িয়ে যেত। পনের দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে আসতাম ঘরে। কিন্তু শেষের দিকে এমন হ'ল যে, আমাকে দেখে আর গর্ত ছেড়ে বেরোতে চাইত না নাগরাজ। গর্তের মাঝ থেকে জ্বলজ্বলে চোখে আমাকে তাকিয়ে দেখত। অবাক হয়ে গিয়েছিল। —বুঝি বা ভয় করত আমাকে। আমিও বসে থাকতাম গর্তের ধারে নাগরাজের চোখে চোখ মিলিয়ে। গরল যে আমার অমৃত, বিষ যে আমার চাই-ই।

রাত গড়িয়ে যেত। পূর্ণিমার চাঁদ ঢলে পড়ত, কিংবা অমানিশার শেষ পরোয়ানা জেগে উঠত আকাশে। নাগরাজ যন্ত্রণায় ছটফট করত বিশেষ ভাবে। তিথিরাতে বিষের থলে যে তার কানায় কানায় টইটম্বুর। বিষ তার ঢেলে আসতেই হবে, নইলে যে নিজের বিষের যন্ত্রণায় নিজেকেই আত্মাহুতি দিতে হবে। মরীয়া হয়ে নাগরাজ গর্ত ছেড়ে বেরিয়ে আসত, বিদ্যুতের মত ছুটে পালাতে চাইত আমার হাত থেকে। পাগলের মত দৌড়ে গিয়ে চেপে ধরতাম তার লেজ। ঘুরে দাঁড়াত ফণীধর। কাচের মত ঝকঝকে দুটি চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে থাকত বিস্ময়ে। ওর কালো খয়েরে ছোপ লাগান বরফের মত শীতল লকলকে জিভটা বার করে বুলিয়ে যেত আমার কপাল নাক ও চিবুকের উপর দিয়ে। তারপর এক সময় সে ফণা নামিয়ে নিত পরাজয়ে···বশ্যতায়। কিন্তু এ বশ্যতা যে আমার কাম্য নয়। প্রচণ্ড শক্তিতে মুচড়ে ধরতাম লেজ। যন্ত্রণায় নাগরাজ ঝাঁপিয়ে পড়ত আমার হাতের উপর। সমস্ত রাতের প্রতীক্ষা আমার সার্থক হয়ে উঠত সেই মুহূর্ত্তে। আনন্দে ফিরে আসতাম ঘরে।

বুঝলে খোকাবাবু, আবার সাপের ছোবল নিতে পারলেই ভাল হয়ে যাবো। যা জ্বালা সব আমার সেরে যাবেই। কিন্তু সহরে যে সে সুবিধে নেই। এ সহরে দেশে সাপের খবর পেয়ে যেখানে গিয়েছি, সেখানকার লোকজন আমার কথা শুনে ভয় পেয়ে পুলিশ ডেকে আমাকেই ধরিয়ে দেবার ভয় দেখিয়েছে। তাই না অমন করে ব্যায়রামটা জাঁকিয়ে ধরল—ক্ষোভে দুঃখে জগাদা' কেঁদে ফেলে।

শিউরে উঠছিলাম তার কথা শুনে। কেউটের ছোবল খেয়েও বেঁচে থাকে মানুষ,—বলছে কি জগাদা' ?

—বুঝলে খোকাবাবু ! ঐ যে তোমার সাপের বিষের চিকিৎসা করিয়েছিলাম না, সে জন্যই নাকি ইন্‌জেকশান ওষুধ আর ধরবে না, তার উপর ভুল করেছিলাম, দেশে গিয়ে আবার ফিরে এসে। এখন যে গাড়ীতেই উঠতে দেয় না, দেশে যাবার উপায়ই বন্ধ। যদি একবার গাঁয়ে যেতে পারতাম, যদি আবার ছোবল নিতে পারতাম, হ্যাঁ !—না খেয়ে শুকিয়ে মরে গেলেও সহরে আসার নাম নিতাম না ভুলে।

হঠাৎ আমার দিকে নজর পড়তেই চমকে ওঠে জগাদা', ঘামে নেয়ে যাচ্ছো যে দাদা ভাই, আর দাঁড়িয়ে থেকো না, সন্ধ্যের দিকে বরং এসো একদিন—

জগাদা'র ওখান থেকে চলে এলাম বটে, কিন্তু কাজে আর মন বসাতে পারিনে। সন্ধ্যের পর গিয়ে হাজির হ'লেম।

বোষ্টমদি' বসেছিল জগাদা'র পাশে। আমাকে দেখে দৃষ্টি তার আনন্দে নেচে ওঠে। হাসিমুখে বলে,—ইস্ কতো বড় হয়ে গিয়েছো বাপধন! বলতে বলতে সে এগিয়ে এসেছিল কয়েক পা। হঠাৎ যেন আঁৎকে উঠল। আনন্দ তার নিবে গেল। ম্লানমুখে কয়েক পা পিছিয়ে গেল। সস্নেহ কণ্ঠও যেন কুণ্ঠিত। অস্ফূটকণ্ঠে বললে, ব্যায়রামের কথাটা মনে ছিল না ভাই, বাড়ীর সবাই ভাল আছে নিশ্চয়।

আমি তাকিয়ে দেখছিলাম বোষ্টমদি'কে। কোথায় সেই নাকের উপর সুক্ষ্ম করে কাটা রসকলি, পানের রসে টুকটুকে ঠোঁট, সুগন্ধি তৈলে ভেজান মেঘবরণ চুলের রাশি, আর গুন্‌গুন্ করে গানের কলি। সে যায়গায় ফ্যাকাশে পাংশু ম্লান মুখ, রুক্ষ তেলহীন কয়েক গোছা চুল অযত্নে পিঠের উপর ছড়িয়ে আছে। এমন গরমের মাঝেও ঠোঁট দুটি শুষ্ক ফাটা, কুঁচকে যাওয়া রেখায়ভরা কপালে দুশ্চিন্তার বোঝা।

বোষ্টমদি' চুপ করে আছে। জগাদা' নির্বাক। আমিও যেন কথা বলতে ভুলে গেছি। শুধু মনে হয়, এদের সাথে এভাবে দেখা না হলেই বোধ হয় ছিল ভাল। সুখস্মৃতির মণিকোঠায় নাড়া দিয়ে শুধু যে উঠছে দুঃখ ও বেদনা।

এক ফাঁকে বিদেয় নিয়ে চলে এসে বাঁচলাম যেন নিজেরই কাছে।

দিন এগিয়ে চলে। কাজকর্ম্মে ডুব দিয়েছি। কিন্তু অবসরে নিরালায় মনে পড়ে জগাদা'র কথা। ওদের জীবনের এমনধারা পরিবর্ত্তন যে কিছুতেই ভুলতে পাচ্ছিনে। বরং, এ ভাবে পালিয়ে আসায় মনের মাঝেও স্বোয়াস্তি পাইনে। কিছুই কি বলার ছিল না সেদিন, কিছুই কি করার নেই আমার তরফ থেকে?

অবশেষে একদিন সন্ধ্যের পর গিয়ে দাঁড়ালাম তাদের ওখানে। আজ কিন্তু বোষ্টমদি' চুপ করে রইল না সে দিনের মত। হাসিমুখে বললে, তুমি আবার না এসে পারবে না, এ আমার মনের মাঝে বার বার করে বলছিল। কি গো বলিনি,—খোকা আমার না এসে পারবে না!

স্বাস্থ্যের মতই নষ্ট হয়ে গেছে বোষ্টমদি'র কণ্ঠ-মাধুর্য্য। তবু তার কথাগুলি হৃদয় ছুঁয়ে যায়। জিজ্ঞেস করি, তোমাদের জন্য কতটুকু কি করতে পারি বোষ্টমদি'? বোষ্টমদা'র জন্য হাসপাতালে চেষ্টা করব কি? আমার এক বন্ধু রয়েছে কুষ্ঠ হাসপাতালের ডাক্তার।

: সে ভাই হাসপাতালে চেষ্টা করার হয়ে করো, তার থেকে একটা কাজ করে দেবে?

: আমার সাধ্যের মধ্যে হলে করব বৈ কি।

: তুমি পারবে ভাই, তোমাকে ওরা দেবে। মেয়েছেলে বলে আমার কথা ওরা কানেই নেয় না। যাচ্ছেতাই দাম চেয়ে হটিয়ে দেয়। ঐ ক্যাম্বেল হাসপাতালের ওখানে যে বেদেরা এসেছে, কষ্ট করে ওদের কাছ থেকে দুটো সাপ এনে দেবে? তাজা তাজা সব সাপ ধরে এনেছে ওরা। বিষদাঁত না ভাঙ্গা জোয়ান দেখে দু'টি মাত্র সাপের বদলি তোমার দাদা বেঁচে যাবে—এ কি তুমি চাও না?

বোষ্টমদি'র কাতর কণ্ঠ বড় করুণ শোনায়। অনিমেষ নয়নে সে তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে কত ভরসায়। কিন্তু বিষধর দু'টি এনে দেবার মত সাহস পাইনে মনে।

আমাকে নিরুত্তরে চুপ করে থাকতে দেখে বোষ্টমদি'র চোখ দু'টি ছলছলিয়ে ওঠে। রুদ্ধ কণ্ঠে বলে, তোমার দাদার কষ্ট আর চোখে দেখা যায় না ভাই! এক এক সময় ওর যন্ত্রণা দেখে মনে হয় বিষ কিনে এনে দু'জনে খেয়ে মরে পড়ে থাকি, সকল জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যাক। কিন্তু পারিনে অতটা শক্ত হতে। বোষ্টমের মেয়ে, ছোট-বেলা থেকে শুনে এসেছি আত্মহত্যা মহাপাপ। পিছিয়ে যাই, পলে পলে মরণযন্ত্রণা অনুভব করি। তাই তোমাকে বলছি, জোড়া সাপের ছোবল নেওয়াতে পারলে ঘা কমে যাবেই, সেই সাথে দেশে যাওয়াও সম্ভব হয়ে উঠবে, বেঁচে যাবে মানুষটা।

জগাদা' নির্ব্বাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল নিজের ঘায়ের পানে। রুদ্ধ কণ্ঠে বোষ্টমদি' থেমে যেতে ব্যথাতুর দৃষ্টি তুলে জগাদা' আমার দিকে তাকাল, মুহূর্ত্তকাল পরেই দৃষ্টি নাবিয়ে নিল মাটির 'পর।

আমার দ্বন্দ্ব ভাবনা, অনিচ্ছা ভয় তলিয়ে যায়। স্বীকার করে নিলাম অনুরোধ।

বোষ্টমদি'র মুখে ফুটে উঠেছে হাসি। চোখের জল আঁচলের কোণা দিয়ে মুছে নিয়ে বলে, সন্ধ্যের পর আমরা বসে থাকব তোমারই প্রতীক্ষায়।

আশ্বাস দিয়ে এলাম ক্যাম্বেলের সুমুখে। বেদেদের সর্দ্দারকে অনেক বলে কয়ে অনেক করে বুঝিয়ে পুলিশের ভয় ভাঙিয়ে রাজী করালাম। টাকা নেবার আগে সাপ দুটো ঝাঁপি খুলে দেখিয়ে দিল সর্দ্দার। ঝাঁপি খোলার সাথেই বিদ্যুতের মত ফণা তুলে লেজের উপর দাঁড়িয়ে উঠল ওরা। কালচে ঠোঁট দুটি যেন হিংস্রতায় ফেটে পড়তে চাইছে। দংশনের অধীরতায় মুখের উপরকার ফাঁসের বন্ধনী মাংসপেশীর মত ফুলে উঠেছে। অদ্ভুত ক্ষিপ্রহাতে সাপ দু'টিকে ধরে ঝাঁপি বন্ধ করে দিল সর্দ্দার।

সাপের ঝাঁপি পেয়ে আনন্দ আর ধরে না বোষ্টমদি'র। ঝাঁপিটা সে পরম স্নেহে বুকের মাঝে টেনে নিলে। আনন্দে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললে।

সাপের ঝাঁপি নিয়ে অমন করো না রাধা, নাবিয়ে রাখো। —সাবধান করে বোষ্টমদা'।

: এ কি নাবিয়ে রাখার জিনিস? এ যে আমাদের অমৃতভাণ্ড

গো! স্বামীর দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভর্ৎসনায় বোষ্টমদি' একটুখানি গর্জ্জে ওঠে।

তাদের স্বামি-স্ত্রীর আনন্দোজ্জ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে বিদায় চাইলাম।

: চলে যাবে ভাই, কিন্তু যে উপকার তুমি করে গেলে, সে ঋণ যে জীবনে শুধতে পারব না। সাপের ছোবল নেবার পক্ষকালের মধ্যেই আমাদের সহর ছাড়তে হবে। অমাবস্যার এখনও দু'-একদিন দেরি আছে, এর মাঝে একদিন এসো, কেমন ?

বাড়ী এসে রাত্তিরে ভাল ঘুম হ'ল না। কেউটেদের সে বীভৎস হিংস্র চোখের চাহনি বার বার করে আমার ঘুম ভেঙ্গে দিল। শিউরে উঠলাম, ঘামে ভিজে গেল সর্ব্বাঙ্গ।

দিনের আলোর সাথেই ভীতিটা কমে গেল। কাজকর্ম্মের চাপে সেদিন আর যাওয়া হ'ল না জগাদা'র ওখানে। পরদিন সন্ধ্যের সময়ে গিয়ে হাজির হলাম। ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটলী পড়ে আছে লাইটপোষ্টের নীচে, কিন্তু জগাদা' নেই। পাশের পানের দোকানে খোঁজ নিলাম। ওরা বললে, দু'দিন যাবৎ নাকি জগাদা' বসছে না এখানে। পরের দিন অমাবস্যা। আজ বিষধরদের বিষ নিজের দেহে টেনে নেবে জগাদা'। নিরাশ জীবনে ফুটে উঠবে আশা। দেশের বাড়ীতে ফিরে যেতে পারবে, হয়ত গুণীনের ওষুধে ভাল হয়ে উঠবে, আবার গান গাইবে, সংসার সাজাবে···

অমানিশি পেরিয়ে গেল, পেরিয়ে গেল আরও কয়েকটি দিন। কিন্তু তারা আর ফিরে আসেনি ফুটপাথে। আশ্বস্ত হ'লাম, যাক্ ফিরে গেছে দেশে।

নিশ্চিন্ত মনে কাজকর্ম্মে ডুব দিয়েছি। তবু ট্রামে-বাসে যাবার সময় তাকিয়ে দেখি লাইট-পোষ্টের নীচটা। নোংরা ন্যাকড়ার পুঁটলী আর নেই, শূন্য খাঁ-খাঁ করছে সে-স্থান।

হপ্তা পেরিয়ে যায়। শনিবার অফিস ছুটির পর ট্রামের হাতল ধরে বাদুড়-ঝোলা হয়ে বাড়ী ফিরছি। হঠাৎ লাইট-পোষ্টের নীচে জগাদা'কে শুয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠলাম, হাতল ছেড়ে দিয়ে নেমে গেলাম।

হাত-পায়ের ঘা আগের মতই দগদগ করছে। উপরন্তু মাথার কাঁচা-পাকা চুলগুলি এ ক'দিনে সব সাদা হয়ে গেছে। তবে কি বিষদাঁত ভাঙ্গা ছিল সাপেদের ? ঠকিয়ে দিয়েছে কি বেদেদের সর্দ্দার ? সশঙ্ক মন দুলে ওঠে।

চোখ বুজে পড়ে আছে জগাদা'। ঘুমিয়ে রয়েছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। মৃদুকণ্ঠে ডাকলাম।

চোখ মেলে ঘোলাটে শূন্যদৃষ্টিতে জগাদা' তাকায়।

ইতস্ততঃ করে জিজ্ঞেস করি, অনেক দিন বাদে কি না, তাই বোধ হয় সাপের বিষে তেমন কোন কাজ দেয়নি এবার,—না জগাদা' ?

আমার কথার মাঝে অদ্ভুত করে টেনে টেনে হাসতে সুরু করে জগাদা'। হাসি আর তার থামতে চায় না। হাসছে ত শুধু হাসছেই।

জগাদা'র এমনধারা হাসির সাথে পরিচয় নেই আমার। বড় বিশ্রী লাগে। বলি, সন্ধ্যের পর আসব'খন, কেমন ? বোষ্টমদি'কে থাকতে বলো।

প্রচণ্ড হাসিতে ফেটে পড়ে জগাদা'। হাসির মাঝে মাঝে বলতে থাকে, সন্ধ্যের পর আসবে বৈ কি, নিশ্চয় আসবে। রাধা থাকবে বৈ কি, নিশ্চয় থাকবে। রাধা তোমায় খুব ভালবাসত, কিন্তু কিছু বলে যেতে সে পারেনি, মুহূর্ত্তের মাঝে স্থির হয়ে গেল কিনা চোখের দৃষ্টি, নীল হয়ে গেল দেহ, বুঝলে না কালো কেউটের বিষ! তায় অমাবস্যায়···ধ্যেৎ অমন করে তাকিয়ে রয়েছ কেন ? কথা বলো, যা হয় একটা কিছু বলো—বলতে বলতে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে জগাদা'। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

জগাদা'র অসংলগ্ন কথাগুলির অর্থ করতে গিয়ে শিউরে উঠছিলাম, আঁৎকে উঠছিলাম তার ভাবভঙ্গিতে।

আমাকে অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে পাশের পানওয়ালা ডাকলে দোকান থেকে। সহানুভূতি কণ্ঠে বললে, ক'দিন যাবৎই দেখছি আপনাকে, নিশ্চয় চেনাজানা কেউ হবে। আহা, বহুৎ ভালমানুষ ছিল বউ, অমন ঘা মানুষটার, তবু ছেড়ে পালায়নি। হঠাৎ কি হ'ল মাথায়, কোত্থেকে সাপ নিয়ে এল ঘরে, পুষবে না কি খেলা দেখাবে বলে। তিন রাতও কাটল না, সাপের খাবার দিতে গিয়ে 'জান্' দিল বেটি। শোকে জগাও একদম পাগল হয়ে গেছে। ভিক্ষা চায় না, এসে শুধু শুয়ে থাকে, কি বলে কিছুই বোঝা যায় না।

বরফের মত একটা হিমশীতল রক্তস্রোত যেন আমার সমস্ত দেহ কাঁপিয়ে দিয়ে গেল। জগাদা'র অসংলগ্ন কথাগুলির মানে এখন আর অস্পষ্ট নয়। তবু বিশ্বাস হতে চায় না। পানওয়ালাকে জিজ্ঞেস করি, তুমি যা বলছ তা কি সত্যি ?

ওরা ত আমার অচেনা নয় বাবু! মৌলালীর কর্পোরেশন অফিসের সামনে মোটা মোটা লোহার পাইপগুলি নিশ্চয় দেখেছেন, সে পাইপের মাঝেই যে ছিল ওদের ঘর। রোদ-বাদলার হাত থেকে বাঁচার জন্য ভাঙা হোগলা, দড়মা চাটাই দিয়ে ঢেকে নিয়েছিল পাইপের মুখ। আমার বাড়ী এণ্টালী। আসা-যাবার মুখে ওদের দেখতুম, খোঁজ-খবরও নিতুম মাঝে-সাঝে। সেদিন আসবার মুখে ওদের পাইপ-ঘরে লোকজনের ভিড় দেখে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখলুম মুখ দিয়ে ফেনা বেরোচ্ছে রাধার, অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে সে। জোড়া-সাপ নাকি ছুবলিয়েছে হাতে। শক্ত করে হাত বাঁধা, পাশে পড়ে আছে শূন্য সাপের ঝাঁপি, বিষ ঢেলে পালিয়ে গেছে সাপ! জগা রাধার বিষাক্ত হাতে মুখ লাগিয়ে রক্ত চুষে নিচ্ছে। সে এক বীভৎস দৃশ্য!—বলতে বলতে শিউরে ওঠে পানওয়ালা। ক্ষণকাল থেমে আবার বলতে থাকে, জানেন বাবু, ও ভাবে জগাকে রক্ত চুষতে দিলে, শেষ পর্য্যন্ত কে যে বাঁচত, কে মারা যেত বলা যায় না। কিন্তু পুলিশ এসে বাধা দিল। জোর করে জগাকে সরিয়ে দিল। রাধার দেহ তুলে নিয়ে গেল হাসপাতালে।

থেমে যায় দোকানী। এক দঙ্গল খদ্দের এসেছে দোকানে, পানওয়ালা ব্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের নিয়ে।

ভীত দৃষ্টিতে জগাদা'র দিকে তাকালাম। ফুটপাথের উপর কুঁকড়ে শুয়ে আছে জগাদা'।

নিঃশব্দে ভীতু খরগোশের মত পালিয়ে এলাম। ট্রাম-ষ্টপে দাঁড়িয়ে রুমাল বের করে কপালের জমে-ওঠা ঘামের বিন্দুর রাশি মুছতে গিয়ে টের পেলাম, সমস্ত শরীরই যে ঘামে ভিজে জবজব করছে। কতটুকু মুছব এ রুমালে ?



নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

সতেরো

এর পরে আরও পাঁচ বৎসর কেটে গেল। এই পাঁচ বৎসরের ইতিহাস অত্যন্ত দুঃখের ইতিহাস। সে ইতিহাস কমলেশের আর্থিক জীর্ণতার ইতিহাস।

শুধু গ্রামের জমিদারীটুকু রেখে আর সমস্তই রামপ্রসাদ এত গোপনে এবং এমন কৌশলের সঙ্গে বিক্রি করেছিলেন যে, সমরেশকেও তাঁর বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হতে হয়েছিল। তা থেকে সমস্ত দেনা পরিশোধ করে তিনি কমলেশকে শুধু ঋণমুক্তই নয়, আর্থিক দিক দিয়ে খানিকটা স্বচ্ছলতার মধ্যেই উন্নীত করেছিলেন। কিন্তু তাতে করেও তিনি তাকে সমরেশের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন নি।

এই পরিবারে এমন কোনো ঋণ ছিল না, যা রামপ্রসাদের অজ্ঞাত। সেই সমস্ত ঋণই তিনি একটি একটি করে নির্মূল করেছিলেন। এবং নিজের জ্ঞান বুদ্ধি ও হিসাব অনুযায়ী যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে, কোথাও আর এক পয়সাও তাঁর ঋণ নেই, তখন নতুন নতুন ঋণ আবিষ্কৃত হতে লাগল আদালতের পেয়াদার সামনে।

জমিদারী সেরেস্তার কাজেই রামপ্রসাদ চুল পাকিয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝতে বিলম্ব হল না যে, এই সমস্ত মিথ্যা ঋণের পিছনে আছেন স্বয়ং সমরেশ গোবিন্দ। উদ্ধত প্রজা সায়েস্তা করবার জন্যে রামপ্রসাদ নিজেও এই শ্রেণীর অনেক মামলা করেছেন। তিনি মামলায় যথাবিহিত তদ্বির করতে লাগলেন।

কিন্তু তদ্বিরে মামলা জেতা যায়, কিন্তু অর্থব্যয় নিবারণ করা যায় না। মামলায় জিততে গেলে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ অপব্যয় করা অনেক সময়ই অনিবার্য হয়ে ওঠে। মামলার ক্ষেত্রে এইটেই মহাজন-পন্থা। রামপ্রসাদকেও বাধ্য হয়ে সেই পন্থাই অনুসরণ করতে হল।

তাতে করে তিনি মামলা জিততে লাগলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে জমিদারী বিক্রয়লব্ধ সঞ্চিত অর্থের থলিটিও ক্রমেই শীর্ণ হতে লাগল। রামপ্রসাদ এর পরিণতির কথা ভেবে মনে মনে শঙ্কিত হলেন।

মামলা একটা নয়। মিথ্যাই হোক আর যাই হোক, তাদের সংখ্যাও অনির্দিষ্ট। বিভিন্ন কোর্টে বিভিন্ন মামলা ঝুলছে। কোনোটা জজের কোর্টে, কোনটা কাছের। কোনোটা মুন্সেফকোর্টে, কোনোটা জজ কোর্টে, কোনোটা বা হাইকোর্টে। একটা কোর্টেই এর জের মেটে না। একটা জায়গার হারই চূড়ান্ত হার নয়। নিচের আদালতে হার হলে উপরের আদালত আছে। সেখান থেকে তার উপরের আদালত। অনেক সময় পুনর্বিচারের জন্যে উপর থেকে নিচের আদালতেও ফিরে আসে। সুতরাং কমলেশের ভবিষ্যৎ ভেবে রামপ্রসাদ যে উদ্বেগ বোধ করবেন, তাতে আর বিচিত্র কি? তাঁর আশঙ্কা হল, এই ভাবে আরও দীর্ঘকাল মিথ্যা-মামলার খরচ যোগাতে হলে গ্রামের জমিদারীটুকুও রাখা সম্ভব হবে কি না।

হরসুন্দরী থাকতে রামপ্রসাদের মাথার উপর একজন পরামর্শ করবার লোক ছিল। জমিদারীর কাজ হরসুন্দরী চমৎকার বুঝতেন। এবং আইন না বুঝলেও সাধারণ বুদ্ধি তাঁর এমনই তীক্ষ্ণ ছিল যে, অনেক সময় তাঁর পরামর্শে রামপ্রসাদ আশ্চর্য ফল পেতেন।

তিনি নেই। তাঁর জায়গায় অরুন্ধতী বর্তমানে এ বাড়ির গৃহিণী। টাকাকড়ি তার কাছে থাকে। সংসার সেই দেখে। যদিচ আগের চেয়ে অনেক ছোট সংসার। বাইরের সেরেস্তায় আমলা কর্মচারীর ভিড় অনেক কমেছে। অন্দরে আত্মীয়-স্বজনেরও।

স্বামী বিয়োগের পর হেমের মা আত্মীয়তাসূত্রে এই পরিবারে একদিন আশ্রয় নেয় একমাত্র পুত্রটিকে কোলে করে। ছেলেটি এবাড়িতে থেকেই লেখাপড়া শেখে। এখন বাইরে কোথায় চাকরী করে। পূর্বঋণ স্মরণ করে হেমের মা এখানেই ছিল। এদের অবস্থার অবনতি দেখে নিজে থেকেই একদিন ছেলের কাছে চলে গেল। চিঠিপত্র দিয়ে মাঝে মাঝে খবরাখবর নেয় অবশ্য।

শৈলেশ গোবিন্দের বিবাহ উপলক্ষে বরদাসুন্দরী সেই যে এসেছিলেন, আর যান নি। তাঁর সপত্নীপুত্রের বিবাহ উপলক্ষে একখানা নিমন্ত্রণ পত্র আসতে তিনিও চলে গেছেন। জীবনের অবশিষ্ট কাল সম্ভবত সেখানেই কাটাবেন। দীর্ঘকাল এই সংসারের সেবা করে বেশ কিঞ্চিৎ অর্থও তিনি সঞ্চয় করেছেন। বোধ করি সেই সাহসেই নিজের বিধবা কন্যা এবং তাঁর পুত্র-কন্যা দুটিকেও সঙ্গে নিয়ে গেছেন।

এমনি করে হারুর মা, বীরুর মা এবং যোগেশের মাও একে একে নিজের নিজের জীর্ণ আশ্রয়েই ফিরে গেছে। রয়েছে শুধু কুমুদ-কামিনী। একমাত্র গঙ্গাকূল ছাড়া আর কোনো কূলেই তাকে আশ্রয় দেবার কেউ নেই।

এরা চলে যাবার পরে এবং বাইরের সেরেস্তাও খালি হয়ে যাওয়ায় সংসারের কাজ বহু পরিমাণে হালকা হয়ে গেল। সুতরাং অতগুলি দাস-দাসীরও প্রয়োজন রইল না। অবশ্য সকলেই যে প্রয়োজনের খাতিরেই ছিল, তা নয়। জমিদারী ব্যয়বাহুল্যের অঙ্গ হিসাবেও অনেকে ছিল। তাদের ছোট সংসারের একটি ঝি এবং একটি চাকর ছাড়া আর সবগুলিকেই অরুন্ধতী একে একে জবাব দিলে।

অবশ্য অরুন্ধতী জবাব দিলেও তারা জবাব দেয়নি। বড়লোকের বাড়ি বেশি দিন চাকরী করার ফলে তাদের পরকাল ঝরঝরে হয়ে গেছে। গৃহস্থ-বাড়িতে খেটে খাবার শক্তি হারিয়েছে। এদের অনেকেই বেকার এবং মাঝে মাঝে এসে অরুন্ধতীর কাছে হাত পাতে, টাকাটা-সিকিটা নিয়ে যায়।

এই অরুন্ধতীর সংসার: কমলেশ, বধূ সুস্মিতা এবং শিশুপুত্র অনিমেষ। অর্থাৎ আলমগীরের পরে বাহাদুর শা যেমন বাদশা,

হরসুন্দরীর পরে অরুন্ধতীও তেমনি কর্ত্রী। জমিদারী নেই, অথচ জমিদার-গৃহিণী।

কিন্তু এই স্বল্প পরিসরের মধ্যেও তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় মাঝে মাঝে রামপ্রসাদ পেয়ে থাকেন। কিছুটা সেই কারণে, কিছুটা পুরাতন অভ্যাস বশে এক একদিন রামপ্রসাদ তার কাছে এসে বসেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থার কথা জানান। বাইরের ছোট-বড় খবর দেন, যার সঙ্গে এই পরিবারের সুখ-দুঃখ জড়িত।

অরুন্ধতী শান্ত অথচ নির্লিপ্ত ভাবে শোনে। কদাচিৎ সামান্য ব্যাপার হলে ছোট্ট একটু মন্তব্য করে। বড় ব্যাপার হলে চুপ করে বসে থাকে। জিজ্ঞাসিত না হলে মন্তব্য করে না। রামপ্রসাদ বোঝেন, অরুন্ধতীর নির্লিপ্ততা নিতান্তই বাহ্য। এই পরিবারে রামপ্রসাদের মর্যাদা এবং নিজের বয়স স্মরণ করেই সে নির্লিপ্ততার ভাণ করে। যেন এ বিষয়ে তার করবার কিছু নেই। রামপ্রসাদ এই পরিবারের হিতৈষী এবং অভিভাবক। তিনি যা করবেন, তাই হবে। তিনি যে অরুন্ধতীর কাছে বৈষয়িক কথার অবতারণা করেন, সেটা তাঁর অনুগ্রহ। তার আবশ্যক ছিল না।

একথা মিথ্যা নয়। কিন্তু রামপ্রসাদ জানেন, সমস্ত সত্যও নয়। অরুন্ধতী সমস্ত কথা মন দিয়েই শোনে। রামপ্রসাদ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, দূর থেকে সেদিকেও লক্ষ্য রাখে। রামপ্রসাদ যথেষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর সিদ্ধান্তের উপর কথা বলার বড় একটা আবশ্যক হয় না। কিন্তু হঠাৎ একদিন হয়তো একটা প্রস্তাব সে করে বসে, রামপ্রসাদ অবাক হয়ে যান। বিষয়টিকে ওই দিক দিয়ে তিনি ভেবে দেখেন নি।

এমনি একটা প্রস্তাব একদিন অরুন্ধতী করে বসল।

মাধবদীঘির দত্তদের হ্যাণ্ডনোটের মামলায় জজ কোর্টে জিত হয়েছে, এই খবরটা নিয়ে রামপ্রসাদ হাসতে হাসতে সন্ধ্যাবেলায় অরুন্ধতীর কাছে এলেন।

অরুন্ধতী মামলা বোঝে না। কিন্তু গত কয়েক বৎসর থেকে অনেকগুলো মামলার আঁকাবাঁকা পথে ঘোরাফেরা লক্ষ্য করে সে সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণা তার জন্মেছে।

জিজ্ঞাসা করলে, এই মামলাটা নিচের আদালতেও আমরা জিতেছিলাম না?

রামপ্রসাদ বললেন, হ্যাঁ মা!

—তার বিরুদ্ধে ওঁরা আপীল করেছিলেন?

—হ্যাঁ মা!

—এর বিরুদ্ধেও তো হাইকোর্টে আপীল হতে পারে?

—পারে বই কি।

—তাহলে একে জিত বলি কি করে? বরং এই সব মামলায় যে টাকাগুলো খরচ হচ্ছে সেইটেই লোকসান।

হাসতে হাসতে রামপ্রসাদ বললেন, মামলায় জিত হলে তাকে জিতই বলে মা! তবে লোকসানের কথা যা বললে, তা-ও সত্যি।

হাসতে হাসতে অরুন্ধতীও বললে, সেইটেই আসল সত্যি কাকাবাবু। হাইকোর্টে মামলায় যদি আমরা হেরে যাই, তাহলে এই জিত মিথ্যে হয়ে যাবে। কিন্তু হাইকোর্টে জিতলেও লোকসানের সত্যি তবু মিথ্যে হবে না।

রামপ্রসাদকে স্বীকার করতে হল: তা যা বলেছ মা!

—আমি এই কথাটা কিছু দিন থেকেই ভাবছি কাকাবাবু! ভেবে ভেবে একটা বুদ্ধি আমার মাথায় এসেছে।

অরুন্ধতী হাসতে লাগল।

—কি বুদ্ধি? রামপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন।

—কিন্তু সে আপনার অনুমতি ছাড়া তো হতে পারবে না?

—অনুমতি তো পরের কথা বৌমা! বুদ্ধিটা কি আগে শুনি।

—আমি ভাবছি, আমি ও-বাড়ি যাব।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও রামপ্রসাদ এতখানি স্তম্ভিত হতেন না। সবিস্ময়ে বলে উঠলেন: সেখানে যাবে কি বৌমা!

—তাই যাব। তা ছাড়া উপায় নেই। অরুন্ধতীর কণ্ঠে আশ্চর্য দৃঢ়তা।

—কিন্তু সেখানে গেলে কি—

—গেলে কি করবেন তিনি? খুন? করুন। যে বিষের আমাকে নিয়েই এত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, তা আমাকে দিয়েই শেষ হোক। কমলেশ বাঁচুক। আপনি অনুমতি দিন।

অনুমতি দেবেন কি, রামপ্রসাদের চোখে পলক পড়ছে না।

সমরেশ গোবিন্দ কি ধরণের লোক, এ অঞ্চলের একটা শিশুও তা জানে। সব চেয়ে বেশি জানে অরুন্ধতী নিজে। একদিন তাকে তিনি স্পষ্ট খুন করে ফেলবেন বলে শাসিয়েছিলেন। এ-বাড়ি চলে আসার সে-ও একটা মস্ত বড় কারণ। সেইখানে, নিতান্ত মাথা খারাপ না হলে, কেউ যে স্বেচ্ছায় ফিরে যেতে চাইতে পারে, এটা বিশ্বাস করবার মতো কথাই নয়।

তারপরে সেখানে ফিরে যাবেই বা কি দুঃখে?

এ বাড়িতে তার স্থান সকলের উপরে। যেখানে হরসুন্দরীর স্থান ছিল, ঠিক সেখানে হয়তো নয়। সেখানে কেউই উঠতে পারে না। কিন্তু ঠিক তাঁর নিচেই। এবং সে অধিকারটা মেকি নয়। অন্দরে তার কথাই শেষ কথা। বাইরে রামপ্রসাদের কর্তৃত্বে কখনও সে হস্তক্ষেপ করে না বটে, কিন্তু রামপ্রসাদ অরুন্ধতীকে সমীহ করেন। ছেলেমানুষ বলে উপেক্ষা করেন না। দুরূহ ব্যাপারে তার সঙ্গে পরামর্শও করেন। অরুন্ধতী প্রায় সকল ক্ষেত্রেই নিঃশব্দে তাঁর কথা শুনে যায়। তাঁর কথার উপর কথা বলে না। কিন্তু রামপ্রসাদ জানেন এবং অরুন্ধতীও যথেষ্ট সচেতন যে, কথা বলার তার অধিকার আছে।

এ-বাড়ির সে সত্যিকারের কর্ত্রী। টাকার পরিমাণ কমতে পারে, কিন্তু সেই অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণ অর্থও যে লোহার সিন্দুকে থাকে, তার চাবি অরুন্ধতীর কাছেই। আগে যেমন তা হরসুন্দরীর কাছে থাকত। লোক-লৌকিকতা, সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সমস্ত তারই নির্দেশে হয়। আসল কথা, সে যে সমরেশ গোবিন্দের স্ত্রী, এই কথাটাই গত কয়েক বৎসরে শুধু বাড়ির লোকেরাই নয়, বাইরের লোকেরাও ভুলে গেছে।

এমন কি রামপ্রসাদ, যাঁর ধারণা ছিল অরুন্ধতী ও-বাড়ি ফিরে গেলে এ-বাড়ির উপর সমরেশ গোবিন্দের আক্রোশ কমতে পারে, তিনি পর্যন্ত ভুলে গেছেন।

অরুন্ধতীর প্রস্তাবে তিনি পর্যন্ত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

অরুন্ধতী বললে, আপনি তো জানেন কাকাবাবু, কমলেশের ওপর ওঁর আক্রোশের কারণ আমি।

মাথা দিয়ে রামপ্রসাদ বললেন, আমিও একদিন তাই ভাবতাম মা। কিন্তু এখন মনে হয় সেটাই আক্রোশের মূল কারণ নয়।

এবার অবাক হল অরুন্ধতী।

জিজ্ঞাসা করলে, নয়? তাহলে মূল কারণটা কি বলে আপনি অনুমান করেন?

—ওঁর প্রকৃতি।

দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে রইলেন। দু'জনেরই মন পিছন দিকে চলতে সুরু করল সেই ক্রুর অথচ রহস্যময় প্রকৃতির উৎস-সন্ধানে।

অরুন্ধতীর চোখের সামনে ভেসে উঠল সমরেশ গোবিন্দের সেদিনের সেই কঠিন নিষ্ঠুর মুখ, ললাটের সেই কুটিল ভ্রূকুটিরেখা, চোখের সেই অনন্ত হিংস্র দৃষ্টি। সে যে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিল, তা মৃত্যুর ভয়ে নয়, ওই দৃষ্টির আঘাতে। ওই দৃষ্টি সে সইতে পারেনি। তার বুকের সমুদ্র সেই মন্থনের আঘাতে তোলপাড় হয়ে উঠেছিল। তার ফলে বিষ উঠেছে, কি অমৃত উঠেছে তা সে এখনও জানে না। হয়তো কিছু বিষ, কিছু অমৃত। বুঝি বিষই বেশি, অমৃত বিন্দুমাত্র। সেই অমৃত তাকে নীড় রচনার অবাধ অধিকার দিয়েছে। দিয়েছে কমলেশকে সুমিতাকে এবং সকলের চেয়ে বেশি অনিমেষকে। অনিমেষ যেন তার গলার হার, তার চোখের তারা।

আর বিষ? সে যেন নালী ঘায়ের মতো তার হৃদয়ের মাংস গলিয়ে পচিয়ে খইয়ে আনছে। তার জ্বালায় সর্বদেহ জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

আর রামপ্রসাদের চোখের সামনে ভেসে উঠল বহু পুরাতন একটা ছবি, যা তিনি নিজের চোখে দেখেননি, শুনেছেন মাত্র। সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি বালক একটি শিশুকে নিয়ে চলেছে ইন্দারার মধ্যে ফেলে দেবার জন্তে।

এই ওঁর প্রকৃতি!

রামপ্রসাদ বললেন, ওঁর কথা প্রায়ই আমি ভাবি। এ বংশে ওঁর মতো কেউ ছিলেন না। অথচ উনি এমন হলেন কেন? প্রায়ই ভাবি। আমার কি মনে হয় জান?

—কি?

—কিছুটা ওঁর প্রকৃতি, কিছুটা স্বোপার্জিত।

—তার মানে?

—যে ভগবান সাপের দাঁতে, বিছের লেজে বিষ দিয়েছেন, ওঁর বুকেও তিনিই আক্রোশ দিয়েছেন। এটা ওঁর প্রকৃতি। আর আক্রোশে উনি নিজে যে শাণ দিয়েছেন, সেইটে ওঁর স্বোপার্জিত।

—শাণ দিয়েছেন কি করে?

—অস্বাভাবিক জীবন যাপন করে। বৌমা, বাপ-মা বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন থেকে দূরে একটি বালক ধীরে ধীরে যৌবনের প্রান্তে এসে পৌঁছুলেন। না পেলেন ভালোবাসা, না কাউকে ভালোবাসতে শিখলেন। মানুষের মধ্যে যে সমস্ত কোমলবৃত্তি আছে, তার একটিও ফুটতে পেল না। তারপরে তুমি এলে। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। তোমাকে উনি গ্রহণ করতে পারলেন না।

গভীর আগ্রহ নিয়ে অরুন্ধতী ওঁর কথা শুনছিল। সমরেশের কথা সে-ও ভেবেছে। কিন্তু এই দিক দিয়ে ভাববার চেষ্টা করেনি কখনও।

জিজ্ঞাসা করলে, দেরি আপনি কা'কে বলছেন?

রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন, ওঁর যে বয়সে তুমি এলে হয়তো ওঁর জীবন স্বাভাবিক ধারায় বইতে পারত, সে বয়সে তো তুমি আসনি? তুমি যখন এলে তখন সে ঋতুর ফুল ফোটা শেষ হয়ে গেছে। অসময়ে সে ফুল আর ফুটল না।

রামপ্রসাদ চুপ করলেন।

একটু পরে বললেন, তোমরা সবাই তাঁর ওপর রেগে রয়েছ। অনেকে তাঁকে ঘৃণাই করে। আমিও যে তাঁর ওপর খুব প্রসন্ন তা নয়। কিন্তু রাগের চেয়ে তাঁর জন্তে আমার দুঃখই বেশি হয়।

—দুঃখ হয় কেন? অরুন্ধতী সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—দুঃখ নয়? রামপ্রসাদ ম্লান হাস্যে বললেন,—কত বড় করুণার পাত্র বল তো? সংসারে এসে শুধু ঢিলই কুড়িয়ে গেলেন। মরুভূমিতে বসে তৃষ্ণায় যখন ওঁর ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তখন একটা বালির পাহাড় তৈরিতে মেতে রইলেন।

একটু চুপ করে থেকে অরুন্ধতী প্রশ্ন করলে, তাহলে কালাপাহাড়ের ওপরও কি আপনার করুণা হয়?

—হয় মা! আগে হত না, এখন হয়। এখন পরকালের ডাক এসেছে। তাই বোধ হয় পিছন দিকে যখন চাই, তখন অনেক কিছুরই জন্তে রাগের চেয়ে করুণাই হয় বেশি।

অরুন্ধতীর চোখ দিয়ে দপ করে যেন এক ঝলক আগুন বেরুল। বললে, আমার হয় না। আমি শুধু অবাক হয়ে যাই, মানুষের শরীরে এত বিষও থাকে!

রামপ্রসাদ হো-হো করে হেসে ফেললেন। মামলা জিতে মনটা তার বেশ প্রসন্ন হয়েছে সম্ভবত। বললেন, যা বলেছ মা! যেন অনন্ত সাপের বিষ। যেখানে ওঁর নিশ্বাস পড়ছে, তাই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। তাই তো বলছি বৌমা, সেখানে তোমাকে কিছুতেই পাঠাতে পারি না। তার চেয়ে যা হবার হোক। কমলেশ তো কিছুতেই রাজি হবে না।

—তা জানি। কিন্তু এমন করে নিশ্চিন্ত বসে থাকাও তো যায় না? একটা মোকাবিলা হওয়া দরকার।

—মোকাবিলা আবার কিসের মা?

মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে অরুন্ধতী উত্তর দিলে, আমার অনেক মোকাবিলা আছে কাকাবাবু! সব আপনাকে বলা যায় না। আপনি বাধা দেবেন না কাকাবাবু! আমি যাবই।

ওর চোখের দিকে চেয়ে রামপ্রসাদ বুঝলেন, ওকে নিরস্ত করা যাবে না। একটা কিছু ও ভেবেছে। সেটা বলতে চায় না।

বললেন, বেশ। কমলেশ তো শনিবারে আসছে। নিতান্তই যেতে চাও, তারপরে যেও।

ব্যস্ত ভাবে অরুন্ধতী বললে, না কাকাবাবু! সে আসার আগেই আমাকে যেতে হবে। সে এলে যাওয়া হবে না।

—কিন্তু তার সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া কি ঠিক হবে?

—খুব ঠিক হবে। এমনও হতে পারে যে, সে আসার আগেই আমি ফিরে আসব। আর যদি থেকে যাই, তাতে কমলেশের ভালোই হবে। আপনি কাল সন্ধ্যাবেলায় আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিন।

অরুন্ধতীর কণ্ঠস্বরের আকুলতা তাঁকে স্পর্শ করলে। ওর বুদ্ধির উপর রামপ্রসাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে বলে আর বাধা দিলেন না। বললেন, বেশ তাই হবে। তবে কমলেশ আসার আগেই ফিরে আসার চেষ্টা কোরো মা! তুমি নইলে এ সংসার একদিনও চলবে না, সেটা মনে রেখ।

তাই হল।

পরদিন সন্ধ্যার কিছু আগে অরুন্ধতীর পালকি সমরেশের বাগানের মধ্য দিয়ে সদর দরজায় সামনে থামল। সমরেশ তখন দূরে নিঃশব্দ একাকী বাগানে পায়চারি করছিলেন।

অরুন্ধতীর পালকির দরজা বন্ধ ছিল॥ সে দেখতে পায়নি। কিন্তু বেহারারা দেখতে পেয়েছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভ্যস্ত 'হুম হুম' ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মীও দেখেছিল এবং তৎক্ষণাৎ পালকির অন্য পাশ দিয়ে লুকিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেছিল।

পালকি! এই সন্ধ্যায় পালকিতে কে আসে! সমরেশ অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

অরুন্ধতী পালকি থেকে অত্যন্ত সহজ ভাবে নেমে ভিতরে গেল। সামনেই কেষ্ট চাকর। হঠাৎ সামনে ভূত দেখলে মানুষের চোখ মুখের যেমন অবস্থা হয়, অরুন্ধতীকে দেখে তার চোখ-মুখের অবস্থাও তেমনি।

সেটা অরুন্ধতীর দৃষ্টি এড়াল না। তবু সে সহজ ভাবে হেসে জিজ্ঞাসা করলে, কি রে! তুই আছিস এখনও এ বাড়িতে?

ওর কণ্ঠস্বরে ঠাকুরও এক পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াল।

অরুন্ধতী বললে, এই যে, তুমিও রয়েছ। বেশ বেশ।

লক্ষ্মী তখন পিছন থেকে তাকে ঠেলা দিচ্ছে উপরে যাবার জন্যে। যদিচ দূরে, বড়বাবু তবু নিচেই রয়েছেন। সুতরাং অনেক দূরের কুমীরের ভয়ে মানুষ যেমন ব্যস্ত হয়ে জল থেকে উপরে উঠতে চায়, সেও তেমনি নিচে থেকে তাড়াতাড়ি উপরে উঠতে চায়। যদিও বোঝে, এ কুমীর জলে এবং ডাঙায় সমান চলে তবু উপরটা তার কাছে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ মনে হচ্ছে। সেটা উপর বলে নয়, অন্য একটা জায়গা বলে। তার মনের অবস্থা কোথাও সে পালাতে চায়। কিন্তু সেই কোথাওটা যে কোথায়, সে বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।

লক্ষ্মীর ঠেলায় অরুন্ধতী ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল। আগে সে, তার পিছনে লক্ষ্মী, তার পিছনে বাক্স-মাথায় বেহারাটা, সর্বশেষে কেষ্ট।

যে ঘরে অরুন্ধতী থাকত সেই ঘরে এসে অরুন্ধতী দেখলে, ঘরটি বেশ গোছানো। সমরেশের কাপড়-জামা, তাঁর হাত-বাক্স, আরও নানা টুকিটাকি এই ঘরে রয়েছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারি দিকে চেয়ে অরুন্ধতী কেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে, এই ঘরে বাবু থাকেন ?

কথা বলার শক্তি কেষ্টর নেই। ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

—পাশের ঘরে কি আছে ?

—কিছুই নেই।

অরুন্ধতী সেই ঘরে এল। এই ঘরে আগে সমরেশ থাকতেন। দুই ঘরের মধ্যে একটা দরজা। এখন বেশ বোঝা যায় অব্যবহৃত।

বেহারাটাকে বললে, বাক্সটা এইখানে রাখ। রেখে তুই চলে যা।

সে আর তাকে বলতে হবে না। লোকটা বাক্সটা রেখে এক রকম ছুটেই চম্পট দিলে।

সেই বাক্সটার উপর স্তব্ধ হয়ে অরুন্ধতী বসে রইল।

এইবার ? এর পরে কি ?

কেষ্ট খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেল। বাইরে থেকে একবার উঁকি দিলে ঠাকুরটাও।

অরুন্ধতী লক্ষ্মীকে বললে, তোর ঘরটা গোছগাছ করে নে। দেখ, কি অবস্থায় আছে।

পালাতে পারলে লক্ষ্মীও বাঁচে। তার একটি কান সকল সময় সিঁড়ির দিকে রয়েছে, কখন হট করে বড় বাবু সামনে এসে দাঁড়ান ! অথচ সেই বাঘের মুখে অরুন্ধতীকে একা ফেলে রেখে যেতেও তার মন সরছে না। বললে, আমি তোমার ঘরে থাকলেই ভালো হত না দিদিমণি ?

—না, না। তোর নিজের ঘরে গিয়েই শো ! একা শুতে ভয় করছে নাকি।

—ভয় তো আছেই দিদিমণি ! কিন্তু সেজন্যে বলছি না।

—তবে ?

—তুমি একলা থাকবে ?

অরুন্ধতী রসিকতা করে বললে, একলা কিসের ? পাশের ঘরেই উনি থাকবেন। মধ্যের দরজাটা খোলা থাকবে।

লক্ষ্মীর সমস্ত দেহ ঠক-ঠক করে কেঁপে উঠল।

খপ করে অরুন্ধতীর একখানা হাত চেপে ধরে বললে, না না। মাঝের দরজাটা তুমি খুলে রাখতে পাবে না। এ দরজাটাও বন্ধ থাকবে। তা যদি না কর, আমি এ ঘর থেকে এক পা-ও নড়ব না।

ওর ভয় দেখে অরুন্ধতী হেসে ফেললে। বললে, আচ্ছা আচ্ছা, তাই থাকবে। তুই যা তো।

—যাচ্ছি বটে। কিন্তু আমি রাত্রে মাঝে মাঝে উঠে এসে দেখে যাব, দরজা খোলা আছে কি না।

—আচ্ছা দেখিস। যা এখন।

লক্ষ্মী চলে গেল। একটু খুঁৎ খুঁৎ করতে করতেই। আর অরুন্ধতী সমরেশের প্রতীক্ষায় মেঝের উপর শক্ত হয়ে বসে রইল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যা নামল।

অরুন্ধতীর মনে হল, অনেকক্ষণ ধরে সে এইখানে একই ভাবে বসে রয়েছে। কখন যে অন্ধকার নেমেছে টের পায়নি। কেষ্ট এসে হারিকেনটা নামিয়ে দিতে টের পেলে, অন্ধকার নেমেছে।

কিন্তু সমরেশ আসেন না কেন ? তিনি কি অরুন্ধতীর আসা টের পাননি ? না পাবার তো কথা নয় ? তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। বাড়ির বাইরে কোথাও বড় একটা যায় হন না। কোথায় বেরুবেন ? সবাই তাঁকে এড়িয়ে চলে। সবাই তাঁকে ভয় করে.

অনেকক্ষণ হল অরুন্ধতী এসেছে। এর মধ্যে তাঁর তো আসা উচিত ছিল। তাকে স্বাগত জানাবার জন্যে যদিও নয়, তবু তো তাঁর আসা উচিত ছিল। পরশুরামের মতো কুঠার হাতে তিনি আসুন। জল্লাদের মতো খড়্গপাণি হয়েই আসুন।

কিন্তু তিনি আসুন। অরুন্ধতী তাঁকে একবার দেখতে চায়।

দেখতে চায়, কত বিষ, কত বিদ্বেষ, কত আক্রোশ ওঁর বুকের মধ্যে পোরা আছে। সে কি তক্ষক নাগের বিষের চেয়েও ভয়ঙ্কর ? ছোবল মেরে একটা আস্ত অশ্বত্থগাছ পুড়িয়ে ছাই করে দিতে পারেন ?

দিন। অরুন্ধতী তাতে ভয় পায় না। অরুন্ধতী তাঁকে ভয় করে না। নিঃশেষ হয়ে যাক সেই অনন্ত বিষ তার ওপর দিয়ে। কমলেশ বাঁচুক, পৃথিবী শান্ত হোক, সমরেশ নিজেও স্বাভাবিক হোন।

তিনি শুধু আসুন। তার সামনে একবার দাঁড়ান। দেখুন অরুন্ধতী তাঁকে ভয় করে না।

হঠাৎ তার মনে হল, এমন তো হতে পারে সমরেশ এখানে নেই। মাঝে মাঝে বিষয়কর্মে তিনি সদরে যান। হয়তো তাই গিয়েছেন। ফিরবেন রাত্রের ট্রেনে। কোনো কোনো দিন রাত্রে ফিরতেই পারেন না হয়তো। পরের দিন ফেরেন। এমন হয়েছে অনেক দিন !

কথাটা ভাবামাত্র তার দুই চোখে, তার বুকের ভিতরে কে যেন স্নিগ্ধ ছায়া বিছিয়ে দিল। তার দুই চোখের জ্বলা, তার বুকের আগুন যেন জুড়িয়ে এল।

কেষ্ট আলোটা নামিয়ে নিয়ে চলে যেতে উদ্যত হতেই অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে, বাবু এখানে নেই নাকি রে ?

—আছেন বই কি।

—কোথায় আছেন ?

—নিচের সেরেস্তায়। কাজ করছেন।

—আমার আসার কথা জানেন ?

একটু চিন্তা করে কেষ্ট বললে, জানারই তো কথা। আপনারা যখন আসেন তখন উনি ওদিকের বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

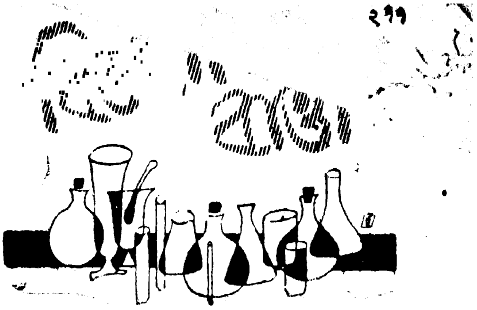
—আচ্ছা তুই যা।

অরুন্ধতী ভাবতে বসল। দেখেছেন, তবু এলেন না এখনও, তার মানেটা কি ? তখনই তো ঝড়ের মতো হুড়মুড় করে ওঁর এসে পড়া উচিত ছিল ! তার বদলে নিচের সেরেস্তা-ঘরে নিশ্চিন্তে কাজ করে যাচ্ছেন, যেন কিছুই হয়নি, কেউ আসেনি, এ সংসার প্রতিদিন যেমন একঘেয়ে চলে আজও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এ কী অদ্ভুত ব্যাপার !

একবার তার মনে হল, উপর থেকে চিৎকার করে কাউকে সে ডাকে। সমরেশকে জানিয়ে দেয় সে এসেছে। জানিয়ে দেয় তাঁকে, সে ভয় করে না। কিন্তু এবাড়ির হাওয়া যেন কী রকম ! এই ধ্বংসস্তূপের কারাগারে টিকটিকিও ডাকে না। এখানে ঠাকুর-চাকর, কুকুর-বেরাল কেউ শব্দ করে না।

অরুন্ধতীও চিৎকার করতে পারলে না। যেমন স্তব্ধভাবে মেঝের উপর বসেছিল, তেমনি স্তব্ধ ভাবেই বসে রইল।

[ক্রমশঃ।



পক্ষধর মিশ্র

কোন দিন ঘুরপাক খেয়ে দেখেছেন কি? ছেলেবেলায় ঘুরপাক খাওয়া অভ্যাস নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু এখন খেতে হলে চোখে-মুখে অন্ধকার দেখবেন। এই রকম অন্ধকার মাঝে মাঝে উড়ো-জাহাজের আরোহীদের দেখতে হয়, বিশেষ করে যুদ্ধের সময় অথবা যখন ডিগবাজি খেয়ে উড়োজাহাজের কায়সাজির কায়দা-কানুন দেখান হয়। মানবদেহের ঘূর্ণনের সঙ্গে মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের একটা সম্বন্ধ আছে এবং তার জন্যই এই বিশেষ অবস্থায় আমাদের চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। যাই হোক, সাধারণ মানবদেহ কতোখানি ঘূর্ণন সহ্য করতে পারে তা নির্ণয় করতে কয়েক জন বিজ্ঞানী অগ্রসর হয়েছেন। রয়েল এয়ারফোর্স-এর ফারণবোর্গএ অবস্থিত আকাশ ভ্রমণে প্রয়োজনীয় ঔষধ পত্রাদি নির্দ্ধারণের জন্য যে গবেষণ মন্দির আছে তার কয়েক জন বিজ্ঞানী মানবদেহের ঘূর্ণনশক্তি নির্ণয়কল্পে এক বিচিত্র যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন। এই যন্ত্র পৃথিবীর সঙ্গে সমান্তরাল প্রায় ২১ গজ লম্বা একটি দণ্ড আছে, দণ্ডের প্রান্তে একজন মানুষ বেশ আরাম করে বসতে পারে এবং এই যন্ত্রটিকে প্রয়োজন মতো খুব জোরে ঘোরান যায়। মনে করুন, প্রান্তদেশে আমাকে বসিয়ে দেওয়া হলো, তার পর আস্তে আস্তে ঘূর্ণনশক্তি বৃদ্ধি করে আপনার উপলব্ধির সঙ্গ ঘূর্ণনের প্রকৃতির তুলনামূলক বিচার করে বিজ্ঞানীরা মানবদেহে এর প্রভাব স্থির করবেন। বহু লোকের ওপর পরীক্ষা করে তাঁরা এই বিষয়ে মোটামুটি একটা ধারণাও সংগ্রহ করেছেন। তাঁরা দেখেছেন, পৃথিবীর আকর্ষণে পড়ন্ত বস্তুর গতির চেয়ে পাঁচগুণ বেশী জোরে ঐ দণ্ড ঘোরালে মানুষের দেহের নরম অংশগুলির উপর তার বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। আক্রমণটা প্রথমেই হয় গালের ওপর—গালগুলো ভিতরের দিকে ঢুকে গিয়ে একজন যুবককে দেখায় বৃদ্ধের মতো।

* * * *

আগুন মানুষের অন্যতম প্রধান বন্ধু, যে সেই আদিম যুগ থেকে একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেবা করছে। আবার আগুনের মতো বিরাট শত্রুও মানুষের আর নেই,—তার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতিদিন চলেছে প্রচেষ্টা। সম্প্রতি একটি সংবাদে জানা গিয়েছে, ফোর্ট বেলভয়েরে সৈন্যবাহিনীর যন্ত্রবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণা বিভাগ এমন একটি রং উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছেন, যা আগুনের আক্রমণ রোধ করতে সক্ষম। এই রং আগুনকে নিবিয়ে দিতে পারে না বটে কিন্তু তাপের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ঐ প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রবিজ্ঞানী মিঃ হার্ভে মিলারের বিবৃতি থেকে জানা যায়, রংটি এমন কয়েকটি তৈল জাতীয় পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত যা উত্তাপ লাগার সঙ্গে সঙ্গে তাপ পরিবহন করতে অক্ষম পদার্থে পরিণত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন আবহাওয়ায় এই রংটির গুণাগুণ কেমন থাকে তা পরীক্ষা করবার জন্য একে মেরু প্রদেশে, মরু অঞ্চলে এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ছয় মাস করে ফেলে রেখে একটি বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত কক্ষের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট তাপ দিয়ে কতোখানি ওজন কমে তা হিসাব করে দেখা গেছে। ফলাফল খুবই আশাপ্রদ, বিজ্ঞানীদের মতে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বিস্ফোরণের সময় এই রং ঐ অঞ্চলের ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমিয়ে দিতে পারতো। আশা করা যায়, অগ্নিবিমুখতার কার্য্যে এই রং নিকট ভবিষ্যতেই মানব সভ্যতার এক বিরাট সহায় হবে।

* * * *

সূর্য্যের উপরিভাগের জ্বলন্ত গ্যাসের এক বিরাট আলোড়নের ছবি আমেরিকার জ্যোতির্বিজ্ঞানী মহলের এক সভায় নিউ মেক্সিকোর সেক্রামেন্টো পিক্ অবজারভেটারীর বিজ্ঞানিবৃন্দ পরিবেশন করেন। ঐ ছবি গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। ঐ বিরাট আলোড়নের প্রচণ্ডতা প্রায় ১০০০ লক্ষ হাইড্রোজেন বোমা ফাটানোর সমান! পৃথিবী থেকে প্রতি মিনিটে চারটি করে ছবি টেলিস্কোপের সাহায্যে নেওয়া হয়। প্রথমেই সূর্য্যের পূর্ব্ব অঞ্চলে দেখা যায় গ্যাসের একটি বুদবুদ—ঐ বুদবুদটি প্রতি সেকেণ্ডে ৬০ মাইল করে বিস্তার লাভ করতে থাকে। প্রায় ৫ থেকে ১০ মিনিট ক্রমাগত ঔজ্জ্বল্য বাড়তে থাকার পর হঠাৎ ঐ বুদবুদের বিস্তার শুরু হয় প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ মাইল। যখন ব্যাস ২০,০০০ মাইলের কাছাকাছি তখন তার যাত্রা শুরু হয় মহাশূন্যে,—হারভার্ড অবজারভেটারীর পরিচালক ডাঃ ডোনাল্ড মেন্জেল-এর মতে গ্যাসের এই জ্বলন্ত বুদবুদটির গতি মহাশূন্যে ধাবমান জ্বলন্ত দেহসমূহের মধ্যেই এক রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। ঐ জ্বলন্ত গ্যাসপুঞ্জটির সহিত সূর্য্য থেকে বিচ্ছিন্ন গ্যাসের পরিমাণ প্রায় ১০০ কোটি টন এবং ঐ গ্যাসের বেশীর ভাগই হাইড্রোজেন।

* * * *

কুমারেশ প্রস্তুতকারক ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীস্ এর প্রতিষ্ঠাতার বার্ষিক স্মৃতি-সভায় বিশেষ আমন্ত্রণ ক্রমে এবার পক্ষধর মিশ্রকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। ঐ সভার সভাপতি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম মন্ত্রী ডাঃ জীবনরতন ধর এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি ও ডাঃ শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশীয় ঔষধি শিল্পের বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং তার ভবিষ্যৎ বিষয়ক যে সারগর্ভ আলোচনার সূত্রপাত করেন, এই পরিপ্রেক্ষিতে তার মূল্য যথেষ্ট বেশী। দেশীয় ভেষজ-শিল্পের উন্নয়ন নিশ্চয়ই প্রয়োজন, আরও প্রয়োজন ঔষধি গুণসম্পন্ন দেশীয় গাছ-গাছড়ার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরীক্ষিত হওয়া কিন্তু বিদেশী ঔষধি সমূহের আমদানী বন্ধ করার জন্য দেশী প্রতিষ্ঠানগুলির ভারতবর্ষেই বিভিন্ন ঔষধাদি এবং রসায়ন দ্রব্য প্রস্তুতে আরও সচেষ্ট হওয়া উচিত। বিদেশ থেকে বিভিন্ন ঔষধাদি প্রস্তুতের রসায়ন দ্রব্য সমূহ আলাদা করে নিয়ে এসে ভারতবর্ষে তাদের মিশ্রণ ঘটিয়ে ভারতীয় ঔষধ বলে চালানোর মনোভাব পরিত্যাগ অবিলম্বে করতে হবে। সামর্থ্যের যা আছে তা এখনই করতে হবে—সামর্থ্যের মধ্যে যা নেই

তাকে আয়ত্তে আনতে হবে নিকট ভবিষ্যতেই, শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের তাই আদর্শ হওয়া উচিত। ছোট ছোট শিল্পপতিদের পক্ষে পেনিসিলিন প্রস্তুত করা সম্ভব না হতে পারে, কিন্তু তাঁরা পেনিসিলিন শিল্পে প্রয়োজনীয় রসায়ন দ্রব্য তো সরবরাহ করবার চেষ্টা করতে পারেন। ভারত সরকার বোম্বাইয়ে পেনিসিলিনের কারখানা স্থাপন করেছেন—আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতেই ভারতবর্ষ এ্যান্টিবায়োটিকস্ এর জন্ম আর পরনির্ভরশীল থাকবে না, কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, পেনিসিলিন প্রস্তুত করে প্রয়োজনীয় কয়েকটি রসায়ন দ্রব্যের জন্ত ভারতকে এখনও অন্য দেশের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হয়! ওরিয়েণ্টাল রিসার্চ ল্যাবরেটরীস্ এর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় বিভূতিভূষণ মিত্র মহাশয় একজন আদর্শ কর্ম্মী পুরুষ ছিলেন। দশ টাকা কয়েক আনা সম্বল করে তিনি কেবল মাত্র একটি ভারতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানই সৃষ্টি করেন নি,—আজ থেকে পঁচিশ বছর আগে ভারতবর্ষে তিনিই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম সরাবীন থেকে প্রোটিন জাতীয় খাদ্য উৎপাদনের চেষ্টা করেছিলেন।

• • • •

মাইকেল ফ্যারাডে

কথিত আছে, কোন এক বিজ্ঞানী একবার বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রি ডেভীকে প্রশ্ন করেছিলেন,—"আপনার সব চেয়ে বড় আবিষ্কার কি?" ডেভী উত্তর দেন,—"মাইকেল ফ্যারাডে,"

জগদ্বিখ্যাত ইংরেজ রাসায়নিক এবং পদার্থবিদ মাইকেল ফ্যারাডে সারের নিউইংটন সহরে ১৭৯১ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন, লণ্ডন সহরে তাঁর পিতা কামারের কাজ করতেন,—কামারের ছেলে, তাই বাল্যকাল থেকেই তাঁর নিজের অন্নচিন্তা সুরু হলো এবং মাত্র ১৪ বছর বয়সে মাইকেল ফ্যারাডে একটি দপ্তরীর কারখানায় শিক্ষার্থী হিসাবে যোগদান করলেন, প্রায় ২২ বছর পর্য্যন্ত দপ্তরীর কাজই ফ্যারাডের পেশা ছিল, তারপর তিনি বিখ্যাত ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার হামফ্রি ডেভীর বিশেষ অনুমতি ও সুপারিশ বলে রয়েল ইনস্টিটিউসনের গবেষণাগারে একজন সহকারী হিসাবে যোগ দেন। ডেভীর অনুমতিও তিনি এক বিচিত্র পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে লাভ করেন;—ডেভী একবার রয়েল ইন্‌স্টিটিউসনে কয়েকটি বক্তৃতা দেন—মাইকেল ফ্যারাডে ছিলেন তাঁর একজন শ্রোতা; বিজ্ঞানের অজানা প্রকৃতির স্বভাব জানবার অনুসন্ধিৎসা ছিল তাঁর বাল্যকাল থেকেই,—এই ইচ্ছাই তাঁকে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বক্তৃতাবলীর সভায় যোগদান করতে অনুপ্রাণিত করতো।

যাই হোক, ডেভীর বক্তৃতাবলীতে যোগদান করে ফ্যারাডে তা লিখে এবং সেই বিষয়ের ওপর নিজের মতামত পরিষ্কার ভাবে লিপিবদ্ধ করে, সুন্দর ছবি এঁকে এবং বাঁধিয়ে ডেভীর কাছে পাঠিয়ে দেন। এই বাঁধান মতামতের সঙ্গে একটি আবেদন-পত্রও তিনি পাঠিয়েছিলেন, তা হলো রয়েল ইনসটিটিউসনের গবেষণাগারে তাঁকে সহকারী হিসাবে গ্রহণ করবার আবেদন। যোগ্যতমের কাছে যোগ্যের আবেদন নিষ্ফল হয়নি, ডেভী গবেষণাগারে সহকারী হিসাবে ফ্যারাডেকে সাদরে গ্রহণ করলেন।

ফ্যারাডে লেখাপড়া শিখেছিলেন নিজের চেষ্টায়, তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ বক্তা। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল খুবই কম কিন্তু তিনি তাঁর গবেষণার প্রতিটি বিষয় লিখে রাখতেন। স্যার হামফ্রি ডেভীর সঙ্গে তিনি প্রায় দেড় বছর ধরে ফ্রান্স, ইটালী এবং সুইজারল্যাণ্ড পরিভ্রমণ করেন। ফ্যারাডের আবিষ্কার সমূহকে দুইটি নির্দিষ্ট ভাগে ভাগ করা যায়, প্রথমটি হলো রাসায়নিক আবিষ্কার সমূহ এবং দ্বিতীয়টি হলো বিদ্যুৎ-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আবিষ্কার সমূহ। যদিও দ্বিতীয় শ্রেণীর আবিষ্কারই মর্য্যাদা ও কৌলীন্যে তাঁকে বিজ্ঞানী সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুখপাত্ররূপে পরিগণিত করেছে, তিনি ক্লোরিণের গুণাগুণ বিষয়ক গবেষণা করেন এবং কার্ব্বণের দুইটি নতুন ক্লোরাইড তাঁরই আবিষ্কার। তিনি কয়েকটি গ্যাসকে তরল অবস্থায় পরিবর্ত্তিত করেন এবং লোহার মিশ্র ধাতুর উপর গবেষণা করেন। বেনজিন এবং কয়েক প্রকার বিশেষ গুণসম্পন্ন কাচ আবিষ্কারও তাঁর অন্যতম কাজ। তিনি ল্যাবরেটরীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার কর্ম্মপদ্ধতির উন্নতি বিধানও করেছিলেন। ফ্যারাডে'স্ 'ল' এবং কোলারাইজড্ আলোর প্রতি চুম্বকের ব্যবহারাবলী মাইকেল ফ্যারাডের প্রধানতম আবিষ্কার। তিনি ১৮২৫ সালে ঐ গবেষণাগারের পরিচালক এবং ১৮৩৩ সালে রয়েল ইনষ্টিটিউসনের রসায়নশাস্ত্রের আজীবন ফুলেরিয়ান অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৮৬৭ সালের ২৫শে আগষ্ট হ্যাম্পটন কোর্টে তাঁর মৃত্যু হয়।

[ক্রমশঃ।


সুচিত্রা সেন পছন্দ করেন লাক্স
টয়লেট সাবান
এর
শুভ্রতা ও বিশুদ্ধতার
জন্য।
সুচিত্রা সেনের সৌন্দর্য্যের উৎস
বিমল রায়ের "দেবদাস"
এর মনোমোহিনী অভিনেত্রী
চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান
ভারতে প্রস্তুত
LTS. 475-X52 BG

কুলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

আঠেরো

সুরেশ্বরী কাছারী-ঘর থেকে সোজা নিজের শয়নকক্ষে চলে এলেন। যে আশঙ্কা মাধবীর কথায় তার মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া ফেলেছিল এবং জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণীকে দৃঢ়চিত্তে অবহেলা করে এক প্রকার জোর করেই শশাংকর বিবাহ দিয়ে পুত্রবধূ স্বর্ণময়ীর মুখখানা দেখে মনে মনে আশা করেছিলেন, আশঙ্কার বুঝি আর কোন কারণ থাকবে না, আজ স্বামীর কথায় বুঝলেন সব। সব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে।

ভানুমতীর চোখের জলের অভিশাপের ঋণ আজও শোধ হয়নি। এখনো সে ঋণ শুধতে হবে। স্বামি-সোহাগিনী সতী সাধ্বী স্বামীর পদাঘাতের দুঃসহ লজ্জা ঢাকতে কৃষ্ণসাগরের অতল তলে গিয়ে মুখ লুকিয়েছিলেন।

লোকে বলে, আজও নাকি রাত্রি নিশীথে আবছায়া এক নারী-মূর্তি কৃষ্ণসাগরের তীরে তীরে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। বুকভাঙা সে করুণ বিলাপ কৃষ্ণসাগরের অথৈ জলে আজও নাকি চাপা পড়েনি!

রত্নেশ্বর রায়ের মৃত্যুর পর ছয় মাসও গেল না। নর্তকী লক্ষ্মী-বাঈকে হত্যা করে আরামকুটিরকে চিরতরে ভস্মসাৎ করে, মৃত পিতার সমস্ত কলঙ্ক ও লজ্জাকে চিরদিনের মত মুছে ফেলবার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা নিয়ে শশিশেখর এক দ্বিপ্রহরে আরামকুটিরাভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

যাত্রা সে নয়। ভানুমতীর চোখের জলের ঋণ শুধতেই বুঝি দুর্লজ্ঘ্য নিয়তি টেনেছিল শশিশেখরকে সেদিন আরামকুটিরের দিকে। কিন্তু ঘণ্টাখানেক বাদেই ফিরে এলেন শশিশেখর।

সুধাময়ী যখন গিয়ে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হলো?

শশিশেখর কেবল ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর মুখের দিকে। কোন কথাই মুখ থেকে বের হলো না।

শুধু তাই নয়। তার পর থেকেই দেখা গেল, শশিশেখর অকস্মাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন। বরাবর বিবাহের পর থেকে সুধাময়ী স্বামীকে হাসিখুশী ও কৌতুকপ্রিয় দেখে এসেছেন, সেই স্বামী যে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছেন এবং ঠিক আরামকুটির থেকে ফিরে আসবার পরই তীক্ষ্ণবুদ্ধি সুধাময়ীর ব্যাপারটা যেমন দৃষ্টি এড়ায় না, তেমনি মনের মধ্যে দুশ্চিন্তাও এনে দেয়।

স্বামী গিয়েছিলেন তার নর্তকী লক্ষ্মীবাঈকে হত্যা করতে ও আরামকুটিরকে চিরতরে ভস্মসাৎ করতে কিন্তু ফিরে এলেন কি যেন এক ভয়াবহ গাম্ভীর্যে নিজেকে পাথর করে।

জিজ্ঞাসা করেন সুধাময়ী, কি হয়েছে তোমার বল ত?

চমকে ওঠেন শশিশেখর, কেন? কি আবার হবে?

দেখ, আর যার চোখকেই তুমি ফাঁকি দাও না কেন, আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

বিশ্বাস করো, কিছু আমার হয়নি।

বিশ্বাস?

বলেছিলেন সুধাময়ী তাঁর পুত্রবধূকে সেদিন। এ বাড়ির কিশোরী বধূ সুরেশ্বরী তখন।

সুধাময়ী বলেছিলেন, সেই ভয়ঙ্করী রাত্রির কথা। কিছুই জানতে পারেন নি তিনি। নিজের ঘরে শুয়েছিলেন। দাসী মঙ্গলার ডাকে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। বৌমা! তাড়াতাড়ি বের হয়ে এসেছিলেন সুধাময়ী। কি মঙ্গলাদি'!

তোমাকে এখুনি একবার মা ডাকছেন। মা অর্থে তার শাশুড়ী।

মা! মা কোথায়?

আঙিনায় আপনার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন।

অন্দরমহলের শেষপ্রান্তে যে আঙিনা, মঙ্গলার পিছনে পিছনে সেখানে এসে দেখলেন সুধাময়ী ধূসর চন্দ্রালোকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন তার শাশুড়ী ভানুমতী।

পদশব্দে ফিরে তাকালেন ভানুমতী।

মা! মা বলে ডেকে শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়েই চমকে উঠেছিলেন সুধাময়ী। ছোটখাটো মানুষটি ছিলেন ভানুমতী। কিন্তু সেই ছোটখাটো গঠনের মধ্যে রূপ ছিল যেন তার দেবী প্রতিমার মতই। রত্নেশ্বরের পিতা ভানুমতীকে যেদিন পুত্রবধূরূপে ঘরে নিয়ে এসে তোলেন, পর পর কতকগুলি বিপর্যয়ে রায়-পরিবারের তখন চলেছে একটা দুঃখ, অভাব ও অশান্তির যুগ। সর্বেশ্বর রত্নেশ্বরের পিতা তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, মা লক্ষ্মীকে বরণ করে নিয়ে এলাম বৌ! রায়-বাড়ির লক্ষ্মী! দেখো, মা যেন আমার কখনো দুঃখ না পায়। জ্যোতিষাচার্য বলেছেন, মায়ের চোখে যদি কখন জল ঝরে তাহলে জানবে সেই দিনই রায়-বাড়ির সৌভাগ্যলক্ষ্মী, ইজ্জৎ, মান-সম্ভ্রম সব বিদায় নিল।

আট বছরের বালিকা তখন ভানুমতী। শাশুড়ী তাকে কোলে তুলে নিয়ে স্নেহচুম্বন দিয়ে বলেছিলেন, ভয় নেই গো ভয় নেই! সোনার পালঙ্কে তোমার লক্ষ্মীকে চিরদিন বসিয়ে রাখবো।

বৃদ্ধা দাসী মঙ্গলার মুখেই শোনা সে কাহিনী সুধাময়ীর।

শাশুড়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে স্তম্ভিত হয়ে চেয়েছিলেন সুধাময়ী। কপালের ক্ষতস্থান দিয়ে তখনও ক্ষীণধারায় রক্ত ঝরছে।

বৌমা! মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন ভানুমতী পুত্রবধূকে।

আমি চললাম মা!

বুঝতে পারেননি সুধাময়ী প্রথমটায় শাশুড়ীর কথায়। তাই প্রশ্ন করেছিলেন, কোথায় মা?

কিন্তু ভানুমতী সে কথার জবাব না দিয়ে বললেন, এবার থেকে তোমাকেই সব দেখতে হবে মা! পারবে তুমি, আমি জানি। কেবল একটা কথা বলে যাই মনে রেখো। পুরুষকে কখনো বিশ্বাস করো না। আর, আর পারো ত আরামকুটিরটা পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিও। বলে আঁচল থেকে ভারী চাবীর গোছাটা খুলে পুত্রবধূর হাতে তুলে দিলেন।

নির্বাক পুত্রবধূ হাত বাড়িয়ে কতকটা যেন যন্ত্রচালিতের মতই শাশুড়ীর হাত থেকে চাবীর গোছাটা নিয়েছিলেন। এবং সেই সময়েই দেখেছিলেন শাশুড়ীর দু' চোখের কোল বেয়ে ঝরে পড়ছে অশ্রুর ধারা। আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে ভানুমতী সোজা এগিয়ে গেলেন খিড়কীর দরজার দিকে।

দরজা খুলে প্রথমে ভানুমতী ও তার পশ্চাতে রায়-বাড়ির পুরাতন দাসী মঙ্গলা অদৃশ্য হয়ে গেল।

কতক্ষণ যে নিশ্চল নির্বাক, তারপরেও সেই শূন্য আঙ্গিনায় একাকিনী দাঁড়িয়েছিলেন সুধাময়ী তার মনে নেই। ব্যাপারটা তখনও ভাল করে যেন তিনি বুঝতে পারেন নি।

তারপর হঠাৎ এক সময় খেয়াল হতেই দ্রুতপদে ফিরে এলেন নিজ শয়নকক্ষে। শয্যায় নিশ্চিন্ত ঘুমে অচেতন স্বামীর গায়ে হাত দিয়ে ঠেলে ডাকলেন, ওগো শুনছো? ওঠো। ওঠো।

স্ত্রীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল শশিশেখরের।

ওগো! ওঠো। ওঠো।

কি? কি হয়েছে সুধা?

মা চলে গেলেন।

মা চলে গেলেন! কোথায়?

তা ত জানি না? এই যে চাবীটা আমার হাতে দিয়ে বলে গেলেন তিনি চললেন।

কি পাগলের মত যা-তা বলছো সুধা? উৎকণ্ঠায় শশিশেখর তখন শয্যার উপরে উঠে বসেছেন।

ক্ষণপূর্বের সমস্ত ঘটনা বলে গেলেন তখন সুধাময়ী স্বামীকে।

সর্বনাশ! সে কি! তাড়াতাড়ি ছুটলেন তখুনি শশিশেখর। নায়েব কৃষ্ণদাসকে ডেকে পাঠালেন। দাস-দাসীরা সব উঠে পড়ল। খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল সমস্ত রায়বাড়িতে কিন্তু ভানুমতী বা মঙ্গলার কোন সন্ধানই পাওয়া গেল না।

পরের দিন ভানুমতীর দেহটা কৃষ্ণসায়রের জলে ভাসতে দেখা গেল এবং তারও চার দিন পরে হোগলা ও শরের বনের মধ্যে কৃষ্ণসায়রের তীরে একাকী মুহ্যমানের মত বসে থাকতে দেখা গেল দাসী মঙ্গলাকে।

সুধাময়ীও বলেছিলেন সুরেশ্বরীকে, বিশ্বাস করো না পুরুষ জাতকে। কারণ সুধাময়ীও যে মর্মে মর্মেই শাশুড়ী ভানুমতীর কথার সত্যতা উপলব্ধি করেছিলেন।

তাই ত স্বামীর ভাব পরিবর্তনে অজানা এক আশঙ্কায় শিউরে উঠেছিলেন সুধাময়ী। তার আশঙ্কা যে মিথ্যা নয়, প্রমাণ হ'তেও খুব বেশী দেরি হলো না।

আরামকুটিরের কালনাগিনী শশিশেখরকেও টানলো। প্রথম প্রথম গোপনে গোপনে। অভিসার চললেও মাস দুইয়েকের মধ্যেই কারুরই আর জানতে বাকী রইলো না শশিশেখরের আরামকুটিরের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণের কথাটা।

কিন্তু শশিশেখর-পত্নী সুধাময়ী অত সহজে হাল ছাড়লেন না। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যেমন করে হোক আরামকুটিরের কালনাগিনীর মায়া-আবেষ্টনী থেকে তার স্বামীকে ছিনিয়ে আনবেনই।

দিনের পর দিন ধরে তার পর চলতে লাগলো ধৈর্য ও প্রেমের পরীক্ষা! কিন্তু কোন পথই খুঁজে পেলেন না সুধাময়ী। ইতিমধ্যে মাত্র আঠারো বৎসরের তরুণ যুবক পুত্র রাজশেখরের বিবাহ দিয়াছিলেন শশিশেখর সুরেশ্বরীর সঙ্গে অকস্মাৎ, মাত্র সাত দিনের মধ্যেই সমস্ত স্থির করে। এবং সুধাময়ী শুনেছিলেন পুত্রের অকস্মাৎ ঐ ভাবে মাত্র সাত দিনের মধ্যে কন্যা নির্বাচন করে বিবাহ দেবার মধ্যেও নাকি ছিল ঐ আরামকুটিরের কালনাগিনীই। এবং তারই মাস কয়েক বাদে অকস্মাৎ একদিন রাত্রে মদমত্ত অবস্থায় ঘোড়ায় চেপে আরামকুটির থেকে ফিরবার পথে ঘোড়া থেকে ছিটকে পড়ে মাথার খুলি চৌচির হয়ে ফেটে গিয়ে শশিশেখর মৃত্যুমুখে পতিত হলেন।

সংবাদ পেয়ে পাইকেরা যখন শশিশেখরের রক্তাক্ত মৃতদেহটা রায়বাড়ির বহিঃপ্রাঙ্গণে বয়ে এনে নামাল, সেই দিকে তাকিয়ে সুধাময়ী যেন পাথর হয়ে গেলেন। এবং আশ্চর্য! এক ফোঁটা জলও সেদিন কেউ তার চোখে দেখেনি! অশ্রুহীন দু'চোখের তারা যেন দু'খণ্ড অঙ্গারের মতই ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বলছিল কেবল।

কৃষ্ণসায়রের তীরে সকলে যখন শশিশেখরের দাহকার্য নিয়ে ব্যস্ত, সমস্ত রায়বাড়িটা শোকে নিঝুম হয়ে গিয়েছিল। অবগুণ্ঠনবতী এক নারী নিঃশব্দে রায়বাড়ির খিড়কীর দ্বার দিয়ে বের হয়ে গেল। কেউ জানলো না, কেউ দেখলো না।

আরামকুটিরের দোতলার একটি কক্ষে সুরবাহারে দবীর খাঁ বেহাগ আলাপ করছিল। আর পাশের ঘরে খোলা জানালাপথে দূরবর্তী কৃষ্ণসায়রের তীরে প্রজ্বলিত চিতাগ্নি-শিখার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল নর্তকী লক্ষ্মীবাঈ।

লক্ষ্মীবাঈ টেরও পেল না কখন এক অবগুণ্ঠিত নারীমূর্তি এসে তার পশ্চাতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি।

কোমর থেকে টেনে বের করলো ধারালো একখানি ছোরা। দৃঢ় মুষ্টিতে সেই ছোরাটা হাতে ধরে পায়ে পায়ে নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল লক্ষ্মীবাঈয়ের পশ্চাৎ দিক থেকে।

তারপর সমস্ত গায়ের শক্তি একত্রিত করে অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি চক্ষের নিমেষে বসিয়ে দিল ধারালো সেই ছোরার ফলাটা আমূল লক্ষ্মীবাঈয়ের পৃষ্ঠদেশে।

আর্ত একটা চিৎকার করে ফিরে দাঁড়াতে গিয়েই টলে পড়ে গেল নর্তকী লক্ষ্মীবাঈ মাটিতে। রক্তে মেঝে ভেসে গেল। পরক্ষণেই দ্রুতপদে বের হয়ে গেল অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি ঘর থেকে। পাশের ঘরে দবীর খাঁ জানতে পারল না। বেহাগের মধ্যেই তখনও সে তন্ময় হয়েই রইলো।

খিড়কীর দ্বারপথে প্রাসাদে প্রবেশ করে অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তি যখন আঙ্গিনা পার হয়ে অন্দরে প্রবেশ করে নিজের শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করেছিল, হঠাৎ ডান পায়ের গোড়ালীর কাছে যেন কিসে দংশন হানলো। চমকে চেয়ে দেখে এক কাল সাপ।

এঁকে-বেঁকে সাপটা তখন ঘরের চৌকাঠ পার হয়ে চলে যাচ্ছে।

অস্ফুট একটা শব্দ করে অবগুণ্ঠনবতী সেই নারী ঘরের মেঝের উপরেই বসে পড়লেন। তারপরই চিৎকার করে ডাকলেন বৌমা!...

সুরেশ্বরী জেগেই ছিলেন। সে ডাক তার কানে পৌঁছাতে দেরি হয় না। ছুটে এলেন তিনি শাশুড়ীর ঘরে।

এ কি মা! কি হয়েছে?

সর্প দংশন করেছে মা!

তারপর ঠিক দীর্ঘ তের বৎসর পূর্বে ভানুমতী যেমন সুধাময়ীকে ডেকে বলেছিলেন, আমি চললাম মা! ঠিক তেমনি করে সুধাময়ী বললেন, আমি চললাম মা!

সুরেশ্বরী কেঁদে উঠেছিলেন সে কথা শুনে।

সর্পবিষে জর্জরিত সর্বাঙ্গ তখন সুধাময়ীর নীল হয়ে গিয়েছে। বললেন, কেঁদো না মা! এই নাও চাবী!···আর ভয় নেই! আরামকুটিরের সর্বনাশীকে আমি চিরদিনের জন্য শেষ করে এসেছি!···বোধ হয় এইবার মায়ের চোখের জল শুকাবে।··· তার ঋণ আমি শোধ করেছি!···

ক্রমে কথা জড়িয়ে এলো সুধাময়ীর। চোখের পাতা বুজে এলো।

দৈবাচার্য নাকি সুধাময়ীর করকোষ্ঠি বিচার করে বলেছিলেন সর্প দংশনে তার মৃত্যু হবে এবং ষাট বৎসর বয়েসে কিন্তু সর্প দংশনে মৃত্যু হলো ঠিকই, ষাট বৎসর বয়েসে নয়, মাত্র বিয়াল্লিশ বৎসর বয়েসে।

আলতা-সিন্দুর পরিয়ে স্বামীর নির্বাপিত চিতার পাশেই নতুন করে চিতা সাজিয়ে সতী লক্ষ্মী সুধাময়ীকে দাহ করা হলো কুরুসায়রের তীরে পরের দিন প্রত্যুষে। এবং সবার অলক্ষ্যে সেই দিন রাত্রে আরামকুটিরের পশ্চাতের উদ্যানে বিরাট ঝাউ-বৃক্ষের তলায় অশ্রুসজল চক্ষে দবীর খাঁ মাটির নীচে শুইয়ে রাখলেন নর্তকী লক্ষ্মীবাঈকে!

কিন্তু ভানুমতীর চোখের জলের ঋণ যে তখনও শোধ হয়নি, সুরেশ্বরীর জানতে সেটা খুব বেশী দেরি হলো না।

মাস খানেক বাদেই শুনতে পেলেন সুরেশ্বরী, রায়বাড়ির বহির্মহলের একাংশে চারি দিকে প্রাচীর তুলে নির্দিষ্ট একটি অংশ চিহ্নিত হচ্ছে। রাজমিস্ত্রীর দল দিবারাত্রি খাটছে।

তারপরই এক নিশি রাত্রে দু'খানা পাল্কী এসে রায়বাড়িতে প্রবেশ করল।

সুরেশ্বরী গোপনে সংবাদ পেলেন রায়বাড়ির সেই নির্দিষ্ট অংশে নাকি এসেছে দু'জন নতুন অতিথি। একজন প্রৌঢ় মুসলমান গায়ক ও তার দ্বাদশবর্ষীয়া অপরূপ রূপলাবণ্যময়ী ফুল্লকুসুমবৎ এক কিশোরী নাতনী!···মুনিয়া।

বহুকাল পরে তারপর থেকে আবার রায়বাড়িতে শোনা যেতে লাগল কখনো বেহাগ, কখনো জয়জয়ন্তী, কখনো কেদারা, কখনো মালকোষ, কখনো মল্লারের সুর-ঝঙ্কার! শোনা যেতে লাগল ঘুঙুরের মিষ্টি রুণু ঝুণু শব্দ!

রাজশেখর মেতে উঠলেন সংগীত নিয়ে।

সুরেশ্বরীর বুঝতে আজ আর কিছুই বাকী ছিল না, আজকের আশঙ্কার বীজ সেই দিনেই রোপিত হয়েছিল রায়বাড়িতে। এবং সব কিছুর পশ্চাতে ছিল দীর্ঘ চোদ্দ বছর আগেকার ভানুমতীরই চোখের জলের অভিশাপ। ক্রমে দেখতে দেখতে আরো চারটে বছর গড়িয়ে গেল।

শশাংক এলো সুরেশ্বরীর বুক জুড়ে।

রাজশেখর তাঁর বহির্মহল নিয়েই পড়ে আছেন, সুরেশ্বরী সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলেন তার আত্মজাকে নিয়ে।

ছেলেকে আদর করেন, চোখে কাজল টেনে, কপালে চন্দন দিয়ে মনের মত করে সাজান। এবং নিশি রাত্রে সংগীতের ঝাপটায় যখন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায় শিশু পুত্রকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরে চোখের জলে ভীরু জননীর কামনা দেবতার চরণে পৌঁছে দেন।

মনে মনে গৃহদেবতার চরণে স্নেহ-ভীরু মাতৃ হৃদয়ের অশ্রু মিনতি জানান, ঠাকুর, শেখর যেন আমার অমনি না হয়।

শশাংকশেখর! শেখর! তার বড় আদরের শেষ আশা।

নিবিড় স্নেহে পুত্রকে নিজের আশা-আকাঙ্খা দিয়ে মানুষ করতে লাগলেন।

পুত্র শেখরও যেন মা অন্ত প্রাণ! ছায়ার মতই মায়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। মা-ই তার ধ্যান-জ্ঞান ভাবনা-চিন্তা আশা-আকাঙ্খা সব কিছু!

সেই শেখরের মাথার উপরে নেমে এসেছে আজ কালো ছায়া।

কাল নাগিনীর অভিশাপ।

কত দিনের কত টুকরো টুকরো আশা-আকাঙ্খার কথাই না মনে পড়ছে আজ সুরেশ্বরীর।

ছেলেকে মানুষের মত মানুষ করে তুলবেন। মায়ের দুঃখ সে ঘোচাবে।

শশাংক যখন তের বছরের কোলে, দীর্ঘ দিন পরে এলো মাধবী!

তারই দুই বৎসর পরে স্বামীর মতের বিরুদ্ধেই জোর করে এক প্রকার ছেলেকে দূরে কলকাতায় শিক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

সব ব্যবস্থাই করেছিলেন তিনি কিন্তু নির্মম ভাগ্যে সবই তার বুঝি বিপরীত হলো।

হঠাৎ এমন সময় মনে পড়লো স্বর্ণময়ীর কথা!

হাঁ, কালই তিনি স্বর্ণময়ীকে পিত্রালয় থেকে নিয়ে আসবেন।

কথাটা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পুত্রের ঘরের দিকে চললেন।

পূবের আকাশে তখন প্রথম আলোর ছোঁয়া লেগেছে।

শশাংকর চোখে তখনও ঘুম আসেনি। আরামকুটিরে পিতার আকস্মিক আবির্ভাবের কথাটাই চোখ বুজে শয্যায় উপর শুয়ে শুয়ে সে ভাবছিল।

সুরেশ্বরী নিঃশব্দ পায়ে পুত্রের শয্যার শিয়রে এসে দাঁড়ালেন। মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, শেখর!

চমকে চোখ মেলে তাকাল শশাংক। তার চিন্তা-জাল ছিন্ন হয়ে গেল।

এ কি! মা!

আজই তোমাকে একবার নিশ্চিন্দপুরে যেতে হবে।

মার কণ্ঠস্বরে এমন একটা কিছু ছিল, শশাংককে যা আকর্ষণ না করে পারে না।

ক্ষণকাল তাই মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলে, নিশ্চিন্দপুরে?

হাঁ। বৌমার জন্ম মনটা আমার বড় উতলা হয়েছে। তুমি যাও, গিয়ে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো।

কিন্তু মা!

সুরেশ্বরী এবারে পুত্রের কথায় যেন বাধা দিয়েই বললেন, ভোর হয়ে এলো। তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও। আমি পাল্কীর ব্যবস্থা করছি গিয়ে। ইচ্ছা করলে তুমি ঐ পাল্কীতে চেপেও যেতে পারো—না হয় ঘোড়ায় চেপেও যেতে পারো। আদেশের মতই কথাটা জানিয়ে দিয়ে, দ্বিতীয় আর বাক্যব্যয় পর্যন্ত না করে ধীর মন্থর পদে সুরেশ্বরী আবার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

ছোটবেলা থেকেই শশাংক দেখে আসছে, সাধারণত স্বল্পবক্তা মা তার কাউকে কখনো বড় একটা আদেশ করেন না। কিন্তু আদেশ যখন করেন তাকে লঙ্ঘন করবার সাধ্য এ-বাড়িতে কারুরই বোধ হয় নেই! শশাংকর ত নেই-ই। তাই শশাংককে উঠে প্রস্তুত হতেই হলো।

ঘণ্টাখানেক বাদেই দেখা গেল, ঘোড়ায় চেপে শশাংক আগে আগে ও তার পশ্চাতে বলিষ্ঠ ছয় কাহার-বাহিত সুদৃশ্য ঝালর ঢাকা একটা পাল্কী রায়-বাড়ির দেউড়ি পথে বের হয়ে গেল।

পুত্রকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে সুরেশ্বরী এসে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করলেন।

শশাংকর যাত্রার কিছু পরেই দেখা গেল, কাছারী-ঘর থেকে রাঘব বের হয়ে শম্ভুচরণের ঘরের দিকে গেল। তারপর আরও ঘণ্টাখানেক বাদে শম্ভুচরণ একটা লাঠি হাতে রায়বাড়ি থেকে বের হয়ে গেল।

সমস্ত রাত্রি অনিদ্রার পর স্নান সমাপনান্তে রাজশেখর যখন তার শয়নঘরে জলযোগে বসেছেন একজন দাসী এসে সংবাদ দিল, জামাই বাবু এসেছেন দিদিমণিকে নিয়ে যেতে।

মনে পড়লো রাজশেখরের ঐ দিনই মাধবীর শ্বশুরালয়ে যাবার কথা। জামাই সকালবেলা এসে সন্ধ্যার দিকেই মেয়েকে নিয়ে চলে যাবেন।

অনেক দিন হয়ে গেল মাধবী এবারে পিত্রালয়ে এসেছে।

কত দিন আর তাকে ধরে রাখা যায়! তার নিজের মেয়ে হলেও আজ ত সে পরের বাড়ির বৌ।

জলযোগ শেষ করে রাজশেখর বহির্বাটিতে চলে গেলেন।

জামাই আসার সংবাদ পেয়ে সুরেশ্বরীও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু মাধবী শুনে বললে, বৌ না আসা পর্যন্ত সে কেমন করে যাবে?

সুরেশ্বরী বললেন, না মা, জামাই যখন এসেছেন তখন তোর না যাওয়া ভাল দেখাবে না, তাছাড়া শেখরকে আমি পাঠিয়েছি বৌ আনতে।

সত্যি মা! দাদা বৌদিকে আনতে গিয়েছে?

হাঁ। সন্ধ্যার আগেই হয়ত এসে পড়বে তারা।

তাহলে তুমি বলো মা, কালই আমরা যাবো, আজ বৌদি আসছে।

কিন্তু জামাইকে একটা রাত থাকবার জন্ত সুরেশ্বরী অনুরোধ করায় সে বিনীত ভাবে বললে, তা হয় না মা! কালই

মাধবীকে পৌঁছে দিয়ে আমাকে কার্যস্থলে যেতে হবে। তাছাড়া মা অসুস্থ।

মাধবীর শাশুড়ীর অসুখের কথা শুনে সুরেশ্বরী আর আপত্তি করতে পারলেন না। ঠিক হলো ঐ দিনই বৈকালের দিকে মাধবী শ্বশুরালয়ে যাত্রা করবে।

রাজশেখর যখন শুনলেন প্রত্যুষে তার সঙ্গে কোনরূপ পরামর্শ না করেই গৃহিণী শশাংককে শ্বশুরালয়ে নিশ্চিন্তপুর প্রেরণ করেছেন বধূকে নিয়ে আসবার জন্ত, মনে মনে খুশীই হলেন।

ভাবলেন, যাক ভালই হলো, রাতারাতি নির্বিঘ্নে চন্দ্রা ও সরযুকে আরামকুটির থেকে সরিয়ে সোজা একেবারে ময়নামতীর নীলকুঠীতে নিয়ে গিয়ে তোলা যাবে। কিন্তু নিষ্ঠুর নিয়তি বোধ হয় তখন অলক্ষ্যে বসে হাসছিলেন।

ব্যাপারটা যে একেবারেই কারো সন্দেহ মাত্রও না উদ্রেক করতে পারে তাই রাজশেখর পূর্ব হতেই সাবধানতা অবলম্বন করে শম্ভুচরণকে দুই ক্রোশ দূরবর্তী মহাদেবপুরের কাছারী-বাড়িতে প্রেরণ করেছিলেন।

সেখানে যে পাল্কী ও ছয় জন কাহার আছে, তাদেরই দিয়ে পাল্কীতে তিনি রাঘবকে সঙ্গে দিয়ে চন্দ্রা ও সরযুকে নীলকুঠিতে প্রেরণ করবেন স্থির করে সদর নায়েবের কাছে জরুরী সংবাদ পাঠিয়েছিলেন।

দ্বিপ্রহরের দিকে শম্ভুচরণ এসে সংবাদ দিল, সদর নায়েব কালী বাবু মায়ের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে তার আগের দিনই পাল্কী নিয়ে মোমিনপুর চলে গিয়েছেন। আগামী কাল ফিরবার কথা আছে। সে সত্বেও শম্ভুচরণ জমিদারের আদেশ জানিয়ে দিয়ে এসেছিল কালী বাবু ফিরবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কৃষ্ণসায়রে পাল্কী পাঠিয়ে দেওয়া হয় রাত্রে।

শম্ভু-আনীত সংবাদটা পেয়ে রাজশেখর কিন্তু চিন্তিত হয়ে উঠলেন। এদিকে বাড়ির দুটি পাল্কীর একটি পাল্কী শশাংক বধূকে আনবার জন্ত সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে, অন্যটিতে মাধবী আজ শ্বশুরালয়ে যাত্রা করবে। অগত্যা মোমিনপুর থেকে কালী বাবুর প্রত্যাবর্তন বা নিশ্চিন্দপুর থেকে শশাংকর প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর পথই নেই।

শেষ পর্যন্ত শশাংকর প্রত্যাবর্তনের জন্তই অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই মতই সমস্ত আয়োজনও তিনি গোপনে স্থির করে রাখলেন। শশাংকর এসে পৌঁছানমাত্রই ঠিক হলো, রাঘব পাল্কী নিয়ে আরামকুটিরের দিকে যাত্রা করবে এবং তিনি ও শম্ভু সঙ্গে যাবেন।

এদিকে বৈকালের দিকে মাধবী যাত্রা করে চলে যাবার পর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল ক্রমে ক্রমে, শশাংক ফিরে এলো না।

বৈশাখের মাঝামাঝি তখন। মধ্যে মধ্যে বিকালের দিকে আকাশ কালো করে কালবৈশাখী দেখা দিচ্ছে। সেদিনও সন্ধ্যার পরেই নিশ্চিন্দপুরের আকাশে কালো মেঘে ছেয়ে গিয়েছিল।

আর ঠিক সেই কারণেই সেদিন নির্দিষ্ট সময়ে নিশ্চিন্দপুর থেকে ফিরে আসবার ইচ্ছা থাকা সত্বেও যাত্রা করতে পারল না শশাংকশেখর তার বৌকে নিয়ে।

তারপর রাত আটটা নাগাদ যখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে চাঁদ দেখা দিল, শশাংক বললে সেই রাত্রেই সে যাত্রা করবে।

নিশানাথ ও বসুধারা যথেষ্ট বাধা দিলেন কিন্তু শশাংক কারো কথাই শুনলো না। স্বর্ণময়ীকে সঙ্গে নিয়ে যাত্রা করল। রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহরে স্বর্ণময়ী এসে শ্বশুরালয়ে পৌঁছাল।

বধূর আসবার সাড়া পেয়ে সুরেশ্বরী তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এলেন। এবং পাল্কী থেকে নেমে শাশুড়ীর পায়ে প্রণাম করতেই দু'হাতে বধূকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে স্নেহসজল চক্ষে সুরেশ্বরী বললেন, এসো মা! আমার ঘরের লক্ষ্মী এসো।

উপরে যেতে যেতে বধূ প্রশ্ন করে, মাধুকে দেখছি না, সে কোথায় মা?

সে আজই বিকালে চলে গেছে।

চলে গেছে?

হাঁ, জামাই এসেছিলেন।

আমার সঙ্গে না দেখা করেই মাধু চলে গেল?

তোমরা আসবে আসবে করে সে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত তোমাদের জন্ত অপেক্ষা করেছিল।

সে রাত্রেও রাজশেখর তখনো শয়নঘরে যাননি। কাছারী-ঘরের মধ্যেই বসেছিলেন। তিনি ইতিপূর্বেই স্থির করেছিলেন, আগামী কালই চন্দ্রা ও সরযুকে নীলকুঠিতে পাঠাবেন।

শশাংক ফিরে আসবার পরও শয়নঘরে গেলেন না। কেবল রাঘবকে ডাকলেন। রাঘব দরজার বাইরেই জেগে বসেছিল।

হুজুর।

উপরে যা। শেখরের উপরে নজর রাখবি। রাত্রে সে ঘর থেকে বের হলেই আমাকে এসে সংবাদ দিবি। কিন্তু সাবধান! সে যেন টের না পায়।

নিঃশব্দে মার্জারের মতই ঘর থেকে বের হয়ে রাঘব অলিন্দের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর শশাংক? সে তখন তার নিজের ঘরে খোলা জানলাটার সামনে চন্দ্রালোকিত কৃষ্ণসায়রের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভাবছিল আজকের রাতটা বৃথাই গেল। চন্দ্রা হয়ত এতক্ষণ তারই অপেক্ষায় বসে বসে পালঙ্কের বাজুতে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

হঠাৎ এমন সময় অলঙ্কারের মৃদু শব্দে চমকে ফিরে তাকাতেই শশাংক দেখল, স্বর্ণময়ী কক্ষে প্রবেশ করেছে। চোখাচোখি হতেই মুখটা ঘুরিয়ে নিল শশাংক।

উনিশ

শশাংক গৃহে পৌঁছেই সোজা একেবারে নিজের শয়ন-কক্ষে চলে গিয়েছিল। রাত্রি তখন প্রায় বারটা বেজে গিয়েছে। মাত্র একটি রাত্রি চন্দ্রাকে দেখেনি, অথচ শশাংকর মনে হচ্ছিল যেন এক যুগ সে চন্দ্রার মুখখানি দেখে না। প্রতি নিশীথের মধ্যে

এক দুর্নিবার আকর্ষণ যেমন তাকে কেবলই আরামকুটিরের দিকে টানতে থাকে, আজও তাকে টানছিল। তার সমস্ত বোধশক্তিকে যেন শিথিল করে দিতে থাকে, রাত্রির অন্ধকারে বিশ্বচরাচর ঢেকে গেলেই, চুম্বকের মত একটা আকর্ষণ যেন কেবলই সামনের দিকে তাকে ঠেলতে থাকে। আজও তেমনি ঠেলছিল। শয়নঘরের খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই আকর্ষণের সঙ্গেই যুদ্ধ করছিল শশাংক।

বাইরে থেকে এসে জামা-কাপড় ছাড়বার কথাও যেন তার মনে ছিল না, পথশ্রমের ক্লান্তিও বুঝি সে ভুলে গিয়েছিল।

চন্দ্রা হয়ত কত ভাবছে, কে জানে! কাল রাত্রে আসবার সময় বলে এসেছিল, আজও রোজকার মতই রাত্রে সে যাবে। কিন্তু মা সব গোলমাল করে দিলেন।

কে জানে হয়ত সে এখনো তারই অপেক্ষায় জাগরণেই নিশি কাটাচ্ছে!

চন্দ্রা! তার চন্দ্রা!

না আর এমনি করে দূরে দূরে থাকা যায় না। এ গোপন অভিসার রাতের পর রাত সত্যিই দুঃসহ হয়ে উঠেছে। চন্দ্রাকে নিয়ে সে কলকাতাতেই চলে যাবে। সেখানে নিশ্চিন্ত আরামে দু' জনে বাঁধবে সুখের নীড়। যেখানে প্রতিটি মুহূর্তে তাদের শঙ্কা ও ভয়ে কাটবে না। প্রতি রাত্রে এমনি করে চোরের মত পালিয়ে গিয়ে চন্দ্রার সঙ্গে মিলিত হতে হবে না।

যেখানে রাজশেখর নেই। কুম্ভ সর্দারের সদা-সতর্ক প্রহরা নেই। সবযুর খবরদারী নেই।

হাঁ, সে যাবে। আর দেরি নয়। আগামী কালই রাত্রে সে চন্দ্রাকে নিয়ে কৃষ্ণসাগর ছেড়ে যাবে।

রাতারাতি ঘোড়ায় চেপে নাকি সে মোকিমপুর পৌঁছাতে পারে, সেখান থেকে ভোরের ট্রেণে চাপলে সন্ধ্যা নাগাদ সে কলকাতায় পৌঁছাতে পারবে। স্থলপথেই সে যাবে। জলপথে সে যাবে না। নানা হাঙ্গামা। নৌকা করে কৃষ্ণসাগর না পার হতে পারলে নদীতে পড়তে পারবে না। আর নদীতে না পড়তে পারলে ষ্টীমারও ধরতে পারবে না। অবিশ্যি ষ্টীমারে যেতে পারলে আরো ঘণ্টা তিনেক আগে সে রাধাগঞ্জে পৌঁছে ট্রেণ ধরতে পারত। তার যখন উপায় নেই তখন সোজা এখান থেকে ঘোড়ায় চেপে মোকিমপুরে গিয়েই ট্রেণ ধরতে হবে। তার পর কলকাতায় একবার পৌঁছাতে পারলে—

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল। ঘরের মধ্যে অলঙ্কারের মৃদু সিঞ্জন শুনে ফিরে তাকাল শশাংক। স্বর্ণময়ী ইতিমধ্যে কখন যে এসে ঘরে প্রবেশ করেছে, তা ও টেরও পায়নি।

বাইরের পোষাকে তখনও জানালার কাছে স্বামীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে স্বর্ণময়ীও আশ্চর্য হয়েছিল। সে ভেবেছিল, ইতিমধ্যে পথশ্রমে ক্লান্ত স্বামী হয়ত জামা-কাপড় ছেড়ে শয্যায় শুয়ে ঘুমিয়েই পড়েছে।

স্ত্রীর মুখের দিকে ক্ষণকাল তাকিয়ে থেকে শশাংক আবার খোলা জানালার দিকেই মুখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু মনের মধ্যে কেমন যেন একটা অস্বোয়াস্তি বোধ করতে থাকে শশাংক। একজোড়া চোখের নীরব দৃষ্টি পশ্চাৎ দিক থেকে তার সর্বাঙ্গে নিঃশব্দে যেন ছুঁচ ফোটাতে থাকে।

সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না যখন, শশাংক বুঝতে পারছিল স্বর্ণময়ী নিঃশব্দে যেন তার পশ্চাতে দাঁড়িয়েই আছে।

আজ সকালে শ্বশুরবাড়ীতে পৌঁছাবার পর, দোতলায় একটা ঘরে তাকে বসতে দেওয়া হয়েছিল। এবং জলপানের পর সে যখন একাকী ঘরের মধ্যে বসে বসে একটা উপন্যাসের পাতা উলটাচ্ছে, স্বর্ণময়ী এসে ঘরে প্রবেশ করল। এবং নিঃশব্দে এগিয়ে এসে পায়ের কাছে নত হয়ে গলবস্ত্রে প্রণাম করে একটি মাত্র প্রশ্নই করেছিল, বাবার মুখে শুনলাম আপনি নাকি এসেছেন আমাকে নিয়ে যেতে?

হাঁ। জবাব দিয়েছিল শশাংক, তার পর একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বলেছিল, মা-ই আমাকে পাঠিয়েছেন তোমাকে নিয়ে যেতে এবং বলে দিয়েছেন আজই যেতে।

আর কোন কথাই বলেনি স্বর্ণময়ী। তার পর মিনিট কয়েক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে এক সময় ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল।

বৈকালের দিকে হঠাৎ আকাশ কালো করে কালবৈশাখী শুরু হওয়ায় যাত্রা করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে সন্ধ্যার পর রওনা হয়েছিল তারা। দীর্ঘপথ স্বর্ণময়ী এসেছে পাল্কীতে আর সে এসেছে ঘোড়ায় চেপে। পাল্কীর কাহারদের গতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে গিয়ে সমস্ত পথটাই তাকে প্রায় মন্থর বেগে এক প্রকার পাল্কীর পাশাপাশিই ঘোড়ায় চেপে আসতে হয়েছে। দীর্ঘপথ, কিন্তু দু'জনার মধ্যে একটি বাক্য-বিনিময়ও হয়নি।

সেই কথাই মনে পড়ছিল ঐ মুহূর্তে শশাংকর, আশ্চর্য্য সংযম মেয়েটির, আশ্চর্য শান্ত মেয়েটি!

সেই সেদিন তার চরম আদেশ শুনিয়ে দেবার পর থেকে আশ্চর্য রকম ভাবেই মেয়েটির তার এত কাছাকাছি থেকেও সর্বতোভাবে দূরত্ব বাঁচিয়ে চলেছে। কোন অভিযোগ বা কোন নালিশই জানায়নি।

অথচ ইচ্ছা করলেই ত ও বিদ্রোহ জানাতে পারত। অগ্নি, নারায়ণ-শিলা সাক্ষী করে, পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে স্ত্রী বলেই ত ওকে সে গ্রহণ করেছে। আর কিছু না হোক, সেই দাবী নিয়েও ত ও তার সামনে এসে দাঁড়াতে পারত। কিন্তু কোন দাবীই জানায়নি।

হঠাৎ চমকে ওঠে শশাংক স্বর্ণময়ীর কথায়, রাত ত প্রায় শেষ হয়ে এলো! অনেকটা পথ, পরিশ্রান্ত হয়েছেন—বিশ্রাম নেবেন না?

কি জানি কেন কর্কশ ভাবে প্রত্যুত্তর দিতে মন চাইল না শশাংকর।

মৃদু কণ্ঠে বললে, হাঁ, বিশ্রাম নেবো।

রাস্তার ঐ জামা-কাপড় ছাড়বেন ত?

হাঁ।

দেবো জামা-কাপড়?

দাও।

বস্ত্র পরিবর্তন করে চোখে-মুখে জল দিয়ে শশাংক শয্যায় গিয়ে গা এলিয়ে দিল। সত্যই পথশ্রমের ক্লান্তিতে দু'চোখের পাতা যেন বুজে আসছিল।

কিন্তু চোখের পাতা বুজে আসলেও ঘুম আসে না শশাংকর চোখে। আবার সে চোখ মেলল পাশ ফিরে।

ঘরের দেওয়ালগিরির শিখাটা কমিয়ে দিয়ে পালঙ্কের কিছু দূরে পাথরের ঠাণ্ডা মেঝেতেই একটা মাদুর বিছিয়ে স্বর্ণময়ী শুয়ে পড়েছে। একটি বালিশ পর্যন্ত মাথায় দেবার জন্য নেয়নি।

বাঁ হাতটা ভাঁজ করে হাতের উপরেই মাথা রেখে শুয়েছে। দেওয়ালগিরির বাতির শিখাটা কমিয়ে দিলেও সামান্য যে আলোটুকু ঘরের মধ্যে ছিল তাতেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল শশাংক স্বর্ণকে।

নিটোল বাহুর উপাধানে মাথাটি ন্যস্ত। রাশীকৃত কুঞ্চিত কালো কেশ খোঁপা ভেঙ্গে বাহুর উপরে এলিয়ে পড়েছে। হাতের সোনার চুড়িগুলো সামান্য সেই আলোতেও চিক্-চিক্ করছে।

নির্নিমেষে চেয়ে চেয়ে সেই দিকে দেখতে লাগলো শশাংক!

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মুখখানি। মুদ্রিত দু'টি চক্ষু। ঘুমন্ত পদ্মের মতই যেন মনে হয় মুখখানি।

দেওয়ালগিরির মৃদু আলোর আলতো একটা স্পর্শ যেন এসে পড়েছে মুদ্রিত চক্ষু ঘুমন্ত স্বর্ণর মুখখানির উপরে, এই প্রথম শশাংক স্বর্ণর মুখখানি দেখলো।

বিবাহের সময় লাজবস্ত্রের মধ্যে শুভদৃষ্টির সময়ও তাকায়নি শশাংক ঐ মুখখানির দিকে। নিদারুণ বিতৃষ্ণায় চোখ বুজেই ছিল।

ঐ তার বিবাহিতা স্ত্রী! তার অর্ধাঙ্গিনী! সে বিবাহিত। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, অদূরে শায়িত, নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন মেয়েটি অবিচ্ছেদ্য ভাবেই তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছে।

আর অস্বীকার করবার উপায় নেই! সে যতই অস্বীকার করুক না কেন, সমাজ বলবে ঐ তার স্ত্রী। একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেও সে মন্ত্রোচ্চারণ করে অগ্নি, নারায়ণ-শিলার সামনে সহধর্মিণীর স্বীকৃতি দিয়েছে।

কিন্তু কাল এই সময়ে ওকে ছেড়ে এ জীবনের মতই দূরে চলে যাবে।

আর হয়ত এ-জীবনে কোন দিন ওর সঙ্গে দেখাই হবে না। তথাপি তারই স্মৃতি নিয়ে বাকী জীবনটা ওকে এই সংসারে তারই স্ত্রীর পরিচয়ে কাটাতে হবে।

কিন্তু কেন? সেই যখন অস্বীকার করতে পারল, ঐ বা কেন অস্বীকার করতে পারবে না তাকে? পবিত্র বেদমন্ত্র, অগ্নি-নারায়ণ—সব যত কুসংস্কার! অর্থহীন নীতি। মনই যেখানে গ্রহণ করলো না, মন্ত্রের দাবীতে সেখানে স্বীকৃতির মূল্য কতটুকু? আহা! বেচারী! মিথ্যে সংস্কারের বোঝা বয়েই বেড়াতে হবে অথচ মুখ ফুটে কোন দিন মিথ্যাকে মিথ্যা বলতে পারবে না?

ভাবতে ভাবতে বিনিদ্র চক্ষে তাকিয়ে থাকে শশাংক নিদ্রিতা স্বর্ণময়ীর মুখের দিকে।

সে রাতে ঘুম ছিল না রাজশেখর রায়ের দু'চোখেও। নিদ্রিত রায়বাড়ির কাছারী-ঘরে কেবলই পায়চারি করে বেড়াচ্ছিলেন একাকী। প্রথম যৌবনে রূপের মোহে ক্ষণিক যে ভুল করেছিলেন আজ বুঝি তারই মাশুল দেবার ডাক পড়েছে [illegible] নিজের মনেও তার পাপ ছিল বৈ কি। নইলে কেন সেদিন অপর্ণাকে এনে এই রায়বাড়িতেই তুলেছিলেন? দবীর খাঁ তো বলেছিলই অপর্ণাকে নিয়ে সে চলে যাবে। কিন্তু সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হতে পারলেনই না। এমন কি, পাছে দবীর খাঁ সত্যি-সত্যিই কোন দিন অপর্ণাকে নিয়ে চলে যায়, তাই তাদের উভয়ের উপরেই সর্বদা অত্যন্ত কড়া প্রহরার ব্যবস্থা করেছিলেন। চারি দিক থেকে তাদের প্রহরার কঠিন লৌহপ্রাচীর বসিয়ে, বলতে গেলে বন্দীই করেছিলেন। কিন্তু তখনও বুঝতে পারেননি, জোর করে নারীর দেহটাকে বন্দী করলেও তার মনকে বন্দিনী করা যায় না। এবং তার সমস্ত সতর্কতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে তারই তৈরী লৌহবাসরে শেষ পর্যন্ত প্রবেশ করলো কালনাগিনী। তার হাতে তৈরী রূপবহ্নিকে ভোগের পূর্ব মুহূর্তে তার গ্রাস থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল!

সেদিন স্ত্রী সুরেশ্বরী ঠিকই বলেছিলেন, তোমার ব্যর্থ পৌরুষের আক্রোশে আজ তুমি হিতাহিত জ্ঞানশূন্য। তুমি আজ অন্ধ। তাই তুমি রঘুবীরের হত্যায় নিষ্ঠুরতার মধ্যেও কোন পাপ দেখতে পাচ্ছো না। তোমার মনের লুকানো পাপই আজ আক্রোশের রূপ ধরে রঘুবীরকে হত্যা করেছে!

সত্যিই তাই।

নইলে আজও তিনি সে অপমানের দুঃসহ জ্বালাকে এই দীর্ঘ দিনের মধ্যেও ভুলতে পারলেন না কেন? হঠাৎ এমন সময় কাছারী-ঘরের বন্ধ দরজায় করাঘাত পড়লো, কে? চমকে উঠলেন রাজশেখর রায়।

চোখে নিদ্রা ছিল না সে রাত্রে সুরেশ্বরী ও। নিভৃতে ঠাকুরঘরে, গৃহ-দেবতা গোপীবল্লভের মৃন্ময় মূর্তির সামনে চক্ষু মুদে বসেছিলেন। মুদ্রিত চক্ষুর দুটি কোল বেয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরে পড়ছিল।

সতী নারী ভানুমতীর চোখের জলের ঋণশোধ কি আজও হলো না?

স্বামীর দেওয়া অবহেলা ও অপমানের জ্বালা যে তিনি শশাংককে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরেই ভুলতে চেয়েছিলেন! এ-বাড়ির বধূদের মত হতভাগিনী স্বর্ণকেও তবে কি সারাটা জীবন ধরে চোখের জলই মুছতে হবে? না। না—যেমন করে হোক, অবশ্যম্ভাবী ঐ অভিশাপকে, যেমন করেই হোক তাকে রোধ করতে হবে। উঠে পড়লেন চোখের জল মুছতে মুছতে সুরেশ্বরী। ঠাকুরঘর থেকে বের হয়ে সোজা চলে গেলেন উপরের তলায় পুত্রের শয়নঘরের দিকে।

পুত্রের শয়নঘরের বন্ধ দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলেন, ক্ষণকাল বুঝি ইতস্তত করলেন। তার পরই মৃদু কণ্ঠে ডাকলেন, বৌমা! বৌমা!—

চন্দ্রা!...

সরযূর ডাকে চন্দ্রা চমকে ওঠে।

নিদ্রাহীন চক্ষে নিজের ঘরের খোলা জানালাটার সামনে, বাইরের নিশ্চিদ্র অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি ফেলে পাষাণপুত্তলিকার মতই যেন দাঁড়িয়ে ছিল চন্দ্রা।

রাত শেষ হতে চলল অথচ শশাংক এলো না।

তবে কি আজ রাত্রে শেখর আর আসবে না? হঠাৎ সরযূর ডাকে ফিরে তাকাল চন্দ্রা।

আজ রাতে কি আর ঘুমাবি না? এমনি করেই জেগে বসে থাকবি?

ঘুম যে আসছে না সরযূ!

সরযূ এবারে এগিয়ে এসে একেবারে চন্দ্রার সামনে দাঁড়াল। মুহূর্তকাল চন্দ্রার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, আমার কথা শোন চন্দ্রা! আজ কয় দিন থেকেই কেন যেন কেবলই আমার মন বলছে, এ ভাল হচ্ছে না। শেখরের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক তুই ছিন্ন করে দে!···

সরযূ! বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর মতই যেন বেদনার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো।

তুই বুঝতে পারছিস না চন্দ্রা, এত দিন পরে কাল যখন হঠাৎ আবার রাজশেখর আরামকুটিরে এসেছে, নিশ্চয়ই তার মনে কোন রকম সন্দেহ হয়েছে। ভয়ে কাল থেকে বুক আমার কাঁপছে চন্দ্রা!···

দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্ত চাপা কণ্ঠে বলে উঠলো 'চন্দ্রা, পারবো না। আমি পারবো না সরযূ, তাকে ভুলতে। তার জন্য যদি আমাকে মরতেও হয়, তবু ভুলতে পারবো না!

পারবো না। আমি ভুলতে পারবো না, আমার মনুকে ওস্তাদজী! তার জন্য যদি আমাকে রাজশেখরের হাতে প্রাণ দিতেও হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অপর্ণা দবীর খাঁর সামনে।

বুড়ো শিবের ভাঙ্গা মন্দিরের পাষাণ-চত্বরের উপর উপবিষ্ট বৃদ্ধ দবীর খাঁর হাঁটুর উপরে মাথা রেখে কেঁদে ওঠে অপর্ণা।

কিন্তু বেটি, ভুলতে পারলেই বুঝি ভাল হতো রে! কন্যা-স্নেহে রোরুদ্যমানা অপর্ণার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে দবীর খাঁ বলেন।

চারিদিকে ঘন গাছপালার মধ্যে মধ্য যামিনীর অন্ধকার যেন স্তূপ বেঁধে আছে। সেই অন্ধকারের স্তূপে স্তূপে কখনো নিবছে কখনো জ্বলছে জোনাকীর হাজারো বাতি।

মধ্যে মধ্যে হঠাৎ ঝিঁঝি-ঝিল্লী ধ্বনি করে ওঠে! ঘুম ভাঙ্গা বিহঙ্গের হঠাৎ পাখার ঝাপটানি চারিদিককার স্তব্ধতায় সাড়া জাগায়।

শোন। শোন বেটি, আমার কথা শোন। নিশ্চয় করে আমি তোকে বলতে পারি, আর যাই করুক রাজশেখর তোর মনুকে প্রাণে মারবে না। তাকে ত আমি জানি, এত বড় ভালবাসার সে অপমান করবে না।

না। না—ও শয়তান ও ঘাতককে আর বিশ্বাস নেই! ও সব পারে, সব পারে!···

কিন্তু বেটি, আমি ত তোর মনুর খোঁজ এখনো পাইনি!···

পাওনি?

না।

রাজশেখর রায় এখন কোথায় জানো ওস্তাদজী!

হাঁ, সে বোধ হয় এখনো কাছারীঘরেই আছে।

বেশ। তবে আমি চললাম। বলেই অপর্ণা উঠে দাঁড়াল। এবং যাবার জন্য পা বাড়াতেই দবীর খাঁ বাধা দিলেন।

কোথায় যাচ্ছিস বেটি! শোন! শোন—

কিন্তু দবীর খাঁর ডাকে অপর্ণা কর্ণপাতও করলো না। দ্রুতপদে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল মুহূর্তে।

সত্যিই যেন মরীয়া হয়ে উঠেছিল অপর্ণা। আর কারো কথাই সে শুনবে না। সোজা সে রাজশেখরের কাছেই এবারে যাবে। এবং তাকেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে তার মনুর কথা।

এমনিতে সে তার মনুর সন্ধান দেয় ভালই, নচেৎ পায়ে ধরে সে বলবে মনুকে তার ফিরিয়ে দিতে।

সোজা চলে এলো রায়বাড়িতে অপর্ণা। এবং এসে দাঁড়ালো কাছারীঘরের বন্ধ দরজার সামনে। কোনরূপ ইতস্তত না করেই বন্ধ দরজার গায়ে করাঘাত হানলো।

ভিতর থেকে সাড়া এলো, কে?

আবার দরজার গায়ে করাঘাত হানলো অপর্ণা।

পরমুহূর্তেই দরজা খুলে গেল।

কোনরূপ দ্বিধামাত্রও না করে অপর্ণা ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো, অপর্ণার মাথায় দীর্ঘ অবগুণ্ঠন টানা। রাজশেখর প্রথমটায় চিনতেই পারেন না অপর্ণাকে, তাইতেই বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে, ঈষৎ হেঁটে গিয়ে প্রশ্ন করেন, কে! কে তুমি?

অবগুণ্ঠনবতী অপর্ণা তখন দরজার কপাট দুটো ভেজিয়ে দিয়ে তার উপরে পৃষ্ঠদেশ স্থাপন করে দাঁড়িয়েছে, কে তুমি ?

অবগুণ্ঠন তুলে দিল অপর্ণা।

ঘরের মৃদু দেওয়ালগিরির আলোকে অনবগুণ্ঠিতা সেই মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে দু'পা যেন নিজের অজ্ঞাতেই পিছিয়ে আসেন রাজশেখর রায়।

বিস্ময়-চকিত কণ্ঠ হতে তার একটিমাত্র শব্দই উচ্চারিত হয়, অপর্ণা !

একি বিস্ময় ! একি স্বপ্ন না সত্যি ?

ক্ষণপূর্বে এই নিশিরাত্রে মস্তিষ্কের সমস্ত চিন্তাজালকে আচ্ছন্ন করে আজকের নিদ্রা হরণ করেছে যে নারী, সে যে এমনি অভাবিত রূপে এমনি অকস্মাৎ তার সামনে এসে দাঁড়াবে, এ যেন তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি !

হাঁ, আমি অপর্ণাই। চিনতে পেরেছেন তাহলে আমাকে ? বুঝতে পেরেছেন যে আজও আমি মরিনি ?

তুমি যে মরোনি তার প্রমাণ আগেই আমি পেয়েছিলাম।

আজ আমি আপনার কাছে একটা ভিক্ষা চাইতে এসেছি।

ভিক্ষা ?

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়।

অপর্ণা আজ তার সামনে ভিক্ষাপ্রার্থিনী।

হাঁ, ভিক্ষা ! আমার মনুকে আপনি ফিরিয়ে দিন !

কা'কে ফিরিয়ে দেবো ?

আমার একমাত্র সন্তান, মনুকে, যাকে আপনি আমার বুক থেকে একদিন দস্যুর মত ছিনিয়ে এনেছিলেন।

মনুকে তোমার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছো অপর্ণা, তাই না ? কিন্তু তা'ত আজ আর হবার নয় ?

হবার নয় ?

না।

রাজশেখরের পায়ের সামনে বসে পড়লো অপর্ণা। কান্নাঝরা সুরে বললে, দয়া করুন ! আমাকে দয়া করুন।

দয়া ? আজ তুমি দয়ার প্রার্থিনী হয়ে আমার কাছে এসেছো অপর্ণা, তাই না ? কিন্তু সেদিন যখন একজনের নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের বুকে ছুরি হেনে চলে গিয়েছিলে, কোথায় ছিল সেদিন তোমার আজকের এই নীতিজ্ঞান ? তখন কেন ভাবনি যে, একদিন যার বুকে তুমি অনায়াসে ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেলে, তারই পায়ের তলায় আবার একদিন তোমাকে আজকের মতই দয়া-ভিক্ষা করতে হতে পারে ?

দয়া করুন আমাকে, ক্ষমা করুন।

দয়া, ক্ষমা, আজ আর রাজশেখরের হৃদয়ে নেই অপর্ণা !

কিন্তু একদিন ত সত্যিই আপনি আমাকে ভালবেসেছিলেন ?

হাঁ বেসেছিলাম, পৃথিবীতে কেউ বুঝি কাউকে অতখানি ভালবাসতে পারে না। কিন্তু সে ভালবাসার চিহ্নমাত্রও নেই আজ রাজশেখরের বুকে !

দেবেন না ? আপনি আমার মনুকে তাহলে ফিরিয়ে দেবেন না ?

না। না—

সহসা উঠে দাঁড়াল অপর্ণা। সমস্ত দেহটা তার ঋজু প্রদীপ-শিখার মতই প্রজ্বলিত হয়ে উঠলো।

মাথার গুণ্ঠন খসে গিয়েছে। চোখে আগুন।

দেবেন না ?

না। না—

বেশ। তবে আপনিও জেনে রাখুন, আপনার কবল থেকে অপর্ণা তার সন্তানকে ছিনিয়ে নেবেই। সাধ্য নেই আপনার, আপনি তাকে জোর করে ধরে রাখেন, বলে ঝড়ের বেগেই যেন অপর্ণা ঘরের দরজাটা এক টান দিয়ে খুলে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

হাঃ হাঃ, করে রাজশেখর রায় হেসে উঠলেন। [ক্রমশঃ।

প্রতিরোধ

প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায়

শিবিরে শিবিরে নেই অসির ঝঙ্কার,
দুর্গে দুর্গে ওড়ে না তো বিজয়ের উদ্ধত পতাকা,
সন্ধির রাজদূত ক্ষয়িষ্ণু জীবনের দিন গোণে,
দামামার উগ্র উচ্চ ঘোষণা থেমেছে,
অশ্বারোহী, পদাতিক যোদ্ধারা বিশ্রামে।
আণবিক রোশনাই আকাশ-পিদীম হ'য়ে
আলো দেয় শূন্য ছিন্ন শিবিরে শিবিরে
আতঙ্কের ছায়া ফেলে দুর্গে দুর্গে প্রতি ক্ষণে ক্ষণে।

এসো, বন্ধু, ভুলে যাই ব্যর্থ অহমিকা,
জীবনের নির্দয় পথে হাতে হাত রাখি,
এসো, বন্ধু, সন্ধি হোক্ প্রাণ থেকে প্রাণে,
শান্ত হোক এ রক্ত-পিপাসা।
আণবিক রোশনাই হয় হোক্ আকাশ-পিদীম,
আমরা তবুও এসো পাশাপাশি মিছিলে দাঁড়াই।



—বিবেকানন্দ-স্তোত্র—

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

১২

প্রত্যেক জীবনের মূলে
এক-একটা মূলসুর
থেকে থেকে গুঞ্জন তোলে।
সেটা তার মূলসত্তা,
ব্যক্তিত্বের মধুগুঞ্জরণ।
জীবনী লিখতে বোসে তাই
ঘটনার কোলাহল থেকে
সেই মূল-সুরটাকে
সযত্নে কুড়িয়ে আনা চাই।
জীবনীর মূল উপাদান—
প্রথম বিকাশ থেকে
ব্যক্তিত্বের শেষ পরিণাম।
অন্তরের সহস্রদল
কোথায় কতটা খোলে, কখন, কি ভাবে,
পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটে ওঠে কবে,
—এরই ইতিহাস
জীবনীর মূলমন্ত্র,
ঘটনার মালা গাঁথা নয়।

* * *

তা' যদি না হয়,
'আপেলটা' বড় হোতো
নিউটন নয়।
তার আগে আপেল কি পড়েনি মাটিতে?
কার মনে উঠেছিল এত বিপ্লব?
আপেল প'ড়তে দেখে তারা খুব জোর
দেখেছে 'রিসার্চ্' কোরে মিষ্টি না টক্।
পড়ন্ত আপেলের এইটুকু দাম—
নিউটন্ দেখেছেন নিউটনি চোখে।
হৃদয়ের শতদল—সে তো খুলবেই,
বহির্ঘটনা তার তুচ্ছ গোলাম।
অন্তঃপ্রকৃতির প্রয়োজনটাই
বহির্জগতে তার ঘটনা ঘটায়।
তাইতো আপেল পড়ে হঠাৎ সেদিন,
বুদ্ধের চোখে পড়ে রোগ, শোক, জরা,
কলিঙ্গ ভেসে যায় রক্ত-নদীতে,
'পলিটিক্স্' করে মন্থরা।

* * *

আসল কথাটা হোলো—পদ্ম যে খোলে,
তারই ইঙ্গিতে ওরা রায়পুরে যায়;
তারই ইঙ্গিতে ঐ পাহাড়ের গায়
মধু নিয়ে মৌচাক দোলে।

১৩

বুদ্ধ আসার পর থেকে
জীবনের লক্ষ্যটা গিয়েছিল বেঁকে।
ফের কবে খ্যাখা পাবে তাঁর,
তারই প্রতীক্ষায়
সমস্ত শরীর মন রোমাঞ্চিত হোতো থেকে থেকে।
তখন ছিল না জানা 'বুদ্ধ' মানেটা কি।
"Buddha is not a man
But a state."*
নরেন তখন সেটা বোঝেনি মোটেই।
তখনো বোঝেনি
'বুদ্ধ' মানে মায়া-মোহ বিসর্জন দিয়ে
আত্মসাৎ কোরে নেওয়া সেই অবস্থাটা;
চিনিতে-বালিতে মেশা এই পৃথিবীতে
বালি ছেড়ে চিনি চাটা পিঁপড়ের মত;
ছন্নছাড়া জীবনের কোলাহল থেকে
অন্তর্নিহিত সত্যে হওয়া উপনীত।
'বুদ্ধ' মানে চিত্তটাকে বৃত্তিহীন করা,
'এহ বাহ্য আগে কহ' বোলে
অসীমের মৌচাকে ঢিল ছুঁড়ে মারা।

* * *

তাই যদি হয়
বিন্ধ্যাচলের বুকে

---

* "বুদ্ধ কোনো ব্যক্তিবিশেষের নাম নয়, ওটা হচ্ছে মনের একটা উচ্চাবস্থা।"

মৌমাছির গুঞ্জরণটা কি
বুদ্ধের চরণ-ধ্বনি নয় ?

* *

এটা যেন ঠিক
ছ'বছরে ঠাকুরের সেই
কৃষ্ণ মেঘের বুকে
শুভ্র বলাকা দেখে
সমাধির দেশে চলে যাওয়া।
শিল্পের শিহরণে শিল্পীকে সরাসরি চাওয়া।*
কালোমেঘে বলাকার শ্রেণী
তার আগে কেউ কি দ্যাখেনি ?
মৌচাক দেখে কার মনে হয় বলো
অসীমের মৌচাকে মারি এক ঢিল ?

* * *

তার মানে এই—
আমের বাগানে ঢুকে আম না-খেয়েই
গাছের বিচার কোরে 'বটানিষ্ট' হোতে চায় না সে।†
'এহ বাহ্য আগে কহ আর'
—এই হোলো জীবনের মূলসুর তার।

১৪

"It is grand and good
To know the laws
That govern the stars and planets ;
It is infinitely grander and better
To know the laws
That govern the passions,
The feelings
The will of mankind." *

* * *

আমরা সবাই
অন্তর্নিহিত সেই সত্যকে চাই।
অধ্যস্ত আমিকে ভুলে
সকলেই ব্রহ্মানন্দ চাই।
আমাদের হাসি-কান্না দিয়ে,
কাম-ক্রোধ-ভালোবাসা-মায়া-মমতায়,
স্বার্থ-দ্বেষ-বুদ্ধি আর বুদ্ধি-হীনতায়,
আমরা সবাই
অন্তর্নিহিত সেই ব্রহ্মকে চাই।
এই হোলো জীবনের 'মাধ্যাকর্ষণ'!
এ-ক্ষেত্রে নিউটন্‌ও ব্যতিক্রম নন।
তবে কথা এই—
অন্তরে পেতে হয় যাকে,
ইন্দ্রিয়ের অগোচর শাশ্বত সেই স্রষ্টাকে,
আমরা তাকেই
বহির্জগতে খুঁজি 'বাঁদরে' 'আপেলে'।
ডারউইন-নিউটন সে-হিসেবে আমাদেরই দলে।
আমাদেরই গুরুভাই এঁরা
নয় শুধু বুদ্ধ বা বিবেকানন্দরা।
খাতা-পেন্সিল নিয়ে দুনিয়াটা জেনে
ওদের কি চিঁড়ে ভেজে বাপ্‌ ?
তাইতো ওদের কথা
আমাদের আনে সন্তাপ।

"Did not gravitation
Already exist in nature
Before it was observed and named ?
Then
What difference does it make
To know that it exists ?
Are you happier than the Red-Indians ?"†

* * *

তা-ছাড়াও ভেবে দ্যাখো দেখি
অন্তর্জগতে ও-'থিওরি' খাটে কি ?

---

* ঠাকুরের বয়েস তখন তখন মাত্র ছ'বছর। কামারপুকুরে ধানক্ষেতের সরু আল্ দিয়ে একদিন মুড়ি চিবোতে চিবোতে যাচ্ছেন। হঠাৎ কি মনে হোলো, আকাশের দিকে একবার তাকালেন। দেখলেন—একটা বিশালকায় কালো মেঘ সারা আকাশটাতে ছড়িয়ে পড়ছে আর এক ঝাঁক সাদা বক সেই কালো-মেঘের বুকের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে। আহা কি সুন্দর! কবি রামকৃষ্ণের শরীর এবং মন এই অনির্বচনীয় সৌন্দর্যে শিউরে উঠলো! দেহের খাঁচাটাকে মাটিতে ফেলে রেখে পাখা মেললেন—এই দিব্য মহিমামণ্ডিত শিল্প সৃষ্টি কোরেছেন যিনি—তাঁর সন্ধানে।

† শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রায়ই তাঁর পণ্ডিত এবং তার্কিক ভক্তদের বোলতেন—"তুই আম খেতে এসেছিস, আম খেয়ে যা। বাগানে কত শত গাছ আছে, কত হাজার ডাল আছে, কত কোটি পাতা আছে, এ সব হিসেবে তোর কাজ কি ? তুমি এ-সংসারে ঈশ্বর সাধনের জন্যে মানবজন্ম পেয়েছো, ঈশ্বরের পাদপদ্মে কিরূপে ভক্তি হয়, তাই চেষ্টা করো।"—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ)

* "যে-নিয়মগুলোর দ্বারা গ্রহ নক্ষত্র চালিত হচ্ছে তাদের জানা বেশ কথা। কিন্তু তার সহস্র গুণে মহৎ এবং উত্তম হচ্ছে সেই নিয়মাবলী জানা—যা' মানুষের মনোবৃত্তি, রিপু এবং ইচ্ছাশক্তিকে চালিত কোরছে।" —জ্ঞানযোগ।

† "'মাধ্যাকর্ষণে'র আবিষ্কার ও নামকরণের আগেও কি ও-শক্তিটা প্রকৃতিতে ছিল না ? যদি ছিলই, তবে তার অস্তিত্ব জানাতে তফাৎটা কি হোলো ? বলি, অ্যামেরিকার 'রেড-ইণ্ডিয়ান'দের চেয়ে কি তোমরা বেশী সুখী হয়েছো ?"—পত্রাবলী

আত্মার আপেল তো ফের গাছে চড়ে ;
মাটির 'গ্র্যাভিটি'কে তো করে না কেয়ার।
অনন্ত থেকে এসে আমরা সবাই
অসীমেই যাচ্ছি ও যাবো।
আজীবন ধরে শুধু বাইরেটা জেনে
হৃদয়ের পিপাসা মেটে কি ?
"Such a conception
Is nothing to me.
If I had only to learn
How an apple falls on the ground,
I would commit suicide."*

* * *

তিনি চান জীবনের মূল উৎসকে,
আজীবন তাকে খুঁজেছেন।
"I want the 'why' of everything,
I leave 'how' to the children."†

* * * *

তার মানে এই—
আপেলটা কার টানে প'ড়েছে মাটিতে
এ-তথ্যে হৃদয়ের কতটুকু লাভ ?
স্বামিজী জানতে চান 'শেষ কেন'টাকে,
পৃথিবীটা কেন টানে ও-আপেলটাকে ?
গ্রহ কেন টানে গ্রহ বিরামবিহীন ?
দিন কেন রাত টানে, রাত কেন দিন ?
পরমাণু কেন টানে পরমাণুটাকে ?
মা' কেন ছেলেকে টানে, ছেলে কেন মা'কে ?
মৌচাক কেন টানে নরেনের মন ?
'থিওরি'র টানে কেন বাঁধা নিউটন্ ?
গাড়ি চাপা প'ড়ছে যে—তাকে কেন টানা ?
কেন টানো পকেটের 'মনিব্যাগ'খানা ?
যীশু কেন প্রাণ দান মানুষের টানে ?
সোনার টানেতে কেন খুনে ছুরি হানে ?
তাঁর টানে সব টান, টান মানে তিনি।
জন্মই বৃথা তার—এটা যে বোঝেনি !

* * * *

'এহ বাহ্য আগে কহ আর,'
—এই হোলো জীবনের মূলসুর তার।
ঐ জন্যেই
'পড়ার বই'এর প্রতি নরেনের কোনো মন নেই।
ঐ জন্যেই
আজীবন রাশি-রাশি বই প'ড়ে প'ড়ে
'থিওরি'র 'গ্র্যাভিটি'তে পড়েনি নরেন।
"He is brainless,
Nor has He any reason.
He is fooling us
With little brains and reason."*

[ক্রমশঃ।

* "আমার কাছে এ-সব ধারণার কোনো মূল্যই নেই। আপেল কি ভাবে মাটিতে পড়ে—এইটে জানাই যদি জীবনের একমাত্র কাজ হোতো, তাহ'লে আমি গলায় দড়ি দিতুম।" —জ্ঞানযোগ।

† "আমি সব কিছুর 'কেন'টাকে জান্তে চাই, 'কেমন কোরে হয়' এ-খোঁজ অপোগণ্ডেরা করুক্‌গে।" —জ্ঞানযোগ।

* "ভগবানের তো কোনো মাথামুণ্ড নেই, তিনি যুক্তি-বিচারেরও কোনো ধার ধারেন না। তিনি আমাদের ছটাকে মাথা এবং বুদ্ধি দিয়ে বোকা বানিয়ে রেখেছেন।"—পত্রাবলী।

আবর্ত্তিতা

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

কোন তরঙ্গ উত্তল হ'য়েছে রেখায়িত তনিমায়
কোন বিদ্যুৎ ম্লান হ'য়ে গেছে তনিমার ভাঁজে ভাঁজে—
অরুণিমা বলো সে কোন তুফান, সে কোন তুফান হায় ;
কোন রহস্য তোমার চলার পদসিঞ্চনে বাজে ?

সাহারার তৃষা আছে কী তোমার, জলে কী তোমার বুকে
সোনার রোদের রং লেগেছে কী, তোমার চপল ঠোঁটে ?
শ্যামল মাঠের শ্যামলিমা আছে, আছে কী তোমার মুখে ;
এক-জোড়া অকে দেখেছো কখনো প্রজাপতি বনে ছোটে ?

অরুণিমা বালা, ইরাণী মেয়ের লালিমা কোথায় পেলি
বলাকার মত ওড়বার নেশা পেলে তুমি কোথা কবে,
পেয়েছো কখনো শূন্যের স্বাদ মন পাখা মেলে মেলে
নাই যদি পাও, অলীক বাসনা মিছে কেন কর তবে ?

নিগূঢ় ইসারা দেখছো কখনো অরুণিমা তনিমায়—
তোমার দেহের ভাঁজে ভাঁজে আছে, সবুজের সুঘ্রাণ—
অরুণিমা বলো চোখের ইশারা কী আজ তোমার চায় ;
ফুলের গন্ধে ভরবে না আজ তোমার তৃষিত প্রাণ ?

জোয়ারের স্বাদ পেয়ে থাকো যদি পেয়েছো মনের সীমা
বলো আজ তুমি সোনালী মেয়ে গো, বলো তুমি অরুণিমা।


নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নীচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো·
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো!
নির্ম্মলার বাসা
না এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
মুন্নার খ্যালনা টা মালতীকে ফিরিয়ে দাও না কেন?
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
(ভাবলো)কিন্তু কি পরিস্কার করে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা নিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ-আর তোমার তোয়ালে-টাও নিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমিনা একটা কথা বলবে-
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
কিন্তু আমি তো আছড়াইনা, - আমি যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনী ফেঁসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছাড়েই পরিস্কার করে কাচে - আর সেইজন্যে কাপড় টেঁকেও বেশী দিন।
সত্যিই! সানলাইট সাবানে বিনা আছাড়েই সাদা আর ঝক্‌ঝকে পরিস্কার হয়-কাপড় টেঁকেও বেশী দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
সান্‌লাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
S. 234-X52 BG



(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডি. এচ. লরেন্স

ক্লারা একটা ফুল চিরে বীজগুলি বার করবার চেষ্টা করছিল। ওর মাথার উপর এলিয়ে পড়েছে একটা 'হলিহক্'এর লতা, মৌমাছির দল মৌচাকের পথে পাড়ি জমিয়েছে। পল বলল, 'হ্যাঁ। বেশ করে গুণে নাও টাকাগুলো।'

ক্লারা ফুলের বীজগুলি গুণে গুণে রাখছিল। ওর দিকে চেয়ে হাসল। বলল, 'আর কি, এ বারে বড়লোক।'

পল বলল, 'ইস্, এ আর কত? এগুলোকে সোনা ক'রে নেওয়া যায় না?'

—'আহা তাই যদি হ'ত!' ক্লারা হাসল। হাসতে হাসতে দু'জনে চাইল দু'জনার দিকে। ঠিক সেই মুহূর্তে মিরিয়াম এসে উপস্থিত হ'ল। খুট করে দৃশ্যটা বদলে গেল যেন। পল উৎফুল্ল ভাব দেখিয়ে বলল, 'আরে, মিরিয়াম যে! তুমি আসবে বলেছিলে বটে!'

—'হ্যাঁ। কেন, ভুলে গিয়েছিলে না কি?'

ক্লারার সঙ্গে করমর্দন করল মিরিয়াম। বলল, 'তোমাকে এ বাড়িতে দেখতে পাওয়া কেমন আশ্চর্য্য নয়?'

—'হ্যাঁ।' ক্লারা জবাব দিল, 'এখানে এলে কেমন-কেমনই যেন লাগে।'

এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত: করল দু'জনেই। তার পর মিরিয়াম বলল 'জায়গাটা ভারী সুন্দর, নয়?'

—'আমার ত' খুবই ভালো লাগে।'

সে দিন মিরিয়াম বুঝতে পারল, ক্লারা যেমন করে এ বাড়ির অন্তরে প্রবেশ করেছে, সে কোন দিন তেমন করে প্রবেশ করতে পারেনি।

পল বলল, 'তুমি কি একাই এসেছ নাকি?'

—'হ্যাঁ। আমি চা খেতে গিয়েছিলাম অ্যাগাথার ওখানে। গির্জ্জের যাবার পথে ক্লারাকে একটু দেখে যাবার জন্যে ঢুকে পড়লাম।'

—'এলেই যদি, চায়ের সময় একেই পারতে?'

শুনে মিরিয়াম সংক্ষেপে একটু হাসল মাত্র। আর ক্লারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে লাগল।

পল আবার জিজ্ঞেস করল, 'ক্রীসান্থীমাম্ ফুলগুলোকে কেমন লাগছে?'

—'সত্যি, খুব চমৎকার!'

—'আচ্ছা কোন রঙটা তোমার সব চাইতে পছন্দ?'

—'কে জানে। বোধ হয় ঐ ব্রোঞ্জ রঙের ফুলটা।'

—'তা'হলে তুমি সবগুলো দেখনি। এসো, দেখবে এসো। ক্লারা, তুমিও দেখবে চলো কোনটা তোমার সবচেয়ে পছন্দ।'

মেয়ে দুটিকে নিয়ে পল ফিরে গেল বাগানে। ফুলে ফুলে ছড়াছড়ি সেখানে—নানা রঙের ফুল পথের দু'ধারে এলোমেলো হয়ে ফুটেছে। এ অবস্থায় পড়েও পল একটুও বিব্রত বোধ করছিল না নিজেকে। বলল, 'এই দিকে চেয়ে দেখ, মিরিয়াম! এই সাদা ফুলগুলো তোমাদের বাগান থেকেই আনা হয়েছিল। এখানে কিন্তু এদের আর তত সুন্দর দেখাচ্ছে না।'

—'হ্যাঁ, তাই বটে।'

ওরা যখন বাগানে, তখনই গির্জ্জার ঘণ্টা বাজতে শুরু করল। তার তীক্ষ্ণ শব্দ শহরের প্রান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে। মিরিয়াম গির্জ্জার চূড়ার দিকে চাইল একবার, মনে পড়ল কত বার এই গির্জ্জার ছবি এঁকে পল তাকে উপহার দিয়েছে। সে ছিল আর এক দিন, কিন্তু আজও ত' পল ওকে একেবারে ত্যাগ করেনি? মিরিয়াম একটা বই চাইল পড়বার জন্যে। পল ছুটে গেল বাড়ির মধ্যে।

মা গম্ভীর ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, 'ও কে? মিরিয়াম নয়?'

—'হ্যাঁ। ও বলেছিল ক্লারা এলে দেখা করতে আসবে।'

—'ও, ওকেও তা'হলে বলা হয়ে গেছে?' মা ব্যঙ্গ করে বললেন।

—'বলেছি তো। কেন, দোষটা কী?'

—'না, দোষ আবার কি।' বলে মিসেস মোরেল বইয়ের পাতায় মন দিলেন আবার। কিন্তু মায়ের ব্যঙ্গ পলের মনে ছুঁচের মত ফুটতে লাগল, ভুরু কুঁচকে সে ভাবতে লাগল, 'কী অন্যায়, নিজের খুশিমত কিছুই আমি করতে পারব না?'

এদিকে মিরিয়াম ক্লারাকে বলছিল, 'তুমি ত' মিসেস মোরেলকে এর আগে আর দেখনি?'

'না। কিন্তু ভারী চমৎকার লোক উনি। এমন ভালো!' মিরিয়াম মুখ নিচু করে মনের ভাব গোপন করল। বলল, 'হ্যাঁ। অনেক দিক দিয়েই উনি খুব চমৎকার।'

'আমারও আজ তাই মনে হ'ল।'

'আচ্ছা পল তোমাকে ওঁর কথা অনেক বলেছে, নয়?'

'তা বলেছে বই কি।'

'তবে ত' তুমি জানই।'

তার পর পল বইটা নিয়ে না-আসা অবধি দু'জনেই চুপচাপ বসে রইল। পল এলে মিরিয়াম জিজ্ঞাসা করল, 'ওয়াইলি ফাম্নে কবে আসছ?'

'বলতে পারি না।' ক্লারা বলল জবাবে।

—'মা বলে দিয়েছেন, তুমি গেলে খুব খুশি হবেন, যেদিন খুশি চলে এসো।'

—'তাঁকে বলো, যেতে খুব ইচ্ছে, কিন্তু কবে যাওয়া হবে জানি না।' মিরিয়াম যেতে যেতে সংক্ষেপে বলল, 'বেশ তাই বলব।' মনের বিরক্তি আর সে চাপতে পারছিল না। পল বলল, 'বাড়ির ভেতরে আসবে না তা'হলে ?

—'না। আজ নয়, ধন্যবাদ।'

—'আমরাও যাব গির্জ্জেয়।'

—'বেশ ত', আবার দেখা হবে তা হলে।' মিরিয়াম তিক্ত কণ্ঠে বলল।

—'আচ্ছা।' বলে পল বিদায় নিল। মিরিয়ামের কাছে নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী বলে মনে হ'ল তার। মিরিয়াম অন্তরে অন্তরে জ্বলছিল, পলের উপর দারুণ ঘৃণা জাগছিল তার। পল যে একান্ত ভাবে তার, এ বিশ্বাস তখনও মন থেকে সে দূর করতে পারেনি। তবু কী করে সে ক্লারাকে বাড়ি নিয়ে আসে, মায়ের সঙ্গে গির্জ্জেয় এসে ওকেই পাশে নিয়ে বসে, ধর্ম্মসঙ্গীতের যে বইখানা অনেক দিন আগে সে মিরিয়ামের হাতে তুলে দিয়েছিল, আজ কি ক'রে সেই বইখানাই আবার সে ক্লারার হাতে দিতে যায়, আশ্চর্য্য! দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মিরিয়াম শুনল, পল শশব্যস্ত হয়ে ভিতর-বাড়ির দিকে ছুটে চলেছে।

পল কিন্তু সোজাসুজি বাড়ির মধ্যে গেল না। বাইরে মাঠের ঘাসের উপর দাঁড়িয়ে সে শুনতে পেল মায়ের গলা আর তার উত্তরে ক্লারার উক্তি। ক্লারা বলছে: 'মিরিয়ামের মধ্যে যে জিনিসটা আমার সব চেয়ে খারাপ লাগে সে হ'ল ওর এই শিকার খুঁজে বেড়ানো—অনেকটা ব্লাড হাউণ্ড কুকুরের মত, একেবারে নাছোড়বান্দা।'

মা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, বললেন, 'ঠিক বলেছ। এই জন্যেই ওকে তোমার খারাপ না লেগে পারে না, কেমন ?'

গির্জ্জায় মিরিয়ামের চোখে পড়ল পল আগে ওকে যেমন করে গানের পাতা খুঁজে দিত, ঠিক তেমনি করে আজ সে ক্লারার বই থেকে গান বের করে দিচ্ছে। যাজক যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, তখন মিরিয়াম দেখছিল, ক্লারার টুপিতে ঢাকা মুখখানা। ক্লারাকে তার পাশে দেখে মিরিয়াম কী ভাবছে? পলের মাথা ব্যথা ছিল না এ নিয়ে। শুধু অকারণে মিরিয়ামের উপর নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে চাইছিল তার মন।

উপাসনার পর ক্লারাকে নিয়ে সে গেল পেন্‌টিরিচ-এ। শরৎকালের অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত। মিরিয়ামের কাছে বিদায় নিয়ে এসেছিল দু'জনে, মিরিয়ামকে পথে ছেড়ে আসতে পলের কষ্ট হচ্ছিল। তবু মনে মনে বলেছিল, 'এই ওর উচিত শাস্তি।' ওরই চোখের সামনে আর একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে চলে আসায় মধ্যে খানিকটা আনন্দই যেন সে অনুভব করছিল।

অন্ধকারে শিশিরভেজা পাতার গন্ধ। হাঁটবার সময় ক্লারার নিঃসাড় হাতখানা ওর হাতের মধ্যে উষ্ণতার সঞ্চার করছে। আজ পলের হৃদয়ে অনেক দ্বন্দ্ব, অনেক সংগ্রাম। এক একবার সে দিশাহারা হয়ে পড়ছিল।

পেনটিরিচ পাহাড়ে উঠতে গিয়ে ক্লারা নিজের দেহভার এলিয়ে দিল ওর উপর। পল নিজের হাতখানা জড়িয়ে নিল ওর কটিতে। দু'জনে চড়াই ভেঙে উঠছে, পলের বাহুর কক্ষে ক্লারার দেহযষ্টি সংলগ্ন, ক্রমশঃ পলের মনের মেঘ কেটে যেতে লাগল, মিরিয়ামের কথা আর মনে রইল না, দেহের সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত হয়ে ওকে যেন মাজ্জিত করে দিয়ে গেল। ক্লারাকে ক্রমশঃ শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে লাগল পল। তখন ক্লারার মুখে কথা ফুটল। আস্তে আস্তে সে বলল, 'তুমি এখনও মিরিয়ামের সঙ্গে ভাব রেখেছ ?'

—'শুধু কথার ভাব।' পল বলল। তিক্ত কণ্ঠে বলল, 'শুধু কথা ছাড়া আর কিছু কোন দিন ছিল না আমাদের।'

ক্লারা বলল, 'তোমার মা ত দেখতে পারেন না ওকে।'

পল বলল, 'জানি। তা নইলে হয়ত ওকে বিয়ে করতুম আমি। কিন্তু এখন সে সব চুকে গেছে।' বলতে বলতে ঘৃণায় যেন ও ফেটে পড়তে লাগল।

বলল, 'উঃ, ধরো এখন যদি ওর কাছে থাকতাম, তা হলে হয়ত বা 'খৃষ্টধর্ম্মের রহস্য' বা এই ধরণের কোন কিছু নিয়ে ঝেড়ে বকতে হ'ত। খুব বেঁচে গেছি ঈশ্বরের দয়ায়।'

নীরবে কিছুক্ষণ হাঁটবার পর ক্লারা বলল, 'তাই বলে ওকে তুমি ফেলে দিতে পার না।"

'ফেলে দিতে যাব কেন?' পল বলল, 'ওকে দেবার আমার কিছু নেই বলেই ফেলে দেবার প্রশ্ন অবান্তর।'

'কিন্তু ওর দিক থেকে থাকতে পারে।'

'আমার বন্ধুত্ব আজীবন বজায় থাকবে, তাতে আমি বাধা দিতে যাব না। কিন্তু সে শুধু নিছক বন্ধুতা।"

ক্লারা সরে এল, নিজেকে টেনে নিল ওর দিক থেকে। পল অবাক হয়ে বলল, 'ও কি, তুমি হঠাৎ সরে গেলে যে?'

জবাব না দিয়ে ক্লারা আরও খানিকটা দূরে চলে এল।

পল বললে, 'তুমি অমন একলা চলতে শুরু করলে কেন?'

তবু ক্লারা নিরুত্তর। মাথা নুইয়ে রাগত ভাবে সে হেঁটে চলেছে। পল বললে, 'ও আমি মিরিয়ামের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখব বলেছি, তাই।'

ক্লারা কোন কথাই বললে না। তখন পল আবার ওকে টেনে আনতে গেল, বললে, 'আমি ত' বলেছি, আমাদের মধ্যে শুধু কথা আর গল্প ছাড়া আর কিছু নেই।'

ক্লারা কিছুতেই ধরা দেবে না। এবার পল গিয়ে ওর পথ আগলে দাঁড়াল, সামনে গিয়ে বলল, 'কী বিপদ! আরে কী হয়েছে তাই বল না।'

ক্লারা ঠেস্ দিয়ে বলল, 'কী হবে শুনে? তার চেয়ে তুমি তোমার মিরিয়ামের কাছেই যাও।'

পলের রক্ত যেন টগবগিয়ে উঠল। দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি হয়ে গেল একবার। ক্লারা মুখ ভার করে মাথা হেলিয়ে রইল। সঙ্কীর্ণ রাস্তাটি অন্ধকার, লোকজন নেই পথে। হঠাৎ পল নিজের বাহুবন্ধনের মধ্যে টেনে নিল ওকে, তারপর এগিয়ে গিয়ে প্রচণ্ড চুম্বনের আঘাত হানল ওর মুখে। ক্লারা প্রাণপণে চাইল মুখ ফিরিয়ে নিতে। পল বজ্রমুষ্টিতে ওকে ধরে রাখল। তার কঠিন

মুখখানা আবার অমোঘ বিধানের মত নেমে এলো ক্লারার মুখের উপর। পলের বুকের প্রাচীরে ক্লারার নরম বুক পিষ্ট হয়ে যেতে লাগল। ক্লারা নিরুপায়ের মত বিলিয়ে দিল নিজেকে, আর পল উদ্‌ভ্রান্তের মত চুম্বনে চুম্বনে ওকে চূর্ণ করে দিতে উদ্যত হ'ল।

পাহাড় বেয়ে কাদের নেমে আসার শব্দ শুনে সে ক্ষান্ত হ'ল। চাপা গলায় বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও সোজা হয়ে।' জোর করে হাত ধরে রাখল ক্লারার। জান ত, ছেড়ে দিলেই ও মাটিতে লুটিয়ে পড়বে?

ক্লারা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ওর সঙ্গ ধরে এগিয়ে চলল। তার সারা পৃথিবী তখন দুলছে। পথে কেউ কোন কথা বলল না।

অবশেষে পল বলল, 'এবার মাঠের উপর দিয়ে পথ।' শুনে ক্লারার যেন ঘুম ভাঙে। মাঠের বেড়ার উপর দিয়ে পলের হাত ধরেই সে পার হ'ল, তার পর নীরবে পলের সঙ্গে সঙ্গেই হেঁটে চলতে লাগল অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে মাঠের রাস্তা ধরে। ক্লারা জানত, এটা নটিংহ্যাম আর ষ্টেশনে যাবার পথ। পল যেন এদিক-ওদিকে চেয়ে কী খুঁজছিল। একটা ন্যাড়া পাহাড়ের মাথায় একটা পুরোন বাতাস চলা কলের ভগ্নাবশেষ। সেইখানে গিয়ে পল থেমে পড়ল। অন্ধকারে দু'জনে সেই উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, নিচে রাতের বুকে অগুণতি আলোর মালা. ছোট ছোট গ্রাম নানা জায়গায় ছড়ানো, যেন এক রাশ তারা কে মাটির বুকে ফুটিয়ে রেখেছে!

উপরে উঠে পল ওকে দুই হাত মেলে জড়িয়ে নিলো,—বেঁধে রাখল নিজের বুকে। ক্লারা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল 'ক'টা বেজেছে এখন?' মৃদু প্রতিবাদ ওর কথার সুরে।

জবাব দিতে গিয়ে ভারী হয়ে এল পলের গলা। মিনতি করে বলল, 'তাতে কিছু এসে-যাবে না।'

—'না—সত্যি, এবার আমাকে যেতে হবে।'

—'এখনও ত' বেশী রাত হয়নি। মোটে ত' সন্ধ্যে।'

—'ক'টা বেজেছে বলো তা'হলে?' ক্লারা নিজের জেদ ছাড়ল না। ওদের ঘিরে নিবিড় হয়ে উঠেছে রাতের অন্ধকার, মাঝে মাঝে শুধু ফোঁটা ফোঁটা আলোর মেলা। পল বললে, 'আমি জানি না।'

মনে মনে পল চাইছিল যেন গাড়ি ধরবার সময় আজ আর না থাকে। বলল, 'দাঁড়াও, দেশলাই জ্বেলে দেখি।'

ক্লারা দেখল ওর হাতের মধ্যে দেশলাইয়ের কাঠিটি জ্বলে উঠেছে—তার আলোকে উদ্ভাসিত ওর মুখ, চোখ দুটি নিবদ্ধ ঘড়ির কাঁটার দিকে। মুহূর্তে আবার সব অন্ধকার হয়ে গেল। শুধু পায়ের কাছে দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটার লাল রঙ, আর সব কিছু অন্ধকার। পল-ই বা কোথায়? চমকে গিয়ে ক্লারা ডাকল, 'কী হ'ল?'

শুনতে পেল অন্ধকারে পলের গলা, 'আর হ'ল না। অসম্ভব তোমার পক্ষে।'

একটু নীরবতা। ক্লারা বুঝল এবার সে পলের মুঠোয়। ওর গলার চাপা উল্লাস তার কান এড়ায় নি। তার ভয় করতে লাগল। শান্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ক'টা বেজেছে?' তার মন নিরাশার মধ্যে ডুব দিয়ে একটা স্থৈর্য্য লাভ করেছে।

পল সত্যটা প্রকাশ করল অনেক চেষ্টায়। বলল, ন'টা বাজতে দু'মিনিট।'

—'চোদ্দ মিনিটে এখান থেকে পৌঁছুতে পারব ষ্টেশনে?'

'না। বিশেষতঃ এই অন্ধকারে'—

অন্ধকারের মধ্যেও আবছা করে ক্লারার চোখে পড়ল দু'হাত দূরেই পল দাঁড়িয়ে। তার ইচ্ছে হ'ল ছুটে পালায়। অনুনয় করে বলল, পারব না? বল না গো!'

'দৌড়ে গেলে পারবে।' পলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল কথাটা। বলল, 'তার চেয়ে হেঁটে যাওয়াই ত ভালো। ট্রাম-রাস্তা এখান থেকে সাত মাইল। আমি সঙ্গে থাকব।'

'না, না। আমি ট্রেণ ধরেই যাব। সেই ভালো।'

'কিন্তু কেন? কী হ'ল?'

'সত্যি বলছি তোমায়। ট্রেণ ধরেই যাব আমি।'

পলের স্বর শুষ্ক, নীরস হয়ে উঠল। বলল, 'তাই হবে। এসো তবে।'

অন্ধকারের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল পল। ক্লারা ছুটে চলল তার পেছনে, গলা দিয়ে তার কান্না ঠেলে উঠছে। থামা-খন্দের উপর দিয়ে ওকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে এই ঘূর্ণি অন্ধকারে। দম আটকে আসছে ক্লারার, বার বার মনে হচ্ছে পড়ে যাবে। ক্রমশঃ ষ্টেশনের আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কাছাকাছি এসে পড়েছে ওরা। হঠাৎ পল চেঁচিয়ে উঠল, 'ওই যে, এসে পড়েছে।' সে দৌড়ে ছুটে চলল।

একটা অস্পষ্ট ঘটাংঘট আওয়াজ। ডান দিকে চেয়ে ক্লারা দেখল, রাতের বুক চিরে ছুটে আসছে ট্রেণখানা, একটা আলোর ফড়িং যেন। তারপর আওয়াজটা থেমে গেল।

—'গাড়িটা পুলের উপরে। ধরা যাবে, একটুর জন্যে পাওয়া যাবে।' ক্লারা প্রাণপণে ছুটল। শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, কোন মতে লাফিয়ে উঠল গাড়ির কামরায়। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি দিয়ে ট্রেণ ছেড়ে দিল। কোথায় পল? ক্লারা দেখল গাড়ির ভিতর লোক গিসগিস করছে। পল চলে গেছে। এতক্ষণ পরে সে যেন বুঝতে পারল, কত বড় নিষ্ঠুরের মত হয়েছে কাজটা।

পল যাত্রা করল বাড়ির দিকে। সারা রাস্তা পার হয়ে বাড়ির রান্নাঘরে যখন এসে পৌঁছল, তখন শুধু তার চমক ভাঙল। মুখের সমস্ত রক্ত যেন উবে গেছে, চোখ দু'টি মাতালের মত ভয়ঙ্কর। মা দেখে চমকে উঠলেন, বললেন, 'এ কি, পায়ের জুতোজোড়ার এ অবস্থা কেন?'

পল পায়ের দিকে চেয়ে দেখল। ওভারকোটটা খুলে রাখল। মা অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন, ও কি মদ-টদ খেয়ে এল নাকি? বললেন, 'ট্রেণ ঠিক ধরতে পেরেছিল ত?'

হ্যাঁ।

—'ওর পায়েও কি এমনি ময়লা লেগেছে নাকি? কোন আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরতে গিয়েছিলে ওকে নিয়ে, জানি না বাপু!'

পল চুপচাপ বসে ভাবতে লাগল। তার পর যেন কিছু না বললে ভাল দেখায় না তাই ভেবে বলল, 'ওকে কেমন লাগল তোমার?'

—'আমার ত' বেশ ভালই লাগল। কিন্তু তুমি ওকে নিয়ে

বেশী দিন খুশি থাকতে পারবে না। অল্পেই তোমার বিরক্তি এসে যাবে। তা তুমি নিজেও বোধ হয় বুঝতে পেরেছ?'

শুতে গিয়ে জানালার কাছে মুখ রেখে উপুড় হয়ে রইল পল। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল রুদ্ধ রোষ আর বেদনার অশ্রু। একটা অব্যক্ত শারীরিক যন্ত্রণায় সে নিজের ঠোঁট কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে তুলল। মনের মধ্যে যে ওলোটপালট চলেছে তাতে কোন কিছু ভাববার বা অনুভব করবার ক্ষমতাই তার ছিল না। বার বার বালিশে মুখ লুকিয়ে শুধু এই কথাটাই সে মনে মনে বলতে লাগল, 'এই ওর ব্যবহার, এই শাস্তি ও দিয়ে গেল আমাকে।' যতই ভাবতে লাগল, ততই বিরাগের মাত্রা বাড়তে লাগল। মনে মনে ক্লারাকে সে ঘৃণা করতে লাগল।

পরদিন একটা নির্লিপ্তি নিয়ে পল দূরে দূরে সরে রইল। ক্লারা মিষ্টি হেসে কথা বলল, ভাব করতে চেষ্টা করল দু'-একবার। পল ওকে কাছে ঘেঁষতে দিল না, কথা বলল অনেকটা অবজ্ঞার সুরে। ক্লারা রাগ করল না, তার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস শুধু বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে পলের মন সুস্থ হয়ে উঠল।

সেদিন নটিংহাম-এর রয়াল থিয়েটারে সারা বার্ণহার্ড এসেছেন। এই বৃদ্ধা খ্যাত-নামা অভিনেত্রীটির অভিনয় দেখবার আগ্রহ অনেক দিন থেকেই পলের ছিল। ক্লারাকে সে বলল তার সঙ্গে যেতে। মাকে বলে গেল জানালায় চাবি রেখে শুয়ে পড়তে।

ক্লারাকে আজ চমৎকার মানিয়েছে। থিয়েটারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল ক্লারা। পল দেখল ক্লারার পরনে সান্ধ্য-পোশাকের মতই একটা কিছু, গলা, হাত আর বুকের খানিকটা অংশ অনাবৃত। আঁট-সাঁট পোশাকে যেন ওর ভরা দেহের প্রতিটি রেখা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

এই সারা সন্ধ্যাটা কাটবে ওর অনাবৃত বাহুর সৌন্দর্য্যটুকু সামনে নিয়ে, বার বার চোখে পড়বে ওর সুঠাম গ্রীবা, সবুজ পোশাকের অন্তরাল থেকে জাগবে ওর দেহের ইশারা। কেন, কেন ওর সান্নিধ্যের এই তীব্র যন্ত্রণায় বার বার পলকে ও ডেকে আনবে? সেই জন্যেই ওর উপর বিরক্ত হয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়। এমন স্থির হয়ে সামনের দিকে চেয়ে বসে আছে ক্লারা, দেখে মনে হয় কী যেন করুণ অসহায়তা নিয়ে ও দুরতিক্রম্য ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে। সেই জন্যেই ওকে পলের ভাল লাগে আবার। ওর দোষ কি? ও এমন একটা শক্তির পাল্লায় পড়েছে যা ওর চেয়ে, অনেক বড়ো/অনেক শক্তিমান। ওর চোখে অন্তহীন রহস্যের প্রখর ব্যাকুলতা দেখে দেখে পলের মনে হ'ল ওকে একবার চুম্বন না করতে পেলে সে আর বাঁচবে না। হাত থেকে থিয়েটারের প্রোগ্রামটা ফেলে দিয়ে সেটা তুলে নেবার ছলে সে ওর মণিবন্ধে চুম্বন করল। ওর সৌন্দর্য্য চোখ ধাঁধিয়ে দেয়, বুকে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি করে।

অভিনয় চলে রঙ্গমঞ্চে।

মাঝে মাঝে অভিনয়ের মধ্যে ছেদ পড়ে। হলের বাতি জ্বলে ওঠে। তখন পলের মনও ব্যথাতুর হয়ে ওঠে। মনে হয় ছুটে পালিয়ে যায় যেখানে আছে শুধু অন্ধকার। একবার সে বেরিয়ে পড়ল পানীয়ের সন্ধানে। তার পর বাতি নিবে গেলে আবার

বলল এসে ক্লারার কাছে, ক্লারা আর অভিনয় দুয়ে মিলে যে এক অদ্ভুত উন্মাদনার সৃষ্টি করেছে, তারই মধ্যে ডুবে গেল আবার।

অভিনয় এগিয়ে চলে। কিন্তু পলের সারা মন জুড়ে থাকে ক্লারার কনুয়ের কাছে ছোট্ট নীল শিরাটি। তার উপর একটি চুম্বন এঁকে দেবার জন্তে সে মরিয়া হয়ে ওঠে। সে যেন ছুঁয়ে আছে ঐ নীল শিরাটিকে। একটি চুম্বন ওখানে না দিতে পারলে তার জীবন যেন বেরিয়ে যাবে। থাকুক অন্ত লোক। মুখ নীচু করে আচমকা সে ওষ্ঠ স্পর্শ করল ঐ স্থানটিতে। তার গোঁফজোড়া লাগল ক্লারার সুকোমল ত্বকে; চমকে উঠে ক্লারা হাত টেনে নিলো।

অভিনয় শেষ হয়ে গেলে যখন বাতি জ্বলে উঠেছে, লোক-জন হাততালি দিচ্ছে, তখন পলের সম্বিৎ ফিরে এলো। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল গাড়ির সময় পেরিয়ে গেছে। বলল, 'এবার বাড়ি ফিরতে হবে হেঁটে'।

ক্লারা চাইল ওর দিকে। বলল, 'কেন, রাত কি অনেক হ'ল'?

পল মাথা নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ'। তারপর ক্লারা কোটটা চাপিয়ে দিল ওর গায়ে। আশে-পাশে অসংখ্য লোকজন, তার মধ্যে ক্লারার কাঁধের কাছে মুখ এনে পল গুঞ্জন করে উঠল, 'আজ ভারী ভাল লাগছে তোমাকে। চমৎকার মানিয়েছে তোমাকে ওই পোশাকটায়'।

ক্লারা কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। দু'জনে পাশাপাশি বেরিয়ে এলো থিয়েটার থেকে। সামনে গাড়ি-ঘোড়া, লোকজন। হঠাৎ পলের মনে হ'ল একজোড়া কটা চোখ যেন তার দিকে তাকিয়ে অগ্নিবর্ষণ করছে। পল দেখেও দেখল না, জানাল না। এ কার চোখ। ক্লারা আর সে দু'জনে যন্ত্রের মত হেঁটে এগিয়ে গিয়ে ষ্টেশনের পথ ধরল।

গাড়ি অনেকক্ষণ চলে গেছে। এখন দশ মাইল হেঁটে বাড়ি যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। পল বলল, 'তাতে কী। হেঁটে যেতে বেশ ভালই লাগবে আমার।'

'তার চেয়ে'—ক্লারা মুখ-চোখ লাল করে বলে ফেলল, 'তার চেয়ে আজ রাতটা আমাদের বাড়ি থেকে যাও না কেন? আমি না হয় মায়ের সঙ্গে শোব।'

পল চাইল ওর দিকে। চোখাচোখি হ'ল দু'জনার। বলল, 'তোমার মা কি বলবেন?'

—'মা কিছু মনে করবেন না।'

—'সত্যি জানো তুমি?'

—'সত্যি বলছি।'

—'তা'হলে যেতে বলছ আমাকে?'

—'তোমার যদি আপত্তি না থাকে।'

—'বেশ, চল তবে।'

ফিরে এলো দু'জনে। এসে ট্রাম ধরল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস হু-হু করে লাগছে মুখে। অন্ধকার নেমেছে সর্বত্র, তাড়াতাড়ি চলতে গিয়ে দুলছে ট্রামখানা। ক্লারার হাত মুঠি করে ধরে রাখল পল। বলল, 'গিয়ে হয়ত দেখবে তোমার মা শুয়ে পড়েছেন।'

'হয়ত। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে শোন নি এখনো।'

বাড়ির সামনের অন্ধকার রাস্তাটা এখন জনহীন। নীরব পথে এখন ওরা দু'জনেই শুধু যাত্রী। ক্লারা দ্রুত পায়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। পল দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছিল। ক্লারা বলল, 'এসো না!'

পল এক লাফে সিঁড়ি ডিঙিয়ে ঘরের মধ্যে এসে গেল। অন্দরের দরজায় দেখা গেল ক্লারার মাকে। বিপুলাঙ্গী মহিলা, দেখে রীতিমত ঘাবড়ে যেতে হয়। বললেন, 'কা'কে সঙ্গে করে নিয়ে এলে বাছা?'

ক্লারা বলল, 'ইনি মিষ্টার মোরেল, মা! আজ গাড়ি ধরতে পারেননি। আজকের রাতটা কোন মতে এখানে কাটিয়ে দেবেন, নইলে ত' আবার সেই দশ মাইলের ধাক্কা।'

মিসেস্ র‍্যাড্‌ফোর্ড গম্ভীর হয়ে গেলেন। বললেন, 'তা তুমি যখন নিয়েই এসেছ, তুমিই ব্যবস্থা কর। তোমার অতিথি, আমি ত' মানা না করে পারি না। তবে ঘর সামলানোর ঝক্কিটা তুমি নিও।'

পল বলল, 'আপনার যদি আপত্তি থাকে, তা'হলে আমি না হয় চলেই যাই।'

'না না, যাবার দরকার কী? এসো ভেতরে। আমি শুধু ভাবছি তুমি ওর রাতের খাবার ব্যবস্থা দেখে কি ভাববে।'

ছোট্ট একটি ডিসে কুচি কুচি আলুভাজা আর এক টুকরো বেকন্। একজনের বরাদ্দ খাবার যেমন তেমন করে টেবিলে ফেলে রাখা হয়েছে।

মিসেস র‍্যাডফোর্ড বলে চললেন, 'বেকন্ না হয় আর কিছু তোমাকে দেওয়া গেল। কিন্তু আলুভাজা কোথায় পাব?'

পল বলল, 'এ শুধু আপনাকে ব্যস্ত করলুম দেখছি।'

মিসেস র‍্যাডফোর্ড হঠাৎ কী ভেবে বলে উঠলেন, 'তোমরা দুটিতে ত' জোড়া মিলিয়েই জুটেছ। এ সব কিসের জন্তে শুনতে পাই?'

পল যেন ধরা পড়ে গেছে, ভয়ে ভয়ে বললে, 'তা ত' আমরা কেউ ভেবে দেখিনি।'

ক্লারার মা হঠাৎ হেসে উঠলেন। বললেন, 'তোমাদের দু'জনকে কয়েক ঘা করে দিতে পারলে দু'জনারই মঙ্গল হ'ত।'

পল বলল, 'আমার উপর এত আক্রোশ কেন আপনার? আমি ত' আপনার কিছু চুরি করিনি?'

মিসেস র‍্যাড্‌ফোর্ড হেসে বললেন, 'না, সে দিকে কড়া নজর রেখেছি আমি।'

এমনি কথাবার্তার মধ্যে রাত্রের খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। মিসেস র‍্যাড্‌ফোর্ড প্রহরীর মত ঠায় বসে রইলেন চেয়ারে। পল একটা সিগারেট ধরাল। ক্লারা উপরে গিয়ে একটা 'স্লিপিং স্যুট' নিয়ে এলো, এনে আগুনের উপর বাতাসে রাখল। মিসেস র‍্যাড্‌ফোর্ড বললেন, 'আরে, আমি ত' ওটার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ কোত্থেকে বেরুল ওটা?'

—'আমার দেরাজ থেকে।'

—'বটে! তুমি ওটা বাক্সটার-এর জন্তে কিনেছিলে, নয়? সে ত' কিছুতেই পরবে না, বলে কি'—মিসেস র‍্যাডফোর্ড হেসে উঠলেন, 'বলে বিছানায় শোওয়া তার পায়জামা ছাড়াই চলবে। আসলে এ সব ও বরদাস্ত করতেই পারত না।' পলের দিকে ফিরে গোপন কথার মত ক'রে বললেন। পল বসে

বসে মুখ থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়ছিল। বলল, 'সে যার যেমন রুচি।'

এর পর পায়জামার গুণাগুণ নিয়ে খানিকটা চলল ওঁদের আলোচনা। পল বলল, 'আমার মা ত' আমাকে পায়জামা পরতে দেখলে খুব খুশি হন। বলেন বেশ চোস্ত দেখায় আমাকে।'

মিসেস র‍্যাডফোর্ড বললেন, 'হ্যাঁ। আমারও মনে হচ্ছে পায়জামা পরে বেশ মানাবে তোমাকে।'

একটু পরে পল চেয়ে দেখল তাকের উপর ছোট ঘড়িটাতে সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। বলল, 'থিয়েটার দেখে এলে ক' ঘণ্টা যে কেটে যায় ঘুম আসতে আসতে। কেন বলুন তো?'

মিসেস র‍্যাডফোর্ড টেবিল সাফ করছিলেন। বললেন, 'তুমি এখন শুয়ে পড় ত'

পল ক্লারাকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি খুব ক্লান্তি বোধ হচ্ছে?'

ক্লারা ওর চোখে চোখ রাখতে পারল না, অন্য দিকে চেয়ে বলল, 'কই, মোটেই না।'

—'তা'হলে এক পালা তাস হোক না কেন?'

—'আমি খেলা ভুলে গেছি।'

—'আমি শিখিয়ে নেব। কী বল? আপনার আপত্তি নেই ত, মিসেস্ র‍্যাডফোর্ড!'

মিসেস র‍্যাডফোর্ড বললেন, 'তোমাদের খুশি। রাত কিন্তু অনেক হ'ল।'

পল বলল, 'এক হাত খেলতে-খেলতেই ঘুম পেয়ে যাবে।'

ক্লারা তাস এনে দিয়ে বসে বসে তার হাতের বিয়ের আংটিটা ঘোরাতে লাগল। পল ভাঁজতে লাগলো তাসগুলো। মিসেস র‍্যাডফোর্ড পাশের ঘরে হাত-পা ধুয়ে নিচ্ছেন। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পলের উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়ছিল।

ক্রমে একটা বাজল। তবু ওদের খেলা আর শেষ হয় না। মিসেস র‍্যাডফোর্ডএর শোবার আগের সব খুঁটিনাটি কাজ সারা হয়ে গেছে। তবু পল বসে বসে শুধু তাস খেলছে আর নম্বর টুকছে। ক্লারার দুটি বাহু আর খোলা কাঁধের মোহ ওকে পেয়ে বসেছে। ওকে ছেড়ে উঠে যাওয়া অসম্ভব। পলের হৃদয় উন্মুখ হয়ে উঠল। মিসেস র‍্যাডফোর্ড-এর উপর বিরক্তি জাগতে লাগল—ভদ্রমহিলা চেয়ারে বসে বসে ঘুমে ঢুলছেন, তবু চেয়ার ছেড়ে উঠবার নাম নেই। পল একবার ওঁর দিকে চেয়ে তারপর ক্লারার দিকে চাইল। ক্লারা দেখল ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখ, সে চোখে ক্রোধ আর তীব্র ব্যঙ্গের জ্বালা। ক্লারার আনত দুটি চোখে পল দেখল নিরুপায়ের লজ্জা। বুঝল, ক্লারা অন্ততঃ তার মতেই সায় দেবে। সে তাস দিয়ে যেতে লাগল।

এবার মিসেস র‍্যাডফোর্ড ঘুম ঝেড়ে সোজা 'হয়ে বসলেন, বললেন, 'এখনও রাত হয় নি তোমাদের? শোবার সময় হয়নি এখনও?'

পল জবাব না দিয়ে খেলে যেতে লাগল। মিসেস র‍্যাডফোর্ডকে খুন করে ফেলবার ইচ্ছে তার মনে জাগছিল। বলল, 'এই আর আধ মিনিট।'

বুড়ী চেয়ার ছেড়ে উঠে গুম্-গুম্ করে কল-ঘরে গিয়ে ঢুকল। সেখান থেকে একটা মোমবাতি এনে তাকের উপর রেখে আবার বসল চেয়ারে গা মেলে। রাগে পল-এর শিরায় শিরায় আগুন ছুটতে লাগল। হাত থেকে তাস ফেলে দিয়ে বলল, 'থাক তবে।'

ক্লারা দেখল ওর মুখের ভ্রূকুটি। আবার পল চাইল ওর দিকে। যেন একটা চুক্তি হয়ে গেল দু'জনার মধ্যে, ক্লারা গলা সাফ করে নেবার জন্যে একটু কাশলো তাসগুলোর উপর ঝুঁকে পড়ে।

মিসেস র‍্যাডফোর্ড বললেন, 'বাঁচলুম। এতক্ষণে তোমাদের শেষ হ'ল। এখন চলো; এই তোমার পোশাক, এই মোমবাতি। ঠিক উপরেরটাই তোমার ঘর। দু'খানাই ত' মোটে ঘর। চিনে নিতে পারবে। আচ্ছা শুভরাত্রি! রাত্তিরে ভাল করে ঘুমিও।'

—'হাঁ, বরাবরই ভাল ঘুমোই আমি।'

—'তা ত' বটেই। তোমাদের বয়সে ভাল ঘুমোবে না ত' কি!'

ক্লারাকে শুভরাত্রি জানিয়ে পল বিদায় নিল। উপরে উঠবার সিঁড়িটা প্রতিপদে ক্যাঁচকোঁচ করছে, তবু পল দাঁতে দাঁত চেপে উঠল গিয়ে দোতলায়। সামনাসামনি দুটি দরজা। নিজের ঘরে গিয়ে পল দরজাটা ভেজিয়ে দিল, খিল এঁটে দিল না।

ছোট ঘর কিন্তু বিছানা প্রকাণ্ড। টেবিলে ক্লারার কয়েকটা চুলের কাঁটা আর বুরুশ। এক কোণে কাপড়-ঢাকা হয়ে ওর পোশাক-আশাক ঝুলছে। চেয়ারের উপর একজোড়া মোজা পড়েই রয়েছে।

পল ঘরময় তন্ন তন্ন করে দেখে বেড়াল। তাকের উপর তার নিজের দু'খানা বই। পল জামা খুলে ভাঁজ করে রাখল, বিছানায় বসে কান পেতে রাখল বাইরে। তারপর বাতি নিবিয়ে শুয়ে দু'মিনিটের মধ্যেই এক রকম ঘুমিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ কি যেন তার মনের মধ্যে দংশন করতে সে ধড়-মড় ক'রে জেগে উঠল। শুয়ে শুয়ে যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে লাগল। কী যেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণা পাগল করে তুলল তাকে। পল উঠে বসল, অন্ধকার ঘরের মধ্যে স্থির হয়ে একাসনে বসে চোখ আর কান দু'টোকেই তুলল সজাগ করে। শুনতে পেল বাইরে কোথায় একটা বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপর ক্লারার মায়ের ভারী পায়ের চলার শব্দ। তারপর স্পষ্ট শোনা গেল ক্লারার গলা: 'আমার জামার বোতামটা খুলে দেবে নাকি?'

কতক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর ক্লারার মা বললেন, 'ও কি? এখনও তোর শুতে আসার সময় হয়নি?'

মেয়ে নির্বিকার সুরে জবাব দিল, 'না। এখনই কি?'

—'বেশ, তবে তুই থাক। তারপর ভোর রাত্রে শুতে এসে যে আমার ঘুম ভাঙাবি সেটি হবে না।'

—'তুমি যাও, বেশী দেরি হবে না আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে পল সিঁড়িতে মায়ের পায়ের শব্দ শুনতে পেল। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেল, ওঁর হাতের মোমবাতির আলো। যাবার সময় পলের ঘরের দরজায় ওঁর গায়ের পোশাক আছড়ে যেতে পল প্রায় লাফিয়ে উঠেছিল আর কি। তারপর বাতি নিবে গেল, দরজায় খিলের শব্দও শুনতে পাওয়া গেল। শুতে গিয়েও অনেকটা সময় এটা-ওটা করে কাটালেন, ওঁর কাজ যেন আর ফুরোয় না। অনেকক্ষণ পরে সব সাড়াশব্দ যখন থেমে গেল, পল তখনও বিছানায় বসে। তার গায়ে বার বার কাঁটা দিয়ে উঠছে। ঘরের দরজা একটু ফাঁক রয়েছে। ভাবল, ক্লারা যখন উপরে উঠবে, তখন ওর সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। অপেক্ষায় অপেক্ষায় অনেকক্ষণ কাটল। রাত বাজল দুটো। চার দিক নিস্তব্ধ। পল শুনল নিচে লোহার উনুনে কে যেন আস্তে আস্তে একটা শব্দ করে চলেছে। এবার আর পলের তর সইল না। তার সারা শরীর কাঁটা দিয়ে উঠতে লাগল। এ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যেতে না পারলে আর তার রক্ষে নেই।

বিছানা ছেড়ে নিচে এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াল পল। পা কাঁপছে। তারপর সোজাসুজি দরজা দিয়ে বেরিয়ে সিঁড়িতে পা রাখতে গেল। কিন্তু আস্তে পা ফেলে চলবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও প্রথম সিঁড়িটাই ভীষণ শব্দ ক'রে উঠল। দাঁড়িয়ে কান পেতে রইল পল। বুড়ী ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরছে। সবটা সিঁড়ি অন্ধকার। শুধু সিঁড়ির দরজার চৌকাঠের তলা দিয়ে রান্নাঘরের এক ফালি আলো দেখা যাচ্ছে। মুহূর্ত্তে পলের সংকল্প স্থির হয়ে গেল। যন্ত্রচালিতের মত সে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো। প্রত্যেক বার পা ফেলতে সিঁড়িগুলো আর্ত্তনাদ করে উঠছে আর পল ভাবছে এই বুঝি বুড়ীর ঘরের দরজা খুলল, পেছন দিকে ফিরে চাইতে তার সাহস হয়নি। নিচে গিয়েও দরজা খুলবার জন্তে হাতড়াতে হ'ল খানিকক্ষণ। অবশেষে সশব্দে দরজার খিল খুলল। পল তিলমাত্র বিলম্ব না করে ঢুকে পড়ল, ঢুকে সজোরে ভিতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা। বুড়ী জেগে থাকলেও এখন আর আসতে সাহস পাবে না।

তারপর পলকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। আর তার এগিয়ে যাবার শক্তি রইল না। আগুনের সামনে মেঝের উপর বসে ক্লারা শুধুমাত্র শাদা অন্তর্বাস পরে আগুনের তাপ উপভোগ করছে। ওর অনাবৃত পিঠ পলের দিকে ফেরানো। পল ঘরে এলেও ওর দিকে ফিরে চাইল না ক্লারা, শুধু জড়োসড়ো হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে রইল। পল ওর মুখ দেখতে পেল না। তার মনে হ'ল যেন অন্য কিছুর অভাবে আগুনের তাপকেই ও একান্ত ভাবে সম্বল করেছে। তাই একদিকে ওর গোলাপী আভা, অন্য দিকে ঘন আতপ্ত ছায়া। ওর বাহু দু'টি শিথিল হয়ে এলিয়ে পড়েছে।

পলের সারা দেহ তখন থর-থর করে কাঁপছিল। দাঁতে দাঁত চেপে হাতের মুঠি শক্ত করে কোন রকমে সে নিজেকে সামলে নিলো। তারপর এগিয়ে গেল ওর দিকে। এক হাত রাখল ওর কাঁধে, অন্য হাত দিয়ে ওর চিবুক তুলে ধরতে গেল। ক্লারার সর্বাঙ্গে যেন ঝড় উঠল, সে মাথা হেঁট করে বসে রইল।

পল ভাবল ওর ঠাণ্ডা হাত লেগেই ক্লারা শিউরে উঠেছে, বলল, 'বুঝতে পারিনি। দুঃখিত।'

ক্লারা মুখ তুলে চাইল; চোখে সকাতর, ভীরু চাহনি। পল অস্ফুটস্বরে বলল, 'এত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে আমার হাত!'

ক্লারা চোখ বুজে চুপি চুপি বলল, 'এই আমার ভালো, এই ভালো।'

ওর কথার সুবাস ছড়িয়ে গেল পলের মুখে। দু'টি হাত আকুল হয়ে পলের জানুতে জড়িয়ে রইল। পলের রাত্রিবাসের একটি কোণ স্পর্শ করল ক্লারার গায়ের পোশাককে। ক্লারার গায়ে জাগল শিহরণ। সেই সান্নিধ্যের উষ্ণতায় ক্রমশঃ পলের কাঁপুনির বেগ কমে এলো।

এ অবস্থা বেশীক্ষণ সহ্য করা কঠিন। পল হাত মেলে ধরে তুলল ওকে, ক্লারা ওর কাঁধে মুখ গুঁজে দাঁড়াল। গভীর স্নেহে পল হাত বুলিয়ে দিতে লাগল ওর গায়ে। ক্লারা ওর বুকে মুখ লুকিয়ে ক্রমশঃ আরও আঁকড়ে ধরতে লাগল ওকে। পল সজোরে ওকে বুকের মধ্যে আগলে রাখল। তখন ক্লারা চোখ তুলে চাইল। দুটি ভাষাহীন চোখে সবেদন মিনতি যেন বলছে। ওগো, বলে দাও, বলে দাও একি আমার লজ্জা, একি লজ্জার কথা?

পলের চোখ দুটি গভীর, কালো, অচপল। যেন ক্লারারই এই সৌন্দর্য্যরাশির দিকে হাত বাড়াতে গিয়ে অজ্ঞাতে সে কাউকে আঘাত করে বসেছে, এই ধরণের একটা বেদনা তার মনে জাগছে। ওর দিকে চেয়ে দুঃখ হ'ল তার, ভয়ও হ'ল। ওর সামনে সে কত ছোট। ক্লারা গভীর প্রেমে চুম্বন করল একে একে ওর দুটি চোখে। নিজেকে মেলে ধরল ওরই জন্তে। উজাড় করে দিল নিজেকে। গভীর বেদনায় সুধায় ভরা একটি সুতীব্র মুহূর্ত্ত এলো ওদের জীবনে।

পলের এই অজস্র অফুরন্ত আদর, তাকে পেয়ে ওর এই তীব্র পুলক, ক্লারা এতে বাধা দিতে গেল না। দাঁড়িয়ে সে এই আদর উপভোগ করতে লাগল। তার বহুদিনের আহত অভিমান আজ শান্ত হ'ল। শান্ত হ'ল তার হৃদয়, আনন্দে উদ্বেল

হয়ে উঠল। আবার সে মাথা তুলে, দাঁড়াতে পারবে বলে মনে হ'ল। তার যে গর্ব্ব চূর্ণ হয়ে যেতে বসেছিল, তাতে আবার জোড়া লাগাল। তার দাম কমে গিয়েছিল; এখন আবার সে খুশিতে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। এ তার স্বীকৃতি, তার পুনঃ সংস্থান, তার সম্মানের নতুন অভিষেক।

পল আবার ভালো ক'রে চেয়ে দেখল ওর দিকে। তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। দু'জনে হাসল দু'জনার দিকে চেয়ে আর পল আরও জোরে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলো। টিক্‌টিক্ করে ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে, মুহূর্ত্তগুলো খ'সে পড়ছে, তবু দু'জনে বাহুতে বাহু, কণ্ঠে কণ্ঠলগ্ন করে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রইল, যেন একই ছাঁচে ঢালা যুগল মূর্ত্তি।

তবু আবার পলের আঙুলগুলো ওর সারা দেহ পরিক্রমা করে এলো, বড় অশান্ত, বড় চঞ্চল ওরা, কিছুতেই যেন ওদের তৃপ্তি নেই। শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের তরঙ্গ বইতে লাগল,—তরঙ্গের পর তরঙ্গ। ক্লারা আবার মাথা রাখল ওর কাঁধে। পল বলল মৃদু স্বরে, 'তুমি আসবে আমার ঘরে?'

ক্লারা ওর দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল। ওর মুখে অতৃপ্তির চিহ্ন, চোখে গাঢ় কামনার ছায়া। পল একদৃষ্টে চেয়ে দেখতে লাগল ওকে। বলল, 'হ্যাঁ, এসো।'

আবার ক্লারা মাথা নেড়ে আপত্তি জানাল।

—'কেন? নয় কেন?'

ক্লারা আবার উদাস চোখে চাইল ওর দিকে। চেয়ে আবার মাথা নাড়ল। পলের চোখের দৃষ্টি কঠিন হয়ে উঠল। আর প্রতিবাদ করবার প্রবৃত্তি রইল না।

পরে বিছানায় শুয়ে পল ভাবল, ক্লারা সবাইকে জানিয়ে, ওর মাকে জানিয়ে, তার কাছে চলে এলো না কেন? ওর মাকে জানাতে পারলে আর কিছু না হোক ব্যাপারটার কিনারা হয়ে যেত। ক্লারাও সারা রাতটা কাটাতে পারত ওর সঙ্গে। মায়ের সঙ্গে শুতে যাবার দুর্ভোগ ভুগতে হ'ত না। ভেবে ভেবে সে এর কূল-কিনারা পেল না। সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে রহস্যময়। অল্প পরেই তার দুই চোখ ঘুমে জড়িয়ে এলো।

সকালবেলায় কার গলার আওয়াজ শুনে তার ঘুম ভাঙল। চোখ খুলে দেখল, বিপুলাঙ্গী মিসেস র‍্যাডফোর্ড সোজাসুজি চেয়ে আছেন তার দিকে। হাতে এক কাপ চা নিয়ে এসেছেন। ওকে জাগতে দেখে বললেন, 'কি গো, আজ কি সন্ধ্যে অবধি ঘুমোবে?' তৎক্ষণাৎ হাসি পেল পলের। বলল, 'এখন ত' মোটে পাঁচটা। তার বেশী হবে কি করে?'

—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। সাড়ে সাতটার একচুল কম নয়। নাও, ওঠো, এক কাপ চা এনেছি তোমার জন্যে।'

পল চায়ে চামচ নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমি শুধু ভাবছি, আমার বিছানায় এ ভাবে চা নিয়ে আসা—আমার মা হলে ভাবতেন আমার জাতজন্ম সব গেল!'

—'উনি কোন দিন নিয়ে আসেন না?'

—'ওরে বাবা! ভুলেও নয়।'

—'ভুল করেন। আমি ত' এমনি করেই নষ্ট করেছি আমার বাড়ির লোকজনকে। এই জন্যেই ওরা এমন বিগড়ে গেছে।'

পল বলল, 'আপনার বাড়িতে ত' শুধু ক্লারা। আর মিঃ র‍্যাডফোর্ড, তিনি ত' স্বর্গে। কাজেই খারাপ হতে হলে আপনাকেই খারাপ হতে হয়।'

'আমি লোকটা খুব খারাপ নই, তবে আমার মনটা বড্ড নরম। সব কিছুতেই একটা বোকামি করে বসি, এই আমার দোষ।' বলতে বলতে মিসেস র‍্যাডফোর্ড ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

প্রাতরাশের সময় ক্লারা বেশী কথাবার্ত্তা বলল না। কিন্তু ওরই মধ্যে পলের উপর একটু বিশেষ অধিকার ফলাবার চেষ্টা দেখে পলের খুশির সীমা রইল না। মিসেস র‍্যাডফোর্ড ত' স্পষ্টই তার উপর খুশি। তার আঁকা ছবির কথা অনেক বললেন বললেন, 'তোমার ঐ ছবি নিয়ে অমন মাথা ঘামানো আর মেতে ওঠা—এতে লাভটা কি? তোমার কি লাভটা হয় এতে? তার চেয়ে ওই সময়টা দিব্যি হেসে-খেলে বেড়াতে পারো।'

পল বলল, 'বা রে! গত বছর ত' ত্রিশ গিনি পেলাম ছবি থেকে!'

'পেলে? তা'হলে মন্দ নয়। তবে কিনা তোমার সময় যতটা যায় ওর পেছনে, তার তুলনায় এ আর কি!'

'জানেন এখনও চার পাউণ্ড পাওনা আছে। একজন আমাকে বলেছিল তার বাড়ি, ঘর, তার বৌ, আর কুকুর সব মিলিয়ে একটা ছবি এঁকে দিলে আমাকে পাঁচ পাউণ্ড দেবে। আমি ত' গেলুম, গিয়ে কুকুর না এঁকে, এঁকে ফেললুম মুরগীগুলোকে, দেখে ওর খুঁৎখুঁতুনি। কাজেই এক পাউণ্ড দাবি ছেড়ে দিলুম। সে এক কাণ্ড, কুকুরটাকে দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গিয়েছিল। ছবি একখানা হয়েছিল বটে, ওই চার পাউণ্ড পেলে তা দিয়ে কী করব তাই ভাবছি।'

'তোমার টাকা, তা দিয়ে তুমি কি করবে জান না?' মিসেস র‍্যাডফোর্ড বললেন।

'তা নয়, এই চার পাউণ্ড আমি ওড়াব। ধরুন যদি দু'-এক দিনের জন্যে সমুদ্রের ধারে যাই আমরা'—

'আমরা কারা?'

'এই—আপনি, ক্লারা আর আমি।'

—বল কী, তোমার টাকায়?' মিসেস র‍্যাডফোর্ড বেশ একটু যেন ক্ষুণ্ণ হলেন।

—'কেন দোষ কি?'

'বুঝেছি। কোন দিন না বেপরোয়া হয়ে ছুটতে গিয়ে তোমার ঘাড়টা যায়!'

'তা যাক্। টাকার অনুপাতে দৌড়টা খারাপ না হলেই হ'ল। যাবেন কিনা বলুন?'

—'আমি কিছু বলব না। তোমরা পরামর্শ করে ঠিক করতে পারো করো।'

—'তা হলে আপনার আপত্তি নেই ত?' পলের বিস্ময়ের সীমা রইল না। খুশির আলো জ্বলে উঠল তার মনে।

মিসেস র‍্যাডফোর্ড বললেন, 'তোমরা কি আর আমার ইচ্ছের চলবে? তোমাদের যা মনে ধরবে তাই করবে তোমরা।'

[ক্রমশঃ।

রূপালী পর্দার কাহিনী

ইতালীর র‍্যাপাল্লো অঞ্চলের এক অখ্যাত সমাধিক্ষেত্রে কনটেসা তোরলাতো-ফাভ্রাণি হিসাবে ওকে কবরস্থ করা হল। কবরের ওপর ওরই একটি মর্মর প্রতিমূর্তি স্থাপিত হল। অথচ মাত্র ছ' মাস আগে এই অঞ্চলের নাম পর্যন্ত মেয়েটির জানা ছিল না।

জল-বৃষ্টির মধ্যে এত লোক ইতালীর চারদিক থেকে ছুটে এসেছে কনটেসার অন্ত্যেষ্টিতে যোগদানের তাগিদে নয়, ক্যামেরা, ফুলের মালা আর চোখের জল নিয়ে ছুটে এসেছে চিত্রতারকা মারিয়া দ'আমতাকে একবার শেষবারের মত দেখতে। ওর আসল নাম মারিয়া ভারগাস। মাদ্রিদের এক অখ্যাত নাইটক্লাবের নর্তকী।

আজ থেকে তিন বছর আগে মারিয়াকে প্রথম দেখেছিলাম। এক রাতে রোম থেকে কার্ক এডওয়ার্ডসের প্রাইভেট প্লেনে মাদ্রিদে এলাম। মেয়েটির অসামান্য রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল, আমাদের ছবির জন্য একটি সুন্দরী মেয়ে খুঁজছিলাম। ভূমিকাটি ভালো, সহ-অভিনেতা বিশেষ খ্যাতিমান। তেমন সুদক্ষ অভিনেত্রীর প্রয়োজন ছিল না, আমাদের দরকার একটি সুন্দর মুখের, কার্ক এডওয়ার্ডস্ অন্ততঃ তাহলেই খুশী হয়।

কার্ক এডওয়ার্ডসের নাম হয়ত আপনারা শুনে থাকবেন, বেচারী বড়লোক, টেক্সাসের এক কোটিপতির বংশে রূপার চামচ মুখে নিয়ে জন্মেছে। ছায়াছবির প্রযোজক হওয়ার সখ, আমাকে তার প্রথম ছবির ডাইরেক্টর করেছে। আমার তখন যা অবস্থা, তা পছন্দসই প্রযোজক খুঁজে নেওয়ার মত নয়। দীর্ঘকাল হলিউডে বেকার হয়ে বসে আছি, ছ' মাস মদ্যপান ত্যাগ করেছি, পাছে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে কার্ককে বেফাঁস কিছু বলে বসি। তার সঙ্গে কথা বলতে সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কার্ক এই ব্যবসায় নেমেছে একটিমাত্র কারণে, সেই কারণ হ'ল স্ত্রীলোক।

তার একটি রক্ষিতা আমাদের সঙ্গে এখানে এসেছে, তার নাম মার্থা। কার্কের যোগাযোগরক্ষী, প্রচার-সচিব অসকারও এসেছে, কার্ক তার সঙ্গে কথা বললেই বেচারী ঘর্মাক্ত হয়ে ওঠে।

মারিয়ার নৃত্য শেষ হওয়ার কিছু পরেই আমরা সেই নোংরা নাইট ক্লাবে গিয়ে হাজির হলাম। শ্রোতা এবং দর্শকদের মানসিক প্রতিক্রিয়া মুখাকৃতিতেই বেশ বোঝা গেল, মেয়েটির সৌন্দর্যখ্যাতি যে অতিরঞ্জিত নয়, তা দেখলাম।

মারিয়ার আকৃতিতে অপরূপ মাদকতা, [সিনেমা জগতের ভাষায় এর নাম আকর্ষণ, মোহিনী শক্তি। মেয়েটির দৃঢ়তা অসীম। অসকারের মুঠো মুঠো টাকার প্রলোভনেও নাইট ক্লাবের স্বত্বাধিকারী মারিয়াকে আর একবার নাচতে অনুরোধ করতে পারল না। এমন কি আমাদের টেবলেও এল না। অসকারকে তখন কার্ক হুকুম করলো ব্যবস্থা করতে। অবশেষে সে-ও হতাশ হয়ে ফিরল।

কার্ক বিশ্বাস করতে চায় না, বলে: "খুলে বলেছ, ব্যাপারটি কি?"

অসকার সবিনয়ে জবাব দেয়,—"ও সব জানে, আমরা যে কে তাও ওর অজানা নয়। টেবলে এসে বসা ওর রীতিবিরুদ্ধ।"

কার্ক আমার মুখের পানে তাকালো। আমি প্রতিবাদ করলাম, কিন্তু বৃথা। তার যা ইচ্ছা সেই মত আমাকে চলতেই

বেয়ারফুট কনটেসা

মূল লেখক: জোসেফ এল ম্যানেকউইজ্

হবে। সমস্ত কিছু সে এক কথায় বাতিল করে দিয়ে বলবে আমার স্ক্রীপট্ ঠিক হয়নি। এই ছবিটা আমার পক্ষে হওয়া বিশেষ প্রয়োজন—সুতরাং হুকুম পালন করার চেষ্টা করলাম।

একজন অর্কেষ্ট্রার জনৈক শিল্পী কোথায় মারিয়াকে পাওয়া যেতে পারে তার সন্ধান দিল। আমি মারিয়ার সাজঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। দরজায় ধাক্কা দিতে সাড়া নেই, যেন কেউ নেই, আমি সোজা ঢুকে পড়ে চারদিক দেখছি হঠাৎ একটা পর্দার তলদেশে দু'টি সুন্দর পা দেখা গেল, পা ত' নয় চরণ-কমল। কিন্তু সেই সঙ্গে একজন পুরুষের স'বুট পদযুগলও শোভা পাচ্ছে। পর্দাটি একটু তুলে আমি গলা ছেড়ে বললাম—"সিনোরিটা তোমার খালি পা দেখতে পেয়েছি।"

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ পর্দা টেনে দিল, অতিশয় ক্রুদ্ধ হয়েছে। যাই হোক, একটু শান্ত হয়ে সামনের পুরুষটিকে 'কাজিন' বলে পরিচয় করিয়ে দিল। অলকার তাকে কার্ক সম্পর্কে সব কথাই বলেছে বুঝলাম; কিন্তু আমার কথা আর অনুগ্রহ করে বলেনি। আমার পরিচয় দিলাম। মারিয়া সে নাম শুনেছে, এমন কি আমি কোন ছবি পরিচালনা করেছি, কারা সেই ছবিতে তারকাখ্যিত হয়েছে সব জানে। অনেক পরে সে বলল—"আমার মনে হয়, যে লোক কিছু লিখতে পারে, টাকাওলা ধনীদের চাইতে সে অনেক বড়ো।"

"ও-কথা প্রকাশ্যে বলতে নেই, কে কোথায় শুনে ফেলবে কে জানে?"

অনেক সাধ্য-সাধনার পর মেয়েটি টেবলে এসে বসতে রাজী হল। অলকারের জন্ত যেন আমি জমি তৈরী করে দিলাম। সে সাগ্রহে সিনেমা সম্পর্কে তাকে অবহিত করতে বসল, কারা অভিনয় করবে, রোমের ফ্যাসনধারা এবং কি পরিমাণ অর্থ সে পেতে পারে তার সুদীর্ঘ তালিকা। তাছাড়া যদি সুদূর হলিউডে নেহাৎ নিঃসঙ্গ মনে হয়, তাহলে না হয় মাকেও সঙ্গে নেওয়া যাবে।

"আমি আমার মাকে চাই না—"

কার্ক অত্যন্ত সাধু ভঙ্গীতে বললে—"কিন্তু মাকে ত' সবার ভালোবাসাই উচিত। হয়ত এই তার মনোভাব, কার্কের মা অনেক টাকা তার জন্ত রেখে গেছে।"

মারিয়ার কিন্তু মোটেই ভালো লাগল না—অবশেষে সে একটা জরুরী টেলিফোন করতেই হবে বলে উঠে পালালো। আমি কিন্তু জানতাম সে আর ফিরবে না। সত্যই এলো না। এমন সময় বিমানের পাইলট এসে বললো, এখনই রোমে ফিরতে হয় কারণ একটু পরেই আবহাওয়া খারাপ হয়ে পড়বে। আমার ওপর আবার সেনোরিটাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়লো। কার্ক বললে—"যদি ওকে সঙ্গে নিয়ে না আসতে পারো, তাহলে আর মুখ দেখানোর প্রয়োজন নেই,—শুধু একটা টেলিগ্রাম করবে—যাচ্ছি।"

একজনকে ঘুষ দিয়ে ওর বাসার ঠিকানা জেনে নিলাম। একটা পুরাতন বস্তীতে অতি কষ্টে ওদের বাড়ি খুঁজে বার করলাম। দরজায় ধাক্কা দিতে যে মহিলাটির কর্কশ মুখখানি দেখা গেল, তাতেই বুঝলাম কেন মারিয়া তার মাকে ভালোবাসে না। বাপও আছেন, সংগ্রামক্লান্ত মধ্যবয়সী বৃদ্ধ রেডিওর পাশে চেয়ার টেনে চুপ করে বসে আছেন বিরস বদনে। রেডিওটা উচ্চৈঃস্বরে বাজছে। মারিয়ার ভাই পেড্রো কিছু কিছু ইংরাজী বলতে পারে। আমি হলিউডের কথা বলতে মারিয়ার মা চীৎকার করে উঠলেন, রেডিওটা বন্ধ করে দেওয়া হল। আমাকে বললে—ঐ নিমকহারাম মেয়েটা দেখছি সর্বনাশ করবে, আমাদের ফেলে পালাতে দেব না।

এই গোলমালে বোধ করি বৃদ্ধ পিতৃদেবকে বাঁচাবার জন্তই মারিয়া এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ করল। ওর মা যখন চীৎকার করে আমেরিকায় যেতে নিষেধ করল, তখন দরজাটা বন্ধ করে মারিয়া বাইরে চলে এল। আমি বুঝলাম মেয়েটিকে এইবার রাজী করান যাবে।

মারিয়া প্রশ্ন করল—"কার্ককে নিয়ে কি বিপদে পড়েছেন? আমি চলে এলাম বলে কিছু বলছে? আমি ও সব বেয়াড়া লোক সইতে পারি না। তাই পালিয়ে এলাম।"

কিছুক্ষণ আমরা চুপ করে রইলাম, সিগারেট বার করলাম, মারিয়া আবার বলে—"মিঃ ডয়েস, আপনার কি মনে হয় আমি ষ্টার হতে পারবো?"

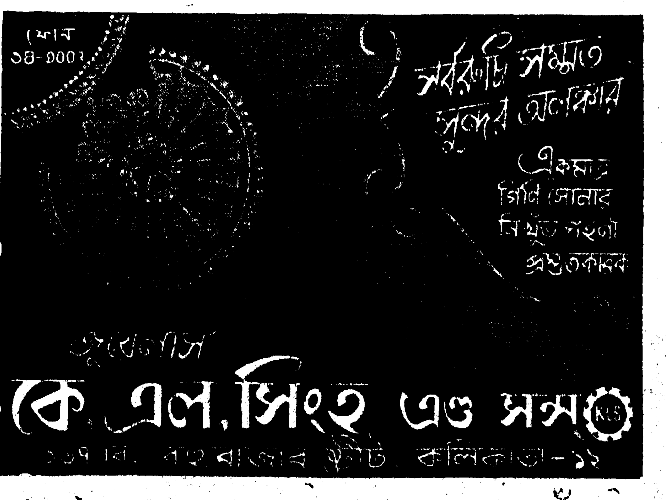
"আমার ত' মনে হয় পারবে।" এর চেয়ে আন্তরিকতা ভরা কথা আর বলিনি।

"আমি যে দেখতে সুন্দরী তা জানি, কিন্তু সে রকম তারকা হয়ে নাম করতে চাই না, আমি অভিনয় করতে চাই, আপনি শিখিয়ে দেবেন?"

এ অন্ত মারিয়া। আমি আমার নিজের গলায় ছুরি চালাতে গেলাম,—"তুমি কিন্তু পরীক্ষা দেওয়ার মতলবে রোমে এসো না।"

"অন্ততঃ এভ হাউসের কাছে না, কেমন, তাই বলতে চান ত'। সে হয় না?"

সেই চাঁদের আলোয় মেয়েটিকে চমৎকার দেখাচ্ছে, অতি সুন্দর।



সে আবার বলে—"কিন্তু কেন? আপনি আমার কতটুকু জানেন? —কিংবা আপনার নিজেরই বুঝি আমাকে প্রয়োজন?"

আমি ধীর কণ্ঠে বললাম—"আমার তিনটি স্ত্রী ছিল। ছ' মাস আগে আবার প্রেমে পড়েছি। এই মেয়েটি 'স্ক্রীপট্' গার্ল, তার নাম জেরী।"

মারিয়া শান্ত গলায় বলে—"এডওয়ার্ডসকে আমার ভয় নেই। বদ লোক আপনাদের একচেটিয়া নয়, খুব ছোট বয়স থেকেই আমার তাদের সঙ্গে পরিচয় আছে!" অন্যমনস্ক ভাবে জুতার ভেতর থেকে পা সরিয়ে নিল মারিয়া। বললে—"যখন খুব ছোট, তখন স্পেনে চলেছে গৃহযুদ্ধের হিড়িক,—বালির গর্তে গিয়ে প্রবেশ করতে হ'ত নিরাপত্তার খাতিরে। তখন এই পায়ের বুড় আঙুল নাচিয়ে চুপ করে বোমার শব্দ শুনতাম। ধূলাকাদায় আমার পা নিয়ে আমি নিরাপদে থাকি। নোঙরা জিনিষের ছোঁয়া লাগে না। যখন বড় হলাম, তখনও বোমা পড়ছে, কাছে একজন কাউকে চাই, ভরসা বাড়ে। কেউ আমাকে ভালোবাসুক, আদর করুক এই আমার বাসনা! আমাকে নিরাপদে রাখবে। আজও ভয় পেলে ওই কথাই মনে হয়, খুঁজি নিরাপদ আশ্রয়। ভালোবাসা চাই।" ধূলায় লুকিয়ে বাইরের আক্রমণ থেকে মুক্তি খুঁজি।"

বললাম—"এখন ত আর বোমা পড়ে না, ভয় কিসের, কাকে ভয়?"

"সবাই যাকে ভয় করে। কেমন মনে হয় বুঝি কোনো নিরাপত্তা নেই, কেমন যেন হঠাৎ সব মুখোস খসে যায়। যেমন টাকাহীন এডওয়ার্ডসের কথা ভাবুন। টাকাটাই ত ওঁর বর্ম। আপনি যেমন—মন্ত্রহীন আপনার কথা ভাবুন।"

"তুমি কি কাউকে ভালোবেসেছ?"

"ধূলার ভিতর থেকে মেঘের পানে তাকাতে বেশ লাগে মিঃ জয়েস। আচ্ছা মণি মুক্তা খচিত বিমানে চড়ে মিঃ এডওয়ার্ডস কি এতক্ষণে আকাশে উঠেছেন?"

আমি বললাম—"এখনও কিছু সময় আছে, বাড়ীতে বিদায় জানিয়ে এসো"—

"মার দিকে তাকাতে আর বাসনা নেই, বাবাকে কিছু বললে তাঁর মাথায় ঢুকবে না। পেড্রো তাঁকে দেখবে।"

তারপর বাড়ীর দরজাকে উদ্দেশ করে বলে—"চললাম বাবা, চলুন মিঃ জয়েস।"

অতঃপর কি ঘটলো, আপনি যদি নিয়মিত সিনেমা-দর্শক হন তাহলে তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু। আমাদের প্রজেকসন কক্ষেই মারিয়ার তারকাখ্যাতির জ্যোতি লক্ষ্য করলাম। কিছু তারকা আছে যাদের গায়ে আলো ফেললে সে আলোর ছটা আপনার গায়ে ফিরে আসবে। এই আমাদের মারিয়া।

মারিয়ার এই মোহিনী শক্তি লক্ষ্য না করার মত নির্বোধ কার্ক এডওয়ার্ডস্ নয়, কিন্তু তার তখন মূলতঃ মারিয়ার প্রতিই আকর্ষণ। কিন্তু সে প্রচেষ্টা তার বেশীদূর অগ্রসর হল না। তাই অসকারের জবানীতে য়ুরোপের আরো কয়েক জন বিশিষ্ট ফিলম ব্যবসায়ীকে আমন্ত্রণ করলাম। তারা ত' মারিয়াকে দেখে একেবারে আত্মহারা। আমি জানতাম আগামী কাল মারিয়ার খ্যাতি ন্যু ইয়র্ক ও হলিউডে ছড়িয়ে পড়বে। মারিয়া কার্কের টাকার মাকড়সার জাল থেকে মুক্তি পাবে।

আমি কার্ককে বললাম—"মারিয়া এখন তোমাকে উপহাস করবে। যে-নারী তোমাকে উপেক্ষা ও উপহাস করে তুমি তাকে ধ্বংস করতে পারো জানি—এখানে আর তোমার সে চালাকী চলবে না, মারিয়ার কাছে আর কোন কৌশল খাটবে না। মারিয়া তোমার কোম্পানীতে কনট্রাক্ট সই করবে না।"

চোখ দুটো ছোট হয়ে গেল কার্কের, সে বললে—"ও সে বুঝি তোমার দলে কনট্রাক্ট সই করছে। তাই না?"

"আমি ব্যাবসায়ী নই। কারবারের কি জানি। তবে মারিয়াকে আমি যা বলব, লক্ষ্মী মেয়ের মত সে তাই করবে।"

কার্ক চুপ করে রইল। আমি অনেকক্ষণ পরে বললাম—"আচ্ছা হলিউডে ফেরা যাক, তার পর নতুন মুখ খুঁজে বের করার চেষ্টা করা যাবে।"

আমেরিকা,—মারিয়া সম্পর্কে আমেরিকার যেন প্রথম দর্শনেই প্রেম। জাহাজ থেকে নামার সঙ্গেই তার জনপ্রিয়তা যেন বেড়ে গেল। সবাই তার কথা জানতে চায়, শুনতে চায়। কিন্তু জানাবার কিছুই নেই। মারিয়া আত্মকেন্দ্রিক, শুধু প্রচার সচিব অসকার কোনোরকমে তার নামটা পরিবর্তন করে মারিয়া ডা' আমটা করেছিল।

এই নামের অর্থ কয়েক মিলিয়ন ডলার বক্স অফিস পাওনা। কার্ক, মারিয়া এবং আমি সকলের ভাগ্যেই অজস্র টাকা। কিছুই এখন তার পথ রোধ করতে পারবে না, এমন কি কোনো রকমের জঘন্য কলঙ্ক রটনা হলে যেখানে চিত্রতারকার ভবিষ্যৎ ধূলিতে মিলিয়ে যায়—সেই জাতীয় কলঙ্কও ওর এতটুকু ক্ষতি করতে পারে না।

ইতিমধ্যে মাদ্রিদ থেকে সংবাদ এল ওর মাকে ওর বাবা হত্যা করেছে। সেই সময় কার্ক এবং অসকার লণ্ডনে। আমি হলিউডে বসে আছি, ওরা আমাকে জানালো মারিয়াকে আমেরিকায় ধরে রাখতে। কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। মারিয়া তখন মাদ্রিদে ছুটেছে বাপের পক্ষ নিয়ে আদালতে সাক্ষ্য দিতে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মারিয়া কিছুই গোপন রাখলো না। কি নোঙরা পরিস্থিতিতে মারিয়া আর তার ভাই জন্মেছিল! তার মার ঘৃণা এবং মার প্রতি তাদের ঘৃণা। মার চরিত্র, কর্কশ-কাঠিন্য ভরা ব্যবহার, কিছুই বাদ রইলো না। মারিয়ার বাবা দোষী সন্দেহ নেই, কিন্তু বিচারকবৃন্দ মারিয়ার জবানবন্দীতে সবই বুঝলেন। তাঁদের চক্ষু সজল হয়ে উঠল, আর সারা পৃথিবীর লোকও সহানুভূতিতে বিগলিত হল। মারিয়ার বাবা মুক্তি পেলেন। আত্মরক্ষার খাতিরেই তিনি হত্যা করেছেন প্রমাণিত হল। এই বিচারালয় থেকে মারিয়া যখন বেরিয়ে এল তখন তার প্রতিষ্ঠা প্রথম শ্রেণীর তারকার তালিকায় পৌঁছেছে।

আমিও এই কাণ্ড দেখে হতভম্ব। অসকার ত' কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। ওদের বাঁধা-ধরা আইন যেন সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল! অসকার বুঝলো, কার্কের পদতলের মাটি সরে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত কার্কের পতনে আরো দুটি বছর লাগল। জেরী ও আমার জীবনের দুটি সুন্দর বছর।

মারিয়া ও আমার কোম্পানী হল। কার্ক অবশ্য মহাজনী করত। তার নিজস্ব ডিসট্রিবিউটিং ফার্মের মারফৎ।

অবশেষে মারিয়ার বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক পার্টিতে সব ভেঙে গেল। তথাকথিত হলিউডের পার্টি, আড়ম্বরের শেষ নেই। বেভারলি হিলের মারিয়ার ভাড়া করা প্রাসাদে পার্টি চলছে। আমি আর জেরীও নিমন্ত্রিত হয়ে হাজির হয়েছি।

কার্ক এডওয়ার্ডস নিমন্ত্রণ কর্তা। আমার আপত্তি সত্ত্বেও মারিয়া কার্ককে অনুমতি দিয়েছিল। সেনর আলবার্টো ব্রাভানোকে আপ্যায়নের উদ্দেশ্যেই এই পার্টি। সাউথ আমেরিকার বিখ্যাত ধনী ব্রাভানো। গোড়া থেকেই বোঝা গেল ব্রাভানো মারিয়াকে দেখে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। সাউথ আমেরিকান ভদ্রলোকটিকে উপেক্ষা করলেও, কার্ক নিঃশব্দে বসে আছে।

মারিয়া আমার কাছে এসে বসেছে, জেরী আর আমি জুয়া খেলছিলাম ও দেখছে। খেলা শেষ হল, মারিয়া অশান্ত ভঙ্গীতে বলে উঠল—"আমি হ্যারীকে কিছু বলতে চাই, আপনার আপত্তি আছে?"

জেরী হেসে বলল—"বেশ ত।"

আমরা উভয়ে বাইরে গেলাম,—বারান্দা থেকে অন্ধকারের বুক চিরে অসংখ্য আলো জোনাকির মত জ্বলছে। মারিয়ার অতিথিশালার জানলায় আলো জ্বলছে। আমি একটা সিগারেট ধরালাম, মারিয়া কথা বলে চলে,—বলে—"হ্যারী, আমি ভাবছি বাড়ি যাব—এ ত' আমার ভাড়া করা বাড়ি।"

"তোমার খাটুনি বেড়েছে, কিছু বিশ্রামের প্রয়োজন।"

"আমার মনে হয় মাদ্রিদে ফিরে যাওয়াই ভালো,—আমার, সেই আমার নিজস্ব স্থান, অন্ততঃ যেখানকার মানুষ সেই ধূলিময়লায় ফিরে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। পথের ধূলাই আমার বিচরণক্ষেত্র—

"কিন্তু তুমি ত' বলেছিলে কিছুই তোমার অনুকূল নয়।"

"এ এক রূপকথা, আমি হলাম 'La Cenicineta' রূপকথার মেয়ে। আমার অলঙ্কার আছে, গাউন আছে"—

অনুমানে বুঝলাম কথাটি ইংরাজী সিনডেলার স্পেনীয় প্রতিশব্দ। বললাম—"কিন্তু একটা বিশেষ চরিত্রের উল্লেখ করোনি।"

—"রূপকথার রাজপুত্র—তার কথাই বলিনি।"

অতিথিশালার সেই আলোকিত কক্ষ থেকে গীটারের শব্দ ভেসে আসছিল। স্প্যানীশ গীটারের শব্দ। ওর মাদ্রিদের সাজঘরের সেই 'কাজিন' এই ধরণের গীটার বাজিয়েছিল। আমি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের পানে তাকালাম।

মারিয়া বুঝেছিল আমার মনোভাব, সে মৃদুগলায় বললে—"রূপকথার রাজপুত্তর ত' আর ভাড়া পাওয়া যায় না।"

বাইরে আমাদের কথাবার্তা চলছে কিন্তু ভিতরে এদিকে দেবাসুরের যুদ্ধ বেধে গেছে। কার্ক আর ব্রাভানোর বাক্‌যুদ্ধ চলেছে আর সমগ্র অভ্যাগতবৃন্দ স্থাণুর মতো নিঃশব্দে সেই দৃশ্য

দেখছেন। কার্ক তার দক্ষিণ-আমেরিকার অতিথিকে যা খুসী বলছে আর ব্রাভানোর উত্তরও তেমনই অপমান জনক।

কার্কের কণ্ঠস্বর কর্কশ ও রূঢ়—"ব্রাভানো, আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যাও, নইলে আমি তাড়িয়ে দেব।"

ব্রাভানোর চোখ ছোট হয়ে এসেছে, কিন্তু মারিয়ার দিকে মধুর হেসে সে বলল, "আপনিও আমার সঙ্গে আসবেন? কাল ক্যানে যাত্রা করছি, আপনি যদি আমার সহযাত্রী হন, অতি আনন্দের কারণ হবে। এই বাড়ি থেকে বেরিয়ে চলুন।"

মারিয়া মৃদু গলায় বলে—"ভুল করছেন সেনর, এ বাড়ি আমারই।"

কার্ক চীৎকার করে ওঠে—"মারিয়া, ওকে জানিয়ে দাও, আজ কেন, কোনো দিনই তুমি ওর সঙ্গিনী হবে না।" কার্কের চোখ জ্বলছে, তার নিঃশ্বাস অতি দ্রুত তালে পড়ছে।

মারিয়ার মুখে আবার হাসি ফুটে ওঠে—"কার্ক, তুমি চিরদিনই অতি অশুভক্ষণে আমার ওপর হুকুমজারি করতে চাও। তোমার ডিকটেটরী চাল আমার কাছে খাটবে না। যাব নাই ভেবেছিলাম, কিন্তু এখন আমি ঠিক করলাম যাবই।"

কার্ক চীৎকার করে ওঠে—"অসকার, সবাইকে ভাগাও, পার্টি খতম্।"

অসকার এতক্ষণ দু'জনকেই ওজন করছিল মনে মনে। চার বছরের পুঞ্জীভূত অপমান তাকে আজ সাহসী করে তুলেছে—"এইবার, কার্ক সাহেব আপনি নিজেই আপনার ছাইদানী পরিষ্কার করুন। আপনি বলছেন পার্টি খতম্,—বেশ ধন্যবাদ! সময়টা বেশ কাটল।"

আমার মহাজন কার্ক উত্তেজিত কণ্ঠে অসকারকে বললেন—তোমার চাকরীও খতম্—এখনই, এই মুহূর্ত্তেই—"

ব্রাভানো হাততালি দিয়ে বলে ওঠে—"চমৎকার! মিঃ মূলড্রণ, আপনিও যদি আমার সঙ্গে চলে আসেন, খুসী হব।"

অসকার সবিনয়ে নমস্কার জানিয়ে বলে—"সেনর, আপনি সব ব্যবস্থা করলেন তার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।"

কার্ক আমার দিকে তাকিয়ে ফেটে পড়ে—"আর মারিয়াকে ছবি করতে হবে না, আমি ওকে বাদ দিলাম। ওকে আমি ছবির জগতে নিশ্চিহ্ন করে দেব।"

আমি বললাম—"তাহলে আপনাকে পৃথিবীর সব ষ্টুডিও কিনতে হবে। হাতের চেয়ে আম এখন অনেক বড়ো হয়ে গেছে"। জেরী আমার পাশেই ছিল, তারও এখান থেকে সরে পড়ার তাড়া।

পথ চলতে অন্ধকারে দেখি, ঘাসের ওপর মারিয়ার পরিত্যক্ত স্যাণ্ডাল জোড়া পড়ে আছে, যেন দুটি সোনালী তীর অতিথিশালার দিক্ নির্দেশ করছে। লনের ওপাশে গেষ্ট-হাউসের আলো ততক্ষণে নিবে গেছে, গীটার বাজছে না।

জেরী প্রশ্ন করলো—"ঐ বাড়িটায় কে থাকে? প্রিন্স? মারিয়ার জীবনের রাজপুত্র।"

আমি জবাবে বললাম—"সিনড্রেলার সেই কাজিন। গীটার-বাদক আত্মীয়"।

জেরী বলে—"কি জানি, কিছুই বুঝি না বাপু।"

আমিও আর কিছু খুলে বললাম না। জেরীকেও কিছু বলা ঠিক নয়। এমন অনেক কথা আছে যা সবাইকে বলা যায় না। বলে যদি কিছু ফল হ'ত তাহ'লে অবশ্য পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে চীৎকার করতাম।

মারিয়া ব্রাভানোর অতিথি হয়ে সেই প্রমোদ-তরণীতে রিভিয়েরায় চলে গেল। সেই সঙ্গে অসকারও চলে গেছে। ব্রাভানো যে হতাশ প্রেমিক হিসাবে ক্যানে পৌঁছবে একথা অসকারের মুখে শোনার প্রয়োজন আমার ছিল না। আমি আগেই জানতাম। আমি শুনলাম, মারিয়া ব্রাভানোর চোখে ঘুঁসি মেরে কালসিটে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণ-আমেরিকাবাসী ব্রাভানো অবশ্য সেই দাগটি জয়তিলক হিসাবে গ্রহণ করেছে। মারিয়া যে তার রক্ষিতা, এই কথা সর্বত্র বিজ্ঞাপিত করেই তার আনন্দ। সবাই এই কথা মনে করলেই তার সব শ্রম সার্থক।

সুন্দর গাছকে কেন্দ্র করে—বৎসরান্তে একবার যেমন ছত্রক জন্মায়, ফরাসী রিভেয়ারায় বৎসরে একবার ধনীদের ভিড় বাড়ে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হবে পৃথিবী থেকে সাধারণ মানুষের দল নিশ্চিহ্ন হয়েছে, তার পরিবর্তে প্রজাপতির আকার নিয়ে মানবকুল ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছে। এরা সব ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত। রাজ্যহীন রাজন্যবর্গের চার পাশে এই জাতীয় মানুষ ভিড় করে আসে। এই বছর ব্রাভানোর অতিথি এই রকম জনৈক সিংহাসনচ্যুত ভূস্বামী। এই দলে লুলু ম্যাক্‌গী আছে, তার কাজ ধনীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া, সিংহাসনের দাবীদারের স্ত্রীও সঙ্গে আছেন, একদা তিনি লণ্ডনের মঞ্চাভিনেত্রী ছিলেন।

মারিয়া তাদের ভেতর এমন ভাবে বিচরণ করত, যেন নভোকেন প্রভাবে আচ্ছন্ন। বেদনা নেই, আনন্দ নেই, আগ্রহ নেই, কোনো কিছুতে কৌতূহল নেই। নিরাসক্ত নিস্পৃহ প্রাণী মাত্র।

কাউণ্ট টোরলাটো—ফাভরিণি মারিয়ার জীবনে প্রবেশ করল ক্যাসিনোর এক সান্ধ্য জুয়ার আড্ডায়। ব্রাভানো চড়াদরের বাজি ধরে খেলছে, সহসা মারিয়া অতর্কিতে এসে কিছু টাকা তুলে নিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে ফেলে দিল। নীচে একজন বেদে যুবক দাঁড়িয়ে ছিল, সে টাকাটা লুফে নিয়ে চলে গেল। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে এই বেদে যুবকও মারিয়ার তথাকথিত কাজিন সম্প্রদায়ভুক্ত।

এদিকে তার পর থেকেই ব্রাভানো হারতে সুরু করেছে। রাগে ফেটে পড়ে ব্রাভানো বলে—"তুমিই আমার সর্বনাশ করেছ, আমার 'পয়' নষ্ট করেছ।" এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল ব্রাভানো যে ক্যাসিনোর সকলেই সে কথা শুনতে পেল। "তোমার জন্য আমার কোটি টাকা উড়ে গেছে, যেদিন থেকে তোমাকে সঙ্গে নিয়েছি, সেদিন থেকেই এই ভাগ্য বিপর্য্যয়, তুমি নারী নয়, তুমি পিশাচী। তোমার মুখে যে মাধুরী দেখেছিলাম, আজ তা কই, এখন শুধু দেখছি তোমার দেহটা পশুর, তুমি থাকো পশুর মত, তুমিও একটি পশু।"

সহসা একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে হাজির, গাত্রবর্ণ কিঞ্চিৎ ম্লান কিন্তু আকৃতি ব্যক্তিত্বপূর্ণ ও মর্য্যাদামণ্ডিত। তিনি সবিনয়ে বললেন—"ম'সিয়ে, অনুমতি দিন—" তার পর ব্রাভানোর গালে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করল।

বিস্ময়াহত ত্রাভানো অসহায় ভঙ্গীতে অসুকারের মুখের পানে তাকায়, অসুকার নিস্পন্দ, নিষ্ক্রিয়। অপরিচিত ব্যক্তির প্রসারিত হাত ধরে মারিয়া নিঃশব্দে হল থেকে বেরিয়ে গেল। একবার পিছনে চেয়েও দেখলো না।

মারিয়ার সঙ্গে যখন ভিনসেনজো তোরলাতো ফাভরিণির পরিচয় হয়, তখন আমি তাকে জানতাম না। না জানাই হয়ত ভালো ছিল, অন্ততঃ এই ট্রাজেডিটা হয়ত নিবারণ করা যেত। যাই হোক, এই আমার ধারণা। মারিয়ার প্রকৃতি এমন যে তার শুভানুধ্যায়ীরা যে তাকে গড়ে-পিটে নিতে পারবে, তা হবে না। এমন কি আমার মত অন্তরঙ্গ প্রাণীর পক্ষেও তা সম্ভব নয়। তার একমাত্র শান্তি সাময়িক প্রেমে, সেই ভাবেই সে গড়ে উঠেছে, আর সেই প্রেমের ক্ষেত্র সমাজের নীচের তলায়।

কাহিনীটা বিচ্ছিন্ন অংশ থেকে সংগ্রহ করে গাঁথলে যা দাঁড়ায় তাই বলছি:

যেদিন এই ঘটনা ঘটে সেদিন অপরাহ্নে ভিনসেনজো সর্বপ্রথম মারিয়াকে দেখে, মারিয়া পথের ধারে বেদের হাত ধরে পরমানন্দে নাচছিল, এই বেদে যুবকটিকেই সে পরে টাকা দেয় ক্যাসিনোর জানলা থেকে। ভিনসেনজো তার বিরাট মার্কিনী মোটরে র‍্যাপালো থেকে প্রাণ্ড করনিসে পর্যন্ত উদ্দেশ্যহীন ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, ইতালীয় সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবকটি এই রকম ঘুরে বেড়ায় মাঝে মাঝে,—নিদ্রাহীন রাত্রির জ্বালা আর তার পর নিরর্থক প্রভাত তার মনে নিদারুণ অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। তাই তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়, অনিশ্চিতের পিছনে,—নিরুদ্দেশ যাত্রা। মারিয়া প্রথম পরিচয়ে ভিনসেনজোর আকৃতিতে এই উৎপীড়নের ছাপ লক্ষ্য করেনি, নিওরটিক ভিনসেনজোর মন সে বোঝেনি। আজ আমি ভাবি, কোনো দিন কি বুঝতে পেরেছিল?

সেই রাত্রে ওরা র‍্যাপালোর ভিনসেনজোর পূর্বপুরুষদের বিরাট প্রাসাদে উপস্থিত হল,—পরিচারক এসে মারিয়ার নির্দিষ্ট ঘরে নিয়ে গেল। পরদিন প্রাতে মারিয়া টোরলাটো ফাভরিণি পরিবারের ইতিহাস জানতে সুরু করল। বিরাট ঐতিহ্যময় বনেদী ঘর।

ভিনসেনজো আর তার যুদ্ধজনিত বৈধব্যভোগী বোন এলেনোরার সঙ্গে এই বিরাট প্রাসাদে বাস করা যেন এক মধুর স্বপ্নের অংশ। এক মায়াময় বিচিত্র পরিবেশ!

ভিনসেনজো মর্যাদামণ্ডিত ভঙ্গীতে এবং দুঃখিত চিত্তে ফাভরিণি ও টোরলাটো পরিবারের পূর্বপুরুষদের চিত্রাদি দেখালো—বললো, "এই পরিবারের নীতিবাক্য হল Che Sara Sara—যা হবার তা হ'বে।"

ভূমধ্যসাগরের বুকে ভিনসেনজোর সুন্দর বোটে চড়ে ওরা নৌকা-বিহারে বেরোল। প্রাসাদের সন্নিকটস্থ সাগর-সৈকতে মারিয়া পরমানন্দে সাঁতার কাটলো। দিন কেটে

সপ্তাহে পৌঁছাল—এই কালটুকুর ভিতর মারিয়া গভীর প্রেমে ডুবলো। জীবনে আর কখনও সে এতখানি আনন্দের আস্বাদ পায়নি।

ভিনসেনজোও ইতিমধ্যে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে, সে এলিয়ানোরাকে বলল—"মারিয়া এই বংশের শেষ 'কনটেসা'।"

এলিয়ানোরার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। "মারিয়াকে বিবাহ করার মত নিষ্ঠুর আর ধ্বংসাত্মক আর কিছু হতে পারে না। কোন অধিকারে তুমি এই সর্বনাশ করবে?"

ভিনসেনজো শান্তকণ্ঠে বলে—"আমি আঘাত দিতে চাই না, আমি তাকে ভালোবাসি—আর ধ্বংস বা সর্বনাশ? সে সর্বনাশ ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে।"

এলিয়ানোরা বলে—"দেখ এই পৃথিবী আমাদের বাদ দিয়েও চলবে, আমরা মিলিয়ে যাব, যেমন ডায়নাসোরের বংশ লোপ পেয়েছে। এ সংসারে আমাদের আর কিছু কাজ নেই। আমার সন্তান নেই। আর বোধ করি সেই কারণেই তুমি—"

"আমি কি করব? আমার কি অপরাধ? এ ত আমি চাই নি, যা হয়েছে তার গতিরোধ করার শক্তি আমার নেই। আমি মারিয়াকে ভালোবাসি।"

ওদের বিবাহের ঘোষণা আমার নজরে পড়লো জাহাজের সংবাদপত্রে। আমি ইতালী যাচ্ছিলাম একটা নতুন ছবির স্যুটিং উপলক্ষে, হঠাৎ এই সংবাদ দেখলাম। মারিয়া দা আমটা কাউন্ট টোরলাটো ফাভরিণিকে বিবাহ করবেন। এ সংবাদ আমার কাছে বিস্ময়ের নয়, মারিয়া আমাকে মাঝে মাঝে চিঠি দিত। বুঝলাম সিনড্রেলার জীবনে রাজপুত্রের আবির্ভাব ঘটেছে।

আমি যখন পৌঁছলাম তখন ও রোমে, কিছু কেনা-কাটা করতে গিয়েছিল। কিন্তু একটু সময় করে তাড়াতাড়ি এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। তার মুখ এক অপূর্ব মাধুরীতে উদ্ভাসিত।

আমাকে সে বুঝিয়ে বলে—"যেন আমার সারা জীবন এরই জন্য বসেছিলাম। যেন অন্ধকারে এত দিন ছিলাম, এইবার হঠাৎ আলোর ঝলক লেগেছে।"

রূপকথার এমনই সব ঘটনা ঘটে। এখনও কি তুমি কুহকে জড়িত ?"

"আর কোনো দিন কোনো বিষয়ে এত আনন্দ পাইনি, এখন সব কিছুতেই আনন্দ, কি তোমাকে বলবো? মানুষটি সুন্দর, রূপবান, মার্জিত, ভদ্র, দাম্ভিক এবং মহৎ, এই কথা কি বলার প্রয়োজন আছে? কিছু বলতে যাওয়াটাই বাতুলতা। কিন্তু তোমাকে সব বলতে পারি। হ্যারী এ যেন সেই La Cenicienta আর রাজপুত্রের কাহিনী। ও আমার হাতে চুমা খায়।"

মারিয়ার মত স্ত্রীলোক? কিঞ্চিৎ আশ্চর্য বটে! বললাম, "তা, কত দিন এমন চলছে?"

বালিকার মত মুখভঙ্গী করে মারিয়া বলল—"ছ' সপ্তাহ হবে।"

"ছ' সপ্তাহ! তোমার সঙ্গে ছ'টি সপ্তাহ ধরে দিন আর রাত কাটানো, বিচিত্র!" আমার অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল।

আমি বললাম—"কি জানি হয়ত রূপকথার জের অনেক দূর অবধি টেনেছি। তবে সিনড্রেলা আর প্রিন্স আর যাই হোক, রক্ত-মাংসের মানুষ, কাউণ্ট আর কাউণ্টেস এ যুগের নর-নারী।"

এর ক'দিন পরে আমি র‍্যাপালোর সেই প্রাসাদে গেলাম। তসবিরখানায় এক ফরাসী ভাস্কর মারিয়ার প্রস্তরমূর্তি গড়ছে। অজানা আতঙ্কে লক্ষ্য করলাম মারিয়ার পা দুটি নগ্ন। মারিয়া আমার সেই বিহ্বল দৃষ্টির পানে তাকিয়ে রইলো।

কিছু বলা উচিত তাই বললাম, "ক্যালিফোর্ণিয়ায় একবার সংবাদটা পৌঁছাক, তারপর কমলালেবুর গাছের চাইতে সংখ্যায় অনেক বেশী মারিয়ার প্রতিমূর্তি গড়ে উঠবে।"

মারিয়া আমাকে পাত্রী সম্প্রদান করতে অনুরোধ করলো, আমিও রাজী হলাম। এক ছোট্ট প্রাচীন পারিবারিক গির্জায় অতি অল্পসংখ্যক অভ্যাগতের উপস্থিতিতে বিবাহ হয়ে গেল। পরে কাউণ্টের প্রাসাদে এক বিরাট পার্টি দেওয়া হল। এক হিসাবে দুটি পার্টি—প্রাসাদের অভ্যন্তরে অভ্যাগত মাননীয় অতিথিবৃন্দ, সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহামান্যের দল আর প্রাসাদের বাইরে চাকর-দাসীদের উৎসব। ক'নে মারিয়ার মন আমার জানা, তাই ভাবছিলাম ভিতরের পার্টির চাইতে ঐ বাইরের পার্টিতে যোগ দিতে পারলেই সে বেশী খুশী হ'ত। মারিয়া আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল—"হ্যারী, চলো আমরা নাবি,—আমরা কিন্তু ঐ নীচের দলে, এ আমাদের স্থান নয়।"

তাহ'লে আমার ধারণাই ঠিক। বললাম—"আমি হয়ত ঐ দলে, কিন্তু কনটেসা তুমি?"

মারিয়া সবিস্ময়ে বলে, "আজকের দিনে এই যুগে, এই সব আর যেন বিশ্বাস করা যায় না।"

"হঠাৎ দিন আর যুগের কথা কেন?" ঘড়ির দিকে তাকালাম, বললাম "এখন সময় হয়েছে, শিশু এবং বুড়ো ডাইরেক্টরদের এইবার বিশ্রাম নেওয়ার পালা।"

মারিয়া হাসলো, আমার আগেই প্রধান প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে চললো। ওর পিছনে যেতে যেতে ভিনসেনজোর সঙ্গে দেখা, আমি তাকে বললাম—"আমাকে কিছু বলার আছে। মারিয়া চিরদিন রূপকথার রাজত্বে বাস করেছে। তার স্বপ্ন-বিজড়িত মনের সবটা জুড়ে আছে রাজপুত্র। আপনি সেই রাজপুত্র। আশা করি আপনি তাকে সুখে রাখবেন।"

ভ্রূ কুঞ্চিত করে কাউণ্ট বললেন "কি জানি হঠাৎ আপনার এই কথা আমাকে বলার অর্থ কি?"

আমি বললাম, "আমিও জানি না—আচ্ছা গুডনাইট," আমি সোজা চলে এলাম, দোর গোড়ায় মারিয়া দাঁড়িয়েছিল, তাকে বললাম—"গুড নাইট কনটেসা।"

মারিয়া তার সুন্দর মাথাটি মনোহর ভঙ্গীতে নেড়ে আমাকে বলল—"আমাকে ঐ নামে ডেকো না।" আমি বললাম—"সিনড্রেলার স্প্যানীস নামটি আমার মনে নেই।"

কি জানি কেন, অকারণে সেই রাতে মারিয়ার জন্য আমার মনে বেদনা অনুভব করলাম।

সেই রাত্রের পর আর একবার মাত্র তাকে দেখলাম। এক হিসাবে দু'বার, তবে জীবিত অবস্থায় মাত্র একবার।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছে, সেই রাত্রে আমার হোটেলে মারিয়া এসে হাজির। আমি টাইপ করছিলাম, মারিয়া দরজায় ধাক্কা দিল। অতি দ্রুত ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকেই দরজায় হেলান দিয়ে সে হাঁপাতে থাকে।

কি যে বলি ভাবতে লাগলাম, তার পর বললাম—"কি রকম হনিমুন হ'ল?"

"আমার হনিমুন? আমরা দশ সপ্তাহ ধরে বাড়িতেই আছি।" সহসা কাউচে বসে পড়ে মারিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল মুখে হাত চাপা দিয়ে।

আমি বললাম—"ছিঃ, আমার কাছে লজ্জা কি? আমি ত' তোমার শুভাকাঙ্খী, আমাকে সব বলতে পারো।"

অতি মৃদু গলায় মারিয়া বলে—"হ্যারী, যাকে ভালোবাসি তাকে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করলাম,—তারপর সেই বিবাহের রাত্রে আশাভরা মন নিয়ে স্বামীর প্রতীক্ষায় রইলাম—"

গলা ভেঙে গেল মারিয়ার।

আমি চুপ করে রইলাম। মনে পড়ল কি এক অশুভ আশঙ্কায় সেই রাত্রে মারিয়ার জন্য আমার মনে বেদনা জেগেছিল।

অবশেষে কিঞ্চিৎ শক্তি সঞ্চয় করে মারিয়া তার বিবাহ-রজনীর কাহিনী বলতে সুরু করল। আমার আশঙ্কা সত্যে পরিণত হল। স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছে তখন দরজা খুলে ভিনসেনজো প্রবেশ করলেন। সেই অভ্যর্থনার পোষাক পরা। নির্বাক মারিয়া স্বামীকে চুম্বনে অভিষিক্ত করলো। কিন্তু ভিনসেনজো তাড়াতাড়ি ওর বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি নিল। মুখে নিবিড় বেদনার ছাপ।

মারিয়া কোমল গলায় বলল—"আমি তোমাকে কয়েকটি কথা বলবো,—সারাজীবন আমি তোমারই প্রতীক্ষায় ছিলাম, আর কাউকেই আমি এই কারণে ভালোবাসিনি। আমার মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছি। আজ আমার স্বপ্ন সত্য হয়েছে। তুমি আমাকে ভালোবাসো, সত্যি"?

"ভালো বাসি"। ভিন্সেনজোর মুখে এই কথা শুনে মারিয়া যখন

তাকে আবার চুম্বনোদ্যত হল, তখন তার কাছ থেকে সরে এসে ভিনসেনজো বলল—"আমার মুখের কথা আর কোনো দিন এমন জড়ত্ব পায়নি, আজ আর কথা বলার শক্তি নেই। জীবনে এমন একটা সময় আসে যখন স্বপ্ন থেকে জেগে উঠতে হয়। যা বলি, বিশ্বাস করো, তোমাকে আমি ভালোবাসি। তোমাকে আমি স্ত্রী হিসাবে পেয়েছি, তোমাকে আমি সুখী করবো। কিন্তু আমার কথা এই কাগজে পরিষ্কার ভাবে টাইপ করা আছে।"

"ভিনসেনজো, এ যে সামরিক দলিল! ইতালীয় ভাষায় লেখা"—

"Che Sara Sara, কোনো কথাই গোপন করছি না, এটা সামরিক দলিল সন্দেহ নেই। মেডিকাল রিপোর্ট তারিখ ১৯৪২। বিস্তারিত ভাবে এই দলিলে লেখা আছে আমার দেহ কি ভাবে গোলাঘাতে উড়ে গেছে, চিকিৎসকের কৌশলে সেই বিচ্ছিন্ন অংশ কোনোক্রমে সংযুক্ত আছে। শুধু আমার হৃদয়টা অক্ষত আছে, আর সেইটুকুই তোমাকে দিতে পারি। আর আমার কিছু নেই। হৃদয় দিয়ে তোমাকে ভালোবাসি।"

আমার জানলার সার্সিতে বৃষ্টির জলতরঙ্গ বাজছে। আমি কোনো ক্রমে বললাম, "তাহ'লে এই ব্যাপার! কত দিন সইবে?" সে মিথ্যা বলে না। অন্ততঃ আমার কাছে নয়, বলল—"যত দিন পারবে"।

"এখন কনটেসার কাজিন কে? কোন ভাগ্যবান কিষাণ? মারিয়া আমি বলেছিলাম, আমি তোমার শুভানুধ্যায়ী। এখন আর কি বলবো জানি না।"

"সেও জানে না। আমার কি দোষ!"

"তাতেই বা কি দোষ—তোমরা ছুটি প্রাণী পরস্পর কত সুখী হতে পারতে—এখন আমার স্ক্রীপট বদলে গেল। জীবন অতি নির্মম লেখক"।

"আমি কিন্তু ওকে সুখী করবো।"

"কি ভাবে? যতক্ষণ না ধরা পড়ছ। কিন্তু আমাকে কেন বলছ, কনটেসা?"

"আমার স্বামী, তার ভগিনী কেউই আর মনে করবে না যে তাদের সঙ্গেই তাদের বংশ লোপ পাবে। এই বংশের শেষ নেই। সত্য হবেই। আমিই তা পূর্ণ করবো।"

"বলো কি? কিন্তু কে তোমার সেই সন্তানের জনক?"

"তার খবরে প্রয়োজন কি? আমি তার মা? আমার স্বামী তার পিতা! বাইরের লোকের কিছুই জানবার কথা নয়। ওরা সুখী হবে।"

আমি প্রায় চীৎকার করে বললাম—"মারিয়া, তুমি কি জানো না, তোমার স্বামী অত্যন্ত উৎপীড়িত যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষ? জীবনটা সে নিজের খেয়ালমাফিক পরিপূর্ণ করতে চায়?"

"আমি ভিনসেনজোকে তোমার চেয়ে বেশী জানি। কিন্তু মারিয়ার কণ্ঠস্বরে আর দৃঢ়তা নেই। "কাল হয়ত ব্যাপারটা কঠিন হবে, কিন্তু পরে"—

"কিন্তু ধরো তোমার স্বামীর দৃষ্টিভঙ্গী যদি পৃথক হয়? সে যদি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে না পারে?"

"সব ঠিক হয়ে যাবে! আমি আজই ওকে বলবো, সব কথা আজ রাতে বলবো।"

মারিয়া চলে গেল। দরজাটা বন্ধ করে একটা সিগারেট ধরিয়ে জানলার ধারে দাঁড়ালাম। মারিয়া তার ছোট্ট গাড়িতে উঠল। তারপর সেই অন্ধকারে আর একটি বৃহৎ মোটরের গর্জন শোনা গেল, আলো জ্বলে উঠল। সে গাড়ি ভিনসেনজোর।

প্রাসাদে পৌঁছতে অনেক সময় লাগলো। ঘণ্টা দিলাম, সাড়া নেই। পিছনের দরজা দিয়ে বাগানে ঢুকলাম, ঘরে আলো জ্বলছে। সেই বৃষ্টিতে ভিজে ভিতরে যাবার উদ্যোগ করলাম।

সেই মুহূর্তে পর পর দুটি পিস্তলের আওয়াজ শোনা গেল।

অন্ধকারের ভিতর থেকে ধীরে-ধীরে ভিনসেনজো আমার দিকে এগিয়ে এলো। তার দুই হাতে মারিয়ার মৃতদেহ। অতি ধীর গলায় ভিনসেনজো বলল—"মারিয়া মৃত—মিঃ ডয়েস, সেই সঙ্গে আর একজন। আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম, পিছনে আর একজন আছে।"

"মারিয়া কি আপনাকে কিছু বলতে পেরেছিল?"

"নাঃ, কি আবার বলার ছিল?"

আমি ওর পিছনে ভিতরে গেলাম। দেখলাম, সেই মৃতদেহ ধীরে ও কাউচে নামিয়ে রাখলো। তার পর টেলিফোন তুলে পুলিশকে সংবাদ পাঠাল।

সমাধির দিনটিও এমনই বর্ষণক্লান্ত।

পুলিশ জনতা হটাচ্ছে। অস্কার এসেছে, ত্রাভানো এসেছে। ভিনসেনজোর চার পাশে পুলিশ প্রহরী। কার্ক এডওয়ার্ডস্ অনুগ্রহ করে আসেনি। যখন প্রার্থনা শেষ হল অভিজাত এলিয়োনারা তখনও মাথা নীচু করে আছে। শোকে কিংবা লজ্জায়।

সমাধির উপরে মারিয়ার সেই প্রস্তরমূর্তি। তার নীচে লেখা—মারিয়া ভারগাস্—কনটেসা টোরলাটো ফাভরিনি—আর তার নীচে লেখা—che sara sara, যা হবার তা হ'বে। সবাই চলে গেল।

বেয়ারফুট কনটেসার প্রতিমূর্তির দিকে তাকিয়ে রইলাম। বৃষ্টি পড়ছে, আমার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। আমার কানে মৃদু গলায় যেন মারিয়া বলছে—"জুতায় আমার ভয়, ধুলা-কাদায় আমার নিরাপত্তা বেশী।" সহসা সিমড্রেলার স্প্যানীশ কথাটা মনে এল, "আমার জীবনটা এক রূপকথা, আর আমি সেই রূপকথার La Cenicienta"

ধীরে ধীরে সকলে কবরখানা থেকে বেরিয়ে এলাম।

অনুবাদঃ ভবানী মুখোপাধ্যায়

টাকা/আনা/পাই

(চিত্রনাট্য)

জ্যোতির্ময় রায়

জনবহুল রাস্তার দৃশ্য।

দূর থেকে দেখা যায় হরেক রকমের জিনিসের গাড়ী ঠেলে এগিয়ে আসছে বিশু। মুখে হাঁক দিচ্ছে—

বিশু। ছ' ছ' আনা, ছ'আনা, হরেক চীজ ছ' আনা, যা নেবে তাই ছ' আনা—বলতে বলতে সে আরও কাছে এসে পড়ে।

অন্য রাস্তা। বেলা দুপুর। দেখা যায় বিশুকে, ঠেলা ঠেলে চলেছে আর হাঁক দিচ্ছে—

বিশু। মার্কিণবালা ছ' আনা, জাপানবালা ছ' আনা—দেশীবালা ছ' আনা—

ভরদুপুরে অভিজাত পল্লীর একটি জনবিরল রাস্তা। শেষ ডাক দিতে দিতে বিশু ঢোকে।

বিশু। হরেক চীজ ছ' আনা—লে লে বাবু ছ' আনা—

তার পর একটু স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে কপালের ঘাম মোছে। এমন সময় একটি ছোট্ট মেয়ে ছুটে আসে। ডাকে—

ছোট্ট মেয়ে। এই ছ'আনা এসো।

মেয়েটি আবার ছুটে বাড়ীর দিকে চলে যায়। বিশুও সেদিকে এগোয়।

একটি বাড়ীর সামনের বারান্দা। দেখা যায় মেয়েটির অভিভাবক সেখানে দাঁড়িয়ে। ঠেলা-অলা বিশু কাছে এলে ডেকে বলেন—

ভদ্রলোক। এই দেখি এদিকে এসো।

বিশু ঠেলাটিকে আরেকটু ঠেলে বাড়ীর রক ঘেঁসে দাঁড় করায়। ছোট্ট মেয়েটি ঠেলা থেকে একটি পুতুল তুলে নেয়। ভদ্রলোক প্রশ্ন করে—

ভদ্রলোক। কতো দাম এটা ?

বিশু। [ঠেলার ওপর দিয়ে হাতটাকে একটা বিশেষ ভঙ্গীতে ঘুরিয়ে নিয়ে সুর করে চেঁচিয়ে ওঠে] ছ' ছ'আনা ছ'আনা—মার্কিণ, জাপান ইণ্ডিয়া—কই ফারাক নেই, সব এক দামে যাচ্ছে, 'ইচ্ আর্টিক্‌ল্ সিক্স এ্যানাস, নো ডিফারেন্স ইন প্রাইস, স্যর।'

ভদ্রলোক। [মুচকে হেসে] আবার ইংরেজীও বলছে।

বিশু। [খুব একটা তাচ্ছল্যের ভাব নিয়ে সহজ সুরে] বলছি— কিন্তু শুনে শেখা নয়।

ভদ্রলোক। তার মানে লেখাপড়া জানো ?

বিশু। হ্যাঁ লেখাপড়াও জানি, ভদ্দরলোকেরও ছেলে।

ভদ্রলোক। [প্রশংসার ভাব নিয়ে] ভদ্দরলোকের ছেলে লেখাপড়া শিখে একাজে নেমেছো—বাঃ বেশ বেশ। 'ডিগনিটি অব লেবার'—আজকের দিনে কাজকে মর্য্যাদা দেওয়া এই তো মানুষের মতো কাজ।

বিশু। [খানিকটা বিদ্রূপের সুরে সমর্থনের ভঙ্গীতে] মানুষের মতো কাজ—তা দুঃখের কথা হলো কাজের মর্য্যাদা তো বাড়লো কিন্তু মানুষের মর্য্যাদাখান যে কমলো—এই তো দেখুন না, ভদ্দরলোকের ছেলে আমি, আপনি আমাকে তুমি বলছেন।

ভদ্রলোক। [তা দেখো—

বিশু। [কথায় বাধা দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের ভঙ্গীতে] খুকী—খুকী—হ্যাঁ খুকী কি চাই তোমার—এটা ?—[ভদ্রলোকের দিকে হাত বিছিয়ে] ছ'আনা—

ভদ্রলোক বিব্রত হাসির সঙ্গে ছ'আনা পয়সা হাতে দিয়ে দেয়। ঠেলায় ধাক্কা দিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বিশু আবার চিৎকার করে ওঠে—

বিশু। ছ' ছ'আনা ছ'-আনা—মার্কিণবালা ছ'আনা—

আরও বেশী জনবিরল রাস্তা। মাথার ওপর প্রখর রোদ। বিশু মুখচোখে বিরক্তির ভাব নিয়ে ক্লান্ত ভঙ্গীতে একবার রোদের দিকে তাকায়। ছায়া দেখে একটা বারান্দার দিকে এগিয়ে যায়। ঠেলা থেকে ঝাড়নটা তুলে নিয়ে এটা ওটা একটু ঝেড়ে তা দিয়ে নিজের মুখে হাওয়া করতে করতে বসে সেই রকে। সেই রকেরই এককোণ ঘেঁষে ক্লান্ত ভঙ্গীতে গা এলিয়ে বসে আছে একটি যুবক। তার চিন্তিত দৃষ্টি সামনের দিকে প্রসারিত, আশপাশের কোনো কিছু তার চোখেও পড়ছে বলে মনে হয় না। বিশু পকেট থেকে বিড়ি বার করে, এমন সময় নজরে পড়ে লোকটিকে। বেশ একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে তার মনে যেন লোকটি সম্পর্কে একটু কৌতূহল জাগে। বিড়িটা হাতে নিয়ে একটু সরে গিয়ে বসে তার পাশে।

হঠাৎ যেন পাশে কি একটা নজরে পড়লো—বিশু নজর করে—ওয়াণ্টেড কলম ব্যাগ আর ফুটো সোল, ছেঁড়া জুতো। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তাকিয়ে দেখে বিশু তার। তারপর বিড়ি ধরাতে যায়। ধরাতে গিয়ে কি ভেবে থামে, বিড়িটি তার দিকে বাড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে—

বিশু। বিড়ি চলে ?

মৃগাঙ্ক। চলে।

বিশু। ধরান।

মৃগাঙ্ক। থাক, ইচ্ছে করছে না।

বিশু। বিড়ি চলে কিন্তু ইচ্ছে নেই। বিড়িতে তো অরুচি আসে জানি, একমাত্র পেটে যখন ছুঁচোয় ডন মারে।

মৃগাঙ্ক। হয়তো তাই।

বিশু। [একটু মুচকে হেসে] হুম্ [তারপর হঠাৎ যেন অবস্থাটা উপলব্ধি করে] কোথায় থাকা হয় ?

মৃগাঙ্ক। সকাল অবধি থাকা হতো একটা মেসে—পাট গুটিয়ে বর্তমানে এখানে।

বিশু। [কর্মখালি বিজ্ঞাপনের ওপর দু-তিন বার চোখ বুলিয়ে] অ—কাজকর্ম কিছু— ?

মৃগাঙ্ক। কিছু না, আন্-এডাল্টারেটেড বেকার !

কিছুক্ষণের স্তব্ধতা।

বিশু বিড়ি ধরাতে দেশলাই জ্বেলে, না ধরিয়েই আবার তা নিবিয়ে দেয়।

বিশু। চলুন না—একটা চায়ের দোকানে ঢুকে একটু গল্প-সল্প করা যাক।

মৃগাঙ্ক। অ—আমাকে খাওয়াতে চাচ্ছেন ?

বিশু। এই তো দাদা ল্যাঠা বাধালেন। ভদ্দরলোক সমস্তে। এই ছ'ছ' আনার কাজে হাত দেবার আগে ভেবে ভেবে নয়-ছয় হয়ে গিয়েছিলাম। ভদ্দরলোকের কি কম বিপদ ! প্রাণ গেলেও চাইতে পারে না—হাত বাড়িয়ে দিতে এলেও নিতে পারে না। আর তা ছাড়া আপনি বিদ্বান লোক, আমার মতো একজন হকারের সঙ্গে চা খাবেনই বা কেন ?

মৃগাঙ্ক। হকার ! ভদ্দরলোক সমস্যা ! [হেসে বিশুর কাঁধে একটা চাপড় মেরে উঠে পড়ে] দেখি একটা বিড়ি—[বিশুর হাত থেকে বিড়ি নিয়ে] চলো ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে কিন্তু।

বিশু মৃগাঙ্কের ব্যাগ আর খবরের কাগজটা তার ঠেলার ওপর তুলে নেয়। বিশু ঠেলায় ধাক্কা দেয়, দুজনে এগিয়ে চলে।

রাত্রি। বস্তিতে বিশুদের ঘরের দাওয়া। দাওয়ার এক কোণে রান্নার ব্যবস্থা। বিশু রান্না করছে, চারিদিকে তার সরঞ্জাম। এক পাশে একটি মোড়ায় বসে মৃগাঙ্ক।

বিশু। হুম্, তা মেসের ম্যানেজারটা তো ভারি পাজি। আপনার এই খানকয়েক বইপত্তর আর বিছানাটা আটকে রেখে ওর ফায়দাটা কি হবে ?

মৃগাঙ্ক। ফায়দা কিছু না হোক, আমার অক্ষমতার সাজাটা তো হওয়া দরকার—বোধ হয় তাই। যাকগে, এখন সবচেয়ে বড় কথা হলো একটা চাকরী। [ক্ষুব্ধ উত্তেজনার সুরে] শুধু টাকা—টাকা আর টাকা—সমস্ত দিনের হীন বাণিজ্যটাই ফাঁকা।

বিশু। আরে দাদা, দু'দিন আগে-পিছে হয়ে যাবে একটা কিছু, একা মানুষ, অত ব্যস্তই বা হয়ে পড়ছেন কেন ?

মৃগাঙ্ক। [ক্ষুব্ধ সুরে] একা ! একা তো আমি নই ?

বিশু। ও, মা-বাবা আছেন বুঝি ?

মৃগাঙ্ক। না, সে পাট অনেক দিন হলো চুকে গেছে—আছেন স্ত্রী।

বিশু। বিয়ে করেছেন ? তা বৌদি কোথায় ?

মৃগাঙ্ক। কলকাতাতেই। ধনিকন্যা, নিবাস বালীগঞ্জের অভিজাত পল্লী।

বিশু। কিছু মনে করবেন না দাদা, বাবা-মা, টাকা, চাকরী কিছুই নেই, অথচ বিয়েটা—

মৃগাঙ্ক। ধনী পরিবারে ঘটলো কি করে ? হ্যাঁ, অঘটনটা ঘটক ঘটায়নি, সে তো বুঝতেই পারছো ? পরিচয় ? প্রেম, ইউনিভার্সিটিতে বিবাহ, গোপনে রেজিস্ট্রি অপিসে।

বিশু। অ—তা এখনও জানাজানি হয়নি বুঝি ?

মৃগাঙ্ক। হয়েছে। যদ্দিন চাকরীবাকরির ব্যবস্থা একটা না হয়, ইচ্ছে ছিল না কথাটা প্রকাশ পায়। কিন্তু রচনা রাজি হলো না কিছুতেই। বললো, 'বাধা এড়াতে গোপন করতে পারি, কিন্তু এত বড় সত্য গোপন রাখবো কেন ? অন্যায় তো আমরা কিছু করিনি।'

বিশু। ঠিক, গোপন থাকবে কেন ? বিয়ের খবরটা কি বটুয়ায় তুলে রাখার জিনিস ? আর তা'ছাড়া বাড়ীর মেয়ে জানে, জামাইকে তো আর ফেলে দিতে পারবে না ?

মৃগাঙ্ক। পারবে না, না ? হুঁ খবরটা জানাজানি হবার পর প্রথম যেদিন ঢুকলাম ওদের বাড়ী, অভ্যর্থনাটা ভালোই হলো—খবর পেয়েই জ্যাঠাশ্বশুর ছুটতে ছুটতে এলেন—

ঠিক এই সময় বিশু কড়াইয়ের তপ্ত তেলে তরকারী ছাড়ে—'ছ্যাঁক' করে তার শব্দ হয়। মৃগাঙ্ক বলে যেতে থাকে। মৃগাঙ্কের মুখ, তপ্ত তেলের 'আওয়াজ—সব কিছুর ওপর ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে পূর্ববর্তী কাহিনী।

। পূর্ববর্তী কাহিনী ।

[ফ্ল্যাশ ব্যাক]

জ্যাঠাশ্বশুর প্রকাশ। সিঁড়ি দিয়ে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে নামতে নামতে বলতে থাকে—

প্রকাশ। ইউ, স্কাউণ্ড্রেল চীট, একটা মেয়ের সর্বনাশ করেছো তুমি ! আই—আই—আই ওণ্ট স্পেয়ার য়ু, আমি তোমাকে ছাড়বো না—আমিও একজন জাঁহাবাজ এ্যাটর্নি। তোমার এই তিন আইনের বিয়ে তেত্রিশ আইনের প্যাঁচ দিয়ে কি করে নাকচ করতে হয় সে আমি জানি।

মৃগাঙ্ক হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অন্য দিকে এগিয়ে আসে রচনার মা সুরমা।

সুরমা। উঃ, তোমার কি সাহস ! তুমি আবার এ বাড়ীতে ঢুকেছো ? টাকা নেই, পয়সা নেই, গোষ্ঠী-গোত্রের খবর নেই—বিয়ে ! তুমি জেনে যাও, আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়নি তোমার।

এমন সময় ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে আসেন রচনার বাবা অবিনাশ।

অবিনাশ। আ-হা-হা যা হয়েছে, তাকে হয়নি বলে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না ? তার চেয়ে বরং—

প্রকাশ। [ধমকে] চুপ করো অবিনাশ ! নিজের মেয়ের ভালোমন্দ তুমি বুঝলে না। শোনো ছোকরা, বাঁচবার ইচ্ছে থাকে তো আমার কথা মতো আপোষে বিয়ে ভেঙে দাও।

মৃগাঙ্ক। ভাঙবার জন্যে তো গড়িনি ?

জ্যাঠা। এত বড় স্পর্ধা ! আমার মুখের ওপর দাঁড়িয়ে তুমি এমন কথা বলছো ?

সুরমা। চাবকে তোমাকে সোজা করে দেওয়া উচিত—

অবিনাশ। আ-হা-হা, তোমরা কি করছো—এসব হচ্ছে কি ?

রচনা। মা—মা তোমরা—তোমরা একটু চুপ করো, যা বলবার আমি বলছি। [সিঁড়ি দিয়ে দু'-চার ধাপ আরও নেমে এসে মৃগাঙ্ককে বলে] এ বাড়ীতে তুমি আর এসো না। যত শীগগির পারো একটা ব্যবস্থা করতে চেষ্টা করো, এমনি যাতে যেতে পারি।

প্রকাশ। তুমি চুপ করো রচনা!

(মিলিত চেঁচামেচির মধ্যে)

প্রকাশ। ওর ব্যবস্থা করা আমি যার করবো।

সুরমা। হতচ্ছাড়া নচ্ছার বজ্জাতকে জেলে পাঠাবো তবে ছাড়বো।

স্বপ্না। (রচনার ছোট বোন)—মা তুমি চুপ করো না।

সুরমা। (ধমকে) তুই চুপ কর তো।

অবিনাশ। আঃ তোমরা থামো—থামো তোমরা কি ক্ষেপে গেলে?

প্রকাশ। তোমার মতো একটা লোফারকে উপযুক্ত শিক্ষা আমি দেবো, তবে ছাড়বো।

গোলমাল অর্ধ পথেই মিলিয়ে যেতে থাকে মৃগাঙ্কের মুখের ওপর। 'ফ্ল্যাশ-ব্যাকের' পর।

দেখা যায় মৃগাঙ্ক ঠিক আগের অবস্থায় স্তব্ধ হয়ে বসে। কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর প্রথম কথা বলে বিশু।

বিশু। [ভারী গলায়] এর পর থেকে আর ও-বাড়ীতে যাওয়া হয়নি নিশ্চয়ই—না?

মৃগাঙ্ক। ছ' সাত মাস যাওয়া হয়নি। কিন্তু আজকাল যেতে হচ্ছে। রচনা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলো। এখনও তেমন সামলে উঠতে পারেনি, তাই।

বিশু। হ্যাঁ, যাবেন বৈ কি, নিশ্চয়ই যাবেন। তা আপনার শ্বশুর মশায় তো বেশ?

মৃগাঙ্ক। হ্যাঁ খুবই ভালো, আধ-ভোলা পণ্ডিত লোক। একমাত্র পড়াশোনা নিয়েই থাকেন, তাই বাড়ীতেও তার কোন কদর নেই—এ্যাটর্ণি দাদাই সর্বেসর্বা।

বিশু। [অদূরে তাকিয়ে] এই তো ভোলা এলো, আপনাকে যার কথা বলছিলাম।

ছিট কাপড়ের গাঁটরী নিয়ে ভোলাকে আসতে দেখা যায়। ভোলা কাছে আসে। কাঁধ থেকে তার কাপড়ের বোঝাটা নামিয়ে রেখে দাওয়ায় বসতে যায়, এমন সময় বিশু বলে।

বিশু। এই যে ভোলা, আমি ঠেলা-অলা, এ কাপড়ে-অলা, আমার স্বজাত। ভোলা—[আঙুল দেখিয়ে] দাদা—

ভোলা। অ—দাদা কি ওয়ালা?

বিশু। মাথাওয়ালা। খুব বিদ্বান লোক। দাদার শ্বশুরবাড়ী টাকাওয়ালা।

মৃগাঙ্ক। [হেসে] বেশ বলেছিস, টাকাওয়ালা, মাথাওয়ালা আর খাটনেওয়ালা তিনটে আলাদা জাত।

ভোলা। মাথাওয়ালা। [নিজের মাথায় আঙুল ঠুকে] আমার আবার এইটাই নেই। দেখ না বিশু, সওয়া এগারো আনা গজের তিন গজ বারো গিরে কাপড় নিলো। আর দিল দু'টাকা দশ আনা। আচ্ছা দাদা, ঠকে এলাম না তো? দাদা যদি হিসেবটা একটু—

বিশু। ভাখ ভোলা, এখন আলাপ না বলছি।

মৃগাঙ্ক। [হেসে দাঁড়িয়ে] আমাদের কলেজি বিদ্যের ঐ হিসেব তোমার চেয়ে আমিই বেশী গুলিয়ে ফেলবো। আচ্ছা বিশু এখন চলি—

বিশু। চলি! কোথায়?

মৃগাঙ্ক। কোথায়—দেখি—

বিশু। যাক দেখতে হবে না। কেন এইখানটা দেখা যাচ্ছে না?

মৃগাঙ্ক। [সবিস্ময়ে] এ-খা-ন-টা! [স্থির দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থাকে। বলে ভারী গলায়] তুমি এখানে থাকতে বলছো?

বিশু। বলবো কেন দাদা, রাখবো।

মৃগাঙ্ক। কিন্তু বিশু, আমি যে বেকার।

বিশু। বেকার বলেই তো বলছি, তুমি ম্যাজিষ্ট্রেট হলে কি বলতাম? এই ভাখো, আবার 'তুমি' বলে ফেললাম।

মৃগাঙ্ক। বেশ করেছিস। মেসের ম্যানেজারটা আমাকে 'আপনি' বলতো।

এমন সময় কাঁদতে কাঁদতে এসে ঢোকে বস্তিরই একটি ছোট ছেলে—নাম মধু।

বিশু। [মধুকে] কি হয়েছে রে?

মধু। [ফুঁপিয়ে] বাবা আজ আবার মাকে মারছে—মা কাঁদছে, ভাখো এসে—

বিশু। [মুখভাব পরিবর্তিত হয়] আচ্ছা তুই যা। আমি আসছি।

মধু চলে যায়। [ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর



জলে ডাঙায়

সৈয়দ মুজতবা আলী

২২

আহা! সুন্দর দেশ!

খালে নালায় ভর্তি। গাড়ি মিনিটে মিনিটে গম্, গড়ম, গড়ড়ম করে সে সব নালার উপর দিয়ে পেরুচ্ছে। তারপর গাড়ি বলে 'বড়ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো,' 'বড়ঠাকুরপো-ছোট্‌ঠাকুরপো', তারপর ফের নালার উপর 'গম', 'গড়ম্', 'গড়ড়ড়ম।' আর গাড়ির শব্দ যে এত মিষ্টি কে জানতো? এ ট্রেন মিস করলে আর দেখতে হ'ত না।

খাল নালা তো বললুম, কিন্তু এক একটা নদ নদী এমনই চওড়া যে বোধ করি সেগুলো নাইলেরই শাখা-প্রশাখা। আর সেগুলোতে জলে ডাঙার মাঝখানে ফাঁক প্রায় নেই। নিতান্ত বর্ষাকাল ছাড়া আমাদের নদীর জল যান তলিয়ে, আর পাড়গুলো থাকেন খাড়া হয়ে। সে জল অত নিচু থেকে উপরে তোলা যায় না বলে সে জল থেকেও নেই। চাষী ভাই' দিয়ে শীতকালে আরেকটা ফসল তুলতে পারে না। এদেশের লোক সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে চাষবাস শেখার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের একমাত্র নদী নাইলের গা থেকে এত হাজার, হাজার খাল নালা কেটে রেখেছিল বলে সে নদী গভীর হবার সুযোগ পায়নি এবং ফলে নাইলের জল দেশটাকে বারো মাস টৈটম্বুর করে রাখে।

ক্ষেতভরা ধান গম কাপাস। সবুজে সবুজে ছয়লাপ। মাঝে মাঝে খেজুরগাছের সারি, আর কখনো বা এখানে একটা সেখানে একটা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ক্ষেতের পাহারা দিচ্ছে।

আর নদীর উপর দিয়ে চলেছে উঁচু উঁচু তেকোণা পাল তুলে দিয়ে লম্বা লম্বা নৌকো। এ দেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না বলে নৌকোতে ছইয়ের ব্যবস্থা প্রায় নেই। জোর হাওয়ায় নৌকোগুলো চলেছে দ্রুতগতিতে। পালের দড়ি ছিঁড়ে গেলে নৌকো যে ডুবে যাবে সে ভয়ডর এদের নেই। তবে বোধ করি এদেশে দমকা হাওয়া হঠাৎ এসে নৌকোকে এলোপাতাড়ি ধাক্কা লাগায় না।

সবুজ ক্ষেত, নানারঙের পাল, ঘোর ঘন নীল আকাশ, চল্ চল্ ছল্ ছল্ জল মনটাকে গভীর শান্তি আর পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে দেয়। গাড়ীর জানলার উপরে মুখ রেখে আধ-বোজা চোখে সে সৌন্দর্যরস পান করছি, আর ভাবছি, এই সৌন্দর্য দেখার জন্যেই তো বহুলোক রেল গাড়ী চড়বে, আমি যদি এ-দেশে থাকবার সুযোগ পেতুম তবে প্রতি শনিবারে রেলে চড়ে যে দিকে খুশী চলে যেতুম। কিছু না, শুধু নৌকো, জল, ক্ষেত আর আকাশ দেখে দেখে দিন-রাত কাটিয়ে দিতুম।

রাতের কথায় মনে পড়ল, চাঁদের আলোতে এ সৌন্দর্য নেবে অন্য এক ভিন্ন রূপ। সেটা দেখবার সুযোগ হল না—এখানটায়, এবারে।

মাঝে মাঝে নদী, নৌকো, খেজুরগাছ সব-কিছু ছাড়িয়ে দেখতে পাই সেই তিন বিরাট পিরামিড। এত দূরে চলে এসেছি তবু তারা মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে, আবার কাছের গাছের পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আবার মুখ দেখাচ্ছে। তখনই বুঝতে পারলুম, পিরামিডগুলো কত উঁচু! কাছের থেকে যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারিনি।

কম্পার্টমেন্টের মাঝখান দিয়ে চলাফেরার পথ—কলকাতার ট্রাম গাড়িতে যে রকম। সেই পথ দিয়ে যে কত রকমের ফেরিওলা এল গেল তার হিসেব রাখা ভার। কমলালেবু, কলা, রুটি থেকে আরম্ভ করে নোটবুক, চিরুণি, মোজা, ঘড়ি, লটারির টিকিট হেন বস্তু নেই যা ফেরিওলা দু'চার বার না দেখালে—মনে হল লোহার সিন্দুক এবং আস্ত মোটর গাড়ি মাত্র এই দুই বস্তুই বোধ করি ফেরি করা হল না।

এক কোণে দেখি জাব্বা-জোব্বা পরা এক মৌলানা সায়েব হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাকে ঘিরে বসেছে এক পাল ছোকরা—তারাও পরেছে জাব্বা-জোব্বা, তাদের মাথায় ও লাল ফেজ টুপিতে প্যাঁচানো পাগড়ী। দু-চারজন সাধারণ যাত্রীও দলে ভিড়ে বক্তৃতা শুনছে। পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলুম, ইনি অজহর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ছুটিছাটায় যখন গ্রামের বাড়ি যান তখন তাঁর প্রিয় শিষ্যেরা তাঁর সঙ্গে তাঁরই বাড়ি যায়। সমস্তক্ষণ চলে জ্ঞানচর্চা। ট্রেনের অন্য লোকও সে শাস্ত্র-চর্চা কান পেতে শোনে।

উত্তম ব্যবস্থা। প্রাচীন যুগে গুরুগৃহে বাস এবং বর্তমান যুগের কলেজে গিয়ে পড়াশুনো করা দু'টোর উত্তম সমন্বয়। মাঝখানে থার্ডক্লাস গাড়ির প্যাসেঞ্জার, চাষাভূষোরাও এদের জ্ঞানের কিছুটা পেয়ে গেল। আমাদের দেশের চাষারা তো প্রফেসরদের জ্ঞানের একরত্তিও পায় না।

সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওলার কাছ থেকে কলামূলো কিনে নিয়ে মৌলানা সায়েব খাচ্ছেন, ছেলেদেরও খাওয়াচ্ছেন। সেও পরিপাটি ব্যবস্থা।

হরেকরকম ফেরিওলাই তো গেল। এখন এলেন আরেক মূর্তি। মুখে এক গাল হাসি—আপন মনেই হাসছে—পরনে লজঝড় কোট-পাতলুন, নোংরা শার্ট, টাইয়ের 'নট্' টা চ্যাবচা হয়ে কলারের ভিতর ঢুকে গিয়েছে, আর হাতে এক তাড়া রঙিন ছবিতে ভর্তি ব্যাণ্ডবিল-প্যাম্ফ্লেট্।

কেন যে আমাকেই বেছে নিলে বলতে পারবো না। বোধ হয় আমাকেই সব চেয়ে বেশী বোকা-বোকা দেখাচ্ছিল। ফেরিওলারা বোকাকেই সক্কলের পয়লা পাকড়াও করে এ তো জানা কথা।

এক গাল হাসির উপর আরেক পোঁচ মুচকি হাসি লেপটে দিয়ে শুধালে, 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে স্যর?'

ইয়োরোপিয় জাহাজ চড়ে মেজাজ খানিকটে বিলিতি রঙ ধরে ফেলেছে। বলতে যাচ্ছিলুম, তোমার তাতে কি? কিন্তু মনে পড়ল, মিশর প্রাচ্য দেশ, এ প্রশ্ন শুধনো অভদ্রতা কিম্বা অনধিকার প্রবেশ নয়। বললুম, 'পোর্ট সঈদ'।

'তার পর?'

মোগলাই মেজাজ চেপে নিয়ে বাঙালী কণ্ঠে বললুম, 'ইয়োরোপ।'

'ওঃ, তাই বলুন। কিন্তু ইয়োরোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তার আগে এই মিশরের পাশের দেশ প্যালেস্টাইনটা ঘুরে আসুন না। আমি তো একেবারে থ। হরেকরকমের ফেরিওলা তো দেখলুম। কেউ বিক্রি করে ছ' পয়সায় জুতোর ফিতে, কেউ বিক্রি করে পাঁচ শ টাকার সোনার ঘড়ি কিন্তু একটা আস্ত দেশ বিক্রির জন্য তার আড়কাটি ট্রেনের ভিতর ঘোরাঘুরি করবে এ ও কি কখনো বিশ্বাস করা যায়? তবু ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য শুধালুম, 'আপনি বুঝি দেশ বিক্রি করেন?'

সে আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আরেক গাল হেসে তার হাতের তাড়ার ভিতর থেকে কি একটা খুঁজতে আরম্ভ করলে। ইতিমধ্যে আমার পাশের ভদ্রলোক তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। সে ঝুপ করে বসে পড়ে তার হাতের ডাঁই থেকে বের করলে প্যালেস্টাইনের হরেকরকম ছবিওলা একখানা রঙচঙা প্যাম্‌ফ্লিট। তার উপর দেখি মোটামোটা অক্ষরে লেখা প্যালেস্টাইন—'Palestine, The Land of the Lord', 'প্রভুর জন্মভূমি' ইত্যাদি আরো কত কী! তারপর বললে, 'দেশ বিক্রি করি? হ্যাঁ, তাই বটে, তবে কি না আপনি যে ভাবে ধরেছেন, ঠিক সে ভাবে নয়। কিন্তু সে-কথা পরে হবে। উপস্থিত দেখুন তো, কী চমৎকার দেশে আপনাকে যেতে বলছি। যে-দেশে প্রভু জিসাস ক্রাইষ্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনি নিশ্চয় প্রভুর'—

আমার ভারি বিরক্তি বোধ হল। এসব লোক কি ভাবে? ভারতবর্ষের লোক যীশুর নাম শোনেনি? তেড়ে বললুম, 'The book of generation of Jesus Christ, the son of David the son of Abraham, Abraham begot'—ইত্যাদি ইত্যাদি,—চড়চড় করে মথি-লিখিত সুসমাচার থেকে মুখস্থ বলে যেতে লাগলুম, প্রভু যীশুর ঠিকুজি কুলজি। লোকটা কিন্তু একদম না দমে গিয়ে বললে, 'ঠিক, ঠিক। এই দেখুন সেই জায়গা যেখানে প্রভু জন্ম নিলেন। একটা সরাইয়ের আস্তাবলে। মা মেরি আর তাঁর বর যোসেফ তখন প্যালেস্টাইন থেকে এই মিশরের দিকে পালিয়ে আসছিলেন। বেৎলেহেম গ্রামে সন্ধ্যা হ'ল। সরাইয়ে জায়গা না পেয়ে মা-মেরি আশ্রয় নিলেন আস্তাবলে। এই দেখুন সেই আস্তাবলের ছবি। কত চিত্রকরই না এ ছবি এঁকেছেন। কত যুগ ধরে। তার পর দেখুন, নাজারেৎ গ্রামের ছবি। যোসেফ সেখানে ছুতোরের কাজ করতেন, আর মা-মেরি যেতেন জল আনতে। এই দেখুন—

আমি বললুম, 'ব্যস, ব্যস, হয়েছে। কিন্তু আপনি আমার মুশকিলটা আদপেই বুঝতে পারেননি। আমি যদি পোর্টসঈদ থেকে 'প্রভুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে' চলে যাই তবে সেখানে ফিরে এসে ইয়োরোপে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে জাহাজের টিকিট কাটতে হবে। তার পয়সা দেবে কে?—না হয় প্যালেস্টাইন তীর্থ-দর্শন-খর্চা আমি কোনো গতিকে, কেঁদে-কুঁকিয়ে সামলে নিলুম। এক জাহাজের টিকিট একই জায়গা যাবার জন্য দু' দু'বার কাটবার মত পয়সা কিন্তু আমার নেই।'

আড়কাঠি তো হেসেই কুটিকুটি। আমি বিরক্ত। নিজকে সামলে নিয়ে সে বললে, 'জাহাজের ডবল ভাড়া লাগবে কেন? আপনি যে জাহাজে করে পোর্ট সঈদে এসেছেন সেই কোম্পানিরই আরেকখানা জাহাজ পনেরো দিন পর সেখানে এসে ইয়োরোপ যাবে। আপনি সে জাহাজে গেলেন কিম্বা এ জাহাজে গেলেন তাতে কোম্পানির কি ক্ষতিবৃদ্ধি? ডবল পয়সা নিতে যাবে কেন? আর ঐ পনেরো দিনে আপনি দেখে নেবেন প্যালেস্টাইন।

আমি বললুম, 'হুঁ, হুঁ, হুঁ-উঁ-উঁ—কিন্তু সে জাহাজে যদি সীট না থাকে?'

লোকটার ধৈর্যও অসীম। সর্বমুখে বুদ্ধদেবের মত করুণার হাসি হেসে বললে, 'কে বলবে থাকবে না? এখন তো অফ সীজন, স্ল্যাক পিরেরিয়েড, অর্থাৎ যাত্রীর ভিড় নেই। আপনি যে জাহাজে এলেন তার কি আধেকখানা ফাঁকা ছিল না। আসছে জাহাজ গড়ের মাঠ।'

আমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলুম। চিন্তাশীল লোক বলে নয়। আসলে সব-কিছু বুঝতেই আর পাঁচ জনের তুলনায় আমার একটু বেশী সময় লাগে। ব্রেন-বক্সে আল্লাতালা রিসিভিং সেট্‌টা দিয়েছেন অতিশয় নিকৃষ্ট পর্যায়ের। বাল্‌বগুলো গরম হতে লাগে মিনিট তিন। তার পরও চিত্তির। তিনটে ষ্টেশন সবলেট পাকিয়ে দেয় শুধু কম্বা শিষ। কিছুই বুঝতে পারিনে।

হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল। জানো বোধ হয়, অগা বোকারা মাঝে মাঝে, অর্থাৎ বছরে দু'একবার, পাকা জ্ঞানীর মত দু'একটা প্রশ্ন শুধাতে পারে। তাই শুধালুম, কিন্তু আমি প্যালেস্টাইন গেলে তোমার টাকে কি চুল গজাবে? তোমার তাতে কি লাভ?'

লোকটা এইবারে একটু বিরক্ত হল। প্রশ্নটা মোক্ষম কঠিন বলে, না 'টাক টাক' করলুম বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না। আমার মগজ তখন ঐ একটা কঠিন প্রশ্ন শুধবার ধকল কাটাতে গিয়ে হাঁপাতে আরম্ভ করছে।

বললে, আমার কি লাভ? আমার লাভ বিস্তর না হলেও অল্প। অর্থাৎ অল্প-বিস্তর। বুঝিয়ে বলি। আপনাকে নিয়ে যাবো কুকের আপিসে। তাদের কাছ থেকে কাটবেন আপনার পয়লা গন্তব্য স্থল, প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের টিকিট। ন্যায্য ভাড়াই দেবেন। কিন্তু কুক আমাকে দেবে কমিশন,"—

আমি শুধালুম, 'কুক তোমাকে কমিশন দিতে যাবে কেন'?

আমার 'যুক্তির' 'প্রাখর্য' দেখে লোকটা প্রায় হতাশ হয়ে বললে, 'প্যালেস্টাইন সরকার কুককে পয়সা দেয়, তার দেশে টুরিস্ট নিয়ে যাবার জন্য—তাতে করে সরকারের দু'পয়সা লাভ হয়। তাই তারা কুককে দেয় কমিশন, কুক তার-ই খানিকটে দেয় আমাকে। তারা তো আর ট্রেনে ট্রেনে খদ্দেরের সন্ধানে টো টো করতে পারে না। ঐ কর্মটি করি আমি। তাই আমার হয় কিঞ্চিৎ মুনাফা বুঝলেন তো?"

পাছে লোকটা আমাকে ফের বোকা বানিয়ে দেয়, তাই তাড়াতাড়ি বললুম, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি, বিলক্ষণ বুঝেছি'। যদিও আমি ততখানি সংসারী বুদ্ধি ধরিনে বলে ঐসব কমিশন-ফমিশনের মারপ্যাঁচ আদপেই ধরতে পারিনি।

কিন্তু লক্ষ্য করলুম, সে প্যাটপ্যাট করে আমার হ্যাণ্ড-ব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে। তার উপরে মোটামোটা হরফে লেখা ছিল ALI, লোকটা শুধলে, 'ব্যাগটা আপনার'?

আমি বললুম, 'হ্যাঁ'।

'বাঃ। তাহলে তো আপনি মুসলমান। আর জেরুজালেম মুসলমানদের তীর্থভূমি—মক্কার পরেই তার স্থান। আল্লাতালা মুহম্মদ সায়েবকে রাত্রে আরব থেকে জেরুজালেমে এনে সেখান থেকে স্বর্গদর্শনে নিয়ে যান। জেরুজালেমের সে জায়গাটার উপর এখন মসজিদ-উল-আক্‌সা। বিরাট সে মসজিদ, অদ্ভুত তার গঠন। এই কিছুদিন হল আপনাদের দেশেরই রাজা হাইদ্রাবাদের নিজাম সেটাকে দশলক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করে দিয়েছেন। দেখতে যাবেন না সেটা?'

তারপর বললে, "আসলে কি জানেন? আসলে জেরুজালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী। ইহুদী, খৃষ্টান আর মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে। এক ঢিলে তিন পাখী।'

তীর্থ দেখলে পুণ্য হয়, কি না হয়, সে কথা আমি কখনো ভালো করে ভেবে দেখিনি। কিন্তু হিন্দুদের কাশী, বৌদ্ধদের রাজগীর যখন দেখেছি, তখন এ-তিনটেই বা বাদ যাবে কেন? বিশেষ কোনো ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমি আদপেই পছন্দ করিনে। তাকেই বলে কম্যুনালিজম। সৃষ্টিকর্তা যখন তাঁর অসীম করুণায় একগুলো ধর্ম বানিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সব-কটাতেই কিছু-না-কিছু আছে। আর বিশেষ করে মা ভারী খুশী হবে, যখন শুনবে আমি বয়ৎ-উল-মুকদ্দস্ ('পুণ্যভূমি' অর্থাৎ জেরুজালেম) দর্শন করেছি। তাঁর বাবাও মক্কা অবধি পৌঁছতে পেরেছিলেন—বয়ৎ-উল্-মুকদ্দস দেখেননি। সেখানে শুনেছি, অতি উত্তম তসবী (জপমালা) পাওয়া যায়। এক গাছা কিনে দিলে মা যা খুশী হবে। সাত রকৎ নমাজ পড়ার সময় (মুসলমানরা সচরাচর পড়ে পাঁচ রকৎ—মা পড়ে সাত) মা তসবী গুণবে, আর আমার উপর ভারী খুশী হবে।

* * * *

পল আর পার্সি অবশ্য অত্যন্ত দুঃখিত হল। পার্সি বললে, আমাদের ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইন! আপনি না বলেছিলেন, ভূমধ্যসাগরের নানা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাবেন, ইটালি আর সিসিলি, তার পর কর্সিকা আর সার্ডিনিয়ার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবার সময়, ভিসুভিয়স, আরো কত কী দেখাবেন?

আমি স্বার্থপর, পাষণ্ড। পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলুম। তবু হাতজোড় করে মাপ চাইলুম।

পল পার্সির দিকে তাকিয়ে বললে, 'ছিঃ, পার্সি! উনি ধর্মের জায়গা দেখতে ভারী ভালোবাসেন। এ সুযোগ ছাড়বেন কেন?'

তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল।

এক দিকে বন্ধুজন, আরেক দিকে মায়ের তসবী।

সংসার কি শুধু দ্বন্দ্বেতেই ভরা?

পরিশিষ্ট

প্যালেস্টাইন ভ্রমণ যে এ পুস্তকের অংশ হতে পারতো না তা না। কিন্তু পল আর পার্সি সঙ্গে না থাকলে সে বই তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের কাছে ভালো লাগবে না বলে আমার বিশ্বাস। সে-বই হয়ে যাবে বয়সীদের জন্য।

মানুষ বই লিখে বন্ধুজনকে উৎসর্গ করে। আমি প্যালেস্টাইন সম্বন্ধে না-লেখা ভ্রমণ কাহিনী উৎসর্গ করলুম মিত্রদ্বয় পল এবং পার্সিকে।*

সমাপ্ত

রেল গাড়িতে বিভ্রাট

যতীন্দ্রনাথ পাল

অনেক বছর আগেকার কথা।

একজন ভদ্রলোক তাঁর ছেলেকে নিয়ে ট্রেনে করে যাচ্ছেন। অমৃতসরের অভিমুখে। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকবেন, এই ইচ্ছে।

এলাহাবাদ ষ্টেশনে গাড়ী এসে থামলো। হৈচৈ, কলরব সুরু হলো। যাত্রীরা ওঠা-নামা করতে লাগলো।

যে কামরায় তাঁরা ছিলেন, সেই কামরায় একজন টিকিট-পরীক্ষক এলেন। পিতাপুত্রের টিকিট দেখলেন তিনি, তার পর ছেলেটির মুখের দিকে তাকালেন। মুখটি দেখে কী একটা সন্দেহ করলেন, কিন্তু কোন কথা বলবার সাহস হলো না। অল্পক্ষণ পরে আর একজন এলেন। দু'জনে গাড়ীর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ফিস্‌-ফিস করে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা কইতে লাগলেন এবং কী একটা মতলব ঠাওরাতে লাগলেন, কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। তার পর চলে গেলেন। এবারে এলেন একজন ভারিক্কী লোক, বোধ হয় ষ্টেশন-মাষ্টার। বালকটির হাফ-টিকিট পরীক্ষা করে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তার বাবাকে: এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের বেশি নয়?

তার পিতা উত্তর দিলেন: না।

ছেলেটিকে দেখে কিন্তু ষ্টেশন-মাষ্টারের ধারণা হয়েছে যে, তার বয়েস বারো বছরের বেশি নিশ্চয়ই। কত ছেলেকে তিনি দেখছেন

* পাঠক পাঠিকাদের কাছে নিবেদন:—

এ-ভ্রমণ কাহিনী 'বসুমতীতে' প্রতি মাসে, নিয়মিত না বেরনোর জন্য আমি দায়ী। সে অপরাধ আমি নতমস্তকে স্বীকার করছি। তবে এটা জানি, তোমরা আমাকে ক্ষমা করবে।

—সৈয়দ মুজতবা আলী।

তো রোজই, তিনি দেখলেই বলে দিতে পারেন কোন্ ছেলের কত বয়েস।

তিনি বললেন : এর জন্ত পুরো ভাড়া দিতে হবে।

একথা শুনে ছেলেটির বাবার চোখ জ্বলে উঠলো, কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করলেন না। বাক্স থেকে তৎক্ষণাৎ নোট বার করে দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়ে বাকি টাকা যখন তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হলো, তিনি সে টাকা নিয়ে ছুড়ে ফেলে দিলেন। টাকা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের ওপর পড়ে ঝন-ঝন করে একটা শব্দ হলো।

ষ্টেশনমাষ্টার ভারি অপ্রস্তুত হলেন এতে, তারপর চলে গেলেন। তিনি বুঝলেন, তিনি খুবই অন্যায় করেছেন ভদ্রলোকটির কথা অবিশ্বাস করে।

যে বিষয়টি নিয়ে এ সব কাণ্ড হোয়ে গেল, তা এই। বয়সের তুলনায় ছেলেটির শরীরের বাড় হয়েছিল বেশি, তাতেই এই বিভ্রমের সূত্রপাত। বারো বছর দূরে থাক, ছেলেটির বয়েস এগার-ও পার হয়নি।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলায় ঘটেছিল এই ঘটনাটি।



[পূর্বানুবৃত্তি]

(আধুনিক কালের এক দৈত্যকাহিনী)

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

[পূর্বানুবৃত্তি : গত বারে আমরা দেখেছি রাজুকে প্রোফেসারের সঙ্গে। লোকটি তার কলকব্জা নিয়ে পাগল হয়ে থাকে। এত আনমনা লোক রাজু জীবনে দেখেনি। সব সময়েই তার মাথায় বিজ্ঞানের নানান তত্ত্ব ঘুরছে। সে এক কল তৈরী করছে, যাতে চড়ে চাঁদে যাওয়া যাবে। যাই হোক, এখন তারা দুজনে চা খেতে বসেছে।]

চা খেতে খেতে প্রো: ঘণ্টেশ্বর রাজুকে অনেক গল্প বলতে থাকে। অসম্ভব আজগুবি বলে তার কাছে কিছু নেই।

দেখ, বিজ্ঞানে হয় না এমন জিনিষ নেই। বললে প্রো: ঘণ্টেশ্বর। আমি একবার এক ওষুধ বানিয়েছিলুম—সে এক মজার ওষুধ।

অম্বলের না পেট খারাপের? জিগ্যেস করে রাজু।

মোটেই না। আরে, ওসব ওষুধ ত ডাক্তারদের আলমারি ঠাসা। আমারটা হচ্ছে একেবারে অন্য রকম। মানে কথা কি রকম জানো? সঞ্জীবনী গোছের, মানে, যাতে লাগানো যাবে সেটাই বেঁচে উঠবে।

তা আবার হয় নাকি? রাজু অবাক।

হয় না মানে? আলবাৎ হয়। মানে কথা, বলছি তবে। পরশপাথরে ছোঁওয়ালে যদি লোহা সোনা হয়ে যেতে পারে তাহ'লে একটা পুতুল বাঁচবে না কেন? মানে কথা, এলিক্সার নিয়ে তখন ঘাঁটাঘাঁটি করি কি না। নানান জিনিষ মিশিয়ে মিশিয়ে দেখি আর ফেলে দিই—সাত শো শিশি আর দেড় হাজার বোতল ছিল আমার কাছে। তা ছাড়া, নানান মশলা। কোনটা গুঁড়ো, কোনটা দানা, কোনটা লিকুইড মানে কথা, জলের মত।

তারপর কি হোল? রাজু ধৈর্য ধরতে পারে না।

হোল মানে, তৈরী হোল। আমার বাচ্চা মেয়ের পুতুল ছিল অনেকগুলো। দু'ফোঁটা ক'রে তাদের গায়ে ঢালি আর বেঁচে ওঠে। কাঠের ঘোড়াটা পর্যন্ত উঠলো বেঁচে। মানে কথা, খট খট ক'রে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগ'লো।

বা: বেশ মজা তো, আমাকে এক শিশি দেবেন সেই ওষুধ? রাজু বলে ফেললে।

না না না, খবরদার না! ঘণ্টেশ্বর বলে ওঠে, সে ওষুধ দিয়ে আমার কি হয়েছিল, তা বুঝি জান না? মানে কথা, জানলে তুমি আর চাইতে না। আমার কী মুস্কিল যে হয়েছিল! হয়েছে কি, একদিন টেবিলের ওপর একখানা ফটোর অ্যালবাম ছিল। সেখানা যে খোলা ছিল তা আমার খেয়াল ছিল না। ওষুধ নিয়েই আমি নাড়াচাড়া করছি—বেশ ঘন সবুজ রং হয়েছে তখন একটা বিকারও ঢালছি। ঢালছি, মানে কথা, তাই থেকে দু'ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছে অ্যালবামের ওপর। আর সেই পাতাতেই ছিল আমার ছোটবেলার দু'খানা ছবি। যাঁহাতক পড়া অমনি, আমি, মানে কথা, সেই ছোটবেলার আমি দু'খানাই নড়ে চড়ে উঠেছি। শুধু নড়া? বেশ দাঁত বার করে হাসছি। বুকটা ধড়াস করে উঠলো—ওই বাচ্চা দুটোকে নিয়ে করবো কি? ত্রিধা বিভক্ত আমাকে নিয়ে যে কী সমস্যা হবে তা আমার বুঝতে বাকী রইলো না। সেই নাবালক আমি দুটিকে মানুষ করা সেও কম কথা নয়। তাড়াতাড়ি অ্যালবামটা মুড়ে ফেললুম। আর তার ওপর একটা ভারী বাক্স চাপিয়ে দিলুম। যাতে সদ্যোজাত তারা আর পাতার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে আসতে না পারে।

ঐ মারাত্মক ওষুধ নিয়ে, মানে কথা প্রাণান্তক ওষুধ নিয়ে আর ছেলেখেলা নয়। খুব হয়েছে। তাড়াতাড়ি ঘর ছেড়ে বাইরে গেলুম—যাবার সময় চাদরের খুঁট লেগে একটা শিশি ওলটালো তাও শুনলুম। পেছনে তাকাবার তখন অবসর কোথায়? দু'ঘণ্টা পরে আবার ঘরে ঢুকি। ঢুকে দেখি, আমার চেয়ারে কে যেন বসে রয়েছে। মানে কথা, ভাল করে চেয়ে দেখি, চেনা-চেনা মনে হচ্ছে যেন! একি? এ যে স্বয়ং হের হিটলার। সেই আঁট সাট পোষাক...সেই টুপি সেই গোঁফ সেই কপালে ঝুলে-পড়া চুল। সামরিক কায়দায় দাঁড়ালুম। মনে মনে ভাবছি একি স্বপ্ন? পা দুটো কাঁপছে ঠক্‌ঠক্ করে, মানে কথা, রাজা রাজড়াদের আমি একটু

ভয়ই করি বরাবর। তার ওপর, মানে কথা, এযে মোক্ষম ব্যক্তি··· নাৎসী জার্মানীর সর্দার!

ইংরিজি বাংলা না হিন্দী, কিসে কথা বলবো এই ভাবছি, এমন সময় হেরের চোখ দুটো কট কট করে আমার দিকে পড়ল। আর অমনি ইন্তিরি বিন্তিরি ভাষায় কি একটা আওড়ালো—বাপ রে বাপ, সে কি কথা, যেন হুকুমের বোমা ছুঁড়লো আমায় টিপ করে। তবু, মানে কথা, আমি তখনও নড়িনি। সামরিক কায়দাটা জানা ছিল। এক পা দু'পা করে পিছু হটে বাইরে এসে, একেবারে চোঁচা দৌড়। গলির পর গলি পেরিয়ে ঘুঘুবাগানে পিসতুতো ভায়ের মেসে এসে হাঁফ ছাড়ি।

তার পর? হিটলারের কি হোল? বললে রাজু।

কি হোল, সে খবর কে রাখে! হ্যাঁ, ক'দিন পরে পিসতুতো ভায়ের মেসের লোক দিয়েই এক বাহিনী গড়লুম। তাতে মোক্ষদা ঝি-ও ছিল। সেই বাহিনী নিয়ে দিলুম হানা আমার সেই পরিত্যক্ত ল্যাবরেটরীতে; মানে কথা, সেই মারাত্মক ওষুধের সূতিকাগারে। ঘরের বাইরে থেকে প্রচুর হৈ-হল্লা করতে অনেকক্ষণ পরে বেরিয়ে এল এক বেড়াল। ঘরে ঢুকে দেখি, চেয়ারের ওপর হিটলারের কোর্তা পাট হয়ে পড়ে আছে। টুপি এবং গোদা বুট সবই আছে কিন্তু খোদ মালিকের পাত্তা নেই। বাথরুম খুঁজেও, মানে কথা, কোথাও-ই পাওয়া গেল না তাকে।

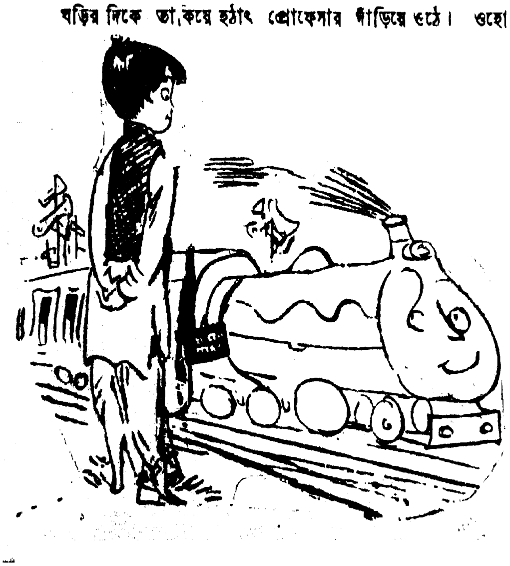
টেবিলের নীচে ছত্রাকার জিনিষ—সেখান থেকে বেরুল একটা পুরোনো খবরের কাগজ। আর সেই কাগজে ছাপা ছিল একটা হিটলারের ছবি। ছবিটির গায়ে দু' ফোঁটা সবুজ ওষুধের শুকনো দাগ।

ও, তাহ'লে সেই ছবিই বেঁচে উঠেছিল! বলে উঠলো রাজু।

হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে কথা, তা ছাড়া আর কি? বলে হেসে উঠলো প্রোফেসার। 'আহাহা, কেটলির চা'টা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে। আমার মনেই ছিল না।

আমি কিন্তু আমার চা-বিস্কুট খেয়ে ফেলেছি। বলে ফেললে রাজু।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ প্রোফেসার দাঁড়িয়ে ওঠে। ওহো



পাঁচটা বেজে গেল, আমার কাজ রয়েছে। এক্ষুণি উঠতে হবে। তুমি বরং বিকেলটা একটু বেড়িয়ে এসো ঐ মাঠের দিকে। বলেই প্রোফেসার হন্ হন্ করে চলে যায়।

রাজুও উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে একটা হলঘরে এসে পড়লো। সেখান থেকে খানিকটা গিয়ে একটা ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো ফাঁকা জায়গায়। এখানটায় মাটির ওপর অনেকগুলো লাইন পাতা। রেলের লাইন। কোনওটা সোজা গেছে, কোনওটা বেঁকে গেছে। মাঝে মাঝে একটার সঙ্গে আরেকটা জোড়া।

রাজু লাইনের পাশ দিয়ে দিয়ে চলছে। দূর থেকে তার কানে শব্দ এল ভুশ্ ভাশ্—যেন কে হাঁফ ছাড়ছে। দেখতে দেখতে একটা লাইনের ওপর দিয়ে একটা ইঞ্জিন আসছে দেখা গেল। রাজু বুঝলো ঐটারই ঐ হাঁশ-ফাঁশ শব্দ।

ইঞ্জিনটা রাজুর কাছে বরাবর এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। কী সুন্দর ইঞ্জিন! কেমন ছোট আর তার পিছনে জোড়া গাড়ীগুলোও কী সুন্দর! সোনার মত চক্-চক্ করছে, গায়ের ওপর লাল সবুজ কালো দিয়ে কেমন বাহারে ছবি আঁকা। রাজুর ইচ্ছে হ'ল উঠে বসে··· ভেতরটা না জানি আরও কত সুন্দর!

গাড়ীর গায়ে একটি ছোট বোর্ড ঝুলছিল, সে এতক্ষণ পরে দেখলো। তাতে লেখা আছে 'তেপান্তরপুর।'

হঠাৎ সে দেখে, লাল জামা পরা ভারিক্কে চেহারা একজন লোক এসে হাজির। তার মুখে বাঁশী, হাতে দুটো ফ্ল্যাগ। সবুজ ফ্ল্যাগ নাড়তে নাড়তে সে বললে 'দশ নম্বর ইঞ্জিন, ষ্টার্ট।' লাইনের ওপর দিয়ে যাবে···লাইন ছাড়া যেন নেমে পড়ো না পি···ই···ক। বাঁশী বেজে উঠলো।

অমনি টু-উ-টু করে হুইসিল দিয়ে গাড়ীটা চলতে লাগলো। গাড়ীর ভেতর রঙিন পোষাকপরা কত সুন্দর ছেলে-মেয়ে। সবাই হাসছে, গল্প করছে।

একটু পরে আবার হুশ্-হাশ্ শব্দ। অন্য লাইনের ওপর দিয়ে আর একটি ছোট গাড়ী এল। এ ইঞ্জিনটি আরও সুন্দর। গাড়ীর গায়ে বোর্ডে লেখা 'রূপকথার দেশ।'

রাজুর বুঝতে বাকী রইল না যে, এ গাড়ীতে চাপলে রূপকথার দেশে যাওয়া যায়। কত জল-জঙ্গল গহন অরণ্য—কত মাঠ প্রান্তর পার হয়ে যাবে ঐ গাড়ী। ঐ তো গাড়ীর মধ্যে কত ছেলে-মেয়ে রয়েছে। একটি মেয়েকে দেখা যাচ্ছে, পুতুলের মত টুল্ টুল্ করছে মুখটি, এক রাশ কোঁকড়ানো চুল মাথা ছাপিয়ে পড়ছে। চোখ দুটি দেখলে মনে হয় যেন স্বপ্ন দেখছে। আহা, ওদের সঙ্গে গেলে কেমন হতো? খুব মজা···

হঠাৎ পি-ই-ক্ করে উঠলো বাঁশী। আবার সেই ভারিক্কি লোকটার গলা। তের নম্বর ইঞ্জিন, ষ্টার্ট। লাইনের ওপর দিয়ে যাবে···লাইনের বাইরে পা বাড়াবে না খবরদার!

হুইসিল বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিলে, একটি ছেলে গাড়ী থেকে হাত বাড়িয়ে রাজুকে বিদায় জানালো।

এক মিনিটের মধ্যে রাজুর পেছন দিক থেকে আঁকা-বাঁকা লাইনের ওপর দিয়ে আর একখানি গাড়ী এসে দাঁড়ালো। এটি যাচ্ছে 'নীল সবুজের দেশে।' ফ্ল্যাগ নাড়া দেখে আর বাঁশী শুনে

ইঞ্জিনের চোখ জ্বল জ্বল করে উঠলো। হাসি হাসি মুখে সে-ও ছেড়ে দিলে।

এমনি ভাবে পর পর আরও অনেকগুলি গাড়ী এসে দাঁড়ালো আর ছেড়ে গেল। তাদের মধ্যে কেউ যাচ্ছে,—'সোনালী স্বর্ণার দেশে।' কেউ যাচ্ছে, 'তুষার পাহাড়', কেউ 'শুধু ফুলের দেশে' কেউ বা 'নীল হ্রদের দেশে।'

এতগুলি দেখে রাজু ঠিক করলো সে এই বারেরটায় উঠবেই উঠবে। তাতে যা থাক তার বরাতে। বেড়ানো ত হবে। আর দূর দেশ যাওয়াতে আনন্দ কত···কত নতুন নতুন দৃশ্য দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যাবে। রেলগাড়ীকে এই জন্যই ত সে এত ভালবাসে। সে কেমন চেনা জায়গার গণ্ডী পেরিয়ে নতুন দেশের দিকে উধাও হয়ে যায়।

ঠিক এমনি সময় এসে পড়লো একটি ছোট গাড়ী। খুব সুন্দর তার ইঞ্জিনটি। বেশ ছুট্‌ ছুট্‌ তার চাউনিটি। বোর্ডে লেখা আছে 'খেলা খেলনার দেশ।' আশ্চর্যের বিষয়, রাজুর সামনে দরজা খুলে গেল, এবং রাজু আর সুযোগ না ছেড়ে টপ করে উঠে পড়লো। আর উঠে পড়া মাত্রই গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে।

যে কামরায় রাজু উঠলো, সেখানেও অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—প্রায় তারই সমবয়েসী সবাই। বসবার জায়গাগুলি সবই রঙিন ভেলভেট দিয়ে মোড়া, গাড়ীর ভিতরটাও খুব সুন্দর বাহারে জিনিষ দিয়ে সাজানো। চার পাশে খেলাধূলার নানান ছবি।

কিন্তু মুস্কিল হলো, রাজুর বসবার জায়গা নিয়ে। গণা-গুণতি দশটি সীটে দশজন যাত্রী। রাজুর জন্যে খালি সীট নেই।

যাই হোক, একজন তার অবস্থা দেখে একটু দুঃখ পেল যেন। সে তাকে ডেকে তার পাশে বসালো। কিন্তু তার পাশের ছেলেটি আপত্তি করে উঠলো। সে রাজুকে এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। রাজু কিন্তু এ অপমান সহ্য করার পাত্র নয়। সেও ছেলেটিকে রীতিমত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল এবং তার পিঠে চেপে বসলো।

হো-হো করে অনেকগুলি ছেলে হেসে উঠলো। ওর শক্তি দেখে তারা বেশ খুশি হয়েছে। কিন্তু আর এক দল বেশ চটে গেল। তারা মারামারি করার জন্যে প্রস্তুত হতে লাগলো। ইতিমধ্যে কে যেন গাড়ীর চেন ধরে টেনে দিয়েছে, যার ফলে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়লো।

কি হয়েছে? কি হয়েছে? হেঁড়ে গলায় চীৎকার করতে করতে একজনের আবির্ভাব হলো। সবাই ভয়ে জড়োসড়ো। রাজু দেখেই চিনলো—সেই গোরিলা-মুখো চেকার মশাই। হাতে সেই পাঞ্চ কল খট-খট নড়ছে। কিড়-মিড় করছে দাঁত।

টিকিট? টিকিট? বাজখাঁই আওয়াজ বেরোয় তার মুখ থেকে।

রাজুরই শুধু টিকিট নেই, তাই রাজুকে শূন্যে তুলে নামিয়ে নিল চেকার মশাই। তারপর তাকে একটা লোহার শিক-আঁটা পিঁজরে, মধ্যে পুরে তালা বন্ধ করে রাখলে। বিচার পরে হবে—তারপর শাস্তি। বুঝলে খোকা! এই কথা বলে হা-হা করে হাসতে হাসতে চলে গেল সে। গাড়ী ত তার আগেই চলে গেছে।

পরদিন কি করে যে রাজু বিচারকের কাছে হাজির হলো তা সে জানে না। হয়ত সে ঘুমিয়ে ছিল। বন্দী অবস্থাতেই সে আদালতে এসে গেছে।

তুমি নাকি মারামারি করেছিলে গাড়ীর মধ্যে? বললেন বিচারক।

হ্যাঁ, কিন্তু আমি পরে মেরেছি। বললে রাজু।

যে ছেলেটির সঙ্গে মারামারি হয়েছিল, তাকে বিচারক জিগ্যেস করলেন।

না, মশায়, আমি ত ওকে মারিনি। সে বললে। তখন অন্য ছেলেরা সাক্ষ্য হিসাবে বললে—মিথ্যে কথা! রাজুকে আগে মারা হয়েছে।

আমাকে অপমান করেছিল বলেই আমি মেরেছি। বলল রাজু, কিন্তু তার জন্যে আমি দুঃখিত।

বাঃ সত্য বলার জন্যে তোমাকে আমি নির্দোষ বলে রায় দিচ্ছি। বললেন বিচারক। কিন্তু আরও অভিযোগ আছে। চেন টেনেছিল কে?

আমি না। জোর গলায় বললে রাজু।

আচ্ছা। তোমার টিকিট ছিল?

না।

এর জন্যে তোমায় শাস্তি পেতে হবে। বললেন বিচারক।

তারপর একটা মোটা বই খুলে একটু পড়ে নিয়ে বাতলালেন, এখানে এই অপরাধের শাস্তি হচ্ছে—তোমাকে একটা পরীক্ষা দিতে হবে।

কি পরীক্ষা? একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলে রাজু।

বাষ্প আর রেল গাড়ী সম্বন্ধে কি জান, তারই পরীক্ষা। অন্তত কুড়িটা প্রশ্ন করা হবে। তবে এ বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে



তোমাকে বই দেওয়া হবে। পড়ে নিতে পার। তিন দিন পরে পরীক্ষা।

রাজুর কয়েদখানায় খানকয়েক মোটা মোটা বই দিয়ে দেওয়া হলো। কি বিপদ! রাজু প্রায় কেঁদে ফেলে আর কি! একটা বই-এর পাতা উল্টে দেখে—বিজ্ঞানের বই বলেই মনে হলো। কিন্তু তার কাছে দুর্বোধ্য। গল্পের বই হলেও পড়া যেত। যদি পরীক্ষায় পাশ করতে না পারি তাহলে কি শাস্তি হবে কে জানে! হয়তো কয়েদখানাতেই থেকে যেতে হবে। আর বাড়ী যাওয়া হবে না, মার কাছেও যেতে পারবো না···দুফোঁটা জল ঝরে পড়ে রাজুর চোখ থেকে।

জানলা থেকে অনেক দূর অবধি চোখ যায়। বড় বড় ঘাসে-ঢাকা খোলা মাঠ একটা। তার পাশ দিয়ে একটা রেলের লাইন গেছে। হঠাৎ তার চোখ পড়ে একটা সুন্দর ইঞ্জিনের দিকে। কিন্তু, ও কি? ওটি মাঠের মধ্যে কেন?

ভাল ক'রে সে তাকিয়ে থাকে। দেখে, মাঠে হাজার হাজার কাশ ফুল হাওয়ায় দুলছে। মাঝে মাঝে এক রকম ছোট হলদে ফুল ফুটে আছে। লোহা ইস্পাতের ইঞ্জিনটিকে ঠিক যেন মনে হচ্ছে একটি ছোট দুষ্টু ছেলে। লোহা-বাঁধানো পথ ছেড়ে সে নেমেছে খেলা করতে। তাই তার চার দিকে ঘাস আর ফুলের মেলা, পাশেই একটি করবী ফুলের ঝাড়। ছোট ছোট পাখী উড়ছে আশে-পাশে, কয়েকটি কাঠবিড়ালী ওর গায়ে উঠে ঘুরে বেড়াচ্ছে। রাজুর ইচ্ছা হয় সে-ও গিয়ে যোগ দেয় ওদের ঐ উৎসবে।

কিন্তু ঐ সময়েই কার গলা শুনতে পাওয়া গেল! সেই ফ্ল্যাগ হাতে ভারিক্কি লোকটি খুব চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

সতেরো নম্বর! কেন তুমি লাইন ছেড়ে নীচে নেমেছ? শাস্তির কথা ভুলে গেছ বুঝি? না তোমাদের এত করে ট্রেনিং দিয়েও শেখাতে পারলুম না! লাইনগুলো পাতা হয়েছে কেন? তোমাদের জন্তেই ত! বাঁধা রাস্তায় সকলকেই চলতে হয়—তার জন্তে কত ব্যবস্থা আমরা করেছি দেখতে পাচ্ছো না? বেয়াদপ কোথাকার? তোমায় খোলা রোদ্দুরে সাইডিংএ বেঁধে রাখলে ভাল হবে, না?

হেঁড়ে গলায় আরও অনেক কথা বলতে লাগলো সে। রাজুর ভাল লাগলো না, সে সরে এল। আহা, ঐ বাচ্ছা ইঞ্জিনটার জন্তে তার দুঃখ হলো। কেমন খেলা করছিল সে ঐ সবুজ মাঠে! বাঁধা লাইনে চলতে কি ভাল লাগে কারুর? মানুষকেও ত চলতে হয় বাঁধা রাস্তা দিয়ে। একঘেয়ে লাগে নাকি? বাঁধারাস্তার দুপাশেই ত আনন্দ। ঐ ফ্ল্যাগধারী মোটা লোকটা বুঝবে কি করে? স্কুলের পড়া আমিও ত পড়ি, কিন্তু টেক্‌স্‌ট বই ছাড়া যে কোনও অন্ত বই পড়তেই ত ভাল লাগে। বই এর কথা মনে হতেই তার চোখ পড়লো পাশের সেই দশ ইঞ্চি ইটের মত মোটা বইগুলোর দিকে।

সে একটা বই কোলে তুলে পাতা ওল্টাতে লাগলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে এল। সাড়া-শব্দ নেই, মাঝে মাঝে খুট খাট খটাং করে লোহা-লক্কড়ের শব্দ ভেসে আসছে। ঘরের দেয়ালে কে একজন এসে একটা দেয়ালগিরি জেলে দিয়ে গেল। তার যতটা আলো তার চেয়ে বেশী তার ছায়া। গরাদেগুলোর লম্বা লম্বা ছায়া পড়ছে মেঝেয়, তার কোলের ওপর। রাজুর চোখ ভারী হয়ে এল।

কত রাত হবে কে জানে, হঠাৎ খুট খুট খটাস শব্দে রাজুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। এত রাত্রে কে? রাজুর ভয় হলো। সত্যিই, একজন লোক তার ঘরে ঢুকেছে। তার কাছে আসছে। রাজু চেঁচাবে নাকি? এমন সময় আগন্তুক কথা বলে উঠলো—

অনেক কষ্টে তোমার খোঁজ পেয়েছি, মানে কথা, তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি ক'দিন—

কে প্রোফেসার মশাই?

হ্যাঁ, গো হ্যাঁ, আমারই ভুল, মানে কথা তোমাকে সাবধান করে দিতে পারতুম। যাই হোক, উঠে পড়ো, দরজা খোলা, চল বেরিয়ে পড়ি—চল, মানে কথা, দেরী করলেই মুস্কিল।

আমার যে পরীক্ষা দিতে···

হ্যাঁ হ্যাঁ সব জানি, তার ব্যবস্থা আমি করেছি—চল চল···রাজুকে নিয়ে প্রোফেসার কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে পড়ল।

[ক্রমশঃ।

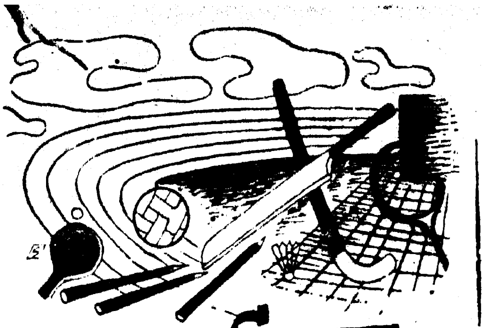
বাঙলা ভাষার পরিসংখ্যা

[৺জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাসের অভিধান দৃষ্টে অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহোদয় বাংলা ভাষায় বিভিন্ন শব্দের এইরূপ হার নির্ণয় করিয়াছেন :—

তৎসম (বা সংস্কৃত) শব্দ	···	···	৪৪·০০
তদ্ভব (সংস্কৃত হইতে জাত) ও দেশী শব্দ			৫১·৪৫
বিদেশী (আরবী ও পারসী)	···	···	৩·৩০
অন্ত বিদেশী	···	···	১·২৫

—২৭]


এ রকমটি
যেন না হয়!
আপনার নতুন ট্রাউজার
যাতে কুঁচকে খাটো না হয়
তার জন্যে
•SANFORIZED•
স্যান্‌ফোরাইজ্‌ড্‌
ছাপ দেখে নিন
সাধারণ কাপড়ের তৈরী হ'লে ভালো
ট্রাউজারও খাটো হয়ে যেতে পারে—
আর তা একটু খাটো হ'লেই
বরবাদ! কিন্তু এই খাটো হওয়ার
ঝঞ্ঝাট আপনাকে পোয়াতে হয় না
যদি আপনি পোশাক কেনবার
সময় স্যান্‌ফোরাইজ্‌ড্‌ ছাপ
দেখে কেনেন।
স্যান্‌ফোরাইজ্‌ড্‌ ছাপ দেওয়া কাপড়
আগে থেকেই সম্পূর্ণ খাপী ক'রে দেওয়া
হয়। তাই বার বার কাচার পরেও আর
কুঁচকে মাপের চেয়ে খাটো হয় না।
সব সময়েই স্যান্‌ফোরাইজ্‌ড্‌ ছাপ
দেখে পোশাক কিনুন।
•SANFORIZED•
SHRUNK FABRIC
স্যান্‌ফোরাইজ.ড. সার্ভিস 'পারিজাত', নেতাজী সুভাষ রোড,
মেরিন ড্রাইভ, বোম্বাই—২
রেডিও সিলোন থেকে প্রচারিত 'স্যান্‌ফোরাইজ্‌ড্‌-কে-মেহমান' শুনুন—
রবিবার দুপুর ১২-৩০এ ৩১-মিটারে, মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭-৩০এ ৪১-মিটারে



খেলাধুলা

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

প্রতি বছর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যে হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, তার নাম অন্তঃরাজ্য বা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা। সম্প্রতি জলন্ধরে অনুষ্ঠিত ফ্যাইনাল খেলায় উত্তর প্রদেশকে ২—০ গোলে হারিয়ে সার্ভিসেস দল জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছে।

বাইটন কাপ ও জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় সার্ভিসেস দল তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করলো ভারতীয় হকিতে। সার্ভিসেস টীম এবার জাতীয় হকি প্রতিযোগিতায় 'সার্ভিসেস হকেটস' নামে অংশ গ্রহণ করেছিল।

অলিম্পিক দল গঠনের জন্যই একদিন সৃষ্টি হয়েছিল এই জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার। ১৯২৮ সালে ভারত সর্বপ্রথম বিশ্ব ক্রীড়ানুষ্ঠানে যোগদান করে গৌরব-মুকুট লাভ করা থেকেই এ অনুষ্ঠানের সূচনা। দুই বছরের ব্যবধানে একটি রাজ্যে এই অনুষ্ঠান হয়। ১৯৪৭ সা'ল পর্য্যন্ত এই প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার ছিল মেওয়ারী শীল্ড। ১৯৪৭ সালে পাঞ্জাব এই পুরস্কার লাভ করে। এবং রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য পাঞ্জাবের কাছ থেকে সে শীল্ড উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ১৯৪৮—১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত কোন পুরস্কার দেওয়া হয়নি। ১৯৫১ সালে মাদ্রাজে জাতীয় হকির অনুষ্ঠান কালে Hindu এবং Sports and Past time পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাদের পরলোকগত সম্পাদক এস, রঙ্গস্বামীর স্মৃতি-রক্ষার উদ্দেশ্যে জাতীয় হকির রঙ্গস্বামী কাপ বিজয়ীকে পুরস্কার দেওয়া হয়। খেলাধূলার সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী "উবেরয়" প্রতিষ্ঠান বিজিত দলকে একটা পুরস্কার দেন।

একবিংশতি অনুষ্ঠানে ২১টা দল যোগদান করে। একমাত্র আসাম ছিল অনুপস্থিত। হকি প্রতিযোগিতার বিজয়ী ১১ জন খেলোয়াড়কে ১১টা স্বর্ণপদক ও বিজিত দলের ১১ জন খেলোয়াড়কে এগারটা রৌপ্যপদক দেওয়া হয়। এটাই এবারের প্রতিযোগিতার নতুন ঘটনা। শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক জন খেলোয়াড় একটি 'ষ্টিক' উপহার পেয়েছেন।

ফুটবল

ফুটবল মরশুম সুরু হতে না হতেই ফুটবল-পাগল দর্শকদের ভীড় জমতে সুরু হয়েছে। এক কথায় বলা যায়, গত দু'বছরের চেয়ে এবারের ফুটবল মরশুম জমে উঠতে মোটেই দেরী হবে না। তার পিছনে কিছু কারণ আছে। আগামী অলিম্পিক আসন্নপ্রায়। তার রেশ এখন প্রতিদেশেই সুরু হয়েছে। গৌরব-মুকুট পাওয়ার জন্যে প্রত্যেকটি দেশের মধ্যেই চলেছে প্রস্তুতি পর্ব।

প্রথম ডিভিসনে নবাগত দল বালী প্রতিভা। তরুণ খেলোয়াড়-পুষ্ট এই দলটি আশা করে অনেক। নিতান্ত নবাগত দল হিসেবে প্রথম ডিভিসনে এরা মোটেই খারাপ খেলছে না। আমার ব্যক্তিগত খেলা দেখার অভিজ্ঞতা থেকে যে-টুকু উপলব্ধি করেছি, সেইটুকু পাঠকের কাছে তুলে ধরছি।

তরুণ খেলোয়াড়পুষ্ট দলগুলি প্রথম দিকে নতুন উদ্দীপনা নিয়ে খেলতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তারা ঠিক্‌মত তাল সামলাতে পারে না। প্রথম দিকে এই সমস্ত দলগুলি বড় বড় দলগুলিকে নাজেহাল করে ছাড়ে। শেষরক্ষা হয় না, তার কারণগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, তরুণ খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা কম। ঠিক মত কখন কি ভাবে বল আদান-প্রদান করতে পারলে বিপক্ষ শক্তিশালী দলের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সমকক্ষ হয়ে উঠবে তাদের সে হিসেব কম; তাই অধিকাংশ সময়েই দেখা যায় তরুণ খেলোয়াড়দের অনভিজ্ঞতার দরুণ সুযোগের সদ্ব্যবহার হয় না। এটা তরুণ খেলোয়াড়দের দোষ নয়। দোষ হল যাঁরা খেলোয়াড়দের নির্দ্দেশ দেন কি ভাবে খেলতে হবে, সেই সমস্ত ট্রেণারদের।

ইতিপূর্বে বাংলাদেশের তরুণ খেলোয়াড়দের খেলাধূলার উপর কিছু আলোকপাত করেছিলাম। এবারে আরও কিছু বিস্তারিত আলোচনা করছি, কারণ আমাদের দেশের ফুটবল খেলার মান দিন দিন নিম্নগামী হতে চলেছে।

ফুটবল খেলোয়াড়দের দৈহিক শক্তি চাই। যেটি আমাদের ভারতীয় খেলোয়াড়দের একান্ত অভাব। প্রত্যেকটি বহিরাগত দল ভারতে যখন খেলতে এসেছে, তখন লক্ষ্য করা গেছে তাদের দৈহিক শক্তি প্রচুর। আমাদের খেলোয়াড়দের অর্জ্জন করতে হবে দৈহিক শক্তি। বিদেশী দলের সংগে ভারতীয় দলের পরাজয়ের এই একটি অন্যতম কারণ। তার উপর খেলোয়াড়দের অনুশীলন করতে হবে।

এবার কলকাতার মাঠে কিছু কিছু তরুণ খেলোয়াড়ের মাঝে ভবিষ্যত দেখা গেছে। তাই প্রত্যেকটি ক্লাব-কর্ত্তৃপক্ষদের অনুরোধ, খেলোয়াড়দের সুখ-সুবিধা দেখুন। আপনাদের প্রচেষ্টায় ভারতের ফুটবল খেলার মান উন্নত হবে নিঃসন্দেহে।

এবার কলকাতা মাঠে প্রথম ডিভিসন দলগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী বলে মনে হচ্ছে মহামেডান স্পোর্টিংকে। ইষ্টবেঙ্গল দল তাদের সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারছেন না। তার কারণ এই যে, অনেক খেলোয়াড় বদল হয়েছে। নতুন খেলোয়াড়রা মোটেই সুবিধা করতে পারছেন না।

মোহনবাগান দল যে ভাল খেলছে তা মোটেই বলা যায় না। তারা তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে না পারলেও কোন রকমে জোড়াতালি দিয়ে চলেছে।

রাজস্থানের অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নয়। ভাল খেলোয়াড়পুষ্ট এই দলটা এ বছর মোটেই সুবিধা করতে পারছে না।

এরিয়ান্স দল তাদের খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে না পারলেও বড় বড় দলগুলিকে ঘায়েল করতে ওস্তাদ। নবাগত বালী প্রতিভা দল লীগ খেলায় তাদের সাধ্য অনুযায়ী খেলেছে।

ইষ্টবেঙ্গল ও মহামেডান দলের প্রথম চ্যারিটী ম্যাচ খেলায়



গাগরি ভরণে
—শ্যামাপদ চক্রবর্ত্তী

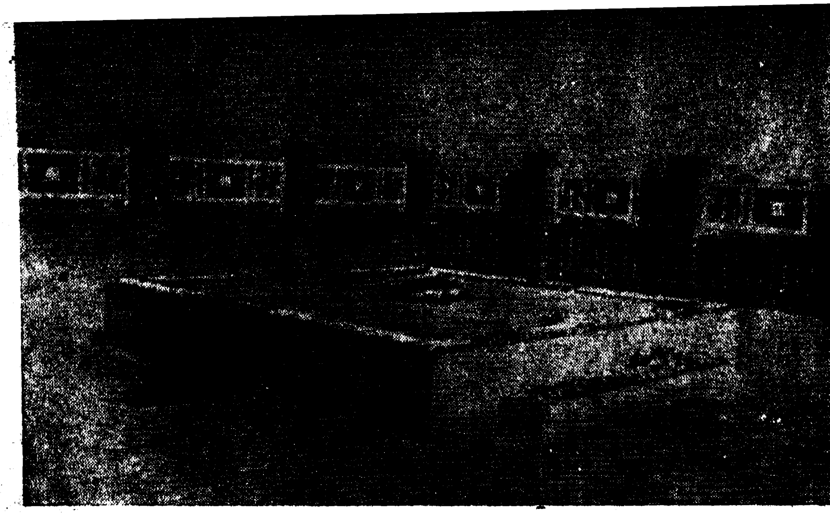
জুতা পালিশ
—সলিল গোস্বামী



আলোকচিত্র

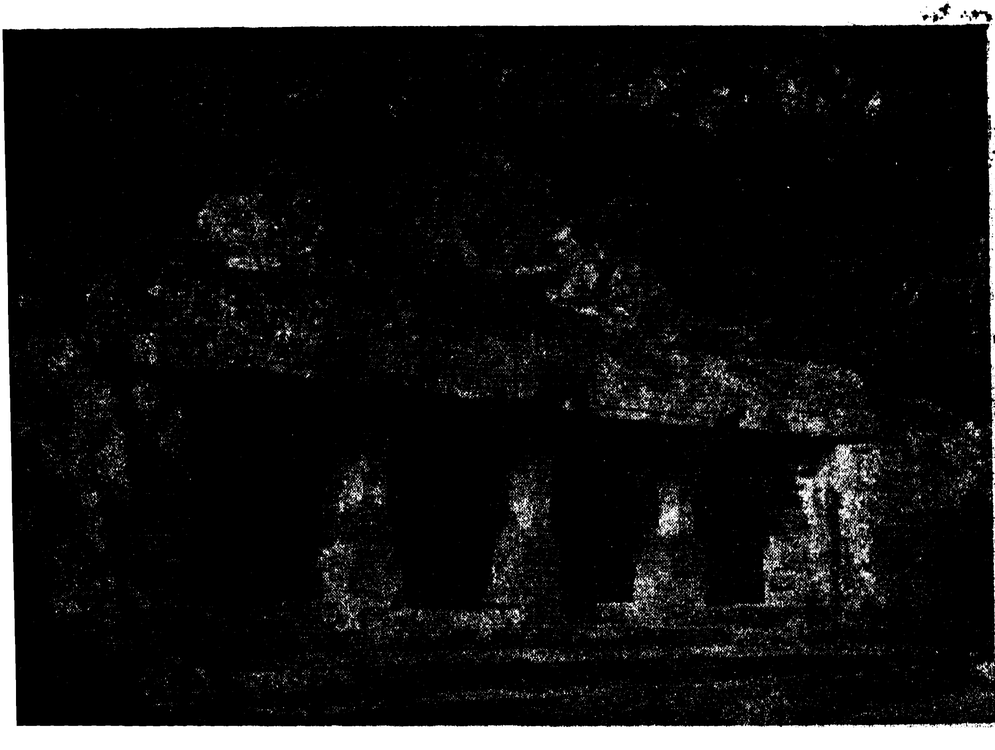
ঘুমন্ত শিশু
—এস. মুখোপাধ্যায়

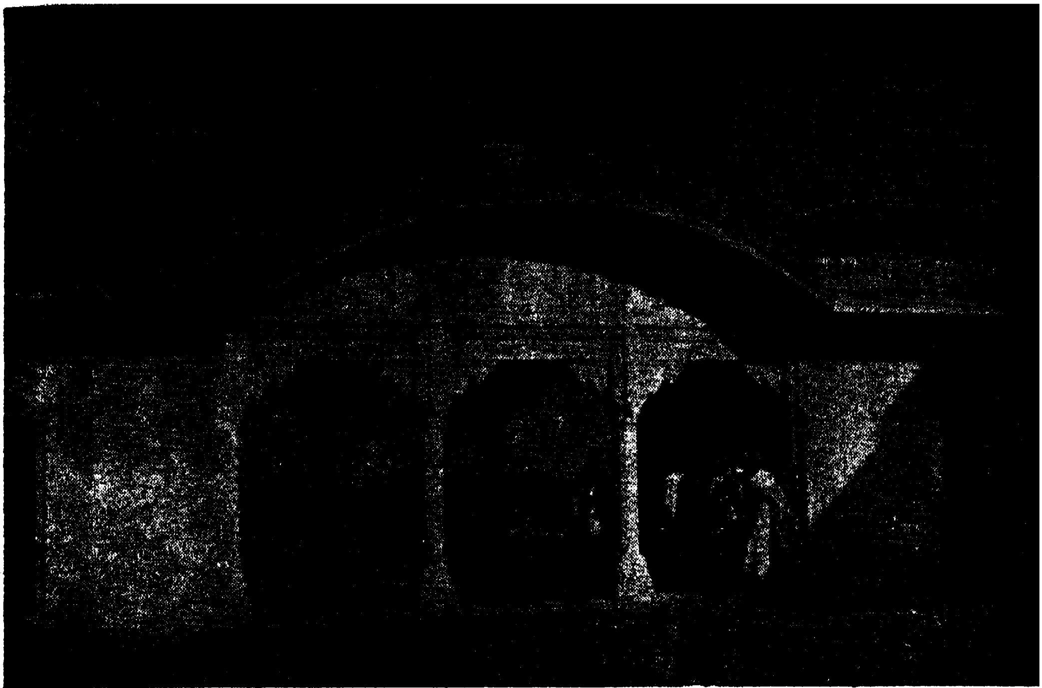




গান্ধী-সমাধি (রাজঘাট, দিল্লী) —শিশির রাহা

উদয়গিরির গুহা (ভুবনেশ্বর) —রবীন্দ্রনাথ ভৌমিক





জাহানারার প্রকোষ্ঠ থেকে তাজমহল —অনিমেষ রায়চৌধুরী

শিকার —সুভাষ বিশ্বাস





দার্জিলিংকন্যা —অহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



মধুপায়ী —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

বনবালা — অরুণ চৌধুরী



জ্যামিতিক —দীপককুমার রায়



ইষ্টবেঙ্গল দল মহামেডান স্পোর্টিংকে পরাজিত করায় ইষ্টবেঙ্গল দলের লীগ কোঠায় অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। এ খেলা দেখে দর্শক ও ইষ্টবেঙ্গল দলের সমর্থকরা মনের মধ্যে ভাল আশা পোষণ করছেন। প্রথম দিকে যতখানি হতাশ করেছিল ইষ্টবেঙ্গল দল, শেষ দিকে তা করবে না বলে আশা করা যায়।

কলকাতার প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা দেখেই বেশ বোঝা যায় ভারতের ফুটবল খেলার মান কত নিম্নে চলে যাচ্ছে। গত কয়েক বছর ধরে এটা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করছি।

বহিরাগত ফুটবল দল

অলিম্পিক যাত্রার পথে চীনা ফুটবল দল কলকাতা মাঠে দারুণ দুর্যোগপূর্ণ অবস্থায় মোহনবাগান দলের বিরুদ্ধে ৮-১ গোলে জয় লাভ করে। কলকাতার মাঠে ইতিপূর্বে কোন বহিরাগত দল এত গোল দিতে পারেনি।

প্রবল ঘূর্ণিবাত্যা আর নিদারুণ বৃষ্টিতে এই খেলার আয়োজন হয়েছিল। অলিম্পিকগামী এই চীনা দলটির ক্রীড়ানৈপুণ্য নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে দিয়েছে তাদের দেশে ফুটবল খেলার মান কত উচ্চে।

এদিনের খেলায় কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল মোহনবাগানের শোচনীয় পরাজয় ভারতের ফুটবল খেলার মান কতখানি তা প্রমাণ করে দিয়েছে। এই বর্ষাসিক্ত মাঠে অনেক উন্নত ধরণের ক্রীড়া নৈপুণ্য আমরা দেখেছি। মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়রা কোন রকম সুবিধা করতে পারেন নি। পেনাল্টির সুযোগ সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি। দলের অধিনায়ক সাত্তার শেষ মুহূর্তে একটি গোল পরিশোধ করেন।

ক্রিকেট

ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াকে ঘিরে যে ক্রিকেট আসর জমে উঠেছে তার জন্যে বিশ্বের ক্রীড়ামোদীদের মাঝে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অন্ত নেই। জুন মাসের ৭ তারিখে প্রথম টেষ্ট খেলা আরম্ভ হবে। তার আগে এ খেলা আরম্ভ করতে হয়েছে? অতএব টেষ্ট খেলার ফলাফলের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ক্রিকেটের পথিকৃত হিসেবে নিঃসন্দেহে আমরা বলতে পারি ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়াকে। মহাকাল অনন্তদিন ধরে চলে আসছে। এই চলার মুহূর্তে এসেছিল ক্রীড়া-জগতে একটি পরমক্ষণ। সেই পরমক্ষণেই মিলন হল ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার ক্রীড়া-জগতে ক্রিকেট খেলা। তারপর এই খেলা নিয়ে দুই দেশের ক্রীড়ামোদীদের মাঝে ঘটে গেছে কত ঘটনা-দুর্ঘটনা।...

ইংলণ্ডের ক্রীড়া-জগতের রাজা ক্রিকেট। যেখানেই বৃটিশ সাম্রাজ্য পত্তন করেছে সেইখানেই তাদের প্রিয় খেলাটির প্রসার লাভ করিয়েছে। ইংলাণ্ডের সংস্পর্শে এসেই ভারতের কয়েকটি ধনীর পুত্র সখ করে ক্রিকেট খেলতে নেমেছিল, তারপর আস্তে আস্তে প্রসার লাভ করেছে সেই খেলা বিশ্বের মাঝে।

ক্রিকেটের গুরু ইংলণ্ড। অষ্ট্রেলিয়া তার কাছ থেকে খেলা শিখে তাদের অপেক্ষা বেশী সম্মান লাভ করেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলার গৌরব ম্লান করার জন্য ইংলণ্ডের মাঝে চলেছে বিরাট প্রস্তুতি পর্ব।

১৮৩৬ সালে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ায় প্রথম ক্রিকেট খেলা হয়। কিন্তু তাকে টেষ্ট খেলার মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি। ১৮৭৬-৭৭ সালে যে খেলা অনুষ্ঠিত হয়, সেই খেলাকে সরকারীভাবে টেষ্ট খেলার মর্য্যাদা দেওয়া হয়। অষ্ট্রেলিয়া ও ইংলণ্ডের মধ্যে ১৬৮ বার খেলা হয়েছে। তার মধ্যে ইংলণ্ড জয়লাভ করেছে ৬০টি, অষ্ট্রেলিয়া ৬১টি ৩১টি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

দীর্ঘ ১৯ বছর পরে ১৯৫৩ সালে ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে 'আসেস' নিয়ে ঘরে ফিরেছে। এবার অষ্ট্রেলিয়া মোটেই সুবিধা করতে পারেনি।

অষ্ট্রেলিয়া এবার সবচেয়ে শক্তিশালী দল গঠন করেছে। অপরদিকে ইংলণ্ডও কম নয়। তবে ইংলণ্ডের ধুরন্ধর দিকপাল খেলোয়াড় লেন হাটন অবসর গ্রহণ করেছেন আর ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন অসুস্থ হওয়ায় ইংলণ্ড দলকে বেশ কিছুটা অসুবিধা বোধ করতে হবে, তবুও ইংলণ্ডের তরুণ খেলোয়াড়দের মনে অটুট বল। তারা এ সংগ্রামে হাসি মুখে অবতীর্ণ হবে। সাদর সম্ভাষণ জানাই ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের।

টুকরো খবর

ইংলণ্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক লেন হাটন নাইট উপাধি লাভ করেছেন। ইংলণ্ডে পেশাদার খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনিই এই সম্মান প্রথম লাভ করলেন। খেলোয়াড়দের এ সম্মানে যে কোন দেশের যে কোন খেলোয়াড় মাত্রই সুখী নিঃসন্দেহে।

* * * *

চীনা ফুটবল দল দিল্লীতে এক আই, এফ, এফ এর সংগে একটি খেলা খেলবে, তাতে কলকাতা থেকে চারজন তরুণ খেলোয়াড় সুযোগ পেয়েছেন।'

* * *

অলিম্পিকের প্রস্তুতিপর্ব চলছে। অলিম্পিক সম্বন্ধে আলোচনা আগামীবারে করার ইচ্ছা রইলো।

* * *

কলকাতার ষ্টেডিয়ামের অভাব শীঘ্রই দূরীভূত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বর্দ্ধমান জেলার কালনা শহরের একটি প্রাচীন মন্দিরের আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি শ্রীসমীরেন্দ্র সিংহরায় কর্ত্তৃক গৃহীত।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



নারী অগ্রগতি সমিতি

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

—মমতা ব্যস্ত আছো নাকি?

কল্যাণী ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে ঘরে প্রবেশ করতে করতে বললে।

মমতা সোফায় বসে কি একটা বুনছিল। কল্যাণীর প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে বললে, ব্যাপার কি কল্যাণী? কি হয়েছে?

কল্যাণী বললে, এখন আমার কথাটা মন দিয়ে শোন, বাংলা দেশের সহরে এবং অনেক উন্নতিশীল গ্রামেও মেয়েদের সমিতি আছে, কিন্তু এমনি আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমাদের এই সহরে মেয়েদের উৎসাহ-আনন্দ দেবার কোন আয়োজনই নেই। অবশ্য এটা আমাদের দোষ, কারণ আমরা কোনদিন এ বিষয়ে মাথা ঘামাইনি। এখন আমার বক্তব্য এই যে, যদি এই সহরে একটি সমিতি করা যায়, তাহলে কি ভাল হয় না? তুমি কি বল?

—খুব ভাল হয়, কিন্তু তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছো দুপুরের ঘুম, এবং পাড়া-বেড়ানো বন্ধ রেখে কেউ সভ্য হতে আসবে কি না। সমিতি করার হাঙ্গামা অনেক, দায়িত্ব নিয়ে এসব করবে কে?

কল্যাণী তর্কের সুরে বললে, কোন্ কাজে ঝঞ্ঝাট নেই তা বল। কোন একটা ভাল কাজ করতে গেলেই কত বাধাই না আসে! কিন্তু মমতা, আমরা সে বাধা মানবো কেন? আমরা কি এতই দুর্ব্বল যে, সবকিছুতে পেছিয়ে থাকবো? ওসব যেতে দাও, আমি সমস্ত প্ল্যান করে তবে তোমার কাছে প্রস্তাব করছি। তোমার নীচের তলায় বড় ঘরখানা তো পড়েই আছে, সেখানা সমিতিকে দাও, সমিতির প্রেসিডেণ্ট হবার যোগ্যতা একমাত্র তোমারই আছে বলে মনে হয় আমার।

মমতা লজ্জিত ভাবে বললে, আমি তো এ সম্বন্ধে কিছুই জানি না।

বাধা দিয়ে কল্যাণী বললে, অত ভাবতে গেলে কোন কাজ করা চলে না। শোন তুমি, সব আমি লিখে এনেছি।

ফার্ষ্ট এডের জন্যে একজন ডাক্তারের সাহায্য নেব আমরা। আমার মনে হয় ডাক্তার চ্যাটার্জ্জীকে বললে তিনি খুশী হয়ে শেখাবেন। আর সেলাই-বোনা শেখানো—সেটা আমরা ২।১ জন যা জানি, তাতে অনায়াসে ক্লাস করা যাবে। আচ্ছা, এই খাতাখানা রইলো, তুমি পড়ে দেখো। আচ্ছা, আজ যাই, কাল তাহলে এই সময়ে সদলে হাজির হচ্ছি।

মমতা হাত বাড়িয়ে ওর আঁচলটা চেপে ধরে বললে, একটু চা খেয়ে যাও কল্যাণী। যা বক্তৃতা দিলে, গলা নিশ্চয় শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

পরদিন কল্যাণী যথাসময়ে সকলকে নিয়ে মমতার বাড়ী উপস্থিত হোল। সকালে সে আর একবার এসে ঘর ঠিক কোরে রেখেছিল। ওরা বসবার প্রায় সংগে সংগে মমতা ঘরে প্রবেশ করে সকলকে নমস্কার জানিয়ে বললে, আপনারা সকলে যে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তার জন্যে আমি আপনাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কল্যাণী যে উদ্দেশ্য নিয়ে আপনাদের সকলকে আহ্বান করেছেন, সেই উদ্দেশ্য অতি মহৎ। একার শক্তিতে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন হয় না, তাই চাই আপনাদের সাহায্য, আশা করি, আমাদের সাহায্য করতে আপনারা এগিয়ে আসবেন।

কল্যাণী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, শ্রীমতী মমতা বসুকে যদি সমিতির সভানেত্রী করা হয় তাতে আপনাদের সম্মতি আছে তো?

সকলের মুখপাত্র হয়ে অনামিকা উঠে বললে, আমরা কল্যাণীদির প্রস্তাব সমর্থন করি।

মমতা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে লজ্জিত ভাবে বললে, আমাকে এই সম্মানিত পদ দেওয়ার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

অনামিকা উঠে বললে, সমিতি গঠনের প্রস্তাব করে কল্যাণীদি যে উপকার করলেন, আমার মনে হয়, সেক্রেটারির পদ ওঁকেই দেওয়া উচিত।

অনামিকার কথা সকলেই উৎসাহের সংগে সমর্থন করার পর কল্যাণী বললে, আজ আপনারা যে গুরুদায়িত্বভার আমার ওপর দিলেন, তার জন্যে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আমি যেন তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে পারি। আজকের এই ছোট্ট সমিতি তার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বিজয়-যাত্রা সুরু কোরলো, আশা করি অদূর ভবিষ্যতে সমিতির উদ্দেশ্য সাফল্যমণ্ডিত হয়ে বিরাট এক সমিতিতে পরিণত হবে। আজ আমরা নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে আলোকের সন্ধান পেয়েছি, নতুন জগতের সংগে পরিচিত হতে পারছি, সেই জন্যে আর আমরা কুয়োর ব্যাঙ হয়ে থাকতে চাই না। আমরা চাই নারী জাতির উন্নতি, আমরা চাই তারা সংস্কারমুক্ত হয়ে এই আনন্দময় জগতকে উপভোগ করুক।

যে সব মেয়েরা অন্ধকারে আছে, তাদের আলোকে আনাই হবে সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য। সমিতির সভ্যাদের চাঁদা আট আনা হিসাবে ধরা হোল। আশা করি এতে আপনারা কোন আপত্তি করবেন না। এবার অন্যান্য বিবরণ শুনুন—মাসের প্রথম সপ্তাহের বুধবার সাধারণ সভা হবে। ঐ দিন প্রত্যেক সভ্যা চাঁদা জমা দিয়ে খাতায় সই করবেন। সপ্তাহের প্রতি সোমবার পাঠচক্র বসবে বেলা দুটো থেকে

সাড়ে তিনটে অবধি। প্রতি বুধবার কুটীর-শিল্প বেলা ছুটো থেকে সাড়ে তিনটে অবধি। আর প্রতি শুক্রবার প্রাথমিক চিকিৎসা বা ফার্ষ্ট এডের শিক্ষা দেবেন সর্ব্বজন-পরিচিত ডাক্তার ব্যানার্জ্জী। তা হলে সপ্তাহে তিন দিন আসর বসবে, মনে হয় এতে আপনাদের কোন অসুবিধা হবে না। যদি এ বিষয়ে কারুর কোন বক্তব্য থাকে, স্বচ্ছন্দে বলতে পারেন। কারণ আপনাদের মতই আসরের মত।

কল্যাণী দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করে চেয়ারে বসতে সকলের পক্ষ থেকে তটিনী বললে, কল্যাণীদির প্রস্তাব আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

কল্যাণী আবার উঠে দাঁড়ালো—বললে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ, সভ্যাদের পক্ষ থেকে মমতাকেও ধন্যবাদ দিচ্ছি এই ঘরখানা সমিতিকে দেওয়ার জন্যে। আজ আমাদের সভা এইখানেই শেষ হোল। আজকাল সমিতি নিয়ে কল্যাণী দিনরাত ব্যস্ত। সব সময় চিন্তা করে, কি করলে সমিতির উন্নতি হবে। সেদিন সে আগামী কালের সমিতির অধিবেশনে পড়বার জন্যে কি একটা লেখা নিয়ে ব্যস্ত ছিলো, এমন সময় ওর ছোট ভাই বিমান হুড়-মুড় কোরে ঘরে প্রবেশ করে বললে, বাঁচালে, আচ্ছা দেখছি। ব্যাপার কি বলতো? যখনি আসি, দেখি বাড়ী নেই।

—নারে, সমিতিটা সুরু করা হয়েছে তো! তাই সেটাকে দাঁড় করাতে একটু ঘোরাঘুরি করতে হচ্ছে। নইলে মমতার বাড়ী ছাড়া বিশেষ কারুর বাড়ীতে যাই না। যাকগে। এখন দেখ তো এই লেখাটা কেমন হয়েছে বল।

বিমান আঁতকে উঠে বললে, সমিতি? বল কি দিদি! জামাই বাবু, রেবা, ইনু, সন্তু, হাতাবেড়ি, এদের নিয়েই তো তোমার জগত, এর ভেতর আবার সমিতি মিটিং লেখা,—নাঃ মাথাটা কেমন যেন গোলমেলে হয়ে উঠছে।

বিমানের কথায় কল্যাণী খিল-খিল কোরে হেসে বললে, তোরা যে আমাদের কি ভাবিস, তা বুঝি না। কেন, ঘর সংসার ছাড়া আমরা কি বাইরের কোন ব্যাপার বুঝি না, না কোন কাজ করবার যোগ্যতা নেই, এই বলতে চাস?

—আহা, তা কেন পারবে না। যাক্, এখন সমিতিটা কি উদ্দেশ্যে তৈরী হোল?

—সমিতি এখন ছোট, কিন্তু তার উদ্দেশ্যটা ছোট নয়। কালে এই ছোট্ট সমিতি বড় হয়ে উঠবে।

—রাগ কোর না দিদি, আমার মনে হয় বেশী দিন নয় আয়ু। কারণ শুনবে? কারণ, আমাদের ভেতর একতার বড় অভাব। তুমি শুনেছো, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাঙালী কোন কাজ করছে? হয়তো দু'চার জন সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করতে গিয়েছে। প্রথমটা বিরাট



হৈ-চৈয়ের সংগে সুরু করলে, শেষটা দেখা গেল সেই হৈ-হৈএর মাঝে উদ্দেশ্য কোথায় তলিয়ে গেছে।

এরপর বিমান চেয়ার ছেড়ে উঠে বললে, আচ্ছা আমি চলি, মা কি জন্যে যেন একবার তোমাকে যেতে বলেছেন। সময় পাও তো যেও।

পরদিন মমতার বাড়ীর সেই ঘরে যথারীতি সমিতির মিটিং আরম্ভ হয়েছে। মমতা নিজের স্থানে বসে এতক্ষণ কি একটা লেখা পড়ছিল, এবার মুখ তুলে বললে, আজকের মিটিং'য়ে সম্পাদিকা একটি প্রস্তাব করছেন। তাঁর প্রস্তাবে আপনাদের কারোর কিছু বলবার থাকলে নিশ্চয় বলবেন। কারণ আগেই বলেছি আপনাদের সকলের মতই সমিতির মত। কল্যাণী, তুমি কি প্রস্তাব এনেছ, সেটা এঁদের কাছে বল।

কল্যাণী উঠে বললে, আমি আপনাদের কাছে যে কথাটা বলতে এসেছি, জানি না, সেই কথাটা ঠিকমত আপনাদের সামনে ধরে তুলতে পারবো কি না। আমাদের সমিতি খুবই ছোট, কিন্তু এমন দিন আসবে, সেদিন এই সমিতি আজকের মত এত ছোট থাকবে না। কাজের মধ্যে দিয়ে বিরাট সমিতিতে পরিণত হবে। কিন্তু একার শক্তিতে এই চেষ্টা সম্ভব নয়, তাই হতে হবে ঐক্যবদ্ধ—যে শক্তিতে শক্তিমান হয়ে আমাদের সমিতি শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবে। আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের পথে বহু বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হবে, কিন্তু সেই সব বাধা বিঘ্ন তুচ্ছ কোরে লক্ষ্য স্থির রেখে চলতে হবে। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ করলে কারুরই সাধ্য নেই আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করার। আশা করি একথা সকলেই জানেন, একের পক্ষে যা অসম্ভব, দশের চেষ্টায় তা হয় সহজ। সেইজন্যে আপনাদের সহযোগিতা কামনা করি। আমার দীর্ঘ বক্তব্য শেষ করবার আগে আমি একটি প্রস্তাব করছি, সকলকে উৎসাহিত করবার জন্যে প্রতি মাসে একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হোক। সাহিত্য, শিল্প, যে কোন বিষয় নিয়ে প্রতিযোগিতা। আমার আর একটি প্রস্তাব, আমাদের সমিতির এখনও কোন নামকরণ করা হয়নি। যদি এর নাম 'নারী অগ্রগতি সমিতি' রাখা হয়, আপনারা সমর্থন করবেন কিনা।

বক্তব্য শেষে আরক্তমুখে কল্যাণী চেয়ারে বসে পড়লো। মমতা স্নিগ্ধ নেত্রে একবার তার পানে তাকিয়ে সভ্যাদের লক্ষ্য কোরে বললে, আমাদের সম্পাদিকা যে প্রস্তাব করলেন, এ সম্বন্ধে আপনাদের মতামত জানবার জন্যে আমরা উৎসুক।

সভ্যারা নিজেদের ভেতর বলাবলি কোরে একজন সকলের পক্ষ নিয়ে বললে কল্যাণীদির দুটি প্রস্তাবই সমর্থন করি।

মমতা কল্যাণীকে বললে, কল্যাণী, সমিতির নামকরণের জন্যে সমিতি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ, এবং সমিতির পক্ষ থেকে আমি তোমাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সভ্যাদের লক্ষ্য কোরে মমতা বললে, আপনাদের সকলের সমর্থন নিয়ে আজ থেকে সমিতির নাম হোল 'নারী অগ্রগতি সমিতি'।

এবার আমি প্রতিযোগিতার বিষয় বলবো। 'নারীর কর্ত্তব্য' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হবে। যাঁরা যাঁরা প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন, আগে থেকে জানাবেন, এবং তাঁদের লেখাগুলি সকলের সামনে পড়া হবে সামনের মাসের বুধবার। প্রবন্ধ লিখে এই মাসের শেষ সপ্তাহে জমা দেবেন, নইলে অসুবিধা হবে সকলের। যাঁর লেখা সর্ব্বসাধারণের মতে ভাল বিবেচিত হবে, তিনি প্রথম পুরস্কার পাবেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার দেওয়া হবে যাঁদের লেখা ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে।

আশা করি, সকল সভ্যাই প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে উৎসাহিত করবেন।

মমতার কথার সংগেই সেদিনের মত সমিতি শেষ হয়ে যেতে সকলে প্রস্থান করলে।

প্রতিযোগিতার পর দু'মাস কেটে গেছে। আজকাল সপ্তাহে তিনদিনের ভেতর সভ্যাদের প্রত্যেক দিনই প্রায় যাওয়া হয়ে ওঠে না।

কল্যাণী এটা লক্ষ্য করলেও মমতার কাছে কিছু বলেনি। সেদিন অনামিকাদের বাড়ীতে রেণুকা, তটিনী, প্রতিমা বেড়াতে এসেছে। সমিতি নিয়েই ওদের গল্প জমে উঠলো, হঠাৎ অনামিকা বললে, মমতাদির এক-চোখোমিটা তোমরা লক্ষ্য কোরেছো? শ্রীলেখা কল্যাণীর মামাতো বোন, তাই প্রথম পুরস্কার ওই পেল।

অনামিকার কথা শুনে প্রতিমা বিস্মিত হলেও সহজ ভাবে বললে, আমরা'ও তো দ্বিতীয় তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছি ভাই। তাছাড়া এর ভেতর মমতাদির হাত কোথায়? তাচ্ছিল্যভরে অনামিকা বললে, তুমি তো ভারি খোঁজ রাখো। যাঁরা জজ হয়েছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই মমতাদির বন্ধু বা বিশেষ পরিচিত। কাজেই তাঁরা তো মমতাদির মতে মত দেবেনই। ওসব দ্বিতীয় তৃতীয় পুরস্কারের কথা ছেড়ে দাও। ওটুকু না দিলে নয়, তাই দিয়েছে। শুনতেই দ্বিতীয় পুরস্কার! কতই বা দাম তার?

প্রতিমা বললে, পুরস্কারের আবার কম-দামী বেশী-দামী কি? সকলকে উৎসাহ দেবার জন্যে মমতাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছেন।

ধমকের সুরে অনামিকা বললে, তুমি আর বাজে বোকো না প্রতিমা! আমরা যে মাস মাস চাঁদা দিচ্ছি, তা কি শুধু শুধু নাকি? উৎসাহ দেবার জন্যে না ছাই! শুনলে গায়ে জ্বালা ধরে। এই যে আমার লেখাটা ভাল হয়েছে শ্রীলেখার চেয়ে, তবে কেন আমি প্রথম হলুম না। এমন কি তটিনীর লেখাও শ্রীলেখার চেয়ে ভাল।

রেণুকা বললে, আমি-ই বা কি মন্দ লিখেছি অনুদি!

—বুঝতে পারছো না, শ্রীলেখা যে সম্পাদিকার বোন।

প্রতিমা হঠাৎ উঠে বললে, আজ আমি যাই অনুদি। পিণ্টুর শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না।

প্রতিমা চলে যেতে রেণুকা বললে, ও নিশ্চয় সব কথা কল্যাণীদিকে বলে দেবে।

অনামিকা ঠোঁট উল্টে বললে, বলে বলুক। মমতাদি যদি কিছু বলে, উচিত কথা বোলবো। কিসের অত ভয়?

এ দিনের পর আরও এক মাস কেটে গেছে। কল্যাণীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সমিতি বেশ ভালই চলছে।

মমতাও প্রথমটা ভয় পেলেও, এখন নিজেকে গভীর ভাবে ডুবিয়ে রেখেছে সমিতির ভেতর। মাঝে মাঝে কল্যাণীকে বলে, ভাগ্যি তোমার মাথায় এই আইডিয়া এসেছিল—তাই তো কাজ পেয়ে বেঁচে গেছি। নইলে ঘর-সংসারের কঠিনযন্ত্র চলতে গিয়ে যেন যন্ত্র হয়ে যাচ্ছিলুম।

এই দিনও সমিতির কি একটা লেখা নিয়ে পড়েছে, এমন সময় ক্লান্তভাবে কল্যাণী ঘরে প্রবেশ করলে।

মমতা মুখ তুলে ওকে দেখে হাসলে। বললে, এতক্ষণ তোমার কথাই ভাবছিলুম। কল্যাণী ধপ কোরে ওর পাশে বসে বলে, সেটা আমার সৌভাগ্য।

কল্যাণীর কথায় মমতা বিস্মিত হয়ে বললে, ব্যাপার কি কল্যাণী, কথাটা কেমন যেন কানে বেসুরো ঠেকছে?

—আমাকে এবার ছুটি দাও মমতা।

—ছুটি? কেন কোথাও যাচ্ছো নাকি?

—নাঃ, কোথায় আর যাবো।

—তবে হঠাৎ ছুটির কথা বোলছো কেন? শরীর কি ভাল নেই?

—আমার দ্বারা সমিতি চালানো অসম্ভব মমতা, তাই ছুটি চাইছি, মানে—

মমতা বাধা দিয়ে বললে, রাখো তোমার মানে, কি ব্যাপার তাই আগে বল তো?

কল্যাণী বললে, যারা নিজেদের সংসারে কেউ কারুকে মানিয়ে নিয়ে চলতে পারে না, সংসারে কারুর প্রাধান্য একটুকু সহ্য করতে চায় না, তারা কি কোরে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে কাজ কোরবে? আমার হাতে-গড়া সমিতিকে এমন ভাবে ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু সমিতির জন্যেই আমাকে ছাড়তে হবে। ওদের বাঁকা বাঁকা কথা আর আমি সহ্য কোরতে পারছি না মমতা, আমাকে ছেড়ে দাও।

মমতা ধীরে ধীরে বললে, সমিতির কথা ভেবে সম্পাদিকার পদ তুমি ছাড়তে চাইছো কল্যাণী, কিন্তু তুমি সমিতি ছাড়ার সংগে সংগে যে সমিতিও উঠে যাবে, এ আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। তোমার মত প্রাণ দিয়ে, এত দরদ দিয়ে কাজ কোরবে কে? আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি, সামান্য ব্যাপার নিয়ে এরা ঝগড়া করবার জন্যে দল পাকাচ্ছে, অথচ দেখো দলবদ্ধ হয়ে কাজ করতে পারছে না। অদ্ভুত স্বভাব! মমতার কথা শুনে কল্যাণীর দুটি চোখ অশ্রুতে ঝাপসা হয়ে এল। প্রাণপণে নিজেকে সংযত কোরে রুদ্ধস্বরে সে বললে, আমরা কুয়োর-ব্যাঙ, কুয়োতেই থাকি ভাল, আমাদের কি সমুদ্রে পোষায়?

কল্যাণী কথাটা শেষ কোরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে উঠতে যাবে; মমতা সাদরে ওকে কাছে টেনে বললে, সম্পাদিকার পদ ছেড়ে দিচ্ছো বলে কি আমাকেও ছেড়ে যাচ্ছো কল্যাণী! তুমি ছাড়তে চাইলেও আমি কিন্তু কিছুতেই তোমাকে ছাড়বো না।



মহাসঙ্গীত

বাণি দেবী

নৈনিতাল পর্ব্বত ! সহরের সীমানা ছাড়িয়ে চলেছি পার্ব্বত্য গ্রামীণ পথে !

সরু আঁকা-বাঁকা পথ সাপের মত এঁকে-বেঁকে কখনও চলেছে পাইনের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে কখনও বা গভীর খাদের ধার ঘেঁসে।

বন্ধুর পথে চলতে চলতে উপলখণ্ডে হোঁচট লেগে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে, ক্লান্ত স্বরে বলি : আর কত পথ চিন্ময়দা ? কোথায় তোমার আশ্রম আর উপবন ?

চিন্ময়দা ওরফে চিদানন্দ স্বামী বললেন,—অত ব্যস্ত হলে কি কোনো অসাধারণ দৃশ্য দর্শন করা চলে ? কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে ?

যথার্থবাক্য ! আবার এগিয়ে চলতে থাকি নব উত্তমে !

পথটা সহসা যেন বাঁক ফিরে প্রবেশ করেছে পাথরের তিন দেয়ালের মাঝখানে ! দুটি বিরাট পর্ব্বত পাশাপাশি গা ঘেঁসে দণ্ডায়মান ! ওপরে পার্ব্বত্য জঙ্গল যেন ছাদ রচনা করেছে ! ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার ! একটি ক্ষীণকায়া পাহাড়ী ঝরণার জল কোন্ গহ্বর থেকে মুক্তিলাভ করে ঝুপ ঝুপ করে ঝরে পড়ছে। আশে পাশে জলের ওপর অসংখ্য ছোট-বড় উপলখণ্ড ছড়ানো ! সাবধানে উপলখণ্ডের ওপর পা দিয়ে চলেছি জলটুকু পার হয়ে !

সহসা কানে ভেসে এলো এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত ধ্বনি ! পাহাড়ের চার দেয়ালের মাঝে যেন সে সুরের গম্ গম্ করে প্রতিধ্বনি হ'তে লাগলো। ভাবগম্ভীর কণ্ঠের ভজনের ক'টি লাইন স্পষ্ট শুনতে পেলাম—

'মাধব হম পরিণাম নিরাশা।
তুঁহু জগতারণ, দীন দয়াময় ;
অতয়ে তোহারী বিশোয়াসা।'

সে অপূর্ব্ব সঙ্গীত লহরী ছড়িয়ে পড়লো পর্ব্বত চূড়ার রন্ধে রন্ধে ! বাতাস যেন হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো ! আমার সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো ! চেয়ে দেখি চিন্ময়দা মুদিত নেত্রে পাথরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে শুনছেন। তাঁর দুটি চোখের কোলে জমেছে দু' ফোঁটা অশ্রুবিন্দু। গান থেমে গেল ! আমি বিস্ময় ভরে জিজ্ঞাসা করলাম : অমন গান কে গাইছে চিন্ময়দা ? তিনি চলতে চলতে জবাব দেন : উনি ছিলেন একজন জন্মসাধক ; পরে বলবো ওঁর কথা !

পাথরের দেওয়াল ছাড়িয়ে খোলা জায়গায় এসে পড়লাম ! আকাশে ঘন মেঘ ! অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তার মাঝে কালো কালো পর্ব্বত-চূড়াগুলো উদ্ধত প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে যেন বলছে : সাবধান কামনা-কলুষিত সংসারী মানব, এখানে তোমাদের প্রবেশাধিকার নেই ! এটা দেবক্ষেত্র, স্বর্গীয় প্রেমের লীলাভূমি !

এলো মেলো ঝড়ো হাওয়ায় ভেসে এলো এক অপূর্ব্ব সুরভি ! বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে অদূরেই দেখতে পেলাম এক অপরূপ রঙের খেলা ! লাল, নীল, হলুদ, গোলাপী রাশি রাশি ফুলের স্তবক একখানি রঙিন গালচের মত বিছানো রয়েছে ! সোৎসাহে চেঁচিয়ে উঠলাম : দেখো দেখো চিন্ময়দা ! চিন্ময়দা হেসে বললেন : ঐ তো আমাদের আশ্রমসংলগ্ন বাগান !

বাগানে প্রবেশ করে যেন হারিয়ে ফেল্লাম নিজেকে ! অমন বৃহদাকার নাম-না-জানা হাজার হাজার ফুল আগে আর কখনও দেখিনি ! এ কোথায় এলাম ? নন্দনকানন নাকি ? বাতাস সেথায় পুষ্পগন্ধে ভারী হয়ে যেন মন্থর গতিতে বইছে ! চিন্ময়দার ডাকে সম্বিত ফিরে পেলাম ! বাগান ছেড়ে প্রবেশ করলাম আশ্রমে। ছোট্ট আশ্রমটির সংলগ্ন একটি মন্দির। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্ত্তি। প্রণাম করে একপাশে দাঁড়ালাম ! বিগ্রহের সামনে উপবিষ্ট কয়েকজন সন্ন্যাসিনী ! ধূপ ধুনো, পুষ্পগন্ধে স্থানটি ভরপুর !

চিন্ময়দা বললেন : মাতাজীকে প্রণাম করো ! মাতাজী ?—হ্যাঁ, চেয়ে দেখলাম একজন বৃদ্ধা সন্ন্যাসিনী যুক্ত করে বিগ্রহের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে বসে আছেন ! কিন্তু তাঁর গাত্রবর্ণ নীল চক্ষু ও মুখাকৃতি দেখে মনে হ'ল ইনি বোধহয় সাগর-পারের মেয়ে ! '

আমি তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলাম ! তিনি আমাকে বসতে বললেন ! চিন্ময়দা আমার পরিচয় জানিয়ে বললেন : ও বড় ফুল ভালোবাসে, আমাদের আশ্রম ও আপনাকে দেখবার ওর ছিলো প্রবল বাসনা, তাই ওকে নিয়ে এলাম মাতাজী ! ও গানও গাইতে পারে !

মাতাজী আমার মাথায় হাত দিয়ে নীরব আশীর্ব্বাদ জানিয়ে হিন্দি ভাষায় আদেশ করলেন একখানি ভজন গাইতে-! তাঁর আদেশ পালন করতেই হ'ল, যদিও মনে মনে ভীষণ রাগ হচ্ছিলো চিন্ময়দার ওপর !

আমার গানের শেষে তিনি তাঁর পার্শ্ববর্ত্তিনী একজন মধ্য-বয়স্কা সন্ন্যাসিনীকে বললেন, : যমুনাবাঈ গোপীবল্লভকে এবারে

তুমি একখানি ভজন শোনাও! অপূর্ব্ব সুন্দরী যমুনাবাঈ! মুখখানি শান্ত কোমল ভাবপূর্ণ! তিনি উঠে গিয়ে নিয়ে এলেন একটি তানপুরা ও একজোড়া খঞ্জনী।

তারপর তানপুরাটি কোলে তুলে নিয়ে মৃদু মৃদু ঘা দিতে দিতে ভজন গাইতে সুরু করলেন।

অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল।
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহয় হিলোল।

কি ভাবোন্মাদনাময় সঙ্গীত সেদিন শুনেছিলাম, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না! সমস্ত মন প্রাণ যেন আমার এক অনাস্বাদিত অমৃতসিক্ত হয়ে উঠলো! মাতাজী খঞ্জনী বাজাচ্ছিলেন, মুখে তাঁর স্বর্গীয় ভগবৎ প্রেমালোক ঝলমল করছিলো।—আর যমুনাবাঈয়ের মুদিত দু আঁখিধারায় রক্তিম গণ্ডদুটি সিক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি তখনও গাইছেন…

শূন ভেল মন্দির শূণ ভেল নগরী,—
শূন ভেল দশদিশ, শূন ভেল সগরী।
কৈসনে যাওব যমুনাতীর
কৈসে নিহারব কুঞ্জ কুটীর।

তন্ময় হয়ে গেছে আমার অন্তর, বাহিরের সমস্ত অনুভূতিকেন্দ্র। কোন্ অতীন্দ্রিয় মহাভাব যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো আমার সমগ্র সত্বাগুলোকে।

ধীরে ধীরে গান থেমে গেলো। ছড়ানো রইলো সুরের রেশ।

মাতাজী প্রসাদি কিছু ফল আমাকে দিয়ে খেতে অনুরোধ করলেন। খেতে খেতে ভালো করে দেখলাম সন্ন্যাসিনীদের! প্রত্যেকের পরনে গেরুয়া লালপাড় বসন, হিন্দুস্থানী ঢং-এ পরা। গলায় তুলসীর মালা, কপালে, কণ্ঠে, বাহুতে গোপীচন্দনের ছাপ। বেলা বাড়ছিলো, মাতাজীকে ও অন্য সন্ন্যাসিনীদের প্রণাম করে বিদায় চাইলাম। মাতাজী মধুর হেসে বললেন: আবার এসো। আনন্দপ্লাত হৃদয়ে এগিয়ে চললাম উপবনের পথ ধরে। মাতাজী সঙ্গে এসেছিলেন, আমাকে বললেন: ফুল তুলে নাও, যত তোমার ইচ্ছা। পরমানন্দভরে গোছা গোছা ফুল ছিঁড়ে নিতে নিতে হঠাৎ বিমনা হয়ে গেলাম…মন্দির থেকে ভেসে আসছে গান…

সখি রে; হমর দুখক নহি ওর।
ঈ ভর বাদর, ঈ মাহ ভাদর,
শূন্ত মন্দির মোর।

আশ্রম-সীমানা ছাড়িয়ে চলেছি। এবার অন্য পথে চলেছেন চিন্ময়দা।

আশ্রমের অনতিদূরেই, একটি পাহাড়ী ঝরণার স্রোত কল-কল ধ্বনি তুলে প্রবাহিত হচ্ছে। তারই ঠিক পাশে একটি ঝোপের আড়ালে একখানি বিরাটকায় কৃষ্ণবর্ণের পাথর। তার আশে পাশে জন্মেছে অসংখ্য অঙ্কিত, তাতে ফুটে আছে নানা বর্ণের কুসুম। চিন্ময়দা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন: ঐটি কৃষ্ণানন্দজীর সমাধি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম: তিনি কে?

যাঁর ভজন শুনতে পেয়েছিলে আসবার সময়? শুনবে তাঁর কথা? তাহলে বোসো এখানে। মহা বিস্ময় নিয়ে বসলাম একটি পাথরের ওপর, চিন্ময়দাও বসলেন আরেকটি পাথরে। তিনি বলে যান—

—প্রায় চল্লিশ বছর আগেকার কথা,—তখন এখানে ছিলো গভীর জঙ্গল! সেই সময় এখানে একটি কুটীর বেঁধে বাস করতেন একজন সাধক মহাপুরুষ, নাম তাঁর স্বামী প্রেমানন্দ! প্রস্ফুটিত পদ্মের গন্ধ কখনও চাপা থাকে না, ক্রমশঃ এখানে ভগবৎ প্রেমপিপাসু জনগণের গতায়াত সুরু হল। এ তল্লাটে সকলেই তাঁর নাম জানতো, শ্রদ্ধা করতো! এই সময় একবার জয়পুরের মহারাজা এসেছিলেন এখানে, তিনি স্বামীজির অলৌকিক ভগবৎ প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ঐ আশ্রমটি তৈরী করিয়ে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে যান! তার কিছু দিন পরে বেড়াতে এসেছিলেন একজন আমেরিকান বিধবা মহিলা, নাম তাঁর রুদ দানিয়েল। সঙ্গে তাঁর পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র ফ্রেডারিক। তিনি লোকমুখে প্রেমানন্দজীর নাম শুনে তাঁকে দর্শন করতে যান! তার পর তাঁর ফিরে যাওয়া আর হলো না, স্বামীজির কাছে দীক্ষা নিয়ে সাধনপথে অগ্রসর হলেন! স্বামীজি তাঁর নাম দিলেন যশোদা-বাঈ, আর পুত্রের নাম কৃষ্ণানন্দ। এ ঘটনার বছরখানেক পরে যশোদাবাঈ এক দিন অতি প্রত্যূষে দেখতে পেলেন, মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি পদ্মফুলের মত শিশুকন্যাকে কে যেন দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করে গেছে! মাতাজী সস্নেহে তাকে বুকে তুলে নিয়ে প্রতিপালন করতে লাগলেন,—নাম রাখলেন যমুনাবাঈ।

কৃষ্ণানন্দ ওরফে কিষণজী আর যমুনাবাঈ ছিলো একবৃন্তে দুটি ফুলের মত!

কয়েক বছর পরে স্বামী প্রেমানন্দ মহানির্ব্বাণ লাভ করলেন।

আশ্রম পরিচালনা করতে লাগলেন মাতাজী। কিষণজীর বয়স যখন উনিশ কুড়ি হবে, তখন আমি এসেছিলাম এ আশ্রমে! অপূর্ব্ব ভজন গাইতো কিষণজী আর যমুনাবাঈ। কত দূর দূরান্তর থেকে লোক আসতো ওদের কৃষ্ণনাম শুনতে। তপ্ত কাঞ্চন গাত্রবর্ণ নীলপদ্মের মত ছুটি চোখ, আর সোনালী কেশগুচ্ছ চুড়ো করে বাঁধা,—কিষণজীকে এই পার্ব্বত্য অরণ্যে দেখলে দেবদূত বলে ভ্রম হতো। সে ছিলো শিশুর মত সরল, পরম ভক্ত, একজন খাঁটি বৈষ্ণব! সংস্কৃত পাঠ ছাড়া অন্য কোনো লেখাপড়া মাতাজী শেখাননি তাঁকে। তিনি বলতেন অসৎ বিদ্যালাভ নিষ্ফল, পণ্ডশ্রম মাত্র। ওরা সাধন ভজন বিদ্যাভ্যাস করুক!

আমি এখানে আসবার বছর তিন চার পরে কলকাতা থেকে এলেন রায়বাহাদুর পান্নালাল মিশ্র, বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্ম। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা অনুরাধা! ওঁরা একদিন এলেন আশ্রমে বেড়াতে! অনুরাধার পরনে ছিলো নীলশাড়ী; গলায় কবরীতে পীতবর্ণ কুসুমের মালা। অপরূপ সুন্দরী মেয়েটি।

পিতার আদেশে সে গাইলো একখানি ভজন, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! তারপর কিষণজী আর যমুনাবাঈ গাইলো কবি বিদ্যাপতির পদাবলী।

ওদের সে অপূর্ব্ব গান শুনে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেল মেয়েটি। তারপর তার প্রতিদিনের কাজ হলো, আশ্রমে ছুটে আসা, আর কিষণজীর কাছে ভজন শেখা! কখনও ঝরণার ধারে, কখনও পর্ব্বতচূড়ায়, কখনও অরণ্য ছায়ায় বসে ওরা দুটিতে গাইতো বৈষ্ণব পদাবলী। কবীরের দোঁহা, বিদ্যাপতির পদাবলী ও মীরার ভজনে যখন মেতে উঠতো ওরা দুজনে, তখন যমুনাবাঈ নিযুক্ত থাকতো আশ্রমের কাজে। কখনও রাশিকৃত ফুল নিয়ে মালা গেঁথে দিতো ঠাকুরের গলায় আর দিয়ে যেত কিষণজী আর অনুরাধাকে। মাঝে মাঝে দেখেছি তানপুরা নিয়ে সে বিগ্রহের সামনে একা বসে গাইছে ভজন. দু'চোখে ঝরে পড়ছে প্রেমাশ্রুধারা।

কিষণজীর জীবনে যেন এসেছে প্রেমের জোয়ার। যতক্ষণ অনুরাধা আশ্রমে না আসতো, ততক্ষণ সে অস্থির ভাবে ঘুরে বেড়াতো এই ঝরণার ধারে।

দূর থেকে অনুরাধাকে দেখতে পেলে ছুটে যেতো তার কাছে! কপালে পরিয়ে দিতো গোপীচন্দনের টিকা. খোঁপায় গুঁজে দিতো বনফুল। তারপর তার উদাত্ত কণ্ঠে জেগে উঠতো সে এক অলৌকিক ভাবময় সুর। সে গানে মুখরিত হয়ে উঠতো এখানকার আকাশ বাতাস, পাহাড়ী দেওয়ালের গায়ে গায়ে বুঝি আজও ঘুরে বেড়ায় তার প্রতিধ্বনি।

শঙ্কিতা হয়ে উঠলেন মাতাজী পুত্রের ভাব-বিপর্য্যয় দেখে। নিভৃতে ডেকে তাকে বললেন: মানবীর মোহপাশে বদ্ধ হয়ে যেন তপঃভ্রষ্ট হোয়োনা বেটা, ক্ষুদ্র প্রেম আনে বন্ধন, আর ভগবৎ প্রেমে মেলে মুক্তি!

আশ্চর্য্য চোখে মায়ের দিকে চেয়ে জবাব দিয়েছিলো কিষণ…

—ও যে মূর্ত্তিমতী শ্রীরাধা মাতাজী! পাষাণ দেবতাকে পূজো করে—ভজন শুনিয়ে আমি যে আর আনন্দ অনুভব করি না,—কিন্তু যখন ওর পাশে বসে কৃষ্ণনাম করি, তখন আমার মন সমস্ত আগল ভেঙে চলে যায়, সে এক অজানা ভাবলোকে, আনন্দময় ভূমিতে। আমার সমস্ত ধমনীতে বইতে থাকে পুলক স্রোত।…সে অবস্থার কথা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না মাতাজী!

পরমবিস্ময়ে শোনেন মাতাজী পুত্রের কথা! হঠাৎ মনে পড়ে তাঁর গুরুমহারাজের বাণী—যার দরশন বা পরশনে তোমার মানস-লোকে—শুদ্ধ প্রেমানন্দ স্ফুরিত হবে,—সে যে কোন আধারই হোক্ না কেন, তারই মাঝে মিল্‌বে তোমার মুক্তির সন্ধান!

পরম স্নেহভরে তিনি পুত্রকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বললেন,—তোমার ভাবের স্রোত—সেই—মহা ভাবসাগরে…নির্ব্বাণ লাভ করুক বেটা!

রায়বাহাদুরের কলকাতায় ফিরে যাবার সময় ঘনিয়ে এলো। একমাত্র কন্যার বিয়ে দিয়েছিলেন রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, যোগ্য পাত্র শঙ্কর পাণ্ডের সঙ্গে!

তারপর তাকে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নিজের খরচায় আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন!

জামাতা ফিরছেন জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে, সেজন্য তাঁকে ফিরে যেতে হবে!

রায়বাহাদুর দম্পতি আশ্রমে বিদায় নিতে এসে মাতাজীকে, আমাদের সকলকে বিশেষ, করে কিষণজীকে কলকাতায় নিজ ভবনে আমন্ত্রণ জানালেন।

অশ্রু ছল ছল নেত্রে ম্লানমুখে বিদায় নিলো অনুরাধা।

সাথীহারার দুঃসহ বেদনা বুকে নিয়ে কিষণজী একা ঘুরে বেড়াতো, এই ঝরনার ধারে, বনে জঙ্গলে! মাঝে মাঝে যখন গাইতো গান, মনে হতো, সে গান নয়, সে ওর মর্মভেদী করুণ বিলাপ।

যমুনাবাঈ ওকে ডেকে নিয়ে যেতো মন্দিরে। নিজে তানপুরায় সুর যোজনা করে বল্‌তো: গোপীবল্লভকে কতদিন ভজন শোনাওনি কিষণ, গাও আমার সঙ্গে! ওর সঙ্গে ভজন আরম্ভ করতো কিষণ, কিন্তু মধ্যপথে থেমে যেতো সুর,—উদাস দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকতো গোপীবল্লভের দিকে।

মাসখানেক পরে চিঠি আসে রায়বাহাদুরের,…বারংবার অনুরোধ করেছেন,—কিষণজীকে ও আমাকে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্যে। পত্রের শেষে অনুরাধাও লিখেছে—কিষণ তুমি আমাকে ভুলে যাওনি তো? অবশ্যই এসো।

কিষণজীর বিমর্ষ মুখে আবার দেখা দিলো হাসির রেখা। বাগান থেকে বাছাই করে ফুল তুলে সে গাঁথলো মালা। আর নিলো গোপীচন্দন, তুলসীর মালা।

মাতাজীর অনুমতি নিয়ে আমরা দুজন কলকাতায় রওনা হলাম।

যথাসময়ে রায়বাহাদুর-ভবনে পৌঁছুলাম আমরা। বিরাট মার্ব্বেলমণ্ডিত প্রাসাদ, বিলাতি কায়দায় সুসজ্জিত। আমরা ওপরে গেলাম। বেয়ারা ড্রয়িং-রুম দেখিয়ে দিয়ে বললো, ঐ ঘরে মেমসাব আছেন, আপনারা যান।

কিষণজী মহা ব্যস্তভাবে রাধা রাধা বলে ডাকতে ডাকতে ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করলো।—কিন্তু কোথায় রাধা? হাসিমুখে যে এগিয়ে এলো আমাদের স্বাগতম্ জানাতে,—তাকে দেখে কিষণজী অস্ফুটস্বরে

কি বলে দু পা পেছিয়ে গেলো।—এ কোন্ রাধা? কোথায় সেই নীলবসন? কই সে গোপীচন্দন তিলক? পুষ্প আভরণ?…সবিস্ময়ে কিষণজী অনুরাধার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

অনুরাধার পরনে ছিলো দামী জর্জেট শাড়ি,—চুলগুলো রোমান্ ষ্টাইলে বাঁধা, গায়ে মূল্যবান অলঙ্কার, হাইহিল জুতো পায়ে।

অনুরাধা কিষণজীর বিমূঢ়ভাব দেখে সহাস্যে এগিয়ে এসে বলে: এ কি কিষণ? আমাকে কি চিনতে পারছো না? এরি মধ্যে ভুলে গেলে? কেমন আছ? মাতাজী, যমুনাবাঈ, আশ্রমের আর সবাকার কুশল তো? কিষণজী কোনো কথারই জবাব দিলো না, তার পরিবর্ত্তে আমি জানালাম সবাকার কুশল। অনুরাধার স্বামী বিলাতি পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে একখানি কৌচে বসেছিলেন। হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। একখানি বিলাতি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। অনুরাধা আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো। আমরা নমস্কার জানালাম, তিনি একখানি হাত তুললেন, মানে প্রতি নমস্কার! রায়বাহাদুর-দম্পতি অবশ্য আমাদের খুবই যত্ন করেছিলেন।

সেদিন রাত্রে আয়োজন হল একটি গানের জলসার। দু'চার জন বড় গাইয়ে এসেছিলেন—তাঁদের গানের পর, রায়বাহাদুরের অনুরোধে কিষণজী ও অনুরাধা সম্মিলিত কণ্ঠে ভজন গাইলো—

সজনী, কে কহ আওব মধাই।
বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নহি পতিয়াই।
এখন তখন করি, দিবস গমাওল,
দিবস, দিবস, করি মাসা।
মাস মাস করি, বরষ গমাওল,
ছোড়লু জীবন আশা।

এমন ভাবোন্মাদনাময় ভজন বুঝি এর আগে কেউ শোনেনি। নিঃশব্দ সভাস্থল। শ্রীমতীর মহাভাব সবাকার প্রাণে এনেছে ব্যাকুলতা, চোখে জল।

এর পরে আর কারুর গান জমলো না। সকলকার একান্ত অনুরোধে কিষণজী আর অনুরাধা আরো দু'খানি ভজন গাইলো।

পরদিন ওদের বাড়িতে ছিলো বড় রকমের একটি পার্টির ব্যবস্থা। জামাই ফিরেছেন কৃতি হয়ে সেই উপলক্ষে।

বাড়ীর সকলেই মহাব্যস্ত। অতিথি আপ্যায়নের নানাবিধ উপকরণে বাড়ী ভরে গেলো। কিষণজীর ভালো লাগছে না, এই কোলাহল। সে বাগানে একটি ঝোপের পাশে গিয়ে বিমর্ষভাবে বসেছিলো। অনুরাধার জন্যে যা এনেছিলো উপহার, তা তাকে দেওয়া হয়নি। ওর সকল উৎসাহ-আনন্দের দীপগুলো যেন নিভে গেছে।

অনুরাধা ওকে বাড়ীর ভেতর দেখতে না পেয়ে বাগানে খুঁজতে যায়, আমিও খুঁজছিলাম ওকে। ঝোপের পাশেই একটি মস্ত চাঁপাগাছ ছিলো, তার কাছাকাছি এগিয়ে গেছি, হঠাৎ পাশেই ওদের দুজনকে বসে থাকতে দেখে, আর অগ্রসর হলাম না।… শুনতে পেলাম,—অনুরাধা বলছে,—তোমার কি হল কিষণ? তুমি কি আমাকে ভুলে গেছ? কিন্তু আমি তো ভুলিনি তোমাকে? তোমার ছবির সামনে বসে রোজ তোমাকে ভজন শোনাই,… তোমাকে ফুল দিই!

কিষণ…ফিরে চায় ওর দিকে! বলে—রাধা! তুমি যেন হারিয়ে গেছ! আমার সেই ভজনের…শ্রীরাধাকে আর কেন খুঁজে পাচ্ছি না তোমার মাঝে! তুমি আবার সেখানে ফিরে চলো রাধা।

—ওঃ! এই কথা? এখানে পাহাড় নেই, ঝরণা, ফুলে-ভরা বন, কিছুই নেই। এই তফাৎ তো? কিন্তু মানুষটা তো আমি সেই আছি। আর নীলশাড়ী পরিনি, ফুলের মালা, গোপীচন্দন, ওসব এখানে তো চলবে না কিষণ, সকলে আমাকে ঠাট্টা করবে যে? আর ঐ যে আমার স্বামী—ও খুব রাগ করবে! দেখছো না একেবারে সাহেব, আর আমাকেও মেম সেজে থাকতে হয়।

ম্লান হাসি হেসে বললো কিষণ: কি অদ্ভুত! আমার মাতাজী ওদেশের মেয়ে, তবে কেন গ্রহণ করলেন এদেশের ধর্ম্ম, আচার নিষ্ঠা? তবে কোন্‌টি সত্য রাধা? আমার যেন সব কেমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তার পর খানিকটা নীরব থেকে অনুরাধার একখানি হাত ধরে ব্যাকুলস্বরে বলে: ওগুলো সবই ভাবরাজ্যের কথা। আমার সেই মহাভাবটি যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। তুমি একবার সেখানে চলো রাধা। সেই ঝরণার ধারে তুমি পরবে নীলশাড়ী। আর আমি চন্দন-ফুলহারে সাজিয়ে দেব তোমায়। তোমার মাঝে আবার ফিরে পাব আমার শ্রীরাধাকে।

—সেই ঝরণার ধারে…আজও ফোটে কত রাশি রাশি ফুল,—মনটা বড় কাঁদে তোমার জন্যে।

অনুরাধার দুটি চোখের কোল ছাপিয়ে টপ-টপ করে ঝরে পড়ে জল,…চোখ মুছতে মুছতে বলে: যাবো কিষণ!…তবে এখন তো হবে না, ওঁর ছুটি হলে পর, ওখানে যাবো বেড়াতে।

পরদিন ফিরে যাবার জন্য কিষণ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উঠলো। ওঁদের বারংবার থাকবার জন্য অনুরোধ সত্ত্বেও আর একদিনও থাকতে চাইলো না। অগত্যা সেইদিনই আমাদের রওনা হতে হল।

এখানে ফিরে আসবার পর কিষণ যেন কি রকম হয়ে গেলো। ঐ মন্দিরের সামনে সারা দিন নিঝুম হয়ে পড়ে থাকতো। কখনও ঐ উপবনে মাটির ওপর গড়াগড়ি দিতো। কখনও বা ফুলগুলোকে জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে কাঁদতো।

কোনোদিন তার পাগোলকরা গানের সুরে বনের তরুলতা পশুপাখী শিউরে উঠতো! মাতাজী বলতেন: এই অবস্থার নাম মহাভাব! কৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার হয়েছিলো ঐ ভাব!—তিনি সর্ব্বদা ভাগবত পাঠ করতেন ওর পাশে বসে, মূর্ত্তিমতী শুদ্ধপ্রেমময়ী যমুনাবাঈ তাঁর সুললিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম গেয়ে সর্ব্বদা ওর বিরহতাপদগ্ধ হৃদয়ে শান্তির জল সিঞ্চন করবার চেষ্টা করতেন। সর্ব্বদা করতেন ওর সেবা, গোপীবল্লভের চরণে পড়ে তার সে কি আকুল কান্নাভরা মিনতি—কিষণজীকে কৃপা কর ঠাকুর।

কিষণজী ক্রমে ক্রমে বড় দুর্ব্বল হয়ে পড়লো। আমরা সহর থেকে বড় ডাক্তার এনে দেখালাম, চিকিৎসা চলতে লাগলো।

সেদিন ঝুলন পূর্ণিমার রাত্রি; চারি ধারে ধবধবে শাদা চাঁদের আলো। মন্দিরে উৎসব চলেছে। কিষণজী ঘুমুচ্ছিলো বড় শান্ত

ভাবে। মাতাজী বাতাস করছিলেন ওর পাশে বসে। হঠাৎ ধর-মড়িয়ে ও উঠে বসে দু'হাতে মাতাজীর গলা জড়িয়ে ধরে বললো— মাতাজী ঐ যে এসেছেন আমার গোপীবল্লভ! কিন্তু বাঁশী তো নেই ওঁর হাতে! ঐ যে বাঁশী বাজাচ্ছেন আমার শ্রীরাধা! বাঁশীর সুরে বাজছে আমার নাম!—মাতাজীর বুকের ওপর ঢলে পড়লেন কিষণজী!

মাতাজী ওর কানে শোনালেন মহামন্ত্র পরব্রহ্ম নাম। যমুনা-বাঈকে শান্তকণ্ঠে বললেন: কিষণ চলে যাচ্ছে, ওকে কৃষ্ণনাম শোনাও। গুরুবাক্য পালন করতেই হবে তাকে। যমুনাবাঈ গাইলে কিষণজীর বড় প্রিয় ভজনখানি—

মাধব, বহুত মিনতি করো তোয়।
দেই তুলসী তিল, এ দেহ সোঁপিল,
দয়া জনু ছোড়বি মোয়।
গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুঁহু করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহ মোঞে ছার।

দুচোখে তার ঝরে পড়তে লাগলো শ্রাবণের ধারা। ওর পরম-প্রিয় আবাল্য-সাথীকে শোনালো চির বিদায় সঙ্গীত।

তার পর এইখানে কিষণজীর শেষ বিশ্রামের স্থান নির্ব্বাচন করলেন মাতাজী।

সাধককণ্ঠের সেই অপূর্ব্ব সঙ্গীত-লহরী এখনও মাঝে মাঝে শোনা যায়। মাতাজী বলেন, সে এখানে গভীর প্রেমে আত্মহারা অবস্থায় যে গানের ভেতর দিয়ে ইষ্টচরণে আত্মনিবেদন করেছিলো, সে গান শাশ্বত অবিনশ্বর বাণীরূপে, এখানে ধ্বনিত হবে অনন্তকাল ধরে। তার বিনাশ নেই।

চিন্ময়দা নীরব হলেন। মনটা যেন কোন্ অভূতপূর্ব্ব পুলক ও বেদনায় আলোড়িত হয়ে উঠেছিলো। চোখের জল মুছে জিজ্ঞাসা করলাম: অনুরাধা কি পেয়েছিলো কিষণজীর মৃত্যুসংবাদ?

: হ্যাঁ আমি এ ঘটনার কয়েক মাস পরে কার্য্যোপলক্ষে কলকাতায় গিয়েছিলাম,—তখন জানিয়েছিলাম তাকে।

সে দু'হাতে মুখ ঢেকে আর্ত্তস্বরে বলেছিলো,—না স্বামিজী! সে কোথাও যায়নি! সে আছে আমার অন্তরের অন্তঃস্থলে! আমি যখন ভজন গাই, তখন আমি স্পষ্ট শুনতে পাই; সে গাইছে আমার সঙ্গে। আমার সুরে আসে তারই ভাবের জোয়ার! তখন সারা বিশ্ব মুছে যায় আমার চোখের সামনে! শুধু মানসলোকে ভেসে ওঠে তার সেই মোহন রূপখানি।

সূর্য্যদেব তখন ধীরে ধীরে নেমে যাচ্ছেন অস্তাচলে! মেঘাবরণ ছিন্ন করে রক্তিম আলোকধারা ছড়িয়ে পড়েছে সমাধির ওপর, ঝরণার জলে! হিমেল বাতাস পুষ্পগন্ধে ভরপুর!···হঠাৎ মনে হল, কোথায় এসেছি? এ বুঝি মর্ত্তভূমি নয়! কোনো গন্ধর্বলোকের মায়া-কানন!

গভীর ভাবোদ্বেলিত হৃদয় নিয়ে যখন ফিরে চলেছি, তখন মনে হলো! কোন অদৃশ্য লোক থেকে যেন ভেসে আসছে সেই মহা সঙ্গীতধ্বনি! মানসকেন্দ্রের প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে ধ্বনিত হচ্ছিলো, সেই উদাত্ত কণ্ঠের পদাবলী—

কত চতুরানন, মরি মরি যাও ত,
ন তুয়া আদি অবসানা!
তোহে জনমি' পুন, তোহে সমাওত,
সাগর লহরী সমানা।

সাবিত্রী

শ্রীসুতপাপুরী দেবী

অয়ি সাবিত্রী, হে প্রাণদাত্রী দুঃখব্রতা সতী,
প্রেম অলকার হে প্রাণশিখা দীপ্ত জ্যোতিষ্মতী।
প্রাণনিস্যন্দা অলকানন্দা জীবনের পরপারে,
মৃত্যু-বিজয়িনী শুভ্র সীমন্তিনী মরণের কারাগারে।
ঝটিকা ক্ষুব্ধ চির নিস্তব্ধ মন্থর যবে শ্বাস—
হে অচঞ্চলা অলদঞ্চলা, স্থির তব বিশ্বাস।
বসে আছ সতী, ধ্যানের মূরতি মৃতপতি লয়ে ক্রোড়ে,
একী তপস্যা, হে চির নমস্যা, ছিঁড়িতে মৃত্যু ডোরে!
মহা অরণ্য—যেন নগণ্য, ঐ চরণে ধন্য করি
চলেছে সুস্মিতা, অয়ি শুচিস্মিতা, মৃত্যুরে অনুসরি।
চরণে নেমেছে চলার ছন্দ স্বচ্ছন্দ গতি-বেগ!
হে চিরযাত্রী জীবন-দাত্রী, দিবস রাত্রি করেছ এক।
কোথা বৈতরণী, কোথা বা তরণী চলেছ তরুণী অয়ি!
কার ছায়াহীন কায়া অনুসরি, হে চির বৈভবময়ী?

অতি দুরন্ত মহা কৃতান্ত মহাকাল তব দ্বারে,
হানিল আঘাত করি করাঘাত প্রচণ্ড একেবারে।
দুখবিমিশ্র ঘন তমিস্র কত অজস্র বাধা ঠেলে,
কৃতান্তের সাথে কোন জয়রথে বিজয়িনী, ফিরে এলে?
করিলে মিতালি প্রীতি, দীপ জ্বালি সপ্ত পদ চলি পথে,
নিলে উপহার প্রিয় দেবতার প্রাণ বিনিময় সাথে।
তব 'সত্যবান' হ'ল প্রাণবান শত কুমারের পিতা;
অনুষ্ঠ প্রমাণ অতটুকু প্রাণ ফিরালে মৃত্যু জিতা!
তব বিশ্বাস আনিল নিঃশ্বাস শ্বাস প্রশ্বাসহীনে;
মৃত্যুঞ্জয়ী প্রেম সমুজ্জ্বল হেম সুস্নিগ্ধ ক্ষেম মেঘ দুর্দ্দিনে।
হে চির সাধ্বী, ব্যাকুল আর্ত্তি রিক্ত অন্তর হাহাকার,
দিয়ে আশীর্ব্বাদ তোমার প্রসাদ শোন দেবী একবার।
ওগো চিরন্তনী, সতী শিরোমণি, সকল সাধনা অয়ি,
জপি তব নাম করিগো প্রণাম হে মহা মহিমময়ী!

ভরি অঞ্জলি মাগি পদধূলি, কৃপার প্রসাদ লাগি,
তোমার সাধনা ভারতের গৃহে রহে যেন চির জাগি।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

আর অসুবিধা নেই, হৃষীকেশ লিফটে নিয়ে তুলল। বিমল রায় স্নানঘরে। সলিল চৌধুরী একটা ক্যামেরা নিয়ে গভীর মনোযোগে কল-কব্জা পরখ করছে। সিনেমা-দলের সবাইকে ওরা একটা করে ভাল ক্যামেরা দিয়েছে। কোন বিদ্যা ছাড়াছাড়ি নেই সলিলের কাছে। গান গায়, বাজনা বাজায়, সুর দেয়, গান লেখে; আবার দু-বিঘা জমির গল্প ও সংলাপ লিখেছে। এবার বুঝি ক্যামেরা নিয়ে পড়ল, ওটুকু আর বাকি থাকবে কেন?

হঠাৎ দেশের মানুষ দেখে হৈ-চৈ করে ওঠে। আজকের দিনটা ওদের থেকে যেতে হল, কাল সন্ধ্যায় বিদায় নিয়ে যাচ্ছে। সুরকার অনিল বিশ্বাসও আছেন, খুব জানাশোনা তাঁর সঙ্গে—আমার গল্পের এক ছবিতে সেই সময়টা সুর দিচ্ছিলেন। সকলে যাবে, অনিল বিশ্বাস থেকে যাচ্ছেন আপাতত। রাশিয়ার গান-বাজনায় তাঁকে পেয়ে বসেছে, এ বস্তু খানিকটা রপ্ত না করে নড়বেন না। আর থাকবেন খাজা আহমেদ আব্বাস, সিনেমা-দলের নেতা হয়ে তিনি এসেছেন।

সাজসজ্জা সমাপন করে বিমল রায় এসে পড়লেন হেনকালে। অনেক দিনের বন্ধু—তখন এত বড় হন নি। গুণপনা বলতে গেলে খোশামুদির মতো শোনাবে—আপনারা চোখ টেপাটেপি করবেন। এ সব মানুষকে ভাল বলতে গেলেও বিপদ আছে। অতএব থাক পুরানো কথা। কিন্তু মস্কোয় এসে একটা খবর শুনলাম—যতগুলো বক্তৃতা করেছেন, সমস্ত বাংলায়। আমার মাতৃভাষায় বলব আমি, বিদেশের যে-কেউ আসে তারা মাতৃভাষায় বলে—লালামুক্ত ভাঙা ইংরেজিতে নয়। দোভাষি জোটাতে পারো ভালই, নয়তো কিছুই বলব না, মুখ বুজে চুপ করে থাকব। সোবিয়েত দেশে বাংলা দোভাষি পাওয়া দায়, দিনকে-দিন কমে আসছে, হিন্দি-উর্দুর উপর জোর দিচ্ছে। সবুর সবুর—এসব পরে শোনাব; সমস্ত শুনবেন—এমন কোন দাদা নেই যে মুখ চেয়ে চেপেচুপে বলতে হবে। মোটের উপর বিমল রায়ের জন্যে ওঁরা সর্বক্ষণের বাংলা দোভাষি মোতায়েন রেখেছেন; বিদেশে তিনি মাতৃভাষার ইজ্জত ক্ষুণ্ণ হতে দেন নি।

ডিরেক্টর রায়কে কাছে পেয়ে সকাতরে দরবার জানাই। আজ্ঞে না, গল্প গছানোর দরবার নয়—বললাম, কলম ছোঁব না আর, ঘেন্না হয়ে গেছে সিনেমার ছবিতে। পার্ট দিতে হবে আমায়। সবাই যে কন্দর্পকান্তি নায়ক হবে তার মানে নেই—দূত, গ্রাম্য পথিক, মৃত চাষী, এসবেও মানুষ লাগে তো আপনাদের—

বিমল রায় বলেন, হল কি বলুন তো?

সবিস্তারে বললাম তাসখন্দের সেই কাহিনী। জনারণ্য দেখে বড় খুশ হয়েছিল—ভারত থেকে তা-বড় তা-বড় সাংস্কৃতিক দিকপাল এসেছেন, তাঁদেরই গুণগ্রাহী ভক্তদল বুঝি! ও হরি, খুঁজে বেড়াচ্ছে নার্গিসকে। অতএব গল্পলেখক রূপে পর্দার বহির্দেশে আর নয়, পর্দার উপরিভাগে একটুখানি ঠাঁই দিন।

এমন আক্ষেপোক্তি—কিন্তু বিমল রায় বিশেষ যে আমল দিলেন, মনে হল না। বললেন, ফিরবার পথে বম্বে হয়ে যাবেন। আমার বাড়িতে থাকবেন, সেই সময় বিচার-বিবেচনা হবে।

বটেই তো! ফিরবার সময় কাবুলের পথে নামব দিল্লিতে। সেখানে থেকে ট্রেনে কলকাতা। বম্বে অতএব পথের উপরেই যখন পড়ছে, সেখানে নেমে পড়তে অসুবিধা কিসের?

হৃষীকেশ গল্প করছে, তাসখন্দের ব্যাপার ঐ তো দেখলেন—আর কোন্ শহরের হোটেলে তাদের একেবারে আটক করে ফেলেছিল। গেটের মুখে হাজার মানুষ—ঐ ভিড় ঠেলে বেরিয়ে পড়বে হেন বীরপুরুষ কে? সিনেমা-হাউসেও এমনি কাণ্ড চলছে। অফুরন্ত কিউ সর্বক্ষণ। ছবি দেখানো একবার সারা হল তো নতুন লোক ঢুকিয়ে আবার তক্ষুণি দেখানো শুরু হয়ে গেল। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টাই চলছে। কিউয়ের মাথা থেকে খানিকটা হলে ঢুকে গেল, লেজের অংশ পড়ে রইল। তার পিছনে ক্রমাগত নতুন লোক এসে এসে জুড়ে যাচ্ছে। ভারতীয় ছবির এমন চাহিদা। লোকে যেন ক্ষেপে গেছে। একমাস চলবার কথা, সে ছবি একাদিক্রমে ছ-মাস চালিয়েও তুলে দেওয়া মুশকিল হবে। সব প্রোগ্রাম উলটপালট হয়ে যাচ্ছে। টেলিভিসনে রাতের পর রাত ভারতীয় ছবি—নইলে মানুষ ছাড়ে না। তিন দিন ধরে গোটা সিনেমা-দল এঁরা বন্দী হয়ে রইলেন হোটেলের ভিতর। একটা জায়গায় এমন ধারা পড়ে থাকলে চলে কেমন করে? অবশেষে অনেক মারপ্যাঁচ করে পিছন-দরজা দিয়ে উদ্ধার করা হল।

গল্পেরও সময় নেই, মীটিং আছে কোথায়, এখুনি বেরুবেন। বিমল রায় বলেন, নিচে চলুন খাবার ঘরে। সকলের সঙ্গে দেখা হবে, চলুন।

এসেছেন তো বিস্তর। রাজ কাপুর, নার্গিস, নিরূপা রায়, দেব আনন্দ, বলরাজ সাহানী, রাধু কর্মকার—আরও সব আছেন, সঠিক মনে করতে পারছিনে। ওঁরা হাত তুললেন, আমিও পালটা হাত তুলে নমস্কারের দায় সেরে সোজা চলে আসি আব্বাসের কাছে। আলাপ ছিল না, কিন্তু ও মানুষের সঙ্গে আলাপ জমাতে দেড় সেকেণ্ডও লাগে না। যতই হোক, স্বজাতি আমার। সিনেমা নিয়ে অধিক মাত্রায় পড়েছেন বটে, তা হলে লেখার অভ্যাস ছেড়ে দেন নি। লেখক মানুষ হাজির থাকতে অন্য কাউকে মনে ধরবে কেন?

আব্বাসও ভারি বিপন্ন। অনেক রুবল জমে গেছে। তাই বলছেন, বিষম বড়লোক হয়ে গেছি এখানে এসে। পুরানো লেখার দরুন পাচ্ছি, নতুন লিখে আর রেডিওয় বলেও রোজগার করছি।

রুবল দেশে নিয়ে যাওয়া যাবে না, নিয়ে লাভও নেই, এখানে খরচ করে যেতে হবে। রুবলের দরকার থাকে তো বলুন, দিয়ে কিছু ভারমুক্ত হই।

বিপদটা শুরু হল, যেদিন মস্কোয় পা দিয়েছেন ঠিক তার পরের দিন থেকে। রাত্রিবেলা পৌঁচেছেন, সকালের কাগজে নাম-ধাম সহ খবর বেরিয়েছে। অনতিপরেই টেলিফোন এলো, হ্যাঁ মশায়, আপনিই কি লেখক আব্বাস?

আজ্ঞে হ্যাঁ, লেখাটেখার অভ্যাস আছে বটে!

অমুক নামের একটা গল্প আপনিই তো লিখেছিলেন?

না—

এমনও হতে পারে অনুবাদের সময় গল্পের নাম পালটানো হয়েছে। গল্পের ঘটনা হল এই—

ফোনের মুখেই গল্পের মোটামুটি কাঠামোটা বলে গেল। আব্বাস বললেন, হ্যাঁ, লেখাটা আমারই—

বিকেলবেলা এই ধরুন চারটে থেকে সাড়ে-চারটে অনুগ্রহ করে আপনি হোটেলে থাকবেন।

যথাসময়ে তারা এসে ন'শ রুবল অর্থাৎ হাজার খানেক টাকা দিল। বছর তিন-চার আগে গল্পটার রুশ অনুবাদ একটা কাগজে বেরিয়েছিল; আব্বাসের হিসাবে দক্ষিণাটা লেখা ছিল। ঋণের বোঝা টানছিল এত দিন, অবশেষে শোধ করে দিয়ে বাঁচল।

তা দক্ষিণার কথাই উঠল, তবে শুনুন। ঐ সামান্ত সময়ে অত ছুটোছুটির ফাঁকে ফাঁকে অধমও কিঞ্চিৎ রোজগার করেছে—সাত-আট শ'র মতো দাঁড়াবে। কিছু লেখা ছেড়ে এসেছিলাম,—সেগুলো ছাপা হচ্ছে এখন, দক্ষিণা জমছে। আবার যদি কখনো যাই, স্বদেশের মতন ফাঁকা পকেটে ঘুরব না সুনিশ্চিত জানবেন। ঐ যে বললাম—বিষম রুজি-রোজগার ওদেশে লেখকের। আব্বাসের সঙ্গে পরে অনেকবার দেখা হয়েছে। সিনেমা-দল কবে চলে গেছে, তার পরেও জমিয়ে বসে আছেন। সে যে কী খাতির, বর্ণনা পড়ে প্রত্যয় হবে না। হোটেলের সব চেয়ে ভাল ঘর দিয়েছে তাঁকে, বিরাট মোটরগাড়ি। সেকালের জার-জারিনার কথা শুনেছি, প্রায় সেই মেজাজে সর্বত্র টহল দিয়ে বেড়ান। ভারি ওজনের একটা বই লিখছেন—ওখান থেকে ছাপা হবে বলে।

একদিন দুঃখ করলেন, কত ভাষায় বই ছাপা হল। আপনাদের বাংলা ভাষায় আমার কোন বই নেই।

কেন থাকবে না? একটা বই অন্তত জানি—এডিশানও হয়েছে বইটার।

আব্বাস অবাক হলেন, বলেন কি?

আপনি জানেন না?

জানাতে যাবে কোন্ বোকারাম! কিঞ্চিৎ ভাগ চেয়ে বসি যদি? দুনিয়ার কত দেশই তো দেখলাম। কিন্তু তেড়ে ধরে লেখার দক্ষিণা দিয়ে যায়, এই সোবিয়েত দেশের মতন আর দেখিনি।

ভারতীয় দুটো ছবি চলছে—আওয়ারা এবং দো-বিঘা-জমিন। এ দেশে যা দেখেছেন তাইই—খানিকটা সংক্ষেপ করে নিয়েছে শুধু। এবং পাত্র-পাত্রীর মুখ থেকে হিন্দি ছেঁটে ফেলে রুশভাষা বসিয়েছে। ভারি কায়দায় পালটেছে কিন্তু—গানের সুর হিন্দিতে যা শোনেন অবিকল তাই; গানের কথাও এমন বেছে নিয়েছে, দূর থেকে ভাববেন হিন্দি গানই শুনছি। সেই ভুলই করেছিলাম আমরা কাস্পিয়ান সাগর-কূলে বাকু শহরে। উঁহু, আজকে নয়—আর একদিন সে গল্প। আমাদের দোভাষি ইরা—সুন্দরী তরুণী, ভারি চালাক, পড়াশুনোও আছে—তাকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ ছবিটা ভাল দুয়ের মধ্যে?

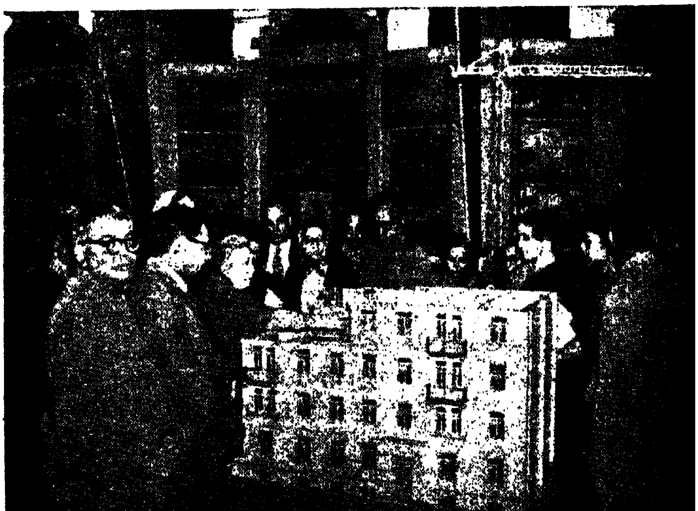
ইরা জবাব দেয়, দো-বিঘা-জমিন এক আশ্চর্য সৃষ্টি, গৌরব করবারই মতো, কিন্তু—

ঢোক গিলে বলে, কিন্তু আমার কথা যদি কথো, আওয়ারাই বেশি পছন্দ আমার। চার বার দেখেছি—দেখবার মনন আছে।

কেন, হেতুটা কি?

উদ্দাম বেপরোয়া যৌবনের ছবি—

এমনি সর্বত্র। কাগজে দো-বিঘা-জমিন নিয়ে হৈ-হৈ করছে,



বিল্ডিং-একজিবিসন, মস্কো—টুকরো টুকরো অংশ জুড়ে পাঁচতলা মডেল-বাড়ি বানানো। আসল বাড়িও এমনি টুকরো জুড়ে বানায়।

এমনটি আর হয় না। আর মানুষ উন্মাদ আওয়ারার নামে। ঠিক যেমনটা এদেশে দেখেছিলেন। আওয়ারার শতেক নিন্দা করে চুপি-চুপি টিকিট কেটে ঢুকছে আবার সেই ছবিই দেখতে। হীরেন মুখুজ্জে মশায় রুচিবান বিদগ্ধ ব্যক্তি,—তাঁর পরিচয় আপনাদের কি দেবো ? সদুঃখে তিনি বললেন, এত বড় প্রগতিশীল দেশেও এই ?

আমি বললাম, গোটা দুনিয়া জুড়ে মানুষের মনের গড়ন মোটামুটি একই—এখানে এসে সেইটে আর একবার প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু আরও কিছু ছিল, এখন বুঝতে পারছি। চীনেও গিয়েছে ঐ ছবি দুটো, সেখানেও হুল্লোড়। বীরেন্দ্রনাথ সরকার মশায় চীনের দলে ছিলেন, তাঁর কাছে সেখানকার গতিক জিজ্ঞাসা করলাম। চীনের মাতামাতিটা দো-বিঘা-জমিন নিয়েই বেশি, আওয়ারা তেমন নয়। এবারে মালুম হল। ভূমি-সংস্কার চীনে অল্প দিন হয়েছে, সমস্যাগুলো টাটকা রয়েছে মানুষের মনে। দো-বিঘা-জমিনের মধ্যে ওরা নিজেদের ব্যাপারই খানিকটা দেখতে পায়। কিন্তু সোবিয়েতের ভূমি-সমস্যা চুকেবুকে গেছে তিরিশ বছরের উপর। আজকের ছেলেমেয়েরা সিনেমা দেখছে, নতুন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে তারা মানুষ। দো-বিঘা-জমিনের আবেদন বুঝতে পারে না, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়, কোন পুরানো কালের ইতিহাস—মনের উপর না ... আঁচড় কাটে না।

... দের থিয়েটারে বিস্তর পালা দেখেছি, সিনেমার ছবিও দেখেছি ... কিছু। শিশুদের একটা পালায় যৎকিঞ্চিৎ নীতিবাক্য—ঐটে বাদে বাকি অন্তগুলোর ভিতরে মহদাদর্শ তিল পরিমাণ হাতড়ে পাবেন না। মিষ্টিমধুর রোমান্স, রাজরাজড়ার কাহিনী,—যাদের ওরা অনেক দিন উৎখাত করে দিয়েছে। অথবা পরী-দৈত্য-দানবের রূপকথা। ঐ রকম নাটক আমি লিখলে প্রগতিবিহীন বলে এ দেশের লেখক-সমাজে অচিরে আমার হুঁকোনাপিত বন্ধ হবে। ব্যাপার বুঝতে পারছেন ? আমাদের যা-কিছু বৃহৎ সমস্যা, অনেক দিন আগে ওরা তার নিরসন করে ফেলেছে। দু-দশটি প্রাচীন মানুষ ছাড়া হাল আমলের কেউ সে সব বুঝতে পারে না। অভিনব দেশের ভাগ্যবান নরনারী—আমাদের দুঃখ-বেদনা অবাস্তর ও অবাস্তব তাদের কাছে। ভাবনাহীন চিত্তে তারা নেচে-কুঁদে হুল্লোড় করে বেড়ায়।

সোবিয়েতস্কায়া থেকে ফিরে এসে দেখি, সেজেগুজে সকলে তৈরি। বিল্ডিং-একজিবিসনে যাওয়া হচ্ছে।

মস্কো শহরে খুশি মতন বাড়ি সরায়, পুবমুখো বাড়ি ঘুরিয়ে উত্তরমুখো করে দেয়। আবার মতলব হল তো ময়দানব লাগিয়ে রাতারাতি আকাশ-ছোঁয়া ইমারত তুলে ফেলল। চারতলা এক বাড়ি, তাতে আটচল্লিশটা ফ্লাট, ফ্লাটে চারটে করে ঘর—এমনি বাড়ি হয়ে যাচ্ছে এক মাসের মধ্যে—ময়দানবের কাণ্ড ছাড়া কি বলবেন তাকে ? বাড়ি তোলা কিছুই নয়, অতি সহজ ব্যাপার। জায়গা পছন্দ করে ভিত খুঁড়ে ফেলুন ; রেলের পাটি বসিয়ে দিন ভিতের গর্তের চারিদিকে। পাটির উপরে ক্রেন এনে ফেলুন একটা কি দুটো—বাড়ির আয়তন বুঝে। ক্রেন অতি-অবশ্য চাই। আলাদা ধরণের ক্রেন—পাটির উপর ঘুরে ঘুরে কাজ করে। ক্রেনের বন্দোবস্ত হল তো এবারে যেতে হবে একবার ফ্যাক্টরিতে। নক্সার মাপ মিলিয়ে বাছাই করে ফ্যাক্টরি থেকে দেয়াল কিনুন, ছাত কিনুন, ভিতে বসাবার জন্য কংক্রিটের চাই কিনুন।—মালপত্র কিনে গাড়ি বোঝাই করে এনে ফেলুন ভিতের জায়গায়। আর হাঙ্গামা নেই—যা করবার, ক্রেনই এখন করছে। কংক্রিটের চাই বসিয়ে ভিতের গর্ত ভরাট করে দিল ; দেয়ালগুলো যেখানকার যেটা খাড়া করে বসাল ; দেয়ালের খাঁজে ছাত লাগিয়ে দিল। দেয়ালে ছাতে ভিতের কংক্রিটে জোড়ের মুখে মুখে আংটা বেরিয়ে আছে—ঐ সব আংটায় ইস্ক্রুপ বসিয়ে আচ্ছা করে এঁটে দিন এবার। পলস্তারা করে ঢেকে দিন জোড়ের মুখগুলো। পছন্দমতো রং করে নিন। ব্যস, হয়ে গেল বাড়ি। দুটো তলার দেয়াল একেবারে একসঙ্গে তৈরি হচ্ছে ফ্যাক্টরিতে। দেয়ালের মাঝে মাঝে দরজা জানলা বসানো। জলের পাইপ ও বিদ্যুতের তার গিয়েছে দেয়ালের ভিতর দিয়ে। মোটামুটি অলঙ্করণও হয়ে আছে। নিখুঁত পরিমাপে সমস্ত বানানো—জায়গায় নিয়ে গিয়ে শুধুমাত্র থাপে থাপে বসিয়ে জুড়ে দেবার ব্যাপার। সাউণ্ড-প্রুফ করবার ব্যবস্থা রয়েছে—ছাতের উপরে কিম্বা দেয়ালের বাইরে শুম্ভ-নিশুম্ভর লড়াই বেধে যাক না, ঘরে শুয়ে নিরুপদ্রবে পা দোলানোর ব্যাঘাত ঘটবে না। মস্কোর এপাড়া-ওপাড়া সর্বত্র বাড়ি বানাচ্ছে। পাশ দিয়ে যেতে যেতে কত দিন দেখেছি, অশ্রান্ত উদ্যমে ক্রেন কাজ করে যাচ্ছে। বাড়ির কাজে ক্রেন এত খাটায় কেন, মনে ভারি কৌতূহল ছিল। বিল্ডিং-একজিবিসনে এসে পদ্ধতিটা এবার মাথায় ঢুকল।

বারো মেসে একজিবিশন, নিজস্ব ঘরবাড়ি। এ-ঘরে ও-ঘরে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে, কম সময়ে কম খরচে মজবুত বাড়ি বানানোর কত কি পদ্ধতি আছে। প্রিফ্যাব্রিকেটেড পদ্ধতিতে পাইকারি হারে অংশগুলো তৈরি হচ্ছে, প্রত্যেক বাড়ির ব্যাপারে আলাদা আলাদা বানাবার গরজ নেই। এ যেন হল, রান্নাঘরে তালাচাবি এঁটে হোটেলের রান্না কিনে এনে খাওয়া। খরচ কম, হাঙ্গামাও বাঁচে। তা ও প্রশ্ন তুলেছিলাম, একঘেয়ে হয়ে যাবে মশাই, বাড়িতে বাড়িতে বৈচিত্র্য থাকবে না যে ! কেন থাকবে না ? নানান মাপের দেয়াল, নানান মাপের ছাত—মাথা খাটিয়ে নক্সা বানিয়ে ঐ সবের রদবদল ও রকমফের করে সাজান, কারুকর্ম ও সাজগোজ আলাদা করুন—দেখবেন ইমারতের একেবারে নতুন চেহারা।

শুধু আমরাই নই, ঘুরে ঘুরে কত লোকে দেখছে। বাড়ি বানানো নিয়েও এত আগ্রহ, অথচ শহরের উপর এক কাঠার একটি বাড়িও কারও নিজস্ব নয় ! একজিবিশনের লোকগুলো পণ করে লেগেছে, আনাড়িদের এক লহমায় স্থাপত্য বিদ্যায় পণ্ডিত করে তুলবে। গলা ফাটিয়ে বোঝাচ্ছে। তা দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে খানিকটা পণ্ডিত হয়ে উঠলাম বই কি ! সাত-আট তলা অবধি এই প্রিফ্যাব্রিকেটেড পদ্ধতিতে বানানো চলে, তার উপরে হলে ভিন্ন রীতি। এমনি সাত-আট তলা শেষ করতে লাগবে বড় জোর ছ' মাস। কারখানার বাতিল যে সব ধাতু, তাই দেদার লাগাচ্ছে কংক্রিটের কাজে। আচ্ছা, দোতলা অবধি তো এক দেয়ালে চালাচ্ছ—মেরামতের সময় কি হবে ? দুটো তলাই তো ভেঙে ফেলতে হবে তখন ? কোন বাড়ি আজ অবধি মেরামতের দরকার হয়নি। কত দিনে

হবে, তার ঠিকঠিকানা নেই। তখন ভাবনা করা যাবে। সে দিনের অনেক—অনেক বাকি।

ঘরে ঘরে মডেল সাজিয়ে রেখেছে! দেখাচ্ছে যত্ন করে। বাড়ির কোন অংশের জন্য দেশের বাইরে যেতে হয় না। ককেশাস ও উরাল পর্বত থেকে মার্বেল আর রকমারি পাথর আসছে। কাচের উপরেই বা কত রকম নক্সা! মস্কো শহরটা কেমন হয়ে দাঁড়াবে, বৃহৎ প্লান রয়েছে তার। প্লান মাফিক তড়িঘড়ি কাজ চলছে। শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা বিশেষভাবে বাড়ানো হচ্ছে। সে দিকটায় ফ্যাক্টরি নেই—পাহাড়। বাতাস অতএব নির্মল। নতুন য়্যুনিভার্সিটি-বাড়িও ঐ অঞ্চলে। মস্কো এত বড় হয়ে পড়ছে, জল-সরবরাহের সমস্যা দেখা দিতে পারে। সোজা খাল কেটে তাই মস্কোবার সঙ্গে ভল মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। জলের প্রাচুর্য হল, নির্মলতা বাড়ল; ব্যাপার-বাণিজ্যের আরও সুবিধা হয়ে গেল। এক ঢিলে তিন পাখী। মেট্রো তো দেখলেন সেদিন—তার আরও দুটো লাইন পড়ছে। একটা ঐ য়্যুনিভার্সিটির নতুন অঞ্চলে, আর একটা এগ্রিকালচারাল একজিবিসনের দিকে। আট শ' বছর আগে রাজপুত্র য়্যুরি ডোলগোরুকি ওকগাছের গুঁড়ির দেয়াল বানিয়ে মস্কো শহর বানিয়েছিলেন, বছরের পর বছর শহর কী অপরূপ হয়ে উঠছে দেখুন! বিপ্লবের ঠিক আগেও শহরের পনের আনা জুড়ে ছিল একতলা-দোতলা কাঠের বাড়ি। কমতে কমতে এখন সেগুলো গণনার মধ্যে এসে গেছে। নতুন এক বড় রাস্তা হচ্ছে য়্যুনিভার্সিটি থেকে ক্রেমলিন অবধি; দু-পাশের দুটো পুলে নদী পার হবে—মাঝখানে ঠিক কূলের উপরে ষ্টেডিয়াম!

কত ভাবছে বাড়ি তৈরির কায়দাকানুন নিয়ে, কত খাটছে! তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। লড়াইয়ে শহরকে শহর তছনছ করেছে, তাড়াতাড়ি বাড়ি বানিয়ে মানুষের জায়গা দিতে হবে। কত কম খরচে ও কত কম সময়ে মজবুত ইমারত বানানো যায়—বাস্তুকারের দল একেবারে ক্ষেপে উঠেছেন। ভিতের তলার জল বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাতালের দিকে চালান করে মাটি পাথরের মতো জমিয়ে তুলছে—তারই উপর ইমারত। আমেরিকায় আকাশ-ছোঁয়া বাড়ি তুলেছে, জোর হাওয়ায় সে-সব বাড়ির মাথা কাঁপে; তিরিশ-বত্রিশ তলায় যারা থাকে, ভয়ে বুক কাঁপে তাদের। কিন্তু মস্কোর আকাশ-ছোঁয়া বাড়িগুলোর ঝাঁকুনি, অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রেও, নগণ্য পরিমাণ ধরা যায়।

অভাবিত ভাগ্য। হঠাৎ দেখতে পেলাম পলিতকেশ দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি—মাথার সামনে টাক, গলায় ক্রশ ঝুলানো—কি রকম চোখে তাকাচ্ছেন আমার দিকে। হাত বাড়াতে যাচ্ছেন—একটু তবু দ্বিধাগ্রস্ত। চিনতে পেরেছি, ছবি দেখেছি ওঁর বইয়ে—হিউয়েট জনসন, ডীন অব কান্টারবেরি। সোবিয়েত ও চীন ঘুরে ঘুরে তার উপরে বই লিখেছেন—ধর্মজ্ঞ পাদরি মশায়ের কাণ্ড দেখুন, কম্যুনিষ্ট দেশকে বাপান্ত না করে হরদম প্রশংসা করেছেন। বুড়া মানুষটির নাম হয়ে গেছে তাই লাল-ডীন। সকালে যখন সোবিয়েত-আবাসে গিয়েছিলাম, হৃষীকেশ বলেছিল আমায় বটে, লাল-ডীন মশায় মস্কোয় আছেন—এই হোটেলেই। অতএব সন্দেহ কি বা? ঝাঁপিয়ে পড়ে সেকহাণ্ড করলাম: ভারত থেকে আসছি আমি। উনিও সেই আন্দাজ করেছেন, আলাপনে উৎসুক সেই জন্য।

উঃ, রত্নে ভগবান এমন মেয়ে রেখেছেন যে, সাহেবি পোশাকেও কারো চোখ ফাঁকি দেওয়া যায় না।

বাঙালি লেখক আমি, বাংলা ভাষায় লিখি। সোবিয়েত ও চীন নিয়ে লেখা আপনার বই দুটো পড়েছি আমি। চীনের উপর আমিও বই লিখেছি, রাশিয়ার উপরেও লিখবার বাসনা।

এক নেশার মানুষ পেয়ে লাল-ডীন আরও যেন মজে গেলেন।—আমার চীনের বই মন দিয়ে পড়েছ তো? বড় যত্নে লেখা।

বললাম—রীতিমতো ওজন বাড়িয়েই বললাম—জানি যে পড়া ধরতে আসবেন না।—প্রত্যেকটা লাইন পড়েছি। মুখস্থও বলতে পারি অনেক জায়গা।

ডীন বললেন, তোমাদের বাংলার খুব উঁচু সাহিত্য। বাংলায় বইটার অনুবাদ হয়, আমার ইচ্ছা।

তার জন্তে কি, সে আমি ঠিক করে দেবো।

বলছি অবশ্য মুখের কথা। বললে যদি খুশি হন, আপত্তি কিসের? আর বেশি বললে ব্যবসাদারির মতো শোনাবে। অনেকেই এসে ঘিরে ধরেছেন ইতিমধ্যে। ডক্টর ধীরেন সেন পুরোবর্তী।

ভারতে চলুন আপনি—

ভিসার গোলমাল হবে হয়তো।

কে বলল? ভারত-সরকারের তরফ থেকে কিছু বলবার অবশ্য এক্তিয়ার নেই। তা হলেও, আপনার মতন মানুষ ভারতে যাবেন—এতে কোন রকম বাধা আসতে পারে না। ভারতের মানুষ সমাদরে আপনাকে গ্রহণ করবে।

তারপর জিজ্ঞাসা করি, বয়স কত হল আপনার?

এবারে একাশিতে পড়ব। জীবনের সবে শুরু—কি বলো হে?

হাসছি। ক্যামেরার লোকেরা এসে ওদিকে চুপিসারে মনের খুশিতে ফোটো তুলে যাচ্ছে। একজনকে দেখিয়ে অনুযোগের সুরে ডীন বলেন, যেখানে যাবো সেইখানে আছেন ঐ ভদ্রলোক। সর্বত্র তাড়া করে বেড়ান ফোটো তোলার জন্য।

হেসে বললাম, বলছেন কাকে? কীটস্য কীট আমাদেরও ঐ দশা। 'বাপ' 'বাপ' বলে কোন দিন এদেশ থেকে ছুটে পালাব ওঁদের ঐ ফোটো তোলার জ্বালায়।

বিল্ডিং-একজিবিসন থেকে ফিরতে দুপুর গড়িয়ে যায়। বিকালটা আজ ঘরে কাটালাম। দাশগুপ্ত এলেন—চেনেন তো আপনারা তাঁকে—ইন্দুভূষণ দাশগুপ্ত। আড়াই বছর কাটল মস্কো অ্যাম্বাসিতে। দেশে যাচ্ছেন, স্ফূর্তিতে ডগমগ। তাঁর জায়গায় ধর এসে পৌঁছচ্ছেন দু-এক দিনের মধ্যে। ধরের ভাইয়ের সঙ্গে আমার চেনা, কলকাতা থেকেই খবর শুনে এসেছি। ধরের জন্য দাশগুপ্ত পথ চেয়ে আছেন। আর পাঁচটা দিন কাটাতে পারলে যে হয়। পাঁচদিন পরে গৃহস্থালীর যাবতীয় লটবহর জাহাজে রওনা করে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী ও বাচ্চারা আকাশে উড়বেন। লণ্ডনে থাকবেন কয়েকটা দিন। তারপর ইউরোপে একটা চক্কর মেরে স্বর্বের ছেলে ঘরে গিয়ে উঠবেন। এতদিন আছেন, অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছেন এখানকার মানুষজনের সঙ্গে। ঘরোয়া খাটি খবর পাওয়া যাবে, সেই জন্তে বলে দিয়েছিলাম—যাওয়ার আগে একদিন সময় করে আসতে। এসেছেন তাই তিনি আজ। নিচু টেবিলের ধারে চা ইত্যাদি সহ জমিয়ে বসেছি।

হেনকালে পল এসে উপস্থিত। ডাকতে এসেছে: কনসার্ট ও লোকনৃত্য আছে সন্ধ্যার পর—তৈরি হয়ে নাও। এ কি কথা শুনি আজি পল—তোমার দেশে কৌমার্যের উপরে ট্যাক্স? নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে বিয়ে না করলে ট্যাক্স দিতে হয়—মেয়েপুরুষ বাছ-বিচার নেই? মেয়েরা গুণতিতে অনেক বেশি, ইচ্ছে করলেও সবাই তো বর জোটাতে পারবে না। লড়াইয়ে দেশের জোয়ান-যুবা কচু-কাটা করে গেছে, সে ক্ষতি সামলে উঠতে পারেনি এখনো। তবু কিন্তু মেয়েদের ব্যাচিলর-ট্যাক্স থেকে রেহাই নেই। বর পাবে না, তার উপরে আবার ট্যাক্স দিয়ে মরবে। এটা অন্যায়—ঘোরতর অন্যায়।

পল বলে, হয়তো তাই। কিন্তু কেউ কিছু মনে করে না। ব্যাচিলর-ট্যাক্সের সমস্ত টাকা আলাদা করা থাকে—লড়াইয়ে বাপ-মা মরে যে সব শিশু অসহায় হয়েছে, তাদের কল্যাণে খরচ হয়। বড় বড় প্রতিষ্ঠান আছে ঐ সব অনাথদের মানুষ করে গড়ে তোলবার জন্য। গিয়ে দেখে আসবেন এমনি একটা-দুটো প্রতিষ্ঠান। ঐ সব শিশুদের জন্য জাত ধরে আমাদের বড় মমতা, বড্ড বেশি উদ্বেগ। মেয়েরা হল মায়ের জাত—তাদের তো আরও বেশি। মেয়েদের উপর ট্যাক্স অন্যায় বলে ঠেকলেও কেউ তারা কোনদিন আপত্তি তোলে নি।

ট্যাক্স ধরে দিল আপনার উপর—ক্ষেত্র বিশেষে মার্জনাও আছে। ধরুন আপনি ছাত্র, অথবা গবেষণা করেন কোন এক বিষয়ে—স্ত্রী-ঘটিত ঝামেলা এ সময়টা হিতকর হবে না। কিম্বা ধরুন রোগে ভুগছেন। প্রমাণ দেখিয়ে ট্যাক্স মকুব করে আসুন। দায়িত্ব আপনারই উপর।

বিয়ে তো করলেন, দায় তা বলে একেবারে চুকল না। বিয়েই শুধু নয়, বাচ্চা হওয়া চাই বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যে। নয় তো আবার ট্যাক্স। এই ট্যাক্সও অবশ্য মাপ হতে পারে উপযুক্ত কারণ দর্শাতে পারেন যদি। পল বলে, উঃ—কম ট্যাক্স দিয়েছি! আমি দিয়েছি—আর ও-তরফে আমার স্ত্রীও দিয়েছে। আরে মশায়, বয়স হলেই তো হয় না—যাকে জীবন-সঙ্গিনী করব, তাকে দেখে শুনে একটু বাজিয়ে নিতে হবে না? স্ত্রীরও তেমনি—স্বামী দেখেশুনে নিতে দু-চার বছর লাগবেই। কিন্তু আইন সবুর মানবে না, দিয়ে যাও ট্যাক্স ততদিন। বিয়ে হয়েছে—আমাদের বছর তিনেক, গত বছর একটি বাচ্চাও হয়েছে। ব্যস, বাঁচোয়া। স্ত্রীর বরঞ্চ এবার নতুন পাওনার পথ খুলে গেল। কপালে থাকলে বড়লোক।

পল চলে গেছে তৈরি হবার জন্য আর একবার তাগিদ দিয়ে। দাশগুপ্তর কাছে ঐ নতুন পাওনার পদ্ধতিটা সবিস্তারে শুনছি। এক বাচ্চা জন্মানোর পরে এ সব বাবদে কখন আর ট্যাক্স দিতে হবে না স্বামী স্ত্রী কোন তরফের। স্ত্রীর এর পরে রোজগারের মওকা। দ্বিতীয় বাচ্চা হল, তৃতীয় বাচ্চা হল। তার পরেরটা যেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে, সরকার থেকে মাসিক পঁচাত্তর রুবল বরাদ্দ, তা ছাড়া থোক কিছু। কেমন ফেখন

বিনা চাকরির মাইনে। চতুর্থ থেকে সপ্তম চলল এই ভাবে—প্রত্যেক বাচ্চার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে নগদও পেয়ে যাচ্ছেন, এবং তার পরিমাণ বাড়ছে সন্তানের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে। অষ্টম সন্তানের জন্মের থেকে মাস মাইনে পঁচাত্তরের জায়গায় একশ রুবল। এগারো অবধি চলল এই রেট। বারো সন্তানের মা হতে পারলেন তো খাতিরের আর অবধি নেই। হয়ে গেলেন বীর-মাতা। থোক রুবলও এত পেয়েছেন যে, স্বচ্ছন্দে পায়ের উপর পা দিয়ে বাকি জীবন কাটাতে পারবেন।

আমার নিরঞ্জন-দা আছেন—এই গল্প শুনে তিনি তো লাফিয়ে উঠলেন। উঃ, তোমার বৌদিকে ছা-বাচ্চা সহ পাঠাতে পার ওদেশে? দেখ না চেষ্টা করে। তাই বটে! দাদার উপর ষষ্ঠীর বিষম দয়া—নানা বয়স ও আয়তনের তেরোটি ছেলে-মেয়ে। আপাতত এই, ভবিষ্যতের আরও আশা রাখেন। সন্তান-সংখ্যা নিরঞ্জন-দা'র নিজেরই গণতে ভুল হয়ে যায়।

অর্থাৎ সোবিয়েতের ওরা মানুষ চাচ্ছে—আরো বিস্তর মানুষ। মানুষ হল লক্ষ্মী—ভাল ভাল মানুষে ভরে যাক। মরু আর স্তেপভূমিতে সোনার ফসলের বন্যা বহাচ্ছে, ধরণী-গর্ভের সুগুপ্ত ভাণ্ডার লুঠ করে এনে সম্পদের পাহাড় বানাচ্ছে, নিশ্চেতন তুষারময় উত্তর-মেরু অঞ্চল অবধি প্রাণের জোয়ার—কোন্ কাজে লাগবে এত সমৃদ্ধি, কারা ভোগ করবে? বীর সন্তান প্রসব করো মা-জননীরা।

তবু যত তাড়াতাড়ি চায়, জনবৃদ্ধি ঘটছে কই তেমন? কানীন সন্তানও সরকার স্বীকার করে নেয়—পয়লা সন্তান থেকেই মায়ের বৃত্তি। তা হলেও এ জাতীয় সন্তান জন্মে সামান্যই। মেয়েগুলোর ঘর বাঁধবার বড় লোভ, উচ্ছৃঙ্খলতা বরদাস্ত করে না।

গল্পে গল্পে আটটা বেজে গেছে। দাশগুপ্তের খেয়াল নেই; আমারও নেই। ঘড়ি দেখে ব্যস্ত হয়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আর দেখা হবে না মস্কো শহরে, কপালে থাকলে দেশে গিয়ে হতে পারবে। কনসার্টে যাবো—লাউঞ্জে গিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ—সকলে বেরিয়ে পড়েছেন। আমাদের পিছনের দল কাবুল ও তাসখন্দে আটক হয়েছিলেন; খারাপ আবহাওয়ায় প্লেন আকাশে তুলতে ভরসা করেনি। অবশেষে আজ সন্ধ্যায় এসে পৌঁচেছেন। গল্পে মত্ত ছিলাম, দেখা হল না। তাঁরাও কনসার্টে চলে গেছেন।

কি করা যায়? বেরিয়ে পড়লাম পায়দলে আমি আর ডাক্তার জ্ঞান মজুমদার। আপনারা বলেন, বেরুতে দেয় না যত্রতত্র—পুলিশ ওত পেতে থাকে। দেখুন—এই টহল মেরে বেড়াচ্ছি, কেবা কার খোঁজ রাখে? হোটেলের নাম-ছাপা চিঠির কাগজ পকেটে নিয়েছি—পথ হারালে, মুখের কথা কেউ বুঝবে না, তখন এই জিনিষটা বের করে ঠিকানার হদিস নেবো। আছি বটে ক'দিন এখানে, কিন্তু অবিরত মোটরে চলাচলের দরুণ পথ-ঘাটের তেমন আন্দাজ হয়নি।

শহরের সরগরম অঞ্চলটায় হোটেল আমাদের। ঠিক সামনেই থিয়েটার স্কোয়ার—স্কোয়ারের পূর্বদিকে বলসই ও আরও গোটা পাঁচ-সাত থিয়েটার। পার্কের পশ্চিম দিয়ে চললাম মেট্রো-ষ্টেশনের পাশ দিয়ে। সতর্ক ভাবে ঘর-বাড়ি ঠাহর করে করে এগুচ্ছি—এই সমস্ত চিহ্ন ধরে ফিরে আসব। কনকনে ঠাণ্ডা। ফুরফুরে বরফ পড়ছে স্বরলোকের পুষ্পবৃষ্টির মতন—বরফগুঁড়ি জামায় পড়ে, মুখে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে যায়। পথে বিস্তর লোক চলাচল। সেই কথাই বলতে বলতে যাচ্ছি। স্বাস্থ্য কি দেখুন মশাই, একটা রোগা পটকা লোক দেখতে পান কোনদিকে কোথাও? উত্তম সাজগোজ—মেয়ে-পুরুষ সকলের অঙ্গে ওভারকোট, পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি। সকালে যখন কাজে যাচ্ছিল, কারো কারো মলিন পোশাক দেখেছি, কিন্তু এখনকার সাজ-পোশাকে উজ্জ্বল স্বাচ্ছল্য ঠিকরে পড়ছে যেন। সাহস কি রকম গো—বাচ্চাদের অবধি এই বরফগুঁড়ির রাত্রে নিয়ে বেরিয়েছে। হাঁটিয়ে নিয়ে চলেছে যে সময়টা বন্ধ কামরার ভিতর লেপে-কম্বলে চাপা দিয়ে রাখবার কথা।

বাঁ-দিকে ক্রেমলিন, মিনারের মাথায় মাথায় রক্ততারকা। বাঁয়ে ঘুরে রেড স্কোয়ারে এসে পড়লাম। ক্রেমলিনের প্রায় লাগোয়া বিপ্লব-মিউজিয়াম, উল্টো দিকে লেনিন-মিউজিয়াম। লেনিন-মিউজিয়ামের কিনার ঘেঁষে যাচ্ছি। একটা রাস্তা পার হয়ে ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরের ফুটপাথে এসে পড়লাম। কাচের জানলায় জানলায় দাম-সাঁটা হরেক জিনিষ—লুব্ধ পথিকজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। রাস্তার ওপারে লেনিন মুসোলিয়াম—দরজার দু-পাশে দুই সৈন্যের দুটি নিশ্চল প্রহরা। পাহারা বদল দেখবার জন্য যথারীতি মানুষ ভিড় করে আছে। মুসোলিয়ামের দু-দিকে ক্রেমলিনের দুই মিনারের দুটি রক্ততারকা—মৃত্যুশান্ত মানুষ দুটির উপর চোখের তারা মেলে ক্রেমলিন তাকিয়ে আছে। আরও খানিক এগিয়ে বধ্যভূমি ও বেসিল ক্যাথিড্রাল পার হয়ে পথ নিচু হয়ে নেমে গেছে। সেই পথ ধরে পায়ে পায়ে চলে গেলাম অনেক দূর অবধি।

দেখে বেড়াচ্ছি শুধু আমরাই নয়। আমাদেরও দেখছে। এক তরুণী

হুড়দাড় করে পাশ কাটিয়ে আগে চলে গেল। জ্ঞান মজুমদার বললেন, দেখবেন ফিরে আসবে এখুনি আবার। স্পষ্টাস্পষ্টি তাকানো অভদ্রতা—চুরি করে আড়চোখে একবার দেখে নিয়েছে। ভাল করে মুখোমুখি দেখবার জন্ত আবার ফিরবে, দেখতে পাবেন। ঠিক তাই, মজুমদার মশায় ঠিকই বলেছেন। সেই মেয়ে সামনের দিক দিয়ে এসে পিছনে চলে গেল। এমন ব্যস্ত, তাকিয়েও দেখল না একটুকু—ভাবখানা এই প্রকার, আপনারা দেখলে হয়তো এমনই বুঝে যাবেন। কিন্তু আমরা জানি, দেখবেই সে কায়দা করে। না দেখে উপায় নেই 'কালো জগতের আলো' এই আমাদের। আজ্ঞে হ্যাঁ, কালোর বড় কদর ওদেশে। কালোর মতো কালো হলে রঙের দেমাকে ভূতলে পা পড়বার কথা নয়। সে-পর্ব আজকে পথের মাঝখানে নয়, আর একদিন!

১১

এতদিন ইতি-উতি দেখে বেড়িয়েছি। পুরো দল এসে গেছে, পরশু-তরশুর মধ্যে লম্বা পাড়ি। প্লেনের তোড়জোড় এবং এ-জায়গায় ও-জায়গায় মান্ত অতিথিদের পদার্পণ বারতা বাতলাবার জন্য আজ আর কাল দুটো দিন হাতে রাখা যাক। তরশু আর নয়, পরশুদিনই মস্কো ছাড়ছি।

অতএব কে কোন দিকে যাচ্ছেন সেটা আজ পাকাপাকি হবে। দক্ষিণে মধ্য-এশিয়ার দিকে যাচ্ছেন কারা, এবং পশ্চিমে ইউরোপীয় তল্লাটেই বা যাচ্ছেন ক-জন? সবসুদ্ধ আমাদের ভোকসে টেনে নিয়ে চলল, যাঁরা দাওয়াত দিয়ে এনেছেন। ভোকসের প্রেসিডেন্ট চীনে গেছেন তাদের বার্ষিক উৎসব দেখতে (এই উৎসব বাবদেই আমি চীনে গিয়েছিলাম দু-বছর আগে)। প্রফেসার ইয়াকোভলেভ—মাথায় চকচকে টাক, কথায় কথায় রসিকতা—আপাতত সভাপতির কাজ চালাচ্ছেন। মুখপাত্র ভদ্রলোক মিষ্টি মিষ্টি বচন ছাড়লেন আমাদের ডাক করে। ইণ্ডিয়া থেকে দলের পর দল ডেলিগেশন আসছেন—লোকে তাই কি বলাবলি করে জানেন, এটা হচ্ছে ইণ্ডিয়ান ডেলিগেশনের মরশুম। তোমার দেশে নতুন প্রাণের আবেগ—এত দূর থেকেও আমরা তার স্পন্দন পাচ্ছি। আমার দেশের মানুষ নতুন ভারতকে ভাল করে বুঝতে চায়, ভারত সম্পর্কে উৎসাহ শতগুণ হয়েছে আগের দিনের তুলনায়। তোমাদের বই পড়ছে লোকে প্রচুর—একাল-সেকালের বিস্তর বইয়ের অনুবাদ হচ্ছে। আরও বেশি বই ভাল ভাল বই চাচ্ছি অনুবাদের জন্ত। কিন্তু বুঝসমঝের সব চেয়ে ভাল উপায় হচ্ছে মানুষে মানুষে প্রত্যক্ষ দেখাসাক্ষাৎ ও আলাপ-পরিচয়; তাতেই মানুষকে ঠিকমতো বোঝা যায়। সম্প্রতি ফিল্মের দল এসে গেলেন, ছবির মধ্য দিয়ে ভারতের জীবন-পরিচয় কিছু কিছু পেলাম। এমনি নানানতরো উপায়ে চেনাজানা করতে চাই মানুষের সঙ্গে—বিশেষ করে ভারতের মানুষের সঙ্গে। নানা রকম বৃত্তি ও মতবাদের মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে দল হয়ে এসেছ—এদেশ-ওদেশের সৌহার্দের ভিত্তিভূমি হলে তোমরা। আমাদের প্রীতির সম্পর্ক শুধুমাত্র সরকারি চেষ্টায় নয়, বিভিন্ন এমনি বেসরকারি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েও গড়ে তুলতে হবে। তোমাদের প্রধান মন্ত্রী নেহরু বিরাট ব্যক্তি। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের মধ্যেকার ঘনিষ্ঠতা নিবিড়তর হচ্ছে দিনকে দিন (মনে রাখবেন, নেহরু তখনো রাশিয়ায় যান নি; আমরা ফিরে আসার অনেক পরে তিনি গিয়েছিলেন)। বিভিন্ন জাতি ও মানুষের মধ্যে সকলের আগে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে তোল—এই হল লেনিনের কথা। আমাদের স্বার্থ আছে মশায়, এমনি এমনি দাওয়াত করিনি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস লোক-চর্চা যে যা জানো, বলতে হবে—আমাদের কাছে। মুখে মুখে শুনে আর জিজ্ঞাসাবাদ করে নিয়ে পূর্ণতর হবে আমাদের শিক্ষা। কৃষি ও শিল্প নিয়ে ভারত ও সোবিয়েতে অশেষ চেষ্টা চলছে। দুটো দেশের ভূমিপ্রকৃতি, সামাজিক পরিবেশ ও মানুষ একেবারে আলাদা বটে, কিন্তু লক্ষ্যে কিছুমাত্র তফাৎ নেই—মানুষকে সর্বসম্পদে ও সর্বাঙ্গীণ আনন্দে প্রতিষ্ঠিত করা। প্রপাগাণ্ডার কারণে নয়—জনশিক্ষার জন্তই জ্ঞানীগুণীদের এমনি আসা-যাওয়ার প্রয়োজন।

এবার পরিচয় হচ্ছে, যাঁরা যাঁরা এখানে হাজির আছেন তাঁদের সকলের সঙ্গে। দোভাষি হয়ে খেজমত করে বেড়ায়—এরা আবার কি, মাইনে-খাওয়া আধা-পরিচারক—মনে মনে এমনি ধরণের অবজ্ঞা ছিল ছেলেমেয়েগুলোর সম্পর্কে। পরিচয় পেয়ে পেয়ে তাজ্জব হচ্ছি। পেশাদার আছে অবশ্য কয়েকটি—কিন্তু বেশির ভাগই ভাল স্কলার, কেউ কেউ গাঁটের খরচা করে এসেছে বিদেশির সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে সেদেশের হালচাল বুঝবে, দুনিয়ার যৎকিঞ্চিৎ আস্বাদন নেবে বলে। সকলের বেশি অবাক হলাম জুলিয়ার পরিচয়ে। ঘিয়ে-ভাজা শুকনো চেহারা, ইংরেজিটা বড্ড খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বলে—এই দোভাষিণীকে আমল দিতাম না আমরা কেউ। এখন জানা যাচ্ছে ভোকসের প্রতিনিধি সে-ই। এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে তোলার বিশেষ একটা বিভাগ আছে, কমরেড জুলিয়া তার প্রধান কর্মকর্ত্রী। দরকার-বেদরকার সমস্ত কিছু জুলিয়াকে জানিয়ে ব্যবস্থা হয়। অন্যদের কাছে এতদিন যত কিছু কাজের কথা বলেছি, জেনে বুঝে নিয়ে পৌঁছে দিয়েছে তারা জুলিয়ার কাছে।

কোথায় কোথায় যাচ্ছেন, ঠিক করে ফেলুন এবারে। এখনই। এত বড় দেশ বেড়ানোর পক্ষে সময় হাতে আছে অত্যন্ত কম। ট্যুরিষ্টদের মতন কতকগুলো জায়গায় শুধুমাত্র নজর বুলিয়ে যেতে চাই নে, যথাসম্ভব জানতে বুঝতে চাই। যার মুখে যেমন এলো, বলে ফেললাম নানান জায়গার কথা। তা বেশ তো, বাধা কিছুই নেই—কিন্তু কিভাবে কোথায় যাওয়া হবে, কোথায় কত দিন লাগবে, হাতে যা সময় আছে তাতে কুলোবে কিনা—আমাদের ক'জন ওঁদের ক'জন একত্র বসে ঠিক করে ফেলবেন আজকের দিনের মধ্যেই।

আপাতত দুটো দল হয়ে তো বেরিয়ে পড়ি। ওসব হল, ফিরে এসে যখন আবার মস্কোয় একত্র হব তার পরের। তাজিকিস্তানে কে কে যাচ্ছেন বলুন। নিতান্তই দুয়োরের পাশের জায়গা—ভারত থেকে জোরে ঢিল ছুঁড়ে দিলে হিন্দুকুশের মাথা টপকে পামিরের পদতলে টুক করে পড়বে। এই সেদিন অবধি পিছিয়ে-পড়া দেশ—এক মাইলও রেললাইন ছিল না, পাহাড় জঙ্গল আর মরুভূমি। তাড়া খেয়ে বোখারার আমির এই দুর্গম জায়গায় এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন। আফগানিস্তানের একেবারে লাগোয়া—আমির ঘাঁটি বাঁধালেন তো ইংরেজ এবং মতলববাজ আরও কেউ কেউ টাকাকড়ি ও

লড়াইয়ের সরঞ্জাম পাঠাতে লাগল আফগানিস্তানের ভিতর দিয়ে। অনেক বছর চেপে ছিলেন আমির। এখন গিয়ে সেখানে অপরূপ নতুন জীবন দেখবেন। যেতে কষ্ট হবে কিন্তু; অনেকক্ষণ উড়বেন, অনেক সময় লাগবে। যাবেন'?

আমাদের মধ্যে নির্ভেজাল ভদ্রলোকেরা আছেন, তাঁরা মুখ বাঁকাচ্ছেন। দূর, মাথা খারাপ না হলে কেউ ঐ পোড়ারমুখো দেশে যায়! কৃষ্ণসাগর-কূলে মনোহর স্বাস্থ্যাবাস সোচি, শস্যভাণ্ডার ইউক্রেন, আরও কত সব ভালো ভালো জায়গা—কত আরাম ও আনন্দ!

ভোকস বলেন, তথাস্তু।

আর আমরা ইতর-ভাবাপন্ন যতগুলি আছি, প্রস্তাব শোনা থেকেই লাফালাফি করছি। দলে আমরা অনেক ভারী। রাশিয়ায় যাঁরা আসেন, ভালো ভালো ক'টা জায়গা দেখে তাঁরা ফিরে যান। এসব অঞ্চলে যাওয়ার সুবিধা হয় না। নরনারী ছিল প্রায়-নিরক্ষর, মানবাত্মা ধর্মের গোঁড়ামিতে নিজিত—হঠাৎ সে দেশে কত আলো আর আনন্দ! ভাগ্যক্রমে সুযোগ এসেছে তো নিশ্চয় যাবো আমরা। ব্যবস্থা করুন।

ভোকস বললেন, তথাস্তু—

ভারি খুশি। ওঁদের আহ্বানে এসেছি, এদেশে ওঁরাই আমাদের গার্জেন। তাজিকিস্তানের নিমন্ত্রণ কাজেই ওঁদের মারফতে এসেছে। এখন যদি লিখতে হয়, না মশায়, তোমাদের ধাপধাড়া জায়গায় কেউ যেতে চাচ্ছে না—লজ্জার ভবে অন্ত থাকত না। উল্লাস ভরে ভোকসের কর্তা বললেন, দুটো প্লেনের ব্যবস্থা হবে তোমাদের এই বড় দলের জন্য।

তারপরে সামাল করে দিচ্ছেন, সোবিয়েতে ঘোরাঘুরি করে সব-কিছুতেই যে খুশি হবে, এমন কথা বলি না। ত্রুটি-গ্লানি বহুত আছে। যেমনটি হওয়া উচিত, এখনো তা হয়ে ওঠে নি। এই মস্কোতেই দেখবে সেকেলে জীর্ণ কত কাঠের বাড়ি। বিপুল বেগে শহর-সংস্কারের কাজ চলছে, তা'ও এক নজরে মালুম হবে তোমাদের। আট শ' বছর ধরে যে শহর গড়ে উঠেছে, পঁচিশ-ত্রিশ বছরে যে বস্তু পুরোপুরি পালটে যায় কেমন করে? তার উপরে এই সাংঘাতিক লড়াই গেল। মস্কো শহরের তেমন কিছু ক্ষতি হয় নি অবশ্য, লড়াইয়ের ডামাডোলের মধ্যেও পরিকল্পনা অনুযায়ী নগর-নির্মাণের কাজ চলেছে। সে যাই হোক, জারের আমলের কাঠের বাড়ির জন্য আমাদের সোশ্যালিষ্ট রাজ্য দায়ী হতে পারে না। সংস্কার অতি-দ্রুত বটে, তবু খুশি নই আমরা। আরও—আরও ত্বরা করতে হবে। ফুলের মতন হাজার হাজার যুবা লড়াইয়ে প্রাণ দিয়েছে,—সকল বিভাগের পাকাপোক্ত কর্মীরা সৈন্য হয়ে ফ্রন্টে চলে গেল; কাজ তা বলে থেমে থাকে নি একটা দিনও। ছেলেরা গেল তো মেয়েরাই এগিয়ে এসে সকল দায় কাঁধে তুলে নিল। তার জের এখনো চলছে। তাজিকিস্তানে যাচ্ছ তো—একটা দেশ কত তাড়াতাড়ি এগিয়ে নেওয়া যায়, দেখতে পাবে সেখানে। শুধু মাত্র রুশ দেশ দেখে গোড়ায় আমরা কেমন ছিলাম বুঝতে পারবে না। তাজিকিস্তান দেখে কতক কতক বুঝবে। [ক্রমশঃ।

নাচ গান বাজনা



ওয়ালজ নাচের ইতিকথা

ইউরোপের নাচের আসরে যখন প্রথম ওয়াল্‌জ নাচ চালু হতে সুরু করে, তখন লোকে খুব ছ্যা-ছ্যা করেছিল। নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ নর-নারী পরস্পরের পায়ে পা মিলিয়ে নৃত্যের হিল্লোলে আনন্দের মাতন জাগাচ্ছেন—এ দৃশ্য সে আমলের নীতিবাগীশদের কাছে খুবই দৃষ্টিকটু লেগেছিল। মেয়েরা গোড়ালীর কাপড় তুলে পর-পুরুষের কণ্ঠলগ্না হয়ে স্মিতমুখে হাল্কা হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছে—এ-যে সাংঘাতিক কেলেঙ্কারীর কথা! এ সব চোখে দেখলেও যে পাপ-প্রবৃত্তি মনের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে! আতঙ্কে নীতিবাগীশদের মাথায় চুল খাড়া হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু নৃত্য চিরকাল যুগের সুর এবং ছন্দকেই রূপায়িত করে, আর ওয়াল্‌জ্‌ নাচে ধরা পড়েছিল (নেপোলিয়নীয় যুদ্ধের সঙ্কোচনের পর) উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের যুদ্ধোত্তর নবজাগৃতির সুর তাল এবং ছন্দ। ওয়াল্‌জ্‌ নাচে ফুটে ওঠে হাল্কা হাসিখুশী উচ্ছলতার অভিব্যক্তি। তাই এক ব্রহ্মচারী গোচের বিখ্যাত জার্মাণ সাহেব একখানা বই লিখে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, তাঁর আমলের মানুষের দেহ মনের দুর্বলতার প্রধান উৎস ছিল ওয়াল্‌জ্‌, অবশ্য তাঁর এই আবিষ্কারে কেউ কান দেয়নি। ওয়াল্‌জ প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রমোদশালায় স্থায়ী আসন পেয়ে গেল এবং দেখা গেল যে, সমস্ত ইউরোপের নর-নারী পরস্পরের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়ে এই দুর্নিবার নূতন ছন্দের তালে তালে ঘুরপাক খাচ্ছেন।

শোনা যায় যে 'পোলকা' নাচের স্রষ্টা নাকি চেকোস্লাভাকিয়ার এক কিষাণ কন্যা, কিন্তু ওয়াল্‌জ্‌ নাচটা যে কে প্রথম সৃষ্টি করেছিল, তা আজও সঠিক জানা যায় নি। সম্ভবত ব্যাভেরিয়ার শ্লথ এবং গুরুভার গণ-নৃত্য থেকেই ওয়াল্‌জের জন্ম! পরে এর সঙ্গে একটি ফরাসী নৃত্যের কিছু উপাদান সংযুক্ত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি সাধারণ মানুষের মধ্যে ওয়াল্‌জের অনুরূপ একটা নাচের খুব প্রচলন ছিল। তবে রাজদরবারের অভিজাত সম্প্রদায় বাহ্যাচার পরিপূর্ণ অসরল 'মিনিউয়েট' নাচটাকেই বেশী পছন্দ করতেন। ইংল্যাণ্ডের গ্রামীণ নৃত্য সহরের প্রমোদশালায় প্রবেশ লাভ করার পর, নাচটা আর মুষ্টিমেয়র ভোগের বস্তু রইল না, কারণ তাতে সকলেই সকলের সঙ্গে নাচতে পারত। আর ভিয়েনায় গণতান্ত্রিক সম্রাট দ্বিতীয় জোসেফের আমলে কার্ণিভালের সময় মুখোস নৃত্যে সকল শ্রেণীর লোক পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পেতে আরম্ভ করে। কালে ভিয়েনার সদাপ্রফুল্ল হাসি-খুশী-সঙ্গীতপ্রিয় অধিবাসীদের কাছে ওয়াল্‌জ নাচ সব চেয়ে বেশী জনপ্রিয়তা লাভ করল। ভবঘুরে বেহালা বাজিয়েরা দানিয়ুবের স্রোত বেয়ে গণসঙ্গীতের পশরা এনে তুলল রাজধানীতে।

নৃত্যশালার মসৃণ মঞ্চভূমিতে চাঞ্চল্যের সাড়া জাগল এবং নদীতীরের পানশালা থেকে নাচটা ছড়িয়ে পড়ল শহরের কেন্দ্রস্থলে। ওয়াল্‌জ্‌ পেল সাবালকত্ব। তারই সুরে নেপলিয়নীয় যুদ্ধের সময় নেচে উঠল ফ্রান্স এবং ১৮১৩ সালে ইংলিশ চ্যানেল পাড়ি দিয়ে ওয়াল্‌জ্‌ এসে উঠল ইংল্যাণ্ডে। লোকে বলল "সৌন্দর্য, ভব্যতা এবং কমনীয়তা বিবর্জিত জার্মাণীর এক শয়তান" এসে হাজির হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। কিন্তু নেপোলিয়ান যেখানে ব্যর্থতা বরণ করেছিলেন, ওয়াল্‌জ্‌ সেখানে পেল জয়ের টীকা। ওয়াল্‌জের বৃটেন "অভিযান" ষোল আনা সার্থক হয়ে উঠল। সারা ইংল্যাণ্ডের লোক ওয়াল্‌জের সুরে সুর মিলিয়ে তারই তালে তালে পা ফেলে নেচে বেড়াতে লাগল সহরে সহরে। কোন কোন মহল অবশ্য কঠোর ভাবে এর প্রতিরোধের চেষ্টাও করেছিলেন। বিখ্যাত লাজুক ঔপন্যাসিক ফ্যানি বার্ণে লিখেছিলেন "ইংল্যাণ্ডের মায়েরা যখন দেখেন, তাদের মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে প্রকাশ্যে ঢলাঢলি করছে, তখন তাঁরা নিশ্চয়ই খুব অস্বস্তি বোধ করেন।" সচ্চরিত্র পুরুষ বলে লর্ড বায়রনের কোন সুনাম ছিল না। সব চেয়ে মজার কথা এই লর্ড বায়রণও ওয়াল্‌জের



মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও প্রিন্স এ্যালবার্ট ওয়ালজ নাচের আসরে

বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। 'দি ওয়াল্‌জ' নামক কবিতায় হোরেস হরনেম নামক এক ভদ্রলোকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী বর্ণনা করে বায়রণ লিখেছিলেন যে, হরনেম গাঁ থেকে লণ্ডন সহরে এসে এক নৃত্যশালায় ঢুকে দেখেন যে, তাঁর স্ত্রী "ঘোড়সওয়ারের মত দেখতে অজ্ঞাতপরিচয় এক বিশালবপু ভদ্রলোককে বাহুডোরে বেষ্টন করে রেখেছে আর ভদ্রলোকটিও তাঁর স্ত্রীর কটিদেশ বেষ্টন করে আছেন। এইভাবে দুজনে জড়াজড়ি করে একটা হাল্কা তাল লয়ের ছন্দে ঘুরপাক খাচ্ছেন নাচের আসরে।" এখনও পুরোনো ঘরাণার ওয়াল্‌জ নাচ নাচবার সময় নায়ক নায়িকারা যে ধরণের আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়, সে আমলের চারুকলারও ঠিক এই ধরণের আলিঙ্গনাবদ্ধ নায়ক-নায়িকার ছবির বিশেষ প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু লর্ড বায়রণ একে বলেছেন "কাম-আলিঙ্গন এবং অপবিত্র সংস্পর্শ।"

তিনি লিখেছিলেন :—

The fashion hails—from Countesses to Queens,
And maids and valets waltz behind the scenes;
Wide and more wide witching circle spreads,
And turns, if nothing else—at least our heads;
With thee even clumsy chits attempt to bounce,
And cockneys practice what they can't pronounce."

কিন্তু নিন্দা দুর্নামে ঘাবড়াবার লোক ইংরাজরা নয়। টমাস উইলসন নামক একজন বিশিষ্ট বৃটিশ নৃত্যাচার্য্য তাঁর "ওয়াল্‌জ নৃত্যের সঠিক পদ্ধতি" বইতে ঘোষণা করলেন যে ওয়াল্‌জ্‌ নাচে ইংল্যাণ্ডের 'সতীত্ব' বিপন্ন হয়নি। এই নৃত্যে যে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে বলে অভিযোগ করা হচ্ছিল, সেগুলির মূলে না কি কোন সত্য নেই। ওয়াল্‌জ্‌ নাচের অন্যান্য ভক্তরা বলল, এ নাচে নাকি তাদের শরীর এবং মন বেশ তাজা থাকে। এত বড় প্রমাণের পর আর বিরুদ্ধ যুক্তি চলে কি করে!

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের কথা এই যে, রাণী ভিক্টোরিয়ার ভব্যতা ও মাত্রাজ্ঞান' পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছিল, সেই মহারাণীই ওয়াল্‌জকে ভব্য নাচ হিসাবে অনুমোদন করেছিলেন। ভিক্টোরিয়ার অভিষেকের পর বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে প্রথম যে নৃত্যোৎসব হয়েছিল, সেখানে ওয়াল্‌জের সুরসৃষ্টির জন্য ভিয়েনার বিশ্ববিখ্যাত সুরস্রষ্টা ষ্ট্রসকে আমন্ত্রণ করে আনা হয়েছিল। তিনি তাঁর অর্কেষ্ট্রার দল নিয়ে লণ্ডনে এসে অভূতপূর্ব সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছিলেন। সেই নাচের আসরে রাণী ভিক্টোরিয়া তাঁর স্বামী এলবার্টের সঙ্গে নৃত্য করে সারা দুনিয়ায় বিস্ময় সৃষ্টি করেন। কেউ কেউ অবশ্য বলেছিলেন কাজটা রাণীর মর্যাদানুগ হয়নি। কিন্তু তাদের ভ্রূ-বিক্ষেপে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি।

ওয়াল্‌জ্‌ নাচ যেমন ভিয়েনা থেকে সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল, তেমনি ওয়াল্‌জের বড় বড় সুরস্রষ্টারাও সব জন্মেছিলেন ভিয়েনায়। বিখ্যাত সুরস্রষ্টা জোয়েফ ল্যানার এবং ষ্ট্রস ওয়াল্‌জের ছন্দের উপর ক্লাসিক ওয়াল্‌জের সুর সৃষ্টি করেন। পরে ষ্ট্রসের পুত্র জোহান তাঁদের সেই সুরকে নতুন নতুন বৈচিত্র্য এবং আবেগের মাধ্যমে আরও সমৃদ্ধিশালী করে তোলেন। এ যুগে কোন কাপ অথবা শীল্ডের ফাইনাল খেলা দেখবার জন্য লোকের মধ্যে যে অসাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়, সে যুগে ভিয়েনার অধিবাসীরা ওয়াল্‌জ্‌ নাচ সম্পর্কে তেমনি অসাধারণ আগ্রহ পোষণ করতেন। সুরসৃষ্টির ব্যাপারে ল্যানারের সঙ্গে ষ্ট্রসের ছিল ভীষণ রেষারেষি এবং সারা নগরী হয়ে উঠেছিল ওয়াল্‌জ্‌-পাগল। ষ্ট্রস ছিলেন অত্যন্ত ভাবপ্রবণ খেয়ালী মানুষ। পুত্রের সঙ্গীত সাধনায় ছিল তাঁর ঘোরতর আপত্তি। একদিন ছেলেকে (জোহান) বেহালা বাজাতে দেখে তিনি ক্রোধে অধীর হয়ে বেহালাটা ছিনিয়ে নিয়ে বাইরে ফেলে দেন। পিতার এই তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ১৮৪৪ সালের এক সন্ধ্যায় এক নাচের আসরে জোহান এমন অভূতপূর্ব সুর সৃষ্টি করলেন যে, ওয়াল্‌জ-ভক্তরা প্রায় রাতারাতি তাকে তাঁর পিতার সিংহাসনে বসিয়ে দিল।

জোহানের খ্যাতি অতি অল্পদিনেই ছড়িয়ে পড়ল সারা ইউরোপময়। রুশিয়ার তৎকালীন রাজধানী সেণ্ট পিটার্সবার্গে পর্যন্ত তিনি তাঁর অর্কেষ্ট্রা বাজিয়ে এসেছেন। তাঁর বিখ্যাত সুর "নীল দানিয়ুব" রচিত হয় ১৮৬৭ সালে। প্রথম দিকে সুরটা তেমন জনপ্রিয় হয়নি কিন্তু 'ফিগারো' পত্রিকা এই সুরের উপর যথেষ্ট প্রচারকার্য্য করায় কিছুকালের মধ্যেই এটা বছরের সেরা সুর বলে স্বীকৃত হয়। জোয়ান ওয়াল্‌জের সুর রচনা করে প্রচুর ধন-সম্পদ অর্জন করেছিলেন বটে, তবে "নীল দানিয়ুব" সঙ্গীতটির জন্য তিনি প্রকাশকের কাছ থেকে মাত্র ১৫ পাউণ্ডের মত পেয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে ওয়ালজ মধ্যযুগীয় মর্যাদালাভ করে গেছে। ইংল্যাণ্ডের নাচের আসরে ওয়াল্‌জ নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সাদা হাতমোজা-পরা ভদ্রলোকেরা রাতের পর রাত তাঁদের মহিলাদের কোমর জড়িয়ে গ্যাসের আলোয় উজ্জ্বল নাচের আসরগুলোয় হাল্কা পায়ে দুলে দুলে উড়ে বেড়াচ্ছেন। সে এক জমজমাট ব্যাপার।

কিন্তু যে সমস্ত নরনারী এই হাল্কা নাচ নেচে নেচে মনের আনন্দে মশগুল হয়েছিলেন, তাঁরা জানতেন না যে, হাল্কা-নাচের উপযোগী হাল্কা সুর তোলা কি কঠিন কাজ। প্রত্যেকেই চাইত যে প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানে ওয়াল্‌জের নতুন নতুন সুর বাজুক। কিন্তু নিত্য নতুন সুর সৃষ্টি করা যে কি অমানুষিক পরিশ্রমের ব্যাপার, তা শুধু সুরস্রষ্টারাই জানতেন। ষ্ট্রস জনসাধারণের চাহিদা মেটাবার কোন ত্রুটি করেন নি। রাতের পর রাত তিনি একের পর এক আসরে গিয়ে নতুন নতুন সুরে নর্তক-নর্তকীদের অনুপ্রাণিত করেছেন। ফলে ১৮৩৮ সালে ইংল্যাণ্ড সফরের পর ষ্ট্রস একেবারেই ভেঙে পড়েন।

ষ্ট্রসের পুত্র জোহান কিন্তু আরও শক্তসমর্থ ছিলেন। তিনি ওয়াল্‌জের প্রায় ছ'শত সুর রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই বাহ্য সুরসৃষ্টির উচ্ছলতার পেছনে ছিল একটা অস্বাভাবিক মৃত্যু-ভয়। এই মৃত্যু-ভয় তাকে এমন আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, মায়ের মৃত্যুর পর তাঁর শবযাত্রায় যোগ দিতে পারেননি।

১৮৯৯ সালে সর্দিতে তিনি মারা যান। সঙ্গীত পরিচালনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি এমন ঘেমে নেয়ে উঠেছিলেন যে, জামা-কাপড় ভিজে যায়। সেই ভিজে জামা-কাপড় থেকে তার শরীরে যে ঠাণ্ডা লাগে, তাতেই তিনি সর্দিতে পড়েন এবং সেই সর্দিই তাঁর কাল হয়। তাঁর মৃত্যুতে ভিয়েনা শোক-সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল।

আজ নাচের আসরে ওয়াল্‌জ টিকে আছে সেই পুরোনো দিনের নিছক ছায়া হয়ে। সেদিনের সেই জাঁকজমকপূর্ণ ঘাঘরার উচ্ছ্বাস, ছন্দোময় রাগিণীর বিক্ষেপ এবং দেহ আন্দোলনের কমনীয়তা শুধু সে-যুগের ভয়-ভাবনাহীন শান্তিময় জীবনেরই প্রতিচ্ছবি ছিল। এখন সেদিনের কথা স্মরণ করে শুধু দীর্ঘশ্বাসই ফেলা যেতে পারে।

রেকর্ড-পরিচয়

আষাঢ়ের দীর্ঘ দিনের বৃষ্টিমুখর অবকাশ এসে পড়ল। এ সময়ে গান-বাজনার কথা স্বতঃই মনে পড়ে। বাইরে বৃষ্টির তাণ্ডব, কিন্তু গৃহকোণের শান্ত পরিবেশ গানে গানে ভরিয়ে তুলতে আপত্তি নেই। তারই আয়োজনে অনেক নতুন রেকর্ড বেরিয়েছে—এখানে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিই :

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

বোম্বাই-এর স্বনামধন্যা গায়িকা শ্রীমতী গীতা দত্ত (রায়) নতুন দুটি গান গেয়েছেন—"কাজল কাজল কুমকুম" আর "ওঠো ওঠো মা গৌরী"—N 82701 রেকর্ডে। এঁর গাওয়া "আমি চার যুগে হই জনম দুখিনী" যাঁরা শুনেছেন, বর্তমান রেকর্ডে তাঁরা আরও তৃপ্ত হবেন।

N 82702—মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ভাবগম্ভীর কণ্ঠের নতুন গান—"যত ফুল দোলে" এবং "এমনি করেই পড়বে মনে" সত্যই অপূর্ব।

N 82703—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এবার দুটি পুরাতন গান আবার নতুন করে শোনা গেল। কান্তকবি রজনীকান্তের "আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে" বস্তুতঃ ক্লাসিকে পরিণত হয়েছে। বহুকাল পরে এ গানটি আবার রেকর্ডে শুনে গীতি-রসিক মাত্রেই তৃপ্ত হবেন। অপর দিকে আছে—"আর কত দিন ভবে"।

"মহাকবি গিরিশচন্দ্র" চলচ্চিত্রটি স্বল্পদিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তার সাতখানি গান আছে এবারের হিজ মাষ্টার্স ভয়েস রেকর্ডে। N 76032—"পুজিতে মহেশে হেরি" এবং "সুরায় ডুবে থাকলে পরে"। N 76033—"কিশোরীর প্রেম নিবি আয়" এবং "রাধে, না হেরিয়ে শ্যামচাঁদে"। N 76034—"আকুল বসন্তে আজি", "এমন সুধার" এবং "হরি, মন মজায়ে"। এই চিত্রের আরও দু'টি গান বেরিয়েছে 'কলম্বিয়া' রেকর্ডে।

'পরাধীন' বাণীচিত্রের গান—"মন পবনের নৌকা বেয়ে" এবং "কেন আমার মনে"—N 76031।

যন্ত্র-গীতির নতুন রেকর্ড—N87537—সুজিত নাথ ও দক্ষিণা-মোহন ঠাকুর খাম্বাজ ও কিরোয়ানী দুটি গৎ বাজিয়েছেন গীটারে ও দীলরুবায়।

কলম্বিয়া

এ বছরে কলকাতা ও বোম্বাই তথা সর্বভারতের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-পরিচালকরূপে অভিনন্দিত হেমন্ত মুখোপাধ্যায় কলম্বিয়া GE 24794 রেকর্ডে দুটি নতুন গান গেয়েছেন—"ক্লান্ত চাঁদের নয়নে ঘুম" এবং "পথে যেতে যেতে"।

GE 24795—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন গান—"রাত বুঝি ঐ বিদায় চায়" এবং "তবু আমি তোমার নামে"।

GE 24796—গম্ভীরা গানের গুণীগায়ক তারাপদ লাহিড়ী ও তাঁর সম্প্রদায় এবার দুটি চমৎকার গম্ভীরা গেয়েছেন—"ভোলা বেশ ভালো তো মজা" এবং "টসালু গো রাই আমরা"।

জনপ্রিয় সঙ্গীতমুখর চিত্র 'অসমাপ্ত' হতে নয়খানি গান কলম্বিয়া রেকর্ডে বেরিয়েছে। GE 30324—"কান্দো কেনে মনো রে" আর "ফাগুনের ফুলবনে আজ"। GE 30325—"রিমিকি ঝিমিকি ছন্দে" এবং "পূর্ণিমা নয়, এ যেন"। GE 30326—"এতো ভাবিনি কোন দিন" এবং "বাউরি হয়েছে আজ শ্রীরাধা"। GE 30327—"মনোবীণা বাজে" এবং "প্রেম করা কি জ্বালা"। GE 30328—"কন্যা তোমার কাজল"—দুই খণ্ড।

'পরাধীন' চিত্রের আর দু'খানি গান—"কেন মায়ার জালে" এবং "শুধু আশা লয়ে"।—GE 30323।

'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' চিত্রের আর দু'খানি গান—"আমায় নিয়ে বেড়ায়" এবং "নদে টলমল্ করে"—GE 30329।

'নাগরদোলা' চিত্রের গান—"কে ভোলালো দোল" এবং "নিরালা রাতে বনেতে ফুল"—GE 30330 এবং "বেহুলারে ভোর" ও "শোন শোন গল্প বলি"—GE 30331।

মোট কুড়িখানা রেকর্ডের এই নতুন পসরায় সকল শ্রেণীর শ্রোতারই মনের মত জিনিস কিছু না কিছু আছেই।

সাঙ্গীতিকী

১১শে মে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ৮ম বাৎসরিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমর মিত্র ও স্বপ্না সেনগুপ্তের উদ্বোধন-সঙ্গীতের পর অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। বাৎসরিক পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীমতী উষা গুপ্ত। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীগোপাল দাসগুপ্ত বাণীতীর্থ ও অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রী জে সি গুপ্ত এম-এল-এ, শ্রীমতী দীপালী নাগ। অনুষ্ঠান উদ্বোধকের আসন গ্রহণ করেন শ্রীঅশোক সেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন নৃত্যশিল্পী নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। নৃত্য বিচিত্রায় বেদানা রায়-চৌধুরী, ছন্দা চক্রবর্তী, ভাঁরতী সেনগুপ্ত, মুক্তি চক্রবর্তী, অঞ্জলি রায়, আলো বাগচি, গীতা বোস, আরাধনা মিত্র, মাধুরী ব্যানার্জি, তুষার গুহ, কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, নন্দিতা দেব, পাপিয়া ঘোষ, টুটু বোস, অনুভা চক্রবর্তী। বিভিন্ন নৃত্যে ও রাবণ-বধ নৃত্য-নাট্যে শুক্লা সেনগুপ্ত ও ইরাণী কর, স্বপ্না ঘোষ, স্বাগতা রায়, মৈত্রী বোস দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও দর্শকবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করে। অনুষ্ঠানে শ্রীমতী দীপালী নাগ একটি সঙ্গীত পরিবেশন করেন, যন্ত্রসঙ্গীত পরিচালনা করেন যন্ত্রশিল্পী সঞ্জয়। গত ২৬শে মে সন্ধ্যায় আলাউদ্দিন সঙ্গীত-সমাজের মাসিক সঙ্গীতানুষ্ঠান ১০৩বি, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীটে (সমাজ হলে) অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমে বাণী রায় ভজন গান করেন। তারপর উক্ত সঙ্গীত-সমাজের ছাত্র শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী 'নন্দকোষ' রাগে সেতার বাজান। সভার প্রারম্ভে সমাজের সম্পাদক ওস্তাদ আলী আমেদ খাঁ ঘোষণা করেন যে, প্রসিদ্ধ নৃত্য-শিল্পী শ্রীমতী ঝর্ণা সাহা (বর্তমানে শ্রীমতী রায়) আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের শিক্ষা বিভাগে নৃত্যের শিক্ষিকারূপে যোগ দিয়াছেন—তিনি প্রতি শনিবারে উক্ত শিক্ষা-কেন্দ্রে নৃত্য শিক্ষা দিবেন। ১লা বৈশাখ হাওড়া ধ্রুপদ সঙ্গীত সমাজের ২য় বার্ষিক অনুষ্ঠান সুরেন্দ্র মেমোরিয়াল হলে (১১।১৭, জয়নারায়ণ বাব আনন্দ দত্ত লেন) সম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় কটন বোর্ডিং ইনষ্টিটিউশনের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীসুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সম্প্রতি শিশিরকুমার ইনষ্টিটিউট-এ অনুষ্ঠিত ও পরিচালিত আন্তঃ বিদ্যালয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় নয় বৎসর বয়স্কা কুমারী স্বপ্না সেনগুপ্তা খেয়াল, ভজন ও প্রাচীন বাঙ্গলা গানে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম ও তারাণা রবীন্দ্রসঙ্গীতে ও কীর্তনে ২য় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেয়। সঙ্গীতাচার্য শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের ৬৬তম জন্মবার্ষিক উৎসব গত ১১শে মে ৪৮।১ রামতনু বসু লেনস্থ ভবনে সম্পন্ন হইয়াছে।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বেতার অনুষ্ঠান

১লা জ্যৈষ্ঠ—কমলা ঝরিয়া—গজল ও দাদরা। ২রা—বিভূতি ভূষণ চট্টোপাধ্যায়—সেতার। কৃষ্ণা বসু—রাগপ্রধান। ৩রা—মালবিকা রায়—খেয়াল। ৪ঠা—কমলা বসু—রবীন্দ্র সংগীত। প্রসূন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—খেয়াল। ৫ই—উত্তরা দেবী—কীর্তন। ৬ই—মীরা চট্টোপাধ্যায়—খেয়াল ও ঠুংরি। আলি হোসেন ও সম্প্রদায়—সানাই। ৭ই—উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—খেয়াল। শ্রীলা সেন—রবীন্দ্র সংগীত। ৮ই—সুখেন্দু গোস্বামী—ঠুংরি। দীপালী নাগ—খেয়াল। ৯ই—দেবব্রত বিশ্বাস—রবীন্দ্র-সংগীত। আতা হোসেন খাঁ—খেয়াল। ১০ই—মহম্মদ দবীর খাঁ—বীণা। পূরবী সরকার—রবীন্দ্র-সংগীত। ১১ই—পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ—ঠুংরি। ১২ই—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত। ১৩ই—উৎপলা সেন—আধুনিক। ১৪ই—প্রতিমা চক্রবর্ত্তী—রবীন্দ্র-সংগীত। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক। ১৫ই—রাধিকামোহন মৈত্র—সরোদ। সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত। ১৬ই—রেণুকা অধিকারী—গীটার। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—আধুনিক ও ঠুংরি। ১৭ই—অনিতা মজুমদার—রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান। ২০শে—ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়—কীর্ত্তন। ২১শে—আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত। ২২শে—ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র—ঠুংরি। ২৩শে—মহম্মদ সাগীরুদ্দীন—সারেঙ্গী। এ, ডাগর—ধ্রুপদ। ২৪শে—চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত। শম্ভু গুপ্ত—অতুলপ্রসাদের গান। ২৫শে—কে, সি, দে—কীর্ত্তন। ২৬শে—নীলিমা সেন—রবীন্দ্র-সংগীত। ২৭শে—চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল ও ঠুংরি। ২৮শে—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী—সরোদ। বেলা ভট্টাচার্য—রবীন্দ্র-সংগীত। সতীনাথ মুখোপাধ্যায়—রাগপ্রধান। ২৯শে—গৌরী দাস—রবীন্দ্র-সংগীত। রথীন চৌধুরী—আধুনিক। ৩০শে—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত ও আধুনিক।

আমার কথা (১৮)

সুনীল বসু (আকাশবাণী, কলিকাতা)

আমাদের আদি নিবাস—হুগলী জেলার বিঘাটিপালেরা গ্রাম, আমার জন্ম কলকাতায়, ১৯১৪ সালে ২৩শে জুন তারিখে। বাবা স্বর্গীয় ক্ষীরোদকুমার বসু বোম্বের গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ ক'রে কলকাতায় প্র্যাকটিশ করতে চ'লে আসেন এবং তখনই আমরা পাঞ্জাব ছেড়ে পুনর্বার বাংলাদেশে বসতিস্থাপন করি।

আম্বালা (পাঞ্জাবে) বেনারসিদাস হাইস্কুলে আমার ছাত্রজীবনের সূত্রপাত। কয়েক বৎসর ওখানে পড়বার পর আমরা কলকাতায় চলে আসি এবং এখানে টাউন স্কুলে ভর্ত্তি হই। টাউন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করার পর সিটি কলেজে আই, এ, ক্লাসে ভর্তি হই; এক বৎসর পরে রিপণ কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) যাই এবং ওখান থেকে আই, এ পাশ করি। তারপর ১৯৩৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি, এ পাশ করে রিপণ ল কলেজে পড়তে থাকি। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজে পড়েছিলাম। ঐ বছরেই কলকাতা বেতার কেন্দ্রে 'প্রোগ্রাম



সুনীল বসু

এ্যাসিষ্টাণ্ট' বা পি এ.-র পদে অধিষ্ঠিত হই। কার্যব্যপদেশে পাটনা, ঢাকা, কলকাতা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, বরোদা, আমেদাবাদ, বেজওয়াদা প্রভৃতি ভারতবর্ষের প্রায় রেডিও ষ্টেশনের সংগেই আমাকে সংশ্লিষ্ট হতে হয়েছে। বর্তমানে আমি কলকাতা কেন্দ্রের সহকারী ষ্টেশন ডাইরেক্টার।

বাবার কাছে সংগীতশিক্ষার প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত করে আমি কাত্রাসগড়ের (ঝরিয়া) ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ সাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। তারপর ক্রমান্বয়ে সুরেন দাস, ওস্তাদ ছোটে খাঁ, ওস্তাদ মুস্তাক হোসেন খাঁ, গোয়ালিয়রের জ্যোতিভূষণ যোগেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (কোটিরাম) এবং সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তীর কাছে সংগীত শিক্ষা করি।

১৯১৭ সালে আমি কলকাতা বেতারকেন্দ্রে সর্বপ্রথম উচ্চাংগ এবং লঘু উভয় শাখাতেই গান করি। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। এর পর উত্তর জীবনে আমি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত বেতারকেন্দ্রেই গান করেছি। ১৯২৮ সালে H. M. V. গ্রামোফোন কোম্পানীতে প্রথম রেকর্ড করি—'আলোকধারার পাগল মেয়ে' এবং 'গহনঘন তমালবনে'—রেকর্ডটি। H. M. V. Megaphone এবং বোম্বের Broadcast Record Companyতে আমি রেকর্ড করেছি। আমার শেষ রেকর্ড প্রকাশিত হয় H. M. V. থেকে।

উচ্চাংগ ও আধুনিক গান ছাড়া নজরুল-গীতিও আমি অনেক গেয়েছি। উদাহরণত আমারই গাওয়া 'জাগো জাগো রে মুসাফির' নজরুল-গীতিটি একসময় খুব নাম করেছিল। নিজের সুরেও আমি অনেক রেকর্ড করেছি এবং অন্যেরাও আমার সুরে অনেক গান গেয়েছেন। আমার সুর-যোজিত গানগুলির মধ্যে 'লাগিল রে দোলা', 'আজি এ সাঁঝে ওগো একলা ঘরে' প্রভৃতি গানগুলি একসময় অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। বেতারকেন্দ্র ও গ্রামোফোন কোম্পানীতে গান গাওয়া ছাড়া চলচ্চিত্রে সুর-যোজনার ক্ষেত্রেও একসময় অবতীর্ণ হয়েছিলাম। ১৯৩৩-৩৫ সালে 'তরুণী' ও 'তুলসীদাস' নামে দুটো ছবিতে আমি সুরারোপ করেছিলাম। বলা বাহুল্য, তখন আমি কলেজের ছাত্র। এছাড়া কলকাতার এবং বাইরের বহু নাম-করা জলসায় আমি অংশগ্রহণ করেছি।

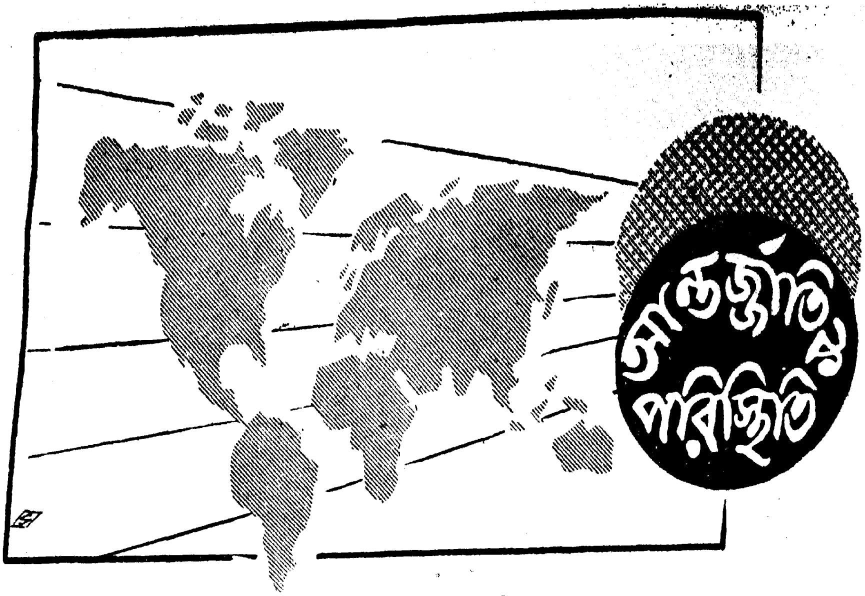
শিল্পীজীবনে গিরিজাশংকর চক্রবর্তী এবং নজরুল ইসলাম, এঁদের দু'জনের ঘনিষ্ঠ সাহচর্য পাবার সৌভাগ্যে আমি আনন্দগর্বিত। শিশু-ভোলানাথ কবির কত মিষ্টি নিবিড় সান্নিধ্যে কত দিন যে কাটিয়েছি তার কি ঠিক আছে? প্রাণচঞ্চল আনন্দমাদনায় কবি শুনিয়েছেন তাঁর গান, আবার শুনেছেন আমারও গান। লিখেছেন আর সংগে সংগেই সুর করেছেন, সুর করেছেন আর আপন আনন্দেই বলেছেন সে গান রেকর্ড করতে। গ্রামোফোন কোম্পানীর অনুমতিতে সে সব গানের অনেকগুলি রেকর্ডও করেছি। রেকর্ড শুনে কাজিদা স্বভাবতঃই খুব খুশি, খুশিতে জড়িয়ে ধরেছেন। কাজিদার সেই প্রাণময় কণ্ঠ আজ নীরব। এ কথা ভাবলেও দুঃখ পায়, কান্না আসে। কাজিদার জন্যে কিছুই করতে পারি নি। সেদিন চারদিনব্যাপী নজরুল জন্মজয়ন্তীতে তাঁর গান সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আলোচনা ক'রে খানিকটা মুক্তভার মনে হলো। যাক এটুকু একেবারে তুচ্ছ তো নয়! সামান্য হলেও শিল্পীজীবনে গিরিজাশংকর এবং নজরুল ছাড়া শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শচীন দাস (মতিলাল), প্রমুখ কৃতকীর্তি সংগীতজ্ঞরও ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পাওয়াতে আমি বিশেষ আনন্দিত।

গান ক'রে প্রথম আমি পুরস্কার লাভ করি 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংগীত-প্রতিযোগিতায়' ১৯৩৩ কি '৩৪ সালে তারিখটা ঠিক মনে নেই। মোট কথা, সেই প্রতিযোগিতায় 'Bestman Prize'টা আমিই পেয়েছিলাম। আর তারপরে বেনারসে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত সংগীত-প্রতিযোগিতায় যোগদান করি এবং সেখানেও প্রথম পুরস্কার ও স্বর্ণপদক লাভ করি। শিল্পীজীবনে গান আমি গেয়েছি ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত স্থানেই। কলকাতা, কানপুর, বেনারস, এলাহাবাদ, মজঃফরপুর, প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সংগীত সম্মেলন সমূহে আমি বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছি।

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস-চর্চা আমার অন্যতম প্রিয় বিষয়। ভারতীয় সংগীত সম্পর্কে আমি বহুজায়গায় বক্তৃতাও দিয়েছি যেমন, লিখেওছি তেমনি বহু পত্র-পত্রিকায়। এই সমস্ত প্রবন্ধ প্রধানত ইংরাজিতে লেখা। বাংলাতেও অবশ্য লিখেছি।

সংগীত সম্পর্কেই আমার প্রথম কথা হলো, Brain, Throat এবং Heart অর্থাৎ বুদ্ধি, কণ্ঠস্বর এবং বোধি বা অনুভূতির সার্থক সাযুজ্যের সানন্দ কলশ্রুতিই হলো ভালো গান। গাইয়ের মধ্যে এই তিনটির যে কোনো একটির অভাব হ'লেই গান ত্রুটি-মলিন হতে বাধ্য। প্রসংগত আমাদের উচ্চাংগ সংগীতের জনপ্রিয়তার অভাবের কথা উল্লেখ করতে হয়। উচ্চাংগ-সংগীত জনপ্রিয় না হবার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে—উচ্চাংগ-সংগীতের বেশিরভাগ শিল্পীই সংগীতের রসমাধুর্যের প্রতি কোনো নজর না দিয়ে ব্যাকরণ নিয়েই মেতে ওঠেন এবং সেই জন্যে তাঁদের সংগীতের শেষ পর্যন্ত এক-ঘেঁয়েমিই ফুটে ওঠে বেশি। এ মন্তব্য রেডিওর ভেতরে এবং বাইরে উভয়প্রকার সংগীতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অবশ্য সম্প্রতি উচ্চাংগ সংগীতের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করছি এবং নিঃসন্দেহেই এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা।


LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।
L. 261-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

সিঙ্গাপুরের ভবিষ্যৎ—

সিঙ্গাপুরের প্রধান মন্ত্রী মিঃ ডেভিড মার্শাল বড় আশা করিয়া স্বাধীনতা আনিবার জন্ত লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ২৩শে এপ্রিল (১৯৫৬) হইতে তিন সপ্তাহ ব্যাপী আলোচনার পর ১৫ই মে আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি নিরাশ হইয়া শূন্য হস্তে সিঙ্গাপুরে ফিরিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার আশা করিবার কারণ যে একেবারেই ছিল না, তাহাও নয়। তিনি বৃটিশের একজন বিশেষ অনুরাগীভক্ত এবং কম্যুনিজমেরও ঘোরতর বিরোধী। তা ছাড়া তাঁহার দাবীও খুব বেশী কিছু ছিল না। শুধু আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অবিলম্বে পূর্ণ কর্তৃত্ব পাইলেই তিনি খুসী। পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষার ব্যাপারে বৃটিশের পূর্ণকর্তৃত্বই তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেন। তাঁহার দাবী যে সত্যই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টও তাঁহার মনে আশা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ কিছুটা যে দিয়াছিলেন, তাহাতেও সন্দেহ নাই। নূতন শাসনতন্ত্র অনুসারে সাধারণ নির্ব্বাচনের পর ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রধান মন্ত্রীরূপে মিঃ মার্শাল মন্ত্রিসভা গঠন করার পরই গবর্ণরের ভেটো ক্ষমতা লইয়া গবর্ণর স্যার রবার্ট ব্ল্যাকের সহিত তাঁহার মতবিরোধ দেখা দেয়। সাধারণ শাসনকার্য্যে গবর্ণর তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ না করিলে তিনি পদত্যাগের হুমকীও দিয়েছিলেন। ঐ সময় তিনি পদত্যাগ করিলে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হওয়ার আর কোন সম্ভাবনা ছিল না। নূতন শাসন-সংস্কারই ব্যর্থ হইয়া যাইত। একজন বৃটিশ অনুরাগীর প্রধানমন্ত্রিত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে, বৃটেনের রক্ষণশীল গবর্ণমেণ্টও তাহা চাহেন নাই। বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব মিঃ লেনক্স বয়েড বৎসরের মাঝামাঝি সিঙ্গাপুরে যাইয়া এই ভাবে মীমাংসা করিয়া দিয়া আসেন যে, মন্ত্রিসভাই সিঙ্গাপুর শাসন করিবে, গবর্ণর তাঁহাদের কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন না। নূতন শাসন সংস্কার অনুযায়ী এক বৎসর শাসনকার্য্য চলার পর শাসনতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সংশোধন সম্পর্কে আলোচনার জন্ত একদল প্রতিনিধিকেও লণ্ডনে আমন্ত্রণ করা হয়। তদনুসারে প্রাথমিক আলোচনার জন্ত মিঃ মার্শাল গত ডিসেম্বর (১৯৫৫) মাসে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ঐ আলোচনায় স্থির হয় যে, ১৯৫৬ সালের ২৩শে এপ্রিল সিঙ্গাপুরের শাসনতন্ত্র সংশোধন সম্পর্কে লণ্ডনে আলোচনা-বৈঠক বসিবে। এই বৈঠকে কি কি বিষয় আলোচিত হইবে, তাহাও ঐ সময়ই স্থির করা হইয়াছিল। এই প্রাথমিক আলোচনার ভিত্তিতেই মিঃ মার্শালের নেতৃত্বে বার জন সদস্যের এক প্রতিনিধি-দল সিঙ্গাপুরের ভবিষ্যৎ শাসন সংস্কার সম্পর্কে আলোচনার জন্ত লণ্ডনে গিয়াছিলেন। ডিসেম্বর (১৯৫৫) মাসে মিঃ বয়েডের সহিত আলোচনায় মিঃ মার্শাল খুব খুসী হইয়াছিলেন। তাঁহার মনে বিশেষ আশার সঞ্চার হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'সকলি গরল ভেল।'

আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলিতে যাইয়া মিঃ মার্শাল নিজেই স্বীকার করিয়াছেন, 'আমরা সব কিছুতেই রাজী হইয়াছিলাম। আমরা আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম।' আত্মসমর্পণের পরেও আর কি থাকিতে পারে যাহার জন্ত আলোচনা ব্যর্থ হইল, তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয়। পররাষ্ট্র ও দেশরক্ষার ব্যাপারে সম্পূর্ণ বৃটিশ কর্তৃত্ব মিঃ মার্শাল মানিয়াই লইয়াছিলেন। কমন্স সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে মিঃ বয়েডও স্বীকার করিয়াছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যতীত পররাষ্ট্র ব্যাপারে এবং দেশরক্ষায় বৃটিশের কর্তৃত্বই বজায় থাকিবে, এ সম্পর্কে উভয় পক্ষই একমত হইয়াছিলেন। সুতরাং মতানৈক্য সৃষ্টি হইয়াছিল আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা লইয়া। এ ক্ষেত্রেও মিঃ মার্শাল যে সত্যই আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রস্তাবগুলি আলোচনা করিলেও বুঝিতে পারা যায়। প্রথমে তাঁহার প্রস্তাব ছিল, স্বভাবিক অবস্থায় আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর গবর্ণমেণ্টেরই পূর্ণকর্তৃত্ব থাকিবে, কিন্তু জরুরী অবস্থা দেখা দিলে বৃটেন শাসনতন্ত্র বাতিল করিয়া স্বহস্তে শাসন-ক্ষমতা গ্রহণ করিতে পারিবেন। ইহা আত্মসমর্পণ ছাড়া

আর কি ? কিন্তু শাসনতন্ত্র বাতিলের প্রস্তাব মিঃ বয়েডের পছন্দ হয় নাই। কেন পছন্দ হয় নাই ? সম্মুখে মন্ত্রিসভার শিখণ্ডী থাকিবে না বলিয়াই নয় কি ? বিলাতের টাইমস পত্রিকা বলিয়াছেন, শাসনতন্ত্র বাতিল করিলে জাতীয় মনোভাবে আঘাত করা হয়। সিঙ্গাপুরের জনগণের জাতীয় মনোভাবের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের কি অসীম দরদ ! এই দরদ প্রদর্শন করিয়াই বৃটিশ গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে দাবী করা হয় যে, সিঙ্গাপুরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে অর্ডার-ইন-কাউন্সিল দ্বারা আইন প্রণয়নে সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিমণ্ডলীকে রাজী হইতে হইবে। বৃটিশের এই দাবীর পাল্টা দাবী হিসাবে মিঃ মার্শাল আর একটি প্রস্তাব করেন। এই প্রস্তাবের মূল কথা এই যে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি কাউন্সিল গঠন করা হইবে। উহার চেয়ারম্যান হইবেন একজন মালয়ী এবং সিঙ্গাপুরের তিনজন মন্ত্রী এবং তিনজন প্রধান বৃটিশ সামরিক কর্ম্মচারী উহার সদস্য হইবেন। বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাতেও রাজী হইতে পারিলেন না। তাঁহারা দাবী করিলেন, বৃটিশ হাইকমিশনারকে ঐ কাউন্সিলের চেয়ারম্যান করিতে হইবে। সোজা কথায় ইহার অর্থ অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ব্যাপারেও পূর্ণ বৃটিশ কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখিতে হইবে। অবশেষে মিঃ মার্শাল প্রস্তাব করেন যে, সিঙ্গাপুরের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে বৃটিশ কমন্স সভা আইন প্রণয়ন করিতে পারিবেন। মিঃ বয়েড এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোন যুক্তি উত্থাপন করিতে পারেন নাই। সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিমণ্ডলী এই প্রস্তাব সম্পর্কে একমত নহেন, এই অজুহাত তুলিয়া তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। আলোচনা ব্যর্থতায় পর্য্যবাসিত হইল। সত্যই কি এই প্রস্তাব সম্পর্কে সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিমণ্ডলী এক হইতে পারেন নাই ?

শ্রমিক ফ্রণ্ট, উদারনৈতিক দল এবং পিপলস্ এ্যাকশন পার্টি সিঙ্গাপুরের এই তিনটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া এই প্রতিনিধিমণ্ডলী গঠিত হইয়াছে। শেষোক্ত দলটি চরমপন্থী। তাঁহাদের দাবী পূর্ণ স্বাধীনতা। শ্রমিক ফ্রণ্ট মিঃ মার্শালের দল। তাঁহারা আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থার উপর কর্ত্তৃত্ব পাইলেই খুসী। উদারপন্থীরা অন্তর্বর্তী কালে তাহাও চান না। তথাপি মিঃ মার্শালের শেষ প্রস্তাব লইয়া তাঁহাদের মধ্যে মতভেদ হইয়াছিল, একথা স্বীকার করার মত কিছু জানা যাইতেছে না। বৃটিশ শাসকশ্রেণী সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধি মণ্ডলীর মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। মিঃ মার্শাল যাহাতে রাজী হইতে পারেন নাই, আর কেহ তাহাতে রাজী হইয়া মীমাংসা করিবেন এবং মীমাংসা করিয়া সিঙ্গাপুরে স্থায়ী গবর্ণমেন্ট গঠন করিবেন, এইরূপ ভরসা করিবার মতও কিছু দেখা যায় না। কিন্তু মিঃ বয়েডের মনে খুব সম্ভব আশঙ্কা জাগিয়া ছিল যে, একটা মীমাংসা যদি এখনই হইয়া যায়, তবে উহাই যে চূড়ান্ত হইবে, তাহার নিশ্চয়তা কোথায় ? মিঃ মার্শালের স্থানে যদি চরমপন্থীদের কেহ প্রধান মন্ত্রী হন, তাহা হইলে তিনি শাসন-সংস্কার সম্পর্কে নূতন দাবী তুলিতে পারেন। সিংহলের অবস্থা দেখিয়া বৃটিশ গবর্ণমেন্ট বিশেষ ভাবে সতর্ক হইয়াছেন বলিয়াই মনে হয়। মিঃ বয়েডের দৃষ্টিতে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের প্রস্তাব imaginative

and constructive হইতে পারে, কিন্তু সিঙ্গাপুরের অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা কিসে পূরণ হইবে, তাহা স্থির করিবার অধিকার তাঁহার নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বৃটেন এখনও তাহার কাল্পনিক সাম্রাজ্যের জীবনধারার কল্পিত প্রাণকেন্দ্রগুলির মায়া ছাড়িতে পারে নাই। গত ১১শে মে (১৯৫৬) সহকারী বৃটিশ ঔপনিবেশিক সচিব লর্ড লয়েড এডেনে বলিয়াছেন যে, বৃটেন কোন সময়ে এডেন সম্পর্কে তাহার দায়িত্ব শিথিল করিবে, তাহা তিনি দেখিতে পাইতেছেন না। ইহাই দুই দিন পরে টোরীদের এক সমাবেশে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড বলিয়াছেন যে, তাঁহারা দ্বীপবাসী; বিদেশে তাঁহাদের যে স্বার্থ আছে, তাহার উপরে তাঁহাদিগকে নির্ভর করিতে হয়; যে-কোন মূল্যে শক্তিকেন্দ্রগুলিকে তাঁহাদের রক্ষা করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি সাইপ্রাস, এডেন ও সিঙ্গাপুরের কথা উল্লেখ করেন। জিব্রাল্টার ও হংকং-এর নাম কেন করেন নাই, তাহা বুঝা গেল না। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভগ্নস্তূপের মধ্যে এই সকল ঘাঁটির সার্থকতা কি, স্থানীয় অধিবাসীদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এই সকল ঘাঁটি জরুরী অবস্থায় রক্ষা করা সম্ভব হইবে কিনা, অবশিষ্ট যাহা কিছু আছে, তাহা রক্ষা করিবার আগ্রহে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাহা ভাবিয়া দেখিবেন, ইহা অবশ্য আশা করা সম্ভব নয়। সুয়েজের সামরিক ঘাঁটি বৃটেন বড় সহজে পরিত্যাগ করে নাই। লণ্ডন বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার উহাই প্রধান কারণ। বৃটেন সিঙ্গাপুরের উপর তাহার শাসন নিয়ন্ত্রণ একটুকুও ক্ষুণ্ণ করিতে রাজী নয়।

আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের মরণ কামড়—

১৯৫৪ সালের নবেম্বর হইতে আলজেরিয়ায় যে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে, গত দেড় বৎসরে তাহা অধিকতর ব্যাপক ও প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই বিদ্রোহ দমনের জন্য ফ্রান্স সমগ্র আলজেরিয়াকেই এক বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। বহু অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের ১লা নবেম্বর হইতে বর্ত্তমান বৎসরের (১৯৫৬) ১০ই মে পর্য্যন্ত ফ্রান্সের ৮ শত সৈন্য নিহত হইয়াছে, আহত হইয়াছে ২ হাজার সৈন্য এবং ৩৫০ জন সৈন্য নিখোঁজ হইয়াছে। ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ অবশ্য বিদ্রোহীদের পক্ষেই বেশী হইয়াছে। ইহা খুবই স্বাভাবিক। উক্ত সময়ের মধ্যে ৮ হাজার বিদ্রোহী নিহত এবং ৫ শত আহত হইয়াছে। সাড়ে তিন হাজার বিদ্রোহী ধরা পড়িয়াছে। উভয় পক্ষে অসামরিক লোকও বড় কম হতাহত হয় নাই। ইউরোপীয় অসামরিক লোক ১৯৫ জন এবং মুসলমান অসামরিক লোক ১ হাজার ৫ শত জন নিহত হইয়াছে। ইহার উপর আহত ও নিখোঁজ লোকের সংখ্যা তো আছেই। ফ্রান্স আলজিরিয়ায় যে বিরাট নরমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিতেছে, এই সংখ্যা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ১লা জুন (১৯৫৬) আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের সৈন্য-সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩ লক্ষ ১০ হাজার। বিদ্রোহীদের মোট সংখ্যা ১৫ হাজার। আলজেরিয়ায় এই রক্তপ্লাবন বন্ধ করিবার জন্য ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরু গত ২২শে মে লোকসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পাঁচ দফার এক শান্তি-প্রস্তাব করিয়াছেন। তন্মধ্যে উভয় পক্ষ কর্ত্তৃক হিংসাত্মক কার্য্যকলাপের অবসান ঘোষণা, স্বাধীনতার ভিত্তিতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আলজেরিয়ার জাতীয়-সত্তা ও ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, জাতি নির্ব্বিশেষে আলজেরিয়ার সকল অধিবাসীর সমান অধিকারের স্বীকৃতি অন্যতম প্রস্তাব। দুই বৎসর পূর্ব্বেই ইন্দোচীন সম্পর্কে নেহরুজীর শান্তি-প্রস্তাব ফ্রান্স গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু আলজেরিয়া সম্পর্কে তাঁহার শান্তি প্রস্তাবকে ফ্রান্সের বর্ত্তমান সমাজতন্ত্রী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলে আমল দেন নাই।

ফরাসী জাতীয় পরিষদে ফরাসী উত্তর আফ্রিকা সম্পর্কে বিতর্কের উত্তরে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলে গত ২রা জুন (১৯৫৬) বলিয়াছেন যে, আলজেরিয়ায় তাঁহারা নূতন ব্যবস্থা (New Order) কার্য্যকরী করিতে প্রস্তুত আছেন, কিন্তু ফ্রান্সের সহিত আলজেরিয়ার বন্ধন ছিন্ন হইতে দিবেন না। তাঁহার এই 'নূতন ব্যবস্থা' যে কি, তাহা তিনি বলেন নাই। তবে এইরূপ প্রকাশ যে, সৈন্য-বাহিনী দ্বারা বিদ্রোহীদিগকে পার্ব্বত্য অঞ্চলে আবদ্ধ রাখিয়া সমতল অঞ্চলে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান করা হইবে এবং এই নির্ব্বাচনে যে সকল আরবনেতা নির্ব্বাচিত হইবেন, তাঁহাদের সহিত শান্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হইবে। এই আলোচনা যে আলজেরিয়ার স্বাধীনতার ভিত্তিতে হইবে না, তাহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। আরবরা এই নির্ব্বাচনে যে অংশ গ্রহণ করিবে তাহার নিশ্চয়তা কোথায়? আলজেরিয়ার জাতীয় বাহিনীর অধিনায়ক বেন বেল্লা তাঁহার গুপ্ত আবাসে এক সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, ফ্রান্স যদি আলজেরিয়ার স্বাধীনতা দানের নীতি স্বীকার করে, তবে বিদ্রোহীরা আলোচনা করিতে রাজী আছে। আরবরা নির্ব্বাচনে যোগ না দিলেও ফ্রান্সের ক্ষতি হইবে না। ফরাসী জমিদারদের আরব-তাঁবেদাররা নির্ব্বাচিত হইবে। ১৯৫১ সালেও এইরূপ অবস্থাই হইয়াছিল।

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মে (১৯৫৬) মাসের মধ্য ভাগে মস্কো গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রনায়কদের নিকট হইতে আলজেরিয়ায় ফ্রান্সের নীতি সম্পর্কে সমর্থন আদায় করিতে পারেন নাই। আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া মস্কো রেডিও হইতে যে ঘোষণা করা হইত, তাহা অবশ্য এখন বন্ধ করা হইয়াছে। ইহা হয়ত মঃ মলে এবং মঃ পিনোর মস্কো ভ্রমণেরই ফল। কিন্তু মস্কো রেডিও হইতে সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্তি সম্পর্কে ঘোষণা চলিতেছে। আলজেরিয়া নীতি সম্পর্কে মতভেদ হওয়ার ফলে দপ্তরহীন মন্ত্রী প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মেঁদে ফ্রাঁস পদত্যাগ করিয়াছেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, আলজেরিয়ার এই দমননীতি চিরকাল চলিতে পারে না। উহা সাফল্যলাভ করিবে, ইহাও দুরাশা। জুন মাসের মাঝামাঝি বিদ্রোহীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্ভব হইবে বলিয়া ফ্রান্স দুরাশা পোষণ করিতে পারে, কিন্তু বিদ্রোহীদল এখনও অটুট রহিয়াছে। মঃ মলের দৃষ্টিতে ইহারা অল্পসংখ্যক সশস্ত্র দস্যু হইতে পারে। কিন্তু ইহারাই আলজেরিয়ার আত্মত্যাগী দেশপ্রেমিক।

মলটভের পদত্যাগ—

যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো ২রা জুন (১৯৫৬) মস্কো পৌঁছেন। তাহার পূর্ব্বদিন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ মলটভ পদত্যাগ করেন। এই দুইটি ঘটনার মধ্যে একটা কার্য্যকারণ সম্বন্ধ

রহিয়াছে বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে রুমানিয়ায় অনুষ্ঠিত কমিনফর্ম্মের বৈঠকে যুগশ্লাভ কম্যুনিষ্ট পার্টিকে কমিনফর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করা হয়। উহার আট বৎসর পর ১৯৫৬ সালের জুন মাসে টিটো রাশিয়ায় গমন করিলেন। কমিনফর্ম্মের ঐ বৈঠকে ঝানভের সহযোগীরূপে মলটভ উপস্থিত ছিলেন না, ছিলেন ম্যালেনকভ। কিন্তু যুগোশ্লাভিয়াকে বহিষ্কৃত করিয়া যে নির্দ্দেশনামা রচিত হয় তাহাতে দস্তখত করেন মলটভ। প্রাক্তন অপরাধীকে রাশিয়ার সম্মানিত অতিথিরূপে সম্বর্দ্ধনা করা রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসাবে মলটভের পক্ষে শুধু বিসদৃশই হইত না গ্লানিজনকও হইত। মঃ মলটভের স্থানে রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হইয়াছেন প্রাভদার প্রাক্তন সম্পাদক মঃ শেপিলভ। প্রাভদার সম্পাদকরূপে তিনিও মার্শাল টিটোর বিরুদ্ধে কম বিষোদ্গার করেন নাই। রাশিয়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্রনায়কগণ টিটোর সহিত আবার বন্ধুত্ব স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যই এক বৎসর পূর্ব্বে এইরূপ সময়ে মার্শাল বুলগানিন ও মঃ ক্রুশ্চেভ যুগোশ্লাভিয়ায় গিয়াছিলেন। টিটোর বহিষ্কারের জন্য ষ্ট্যালিন, ঝানভ, না বেরিয়া কে দায়ী এই প্রশ্ন এখন হয়ত অবান্তর। ষ্ট্যালিন ও ঝানভ মারা গিয়াছেন। বেরিয়াকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইয়াছে। কিন্তু টিটোর বহিষ্কারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে আছেন মলটভ। রুশ রাষ্ট্রনায়কগণ টিটোর আগমন উপলক্ষে মলটভকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করিবেন, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু তিনি এখনও সহকারী প্রধান মন্ত্রীদের একজন এবং দলের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য রহিয়া-গিয়াছেন। এই পদ দুইটিতে আর কতদিন তাঁহাকে রাখা হইবে তাহা বলা কঠিন। সোভিয়েট আজেরবাইজানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাগিরভের মতই তাঁহার অবস্থা হইবে কি না, তাহাও বলা সম্ভব নয়।

মার্শাল টিটো রাশিয়ায় না গেলেই যে মলটভকে পররাষ্ট্র মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত করা হইত না তাহাও নয়। ষ্ট্যালিনবাদ বিলোপের যে নীতি নয়া রুশ রাষ্ট্রনায়করা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার অগ্রগতির সঙ্গে মলটভকে অপসারিত হইতে হইত-ই। টিটোর আগমনকে উপলক্ষ করিয়া উহাকে নাটকীয় রূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। ষ্ট্যালিন-বিরোধী বলশেভিক নেতাদের অপসারণের জন্য যে-সকল বিচারে তাঁহারা দণ্ডিত হইয়াছেন সেগুলি যে আইনসঙ্গত ভাবে অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাহা লইয়া আজ রুশ সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র ভাষায় আলোচনা চলিতেছে। এই সকল বিচারের মধ্যে প্রধান প্রধান বিচার হইয়াছে মলটভ যখন রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। মলটভ রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ১৯৩০ সাল হইতে ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত। রাশিয়ার ভিতরে এবং বাহিরে ষ্ট্যালিন-পন্থীরা মলটভের উপর অনেকখানি ভরসা করিয়াছিলেন। মলটভের অপসারণে তাঁহারা যে নিরাশ হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার অপসারণে রুশ পররাষ্ট্রনীতির গুরুতর কিছু পরিবর্ত্তন হইবে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই পররাষ্ট্র নীতি নিয়ন্ত্রণে তাঁহাকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া হইত না। তিনি রূঢ়ভাষী বলিয়া খ্যাত। রাশিয়া যতদিন দুর্ব্বল ছিল ততদিন রূঢ়ভাষিতার প্রয়োজনীয়তাও হয়ত ছিল। কিন্তু রাশিয়া এখন শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে। মঃ শেপিলভ মিষ্টভাষী। শক্তিশালী রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে তাঁহার পক্ষে 'Carry a big stick and speak softly নীতি অনুসরণ করা কঠিন হইবে না।

টিটো তিন সপ্তাহ রাশিয়া ভ্রমণে কাটাইবেন। এই ভ্রমণ ও রুশ-নেতাদের সহিত আলোচনার ফলে তিনি আবার রুশ শিবিরে ফিরিয়া যাইবেন, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। রাশিয়ার প্রভাবের বাহিরেও যে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র থাকিতে পারে এবং রাশিয়ার সহিত তাহার মৈত্রী থাকাও সম্ভব নয়া রুশ রাষ্ট্রনায়করা তাহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন। টিটোর রাশিয়া ভ্রমণের ইহাই সার্থকতা। রাশিয়া ভ্রমণে যাইবার পূর্ব্বে টিটো ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। মে মাসের (১৯৫৬) মধ্যভাগে ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মস্কো গিয়াছিলেন। এই ভ্রমণের একমাত্র দৃষ্টফল বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময় সম্পর্কে ফ্রান্স-রুশ চুক্তি। ইহার বেশী কেহ-ই প্রত্যাশা করেন নাই। মস্কো যাওয়ার ফলে ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলের মনে এই বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভবপর। শান্তিপ্রতিষ্ঠা হউক আর নাই হউক বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র নায়কদের এইরূপ ভ্রমণ এবং আলাপ-আলোচনা যে আন্তর্জ্জাতিক উত্তেজনাকে অনেকখানি প্রশমিত রাখে তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রসঙ্গে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট ডাঃ সোয়েকর্ণের মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের কথাও উল্লেখযোগ্য। মার্কিণ কংগ্রেসে তাঁহার বক্তৃতায় তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার নবজাগরণের তাৎপর্য্য বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "আপনারা যদি ইহা বোঝেন, তাহা হইলে যুদ্ধোত্তর ইতিহাসের চাবিকাঠি আপনাদের হস্তগত হইবে। না বুঝিলে যতই চিন্তা করুন, যতই কথা বলুন, ডলারের নায়গারা প্রপাত বহাইয়া দেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। যতই সৃষ্টি হইবে শুধু তিক্ততা এবং মোহ ভাঙ্গিয়া যাইবে।" মার্কিণ পররাষ্ট্র নীতির উপর তাঁহার এই বক্তৃতার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, ইহা আশা করা সম্ভব নয়। কম্যুনিজম ভীতি সৃষ্টি করিয়া আমেরিকা এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশবাদ সমর্থন করিতেছে, দাবাইয়া রাখিতেছে জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থানকে।

সাহায্যদানের আবরণে এই নীতি পরিচালিত হইতেছে। আমেরিকা এই নীতি ত্যাগ করিবে সে সম্বন্ধে ভরসা করিবার কিছুই নাই।

নাটো ও নিরস্ত্রীকরণ—

গত মে মাসের (১৯৫৬) প্রথম ভাগে প্যারীতে আটলান্টিক কাউন্সিলের যে অধিবেশন হইয়া গেল মিঃ ডালেস তাহাকে মৈত্রীর ইতিহাসে পরিবর্ত্তনের লক্ষণ বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। নাটোর সাত বৎসর পার হইয়া গিয়াছে। এই সাত বৎসরে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাতে নাটোর ধার ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, এমন কি নাটোতে ফাটল ধরিয়াছে বলিয়াও আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিয়াই নাটোর রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য বৃদ্ধি এবং তাহাদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটি কমিটি গঠনে সকলে একমত হইয়াছেন। স্বাধীন বিশ্বের জন্য দশ বৎসরের একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্ম্মসূচীর খসড়া প্রস্তুতের জন্য তিন জন বিজ্ঞ ব্যক্তিকে লইয়া একটি কমিটি গঠনের জন্য বৃটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেলুইন লয়েড সুপারিশ করিয়াছেন। নাটো কাউন্সিলের বৈঠক হইতে প্রচারিত বিজ্ঞপ্তিতে রাশিয়ার সহ অবস্থান নীতি গ্রহণের কৃতিত্ব দেওয়া হইয়াছে নাটোকে। ইহা যে সত্যের অপলাপ ছাড়া আর কিছুই নয় তাহা সকলেই জানেন। ১৯৫৪ সালেই নাটো কাউন্সিল উহার সৈন্যবাহিনীকে পরমাণু অস্ত্র সজ্জিত করার প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৭ই মে (১৯৫৬) প্রেঃ আইসেনহাওয়ার নাটোর শক্তিবর্গকে পরমাণু অস্ত্র সরবরাহের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা করার কথা বলিয়াছেন। মে মাসের শেষ ভাগে তিনি বলেন, স্বাধীন ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সময় আগত। নাটোর ভাঙ্গিয়া পড়ার আশঙ্কা রোধের জন্যই এই ঘোষণা করা হইয়াছে।

১৯শে মার্চ্চ (১৯৫৬) হইতে লণ্ডনে নিরস্ত্রীকরণ সাব কমিটির যে অধিবেশন চলিতেছিল ৪ঠা মে অচল অবস্থার মধ্যে উহার অবসান হইয়াছে। ১৪ই মে রাশিয়া ঘোষণা করে যে, আগামী বৎসরের ১লা মের পূর্ব্বে রাশিয়া ১২ লক্ষ সৈন্য হ্রাস করিবে। ইহার মধ্যে রাশিয়ার অনেক মতলবের সন্ধান করা হইয়াছে। মিঃ ডালেস মনে করেন, "রাশিয়ার শিল্প ও কৃষির ক্ষেত্রে বহু শ্রমিকের প্রয়োজন। এই প্রয়োজন সঙ্কুলান করাই সৈন্য সংখ্যা হ্রাসের উদ্দেশ্য। তিনি আরও বলেন, রুশ সৈন্যদের শ্রমিক সাজিয়া পরমাণু বোমা নির্ম্মাণ করা অপেক্ষা তাহারা সৈনিকের পোষাক পরিয়া প্রহরীর কার্য্য করে, ইহাই তিনি বেশী পছন্দ করেন। অনেকে মনে করেন, রাশিয়া ১২ লক্ষ সৈন্য হ্রাস করিলেও তাহার সামরিক শক্তি ক্ষুণ্ণ হইবে না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, গত ১০ই মে (১৯৫৬) স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল পশ্চিম জার্ম্মাণীর আসেন সহরে সারলামেন পুরস্কার প্রদান উপলক্ষে বলেন যে, ষ্ট্যালিনবাদ বর্জ্জন সম্পর্কে রাশিয়ার আন্তরিকতা থাকিলে তাহাকে ঐক্যবদ্ধ ইউরোপে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও বলেন, রাশিয়া যদি সত্যই আন্তরিকতার সহিত ষ্ট্যালিনবাদ বর্জ্জন করে, তাহা হইলে মহৎ চুক্তিতে অর্থাৎ নাটোতে তাহাকে গ্রহণ করা হইবে না কেন, তাহার কোন কারণ তিনি দেখিতে পান না। কিন্তু সমস্যা হইয়াছে এই যে, রাশিয়ার আন্তরিকতায় পশ্চিমী শক্তিবর্গ কোনদিনই বিশ্বাস করিবে না!

১২ই জুন, ১৯৫৬

বীরভূম

সচ্চিদানন্দ ঠাকুর

বীর-ভক্ত ও সাধু সমাবেশে এ দেশ ধন্য ধন্য।
তান্ত্রিক সাধু বীরাচারী নিয়ে এর ধূলি হ'ল পুণ্য।
আকাশ-বাতাসে মর্ম্মরি তোলে অজয়ের কল-কল্লোল।
ঘন বনানীর সুশীতল ছায়ে চিরবসন্ত-হিল্লোল।
'চণ্ডীদাসে'র ভজনের সহান 'জয়দেব' পূত তীর্থ।
'রামী রজকিনী' রাধার আবেশে 'নান্নুরে' করেছে নৃত্য।
অঘোর-পন্থী কত কাপালিক আউল বাউল ভক্ত।
প্রেমের রঙেতে রাঙাল এ মাটী শক্তির অনুরক্ত।
শ্যামল বনানী ব্যাপী কে র'চেছে এত সুন্দর দৃশ্য।
বসাইতে বুঝি শ্যামসুন্দরে আপনারে করি নিঃস্ব।
'বামার শ্মশান' কাছে 'তারাপীঠ' সংযোগ বড় সুন্দর।
বালুকার চর ধূ ধূ করে সেথা 'ময়ূরে' চলে মৃদু মন্থর।
'বক্রেশ্বরে' মহাদেব পদে তপ্ত জলের কুণ্ড।
শিবের ভক্ত লীলা সঙ্গীরা খেলে নিয়ে নর মুণ্ড।
'ভাণ্ডীর বনে' গোপালের কথা নহে আজি যাহা গুপ্ত।
ভক্তের সেবা নিত্যই চলে এখনো হয়নি লুপ্ত।
'গর্ভবাসেতে' গুপ্ত যমুনা কিছু দূরে 'ময়ূরাক্ষী'।
"বাঁকারায় দেব" মন্দিরে রাজে দেশের হইয়া সাক্ষী।
তব গৈরিক অঙ্গেতে মাখি ধন্য আমি হে 'বীরভূম'।
এ রূপের কাছে অতীব তুচ্ছ রাঙা কাশ্মিরী কুমকুম।
কিছু নাহি পাই তবু মনে হয় হৃদয় হ'ল যে পূর্ণ।
তোমার পরশে আমার জীবনে সকল গর্ব্ব চূর্ণ।
কল্পনা মোর মানে পরাজয় হেরি শত শত মূর্ত্তি।
চিন্ময় ধাম সারা 'বীরভূম' সাধনায় পরিপূর্ত্তি।

তব পরিচয় বিস্মৃত লোকে বিলাসের মহারণ্যে।
'বীরভূমে' রাখে মাথায় করিয়া ভক্তের শত পুণ্যে।

রাজায় রাজায়

উদয়ভানু

—রাতরাণী কৈ?

ডাচ ছাপ দেওয়া নক্সা-কাটা দোনলা এক গুপ্তস্থানে রেখে কাশীশঙ্কর সটাং অন্দরমহলে চলে গেলেন। অন্দরের ঘরে ঘরে কাকে যেন খুঁজতে থাকেন ব্যস্ত হয়ে। দরদালানের খিলানের কবুতরেরা শুধু বকবক করছে। যেন বিদ্রূপের হাসি হাসছে গৃহের অধিকর্তার ব্যস্ততায়। কাশীশঙ্কর এ-ঘরে সে-ঘরে কত খোঁজাখুঁজি করেন, কিন্তু কৈ দেখা মেলে না কেন! ভাঁড়ারের ঘর থেকে পাকশালার দিকে এগিয়ে চললেন। দেখলেন কয়েকটা আগুনের চুল্লী, জ্বলছে দাউ-দাউ। উনানের ধারে কেউ নেই। রন্ধনাগার থেকে শাকসব্জীর ঘরে উঁকি দিলেন একবার। আশাহত হয়ে ফিরে চললেন ভাঁড়ারের তল্লাটে। এক ঝাঁক পায়রা, যেন ভাঁড়ার সাফ করছে দল বেঁধে। চাল আর ডালের বস্তার আশ্রয় নিয়েছে। আঁশরান্নার ঘর দেখতে বাকী থাকে কেন! দেখলেন বঁটির সারি। মাছের চুবড়ি। একটা বেড়াল লাফ দিয়ে পালিয়ে গেল। মেছুনীরা আগেই ভয়ে স'রে গেছে আড়ালে, কুমারের পদশব্দ শুনে। ঘি আর তেলের কুঠরীর পাল্লা সরিয়ে দেখলেন। মিষ্টির ঘরের দুয়োরে ক্ষণেক দাঁড়ালেন। ক্ষীর আর ছোট এলাচের খোসবয় বইছে যেন ঘরে। ফলের ঘরেও দেখলেন, কিন্তু কোথাও কারও সাক্ষাৎ নেই। আম, আনারস, নারাঙ্গী আর কদলীর সুগন্ধ আসে যেন নাসিকায়।

—রাতরাণী, কোথায় গো?

ব্যগ্র কণ্ঠে আবার ডাকলেন কাশীশঙ্কর। প্রশস্ত দরদালানে তাঁর কথার প্রতিধ্বনি ভাসলো। একেই বড় ক্লান্ত যেন তিনি, বন্দুক দেগে দেগে। এখনও স্কন্ধ আর বাহু যেন ব্যথা করছে। ফাঁকা গুলী দেগেছেন, তা হোক, ঘোড়া টিপতে হয়েছে। শূন্য আকাশে তাক করতে হয়েছে। বন্দুক দু'হাতে ধ'রে, সামলাতে হয়েছে।

দরদালানে আবার প্রতিধ্বনি ভাসলো। কাশীশঙ্করের নিজের কণ্ঠ যেন ব্যঙ্গ করলো তাঁকে। বিরক্তির রেখা ফুটলো কপালে।

—এই যে আমি, কোথায় আপনি খোঁজেন!

অন্দরের এক সিঁড়িতে সহসা দেখা পাওয়া যায়। স্বর্গ থেকে যেন নেমে আসে অপ্সরীকন্যা। কথা বলে মিষ্টি সুরে।

—রাতরাণী! এত ডাকাডাকিতেও সাড়া নাই কেন? শোন নাই?

—হ্যাঁ।

মাথা দোলাতেই বধূরাণীর কানের ঝুমকো আর নাকের নোলক দুলতে থাকলো। তাম্বুল-লাল ওষ্ঠের 'পরে, নোলকের মুক্তা নেচে নেচে উঠছে যেন। তসরের লাল পাড় শাড়ী প'রেছেন কি এক পবিত্র কাজে। বললেন,—পূজাঘরে ছিলাম। নারায়ণকে ডাকতে ডাকতে আর শুনা হ'ল না।

কাশীশঙ্কর লক্ষ্য করলেন পূজারিণীর চোখে যেন জল। বললেন জিজ্ঞাসু সুরে,—কাঁদো কেন তুমি? চোখে জল কেন? নারায়ণকেই বা কেন এত ডাকাডাকি, এমন অসময়ে?

—আপনি নরহত্যা না করেন, তাই প্রার্থনা জানাই।

কম্পিতকণ্ঠে কথা বললেন কুমার-পত্নী। তসরের আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলেন।

—একটাও মরে নাই। তবে আর ভয় কি?

—ম'রতে কতক্ষণ! হাতের তীরকে বিশ্বাস কি! গুলীবারুদের কি প্রয়োজন?

—ডুলে আর বাগদীরা যে রাজপুরী ঘেরাও ক'রেছিল। দা আর ভল্ল ছোড়াছুড়ি করছিল। সংবাদ পেয়ে আমি আর স্থির থাকতে পারি নাই।

—ভরসা এই ফাঁকা আওয়াজ! দিনের আহার মিটবে কখন? সূর্য্য যে মাথায় উঠেছে।

—এখনই মিটাবো। মাথায় দু' দশ কলসী জল ঢালি আগে।

রাতরাণী বললেন অস্ফুট কণ্ঠে,—জগমোহন লেঠেল ম'ল শেষে বাঘের কবলে?

মুখে আবার যেন বিরক্তি ফুটলো। কাশীশঙ্কর বললেন,—না মরে নাই, জগমোহনের জিত্ হয়েছে। নেকড়েটা শেষ হয়েছে।

—ননদিনী কেমন আছে? বিন্ধ্যবাসিনী?

কিছু বা নিশ্চিন্ত হয়ে কথা বললেন বধূরাণী। প্রশ্ন করলেন ব্যাকুল কণ্ঠে।

কাশীশঙ্কর বললেন,—শারীরিক ভালই আছে বিন্ধ্য। রাজমাতাকে আওটি পাঠিয়েছে হাতের। মান্দারণেই আছে।

—এমন মতির মালা কে দিয়েছে? হাতে এক স্বর্ণপাত্রই বা কেন?

হেসে হেসে বললেন কাশীশঙ্কর। মালা খুলে সমুখজনের কণ্ঠে পরিয়ে দিতে দিতে বললেন,—রাজাবাহাদুর উপহার দিয়েছেন এই মালা। বড়রাণী এই স্বর্ণপাত্র দিয়েছে। যথাস্থানে থাক। তুমিই লও।

রত্নহারের থামি হাতে তুললেন রাতরাণী। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন থামিতে নানাবিধ রত্ন বসানো। রক্তবিন্দুর মত লাল চুনী, শ্যাওলা-সবুজ পান্না, মেঘনীল নীলা। মাণিক্য আর পুষ্পরাগে গাঁথা হার। স্বর্ণপাত্রের কারুকাজ দেখলেন। সরোবরে হংসমিথুন, পদ্ম আর পদ্মপত্র। পাত্রটি জলপাত্র।

তেমন যেন খুশী হ'তে পারলেন না বধূরাণী। এত শান্ত হয়েছে তবুও নয়। শুশ্রূষণের সুরে বললেন,—গুলী-বারুদকে কেমন যেন ভয় করে আমার। নাম শুনে বুক কেঁপে ওঠে। তাই ছুটতে ছুটতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছি নারায়ণের ঘরে।

হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন কাশীশঙ্কর। সহধর্ম্মিণীর কাতর কথা শুনে হেসে ফেললেন। মজা দেখে মানুষ যেমন উল্লাসে হাসে। হাসি থামিয়ে বললেন,—তীর আর ধনুকের যুগ শেষ হয়েছে। এখন বন্দুক যা করে।

—গুলী-বারুদ আর বন্দুক আমি পুকুরে ফেলিয়ে দেবো। তখন কি করবেন?

আরও জোরে হেসে ফেললেন ছোটকুমার। হাসতে হাসতে বললেন,—একটা গেলে আবার একটা আসবে. সেজন্য ডরাই না আমি। আমাকে যে যেতে হবে মান্দারণে। বন্দুক সঙ্গে ল'য়ে যাবো। রাজাবাহাদুর রাজী হয়েছেন।

শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন বধূরাণী। ভয়ে যেন কাঠ হয়ে যান। ঢলো-ঢলো মুখে যেন অভিমান ফুটলো।

কাশীশঙ্কর আবার বললেন,—কারও কাছে বিষয়টা এখন ফাঁস ক'র না। আমি যাবো আর সঙ্গে যাবে ঐ জগমোহন লেঠেল। আরও দু'-চার জন লেঠেলকে সঙ্গে লবো।

রাতরাণী নিরুত্তর। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকেন। অভিমানে যেন মূক তিনি। শেষ পর্য্যন্ত থাকতে পারলেন না যেন। কথা ফুটলো মুখে। বললেন,—একটা বিপদ-আপদ যদি ঘটে, তখন আমার কি উপায় হবে? বনবালাকে কে দেখবে! সে কচি মেয়ে। আমি না হয় পরনের কাপড়ে আগুন ধরিয়ে—

কুমারবাহাদুর তাঁর সহধর্ম্মিণীর মুখে হাত চাপলেন। কথা শেষ করতে দিলেন না। বললেন,—বিপদ-আপদ জয়ের মন্ত্র জানি আমি। শত্রুকে পরাস্ত ক'রবো ঠিক। আমাদের সোহাগী রাজকুমারীকে ফিরায়ে আনবো।

—আমাকে বলবেন না কোন কথা, গড় করি আপনার পায়ে। আমি জানতে চাই না, শুনতেও চাই না।

—অধীর হও কেন এত!

কাশীশঙ্কর অর্দ্ধাঙ্গিনীকে' দুই বাহুতে জড়িয়ে ধরলেন। বুকের কাছে টেনে নিলেন। বললেন,—রাতরাণী, তুমি তোমার নারায়ণের কাছে প্রার্থনা জানাবে। বিনা বাধায় কার্য্য উদ্ধার করবো আমি। সহোদরা বিন্ধ্যবাসিনী বনজঙ্গলের দেশে বাঘের পেটে যাবে, তুমি তাই চাও? সর্প দংশনেই যদি মারা যায়, কে বলতে পারে!

—ছেড়ে দিন, কারও যদি চোখে পড়ে!

নিজেকে মুক্ত করতে সচেষ্ট হন বধূরাণী, ছোটকুমারের কঠোর বাহুপাশ থেকে।

কুমার বললেন,—মুখে হাসি না ফুটালে ছাড়বো না। হাসি দেখাও আগে।

—হাসি আসে না কুমারবাহাদুর। ভয়ে আমার বুক দুর দুর করে যে! আপনি বৃথা সময় নষ্ট করেন কেন? যান স্নান সেরে আসেন। আহার প্রস্তুত।

—হাসি না দেখে ছাড়বো না জেনো। এত ভয় কেন তোমার!

কালীশঙ্কর যেন কেমন দৃঢ়কণ্ঠে বললেন। বাহুবন্ধন আরও কঠোর করলেন।

কৃত্রিম হাসি হাসলেন বধূরাণী। হঠাৎ হাস্যরেখা, বিদ্যুতের মত দেখা দিয়ে তৎক্ষণাৎ মিলিয়ে গেল। বললেন,—হিন্দুর ঘরের কুলবালার মুখে হাসি শোভা পায় না। ঐ দেখেন, বনবালা আসে। যেতে দিন আমাকে।

—কোথায় যাবে?

—আপনার আহার্য্য সাজাতে যাবো। বেলা আর নাই যে!

আকাশের পরীর মত যেন, উড়তে উড়তে আসে বনবালা। ডানার মত অগোছালো শাড়ীর আঁচলা উড়ছে পেছনে। বন্দুকের দুম দাম শব্দে বনবালা কোথায় লুকিয়ে ছিল এতক্ষণ। মুখ তার পাংশু। কাজলপরা চোখে যেন ভয়ের আভাস। ছুটতে ছুটতে আসে।

—বাবামশাই, বাবামশাই!

কিশোরীকণ্ঠ সুর ছড়ায় দালানে। জলতরঙ্গের সুর তোলে যেন।

মুক্তি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খানিক দূরে সরে গেলেন বধূরাণী। বক্ষোবাস ঠিকঠাক করতে করতে দালানের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কন্যাকে কাছে টানলেন কালীশঙ্কর। তার ছোট কপালে ওষ্ঠ ছুঁইয়ে চুমা খেলেন। বললেন,—বনবালা, তুমিও ভীতা না কি?

পিতার কটিদেশ দুই হাতে জড়িয়ে ধরে মেয়ে। কুমারের লোমশ বক্ষে মুখ লুকোয়। বলে,—রাজবাড়ীতে যে যুদ্ধ চ'লেছে! জানো না তুমি?

—খুব জানি আমি।

—গুড়ুম গুড়ুম শব্দ শুনেছো?

—হাঁ, খুব শুনেছি।

—মানুষ ম'রেছে?

—না, একটাও নয়।

—যুদ্ধ থেমে গেছে?

—হাঁ, তুমি কোথায় ছিলে শুনি?

—দাসীর কাছে। জল-কুঠরীতে লুকিয়ে রেখেছিল দাসী।

অট্টহাসি শুরু করলেন কুমারবাহাদুর। মেয়ের কথায় ভীতির আধিক্য শুনে হাসতে থাকলেন অন্দর কাঁপিয়ে।

—আমাদের রাজামশাই কেমন আছে? ভাই শিবশঙ্কর?

—বহাল তবিয়তেই আছে। তোমার চিন্তার কোন কারণ নাই।

হাসতে হাসতে কথা বলেন কালীশঙ্কর। বনবালার হাত ধ'রে এগিয়ে চলেন। বলেন,—বন, তোমার মা জননীর কাছে থাকো। যাই স্নান সেরে আসি।

—রাজামশাইও লড়াই ক'রেছে।

—হাঁ। বড় রাজা হাতীর পিঠে চেপে যুদ্ধটা চালিয়েছে। তুমি থাকো এখানে, আমি আসি।

হাসতে হাসতে চললেন কুমারবাহাদুর। সদরের পথে চললেন। দালানের শেষ প্রান্তে গিয়ে বললেন,—রাজরাণী, ভাত বাড়ো তুমি। আমি শীঘ্র আসছি।

অন্দরমহলের উঠানে একজোড়া কাকাতুয়া। ঝুঁটি ফুলিয়ে বসে আছে পেতলের দাঁড়ে। ওদের মধ্যে একটা, লাল লঙ্কা কাটছে ঠোঁটের ধারে। অন্যটা কুমারবাহাদুরের কণ্ঠ অনুকরণ করলো। বললে,—রাজরাণী, ভাত দাও!

হাসির কথা নয়, রাজাবাহাদুর কালীশঙ্কর একদা সত্যিই যুদ্ধ ক'রেছেন। জ্যান্ত বাঘের সঙ্গে লড়াই ক'রেছেন। তরোয়াল চালিয়ে কত সিংহকে হত্যা করেছেন। তাই না নবাব সরকার খেতাব দিয়েছে তাঁকে। রাজা ছিলেন শুধু, বাহাদুর উপাধি দিয়েছেন দিল্লীর বাদশা। সুবে বাঙ্গালায় শ্রেষ্ঠ শিকারীদের মধ্যে একজন ছিলেন রাজা কালীশঙ্কর! এখন আর চলে না। তরোয়াল ধ'রতে পারেন, কিন্তু চালাতে পারেন না।

জগমোহনের জয় হয়েছে, সেজন্য রাজা অখুশী হননি একতিলও। বরং খুশী হয়েছেন জগমোহনের বীরত্বে! এতো ঐ লেঠেলের জয় নয়, তার দেহবলের জয়। সুতানুটির চুলে আর বাগদীদের পরাক্রম খুব। সমুখযুদ্ধে তারা অদ্বিতীয়। অস্ত্রচালনাতেও অত্যন্ত দক্ষ—দরবারের অলিন্দ থেকে স্বচক্ষে দেখেছেন রাজাবাহাদুর। দেখে বিস্মিত হয়েছেন খুব।

নেকড়ে আর মানুষের লড়াই দেখতে দেখতে আজ কত পুরানো স্মৃতি জেগে উঠেছে রাজার মনে। কৈশোর আর যৌবনের। দুই বাহুতে চিহ্ন আঁকা আছে। দুই জানুতেও দাগ আছে এখনও। বাহুতে প্রতিপক্ষের তরবারি-আঘাতের চিহ্ন। জানুতে আছে সিংহের নখরের।

আজ দরবার ভেঙ্গে দিয়েছেন রাজাবাহাদুর! মানুষের জয় হওয়ায় কেমন যেন উৎফুল্ল তিনি। ঠাণ্ডা রক্ত আজ যেন সহসা আবার তপ্ত হয়ে উঠেছে। হাতের সেই বজ্রমুষ্টি যেন আবার বল পেয়েছে। কালীশঙ্করের স্মরণে আছে, তিনি স্বহস্তে বাঘে আর সিংহে প্রায় শতাধিক হত্যা ক'রেছেন। ভল্ল আর তরবারির সাহায্যে।

আজ জগমোহন বাগদীর জয় হয়েছে, তাই পানের মাত্রাও যেন বেড়েছে। দরবার থেকে মনুষ্যবাহী সুখাসনে ফিরতে ফিরতে পান থামলো না। জরির কামদার তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ব'সে পানপাত্রে চুমুক দিতে দিতে ফিরলেন কালীশঙ্কর। রাজমহলের প্রধান দ্বারের সামনে সুখাসন নামাতে হুকুম দিলেন। দেহরক্ষীদের বললেন,—ডুলি আনয়ন করা হোক। পায়ে হেঁটে চলা সম্ভব নয় কোন' মতেই।

অন্দরমহলে সুখাসনের প্রবেশ নেই। তেমন প্রশস্ত নয় অন্দরের পথ। চেলা আর দাসেরা জরিজড়ানো ডুলি এনে হাজির ক'রলো। ডুলিতে মোটা গদী, লাল ভেলভেটের আবরণে ঢাকা। রাজাবাহাদুর সুখাসন থেকে ঐ ডুলিতে আশ্রয় নেন। দেহরক্ষীদের বললেন,—রাণীমহলে যাবে, বাহকদের বুঝায়ে বল।

মেজরাণীর মহলে ডুলি নামিয়ে রেখে বাহকরা ছুটি পায়। দেহরক্ষীরা ফিরেন পায়। অন্দর থেকে বেরিয়ে যায় তারা।

—সর্ব্বমঙ্গলা আছো না কি মহলে!

রাজাবাহাদুরের কণ্ঠস্বর, আশাতীত আনন্দে সাড়া দিলেন মেজরাণী। মুখে পান আর তাম্বুল। স্ফূর্তি-জর্দ্দার সুগন্ধ ভাসিয়ে সর্ব্বমঙ্গলা আসেন। একটি হাত প্রসারিত করেন। কালীশঙ্করের হাত ধরেন। সহাস্যে বলেন,—রাজাবাহাদুর! চলুন পালঙ্কে বসবেন।

—তাই চল' মেজরাণী। কালীশঙ্কর ধীরে ধীরে চলতে চলতে বললেন,—আসবের পাত্র আনতে কও। আজ এক সুখ-আনন্দের দিন। জগমোহন বাগদী খালি হাতে একটা নেকড়েকে ঘায়েল ক'রেছে। বিন্ধ্যবাসিনীর শুভসংবাদ এনেছে সে। আমার সহোদর কাশীশঙ্কর রাজকুমারীকে উদ্ধার করবে, সম্মত হয়েছে। তাই বড় আনন্দের দিন আমার। দরবার ছেড়ে চ'লে আসছি।

মেজরাণীর মেঘ-গম্ভীর মুখেও যেন হাসি ফুটলো। পান চিবাতে চিবাতে অল্প অল্প হাসলেন যেন। রাজাবাহাদুরকে রেশমের চাদর বিছানো পালঙ্কে বসালেন। উপাধান এগিয়ে দিলেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—সর্ব্বজয়া কোথায়? তারেও ডাকাও, আসুক। তোমরা দুই বোনেই এসো আমার কাছে।

—ছোটরাণীকে ডাকি। পানপাত্র আনাই। আপনি শান্ত হোন।

কথা বলতে বলতে সর্ব্বমঙ্গলা ঊর্দ্ধে চোখ তুললেন! দেখলেন, টানাপাখা, সচল হয়ে উঠেছে। দ্রুত গতিতে দুলছে। হাওয়া খেলছে রাণীর ঘরে। ফুলদানির ফুল হাওয়ার বেগে কেঁপে কেঁপে উঠছে! পালঙ্কের রেশমী চাদরের মণিমুক্তার ঝালর দু'লে দু'লে ওঠে। ফুলদানে যুঁয়ের স্তবক আর মল্লিকের তোড়া—স্নিগ্ধসুগন্ধ ভাসলো কক্ষময়।

সর্ব্বজয়া, ছোটরাণীর হাতের চুড়ির ঝিনিঝিনি শোনা যায় যেন। ধীর স্থির ছোটরাণী, মন্থরগামিনী। নীরব চরণে আসেন তিনি। রাজাবাহাদুর তখন কক্ষের দেওয়াল-গাত্রে তাকিয়ে আছেন। দেওয়ালে তসবিরের ছড়াছড়ি যেন। হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত ফলকে অঙ্কিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপূর্ব্ব চিত্রগুলি! কোন মুসলমান শিল্পীর আঁকা, দিল্লীর বাদশা আর বেগমদের রঙদার ছবি! ছবিতে সোনার আখরে লেখা ফার্সী নাম। যার যার ছবি তার তার নাম!

সর্ব্বজয়া রাজাকে ভাবাবিষ্ট দেখে হাসি গোপন করলেন। কৌতুকের সুরে বললেন,—বেগমদের কোনটিকে আপনার মনে ধরে রাজাবাহাদুর?

বাছা বাছা সুন্দরীদের আলেখ্য। ডানাকাটা পরী একেকজন।

হঠাৎ কথা শুনে যেন বারেক চমকে উঠলেন কালীশঙ্কর। অতর্কিতে যেন চুরি ধরা প'ড়েছে! অল্প হেসে রাজাবাহাদুর বললেন,—যেটি জীবন্ত সেটিকে, অন্য কাকেও নয়! নারীজাতির মধ্যে যিনি উত্তমা সেই তাকে!

—কে সে? কি নাম তার?

অদম্য কৌতূহলের সঙ্গে বললেন সর্ব্বজয়া! দাঁতে ঠোঁট কামড়ালেন কথার শেষে। রাজার অদূরে পালঙ্কের' পরে বসলেন ধীরে ধীরে।

—তার নাম সর্ব্বজয়া দেব্যা! রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী সে।

উপাধানে দেহের ভর রাখলেন রাজাবাহাদুর! মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে কথা বললেন। দেওয়াল গাত্র থেকে চোখ ফেরালেন।

—পরিহাস নয় তো?

—আদপেই নয়! খাঁটি সত্য বচন। অন্তরের কথা।

সর্ব্বজয়া যেন গর্ব্ব বোধ করলেন ক্ষণেক! করাঙ্গুলিতে অলক্ষ্যে শাড়ীর আঁচল জড়াতে থাকলেন নত মুখে! মিহি কণ্ঠে বললেন,—তবে রাজাবাহাদুর শুনেছি আপনি দু'টি ইরাণীকে ভাল বেসে ফেলেছেন না কি খুব!

উপহাসের হাসি হাসলেন রাজা। ন'ড়ে চ'ড়ে বসলেন স্থির হয়ে। হেসে হেসে বললেন,—চেখে দেখায় দোষ কি, খাই আর না খাই। মোসায়েবদের বিলায়ে দিয়েছি দু'টাকেই। রাজমাতার আদেশে প্রায়শ্চিত্ত করায়েছি।

চেরা পটলের মত আঁখি যুগলে কটাক্ষ ফুটলো যেন। ছোটরাণী, আবার চোখ নামিয়ে বললেন,—ভাল না মন্দ?

—ভাল মন্দের বার। শরীর গঠনে তাকত আছে বেশ! মেদভারী আকৃতি!

গোঁফের প্রান্তে পাক দিতে দিতে কথা বলেন রাজাবাহাদুর। বলেন,—ভাষা বোঝে না কিছু। ইসারায় আর কাঁহাতক প্রেম হয়! আমি ভাবের ধার ধারি না।

মোরাদাবাদের মীনার কাজ রূপার পানপাত্রে। মেজরাণীর হাতে ঝলমলিয়ে ওঠে পানপাত্র আর পিয়ালা, এক থালিকায়। পালঙ্কের তেপায়ায় বসিয়ে দিলেন সশব্দে!

—মেজরাণী, পেয়ালায় শরাব ঢালো। দারুণ গ্রীষ্মে কণ্ঠ যেন শুকায়ে যায়!

কথা বলতে বলতে রাজাবাহাদুর ছোটরাণীর হাত ধরলেন। সর্ব্বজয়ার একখানি হাত নিজের হাতে ধ'রে রাখলেন! ছোটরাণী তাঁর কোমল হাতে যেন ঈষৎ পীড়ন অনুভব করলেন!

স্বেচ্ছায় পেয়ালা পূর্ণ করলেন না সর্ব্বমঙ্গলা! তু'লে ধ'রে বললেন,—রাজাবাহাদুর, পাত্র ধারণ করুন। আমার হাত কাঁপে, হাতে ধরায় অভ্যাস নাই তো!

—জয়া, তুমিও থাকো, যেও না কোথাও!

কথা বলতে বলতে কালীশঙ্কর পাত্র ধরলেন সাবধানে। চোখের তাকানিতে যেন মিনতি জানালেন মেজরাণীকে।

সর্ব্বজয়া পানের ডিবা থেকে কয়েকটি খিলি তুলে মুখে দিলেন। ছোট ছোট খিলি মিঠাপানের! সোনার তাম্বুলকরঙ্ক, বন্ধ ক'রে সুর্ত্তির কৌটা খুললেন। বললেন,—খাওয়া দাওয়া চুকবে কখন?

—আরও খানিক যাক।

কথার শেষে মীনাকাজের রঙীন পাত্র তুললেন মুখে। কণ্ঠ সিক্ত করলেন। পাত্র নামিয়ে রেখে সর্ব্বজয়ার একটি হাত আবার ধরলেন নিজের হাতে। খেলার সামগ্রী যেন, শিশুর খেলার মত হাতখানি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকলেন।

সর্ব্বমঙ্গলা পান চিবাতে চিবাতে বললেন,—মেওয়ার রেকাবী আনাই রাজাবাহাদুর? দু'চারটা মুখে দেবেন?

—কিছু চাই না, কিছু চাই না। ব্যস্ত হও কেন?

—একেবারে নির্জ্জলা পান করবেন? ক্ষতি হবে না?

মেজরাণী কথা বলতে বলতে পিকদানি তুললেন। নিজের পানলাল অধর বাঁকিয়ে দেখলেন লালিমার ঘোর।

কালীশঙ্কর বললেন ভেবে ভেবে,—ভাজাভুজি যদি কিছু আনাও তো খাই। মেওয়া খেতে আর রোচে না।

—আমিষ না নিরামিষ?

খানিক ভাবালু চোখে তাকালেন রাজাবাহাদুর। ভেবে ভেবে বললেন,—নিরামিষ। আমিষ খেয়ে তোমার আস্তানাকে উচ্ছিষ্ট করি কেন আর মেজরাণী!

সর্ব্বমঙ্গলা কক্ষ থেকে বেরিয়ে দাসীদের নির্দ্দেশ দিলেন কি যেন। দরজার তারে ঝুলানো পর্দ্দা টেনে দিয়ে ফিরলেন। পর্দ্দা টেনে দেওয়ায় সুসজ্জিত কক্ষে যেন কিঞ্চিৎ আঁধারের সৃষ্টি হয়। টানাপাখার হাওয়ায় তরঙ্গ বইছে। ঘন ঘন দু'লে চলেছে চিত্রবিচিত্র পাখা।

—পান খাবি ছোটরাণী? বলিস তো ডিবা এগিয়ে দিই।

তাম্বুলহীন মুখ, যেন দেখতে ভাল লাগে না সর্ব্বমঙ্গলার। তিনি নিজে পান খাওয়ায় আসক্ত, তাই হয়তো।

স্বল্প গুণ্ঠন থাকায় ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাশি উঁকি দেয় কপালের পাশ থেকে। সর্ব্বজয়া ইসারায় সম্মতি জানাতে ডিবা এগিয়ে ধরলেন মেজরাণী। দু'এক খিলি মুখে পুরলেন ছোটরাণী। সলজ্জায়।

—সর্ব্বমঙ্গলা, এসো। পাশে এসে আসন লও।

মুখ থেকে পাত্র নামিয়ে কথা বললেন কালীশঙ্কর। অর্দ্ধশায়িত তিনি, সর্ব্বজয়ার নরম নরম দেহে হেলান দিয়েছেন। ছোটরাণীর অনিন্দ্য মুখশ্রী, থেকে থেকে লজ্জায় রাঙা হ'তে থাকে।

মেজরাণী বললেন,—গোয়ের জাজা আনতে পাঠিয়েছি রাঙ্গী দাসীকে। সে আসুক। তাজার পাজা বাঁধে নিয়ে বসবো।

হঠাৎ খেয়াল হয় কালীশঙ্করের। তাঁর উষ্ণীষবিহীন মাথায় যেন শীতল জলের ধারা পড়ছে। সর্ব্বমঙ্গলা গোলাপপাশ থেকে গোলাপজল ঢালছেন। গোলাপের উগ্র সুগন্ধ মিশলো যেন আর যুঁইয়ের সুগন্ধে।

—বাঁচালে মেজরাণী। দুই চোখ নিমীলিত, কথা বললেন রাজাবাহাদুর। বললেন,—এই প্রখর গ্রীষ্মে মানুষ বুঝি আর বাঁচে না। কাল-বৈশাখীরও দেখা নাই!

—ঈশানে মেঘ জ'মেছে আজ। বললেন সর্ব্বমঙ্গলা, ঘরের ঝিলিমিলি থেকে আকাশ দেখতে দেখতে। বললেন,—কাকে ফুটো তুলছে।

—তবে আজ ঝড়ের সম্ভাবনা আছে।

রাজবাহাদুরের এক হাতে পানপাত্র। অন্য হাতে ছোটরাণীর সুন্দর চিবুক ছুঁয়ে আছেন।

শব্দ-ইঙ্গিত আসে ঘরের বার থেকে। সর্ব্বমঙ্গলা দুয়োর প্রান্তে এগোলেন। পর্দ্দা সরিয়ে হাত প্রসারিত করলেন। ভাজার থাল নিয়ে ফিরলেন পালঙ্কের কাছে। বললেন,—আলু-বেসম ভাজা, রুচবে তো রাজাবাহাদুর?

—খুব, খুব। দাও, খাই দু'চারখানা।

থাল থেকে তুললেন কালীশঙ্কর। মুখে তুললেন, পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে। পানপাত্র নামিয়ে রেখে দিয়েছেন আগেই। গরম গরম মুখে পুরছেন। খেতে খেতে বললেন,—তোমরাও খাও এক আধখান।

সর্ব্বমঙ্গলা পালঙ্কের এক কিনারায় বসলেন, পা গুটিয়ে। পান-চিবানো বন্ধ ক'রে বললেন,—আমার মুখে পান। সামান্য ক'টা দিয়েছে, আপনি খেয়ে ফেলেন।

—আমারও মুখে পান আছে। ছোটরাণীও বললেন, অস্পষ্ট কথা।

রাজাবাহাদুর আহারে বিরতি দিয়ে পানপাত্র মুখে তুললেন! মৃদু হেসে বললেন,—খুবই মুখরোচক সন্দেহ নাই। আমি তবে একা একাই খাই।

মেজরাণী আর ছোটরাণী এক সঙ্গে বললেন,—হাঁ, তাই খান রাজাবাহাদুর!

রাজাবাহাদুরের দুই পাশে দুই রাণী। অপ্সরী আর কিন্নরী যেন। দু'জনের অধর তাম্বুল লাল। দুই বোনে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করেন পরস্পরে। সর্ব্বমঙ্গলা ইশারায় কি যেন বলছেন রাজার অলক্ষ্যে। সর্ব্বজয়ার মুখে মিনতি যেন। কি যেন নিষেধ করছেন তিনি। মেজরাণীর কি এক প্রস্তাবে গররাজী যেন ছোটরাণী। কক্ষ ত্যাগ ক'রে উঠে চ'লে যেতে চাইছেন সর্ব্বমঙ্গলা! ছোটরাণীর ইশারায় কাতর অনুনয়, তিনি যেতে দিতে চান না অগ্রজাকে। সর্ব্বমঙ্গলা কক্ষ ত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করছেন। সর্ব্বজয়া থাকেন আর তিনি যান, এই তাঁর ইচ্ছা! কিন্তু লজ্জাবতী ছোটরাণী, লজ্জায় যেন রাঙা হয়ে উঠেছেন! দৃষ্টিবাণ হানছেন যেন থেকে থেকে। রাজাকে লুকিয়ে নীরব তিরস্কার করছেন!

কালীশঙ্কর বললেন,—মেজরাণী, তোমার কি অন্য কাজ আছে এ সময়ে? তুমি কি অন্যত্র যেতে চাও কোন' জরুরী কর্ম্মে?

—না রাজাবাহাদুর। অফুরন্ত অবসর আমাদের। মৃদু মৃদু হাসির সঙ্গে কথা বলেন সর্ব্বমঙ্গলা। বললেন,—তবে বড়রাণী একা যদি সব রান্নার কাজ করেন, চোখে দেখতে পারা যায় না। বড়রাণী খাটাখাটি করবেন আর আমরা কিনা খাটে ব'সে থাকবো পায়ের ওপর পা তুলে। তাই ভাবছি আমিও যাই পাকশালে, ছোট থাকুক আপনার কাছে।

লজ্জারুণ মুখ তুললেন সর্ব্বজয়া। ঘোর আপত্তির সুরে বললেন,—না। আমিও থাকি, তুমিও থাকো। বড়রাণীর গতর আছে, তিনি ঠিক সামলে নেবেন।

এক চুমুকে পাত্র শেষ ক'রে বিকৃতমুখে কালীশঙ্কর বলেন,—মেজরাণী মন্দ কথা বলে নাই। সেই বা একা সকল কর্ম্ম করবে কেন? সর্ব্বমঙ্গলা যদি যেতে চায় যাক না। উমারাণীও প্রসন্ন হবে। তার কাজেরও লাঘব হবে কিছু।

মেজরাণীর জয় হয়। হাসি গোপন করলেন তিনি। বললেন,—ঠিকই বলেছেন রাজাবাহাদুর। আমিও প[illegible]শালে যাই।

কথা বলতে বলতে সর্ব্বমঙ্গলা পালঙ্ক থেকে নামলেন ধীরে ধীরে। কনিষ্ঠাকে তর্জ্জনী দেখিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন,—ঠিক হয়েছে। কেমন জব্দ?

মুখে যেন কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য ফুটলো সর্ব্বজয়ার। লজ্জারক্ত মুখ নত করলেন। ক্রোধের বহ্নি যেন তাঁর চোখে। অপ্রস্তুততা ভাবে-ভঙ্গীতে।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পূর্ব্বমুহূর্তে মেজরাণী দ্বার আর বাতায়নের পর্দ্দাগুলি ঠিকঠাক ক'রে দিয়ে গেলেন। চাপাহাসি হাসতে হাসতে চ'লে গেলেন নিজের ঘর ছেড়ে।

রাজাবাহাদুর কাছে টানলেন সর্ব্বজয়াকে। তাঁর সুন্দর চিবুক তুলে ধরলেন। রাণীর চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকলেন অপলক। কম্পমান চাউনি ছোটরাণীর দীর্ঘ চোখে। লজ্জানম্র চোখ পুনরায় নত করলেন। রাজা বললেন,—ভয় কি!

মিষ্টকণ্ঠ ছোটরাণীর। বললেন,—ভয় নয় লজ্জা। দিনদুপুর এখন।

—তা হোক। কালীশঙ্কর বললেন,—তুমি থাকো আমার কাছে। তোমাকে দেখে দেখে আমার চক্ষু জুড়াক। তুমি যে চিত্রাণী।

সুন্দরী, দৃঢ়চিত্তা, সদাসত্যভাষিণী, গুরুজন ও দেবদ্বিজে ভক্তিমতী, সতত প্রিয়ভাষিণী, নিষ্পাপ, দয়া, ক্ষমা ও ধর্ম্মের আধার, স্বল্পে সন্তুষ্টা—এই সকল লক্ষণ দেখেছেন রাজাবাহাদুর, ছোটরাণী সর্ব্বজয়ার।

—শূন্য পাত্র, পূর্ণ ক'রে দিই?

প্রায় চুপি চুপি বললেন ছোটরাণী। ভাবলেন, এই প্রসঙ্গ তোলায় যদি রাজাবাহাদুর তাঁর প্রতি অমনোযোগী হন।

রাজা বললেন,—হাঁ, তাই দাও।

কথার শেষে সর্ব্বজয়াকে নিবিড় বন্ধনে যেন বাঁধলেন। রাণীর মুক্ত দুই হাত। অগত্যা তিনি পেয়ালা পূর্ণ ক'রতে থাকেন। তার মুখাকৃতিতে যেন কি এক অনিচ্ছা। বললেন,—আমাদের ননদিনী, রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী তা হ'লে এখন বনবাসিনী?

—হাঁ, এক রকম তাই বলা যায়। মান্দারণে নির্ব্বাসিতা সে। [illegible] বেশী নিষ্ঠুর আর হৃদয়হীন এ তারই একটা প্রমাণ।

রাজাবাহাদুর কথা বললেন অন্য এক সুরে। প্রতিহিংসার জ্বালায় তিনি যেন জ্বলছেন। সহোদরার কষ্টে যেন কত কাতর!

—কি উপায় হবে এখন? কে তারে রক্ষা করবে?

পাত্র এগিয়ে দিতে দিতে বললেন সর্ব্বজয়া। বক্রকটাক্ষে দেখলেন, রাজার মুখভাব।

—কাশীশঙ্কর রক্ষা করবে। সেই যাবে মান্দারণে, সম্মত হয়েছে। আমিও দুশ্চিন্তার কবল থেকে মুক্ত হয়েছি। রাজাবাহাদুর কথার শেষে স্বস্তির শ্বাস ফেললেন। বললেন,—তাইতো আজ এমন অসময়ে এসেছি তোমার পাশে। আমার চিত্রাণীকে কাছে পেয়েছি।

—রাজাবাহাদুর! প্রেমাপ্লুত কণ্ঠে কথা বলেন সর্ব্বজয়া। বলেন,—আপনি না কি শিবানীর বিবাহের সব ঠিকঠাক ক'রেছেন?

ওপরে নীচে মাথা দুলিয়ে কালীশঙ্কর বললেন,—হ্যাঁ, প্রায় সবই স্থির হয়েছে। শ্রীমন্ত পুরোহিতের ব্যাটা শশিনাথের সঙ্গে বিবাহ হবে। পক্ষকালের মধ্যেই বিবাহ। এখন কেবল শশীর মা অনুমতি দিলেই কার্য্য সমাধা হয়। সেই বুড়ী ত্রিবেণীতে থাকেন। শশিনাথ লোক পাঠায়েছে তাঁর কাছে।

—বেশ হবে। ভাল হবে। শিবানীর জীবনটা রক্ষা পাবে।

ছোটরাণী কথার শেষে রক্তাধরে একটু মধুর হেসে আবার বলেন,—শশিনাথের সহ শিবানীকে বেশ ভালই মানাবে।

—ছোটরাণী!

কক্ষের বাহির থেকে কে এক দাসী, ডাকলো ভয়ে ভয়ে।

—কে ডাকে? মন্দোদরী দাসী না?

সর্ব্বজয়া সাড়া দিলেন অভ্যন্তর থেকে। নাতি উচ্চ কণ্ঠে।

—হ্যাঁ গো ছোটরাণী। খানসামা আলবোলা এনেছে রাজার।

রাজাবাহাদুরের কানে যায় কথা। রাজা বললেন, সর্ব্বজয়াকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে বললেন,—আলবোলা দিয়া যাক খানসামা।

রত্নখচিত নল, সুবর্ণের আলবোলা। তামাকুর সুরভিতে নেশা লাগে যেন। আলবোলার নল স্বহস্তে ধরলেন রাজা। আলবোলায় শব্দ তুলে তাম্রকূটসেবনে মন দিলেন। রত্নময় পালঙ্ক, মুক্তাপ্রবালের ঝালরযুক্ত শয্যা। জরির কামদার বালিশে এলিয়ে পড়েছেন ছোটরাণী। উমারাণী আর সর্ব্বমঙ্গলা গেছেন পাকশালে, তাই যত লজ্জা ছোটরাণীর। অথচ রাজার সান্নিধ্য ত্যাগ করতেও ইচ্ছা হয় না যেন। রাজার প্রেম-সম্ভাষণ।

—আপনি বিশ্রাম করুন, এবার আমি যাই?

রাণীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একখানি হাত ধ'রে আবার টানলেন কালীশঙ্কর। বললেন,—যাবে কোথায়? আমি বাধা দিলে সাধ্য কি যে যাও! এসো, কাছে এসো।

দীর্ঘচোখের কটাক্ষ হানলেন সর্ব্বজয়া। মিষ্টহাসি হাসলেন। দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলে আলস্য ত্যাগ করলেন যেন। রাজাবাহাদুর লক্ষ্য করলেন, রাণীর ক্ষীণ কটি, উন্নত বক্ষ, শুভ্র বাহুযুগল। রাজার সাদর আহ্বান শুনে চপল হেসে ছোটরাণী বললেন,—মুক্তি নাই তবে?

—না। মাথা দুলিয়ে বললেন কালীশঙ্কর। বললেন,—রাহু কখনও চন্দ্রকে মুক্তি দেয়!

রহস্যের হাসি হাসলেন সর্ব্বজয়া। রাজার একাগ্র মন যাতে বিক্ষিপ্ত হয় সেজন্য অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন থেকে থেকে।

বললেন,—রাজকুমারী কি তবে ফিরে এসে সূতানুটিতেই বসবাস করবে? ফিরবে না আর সাতগাঁয়ে?

—কি জানি কি হয়! মুখ থেকে মুখনল নামিয়ে বললেন রাজাবাহাদুর। দুই ভুরু কুঞ্চিত করলেন। বললেন,—এতো ভবিষ্যতের কথা। কৃষ্ণরাম যদি কখনও সদ্ব্যবহার করে তো আবার ফিরে যাবে। শাসনে নয়, স্নেহপ্রেমে যদি কোনদিন বশ মানে বিন্ধ্যবাসিনী।

—লোকে যদি মন্দকথা বলে, তখন? সমাজে যদি নিন্দা ছড়ায়!

সর্ব্বজয়া থেমে থেমে বলতে থাকেন একেকটি কথা। সম্ভাব্য পরিণাম শোনাতে থাকেন।

কালীশঙ্কর বললেন,—তোমার এত চিন্তার কি কারণ? এ সকল প্রসঙ্গ আপাতত তোলা থাক না। তুমি কাছে এসো আরও।

খিল খিল শব্দে হেসে ফেললেন ছোটরাণী। তাঁর মনোগত ইচ্ছা রাজাবাহাদুর অনুমানে বুঝেছেন, তাই হেসে ফেললেন কৌতুকের হাসি। হাসতে হাসতেই বললেন,—ভবি ভোলবার নয়?

—হ্যাঁ ঠিক তাই। প্রচণ্ড নেশা আসবের, তবুও দেখো আমি তো ভুলি না কিছু।

কথার শেষে সর্ব্বজয়ার ক্ষীণ কটি ধরলেন কালীশঙ্কর, বাহু-বেষ্টনে বেঁধে ফেললেন যেন সজোরে।

ধরা পড়েছেন, তবুও কেন কে জানে রাণীর খিল খিল হাসি যেন থামতে চায় না। ঘন ঘন হাসিতে তাঁর অঙ্গসমূহ যেন দুলছে। জলের প্রবাহে নৌকা যেমন দুলে দুলে ওঠে। চোখে যেন মদির দৃষ্টি ফুটেছে।

মনের কোণেও ঠাঁই দেননি রাজকুমারী। স্বপ্নেও ভাবেননি কখনও।

নির্ব্বাসন, তা হোক। স্বামীর আশ্রয় ত্যাগ ক'রে আবার পিত্রালয়ে ফিরে আসবেন, এমন কথা কখনও তাঁর মনে উদয় হয়নি। এমন অমঙ্গলের কথা!

গড়মান্দারণে বেশ আছেন বিন্ধ্যবাসিনী। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। কৃষ্ণরামের গঞ্জনা শুনতে হয় না দিবারাত্র, সতীনদের সমুখে অপমানিতা হ'তে হয় না সর্ব্বক্ষণ, চোখের জলে ভাসতে হয় না। মান্দারণে স্থলচর পশু আর সরীসৃপের বসতি। জঙ্গলে পরিপূর্ণ মান্দারণ। মনুষ্যের দেখা পাওয়া যায় কদাচ। কিছু না থাক, অবিচ্ছিন্ন শান্তি আছে।

রাজকুমারী ভগ্নগৃহের ছাদে বসেছিলেন এলোচুলে। অস্তগামী সূর্য্য পশ্চিম দিগন্তে। সূর্য্যকে পিছনে রেখে ব'সেছেন বিন্ধ্যবাসিনী। ভিজে চুল, শুকিয়ে যায় যদি শেষ রৌদ্রে। আমোদরের অপর তীর থেকে বাতাস আসছে সোঁ সোঁ। সহস্রফণা সাপের মত হাওয়া আসছে ছুটতে ছুটতে। জমিদারনন্দিনীর চোখে মুখে বুকে বাহুতে হাজার হাজার চুমুর পরশ দিয়ে পালিয়ে যায়। আলুলায়িত কেশ, ঠিক যেন কৃষ্ণপতাকার মত উড়তে থাকে। বুকের আঁচল উড়িয়ে দিয়ে যায়। গাছের পাতা মরমরিয়ে ওঠে।

বিন্ধ্যবাসিনীর গালে হাত। নির্নিমেষ দৃষ্টি যেন, আমোদরের জলে নিবদ্ধ হয়ে আছে। দূরে, আমোদরের মাঝজলে একখানি পত্রপুটা নৌকা। লাল শালুর পাল তুলে এগিয়ে আসছে ধীর মন্থর গতিতে।

—বৌ! ছাদের অন্য প্রান্ত থেকে কথা বললে পরিচারিকা। হাতে কিসের ভার, নামিয়ে রেখে বললে,—নদীর তীর থেকে দেখে দেখে এক ধামা এনেছি, দেখো দেখি কাজ হবে কি!

বর্ষার থমথমে আকাশের মত গম্ভীর মুখে সহসা হাসি ফুটলো। রাজকুমারী উঠে পড়লেন। চঞ্চল পায়ে এগিয়ে গেলেন যশোদার কাছে। দেখলেন কানায় কানায় ভরে গেছে ধামা। নদীতীরের বালু, চিক চিক করছে।

—এবার তুমি বালির ঘর বাঁধবে না কি বৌ?

পরিচারিকা যশোদা দম নিয়ে কথা বললে। আমোদরের তীর থেকে এক ধামা বালি বহন ক'রে আনতে আনতে কাহিল হ'য়ে প'ড়েছে যেন। মুখে যেন তার ক্লান্তি আর বিরক্তি ফুটেছে।

—বালির ঘর! সবিস্ময়ে বলেন রাজবালা। বলেন,—না, হাতের লেখা পাকাবো। বহুকাল অভ্যেস নেই। হয়তো ভুলে গেছি। অক্ষর লেখা মক্স ক'রবো।

—তাই বল! বললে যশোদা। ব'সে পড়লো ছাদের আলসের ধারে। বললে,—আমিতো তা জানি না। আমি ঠাউরেছি, ঘর বাঁধবে বালির। কাজ নেই কম্ম নেই, খেলা করবে তাই। লেখা শিখবে কেন গো? আমাদের জমিদারকে চিরকুট লিখবে না কি?

—মরণ তোমার! মনে মনে বললেন রাজকুমারী। কি উত্তর দেবেন ভেবে ঠিক করতে পারেন না যেন। কপাল কুঁচকে বললেন,—একটা কিছু তো করতে হবে। নয়তো খাওয়াপরা চলবে কোথা থেকে! চরকা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সুতো কাটতে পারি না আমি! নকলনবীশের কাজ করবো। চন্দ্রকান্ত কাজ দেবেন, কথা দিয়েছেন। রামায়ণ মহাভারত নকল ক'রেই চলে যাবে আমার।

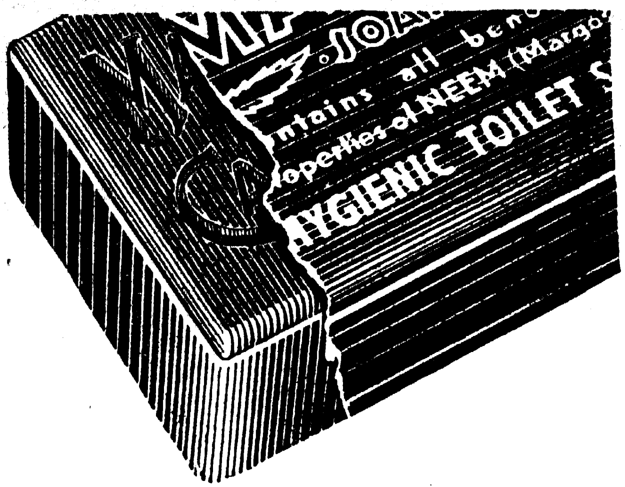
গালে হাত দিলো যশোদা। অবাক মানলো। বললে,—জমিদারের দেওয়া ভাত-কাপড় ছেড়ে ভিক্ষে চাইতে বসবে? তুমি না রাজকন্তে! ভিক্ষের কড়ি হাতে উঠবে তো?

বিন্ধ্যবাসিনী আর বাক্য ব্যয় করলেন না। আমোদরের দিকে চোখ মেললেন। দেখলেন দূরের পালবাহী পত্রপুটা ধীরে ধীরে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে। নৌকার মুখে নাগমুখ। বিস্তারিত ফণা। নৌকার গাত্রে অপূর্ব্ব চিত্রকার্য্য। লাল শালুর পাল বুক ফুলিয়ে উড়ছে। নৌকা যতভাগ দীর্ঘ তার অর্দ্ধেক পরিমাণ বিস্তৃত।

রাজকুমারী ছাদ ত্যাগ করতে উদ্যোগী হ'লেন। নৌকা হয়তো কাছাকাছি কোথাও নোঙর করবে। একজন মাল্লা নৌকার নোঙর হাতে ধ'রে নদীর তীরে নেমেছে। সূর্য্যের শেষরশ্মি ছড়িয়েছে শালুর পালে।

আনন্দকুমারী! অস্ফুটে ব'লে ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। নৌকায় কাকে যেন দেখতে পেয়ে বললেন।

নৌকার মধ্যস্থলে চৌধুরীকন্যা। সুসজ্জিতা, সালঙ্কারা আনন্দকুমারীকে দেখে মুখে হাসি ফুটলো বিন্ধ্যবাসিনীর। পাখীর কলরব আর অনুরাগের আলো ফেলে ঘরে ছুটলেন। এলোচুল আর আঁচল উড়িয়ে ছুটলেন। [ক্রমশঃ।



মার্গো সোপ

বিশুদ্ধ নিম তৈলে প্রস্তুত সুগন্ধী সাবান



মার্গো সোপের স্নিগ্ধ নরম ফেনা রোমকূপের গভীরে প্রবেশ করে দেহ নির্মল করে তোলে। দেহলাবণ্য উজ্জ্বল ও মসৃণ রাখে। পরিবারের সকলের পক্ষেই আদর্শ সাবান।

মার্গো সোপ

প্রস্তুতকারক: ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা ২৯

প্রধান কার্যালয় ; ৩৫ পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা ২৯



কেনা কাটা

দেশী কাচ শিল্প প্রসঙ্গে

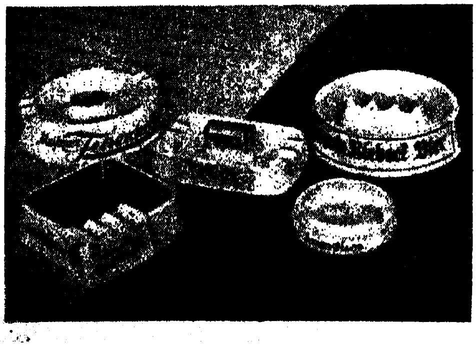
সেদিন একজন সন্ত বিবাহিতা কনের মা গল্প করছিলেন, মেয়ের বিয়েতে মেয়ে কি কি বস্তু উপহার পেয়েছে তাই নিয়ে। বললেন, সবচেয়ে বেশী পেয়েছে ফুল, যার কোন চিরকালীন মূল্য নেই। রাত ফুরোতে না ফুরোতেই ফুলের আয়ু ফুরিয়ে গেল। তারপর বেশী পরিমাণে পেয়েছে বই—যাদের একাধিক সংখ্যা পাওয়ার দরুণ "ডুপ্লিকেট" বইগুলি বিলিয়ে দিতে হয়েছে একে তাকে আর পাড়ায় সাধারণ পাঠাগারে। ফুল, বই বাদ দিয়ে যা যা পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে উল্লেখ করলেন, কাচের আইসক্রীম সেট আর সরবতের সেট। একই ডিজাইনের এতগুলি সেট পাওয়া গেল যে, শেষ পর্য্যন্ত মনিহারী দোকানে বিক্রি ক'রে দিতে হয়েছে সামান্ত কিছু দাম কমিয়ে। ভদ্রমহিলা আরও বললেন, মেয়েদের লজ্জার বিষয় প্রধানত দুটি। যথা (১) কেউ যদি নিমন্ত্রণগৃহে পৌঁছেই দেখতে পান তাঁরই মত শাড়ী পোষাকে আরও দু'একজন এসেছেন। (২) কেউ যদি দেখেন তাঁরই হাতের উপহারের বস্তুটি আগেই আরও কেউ কেউ দিয়ে গেছেন। এই লজ্জাকর পরিস্থিতি কেন আসে বাঙালীর জীবনে? টাকা খরচা ক'রে উপহার কিনে দিয়ে নাম কেনা যায় না কেন! এতে প্রমাণিত হয়, হয়তো বাজারে উপহারের দ্রব্যে নেই কোন বৈচিত্র্য এবং বাঙ্গালী ক্রেতাদের মনে নেই কোন বৈশিষ্ট্য। গতানুগতিক প্রথায় সকলেই একই বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জলের মত মিথ্যাই টাকা খরচ করছেন। ফুল আর বই, উভয়ের মধ্যেই আছে পার্থক্য। হাজারো রকমের ফুলের মত হাজারো ধরণের বই আছে। তবুও দেখবেন সকল উপহারদাতার হাতেই রজনীগন্ধা আর 'পরমপুরুষ' 'দৃষ্টিপাত' 'দেশে বিদেশে' কিম্বা 'ভারতপ্রেম কথা'। যাই হোক ফুল আর বই না হয় এক জাতের হ'তে পারে ক্রেতাদের জ্ঞানের অভাবে, কিন্তু কাচের জিনিসে এত ঐক্য কেন? তার মানে বুঝতে হবে ব্যবসায়ীদের রুচি এবং ডিজাইনের অভাব। দেশী কাচের ফ্যান্সি দ্রব্য সব একই ধরণের। আমাদের দেশী বেলোয়ারী কাচে তবু যেন অনেক বেশী বিশিষ্টতা ছিল, গঠনের পারিপাট্য আর রঙের বৈচিত্র্য ছিল।

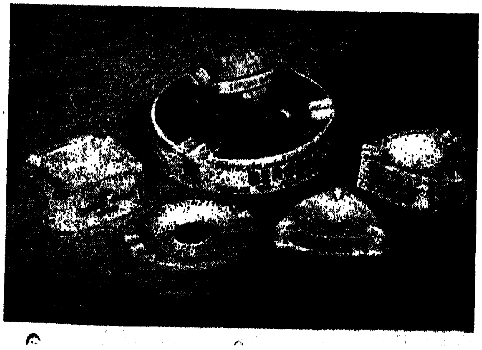
ভদ্রমহিলার কথার কোন জবাব দিতে পারলাম না আমরা। বললাম, ডিজাইনের অভাব বলছেন, দেখুন শ্রেফ কাচের জিনিস-পত্রে কি অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। ছবিগুলি দেখেই বুঝুন, আমাদের কাঁচশিল্প কোথায় পিছিয়ে আছে। এই ছবি দেখে যদি আমাদের দেশীয় কাচ-ব্যবসায়ীদের চোখের দৃষ্টি বদলায়, তবেই ছবি দেখানো আমাদের সার্থক হবে!

টাইপরাইটারের ইতিকথা

প্রথম টাইপরাইটার যন্ত্র অন্ধদের ব্যবহারের কাজে বা লেখায় সাহায্যের জন্য তৈরি হয়েছিল। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে হেনরী মিল নামে একজন ইংরেজ টাইপরাইটার জাতীয় একপ্রকার যন্ত্র বাজারে বের করেন। তারপর ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে Stuttgart এর Von Knaus নামে এক ভদ্রলোক, ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ফরাসী Pingeron এবং ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে এক অন্ধ কাউন্টেস এর সুবিধের জন্যে Turri নামক একজন ইতালীয় এক এক করে বিভিন্ন ধরণের টাইপরাইটার আবিষ্কার করে লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত করেন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে Detroit

সিগারেটের ছাইদানে বিজ্ঞাপন





এর William Burte একপ্রকার টাইপরাইটার সৃষ্টি করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় সেটি কেমন হতো, এক ইংরেজএর ভাষাতেই শুনুন : 'had an action like a sledge hammer.' ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে Marseilles এর Xavier Progin এর 'Machine Kryptagraphique' টাইপরাইটারের রাজ্যে এক যুগান্তর আনে। Machine Kryptographique হলো প্রথম টাইপরাইটার যন্ত্র, আঘাতের পর যার সমস্ত টাইপ-বারগুলি (type bar) কালিযুক্ত রিবনের (ribbon) ভেতর দিয়ে বিশেষ কেন্দ্রে এসে পড়তো।

বিভিন্ন দেশের আবিষ্কর্তাদের পরীক্ষা নিরীক্ষা এখানেই শেষ হলো না। তাঁরা আরও পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যেতে লাগলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে John Pratt এর নতুন ও উন্নত ধরণের টাইপরাইটার যন্ত্রটি আবিষ্কারের পর সাধারণ জনগণ আপন আপন দৈনন্দিন ব্যবহারের কাজেও যে টাইপরাইটারের প্রয়োজনীয়তা আছে, তা উপলব্ধি করলেন। কারণ এ পর্যন্ত লোকের ধারণা ছিল অন্ধদের লিখন কার্যে সুবিধের জন্যেই টাইপরাইটার যন্ত্র। এই একই বছরে Wisconsin এর এক কম্পোজিটর (মুদ্রাকর) পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যে টাইপরাইটার যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন, তারই নাম হয় Remington. এই নতুন উদ্ভাবিত Remington টাইপরাইটার যন্ত্রটির আবিষ্কর্তার নাম হলো Christopher Sholes. পরীক্ষা কার্যে ছ' বছরের ভেতর Christopher ত্রিশটি পরীক্ষা মূলক মডেল তৈরি ও নষ্ট করেন। তখন প্রধান সমস্যা দাঁড়িয়েছিল 'not to make the machines work, but to make them work long enough !'

এক বছরেরও কম সময়ে আমেরিকার বাজারে প্রতিটি ১২৫ ডলার মূল্যে ২৫,০০০ টাইপরাইটার যন্ত্র বিক্রির জন্যে ছাড়া হয়। টাইপরাইটার যন্ত্র বহুল ব্যবহারের জন্যে এই সময় আমেরিকার পত্র-পত্রিকায় যে বিজ্ঞাপন বের হতো তার কয়েকটি লাইন পাঠক পাঠিকাদের জ্ঞাতার্থে উদ্ধৃত করছি : 'Ministers, Lawyears, Authors, and all who desire to escape the drudgery of the pen...'প্রচুর বিজ্ঞাপন দিলে কী হবে, টাইপ-রাইটার যন্ত্রের বিক্রী তাতে করে মোটেই বাড়লো না। তবে একটি সংবাদ জেনে হয়তো অনেকেই খুশি হবেন যে Mr.Clemens(মার্ক টোয়েন) তাঁর বিখ্যাত 'Life on the Missiosippi গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রকাশের পূর্বে পুনর্লিখনের জন্যে একটি টাইপরাইটার যন্ত্র Boston শহর থেকে কেনেন। ১৮৭৬ খৃ: ফিলাডেলফিয়া প্রদর্শনীতে টাইপরাইটার যন্ত্র দর্শকদের প্রদর্শনের জন্যে এক ব্যবস্থা করলে বহু দর্শকই ২৫ সেণ্ট খরচ করে প্রিয়জনদের টাইপ করে শুভেচ্ছা বাণী ইত্যাদি পাঠিয়েছিলেন—তবুও বিক্রী বাড়েনি।

এই সময়কার টাইপরাইটার যন্ত্র শুধু ইংরাজি বড় অক্ষর (Capital) থাকায় সাধারণের কাজের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। জনসাধারণের যাতে তাড়াতাড়ি অসুবিধা দূর হয় তার জন্যে আবিষ্কর্তারা বিশেষ মাথা ঘামাতে থাকেন এবং অবশেষে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'Shift-Key machine' (অর্থাৎ একই হাতে বড় ছোট উভয় হাতের অক্ষর) বাজারে দেখা দেয়।

প্রথম যুগের টাইপরাইটার যন্ত্রের নানা অসুবিধা বা দোষের ভেতর : টাইপ বারগুলি এমনভাবে থাকার বন্দোবস্ত ছিল যে, সেগুলি সিলিণ্ডারের তলদেশে মুদ্রিত হতো। কী লিখছেন পূর্বে



কাচের চায়ের সেট, সচিত্র

তা দেখতে হলে অপারেটরকে ক্যারেজ (carriage) তুলে দেখতে হতো। জনসাধারণের এ অসুবিধাগুলিও বেশী দিন ভোগ করতে হলো না, কারণ ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে এমন একপ্রকার টাইপরাইটার যন্ত্র বাজারে এলো, যে যন্ত্রে পূর্বের অসুবিধাগুলি জনসাধারণকে মোটেই ভোগ করতে হতো না ! কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু টাইপরাইটার যন্ত্রের বিক্রী তবুও বাড়লো না। দেখা গেছে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেও বছরে ১৫০০র বেশি টাইপরাইটার যন্ত্র কখনো বিক্রী হয়নি। টাইপরাইটার যন্ত্র বিক্রী না হওয়ার নানা কারণের মধ্যে একটি হলো Commercial firms গুলির কর্ণধাররা মনে করতেন 'type-writers could never develop a soul to express the courtesis and ideas of business.' ইংল্যাণ্ডের তৎকালীন মন্ত্রী Gladstone তো টাইপরাইটার যন্ত্রের বিশেষ বিরুদ্ধবাদী বা বিতৃষ্ণা সম্বন্ধীয় ছিলেন।

নিউইয়র্কের Y. W. C. A. মহিলাদের মধ্যে প্রথম টাইপিং কোর্স প্রবর্তন করেন। ব্যবসায়ীদের ভেতর যাঁরা একটু দুঃসাহসী



কাচের নক্সাকাটা ফুলদান ও বাটি

ছিলেন, তাঁরা তখন তথাকথিত লেডি টাইপরাইটার্সদের কর্মে নিয়োগ করতে লাগলেন এবং এতদিন যা 'business like' ছিল না, সেই টাইপরাইটারের লেখা 'business like' হলো ও আস্তে আস্তে টাইপরাইটারের প্রতি পূর্বধারণা বা বিদ্বেষ দূর হলো।

আজ টাইপরাইটারকে মনুষ্য দর্শন বিধাতার একটি শ্রেষ্ঠ দান হিসেবে গ্রহণ করেছেন। হয়তো ভবিষ্যতে সমাজের 'ইতিহাস লেখকরা স্ত্রী-স্বাধীনতার ক্ষেত্রে টাইপরাটারের যে একটি বিশেষ দান আছে তা স্বীকার করবেন, বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশসমূহ, কারণ পাশ্চাত্য টাইপরাইটার স্ত্রী জাতিকে প্রথম কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ দেয়।

টাইপরাইটার ও টাইপরাইটারকে বিদেশীরা কী ভাবে নিলেন তার ইতিকথা আপনারা পড়লেন! আমাদের দেশেও টাইপরাইটার যন্ত্র আজ সর্বজননন্দিত। ইংরেজি টাইপরাইটারের সঙ্গে বাঙলা টাইপরাইটারও আমাদের দেশে চালু হয়েছে। আজ বাঙলা টাইপ-রাইটার চালু হলেও তার যে দু একটি অসুবিধার দিক আছে তা হয়তো খুব শীগগীর নতুন আবিষ্কর্তা তাহা দূর করবেন। বাঙলা টাইপরাইটারের কল্যাণে বাঙলা ভাষা আজ প্রসার লাভ করেছে, কার্যক্ষেত্রে বহু সুবিধেও হয়েছে।

সেকালের বাজার দর

(২০ নবেম্বর ১৮১৯ ৬ অগ্রহায়ণ ১২২৬)

এই সপ্তাহের বাজার ভাও—

আলুন তুলা আঠার টাকা মোন।
কাছোড়া তুলা সতর টাকা মোন!
পাটনাই তণ্ডুল তিন টাকা বারো আনা মোন।
পাছড়ি তণ্ডুল তিন টাকা দুই আনা মোন।
মধ্যম তণ্ডুল দুই টাকা দশ আনা মোন।
মুগী তণ্ডুল উত্তম এক টাকা বার আনা মোন।
বালাম তণ্ডুল একটাকা তের আনা মোন।
নীল উত্তম এক শত ষাটি টাকা মোন।

এই সপ্তাহে তুলার ক্রয়বিক্রয় অত্যল্প হইয়াছে এবং গত সপ্তাহ হইতেও তুলার দর ফি মোন ছয় আনা অধিক মূল্য হইয়াছে।

—সমাচার দর্পণ

সেকালের রপ্তানীর হিসাব

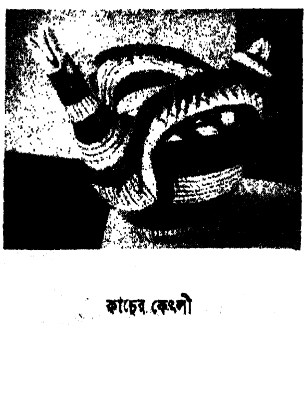
কলিকাতা হইতে ইংগ্লণ্ড দেশে জিনিস রপ্তানি (১১ জানুআরি ১৮২২, ৭ই মাঘ ১২২৮) সন ১৮২১ সালের ইং জানুআরি লাং দিসেম্বর।

হিঙ্গু	৬ মোন
সোহাগা	১৬২ মোন
জেরেণ্ডা তৈল	২৬০৪ মোন
লবঙ্গ	১১১ মোন
নারিকেল তৈল	৬ মোন
সূতা	৮ মোন
গজদন্ত	১১২ মোন
মাজুফল	৩৮০ মোন
ছাগচর্ম	১১৫৩১ খান
মহিষ শৃঙ্গ	৭২৭৭১ মোন
পিপ্পল	৫০ মোন
মঞ্জিষ্ঠা	২৮৪১ মোন
জাংফল	৮ মোন
কুচিলা	২৭১ মোন
বেত	২৫০০ গোছা
রক্তচন্দন	১০২৭ মোন
কুসুম পুষ্প	৩৮২১ মোন
শাল	৮৮১ যোড়া
গুয়ামউরি	৭৮ যোড়া

—সমাচার দর্পণ

কাগজের বিজ্ঞাপনে ছাইদান

কাগজে ছাপিয়ে, হোডিং খাটিয়ে, আকাশের গায়ে ধোঁয়ায় লিখে বিজ্ঞাপন দেওয়ার রীতি সকলেই জানেন এবং দেখেছেন। যদি বলা যায়, কাগজ উনুনে যায় শেষ পর্য্যন্ত, হোর্ডিং ঝড়ে উড়ে যায়, আকাশের লেখার দাগ মুছে যায় দেখতে না দেখতে! তা হ'লে তো বিজ্ঞাপন আর প্রচারের কোন মূল্যই থাকে না। কেউ কেউ বলবেন, মানুষই যখন চিরায়ু নয়, তখন আর সামান্য বিজ্ঞাপনের কথা তোলেন কেন! আমরা তদুত্তরে ব'লবো, এমন বিজ্ঞাপন যা



কাচের কেৎলী



কাচের কেৎলী

প্রচারশিল্প আছে, যাদের শুধু আপনি কেন আপনার উত্তরাধিকারীরাও দেখতে পাবেন। মানুষ থাকে না, মানুষের কীর্ত্তি বেঁচে থাকে। যাই হোক, বিজ্ঞানসম্মত প্রচারবিশারদরা বলছেন, এমন বিজ্ঞাপন দিতে হবে যে বিজ্ঞাপনটি সর্ব্বক্ষণ আপনার চোখের সামনে থাকবে, আপনি শত চেষ্টাতেও ভুলতে পারবেন না বিজ্ঞাপনদাতার নাম। এই প্রসঙ্গে প্রকাশিত ধূমপানের ছাইদানগুলি লক্ষ্য করুন। আপনি যদি নেহাৎ অসাবধানী প্রকৃতির না হন, ছাইদান স্বেচ্ছায় ভেঙে ফেলবেন না। ছাইদানের গায়ে দেখুন নানা ব্যবসায়ীর বিজ্ঞাপন। ছাইদান ধূমপায়ীর নিত্যসঙ্গী। আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ এ ধরণের ছাইদান বিজ্ঞাপনের কাজে ব্যবহার করলেও, এই প্রচারপ্রথা ব্যাপক ভাবে ছড়ায়নি এখনও।

খুচরো কথা

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতীয় মিলগুলি ৩৭৪'৪০ কোটি গজ মাঝারি কাপড় ও ৬০'৬০ কোটি গজ মোটা কাপড় উৎপন্ন করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। উহার মধ্যে ৪৮'৩০ কোটি গজ মাঝারি শাড়ি ও ২০ লক্ষ গজ মোটা শাড়ি আছে। ধুতি উৎপন্নের পরিমাণ হইতেছে ৩৬'৪০ কোটি গজ (মাঝারি) ও ১'১০ কোটি গজ মোটা। ১৯৫৫-৫৬ সালে (১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত) ধুতি (অতিরিক্ত উৎপাদন কর) আইনে ২,৮৮,০০০ টাকা আদায় হইয়া সাধারণ রাজস্বে জমা হইয়াছে। * * ভারত সরকারের উৎপাদনমন্ত্রী লোকসভায় এক প্রশ্নোত্তরে বলেন যে, ভারতে নির্মিত জাহাজের জন্য নীতিগতভাবে ডিজেল ইঞ্জিন তৈয়ারীর কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করা ইহয়াছে। ইহা সরকারী পরিচালনাধীন থাকিবে এবং সম্ভবতঃ ভিজাগাপটমে কারখানাটি স্থাপিত হইবে। * * ভারতে বর্ত্তমানে যে পরিমাণ লবণ প্রস্তুত হয়, তাহা দ্বারা অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটাইয়াও বৎসরে ১ কোটি মণ লবণ সে বিদেশে রপ্তানি করিতে পারে। ১৯৫৫ সালে ভারতে ৮'১১ কোটি মণ লবণ উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই বৎসর অভ্যন্তরীণ চাহিদার পরিমাণ ছিল ৭'২৮ কোটি মণ। দ্বিতীয় পরিকল্পনা শেষে ভারতে লবণ উৎপাদনের লক্ষ্য ধরা হইয়াছে ১০ কোটি মণ। * * সম পরিমাণ কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকদের সমান অঙ্কের মজুরী দেওয়ার যে নীতি বা বিধি বিশ্ব শ্রমিক সংস্থা (আই এল ও) ১৯৫১ সালে প্রচার করেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন সম্প্রতি তাহা অনুমোদন (ও গ্রহণ) করিয়াছেন। ১৯৫৩ সালের ২৩শে তারিখ হইতে এই নীতি কার্যকরী হইয়াছে। সোভিয়েট ইউনিয়নকে লইয়া এ পর্যন্ত এগারটি রাষ্ট্র এই নীতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অপর দশটি রাষ্ট্র হইল :—অষ্ট্রিয়া, বুলগেরিয়া, কিউবা, ডমিনিক্যাল রিপাব্লিক, ফ্রান্স, মেক্সিকো, ফিলিপাইন, পোল্যাণ্ড এবং যুগোশ্লোভিয়া। * * ১৯৫৪-৫৫ সালে সারা ভারতে চা ব্যবহৃত হইয়াছে প্রায় ১৬ কোটি ৮৮ লক্ষ পাউণ্ড। ইহার মধ্যে চা ব্যবহৃত হইয়াছে সবচেয়ে বেশী সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ সহ বোম্বাইতে, তারপর পশ্চিমবঙ্গে এবং তারপর মাদ্রাজ অঞ্চলে। বোম্বাইতে চা ব্যবহৃত হইয়াছে প্রায় ৩ কোটি ১৭ লক্ষ পাউণ্ড, ত্রিপুরা ও চন্দননগর সহ পশ্চিমবঙ্গে ৩ কোটি ৩৮ লক্ষ পাউণ্ড এবং অন্ধ্র ও কুর্গসহ মাদ্রাজে ৩ কোটি ১২ লক্ষ পাউণ্ড। * * আন্তর্জাতিক সমবায় সংঘের কর্তৃপক্ষ এই মাসের প্রথম দিকে কোপেনহাগেনের সভায় এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। উক্ত সংঘটি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে সর্বরকমের সমবায় সংগঠনের আন্তর্জাতিক সমিতি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার একটি উদ্দেশ্য হইল বিশ্বব্যাপী সমবায় নীতি ও পদ্ধতির প্রচার। পারস্পরিক আত্মনির্ভরতার ভিত্তিতে মুনাফাশূন্য উৎপাদন ও বাণিজ্য ব্যবসার প্রবর্তনও ইহার আর এক উদ্দেশ্য। * * ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে সিমেণ্ট ব্যবহৃত হইয়াছে ৪৫ লক্ষ টন এবং ১৯৫৫ সালে ভারতে সিমেণ্ট আমদানী হইয়াছে ৪০০ টন। * * ভারত সরকার পূর্ব অঞ্চলে আরও তিনটি ছোট ইণ্ডাষ্ট্রীজ সার্ভিসেস ইনষ্টিটিউট খোলার



কাচের রেকাবী বা প্লেট



কাচের ফুলদান

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বিহারে একটি পূর্ণাঙ্গ ইনষ্টিটিউট স্থাপিত হইবে এবং উড়িষ্যা ও আসামে কলিকাতার ইনষ্টিটিউটের শাখা স্থাপিত হইবে। ক্ষুদ্র শিল্পের উন্নতির জন্য শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর এই ইনষ্টিটিউটগুলি স্থাপন করিতেছে। * * দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কাগজ শিল্পের আরও উন্নতি হয় এবং কাগজ কলের সংখ্যা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। হিসাবে দেখা যায়, দ্বিতীয় যুদ্ধকালে কাগজের কলের সংখ্যা দাঁড়ায় ১ লক্ষ ৪ হাজার টন। ক্রমে এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেয়ে কাগজের কলের সংখ্যা ২০টিতে এবং উৎপাদনের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৮৪,৮৮৪ টনে। এটা হল ১৯৫৫ সালের হিসাব। নিম্নে ১৯৪৭ সাল থেকে ভারতে কাগজ ও বোর্ডের উৎপাদনের একটি হিসাব দেওয়া হল :—

বৎসর	বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ	বোর্ড	মোট
১৯৪৭	৭৪,৯৪০	১৮,১৫৬	৯৩,০৯৬
১৯৫০	৮৯,৯৬৪	১৮,১৪৮	১,০৮,১১২
১৯৫২	১,১৫,৭৮৮	২১,৭২০	১,৩৭,৫০৮
১৯৫৩	১,২০,১৯২	১৯,৫১২	১,৩৯,৭০৪
১৯৫৪	১,৩৪,৭০৬	২৪,০৩৫	১,৫৮,৭৪১
১৯৫৫	১,৫৩,৪২০	৩১,৪৬৪	১,৮৪,৮৮৪

ভারতে সবশুদ্ধ ২০টি কাগজের কল আছে। এই ২০টি কলের মধ্যে ৪টি পশ্চিমবঙ্গে, ৫টি বোম্বাইতে, ২টি করে উত্তরপ্রদেশ আর মহীশূরে এবং ১টি করে বিহার, উড়িষ্যা, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, অন্ধ্র, হায়দরাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে অবস্থিত। এদের সমবেত উৎপাদন-ক্ষমতা হচ্ছে ১,৮৫,৬০০ টন। ভারতে বিভিন্ন শিল্পের যা উৎপাদন-ক্ষমতা তার একটা বৃহদংশই অকেজো পড়ে থাকে, কিন্তু কাগজশিল্পের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম দেখা যায়। ১৯৫৫ সালের উৎপাদন-ক্ষমতা এবং সত্যিকারের উৎপাদনের হিসাব তুলনা করলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। যা হোক, এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, পশ্চিমবঙ্গেই সবচেয়ে বেশী কাগজ উৎপন্ন হয়। কাগজ-শিল্প প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুক্ত হয়েছে এবং তা বেসরকারী উদ্যোগের আওতায় রাখা কাগজ আমদানী সম্বন্ধে সরকার যে নীতি অনুসরণ করছেন, তার পরিবর্তন করলে শিল্পের অগ্রগতি আরও বৃদ্ধি পাবে বলে অনেকে বিশ্বাস করেন। * * পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত জনৈক ব্যক্তি সম্প্রতি একটি নূতন চরকা তৈয়ার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভদ্রলোক বর্তমানে টিটাগড়ে আছেন। চরকাটির নাম পুনর্বাসন চরকা। ইহা আগাগোড়া কাষ্ঠ নির্মিত ও সহজে বহনযোগ্য। ইহাতে ২৮টি টাকু থাকিবে। এই চরকা দ্বারা তুলা, রেশম, পাট ও শণের ছাট দিয়া যে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর সূতা হইবে, তাহা দ্বারা কার্পেট, ঢাকনি, মাথার টুপি ইত্যাদি প্রস্তুত করা যাইবে।

বিষ্টি নামলো

বাসন্তী সেন

বিষ্টি নামলো, আকাশের পথ বেয়ে
মেঘের সিঁড়ি ভেঙ্গে
পৃথিবীর দরজায়।

বিজলী চম্‌কায়—
থেকে থেকে আলো দেখায়
চঞ্চল পথ হারানো বিষ্টি-মেয়েকে।
ভিজে ঝিঙেফুল ফোটে,
যুঁই ঝরে পড়ে আনমনে,
পাতারা থমকে থামলো।

বিষ্টি নামলো—পৃথিবীর দরজায়,
মনের পর্দায় আলো জেলে।
যেমন চৈত্রের উত্তাপ,
গ্রীষ্মের তৃষ্ণায়
পথ চেয়েছিল শান্তির—বিষ্টির।

বিষ্টি নামলো—
দুঃখের রজনীর সন্তাপহারিণী অশ্রু
মেঘের সিঁড়ি ভেঙ্গে
মনের আলো জেলে,
পৃথিবীর—হৃদয়ের প্রান্তে সে থামলো।
বিষ্টি নামলো।

সাহিত্য পরিচয়

সাংস্কৃতিক লোকরুচির পরিবর্তন

কিছুদিন হ'ল আমেরিকা থেকে "Journalism Quarterly" নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকার উদ্দেশ্য—"Research studies in the field of mass communication"—অর্থাৎ আধুনিক জনপ্রচারের মাধ্যম ও বাহনগুলি সম্বন্ধে গবেষণা। এই ধরণের একটি গবেষণার ফলাফল সম্প্রতি এই পত্রিকায় (১৯৫৫ সালের চতুর্থ সংখ্যায়) প্রকাশিত হয়েছে—"What they read in 130 daily Newspapers"—অর্থাৎ ১৩০ খানি সংবাদপত্রের নানা রকমের পাঠ্যবস্তু কয়েক হাজার পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষভাবে যাচাই করে, কোনটি কি অনুপাতে জনপ্রিয়, তার বিচার করা হয়েছে। প্রথমে দেখা হয়েছে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত মোট পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে কোন্ বিষয় কি অনুপাতে প্রকাশিত হয় এবং তার পর মোট পাঠক-সংখ্যার মধ্যে শতকরা কতজন কোন্ বিষয়ে অনুরাগী, এবং তার মধ্যে স্ত্রীলোক ও পুরুষের সংখ্যা কত, তার হিসেব করা হয়েছে। অনুসন্ধানের বিস্তারিত ফলাফল এখানে প্রকাশ করা বা তাই নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। কেবল উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বিষয়ের কথা আমরা বলব।

সংবাদপত্রের মোট পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে সব চেয়ে বেশি "খেলাধূলার" বিষয় (শতকরা ১১ ভাগের বেশি) প্রকাশিত হয়, কিন্তু মোট পাঠকদের মধ্যে শতকরা সাত-আট জন তা পড়েন। তার চেয়ে বেশি পাঠক পড়েন "কমিক" (শতকরা ১৩ জনের বেশি) এবং "যুদ্ধের" (শতকরা ৮ জন) খবর, যদিও এই দুটি বিষয় সংবাদপত্রের মোট পাঠ্যবস্তুর শতকরা ৪.৭ ভাগ এবং ৪.৬ ভাগ প্রকাশিত হয়। "আমোদ-প্রমোদের" বিষয় মোট পাঠ্যের শতকরা তিনভাগ, এবং তার পাঠক শতকরা ২.৬ জন, তার মধ্যে মেয়েরা বেশি। তার পরেই "Major Crime" ও "Politics"—যথাক্রমে শতকরা ২.৭ এবং ২.৫ ভাগ প্রকাশিত হয়, কিন্তু পড়েন যথাক্রমে শতকরা ৩.২ এবং ২.১ জন পাঠক। অর্থাৎ খুন-খারাবি অপরাধের সংবাদ 'আমোদ-প্রমোদের' সংবাদের পাঠকের চেয়েও অনেক বেশি পাঠক পড়েন। সবচেয়ে শোচনীয় হ'ল "শিক্ষা" এবং "চারুকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্য" বিষয়ের অবস্থা। এই দুটি বিষয়ের পাঠ্যবস্তু যথাক্রমে মোট পাঠ্যের শতকরা ১.৪ ভাগ এবং .৬ ভাগ (পুরো একভাগও নয়) প্রকাশিত হয় এবং তার পাঠক হ'ল যথাক্রমে মোট পাঠকসংখ্যার শতকরা ১.২ ভাগ ও .৪ ভাগ।

সাংস্কৃতিক লোকরুচির যে কি দ্রুত পরিবর্তন হ'চ্ছে আমেরিকায়, তা এই অনুসন্ধানের ফলাফল দেখে বোঝা যায়। লক্ষ্যণীয় হ'ল, সংবাদপত্র পত্রিকার মালিক ও পরিচালকরা ঠিক লোকরুচির সঙ্গে তাল রেখে পাঠ্যবস্তু পরিবেশন করছেন, অর্থাৎ তার দ্রুত-বিকৃতিতে সহায়তা করছেন। শিক্ষা, চারুকলা, সঙ্গীত ও সাহিত্য বিষয়ে রচনা ও সংবাদ সবচেয়ে কম প্রকাশিত হয়, কারণ তার পাঠকসংখ্যাও খুব অল্প। তার চেয়ে অনেক বেশি খুনখারাবি ও রাজনীতির খবর, কমিক ও যুদ্ধের খবর বা রচনা ছাপা হয়, কারণ তার পাঠকসংখ্যা অনেক বেশি। আরও চমকপ্রদ ব্যাপার হ'ল, সাহিত্য, সঙ্গীত ও চারুকলার সামান্য পাঠকসংখ্যার মধ্যেও মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের প্রায় দেড়গুণ বেশি। অর্থাৎ মেয়েদের হৃদয়বৃত্তি বা কোমলবৃত্তি এখনও যৎকিঞ্চিৎ আছে, পুরুষদের প্রায় নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতার চরম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকৃতির এই সব উপসর্গ কেবল কি আমেরিকাতেই পরিস্ফুট হয়ে উঠছে, না অন্যান্য দেশেও উঠছে? প্রায় সব দেশেই একই উপসর্গ দেখা দিচ্ছে। আমাদের দেশের পত্র-পত্রিকার মালিক, পরিচালক ও পাঠকরা এ-সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে দেখবেন, কোন্ পথে তাঁরা চলেছেন?

বই, ব্লাউজ ও শাড়ি

'ফ্যাশান' সম্বন্ধে সমাজবিজ্ঞানীরা বলেছেন যে, ফ্যাশানের উত্থান-পতন অনেক বেশী দ্রুত তালে হয়, 'ষ্টাইলের' তুলনায়। ষ্টাইল আর ফ্যাশান এক নয়, কোন কালে ছিলও না। পোষাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে 'ফ্যাশানের' আধিপত্য যে রকম দেখা যায়, এ রকম আর কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় না। সম্প্রতি বাংলা দেশের বইয়ের ক্ষেত্রে ফ্যাশানের বিলক্ষণ প্রভাব দেখা যাচ্ছে। ঠিক ব্লাউজ ও শাড়ির ফ্যাশানের সঙ্গে বইয়ের জগতের 'ক্রেজের' তুলনা করা চলে। এক একটি ফ্যাশানের শাড়ি যখন বাজারে একবার চালু হয়, তখন বন্যার স্রোতের মতন সেই শাড়ি প'রে মেয়েরা পথেঘাটে চলতে থাকেন। 'মানে-না-মানা' যখন চলল, তখন শহরের পথে খুব অল্প মেয়েই দেখা যেত, যাঁরা এ-শাড়ি পরে চলতেন না। 'পথিক' যখন চলল, তখনও ঠিক তাই। মধ্যে যখন শ্রীনিকেতনী, উড়িয়া ও তাঁতির শাড়ি চলল, তখন তাই পরে চলাই ফ্যাশান হয়ে উঠল। এখন কৃত্রিম সিল্ক চলছে, সুতরাং তাঁত ও তাঁতির অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। ব্লাউজের হাত ছোট হতে হতে কাঁধ পর্যন্ত ঠেলে উঠল, তার পর আবার আর এক দমকা হাওয়ায় নামতে নামতে কনুইয়ের নিচে পর্যন্ত নেমে গেল। এখন কনুইয়ের কাছ বরাবর, বাইসেপের তলায় এসে মেয়েদের ব্লাউজের ফ্যাশান একটা "ইকুইলিব্রিয়ামে" পৌঁচেছে মনে হয়।

বইয়ের বাজারেও ঠিক এই উপসর্গ দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একখানা বই বাজারে "চলতে" আরম্ভ করল, হাটি-হাটি-পা-পা ক'রে নয়, ঊর্ধ্বশ্বাসে পড়ি-কি-মরি ক'রে। প্রকাশকরা এবং সাহিত্যিকরাও অনেকে সম্প্রতি চলচ্চিত্রের ভাষায় বলতে আরম্ভ করেছেন—"বইখানা হিট্ করেছে" বা "লেগেছে"। এই ভাবে যেমনি কোন বই 'হিট্'

করল, অমনি একদল পাঠক "হিট্" হয়ে গেল। গোলদীঘি-ও অন্যান্ত বইয়ের বাজারে পাঠকদের গড্ডলিকা প্রবাহ বইতে আরম্ভ করল, জোয়ারের মতন। পড়বার জন্ত নয়, বই উপহার দেবার জন্ত, বন্ধু বান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের বিবাহে। মনে করুন, "নরকের স্বর্গীয় প্রেম" নামে একখানা বই হিট্ করেছে। ক্রেতারা (পাঠক বলা ঠিক নয়) দোকানে এসে বলছেন, "নরকের প্রেম" দিন তো একখানা। প্রতি মিনিটে একজন ক'রে আসছেন। বৈশাখের বিয়ের দিন। সেদিন যাঁদের বিয়ে হ'ল শহরে তাঁরা সকলে দশ কপি ক'রে "নরকের প্রেম" উপহার পেলেন। দু'শ বিয়েতে একদিন, কি দুদিনেই দু হাজার বই বিক্রি হয়ে গেল। প্রকাশকের কাছে লেখকের দাম বাড়ল, লেখক ভাবলেন যে তিনি এমন পপুলার হয়েছেন, পাঠকরা তাঁকে চিনতে পারলে পথে ঘাটে 'মিস্ ক্যালকাটার' মতন পশ্চাৎ ধাওয়া করবেন। আসলে কিন্তু যা হ'ল তা ভয়াবহ।

দশ কপি ক'রে 'নরকের প্রেম' যাঁরা উপহার পেলেন, তাঁরা ফুলশয্যার পরের দিন এক কপি রেখে বাকি ন' কপি বই থেকে নামটি তুলে ফেলে, হয় বইয়ের দোকানে, অথবা শিশি বোতল-ওয়ালাদের কাছে বেচে দিলেন। যাঁরা উপহার দিলেন, তাঁদের উপহারের এই হ'ল পরিণতি। যা সকলে দিচ্ছে, অর্থাৎ "পপুলার" বই উপহার দিলে এই অবস্থাই হয়। লেখকের কি হাল হল? তাঁর দু হাজার বই—দু হাজার পাঠক বা প্রতিষ্ঠানের প্রশস্ত সাগরে না ছড়িয়ে পড়ে, দু'শ জন নববিবাহিত বরবধূর জলাশয়ে বদ্ধ হয়ে গেঁজে গেল। তাই বলছি "ধীরে, রজনী ধীরে"। 'Slow and steady' যাঁরা, তাঁরাই শেষ পর্যন্ত দৌড়-প্রতিযোগিতায় জয়ী হন, এই প্রাচীন জ্ঞানের কথার আজকের Speedএর যুগে ব্যবসায়ী-প্রকাশকদের কাছে কোন মূল্য না থাকলেও, কথাটা আজও মিথ্যা হয়নি, হবেও না কোনদিন। প্রকাশক ও লেখক যাঁরা এই নীতিতে বিশ্বাসী, তাঁরাই আজও দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। বইয়ের ক্রেতা যাঁরা, তাঁরা যদি নিজেরা পাঠক হন, তাহলে কোন 'পপুলার' বইয়ের নাম শুনে, হৈ-হৈ করে সেই বই কিনে উপহার দেবেন না। তাতে লেখকের ক্ষতি করা হয় এবং উপহারের বইটিও নষ্ট হয়। যত ভাল বই-ই হোক, যদি সেটা craze-এর বশবর্তী হয়ে কিনে উপহার দেন, সে বই নষ্ট হবে। যেমন, ভাল Electric Iron চমৎকার উপহার। কিন্তু কেউ যদি পাঁচটি ইস্ত্রি পান, তাহ'লে অন্ততঃ তিনটি তাঁকে বেচে দিতে হয়। দশখানা "মহাভারত" পেলেও ন'খানির দুর্গতি তাই হবে। সেই জন্ত উপহারের বই সুস্থ মস্তিষ্কে নির্বাচন করে, বহু লেখকের অনেক ভাল বই থেকে বেছে দেওয়া উচিত। বইটা ব্লাউজ বা শাড়ি নয়। দশখানা একই ক্যাসানের শাড়ি পেলে, ট্রাঙ্কে সাজিয়ে রেখে, একে একে তা ব্যবহার করা যায়। কিন্তু দশখানি একই বই আলমারিতে সাজিয়ে রেখে একে একে প'ড়ে আনন্দ পাওয়া যায় না।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

সম্রাট ও সাগর থেকে ফেরা

আজও যাঁরা বিপুল উদ্দীপনায় বাঙলা সাহিত্যকে ভরিয়ে দিচ্ছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র একজন। তাঁকে রসগ্রাহী পাঠক-পাঠিকারা চেনেন সুসাহিত্যিক ও সুকবি হিসেবে। প্রেমেন্দ্র মিত্র লেখেন কম। তাঁর গ্রন্থের সংখ্যাও বেশি নয়, কিন্তু যা লেখেন তা একবার পড়লে বিস্মৃত হওয়া কঠিন। কবি জীবনানন্দ দাশ এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।' এবং তাঁদের ভেতর প্রেমেন্দ্র মিত্রের আসন প্রথম সারিতে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা হয়তো এমত সমর্থন করবেন। প্রেমেন্দ্র মিত্রের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সম্রাট' বহুদিন বাজারে ছিল না। সম্প্রতি 'সম্রাট'-এর নতুন সংস্করণ-এর সঙ্গে কবির একখানি নতুন কাব্যগ্রন্থ 'সাগর থেকে ফেরা' আমাদের হাতে এসেছে। 'সম্রাট'-এ ত্রিশ ও 'সাগর থেকে ফেরা'-তে কবির বত্রিশটি কবিতা যথাক্রমে স্থান পেয়েছে। কবি কী চান, এতদিন ধরে কবি কিসের অনুসন্ধান করছেন, কবি-মনের সেই পরিণতি লক্ষিত হয় 'সাগর থেকে ফেরা'র মধ্যে। ঝকঝকে ছাপা, সুন্দর প্রচ্ছদপট। 'সাগর থেকে ফেরা' ও 'সম্রাট' এর নতুন সংস্করণের দামও খুব বেশি নয়, যথাক্রমে তিন ও দু টাকা। প্রকাশক: ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী লিমিটেড, ১৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭।

দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস

বঙ্গীয় সেক্সপীয়র পরিষদ মহাকবি সেক্সপীয়রের বিখ্যাত নাটক "দি মার্চেন্ট অব ভেনিস" বাংলা ভাষায় অনুবাদ ক'রে প্রকাশ করেছেন। অনুবাদ করেছেন শ্রীসুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। বাঙালীর সেক্সপীয়র-অনুশীলনের ইতিহাস প্রায় দেড় শ' বছরের ইতিহাস। বঙ্গীয় সেক্সপীয়র পরিষদের পক্ষ থেকে প্রকাশিত প্রথম অনুবাদ-নাট্য 'দি মার্চেন্ট অফ ভেনিস'। অনূদিত নাটকখানি একাধিক অভিনয়-পরীক্ষাতেও উত্তীর্ণ। বাংলা ভাষায় সেক্সপীয়রের এলিজাবেথান যুগের নাটক অনুবাদ করা যে কত দুরূহ, তা ভাষার কারবারীরা বিলক্ষণ জানেন। অনুবাদক এই দুরূহ কাজে আশাতীত ভাবে সাফল্য লাভ করেছেন। প্রকাশক: বঙ্গীয় সেক্সপীয়র পরিষদ, ১১ স্কট লেন, কলিকাতা-৯। দু' টাকা চার আনা।

ভারতীয় গ্রামীণ সংস্কৃতি

কৃতী সঙ্গীতশিল্পী শান্তিদেব ঘোষের প্রতিভা-পরিচায়ক এই পুস্তকখানি গ্রাম্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার একখানি সংস্কৃত ছবি তুলে ধরেছে অগণিত পাঠক-সাধারণের সামনে। একাধারে সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য ও সমাজ পাওয়া যাবে এই গ্রন্থটির মধ্যে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসত্র' ও মহাত্মাজীর 'নঈ তালিমী শিক্ষা' সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা শান্তিদেব বাবু পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থের মাধ্যমে। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্য গ্রন্থকারের হয়েছে—তাই তাঁর বক্তব্যও রবীন্দ্র ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। গ্রামীণ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের উপায় শীর্ষক অধ্যায়টির প্রতি পাঠকসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। লেখক—শ্রীশান্তিদেব ঘোষ। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ১৩ হ্যারিসন রোড, দাম এক টাকা।

শিশুমন

কোন্ কোন্ পরিবেশ শিশুদের চরিত্র কোন্ কোন্ পথে এই বিষয়ে অবগত হওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য. শিশুদের সুপথে পরিচালনা করা একটি বিরাট ও অবশ্যপালনীয় দায়িত্ব। সুখের বিষয়, সেই দিকগুলিতেই লেখক এই গ্রন্থের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক রুচি অনুযায়ী আলোকপাত করে দেশের ও দশের উপকারই করেছেন। গ্রন্থটির ভূমিকা লিখেছেন বিজ্ঞান কলেজের মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীসুহৃৎ মিত্র, লেখক—ডাঃ রমেশ দাস, প্রকাশক—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ। ৪৪।১এ, হাজরা রোড। দাম তিন টাকা।

আংশিক

উপন্যাস-লেখিকা হিসেবে আশাপূর্ণা দেবীর খ্যাতি সর্বজনবিদিত। আশাপূর্ণা দেবী এই গ্রন্থে সামাজিক জীবনের একটি দিক নিয়ে যে সমাজচিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে এই একটি গ্রন্থ থেকে বহু পাঠক-পাঠিকা আনন্দ পাবেন। সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতি আশাপূর্ণা দেবীর সুচিন্তিত নির্দেশ বাঙলা সাহিত্যের আদরের বস্তু। লেখিকা শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী। প্রকাশক ন্যাশানাল পাবলিশার্স, ১৪৫ বি সাউথ সিঁথি রোড। দাম তিন টাকা।

হে বন্ধু বিদায়

'হে বন্ধু বিদায়' উপন্যাসের বিষয়বস্তু : অরুণা ও বিকাশ উভয়ে উভয়কে ভালোবাসতো, কিন্তু অরুণার বিবাহ হয় অপর একটি যুবকের সঙ্গে। অরুণার বিবাহ হলেও সে ভুলতে পারলো না বিকাশকে, বিকাশও অরুণাকে। শোকে, দুঃখে অরুণার স্বামী আত্মহত্যা করেন আর বিকাশের জীবনে দেখা দেয় আর এক নারী। এই তিনটি চরিত্র ছাড়াও পাঠক পাঠিকারা পরিচিত হবেন আরও অনেক চরিত্রের সঙ্গে। লেখিকা অমলা দেবী। প্রকাশক : সিগনেট প্রেস, ১০।২ এলগিন রোড, কলকাতা। দাম : তিন টাকা।

আমার দেখা ডেনমার্ক

'ডেনমার্ক' দেশটির নামের সঙ্গে অনেকেই পরিচিত কিন্তু তার বিষয়ে খুঁটিনাটি জানেন এমন লোক খুব বেশী হয়তো নেই। উপরোক্ত গ্রন্থে ডেনমার্ক সম্বন্ধে একটি চমৎকার ছবি তুলে ধরেছেন শ্রীমন্মথ রায়। ঐ দেশের ইতিহাস-রাজনীতি থেকে আরম্ভ করে দেশের ভৌগোলিক বিবরণ ও এমন কি তাদের দেশের প্রতিটি সাধারণ মানুষ পর্যন্ত কি ভাবে দিন কাটায়—তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের চিন্তাধারা, তাদের মানবতা ও তাদের সামাজিক প্রতিচ্ছবি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। মন্মথবাবুর রচনাশৈলী ও বর্ণনাভঙ্গী মনোরম, পাঠক-পাঠিকার 'আমার দেখা ডেনমার্ক' আদরলাভ করবে। লেখক—শ্রীমন্মথনাথ রায়। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স। ১৪, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম দু' টাকা।

সাহিত্য চিন্তা

'সাহিত্য চিন্তা' গ্রন্থের মধ্যে লেখক শ্রীশিবনারায়ণ রায় সাহিত্যের কয়েকটি বিতর্কসাপেক্ষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রত্যেকটি প্রবন্ধের মধ্যে লেখকের বলিষ্ঠ ও অনুশীলিত চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের টেক্সট বুক শ্রেণীর 'ইহাও হয়, উহাও হয়' ধরণের রচনার আধিক্যের মধ্যে এই শ্রেণীর চিন্তাস্বাতন্ত্র্যদীপ্ত নির্ভীক রচনা পাঠ করলে মানসিক গুমোটভাব ও একঘেয়েমি বাস্তবিকই কেটে যায়। আলোচ্য গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনার প্রতিপাদ্য বক্তব্যের সঙ্গে সকলেই একমত হবেন না, অনেক বিষয়ে গুরুতর মতভেদও দেখা দেবে। লেখকের বাচনভঙ্গির মধ্যে অনেকে হয়ত প্রচ্ছন্ন অহমিকারও সন্ধান পাবেন। চিন্তার খোরাক যোগানো, ইন্ধন যোগানোই, চিন্তাশীল সমালোচকের অন্যতম লক্ষ্য। 'সাহিত্য চিন্তা'র রচনাগুলির মধ্যে লেখকের এই লক্ষ্য সার্থক হয়েছে।—প্রকাশক : মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা॥

১৩৬২—৬৩ সালের উল্লেখযোগ্য বই

গত বৈশাখ সংখ্যায় আমরা ১৩৬২ সালের ২৫শে বৈশাখ থেকে ১৩৬৩ সালের ২৫শে বৈশাখ পর্যন্ত প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ-সমূহের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিলুম। তাড়াতাড়িতে কয়েকখানি গ্রন্থ গ্রন্থ-তালিকায় বাদ যাওয়ায় কয়েকটি গ্রন্থের লেখক, গ্রন্থ ও প্রকাশকের নাম এই সংখ্যায় পুনরায় প্রকাশ করা হচ্ছে। যথা :—শ্রীপরিমল গোস্বামী—পথে পথে (বেঙ্গল পাবলিশার্স), ম্যাজিক লণ্ঠন (বিহার সাহিত্য ভবন)। শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত—হাসপাতাল (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড), ময়ূর মহল (সাহিত্য ভবন), উল্কা (ন্যাশানাল পাবলিশার্স)। শ্রীহারেশচন্দ্র শর্মাচার্য—জ্যোতিষীর ডায়েরী (ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড)। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর ছোটদের উপযোগী পুতুল (ক্যালকাটা বুক ক্লাব), ভারতে যাঁরা এসেছিলেন এবং সোনার ছেলে (অরুণালোক প্রকাশনী), প্রভৃতি।

বাংলা বই এর মলাট

সন্তোষকুমার দে

বাংলা দেশে বোধ হয় একমাত্র বই-এর ব্যবসায়ে বাঙ্গালীর প্রাধান্য আছে। কিছুকাল পূর্বে একটি অবাঙ্গালী 'বঙ্গ-দর্শন' পুণর্মুদ্রন করিতে নামিয়াছিলেন, বোধহয় বিশেষ লাভজনক মনে না হওয়ায় ছাড়িয়া গিয়াছেন।

আর বাংলা দেশ এমন একটা দেশ, যেখানে মানুষ আধপেটা খাইয়াও গান গায়, কবিতা লেখে, বই লেখে আর তা ছাপাও হয় এবং সবাই না কিনুক, অনেকেই না কিনিয়া পড়িলেও পড়ে। শুনিলে অবাক হইবেন, কেবল রেল কর্মচারীরা যত বই পড়েন তার দ্বারাই এক একটি এডিশন প্রায় নিঃশেষ হইতে পারে! সুতরাং বাংলা দেশ যে বই নিয়া হৈ-চৈ করিবে, মাথা ঘামাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? তাই যখন পাশাপাশি প্রদেশের তুলসীদাসী রামায়ণের চেহারা স্মরণ করি আর তাহার সহিত এ দেশের 'টুকটুকে রামায়ণ' হইতে প্রস্তাবিত 'সংসদের' রামায়ণ পর্যন্ত তুলনা করি, তখন একটু বিস্ময় লাগে বৈকি। শুধু ছাপায় নয়, মলাটেও বাঙ্গালী শিল্পী যথেষ্ট অগ্রসর, বাঙ্গালী দপ্তরী অনেক দক্ষ। প্রসঙ্গত বলা দরকার, হিন্দি সাহিত্য প্রকাশনেও বাঙ্গালীই 'পথ প্রদর্শক। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত 'সরস্বতী' প্রথম এবং এখনও প্রধান হিন্দি মাসিকপত্র এবং বাঙ্গালী প্রকাশক ও মুদ্রক স্বর্গীয় চিন্তামণি ঘোষের প্রকাশিত হিন্দি পুস্তক সম্পর্কে ডক্টর ঈশ্বরীপ্রসাদ সম্প্রতি লিখিয়াছেন :

"They have produced a large number of general books, which include novels, historical and religious texts in Hindi. The "Ramcharit Manas, The Mahabharat, The Gyaneshwari Gita are well-known works which are used throughout the Hindi-speaking world. In point of get-up and printing the general books are

superior to other publications of a similar nature and all this is due to the high ideals of the founder of the Indian Press."

—Benjamin Franklin of Uttar Pradesh (Biography of Late Chintamoni Ghosh), A. B. Patrika, Graphic Arts Industries Review, February. 1956.

পুথির পাটায় চিত্র-বিচিত্র সজ্জা সব দেশেই করিয়াছে। আমরা বাংলাদেশে যখন বই ছাপিলাম তখন বটতলাতেও ছবি আঁকিয়াছি, এমন কি লাল, নীল, সবুজ, হলুদ প্রভৃতি রং তুলি দিয়া লাগাইবার জন্য ঝি নিয়োগ করিয়া একরঙা ছবিকে রঙিন করিয়া বই সাজাইয়াছি। লেখার সঙ্গে রেখার পাল্লা চলিয়াছে। সে যুগ হইতে শিল্পী নরেন সরকারের ৩৬খানি ত্রিবর্ণরঞ্জিত চিত্রে সজ্জিত 'চিত্রে চন্দ্রশেখর' অনেক পথ। শীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের রঙীন মলাটের বইও এক সময়ে বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছিল। তিনিই বাংলা বই-এ প্রথম ছবির Vignetting effect ব্যবহার দেখান।

শিল্পী পূর্ণচন্দ্র ঘোষ যে রঙীন প্রচ্ছদচিত্র সমূহ অঙ্কন করেন তার মুন্সিয়ানা শিল্পীমাত্রেই স্বীকার করিবেন। শিল্পী যতীন সেনও বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবী করিতে পারেন। অফসেট প্রিন্টিং-এ প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা শিশু-সাহিত্যে যুগান্তর আনিয়াছেন, বলা বাহুল্য তার মলাটগুলিও কম লোভনীয় নয়। সদ্যঃস্বর্গত শিল্পী ফণী গুপ্ত মহাশয় তিন রঙা লাইন ব্লকে যে বহুবর্ণের মলাট করিয়াছেন, আজিও তাহার তুলনা হয় না। শিল্পী পূর্ণ চক্রবর্তীর রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম, মেঘদূত, হংসদূত, আরব্যরজনী প্রভৃতি পুস্তক কেবল আভ্যন্তরীণ অঙ্গসজ্জার জন্যই নহে, পরন্তু মলাট এমন কি পুস্তানির জন্যও অবশ্য স্মরণীয়। এ সময় পর্যন্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ছিলেন বাংলা বই-এর শ্রেষ্ঠ প্রকাশক। তাঁহারাই পূর্বে তুলার প্যাড দিয়া রেশমী বস্ত্রে বাঁধাই 'বাণী কল্যাণী' 'মিলন মন্দির' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উপহারের উপযোগী পুস্তক প্রকাশে তৎকালে তাঁহাদের জুড়ি মিলিত না।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে ও পরবর্তী কালে খুব লক্ষ্যণীয় উন্নতি যাঁহাদের কাজে দৃষ্ট হয় তাঁহারা হইলেন—সিগনেট প্রেস। ছাপা, বাঁধাই এবং মলাট, সব কিছুতে প্রতিটি বই বিশিষ্ট 'সিগনেট সংস্করণ' বলিয়া দাবী করিতে পারে। প্রকাশক সিগনেট প্রেস ও শিল্পী সত্যজিৎ রায় উভয়েই স্বদেশে ও বিদেশে বহুবার এজন্য পুরস্কৃত হইয়াছেন, ভারত সরকারও সিগনেটের বই পুরস্কৃত করিয়াছেন। পরিচ্ছন্ন ও সচিত্র বাংলা বই প্রকাশের ইতিহাসে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স ও সিগনেট প্রেস চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

অবশ্য এখন সকল প্রগতিশীল প্রকাশকই পুস্তকের সৌন্দর্য-বর্ধনে যত্নশীল হইয়াছেন। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ইণ্ডিয়ান এসোসিএটেড, রঞ্জন, মিত্র ঘোষ কেহ পিছাইয়া নাই। বই-এর মলাটে বহু বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইতেছে, তবু বাংলা বই-এ অফ-সেট-মুদ্রিত মলাট এখনও বিশেষ চালু হয় নাই। প্রায় সব মলাটই ব্লকে ছাপা হয়। তবে সিল্ক স্ক্রিনও দেখা দিয়াছে। আশুতোষ লাইব্রেরী বার্ষিক শিশুসাথীর মলাটে এবং সোয়ান বুক্‌স্ তাদের জনপ্রিয় গ্রন্থ 'কমলাকান্তের আসর'-এর মলাটে সিল্ক স্ক্রিনে ছাপা প্রবর্তন করিয়াছেন।

প্রাণতোষ ঘটকের 'মুক্তাভস্ম' মলাটের বৈশিষ্ট্যে আরও বিচিত্র ও বিস্ময়কর। ইহাতে সূক্ষ্ম মাদুরের উপর সিল্ক স্ক্রিনে বইয়ের নাম ছাপাইয়া মনোরম কাগজের আবরণের মধ্যে বসাইয়া অপূর্ব শিল্প-মণ্ডিত করা হইয়াছে। খদ্দর, চট, তসর প্রভৃতিতে মোড়া মলাট ইতিপূর্বে হইয়াছে, খেরো-বাঁধাই খাতার মতো বাঁধানো কবিতার বইও দেখিয়াছি, সম্প্রতি প্রকাশিত প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্য 'সাগর থেকে ফেরা'র মলাটটি বিশিষ্ট। আলাদা ভাবে তাহা খুলিয়া রাখাও চলে। প্রচ্ছদচিত্রেও নিত্য নূতন বৈচিত্র্য দেখা দিতেছে। শিল্পী সত্যজিৎ রায়, সূর্য রায়, আশু বন্দ্যোপাধ্যায়, রঘুনাথ গোস্বামী, মাখন দত্তগুপ্ত, খালেদ চৌধুরী প্রমুখ এ যুগের নবীন ও উদ্যোগী শিল্পীরা বিশেষ প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। বাংলা বর্ণলিপি চিত্রণে যতীন সেন, সমর দে প্রভৃতির সার্থক উত্তরসাধক হিসাবে নবীন শিল্পীরা আসিয়াছেন। শিল্পী আশু বন্দ্যোপাধ্যায় দেবনাগরী হরফের ধাঁচটি অবলম্বন করিয়াছেন, রঘুনাথ প্রভৃতি তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছেন। সত্যজিৎ রায় হাতের লেখা হরফ প্রচলন করিয়াছেন, তাহাই নানা বৈচিত্র্য নিয়া নানা রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। বস্তুত বাংলা ও ইংরাজি উভয় হরফে সত্যজিৎ রায়ের প্রবর্তিত পথ বহু শিল্পী জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুসরণ করিতেছেন। সত্যজিৎ প্রধানত পাশ্চাত্য ধরণে হরফ অঙ্কনে উৎসাহী। তাঁহার Discovery of India-র মলাটের হরফগুলি স্মরণ করুন। আবার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ গ্রন্থের মলাটে প্রাচীন নামাবলীখানি শ্বেত ও রক্তচন্দনে চর্চিত করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, আবাহন করিয়া আনিলেন বাংলা পুথির আক্ষরিক ঐতিহ্য। এটি তাঁর সৃজনশীল মনেরই পরিচায়ক।

'ইন্দ্রাণী'-তে তারের স্প্রীং-এর কাজ, 'সংবর্ত' বৃত্তের খেলা, 'বনলতা সেন'-এর সূক্ষ্ম রেখায় ছন্দ, 'জননী জন্মভূমি'-তে হিজিবিজি দাগের খেলার পটভূমি আশ্চর্য সুন্দর। আর হালের অধিকাংশ বই-এর মলাটে আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছাপ সুস্পষ্ট।

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা উল্লেখ করি। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরের ছাপাখানায় হরফ তৈরীর উদ্যোগ হইলেও বই-এর মলাট হইতে সে ধারা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এমন কি, বিশ্বভারতীও রবীন্দ্রাক্ষর ব্যতীত যতীন সেনের ধরণের সুন্দর অক্ষর মলাটে ব্যবহার করিতেন, তাঁহারাও আধুনিকতার প্রবাহে পাল তুলিয়াছেন। এই প্রবহমান ছন্দের অক্ষর-রূপ নিতান্ত বেগবান, ফলে প্রত্যেক অক্ষরের নিজস্ব রূপ অপেক্ষা সমগ্র শব্দের মধ্যে তার অবস্থিতির দ্বারাই তার পরিচয় প্রকাশ করে, তাই অবাঙালীর পক্ষে তাহা সহজপাঠ্য নয়। অতি বেগবান অক্ষর সৃজনের মোহে পড়িয়া অনেক সময়ে শিল্পীরা এমন অক্ষর লেখেন যাহা সহজে পড়াই যায় না।

তবু বই-এর মলাট সৃষ্টিতে আমরা যে দ্রুত উন্নতি করিতেছি, বহুবিধ বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করিতেছি, একথা অবশ্য স্বীকার্য—যদিও বাংলা বই-এর মলাটে ভারনিশিং, ল্যাকারিং বা হিট প্রসেসে সেলোফিন সেটিং প্রভৃতি অত্যাধুনিক চাকচিক্য এখনও আমদানি হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, এখনও আমরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রের বইগুলির অনাড়ম্বর মলাটের মাধুর্য ভুলিতে পারি নাই। বিশ্ব-ভারতীর প্রকাশ বিভাগ আজিও বাংলা বই-এর সর্বশ্রেষ্ঠ 'মান' এবং মর্যাদা রক্ষা করিতেছেন। এবং তাহা কি কেবল মলাটের জন্য?

রঙ্গপট



ল্যাসি—কে ?

পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ। লোকে গিজ-গিজ করছে। অন্ধকার বিরাট ঘরটাতে বসে লোকে অবাক হয়ে দেখছে একটি কুকুরের ছবি। ছবি দেখানো চলছে। পর্দায় ভেসে উঠল কুকুরটি বাড়ী ফিরছে। অনেক ব্যাকুলতার মধ্যে সে পথ অতিক্রম করছে। উন্মুখ হয়ে আছে সে কখন পৌছোবে তার বাড়ীতে, উত্তেজনায় ভরে আছে তার সারা মুখ-চোখ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে সে। দর্শকরা ভাবলেন যে, নিশ্চয় কোন রকম উপায় অবলম্বন করে কুকুরটিকে খোঁড়া করে দেওয়া হয়েছে, না হলে ও রকম খোঁড়াচ্ছে কি করে ? ও তো আর মানুষ নয় যে খুঁড়িয়ে চল, বললেই খুঁড়িয়ে চলবে—কিন্তু সত্যি সত্যিই সে অভিনয়ই করেছিল, সত্যিকারের খোঁড়া তাকে করতে হয় নি—এমনই প্রতিভাবান শিল্পী—হলিউডের ল্যাসি আর ঐ ছবিটিই বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত ছবি—"ল্যাসি কামস্ হোম।"

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে ল্যাসির জন্ম হয় হলিউডের উত্তরাংশে। ল্যাসি তার আসল নাম নয়—আসল নাম তার পল। সেদিন তার আকৃতি মোটেই ক্যামেরার উপযোগী ছিল না—মাথাটা ছিল অসম্ভব চওড়া।

রাড ওয়েদারওয়াক্সের সংস্পর্শে আসে পল। ওয়েদারওয়াক্সের কুকুর-শিক্ষকরূপে খ্যাতি সর্বজনবিদিত। তিনি পেলেন পলকে—জানি না কি তিনি দেখেছিলেন ঐ চওড়ামাথা অসম্ভব বোকা হাদামার্কা কুকুরটার মধ্যে। তিনি তাকে নিয়ে এলেন নিজের স্কুলে। রাখলেন, খাওয়ালেন, পড়ালেন। তার ভার নিলেন। পল বড় হতে লাগল।

মেট্রো-গলডুইন-মেয়ার বিজ্ঞাপন দিলেন একটি কুকুর চাই তাঁদের নির্মীয়মান ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। পরীক্ষা দিতে হবে, গুরুর সঙ্গে চলল পল। পারল না উত্তীর্ণ হতে। ফিরে এল। অভিনয় তখন হোল না তার দ্বারা। শুধু ওঠা বসা আর খানিকটা লেজ নাড়া ছাড়া আর কিছুই পারলে না পল। ওয়েদারওয়াক্স নতুন করে লেগে পড়লেন পলকে তৈরী করতে। অধ্যবসায় কখনও বিফল হয় না। এ ক্ষেত্রেও হোল না।

দেখতে দেখতে পলের আকৃতি ক্রমশঃই সুন্দর হতে সুন্দরতর হতে লাগল। ক্রমেই দৌড়তে, লাফাতে, আক্রমণ হতে রক্ষা পেতে, অঙ্গভঙ্গীতে, অভিব্যক্তিতে চলা-ফেরা করতে সে অদ্ভুতভাবে পারদর্শী হয়ে উঠল। ওয়েদারওয়াক্স আবার তাকে নিয়ে গেলেন পরীক্ষার জন্যে, বলা বাহুল্য এক হাজার প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে থেকে এই দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পল নির্বাচিত হোল "ল্যাসি কামস্ হোম" ছবিতে অভিনয় করার জন্যে। ছবি তোলা হোল, সম্পাদিত হোল, পরীক্ষিত হোল, অবশেষে মুক্তি পেল। পলও প্রথম আবির্ভাবেই জয় করে নিল দর্শকচিত্ত, যাকে বলে ভেনি-ভিডি-ভিসি। পলের নতুন নাম হোল ল্যাসি। ছবি মুক্তি পাবার আগে থেকেই ল্যাসি তার অনুরাগীদের মধ্যে থেকে পনেরো হাজার অভিনন্দনপত্র পেয়েছে। হলিউডের শিল্পীদের গুণানুসারে নামের তালিকার মধ্যে হেডি-লা-মারের পরেই এই সারমেয়নন্দনের স্থান। জনপ্রিয়তায় লানা টার্ণারের সঙ্গেই সমান তাল রেখে চলে ল্যাসি।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অরফিয়াম সার্কিটের জন্যে এক পরিক্রমায় ল্যাসি সপ্তাহে উপার্জন করেছে দু'হাজার সাড়ে সাত শ' ডলার। এর মধ্যে তার গুরু, সাহায্যকারী প্রভৃতিকে টাকা দিয়েও একটি মোটা অঙ্কের টাকা তার নিজের তহবিলে জমা হয়েছে। ঐ বছরই শীতকালে সানফ্রানসিসকোয় এক প্রদর্শনীতে মাত্র দু'দিনের জন্যে নিজেকে প্রদর্শিত করে ল্যাসি লাভ করেছে দেড় হাজার ডলার।

অন্যান্যের মত ল্যাসিরও প্রতিনিধি আছেন, তারও সচিব আছেন। তত্ত্বাবধায়ক তো আছেনই, শুধু তাই নয়, তারও স্ত্রী আছে, আছে পুত্র, আছে কন্যা, সে'ও মানুষের মত ঘর-সংসার করে, কাটিয়ে চলে সুখের পারিবারিক জীবন। ওয়েদারওয়াক্স নিজে তাকে খাওয়ান প্রতিদিন তিন পেয়ালা দুধ, একটি কাঁচা ডিম, টোম্যাটোর রস, মাংস, দাঁত শক্ত রাখবার জন্যে কয়েকখানি কড়া বিস্কুট তার রোজের খাদ্য।

ষ্টুডিওতে ল্যাসিও মানুষেরই মত সম্মান নিয়ে থাকে। যথারীতি কাজ করে যায়, ওয়েদারওয়াক্সকেও সকল সময়েই থাকতে হয় তার সঙ্গে। মানুষের মতই কাজের সময় তার মেক আপ বক্সও থাকে তার বাহকের হাতে। ল্যাসির চরিত্রের আর একটা দিক চোখে পড়ে—কাজের ফাঁকে অবসর সময়ের মাঝে মাঝে সে যেন কি ভাবে, গভীর চিন্তায় নিমগ্ন করে নিজেকে, ভুলে যায় স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ। এ প্রসঙ্গে দর্শন-সম্রাট সক্রেটিসের একটি বাণী মনে পড়লেও পড়তে পারে—ডগ ইজ এ ফিলসফার। ল্যাসি কি সেই মহামনীষীর বাণীর মর্যাদাই রক্ষা করে চলেছে—আপনি কি বলেন ?

মহাকবি গিরিশচন্দ্র

গিরিশচন্দ্রের জীবনী এই প্রথম চিত্রে রূপায়িত হোল, জাতির হৃদয়ে শ্রদ্ধার একটি অটুট আসন অধিকার করে আছেন গিরিশচন্দ্র, সুতরাং তাঁর বিরাট জীবনের প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বিশেষ করে জেনে তবে এ কাজে হাত দেওয়া উচিত, কিন্তু সেইখানেই মধু বসু আমাদের নিরাশ করেছেন। কতকগুলি ভুল এ ছবিকে বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে। গিরিশচন্দ্রের অনেকগুলি নাটকের অভিনয় দেখানো হোল, সুপার ইমপোজ করেও আরও অনেকগুলি নাটকের উল্লেখ করা হল কিন্তু "প্রফুল্ল" বলে গিরিশচন্দ্রের যে একটি নাটক ছিল মধুবাবু কি তার নামটাও শোনেন নি ? "প্রফুল্ল"কে বাদ দিলে [illegible]

গিরিশচন্দ্র যে সম্পূর্ণরূপে অসম্পূর্ণ থেকে যান। এতগুলি নাটকের মধ্যে পিতাপুত্রের সম্মেলন দেখানো উচিত ছিল না কি? যেখানে অমৃত মিত্রের অভিনয় দু'বার দেখানো হোল (অবশ্য তাঁকে আমরা ছোট করছি না, তাঁর উপরও আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে) সেখানে শুধু গিরিশচন্দ্রের পার্শ্বচররূপে দাঁড় করিয়ে না রেখে অর্দ্ধেন্দু-অমৃতকে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ করা উচিত ছিল না কি? গিরিশচন্দ্রের জীবনী চিত্রে কোথাও দেখা গেল না সাধক গিরিশচন্দ্রকে, নাট্যশিক্ষক গিরিশচন্দ্রকে, নরেন-গিরিশ প্রসঙ্গই বা কই? এতে দেখানো হোল যে স্বামীজীর মুখে শুনে গিরিশ গেলেন শ্রীমার কাছে, কিন্তু এ তো ভুল শ্রীমার কাছে গিরিশকে হাত ধরে টানতে টানতে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে যায় তাঁর ছোট্ট ছেলে (দানীবাবু নন, ইনি তিনিই যিনি পূর্বজন্মে দেখা দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের রূপে) মোহাবিষ্টের মত গিরিশও অনুসরণ করেন সেই শিশুকে তারপরই উপস্থিত হন একেবারে শ্রীমার সামনে। আর গিরিশচন্দ্রের অন্তিমকালে তো শ্রীমা উপস্থিত ছিলেন না আর তার উপর সে সময়ে মায়ের বয়েস উনষাট (জঃ ১৮৫৩) সে ক্ষেত্রে শোভা সেনকে বড়জোর চল্লিশ বলে মনে হয়। দানীবাবুরও সে সময়ে সাতচল্লিশ বছর বয়েস (জঃ ১৮৬৫) সবিতাব্রতর রূপসজ্জা সেই কথাই কি প্রমাণ করে? বিনোদিনীর ঘরে মধুবাবু তো "মডার্ণ শিব" দেখিয়ে ছেড়েছেন। অর্দ্ধেন্দুশেখরের ভূমিকায় জহর রায়কে নামানোর অপরাধ যেমনি অমার্জনীয় তেমনই লজ্জাস্কর। প্রচার-পুস্তিকা যেটি ছাপা হয়েছে তাতে একগাদা শিল্পীর নাম আছে কিন্তু নাম নেই খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী পদ্মা দেবীর। যে সব শিল্পীদের নামানো হয়েছে অধিকাংশেরই চেহারার সঙ্গে আসল চরিত্রের কোনও মিল নেই। অভিনয়ে মনে ছাপ এঁকে যান প্রধান শিল্পী পাহাড়ী সান্যাল কেবলমাত্র মঞ্চাভিনয়গুলি ছাড়া—সেগুলি যাত্রায় রূপান্তরিত হয়েছে। শিশুর মত সরল মনের মানুষ রামকৃষ্ণদেবের রূপটি ফোটাতে গিয়ে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ফুটিয়ে তুলেছেন এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত উন্মাদের রূপ। মলিনা দেবী, ভারতী দেবী, পদ্মাদেবী, শোভা সেন, তপতী ঘোষও আনন্দ দিয়েছেন দর্শক-সাধারণকে। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, মোহন ঘোষাল, উৎপল দত্ত, মিহির ভট্টাচার্য, বিপিন মুখোপাধ্যায়, অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু, অজিত-প্রকাশ, দেবেন বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশ দাস, শিবকালী চট্টো-পাধ্যায়, চন্দ্রশেখর দে, মেনকা দেবী, পূর্ণিমা দেবী, ছন্দা দেবী প্রভৃতি স্বনামখ্যাত শিল্পীবৃন্দ ও আরও বহু শিল্পী।

অসমাপ্ত

ডোমের ছেলেকে আর বামুনের মেয়েকে কেন্দ্র করে গল্প। সমাজের গণ্ডি, গোঁড়ামি আর একদিকে বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বমানবতা সমভাবে দেখানো হয়েছে। নায়কের চরিত্রে বিধায়কবাবুর নিজের লেখা 'ঢুলী'র ছাপ বেশ পাওয়া যায়, তা ছাড়া শৈলবালা ঘোষজায়ার 'গঙ্গাপুত্র' কাহিনীর অনেক ছাপ পাওয়া যাবে এই ছবিতে। যে দেখানো হোল প্রতাপের মৃত্যু ২২এ আষাঢ় ১৩৫৪ তার আগে অমিয়বাবুকে দিয়ে শিবশঙ্করকে বলানো হোল "আমরা স্বাধীন হয়েছি ইত্যাদি" প্রতাপ তখন জীবিত সুতরাং এ ঘটনা ২২এ আষাঢ়েরও আগে অথচ আমরা স্বায়ত্তশাসন পেলুম ২১এ শ্রাবণ ১৩৫৪, আচ্ছা রতন বাবু—ইংরেজ কি আপনাকে পাঁচ হপ্তা আগে থাকতেই স্বাধীনতা দিয়ে গিয়েছিল? ভাগ্যবান ব্যক্তি আপনি। পাঁচজন সঙ্গীত পরিচালকের পরিচালনায় এবং নামকরা শিল্পীদের কণ্ঠদানে এই অংশটি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তবলা বাজানো অপূর্ব হয়েছে, সেতারেও নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদ পাবেন। ছবিতে 'কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি' আবৃত্তির পর মুহূর্তেই ডোম বলে প্রতাপকে প্রত্যাখ্যান এই অংশটি খুব ভালো লাগবে। মহেশ্বর বাবুর বাড়ী দেখে কিন্তু মনেই হয় না জমিদারের বাড়ী বলে। অভিনয়াংশে অসিতবরণ, সন্ধ্যারাণী, কাবেরী বসু, ছবি বিশ্বাস জহর গঙ্গোপাধ্যায়, পাহাড়ী সান্যাল, ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, কমল মিত্র, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, দীপক মুখোপাধ্যায়, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্ত্তী, অমর বিশ্বাস, বিভু, মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, মঞ্জু দে, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছেন, এ ছাড়াও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ সিংহ, জহর রায় প্রভৃতি ভূমিকা লিপিতে আছেন হবে প্রত্যেককে অতিক্রম করে গেছেন অনুপকুমার।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

পি এল ফিল্মস "পুতুলের মা" কেই ষ্টুডিও থেকে তুলে এনে ছবির পর্দায় দেখবেন বো'লে স্থির কোরেছেন। "পুতুলের মা"কে খুঁজে পাওয়া যাবে সমরেশ বসুর 'পসারিণী' গল্পের ভিতর। বাস্তব রক্ত মাংসের পুতুল কিংবা কাঠের, কাঁচের অথবা কাঁচকড়ার পুতুল, ছবি দেখলে তবেই বোঝা যাবে। নির্মলকুমার, কানু, ভানু, অনুপকুমার তুলসী, সাবিত্রী, মলিনা, রাজলক্ষ্মী, নিভাননী প্রভৃতি শিল্পীরাই আসল ব্যাপারটার পুরোপুরি সন্ধান দেবেন। * * "শনিবারের বিকেলে"র ঘটনা লিখেছেন শৈলেশ দে। গল্পটির ছবি তুলে ভারতীয় বাণী চিত্র জনসাধারণকে দেখাবেন এবার। কোন' এক শনিবারের বিকেলে, রবিবারের অবসর পাওয়ার আনন্দটা এই ছবি দেখেও পাওয়া যেতে পারে। * * বি, আর পিকচার্স প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি কাহিনীকে অবলম্বন কো'রে "হারজিত" ছবি তুলেছেন। যে যুদ্ধে হারজিত, সেই যুদ্ধ পরিচালনা কোরছেন মানু সেন। যোদ্ধা স্ত্রী পুরুষে নাম করা অনেকেই, যেমন, উত্তম-কুমার, অনিতা গুহ, মলিনা, কমল, জীবেন পাহাড়ী সান্যাল প্রভৃতি। * * পঙ্গু এক নারীর জীবনের দুঃখময় করুণ অধ্যায়টিকে কেন্দ্র কোরে একটি কাহিনী লিখেছেন পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়। কাহিনীটির চিত্ররূপ দিচ্ছেন নিউ পিকচার্স। এই "ভঙ্গুর" চিত্রখানির পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। পঙ্গু নারীর জীবন যুদ্ধের এই অধ্যায়টি মর্মস্পর্শী হবে বলেই মনে হয়। * * হারানো সুরকে, হারানো বস্তুকে পাওয়ার যে আনন্দ, সেই "হারানো সুর" এর চিত্রনাট্য লিখেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় আর সেই সুরের সঙ্গে জনসাধারণের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন হেমন্তকুমার। প্রযোজনার ভার নিয়েছেন উত্তমকুমার। সুচিত্রা আর উত্তমকে দেখা যাবে "হারানো সুর" এর মাঝখানে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

অশুভ সূচনা

"নাগা পাহাড়ে ভারত সরকার যে নীতি চালাইয়াছেন, তাহা বিজ্ঞজনোচিত হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করিতে পারিতেছি না। প্রথমে পুলিশ পাঠানো হইল। তারপর গেল আসাম রাইফেল। এখন গিয়াছে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। সাড়ে চারমাস সামরিক বাহিনীর চাপ সহ্য করিবার পর যদি মণিপুর রোডের ঘটনা ঘটিতে পারে, তবে বিশেষ উদ্বেগের কারণ রহিয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। নাগা বিদ্রোহের সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্ব যাহাদের উপর রহিয়াছে, তাহারা সঠিক খবর রাখিতে পারিতেছেন না, মণিপুর রোডের ঘটনায় তাহাও প্রমাণিত হইয়াছে। মণিপুরের শিক্ষা-মন্ত্রী আহত হইয়াছেন। তিনি হাসপাতালে শায়িত অবস্থায় এক সংবাদদাতাকে বলিয়াছেন যে, পুলিসের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া কনভয় রওনা হইয়াছিল, এই সংবাদ সত্য নহে। ডিমাপুর হইতে যাত্রার আগে তাহারা সেখানকার পুলিসকে জিজ্ঞাসা করিয়া তবে রওনা হইয়াছিলেন। কোহিমার উপর দিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং ভয়ের কারণ আছে কি না ইহা তাঁহারা বিশেষভাবে জানিতে চাহিয়াছিলেন। পুলিশ বলিয়াছিল, কোহিমার রাস্তা সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ, সেখানে নাগা বিদ্রোহীদের কোনই অস্তিত্ব নাই। ইহার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এই ঘটনা। ডিমাপুর আসামে অবস্থিত। সেখানকার পুলিস কোন খাঁটি খবর পায় না, ইহা অপেক্ষা বড় প্রমাণ আর হইতে পারে না। যে বিদ্রোহের সংবাদ অসম্পূর্ণ তাহা দমন হইয়াছে, এই আশা কিরূপে কর্তৃপক্ষ করিতেছেন, তাহা বোঝা দুষ্কর এবং দেখা গিয়াছে, সে সংবাদ সত্য নয়। ঘটনাস্থলে ব্যর্থতা, সংবাদ সংগ্রহে ব্যর্থতা, ইহার সঙ্গে যদি আত্মসন্তুষ্টির ভাব আসিয়া জোটে, তবে অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।"

—দৈনিক বসুমতী।

কয়লা সমস্যা

"উত্তোলন বৃদ্ধির পরিকল্পনায় বেসরকারী স্তরের তুলনায় সরকারী স্তরের উপর অনেক বেশী গুরুত্ব আরোপিত হওয়ায় প্রথম পক্ষ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। ইহা অস্বাভাবিক নহে। কারণ বর্তমানে উত্তোলনের তুলনায় তাঁহারা মাত্র এক-তৃতীয়াংশ বেশী কয়লা তুলিবার অনুমতি পাইয়াছেন। কিন্তু সরকারী তত্ত্বাবধানে এখনকার তুলনায় চতুর্গুণ [অর্থাৎ তিনগুণ বেশী] কয়লা তুলিবার বরাদ্দ হইয়াছে। বে-সরকারী খনি পরিচালকগণ দাবী করেন যে,—তাঁহাদের অভিজ্ঞতা যখন অনেক বেশী, তখন বর্ধিত উৎপাদনের অধিকতর অংশও তাঁহাদের জন্য বরাদ্দ হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা হয় নাই। পক্ষান্তরে সরকারী স্তরের জন্য যাহা বরাদ্দ হইয়াছে তাহা সফল করার উপযোগী লোকবল বা অভিজ্ঞতা সরকারের নাই। বর্তমান অবস্থায় একথা সত্য। কিন্তু বে-সরকারী স্তরের জন্য উত্তোলন বৃদ্ধির যে হার নির্দিষ্ট হইয়াছে, তদপেক্ষা বেশী দায়িত্ব গ্রহণ করার উপযোগী লোকবল বা বিশেষজ্ঞ তাঁহাদেরও নাই; মূলধন তো নাই-ই। সুতরাং সামর্থ্যের তুলনায় তাঁহাদের প্রতি অবিচার হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায় না। বিশেষত: নূতন খনি উদ্ধার করার সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রের জন্য সংরক্ষিত করা হইয়াছে। সে কারণে বে-সরকারী তরফকে নূতন খনি খুলিতে দেওয়ার অভিপ্রায় সরকারের নাই। যাহা হউক, পাঁচ বৎসরে কয়লা উত্তোলনের পরিমাণ এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি করার সুযোগ স্বাভাবিক অবস্থায় অপ্রত্যাশিত বলিলেও চলে। ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলেও সুপরিচালিত খনিগুলির সমৃদ্ধি অবধারিত। ইহা শুধু সুযোগ নহে, দায়িত্বও বটে।" —যুগান্তর।

বস্ত্র সমস্যা

"অম্বর চরকা সম্বন্ধে আমরা বরাবর একথা বলিয়া আসিয়াছি যে, পরীক্ষার ফলে যদি উহার কার্যকারিতা প্রমাণিত হয় তাহা হইলেই দেশবাসীর কর্মের সংস্থানের জন্য উহার ব্যাপকভাবে প্রবর্তন যুক্তিযুক্ত হইবে। কিন্তু এই বিষয়ে এখন পর্যন্ত যখন কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইতেছে না, তখন দেশের কাপড়ের কলগুলিতে যেখানে সম্ভবপর সেখানে দুই কি তিন শিফটে কাজ চালাইয়া এবং কাপড়ের কলে ধুতি ও সাড়ী প্রস্তুতের বিধিনিষেধ শিথিল করিয়া দেশে বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধি করাই গবর্ণমেণ্টের কর্তব্য হইবে। তারপর অম্বর চরকার কার্যকারিতা প্রমাণিত হইলে উহার প্রবর্তনে হাত দেওয়া যাইতে পারে। বর্তমান অবস্থায় দেশে বস্ত্রের যোগান বৃদ্ধির এই পন্থা ছাড়া অন্য কোন পন্থা আছে বলিয়া মনে হয় না।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

আমাদের দশমিক মুদ্রা

"১৯৫৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ভারতে দশমিক মুদ্রা চালু হইবে। বিজ্ঞানসম্মত এই অতি আধুনিক মুদ্রাব্যবস্থা এখনও দুনিয়ার বহু দেশে প্রবর্তিত হয় নাই। সেদিক দিয়া বিচার করিলে ভারত সরকারকে অতি প্রগতিশীল বলিতে হইবে। বহু উন্নত ও সভ্যরাষ্ট্রে যে মুদ্রা ব্যবস্থা এখনও প্রবর্তন করা হয় নাই, তাহা আমাদের মত পশ্চাৎপদ দেশে এত তাড়াহুড়া করিয়া চালু করিবার কি প্রয়োজন, তাহা জনসাধারণ বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। ইহার অর্থ অবশ্য ইহা নহে যে, জনসাধারণ উন্নততর [illegible]

প্রবর্ত্তনের বিরোধী। দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হইবার পর ধীরে ধীরে নূতন মুদ্রাব্যবস্থা চালু করিলে এমন কি অসুবিধা হইত? সম্প্রতি মুদ্রাস্ফীতির লক্ষণ বেশ পরিস্ফুট হইয়াছে। নূতন নূতন করের অজুহাতে বড় বড় শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা বহুচ্ছা জিনিষের দর চড়াইয়া মোটা মুনাফা লুঠিতেছে। ঠিক এই অবস্থায় নূতন মুদ্রাব্যবস্থায় সাধারণ লোক যে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। দশমিক মুদ্রা এবং প্রচলিত মুদ্রার বিনিময় হার ঘোষণা করিতে গিয়া ভারত সরকার ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এই স্বীকৃতিতে যে সাফাই গাওয়া হইয়াছে, তাহার নির্লজ্জতা বিস্ময়কর। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে 'যতটুকু ক্ষতিই হউক কেন, তাহাতে মাত্র একজন ব্যক্তির সামান্য ক্ষতি হইবে আর একজন ব্যক্তির ততটুকু লাভ হইবে।' এই যুক্তি দেখাইয়া পকেটমাররাও নিশ্চয়ই রেহাই পাইতে পারে।"—স্বাধীনতা।

বুদ্ধ তাণ্ডব

"বুদ্ধের পঞ্চশীল আর জহরলালের পঞ্চশীলে কোন সাদৃশ্য নাই। বুদ্ধ তাঁহার পঞ্চশীলকে ব্যক্তিগত জীবনের আদর্শ করিতে চহিয়াছিলেন, বলিয়াছিলেন এই পাঁচটি উপদেশ যদি সকলে মানিয়া চলে তাহা হইলে সমাজ উন্নত হইবে, রাজনীতি পরিচ্ছন্ন হইবে, মানুষ সুখে জীবন যাপন করিতে পারিবে। বুদ্ধের পঞ্চশীল এই পাঁচটি—(১) প্রাণের অতিপাত করিবে না, অর্থাৎ অপ্রয়োজনে প্রাণীহত্যা করিবে না। একেবারে অহিংসার কথা তিনি বলেন নাই। কামারপুত্র চুন্দ প্রদত্ত শুকর-মাংস ভোজন করিয়া তিনি উদরাময়ে দেহত্যাগ করেন। (২) অদত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ চুরি-ডাকাতি করিবে না, পথে কোন জিনিষ পড়িয়া থাকিলেও তাহা আত্মসাৎ করিবে না। (৩) কাম হইতে উদ্ভূত মিথ্যাচার করিবে না। কাম কোন মানুষ পরিহার করিতে পারিবে না, এই কারণে তিনি বলিয়াছিলেন যে, কামনাজনিত যে কাজ প্রকাশ্যে স্বীকার করিতে পারিবে না তাহা করিবে না, মুখে বলিব কামনা নাই অন্তরে কামনা রহিবে ইহাই মিথ্যাচার। (৪) মিথ্যা কথা বলিবে না। (৫) মদ্যপান করিয়া প্রমত্ত হইবে না। জহরলালের পঞ্চশীল পররাজ্য অনাক্রমণ, এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিবার প্রতিশ্রুতি, ইহা গবর্ণমেণ্ট লেভেলের ব্যাপার, ব্যক্তিগত পালনীয় বিষয় নয়। জহরলাল যদি ইউ-এন-ওকে বলিতেন যে পৃথিবীর লোক যাহাতে বুদ্ধের পঞ্চশীল মানিয়া চলে তার জন্য প্রচারের ব্যবস্থা করা হউক, তবে তার উপযোগিতা আমরা বুঝিতে পারিতাম। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেই দেশের লোক যে দেশে বুদ্ধ তাঁর পরমজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নিজে যদি পঞ্চশীলের দ্বিতীয়টি মানিতেন তবে আজ বিহার-বঙ্গ বিরোধ দূর হইয়া যাইত।" —যুগবাণী (কলিকাতা)।

খাদ্য সঙ্কট কেন?

"সংবাদপত্রে দেখা গেল সে দিনের ঝড়ে যে সকল অঞ্চল বিধ্বস্ত হইয়াছে—সেখানে হঠাৎ ধান চাউলের মূল্য অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে। দেশে বন্যা বা অন্য কোনও প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা হইলে সাময়িকভাবে খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইতে পারে, কিন্তু মূল্য বৃদ্ধি হইবে কেন? যাহারা জনগণের দুঃখ নিজের অর্থাগমের পন্থা হিসাবে ব্যবহার করে তাহারা নরহত্যাকারীর পর্য্যায়ে পড়ে। পিনাল কোডে ইহাদের কি কোন শাস্তিরই ব্যবস্থা নাই? জনকল্যাণ সমাজ গঠনে প্রয়াসী সরকার এই জনকল্যাণ বিরোধী কার্য্যের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই কি অবলম্বন করিতে পারেন না? গণতন্ত্রের বা চাঁদাতন্ত্রের দোহাই দিয়া পাশ কাটানো কি সঙ্গত? এই বিষয়টি আমরা আমাদের পশ্চিম বাংলা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি এবং আশা করি সরকার এরূপ কার্য্যকলাপ কঠোর হস্তে দমন করিবেন! ইহাতে ব্যবসায়ী মহলে ভবিষ্যতে শুভ বুদ্ধির উদয় হইতে পারে।" —জনমত (জলপাইগুড়ি)।

মূল্যবৃদ্ধির কবলে দেশবাসী

"একজন হাঁকার (hawker) হেঁকে যাচ্ছে 'আমাদের Talcum powder মাখুন।' জনতার মধ্যে থেকে একজন উন্মাভরে বলে উঠলেন, 'আরে পাউডার মাখতি ত' কও, কিন্তু আমাদের ত্যাল কম হয় ক্যান্ তা ত' কও না!' বেচারী পাউডার বিক্রেতা খাদ্যমন্ত্রী নয় যে এর জবাব দিতে পারে, পথের পাঁচজনেও কৌতুক অনুভব করে। কিন্তু ভাববার কথা। সত্যিই ত', এতো ভূমিজ উদ্ভিদ ভেষজ ভেজাল চালিয়েও আমাদের তৈলাভাব হয় কেন? নৈয়ায়িক বলেন তৈলের সঙ্গে পাত্রের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ—তবে কি আমাদের পাত্রগুলোই ফুটো? সম্ভবতঃ তাই; নইলে মণ করা ।০/০ কর বৃদ্ধিতে বাজারে তেলের সের করা ৵০/০ দর বৃদ্ধি কেমন করে হয় কেউ বলতে পারে? কর্তৃপক্ষ সে পাত্র নন, আমরা ত' অপাত্রই। তবে হ্যাঁ, স্বাধীন ভারতে তেলের খরচও বেড়েছে—পরাধীন যুগের মনিবদের এতো তেল লাগতো না। সুতরাং দর চড়বেই, অর্থশাস্ত্র বলছে,—অনর্থক পাত্রপক্ষের মেজাজ চড়িয়ে লাভ নাই।" —পাঞ্চজন্য (কান্দী)।

খতিয়ান

"আজ মফঃস্বল অঞ্চলে জরীপের ব্যাপারটাই যে কিরূপ ভয়াবহ হইয়া দেখা দিয়াছে তাহা যে কেহ অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন ও জানিতে পারিবেন। এই জরীপ কার্য্যের দ্বারাই খতিয়ান প্রস্তুত হইতেছে এবং তাহাতেই মানুষের নিজ নিজ জমির স্বত্ব ও দখল নির্দ্ধারিত হইতেছে। গ্রামাঞ্চলে রহিয়াছে একদল অন্যায় লাভের বশবর্ত্তী লোক এবং অধিকাংশ সরল, নিরক্ষর দুর্গত ও অভাবগ্রস্ত জনসমষ্টি। তাহার উপর আছে পাকিস্তানের সম্পত্তি বদলকারী একদল ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষ। ইহাদের জমি জমার জরীপ কার্য্য চলিয়াছে এবং স্বত্ব দখল স্থির হইলে খতিয়ান প্রস্তুত হইতেছে। সুরু হইতেই আমরা এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিয়া আসিয়াছি যে, জরীপ কার্য্যে যদি কোন প্রকার ত্রুটি হয় তবে মানুষের লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। টাকার জোরে প্রকৃত জমির সত্ত্বাধিকারীর স্বত্ব ও দখল তলাইয়া যাইতে দেরি হইবে না। টাকা না ফেলিলে নিজ দখলীয় জমির স্বত্ব ও দখল লিপিবদ্ধ হইয়াও তাহা বানচাল হইয়া যাইতে দেরি হইবে না। মফঃস্বলে গিয়া হাত পাতিলে হাতে কিছু না কিছু পড়িবেই। এই যদি অবস্থা হয়, তবে সেখানে জরীপের ফলাফল সম্পর্কে কোন আশা পোষণ না করাই ভাল। যাহাদের থাকিয়াও নাই হইল তাহাদের আইনতঃ অমার্জ্জনীয় ত্রুটি বলিয়াই গণ্য হইবে। আমরা এ সম্পর্কেও বহু বিবরণ পাইয়াছি। আমরা উপায়হীন।" —ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)

কৃষি ও পশুক্রয় ঋণ

"নানান তদ্বির তদারকের পর যাহাদের ঋণ মঞ্জুর হয় তাহারাও পশুক্রয় ঋণ বাবদে যাহা পান তাহাতে চাষের উপযুক্ত বলদ কেনা তো দূরের কথা, ঋণের টাকায় এক জোড়া সুপুষ্ট ছাগলও কেনার সংস্থান হয় না। কৃষিকার্য্য সমাপ্ত হওয়ার বহুদিন পরে সাধারণতঃ শারদীয়া পূজার পূর্ব্বাহ্নে কৃষিঋণ বিতরণ শুরু হয়। ঋণের টাকা কৃষিকাজে না লাগিয়া পূজার ব্যয়নির্ব্বাহে খরচ হয় অথবা প্রকৃত কৃষিকার্য্যের সময় উচ্চহারে মহাজনদের নিকট গৃহীত ধারের সুদের দায় মিটাইতে ব্যয়িত হইয়া যায়। এইভাবে ধারের টাকা অপব্যয়িত হয় ও ফসল ওঠার পর ধারের টাকা শোধ করিতে চাষীর হয়রাণির একশেষ হয়। ইহা ছাড়াও ধার মঞ্জুরীর ব্যাপারে নানাবিধ পক্ষপাতিত্ব ও দুর্নীতির যে খেলা চলে তাহা উল্লেখ না করাই ভালো। সরকার যদি সত্যই কৃষকদের সাহায্য করিতে আন্তরিক ভাবে ইচ্ছুক হন, তবে কৃষিকার্য্য শুরু হইবার পূর্ব্বেই যাহাতে ধারের টাকা কৃষকের হস্তগত হয় তাহার ব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য। আবার ধারের টাকার পরিমাণ যাহাতে ধার গ্রহণের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর না হয় সে বিষয়ে সুদৃঢ় বিধি ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।"

—বীরভূম (রামপুরহাট)।

কংগ্রেসের স্বরূপ

"সেকালের কংগ্রেসের প্রসঙ্গ তুলিয়া বর্ত্তমানে কেহ কেহ সমালোচনা করিয়া থাকেন যে, কংগ্রেস ত্যাগের কথা ভুলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি বর্ত্তমান কংগ্রেস অন্ততঃ লজ্জাটি ত্যাগ করিয়াছেন। বাঙলাকে বিহারভুক্তির ষড়যন্ত্র বানচাল হইয়া যাইবার পর বর্দ্ধমানের কংগ্রেসী কর্তৃপক্ষ লজ্জার মাথা খাইয়া জনগণের উপর বিশেষ করিয়া তাহাদের মুখপাত্রগণের উপর বেজায় চটিয়া গিয়াছেন এবং প্রতিশোধ লইবার কোন পথ না পাইয়া শেষ অবধি যে সমস্ত শিক্ষক ঐ কুখ্যাত সর্ব্বনাশা প্রস্তাবে প্রত্যক্ষ বিরোধিতা করিয়াছেন, তাঁহাদের দমন করিবার জন্ম উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। স্কুলবোর্ডরূপী জমিদারী পাইয়া তাঁহারা ধরাকে সড়া জ্ঞান করিয়াছেন।" —দামোদর (বর্দ্ধমান)।

শোক-সংবাদ

তারানাথ রায়

বসুমতী-সাহিত্য মন্দিরের কর্ম্মাধ্যক্ষ তারানাথ রায় গত ২৩শে মে বুধবার নীলরতন সরকার হাসপাতালে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর হইয়াছিল। কিছুদিন যাবৎ তিনি দুরারোগ্য ব্যাধিতে ভুগিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বিধবা স্ত্রী, এক পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার আত্মার কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীমৎ স্বামী বাসুদেবানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী বাসুদেবানন্দ গত ২২শে মে পূত ভাগিরথী তীরে বেলুড় মঠে যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে মহাসমাধিতে লীন হইয়াছেন। তাঁহার বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধরাজির মধ্যে মাত্র কয়েকটি লইয়া ভক্তি, অন্তরাগে আলাপন, দিব্যবাণীর প্রতিধ্বনি ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ভাগবতী স্মৃতিমাধুকরী পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি এককালে সাফল্যের সহিত মঠ-মিশনের মুখপত্র উদ্বোধন পত্রিকা সম্পাদনা করেন। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী কাল তিনি বেলুড় মঠ ও মিশনের একনিষ্ঠ কর্ম্মী ছিলেন।

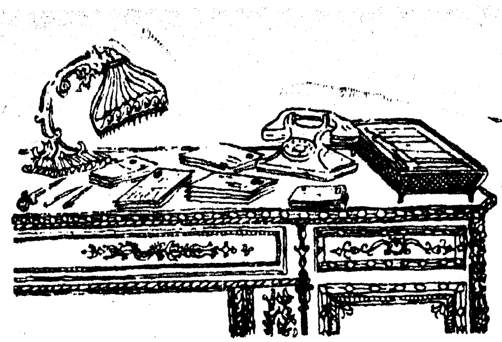
রজনীকান্ত রায়-দস্তিদার

বিগত ২১শে চৈত্র, বৃহস্পতিবার (১২ই এপ্রিল, ১৯৫৬) শ্রীহট্টের জমিদার ও অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট রজনীকান্ত রায়-দস্তিদার মহাশয় তাঁহার বালীগঞ্জস্থ বাসভবনে দেহত্যাগ করেন। শ্রীহট্টের অতি সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশে ১৮৭৮ খৃঃ



১২ই জানুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বংশগৌরবে ও শিক্ষা-দীক্ষায় বহু প্রাচীনকাল হইতে এই পরিবার বিশিষ্ট মর্য্যাদা ও সম্মানের অধিকারী। ১৯৩৩ খৃঃ তিনি কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। রাজকার্য্যের সঙ্কীর্ণ পরিধির মধ্যে তাঁহার কর্মক্ষেত্র সীমিত ছিল না। গীতকলা, জ্যোতিষশাস্ত্র, সামুদ্রিক বিদ্যা অধ্যাত্মতত্ত্ব ও স্বাস্থ্যনীতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তিনি গভীর ভাবে চর্চ্চা করিতেন। তাঁহার প্রণীত "সরল-সঙ্গীত ও হারমোনিয়ম শিক্ষক" সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট সুবিদিত। শ্রীহট্টের ইটা পরগণার পণ্ডিতবর্গ তাঁহাকে "তত্ত্বসিন্ধু" উপাধি প্রদান করেন এবং ৺কাশীধামের শ্রীভারতধর্ম্ম মহামণ্ডল তাঁহাকে "জ্যোতির্বিশারদ" উপাধিতে সম্মানিত করেন। জীবনের প্রতি কর্ম্মে তিনি বলিষ্ঠ নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার স্বাক্ষর রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে পরলোকগমন করেন। তাঁহার তিন পুত্র, দুই বিবাহিতা কন্যা, পুত্রবধূ, পৌত্রপৌত্রী ও বহু আত্মীয়-স্বজন বর্ত্তমান আছেন।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পাঠক পাঠিকার চিঠি

পদচিহ্নের দেশ চিত্রকূট

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়ের "পদচিহ্নের দেশ চিত্রকূট" মনোযোগ সহকারে পড়িলাম (মাসিক বসুমতী, বৈশাখ ১৩৬৩)। চিত্রকূট সত্যই পদচিহ্নের দেশ সন্দেহ নাই, কিন্তু রামপদবাবুর মত খ্যাতনামা সাহিত্যিক কেমন করিয়া সেই সমস্ত পূত পদচিহ্নের সহিত জড়িত মনোরম উপাখ্যানগুলি বর্ণনা না করিয়া সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস পাইলেন, বুঝিলাম না। হনুমান ধারায় মহাবীর হনুমানের মূর্ত্তির অবস্থিতি সম্বন্ধেও তাঁহার মারফৎ তত্র প্রচলিত কাহিনীটুকু আমরা পাই নাই, যেমন পাই নাই হনুমান ধারার পর্ব্বত শীর্ষে অবস্থিত "সীতা রসুই" এর এতটুকুও ভক্তিরসাপ্রিত বর্ণনা। তমাল, শাল পিয়াল ও অর্জ্জুন গাছের ঘন সন্নিবেশমণ্ডিত পবিত্র জানকীকুণ্ডের বর্ণনাও সংশ্লিষ্ট উপাখ্যানটুকুর অভাবে অসম্পূর্ণ। কামদাগিরির পরিক্রমার পথে পড়ে ভরত-মিলনের পবিত্র স্থান। যে কোন মানুষ, যাঁহার এতটুকু কল্পনা শক্তি আছে, তাঁহার পক্ষে সেখানকার বর্ণনা বা তাহার পৌরাণিক কাহিনীটুকুর বিচারের ভার প্রত্নতাত্ত্বিকের উপর ন্যস্ত না করিয়া নিজের সৃজনীশক্তির এতটুকু সদ্ব্যবহার করিলে ভ্রমণ কাহিনীটি সাহিত্য পদবাচ্য হইত। এই সব ত্রুটিগুলির জন্য রচনাটি সাহিত্য হইয়া ফুটে নাই, নিছক ভ্রমণ কাহিনী ত হয়ই নাই। চিঠিখানি দীর্ঘ হইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় আর লিখিলাম না। যদি চিঠিখানি পড়িয়া ঔৎসুক্য জাগিয়া থাকে তবে জানাইলে মনোরম কাহিনীগুলি উপহার দিতে প্রয়াস পাইব। রামপদবাবুকে এই চিঠিখানি দেখাইবেন আশা করি। বসুমতী আমার ভালো লাগে এবং সেই জন্যই এত কথা লিখিলাম। মার্জ্জনা করিবেন। রামপদ বাবুর নিকট অনুরোধ এই যে, তিনি যেন পত্রটিকে অসৌজন্যপূর্ণ মনে না করেন। শ্রীশিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য। ৬৫৩ নং সার্কুলার রোড। সাঁত্রাগাছি, হাওড়া।

চেরো না কেরো না কিরো ?

১৩৬৩ সালের বৈশাখ সংখ্যার মাসিক বসুমতীর ৫৮ পৃষ্ঠায় "চেরো" নামক প্রবন্ধ পাঠ করে এই পত্রখানি আপনাকে দিতে বাধ্য হইলাম, কারণ শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "চেরো" প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে "অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন হস্তরেখাবিদের নাম চেরো···তাঁর নাম কাউণ্ট লুই হ্যামন"। কাউণ্ট লুই হ্যামনের ছদ্মনাম ছিল "কাইরো (অনেকে কিরো বা কেরো বলেন) তাঁর লিখিত পুস্তকে পাওয়া যাইবে, Cheiro (pronounced KI-RO) গ্রীক ভাষায় "কর"কে Cheir (কাইর) বলে। সামুদ্রিক ভাষাকে Cheiramancy (কাইর-ম্যান্সি) বলে। এই সব কারণে কাইরো (কিরো বা কেরো) যুক্তিসঙ্গত। কোনমতেই "চেরো" হয় না। শ্রীঅমলকৃষ্ণ কর। ৮ গুড রোড, দার্জ্জিলিং।

১৩৬৩ সালের মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যায় হস্তরেখাবিদ Cheiro সম্বন্ধে শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চেরো' প্রবন্ধটি পড়লাম। Cheiro কিন্তু তাঁর "Cheiro's language of the Hand" বইটিতে নিজের ফোটোর নীচে নিজের নাম 'Count Louis Hamon "Cheiro" (pronounced KI-RO) বলে উল্লেখ করেছেন। সোমনাথ বাবুর প্রবন্ধটির নাম তাই চেরোর বদলে কিরো হওয়া উচিত নয় কি ?—সনৎকুমার মৌলিক, মেদিনীপুর।

সৈয়দ মুজতবা আলীর অসম্পূর্ণ রচনা

গত ১৩৫৬ সন ২য় খণ্ডে ২য় ও ৩য় সংখ্যা 'নর্ত্তকী' নামে সৈয়দ মুজতবা আলীর একটি অসমাপ্ত রচনা বাহির হইয়াছিল। দয়া করিয়া নর্ত্তকী নামক রচনাটি সম্পূর্ণ প্রকাশ করিলে অত্যন্ত আনন্দিত হইব। আশা করি অনুরোধটি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কৃষ্ণা দাস। ৬১ নং সদরবাজার, বারাকপুর।

ফটোগ্রাফী সম্পর্কে লেখা চাই

মাসিক বসুমতীর মাধ্যমে আধুনিক পদ্ধতিতে ফটোগ্রাফী শিক্ষার ব্যবস্থা হইলে অনেকেই উপকৃত হইবেন আশা করা যায়। —শ্রীগোলাম মহবুব। তালিবপুর, মুর্শিদাবাদ।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

১৩৬৩ সালের "মাসিক বসুমতী", বৈশাখ সংখ্যায় "রঙ্গপট" বিভাগে ১৮৫ পৃষ্ঠায় প্রতিভাময়ী চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী রেখা দেবী "অন্তরের বিয়েতে" "মায়ের" ভূমিকায় নয় "মায়ার" ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। আশা করি পরবর্ত্তী সংখ্যায় এই ভুলটুকু শুদ্ধ করে নেবেন। শ্রীপূর্ণেন্দু পাল, ৪৬ বি-টি- রোড, কলিকাতা—২।

শ্রেষ্ঠ বইয়ের তালিকা থেকে বাদ

মাসিক বসুমতীর বৈশাখ সংখ্যায় গত এক বৎসরে প্রকাশিত বাংলা বইয়ের তালিকা দেখলাম। ঐ তালিকায় ১৩৬২ সালের ১লা আষাঢ় তারিখে প্রকাশিত আমার 'বাংলা নাটকের ইতিহাসে'র কোন উল্লেখ দেখলাম না। যিনি তালিকা প্রস্তুত করেছেন—তিনি বইখানির নাম শোনেন নি, অথবা তালিকাভুক্ত করবার যোগ্য বিবেচনা করেননি তা' বুঝতে পারলাম না। তাঁর অবগতির জন্যে জানাতে পারি যে, বইখানি কলকাতা ও অন্যান্য কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, ও এম, এ, পরীক্ষার জন্যে অনুমোদিত এবং প্রায় সব পত্রিকায় উচ্চ-প্রশংসিত হয়েছে। অজিত কুমার ঘোষ ৩, উমেশ দত্ত লেন। কলিকাতা—৬

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

[বাংলা ভাষার একমাত্র সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহক-গ্রাহিকা ছড়িয়ে আছে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র দুনিয়ার। প্রতি মাসেই আমরা শত শত নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও পাব। গত সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে কয়েক জন নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকার আবেদন-পত্র মুদ্রিত করি। প্রত্যেকের চিঠি প্রকাশের স্থানাভাব; সে জন্য বর্তমান সংখ্যাতেও মাত্র কয়েক জনের আবেদন-লিপি প্রকাশিত হয়েছে।—স]

আমার গ্রাহক নং ৫০১৪৭ আসি এই বৎসরের জন্য মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। গ্রাহক করিয়া লইবেন। সুব্রত দাসগুপ্ত। C/o ডাঃ এস, বি দাসগুপ্ত, রেলওয়ে হাসপাতাল আসাম।

মাসিক বসুমতীর চাঁদা পাঠালাম। অনুগ্রহ করিয়া বসুমতী পাঠাইবেন। শ্রীমতী ইলা রায়। পুরবাসা কাদাই বহরমপুর।

ছয় মাসের মাসিক বসুমতীর অগ্রিম চাঁদা পাঠালাম। বই যেন ঠিক সময় মতন পাই। কমলা রায় C/o ডাঃ জে এস রায় গুজরাট।

আপনার চিঠি পাইলাম (১৩৬৩) এক বৎসরের মাসিক বসুমতীর জন্য ১৫৲ টাকা পাঠালাম। পূর্ণিমা ভাদুড়ী পোঃ মাধীপুরা ভাগলপুর।

Ref: Your reminder of 6. 5. 56. I am remiting an year's subscription. The pay may kindly be continued. I am a member of many Monthly Bengali Magazine from time to time, but Monthly Basumati has been subscribed with out break since 1939. Sm. Arotirani Sinha C/o Sj. M. N. Saha. Engineer, Govt. Saw Mill. Po. Allapalli, Chandai, M. P.

Remitted Rs 7/8 Seven & Annas Eight. being the half yearly subscription for the Monthly Basumati in my name. Sm. Bela Bose. C/o A. C. Bose. Darjeeling.

With Reference to your reminder I am sending Rs. 15/—being the yearly subscription for Basumati for the next year. Mrs. Himani Das. Madras.

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। অনুগ্রহ করিয়া পত্রিকা নিয়মিত পাঠাইবেন। শ্রীমতী প্রভাবতী মুখার্জি C/o Prof. N. N. Mukherji. আগরা।

I have to thank you for your Card of 6. 5. 56. and as per advice contained there in, I am sending you Rs 15/—towords yearly subscription of Monthly Basumati & have to request you to continue sending me my copies as before. Mrs. Kamala Ganguly. 21 Puram P. Rao Road. Madras.

This remittance covers the yearly subscription of the monthly Magazine Basumati. Please keep up the supply regularly. Mira Choudhury (Baulia)

মাসিক বসুমতী পাঠাবার জন্য ১৫৲ পাঠালাম। ঠিকানা একটু বদল হইয়াছে নূতন ঠিকানা লিখিয়া লইবেন। বীণা রায়-চৌধুরী C/o টি, কে, রায়-চৌধুরী, পোঃ আহাবাদ (গুলবার্গ)

মাসিক বসুমতীর ১৩৬৩ সালের প্রথম ৬ মাসের চাঁদা পাঠাইলাম গ্রহণ করিয়া বাধিত করিবেন। আমার নব-বর্ষের শুভেচ্ছা ও নমস্কার গ্রহণ করিবেন। শ্রীমতী নীলিমা দেবী C/o ডাঃ বি, কে, গোস্বামী। দিনাজপুর।

১৩৬৩ সালের মাসিক বসুমতীর অগ্রিম বার্ষিক মূল্য পাঠালাম। বৈশাখের সংখ্যা বাহির হইলেই পাঠাইয়া দিবেন। শ্রীমতী প্রতিমা সেন। C/o ডাঃ বি, আর, সেন নাগপুর।

আপনাদের মাসিক বসুমতীর বৈশাখ হইতে ছয় মাসের গ্রাহক। মূল্য পাঠালাম। শ্রীমতী অমিয়বালা ব্যানার্জি।

বৈশাখ '৬৩ হইতে আশ্বিন পর্য্যন্ত চাঁদা পাঠালাম, উপস্থিত আমি কলিকাতায় আছি, অতএব বৈশাখ সংখ্যা হইতে কলিকাতার ঠিকানায় পাঠাবেন। মঞ্জু বোস। ১৩ মহানির্ব্বাণ রোড, কলিকাতা—২৯

মনি অর্ডার যোগে বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠালাম মাসিক বসুমতী সত্বর পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী স্বর্ণারাণী সিংহ, পাটনা।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠালাম। বৈশাখ বাহির হইলে শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী রমা দত্ত। ১৬ লেক সাইড রোড, কলিকাতা-২৯

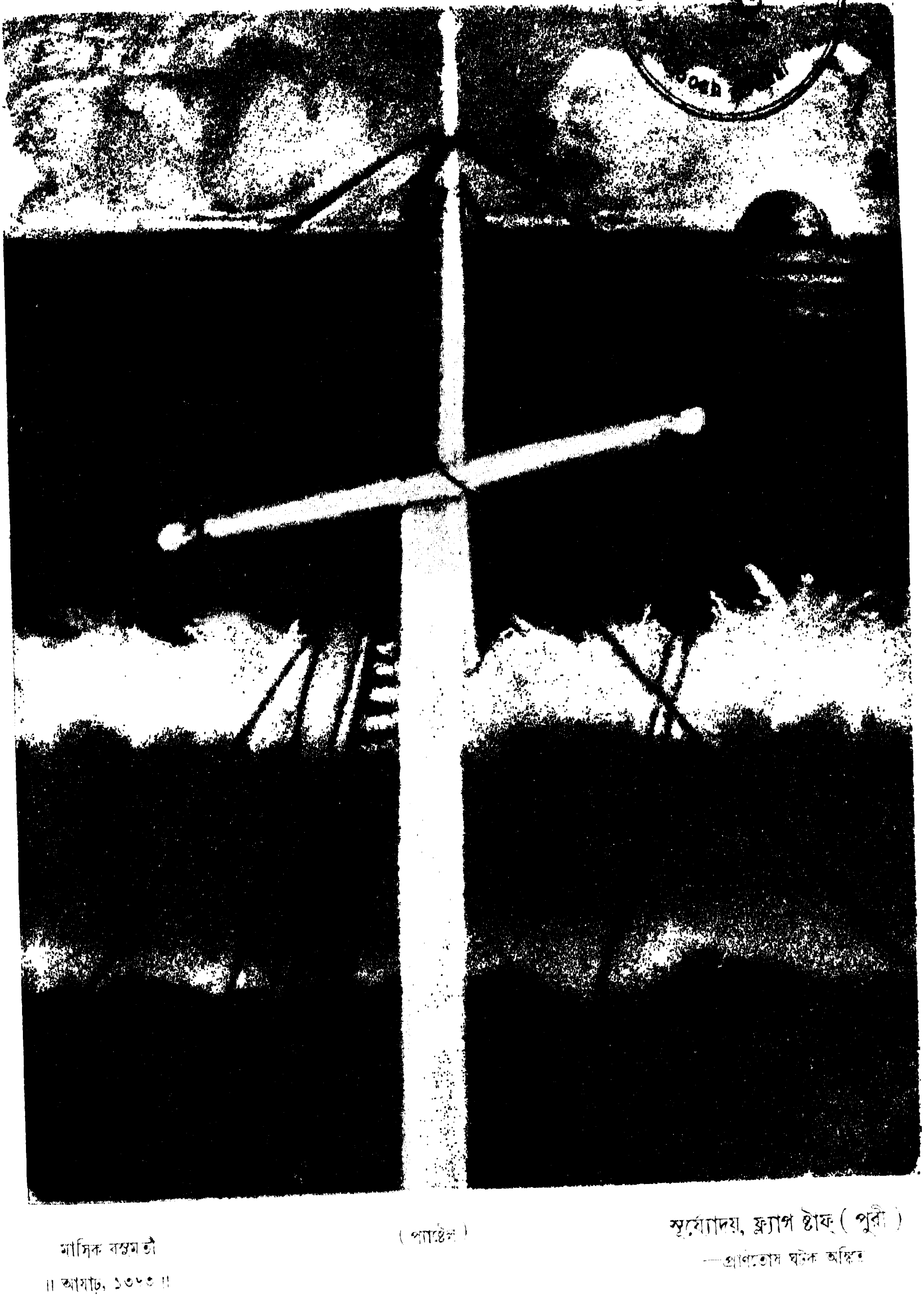
১৩৬৩ সালের মাসিক বসুমতীর চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠালাম। বিশেষ কারণবশতঃ টাকা পাঠাইতে দেরী হইল বলে দুঃখিত। শ্রীমতী সুপ্রিয়া ঘোষ C/o Capt. আর, এন ঘোষ Stavely Road, Poona-I.

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। প্রাপ্তি সংবাদ দানে সুখী করিবেন। শ্রীমতী অপর্ণা সান্যাল, C/o এম, সান্যাল পোঃ রামগর, চামগোরাণ।

অগ্র ১০৲ টাকা পাঠালাম মাসিক বসুমতীর চাঁদা হিসাবে আমার নামে জমা করিবেন। শ্রীঅণিমা শেঠ, C/o কে, এল, শেঠ। চৌকিডিঙ্গি রোড পোঃ রিহাবাড়ী ডিব্রুগড়।

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠালাম। গ্রাহক করিয়া লইবেন। শ্রীমতী ভারতী দাসগুপ্তা। C/o পি, এন, দাসগুপ্ত F. C. R. প্রফেসার পাড়া, গৌহাটি।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক ১৫৲ টাকা পাঠালাম। বসুমতী পাঠাইয়া দেবেন। গীতা বসু। C/o সুরেন্দ্রকুমার বসু আসাম।



(প্যাস্টেল)

সূর্য্যোদয়, ফ্ল্যাগ ষ্টাফ (পুরী)

—প্রাণতোষ ঘটক অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—আষাঢ়, ১৩৬৩]   ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥   [প্রথম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "বেদে আছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। ব্রহ্ম একও নয় দুইও নয়, এক দুইয়ের মধ্যে। 'অস্তি'ও বলা যায় না, 'নাস্তি'ও বলা যায় না—তবে অস্তি-নাস্তির মধ্যে। এই অস্তি-নাস্তি, প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি, নাস্তি ছাড়া।"

"যিনি সৎ তাঁর একটি নাম ব্রহ্ম। সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম নিত্য—তিন কালেই আছেন, আদি-অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না,—হদ্দ বলা যায়, তিনি চৈতন্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ। জগৎ অনিত্য, তিনিই নিত্য। জগৎ ভেল্কিস্বরূপ। বাজীকরই সত্য, বাজীকরের ভেল্কি অনিত্য। বেদান্তের সার— ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা—আমি আলাদা কিছু নই—আমি সেই ব্রহ্ম।"

"ব্রহ্ম—শুদ্ধআত্মা—নির্লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতর তিন গুণ আছে—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। যিনি শুদ্ধ-আত্মা তাঁতে এই তিন গুণ রয়েছে অথচ তিনি নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম আকাশবৎ।"

"ব্রহ্মের ভিতর বিকার নাই—তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণ শক্তিরই গুণ। ব্রহ্ম, সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের অতীত। তিনি গুণাতীত মায়াতীত। ব্রহ্ম—তিনি বিদ্যা অবিদ্যার পার। বিদ্যা মায়া ও অবিদ্যা মায়া দুইয়েরই অতীত। এই জগতে বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া দুই-ই আছে—জ্ঞান ভক্তি আছে, আবার কামিনী-কাঞ্চনও আছে। সৎ আছে অসৎও আছে, ভাল আছে আবার মন্দও আছে, কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে সুগন্ধ দুর্গন্ধ পাওয়া যায় কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। ভাল মন্দ জীবের পক্ষে, সৎ অসৎ জীবের পক্ষে, তাঁর ওতে কিছু হয় না। সুখ দুঃখ পাপ পুণ্য এ সব আত্মার কোন অপকার করতে পারে না,—তবে দেহাভিমানী জীবদের কষ্ট দিতে পারে। যেমন ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকাশের কিছু করতে পারে না। সাপের ভিতর বিষ আছে, অন্যকে কামড়ালে মরে যায়—সাপের কিছু হয় না।"

"ব্রহ্ম কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিষ উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে; বেদ পুরাণ তন্ত্র ষড়্‌দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে—মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিষ কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই—সে জিনিষটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্য্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।"

"শুদ্ধআত্মা নিষ্ক্রিয়। যেমন চুম্বক পাথর অনেক দূরে আছে কিন্তু ছুঁচ নড়ছে। চুম্বক পাথর চুপ করে আছে—নিষ্ক্রিয়।"

"শুদ্ধআত্মা নিরাকার, দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাকলে চক্ষের দ্বারা দেখা যায় না। বেদান্ত বিচারে ব্রহ্ম—নির্গুণ। তিনি বাক্য-মনের অতীত, মন-বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। তাঁর কি স্বরূপ, মুখে বলা যায় না। মনের লয় হলে তবে অনুভব বোধে বোধ হয়—আর 'অস্তি' মাত্র জানা যায়।"

আরব্যোপন্যাসের গল্প

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। শিয়রের কাছে টেবিলের ওপর আলোটা তখনো দপদপ করে জ্বলছে। মনে হল, কানে গেল—দরজার কাছে খট্ করে একটা শব্দ।

মাথা তুলে তাকিয়ে দেখি, কে এক জন দরজা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকছেন। মনে হল—স্ত্রীলোক, তরুণী, সুবেশা, সুন্দরী। আশ্চর্য্য হলাম, হবারই কথা,—এ ঘরে সচরাচর বাইরের লোকের গতাগম্যি নেই তো! আর সময়টাও অদ্ভুত। রাত তখন ক'টা হবে? দু'টোর এদিকে নয় নিশ্চয়। এমন অসময়ে এমন অতর্কিতে এ ঘরে এসে কে ঢুকলেন? কে ইনি?

মনে হল, রমণী অপরিচিতা। আবার একটু এগিয়ে আসতেই দেখা গেল—শুধু অপরিচিতাই নন তিনি, অ-বাঙালিনীও বটে।

পরনে আঁট-সাট পা-জামা, গায়ে পেশোয়ারী ঢঙের ঢিলে কামিজ, তার ওপর জড়োয়া-কাজ করা হাতকাটা খাটো কোরতা, আর সর্ব্বোপরি হীরে-পান্নায় ঝলমল বুটেদার মসলিনের একখানি ওড়নার আচ্ছাদন—ইরাণী-টিরাণী কেউ হবেন হয়ত! তা হোন, কিন্তু কি তাঁর রূপ, আর কি তাঁর চোখ-ঝলসানো বেশভূষার পারিপাট্য! এত রূপ মানুষে সম্ভবে? কখনো কল্পনা করতে পারিনি; আর এত সব মহার্ঘ অদ্ভুত-অদ্ভুত অলঙ্কার! জীবনে বোধ হয় তা-ও কখনো দেখিনি।

কেমন একটা সম্ভ্রমের ভাব অতর্কিতে আপনা থেকেই এসে গেল, বিছানার ওপর বসে পড়লাম চট্ করে।

বললাম—"কে? কে?"

জবাব পেলাম না, কিন্তু একটু পরে টেবিলের ধারে এসে একখানি চেয়ারের ওপর বাঁ হাতখানি রেখে হাসতে হাসতে নিজেই তিনি একটা পাল্টা প্রশ্ন করলেন—"কি, চিনতে পারছেন না আমায়?"

অদ্ভুত প্রশ্ন! আর ততোধিক অদ্ভুত তাঁর বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর, আর মুখের অপূর্ব্ব হাসিটি। সর্ব্বোপরি আশ্চর্য্য ঠেকল—তাঁর ঐ চলতি ঢঙের পরিষ্কার বাংলাবুলি। কে ইনি? কোথায় শিখলেন এমন সুন্দর চলতি বাংলাবুলি? এমন নিখুঁত বাংলাবুলি কচিৎ-কদাচিৎ শুনতে পাওয়া যায় কোনো পরদেশীর মুখে। এ দেশের মাটি আর জল-বায়ুতেই দীর্ঘকাল ইনি পুষ্ট হয়েছেন নিশ্চয়। কিন্তু এ কি তাঁর প্রশ্ন?

ঘরের আবহাওয়াটা আচম্বিতে যেন বদলে গেছে, সরস হয়ে উঠেছে চার দিক, আর মনে হল, তার সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তরের ভিতরটারও সরস হয়েছে অনেকখানিই। স্মৃতির ভাণ্ডারটাকে আর একটু মথিত করে এদিক-ওদিক হাতড়ে হাতড়ে সন্ধান নেবার চেষ্টা করলাম—কোথাও এঁকে দেখেছি কি না—কোনো দিন, কোনো অবকাশে। কিন্তু না, সে-ইঙ্গিত কোথাও নেই। এমন কোনো পেশোয়ারী বা আফগানী, ইরাণী বা আরমাণী রমণীর সঙ্গে জীবনে কখনো কোথাও আমার সংযোগ ঘটেছে—ধরা-ছোঁয়া পড়ছে না। তবে হাঁ, আবছা আবছা গোছের একটা অনুভূতি থেকে থেকে আমার মনের দোরে উঁকি-ঝুঁকি মারছিল বটে। মনে হচ্ছিল বটে, কোথায় যেন এমন একটা মূর্ত্তি কবে আমি দেখেছি। কিন্তু সে কবে, কোথায়? জাগ্রতে কি স্বপ্নে? সত্যিকার রক্ত-মাংসের কোনো মানুষে, না কোনো শিল্পীর গড়া চিত্রে, বা মাটিতে পাতরে-ধাতুতে গড়া পুতুলে? খুঁজে দেখলাম, কিন্তু উত্তর পেলাম না এ-সব প্রশ্নের কোথাও।

অগত্যা বলতে হল—"মাফ করবেন, কোথাও আপনাকে দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না! কোথা হতে আসছেন—জানতে পারি কি?"

এ কথাটারও ঠিক জবাব পাওয়া গেল না। উত্তরে আগন্তুকা যা বললেন, রহস্যটা আরো যেন তাতে জমাট বেঁধেই উঠল।

বললেন—"আশ্চর্য্য তো! আমায় চেনেন না, অথচ আমায় নিয়েই আজ আপনার যত মাথা-ব্যথা, যত কারবার, যত কিছু। বলি, আরব্যোপন্যাসের গল্প লিখছেন তো?"

ভারী অবাক কাণ্ড! কি করে তিনি তা জানলেন?

বললাম—"কে আপনাকে এ-খবর দিলে?"

আগন্তুকা বাংলা বলতে পারেন ভাল—সে পরিচয় পেয়েছি। বাংলা সাহিত্যেও অনুরাগ আছে না কি তাঁর?

তারও খবরাখবর রাখেন? আশ্চর্য্য তো! আবার, এ কি কথা? তাকে নিয়েই আজ আমার যত মাথাব্যথা, যত কারবার যত কিছু? তার মানে? উনিও আরব্যোপন্যাস নিয়ে পড়েছেন, হবে? তাই নিয়ে মাথা ঘামান, লেখেন, গল্প রচনা করেন। হয়ত ভেবে নিয়েছেন, কোনো ক্রমে তাঁর এই গোপন সাধনার মণি-কোঠাটির হদিস পেয়েই এ বেচারা গ্রন্থকার তাতেই সিঁদ কাটবার ফিকিরে আছে, আর তারই সন্ধানে আজ তার এ-গরীবখানায় শুভ পদার্পণ। ভারী মজা তো!

কিন্তু মজাটা উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া গেল না। অনুমানটা আমার টেকসই হয়নি। একটু পরেই প্রশ্নের জবাবে আবার তিনি যা বললেন, সবই তাতে উল্টে-পাল্টে গেল। আবার আমায় দিশেহারা হতে হল।

বললেন—"যেতে দিন ও-কথা। খবরগুলো আমরা পাই—পেয়ে থাকি। আসল কথাটা এবার তবে শুনুন—যে জন্যে এমন গা-পড়া হয়ে আজ আমার এখানে আসা।"

দেখলাম তখনো তিনি ঠায় দাঁড়িয়েই আছেন। বললাম—"আচ্ছা বসুন, দাঁড়িয়ে কেন? বসে বসেই বলুন—যা বলবার।"

তরুণী আসনস্থা হতে হতে মৃদু হেসে বললেন,—"দেখুন, এই আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলো সত্যই আমায় ভারী অতিষ্ঠ করে তুলেছে। কেন জানেন? শ'কয়েক বছর আগে কোনো এক পথভোলা নরপতিকে পথে টেনে আনবার জন্যে আমিই তাঁকে এ গল্পের ঝোলাটা প্রথম ভেট দিয়েছিলাম, আর সেদিন থেকেই ওদের এই জয়যাত্রার সুরু। কিন্তু,—কি, হেসে ফেললেন যে? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

বললাম—"কিন্তু সে যে ক'শ বছর আগেকার কথা!"

তরুণীও হাসতে হাসতেই জবাব দিলেন—"হলই বা। সেদিনের কথাই যে আমি বলছি।"

"সেদিনের কথাই বলছেন! অবাক করলেন আপনি!" একটু প্রতিবাদ জানিয়ে আবার বললাম—"জানেন, সেদিন এ গল্পগুলোর যিনি কথিকা হয়েছিলেন, তিনি ছিলেন সে-কালের পারস্যের উজীর-কন্যা ও পারস্য-সম্রাটমহিষী স্বনামধন্যা শাহারজাদী!"

"হাঁ, বাবুজী, সে-সম্মান লাভের সৌভাগ্য একদিন আমারই হয়েছিল। তা, এমন তো হয়! আপনাদের শাস্ত্রেও বলে যে। তাই কি না বলুন?"

ভাবলাম—লোকটার মাথায় বোধ হয় একটু ছিট আছে, কি-সব আবোল-তাবোল বকছেন! যা হোক একটু ভেবে, ভদ্রতার সীমাটা লঙ্ঘন না করেই বললাম—"বুঝেছি, বলতে চান আপনি, সুদূর অতীতে কোনো জন্মজন্মান্তরে আপনিই ছিলেন সেই পারস্য-সম্রাট-মহিষী শাহারজাদী—আরব্যোপন্যাসের সেই স্বনামধন্য কথিকা—যাঁর কথা এত করে আজ আমরা পড়ছি, আর—"

—"আর যাঁর নাম ভাঙিয়ে অনায়াসে বিনা দ্বিধায় আজ আপনারা কতকগুলো পচা-সস্তা ভেজাল মালের সওদা ফিরি করছেন বাংলা সাহিত্যের বাজারে—আরব্যোপন্যাসের নামে।"

বিচিত্র অভিযোগ! বললাম—"আপনার এ অভিযোগের ভিত্তি কি, জানিনে, বলতে পারব না। কিন্তু আপাতত আপনার নিজের পরিচয়টা নিয়েই বড্ড তাল পাকিয়ে ফেলছেন যে। মানলুম—আপনিই সেই!—সেই অতীত যুগের পারস্য-রাজমহিষী শাহারজাদী। পূর্ব্বজন্ম, পুনর্জন্ম, জন্মজন্মান্তর আমরা মানি—একথা ঠিক। কিন্তু কি করে আজ আপনি জানতে পারলেন, টের পেলেন সে-কথা? সমস্যাটা যে ওখানেই।"

এ-কথায় আগন্তুকা এবার বেশ মন খুলেই হেসে উঠলেন। বললেন—"বাবুজী, আপনার যে দেখছি গোড়ায়ই মস্ত গলদ। যারা একবার দুনিয়া ছেড়ে গিয়ে আবার দুনিয়ায় ফিরে আসে তারাই সব ভুলে যায়। আমি কিন্তু সে দলে নই।"

—"সে দলের নন আপনি?—তার মানে?"

—"তার মানে—আজ আমি এ দুনিয়ার কেউ নই। বুঝলেন কথাটা?"

—"রহস্য ছাড়ুন। এ দুনিয়ার কেউ নন, তবে আজ আপনি আসছেন এখানে কোন্ দুনিয়া থেকে?

আগন্তুকা এবার একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—"না বাবুজী, রহস্য নয়, আর দুনিয়া বলতেও এই একটিই, আর নেই; কিন্তু কি জানেন বাবুজী, খোদা কা'কেউ ভোলেননি। সবার জন্যেই সব ব্যবস্থা তাঁর আছে। জীবনান্তে বিশ্রামের জন্য আপনাদের আর খৃষ্টানদের যেমন আছে লোকান্তর—স্বর্গ, আমাদের জন্যেও তেমনি আছে—বেহেস্ত। মানুষ অন্ধ গোঁড়ামিতে এ সত্যটা ভুলে যায়, আর তাইতেই তো নানা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর অন্ধ সংস্কারের ফলে দুনিয়াভর আজ এত দ্বন্দ্ব,এত মারামারি, এত কাটাকাটি—চার দিকে। কিন্তু যাক, অবান্তর কথা বিস্তর হল, এখন আসল কথাটায় আসুন, শুনুন আমার কথাটা—"

ভাবছিলাম লোকটির মাথায় ছিট আছে, কিন্তু তা নয় ত! কথাগুলোতে গাঁথনি আছে, যুক্তি আছে, বুদ্ধির চমক আছে। তবে কি, যা উনি বলছেন তাই ঠিক? স্বর্গত আত্মা সত্যই আজ স্বর্গ ছেড়ে মর্ত্ত্যলোকে নেমে এসেছেন জোর প্রয়োজনের তাগিদে—রূপ ধরে? আর তাঁরই সামনে মুখোমুখি বসে আজ আমি! আর কি না বলছেন—তিনিই সেই শাহারজাদী! কে ভেবেছিল, শাহারজাদী ছিল একটা কল্পিত গল্পের নায়িকার বাইরেও সত্যি সত্যিই আর কিছু! আমাদের মতই বাস্তব জগতের রক্তমাংসের মানুষ একটি!"

কথাগুলি মনে মনেই আওড়াচ্ছিলাম, কিন্তু আশ্চর্য্য, আগন্তুকা ফিক করে হেসে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠলেন,—"না বাবুজী, যা ভাবছেন তা নয়। আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলো গল্পই—কে না তা জানে? কিন্তু তাই ব'লে শাহারজাদী আর পারস্যপতি শেরইয়ার—গল্পের বস্তু নয়। ইতিহাস খুঁজে দেখুন সন্ধান পাবেন। ঘাবড়াবেন না, আমি কিছু মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে আসিনি আপনাকে দিক করতে। আচ্ছা, কথাটা শুনুন তো, তা হলেই টের পাবেন!"

না, আর সন্দেহের অবকাশ রইল না। এবার আমার ভুল শুধরাবার পালা। কি করে তিনি জানতে পারলেন আমার মনের গোপন কথা, অন্তরের লুকানো ভাব! হাল ছেড়ে দিলাম, গা'টা ছমছমিয়ে উঠল। কেমন একটা আচ্ছন্ন ভাবের মধ্যেই বলে উঠলাম—"হাঁ হাঁ, তাই বলুন—তাই বলুন—শুনছি।"

বললাম ত 'শুনছি', কিন্তু সত্যই শুনছিলাম—শুনতে পারছিলাম তখন কি তেমন মন লাগিয়ে? মন আমার তখন কোথায়? নেতিয়ে পড়ছে কি-এক পরম বিস্ময়ে—গা-শিউরানো অনুভূতির প্রবল চাপে, ভেসে যাচ্ছে কোন্ অজানা রাজ্যের অজানা রহস্যের খোঁজে—অজানা আবহাওয়ায়।

আগন্তুকাও বলতে সুরু করলেন।

শুনলাম, বলছেন—"দেখুন, আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলো আজ শুধু আপনাদেরই নয়, সারা জগতের সাহিত্যেই একটা বেশ উঁচু আসন জুড়ে বসে আছে। এ ঝোলাটা হাতে পেলে দুনিয়ার ছেলে-বুড়ো মসগুল হয়ে যায়, ভুলে যায় আহার-নিদ্রা—সেদিনের সেই পারস্য-সম্রাটের মতোই। দুনিয়া-জোড়া তাদের খাতির। কিন্তু 'খাতির' এক কথা, আর 'খ্যাতি' অন্য। খ্যাতিটাও সে-অনুপাতে বাড়ছে কি? অন্ততঃ বাড়বার তেমন অবকাশ পাচ্ছে কি? আমার কি মনে হয় জানেন? মনে হয়, ওটা আরো অনেক বেশী ক'রে তারা পেতে পারত যদি না—"

—"যদি না?"

—"যদি না আপনারা এ বিষয়ে আর একটু কম উদাসীন হতেন।"

—"আমরা? উদাসীন?"

—"হাঁ, আপনাদের মানে, আমি সাহিত্যসেবীদের কথা বলছি। দেখুন, এই আরব্যোপন্যাসের গল্পগুলো গোড়ায় যা ছিল আজ আর কিন্তু ঠিক তা নেই। সে আমার ঝোলাটি হতে মুক্তি পেয়েই এদিক-ওদিক ঘুরে-ফিরে হাত-বদল হতে হতে একদিন নানা অভিনব চেহারা নিয়ে কোথায় এসে যে তারা থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, আর এগুতে পারেনি। আজ তারা না আমার গোড়ার কথা, না আপনাদের এ-আমলের যোগ্যবস্তু উপভোগের সামগ্রী। ওদের ভাব, ভাষা, গাঁথুনি সব সেকেলে, এ-যুগ থেকে কমসে কম চার পাঁচশো বছর পিছনে তো বটে। কি করে তারা এযুগের সঙ্গে তাল ঠিক রেখে পথ এগিয়ে চলবে? ওদের উপরে ঠেলে তোলবার উপকরণের অভাব নেই, কিন্তু কলকাটিটা আপনাদের হাতে, আপনারা নিশ্চেষ্ট কেন?"

কথাগুলো যে ঠিক বুঝতে পারছিলাম, তা নয়। তবু প্রশ্ন করলাম—"কি করতে বলছেন আপনি?

গল্পগুলোকে আবার ঢেলে সাজাতে হবে—তাই বলতে চান কি?"

—"না, তা কেন? ও অধিকার কারু নেই। কাঠামোগুলো

ঠিকই থাকবে, আর মূল কথাগুলোও ;—ওদেরও বজায় রাখতে হবে বই কি,—নইলে যে সবই গেল! অরাজক লেগে যাবে, একই বস্তু নানা হাতে পড়ে নানা মূর্ত্তিতে দেখা দিয়ে তাল পাকিয়ে ফেলবে, সব কারু সঙ্গে কারু মিল থাকবে না। তাই কি আমি বলছি? তোবা-তোবা!···আচ্ছা, আপনাদের পুরাণ-পাঠকেরা কি করেন? মূল কাহিনীগুলোকে ঠিকই রেখে তা থেকেই তো তাঁরা নিঙড়ে নিঙড়ে কত রস বের করেন, নিত্য চিরনূতন করে তোলেন শ্রোতাদের নিকট সেই একই কথা—শুধুই বলবার মাধুর্য্যে—কথকতার দক্ষতায়—অফুরন্ত নানা রসের অবতারণায়। হাস্যরসের চাটনি, বীররসের ঝাল, করুণরসের খাট্টা, মধুর রসের মিষ্টত্ব, শান্তরসের তৃপ্তি, আদিরসের আনন্দ—কি নেই তাতে? এ সবার উপকরণ আরব্যোপন্যাসেও যথেষ্ট, কিন্তু হচ্ছে কি? সেই একঘেয়ে, 'অদ্ভুত আদিরসের,' আর, 'আদিরস-অদ্ভুতরসের' পর পর একটানা উদ্ভট একটা ঘণ্ট! কৌশলী রাঁধুয়ে কই? মসল্লা চেনবার চোখ কই? আপনারা কি করেন? তালাবদ্ধ রসগুলোকে, তালা ভেঙে বাইরে টেনে এনে একখানা ভাল থালি সাজাতে পারেন না—হরেক রসে ভরপুর! এ যে আপনাদেরই কাজ।"

তার পর আগন্তুকা একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন—"আদিরসটাকে আমিও তুচ্ছ করিনে—রসটা খুবই উপভোগ্য আর মিষ্টি, কিন্তু একঘেয়ে কিছুই ভাল নয়, মিষ্টিও নয়! অরুচি জন্মায় যে! আর সাচ্চা জিনিষ না হলে বদ-হজমিও। আজ-কাল যা চলছে তাতে কিন্তু এ আশঙ্কাটাও বেশ আছে। কেন একথা বললাম, বুঝতে পারছেন? ওই আদিরস বলুন, আর যা-ই বলুন, ওরও রকমফের আছে। আমি তো বলি· কি, ওকে একটা বীভৎস রস বললেও তেমন অন্যায় হবে না। ওটা অতি গুরুপাক বস্তু। দেখুন, চিনিও মিষ্টি, আর চিটেগুড়ও মিষ্টি। আজ পর্য্যন্ত তো দেখা যাচ্ছে, আরব্যোপন্যাস রচনায় এই চিটেগুড়ের মরানটাই চলছে খুব জোরসে,—চিনি কই? একটু খুঁজে-পেতে দেখুন না, তা-ও আছে, পাবেন তাও। রসটা জমবে ভাল।"

বললাম—"কিন্তু সে-চেষ্টাও যে না হচ্ছে তা তো নয়! আপনি কি তাই বলতে এত কষ্ট করে···"

আগন্তুকা বললেন—"না বাবুজী, আমার আরো গুরুতর কথা আছে, আর সেইটিই হচ্ছে আসল কথা—যা না কি এমন করে আজ আমাকে এখানে টেনে এনেছে। দেখুন, এতক্ষণ যার আলোচনা হল সে হচ্ছে ওই গল্পগুলো। কিন্তু গল্প আর ইতিহাস এক নয়; আর আমারও সেই পারস্য-সম্রাট শেরইয়ারের কাহিনীটা যে গল্প নয়, ইতিহাস,—সে কথা তো আপনাকে বলেছি। আচ্ছা, আপাততঃ সে ছোট্ট গণ্ডীটুকুরও কি হাল দাঁড়িয়েছে, সে খবর রাখেন?"

—"কি বলুন তো?"

—"কি করেই বা জানবেন আপনারা, এ শুধু আমিই জানি, আমিই বলতে পারি। আর তার জন্যই যে আসতে হল খোদ আমাকে—ওই হারানো সন্দেশটুকু নিজে বয়ে। ইতিহাস গল্প নয় বলেছি, কল্পনার ঠাঁই নেই তাতে—তা সে যত কবিত্বপূর্ণ, যত সুন্দর, আর যত সুসম্বদ্ধই হোক। ছিনিমিনি খেলা চলে না ওকে নিয়ে, অনেক বিপদ তাতে। কত দুর্জ্জনকে সাধু ফকির সাজানো হয়, আবার কত নির্দ্দোষী ভাল মানুষকেও অযথা তলিয়ে দেওয়া হয়, মিথ্যা দুর্ণাম ও কলঙ্কের পঙ্কে। অন্ততঃ পারস্য-সম্রাট হতভাগ্য শেরইয়ারের নসীবে তো তাই ঘটছে দেখতে পাই।"

—"বলেন কি?"

—"শুনুন তো। বলা হয়, লোকটি ছিল একান্ত হৃদয়হীন, আর বেপরোয়া রক্তপিপাসু—নরপিশাচ বা রাক্ষস—এমনি একটা কিছু বললেই হয়। তার বিবেক ছিল না, বিচার ছিল না, এমন কি—নিজের ভাল-মন্দ ভুল-ভ্রান্তি বুঝতে পারেন—অতটুকু বুদ্ধিও ছিল না তাঁর। একপাল বেগমকে একদিন কিনা কচুকাটা করে ফেললেন অবহেলে—শুধু তাদের একজনার মাত্র দোষে। আর শুধু তাই কি? তারপর নিত্য চললো ওই পত্নীহত্যার সমারোহ! পত্নীহত্যা!—ব্যাপারখানা বুঝুন। রোজ একটি করে আসছেন, আর চলছে রাতভর আমোদ-প্রমোদ, খানাপিনা, হাসিঠাট্টা একসঙ্গে। ব্যস্, আর তারপর রাত পোহাতেই সব শেষ! কেউ কারু নয়! একজন চলছেন রাজসভায় খোস মেজাজে, সাজগোজ করে, আর একজন চলেছেন বধ্যভূমিতে জল্লাদের সাথে, খোদার নাম জপতে জপতে! রূপকথা আর কা'কে বলে! কথাগুলো কিন্তু আদবে খাঁটি নয়,—আমি তো জানি। দেখে শুনে দুঃখ হয় সত্যি। যাই হোক, এক-দিন একপ্রাণ এক-আত্মা ছিলাম দু'টিতে! আর সে-প্রীতির বন্ধনটা, মনে হয়, আজও যেন আছে তেমনি অটুট, তেমনি শক্ত, সেদিনের মতোই। ওই দুঃখের তাড়নায়ই তো আজ আমার এমন করে আপনার নিকট আসা। কি জানেন বাবুজী, মানুষ মরেও সংস্কার ছাড়তে পারে না সহজে। স্বজনপ্রীতি, মায়া-মমতা, স্নেহ-ভালবাসা, সুনামের দুর্ণামের ভয়—এগুলোও নাছোড়বান্দা কম নয়। আপনার নিকট এসেছি, জানি আপনিও মেতেছেন ঐ আরব্যোপন্যাস নিয়েই, পারবেন তার এ ভুল ভাঙাতে?"

বললাম—"দেখুন, এটা নির্ভর করছে, গোড়ায় আপনার ভুল ভাঙবার ওপর, আর তার পর এ অক্ষম গ্রন্থকারের শক্তি-সামর্থ্যের ওপরেও অনেকখানিই। সত্যি কাহিনীটা যে কি, আর যে কি আপনি জানেন, সেটা এখনো কিন্তু স্পষ্ট করে আপনি আমায় জানাননি।"

আগন্তুকা বললেন—"তা ঠিক, কিন্তু আপনাকে বলতেই তো আমার আসা। আচ্ছা শুনুন তবে। সময় কম, বলতে হবে সংক্ষেপেই। তা হোক, সঙ্গতি ও সূত্র ঠিক থাকবে, বুঝতে কষ্ট হবে না।"

তার পর আগন্তুকা তাঁর গল্প সুরু করলেন, গল্প নয়, থুড়ি, ইতিহাস! শুনতে লাগলাম যথাসাধ্য মন লাগিয়েই আমিও—চোখ বুজে, হাত-পা গুটিয়ে, স্থির স্তব্ধ হয়ে। কিন্তু কতক্ষণ যে এ ভাবে ছিলাম আর কখন যে আগন্তুকা তাঁর কথা শেষ করেছিলেন, ঠিক বলতে পারব না। শেষের দিকে হঠাৎ এক সময় কেমন মনে হল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে। চোখ দু'টো বুজেই ছিল, মনে হল, কান দু'টোও যেন নন-কো-অপারেশন চালাচ্ছে। এক ফাঁকে কেমন মনে হল, আমি আর বসেও নেই, শুয়ে পড়েছি সটান। আর তার পরই ব্যস, সব নিরাকার—সব অন্ধকার!

সংজ্ঞা যখন ফিরে এল, চেয়ে দেখি কি না ভোর হয়ে গেছে, আলোয় আলোময় সব কিন্তু কোথায় সে আগন্তুকা? দেখি, মেয়ে এসে সামনে দাঁড়িয়ে তাড়া লাগিয়ে ডাকছে "বাবা, উঠো

ওঠো, চা হয়ে গেছে যে! আর এই নাও তোমার খবরের কাগজ—অকবার-আলা দিয়ে গেল।"

সকাল বেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় মাথাটা আবার বেশ শান্ত সবল হয়ে উঠেছে। ঘুম ভাঙ্গা অবধি ভাবছিলাম, বিগত রাতের অদ্ভুত দর্শনের কথাটা। হাত-মুখ ধুয়ে চা-পানান্তে বসে গেলাম আবার তারই তত্ত্ব নির্ণয়ে। ব্যাপারখানা কি? সেই শাহারজাদী? স্বর্গতা বিদেহী আত্মার মর্ত্তে অবতরণ? কে জানে—বলা যায় না তো। না স্বপ্ন? থাকগে সে-চিন্তা এখন থাক। তাঁর বলা কাহিনীটাই এখন আমার কাছে সব চেয়ে বেশী গুরুতর, দরকারী আর বিচার-বিবেচনার বিষয় হয়ে উঠেছে যে। মনটাকে বিশেষ করে টানছে। কি বললেন তিনি? নতুন কি পেলাম? নতুন কিছু পেলাম কি? আরব্যোপন্যাস লিখছি, তার একটা খসড়া আমার মাথায়ও আনাগোণা করছিল। দু'টোতে মিলিয়ে দেখলাম, কতখানি কোথায় তফাং। হাঁ, তফাং কিছুটা আছে বটে, কিন্তু মূলত সেটা পারস্যপতির অন্তর-রহস্যের একটা নিপুণ বিশ্লেষণ বই আর কিছু নয়, ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে তেমন কিছু নয়। যাক্, বাঁচা গেল! আশ্চর্য্য হয়ে আরো লক্ষ্য করলাম, তাঁর সে সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ফলে, আসল কাহিনীটা একবারে ডিগবাজি খায়নি, বরং এবার সত্যই নেমে এসেছে অনেকখানি সরল স্বাভাবিক স্তরে। বটেই তো! বেখাপ্পা অতিশয় উক্তি তাতে কিছু কিছু ছিল বই কি! কিন্তু যাক, এ লেখকের কথা আর নয়, শাহারজাদীর নিজের কথাগুলোই এবার আপনাদের সামনে ধরে দিয়ে বিদায় গ্রহণ করব; নিজের কানেই আপনারা শুনে নিন। হাঁ, তাই ভাল হবে।

শেষ আর একটি কথা।

আরব্যোপন্যাসের অপর কয়টি মামুলী গল্পও এর পর আপনারা পাবেন—যা নাকি এক কালে পারস্যপতি শেরইয়ারকে তিনি ভেট দিয়েছিলেন, আর যাতে তাঁর নিজের বিশেষ অনুরোধ-ইঙ্গিতগুলোকে আমিও যথাসাধ্য আকার দেবার চেষ্টা দেখেছি।

ব্যস্, এইবার আমার ছুটি।

শাহারজাদীর কথা

পারস্যদেশে আমার জন্ম, ছোট বোন দিনারজাদী, সংসারে একমাত্র বাবা ছাড়া আর আমাদের কেউ ছিল না। বাবা ছিলেন শাহান শা পারস্যপতির মহামান্য উজীর। তা' সুখেই ছিলাম।

বাবাজান তাঁর বুকভরা সমস্ত স্নেহ-মমতাই ঢেলে দিয়েছিলেন উজাড় করে তাঁর এ দু'টি মাতৃহারা সন্তানের ওপর। উজীরকন্যা, অভাব-অভিযোগ কাকে বলে জানতাম না। যা চাইতাম তাই পেতাম। বাছা বাছা মৌলবীরা ঘরে এসে নানা বিদ্যা শিক্ষা দিতেন, কাব্য, ইতিহাস, কোরাণের কথা, নৃত্য, গীত আরও কত কি! বাঁদীবান্দার অন্ত নেই। চার-পাঁচ মহল বাড়ী, চারদিক পাঁচিলে ঘেরা, তার ভিতর এদিক ওদিকে কত বাগ-বাগিচা, ফুলের কেয়ারী, চিড়িয়ার আস্তানা, তালাও।

বয়স হয়েছিল আমাদের দু'বোনেরই। আমার ষোল সতের, দিনারের বোধ হয়, চৌদ্দ পনেরো। রূপের খ্যাতি আর বিদ্যাবুদ্ধির খ্যাতি দু'টোই আমাদের ছিল। কত দিক থেকে কত জমকালো জমকাল সাদির প্রস্তাব আসত, কিন্তু বাবাজানের মন উঠত না। বলতেন এখনই হয়েছে কি,আগে আরো শিখুক পড়ুক, আচ্ছা, তারপর সে হবে। কিন্তু আসল কথাটি কি, জানেন? আমাদের ছেড়ে একদিনও তিনি থাকতে পারতেন না। সাদি হয়ে চলে যাব আমরা, তারপর তাঁর কি হবে? কা'কে নিয়ে দিন কাটাবেন তিনি? বুকটা তাঁর একবারেই ফাঁকা, শুকনো কাঠ হয়ে যাবে যে!

অবশ্যি, সব সময়েই তিনি যে আমাদের কাছে নিয়ে ঘরে বসে থাকতে পারতেন, তা পারতেন না। পারস্যসম্রাটের প্রধান উজীর! সোজা কথা কি? কত কাজ তাঁর! আজানের ডাক পড়তেই সেই সাত সকালে উঠে নমাজ পড়ে ছুটতে হত তাঁকে রাজবাড়ীতে, আর ফিরে যে কখন আসতেন, তার ঠিক-ঠিকানা ছিল না। তবে রাতটা কাটত ভাল, খুব আনন্দে আর সমারোহেই। রাজবাড়ী থেকে তাঞ্জাম বোঝাই করে কত-কি তিনি আমাদের জন্যে নিয়ে আসতেন। ধুম পড়ে যেত গান-বাজনার, খানাপিনার, বান্দাবাঁদীদের ছুটাছুটির। রাজবাড়ীর কত কি গল্প তিনি আমাদের শোনাতেন।

দিনের বেলাগুলো আমাদেরও কাটত মন্দ নয়। বাবাজান রাজবাড়ী চলে যেতেন, আর আমাদেরও নানা কাজে লেগে যেতে হত। সময়গুলো বেশ হৈ-রৈ-তেই কেটে যেত।

সকালে বিছানা ছেড়ে উঠে, খোদার নাম নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম দু'বোনে ফুলবাগানে। ফুল কুড়িয়ে মায়ের কবর সাজাতাম, পাখীগুলোকে ডেকে নিয়ে তাদের গায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিতাম; খেলাতাম, ময়ূর, খরগোস আর হরিণগুলোকে নাচিয়ে, তাড়া করে খাবার লোভ দেখিয়ে। তার পর ঘরে ফিরে এসে বসতাম পড়া করতে, বুড়ো বুড়ো মৌলবী সাহেবদের কাছে।

কিন্তু সব চেয়ে আনন্দের সময় ছিল আমাদের দুপুর বেলাটা। সেটা ছিল আমাদের আরাম করে খাটপালঙ্কে শুয়ে কেচ্ছা শোনবার সময়। বাবাজানেরই ব্যবস্থায় এক পাল বুড়োবুড়ি তখন এখানে এসে জুটত। আর কেচ্ছা শোনাত আমাদের দেশ-বিদেশের। কত সুন্দর সুন্দর, অদ্ভুত রকমের সব গল্প। কত রাজরাজড়া, দৈত্য-দানা, মায়াবী-মায়াবিনী আর রঙ্গ-চাতুরীর কাহিনী। শুনলে মন উদাস হয়ে যায়, ভুলে যেতে হয় ঘর-সংসার, খানাপিনা সব। ভাবতাম, একদিন আমিও হব এই রকমেরই একজন গল্পের কথিকা, আর তা হয়েছিলামও, কিন্তু সে-কথা পরে।

বিকেলে আসতেন তাসপাশার সঙ্গী-সাথীরা, আর কখনো কখনো বা গানের ওস্তাদ। সুতরাং এ সময়টাও আমাদের ফাঁকা যেত না, কাটত ভালই। তাই বলছিলাম, ছিলাম আমরা সুখেই।

কিন্তু সুখেই থাকি, আর যে ভাবেই থাকি, মানুষের জীবন কখনো একটানা এক ভাবে যায় না। তাই, খোদার-মরজিতে একদিন যখন একটা ঝড় উঠল, তাতে সবই উল্টে পাল্টে গেল।

সেদিন সকাল বেলাটায় হাসিঠাট্টায় মেতেছিলাম, এক পাল টিয়া পাখী নিয়ে দিনারজাদী হঠাৎ কোথা হতে ছুটে এসে বললে—"শুনছ বহিন, আমাদের বাদশা যে ক্ষেপে গেছে!"

বললাম—"কেন রে, কি হয়েছে তাঁর?"

হাসতে হাসতে হালকা ভাবেই কথাটা বললাম তখন; কে জানে অত-শত!

দিনার একটু তাচ্ছীল্যের ভাবেই ঠোঁট উল্টে বললে—"কে জানে দিদি, শুনছি নাকি রোজ তিনি একটি করে বেগম সাদি করছেন,

আর পরদিন রাত পোহাতেই দিচ্ছেন তাঁর মুণ্ডটি উড়িয়ে। আবার সন্ধ্যেবেলায় নতুন বেগম আসছেন। এই সব নাকি হচ্ছে।"

বললাম—"তোর মুণ্ডু হচ্ছে! কে তোকে ঐ সব আজগুবি খবরটা দিলে শুনি?" তারপর হাতের ডানায় বসা পাখীটার দিকে চেয়ে বললাম,—"হাঁ রে কাকাতুয়া, তুই কি বলিস বল ত,"—আর একথায় পাখীটা চিঁ-চিঁ করে চেঁচিয়ে উঠতে বললাম,—"শুনলি? কাকাতুয়াও বলছে—ছি-ছি-ছি! ও মিথ্যে, সত্যি নয়।"

কিন্তু সেদিন রাত্তির বেলায় টের পেলাম, খবরটা যত অসম্ভব আর যত আজগুবিই হোক, মিথ্যে নয়; একেবারে সত্য কিছুটা আছে, দিনার মিছে শোনে নি।

জিজ্ঞেস করতে বাবাজান একটু যেন চমকে উঠে বললেন—"কে তোদের এ খবরটা দিলে রে শুনি? তা যেই দিক, কাজটা কিন্তু ভাল করেনি। খবরটা আমি চেপে রাখতেই চাইছিলুম। কার কি লাভ ওতে? দেশময় একটা অযথা অশান্তি আর আতঙ্ক সৃষ্টি করা বই ত নয়। কিন্তু বাদশার মরজি!—আশ্চর্য্য! তিনি কিন্তু তাই চান।"

—"কি চান? দেশজোড়া অশান্তি আর আতঙ্ক?"

—"তাই ত দেখছি। কি বলব?—রাজা-রাজড়ার খেয়াল, তার ওপর কথা বলবে কে? আর তাছাড়া আমার ওপরেও হুকুমজারি করা হয়েছে কি জানিস? তাঁর ভেতরের আসল কথাগুলো কেউ না টের পায়।

হাঁ, সে কথাগুলো শুধু আমিই জানলুম, আর তিনিই জানেন, আর কেউ জানবে না, জানতে পারবে না। আর কথাগুলো দেশের লোকের কাছে যাতে গোপন থাকে, তা-ও করতে হবে আমাকে।"

—"ভিতরের আসল কথা! সে আবার কি বাবাজান?"

—"আরে, আছে রে আছে। কিন্তু ওখানেই যে মুস্কিল! বাদশা-উজীরের গোপন কথা, বাইরে জানাতে আছে কি? তা'হলে বাদশাইটাই যে ভেঙে তলিয়ে যাবে।"

তার পর গম্ভীর মুখে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বাবাজান আবার বললেন,—"তা তো বুঝলুম, কিন্তু চালটা তাঁর ঠিক হচ্ছে না তো? একটা মস্ত বিপদ নিজেই আজ তিনি টেনে আনছেন নিজের ওপর—নিজের একটা বিদখুটে খেয়াল মেটাতে গিয়ে। ফলটা দাঁড়াচ্ছে উল্টো। যাকৃগে, খোদার মরজি! আমি আর কি করব।"

হেঁয়ালির মত সব কথা! কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। বললাম—"একটু বুঝিয়েই বল না বাবাজান! কিছুই বুঝতে পারছি না যে। আচ্ছা, যতটুকু বলা চলে তোমার দায়িত্ব বজায় রেখে, আর বাদশার কাছেও তোমার ইমান না খুঁইয়ে, তাই বল।"

মেয়ের কথা বাবাজান একবারে ঠেলতে পারেন না। চুপ করে কি একটু ভেবে নিয়ে আবার বললেন—"আচ্ছা শোন, তবে বলছি। কিন্তু খপরদার বেটি কথাগুলো কর্ণান্তর করিসনে যেন—বিপদ বেড়ে যাবে। হয়েছে কি জানিস?—যা শুনছিস একেবারে মিথ্যে নয়। রাজপুরীতে ক'দিন হতে এমনি ধারা একটা কাণ্ড চলছে বটে। কে একটা বেগমকে নিয়ে যত ফ্যাসাদ, কি একটা বিশ্রী অপরাধ সে করে ফেলেছে, আর তাইতেই তাঁর গোসা এসে গেছে তামাম স্ত্রীজাতটার ওপর। বলছেন—ও জাতটা যেমনি অপদার্থ, তেমনি নিমকহারাম আর বেইমানও বটে। ওরা শয়তান! আবার ওদের ভেতর এই বেগমগুলোই হচ্ছে সবচেয়ে ভয়ানক। খাওয়া-পরার ভাবনা নেই, আরাম ক'রে শুধু খায়-দায়, ফুর্ত্তি করে—আর বসে বসে এই কত কি ষড়যন্ত্রের জাল বোনে। তিনি ওদের ডানা কেটে দেবেন। রাজপ্রাসাদে এসে জাঁকিয়ে বসে দিনের পর দিন অমনি ধারা তারা বেগমগিরি ফলাবেন—কিসের তাদের সে-অধিকার?—কোন্ গুণে?—কোন দাবিতে? না, আর তিনি তা বরদাস্ত করবেন না, এখন থেকে ওদের আয়ু ঐ এক রাত্তির! ব্যস্।"

চমকে গেলাম। বললাম—"কাদের আয়ু এক রাত্তির বাবাজান! মানুষগুলোর, না ওদের ওই বেগমগিরি?"

বাবাজান বললেন,—"ওইখানেই তো যত ফ্যাসাদ রে। ও কথাটা, না বাদশা খোলসা করে বলছেন, না দেশের লোক ভেবে ভেবে ঠাওরে নিতে পাচ্ছে। এতে যদি দেশময় একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, আশ্চর্য্য কি তাতে? আর তার দায়িত্বটাই বা কার বল ত? বরং আশ্চর্য্য হতে হয় এই ভেবে যে, এ হেন সুস্পষ্ট একটা কথাও আজ কি না আমাদের বাদশার নজর এড়িয়ে গেল! ভেবে দেখছেন না, কোথায় এর শেষ; এক রাত্তিরের বেগম হবার সাধ ক'জনার হবে? কোথা হতে আসবে নিত্য তাঁর এই সব নতুন বেগম?"

অবাক হয়ে কথাগুলো শুনছিলাম, আর কত কি মনে মনে ভাবছিলামও। অবাক হবার কথাই বটে। আমাদের বাদশাটি ছিলেন দেশের একটা মস্ত বড় গৌরব; মুখে মুখে ছিল তাঁর সুখ্যাতি। লোকে বলাবলি করত, বড় হয়েও যাঁরা ছোটকে তুচ্ছ করেন না, রাজা হয়ে প্রজার জন্য রাত-দিন ভাবেন, তিনি ছিলেন সে-দরেরই একটি সেরা মানুষ। এমন মানুষ কি করে এমন হল? একটা অল্পবুদ্ধি নারীর অপরাধে—হোক না সে যত বড়ই—আজ তিনি গোটা নারী জাতিটার ওপরেই খড়গহস্ত হয়ে উঠেছেন!

আর জানেন, সেদিনেও পারস্য দেশটা ছিল মহান এক অতি প্রাচীন সুসভ্য দেশ, আপনাদের এ ভারতবর্ষটির মতোই। পারস্য-সম্রাটের প্রতাপে এক কালে সারা দুনিয়া টলমল করে উঠেছিল, তখনো আপনাদের বুদ্ধদেব জন্মাননি। যাক্, সে-কথা আজ বলছি না। সে বিরাট সাম্রাজ্য প্রথম ধ্বংস হয়ে যায় গ্রীকদের হাতে; তারপর কয়েক শতাব্দী বাদে আরবদের আগমন। আরবেরা আসেন ইসলাম ধর্ম্মের জয়পতাকা উড়িয়ে। তাদের বশ্যতা আমাদের মেনে নিতে হয়েছিল—ধর্ম্মের ডাকে, ইসলামের সর্ব্বময় কাণ্ডারী খলিফাদের শক্তি আর মর্য্যাদা বাড়াতে। কিন্তু সেদিনও গেছে। যে-সময়ের কথা এখন বলছি, তখন আবার স্বাধীন হয়ে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছি আমরা। আমাদের হারানো স্বাধীনতা আবার আমরা ফিরে পেয়েছি। নতুন করে আবার একটা পারস্য-সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছে। খলিফারা তখনো আছেন, কিন্তু তাঁদের সেদিন আর নেই। সে কেমন জানেন? বুড়ো বাপকে বেদখল দিয়ে 'অনেক সময় যেমন ছেলেরা তাঁর সম্পত্তি কেড়ে নেয়, ভাগ করে নিয়ে নিজেরাই এক এক ভাগের মালিক হয়ে বসে; আশে-পাশের দেশগুলোর অবস্থাও তখন অনেকটা তাই। এই আপনারা আজ-কাল যাকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ "বলেন না? কতকটা যেন সেই গোছের। কিন্তু ওদের ভিতর কি শক্তিতে, কি সভ্যতায়, কি এলাকার বিস্তারে পারস্যই হয়ে উঠেছিল তখন সর্ব্বপ্রধান। সকলকেই তাকে হিসেব করে চলতে হত, মান্য করতে হত, তোষামোদ করতে হত, এমন কি, স্বয়ং খলিফাকেও। ইরাণ'

খোরাসান, তুখার, গজনী, বোখারা, সমরখন্দ সব তখন পায়ের পদানত। যাক্, যে-কথা বলছিলাম সেদিনে যাঁদের বুদ্ধিতে বিবেচনায়, বীরপণায় আর কৌশলে এটা সম্ভব হয়েছিল, আমাদের এ বাদশাটিও যে ছিলেন তাঁদেরই এক জন! এমন বিচক্ষণ সুচতুর মানুষটির আজ এ কি দুর্ব্বুদ্ধি, এ কি অধোগতি!

হাঁ, এ তাঁর দুর্ব্বুদ্ধি বই কি? ভাল-মন্দ মিশিয়েই মানুষ, আর নারী-পুরুষ এ দু'টিই খোদার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। পুরুষকে যেমন তিনি ক'টা বিশেষ শক্তি আর গুণ দিয়েছেন, নারীকেও কি তা দেননি? পারে পুরুষ মা হতে? একা সৃষ্টি রক্ষা করতে? ফলে-ফুলে বিচিত্র মধুর করে জীবনটাকে তার গড়ে তুলতে? নারী না থাকলে দুনিয়াটাই এত দিনে রসাতলে যেত যে! আশ্চর্য্য! মনে পড়ছে নাকি তাঁর—তাঁর মাকে। ভাবছেন না একবারটি আপন ভাবী বংশধরের কথা? নারী অপদার্থ! কিন্তু আজও যে তাকে তাঁর চাই রংমহল সাজাতে, সেবা-পরিচর্য্যার তাগিদে, নিজকে সুস্থ-সবল-তাজা রাখবার দায়ে। এ দুর্ব্বুদ্ধি তাঁর কোথা থেকে এল?

ভাবছিলাম এ সবই এক মনে। আর থেকে থেকে মনের ভিতরটায় কোথায় যেন কেমন একটা বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠছিল। কিন্তু এমন সময় শুনতে পেলাম, পাশ থেকে দিনার বলে উঠেছে—"বাদশাটা তো আচ্ছা বদমাস!"

বুঝলাম, বিদ্রোহের ঢেউটা তার গায়েও এসে লেগেছে, কিন্তু কথাটা প্রাণে বাজল। বললাম—"ছিঃ বহিন, বাদশাকে অমন করে বলতে নেই। তিনি ছোট হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে কি আমরাও তাই হব?"

দেখলাম, শুনে পিতাজী খুসী হলেন। বললেন—"তোফা, তোফা! সাচ্।"

জবাবে বললাম—"হাঁ, বাবাজান, তা আমরা হব না। কিন্তু বাবাজান, গোসা একটু এসে যায় বই কি, আমরাও যে নারী। নারী কি সত্যই আজ এত অসহায়, এত অপদার্থ? আততায়ীর আক্রমণে আত্মরক্ষার কোন উপায়, কোন অস্ত্রই তার নেই?"

মনে আছে, এ কথার জবাব পিতাজী দিতে পারেননি, শুধু একটু দুঃখের হাসি হেসেছিলেন, আর সেদিনে আমিই তাঁকে বুক ফুলিয়ে বলেছিলাম—"তুমি জানো না, আর আমিও আজ জানিনে। কিন্তু জানতে হবে আমাকে, ভাববো।"

এ কথায়ও পিতাজী নিরুত্তরই ছিলেন, শুধু একটু হেসেছিলেন, কিন্তু মনে হয়েছিল, সে-হাসিটা দুঃখের হাসি নয়, অবিশ্বাসের! বলেছিলেন—"হাঁ রে, তুই?" আর জবাবে আমি আবার বলেছিলাম—"কেন বাবাজান? আশ্চর্য্য হচ্ছ যে? আমি যে তোমারই মেয়ে, আর নারীও"। আর তারও জবাবে পিতাজী আবার বলে উঠেছিলেন—"সাবাস! সাবাস! তোফা"! কিন্তু তখনো ফুটে বেরুচ্ছিল তাঁর মুখে সেই অবিশ্বাসের হাসিটুকু। যাক্, এ-হাসিটা একদিন কিন্তু তাঁকে গুটাতে হয়েছিল। হাঁ, সে কথাটাই এবার বলছি। কথাটা আমার আজও বেশ মনে আছে।

সারা দিনের পর পিতাজী সেদিন বেশ একটু দেরি করেই ঘরে ফিরেছেন। দেখলাম, মুখ-চোখ তাঁর শুকনো। চেহারাটা কেমন মজা-মজা। খেতে বসেছেন, ভাল করে খেতে পারছেন না যেন। কথাবার্ত্তা কইছেন না তেমন মন লাগিয়ে কারু সঙ্গে। ভাবছিলাম, হল কি? আজ হয়ত বিশ্রামের ফাঁকটুকুও পাননি! কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত পিতাজী নিজেই সেটা ব্যক্ত করলেন। শুনে সবাই চমকে উঠলাম।

পিতাজী বললেন—"আজ একটা মস্ত বিভ্রাট হয়ে গেছে, যা ভয় করছিলাম—তাই। আজ নতুন বেগম খুঁজে পাওয়া যায়নি। কোটাল সায়েবের কাজ গেছে। তিনি আজ জানিয়েছেন—বেগম আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। শুনে বাদশা রেগেমেগে কাঁই! বললেন—"অপদার্থ—না-লায়েক! যাও, আজ থেকে তুমি অবসর। এ দরবারে আর তোমার ঠাঁই নেই"। আর আমাকে বললেন, "উজীর, আজই তুমি একজন ভাল কোটাল বহাল কর। বাদশার বেগম জুটছে না—সে কি কথা!"

খবরটার অপেক্ষা করেই ছিলাম। জানতাম, এ-দিন একদিন আসবেই। আর অনেকখানি তৈরী হয়েও ছিলাম তার জন্যে। কিন্তু ধাক্কাটা আকস্মিক। বললাম—"তারপর?"

পিতাজী বললেন—"তারপর আর কি রে বেটি, এবার আমার পালা। কোটাল সায়েব গেছেন, না বেঁচেছেন, এবার আমি কি করি বল তো? শেষ পর্য্যন্ত বোঝাটা যে চাপিয়ে গেলেন এ গরীবের ঘাড়ে। এ বোঝা কার ঘাড়ে আমি ফেলব—সে লোক কই?"

বললাম—"কেন বাবাজান"?

পিতাজী একটু বিরক্তি দেখিয়ে বললেন—"বোকা মেয়ে! বুঝিয়ে বলতে হবে তা-ও?"

বললাম—"ওঃ, বুঝেছি, নতুন কোটাল সায়েব খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু ভাবছি আমি, তাই বা কেন?"

এ কথায় পিতাজী একটু উষ্মা দেখিয়েই বললেন—"তুই কি বলতে চাস শুনি? কাজটা সহজ, না? কোটাল সায়েবের সেদিন আর নেই। তাঁর কাজ আজ আর শুধু লোকলস্কর নিয়ে শহরবাসীর ওপর খবরদারী করা নয় তো। বেগম জোগাতে হবে নিত্য নতুন রংমহলের জন্যে, তা তুমি যেমন করে পার। কিন্তু কই বেগম? আর যা-তা কা'কেও একটা ধরে আনলেও তো চলবে না। বাদশার বেগম! রূপে হবে সে ডানাকাটা পরী, আর সাহসে বেপরোয়া!"

বুঝে-শুনেও একটু ন্যাকা সেজেই বললাম—"এমন মেয়ে এ-রাজ্যে আর নেই?"

জবাবটা প্রত্যাশা মতই পাওয়া গেল।

পিতাজী বেশ একটু গরম হয়ে উঠেই বলতে লাগলেন—"আরে বেটি, এদেশটা তো আর বসোরার গোলাপবাগ নয়, আর এখানকার মেয়েগুলোও এক একটি ফুল নয় যে, নিত্য ফুটবে আর সাজি হাতে বাগানটা একবার ঘুরে এলেই হল সাজি ভরতি! জানিস, এরাজ্যের বাগবাগিচা সব আজ পর্য্যন্ত উজাড়!"

বললাম "কিন্তু বাবাজান!"

কিন্তু বলতে গিয়েও থেমে গেলাম। জীবনের একটা সন্ধিক্ষণে এসে পৌছেছি, কথাটা মুখে আটকে যাচ্ছে। কিন্তু পিতাজী তাড়া দিয়ে বললেন, "বল না রে, কি বলবি," তাই, আর বলতেই হবে তা জানতাম, আর তার জন্যে প্রস্তুত হয়েও ছিলাম সে জন্যেও বটে, অগত্যা বললাম, "কিন্তু তোমার নিজের বাগানের ফুলটি আজো কিন্তু তোলা হয়নি বাবাজান, সে খেয়াল রাখো?"

পিতাজী চমকে উঠলেন—উঠবারই কথা। চেয়ে রইলেন ফ্যাল-ফ্যাল করে এক মুহূর্ত্ত আমার মুখের দিকে। আর তার পর আর্ত্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন "ও কি কথা রে বেটি?"

এর জন্যেও প্রস্তুত হয়ে ছিলাম। তাই, বিনা আড়ম্বরে আর সহজ সুস্থভাবে অনেকখানি দৃঢ়তার সহিতই বললাম—"কিছু অন্যায় আর আশ্চর্য্য কথা বলিনি বাবাজান! বুঝতে পারছ না কি, কোথায় এসে আজ আমরা ঠেকেছি। কোটাল সায়েব গেলেন, তুমিও 'যাব-যাব' করছ, তার পর? কোথায় ভেসে যাব আমরা? কি আশ্রয় করে কোথায় ঝেড়ে ফেলে দেবে, তোমার ঘাড়ের এ দু' দুটো মেয়ের বোঝা? চিরকাল পরম আদর-যত্ন দিয়ে পোষেছ, কি করে প্রাণ ধরে দেখবে এ দুর্গতি এ দুর্দ্দশা তাদের? তার চেয়ে এই যে ভাল। হাঁ, আমি ভেবে দেখেছি বাবাজান, এই ভাল। হয়ত আর তোমাকে দেখব না, আর তুমিও হয়ত আর আমাদের দেখবে না, কিন্তু এ কিছু নতুন কথা নয়। মেয়ে হয়ে জন্মেছি, এ ছাড়াছাড়ি গাঁটে বেঁধেই এসেছি। সাদি হয়ে পরের ঘরে যাব, চিরকাল আর কিছু তোমার কাছে থাকব না—থাকা চলবে না, লোকসানটা কই?"

পিতাজী ঘাড় নিচু করে কথাগুলো শুনছেন। জবাব দিলেন না। আবার আমি বলে চললাম—"হাঁ, এবার আমি যাব। অদৃষ্টে কি আছে বলতে পারিনে, বাদশার সঙ্গে একবার মুখোমুখি হয়, তাঁর সঙ্গে কিছু বোঝাপড়া করি—এটা আমারো মনের একটা মস্ত বড় কামনা। তারপর খোদার মরজি, কে তাঁকে রোকবে? কিন্তু তাঁর দোয়ায় কি না হয়—কি না হতে পারে? একদিন তাঁকেই আমি ডেকেছি যে। আর নিজেও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হয়েই নিয়েছি। বেঁচে থাকি, সবই বজায় রইল, বাড়ার ভাগ বাদশাকে তুমিও পেলে আপনার জন বলে। আর মরে যাই তো তাতেই বা কিসের দুঃখ? সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও তলিয়ে যেতে হবে যে জানে। খোদা না-করুন, তাই যদি হয়, যদি সে-দুর্দ্দিনই আসে, তোমার বোঝা হালকা হল। তুমি হালকা হলে আর আমিও মরে হালকাই হলাম। আমাকেও রাত-দিন তোমার কথা ভেবে ভেবে চোখের জল ফেলতে হবে না, আর আমাদের জন্য মিছে চিন্তা করে তোমার নিজের দুঃখের বোঝাটাকে আরো বেশী ভারি করে তুলতে হবে না। বল না বাবাজান, এ আমি সত্যি বলছি, কি মিথ্যে বলছি?"

পিতাজী তবু নিরুত্তর! কিন্তু এর পরই একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড হল। আরো কিছু হয়ত বলতে যাচ্ছিলাম আমি, কিন্তু এমন সময়েই পিতাজী হঠাৎ তড়াক করে আসন ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন—"না, আর নয়, চুপ কর বেটি, বড্ড ঘুম পাচ্ছে আমার, শুতে যাবো এখন, আচ্ছা চললাম। কাল আবার কথা হবে।" আর তারপরই দেখলাম, সত্যি-সত্যিই তিনি চলে গেছেন, আর শয়নঘরে ঢুকে দোরটা বন্ধ করে দিয়েছেন ভিতর দিক হতে নিজ হাতেই। আর আরো একটা বস্তু দেখেছিলাম, সেদিন, যা কেউ আমরা আর কখনো দেখিনি—তাঁর চোখের জল!—ঝরে-পড়া শেফালি ফুলের ওপর সকালের শিশিরপাতের মতো।

কিন্তু পরদিন ঘুম থেকে উঠতেই পিতাজী আবার যা করলেন, আমাদের সকল কল্পনার অতীত। কে এমন ভেবেছিল! ছুটে এসে আমাদের দু'টিকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলেন—"ব্যস! মামলা মিটে গেল। আরজি তোদের মঞ্জুর।" তারপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন—"বেগম হবার সাধ হয়েছে বেটি?—বেশ! তাই যা। আর একা তুই কেন? দিনারও যাবে, সঙ্গে দিব তাকেও তোর আমি। ওকেই বা কোথায় ফেলব এর পর? হাঁ, দিনারও যাবে। বেগমের খাস বাঁদী থাকে তো, তাই হয়েই ও যাবে।" তারপর দিনারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন—"কি বলিস রে তুই বেটি?"

দিনারও কম আশ্চর্য্য আর হতবুদ্ধি হয়নি। নীরব হয়ে আছি দু'জনাই। পিতাজী আবার বলে চললেন—"হাঁ, আমিও ভেবে দেখেছি, ভুল আমারই, তোরাই ঠিক। যাবি না তো কি? রাজ্যি-শুদ্ধ লোক মেয়েহারা হয়ে বুক চাপড়ে মরছে আজ, আর দেশটার উজীর, আমিই কি না পিছু হটে থাকব, নিশ্চিন্ত ঘর-সংসার করব তোদের দু'টিকে নিয়ে? খোদার কাছে জবাব দেব কি? না, তা হয় না রে বেটি! বুক বেঁধেছি আমি। খোদার দান আমি খোদাকেই আবার ফিরিয়ে সঁপে দিয়ে দায় খালাস হব। আজ হতে আমি ফকির—সত্যিকার ফকির। বাদশা আমার উজীরী কেড়ে নেবেন কি?—নিজেই যে আজ আমি ইস্তাফার আরজি হাতে তাঁর ঠেঁই—হাঁ, আরজি। যাক্, তোরা তৈরী হয়ে সেজে-গুজে নে। আরে! ফ্যাল্-ফ্যাল্ করে তাকিয়ে তাকিয়ে অত দেখছিস কি, বল দিকিনি? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?"

অবাক কাণ্ড! কিন্তু পিতাজী আমার ভাবটা ঠিক আঁচ করে নিতে পারেননি। হকচকিয়ে গিয়েছিলাম সত্যই, কিন্তু তাঁকে বিশ্বাস না করবারও কারণ ছিল না। গত্যন্তর ছিল না যে। বললাম—"না বাবাজান, অবিশ্বাস তোমায় করছিনে। কিন্তু ভাবছিলাম আমি—এ হল কি! খোদার একি মরজি! তুমি শুধু আমাদের পিতা নও তো, একসঙ্গে পিতামাতা গুরু-বন্ধু সব। জন্মে অবধি তোমায় আশ্রয় করেই এত বড়টি হয়েছি। সেই আমাদের এত দিনের এত বড় আশ্রয়টি আজ এক ফুৎকারে উবে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে—এ কি নসীবের খেলা? মনের এ দুঃখ খুলে জানাবার মত ভাষাও যে আমার নেই। যাক, খোদা যা করেন তা যে আমাদের ভালর জন্মেই, এ বিশ্বাস আমার আছে, আর এ সত্যি কথাটা তুমিও যেন আজ ভুলে যেয়ো না। বাবাজান! আজ আমিও তাঁর ওপরেই সব সঁপে দিয়ে চললাম। রাতের পর দিনের আলো আসে, আমাদের এ ত্যাগও একবারে অমনি যাবে না বাবাজান! দোয়া তাঁর হবেই।"

পিতাজী যে কি করে রাতারাতি অতখানি উদার হয়ে উঠে-ছিলেন, তখন তা বুঝতে না পারলেও পরে কিন্তু পেরেছিলাম। পরে একদিন বুঝেছিলাম—তার এ অবাক করা উদারতার পেছনে আর যাই থাক, সন্তান-বাৎসল্যের অভাব এক বিন্দু ছিল না। হয়ত সেদিনে তাঁকে একটু ভুলই বুঝেছিলাম, আর তাই অযথা একটু নিষ্ফল অভিমানের বেদনাবোধও হয়েছিল। কিন্তু তখন কে জানত এত কথা? আচ্ছা, পরের কথা পরে। তারপর শুনুন।

সন্ধ্যা উৎরে গেছে। বাদশার প্রাসাদে মহলের পর মহলগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে আলোর পর আলোর রোসনাই। ঘরে, অলিন্দে, পথে, ঘাটে, বাগানে—সুবেশা সুন্দরী বাঁদীর মেলা। চারদিক সুগন্ধে ভরপুর। দ্বারে দ্বারে সতর্ক খোজাপ্রহরী-শান্ত্রী।

বাঁদীরা সমাদর করে আমাদের পথ দেখিয়ে গোসলখানায় নিয়ে গেল। সুগন্ধি তেল মাখিয়ে, সুগন্ধি জলে স্নান করিয়ে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিলে। আর তারপর নিয়ে চলল হুজুর-দরবারে।

[ক্রমশঃ।

চারজন

ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

(বিশ্ববিদ্যালয় মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ও
খ্যাতনামা বিজ্ঞানী)

ব্যক্তিত্বের যে পরিচয়ে সাধারণ মানুষ ভক্তি করত অতীত ভারতের সত্যদ্রষ্টা গুরুকুলকে, আজকের দিনে সে পরিচিতির অভাব প্রতি পদেই পরিলক্ষিত হয়। জীবনের পরিচয়ে মানুষ স্বভাবতঃই সম্মান ক'রে চলে বিদ্বান ও বিত্তবানকে। কিন্তু বিদ্যা যেখানে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত, বিত্ত যেখানে বিত্তার পরিস্ফুচক, সেই পরিস্থিতিতে ব্যক্তিকে কল্পনা করা আজকের দিনে অন্ততঃ অবাস্তব বলে মনে হয়। তবুও, এখনও এই বাংলা দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-গুলির মধ্যে এমন কয়েক জন শিক্ষক আছেন, যাঁদের সংস্পর্শে এসে মনে হয় সত্যিকারের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন গুরুকুলের অভাব থাকলেও, শেষ হ'য়ে যায়নি।

আমাদের দেশে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন দিনই প্রতিভার অভাব হয়নি—একের পর এক এসে বাংলার ভাণ্ডার ভরে দিয়ে গেছেন নতুন নতুন সম্ভারে। কিন্তু যে পরিমাণে মানুষ বুঝেছে তত্ত্ব ও তথ্যকে, সেই পরিমাণে সে বোঝেনি অপর মানুষকে। আজ বাংলা দেশ যতটুকু দায়িত্ব তুলে দিয়েছে মানুষকে বুঝবার আশায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মাধ্যমে মনস্তত্ত্ব বিভাগের হাতে, তারই প্রধান অধ্যাপক ডাঃ সুহৃৎচন্দ্র মিত্রের শান্ত, সমাহিত অথচ বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার না দেখলে বোঝা যাবে না, কত বড় দায়িত্বভার আজ তাঁর কাঁধে অথচ কর্মক্ষেত্রের বৃহত্তর পরিধিতে কত অসহায় তিনি! মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার কত সূক্ষ্মবোধ আজ তাঁর জানা, প্রতি কার্য্যকারণের কত বিচিত্র রূপ আজ তাঁর চোখের সম্মুখে প্রতিফলিত হ'চ্ছে, মানুষের কত পরিচয়ে তিনি পরিচিত, অথচ আজকের বাংলার কর্মপরিচিতিতে তিনি কত সীমাবদ্ধ! তিনি শিক্ষক, তিনি দ্রষ্টা; তিনি স্রষ্টাও বটেন কিন্তু সেই সৃষ্টির মাঝে কোন বিচিত্রতা নেই—তিনি তৈরী করছেন 'শিশু' মনস্তাত্ত্বিক, যাঁরা দায়িত্ব নিচ্ছেন সারা ভারতব্যাপী মানুষের প্রাতিস্বিকতাকে জানবার, বুঝবার এবং পরিচালিত করবার। এই কাজে আড়ম্বরের স্থান নেই, তাই তিনি সাধারণ্যে অজানিত। ভারতের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিংবা অন্য কোন সংস্থায় এমন কোন মনস্তাত্ত্বিক নেই যিনি ডাঃ মিত্রের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত নন। যখনই কোন সমস্যা দেখা দেয় তখনই তাঁর আহ্বান আসে সমাধানের জন্য।

১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয় হুগলীর বিখ্যাত মিত্র-পরিবারে। পিতার ও অগ্রজের কর্ম্মোপলক্ষে তাঁরা কলকাতাতেই বসবাস করতেন এবং এখান থেকেই তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ হয়। ছেলেবেলা থেকেই তিনি অত্যন্ত রুগ্ন ছিলেন এবং প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার সময় সম্পূর্ণ অন্ধ হ'য়ে যান। এই দুর্বিষহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে তিনি সঙ্গীতচর্চ্চা আরম্ভ করেন এবং অল্পদিনে যথেষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। প্রায় দু'বছর বাদে বহুচেষ্টার পর তিনি আবার তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান এবং প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। তার পর তিনি ভর্ত্তি হন স্কটিশচার্চ্চ কলেজে এবং যথাসময়ে আই, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে দর্শনে অনার্স নিয়ে এই কলেজ থেকেই পরীক্ষা দেন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে উত্তীর্ণ হন। এই পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় বিষয় হিসাবে অঙ্কতে শতকরা এক শত নম্বর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড সৃষ্টি করেন। দর্শন পড়ার সময়েই তিনি ব্যবহারিক মনস্তত্ত্বের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রতিষ্ঠিত মনস্তত্ত্ব বিভাগে ভর্ত্তি হন। ১৯১৯ সালে এম, এ পরীক্ষায় তিনি প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হ'য়ে উত্তীর্ণ হন।

মনে হয় ডাঃ মিত্রের জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় দিনগুলি ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছটি বছর। বাংলাদেশের কেন, সারা ভারতের বহু কীর্ত্তিমান পুরুষের কিশোর-যুব সান্নিধ্যের যে পরিচয়ে ১৯১৩—১৯ সাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে ছাপ রেখে গেছে তাদের বহু স্ফুলিঙ্গের সঙ্গে ব্যক্তিগত ভাবে পরিচিত ছিলেন তিনি। স্কটিশচার্চ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আলোচনায় তিনি উপস্থিত থাকতেন নিয়মিত ভাবে। এই সব আলোচনায় তাঁর অন্তর্মুখিতা তাঁকে কোন দিনই বক্তা বলে স্বীকৃতি দেয় নি কিন্তু তাঁর ধীর স্থির ব্যক্তিত্ব, যুক্তির তীক্ষ্ণতা এবং প্রকাশভঙ্গীর সরলতা অধ্যাপক এবং বন্ধুমহলে তাঁকে যথেষ্ট পরিচিত করেছিল। বন্ধুরা তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'এ্যাডিসান'। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্কটিশচার্চ কলেজের সেরা ছাত্রকে প্রতিবছর একটি করে বিশেষ সম্মান-সূচক পদক (হকিন্স গোল্ড মেডেল) উপহার দেওয়া হয়; ডাঃ মিত্র ছাত্রজীবনে এই সম্মানের অধিকারী হ'য়েছিলেন।


সুহৃৎচন্দ্র মিত্র

বিদ্যায় ও ব্যক্তিত্বে উজ্জ্বল পরিপূর্ণতার মধ্যেও তাঁকে অর্থজীবনের সূচনা করতে হ'য়েছিল সরকারী দপ্তরখানায় এক সামান্য বেতনের চাকুরী নিয়ে, দিল্লীতে। কিন্তু তাঁকে সেখানে বেশী দিন থাকতে

হয় নি। স্যার আশুতোষ, যাঁর আনুকূল্যে এবং সহযোগিতায় মনস্তত্ত্ব বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল, ব্যক্তি নির্ব্বাচনের ক্ষমতা ছিল তাঁর অসীম। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-সমাজে তিনি বহু জ্ঞানী, গুণী ব্যক্তিকে আহ্বান করে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনিই আহ্বান ক'রে নিয়ে আসেন অধ্যাপক মিত্রকে নবপ্রতিষ্ঠিত মনস্তত্ত্ব বিভাগে।

১৯২৪ সালে অধ্যাপক মিত্রকে কলকাতা থেকে পাঠান হয় মনস্তত্ত্বের প্রথম গবেষণাগার জার্ম্মাণীর লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্বের ব্যবহারিক পরীক্ষা পরিচালনায় উচ্চশিক্ষা লাভার্থে। অধ্যাপক ক্রুগারের অধীনে গবেষণা করে ১৯২৬ সালে তিনি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানের সঙ্গে পি-এইচ, ডি ডিগ্রী লাভ করেন। জার্ম্মাণীতে থাকা কালীন, ১৯২৫ সালে, ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস ফর সাইকোয়্যানালিসিস্-এর বাৎসরিক অধিবেশনে তিনি ইণ্ডিয়ান সাইকোঅ্যানালিটিক্যাল সোসাইটির সভ্য মনোনীত হন।

এই সময়ে ব্যক্তিগত ভাবে তিনি বহু দার্শনিক, মনস্তাত্ত্বিকের ও অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সঙ্গে পরিচিত হন—যাঁদের আদর্শ বর্ণনায় আজও তিনি পঞ্চমুখ। ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শ, সেদিনের জার্ম্মাণ বিদ্বৎ সমাজের প্রতিটি ভাবধারাকে তিনি আজও পালন করে চলেন তাঁর প্রতিটি ব্যবহারে। সাংস্কৃতিক বিচারে তিনি শতভাগ বাঙালী, কিন্তু ব্যবহারিক বিশ্লেষণে তিনি সর্ব্বৈব ভাবে জার্ম্মাণ।

দেশে ফিরে এসে তিনি আত্মনিয়োগ করলেন মনস্তত্ত্বের সেবায়। প্রথম দিন থেকেই তিনি বুঝেছিলেন মানুষের নির্জ্ঞান মন সম্বন্ধে সম্যক ধারণা করতে না পারলে মানসিক গতি-প্রকৃতির একটি বিরাট অংশই অজানা থেকে যায়। তাই তিনি গবেষণাগারের গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়োগ করেছিলেন মনঃসমীক্ষণের গবেষণায়। একাধারে তিনি সংজ্ঞান ও নির্জ্ঞান মনের দুই স্তরেরই গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছিলেন।

১৯৩২ সালে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের নেতৃত্বে ইণ্ডিয়ান ফিলোসফিক্যাল কংগ্রেসের যে অধিবেশন হয়, ডাঃ মিত্র তারই মনস্তত্ত্ব শাখার সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। এই অধিবেশনে তিনি পাঠ করেন তাঁর গবেষণালব্ধ ফল "The New Theory of Emotion." আজও এই তত্ত্ব বিদ্বৎ-সমাজের যথেষ্ট চিন্তার ও গবেষণার স্থল হয়ে আছে। ১৯৩৫ সালে তিনি ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের মতস্তত্ত্ব ও শিক্ষা বিভাগের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। ১৯৩৮ সালে সায়েন্স কংগ্রেসের জুবিলী উৎসবে, মনস্তত্ত্ব বিভাগের অধীনে তিনি এক আলোচনা-সভার নেতৃত্ব করেন এবং সেখানে তিনি যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, তার সম্বন্ধে ডাঃ ঝিগমুণ্ড ফ্রয়েড বলেছিলেন—"আমি যা বলতে চেয়েছিলাম অথচ সম্পূর্ণ ভাবে পারিনি, অধ্যাপক মিত্র তা' পরিষ্কার ভাবেই পরিবেশন করেছেন।"

মনস্তাত্ত্বিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বহু দায়িত্বপূর্ণ পদ তিনি অধিকার করেছিলেন এবং বর্ত্তমানে আছেনও। এ ছাড়াও তিনি ন্যাশনাল ইনৃষ্টিটিউটের ফাউণ্ডার ফেলো।

১৯৫০ সালে স্বর্গতঃ ডাঃ গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের অবসর গ্রহণের পর তিনি মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং এখন অবধি সেই পদই অলঙ্কৃত ক'রে আছেন।

মনস্তত্ত্বে, দর্শনে ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে গবেষণা ক'রে এ পর্য্যন্ত প্রায় পঁচিশ জনেরও অধিক ছাত্রছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেয়েছেন। যাঁরা তাঁর কাছে গবেষণা করেছেন তাঁরা জানেন, কি অসাধারণ যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি তাঁদের সাহায্য করেছেন। আজ তাঁর বয়স ষাটের ওপরে, শরীরও যথেষ্ট ভেঙে পড়েছে, কিন্তু এখনও তাঁর কাছে প্রায় পাঁচ-ছয় জন ডক্টরেটের জন্য গবেষণা করছেন, তাঁদের মধ্যে ভারত সরকারের এক্সচেঞ্জ বৃত্তি প্রাপ্ত দু'জন বৈদেশিকও আছেন। এ ছাড়া, প্রতি বছরেই পোষ্টগ্র্যাজুয়েট মনস্তত্ত্ব পরীক্ষার জন্য তাঁকে অন্ততঃ ৩০।৩৫টি নূতন সমস্যার নির্ব্বাচন করতে হয়, যার উপর নির্ভর ক'রে ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁদের গবেষণাপত্রাদি তৈয়ারী করেন। বৎসরের পর বৎসর এই যে ব্যক্তিগত গবেষণাগুলি পরিচালিত হয়, তাদের বিরাট অবদানগুলি আজ যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈর্ষার স্থল।

মনস্তাত্ত্বিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর যে গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি প্রকাশিত হয়েছে, মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিকের কাছে তো বটেই, সাধারণ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছেও তা মূল্যবান। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে এইগুলি বহু ভাবে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে; এইগুলি তাঁর জনৈক ছাত্র কর্ত্তৃক পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার চেষ্টা হ'চ্ছে। এই পুস্তক বহু বিষয়ে বহু তথ্যের সন্ধান দিতে সক্ষম হবে। বর্ত্তমানে বাংলা ভাষায় তাঁর দু'টি পুস্তক আছে 'মনঃসমীক্ষণ' ও 'অনিচ্ছাকৃত' নামে। এই পুস্তক দু'টিতে নির্জ্ঞান মনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হ'য়েছে।

ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হ'ল 'রাগ' বলে কোন প্রকাশ তাঁর নেই এবং কখনও কোন ভাবে কোন ব্যক্তিকে তিনি 'ছোট' বলে ভাবেন না। আর এ পর্য্যন্ত যত ব্যক্তির সঙ্গে তিনি পরিচিত হ'য়েছেন, তাঁরা কখনও কেউই বলতে পারবেন না ডাঃ মিত্র তাঁদের বিস্মৃত হ'য়েছেন। প্রত্যেকের নাম অবধি তিনি মনে রাখেন। শিক্ষক-জীবনের এই ব্যক্তিত্ব অনুকরণীয়।

কর্ম্মবীর আলামোহন দাস

হৃদ্‌স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবুও সেই মহাতীর্থ থেকে ফিরে এল সবাই মৃত সন্তানকে বুকে করে। তার পর চলেছে একটানা দীর্ঘ ৬২ বছর। ১৩০১ সালের চৈত্র মাসের কোন এক রবিবারে খিলাবারুইপুর গ্রামের কোন এক কৃষক-পরিবারে জন্ম।

নাম রাখা হয়েছিল সুরেন্দ্র। কিন্তু মহাতীর্থ শ্মশান থেকে ছেলে কোলে করে শবযাত্রীরা যখন ফিরলো তখন ঠাকুরমা আদর করে বলেছিলেন 'এলা'। সেই থেকেই তাঁর নাম হয়েছে আলামোহন।

বিপর্য্যয় এলো সংসারে। দুরন্ত দাপাটে ছেলের মনে আস্তে আস্তে বাসা বাঁধলো জীবনে বড় হতে হবে।

৭।৮ বৎসর বয়সে একবার পাঠশালায় যেতে আরম্ভ করেছিলেন গুরুমহাশয়ের স্নেহাশীষ পেয়ে। কিন্তু তা বেশী দিন নয়। দারিদ্র্যের জন্য পিতা চলে এসেছেন কলকাতায়। মাতা অসুস্থ অবস্থায় চলে গেছেন মামার বাড়ী। জেদী একগুঁয়ে ছেলের মনোভাব পাল্টাতে পারেনি মামারা।

১১নং গ্যালিফ ষ্ট্রীটে রতিকান্ত দে'র খৈ-মুড়ি আর বাতাসার দোকান। বেশ বড় দোকান। অনেকেই এ দোকান থেকে জিনিষ-পত্তর নিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। কিশোরের মনে ইচ্ছে হয় ব্যবসা করবো।

১৫ বছর বয়স থেকে আরম্ভ হল প্রকৃত জীবন-সংগ্রাম। মাথায় করে খৈ-মুড়ি ফেরী করতে করতে, চিৎপুর কাশীপুর বরাহনগর,

কুটিঘাট পর্য্যন্ত। কোন কোন দিন আলমবাজার পেরিয়ে এঁড়েদা বাজার, দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত। তার পর কুটিঘাটে স্নান সেরে দিনের খাওয়া শেষ হোত। তার পর এ-গলি, সে-গলি ঘুরে সন্ধ্যার আগেই গিয়ে পৌঁছাতো গ্যালিফ ষ্ট্রীটে রতি বাবুর দোকানে। রতি বাবুকে জিনিষের দাম দিয়ে যা থাকতো, সেটা দোকানের খাতায় জমা হোত। এই ভাবে কাটলো আড়াই বৎসর।

শিকদার বাগানের মোড়ে একটা খই-মুড়ির দোকান করলেন। পিতা এলেন সেই দোকান দেখাশুনার জন্যে।

কালগ্রাসী মহাযুদ্ধ এগিয়ে এলো। কারখানার ধারে মুড়ি বেচতে গিয়ে মনের মাঝে কত স্বপ্ন ঘুরে বেড়াতে লাগলো। এমন সময় কলকাতার দোকান তুলে দিয়ে হাওড়ায় চলে আসতে হোল; সেটা ১৯১৮ সাল। ইতিমধ্যে পরিচয় হয়েছিল ডাঃ শেখরচন্দ্র হাজরার সংগে। তিনি ছিলেন পি, এন, দত্ত কোম্পানীর অফিসার। তাঁরই পরামর্শে হাওড়ার বোষ্টমপাড়ায় জমি লীজ নিয়ে এসিডের কারখানা তৈরী করলেন। তার নাম—দি হাওড়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস। কিন্তু এসিডের গন্ধে প্রতিবেশীরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হল।

এর পর মিউনিসিপ্যালিটি ছাড়িয়ে সানপুরে কারখানা তৈরী হল। কিন্তু এমন সময় শেখর বাবু অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ব্যবসা মন্দা পড়ে গেল। পাইকারী দরে মাল কিনে পাইকারী দরে মাল বিক্রী করায় লাভ কম। এরই সংগে চালাতে লাগলেন অন্যান্য ব্যবসা। অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ। ইতিমধ্যে পরিচয় হোল মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীদের সংগে। ফাটকা বাজারের ব্যবসা করতে গিয়ে লাভ-লোকসান দুই-ই হোল।

এর পর ওইং মেসিনের কারখানা তৈরী হলো। দেশী মেসিন কেউ নিতে চায় না। কারবার চলে না। এমন সময় রজনী পাল নামক এক ভদ্রলোককে কারখানার পার্টনার করে নেওয়া হোল। প্রত্যেক জায়গায় মেসিন দিয়ে সর্ত্ত হোল, এক বৎসর পরে দাম পাওয়া যাবে। যদি ভাল কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু হঠাৎ ব্যবসার অবস্থা খারাপ হয়ে যাওয়ায় অবাঙ্গালীর হাতে কারখানা চলে গেল। অত সাধের বেঙ্গল ওয়েইং স্কেলস্।

পশ্চিম-বাংলা থেকে পূর্ব-বাংলায় পাড়ি দিলেন। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের রেখে ছোট ভায়ের কাছে। দৈব-চক্রে পূর্ববাংলা থেকে একেবারে রেঙ্গুনে। সাড়ে পাঁচ আনা সম্বল করে রেঙ্গুন যাত্রা। সমস্ত টাকাই ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে চা-এর ব্যবসা করলেন।

পুত্রের মৃত্যু, পিতার মৃত্যু, ভাইয়ের মৃত্যু বিচলিত করল। জীবনের মাঝে এলো হতাশা। এমন সময় সহকর্মীদের মাঝে নতুন আশা পেয়ে বি ডব্লিউ স্কেলস্-এর কাজ সুরু হোল। বড় করে কারখানা তৈরী করে ১৯৩৪ সালে নতুন কারখানার উদ্বোধন হ'ল; কারখানার নাম হ'ল "পালস ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস।"

রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে নানান কাজে ঘুরে বেড়াতেন। মাড়োয়ারীদের জুট মিল দেখে জুট মিল করার ইচ্ছা হয়। জনৈক মাড়োয়ারীর কাছে সাহায্য চাইলে, তিনি অবজ্ঞার সহিত কথাটি উড়িয়ে দেন। এই প্রসঙ্গে বলা যায়, আলামোহন বাবু ঐ জুট মিলেরই এক জন কর্ম্মী ছিলেন।

অপমান আর ক্ষোভ মাথায় নিয়ে ফিরে এলেন বাড়ী। মনের মাঝে জেদ বেড়ে উঠল। জুট মিল করতেই হবে। জুট মিলের মেসিন-পত্তর নিজের কারখানাতে যথাসম্ভব তৈরী হল। লিমিটেড কোম্পানীরূপে কাগজপত্তর তৈরী হল। বর্ত্তমান দাশ নগরে যে জুট মিল হোল তার নাম 'ভারত জুট মিলস্ লিমিটেড'। কিন্তু এই মিলের শেয়ার কিনতে কেউ রাজি হল না। শেষ পর্য্যন্ত বেলিয়াঘাটার রাধিকামোহন সাহা মহাশয় পাশে এসে দাঁড়ালেন। জুট মিল চালু হোল।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় জুট মিলের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেছিলেন। তিনি এই কারখানার প্রশংসা করে বলেছিলেন, "এই প্রতিষ্ঠান-গুলির তুলনা নাই। এইগুলি শুধু কারখানা নহে; মরণোন্মুখ বাঙালীর তীর্থক্ষেত্র।"

১৯৩৮ সালে বি, ডব্লিউ, স্কেলস আর এট্‌লাস ইঞ্জিনিয়ারিংকে একত্রিত করে তৈরী হল 'দি ইণ্ডিয়া মেসিনারী লিঃ'; ইণ্ডিয়া মেসিনারীতে এখন নানান মেসিন-পত্তর তৈরী হয়। ১৯৪০ সালে দাশ ব্যাঙ্ক করেন। ব্যাঙ্কটিকে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্ক করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সে ব্যাঙ্ক লিকিউডিসনে চলে গেছে। ১৯৪২ সালে এশিয়া ড্রাগ কোম্পানী লিঃ ও ১৯৪৬ সালে আরতি কটন মিলস তৈরী করেছেন। আনুমানিক তিন হাজারের মত লোক তাঁর প্রতিষ্ঠানে কাজ করে।

এই কর্মবহুল জীবনের ফাঁকে ফাঁকে করেছেন রাজনীতি। ভাগ্যে জুটেছে নিন্দা-প্রশংসা। ভালো-মন্দ জড়িয়ে যে জীবন, তার সমস্ত পাপ্যাই তিনি পেয়েছেন।

এর পর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আর নতুন কিছু করার ইচ্ছা আছে কিনা? তিনি বললেন, না। কথার ফাঁকে ফাঁকে মানুষটিকে অল্প সময়ের মধ্যে বুঝেছি যেটুকু, তাতে এইটুকু বলা যায়, ভীষণ জেদি এবং



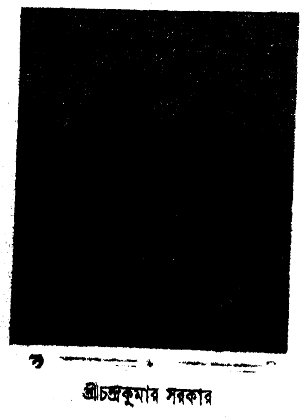
আলামোহন দাস

নিজ সংকল্পে অটুট। দীর্ঘ দিন শ্রমিক নিয়ে নানাচাড়া করছেন, তাই তাঁর কাছে শ্রমিক প্রসঙ্গ তুলতে তিনি বললেন—যেখানে হায়ার অফিসারের মাইনে ১০০ টাকা সেখানে নিম্নতম কর্মচারীর মাইনে ১০৲ টাকা হওয়া উচিত। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কতটুকু কাজে লাগিয়েছেন এই নীতি? বললেন, যত দিন পেরেছিলাম এই নীতি চালিয়েছি। এখন আর তা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অনেক কথাই হোল। কিন্তু সে সমস্ত প্রকাশ করতে বাধা আছে। আলামোহন বাবুর রাগ আছে একটি বিশেষ শ্রেণী-সম্প্রদায়ের উপর। সেটি হল so called শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাঁরই ভাষায়। আমার বোধগম্যে যাঁরা লেখাপড়া জানেন। এরা নাকি অনেক ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি নিজেই বলেছেন, এ সব কথা আপনি লিখলেও আমি অস্বীকার করবো। কারণ কোন লিখিত প্রমাণ নেই। এই ভাল-মন্দ জড়িয়ে যে মানুষের জীবনযাত্রা তারই মাঝে যে কর্ম-প্রতিভার স্বাক্ষর বাংলা দেশে রেখে গেলেন, তা যে কোন বাঙালী এক ভারতীয় যুবকের অনুসরণযোগ্য। তিনি বললেন, জীবনে সংগ্রাম করো, সফলতা লাভ করবে। বেশবাসে আড়ম্বর নেই। সাধারণ ফতুয়া আর ধুতি। বাইরে গেলে পাঞ্জাবী। এই বেশই তাঁর গর্বের আর একটি প্রধান বস্তু।

শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার

[সি, কে, সরকার নামে পরিচিত সুপ্রতিষ্ঠ বাস্তবিদ্]

মায়ের বুকে যদি নিত্যনিয়ত শিশুর আগমন না হোত, তা হলে বিশ্বের মাতৃত্বই হয়ে যেত অর্থহীন শূন্যতায় ভরপুর—শিশুর আবির্ভাব বন্ধ হলেই বোঝা যেত, সৃষ্টির বিজয় অভিযানের ব্যর্থতা সুনিশ্চিত। যুগে-যুগে কালে-কালে লক্ষ-কোটি বিবর্তনের মধ্যে দিয়েও শিশুর জন্মই রক্ষা করে চলেছে বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির রসমাধুর্য। ঠিক তেমনই বিরাট বিরাট নগরের সঙ্গে গহন নিবিড় অরণ্যের কোন তফাৎই থাকত না, যদি না তার বুকের উপর বিরাজ করত নানা শ্রেণীর নানা বর্ণের নানা ধরণের গৃহগুলি—তা রাজার প্রাসাদই হোক আর কৃষকের কুটীরই হোক। শহরের বুকে আজ এরা শোভা পাচ্ছে বলেই তো শহর আজ শ্মশান নয়, মরুভূমি নয়, জনবিহীন নয়—আর সেই জন্যেই তো মনে হয় যেন মায়ের স্নেহনীড়ে শিশু আনন্দে বিরাজ করছে নগরের বুকে, যেমন করছে মানুষের বাসগৃহ। যে কোন সৃষ্টির পূর্ণতা তখনই সম্ভব হয়, যখন তাতে পড়ে কোন একটি বিশেষ শক্তির স্পর্শ। পৃথিবীর বুকে এত বাস্তভিটের প্রতিষ্ঠা কখনই সম্ভব হোত না, যদি না তাতে ছাপ পড়ত সাক্ষাৎ



শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার

বিশ্বকর্মার বংশধরগণের অর্থাৎ কুশলী বাস্তবিদদের বুদ্ধিদীপ্ত কর্ম-নির্দেশের —সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষেরই তাঁরা শ্রদ্ধার অধিকারী। সৃষ্টির বৈচিত্র্য নিষ্প্রভ হয়ে যেত তাঁদের কুশলী হাতের স্পর্শ না পেলে। জ্ঞানী-গুণীর দরবারেও তাঁরা সম ভাবেই পূজিত।

বাঙলা দেশে বর্তমানে যে ক'জন বর্ষীয়ান্ বাস্তু-বিশেষজ্ঞ এখনও আমাদের মধ্যে আছেন, স্বনামধন্য শ্রীচন্দ্রকুমার সরকার মহাশয় তাঁদের মধ্যেই এক জন। রাণাঘাটে এঁদের আদি নিবাস। কলকাতায় বাগবাজার অঞ্চলেও এঁদের বাস বহুকালের। পরলোকগত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নবীনকৃষ্ণ সরকার মহাশয় এঁর বাবা। বাগবাজারে নবীনকৃষ্ণের নামে একটি গলি তাঁর স্মৃতি অমলিন করে রেখেছে। চন্দ্রকুমারের জন্ম হয় ১২৮০ সালের ১৬ই ফাল্গুন তারিখে অর্থাৎ ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। বর্তমানে বিরাশী বছর পূর্ণ করে তিরাশীতে পড়েছেন তিনি। ছাত্রজীবনে বৌবাজার বঙ্গ বিদ্যালয়, মেট্রোপলিটান ইনষ্টিটিউশান (শ্যামবাজার শাখা), জগবন্ধু মোদকের বিদ্যালয় (বর্তমানের শ্যামবাজার এ-ভি-স্কুল) প্রভৃতি বিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছেন চন্দ্রকুমার। সহপাঠিরূপে পেয়েছিলেন উত্তর কালের অনেক কৃতবিদ্য বাঙালী সন্তানকে—তাঁদের মধ্যে আইন-সম্রাট স্যার ব্রজেন্দ্রলাল মিত্র ও স্যার নৃপেন্দ্রনাথ সরকার, দিঘাপতিয়ার পরলোকগত রাজা প্রমদানাথ রায়, স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্র, স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র, স্যার চারুচন্দ্র ঘোষ ও ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য—এখন এঁদের মধ্যে প্রত্যেকেই পরলোকগত। চন্দ্রকুমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এফ-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পুণায় যান। এখানে তিনি অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হলেন পশ্চিম-ভারতের সিংহমানব বাল গঙ্গাধর তিলকের। তিলকের নেতৃত্বে কিছু দিন স্বেচ্ছাসেবকের কাজ গ্রহণ করেন চন্দ্রকুমার। পুণা থেকে বারাণসী। এখানকার সেচ ও পয়ঃপ্রণালী বিভাগের 2nd officer পর্যন্ত হয়েছিলেন। বারাণসী থেকে একেবারে পাড়ি দিলেন ব্রহ্মদেশে। সেখানে পিগু জেলার রাস্তা নির্মাণের সমগ্র দপ্তরটির ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। পশ্চিম-ভারত থেকে পূর্ব-ভারত পর্যন্ত অর্থাৎ এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিভার রথের চাকাকে মাটির সঙ্গে গেঁথে রেখে বাঙলার ছেলে বাঙলার বুকে ফিরে এলেন ১৯১০ খৃষ্টাব্দে। কাশীতে ও পিগুতে এঁর অসংখ্য কীর্তি আজও বাঙলার গৌরব ঘোষণা করে চলেছে। মানুষের নিত্য-প্রয়োজনীয় জীবনে বাস্তু-বিশেষজ্ঞের অবদান যে অসামান্য এই সব কীর্তিগুলির মধ্যে থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। যেমন কাশীর ভেলুপুরার জলাধারা, পিগু অঞ্চলের ককরীচ মেওয়ারী রোড ইত্যাদি। এখানে ১৯১০ থেকে ১৯৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এঁর পসার ছিল, তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ইনি যাপন করছেন অবসর জীবন, তবে অবসর তাতে একটুকু নেই, নিজের পেশা ছেড়েছেন কিন্তু পড়াশুনো ছাড়েননি; শুধু নিজের পেশা সম্বন্ধীয় নয়, নানা শ্রেণীর পুস্তকে সুশোভিত এঁর নিজস্ব গ্রন্থাগার, প্রায় দশ হাজার পুস্তক শোভা পাচ্ছে সেই গ্রন্থাগারে, কাব্য-সাহিত্য-রাজনীতি-ধর্মতত্ত্ব-ইতিহাস-জ্যোতিষবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, স্থাপত্যবিদ্যা প্রভৃতি সকল বিষয়েই সমান দক্ষতা চন্দ্রকুমারের মধ্যে বিদ্যমান। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে, স্বনামধন্য পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শাস্ত্রীর কাছে ইনি সংস্কৃতের পাঠ নেন। ঈশ্বরচন্দ্র চন্দ্রকুমারকে "বাস্তুবিদ্যাবিশারদ" উপাধিতে ভূষিত করেন।

দীর্ঘ উনচল্লিশ বছর এখানে কাজ করেছেন, তারই সাক্ষ্য বহন করছে হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, গ্রে ষ্ট্রীটের "হরেন্দ্রনিবাস" প্রভৃতি। সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা তিনি ভবিষ্যত ইঞ্জিনিয়ারদের পক্ষে আশাজনক বলেই মনে করেন। তবে সম্পূর্ণ নয় আংশিক। এঁর মতে রূড়কীর শিক্ষাদান পদ্ধতিই উত্তম পুণার "সি-ই" শিক্ষাদানের ধারাও ভালো। চন্দ্রকুমার বলেন যে, ছাত্রদের কাজ করতে দেওয়া হোক, তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করানো হোক আর কাজের মধ্যে দিয়েই তাদের সুযোগ দেওয়া হোক নিজেকে দেখার, তবেই তারা নিজেদের ভুল-ত্রুটি সংশোধন করে প্রতিষ্ঠার আসনের অধিকারী হতে পারবে। জিজ্ঞাসা করি, আপনার মধ্যে এ পথে আসার প্রেরণা কোথা থেকে এল, উত্তরে চন্দ্রকুমার এক কথায় বললেন—তিলক। বোম্বাইতেও কার্যোপলক্ষে বহুদিন অতিবাহিত করেছেন চন্দ্রকুমার। সেখানে তাঁর দক্ষিণা দৈনিক আড়াইশো টাকা পর্যন্ত হয়েছিল।

ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিছু বলতে বলায় তিনি বললেন যে, অনেকের ধারণা, এ বিদ্যা বুঝি আমরা ইংরেজের কাছে রপ্ত করেছি, কিন্তু তাই যদি হয় তা হলে এখনও ভারতের বুকে যে সব প্রাচীন দেবালয়গুলি বা অট্টালিকাগুলি দাঁড়িয়ে আছে, এগুলি কোথা থেকে এল ? তা ছাড়া এ বিদ্যার যে বহু আগে থাকতেই এ দেশে প্রচলন ছিল তার যথেষ্ট সাক্ষ্য পাওয়া যাবে রামায়ণ-মহাভারতের মধ্যেই। কর্মবীর স্যার রাজেন্দ্রনাথের প্রতি অসীম শ্রদ্ধা চন্দ্রকুমারের মধ্যে বিরাজমান, রাজেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ইনি বলেন—**He was a born engineer not made.**

আজ বার্ধক্য প্রবেশ করেছে চন্দ্রকুমারের দেহমন্দিরে। আমার আরও অনেক কিছু জানবার এবং সেই সঙ্গে আপনাদেরও জানাবার যথেষ্ট ইচ্ছা ছিল কিন্তু চন্দ্রকুমারের প্রতি তাতে অবিচার করা হবে অর্থাৎ তাঁকে শারীরিক কষ্ট দেওয়া হবে ভেবেই নিজের কৌতূহল দমন করে গেলুম। বার্ধক্য চন্দ্রকুমারের দেহে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর কর্মে, তাঁর প্রতিভায়, তাঁর অবদানে সে কোন দিনই প্রবেশ করতে পারবেন না। রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, বিলাসশয্যা ছেড়ে সর্বসাধারণের সঙ্গে একসঙ্গে পথে দাঁড়িয়ে কাজ করে যে গৌরবদীপ্ত জীবনের সৃষ্টি করে গেলেন চন্দ্রকুমার, বার্ধক্য তাকে গ্রাস করা তো দূরের কথা স্বয়ং মহাকাল তাঁর ললাটে পরিয়ে দেবেন জয়তিলক, হাতে দেবেন অমরত্বের মানদণ্ড আর বুকে এঁকে দেবেন শাশ্বত মহিমার সুপ্রদীপ্ত রেখা।

ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত

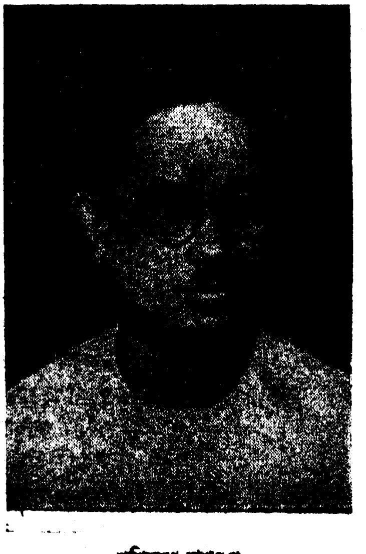
(রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের অধ্যাপক সাহিত্যিক হন না। সাহিত্যিকদের অনেকেই যদিও সাহিত্য-অধ্যাপক হন, সাহিত্যিক অধ্যাপকের দৃষ্টান্ত যেমন বহুল, অধ্যাপক-সাহিত্যিকের উদাহরণ তেমনি দুর্লভ। বাংলা সাহিত্যের এই দুর্লভ ঘটনাসমূহের অন্যতম, অন্যতম ও বিশিষ্ট শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত। তিনি শুধু পণ্ডিত নন ; সাহিত্যিকও—দু' অর্থেই 'বিদগ্ধ'।

প্রথিতযশা এই অধ্যাপক ও সাহিত্যিক ১৩১৮ সনের ৩রা ফাল্গুন বরিশালের চন্দ্রহার গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গত কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত। অন্যান্য অনেকের মতো গ্রামের পাঠশালাতে শশি বাবুর বিদ্যারম্ভ। এর পর গ্রাম্য জাতীয় বিদ্যালয় ও বরিশাল জাতীয় বিদ্যালয়ে কিছু দিন পড়ার পর তিনি গ্রামের উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হন এবং মাহিলাড়া উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে বিভাগীয় বৃত্তি (Divisional scholarship) পেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তার পর যথাক্রমে বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ থেকে আই, এ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স সহ বি, এ পাশ করেন। ১৯৩৫ সালে তিনি 'বংগভাষা ও সাহিত্য' নিয়ে এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৩৮ সালে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ বৃত্তি এবং ১৯৪০এ ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেন।

এম, এ পরীক্ষার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রামতনু লাহিড়ী গবেষক নিযুক্ত হন এবং ১৯৩৮ সালে গবেষণা অন্তে তিনি বাংলা সাহিত্যের লেকচারারের পদে অধিষ্ঠিত হন। এই বৎসর তিনি রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষা-বিভাগের প্রধান অধ্যাপকের সম্মানিত আসন গ্রহণ করেছেন।

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত প্রথম যে বইটি লিখে পণ্ডিতমণ্ডলীর মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সেটি হলো : **Obscure religious cults as background of Bengali liturature.** এই বইটি লিখে তিনি ১৯৪০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেন। তাঁর পরবর্তী বই **An introduction to Tantric Buddhism** ও বিদ্বজ্জন মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করে। বাংলার ধর্ম ও ধর্মসাহিত্যের ইতিহাসে গ্রন্থ দু'টি অবিস্মরণীয় সম্পদরূপে পরিগণিত। বাংলার ধর্ম ও ধর্মসাহিত্যের বহু অজ্ঞাত দিকে নতুন আলোকপাত করে ড দাশগুপ্ত চির অভিনন্দনার্হ হ'য়ে থাকবেন। ইংরেজীতে এ দু'টি বই ছাড়া তিনি আর কোনো বই লেখেন নি। তাঁর বাংলা প্রবন্ধগ্রন্থ সমূহের নাম : বাংলা সাহিত্যের এক দিক, বাংলা সাহিত্যের নবযুগ, সাহিত্যের স্বরূপ, উপমা



শশিভূষণ দাশগুপ্ত

কালিদাসত্ত, ত্রয়ী, শিল্পলিপি, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ, কবি যতীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম পর্যায়, নিরীক্ষা এবং বিশ্বভারতী থেকে 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ-গ্রন্থমালা'র বই হিসাবে প্রকাশিত, ভারতীয় সাধনার ঐক্য।

প্রাবন্ধিক ও সমালোচক হিসাবে ডঃ দাশগুপ্তের খ্যাতি আজ সর্বজনবিদিত। তাঁর প্রবন্ধে যে গভীর মনন ও বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়, তা সত্যই বিস্ময়ের বস্তু! বাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মূল্যবান আলোচনাগুলি, আমার মনে হয়, বাঙালী মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য। শুধু প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেই তিনি লেখেন নি, আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর প্রবন্ধাবলী বর্তমান। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও তাঁর অভিনবত্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমাণ 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে' যুগে-যুগে ভক্ত, ভাবুক ও রসিকজনের কাছে শ্রীরাধা কেমন ভাবে দেখা দিয়েছেন, তাঁদের চোখের সামনে অমেয় রূপৈশ্বর্যে কেমন ক'রে তিনি আস্তে আস্তে বিকশিত হয়েছেন, তা'রই রসমধুর আলোচনা রয়েছে বইটিতে। বইটি একাধারে ইতিহাস ও সাহিত্য, সাহিত্য ও দর্শন। শুধু তথ্যে ভারাক্রান্ত নয়, সাহিত্যমাধুর্যে বিশিষ্ট ও অনবদ্য। আগেই বলেছি, ডঃ দাশগুপ্ত শুধু পণ্ডিত নন, রসবেত্তাও। দু' অর্থেই বিদগ্ধ। অধ্যাপকসুলভ পাণ্ডিত্যের সংগে মিশেছে সাহিত্যিকের রসদৃষ্টি। আর এই দুর্লভ সমাবেশ শুধু প্রশংসার নয়, মুগ্ধ-বিস্ময়েরও বস্তু।

ডঃ দাশগুপ্তের সাহিত্যকৃতির পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতাগ্রন্থে। সাহিত্যের সমস্ত বিভাগেই তাঁর লেখনী সমান সচল। তাঁর কবিতাগ্রন্থ হলো: এপারে-ওপারে, গীতা ও নিশাঠাকুরের কড়চা; নাটক: রাজকন্যার ঝাঁপি ও দিনান্তের আগুন; উপন্যাস: বিদ্রোহিণী ও জঙলা মাঠের ফসল; ছোটদের জন্যে লেখা: ছোটদের ছোট গল্প, ছুটির দিনের মেঘের গল্প ও হলুদ পাখি। অধ্যাপক হয়েও যে সাহিত্যিক হওয়া যায় তার প্রমাণ এই বইগুলি; এই বইগুলির লেখক শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্ত।

সৌম্য-সহাস, শান্ত-ধীর ও নিরহংকার এই পণ্ডিত মানুষটির একটি উজ্জ্বল দিক তাঁর অপার ছাত্রবাৎসল্য। ছাত্রদের সুখ-সুবিধার জন্যে তিনি সব রকম ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধা বিসর্জন দিতে সদা প্রস্তুত। যাতে তাদের ভালো হয়, যাতে তারা ভবিষ্যতে উন্নতি ও সমৃদ্ধির স্বর্ণশিখরে পৌঁছাতে পারে, তার জন্য তাঁর দৃষ্টি সর্বদাই সজাগ। আর প্রাণঢালা পড়ানো কা'কে বলে তা' শশি বাবুর কাছে যারা পড়েছে, তারাই বলতে পারে। অত সুন্দর, সহজ ও সাবলীল করে পড়াতে তাঁর সমকক্ষ অধ্যাপক খুব কমই দেখা যায়! বিভিন্ন সভা-সমিতিতে তাঁর বক্তৃতাতেই বাচনভংগীর এই সহজ সৌন্দর্য লক্ষণীয়। 'রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কলচারে' অনেক বিষয়ে তিনি বহু বার বক্তৃতা করেছেন। আর এখানে-ওখানে, এ-পাড়ায় সে-পাড়ায় ঘরে-বাইরে প্রায়ই তো তাঁকে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতাদি করতে হয়।

শুধু অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাতেই ডঃ দাশগুপ্ত নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, দেশের কাজেও এক সময় সক্রিয় ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। বরিশালে থাকা কালীন তিনি অসহযোগ আন্দোলনে আর সকলের সংগে উৎসাহী হাত মিলিয়েছিলেন। সন্ত্রাসবাদ আন্দোলনেও তিনি বিশেষ ভাবে জড়িত ছিলেন। মনোরঞ্জন গুপ্ত, কিরণ মুখোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র গুহ (বর্তমানে মন্ত্রী) প্রমুখ বিখ্যাত সন্ত্রাসবাদিগণ তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। আজ তিনি রাজনীতি থেকে দূরে সরে এসেছেন। আসতে হয়েছে। এসে ভালোই করেছেন। শ্রুতকীর্তি রাজনীতিকদের মতো হয়তো সরব দেশসেবা করছেন না, কিন্তু দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গভীর ভাবে নিবিড় ভাবে চিন্তা যিনি করেন, যে-চিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে যাঁর মূল্যবান মননসমৃদ্ধ গ্রন্থাবলী ও প্রবন্ধে, তাঁর চেয়ে একনিষ্ঠ ও বড়ো দেশসেবক আর কে আছে?

[মাসিক বসুমতীর পক্ষ হইতে যথাক্রমে পক্ষধর মিশ্র, অরবিন্দ ঘোষ, কল্যাণাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত কর্তৃক সংগৃহীত।]

যদি

দুর্গাদাস সরকার

একটি তারার একটু ইসারা আকাশের এক কোণে,
নিবু-নিবু তার রেখাটি মিলায় দূরের সবুজ বনে।
কুয়াশায় নদী নেমে আসে, যদি নিবে যায় সেই রেখা।
হাতড়িয়ে মরি মাটিতে আকাশে আলোর রশ্মি একা।
পৃথিবী অন্ধকার,
জোনাকিও তার এক নিমেষের চপল অলঙ্কার।

একটি হাতের একটু পরশ হৃদয়ের এক কোণে
থাকে যদি, ভয় থাকে না কখনো সমুদ্র-মন্থনে।

নবাবের পত্র

[নবাব দুর্ল্লভরামকে প্রধান এবং মীরমদনকে দ্বিতীয় সেনাপতি করিয়া ফরাসীদের সাহায্যে প্রেরণ করেন। মুসে ল, রায়দুর্ল্লভ ও অন্যান্য সেনানীকে তাঁহাদের পদোচিত উপহার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। লর বাসনা পূর্ণ হইল না। যথাসময়ে তাঁহারা ফরাসীদের সাহায্যে উপস্থিত হইলেন না। ল, নবাব দরবারে প্রাতঃকালে যে পরামর্শ স্থির করিলেন, অপরাহ্নে শেঠেরা নবাবকে তাহার উল্টা বুঝাইয়া দিলেন। কাজেই নবাব প্রতারিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশের দ্বার সুপ্রশস্ত হইল। নৌসেনানী ওয়াট্‌সনকে ক্লাইব প্রভৃতি ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের অনুমতি ব্যতীত ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তোলন করিবেন না, অথচ ফরাসীদের ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনও করিবেন না, যখন এই বিষয় লইয়া ইংরাজসভায় ঘোর তর্ক হইতেছিল, তখন ওয়াট্‌সের উৎকোচলব্ধ নবাবের পত্র সভাস্থলে আনীত হয়। ওয়াট্‌সন আর কোন কথা না কহিয়া চন্দননগর আক্রমণের অনুকূলে মত প্রদান করিলেন। এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে (৪ঠা মার্চ্চ) নবাব ক্লাইবকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি ইংরাজকে এ দেশে ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করেন। আর ফরাসীরা যদি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়া উপযুক্ত দণ্ড-প্রদান করিবেন, ইত্যাদি লিখিয়া নবাব স্বহস্তে লেখেন যে—]

"বাঙ্গালা-দেশে বাদশার ফৌজ আসিবার উপক্রম করিতেছে। আমি আজিমাবাদে (পাটনা) যাইতে মনস্থ করিয়াছি। এ সময় যদি আপনি আমার সহিত মিলিত হন তাহা হইলে আমি মাসিক ১ লক্ষ টাকা আপনার খরচের জন্য প্রদান করিব। ইহার শীঘ্র উত্তর দিবেন।" ক্লাইব ৭ই মার্চ্চ ইহার উত্তরে লিখিলেন, "ফরাসীদের সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে আমার ইচ্ছা। সেরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার শক্তি চন্দননগরের নাই। পণ্ডিচারীতে তাহা করিতে গেলে তিন মাসের কম হইবে না। ইহা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং আমাদের পক্ষে হানিজনক হইবে। আমরা যখন আপনার সহায়তার জন্য গমন করিব, সে সময় চাই কি মুসে বুসি আসিয়া আমেদের কুঠী বিধ্বংস করিতে পারে। গত আর্কটের যুদ্ধে নবাব যখন আমাদের উভয়কে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করিও না, তখন ফরাসীরাই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চেনাপটন (মান্দ্রাজ) আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। আপনি এ কথা° নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। এখন কেমন করিয়া উহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি? আমি এখন চন্দননগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম, যে পর্য্যন্ত না আপনার পত্র পাইতেছি, সে পর্য্যন্ত আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। আশা করি, ইহা আপনার আনন্দপ্রদ হইবে। আপনার সহিত আমি পাটনায় গমন ও তথায় সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। ভগবৎকৃপায় আপনি শত্রুবিজয়ী হউন।"

লর্ড ক্লাইবের পত্র

[ক্লাইব সৈন্যগণকে ইতিপূর্ব্বেই বরাহনগরের অপরপারে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার, তিনি মনে করিলে ইংরাজদের জব্দ করিতে পারেন—আহার্য্যদ্রব্য প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট বাধা দিতে পারেন—দূরদর্শী ক্লাইব এই সকল বিবেচনা করিয়া নন্দকুমার যাহাতে তাঁহার প্রতিপক্ষতা অবলম্বন না করেন, সে জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মে তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। (৮ই মার্চ্চ)]

"আমি এখন নবাবের বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে আমি সৈন্যসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করিতেছি। আমার উপস্থিতিতে আপনি ভীত হইবেন না। আমার সৈন্য যদি আপনার প্রজার প্রতি কিছুমাত্র উপদ্রব করে, তাহা হইলে সে বিশেষরূপে দণ্ডিত হইবে। এ বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আপনি আপনার অধিকারস্থ প্রজাদিগকে আমার সৈন্যের খাদ্যের জন্য বাজার বসাইতে অনুমতি দিবেন।"

[৯ই মার্চ্চ ক্লাইব শ্রীরামপুরের নিকট শিবির-স্থাপন করেন। এ স্থান হইতে তিনি চন্দননগরের বড় সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি চন্দননগর কখনই আক্রমণ করিবেন না, আর যদি করেন, পূর্ব্বাহ্নে জ্ঞাপন করিবেন ইত্যাদি লিখিয়াছিলেন। ক্লাইব পাশ্চাত্য রাজনৈতিকদিগের আদর্শ-পুরুষ, তাই তিনি ফরাসীদিগকে কোনরূপে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন না; অকস্মাৎ তাহাদিগকে করতলগত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফরাসীরাও পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্য ক্লাইবের কথার মূল্য তাঁহারা ভালই জানিতেন, তাই তাঁহারা ক্লাইবের কথায় বিশ্বাস না করিয়া আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১০ই মার্চ্চ ক্লাইব সৈন্য সহ গরুটির নিকট উপস্থিত হন। ১১ই বিশ্রাম করেন। ১২ই তিনি চন্দননগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে তাঁবু ফেলেন। ১৩ই ইংরাজ, ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ফল্‌তায় যখন ইংরাজ ঘোরতর দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন, অন্নাভাবে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া কালসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সে সময় ফরাসীরা অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার

করিয়াছিলেন। ইংরাজ ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা বা উপকারের যথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া, জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্ব-বন্ধু ফরাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের দাস হইলেও এক্ষণে সে কথা বিস্মৃত হইয়া, সকলে একপ্রাণে মিলিত হইয়া, জাতীয় সমৃদ্ধির ভিত্তি-স্থাপন করিলেন। এ সময় আমরা ইংরাজ-চরিত্রে দেখিতে পাই, তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য এক প্রকার বাক্য বলিয়া কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিয়াছেন। ঘুষ, মিথ্যা-প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা নবাব-কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন।]

লর্ড ক্লাইবের পত্র

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে, ক্লাইব ফরাসীদের বড় সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে, "আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব না, যদি একান্তই করিতে হয়, তাহা হইলে না জানাইয়া যুদ্ধ করিব না।" তাই ক্লাইব, চন্দননগরের উপকণ্ঠ হইতে ১৩ই নিম্নের লিখিত পত্র প্রেরণ করেন।

"মহাশয়—গ্রেটব্রিটেনের অধীশ্বর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন! তাঁহার নামে আমি আপনাকে আদেশে করিতেছি যে, আপনি চন্দননগর দুর্গ অর্পণ করুন। অস্বীকৃত হইলে ইহার জন্য আপনাকে জবাব দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের নিয়ম আপনার প্রতি ব্যবহৃত হইবে।

মহাশয়, আমি আপনার একান্ত অনুগত
বিনীত ভৃত্য
আর, ক্লাইব।"

["অনুগত বিনীত ভৃত্য" সুসভ্য ক্লাইব চন্দননগরের বড় সাহেবকে দুর্গ অর্পণের জন্য পত্র লিখেন। তিনি কামানের মুখ ব্যতীত লেখনীমুখে উত্তর দিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা অবগত নহি। আর আমাদের দেশে গৃহস্থকে পত্র দিয়া তাহার গৃহ রাত্রিকালে অধিকার করিয়া তাহার যথাসর্ব্বস্ব গ্রহণ করার প্রথা এই সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে কি না, তাহাও আমরা অবগত নহি।

ফরাসীরা সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গঙ্গার দিকে তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। এই দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য তাঁহারা গঙ্গাগর্ভে দুইখানি জাহাজ মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া ডুবাইয়া রাখেন। আরও কয়েকখানি ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফরাসীরা যদি জাহাজের রাস্তা ভাল করিয়া রোধ করিতে পারিতেন তাহা হইলে ওয়াটসন অত শীঘ্র কখনই চন্দননগর হস্তগত করিতে পারিতেন না। ১৩ই ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করেন। তিনি ইহা হস্তগত করা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন, ইহা অত সহজ নহে। সামান্য সামান্য যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে উভয় পক্ষেরই লোক-হতাহত হইতে লাগিল। ক্লাইব ইহাতে বিশেষ সুবিধা কিছু পাইলেন না। নন্দকুমার, ফরাসীদের সহায়তার জন্য ২ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত হয়, তাহারা ফরাসীদের বড় কার্য্যে আসে নাই, ক্লাইব এই সময় একটি অমোঘ চাল চালিলেন, তিনি প্রচার করিয়া দিলেন, যে কোন ফরাসী-সৈন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন, তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন। ইহার ফল ফলিল। ফরাসীদের একমাত্র গোলন্দাজ কর্ম্মচারী লেফটেনাণ্ট টেরা স্বজাতির পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় নারকীয় উন্নতির জন্য ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করে। ইহার মুখে ফরাসীদের ভিতরকার কথা অবগত হইয়া ক্লাইব উৎফুল্ল হইলেন। নবাব ১৫ই ক্লাইবকে লিখিলেন যে, তাঁহাকে আর আসিতে হইবে না। কলিকাতায় প্রত্যাগমন এবং ফরাসীদের সহিত শান্তিস্থাপন করুন। যাহাতে গঙ্গার উপর না যুদ্ধ হয়, সে বিষয় নবাব পুনরায় নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব ফরাসীদের উপর তাঁহার কাল্পনিক দোষারোপ করিয়া নন্দকুমারকে ফরাসীদের সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।]

ক্লাইব লিখিলেন—"ফরাসীরা কতকগুলি জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে নবাবের বিরাগভাজন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার প্রীতি আমার প্রতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমি অনেক দিন হইতেই তাহাদিগকে আমাদের শত্রুরূপে দেখিতেছি। আমি আর রাগ সামলাইতে পারিতেছি না, তাহারা কোন্ সাহসে ইংরাজের বাণিজ্যে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়? তাহাদের সহরের নীচে দিয়া যাইবার সময় তাহারা কোন্ সাহসে ইংরাজপতাকা ও ইংরাজদস্তক সহ নৌকা কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হয়? আমি সে জন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আগমন করিয়াছি। শুনিলাম, সরকারের কতগুলি অর্থলোভী ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়াছে। নবাবের (His Excellency) যথেষ্ট অনুগ্রহ এখন আমার প্রতি রহিয়াছে, এ সময় কোন কর্ম্মচারীর অনিষ্ট করিতে আমি বড়ই দুঃখিত হই। এ জন্য আমি ইচ্ছা করি, আপনি সেই সৈন্যগণকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিবেন এবং অন্য কেহ যেন তাহাদের সাহায্যার্থে না যায়"।

[ক্লাইব ফরাসডাঙ্গা আক্রমণের যে কারণ উল্লেখ করেন, তাহা সম্পূর্ণ অলীক, তাহা বলাই বাহুল্য। নন্দকুমার ফরাসীদের সাহায্য করিয়াছিলেন, ক্লাইব তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। নন্দকুমার তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব বিশ্বাস-ঘাতক স্বদেশদ্রোহী টেরাণুর সাহায্য পাইয়াও ফরাসীদের বড় কিছু করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে ৭ দিন অতীত হইল, তথাপিও ক্লাইব প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও ফরাসীদের কিছুমাত্রও ক্ষতি করিতে সমর্থ হইলেন না। মীরমদন উপযুক্ত লোক বলিয়া ল'র ধারণা ছিল। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তিনি তাঁহাদিগকে আরও অনেক অধিক টাকা প্রদান করিবেন, এ কথা তাঁহাদের কাছে প্রতিশ্রুত হন। সম্ভবতঃ দুর্ল্লভরাম রাজদ্রোহীদিগের পরামর্শে দ্রুতবেগে গমন না করিয়া মৃদুমন্থরগতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুর্ল্লভরামের মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রার কথা ক্লাইব অবিলম্বে জ্ঞাত হইলেন। তিনি মন্ত্রপূত পত্রে বিভীষিকাগ্রস্ত দুর্ল্লভরামকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন—দুর্ল্লভরামের আত্ম-মর্য্যাদা ও কর্ত্তব্যবুদ্ধি অন্তর্হিত হইল।]

ক্লাইব ২২শে মার্চ্চ দুর্ল্লভরামকে লিখিলেন। "শুনিলাম, আপনি হুগলীর দশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি বন্ধুরূপে কি শত্রুরূপে আসিতেছেন, তাহা আমি অবগত নহি। যদি শেষোক্তরূপে আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখনই আপনার

সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কিছু লোক পাঠাইব। আর যদি বন্ধুরূপী হন, "তাহা হইলে আপনি ঐ স্থানেই অবস্থান করুন। যে শত্রুর সহিত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সে দশগুণ বলশালী হইলেও আমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিব। সন্ধি-স্থাপনের পর হইতে নবাব আমাদের বিশেষ বন্ধু হইয়াছেন, আমিও তাঁহার যে কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি শপথ করিয়া আমাদের সহিত যে সন্ধি করিয়াছেন, তাহাতে আপনার ও অন্যান্য বড়-লোকের সহি-মোহর আছে। সে সন্ধি যদি তিনি অন্যথা করেন, তাহা হইলে সে দোষ তাঁহার উপর পতিত হইবে।

"আমাদের যিনি শত্রু বা মিত্র, তিনি নবাবের শত্রু ও মিত্র। সেইরূপ নবাবের শত্রু-মিত্র আমাদেরও শত্রু-মিত্ররূপে পরিগণিত হন। আমি আপনাকে বলিতেছি যে, ফরাসীরা আমাদের দারুণ শত্রু। আমি তাহাদিগের ধ্বংস-সাধন করিব। আমি বড়ই ভাবিত, আমার সহিত যদি আপনার যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে এক পক্ষের সর্বনাশ হইবে। কোন্ পক্ষ, তাহা ভগবান্‌ই জানেন। এখনই আপনি আমার মনের ভাব বুঝুন।"

এই পত্রে দুর্ল্লভরামের চলৎশক্তি চলিয়া গেল। তিনি আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। নিজের যুদ্ধ-ব্যবসায়ের কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন।

ফরাসীদের আত্মসমর্পণ পত্র

ফরাসীদের এই প্রলয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধে দুইজন কাপ্তেন এবং দুই শত সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। ইংরাজপক্ষে হতাহতের সংখ্যা বড় কম হয় নাই। সেনানী পোকক এবং অনেকগুলি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আহত ও নিহত হন। কেণ্ট জাহাজের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাহাকে আর সমুদ্রে গমন করিতে হয় নাই। ফরাসীরা শ্বেত পতাকা দেখাইলে যুদ্ধ স্থগিত হইল। ইংরাজপক্ষ হইতে লেফটেনাণ্ট ব্রিটন এবং কাপ্তেন কুক দুর্গে গমন করিলেন। ফরাসীরা নিম্নলিখিত প্রকারে আত্ম-সমর্পণ পত্র প্রদান করেন।

১। পলাতকদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে (যে সকল ইংরাজ সৈন্য পলাইয়া ফরাসীদের সহিত মিলিত হয়)।

উত্তর। পলাতকদিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

২। এই দুর্গের কর্ম্মচারীরা বন্দী হইবে, শপথ গ্রহণ করিলে তাহারা আপন আপন আসবাবপত্র লইয়া যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারিবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে ব্রিটনেশ্বরের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিবে না।

উত্তর। ইহাতে এডমিরাল স্বীকৃত হইলেন।

৩। দুর্গের সৈন্যেরা, যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইবে, সে পর্য্যন্ত বন্দী থাকিবে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডেশ্বর উভয়ের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইলে তাহাদিগকে পণ্ডিচারীতে পাঠাইয়া দিবেন এবং সে কাল পর্য্যন্ত ইংরাজ কোম্পানীর ব্যয়ে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে হইবে।

উত্তর। এডমিরাল ইহা স্বীকার করিয়া বলেন যে, সৈন্যগণকে পণ্ডিচারীর পরিবর্ত্তে মান্দ্রাজ বা ইংলণ্ড, পরে যথায় তিনি স্থির করিবেন, তথায় পাঠাইয়া দিবেন। ফরাসী ব্যতীত যে কোন বিদেশী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইংরাজের অধীনতায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে, সে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে।

৪র্থ। দুর্গের সিপাহীরা যুদ্ধ-বন্দী হইবে না, তাহারা স্বীয় স্বীয় দেশে যাইতে অনুমতি পাইবে।

উত্তর। এডমিরাল ইহা স্বীকার করিলেন।

৫ম। সেণ্ট কনষ্টেট নামক জাহাজের ইউরোপীয় কর্ম্মচারী ও লোকদিগকে—করমণ্ডলকূলে যে জাহাজ প্রথমে গমন করিবে, সেই জাহাজে তাহাদিগকে পাঠাইতে হইবে।

উত্তর। জাহাজের ইউরোপীয় লোকবৃন্দ এবং কর্ম্মচারিগণের অবস্থা সৈন্যগণের সমতুল্য। তাহাদিগকে মান্দ্রাজ বা ইংলণ্ডে অবিলম্বে পাঠান হইবে।

৬ষ্ঠ। ফরাসী রোমান ক্যাথলিক পাদরীদিগকে তাহাদের গির্জ্জা ভাঙ্গার পর তাহাদিগকে যে গৃহ প্রদান করা হইয়াছে, সেই গৃহে ধর্ম্মকার্য্য করিতে যেন দেওয়া হয়। রৌপ্যের অলঙ্কার এবং গির্জ্জার জিনিসপত্র এবং তাহাদের আসবাবপত্র যেন তাহারা প্রাপ্ত হয়।

উত্তর। এখানে কোন ইউরোপীয়কে রাখিতে এডমিরাল স্বীকৃত নহেন। পাদরীরা নিজেদের বা গির্জ্জার জিনিসপত্র লইয়া পণ্ডিচারী বা অন্যত্র গমন করিতে পারেন।

৭ম। এখানকার অধিবাসী, তিনি যে-কোন জাতীয় হউন না কেন, ইউরোপীয়, মুস্তী (মেটে ফিরিঙ্গি), ক্রিশ্চান, কৃষ্ণকায় হিন্দু, মুসলমান দুর্গমধ্যে বা নগরে তাহাদের দখলে যে সকল গৃহ ও দ্রব্যাদি আছে, তাহা তাহাদেরই থাকিবে।

উত্তর। এডমিরাল এ বিষয়ে ন্যায় বিচার করিবেন।

৮ম। কাশিমবাজার, ঢাকা, পাটনা, জগদীয়া এবং বালেশ্বরে যে কুঠী আছে, তাহা তথাকার বড় কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিবে।

উত্তর। এ বিষয় নবাবের সহিত এডমিরালের বন্দোবস্ত হইবে।

৯ম। ডাইরেক্টর, কাউন্সিলার এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ সবস্ত্র যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারিবেন।

উত্তর। এডমিরাল ইহা স্বীকার করিলেন।

[দুর্গ সমর্পণের পর একটি ঘটনা ইংরাজকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে হউক বা কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বারুদে আগুন লাগানতে বিস্তর বহুমূল্য দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে ইংরাজেরা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল। জাহাজের পণ্যদ্রব্য সকল যাহাতে ইংরাজের হস্তে পতিত না হয়, সেজন্য ফরাসীরা গঙ্গাগর্ভে সপণ্য জাহাজ ডুবাইতেও বিস্মৃত হয় নাই। ইংরাজদের হস্তে পতিত হইবার ভয়ে পলাতক সৈন্যসকল উত্তরদিকের অরক্ষিত দ্বার দিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। এজন্যও ইংরাজ ফরাসীদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।]

কুর্ত্তিনের পত্র

[২২শে জুন কুর্ত্তিন, ১৭ জন মেটে ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ, ৪।৫ জন কোম্পানীর ভৃত্য, ২৫।৩০ জন হরকরা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ জন সৈন্য এবং তাঁহাদের আসবাবপত্র বোঝাই ৩০ খানা নৌকা লইয়া তিনি ল'র সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।]

বীরহৃদয় কুর্ত্তিন, তাঁহার স্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, "৭।৮ দিন পরে আমরা শুনিলাম যে, পলাশীর যুদ্ধে ইংরাজ মিরজাফরকে বাঙ্গালার তক্তে বসাইয়াছেন। স্মৃতির কাছে

সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের কথা নিঃসন্দেহে অবগত হইলাম। আমরা মুর্শিদাবাদের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম যে, দুই দিন ধরিয়া আমরা কামানের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। এ অবস্থায় আমি আমার গতির দিক পরিবর্ত্তন করিলাম। যে পর্য্যন্ত না ফরাসী-সৈন্য বাঙ্গালায় পুনরায় আসিতেছে, সে পর্য্যন্ত ভারতের পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থান কর, আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম এবং তদভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ১০ই জুলাই আমি দিনাজপুররাজের রাজধানীতে উপস্থিত হই। ইনি আমার গতিরোধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। আমরা ভয় দেখাইয়া বলিলাম যে, আমাদের গতিরোধের চেষ্টা করিলে তাঁহাকে আমরা আক্রমণ করিব। রাজার ৫ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। যদি রাজা একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি হইত, তাহা আমার অজ্ঞাত। এ স্থানে আমি এক জন ফরাসী সৈনিক দেখিতে পাই। ইনি পলাশী-যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এ স্থান হইতে আমি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি বাঙ্গালার সীমানার বহির্ভাগে উপস্থিত হইলাম, আমার সম্মুখে পর্ব্বত, এ স্থান হইতে ২।৩ দিনের রাস্তা ব্যবধানে। পর্ব্বতে যাইবার আমার বাসনা ছিল। কিন্তু নৌকার মাঝি-মাল্লা কতকগুলা পলাইয়া যাওয়াতে আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সাহেবগঞ্জের রাজা আমাকে দুর্গ নির্ম্মাণের ভূমি এবং আমার যাহা কিছু দরকার হইবে, তাহা প্রদান করিবেন, এরূপ বলিয়া পাঠান। আমি তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া একটি উচ্চ ভূমিতে ত্রিকোণ-দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। সকল প্রকারের কারুকর আমার সহিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে দুর্গের যাহা যাহা দরকার, তাহা সকলই প্রস্তুত হইল। নৌকার মাস্তুল দুর্গের পতাকা-স্তম্ভ হইল। দুইটি কামান ইহার প্রাচীরের উপর স্থাপিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই হাজার পাউণ্ড উত্তম বারুদ প্রস্তুত হইল। দুর্গমধ্যে ইহা রাখিবার নিরাপদ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দুর্গের নামকরণ হইল (Fort Bourgogne)। এ দেশে আমি "ফিরিঙ্গি রাজা" নামে অভিহিত হইলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের আমি পরস্পরের বিবাদভঞ্জন করি, তাহারা আমার কাছে দূত প্রেরণ করে, আমার যশঃ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

"তিব্বতরাজ আমার কাছে এক সময় দূত প্রেরণ করেন, তাঁহার সহিত প্রায় ৮ শত লোক ছিল, আমি তাহাদিগকে নয় দিবস ভোজ দিয়াছিলাম। গমনকালে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে পদমর্য্যাদা অনুসারে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে পাঁচটা ঘোড়া, কয়েক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, ৩।৪ রকম চীনে বাসন, গিল্‌টি করা কাগজ এবং ভুটিয়ারা যেরূপ তলোয়ার ব্যবহার করে, সেইরূপ একখানি তরবারি প্রদান করে।" ইহাদিগকে দৃঢ়কায় এবং বলবান দেখিয়া কুর্ত্তিন ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে মনন করেন। ইহারা গ্রীষ্মাগমের পূর্ব্বেই স্বদেশে প্রত্যাগমন করে; সুতরাং তাহাদের দ্বারা স্থায়িভাবে বিজয়-সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কুর্ত্তিন নির্ব্বাসিতপ্রায় হইয়াও এইরূপে নিজেদের প্রাধান্য-সংস্থাপনের উপায়-চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছিলেন।

[ল মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও ইংরাজ তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য পত্রের উপর পত্র লিখিয়া নবাবকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন।]

লর্ড ক্লাইবের পত্র

ক্লাইব নবাবকে লিখিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তাহারা মহারাট্টা বা পাঠান অথবা অন্য কোন শত্রুকে আহ্বান করিবার কল্পনা করিতেছে। সেই শত্রু এ দেশে আসিলেই উহারা তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে।"

দেওয়ান শিব বাবুর পত্র

নন্দকুমার যথেষ্ট বলিলেও ক্লাইব কিছুতেই প্রত্যয় গেলেন না। নন্দকুমার সমস্ত ঘটনা নবাবকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। এই ঘটনায় নবাব ইংরাজের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এই সময় মথুরমল, খোজা ওয়াজিদের দেওয়ান শিব বাবুকে ইংরাজদের কাহিনীপূর্ণ একখানি পত্র লিখেন, নবাব এই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধ সীমা অতিক্রমণ করিয়া বর্দ্ধিত হইল। এই পত্রে লিখিত হইয়াছিল যে,—"পূর্ব্ব-পত্রে সমস্ত সংবাদ দিয়াছি, এখন শুনিলাম, কামান, যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য এবং বন্দুক, ১১ খানা নৌকায় কাশীমবাজার অভিমুখে নীত হইতেছে। দুইজন তেলেঙ্গা সেপাই স্থলপথে গমন করিতেছে, তাহাদের মুখে শুনিলাম, ৫ শত বাছা গোরাও ৫ শত তেলেঙ্গা অদ্য রাত্রে কাশীমবাজারে যাত্রা করিবে। কাশীমবাজারে নাকি ৩ শত সেপাই জমায়েৎ হইয়াছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিবেন। গুপ্তচর পাঠাইয়া এ বিষয় আরও সঠিক খবর অবগত হউন। আপনি নবাবকে এ কথা নিবেদন করিবেন, দিন-রাত যেন অস্ত্রধারী সৈন্য দেউড়ি পাহারা দেয়। কাশীমবাজারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, তথায় প্রত্যহ গোরা ও সেপাই গমন করিতেছে। আর দুর্ল্লভরাম বাহাদুরকে এ সংবাদ দিবেন, তিনিও যেন সতর্ক হন। সকলে প্রস্তুত থাকিবেন, বেহুঁস হইবেন না। নবাবকে বলিবেন, তিনি নিজেকে কখন যেন সুরক্ষিত বিবেচনা না করেন। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে, আমি তাহা আপনাকে জানাইব।"

এই সংবাদে নবাব উমিচাঁদকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। মিরজাফরকে যাত্রা করিতে আদেশ দেন, ইংরাজের সর্ব্বনাশের শপথ গ্রহণ করিয়া তিনি ল'কে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। এ অবস্থায় ইংরাজ, যাহাতে বিপ্লব শীঘ্র সাধিত হয়, ভিতরে ভিতরে তাহার নিরতিশয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাহাকে বা তাহার স্বার্থের অনুকূল প্রস্তাব করিয়া, কাহাকে বা ভয় দেখাইয়া সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

লর্ড ক্লাইবের পত্র

ক্লাইব মোহনলালকে একখানি পত্রে লেখেন—"নবাবের কার্য্যকলাপ ওয়াট্‌সের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এবং অন্যান্য কার্য্য দেখিয়া আমি বড়ই ভাবিত হইতেছি। এই ধনধান্যপূর্ণ রমণীয় দেশ আমার বোধ হইতেছে যে, যুদ্ধের দারুণ স্বাদ গ্রহণ করিয়া উচ্ছিন্ন যাইবে। আমি আমার প্রত্যেক পত্রে নবাবকে আমার সরলতা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি যদি তাহাতেও বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাকেই ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। আপনার প্রচুর শক্তি এবং আপনার প্রতি নবাবের অনুগ্রহের জন্য আমি আপনাকে আমার মত লিখিলাম। সম্ভবতঃ যদি যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে

তাঁহার বা আমাদের উচ্ছেদ নিবারিত হইতে পারে না। নবাব যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন আমি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, এখন আমার সৈন্যবল বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ সময় আমি কোন অংশে ন্যূন নহি। আপনার মিত্রতার অনুরোধে আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আমাকে যেন নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়। তাঁহার সহিত যেন যুদ্ধ করিতে না হয়। আপনি মনে রাখিবেন, যে স্থানে বিশ্বাস নাই, সে স্থানে শান্তি বা বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না। উকীল তাড়ান এবং ওয়াট্‌স্‌কে ভয় দেখানতে আমি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। নবাব একান্তই যদি তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলেন, এই আশঙ্কায় আমি আমার সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়াছি। নবাব আপনার কথা খুব শুনিয়া থাকেন, আমার অনুরোধ, আপনি তাঁহাকে এরূপ পরামর্শ দিবেন, যাহাতে তাঁহার সম্মান রক্ষিত এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। ইহাতে আপনি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাতি এবং ইংরাজকেও বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইবেন।"

[ক্লাইব মোহনলালকে ২৩শে এপ্রেল যে পত্র লেখেন, তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য, এইরূপে কিছু সময় অতিবাহিত হয়—ইংরাজ ষড়যন্ত্র পাকাইবার পক্ষে আর একটু বেশী সময় প্রাপ্ত হইবে। রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দল নিজেদের দল পুষ্ট করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইবে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ক্লাইব মোহনলালকে নরম-গরম পত্র লিখিলেন। এই তারিখের ক্লাইবের অপর পত্রে কাশীমবাজারে কোম্পানীর যাহা কিছু টাকা-কড়ি আছে, তাহা পাঠাইতে লিখেন—তাহাদের কাছে কিছু সৈন্য ও বারুদ গোলাগুলী পাঠাইবার কথাও লিখিলেন। ঠিক এই তারিখে ফন্দীবাজ ওয়াট্‌স্‌ ক্লাইবকে লিখিলেন—]

ওয়াটসের চিঠি

"এক ঘণ্টার মধ্যে যাহাতে আপনি প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিতে পারেন, সর্ব্বদা এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন—খুব গোপন ভাবে বলদ, গাড়ী ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য ঠিক করিয়া রাখিবেন। আপনি মাল পাঠাইতেছেন, এরূপ ভাবে কিছু বারুদ ও গোলা পাঠাইবেন। একজন প্রবীণ কর্ম্মচারী এবং এক একবারে ৪।৫ জন করিয়া লোক আমাদের দুর্গ-রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নবাব যদি পাঠান-আক্রমণ রোধ জন্য বেশী সৈন্য লইয়া উত্তরে গমন করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে সেই অবকাশে আপনি অক্লেশে নগর ও নবাবের ধন-সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিবেন।"

[একই তারিখের ক্লাইব ও ওয়াট্‌সের পত্র দেখিলেন। ক্লাইব মোহনলালকে লিখিলেন, "নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিতে আমার বড় ইচ্ছা", এইরূপ লিখিয়া নবাবগতপ্রাণ মোহনলালকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। অপর পক্ষে ওয়াট্‌স্‌ মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও ধনরত্ন হস্তগত করিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। রাজদ্রোহী জগৎশেঠ এবং বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর প্রভৃতি নবাব-কর্ম্মচারী যদি ইংরাজের সহিত মিলিত না হইত, তাহা হইলে ইংরাজ কখনই নবাবকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। ইহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরাজকে বুঝাইল, নবাব প্রথম সুযোগে সন্ধি-বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবেন। ইংরাজ বুঝিল, দরবারের যেরূপ অবস্থা, ইহাতে শীঘ্রই একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে। অতএব এই সময় হইতেই ভাবী নবাবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্যতের সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া বণিক ইংরাজ, নবাব হইবার যাহার বেশী সম্ভাবনা, তাহার সহিতই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করেন।]

মিরজাফরের গ্রন্থি-পত্র

[মিরজাফর ও ইংরাজের মিলনের সহিত উমিচাঁদের কিছু মতপরিবর্ত্তন হইল। ইয়ারলতিফ নবাব হইলে উমিচাঁদের পক্ষে অনেকটা ভাল হইত। সে উহার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিত। মিরজাফরের কাছে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কাজেই উমিচাঁদের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। মধ্য হইতে উমিচাঁদ প্রচুর পরিমাণে টাকা হস্তগত করিবে। মিরজাফরেরও ইহা আন্তরিক বাসনা নহে। ষড়যন্ত্র যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ সময়ে উমিচাঁদকে বাদ দিয়া কার্য্য করাও শ্রেয়স্কর নহে। উমিচাঁদ এই আসন্ন সময়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং নবাবের যত ধন আছে, তাহার উপর শতকরা ৫ ভাগ তিনি দাওয়া করিয়া বসিলেন। যদি তাঁহাকে তাঁহার এই প্রস্তাব অনুসারে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি এই ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের কর্ণগোচর করিবেন। উমিচাঁদের টাকার প্রস্তাবে ক্লাইব প্রভৃতি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইল, গায়ে হাত বুলাইয়া কার্য্য উদ্ধারের জন্য ওয়াট্‌স্‌কে পত্রে লিখিলেন যে,—"উমিচাঁদের একটু ভাল ক'রে খোসামোদ ক'রে—তাহাকে বলিবে, সে কোম্পানীর কার্য্যের জন্য যেরূপ শ্রমস্বীকার করিতেছে, তাহাতে তাহার বিলাতে বড় নাম হইবে—এ জন্য তাহার কাছে এডমিরাল, কমিটী এবং আমি বড়ই কৃতজ্ঞ আছি।" ইত্যাদি লিখিয়া উমিচাঁদকে তুষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। বিশ্বাসঘাতক মিরজাফর নিজের জাতি, নিজের ধর্ম্ম, নিজের জন্মভূমির স্বার্থের দিকে একবার না দেখিয়া নিজে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, নিম্নে তাহার গ্রন্থি প্রদত্ত হইল।]

১ম। নবাব সিরাজদ্দৌলা ইংরাজদিগকে যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছেন, তিনিও তাহা রক্ষা করিবেন।

২য়। ইংরাজদের সহিত মিলিত হইয়া এ দেশী বা ইউরোপীয় শত্রুর সহিত তিনি যুদ্ধ করিবেন।

৩য়। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যার ফরাসীদের কুঠী ও মালপত্রাদি যাহা কিছু কিছু আছে, তাহা ইংরাজকে দিতে হইবে, আর তাহাদিগকে কখন এখানে অবস্থান করিতে দিবেন না।

৪র্থ। ইংরাজ সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা-ধ্বংসজনিত ক্ষতি এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ (এক শত লক্ষ সিক্কা টাকা) প্রাপ্ত হইবে। বন্ধনস্থ টাকা মিরজাফর পূরণ করেন।

৫ম। কলিকাতা-গ্রহণজনিত ইউরোপীয়দিগের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার জন্য ৫০ লক্ষ সিক্কা টাকা প্রদান করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। হিন্দুরা এই উপলক্ষে ২০ লক্ষ সিক্কা টাকা পাইবে।

৭ম। আরমেনিয়ানরা ৭ লক্ষ টাকা পাইবে।

৮ম। উমিচাঁদ ২০ লক্ষ সিক্কা পাইবে। (ইহা জাল পত্রে ছিল।)

৯ম। কলিকাতা খাতের ভিতর জমীদারদের যে জমী আছে এবং খাতের বাহিরে চতুর্দ্দিকে ৬০০ গজ পরিমিত ভূমি ইংরাজ প্রাপ্ত হইবে।

১০ম। কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্য্যন্ত এবং গঙ্গা ও ধাপার

মধ্যবর্তী ভূভাগ চিরকালের জন্য ইংরাজ পাইবে। জমীদারেরা ইহার রাজস্ব যেরূপ প্রদান করিত, ইংরাজও সেইরূপ দিবে।

১১। নবাব যখন আমাদের সৈন্য-সাহায্য চাহিবেন, তখন তাঁহাকে ইহার ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার উপরে নবাব দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না।

১৩। নবাব হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ইহা কার্য্যকরী হইবে।

১৪। সন্ধি রক্ষিত হইলে কোম্পানী, নবাবের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে।

ইহার নীচে নাম স্বাক্ষর করিলেন, চার্লস্ ওয়াট্‌সন, রোগার ড্রেক, রবার্ট ক্লাইব, উইলিয়মস্ ওয়াট্‌স্, জেমস্ কিলপাট্রিক, রিচার্ড বিচার।

[এই সন্ধিপত্র দুই রকম কাগজে লিখিত হইয়াছিল। শ্বেতবর্ণের যথার্থ, লালখানি জাল। শেষের খানিতে ওয়াট্‌সন তাঁহার নাম স্বাক্ষর বা শীলমোহর করেন নাই। অষ্টাদশবর্ষীয় সেনারী লুসিংটন, ক্লাইবের আদেশ অনুসারে লাল সন্ধিপত্রে ওয়াট্‌সনের নাম জাল করেন। এরূপ বিপদের সময় ক্লাইব যদি ওয়াট্‌সনের নাম জাল করাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা উমিচাঁদের ন্যায় ধূর্ত্তকে কখনই প্রতারণা করিতে সমর্থ হইতেন না, এবং বঙ্গদেশও তাঁহাদের কখনই পদাক্রান্ত হইত না। বঙ্গদেশই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ, ক্লাইব যদি জালিয়াতি না করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সম্পদ কোথায় থাকিত? আর এক কথা, ক্লাইব-চরিত্র কিছু এরূপ নির্ম্মল নহে যে, তাহাতে এই দোষটিমাত্র পতিত হইয়া তাহা সকলের চক্ষুর অন্তর্গত করিয়াছে। ইংরাজ যদি এই বিপ্লবে অকৃতকার্য্য হইত, তাহা হইলে কেহ এ কথা লইয়া আলোচনা করিত না। কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া নানা দোষের খনি ক্লাইবের উপর আর একটি দোষ আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে তাহার চরিত্রের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। যে কেহ স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধনের জন্য যে কোন দোষাবহ কার্য্য করিয়াছেন, নৈতিক চক্ষে দেখিলে তাহা বড় দোষের বলিয়া বোধ হয় না। যাঁহার হৃদয়ে স্বদেশের গৌরব কিসে বর্দ্ধিত হইবে, এই ভাব প্রবলরূপে অবস্থান করে, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি সম্মানের পাত্র সন্দেহ নাই।]

লর্ড ক্লাইবের চিঠি

ক্লাইব ওয়াট্‌সের কথা অনুসারে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন। ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি ১৩ই জুন মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি নবাবকে এইরূপ মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে,—"আপনি সন্ধি ভাঙ্গিয়াছেন, আমাদের শত্রুকুলের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন—ল'কে মাসিক দশ হাজার টাকা দিয়া পোষণ করিতেছেন—আপনি লিখিলেন, তাহারা কর্ম্মনাশা পার হইয়াছে—অথচ তাহারা ভাগলপুরে রহিয়াছে। আমাদের প্রাপ্য টাকা-কড়িও আপনি দিতেছেন না। টাকার জন্য আমি বড় ভাবিত নই। আপনি বারংবার কথা বদলান বলিয়া আমি ভাবিত হইয়াছি। ইংরাজদের আপনি বড় অবিশ্বাস করেন। তাহাদিগের কাশীমবাজারের কুঠীতে দুষ্ট অভিপ্রায়ে বারুদ, গোলা ও সৈন্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আপনি তথাকার কুঠী খানাতল্লাসী করেন—কাশীমবাজার গমনকালে ইংরাজ অবমানিত হয়—আমাদের উকীলকে আপনি আপনার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি আপনার কৃত অপমান আর কত সহিব? এখানকার সকলের এরূপ মত যে, আমি কাশীমবাজারে উপস্থিত হইয়া জগৎশেঠ, রাজা মোহনলাল, মিরজাফর খাঁ, রাজা রায়দুর্লভ, মীরমদন এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির হস্তে আমাদের এই বিবাদ অর্পণ করিব। তাঁহারা মধ্যস্থ থাকিয়া ইহা নিষ্পত্তি করিবেন। তাঁহারা যদি বলেন, আমি সন্ধি ভাঙ্গিয়াছি, তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত দাবীদাওয়া পরিত্যাগ করিব, আর আপনি ভাঙ্গিয়াছেন, যদি ইহা সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে আপনাকে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও আমাদের সৈন্যের ও জাহাজের সমস্ত ব্যয় দিতে হইবে। বৃষ্টি দিন-দিন বাড়িতেছে, ইহার উত্তর পাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া আমি স্বয়ং আপনার কাছে গমন করিতেছি। আপনি যদি আমার উপর বিশ্বাস করেন, তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। বন্ধুভাবে বলিলাম, যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন।" ক্লাইব এই পত্র লিখিয়া মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। ১২ই ওয়াট্‌স্ কাশীমবাজার হইতে পলায়ন করেন। ১৩ই ক্লাইব মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

নবাবের পত্র

১৫ই নবাব ক্লাইবকে লিখিলেন, "সন্ধি অনুসারে প্রায় সমই ওয়াট্‌সকে দেওয়া হইয়াছে, আর অতি অল্পই বাকী আছে। মাণিকচাঁদ সম্পর্কীয় হিসাবও খুব শীঘ্র শেষ হইতেছে। এ সকল হইলে ওয়াট্‌স্ সদলে বাগানে যাইবার নাম করিয়া রাত্রে পলায়ন করিয়াছে। কু-মতলব ও সন্ধি ভাঙ্গিবার অভিপ্রায়ে এরূপ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আপনার অজ্ঞাতসারে ইহাদের কোন কার্য্য যে হয় নাই, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এই কারণেই আমি পলাশী হইতে সৈন্য আনি নাই। যে ইহা প্রথমে ভাঙ্গিয়াছে, নিঃসন্দেহে ভগবান্ তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন।"

[নবাব স্পষ্ট কথায় নির্ভয়ে ক্লাইবকে লিখিলেন। অপর পক্ষে ক্লাইব নবাবকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। মনের ভাব তখনও গোপন রাখিয়া প্রবঞ্চনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না। নবাব ইংরাজের দ্বিভাবের কাছে পরাজিত হইলেন। তিনি যদি প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, শঠতায় ইংরাজকে পরাজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই রাজ্যচ্যুত হইতেন না।]

ক্লাইব লিখিলেন, "যদি আমি সন্ধি ভাঙ্গিয়া থাকি, তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করিব"। তিনি কোম্পানীর দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করিবেন, এ কথা না লিখিয়া তিনি লিখিলেন, "তিনি নিজের দাবী-দাওয়া পরিত্যাগ করিবেন।" বাস্তবিকপক্ষে ক্লাইবের নিজের কিছুই দাবী-দাওয়া ছিল না, সুতরাং তাঁহার ক্ষতিরও কোন আশঙ্কা ছিল না। ক্লাইবের পত্র এইরূপ ধূর্ত্ততায় পরিপূর্ণ, ইহাতে তাঁহার চরিত্র বেশ ভাল করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সদাশয় প্রভু কর্জ্জন "আমাদের পূর্ব্বজেরা মিথ্যাবাদী ছিলেন, আমরাও কোন কাজের নহি" ইত্যাদি মিথ্যা কথায় আমাদিগকে আবার সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। আবার উন্মুক্ত হইয়াছে। এসিয়াবাসীর উপর পাশ্চাত্য-প্রভাব দিন দিন হ্রাস হইতেছে।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

কৃষি-প্রদর্শনী। সে যে কী বস্তু, চোখে না দেখে আন্দাজ হবে না। উত্তরমুখো ধাওয়া করেছি। দিব্যি ফাঁকা-ফাঁকা। শহর বলব না আর এখন, শহরতলী। হোটেল থেকে মাইল ছয়েক। অগণ্য গাড়ি যাওয়া-আসা করছে—মোটরকার, মোটরবাস, ট্রলিবাস। কাতারে কাতারে মানুষ। একটা জায়গা নিরিখ করে যাচ্ছে সকলে—প্রদর্শনী। চাষবাসের তো ব্যাপার—এত মানুষ তবে কি মজা দেখতে চলেছে? তা-ও মাংনা নয়, তিন রুবল করে দক্ষিণা। নগদ দক্ষিণা দিয়ে প্রতিদিন লাখের বেশি মানুষ দেখতে যায়। বুঝুন। সোবিয়েত দেশের এমুড়ো-ওমুড়ো থেকে মস্কোয় এসে ভিড় করে প্রদর্শনী দেখবার মনন নিয়ে। শুধু সোবিয়েত কেন—আসছে ভুবনের নানা অঞ্চল থেকে। আমরা এই ভারতের দল যেমন চলেছি।

প্রদর্শনী বলতে একটা কি দুটো কিম্বা আট-দশটা বাড়ি ভেবে বসে আছেন নাকি? বিশাল এক উদ্যান-নগরী। মস্ত বড় ফটকে ঢুকে পড়ে আর দিশা করতে পারবেন না। নিবিড় অরণ্য ছিল জায়গাটায়; তার থেকে অনেকগুলো বড় বড় পাইনগাছ রেখে দিয়েছে। এখন চওড়া রাস্তা, পার্ক, লেক, ফোয়ারা, ফুলবাগান, ফলবাগান, লতাগুল্ম, মহীরুহ, ঘর-বাড়ি ও বিচিত্র মণ্ডপমালা এদিকে-ওদিকে। কী যে নেই, সেই ক'টি বলে দেওয়া বরঞ্চ সোজা।

ইস্পাতের এক যুগলমূর্তি সামনে—এক তরুণ কর্মিক আর এক তরুণী কৃষাণী। পাখনার মতন হাত মেলেছে তারা আকাশে; তরুণের হাতে হাতুড়ি, তরুণীর হাতে কাস্তে। সোবিয়েতে নগর ও গ্রামের সমন্বয় ঘটাচ্ছে, শিল্প ও কৃষির মিলন হচ্ছে—যুগল-মূর্তি তারই প্রতীক। প্যারিসে অখিল বিশ্ব শিল্প-মেলা (১৯৩৭) বসে, সেই সময় এটা বানিয়েছিল।

দুটো বড় বড় ফোয়ারা—একটার নাম 'মানুষের মৈত্রী'। সোবিয়েতের ষোলটা গণতন্ত্র—সেই ষোল দেশের মানুষের ষোলটা সোনার বরণ মূর্তি ফোয়ারার চারিদিকে ঘেরা। লক্ষ লক্ষ ধারায় তারা স্নান করছে। আর এক ফোয়ারার নাম 'পাথরের ফুল'। উজবেকিস্তানের প্রাচীন রূপকথা—তারই নামে এই ফোয়ারা। সেই রূপকথা নিয়ে অপেরা হয়েছে, বলসই থিয়েটারে দেখলাম একদিন।

চওড়া স্কোয়ার, ফুলে ফুলে আচ্ছন্ন। আরো অনেক ফোয়ারা—ফুরফুর করে ঝরছে অবিরাম। পাশ দিয়ে এগিয়ে চলুন। কত মানুষ যাচ্ছে পাশাপাশি—পুরুষ-মেয়ে বুড়ো-শিশু সাদা-কালো—রকমারি চেহারা, বিচিত্র সাজপোশাক! দুটো মণ্ডপ সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে—মুখ্যমণ্ডপ আর যন্ত্রমণ্ডপ। একটার সোনালি মাথা, অন্যটার মাথা কাচের। মুখ্যমণ্ডপ হল গোটা কৃষিপ্রদর্শনীর ভূমিকা। অক্টোবর-হলে ঢুকলেন—অগ্নিবর্ণ দেয়াল, বিপ্লবের আগুনের মধ্যে নব-রুশের জন্ম সেইটে মনে করিয়ে দেয়। আসুন এবারে কনস্টিট্যুশান-হলে। উজ্জ্বল আলোয় বিভাসিত—বিপ্লবের পর জনগণ বিপুল অধিকার লাভ করল, ঘরময় সেই আনন্দ ঝলমল করছে। পাশের হলগুলোয় দেখুন এবার—ধাপে ধাপে জাতির অগ্রগমন—আটত্রিশ বছর আগে সমাজতন্ত্র চালু হল, ঘুণ-ধরা রাষ্ট্র-কাঠামো চুরমার করে অর্থনৈতিক নতুন বিধান গড়ে তুলল, সেই ইতিহাস ছেঁকে তুলে ধরেছে লোকজনের সামনে।

ইতিহাসই শুধু নয়—বাইরে আসুন, ভূরিপরিমাণ উৎপাদনের ঘুরে ঘুরে আন্দাজ নিন। ভবিষ্যতের আরও বিপুলতর পরিকল্পনা। মা বসুন্ধরার কাছে এতকাল ভিক্ষা চেয়ে এসেছি—দামাল সন্তানেরা জোর-জবরদস্তি করছে এবারে—পেট ভরে না, তবে আরো দিবিনে কেন আমাদের? আরো আরো চাই। ম্যালথসের আতঙ্ক এরা অমূলক প্রমাণ করেছে। ম্যালথস হিসাব করে দেখালেন, পঁচিশ বছরে কোন দেশের জনসংখ্যা যদি দুনো হয়ে যায়, খাদ্য-উৎপাদন সেই বিশেষ অবস্থায় কিছুতেই দুনো হতে পারবে না। অতএব উপবাস ও দারিদ্র অনিবার্য যদি না জন্মনিয়ন্ত্রণ কর। এরা হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে অন্য রকম। পঁচিশ বছরে খাদ্যশস্যের উৎপাদন দুনো নয়, চারগুণ হয়েছে। আলুও হয়েছে চারগুণ, দুধ তিনগুণ, মাংস দ্বিগুণের কিছু বেশি। অতএব বাড়ুক জনসংখ্যা, বেশি বেশি খাক মানুষে।

রুশ-মণ্ডপে ঢুকেছি। অনেকগুলো ঘর-বারাণ্ডা ও প্রাঙ্গণ নিয়ে নিয়ে এক এক মণ্ডপ। মানুষের ছবি দেয়াল ভরা—যারা ফসল ফলাচ্ছে, শিল্পকর্ম করছে। পৃষ্ঠপট সোনার রঙের। মানুষই হল সোনা—রাষ্ট্রের সব চেয়ে বড় সম্পদ। নানা রকম সংখ্যাতত্ত্ব দিয়েছে, পণ্ডিতজনেরা টুকে টুকে নিচ্ছেন—কোন ফসল কি পরিমাণ ফলল তারই হিসাব। রুশ গণতন্ত্রের মধ্যে কৃষি-কলেজ সাতান্নটা; সেকেণ্ডারি কৃষি-ইস্কুল ৩৫৬টা; স্বল্প সময়ে শিক্ষার কৃষি ইস্কুল ৪৯৯টা; রিসার্চ ও এক্সপেরিমেণ্ট ইস্কুল ৭০০টা। নিরক্ষর একজনও নেই। বই ছাপা হয়—তারও হিসাব রয়েছে—প্রতি বছর সত্তর কোটি। কাচের আবরণের মধ্যে দিগব্যাপ্ত গমের ক্ষেত। সত্যিকার ফলন্ত গম সামনের খানিকটা জায়গায়, পিছন দিকটা ছবি—সত্যিকার ফসল আর ছবির ফসলে আশ্চর্য্য রকম মিলিয়ে দিয়েছে। লাল রঙের বাঁধাকপি দেখলাম, আর রাক্ষুসে আয়তনের আলু। সূর্যমুখী ফুলের দেদার চাষ হচ্ছে—শোভার জন্য শুধু নয়, বীজ থেকে তেল আদায় করে।

পশু-পালনের ঘরেও অমনি অনেকটা জায়গা কাচে ঘেরা। তার মধ্যে সুবিস্তীর্ণ ঘাসের জমি—ছবির পশুরা চরে বেড়াচ্ছে। দেয়ালে দেয়ালে গরু-ভেড়া ছাগল-শূকর হাঁস-মুরগির ছবি। টিনের দুধ ও পনীর থেকে শুরু করে জুতো ব্যাগ কার্পেট ও মাংসের তৈরি নানা খাদ্যদ্রব্য টেবিলে সাজানো।

উজবেকিস্তানের মণ্ডপে ঢুকে পড়ে অবাক—ঘর না তুলার ক্ষেত?

দেয়ালের প্লাষ্টারেও যেন থোপা থোপা সাদা তুলা সাজিয়ে রেখেছে। উজবেকিস্তানের কথা তো জানেন—মরু ও স্তেপভূমি। অগণ্য খাল কেটে আর বাঁধ বেঁধে দেশময় জলসেচের ব্যবস্থা করে ফেলেছে—মরুভূমি সবুজ ফসলে হাসছে এখন। তুলার ফসল সব চেয়ে বেশি। এক দিককার দেয়ালে সারবন্দি বড় বড় ছবি। কোন মহাজন এঁরা—চেহারায় তো চিনতে পারিনে। কৃষক বীর—চাষে খুব দড়, ক্ষেতে বিস্তর ফসল ফলিয়েছেন। বীরবৃন্দের উপর মহাবীরেরা আছেন—বড় বড় কোলখোজ অর্থাৎ যৌথ-খামারের যাঁরা অধিনায়ক ছিলেন। মার্বেল পাথরের মূর্তি গড়িয়ে রেখেছে, বিস্তর মেডেল ও সম্মান-চিহ্ন তাঁদের বুকে। তুলার ঘর থেকে চলুন রেশমের ঘরে। বাঁশ জন্মাচ্ছে খুব, আস্ত এক বাঁশঝাড় পুঁতে নমুনা দেখাচ্ছে। আগে বলত আখের চাষ ওখানে সম্ভব নয়। কিন্তু মিচুরিন আর তাঁর শিষ্যপ্রশিষ্যেরা যেখানে ঘাঁটি করে আছেন, কোন গাছের সাধ্য নেই গোঁ ধরে থাকা। যাকে যেখানে খুশি নিয়ে বসাবে—প্রসন্ন হয়ে ডালপাতা মেলতে হবে, ফুলফল ফলাতে হবে। অতএব আখ ফলছে ১৯৪৭ অব্দ থেকে। আখে, চিনি নয়, রম মদ বানায়। চিনি তৈরি হয়ে সুগার-বীট থেকে; তার চাষ প্রচুর। সেরাকুলের জন্য বিখ্যাত এই তল্লাট। এক রকম পাতলা কোমল চামড়া। কালো রঙের টুপি ও পোশাক বানায় সেরাকুল থেকে।

জর্জিয়া ষ্ট্যালিনের দেশ; মণ্ডপে ঢুকেই ষ্ট্যালিনের প্রকাণ্ড ছবি। রকমারি ফলের জন্য জর্জিয়ার নাম; আর নাম মদের জন্য। সিনেমা ছবির মতো পর পর সাজিয়ে দিয়েছে—আগে দেশটার কেমন হাল ছিল আর এখন কি অবস্থা। সেকালের পতিত জলাজমি ফলে শস্যে মানুষের আনন্দে ঐশ্বর্যে অভিনব রূপ নিয়েছে।

ছোট বড় সকল অঞ্চলের নামে নামে এমনি সব মণ্ডপ। প্রতিটি মণ্ডপ আলাদা—চেহারায় অঞ্চলের বিশেষ শিল্পরীতি। প্রদর্শনীর ফলোৎপাদন বিভাগে চলে যান এইবার। গিয়ে মজাটা দেখুন। রকমারি ফল। মিচুরিনের হাতের জাদু। বৈজ্ঞানিক মিচুরিন প্রকৃতির উপর বিষম এক হাত নিয়েছেন, দুনিয়ার মানুষ সে খবর জানেন। গাছপালার চরিত্র অবধি বদল হয়ে যাচ্ছে। এক আবহাওয়ার গাছ শক্তি জুটিয়ে নিয়েছে অন্যত্র গিয়ে বেঁচে থাকবার। ফলে নতুন স্বাদ আসছে। ধরুন, আমড়া হবে মিষ্টিফল, এবং পেঁপে হবে টক। কিম্বা আমে কাঁঠালে মিশাল করে এক রকম ফল, যার মধ্যে আমের মিষ্টতা কাঁঠালের গন্ধ। হেসে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই—বলুন না মিচুরিনের দলবলকে চেষ্টা করে দেখতে। চুলের মুঠি ধরে খেলাচ্ছেন ওঁরা প্রকৃতিকে। উৎকৃষ্ট পিয়ার ফল—সুগন্ধ ও ওজনে ভারী, উষ্ণ অঞ্চলে ফলত—সে গাছকে এখন হিমসহন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। গম ফলছে এখন সকল অঞ্চলে, এবং প্রায় সর্বঋতুতে। সব চেয়ে মজা লাগল, লতানো আপেল গাছ ও চেরি গাছ দেখে। মহীরুহ হয়ে মহা দাপটে বিরাজ করতেন—কি হাল করেছে দেখুন, একেবারে ললিত লবঙ্গলতা!

বিস্তর মানুষ ফল-তরকারি নিয়ে বেরুচ্ছে। বাজার আছে নাকি এর ভিতরে? বাজারই বটে। প্রদর্শনীর যাবতীয় ফল-তরকারি তিন তিন দিন পরে বিক্রি করে দেয়, নতুন এনে সাজিয়ে রাখে। আর ক'দিন পরে নবেম্বর পড়লে প্রদর্শনী বন্ধ। বন্ধ হয়ে থাকবে কয়েক মাস—বরফে চতুর্দিক ঢেকে থাকবে। টাটকা ফলপাকড়ও দুর্লভ হয় সেই সময়টা।

একটি মেয়ে আলাপ জমিয়েছে প্রফেসার গুপ্তর সঙ্গে। ভারি হাসে। বয়স কম, মিষ্টি হাসি মাখিয়ে দেয় প্রতি কথায়, দেখতে সুন্দর লাগে। গুপ্ত আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন—খুব নাম-করা লোক। মেয়েটি বলে, আমি কিন্তু একেবারে অনামি। নাম লিউবা। অর্থাৎ লভ—ভালবাসা।

লভ নামটা বেমানান নয় তোমার—

চোখ বড় বড় করে লিউবা বলে, বলেন কি! ভালবাসায় পড়ে যাবেন না সত্যি সত্যি। খেটে খেতে হয় আমায়, প্রদর্শনী দেখিয়ে বুঝিয়ে বেড়াতে হয়। ঝামেলায় পড়লে মুশকিল।

খিলখিল করে হাসল তরুণী। জড়তা নেই, নির্ঝরের মতো। হাসতে হাসতে গল্প করতে করতে চলল আমাদের সঙ্গে। ঘরোয়া সাদামাঠা কথা—প্রদর্শনীর সম্বন্ধে যা দু-একটা জিজ্ঞাসা করি, জবাব দেয়।

ওদিকে আটক করেছে একদল বাচ্চা আমাদের। দোষ বাচ্চাদের নয়, মায়েরা লেলিয়ে দিচ্ছেন—ঐ যাচ্ছে সবাই, পাকড়ো—। ছুটোছুটি করে এলো তারা, কাছে এসেই কিন্তু লজ্জা। কচি কচি হাত লজ্জা ভয়ে একটুখানি বাড়িয়ে ধরে। সেকহ্যাণ্ড করো, অন্তত পক্ষে ছুঁয়ে দাও একটু। শিশু লাইব্রেরি দেখবার সময় বলেছিল, সব দেশের মানুষ এক, সব মানুষ আপন—ছেলেদের এইটে ভাল করে শেখাই আমরা। মায়েরাও তাই শেখান, এই তো দেখতে পাচ্ছি। চীনেও ঠিক এই বস্তু দেখেছি—বাচ্চা বয়স থেকে সকল দেশের মানুষকে ভালবাসতে শেখায়।

পল চেঁচাচ্ছে ওদিকে, কি হল তোমাদের? চা খেতে যাই চলো। খেয়ে এসে তারপরে যন্ত্রমণ্ডপটা দেখা যাবে। অন্য কিছু দেখার সময় হবে না।



লেনিন লাইব্রেরিতে—ওদের বই দেওয়ার পদ্ধতি দেখছি।

আর্তকণ্ঠে আমরা বলি, বন্দী করেছে এই দেখ। এসে উদ্ধার করে নিয়ে যাও।

বিস্তর কষ্টে ফাঁক কাটিয়ে হনহন করে বেরিয়ে পড়লাম। মোটরে নিয়ে তুলল। চলেছে তো চলেইছে। কোথায় নিয়ে যায় রে বাপু চা খাওয়াতে? কেউ বলে হোটেলে মেট্রোপোলে ফেরত নিয়ে যাচ্ছে—চা খাইয়ে আবার পাঠাবে। লেকের ধারে ধারে গাছপালার ছায়ার মধ্যে নিয়ে তুলল রেস্তোরায়—ও হরি, প্রদর্শনীরই রেস্তোরা, এলাকার ভিতরে। কত বড় জায়গা নিয়ে প্রদর্শনী বানিয়েছে, ঘোরাঘুরিতে ভাল করে মালুম পাই।

রেস্তোরায় যাওয়া মাত্র খাবার মেলে না—অর্ডার মতন গরমাগরম বানিয়ে দেয়, বিস্তর সময় লাগে। খেয়ে এসে দেখি, মণ্ডপগুলোর দরজা বন্ধ হয়ে গেছে, লোকজন বড় বেশি নেই, থমথমে নির্জনতার ভাব। শুধু মাত্র যন্ত্রমণ্ডপটা খুলে রেখে জনকয়েক অপেক্ষা করছেন আমাদের দেখানোর জন্য। কাচের গম্বুজ—ভিতরে ঢুকে আয়তনের আন্দাজ পাই, বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এত বড় কাচের ঘর মস্কো শহরে আর নেই। ট্রাক্টর, চাষের নানান যন্ত্র, নানা জাতীয় প্লেনের নক্সা ও নমুনা, অসংখ্য বৈদ্যুতিক কলকব্জা—এঘরে-ওঘরে ছুটোছুটি করে এক রকম নমো-নমো করে দেখতেও ঘণ্টা খানেক লেগে গেল।

হোটেলে ফিরে দেখি, বিনয় রায় এসেছেন। অন্যায় হয়ে গেছে, বিনয় রায়ের কথা বলিনি এদ্দিন আপনাদের। মস্কোয় পৌঁছে সেই সন্ধ্যাবেলাই তাঁর বাসার খোঁজ নিয়ে ফোন করেছি। বাসায় পাত্তা মিলল না তো রেডিওয়। মস্কো রেডিও-র বাংলা বিভাগ—বাংলা কথা-বার্তা ও বাংলা গান শোনেন যেখান থেকে—বিনয় তার কর্তা। আরও তিনজন আছেন ঐ বিভাগে—বিনয়ের স্ত্রী জয়া দেবী, গুজরাটের মেয়ে তিনি; এবং রুশ তরুণী ভাল্যা ইসোরিবোভা ও রুশীয় যুবা বরিস কাপুস্কিন। রেডিও-অফিসেও বিনয় ছিলেন না সেদিন। নাম জানিয়ে দিয়েছিলাম, তাই এসেছেন খবর নিতে। চুপচাপ এক জায়গায় বসা ওঁর কুষ্ঠিতে নেই, এসে অবধি চক্কোর মেরে বেড়াচ্ছেন এঘর-ওঘর উপর নিয়ে।

বিনয়কে জানেন আপনারাও। আই, পি, টি, এ, নিয়ে মেতে ছিলেন একসময়ে, তার সেক্রেটারি—উঁহু, কিছুই বলা হল না—ঐ প্রতিষ্ঠানের জান-প্রাণ সমস্ত। বছর কয়েক এখন মস্কোয় পাকাপাকি আস্তানা নিয়েছেন। ভারতের মানুষ পেলে স্ফূর্তির অবধি থাকে না, সর্ব উপায়ে খেদমত করেন। আর বাঙালি হলে তো কথাই নেই, এক সাঁজ বিনয়ের বাড়ি মাছের ঝোল-ভাত বাঁধা। এবং গুজরাটিদেরও তাই—মাছ খান না, তাঁদের ডাল-ভাত। দু-তরফের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ—আমরা জয়া দেবীর শ্বশুরবাড়ির লোক, ওঁরা বিনয়ের শ্বশুরবাড়ির লোক।

বিনয়কে দরকার, এদের ভিতরের কথা শুনে নেবো। যেমন দাশগুপ্তকে পেয়ে গিয়েছিলাম।—এত ছটফট করলে হবে না কিন্তু। ফিরে আসি তাজিকিস্তান থেকে, একদিন ঠাণ্ডা হয়ে বসে সমস্ত কথার জবাব দেবেন।

হাঁ-হাঁ—

একবার হাঁ বলে সুখ হয় না, দু-বার বলা বিনয়ের রীতি। দুটো-একটা কথার পরেই উঠে দাঁড়ালেন তিনি। কাজের অন্ত নেই। রেডিওর অতবড় দায়িত্ব, তার উপর য়্যুনিভার্সিটিতে পাঁচ বছরের পুরো কোর্স নিয়ে পড়াশুনো করছেন। তারই মধ্যে ফাঁক কাটিয়ে ঘোরাঘুরি আছে এমনি।

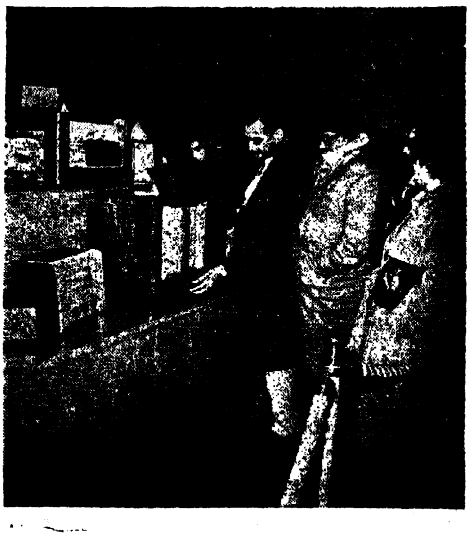
দেশে-ঘরে যাবেন না?

হাঁ-হাঁ। দেশে যাব বই কি। দেশ ছাড়ব কার ভয়ে? তবে পাকাপাকি গিয়ে থাকব কেমন করে? এখানে ধরুন আমি আর আমার স্ত্রী দু-জনে মিলে—

আঙুলের কর গুণে হিসাব করছেন। দু-জনের মাইনে এবং লেখা ও অনুবাদের দক্ষিণা নিয়ে মাসে পাঁচ হাজার রুবলের মতো দাঁড়িয়ে যায়। হেসে বললেন, দেশে ফিরে গেলে আপনারা পঞ্চাশ টাকাও তো দিতে চাইবেন না!

১২

২০ অক্টোবর, বুধবার। সকালবেলা উঠে কাচের জানলার পর্দা সরিয়ে দেখি, আশ্চর্য ব্যাপার, কুন্দফুলের বৃষ্টি হচ্ছে মস্কোয়। ঘরে কি থাকা যায়? তাড়াতাড়ি পোশাক এঁটে দুড়দাড় সিঁড়ি ভেঙে ঘড়াং করে ভারি ফটকটা খুলে একেবারে বাইরে। ছাতের তলে দাঁড়িয়ে সুখ হল না—বাইরে, ফুটপাথের বরফ মাড়িয়ে মাড়িয়ে থিয়েটার-পার্কের কাছ বরাবর চলে এলাম। সর্বদেহের মধ্যে মুখের ইঞ্চি চারেক জায়গা তো আলগা—হিমে এমন কনকন করছে যে ক্ষণে ক্ষণে হাত চাপা দিতে হয় মুখের উপর। জমে গিয়ে পার্কের ঐ ষ্ট্যাচুর মতন পাথর হয়ে না যাই। আরে ষ্টাচু গেল কোথায়—গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ গাদা দিয়ে রেখেছে যেন ওখানটায়। পথে পার্কে সর্বত্র রাতারাতি যেন বস্তা বস্তা



কৃষি-প্রদর্শনীর যন্ত্রমণ্ডপে

রাত বশি হয়েছে, বড্ড শীত করছে আমার]

ময়দা ঢেলে সাদা করে দিয়েছে। বড় বড় গাছের গুঁড়ি মালুম হচ্ছে—ডালপাতা সমস্ত সাদা। এমন জিনিষ একলা দেখে সুখ হয় না—ঢুকে পড়লাম আবার হোটেলে। মনে মনে শঙ্কা, দুর্যোগ দেখে আজকের বেরুনো বাতিল করে না দেয়। ব্রেকফাস্ট টেবিলে অবিরত তাগাদা দিচ্ছি, কই গো, কখন বেরুচ্ছি আজ? বাইরে বড় মজা। তাড়াতাড়ি করো।

পর্দা সরিয়ে দিয়ে কাচের জানলায় বসে বসে চিঠি লিখছি। দেশের জন্য মন কেমন করে উঠল, আপন-মানুষদের কথা মনে পড়ছে—আহা, এমন ছবি দেখতে পেলে না তোমরা! পুরাণে পুষ্পবৃষ্টির কথা পড়ি, দেখতে পাচ্ছি তাই চোখের উপরে।

প্রোগ্রাম একেবারে বাতিল নয়—শুধু মাত্র একটা জায়গায়, লেনিন লাইব্রেরি। তা এই এক জায়গা দেখেই স্বচ্ছন্দে একটা মাস কাবার করা যায়। সোবিয়েত দেশের মানুষ মোটামুটি দু'শ কোটি; আর বই কেনাবেচা হয় আশি কোটি বছরে। অর্থাৎ কোলের বাচ্চা থেকে থুথুড়ে বুড়ো অবধি হিসাব করে গড়ে আড়াই জনে একটা করে বই কেনে। যথাধর্ম বলছি—এর মধ্যে গালগল্প নেই, আঙ্কিক যোগ-ভাগের ব্যাপার। বই তা হলে কি সাংঘাতিক বস্তু ওদের জীবনে ভেবে দেখুন। লাইব্রেরি গোটা সোবিয়েত জুড়ে তিন লাখ সত্তর হাজারের উপর। তুষারে ঢাকা মেরুর দেশে লাইব্রেরি, পৃথিবীর ছাত পামিরের উপরে লাইব্রেরি। এই যাচ্ছি মস্কো শহরের কেন্দ্রে আঠারোতলা প্রাসাদের বনেদি লাইব্রেরিতে। আবার আছে অসংখ্য চলতি লাইব্রেরি—রাখালেরা এদেশ-সেদেশ গরু-ভেড়া চরায়, সৈন্যেরা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ঘোরে, তাঁবুর লাইব্রেরিগুলোও চলে তাদের সঙ্গে সঙ্গে। নেশাখোর লোকের ভাত জুটুক না জুটুক নেশার বস্তু চাই-ই, এদেরও সেই ব্যাপার। মরার পরে কফিনের ভিতর খানকতক বই ঢুকিয়ে দেয় না কেন তাই ভাবি।

লেনিন লাইব্রেরির পাশ দিয়ে কত দিন বেরিয়ে গেছি, আজকে চত্বরে এসে নামলাম। চারতলা বাড়ি সামনে থেকে মালুম হয়, ভিতর দিকে নিচু ছাতের আঠারো তলা বানিয়েছে বই রাখবার প্রয়োজনে। লেনিনের বিশাল মূর্তি সামনে। ঘরে ঢুকলাম। এবং যেমন হয়ে আসছে, চীফ-সেক্রেটারি হাঁ-হাঁ করে এসে পড়লেন: আসুন—আসতে আজ্ঞা হোক। ডিরেক্টর মশায় একটা কনফারেন্সে আটকা পড়ে গেছেন, এসে পড়বেন এখনই। সেক্রেটারির ডান হাত কাটা, লড়াইয়ে হস্তদান করে এসেছেন। বাঁ হাতে সেকহ্যাণ্ড করছেন।

সোবিয়েতের মধ্যে সকলের সেরা লাইব্রেরি—পৃথিবীর যত বড় বড় লাইব্রেরি আছে, তার একটি। বই আছে এক কোটি সত্তর লক্ষ। অমন ভারি একটা অঙ্ক সহসা মাথায় আসে না। মনে করুন;—আঠারোটা তলা জুড়ে যত বইয়ের শেলফ আছে, সমস্ত মাটিতে নামিয়ে পাশাপাশি শুইয়ে দেওয়া হল; তা হলে একশ' তিরিশ মাইল অর্থাৎ কলকাতা থেকে আসানসোল পার হয়ে চলে গেল। আমেরিকার কংগ্রেস লাইব্রেরি ছাড়া এত বই কোথাও নেই, কিন্তু পাঠক তার দশগুণ এখানে। এটা ছাড়া আরও দু-হাজার লাইব্রেরি আছে মস্কোয়। সে সব জায়গাতেও ভিড় বিষম। তা-ও কুলোচ্ছে না। মস্ত বড় নতুন বাড়ি হচ্ছে লেনিন লাইব্রেরির। রিডিং-রুমগুলোয় মাত্র পাঁচ হাজার মানুষের জায়গা। এতে কি হবে বলুন? নতুন বাড়ি হয়ে গেলে পাঁচ হাজারের জায়গায় দশ হাজার মানুষ বসে পড়াশুনো করবে। আর এমন ঘিঞ্জিও হবে না তখন।

সকাল ন'টা থেকে রাত সাড়ে-এগারোটা পর্যন্ত লাইব্রেরি খোলা থাকে। পড়াশুনা করবেন তো ঝটপট একটা কার্ড করে ফেলুন। এক বছর চলবে, তার পরে বদলে নেবেন কার্ড। গবেষক কিম্বা লেখক হন তো বই বাড়ি নিতে দেবে, অন্যথা এইখানে বসে বসে পড়ুন-যতক্ষণ আপনার খুশি। গবেষকদের ভারি খাতির, এরই মধ্যে নিরিবিলি ব্যবস্থা আছে, অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা তাঁদের জন্য। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখলাম একটু; যেদিকে যাই না, সঙ্কোচ হয়, গা ছমছম করে। সূঁচ পড়লেও বুঝি শব্দ পাওয়া যাবে—বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে কাগজের উপর, তারই সামান্য একটু খসখসানি।

চারশ' বছর আগে ওদের বই ছাপা শুরু হয়—সমস্ত ছাপা বইয়ের সংগ্রহ এখানে, একখানিও বাদ নেই। বই ছাপা হলেই তিন কপি করে পাঠাবার নিয়ম; অতিরিক্ত এরা পয়সা দিয়ে কেনে। চাহিদা বুঝে কোন কোন বইয়ের আড়াই শ' কপিও কিনেছে, জায়গার অকুলান না হলে আরও বেশি কিনত। বিদেশি বইও বিস্তর কেনে। বছর বছর বই বেড়ে যাচ্ছে—জায়গা বাঁচাবার এক কায়দা বের করেছে—মাইক্রোফিলম। পুরো পৃষ্ঠার ফোটো নেওয়া আধ ইঞ্চি জায়গার মধ্যে। সাদা চোখে কিছুই বুঝবেন না—রেণু পরিমাণ কতকগুলো ফুটকি। যন্ত্রে ফেলে অবাধে পড়ে যান, সাধারণ বইয়ের চেয়ে তখন অনেক মোটা হরফ দেখাবে। একটা দুষ্প্রাপ্য বই কিছুতে সংগ্রহ হচ্ছে না, দু-চার দিনের জন্য চেয়ে-চিন্তে এনে মাইক্রোফিলম তুলে নিয়ে বই ফেরত দিয়ে দিল। অথবা যে বইয়ের একটা কপি জোগাড় হয়েছে, ফিলম তুলে তার সংখ্যা বাড়িয়ে নিল। ষাট হাজার মাইক্রোফিলম তুলেছে এখন অবধি। কাজ বন্ধ নেই, রোজই তুলছে। আমাদের ভারতীয় দল দেখে তড়িঘড়ি একটা ভারতীয় বইয়ের মাইক্রোফিলম যন্ত্রে ফেলে পড়তে লাগল। ভাগ্যবশে সেটা বাংলা বই—আমাদের শ্রদ্ধার্হ বন্ধু ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'সমালোচনা-সাহিত্য'। ভারি স্ফূর্তি লাগল নানান এলাকার ভারতী ভাইদের সামনে বাংলা বইয়ের খাতির দেখে। স্ফূর্তির চোটে ঐ লাইব্রেরিতে বসেই দু-ছত্র চিঠি লিখে ফেললাম ডক্টর বন্দ্যোর নামে। চিঠি তখনই ডাকে পাঠালাম।

আপনি আমি চাইলে বই বাড়ি নিতে দেবে না, কিন্তু অন্য লাইব্রেরিকে দেদার ধার দিচ্ছে। বই মস্কোর বাইরে চলে যাচ্ছে সেই মধ্য-প্রাচ্য অবধি। তাতে খুব দরাজ ব্যবস্থা। তা হলে দেখুন, লেনিন লাইব্রেরির বই মস্কোয় বসে পড়া যায়; আবার পড়ছে দেশের অতি দূর প্রান্তে বসেও। অন্যান্য বহু লাইব্রেরির বইয়ের হিসাব রাখে এরা, তাদের ক্যাটলগ বানায়, নানান বিষয়ে সাহায্য করে। ভারতীয় বইয়ের খবরাখবর নেওয়া ও ক্যাটলগ বানানোর ভার অধ্যাপক বগদানভের উপর।

বিরানব্বুই বছর আগে লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা, সে হিসাবে নিতান্ত অর্বাচীন। আগে রাশিয়ার মধ্যে পিটার্সবার্গ লাইব্রেরি সকলের সেরা ছিল, এটা দ্বিতীয়। বিপ্লবের পর রাজধানী মস্কোয় চলে এলো, লাইব্রেরিটা সেই থেকে পুরোপুরি সরকারি প্রতিষ্ঠান—নতুন নামকরণ হল সেন্ট্রাল অথবা লেনিন লাইব্রেরি।* বৃটিশ মিউজিয়াম অনেক পুরানো (১৭৫৩ অব্দে জন্ম)। একশ' বছর আগে একজন

রুশীয় বৃটিশ মিউজিয়াম দেখে এসে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেন ; ঐ বৃটিশ মিউজিয়ামের উপদেশ নিয়ে তাদেরই পথ ধরে লাইব্রেরি গড়ে তোলা হয়। ১৯৪২ অব্দে আশী বছর বয়স হল ; সেই উৎসবে বৃটিশ মিউজিয়ামের ডিরেক্টর নিজে এসে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বৃটিশ মিউজিয়াম আজকে পিছনে পড়ে গেছে ; লেনিন লাইব্রেরির অনেক বেশি সচ্ছলতা। দুই কোটি পাঁচ লক্ষ পাণ্ডুলিপি জোগাড় করেছে, বেশির ভাগ রুশীয় ; বিদেশিও আছে কিছু কিছু। এগারো শতকের পাণ্ডুলিপি দেখলাম, আশি বছর আগেকার সংগ্রহ। একশ' ষাটটি ভাষার বই আছে এখানে।

আঠারো শ' কর্মচারী কাজ করে এখানে। মাইনে দু'শ থেকে চার হাজার রুবল। দুই কোটি সত্তর লক্ষ রুবল বছরে খরচ করে। কর্মচারীদের নিজেরা ট্রেনিং দিয়ে নেয়। কেমিস্ট্রির জ্ঞানও কিছু কিছু চাই তাদের. বই পরিরক্ষণ শিখতে হয়—বইয়ে পোকা না ধরে, ড্যাম্প না লাগে, কাগজ শুকিয়ে খড়খড়ে না হয়। বইয়ের কাগজ সুদীর্ঘ স্থায়ী করবার কায়দাও ওরা আবিষ্কার করেছে।

বাইরের হাজার তিনেক লাইব্রেরির সঙ্গে বইয়ের লেনদেন। তাদের সেখানে কত লোকে পড়ে সঠিক হিসাব নেই। হাজার পঞ্চাশের মতন আন্দাজ করা যায়। বই ধার দেয় এক মাসের জন্য—পৌঁছে দিতে এবং ফেরত আনতে যে সময়, সেটা এর মধ্যে নয়। বই দুষ্প্রাপ্য হলে অথবা বইয়ের এক কপি মাত্র থাকলে মূল-বই হাতছাড়া করে না, মাইক্রোফিলম পাঠিয়ে দেয়।

ক্যাটলগ হাতড়াচ্ছি। ভারতীয় বইয়ের তালিকায় চোখ বুলিয়ে গেলাম। বাংলাই বেশি, শ-দুয়ের কাছাকাছি। সবই প্রায় সেকালের। মাইকেল বঙ্কিম আছেন, তার এদিকে বেশি নেই। রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ খানকয়েক আছে, মূল-বাংলা দেখতে পেলাম না। আধুনিক বইও অতি সামান্য। (এখানে না থাক, গর্কি ইনস্টিট্যুট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ প্রচুর পরিমাণে আছেন।)।

প্লিনির লেখা বই আছে, ১৯৬৯ অব্দে ইতালিতে ছাপা। টমাস মুরের বিরাট-বপু বই 'উটোপিয়া'—১৫১৮ অব্দে ছাপা। কোপার্নিকাসের বইয়ের প্রথম সংস্করণ। ভগবদ্‌গীতার মস্কো সংস্করণ ১৭৮৯ অব্দে ছাপা। নলদময়ন্তীর মস্কো সংস্করণ ১৮৪৫ অব্দে ছাপা। রামায়ণ মহাভারতের পুরাপুরি অনুবাদ। রুশ পরিব্রাজক আলফান্সি নিকিন পনের শতকে ভারত ভ্রমণ করেছিলেন, তাঁর লেখা ভ্রমণ-কথা দেখলাম। উনিশ শতকে ছাপা ভারিক্কি রকমের এক এলবাম দেখে মজা লাগল—শিল্পীর নাম সাল্তিকোপ্‌ট্ (Saltykopt), তার মলাটে বাংলার মন্দির, ভিতরেও খাসা খাসা ছবি এদেশের।

আঠারো তলা ভাণ্ডারের অন্ধিসন্ধি থেকে বই এনে রিডিং-রুমগুলোয় পৌঁছে দিচ্ছে। দেখছি অবাক হয়ে। অনেকগুলো লিফট ওঠানামা করছে এতলা-ওতলার বই বোঝাই হয়ে। ছাতের নিচে ঘর-দালানের ভিতরে ছোট্ট রেললাইন পাতা ; ছোট ছোট্ট গাড়ি, লিফটে নামানো বই বোঝাই করছে গাড়ির ভিতর। বিদ্যুতের ইঞ্জিন গড়গড় করে নিয়ে চলল। অবিরত এই কাণ্ড চলছে। পাঠক ফরমায়েস করল, ঠিক তার পনের মিনিটের মধ্যে বই এসে হাজির হবে। কি কায়দায় হচ্ছে, সহজ বুদ্ধিতে আসে না।

উপরের ব্যালকনি থেকে তাকাচ্ছি একটা রিডিং-রুমের ভিতরে। নিঃশব্দ, কদাচিৎ জুতোর অতি মৃদু আওয়াজ। কেতাব সরবরাহ করে বেড়াচ্ছে লাইব্রেরির লোক। মস্ত ব্যস্ত। নানান বয়সের মানুষ সারি সারি মগ্ন হয়ে পড়ছে। পলিত কেশ বুড়ো, তরুণী ছাত্রী। উজ্জ্বল আলো। সন্তর্পণে পা ফেলছি আমরা, শব্দ উঠে ধ্যান বিচলিত না হয় যেন ওদের!

বেরিয়ে এসে—আমাদের গাড়ি কোথায় গো?—কালো রঙের গাড়ি বিলকুল সাদা হয়ে গেছে। ইঞ্চি দুয়েক পুরু বরফ ছাতের উপরে। ষ্টার্ট বন্ধ হয় নি, সেই তখন থেকেই চলছে—গাড়ির ভিতরে কোমল উষ্ণতা। বাইরে এমন কাণ্ড চলছে কিন্তু গাড়ি কি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লে আর শীত বুঝতে পারবেন না।

১৩

রাত থাকতে উঠে পড়েছি। মস্কো ছাড়ছি আজ, তাজিকিস্তান যাবো। দূরের পথ, কথা হয়েছিল রাত আড়াইটের বেরুনো হবে হোটেল থেকে। একটু সকাল সকাল তাই শুয়েছি। যদি কিছু ঘুমানো যায়। ঘুমিয়েও পড়েছি। রাত একটায় শুনি, দুয়োর ঝাঁকাচ্ছে কে। বিষম রাগ হল। কার ধেরে খেয়েছি, এই রাত্রে হানা দেয় কে? লুঙ্গি পরে খাঁটি স্বদেশি মতে শুয়ে পড়ি, এ অবস্থায় বেরুই বা কেমন করে? দোর ওদিকে ভেঙে ফেলার গতিক। তাড়াতাড়ি ঐ লুঙ্গিরই উপরে উপর জামা চাপিয়ে অ্যান্টি-চেম্বার পার হয়ে হাঁক দিচ্ছি, কে বট হে তুমি?

আরে মশায়, ঘুমোন, মনের সুখে কষে ঘুম দিন। প্লেন রাত্রে ছাড়বে না। সাতটায় ব্রেকফার্ষ্ট, একেবারে তৈরি হয়ে খানাঘরে যাবেন। ওখানে থেকেই রওনা।

ধীরেন সেনের গলা। দোর খুলতে তবে বাধা নেই। এই শোনাতে রাত দুপুরে ডেকে তুললেন। ঘুম আর হল না তার পরে, ছেঁড়া-ছেঁড়া স্বপ্ন। স্নান বিনে বাঁচিনে আমি। তাসখণ্ড হয়ে যাবো—সেই হোটেলে নিয়ে তুলবে তো! স্নানের ভারি মুশকিল। কাজটা অতএব সেরে যাই এখান থেকে। পাঁচটা তখন, অন্ধকার আছে। গরম জল কলে আসে সাড়ে ছ'টার আগে নয়। বয়ে গেল, ঠাণ্ডা জলই সই। তুরতুর করে কাঁপতে কাঁপতে তাড়াতাড়ি জামাজোড়া পরে নেওয়া গেল। সময় আছে তো চিঠি লিখে ফেলা যাক খান কয়েক। দূরের পাল্লায় পাড়ি—শুধু তাজিকিস্তান নয়, ঐ উপলক্ষে তামাম মধ্য-এশিয়ার আকাশে চক্কোর দিয়ে বেড়াব। ডাঙার মানুষ পাখনা মেলছি—ভবিতব্যের কথা বলা যায় না, হয় তো বা এই শেষ চিঠি আমার লেখা।

ব্রেকফার্ষ্ট সারা করে বসেই আছি। কখন রওনা হবো গো? দুটো প্লেন ভাড়া করেছে আমাদের জন্য। আবহাওয়া খারাপ বলে দেরি হচ্ছে, ভাল রিপোর্ট পেলে তবে ছাড়বে। সেই সময় এরোড্রোম থেকে হোটেলে ফোন করবে। এই এক নিয়ম, দুর্ঘটনার তিলেক সম্ভাবনা থাকতে নড়বে না। মানুষ এদের কাছে সব সম্পদের বাড়া, মানুষের জীবনের বড় বেশি দাম দেয়। তাই দু-চার বছরেও একটা প্লেন-দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় না। কোন দুর্ঘটনাও হয় না।

রাস্তার দুর্ঘটনা দুটো-চারটে ঘটে—যার দোষে ঘটে বিষম শাস্তি পেতে হয় সেই লোকটাকে। গাড়ি চালায় তাই অতি সতর্ক হয়ে।

অবশেষে খবর হল। চলেছি এরোড্রোমে। সে তো কম পথ নয়! পল উঠেছে আমাদের গাড়িতে। রাস্তার দু-পাশে সারবন্দি গাছ। একটা পাতা নেই, শুধু গুঁড়ি আর ডাল। কালো কটকট করছে। আগুনে পুড়ে গেছে যেন, দগ্ধ অঙ্গার খাড়া দাঁড়িয়ে গাছের মূর্তিতে। শীতকাল আসছে, কাল এক চোট বরফ পড়ে গেল। বরফ পড়ার আগেই সর্বরিক্ত হয়েছে। গ্রীষ্মকাল এলে পত্রশ্যামল হবে আবার।

গির্জা দেখতে পাচ্ছি ডান হাতে, রাস্তার অল্প একটু দূরে। সেকেলে বাড়ি, কিন্তু ঝকমক করছে। কি গো গির্জায় যায় এখানে মানুষ?

পল বলে, ফিরে এসো, এসে কোন এক রবিবার যেও গির্জায়। নিজের চোখে দেখো।

তাই গিয়েছিলাম। বেশি ভিড় না হলেও লোক নিতান্ত কম আসে না। সাড়ে পনের আনাই বুড়ো-বুড়ি। সব দেশেরই গতিক ঐ। হাল আমলের ক'টা তরুণ-তরুণী আমাদের মন্দিরে পুজোয় গিয়ে বসে? গির্জায় ঘণ্টা বাজানো মানা। ধর্মচর্চা ব্যক্তিগত ব্যাপার—যার যেমন খুশি উপাসনা করবে। কিম্বা করবেই না মোটে। ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকাডাকি করবে এবং সাধারণের শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটাবে—এ সব হতে পারবে না।

খেলার মাঠ। স্কি করবার মাঠ—আর দিন কতক পরে বরফে ঢেকে যাবে, মজা জমবে তখন এখানে। আরও অনেক দূর গিয়ে নতুন য়্যুনিভার্সিটি অঞ্চল ছাড়িয়ে শহরের বাইরে এসে পড়লাম। রাস্তা এই আকাশমুখো উঠছে, এই পাতালমুখো নামছে। লেনিন পাহাড় বলে অঞ্চলটাকে—এমন চৌরস করে ফেলেছে যে পাহাড় বলে ধরা মুশকিল। ঘর বাড়ি, দেখতে পাচ্ছি, প্রায় সব সেকেলে। কাঠের তৈরি। টালি দিয়ে ছাওয়া। কাঠের বাড়ি বানাত শীত ঠেকানোর জন্য—খুব বেশি ঠাণ্ডাতেও কাঠের ঘর খানিকটা গরম থাকে। এখন সব বাড়িতে তাপের বন্দোবস্ত—যত কাঠের বাড়ি চুরমার করে দৈত্যসম বাড়ি বানাচ্ছে। একটা কোলখোজের পাশ দিয়ে যাচ্ছি—যাচ্ছি তো যাচ্ছিই—ফসলে ভরা মাঠের পর মাঠ, ঘাসে ঢাকা গোচারণের ভূমি, দূর প্রান্তে চাষীদের ঘর-বাড়ি দেখা যায়। অরণ্যভূমে এসে পড়লাম এবারে—রাস্তার দু'ধারে বার্চ এলম পাইন জাতীয় গাছ। দু-দিকে অনেক দূর অবধি উঁচু-নিচু পতিত জমি—খানিক জঙ্গল, খানিকটা বা ফাঁকা। অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র এমনি অরণ্য ছিল, এখন এই নমুনা রয়ে গেছে।

এরোড্রোমে এসে সুখবর পেলাম। প্লেন যাচ্ছে তাসখন্দ হয়ে নয়—খানিকটা দক্ষিণে ঘুরে আমাদের নতুন নতুন জায়গা দেখাবার জন্য। ষ্ট্যালিনগ্রাড শহরের উপর দিয়ে অষ্ট্রাখান গিয়ে নামব। সেখান থেকে কাস্পিয়ান সাগরের কিনারা ধরে চলতে চলতে দক্ষিণ-পশ্চিমে বাকু শহরে রাত্রিবাস আজকে। সকালবেলা চা-টা খেয়ে পাড়ি দেওয়া যাবে কাস্পিয়ান সাগর। তার পর আরলে হ্রদের দক্ষিণ দিয়ে সমরখন্দের উপর দিয়ে উৎসবের দেশে পৌঁছে যাব—ষ্ট্যালিনবাদ, তাজিকিস্তানের রাজধানী।

দুটো প্লেন, আমরা দ্বিতীয়ের যাত্রী। আকাশে উঠে যেতেই ঘন কুয়াশার মধ্যে ভুবন অন্ধকার। সাত হাজার ফুট উঠে গিয়েছি—সাত হাজার ফুটের উঁচু আসনে আরামসে চেপে বসে খাতা খুলে টুকে যাচ্ছি। খোপ থেকে হঠাৎ পাইলট বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। বাক্স ধরে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে বকবক করছে, দোভাষি ব্যাখ্যা করে দিল, যাবতীয় পথ-ঘাট আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে। শেষকালে প্রশ্ন করে, কিছু জিজ্ঞাসা করবে তোমরা?

অষ্ট্রাখান জানেন তো? জায়গাটা না জানুন, টুপি নিশ্চয় দেখেছেন—অষ্ট্রাখানের টুপি। এর পরে এই অধমের মাথায় মাঝে মাঝে ঐ টুপি দেখতে পাবেন, উপহার দিয়েছিল ওরা। ভল্গা এসে কাস্পিয়ানে পড়ল, মোহানার উপর শহরটা। মাছ ধরার এমন জায়গা সোবিয়েতে তো নেই-ই—গোটা দুনিয়ার মধ্যেও বেশি পাবেন না। ফলেরও বড় বাজার—রকমারি ফল ফলে এই তল্লাটে। শহরের ভিতর অনেক খাল চলে গেছে। চতুর্দিকে উঁচু বাঁধ-দেওয়া, বন্যার জলে শহর যাতে ডুবিয়ে না দেয়।

বেলা ডুবে আসে। অষ্ট্রাখানের এরোড্রোমে নেমে আজ বড় ভাল লাগল। তেপান্তরের মাঠ, মাঠের ওধারে সূর্য ডুবছে। চেহারাটা অবিকল আমার বাংলাদেশের মতো। মস্কোর মতন হাড়কাঁপানো শীত নয়, ঝিরঝিরে হাওয়া। এরোড্রোমে নতুন বানানো ঘর বাড়ি উঠেছে আরও অনেক উঠছে। শহর বেশ খানিকটা দূর এখান থেকে। ভারতীয়দের পুরানো আড্ডা; সেকালে ভারতীয় বণিকেরা দলে দলে এসে ব্যাপার-বাণিজ্য করত, তাঁতি-ছুতোর এসে কাজকর্ম করত। শহরে তাদের তৈরি ঘরবাড়ি আছে এখন অবধি। ১৮১২ অব্দে নেপোলিয়নের সঙ্গে রুশরা যখন জীবন-মরণ লড়াই করছে, বিশ হাজার রুবল চাঁদা দিয়েছিল এই শহরের ভারতীয়েরা। পরবর্তীকালে এসে সে সম্পর্ক হারিয়ে গেল।

চা খেতে নিয়ে যাচ্ছে, তা-ও মাইল দেড়েক হাঁটতে হল। দেশের মতন নিশিন্দার গাছ পথের দু-ধারে। প্রকাণ্ড কুকুর, নাদুসনুদুস বিড়াল কয়েকটা। এই কার্তিকে দেশেরই মতন অল্প অল্প শীত করছে। সন্ধ্যা হল তো চারিদিক আলোয়, আলোয় ভরে গেল। দলছাড়া হয়ে ফাঁকা মাঠের এক দিকে একা একা আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর্যদের আদিভূমি ইলাবৃতবর্ষ—ভলগা যেখানটায় কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে।

প্লেনে উঠতে গিয়ে বলছি, একটু মাটি তুলে নিই পকেটে ভরে। দেশে গিয়ে দেখাব, আমার বাপ-ঠাকুর্দার ভিটের মাটি।

এক বন্ধু টিপ্পনি কাটলেন, বাঙালি আপনারা সত্যি সত্যি আর্য যদি হন।

সুপ্রাচীন আর্যভূমির উদ্দেশে নমস্কার করে আবার আকাশে উঠছি। [ক্রমশঃ।

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

পনের

"নূতন উষার স্বর্ণদ্বার, খুলিতে বিলম্ব কত আর?"

সুখের বুলবুলিরা যখন কলকাতার আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছিল, বজরাবিলাসী বাবুরা যখন গঙ্গার বুকে খেমটানৃত্য করছিলেন, তখন 'ইয়ং বেঙ্গল' দল মাটির আকাশে ডানা-ঝাপটানির পালা শেষ ক'রে, মাটির বন্ধন ফেলে, আকাশের কিনারা খুঁজতে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন। অনেক দিন আগে, ইয়ং বেঙ্গলের দীক্ষাগুরু ডিরোজিও তাঁর প্রায়-সমবয়স্ক তরুণ শিষ্যদের এই ডানা-ঝাপটানির কথা মনে ক'রে লিখেছিলেন—

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers,
that stretch
(Like young birds in soft summer hour),
Their wings to try their strength.

লালদীঘির রাইটার্স বিল্ডিং-এর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে আসা-যাওয়ার পথে, বিদ্যাসাগর নবীন বাংলার মুখপাত্রদের এই ডানা-ঝাপটানির ধ্বনিও শুনতে পাচ্ছিলেন, বো-মারা ধ্বনির সঙ্গে। তিনি নিজেও তাঁদের একজন ছিলেন। যদিও ইয়ং বেঙ্গল দলের সঙ্গে তাঁর কোন যোগাযোগ তখনও ছিল না, এবং ব্যক্তিগত পরিচয়ও অনেকের সঙ্গে তাঁর হয়নি, তাহলেও মনে মনে তিনি তাঁদের দাবি-দাওয়াতেই যেন সাড়া পেতেন। তাঁর মনেও ঐ একই প্রশ্ন গুমরে উঠত—

"শিকলদেবীর ঐ যে পূজাবেদী
চিরকাল কি রইবে খাড়া?"

ইয়ং বেঙ্গলের প্রমত্ততার ঘোর তখনও অবশ্য কাটেনি। অশান্তভাব তখনও একেবারে শান্ত হয়নি। 'ঝড়ের মতন বিজয়কেতন নেড়ে' তখনও তাঁরা বাছা-বাছা সব ভুলগুলো এনে তাঁদের চলার পথে জড়ো করছিলেন। ব্ল্যাক পাদ্রি 'কেষ্ট বন্দ্যো' তখন ডাফ, ডিয়ালট্রি প্রমুখ পাদ্রিদের সঙ্গে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করবার কাজে সোৎসাহে হাত মিলিয়েছেন। ইয়ং বেঙ্গলের তখন তিনি একজন অন্যতম গোষ্ঠীপতি। কেবল হিন্দুধর্মের নয়, ব্রাহ্মধর্মেরও তিনি ঘোর বিরোধী। তরুণ-সমাজে তখন তাঁর অসাধারণ প্রতিপত্তি। অর্থাৎ এমন এক সময়, যখন তারুণ্যের প্রতিমূর্তি মধুসূদন। যখন তরুণের চোখে 'মধু'র স্বপ্ন, 'মধুর' চোখে অজানা অনন্ত আকাশভরা তারার মতন স্বপ্ন।

মধুসূদন দত্ত তখনও 'মাইকেল' হননি। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তখনও তিনি মিলিত হননি, তাঁর সন্ধানও পাননি। বাংলার নববসন্তের প্রথম কবির কণ্ঠে কাকলি অবশ্য তখনই শোনা যাচ্ছিল। বিদ্যাসাগর তা শুনতে পাননি। লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তিনি চাকরির জন্য যখন যাতায়াত করতেন, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র কিশোর মধুসূদন মুখে-মুখে ইংরেজীতে গান রচনা করতেন। কিশোর কবিচিত্তের কামনা-বাসনা সব গানের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠত—

I sigh for Albion's distant shore,
Its Valleys green, its mountains high;
Tho' friends, relations, I have none
In that far clime, yet Oh! I sigh
To cross the vast Atlantic wave
For glory or a nameless grave!

"দূর শ্বেতদ্বীপ তরে, পড়ে মোর আকুল নিশ্বাস,
যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ;
নাহি সেথা আত্মজন; তবু লঙ্ঘি অপার জলধি
সাধ যায় লভিবারে যশঃ কিম্বা অ-নামা সমাধি।"

ধুতি-চাদর-চটি পরে' লালদীঘির কলেজের পথে যেতে যেতে বিদ্যাসাগর ভাবতেন বীরসিংহের কথা, বীরসিংহের মতন বাংলার আরও অনেক গ্রামের কথা, বাংলার মানুষের কথা। আচকান-পায়জামা-বুট প'রে, দু'জন ভৃত্যসহ পাল্কি চ'ড়ে গোলদীঘির কলেজে যেতে যেতে মধুসূদন ভাবতেন 'দূর শ্বেতদ্বীপের' কথা, 'যেথা শ্যাম উপত্যকা, উঠে গিরি ভেদিয়া আকাশ'। নবীন বাংলার দু'জোড়া চোখের দু'রকমের স্বপ্ন। ওয়ার্ডস্বার্থ আর শেলীর 'স্কাইলার্ক'। একজনের স্বপ্ন আকাশচারী হয়েও মানবপ্রীতির টানে কেবল মাটিতে

আছাড় খেয়ে পড়তে চায়। আর-একজনের স্বপ্ন হ'তে চায় 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'—বলতে চায়,

'বিবাগী কর অবাধপানে,
পথ কেটে যাই অজানাদের দেশে।'

বাঙালী-চরিত্রের দু'টি দিক, বিদ্যাসাগর ও মধুসূদন, বাঙালীর মানসলোকের দুই মেরু।

দু'জোড়া চোখ, দু'জোড়া কাণ। চোখে-চোখে, কাণে-কাণে তফাৎ অনেক। তবু এ-চোখের দৃষ্টিশক্তি ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং একাণের শ্রবণশক্তি একেবারে নূতন।

'ঐ যে প্রবীণ, ঐ যে পরম পাকা
চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমায় যেন চিত্রপটে আঁকা
অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়'—.

এ-চক্ষু-কর্ণ সেরকম ডানায় ঢাকা নয়। অন্ধকারে বন্ধ-করা খাঁচায়, দুই চক্ষুকর্ণ ডানায় ঢেকে যাঁরা চিত্রপটে আঁকা ছবির মতন ঝিমুচ্ছিলেন, তাঁরা তাই নূতন চোখের দৃষ্টির দীপ্তিতে ধাঁধিয়ে গেলেন। হঠাৎ রূঢ় ঝাঁকুনি খেয়ে তাঁদের ঝিমুনিও যেন ভেঙে গেল।

একদিন এক বিচিত্র দৃশ্য দেখলেন বিদ্যাসাগর, লালদীঘির ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে। সেদিন ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ৯ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার। হিন্দু কলেজের পলাতক ছাত্র মধুসূদন দত্তের খৃষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণের স্মরণীয় দিন।

রাইটার্স বিল্ডিংএর কলেজে থাকলে, এদৃশ্য দেখার কোন অসুবিধা হয়নি তাঁর। দু'পা এগিয়ে হয়ত তিনি অন্যমনস্কভাবে সেদিন মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চের সামনে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুবাজারের বাসায় থাকলেও, মধুসূদনের ধর্মান্তরের ব্যাপার নিয়ে আগে থেকেই শহরে যেরকম হৈ-চৈ হয়েছিল, তাতে তাঁর পক্ষে নির্দিষ্ট দিনে কয়েক পা' হেঁটে মিশন রো'তে আসা অসম্ভব নয়। সব দিক দিয়েই সম্ভব ও স্বাভাবিক।

হিন্দু কলেজের ছাত্রদের দু'-চারজনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের সাক্ষাৎ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতাও হয়েছিল। যখন তিনি ইংরেজী শিখছিলেন এবং সংস্কৃত শিক্ষা দিচ্ছিলেন নিজের বাসাবাড়ীতে, তখন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের কাছ থেকে তিনি মধুসূদনের কথা নিশ্চয় শুনেছিলেন। মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভার কথা, খোশ-পোষাকের কথা, মেজাজের কথা, নিশ্চয় তাঁর কাণে গিয়েছিল। সংস্কৃত কলেজে পড়বার সময় তিনি মধুসূদনকে দেখেননি বলেও মনে হয় না। হিন্দু কলেজ থেকে হঠাৎ অন্তর্ধান এবং ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গে মধুসূদনের অবস্থানের বার্তা যখন শহরময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিল, তখন বিদ্যাসাগরও নিশ্চয় কৌতূহলী হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বয়স তখন তেইশ বছর, মধুসূদনের বয়স উনিশ-কুড়ি।

মিশন রো'র চারিদিকে, ওল্ড মিশন চার্চের সামনে সেদিন শহরের সাহেব বিবি ও পাদ্রিদের নানারকমের ঘোড়ার গাড়ীর ভিড় জমেছিল। শহরের কৌতূহলীর সংখ্যাও দর্শকদের মধ্যে যথেষ্ট ছিল ব'লে অনুমান করা যায়। কারণ, পাদ্রি সাহেবেরা সেদিন গোলমালের আশঙ্কায় গির্জার সামনে সশস্ত্র সৈনিক গার্ড মোতায়েন রেখেছিলেন। সদর দেওয়ানী আদালতের প্রতিপত্তিশালী উকিল রাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র, হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান ছাত্র মধুসূদন দত্তকে পাদ্রিরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষা দেবেন, এ সংবাদ সেদিনকার সীমাবদ্ধ নাগরিক সমাজে কারও অজানা থাকার কথা নয়। বোঝা যায়, সাধারণ শহরবাসীরও বেশ ভিড় হয়েছিল গির্জার চারিদিকে।

এগারো বছর আগে, কলকাতা শহরে আর একবার এইরকম চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় যেদিন খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স তখন বারো বছর, সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর ছাত্র তিনি। তরুণদের এই আচরণের এবং পাদ্রি সাহেবদের ধর্মাভিযানের প্রকৃত তাৎপর্য সেদিন তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি। এখন তিনি আর বারো বছরের বালক নন, তেইশ বছরের যুবক। ছাত্র নন, পণ্ডিত, এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তেইশ বছরের বিদ্যাসাগর চোখের সামনে দেখছেন, তাঁর অনুজতুল্য এক অপরিচিত যুবক খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিচ্ছেন। তার জন্য তিনি নিজ গৃহ থেকে পালিয়ে দুর্গের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। পাদ্রিদের উল্লাসের সীমা নেই। কৃষ্ণমোহন এসেছেন দীক্ষা-উৎসবে 'chosen witness' হয়ে। উৎসব উপলক্ষে মধুসূদনের নিজের রচিত সঙ্গীতের সমবেত সুর গির্জার ভিতর থেকে তরঙ্গায়িত হয়ে আসছে বাইরে—

Long sunk in Superstition's night,
By Sin and Satan driven
I Saw not,—cared not for the light,
That leads the Blind to Heaven.

I sat in darkness, Reason's eye
was shut, was closed in me;
I hastened to Eternity
O'er Error's dreadful Sea!

But now, at length thy grace O Lord!
Bids all around me shine;
I drink thy sweet, thy precious word
I Kneel before thy shrine!

I've broke Affection's tenderest ties
For my blest Saviour's sake
All, all I love beneath the skies
Lord! I for thee forsake!

এ-সঙ্গীতের ভাবার্থে বিদ্যাসাগরের মন বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল হয়ত, কিন্তু তার রচয়িতার মনোভাব তিনি কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি। মানুষের মুক্তিদাতা কোন অদৃশ্য ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারণা ছিল না। সে রকম কোন মুক্তিদাতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে তিনি কোনদিন চিন্তা করার প্রয়োজনও বোধ করেননি। যুক্তিবাদী তরুণ যুবকেরা কেন ধর্মান্তরিত হয়ে, ঈশ্বর বদল ক'রে, পুরোহিতের বদলে পাদ্রি ও আচার্যের উপদেশ শুনে, কুসংস্কারের অন্ধকার প্রেতপুরী থেকে আলোকরাজ্যে যাত্রা করতে চান এবং সেই চাওয়ার মধ্যে যুক্তি কোথায়, বিদ্যাসাগর কিছুতেই তা বুঝতে পারতেন

না। বুঝতে না পারলেও তিনি কোন ধর্মমত নিয়ে কোনদিন কারও সঙ্গে আলোচনা করেননি, প্রকাশ্যে তো নয়ই। তাঁর প্রিয়জনদের মধ্যে অনেকের সঙ্গে এবিষয়ে গভীর মতভেদ থাকলেও, কর্মজীবনে হাত-মিলিয়ে চলার পথে কোনদিন তা দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায়ের সৃষ্টি করেনি।

মধুসূদনের ধর্মান্তরে বিদ্যাসাগর আরও অনেকের মতন ব্যথিত হয়েছিলেন। ১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী, বৃহস্পতিবার দিনটি তাঁর কি ভাবে কেটেছিল, কেউ জানে না। প্রায় প্রতিদিন যাঁরা তাঁর বাসায় আসতেন, তাঁদের সঙ্গে সেদিন তিনি কি আলাপ-আলোচনা করেছিলেন, তা জানলে হয়ত তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার কথা জানা যেত। কিন্তু তাও জানবার উপায় নেই। নৈরাশ্যে একেবারে ভেঙে না পড়লেও, সেদিন যে তিনি কোন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেননি, এ কথা ঠিক।

মধুসূদনের মতন একেবারে 'কাঁচা বয়সের তরুণদের মধ্যে, 'পাগলামি, তুই আয় রে দুয়ার ভেদি' ভাব প্রবল হলেও, ইয়ং বেঙ্গল দলের বয়ঃজ্যেষ্ঠরা নিঃসন্দেহে তখন প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছেন। তাঁদের সামাজিক দায়িত্ববোধও তখন অনেক সজাগ হয়েছে। নানা রকমের সভাসমিতিতে মিলিত হয়ে তাঁরা সমাজের জটিল সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছেন। পত্রপত্রিকার মাধ্যমে সেগুলি লোক-চক্ষুর সামনে তুলে ধরছেন। সমাধানের পথ খুঁজছেন তাঁরা। সভা-সমিতির মধ্যে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ও "তত্ত্ববোধিনী সভা" প্রধান। পত্রপত্রিকার মধ্যে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ও "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" প্রগতিশীল দলের উল্লেখযোগ্য মুখপত্র।

চতুর্থ দশকে, নবীন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিৎ-গঠনের এই উদ্যোগপর্বে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেছিলেন। এই উদ্যোগ ও প্রয়াসের ভিতর থেকেই তিনি তাঁর পথেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। মধুসূদনের ধর্মান্তরের মতন দু'-একটি দুর্ঘটনায় তাই তিনি একেবারে হতাশ হবার মতন কোন কারণ খুঁজে পাননি।

যে সময় মধুসূদনের ধর্মান্তরের ব্যাপার নিয়ে কলকাতা শহরে কোলাহল হচ্ছিল, সেই সময় 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রভৃতি সভা-সমিতির বৈঠকে এবং 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর', 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', প্রভৃতি পত্রিকায় নানাবিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলাপ-আলোচনা, তর্কবিতর্ক, বাদ-প্রতিবাদ চলছিল। নব্যশিক্ষিত যুবকরা বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিলেন বলা চলে। প্রধানতঃ ধর্মমত নিয়েই তাঁদের মধ্যে বিরোধ ছিল; সামাজিক সমস্যা ও মতামত নিয়ে বিশেষ মতভেদ ছিল না। দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকার্যের বিরোধী ছিলেন ইয়ং বেঙ্গলের একটি দল। তাঁদের দলনেতা ছিলেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন। দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীদের উদ্দেশ্য ছিল, নব্য শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব সংযত করা এবং পাদ্রিদের স্বার্থপ্রণোদিত প্রচারের প্রতিবাদ করা। কৃষ্ণমোহনের সমর্থকরা হিন্দুধর্ম ও ব্রাহ্মধর্ম দুয়েরই বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। পাদ্রিরাও এই সময় খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন।

ধর্মান্দোলনের এই কোলাহলে একটি দিনের জন্যও বিদ্যাসাগর তাঁর কণ্ঠস্বর যোগ করেননি। নীরবে তিনি দূরে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জানতেন, ধর্মের বিপক্ষে বা স্বপক্ষে আন্দোলন ক'রে কোন দিন সমাজের স্থায়ী কল্যাণ কিছু করা সম্ভব হবে না। শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় ছাড়া ধর্মান্দোলন আর কিছু নয়। এক গোঁড়ামি ছেড়ে আর এক গোঁড়ামির গোড়াপত্তনের জন্য এই ভাবে শক্তিক্ষয় করতে তাঁর নির্মল পরিচ্ছন্ন যুক্তিবাদী মন সায় দেয়নি কোনদিন। কোন সমাজের ব্যাধির চিকিৎসা না করলে, কোন সম্প্রদায়ের 'ঈশ্বরের' পক্ষেই তার saviour হওয়া সম্ভব হবে না। এ রকম একটা বুদ্ধি-যুক্তি-নির্ভর বিশ্বাস মনে মনে পোষণ না করলে, বিদ্যাসাগরের পক্ষে এই পরিবেশের মধ্যে বাস করেও ধর্ম সম্বন্ধে এমন নির্বিকার থাকা সম্ভব হ'ত না। এ বিশ্বাসের সঙ্গে নাস্তিকতা বা আস্তিকতার কোন সম্পর্ক নেই।

মধুসূদনের খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের কয়েক মাস পরে, ১৮৪৩ সালের ২১ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। "আত্মজীবনী"তে এ-সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন: (১)

"১৭৬৫ শকের ৭ই পৌষে আমরা ব্রাহ্মধর্ম-ব্রত গ্রহণ করিবার দিন স্থির করিলাম। সমাজের যে নিভৃত কুঠরীতে বেদপাঠ হইত, তাহা একটা যবনিকা দিয়া আবৃত করিলাম; বাহিরের লোক কেহ সেখানে না আসিতে পারে, এই প্রকার বিধান করিলাম। সেখানে একটি বেদী স্থাপিত হইল; সেই বেদীতে বিদ্যাবাগীশ আসন গ্রহণ করিলেন। আমরা সকলে তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিলাম। আমাদের মনে এক নূতন উৎসাহ জন্মিল; অদ্য আমাদের প্রতি-হৃদয়ে ব্রাহ্মধর্ম-বীজ রোপিত হইবে। আশা হইল, এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কালে ইহা অক্ষয় বৃক্ষ হইবে, এবং যখন ইহা ফলবান হইবে, তখন ইহা হইতে আমরা নিশ্চয় অমৃতলাভ করিব।...

"প্রথম, শ্রীধর ভট্টাচার্য্য উঠিয়া বেদীর সম্মুখে প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন। পরে, শ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য; পরে, আমি। তাহার পরে পরে, ব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গিরীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তারকনাথ ভট্টাচার্য্য, হরদেব চট্টোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশ্চন্দ্র নন্দী, লালা হাজারী লাল, শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়, ভবানীচরণ সেন, চন্দ্রনাথ রায়, রামনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, জগচ্চন্দ্র রায়, লোকনাথ রায় প্রভৃতি ২১ জন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলেন।

"তত্ত্ববোধিনী সভা যখন প্রথম সংস্থাপিত হয়, তখন সেই একদিন, আর অদ্য ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের এই আর একদিন। ১৭৬১ শক হইতে ক্রমে ক্রমে এত দূর আমরা অগ্রসর হইলাম যে, অদ্য ব্রহ্মের শরণাপন্ন হইয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। এই ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ' করিয়া আমরা নূতন জীবন লাভ করিলাম। আমাদের উৎসাহ ও আনন্দ দেখে কে?

"ব্রাহ্ম সমাজের এ একটা নূতন ব্যাপার। পূর্বে ব্রাহ্মসমাজ

---

(১) শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী: শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত (৩য় সংস্করণ, ১৯২৭), নবম পরিচ্ছেদ, ৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা।

ছিল, এখন ব্রাহ্মধর্ম হইল। ব্রহ্ম ব্যতীত ধর্ম থাকিতে পারে না, এবং ধর্ম ব্যতীতও ব্রহ্ম লাভ হয় না। ধর্মেতে ব্রহ্মেতে নিত্য সংযোগ। সেই সংযোগ বুঝিতে পারিয়া আমরা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিলাম। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আমরা ব্রাহ্ম হইলাম, এবং ব্রাহ্মসমাজের সার্থক্য সম্পাদন করিলাম।"

১৮৪৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার, ২১ ডিসেম্বরও বৃহস্পতিবার। ওল্ড মিশন চার্চ ও ব্রাহ্মসমাজে দু'টি ধর্মদীক্ষানুষ্ঠান হয়। দুই বৃহস্পতিবারের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? পার্থক্য আছে, ধর্মের ক্ষেত্রে, কিন্তু সেটা তো বাইরের পার্থক্য। ভিতরের পার্থক্য বিদ্যাসাগরের খোলা চোখে ধরা পড়েনি। তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ সেদিন পাদ্রিদের অভিযান অনেকটা প্রতিরোধ করেছিল ঠিকই। তা না করলে হয়ত শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে আরও কিছু খৃষ্টানের সংখ্যা বাড়ত। তা না বেড়ে ব্রাহ্মের সংখ্যা বেড়েছে। কিন্তু তাতে বৃহত্তর বাঙালী সমাজের লাভক্ষতি কি হয়েছে, তার খতিয়ান ক'রে কেউ দেখেননি। সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি সমাজ থেকে দূর হয়েছে কি?

কঠোর বস্তুবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরে ধর্ম বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর গুরুতর মতভেদ হলেও, প্রথমে তিনি দীক্ষা গ্রহণে আপত্তি করেননি। ধর্মের ব্যাপারে সব দিক দিয়ে মুক্তপুরুষ ছিলেন বিদ্যাসাগর। অথচ সামাজিক ব্যাপারে তত্ত্ববোধিনী সভা ও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখার প্রয়োজনীয়তা তিনি বোধ করেছিলেন এবং যোগাযোগ রেখেও ছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট থেকেও তিনি ধর্ম বিষয়ে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন।

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' পাদ্রিদের আচরণের কঠোর সমালোচনা করা হ'ত। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা ও খৃষ্টান পাদ্রিরা এই সময় ধর্ম-প্রচারের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন বললে ভুল হয় না। কলকাতার বাইরে (যেমন কৃষ্ণনগর বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে) পাদ্রিরা যেমন অভিযান করতেন, ব্রাহ্মরাও তেমনি তাঁদের ধর্মান্তরের প্রয়াস ব্যর্থ করবার চেষ্টা করতেন। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে শিক্ষিত হিন্দুসমাজের একাংশ এই সময় খৃষ্টধর্মে ও ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন ধর্মান্দোলনের চোরাগলিতে কতকটা পথ হারিয়ে ফেলে।

ধর্ম নিয়ে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রচণ্ড বাক্‌যুদ্ধ চলতে থাকে। পাদ্রিদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করা হয়। চোদ্দ বছরের উমেশ চন্দ্র সরকার যখন তাঁর এগারো বছরের স্ত্রীর সঙ্গে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন, তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা লেখেন: (২)

"অন্তঃপুরস্থ স্ত্রী পর্য্যন্ত স্বধর্ম হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া পরধর্মকে অবলম্বন করিতে লাগিল! এই সকল সাংঘাতিক ঘটনাকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কি আমারদিগের চৈতন্য হয় না? আর কতকাল আমরা অনুৎসাহ নিদ্রাতে অভিভূত থাকিব? ধর্ম যে এককালীন নষ্ট হইল, এ দেশ যে উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইল, এবং আমারদিগের হিন্দুনাম যে চিরকালের মত লুপ্ত হইবার সম্ভাবনা হইল! মিশনারী-দিগের দৌরাত্ম্য এ পর্য্যন্ত সহ্য হইয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে সহিষ্ণুতার সীমা বহির্ভূত হইতেছে। পূর্বাবধি তাহারা কেবল কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিল, কিন্তু এইক্ষণে তাহার সহিত প্রবল অন্যায় আচরণ সকলকে মিশ্রিত করিতেছে।"

কয়েক মাস পরে পত্রিকায় আবার লেখা হয়: (৩)

"নির্লজ্জ মিশনারিরা শতবৎসরাবধি হিন্দুধর্মের উচ্ছেদ চেষ্টা করিতেছে, শত বৎসরাবধি খৃষ্টধর্মে এ দেশকে অভিষিক্ত করিবার যত্ন করিতেছে, মধ্যে মধ্যে মাতাপিতার ক্রোড় হইতে স্নেহের সন্তানকেও হরণ করিতেছে, তথাপি এদেশীয় লোকের চৈতন্য হয় না— তথাপি মিশনারিদিগের দুশ্চেষ্টা নিবারণের কোন সদুপায় ধার্য হয় না। সত্যের পথে যখন তাহারা কণ্টক বিস্তার করিতেছে, তখন সত্যের সাধকেরা কি প্রকারে নীরব রহিয়াছেন?"

কেবল খৃষ্টধর্ম ও পাদ্রিদের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার পরিচালকরা ক্ষান্ত হন নি। বৈদান্তিক মতবাদ প্রচার ক'রে, ধর্মতত্ত্ববিষয়ে রচনা প্রকাশ ক'রে, দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুরাগীরা পাদ্রি-প্রচারিত খৃষ্টধর্মের মাহাত্ম্য ম্লান করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন। তাতে কোন সামাজিক সুফল যে ফলেনি তা নয়। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী সভা ও তার মুখপত্রের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট কয়েকজন সভ্য এই আধ্যাত্মিক আদর্শ-প্রচারে খুব বেশি উৎসাহিত হচ্ছিলেন না। এই কয়েকজন সভ্যের মধ্যে প্রধানতম হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। দু'জনেই সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসংস্কারের মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তত্ত্ববোধিনীর সংস্পর্শে এসেছিলেন, ধর্মচর্চা বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানানুশীলনের জন্য নয়। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হলেও ঘোর বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র তো 'ঈশ্বর' নিয়ে চিন্তা করারই অবকাশ পেতেন না। দুই বন্ধুর

(২) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ৩য় ভাগ, ১ জ্যৈষ্ঠ ১৭৬৭ শক। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনীর' ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। উমেশচন্দ্র সরকার ছিলেন দেবেন্দ্রনাথের হাউসের সরকার রাজেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। উমেশ ও তাঁর স্ত্রীর ধর্মান্তরে দেবেন্দ্রনাথ খুবই বিচলিত হন। তিনি লিখেছেন: "অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক পর্যন্ত খৃষ্টান করিতে লাগিল! তবে রোস, আমি ইহার প্রতিবিধান করিতেছি।" তাঁর অনুরোধে অক্ষয়কুমার প্রতিবাদ ক'রে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখেন। প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গাড়ী ক'রে তিনি কলকাতা শহরের গণ্যমান্য হিন্দুদের বাড়ী গিয়ে গিয়ে অনুরোধ করেন, পাদ্রিদের স্কুলে ছেলেদের না পাঠাতে। রাজা রাধাকান্ত দেব, সত্যচরণ ঘোষাল, রামগোপাল ঘোষ সকলেই তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: "ইহাতেই ধর্মসভা ও ব্রহ্মসভার যে দলাদলি, এবং যাহার সঙ্গে যাহার যে অনৈক্য ছিল, সকলি ভাঙ্গিয়া গেল।" একটি সভা ডেকে নূতন বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হ'ল। বিনা বেতনে হিন্দুর ছেলেরা এই বিদ্যালয়ে পড়বে। আশুতোষ দেব ও প্রমথনাথ দেব দশ হাজার টাকা দিলেন। রাজা সত্যচরণ ঘোষাল তিন হাজার টাকা, ব্রজনাথ ধর দুই হাজার টাকা, রাধাকান্ত দেব এক হাজার টাকা দিলেন। মোট চল্লিশ হাজার টাকা উঠল। বিদ্যালয়ের নাম হ'ল "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়।" ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষক হন। "সেই অবধি খৃষ্টান হইবার স্রোত মন্দীভূত হইল, একেবারে মিশনরিদিগের মস্তকে কুঠারাঘাত পড়িল"—দেবেন্দ্রনাথ।

(৩) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা: ১৭৬৭ শক, ১ পৌষ।

এই দিক দিয়ে এক ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল তত্ত্ববোধিনী সভায়। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে উভয়েরই নানা বিষয়ে মতবিরোধ হ'তে লাগল। তা সত্ত্বেও, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' প্রথম প্রকাশকাল (১৭৬৫ শক, ১ ভাদ্র) থেকে দীর্ঘ বারো বৎসর পর্য্যন্ত যে অক্ষয়কুমার তার সম্পাদক ছিলেন এবং সভার প্রতিষ্ঠাকাল (১৭৬১ শক ২১ আশ্বিন) থেকে না হ'লেও, কয়েক বছর পর থেকে সভ্য হয়ে সভার শেষ দিন পর্য্যন্ত যে বিদ্যাসাগর তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং শেষে তার সম্পাদকও ছিলেন, একথা ভাবলে অবাক হ'তে হয়। অবাক হ'তে হয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদারতা ও গুণগ্রাহিতার কথা ভেবে। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের অনাধ্যাত্মিক মনোভাবে যথেষ্ট বিরক্ত হলেও, দেবেন্দ্রনাথ তাঁদের শক্তি ও প্রতিভাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হতেন না এবং সভা ও পত্রিকার কল্যাণে তাঁদের সহযোগিতাও অপরিহার্য ব'লে মনে করতেন।

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার সমবয়সী ছিলেন। বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সেরেস্তাদারী করেন, অক্ষয়কুমার তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে এসে, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালায় শিক্ষকতা এবং পরে পত্রিকা সম্পাদনার কাজ করেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পরিচয় হয় কবি ঈশ্বর গুপ্তের মাধ্যমে। অক্ষয়কুমারের জেঠতুতো ভাই হরমোহন দত্ত সুপ্রীম কোর্টের মাষ্টার আপিসের বড়বাবু ছিলেন। কোর্টের বিজ্ঞাপনাদির সমস্ত দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। 'সংবাদ-প্রভাকর' সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বিজ্ঞাপন লাভের আশায় হরমোহনের কাছে যাতায়াত করতেন। এই সময় অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৩৯ সালে। প্রতিষ্ঠার দু'-একমাস পরেই ঈশ্বরগুপ্ত এই সভায় সভ্যশ্রেণীভুক্ত হন। "অক্ষয়-চরিত"কার নকুড়চন্দ্র বিশ্বাস লিখেছেন: "এক দিবস সন্ধ্যাকালে তাঁহার সমভিব্যাহারে অক্ষয়বাবু সভা দেখিতে যান। দেখিতে গিয়া মহানুভব দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পরিচিত হন। এই পরিচয় দত্তজর সৌভাগ্যের মূল। ইহার অব্যবহিত পরে উল্লিখিত শকের (১৭৬১ শক) ১১ই পৌষ তারিখে ঈশ্বর গুপ্তের প্রস্তাবে ও ভগবতীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের পোষকতায় ইনি সভ্য মনোনীত হন। পর বৎসর অর্থাৎ ১৭৬২ শকের ১লা (আষাঢ়) শনিবার তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা সংস্থাপিত হইলে, ইনি ৮৲ টাকা বেতনে উহার শিক্ষকতায় নিযুক্ত হন। ৪ঠা শ্রাবণ হইতে বেতন ১০৲ টাকা হয়। তারপর ১৪৲ টাকা বেতনে তৃতীয় শিক্ষক হন"। (৪)

তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ সালের ১৬ই আগষ্ট। পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচনের ব্যাপারে স্থির হয় যে—"বেদান্ত ধর্মানুযায়ী সন্ন্যাস ধর্মের এবং সন্ন্যাসীদিগের প্রশংসাবাদ"—সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে দেবেন্দ্রনাথের কাছে পাঠাতে হবে। যাঁর রচনা সর্বোৎকৃষ্ট হবে তিনিই সম্পাদকের পদে অভিষিক্ত হবেন। নকুড়চন্দ্র এ-সম্বন্ধে লিখেছেন: "ভবানীচরণ সেন, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার প্রতিযোগিতা হয়। অক্ষয়বাবুর প্রবন্ধটি সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইলে, ইনি ৩০৲ বেতনে নিযুক্ত হন। তখন এই পদ 'গ্রন্থ-সম্পাদকতা' বলিয়া অভিহিত ছিল"। (৫) পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য ও পত্রিকার সম্পাদক নির্বাচন প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ আত্ম-জীবনীতে বলেছেন: (৬)

"আমি ভাবিলাম, তত্ত্ববোধিনী সভার অনেক সভ্য কার্য্যসূত্রে পরস্পর বিচ্ছিন্নভাবে আছেন। তাঁহারা সভায় কোন সংবাদই পান না, অনেক সময় উপস্থিত হইতেও পারেন না। সভায় কি হয়, অনেকেই তাহা অবগত নহেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মসমাজে বিদ্যাবাগীশের ব্যাখ্যান অনেকেই শুনিতে পান না; তাহার প্রচার হওয়া আবশ্যক। এতদ্ব্যতীত, যে সকল বিষয়ে লোকের জ্ঞান বৃদ্ধি ও চরিত্র শোধনের সহায়তা করিতে পারে, এমন সকল বিষয়ও প্রকাশ হওয়া আবশ্যক। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়া ১৭৬৫ শাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রচারের সঙ্কল্প করি।

"পত্রিকার একজন সম্পাদক নিয়োগ আবশ্যক। সভ্যদিগের মধ্যে অনেকেরই রচনা পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্তের রচনা দেখিয়া আমি তাঁহাকে মনোনীত করিলাম। তাঁহার এই রচনাতে গুণ ও দোষ দুইই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। গুণের কথা এই যে, ইহাতে তিনি জটা-জুট-মণ্ডিত ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ তরুতলবাসী সন্ন্যাসীর প্রশংসা করিয়াছিলেন। কিন্তু চিহ্নধারী বহিঃসন্ন্যাস আমার মতবিরুদ্ধ। আমি মনে করিলাম, যদি মতামতের জন্য নিজে সতর্ক থাকি, তাহা হইলে ইঁহার দ্বারা অবশ্যই পত্রিকা সম্পাদন করিতে পারিব।

"ফলতঃ তাহাই হইল। আমি অধিক বেতন দিয়া অক্ষয় বাবুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম। তিনি যাহা লিখিতেন, তাহাতে আমার মতবিরুদ্ধ কথা কাটিয়া দিতাম, এবং আমার মতে তাঁহাকে আনিতে চেষ্টা করিতাম; কিন্তু তাহা আমার পক্ষে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

"ফলতঃ, আমি তাঁহার ন্যায় লোককে পাইয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার আশানুরূপ উন্নতি করি। অমন রচনার সৌষ্ঠব তৎকালে অতি অল্প লোকেরই দেখিতাম। তখন কেবল কয়েকখানা 'সংবাদপত্রই ছিল; তাহাতে লোকহিতকর জ্ঞানগর্ভ কোন প্রবন্ধই প্রকাশ হইত না। বঙ্গদেশে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সর্বপ্রথমে সেই অভাব পূরণ করে।..."

দেবেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়, অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর মতামতের বিরোধ কত গভীর ছিল। বিস্ময়কর হ'ল, তা সত্ত্বেও, প্রথম থেকেই তিনি অক্ষয়কুমারকে পত্রিকার সম্পাদক মনোনীত করেছিলেন। মতামত সম্বন্ধে সজাগ হয়েও তিনি সহজে অক্ষয়কুমারের মত বদলাতে পারতেন না। কিন্তু তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহিত্যিক সমৃদ্ধি ও উন্নতি কামনা করেই তিনি নিজের ধর্মমত সব সময় জোর ক'রে সম্পাদকের উপর বা গ্রন্থাধ্যক্ষ-সমিতির সভ্যদের উপর

(৪) অক্ষয়-চরিত: শ্রীনকুড়চন্দ্র বিশ্বাস (১২৯৪ সন): ১৬ পৃষ্ঠা।

(৫) অক্ষয়-চরিত: ঐ।

(৬) আত্মজীবনী: সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৭৫-৭৬ পৃষ্ঠা।

চাপাতেন না। কেবল সম্পাদকের সঙ্গে নয়, গ্রন্থাধ্যক্ষদের দু'-একজনের সঙ্গেও তাঁর মতবিরোধ হ'ত। তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অন্যতম।

এসিয়াতিক সোসাইটির মতন দেবেন্দ্রনাথও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্য একটি 'Paper Committee' বা প্রবন্ধ-নির্বাচনী সভা স্থাপন করেন। সভ্যদের 'গ্রন্থাধ্যক্ষ' বলা হ'ত। পাঁচ জন গ্রন্থাধ্যক্ষ নিয়ে সভা গঠিত হ'ত এবং পাঁচ জনের মধ্যে কেউ অবসর গ্রহণ করলে অন্য একজন মনোনীত হতেন। এই গ্রন্থাধ্যক্ষদের মধ্যে ছিলেন—

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ
রাজেন্দ্রলাল মিত্র	প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারী
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	রাধাপ্রসাদ রায়
রাজনারায়ণ বসু	শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
আনন্দকৃষ্ণ বসু	শ্রীধর ন্যায়রত্ন

এবং আরও অনেকে।

ঈশ্বরচন্দ্র ১৭৭০ শকের (১৮৪৮ সাল) ২৩ শ্রাবণ অধ্যক্ষ-সভার অধিবেশনে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার 'পেপার-কমিটির' সভ্য নির্বাচিত হন। কিন্তু তার আগেই অক্ষয়কুমারের সঙ্গে তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়। সভার নিয়ম ছিল যে, গ্রন্থ-সম্পাদক বা গ্রন্থাধ্যক্ষ বা অন্য যে কেউ হন, প্রত্যেকের রচনা পত্রিকায় প্রকাশিত হবার আগে পেপার-কমিটির অধিকাংশ সভ্যের দ্বারা পঠিত ও মনোনীত হওয়া প্রয়োজন। কমিটির সভ্যদের প্রস্তাব অনুযায়ী যে-কোন রচনা সংশোধন ও পরিবর্তন করাও চলতে পারে। সম্পাদক অক্ষয়কুমারের রচনা দেবেন্দ্রনাথ নিজে প্রায় রাত্রি ১২টা পর্যন্ত জেগে সংশোধন ক'রে দিতেন। তারপর সেগুলি গ্রন্থাধ্যক্ষদের কাছে পাঠানো হ'ত। এই সময় রাধাকান্ত দেবের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসু একজন গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর কাছে অক্ষয়কুমারের রচনাগুলি প্রেরিত হত। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আনন্দকৃষ্ণের ও শ্রীনাথ ঘোষের (রাধাকান্ত দেবের জামাতা) গভীর বন্ধুত্ব ছিল। নানা বিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য, বিশেষ করে ইংরেজী শিক্ষার জন্য তিনি প্রায়ই আনন্দকৃষ্ণের কাছে যাতায়াত করতেন। (৭) আনন্দকৃষ্ণ তাঁকে মধ্যে মধ্যে অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলি দেখে দিতে বলতেন এবং তিনি যত্ন ক'রে দেখে দিতেন। এইভাবে কিছুদিন অক্ষয়কুমারের প্রবন্ধগুলি দেখে দেবার পর একদিন আনন্দবাবু বিদ্যাসাগরকে বললেন: "অক্ষয় বাবু আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।" বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেন: "বেশ তো তাঁকে একদিন আসতে বলবেন।" কথামতো অক্ষয় বাবু একদিন এসে ঈশ্বরচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন: "আমার প্রবন্ধগুলি আপনি অনুগ্রহ ক'রে দেখে দিয়ে যে কত উপকার করেছেন, তা বলা যায় না। এই ভাবে যদি আপনি একটু কষ্ট ক'রে দেখে দেন, তাহলে চিরবাধিত হবো।" ঈশ্বরচন্দ্র সন্তুষ্টচিত্তে সম্মত হন।* নকুড়চন্দ্র লিখেছেন: "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত দত্তজর এই প্রথম আলাপ-পরিচয়। ইহার পর অর্থাৎ ১৭৭০ শকের ২৩ শ্রাবণ তারিখের অধ্যক্ষসভার অধিবেশনে তিনি পেপার-কমিটির সভ্যশ্রেণী-ভুক্ত হন।" (৮)

পেপার-কমিটির কাজকর্ম কি ভাবে পরিচালিত হ'ত তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করছি। দৃষ্টান্তগুলি ঈশ্বরচন্দ্র প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: (৯)

কবিরপন্থিদিগের বৃত্তান্তবিষয়ক পাণ্ডুলেখ্য প্রেরণ করিতেছি। যথাবিহিত অনুমতি করিবেন। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা	শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
১৪ আশ্বিন, ১৭৭০	গ্রন্থ-সম্পাদক।

প্রেরিত প্রস্তাব পাঠে পরম পরিতোষ পাইলাম। ইহা অতি সহজ ও সরল ভাষায় সুচারুরূপে রচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। অতএব পত্রিকায় প্রকাশ বিষয়ে আমি সন্তুষ্ট চিত্তে সম্মতি প্রদান করিলাম। ইতি।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর উক্ত পাণ্ডুলেখ্যর স্থানে স্থানে যে সকল পরিবর্তন করিয়াছেন, তাহা অতি উত্তম হইয়াছে।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।

প্রেরিত পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশযোগ্য।

শ্রীরাজেন্দ্রলাল মিত্র।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসার মহাশয় বঙ্গ ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করিতে আরম্ভ করিয়া তাহার এক অংশ প্রেরণ করিয়াছেন দৃষ্টি করিবেন। আপনারা দেখিবেন তাহা অতি সুচারু শুদ্ধ ভাষায় পরিপাটীরূপে লিখিত হইয়াছে। তাহা পাঠ করিয়া পাঠকেরা পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইবেন এবং পত্রিকার বিষয়ে তাঁহাদিগের অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে পারিবেক। এতদ্ভিন্ন আমারদিগের পূর্বকার আচার-ব্যবহারাদির যেরূপ নিদর্শন পাওয়া যায় এমত আর কুত্রাপি নাই, অতএব এই বাঙ্গালা অনুবাদ দ্বারা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সন্ধায়ি এতদ্দেশীয় ব্যক্তিদিগেরও উপকার হইবেক। নিবেদনমিতি।

তত্ত্ববোধিনী সভা	শ্রীঅক্ষয়কুমার দত্ত।
২৬ পৌষ, ১৭৭০	গ্রন্থ-সম্পাদক।

গ্রন্থ-সম্পাদক মহাভারতের অনুবাদ বিষয়ে উত্তম বিবেচনা করিয়াছেন ইহা অবশ্য প্রকাশ কর্তব্য।

শ্রীআনন্দকৃষ্ণ বসু।

অতি সুললিত ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে এবং ভরসা করি এইরূপ প্রকাশ ক্রমশঃ হয়, তাহা হইলে অনেক উপকার সম্ভাবনা।

শ্রীশ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়

(৭) স্বর্গীয় আনন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী: তদীয় পৌত্র জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ বসু রচিত (১৩৪৬ সন)।

* কথাগুলি "অক্ষয়-চরিত"কার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজ-মুখে শুনেছিলেন।

(৮) অক্ষয়-চরিত: ২১ পৃষ্ঠা।

(৯) অক্ষয়-চরিত: ২২-২৪ পৃষ্ঠা।

এতদ্রূপ মহাভারতের অনুবাদ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে অতি লোকপ্রিয় করিবেক।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।

পেপার-কমিটির এই কার্যপ্রণালী থেকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা পরিচালনার সুনিয়ন্ত্রিত সুসংযত পদ্ধতিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জানি না, বাংলা পত্রিকার ইতিহাসে পরবর্তীকালে ক'খানি পত্রিকা এইভাবে পরিচালিত হয়েছে। পরিচালনার পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য করলে, আরও একটি ব্যাপার পরিষ্কার বোঝা যায়। অক্ষয়কুমার পত্রিকাটিকে কেবল ধর্মতত্ত্বের রহস্য বিচারের পত্রিকা করতে চাননি। বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান, সাহিত্য দর্শন ইতিহাস পুরাবৃত্ত সমাজ ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনুশীলনের একটি উচ্চাঙ্গের পত্রিকা করতে চেয়েছিলেন। সে কাজে যে তিনি কৃতকার্য হয়েছিলেন, একথা দেবেন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: (১০)

"তত্ত্ববোধিনী বঙ্গদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা হইয়া দাঁড়াইল। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যের, বিশেষতঃ দেশীয় সংবাদপত্র সকলের অবস্থা কি ছিল, এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সেই সাহিত্য-জগতে কি পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিলে, তাঁহাকে দেশের মহোপকারী বন্ধু না বলিয়া থাকা যায় না। 'রসরাজ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' প্রভৃতি অশ্লীলভাষী কাগজগুলি ছাড়িয়া দিলেও 'প্রভাকর' ও 'ভাস্করের' ন্যায় ভদ্র ও শিক্ষিত সমাজের জন্য লিখিত পত্র সকলেও এমন সকল ব্রীড়াজনক বিষয় বাহির হইত, যাহা ভদ্রলোকে ভদ্রলোকের নিকট পাঠ করিতে পারিত না। এই কারণে রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ডিরোজিওর শিষ্যগণ ঘৃণাতে দেশীয় সংবাদপত্র স্পর্শও করিতেন না। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনী যখন দেখা দিল, তখন তাঁহারা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। রামগোপাল ঘোষ একদিন লাহিড়ী মহাশয়কে বলিলেন—'রামতনু! রামতনু! বাঙ্গালা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা দেখেছ? এই দেখ', বলিয়া তত্ত্ববোধিনী পাঠ করিতে দিলেন।"

বাংলা ভাষায় গম্ভীর ভাবের রচনা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' যাঁরা প্রবর্তন করেন, অক্ষয়কুমার দত্ত নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অক্ষয়কুমারের রচনাশক্তির বিকাশে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রাজনারায়ণ বসু তাঁর "বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা"য় বলেছেন: "অনেকে অবগত নহেন যে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট অক্ষয়কুমার দত্ত কত উপকৃত আছেন। তাঁহারা তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম বিস্তর সংশোধন করিয়া দিতেন।"

ঈশ্বরচন্দ্রের সহানুভূতি ও সমর্থন ভিন্ন অক্ষয়কুমার একলা কখনও তত্ত্ববোধিনীর হাল ধ'রে রাখতে পারতেন না। দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতার আকর্ষণে সভা ও পত্রিকা দুইই ধর্মতত্ত্বের বিচ্ছিন্ন দ্বীপে ভেসে যেত। খৃষ্টধর্মের প্রচারের উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়াই হ'ত তার অন্যতম কর্তব্য। সমাজজীবনের বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব হ'ত না। অক্ষয়কুমার তা হ'তে দেননি। সম্পাদকীয় কর্তব্য পালনে তিনি যে চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অতুলনীয়। তত্ত্ববোধিনীর গ্রন্থাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ উৎসাহ তাঁর দৃঢ়তাকে আরও অনমনীয় ক'রে তুলেছিল।

অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে দেবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন: "আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আমি খুঁজিতেছি, ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ; আর তিনি খুঁজিতেছেন, বাহ্য বস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির কি সম্বন্ধ; আকাশ-পাতাল প্রভেদ।" কার্যক্ষেত্রে, সভা ও পত্রিকা পরিচালনাকালে ক্রমেই তিনি এ সত্য তীব্রভাবে উপলব্ধি করতে আরম্ভ করলেন। কেবল অক্ষয়কুমারকে নিয়ে নয়, বিদ্যাসাগরকে নিয়েও। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গেও তিনি স্বচ্ছন্দে বলতে পারতেন—'আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়!'

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার মিলনের পর দেবেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সভাটিকে ব্রাহ্মসমাজেরই একটি হাতলে পরিণত করতে। অক্ষয়কুমার ব্রাহ্ম হ'য়েও তা চাননি। ব্রাহ্মদের মধ্যে আরও অনেকে তা চাননি। বিদ্যাসাগর তো চান-ই নি। যাঁরা তা চাননি, তাঁরা মনে করতেন যে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার কোন লক্ষ্যগত প্রভেদ না থাকলে, সভার সামাজিক প্রতিপত্তি খণ্ডিত হবে। সমাজ ও সভার আপেক্ষিক মূল্যায়ন নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সভার সভ্যদের মতবিরোধ হ'ত। পত্রিকার প্রবন্ধ নির্বাচনের ব্যাপারেও যে-দৃষ্টিতে রচনার বিচার করা হ'ত, তাতে সব সময় দেবেন্দ্রনাথের ধর্মপিপাসু মন পরিতৃপ্ত হ'ত না।

অনেক সময় প্রত্যক্ষ সংঘর্ষও এড়িয়ে চলা সম্ভব হ'ত না। ঈশ্বরের স্বরূপ নির্ধারণের ব্যাপারে এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত দেবেন্দ্রনাথের উপাসনা-পদ্ধতির বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার আন্দোলন করতেও দ্বিধা করেননি। বেদান্তবাদ ও বেদের অভ্রান্ততাবাদের প্রতিবাদ ক'রে তিনি বিচার-বিশ্লেষণ আরম্ভ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন: "প্রধানতঃ তাঁহারই প্ররোচনাতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর উভয় বিষয়ে গভীর চিন্তায় ও শাস্ত্রানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন।" তাহলেও, ঘন ঘন বিরোধ ও সংঘর্ষের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ক্রমেই তিতবিরক্ত হয়ে ওঠেন। "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিতও দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর মহাশয় একবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মতত্ত্ব অপেক্ষা বিধবা বিবাহ প্রচারেই অধিক উৎসাহ প্রকাশ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত অথচ রক্ষণশীল লোকদিগকে বিরক্ত করিয়া তোলেন।"(১১)

বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দু'জনেই ঘোর যুক্তিবাদী ছিলেন। অক্ষয়কুমার প্রায় বলতেন, কৃষকরা পরিশ্রম ক'রে শস্য পায়, জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা ক'রে কোন কৃষাণের কস্মিনকালেও শস্য

(১০) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ); ১৯৯-২০০ পৃষ্ঠা।

(১১) 'আত্মজীবনী'র পরিশিষ্ট (২০ নং), 'তত্ত্ববোধিনী সভা ও ব্রাহ্মসমাজ', ৩৫৭ পৃষ্ঠা।

লাভ হয়নি। প্রার্থনার ফলাফল যে শূন্য, কিছু নয়, তা তিনি বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালীতে এই ভাবে বুঝিয়ে দিতেন—

পরিশ্রম = শস্য
পরিশ্রম + প্রার্থনা = শস্য
প্রার্থনা = শূন্য (0)

বলা বাহুল্য, প্রার্থনার ক্ষেত্রেও অক্ষয়কুমারের এই বীজগণিতের সূত্র-প্রয়োগ এবং ধর্মতত্ত্বের বদলে বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহাদি বিষয়ে অধিকতর আগ্রহ, দেবেন্দ্রনাথ বরদাস্ত করতে পারতেন না। একবার রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজে একটি বক্তৃতা করেন। তত্ত্ববোধিনীর গ্রন্থাধ্যক্ষরা (অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর তাঁদের মধ্যে প্রধান) বক্তৃতাটি পত্রিকায় প্রকাশযোগ্য মনে করেননি। এই সময় অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে দেবেন্দ্রনাথ একখানি পত্রে লেখেন :(১২)

"এ বক্তৃতা আমার বন্ধুদিগের মধ্যে যাঁহারা শুনিলেন তাঁহারাই পরিতৃপ্ত হইলেন; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে তত্ত্ববোধিনী সভার গ্রন্থাধ্যক্ষেরা ইহাকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে প্রকাশযোগ্য বোধ করিলেন না। কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।"

এ রকম কঠোর খেদোক্তি দেবেন্দ্রনাথ সহজে করেননি। 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ' বলতে তিনি কাদের কথা বলছেন, তাও পরিষ্কার বোঝা যায়। অবশেষে ১৭৮১ শকের বৈশাখ মাসে (১৮৫৯, মে) দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা তুলে দেন। উল্লেখযোগ্য হ'ল, সভার শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরই তার সম্পাদক ছিলেন। ১৭৮১ শকের ২৬ বৈশাখ সাম্বৎসরিক সভার যে নোটিশ প্রকাশিত হয়, তাও 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা' স্বাক্ষরিত।

আমি কোথায়, আর তিনি কোথায়! আকাশ-পাতাল প্রভেদ!

দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে এ রকম 'আকাশ-পাতাল প্রভেদ' থাকা সত্ত্বেও, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার কি ক'রে তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার সঙ্গে দীর্ঘকাল ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, ভাবলে অবাক হ'তে হয়। বিশেষ ক'রে বিদ্যাসাগরের কথা মনে হ'লে, আরও অবাক হতে হয়। আর্থিক বা চাকরি-বাকরির স্বার্থের ব্যাপারে তত্ত্ববোধিনীর সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল না। কর্মজীবনে তাঁর প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এই সময় ক্রমেই বাড়ছিল। মতামতের ব্যাপারে কোনকালেই তিনি আপস-রফার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন না। মতের সংঘর্ষ বা বিরোধ তিনি কখন সহ্য করতে পারতেন না। বিদ্যাসাগর-চরিত্রের সব চেয়ে বড় দুর্বলতা ও ত্রুটি ছিল এই 'অসহিষ্ণুতা'। মেজাজও এ-ব্যাপারে তাঁর অত্যন্ত খেয়ালী ছিল। মুহূর্তের মধ্যে যে কোন গুরুবিষয়ে তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। তাই মনে হয়, 'আকাশ-পাতাল প্রভেদ' সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কি জন্য শেষ দিন পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন? কি ক'রে তাঁর পক্ষে থাকা সম্ভব হয়েছিল?

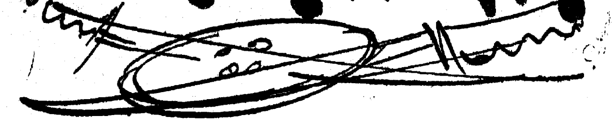
ধর্মান্দোলনের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের আস্থা ছিল না। বরং তিনি মনে করতেন, ধর্মান্দোলনে সামাজিক আন্দোলন ব্যাহত হয়। তবু এ কথা ভাবা যায় না যে মধুসূদন দত্তের মতন প্রতিভাবান যুবকদের, নিজধর্ম পরিত্যাগ ক'রে, খৃষ্টধর্ম গ্রহণের ব্যাকুলতা দেখে তিনি আদৌ চিন্তিত ও ব্যথিত হননি। নিশ্চয় হয়েছিলেন। কৃষ্ণমোহনের মতন জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির পক্ষে গোঁড়া পাদ্রিসাহেবে পরিণত হওয়াও তিনি সামাজিক শুভলক্ষণ বলে মনে করতেন না। ডাফ, ডিয়াল্টি প্রমুখ পাদ্রিদের অনেক চারিত্রিক গুণ থাকলেও, তাঁদের ধর্মপ্রচারের কলাকৌশল তিনি সমর্থনযোগ্য মনে করতেন না। এদিকে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারে যে এ-ব্যাধির উপশম হবে, এ-বিশ্বাসও তাঁর ছিল না। ব্যাধি 'cure' করা সম্ভব হলেও, 'prevent' করা সম্ভব নয়। মূল সমস্যা হল, দিকনির্ণয় করা। সামাজিক কর্তব্যের ও আন্দোলনের দিকনির্ণয় করা। দিকভ্রান্ত যাঁরা, তাঁদের একবার যদি আসল চলার পথটি দেখিয়ে দেওয়া যায়, আসল সমস্যা ও কর্তব্যেও সন্ধান দেওয়া যায়, তাহলে তাঁরা অসাধ্য সাধন করতে পারেন। এ-বিশ্বাস তাঁর ছিল। তিনি জানতেন, মধুসূদন বা কৃষ্ণমোহন সাধারণ মানুষ নন। ব্রাহ্মসমাজ ও তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্যদের মধ্যেও প্রতিভাবান যুবকের অভাব নেই। পাদ্রিদের দলে যোগ দেওয়ার কথা তিনি কল্পনা করতে পারতেন না। সনাতন হিন্দুধর্মপন্থীদের সঙ্গে তো নয়ই। বাকি থাকে ব্রাহ্মসমাজ-তত্ত্ববোধিনীর দল। এ দলের সঙ্গে অনেকদূর পথ অগ্রসর হওয়া যায়। এ দলের সঙ্গে থেকে যদি নূতন গোঁড়ামির রাশ খানিকটা টেনে রাখা যায়, ধর্মান্দোলনের চোরাগলির পথ থেকে যদি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রশস্ত পথের দিকে তার গতি ঘুরিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সাময়িক দুর্যোগের অন্ধকার কেটে যাবে, নূতন উষার স্বর্ণদ্বার খুলতে খুব বেশি বিলম্ব হবে না।

এই রকম ধারণার বশবর্তী হয়ে বিদ্যাসাগর তাঁর কর্মজীবনের উদ্যোগপর্বে, উনিশ শতকের চতুর্থ দশকে, তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন। ধারণা তাঁর মিথ্যা হয়নি। তাতে তিনি নিজেও উপকৃত হয়েছিলেন এবং তাঁর সান্নিধ্যে অন্যান্য সহকর্মিরাও লাভবান হয়েছিলেন। সভার মধ্যে থেকে তিনি তার ধর্মপ্রবণতার ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শকে বড় ক'রে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর নবীন সভ্যদের মধ্যে সকলেই প্রায় তাঁর সহযোদ্ধা ছিলেন। অক্ষয়কুমার দত্ত ছিলেন তাঁর একান্ত অনুরাগী ও বিশ্বস্ত সেনানায়ক।

[ক্রমশঃ।

(১২) 'আত্মজীবনী'র পরিশিষ্ট (৫৫ নং), ৪৫৭ পৃষ্ঠা।

রাজায় রাজায়



উদয়ভানু

প্রগলভার মত খিলখিলিয়ে হাসছে যেন থেকে থেকে! কূলপ্লাবী আমোদর হেসে হেসে ব'য়ে চলেছে উত্তালতরঙ্গে। ছোট ছোট ঢেউ, সর্পফণার মত দলে দলে ছুটে চলেছে কোন্ এক মহানন্দের উৎসবে! উত্তরঙ্গ নদীর জলে লালের আভাস,—সিঁদূর না আলতার লালিমা ছড়িয়েছে আপরাহ্নিক আকাশ। আমোদরের অঙ্গ তীরে ঘন বনরেখার আড়ালে নেমেছে দিনশেষের লাল সূর্য্য। নদীর জলে তাই সিঁদূরে-মেঘের ছায়া ঝিলমিল করে। চৌধুরাণীর পালবাহী পত্রপুটার শব্দহীন গতিতে আরও যেন চঞ্চল হয় আমোদর! নদীর বালিয়াড়িতে তরঙ্গের আঘাত পড়ে ঘন ঘন। নৌকা তীরে লেগেছে, নোঙর প'ড়েছে। নাগমুখী পত্রপুটার লাল শালুর পাল ফুলে ফুলে উঠছে বিপরীত বাতাসে। নৌকা-গাত্রের চিত্রবিচিত্র ছায়া খেলছে আলতারাঙা জলে। ক'জন মাল্লা, নৌকা থেকে তীরে নেমে দেখছে ইদিক-সিদিক। জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্ন-প্রাসাদ লক্ষ্য করছে সাগ্রহে। নদীর তীর থেকে বিশাল বিস্তৃত জমিদার-গৃহ দেখলে যেন কেমন ভয় হয় মনে। ভয় হয়, জোরালো এক হাওয়ার দোলায় যে-কোন মুহূর্তে হয়তো ঐ জরাজীর্ণ অট্টালিকা ধরাশায়ী হয়ে পড়বে। গৃহের নিম্নতল দেখা যায় না, ফাটলধরা প্রাচীরের অন্তরালে লুকানো। দ্বিতলের সারি সারি বাতায়ন পাল্লাহীন, উন্মুক্ত। আঁধার-কালো চতুষ্কোণ গহ্বর যেন একেকটি—নিষ্প্রভ দিনের আলোয় মনে হয়, কবে কোন্ কালে হয়তো অগ্নিদগ্ধ হয়েছে ঐ বিশাল পুরী। প্রাচীরশীর্ষে আর ছাদের আলসেয় বট আর অশ্বত্থের চারা মাথা তুলেছে। নৌকার মাঝিরা দেখলো, এক মুক্ত বাতায়ন থেকে কি এক, দল নিশাচর পাখী, একে একে বেরিয়ে আকাশে পাড়ি জমালো তীরের বেগে। এক ঝাঁক কপিশ-কালো পেঁচা উড়লো আকাশে। উড়তে উড়তে চকিতের মধ্যে হারিয়ে গেল ঐ বাঁশবনের পেছনে।

—জমিদারণী আছো না কি?

আনন্দকুমারীর ভয়ার্ত কথায় অন্দর মহলে কাঁপা-কাঁপা প্রতিধ্বনি ভাসলো। কে যেন কোথায় লুকিয়ে থেকে ভেংচানি কাটলো বেণের মেয়েকে, তার কণ্ঠস্বরের অনুকরণে। পায়ের শব্দ শুনে হিসহিসিয়ে ছুটে পালালো এক পাল গো-সাপ। অন্দরের এক দালান থেকে অন্য দালানে চললো ছুটতে ছুটতে। এত বীরদর্প চৌধুরাণীর, সে-ও ত্রস্ত হয়ে ওঠে। টাটকা কাজলের রেখাটানা চোখে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফুটিয়ে অন্দরের সোপানশ্রেণীর দিকে এগিয়ে চলে। চৌধুরাণীর চলার গতি কখনও অতি দ্রুত, কখনও অতি ধীর। অন্দরে সাঁঝবেলার অল্প অন্ধকারের ম্লান ছায়া ঘনিয়েছে, তাই এই ভয়চকিত পদপাত।

—ও পথে নয়, ও-পথে নয়, ইদিক দে যাও। ওদিকে ভীষণ ভয়!

সাবধানী কথা শুনে সিঁটিয়ে সিঁটিয়ে ওঠে আনন্দকুমারী। কে যেন তার পিছু থেকে ডাক দেয় অতর্কিতে।

জমিদার-নন্দিনীর পরিচারিকা আসমানের ঘাট থেকে ফিরতে ফিরতে কথা বললে। যশোদার কাঁকালে জলের কলসী।

—বৌ কোথায় গো দাসী?

চৌধুরাণী ভয়ের সিঁড়ি থেকে দালানে নেমে বললে শুষ্ককণ্ঠে। ভয়ে ভয়ে বললে,—ও পথে কিসের ভয় গো দাসী?

কাঁকাল বদল করলো যশোদা। কলসী থেকে খানিক জল উপচে পড়লো দালানে। হাসির সুরে বললে,—স্বর্গের সিঁড়ি ওটা নয়, ওটা পাতালের সিঁড়ি। অব্যর্থ মৃত্যু ওর শেষ পরিণাম!

—তবে যে উপুর পানে উঠেছে এঁকে-বেঁকে?

আনন্দকুমারীর কাজল-কালো চোখে বিস্ময়ের বিস্তার। ঠিক বুকের 'পরে' একটি কুসুমকোমল হাত। আঁট কাঁচুলীর মধ্যে আছে খাপেভরা গুপ্ত অস্ত্র—হাতের পরশে একবার অনুভব করলো, আছে না নেই।

ত্রিভঙ্গ যেন পরিচারিকা, জলভরা কলসীর ভারে। হেসে হেসে যশোদা বললে,—হাঁ ঐ উঠতে উঠতে দেখবে শেষে শুধু মিশকালো আঁধার। সিঁড়ির শেষ ধাপে পা দিলেই একেবারে এমন এক পাতকূয়ায় পড়বে যার নাকি তল পাওয়া যায় না।

শুনে যেন শিউরে উঠলো ক্ষীণমধ্যা চৌধুরাণী। কোমর থেকে লাল রেশমী রুমাল টেনে মুখের ঘাম মুছলো চেপে চেপে। অন্দরের বদ্ধ হাওয়ায় মৃগনাভি কস্তূরীর খোশবয় ভাসলো লাল রুমাল থেকে।

—তবে তো আজ মরতাম দেখি! ভাগ্যি দাসী বললে তুমি!

রুমালে মুখ মোছে আর কথা বলে আনন্দকুমারী। আতঙ্কে যেন ঘেমে উঠেছে বড় বেশী। শাঁখের গুঁড়ি মুছে গেছে মুখ থেকে। কাজল ভিজেছে চোখের। কত যতনের প্রসাধন ধুয়ে গেছে অবশ্য মৃত্যুর আশঙ্কায়।

—এসো, আমার সাথে এসো। সস্নেহে বললে পরিচারিকা। যেন স্বর্গের সিঁড়িতে উঠছে সে। ডাকলো হেসে হেসে, পিছু ফিরে। সিঁড়ির ক'টা ধাপ পেরিয়ে থামলো একবার। তারপর আবার উঠতে শুরু করলো বলতে বলতে,—আমাদের জমিদারের শখ-সুবুৎ খুব। কা'কেও শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছে হ'লে জমিদার তাকে কাঁচা মদ গিলিয়ে গিলিয়ে নেশায় চুরচুরে ক'রে ঐ সিঁড়ির মুখে এগিয়ে দিয়ে বলতেন, যাও বাছা, এবার সোজা স্বর্গে চ'লে যাও!

যে যেতো সে আর ফিরতো না। শোনা যায়, ঐ পাতকুয়ায় এখনও না কি কান্না কাঁদে রাত-বেরাতে। কত শয়ে শয়ে মানুষের ইহলীলা যে শেষ হয়েছে ওখানে, কেউ বলতে পারে না! আমরা ওর নাম দিয়েছি মরণ-সিঁড়ি।

অনুসরণ করে আনন্দকুমারী, দাসীর ছায়ার মত চলে যেন। বলে,—তোমাদের জমিদার মশাই তো খুব নিঠুর, অনুমান করি। এ আবার কেমন মৃত্যুযাতনা! এ কেমন শাস্তি!

—নিঠুরই বল, আর দয়ালুই বল, কৃষ্ণরামের ঐ ধরণের প্রকৃতি। তাই মরণেও মজা দেখেন হাসতে হাসতে। নরহত্যায় এতটুকু ভয়-ডর নেই কখনও।

যশোদার ছাড়া-ছাড়া কথায় জমিদারের পক্ষের অহঙ্কার ফুটলো। কেমন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা বলছে।

চৌধুরাণীর দেহে অনেক স্বর্ণ-অলঙ্কার। চুড়ি, কাঁকণ, তাবিজ ছুই হাতে; মুক্তো-চুণীর ঝালরের ঝুমকো ঝুলছে কানে। মুক্তোর একনরী হার কণ্ঠ থেকে বুকে নেমেছে। আসমানী-রঙ ঢাকাই শাড়ী প'রেছে বক্ষগোপন ধাঁচে। শাড়ী পরার এমন রীতি যে, কোন' রকমে যেন শ্লীলতার হানি না হয়। মেদভারী নিতম্বে মেখলা। বণিককন্যার পায়ে নূপুর, সিঁড়ির ধাপে ধাপে অনেক ভ্রমরের শিঞ্জন তোলে যেন।

দ্বিতলে উঠেও কা'কেও দেখা যায় না। যেন জনমানবহীন শূন্যপুরী। ফাঁকা দালান আর ছাদ খাঁ-খাঁ করছে। সন্ধ্যা উৎরোতে চললো, একটিও প্রদীপ জ্বললো না এখনও! ঘরে ঘরে আবছা অন্ধকার।

—বৌ কোথায় গো দাসী, দেখতে পাই না কেন?

—এই যে আমি।

চৌধুরাণীর সন্ধানী কণ্ঠ শেষ হ'তে না হ'তে বিন্ধ্যবাসিনী কথা বললেন। দেখা দিলেন শুভ্রবেশে। মিহি কালোপাড় গরদের শাড়ী তাঁর পরনে। রুক্ষ এলোকেশ, কালো হাওয়ায় উড়ছে কৃষ্ণ-পতাকার মত। কালিমালিপ্ত চোখের তল, তবুও মুখে হাসি ফোটালেন রাজকুমারী। খুশী খুশী হাসলেন কথার শেষে।

—তোমাদের মরণ-সিঁড়িতে পা দিয়ে মরছিলাম যে আমি!

চৌধুরীকন্যা আক্ষেপের সুরে কথা বললে। কেমন যেন অনুযোগের সুরে। বললে—পিদ্দিম জ্বালাও না কেন? আঁধারে কেমন আমি থাকতে পারি না, শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে আমার।

বিন্ধ্যবাসিনীর ম্লান মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা। অনিচ্ছায় হেসে হেসে বললেন,—আমাকে যে আঁধারেই থাকতে হয়, ঘরের কোণে, ঐ আড়কাঠে চোখ তুলে। তুমি আলোর দেশের রূপকথার পরী, তোমার হাসিতে তাই আলো ঝরে। তুমি তো আলোকরা মেয়ে, পিদ্দিম কি প্রয়োজন?

কথা থামলেই নিশ্চুপ নীরবতা প্রকট হয়ে ওঠে। তখন শোনা যায়, কাছাকাছি কোথায় যেন কার ঘন ঘন শ্বাসপতনের শব্দ। দম-আটকানো বুক থেকে যেন অতি কষ্টে শ্বাস পড়ছে কার। থেমে থেমে।

রাজকুমারীর একখানি হাত স্বহস্তে ধরলো চৌধুরাণী। তার বুকের স্পন্দন যেন থেমে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত হিম হয়ে যায়। চোখ ছু'টিতে ভয়-ভীরু চাউনি।

বেশ কিছুক্ষণ কান পেতে শুনলো চৌধুরাণী; শ্বাস ফেললো না কতক্ষণ।

রাজকুমারী অনুভব করলেন চৌধুরাণীর করনিপীড়ন। বিন্ধ্যবাসিনীর কমল-কোমল হাত ভয়ের আধিক্যে সজোরে ধ'রে আছে আনন্দকুমারী।

কষ্টকণ্ঠে কথা বললে চৌধুরাণী,—ও কিসের শব্দ শুনি কানে? কেউ কোথায় মরছে না কি হাঁফ আটকে? কারও প্রেতাত্মা এসেছে না কি?

হেসে ফেললেন বিন্ধ্যবাসিনী। চোখের পাতা নাচিয়ে নাচিয়ে খিল-খিল হাসি হাসলেন। যেন তামাসার হাসি হাসতে হাসতে বললেন,—এটা পোড়োবাড়ী, ভুলে যাও কেন? ভরাসন্ধ্যা এখন, নাম করতে নাই, মা মনসার বাহনরাই ডাকাডাকি করছে হয়তো!

যুক্ত ছুই হাত কপালে ঠেকিয়ে কার উদ্দেশে প্রণাম জানালো আনন্দকুমারী। ড্যাবা-ড্যাবা চোখে তাকিয়ে থাকলো খানিক। বললে,—কা'কেও যদি দংশায় তখন কি হবে?

জমিদারনন্দিনী আবার হাসলেন ঈষৎ। বললেন,—আমি তো আছি এখানে কদ্দিন, কৈ-কেউ তো কিছু বলে না? কোন ক্ষতিই করে না আমাদের।

—তুমি কা'কেও দেখেছো কোন দিন?

ভয় আর কৌতূহলের সঙ্গে বললে চৌধুরাণী। চোখের যেন পলক পড়ছে না। বৈশাখ-বেলার উদাস হাওয়ায় তার পরিধানের আসমানী ঢাকাই শাড়ীর আঁচল নেচে নেচে উঠছে। বেণের মেয়ের শ্বাস পড়ে কি না পড়ে। উৎকণ্ঠার শিহরণ যেন বুকে!

রাজকুমারী বললেন,—হাঁ দেখেছি বৈ কি, রোজই দেখতে পাই। ভোরের বেলায় যখন পুবের আকাশ থেকে রূপালী আলো ছড়ায় তখন দেখি ওদের, ওরা গুপ্তবাস থেকে আঙিনায় বেরিয়ে পড়ে। সূর্য্যিদেবের দিকে সমুখ ফিরিয়ে মনের আনন্দে কেমন নাচানাচি করে লেজের ভরে দাঁড়িয়ে। আলো দেখে হয়তো ওরা খুশী হয়।

পাৎলা কাজলের মত কালো ছায়া যেন হিমানী-আকাশে। শব্দহীন পদসঞ্চারে নিশার অন্ধকারে নামছে কোন্ অলক্ষ্যলোক থেকে। ঐ আকাশ থেকে যেন সোনা-আলোর এক ক্ষুদ্রতম গ্রহপিণ্ড নেমে এসেছে পৃথিবীর মলিন মাটিতে। সেই আলো, এগিয়ে আসছে অত্যন্ত ধীরে ধীরে। দালানের অন্য প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসে অতি সন্তর্পণে। মাটির পৃথিবীর বিষাক্ত কালো হাওয়ার বেগে যেন নিবে যাবে এখনই।

হাতে তৈল-প্রদীপ, পরিচারিকা সাবধানে দালান অতিক্রম করে। যদি নিবে যায় দীপশিখা, দমকা বাতাসে? চকমকি ঠুকে ঠুকে অতি কষ্টে প্রদীপ জ্বালিয়েছে যশোদা।

বিন্ধ্যবাসিনী দেখলেন, দীপের আলোয় দেখলেন চৌধুরাণীকে। তার ভয়ার্ত মুখ দেখলেন সাগ্রহে। কুমোরপাড়া থেকে এসেছে যেন কোন্ এক দেবীমূর্ত্তি। প্রতিমার মত ছাঁচে-ঢালা ঢল-ঢল মুখ। যেন ঘামতেল মাখানো শ্রীমুখে।

—রক্ষে করলে যশোদা, পিদ্দিম জ্বেলে এনেছো যা হোক। আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে আছি। এই ভুতুড়ে শূন্যপুরীতে কোন্ সাহসে তোমরা আছো, জানি না!

আলো দেখে এতক্ষণে সহজ সুরে কথা বললে আনন্দকুমারী। স্বস্তির দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

রাজকুমারী দেখলেন আবার। চৌধুরাণীর অলঙ্কারসমূহ দেখলেন খুঁটিয়ে। এমনটা যেখানে সেখানে যখন তখন দেখা যায় না। কি অপূর্ব্ব গঠন গয়নার! কি বিচিত্র কারুকাজ চুড়ি, কাঁকণ আর তাবিজে। চুণী আর পান্না আর মুক্তার কি অবিমৃষ্য ব্যবহার!

এক নির্জন কক্ষের এক কোণে দাসী প্রদীপ রেখে যায়। বিন্ধ্যবাসিনী সেই কক্ষে প্রবেশ করলেন। বললেন,—চৌধুরাণী, এসো, এই ঘরে তোমাকে বসাই।

আনন্দকুমারী কক্ষের দ্বার অতিক্রম করে, ভয়ে ভয়ে। দীপের উজ্জ্বল আলোয় লক্ষ্য করে ইতি-উতি। দেখে ঘরের মধ্যভূমিতে বালুকার আস্তরণ, হোমকুণ্ডের মত। অন্যান্য কক্ষ অপেক্ষা যেন এই ঘর অধিক পরিচ্ছন্ন। এক মৃৎপাত্রে স্তূপীকৃত যুঁইফুল। আসমানের তীর থেকে যশোদা সংগ্রহ ক'রেছে ফুলের রাশি। কক্ষের বদ্ধ বাতাসে টাটকা যুঁইয়ের সুরভি। বালুকা-শয্যার দুই দিকে দু'টি তালপত্রের আসন। দু'টি লগুড়-লেখনী।

—ধূপ জ্বেলে দিই জমিদারণী?

দাসীর কথায় কক্ষের অবিচ্ছিন্ন নৈঃশব্দ ভঙ্গ হয়। যশোদার হাতে এক গুচ্ছ চন্দনধূপ।

আরেকটি আসন পাতলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—দাঁড়িয়ে থেকে থেকে পা দু'খানিকে আর কষ্ট দাও কেন? এই আসনে ব'সে বিশ্রাম কর খানিক। যশো, তুই ধূপ জ্বেলে দে।

দীপের অগ্নিশিখায় ধূপ জ্বালায় পরিচারিকা। যুঁইয়ের সৌরভে মিশে যায় ধূপের চন্দনগন্ধ।

—যাগযজ্ঞ হবে না কি কিছু! বালুর মধ্যে কিসের আখর? কার নাম লেখা? কোন্ মন্ত্র? আমি তো লিখন-পঠনে অক্ষম।

হঠাৎ যেন চোখে পড়েছে। দেখতে দেখতে কথা বললে চৌধুরাণী। প্রশ্ন করলে এক সঙ্গে একাধিক।

লজ্জায় কেন কে জানে, আরক্তিম হয় রাজকুমারীর মলিন মুখকান্তি। তৎক্ষণাৎ হাত বুলিয়ে মুছে ফেললেন বালুর লেখা। লজ্জা সামলে বললেন,—এ আমার ইষ্টদেবের নাম, ভাগ্য ভাল যে তুমি পঠনে অপারগ।

কখন কোন্ খেয়ালে নিজের অজ্ঞাতে লিখে ফেলেছিলেন রাজকুমারী। চারটি মাত্র বাংলা অক্ষর লিখেছিলেন। ক্ষণেকের মধ্যে মুছে ফেললেন অক্ষর সমূহ। লেখনী-লগুড়ের সাহায্যে লিখেছিলেন চারটি অক্ষর। যথা,—'চ ন্দ্র কা ন্ত'!

—এক পাত্র জল পান করবো রাজকুমারী! তেষ্টায় বুক ফাটে যেন।

সত্যিই যেন তৃষ্ণায় কাতর হয়ে কথা বললে চৌধুরাণী। কথা বললে শুষ্ককণ্ঠে। উৎকণ্ঠা আর উত্তেজনায় কণ্ঠ যেন শুকিয়ে আছে তার। মিন-মিন ঘামছে এখনও।

দাসী বললে,—এই নাও জল। পানের শেষে পাত্রটি ধুয়ে রেখো। উচ্ছিষ্ট না থাকে।

ঘরেই ছিল জলপূর্ণ পাত্র। দাসী পাত্র এগিয়ে দিয়ে বললে রাগো-রাগো সুরে।

ঢকঢকিয়ে জল খায় আনন্দকুমারী। পাত্র বুঝি প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। পানের শেষে বললে,—জল দাও দাসী, পাত্র ধুয়ে রাখি। শূদ্রজাতে জন্মানোর অনেক জ্বালা!

—যে যার কপাল নিয়ে আসে, আফশোসে কি ফল বল?

উচ্ছিষ্ট পাত্রে জল ঢালে আর বলে পরিচারিকা। বলে,—ভাগ্যকে কে খণ্ডাবে বল? যার যেমন ভাগ্যি!

—যা যা, নিজের কাজে যা যশো। কেবলই তুই বাজে বকিস্।

নকল ধমকানির সুরে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। গোপন ইশারায় কক্ষ ত্যাগের নির্দেশ দিলেন। রাজকুমারী কথা বলেন আর থেকে থেকে ঘরের এক ক্ষুদ্র গবাক্ষ রেকে অপাঙ্গে দেখেন একেক বার। বিন্ধ্যর মনে গোপন প্রতীক্ষা। মধ্যে মধ্যে যেন ঈষৎ আকুল হয়ে ওঠেন। দাসী কক্ষ ত্যাগ করে।

—কৈ গো বৌ, তোমার চন্দ্রকান্তর দেখা নাই কেন?

চৌধুরাণী বললেন কিঞ্চিৎ চাপা সুরে। একজনের বেশী অন্য জন যেন না শোনে।

মৃদু মৃদু হাসি ফুটলো জমিদারনন্দিনীর রাঙা অধরে। হেসে হেসে বললেন,—আমার না তোমার বেণের মেয়ে?

খানিক নীরব থেকে হতাশ সুরে আনন্দকুমারী বললে, বুকের মুক্তামালা নাড়াচাড়া করতে করতে। বললে,—জানি না ঠিক তোমার না আমার।

—হাঁ তোমারই।

—কি জানি কার।

আনন্দকুমারীর সহাস কথায় যেন হাতাশা ফুটলো। তার কাজলপরা চোখে যেন শূন্য চাউনি দেখা যায়।

প্রদীপের দীপ্তিতে দেখা যায়, চৌধুরীকন্যার মুখে যেন আষাঢ়-মেঘের সিক্তছায়া। বর্ষার থমথমে আকাশের মত বিষণ্ণতা! কোথায় গেল কাজল-কালো চোখের সেই ঘন ঘন কটাক্ষ-বর্ষণ! সেই হরিণী-চঞ্চলতা! মৃদুরক্ত ওষ্ঠাধরের সেই মুক্তাঝরা হাসি! আনন্দকুমারীর বুকে মনসিজের দহন। মনের মাঝে সদাজাগ্রত সেই মনের মানুষ—কিন্তু মুখের কথায় কি কিছু প্রকাশ করা যায়? মন-মন্দিরের আসন-বেদীতে যাকে স্থান দিয়েছে, তার নাম কি কেউ সহজে ফাঁস করে! পলে অনুপলে সময়ের তরী এগিয়ে চলে। দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা উৎরে রাত্রি নামলো ধীরে ধীরে, কিন্তু কৈ অভীষ্টের কেন দেখা নাই এখনও? চৌধুরাণী স্থির গম্ভীর, কিন্তু তার বেশভূষা জলজ্বল করছে সমুজ্জ্বলা দীপালোকে। আসমানী ঢাকাই শাড়ীর স্বর্ণতারাবলী চাকচিক্য তুলছে। সন্ধ্যাসমীরণে বস্ত্রাঞ্চলে যেন তরঙ্গ-হিল্লোল খেলে। গ্রীবাভঙ্গীতে কর্ণভূষা দুলে দুলে ওঠে। জরি-জড়ানো কেশবেণী, ফণিনীর মত এঁকেবেঁকে নাচতে থাকে। সীমন্তপার্শ্বের হীরকতারা কৃষ্ণাকাশে শুকতারা ব'লে ভ্রম হয়।

এই ভগ্ন-আলয়ের অন্তঃপুরের অসংস্কৃত ও অপরিচ্ছন্ন একটি কক্ষ, রূপালী রূপ আর 'সোনালী বসনভূষণ হেসে হেসে ওঠে। দীপের কম্পমান শিখায় যত অচেতন জীবন্ত হয়ে ওঠে যেন!

—দাসী, ফুলের পাত্রটা এগিয়ে দে, এক ছড়া মালা গাঁথি। আর সূতুলি দে এক হালি। কেমন যেন আলস্যভরা কথা বললেন রাজকুমারী। ক্ষণেক থেমে বললেন,—শুধু যুঁই তুলেছিস্ যশো, আর ফুল নেই আসমানের ধারে?

—আছে, অনেক আছে! বেল চাঁপা করবী গন্ধরাজ কিছুর

অভাব নেই। পরিচারিকা দেওয়াল-গাত্রে হাত পুরলো। কুলঙ্গী থেকে বার করলো সুতোর কাটিম। পুষ্পপাত্র এগিয়ে দিলো এক লহমায়। বললে,—মল্লিকা মালতী মাধবী সব আছে, গাছের মগ-ডালে যে হাত ওঠে না! আসমানে পদ্ম পলাশ আর শালুক থৈ-থৈ করছে, কে আর জলে নামে এই ভরসন্ধ্যেয়!

সহজ হয়ে ব'সলো চৌধুরাণী, আসমানী ঢাকাইয়ের আড়ালে পা লুকিয়ে। এতক্ষণে যেন শ্বাসগতি স্তিমিত হয়েছে। দীপের আলো আর জমিদার-নন্দিনীকে কাছে পেয়ে ভয় ঘুচেছে খানিক। সহজ হওয়ার অঙ্গসঞ্চালনে আর আলোর ছটায় সীমন্তের পাশে হীরার তারায় কত রঙের বাহার ছুটছে। শুভ্র কণ্ঠ কাঁপিয়ে ক'টা ঢোঁক গিললো আনন্দকুমারী। দাসী কক্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর হাসতে চেষ্টা করলো যেন। পিঠে ফেলা জরি-জড়ানো সাপের মত বেণী বুকের 'পরে টানলো। কাঁচা আলতায় লাল অধরে নকল হেসে বললে,—মালা গাঁথবে কেন বৌ? কা'কে পরাবে?

ইদিক-সিদিক দেখলেন জমিদারণী, সভয়ে লক্ষ্য করলেন, দাসী ঘরে আছে না নেই। সুতায় ফুল গাঁথায় বিরত হয়ে মেঘনীল চোখ তুললেন। মলিন মুখে ম্লান হাসি ফুটলো। বললেন,—তোমাকে পরাবো। আর কে আছে আমার!

চৌধুরাণী যেন অপ্রস্তুত হয়। যেমনটি আশা ক'রেছিল তা যেন শুনলো না। তার গলায় মালা পরাবে শুনে হঠাৎ আনন্দে সত্যিকার হাসি হাসলো। কানের ঝুমকো দুলে উঠলো যেন হাসিখুসীতে। হাতের লাল রেশমী রুমাল কটিতে রাখতে রাখতে বললে,—বৌ, তোমার মুখখানি কি মিষ্টি, যেন আকাশের চাঁদ! কথা, তাও কি মিষ্টি!

কলের মত হাত চলেছে যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। রাশি রাশি সদ্য-তোলা শুভ্র যুঁই, মুঠো মুঠো তুলছেন আর গেঁথে চলেছেন। আয়ত চোখের দৃষ্টি বদ্ধ হয়ে আছে হাতের সূতাগ্রে। কথা শুনেই কথা বললেন না রাজকুমারী। মুঠোর ফুল শেষ ক'রে নতমুখেই বললেন,—তুমি আর হাসিও না চৌধুরীর মেয়ে! সুন্দরের নিন্দা ক'র না অযথা। শুনেছি যে আমার রূপ ছিল এক কালে, জ্বলে-পুড়ে এখন ছাই হয়ে গেছে।

আনন্দকুমারীর মুখে হতাশা ফুটলো। নিরাশ চোখে তাকিয়ে থাকে। সমবেদনার দুঃখে যেন অভিভূতা সে। অপলকে দেখে রাজকুমারীর মালাগাঁথার সূক্ষ্ম শিল্পনিপুণতা।

কলের মত হাত চলেছে বিন্ধ্যবাসিনীর। মালার গ্রন্থিহীন ছড়া লুটিয়ে আছে কোলে। নীরবতা ভেঙে বললেন,—চৌধুরী মশাই কেমন আছেন? মান্দারণেই আছেন তো?

সহজ সুরে কথা বলে চৌধুরাণী,—আজ বিকালে নৌকাযাত্রা করেছেন তিনি। সদাগর মানুষ, ঘরে থাকতে মন চায় না তাঁর। সুতানুটিতে সুতা কিনতে গেলেন। এই বুদ্ধ পূর্ণিমার আগেই ফিরবেন আবার।

সুতানুটি! চমকে উঠলেন যেন বিন্ধ্যবাসিনী, তাঁর পিত্রালয়ের বাস্তুগ্রামের নামটি শোনা মাত্র। মালা গাঁথা থামিয়ে ক্ষণেক স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। চোখ দেখে অনুমান হয়, তিনি যেন সহসা অন্যমনা হয়েছেন। রাজকুমারীর বস্ত্রাঞ্চল খসে পড়লো পিঠ থেকে। অস্ফুট স্বগত করলেন,—সুতানুটিতে গেছেন চৌধুরী মশাই!

এক সঙ্গে অনেক ভুলে-যাওয়া স্বপ্ন যেন স্মৃতির অতল থেকে ভেসে উঠলো। কত যেন হারানো সুর ভাসলো কানে। বিস্মরণের কুয়াশায় ঝাপসা অতীত কালের ছবি যেন স্পষ্ট দেখা দিলো। রুখু চুলের গুচ্ছ কপাল থেকে সরিয়ে আবার মালা গাঁথা শুরু করলেন বিন্ধ্যবাসিনী উদাসী চোখে। বললেন,—সুতানুটি থেকে লোক এসে খোঁজ নিয়ে গেছে। রাজমাতা হয়তো আর থাকতে পারেনি! ভেবেছে, তার একমাত্তর মেয়েটা বেঁচে আছে না গেছে জন্মের মত যমের দুয়োরে!

কথার শেষে ক্ষীণ হাসলেন রাজকুমারী। ধারালো ওষ্ঠে বাঁকা হাসির রেখা। গবাক্ষের বাহিরে একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। দেখলেন, খণ্ডমেঘের ছবি-আঁকা আকাশ। দেখলেন, সে-আকাশ সাদা না কালো। দেখলেন, রাত্রি জ্যোৎস্না। দেখলেন, নক্ষত্র-বিলাসী শুক্লাকাশ। মেঘবালার মেঘবরণ চূর্ণকুন্তল আঁধার-গুণ্ঠনে ঢাকা পড়েছে কখন! এই দুঃখ-জর্জর মর-দুনিয়ার স্বপ্নময় আবরণ, ঐ তারা-ভরা আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে বললেন,—চৌধুরাণী, সামনে বড় ধূম, তাই নয়?

থেকে থেকে বুক ঢিপ-ঢিপ করে চৌধুরীর মেয়ের। হাত দু'খানি হিম হয়ে যায় তুষারের মত। ফিকে আলতা-লাল হাতের তালু ঘামতে থাকে। মন যেন তার চঞ্চল হয়ে ওঠে। সামান্য এক গবাক্ষ থেকে সারা আকাশ চোখে ধরা পড়ে। আনন্দকুমারীও আকাশ দেখে নেয় এক মুহূর্তের কটাক্ষ হেনে। দেখতে পায়, কালো রঙের বেনারসী প'রেছে আকাশ। আঁচলায় সোনালী তারের কাজ, জমিতে তারা-ফুল।

আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে চৌধুরীকন্যা বলে,—বৈশাখী পূর্ণিমায়, তথাগতের জন্ম-জয়ন্তীতে সঙ্ঘারামে মহা উৎসব হবে। অবতার গোতমের পুজো হবে আমাদের ঘরে ঘরে।

—মঠে মঠে অনেক বাতি জ্বলবে সে-রাতে, নয়? অগুরু ধূপের গন্ধে ভ'রে যাবে আকাশ-বাতাস। গাছে ফুল আর থাকবে না।

মাল্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। আসন্ন মহালগনের কথা বলেন। হাতের মুঠো থেকে ফুল ঝরে পড়ে। মালা গাঁথা বুঝি শেষ হয়। বিন্দু বিন্দু জলে সিন্ধু যেমন, তেমনি একটি একটি ফুলে গাঁথা পূর্ণাকার এক মালা রচলেন রাজকুমারী। মালার দুই প্রান্ত একত্রে বাঁধতে বাঁধতে বললেন,—বেণের মেয়ে, দু'টা ক্ষীরের পুতুল খেয়ে মুখে হাসি ফোটাও, কেমন? দাসীকে বলি এনে দিক।

—মিষ্টি কখনও কেউ একা-একা খায় না। নকল হেসে হেসে বললে আনন্দকুমারী।

কক্ষের বাইরের দরদালানে পদাঘাতের শব্দ যেন। দাসী হনহনিয়ে আসছে, পায়ের তলার ভূমি কাঁপিয়ে। ভাঙন-ধরা, জরাজীর্ণ দালান আর দেওয়াল কেঁপে কেঁপে ওঠে। প্রাঙ্গণের কোথা থেকে অস্ফুট শব্দ আসে এক, যেমন ভয়াবহ তেমনি শ্রুতিকটু। কে যেন কার দেহে করাত চালিয়ে চালিয়ে খণ্ড-বিখণ্ড করছে। যার দেহ সে ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছে রুদ্ধকণ্ঠে। একটানা কান্না নয়, থেমে থেমে কাঁদছে।

চৌধুরাণীর কর্ণকুহরে পদশব্দ আর কান্নার ধ্বনি। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে আনন্দকুমারী। ভয়বিহ্বলতায় মুখাকৃতিতে সঙ্কোচ নামে যেন। ভয়ে ভয়ে চৌধুরাণী হস্ত প্রসারিত করে।

রাজকুমারীর একখানি হাত স্বহস্তে ধারণ করে। নিষ্পলক চোখে ভয়ার্ত জিজ্ঞাসা ফুটেছে।

মৃদু-মন্দ হাসলেন বিন্ধ্যবাসিনী, এমনই নির্ভীক তিনি। চপল চটুল হাসি নয়, স্নেহের স্নিগ্ধহাস। বললেন,—ভয় পাও কেন? দাসী আসছে, তারই চলার শব্দ।

—ও কে কাঁদে কোথায়?

চৌধুরীর মেয়ে প্রশ্ন করে কম্পিত স্বরে।

আরও হাসলেন জমিদারনন্দিনী। এবার একটু সজোরে হাসি যেন। কৌতুক-হাসি। বললেন,—তাল আর নারকেল গাছের পাতা দোলার শব্দ, বাতাসে দুলছে। কান্নাকাটি করবার মত কে আছে এখানে? আগে আগে আমি কত কেঁদেছি এখানে এসে, এখন আর কান্না আসে না। এখন আমি উষর মরু।

—জমিদারণী, পূজারী ব্রাহ্মণ এসে পৌঁছেছেন।

কক্ষের বাহির থেকে কথা বললে যশোদা। রাগো-রাগো সুর যেন তার কাটা কাটা কথায়। বললে,—পথের ক্লান্তিতে ব'সে প'ড়েছেন নীচের এক দালানে। হাত-পা ধোয়ার জল দিয়েছি আমি। পূজারী কি এখানে আসবেন? এই অন্তঃপুরে?

একজন স্থির আর অন্য জন চঞ্চল হয়ে উঠলেন। উজ্জ্বল কোমল বর্ণের দুই কমনীয় দেহরাজিতে সহসা ভাবান্তর চোখে পড়ে। এক উত্তাল নদী যেন চকিতের মধ্যে স্তিমিত হয়; চৌধুরাণী বিকলচিত্তের মত, ধবলপ্রস্তরের মূর্তির মত নীরবে ব'সে থাকেন। বর্ষণ-ক্ষান্ত হওয়ার পর অল্প অল্প বিদ্যুৎ-ছটার মত তার ওষ্ঠপ্রান্তে একটু একটু হাসি দেখা যায়।

বিন্ধ্যবাসিনী যেন হাসি রাখতে পারেন না। খুশীর উৎস উছলে ওঠে যেন। হাসির ফোয়ারা ছুটলো তার রাঙা অধরে। হাতের মালা চৌধুরাণীর কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন হঠাৎ। মুখে আঁচল তুলে হাসি গোপন করতে সচেষ্ট হ'লেন।

সেই প্রবল প্রগল্‌ভ হাসির উচ্ছ্বাসে যেন হারিয়ে যায় চৌধুরীর মেয়ে। সলাজ আঁখিতে তার আনত দৃষ্টি।

রাজকুমারী আঁচল চেপে হাসি সম্বরণ করেন। রঙ্গিণীর মত চুপি চুপি বললেন,—চৌধুরীর মেয়ে, শুনলে তো সকলি? আর, চিন্তার কি আছে! এবার একটু হাসো, তোমার সেই ভুবন-ভুলানো হাসি দেখাও।

আনন্দকুমারীর আলতালাল ওষ্ঠে ভাঙা-ভাঙা হাসি দেখা দেয়। বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত মুচকি মুচকি হাসি। চৌধুরাণী বলে,—আমি তবে যাই এখন রাজকুমারি! ঘরে ফিরে যাই?

এ-পাশে ও-পাশে মাথা দোলালেন বিন্ধ্যবাসিনী। সহাস্যে বললেন,—কে তোমাকে যেতে দেয় দেখি! যাবে কোথায় এখনি? তুমি যাও, ঐ পাশের ঘরে গিয়ে লুকাও। আমি না ডাকলে আসিও না।

—কথা কও না কেন বৌ?

বাইরের দালান থেকে কথা বললে দাসী। ঝাঁঝালো সুরে। বললে,—পূজারীকে আনবো না কি এখানে?

—আনবি বৈ কি। আমি যে পাঠ নেবো তাঁর কাছে। আমাকে যে তিনি কাজ দেবেন লেখাপড়ার। রাজকুমারী স্পষ্ট সুরে বললেন দাসীর উদ্দেশে। বললেন,—যা তুই, সঙ্গে ল'য়ে আয়।

আনন্দকুমারী আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। তার কণ্ঠলগ্ন ও বক্ষলীন পুষ্পমাল্য থেকে একটি আধটি যুঁইয়ের পাপড়ি খ'সে পড়লো। ফুলের সুরভি বুকে নিয়ে পাশের কক্ষে যায় চৌধুরাণী। বাসর-রাতের নববধূর মত থেকে থেকে কাঁপছে যেন যখন তখন। অনাগত দয়িতের চরণধ্বনি শুনেছে কানে, তাই উৎকণ্ঠায় তার বক্ষ দুরু-দুরু করছে। হাত আর পা দু'খানি শিথিল হয়ে আছে যেন।

দাসী দালান ত্যাগ ক'রলো দুমদামিয়ে। তার পদশব্দ মিলিয়ে গেল অন্ধকার সিঁড়িতে।

বিন্ধ্যবাসিনীও একবার পাশের কক্ষে গেলেন। তাঁর হাতে একটি তালপাতার আসন। চৌধুরাণীর হাতে সেই আসন ধরিয়ে দিয়ে বললেন,—এখানে তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। এই ঘর আমার শয়নঘর, অন্যান্য ঘর অপেক্ষা অনেক পরিচ্ছন্ন। এই আসনে ব'স তুমি। টুঁ শব্দটি ক'র না যেন। চন্দ্রকান্ত যেন কোন মতে না জানেন যে আমি ছাড়া অন্য কেউ আছে এ তল্লাটে। দেখো, শ্বাস ফেলার শব্দও যেন না শোনা যায়।

জড় পুতুল যেন আনন্দকুমারী। যেন চেতনাশূন্য সে। রাজকুমারী যা যা বলেন তাতেই সায় দেয় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে। সম্মতি জানানোর চাঞ্চল্যে কানের ঝুমকো দুলে দুলে ওঠে। ক্ষীণমধ্যা কটি থেকে লাল রেশমী রুমাল টেনে নিয়ে ঘামেভেজা মুখ মুছে নেয়। কত যতনের প্রসাধন, মুখে-মাখা শাঁখের গুঁড়ি ধুয়ে-মুছে গেছে কখন।

—বৌ, এ ঘরে থাকবো, যদি বিছায় কাটে?

অলীক ভয়ে বাষ্পরুদ্ধ স্বরে কথা বললে চৌধুরাণী। পার্শ্ববর্তী কক্ষের দীপের আলো আর এই ঘরের আঁধারে বিন্ধ্যবাসিনী দেখলেন, চৌধুরীকন্যার ভীরুচোখ। হয়তো কানে শুনলেন, উৎকণ্ঠায় তার কম্পিতবক্ষের দুরু-দুরু ধ্বনি। তার চিবুক ধরলেন জমিদারনন্দিনী। বললেন,—বিছায় যদি কাটে তবুও মুখে রা কাড়বি না।

—মনসার বাহন যদি দংশে?

—ম'রে যাবি, তবুও নয়। তবুও নয়—

কথা বলতে বলতে চকিতের মধ্যে কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন বিন্ধ্যবাসিনী। চৌধুরাণীর চিবুকছোঁয়া হাত নিজের ওষ্ঠে ছোঁয়ালেন। চুমা খেলেন হাতে।

শ্বাস ফেলার শব্দ যদি ভাসে, সেই আশঙ্কায় একবুক শ্বাস টানলো আনন্দকুমারী। খোপেভরা ছুরিকা কাঁচুলীতে আছে না নেই, হাতের পরশে একবার অনুভব ক'রলো। আড়নয়নে দেখলো দীপের আলোয় যদি কারও ছায়া পড়ে পাশের ঘরের দেওয়ালে। চৌধুরাণী ভাবলো, ছায়া যদি যুগলমূর্তির দেখা দেয়, তখন কি উপায় হবে? এ চোখে দেখতে পারবে না তখন সে, ঐ লুকানো ছুরিকায় চোখ দু'টিকে বিঁধে ফেলবে। তারপর রক্তঝরা চোখে অন্ধ হয়ে থাকবে এ জন্মের মত, আর দেখতে হবে না কিছু হিংসার চোখে; দেখতে পাবে না ঐ হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর চন্দ্রকান্তকে।

তালপাতার আসনে আসনপিঁড়ি হ'য়ে বসলো চৌধুরাণী। কক্ষটিতে বাতাসের লেশ নেই। হাতের লাল রুমাল তুলে মুখখানি মুছলো আর একবার। হাতের চুড়ি আর কাঁকণ তখনই রিণিঝিণি তুললো। চৌধুরাণী তৎক্ষণাৎ সভয়ে চুড়ি আর কাঁকণ চেপে চেপে হাতের ঊর্দ্ধে তুলে দেয়, পাছে অলঙ্কারের মৃদুশব্দ ভাসে! কাঁচুলীর ফাঁস ঈষৎ আলগা ক'রলো। শ্বাস রোধ হয়ে আসে হয়তো।

কি এক অজানা মন্ত্রের অস্ফুট গুঞ্জরণ ভাসলো যেন, কাছাকাছি কোথায়। জ্যোৎস্নার রাত্রি। শুক্লরজনী যেন বাকহীনা। অন্ধকারের তবু এক ভয়ের ভাষা আছে, নক্ষত্র আর চাঁদে-ধোয়া সোনালী রাতে যেন বড় বেশী নৈঃশব্দ। চন্দ্রাকর্ষণে সমুদ্র স্ফীতকায় হয়, কিন্তু তেমন যেন উচ্ছ্বসিত হয় না। সবুজ পৃথিবী, চাঁদের রাতে বিরামবিহীন হাসি ধরে। মাটির সেই হাসিতে কোন' সাড়া জাগে না, কোন' ধ্বনি বাজে না। ছমছমে জ্যোৎস্নায় অভিসারিকা চুপিসাড়ে দয়িতের আশে যাত্রা করে, উৎসুক চরণে। লোকনিন্দার ভয়ে কিঙ্কিণী খুলে ফেলে দেয় পথের পাশে, ফুলঝরা বিজনবনে।

তাই বলি, সামান্য এক ছত্র মন্ত্র, শুক্লরাতের থমকে-থাকা নীরবতা ভেঙে যেন চুরমার ক'রে দেয়।

চন্দ্রকান্ত বিদ্যাকে পণ্য ক'রেছেন। জ্ঞান-গরিমাকে বিক্রয় ক'রছেন। বাকদেবীর মন্ত্রই তাঁর একমাত্র জীবিকা এখন। তাই বাণীর মন্ত্র বলতে বলতে পথ চলেন তিনি। প্রদীপ হাতে দাসীর পিছু পিছু চলেন। বলেন,—ওঁ তরুণশকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে। নিজকরকমলোদ্যল্লেখনীপুস্তকশ্রীঃ সকল বিভব সিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ।

দীপ-জ্বলা কক্ষের দুয়োর-প্রান্তে এসে সরস্বতীর ধ্যানমন্ত্র শেষ হয়ে যায়। চন্দ্রকান্ত সহজ ভাষায় কথা বলেন, কেমন যেন গম্ভীরকণ্ঠে বলেন,—দাসী, এই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী আমার সমুখে আসার অগ্রে আমাকে জানিও।

—এই ঘরেই আছেন আমাদের জমিদারণী। আপনি থাকুন এখানে, আমি তাঁকে জানাই।

দাসীর কথা কক্ষ-অভ্যন্তর থেকে কানে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর। কি যেন বলতে চাইলেন রাজকুমারী, কিন্তু মুখ বন্ধ হয়। কথা আর উচ্চারিত হয় না, জিহ্বাগ্রে থেমে যায়। পাশের ঘরের লুকিয়ে-থাকা চৌধুরাণীর মতই যেন তাঁরও শ্বাস পড়ে না আর। বিন্ধ্যবাসিনী ইশারায় কি জানালেন শেষে।

দাসী বললে,—এই আসন আপনার তরে পাতা হয়েছে। আসুন বসুন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—দাসী, আমাকে তুমি দিক-নির্দ্দেশ করিও। আমি চোখে কিছু দেখি না।

দাসী দেখলো, উত্তরীয়ধারী ব্রাহ্মণের চক্ষুর্দ্বয় যেন এক বস্ত্রখণ্ডে বাঁধা। কেবলমাত্র অনুমানের ভরসায় চন্দ্রকান্ত কক্ষে প্রবেশ করলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও দেখলেন। অপাঙ্গে।

দাসী বললে,—মশায়ের পায়ের কাছেই আসন আছে। বসতে নিবেদন করি।

পদপ্রান্তে আসনের স্পর্শ পেয়ে চন্দ্রকান্ত সেই আসন গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে বসলেন। পথশ্রান্তিতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, উত্তরী মোচন করলেন সামান্য। উপবীত দেখা দিলো। চন্দ্রকান্ত বললেন,—এ স্থানে, আমার সমুখে কি এক বালুকাস্তূপ আছে? লেখনী-স্বরূপ আছে এক খণ্ড?

দাসী বললে,—হাঁ, তাই আছে। দুই-ই আছে।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—এই গৃহের অধিকারিণী, তিনিও কি আছেন?

দাসী বললে,—হাঁ, তাই আছেন। আমাদের জমিদারণী আছেন।

কথা বলতে বলতে পরিচারিকা যশোদা যেন অবাক মানলো ক্ষণেক। ইতি-উতি কা'কে যেন সন্ধান ক'রলো চোখ ফিরিয়ে ফিরিয়ে। বেণের মেয়ে, গেল কোথায়! দাসীর চোখকে ফাঁকি দিয়ে! আনন্দকুমারী কোথায় গেল এরই মধ্যে! চৌধুরীর মেয়ে?

দাসীর সন্ধানী দৃষ্টি দেখে বিন্ধ্যবাসিনী ওষ্ঠে তর্জ্জনী তুললেন। ইশারায় কি যেন নিষেধ করলেন।

আবার কথা বললেন চন্দ্রকান্ত, খানিক স্তব্ধ থেকে। বললেন,—আমি যাহা যাহা লিখি, সেই সেই লেখাগুলি যদি পঠনে সক্ষম হন, তবেই বোঝা যাবে বিদ্যার দৌড়। শিক্ষমান যে কত, অনুমানে বুঝবো তখন।

—তাই হবে। আপনি লেখনী ধরুন।

এতক্ষণে কথা ফুটলো বিন্ধ্যবাসিনীর কণ্ঠে। তিনি ভাবলেন, পাঠ নেওয়ার মধ্যে লজ্জা-ভয়ের কি আছে! শঙ্কা কাটিয়ে ক'টা কথা ব'লে থামলেন।

দাসী বললে,—মশায়ের চোখে তো বাঁধা, অন্ধ কখনও অন্ধকে পথ দেখাতে পারে না কি!

হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না চন্দ্রকান্ত। হেসে ফেললেন ঈষৎ। বললেন,—রাত্রে আমাদের নারীমুখ দর্শন যে নিষিদ্ধ। কি করি আমি!

কেমন যেন এক ব্যথার আঘাত বাজলো রাজকন্যার বুকে। দীর্ঘ দুই চোখে করুণ দৃষ্টি ফুটলো। ভুরু দু'টি সামান্য কুঞ্চিত হয়ে থাকলো। গালে ক'টা টোল ফুটেছে যেন। তবুও রাজকুমারী এক স্বস্তিশ্বাস ফেললেন। জড়তা ঘুচিয়ে বসলেন সুবাধ্য ছাত্রের মত।

—দাসী, আরও দু'টি প্রদীপ দাও। আমার চোখে যেন ঝাপসা দেখি, দু'টি প্রদীপ আমার দুই পাশে জ্বালিয়ে দিয়ে যাও।

কাঁপা-কাঁপা সুরে কথা বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। কক্ষের দুই দেওয়ালের এক তেকাঠা থেকে যশোদা না-জ্বলা প্রদীপ এনে জ্বালালো জ্বলন্ত দীপশিখা থেকে। জমিদারণীর দুই পাশে রেখে কক্ষ থেকে বেরিয়ে গেল।

বালুকাশয্যায় কি যেন অক্ষর লেখা শেষ করলেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—মহাশয়া, পাঠ করুন যাহা লিখি।

এক জোড়া দীপ জ্বলছে দু'পাশে। সদ্যজ্বলা সলিতার আলোর ছটায় কক্ষ যেন আলোকিত হয়ে উঠেছে।

রাজকুমারী ধীরে ধীরে পড়লেন,—নমঃ সরস্বত্যৈ নমঃ।

পার্শ্বকক্ষে চৌধুরাণী কেমন যেন স্থাণুর মত ব'সে রইলো। অন্ধকার আড়কাঠে চোখ তুলে।

[ক্রমশঃ।

আলোকচিত্র



খস্রুবাগ (এলাহাবাদ)
—অ, কু, চক্রবর্তী



শিব-পার্বতী (হস্তি-দন্ত-শিল্প)
—পুলিনবিহারী চক্রবর্তী



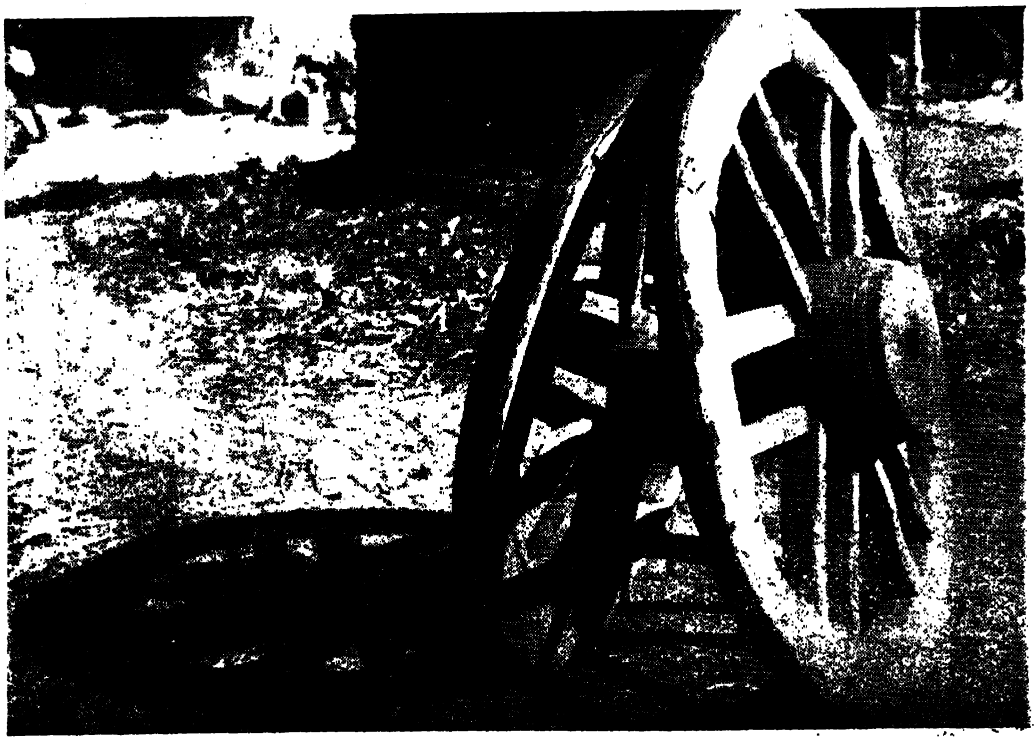
অস্ত্র-শিক্ষা
—গৌরদাস রায়



— শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য।

অচল চাকা

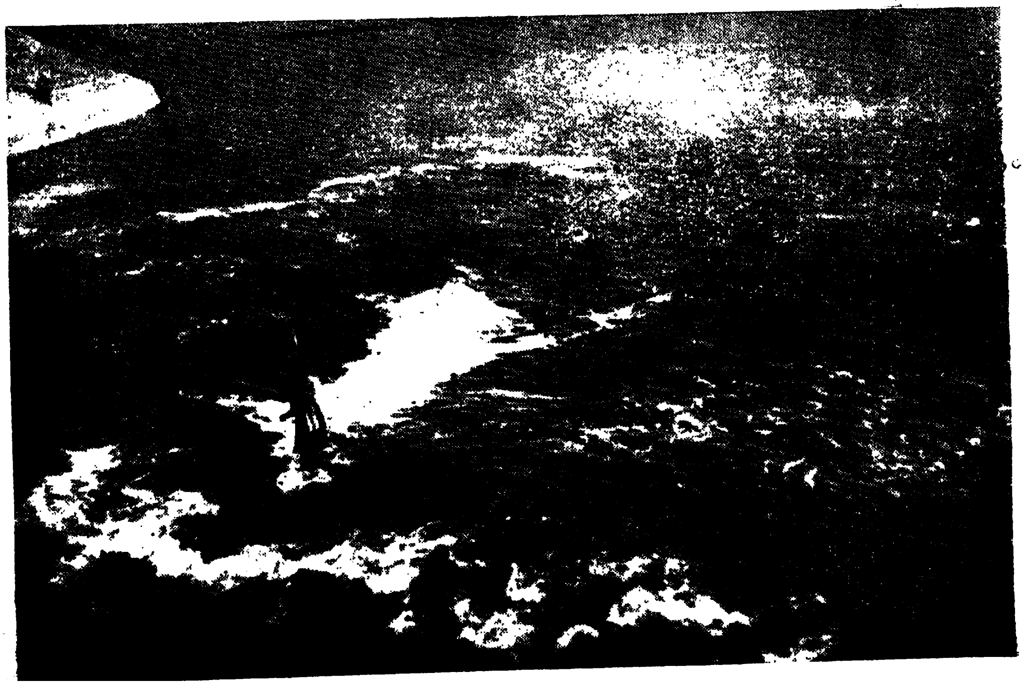
— অসীম বসু





ছেলে-খেলা —প্রবীর রায়

জলের ধারে —জে. ব্যানার্জী





সোনার চাঁদ
—কানু ঘোষ

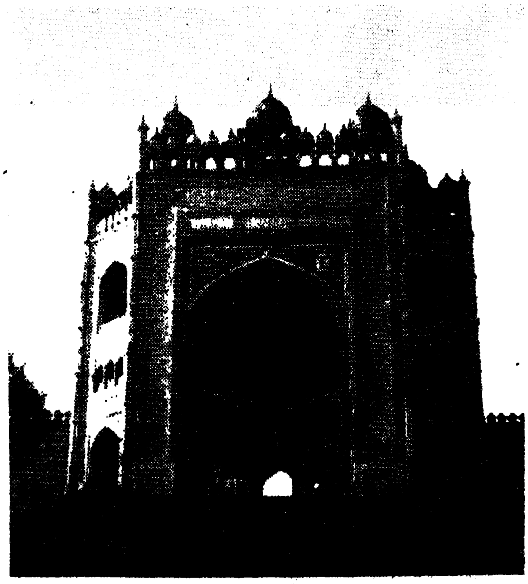


জোনা (রাঁচী)
—বিশ্বনাথ বিশ্বাস



পুষ্কর (আজমীঢ়)
—কল্যাণকুমার মুখোপাধ্যায়

বুলান দরওয়াজা
—অরুণ মুখোপাধ্যায়



পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

'তোমরা অত পাপ-পাপ বলো কেন? একশো বার আমি পাপী আমি পাপী বললে তাই হয়ে যায়।' বিজয়কে বলছেন ঠাকুর: 'এমন বিশ্বাস করা চাই যে তাঁর নাম করেছি, আমার আবার পাপ কি। তিনি আমাদের বাবা-মা, তাঁকে বলো যে পাপ করেছি আর কখনো করব না। আর তাঁর নাম করো, জিহ্বা পবিত্র হয়ে যাবে, দেহ-মন পবিত্র হয়ে যাবে, পাপ-পাখি উড়ে পালাবে দেহবৃক্ষ থেকে।'

মায়ের কাছে সন্তান কি পাপী? সন্তান পীড়িত। সন্তান দুঃখী। সন্তানের দুঃখ হরণ করতে রোগহরণ করতে মা কী না করবে? ব্যথার স্থানে হাত বুলিয়ে দেবে। সমস্ত উপশমের উৎসই তো হচ্ছে মারই করকমল। আর, পাপ রোগ ছাড়া কি, ব্যাধি ছাড়া কি। মা-ই তো সমস্ত ব্যথার সমস্ত ব্যাধির বিশল্যকরণী।

ঈশ্বরই তো বন্ধু। তাঁকে বন্ধু করো। বন্ধু কি আসবে না বন্ধুর সাহায্যে? আর এ তো তোমার প্রবল বন্ধু, পরাক্রান্ত বন্ধু। ক্ষমার সুন্দর ঔদার্যে বিশাল স্নেহে। বিপুল দক্ষিণ। সর্বসময় অব্যবহিত। তোমার সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী তৃপ্তিতে পরিতৃপ্ত। তোমাকে দাঁড় করিয়ে দেবার জন্যে সর্বদা হাত বাড়িয়ে আছে। তোমাকে পাহারা দেবার জন্যে রয়েছে চোখ মেলে। এমন বন্ধুকে যদি না চেন তবে এ সংসারে তুমিই একমাত্র নির্বান্ধব।

মনের কথা বলে প্রাণ খোলসা করতে পারো এমন বন্ধু কে আছে ঈশ্বর ছাড়া? আর যাকেই বিশ্বাস করে বলো তোমার গোপন কথা, ক'দিন পরে দেখবে সে কথা বাজারে বিকোচ্ছে। তখন তুমি দেখবে মতে-মতে মিলনই বন্ধুতা নয়, এক উদ্দেশ্য এক দল এক বাণিজ্য এ-ও বন্ধুতা নয়। আজকের বন্ধু কালকের কালসাপ। তাই কা'কে তুমি বলবে তোমার প্রাণের কথা, তোমার সুখ-দুঃখের কাহিনী? যদি কথা কয়ে প্রাণ উজাড় করে দিতে না পারো তা হলে হালকা হবে কি করে? তাই একমাত্র যিনি বিশ্বাস্য, একমাত্র যিনি ক্ষুদ্র-অন্তঃকরণ নন তার সঙ্গে কথা কও। ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা মানেই সরল হয়ে যাওয়া। আর যে সরল সেই সত্যবাদী।

আগড়পাড়া থেকে একটি বিশ-বাইশ বছরের ছোকরা আসে ঠাকুরের কাছে। এসে, কি সাহস, দূরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে ইসারা করে ডাকে।

ঠাকুরও তেমনি। উঠে যান সেই অচেনা ছোকরার ইসারায়।

ছেলেটি ঠাকুরকে নিয়ে যায় নির্জনে।

'এখানে কেন?'

'তোমার সঙ্গে দুটো মনের কথা কইব। ওখানে বড্ড ভিড়। চুপি চুপি না হলে কি মনের কথা কওয়া যায়?'

'বেশ তো, কও না মনের কথা। চুপি-চুপিই কও।'

ছেলেটি নির্ভয় হয়ে গেল, নির্দ্বন্দ্ব হয়ে গেল। বললে, 'বলতে পারো আমার কামভাব কি করে যাবে?'

ঠাকুর বললেন, 'নিজেকে মেয়ে বলে ভাবো। এ-ও একটা উপায় কামজয়ের। প্রকৃতি ভাব আরোপ করলে কামভাব নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মতন ব্যবহার হয়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে, তাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মতই কথা কয়, দাঁত মাজে।'

নির্জন না হলে নিরঙ্কুশ হবে কি করে? নির্মুক্ত না হলে কইবে কি করে মনের কথা?

তাই তাঁর সঙ্গে খেল, যে এই সৃষ্টির আসল খেলুড়ে। মাটিতে বীজ পুঁতলে অঙ্কুর হয়, এ কৃষকের গুণ নয়, সৃষ্টিকর্তার নিয়মের গুণ। অঙ্কুরের মধ্যে তাঁকে দেখ। তাঁর নিয়ম দেখাই তাঁকে দেখা।

সাধুরা ধুনি জ্বালায় কেন? শীতের থেকে ত্রাণ পাবার জন্যে, না, গাঁজা খাবার জন্যে?

মোটেই না। কাম-ক্রোধকে ইন্ধন করে আহুতি দেবার জন্যে। কাঠের একটা করে কুঁদো নেয়, কোনোটাকে কামভাবে কোনোটাকে বা ক্রোধ। আর আগুনকে মনে ভাবে ইষ্ট, মনোবাঞ্ছার পরিপূর্তি! আগুনের কাছে বসে খুব তেজের সঙ্গে নাম করলে আগুনেরও দাহ-দীপ্তি বাড়তে থাকে। কাঠের কুঁদো ভস্ম না হওয়া পর্যন্ত কেউ আসন ছাড়ে না, অবিশ্রান্ত নাম করে। নিরিন্ধন হয়ে যায়।

চিমটে কেন? ধুনি খোঁচাবার জন্যে?

মোটেই না। চিমটে হচ্ছে বাক সংযমের প্রতীক। যার জিহ্বা সংযত হয়নি সে ধরতে পারবে না চিমটে।

আর কমণ্ডলু? জল খাবার জন্যে নিশ্চয়ই?

মোটেই না। টইটম্বুর করে জল রাখো কমণ্ডলুতে। নির্মল ঠাণ্ডা জল। জলের ঐ সাম্য শৈত্য ও স্থৈর্য তাদের সঙ্গে মনের যোগ রেখে সাধু ভগবানের নাম করে। সব সময়েই দেহ-মন ঠাণ্ডা থাকে, তপ্ত হয় না। চিত্ত অবিকৃত অচঞ্চল থাকে। মনে বিরাজ করে পক্ষপাত নিরপেক্ষ সমতা।

আর ত্রিশূল? হিংস্র জন্তুর আক্রমণের থেকে বাঁচবার জন্যে?

মোটেই না। সত্ত্ব রজ আর তম এই তিন গুণ যার করায়ত্ত, সেই-ই ত্রিশূল ধারণের অধিকারী।

'তুমি সাকারবাদীদের সঙ্গে মেশো, তাই তোমার নাকি খুব নিন্দে হয়েছে?' ঠাকুর জিগগেস করলেন বিজয়কে।

বিজয় চুপ করে রইল।

'যে ভগবানের ভক্ত তার কূটস্থ বুদ্ধি। জাগ্রতে স্বপ্নে সে চিরস্থির, একাবস্থ। যেমন কামারশালের নাই। হাতুড়ির ঘা অনবরত

পড়ছে, তবু নির্বিকার। তোমাকে কত কি বলবে, কত নিন্দে করবে, কটূক্তি। যেহেতু তুমি আন্তরিক ভগবানকে চাও তুমি সব সহ্য করবে।' টলবে না গলবে না।'

বিজয় হাসল।

'দুষ্ট লোকের মধ্যে থেকেও কি ঈশ্বরচিন্তা হয় না?' সরল শিশুর মত ঠাকুর বললেন, 'দেখ না বনের মধ্যে ঈশ্বরকে ডাকত কেমন ঋষিরা। চার দিকে বাঘ ভালুক, তবু সাধনার থেকে নিবৃত্তি নেই। যেমন নিন্দুক আছে তেমনি আবার সৎসঙ্গও আছে। মাঝে মাঝে সৎসঙ্গ করা বড় দরকার।'

বিজয় বললে, 'সময় কই? কাজে আবদ্ধ হয়ে আছি।'

'তোমার আচার্যের কাজ। অন্যের ছুটি হয় কিন্তু আচার্যের ছুটি নেই।'

'ছুটি নেই?'

'আচার্যের নেই। দেখ নি নায়েব যদি এক ধার শাসিত করতে পারে, জমিদার তাকে আরেক ধার শাসন করতে পাঠায়।'

বিজয় বললে, 'আপনি একটু আশীর্বাদ করুন।'

'ও সব অজ্ঞানের কথা। আমি কে! আশীর্বাদ ঈশ্বর করবেন।'

লোকলজ্জা ত্যাগ করে সেই অনন্তের নাম কীর্তন করো। তুমিই তো চলমান তীর্থ।

রাতের অন্ধকারে গোদোহন করছে, কালপ্রেরিত শাপ এসে নারদ-জননীকে দংশন করল। মায়ের মৃত্যুকে নারদ ভগবানের অযাচিত কৃপা বলে মনে করল। চলে গেল গৃহ ছেড়ে। গভীর অরণ্যে গিয়ে বসল এক অশ্বত্থ গাছের নিচে। বুদ্ধিকে সংযত করে অন্তরাত্মায় স্থাপন করল। কি হল তার পর? প্রেম ভরে দেহ পুলকিত হতে লাগল, দু' চোখ ভরে উঠল প্রেমাশ্রুতে। দ্বিতীয় কোনো সত্তার আর জ্ঞান থাকল না। তখন হৃদয় মধ্যে ভগবানের সর্বশোকাপহ দিব্যভাস্বরকলেবর অপরূপ রূপ আবির্ভূত হল। কিন্তু আবির্ভূত হয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। এ কি কোথায় পালালে? বিহ্বল ব্যাকুল হয়ে উঠে পড়ল নারদ। খোঁজাখুঁজি করতে লাগল এখানে-ওখানে। কোথায় সেই ভুবনমনোমোহন মূর্তি! তাকে বাইরে খুঁজছি কোথায়? তাকে তো দেখেছিলাম অন্তরের অন্তরপুরে। সুতরাং আবার মন স্থির করে বসি। নারদ শান্তসংকল্প হয়ে বসল সেই বৃক্ষতলে। বসল প্রেমধ্যানে। কিন্তু কোথায়, কোথায় সেই মণ্ডল-মণ্ডন সুমোহন! আর্ত, আতুর ও অস্থির হয়ে উঠল নারদ। তখন আকাশপথে স্নিগ্ধ গম্ভীর বাণী ধ্বনিত হল—হায়, তুমি আর আমার দেখা পাবে না এ জন্মে। তোমাকে যে একটিবার মাত্র দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়েছি তা শুধু তোমার অনুরাগ বৃদ্ধির জন্যে। যারা কুযোগী, যাদের অন্তর মালিন্য বিদূরিত হয় নি, তারা তো আমার একবার মাত্রও দর্শন পায় না। তুমি যে পেয়েছ তা শুধু তুমি নিষ্পাপ বলে। কিন্তু সর্বক্ষণই যদি দেখ কোথায় পাব তোমার এই আর্তি, এই অনুরাগ, এই খরতরা ব্যাকুলতা!

সেই থেকে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য ধারণ করে দেবদত্ত বীণার ঝঙ্কারে হরিগুণ গান করতে করতে পৃথিবী পর্যটন করছে নারদ।

'আমিও চোখ বুজে ধ্যান করতুম।' বিজয়কে বললেন ঠাকুর। 'শেষে ভাবলুম, চোখ বুজলেই ঈশ্বর আছেন আর চোখ খুললে তিনি নেই, এ কখনো হতে পারে? চোখ খুলেও দেখছি ঈশ্বর সর্বভূতে রয়েছেন। মানুষ জীবজন্তু গাছপালা চন্দ্রসূর্য তারা-তৃণ সব তিনি।'

কিন্তু আমরা তোমাকে দেখি কোথায়? অন্তর অস্বচ্ছ, চর্মচক্ষু অপরিচ্ছন্ন, আমাদের কি করে দর্শন হবে?

আমাদের শ্রবণই দর্শন। আমরা যে তোমার কথা শুনেছি সেই আমাদের তোমাকে দেখা। আমাদের না দেখেই ভালোবাসা আমাদের শুধু বাঁশি শুনেই অভিসার। আমাদের অনুপলব্ধিই প্রমাণ

তোমাকে দেখে তুমি সুন্দর এ বলা কত সহজ। কিন্তু আমরা না দেখেও বলতে পারি তুমি সুন্দরতম, তুমি মধুরতম, তুমি মঙ্গলতম

কাটোয়ায় বৈষ্ণব ঠাকুরকে জিগগেস করলে, 'মশায়, পরজন্মের কথা কিছু বলতে পারেন?'

'এ জন্মের কথা বলতে পারি।'

বৈষ্ণব বাবাজী তাকিয়ে রইল ফ্যাল-ফ্যাল করে।

'এ জন্মের সার কথা ঈশ্বরে ভক্তিলাভ। ঈশ্বরে ভক্তিলাভের জন্যেই মানুষ হয়ে জন্মেছ। সেই জন্মস্বত্ব অর্জন করো।'

'তা তো বুঝলাম, কিন্তু মরবার পর আবার কি জন্ম হবে?'

'গীতায় বলেছে, যে যা ভেবে দেহত্যাগ করবে তার সেই ভাব নিয়ে জন্ম হবে। হরিণকে চিন্তা করে ভরতরাজার হরিণজন্ম হয়েছিল।'

'এটা যে হয় তা কেউ চোখে দেখে বলে, তবে তো বিশ্বাস করতে পারি।'

'তা জানি না বাপু। নিজের ব্যামো সারাতে পারছি না—আবার মলে কি হয়!'

একশো সাতান্ন

ঈশ্বর নাবালকের অছি।

ঈশ্বর কল্পতরু। যে যা চায় সে তাই পায়।

জগৎ দেখলেই বোঝা যায় ঈশ্বর আছেন।

ঈশ্বর আমাদের আপনার লোক। যদি কারু উপর জোর চলে সে একমাত্র ঈশ্বরের উপর।

ঈশ্বরকে মা বলে ডাকতেই শান্তি। ঈশ্বরকে মা বলে ডাকলেই শীঘ্র ভক্তি হয়, ভালোবাসা হয়।

সব ঠাকুরের কথা।

তাই মা-মা করো। নাম করো। নামে যদি অরুচি হয় তার ওষুধও ঐ নামই। যখন পিত্তরোগে মুখ তেতো হয় তখন মিছরিও তেতো লাগে। সেই তিক্ততার ওষুধও ঐ মিছরিই। খেতে-খেতে দেখবে ঐ তেতো মুখেই আবার মিষ্টি লাগতে শুরু করেছে। আনন্দ না পেলে নাম করব না যখন ভালো লাগবে তখন নাম করব, এ ভাব পাটোয়ারি। ভালো লাগুক আর না লাগুক নাম করতেই হবে তৃণের মত নত হয়ে বৃক্ষের মত সহিষ্ণু হয়ে অমানীকেও মান দিয়ে নিরভিমান হয়ে নাম করো। তা হলেই নামের ফল পাবে। নামের ফল আর কি? নামের ফল মহানন্দ।

মা বলে ডাকো। শুষ্কতা লাগবে না, অরুচি ধরবে না। আরো সব চেয়ে সুবিধে, কিছু প্রার্থনাও করতে হয় না মার কাছে। মা বলে ডাকলেই মানুষ পবিত্র হয় নিমেষে। মা বলে ডাকলেই মনে হয় পাশের ঘরে আছেন, এখুনি আসবেন ব্যাকুল হয়ে।

যদু মল্লিকের মাকে বললেন, 'যখন মৃত্যু আসবে সেই সংসার-চিন্তাই আসবে। ছেলেমেয়ের চিন্তা, উইল করবার চিন্তা, বাড়িঘরের চিন্তা। ঈশ্বরচিন্তা আসবে না।'

'উপায় ?'

'উপায় তাঁর নামজপ নামকীর্তন অভ্যাস করা। এই অভ্যাস যদি থাকে তবেই মৃত্যুকালে তাঁর নাম মুখে আসবার আশা।'

কিন্তু যতক্ষণ ভোগ আছে ততক্ষণ যোগ হবে কি করে? ভোগাসক্তি ত্যাগ হলেই শরীর যাবার সময় মনে পড়বে ঈশ্বরকে।

তাই তাড়াতাড়ি ভোগের পালা শেষ করে নাও। নটবর পাঁজা যখন ছেলেমানুষ তখন রাসমণির বাগানে গরু চরাত। তার অনেক ভোগ ছিল। তাই রেড়ির তেলের কল করে অনেক টাকা করেছে। দেখনি আলমবাজারে তার রেড়ির কলের ব্যবসা ?

বিধিপূর্বক যে ভোগ তাতে শাম্য হয়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করে যে ভোগ তার নাম উপভোগ। উপভোগে শাম্য নেই। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। এর অর্থ এ নয়, কামীদের কাম ভোগের দ্বারা উপশম হয় না। এর অর্থ হচ্ছে কামীদের কাম উপভোগের দ্বারা উপশম হয় না। ভোগ হচ্ছে শাস্ত্রসম্মত ভোগ আর উপভোগ হচ্ছে স্বেচ্ছাচারপ্রসূত ভোগ।

দৈত্যগুরু শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীকে বিয়ে করল যযাতি। দৈত্যরাজ বৃষপর্বার মেয়ে শর্মিষ্ঠা যযাতির রাজপুরীতে বন্দিনী, দেবযানীর দাসীত্ব আর আমরণ অভিশাপ। সেই শর্মিষ্ঠারই ছেলে পুরু। দাসীগর্ভে পুত্রোৎপাদনের জন্যে যযাতিকে শাপ দিল শুক্রাচার্য। এই শাপ যে, যৌবনেই যযাতি জরাপ্রাপ্ত হবে। একটু দয়াও করল দৈত্যগুরু। সঙ্গে এই বর দিল, যদি কেউ রাজি থাকে, তা হলে এই জরা তাকে দান করে তার যৌবন সে চেয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কে রাজি হবে এই দুর্ব্যাপারে ? ক্রমান্বয়ে জ্যেষ্ঠ চার-চার ছেলের কাছে গিয়ে যযাতি মিনতি করল, প্রত্যেকের কাছেই মিলল প্রত্যাখ্যান। তখন কনিষ্ঠ ছেলে পুরুর কাছে গিয়ে যযাতি দাঁড়াল কাতরচক্ষে। পুরু রাজি হয়ে গেল। পিতার জরা চেয়ে নিয়ে নিজের নবযৌবন বাপকে দান করল। দেবযানীকে নিয়ে পুনরায় বিষয়ভোগে মত্ত হল যযাতি। দু'-চার বছর নয়, পূর্ণ সহস্র বৎসর।

তখন যযাতি দেবযানীকে বললে, 'পৃথিবীতে যত শস্য, যত স্বর্ণ, যত স্ত্রী যত পশু আছে সমস্ত গেলেও কামপূত পুরুষের মন তৃপ্ত হয় না। উপভোগে কামনার নিবৃত্তি নেই, বরং ঘৃতাহুত বহ্নির মত কেবলই বাড়তে থাকে। পুরুষ যখন সর্বভূতে মঙ্গলভাব পোষণ করে, সমদৃষ্টি হয় তখনই তার কাছে দিঙ্মণ্ডল সুখময় হয়ে ওঠে। যে তৃষ্ণা দুস্ত্যজা, শরীর জীর্ণ হলেও যা জীর্ণ হয় না, সতত দুঃখপ্রদ এই তৃষ্ণাকে ত্যাগ করতে পারলেই কল্যাণ। এক হাজার বছর অবিরাম বিষয়সেবা করলাম, তবুও তৃষ্ণার পার পেলাম না। তাই ঠিক করেছি এবার সকল বিষয় ত্যাগ করে পরব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করব, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরহঙ্কার হয়ে অরণ্যের হরিণের সঙ্গে যথেচ্ছ বিচরণ করব।'

পুরুকে ডেকে পাঠালেন যযাতি। তার যৌবন তাকে ফিরিয়ে দিলেন, তুলে নিলেন নিজের জরাভার। তাকে রাজ্য ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন গহনারণ্যে। অক্লেশে, নিস্পৃহ নির্বিঘ্ন চিত্তে। নীড়ত্যাগী জাতপক্ষ পাখির মত।

দিব্যানুভবে দেবযানীও উদ্দীপ্ত হল। বুঝল সমস্তই ভগবন্মায়া, বিষয়সঙ্গ স্বপ্নতুল্য, কারু কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, সকলেই ঈশ্বরপরতন্ত্র, আর এই যে সুহৃৎসন্নিবাস এ হচ্ছে পানশালার জাসা কতকগুলো তৃষ্ণার্ত লোকের সঙ্গে ক্ষণমিলন। হে বাসুদেব, তুমিই সর্বভূতাধিবাস, তুমিই বৃহৎশান্তি, তোমাকে প্রণাম। এই বলে দেবযানী দেহ রাখল।

খুব সংগ্রাম করো, লোভের সঙ্গে পাপের সঙ্গে প্রবৃত্তির সঙ্গে। সংগ্রাম আরম্ভ হলেই বুঝবে ধর্মজীবন আরম্ভ হল। অগণন তোমার শত্রু কিন্তু তোমার একমাত্র অস্ত্র নামমন্ত্র। জানি তুমি বারে বারে পড়বে, আবার বারে বারে ওঠো গা-ঝাড়া দিয়ে। প্রতিপদে পরাস্ত হতে-হতে যখন একেবারে নিস্তেজ হয়ে পড়বে, চার দিক অন্ধকার দেখবে, তখনই বুঝবে তোমার একলার ক্ষমতায় কিছু হবার নয়। তখনই তুমি উপলব্ধি করবে, তুমি অধম-অক্ষম অকর্মণ্য-অসমর্থ, তখনই তুমি প্রবল কোনো বন্ধুর সাহায্যের জন্যে হাত বাড়াবে, বুঝবে সে ছাড়া তোমার গতি নেই। সে শুধু প্রবল নয়, সে অপরাভূয়। তীব্র তপস্যায় হবে না না কঠিন বৈরাগ্যে না বা নিদারুণ সাধন ভজনে। যখন বুঝবে তুমি দীনহীন পতিত-কাঙাল, তখনই তুমি প্রাণের থেকে ডাকবে ঈশ্বরকে, সে ডাক আর তোমার শেখানো বুলি হবে না। সে ডাকই ডেকে নিয়ে আসবে তাঁর কৃপা। শরণাগতিই নিয়ে আসবে শতশৃঙ্গ পর্বতের আশ্রয়। তখনই বুঝবে তাঁর কৃপাই সার। সাধন-ভজন কেন ? সংগ্রাম কেন ? তাঁর কৃপা ছাড়া কিছুই হবার নয়, এটুকু পরিষ্কার বোঝবার জন্যেই সাধন-ভজন। যত যুদ্ধ-বিগ্রহ।

কর্ণেল অলকট কলকাতায় এসেছে।

'কে অলকট ?'

'প্রকাণ্ড একজন থিয়োসফিষ্ট। মানে ঈশ্বরজ্ঞানী।'

'সে কি করেছে ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে।'

'সে কি, তার নিজের ধর্ম কি দোষ করল ?' ঠাকুর যেন আহত হলেন। 'তার নিজের ধর্ম সে ছাড়ল কেন ? তার ধর্মে কি ঈশ্বর-জ্ঞানের ঘাটতি পড়েছে ?'

সুরেন মিত্তির আফিস-ফেরতা ঠাকুরকে দেখতে এসেছে। হাতে চারটি কমলা লেবু আর দুই গাছা ফুলের মালা।

রাত প্রায় আটটা। ঠাকুর বসে আছেন বিছানার উপর। দু'-একজন ভক্ত এদিকে ওদিকে।

'আফিসের কাজ সেরে এই সবে এলাম। আরো আগে কি আসতে পারতাম না ? আগে আসতে হলে আফিসের কাজ শেষ না করে আসতে হয়। সেটা কি ভালো' ?

ঠাকুর ইঙ্গিত করলেন, ভালো নয়।

'দুই নৌকোয় পা দিয়ে লাভ কি ? তাই কাজ সেরেই চলে এলাম'।

হ্যাঁ, কাজ সেরেই চলে এস। কিন্তু যতক্ষণ কাজ না সারা হয় ততক্ষণ উন্মনা হয়ে থাকো, কতক্ষণে গিয়ে পৌঁছুবে। এই উন্মনা হয়ে থাকাটিও ঈশ্বরকৃপা।

'তাছাড়া আজ নববর্ষ। তার উপর আবার মঙ্গলবার। কালীঘাটে যাওয়া হল না'। সুরেনের দুই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ভাবলাম যিনি কালী, যিনি কালী ঠিক চিনেছেন, তাঁকে দর্শন করলেই হবে'।

ঠাকুর মৃদু-মৃদু হাসতে লাগলেন।

'গুরুদর্শনে সাধুদর্শনে কিছু ফুল-ফল আনতে হয় শুনেছি। তাই এগুলি আনলাম'।

ঠাকুর নিলেন তা হাত বাড়িয়ে।

মনে পড়ল একদিন তার দেওয়া মালা ঠাকুর নেননি, ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। সে মালায় অহঙ্কারের স্পর্শ ছিল, অনেক টাকা খরচ করে এই মালা এনেছি, ছিল সেই আভিজাত্যের ঝাঁজ। মালা ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর প্রথমটা সুরেনের রাগ হয়েছিল, ভেবেছিল রাঢ় দেশের বামুন এ সব জিনিসের মর্যাদা কি বুঝবে! পরে খানিক পরে তার চেতনা হল। বুঝল ভগবান পয়সার কেউ নন, অহঙ্কারের কেউ নন, লোকমান্যের কেউ নন, তিনি শুধু দীনহীন অকিঞ্চনের। আমি অহঙ্কারী, আমি কামকামী, আমি হঠবাদী, আমার পূজা কেন তিনি নেবেন! কেন তিনি বরদাস্ত করবেন এই ঔদ্ধত্য এই ক্ষুদ্রতা? আমার ইচ্ছে নেই বাঁচতে।

ছ'চোখ বেয়ে চোখের জল পড়তে লাগল সুরেনের। তখন সেই বিক্ষিপ্ত মালা কুড়িয়ে নিয়ে গলায় পরলেন ঠাকুর। নৃত্য করতে লাগলেন।

সেদিনের কথা।

'আজ যে এ ছ'গাছা মালা এনেছি তার মোটে চার আনা দাম'।

ঠাকুর আবার নীরবে হাসলেন।

সুরেন বললে, 'ভগবান তো পয়সা দেখেন না, মন দেখেন। কারু হয়তো একটি পয়সা দিতে কষ্ট আর কেউ হয়তো একমুঠো ধুলোর মত এক হাজার টাকা ফেলে দিতে পারে অক্লেশে। ভগবান জিনিসে নয় হৃদয়ে। উপকরণে নয় ভক্তিতে'।

ঠাকুর কথা বলতে পারছেন না, স্নিগ্ধ হেসে সায় দিলেন।

'কাল সংক্রান্তি, তাই আসতে পারিনি। কাল শুধু আপনার ছবিটিকে ফুল দিয়ে সাজালুম'।

এই সেই সুরেন, ঠাকুর যাকে সুরেশ বলে ডাকতেন, এক নম্বরের মাতাল, গিরিশেরই যমজ ভাই। কিন্তু সেই মদ কোথায়? একটুখানি বেঁকিয়ে দিলেন ঠাকুর। মদ-মাতালকে মন-মাতাল করে দিলেন।

'তুমি আফিসে মিথ্যা কথা কও, তবু তোমারটা খাই কেন'! ঠাকুর তাকে বলেছিলেন একদিন। 'খাই তোমার যে দানধ্যান আছে। তোমার যা আয় তার চেয়েও তোমার বেশি দান। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি। কৃপণের ধন উড়ে যায়, দাতার ধন রক্ষা হয়, যেহেতু তা সৎকাজে যায়। যার দানধ্যান তারই ফললাভ'।

'কিন্তু আমার ধ্যান জমে না কেন?' ছঃখ করেছিল সুরেন।

'না জমুক। স্মরণ-মনন আছে তো!'

'আজ্ঞে, মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়ি।'

'আহা হা, তাহলেই হল। মা-মা বলে ঘুমিয়ে পড়তে পারলেই ভালো।'

আর কিছু নয়। শুধু মাকে ডাকো। মাকে প্রণাম করো!

রৌদ্রাকে প্রণাম, গৌরীকে প্রণাম। নিত্যা যে ধাত্রী, তাকে প্রণাম। চিরজ্যোৎস্নাকে প্রণাম। প্রণাম সুখস্বরূপাকে। বৃদ্ধি সিদ্ধিরূপিণীকে প্রণাম, সর্বাণী ভূভৃৎলক্ষ্মীকে প্রণাম, প্রণাম আবার মার রাক্ষসীমূর্তিকে। তুমি দুর্গা দুজ্ঞেয়া আবার দুর্গপরা। তুমিই সর্বকারিণী স্থিরা-শরূপিণী। তুমিই অতিসৌম্যা অতিরৌদ্রা করুণাময়ী ব্যাঘ্রাম্বিণী আবার অপগতবাসনা প্রকটিতবদনা ভয়ঙ্করী। দৃষ্টিসম্পাতমাত্র যদি তোমাকে না চিনি সহস্র চক্ষু পেলেও তোমাকে চিনব না। তুমি এত সরল এত সহজ এত সন্নিহিত। তোমার হাতের মার খেয়ে যখন কাঁদি তখনও তা আনন্দেরই উচ্চারণ। ছঃখ-দারিদ্র্য যে ভোগ করি সেই ভোগের মধ্যেও আনন্দ। যোগ-দৃষ্টি কোথায় পাব? তোমার কৃপাই আমার যোগ-চক্ষু।

চোট চৌকিতে শুয়ে আছেন ঠাকুর, পায়ের কাছে বসে ঠাকুরের পা টিপে দিচ্ছে গঙ্গাধর। হঠাৎ ঠাকুরের ছ' পায়ের ছটো বুড়ো আঙুল দিয়ে নিজের কপালে উর্ধ্বপুণ্ড্র তিলক আঁকতে লাগল।

ও কি, কি হচ্ছে!'

'আপনি যে বলেন যারা সাত্ত্বিক তারা গঙ্গাস্নান করতে করতে গঙ্গাজলে তিলক দেয়। আমি আজ তেমনি সাত্ত্বিক তিলক দিচ্ছি।'

হরিপ্রসন্ন চাটুজ্জে মানে স্বামী বিজ্ঞানানন্দের বেলায় কি করলেন!' জিগগেস করলেন, 'হ্যাঁরে তুই কুস্তি লড়তে পারিস?'

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা, সুগঠিত সুন্দর। ঠিক পালোয়ানের মত দেখতে। দেখতে কি, সত্যি-সত্যি কুস্তিগির পালোয়ান। ছশো-আড়াইশো করে ডন-বৈঠক দেয় রোজ। প্রায় লোহা চিবিয়ে খায়।

'দেখি না, আমার সঙ্গে লড় না এক হাত!' সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন ঠাকুর।

এ কেমনতরো সাধু! হরিপ্রসন্ন তো অবাক। সাধু কিনা কুস্তি লড়তে চায়! এমনতরো তো কোথাও শুনিনি!

'আয় না, দাঁড়িয়ে আছিস কেন?' তাল ঠুকতে-টুকতে হরিপ্রসন্নর দিকে এগুতে লাগলেন ঠাকুর। তার ছ'হাত নিজের ছ'হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে তাকে ঠেলতে লাগলেন পিছনের দিকে।

আর পেছপা হয়ে থাকা যায় না। হরিপ্রসন্নও ঠেলতে লাগল। হারিয়ে দিল ঠাকুরকে। তাঁকে ঠেলতে-ঠেলতে একেবারে ও-দিকের দেয়ালে তাঁকে চেপে ধরল।

ঠাকুর তবু হাসছেন।

'কি রে, হারিয়েছিস তো?'

হারিয়েছি! হরিপ্রসন্নর সমস্ত শরীর শির-শির করে উঠল। বিদ্যুৎ-প্রবাহের মত কি একটা আশ্চর্য শক্তি যেন তার দেহের মধ্যে প্রবেশ করছে। মুহূর্তে অবসাদে শিথিল হয়ে এল হরিপ্রসন্ন। ঠাকুর তাকে ছেড়ে দিলেন। বললেন, 'কি রে হারিয়েছিস তো?'

ভক্ত ও ভগবানের লড়াইয়ে কে হারে কে জেতে কে বলবে! যতক্ষণ লড়াই করেছিলে তন্ময় হয়ে ছিলে। প্রীতিতে বরং বিচ্যুতি ঘটে শত্রুতায় বিচ্যুতি নেই। সুতরাং ঈশ্বরের বন্ধু হতে না পারো শত্রু হও। বৈরানুবন্ধে যেমন তন্ময়তা তেমন তন্ময়তা ভক্তিযোগেও হয় না। অখিলাত্মা ঈশ্বরের তো কোনো ভেদজ্ঞান নেই। তিনি যদি কাউকে দণ্ড দেন নিজের সুখের জন্যে নয়, জীবের হিতের জন্যে। তাই বৈরিতা ভয় স্নেহ কাম যে উপায়ে হোক তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও। এক উপায় আরেক উপায়ের বিরোধী, তা মনে কোরো না।

তাই ঈশ্বরের সঙ্গে করমর্দন করতে না পারো কুস্তি করো। প্রেমে আলিঙ্গন না হয় মল্লযুদ্ধে আলিঙ্গন।

প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ততা না এলে ঈশ্বর তাৎপর্য বুঝবে না। কান দিয়ে আলোকের জ্ঞান হয় না, চোখ দিয়ে হয় না শব্দের। তেমনি মেধার দ্বারা নয়, বহু শাস্ত্রের জ্ঞান দ্বারা নয়, একমাত্র প্রসন্নোজ্জ্বল চিত্ততা দিয়েই প্রেমের অনুভব। প্রসন্নোজ্জ্বল হবে কিসে? একমাত্র ঈশ্বরের কৃপাস্পর্শে।

কর্মও চাই, কৃপাও চাই। পুরুষকারও চাই, দৈবও চাই। উভয়ের

সমাবেশেই সিদ্ধি। পর্জন্য সলিল বর্ষণ করলে কি হবে, ক্ষেত্রে যদি না কর্ষণ থাকে। পুরুষকার যোগে কর্ম দৈবযোগে সিদ্ধি। দৈবশূন্য পুরুষকার নিষ্ফল আর পৌরুষশূন্য দৈবও অসম্ভব। তাই কর্ম দিয়ে কৃপা আকর্ষণ করো। ক্লান্ত হলেই পাবে কৃপার সমীর স্পর্শ।

কুরুক্ষেত্র জয়ের পর রাজশ্রী ত্যাগ করবার সংকল্প করলেন যুধিষ্ঠির। ভাইয়েদের বললেন, আমি গ্রাম্যসুখ পরিত্যাগ করে বনে প্রবেশ করব। মিতাহারী ও চর্মচীর জটাধারী হয়ে দুই সন্ধ্যা-স্নান করে হুতাশনে আহুতি দেব। ফলমূল খেয়ে মৃগযূথের সঙ্গে সঞ্চরণ করব। ক্ষুৎ-পিপাসা শ্রান্তি শীত আতপ ও বায়ু সব ক্লেশ সহ্য করে শরীর শুষ্ক করব। একাকী প্রত্যেক বৃক্ষতলে এক-এক দিন অতিবাহিত করতে করতে প্রাণান্তকাল প্রতীক্ষা করব। গ্রামবাসী কি বনবাসী কারুর অপকার করব না, কারুর প্রতি কখনো ভ্রূভঙ্গী বা উপহাস করব না। কাউকে পথ জিজ্ঞাসা করব না, শূন্য চিত্তে যে কোনো একটি পথ ধরে চলে যাব। স্বভাব সকলের আগে আগে যায়, সেই কারণে আমাকে হয়তো বা গৃহস্থের দ্বারে গিয়ে ভিক্ষা করতে হবে, কিন্তু আমি তখনই তার দ্বারস্থ হব যখন তার গৃহ ধূমহীন, অগ্নিহীন, অতিথিসঞ্চারবিরহিত। তাকে ব্যস্ত করব না, যদি না জোটে থাকব নিরাহারে। আশাপাশে বাঁধা পড়ব না, বাতাসের মত সর্বলোকের অনায়ত্ত থাকব। লাভ-ক্ষতি নিন্দা-স্তুতি শোক-হর্ষ শুভ-অশুভ সব আমার পক্ষে সমান হবে। দেহমাত্র ধারণ করব কিন্তু কোন কাজে লিপ্ত হব না। বিষয়বাসনা পরতন্ত্র হয়ে ঘোরতর পাপানুষ্ঠান করেছি। এখন বৈরাগ্যেই আমার শাশ্বত সন্তোষ। এই নির্ভয় পথে চলতে চলতে জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি বেদনায় অভিভূত এই পাঞ্চভৌতিক দেহ আমি ত্যাগ করব।

অর্থবিষয়িণী বুদ্ধি তিরোহিত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে ভীম আর অর্জ্জুন, নকুল আর সহদেব, এমন কি দ্রৌপদী কঠোর ভাষে তিরস্কার করতে লাগল। অর্জ্জুন বললে, উত্তমহীন ভিক্ষুক, ভীম বললে, ক্লীব অকৃতী। দ্রৌপদীও বিদ্যুল্লসিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'ধিক! পূর্বে দ্বৈতবনে তোমার ভাইয়েরা শীতে আতপে পরিক্লিষ্ট হলে তুমি বলেছিলে দুর্যোধনকে বিনাশ করে সসাগরা বসুন্ধরাকে উপভোগ করবে। কিন্তু এখন কেন এই গিরিকাননসমন্বিতা সদ্বীপা পৃথিবীকে পরিত্যাগ করতে চাইছ? তুমি বিত্ত দান সন্ধি যজ্ঞ বা যাচ্ঞা দ্বারা এ পৃথিবী লাভ করোনি। গজাশ্বরথ সম্পন্ন শত্রুপক্ষীয় বীরদের সংহার করে অধিকার করেছ। পুরুষশার্দূলের মত ব্যবহার, এখন কেন এই হীনতা? তোমার প্রমত্ত গজেন্দ্র সদৃশ ভাইদের দিকে দেখ, অরাতিতাপন অমর সদৃশ তোমার ভাইয়েরা, চিরদুঃখভোগী, এদের আহ্লাদবর্ধন করা কি তোমার কর্তব্য নয়? শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত মূঢ় ব্যক্তিরাই বৈরাগ্য ও বানপ্রস্থের কথা চিন্তা করে।'

দ্রৌপদীর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে ভীমার্জ্জুন আবার কটূক্তি করতে লাগল।

যুধিষ্ঠির বললে, তোমরা কেবল অসন্তোষ প্রমাদ মদ মোহ রাগ দ্বেষ বল অভিমান ও উদ্বেগে অভিভূত হয়ে রাজ্যভোগে বাসনা করছ। ওসব ত্যাগ করে প্রশান্ত হও। যে রাজা এই অখিল ভূমণ্ডলে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নেই। এক দিন বা এক বছর ছেড়েদি, যাবজ্জীবন চেষ্টা করলেও কেউ আশা পূর্ণ করতে পারে না। অগ্নি কাষ্ঠসংযুক্ত হলেই জ্বলে আর কাষ্ঠশূন্য হলেই শান্ত হয়, অতএব তুমি অল্পাহার দ্বারা সমুদ্দীপ্ত জঠরানলের সান্ত্বনা কর। মূঢ় ব্যক্তিই কেবল নিজের উদর পূরণের জন্যে অধিকতর দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করে। সুতরাং আগে উদরকে পরাজয় কর, তাহলেই সমস্ত পৃথিবী পরাজিত হবে। রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা উভয়েই ধর্ম ও অধর্ম আছে, তোমরা তা পরিত্যাগ করে মহৎভাব থেকে বিমুক্ত হও। যে নরপতির ভূমণ্ডলে অখণ্ড প্রভুত্ব তাকে কৃতকার্য বলা যায় না, যার মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমজ্ঞান তিনিই কৃতকার্য। অতএব সংকল্পিত বিষয়ে নিরাশ, নিশ্চেষ্ট ও মমতাশূন্য হয়ে অক্ষয় পদলাভের চেষ্টা করো। ভোগাভিলাষপরিশূন্য ব্যক্তিই নির্ভয়নির্মুক্ত। ভোগ্যবস্তুই বন্ধন, ভোগ্যবস্তুই কর্মবলে কীর্তিত। এই কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিই পরম পদে আরোহণ।

জনকরাজা কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, আমি অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর, কিন্তু আমার কিছুই নেই। এই মিথিলা নগরীমধ্যে অগ্নিদাহ উপস্থিত হলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না।

প্রজ্ঞারূপ প্রাসাদে এসে অশোচ্য বিষয় সম্পর্কে নিস্পৃহ হও। বুদ্ধিপূর্বক চতুর্দিক অবলোকন কর। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন হও। যে যথার্থ বুদ্ধিমান ঈশ্বর তারই আয়ত্ত।

'যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর।'

ঠাকুর বললেন, 'ব্রহ্ম অচল অটল নিষ্ক্রিয় বোধস্বরূপ। বুদ্ধি যখন এই বোধস্বরূপে লয় হয় তখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়। তখন মানুষ বুদ্ধ হয়ে যায়। ন্যাংটা বলত, মনের লয় বুদ্ধিতে, বুদ্ধির লয় বোধস্বরূপে।'

[ক্রমশঃ।

••• এ মাসের প্রচ্ছদপট •••

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে কলিকাতা, সার্কুলার রোডস্থিত সমাধি-ভূমিতে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধির চিত্র প্রকাশিত হয়েছে। মূর্ত্তিটি সভ্যস্থাপিত ও শিল্পী শ্রীরমেশ পাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। চিত্রখানি "ফটোগ্রাফিকস্ ইণ্ডিয়া" কর্ত্তৃক গৃহীত এবং শ্রীমধুসূদনের পৌত্র শ্রী এন, সি, দাতনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

কয়লাকুঠির দেশ

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৩

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। কিন্তু আগেকার সুলতানপুরের জন-মানবহীন সন্ধ্যা যদি হ'তো, ভাববার কিছু ছিল না। বুড়োশিবের পিছু-পিছু নিশ্চিন্ত মনে চলে যেতে পারতো রঞ্জন।

পথে তখনও লোক চলাচল করছে। সীতারামের বাড়ীর দিকটা যদিও গ্রামের এক টেরে, তবু বিশ্বাস নেই, রঞ্জনকে যদি কেউ দেখে ফেলে, কথাটা সারা গ্রামের মধ্যে রাষ্ট্র হতে দেরি হবে না।

রঞ্জন যে সশরীরে বেঁচে আছে এখনও, বুড়োশিব সে কথা জানাতে এখন চায় না। চুপি চুপি বললে, হিঙ্গুলের পথ ধরে সঙ্কটা ভৈরবীর মন্দিরের পাশ দিয়ে একটু ঘুরে যাই চল

রঞ্জন মুচকি একটু হাসলে। বুঝলে সবই। তবু বললে, কেন?

বুড়োশিব বললে, তোমাকে নিয়ে কি ব্যাপার যে চলছে সুলতান-পুরে, তা তুমি জানো না, তাই জিজ্ঞেস করছো। এসো।

পাকা রাস্তা ছেড়ে তারা মাঠের ওপর নামলো।

রঞ্জন বললে, বাবার সঙ্গে দেখা করবো না?

বুড়োশিব বললে, না।

রঞ্জন বললে, একটি বার দেখা করলেই তো সব কিছু চুকেবুকে যায়।

বুড়োশিব বললে, জানি। কিন্তু এখন নয়।

রঞ্জন আর কোনও কথা বলতে পারলে না।

বুড়োশিব বুঝতে পারলে তার মনের অবস্থা। বললে, সীতা-রামের বাড়ীতে গিয়ে উঠতে তোমার লজ্জা করছে—আমি বুঝতে পারছি।

রঞ্জন শুধু বললে, হুঁ।

লজ্জার কিছু নেই। তুমি এসো আমার সঙ্গে।

এই বলে বুড়োশিব রঞ্জনকে এক রকম জোর করেই নিয়ে গিয়ে তুললে সীতারামের বাড়ীতে।

সীতারামের এত বড় বাড়ী—মাত্র একজন মানুষের অভাবে মনে হয় যেন সব ফাঁকা।

ঠিকে ঝি একজন সকাল-বিকেল কাজ করে দিয়ে যায়। এক জন চাকর আছে। বাড়ীতেই থাকে। আর থাকে মা আর মেয়ে।

বাইরের ঘরের দরজাটা বন্ধ ছিল। বুড়োশিবের ডাক শুনে চাকর এসে খুলে দিয়ে গেল।

গেল বোধ হয় আলো আনতে।

ভালই হ'লো।

অন্ধকার ঘরের ভেতর দিয়ে রঞ্জনকে এক রকম টানতে টানতে বুড়োশিব উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো।

লণ্ঠন হাতে নিয়ে চাকরটা এগিয়ে আসছিল, বুড়োশিব বললে, আমাদের আলো দেখাতে হবে না বাবা, যাও তুমি, বাইরের ঘরের দরজাটা বন্ধ করে এসো।

চাকর চলে যেতেই বুড়োশিব এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলে। দেখলে, দোতলার ঘরে আলো জ্বলছে।

বুড়োশিব বললে, এসো। ওরা বোধ হয় ওপরেই আছে।

রঞ্জন যাবে না কিছুতেই। থম্‌কে থামলো সিঁড়ির মুখে।

নাঃ, তোমাকে দেখছি টেনে টেনে নিয়ে যেতে হবে। এত লজ্জা কিসের?

এই বলে বুড়োশিব দু'ধাপ নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে। রঞ্জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললে, ধরো আমার হাতটা। আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি।

হাতটা রঞ্জন অবশ্য ধরলে না। বললে, চলুন যাচ্ছি।

এত বড় বাড়ীতে মা আর মেয়ে! একটা মাত্র চাকর—থাকা না থাকা দুই-ই সমান। কাজেই মা ও মেয়ের চোখ-কান একটু সজাগ রাখতে হয়।

দূর থেকে গলার আওয়াজ পেয়ে মালা বলে উঠলো, কে?

আবার থমকে থামলো রঞ্জন।

বুড়োশিব বলে উঠলো: আমি রে আমি। তোর বুড়োজ্যেঠা।

কলকাতা গেলেন না আপনি? বলতে বলতে লণ্ঠন হাতে নিয়ে মালা বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

বুড়োশিব বললে, না, গেলাম না।

কেন গেল না, সে কথা বলার আগেই মালা তাকে আলো দেখাবার

জন্যই বোধ করি ছুটে এসে দাঁড়ালো সিঁড়ির মাথায়। হাতের আলোটা তুলে ধরতেই তার চোখে চোখ পড়লো রঞ্জনের। সে-ও বোধ হয় অনেক দিন পরে তাকে একটি বার দেখবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে তাকিয়ে ছিল ওপরের দিকে।

কিন্তু এমন যে করে বসবে মালা,—তা কে জানতো?

হাতটা তার থর-থর করে কেঁপে উঠলো। লণ্ঠনটা পড়ে গেল তার হাত থেকে। অস্ফুট কণ্ঠে কি যে বললে কিছুই বুঝা গেল না! যেমন এসেছিল আবার তেমনি ছুটে চলে গেল ঘরের দিকে।

শব্দ শুনে মালার মা তখন বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

ভাঙলি তো লণ্ঠনটা?

বুড়োশিব বললে, না, ভাঙেনি।

লণ্ঠনটা সে তখন তুলেছে হাত দিয়ে। তেল উঠে দপ-দপ করে নিবে গেছে শুধু। কাচটা ফেটেছে কি না বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

অন্ধকারে কাঞ্চন কিছুই দেখতে পেলে না।

শোবার ঘরে টেবিলের ওপর বড় সেজবাতিটা জ্বলছে। কাঞ্চন বললে, ওই ঘরে বসুন। আমি আসছি।

বুড়োশিব বললে, হ্যাঁ মা, আমি ওই ঘরেই যাচ্ছি! সঙ্গে আমার লোক আছে।

লোক আছে শুনে কাঞ্চন নীরবে সরে গেল সেখান থেকে।

ঘরে গিয়ে দেখলে, মালা মেঝের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে কাঁদছে।

দেখে একটু অবাক হয়ে গেল কাঞ্চন। বললে, এ আবার কি ঢং! ভারি তো লণ্ঠনের কাচ একটা! ভেঙ্গেছে তো কি হয়েছে! তুই তো ইচ্ছে করে ভাঙ্গিসনি!—নে ওঠ, আর কাঁদে না ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে! উকিল-ব্যারিষ্টার না কে একজন ভদ্রলোক এসেছেন ওঁর সঙ্গে। খাবার তৈরি করতে হবে। ওঠ—উঠে ষ্টোভটা জ্বালা। আমি ততক্ষণ ওই তোলা-উনুনে চায়ের জলটা গরম করে নিই।

কুঁজো থেকে জল নিয়ে কেটলিতে ঢাললে কাঞ্চন। মালা কিন্তু তখনও উঠছে না।

সামান্য একটা লণ্ঠনের কাচের জন্য এ আবার কি রকম ধারা ব্যবহার!—মালা! মালা! ওঠ মা ওঠ! একা আমি কত দিক সামলাবো!

মালা এবার তার মার দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালে। বললে, খাবার যে করতে যাচ্ছো মা, খেতে ওরা চেয়েছে?

কাঞ্চন বললে, নাই-বা চাইলে! রাত্রে যদি ওরা এখানে না-ও থাকে, সন্ধ্যেবেলা এসেছে, একটু চা-ও তো খাবে?

হ্যাঁ, খাবে!—বলতে বলতে উঠে বসলো মালা। বললে, তুমি একবার যাও মা, রাত্রে এখানে থাকবে কি না ওদের জিজ্ঞাসা করে এসো।

একজন ভদ্রলোক রয়েছে তোর জ্যেঠার সঙ্গে, আমি যাব কেমন করে? তুই যা, জিজ্ঞাসা করে আয়।

ছোট মেয়ের মত মা'র গলা জড়িয়ে ধরলে মালা। আব্দার করে বললে, না মা, আমি যাব না, তুমি যাও।

কাঞ্চন অবাক্ হয়ে মালার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। মেয়েটা কি পাগল হয়ে গেল না কি?

মালা বললে, অমন করে তাকিয়ে দেখছো কি? যাও।

কাঞ্চন উঠে দাঁড়ালো। বললে, নাঃ তোর সঙ্গে বকে কি হবে, তার চেয়ে—জলটা চড়িয়ে দিই।

তোলা উনুনে তরকারি চড়ানো ছিল। কড়াইটা নামিয়ে দিয়ে কেট্‌লিটা বসিয়ে দিলে কাঞ্চন। বললে, শেষ পর্য্যন্ত কপালে আমার অশেষ দুর্গতি আছে, আমি বুঝতে পারছি। উনি রইলেন জেলে হাজতে, আর আইবুড়ো মেয়ে হলো পাগল!

মালা রেগে উঠলো। বললে, পাগল পাগল করো না মা, আমি পাগলামি করিনি। যা বলছি শোনো মা! ও-ঘরে আলো আছে, চট্ করে গিয়ে চুপি চুপি দেখে এসো—কে এসেছে।

—তাই বল্ না কে এসেছে!

—আমি জানি না। চিনি না ওকে।

কাঞ্চন বললে, তুই চিনিস্ না আর আমি চিনি?

মালা বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি বলছি—তুমি চেনো।

—বেশ, তবে দেখেই আসি।

কাঞ্চন, ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি ভেবে দোর থেকে ফিরে এলো। বললে, আয়, তুইও আয় আমার সঙ্গে।

মালা কিন্তু কিছুতেই যেতে চাইলে না। অগত্যা মাকে একাই যেতে হলো।

ঘরের এক কোণে আলোটা জ্বলছিল শ্বেতপাথরের একটা টেবিলের ওপর। রঞ্জনের মুখে এমন ভাবে একটা ছায়া এসে পড়েছিল যে, বাইরে থেকে কাঞ্চন তাকে চিনতে পারলে না। চৌকাঠের বাইরে দোরের কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো কাঞ্চন।

হঠাৎ রঞ্জনের নজর পড়লো তার দিকে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে পায়ের কাছে মাথা নুইয়ে একটি প্রণাম করে বললে, আমি রঞ্জন।

চম করে কাঞ্চনের মাথাটা ঘুরে গেল। মনে হলো, সে যেন পড়ে যাবে। ঘরের চৌকাঠটা হাত দিয়ে ধরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, কোথায় ছিলে বাবা? এদিকে শুনেছো কি হয়েছে?

রঞ্জন বললে, গিয়েছিলাম পিসিমার বাড়ী। এখানে এসে শুনছি সব, কত কাণ্ড হয়ে গেছে। আমি নাকি মরে গেছি—

কাঞ্চন বললে, মালা কিন্তু বলেছিল কথাটা সত্যি নয়।

আর আমি? ভেতর থেকে বলে উঠলো বুড়োশিব।

কাঞ্চন বললে, হ্যাঁ, উনি বলেছিলেন।

বুড়োশিব বললে, যাক্, ভগবান আমার মুখ রক্ষা করেছেন। এই বার বাকি কাজটি চুকিয়ে দিতে পারলেই—

কাঞ্চন বললে, এর পরেও মালার সঙ্গে তোমার বিয়ে যদি না হয় বাবা, তাহ'লে মালার আর বিয়ে হবে না।

রঞ্জন হঠাৎ বলে উঠলো, কেন?

কাঞ্চন বললে, সত্যি হোক্, মিথ্যে হোক্, মানুষ খুন করার অপরাধে বাপকে যার জেলে-হাজতে থাকতে হয়, তার মেয়ের বিয়ে হওয়া শক্ত!

রঞ্জন বললে, সেই জন্যেই তো বলছি, আমি যাই বাবার কাছে। তাহ'লেই—

কথাটাকে বুড়োশিব শেষ করতে দিলে না। বললে, না, তা হয় না। আমি তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করেছি। পুলিশ নিজের ইচ্ছায় ধরেনি সীতারামকে। তোমার বাবাই তাকে ধরিয়েছে। আর এই যে এত দিন ধরে বেচারা হাজতে থেকে অকথ্য যন্ত্রণা ভোগ করছে এ-ও শুধু তোমার বাবার জন্যেই।

রঞ্জন জিজ্ঞাসা করলে, তাহ'লে আপনি কি বলতে চান—আমার বাবার বিশ্বাস—মালার বাবাই এ-কাণ্ড করেছেন?

বুড়োশিব জোর গলায় বললে, নিশ্চয়।

রঞ্জন বললে, বাবার সঙ্গে আমি দেখা করবো না?

বুড়োশিব বললে, না।

—শেষ পর্য্যন্ত কি হবে তাহ'লে?

—সত্য যা, তা' আপনা থেকেই বেরিয়ে আসুক্!

—তত দিন আমি কি করবো?

—তত দিন তুমি এইখানে থাকবে।

—এইখানে? এই বাড়ীতে?

বুড়োশিব বললে, হ্যাঁ, এই বাড়ীতে।

রঞ্জন হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। কি যে বলবে কিছুই বুঝতে পারলে না। কি যেন বলবার জন্য হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে বোধ করি সাহস সঞ্চয় করছিল সে। কাঞ্চন তাকে বাঁচালে। বললে, মালা তোমাদের জন্যে একটু চা করছে। আসছি বাবা, বোসো।

রঞ্জন ধীরে ধীরে গিয়ে বসলো বুড়োশিবের পাশে। বললে, এ আপনি কি বলছেন? এখানে আমার থাকা হ'তে পারে না। লোকে বলবে কি?

বুড়োশিব বললে, লোকে জানবে কেমন করে?

রঞ্জন বললে, তাহ'লে কি আমি বন্দী হয়ে থাকবো এই বাড়ীতে?

বুড়োশিব হো-হো করে হেসে উঠলো। বললে, বন্দী! কথাটা মন্দ বলনি। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক তাই। বন্দী। আজ থেকে তুমি আমাদের বন্দী।

রঞ্জন ঠিক বুঝতে পারলে না—বুড়োশিব তার সঙ্গে রহস্য করছে, না সত্য বলছে!

[ক্রমশঃ।

গত বৎসরে বিলাতে কত বই প্রকাশ হ'ল?

১৯৫৫ সালে অর্থাৎ মাত্র গত বৎসর বিলাতে কি পরিমাণ পুঁথি-পুস্তক বা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, নিশ্চয়ই তা একটি জানবার বিষয়। একটা হিসেব কষে দেখা গেছে—এই সময় মধ্যে প্রকাশিত মোট বই-এর সংখ্যা ১৯,৯৬২। এ সবগুলো বই-ই যে প্রথম সংস্করণের তা নয়, মোট পুস্তক-সংখ্যার মধ্যে ৫,৭৭০ খানি হয় পুনর্মুদ্রিত নয় পুরাতন পুঁথি-পুস্তকেরই নয়া সংস্করণ। এই বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন প্রায় ১৮ শত গ্রন্থপ্রকাশনী প্রতিষ্ঠান। এর ভেতর নামকরা ৭টি মাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতেই বের হয়েছে ১,১১৩ খানি পুস্তক। এই প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে কলিন্‌স, অক্সফোর্ড ইউনিভারসিটি প্রেস, হাচিনসনস, লংম্যান্‌স, হেইনম্যান্‌স, ম্যাক-মিলানস ও মুনারস। ওঁরা যথাক্রমে পুঁথি-পুস্তক বা গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন ২১৫, ১১৬, ১৮৩, ১৬৫, ১৪১, ১১৮ ও ১০৫ খানি।

০

বেগম-বাহার

(একাঙ্কিকা)

জয়ন্তী সেন

চরিত্র

পিয়ারী বেগম
সিতারা } অনুচরী
আমিনা }
নটী
বাদশার দূতী
মনসুর—খাজা অনুচর
নাসিরুদ্দিন খাঁ

(কাহিনী ও চরিত্রাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক)

[**স্থান**—দিল্লী দুর্গের অভ্যন্তরে, বাদশাহের একদা প্রিয়পাত্রী পিয়ারী বেগমের খাস্‌মহল। মোগল যুগের বিলাসিতার পূর্ণ চিত্রপট দৃশ্যমান। **সময়**—রাত্রির প্রথম প্রহর। যবনিকা উঠিলে দেখা যাইবে বেগমের কর্ম্মরতা অনুচরীদ্বয়। একজন ফুল ও জরীর মালা গাঁথিতেছে। অপর জন শ্বেত পাথরের ফুলদানীতে রক্ত-গোলাপ সাজাইতেছে। কিংখাব ও গালিচায় শয্যা সুশোভিত। অদূরে পানপাত্র ও সুরা। ফুলদানী সাজানো শেষ করিয়া আমিনা বলিল—]

আমিনা—আজ কি রাতভোর তোর মালা গাঁথা শেষ হবে না? কাজ করতে করতে মনের এলোমেলো ভাবনাগুলোকে কি দূর করে দিতে পারিস না?

সিতারা—আজ পর্য্যন্ত মানুষ কত অসাধ্য সাধন করেছে—কত আকাশ-ছোঁয়া ইমারত গড়ে তুলেছে নগরে নগরে—দেশ-বিদেশ জয় করে বিজয়ীর গৌরব-মুকুট পরে অমর হয়ে আছে কত যোদ্ধা! কিন্তু বলতে পারো, নিজের মনকে বশ করতে পেরেছে ক'জন? তাই যদি পারব তাহলে আমার চোখে মিছামিছি জল আসবে কেন? [অশ্রু মুছিল] আমার সঙ্গে সঙ্গে ফুলগুলি গেঁথে দাও না। রাত অনেক হয়ে গেল।

আমিনা—যমুনার কালো ঢেউএ আসমানের তারার চুম্‌কি জ্বলে উঠছে রূপার মত—দরবারে সুরবাহারে বাজছে কানাড়ার সুর। আর বেশী সময় নেই আমাদের।

সিতারা—আজ নাসিরুদ্দিন সাহেব আসবেন কি? আমি ত' ভেবেছিলাম পিয়ারী বেগমের শিশ্‌মহলের অন্ধকার ঘুচবেনা কোনদিন।

আমিনা—চুপ্‌, চুপ্‌! অনেক গুপ্তচর নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় জেনানা মহলের আশেপাশে। নিজের মনের কথা পর্য্যন্ত গোপন রাখতে পারিনা, এমন ছল তাদের। [কণ্ঠ মৃদু করিয়া] হামামে পরীবানুকে বলছিলেন বেগম—আমি হঠাৎ শুনে ফেলেছি। আজ হামামে আতরের খুশবু গুলবাগিচা ফুলের গন্ধকেও হার মানিয়ে দিয়েছিল—মনে নেই? [হাসিল]

সিতারা—তাই বুঝি আজ সন্ধ্যা থেকেই এত সাজ? কালো চোখে নীল সুর্মা, বেল-নার্গিশ দিয়ে গাঁথা মালায় জড়ানো বেণীতে সোনালী চুম্‌কী দেওয়া মস্‌লিনের ওড়না, মেহেদির রঙে রাঙান পায়ে মখমলের নাগ্‌রা। তাই আজ তাজা আঙুরের মিঠে শরাব নিয়ে এসেছে মনসুর?

আমিনা—মনের মানুষকে পেলে মেজাজ দিলদরিয়া হয়ে ওঠে। এই দেখ—পাঁচ আশরফী বক্‌শিশ দিয়েছেন আমাকে—আর দিয়েছেন এই ফিরোজা দোপাট্টা। [মালা গাঁথা শেষ হইল]

[সিতারা আপন মনে গান ধরিল]

তারার প্রদীপ জ্বলে আসমানে
ঘাস-ফুল চেয়ে রয়
জানেনা বিরহী দূর মরীচিকা
তৃষ্ণা মেটার নয়।
রাত্রির নেশা দিবসের লাগি
মরু কাঁদে নদী তরে
বন জ্যোৎস্নারে মাগি আকুলতা
বুলবুলিটির সুরে।
আমারো হিয়ায় আগুনের জ্বালা
অনুখন জেগে রয়।



পিয়ারী—এখনও সাবধান করে দিচ্ছি—চলে যাও জন্মের মত।

আমিনা—এত দুঃখের গান তোর মনে আসে! মাঝে মাঝে মনে হয়, চারদিকে বিভব ও বিলাসিতা ছড়ানো, তবু কেন তোর মন ভরে না?

সিতারা—নীল আসমানে যে পাখী ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়, সোনার খাঁচার ঐশ্বর্য্য কি তার মন ভরে দিতে পারে? তাইত বেগমের পোষা বুলবুল করুণ সুরে গান শোনায় তার শিক-ঘেরা দুনিয়া থেকে।

আমিনা—ঐ খাস্‌মহলের ঘণ্টা বেজে চলেছে। রাত্রি গভীর হয়ে এলো। কই, গোলাপী আতর ছড়াবি না চারদিকে?

[আতরদানী তুলিয়া ছড়াইতে লাগিল]

সিতারা—আচ্ছা আমিনা—তুমি ত এখানে অনেকদিন আছ। মনসুর বলছিল, অনেক ইতিহাস তোমার না কি জানা আছে। শুনতে পাই পিয়ারী বেগমের দেহে কাফেরের রক্ত আছে—এ কথা কি সত্যি?

আমিনা—শাহান্‌সার সেনাপতি নবাব ফতে খাঁন গৌড়ে তার ফৌজ নিয়ে গেছিলেন। লড়াইএর শেষে পরিশ্রান্ত নবাব এক কাফের ব্রাহ্মণের মেয়েকে দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়েন। গঙ্গার ঘাটে সোনালী আকাশের তলে সেই মেয়ের মনোহারিণী রূপ দেখে তখুনি তাকে বজরায় তুলে নিয়েছিলেন ফতে খাঁন। স্বয়ং বাদশার হারেমেও শুনেছি ওরকম সুন্দরী ছিলনা তখন।

সিতারা—তারপর?

আমিনা—তারপর পিয়ারী বেগমের জন্ম হয়। আমাদের শাহানসার সঙ্গে ছেলেবেলা থেকেই মন জানাজানি হয়েছিল। সে রক্ষিতার মেয়ে, তাই তার সাদী হয়নি, তবুও পিয়ারী বেগম আজও তাঁর প্রথম মহব্বত ভুলতে পারেননি।

সিতারা—আর নাসিরুদ্দিন?

আমিনা—(সহাস্যে) নাসিরুদ্দিনকেও ভালবাসেন বোধ হয়, কি জানি!

সিতারা—বাঃ, দু'জন মানুষকে একসঙ্গে ভালবাসা যায় নাকি? এক আকাশে দুটো চাঁদ ওঠে কখনও?

আমিনা—হাজার তারা কিন্তু জ্বলে একই সঙ্গে।

সিতারা—তার মানে তুমি নিশ্চয় মনে মনে একজনের বেশী পুরুষের কথা ভাব।

আমিনা—মরণ! আমার কি আর সে বয়স আছে? মহব্বতকে যদি ভুলে থাকতে পারিস—জীবনে আর কোন দুঃখই থাকবে না। আর কোন কিছুরই ত অভাব নেই আমাদের, তবুও তোর মুখভার গেল না।

সিতারা—কি করি বল, জেনানা মহলে মেয়েদের বড়ই দুঃখ।

আমিনা—দুঃখ? রঙ-তামাসায় ভরা নাচ গান সুরা-শরাবের ছড়াছড়ি আমাদের দুনিয়ায়, তবুও অভিযোগ করছিস! নিজেদের অভাবের ঘর-সংসারে কি ভাবে দিন কাটত মনে নেই?

সিতারা—দিন-দুনিয়ার মালিকের কাছে দিন রাত অভিযোগ করি—কেন আমায় কেড়ে এনেছেন আমার সাধারণ জীবন থেকে। এই পাথরের দুর্গ আমার কয়েদখানা, এখানে বেশীদিন থাকলে মনও পাথর হয়ে যায়—চোখের জল শুকিয়ে ওঠে। ওপরের চাকচিক্য দেখে প্রথমে বুঝতে পারিনি—কত বঞ্চিতের আর ব্যথিতের বুক-ফাটা কান্না লুকিয়ে আছে এখানকার হাওয়ায়। মায়া মমতা ভালোবাসা সব মিথ্যা, সবই ভুল। শেরিণার কি হল তুমি জান?

আমিনা—শেরিণার কথা তোকে কে বলেছে? পিয়ারী বেগম জানলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে আমার।

সিতারা—শেরিণা কি কেবল একটা—শত শত শেরিণাদের নিয়ে এই জেনানা মহল। কৌতূহলের বশে দেখতে এসেছিলাম মায়ের সঙ্গে—পিয়ারী বেগমের নজরে পড়ে গেলাম, হঠাৎ তখুনি আমাকে খাস বাঁদী করে নিলেন। মা-ও ঐশ্বর্য্যের জাঁকজমকে ভুলে গেলেন। অথচ আমার সাদীর তখন আর মাত্র এক পক্ষ বাকি ছিল।

আমিনা—শেরিণার কথা কে বলেছে তোকে? মনসুর?

সিতারা—একটা ভুল করে ফেলেছিল বলে তাকে ঐ পাতাল-ঘরে অনাহারে রেখে তিলে তিলে মেরে ফেলা হয়েছে—আমি জানি। তাই একজন নিষ্ঠুর, খামখেয়ালী মানুষের খেলার-পুতুল হয়ে সুখের স্বপ্ন দেখতে চাই না আমি।

(খোজা অনুচর মনসুরের প্রবেশ)

মনসুর—কি যে গল্প করিস সারাক্ষণ!

সিতারা—আলির কাছে গেছিলে—বল, বল কি বলেছে সে?

মনসুর—উঁহুঃ, আমার কাছ থেকে অত সহজে খবর বের করতে পারবে না। আগে বল কি দেবে?

আমিনা—আবার আলির কথা? জানিস, এ মহলে বাদশা ভিন্ন অন্য কোন পুরুষের নাম উচ্চারণ করলে কোতল হয়ে যাবি কোন দিন।

সিতারা—[কর্ণপাত না করিয়া] আমি তোমায় একশ আস্‌রফী দেব মনসুর। বল, আলি আমার জন্যে অপেক্ষা করে থাকবে কি না?

মনসুর—থাকবে, থাকবে, থাকবে। হল ত—আর অনুরোধ কোর না আমাকে, বেগমের কানে উঠলে তোমার আলি শুদ্ধ বেহেস্তে চলে যাবে। কিন্তু দেরী নয়—নাসিরুদ্দিন সাহেব এসে পড়লেন বলে। প্রস্তুত থাক তোমরা। [প্রস্থান

আমিনা—চল সিতারা—বেগমকে খবর দিতে হবে। [প্রস্থান।

[নাসিরুদ্দিনের প্রবেশ। উন্নত বলিষ্ঠ চেহারার সুন্দর যুবাপুরুষ। মহার্ঘ বেশভূষায় সুসজ্জিত। নাসিরুদ্দিন শয্যায় উপবেশন করিলে —আমিনা শরাব লইয়া প্রবেশ করিল]

আমিনা—বেগম আসছেন এখুনি। একটু বিশ্রাম করুন খাঁ সাহেব!

নাসিরুদ্দিন—বহুদিন পরে এই পরিচিত মহলে প্রবেশ করবার সুযোগ পেয়েছি আমিনা—তোমাদের খবর সব ভাল?

আমিনা—[শরাব দিতে দিতে] আপনার মেহেরবাণিতে সব ভালই চলছে হুজুর! অধীনের গুস্তাখী মাফ করবেন—এত দিন কেন আসেননি এ মহলে?

নাসিরুদ্দিন—বাদশাহী ফৌজের অধিনায়ক হয়ে কাশ্মীরের বিদ্রোহ দমন করতে পাঠিয়েছিলেন শাহান্‌সা। ওখানে শালিমার গুল্‌বাগিচায় এখন বসন্তের বিচিত্র বাহার, চেনার গাছের নতুন পাতার সমারোহ আর জাফরাণ ফুলের রেণুতে বাতাস পরিপূর্ণ। কিন্তু তোমাদের কথা আমি একদিনও ভুলিনি আমিনা। [শরাব পান করিল] আঃ! এই নাও তোমার বখশিশ। বেগমকে আমার এত্তেলা দাও।

আমিনা—বন্দেগি খাঁ সাহেব। [কুর্ণিশ করিয়া প্রস্থান।

[পিয়ারী বেগমের প্রবেশ]

নাসিরুদ্দিন—পিয়ারী কি অপূর্ব সাজ-সজ্জা তোমার !—কি মাদকতা তোমার ঐ কালো চোখে ! হিন্দুস্থানের কালো মেঘের মত কমনীয়তার ও গভীরতার মাধুর্য্যে সিক্ত। লোকে বলে এই দুনিয়ার বেহেস্ত হল কাশ্মীর—সেখানে গিয়েও আমি স্বস্তি পাইনি। প্রতিদিন সকালে ফোটা-ফুল যখন সন্ধ্যায় ঝরে পড়ত সবুজ ঘাসে, নিঃশ্বাস ফেলে ভাবতাম, যাক্ আর একটা দিন কাটল আমার।

পিয়ারী—সে কি ? কাশ্মীরের নীলনয়নাদের যাদুতে মন ভোলেনি তোমার ? আমি ত ভাবতেই পারিনি তুমি আবার ফিরে আসবে।

নাসির—ফিরতে পারব কিনা সে আশঙ্কা আমারও হয়েছিল। অদ্ভুত এই জেনানা মহল ! এখানকার পাথরেও বোধ হয় কথা কইতে জানে। স্বয়ং বাদশাহের কাছে তোমার আমার এই নতুন নেশার খবর কেমন করে পৌঁছে গেছে জানি না। অধীনের প্রতি তাঁর অসীম দয়া, তাই যুদ্ধে জয়লাভের পর আবার রাজধানীতে ফেরার অনুমতি পেয়েছি। আমাকে তিনি সত্যিই ভালবাসেন ।

পিয়ারী—শাহান্‌শার ভালোবাসায় বিশ্বাস করলে ঠকতে হয়। [দীর্ঘশ্বাস ফেলিল] অন্য কোথাও এখন যাবে না, আশা করি।

নাসির—সে কথা বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে পিয়ারী। শুধু একটি রাত আমি এখানে কাটাতে পারব। কাল প্রত্যূষে দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমনে আবার রওনা হতে হবে। আবার যেতে হবে ধূলিধূসর দিল্লীর মোহ ছেড়ে কোন অজানা দেশে। শুধু আজকের মত তোমাকে পেয়েছি পিয়ারী—

পিয়ারী—ফিরতে কত দিন লাগবে ?

নাসির—হয়ত ফিরবও না কোন দিন। যুদ্ধে হারজিত উভয় পক্ষেই সম্ভব।

পিয়ারী—ওকথা বোল না নাসির—তুমি জান সারা দুনিয়ায় আপনার বলতে কেউ নেই আমার। অনেক স্বপ্ন দেখেছিলাম যৌবনে, অনেক সুখের আশ্বাস দিয়েছিল তখনকার দিনগুলো। আজ কেউ নেই আমার। কেউ আমার জন্যে কাঁদে না, আমার সঙ্গে হাসে না। মাঝে মাঝে এই সোনার-শিকল কেটে বেরিয়ে পড়তে সাধ যায় খোলা আলো-বাতাসের জগতে—যেখানে নিষেধ নাই, বাধা নাই—স্বার্থের নিত্য নূতন লড়াই যেখানে কলুষিত করে না মানুষের মনকে।

নাসির—আজ এত উতলা কেন পিয়ারী ? কে তোমাকে দুঃখ দিয়েছে বল ?

পিয়ারী—আমার নসীবে সুখ নেই—থাকতে পারে না। সব সুখ-দুঃখের মালিক যে-ভাগ্য রচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে জেহাদ চালাবার মত অস্ত্র আছে নাকি তোমার ?

নাসির—দুঃখের কথা ভেবে আজকের এমন অপরূপ সন্ধ্যাকে মলিন করে দিও না। বসন্তের মিঠে হাওয়ায় ভরা গুলবাগে বুলবুলের সুর, আসমানে তারার দেয়ালী, দেখছ না ? জেগে থাকার জগতে স্বপ্ন দেখার ক্ষণ বেশী আসে না। তাই যখন যেটুকু পাই সাধ মিটিয়ে তাকে ভোগ করতে চাই।

পিয়ারী—শাহান্‌শার সিপাহ-সালারের ক্ষণিক সুখের সহচরী আমি। পরিতৃপ্ত করতে পারলেই আমার প্রয়োজন নিঃশেষ হয়ে যায়, তাই না ?

নাসির—এ কথা বলছ কেন পিয়ারী ? আমার সব কিছুই ত তোমার কাছে বিলিয়ে দিয়েছি। দিন-রাতের প্রতিটি ভাবনায় তুমিই ত ছেয়ে রাখ আমার মন-প্রাণ। নিজের সৌভাগ্যকে এখনও বিশ্বাস করতে পারি না পিয়ারী। যখন তুমি কাছে থাক মনে হয় বুঝি এ দুনিয়াকে মুঠির মধ্যে পেয়েছি।

পিয়ারী—তাহলে তুমি ভুলে যাও তোমার কর্ত্তব্য—ছেড়ে চল দেওয়ান-ই-খাসের এই কুটিল আবহাওয়া। পান্না-মরকত-জ্বলা হাওয়া-মহলের নেশা দূর করে লুকিয়ে চলে যাই সাধারণ মানুষের জগতে। সেখানে ছদ্মবেশে সুখের নীড় বাঁধব আমরা। বাদশাহের সহস্র গুপ্তচরদের কালোছায়া আমাদের অনাবিল স্নিগ্ধ ভালোবাসাকে মলিন করে দেবে না। নাঃ—মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে। জানি বন্ধু, স্বর্ণশিকলের মায়া অত সহজে কাটে না। তাই খাঁচার পাখীকে ছেড়ে দিলেও সে আবার ফিরে আসে বন্ধনের মোহে।

নাসির—অর্থ—যশের মোহ আমার নেই তুমি জান। সামান্য মনসবদার থেকে আজ সেনাবাহিনীর প্রায় শীর্ষদেশে পৌঁছেছি বাদশাহের কৃপায়। তাঁর আদেশ অমান্য করার ধৃষ্টতা আমার নেই। আত্মসুখের জন্য বিপদের দিনে উপকারীকে ভুলে যাওয়া মহাপাপ।

পিয়ারী—সারা হিন্দুস্থানের মালিক যিনি, তাঁর কি এমন বিপদ খাঁ সাহেব যে, তুমি একেবারে অপরিহার্য্য হয়ে উঠেছ ? আর কি কেউ নেই ?

নাসির—তামাসা করছ পিয়ারী ! সময় বয়ে যাচ্ছে এমনি করে।

পিয়ারী—আমিনা—[শরাব পাত্র লইয়া আমিনার প্রবেশ ও প্রস্থান] কাশ্মীর জয় করে শাহান্‌শার জন্যে কি নিয়ে এলে ?

নাসির—নানা উপঢৌকনের সঙ্গে এক কাশ্মীরী সুন্দরীকে নিয়ে এসেছি তাঁর জন্যে। সে বিদেশী রূপচ্ছটায় শাহান্‌শা মোহিত হয়ে অসময়ে দরবার বন্ধ করে দিলেন। পশ্চিমের শিশমহল নতুন রূপসজ্জায় সাজানো হল—উৎসবে মুখর হয়ে উঠল মর্ম্মর-মসৃণ হর্ম্মের নিভৃত অভ্যন্তর।

পিয়ারী—সে কি আমার চেয়েও সুন্দর ?

নাসির—আকাশের চাঁদের সঙ্গে অস্পষ্ট তারার তুলনা করা চলে না। আমার চোখে তুমি সব চেয়ে সুন্দর। আমি শাহান্‌শার বিশ্বস্ত গোলাম, কিন্তু আজকের এমন রাতে তাঁকেও ভুলে যেতে চাই। শ্বেত পাথরের অলিন্দে সাদা জ্যোৎস্নার যাদু খেলছে। চল—আমরা ওখানে বসে সার্থক করে তুলি আমাদের এই মিলন-রজনী।

পিয়ারী—জেগে থাকার বিড়ম্বনাকে আমিও ভুলতে চাই—কিন্তু পারি না যে !

[উভয়ের প্রস্থান। আমিনার প্রবেশ]

আমিনা—সিতারা। (সিতারার প্রবেশ)—শুনলি ত কাশ্মীরী জেনানার জন্যে আজ পশ্চিম মহল আলো হয়ে উঠেছে। নহবতে বাজছে নতুন তান।

সিতারা—হ্যাঁ—তাই আজ হাতির লড়াই হবে শুনলাম। গুলবাগের পদ্ম-সরোবরে বজরায় গান বাজনা হবে সারারাত। লক্ষ্ণৌ থেকে যে বাঈজীরা এসেছে—মীনাবাগে তাদের নাচও হবে।

আমিনা—দেখ দেখ ওধারে রোশনাই-এর মেলা।

সিতারা—চল না ভাই—দেখে আসি একবার।

আমিনা—সর্বনাশ—পুরুষ মহলে যে আমাদের প্রবেশ নিষেধ।

সিতারা—কি জানি—তোমাদের এই সহস্র নিষেধের বেড়ার মধ্যে আমার মন টেঁকে না। তবে আমি মনসুরকে ডাকি। আলির কথা ভাল করে শোনাই হল না।

আমিনা—এত দুঃসাহস করিস না। শেষকালে তোরও ঐ শেরিণার দশা হবে।

সিতারা—শেরিণার গল্পটা ভাল করে বল্ না?

আমিনা—গল্প হলে তোকে বলতে আমার মুখে আটকাত না আমিনা। শেরিণা ছিল আমার ছোট বোন। ছোটবেলায় মা মরে গেছিল, এক রকম আমিই তাকে মানুষ করে তুলেছিলাম। গানে, নাচে হাসি-খুসীতে তার সমকক্ষ কেউ ছিল না—পিয়ারী বেগমের পেয়ারের বাঁদি ছিল সে। তোর মতই সরল কোমল স্বভাব ছিল তার, কখনো কারুর মনে কোন আঘাত সে দেয়নি। কিন্তু আমাকে না জানিয়ে মস্ত বড় ভুল করে বসল সে। ভালবেসে ফেলল একজনকে।

সিতারা—তারপর?

আমিনা—একটি ফুলের মত শিশু এল তার কোলে। পিয়ারী বেগমের কাছে অসুস্থতার দোহাই দিয়ে ওকে লুকিয়ে রেখেছিলাম—কিন্তু গুপ্তচরের মুখে সব খবরই তিনি পেলেন আর—আর তাঁরই আদেশে গলা টিপে ঐ দুধের শিশুকে হত্যা করা হল।

সিতারা—উঃ, কি নিষ্ঠুরতা!

আমিনা—তারপর শেরিণাকেও ওরা ছিনিয়ে নিয়ে গেল আমার বুক থেকে।

সিতারা—তুমি হাসিমুখে পিয়ারী বেগমের সামনে আবার দাসত্ব স্বীকার করে নিতে পারলে? আমি হলে এই পাথরে মাথা খুঁড়ে মরে যেতাম—তবু—

আমিনা—তুই এখনও ছেলেমানুষ বোন! তাই চোখের জলের দাম দিতে প্রস্তুত। আমি সব ভুলে গেছি। যে ক্ষণ চলে গেছে তাকে জীবন থেকে মুছে ফেলে দে, যে ক্ষণ আসবে তার কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলিস না—হাতের মুঠোয় যেদিন পেয়েছিস তাই নিয়েই তৃপ্ত হতে পারলে তবেই মরুভূমির মাঝে পাবি একটু পানির ধারা। [শরাব পান করিল]

(মনসুরের প্রবেশ)

মনসুর—মহল যে বড় চুপচাপ ঠেকছে। তোদেরও মুখে হাসি নেই।

আমিনা—তুমি এখন যাও মনসুর—বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশ করেছ জানলে আমাদেরও অশেষ বিপদ।

মনসুর—আমি যাচ্ছি ঐ পশ্চিমের শিশমহলে নতুন বাঈজীদের নাচ দেখতে। অনেক তামাসা হচ্ছে—দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে সবাই দেখছে। [প্রস্থান।

(নাসির ও পিয়ারী বেগমের পুনঃপ্রবেশ)

নাসির—বিচিত্র আলোর সমারোহে চাঁদের রোশনাই ম্লান হয়ে গেছে। তার চেয়ে এসো এইখানেই অবসর যাপন করি আমরা।

পিয়ারী। [হাততালি দিয়া] আমিনা! [আমিনা ও নর্তকীদের প্রবেশ। নাচ আরম্ভ হইল। অল্পক্ষণ পরে ঝড়ের মত মনসুর প্রবেশ করিল]

মনসুর—বেগম সাহেবা! [এক নিমেষে নাচ গান বন্ধ হইল]

পিয়ারী—অসম সাহস তোমার তাই এই অসময়ে আমার খাস কামরায় প্রবেশ করে স্পর্ধা দেখাচ্ছ।

মনসুর—আমার গুস্তাখী মাফ করুন বেগম সাহেবা। আমি পশ্চিম শিশমহলের আলো আর রঙ-তামাসা দেখতে বেরিয়েছিলাম।

পিয়ারী—চমৎকার! আমার মহলের অনুচরেরা এমনই নির্ভীক স্বাধীনচেতা যে, আমার অনুমতির অপেক্ষা রাখে না দেখছি। এর ফল কি হবে জান বেইমান?

মনসুর—আমাকে সব বলতে দিন! শুনলাম কাশ্মীরের নতুন বেগম আজ পথশ্রমে ক্লান্ত, তাই শাহানশা বাদশা আজ রাত্রে এই মহলে রাত্রি যাপন করতে আসছেন!

পিয়ারী—[অস্বাভাবিক কণ্ঠে] তুমি কি স্বপ্ন দেখছ মনসুর, না শরাবের নেশায় অসম্ভবকে সম্ভব মনে হচ্ছে? মিথ্যা খবর হলে জিভ উপড়ে ফেলে দেব শয়তান!

মনসুর—আমি হলফ করে বলছি—এ খবর সত্যি। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি কেন না দূতী এসে পড়বে এখুনি। [করাঘাতের শব্দ] ঐ যে—[ছুটিয়া প্রস্থান।

পিয়ারী—নাসির তুমি চলে যাও। দেরী কোর না, এক মুহূর্তও নয়। যাও—যাও। [হতবুদ্ধি নাসিরের প্রস্থান এবং নাচ গান পুনরায় আরম্ভ হইল। দূতীর প্রবেশ ও কুর্ণিশ] বল কি সংবাদ তোমার?

দূতী—শাহানশা বাদসা দুনিয়ার মালিকের আর্জি এই যে তিনি আপনার মহাল-এ আজকের রাত্রি যাপন করবেন।

পিয়ারী—সুসংবাদ দিয়েছ দূতী। এই নাও আমার কণ্ঠহার তোমার বখশিশ। [কুর্ণিশ করিয়া দূতীর প্রস্থান] এতদিন পরে পিয়ারীকে মনে পড়ল তোমার? নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয়! ভালবাসা পেয়ে হারানোর ব্যথা এই জগৎ বোঝে না! আকাশের অগুণতি তারার মত সহস্রভোগ্যা মন জানে না প্রকৃত প্রেমের স্বরূপ। তাই বাসি ফুলের মত অবহেলিত হয়েও বিগত বসন্তের সৌরভ ভুলিনি এক লহমার তরে। স্মৃতির কণ্টক-জ্বালা ক্ষত-বিক্ষত করেছে আমার প্রতিদিনের নিঃসঙ্গতাকে। হিন্দুর মেয়েরা শুনেছি দ্বিচারিণী হতে পারে না। জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় আত্মবিসর্জন দেয় পতিহারা সতীরা। আমি হিন্দু মায়ের মেয়ে, তাই আজীবন সংস্কারের ধারা আমার ধমনীতে বয়ে চলেছে প্রতি রক্তকণার মাঝে। তোমাকে হারিয়ে তিলে তিলে বিচ্ছেদের পাবকে দগ্ধ করেছি নিজেকে সবার অগোচরে। কঠিন প্রাণ আমার, তাই সব সহ্য করে পিয়ারী বেগম এখনও বেঁচে আছে। এত বছরের বিফল প্রত্যাশা আজ সফল হতে চলেছে কি? আবার কি রোশনাই জ্বলবে আমার শূন্য মহলে?

আমিনা—বেগম সাহেবা!

পিয়ারী—ওরে তোরা আবার নতুন করে আমায় সাজিয়ে দে। উৎসবে আনন্দে ভরে উঠুক এ মহলের নির্জনতা। মখমলের শয্যায় সুগন্ধি পুষ্পস্তবক দিয়ে সুরভিত করে দে। নতুন বসনে ভূষণে সুন্দর করে দে আমার অঙ্গ। [হাসিতে লাগিল]

নাসির—[প্রবেশ করিয়া] কিছুই বুঝতে পারছি না পিয়ারী—তুমি এত হাসছ কেন?

পিয়ারী—এত দিনের জমা কান্না বুক ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছে। যুগ যুগ ধরে যার পথ চেয়ে বসে আছি, সে আসছে। আমার প্রিয়তম স্বয়ং শাহন্‌শা বাদশা আসছে সকল প্রতীক্ষা সার্থক করে। কিন্তু তুমি এখানে কেন ? চলে যাও—

নাসির—কি প্রলাপ বকছ পিয়ারী ? বাইরে উৎসবের ফোয়ারা বইছে। জেনানা মহলের আশে-পাশে আমাকে কেউ দেখে ফেললে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। আমাকে এমন করে দূর করে দিও না—পূর্ব্বকথা স্মরণ করেও লুকিয়ে থাকতে দাও ছদ্মবেশে ? হয়ত আর কোন দিন তোমাকে এমন অন্তরঙ্গতার মধ্যে পাব না, তবুও আমাকে ভালবাস তুমি, সে কথা ত মিথ্যা নয়।

পিয়ারী—কি বললে ? তোমাকে ভালবাসি আমি ! তার চেয়ে বল না যে শাহান্‌সার প্রেয়সী পথের কুক্কুরকেও ভালবাসে। না না—এখানে কিছুতেই থাকতে পার না তুমি। আমার এতদিনের চাওয়া এ মধুর রাত তোমার কলুষিত নিঃশ্বাসে বিষাক্ত হয়ে উঠবে।

নাসির—এত দিন স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলিয়েছ ছলনাময়ী—মূর্খ আমি, সে ছলনা-জালে আত্মবিস্মৃত হয়ে শাহন্‌শার অনুগ্রহকে অবহেলা করে ছুটে এসেছি বার বার। ব্যভিচারিণীর ক্ষণস্থায়ী মোহ মিটিয়ে আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে দেখছি।

পিয়ারী—নাসির অতিরিক্ত স্পর্দ্ধা। তোমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে যে তুমি কে ! আমার নিঃসঙ্গ জীবন অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। নিমজ্জমান মানুষ তৃণকেও আশ্রয় করে বাঁচতে চায়, তাই তোমাকে পথের ধূলি থেকে কুড়িয়ে এনে উচ্চাসনে বসিয়েছিলাম ! সূর্য্যের অভাবেই আমরা দীপ জ্বালাই অন্ধকারে—সকালের আলোয় সে দীপের কথা কে ভাবে ? ভেবেছিলাম আমার রাত্রি ফুরোবে না, কিন্তু প্রিয়তমের আবির্ভাবের লগ্নে নূতন দিন সমাগত। বাক্যজাল সংবরণ করে দূর হয়ে যাও বেইমান !

নাসির—এত দূর ! কিন্তু তুমিও না জেনে মহা ভুল করছ পিয়ারী ! একদিন সামান্য মনসবদার ছিলাম, কেবল মাত্র নিজের যোগ্যতায় স্বয়ং বাদশার সিপাহ-সালার আমি। ভ্রষ্টা নারীর তিরস্কারে ভয় পাই না। আশাতীত সৌভাগ্যের স্বপ্নে বিস্মৃত হয়েছ তোমার বিগত ইতিহাস। শূন্য শয্যায় সমারোহ নিয়ে তোমার চোখের জলে রাত কাটানর কাহিনী আর কেউ না জানলেও আমি জানি। তুমি কি আশা করছ কাশ্মীরের সুন্দরীকে ফেলে শাহানশা পুরোনো উচ্ছিষ্টকে আস্বাদন করতে রোজই আসবেন। পুরাতনের মোহ নেই তাঁর—পুরানো গান, পুরানো আবাস এমন কি পুরানো প্রেমেরও আকর্ষণ তাঁকে লুব্ধ করে না। কাল থেকে একা একা আশমানের তারা গুণো সুন্দরি !

পিয়ারী—এখনও সাবধান করে দিচ্ছি—চলে যাও চিরজন্মের মত।

নাসির—যাব না। কিছুতেই তোমার এ ছলনাকে ক্ষমা করব না আমি। শুধু অন্তরে নয় আমার পৌরুষেও আঘাত করেছ। রঙিন বুদ্‌বুদের নেশায় মাতাল হয়েছিলাম, আজ ধরা পড়ে গেল সেই অন্তঃসারবিহীন ফাঁকির ইতিহাস। আমি শাহান্‌শার কাছে সব অপরাধ স্বীকার করে নেব। তাঁকে জানাব যে ছলনাময়ী পিয়ারী বেগম তাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ! তারপর একসঙ্গেই মৃত্যু হবে আমাদের। এক কবরের মধ্যে মিশে থাকব অনন্তকাল। তামাম দুনিয়া জানবে নাসিরুদ্দিন খাঁ আর পিয়ারী বেগমের অবৈধ প্রণয় লীলা। হাঃ হাঃ হাঃ—

পিয়ারী—[হাততালি দিয়া] মনসুর ! [মনসুরের প্রবেশ] পাতাল-মহলে কারাঘরে এই বেইমানকে অবরুদ্ধ কর। তিলে তিলে শুকিয়ে মরুক বিশ্বাসঘাতক। [অন্য দুজন প্রহরীর প্রবেশ এবং নাসির খাঁ বন্দী অবস্থায়]

নাসির—আমাকে মাফ্‌ করো পিয়ারী ! ক্রোধের বশে মহাপাপ করেছি—সেজন্যে সত্যিই অনুতপ্ত আমি। আমাকে মুক্তি দাও। পবিত্র কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করছি, তোমার জীবনে কোনদিন আসব না—।

পিয়ারী—কাপুরুষ, পৌরুষের বড়াই করে একজন জেনানার পদতলে নিজের জীবনে ভিক্ষা চাইছ—লজ্জা করছে না ? নিয়ে যাও মনসুর—এখুনি নিয়ে যাও। [মনসুর ও প্রহরীদ্বয় নাসির খাঁকে ধরিয়া বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল]

নাসির—পিয়ারী—তোমার দয়া প্রার্থনা করছি—পিয়ারী—!!!

[সকলের প্রস্থান।

পিয়ারী—হতভাগ্য ! বামন হয়ে চাঁদ ধরার স্বপ্ন দেখেছিলে ? আমিনা—সিতারা কি হল তোদের—দেরী করছিস কেন ? আরও রোশনাই জ্বেলে দে চারদিকে—নহবতে বাজুক সানাই নতুন সুরে। নাচো তোমাদের নতুন ছন্দের নাচ। [নাচ শুরু হইল] বাঃ বাঃ চমৎকার ! কই শরাব—। একি এমন নাচ দেখেও মুখে হাসি ফুটল না তোদের ? আমাকে কি একজনও ভালবাসিস না তোরা, নইলে আমার জীবনের সবচেয়ে শুভলগ্নে অশ্রুর ফোয়ারা ছুটেছে তোদের চোখে মুখে। [সিতারার চোখ ঢাকিয়া প্রস্থান] কি হল চলে গেল কেন ? আমিনা তুই ত অনেক কাল আছিস আমার সঙ্গে। তুই আমাকে নতুন সজ্জায় সুন্দরতর করে তোল। হিন্দু জ্যোতিষীর বশীকরণের মন্ত্র শিখিয়ে দে নতুন করে—যেন প্রিয়তমকে আবার না হারিয়ে ফেলি। আরও শরাব নিয়ে আয়—।

আমিনা—পিয়ারী বেগম—আর শরাব পান করবেন না। বেশী খেলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন শেষকালে।

পিয়ারী—তুইও আমার বিরুদ্ধে চলে গেলি ? শেরিণাকে তোর কলিজা থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করেছিলাম—সে কথা কি এখনও মনে আছে ? কেন মনে করে রাখিস পুরানো দিনগুলোকে—শেষে কি পাগল হয়ে যাবি—ভুলে যা সব, সব কিছু ভুলে যা।

আমিনা—প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠুন বেগম সাহেবা, শাহান্‌শার আসার সময় হয়ে এল।

পিয়ারী—বাজে কথা বলছিলাম বুঝি ? আজকে আমার বকুনির মরশুম শুরু হয়েছে—এলোমেলো ভাবনায় সবই জট্‌ পাকিয়ে যাচ্ছে মনের মধ্যে। (মনসুরের প্রবেশ) আশা করি গোপনে তোমার কার্য্য সমাধা হয়েছে কেউ জানতে পারেনি।

মনসুর—বেগমের অধীনের গোলাম, আদেশ পালন করতে কখন ত্রুটি করে না।

পিয়ারী—সে কি করছিল মনসুর ?

মনসুর—পাথরের মত আমার সঙ্গে চলল। সেই বীভৎস অন্ধকার পাতাল—ঘরে মৃৎপাত্রের একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে যখন বাইরে থেকে দুয়োর বন্ধ করে দিলাম তখন ভেতর থেকে ক্ষীণ আর্ত্তনাদ ভেসে এল কয়েক বার।

পিয়ারী—থাক্ থাক্ আর বোল না। দুঃস্বপ্নকে ধুয়ে মুছে পবিত্র হয়েছে আমার দেহ আর মন। আমিনা আতরদানী কোথায়? কোথায় আমার জ্যোৎস্নার মত স্বচ্ছ মসলিনের রূপালী ওড়না?

মনসুর—বাদশার দূতী দ্বারে অপেক্ষা করছে—তাকে নিয়ে আসব?

পিয়ারী—নিয়ে এস। [প্রস্থান। আমিনা—তোরা মনে করিস আমি নিষ্ঠুর, আমি পাষাণ! সত্যিই তাই ছিলাম। আজ পাষাণ ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। আমি আবার আমার হারানো মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়েছি। জিন্দগীভোর যার প্রত্যাশায় আকুল হয়ে ছিলাম আমার সেই হারানো মানিক আবার ফিরে এসেছে।

(বাদশার দূতীর প্রবেশ)

দূতী—শাহানশা বাদশা দুনিয়ার মালিক জানিয়েছেন যে, বিশেষ জরুরী রাজকার্য্যে ব্যস্ত থাকার দরুণ পিয়ারী বেগমের মহল-এ আসতে অসমর্থ।

পিয়ারী—আমার বহুমূল্য অলঙ্কার তোমায় খুলে দিচ্ছি দূতী—সত্যি করে বল তিনি আজ কোন মহলে রাত্রি কাটাবেন?

দূতী—[ইতস্তত করিয়া] বেগম সাহেবা—আমরা গুপ্তচর নই। তবে—

পিয়ারী—গুপ্তচর নও দূতী—তুমি নারী। জেনানা মহলের প্রতিটি নারী জানে আমার অপমানাহত নারীত্বের ইতিহাস। তোমার কাছে নত হয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি বল আমাকে—। মিথ্যা আশার অঙ্কুরকে ছলনা করে বাঁচিয়ে রাখতে অন্তর সায় দেয় না। যাক্ সব মিথ্যা মোহের বন্ধন টুটে—আমাকে সত্য জানতে দাও।

দূতী—[মৃদুস্বরে] শাহানশা পশ্চিমের শিশমহলে নতুন বেগমের কাছেই যাবেন। পথশ্রমে ক্লান্ত কাশ্মীর সুন্দরী এখন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

[পিয়ারী বেগম যন্ত্রচালিতের মত নিজের অলঙ্কার খুলিয়া দূতীর হস্তে দিল। দূতী প্রস্থান করিলে স্থাণুর মত পিয়ারী বেগম বসিয়া রহিল। আমিনার নীরব নির্দ্দেশে মনসুর এবং নর্ত্তকীরা চলিয়া গেল]

পিয়ারী—রোশনাই নিবিয়ে দে আমিনা। আমার ঘরে আর আলো জ্বলবে না!

[আবহ সঙ্গীতের মূর্চ্ছনায় ধীরে ধীরে যবনিকা পতন]

ক্ষণিকা

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

ভাল ছিল দেখা নাহি হলে।—
কি হবে এমনি ক'রে দেহে-মনে অবিরাম জ্বলে'
অগ্নি-বিষ যন্ত্রণায়
প্রতিদিন ব্যর্থকাম, প্রতি রাত্রি আত্ম-বঞ্চনায়?

দেখা হল অকস্মাৎ; অভাবিত মুহূর্ত্তের তরে
আমার অন্তরে
ছিল নাকো কোনো আয়োজন;
তুমি মোরে চিনিতে না, জানিতে না কোথায় কখন
দু'জনে হঠাৎ হবে দেখা
বিন্দুমাত্র তার স্মৃতিরেখা
তোমার অন্তরে নাই; থাকিবারও কথা নয় প্রিয়ে
আমার সমস্ত আমি গেল যেন তোমাতে মিলিয়ে।
হয়েছিল ছোট দুটি কথা
ভ্রূ কুঞ্চিত প্রত্যাখ্যানে হয়ত বা পেয়েছিনু ব্যথা
সে ব্যথা গোপন ছিল, জানেন তা শুধু অন্তর্যামী,
পেয়ে হারালাম আমি
বহু জন্ম কামনার ধনে,
জন্ম জন্মান্তর আমি ফিরেছি যাহার অন্বেষণে।

কত কাল কেটে গেল; তুমি-হারা আমার ভুবন
ব্যাপ্তিহীন বর্ণহীন; অকৃতার্থ প্রমত্ত যৌবন
অন্ধবেগে ছুটিয়াছে মৃগতৃষ্ণিকার পিছু-পিছু
আধ-আলো আধ-ছায়া তার মাঝে ছিল আরো কিছু
'চোখে যা' পড়েনি ধরা, ছিল অন্তরের অগোচর;
তোমার যৌবন-সরোবর
তরঙ্গিত বক্ষে তার শত চাঁদ ভাঙে আর গড়ে
সেথায় আমার ছায়া পড়ে কি না পড়ে

ছিল নাকো এ হেন সংশয়,
কার ভাগ্য কে করেছে জয়
সে প্রশ্ন আমার নহে।
যে অগ্নি আমারে দহে
সর্বাঙ্গে তাহারি জ্বালা—পুড়ে পুড়ে হয়েছে অঙ্গার
বুক পেতে সহিয়াছি অতর্কিত আঘাত ঝঞ্ঝার
তবু তোমা ভুলি নাই, তোমারে কি কভু ভোলা যায়?
অদৃশ্য-বন্ধনে তুমি কখন যে বেঁধেছ আমায়—
সে কথা জানি না আমি, সে কথা কি তুমিই জানিতে?
অব্যর্থ সন্ধানে শর তুমি কি হানিতে
যে মৃগ স্বেচ্ছায় এসে ধরা দেয় তার বক্ষ ভেদি?
তুমি যে বেঁধেছ তারে সে বাঁধন ছেদি'
সে ত নাহি ফিরে যেতে চায়
নিরুদ্বিগ্ন বনের ছায়ায়।

তবু আজ মনে হয় দেহ পুড়ে হয়ে যাক ছাই
যৌবন-আবেগে অন্ধ কামনার কোনো মূল্য নাই
উদাসীন তোমার নিকটে।
নয়নে নয়ন রাখি' প্রত্যহের এই দৃশ্যপটে
রেখে যাই তপ্ত অশ্রুজল
ফিরে যাই দীর্ঘশ্বাসে, তবু প্রেমে চিত্ত অচঞ্চল।
নিয়ে যাই সর্বদেহে যৌবনের উত্তাপ প্রখর
স্নায়ুরন্ধ্রে অগ্নিজ্বালা দুঃসহ দুর্ভর।
তার চেয়ে যদি আজ নির্জন সন্ধ্যায়
প্রস্ফুটিত গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধায়
শেষ মিলনের ক্ষণে ফেলে দিই কৃষ্ণ-যবনিকা
তুমিই কি সুখী হবে হে আমার প্রেয়সী ক্ষণিকা?

চিত্রলেখা



[উপন্যাস]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মা

অষ্টম পরিচ্ছেদ

শান্ত সাগরে তুফান উঠবার আগে চতুর্দিকে ছেয়ে যায় এক ঘোর নিস্তব্ধতা, বায়ুমণ্ডল হয়ে ওঠে উত্তেজিত এবং ভাবী প্রলয়ের আশঙ্কায় সব শূন্যপ্রায় হয়ে আসে।

তার পর শুরু হয় বাতাসের তাণ্ডব লীলা ও সংগে সংগে আরম্ভ হয় তরংগের প্রলয় নাচন ও বিপ্লব গীত।

আকাশের বক্ষে আগ্নেয়গিরি ফেটে পড়বার পূর্বেও ঠিক এমনি ভাবে ছড়িয়ে পড়ে এক অশান্তি, তার নীল রংএর ভিতর থাকে বিনাশের প্রচ্ছন্ন ইংগিত আর তার ভয়ে সারা আকাশ থেকে বাতাস যায় পালিয়ে। তারপর অগ্নিস্ফুলিংগের উদ্‌গিরণ ও মৃত্যুর ডাক।

চিত্রলেখার রথ বীজগুপ্তের দ্বারে এসে থামে। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। দিনের প্রচণ্ড গরমের পর পাটলিপুত্রের রাস্তায় সামন্তদের ভীড়, কোথাও সুন্দরী যুবতীরা তাদের প্রেমিকের গলায় ফুলের হার পরাতে ব্যস্ত, কোথাও যুবক ও যুবতীরা সুগন্ধি ও শীতল পানীয় পান করে চলেছে। চারি দিকে আনন্দ ও বিলাসের প্রাচুর্য্য।

সমস্ত রাজপথ উৎসবের যেন এক বিরাট কেন্দ্র! জহুরীর দোকানে যুবতীদের ও তাম্বুলের দোকানে যুবকদের ভীড়। বীজগুপ্ত ঐ জন-সমুদ্রের এক অংশে উপস্থিত।

শ্বেতাংকও বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত। প্রহরী এসে তাকে বলে, "প্রভু, দেবী চিত্রলেখার রথ বাইরে প্রভুর জন্য অপেক্ষা করছে।"

ঠিক ঐ সময়ে বীজগুপ্তের অনুপস্থিতি শ্বেতাংকের ভাল লাগে না, সে মনে মনে ভাবে যে, সে পাপ করেছে এবং হয়ত তাকে আরও এমনি পাপ করতে হবে যা সে কল্পনাও করতে পারে না। তবুও শ্বেতাংক উত্তর দেয়, "বল যে, সে শীঘ্র আসছে।"

শ্বেতাংককে সেদিন খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। চিত্রলেখার কাছে গিয়ে সে বলে, "দেবি, কি আজ্ঞা?"

চিত্রলেখা হেসে উত্তর দেয়, "বীজগুপ্তের সংগে দেখা করবার প্রয়োজন ছিল কিন্তু মনে হচ্ছে সে বাড়ী নেই।"

"দেবী ঠিকই অনুমান করেছেন!"

"আমি তা আগেই জানতাম, তবুও মনে করলাম যে তোমার সংগেই দেখা করে আসি।"

"এই অধমের প্রতি দেবীর অশেষ কৃপা, দেবীর সেবা করতে আমি সর্বদা প্রস্তুত।"

"তার কোন প্রয়োজন নেই। আজ আমার চিত্ত বড় ব্যাকুল, তাই ইচ্ছে হ'ল যে কোলাহল-মত্ত জন-সমুদ্রে মিশে গিয়ে চিত্তকে কিছুটা শান্ত করি। বীজগুপ্তের সংগে বেড়াব এই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলাম, বীজগুপ্ত নেই তা হ'ক, তুমি তো আছ, চল, তোমাকে নিয়েই বেরিয়ে পড়ি।"

"এ তো উত্তম প্রস্তাব! দেবি!" বলে শ্বেতাংক তার নিজের রথের দিকে এগিয়ে যায়। চিত্রলেখা শ্বেতাংকের হাত দুখানা সজোরে চেপে ধরে বলে, "না, তোমাকে আমার সংগে আমার রথে যেতে হবে।"

মন্ত্রমুগ্ধ শ্বেতাংক নর্তকীর রথে গিয়ে বসে, রথ রাজপথের দিকে এগিয়ে চলে। পাটলিপুত্রের সুন্দরী নর্তকীকে পাশে বসিয়ে শ্বেতাংক ঘোড়ার লাগাম হাতে নেয়। ঘোড়া দুটি একবার কেঁপে গর্বে মাথা উঁচু করে রাজপথে প্রবেশ করে—তারাও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে তাদের রথে আজ সেই নারী বসে আছে যার একটু ইশারায় নগরের সেরা সেনাপতিরা পুতুলের মত নেচে বেড়ায়। চিত্রলেখার রথ দেখে বড় বড় সেনাপতিদের রথ থেমে যায়। চারি দিক থেকে লোকেদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শোনা যায়। কেউ কেউ আবার চিত্রলেখার সংগে শ্বেতাংককে বসে থাকতে দেখে তাকে লক্ষ্য করে ব্যংগোক্তি করে; নর্তকী শুধু হাসে, তাদের কথা শোনেও না।

প্রত্যেক সেনাপতি তার দিকে হার ছুড়ে দেয়, চিত্রলেখা সেগুলি তুলে নিয়ে গলায় পরে নিলে সেনাপতিরা ধন্য হয়ে যায়। সত্যিই নর্তকীকে তখন দেখে মনে হচ্ছিল যেন সাক্ষাৎ পার্বতী বসে আছে। চারি দিক থেকে লোকেরা তাকে সম্মান দেয়, নতমস্তকে তারা তাদের দেবীকে ভক্তি জানায়। আজ রাজপথে চিত্রলেখাকে স্বাগত করার জন্যই যেন এই অগণিত ভীড় ও কোলাহল।

ঠিক এমনি সময়ে অন্য দিক থেকে একটি রথ এসে নর্তকীর রথের পাশে এসে দাঁড়ায়। নর্তকী তখন এক নবযুবকের সংগে কথা বলছিল, হঠাৎ দেখে, পাশের রথে বীজগুপ্ত দাঁড়িয়ে হাসছে।

"চিত্রলেখাকে আজ রাজপথে দেখে সত্যি বড় আশ্চর্য্য লাগছে!"

"হ্যাঁ, বীজগুপ্তকেও আজ ঘরে না পাওয়াতে বড় আশ্চর্য্য লেগেছে!"

উত্তর ও প্রত্যুত্তর—এ দুইএর মধ্যেই এক গভীর রহস্য ছিল, যা তারা দু'জনাই বুঝতে পারে।

বীজগুপ্ত বলে, "আজ বীজগুপ্তের গৃহে চিত্রলেখা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করবে না।"

চিত্রলেখা উত্তর দেয়, "চিত্রলেখা বীজগুপ্তের নিমন্ত্রণ সানন্দে স্বীকার করছে।"

সন্ধ্যা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। রাজপথ আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়ে উঠছে। বীজগুপ্ত নিজের রথ থেকে নেমে চিত্রলেখার রথে গিয়ে বসে—সে ঘোড়ার লাগাম নিজের হাতে নিয়ে নেয়। শ্বেতাংক বীজগুপ্তের রথ নিয়ে এগিয়ে চলে।

বীজগুপ্ত বলে, "আমি সত্যি ভারী দুঃখিত যে, যে সময়ে তুমি আমার বাড়ী গিয়েছিলে তখন আমি ছিলাম না।"

"দুঃখ করবার কিছু নেই," চিত্রলেখা হেসে বলে, "দোষ আমারই, কারণ আমি ঐ সময়ে সাধারণতঃ তোমার বাড়ী যাই না, তুমি কি করে জানবে যে আজ ঐ সময়ে আমি যাব—এজন্য ঐ সময়ে তোমার বাড়ী না থাকা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।"

দু'জনাই অনেকক্ষণ অবধি চুপচাপ; কোন কথা নেই! হঠাৎ বীজগুপ্ত শুরু করে—"চিত্রলেখা, ক'দিন থেকে আমি এক গভীর চিন্তায় পড়েছি। সে চিন্তার যে কি কারণ তা আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না। আচ্ছা, কয়েক দিন থেকে আমার গৃহে আস না, এর কি কারণ?"

"কারণ? আসতে পারিনি, তার কারণ আসবার ইচ্ছে হয়নি।"

সেনাপতি তার প্রিয়তমার কাছ থেকে এ রকম উত্তর আশা করেনি। সে মনে করেছিল যে, সে নিশ্চয় কোন কারণ দেখাবে কিন্তু এমন স্পষ্ট অথচ স্বাভাবিক উত্তর শুনে সেনাপতির বড় আশ্চর্য্য লাগে এবং সংগে সংগে রাগও হয়, "আসবার ইচ্ছে ছিল না—তার কারণ জানবার অধিকার কি আমার আছে?"

নর্তকী সেনাপতির দিকে তাকিয়ে দেখে যে ক্রোধে ও স্বামিত্ব-বোধে তার মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠেছে। সে মনের ভাব গোপন করে বলে, "অধিকার? আমি তো জানতাম না যে মানুষের ওপর মানুষের কোন অধিকার থাকতে পারে। তবুও কারণ যখন জানতে চাইছ তো শোন, এই ক'দিন আমার মন ভাল ছিল না আর সেই উদ্বিগ্নতায় আমি আমাকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম।"

রথ এসে বীজগুপ্তের দ্বারে এসে পৌঁছয়। শ্বেতাংক নিজের রথ থেকে নেমে এসে প্রভু ও প্রভুপত্নীকে নামতে সাহায্য করে।

তিন জন সেনাপতি বীজগুপ্তের প্রমোদ-গৃহের দিকে এগিয়ে চলে। কিছুক্ষণ পর শ্বেতাংক ওখান থেকে চলে যাবার উপক্রম করলে সেনাপতি বলে, "শ্বেতাংক, দাঁড়াও, তোমার চলে যাবার কোন প্রয়োজন নেই।"

নর্তকী বলে, "না, শ্বেতাংকের এখানে থাকার কোন প্রয়োজন নেই।"

সেনাপতি হেসে বলে, "শ্বেতাংক থাকলেও কোন ক্ষতি হবে না। বরং এতে শ্বেতাংকের লাভই হবে। অনুভব-হীন জীবনে অভিজ্ঞতা আহরণের কিছু সুযোগ হলেও হতে পারে।"

সেনাপতি শ্বেতাংককে সুরা আনবার জন্য ইংগিত করে। প্রভু ও প্রভুপত্নীকে সুরা-পাত্র এগিয়ে দিয়ে শ্বেতাংক নিজেও একটি পাত্র নিয়ে কিছু দূরে গিয়ে বসে।

বীজগুপ্ত আরম্ভ করে "হ্যাঁ, চিত্রলেখা, তুমি বলছিলে যে কোন বিশেষ উদ্বিগ্নতায় তুমি সব কিছু, এমন কি নিজেকেও পর্য্যন্ত ভুলে গিয়েছিলে, তাহলে তো যে উদ্বিগ্নতা তোমাকে সব কিছু ভুলিয়ে দিলে, নিশ্চয় সে বড় অদ্ভুত!"

নর্তকী হেসে উত্তর দেয়, "তার মানে কি সেনাপতি বীজগুপ্ত আমাকে আমার মানসিক চিন্তাধারা বিশ্লেষণ করতে বাধ্য করছে?"

"না, বাধ্য করছি না, বরং প্রার্থনা করছি যে আমার কাছে সব কথা খুলে ব'ল।"

"যদি সেনাপতির এই ইচ্ছে হয়ে থাকে তাহলে সে জানুক যে, চিত্রলেখার এ উদ্বিগ্নতা কোন সাধারণ স্তরের নয় এবং সেজন্য তার কারণও অসাধারণ। কিন্তু এ উদ্বিগ্নতার বিষয়ে আর বেশী কিছু বলতে চিত্রলেখা অসমর্থ।"

সেনাপতি শ্বেতাংকের দিকে একবার তাকিয়ে ধীরে বলে, "চিত্রলেখা অসমর্থ? পরিচয়ের পর এই বোধ হয় প্রথম চিত্রলেখা বীজগুপ্তের কাছে নিজের কথা গোপন রাখছে। তাই বীজগুপ্ত মনে করে যে চিত্রলেখার মনের পরিবর্তন হয়েছে।"

আরও বেশ খানিকটা সুরা নিঃশেষ করে ফেলে নর্তকী বলে, "এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুর পরিবর্তন হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়।"

সেনাপতি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। সে এরকম উত্তর আশা করে নি। "কি বললে? এই পরিবর্তনশীল জগতে কোন কিছুর পরিবর্তন হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়? তাহলে কি ধরে নিতে পারি যে চিত্রলেখার প্রেমেরও পরিবর্তন হ'তে পারে?"

যে কথা বলে ফেলেছে তার জন্য নর্তকীর পশ্চাত্তাপ হয়। কোন কিছু চিন্তা না করে, পরিণামের কথা না ভেবে ভাবের আবেগে সে কথাগুলো বলে ফেলেছে, তার তখন মনেই আসে নি যে তার কথায় এরকম জটিল প্রশ্ন হতে পারে। সামলিয়ে নিয়ে সে বলে, "না, বীজগুপ্তের অনুমান মিথ্যা। চিত্রলেখার প্রেম সাগরের ন্যায় গভীর, তার পরিবর্তন হওয়া অসম্ভব! কিন্তু সংগে সংগে আমি এ-ও মানি ও জানি যে প্রেম পরিবর্তনশীল। প্রকৃতির নিয়মই পরিবর্তন এবং প্রেম তো ঐ প্রকৃতির এক রূপ। প্রকৃতির নিয়ম প্রেমের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।"

সেনাপতি বেশ বুঝতে পারে যে, নর্তকীর কথাগুলো কঠিন হলেও তার ভিতর সত্যতা আছে। তার কেবলই মনে হয় যে, চিত্রলেখা তার কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে ও তাদের দু'জনার মাঝে দেখা দিচ্ছে এক বিরাট ব্যবধান! আজ এই দুই প্রাণীই এক অজ্ঞাত শক্তির কবলে।

"চিত্রলেখা! তুমি ভুলে যাচ্ছ যে প্রেমের সম্বন্ধ আত্মার সংগে, প্রকৃতির সংগে নয়। যে বস্তুর প্রকৃতির সংগে সম্বন্ধ থাকে সে তো শুধু বাসনাময়, কারণ বাসনার সম্বন্ধ হচ্ছে বহির্জগতের সংগে। যে দেহে প্রকৃতি সৌন্দর্য্য ভরে দেয়, সেই দেহই হয় বাসনার লক্ষ্য। কিন্তু প্রেমের সম্বন্ধ দেহের সংগে হয় না, সে আত্মাকে কেন্দ্র করে ঘুরে বেড়ায়। পরিবর্তন তো প্রকৃতির নিয়ম, আত্মার নয়। আত্মা অবিনশ্বর, অমর।"

নর্তকী হেসে ওঠে, "আত্মা অমর? খুবই অদ্ভুত কথা বলছো বীজগুপ্ত! জন্ম নিলেই মরতে হবে আর যদি কোন বস্তু অমর হয় তাহলে তার জন্মও হয় নি। যেখানেই সৃষ্টি থাকবে সেখানেই

থাকবে ধ্বংস। আত্মার জন্ম হয় না, কাজেই সে অমর, কিন্তু প্রেম? প্রেমের তো জন্ম হয়—কারণ কোন বিশেষ ব্যক্তির সংগে প্রেম হয় এবং ঐখানে প্রেমের জন্ম হয়। সে সম্বন্ধ অনন্ত বা শাশ্বত নয়, কখনও না কখনও ঐ সম্বন্ধের শেষ হয়ে যাবে। প্রেম ও বাসনার ভিতর শুধু এই প্রভেদ যে, বাসনা নিছক পাগলামি ও ক্ষণস্থায়ী এবং এই পাগলামি দূর হয়ে যাবার সংগে সংগে বাসনারও মৃত্যু হয়। প্রেমের গুরুত্ব আছে, তাই চট্‌ করে তার অস্তিত্বের বিনাশ হয় না। বীজগুপ্ত! আত্মার সম্বন্ধ অবিনশ্বর নয়।"

সেনাপতি দেখে যে নর্তকী তর্কে বহুদূর এগিয়ে গেছে। এবারেও বীজগুপ্ত হেরে যায়—ভিতরে ভিতরেই গুমরিয়ে ওঠে ও বলে, "তুমি যা কিছু বলছ হয়ত সব ঠিক। আমি তোমার কথার বিরোধিতা করছি না। সমস্ত হল নিজের নিজের বিশ্বাস, কিন্তু একটা কথা এখানে বলা বোধ হয় অনুচিত হবে না যে, উন্মত্ততা ও জ্ঞানের ভিতর যে প্রভেদ আছে ঠিক সেই প্রভেদই আছে প্রেম ও বাসনার ভিতর। উন্মত্ততা ক্ষণস্থায়ী, জ্ঞান স্থায়ী। কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান লুপ্ত হতে পারে কিন্তু তার মৃত্যু হতে পারে না। যখন পাগলামির আধিক্য দেখা যায় তখন জ্ঞান লুপ্তপ্রায় মনে হয় কিন্তু যে মুহূর্তে পাগলামির শেষ হয়ে যায় সেই মুহূর্তে জ্ঞানও স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। যদি জ্ঞান অমর না হয় তবে প্রেমও অমর নয় কিন্তু আমার মতে জ্ঞানের মৃত্যু হয় না—জ্ঞান ও প্রেম দুই-ই ঈশ্বরের এক অংশ।

অর্দ্ধনিমীলিত চোখে চিত্রলেখা শায়িতা, তার মুখে মত্ততার আবেশ। সে উঠে বসে ও বীজগুপ্তকে বলে, "বীজগুপ্ত! তুমি ঠিক বলেছ—আমারই ভুল—ভুলের আবরণে আমি তোমাকে পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছিলাম—ক্ষমা কোর।" এই বলে নর্তকী সেনাপতির গলা জড়িয়ে ধরে।

শ্বেতাংক উঠে দাঁড়ায়। বীজগুপ্ত বলে, "শ্বেতাংক! তুমি যেতে পার। রথ এখন নিয়ে যেও না—আজ আমার ও তোমার দু'জনার-ই নিমন্ত্রণ আছে।

নবম পরিচ্ছেদ

আর্য্যশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় জাতিতে ক্ষত্রিয় হলেও কার্য্যকলাপে তিনি একেবারে ব্রাহ্মণ। পাটলিপুত্রের এই প্রবীণ সেনাপতির ভবনে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রাধান্য, উল্লাস-বিলাসের চিহ্নমাত্রও নেই। লোকেরা তাঁকে বিদেহরাজের সংগে তুলনা করে এবং সত্য-সত্যই তিনি সেই উপমার যোগ্য। সমস্ত নগরে মৃত্যুঞ্জয়ের নাম কে না জানে? মুষ্টিমেয় শুধু কয়েক জন ছাড়া তাঁর মত ব্যক্তিত্ব আর কারুর ভিতর দেখতে পাওয়া যায় না। ক্রীড়া ও কলরব-মুখরিত প্রাংগণ মৃত্যুঞ্জয়ের জন্য নয়, উপাসনা ধ্যান ও একান্ত নির্জন পরিস্থিতি তাঁর একমাত্র কাম্য।

জাগতিক কোলাহলের বাইরে থাকার জন্য উন্মুখ এই ক্ষত্রিয়ের ঐশ্বর্য্য ও অর্থ দুই-ই ছিল। নগরের মুখ্য সেনাপতিগণের ভিতর তিনি এক জন এবং রাজসভায় তিনি এক উচ্চ পদের অধিকারী। লোকেরা তাঁর নাম শুনে সসম্মানে মাথা নত করে নেয় ও তাঁকে সামনে দেখলে তারা জানায় তাদের অসীম ভক্তি। আর্য্যশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়ের সাধনার ভিতর আছে আত্মিক শক্তি ও আধ্যাত্মিক জ্যোতি।

মৃত্যুঞ্জয়ের একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কোন পুত্রসন্তান নেই। কন্যাটির নাম যশোধরা। এই একটি মাত্র সন্তানের প্রতি মৃত্যুঞ্জয় তাঁর হৃদয়ের সমস্ত মমতা-স্নেহ উজাড় করে দিয়েছেন। যশোধরার বয়স প্রায় আঠারো। কন্যার যৌবন পূর্ণ বিকশিত কিন্তু পিতা জীবন-যাত্রার শেষ প্রান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন। কাজেই অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী যশোধরাকে বিবাহ করবার জন্য প্রত্যেক নব যুবকের পক্ষে আগ্রহ প্রকাশ করা খুবই স্বাভাবিক। যশোধরা সুন্দরী, সাধারণের অপেক্ষা সে অনেক বেশী সুন্দরী, তার প্রশান্ত বদনে নির্মলতার ছাপ। হাসির ভিতর বালিকার চপলতা, হরিণের ন্যায় বড় বড় চোখে সংকোচের ভাব ও রক্তিম কপোল দু'খানি লজ্জায় মাখা! অমৃত ও উল্লাসে মিশে গড়ে উঠেছে তার যৌবন, তাই তার ভিতর গর্বিতের কোন উচ্ছৃঙ্খলতা নেই, শুধু আছে লজ্জার প্রণত শান্তি।

বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয় কন্যার জন্য উপযুক্ত পাত্রের অনুসন্ধান করছিলেন, কিন্তু মনে মনে সেনাপতি বীজগুপ্তকেই তাঁর কন্যার একমাত্র পাত্র স্থির করে ফেলেছেন। বীজগুপ্ত অবিবাহিত ও উচ্চবংশোদ্ভূত। আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের বন্ধুগণের অনেকেই যশোধরাকে আপন পুত্রবধূ করবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র, তাঁরা বহু বার মৃত্যুঞ্জয়কে বীজগুপ্ত ও চিত্রলেখার সম্বন্ধের কথা উল্লেখ করে তাঁকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেন কিন্তু প্রবীণ ও অভিজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয় শুধু এই উত্তর দেন। "এ সব বীজগুপ্তের নিছক পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়, তার সম্মুখে পড়ে আছে বিস্তীর্ণ সময়, তা ছাড়া সে একজন শিক্ষিত যুবক—এ সময়ে সে শুধু অভিজ্ঞতার সাগর মন্থন করে চলেছে।"

আজ মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে বীজগুপ্তের নিমন্ত্রণ। যশোধরার জন্মোৎসব উপলক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে বিরাট উৎসবের আয়োজন হয়েছে। যশোধরা যখন নেহাত-ই বালিকা তখন বীজগুপ্ত দু'-এক বার তাকে দেখেছিল। মৃত্যুঞ্জয়ের সংগে তার পরিচয়ও বিশেষ ছিল না। আজ হঠাৎ মৃত্যুঞ্জয়ের কাছ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে বীজগুপ্ত স্তম্ভিত এবং সব চেয়ে বেশী সে আশ্চর্য্যান্বিত হ'ল, যখন সে নিমন্ত্রিত পত্রে দেখলে যে, সে ও চিত্রলেখা একসংগে নিমন্ত্রিত হয়েছে।

সেনাপতি চিত্রলেখাকে বলে, "চিত্রলেখা! এক বড় অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে! তুমি বোধ হয় আর্য্যশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়কে চেনো?"

"হ্যাঁ, খুব চিনি।"

"তার মেয়ে যশোধরাকেও নিশ্চয় জানো?"

একটু চিন্তা করে নর্তকী বলে, "হ্যাঁ, তাকেও দু'-একবার দেখেছি।"

"সেই যশোধরার জন্মোৎসব উপলক্ষে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে আজ আমি নিমন্ত্রিত। আর্য্যের সংগে আমার কোন বিশেষ পরিচয় নেই, তাই এই নিমন্ত্রণ পেয়ে আমার আশ্চর্য্য লাগছে কিন্তু এর চেয়ে বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় হ'ল যে, আমার সংগে তুমিও নিমন্ত্রিত হয়েছ এবং তাও আমার নিমন্ত্রণ মারফত।"

"তাহলে আমার যাওয়া একেবারেই উচিত নয়।"

"না চিত্রলেখা! আমার সংগে যাবার তোমার নিমন্ত্রণ হয়েছে। তা ছাড়া তোমার যাওয়া উচিত। কারণ, তোমার সংগে আমার যে সম্বন্ধ আছে সবাই সে সম্বন্ধকে পবিত্র মনে করে।"

কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর চিত্রলেখা বলে, "বীজগুপ্ত! উচ্চবংশের আমোদ-প্রমোদে আমি নর্তকীর রূপে যেতে অভ্যস্ত, এমনও তো হ'তে পারে যে, কুলবতী নারীরা আমাকে অপমান করবে। যদি এই রকম

পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাহলে কি করা প্রয়োজন হবে, তা তো আমি জানি না ?"

সেনাপতি হেসে ওঠে, "তুমি এটা বেশ ভালো ভাবে জেনে রাখো যে, আমার সংগে থাকলে কেউ তোমাকে অপমান করতে সাহস করবে না।"

সেনাপতি সেবক শ্বেতাংককে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সংগে চিত্রলেখা।

নির্দ্ধারিত সময়ে নিমন্ত্রিত অতিথিদ্বয় মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে এসে পৌঁছয়। প্রহরী উচ্চৈঃস্বরে বলে, "মহাসেনাপতি বীজগুপ্তের রথ দ্বারদেশে উপস্থিত।" মৃত্যুঞ্জয় অভ্যর্থনার জন্য যশোধরাকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। বৃদ্ধ সেনাপতি বীজগুপ্তকে এবং যশোধরা চিত্রলেখাকে সাদরে অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে চলে। শ্বেতাংকও সংগে সংগে চললে।

দ্বারদেশ পার হয়ে সবাই নৃত্যশালায় এসে উপস্থিত হয়। পাটলিপুত্রের প্রায় সমস্ত খ্যাতনামা ব্যক্তি আজ উপস্থিত। বীজগুপ্ত ও চিত্রলেখার আগমনে সবাই হর্ষধ্বনি করে ওঠে। যশোধরার সংগে নর্তকী চিত্রলেখা নারী মহলের দিকে চলে যায়, সেনাপতি বীজগুপ্ত প্রবীণ মৃত্যুঞ্জয়ের সংগে থাকে।

যশোধরাকে দেখে নর্তকী হতবিহ্বলা। আজ পর্য্যন্ত আপন সৌন্দর্য্যের প্রতি তার গর্ব ও আত্মবিশ্বাস ছিল কিন্তু এক মুহূর্ত্তে যশোধরা সে অহংকার ভেংগে চূরমার করে দিলে। আত্মবিশ্বাসকে পর্য্যন্ত নর্তকী হারিয়ে ফেলে। চিত্রলেখাকে সসম্মানে বসিয়ে যশোধরাও তার পাশে বসে পড়ে, কিন্তু যশোধরার নর্তকীর পাশে বসা এবং তাকে বিশেষ খাতির আপ্যায়িত করা উপস্থিত মহিলাগণ ভালো চোখে দেখে না।

বহু দিন আগে যখন যশোধরা ছোট ছিল, তখন সে চিত্রলেখার নাচ দেখেছিল এবং সে নাচের প্রতি সে আকৃষ্টও হয়েছিল। আজ তার পিতার আদেশ যে, সে সব সময় চিত্রলেখার সংগে সংগে থাকবে—এ আদেশ তার বেশ পছন্দও হয়েছে।

নর্তকীকে ঘিরে যুবতীদের ভীড়, কেউ তার সংগে গল্প করছে, আবার কেউ ব্যংগ-বিদ্রূপও করছে, কিন্তু নর্তকীর কোন কিছুতেই আপত্তি নেই ; কারণ সে তার নিজের পরিস্থিতি বেশ ভাল করেই জানে। এমন সময়ে পাশ থেকে এক মহাসেনাপতির স্ত্রী বলে ওঠে, "আজ নর্তকী চিত্রলেখাকে আমাদের সমাজে এসে উপস্থিত হবার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

প্রশ্নের ভিতর যত না শ্লেষ ছিল, তার উত্তর ছিল আরও তিক্ত। "গর্বিতা নারীদের দ্বারা যে নারী আপন সৌন্দর্য্যের জন্য সাদর অভ্যর্থনা পেয়েছে তার কোন অভিনন্দনের প্রয়োজন নেই।"

নর্তকীর উত্তর শুনে সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকে। যে তীব্রতার সংগে চিত্রলেখা কথাগুলো বলে তাতে পুরুষ মহলেও বেশ একটা চাঞ্চল্য দেখা যায়। সেনাপতি বীজগুপ্তও ঘুরে দেখে। তার শুধু ভয় যে, কেউ যদি চিত্রলেখাকে অপমান করে, এই উত্তর-প্রত্যুত্তরে সে অশান্ত হয়ে ওঠে, "কি ব্যাপার ?"

নর্তকী রাগে একেবারে লাল হয়ে গিয়েছিল, বীজগুপ্তের কথায়

সামলিয়ে নিয়ে উত্তর দেয় "কিছু না ; নিজেদের মধ্যে এই একটু হাসি ঠাট্টা হচ্ছিল।..."

চিত্রলেখার কথা শুনে যশোধরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, বীজগুপ্ত চলে গেলে সে আস্তে আস্তে বলে, "দিদি, লোকেদের সংগে ব্যবহারে তুমি খুব চতুর।"

নর্ত্তকী হেসে বলে, "তাই তো আমার এত প্রভাব!"

নর্ত্তকীর কথায় নবযুবকদের ভিতর একটা সাড়া পড়ে যায়। ইতিমধ্যে কয়েক জন সেনাপতি বীজগুপ্তকে গান গাইবার জন্য অনুরোধ করে। বীজগুপ্ত তাদের অনুরোধ এড়াতে পারে না।

সে বীণা তুলে নিয়ে বাগেশ্বরীর আলাপ শুরু করে দেয়। চারি দিক নিস্তব্ধ হয়ে যায়। স্ত্রী ও পুরুষ সবাই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বীজগুপ্তের গান শুনতে থাকে। বীজগুপ্তের গান শেষ হলে পর মৃত্যুঞ্জয় নিজে বীণা নিয়ে এসে কন্যাকে গাইবার জন্য ইশারা করলেন। যশোধরা বাগেশ্বরীতে গান আরম্ভ করে। তার গান শেষ হলে লোকেরা স্পষ্ট অনুভব করে যে, গায়ক হিসেবে বীজগুপ্ত যশোধরা অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর। চিত্রলেখা লোকেদের মনোভাব বুঝতে পেরে বলে ওঠে, "যশোধরার কাছে আমার একটা প্রার্থনা আছে, আমার বিনীত ইচ্ছা যে, সে কল্যাণ-রাগে একটি গান গায়।"

মৃত্যুঞ্জয় নর্ত্তকীর কথার অর্থ কিছুই বুঝতে পারল না। তবুও নিমন্ত্রিত অতিথিদের ভিতর থেকে একজনের এই অনুরোধ, মৃত্যুঞ্জয় বীণাতে কল্যাণের সুর দিলেন, যশোধরা গান গাইতে আরম্ভ করে। এবারে যশোধরার গানে সবাই মুগ্ধ, মুক্তকণ্ঠে লোকে তার প্রশংসা করতে সুরু করে দেয়। গান শেষ হলে চিত্রলেখা যশোধরাকে অভিনন্দন জানায়—"বোন, তোমার সুন্দর গানে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

কথাগুলো বীজগুপ্তের ভাল লাগে না, হাসতে হাসতে সে বলে, "চিত্রলেখাকে কি এখন নাচবার জন্য অনুরোধ করতে পারি?"

চিত্রলেখা হেসে উত্তর দেয়, "সেনাপতি বীজগুপ্তের অনুরোধ আমার কাছে আদেশ সমান।"

বীজগুপ্ত মৃদংগ তুলে নেয়, মৃত্যুঞ্জয় বীণায় সুর দেন। তালে তালে চিত্রলেখার নৃত্য শুরু হয়। নর্ত্তকী নৃত্য-কৌশল দেখাতে ব্যস্ত, ওদিকে জনতা নর্ত্তকীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চলেছে। ঠিক সেই সময়ে প্রহরী এসে বলে, "দ্বারে যোগী কুমারগিরি আপন শিষ্যকে সংগে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।"

মৃত্যুঞ্জয় তাড়াতাড়ি বীণাখানি রেখে দিয়ে কুমারগিরিকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে যান। মৃত্যুঞ্জয়ের বীণা রাখবার সংগে সংগে চিত্রলেখার নাচও বন্ধ হয়ে যায়। যোগী প্রবেশ করলে সকলে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ায়। চিত্রলেখা বীজগুপ্তকে বলে, "আমি এবার যাব, আমাকে অনেক অপমান করা হয়েছে।"

"অপমান হয়েছে? কিসের অপমান?"

"আমার মতে কলার স্থান সর্ব্বোচ্চে। যে ব্যক্তি কলার অপমান করে সে মানুষ নয়, সে পশু। যোগী কুমারগিরিকে অভ্যর্থনা করবার জন্য আর্য্য মৃত্যুঞ্জয় এই যে আমার নাচ বন্ধ করে দিলেন, এটা অপমান ছাড়া আর কি?"

বীজগুপ্ত হেসে বলে, "তুমি যেমন মনে কর।"

যোগী নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করলে পর চিত্রলেখা এগিয়ে গিয়ে যোগীকে অভিবাদন জানালে, তারপর মৃত্যুঞ্জয়কে বলে, "এবার আমাকে যাবার অনুমতি দিন।"

মৃত্যুঞ্জয়ের কিছু বলবার আগেই কুমারগিরি জিজ্ঞেস করেন, "কেন? নর্ত্তকী, আমার উপস্থিতি কি তোমার কাছে এতই অসহ্য লাগছে? তবে এ রকম হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়।" যোগীর শিশুর ন্যায় কোমল ও মধুর হাসিতে চারি দিক ভরে ওঠে।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নর্ত্তকী বলে, "না যোগী, তোমার উপস্থিতি পৃথিবীতে কারুর কাছে অসহ্য মনে হবে না, এ তুমি বিশ্বাস করতে পার। আমার এখান থেকে চলে যাবার অন্য কারণ আছে।"

"কিন্তু তা বলে এটা তো যাবার উপযুক্ত সময় নয়?"

"তাহলে যাব না।"

মৃত্যুঞ্জয় আবার বীণা তুলে নেয় কিন্তু চিত্রলেখা নাচতে আপত্তি জানায়। যশোধরা চিত্রলেখাকে বলে, "দিদি, তোমার অনুরোধ আমি ফেলে দিই নি, এবার আমার অনুরোধ যে তুমি নাচ, তুমি নিশ্চয় আমার অনুরোধ রাখবে।"

যশোধরার অনুরোধ নর্ত্তকী উপেক্ষা করতে পারে না, সে নাচতে আরম্ভ করে। যোগী নর্ত্তকীকে অপলক নেত্রে দেখতে থাকেন। যশোধরার সংগে নর্ত্তকীর তুলনা করেন। দু'জনাই অপরূপ সুন্দরী কিন্তু একজনের ভিতর মত্ততার, অপর জনের ভিতর শান্তির প্রাধান্য। নর্ত্তকী যে মত্ততার প্রতীক তার নৃত্যই তার পরিচয় দেয়। অপর দিকে যশোধরার অতল সাগরের ন্যায় শান্তিময় রূপে মানুষ আপনাকে পর্য্যন্ত ভুলে যায়। নর্ত্তকী চিত্রলেখার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায় জীবনের কলরব ও যশোধরার ভিতর মৃত্যুর পূর্ণ শান্তি। যোগীর মনে হয় যেন তিনি সংসারের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, বৈরাগ্যের অকর্মণ্যতা অনুরাগের সজীবতার কাছে যেন পরাজিত হতে চলেছে।

নাচ শেষ হলে মৃত্যুঞ্জয় সেবিকাকে জিজ্ঞেস করেন, "ভোজনের আর কত বিলম্ব আছে?"

"ভোজন তৈরী, কেবল আপনার আদেশের অপেক্ষা।"

অভ্যাগত অতিথিরা ভোজন-গৃহে গিয়ে বসে। পরিচারিকারা পরিবেশন করতে শুরু করে। বীজগুপ্তের পাশে গিয়ে যশোধরা বসে, যশোধরার পাশে নর্ত্তকী চিত্রলেখা ও তার পর শ্বেতাংক।

সবাই খেতে আরম্ভ করে ও পরস্পরের ভিতর নানা রকম কথাবার্ত্তা চলতে থাকে। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যশোধরা ও বীজগুপ্ত কেউ কারুর সংগে কথা বলেনি। এবার বীজগুপ্ত আরম্ভ করে, "দেবি! আজ প্রথম আমরা পরস্পরের পরিচয় পেলাম, আপনার সংগে পরিচিত হয়ে আমি সত্যি-ই নিজেকে ধন্য মনে করছি।"

আজ পর্য্যন্ত কোন পুরুষের কাছ থেকে এমন সম্ভাষণ যশোধরা শোনে নি, সে লজ্জা পেয়ে তার বড় বড় চোখ দুটো নামিয়ে নেয়। হৃদয়ে বেশ একটা স্পন্দন অনুভব করে, ধীরে উত্তর দেয়, "আমি এমন এক জন কেউ নই, আপনি এ-সব বলে আমাকে লজ্জা দিচ্ছেন।"

তাদের কথাবার্ত্তা শুনে চিত্রলেখা হেসে ওঠে, "ভগবান করুন, যেন এই পরিচয় আরও ঘনিষ্ঠ হয় ও সেই ঘনিষ্ঠতা জীবনের পবিত্র বন্ধনে রূপান্তরিত হ'ক, এই আমার প্রার্থনা।"

যশোধরা কৃতজ্ঞতাভরা নেত্রে নর্ত্তকীর দিকে তাকায়, সেনাপতি

জগুপ্ত নর্তকীর কথাগুলো শুনে কৌতূহল অনুভব করে। ওদিকে তাংক একদৃষ্টে যশোধরাকে দেখতে থাকে। নিমন্ত্রিত সমস্ত তিথিকে যশোধরা চিনত, শুধু শ্বেতাংককেই সে কোন দিন দেখে । যশোধরা বীজগুপ্তকে জিজ্ঞেস করে, "এই নবযুবকটি কে?"

বীজগুপ্ত হেসে উত্তর দেয়, "আমার সেবক ও সংগে সংগে আমার ছোট ভাই।"

"সেবক ও ছোট ভাই? ঠিক বুঝতে পারলাম না!"

"এই যুবকটির নাম শ্বেতাংক, ক্ষত্রিয় ও উচ্চবংশজাত কিন্তু এখনও পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী। পাপের খোঁজ করার জন্য ওর গুরুদেব ওকে আমার কাছে রেখে গেছেন—আজ আমারই সংগে এই নবযুবক এই সমাজে এসে উপস্থিত হয়েছে।"

যশোধরার আশ্চর্য্য লাগে, "পাপের খোঁজে এর গুরুদেব একে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন? সত্যিই কি আপনার স্থান অথবা আপনার ব্যক্তিত্বের মাঝে পাপের খোঁজ পাওয়া যাবে?"

সেনাপতি মনে মনেই হাসে। কত সরল এ বালিকা ও এর ধারণা কত ভুল, "কোনও পাপী কি আর এক জন পাপীকে বলতে পারে যে সে পাপী? প্রত্যেকে নিজেকে ভালো মনে করে, নিজেকে ঠিক বুঝতে পারা কারু পক্ষে একেবারে সম্ভব নয়। যদি শ্বেতাংক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছয়, যে আমি পাপী, ত'লে তো আমি পাপী বলেই গণ্য হ'ব।"

যশোধরার মনে কেমন যেন একটা শঙ্কা উপস্থিত হয়। যে ব্যক্তির প্রণয়-বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, সেই ব্যক্তিকে এক মহান আচার্য্য পাপের উপযুক্ত মাধ্যম বলে মেনে নিলেন! সে শ্বেতাংকের দিকে তাকায়—কত সরল ও সুন্দর নবযুবক। আর বীজগুপ্ত?"

ভোজন সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। লোকেরা হাত-মুখ ধুয়ে আবার একত্রিত হয়। শ্বেতাংকের হাত ধরে বীজগুপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ের সংগে পরিচয় করিয়ে দেয়। তারপর যে যার বাড়ীর দিকে রওনা হয়।

দশম পরিচ্ছেদ

কোলাহল শান্ত হয়ে যায় কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের ভবন আলোকে আলোকময়! অভ্যাগত অতিথিগণের ভিতর অনেকেই চলে গেছে কিন্তু বিশেষ কয়েক জন তখনও সেখানে উপস্থিত। আর্য্যশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় তখনও পর্য্যন্ত যোগী কুমারগিরি ও তাঁর শিষ্য বিশালদেব, নর্তকী চিত্রলেখা, সেনাপতি বীজগুপ্ত ও তার সেবক শ্বেতাংককে যেতে দেননি। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পর মৃত্যুঞ্জয় বীজগুপ্তের হাত ধরে বলেন, "সেনাপতি বীজগুপ্ত! আজকের এই উৎসবে এই গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে এবং তার সংগে তোমার খুব-ই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।" এই কথা বলে তিনি কন্যা যশোধরার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকান। বীজগুপ্ত তাঁর কথার অর্থ ঠিক বুঝতে পারে না, চিত্রলেখা মুচকে হাসতে থাকে।

"আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, বৃদ্ধ মৃত্যুঞ্জয়ের কথা বীজগুপ্ত অস্বীকার করবে না।"

আর্য্যের কথায় ইংগিত সবাই বুঝতে পারে, বীজগুপ্তও এবার বুঝতে পারে যে, তিনি কি বলতে চাইছেন, তবুও সে বলে, "দেব! স্বীকার করা বা না-করা প্রস্তাবের উপযুক্ততা ও অনুকূল পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে। আপনার প্রস্তাব অনুসারে আমার উত্তর হবে।"

আর্য্য জিজ্ঞেস করেন, "সেনাপতি, এখনও পর্য্যন্ত তোমার বিবাহ হয়নি?"

বীজগুপ্ত কথাগুলো শুনে চিত্রলেখার দিকে তাকায়। সে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছিল না যে, সে কি উত্তর দেবে। আর্য্য ঠিকই বলেছেন কিন্তু বীজগুপ্ত সম্পূর্ণ মেনে নেয় না, "হ্যাঁ, শাস্ত্রমতে হয়নি।"

হঠাৎ যোগী কুমারগিরি প্রশ্ন করে বলেন, "যুবক! শাস্ত্রের অনুমোদন ব্যতীত কি বিবাহ হ'তে পারে?"

বীজগুপ্ত উত্তর দেয়, "স্ত্রী ও পুরুষের চিরস্থায়ী সম্বন্ধকে বিবাহ বলে।"

যোগী হাসেন, "কিন্তু সমাজ দ্বারা বিবাহ শব্দটির নির্মাণ হয়েছে, স্ত্রী ও পুরুষের সম্বন্ধকে পবিত্র করে শাস্ত্র সেই সম্বন্ধকে সমাজে মান্যতা প্রদান করে। বীজগুপ্ত, তুমি অর্দ্ধ-সত্যের আশ্রয় নিচ্ছ।"

"যোগিরাজ, সত্য কখনও অর্দ্ধেক হয় না, সত্য সর্বদা পূর্ণ-ই হয়। কিন্তু এখন তর্ক-বিতর্কের সময় নয়, কাজেই এ সময় উত্তর দেওয়া অনুচিত হবে।" এই বলে বীজগুপ্ত আর্য্যকে বলে "আর্য্য! আমি বলছিলাম যে আমার বিবাহ শাস্ত্রানুসারে হয়নি, এ কথাটা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিত। লোকেদের চোখে আমি অবিবাহিত কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমি বিবাহিত। চিত্রলেখা আমার পত্নী। যদিও শাস্ত্রমতে আমি তার পাণিগ্রহণ করিনি এবং সামাজিক নিয়ম দ্বারা আমি তা করতেও পারি না কিন্তু আমার ও চিত্রলেখার সম্বন্ধ পতি-পত্নীর ন্যায়। আমি প্রেমকে বিশ্বাস করি এবং এইরূপ অবস্থায় আমার বিবাহ করা অসম্ভব! কারণ, অন্য কোন নারীকে আমি এখন ভালবাসতে পারি না।"

মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "বীজগুপ্ত, হয়তো তোমার সব কথাই ঠিক—লোকে যখন তোমাকে অবিবাহিত বলে, তখন তুমি নিশ্চয় অবিবাহিত। কিন্তু বিবাহ করার প্রয়োজন কিসের জন্য, তা কি জানো? মানুষে বিবাহ করে পুত্রোৎপাদন হেতু। নর্তকী চিত্রলেখার গর্ভে তোমার যে সন্তান হবে সে কি তোমার উত্তরাধিকারী হতে পারবে? এ কথা কি তুমি কখনও ভেবে দেখেছ?"

সত্যিই বীজগুপ্ত এসব কথা কোন দিনই ভাবে নি, সে কোন উত্তর দিতে পারে না। সেনাপতির কাছে এ একেবারে নতুন সমস্যা! আর্য্য নর্তকীকে ইংগিত করে বলেন, "দেখ চিত্রলেখা! তুমি বিদুষী, আমার বেশী কিছু বলা নিরর্থক। সেনাপতি বীজগুপ্তের অবস্থা তুমি বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পারছ।"

চিত্রলেখা সব কথা নীরবে শুনে যায়, তারপর উত্তর দেয়, "আর্য্যশ্রেষ্ঠ! আপনি যা কিছু বললেন তা সবই ঠিক। আমি সমাজচ্যুত এক নর্তকী, বীজগুপ্তের পত্নী হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু আপনি কি একবার ভেবে দেখেছেন যে এর জন্য আমাকে কত বড় ত্যাগ করতে হবে?"

যোগী কুমারগিরি হেসে বলেন, "ত্যাগ করতে হবে? নর্তকী, তুমি তো বড় অদ্ভুত কথা বলছ? বোধ হয় নিজের মনের প্রবৃত্তিকে তুমি ভুলে গেছ! আমাকে না তুমি বলেছিলে যে তুমি বৈরাগ্যের জীবন গ্রহণ করতে চাও, এই তো সেই ঈপ্সিত জীবন গ্রহণ করবার সুবর্ণ সুযোগ।"

যোগীর কথায় সেনাপতি বীজগুপ্ত চমকিয়ে ওঠে। সে বলে,

"যোগিরাজ, যদি আপনি বৈরাগ্যে বিশ্বাস করেন এবং কোন ব্যক্তিকে বৈরাগ্য গ্রহণের উপদেশ দিতে পারেন, তবে আমাকে কেন বন্ধনে ধরা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে ?"

"কারণ, তোমার দ্বারা বৈরাগ্য গ্রহণ সম্ভবপর নয়। এবং যেহেতু তুমি সামাজিক নিয়মের বিপরীত চলেছ, কাজেই সামাজিক নিয়ম পালন করাই এখন তোমার একমাত্র কর্তব্য।"

নর্তকী জিজ্ঞেস করে, "যোগী, তুমি তাহলে আমাকে দীক্ষা দিতে রাজী আছ? যদি রাজী থাক তাহলে এই মুহূর্তে তোমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করব।"

যোগী শিষ্য বিশালদেবের দিকে তাকান, কিছুক্ষণ পর উত্তর দেন, "নর্তকী! তোমাকে দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব!"

নর্তকী হেসে ওঠে, "তাহলে দেখুন যে বলা যত সহজ করা তত সহজ নয়। যোগী! বৈরাগ্য তোমার পক্ষে সহজ হতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে বেশ কঠিন। বৈরাগী হয়ে একলা ঘুরে বেড়ান আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব! এখন অনুরাগের জগতে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং মানুষের চোখে সে জগত যতই অপবিত্র হ'ক না কেন, ভগবান ও আমার কাছে এ জগত পবিত্র। এর বাইরে বেরিয়ে আসার অর্থ হ'ল কালুষিত জগতে পদার্পণ করা এবং অকারণ পাপ করতে আমি রাজী নই।"

মৃত্যুঞ্জয় দেখলেন যে যুক্তির সৃষ্টি হ'ল কিন্তু ভেংগে গেল। বীজগুপ্ত দেখলে যে যুক্তি ভেংগে গিয়ে আবার সৃষ্ট হ'ল।

যোগী ও নর্তকী দু'জনাই দু'জনাকে বেশ ভালোভাবে চিনেছে। শ্বেতাংক ও বিশালদেব তাদের কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শোনে। কারণ, তারা তাদের সম্বন্ধের কথা খানিকটা জানে। কেবল যশোধরা এসব কিছুই জানে না, সে কিছু বুঝতেও পারে না। সে মৃত্যুঞ্জয়কে বলে, "বাবা! রাত অনেক হয়ে গেছে!"

আর্য্য একবার নিজের কন্যাকে দেখেন, একবার চিত্রলেখাকে। দু'জনার ভিতর কত প্রভেদ—একজন দেবী আর একজন দানবী। একজন শান্তির প্রতিমা আর একজন মত্ততার মূর্ত্ত রূপ। আর বীজগুপ্ত? ভাগ্যচক্রের এক হতভাগ্য শিকার কিন্তু মনুষ্যত্বপূর্ণ এক দীপ্তিমান পুরুষ!"

তিনি নর্তকীকে বলেন, "তোমার জগতকে কে অপবিত্র বলছে! নিজের প্রবৃত্তি অনুসারে তুমি সব কিছু করছ আর এ-ও আমি মানি যে তোমার সমস্ত কার্য্যাবলী প্রেম সম্ভূত। প্রেমের জগতে অপবিত্রতার কোন স্থান নেই। কিন্তু দেবি, যাকে তুমি ভালবাস সে যদি ঠিক রাস্তায় না চলে তাহলে তাকে ঠিক রাস্তায় চালিত করা তোমার কর্ত্তব্য নয় কি? প্রেমের ভিতর ত্যাগের প্রয়োজন হয় এবং বীজগুপ্তের জন্য ত্যাগ তোমার পক্ষে মহান ত্যাগ হবে।"

কথাগুলোর প্রকাশভংগী নর্তকীকে বেশ খানিকটা চিন্তান্বিত করে তোলে। হঠাৎ বীজগুপ্ত বলে ওঠে, "আর্য্যশ্রেষ্ঠ! চিত্রলেখাকে এ-সব বলা নিষ্প্রয়োজন। ভাংগা-গড়ার সব দায়িত্ব আমার, চিত্রলেখা আমাকে সৃষ্টিও করতে পারে আবার বিনাশও করতে পারে না। তবে আমি আমার দিকে বলতে পারি যে চিত্রলেখা ও আমার সম্বন্ধ অমর!"

সেনাপতি উঠে দাঁড়ায়। নর্তকী বলে, "আর্য্যশ্রেষ্ঠ, তুমি যা বলছ তা ঠিক কি না জানি না কিন্তু ত্যাগ আমাকে করতে হবে, আমাকে ত্যাগ করতে হবে শুধু বীজগুপ্তের জন্য—তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পার"। যশোধরার দিকে তাকিয়ে বলে, "আর্য্য! বীজগুপ্ত তোমার কন্যার উপযুক্ত পাত্র। এ মিলন খুব সুন্দর হবে"। "আর বীজগুপ্ত! যশোধরার ন্যায় স্ত্রী পাওয়া তোমার পক্ষে অসম্ভব, আজ থেকে যশোধরা ও তোমার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেল।"

বীজগুপ্ত ফটকের কাছে এগিয়ে এসেছিল, সে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে,—"তোমার কাছ থেকে এ-সব কথা শুনব বলে আশা করিনি। এইটুকু শুধু জেনে রাখ যে এ কাজ আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। আচ্ছা, আর্য্যশ্রেষ্ঠ, এবার বিদায় দিন।"

নর্তকীও উঠে দাঁড়ায়, "আর্য্য! আপনি বীজগুপ্তের কথায় কিছু মনে করবেন না। মোহের বশবর্ত্তী হয়ে মানুষ যখন ভালমন্দের জ্ঞান হারিয়ে ফেলে, সে সময় তার সম্বন্ধে কোন ধারণা করে নেওয়া ভুল। আমি আপনাকে বলে যাচ্ছি যে, বীজগুপ্ত ও আপনার কন্যার এই মধুর মিলন হবেই।"

শ্বেতাংকের সংগে নর্তকী বীজগুপ্তকে অনুসরণ করে। সকলে চলে গেলে আর্য্যশ্রেষ্ঠ আজকের পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেন। কিছুক্ষণ মৌন থেকে যোগী কুমারগিরিকে তিনি বলেন "যোগিরাজ! আমি সব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারলাম না, তবে এটুকু বুঝতে পেরেছি যে বীজগুপ্তের ওপর নর্তকী চিত্রলেখার অদ্ভুত প্রভাব!"

"এরকম অনুমান করা খুবই যুক্তিসংগত!"

"কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, নর্তকীর মনে কোন মলিনতা নেই।"

যোগী চুপ করে থাকেন। কি জানি কেন এমনিই তিনি বিশালদেবের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আর্য্য বলেন, "চিত্রলেখা যা বলে গেছে সে তা পূর্ণ করবেই, তবুও ভাবছি যে সেনাপতি বীজগুপ্তকে মুক্তি দেওয়া যাক্। কারণ তা নাহলে চিত্রলেখা মনে খুব আঘাত পাবে।"

যোগী উত্তর দেন, "চিত্রলেখা মনে দুঃখ পাবে, এ আমি বিশ্বাস করি না। আমার মনে হচ্ছে যে নর্তকী নিজে থেকেই বীজগুপ্তকে ত্যাগ করবে আর তাতেই বীজগুপ্ত মুক্তি পাবে। আমার মতে নর্তকী চিত্রলেখার সংগে বীজগুপ্তের সম্বন্ধ ভেংগে যাওয়াই উচিত"। মৃত্যুঞ্জয় যশোধরার জন্য বীজগুপ্তের চেয়ে যোগ্য পাত্র আর পাবে না, এটা মনে রেখো!"

একাদশ পরিচ্ছেদ

জীবনে নর্তকী চিত্রলেখা বহু বার প্রেমের ব্যাখ্যা করেছে কিন্তু প্রতিবারই তার মনে হয়েছে যে তার পূর্বেকার ব্যাখ্যা ভুল।

সর্বপ্রথম নর্তকীর কাছে প্রেম ছিল এক ঈশ্বরীয় বস্তু। আপন স্বামীকে সে ভালবেসেছিল, সে প্রেম ছিল পবিত্র এবং পতির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তির পরিচায়ক। পতির প্রেমে সে যে শুধু আপন অস্তিত্ব পতির অস্তিত্বের সংগে মিশিয়ে দিয়েছিল তা নয়, সে আপন অস্তিত্ব পর্যন্তও বিসর্জন দিয়েছিল। পতিকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সে সর্বদা হাসিমুখে থাকত, পতিকে সুখী করবার জন্য সে কাজ করত, কথা বলত, এমন কি তার বেঁচে থাকাও ছিল পতির জন্য। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সে পতির জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছিল, পতি ছিল তার

জগত, তার দেবতা, তার অস্তিত্ব এবং পতি-প্রেমে ছিল তার অপার আনন্দ। আত্মাহুতির চরম নিদর্শন ছিল তার পতি-প্রেম এবং আত্মাহুতিতে যে কি আনন্দ পাওয়া যায়, তা সেই বুঝতে পারে যে আত্মাহুতি দেয়।

পতির মৃত্যুর পর তার সমস্ত জগত অন্ধকার হয়ে গেল। তার মনে হ'ল যে তার সব সাধনা ও তপস্যা ব্যর্থ হয়ে গেছে। কখনও কখনও আত্মহত্যা করবার ইচ্ছাও তার মনে জেগেছে কিন্তু সে জানত যে, আত্মহত্যা করা মহাপাপ এবং বিধবার কর্ত্তব্য হ'ল সংযমযুক্ত সাধনা; নর্ত্তকী সেই সাধনা আরম্ভ করে কিন্তু কিছু দিন পর সে সাধনা তার বেশ কঠিন মনে হয়। যে পর্য্যন্ত পতি জীবিত ছিল সে পূজা করতে পারত, তপস্যা করতে পারত ও সাধনায় বসতে পারত; কেন না, এ সবেরই একটা কেন্দ্র—একটা অবলম্বন ছিল—কেন্দ্র ভেংগে যাওয়ায় তন্ময়তা নষ্ট হয়ে গেল, আপন অবলম্বন না পেয়ে বিশ্বাস হারিয়ে গেল।

তার পর সে কৃষ্ণাদিত্যকে ভালবাসে কিন্তু সে প্রেমে ঈশ্বরীয় কোন ভাব ছিল না; সে প্রেম পার্থিব অনুভূতিতে অনুপ্রাণিত ছিল। এবারের প্রেমে ভক্তির লেশমাত্র কিছু ছিল না, নিজেকে ভুলে যাওয়ার ভিতর দিয়ে এ প্রেম বাসা বেঁধেছিল। অস্তিত্ব মিশিয়ে দেবার কোন প্রশ্ন এবার ছিল না, আপন ও প্রেমাস্পদের অস্তিত্বকে এক করে দেওয়াই ছিল চরম লক্ষ্য। কৃষ্ণাদিত্যের প্রেমে নর্ত্তকী প্রথম পিপাসা অনুভব করে, সে চমকিয়ে ওঠে। পিপাসা যে কি, তা সে তখনও পর্যন্ত বুঝতে পারেনি, পতি-প্রেমে সে তো নিজেকে বিলিয়েই দিয়েছে, তবে এ পিপাসা কিসের? আপন আবেগের নগ্নরূপ দেখে সে প্রথমে ভয় পায় কিন্তু পরে আনন্দ অনুভব করে। সে নিজের ভিতরই জীবনকে উপলব্ধি করতে পারে। প্রেম ভক্তি নয়, তাই এক দিক থেকে তার বিকাশ নয় না। সম্বন্ধের আর এক রূপ প্রেম, তাই সে দু'দিক থেকে গড়ে ওঠে। দুটো আত্মার পবিত্র সম্বন্ধকে প্রেম বলে। প্রেমে কম্পন থাকে, পিপাসা থাকে, আবার আত্মবিস্মরণ থাকে। প্রেমের ভিতর যে আত্মবলিদান থাকে তা দু'দিক থেকে হয়, এক দিক থেকে নয়। কিন্তু কিছুদিন পর কৃষ্ণাদিত্য নর্ত্তকীকে ছেড়ে চলে যায়। নর্ত্তকী স্পষ্ট বুঝতে পারে যে, প্রেম অমর নয়, প্রেমের পবিত্র স্মৃতি অস্পষ্ট হতে হতে একেবারে মিলিয়েও যেতে পারে।

কৃষ্ণাদিত্য চলে যাবার পর অনেক দিন সংগিহীন ভাবে নর্ত্তকীর জীবন কাটতে থাকে। তার পর হঠাৎ একদিন সেনাপতি বীরগুপ্ত তার কাছে ধরা দেয়। এবারে কিন্তু তার প্রেমের ভিতর শুধু পিপাসা ও কখনও কখনও আত্মবিস্মৃতি। আত্মাহুতির চিন্তা তার মনে একবারও আসে না। সে প্রেমের নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলে। প্রেমের সংগে সংগে সে ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের আস্বাদও পায়—এ সব ছাড়া নর্ত্তকী এক নতুন পথের অনুসন্ধান পায়। সে বুঝতে পারে যে, জীবনে প্রেম-ই সব কিছু নয়, প্রেম জীবনের একমাত্র অবলম্বন নয়। প্রেমের সংগে জীবনে অন্যান্য উচ্ছ্বাসও থাকে। সে স্পষ্ট অনুভব করে যে, প্রেম শুধু কয়েক দিনের সুখের আধারস্বরূপ। সেই সুখকে চিরস্থায়ী করতে হলে আত্মবিস্মৃতির প্রয়োজন হয়, কিন্তু আত্মবিস্মৃতি জাগতিক

নিয়ম-বিরুদ্ধ। তাই আত্মবিস্মৃতিকে আনবার জন্য বা নিজেকে ভুলে যাবার জন্য সুরার প্রয়োজন হয়।

তার পর সে কুমারগিরির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। কুমারগিরি যুবক, সুন্দর প্রতিভাবান ও সংগে সংগে।···নর্তকী আর বেশী কিছু ভাবতে পারে না। আপন ইচ্ছার অগোচরেই সে কুমারগিরির প্রতি আকৃষ্ট হয়। নর্তকী যোগীকে ভালবেসে ফেলে, এবারে কিন্তু বীজগুপ্ত তার জীবনে থাকবার সময়েই সে নতুন প্রেমে নিজেকে বাঁধতে উন্মুখ। তাই এত দিন কুমারগিরির কাছে যাবার সাহস তার হয় না।

কিন্তু আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের ভবনে উৎসবের দিন যে আলাপ-আলোচনা হয় তা'তে সে ভরসা পায়, সাহস পায়, আপন মনুষ্যত্বকে তুচ্ছ করবার একটা অবকাশও পেয়ে যায়। সে মনে মনে ঠিক করে ফেলে, "বীজগুপ্তকে সুখী করা আমার কর্ত্তব্য, তা'কে মুক্ত করে দেওয়াই আমার জীবনের চরম কর্ত্তব্য এবং তা'র জীবনকে এই ভাবে পরিপূর্ণ করতে হবে। বীজগুপ্তকে চিরকালের মত আমাকে পরিত্যাগ করতেই হবে।"

রাতে নর্তকীর ঘুম আসে না। ভাবতে ভাবতে তার রাত কেটে যায়। ভোরে ক্লান্তদেহে সে ঘুমিয়ে পড়ে। প্রায় দুপুর শেষ হয়ে গেলে তার ঘুম ভাংগে। দাসীকে জিজ্ঞেস করে, "বীজগুপ্তের কাছ থেকে কোন খবর এসেছে ?"

"না।"

নর্তকী স্নান সেরে নেয় কিন্তু খেতে তার ইচ্ছে হয় না। সাজঘরে গিয়ে সমস্ত গয়না খুলে রাখে, একটা সাদা ধুতি পরে চুল না বেঁধেই বাইরে বেরিয়ে আসে। রথ দ্বারেই অপেক্ষা করছিল। বীজগুপ্তকে একটা চিঠি লিখে দাসীকে বলে যে, যদি সন্ধ্যার ভিতর সেনাপতি বীজগুপ্ত না আসে তাহলে যেন এই চিঠিটা পৌঁছে দেওয়া হয়। দাসী কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। যাবার সময় নর্তকীকে বলে, "সুনয়না, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। আমি কিছুদিনের জন্য এই অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে যাচ্ছি, যত দিন আমি না ফিরে আমি তুমিই এ সবের মালিক।"

যোগী কুমারগিরির আশ্রমের দিকে রথ এগিয়ে চলে। কিছুদূর এলে নর্তকী সারথিকে বলে, "এইখানে থামাও। যদি দুপুরের মধ্যে ফিরে না আসি তাহলে আমার অপেক্ষা না করে ফিরে যাবে।"

চিত্রলেখা কুমারগিরির আশ্রমে পৌঁছিয়ে দেখে যে যোগী ধ্যানমগ্ন অবস্থায় বসে। সে পাশেই বসে পড়ে। প্রায় এক প্রহর পরে যোগী সমাধি ত্যাগ করলেন। চোখ মেলেই দেখেন যে, নর্তকী চিত্রলেখা সম্মুখে বসে। চোখ বন্ধ করে নর্তকী কিছু ভাবছে। অংগে শুধু একটি বস্ত্র। যোগী নর্তকীর মনমোহিনী রূপ দেখেছিল, আজ শান্তির প্রতিমূর্ত্তি দীপ্তিমতী চিত্রলেখাকে দেখে। শান্তির প্রলেপে তার পাগল-করা রূপ একেবারে ঢেকে গেছে। যোগী একদৃষ্টে নর্তকীর এই অপরূপ সৌন্দর্য্য-সুধা পান করতে থাকে। সে ধীরে বলে, "নর্তকী!"

নর্তকী চোখ মেলে চায়, "গুরুদেবের সমাধি শেষ হয়ে গেছে ?"

"হ্যাঁ, কিন্তু তুমি আবার কেন এসেছ ?"

"গুরুদেবের কাছে দীক্ষা নিতে।"

"কিন্তু তোমার নিশ্চয় মনে আছে যে, আমি তোমাকে দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেছি।"

"হ্যাঁ, তা মনে আছে। তবুও চলে এসেছি। আমি তা করে এসেছি, আপন বিপুল ঐশ্বর্য্যকে ত্যাগ করেছি, আমার সর্বস্ব ত্যাগ করে এসেছি। শুধু আমিত্বকে ত্যাগ করতে পারি নি, সেই আমিত্বকে আমি আপনার কাছে নিয়ে এসেছি, এখন আপনার কর্ত্তব্য ও আমার ধর্ম সেই আমিত্বকে ভেংগে দেওয়া।"

"না, নর্তকী, তা হয় না।" নর্তকীর হরিণীর মত বড় বড় চোখের সামনে যোগী কেঁপে ওঠে, চিৎকার করে বলে, "না নর্তকী! না, এ হয় না, হতে পারে না, এ একেবারে অসম্ভব! তোমাকে দীক্ষা দেওয়া আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব!"

যোগীর সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। "তোমাকে দীক্ষা দেওয়ার অর্থ হ'ল পতনের দিকে এগিয়ে যাওয়া। আমি তোমাকে জানি এবং নিজেকেও জানি। তোমাকে উপরে ওঠান যত কঠিন, আমার নীচে নেমে যাওয়া তত সহজ।" যোগী অশান্ত ভাবে এদিকে-ওদিকে পায়চারী করতে থাকে। একটু থেমে আবার বলে, "নর্তকী! আমি তোমাকে অসম্ভব কিছুই বলি নি! আচ্ছা! তুমি সত্য করে বল এখানে তুমি কেন এসেছ? সত্যিই কি ভোগ-বিলাস ত্যাগ করবার জন্য এসেছ? তাও কি কখনও সম্ভব? বল, চুপ করে কেন আছ? বুঝতে পেরেছি, তুমি সত্যও চাইছ না, আবার মিথ্যাও বলতে পারছ না। তোমার চুপ করে থাকা 'না'এরই সাক্ষ্য দেয়।"

নর্তকী যোগীকে ভালো করে দেখে। সে শান্ত ভাবে উত্তর দেয়, "যোগী! আপন জয়-পরাজয় তুচ্ছ করে একবার তুমি আমার কাছে সত্য বলেছিলে, আজ আমিও তোমাকে সত্য বলব, আমি এসেছি তোমাকে ভালবাসতে।"

"আমার অনুমান তাহলে মিথ্যা নয়। ধন্যবাদ! তুমি আমাকে কেন ভালবাসতে এসেছ—যে কোন দিন ভালবাসেনি, ভালবাসা যে কি তা জানে না। সত্যি আমার খুব অদ্ভুত লাগছে—হ্যাঁ, আর একটা কথা বুঝতে পারি না। কি করে ভালবাসা যায়? আমি আজ পর্য্যন্ত জানতাম যে অন্ধকারের মধ্যে ভালবাসা আপনা হতেই জন্মায়, কিন্তু আজ তোমার কাছে শুনলাম যে ভালবাসবার জন্য মানুষকে প্রথম প্রস্তুত হতে হয় ও তারপর সে ভালবাসে।"

যোগী হাসে কিন্তু সে হাসি ব্যংগে ভরা। নর্তকী ভয় পায়।

যোগী, এত দিন তোমাকে স্পষ্ট করে মনের কথা জানাতে পারিনি, নিজের ভাব ভাষায় ঠিক প্রকাশ করতে পারিনি। আমি যে তোমাকে ভালবাসি তা তুমি অনেক দিন থেকে জানো। আমি তোমার কাছে এসেছি, কারণ আমি চাই যে তুমিও আমাকে ঠিক তেমনি করে ভালবাস, আমাকে একেবারে কাছে টেনে নাও। এবার নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ কেন পাগলের মত তোমার কাছে ছুটে এসেছি?"

"তুমি আমাকে ভালবাস! এতে আমি তোমাকে বাধা দিতে পারি না। ভালবাসা দেবার বদলে ভালবাসা পাওয়া আশা করা বাঞ্ছ। কিন্তু সেই আশাকে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করা উচিত নয়।"

নর্তকীর সব আশা মিলিয়ে যায়, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বলে, "যোগী, তুমি ঠিক বলেছ। আমি ভুল করছিলাম। প্রেমের অতৃপ্ত পিপাসা মিটাবার জন্য এখানে এসেছিলাম। আমি এখানে এসেছিলাম যাকে ভালবাসি তাকে সেবা করতে, তার মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে। তুমি তো জান যে সেবা, ভক্তি,

আত্মবিস্মৃতি ও অতৃপ্ত পিপাসা হ'ল প্রেমের দ্যোতক। আমার বিবাহের সময়ে বিশ্বাস ও কর্ত্তব্যের আবরণে আমি এই সত্যকে দেখেছিলাম, আবরণ থাকায় সেই সত্যের যথার্থ রূপকে উপলব্ধি করতে পারিনি, আজ আবার সেই সত্যকে দেখতে পেয়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি!"

যোগী গম্ভীর হয়ে নিজেকে জিজ্ঞেস করে, "বাসনা-কামনাকে পৃথক রেখে প্রেম কি থাকতে পারে, এক নারী এক পুরুষকে অথবা এক পুরুষ এক নারীকে কি ভালবাসতে পারে? তার সাধনা, তার বিশ্বাস উত্তর দেয়—না, তা পারে না! তার হৃদয় বলে, মূর্খ! পবিত্র প্রেমে বাসনা ও তৃষ্ণার কোন স্থান নেই।···নর্ত্তকীকে বলে, "কিছু সময় দাও দেবি! এ বড় কঠিন সমস্যা!"

নর্ত্তকী যোগীর পা জড়িয়ে ধরে মিনতি করে বলে, "দেব, সময় দেবার সময় আমার নেই। যা হবার তা হয়ে গেছে। আমি অনেক দূর এগিয়ে এসেছি, এখন পিছিয়ে যাওয়া অসম্ভব! আমি তোমার আশ্রমে থাকবার জন্য এসেছি, চলে যাবার জন্য নয়!"

এ কথার উত্তর না দিয়ে যোগী জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা, তুমি কি পায়ে হেঁটে এখানে চলে এসেছ?"

"না, রথে করে এসেছি।"

"রথ কোথায়?"

"রাজপথে রেখে এসেছিলাম, এতক্ষণ বো· হয় চলে গিয়েছে।"

যোগী ওপরের দিকে তাকিয়ে বলে, ভগবান! এর ভেতর কি রহস্য লুকিয়ে আছে বলে দাও! তোমার কি অভিপ্রায় আমার বলে দাও, বলে দাও আমি কি করব? তোমার যা ইচ্ছা তাই হবে!···

"নর্ত্তকী! বেশ, আমি তোমাকে দীক্ষা দেব। ঈশ্বরের যখন ইচ্ছা যে আমি সাংসারিক বাসনার সংগে যুদ্ধ করি তখন তাই হ'ক!" এই বলে যোগী শিষ্য বিশালদেবকে ডাকেন। বিশালদেব এলে যোগী বলেন "দেখ বিশালদেব, দেবী চিত্রলেখার থাকবার জন্য তোমাকে ব্যবস্থা করতে হবে!"

বিশালদেবের কাছে এই রহস্য অগোচর ছিল না। তবুও সে আশ্চর্য্য হয়। চিত্রলেখাকে বলে, "দেবি, আপনাকে এই আশ্রমে স্বাগত করেছি।" অনুসন্ধিৎসু নয়নে সে গুরুদেবের দিকে তাকিয়ে থাকে।

শিষ্যের দৃষ্টির অর্থ গুরু বুঝতে পারে, "বৎস, তোমার আশ্চর্য্য লাগছে, না? আমার দুর্ব্বলতাকে তুমি একবার দেখেছ, তোমার আশ্চর্য্য হয়ে যাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু একটা কথা মনে রেখ যে, দুর্ব্বলতাকে জয় করাই মানুষের কর্ত্তব্য। আজ ভগবান এক নূতন সত্যের সন্ধান দিলেন, বাসনার সংগে যুদ্ধ করার মধ্যেই জীবনের চরম সার্থকতা আর আমি আজ তাই করতে চলেছি।"

শিষ্য মৃদু হাসে, "গুরুদেবের সব কথাই ঠিক! আজ রাতের মধ্যেই দেবীর থাকবার যায়গার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।"

শিষ্যের হাসিতে গুরুর সমস্ত শরীর রাগে জ্বলতে থাকে। যোগী চিৎকার করে, "না: পৃথক কুটিরের কোন প্রয়োজন নেই, চিত্রলেখা আমার কুটিরেই থাকবে। নবযুবক, তুমি আমার দুর্বলতাকে লক্ষ্য করে ব্যংগ করছ, না? কিন্তু মনে রেখ যে আমি তোমার গুরু ও শিষ্যের চেয়ে অনেক উঁচুতে গুরুর স্থান। আমি তোমাকে দেখাব যে সাধনায় ও তপস্যায় ব্রতী ব্যক্তি কত শক্তিমান হতে পারে।"

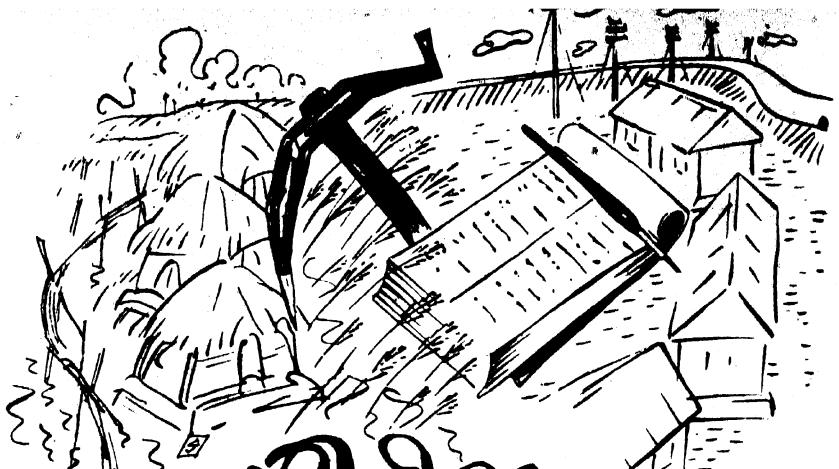
গুরুর অগ্নিমূর্ত্তি দেখে বিশালদেব ভীত হয়ে পড়ে, সে তার চরণে লুণ্ঠিত হয়ে বলে, "গুরুদেব! আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন; আমি কুটির নির্মাণ করতে চললাম।"

"না!" যোগী গর্জন করে বলে, "এখন কুটিরের কোন প্রয়োজন নেই! একবার ভুলে তোমার গুরুকে ব্যংগ করেছিলে তার শাস্তি আজও পাচ্ছ। পাপের খোঁজ করবার জন্য তোমার গুরু তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন, পাপের খোঁজ পাবার সুযোগ তুমি পাচ্ছ কিন্তু সেই পাপকে কি ভাবে জেতা যায় তাও দেখ! তুমি এখন যেতে পার। আমার সান্ধ্যবন্দনার সময় হয়ে গেছে।"

বিশালদেব চলে যায়। যোগী নর্ত্তকীকে বলে, "দেবি, এক মুহূর্ত্তে কত কি ঘটে গেল। আমার নিজেরই এ-সব বিশ্বাস হচ্ছে না। তবুও যা হবার ছিল তা হয়ে গেছে, কখনও কখনও ভয় হয়। মনে হয় যে আমি আগুন নিয়ে খেলতে চলেছি।"

নর্ত্তকীর মুখে হাসির রেখা খেলে যায়, "দেব, আমাকে ভয় করবেন না। সাধনা ও তপস্যার মাঝে তুমি আমাকে কখনও বাধাস্বরূপ পাবে না, এটুকু বিশ্বাস রাখো। আমি তোমাকে ভালবাসি আর ভালবাসার অর্থ হ'ল সীমাহীন ত্যাগ। তোমার যা'তে সুখ হবে তা'তে আমারও সুখ হবে।"

"তাই হবে।" যোগী আসনে বসে পড়ে। "নিজের জন্য কুশাসন তৈরী করে নিতে হবে। বিশালদেবের কাছ থেকে তুমি কুশ চেয়ে নিতে পার। আমার সন্ধ্যা-সমাধির সময় হয়ে গিয়েছে।" এই বলে যোগী চোখ বন্ধ করে নেয়।



দুটি তীর

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণু মণ্ডলের বাড়ীর নীচে একটি বিল ছিল। এখন সেটাকে সনাক্ত করাই মুস্কিল!

এক সময়ে বর্ষার গঙ্গা-প্রবাহধারা ঢালু জমির মধ্যে পড়ে খাত সৃষ্টি করেছিল—এবং অনেকখানি জল আটকে পড়েছিল সেই খাতে। শীতে-গ্রীষ্মে অবশ্য গঙ্গার সঙ্গে এর কোন সংযোগই থাকত না—শুধু বর্ষার বন্যায় গৈরিক জলের ঢল নামিয়ে গঙ্গা স্নেহভরে স্পর্শ করতেন তাঁর আত্মজাকে। কালক্রমে পলিমাটির স্তরে উঁচু হয়ে উঠল আগম-নিগমের সেই পথটি। বর্ষাকালেও এক ক্রোশ দূরের গঙ্গা মিছেই মাটির বাধা ভাঙ্গবার চেষ্টা করতে লাগলেন!

বিষ্ণু মণ্ডলের বাড়ীতে যখন প্রথম যাই তখন ওই বিলের মধ্যেই দেখি সমুদ্রের রূপ। সেটা বর্ষাকালই। গঙ্গার সঙ্গে তাঁর কন্যার এমন গলাগলি উচ্ছ্বসিত স্নেহপ্রকাশের রীতি সত্যই মুগ্ধ করেছিল আমাকে। কূল-কিনারাহারা মাঠে নিশ্চিহ্নতীর একটি বিশাল সমুদ্র দেখলাম সেই প্রথম। দেখা মাত্র নিসর্গদৃশ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলাম।

বিষ্ণু মণ্ডল আমার উচ্ছ্বাস দেখে একটু হাসল। বলল, বাবাঠাকুর, শুধু জল দেখেই আহ্লাদ করছে, মা-ঠাকরোণ! সর্ব্বনেশে জল যে ক্ষেত-খামার ডুবিয়ে চাষার সম্পত্তি অপচো করছে—তা বুঝচে না।

দিদিমা বললেন, বুড়োরাই বোঝে না—ও তো দুধের বালক।

বিষ্ণু মণ্ডল বললে, তা ক্ষেতি অপচো যেমন করে—তেমনি পুষিয়েও দেয় মা-ঠাকরোণ। কথায় বলে, যে কাঠায় নেয়া—সেই কাঠায় শোধ। তবে যতটা নেয়—ততটাই কে পুষিয়ে দেয়? পলিমাটিতে মুগ কলাই ছিটিয়ে দিয়ে ফসল অবিশ্যি পাই—বিনি মেহন্নতের ফসল। কিন্তু মা-লক্ষীর মত কি আর তার পেঁচাটা? মূলে হাভাত করে না—ওই ভাগ্যি। কি বল গো বাবাঠাকুর?

বারো বছরের ছেলে, বুঝি তো সব—তবু ঘাড় নেড়ে সায় দিতে হয়।

বিষ্ণু হেসে ওঠে হা হা করে। দেখ গো মা-ঠাকরোণ—নাতি কেমন ঘাড় নাড়ছে! তা বাবাঠাকুর, থাকবা এখেনে? একদিন নয়—দু'দিন নয়—ছেরকাল থাকবা?

সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ি।

জল কিন্তু থাকবে না, যা ওই বার্ষেকালটা। জাড়কালে শুধু খাঁ-খাঁ মাঠ—এপার-ওপার দিষ্টি চলে না। কেমন গো? থাকতে পারবা?

হুঁ। লম্বা করে ঘাড় নাড়ি।

নদী সমুদ্র হয়েছে বলেই যে এই অপরূপ শোভা মন কেড়ে নিচ্ছে—তা নয়, এ-বাড়ীর মানুষগুলিও চমৎকার! কি খাতির-যত্ন—কি খাওয়ানোর আগ্রহ! এ ছাড়া ছেলেদের সঙ্গে হুড়োহুড়ি, নৌকো-চড়া, ছড়া-শোনা, গল্প-বলা···জলের মতই তরতরে প্রবাহ জীবনের।

সকালে মুখ ধোয়া হতে না হতে এক বাটি ঘন দুধ আর পরিষ্কার কাঁসার থালা-ভর্ত্তি খাজা কাঁঠাল নিয়ে মণ্ডল-বৌ এসে উপস্থিত।

বাবাঠাকুর, দুধটুকু সব শেষ করা চাই কিন্তু।

ভাতের সঙ্গেও তেমনি বাটি-ভর্ত্তি ঘন দুধ, মর্ত্তমান কলা, আখের গুড়। বিকেলে মণ্ডল-বৌয়ের হাতে দুধের বাটি দেখলেই এক ছুটে বাড়ীর পিছনে উঁচু জমিটায় গিয়ে হাজির। সেখানে ফলসা গাছে তখনও দু'-এক থলো ফলসা রয়েছে, মাদার গাছটা রাঙা-রাঙা তালকাটা ফলে ভর্ত্তি, খেজুরের ভারি কাঁদিতে ফিকে লাল রং গুলে কে যেন ঢেলে দিয়েছে আর উঁচু ডালে বর্ষার কষা কালো জাম ফলেছে থলো থলো। দুধের রুচি-বিকার—এগুলি দেখলেই কেটে যায়।

জলে ভর্ত্তি চারি দিক—আনাজপাতির দুর্ভিক্ষ। তবু মণ্ডলের বেড়ার গায়ে ফুলে ফলে ঝিঙ্গে লতার ঠাস বুনুনি। দাওয়ার চালের বাতা থেকে নেমে এসেছে সারি সারি শিকে। তাতে ঝুলছে লাল টুকটুকে বিলাতী কুমড়ো। ওই দাওয়ার এক কোণে ছোট ডোলে রয়েছে ধান—আর এক ধারে আলুর পাহাড়। তার পাশে গুড়ের নাগরী। বর্ষাকালের জলে ভর্ত্তি গ্রামে এর চেয়ে রাজভোগের সামগ্রী কে আশা করতে পারে?

মণ্ডল হেসে বললে, এই আমাদের সাত রাজার ধন এক মাণিক, বুঝলে গো বাবাঠাকুর !

জিজ্ঞাসা করি, তোমরা মাছ খাও না ?

খাই—পেলে আর পাব্বণে।

সন্দেশ ?

ওই পেলে আর পাব্বণে।

জুতো পর না কেন ?

এঁটেল মাটির কাদা দেখছ তো বাবাঠাকুর, পায়ে একবার লাগলে বুট জুতো পরিয়ে দেয়।

ইস্কুলে যায় না ছেলেরা ?

কি হবে ? ক্ষেতখামার আমাদের পাঠশালা। তোমরা নেক শেলেটে—আমাদের শেলেট ওই জমি।

তার জন্য এই গ্রামখানি। বড় জোর গঞ্জের হাট। সেখানে ধান, খড়, গুড়, খন্দ কুটো বিক্রী হয়। পয়সা দিলে কাপড় মেলে, দেশলাই মেলে, নুণ কেরাসিন মেলে, টোকা মেলে। কামার-শালায় ফরমাস দিয়ে বিদে কাঠি আর লাঙ্গলের ফলা তৈরী করানো যায়, কাস্তে, আর নাড়াকাটা বঁটিতে শাণ দেওয়ার ব্যবস্থাও আছে।

একটু থেমে বলল বিষ্ণু, একবার গঞ্জের ডাক-আপিসের ঘর দেখিয়ে নালু মণ্ডল বললে, ইচ্ছে করলে টাকাও জমা রাখতে পার ওখানে।

বললাম, দূর—পরের ঘরে উপার্জ্জনের কড়ি রাখে না কি কেউ ?

ও বলল, না গো খুড়ো—ওরা নিকে-পড়ে টাকা রাখে। যেমন হাতচিঠি দিয়ে টাকা কর্জ্জ কর না—তেমনি হাতচিঠি দেয়। তখন তুমিই হলে গিয়ে মহাজন।

বললাম, না ভাইপো—অমন মহাজন হয়ে কাজ নেই আমার। কথায় আছে না—আপন পাঁজি পরকে দিয়ে দৈবজ্ঞি বেড়ায় হা-ভাত হয়ে।

সুতরাং সেভিংস ব্যাঙ্কে টাকা রাখেনি বিষ্ণু। লেখাপড়ার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলেও—লেখাপড়ার আঁচটা মাঝে মাঝে গায়ে এসে লাগে। যখন বীজধান ছ ভারায় আগে জমিতে সার দিতে হয়, খাজনার টাকা মেটাতে হয় আর অসুখ-বিসুখ হলে ছুটতে হয় ডাক্তার বাড়ীতে। ও ছাড়া বর্ষার কাজল মেঘ যখন শরতের পেঁজা তুলোর আকার নেয়—আর শূন্য মণ্ডলে কাঁকা আওয়াজ তুলে চাষীর বুকটাকে কাঁপিয়ে দেয়—সেই দুর্দ্দিনে মহাজনের বাক্‌সে আর একখানি লাল হাত-চিঠি তুলে না দিয়ে উপায় কি ! কিন্তু গোল বাধে হাত-চিঠির গর্ভনিহিত দুর্ব্বোধ্য ক্ষুদে অঙ্কগুলিকে নিয়ে। টাকা দেওয়া নেওয়ার মানে—আদায় উসুলের জটিল পাকে ওই অঙ্কগুলি যেন অজগর জাতীয়। একটা পাক খুলেছে কি সাতটা পাক জড়িয়েছে।

বিষ্ণু বলে, জমি চেনা—পাট করা, বীজ বোনা, রোওয়া, নিড়েন দিয়ে ঘাস উপড়ে ধান চারার অঙ্গসেবা করা, ধানে দুধ আসা, পাকা, কাটা, মাড়া, গোলাজাত করা—এ সবের নাড়ী-নক্ষত্তর জানি—কোনটাতে ভুলচুক হবার জো নেই। ধান-খড় বেচে টাকার হিসেব—সে-ও কিছু কঠিন নয়—কিন্তু ওই টাকা হাত-চিঠিতে উঠলেই নানান ফৈজত। ওর জের মিটেও মিটতে চায় না।

তহলে লেখাপড়া শেখা দরকার কি না ?

আমার কথার উত্তরে কি প্রাণখোলা হাসি বিষ্ণুর। দিদিমাকে বললে, শোন গো মাঠাকরোণ, বাবাঠাকুরের কথা শোন। ওনারা জামা জুতা গায়ে চাপিয়ে শহরে যাবে কাজ করতে—ওনাদের কথা আলাদা। আমরা যদি বই শেলেট নিয়ে বসি—জমির তত্ত্ব করবে কে বল তো ?

বললাম, মহাজনে যে ঠকিয়ে ঠকিয়ে বেশী টাকা নিচ্ছে।

ইস—কত নেবে, মা লক্ষ্মী যদি দু'হাতে ঢেলে দেন, নিক না কত নেবে। কথায় বলে, দেবতার দেওয়া ফুরোয় না, মানুষের দেওয়া কুলোয় না।

আরও দু'বার এসেছিলাম নরেশপুরে। মানে বিষ্ণুর বাড়ীতে। তখনও মা লক্ষ্মী কৃপণ হননি। বিষ্ণুর আটচালায় বছর বছর নতুন খড় উঠছে—উঠোনের গোলায় মা লক্ষ্মী পাকা বাসা বেঁধেছেন। গোবর দিয়ে নিকোনো তকতকে দাওয়া—উঠোন। চালের বাতায় বাঁধা ছোট একটি বাঁশের দোলনা—তাতে কাঁথা-জড়ানো বিষ্ণুর ছোট ছেলেটি পিট্‌ পিট্‌ করে চাইছে আর ফোকলা মুখে মিষ্টি হাসছে। গোয়ালে গরুর সংখ্যা কিছু বেড়েছে—ছাগলও এসেছে দু'-একটি। আর হাঁসের পাল প্যাঁক-প্যাঁক করতে করতে পুকুরপাড়ে চলেছে। দ্বিতীয় বারে যখন নরেশপুর আসি—সেই সময়ের কথা বলছি।

গ্রীষ্মকাল। কাজেই জলের বদলে সামনে দেখলাম ডাঙ্গার সমুদ্র। আউশ ধানের বেঁটে বেঁটে সবুজ চারারা অল্প হাওয়ায় ঢেউ তুলেছে—যেন সবুজের বন্যায় ভাসছে মাঠ।

বাড়ীর পিছনে ছোট মত একটা ডোবা কাটিয়েছে বিষ্ণু। গ্রীষ্মকালে ওটা শুকিয়ে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। সম্প্রতি কয়েক দিন ধরে বৃষ্টি হওয়াতে কোমর ভর জল দাঁড়িয়াছে। তাতেই বৌ-ঝি, ছোট ছেলে-মেয়ে আর হাঁসেদের কি আনন্দ ! মেয়েরা পাড়ে বসে বাসন মাজছে—ক্ষারে সিদ্ধকরা কাপড় আছড়াচ্ছে। ছেলেরা সাঁতার কাটছে হাঁসগুলোর সঙ্গে। প্রাণের আনন্দে মানুষ পাখী সবাই ভরপুর।

বিষ্ণু বললে, আর বাবাঠাকুর, মা গঙ্গা ছিচরণে রাখলেন না। সেই যে দু'সন হ'ল মুখ ফিরিয়েছে—বাস। একটা ডোবা না কাটালে ইস্তিরি পরিবার নিয়ে কি করতাম বল তো ? পোয়াটাক দূরে কোম্পানীর পুকুর আছে তা সেখান থেকে শুধু খাবার জল নাও আর নেয়ে ধুয়ে এসো। কাপড় কেচেছ কি জরিমানা। আচ্ছা বাবাঠাকুর, নেকা-পড়া শিখলে আইন জানা যায় তো ? তা সবাই বলছে—গোপলাকে পাঠশালায় দাও। গাঁয়ে এখন মশায়ের পাঠশালা হয়েছে কি না।

বেশ তো পাঠশালাতেই দাও না গোপালকে।

গোপলার গব্‌ধধারিণী এই নিয়ে দু'বেলা তক্ক করে। মাগী বোঝে না যে হুট করে একটা কাজ করে বসলে তার ঝক্কি কত। তা আপনাদের পাঁচ জনকে জিজ্ঞেস না করে—

সতেরো বছর বয়স হলেও বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললাম, তাই দাও। পাঠশালাতেই দাও।

কিন্তু গোপলা যে তোমার বইসী বাবাঠাকুর—দু'-এক বছর বড়ই হবে। মশাই বলছে অত ধাড়ী ছেলে নিলে পাঠশালার ক্ষেতি। না কি ছোটগুলো পড়বে না, খালি ফষ্টি-নষ্টি করবে। তা হলে গোপলাকেই না হয় পাঠশালায় দিই।

বেশ তো।

পায়ের ধূলো দাও বাবাঠাকুর—বাঁচালে আমায়। আমার আপত্তি গ্রাহ্য না করে বিষ্ণু পায়ে হাত দিল।

বছর কতক বাদে গঞ্জের হাটে গুড় কিনতে এসেছিলাম। একটি ছেলে এসে আমায় হাত জোড় করে প্রণাম করল। বেশ ফিটফাট ছেলেটি—যদিও আধময়লা জামা-কাপড় ওর পরনে, পায়ের জুতোটাও কালি অভাবে শ্রীহীন। মুখের ভদ্র হাসি ও সপ্রতিভ ভাব দেখে ছেলেটিকে ভালই লাগল।

বললাম, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না?

আজ্ঞে—আমি বিষ্ণু মণ্ডলের ছেলে—নেপাল। আমাকে 'আপনি' বলবেন না।

নেপাল! এখন করছ কি?

এই গঞ্জের ইস্কুলে পড়ছি—এবার ম্যাট্রিক দেব।

তোমার বাবা ভাল আছেন?

আছেন এই পর্য্যন্ত। বাত হাঁপানি হয়ে অথর্ব্ব হয়ে গেছেন—নিজের হাতে লাঙ্গল ধরতে পারেন না।

দাদা বুঝি চাষ-বাস দেখেন?

দাদা তো নেই। যে বার আশ্বিনে ঝড় হলো—সেই বারই মারা গেল।

কি হয়েছিল?

জ্বর—ম্যালেরিয়া।

এখন চাষ-আবাদ দেখছে কে?

মুনিষ জন আছে—তাদের দিয়েই করাচ্ছেন বাবা।

তুমিও দেখতে পার?

ছেলেটি মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তার পর বলল, আমার ইচ্ছে পাস করে গঞ্জের ইস্কুলে মাষ্টারী করি। তার সঙ্গে মাল কেনা-বেচার কাজও চলতে পারে।

তাহলে তোমাদের জমিজমা কে দেখবে?

এখন তো সবাই দেখছেন—ছোট ভাই দুটোও তত দিনে বড় হয়ে উঠবে। আর জমিজমায় লাভ কি বলুন? হাড়ভাঙ্গা মেহনত করে পেটের ভাত হয় না। আর দেখুন আড়তদারের ঘরে টাকা ধরে না।

শুনি তো চাষার অবস্থা ভাল?

ছেলেটি হেসে বললে, দূর থেকে শুনলে সবই ভাল। দূরের কেশ ঘন দেখায়। তা একদিন যাবেন না আমাদের বাড়ীতে। বাবা আপনাদের কথা প্রায়ই বলেন। মাঠাকরুণ মারা গেলেন—আপনারাও যাওয়া-আসার পাট দিলেন তুলে।

গাঁয়ে তো থাকি না—চাকরি করি শহরে।

তাহলে শিষ্য-সেবকদের দেখাশোনা করে কে?

হেসে বললাম, যেমন তোমাদের জমি—তেমনি আমাদের শিষ্য-সেবক! এখন নিজের নিজের বৃত্তি ব্যবসা বজায় রাখা কঠিন। ঠাকুর দেবতায় মানুষের ভক্তি কমছে, মন্ত্রই বা ক'টা লোক নিচ্ছে বল?

যা বলেছেন। ছেলেটিও হাসল।

ওর সঙ্গে আলাপে সুবিধা হল। দরদস্তুর করে সুবিধায় ক'খানা ভাল গুড়ের নাগরী কিনে দিল ও। জিনিস চিনতে এবং দরদস্তুর করতে রীতিমত পাকা হয়ে উঠেছে ছেলেটি।

বিদায় নেবার সময় প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিল আমার কাছ থেকে—একদিন ওদের গ্রামে যেতেই হবে।

গিয়েছিলামও একদিন। তৃতীয় বার এবং শেষবারও। কিন্তু কোথায় সেই আগেকার গ্রাম! চেহারা তার আমূল বদলেছে। যেখানে একটিই কাঁচা রাস্তা ছিল গোরুর গাড়ী মানুষজন চলার এবং অসংখ্য পায়ে-চলা পথ ছিল ওর বাড়ীর কানাচ দিয়ে, ওর বাড়ীর উঠোন দিয়ে, বাঁশ বাগানের গা ঘেঁষে পুকুরের পাড় বেয়ে, আশ্‌শ্যাওড়ার বন ঠেলে সেই গ্রামে হয়েছে পীচের রাস্তা। বাড়ীঘর গাছপালা কাঁপিয়ে পেট্রোলের গন্ধ ছড়িয়ে চলছে অতিকায় বাস লরি। যে গ্রামে হাতের আঙুলে গুণে বলে দেওয়া যেত ক'খানা কোঠা-ঘর আছে সেখানে চালাঘরের হিসাব আজ হাতের আঙুলে উঠেছেন, একটা উদ্বাস্তু কলোনী গড়ে উঠেছে গ্রামপ্রান্তে। বড় ইস্কুল হয়েছে, প্রসূতি-আগার হবার কল্পনা রয়েছে। আরও শোনা গেল বিজলী বাতি আসবে অচিরে।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার, বিষ্ণুর বাড়ীতে একখানিও খড়ের চালাঘর নাই। পাকা গাঁথনির মাথায় ঢেউখেলানো টিন—সেই প্রকাণ্ড আটচালাটা আর এক রূপ ধরেছে। উঠোনে মরাই একটা রয়েছে নিতান্তই হতশ্রী। গোবরের চিহ্ন কোথাও নাই। আধুনিক বেশবাসে ঘর বারান্দা বেশ খানিকটা উন্নত। বারান্দার এক কোণ ঘিরে একটা বাথরুম হয়েছে। শুধু পুরানো কালের বাইপোবটা পাতা রয়েছে বারান্দায়। আর তার উপরে মাদুর বিছিয়ে ফরসা কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে বিষ্ণু।

নেপাল তার শিয়রে ঝুঁকে পড়ে ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে আমার আগমনবার্ত্তা ঘোষণা করল।

ধড়মড় করে উঠে বসল বিষ্ণু। কঙ্কালসার চেহারা। রোগে—না বার্দ্ধক্যে ওর এমন দশা হল?

দু' হাত কপালে ঠেকিয়ে সে মাথাটা নীচু করল। তার পর হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলতে লাগল, কোন ক্ষ্যামতা নেই বাবাঠাকুর! উঠে যে ছিচরণের ধুলো নেব, সে ক্ষ্যামতা পজ্জন্ত কেড়ে নিয়েছে ভগবান। কানে শুনতে পাইনে, নজরের যুত নেই!

একটু দম নিয়ে বললে, হাঁ বাবাঠাকুর—একটা কথা শুনচি—সত্যি? সরকার নাকি জমিজমা সব কেড়ে নেবে? এক কাঠা জমিও থাকবে না কারও?

নেপাল বললে, জমি যাবে, এই ভেবে ভেবেই বাবার এমন হাল হয়েছে। কিছুতেই বোঝাতে পারিনে—

বললাম, জমি গেছেও তো কিছু?

কিছু নয়—অনেক। সে কথা বাবা জানে না কি? মহাজনের কাছে এত টাকা ধার ছিল। দেনার দায়ে মাথার চুল বিক্রী হয়েছিল। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে জমি বেচে দিয়েছিলাম! তাইতো দেনা শোধ হল—টিনের চালাও তুলতে পারলাম। চাষ করে তো ডুবতে বসেছিলাম।

কিছু জমি রাখা উচিত ছিল তো। সে বার এত বড় দুর্ভিক্ষ হ'ল—যাদের জমিজমা ছিল তারা তো না খেয়ে মরেনি—কামিয়েছেও দু'পয়সা।

কিছু জমি আছে তো। নেপাল বললে। সরকার যা রাখতে

দেবে—সেইটুকুই আছে। একখানা হাল আর হেলে-বলদ এক জোড়া ত চেয়েছি। জমি রাখতে হলে আইনটাও তো মানতে হবে।

বিষ্ণুকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম—কোন কথাই ওর কানে গেল না। নেপাল চলে গেলে এক সময়ে গলা নামিয়ে বললে, বাবাঠাকুর—পরামর্শটা আমারে ভাল লাগেনি,—ওদের হালচাল দেখছ তো? অবিশ্যি তোমারই বা দোষ কি—আমার অদেষ্ট! নেকাপড়ার হিসেবকে সাধ করে কি দণ্ডবৎ করেছি বাবাঠাকুর, ও যদি বা এক পাক খোলে তো সাত পাক জড়ায়। এই দেখ না কেন—ক্যাপলাটাকে—ভুবনেটাকে। ভুবনেটাকেও গঞ্জে নিয়ে গিয়ে কি দোকান করে দেবে বলাবলি করে। ধান, পাট, তিসি, ভুষি চালানীর কাজ। আমাদের সাতপুরুষে চাষা—ও সব কম্মো কি সাজে বাবাঠাকুর! এখন ওরা বাবু হয়েছে—জমির মম্মো কি বুঝবে! ওরা খালি বোঝে টাকা উপাজ্জন। ভাল খাও—ভাল পর—হাস, খেলো—আমোদ আহ্লাদ কর বসে, তাহলেই জীবনটা সাত্থক হয়ে যাবে। হা রে অদেষ্ট!

অনেকক্ষণ কথা বলে শ্রান্ত হয়েছিল বিষ্ণু। ফরসা কাঁথাখানা গলা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে শুয়ে পড়ল বাইপোষে।

বাইরে চাইলাম। দাওয়া থেকে কূল-কিনারাহীন মাঠ দেখা যায় আজও। মাঠের মাঝে অনেক বাড়ীঘর উঠেছে। জীয়ল সজিনার বেড়া ঘিরে জমিকে টুকরো টুকরো করে বাসা বেঁধেছে মানুষ। জমি উঁচু হয়েছে অনেকখানি—বন্যার ভয় কেটে গেছে। বাড়ীর বাঁওড়ের শুকনো খাতটাও ভরাট হয়ে আসছে—যত রাজ্যের জঞ্জাল জমছে ওর গর্ভে।

নেপালকে বললাম, বিলটা কাটিয়ে নেবার ব্যবস্থা কর না কেন তোমরা? নৌকো চলাচল পথটা থাকলে গঞ্জের হাটে মাল চালান দেওয়া সুবিধে কত।

নেপাল হাসল। বলল, সরকারই তা বুঝিয়ে দিচ্ছে কি না—দেখছেন না গাড়ী গাড়ী রাবিশ পড়ছে ওর বুকে! আর একটা ভাল রাস্তা হবে—গঞ্জ বরাবর। এখনকার দিনে নৌকো গোরুর গাড়ীতে মাল চালান দিলে লোকসান কত। হটর হটর করে এক দিনের পথ যাবে সাত দিনে! ওর স্বরে তাচ্ছিল্যের সুর ফুটে উঠল।

একটু থেমে বললে, ভাল রাস্তা হলে মনে করছি—মাল চালানির ব্যবসা খুলব—মাষ্টারীটা ছেড়ে দেব। গঞ্জে একটা ভাল ঘরও দেখে রেখেছি—রাস্তাটি চালু হওয়ার অপেক্ষা করছি শুধু।

কথা বলতে বলতে আশা-আনন্দে নেপালের সারা মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

রাজধানীর পথে-পথে

উমা দেবী

সঙ্গসুধা

অনেক মেঘের কান্না কেঁদেছিল কালকে বৈকাল
বিষাদমধুর হয়ে এল শেষে আজকে সকাল।
ফিকে ফিকে সবুজের ঢঙে
রাঙিয়ে লালচে পাতা নতুনের রঙে
নিজেকে রাঙিয়ে নিল দেওদার ডাল।
তারি এক কোণে
সুনীল আকাশ এসে উঁকি দিয়ে চুপি চুপি
যখন মাটির গান শোনে—
আমিও তখন জেগে উঠি
দেখি যে প্রকৃতি তার আলগা করেছে মায়া-রহস্যের মুঠি।
চেরা চেরা দেওদার পাতাদের মিঠে রঙ ঝাপ্‌সা আদরে
কুচ্‌কুচে কালো দু'টি কাক এসে বসেছে বাসরে।
পাশাপাশি শুধু বসে আছে
সবুজ পৃথিবী দূরে—সুনীল আকাশ যেন কাছে—
নিবে গেছে আসঙ্গের ক্ষুধা—
ডুবেছে গভীরে সব—সে গভীর শুধু সঙ্গ-সুধা।

কয়েকটি রেখা

কাক—কালো কাক—
কাক ব'সে শিমূলের ডালে
গির্জার আড়ালে।
কালো কাক—প্রবাল শিমূল
পিছনে পড়ন্ত রৌদ্রে
ঝকঝকে সোনার ত্রিশূল।

চশমার কাচ—কাকচক্ষু জল
তার নীচে সুর্মা-টানা চোখ
শফরী-চঞ্চল।

শিফনের নীল শাড়ী
তরুণীর অঙ্গে লোল—লাবণ্য আভাসে
সুনীল আকাশ যেন
উঠেছে চঞ্চল হ'য়ে—দক্ষিণ বাতাসে।

একগাছি স্বর্ণহার শ্যামাঙ্গীর শ্যাম কণ্ঠে
ঝিলমিল্ করে,
ভীরু কিশোরীর যেন স্বপ্নসুখ আঁধারের
নিরালা প্রহরে।

কলেজের মেয়ে—হাতে গাদা বই
চেক-কাটা শাড়ী অঙ্গে—
মাছের চুবড়ি হাতে নিয়ে যেন
জেলেনী চলেছে রঙ্গে।



মধুমতীর মাঝি

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

কামারখালি ঘাটের নাজির মাঝির নাম জানে না, এমন যাত্রী এ তল্লাটে নেই। মধুমতীর ধারে কামারখালি রেল-ষ্টেশন, হাট, বাজার, বন্দর। অনেক নৌকোই সেখানে থাকে, কিন্তু নাজির মাঝির নৌকোর চাহিদা বেশী,—ভাল মাঝি, লোকও ভাল, তার নৌকোয় চড়ে যাত্রীদের আরামও খুব।

উজান-বাঁকে নাঙ্গলবাধ, আর ভাটির বাঁকে ভাটিয়ালাড়া পর্য্যন্ত সে চলা-ফেরা করে। এর ঘাটে ঘাটে বহু লোক, এমন কি বহু গৃহবধূকেও সে জানে। নৌকোয় সে থাকে, আর তার সঙ্গে থাকে বার-তের বছরের হেতো ছেলে তমিজ। তমিজ তার নিকাহিতা স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামীর ছেলে।

নাজির মাঝির নৌকোর চাহিদার কয়েকটা কারণ আছে,—সে পাকা মাঝি, বহু ঝড়ে-বাদলেও তার নৌকোডুবি হয়নি, সে বিশ্বাসী এবং সময় ও কর্ত্তব্যজ্ঞান তার মাঝে যথেষ্ট আছে। ছোট ভাড়া ছেড়ে সে বড় ভাড়ায় যায় না, কথার ঠিক আছে। সাত দিন আগে বলে রাখলে ঠিক সময়ে ঠিক ঘাটটিতে নাজির মাঝি হাজির—সে হুঁকো টানছে—হেতো ছেলে তমিজ জাল বুনছে। তার নৌকোয় উঠে কেউ কখনও ট্রেণ ফেল হয়নি।

কামারখালির ঘাটের এক পাশে নৌকোর লগি পুঁতে সে রান্নাবান্না করে, ঘাটে অনেকে আসে,—ঝি-বউ তারাও তার সঙ্গে গল্প করে। বিশেষতঃ বন্দরের বারাঙ্গনাদের মধ্যে অনেকে তাকে ভালও বাসে,—তার নৌকোয় স্থানান্তরে যেতে ভয় নেই।

নাজির ইলিশ মাছ রাঁধছিল, নৌকোর আগা-গলুইতে বসে। কামিনী জলে একগলা নেমে বললে,—কি গো, নাজির চাচা, ইলিশ মাছ রাঁধছো?

—হ্যাঁ গো,—কি সুন্দর রাঁধি তা' ত খাইয়া দেখলা না?

কামিনী ভুস্ করে ডুব দিয়ে বলে,—রংটা বেশ খোলতাই হ'য়েছে বটে।

বাসিনী বাসন মাজতে মাজতে বলে,—কি গো, তমিজের বাপ, ভাড়া নেই আজ?

হুঁকো টানতে টানতে নাজির বলে,—টেন আসুক, ভাড়া হবেই।

—দেড়েপুরের মেলায় যাবো মঙ্গলবার, নিয়ে যাবে?

—না, মঙ্গলবার ভাড়া আছে—অন্য নৌকোয় যাও।

—না তা যাবো না,—সব নচ্ছার, বাজারে বসেছি বলে কি মান-অপমান নেই? ওরা সব যা-তা বলে—তোমাকেই যেতে হবে চাচা!

—আচ্ছা আচ্ছা, দেখা যাবে।

আজ বিশ বছর সে তার নৌকো চালাচ্ছে এই মধুমতীর স্রোতে—কত কি বাদল, ঝড় বৃষ্টি, শীত-বসন্ত কেটে গেছে,—যৌবন পেরিয়ে বুড়ো হয়েছে এই মধুমতীর জলো বাতাসে,—মনটা তার তাই সজল।

উজানে তিন বাঁক গেলে তাদের গাঁ,—নাড়িয়া। নদীর ধারেই তাদের গাঁ, এ পথে ভাড়া পেলে ফিরবার মুখে বাড়ী যায়। জমি দু'-চার বিঘে ছিল, চাষ করতেও চেষ্টা করেছে সে, কিন্তু মাঠের কাদা-ঘাস তার ভাল লাগে না; তার চেয়ে মধুমতীর জলে পাল তুলে তর-তর করে যাওয়াই যেন ভাল—তার মাঝে একটা অভিযানের আনন্দ আসে,—খোলা হাওয়ার একটা মাদকতা আছে।

প্রথম পক্ষের স্ত্রীর এক মেয়ে ছিল, বিয়ে হয়ে গেছে। তার পর সে এই নিকা করেছে। বয়স তার তিরিশ, বাড়ীতে থাকে,

নাজির মাঝে মাঝে ঘাটে নৌকো বেঁধে দু'-একদিন থাকে। বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক এই, এই জঙ্গলঘেরা বাড়ীতে তার ভাল লাগে না—জোছনা রাতে নৌকো ভাটির টানে ছেড়ে দিয়ে সে বিভোর হয়ে যায়।

ফাল্গুনের শেষ হবে। হঠাৎ সন্ধ্যায় কালো মেঘ করে ঝড় উঠলো। পুবপাড়ের ঘাট, নৌকোগুলো আছড়াতে লাগলো পশ্চিমের ঝড়ে,—সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে, নাজির বুঝলে ঝড় থামবে না, সারা রাত্রি চলবে, বৃষ্টিও এসেছে ঝেঁপে। সে বললো, তমিজ নৌকো খোল্।

তমিজ অবাক,—এই ঝড়ে কোথায় যাবে?

নাজির একটা গালাগাল দিয়ে বললে,—শীগগির লগি তোল, ভাটির ওই খোলায় যেতে হবে, তা না হলে নৌকো মা'র যাবে—চল্ শীগগির—

বন্দরের পরে সর্পিল গতি মধুমতীর বাঁক ঘুরেছে, টোটার আড়ালে থাকলে ঝড় লাগবে না, তাই নাজির সেখানে নৌকো ভিড়িয়ে ট্রেনের ভাড়ার আশা ত্যাগ করলে সে দিনের মত।

রাত্রি কেটে গেছে—সারা রাত্রি ঝড়ের মাতামাতি চলেছে, কত নৌকো নঙ্গর ছিঁড়ে মরেছে। সকালেও ঝড় চলছে, ঠাণ্ডা বৃষ্টির ফোঁটা তীরের ফলার মত বিঁধছে গায়ে। নাজির বললে,—তমিজ, ঘাটে চল, ট্রেণ এসে গেল।

—ঝড়ে কোথায় যাবে?

—ট্রেণের যাত্রী নৌকো পাবে না ঘাটে, তাই কি হয় রে পোলা?

নাজির বহু কষ্টে নৌকো নিয়ে ঘাটে এসে দেখে, অনেক নৌকোই নেই, কতক ভেঙ্গেছে। মাঝিরা নৌকো ছেড়ে বন্দরে আশ্রয় নিয়েছিল, ঝড়ে নৌকো ডাঙ্গায় তুলে আছড়েছে।

কলকাতা থেকে এক বিয়ে এসেছে,—তারা নৌকো না পেয়ে বিব্রত। ঘাটে পাল্কী-বাজনা এসেছে ওদিকে, নৌকো না পেলে উপায় নেই। মাঝিরা যেতে রাজি নয় কেউ। বরকর্ত্তা ছাতা মাথায় দিয়ে প্রশ্ন ক'রলেন,—নাজির মাঝির নৌকো নেই? সেও কি যাবে না?

নাজির বললে,—আছি কর্ত্তা, কোথায় যাবেন?

—কল্যাণপুরের ঘাট,—যেতে পারবে?

নাজির সামাল মাথায় দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ব'ললে,—বিয়ের বর-বউ যাবে কর্ত্তা?

—হ্যাঁ, ওদিকে পাল্কী, বেহারা, লোক-বাজনা ঘাটে আছে।

নাজির আকাশটা দেখে বললে,—যাবো কর্ত্তা কিন্তু আপনারা ভয় পেয়ে তাড়াহুড়া দেবেন না বলুন?

—না, না,—যেমন বলবে।

ভাড়া ঠিক হল,—বর-বধূ সহ বরযাত্রী সব নৌকোয় উঠে বসল। কর্ত্তা প্রশ্ন করলেন,—ভয় নেই তো নাজির?

—কিছু না,—ঝড় থামলো বলে, পুবলে হাওয়ায় এই ত গেলাম বলে।

নৌকোর পিছনে বসেছে নবোঢ়া বধূ, ট্রেণে রাত্রি জাগরণে আর সম্ভবতঃ মধুমতীর গর্জ্জন শুনে মেয়েটির মুখ শুকিয়ে গেছে। ডাঙ্গা দেশের মেয়ে—নাজিরের মেয়ের বিয়ের দিন এমনি ঝড় হয়েছিল, মুখখানা অমনি শুকিয়ে গিয়েছিল তার। নাজির বললে,—নতুন বৌমা ভয় নেই,—খুঁটি ধরে বসে থাকেন। তমিজ বাদাম বাঁধ—

কর্ত্তা সভয়ে কহিলেন,—পালে যাবে নাজির?

—হ্যাঁ।

ঘড় ঘড় করে কপিকলে বাদাম উঠল, পালে হাওয়া লেগে নৌকোটা একবার কাত হ'য়ে ছুটলো।

বৃষ্টি পড়ছে,—ঝড়ের মত হাওয়া। নাজির হালের ডালির মাঝে একখানা কাঠ দিয়ে হালটাকে খুঁটির সঙ্গে শক্ত করে বাঁধলে। গাজির পীর বদর বদর—

সর্পিল সফেন ঢেউএর উপর দিয়ে দুলতে দুলতে ষ্টীমারের মত তীব্র গতিতে নৌকো ছুটেছে। যাত্রিগণ ভয়ে নির্ব্বাক,—নাজির মাঝে মাঝে হাঁকছে সামাল্ সামাল্; সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়া লেগে নৌকোটা লাফিয়ে উঠল ঢেউএর উপর। নাজির আবার হাঁকলে—কেনির দড়ি হাতে রাখ, বললেই ছেড়ে দিবি।

বৃষ্টি ও হাওয়ায় নাজির কাঁপছিল, হাত দু'টো অবশ হয়ে আসছে, সে ছইএর আড়ালে একটু বসলো—হাওয়াও কম। দেখে, নববধূ কাঁদছে—চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠেছে,—ভয়ে সে কাঁপছে। নাজির বললে,—ভয় নেই মা, নাজিরের নৌকো মরেনি কোনো দিন—দা'খানা দাও ত, বাদামের দড়ি কাটতে যদি হয়—

একজন শাণিত একখানা দা ছইএর বাতা থেকে বের করে দিল। নাজির উঠে দেখে নতুন করে বৃষ্টির সঙ্গে ঝড় এসেছে পুব আকাশ ছেয়ে। সে বললে, সামলে তমিজ, সামলে—দে দে—দে ছেড়ে কেনি।

নৌকোটা এক দিকে কাত হ'য়ে কিছু জল উঠল,—তার পর তার গতি মন্থর হল। যাত্রিকুল তখন ভিতরে তারস্বরে চীৎকার করছে। কর্ত্তা বললেন,—নাজির, নাজির প্রাণটা যেন বাঁচে। তাদের ধারণা নৌকোটা হয়ত ডুবেই গেছে।

ঘড় ঘড় শব্দ করে বাদাম নামলো, নাজির বললে,—কেনি বাঁধ তমিজ, কিছু না কর্ত্তা, হাওয়াটা বড় বেশী তাই—হাফ্ বাদাম করে দিলাম। ভয় নেই—তমিজ তামাক সাজ—একটু হেসে বললে,—নাজির থাকতে নৌকো মরবে না কর্ত্তা!

তমিজ পাটাতন তুলে কাঠের আগুনে তামাক সেজে টেনে-টেনে ধোঁয়া বের করে বাপকে দিল,—নাজির তামাক টানতে টানতে বললো,—লগি ধর, লগি ধর।

তমিজ লগি ধরলে,—কিছুক্ষণ বাদে ঘড় ঘড় করে বাদাম নামলো। তমিজ লগি পুঁতে নৌকো বাঁধতে লাগলো। নাজির বললে,—ঘাটে এসে গেলাম কর্ত্তা,—সে হাল ছেড়ে দিয়ে তামাক খেতে লাগলো। লক্ষ্য করলো—নবোঢ়া বধূটি এতক্ষণে ডাঙ্গার পানে তাকিয়ে যেন হাসলে। নাজির বললে,—মা লক্ষ্মী, নাজিরের নৌকো এটা, এ কোনো দিন মরেনি—ভয় কি? কত ঝড়-বাদল গেল আজ বিশ বছর মা!

ভাড়া দিয়ে বিবাহের যাত্রিকুল বর-কনেকে পাল্কীতে তুলে দিয়ে বৃষ্টির মাঝেই চলে গেল। কিছুক্ষণ বাদে বৃষ্টিও ছেড়ে গিয়ে চিক চিক করে রোদ উঠল—নাজিরকে কর্ত্তা খুশী করেই দিয়েছেন। নাজির ভাবলে,—এক বাঁক ভাটি দিয়ে বাড়ীতেই যাবে—সে তাই করলো।

সে-রাত্রি বাড়ীতে থেকে পরদিন ঘাটে যাবে,—নৌকোয় জিনিষপত্র গোছাতে গিয়ে দেখে, পিছনের ডওরা খোলে একটা স্যুটকেশ,—কিসের? এ নিশ্চয়ই সেই নববধূটির, একটু টান দিতেই তালাটা ভেঙ্গে গেল, খুলে দেখলে কিছু সোনার গয়না, কিছু ভাল কাপড়-জামা।

তার লোভ হ'ল, কিন্তু ক্রন্দনরতা সেই বালিকা-বধূটির কথা মনে পড়ে। গয়না হারিয়ে হয়ত আবার কাঁদবে। মমতা বোধ করলে,—কিন্তু কোন গাঁয়ের ঝিয়ে সে ত শোনেনি?

সে কল্যাণপুরের ঘাটে এসে খোঁজ নিলে—বেতাঙ্গীর ঝিয়ে ছিল, তিন মাইল দূরে। স্যুটকেশ হাতে করে সে রওনা দিল। বললে,—তমিজ ভাড়া পেলে নিবি। আমি এই এলাম বলে—

বিবাহ-বাড়ীতে সেদিন বৌভাতের ব্যাপার—নাজির সরাসরি বাড়ীর ভিতর যেয়ে বললে,—বৌমা কোথা?

কর্ত্তা এক ব্যক্তি বললে,—কেন? তুমি কে?

নাজির তার আগমনের কারণ বললে,—বৌমা এলে বললে,—দেখুন মা, সব ঠিক আছে ত? তালাটা ভেঙ্গে ফেলেছি কি না—

বৌমা হেসে বললে,—সব ঠিক আছে।

কর্ত্তারা বকশিস দিতে চাইলেন। সে বললে,—বকশিস ত দিয়েছেন কর্ত্তা, আর কেন?

একটা সগর্ব্ব আত্মগরিমা নিয়ে নাজির নৌকোয় ফিরলো—লোকে এই সব কারণেই নাজিরের নৌকো ফেলে অন্য নৌকো ভাড়া করে না। বধূটির সকৃতজ্ঞ হাসিটুকু তার চোখের সামনে ভাসে আর সে আনন্দে বসে বসে তামাক খায়। এমনি বহু কাহিনী আছে তার জীবনের।

এমনি করে এক রাত্রে ভাটির মুখে সে বাড়ীর ঘাটে নৌকো ভেড়ালো। তমিজকে নৌকোয় থাকতে বলে সে বাড়ী গেল। ভাবলে, হঠাৎ যেয়ে একটু মস্‌করা করবে। দরজায় ঘন ঘন আঘাত দিয়ে বললে,—দরজা খোলো—খোলো।

ভিতর থেকে স্ত্রী বললে—কে? কে?

নাজির একটু রসিকতা করলে—আলো জেলে ভাখ না—বাইরে জোছনা ছিল। তাই বললে—জোছনায় দেখা যাবে না।

দরজা খুলতে কেন যেন দেরী হ'ল, ভিতরে লম্ফ জেলে স্ত্রী দরজা খুললে। নাজির ঘরে ঢুকে বললে,—এই ত এলাম, নৌকো ঘাটে রেখে, জোছনা রাত্তিরে তোকে নিয়ে নৌকোয় যাবো।

লম্ফটি হাত থেকে হঠাৎ পড়ে গেল,—সঙ্গে সঙ্গে নিবল। নাজির লক্ষ্য করলে, ঘর থেকে যেন একটা লোক বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ জোছনা-ভরা উঠান দিয়ে দৌড়ে চলে গেল, খালি পায়ের দপদপ শব্দে শোনা গেল। নাজির বললে, কে? কে গেল?

স্ত্রী বললে,—কই? কোথায়?

—ঐ যে উঠোন দিয়ে দৌড়ে গেল?

—তোমায় ভীমরতি হ'য়েছে—কাকপক্ষী নড়লে ভয়ে মরি, আর শুনলাম না? আলো জ্বলল—স্ত্রী সযত্নে সস্নেহে বহু সেবাযত্ন করলে। পরের দিন থাকতে বললো কিন্তু নাজির দুপুরে খেয়ে নৌকো খুলে দিলে।

মনটা তার ভাল নেই,—সে যা দেখেছে তাতে সন্দেহও নেই; নিকার স্ত্রী, তালাক দিয়েই বা কি হবে! মাঝে মাঝে রাগ হয়, দুঃখ হয়—জগতে কি সবই এমনি?

সেদিন তাই তার বাদামের নৌকো ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেছে, ভাগ্যিস তমিজ কেনির দড়ি খুলে দিয়েছিল। ভর বাদামে নৌকো দিতে তার যেন ভয় ভয় করে, তার পর থেকে সেদিন ত চড়ায় নৌকো তুলে দিয়েছিল—

নাজির আজ-কাল আনমনে তামাকই খায়। বাসিনী পেশাকর সেদিন বললে তাকে, কি চাচা, তোমাকে যেন কেমন দেখাচ্ছে,—চাচী ভাল তো?

—ভালো বই কি!

—তবে তোমার মনমরা কেন?

নাজির বললে, তোদের জন্যে কি মন ভাল থাকবার যো আছে রে!

—এত দিন ত আমাদের জন্তে তোমার মন কেমন করেনি? হঠাৎ কি হ'ল?—বাসিনী ঘড়া নিয়ে জলে নামতে নামতে বললে,—আমরা ত সকলেরই—মন খারাপে নেই—

একটা নতুন মেয়ে ঘাটে এসে নামলো,—বাসিনী বললে, চাচা, ওর নাম রঙ্গিণী, নতুন এসেছে, বেশ রঙ্গ জানে।

রঙ্গিণী তাকিয়ে ফিক্ করে হেসে বললে, কা'কে বলছো গো দিদি!

—নাজির চাচাকে,—চাচা, রঙ্গিণী গান জানে গো!

ওরা দু'জনই হাসে—বহু দিন ওরা অমনি মস্করা করে কিন্তু আজ হঠাৎ যেন নাজিরের মনটা কেমন হ'য়ে গেল। বললে,—রঙ্গিণীর চেহারাও ত বেশ দেখছি!

রঙ্গিণী একবার তাকিয়ে ফিক্ করে হাসলে,—যেন সে তা জানে।

সেদিন এক দল ট্রেণের যাত্রীকে নিয়ে নাজির আসছিল, বাতাসের বিরুদ্ধে নৌকো এগোয় না। যাত্রীরা তাড়া দিচ্ছিল, ট্রেণ যেন ফেল হয় না।

নাজির বললে,—মুখোড় বাতাস, কি করি? তবুও সে প্রাণপণ হাল চালায় আর বলে, তমিজ হেঁকে দাঁড় টানে—

বহু কষ্টে ট্রেণের অল্প আগে এসে ঘাটে পৌঁছল, যাত্রীরা তোড়পাড় করে নেমে ষ্টেশনে দৌড়ল গাড়ী ধরতে। তামিজকে বাজারে পাঠিয়ে দিয়ে সে রাঁধবে। পাটাতন তুলতেই দেখে, কোনো যাত্রী একটা ছোট টিনের স্যুটকেশ ফেলে গেছে। সে একবার ভাবলে,—তাই ত, কি করি। কিন্তু ট্রেণ তাদের নিয়ে চলে গেছে অনেকক্ষণ অনেক দূরে,—কে, তাও সে জানে না—

বাসিনী আর রঙ্গিণী দু'জন ঘাটে বসে সাবান মাখছে। বাসিনী পিছন ফিরে বসে ছিল, বললে,—চাচা, রান্না হ'ল?

—না হয় নি, তামিজ বাজার আনলেই পাক চড়াবো।

রঙ্গিণী তার দিকে মুখ করে সাবান মাখছে, আর ফিক ফিক করে হাসছে। নাজির টিনের স্যুটকেসটার তালা ধরে মোড়া দিলে, ভাঙ্গে না। দা দিয়ে মোড়া দিয়ে ভেঙ্গে ফেললে—ভিতরে কাপড়-চোপড়—কাপড়ের ভাঁজে গোটা চল্লিশ টাকা রয়েছে।

নাজির বললে,—রঙ্গিণী, হাসছিস কেন?

রঙ্গিণী বললে—তুমি যাবে বললে, গেলে না—মনটা খারাপ হয় না? তাই সে হি-হি ক'রে অসভ্যের মত হাসলে।

বাসিনী শাসন করলে,—এই, ওসব বলিস্ নি,—চাচা তেমন লোক নয়, সাচ্চা লোক, আমরা এত দিন রয়েছি বন্দরে, কোন দিনও দেখিনি।

নাজির হেসে বললে,—তোদের জ্বালায় কি কেউ আর সাচ্চা থাকবে রে?

রঙ্গিণী মুখের সাবানটা ধুয়ে বললে,—তুমিই বলেছিলে আমাকে ভাল দেখতে—তাই না? সে ব্রীড়াভঙ্গি করে মুখ ফেরালো।

বিকেলের গা-ধোয়া শেষ করে ওরা চলে গেল। রঙ্গিণী যাবার সময় পিছনে চেয়ে আবার ফিক্ করে হাস্‌লে।

সন্ধ্যার পরে নাজির স্যুটকেশটার টাকা কাপড় বের করে স্যুটকেশটা নদীর জলে ডুবিয়ে দিলে। ট্যাঁকে কয়েকটা টাকা গুঁজে হুঁকো টানতে লাগলো—ভাবলো অনেক কথা। চোখের সামনে তার ভেসে ওঠে একটা আবছা মূর্ত্তি, স্বল্পালোকিত উঠোন, দপ দপ্ শব্দে পেরিয়ে যাচ্ছে। লম্ফটা হাত থেকে পড়ে নিবে গেল, পড়ল কিন্তু আচমকা নয়।

রঙ্গিণী ফিক্ করে হাসে,—দেহটা ওর সত্যিই মজবুত। তার মনটা একটা দুঃখ ও ক্ষোভে উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বললে,—তমিজ তুই রাঁধ, আমি একটু বেড়িয়ে আসি।

নাজির ফিরলো প্রায় প্রহরেক রাত্রে।

সে বারে আশ্বিনের প্রথমেই পূজা—নৌকো ভাড়ার মরশুম পড়েছে, ভাড়াও বেড়েছে দ্বিগুণ, তাছাড়া পুজো-গণ্ডার দিনে বকশিসও মিলছে।

প্রবাসী এক ভদ্রলোক সপরিবারে যাচ্ছেন বাড়ীতে,—নাজির মাঝির নৌকো ভাড়া করেছেন। নাজিরকে তিনি জানতেন। তার স্ত্রী ভীত হয়েছিলেন পরিপূর্ণ মধুমতীর ফেনিল তরঙ্গোচ্ছ্বাস দেখে। ভদ্রলোক বললেন,—নাজিরের নৌকো, কোন ভয় নেই।

নাজির বললে,—আজ্ঞে, এই বিশ বছর ত মধুমতীর বুকেই কাটলো—

বেলা ন'টা, তপ্ত রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্যে ঢেউএর মাথা চিক্ চিক্ করছে। গাজির পীর বদর-বদর করে নাজির নৌকো ছাড়লে।

পুবাল হাওয়ায় উজান বাঁকে নৌকো ধীরে ধীরে চলছে। নাজির বসে আছে,—হঠাৎ এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া তার রৌদ্রতপ্ত মেরুদণ্ডে ঠাণ্ডা পরশ বুলিয়ে দিয়ে গেল। সে চমকে উঠে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে, দক্ষিণ-পূব কোণে একখানা সজল নীল মেঘ ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। সে হাঁকলো,—তমিজ, একটা হাওয়া আসবে রে! কেনিটা ভাল করে ধরিস্।

কর্ত্তা বললেন,—ঝড় নাজির?

—আজ্ঞে না, একটু বৃষ্টি-হাওয়া আসছে, কিছু নয়। কিছুক্ষণ বাদেই এক পশলা বৃষ্টির সঙ্গে হাওয়া দিল,—নাজির শক্ত করে হালটা ধরে উঠে দাঁড়ালো। বললে, কিছু না বাবু ভয় নেই। হাওয়া ধীরে ধীরে কমলো, —নাজির ভিজে গেছল, তাই পাটাতনে বসে বললে—তমিজ ভিজে গেলাম, তামাক সাজ—সে নৌকোর ভিতরে একবার চেয়ে দেখলো।

কর্ত্তা বসে সিগারেট খাচ্ছেন, গিন্নি খাবার ভাগ করে ছেলেপুলেদের দিচ্ছেন। গিন্নি বলছেন,—তুমি কিছু খেয়ে নাও, কষ্ট হবে।

—কিছু না,—একেবারে চান করেই খাবো।

—পিত্তি পড়ে অসুখ করবে।

নাজির হুঁকো টানতে টানতে ভাবলে,—তমিজের মা-ও এমনি করে কত যত্নে সেদিন তাকে খাইয়েছিল, ধরে রাখতে চেয়েছিল—তার মনে হয় সেই লম্ফটা হঠাৎ পড়ে গেল কেন? পড়েই নিবল কেন? উঠোন দিয়ে কোন লোক কি সত্যিই যায়নি? তার যেন দেখা জিনিষও আজ সন্দেহ হয়।

হাওয়াটা হঠাৎ যেন কেমন জোর দিলে,—বাঁ হাতে হালটা শক্ত করে সে ধরতে চেষ্টা করলো কিন্তু পারলে না,—ছুটে গেল। সে চীৎকার করে উঠলো,—গেল রে!

সঙ্গে সঙ্গে নৌকাখানা তীব্র বেগে একটা পাক দিয়ে, পাল সমেত বৃহৎ একটা তরঙ্গের নীচে চলে গেল। নাজির ছুটে গিয়ে পড়ল দূরে—কিন্তু আর সে ওঠেনি। সেই সঙ্গে গিয়েছিল ওই পরিবারেরও দুই-এক জন নিষ্পাপ শিশু, কিন্তু কেন, সে কথা কেউ জানে না।

আলোর রাজ্যে এসো চ'লে এসো

(কবি Wordsworthএর "The Tables Turned" কবিতার অনুবাদ)

আরে ওঠো—ওঠো—ওঠো না! বন্ধু কেতাবের বোঝা দূরেতে ঠেলে
    ঘাড় গুঁজে বসে পড়ে পড়ে শেষে কুঁজোই হবে?
খোলা চোখ দু'টো সাফ ক'রে নিয়ে দেখ নির্ম্মল চাহনি মেলে—
    এত খাটাখাটি যম-যন্ত্রণা কেনই স'বে?
ওই যে সূর্য্য দূরে পাহাড়ের মাথার উপরে দাঁড়িয়ে হাসে
    সোনালি ঢেউয়ের দোলা জাগে ঐ সবুজ ক্ষেতে;
গোধূলি-লগনে সোনালী আভার প্রথম মধুর কিরণাভাসে
    সঞ্জীবনীর মাধুরী জ্যোতি সে রেখেছে পেতে।
বইগুলো! জ্ঞানভাণ্ডার, তবু প্রাণহীন নিরানন্দময়—
    তা'রি আহরণে সংগ্রাম কর জীবন-ভোর?
শোনো এ কাননে বিহগ-কুলের মধু-কাকলীর বন্যা বয়—
    কেতাবের চেয়ে কিছু কম নয় মূল্য ও'র!
আর শোনো ওই কূজিছে কোকিল পঞ্চম সুরে ধরিয়া তান—
    চির আনন্দ সত্য প্রচারে তুচ্ছ সে কি?
আলোর রাজ্যে এসো চ'লে এসো—প্রকৃতি তোমারে করুন দান
    সত্য শিক্ষা—বস্তু-জগৎ দারুণ মেকি!

এই প্রকৃতির রাণীর মতই ভাণ্ডার চির পূর্ণ রয়—
    বিতরিত তা'রি সম্পদে প্রাণ ধন্য হবে,
স্বাস্থ্যের সাথে স্বতই স্ফুরিত প্রকৃষ্ট জ্ঞান করিবে জয়,—
    সত্য-বিধৃত-আনন্দে প্রাণ পূর্ণ রবে।
মধুঋতু হাওয়া কাননভূমি যে একটি ক্ষুদ্র প্রেরণা দানে
    কত গূঢ় আর জটিল তত্ত্ব শিখাতে পারে;
মানুষের রীতি প্রকৃতিই বল, নৈতিক শুভ অশুভ জানে,
    জ্ঞানী-গুণী জন তা'র মত হেন শিখাতে নারে।
প্রকৃতি যে জ্ঞান দান করে কত মধুর সে যে! আমাদের মত
    বিকৃত করিয়া দেখিবার রীতি তাহার নয়,
সুন্দর যাহা তাহারে ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করি যে কত—
    বিশদ করিয়া জানিবারে তা'র হত্যা হয়।
বিজ্ঞান আর শিল্পকলার সাধনা হয়েছে প্রচুর জানি—
    নিষ্ফলা পুঁথিপত্রগুলিরে বন্ধ কর;
আগ্রহ ভরা হৃদয়টি এনো, আনিও দৃষ্টি সন্ধানী—
    দরশনে মন গ্রহণ করুক অধিকতর।

অনুবাদক—শ্রীসুনীলকুমার লাহিড়ী

সাহিত্যচিন্তা ও বলেন্দ্রনাথ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারের প্রকৃষ্টচিত্ত সাহিত্যসেবীদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর অন্যতম ছিলেন, এ সত্য যদি আধুনিক কালের পাঠক-সাধারণের কাছে আজকের দিনে অজ্ঞাত থেকে থাকে, তাহলে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। কারণ, স্বল্পায়ু বলেন্দ্রনাথ মাত্র উন-ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন এবং আজ থেকে প্রায় সাতান্ন বছর আগে সাহিত্য সাধনার অনিন্দ্যকর্ম অসমাপ্ত রেখেই তিনি ইহলোক থেকে বিদায় নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তদুপরি বাংলাদেশে অদ্যাবধি কবি ও সাহিত্য-সমালোচকের সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে সাধারণ পাঠক-জনের উদ্যোগ ও অধ্যবসায় নিতান্তই সীমাবদ্ধ এবং এমন কি নগণ্য। আর সে কারণেই কবি ও সমালোচক বলেন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর অকাল-মৃত্যুর এই অর্দ্ধশতাব্দীরও অধিক কাল পরে কোনো পাঠক যে বলেন্দ্র-প্রতিভার দীপ্তিতে নিজেকে উদ্দীপ্ত রাখবে, এরূপ প্রত্যাশা সচরাচর না করাই বোধ হয় শোভন।

অথচ সমসাময়িক কালের সাহিত্যচিন্তায় বলেন্দ্রনাথের অবদান নগণ্যমাত্র নয় এবং যে-পাঠক উপন্যাস ও ছোটগল্পের তরঙ্গ-সঙ্কুল তীর অতিক্রম করে সমালোচনা-সাহিত্যের যুক্তি-জালশোভিত চিন্তারাজ্যে প্রবেশ লাভের পক্ষপাতী, তার পক্ষে বলেন্দ্রনাথের সুবিন্যস্ত গদ্যরচনার আকর্ষণ তীব্র হতে বাধ্য। তাছাড়া, বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার প্রধান প্রধান উপাদান ভারতবর্ষ ও বাংলা দেশ। সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্য। ফলে, অনুসন্ধিৎসু পাঠক একবার সে চিন্তারাজ্যে পরিভ্রমণ করলে বলেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম, ঐতিহ্যবোধ ও শিল্পবোধের নিবিড় পরিচয় লাভে শুধু যে বিস্মিতই হবেন তাই নয়, আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ধারায় স্বল্পকালের জন্যে হলেও যে শক্তিমান লেখক নবচেতনার প্রাণস্পন্দন জাগাতে সমর্থ হয়েছিলেন তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গেই বোধ হয় স্মরণ করতে অনুপ্রাণিত হবেন।

বলেন্দ্রনাথ কবি ও সমালোচক। কিন্তু মাঝে মাঝে উল্লেখযোগ্য হলেও কাব্য রচনায় তাঁর অনন্যতা তেমন ধরা পড়েছে কি না সন্দেহ! পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও সর্বত্রগামী কাব্যধারার অপ্রতিরোধ্য প্রভাব যেমন আরো অনেকের কাব্য রচনায়, তেমনি ভ্রাতুষ্পুত্র বলেন্দ্রনাথের কবিতাবলীতেও কোনো না কোনো দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর সে কারণেই 'মাধবিকা' ও 'শ্রাবণী'তে (১) উল্লেখযোগ্য পদবিন্যাস বা শ্রুতিসুখকর শব্দচয়নের অসদ্ভাব না ঘটলেও রবীন্দ্রকাব্যের লাবণ্যজড়িত অনেক স্তবককেই সে-সব কবিতা অনিবার্যরূপে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে। ফলে, 'মাধবিকা' কাব্যগ্রন্থের নাম-কবিতাটি এবং 'কলবেদনা' 'বিষামৃত' 'অকলঙ্ক' কিংবা 'শ্রাবণী' কাব্যগ্রন্থের 'অন্তরবাসিনী' 'অপরাহ্নে' 'দ্বিধা' ইত্যাদি কবিতা যদি 'চিত্রা' বা 'মানসী'র অন্তর্গত কবিতাগুচ্ছের প্রতিধ্বনি হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে অবাক হবার বোধ হয় কারণ থাকে না। কিন্তু তবু একথাটাও স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, বলেন্দ্রনাথের কবিতাবলী রবীন্দ্রকাব্যের প্রতিধ্বনি হলেও কাব্যরসের আস্বাদন সে ক্ষেত্রেও সম্ভব; এবং বলেন্দ্রনাথ যে কালে এই কবিতাগুলো লিখেছিলেন সে কালে রবীন্দ্রকাব্যের ভাব, ছন্দ ও ভাষার হুবহু অনুসরণে কাব্যরচনায় রেওয়াজ প্রচলিত থাকায় সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে 'মাধবিকা' কি 'শ্রাবণীর' কবিতা উপযুক্ত মর্যাদালাভের বোধ হয় অসুবিধা ঘটেনি। তা ছাড়া বলেন্দ্রনাথ যে কবি ছিলেন একথাটা মনে রাখলে তবেই তাঁর সমালোচনাধারার একটি মূল বৈশিষ্ট্যকে অনুধাবন করা সহজ, তাঁর নন্দন-তাত্ত্বিক প্রত্যয় সম্পর্কে অবহিত হওয়া সম্ভব।

বলেন্দ্রনথের কবিতাগুচ্ছ পাঠে উপলব্ধি করা যায় যে, সে-কবিতাবলীর মাধ্যমে তাঁর কবিকল্পনা অসম্পূর্ণতা থেকে সমগ্রতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল মাত্র, সামান্য সত্তা থেকে পূর্ণাবয়ব প্রাপ্তির অপেক্ষায় নিজেকে প্রস্তুত করছিল হয়তো,—কিন্তু খুব সম্ভব তারুণ্যজনিত বয়ঃসন্ধির কারণেই সে-সব রচনায় আদর্শ কাব্যের গভীরতা ও ব্যাপ্তির সঞ্চার আর শেষ পর্যন্ত হয়নি। আর, এই কাব্যরচনার পাশাপাশি চলছিল তাঁর প্রবন্ধ রচনা। বাংলা প্রাচীন সাহিত্য, সংস্কৃত সাহিত্য ও আধুনিক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা; শেষ পর্যন্ত কবিতা রচনার অনুপ্রেরণা যেন ক্রমে-ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলো, ব্যাপক ভাবেই বলেন্দ্রনাথ বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ রচনায় ব্রতী হলেন।

বয়সে তরুণ হলেও বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা কোনো সময়েই বিশেষ কোনো একটি কেন্দ্র অভিমুখেই আবেগ-প্রবণতার সঙ্গে ধাবিত হয়নি। কাব্যরচনায় যুবকোচিত উচ্ছ্বাসের পরিচয় দিলেও প্রবন্ধ রচনায় বলেন্দ্রনাথ প্রায় গোড়া থেকেই প্রাঞ্জল ও সাবলীল অথচ সংহত গদ্যরচনার পরিচয় দিতে পেরেছিলেন এবং একমাত্র তাঁর গদ্য প্রবন্ধাবলী পাঠের মাধ্যমেই তাঁর পরিণত, বুদ্ধিদীপ্ত অনন্য-সাধারণ সাহিত্যচিন্তার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা আর আয়াসসাধ্য মনে হয় না। স্বল্পায়ু সাহিত্য-জীবনে, মাত্র চৌদ্দ বছরের মধ্যে (২) পরিমাণের দিক থেকে তিনি অজস্র রচনাই লিখেছিলেন এবং সে-সব রচনার বিষয়বস্তুও বলতে গেলে বহু ব্যাপক ও বিচিত্র ভাবেই বিভিন্ন। সমসাময়িক কালে যে-সব ঘটনা ধর্ম, সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল সে-সব সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ যে উদাসীন ছিলেন না, এতে তাঁর সংবেদনশীল, স্পর্শক্ষম মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি ছিল শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। বাঙ্গালীর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও স্বদেশপ্রেমের ধারক ও বাহক বলেন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধাবলী পাঠেও এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে। অতএব সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর সর্বদা বিচরণশীল দৃষ্টি 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' 'কণারক' 'খণ্ডগিরি' 'প্রাচীন উড়িষ্যা' 'বারাণসী' 'ভবিষ্যৎ ধর্ম' 'ভূতকথা'

---

(১) মাধবিকা (কাব্য)। ১০ই বৈশাখ, ১৩০৩। পৃঃ ৩২। শ্রাবণী (কাব্য)। ৪ঠা আষাঢ়, ১৩০৪। পৃঃ ২৬।

(২) বলেন্দ্রনাথের জন্মতারিখ ৬ই নভেম্বর, ১৮৭০। ২১শে কার্তিক, ১২৭৭। প্রথম প্রকাশিত রচনা: জ্যৈষ্ঠ, ১২৯২। মৃত্যুর সন তারিখ: ২০ আগষ্ট, ১৮৯৯। ৩রা ভাদ্র, ১৩০৬।

'লণ্ডনে কংগ্রেস' 'জাপানী সভ্যতা' 'বর্মার ডাকাত' ইত্যাদি হরেক রকম বিষয়ের ওপরও ন্যস্ত হতে পেরেছিল এবং এমন কি 'লোক-সংখ্যাবৃদ্ধি ও আহার্যসংস্থান' 'সশস্ত্র য়ুরোপ' 'খ্রীষ্টীয় নরক' ইত্যাদি সমস্যা সম্পর্কেও তিনি প্রয়োজনের তুলনায় বোধ হয় কম অবহিত ছিলেন না। এ থেকে বোধ হয় এ সত্যই প্রমাণিত হয় যে, তরুণ বয়স থেকেই বলেন্দ্রনাথ স্বদেশ ও সভ্যতায় অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় বিষয়ের আলোচনায় উৎসাহী ছিলেন এবং এ সকল ব্যাপারে তিনি বরাবরই গভীর ভাবে চিন্তা করতে ভালোবাসতেন।

সাহিত্য বিষয়ক মূল রচনাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে অপর একটি প্রসঙ্গ অনুধাবনযোগ্য। স্বদেশ ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণা কোনো একটি বিশেষ কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে কার্য উপলক্ষে যাতায়াতের সময় নানা অঞ্চলের আন্তর মাহাত্ম্য তাঁর নজরে পড়েছিল, ফলে, উড়িষ্যা, গুজরাট, লাহোর, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি স্থান সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক বর্ণনায় তিনি সংস্কৃতিসমৃদ্ধ পর্যটক মনের বিস্ময়-মধুর নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পেরেছেন। নিছক স্থান-বিশেষের ভৌগোলিক বর্ণনায় নয় পরন্তু বলেন্দ্রনাথ যখনই ভারতবর্ষের কোনো উল্লেখযোগ্য স্থান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তখনই সে-স্থানের ইতিহাস ও নানা কীর্তি-কাহিনীর মধ্যে ভারত-আত্মার বাণীকে খুঁজে বেড়িয়েছেন। 'উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র' 'কণারক' 'খণ্ডগিরি' প্রভৃতি প্রাচীন পীঠ-স্থানের বর্ণনায় তার প্রমাণ রয়েছে। বলেন্দ্রনাথের মধুর ও সাবলীল গদ্যভঙ্গি যে এই বর্ণনাকে প্রাণময় করেছে, কণারক সম্পর্কিত গদ্য রচনার কোনো-কোনো স্তবক থেকেই সে-দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা সম্ভব। (৩) আধুনিক কালের রঙ্গভূমিতে দাঁড়িয়ে প্রাচীন কালের লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতির বিরাটত্ব ও ব্যাপ্তিকে উপলব্ধি করার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে একটি অবচেতন অভাববোধ হানা দিতে থাকে; যে ঐশ্বর্য একদিন ছিল, আজ আর নেই; যাকে অনুমান বা উপলব্ধি করা যাচ্ছে অথচ দৃষ্টিগোচর বা ইন্দ্রিয়গম্য নয় তার জন্যে তীব্র, মধুর খেদোক্তি দিয়েই বলেন্দ্রনাথ অনেক সময় তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। (৪) 'প্রাচীন ভারতবর্ষে একটি সুন্দর পরিপাটি সংস্কৃত সভ্যতার অস্তিত্ব সম্বন্ধে' পাঠকমনে চৈতন্যবোধের সঞ্চারই তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই এবং এ বিষয়ে যে তাঁর স্মৃতিচারণা (৫) সার্থক হয়েছে, একথা অস্বীকার করবার বোধ হয় উপায় নেই। বোম্বাই প্রদেশে গণেশ উৎসবে এবং গুজরাটে গরবা উৎসবেও বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের অস্তমিত প্রাণচাঞ্চল্যকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অন্যান্য প্রদেশে বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষে মেয়েদের 'প্রমত্ত উৎসাহবেগের তুলনায় বাংলার বরাঙ্গনাদের অপেক্ষাকৃত স্তিমিত আচরণের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। (৬) যেখানেই সম্ভবপর তিনি প্রাচীন সংস্কৃতি ও অনুসন্ধান সম্বন্ধে সার্থক মূল্যায়নের চেষ্টায় উদ্যোগী হয়েছেন। আজকালকার ড্রইংরুম-নিবাসী শৌখীন সংস্কৃতিবিলাসীদের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য এইখানটায়

---

(৩) "সেই পুরাতন দিন—যখন এই মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণ যাজক যজ্ঞোপবীতজড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্যোদয় অবলোকন করিতেন, নীল জল শুভ্র আনন্দে তাঁহাদের পদতলে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতিভরে অরুণিম আশীর্বাদধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য নানা দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত, তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্ক মন্দিরের মধুর ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত; এবং দেবতার যশঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত।..." বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী। পরিষদ সংস্করণ। ৫৩৩ পৃষ্ঠা।

(৪) "পরিত্যক্ত পাষাণ স্তূপের নির্জন নিকেতনে নিশাচর বাদুড় বাসা বাঁধিয়াছে, হিমশিলাখণ্ডোপরি বিষধর ফণিনী কুণ্ডলী পাকাইয়া নিঃশঙ্ক বিশ্রাম সুখে লীন হইয়া আছে; সম্মুখের ঝিল্লি-মুখরিত প্রান্তরদেশ দিয়া গ্রাম্য পথিক জন যখন কদাচিৎ দূর তীর্থ উদ্দেশে যাত্রা করে, একবার এই জীর্ণ দেবালয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে চাহিয়া দেখে এবং বিলম্ব না করিয়া আসন্ন সূর্যাস্তের পূর্বেই দ্রুতপদে আবার পথ চলিতে থাকে।—কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত, যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে এবং অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণ পাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মত বোধ হয়।" বলেন্দ্র গ্রন্থাবলী। সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণ। পৃষ্ঠা ৫৩৫—'৩৬।

(৫) '...কোথায় সে নিত্য নব কবরীর শোভা, কোথায় সে বিচিত্র কেশবিন্যাসের সহিত সুশোভন বিবিধ অলঙ্কার, কোথায় সে মৃণালভুজে চারু বলয়কঙ্কণ!' বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। পৃঃ ৫৩৭।

(৬) "...নিরানন্দ বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের আর সর্বত্রই প্রকৃতির সহিত নারীহৃদয়ের একটা প্রকাণ্ড সমবেদনা দেখা যায়। কোথাও বা বর্ষায়, কোথাও শরতে, কোথাও বা নব বসন্তে—হয়, পর্যাপ্ত পুষ্পপল্লবের বিকাশে, নয়, স্নিগ্ধ সজল সঘন নবমেঘের সমাগমে, নয় শিশির মণিখচিত কনক শস্যরাশির প্রচুর পরিণতিতে রমণীগণ মঙ্গলগান এবং আনন্দনৃত্য সহকারে প্রকৃতির উৎসবে যোগদান করিয়া থাকেন। মূঢ় প্রকৃতি যখন কেবল সমীরোচ্ছ্বাসে ঘনঘটায়, ফুলেফলে পল্লবে নব নব প্রাণ সঞ্চারের আনন্দ মূকভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করে, তখন দয়মানা প্রমদাগণ তাহাকে সুকণ্ঠের সঙ্গীতময় বাক্যময় ভাষা অর্পণ করিয়া বিশ্বব্যাপী আনন্দ প্রকাশকে সম্পূর্ণতা দান করেন। তাহা দেখিয়া মনে হয়, নারীগণ যেন আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী অন্তরঙ্গ ভাবে আত্মীয় ভাবে বিশ্বপ্রকৃতির সন্নিকটবর্তী হইয়া আছেন;—যে নিগূঢ় প্রাণপূর্ণ পুলক-চাঞ্চল্য মাটির ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া অপূর্ব ইন্দ্রজালে শাখায়-শাখায় পুষ্পস্তবক এবং ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে শস্যমঞ্জরী বিরচিত করিয়া দেয়, তাহা অলক্ষিত ভাবে রমণীগণের সুকুমার দেহলতিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া নৃত্যে এবং গীতে স্বতঃই বিকশিত হইয়া উঠে। উন্মুক্ত আকাশতলে পৃথিবীর সৌন্দর্যসভায় বিশ্বলক্ষ্মীর সহিত আমাদের গৃহলক্ষ্মীদের এই কোলাকুলি, এই প্রকাণ্ড প্রীতিসম্ভাষণ, এমন শোভন সুন্দর দৃশ্য আর কি কিছু আছে? কিন্তু হায়, সমস্ত বঙ্গদেশে বসন্ত হইতে হেমন্ত পর্যন্ত সমস্ত ঋতুর পর্যায়ে স্ত্রীকণ্ঠের সঙ্গীত একেবারেই নীরব।..." গুজরাটে গরবা। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। পৃষ্ঠা ৫৫৩-৫৫৪।

যে, কয়েকটি দুর্বোধ্য চিত্রপট, পুতুল ও ফুলের টবে ঘর ও বারান্দা সাজিয়েই তাঁর উত্তম নিঃশেষিত হয়ে পড়েনি, পরন্তু, যেখানেই সম্ভব প্রাচীন নগর, পুরাতন স্থপতি বা শিল্পকার্য এবং ধ্বংসাবশেষের মুখোমুখী হয়ে তিনি অতীতকালের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ভিত্তিমূলে পৌঁছাবার চেষ্টা করেছেন। ফলে, সমগ্রভাবে না হলেও বলেন্দ্রনাথের কবিকল্পনায় স্বদেশ ও সভ্যতার অতীত গৌরবের স্মৃতিসুখকর চিত্র মূর্ত হয়েছে এবং সে-বৃত্তান্ত পাঠে পাঠক-মনেও ভাবাবেগ ও বিচিত্র অনুভূতির সঞ্চার সম্ভব হতে পেরেছে। 'দিল্লীর চিত্রশালিকা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটিতে চিত্রকলার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ যে বিস্তারিত বক্তব্যের অবতারণা করেছেন তা' থেকেও এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হবে। পুরাতন চিত্রপট সম্পর্কে বলেন্দ্রনাথ যে 'বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে'র উল্লেখ করেছেন (৭) তাঁর এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিতেও সেই বর্ণময়তা বিচিত্রভাবেই প্রকাশলাভ করেছে। মনে রাখা দরকার, বলেন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লিখেছিলেন ১৩০৫ সালে, অর্থাৎ, আজ থেকে প্রায় আটান্ন বছর আগে; এবং একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন সেকালের আর কোনো লেখক চিত্রশালা ও চিত্রকর সম্বন্ধীয় রচনায় এরূপ 'স্নিগ্ধোজ্জ্বল রমণীয় আলোক নিক্ষেপ' করতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। রচনাটি বর্তমান প্রবন্ধকারের বিবেচনায় বার-বার ক'রে পড়বার মতো এবং বলেন্দ্রনাথের সার্থক, সুরঞ্জিত ও রম্যময় গদ্যভঙ্গির অন্যতম দৃষ্টান্ত। 'রবিবর্মা' সম্পর্কিত আলোচনাটিও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে এবং তাতেও অনুরূপ প্রসাদগুণ বর্তমান।

কিন্তু বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর অজস্র সাহিত্য-বিষয়ক নিবন্ধাবলী এবং এই রচনাবলী নিঃসন্দেহেই আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। সাহিত্য ও ললিতকলা সম্পর্কিত আলোচনায় তিনি চিত্তহারী ভাষা ও অতুলনীয় গদ্যভঙ্গির যে পরিচয় দিয়েছেন তাকে বিস্ময়কর বলা চলে। আর সে-কারণেই মানসিক ভাব-কল্পনায় বলেন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য সহজেই ধরা পড়বে। সমাস-সন্ধি-অনুপ্রাসের দুর্বহ গুরুভার কোথাও তাঁর ভাষাকে রুদ্ধশ্বাস করেনি এবং যেখানেই সম্ভবপর নতুন শব্দ, নতুন উপমা ও রূপকের সাহায্যে বলেন্দ্রনাথ তাঁর ভাষায় সাবলীল গতিবেগ এবং প্রশান্ত গভীরতার ব্যাপ্তি ঘটিয়েছেন। তাঁর পদ্যরচনায় যে সীমাবদ্ধ ও চেষ্টিত আবেদন লক্ষ্য করা যায় গদ্যরচনার গোড়া থেকেই সে-দুর্বলতা তিনি এড়িয়ে এসেছেন। প্রায় গোড়া থেকেই তাঁর গদ্যরচনা সমকালীন সাহিত্যসেবীদের অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু হয়েছিল; এবং এ সম্পর্কে প্রিয়নাথ সেন একবার যে উক্তি করেছিলেন তাকে তাই অতিশয়োক্তি মনে করারও সঙ্গত কারণ নেই। (৮)

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এক জায়গায় বলেছিলেন যে, বলেন্দ্রনাথ বয়সে বালকত্ব অতিক্রম করবার আগেই প্রৌঢ়ের দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টি-ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। বলেন্দ্রনাথের নানা নিবন্ধে, বিশেষ ক'রে শেষ জীবনের রচনায় রামেন্দ্রসুন্দরের উক্তির সমর্থন প্রভূত পরিমাণেই মিলবে। প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ যুবক বয়সেই যে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তা' বিস্তারিত আলোচনার অপেক্ষা রাখে। প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে তিনি যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন এবং সে সাহিত্যের অপরিমেয় রূপরস যে তিনি প্রভূত পরিমাণে পান করিয়াছিলেন, তার নজীর তাঁর রচনায় প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে। 'উত্তরচরিত' 'কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা' 'মৃচ্ছকটিক' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ইত্যাদির আলোচনায় বলেন্দ্রনাথ অনভিজ্ঞ পাঠকসমাজের সামনে নির্মল আনন্দরসের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিতে পেরেছেন এবং এই আধুনিক কালেও যে-সব পাঠকের পক্ষে মূল সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভবপর নয়, বলেন্দ্রনাথের সমালোচনার মাধ্যমে তাঁরা মূল-সাহিত্যের আনন্দরস যে অনেকটাই আস্বাদন করতে পারবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। 'উত্তরচরিত' 'মেঘদূত' কি 'মৃচ্ছকটিকের' বাংলা অনুবাদ-কার্য বলেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল না এবং সে-চেষ্টাও তিনি করেন নি। কিন্তু সাহিত্যসমূহের আলোচনা তিনি এরূপ ভাবে করেছেন যে, যে-পাঠকের মূল রচনার সঙ্গে প্রাথমিক পরিচয়ও নেই তিনিও যাতে সে-সাহিত্যের প্রতি অভাবনীয় আকর্ষণ অনুভব করেন। বলা বাহুল্য, বলেন্দ্রনাথের জড়তাহীন সুসংস্কৃত মনের অদম্য উদ্যোগ, কবিত্বময় মাধুর্যমণ্ডিত গদ্য ও প্রকৃত রসিকজনোচিত বিচিত্র, উদার দৃষ্টিভঙ্গিই এসব আলোচনায় সঞ্জীবনীপ্রবাহের সঞ্চার করেছে।

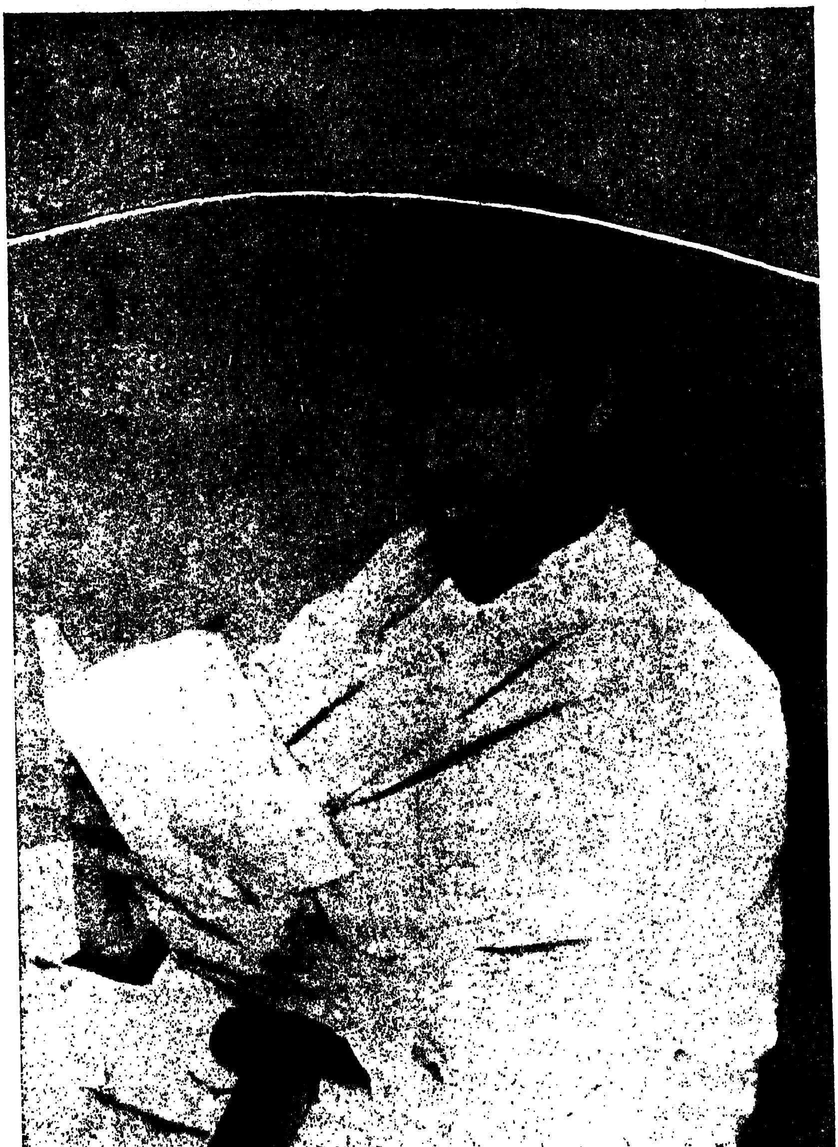
কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনার শেষে বলেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নারী এবং প্রকৃতি সৌন্দর্যের প্রতি এমন নিবিড় প্রেম অন্য কোনো কবিতে দেখা যায় না। "একটি রূপসীর চিত্র খাড়া করিয়া তুলিতে পারিলে কালিদাসের স্ফূর্তি ধরে না। সুখে দুঃখে বেদনা বিলাসে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার যেন কিছু সস্নেহ সহৃদয়তা দেখা যায় এবং স্ত্রীসঙ্গ তিনি একটু বিশেষ আনন্দলাভ করেন।" বলেন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে কালিদাসের প্রতিভায় যে বিশেষত্ব দেখা যায় 'শকুন্তলা' নাটকেই তার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয়েছে। (৯) এখানে আত্মপ্রকৃতির সমগ্র অনুরাগ সেচন করতে পারেন কালিদাস এরূপ একটি স্বভাব অনুযায়ী বিষয়ে প্রতিভাকে নিয়োজিত করতে পেরেছেন বলেই সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে শকুন্তলা এমন একটি অপূর্ব সৃষ্টি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বলেন্দ্রনাথ আরো দেখিয়েছেন যে, কালিদাসের চিত্রপ্রিয় কবিপ্রকৃতি কেবল ছবি আঁকবার জন্যেই আপন মনের মতো বিষয়টি নির্বাচন করে নিয়েছে। রঘুবংশ থেকে নানা দৃষ্টান্তের অবতারণায় তিনি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনও জুগিয়েছেন। তাঁর বিবেচনায় একটি চিত্রশালা পরিদর্শনের পর মনের ভাব যেরকম হয়ে থাকে কালিদাসের রঘুবংশ পাঠান্তেও মনের মধ্যে অনুরূপ ভাবসমূহের সৃষ্টি হয়।

---

(৭) "...আমাদের পুরাতন সূর্যালোক অবহেলালাঞ্ছিত তাহার সেই পুরাতন চিত্রপট আজিও পরিত্যাগ করে নাই। তাহা যেন কেবল এই প্রাচীন চিত্রফলক এবং যে বিচিত্র শিল্প ও কাব্যকলার মধ্যে এই চিত্রকলা চিরদিন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইয়া আসিয়াছে, তাহারই বিচিত্রাভ বর্ণসঙ্গমে একান্ত নিহিত হইয়া রহিয়াছে।..."
দিল্লীর চিত্রশালিকা। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। পৃষ্ঠা ৫৫৭-৫৮।

(৮) '..গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যের এমন কোন রহস্য বা ভঙ্গি নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিল না।..' সাহিত্য-সাধক চরিতমালা। ১৩৫৪। পৃষ্ঠা ১৮।

(৯) '...শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথাবার্তা পর্যন্ত যেন তুলি দিয়া আঁকা যায়। চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা



[বিশ্বভারতীর সৌজন্যে]

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

রঘুর নানা দেশে পর্যটন ও দিগ্বিজয়, ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভা, রাজা দশরথের মৃগয়াগমন, রামসীতার রথযাত্রা, পরিত্যক্তা অযোধ্যাপুরী,

অগ্নিবর্ণের ইন্দ্রিয়সুখসম্ভোগ—'এইগুলি ছবি—বাকি সমস্তই ফ্রেম'। কালিদাস বর্ণনায় সুনিপুণ কিন্তু চরিত্রচিত্রণে যে তেমন কুশলী হতে

ভঙ্গিতে আঁকিয়া তাহার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্যে এবং বিবিধ ভাব ও ভঙ্গিতে যত রকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন। কোথাও বা কুরবক-শাখায় বল্কল বদ্ধ হইয়া যায়, কোথাও বা প্রিয়সখী বল্কলের দৃঢ় বন্ধন শিথিল করিয়া দেয়, কোথাও বা অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে সুন্দরীর

নব কিশলয়বৎ রূপলাবণ্য ফুটিয়া পড়ে; সৌন্দর্যের কবি সৌন্দর্য ফুটাইতে ব্যাকুল—একটি বাহুভঙ্গি, একটি হৃদয়স্পন্দন, পাণ্ডু মুখ-কমলে অতি ক্ষীণ মৃদু অরুণিমাসঞ্চার এবং স্নিগ্ধদৃষ্টির নিবিড় চাঞ্চল্যটুকু পর্যন্ত তাঁহার দৃষ্টি অতিক্রম করে না।...যেখানে তপোবনের মধ্যে ঋষিবালিকার সমাবেশ করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার সেই দুই

পারেন নি সে-কথার উল্লেখও বলেন্দ্রনাথ অনেক স্থলেই করেছেন। তা ছাড়া, খণ্ড-খণ্ড চিত্র এবং ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কারুকৌশলের প্রতি কালিদাসের বিশেষ দৃষ্টি ও ঝোঁক থাকাতে অনেক সময় বৃহৎ চিত্ররচনায় তিনি যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য হতে পারেন নি এবং এই কবি যে নিপুণ চিত্রকর হয়েও তাঁর অতিনৈপুণ্য বশতঃই হিমালয় ও সমুদ্রবর্ণনায় অকৃতকার্য হয়েছেন সে-প্রসঙ্গও মনোরম গদ্যভঙ্গির মাধ্যমে বলেন্দ্রনাথ উপস্থিত করেছেন। রামায়ণের মৃগয়াবর্ণনার পাশাপাশি কালিদাসকল্পিত মৃগয়াকে বলেন্দ্রনাথ 'সৌখীন বিলাসমাত্র' বলে অভিহিত করেছেন এবং ভবভূতি যেস্থলে একটিমাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্বতের অন্ধকার অরণ্য চোখের সামনে উপস্থিত করতে পেরেছেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়তে পারেননি একথার উল্লেখ করেই তাঁর বক্তব্যের উপসংহার ঘটেছে।

বলেন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তা সমগ্রতার সন্ধানী। ফলে, সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনায় প্রথমেই পটভূমির বিস্তৃত বিবরণী তিনি স্পর্শক্ষম পাঠক-পাঠিকার সম্মুখে উপস্থিত করার পক্ষপাতী। সুতরাং যে-পাঠকের মূল বিষয়-বস্তু সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাও নেই তাঁর পক্ষেও মনোযোগী হলে মূল বিষয়ের রস ও সৌন্দর্য সম্বন্ধে আভাস পাওয়া সম্ভব। 'মৃচ্ছকটিক' 'রত্নাবলী' 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ইত্যাদি প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের আলোচনায় তার প্রমাণ চূড়ান্তভাবেই উপস্থিত। এমন কি 'মেঘদূত' "ঋতুসংহার' কাব্যসাহিত্যের চিন্তাশীল আলোচনায়ও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের লিপিচাতুর্যের গুণে পাঠক গলদ্ঘর্ম না হয়েও তাঁর বক্তব্যের মর্মমূলে গিয়ে পৌঁছাতে পেরেছেন এবং সে-স্থান থেকেই ধীরে-ধীরে শাস্ত্র পদক্ষেপ সমালোচক-প্রদর্শিত কবিকল্পনার বৈচিত্র্য-বিচ্ছুরিত সমতল পথে আনন্দের সঙ্গে বিচরণ করতে সমর্থ হয়েছেন। 'মৃচ্ছকটিক' প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথ মূল সংস্কৃত রচনার অনুসরণে রাজনটী বসন্তসেনার প্রাসাদের যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে নাটকের সেই বিশেষ দৃশ্যটি অভিভূত পাঠকের চোখের সামনে মূর্ত হয়ে উঠেছে বলতে পারা যায়। এখানেই বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা স্বতন্ত্র শিল্পকর্মে রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ কৃত বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহের' সমালোচনার মতোই বলেন্দ্রনাথের অনেক সাহিত্য-বিষয়ক আলোচনাও তাই যথার্থ সৃজনশীল সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হতে পারে। শুধু লেখকরাই যে সৃষ্টি করেন না, প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ ও রসসন্ধানী সমালোচকরাও যে সৃষ্টি করতে পারেন, বলেন্দ্রনাথের নানা রচনায় তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

সৃজনীশিল্পই হোক বা সমালোচনাশিল্পই হোক, তার প্রধান অবলম্বন ভাষা এবং সে-ভাষায় বলেন্দ্রনাথের দখল অসাধারণ ছিল বলেই, সমালোচনার ক্ষেত্রে তিনি অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিলেন।

অনুরাগের (নারী এবং প্রকৃতিসৌন্দর্যের প্রতি অনুরাগ) মিলন হইয়াছে। নগরবাসী রাজা, তপোবনের পালিত মৃগসেবিত তরুকুঞ্জের মধ্যে একটি ঋষিকুমারীর—একটি অনাঘ্রাত পুষ্পের সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া যে একটি নাট্য ব্যাপার ঘটাইয়া তুলিয়াছেন, তাহা যেন কবির নিজের কামনাস্বপ্ন।...' বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী। পৃষ্ঠা ১৩ ও ১৪।

এ সম্পর্কে তাই প্রিয়নাথ সেনের উক্তিকে (১০) অতিশয়োক্তি মনে করার কোনো সঙ্গত কারণ আছে কিনা সন্দেহ! প্রকৃত প্রস্তাবে যে মুষ্টিমেয় শক্তিমান গদ্যলেখক আধুনিক বাংলা ভাষায় বৈচিত্র্য, দীপ্তি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে পেরেছেন, বলেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহেই তাঁদের প্রথম সারিতে দণ্ডায়মান এবং মধুর ও চিত্তহারী বর্ণনার ক্ষেত্রে সমসাময়িক কালে তাঁর প্রতিযোগীর সন্ধান নিশ্চয়ই অনায়াস-সাধ্য ছিল না।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায়ও বলেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় রয়েছে। 'বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস' 'কৃত্তিবাস ও কাশীদাস' 'মুকুন্দরাম চক্রবর্তী' 'রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর' সম্বন্ধীয় তাঁর রচনাবলীপাঠে পাঠক-মনে যে অপূর্ব রসসঞ্চার হয়, তার মূল্য বড়ো অল্প নয় এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় এই রচনাবলী যে মূল্যবান উপক্রমণিকা হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে, এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় আরো একটি বিষয় নজরে পড়বে; সেটি বলেন্দ্রনাথের ঈষৎ শ্লেষমিশ্রিত মৃদু-মধুর হাস্যরস। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের লেখকদের রচনায় যেখানেই অসঙ্গতি ও নীচতা প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই বলেন্দ্রনাথ মৃদু হাস্যরস ও ঈষৎ শ্লেষের সঙ্গে তার উল্লেখ করেছেন। অতএব কবি জয়দেব সম্পর্কে তীব্র কটাক্ষ করতে তিনি ইতস্ততঃ করেননি। "...হরিকে স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয়ত তাঁহার (জয়দেবের) লক্ষ্য ছিল, কিন্তু বিলাসকলায় কুতূহল উদ্রেক করিয়া দেওয়া তদপেক্ষা গৌণ উদ্দেশ্য ছিল না।...দুর্ভাগ্যক্রমে দুর্বল মানবহৃদয় এরূপ সঙ্কটস্থলে হরি-স্মরণ অপেক্ষা বিলাসকলার দিকেই সাধারণতঃ কিছু আকৃষ্ট হইয়া পড়ে।...এই অতি সচেতন বিলাসিতাই জয়দেবের শ্রীহানি করিয়াছে।...সম্ভোগবর্ণনা তাঁহার হৃদয় হইতে সহজ আবেগভরে বাধা-বিঘ্ন ঠেলিয়া ফেলিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে নাই, বিলাস উদ্রেক মানসে ইঙ্গিতে ইসারায় নানা ছলে তিনি সমস্ত বর্ণনার মধ্যে অনেকখানি গরল সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাগরিকতা, এই ধারই সর্বাপেক্ষা জঘন্য।..." বলেন্দ্রনাথের এই সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি ও পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অন্যত্রও উপস্থিত। কবিকঙ্কণচণ্ডী প্রসঙ্গে ধনপতি ও শ্রীমন্তের চরিত্রে কবিকঙ্কণের সৃষ্টি-কল্পনার অভাবের উল্লেখ করেও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপমিশ্রিত হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। "তাঁহার ধনপতি প্রতিদিন ঘরে-ঘরে দেখা যায়। রাগ হইল, স্ত্রীকে দুই ঘা বসাইয়া দিয়া ধনপতি স্থির হইলেন। তাঁহার কাপুরুষত্বও মনে হয় না, স্ত্রীকে সম্মান প্রদর্শন বলিলে অবাক হইয়া

(১০) "...সে গদ্য সকল কথা কহিতে জানে, সকল ভাব প্রকাশ করিতে পারে। তাহার অভিধান যেমন বিস্তৃত, তাহার ছন্দও তেমনই সুমধুর। শব্দচয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা এক একটি কথা এক একটি চিত্র এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণ-অবয়ব কথা বাংলা গদ্যে কোথাও দেখি নাই। এই বিস্তৃত অভিধান ভাষার অপূর্ব বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছেন—সে ভাষা কোথাও নিতান্ত সহজ, সরল, ভদ্র কোথাও সরসীর ন্যায় স্নিগ্ধ, কোথাও ফল-পুষ্পাভরণে বিচিত্র এবং কোথাও নক্ষত্রনিবিড় অনন্ত নৈশ গগনের ন্যায় সমুজ্জ্বল।..." সা, সা, চ, পৃঃ ২১।

থাকেন মাত্র।…শ্রীমন্তের ভাবও পিতার মত।…সুশীলাকে বিবাহ করিয়াই জয়াবতীর পাণিগ্রহণ করিতে শ্রীমন্তের বিশেষ সঙ্কোচ বোধ হইল না।…শ্রীমন্ত একীকরণ, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে মিলন, এ সকলের বড় ধার ধারে না। হয়ত তাহার অর্থই বুঝে না, এমনতর কতকগুলো বড় বড় কথা উচ্চারণ করিয়া তাহাকে বিবাহকার্য সম্পন্ন করিতে হইয়াছে। স্ত্রী সেবা করিতেই আছে। সুতরাং পঞ্চাশটা বিবাহ করিলে চব্বিশ ঘণ্টা পাখার বাতাস খাইবার সুবিধা। জঠরানলবিহীনা স্ত্রী মিলিলে খরচের হিসাবে আরও ভাল। শ্রীমন্ত, বোধ হয়, এই ভাবের অধিক উর্দ্ধে উঠে নাই।… কবিকঙ্কণের যে কল্পনার অভাব, তাহা উন্নত, মহান, গম্ভীর কল্পনা। লাগাম-ছাড়া কল্পনা আলস্যের চির সহচর। আমাদের তাহার অভাব হইতেই পারে না। কবিকঙ্কণ যে তেমন কবি ছিলেন, তাহাও নহে। লেখক একজন তিনি বটে।…" এবং এই প্রবন্ধেই অন্যত্র "দুর্বলা হাট হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিল। মুকুন্দরাম তাহার এক নিখুঁত হিসাব দিয়াছেন; হাট-বাজারে মুকুন্দকে কেহ ঠকাইতে পারে না।…" এবং এরূপ নানা মন্তব্য বলেন্দ্রনাথের নানা রচনায় নজরে পড়বে। পুরাণের দেবদেবী সম্পর্কে বাঙালী কবির সহজাত রূপকল্পনা প্রসঙ্গেও তাঁর সাহিত্যচিন্তার অনন্যতা প্রমাণিত হবে। 'শিব' সম্বন্ধীয় নিবন্ধটি এদিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এবং 'বাংলা সাহিত্যে দেবতা' নিবন্ধটি দ্রষ্টব্য। তাছাড়া, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনায়ও যে বলেন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন 'কুন্দনন্দিনী ও সূর্যমুখী' রচনাটিকে তার প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করা যেতে পারে।

মাসিকপত্রে বিক্ষিপ্ত রচনায় বলেন্দ্রনাথ বহু বিষয়ে লিখেছেন। সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ বর্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। শুধু একথাটাই জোর দিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে যে, বলেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ কবিকল্পনা ও চিত্তহারী ভাষার মণিকাঞ্চন সংযোগে তাঁর সাহিত্যচিন্তা সংযত ও সুগভীর আনন্দরসের জগৎকে উন্মোচিত করেছে। এমন কি, বিশেষ এক-একটি ভাব নিয়ে লেখা তাঁর ছোট ছোট 'ব্যক্তিগত' প্রবন্ধেও এই বৈশিষ্ট্য বর্তমান। বাংলা সাহিত্যে যে অল্প ক'জন লেখক বিস্ময়কর ও বিচিত্রভাবে সৃজনশীল সুস্থ মানসিকতার পরিচয় দিতে পেরেছেন বলেন্দ্রনাথকে তাঁদের অন্যতম বলে মেনে নিতে বাধা নেই। ভাষা গঠনে ও ভাবপ্রকাশের ভঙ্গিতে তিনি যে গোড়া থেকেই স্বকীয়তা অর্জন করেছিলেন একথার উল্লেখ আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর বলেন্দ্রনাথের আদি গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় করেছিলেন (১১) এবং সে-উক্তি যে অতিশয়োক্তি নয়, তা বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী পাঠে অতি-আধুনিক কালের পাঠকও উপলব্ধি করতে পারবেন। কাব্যে যে ছন্দলীলা কাব্যপাঠককে মাতায় সেই ছন্দই ভাবের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে তাঁর গদ্যরচনায় প্রাণের প্রসার ঘটিয়েছে।

বলেন্দ্রনাথের সাহিত্য-চিন্তায় যে-সব প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার অনুরূপ আলোচনা বেশী দেখা যায় না। সে-কারণেই বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী সৎসাহিত্যের অনুসন্ধানী পাঠকসম্প্রদায়ের সুবিবেচনার অপেক্ষা রাখে। একজন জীবনীকার বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিচিত্র প্রবন্ধ' বইটিতে বাংলা সাহিত্যে যে নবধারার প্রবর্তক, বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধ সমূহে সেই ধারারই পূর্ণ পরিণতি দেখতে পাওয়া যায়। (১২) অন্ততঃ বলেন্দ্রনাথের অনেক গদ্য রচনা পাঠে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য ও ভাষার অপূর্ব মাধুর্যের আস্বাদ যে লাভ করা সম্ভব, এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই। এক-এক সময় ভ্রম হয় বুঝি রবীন্দ্র রচনাই পড়ছি! আর সে কারণেই বলেন্দ্রনাথের অকালমৃত্যুর প্রসঙ্গ পাঠকমনকে গম্ভীরভাবে নাড়া দেয়। তাঁর রচনাবলীর মাধ্যমে 'the realisation of a purpose' নয়, কিন্তু 'the realisation of a possibility' সম্বন্ধেই সজাগ হতে হয়। রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী সুদীর্ঘ কাল সাহিত্যসাধনার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং তার ফলে বাংলা সাহিত্য নানা দিক থেকেই সমৃদ্ধ হয়েছে। বলেন্দ্রনাথ দীর্ঘায়ু হলে এবং সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখার সুযোগ পেলে আধুনিক বাংলা সমালোচনা যে সমৃদ্ধতর হ'তো একথা বোধ হয় অনুমান করা চলে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে তাঁর কাছ থেকে যে রচনাবলী পাওয়া গিয়েছে বাংলাসাহিত্যে তা' শুধু মূল্যবান সংযোজনমাত্র নয়, বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত উপেক্ষিত ও স্বল্প-আলোচিত দিকটার ওপর তার ফলে নতুন আলোকসম্পাত হয়েছে বলতে পারা যায়। সংখ্যার দিক থেকে মুষ্টিমেয় হলেও আধুনিককালের যে-সব পাঠক-পাঠিকা সৎসাহিত্যের আলোচনায় আস্থাবান এবং সাহিত্য সমন্বয় ও সমগ্রতার সন্ধানী বলেন্দ্রনাথের রচনাবলী তাদের মূল্যবান প্রাণসূত্রের সন্ধান দেবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

---

(১১)…"শুনিয়াছি, বলেন্দ্রের ভাষা তাঁহার সাধনার ফল, শিক্ষানবিশী অবস্থায় কাটিয়া ছাঁটিয়া পালিশ করিয়া তিনি ভাবের উপযোগী ভাষা গড়িয়া লইয়াছিলেন। অলঙ্কারের বোঝা চাপাইয়া ভাষাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতা দিবার চেষ্টা করিতেন না, কিন্তু শব্দগুলিকে বিশেষ বিবেচনার সহিত বাছিয়া লইয়া কোথায় কোন্‌টি বসিলে মানাইবে ভাল, তাহা স্থির করিয়া ও গাঁথনির দৃঢ়তার দিকে নজর রাখিয়া তিনি যত্নের সহিত শব্দের মালা গাঁথিতেন। কাজেই তাঁহার ভাষা কারিকরের হাতের অপূর্ব কারুকার্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐশ্বর্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার জন্য যে সুরুচির, যে সামঞ্জস্য বুদ্ধির, যে সংযমের প্রয়োজন ছিল, তাহা প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ভাষার প্রতি এইরূপ যত্ন অতি দুর্লভ, অধিকাংশ লেখক ভাষাকে কেবল ভাবপ্রকাশের যন্ত্রমাত্র দেখেন, উহাকে কারুশিল্পের হিসাবে দেখেন না। বলেন্দ্রের ভাষায় যে স্নিগ্ধ, কোমল, প্রশান্ত উজ্জ্বলতা আছে, তাহা চোখ ঝলসাইয়া দেয় না, কেবলই তৃপ্তি উৎপাদন করে।…" সজনীকান্ত দাস কৃত বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(১২) বলেন্দ্রনাথ ও বাংলা-সাহিত্য। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালার অন্তর্ভুক্ত জীবনী দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ১৬। ১৩৫৪

গৃহদাহের ট্রাজেডির সামাজিক পটভূমিকা

সুনীল ঘোষ

শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে 'গৃহদাহে'র স্থান প্রথম শ্রেণীতে। ঘটনাবিন্যাস, পরিস্থিতি এবং মনোবিশ্লেষণ, ভাষা, চরিত্র চিত্রণ ইত্যাদির দিক দিয়ে "গৃহদাহ" সত্যিই বাঙলা সাহিত্যের এক অতুলনীয় সম্পদ! কিন্তু এর শ্রেষ্ঠত্ব শুধু লেখকের এই কারিগরি মুন্সিয়ানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। সমাজজীবনের নিখুঁত এবং বাস্তব রূপায়ণের মধ্যেই 'গৃহদাহে'র প্রকৃত শ্রেষ্ঠত্ব এবং সৌন্দর্য নিহিত। সেই হিসেবে 'গৃহদাহ' রস-সাহিত্যের বাঁধ ভেঙে যেন ইতিহাসের পাদস্পর্শ করতে চেয়েছে। লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের মধ্যবিত্ত বাঙালী জীবনের যে দ্বন্দ্ব এবং ট্রাজেডি মূর্ত্ত হয়ে উঠেছে, তিনি সেই ট্রাজেডিকেই মহান শিল্পী হিসেবে যথাযথ ভাবে তুলে ধরেছেন আমাদের চোখের সামনে।

বনেদী সমালোচকদের দৃষ্টিতে

ক'লকাতার এক ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের শিক্ষিত সংস্কৃত তরুণী অচলার জীবনে পরস্পর-বিরোধী প্রকৃতির দুই পুরুষের আবির্ভাবের ফলে কী ভাবে একসংগে কয়েকটি মানুষ ও পরিবার প্রায় রাতারাতি বিধ্বস্ত হয়ে গেল, তারই মর্মগ্রাসী কাহিনী 'গৃহদাহ'। পড়তে পড়তে পাঠকের মনে দীর্ঘস্থায়ী বেদনার গুরুভার নেমে আসে। প্রশ্ন জাগে, এই ট্রাজেডির স্বরূপ কি এবং এর জন্যে দায়ী কে ও কেন? বনেদী সমালোচকের কাছে এ প্রশ্নের সহজ জবাব নিয়তি। তাঁরা মূলত "অচলার দোলাচল বৃত্তি"কেই দায়ী করেছেন এবং পাছে এই দোলাচল বৃত্তির কারণ জিজ্ঞাসা ক'রে আপনি তাঁদের বিব্রত করেন, সেই ভয়ে বার্নাড শ'র উক্তি উদ্ধৃত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন খ্যাতনামা সমালোচক স্পষ্টই বলেছেন যে, সমাজে নারীর একসংগে বহু বিবাহের অধিকার নেই বলেই অচলার জীবনে এত বড় ট্রাজেডি ঘটে গেল! ভদ্রলোক সম্ভবত একথাটা একবারে চিন্তা করেননি যে, বহু-বিবাহের অধিকার থাকলেও অচলার জীবনে আরও বড় ট্রাজেডি দেখা দেবার আশংকা ছিল। তখন শুধু মহিম আর সুরেশকে বিয়ে করলেই চলতো না, আরও অনেক পাণিপ্রার্থীর আবির্ভাব হ'তো এবং অচলার যে প্রকৃতি আমরা দেখেছি তাতে কাউকেই 'না' বলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। অচলার দোলাচল বৃত্তি যে 'গৃহদাহে'র ট্রাজেডির অন্যতম কারণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তাতে পাঠকের সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় না। অচলা এবং গৃহদাহের অন্যান্য পাত্র-পাত্রী যদি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ছিন্নমূল চরিত্র হ'ত এবং গৃহদাহ যদি কতকগুলো আকস্মিক ঘটনার সমষ্টি হ'ত, তাহ'লে আমরা অচলার মনের ওঠা-নামা এবং তার জীবনের উত্থান-পতনের দিকে তাকিয়ে তার মনের দ্বৈধতাকেই ট্রাজেডির মূল কারণ বলে সন্তুষ্ট হতে পারতাম। কিন্তু 'গৃহদাহে'র চরিত্র এবং ঘটনাগুলোকে আকস্মিক বলে ভাববার কোন কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। অচলা, কেদার বাবু, মহিম, সুরেশ, মৃণাল—এরা সকলেই সমাজের বহু অচলা, বহু মহিম এবং বহু সুরেশের প্রতিনিধি। সুতরাং শুধু অচলার মনস্তত্ত্ব নিয়ে ফ্রয়েডের ফরমূলা দিয়ে অঙ্ক কষে তার মনের আবর্তে ঘূরপাক খেয়ে আমরা আর যে আনন্দই পাই না কেন, গৃহদাহের ট্রাজেডির মূলানুসন্ধান করতে পারবো না।

ট্রাজেডির পটভূমি

গৃহদাহের ট্রাজেডির কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে তার চরিত্রগুলোকে সামাজিক চরিত্র হিসেবে ধরে নিতে হবে এবং সামাজিক পরিস্থিতির পটভূমিকায় গৃহদাহের ঘটনা এবং চরিত্র বিশ্লেষণ করতে হবে।

সেই পথে গেলে আমরা দেখতে পাই, গৃহদাহের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত হচ্ছে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ক'লকাতা মহানগরী। তখন সারা দেশময় একটা ভাঙা-গড়া চলছে। গ্রামাঞ্চলে ফিউডাল ব্যবস্থা পুরোমাত্রায় বজায় থাকলেও ক'লকাতা সহরের আবহাওয়ায় পুরোপুরি বুর্জোয়া ছাপ। এখানকার ধ্যান-ধারণা, চাল-চলন, আদান-প্রদানে পুরাতন ফিউডাল আমলের ন্যায় নীতির প্রভাব আর নেই। তার স্থান দখল করেছে বুর্জোয়া-ধ্যান ধারণা ও বুর্জোয়া আদর্শ। বুর্জোয়া সমাজে "অর্থ"ই হলো 'সবার সত্য, তাহার উপরে নাই'। সেখানে মানুষের সম্পর্কে পারস্পরিক প্রেম প্রীতি ভালবাসার স্থান নেই। আছে শুধু অর্থনৈতিক বিনিময়ের সম্পর্ক। ধর্ম-কাম-মোক্ষ ইহকাল-পরকাল সবই ওজন হচ্ছে অর্থের তুলাদণ্ডে। বুর্জোয়া সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের একমাত্র লক্ষ্য হলো মুনাফা। অর্থই হলো বুর্জোয়া-বিশ্বের গতিশক্তি। বুর্জোয়া সমাজটা ঘুরছে স্বার্থপরতার হাঁসকলে। সমস্ত সামাজিক সম্পর্ককে এই ভাবে ব্যবসায়ী লেন-দেনে এনে দাঁড় করানোর ফলে একান্ত আবেগের সম্পর্ক, এমন কি নর-নারীর যৌন সম্পর্ক পর্যন্ত তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। গৃহদাহের দম বন্ধ করা ট্রাজেডির মধ্যে আমরা সেই বুর্জোয়া সমাজ-আদর্শের ভয়াবহ পরিণামই দেখতে পেলাম। মানুষের হৃদয়ের সম্পদ বাইরের ধনসম্পত্তির সর্বগ্রাসী আগুনে কি ভাবে জ্বলে-পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে, বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় তারই জীবন্ত প্রতীক 'গৃহদাহ'। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে শ্রেণীস্বার্থের নিয়ত সংঘাত কোথাকার মানুষ যে কোথায় চলে যেতে পারে তার জ্বলন্ত উদাহরণ গৃহদাহের চরিত্রগুলো।

নায়কের দারিদ্র্য

গৃহদাহের ট্রাজেডির মূলে আছে মহিমের দারিদ্র্য। সেটা বনেদী সমালোচকদের নজরে পড়ুক আর নাই পড়ুক, লেখকের দৃষ্টি এড়ায় নি। সুরেশ তার মৃত্যুশয্যায় সেকথা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছে মহিমের কাছে। "অচলা যে তোমাকে কত ভালোবাসতো সে আমিও বুঝিনি, তুমিও বোঝনি—ও নিজেও বুঝতে পারেনি। সেটা তোমার দারিদ্র্যের সাথে এমন ঘুলিয়ে উঠলো…।" গৃহদাহের প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নানা ঘটনার মাঝখান দিয়ে এই সত্যই প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের প্রেম প্রীতি স্নেহ ইত্যাদি বৃত্তিগুলো যত মহৎই হোক, বুর্জোয়া সমাজে ধনসম্পত্তির দাঁড়িপাল্লায় তুললে সেগুলো তুচ্ছ এবং অকিঞ্চিৎকর হ'য়ে যায়। ধনীরা স্রেফ অর্থের জোরে মানুষের পবিত্রতম সম্পর্ককে কতখানি কলুষিত করতে


LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
সুস্থ লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে চান করে
— এতে দৈনন্দিনের * ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়।
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি,
তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের
প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোকমাত্রেই
লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত
রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

পারে এবং নিজের ব্যক্তিগত ভোগসুখের জন্যে একসংগে কত মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, তা-ও আমাদের চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

নতুন বুর্জোয়া সমাজ

আগেই বলেছি গৃহদাহ কলকাতার কাহিনী। সুরেশ হলো এই শহরের ধনী। অচলা ক্ষয়িষ্ণু নিম্ন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্ম-পরিবারের মেয়ে, আর মহিম এসেছে একেবারে দরিদ্র (মধ্যবিত্ত) পরিবার থেকে। অর্থের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন কলকাতার ধনী সুরেশ পৃথিবীটাকে দেখে নিজের শ্রেণী-দৃষ্টি দিয়ে। তার নাস্তিকতার পেছনে কোন সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক জ্ঞান নেই, আছে ফিউডাল আমলের পুরাতন এবং মুনাফা লাভের অনুপযোগী সমস্ত ভাবপ্রবণতা ও হৃদয়াবেগকে নস্যাৎ করার দম্ভ। নিজের শক্তি ছাড়া আর কোন শক্তিকে সে স্বীকার করতে চায় না এবং তার এই শক্তির উৎস যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধনসম্পদ, তা-ও সে জানে। তার বস্তুবাদ হচ্ছে ইতর বস্তুবাদ। "সংসারে ভোগ ছাড়া সে আর কিছুই বোঝে না।" ভোগের আয়োজনও প্রচুর। এই সমাজে টাকা থাকলে ভোগ্যবস্তুর অভাব হবার কথাও নয়। তার ভোগের ধারণাটা স্থূল। "সে নাস্তিক, সে আত্মা মানে না। যে প্রস্রবণ বহিয়া অনন্ত সৌন্দর্য নিরন্তর ঝরিতেছে, সেই অসীম তাহার কাছে মিথ্যা। তাই স্থূলটার প্রতিই সমস্ত দৃষ্টি একাগ্র করিয়া সে নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল "ওই সুন্দর দেহটাকে দখল করার মধ্যে (অচলার দেহ) তাহার পাওয়াটা আপনা আপনিই সম্পূর্ণ হইয়া উঠিবে।" মৃত্যুর আগে সে অচলার কাছেও স্বীকার করেছে, "আমার ধারণা, মানুষের মন বলে স্বতন্ত্র কোন একটা বস্তু নেই। যা আছে তা এই দেহটারই ধর্ম। ভালবাসাও তাই। ভেবেছিলাম তোমার দেহটাকে পেলে মনটাও পাবো, তোমার ভালবাসাও দুষ্প্রাপ্য হবে না।" সুরেশ এখানে নিজের ধ্যান ধারণা যা প্রকাশ করছে, তা আসলে ধনিক শ্রেণীরই জীবন দর্শন। বাজারী কেনা-বেচা তেজী-মন্দার অভিজ্ঞতায় আচ্ছন্ন তাদের দৃষ্টি। বাজারে টাকা দিয়ে স্থূল জিনিস সবই কিনতে পাওয়া যায়, এমন কি সুন্দরী নারীর দেহও। কিন্তু বাজারে কুরূপা নারীরও মন কিনতে পাওয়া যায় না। তখন ব্যাপারীরা ভাবতে পারে, মন বলে কিছু নেই। থাকলে বাজারে মিলত। যেখানে বাঘের দুধও অমিল নয়, সেখানে মানুষের মনও অমিল হত না। মন বলে কিছু নেই স্বীকার করে নিলে ও সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন তখন আর তার কাছে সমস্যার আকারে দেখা দেয় না। মনের অস্তিত্বে অনাস্থা প্রকাশ করার পর যদি কেউ বলেন, সুরেশ অচলার প্রেমে পড়েছিল তা হলে আর যাই হোক, সেটা সত্যি কথা হবে না। প্রেম হচ্ছে মনের ধর্ম, অবশ্য দেহকে বাদ দিয়ে নয়। কারণ দেহ ছাড়া মনের অস্তিত্ব নেই। যে মনকেই স্বীকার করে না তার আবার প্রেম কিসের? আসলে নারী তার কাছে নিছক ভোগের আয়োজন। অচলার দেহটা দেখে সে প্রলুব্ধ হয়েছিল। ধনীর লোভ বড় সাংঘাতিক! যা তার ভাল লাগে সেটাকে সে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায়। ভাল জিনিস, হয় সে একা ভোগ করবে না হয় তাকে সে ধ্বংস করবে। কাউকে ভোগ করতে দেবে না। এই প্রসঙ্গে পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাবের উল্লেখ করা যেতে পারে। আমেরিকা হাইড্রোজেনের গদা ঘুরিয়ে এই কথাই কি বলতে চাইছে না যে, হয় সে বিশ্বপ্রকৃতিকে একা ভোগ করবে, না হয় হাইড্রোজেনের গুঁতোয় পৃথিবীকে রসাতলে দেবে। সুরেশের মনোভাবও তাই। অচলার মত 'ভোগ্যবস্তু' যখন তাকে প্রলুব্ধ করেছে তখন সেটা একা ভোগ না করতে পারলে তার জীবনই বৃথা। সে জানে, অচলা তার বাল্যবন্ধু মহিমের বাগ্দত্তা। কিন্তু শ্রেণীসুলভ নির্মম স্বার্থপরতা তার বন্ধুবাৎসল্য এবং চক্ষুলজ্জাকে এক মুহূর্তে দাবিয়ে দিলে। ধনীর বিবেক তার স্বার্থের সীমানাকে এখনও অতিক্রম করতে পারে না। বিকৃত-বস্তুবাদী সুরেশের কাছে মনের প্রশ্ন অবান্তর—দেহটাই সব। অচলার দেহটা তার চাই-ই। সেখানে অচলা অথবা মহিমের চাওয়া না চাওয়া ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সে গ্রাহ্য করে না। গরু কিনতে গেলে গোয়ালা কি গরুর মনের খোঁজ নেয় যে, সে তার সঙ্গে আসতে রাজি আছে কি না? নেয় না। সুরেশের পক্ষে ভালো গরু সংগ্রহ করা আর অচলাকে বাগানোর মধ্যে তফাৎ হচ্ছে মাত্রার, গুণের নয়। দুটোই তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। তাই তো মৃত্যুর মুহূর্তে সে বলছে "এমন সুন্দর জিনিসটি (অচলা) মাটি করে ফেললুম; না পেলুম নিজে, না পেতে দিলুম অপরকে।" সত্যিই অচলাকে সে তার শ্রেণীদৃষ্টি দিয়ে উপভোগ্য 'জিনিস' বলেই মনে করেছে, মানুষ বলে কখনও ভাবে নি।

বুর্জোয়া সমাজে ভালোবাসা

বুর্জোয়া সমাজে যেমন ধনিকশ্রেণী কর্তা আর সবাই কর্ম, গৃহদাহেও ঠিক তারই প্রতিফলন হয়েছে। গৃহদাহের সমস্ত ট্রাজেডি সুরেশের একক ক্রিয়ার ফল। আর্থিক প্রাধান্য তাকে হটকারী, অসংযমী, এবং প্রবৃত্তির বশ করছে। বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় সে সৃষ্টি করে যাচ্ছে একা। আর সবাই তার ক্রিয়াকলাপের ঝক্কি পোয়াচ্ছে, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার শিকার হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

কেদার বাবুরা শহরের ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত। ভাবধারা এবং ব্যবহারিক জীবনের দিক দিয়ে সুরেশের সঙ্গে তাদের বিশেষ পার্থক্য নেই। কারণ, বুর্জোয়ার পৃথিবী বুর্জোয়ার মনের সুরেই বাঁধা থাকে (**Its creates a world after its own image—Communist manifesto**)। সেই পৃথিবীতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্যে প্রত্যেককে একক ভাবে লড়াই করতে হয়। তাই প্রত্যেকেই হয়ে ওঠে স্বার্থপর। কেদার বাবুরা সমাজের যে জায়গায় বসে আছেন সেখান থেকে সব সময় তাঁরা সুরেশদের দলে উঠতে চান, কিন্তু সামাজিক ব্যবস্থা সব সময় মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত তাঁদের নিচের দিকে টানে। এই দোটানায় নিজেদের আত্ম-স্বার্থের দিকে তাকিয়ে তাঁরা সুবিধাবাদের পন্থা গ্রহণ করতে বাধ্য হন। শরৎচন্দ্র কেদার বাবুর মাধ্যমে সেই সুবিধাবাদকে কী ভাবে প্রকাশ করেছেন দেখুন: "কেদার বাবু সংসারের সাধারণ দশজনের মত দোষে-গুণে মানুষ। মেয়ের বিয়েতে জামাই যাহাতে পাশ-করা হয়, অবস্থাপন্ন হয়, এই কামনাই করিয়াছিলেন। মহিম ভালো ছেলে। সে এম এ পাশ করিয়াছে, দেশে তাহার অন্নবস্ত্রের সংস্থান আছে, অতএব তাহার হাতে কন্যা সম্প্রদান করাতে তিনি সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ তাহার ধনাঢ্য বন্ধু সুরেশ যখন একদিন তাহার বাড়ীর গাড়ী করিয়া

আসিয়া একটা উলটা ধরণের খবর দিয়ে নিজেই জামাইগিরির উমেদার খাড়া হইল, তখন উভয় বন্ধুর আর্থিক সঙ্গতির হিসাব করিয়া মহিমকে বরখাস্ত করিতে কেদার বাবুর মনের মধ্যে কোন আপত্তিই উঠিল না। তিনি ভালোবাসার সূক্ষ্ম তত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতেন না, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, মেয়েমানুষ যাহার কাছে গাড়ি-পাল্কি চড়িয়া বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে, স্বামী হিসাবে তাহাকেই সকলের শ্রেষ্ঠ গণ্য করে। সুতরাং মেয়েকে সুখী করাই যদি পিতার কর্তব্য হয় ত এত বড় অযাচিত সুযোগ যে কোন মতেই হাতছাড়া করা উচিত নয়, ইহা স্থির করিতে তাহাকে অত্যন্ত বেশী চিন্তা করিতে হয় নাই।"

এখানে স্পষ্ট ভাবেই দেখা যাচ্ছে, কেদার বাবুর বিচার-বুদ্ধি অর্থনৈতিক ভাল-মন্দের হিসাব-নিকাশেই পুরোপুরি আচ্ছন্ন। সুরেশের প্রতি লোভটা তার সাধ এবং সাধ্যের বিরোধে সুরেশদের না পাওয়া গেলে অগত্যা মহিমদের দিয়েই কাজ চালাতে হয় এবং শেষ মুহূর্তে সুরেশরা এসে গেলে আবার মহিমরা বিতাড়িত হয়। এই নির্লজ্জ সুবিধাবাদ এত নিচে নামতে পারে যে, মেয়ের লোভ দেখিয়ে তার যৌবনপিয়াসী প্রেমিকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা আদায় করতেও তিনি এতোটুকু নৈতিক বাধা অনুভব করেন না।

কেদার বাবুর কন্যা এবং ক্ষয়িষ্ণু মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে হিসাবে অচলার মধ্যেও এই সুবিধাবাদ এবং অর্থপূজার মনোবৃত্তি থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। "যে সমাজ এবং সংস্কারের মধ্যে (অচলা) শিশুকাল হইতে মানুষ হইয়াছে···সেখানে পরলোকের আশায় ইহলোকের সমস্ত সুখ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করার নিষ্ঠুর নিষ্ঠাকে সে কোন দিন দেখিতে পায় নাই। সে দেখিয়াছে, পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে। যাহার প্রত্যেক নরনারী আকণ্ঠ পিপাসায় দিনের পর দিন কেবল শুষ্ক হইয়া উঠিয়াছে।" একমাত্র অর্থই এই পিপাসার নিবৃত্তি করতে পারে। সে কথা অচলা অনুভব করেছে। সুরেশের সঙ্গে প্রাথমিক আলাপে সে স্পষ্টই বলেছে, "টাকার জোর সংসারে সর্বত্রই আছে, এ তো জানা কথা।" কিন্তু এত জেনেও সে মহিমের গলায় বরমাল্য পরালো কেন? মহিম যে খুব গরীব, তা তো তার অজানা ছিল না? তবুও স্বামী নির্বাচনের ব্যাপারে পিতার মত সুবিধাবাদের পথে না গিয়ে সে হৃদয়াবেগকে প্রাধান্য দিল কেন? এইটাই অচলা-চরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এইটাই তার জীবনের প্রধান দ্বন্দ্ব। সে যদি মৃণালের মত ফিউডাল সমাজের ভাবধারায় মানুষ হ'ত, তাহলে তার মনের কুরুক্ষেত্রে মহিম-সুরেশের কুরু-পাণ্ডব লড়াই ঘটবার কোন অবকাশই থাকত না। কারণ, ফিউডাল সমাজে নারীর প্রেম ও পতিনির্বাচনের স্বাধীনতা তো দূরের কথা, তার পুরুষ-নিরপেক্ষ স্বাধীন সত্তাই স্বীকৃত নয়।

অচলা ধনতন্ত্রী সহরের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আবহাওয়ায় মানুষ। সহরের শিক্ষা-দীক্ষায় তার মধ্যে যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেছে, সেটা তাকে ব্যক্তি-স্বাধীনতার পথে এনে দাঁড় করিয়েছে। এই স্বাধীনতাবোধ পরিপূর্ণতা লাভ করেছে মহিমকে ভালবেসে। মহিম তার কাছে মুক্তির স্বাদ বয়ে এনেছে। স্বেচ্ছায় ভালবেসে পতি নির্বাচন করার মধ্যে রয়েছে তার ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি, তার নারীত্বের বৈজয়ন্তী। এই নবলব্ধ স্বাধীনতার মধ্যে যেমন একটা উগ্র ঝাঁঝ আছে, তেমনি প্রথম যৌবনের ভালবাসায় আছে একটা অতি রোমাণ্টিক আবেগ। প্রেমের রঙিন স্বপ্নে সে এত বিভোর ছিল যে, মহিমের দারিদ্র্যও নানা রঙে রঙিন হয়ে দেখা দিয়েছে তার চোখের সামনে। সুরেশ তাকে সেই দারিদ্র্যের করাল মূর্তি দেখিয়ে মনে খট্‌কা লাগিয়েছে সত্যি, তবে সে দারিদ্র্যের বাস্তব অভিজ্ঞতা তখনও সে লাভ করেনি। তাই মোহমুক্ত হবার প্রশ্ন ওঠেনি। তা ছাড়া তার সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল, "মহিম না বুঝে কিছুই করে না।" সম্ভবত তার অতি রোমাণ্টিক মন মহিমের কাছে অলৌকিক কিছু আশা করছিল। হয়ত সে ভেবেছিল, মহিম আজ দরিদ্র হলেও অদূর ভবিষ্যতেই তার সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়ে যাবে। এই সমস্ত কারণেই সুরেশের ঐশ্বর্যের টান এবং পিতার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সে মহিমকে গ্রহণ করতে পেরেছিল। তার এত বড় বিদ্রোহ কিন্তু প্রথম ধোপেই ফেঁসে গেল। বিয়ে করে মহিমের দেশের বাড়ী গিয়ে যেদিন সে দুঃখ-দৈন্যের প্রকৃত স্বরূপ দেখল, সেদিন বিদ্রোহের সমস্ত মহিমা তার কাছে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। "শ্রাবণের এক স্বল্পালোকিত দ্বিপ্রহরে, মাথার উপর ক্ষান্তবর্ষণ মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, ও নীচে সঙ্কীর্ণ কর্দমাচ্ছন্ন পিচ্ছিল গ্রাম্য পথ দিয়া পাল্কি চড়িয়া অচলা একদিন স্বামি-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এই পথটুকুতেই তাহার নব বিবাহের সমস্ত সৌন্দর্য তিরোহিত হইয়া গেল।···পাল্কি হইতে নামিয়া সে বাড়ীর ভিতরে আসিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, কোথাও কোন দিক হইতে কবিত্বের এতটুকু ইঙ্গিত তাহার হৃদয়ে আঘাত করিল না। তাহার কল্পনার পল্লীগ্রাম যে সাক্ষাৎ দৃষ্টিতে এমনি নিরানন্দ, নির্জন, মেটেবাড়ীর ঘরগুলো যে এরূপ স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার, জানলা দরজা যে এতই সঙ্কীর্ণ ক্ষুদ্র, উপরের বাঁশের আড়া ও মাচা এত কদাকার—ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারিত না। এই কদর্য গৃহে জীবন যাপন করিতে হইবে উপলব্ধি করিয়া তাহার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িতে চাহিল। স্বামিসুখ, বিবাহের আনন্দ সমস্তই এক মুহূর্তে মায়া-মরীচিকার মত হৃদয় হইতে বিলীন হইয়া গেল।"

এত দিন মহিমকে ঘিরে যে রোমান্সের স্বপ্ন ছিল এবং যে দিকে তাকিয়ে অচলা সুরেশের ঐশ্বর্যের দিকে চোখ রেখে মহিমের দিকে এগিয়ে এসেছিল, সেই স্বপ্ন টুটে গেল, বাস্তব জীবন তথা দারিদ্র্যের রুক্ষ আঘাতে। এত দিনে সে বুঝতে পারল মহিমকে গ্রহণ করার ফলে যে মুক্তির স্বাদ সে পেয়েছে, তার মূল্য বড় বেশী। দুঃখ দৈন্য দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে এই মূল্য শোধ করতে হবে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ মহিমের কাছে বেশী কিছু আশা করবার নেই। তখন থেকেই মহিমের দিকে তার মন ভাঙ্গতে সুরু করেছে। কারণ, বুর্জোয়া সমাজে দাম্পত্য সম্পর্কের ভালমন্দও নির্ভর করে স্বামি-স্ত্রীর অর্থনৈতিক বনিয়াদের উপর। মহিমের দারিদ্র্যের পটভূমিকায় সুরেশের প্রাচুর্যের চিত্রটা অচলার মনে ভেসে ওঠা স্বাভাবিক নয়। সুরেশের কাছে আত্মসমর্পণের অর্থ ছিল নিজের নবলব্ধ ব্যক্তিস্বাধীনতাকে নিজের হাতে সমাধিস্থ করে তাকে দেহ দান করা। সেটা নিজের মনে যতই গ্লানি এবং অগৌরব বয়ে আনুক, আজীবন আরাম এবং আয়েসে কাটাবার নিশ্চয়তা তাতে ছিল। বিয়ের আগে অচলার সমস্যা ছিল—প্রেম বড়, না টাকা বড়? সংসারে সর্বত্র টাকার প্রাধান্য আছে, সে কথা জেনেও প্রেমকেই সে জয়মাল্য দিয়েছিল, কিন্তু বিয়ের পর স্বামীর

ঘর করতে এসে বুঝল টাকাটাকে উপেক্ষা করা তার উচিত হয়নি। তখন তার আফশোস হল। অর্থের মানদণ্ডে পতি নির্বাচন না করে প্রেমের মানদণ্ডে পতি নির্বাচনের আফশোস। অচলার এই আফশোসের ছিদ্র ধরেই সুরেশ তছনছ করে দিল তার জীবনটাকে।

মহিমের সম্বন্ধে অচলার অরুচির আর যে-সব কারণ ছিল (মহিমের উচ্ছ্বাসহীনতা, গ্রামের সমাজে ম্লেচ্ছ বলে অমর্যাদা ইত্যাদি) সেগুলির গুরুত্ব কিছুমাত্র হ্রাস না করেও একথা স্বচ্ছন্দে বলা চলে যে, সব চেয়ে বড় কারণ অর্থ নৈতিক। বিয়ের আগেই সুরেশের ঐশ্বর্য অচলার মহিম-প্রেমে যথেষ্ট শৈথিল্য এনে দিয়েছিল। "সেদিন সুরেশের বাটী হইতে (মহিমের সঙ্গে বিয়ের আগে) এমনি এক সন্ধ্যাবেলায় এমনি গাড়ী করিয়াই ফিরিতেছিল। সেদিন তাহার (সুরেশের) সম্পদ ও সম্ভোগের বিপুল আয়োজন মহিমের নিকট হইতে তাহার অতৃপ্ত মনটাকে বহুদূরে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল।" এই অতৃপ্তি তার সুখ-সম্ভোগের সাধ অপূর্ণ থাকার অতৃপ্তি। সুরেশও এ অতৃপ্তির কথা জানত। তাই একেবারে সুরু থেকেই সে অচলার হৃদয় জয়ের জন্য কোন দুরূহ পথে না গিয়ে টাকা দিয়ে তাকে কিনে নেবার চেষ্টা করেছে। সে জানত, কেদার বাবু এবং অচলা আর যাই করুক, টাকার কাছে নতি স্বীকার না করে পারবে না।

সুরেশ তাই প্রথম পরিচয়ের দিনই মহিমের দারিদ্র্যের একটা ভীষণ চিত্র এঁকে সেই তুলনায় নিজের ঐশ্বর্যের কথা জাহির করেছে। কেদার বাবু সুবিধাবাদী বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন ঝানু লোক। কাজেই তাঁকে টলাতে এক মুহূর্তও সময় লাগেনি। অচলা কিন্তু তখনও দৃঢ় ছিল। তাই দ্বিতীয় পর্যায়ে সুরেশকে পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ দিতে হল। ঘটনাটা অচলার মনে নাড়া দিয়েছিল বোঝা যায়। কারণ, বাবার ভাবগতিক দেখে সে বুঝেছিল সুরেশের দাবী যদি বা প্রত্যাখ্যান করা যায়, তার টাকার সুদ তাকে ধরে না দিয়ে উপায় নেই। বাবা তাকে প্রকৃত পক্ষে পাঁচ হাজার টাকায় বেচে দিয়েছেন সুরেশের কাছে। নিজেকে বাজারের পণ্যের সামিল দেখে তার মনে ক্ষোভ জমেছিল ঠিকই কিন্তু সে এত বেশী নয় যে সুরেশকে 'না' বলবে। বরং দেখা গেছে, সে সুরেশকে মেনে নেবার জন্যই মনে মনে প্রস্তুত হচ্ছে। বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা। এমন কি সুরেশকে সে এ পর্যন্ত বলেছে, "তাহলে (মহিমের) খোঁজ নিয়ে একটা চিঠিতে তাঁকে সব কথা (কথাটা হচ্ছে এই যে, অচলার জীবন থেকে মহিম বাতিল হয়েছে আর তার শূন্য আসন দখল করেছে সুরেশ) জানানো বাবার উচিত। হঠাৎ কোন দিন আবার না এসে উপস্থিত হন।"

এ কথার মধ্যে ক্ষোভ থাকতে পারে কিন্তু অস্পষ্টতা নেই। কথাটা শুনে সুরেশের আনন্দ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা যে হয়নি, কারণ সে বুঝেছিল ওটা অচলার হৃদয়ের কথা নয়। তাই বলেছিল, "আমার সব চেয়ে কষ্ট হয় অচলা, যখন মনে হয় আমাকে তুমি কোন দিন শ্রদ্ধা পর্যন্ত করতে পারবে না। তোমার চিরকাল মনে হবে, শুধু টাকার জোরেই তোমাকে আমি ছিঁড়ে এনেছি।" এ সত্য অচলার চেয়ে বেশী আর কেউ জানত না। তবু সে যে তার ব্যক্তিত্ব এবং আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে আত্মবিক্রয়ের জন্যই প্রস্তুত হচ্ছিল, তাতে বোঝা যায় সুরেশের কিছু একটার প্রতি তার আকর্ষণও এসেছিল। সেটা আর যাই হোক প্রেম নয়, কারণ প্রেমের প্রধান গুণ হচ্ছে নারী ও পুরুষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা। আর এ ক্ষেত্রে সেই শ্রদ্ধা জিনিষটারই একান্ত অভাব। প্রেম বাদ দিলে আর যা বাকী থাকে সেটা সুরেশের আর্থিক স্বচ্ছলতা। (সুরেশের সম্পদ এবং সম্ভোগের আয়োজন যে তার মনটাকে অনেক দূর উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল একথা সে পরে স্বীকার করেছে।) কিন্তু অর্থের জন্য আত্মবিক্রয়ের লজ্জা এবং গ্লানি দ্বিগুণ হয়ে বাজল তার বুকে। তখন সে বিদ্রোহের পথ বেছে নিল। মহিমের আঙুলে নিজের আংটি পরিয়ে দিয়ে বলল, "তুমি কি তোমার কসাই-বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্য রেখে গেলে? যে তোমার উপর এত বড় কৃতঘ্নতা করতে পারলে, তার হাতে আমাকে ফেলে যাচ্ছ কি বলে?"

এ কথার মধ্যে যে সুরেশের প্রতি কোন অনুরাগ ফুটে ওঠেনি, তা বলাই বাহুল্য। অচলার মত ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মেয়ে প্রেমিককে বাতিল করে তার ঘৃণার পাত্র সুরেশকে গ্রহণ করবার জন্য কেন এত দিন প্রস্তুত হচ্ছিল, তার কারণ আগেই বর্ণনা করা হয়েছে।

আসলে সুরেশ এবং অচলার মধ্যে কোন সত্যিকার প্রেমের স্থান ছিল না। সুরেশের প্রতি অচলার যে দুর্বলতা, তার মূলে হৃদয়বৃত্তির স্থান নেই, আছে সুখ-সম্ভোগের লোভ। আর অচলার দিকে সুরেশের টান দেহের। এই দুই লোভের যোগফলকে কেউ প্রেম বলে নিশ্চয়ই অভিহিত করতে রাজি হবে না।

অচলার এই লোভ সম্বন্ধে সুরেশ অবহিত ছিল বলেই অচলার বিবাহের পরও সে হাল ছাড়েনি। সে জানত, মহিমের দারিদ্র্য অচলার মনে ফাটল ধরাবে। সেটা সুরেশের শ্রেণী-বোধি। সেই সুযোগ নেবার আশায় সে অযাচিত ভাবে গিয়ে হাজির হল মহিমের গ্রামের বাসায়। গিয়ে দেখল অনুমান খেটে গেছে। তখন সে মহিমের প্রতি অচলার বিরূপতার তিলকে প্রায় রাতারাতি তাল বানিয়ে ফেলল। সুরেশের উস্কানীতে অচলা মহিমকে "ভালবাসি না" বলে তার কাছ থেকে চলে এলো বটে, কিন্তু সে নিছক অভিমান। স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীর উত্তাপহীনতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। মহিমের দারিদ্র্যতার মন ভেঙ্গে দিলেও সে স্বামী ত্যাগের কথা কখনও মনে স্থান দেয়নি। তার মধ্যবিত্ত সুলভ নীতিবোধ সে পথ রোধ করেছিল। তার স্বামিগৃহ ত্যাগ চিরাচরিত দাম্পত্য কলহের বহ্বারম্ভের পর বাপের বাড়ীতে কিছু কাল কাটিয়ে বিরহের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য বন্ধনকে দৃঢ়তর করার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই তো শেষ মুহূর্তে সে স্বামীকে ছেড়ে আসতে চায়নি। স্বামীকে দূর দেশে গিয়ে নিরিবিলি ঘর বাঁধবার জন্য মিনতি করেছে। মহিমকে নিয়ে সুখী হবার জন্য সে তখন বিকল্প পথ খুঁজছিল। সুরেশ মৃণালদের সমাজ থেকে পালিয়ে নিজের উসখুসে মনটাকে স্ববশে আনবার কথাই তার মনে হচ্ছিল। সুরেশের সঙ্গে ঘর-বাঁধার কথা তার একবারও মনে হয়নি। নইলে মহিমের বাড়ী থেকে সুরেশের হাত ধরে সে কেদার বাবুর কাছে ফিরে না এসে সরাসরি কোন ভিনদেশী আশ্রয়ে গিয়ে উঠত। শেষ পর্যন্ত সুরেশ তাকে অত্যন্ত জঘন্য উপায়ে অপহরণ করেছে। কিন্তু সেই অপহরণের আগে পর্যন্ত এমন কোন ঘটনা পাঠকের চোখে পড়ে না, যাতে মনে হতে পারে, সুরেশের প্রতি অচলার প্রেম একেবারে

লে উথলে উঠছিল। বরং দেখা গেছে, স্বামি-গৃহ ত্যাগ করে পের বাড়ী আসার জন্ম অচলা মনে মনে ভয়ানক অনুতপ্ত হয়েছে। সুরেশের সহিত আসার কালে কেদার বাবুর মনে যে সব দেহ দেখা দিয়েছিল সেগুলিকে উড়িয়ে দিয়ে অচলা দৃঢ় কণ্ঠে ছে, "আমি এমন কিছু যদি করতুম বাবা, যার জন্ম তুমি দেখাতে পারো না, তাহলে সকলের আগে আমার মুখই মরা কেউ দেখতে পেতে না। সে দেশে আর যাই থাক, মরার মত জলের অভাব ছিল না। বলিতে বলিতে তাহার গলা রিয়া আসিল। কহিল, কাল থেকে যে অপমান আমায় তুমি কোরছ, ধু মিথ্যে বলেই সইতে পেরেছি, নইলে—"

এ কথার পর সুরেশের সঙ্গে স্বামি-গৃহ ত্যাগ করে বাপের বাড়ীতে াসার ব্যাপারটাকে বাড়িয়ে দেখবার প্রয়োজন করে না। এই ঘটনাটা রেশের অনুকূলে যায় না মোটেই। তাই ত দেখি, মহিমের অসুখের ময় সুরেশদের বাসায় সে 'কঠিন এবং মৃদু কণ্ঠে' সুরেশকে স্পষ্ট বলে য়েছে "সংসারে শুধু মৃণালই একমাত্র সতী নয় সুরেশ বাবু! এমন তাও আছে, যারা মনে-মনেও একবার কাউকে স্বামিত্বে বরণ করলে, হস্র কোটি প্রলোভনেও আর তাদের নড়ানো যায় না। দের কথা আপনি ছাপার বইতে পড়তে পেলেও সত্যি বলে নে রাখবেন সুরেশ বাবু!"

নিজের প্রেম, সতীত্ব, মান, মর্যাদা রক্ষার জন্ম অচলাকে খন সংগ্রাম করতে হচ্ছে সুরেশের ঐশ্বর্যের (যা তাকে বিয়ের আগেই স্বকের টানে মহিমের কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে য়েছিল) প্রলোভনের বিরুদ্ধে। এ সংগ্রামে তার প্রেম ও পতি-নিষ্ঠাই জয়লাভের পথে এগিয়ে চলেছিল। সে সুরেশের ঐশ্বর্যের প্রলোভন জয় করেছে এবং স্বামীর হাওয়া-বদলের সাথী হওয়ার আনন্দে াবছে, "সেখানে (জব্বলপুর চেঞ্জে) তাহার স্বামী ভগ্ন দেহ ফিরিয়া াইবে, একাকী সে-ই সেখানে ঘরণী গৃহিণী, সর্ব কার্য্যে স্বামীর সাহায্য-কারিণী। তিনি ভাল হইলে হয়ত একদিন তাহারা সেইখানেই তাহাদের ঘর-সংসার পাতিয়া বসিবে এবং অচির ভবিষ্যতে যে সকল অপরিচিত অতিথিরা তাহাদের গৃহস্থালী পরিপূর্ণ করিয়া তুলিবে, তাহাদের কচি মুখগুলি নিতান্ত পরিচিতের মতই সে যেন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখিতে লাগিল। এমনি কত কি যে সুখের স্বপ্ন দিবা-নিশি তাহার মাথার মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই।"

এ সিদ্ধান্তের পর অচলাকে জোর করে অপহরণ না করলে কাছে পাওয়া যায় না। সুরেশ অচলার মন চায়নি, চেয়েছে দেহ। কাজেই ে অপহরণের পথটাই বেছে নিয়েছে।

অপহরণের পরও অচলা পালাবার চেষ্টা করেছিল। পারেনি। অচলা বুঝেছিল যে, এ ঘটনার পর সামাজিক এবং স্বাভাবিক জীবনের দ্বার তার সামনে চিরকালের জন্য রুদ্ধ হয়েছে। কিন্তু এই সুন্দর পৃথিবীতে মরতে সে চায়নি। আত্মহত্যার বীভৎসতা সে কল্পনাও করতে পারত না। সুরেশ তখন তার বাঁচার একমাত্র অবলম্বন। তাই সে সুরেশকে আঁকড়ে ধরবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে—এমন কি দেহ দিতেও আপত্তি নেই। "সুরেশ নাই,—সে একা। এই একাকীত্ব যে কত বৃহৎ, কিরূপ অসুস্থ তাহা বিদ্যুৎ বেগে তাহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় যে তরণী বাহিয়া সে সংসার-সমুদ্রে ভাসিয়াছে, সে যে ভগ্ন, সে যে অনিবার্য মৃত্যুর মতই তিল তিল করিয়া ডুবিতেছে, ইহা তাহার চেয়ে বেশী কেহ জানে না। তথাপি সেই সুপরিচিত ভগ্নতর আশ্রয় ছাড়িয়া আজ সে দিক্ চিহ্নহীন সমুদ্রে ভাসিতেছে, ইহা কল্পনা করিতেই তাহার সর্বাঙ্গ হিম হইয়া গেল। আর তাহার কেহ নাই; তাহাকে ভালবাসিতে, তাহাকে ঘৃণা করিতে, তাহাকে রক্ষা করিতে, তাহাকে হত্যা করিতে কোথাও কেহ নাই। সংসারে সে একেবারেই সঙ্গিবিহীন! এই কথা মনে করিয়া তাহার যেন নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।"

তাই বলছিলাম, এ তো প্রেম নয়, নিছক বাঁচার তাগিদ—জীবন-তৃষা। জীবনের সব চেয়ে বড় তাগিদ। যার জন্ম সুরেশের প্রতি কোন সত্যিকারের ভালবাসা না থাকা সত্ত্বেও ("যাহাকে (সুরেশকে) সে কোন দিন ভালবাসে নাই, সে-ই তাহার প্রাণাধিক, শুধু এই মিথ্যাটাই কি সবাই জানিয়া রাখিল"···অচলার ক্ষোভ) প্রণয়ের অভিনয় করে, দেহদান করে তাকে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে হচ্ছে অচলাকে। এই অধঃপতনের লজ্জা যতই ব্যাপক এবং গভীর হোক, লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে, তাতে অচলার শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ণ হয়নি। জীবনের তরী যখন গ্লানির গভীর পঙ্কে নিমজ্জমান, তখন আর কিছু নয়, শুধু সুরেশের বিপুল ধনসম্পদ ভোগের স্পৃহাই তাকে সান্ত্বনা যোগাতে পারছে। ডিহরীতে সুরেশের নতুন বাড়ীতে ভোগ-বিলাসের সেই বিপুল আয়োজন দেখে সে কি ভাবছে দেখুন! "নিরালা শয্যার মধ্যে চোখ বুজিয়া সে ঐশ্বর্য জিনিষটাকে কিছুই না বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারিল না, এবং চাই না, প্রয়োজন নাই, এ কথাতেও মন তাহার কোন মতেই সায় দিল না। তাহার আজন্মের শিক্ষা ও সংস্কার ইহার কোনটাকেই তুচ্ছ করিবার পক্ষে অনুকূল নহে, অথচ গ্লানিতেও সমস্ত হৃদয় কালো হইয়া উঠিয়াছে। তাই যত সম্পদ, যত উপকরণ—এই দেহটাকে সর্বপ্রকারে সুখে রাখিবার যত বিবিধ আয়োজন—আজ অযাচিত পদতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে, তাহার দুর্নিবার মোহ তাহাকে অবিশ্রাম এক হাতে টানিতে এবং অন্য হাতে ফেলিতে লাগিল। অথচ দুঃখের স্বপ্নের মধ্যে যেমন একটা অপরিস্ফুট মুক্তির চেতনা সঞ্চরণ করে, তেমনি এই বোধটাও তাহার একেবারে তিরোহিত হয় নাই

যে, অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় আজ যাহা ফাঁকি, ইহাই একদিন সত্য হইয়া উঠিবার পথে কোন বাধাই ছিল না। এই সুরেশই তাহার স্বামী হইতে পারিত, এবং কোন এক ভবিষ্যতে ইহা যে একেবারে অসম্ভব, এমন কথাও কেহ জোর করিয়া বলিতে পারে না।"

অচলার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হল। নিজেকে রক্ষিতার আসনে বসিয়ে প্রেমের সহস্র অভিনয় করে, দেহের নৈবেদ্যে সুরেশের পূজা দিয়েও আর তাকে ধরে রাখা গেল না। যেখানে সত্যিকারের প্রেম নেই সেখানে দেহের লেন-দেন শুধু ক্লান্তি, অবসাদ এবং একঘেয়েমিই বাড়াতে পারে। "মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা যে এমন অসহ্য ভারী" তা সুরেশ "স্বপ্নেও ভাবেনি"। অর্থাৎ এত দিন অচলার যে দেহটা আয়ত্তের বাইরে থেকে সুরেশকে আভাসে-ইঙ্গিতে ক্রমাগত প্রলুব্ধ করেছে, সেটা ভোগ করার পর সে অবসাদে আচ্ছন্ন হয়ে পলায়নের পথ খুঁজছে। এই সমাজে ধনীরা এই-ই করে। আকাঙ্ক্ষিত নারীর সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাকে এমনি রিক্ত নিঃসহায় করে বিদায় দেয়। সুরেশ এখানেও শ্রেণী-চরিত্রের ঊর্ধ্বে ওঠতে পারেনি।

মহিমও মধ্যবিত্ত, তবে অচলাদের চেয়েও তার আর্থিক অবস্থা খারাপ। সেদিক দিয়ে সে সমাজের সর্বনিম্ন স্তরের মানুষদের অনেক কাছাকাছি। তাই ছেলেবেলা থেকেই তার মধ্যে কয়েকটি গুণ দেখা যায়। নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে সচেতন মহিমের আত্মসম্মানবোধ প্রখর। সুরেশ তার আবাল্য বন্ধু হলেও তার কোন সাহায্য সে গ্রহণ করে না। কারণ সে জানে, ওটা বড়লোকের 'ভিক্ষার দান'। সে বুদ্ধিমান, ধীর স্থির এবং বিবেচক। নিজের দুঃখ-দুশ্চিন্তার ভাগ সে কাউকে দিতে চায় না—এমন কি নিজের স্ত্রীকেও নয়। "কৃপণের ধনের মত মহিম এই বস্তুটিকে সমস্ত সংসার হইতে চিরদিন এমনি একান্ত করিয়া আগলাইয়া ফিরিয়াছে যে, তাহাকে দুঃখে-দুঃসময়ে কাহারও সাহায্য করা দূরে যাক, কি যে তাহার অভাব, কোথায় যে তাহার ব্যথা, ইহাই কোন দিন কেহ ঠাহর করিতে পারে নাই।"

নিজের দারিদ্র্য সম্বন্ধে অতি সংবেদনা অনেক জায়গায় গোঁড়ামীতে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই গৃহদাহের পর অনুতপ্ত অচলা যখন অন্তরের প্রেরণায় তার বুকের কাছে এসে দাঁড়াতে চেয়েছে তখন সে নির্মম অবহেলায় দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাকে। সেদিন অমনি না করলে গৃহদাহের কাহিনী হয়ত অন্য রকম হত। সুরেশের কাছে প্রেম হচ্ছে নিছক দেহ আর মহিমের কাছে প্রেমের তাৎপর্য আরও গভীর। সে জানত, অচলার মন যদি তাকে চায়, তবেই সে অচলাকে পেতে পারে। নইলে নয়। তাই অচলাকে সে সুরেশের সঙ্গে গৃহত্যাগ করতে বাধা তো দেয়ই নি বরং ষ্টেশনে গিয়ে তুলে দিয়ে এসেছে। স্বামীর আইন জারি করে আটকে রাখতে চায়নি বরং বিদায়ের আগে সে এই আশ্বাসই দিয়েছে "ভুল যদি কখনও ধরা পড়ে, আমাকে জানিও, আমি তখনই গিয়ে নিয়ে আসব।"

এর মধ্যে এক দিকে যেমন পত্নী-প্রেম প্রকাশ পেয়েছে, অন্য দিকে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তার বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস। মহিমের অতিরিক্ত সংযম মাঝে মাঝে দাম্পত্য সম্পর্ক এত শীতল করে দিয়েছে যে, নব পরিণীতা পত্নীর মনে ক্ষোভ এবং অভিমান জমে ওঠা মোটেই অসম্ভব নয়। বিশেষ করে অচলার মত অত আবেগ-প্রবণ মেয়ের পক্ষে। তবু একথা মানতেই হবে যে, বউকে ভালবাসা জানাবার সুযোগ সে কখনও হাতছাড়া করেনি। তাকে যে বার বার সে ক্ষমা করেছে, সে ভালবাসা ছাড়া আর কি হতে পারে? এই সমাজে ধনীর লোভের আগুনে দরিদ্রের সুখের নীড় কি ভাবে জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যায় এবং দরিদ্র সেখানে কত অসহায়, মহিম তার নিদর্শন। কিন্তু সম্ভবতঃ গরীব বলেই মনের দিক দিয়ে মহিম গৃহদাহের সমস্ত পুরুষ চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশী ঐশ্বর্যশালী। খোলা মন তার অনেক বেশী উদার। তাই ভালবাসার দাবীতে সে চিরকালের সংস্কার ত্যাগ করে অনায়াসে ব্রাহ্ম কুমারীর পাণিগ্রহণ করল এবং ঘর পোড়ার পর গ্রামের শিরোমণিরা তাকে প্রায়শ্চিত্ত করে পত্নী ত্যাগের পরামর্শ দিলে সে স্পষ্ট ভাষায় তাদের শুনিয়ে দিল, "যা নয়, তা মুখে আনবেন না। আমি যাকে ঘরে এনেছি, তার পুণ্যে ঘর থাকে ভালই, না হয়, বার বার পুড়ে যায়, সে-ও আমার সহ্য হবে।" মহিমের এই আদর্শনিষ্ঠা এবং চরিত্রের উদারতার কথা মনে রেখেই মৃণাল সুরেশ-পরিত্যক্ত অচলাকে শেষ পর্যন্ত তার আশ্রয়েই তুলে দিতে চেয়েছিল আর মহিমও তাতে আপত্তি করেনি।

গৃহদাহে মৃণাল চরিত্রের বিশেষ তাৎপর্য আছে। মৃণাল গ্রামের ফিউডাল সমাজাদর্শের মেয়ে। বিবাহ এবং স্বামী তার কাছে ধর্ম। বই পড়তে পড়তে পাঠকের অনেক সময় মনে হয়, লেখক যেন অচলার বিরুদ্ধে মৃণালকে দাঁড় করিয়ে বুর্জোয়া ও ফিউডাল আদর্শের দুই নারীর তুলনামূলক সমালোচনা করেছেন। তুলনায় আপাতদৃষ্টিতে মৃণালই জয়ী হয়েছে বলে মনে হয়, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, লেখকের অসাধারণ বাস্তব সচেতনতা তাঁর ইচ্ছাকে অতিক্রম করে গেছে। মৃণাল এবং অচলা মুখোমুখি না দাঁড়িয়ে দুই সমান্তরাল রেখায় এসে দাঁড়িয়েছে।

ফিউডাল সমাজে নারীর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকৃত নয়। সে হল সামাজিক অনুশাসনের দাস মাত্র। সংস্কারের অসংখ্য বেড়াজালে ঘেরা তার জীবন। সেখানকার বাঁচাটা উৎসাহ উদ্দীপনা-হীন যান্ত্রিক পদ্ধতির চেয়ে বেশী কিছু নয়। সেখানে বিবাহ, সন্তান, সংসার সবই প্রাণহীন নিয়ম মাত্র। মৃণাল এই ফিউডাল সমাজের নিঃস্ব নারীত্বের প্রতিভূ। পৃথিবীতে একটি মেয়ে যে অফুরন্ত পাওনা নিয়ে জন্মায় তার কিছুই সে পায়নি। আজীবন খালি বঞ্চনা, বঞ্চনা, বঞ্চনা। সারা জীবন আত্মনিগ্রহ করে মৃত্যুর জন্য প্রহর গোণা। বিবাহের আগে সে মহিমকে ভালবাসত, কিন্তু সে কথা প্রকাশের অধিকার তার নেই, কারণ ফিউডাল সমাজে প্রাকবিবাহ প্রণয় ব্যভিচারের সামিল। কৈশোরে হৃদয়ের অভিব্যক্তি বাইরের সংস্কারের কাছে এই ভাবে বাধা পাওয়ায় মৃণাল সংস্কারটাকে অনেক বড় করে দেখতে বাধ্য হয়েছে। বিদ্রোহের প্রেরণা পায়নি, কারণ তেমন শিক্ষা-দীক্ষায় সে মানুষ নয়। যে সংস্কার তার সহজ এবং স্বাভাবিক প্রেমকে এ ভাবে অঙ্কুরে বিনষ্ট করেছে তার কাছে হার মেনে তারই দাসত্ব করতে হয়েছে। তখন থেকে সে সংস্কারকেই যুক্তি দিয়ে মেনে নিতে চেয়েছে।

তাই বাল্য-প্রেম উপেক্ষা করার কারণ জানতে চাওয়ায় মৃণাল বলেছে, "তুমি কি মনে কর, ছেলেবেলার সব ভালবাসারই শেষ ফল এই? না, মানুষ বিয়ে দেবার মালিক? এ শুধু এ জন্মের সম্বন্ধ নয় মেজদি, জন্মজন্মান্তরের সম্বন্ধ। আমি যাঁর চিরকালের দাসী, তাঁর হাতেই তিনি আমাকে সঁপে দিয়েছেন। মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় কি এসে যায়?"

এটা শুধু মৃণালের কথা নয়, সমস্ত ফিউডাল নারীরই অভিজ্ঞতা। মানুষের অর্থাৎ নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বীকৃতি নেই বলেই তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও ভাল-মন্দ বিচারের পথ রুদ্ধ। নিজেকেও সে নিয়মের অঙ্গ বলেই ভাবতে শিখেছে। তাই বৃদ্ধ স্বামী তার মনে কোন ক্ষোভের সঞ্চার করে না। মনটা যে তার আগেই দুমড়ে গেছে। সামাজিক বিধি-ব্যবস্থার উপর নিজের সর্বস্ব অর্পণ করে তারই হুকুমে দিন কাটানোর মধ্যে একটা শ্মশানের শান্তি থাকতে পারে, গৌরব নেই, সুখও নেই। সেদিক থেকে মৃণালের গর্ব করার মত কিছু পাওয়া যাবে না। মৃণালই তার প্রমাণ। তার মত নানা গুণে ভূষিতা মেয়ে স্বামিপুত্র সংসার কিছুই পেল না। এই না পাওয়ার ব্যর্থতাটাকে সে ধর্ম আর সংস্কারের গালভরা ফাঁকা বুলি দিয়ে যতই মোলায়েম করে নিক, পাঠকের বুকে তার অসহায় অক্ষমতা হাহাকারের ঝড় তোলে। তার ব্যর্থতা ফিউডাল সমাজের সমস্ত নারীত্বের দীর্ঘশ্বাসে ভারী। মৃণালের মারাত্মক সংস্কার নিষ্ঠা তাকে অচলার বিড়ম্বনার হাত থেকে বাঁচালেও বাঁচাতে পারে, কিন্তু তাকে সার্থক করতে পারবে না। সেখানে অচলার সঙ্গে মৃণালের পার্থক্যটা স্পষ্ট। মৃণাল পৃথিবীতে কিছুই পায়নি আর অচলা সবই পেয়ে হারিয়েছে। তার প্রেমের স্বাধীনতা পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা, নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার স্বীকৃতি সবই তার মৃণালের তুলনায় অসাধারণ প্রাপ্তি। এসবই বুর্জোয়া সমাজের দান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবই তার ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। এই হল বুর্জোয়া সমাজ ব্যবস্থার নির্মম রসিকতা। এখানে আইনের চোখে সবাই সমান, তত্ত্বগত ভাবে সকলেরই ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং নারী-পুরুষের সমান অধিকার স্বীকৃত, কিন্তু বাস্তব জীবনে ধনী এবং ধনের হাতে মানুষের জীবন এমন ভাবে বাঁধা যে, মানুষের সমস্ত অধিকারই শেষ পর্যন্ত মানুষকে মুখ ভেংচায়। কারখানার শ্রমিক না পোষালে চাকরী ছেড়ে দেবে। সে অধিকার তার আছে, কিন্তু নতুন চাকরী পাবার অধিকার নেই। তাই চাকরী ছাড়ার স্বাধীনতা তাকে শুধু ব্যঙ্গই করতে পারে। অচলাও অনেক স্বাধীনতা লাভ করেছিল, কিন্তু সুরেশের অর্থসম্পদ তার সে স্বাধীনতাকে একেবারে তছনছ করে দিল। অর্থনীতির চাকায়-বাঁধা সমাজে অর্থের প্রাধান্য সমস্ত স্বাধীনতার উপরে।

শরৎচন্দ্রের লেখায় ফিউডাল ও বুর্জোয়া দুই সমাজেই নারীর ব্যর্থতার ও লাঞ্ছনার প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। তবু যে অচলার চেয়ে মৃণালকে আমাদের বেশী ভাল লাগে, তার কারণ মৃণালের প্রাণের প্রাচুর্য ও নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতা। নিজের জীবনের ব্যর্থতা দিয়ে অন্য লোককে বিব্রত না করে সে গৃহদাহে এসেছে স্বস্তির নিঃশ্বাসের মত। গ্রামের বাড়ীতে অচলার সখী হিসাবে, কলকাতায় অসুস্থ মহিমের সেবিকা হিসাবে, কেদার বাবুর শেষ আশ্রয় হিসাবে এবং পরিশেষে অচলার ত্রাতা হিসাবে সে পাঠকের মনের কামনাকেই রূপায়িত করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অচলা কেদার বাবু মহিম সুরেশদের সঙ্গে মেলা মেশার মধ্য দিয়ে সে তার সংস্কার কাটিয়ে উঠছিল। তাই অমন স্বচ্ছন্দে মহিমকে বলতে পেরেছিল যে, অচলাকে সে তার আশ্রয়েই তুলে নেবে যদিও অচলা তখন সমাজের চোখে এবং সত্যিকারও অসতী।

লেখকের মনের ঔদার্য গৃহদাহে যেন চরমে উঠেছে। শরৎ বাবু সমাজত্যাগী অনেক মেয়ের চরিত্র এঁকেছেন। লক্ষ্য করা গেছে, তারা সকলেই দেহের দিকে পবিত্র ছিল। তবু তাদের তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। গৃহদাহে কিন্তু তিনি অনেক দূরে এগিয়ে গেছেন। দেহ-মনে সত্যিকারের অপবিত্র অচলাকে তিনি সংস্কারাচ্ছন্ন নারীর হাত ধরিয়ে সমাজে তুলে নেবার প্রয়াস পেয়েছেন। ডিহরীর সংস্কারান্ধ রাম বাবুর স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে লেখক সামাজিক সংস্কারের যে অমানুষতা ও বীভৎসতা পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন তা সত্যিই অতুলনীয়! রাম বাবুর কাছে মানুষ হিসাবে অচলার কোন মূল্য নেই, মূল্য আছে শুধু সুরেশের পত্নী হিসাবে। রাম বাবু এমনি তো লোকটি তেমন খারাপ নন? তাঁর হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলোই তার দিকে আমাদের আকর্ষণ করেছে, অথচ দেখুন, যে মুহূর্তে তাঁর সংস্কারে আঘাতে লাগলো অমনি তিনি অমানুষ নৃশংস হয়ে উঠলেন।

যে সংস্কার মৃণালের মধ্যে থেকে লেখকের কিছুটা শ্রদ্ধা আকর্ষণ করছে, সেই সংস্কারই রাম বাবুকে শ্লেষের শিকারে পরিণত করেছে। এতেই বোঝা যায় ও সম্বন্ধে লেখকের মনে বেশ একটু দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেটা খুবই স্বাভাবিক। শরৎ বাবু ফিউডাল ও বুর্জোয়া—উভয় সমাজের ব্যর্থতাই দেখেছেন। সম্ভবত কোন আদর্শ তৃতীয় সমাজের কথা তাঁর কল্পনায় সুস্পষ্ট ভাবে ধরা দেয়নি বলে তিনি চলতি কাঠামোর মধ্যেই সমস্যার সমাধান খুঁজতে চেষ্টা করেছেন। তাই এই দ্বন্দ্ব। ‘শেষ প্রশ্নে’ এটা আরও প্রকট হয়ে উঠেছে।

অচলা-এ্যানা-মাদাম বোভারী

গৃহদাহ, মাদাম বোভারী এবং এ্যানা ক্যারিনিনা—এই তিনখানা উপন্যাসের বাহ্যাবরণে কিছুটা মিল থাকায় বাঙলা দেশের অনেক বনেদী সমালোচক অচলা, এ্যানা এবং মাদাম বোভারীর মধ্যে একটা সামঞ্জস্য অনুসন্ধানের প্রয়াস পান, কিন্তু একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, এই তিন চরিত্রের মধ্যে কোথাও এতটুকু মৌলিক মিল নেই। তিন জনের জীবনেই অতৃপ্তি ছিল এবং সেই অতৃপ্তি থেকেই তাদের ট্রাজেডি এসেছে, একথা ঠিক। তবে তিন জনের অতৃপ্তিই সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের, তিন জনের চরিত্রও সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এ্যানা বিদ্রোহ করেছিল তাদের দাম্পত্য সম্পর্কের যান্ত্রিকতা এবং হৃদয়হীনতার বিরুদ্ধে। সে তার নারীত্বের আত্মপ্রতিষ্ঠার বিদ্রোহ। সেখানে ভ্রনস্কি (প্রেমিক) তার যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। ভ্রনস্কির সঙ্গে সে অত্যন্ত সচেতন এবং উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু তার লক্ষ্যটা যেন অন্য কিছু। এ্যানা ক্যারেনিনায় এ্যানা হল সত্যিকারের নায়িকা। সে করে এবং অন্তরা হয়। সে প্রত্যক্ষ অন্তরা পরোক্ষ। অচলার সহিত তার কোথাও মিল নেই। অচলার অতৃপ্তি এ্যানার মত আত্মিক নয়। তার অতৃপ্তি ঐশ্বর্য সম্ভোগের সাধ অপূর্ণ থাকার অতৃপ্তি। খুব বাস্তব এবং স্থূল জিনিষ। ভ্রনস্কি-এ্যানার সম্পর্কে এ্যানাই উদ্যোগী আর সুরেশ অচলাকে এনেছে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অপহরণ করে। কাজেই দু'জনের মধ্যে তফাৎ প্রায় আকাশ-পাতালের।

মাদাম বোভারীর অতৃপ্তিও কতকটা আত্মিক। সুস্পষ্ট জীবনাদর্শের অভাব থেকে অচেতন ভাবে মনের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা দেখা

দেয় তারই প্রকাশ বোভারী। সে যে কি চায় তা তার নিজের কাছেও স্পষ্ট নয়, কিন্তু অচলা জানত সে কি চায়। সেখানে তার কোন অস্পষ্টতা ছিল না।

সুতরাং অচলার সমস্যার সহিত এ্যানা এবং বোভারীর সমস্যাকে এক করে দেখলে মস্ত ভুল করা হবে। তবে হ্যাঁ একথা ঠিকই যে, ঐ তিনটি নারীই প্রায় একই সমাজ-ব্যবস্থার তিনটি ভিন্ন ভিন্ন শিকার। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ হচ্ছে মোহ ভাঙ্গার উপন্যাস। দেশে তখন ফিউডাল ও বুর্জোয়া দুই রকম সমাজেরই অস্তিত্ব রয়েছে। এই দুই সমাজেই মানুষের স্বাভাবিক জীবন কি ভাবে সমাজের প্রচণ্ড বিরুদ্ধ শক্তির চাপে বিপর্যস্ত হচ্ছে, তারই এক দিকের নিখুঁত চিত্র গৃহদাহ। ফিউডাল সমাজের মৃণাল রিক্ত শূন্য ব্যর্থ। তার সার্থকতার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ। বুর্জোয়া সমাজে অচলার চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত, জীবন গ্লানিময় ক্লেদাক্ত মলিন। ফিউডাল ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু বুর্জোয়া সমাজে ব্যক্তির মুক্তি হচ্ছে মরীচিকা। সে শুধু চোখ ধাঁধায়, আকণ্ঠ পিপাসার নিবৃত্তি এনে দেয় না, জীবনটাকে আরও জটিল ঘূর্ণাবর্তে ঠেলে দিয়ে খান খান করে দেয়। শরৎ বাবু তৎকালীন সামাজিক জীবনের এই মূল সত্য উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজের সব স্তরের মানুষের জীবনের ব্যর্থতা তার মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। এই ট্রাজেডির মূলে ব্যক্তি হিসাবে কোন মানুষের যে বিশেষ কোন ভূমিকা নেই, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি দেখেছিলেন, এটা একটা সামাজিক অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যের পরিণাম। তাই গৃহদাহের এত বড় মর্মান্তিক ঘটনার জন্য লেখক হিসাবে তিনি কাউকেই দায়ী করেন নি। সকলকেই দেখিয়েছেন সামাজিক শক্তির প্রতিভূ হিসাবে। প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বতন্ত্র-ব্যক্তিত্ব কাহিনীকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে সত্য, কিন্তু তারা কেউ সামাজিক শক্তির ঊর্দ্ধে উঠতে পারেনি। এখানেই লেখকের দক্ষতা চরমে পৌঁছেছে। গৃহদাহের মধ্যে যে সামাজিক বাস্তবতা ফুটে উঠেছে, সে লেখকের সচেতন সৃষ্টি বলেই মনে হয়। তাই এর প্রাণশক্তি এবং গতি এত প্রচণ্ড।

গৃহদাহ বাঙলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি তো বটেই, বিশ্ব-সাহিত্যের দরবারেও বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবার অধিকার এর আছে। আজকাল অনেক রামা-শ্যামার লজ্জার জনক গল্প উপন্যাস ভারতীয় সাহিত্যের প্রতিনিধিত্ব করতে যায় বিশ্বের দরবারে। ফলে বাইরের পৃথিবীর ধারণা হয় যে, সাহিত্য ক্ষেত্রে আমরা এখনও দাগা বুলোবার স্তরে আছি। ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রের অযোগ্য এবং অশিক্ষিত কর্মকর্তাদের আহম্মকীই ভারতের এই মর্যাদাহানির কারণ। সাহিত্য ক্ষেত্রে আমাদের সত্যিকারের সম্পদের দিকে বহির্বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হলে সব চেয়ে আগে শরৎ সাহিত্যের অনুবাদ বিদেশে পাঠাবার প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, আর কেউ এগিয়ে না এলে বাঙলা সরকারকেই এ বিষয়ে অগ্রণী হতে হবে।

রাজপথ-তীর্থ

করঞ্জাক্ষ বন্দ্যোপাধ্যায়

হে ভুক্ত-চিত্ত শহর-তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই কলকাতা জনতা-সাগর-হৃদয়তীরে
হেথা রাস্তায় হাঁটি হাঁটি পায় হের নর-অবতারে
দাঁত বিকশিয়া রম্ভা বেচিয়া মেজাজ দেখায় কারে।
পিচ-ঢালা পথে চলে যে মোটর,
বাস ও রিক্‌শ ট্রাম ঘর্ঘর
হেথায় নিত্য হের বিচিত্র ট্যাক্‌সিটিরে
এই কলকাতা জনতা-সাগর-হৃদয়তীরে।
হেথা একদিন ছিল কত হীন ঘর্ঘরে ঠিকে গাড়ী
পথ-চলা যত পথিকের দল দেখে দিত পথ পাড়ি
এ-মোড় ও-মোড় পথিকের দল
দেখে হ'ত পার, হিসবীর ফল
পড়িত না চাপা করিত পরোয়া জীবনটিরে
এই কলকাতা জনতা-সাগর-হৃদয়তীরে।

সেই সেকালের লোক নাই আর
একালের সবে যারা হয় পার
ভাবে বুঝি পথ ঘরের মাঝার উঠান ঘিরে
এই কলকাতা জনতা-সাগর-হৃদয়তীরে।
হে horn তুমি যত খুশি বাজো
গ্রাহ্য না ক'রে তোমা হেথা আজো
ধার সবে ত্যজি, দাঁড়ায় যে মাঝি' সমুখে ঘিরে
এই কলকাতা জনতা-সাগর-হৃদয়তীরে।
ব্রেক ফেল হ'লে সে দোষও তোমার
পিটিয়া চালককে ঘিরি চারি ধার
অগ্নি লাগাবে জনতা তখন শকটটিরে
এই কলকাতা জনতা-সাগর-হৃদয়তীরে।

সংযুক্ত এশিয়া

[লেখকের ইংরাজী **Faderated Asia** পুস্তকের বঙ্গানুবাদ]

(শেষাংশ)

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

প্রাথমিক শিক্ষা

ছেলে-মেয়েদের জন্য প্রত্যেক গ্রামেই প্রাথমিক স্কুল থাকা উচিত। তাদের মন ও বুদ্ধির যাতে বিকাশ হয় এবং সমস্ত দেশের ও বাহির বিশ্বের খবরাখবরের সঙ্গে যাতে তাদের যোগ সাধিত হয়, শিক্ষার সেই প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আজ-কাল অন্নসমস্যাই যখন প্রধান সমস্যা, তখন ছেলে-মেয়েদের ব্যবসায়-বাণিজ্য এমন ভাবে শিক্ষা দিতে হ'বে, যাতে স্কুল ও কলেজ-জীবনের পরে তারা বেকার হয়ে না বসে থাকে।

স্কুলে ছেলে-মেয়েদের সাধারণতঃ কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শেখান হয়, যেগুলি প্রকৃত জীবনের কোন কাজে আসে না। তারা অতীতের বেশ ভাল গল্প বলতে পারবে, বাক্‌যুদ্ধ করতে পারবে—কিন্তু কাজের লোক হবে না, স্কুলে তারা যে সময় কাটায় তাহা বাজে ও ব্যর্থ হয়। স্কুল-জীবন থেকে তারা কোন উপকার বা কোন কার্য্যকরী শিক্ষা পায় না। ইহাকে শিক্ষার প্রাচীন পদ্ধতি বলে। পৃথিবীর এই দ্রুত অগ্রগতির পথে অন্নসমস্যাই যখন প্রধান সমস্যা, তখন শিক্ষার সমস্ত পদ্ধতিটিকে বর্ত্তমান প্রয়োজন অনুযায়ী সংস্কার করা উচিত। এশিয়ার প্রত্যেক গ্রামে ও প্রত্যেক দেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের এমন শিক্ষা দেওয়া উচিত, যাতে যুবকেরা পৃথিবীর যে কোন স্থানে উপযুক্ত ও যোগ্যতম ব্যক্তি বলে পরিচয় দিতে পারে। এশিয়ার চিন্তানায়কগণ এ সম্বন্ধে উপায় উদ্ভাবন করে তা কার্য্যকরী করবার অবশ্যই চেষ্টা করবেন, নিম্নলিখিত কার্য্যকরী প্রস্তাবগুলি যুগের প্রয়োজন অনুযায়ী এখানে দিতেছি।

গ্রামের প্রাথমিক স্কুলে ছেলে-মেয়েরা সকাল সাড়ে সাতটা থেকে সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত লেখাপড়া করবে এবং দিনের বেলায় যাতে তারা জীবনের প্রকৃত কার্য্যকরী শিক্ষা পায়, সেজন্য মাঠে বা কোন কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠানে কাজ করবে। এই ভাবে যৎসামান্য রোজগারে তারা তাদের সংসারকে ও বাপ-মাকে সাহায্যও করবে। গ্রামের কোন বাড়ীর দালানে বা ঘরে এই প্রাথমিক স্কুল করা যেতে পারে। অথবা আমাদের এই গরম দেশ ও লোকের অনুকূল স্বভাব অনুযায়ী কোন বট বা অশ্বত্থ গাছের তলায় ফাঁকা জায়গায়ও করা চলতে পারে। স্থানীয় লোকের সুবিধা অনুযায়ী এই স্কুল সকালে বা রাত্রে করা উচিত। শুধু ছেলে-মেয়েরাই যে এই স্কুলে যোগদান করবে তা নয়, পুরুষ ও স্ত্রীগণও বাহির বিশ্বের সহিত পরিচয়ের জন্য যে কোন রকম শিক্ষা পেতে পারে।

স্কুল-জীবনের পর কার্য্যকরী ও ব্যবহারিক জীবনের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সহজ স্থানীয় ভাষায় শিশুপাঠ্য চাষের বই, গো-পালনের বই, বুককিপিং ও একাউন্টের বই এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের অন্যান্য বইও লেখা উচিত। গ্রামের ছেলেমেয়েরা তাহলে চাষের, সারের ও অন্যান্য জিনিষের ব্যবহার জেনে ভবিষ্যতে ভাল চাষা হ'তে পারবে। বৈজ্ঞানিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যাকরণ, ভাষা এবং অন্যান্য শিক্ষাও ছেলে-মেয়েদের দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু ধর্মতত্ত্বের বইগুলি কখনও দেওয়া উচিত নয়। কারণ, এই বইগুলি তাদের কল্পনার জগতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বৈরাগ্য ও বিষাদের প্রভাবে সুন্দর যৌবনকে নষ্ট করবে। ধর্মপুস্তকের ঝড়ঝাপটা থেকে পৃথিবীকে এখন রক্ষা করা উচিত। কারণ, পৃথিবী এখন দুর্বৃত্ত লোকে পূর্ণ। খুব কম লোকই এখন উপযুক্ত দেখতে পাওয়া যায়। শুধু ভাবীকালের কথা চিন্তা কর। জগৎ, সামাজিক উন্নতি ও সুবিধার কথা এখন চুলোয় যাক্। এগুলি অনিত্য ও মাত্র কিছুদিনের জন্য সৃষ্টি হয়েছে। মুমূর্ষু মতবাদগুলো যুবকদের মনগুলিকে দুর্ব্বল ও হতাশ করে সমাজের উন্নতি ও জন-কল্যাণের দিকটিতে ক্রমিক অবনতি ঘটাবে। অতএব ধর্মপুস্তকগুলি ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক হওয়া উচিত নয়। বাপ-মা একান্তই যদি ছেলেদের পড়াতে চান, তবে সেটা বাড়ীতে বন্দোবস্ত করবেন। কারণ, এটা ব্যক্তিগত ও গোপন জিনিষ—জাতীয় সমস্যা নয়।

আমার মতে ছেলে-মেয়েরা দিনের বেলায় গ্রামের কোন কাজ করে কিছু উপায় করুক। যাতে তাদের খাওয়া-পরার অভাব মিটিয়ে কিছু কিছু করে সঞ্চয় হয়। কারণ, এই অর্থ তাদের সংসারে প্রবেশের সময় অনেক কাজে লাগবে। কতকগুলি ছেলে-মেয়ের এইরূপ সঞ্চিত অর্থ একসঙ্গে জড়ো করে স্বাধীন ভাবে একটি ব্যবসা চলতে পারে এবং পিতা-মাতাগণও ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার খরচ থেকে অব্যাহতি পেতে পারেন।

এবারে পরবর্ত্তী বিষয়টি এই যে, স্কুলের ও শিক্ষকগণের খরচ কে জোগাবে? দেশই গ্রামের স্কুলগুলোর খরচ জোগাবে কিম্বা যে রকমেই হোক, কিছু করে সাহায্য করবে।

তার পর স্বাস্থ্যের প্রশ্ন। স্কুলের পর অবসর সময়ে ছেলে-মেয়েরা মিলিটারী কায়দায় ড্রিল করবে। ছেলেবেলা থেকে এইরূপ অভ্যাস করলে তারা শৃঙ্খলা শিখে ভাল স্বাস্থ্য অর্জন করবে এবং দেশরক্ষার জন্য যখন প্রয়োজন হবে,—এই সব ছাত্রগণই তখন দেশের দক্ষ সৈন্যের কাজ করবে এবং ছাত্রীগণও হাসপাতালের নার্সের কাজ, কারখানার কাজ এবং সৈন্যদের আরও যে সমস্ত কাজের দরকার হয়, তাহারও সাহায্য করবে।

সমস্ত জাতটাকে সংস্কার করে কার্য্যকরী জীবনের উপযুক্ত মানুষ করে গড়ে তুলতে হবে। দুর্ব্বল ও হতাশ ভাবগুলিকে বন্ধ করতে হবে। সমাজের তলা থেকে অর্থাৎ গ্রাম থেকে দুর্ধর্ষ, দুর্ভেদ্য ক্ষত্রিয় বীর গড়ে তুলতে হবে। ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মিলিটারি সুর, মিলিটারি আদব-কায়দা—জাতীয় সঙ্গীত, এক কথায় যাকে ক্ষত্রিয় শক্তি বলে তাহাই জাগাতে হবে এবং ঘুমানো অলস ভাব ছাড়াতে হবে। সমস্ত জাতটা যেন সৈন্যশিবিরে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে চনমনে হয়;

ধর্মতাত্ত্বিকদের মত অলস না হয়। শিক্ষার এখন ইহাই প্রধান বিষয় জাতির অন্নসমস্যা ও আত্মমর্য্যাদা এই শিক্ষাই সমাধান করবে।

এবারে অন্য প্রশ্নটি হচ্ছে গ্রামের স্বাস্থ্য। এশিয়ার অধিকাংশ গ্রাম সকল অপরিষ্কার, অস্বাস্থ্যকর, নোংরা ও কুৎসিত। গ্রামবাসীরা সব সময় এই বলে অভিযোগ করে যে, দারিদ্র্যতা বশতঃ তারা গ্রামের ডোবা পুকুর ও রাস্তার নর্দ্দমাগুলি পরিষ্কার করতে পারে না, এবং সেই জন্যই তারা শোচনীয় দুরবস্থার মধ্যে বাস করতে বাধ্য হয়। তাদের এই অভিযোগ অনেকটা সত্য। ছুটির দিনে তিন-চারটি স্কুলের ছেলে-মেয়েরা পরিচালক হিসাবে তাদের শিক্ষকগণের সহিত গ্রামের এই সমস্ত পল্লী উন্নয়নের কাজ করতে পারে এবং ইহার বিনিময়ে শিক্ষক ও ছাত্রদের ঐ দিনটির জন্য ভাল খাওয়া ও কিছু পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। কারণ এই অর্থ ও খাওয়া তাদের কাজের উৎসাহ বর্দ্ধন করবে। দয়ার কাজ ও দেশের কাজ—এগুলি প্রাচীন মতবাদ ও বুলি, কার্য্যকরী সমস্যা সমাধানের উপায় নয়। শুধু কথায় কোন কাজ হয় না। কর্মীকে নিশ্চয়ই পারিশ্রমিক দেওয়া উচিত। এই অর্থ চাষীদের সার বিক্রয় করেও পাওয়া যেতে পারে। স্বাস্থ্য ও পল্লী উন্নয়নের কাজগুলি ছুটির দিনে ছেলে-মেয়েদের আমোদ ও খেলা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে। গ্রাম থেকে পার্শ্ববর্ত্তী সহরের ও জেলার স্কুল-কলেজেও এই ভাবে কাজ হ'তে পারে।

কলেজ শিক্ষা

কলেজ শিক্ষা সম্বন্ধে আমি বলি যে, এখানেও ছাত্র ও ছাত্রীদের সকালে ক্লাশ করে তাদের কলেজের মাইনে ও বোর্ডিংএ থাকা, খাওয়া-খরচের জন্য দিনের বেলায় কিছু করে উপার্জ্জন করা উচিত। কলেজ-জীবনের পরে স্বাধীন ভাবে যাতে তারা কোন ব্যবসা করতে পারে সেই জন্য কিছু করে তাদের অর্থ জমানও উচিত। কলেজ-জীবনে শ্রমশিল্প সম্বন্ধীয় শিক্ষা করা উচিত। অনেকে চাকুরী করে থাকেন, সেই জন্য তাঁদের সুবিধার জন্য স্কুল-কলেজে রাতের ক্লাস করা উচিত। এই রাতের ক্লাসের অনেক উপকারিতা আছে। ইহা দেশের অজ্ঞানতা দূর করে ও মানুষের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত করে। এখানে আমার একটা বিষয় বলবার এই আছে যে, কলেজের ছাত্র বা ছাত্রীগণ পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে তাদের সেই শ্রেণীতে আটক রাখা হয় এবং আবার সব বিষয়ের পড়াশুনা করতে হয়। ইহাতে তাদের অনেক অমূল্য সময় নষ্ট হয় এবং অনেকের পড়াশুনা একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্রদের যৌবন কালে সময়ের মূল্য অর্থের চেয়ে অনেক বেশী। যদি কোন ছাত্র কোন বিষয়ে কম নম্বরের জন্য ফেল করে, তখন ৩।৪ মাসের মধ্যে সেই বিষয়ে তাকে পুনরায় পরীক্ষা দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত এবং অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা থেকে তাকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। দেশ ছাত্রদের উন্নতি চায়, সামান্য ভুলের জন্য অবনতি চায় না। যে রকম করেই হোক্ কলেজ-জীবনের মধ্যে দেশের অজ্ঞতাকে দ্রুত শোধন করা উচিত। কলেজে অনেক বিষয়ের প্রয়োজন নেই। নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞানের জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। একটি বা দুটি বিষয়ের ওয়াকিবহাল হওয়া ছাত্রদের পক্ষে যথেষ্ট।

বর্ত্তমান যুগে রসায়ন ও বৈদ্যুতিক জ্ঞানের সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন। দর্শন ও অন্যান্য বিষয় ছাত্রগণ শিক্ষা করতে পারে, তবে আজ-কাল উহাদের প্রয়োজনীয়তা অনেক কম। কর্মদক্ষতা ও অর্থোন্নতি এ দুটি শিক্ষার প্রধান বিষয়। দর্শন ও অধিবিদ্যার শুধু বুলি আওড়ানই শিক্ষা নয়। রসায়ন শাস্ত্রকে চারটি ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। থিওরেটিক্যাল অর্থাৎ মৌখিক, মেডিক্যাল অর্থাৎ ডাক্তারী, কমারশিয়াল অর্থাৎ ব্যবসায়ী ও মিলিটারি। কলেজ-জীবনের পর মানুষ যাতে কার্য্যকরী সংসার-জীবন যাপন করতে পারে, সেজন্য সে চারটি বিভাগের যে-কোন একটি বিষয়ে শিক্ষা করতে পারে। ব্যবসার উন্নতির জন্য এবং প্রত্যেক কারখানা ও শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল থেকে নানাবিধ জিনিষপত্র প্রস্তুতের জন্য রসায়নবিদ্যা খুব প্রয়োজন। লোহা, পাট, কাগজ এবং অন্যান্য কারখানায় কেমিষ্টগণই যেন সেখানকার প্রকৃত মালিক। অধিক শস্য উৎপাদনের জন্য এবং নতুন ধরণের ভাল সার প্রস্তুতের জন্য, এমন কি কৃষি-কেমিষ্টেরও প্রয়োজন। প্রকৃত পক্ষে একটি কারখানা চালাতে গেলে কেমিষ্ট্রই প্রধান জিনিষ এবং এইটি না হ'লে একদম চলে না। অতএব কলেজ-জীবনে দর্শন ও লজিক পড়ে সময় নষ্ট করা উচিত নয়। কলেজ-জীবনের পর ছাত্রগণ যাতে উপযুক্ত ও পটু হয়ে কারখানার তথা দেশের শ্রীবৃদ্ধি করতে পারে, কলেজে সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত। আজ-কাল শিক্ষিত লোকে অস্পষ্ট, অসংলগ্ন ও কাল্পনিক কথা বলে থাকেন। বাস্তব বা ফলিতজ্ঞান, কার্য্যোপযোগী কৌশল এবং ধনোৎপাদনের ব্যবহারিক শিক্ষা—এসব জ্ঞান তাঁদের মোটেই নাই। যুবকদের কলেজ-জীবনটি যেন ব্যর্থ সময়। ইহার প্রতিকার করতে হ'লে কলেজকে কার্য্যকরী শিক্ষার স্থান করে গড়ে তুলতে হ'বে—পোড়ো জমি করে ফেলে রাখলে চলবে না। কেমিষ্ট্রির সঙ্গে ইলেক্ট্রিসিটিও ব্যবসার ক্ষেত্রে এক অন্যতম জিনিষ। আজ-কাল ইলেক্ট্রিসিটিরই যুগ। কেমিষ্ট্রির মত ইলেক্ট্রিসিটিরও চারটি ভাগ আছে। Theoretical, Medical, Military and Commercial. ছাত্রগণ Chemistry অথবা Electricity ইহার যে-কোন একটি বিষয় গ্রহণ করিবে। দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করা উচিত। ব্যবসায়িগণ কলেজের ছেলেদের এই বলে অপবাদ দেয় যে, তারা কতকগুলি Boobies & F ossils অযোগ্য ও অকর্মণ্য পুরুষ, শুধু কল্পনার জাল তারা বুনতে পারে। বাস্তবক্ষেত্রে এই কারণেই কলেজের ছেলেরা অনুপযুক্ত হয়। কাজেই তাদের এখন নতুন করে শিক্ষা দিতে হবে। বাস্তব ও ব্যবসার ক্ষেত্রে কলেজ-জীবনটা সময় ও অর্থের অপব্যয় মাত্র।

কারখানার দৈনন্দিন জীবন থেকে ছাত্রগণ কিছু করে অবশ্যই জমাবার চেষ্টা করবে। তারা সকাল বেলায় কলেজ করে বেলা ১২টা থেকে ৬টা পর্য্যন্ত যে কোন কারখানায় যোগদান করবে। তারা কারখানার লোকের মত নিয়মানুবর্ত্তী হবে। তা'হলে তারা প্রকৃত ব্যবসায়ীর জ্ঞান পাবে। নিজ নিজ অথবা যৌথ সঞ্চিত টাকা দিয়ে তারা তখন কলেজ ও কারখানার অভিজ্ঞতা নিয়ে সুদক্ষ ব্যবসায়ী হতে পারবে। ছাত্রদের প্রত্যেককেই নিজের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। দেশে তারা শিক্ষিত বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি করবে না, কারণ ইহাতে জাতির নিরুৎসাহ ভাব আসে।

মিলিটারি শিক্ষাকে ছাত্রদের একটি অঙ্গ করা উচিত। কারণ, পৃথিবীর আজ-কাল যা অবস্থা তাতে যে কোন মুহূর্ত্তে দেশ-রক্ষায় জন্য


সবাই জানেন –
এতে আপনার পয়সাও বাঁচে,কারণ প্রতি প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চা থেকে আপনি অনেক বেশী কাপ ভালো চা পেয়ে থাকেন
ব্রুক বণ্ড চা এত ভালো যে রোজ ২৪,৯০,৪৯৬ প্যাকেট চা লোকে কেনেন
সদ্য সদ্য সরবরাহ করা হয় ব'লে ব্রুক বণ্ড চা এত বেশী তাজা থাকে
Brooke Bond Tea
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান !

সৈন্য-বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে। ছাত্রগণের কলেজ-জীবনেই মিলিটারি ড্রিলের সমস্ত আদব-কায়দা আয়ত্ত করা উচিত। শুধু বন্দুক, কামান ও অন্যান্য শিক্ষাগুলি যখন সৈন্যদলে যোগ দেবে তখন শিক্ষা করবে। ছাত্রগণ মিলিটারি ড্রিলে এই ভাবে বেশ ভাল আমোদ পাবে এবং তাতে তাদের স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। ছুটির দিনে দেশের বর্ত্তমান প্রয়োজনানুসারে তাদের স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ করতে বাধ্য করা উচিত, এবং এর বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক ও ভাল খাওয়া তাদের পাওয়া উচিত।

সমস্ত জাতিটিকে পুনর্গঠন ও সংস্কার করা উচিত। দেশে এখন বড় বড় কাজের জন্য শক্তিশালী ও তেজস্বী ক্ষত্রিয় বীরের প্রয়োজন। দেশকে এখন আর পেছিয়ে রাখলে চলবে না—তাকে অগ্রগামী করতেই হবে। শ্রমশিল্প শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য জাতীয় সম্পত্তি শ্রীবৃদ্ধি করা এবং দেশে উপযুক্ত পটু লোক বৃদ্ধি করা। বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি সংস্কারের এইগুলি আমার আভাস মাত্র। জাতিকে সম্পূর্ণ কার্য্যকরী করাই আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। তিন-চারটি জেলা নিয়ে, দেশের লোকসংখ্যা হিসাবে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। কারণ, এক দেশে একটি বিশ্ববিদ্যালয় লোকের ও দেশের প্রয়োজন ও অবস্থাভেদে শিক্ষা পদ্ধতিকে পরিচালনা করতে পারে না। এখানে বেশীর ভাগ আমি শ্রমজাতির ছেলেদের শিক্ষা সম্বন্ধে উল্লেখ করছি। কারখানার বালকদের সঙ্গে শিক্ষার কর্ত্তৃপক্ষদের এই সর্ত্ত থাকবে যে কলেজের ছাত্রগণ দিনের বেলায় বারটা থেকে ছ'টা পর্য্যন্ত যাতে কাজ বা চাকুরী করতে সুবিধা পায়। শিক্ষার ও জাতীয় উন্নতির শ্রেষ্ঠ মনোবিদগণ এ সম্বন্ধে বিবেচনা করে কার্য্যকরী করবার চেষ্টা করবেন।

এখন আর একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বৎসরের কোন এক সময়ে দেশের নির্দ্দিষ্ট কোন এক স্থানে যাতে মিলিত হয়। কারণ প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয়েরই স্বনামধন্য ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক রাখবার সামর্থ্য নাই, অতএব ছাত্র ও অধ্যাপকগণ সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে সেই সব প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের বক্তৃতা শুনিবে। ইহা এক প্রকার আমোদ-প্রমোদের ভ্রমণ এবং শিক্ষাও বটে, তাছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র বিনিময়ের দ্বারা ছাত্রদের একটি জাতীয় সংঘ গঠন হতে পারে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণকে নির্দ্দিষ্ট শিক্ষাকেন্দ্রে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বক্তৃতা দিতে আমন্ত্রণ করা যেতে পারে। শিক্ষা পদ্ধতিটিকে জাতির গণতন্ত্রে পরিণত করা উচিত। জাতীয় উন্নতির ইহাও একটি দিক।

এবারে ছাত্র-ছাত্রীদের আমোদ-প্রমোদের ভ্রমণ সম্বন্ধে বলা হবে। তারা তাদের অধ্যাপকগণের সঙ্গে বছরের যে কোন এক সময়ে এশিয়ার বিভিন্ন বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করতে যেতে পারে। সেখানে তারা কত রকম ছেলে-মেয়ের সঙ্গে মিশে ও তাদের দেশসেবার কাজকর্ম দেখে এক কার্য্যকরী সম্যক জ্ঞান অর্জ্জন করবে। ইহাতে এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব সৃষ্টি হবে। এই ভ্রমণ শুধু যে আমোদ-প্রমোদই তা নয়—ইহা তাদের চাষের, কারখানার, শিক্ষা-কেন্দ্রের ও জাতীয় জীবনের বিশেষ শিক্ষা। ইহাতে এশিয়ার সমস্ত জাতিগুলি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে। তাছাড়া সামাজিক সম্বন্ধ ও বন্ধুত্ব বাড়বে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতি হবে। এই ভ্রমণকে আমোদ প্রমোদের ভ্রমণ করলে চলবে না—ইহাকে কার্য্যকরী শিক্ষার ভ্রমণ করতে হবে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে যে, শিক্ষা একটি নদীর স্রোত। ইহাকে সর্বকালের জন্য চিরন্তন করতে চেষ্টা করা বৃথা। শিক্ষার কর্ত্তৃপক্ষগণ বছরে একবার করে দেশের কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হয়ে দেশের উন্নতির জন্য নব নব ফলিত ও উন্নত জ্ঞান-বুদ্ধির সমালোচনা করবেন। তারপর প্রতি দশ বৎসর অন্তর জগতের ও সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতিকে সংস্কার করা উচিত। মনে রাখতে হবে যে, পাশ্চাত্য জাতি সমূহের চেয়ে বিজ্ঞানে, ব্যবসায়, বাণিজ্যে ও অর্থে আমাদের সজাগ ও শ্রেষ্ঠ হতে হবে। তার পর প্রতি দশ বৎসর অন্তর এশিয়ার শিক্ষার কর্ত্তৃপক্ষগণ এশিয়ার কোন নির্দ্দিষ্ট সহরে এক মহাসভা করে দেশের অবস্থা ও কালের পরিবর্ত্তন অনুযায়ী শিক্ষার সমস্ত পদ্ধতিটিকে সংস্কার করবেন। এই ভাবে সমস্ত এশিয়া দেশের মহৎ কাজ করে নবীন উৎসাহে জেগে উঠবে।

ভাষার প্রশ্ন এক মহা সমস্যা, বর্ত্তমানে ইংরাজী ভাষা এশিয়ার সমস্ত অংশেই ব্যাপক ভাবে জানে। কাজেই ইংরাজী ভাষাকে এশিয়ার সমস্ত বিভিন্ন জাতির আদান-প্রদানের ভাষা করা উচিত। বর্ত্তমানের জন্য ইহা এক সাময়িক পরিকল্পনা। যত দিন না এশিয়ার কোন ভাষা উন্নতি লাভ করে ইংরাজী ভাষার স্থান লাভ করে, তত দিন কাজের সুবিধার জন্য মাত্র কিছু দিনের জন্য ইংরাজী ভাষার বশ্যতা স্বীকার করতে হবে। ইহা এক অস্থায়ী পরিকল্পনা মাত্র। কিন্তু এশিয়ার কোন ভাষা যখন উপযুক্ত ভাবে উন্নতি লাভ করবে,—তখন এশিয়ার জাতিগুলি তাহাকে অনুকূল স্থানীয় যোগাযোগ হিসাবে গ্রহণ করবে। কারণ ভাষাসমস্যা জাতীয় উন্নতির মহা সমস্যা, এশিয়ার সমস্ত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ এশিয়ার এই মহা-মিলনের জন্য অধিক মনোযোগ দিবেন। এক ভাষায় কথা বলার এই সাধারণ পদ্ধতির জন্য এশিয়ার মিলন ধীরে ধীরে বিস্তারিত হবে এবং এশিয়া নিশ্চয়ই উঠবে ও জাগবে।

জেল ও আইন

আইনের কথা বলতে গিয়ে এটা প্রায়ই দেখা যায় যে, অপরাধীকে রক্ষা করবার জন্য কোন উকিলের সুবিধা না দিয়ে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হয়। অনেক নির্দ্দোষী লোক তাদের মকদ্দমায় উকিল দিতে না পারার অভাবে শাস্তি ভোগ করে, আবার অন্য দিকে নিকৃষ্ট অপরাধীও তাহার পক্ষে বড় উকিল দিয়ে ও যথেষ্ট টাকা খরচ করে অব্যাহতি পায়। এইরূপে মানুষের সত্য ও ন্যায্য দাবীকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করা হয়, ইহাকে আইনের বর্ব্বরতা বলে। অপরাধী ব্যক্তিমাত্রকেই তাহার পক্ষে উপযুক্ত উকিল দেবার সুযোগ দেওয়া উচিত। গরীব লোক উকিলের ফি দিতে পারে না এবং বিচারকের কাছে তাহার কথাও ভাল করে বলতে পারে না। আইন আদালতে কাজে কাজেই তাহাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়, এই জন্যই বলা হয় যে, আইন বড়লোকদের সম্পত্তি ও মর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্য এবং গরীব ও নির্ব্বোধদের জব্দ করবার জন্য। আইনে বড় লোকদেরই সুবিধা ও উপকার হয়ে থাকে।

এখন এই অসুবিধা দূর করতে হলে প্রকৃত উপায় হচ্ছে,

যে কেহই হোক না কেন, উকিল না দিলে তাহাকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হবে না। আইন করতে হবে যে প্রত্যেক অপরাধীকে উকিল দিতে হবে, এই কাজের জন্য আদালত অপরাধীর পক্ষ নেবার জন্য কোন জুনিয়র অর্থাৎ নিম্ন উকিলকে অনুরোধ করিবে, জুনিয়র উকিল এই ভাবে শিক্ষা পাবে এবং অপরাধীও তাহার বিপক্ষের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করবার সুযোগ পাবে। উকিল না হলে কোন বিচার বা শাস্তি সঙ্গত হবে না।

এবারে পরবর্ত্তী বিষয় হবে যে, বিচারক একা আসামীর বিরুদ্ধে মকদ্দমা মীমাংসা করতে পারবেন কি না। বিচারের মূল তত্ত্ব হচ্ছে যে, বাদী ও প্রতিবাদী দুই পক্ষের বিচার হয়ে মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত কাহাকেও দোষী বলে সাব্যস্ত করা হয় না। ইহাকে জুরির বিচার বলে। প্রত্যেক মকদ্দমায় কাহাকেও দোষী বলে সাব্যস্ত করবার পূর্ব্বে উকিল তাহাকে রক্ষা করবেন এবং প্রতিবাদীর ন্যায় বাদীরও সুবিচার হবে। ইহাকে ন্যায্য বিচার বলে। বিচারক জুরির প্রত্যেকের কাছ থেকে তাঁহাদের নিজস্ব মতামত নেবেন। বাদী ও প্রতিবাদীর উভয়ের উকিলের মতামত ছাড়া আদালতের দণ্ডনীয় বিচারকে স্বেচ্ছাচার ও বর্ব্বরতা বলে। ইহাতে স্বাধীন নাগরিকের ন্যায্য দাবী ও অধিকার ক্ষুন্ন হয়। প্রাচীন অত্যাচারী ও বর্ব্বর যুগের রাজত্বের ইহা নিদর্শন। বর্ত্তমান যুগোপযোগী করে ইহাকে এখন সংশোধন, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা উচিত। আইন-আদালত গরীব ও শ্রমজীবীদের স্বাধীনতার দুর্গপ্রাকার স্বরূপ। অত্যাচারী ধনাঢ্যের কবল থেকে গরীবের দাবী ও অধিকার রক্ষা করাই একমাত্র লক্ষ্যের বিষয়।

আদালত সাধারণের দাবীর রক্ষাকর্ত্তা, ইহা রাজকার্য্য পরিচালকদের কাছ থেকে দূরে থাকা উচিত। রাজকার্য্য পরিচালকগণ ও ব্যবস্থাপকগণ নিজেদের হাতে ক্ষমতা রেখে কর্তৃত্ব করবার জন্য আইন ও বিচারের দোহাই দেন। যে বিচারকগণের উপর মানব রক্ষার ভার থাকে, তাঁরা রাজসরকারের কাছ থেকে অবশ্যই পৃথক থাকবেন। রাজসরকার মানুষকে নির্যাতন করতে সর্বদা চেষ্টা করেন। মানুষের যাতে আদালতের প্রতি বিশ্বাস থাকে এবং তাদের দাবী ও অধিকার যাতে রক্ষা পায় বিচারপতির তাহাই কর্ত্তব্য নয় কি? আইন যেহেতু সরল স্পষ্ট নয়—অতএব নিরপেক্ষতা ও ন্যায়বিচার বিচারালয়ের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। যে দেশে বিচারালয়ের অধিপতিগণ অযোগ্য এবং রাজসরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই, বিচার সেখানে কখনই ভাল হতে পারে না, প্রত্যেক সভ্য দেশে আদালতই মানুষের স্বাধীনতার প্রধান দুর্গ এবং বিচার সেখানে নিরপেক্ষ ও অপক্ষপাত। আইন আদালতে লোকের সুবিচার ও বিশ্বাস না থাকলে, দেশের রাজশাসনকে প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হতে হয়।

এশিয়ার কোন কোন দেশে যাঁরা উকিল নন, তাঁরাও বিচারপতি বা জজ হন। ইহা কিরূপে সম্ভব হয়? ব্যাপারটা এই যে, তিনি অভিজ্ঞতা থেকে আইনের মার-প্যাচ শিখেছেন। কিন্তু ইহা কোন যুক্তির বিষয় নয় যে, তিনি ছেলেবেলা থেকে উকিলের কাজ শিক্ষা করে হঠাৎ তিনি তাঁর জীবন পরিবর্ত্তন করে জজ বা বিচারপতির উচ্চ আসনের দাবী করবেন, ইহা রাজশাসনের দোষ।

সমস্ত এশিয়ার আইন সম্বন্ধে আমি এই পর্য্যবেক্ষণ করেছি যে, প্রাচীন আইনগুলি সব ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সেগুলি শুধু ধর্মতাত্ত্বিকদেরই উপকারে আসে। শ্রমজীবী ও নারীর অধিকার এবং আত্মকেন্দ্রিক ভাব সেখানে নাই। এই সমস্ত আইন আদালত-গুলি প্রাচীন যুগের কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু, আধুনিক উন্নত সমাজের পক্ষে অতীব দোষণীয়, এশিয়ার সমস্ত দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতগুলি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী করে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ও সংস্কার করা উচিত। ভারতবর্ষে—"দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা" নামে হিন্দুদের উত্তরাধিকারের কতকগুলি আইন আছে। এগুলিকে **Cult Laws** ধর্ম্মানুষ্ঠানের সাম্প্রদায়িক অথবা নির্দ্দিষ্ট শ্রেণীর আইন বলে। আবার **Creedal Laws** ধর্ম্মবিশ্বাসের আইনও বলে। দক্ষিণ-ভারতে হিন্দুদের উত্তরাধিকারের আইনগুলির ভিন্ন ভিন্ন অর্থ। মুসলমানদের মধ্যে সিয়া ও সুন্নির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইন। তাছাড়া খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের জন্যও ভিন্ন ভিন্ন আইন।

কার্য্যরত উকিল ও বিচারপতির পক্ষে এই সকল বিভিন্ন আইনগুলি অত্যধিক অপকার ও ধাঁ-ধাঁ স্বরূপ। কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্মানুষ্ঠানের আইনের প্রকৃত অর্থ সম্বন্ধে কেহই নিশ্চিত হতে পারে না। এখন এই সকল দোষগুলির সংশোধন করতে হ'লে ভারতবর্ষের মত বৃহৎ জায়গায় যেখানে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠান রহিয়াছে, সেখানে ভিন্ন-ভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মানুষ্ঠানের ভাল ভাল উকিল এক স্থানে জড়ো হ'য়ে ভারতের সকল লোকের উপযোগী—এক নিরপেক্ষ আইন সংগ্রহ করবেন। ইহাকে ভারতের আইন সংগ্রহ বলা হবে—কোন ধর্মবিশ্বাসের আইন বলা হবে না। ভারতের এই নূতন ও ব্যাপক আইন সংগ্রহ বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উপযোগী হওয়া উচিত। কিন্তু ইহার প্রধান উদ্দেশ্য আত্মকেন্দ্রিক হবে এবং শ্রমজীবী ও নারীদের সুবিধা হবে। এই যুগের উপযোগী নূতন ভারত আইন সংগ্রহ যত দিন না প্রস্তুত হয়,দেশ তত দিন অশান্তি ভোগ করবে। **Pariahs** ও দক্ষিণ-ভারতের অস্পৃশ্যগণ প্রাচীন ভারত আইন কর্ত্তৃক সামাজিক সুবিধা ও অধিকার হতে বঞ্চিত হয়ে বড়ই গোলযোগ করে। তাছাড়া স্ত্রীলোকদের উত্তরাধিকার স্পষ্টতঃ সেখানে উল্লেখ নাই। প্রাচীন আইনের এই সমস্ত দোষের জন্য ভারতের বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের আইন সংগ্রহ অত্যাবশ্যক। ইহাতে নবভারত সকল শ্রেণীর লোকের দাবী ও অধিকার অটুট রেখে অন্যের সহিত সমকক্ষ উন্নতি ও স্বাধীনতার সুযোগ পাবে। এই আইন কোন ধর্মবিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করবে না। ইহা সকলের সহিত সমান ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। ইহা কোন নির্দ্দিষ্ট ধর্মের আইন না হ'য়ে প্রকৃত ভারতের আইন হবে। বিভিন্ন ধর্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ উকিলগণ ভারতের এই আইন সংগ্রহের জন্য একত্র মিলিত হ'য়ে যে আইন রচনা করবেন, তাহাকে ভারতের জাতীয় নাগরিক আইন বলা হবে।

এবারে অপর বিষয়টি হচ্ছে যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের ও জীবনের বিভিন্ন কার্য্যাবলীর আইনগুলিকে সংস্কার করা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের উন্নত দেশগুলি থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও অন্যান্য বিষয়ের শ্রেষ্ঠ আইনগুলি গ্রহণ করে আমাদের এই ভারতে ও এশিয়ার চালু করা। তুরস্ক দেশের লোকেরা এই ভাবে বিভিন্ন দেশের উন্নত জাতিগুলির কাছ থেকে আইন সংগ্রহ করে তুরস্কের জাতীয় আইনে একত্রিত করেছে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশও তুরস্কের ন্যায় এই সাম্য আইন প্রথার আদর্শ গ্রহণ করতে পারে। কারণ, আধুনিক

উন্নত মনুষ্য সম্প্রদায় ধর্মতাত্ত্বিকদের সীমাবদ্ধ অনুশাসন আর মেনে চলতে পারে না। উহাদের হাজার বছরের পুরাতন শাসনে জাতীয় উন্নতি অতিশয় মন্থরগতি হয়েছে এবং সমাজের আত্মকেন্দ্রিক ভাবকে অবজ্ঞা করে ধর্মতাত্ত্বিকেরা নিজেদের অনেক সুবিধা করেছে। এই জন্য এশিয়ার নাগরিক ও ব্যবসায়িক আইন সংগ্রহগুলি বর্ত্তমান যুগোপযোগী পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা উচিত।

এখন ফৌজদারি আইনের কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় যে, এই আইনসংগ্রহগুলি বর্ত্তমান রাজসরকারের নির্য্যাতিত ও নিপীড়িত আইনের ন্যায় অতীত মানবের নিষ্ঠুর মনের পরিচয়। কোন নিরপেক্ষ, উন্নত ও চিন্তাশীল লোকের কাছে এই ফৌজদারি আইন এক আশ্চর্য্য ব্যাপার! সামান্য কারণের জন্য লোকে কেন তার স্বাধীনতা ও জীবন নষ্ট করবে? এই ফৌজদারি আইন বলে—যে-সব লোকই দুর্বৃত্ত তাদের সকলেরই নির্য্যাতন ও শাস্তি পাওয়া উচিত। পবিত্র ও মহান ভাবগুলি এই ফৌজদারি আইন সংগ্রহ হ'তে সম্পূর্ণরূপে মুছে ফেলা হয়েছে। প্রাচীন আইন সংগ্রহকারীদের ও বর্ত্তমান সমাজের উন্নত ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এই জন্যই কলহ হয়ে থাকে। বর্বর যুগের ফৌজদারি আইন সম্পূর্ণরূপে এখন সংস্কার হওয়া উচিত।

দারিদ্র্যে নিপীড়িত অনাহারী মানুষ তার ছেলেমেয়েদের মুখে এক মুঠো অন্ন দেবার জন্যে অপরের জিনিষ নিতে উন্মুখ হয়। ক্ষুধার্ত্ত ছেলেমেয়েদের প্রতিপালনের জন্য পিতাকে এই অন্যায় কাজ করতে বাধ্য হ'তে হয়। বেকার লোকদের এই অন্যায় কাজ হ'তে মুক্তি পাবার জন্য কাজ দিয়ে টাকা রোজগারের সুযোগ দেওয়া হয় না কেন? অন্য বিষয়টি এই যে, সমাজের কোন লোককে সমাজের কোন অন্যায় কাজ বা দোষের জন্য তার ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট করে তাকে অবনত করা ঠিক নয়। অপরাধী যাতে খেটে খেতে পায়, তার দৈনন্দিন খরচ চলে ও কিছু করে জমিয়ে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভাবে যাতে কোন ব্যবসা করতে পারে, সেজন্য তাকে জেলে না দিয়ে কোন কারখানায় দেওয়া উচিত। মানুষের এই সামান্য দোষের জন্য তার ভবিষ্যৎ জীবনকে পঙ্গু করা বা সমাজে তাকে হেয় করা উচিত নয়। স্বাধীন মানুষ সমস্ত জীবন ধরে সে স্বাধীনই থাকবে।

এখন প্রশ্ন হবে যে, কয়েদীদের কি অবস্থা হবে। মানুষের হঠাৎ কোন দোষের জন্য তার শেষ জীবন পর্য্যন্ত কেন তাকে হীন ও ব্যর্থ করা হয়? আইনের অপব্যবহারে জাতীয় মন তাই হীন, রুগ্ন ও নিরুৎসাহ হয়। কয়েদীরাও জাতির স্বাধীন মানুষ। দেশের যে কোন স্বাধীন লোকের মত তারাও জীবিকার্জ্জনের সমান সুবিধা ভোগ করবে। কারখানার লোকেদের জন্য লাইব্রেরী। গানের ঘর এবং উন্নত সভ্য জীবনের যাবতীয় সামগ্রী থাকা উচিত। তারা পশুর মত সেখানে ব্যবহার যেন না পায়। এটা প্রায়ই দেখা যায়, মানুষ যখন প্রথমে জেলে যায়, কয়েক মাস সেখানে থাকার পরে সে আরও ভীষণ ও দুর্বৃত্ত হয়ে ফিরে আসে। জেলের পরিচালকগণের ইহা বড়ই অন্যায়। মানুষ এই ভাবে নিষ্ঠুরতম অপরাধীর সঙ্গে মিশতে বাধ্য হয়ে শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃতই পশুভাবাপন্ন হয়ে যায়।

মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি আরও ভয়ঙ্কর! খুনী কোন লোকের প্রতি হঠাৎ রেগে আগুন হয়ে অথবা ভাবাবেগের আতিশয্যে কুকর্ম অনুষ্ঠানে রত হয়। ইহা অপ্রত্যাশিত ঘটনা—যার জন্য এই কুকর্মানুষ্ঠানকারী তার শান্ত অবস্থায় দুঃখিত হয়। হঠাৎ রেগে অথবা রাগের কোন প্রধান কারণে খুনীরা সাধারণতঃ খুন করে থাকে। দ্বিতীয়তঃ খুনীরা সাধারণতঃ কোন ভালবাসার বিষয় বস্তুতে জড়িত। এই দুই শ্রেণীর খুনীই সমাজে প্রধান। তৃতীয় শ্রেণীর খুনীগণ মাতাল অবস্থায় স্বভাব বশতঃ গুপ্তঘাতকের কাজে অগ্রসর হয়। মানুষের এই হঠাৎ রাগের জন্য তাকে ক্ষমা করতে পারা যায়। অথবা তার আত্মীয়ের কিম্বা অপরাধীর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ অর্থ আদায় করে আঘাতকারীকে দেওয়া যায়। হঠাৎ ক্রোধান্বিত হওয়ার দোষের জন্য অর্থের প্রশ্ন বিবেচনা করা উচিত। ইহা নাগরিক ব্যাপার, আসামীর বিষয়বস্তু নয়। ভালবাসার জন্য অন্য শ্রেণী খুনীদেরও নাগরিক ব্যাপার বলে গ্রহণ করা হবে এবং তাদের অর্থের দাবীতে ক্ষতিপূরণ হবে। এই দুই শ্রেণীর খুনীদের অধিকাংশ ক্ষেত্রে অর্থে ক্ষতিপূরণ সাব্যস্ত হবে।

ব্যবসায়ী গুপ্তঘাতকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা হবে, এবারে সেই কথা বলা হবে। প্রথমতঃ যুদ্ধ করার মনোবৃত্তি নিয়ে যোদ্ধার ঘরে তাদের জন্ম, তাদের মধ্যে অনেকেই বলে যে, তারা প্রবল পরাক্রান্ত লোকের অত্যাচার থেকে দুর্বল ও নির্য্যাতিতদের রক্ষা করে। অনেকে আবার বলে যে, তাদের ছেলেমেয়েরা শুকিয়ে মরছে। কাজে কাজেই তাদের অন্যায় পথ অবলম্বন করতে বাধ্য হতে হয়, যোদ্ধা হয়ে জন্মানর জন্য জাতি তাদের সাহসিকতা ও সক্রিয়তার সদ্ব্যবহার করে সৈন্য বিভাগে লুণ্ঠন কাজে অথবা ঘোড়ার খাদ্য আহরণের কাজে নিযুক্ত করতে পারে। এইরূপ সবল দুর্দ্ধর্ষ মানুষ সৈন্য বিভাগে প্রয়োজনে লাগে। দেশের কাজে তাদের নিযুক্ত কর। এই সকল জন্মযোদ্ধার জীবনগুলিকে নষ্ট করো না। প্রত্যেক সৎ ও অসৎ লোকটিকে জাতীয় উন্নতির কোন কাজে লাগাও, তাহাদিগের জীবনগুলিকে ফাঁসি কাঠে ঝুলিয়ে অথবা বধ করে নষ্ট করো না। কারণ ইহাতে জাতির যোগ্যতা ক্ষীণ হবে। কাঁচা মালের প্রত্যেক টুকরাটি বা খোসাটি, সে ভালই হোক্—অথবা মন্দই হোক, দেশের উন্নতির জন্য সদ্ব্যবহার করতে হবে। এই জন্যই আমি লোককে ফাঁসি দেওয়া অথবা জেলে দেওয়ার বিপক্ষে বলি, মানুষের মধ্যে দেবত্ব জাগাবার চেষ্টা করা উচিত। পাপী হয়ে জন্মানর ইহুদিদের পুরাণ-প্রথা এক হাস্যকর ব্যাপার। প্রত্যেক লোকই দেবতা এবং তার মধ্যেই দেবত্ব আছে। মানুষের দেবত্ব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা কর। তাহ'লেই মানুষ উন্নত হয়ে এক শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হবে।

এবারে অবৈধ ছেলে-মেয়েদের কথা বলতে গিয়ে বলতে হয় যে, এই সমস্ত স্বাভাবিক সন্তানগুলি কোন বংশধরের অন্যান্য সন্তানের মতই সন্তান। সাধারণ ছেলের মত এরাই বা তার দাবী ও অধিকার হতে বঞ্চিত হবে কেন? জাতির উন্নতিকে ক্ষীণ করবার ইহা এক হীন উপায়, প্রত্যেক স্বাধীন লোকের মতই উহারাও স্বাধীন। অতএব সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ, এই সমস্ত স্বাভাবিক বংশধরগণ যাতে সমাজে স্থান পায় ও অপরের সমতুল্য হয় এবং উত্তরাধিকার সূত্রে বংশের মর্য্যাদা পায়, সম্পত্তি পায়, সেজন্য অবশ্যই আইন রচনা করবেন। কারণ, ইতিহাসে আমরা দেখতে পাই যে, জাতির অনেক উজ্জ্বল ও সুমহান ব্যক্তিগণ এই সমস্ত স্বাভাবিক সন্তান। বর্ত্তমান এই প্রগতির যুগে স্বাভাবিক সন্তানদের অপরের সমকক্ষ হয়ে সমাজে তাদের মর্য্যাদা ও স্থান দেওয়া উচিত।

এবারে বিবাহ সম্বন্ধে বলা হবে। প্রাচীন আইন অনুসারে ধর্ম-বিবাহই প্রচলিত। সেখানে রাশি, গণ, বংশ প্রভৃতি অনেক কিছুর দেখবার থাকে। কিন্তু এখন লোকে সিভিল বিবাহের পক্ষপাতী। এই সিভিল বিবাহ প্রচলনের এখন প্রত্যেক সুবিধাটি দেওয়া উচিত। ইহাকে বঞ্চিত করা চলে না। সামাজিক জীবনের ইহা এক অঙ্গ। ধর্মবিবাহের সঙ্গে এই সিভিল বিবাহও আজকাল সমান ভাবে চালু হবে। স্বাভাবিক সন্তানগণের সংখ্যা এই ভাবে কমে যাবে এবং সবই সিভিল বিবাহের বংশধর হবে। জাতির ইহা পরম উপকার। ইহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্ন লোকদিগকে এক শক্তিশালী গোষ্ঠীতে পরিণত করবে।

এই সব আইনগুলি শুধু ভারতেই নয়—এশিয়ার সমস্ত অঞ্চলেই প্রযোজ্য, ইহা এশিয়ার সমস্ত সামাজিক রীতি নীতি ও আশা-ভরসাকে এক করে জাতির কাঠামোকে উন্নত ও দৃঢ় করবে, ধর্মতাত্ত্বিকদের আইন সংগ্রহগুলিকে সংস্কার করে বর্ত্তমান উন্নত সমাজের উপযোগী এক নূতন আইন-সংগ্রহ প্রচলন করা উচিত।

ভারতের উন্নতির জন্য যত সব আইন ও তার মূলতত্ত্ব ভাষায় বর্ণনা ও বিবৃত করেছি, তাহা সমগ্র এশিয়ার পক্ষেও প্রযোজ্য। এই সব মূলতত্ত্বগুলি স্থানীয় লোকের অবস্থানুযায়ী কার্য্যকারী করা উচিত। জাতীয় উন্নতির মূলতত্ত্বটি স্মরণ করে যেমন করেই হোক, দেশের অবস্থা ও দুঃখ নিবারণ হবে।

সংগঠিত ও অসংগঠিত দান

দীন দরিদ্রদের দান সম্বন্ধে এবারে প্রশ্ন হবে। সমস্ত এশিয়া দেশেই অসংগঠিত দানের প্রথা প্রচলিত। ইহাতে দরিদ্র লোক যে উপকৃত হয় সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ, কিন্তু অনেক ভবঘুরে ও অলস লোক এই সব দানের সুবিধা গ্রহণ করে। এই অসংগঠিত দান সমস্ত এশিয়ার অতি প্রাচীন প্রথা, কিন্তু পাশ্চাত্যে সংগঠিত দানের ব্যবস্থা আছে। সেখানে ভিক্ষা করা অপরাধ। সংগঠিত দান যেমন হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, বার্দ্ধক্যাশ্রম এবং এই ধরণের আরও অন্যান্য সেবাশ্রম। যেখানে দীন, দরিদ্র, অন্ধ, আতুর প্রভৃতি লোকেরা আশ্রয় পায়। এই সমস্ত সংগঠিত প্রতিষ্ঠানের যে দোষ নাই তাহা নহে। কারণ, আমি আমার অনেক বন্ধুর কাছ থেকে এই সব আশ্রমের অনেক দোষের কথা শুনেছি। কিন্তু যে ভাবেই হউক, উহা ভবঘুরেদের দমন করে। ভবঘুরেরা ভিক্ষা করেই জীবন ধারণ করে এবং এই ভিক্ষাই তাদের টাকা রোজগারের একমাত্র ব্যবসা। জাতি যাতে নব সভ্যতা ও কৃষ্টির পথে অগ্রসর হতে পারে, এই প্রশ্নের তাই দুই দিক ভাল করে বিচার করা উচিত। ভিক্ষাবৃত্তি সম্পূর্ণ বন্ধ করা অন্যায় ও নিষ্ঠুর কাজ। কারণ, অধিকাংশ লোকই বেকার এবং তারা নিজেদের জীবিকার্জ্জন করতে পারে না। মধ্যপন্থা হ'ল যে দীনাতুরের আশ্রয় ও রক্ষার জন্য সংগঠিত দানের

প্রথা থাকবেই এবং সঙ্গে সঙ্গে বেকারগণ যাতে চাকুরী পায় সেজন্য কলকারখানা আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন। তবে ভিক্ষাবৃত্তি ক্রমশঃ উঠিয়ে দেওয়া উচিত। এখন সংগঠিত দানের প্রথা উন্নত করা উচিত এবং অসংগঠিত দান যাতে বন্ধ হয় সে চেষ্টাও করা উচিত। এখানে লোকের ভাবপ্রবণতার প্রশ্ন বড় নয়, জাতীয় উন্নতি, আত্মনির্ভরশীলতা ও দাবী সমর্থনের প্রশ্নই শ্রেষ্ঠ। মানুষ সব সময় পূর্ব্বপুরুষদের প্রাচীন মনোভাবে পরিচালিত। কোন রকম নূতন কাজ বা চিন্তা করতে তারা অপারগ। অতএব সংগঠিত প্রথার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া উচিত। ইহা শুধু ভারতে নয়, সমস্ত এশিয়ায়ও দানের এই নব দৃষ্টি ধীরে ধীরে খুলে জাতীয় জীবনে যেন মিশে যায়। সংগঠিত দানের প্রথা স্থানীয় লোকের মনোভাব ও অবস্থা অনুযায়ী বহু প্রকারের হয়ে থাকে। ব্যবসায়ী ভবঘুরেদের সম্পূর্ণরূপে বর্জন করা উচিত।

আমার অপর প্রস্তাবটি এই যে, বার্দ্ধক্যের পেনসন ও বার্দ্ধক্যের জীবনবীমা প্রত্যেক লোকেরই থাকা উচিত। লোকেরা তাহলে বুড়ো বয়সে তাদের হীন দরিদ্র জীবনের হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে। বার্দ্ধক্যের এই পেনসন প্রথার প্রবর্ত্তনে সমস্ত এশিয়ার ভিক্ষুকের প্রশ্ন কিছুটা সমাধান হতে পারে, এশিয়ার প্রত্যেক দেশই এ সম্বন্ধে নিজ নিজ বিবেচনা করবে।

এশিয়াবাসিগণ তাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাজ ও চিন্তাধারা বদ্‌লাতে নারাজ। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যেখানে দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছে, এশিয়া সেখানে তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের আঁচল ধরে পশ্চাতে পড়ে রয়েছে। তাই বলি, বর্ত্তমান অবস্থা অনুযায়ী এশিয়ার সমস্ত চিন্তাধারা পরিবর্ত্তন করা উচিত নয় কি?

পোষাক

এশিয়ার লোকেরা লম্বা ঢিলে পোষাক পরতে অভ্যস্ত। এই পোষাক তাদের রাজপোষাক কিন্তু ব্যবসায়ী জীবনের দ্রুত চলাফেরা ও কর্ম্মতৎপরতার পক্ষে এই পোষাক বাধাস্বরূপ, তাছাড়া এই পোষাকের দাম সংসারের এক বড় খরচ। এখন ব্যবসায়ীর যুগ এবং সমস্ত জাতিই শ্রমশিল্পী; কাজেই চট্‌পটে smart ও ছোট পোষাকই এখন উপযুক্ত, কাজের লোকেদের চলাফেরার পক্ষে এই ছোট পোষাক খুব সুবিধে এবং কাজে ইহা খুব তৎপরতা আনে। এই ছোট পোষাকে খরচও খুব কম হয়। অতএব লম্বা ঢিলে ঐ রাজপোষাক ছেড়ে এখন আমাদের চট্‌পটে ছোট পোষাক পরা উচিত নয় কি? তবে পোষাক যে সুন্দর ও পছন্দসই হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এবারে মাথার পোষাকটি কেমন হবে, বলা হবে। মাথার পোষাক, সূর্য্যের প্রখর কিরণ ও তাপ থেকে চোখ ও মাথাকে বাঁচাবার জন্যে, চওড়া কিনারাযুক্ত, হাল্কা ও কম দামী হওয়া উচিত। ট্রাউজার ও বিচেস হাঁটু পর্য্যন্ত হবে। তাতে কাজের লোকেদের খুব সুবিধে। উকিলদের কিন্তু এই ছোট পোষাক পরা থেকে বাদ দিতে হবে। কারণ তাঁরা আদালতের অন্তর্ভুক্ত—এবং বিচারকের বিচারালয়ও রাজদরবারের একটি অঙ্গ, উকিলদের লম্বা ঢিলে পোষাক, ব্যবসায়ী লোকেদের পোষাক থেকে তাই ভিন্ন হবে। স্কুলের ছাত্রদের ও অফিসের কেরাণীদের ছোট্ট চট্‌পটে পোষাক হওয়া উচিত। কারণ, বর্ত্তমান এই অর্থসঙ্কটেও ব্যবসার যুগে এখন প্রগতির এই ছোট পোষাক পরতে হবে। এতে মানুষের মনোভাবগুলিও ব্যবসা ও শ্রমশিল্পে পরিবর্ত্তিত হবে।

উত্তর-অফ্রিকার কাইরোতে যখন কোন উৎসব হয়, সেখানে দেখা যায় যে, সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা কর্ণেল ও জেনারেলদের মিলিটারি পোষাক পরে। এই পোষাক তাদের এতো নিখুঁত হয় এবং চলনভঙ্গী ও আদব-কায়দা এতো সুন্দর হয় যে, কর্ণেল ও জেনারেলদের চেয়ে তারা কোন অংশেই ছোট নয়। যুবকদের মনে এতে বীর ও ক্ষত্রিয় ভাব আসে। আমার ইচ্ছা, কাইরোর মত আমাদের ভারতবর্ষেও উৎসবের ঐ পোষাক প্রচলন হোক। কারণ, ওতে ছেলে-মেয়েরা ছেলেবেলা থেকেই ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হবে। ছোট ছোট বালিকারা বাদ যাবে না। তারাও উৎসবে মিলিটারি ও নেভি পোষাক পরিধান করবে।

এবারে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে, কি করে আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েদের মুখে বিভিন্ন ধরণের ছড়া গান না গেয়ে সামরিক সুরে জাতীয় সঙ্গীত দেওয়া যায়। ইহাতে দেশের জাতীয় মনোভাব বজ্র, সাহসী ও সামরিক ভাবাপন্ন হবে এবং দেশ দুর্ব্বলতা অবসাদ ও জড়তা ত্যাগ করে ক্ষত্রিয়ভাবাপন্ন হবে। জীবনের প্রতি পদক্ষেপে যুবকদের বুকে এই ক্ষত্রিয় শক্তি সঞ্চার করে তাদের আজ ওঠাতে হবে—জাগাতে হবে ও ঘুম ভাঙাতে হবে।

সমাপ্ত

অনুবাদক: লালবিহারী ঘোষ

মরাল

(ফরাসী কবি মালার্মের মূল সনেট থেকে)

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পবিত্র যে, অনুপ, চির পরাণ-উচ্ছল আজ
বিভোল তারি পাখার গতি তুষার-গহনে
নিমগ্ন ওই বিস্মরিত কঠিন সরসীর
তন্দ্রা দেবে দীর্ণ করে মুক্তি-এষণায়?

অতীতের এক মরাল-প্রাণে জাগে স্মৃতির রেশ,
বন্ধ্যা শীতের পরশ-জ্বালা সে-কোন্ নিরাশায়
বিষাদ ত্যজি' প্রবল-পাখায় যাচি' পরিত্রাণ
গায় নি কভু সুদূর পানে এই জীবনের স্তব।

মর্ত্য-জাত শুভ্র ব্যথা গ্রীবার আঘাতে
মর্ত্য-বিমুখ পাখী দেবে তুচ্ছ করে আজ,
কিন্তু ধরার নির্মমতায় বন্দী পাখা তার।

অশরীরী—বর্ণজালে যে তায় ঘিরেছে,—
অবজ্ঞাত সে যে নিথর শীতল স্বপনে,—
আবরি' দেয় ওই মরালের বিফল এ-প্রবাস।


এখন রেক্সোনায় নতুন একটা কিছু আছে !
এটা অনেক...
অনেক...
বেশী সুগন্ধী !
রেক্সোনা সাবানে এখন
অনেক...অনেক
বেশী সুগন্ধ আছে
দীর্ঘস্থায়ী
সতেজতার জন্যে
Rexona
রেক্সোনা প্রোপ্রাইটরি লিঃএর পক্ষে ভারতে প্রস্তুত।



পক্ষধর মিশ্র

বহু দিনের অভাব দূর করে সম্প্রতি ভারতীয় রসায়নের একটি সুসম্পাদিত ইতিহাস প্রকাশিত হয়েছে,—প্রকাশ করেছেন ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটী এবং বইটির লেখক খ্যাতনামা বিজ্ঞানী অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়। প্রাচীন ভারতীয় রসায়নের লুপ্ত ইতিহাসকে উদ্ধার করে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র 'হিন্দু রসায়ন' নামক যে অতুলনীয় বইখানি লিখে গিয়েছিলেন, আলোচ্য পুস্তকটি তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা হয়েছে। আচার্য্য রায়ের বইখানা দীর্ঘ দিন যাবৎ পুনর্মুদ্রিত না হওয়ার দরুণ বিজ্ঞান-ইতিহাসের গবেষকদের প্রাচীন ভারতীয় রসায়ন বিষয়ক জ্ঞানার্জ্জনে যে বিরাট বাধার সৃষ্টি হয়েছিল, বর্ত্তমান বইটি প্রকাশিত হওয়ায় তা অপসারিত হবে।

বইখানা আগাগোড়া পড়ে ফেললাম। আচার্য্যদেবের 'হিন্দু রসায়ন'ও আমার পড়া আছে,—কিন্তু মনে হোল, এই বইখানা সাধারণ পাঠক ও বিজ্ঞানেতিহাসের ছাত্রদের কাছে আরও বেশী প্রিয় হবে। কারণ, "আচার্য্যদেবের বইখানা একটি সংগ্রহ, যে কোন নতুন তথ্যাবলী তিনি প্রাচীন পুঁথিপত্র ঘেঁটে উদ্ধার করেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করেছেন, তাই সময়ের সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতির একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ আলোচনা 'হিন্দু রসায়নে' সামান্য ব্যাহত হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু অধ্যাপক রায়ের রচনায় সেই উপলব্ধির অভাব নেই। কারণ মালমশলা তাঁর হাতের কাছেই ছিল,—আচার্য্যদেবের বইখানা নতুন ধারায় সম্পাদিত করে তিনি পরিবেশন করেছেন। এই সম্পাদনায় নতুন করে সংযোজিত হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রসায়নের ইতিহাস এবং তিব্বতী ভাষা থেকে অনূদিত প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানেতিহাসের সামান্য কিছু আলোচনা। জ্ঞানের যে গভীরতা আচার্য্যদেবের বইয়ের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল তাকে সুসংবদ্ধ ভাবে সঙ্কলিত করে এই পুস্তকের প্রধান সম্পাদক ও লেখক অধ্যাপক রায় বিশ্বের সকল বিজ্ঞান-ঐতিহাসিকের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এই মূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা যথাক্রমে,—পরলোকগত বিজ্ঞানী ডাঃ ভাটনগর, ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়, ডাঃ জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্ত্তী ও ডাঃ কে জি নায়েক। এই মূল্যবান পুস্তকটি প্রকাশনে অর্থসাহায্য করেছেন, বাংলা সরকার, ভারত সরকার, ইউনেস্কো, বেঙ্গল কেমিক্যাল, ক্যালকাটা কেমিক্যাল ও বরোদার এ্যালেমবিক কেমিক্যাল ওয়ার্কস। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান-মনীষার প্রচারকল্পে তাঁদের এই মহান দান প্রশংসনীয়।

* * * *

গবেষণার জগতে বিভিন্ন মনোভাব থাকবেই—নিজ পক্ষ সমর্থনে যুক্তি খাড়া করাও এমন কিছু একটা কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সত্য তাতে অতলে তলিয়ে যায়। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে হলে বিচার সম্মত উপলব্ধির ও নিরপেক্ষ মনোভাবের প্রয়োজন সব চেয়ে বেশী। অনেক ভারতীয় লেখক প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের জয়কীর্ত্তন করতে গিয়ে যুক্তি আর ওকালতির দ্বারা বিবেচনা থেকে বিচ্যুত হয়ে আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাসকে প্রাচীনতর করবার জন্য যে অস্বাভাবিক আলোচনার সৃষ্টি করেছেন, তা যে কোন বিজ্ঞানসম্মত মনোভাবের অধিকারীর কাছে বাতুলতা বলে মনে হবে। চরকের বা নাগার্জ্জুনের সময়কালকে দিলাম আরও পেছিয়ে—পৃথিবীর লোক জ্ঞাত হোক, ভারত তৎকালে কতো উন্নত ছিল; এই ব্যর্থ প্রচেষ্টায় মর্য্যাদাহানির সম্ভাবনাই বেশী। বিদেশী বিজ্ঞান-ঐতিহাসিকদের নীরব উদাসীনতা এবং ভারতীয় গবেষকদের অবাস্তব যুক্তিবিন্যাসের টানাপোড়েনে ভারতের সত্যিকারের বিজ্ঞানেতিহাস আজ বিলুপ্তির পথে। প্রাচীত ভারতীয় কোন বিজ্ঞানীর সময়কালই আমরা নিশ্চিত ভাবে ঘোষণা করতে পারি না।

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের নিরপেক্ষ মনোভাব ও উপলব্ধির বিশালতাই সর্ব্বপ্রথম জগৎ সমক্ষে হিন্দু রসায়নের মহিমা কীর্ত্তন করলো। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিচারের ন্যায়দণ্ড দিয়ে পরিমাপ করে আচার্যদেব দেখালেন, প্রাচীন জগতের বিজ্ঞানেতিহাসে হিন্দু বিজ্ঞানের স্থান কোথায়। তাঁর পুস্তক পড়ে সমালোচকেরা চমৎকৃত হলেন, দেশ-বিদেশ থেকে এলো অজস্র অভিনন্দন। তিনি মানব সভ্যতার ইতিহাসের এক বিলুপ্তপ্রায় অধ্যায়কে উদ্ধার করেছেন। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায় মহাশয়ের সদ্য-প্রকাশিত পুস্তকটিকে আচার্য্যদেবের পুস্তকের একটি পরিবর্ধিত ও পরিমার্জ্জিত সংস্করণ বলা যেতে পারে। বইটি সুরু হয়েছে—সিন্ধু সভ্যতার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ব্যবহারিক বিজ্ঞানের আলোচনা দিয়ে, যা সুমারীয় সভ্যতার সমসাময়িকত্বের দাবী রাখতে পারে। এর পর সময়ের সঙ্গে সমতা রেখে এক এক করে আলোচনা করা হয়েছে সিন্ধু সভ্যতার যুগ, বৈদিক যুগ, আয়ুর্ব্বেদিক যুগ, তান্ত্রিক যুগ, ও সর্ব্বশেষে মধ্যযুগ। ভারতীয় দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের পদার্থের স্বরূপ বিষয়ক মতামতের বিস্তারিত আলোচনাও আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞান বিষয়ক রচনার সংক্ষিপ্তসারের সংযোজনও এই পুস্তকের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। পরিশেষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাসায়নিক অগ্রগতির সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক যে চার্টটি সম্পাদন করা হয়েছে তা যথেষ্ট কৃতিত্বের দাবী রাখে।

* * * *

ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বোস বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য নিযুক্ত হয়েছেন। পক্ষধর মিশ্র মনে করেন, এই নির্ব্বাচনের ফলে বিশ্বভারতীর কর্ম্মধারায় এক নতুন যুগের সূচনা হলো। আচার্য্য বোসের বিশ্বভারতীর সঙ্গে সংযুক্তি কেবল মাত্র গুরুদেবের স্বপ্নকেই রূপায়িত করেই তুলবে না, প্রতিষ্ঠা করবে এক নতুন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের যার চিন্তাধারায় প্রবাহিত হবে বর্ত্তমান ভারতের আপন চিন্তা ও কল্পনা। প্রাচীন ভারতবর্ষ কেবলমাত্র ইতিহাস ও দর্শন-চর্চ্চার মূলকেন্দ্র ছিল না,—বিজ্ঞানচর্চ্চা অর্থাৎ জীবনের সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ সংযোগেও বিশ্বমধ্যে সে ছিল অগ্রণী। সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা বাস্তব সত্যকে কোন দিনই উপেক্ষা করেন নি। কিন্তু আমরা আত্মবিস্মৃত

জাতি, তাই অতীত ভারতের কল্পনা করলেই আমাদের চিন্তা কেবলমাত্র উপলব্ধি করে দর্শন, কলা, ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে অতীত ভারতে বিরাট গৌরবময় অবদানের কথা। পদার্থের স্বরূপ ও অণু-পরমাণু বিষয়ক চিন্তাধারার অন্যতম পথিকৃৎ কণাদ ও পতঞ্জলিকে আমরা ঋষিরূপে কল্পনা করি—সত্যদ্রষ্টা বিজ্ঞানিরূপে নয়। তাই পরমাণুবাদের জন্মের ইতিহাস গ্রীসদেশীয় বিজ্ঞানীদের সমসাময়িক হলেও বিশ্বের লোক এই ভারতীয় বিজ্ঞানীদের পরিচয় অল্পই জানে। অধ্যাপক বোস বিশ্বভারতীর উপাচার্য্য নিযুক্ত হওয়ায় আমরা আশা করতে পারছি,—ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ সমতা রেখে অবিলম্বে বিশ্বভারতীতেও বিজ্ঞানচর্চ্চা সুরু হবে। জ্ঞান ও বিজ্ঞান এই উভয় চর্চ্চার প্রাধান্যে বিশ্বভারতী জগৎসমক্ষে ভারতবর্ষের মুখ নতুন করে উজ্জ্বল করবে।

উইলিয়াম থম্‌সন কেলভিন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে যে কয়েক জন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী নিজ কর্ম্মপ্রতিভার দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি ঘটিয়েছেন,—বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন কেলভিন তাঁদের অগ্রগণ্য। কেবল নিজের প্রতিভা দ্বারাই নয়, সহানুভূতিশীল ও সহৃদয় মনোভাব নিয়ে তরুণ বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণার অন্যতম প্রধান উৎসরূপে তিনি সেই যুগে পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণার ক্ষেত্রে এক নবযুগ সৃষ্টি করেছিলেন। একটা প্রবাদ বাক্যই আছে,"গ্লাসগো চেয়ার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীদের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল।" ঐ অর্দ্ধশতাব্দী গ্লাসগো চেয়ারের অধিকারী ছিলেন বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন কেলভিন।

উইলিয়াম থমসন আয়ারল্যাণ্ডের বেলফাষ্টে ১৮২৪ সালের ২৬শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জেমস্ থমসন ছিলেন রয়েল একাডামিক্যাল ইনস্‌টিটিউটের একজন গণিতের অধ্যাপক। উইলিয়ামের জন্মের কয়েক বছর পরেই পিতা জেমস থমসন গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দ্বিতীয় র‍্যাংলাররূপে উপাধি পরীক্ষা উত্তীর্ণ হয়ে উইলিয়াম থমসন উচ্চ শিক্ষার জন্য ফরাসী দেশে যাত্রা করলেন। সেখানে তিনি প্রায় এক বছর বিজ্ঞানী রেগনাল্ট-এর গবেষণাগারে অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা গ্রহণ করে ফিরে এলেন গ্লাসগোতে—বিজ্ঞানের অন্যতম অধ্যাপকরূপে।

তাপবিজ্ঞান ছিল বিজ্ঞানী থমসনের গবেষণার প্রধান বিষয়। ১৮৪৮ সালে তিনি উত্তাপের 'অ্যাবসলিউট স্কেল' বিষয়ক প্রস্তাব পেশ করেন। ইতিমধ্যেই তিনি পৃথিবীর বয়স বিষয়ক মতামত প্রকাশ করে বিজ্ঞানী-মণ্ডলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। তাপ পরিবহনের হিসাব পরিমাপ করে থমসন জানিয়েছিলেন, বহুযুগ অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর দৈহিক অবস্থা বর্ত্তমান কাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। যাই হোক, ১৮৫১ সালে থার্মোডাই-নামিক্‌সের দ্বিতীয় মতবাদটি লিপিবদ্ধ করে তিনি এডিনবার্গে রয়েল সোসাইটীতে যে গবেষণামূলক প্রবন্ধ পেশ করেন, তা আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানী মহলে উইলিয়াম থমসনের অসাধারণ প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় প্রদান করলো। তিনি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী বলে স্বীকৃত হলেন।

বিজ্ঞানী হিসাবে থার্মোডাইনামিক্‌স্ বিষয়ক গবেষণাই তাঁর প্রধান অবদান হলেও বিদ্যুৎ-শক্তি বিষয়ক কার্য্যকলাপই সমস্ত পৃথিবীতে উইলিয়াম থমসনকে সুপরিচিত করেছে। তারবার্ত্তা প্রেরণ বিষয়ে তাঁর অবদানের কথা আজ সমগ্র বিশ্ব শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। বিশেষ করে সমুদ্রের তলা দিয়ে তার মারফৎ সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যে দিয়ে তার মারফৎ সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করা ও তৎসঙ্গে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক অবদানের জন্য ১৮৬৬ সালে উইলিয়ম থমসন স্যার উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৯২ সালে তাঁকে 'ব্যারন কেলভিন অফ লার্গস্' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। বিজ্ঞানী উইলিয়াম থমসন এর পরে 'লর্ড কেলভিন' নামেই সমগ্র জগতে পরিচিত হলেন। ১৮৯৬ সালে লর্ড কেলভিন **The Grand Cross of the Royal Victorian Order** দ্বারা সম্মানিত হন। এই বৎসরই গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অধ্যাপনার পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ায় মহাসমারোহের সঙ্গে এক জয়ন্তী উৎসব পালন করে। ১৮৯৯ সালে লর্ড কেলভিন অধ্যাপকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং আবার ১৯০৪ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলারের পদ গ্রহণ করেন। ১৮৯০ সালে তিনি রয়েল সোসাইটীর সভাপতির পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন।

এই ক্ষুদ্র পরিচিতির মাধ্যমে লর্ড কেলভিনের কর্ম্মময় বিশাল জীবনের আলোচনা অসম্ভব! সাগরমধ্যে জাহাজের প্রয়োজনে সঙ্কেত প্রেরণ, জলমধ্যে শব্দ সঞ্চার ও দিকনির্ণয় যন্ত্র বিষয়ক গবেষণার ফলাফলও তাঁর অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ, তাদের ক্ষমতার পরিমাপ এবং গুণাগুণের একটি নির্দ্দিষ্ট মান নির্দ্ধারণের চেষ্টার জন্যও বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিনের কাছে বর্ত্তমান মানব-সমাজ বহুলাংশে ঋণী।

অমায়িক, ছাত্রবৎসল, সহানুভূতিশীল,—দেবতুল্য বিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন ১৯০৭ সালের ১৭ই ডিসেম্বর স্কটল্যাণ্ডের লার্গস্ এর নিকটে তাঁর নিজের আবাসে ৮৩ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

পর্দ্দভ

তুমি নানা রূপে নানা দেশে আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে * * * তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ। * * * হে মহাপৃষ্ঠ! তুমি কখন রাজ্যের ভার বহ, কখন পুস্তকের ভার বহ, কখন ধোপার গাঁটরি বহ। হে লোমশ! কোনটি গুরুভার আমায় বলিয়া দাও।

—লোকরহস্য (বঙ্কিমচন্দ্র)।



বিবেকানন্দ-স্তোত্র

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

১৫

স্বামিজী যথার্থ বোলেছেন,
বোধাতীত ভগবান
ছটাকে-বুদ্ধি দিয়ে
আমাদের বোকা বানালেন !
বুদ্ধির চুষি পেয়ে আমরা সবাই
স্নেহোত্তপ্ত মার কোল
ভুলে থাকি তাই !
'কালীঘাটে' যেতে গিয়ে
'চৌরঙ্গী'র প্রেমে প'ড়ে যাই !
অশুভ যুক্তির খাল কেটে
সংশয়ের কুমীরকে ডাকি ;
দর্শনের দৌরাত্ম্যে
মর্মান্তিক মজা পেয়ে থাকি।
'আত্মজয়' ছেড়ে দিয়ে
'এভারেষ্ট-অভিযানে' যাই ;
জজ-ব্যারিষ্টার হোতে
সামর্থ্যের সর্বস্ব খোয়াই।
জীবনের শ্রেষ্ঠ আধখানা
বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটে স্তার
জরাজীর্ণ শেষার্ধ জীবনে
বীভৎস ঢেঁকুর তুলি তার !

* * *

এইবার ঢুকেছে মাথায়
'চাল-কলা-বাঁধা বিদ্যে'টায়*
ঠাকুরের কেন অত রাগ।
তাঁকে যদি আমাদের মত
যেতে হোতো বিশ্ববিদ্যালয়ে,
'রামকৃষ্ণ-কথামৃত'
অপরের চিন্তা-বিষে
গরলিত হোতো নির্ঘাত্।

১৬

এইখানে প্রশ্ন এসে যায়
'সপ্তর্ষির ঋষি'† টিকে কেন
যেতে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ?

---

* অর্থকরী বিদ্যাকে ঠাকুর ঐ নামে অভিহিত কোরেছেন এবং কায়মনবাক্যে তাকে বর্জন কোরেছেন।

† স্বামী সারদানন্দ 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে' নরেনের দক্ষিণেশ্বরে আসার বহুকাল আগে ঠাকুরের 'সপ্তর্ষিলোকে'র এক দিব্য দর্শনের কথা এইভাবে লিপিবদ্ধ কোরে গেছেন। ঠাকুর বোলেছিলেন,—"একদিন দেখিতেছি, মন সমাধিপথে জ্যোতির্ময় বর্ত্মে উচ্চে উঠিয়া যাইতেছে। চন্দ্র সূর্য্য তারকামণ্ডিত স্থূলজগৎ সহজে অতিক্রম করিয়া উহা প্রথমে সূক্ষ্ম-ভাবজগতে প্রবিষ্ট হইল। ঐ রাজ্যের উচ্চ উচ্চতর স্তরসমূহে উহা যতই আরোহণ করিতে লাগিল ততই নানা দেব-দেবীর ভাবঘন বিচিত্র মূর্তিসমূহ পথের দুইপার্শ্বে অবস্থিত দেখিতে পাইলাম। উক্তরাজ্যের চরমসীমায় উহা আসিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে দেখিলাম এক জ্যোতির্ময় ব্যবধান (বেড়া) প্রসারিত থাকিয়া খণ্ড ও অখণ্ডের রাজ্যকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উক্ত ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া মন ক্রমে অখণ্ডের রাজ্যে প্রবেশ করিল, দেখিলাম—সেখানে মূর্তিবিশিষ্ট কেহ বা কিছুই আর নাই, দিব্যদেহধারী দেবদেবী সকল পর্য্যন্ত যেন এখানে প্রবেশ করিতে শঙ্কিত হইয়া বহুদূরে নিম্নে নিজ নিজ অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছেন। কিন্তু পরক্ষণেই দেখিতে পাইলাম, দিব্যজ্যোতিঃঘনতনু সাতজন প্রবীণ ঋষি সেখানে সমাধিস্থ হইয়া বসিয়া আছেন। বুঝিলাম, জ্ঞান ও পুণ্যে, ত্যাগ ও প্রেমে ইঁহারা মানব তো দূরের কথা দেবদেবীদিগকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়াছেন। বিস্মিত হইয়া ইঁহাদিগের মহত্বের বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় দেখি, সম্মুখে অবস্থিত অখণ্ডের ঘরের ভেদমাত্র বিরহিত, সমরস জ্যোতির্মণ্ডলের একাংশ ঘনীভূত হইয়া দিব্যশিশুর আকারে পরিণত হইল। ঐ দেব-শিশু ইহাদিগের অন্যতমের নিকটে অবতরণ-পূর্বক নিজ অপূর্ব সুললিত বাহুযুগলের দ্বারা তাঁহার কণ্ঠদেশ প্রেমে ধারণ করিল। পরে বীণানিন্দিত নিজ অমৃতময়ী বাণী দ্বারা সাদরে আহ্বান-পূর্বক সমাধি হইতে তাঁহাকে প্রবুদ্ধ করিতে অশেষ প্রযত্ন করিতে লাগিল। সুকোমল প্রেমস্পর্শে ঋষি সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেন এবং অর্ধস্তিমিত নির্নিমেষ লোচনে সেই অপূর্ব বালককে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখের প্রসন্নোজ্জ্বল ভাব দেখিয়া মনে হইল, বালক যেন তাঁহার বহুকালের পূর্বপরিচিত হৃদয়ের ধন। অদ্ভুত দেবশিশু তখন অসীম আনন্দ প্রকাশপূর্বক

জীবনের শ্রেষ্ঠ আধখানা
কেন কাটে বিদেশী শিক্ষায় ?

* *

যদি বলি ওটা নরেনের
'নরবৎ নরলীলা' স্রেফ
'Utilitarian' পাঠকের*
সে-কথায় ভরবে কি পেট্ ?

* *

আমার বিশ্বাস,
নরেন্দ্রনাথ
উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সংশয় ।
সদ্যোজাত বিজ্ঞানের উগ্র আস্ফালন ।
'ভিক্টোরীয় যন্ত্র-যুগে'
যান্ত্রিক যুক্তির দুঃসাহস,
আর তারই শেষ পরিণাম ।
নরেন্দ্রনাথ
বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের দো-টানায় পড়া
আশাহত ইউরোপের প্রচণ্ড প্রলাপ !
সাম্যহারা জীবনের দর্পোন্মত্ততা !

* * *

'সপ্তর্ষির ঋষি'টিকে লীলার্থে তাই
'অখণ্ডের' সঙ্গ-সুখ ছেড়ে
পশ্চিমের 'যুক্তি-বাদে' ক'ষে আঁট কোরে
গাঁট-ছড়া বেঁধে নিতে হয় ।

তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—'আমি যাইতেছি, তোমাকে যাইতে হইবে' । ঋষি তাহার ঐরূপ অনুরোধে কোনো কথা না বলিলেও তাঁহার প্রেমপূর্ণ নয়ন তাঁহার অন্তরের সম্মতি ব্যক্ত করিল । পরে ঐরূপ সপ্রেম দৃষ্টিতে বালককে কিছুক্ষণ দেখিতে দেখিতে তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন । তখন বিস্মিত হইয়া দেখি, তাঁহারই শরীরমনের একাংশ উজ্জ্বল জ্যোতিঃর আকারে পরিণত হইয়া বিলোম-মার্গে ধরাধামে অবতরণ করিতেছে । নরেন্দ্রকে দেখিবামাত্র বুঝিয়াছিলাম এই সেই ঋষি" ।

* ফলবাদী, যুক্তি দিয়ে উপকারিতা বা ব্যবহার্যতা দেখে যাঁরা বস্তুবিচার করেন । বিশেষ অর্থে **'Utilitarianism'** মতবাদের পোষক । **"Geatest good or happiness of the greatest number"** অর্থাৎ "সবচেয়ে বেশি লোকের সবচেয়ে বেশি মঙ্গল বা সুখ" এই হোলো এই নীতিবাদীদের আদর্শ । বেন্থাম মিল্ প্রমুখ পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা যুক্তির তুফান তুলে এই যুক্তিসর্বস্ব নীতির পৃষ্ঠপোষকতা কোরে গেছেন । কিন্তু যেহেতু এই নীতি 'সমাজ'কে ভিত্তি কোরে খাড়া করা হ'য়েছে, সেই হেতু এর উপকারিতা চিরস্থায়ী নয় ; কেন না মানবসমাজ পরিবর্তনশীল এবং ক্ষণস্থায়ী । কোনো বিশেষ কালের বিশেষ সমাজে এ-নীতির **utility** থাকতে পারে, কিন্তু সত্য বা ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত হ'লে এর উপকার চিরস্থায়ী হ'তে পারতো, অন্ততঃ অকাল মৃত্যুর কোন কারণ ছিল না ।

সর্বনেশে বিশ্ববিদ্যালয়ে
অপরের চিন্তা-বিষ পেট ভরে খেয়ে
আধা-নাস্তিক হ'তে হয় ।
তারপর কিছুকাল পরে
বেদনা-মলিন মনে 'দক্ষিণেশ্বরে'
সনাতন বিশ্বাসের বিশ্ববিদ্যালয়ে
সযত্নে লেখাতে হয় নাম ।
বিশ্বাসের শ্যামল ছায়াতে
'ভিক্টোরীয় অবিশ্বাস',
বিজ্ঞানের মূঢ় প্রগল্‌ভতা,
'যন্ত্র-যুগে'র ঐ আধা-নাস্তিকতা
এইভাবে মরে অপঘাতে ।

* * *

নরেনের মৃত্যু নয় ওটা,
সমতাবিহীন ঐ
জড়বাদী ইউরোপের
মত্ততার অপমৃত্যু ওটা ।

* * *

১৭

Utilitarian বোলবেন—
এ-ব্যাখ্যাতে সমাজের লাভ ?
দু'-চারটে ভাবুকেরা এ-তথ্যে উপকৃত হবে,
চিন্তাবিলাসীরাই আনন্দে উঠবেন মেতে ।
সমাজের **'greatest number'***
হরে-প্যালা-পঞ্চা যারা,
তাদের কি **'utility'**† এতে ?

* * *

Utility যদি নাই থাকে
লীলাটা কি খেলো হয়ে যাবে ?
'সত্য' কি বৃথা হ'য়ে যাবে
তোমাদের **'utility'** বিনা ?
সোনা-দানা যদি নাই থাকে
মা' কি স্রেফ **utility**-হীনা ?

* * *

অবিশ্যি ছটাকে-মাথাদের
'নরবৎ নরলীলা'টার
Practical utilityটাও
সশব্দে বুঝিয়ে দিতে পারি ।

* * *

বেশ, তবে ধরা যাক
'সপ্তর্ষির ঋষি' নন তিনি ।
লীলার্থে আসেননি কো দেবলোক থেকে ।

---

* সবচেয়ে বেশি সংখ্যক লোক ।
† ব্যবহারিক উপকারিতা ।

'অখণ্ডের ঘরে' নয়,
'গৌর মুখার্জী ষ্ট্রীটে' বাড়ি।
তাহ'লেও utility আরো বেশি তারই।

'সপ্তর্ষির ঋষি' যদি নাই বলি তাঁকে,
যদি বলি 'সিমলে'র ডেঁপো-ছোঁড়াটাই
মানুষের মত শ্রেফ চেষ্টায় চোটে
অশান্ত দুনিয়ার সমুদ্র স্রোতে
আশা ও হতাশ্বাসে দোলা খেতে খেতে,
আজীবন সংগ্রামে জাগ্রত থেকে
আনন্দ-বেদনার পারে চ'লে গিয়ে
হুট্ কোরে একদিন 'চিকাগো'র এসে
বিবেকানন্দ হ'য়ে পৃথিবী কাঁপান্,
সমাজের utility তাতে maximum.*
নির্বিচারে সকলেই লাভবান হবে।
অভক্তেরা ভক্ত আর
ভক্তেরা পাকা ভক্ত হবে।

ঐশ্বর্য-রহিত কোরে দেখি যদি তাঁকে,
আত্মজয়ের ঐ সংগ্রামটাকে
'দেবতার লীলা' ভেবে রাখবো না তুলে,
চেষ্টাটা বৃথা ভেবে প'ড়বো না ঢুলে।
'স্বামিজী-হওয়ার' ঐ দুর্গম পথে
হরে-প্যালা-পঞ্চাও যাবে পা বাড়াতে।
দেব্‌তা হওয়ার পথে চার-পা গেলেই
শুদ্ধ মনের ঐ শুভবুদ্ধিই
যে-কথাটা বোলে দেবে সেটা হোলো এই—
কামনামলিন মনে 'happiness'† নেই।

তখন বুঝবে তারা সমাজের ত্রুটি,
বুঝবে 'ত্যাগে'র ঐ utility কি।
যে-সুখের পশ্চাতে তারা এতকাল
ছুটে ছুটে মাথা কুটে হোলো নাজেহাল,
তখন বুঝবে তারা সুখটা কোথায়,
নির্মোহ জীবনে না ভোগলিপ্সায়?
বুঝবে ভোগের কাছে সুখ চাওয়া যেন
বরফের কাছে গিয়ে আগুন-পোয়ানো!
বুঝবে চিলের মুখে যদি থাকে মাছ
তখনই কাকের ঝাঁক করে উৎপাত।
বাসনাবিবশ মনে সুখটা কোথায়?
বাসনা-বিসর্জনে তাকে পাওয়া যায়।
তুচ্ছ ও ক্ষণিকের উল্লাসে মেতে
বেদনার কা-কা-ডাক বৃথা আনি ডেকে।

* * *

সমাজকে সুখে রাখি এই 'অভিমান'
সমাজের সব চেয়ে বড় লোকসান।
'সমাজ'কে সুখে রেখে তোমার কি লাভ?
বলো দেখি কেন তাকে হানবে না বাজ?
সুখই যদি তোমাদের উদ্দেশ হয়,
অপরের সুখে কেন সাধবে না বাদ?
তার মানে শুনে রাখো 'মিল্-বেন্থাম'
'সমাজে'র হাসি দেখে তোমার আরাম।
অথচ 'সমাজ-সেবা' এই ফাঁকা বোলে
'অহং'এর সেবা করি আমরা সকলে।
মনের ঠোঁটেতে যদি থাকে 'কাঁচা-মাছ',
আমাদের 'সেবা' মানে শ্রেফ উৎপাত।
কামনা-কঠিন এই 'কাঁচা-আমি'টাই
তৃষ্ণা ও পানীয়ের ফাঁকটা বাড়ায়।
'অহং'এর বিরুদ্ধে আগে অভিযান,
তারই পরে সমাজ বা নিজের আরাম।
তার আগে 'সেবা' নয়, প্রভুত্ব সেটা,
নিজের মূঢ়তা দিয়ে সমাজকে পেটা!

* * *

এ-কথাটা পাকা কোরে অন্তরে জেনে
মাছের আঁশটে স্বাদে বিরক্তি এনে,
'সেবা'র ছদ্ম-নামে নিপীড়ন ছেড়ে
সমাজকে ত্যাগ কোরে 'অহং'কে মেরে
প্যালা-পঞ্চাই ফের ঢুকবে সমাজে;
তখনই লাগবে তারা সমাজের কাজে।
তোমার-আমার ঠিক্ মাঝখানটায়
বিদ্বেষ-বিষে নীল সিন্ধু-বেলায়
অসীম শ্রদ্ধা আর উৎসাহ নিয়ে
তুচ্ছ 'বালির বোঝা' মস্তকে ব'য়ে
'কাঠ-বেরালি'র মত চুপিসাড়ে এসে
তা'দের যা' দেয় আছে দিয়ে যাবে হেসে।
কর্মে'র ফলটাকে চাটবে না তারা,
ভাববে না সেতু-বাঁধা কবে হবে সারা!

* * *

কর্মের চেয়ে তার ফলটা যে চায়,
তুচ্ছ ও-কর্মের আগ্রহটায়
সহাস্যে দিয়ে যাবে বিদ্রূপ-বিষ;
যাঁর কাজ তাঁর হাতে পাবে স্নেহাশীষ!

* * *

না-চাইতে যে-ফলটা দ্যান তিনি হাতে
জীবনের বিফলতা কেটে যায় তাতে।
নিষ্কাম কর্মের শ্রেষ্ঠ যে দান
'নির্বিকল্প'রূপ প্রকাণ্ড 'আম' *

---

* সবচেয়ে বেশি।

† সুখ, আনন্দ।

* কাশীপুরের উদ্যান-বাটীতে এই আমের আধখানা স্বামিজীকে দিয়ে ঠাকুর বোলেছিলেন— "কেমন, মা তো আজ তোকে সব দেখিয়ে

তারই আধখানা পেয়ে নেশা ছুটে যাবে,
ছুদিনের কোলাহল বৃথা মনে হবে।
সেবা-বোধ যিনি জান মানব মনেই,
মনে হবে, তিনি ছাড়া আদর্শ নেই ;
সত্য বা ব্রহ্ম বা যা-ইচ্ছে বলো
হৃদয়ের শতদল তাঁরই জন্তেই।
তারপর ? তুলে-রাখা আমটাকে খাবে,
'তোমার' আর 'স্বামিজী'র ভেদ ঘুচে যাবে।
অকাজের কাজ সেরে গামছাটা নিয়ে
বেলা-শেষে অসীমের 'কলঘরে' যাবে।*

* * *

দিলেন। চাবি কিন্তু আমার হাতে রইল। এখন তোকে কাজ করতে হবে। যখন আমার কাজ শেষ হবে তখন আবার চাবি খুলবো।" ঠাকুরের কাজ শেষ হ'লে ঠাকুর চাবি খুলে বাকি আমটা দিয়েছিলেন এবং সেই বাকি আমটা খেয়েই স্বামিজী ১৯০২ সালে সমাধিযোগে দেহের খাঁচাটা ভেঙ্গে দিয়ে 'অখণ্ডের ঘরে' পাড়ি মেরেছিলেন।

* "তিনি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে নিচ্ছেন। কাজ শেষ হ'লে তুমি আর ফিরবে না। যে কর্মটা আছে, সেটা শেষ হ'য়ে গেলে নিশ্চিন্ত। গৃহিণী, বাড়ির রাঁধা-বাড়া, আর আর কাজকর্ম সেরে যখন নাইতে গেল, তখন আর ফেরে না, তখন ডাকাডাকি করলেও আর আসবে না।"—শ্রীরামকৃষ্ণ।

মহৎ জীবন কিনা 'মিছরীর রুটি'*
যে ভাবেই খাও তার আছে 'utility'.

১৮

'আড় কোরে' খাও কিংবা 'সিধে কোরে' চাটো,
মোটমাট খেতে হবে—এটা ভুলো নাকো।
বেশি খেলে বেশি লাভ, কম খেলে কম,
এ-নীতিটা নিশ্চয়ই জানো 'বেন্থাম'।
'Greatest good'টা চাও এটা কি না-জানো ?
'Greatest number'টাকে সঙ্গেতে আনো।
তোমরা যে সব কিছু বেশি-বেশি চাও,
অতএব বেশি কোরে নোলাটা বাড়াও,
তারপর জিবটাকে বেশি কোরে ঠেলে
যত বেশি সম্ভব মন-প্রাণ ঢেলে
যত বেশি দিন পারো শুধু চেটে যাবে।
অন্ততঃ 'great good' তাহ'লেই পাবে।
যদি 'great'এ না পোষায়, মনে হয় খাটো,
'Greater'টা পেতে হ'লে আরো বেশি চাটো।
চেটে-চেটে 'মিছরীর রুটি' হ'য়ে গেলে,
তবেই বুঝবে তুমি 'greatest'টা পেলে।

[ক্রমশঃ।

* ঠাকুর ঈশ্বরতত্ত্বের utility (উপকারিতা) বোঝাতে গিয়ে প্রায়ই এই উপমাটা ব্যবহার কোরতেন,—"মিছরীর রুটি সিধে কোরেই খাও আর আড় কোরেই খাও, মিষ্টি লাগবে।"

'ফোবিয়া' কত রকমের আছে ?

দুনিয়ায় 'ফোবিয়া' বা আতঙ্ক ব্যাধি বহু রকমের আছে, অনেক কারণেই মানুষের মনের পর্দায় বিকৃতি ঘটে, নিরর্থক ভয়, ভীতি বা ভাবান্তর উপস্থিত হয়। এগুলোকে একরূপ বদ অভ্যাসও বলা যেতে পারে। এইখানে কয়েকটি মাত্র 'ফোবিয়া'র নাম করা হচ্ছে :— 'হাইড্রোফোবিয়া' জলাতঙ্ক ; 'একোফোবিয়া' উচ্চতার আতঙ্ক ; 'এগোরাফোবিয়া' বিরাট প্রান্তরে একাকী অবস্থানের আতঙ্ক ; 'অটোফোবিয়া' নির্জ্জনতার আতঙ্ক ; 'এন্থ্রোফোবিয়া' মানুষ হইতে আতঙ্ক ; 'এইলুরোফোবিয়া' মার্জ্জারাতঙ্ক ; 'জিমিওফোবিয়া' স্ত্রীলোকাতঙ্ক ; 'হিমোফোবিয়া' শোণিতাতঙ্ক ; 'টক্সিকোফোবিয়া' বিষাতঙ্ক ; 'থানাটোফোবিয়া' যমাতঙ্ক বা মরণাতঙ্ক ; 'তাপোফোবিয়া' জীবন্ত দগ্ধ হওয়ার আতঙ্ক ; 'ওফিডিওফোবিয়া' সর্পাতঙ্ক ; 'কেনোফোবিয়া' বিস্তৃত প্রান্তরের আতঙ্ক ; 'লালোফোবিয়া' কথা বলার আতঙ্ক ; 'কেরৌনোফোবিয়া' বিদ্যুৎ ও বজ্রাতঙ্ক ; 'এইকমোফোবিয়া' ধারালো অস্ত্রাতঙ্ক ; 'পাইরোফোবিয়া' দাহনাতঙ্ক ; 'কমোফোবিয়া' খাবড়ে মরার আতঙ্ক।

ছোটদের আসর



"লাটু আর বল"

হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এ্যাণ্ডারসন

বেণ্টু তার পড়বার টেবিলের দেরাজে রেখেছে একটা লাটু আর একটা বল। লাটু আর বল। দু'জনে পাশাপাশি। ও যখন তাকায়, ও তখন চোখ বোজে, আর ও যখন তাকায় এ তখন চোখ বোজে।

লাটু বললে—"এসো না সুন্দরী বল, আমরা দু'জনে বর-বৌ হই। যখন দু'জনে এত কাছাকাছি। এতো পাশাপাশি। বেশ মানাবে কিন্তু আমাদের। এসো না।"

লাল বল বড্ড অহঙ্কারী। লাল মরক্কো চামড়ার তৈরী কি না; তাই। লাল বল লাটুর কোন কথা কানেই নিলে না।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠে, বেণ্টু দেরাজ খুলে বার করলে লাটু আর বলটাকে। লাটুকে লাল আর হলদে রং করে—একটা চকচকে পেতলের পেরেক ঢুকিয়ে দিল লাটুটার পেটের ভেতর দিয়ে। এখন লাটুটাকে দেখতে খু-উব সুন্দর হয়েছে! লাল আর হলদে রং। বেশ মানিয়েছে। পেতলের পেরেকটায় রোদের আলো পড়ে ঝক্ ঝক্ করছে। মনে হয় যেন সোনার। কি সুন্দর ঝিম ধরে ভোমরার মতো ভোঁ-ভোঁ-ভোঁ সুর করে ঘুরছে। ঘুরচে না তো নাচছে।

ঘোরা শেষ হ'লে লাটু বললে—"দেখ তো, সুন্দরি, এখন কেমন দেখাচ্ছে? এবারে সুন্দর হইনি আমি? এবার কিন্তু ভাই বলতে পারবে না যে, আমি দেখতে খারাপ। দেখ কি সুন্দর রং আমার। এসো না এবারে আমরা দু'জনে বিয়ে করি কেমন? বেশ মানাবে কিন্তু আমাদের! তাই না? দেখো না তুমি কেমন লাফাতে পারো আর আমি কি সুন্দর বন্ বন্ করে ঘুরতে পারি। সত্যি এমন জুটি আর হবে না। এ যে হবে রাজযোটক। এসো না।"

বল বললে—"তুমি বুঝি তাই ভাবো? তুমি কি জানো না আমার বংশপরিচয়? আমার বাবা মা হোল মরক্কো চামড়ার জুতো আর আমার ভেতর আছে দামী কর্ক। দেখছো না আমার রূপ আর রং।"

লাটু বললে—"হ্যাঁ সব জানি, সুন্দরি! আর তুমিও ভুলে যেয়ো না যে আমিও মেহগনী কাঠের তৈরী লাটু।"

বল বললে—"এ সব কি আমায় বিশ্বাস করতে হবে?"

লাটু বললে—"মার খাবার ভয় নেই?"

বল বললে—"থাক্ থাক্, ওসব কথা আর বলো না। জানো না ও সব কথা শুনতে নেই। শুনলে পাপ হয়।"

লাটু বললে—"কেন"?

বল বললে—"জানো না আমি আর এখন স্বাধীন নই। নীল আকাশের ঐ মরালের কাছে যে আমি বাক্‌দত্তা। তাই। যখনই আমি হাওয়ায় উড়ি, তখনই ঐ মরাল তার বাসা থেকে বলে—'বিয়ে করবে' আমি বলি, 'হ্যাঁ।' কথা দেওয়াও যা' বিয়ে হওয়াও তা'। তাই আর কি। কিন্তু ভাই তোমায় কথা দিচ্ছি—তোমায় কোন দিন ভুলবো না।"

লাটু বললে—"সত্যিই বলছো ভুলবে না? তোমাদের তো বিশ্বাস করা যায় না। বিয়ে হবার পর তোমরা ভুলে যাও তোমাদের প্রতিজ্ঞা।"

বল বললে—"না গো না। কথা দিচ্ছি।"

লাটু বললে—"ওতেই আমি ধন্য।"

দেরাজের ভেতর সেদিন ঐ পর্য্যন্ত ওদের কথাবার্ত্তা হোল। তার পর দিন বেণ্টু দেরাজ থেকে বলটা বার করে উঠোনে লোফালুফি করতে লাগলো। লাটুটা দেখতে পেলো বলটা পাখীর মতো হাওয়ায় উড়ছে। একবার দেখলো বলটা দূরে খু-উব উঁচুতে উঠেছে! আবার দেয়ালে লেগে ফিরে এলো বেণ্টুর হাতে। একবার, দু'বার এলো ফিরে বলটা, কিন্তু তিন বারের বার বলটা উঁচু থেকে মাটিতে পড়ে কোথায় ছিটকে পড়লো, তা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। বেণ্টু তো বল না পেয়ে কাঁদো-কাঁদো। তন্ন-তন্ন করে খোঁজা হলো। এ কোণ থেকে ও কোণ। ও কোণ থেকে এ কোণ। বল আর পাওয়া গেল না। মনে হয় এই হারানোর মূলে আছে বলের ভেতরকার কর্ক না হয় ভেতরকার গভীর ভালবাসা।

লাটু মনে মনে বললে—"আমি জানি ও কোথায় গেছে। আজকে ও গেছে মরালের বাড়ীতে। আজকে যে ওদের বিয়ে।" লাটু যতো বলটার কথা ভাবে, ততই ওকে বেশী ভালবেসে ফেলে। ওর কথা মনে হ'লেই ও কেমন উদাস হয়ে যায়। আর মনে মনে বলছে—"না, ওতো বলেছে যে ও আমায় কোন দিন ভুলবে না।"

এ ভাবে কয়েকটা বসন্ত কেটে গেল।

লাটুর বয়েসও বেড়ে গেছে। এখন আর তেমন দেখতে সুন্দর নেই, যেমন আগে ছিল। বয়েস বেড়েছে তো, তাই। এখন আর তেমন বন্ বন্ করে ঘুরতে পারে না। শীগ গির হাঁপিয়ে পড়ে। তবুও ঘুরতে হয় বেণ্টুর হাতে পড়ে।

সেদিন ঘুরতে ঘুরতে লাটুর কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল, আর ছিটকে কোথায় গিয়ে যে পড়লো কেউ আর খুঁজে পেল না তাকে। খোঁজ, খোঁজ আর খোঁজ।

বেণ্টুর মুখ আবার কাঁদো-কাঁদো। মাকে কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে—"লাটুটা ছিল তাও গেল।"

কোথাও লাটুটাকে পাওয়া গেল না।

সে যে উঠোনের ধারে, রান্নাঘরের পাশে একটা কুটনোর খোসা, কপিপাতা ফেলবার ব্যারেলের ভেতর পড়ে গেছে, সে তো আর কেউ জানে না। বাড়ীর যত আবর্জনা ফেলা হয় ঐ ব্যারেলের ভেতর। যত সব নোংরা জিনিষ।

ঐ ব্যারেলে পড়ে লাটুটা বললে—"এখানে থাকলে, আমি আমার ঔজ্জ্বল্য আর বেশী দিন রাখতে পারবো না। পোড়াকপাল

আমার!" লাট্টু তাই শাকপাতার ভেতর দিয়ে উঁকি মারছে। যদি কিছু একটা উপায় বাতলাতে পারে। হঠাৎ কপিপাতার ভেতর দিয়ে উঁকি মারতেই সে কি যেন একটা ফ্যাকাসে লাল রংয়ের দেখতে পেলো। সে বললে—"আরে পচা অ্যাপেল নাকি? না অ্যাপেল নয় তো? আরে এ যে বল! ও হে সুন্দরী বল! কি ব্যাপার? তুমি এ রকম ফ্যাকাসে হয়ে গেলে কেন? কি হয়েছে?"

"কি আর হবে বলো? বলো তো কত দিন ধরে এখানে এই নোংরার ভেতর আছি? জল, ঝড় আর রোদে থাক্‌লে কি আর রং থাকে? আমার পোড়া কপাল! যাক্ কপাল ভালো যে তোমার মতো সমগোত্রীয় একজন লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল! যদিও আমি দামী মরক্কো চামড়ার আর সুন্দরী নারীর কোমল হাতে তৈরী, তবুও কেউ তো আমার খানদান্, রূপ আর স্বাস্থ্য জান্‌বে না বা জান্‌বার জন্যে উৎসুকও হবে না। জানো ভাই লাট্টু, আমি যেই মরালের বাড়ীতে ঢুক্‌তে যাব, ঠিক সেই সময়েই গেলাম পড়ে। একেবারে এই নোংরা শাক-পাতা-ভর্ত্তি ব্যারেলের ভেতর। আমি এখানে পাঁচ বছর আছি। তাহ'লে ভাবো তো আমার অবস্থাটা! এ রকম পরিবেশে একজন সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী নারীর কি অবস্থা হ'তে পারে, ভেবে দেখ তো?"

লাট্টু চুপ করে আছে। একটা কথাও বললে না। শুধু ভাবছে তার হারিয়ে-যাওয়া বান্ধবীর কথা। যাকে সে এত দিন পরে কাছে পেল।

বেণ্টুদের বাড়ীর ঝি এসে ব্যারেলটাকে উল্টে দিল পরিষ্কার করবার জন্যে। উল্টে দেওয়াতে লাট্টুটা ব্যারেল থেকে বেরিয়ে পড়লো মাটিতে। কারণ, ও তো শাকপাতার ওপরেই ছিল।

লাট্টুটাকে দেখে সে চেঁচিয়ে উঠলো—"পেয়েছি, বেণ্টুর লাট্টু পেয়েছি" বলে।

ঝি সেটা ধুয়ে নিয়ে এলো বেণ্টুর পড়বার ঘরে। বেণ্টু লাট্টুটাকে মুছে, খুব আদর করতে লাগলো। এবারকার আদরটা যেন একটু বেশীই করলো বেণ্টু। কিন্তু বলের কথা কেউ কিছু জিজ্ঞেস্ করলোও না বা ভাবলেও না। এমন কি লাট্টুও কিছু বললে না।

বলের ওপর লাট্টুর ভালবাসা উবে গেছে। থাকবে কি করে? বলো—তাকে যে চেনাই যায় না, তার রং আর চেহারা দেখে।

লাট্টু মনে মনে বললে—"সুন্দরীর বড্ড অহঙ্কার!"

অনুবাদক—দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায়





[পূর্বানুবৃত্তি]

(আধুনিক কালের এক দৈত্য কাহিনী)

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

[রাজুকে রাখা হয়েছিল একটা অন্ধকার খুপরির মধ্যে। আর তাকে বলা হয়েছিল যদি সে বাষ্প সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্নের জবাব দিতে পারে এবং সেই উত্তর যদি ঠিক হয়, তবেই সে ছাড়া পাবে। সে বিষয়ে সাহায্য করার জন্যে কয়েকটা মোটা মোটা বইও তাকে দেওয়া হয়েছিল। রাজু যখন নিরুপায় হয়ে ভাবছে, এমন সময় প্রোফেসরের আবির্ভাব হলো। তিনিই তাকে চাবি খুলে ঘর থেকে বার করে নিয়ে গেলেন।]

অন্ধকারের মধ্যে চলছে রাজু প্রোফেসরের পিছন পিছন। অনেক দূর গিয়ে তারা একটা ঘরের মধ্যে ঢুকলো।

'আমরা পালিয়ে এসেছি, ওরা যদি জানতে পারে?' বলে উঠলো রাজু।

'কিচ্ছু ভয় নেই।' বলে ফেললো প্রোফেসর ঘণ্টেশ্বর। 'আমি যখন এনেছি তোমায়, মানে কথা হচ্ছে, আমার ওপরই সব ভার।'

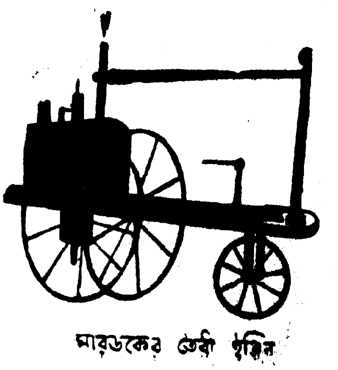
'কিন্তু, বইগুলো ত আমার পড়া হ'লো না?'

'তুমি কি পাগল হয়েছ? ও বই পড়া তোমার দ্বারা এখন হবে ভেবেছ নাকি? বড় হয়ে পড়বে ও-সব, মানে কথা আমরা কলেজে ও-সব বই পড়েছি।'

'তাহ'লে পরীক্ষা দেব কি ক'রে? আর তা না হ'লে ত ছাড়া পাব না এখান থেকে'—বলেই কেঁদে ফেললো রাজু।

'বেশ তো, থেকে যাবে এখানে। মানে কথা, এই তো আমরাও আছি।' প্রোফেসরের গোঁফের ফাঁক দিয়ে বুঝি একটু হাসির আভাসও দেখা যায়।

'না, কখখনোই না। বন্দী হয়ে আমি থাকতে চাই না হেথা।' জোর করেই বললো রাজু।



মারডকের তৈরী ইঞ্জিন

'তাহ'লে তো কিছু একটা করতে হয়।' বলেই প্রোফেসর কৃত্রিম ভাবে একটু গম্ভীর হয়ে পড়ে। দু'জনেই ভাবতে থাকে কিছুক্ষণ।

একটু পরে রাজু বললে, 'না হয়, বইগুলোতে কি লেখা আছে আপনিই একটু বুঝিয়ে দিন না আমায়। আপনার তো পড়া আছে।'

'পড়া এক কালে ছিল অবশ্য, কিন্তু, মানে কথা আজ আর কি মনে আছে ওসব? তা ছাড়া তোমাকে বললেই কি সব মনে থাকবে ঐ সব? মানে কথা হচ্ছে ও সব বিজ্ঞানের কটোমটো বই কিনা'।

'তা'হলে আপনি আমাকে আনলেন কেন?' বললে রাজু।

'আমি বরং ওখানেই বন্দী থাকবো, পালিয়ে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না।'

'তাই নাকি?' প্রোফেসর গম্ভীর ভাবে বলে ওঠে। 'তাহলে তোমাকে সেখানে রেখেই আসি, চল'।

দু'জনে চলতে চলতে হঠাৎ প্রোফেসরের মাথায় কি যেন এসে গেল। সে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'ম্যাজিক চশমা! ম্যাজিক চশমা! ঠিক হয়েছে! এতক্ষণে মনে পড়েছে। মানে কথা, মনে মনে এইটাই হাতড়ে বেড়াচ্ছিলুম'।

'আমি কিছু বুঝতে পাচ্ছি না'। অবাক হয়ে বললে রাজু। 'তোমার বোঝবার কথা নয়, কে'ই বা পারে বল? মানে কথা, দেখলেই বুঝতে পারবে। চল বাঁদিকের ঐ গলিটার মধ্যে। তোমার পরীক্ষা দেবার আগ্রহ দেখে আমি খুব খুশি হয়েছি। পরীক্ষা দিতে হলে পড়তে হয় আর পড়লেই যে শেখা যায় এটা হচ্ছে সহজ কথা। কিন্তু এটা আমার কথা নয়। মন দিয়ে দেখলে আর শুনলেই তবে শেখা যায়। আর যা শেখা যায় তা আর ভোলা যায় না'।

এতক্ষণে তারা একটা সুন্দর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ঘরটি প্রায় তেকোণা। সম-দ্বিবাহু ত্রিভুজের মত। সমবাহু দুটির মাঝের কোণে একটি বসবার চৌকি আর একটি ছোট্ট টেবিল। টেবিলের ওপর ঘননীল ভেলভেটের ঢাকা। তার ওপর কাচের রেকাবে একটি চশমা। চশমার ফ্রেমটি, কালো কাচটি বেগুনি রংয়ের। এই টেবিলের বিপরীত দিকের দেওয়ালে একটি চৌকো পর্দার মত—কিছুটা স্বচ্ছ। কিন্তু ভিতরে কিছু আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না।

প্রোফেসর ঘণ্টেশ্বর রাজুকে ইঙ্গিত করলো চৌকিতে বসতে।

এইটার কথাই মনে পড়লো তখন। যাই হোক, দেরীতে হলেও তোমার অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, এইবার তোমায় বলছি, মানে কথা, এটা হচ্ছে আমারই আবিষ্কার। সেই জীবন-দেওয়া ওষুধের কথা বলেছিলুম—'



ষ্টিভেনশনের তৈরী প্রথম ইঞ্জিন

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেটা ভারী মজার গল্প।' বললে রাজু।

'সেই রকম কত জিনিষই যে করেছি—সে সব ভারী ভারী দরকারী দরকারী জিনিষ। সব কথা, মানে হচ্ছে, সব গল্প আবার মনে থাকে না আমার।'

'মনে না থাকলে এত শক্ত শক্ত জিনিষ করেন কি করে? মানে মাথায় আসে কি ক'রে?' রাজু অবাক হয়ে যায়।

'হাঃ হাঃ হাঃ' প্রোফেসর হেসে ওঠে। 'আরে সেইটেই ত মজা। মনের মধ্যে জমা কিছু থাকে না, তাই কেবলই নতুন দিয়ে ভরি। আবার দেখি তাও সাফ। তখন আবার নতুন জিনিষ খুঁজতে হয়। দেখ, খুঁজতে খুঁজতে, মানে কথা, ভাবতে ভাবতে বুদ্ধিটা বেশ পাকা হয়ে যায়…হা হা হা'

—'যাক্, চশমাটা চোখে দাও তো একবার। আর ঐ চৌকো ফ্রেমের দিকে তাকাবে। এটা হচ্ছে, কি জান, অতীতকে দেখার চশমা।'

'অ্যাঁ, অতীত?' রাজুর চোখ বড় বড় হয়ে যায়। কেমন দেখতে অতীতকে, কেমন তার আচরণ কিছুই সে জানে না।

অতীত জিনিষটা ভয়ঙ্করও হতে পারে তো। আবার ভালও হতে পারে। আবার কোন নতুন বিপদ আসবে কে জানে? ঐ বুড়ো প্রোফেসর কি তাকে বিপদে ফেলবে? অতটা খারাপ লোক তাকে মনে হয় না। লোকটি ভুলো আর খেয়ালী হলেও মনটা তার খুব খারাপ নয়। তার নতুন জিনিষ খোঁজার নেশাটা রাজুর ভালই লাগে।

ভয়ে ভয়েই রাজু চশমাটা চোখে লাগালো। সামনের চতুষ্কোণ পর্দার দিকে তাকাতেই সে বলে উঠলো, 'ঐ তো কি যেন দেখতে পাচ্ছি।'

যেটা সে দেখতে পেল সেটা নীলাভ ধূসর তাল তাল কতকগুলো মেঘ ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু অন্ধকার ধীরে পাতলা হতে থাকে। অল্প অল্প সঙ্গীতের সুরও যেন কানে আসে—সে কি তবে সিনেমা দেখছে?

হঠাৎ একটা লেখা ভেসে উঠলো রাজুর চোখে।

'অনেক অনেক দিন আগে হিরো নামে এক ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, জল থেকে যে বাষ্পের ধোঁওয়া ওঠে, তার মধ্যে যেন কিছু একটা শক্তি লুকানো আছে।'

লেখা সরে গিয়ে সত্যিই দেখা গেল একটা ছোট্ট ঘর। তার মধ্যে হাঁড়ি কলসীর মত নানান রকমের পাত্র। তাছাড়া আরও অনেক কিছু—কতকগুলো নল, ফাঁপা গোলকের মত আরও কত কি। একটা কোণে আগুন জ্বলছে—একটি লোক আগুনে কাঠ ঠেলে দিচ্ছে। লোকটির চোখে যেন কিসের নেশা, কি যেন খুঁজছে সে। এই সেই হিরো!

হঠাৎ হিরো চেঁচিয়ে ওঠেন, 'বাষ্প, বাষ্প, বাষ্প—ফুটন্ত জল থেকে ফুলে-ওঠা রহস্যময় ধোঁওয়া! তোমার মধ্যে শক্তির সন্ধান পেয়েছি। তোমাকে আমি মানুষের কাজে লাগাবো।'

সত্যিই দেখা গেল, তিনি একটা খাড়া দণ্ডের ওপর একটা গোলক রাখলেন—গোলকের দু'দিকে দুটি নল লাগানো। বয়লার থেকে একটি নল গোলকের সঙ্গে সংযুক্ত। আগুন প্রজ্বলিত হবার কিছু পরেই দেখা গেল আশ্চর্য কাণ্ড! গোলকটি বন বন করে ঘুরছে।

'পেয়েছি, পেয়েছি! বাষ্প মানুষের অনেক কাজ করবে!' আনন্দে ফেটে পড়েন হিরো।

ছবিটি আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। তার সঙ্গে নেমে এল ঘন অন্ধকার। ফুটে ওঠে আবার একটি লেখা।

—'তার পরে বহুদিন অন্ধকারে কেটে গেল। এর মধ্যে আর কেউ হিরোর মত স্বপ্ন দেখলো না—বাষ্পকে কাজে লাগানোর স্বপ্ন, মানুষের কল্যাণের স্বপ্ন। এক হাজার আটশো বছর পরে এলেন ডেনিস্ প্যাপিন। ইনি একটি আঁট ক'রে চাপা-দেওয়া পাত্রে মাংস সিদ্ধ করলেন।'

দেখা গেল একটি ভোজের টেবিল। মাংস পরিবেশন করা হলো। মাংস মুখে দিয়ে সবাই অবাক। এ কি? হাড়গুলোও যে জেলির মত নরম হয়ে গেছে! এ কি ম্যাজিক!

ডেনিস বুঝিয়ে দিলেন, 'এটা ম্যাজিক নয়, এটা হচ্ছে বাষ্পের কীর্ত্তি। ঢাকা পাত্রে বাষ্পের চাপেই মাংস ঐ রকম গলে গেছে।'

ডেনিস তার পরে লাগলেন বাষ্পকে দিয়ে আর কি শক্ত কাজ করানো যায়, যাতে মানুষের শ্রমের লাঘব হবে। দেখা গেল শীঘ্রই তিনি এমন একটি কল তৈরী করলেন, যাতে বাষ্প দিলেই একটা দণ্ড নিয়মিত ছন্দে ওঠা-নামা করছে।

প্যাপিন বলে উঠলেন, 'হয়েছে, এটা দিয়ে স্বচ্ছন্দে জল তোলা যেতে পারবে।'

সত্যি সত্যি, হলোও তাই। তিনি একটি পাম্প বানিয়ে ফেললেন, যা দিয়ে সুগভীর ইঁদারা থেকে জল তোলা হ'তে লাগলো। মানুষের পরিশ্রম লাগলো না—শুধু আগুনটিকে জ্বালিয়ে রাখা আর বয়লারে জল আছে কি না লক্ষ্য রাখা।

রাজু এই পর্য্যন্ত দেখেই হঠাৎ চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে ফেলে। অপরিসীম বিস্ময়ে সে ভাবতে থাকে সেই অতীত দিনের কথা। অতীতের সেই বিজ্ঞান সাধনার দিনগুলি কি সুন্দর ছবির মত দেখতে পেল সে! বাষ্পকে আবিষ্কারের কাহিনী কি রোমাঞ্চকর! তার মনে পড়লো রেলগাড়ীর কথা—কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই সে টের পেল, তার কাঁধে যেন কার গরম নিঃশ্বাস এসে পড়লো। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস।

বাষ্পরাজ একটু হাসলো। 'এখন তুমি বুঝলে, তোমরা, মানে মানুষ প্রথম কেমন ক'রে আমার শক্তির সন্ধান পেল? আমাকে ঘাড় ধ'রে প্রথম কাজ করালে তোমরা?'

রাজু বললে, 'এখন মহারাজকে আরও অনেক কাজ করতে হয়, তাই না? যেমন ট্রেন চালানো—'

'চশমাটা আবার পরো, সবই দেখতে পাবে।' বলে ওঠে বাষ্পরাজ।

আবার সুরু হলো দৃশ্য। একটি ঘর, তার মধ্যে উনুনের ওপর একটি কেৎলি বসানো। কেৎলির মধ্যে জল ফুটছে টগ বগ, টগ, বগ,। কেৎলির নল দিয়ে ধোঁওয়ার মত বাষ্প নির্গত হচ্ছে।

ছোট্ট একটি চৌকিতে বসে আছে একটি ছেলে। মাথাভর্ত্তি কোঁকড়ানো সোনালি চুল ছেলেটির কাঁধে এসে পড়েছে। তার নীলাভ দুটি চোখের তারা কেৎলির দিকে উৎসুক হয়ে আছে। ছেলেটির মনে বিস্ময় আর প্রশ্ন।

একটু পরে হঠাৎ কেৎলির ঢাকাটি লাফিয়ে উঠলো। তারপর যথাস্থানে আবার পড়লো। বাষ্পের ঠেলা লেগে এ রকম হয়েই থাকে। কিন্তু এই সাধারণ ঘটনাই বালকটিকে চিন্তামগ্ন ক'রে তুলেছে। হঠাৎ ভেসে ওঠে কয়েকটা কথা।

—'এই বালকের নাম জেমস্ ওয়াট। ওয়াটের মনে গভীর চিন্তা এই বাষ্প নিয়ে—এই রহস্যময় পদার্থটির খবর জানতে চায় সে। নতুন সম্ভাবনার স্বপ্ন তাকে আকুল করেছে।'

সে উঠে দাঁড়ালো এবং নাটকীয় ভাবে বললো, 'এই রহস্যময় পদার্থের হদিস আমাকে পেতেই হবে। আমি একে কাজে লাগাবো মানুষের কল্যাণে।'

তারপরে নানান টুকরো টুকরো দৃশ্যে দেখা গেল, সে পরীক্ষা ক'রে চলেছে। তার সরঞ্জাম হচ্ছে জল আগুন, নল, হাঁড়ি, বয়লার, সিলিণ্ডার আরও কত রকম কলকব্জা। অবশ্য তখন ওয়াট আর বালক নন, তিনি একজন সুন্দর মানুষ। তাঁর তৈরী কলটি দেখা গেল সত্যই চলছে। চলছে মানে, একটি চাকা অনবরত ঘুরছে। এই চাকা ঘোরানোই হচ্ছে তাঁর বাহাদুরী। আনন্দে আত্মহারা ওয়াট। মানুষকে আর ভারী কাজ করতে হবে না। পুলকিত ওয়াট নেচে উঠলেন।

'ফোটে জল ফোটে জল টগ বগ ক'রে,
কিসের যাদুতে ঐ চক্রটি ঘোরে।'

চাকা ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে। তারপর সেই কলটির চেহারা বদলাতে থাকে। এক রকম থেকে হলো আর এক রকম—তা আরও অন্য রকম। ক্রমেই উন্নত হচ্ছে, অসুবিধাগুলি একে একে দূর হচ্ছে। ওয়াটের সাধনা সফল হলো। কিন্তু ধীরে ধীরে ওয়াটের কীর্ত্তি অস্পষ্ট হ'তে লাগলো।

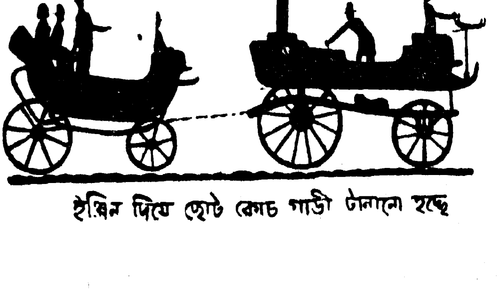
উজ্জ্বল আলোয় ফুটে উঠলেন আর এক ভদ্রলোক। তাঁর নাম নিউকোমেন। ইনিও ঐ একই ব্রত নিয়ে কাজে লাগলেন। চাকা ঘোরানোর ইঞ্জিন ইনিও তৈরী করেন। কিন্তু তার কয়েকটি দোষ শুধরে দিলেন ওয়াট। তখন সত্যিই একটা ভাল ইঞ্জিন হলো, যা সহজে চলতে থাকে এবং বন্ধ হবার ভয় নেই। মসৃণ ভাবে ঘুরছে চাকা। একটি চাকা থেকে অন্য চাকাও সহজে ঘোরানো যেতে পারে। রাজু কলকব্জার খুঁটিনাটি বিশেষ বুঝলো না, কেন না, পিষ্টন ভাল্‌ব এগুলি সে বুঝবে কি করে?

তারপরে আর এক ব্যক্তির আবির্ভাব হলো। তাঁর নাম মারডক। মারডক বললেন, 'আমি এই ইঞ্জিন দিয়ে গাড়ী চালাবো।' এটি তাঁর নতুন স্বপ্ন। তিনি কাজে লেগে গেলেন।

রাজু স্পষ্টই দেখলো একটি জবড়জং ইঞ্জিন তৈরী ক'রে চালাচ্ছেন মারডক। সেটি চলছে নড়বড় করে, কিন্তু কী ভীষণ আওয়াজ তার!

'কি বিশ্রী ইঞ্জিন এটা!' বলে ওঠে রাজু।

কিন্তু সেটা মুছে যেতে দেরী হলো না। এলো আর একটি



ইঞ্জিন দিয়ে ছোট কোচ গাড়ী টানানো হচ্ছে

ইঞ্জিন। আগের চেয়ে অনেক ভালো। চালাচ্ছিলেন আর একটি ভদ্রলোক। এ লোকটা কে?

লেখা ফুটে উঠলো—'ইনিই বিশ্ববিখ্যাত ষ্টিভেনশন—রেল গাড়ীর জন্মদাতা।'

ষ্টিভেনশনের নতুন ইঞ্জিন রাস্তায় চলেছে। লোকের কি উল্লাস! মজা দেখছে রাস্তার ধারে হাজার হাজার লোক। ইঞ্জিনের লম্বা একটা চিমনি, তাই দিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে কালো কালো ধোঁওয়া উঠছে। চাকা ঘুরছে বিরাট ঘড় ঘড় শব্দ ক'রে। ইঞ্জিনের ঘর্ঘর আওয়াজ বিকালের আকাশ বিদীর্ণ করছে। রাস্তায় পাছে কেউ চাপা পড়ে তাই এক বিরাট ঘণ্টা ছিল গাড়ীতে, সেটা বাজছে ঢঙ ঢঙ ঢঙ। ছেলে বুড়ো ছুটে এলো বাড়ী থেকে নতুন লৌহদানবকে দেখবার জন্যে। যেন রূপকথার এক কৃষ্ণকায় দৈত্য।

রাজুরও বেশ মজা লাগে। রাস্তায় কি দাপাদাপি, হুড়োহুড়ি।

একটু পরে সে দৃশ্যও গেল বদলে। ঐ রকম একটা ইঞ্জিনের সঙ্গে জুড়ে-দেওয়া একটা কোচ। কোচ মানে পুরানো ঘোড়ার গাড়ীর মত একটা গাড়ী। তাতে কয়েক জন লোক বসে—প্রথম রেলের যাত্রী।

ষ্টিভেনশন বলে উঠলেন, 'ষ্টীম, ষ্টীম! ষ্টীমের সাহায্যেই মানুষের যান-বাহন তৈরী হবে। মানুষ সহজেই এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে পারবে। দূরত্বের ব্যবধান আমি লুপ্ত করবো'।

তখনও ঘর্ঘর শব্দ কানে আসছে। ঐ অদ্ভুত লৌহদৈত্যের ভয়ে লোক ছুটোছুটি করছে। রাজু স্পষ্টই দেখে, এক পাদ্রী সাহেব ইঞ্জিনের সামনে পড়ে প্রাণভয়ে কী ছুটই দিল! ছুটে একেবারে গির্জার মধ্যে।

ষ্টিভেনশন এবার এলেন রেলের লাইন নিয়ে। এই লাইনের ওপর দিয়েই চলবে তাঁর ইঞ্জিন আর পেছনে জোড়া গাড়ী। তাই থেকেই নাম রেল গাড়ী। সত্যিই দেখলো রাজু এখনকার মতই গাড়ীর পর গাড়ী জোড়া লম্বা ট্রেন, একটি ইঞ্জিন তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তার পরে আরও আধুনিক ধরণের ইঞ্জিন এল।

রাজু চোখ থেকে চশমা খুলেছে। প্রোফেসর তার পিঠে ধাক্কা দিতে আরম্ভ করেছে কিনা।

'দেখ দেখ, গিয়ারের কলটা হয়েই গেছে, এখন ফ্লাই হুইলটায় কোন নাটটা লাগাবো বলতে পার?'

'যেটা হোক লাগান না'। বিরক্ত হয়ে বললে রাজু।

'ঠিক আছে, তবে দু'কোণাটাই লাগাই, আমি এখুনি আসছি। এই কথা বলে প্রোফেসর উধাও হলো। রাজু অবাক! কি রকম লোক ঐ প্রোফেসর? কি দেখলাম তার কোনও কথা নেই—ঘুম করে সবা পড়লো।

কিন্তু ঠিক এই সময় ঘ্যম করে ঘরে ঢুকলো দু'জন। সেই রাজকীয় দূত দু'জন, চৌকোমাথা আর গোলমাথা। এসেই দু'জনে দু'হাত ধরলো।

'কোথা? কোথা?'

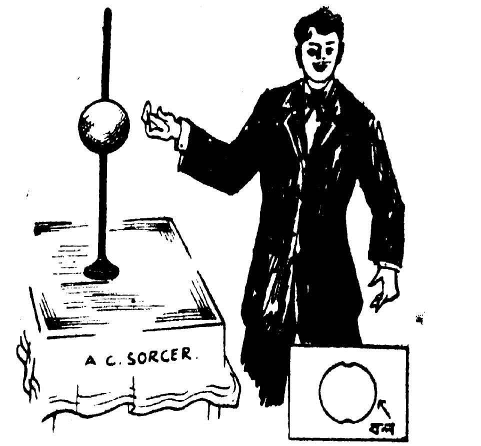
'খাবার জায়গা হয়েছে।'

[চলবে।

আজ্ঞাবহ ম্যাজিক বল

যাদুকর এ, সি, সরকার

বৈশাখ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে বিলাত থেকে লেখা আমার "ম্যাজিক আংটি" খেলাটি প্রকাশিত হয়েছে। তোমরা অনেকেই যে সাফল্যের সঙ্গে এই খেলাটি দেখিয়ে প্রশংসা পেয়েছ, তা আমি জানতে পেরেছি পত্র মারফৎ। এবারে তোমাদের শিখিয়ে দিচ্ছি



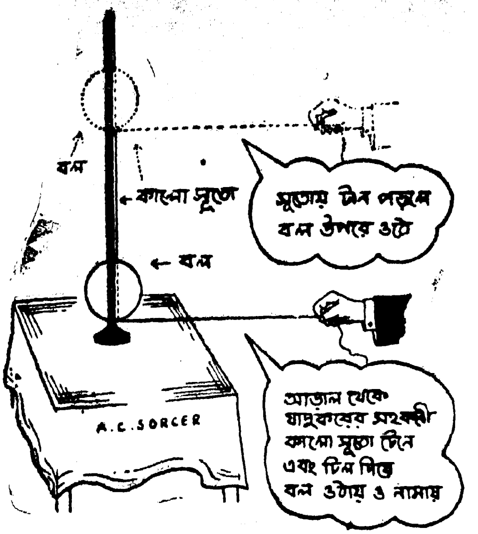
আরও একটি খেলা যার মূল কৌশল আংটির খেলারই অনুরূপ। এই খেলাতে আংটির বদলে ফুটোওয়ালা ফাঁপা এলুমিনিয়মের বল আর কলমের বদলে টেবিলের উপরে লম্বাভাবে ফিট-করা সরু লোহার রড ব্যবহৃত হবে।

খেলাটি এই রকম:—যাদুকর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেন একটা ফাঁপা বল হাতে নিয়ে। এই বলটা অতঃপর তিনি দেন দর্শকদের হাতে। দর্শকেরা ভাল করে পরীক্ষা করে দেখে যখন বলটি যাদুকরের হাতে ফেরৎ দেন, তখন যাদুকর বলটিকে গলিয়ে দেন টেবিলের উপরে লম্বাভাবে ফিট-করা সরু লোহার রডের ভিতরে। বলা বাহুল্য, বলটির মধ্যে এমন ভাবে ফুটো করা আছে যে, রডটি বলের এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে।

এর পরে আরম্ভ হয় যাদুকরের বক্তৃতা: "ভদ্রমণ্ডলী, এই যে বলটা আপনারা দেখছেন, এটা দেখতে সাধারণ মনে হলেও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। আমার যাদুমন্ত্র প্রভাবে মুহূর্ত্তমধ্যে এই জড়-পদার্থের মধ্যে আপনারা প্রত্যক্ষ করবেন জীবনের লক্ষণ।" এই কথা বলে যাদুকর দু' তিনবার তার হাতনাড়া দিলেন বলের উপর দিয়ে। যাদুকরের আদেশে বলটা থাকলো উপরের দিকে। যখনই যাদুকর থামতে বলেন বলটা থেমে যায় মাঝ-পথে···যখন উঠতে বলেন তখনই এ উঠতে থাকে···নামতে বললে এ নামে, আবার নাচতে বললে বাজনার তালে তালে নাচতে থাকে এ বল। অবাক কাণ্ড নয় কি?

এবার শোন খেলাটার কৌশল। বলের মধ্যে কোনই কারসাজি নাই।

যে রডটার ভেতরে বলটা গলিয়ে দেওয়া হয়, তার ডগায় আছে একটা ছোট হুক। এই হুকের সঙ্গে আটকানো থাকে একটা সরু শক্ত কালো সুতোর এক প্রান্ত। এই সুতোর অন্য প্রান্ত



থাকে দর্শকদের দৃষ্টির বাইরে বসে-থাকা যাতুকরের সহকারীর হাতে। যাতুকর যখন রডের ভেতরে বলটা গলিয়ে দেন, তখন সুতোটাও গলে যায় বলের ভেতর দিয়ে। এখন সুতোয় টান পড়লে বলও উপরে উঠবে। যাতুকরের সহকারী আড়ালে থেকে যাতুকরের নির্দেশ অনুযায়ী সুতোয় ঢিলা দেয় বা টান মারে, আর এরই ফলে বল নাচে বা ওঠা-নামা করে।

এলুমিনিয়মের বলের অভাবে সস্তা-দামের ধাতুনির্মিত School Globe দিয়েও এ খেলা দেখানো যেতে পারে। এই সব Globe এর তু'দিকে ফুটো করা থাকে। সরু লোহার রড আর কালো সুতো সংগ্রহ করা খুব কঠিন নয়। কাজেই আশা করছি, এ খেলাটাও তোমরা সাফল্যের সঙ্গে দেখাতে পারবে।

রাজপুত্রের মৃত্যু

[Mort du Dauphin—Alphonse Daudet-এর মূলানুবাদ]

শ্রীসুকুমার দাস

দোফ্যাঁর অন্তিম সময়। কোনো আশা নাই।

গীর্জায় গীর্জায় স্যাক্রামেণ্ট তৈরী। পবিত্র শিখা সর্বক্ষণ জ্বলছে রাজপুত্রের মঙ্গল কামনায়।

টুইলারী প্রাসাদ আজ থমথমে, নিস্তব্ধ। প্রাসাদচূড়ার পেটাঘড়ি বাজে না। প্রকাণ্ড গাড়ীগুলি নিঃশব্দে আসছে যাচ্ছে। প্রাসাদের সামনে বুর্জোয়াদের জটলা। গেটের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় রাজার সুইস্ গার্ডের দল। জমকালো পোষাকে ভারী হোমরা-চোমরা ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রাসাদময় একটা উৎকণ্ঠিত চঞ্চলতা। দৌবারিক ও পুরভৃত্যগণ মার্বেলের সিঁড়ি দিয়ে ব্যস্ত ভাবে ওঠানামা করছে। গ্যালারী-ঠাসা অমাত্য ও রাজপুরুষে। মাতব্বরগণ ফিস্-ফিস্ করে একে অন্যকে খবর জিগগেস করছেন। রোগীর ঘরের সামনে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বাহারের রুমালে চোখ মুছতে মুছতে উঁকি দিচ্ছেন।

সবুজঘরে জমায়েত চিকিৎসকমণ্ডলী। কাচের মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে তাঁদের ডাক্তারী কায়দায় পরচুলায় হাত বুলোনো। যুবরাজের অশ্বশালার অধ্যক্ষ দরজায় দাঁড়িয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের অভিমত শুনছেন। খুদে সহিসরা তাঁকে সেলাম না দিয়েই পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। অশ্বশালার দিক থেকে একটা দীর্ঘ কাতর হ্রেষারব শোনা গেলো—আলেজাঁ! যুবরাজের খুদে ঘোড়াটাকে সহিসরা খাবার দিতে ভুলে গেছে বোধ হয়। কাতরস্বরে সে তাই মনে করিয়ে দিচ্ছে।

রাজা উপরে দোরবন্ধ করে বসে আছেন। রাজা কখনও কাঁদতে পারেন! রাণীমার কথা আলাদা। যুবরাজের শয্যাপার্শে তিনি নেহাৎ সাধারণ লোকের মতো সবার সামনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন।

লেসের বিছানার সঙ্গে মিশে আছে ছোট্ট রাজকুমারের সাদা ফ্যাকাশে দেহ। মনে হয় ঘুমোচ্ছেন বুঝি! একটু পরে পাশ ফিরে মাকে কাঁদতে দেখে বললেন—তুমি কাঁদছো কেন মা? তুমি কি মনে করেছো আমি সত্যিই মরে যাচ্ছি?

রাণীর রুদ্ধগলা দিয়ে উত্তর বেরোলো না।

—কেঁদো না রাণী-মা। তুমি কি ভুলে গেছো আমি যুবরাজ? যুবরাজরা কখনও এভাবে মরতে পারে?

রাণীর কান্না উথলে উঠলো। ছোট্ট রাজপুত্র এবার একটু ভয় পেয়ে গেলেন।

—বলছো কি গো তোমরা? যম আমাকে নিতে আসবে? দাঁড়াও ওর আসা বার করে দিচ্ছি। চল্লিশ জন সৈনিক তরোয়াল হাতে পাহারা দিক আর জানালার নিচে তৈরী থাক একশো কামান। আসুক দেখি এবার যম?

দোফ্যাঁ (Dauphin) ফ্রান্সের যুবরাজ।

তাকে খুসী করবার জন্যে রাণী একটা ইসারা করতেই উঠোনে কামানের ঘর-ঘর শব্দ শোনা গেলো, চল্লিশ জন দীর্ঘকায় সৈনিক চারপাশে মোতায়েন হয়ে গেলো। রাজকুমার ইঙ্গিতে একজনকে ডাকলেন।

—লর‍্যাঁ!

প্রবীর লর‍্যাঁ আর একটু এগিয়ে এলো।

—আমি তোকে খুব ভালবাসি। কতো বড়ো তরোয়াল রে তোর? দেখ যম আমাকে নিতে আসলে তখুনি তাকে তু'টুকরো করে ফেলবি।

—আজ্ঞে, যুবরাজ! গলা তার বুজে আসে। গাল বেয়ে বড় বড় তু'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো।

ধর্মযাজক নিম্নস্বরে কিছু বলতে শুরু করলেন এবং ক্রশচিহ্ন দেখালেন। বিস্মিত রাজপুত্র হঠাৎ বলে উঠলেন—"আপনার কথা সব শুনলাম। আচ্ছা বলুন তো, আমার বন্ধু বেপ্পো আমার হয়ে মরতে পারে? ওকে যদি অনেক টাকা দেওয়া হয়?"

যাজক আবার কিছু বলতে লাগলেন। যুবরাজের বিস্ময় বেড়েই চললো। যাজকের কথা শেষ হলে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন—আপনি যা কিছু বললেন সবই বড় নিরানন্দময়। তবে একটা কথা তবু ভালো যে, স্বর্গে গিয়ে আমি আবার দোফ্যাঁ হবো। আমি জানি ঈশ্বর মঙ্গলময়। তিনি আমাকে যুবরাজের যোগ্য সম্মান ঠিক দেবেন।

তার পর মায়ের দিকে ফিরে বললেন—আমার সবচেয়ে ভালো জামা কাপড়টা দিতে বলো না মা! আমার সেই সাদা ভেলভেটের পোষাকটা। স্বর্গে দেবদূতদের কাছে আমি দোফ্যাঁর বেশেই যেতে চাই।

তৃতীয় বারের জন্যে ধর্মযাজক মন্ত্রপাঠ সুরু করতেই রাজপুত্র রাগের সঙ্গে বলে উঠলেন—তাহলে যুবরাজ হওয়াটা কি কিছুই নয় নাকি?

তারপর আর কিছু শোনার অপেক্ষা না করেই দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে ফুলে-ফুলে কাঁদতে লাগলেন।



ভণ্ড-জাতক

শ্রীদ্বারেশচন্দ্র শর্ম্মাচার্য্য

(২)

লবাই সর্দার গল্প বলে ; ভাটির চোখ দু'টি ছলছল হয়ে উঠে। আমিও মন্ত্রমুগ্ধের মত সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। পাহাড়ী মেয়ে চম্পা আর রাজার ছেলে মদনকুমারের বাঁশির সুর যেন অতীতের কোল থেকে ভেসে আসছে—'রাধা-রাধা-রাধা'।

সর্দার বলতে থাকে, "বাঁশির আওয়াজ শুনলেই রতনের চোখ জলে ভরে উঠত ; সত্যি সে চম্পাকে ভালবাসত। চম্পার মন বুঝা যেতো না ; রতনকে যে সে ভালবাসত না, তা নয়। রাজার ছেলের বাঁশিই তাকে উন্মনা করে তুলেছিল। রতনের সাধ্যিসাধনা চম্পার মন ফেরাতে পারে না। তবুও রতন চম্পার পিছু-পিছু ঘুরে ; সকলেই জানে, রতনের সঙ্গে চম্পার বিয়ে হবে। দু'জনেরই বিয়ের বয়স হয়েছে ; আর দেরী করা চলে না। সর্দারদের বৈঠক বসে শঙ্খ সর্দারের বাড়ী ; সাতপুঞ্জীর মোড়ল শঙ্খ সর্দার। ঐ পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে শাঁখে ফুঁ দিলে পাহাড়ীরা যে যেখানে আছে ছুটে আসত তীর, ধনু আর বল্লম-বর্শা হাতে। লুসাইদস্যুরা একবার আমাদের রাজ্য আক্রমণ করেছিল ; শঙ্খ সর্দারের দল কচুকাটা করে তাদের পাহাড়ের গহ্বরে ফেলে দিয়েছিল। রাজা তাই খুশী হয়ে শঙ্খ সর্দারকে সোনায়-মোড়া শাঁখ বকশিস্ দিয়েছিলেন।

রাজার হুকুম, চম্পাকে সামলাতে হবে ; সে আর বাঁশি হাতে নিতে পারবে না। হুকুম অমান্য করে কার সাধ্যি ! এমন যে শঙ্খ সর্দার সে'ও রাজাকে দেখলে থরথর করে কাঁপত। রাজা যে নারায়ণ—পাণ্ডব অর্জুনের রক্ত বইছে তাঁর গায়ে। শঙ্খ সর্দার বুড়ো হয়েছে ; মেয়ে চম্পার দিকে তাকিয়ে তারও চোখে জল ঝরে। বড় আদরের মেয়ে চম্পা। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছে। বুড়ো বাপই তার সব। তার খেলার সাথী রতনকে দেখলেও চোখ জুড়াত বুড়োর। রতনের বাবা লুসাইদের হঠাতে গিয়ে দু'চোখ হারিয়েছিল ; আগুনের মশাল ঢুকে গিয়েছিল তার চোখে।

শঙ্খ সর্দার ভাবে, এ কি হল ? রাজার ছেলের বাঁশি যে আজ সব সুর পাল্টে দিচ্ছে ? সর্দার মেয়েকে বুঝায় ; চম্পা শুধু কাঁদে ; "আমার জন্য ভেবো না বাবা, তুমি নিশ্চিন্দি থাকো ; আমার কিছুই হয়নি"। বুড়ো বাপ বলে, "তা হলে রতনের বাবাকে বলে দিই ?" মেয়ে উত্তর দেয়, "তোমার জন্যই ভাবি বাবা, তুমি বুড়ো মানুষ ; একা-একা থাকবে কি করে ?" বুড়ো শঙ্খ সর্দার হাসে ; ডান হাত বাড়িয়ে দিয়ে মেয়ের মাথায় হাত বুলোয় আর তার চোখ দিয়ে জল ঝরে।

ভাটি হঠাৎ বলে উঠে, "তাহলে চম্পা বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল বাবা ?"

লবাই সর্দার হেসে উঠে, "হাঁ রে, হাঁ ! রতনকে বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল।"

ভাটির চোখে-মুখে বিস্ময়, কৌতূহল আর আবেগ যেন ফুটে উঠছে ; গল্পে বাধা পড়ে গেল ; লবাই সর্দারও হঠাৎ যেন তার এই মা-হারা মেয়ে ভাটির মুখের দিকে চেয়ে ক্ষণকাল কি ভাবতে লাগল ; ভাটি আমার পাশেই বসেছিল ; সে আমার একখানি হাত চেপে ধরল। তার হাতখানিতে যেন একটা কম্পনের ঢেউ চলছে ; ভাটি আবার তার বাবাকে বললে, "তার পর কি হ'ল বাবা ?"

লবাই সর্দার আবার সুরু করলে, "চম্পা বন্দিনী হয়েছে ; ঘর ছেড়ে যাবার হুকুম নেই। সে আর বাঁশিতে হাত দিতে পারে না। শঙ্খ সর্দারের উপরই পড়েছে মেয়েকে পাহারা দেবার ভার। কিন্তু রাজার ছেলের বাঁশি বন্ধ হয় না। রাজার পাটের সেই উঁচু চূড়ায় বসে মদনকুমার বাঁশি বাজায় ; শাল-তমাল আর বেতবনের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর বাঁশির সুর ঢেউ তুলে ; যেন আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে বেড়ায় সে সুর। বন্দিনী চম্পা উত্তর দিতে পারে না। সে ছটফট করে ; একদিন, দু'দিন—তিন দিন ; চম্পা কিছুই মুখে দিতে চায় না। তার বুড়ো বাপেরও মুখে অন্ন উঠে না।

এদিকে রাজার ছেলেরও একই অবস্থা ! বাঁশির সুর যেন কেঁদে কেঁদে উঠে। কিন্তু তার প্রত্যুত্তর আসে না। তিন দিনের পর রাজার ছেলেরও বাঁশি বন্ধ হ'ল। রাজার ছেলেও জল স্পর্শ করে না ; রাজা হুকুম দিলেন, "চম্পার বিয়ে দাও ওই রতনের সঙ্গে ; সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সর্দার-পুঞ্জীর সকলেরই তাই ইচ্ছা। শঙ্খ সর্দার যেন আশার আলো দেখতে পেল। মেয়ের বিয়ে হবে ওই পূর্ণিমার দিনে। আমাদের একটা রীতি আছে ; বিয়ের আগের দিন সকলের অজান্তে হবু-বউকে নিয়ে পালিয়ে যাবে হবু-বর। একটা রাত তাকে লুকিয়ে রাখতে হবে। তার পরদিনই হবে বিয়ে। কিন্তু সে রাত্রে তাঁদের খুঁজে পেলেই মহা বিপদ ! লড়াই করে সকলকে হারিয়ে দিতে হবে ; তা না পারলে তাকে প্রাণ দিতে হবে।

লবাই বলে, "সে নিয়মটা এখন রদ হয়ে গেছে বাবাঠাকুর ! তবু দু'জনকে লুকিয়ে থাকতে হয় একটা রাত। খোঁজ-খবর নেওয়া হয় বৈ কি ! রীতিমত হৈ-হল্লা করে বন-বাদাড়ে পাহাড়ের আনাচ-কানাচে খুঁজে বেড়ায় সকলে। কিন্তু এটা এখন একটা লোকদেখানো আচারে দাঁড়িয়ে গেছে। পূর্ণিমার আগের দিন, চতুর্দশীর চাঁদ দেখা দিয়েছে। থরে থরে জোছনার ঢেউ নেমে আসছে পাহাড়ের উপর। শরৎকাল সেটা, কোজাগরী ঠাকরুণের পূজো হবে পরদিন। ওই টিলায় ছিল রাজার স্থলপদ্মের বন ; ফুটন্ত স্থলপদ্মের পাপড়িগুলির গোলাপী


"এর শুভ্রতাই
এর বিশুদ্ধতার
পরিচায়ক"
বলেন অনুভা গুপ্ত
"সেইজন্যেই
আমি সর্ব্বদা
লাক্স টয়লেট
সাবান
ব্যবহার করে
থাকি"
ভারতে প্রস্তুত
অনুভা গুপ্ত বলেন:
"আপনার ত্বক মসৃণ ও সুন্দর রাখতে হলে ভালভাবে মেখে নিন…"
"লাক্স টয়লেট সাবানের সরের মত ফেনা—কি সৌরভময়"।
"তারপর ধুয়ে মুছে ফেলুন—আপনি এত তাজা অনুভব করবেন।"
"সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে বড় সাইজ ব্যবহার করুন—যা আমি করি।"
চিত্র-তারকাদের বিশুদ্ধ শুভ্র সৌন্দর্য্য সাবান
LTS. 479-X52 BG

আভায় যেন হাসাহাসি করছে ; গাঢ় সবুজ কমলা ফলগুলো চিকমিক্ করছে চাঁদের আলোয়। কাল চম্পার বিয়ে !

শঙ্খ সর্দারের ঘরের বাঁ পাশ দিয়েই কমলার বন সুরু হয়েছে ; তার ভেতর দিয়ে একটা পথ চলে গেছে ঐ পাহাড়ী ছড়ার দিকে। সে পথে চলেছে দু'জন হাত ধরাধরি করে ; রতন আর চম্পা। মাঝে মাঝে কমলা-বনের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো পড়ছে তাদের মাথায়-মুখে। চম্পার মুখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠে রতন ; তার মুখখানা যেন সাদা পাথরের মত হয়ে উঠেছে ; তাতে কোন ভাব বা আবেগের লেশ মাত্র দেখতে পায় না রতন। হাত-দু'খানিও যেন বরফের মত ঠাণ্ডা। চোখ যেন তার পলকহীন ; যন্ত্রের পুতুল যেন চলছে। রতন ডাকে, "চম্পা, কাজ নেই, তুমি ফিরে যাও।" চম্পা বলে, "সে হয় না রতন, রাজার হুকুম মানতেই হবে।" রতন বলে, "শুধু কি রাজার হুকুম মানতেই তুমি আমার সঙ্গে চলেছ চম্পা ?" চম্পা উত্তর দেয়, "কেন রতন ? একথা আজ আবার কেন আমায় জিজ্ঞেস করছ ? আমাদের দু'জনের মিলন ত কবে কোন দিন হয়ে গিয়েছে।" রতন বলে, "তাহলে মদনকুমারের বাঁশি তোমায় এমন উতলা করে তুলে কেন ? তুমি ত আগের মত আমার ডাকে সাড়া দাও না ?" চম্পার মুখের হাসি ফুটে উঠে ; খোদাই করা পাষাণ মূর্ত্তি যেন আবেগে জীবন্ত হয় উঠে। চম্পা বলে, "কিছুই বুঝতে পারি নে রতন ! ওঁর বাঁশি শুনলে আমি সব ভুলে যাই ; স্বপ্নের ঘোর নেমে আসে আমার দেহ-মনে ; রাসলীলায় কৃষ্ণের কথা শুনেছি : মনে হয়, সেই কৃষ্ণের বাঁশি আমি শুনছি ; বৃন্দাবনে যমুনার তীরে আমারই মত কত জন আকুল আর তন্ময় হয়ে বাঁশি শুনছে।"

চম্পার কথা শুনে রতনের বুকে যেন নিঃশ্বাস আটকে যায়। অতি কষ্টে নিঃশ্বাস ছেড়ে রতন বলে, "তাহলে তুমি ত সুখী হতে পারবে না চম্পা ? মদনকুমার যত দিন বেঁচে থাকবে তাঁর বাঁশি নিয়ে আমিও সুখী হতে পারব না।" চম্পা উত্তর দেয়, "তাহলে কি করতে চাও রতন ?" রতন বলে, "শুন, চম্পা, আমার কথা শোন ; যেখানে বাঁশি নেই ; যেখানে মদনকুমার নেই ; যেখানে তাঁর বাঁশির সুর ভেসে যাবে না, চল আমরা সে দেশে চলে যাই। এ দেশ ছেড়ে চল চম্পা ! আর আমরা ধরা দেবো না।" চম্পা বলে, "সে হয় না ; তুমি বুঝবে না রতন ! পাতালে গেলেও আমার নিস্তার নেই ; সেখানেও বাঁশির সুর আমার কানে পৌঁছুবে ; তার জন্য চিন্তা কেন ? তুমি আমাকে চাও ; আমি ত ধরা দিয়েছি তোমার হাতে। আর কি চাও রতন !" রতন আশ্চর্য্য হয়ে যায় চম্পার কথা শুনে ; নিশ্চুপ হয়ে শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে ; তার পর ডাকে—"চম্পা, সত্যই কি তুমি ধরা দিয়েছ ?" চম্পা তার গলা জড়িয়ে ধরে, "হ্যাঁ রতন, ধরা ত দিয়েছি : তা না হলে কি তোমার সঙ্গে আসি ?"

ভাটি যেন চম্পা আর রতনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে শিউরে উঠছে—পুলকের একটা শিহরণ তার চোখে-মুখে। হঠাৎ ভাটি বলে উঠে, "আচ্ছা ভৃগু, এরকম হলে তুই কি করতিস্ ?"

ভাটির প্রশ্ন আমাকে চমকে দেয় ; হঠাৎ বুড়ো লবাই সর্দারের মুখের দিকে তাকিয়ে লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে উঠি ; ভাটির মুখে এ কি কথা ? আমাকে চুপ থাকতে দেখে ভাটি বলে উঠে, "বল না ভৃগু, চম্পা কি সত্যি রতনকে ভালবাসত ?"

উত্তর দেয় লবাই সর্দার, "ভাল বাসত বৈ কি ভাটি ! কিন্তু রাজকুমারের টান ছিল দৈবের টান ! কোন দেবতার শাপে চম্পা এসে পাহাড়ীদের ঘরে জন্ম নিয়েছিল। তাই যখনই পরশ পাথরের পরশ পেয়েছে তখনই তার এখানকার কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে ; মা গঙ্গা এসে এক রাজার ঘরের ঘরণী হয়েছিলেন, জানিস নে ?"

লবাই সর্দার বলতে থাকে, "তার পর চম্পা আর রতন চলেছে বনপথে কোথায় গিয়ে লুকোবে তারাই জানে।" রতনের কাঁধে বড় একটা ধনুক, পিঠে তার তীরের তাড়া ; হাতে বল্লম। কোমরে বিষমাখা ছুরি—যোদ্ধার বেশ। চম্পার পরনে লালরঙের ঘাঘরা, গায়ে গোলাপী রঙের আঙরাখা ; চুলগুলি এলোমেলো। খুব জোরে চলেছে তারা ; দূরে হৈ-হল্লা শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ এক দিক থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসতে লাগল ; চম্পা উন্মনা হয়ে উঠল। তাকে আর ধরে রাখা যায় না ; হঠাৎ রতনের হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলল সে, সেই বাঁশির সুর যেদিক থেকে ভেসে আসছে সেদিকে।

বনবাদাড় খেয়াল নেই ; ঝোঁপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উন্মাদিনী চম্পা ছুটে চলেছে,—আর তার পিছু পিছু রতন। রতন ডাকছে চম্পা, চম্পা,—চম্পা ! চম্পা সাড়া দেয়—আয় রতন এই যে, আমার সঙ্গে আয়। ছিঁড়ে গেছে তার ঘাঘরা,—কাঁটা-বনের কাঁটায় হাতে-পায়ে আঁচড় লেগেছে। জোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে রতন,—চম্পার হাতে-মুখে রক্তের ধারা ! রতনেরও খেয়াল নেই ; তারও হাত-পা আঁচড়ে গেছে ; জ্বালা-যন্ত্রণা সে-ও ভুলে গেছে। এ যে সেই পাগল-করা বাঁশির সুর রাজকুমার মদনের বাঁশি। কিন্তু কই কোথায় ? চম্পা পথ ছেড়ে যেদিকে খুশী সেদিকে চলেছে। রতন তীর-ধনু ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বর্শা হাতে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে ছুটে যায় ; কিন্তু কোথায় চম্পা ? সে কি অদৃশ্য হয়ে গেল ! ঘোর বন-জঙ্গল ভেঙ্গে কোথায় যায় চম্পা ? বাঘ-ভালুক রয়েছে ! হঠাৎ রণশিঙ্গায় ফুঁক দিয়ে উঠে রতন—বিপদের সঙ্কেত ! নিজের যে প্রাণ যাবে সেদিকে খেয়াল নেই। পাহাড়ের আনাচে-কানাচে পাত-পুঞ্জী মথিত করে তার প্রতিধ্বনি উঠে শত শত শিঙ্গায়।

ভাটি গল্প শুনে চমকে উঠে ; তার সমস্ত শরীর যেন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। তার নরম আঙুলগুলো বরফে ধোয়া বেলফুলের মত আমার হাত জড়িয়ে আছে। আমারও কৌতূহল বাড়ে ; ভাটিকে বলি, "বড় ভীরু মেয়ে ! গল্প শুনে হিম-কাঠ হয়ে যায় আবার।"

লবাই সর্দার বলে, "তার পর এদিকে আর এক ব্যাপার ! বুড়ো শঙ্খ সর্দার শিঙ্গার আওয়াজ শুনে ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে উঠল। চম্পা নেই ; সে ত আনন্দের কথা। কাল যে চম্পার বিয়ে। রতনের মত জোয়ান মরদ নিশ্চয়ই একটা রাত লুকিয়ে কাটাতে পারবে। কিন্তু এত শিঙ্গা বাজে কেন ? এ ত বিপদের সঙ্কেত। সারা পাহাড়টা যেন তোলপাড় করছে। বুড়ো সর্দার হঠাৎ সেই পুরানো শঙ্খ হাতে নিয়ে উঁচু মাচানের উপর থেকে তাতে ফুঁ দিলে। শিঙ্গা আর শাঁখের আওয়াজে সে কি তুমুল কলরব ! রাজপাটে রাজা আর শাস্ত্রীরা সচকিত হয়ে উঠল ; তাহলে কি আবার কোন শত্রু রাজ্যে চড়াও হয়েছে ? শঙ্খ সর্দারের শাঁখের শব্দে রাজারও অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। কুড়ি-পঁচিশ বছর যে কেউ অস্ত্র ধরেনি। রাজার হুকুমে সাজ সাজ রব পড়ে যায় সেই গভীর নিশীথে।

মহারাণী ছুটে এসে বলেন, "সর্বনাশ হয়েছে মহারাজ! মদন যে তার ঘরে নেই! তার বাঁশিও নেই। চারি দিকে পাহারা, কেউ কিছুই বলতে পারে না। এ কি হল?" রাজা বলেন, "কি আর হবে, নিশ্চয়ই কোথাও বসে বাঁশি বাজাচ্ছে।" সত্যই সেই তুমুল কোলাহল ভেদ করে প্রাণমাতানো করুণ বাঁশির সুর ভেসে আসতে লাগল। রাজা বলেন, "ঐ শোন, ঐ শোন—ওই সুর লক্ষ্য করে ছুটে যাও।" বৃদ্ধ সেনাপতি বলেন, "কিন্তু মহারাজ! এই গভীর নিশীথে শিঙ্গা আর শাঁখের কলরবে যে কি ঘটেছে কিছুই বুঝতে পারছি নে; ঐ দেখা যাচ্ছে, পুঞ্জীতে পুঞ্জীতে মশাল জ্বলে উঠেছে; ঘুরাঘুরি করছে মশালগুলো! চাঁদের আলো যেন রক্ত-রাঙা হয়ে উঠেছে। মদনকুমারের খোঁজে সান্ত্রীরা ছুটেছে! দেখি, কি খবর আনে।" রাজা বলেন, "আমার সাত পুঞ্জীর সর্দাররা বেঁচে থাকতে রাজপাটের ভয় নেই সেনাপতি! কিন্তু মদনকুমারের জন্যই আমার ভাবনা। কাল না চম্পার বিয়ে? তবে কি কুমার চম্পার কাছেই গেছে? পাহাড়ীদের রীতি পালন করবে রাজার ছেলে, বিয়ের আগের রাত্রে ভাবী বধূকে চুরি করে?" রাজা থরথরি কাঁপতে থাকেন।

গল্প শুনে আমিও চমকে উঠি। রাজার কথা শুনে অজানা ভয়ে আমারও অন্তর কেঁপে উঠে, হঠাৎ দেখি, ভাটির মুখে মৃদু হাসি। আমি বলে উঠি, "ছিঃ, এমন বিপদে হাসতে আছে?" ভাটি বলে, "হাসব না? তার পরও কাঁদতে হবে; মেয়েদের জীবন ত কাঁদবার জন্যই।"

ভাটিকে লবাই সর্দারের মেয়ে বলেই জানি; কিন্তু হঠাৎ সর্দার বলে উঠল, "ওঁর বাবা আর মা একদিনেই মারা যায় বাবাঠাকুর! কোন্ সে ছোটবেলায়! সেই থেকে ওকে আগলে বসে আছি! সবাই জানে, আমিই তার মা আর বাবা! ভাটি অনেক দিন তা জানতে পারেনি। যখন জানতে পেরেছে, তখন থেকেই ওর মুখের আগল খুলে গেছে। কত কি বলে, বুঝতে পারি নে।"

আজ ভাটিকে নূতন ভাবে দেখলাম। লবাই সর্দারের কথায় সে যেন একটু লজ্জিত হল। তারপর বললে, "আচ্ছা তারপর কি হ'ল রাজপাটে?"

লবাই বলতে লাগল। "কি আর হবে? রাজপাটের চত্বরে দাঁড়িয়ে রাজা-রাণী আর সেনাপতি পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। দূর থেকে বাঁশির সুর ভেসে আসছে। আর সে দিকে সমস্ত মশাল ছুটে চলেছে। কিছুই বুঝা যায় না। রাজার মন্ত্রীরাও চলেছে সে দিকে; তাদের হাতের খোলা তলোয়ার চিক্-চিক্ করছে; মশালের আলোতে বল্লম আর বর্শা নিয়ে চলেছে যত পাহাড়ী।"

পাহাড়ী ছড়ার সেই কালো পাথরের ঢিবির উপর রাজার ছেলে মদন বসে বাঁশি বাজাচ্ছে। শত শত ধারে উছলে উঠছে ঝরণা-ধারা। চাঁদের আলোতে অপরূপ শোভা তাঁকে ঘিরে রয়েছে। শত শত ব্রজগোপীর হাসি যেন সেই জলকল্লোলে শোনা যাচ্ছে। আকাশ-গাঙে জোছনাধারায় নেমে আসছে রাশি রাশি মন্দার ফুল। রাজকুমার আপন মনে বাঁশি বাজানোয় বিভোর! তাঁর কোন খেয়ালই নেই! কোথা থেকে ঝড়ের মত আলুথালু বেশে ছুটে এলো চম্পা। হাত-পা ছিঁড়ে গেছে; মুখ আঁচড়ে গেছে কাঁটাগাছের কাঁটায়; হাতে-মুখে তার রক্তধারা। ছুটে গিয়ে সে মদনকুমারের

পাশে বসেছে। বাঁশির করুণ সুর পালটে গিয়ে মধুর মিলন রাগিণী বেজে উঠল।

পাহাড়ীরা এগিয়ে আসছে; ছুটে আসছে উন্মাদ রতন। হাতে তার বিষমাখা পাহাড়ী ছুরি। রাজার ছেলের বুকে বসিয়ে দেবে! টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে সে! চম্পা কিংবা মদনকুমারের সেদিকে ভ্রূক্ষেপই নেই। রতন গর্জে উঠল—"কুমার, কুমার।" কুমারের দৃষ্টি নিষ্পলক! এক মনে বাঁশিতে সে সুরই দিচ্ছে। রতনের হাতের ছুরি চিক্‌-চিক্ করে উঠল দূরাগত মশালের আলোতে আর জোছনায়। রতন ডাকলে, "চম্পা, চম্পা!"

চম্পারও ভ্রূক্ষেপ নেই; থেমে গেল পাহাড়ীরা সে দৃশ্য দেখে। বল্লম-বর্শার মাথা নীচু হয়ে গেল। রাজার এক শত শান্ত্রীর তলোয়ার হেঁট হয়ে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সকলে বাঁশিই শুনছে; সেই যুগল মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রতন; তার হাতে উদ্যত ছুরি! সে-ও দাঁড়িয়ে রইল; ঝির-ঝির করে তারও গায়ে-মাথায় পড়ে ফোয়ারার ধারা। আবার রতন ডাকলে, "চম্পা, চম্পা, সত্যই কি তুমি আমার হাতে ধরা দিয়েছ?"

এবার যেন টনক নড়ল। চম্পা জড়িত স্বরে উত্তর দিলে, "হ্যাঁ, তুমি বিশ্বাস করো। কিন্তু বাঁশির সুর কেটে দিয়ো না।"

মদনকুমারের বাঁশির সুর হঠাৎ কেটে গেল; সে যেন একবার রতনের মুখের দিকে তাকাল। পাশে তাঁর চম্পা, চম্পার পরশ পেয়েই রাজকুমার আবার বাঁশিতে সুর দিল। সে এক করুণ রাগিণী, বিরহিণী রাধার করুণ বিলাপ পাহাড়ের গায়ে ঠেকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল তার সুর। রতনও যেন মুগ্ধ হয়ে গেল; একবার উপরের দিকে হাতের ছুরিখানি তুলে ধরে রতন হঠাৎ নিজের বুকেই বসিয়ে দিলে সে ছুরি। ফিনকি দিয়ে রক্তের ধারা বেরিয়ে এল। ফোয়ারার ধারা আর রক্তের ধারা মিশে গিয়ে চম্পা আর মদনকুমারের গা আর মুখ রাঙিয়ে দিলে সে ধারা। রতন পড়ে গেল—মুখ দিয়ে শুধু উচ্চারিত হল দুটি কথা…"তাই হোক্ চম্পা, তাই হোক্"।

রক্তে লাল হয়ে উঠেছে পাহাড়ী-ছুড়ার জল; 'হায় হায়' করে উঠল পাহাড়ীরা; এগিয়ে এসেছে শঙ্খ সর্দার। রতনকে তারা তুলে নিলে। রাজার হুকুম এসেছে, বন্দিনী কর চম্পাকে আর মদনকুমারকে, নিয়ে এসো রাজার পাটে। সান্ত্রীরা এগিয়ে এল; রতনের দেহ নিয়ে শিঙ্গা বাজিয়ে মশালের আলোতে বনভূমিতে চলল পাহাড়ীদের মিছিল। শঙ্খ সর্দারের হাত ধরে চলেছে রতনের অন্ধ বাপ।

রাজপাটের উঁচু চূড়ার পাশেই গভীর খাদে থাকে মস্ত এক অজগর—রাজপাটের রক্ষক, বাস্তুদেবতা। রোজ আস্ত ভেড়া কিংবা ছাগল ছেড়ে দেয় রাজবাড়ীর জল্লাদ সেই গভীর খাদের গুহা-গহ্বরে। বাস্তুদেবতার ভোগে লাগে সে-সব। অজগর মাথা তুলে উপরের দিকে বাড়িয়ে দেয় তার বিরাট ফণা। দূর থেকে স্তবস্তুতি করেন রাজা আর রাণী।

পূর্ণিমা রজনীতে চম্পা আর রতনের হবে বিয়ে। তাই ছিল ঠিক। কোজাগরী পূর্ণিমা,—আকাশগাঙে নেমে আসবে লক্ষ্মী দেবীর নৌকো! রাজার বিচার হুকুম হয়েছে, আজ গভীর নিশীথে বিয়ের লগ্নে চম্পাকে অজগরের মুখে দেওয়া হবে, এই তার শাস্তি। ভ্রষ্টা মেয়ে রাজকুমারকে বিগড়ে দিয়েছে; তার আর ক্ষমা নেই। বুড়ো শঙ্খ সর্দার রাজার আদেশ শুনে থমকে দাঁড়ায়। সর্বাঙ্গ তার থরথর করে কেঁপে উঠে! আগুন জ্বলে উঠে তার চোখে, চোখের জল নয়,—চোখে নেমে আসে যেন আগুনের বন্যা।

রাজার আদেশ শুনে মহারাণী মূর্ছিতা হয়ে পড়েন। মদনকুমার কিন্তু নিষ্পলক, নিথর; তাঁর মুখে কোন কথা নাই। রাজা কারো অনুরোধ বা উপরোধে কান দিলেন না; তিনিও যেন পাষাণ হয়ে উঠেছেন। আর চম্পা নির্বিকার হয়ে সে আদেশ শুনলে; তার শেষ ইচ্ছা রাজা পূরণ করলেন। তার হাতে তার বাঁশি দিলেন। স্নান সেরে গোলাপী ঘাঘরা আর সোনালী আঙরাখা পরলে চম্পা; বনফুলে হ'ল তার আভরণ। সে নিশীথে লক্ষ্মীর প্রদীপ আর কারো ঘরে জ্বলল না।

রতনকে পাহাড়ের চূড়ায় সমাধি দিয়ে পাহাড়ীরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে ফিরছে। তার উপর রাজার এই হুকুম শুনে জ্বলে উঠল তারা। ছুটে এল শঙ্খ সর্দারের কাছে। "হুকুম দাও সর্দার, রাজপাট আমরা উড়িয়ে দেবো। চম্পাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো আমরা।" সর্দার বলে, "না, না, না, তা হয় না; রাজা নিজের পাপে নিজেই ধ্বংস হবে; নির্বংশ হবে রাজা। আজই কোজাগরী লক্ষ্মী চম্পার সঙ্গে সঙ্গে রাজপাট থেকে বিদায় নেবেন; বাস্তুদেবতা রাজাকে চিরতরে ত্যাগ করবে। দেখে নিও তোমরা।"

শঙ্খ সর্দারের হুকুমে পাহাড়ীরা শান্ত হয়; গভীর নিশীথে ডঙ্কা বেজে উঠে; সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ের চূড়ায় বেজে উঠে হাজার হাজার শাঁখ। মশালে মশালে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে সারা পাহাড়! পাহাড়ী মেয়েরা শাঁখ বাজাচ্ছে; চম্পার বিয়ের লগ্ন! মুখে বাঁশি চম্পা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে—সেই খাদের ধারে। অদূরে দাঁড়িয়ে মদনকুমার; তাঁরও হাতে বাঁশি। খাদের কাছে থমকে দাঁড়িয়ে চম্পা একবার মদনকুমারের দিকে তাকিয়ে বাঁশিতে শেষবার ফুঁ দিলে; তারপর দিল ঝাঁপ সেই গুহা-গহ্বরে।

কি আশ্চর্য্য! বাস্তুদেবতা অজগর বিরাট ফণা মেলে চম্পাকে মাথায় ধারণ করলে; সকলে আশ্চর্য্য হয়ে দেখে, গুহা-গহ্বর ভেঙ্গে অজগর উত্তর মুখে ঐ নদীর দিকে চলেছে, তার ফণার উপরে দাঁড়িয়ে আছে মূর্তিমতী লক্ষ্মী চম্পা। তখনও বাঁশি বাজছে; হঠাৎ মদনকুমার ঝাঁপিয়ে পড়লো গুহা-গহ্বরে। 'হায়, হায়,' করে উঠল রাজা! শঙ্খ সর্দারের মুখে অট্টহাসি, হাঃ-হাঃ-হাঃ!

—আগামী সংখ্যায়—

রূপালী পর্দার কাহিনী

পিকনিক

মূল লেখক: উইলিয়াম ইনজে


ডালডা আমার পক্ষে ভালো
DALDA
ডালডা
ডালডা
মার্কা
বনস্পতি
শুধু রান্নার জন্যেই ভালো নয় – পুষ্টিকরও বটে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



একটি সংসারের কাহিনী

সত্য ঘটনা—নামগুলি কাল্পনিক

শ্রীমতী সুধীরা বসু

মস্ত বড় বাড়ীর একটি অংশ। দোতলার খোলা বারান্দায় বসে এক সৌম্যদর্শনা উজ্জ্বল গৌরবর্ণা বিধবা রমণী হরিনামের মালা জপ করছেন। যদিও তিনি মালা জপ করছিলেন কিন্তু মনে হচ্ছিল তাঁর মন যেন তাতে তেমন নিবিষ্ট নয়, তাঁর বিষণ্ণ মুখে মাঝে মাঝে কি যেন চিন্তার ছায়া ভেসে যাচ্ছিল। তিনি শূন্য দৃষ্টিতে এক একবার রাস্তার দিকে চেয়ে দেখছিলেন। প্রৌঢ়ার দেহ ক্ষীণ, মুণ্ডিত মস্তক, পরনে শুভ্র থান কাপড়, এই বেশে তাঁকে যেন আরো মহিমামণ্ডিতা করে তুলেছে। এবং তিনি যে অতি উচ্চবংশসম্ভূতা তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু তিনি এত বিষণ্ণা কেন? অতীতের স্মৃতিগুলি কি তাঁর অন্তরে আলোড়ন তুলছে? সেই বেদনাময় অতীত তো ভোলবার নয়! বারান্দার পাশের ঘরে শিশুর কলকণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, ছুটি একটি করে আলো ঘরে ঘরে জ্বলে উঠছে, রাস্তায় বিজলী বাতিগুলিও জ্বলে উঠল। আর একটি নারী ধীরে ধীরে এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন, এঁর চেহারায় ওই প্রৌঢ়ার সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে, দেখলে তাঁর কন্যা বলে বোঝা যায়। কন্যার অঙ্গে সধবার বেশ, তিনি কিছুক্ষণ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে মাকে দেখলেন। তার পরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন "মা, সন্ধ্যা হোল, ঘরে এসে পুজো শেষ কর, একটু কিছু খাও।" মা কন্যার দিকে চেয়ে দেখলেন, নীরবে হাতের মালা কপালে ঠেকিয়ে থলির ভিতর রেখে বললেন—"চল মা, যাই।" মাতা ও কন্যা গিয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন। কে ওই প্রৌঢ়া? কি ছিল তাঁর অতীতে? যা হারিয়ে তিনি আজ এত কাতরা? তা জানতে হলে অতীতে ফিরে যেতে হবে; আমাদের প্রায় সত্তর বৎসর আগের দৃশ্যের দর্শক হতে হবে।

কলকাতার বর্দ্ধিষ্ণু ধনীর বাড়ী, কিন্তু সেকেলে পুরোন বাড়ী, নীচু, অন্ধকার, চকমিলানো তিন চার মহল বাড়ী। রাস্তার উপরে বারান্দা, তার কোলে ঘরের সারি, মাঝখানে উঠান, তার চারি দিক ঘিরে ঘর, এটা বার মহল। বাড়ীর কর্তার ও তাঁর পুত্রদের বৈঠকখানা এই দোতলার ঘরগুলিতে। বৈঠকখানার সজ্জা বিচিত্র ও ধনীজনোচিত; শ্বেত ও কৃষ্ণ পাথরের ছককাটা মেঝেয় পুরু গালিচা পাতা; দেওয়াল-জোড়া তৈলচিত্র, তার মধ্যে অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। ঘরের কোণে কোণে রাখা ব্র্যাকেটে পাথরের নারীমূর্ত্তি। দেওয়ালের মাঝে মাঝে ফুলকাটা সোনালী ফ্রেমে মোড়া আয়না; তার কোনটার তলায় পাথরের ব্র্যাকেটে সোনালী ঘড়ি, কোনটার তলায় মূল্যবান পুষ্পাধারে সুগন্ধি পুষ্পগুচ্ছ সজ্জিত রয়েছে। বার মহলের পিছনে অন্দর মহল, ঠিক ওই রকম উঠানের চার দিক ঘিরে ঘর, তবে অন্দরের ঘরগুলির সাজসজ্জা সাধারণ, বার মহলের মত আড়ম্বরপূর্ণ নয়। বাড়ীর শেষ প্রান্তে ঠাকুরবাড়ী। ঠাকুরবাড়ীতে নাটমন্দির, ঠাকুর দালান, উৎসবের সময়ে গম গম করে; যাত্রা, থিয়েটার, কীর্ত্তন ইত্যাদি সপ্তাহব্যাপী উৎসব চলে। প্রকাণ্ড বড় বড় উনান জ্বেলে ভোগের নানাবিধ মিষ্টান্ন লুচি, তরকারি তৈরী হয়। অন্নভোগ হয় না দেবতার শূদ্রবাড়ীতে; বাড়ীর কর্ত্তা ব্রাহ্মণ নন, কায়স্থ। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তি; এঁরা পরম বৈষ্ণব। উৎসবের সময়ে বহু আত্মীয়, অনাত্মীয়, বন্ধু, কুটুম্ব নিমন্ত্রিত বা অনিমন্ত্রিত হয়ে আসেন, প্রসাদ গ্রহণ করেন। কাঙ্গালী বিদায়ও চলে। কলকাতার নামজাদা ধনী-বংশ। কর্ত্তার পুত্র-কন্যাদের বিবাহও হয়েছে বর্দ্ধিষ্ণু ঘরেই। জমজমে সংসার। পরম রূপবান কর্ত্তা, গৃহিণীও তাই।

চার পুত্র ও কন্যাগণও পিতামাতার রূপের অধিকারী হয়েছেন। পুত্রবধূ, পৌত্র, পৌত্রী সকলেই সুশ্রী, সুন্দর, যেন রূপের হাট বসে গিয়েছে কর্ত্তার বাড়ীতে। এমন ঘরের সুন্দরী কন্যাদের বধূরূপে পাবার জন্য কলকাতার ধনী কায়স্থ-সমাজ লালায়িত, কর্ত্তার মনে সেজন্য বেশ একটু গর্ব্বিত ভাব আছে। সুপুরুষ, সৌখিন, সদা-প্রফুল্ল বিনোদনাথ মিত্র বৃদ্ধ হলেও তখনও একেবারে অশক্ত হয়ে পড়েননি। সম্প্রতি মিত্র মহাশয়ের চেহারা যেন একটু খারাপ হয়ে গিয়েছে। একটি ক্লিষ্ট-করুণ ছায়া তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়েছে, হাসতে গিয়ে হাসি থামিয়ে অন্যমনস্কের মত কি যেন চিন্তা করেন! তবুও যাঁরা তাঁকে পূর্ব্বে দেখেননি তাঁর এ ব্যতিক্রম তাঁদের চোখে সহজে ধরা পড়ে না। বিনোদনাথ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের মাস তিনেক হল মৃত্যু হয়েছে। সুস্থ সবল অতি রূপবান যুবক পুত্র অকালে মারা গেলেন! কোন কার্য্যোপলক্ষে সেদিন বিনোদনাথ বাবুর বাড়ীতে ছিল ব্রাহ্মণ ভোজন। কর্ত্তা স্বয়ং ও পুত্রেরা সকলে দাঁড়িয়ে বিনীত ভাবে তাঁদের দেখাশোনা করছিলেন। অকস্মাৎ কি যে হয়ে গেল, বিনোদনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র একজন ব্রাহ্মণকে কোন অন্যায় কার্য্যের জন্য তিরস্কার ও অপমানিত ক'রে বহিষ্কৃত করে দিলেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ ক্ষোভে অপমানে উপবীত স্পর্শ করে অভিশাপ দিলেন, "তোমার এত দম্ভ থাকবে না, ত্রিরাত্রি কাটবে না"। সত্যিই তাই হল, পরদিন অকস্মাৎ বিনা রোগে তাঁর মৃত্যু হল। কর্ত্তা গিয়ে যুগলমূর্ত্তির সামনে আছড়ে পড়লেন—"এ কি হোল ভগবান! অষ্টাদশী সুন্দরী বধূ, এক বৎসরের শিশুপুত্র তার কোলে, তার তো কোন অপরাধ ছিল না প্রভু"! যুগলমূর্ত্তি তেমনি হাস্যমুখে সর্ব্বাঙ্গে হীরকালঙ্কারের দ্যুতি ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কর্ত্তা ধীরে ধীরে বারমহলে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। সেই দিন থেকে জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ কর্ত্তা ও গৃহিণীর নয়নের মণি হয়েছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সংসারের কাজকর্ম্ম চলে। তবে তাঁর নিজের কাজ

হল শুধু শ্বশুরের সেবা, শিশু পুত্রের পরিচর্য্যা ও জায়েদের ওপর হুকুমজারি।

তখন সকাল প্রায় সাতটা হবে। বিনোদনাথ বাবুর বাড়ীর সকলে তখনও শয্যা ত্যাগ করেননি। অন্দরের এক তলায় শুধু ঝিয়েদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঘর ধোয়া ও বাসন মাজার সঙ্গে তাঁদের মুখের তোড় সমান ভাবে চলছে। বিনোদনাথের তৃতীয়া পুত্রবধূ বহু সন্তানের জননী; রাত্রে ছেলেদের কান্নাকাটিতে সুনিদ্রা হয় না, এবং শরীরও তাঁর তেমন ভাল নয়। সেজন্য তিনি অনেকটা বেলায় শয্যাত্যাগ করেন। নীচে রান্নাঘরে তার ঝি মস্ত একটা থালায় অনেকগুলি বাটি বসিয়ে তাতে দুধ তুলে সাজিয়ে নিয়ে ওপরে যাবার জন্যে যেমন পা বাড়িয়েছে, অমনি বড় বউয়ের সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল। বড় বউ তখন শ্বশুরের প্রাতঃকালীন জলযোগের আয়োজনে ভাঁড়ার ঘরে আসছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "হ্যাঁরে ঝি, সেজ বউ উঠেছে?" ঝি যেতে যেতে জবাব দিল, "না তেনো এখনও ওঠেনি।" "মেজ বউ?" "না কই আমি তো দেখিনি!" এমন সময়ে ওপরে ছেলেদের কান্নার শব্দে চকিত হয়ে ঝি বললে—"যাই বড়মা, ছেলেদের ক্ষিদে নেগেছে, দুধ নিয়ে গিয়ে খাওয়াই।" বড় বউ আর কিছু বললেন না, অন্ধকার মুখে ভাঁড়ারে ঢুকে সাদা পাথরের রেকাবীতে ফল কেটে স্বহস্তে প্রস্তুত সন্দেশ সাজিয়ে, রূপার বাটিতে দুধ নিয়ে শ্বশুরের সন্ধানে বারমহলের বারান্দায় এসে দেখলেন, শ্বশুর চৌকিতে বসে আছেন, এবং তাঁর সামনে পাথরের মেঝেয় শাশুড়ী মালা জপ করতে করতে সাংসারিক কথাবার্ত্তা বলছেন। বড় বউকে দেখে সস্নেহে শাশুড়ী বললেন, "মা তুমি আজ ভাঁড়ারে যেও না, মেজো কি সেজো বৌমাকে বল ভাঁড়ার বার করে দেবে, তাদেরও তো এ-সব শেখা দরকার।" বড় বউ বাঁকা হাসি হেসে মৃদু স্বরে বললেন—"তাঁরা এখনও ঘুম থেকেই ওঠেননি।" শাশুড়ী বিস্মিত ভাবে বললেন—"সে কি! সাতটা বেজে গেল, গেরস্তের বউ ঘুম ভাঙেনি এখনও? নাঃ আজকালকার বউরা যে কি হয়েছে; আমরা অন্ধকার থাকতে উঠে যখন সংসারের আদ্দেক কাজ সেরে ফেলতাম তখন সূয্যি উঠত। যাই দেখি কচি-কাচার মা, সব ছেলেগুলো হয়ত ক্ষিদেয় ছট্‌ফট্ করছে।" বলতে বলতে তিনি উঠে অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন। সেই সময়ে বাড়ীর সরকার মশায়কে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে দেখে বড় বউ বুঝলেন যে তিনি শ্বশুরের কাছেই আসছেন। ক্ষিপ্র হস্তে ঘোমটা টেনে বড় বউও শাশুড়ীর অনুসরণ করলেন। ভিতরে এসে কোন বধূকে সত্যই দেখতে না পেয়ে শাশুড়ী তিন তলার দিকে চেয়ে হাঁক দিলেন, "ওগো স্বর্গের অপ্সরীরা, মর্ত্তে নেমে এসো গো, সূয্যি যে মাথার ওপর উঠল।"

তাঁর চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একটি সুন্দরী ছিপছিপে বধূ হাস্যমুখে "এই যে মা এসেছি," বলতে বলতে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। শাশুড়ী ঝেঁঝে উঠে রাগতস্বরে বললেন, "গেরস্তের বউ, এত বেলায় নাম্‌লে সংসার চলে? সেজ বৌমার শরীর তেমন নয়, সে না হয় বেলায় ওঠে, আর ছোট বৌমা তো ছেলেমানুষ, অত তো আর বোঝে না; কিন্তু তুমিও কি বাছা কচি খুকী হোলে, বেলা পর্য্যন্ত ঘুম! ভাগ্যিস বড় বৌমা আছে, তাই যা হোক শ্বশুরের একটু সেবাযত্ন হয়।

লজ্জিতা বধূ তাড়াতাড়ি নীচে নামতে নামতে শুনতে পেলেন, বড় বউ শাশুড়ীকে বলছেন, "রোজই তো মা এই, বড়লোকের মেয়ে সেটা তো সর্ব্বদাই আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, কারুকে গ্রাহ্যই নেই। আরো কত কি তিনি শাশুড়ীকে বলতে লাগলেন। মেজো বউ একটা নিঃশ্বাস ফেলে সংসারের কর্ম্মব্যস্ততায় নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন। এখনি স্বামী ও দেবরেরা অফিসে যাবেন, দশটায় তাঁদের ভাত চাই, সঙ্গে দেবার টিফিন চাই, ডিবাভর্ত্তি পান চাই, আর কোন দিকে চাইবার সময় নেই, সত্যিই বড় বেলা হয়ে গিয়েছে।

আমাদের গল্প এই বধূটিকে নিয়ে। ইনি বিনোদনাথ মিত্রের মধ্যম পুত্রবধূ। বিনোদনাথের মধ্যম পুত্র আশুতোষ কোন এক সওদাগরী অফিসে চাকরী করেন। কয়েক বৎসর হল চাকরী করছেন, এখন উচ্চপদে উন্নীত হয়েছেন এবং তৎকাল অনুযায়ী বেতনও মন্দ পান না। ইনি বিবাহ করেছিলেন কোন বিখ্যাত জমিদার-বংশে। এই বংশের পূর্ব্বপুরুষ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নানারকম কার্য্যের সহায়তা করে জমিদারী ও মহারাজা উপাধি লাভ করেন। তাঁহার পুত্র, পৌত্রেরাও রাজা খেতাবের অধিকারী হন; এখনকার বংশধরেরা মহারাজকুমার খেতাবের অধিকারী। এই বধূর পিতাও মহারাজকুমার উপাধি ভোগ করছেন ও তিনি বিপুল ধনের অধিকারী। সেই সঙ্গে বিদ্যা ও যশ তাঁর করতলগত হয়েছে। কৃষ্ণবাসিনী তাঁর মধ্যমা কন্যা, অতি শৈশবে মাতৃহীনা, এবং পিতার স্নেহাদরে অতি যত্নে লালিতা। দশ এগারো বৎসর বয়সে বিনোদনাথ মিত্রের মধ্যম পুত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। অতি রূপবান ও স্বাস্থ্যবান তরুণ আশুতোষকে দেখে মহারাজকুমার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং তিনি সমাদরে তাঁর হস্তে মাতৃহীনা কন্যাটিকে দান করেছিলেন।

উপরিউক্ত ঘটনাগুলির পর কয়েক বৎসর অতীত হয়েছে। কৃষ্ণবাসিনী এখন চার কন্যা ও এক পুত্রের জননী। তাঁর প্রথমা কন্যা নবম বৎসরে পদার্পণ করেছে। বিনোদনাথ বাবু ও তাঁর গৃহিণী এই বিবাহযোগ্যা প্রথমা পৌত্রীর বিবাহের জন্য চিন্তিত হয়ে উঠেছেন। বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসছে। তার মধ্যে এক বিখ্যাত জমিদার-বংশের পুত্রের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্ত্তা চলেছে, সম্ভবতঃ সেখানেই বিবাহ হবে। সেই জমিদার-বংশে লক্ষ্মী অচলা বটে, কিন্তু সরস্বতীর সঙ্গে প্রায় কোন সম্পর্ক নেই বললেই হয়। কৃষ্ণবাসিনী সবই শুনেছেন, কিন্তু তাঁর মনোগত ভাব মুখ ফুটে বলবার অধিকার নেই; বিশেষতঃ শ্বশুর, শাশুড়ীর মুখের উপর কথা বলবার ক্ষমতা তাঁর পক্ষে কল্পনা করাও কঠিন! কৃষ্ণবাসিনী শৈশবে পিতার বিদ্যানুরাগ দেখেছিলেন, সেই জন্য বিদ্যার প্রতি তাঁরও একটা গভীর আকর্ষণ ছিল। আশুতোষও পিতার কথার উপর কথা বলতে জানেন না, পিতা যা স্থির করবেন তাই হবে। কৃষ্ণবাসিনীর বড় ইচ্ছা জামাতা বিদ্বান হন, কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে তিনি নিরুপায়! কাজেই তিনি নীরব দর্শক হয়ে রইলেন। এই জমিদারপুত্র বড় বউয়ের অতি নিকট-আত্মীয়; তাই তাঁর আগ্রহ, উৎসাহ ও অনুরোধ বিনোদনাথ বাবু অবহেলা করতে পারলেন না। তার উপর অত বড় ধনীবংশে কুটুম্বিতা, অবশেষে তিনি তাতেই সম্মতি দিলেন। নয় বৎসরের অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কমল-কলির ন্যায় সুন্দরী নন্দিনী বিখ্যাত জমিদারবংশের বধূ হতে চললেন।

আজ বিনোদনাথের পৌত্রীর বিবাহ, বাড়ীতে আত্মীয়, কুটুম্ব ও জ্ঞাতিতে ভর্ত্তি। বিনোদনাথের কন্যারা সকলেই বড় ঘরের ঘরণী। তাঁরা অন্দরের দালানে মাতাকে ঘিরে বসে নলিনীর শ্বশুরালয় থেকে আসা প্রচুর মূল্যবান শাড়ী, জামা, গহনা, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদির সমালোচনায় ব্যস্ত। জমিদার বাবুরা দেওয়ার মতন দেওয়া দিয়েছেন বটে, প্রচুর জিনিষপত্র পাঠিয়েছেন। কৃষ্ণবাসিনী ননদের পিছনে বসে আছেন। তাঁরাও শাশুড়ী এবং বড় জায়ের ফরমায়েস মত ছুটোছুটি করে কাজ করছেন, এবং ননদের শূন্য পানের ডিবা পানে পূর্ণ করে দিচ্ছেন, জর্দার কৌটা হাতের কাছে ধরছেন। আজ বড় কোন কাজের ভার তাঁর উপরে নেই। ঠাকুরবাড়ীর কয়েকটা ঘরে ভাঁড়ার হয়েছে, সেখানে আছেন সরকার মশাই স্বয়ং ও ভৃত্যেরা। রাধামাধবের আজ বিশেষ ভোগ দেওয়া হবে; পুরোহিত সে কার্য্যে নিযুক্ত কয়েক জন ব্রাহ্মণকে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। জ্ঞাতি ও আত্মীয়া বৃদ্ধারা ঠাকুরবাড়ীর দালানে ঢালা প্রচুর তরকারী কোটাতে ব্যস্ত। ঝিয়ের দল গোলাপী রংয়ের ছোপান কাপড় পরে ঘুরছে। নায়েব মশাই অন্দরের নীচে রন্ধনের জন্য নিয়োজিত ব্রাহ্মণদের তদারক ক'রছেন ও মধ্যে মধ্যে এসে গৃহিণীর সঙ্গে এ বিষয়ে পরামর্শ করে যাচ্ছেন। বাইরে বিনোদনাথ মিত্র স্বয়ং কুটুম্বদের অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হোল। প্রকাণ্ড লাল, সাদা, কালো ল্যাণ্ডো গাড়ীর ভীড় বাড়তে লাগল, আসতে আরম্ভ করলো ধনী বেয়াইরা ও বন্ধুরা। শান্তিপুরী চুনটকরা মিহি ধুতি ও পাশে বোতাম দেওয়া মসলিনের পাঞ্জাবী তাঁদের অঙ্গে। পাঞ্জাবীতে হীরে, চুণি, মুক্তো বা সোনার বোতাম লাগান, পায়ে নাগরা বা পামশু জুতো, গলায় মাল্যাকারে পাকান কোঁচান চাদর, আট আঙুলে দামী আংটি, গলায় আবার কারুকারু চেন হারও আছে। তাঁদের মাথায় রূপোর গোলাপ পাশ থেকে গোলাপজল ছিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। হাতে বেলফুলের মালা ও আতর দেওয়া হচ্ছে। ফুলের ও গোলাপী আতরের গন্ধে বারবাড়ী আমোদিত, নহবতখানার ছাতে বিচিত্র সুরে নহবত বাজছে। খিড়কীর দরজায় রাস্তার দু'ধারে পাল্কির সারি দাঁড়িয়ে। যেমন ঘরের পাল্কি তেমনি সাজও পাল্কির ও পাল্কির বেয়ারাদের। কোনও পাল্কির উপর লাল সাটিনের জরির নক্সাকাটা ঘেরাটোপ, কোনটার হাতল ও ডাণ্ডি স্বর্ণরৌপ্যের বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত ফুল-লতা-পাতা আঁকা, কোন বেয়ারাদের পরনে পাল্কির ঘেরাটোপের রংয়ের সঙ্গে রং মিলিয়ে জামা ও পাগড়ি, কোন বেয়ারাদের অঙ্গে আবার সাদা ধুতি, জামা ও সাদা পাগড়ি। প্রায় প্রত্যেক পাল্কির সঙ্গেই আছে দরোয়ান, আসাসোটা, জরির কোমরবন্ধ পরা, মাথায় জরির পাগড়ি। পাল্কি এসে থামছে খিড়কী দরজায়। দরজার দু' পাশে দু'জন দরোয়ান বসে আছে। প্রবেশপথের ভিতর দিকে উপরে ওঠবার সিঁড়ির মুখে একটি সুসজ্জিতা বালিকা অভ্যাগতাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। পাল্কি এসে থামলেই দরোয়ানরা জিজ্ঞাসা করছে কোথাকার পাল্কি, এবং সসম্ভ্রমে সামনের লোক সরিয়ে যাবার রাস্তা করে দিচ্ছে। প্রথমে নামছে ধবধবে থান বা পাড়ওলা শাড়ী-পরা ঝি, হাতে তাগা, সধবা হলে হাতে বালাও আছে। তারা নেমে পাল্কির দরজা ভাল করে খুলে দিয়ে ভিতর থেকে শিশুদের কোলে নিয়ে দাঁড়াচ্ছে; পরে নামছে মেয়েরা। তাদের মধ্যে গৃহিণীস্থানীয়া বয়স্থা মহিলা খুবই কম, বেশীর ভাগ বধূ ও কন্যার দলই এসেছে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। কারণ, অধিকাংশ স্থানেই অল্পবয়স্কা বধূ-কন্যারাই গিয়েছিল নিমন্ত্রণ করতে, গৃহিণী তো সব জায়গায় যান না, নেহাৎ যেখানে না গেলে চলবে না নিজের বেয়ান বা খুব নিকট-আত্মীয়াকে নিমন্ত্রণের প্রয়োজন হলে গৃহিণী স্বয়ং যান। বধূরা একগলা ঘোমটা টেনে পাল্কির ভেতর থেকে নামছে, ঝমঝম্ করে মল পায়জোড় বাজছে। অবিবাহিতা বালিকারা কেউ ভেলভেটের ওপর লেস ও জরিলাগান জামা প'রে আছে; এবং যাতে তেল লেগে জামা না নষ্ট হয় সেজন্য পিঠে পানাকৃতি লেসের রুমাল ঝুলছে, তার ওপর এলায়িত কেশে জরি বেঁধে, পায়ে সাদা বা গোলাপী রংয়ের মোজার সঙ্গে জুতো ও তার ওপর মল প'রে এসেছে। কেউ আবার ফুল, চিরুণী, জরি ও কাঁটায় কণ্টকিত প্রকাণ্ড খোঁপা বেঁধে, শাড়ী ও অলঙ্কারে আপাদ-মস্তক সজ্জিত করে এসেছে। উপরে অন্দরের বড় ঘরটায় তাঁদের বসবার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। রং-বেরংয়ের জরি ও বারাণসীর জৌলুষে চোখ ঝলসে যাচ্ছে, অলঙ্কারের শিঞ্জন, মৃদুহাসি ও কথার শব্দে চারিদিকে গুঞ্জন তুলছে। কৃষ্ণবাসিনী নানা কাজে ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, ও মধ্যে মধ্যে গিয়ে কন্যার নিদ্রাকাতর ঢুলে-পড়া মুখখানি সস্নেহে দেখে আসছেন। এমন সময়ে বাইরে থেকে জোর ব্যাণ্ড ও ব্যাগপাইপের আওয়াজ ও তার সঙ্গে নহবত এবং শঙ্খধ্বনি ভেসে আসতেই বর এসেছে বুঝে ছোট ছেলেমেয়ের দল বার মহলের দোতলায় ছুটে গেল বর দেখতে।

বিবাহের আয়োজন সব ঠিক আছে কি না দেখতে গৃহিণীরা নীচে নামলেন। ক্রমে লগ্ন হয়ে এল, বরকে ছাঁদনাতলায় স্ত্রী-আচারের জন্য নিয়ে আসা হল। বাড়ীর ছেলেরা এসে পিঁড়িশুদ্ধ নলিনীকে নিয়ে গেল ছাঁদনাতলায়। নিদ্রাকাতরা বিহ্বলা নলিনী ভাল করে চেয়ে দেখবার আগেই সাত পাক ঘুরিয়ে পিঁড়িশুদ্ধ বরের সামনে শুভদৃষ্টির জন্য তাকে তুলে ধরা হ'ল। মহিলারা সকলে সমস্বরে বলে উঠলেন, "ভাল করে চেয়ে ছাখ নলিনী, চোখ বন্ধ করে থাকিস নি যেন।" "ছাখ মা, চেয়ে ছাখ," বললেন পুরোহিত। ধীরে ধীরে চোখ তুলে চাইলে বালিকা। বরের রং কালো; সেই ঘনশ্যাম বর্ণের উপর টকটকে লাল বারাণসী জোড়ের ঝকঝকে জরির পাড়টা ও গলায় ঝোলান বৃহৎ শুভ্র-মোতির মালাটা বড় বেশী চকচক্ করে উঠল, চোখ ঝলসে গেল। একে তো ঘুমে ঢুলুঢুলু চোখ, এক মুহূর্ত্ত চেয়ে দেখেই চোখ বন্ধ করে পিঁড়ির ওপর এলিয়ে পড়ল বালিকা। সঙ্গে সঙ্গে পিঁড়িশুদ্ধ ধরে বারমহলে নিয়ে যাওয়া হোল তাকে, সম্প্রদান হবে এবার, তাই কন্যাকে সভাস্থ করা হোল।

কৃষ্ণবাসিনীর প্রথমা কন্যা নলিনীর বিবাহের পর প্রায় সাত বৎসর অতীত হয়েছে। নলিনীর একটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করেছে। কৃষ্ণবাসিনীর অবস্থার কিন্তু কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। তিনি সেই রকমই বধূভাবে বড় জা ও শাশুড়ীর কর্ত্তৃত্বাধীনে দিন কাটাচ্ছেন। কৃষ্ণবাসিনীর তিনটি কন্যারই বিবাহ হয়ে গিয়েছে। মধ্যমা কন্যা শশিমুখী ও কনিষ্ঠা কন্যা বাসন্তিকার ধনীপুত্রের সহিতই বিবাহ হয়েছে। জামাতারা রূপবান ও বিদ্বানও, কৃষ্ণবাসিনীর মনোবাসনা কতকটা পূর্ণ হয়েছে বটে, কিন্তু তাঁর তৃতীয় জামাতা বোধ হয় তাঁর সম্পূর্ণ মনোমত হয়েছে। তৃতীয়া কন্যার বিবাহে কৃষ্ণবাসিনী আশুতোষকে ধরলেন যে, অন্ততঃ একটি কন্যার বিবাহ তাঁর মতেও

পছন্দে দিতে হবে। তাই হোল শেষ পর্য্যন্ত। কৃষ্ণবাসিনী নিজেই তাঁর পিতৃগৃহের সাহায্যে এ বিবাহ স্থির করলেন। তিন কন্যার মধ্যে এইটিই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী ছিল। বিনোদনাথ বাবু সগর্ব্বে পুত্রকে বলতেন, "দেখো, তোমার এ মেয়ে রাজরাণী হবে।"

শৈশবে তার আধ-আধ মধুর কথায় মোহিত হয়ে আদর করে তিনি তার নাম রেখেছিলেন মধুভাষিণী। মধুভাষিণী কিন্তু বড় হয়ে তিন বোনের চেয়ে হয়ে উঠলেন কটুভাষিণী না হোক, মুখরা ও অতি চঞ্চলা। কৃষ্ণবাসিনী বড় চিন্তিত হতেন, কোথায় যাবে এ মেয়ে, কার ঘরে পড়বে! কিন্তু তাঁকে সর্ব্বরকমে নিশ্চিন্ত করে মধুভাষিণী পড়ল এক অতি বিদ্বানবংশে, সাধারণ গৃহস্থের একমাত্র সন্তানের হাতে। জামাতা অতি বিদ্বান, এবং শ্বশুর-শাশুড়ীর একমাত্র আদরের পুত্রবধূ হয়ে মধুভাষিণীর চঞ্চলতা বেড়েই গেল; অবশ্য শ্বশুর তা পরম স্নেহের চক্ষেই দেখতেন এবং কন্যার মত ভালবাসতেন। মধুভাষিণীর গৃহস্থ ঘরে বিবাহ হওয়ায় বিনোদনাথ ও তাঁর পুত্রেরা মোটেই সুখী হতে পারেননি, যে মেয়ে রাজরাণী হতে পারত, সে কি না হল দরিদ্র-গৃহের বধূ! কৃষ্ণবাসিনীর এই অপরিণামদর্শিতায় তাঁরা বিরক্তই হলেন। মধুভাষিণীর বোনেরাও তাঁকে বিদ্রূপ করতে ছাড়তেন না, এবং দরিদ্র ভগিনীপতির সাজসজ্জা ও আচার-ব্যবহার নিয়ে হাসাহাসিও করতেন। মধুভাষিণী বালিকামাত্র, সব বুঝতেন না, কখনও কিছু বুঝতে পারলে ম্লান মুখে চুপ করে থাকতেন। একে একে শশিমুখী ও মধুভাষিণীও সন্তানের জননী হলেন। তার পরেই কৃষ্ণবাসিনীর জীবনে এল পরিবর্ত্তন। তাঁর ভাগ্যাকাশে কি ফুটে উঠছে? সুখের দীপ্তালোক না দুঃখের কালো মেঘ?

[ক্রমশঃ।

নীলাচলে চার দিন

শ্রীসংযুক্তা কর

পৌষালি শীতের দিন। বড়দিনের আসন্ন উৎসবের আয়োজনে মহানগরী ব্যস্ত। নানা জল্পনা-কল্পনায় মেতেছি আমরাও। এমনি সময়ে একটি আকস্মিক প্রস্তাবে আমরা পা বাড়াই নীলাচলের পথে। আনন্দে ও উদ্বেগে বিলম্বিত তন্দ্রা কখন নেমেছে জানি না কিন্তু ঘুম ভাঙল হঠাৎ ট্রেনের দোলানিতে ও ভিজে হাওয়ার স্পর্শে। উঠে বসলাম। ভোরের কুয়াশার একটি স্তিমিত দ্যুতি পঞ্চমীর চাঁদের ম্লান আলোয় মেশামেশি হয়ে শেষ রাতের তৃপ্তিকর ঘুমের নেশার মতই ছড়িয়ে আছে বাইরের মাঠে। শুকতারা দপ-দপ করে জ্বলছে দিগন্তের কাছাকাছি। কামরায় সহযাত্রী দল ঘুমে অচেতন। ট্রেনের দোলার সঙ্গে দুলে দুলে উঠছে তাদের সুখতৃপ্ত নিঃশ্বাস। গায়ে

র‍্যাপার জড়িয়ে কাচের শার্সির পাশে আরো একটু সরে এলাম। ট্রেণ ছুটেছে দ্রুতগতিতে। সমতাল চক্রযানের ছন্দে শব্দমুখর হয়ে উঠেছে লৌহবর্ত্ম। সুপ্তিভাঙা চেতনায় প্রথমে যেন বিশ্বাসই করতে পারলাম না আমি কোথায়! এ কোন পথে কিসের সন্ধানে ছুটেছে আমার সুদূরপিয়াসী মন? শিশুকালে যার কোলে শুয়ে যার গল্প-গাথা শুনতে শুনতে ঘুম নেমে এসেছে দুটি চোখে। বড় হয়ে কাব্য-কাহিনী পড়তে পড়তে তন্ময় মন আমার ডুবসাঁতারে তলিয়ে গেছে যে, অদেখা অরূপ সুন্দরের অন্বেষণে দেশান্তরবাসী কত স্বজন-বান্ধবের মুখে-শোনা উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি। আমার কত অতন্দ্র যামিনীর প্রহর কত রোদজ্বলা দীর্ঘ বিমনা দিবস চঞ্চল করেছে, চলেছি কি সেই সাগর সন্ধানে? কবি নই, কাব্যের শৃঙ্খলে তাকে সীমায়িত করব কি করে? পুরাতাত্ত্বিক নই—বুক চিরে চিরে কোনো গুপ্ত সন্ধানের নাগাল আমি পাব না কোনো দিন। বৈজ্ঞানিক নই। বিশ্লেষণ করে করে নব নব তথ্যের সন্ধানও হয়ত করতে পারব না আমি। মরমী ভক্ত বলেও দাবী করিনে। শ্যাম নীলাম্বুতে কোন নবঘন শ্যামের চকিত দরশন পাব, এ আশাও দুরাশা! তবে কিসের এই পাগলকরা আনন্দের জয়ধ্বনি সারা অঙ্গ জুড়ে করতালি দিয়ে উঠছে?

কিম্বা হয়ত ঠিক বিপরীত। কবি তাঁর কাব্যরসামৃতে তন্ময় হয়ে থাকুন। ভক্ত থাকুন বিলীন হয়ে শুধু তাঁর ভক্তির বন্যায়। বৈজ্ঞানিক ও পুরাতাত্ত্বিক তাঁদের এষণায় থাকুন ব্যাপৃত হয়ে। আমি শুধু দ্রষ্টা। কিছু স্বপ্নে, কিছু জাগরণে মেশা আমার মনোভূমি। সেখানে কিছু রসে কিছু বাস্তবে মিলে, কিছু তত্ত্বে কিছু কল্পনায় মিশে অলোকসুন্দরের বিচরণ। আমি তারই জন্য আমার উৎকর্ণ, হৃদয় আজ মেলে দিয়েছি। কোথায় যেন শুনেছিলাম, রসিক পাঠক নইলে কাব্যসৃষ্টি ব্যর্থ। রসিক দ্রষ্টা নইলে এই বিশ্বসৃষ্টিও ব্যর্থ। আজ তার তাৎপর্য পেলাম। আমি শুধু এই দ্রষ্টা।

মহানদী অতিক্রম করে এলাম। এবার চোখে পড়ছে সমুদ্র-উপকূলবর্ত্তী উড়িষ্যার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য। বাঁশবনে ঘেরা ছোট ছোট গ্রাম, পুকুর বাংলার মতই বটে কিন্তু যতদূর দৃষ্টি চলে, জমি। বালিয়াড়ি পর্য্যায়ের। অসমতল। কোথাও তৃণে-গুল্মে শ্যাম, কোথাও নগ্নতার বর্ণালী। রেলপথের দু'পাশে ঘন কেয়াবন আর কেয়াবন। শুধু কেয়াবনের অফুরাণ অজস্রতা। কেতকী বিরহে শুধু বাংলার বর্ষাই ব্যর্থ হয়ে যায় জানতাম। বাইরে দৃষ্টি মেলে দিতে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত মাথায় ঘন সবুজ সুচিক্কণ লতার ডালি সাজানো নারিকেল কুঞ্জের অপরূপ শোভা দৃষ্টিকে নন্দিত করল এসে। সুদূর চক্রবাল পর্য্যন্ত প্রসারিত অগণ্য সে পুঞ্জের সমারোহ উড়িষ্যার প্রান্তরকে একটি সরস সুন্দর শ্রী অর্পণ করেছে। রঘুবংশে পড়া ছিল, মহারাজ রঘু তাঁর শারদীয় দিগ্বিজয়ে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ক্রমে কলিঙ্গের তালীবনশ্যাম উপকণ্ঠে উপস্থিত হলেন। আজ তাকে প্রত্যক্ষ করলাম। মাঝে মাঝে পানের বরজ। তাল নারিকেল গাছের মধ্যে খর্জ্জু ও সমদীর্ঘ ঝাউ গাছ। এত দীর্ঘ ঝাউ গাছ আগে কখনও দেখিনি। বুঝলাম, গন্তব্যস্থলে এসে পড়েছি। এই সেই তাল নারিকেল তাম্বুল সুশোভিত সামুদ্রিক বাত্যাতাড়িত ঝাউ আর কেতকী-সমাকীর্ণ উড়িষ্যার সমুদ্রোপকূল। ট্রেণের গতি মন্দ হয়ে আসছে। এই সেই কলিঙ্গ। কালিদাস যার প্রাকৃতিক বন্দনা গেয়েছেন :—

'তাম্বুলীনাং দলৈস্তত্র রচিতাপানভূময়ঃ।
নারিকেলাসবং যোধাঃ শাত্রবঞ্চ পপুর্যশঃ।'

মহারাজ রঘুর সৈন্যদল তাম্বুল পর্ণে রচিত পানপাত্রে নারিকেল মধু এবং শত্রুর যশ সমভাবে পান করল।

এত দিন কালিদাসের কাব্যের উপমাকে অতিরঞ্জিত বলে মনে করেছি। আজ আর পারলাম না। এই সেই নীলাচল। কত ভক্তপদরেণুধন্য এর ধূলি। কত ধর্ম্মবিবর্ত্তনের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এর ইতিহাস। প্লাটফরমে নামতে গিয়ে অজানিত ভাবেই যেন ক্ষণকালের জন্য থমকে গেলাম।

একটি বিদ্যার্থী দল এবং সহগামী অধ্যাপকবৃন্দের সঙ্গ নিয়েছি আমরা। হোটেল ঠিক করাই ছিল। দুটো বাস রিজার্ভ করে সেই দিকে রওনা দিলাম। পুরীতে নেমেই যে প্রধান বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল এই যে, শহরটি একটি বালিয়াড়ির উপর বসান। চারিদিকে পথে মাঠে শুধু বালি। অসমতল জমি। কোনো বাড়ির প্রাঙ্গণের বাইরেও বালি, ভিতরেও বালি। যেটুকু অংশ প্রয়োজনে লাগে তার অতিরিক্ত অংশটুকুই বালুকাময়। পথের দু'ধারে সুবিশাল ঝাউগাছ। পুরী শহরের বাইরে অন্য রকম গাছ দেখেছি বটে কিন্তু শহরের ভিতর প্রধানতঃই ঝাউ গাছ ছাড়া অন্য গাছ নেই। হোটেল সমুদ্রের ধারেই। বাস দক্ষিণে বাঁক ফিরতেই বামে অনন্ত জলধির নীলিমা দৃষ্টিগোচর হল। হোটেলের সামনে যখন পৌছান গেল তখন প্রায় ন'টা। দলপতিরা ক্যাম্প নির্ব্বাচনে তৎপর হলেন। আমরা সমুদ্রের ধারে চলে এলাম। কিন্তু প্রথম দর্শনে আহত হল চিত্ত। কত স্বপ্নে দেখা, কত কাব্যের মাধুর্য্যে গড়া যে সাগর—এ কি সেই? দিগন্তছোঁয়া নীলিমার পরিব্যাপ্তি আছে বটে কিন্তু শীতের সমুদ্রের ঢেউ-এ নেই সে উত্তাল উদ্দামতা! বিস্তীর্ণ বালুতটে নুলিয়াদের অসংখ্য জেলে-নৌকো আর রোদে মেলে দেওয়া সুদীর্ঘ জালের প্রাচুর্য্য প্রথম দৃষ্টিতে অপরিচ্ছন্ন লেগে হতাশ করল আমার ব্যাকুলতাকে। কিন্তু পথশ্রমে ক্লান্ত ও রাত্রে ঘুম না আসা চোখে যে মাধুরী ধরা দেয়নি তাকে সেদিন দেখেছিলাম মধ্যাহ্নের খররৌদ্রে আর অপরাহ্ণের পড়ন্ত বেলায়। একটি মজার ঘটনা মনে পড়ল। সে অনেক দিনের কথা। আমরা এখন উড়িষ্যার একটি দেশীয় রাজ্যে থাকি। রাজপরিবারের সঙ্গে নানা সূত্রে অন্তরঙ্গতা ছিল আমাদের। দুই ভাই ধরে বসলেন রাজা দেখবেন। কল্পনায় আঁকা আছে—রাজা বসে আছেন রাজ-সিংহাসনে। মাথায় মুকুট, হাতে রাজদণ্ড। পাশে মন্ত্রী মশাই। অবশেষে একদিন তাঁদের একান্ত আগ্রহে বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন রাজ-সন্দর্শনে। কিন্তু রাজা দেখে দুই ভাইএর চক্ষু স্থির! বাড়ি ফিরে এসে অভিমানে ভেঙে পড়লেন তাঁরা। বিচ্ছিরি রাজা। অতি সুশিক্ষিত ও সুদর্শন রাজাসাহেব ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব ছিলেন এবং রাজত্ব করতেন উড়িষ্যায়। কিন্তু আচারে-ব্যবহারে বাঙালি-সুলভতা প্রকাশ পেত। সাধারণতঃ ধুতি-পাঞ্জাবি পরে থাকতেন। আর মন্ত্রী মশাই ত জাতেও বাঙালী, আচারেও তাই। নিজের বাড়িতে খালি গায়ে ইজিচেয়ারে বসেছিলেন তিনি। ভাইদের এত সাধের রাজ-সন্দর্শন ধুতি-চাদর আর নগ্নদেহের প্রকাশ নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিল। তাই পরে যখন স্নান ও মধ্যাহ্ন আহারের পর আবার সমুদ্র-সৈকতে এসে দাঁড়ালাম, তখন এই প্রথম রাজ-সন্দর্শনের গল্পটি মনে পড়ে গিয়েছিল। কিছু আগেই ক্ষুব্ধ অনুযোগ করেছি—এ কি রূপ? কই কল্পনাকে

অতিক্রম করছে না ত? এখন কূলে দাঁড়িয়ে লজ্জা পেলাম মনে মনে।

শুনেছি রাজপুরীতে প্রহরে প্রহরে ঘণ্টা বাজে। কাজ বদলের ঘণ্টা। তার নির্দ্দেশে নতুন নতুন সুরের আলাপ ধরে নহবৎখানা—ললিত হতে ভৈরো, জৌনপুরী হতে মূলতান, পূরবী হতে গভীর নিশীথের বেহাগ। পরিবর্ত্তিত হয় কর্ম্মপট, পরিবর্ত্তিত হয় গতির ধারা। এই বিশ্বসৃষ্টির রাজপুরীতে কোথায় অলক্ষ্যে ঘণ্টা বাজে জানি না, তাকে শোনবার মত হৃদয় আমাদের নেই কিন্তু চোখে পড়ে তার পরিবর্ত্তিত চলার ধারা—ভোরের শিশিরে, মধ্যাহ্নের বিজনতায় আর সন্ধ্যার গোধূলিতে। সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়ালে এই পরিবর্ত্তনের রূপটি বিশেষ করে চোখে পড়ে। এখানে নেই চঞ্চলা তটিনীর রূপ, নেই ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বিনীর ধারা। এখানে আছে শুধু অনন্ত দুর্জ্ঞেয়তা, অসীম গভীরতা আর অখণ্ড বৈচিত্র্য। আছে প্রহরে-প্রহরে নতুন রূপের পালা।

সারা রাত ঘুমের ঘোরে মত্ত ঝড়ের গর্জ্জনের মত সমুদ্রের ডাক শুনেছি। শেষ রাতের স্বল্প আলো ও আঁধারে ছুটে এলাম সমুদ্রের ধারে। নাতিশীতোষ্ণ ভোরের বাতাস সুপ্তির জড়িমা ভেঙে দিল। বালি ভেঙে ভেঙে নেমে এলাম জলের কিনারে। সূর্য্যোদয়ের ঠিক পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। সমুদ্র-সৈকতে অগণ্য যাত্রীদল পদচারণা করছেন। সামনে সমুদ্রের বুকে একটি শ্যামাভ শুভ্র তার আবরণ। কূলের কাছে ঢেউ-এর ফেনা এসে আছড়ে পড়ে জলের নক্সা কেটে কেটে আবার যাচ্ছে পিছিয়ে। ঠিক জলের কিনারের বালি কঠিন ও সুমসৃণ। অবিরাম জলসিঞ্চনে দর্পণের মত স্বচ্ছ। যাঁরা আসা-যাওয়া করছেন তাঁদের রঙীন প্রতিবিম্ব তার বুকে ফুটে উঠছে স্পষ্ট হয়ে। একটু পরে কুয়াশার গুণ্ঠন সরিয়ে দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে জবাকুসুমসঙ্কাশ, ধ্বান্তারি, কাশ্যপেয় আদিত্য সমুদ্রাভিষেক সাঙ্গ করেই যেন উঠে এলেন। তরঙ্গে তরঙ্গে ছড়িয়ে গেল তার আবির। সমুদ্রের অঙ্গবাস শুভ্র হতে গৈরিক এবং তার পর রক্তকুসুম-সঙ্কাশ হয়ে গেল। সূর্য্য জলের আরো একটু উপরে উঠে এলে দিগন্তের কোল হতে তীর পর্য্যন্ত অসংখ্য ছোট ছোট ঢেউএ আলোর কণা ভেঙে ভেঙে একটি আবছায়া রামধনু রাঙা পথের সৃষ্টি হল। মনে হল আমার তৃষিত হৃদয় ধন্য হবে বলেই এই অপরূপ মনোহর বেশে সুন্দরের হল আবির্ভাব। মনে হল আজ এই অতল সাগরের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় হিরণ্ময়ের আবির্ভাবে রুদ্ধ মনের একটি অন্ধকার কোণ যেন সহসা আলোকোজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুঝলাম, দর্শনের জটিলতা যখন বুদ্ধির দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করে নি, যখন প্রকৃতি-ই ছিলেন উপাস্যা তখন কেন আদিত্য-ই ছিলেন প্রধান উপাস্য দেবতা!

তার পরেও পুরীপ্রবাসের ঐ ক'টি দিনেই নব নবরূপে দেখেছি সমুদ্রকে। দ্বি-প্রহরের খররৌদ্রের বহ্নিজ্বালা দেখেছি তার বুকে, শাণিত ইস্পাতের মত তীব্র তার জ্যোতি। দেখেছি নীলাম্বরী আঁচলে তার রূপার চুমকির ছলক। সূর্য্যাস্তের সুবর্ণবেলায় দেখেছি তার অবর্ণনীয় রঙের প্রাচুর্য্য আর রসের লীলা। চাঁদজ্বলা রাতের স্বল্পালোক ও আঁধারে দেখেছি তার জোয়ারের স্রোতে ভেসে আসা খণ্ডিত ফসফরাসের তারাফুল। দেখেছি তার রাত্রের প্রলয়ঙ্কর রূপ একটি, দুটি, তিনটি পর পর শুভ্র ফেনার নাগিনী নাচিয়ে নাচিয়ে তার

খেলার মত্ততা, দেখেছি ওপারে মেঘঘনানো প্রভাতে তার স্থৈর্য্যের অতলস্পর্শিতা। .

সমুদ্র দর্শনের সঙ্গে তার বালুতীর ও ঢেউ-এর মত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে নুলিয়াদের জীবনযাত্রা। সমুদ্রের তীরেই এদের বাস। [illegible]। সভ্যতায় আদিম তার গণ্ডী অতিক্রম করে নি —জানা ছিল শুধু এইটুকু। পুরীবাসের প্রথম দিন জানা গেল, অধ্যাপক নির্মল বসু মহাশয় এখানে আছেন। খবর শুনে সান্ধ্যবৈঠকে তাঁকে সেই দিনই নিয়ে আসা হল। সে বৈঠকে যোগ দিয়ে পেলাম অনেক কিছু। সৌন্দর্য্য-পিপাসা যেখানে উচ্ছ্বাস মাত্র সেখানে সে অন্ধ। যুক্তি-বিচারের তবকে মুড়ে কার্য্য-কারণের শৃঙ্খলে বেঁধে যখন তাঁকে আমরা উপভোগ করি তখন তাঁর অন্তর্নিহিত রসের ক্ষেত্র ব্যাপকতর হয়। কেন না, তখন সে সুদূরকে আনে নিকটে, অজানাকে আনে জ্ঞানের সীমায়। এই নুলিয়ার দল উড়িষ্যায় বাস করলেও সকলেই তেলেগুভাষী দক্ষিণী। এদের নিজস্ব সমাজ এবং বিবাহাদি ব্যাপারে সামাজিক অনুশাসন আছে। নৌকার মালিকের সঙ্গে পরিশ্রমের বিনিময়ে এরা মাছ ধরা ব্যবসা করে। মাছের ভাগ পায় —পায় কিছু পারিশ্রমিক। কোনো কোনো নুলিয়ার নিজস্ব নৌকাও আছে। এদের নৌকা বাংলার নৌকার মতন নয়। তিনটি লম্বা কাঠ মধ্যভাগকে ঈষন্নিম্ন করে বাঁধা—দড়ি দিয়ে। প্রয়োজন মত কাঠেরও গোঁজি দেওয়া আছে। সামুদ্রিক লাবণতায় লোহার পেরেকে অতি সহজে মরিচা পড়ে। তাই লোহা এরা ব্যবহার করে না—অবশ্য স্বতন্ত্র বিশ্বাসে। এদের ধারণা, সমুদ্রতলের চুম্বক পাহাড় এদের নৌকার লোহাকে আকর্ষণ করে। এই সামান্য ভেলায় বিশাল বিশাল ঢেউ-এর নাগরদোলায় চেপে মাঝদরিয়ায় অক্লেশে নির্ভীকভাবে এরা বিচরণ করে। সারা সকাল রোদে শুকোয় এদের জাল—দেখেছি সেও নানা রকমের। বেড়াজাল দিতে দেখেছি সমুদ্রে। একদিন একটি ছোট নুলিয়া ছেলের হাতে অতি দীর্ঘ বঁড়শির ছিপ দেখেছিলাম। এই জালে যে মাছ ধরা পড়ে তার অধিকাংশই বেলে মৌরলা বাটা জাতীয়। পমফ্রেট এবং নাম না জানা সামুদ্রিক মাছও কিছু আছে। ক'দিন লক্ষ্য করে করে আমার মনে হয়েছিল, এই নুলিয়ারা ঔপকূলিক মাছই ধরে। গভীর সমুদ্রের শিকারী এরা নয়। নুলিয়া পল্লীতে গেলে দেখা যায়, বালির উপর অসংখ্য রূপার চাকতির মত মাছ রোদে দেওয়া। ঝড়ের উদ্দামতার সঙ্গে সংগ্রাম করে নুলিয়াদের জীবনের সকাল হতে সন্ধ্যা কাটে। কঠোর সংগ্রামী এদের দেহ। এদের আবাসও স্বতন্ত্র ধাঁচের। লম্বা একটানা একটি অখণ্ড ব্যারাকের মত এদের অনেকের কুটির একত্রে গাঁথা। সমগ্র পল্লীটি পরস্পর নির্ভরশীলের মত গলাগলি হয়ে আছে। ঝড়ের বাতাসের আঘাত এতে কম লাগে। কিছু লাগলেও মারাত্মক হয় না। ভুবনেশ্বরের পথেও গ্রামের পর গ্রাম এই বিচিত্র গঠনের আবাস দেখেছি। সংগ্রাম যেখানে অনিবার্য্য সেখানে পূর্ব্ব-প্রস্তুতি বুদ্ধিমত্তারই পরিচয়। অধ্যাপক বসু মহাশয় একটি মজার খবরও শোনালেন। পুরীর বাজারে যে লোভনীয় কড়ি এবং শঙ্খ পাওয়া যায় সেগুলি কিন্তু পাওয়া যায় রামেশ্বরমের সমুদ্রকূলে। ওগুলি দাক্ষিণাত্যের চালানী মাল।

দ্বিতীয় দিন সকালে ক্যাম্পে প্রচারিত হল আজ ভুবনেশ্বর। প্রস্তুত হও। যাত্রার সময় ছিল দশটায়—কিন্তু আমাদের রিজার্ভ-বাস যখন পুরী অতিক্রম করে ভুবনেশ্বরের পথ ধরল, তখন রবি মধ্যগগনে পুরী হতে ভুবনেশ্বর একটানা বাসেই যাওয়া যায়। পথ পাকা। পৌঁছাতে সাড়ে তিন কি চার ঘণ্টা লাগে। বছর কুড়ি আগে আমার যে সব আত্মীয়েরা পুরী হতে ভুবনেশ্বর এই পথে গিয়েছিলেন, তাঁদের যেতে হয়েছিল গো-যানে। পথও ছিল কাঁচা। প্রগতির যুগের মানুষ আমরা। অলস মন্থরতা কাব্যেই সুখকর লাগে—আসলে ধাতে সয় না। তাই তাঁদের কাছে ঐ যাত্রার স্মৃতি বেদনাদায়ক হয়ে আছে আজো। আমাদের কিন্তু মনে হলো, শীতের মিষ্টি রোদের নেশায় ভরা সুনীল আকাশের নীচের পাকা ফসলের গন্ধ ভরে এই দিনটি একটি উদার-প্রসন্ন খুসীর নিমন্ত্রণ মেলে ধরেছে। পুরী অতিক্রম করার পর পথে যে ক'টি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম পড়ল—প্রতি গ্রামের থানাতেই যাত্রীদলকে রিপোর্ট দিতে দিতে যেতে হল। সুদীর্ঘ সুমসৃণ একটানা বনপথ। দু' ধারে আবার শুরু হল বর্ণের সমারোহ-শ্যামল স্বর্ণে অতুলনীয়! সেই দীর্ঘপত্র নারিকেলকুঞ্জ যত দূর দেখি অপূর্ব্ব শোভন শ্রী! ধান-কাটা শেষ—ফসল কোথাও কূপের আকারে, কোথাও মন্দিরের আকারে সাজানো। ঝাউগাছ চোখে পড়ল না—কিন্তু কলাবন ও পানের বরজ প্রচুর। কেয়াবন নেই। দাদা দেখালেন বাঁ দিকে Deltic land তার ওধারে Salt lake অনেকক্ষণ ধরেই দেখছিলাম—ভাবছিলাম জলাভূমি হবে বুঝি। ডোঙার মত পাত্রে হাতেটানা বড় হাপরের রীতিতে চাষী জলসেক করছিল ক্ষেতে। দূরে কোথাও বিকচ-নীল শাপলার দামে জড়িয়ে আছে পানিফলের লতা। মধ্যে মধ্যে ধূলির রং রক্তিম আবিরের মত গাঢ় লাল। পথে পথচারী আছে—কখনো চলেছে পাল্কী আর গোরুর গাড়ি। গো-খুরে-খুরে উড়ছে সে ধূলি। আমাদের বাস চলেছে ত্রিশ-চল্লিশ মাইল বেগে। সে গতির বেগে চঞ্চল হয়ে ফাগের মত বাতাসে উড়ছে ধূলির আবির। সে আবির পথের পাশে ছায়াতরুর উপর পড়ছে —পড়ছে সে ঘন লতাগুল্মের উপর। পাতাগুলি তাদের তাই টুকটুকে লাল—যেন বেলাশেষের এক মুঠি অস্তরাগ ছড়িয়ে আছে তাদের বুকে।

দয়া নদীর ব্রিজে যখন বাস এসে থামল, তখন প্রায় তিনটে বাজে। বিশাল নদীর দুকূল ভাঙা বিরাট খাতে বালুর চড়ার উপর দিয়ে শীতের দিনের স্বল্পস্রোত শান্ত ধারায় বইছে। অতি শান্ত নিথর নীরবতার সে বৈশিষ্ট্য ভুবনেশ্বরে প্রবেশের অনুকূলই বটে। এই ব্রিজ অতিক্রম করেই ভুবনেশ্বরের ভূমি স্পর্শ করলাম আমরা। এখন প্রায় বৃক্ষবিরল হলেও আগে যে এস্থানে নিবিড় বনভূমি ছিল, সে চিহ্ন স্পষ্টই বোঝা যায়। নিকটে এবং দূরে চোখে পড়ল ধ্বংসোন্মুখ পরিত্যক্ত মন্দিরের চূড়া এবং নাটমন্দিরের অংশবিশেষ। কথিত আছে, একদা ভুবনেশ্বরে লক্ষাধিক শিবমন্দির ছিল, এর নামই ছিল গুপ্তকাশী—গুপ্ত শিবস্থান। কিছু দূরে বামে কেদারগৌরীর মন্দির এবং দক্ষিণে রাজারাণী মন্দিরটি পড়ল। রাজারাণী মন্দিরটি প্রাচীর-চিত্রের জন্য বিখ্যাত। কেদার-গৌরীর মন্দির-প্রাঙ্গণে আরো ক'টি ছোট মন্দিরের বিগ্রহ দেখবার মত। এরই প্রাচীর-সংলগ্ন গৌরীকুণ্ড। জলে প্রচুর পরিমাণে ধাতব পদার্থ আছে। স্নান করলে নাকি যাবতীয় চর্ম্মরোগ সারে। জলের স্বাদ কষায়-মধুর। মন্দিরগুলিতে


নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো।
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো।
নির্ম্মলার বাসা
মা এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
মুন্নার খ্যালনাটা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
ভোবলোকিন্তু কি পরিস্কারকরে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা দিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ- আর তোমার তোয়ালেটাও দিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে-
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
কিন্তু আমি তো আছড়াইনা, - আমি যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনী ফেসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছাড়েই পরিস্কার করে কাচে - আর সেইজন্যে কাপড় টেঁকেও বেশী দিন।
সত্যিই! সানলাইট সাবানে বিনা আছাড়েই সাদা আর ঝকঝকে পরিস্কার হয় - কাপড় টেঁকেও বেশী দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
SUNLIGHT SOAP
সান্‌লাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।
S. 238-X52 BG

টাকা/আনা/পাই

(চিত্রনাট্য)

জ্যোতির্ময় রায়

মৃগাঙ্ক। ছেলেটি কে ?

বিশু। আমাদের বিনুদি'র ছেলে—দাদা, আমি যেদিন বেকার ছিলাম, এই বিনুদি'ই আমাকে বস্তিতে আশ্রয় দিয়েছিলো। তার পরই না এই ব্যবসা—ঘর—[আবেগে নড়েচড়ে) এই বিনুদি' যে কি মানুষ—আচ্ছা আমি একটু দেখে আসছি।

বিশু যেদিকে যায়, মৃগাঙ্ক সেদিকে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে বসে থাকে। ভোলা, বিশু কতটা গেছে দেখে নিয়ে, মৃগাঙ্কের দিকে ঝুঁকে পড়ে। নিজের মাথাটা দেখিয়ে—

ভোলা। এখানে কি স্থির হলো, থাকা তো ?

মৃগাঙ্ক। থাকা।

ভোলা। আচ্ছা দাদা, এই মাথাওলা লোকগুলোর চাকরি বাকরি হয় না ? এই তো কাপড় বিক্রী করতে করতে বাড়ী বাড়ী গিয়ে শুনি যে চাকরি নেই—বিক্রীই হয় না। [একটু থেমে] আর তোমরা বোধ হয় সে রকম চেষ্টাও করো না।

মৃগাঙ্ক। না রে ভাই, চেষ্টার কমতি নেই। দেখবি কাল সকালে তুই যখন কাপড়ের বস্তা কাঁধে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘুরছিস আমিও তখন মাথাটা ঘাড়ে নিয়ে অফিসের দরজায় দরজায় হানা দিয়ে ফিরছি।

প্রচণ্ড রোদ। ডালহৌসী স্কোয়ার। দেখা যায় রাস্তা দিয়ে হেঁটে ক্লান্ত পদে এগিয়ে যাচ্ছে।

এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের ভিড়। লম্বা লাইন পড়েছে। মৃগাঙ্ক কিউ দিয়ে লাইনে দাঁড়ায়।

এক ব্যক্তি। আমারও পরে। এতক্ষণে দাদা, আমারই সরে যাওয়া উচিত ছিলো—ই: পঞ্চাশ টাকার চাকরি—দু' হাজার গ্র্যাজুয়েটের এ্যাপ্লিকেশন পড়ে গেছে—নিন, আমার জায়গাটুকু আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। এক-পা তো এগোলেন, চললাম নমস্কার।

একটা চরম ব্যর্থতা আর ক্লান্তির ভাব নিয়ে মৃগাঙ্কও সরে পড়ে।

রাত্রি। মৃগাঙ্ককে তার শ্বশুরবাড়ীতে ঢুকতে দেখা যায়।

বসবার ঘর। ভাইরাভাই অদিতি সেন সেন্টার টেবিলের ওপর পা তুলে বসা। সেই কৌচের হাতলের ওপর বসে ছোটো শালী স্বপ্না। মৃগাঙ্ক যখন ঘরে ঢোকে, দেখা যায় মিঃ সেন স্বপ্নার গালে টোকা মারলো। স্বপ্না খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়ছে—

স্বপ্না। যান আপনি ভারি দুষ্টু!

মিঃ সেন। [মুখ গম্ভীর করে] এই যে স্বপ্না, তোমার নতুন জামাই বাবু এলেন।

স্বপ্নার হাসিখুশী ভাবটা ব্যাহত হয়। ততক্ষণে মৃগাঙ্ক এগিয়ে আসে।

মিঃ সেন। [টেনে টেনে] যাও না—দিদিকে খবরটা দাও।

স্বপ্না। রামু—রামু—টিকে—টিকে—ইডিয়টগুলো যে কোথায় যায়।

মিঃ সেন। তুমি যাও না বাপু।

স্বপ্না। [অনিচ্ছা সত্ত্বেও যাওয়ার ভঙ্গী করে বলে] দেখবেন, আপনি পালিয়ে যাবেন না জামাইবাবু।

বলে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠে যায়। মৃগাঙ্ক মিঃ সেনের টেবিলে-তোলা পায়ের দিকে তাকায়। মিঃ সেন তা লক্ষ্য করে পা'টি একটু টেনে নেয়—কিন্তু নাবায় না।

মিঃ সেন। বসুন—

মিঃ সেন। তার পর কি খবর, কিছু সুবিধে টুবিধে হলো ?

মৃগাঙ্ক। [ম্লান কণ্ঠে] না: খুবই অসুবিধে চলছে।

মিঃ সেন। না: আই মীন চাকরি-বাকরি কিছু জুটলো ?

মৃগাঙ্ক। (ভ্রূ কুঁচকে) তেমন ব্যাকিং না থাকলে কি আর ওসব এতো সহজে জোটে ?

মিঃ সেন। হেঃ হেঃ—এ একটা কাজের কথা হলো। এজন্য মেন্‌লি চাই এফিসিয়ান্সি, ব্যাকিং-এর দরকার কি ? ডিমক্র্যাসির যুগে 'চান্সেস আর ইকোয়াল'—বাজারে সবারই জন্যে সুযোগ সমান।

মৃগাঙ্ক। (তিক্ততার সুরে) হ্যাঁ অনেকে তাই বলে বটে, তবে কিনা সুযোগটা সমান হলেও সুরুটা সমান নয়। সুযোগ সবার সমান—দৌড়তে হয় সবাইকেই—মিল মাত্র সেখানেই—কিন্তু চালে মিল কোথায় ? কেউ হেঁটে, কেউ গড়িয়ে, কেউ মোটরে—কেউ প্লেনে, তবু শুনি 'চান্সেস্ আর ইকোয়াল্' !

মিঃ সেন। কথার সুরটা তো ভালো ঠেকছে না—খালি-পকেটের মতবাদ মাথায় ঢুকেছে বুঝি ? ওসব 'ফেলিওরস্'দের মতবাদ ছাড়ুন, লুক এ্যাট মি, এ সেল্‌ফ-মেড ম্যান, নেভার কমপ্লেও এনেন্ট্‌ চল্—

ইতিমধ্যে স্বপ্না ফিরে আসে।

স্বপ্না। যান, দিদি ওপরে ডাকছে।

মৃগাঙ্ক উঠে দাঁড়ায়। এমন সময় ভৃত্য এক-ট্রে খাবার এনে টেবিলে রাখে। মৃগাঙ্ক এগিয়ে যেতে যেতে শোনে মিঃ সেন বলছে—

মিঃ সেন। 'ওঃ হোয়াট এ ডেলীশস্ ডীস !'

মৃগাঙ্ক সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে যায়।

ওপরতলার বারান্দা। মৃগাঙ্ক সেখান দিয়ে যাবার পথে সাক্ষাৎ হয় রচনার বাবা অবিনাশের সঙ্গে।

অবিনাশ। এই যে মৃগাঙ্ক, তারপর তোমার কি খবর ? তুমি কখন আসো, কখন যাও জানতেই পারি না—সেই 'ডিটারমিনিজম'

নিয়ে আলোচনাটা—সে আর আজ অবধি হলো না। দেখো, আমি তোমোকে ঠিক বুঝিয়ে দেবো, পুরুষকার বলে কিছু নেই, ভাগ্যই একমাত্র—

পেছন থেকে হঠাৎ রুক্ষস্বরে ডাক আসে—

সুরমা। শুনছো—

অবিনাশ। এই যাচ্ছি, একটু—

সুরমা। না এক্ষুণি এসো।

অবিনাশ। আচ্ছা তুমি যাও মৃগাঙ্ক।

বলে অবিনাশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও এগিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক ঢোকে রচনার ঘরে।

রচনার ঘর। রচনা শুয়েছিল, মৃগাঙ্ককে দেখে উঠে বসে।

রচনা। সারাদিন খুব ঘুরেছো, না?

মৃগাঙ্ক। খুব কিছু না। [ম্লান হেসে] রোজকার মতই।

রচনা। কিছু খেয়েছো?

ঠিক এমনি সময় বাইরে শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর শোনা যায়।

শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর: নীচে ছোটো জামাইবাবুর খাবারটা নিয়ে গেলি—পুডিংটা তো পড়ে রয়েছে হতভাগা।

ভৃত্যের কণ্ঠস্বর: উনি যে ওটা খাবেন না বললেন।

শাশুড়ীর কণ্ঠস্বর: তবে রাবড়িটুকু দিয়ে আয়।

রচনা। [মৃগাঙ্ককে] বসো—

বলে উঠে পাশের টেবিল থেকে দুধের গ্লাস ও দু'টুকরো আপেল নিয়ে এগিয়ে আসে।

রচনা। এটুকু খেয়ে নাও তো।

মৃগাঙ্ক। না—না, সে কি কথা! এ তো তোমার জন্যে।

রচনা। [রুদ্ধ কণ্ঠে] হ্যাঁ আমারই জন্যে। এ বাড়ীতে তোমার জন্যে বলে তো কিছু নেই—নাও খেয়ে নাও।

মৃগাঙ্ক। কিন্তু!

রচনা। [গ্লাসটা একটু সরিয়ে নিয়ে] তুমি যদি না পারো তবে আমিই বা পারব কেন, আমাকেও এখান থেকে সরিয়ে নাও।

মৃগাঙ্ক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে গ্লাসটা হাতে নিয়ে সামান্য একটা চুমুক দিয়ে রেখে দেয়।

মৃগাঙ্ক। তোমার শরীর আজ কেমন রচনা?

রচনা। আজকাল তো এমনিতে আমি ভালোই আছি, তবে মাথাটা একটু ঘোরে বলে কাল ডাক্তার একটা টনিক প্রেসক্রাইব করে গেছে।

মৃগাঙ্ক। [ধীর কণ্ঠে] কাল থেকে এখনও আনা হয়নি! প্রেসক্রিপশনটা কোথায়?

(রচনা প্রেসক্রিপশনটা টেবিল থেকে বাড়িয়ে দেয়। মৃগাঙ্ক সেটিতে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে রাখতে যায় পকেটে।)

রচনা। ও কি! ওটা তুমি নিয়ে যাচ্ছ, টাকা ও হ্যাঁ, তোমার না গত কাল মেসের টাকা মিটিয়ে দেবার শেষ তারিখ ছিলো?

মৃগাঙ্ক। [হেসে] পারিনি, তাই মেস ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রচনা। [চিন্তিত বিস্ময়ে] তাহলে!

মৃগাঙ্ক। পথে চমৎকার এক বন্ধু জুটে গেল, আপাততঃ তার ওখানেই আছি।

রচনা। [সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে] লোকটি—

মৃগাঙ্ক। বড় অদ্ভুত লোক! আজ আমি উঠি রচনা! কাল ওষুধটা নিয়ে আসব।

রচনা। এসো, কিন্তু ওই ওষুধটার জন্যে তুমি ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করো না।

মৃগাঙ্ক। কি বলবো, করবো না!

(রুদ্ধ বেদনার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মৃগাঙ্ক।)

[মৃগাঙ্ক বেরিয়ে আসতেই জ্যাঠাশ্বশুর প্রকাশের সঙ্গে দেখা।]

প্রকাশ। [জমাট মুখে] চাকরি-বাকরি কিছু জুটলো?

মৃগাঙ্ক। না এখনও।

প্রকাশ। হুঁ:।

(মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়। পাশ দিয়ে রচনার মা এসে ঢোকে রচনার ঘরে।)

রচনার ঘর।

সুরমা। কি, ওর কিছু সুবিধে টুবিধে হলো? রচনা ঘাড় নেড়ে জানায়, না—তার পর বলে—

রচনা। চেষ্টা তো খুবই করছেন।

সুরমা। ও চেষ্টাই করবে। নিজের কপাল নিজেই পুড়িয়েছো। এখন বোঝো—আমার মতো মাকে লুকিয়ে বিয়ে করার সাহস যে মেয়ে রাখে, তার ভাগ্যে লাঞ্ছনা না থেকে পারে!

বলে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

বস্তি। বিশু তার ঘরের সামনে বসে বিড়ি খাচ্ছে, এমন সময় সেখানে আসে বিণুদি।

বিণুদি। এই ছাখ, কাণ্ড দ্যাখ বিশু মানুষটার। ওষুধটুকু তো কিছুতেই খাওয়ান গেলো না—খামু না কইয়া সেই যে গো ধইরা বইসা রইছে, আয়না বাই একটু বুঝাইয়া সুজাইয়া তুই খাওয়াই যা।

বিশু। না তুমি যাও, আমি পারবো না, তুমি আস্কারা দিয়ে মাথা খেয়েছো। কাল রাত্রে তোমাকে মারধোর করলে, বলতে গেলাম, উল্টে তুমিই আমায় বকাঝকা করে সরিয়ে দিলে।

বিণুদি। দিমু না—তরা তো বুঝবি না বাই, কি পালানের মত শরীর আছিল মানুষটার! [দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে] সেই মানুষটা আজ ছ' মাস ধইরা বিছানায়, কাল আমারে মারতে গিয়া যখন উইঠা দাঁড়াইল, মনে হইলো মারুক—মারুক তবু তো তো উইঠা খাড়াইছে। এখনও চোখের সামনে ভাসে সেই চেহারা [কান্নায় বুজে-আসে গলা] আমারে কইতো, তুমি তো আমার পুতুল-বৌ। কইয়া, শ্বশুর-শাশুড়ী মানন নাই, তুই হাতে আলগোছে তুইলা ধরতো—লজ্জায় আমি মরে যাইতাম। সেইসব—হঠাৎ বিণুদি থেমে যায়। একটা আত্মগত হয়ে সে কথা বলছিলো, টেরই পায়নি কখন এসে মৃগাঙ্ক দাঁড়িয়েছে। লজ্জা পেয়ে বিণুদি ঘোমটা একটু টেনে দেয়।

বিশু। [বিণুদির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার ভঙ্গীতে] দাদা—

মৃগাঙ্ক। [বিশুকে লক্ষ্য করে] বিণুদি বুঝি?

বিণুদি। হ, আমিই অগো বিণুদি—বিশু তুই আবি না ভাই?

বিশু। যাও, একটু পরে আসছি।

বিণুদি। [মৃগাঙ্কের প্রতি] আমি যাই, অনেক কাজ ফালাইয়া আসছি।

মৃগাঙ্ক সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে। বিণুদি চলে যায়।

বিশু। বৌদির ওখানে গিয়েছিলে? কেমন আছে?

মৃগাঙ্ক। ভালোই [বলে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ক্লান্তভাবে খাটিয়ায় বসে পড়ে]

বিশু। তবে তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন?

মৃগাঙ্ক। কিছু না—ওর ওষুধের প্রেসক্রিপশনটা নিয়ে এসেছিলাম। এতো দাম, কিছুতেই কিনে উঠতে পারলাম না—কাল নিয়ে যাবো বলেছি।

বিশু। দেখি, তোমার প্রেসক্রিপশনটা দেখি—

মৃগাঙ্ক। কেন?

বিশু। দাওই না।

মৃগাঙ্ক প্রেসক্রিপশনটা পকেট থেকে নিয়ে বার করেছে, বিশু সেটাকে টেনে নিয়ে বলতে থাকে—

বিশু। আরে বাবা, তুমিই আমার কাছ থেকে ধার নাও, আমিই অন্যের কাছ থেকে ধার করি—করতে তো হবে একটা কিছু। পকেটে চেপে রাখলে তো চলবে না। আচ্ছা, তুমি একটু বসো, আমি আসছি বিণুদির ঘর থেকে।

বিশু উঠে এগিয়ে যায়।

বস্তির ঘর। রাত্রি। তক্তাপোষে মৃগাঙ্ক শুয়ে আছে। মাটিতে মাদুর বিছিয়ে ভোলা শুয়ে শুয়ে মেঝেতে তাল ঠুকতে ঠুকতে বলে—

ভোলা। দাদা, চালের ফুটো দিয়ে কেমন 'ফাস-কেলাস' চাঁদের আলো দেখা যাচ্ছে দেখুন—[গান ধরে]

এমনি চাঁদের আলো
মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ শ্বরগ সমান।

মৃগাঙ্ক। [হেসে] আরে দূর বোকা, শ্বরগ কি রে—স্বরগ সমান।

ভোলা। স্বরগ কি আমাদের জন্যে দাদা! এই বলে ভোলা আবার গান ধরে—এমন সময় বিশু ওষুধ হাতে ঘরে ঢোকে। ভোলা গান থামায়।

ভোলা। এই যে, বাবু এলেন আড্ডা দিয়ে। আমরা যে এদিকে খিদের জ্বালায় মরছি—[সুর পাল্টে] তোর হাতে ওটা কি রে বিশু? দাদার জন্যে বিস্কুট আনলি বুঝি—দে না ভাই আমি খুলি—

বিশু। আঃ তোর জ্বালায়—[মৃগাঙ্কের দিকে ফিরে] এই নাও দাদা, বৌদির ওষুধটা—মৃগাঙ্ক হাত বাড়িয়ে ওষুধটা ধরে লেবেলটা দেখে নিয়ে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে বিশুর দিকে।

মৃগাঙ্ক। বিশু, তুই এই রাত্রে গিয়ে—

বিশু। [বাধা দিয়ে] কিছু বলতে হবে না দাদা, যা বলছি শোনো, কাল সকালে উঠেই আগে বৌদিকে এটা দিয়ে এসো কিন্তু।

পরদিন সকাল। রচনাদের বাড়ীর লবি। মৃগাঙ্ক লবি পার



শিকারের মুখে

॥ আলোকচিত্র ॥

—মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

—সনৎকুমার দত্ত





—গোপালচন্দ্র দাস

খোকা-খুকু

—চিত্ত রায়



—এস. পি. মুখোপাধ্যায়



—গোপালদাস মজুমদার





—অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায়

খোকা-খুকু



—কুমুদ ঘোষ

—নীলজকুমার বসু





ব্রহ্মাজীর মন্দির (আজমীড়)
—যতীন্দ্রনাথ পাল

দুই বোন —গীতা গুহ-রায়



পোষাপাখী
—বারিদিভূষণ মজুমদার



মৃগ ও মৃগী —অলকনাথ রায়



হয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে জ্যাঠাশ্বশুর প্রকাশকে নামতে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে।

জ্যাঠাশ্বশুর এসেই মৃগাঙ্কর পাশ ঘেঁষে পার হতে গিয়েই থমকে দাঁড়ালো।

প্রকাশ। শোনো—

মৃগাঙ্ক এগিয়ে এলো। সকালেই চলে এসেছো, চাকরি-বাকরির চেষ্টাও ছেড়ে দিলে নাকি? (নাক কুঁচকে দু'বার গন্ধ নেবার মতো শ্বাস টেনে) বিড়ি খাও?

মৃগাঙ্ক চুপ করে থাকে। প্রকাশ উত্তরের জন্যে একটু অপেক্ষা করে উত্তেজিত কণ্ঠে—

কি জিজ্ঞেস করছি শুনতে পেয়েছো, কথাটার জবাব দিতে পারো না?

মৃগাঙ্ক। খাই।

প্রকাশ। আশ্চর্য্য, বলছো খাই! আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলছো বিড়ি খাও—একটা লঘুগুরু জ্ঞান নেই, তুমি না শুনেছি লেখা-পড়া শিখেছো?

ইতিমধ্যে দেখা গেল শাশুড়ী সুরমা এগিয়ে আসে। মৃগাঙ্ক জবাব দেয়—

মৃগাঙ্ক। (চাপা উত্তেজনার সঙ্গে) আমি চুপ করেই ছিলাম—বলতে হলে আমাকে সত্য কথাই বলতে হয়।

প্রকাশ। আবার মুখে মুখে তর্ক করা হচ্ছে! সত্য কথা! শোনো—শোনো সুরমা, আমার মুখের সামনে দাঁড়িয়ে বলে কিনা 'বিড়ি খাই'।

সুরমা। (বিস্ময়ের সুর টেনে) এ্যাঃ, বিড়ি খায় বলেছে, বলেন কি! আস্পর্দ্ধা তো কম নয়—আবার দাঁড়িয়ে মুখে মুখে তর্ক করছে।

সুরমার কথা শেষ হওয়ার আগেই দেখা যায়, উপর থেকে রচনা, স্বপ্না ও তার বাবা অবিনাশ সিঁড়ি বেয়ে নেবে আসছে। কথাগুলো তাদের কানে যায়। সুরমা বলে চলে—

সুরমা। হাতে আবার ওটা কি? ও বুঝেছি। জানেন দাদা, আপনি চটে যাবেন বলে কাল আমি বলিনি। কাল রচনার ঘরে প্রেসক্রিপশনটা খুঁজতে গিয়ে শুনি উনি ওটা নিয়ে গেছেন—এক পয়সার সম্বল নেই, একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করে আবার দরদ দেখানো হচ্ছে।

মৃগাঙ্কর হাত থেকে ওষুধটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

স্বপ্না। ওকি মা, এ কি করছো?

সুরমা। [মৃগাঙ্ককে] ঢুকবে না তোমার কেনা জিনিস এবাড়ীতে। এসময় রচনার বাবা অবিনাশকে দেখা যায় বিব্রত অবস্থায়—এদিক ওদিক ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে। রচনা এগিয়ে যায় মৃগাঙ্কর কাছে। গিয়ে বলে—

রচনা। চলো—

প্রকাশ। 'ইফ ইউ ক্যানট্ বি হেভ ইওর সেলফ' আই ওয়রণ য়ু' আমি তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি—তাহলে এ বাড়ীতে আসা তোমার চলবে না।

রচনা। চলো—

রচনার কথা শুনে মৃগাঙ্ক সবিস্ময়ে।

মৃগাঙ্ক। তুমি—

রচনা। এর পর আর এক মুহূর্ত এখানে দাঁড়িও না, চলে এসো।

বাধ্য হয়ে মৃগাঙ্ক রচনার সঙ্গে এগিয়ে যায়।

অবিনাশ। রচনা—রচনা, কোথায় যাচ্ছিস তুই?

স্বপ্না। দিদি—দিদি—[কান্না]

প্রকাশ। এ ভাবে চলে গেলে মনে রেখো, ভবিষ্যতে আর ফেরা চলবে না।

রচনা আর মৃগাঙ্ক ধীরে ধীরে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায়। শিকলে বাঁধা রচনার কুকুরটা ডেকে ডেকে কুঁকিয়ে কেঁদে ওঠে।

প্রকাশ। [ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কুকুরকে ধমকে] শাট্ আপ—

অবিনাশ। [সিক্ত চোখে] থাক—থাক পশু কি না কাঁদছে।

অবিনাশ জামার হাতায় চোখ মোছে। রাস্তা দিয়ে রচনা ও মৃগাঙ্ক উদ্দেশ্যহীন শিথিল পদে চলছে। মৃগাঙ্কর দৃষ্টি চিন্তা-ভারাক্রান্ত। রচনা বার দুই মৃগাঙ্কর মুখের দিকে দেখে নিয়ে ধীর কণ্ঠে বলে।

রচনা। একটা রিক্সা নিলে হতো না?

মৃগাঙ্ক। [দাঁড়িয়ে পড়ে] অহুঁ, চলো—যেন কাছাকাছি রিক্সা দেখে এগিয়ে যায়। একটা রিক্সার কাছে এসে দু'জনে দাঁড়ায়।

মৃগাঙ্ক। কিন্তু কোথায় যাবো?

রচনা। [মুখ তুলে তাকিয়ে] কেন তুমি যেখানে থাকো?

মৃগাঙ্ক। আমি যেখানে থাকি—[একটু চিন্তা করে নিয়ে] চলো—

দু'জনে রিক্সায় উঠে বসে। একটা দীর্ঘ পিচঢালা সোজা সুন্দর রাস্তা চলে গেছে। দু'দিকে তার গাছ আর বিরাট বিরাট বাড়ী—সেই রাস্তা ধরে ঠুং-ঠাং শব্দে এগিয়ে চলেছে তাদের রিক্সা। কিছু দূর এগিয়ে রিক্সাটা থেমে পড়ে। তার পর দেখা যায় রিক্সাঅলা রিক্সাটা একটু পিছনে টেনে নিয়ে রিক্সাটা ঘুরিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে একটা সরু সড়কে মোড় ফিরে ঢকর ঢকর শব্দ করে এগিয়ে চলে সেই বন্ধুর পথ দিয়ে। পিছনে পড়ে থাকে সুন্দর সোজা মসৃণ পথ!

[ক্রমশঃ।



নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

আঠারো

না। রাত্রি দশটা পর্যন্ত সমরেশের একটা শব্দও পাওয়া গেল না। তিনি সেরেস্তায় কাজ করে চলেছেন তো নিঃশব্দে একমনে কাজই করে চলেছেন।

কিন্তু অরুন্ধতীরও জেদ চড়ে গেছে। খেয়ে-দেয়ে এসে সে খাটে পা ঝুলিয়ে বসল। সমরেশের সঙ্গে মোকাবিলা আজ রাত্রে করাই চাই। অত্যন্ত সতর্ক ভাবে সে বসে রইল। সমরেশ যে রকম নিঃশব্দে হাঁটেন, তাতে সতর্ক না থাকলে কখন তিনি ওঘরে গিয়ে শুয়ে পড়বেন, অরুন্ধতী টেরও পাবে না।

একবার উঠে গিয়ে দুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার সমরেশের ঘরের দিকের খিলটা খুলে রেখে দিয়ে এল। সমরেশ যদি এঘরে না এসে সটান নিজের ঘরের খিল বন্ধ করে শুয়ে পড়েন, তাহলেও এঘর থেকে স্বচ্ছন্দে ওঘরে গিয়ে সে সমরেশের সামনে দাঁড়াতে পারে।

কিন্তু সমরেশ তাকে এড়িয়ে যাবেনই বা কেন? কেন তার সঙ্গে এখনও দেখা করছেন না?

ভয়ে?

কিন্তু ভয় করবার পাত্র তো সমরেশ নন! পৃথিবীতে কাউকেই, কিছুকেই তিনি ভয় করেন না'।

তবে?

হরসুন্দরীর ধারণা ছিল সমরেশ অরুন্ধতীকে ভয় পায়। মৃত্যু-শয্যায় শুয়েও একদিন তিনি এই কথারই পুনরাবৃত্তি করেছিলেন।

অরুন্ধতী এর প্রতিবাদ করতেই তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, করে বৌমা। তুমি জান না, সমরেশ তোমাকে ভয় করে। তোমার পক্ষে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কিন্তু কে কা'কে কেন ভয় করে, কার সম্বন্ধে কার মনে একটুখানি দুর্বলতা থাকে, 'সে সব কি সহজ চোখে সব সময় ধরা পড়ে?

সেই ভয় অথবা দুর্বলতার জন্যেই কি সমরেশ তাকে এড়িয়ে চলছেন? এ কি কখনও সত্য হতে পারে?

হয়ও যদি,—অরুন্ধতী অবশ্য তা বিশ্বাস করে না, তবু যদিই হয়,—তাহলেও আজ সমরেশকে তার মুখ থেকে শুনতেই হবে যে, সে তাকে ভয় করে না। মোটেই ভয় করে না।

এই চিন্তার মধ্যে যখন সে একেবারে ডুবে গেছে, তখন দ্বারপ্রান্তে কাশির মতো একটা হাসির শব্দে সে চমকে উঠল।

সমরেশ।

—কি ব্যাপার! হঠাৎ কি মনে করে?

চমকের ভাবটা কাটিয়ে অরুন্ধতী তখন দাঁড়িয়েছে। আস্তে আস্তে গিয়ে সমরেশের পা ছুঁয়ে প্রণাম করলে। ওঁর মুখের দিকে চেয়ে অকারণে একটু হাসলেন।

দু'পা পিছিয়ে গিয়ে সমরেশ ওর প্রণামে বাধা দিলে। বললে, থাক, থাক। ওতে আমাকে ভোলান যায় না। মতলবটা কি, চটপট বলে ফেল দেখি?

—কিসের মতলব?

—হঠাৎ আসার মতলব? কোনো খবর না দিয়ে?

অরুন্ধতীও ধীরে ধীরে শক্ত হতে লাগল। বললে, নিজের বাড়িতে কেউ কি খবর দিয়ে আসে? না মতলবে আসে?

সমরেশের মুখে একটা কুটিল হাসির রেখা দেখা গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে এখন কি নিজের বাড়িতে কিছু দিন থাকার মতলব?

—হ্যাঁ।

—কত দিন?

—যত দিন ভালো লাগবে।

ওর স্পর্ধা দেখে সমরেশ কৌতুকের সঙ্গে বিস্ময়ও বোধ করছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ভয় করবে না?

—না। ভয় কিসের?

—যে ভয়ে পালিয়েছিলে, সেই ভয়?

—না। ভয়ে আমি পালাইনি।

—তবে কেন পালিয়েছিলে?

—ভয়ে নয়।

—কেন নয়? তুমি আমাকে ভয় কর না?

—না। বিশ্বশুদ্ধ লোক তোমাকে ভয় পেতে পারে, কিন্তু আমি করি না। আমি তোমাকে মোটেই ভয় করি না।

—তাই নাকি! সমরেশের কণ্ঠে বিদ্রূপ ঝকমক করে উঠল। আমি খুন করতে পারি, তুমি বিশ্বাস কর না?

—করি। তোমার অসাধ্য কাজ কিছু নেই। তবু তোমাকে আমি তিল মাত্র ভয় পাই না। তোমাকে আমি করুণা করি।

উত্তেজনায় অরুন্ধতী হাঁফাতে লাগল।

—কি কর?

সমরেশ যেন হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। তাঁর দুই চোখে দু'খানা ছোরা যেন বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল।

—করুণা! করুণা! তোমার চেয়ে হতভাগ্য লোক পৃথিবীতে আর নেই। তুমি স্নেহ পাওনি, ভালোবাসা পাওনি, কাউকে কোনো দিন ভালোবাসওনি। মরুভূমিতে বসে বসে বালির পাহাড় তৈরি করে চলেছ।

জীবনে বিস্মিত হবার অবকাশ সমরেশের অতি অল্পই এসেছে। বোধ করি এই প্রথম তিনি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অরুন্ধতী বলে চলল: তোমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত বিষে ভর্তি। সেই বিষে তুমি জ্বলছ, তোমার সংস্পর্শে যারা এসেছে তারাও জ্বলছে। আমাকে খুনের ভয় দেখাও? কর খুন। আমার ওপর দিয়ে তোমার সমস্ত বিষ নিঃশেষ হয়ে যাক। তুমিও বাঁচ,

পৃথিবীও ঠাণ্ডা হোক। কর খুন, আনো তোমার বন্দুক। আমি মরতে ভয় পাই না। উত্তেজনায় অরুন্ধতীর দেহ ঠক্‌-ঠক করে কাঁপতে লাগল। সমরেশ স্তব্ধ! তাঁর মুখমণ্ডল আরক্ত। ওষ্ঠাধর দৃঢ়সম্বদ্ধ। দুই চোখ দিয়ে যেন ড্রাগনের নিশ্বাসের মতো ঝলকে ঝলকে আগুন বেরুচ্ছে। হাতের লম্বা লম্বা আঙুলগুলো যেন অক্টোপাসের পায়ের মতো কিলবিল করে উঠল!

কিন্তু তখনই মনে পড়ল, সে বারে এমনি উত্তেজনার পরেই অরুন্ধতী মূর্ছিত হয়ে পড়ে গিয়েছিল।

গম্ভীর কণ্ঠে সমরেশ বললেন, দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়্। বলেই নিজের ঘরে গিয়ে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন।

ওই কথার এই উত্তর? বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে অরুন্ধতী দাঁড়িয়ে রইল। হয়তো সমস্ত রাত্রি অমনি করে দাঁড়িয়ে থাকত। কিন্তু নিজের ঘরে শুয়ে লক্ষ্মী মোটেই শান্তি পাচ্ছিল না। সমরেশের গলা পেয়ে সে-ও বেরিয়ে আসতে যাচ্ছিল। বারান্দায় সমরেশকে দেখে ভয়ে ফের ভিতরে ঢুকে পড়ে। সমরেশের ঘরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ পেয়ে আবার বাইরে বেরিয়ে এল।

নিজের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে উভয়ের সমস্ত কথাই সে শুনেছে। অরুন্ধতীকে জিজ্ঞাসা করবার কিছুই ছিল না। শুধু ফিস-ফিস করে জিজ্ঞাসা করলে, আমি এই ঘরে তোমার কাছে শোব দিদিমণি!

ওকে দেখে অরুন্ধতী যেন বাস্তব-জগতে নেমে এল। বললে, না। তুই শুগে যা। বলে নিজের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। আলোটা নিবিয়ে দেবার কথা খেয়ালই হল না।

অরুন্ধতী কি তার পরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল? কে জানে? অরুন্ধতী নিজে অন্তত জানে না।

অরুন্ধতী স্বপ্ন দেখছিল,—কিংবা হয়তো স্বপ্ন দেখছিল না, তার কেমন মনে হচ্ছিল,—দুপুরে, ওবাড়ীতে তার শোবার ঘরে সে যেন শুয়ে আছে আর অনিমেষ মুখে এক রকম অস্ফুট শব্দ করছে আর হাসতে হাসতে হামা দিয়ে তার দিকে আসছে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যাবে, এমন সময় হারিকেনের আলো তার চোখে পড়ল।

তার প্রথম মনে হল, ভোরের সূর্যের আলো বুঝি। পরক্ষণেই ভ্রম ঘুচে গেল। সূর্যের আলো নয়, হারিকেনের। যেটা সন্ধ্যার সময় কেষ্ট এসে রেখে গেছে। সে ওবাড়িতে শুয়ে নেই, এ বাড়িতে। পাশের ঘরেই সমরেশ রয়েছেন। মনে পড়ল, একটু আগেই উভয়ের প্রচণ্ড কলহ হয়ে গেছে।

কিন্তু সে কি একটু আগেই? না কি অনেক আগে?

মনে হল অনেক আগে। অনেক ঘণ্টা, অনেক দিন, অনেক বৎসর আগে। মনে এখন তার গভীর অশান্তি। ক্রোধ নেই, বিদ্বেষ নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই, কিছু নেই। গভীর প্রশান্তি। এই রাত্রির মতো। শান্ত, গভীর, নির্জন, বেদনা-মৌন।

এই রাত্রির মতো তারও মনের আকাশে একটি শুকতারা জ্বলছে। সেই তারাটি যেন রাত্রির একতারায় সুর বেঁধে দিয়েছে শান্তির, গভীরতার, নির্জনতার, মৌনতার। এবং করুণার।

সুনিবিড় বেদনাঘন করুণায়। যা কাউকে কৃপা করে না, আঘাত দেয় না, কাউকে অনুগৃহীত করার স্পর্ধা রাখে না। বরং কি যেন একটা অপূর্ব অনুভূতির স্পর্শে নিজের পরিধির মধ্যে আনন্দিত চরিতার্থতায় ছলছল করে ওঠে। এবং কস্তুরীর গন্ধে মৃগ যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে, তেমনি ভাবে উঠে বসে চারি দিকে যেন কিসের অন্বেষণ করতে লাগল।

কিসের অন্বেষণ? কি চায়? কি খুঁজছে অরুন্ধতী?

তা ও নিজেও জানে না। শুধু একটা অজ্ঞাত বস্তুর জন্যে ওর বুকের ভিতরটা আঁকুপাঁকু করতে লাগল।

অরুন্ধতী উঠে দাঁড়াল। নিজের শিথিল বেশ-বাস সংযত করে নিলে। তার পর দুই ঘরের মধ্যে দরজাটা একটা আঙুল দিয়ে ঠেললে। ধীরে···অতি সন্তর্পণে···

ওদিকে খিল লাগান ছিল না। নিঃশব্দে দরজা ফাঁক হয়ে গেল। অরুন্ধতী কিন্তু তখনই ও-ঘরে যেতে পারলে না।

ওর বুকটা হঠাৎ অসম্ভব জোরে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। এত জোরে যে, ওর নিজের কানেই তার শব্দ বাজছে।

ওকে দাঁড়াতে হল। তখনই ও-ঘরে যেতে পারলে না। নিজেরই দেহ নিজেকেই মাঝে মাঝে এমন বিপদে ফেলে! অদূরে খাটের উপর সমরেশ শুয়ে।

খোলা জানালা দিয়ে একরাশ চাঁদের আলো এসে পড়েছে বিছানার উপর। দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যা সেই আলোর যেন ফেনিল হয়ে উঠেছে।

তারই মধ্যে একরাশ কাঁটাল-চাঁপার মতো শুয়ে রয়েছেন সমরেশ। তাঁর প্রশস্ত বক্ষ নিশ্বাসের তালে তালে দুলছে!

অরুন্ধতী আর একটু এগিয়ে এল। আরও একটু।

চাঁদ যেন নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে সমরেশের ঘুমন্ত মুখের উপর। তাঁর দীর্ঘছন্দ বলিষ্ঠ দেহের উপর।

কী সুন্দর সমরেশের মুখ! সাহস করে অরুন্ধতী কোনো দিন তাঁর জাগ্রত মুখের দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখতে পারেনি। যেটুকু দেখেছে, ভয়েই তার বুক কেঁপে উঠেছে। এখন অসঙ্কোচে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে মনে হল, কী সুন্দর তাঁর মুখ! এমন সুন্দর মুখ সচরাচর চোখে পড়ে না!

শালপ্রাংশু মহাভুজ। বয়স হয়েছে, কিন্তু বুড়ো হয়ে যাননি। ললাটে, কপোলে এখনও বার্ধক্যের বলিরেখা পড়েনি। নাতিস্থূল, নাতিশীর্ণ দেহে এখনও লোলতা আসে নি। শুধু মাথার চুলে পাক ধরেছে।

অরুন্ধতী তন্ময় হয়ে দেখছে। হঠাৎ সমরেশ হেসে ফেললেন ঘুমের ঘোরে। ঘুমের ঘোরেই। নিশ্চয় সমরেশ অঘোরে ঘুমুচ্ছেন।

কী সুন্দর হাসি! পাৎলা দুটি আরক্ত ঠোঁট ঈষৎ উদ্ভিন্ন হল। সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্র থেকে, দুটি শীর্ণ তরঙ্গরেখা উঠে দুই প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

কী সুন্দর হাসি! অথচ এই হাসি দেখেই অরুন্ধতীর বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠত। হাসি তো নয়, যেন একখানা ঝকঝকে বাঁকানো ছোরা, বুকে গিয়ে বিঁধত। এই হাসি নিয়েই ওর আর লক্ষ্মীর মধ্যে কত হাসাহাসি হয়েছে। অবশ্য সমরেশ চলে যাওয়ার পরে। তাঁর হাসির ধমকে স্নায়ু-শিরায় যে হিমপ্রবাহ বইছিল, তা থেমে যাওয়ার পরে। জামাইবাবু

হেসেছেন, এত বড় খবরটা অরুন্ধতীর মায়ের কাছে পাঠাবার জন্যে লক্ষ্মী একদিন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সে কথা অরুন্ধতীর এখন মনে পড়ল না।

আর একদিনের কথা। অনেক দিন আগের কথা। তখন অরুন্ধতী ছোট। ওদের বাপের বাড়ির গ্রামে মাঝে মাঝে বাঘের উপদ্রব হত শীতকালে। ওদের যে সর্দার লাঠিয়াল, সূর্য গোয়ালা তার নাম, সে একবার তলোয়ার দিয়ে একটা বাঘিনী মেরেছিল। তার গল্প :

সূর্য বাঘ মারার মতো একটা গৌরবময় কৃতিত্বের চেয়ে জোর দিত বেশি বাঘিনীর হাসিটার উপর। সূর্যের উপর লাফিয়ে পড়ার আগে সেটা নাকি হেসেছিল। শ্রোতা যদি আপত্তি জানিয়ে বলত, ওটা হাসি নয় হে, দাঁত-ভেংচি,—সূর্য তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করত, আজ্ঞে না, ওটা হাসিই। স্পষ্ট দেখেছি।

লোকে বলত, দূর পাগল! বাঘ কি হাসে?

—কেন হাসবে না? আপনি হাসতে পারেন, আমি হাসতে পারি, আর বাঘে হাসতে পারে না?

হয়তো পারে, কি হয়তো পারে না। তা নিয়ে তর্ক নয়। কিন্তু ওটা দাঁত-ভেংচিই হোক, আর হাসিই হোক, সূর্য ওর মধ্যে হয়তো একটা মাধুর্যের সন্ধান পেয়েছিল। যার জন্যে ওর সেটাকে হাসি বলেই মনে হয়েছিল, দাঁত-ভেংচি নয়। যার জন্যে ওটাকে সে বহুদিন পর্যন্ত ভুলতে পারেনি।

সূর্য কি বাঘিনীটার প্রেমে পড়েছিল? যার চরম পরিণতি হল, ওর হাতে বাঘিনীটার মৃত্যু?

সমরেশের হাসি দেখে এই গল্পের কথাও অরুন্ধতীর মনে পড়ল না। কিছুই মনে পড়ার অবস্থায় সে নেই। সে যেন একটা জ্যামিতির বিন্দুর উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। জ্যামিতির বিন্দুর উপর যার অবস্থান আছে, কিন্তু অস্তিত্ব নেই। তার সামনে পিছনে, ভবিষ্যৎ অতীত লেপে, মুছে একাকার হয়ে গেছে। কিছুই আর মনে পড়ছে না। লক্ষ্মীর সঙ্গে হাসাহাসিও না, সূর্য গোয়ালার গল্পও না।

শুধু তন্ময় হয়ে দেখছে। দেখছে প্রশস্ত খাট। তার এ-পাশে ও-পাশে কত স্থান! লোভে ওর সমস্ত দেহ থরথর কাঁপতে লাগল।

তারই একান্তে সমরেশকে জড়িয়ে ধরে সে শুয়ে পড়ল। না, ভয় করল না! সমরেশকে ভয় সে কিছুতে করবে না।

পোষা হরিণ কি বনের বাঘের প্রেমে পড়ে গেল ? যেমন করে পড়েছিল সূর্য গোয়ালা বাঘিনীটার প্রেমে ?

তারপরে কি হল ?

ঘর অন্ধকার হয়ে গেল। চাঁদ কি ডুবে গেল ? না, এক টুক্‌রো কালো মেঘ চাঁদকে ঢেকে দিলে ?

কিছু একটা হয়ে থাকবে। মোট কথা, ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

উনিশ

পরদিন ভোরে, তখনও একটু অন্ধকার আছে, সমরেশ অকাতরে ঘুমুচ্ছেন, হঠাৎ অরুন্ধতীর হাতের ধাক্কায় জেগে উঠলেন।

—কী হয়েছে ?

—উঃ ! বুকটা এমন করছে কেন গো ?

—কী করছে ?

—বুক যে গেল ! আমি আর সহ্য করতে পারছি না। অরুন্ধতী ছটফট করতে লাগল।

খাট থেকে নেমে সমরেশ দরজা খুলে চাকরটাকে ডাকলেন। তাকে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনতে বললেন। তখনই ফিরে এসে খাটে বসে অরুন্ধতীকে শান্ত হবার জন্যে বার বার অনুরোধ করতে লাগলেন। এ ছাড়া তাঁর করবার কিছু ছিলও না।

লক্ষ্মী ছুটে এসে অরুন্ধতীকে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। অরুন্ধতী আরও কিছুক্ষণ ছটফট করে শান্ত হয়ে গেল। তার মুখ দিয়ে লালা ভাঙতে লাগল। ইতিমধ্যে ডাক্তার এলেন।

নাড়িতে অনেক পরে-পরে অত্যন্ত ক্ষীণ স্পন্দন তখনও পাওয়া যাচ্ছে। তিনি ছুটলেন তাঁর ডাক্তারখানা থেকে ঔষধ আনতে।

যখন ফিরে এলেন, তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। বিন্দু বিন্দু করে মুখের ভিতর ঔষধ দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু তা আর পেটের মধ্যে গেল না। কষ বেয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।

আর একবার পরীক্ষা করে ডাক্তার বাবু বলে গেলেন, সব শেষ।

লক্ষ্মী চিৎকার করে কেঁদে উঠল।

আর কে কাঁদবে ? এ বাড়িতে তার জন্যে কাঁদবার আর কেউ নেই। সমরেশ স্তব্ধভাবে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। চোখে তাঁর জল নেই। অবশেষে একটা নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে নিচে নেমে এলেন।

যারা অরুন্ধতীকে ভালোবেসেছে, তাদের চোখে জল আছে, মুখে ভাষা আছে। তাই দিয়ে তারা বুকের ভাষা প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু সমরেশের কী আছে? তাঁর কথা কে বুঝবে?

কাল সন্ধ্যার আগে অরুন্ধতী এ বাড়ি এসেছে। তার সম্বন্ধে রামপ্রসাদের মনে আশঙ্কা ছিল, সুমিতার মনেও। কোনো রোগ-ব্যাধি তার ছিল না। এ অবস্থায় খবরটা শোনামাত্র সবাই পরস্পরের মুখের দিকে ইঙ্গিতপূর্ণ চাইতে লাগল, মুখে কিছু না বললেও।

রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ ডাক্তারকে ডেকে পাঠালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারটা কি?

ডাক্তার বাবু যা দেখেছেন, সবই আনুপূর্বিক বললেন।

—মৃত্যুর কারণ কি, অনুমান করেন?

—হার্ট। হৃদ্‌রোগ।

—কিন্তু এ বাড়িতে তো দীর্ঘকাল উনি ছিলেন, তার মধ্যে তো কখনও টের পাওয়া যায়নি!

—কখনও কি পরীক্ষা করিয়েছিলেন?

—সুস্থ লোকের তো পরীক্ষা করাবার প্রশ্ন ওঠে না?

—সুস্থ ঠিক ছিলেন না। পরীক্ষা করালেও যে টের পেতেন তারও কিছু নিশ্চয়তা নেই। এ রোগ এমনই।

একটু চুপ করে থেকে রামপ্রসাদ আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার মনে অন্য কোনো সন্দেহ হয় না?

—কি সন্দেহ?

—খুন। ধরুন গলা টিপে কিংবা বিষপ্রয়োগে?

ডাক্তার বাবু চিন্তিত ভাবে একটু ভাবলেন। বললেন, গলা টিপে তো নয়ই। কারণ তাহলে দেহে ধ্বস্তাধ্বস্তির চিহ্ন থাকত। আমি ভালো করেই লক্ষ্য করেছি। সে রকম কোনো চিহ্ন নেই।

—কিন্তু বিষপ্রয়োগ তো হতে পারে? বড়বাবুকে তো চেনেন?

—তা চিনি। ডাক্তার বাবু হেসে বললেন,—আমার কিন্তু সে রকম সন্দেহ হয় না।

—কেন হয় না?

—তা-ও বলতে পারব না। তবে কি জানেন, ওঁর ঝি যখন ওঁর কাছে আসে তখনও ওঁর জ্ঞান ছিল। সে রকম কিছু হলে নিশ্চয়ই বলে যেতেন।

রামপ্রসাদ ডাক্তারকে আর কিছু বললেন না। কিন্তু তাঁর সন্দেহও দূর হল না। পাড়াগাঁয়ের হাতুড়ে ডাক্তার। বোঝেই বা কি? তিনি পুলিশে খবর দেওয়ার কথা ভাবলেন। কিন্তু সুমিতা নিষেধ করলে।

—কি হবে আর সে হাঙ্গামা করে? বড়মাকে তো আর ফিরে পাওয়া যাবে না?

তা যাবে না সত্যি।

সুমিতা বললে, তার চেয়ে এখনই কলকাতায় টেলিগ্রাম পাঠান, যাতে তিনি এসে মুখাগ্নি করতে পারেন। এইটে তাঁর বরাবরকার ইচ্ছা।

রামপ্রসাদ বললেন, কিন্তু বড় বাবু যদি আপত্তি করেন? তিনি যদি অতক্ষণ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে না চান?

সুমিতা দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলে, অপেক্ষা তাঁকে করতেই হবে। তিনি আমাদের বড়মা, ওঁর কে?

এতক্ষণে রামপ্রসাদের মনটা খুশি হল। বললেন, তাই হবে ভাই! কিন্তু এই মৃত্যু সম্বন্ধে তোমার সন্দেহ হয় না?

—হয়।

উৎসাহিত হয়ে রামপ্রসাদ বললেন, কাল সন্ধ্যেবেলায় সুস্থ মানুষ গেলেন, আর সকালেই সব শেষ! ডাক্তারে বলছেন হৃদ্‌রোগ। বললেই হল?

—উনি যেন মরবার জন্যেই গেলেন?

—তাই তো গেলেন।

রামপ্রসাদের কণ্ঠস্বর হঠাৎ ভারি হয়ে উঠল। বললেন, বড়মার সেই কথাটা এখনও আমার কানে বাজছে নাতবৌ! বললাম, সেখানে যেতে তোমার সাহস হয় বড়মা? বললেন, হয়। কী করবেন তিনি? খুন? করুন। যে আক্রোশ আমাকে নিয়েই এত ভয়ংকর হয়ে উঠেছে, আমার ওপর দিয়েই তা শেষ হয়ে যাক। কমলেশ বাঁচুক।

সুমিতার চোখে জল এল। বললে, ওঁকে বাঁচাবার জন্যেই তো তিনি এ কাজ করলেন।

—তবু তুমি বলবে, এর শোধ নোব না?

—না দাদু! বড়মার ওপর দিয়েই বিষ শেষ হয়ে যায় যেন। তাঁর মৃত্যু সার্থক হোক। আর শোধ নেওয়া-নেওয়িতে কাজ নেই। আপনি ওঁকে জরুরী তার করে দিন। তাহলে একটার মধ্যে এসে পড়বেন।

—ততক্ষণ বড়মার দেহ কি এখানেই থাকবে বলছ?

—না, না। ও বাড়ি থেকে যত শীগগির সম্ভব ওঁকে বার করতে হবে। ওঁর শূন্য দেহটাও ওখানে হাঁপিয়ে উঠেছে নিশ্চয়। আপনারা শ্মশানে ওঁর জন্যে অপেক্ষা করবেন বরং। লোকজন দেখুন।

রামপ্রসাদ যখন চলে যাচ্ছেন, সুমিতা ডাকলে: দাদু?

—কি ভাই?

—তহবিলে কি টাকা কম আছে?

রামপ্রসাদ বিস্মিত ভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন বল তো?

বার দুই ঢোঁক গিলে সুমিতা বললেন, ইচ্ছে ছিল চন্দনকাঠে—

সুমিতা কথাটা আর শেষ করতে পারলে না। তহবিলের কথা ভেবে থেমে গেল।

কিন্তু কথাটা শোনা মাত্র রামপ্রসাদ হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন। বললেন, ওরে পাগলী, তিনি কি শুধু তোমাদেরই বড়মা ছিলেন, আমার বড়মা ছিলেন না? রায়বাড়ির শেষ কর্ত্রীর কাজ তাঁর মতো করেই হবে। তহবিলের কথা তোমরা ভেব না।

রোদনের বেগে তাঁর জীর্ণ দেহ ফুলে-ফুলে কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। সেই অবস্থাতেই আবশ্যকীয় ব্যবস্থাদির জন্যে তিনি চলে গেলেন।

আশ্চর্য্য! সমরেশ সেই যে নিচের ঘরে এক কোণে গিয়ে বসলেন, সেইখানেই নিঃশব্দে বসে রইলেন।

রামপ্রসাদ লোকজন নিয়ে এলেন। শবদেহ খাটিয়ায় তুলে ফুলে সাজান হল। সুমিতা নিজে এসে দুই পায়ে চওড়া করে আলতা পরিয়ে দিলেন। সীঁথিতে জলজলে সিন্দুর পরিয়ে দিলেন। উচ্চ হরিধ্বনি দিয়ে বাহকেরা শব নিয়ে চলে গেল। কিন্তু সমরেশ তাদের কাজে বাধা দেওয়া দূরের কথা, একবার বাইরে বেরিয়ে পর্য্যন্ত

এলেন না। তিনি যে এই বাড়িরই নিচের তলার একটা ঘরের এক কোণে বসে রয়েছেন,—তিনি সমরেশ গোবিন্দ—যাকে মানুষ বাঘের মতো ভয় পায়,—এ যেন কেউ টেরই পেল না।

কি হল জবরদস্ত সমরেশ গোবিন্দের ?

সে কাউকে বলবার নয়। তাঁর কথা কেউ বুঝবে না। তাঁর মনে হচ্ছে, তাঁর বুকের মধ্যেকার অণু-পরমাণুগুলো তাদের অভ্যস্ত স্থান থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে আবার নতুন নক্সা আঁকছে। পুরোনো নক্সার খিলান খুলে যাচ্ছে। তার জায়গায় নতুন খিলানের নক্সা। এ নক্সা একেবারেই তাঁর অপরিচিত। এর মূল্য স্বতন্ত্র। তাঁর স্তিমিত দুই চোখে নতুন মূল্যবোধের স্বপ্ন !

এ কথা তিনি কা'কে বলবেন ? কে বিশ্বাস করবে সমরেশ গোবিন্দ স্বপ্ন দেখেন ? নতুন জীবনের স্বপ্ন ! নতুন নক্সার নতুন মূল্যবোধের ? এ কি বিশ্বাস করবার মতো কথা ?

অথচ এ সত্য। পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য বস্তু অদৃশ্য কোন যাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় সত্যে পরিণত হয়। বিশ্বাস করা যায় না, তবু বিশ্বাস করতে হয়।

অঘটনও ঘটে।

কাল রাত্রে সমরেশ স্বপ্ন দেখেছিলেন।

স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেন একটা প্রকাণ্ড বড় সাপ তাঁর বুকের উপর দিয়ে চলেছে। পরক্ষণেই মনে হল সাপ নয়, ফুলের মালা। চমকে ঘুম ভেঙে যেতেই দেখলেন•••

কি দেখলেন, সে কথা কাউকে বলবার নয়। রাগের মাথায় হলেও অরুন্ধতী সত্য বলেছিল, জীবনে কিছুই তিনি পাননি, মরুভূমিতে বসে বসে শুধু প্রচণ্ড আক্রোশে বালির পাহাড় তৈরি করেছিলেন। সমরেশকে দেখে অরুন্ধতীর করুণা হয়। করুণা হবারই কথা। পিছনের দিকে চাইলে সমরেশের নিজেরই নিজের উপর করুণা হয়।

সে কথাও কাউকে বলবার নয়।

পরশ-পাথরের কথা সমরেশ গল্পে শুনেছেন। কে জানে তা সত্যই কোথাও আছে কি না। কিন্তু চোখ বন্ধ করলেই সমরেশ দেখতে পাচ্ছেন, তাঁর বুকের একটুখানি যেন সোনা হয়ে গেছে।

মন বলছে : পেলাম, পেলাম ; বিদ্যুচ্চমকের মতো হলেও অবশেষে পেলাম। কিন্তু পেয়েই হারালাম।

এ কি কাউকে বলবার ?

সন্ধ্যার মুখে সমরেশ বাগানে বেড়াচ্ছিলেন। রাস্তা দিয়ে রামপ্রসাদ কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। সমরেশ তাঁকে ডাকলেন।

জিজ্ঞাসা করলেন, শ্মশান থেকে লোকেরা কি ফিরেছে ?

—না। একটু দেরি হবে তাদের।

—দেরি হবে কেন ?

—খোকাবাবুর জন্যে ওরা অপেক্ষা করবে।

—কেন ?

—মুখাগ্নি তো সেই করবে।

সমরেশ কি যেন একটু চিন্তা করলেন : হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারই তো মুখাগ্নি করার কথা। তাকে কি খবর দেওয়া হয়েছে ?

—সকালেই টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

সমরেশ চুপ করে আর যেন একটু কি ভাবলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, এখান থেকেই গেছে তারা, শ্মশান থেকে এখানেই ফিরবে তো?

—তাই তো ফেরা উচিত।

—আমাকে তো তার ব্যবস্থা করে রাখতে হবে?

—তা হবে।

—কি ব্যবস্থা করতে হবে বলুন তো? আমি কিছুই জানি না। আমার বাড়িতে যারা আছে তারাও না।

রামপ্রসাদ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইলেন। সমরেশ কি ভাণ করছেন? সরলতা তো তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ!

বললেন, এ তো সবাই জানে। ব্যবস্থা তো বিশেষ কিছু নয়,—আগুন, নিমপাতা আর একটু মিষ্টি-জল।

—তাই বুঝি?

—আর পরের যা ব্যবস্থা সে তো আপনাকে করতে হবে না। সে সব ও-বাড়িতেই হবে।

সমরেশ বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। জিজ্ঞাসা করলেন, ও-বাড়িতে কেন?

—খোকাবাবু যখন শ্রাদ্ধ করবেন তখন ও-বাড়িতেই করবেন নিশ্চয়।

—ও!

অর্থাৎ এ ব্যাপারে তাঁর করণীয় কিছুই নেই। ইহলোকে মৃত্যুর আগে যেমন ছিল না, পরলোকে মৃত্যুর পরেও তেমনি নেই। করণীয় যা কিছু কমলেশের, শ্রদ্ধার সঙ্গে যা-কিছু দেবার দেবে কমলেশ।

তাহলে কাল রাত্রে পৃথিবী থেকে শেষ নিশ্বাস নেবার আগে যা দিয়ে গেল অরুন্ধতী, পরস্পরকে নিঃশেষ করে দেওয়া-নেওয়া,—ইহলোকে অথবা পরলোকে, তার কি কোনো মূল্যই নেই?

কে জানে!

রামপ্রসাদ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমরেশের দিকে চেয়েছিলেন। একটা ছোট প্রাচীরের দুই পারে দু'জন। তাঁর মনে পড়ছিল, অনেক দিন আগের একটা কথা। তাঁদের সর্দার লাঠিয়ালের কথা। এ অঞ্চলের বিখ্যাত লাঠিয়াল সে। বিশখানা গ্রামের লোক তাকে সর্দার বলে সমীহ করে। সমরেশকে সে পর্যন্ত ভয় করত তাঁর শারীরিক শক্তির জন্যে, কি হয়তো আরও কিছুর জন্যে।

সেই সমরেশ একটা অনুচ্চ প্রাচীরের ওপারে। কমলেশ এবং ও-বাড়ি সম্বন্ধে তাঁর আক্রোশ সুপরিচিত। আত্মমর্যাদা বোধও তাঁর প্রচণ্ড। বিশেষ আজ সকালেই একটা নৃশংস হত্যাকাণ্ড অবলীলাক্রমে সম্পন্ন করেছেন। রক্ত হয়তো এখনও গরম হয়ে রয়েছে।

তাঁর স্ত্রীর শ্রাদ্ধ,—সম্পর্ক যেমনই হোক, মর্যাদার প্রশ্ন তো একটা রয়েছে,—ও-বাড়িতে হবে শুনে হঠাৎ সমরেশ একটা হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিয়ে ও-পারে এসে পড়েন, তাহলে নখে করেই হয়তো জরাজীর্ণ রামপ্রসাদের ক্ষীণ দেহ টুকরো টুকরো করে ফেলবেন!

সেই ভয় মনে হতেই রামপ্রসাদ সতর্ক হয়ে গেলেন। সমরেশের ক্রোধোপশমের জন্যে মোলায়েম করে একটা কি বলতেও যাচ্ছিলেন। কিন্তু হুঙ্কার দেওয়া দূরে থাক, সমরেশ মৃদু কণ্ঠেও একটা আপত্তি জানালেন না।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে শুধু বললেন, বেশ! তাই হবে। কেবল কি পরিমাণ ব্যয় হবে, আমাকে জানাবেন।

একটু চিন্তা করে নম্র কণ্ঠে রামপ্রসাদ উত্তর দিলেন, খোকাবাবু তাঁর বড়মার শ্রাদ্ধ করবেন। সুতরাং আপনাকে জানাবার কি আবশ্যক হবে?

—হবে বই কি রামপ্রসাদ বাবু! নিশ্চয়ই হবে। কমলেশ তার কর্তব্য করবে, ঠিকই করবে। কিন্তু আমিও তো তার জ্যাঠা-মশাই? আমার কর্তব্য থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়ার তো কিছু নেই। সমরেশ সকাতরে বললেন।

রামপ্রসাদের কিন্তু করুণা হল না। এই পাষণ্ডটার মুখ থেকে কর্তব্যের কথা শুনে তাঁর মনে মনে হাসিই এল। যাঁর সমগ্র জীবন কর্তব্যচ্যুতির ইতিহাস, তিনিও কর্তব্যের কথা বলেন!

কিন্তু সমরেশ সম্বন্ধে একটা ভয় রামপ্রসাদের মনে কিছুক্ষণ থেকেই জেগেছে। তিনি হাসতে সাহস করলেন না।

মনের হাসি মনেই চেপে রেখে শুধু বললেন, এ কথা আমি খোকাবাবুকে জানাব।

—আজ্ঞে হ্যাঁ। জানাবেন দয়া করে। সমরেশ হাত জোড় করলেন।

রামপ্রসাদ জমিদারী-সেরেস্তায় চুল পাকিয়েছেন। উদ্বিগ্ন ভাবে ভাবতে-ভাবতে গেলেন, বড় বাবুর এ আবার কি নতুন চাল! এই কাতরতা কি পুলিশের ভয়ে? কিন্তু পুলিশের ভয় তো এতক্ষণ শ্মশানে চুকেই গেছে। তবে কি আত্মগ্লানি? অথবা কমলেশের নতুন কোনো সর্বনাশের ফন্দি কি সমরেশের মাথায় এল?

[ক্রমশঃ।

"INDIA, WHAT CAN IT TEACH US"

"If I were to look over the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow—in some facts a very paradise on earth—I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant—I should point to India."

"And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of the Greeks and Romans, and of one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India."

—Max Muller


প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY BRAND
PEARL
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LIMITED
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
REGISTERED DESIGN & BRAND
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA CALCUTTA
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪



খেলাধূলা

অলিম্পিক প্রসঙ্গ

গত বারে খেলাধূলার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলাম, অলিম্পিক সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো।

সভ্যতার আলোক স্পর্শ যখন করলো, তখন মানুষ অনুভব করলো তার দৈহিক এবং মানসিক শক্তির বিকাশ চাই। খেলাধূলার মাধ্যমে সে পথ সর্বাপেক্ষা প্রশস্ত।

'ত্যাগের ধর্ম, পরকে ভালবেসে আপন করা, পরের জন্য স্বার্থ ত্যাগ, আবার পরাজিত হয়ে আলিঙ্গন করা' প্রভৃতি গুণ বিকশিত হওয়ার সব চেয়ে প্রশস্ত পথ খেলাধূলা।

আমাদের প্রাচীন ভারতের সেই রামায়ণ মহাভারতের যুগ থেকে দেখেছি খেলাধূলার ক্রমবিকাশ। ঠিক তেমনি ইউরোপের ইতিহাসে গ্রীস ও রোমে আমরা অনুরূপ খেলার নিদর্শন পেয়েছি।

ইউরোপে সভ্যতা ও শিক্ষার বিস্তার হয়েছিল সর্বপ্রথম গ্রীসে।

গ্রীস দেশ তখন ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। আর যুদ্ধ তাদের মধ্যে লেগে থাকতো। যুদ্ধকালীন সময়ে গ্রীসের জনসাধারণের সাধারণ জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়েছিল। এই অমঙ্গল ও অশান্তির মধ্যেই এই খেলাধূলার আয়োজন যেমনি বিস্ময়কর, তেমনি আশার বাণী বহন করে এল। সেই থেকে অলিম্পিক প্রতিযোগিতার সৃষ্টি।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে বিভূষিত এথেন্স থেকে ১২৫ মাইল দূরে অবস্থিত অলিম্পিয়া নামক একটি শহর। এক দিকে এ্যালফিয়াস ও ক্লডিয়াস নদীর মোহানা। এই অলিম্পিক ভূমিক্ষেত্রেই বসেছিল অলিম্পিকের প্রথম আসর। এইখানেই প্রথম হয়েছিল সার্বজনীন খেলাধূলা। ইংরেজীতে একটি কথা আছে—

"The game is greater than the
players of the game
And the ship is greater than
the crew"—

অর্থাৎ কি না খেলার চেয়ে খেলোয়াড়-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে আচার ব্যবহার ভাল করা।

খৃষ্ট জন্মাবার ৭৭৬ বছর আগে গ্রীস দেশে যখন একাধিক জাতি যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যে লিপ্ত থাকতো তার মধ্যে আবির্ভাব অলিম্পিক গেমসের। কথিত আছে, অলিম্পিক এগিয়ে এলেই দূত ছুটতো নানা দিকে শান্তি ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করতে—যুদ্ধ বন্ধ কর, অলিম্পিক সমাগত।

কিন্তু অলিম্পিকের আত্মা অমর। দীর্ঘ পনের শতাব্দী বাদে এক ফরাসী ব্যারণের মনে জেগে উঠলো সেই পুত শিখা। তিনি হলেন পিয়ের দ্য কুবার্তিন।

"The important thing in the Olympic games is not winning but taking part, the essential thing in life is not conquering but fighting well."

আধুনিক কালের অলিম্পিকে প্রথম অনুষ্ঠান হয় এথেন্সে ১৮৯৬ সালে। তার পর—প্যারিস ১৯০০, সেন্ট লুই ১৯০৪, লণ্ডন ১৯০৮, ষ্টকহলম্ ১৯১২, এ্যান্ট্‌য়ার্প ১৯২০, প্যারিস ১৯২৪ আমষ্টার্ডাম—১৯২৮, লস এঞ্জেলস ১৯৩২, বার্লিন ১৯৩৬ লণ্ডন ১৯৪৮, হেলসিঙ্কি ১৯৫২ আর আগামী অলিম্পিকের অনুষ্ঠান মেলবোর্ণে।

এশিয়ার দ্বারপ্রান্তে এ আসর বসলো প্রথম। ২২শে নভেম্বর ৬টা ৩০ মিনিটের সময় মেলবোর্ণের ক্রিকেট মাঠে অলিম্পিকের পূতাগ্নি দিয়ে অলিম্পিকের দীপশিখা প্রজ্বালিত করা হবে।

ক্রিকেট

নটিংহামশায়ারের টেন্ট ব্রিজ মাঠে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম টেষ্টে খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে। ক্রিকেট-ইতিহাসে ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার এটি ছিল ১৬১তম খেলা।

এবারকার প্রথম খেলায় অষ্ট্রেলিয়া দলকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে খেলতে হয়েছে। বৃষ্টি-ভেজা মাঠ, খেলোয়াড়ের চোট। লিণ্ডওয়াল মাত্র ২০ ওভার বল করার পর মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়। ইংলণ্ডের দুই জন কীর্তিমান খেলোয়াড় ট্র্যাথাম ও টাইসন অসুস্থতার জন্য খেলতে পারেন নি।

বৃষ্টির জন্য ৫ দিনের পরিবর্তে ৪ দিন খেলা হয়। ১২ ঘণ্টা অবিরাম বর্ষণের ফলে দ্বিতীয় দিন খেলা বন্ধ ছিল।

এই খেলায় অষ্ট্রেলিয়াকে বেশ বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস (৮ উইঃ ডিক্লে) ২১৭ (রিচার্ডসন ৮১, পিটার মে ৭৩, কাউড্রে ২৫; মিলার ৬১ রাণে ৪ উইঃ আর্চার ৫১ রাণে ২ উইঃ জনসন ২৬ রাণে ১, ডেভিডসন ২২ রাণে ১)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ১৪৮ (নীল হার্ভে ৬৪, আর্চার ৩৩, লেকার ৫৮ রাণে ৪ উইঃ লক ৬১ রাণে ৩ উইঃ এপ্লাইড ১৭ রাণে ২ উইঃ)

ইংলণ্ডদ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ ডিক্লে) ১৮৮ (কাউড্রে ৮১ রিচার্ডসন ৭৩, মিলার ৫৮ রাণে ২ উইঃ আর্চার ৪৭ রাণে ১ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস (৩ উইঃ) ১২০ (বার্ক নট আউট ৫৮ পি বার্জ নট আউট ৩৫, লেকার ২১ রাণে ২ উইঃ লক ২৩ রাণে ১ উইঃ)

[অমীমাংসিত]

দ্বিতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ লর্ডস মাঠে। অষ্ট্রেলিয়া ১৮৫ রাণে ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। এখনো তিনটি খেলা বাকি, তবুও অষ্ট্রেলিয়ার এই জয়লাভ 'এ্যাসেস' পুনরুদ্ধারের পথে সহায়ক সন্দেহ নেই।

এই খেলাটিতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল অষ্ট্রেলিয়ার উইকেট

স্কিপিং-এর বিশ্বরেকর্ড প্রতিষ্ঠা। এই খেলায় ক্যান লুকে এবং ষ্ট্যাম্প করে আউট করেছেন ৯ জন খেলোয়াড়কে। ইতিপূর্ব্বে লেসলী এমস্ ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৮টি উইকেট লাভ করেছিলেন। লিণ্ডওয়াল ও ডেভিডসন ব্যতিরেকে এই জয়লাভ সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—২৮৫ (ম্যাকডোনাল্ড ৭৮, জিম বার্ক ৬৫, ম্যাকে ৩৮, আর্চার ২৮, বার্জ ২১, লেকার ৪৭ রাণে ৩, ষ্ট্যাথাম ৭০ রাণে ২ টম্যান ৫৪ রাণে ২ ও বেলী ৭২ রাণে ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—১৭১ (পিটার মে ৬৩, বেলী, কাউড্রে ২৩, মিলার ৭২ রাণে ৫ বিনাউড ১১ রাণে ৩, আর্চার ৪৭ রাণে ২ ও ম্যাকে ১৫ রাণে ১ উই)।

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—২৫৭, (বিনাউড ৯৭, মিলার ৩০, ম্যাকে ৩১, ম্যাকডোনাল্ড ২৬, টুম্যান ১০ রাণে ৫ ও বেলী ৬৪ রাণ ৪টি উইঃ)।

ইংলণ্ড দ্বিতীয় ইনিংস—১৮৬ (পিটার মে কাউড্রে ২৭ রিচার্ডসন ২১, ইভান্স ২০, মিলার ৮০ রাণে ৫ আর্চার ৭১ রাণে ৪ উইঃ)

[অষ্ট্রেলিয়া ১৮৫ রাণে বিজয়ী]

ফুটবল

কলকাতা মাঠের প্রথম ডিভিসন লীগ, শীল্ড নিয়েই কলকাতার ফুটবল আসরের উন্মাদনা। কিন্তু ইদানীং প্রথম ডিভিসন খেলার মাঝে এত গোলযোগ, দর্শকদের বললে ভুল বলা হবে, অন্ধ বিশ্বাসী দলগত সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলা ফুটবল ক্রীড়াঙ্গনের ঐতিহ্য ম্লান করে দিয়েছে। রেফারীর ভুল হওয়া হয়তো স্বাভাবিক, কিন্তু সমর্থকদের উচ্ছৃঙ্খলতা সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আর তার বিষময় ফল দেখা গেছে খেলোয়াড়দের মধ্যে। বি, এন রেল দলের খেলার বিরুদ্ধে আমাদের মতন অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে এইরূপ অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় ক্ষমার যোগ্য নয়। জয়-পরাজয়ের সীমা-রেখা টানা আছেই বলে পরাজয়ের গ্লানি বরণ করবো না। যেমন করে হোক, বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে অখেলোয়াড়ী মনোভাবের পরিচয় দেওয়া কোন খেলোয়াড়ের পক্ষেই শোভন নয়।

রেফারিং-এর সমস্যা একটি প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রেফারীদের খেলা পরিচালনা মোটেই আশাপ্রদ হচ্ছে না। প্রতিনিয়ত দৈনিক সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা আলোকপাত করেছেন। কলকাতার চারটি প্রধান ক্লাব আই, এফ এর নিকট পত্র প্রেরণ করেছেন। শোনা যাচ্ছে যে, সে পত্রের ভাষা নাকি আপত্তিকর। রেফারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ যা আনা হয়েছে, তা নাকি নিতান্ত অস্পষ্ট এবং এলোমেলো।

রেফারিং-এর যে সমস্যা কলকাতা মাঠে দেখা দিয়েছে তার আশু সমাধানের প্রয়োজন। আই, এফ কর্ত্তৃপক্ষ কেন যে এদিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন না তা ঠিক মত ভেবে পাচ্ছি না!

শোনা যাচ্ছে, কলকাতা মাঠে দু'মাসের জন্যে একজন প্রথম শ্রেণীর রেফারী ও কোচ নিয়োগ করা হবে। এখানেই স্বাভাবিক প্রশ্ন জাগে, কোচ এসে কি করবেন? নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেবেন রেফারীদের?

তাহলে যাঁরা এত দিন কলকাতা মাঠের খেলা পরিচালনা করছিলেন সেই সমস্ত রেফারীরা কি নিয়ম-কানুন জানতেন না?

রেফারিং শুধু নয়, আই এফ এর কাঠামো বদলাতে হবে। ঘুণ-ধরা বাঁশ দিয়ে কি ঘর তৈরী করা যায়? যায় না। যার অভ্যন্তর কলঙ্কময় সে কলঙ্ক মোচন করতে কাঠামো বদলাতে হবে। এ যেন হয়েছে বেশ করবো—করবো। নিতান্ত জিদ ছাড়া কিছু নয়।

এবারের ফুটবল খেলার মানও মোটেই আশাপ্রদ নয়। দু'-এক জন তরুণ খেলোয়াড়কে ভাল খেলতে দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ঠিক মত সহযোগিতার অভাবে তাঁরা ত মাঝে মাঝে অত্যন্ত আশাহীন খেলা খেলছেন। ইষ্টবেঙ্গল দল তাদের অবস্থা অনেক উঁচুর দিকে টেনে এনেছেন। এখন শক্তিশালী দল বলা যায় মোহঃ স্পোর্টিংকে। ভাল খেলোয়াড়পুষ্ট শক্তিশালী দলটির খেলা দেখে দর্শকরা আনন্দ উপভোগ করেন। মোহনবাগান দল প্রথম দিকে এক রকম ভালই খেলছিলো বলা যায়। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাদের খেলা ক্রমশঃ দর্শকদের হতাস করে দিচ্ছে। তার কারণ মোহনবাগান দলের তেমন কোন ভাল ফরওয়ার্ড নেই। প্রতিনিয়ত তাদের খেলোয়াড় বদল করতে হচ্ছে। এরিয়ান্স দল মোটামুটি ভালই খেলছেন বলা যায়। আর প্রথম ডিভিসনে নবাগত বালী প্রতিভা দলের খেলা সত্যই প্রশংসা পাবার দাবী রাখে। এই দলের প্রতিটি খেলোয়াড় বয়সে তরুণ এবং নিজস্ব দল হিসেবে খেটে খেলেন। এঁদের খেলার মধ্যে আছে ঐকান্তিকতা। যেটি খেলোয়াড়দের মধ্যে একান্ত প্রয়োজন। ইষ্টবেঙ্গল দলের খেলোয়াড় আমেদ আই. এফ. এ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। এবং আই. এফ. এ কর্ত্তৃপক্ষ এবারের মত ক্ষমা করেছেন এবং তাঁকে আবার খেলার অনুমতি দিয়েছেন।

*　*　*

আসন্ন অলিম্পিক হকি পর্য্যায়ের তালিকা ইতিমধ্যে রচিত হয়েছে। ষোলটি প্রতিযোগী দেশের মধ্যে ভারত শীর্ষস্থানে অবস্থান করছে।

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

কুড়ি

চোখ বুজেই শুয়েছিল স্বর্ণময়ী, ঘুমায়নি। চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে নিজের বিচিত্র ভাগ্যের কথাই ভাবছিল। কার অভিশাপে তার বিবাহিত জীবন এমনি বিড়ম্বিত হয়ে উঠলো? কেন ভাগ্য তাকে স্বামীর চরণতলে এতটুকু স্থানও দিল না? কেন ব্যর্থ হয়ে গেল এমনি করে তার দেহভরা রূপ-যৌবন ও মন-ভরা ভালবাসা? গত কয়েক দিন ধরে একটা অস্পষ্ট আশংকা কেবলই তার মনের মধ্যে এসে উঁকি দিচ্ছিল। তবে কি তার স্বামীর মন জুড়ে অন্য কেউ বসে আছে? তাই কি অভাগিনী সে স্বামীর মনের মধ্যে কোথাও এতটুকু ঠাঁই পেলে না? তার রূপ-যৌবন ভালবাসা ব্যর্থ হয়ে গেল!

না। না—নিশ্চয়ই সে রকম কিছু নয়। এ তার অহেতুক আশংকা। সে হয়ত স্বামীর মনের মত হতে পারেনি, তাই স্বামীর মনের মধ্যে তার ঠাঁই হলো না। দোষ তার স্বামীর নয়। তারই দুর্ভাগ্যের।

আচ্ছা একবার স্পষ্টাস্পষ্টি স্বামীকে জিজ্ঞাসা করবে কি? কিন্তু তক্ষুণি আবার মনে হয়, ছিঃ ছিঃ উপযাচিকার মত আবার সে স্বামীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবে? স্বামী ত স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, স্বর্ণময়ীর জন্য তার মনে কোন ঠাঁই নেই। লৌকিক সম্পর্কে এবং মন্ত্রের জোরে সে তার স্ত্রী হলেও স্বামী তাকে স্বীকৃতি দেন নি। এবং দেবেনও না কোন দিন।

দিও না তুমি! দিও না! তবু আমি জানবো, তুমিই আমার সব! তুমি আমাকে অস্বীকার করতে পারো কিন্তু আমার মন? তাকে তুমি রুখবে কেমন করে?

হঠাৎ এমন সময় বাইরে থেকে শাশুড়ির ডাক শোনা গেল, বৌমা!

ডাক শুনেই এস্তে উঠে বসলো স্বর্ণময়ী এবং তাড়াতাড়ি মেঝে থেকে মাদুরটা গুটিয়ে এক পাশে রেখে দিয়ে দরজা খুলে দিল।

মা! কি হয়েছে মা?

শেখর কি ঘুমাচ্ছে?

হাঁ মা।

আমার ঘরে এসো বৌমা!

বিস্মিত স্বর্ণময়ী নিঃশব্দে শাশুড়িকে অনুসরণ করে।

নিজের শয়নঘরে প্রবেশ করে পালঙ্কের উপরে উপবেশন করলেন সুরেশ্বরী, তারপর পুত্রবধূকে সস্নেহে হাত ধরে কাছে বসালেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্যে কেটে গেল। বিস্মিত স্বর্ণময়ী শাশুড়ির মুখের দিকে তাকায়। সমগ্র মুখখানা ব্যেপে যেন কি এক অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য থম-থম করছে!

বৌমা!

কেন মা!

কেন জানি না বৌমা, আমার মনে হচ্ছে রায়বাড়ির উপর একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। তাই আজ তোমাকে একটা কথা বলতে চাই বৌমা! যত বা[illegible] আগে রায়বাড়ির উপর দুর্যোগ এসেছে, প্রত্যেক বারই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রায়বাড়ির বৌরা।

মা!

ভয় পেয়ো না বৌমা! আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, কোন বিপদকেই তোমাকে স্পর্শ করতে দোবো না। কিন্তু তোমাকেও সেই সঙ্গে সাহসে বুক বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। মনে রেখো, শেখর আমার সন্তান হলেও তোমার স্বামী। আজ তার ভাল-মন্দ শুভাশুভের ভার আমার চাইতে তোমারই উপর বেশী। চরমতম দুঃখ বা লজ্জা যদি আসেই তাকে এড়িয়ে যাবার মধ্যে কোন গৌরব নেই—ভীরুর মত! অধিকার কেউ কাউকে হাতে তুলে দেয় না মা, নিজের গৌরবে তাকে অর্জন করে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়। এ-বাড়ির বধূরাণী ভানুমতীর কথা তুমি জান কি না জানি না। তার অধিকারকে তিনি প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি বলেই তাকে কৃষ্ণসায়রের অথৈ জলে মুখ লুকাতে হয়েছিল। তা যদি তিনি সেদিন না করতেন তবে হয়ত এ-বাড়ির অন্য দুটি বধূকে প্রাণ দিয়ে তার লজ্জার ঋণ শোধ করতে হতো না। এবারে শুতে যাও মা, এই কথাগুলো বলবার জন্যই তোমাকে আমি ডেকেছিলাম।

স্বর্ণময়ী গলায় আঁচল দিয়ে শাশুড়ির চরণে প্রণাম জানাতে জানাতে বললে, আশীর্বাদ করুন মা!

গভীর স্নেহে পুত্রবধূর মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সুরেশ্বরী বললেন, স্বামি-সোহাগিনী হও মা! স্বামি-সোহাগিনী হও।

ভারী মরচে-ধরা প্রকাণ্ড লোহার তালাটা চাবি দিয়ে খুলে পা দিয়ে লাথি মেরে বহুদিনকার বন্ধ গুমঘরের লোহার ভারী দরজায় কবাট দুটো খুলে শম্ভুচরণ সূর্যকান্তর গলায় একটা ধাক্কা দিয়ে গুমঘরের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার-গর্ভে ঠেলে দিল।

অতর্কিত ধাক্কায় টাল সামলাতে না পেরে অন্ধকারের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সূর্যকান্ত।

পরক্ষণেই সশব্দে পশ্চাতে লোহার ভারী দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল ও শম্ভুচরণের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মর শালা! এবারে অন্ধকারে পচে মর।

শম্ভুচরণের ধাক্কা খেয়ে সূর্যকান্ত যেখানে পড়েছিল সেটা একটা চত্বরের মত জায়গা। তারও নীচে চার ধাপ সিঁড়ির পরে ঘরের মেঝে।

অতর্কিতে সেই চত্বরের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে কয়েকটা মুহূর্ত সূর্যকান্ত নড়াচড়া করতেও যেন ভুলে যায়। অভাবনীয় পরিস্থিতিতে এমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল সূর্যকান্ত যে, সমস্ত চিন্তা ও বোধশক্তি যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে একটু একটু করে আবার মস্তিষ্কের মধ্যস্থিত কোষে কোষে স্বাভাবিক বোধশক্তিটা যখন সূর্যকান্তর ফিরে এলো, দেখলে দু'চক্ষু মেলে, সম্মুখে পশ্চাতে, ডাইনে বাঁয়ে, উর্ধে নীচে কেবলই অন্ধকার আর অন্ধকার! ছেদহীন হিমশীতল অন্ধকারের একটা প্রবাহ যেন চতুর্দিক থেকে এসে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন অবলুপ্ত করে দিয়েছে! বিরাট একটা হাঁ করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার যেন তাকে রাহুর মতই গ্রাস করেছে!

ধীরে ধীরে হাত দিয়ে অন্ধকারেই চারি দিক সে স্পর্শ করতে লাগল। ঠাণ্ডা পাথরের চত্বর। যুগ-যুগান্তের অন্ধকার যেন বোবা হয়ে আছে।

বন্দী! রাজশেখর রায়ের প্রপিতামহের তৈরী অন্ধকার গুমঘরে সে বন্দী হয়েছে!

এই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যেই তাকে জীবনের বাকী ক'টা দিনের প্রতিটি মুহূর্ত্ত, পল, শবরীর প্রতীক্ষায় মৃত্যুর পথ চেয়ে বসে থাকতে হবে?

কান পেতে মুহূর্ত্ত পল ও প্রহর গুণতে হবে। কবে মৃত্যু এসে তাকে এই অন্ধকার থেকে মুক্তি দেবে! অনিদ্রায় অনাহারে প্রতিটি মুহূর্তের নির্মম যন্ত্রণার পাষাণ গুরুভার তার সমস্ত চেতনা ও বোধশক্তির উপরে ধীরে ধীরে চেপে বসবে!

না। না—এমন করে সে মরতে পারবে না। তার আগেই সে পাগল হয়ে যাবে। তবে কি তার পূর্বে এ ঘরে যারা বন্দী হয়েছিল এই ভয়াবহ যন্ত্রণার পীড়নে পাগল হয়েই এই অন্ধকার কক্ষের দেওয়ালে দেওয়ালে মাথা খুঁটে মরেছে! নির্মম মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ করেছে!

ভয়ে আতংকে উঠে পড়ল সূর্যকান্ত। তার পরে অন্ধকারেই ঠাওর করে করে হাতড়ে হাতড়ে গোলাকার চত্তরটার চার পাশে অন্ধের মতই ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

নিরেট ঠাণ্ডা পাথরের দেওয়াল। কোথায়ও এতটুকু একটা খাঁজ নেই, একটা ছিদ্র পরিমাণ ফাঁক নেই। কিন্তু তথাপি কোথা থেকে আসছে একটা ঠাণ্ডা হিম বায়ুপ্রবাহ! ক্ষীণ, অতি ক্ষীণ।

একটি মাত্র লৌহদ্বার ছাড়া এ কক্ষে প্রবেশের কোন পথ নেই। তবু সূর্যকান্ত অন্ধকারে অন্ধের মত হাতড়ে হাতড়ে ফিরতে লাগলো।

সূর্যকান্ত জানত না যে সেই পাষাণ চত্তরের পরেই ঘরের মধ্যবর্তী মেঝে প্রায় চার হাত নিম্নে। এবং বর্ষাকালে কৃষ্ণসায়র যখন জলে টৈ-টম্বুর হয়ে ওঠে, মেঝের মধ্যস্থিত একটি প্রণালী-পথে জল এসে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে। এবং সেই প্রণালী-পথেই বাইরের হাওয়া কক্ষমধ্যে এসে প্রবেশ করে। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় চত্তরের শেষ সীমানা ঠাওর না করতে পেরে ঝুপ করে সেই নীচের মেঝেতে পড়ে গেল সূর্যকান্ত।

সামান্য জল-কাদা তখনও সেই মেঝেতে জমে ছিল, তারই মধ্যে গিয়ে ঝপাং করে পড়লো।

পুত্রবধূকে বিদায় দিয়ে সুরেশ্বরী নিঃশব্দ পদসঞ্চারে স্বামীর শয়ন-কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

ঘরের মধ্যে দীপাধারে মিটি-মিটি একটি প্রদীপ জ্বলছে। নিদ্রার পূর্বে বরাবর দেওয়ালগিরির আলোটা নিবিয়ে দিয়ে প্রদীপ জেলে শোওয়া রাজশেখরের অভ্যাস।

প্রদীপের মৃদু আলোয় দেখলেন শয্যার 'পরে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন স্বামী!

নিঃশব্দে আবার পা টিপে টিপে বের হয়ে এলেন স্বামীর শয়ন-কক্ষ থেকে। সমস্ত রায়বাড়ি ঘুমের মধ্যে যেন তলিয়ে গিয়েছে! সোজা সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এসে পা টিপে টিপে কাছারীঘরের দিকে চললেন।

কাছারীঘরের দরজাটা ভেজান ছিল। মৃদু হাতের ঠেলায় ভেজান দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

শূন্য কক্ষে মিট্-মিট্ করে জ্বলছে দেওয়ালগিরিটা। অদ্ভুত একটা আলো-ছায়ার কুয়াশা যেন সমস্ত ঘরটার মধ্যে থির-থির করে কাঁপছে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন সুরেশ্বরী, দেওয়ালের গায়ে লোহার সঙ্গে যেখানে ঝোলান ছিল গুমঘরের লোহার চাবিটা। হাত বাড়িয়ে চাবিটা তুলে নিলেন। তার পর নিজের ঘরে গিয়ে একটি প্রদীপ ও দেশলাই নিয়ে নিঃশব্দে এগিয়ে চললেন ছায়ার মত অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গুমঘরের দিকে।

গুমঘরের ভারী লোহার দরজাটার সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন, উত্তেজনায় অস্থিরতায় বুকের মধ্যে তখন ধুক্-ধুক্ করছে।

অন্ধকারেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলেন। তার পর চাবি দিয়ে দরজার তালাটা খুলে ফেললেন। কিন্তু কি ভারী লোহার দরজাটা! অনেকক্ষণ ঠেলবার পর ধীরে ধীরে দরজার কবাট দুটো ফাঁক হয়ে গেল।

ভিতরে প্রবেশ করে প্রথমেই দেশলাইয়ের সাহায্যে যে প্রদীপটি সঙ্গে এনেছিলেন সেটি জ্বালালেন। তার পর জ্বলন্ত প্রদীপ হাতে সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। সামান্য প্রদীপের ক্ষীণ শিখা, বর্ব-বর্ব সঙ্কীর্ণ কক্ষের সেই অন্ধকার যেন গ্রাস করে নিতে চায়!

চাপা গলায় ডাকলেন, কে? কে আছো ঘরের মধ্যে? এসো। তাড়াতাড়ি চলে এসো।

কিন্তু কই! কেউ ত সাড়া দেয় না?

প্রদীপ হাতে ধীরে ধীরে চত্তর দিয়ে এবারে এগিয়ে এসে চত্তরের শেষ সীমানায় দাঁড়ালেন। হাতের প্রদীপটা উঁচু করে তাকালেন নীচের দিকে। নীচে কেউ আছো কি? তবে তাড়াতাড়ি চলে এসো।—

নিয়ে জলের মধ্যে মেঝেতে দণ্ডায়মান সূর্যকান্ত যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারে না!

এ কি স্বপ্ন! না সত্যি!

নিশ্চিত মৃত্যুর অন্ধকারে ও কিসের আলো? না, জেগে জেগেই সে স্বপ্ন দেখছে! মিথ্যা মরীচিকার মায়া! এখুনি কাছে যেতে গেলে তো মিলিয়ে যাবে!

আবার সুরেশ্বরীর কোমল কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে নীচে আছো, উঠে এসো! দেরি করো না।

সূর্যকান্ত আবার সাড়া দেয়, কে?

কে? কে তুমি? কোথায়?

কিন্তু আমি কেমন করে উঠবো?

পারবে না? উঠতে পারবে না?

হঠাৎ এমন সময় সেই ক্ষীণ আলোয় সূর্যকান্তর নজরে পড়ে, সিঁড়ির ধাপ উপরে উঠে গিয়েছে। একটা দিন ও একটা রাত ঘুরে ঘুরে ও যেটার হদিশ পায়নি সে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বলে, পেয়েছি, পেয়েছি।

সেই সিঁড়ি দিয়েই সূর্যকান্ত উঠে আসে এবারে উপরে। সামনের দিকে তাকাতেই যেন তার দুটি চক্ষুর দৃষ্টি মুগ্ধ-বিস্ময়ে পলকহারা হয়ে যায়।

আগন্তুকার হস্তধৃত প্রদীপালোকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে সূর্যকান্ত যেন বোকা হয়ে গিয়েছে!

দেবী প্রতিমার মতই একখানি মুখ। ছোট কপালের প্রান্ত স্পর্শ করে রয়েছে গরদের শাড়ীর লাল চওড়া পাড়টি, দুটি ভ্রূর মধ্যস্থলে রক্ত সিন্দুরের গোলাকার টিপটি। মুখাবয়বের মধ্যে যেন একাধারে প্রীতি, স্নেহ, ক্ষমা, সান্ত্বনা নির্ভয় সব কিছু ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ সূর্যকান্তর যেন কি হলো, নীচু হয়ে সুরেশ্বরীর চরণপ্রান্তে মাথাটা লুটিয়ে দিয়ে ডেকে উঠলো মা!

ওঠো! ওঠো—আর দেরি করো না। জানতে পারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। চল আমার সঙ্গে তাড়াতাড়ি, তোমাকে খিড়কীর দরজা-পথে প্রাসাদের বাইরে বের করে দেবো।

গুমঘরের দরজা বন্ধ করে সূর্যকান্তকে সঙ্গে নিয়ে সুরেশ্বরী বহির্মহল অতিক্রম করে অন্দর মহলের দিকে যেমন পা বাড়াবেন, রাত-জাগা সতর্ক প্রহরীর সাবধানী কণ্ঠস্বর শোনা গেল, কে?

চকিতে সূর্যকান্তকে আকর্ষণ করে সুরেশ্বরী অলিন্দের বিরাট একটা থামের আড়ালে আত্মগোপন করলেন।

প্রহরীর পদশব্দ শোনা গেল। এই দিকেই সে আসছে। প্রহরী সেই থামটার পাশ দিয়ে চলে গেল কিন্তু থামটার অন্য দিকে সূর্যকান্ত ও সুরেশ্বরী আত্মগোপন করে থাকায় তাদের দেখতে পেল না।

প্রহরীর পদশব্দ অলিন্দের অপর প্রান্তে মিলিয়ে যাবার পর সুরেশ্বরী আবার অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন।

সূর্যকান্ত তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করলো।

অন্দর মহলে প্রবেশ করে সুরেশ্বরী যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

কাল থেকে ত কিছু খাও নি। ক্ষুধা পায়নি? সুরেশ্বরী প্রশ্ন করলেন সূর্যকান্তকে।

সূর্যকান্ত তখন অন্য কথা ভাবছিল। কে এই দয়াবতী মহিলা? আর কেনই বা তাকে এমনি করে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন? এখনো যেন সমস্ত ব্যাপারটা তার স্বপ্নের মতই বলে মনে হচ্ছে। সত্যি সত্যিই স্বপ্ন নয়ত?

এখানে একটু দাঁড়াও। ভয় নেই তোমার, এখুনি আমি আসছি। সুরেশ্বরী ভাঁড়ার ঘরের দিকে চলে গেলেন।

সূর্যকান্ত সেইখানে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই সুরেশ্বরী ফিরে এলেন হাতে একটা ছোট্ট পুঁটলী নিয়ে। সূর্যকান্তর দিকে সেই পুঁটলিটা এগিয়ে দিতে দিতে বললেন, এর মধ্যে কিছু খাবার আছে, বাইরে গিয়ে খেও, চল, তোমাকে বাইরে রেখে আসি।

খিড়কীর দ্বার খুলে সুরেশ্বরী সূর্যকান্তর দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, যত তাড়াতাড়ি পারো এ তল্লাট ছেড়ে একেবারে চলে যাও। একবার যদি উনি টের পান যে তোমাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি, যেমন করেই হোক তোমাকে হয়ত ধরে আনবে। যাও! রাত শেষ হতে আর বেশী দেরি নেই। আলো ফুটে উঠবার আগে যত দূর পারো পালিয়ে যাও।

সূর্যকান্ত আর একবার মনে মনে সুরেশ্বরীর পায়ে প্রণাম জানিয়ে সম্মুখের অন্ধকারে এগিয়ে গেল। কিছুদূর এগুবার পর পিছন দিকে একবার ফিরে তাকাতে দেখলো, প্রদীপ হাতে তখনো সেই মহিলা খিড়কীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

আরামকুটিরের কাছাকাছি কৃষ্ণসায়রের তীরে এসে দাঁড়াল সূর্যকান্ত। দুই রাত্রির ও একটি দিনের নিদারুণ বিপর্যয়ে ক্ষুধার ক্লান্তিতে দেহ এমন অবসন্ন যে, সে আর যেন চলতে পারে না, তবু আরো খানিকটা এগিয়ে কৃষ্ণসায়রের তীরবর্তী কাশবনের প্রান্ত ঘেঁসে মাটিতে বসে পড়ল।

কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সুরেশ্বরীর দেওয়া পুঁটলিটা খুলে দেখলে, তার মধ্যে কিছু মিষ্টান্ন রয়েছে। সমস্ত মিষ্টান্নগুলো গোগ্রাসে উদরসাৎ করে, কৃষ্ণসায়র থেকে অঞ্জলি পুরে তৃষ্ণা নিবারণ করে আবার এসে সে পূর্বস্থানে উপবেশন করল।

রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। রাত-বিদায়ী আকাশের গায়ে লেগেছে প্রথম আলোর প্রলেপ।

একুশ

তার পর এলো সেই দুর্যোগময়ী সর্বনাশা রাত্রির প্রথম প্রহর!

বিকাল থেকেই আকাশের পশ্চিম কোণে এক টুকরো কালো মেঘ দেখা দিয়েছিল, ক্রমে সেই এক টুকরো মেঘ যেন শত শত কালো বাহু মেলে বিরাটকায় এক কৃষ্ণদৈত্যের মত সমস্ত আকাশটাকেই গ্রাস করে ফেলতে উদ্যত হলো। দিগন্তপ্রসারী কৃষ্ণসায়রের জলের বুকে আকাশের সেই কালো মেঘের ছাপ যেন ভয়াবহ এক দুর্যোগের সংকেতে লক্ষ লক্ষ ঢেউ তুলে নেচে নেচে বেড়াতে লাগলো। কৃষ্ণসায়রের তীরে তীরে কাশ আর বেতস-বন হাওয়ায় লুটোপুটি করতে শুরু করে।

কাছারীঘরে রাজশেখর রায় পায়চারী করছিলেন ধীরে ধীরে। অদূরে দাঁড়িয়েছিল পাইক শম্ভুচরণ ও রাঘব নিঃশব্দে। দ্বিপ্রহরের

দিকেই মোকিমপুর থেকে দ্রুতগামী ছয় কাহার-বাহিত পাল্কী এসে গিয়েছে।

পরিকল্পনা মত সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত।

রাজশেখর রাঘবের দিকে তাকিয়ে বললেন, যা বললাম মনে থাকে যেন। রাত ঠিক এগারটায় পাল্কী নিয়ে তুই সোজা আরামকুটিরে চলে যাবি। কুম্ভ সর্দারকে আমার সব বলা আছে। আমি আর শম্ভু ঠিক সোয়া এগারটা থেকে সাড়ে এগারটার মধ্যেই সেখানে পৌঁছাবো।

বাইরে এমন সময় প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো, প্রবল হাওয়ার ঝাপটায় কাছারীঘরের জানালার কবাটগুলো সশব্দে এসে দেওয়ালের গায়ে আঘাত হানলো।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে জানলার কবাটগুলো বন্ধ করতে করতে শম্ভুচরণ বলে, আকাশ একেবারে কালো হয়ে গেছে হুজুর! ভীষণ ঝড় আসছে।

ঝড় দুর্যোগ যতই হোক না কেন, নীলকুঠীতে পাল্কী যাবেই সওয়ারী নিয়ে, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন রাজশেখর শম্ভুচরণের কথার প্রত্যুত্তরে। তার পর রাঘবের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই যা রাঘব, যেমন বলেছি ঠিক সেই সময়ে কাহারদের নিয়ে পাল্কী নিয়ে বের হয়ে যাবি।

ঠিক আছে হুজুর! রাঘব নত হয়ে সেলাম জানিয়ে কাছারী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

নিজের শয়ন-কক্ষের জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছিল শশাঙ্ক। বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-জল শুরু হয়েছে। তা হোক, অশ্বশালায় দ্রুতগামী অশ্ব সে প্রস্তুত করেই রেখে এসেছে। রাত ঠিক দশটা নাগাদ বের হয়ে পড়বে সে স্থির করে রেখেছে। এক পক্ষে এই ঝড়-জল ভালই হলো। ঝড়-জলের মধ্যে কেউ টের পাবে না। নির্বিঘ্নে সে চন্দ্রাকে নিয়ে এখান থেকে পালিয়ে যেতে পারবে।

তার পর সে আর চন্দ্রা! নিভৃতে কোন ছোটখাটো একটা শহরে গিয়ে বাঁধবে একখানি নিরালা শান্তির নীড়। কিন্তু তবু গত রাত থেকে মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা অস্বোয়াস্তির কাঁটা খচ-খচ করছে।

মুদ্রিত চক্ষু একখানি মুখচ্ছবি বার বার যেন মনের পাতায় ভেসে ভেসে উঠছে।

প্রশান্ত একখানি মুখ। দুটি মুদ্রিত চক্ষু নিবিড় নিশ্চিন্তে।

ঝড় ও জলের ঝাপটায় জানালার কবাট কেঁপে কেঁপে ওঠে। মধ্যে মধ্যে মেঘের বজ্র হুংকার। বিদ্যুতের অগ্নি-ইসারা। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে যেন চলেছে তাণ্ডবের লীলা!

তানপুরাটা বক্ষের কাছে নিবিড় করে ধরে মেঘমল্লার আলাপ করছিলেন দবীর খাঁ। বহিঃপ্রকৃতির তাণ্ডবের সঙ্গে যেন তার অন্তরেও আজ জেগেছে সুরের তাণ্ডব! প্রথম যৌবনের একটা এমনি মেঘ মেদুর দুর্যোগ রজনীর স্মৃতি দবীর খাঁর মানসপটে ভেসে ওঠে।

তিনি ধরেছিলেন আজকের মতই সেদিনও মেঘমল্লার। আর ঘরের মধ্য ময়ূরীর মতই নৃত্যের পেখম মেলেছিল যেন লক্ষী বাঈ।

শুনতে পাচ্ছেন যেন সেই নূপুরের মদোন্মত্ত ঝঙ্কার। বাইরে দুর্যোগময়ী রজনী মত্ত হাহাকারে কেঁদে কেঁদে সে রাতেও এমনি ফিরছিল।

দর্পণের সামনে দাঁড়িয়ে কেশ রচনা করছিল আরামকুটিরে চন্দ্রা। শেখরের কথাই ভাবছিল।

ভাবছিল আজ আসবে কি তার শেখর? গত রাত্রে আসেনি যখন নিশ্চয়ই আজ রাত্রে সে আসবে। একটি রাতও যে তাকে না দেখে সে থাকতে পারে না। আসবে সে! নিশ্চয়ই আসবে। যতই দুর্যোগ হোক, সে আসবেই। চন্দ্রার মনই যে বলছে সে আসবে। কবরী নয়, রচনা করেছে চন্দ্রা সাপের মতই দীঘল বেণী। সেদিন বলেছিল শেখর তার বহু যত্নে রচিত কবরী খুলে দিতে দিতে, কবরী নয় চন্দ্রা, তুমি প্রত্যহ রচনা করো বেণী।

সকৌতুকে প্রশ্ন করেছিল চন্দ্রা, কেন বল ত?

বেণীই তোমার কেশে শোভা পায়, কবরী নয়। আর তা যদি না হয়ত মুক্ত রেখো তোমার কেশ। কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ কেশ—সেই যে সেই রূপকথার রাজকন্যার মত।

তাই আজকাল রাত্রে সন্ধ্যার সরযুর হাতে তৈরী কবরী খুলে ফেলে প্রত্যহ রচনা করে চন্দ্রা বেণী।

বাইরে চলেছে তখন প্রচণ্ড ঝড়ের মত্ত হাহাকার।

সন্ সন্ বায়ু, ঝর ঝর অঝোর ধারায় বৃষ্টি! থেকে থেকে চমকে উঠছে আকাশ বিদ্যুতের কশাঘাতে।

হঠাৎ দর্পণে সরযুর ছায়া পড়তেই চমকে ফিরে তাকালো চন্দ্রা, সরযু!

সরযুর চোখে-মুখে একটা যেন ভীতির বিহ্বলতা!

কি হয়েছে সরযু!

বাইরে কি ভয়ানক দুর্যোগ!

কেন! ভয় পেয়েছো না কি? দুর্যোগ, তাতে হয়েছে কি? হেসে ফেলে চন্দ্রা।

না। তাই বলছি।

ভয় করে ত ঘরে খিল দিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকো। হাসতে হাসতে চন্দ্রা বলে।

সরযু চন্দ্রার পরিহাসে কান দেয় না। বলে, তা নয়। তোকে একটা কথা বলতে এসেছি চন্দ্রা!

বিস্মিত চন্দ্রা সরযুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি?

দুপুরে রাজশেখর রায়ের লোক এসেছিল?

হঠাৎ! পরশু রাত্রে ত বলছিলি তিনি এসেছিলেন। তবে আবার আজ দুপুরে—

হাঁ, আমাকে আদেশ দিয়ে পাঠিয়েছেন তোকে প্রস্তুত করে রাখতে।

প্রস্তুত করে রাখতে? তার মানে?

আজ রাত্রেই—বলতে বলতে সরযু হঠাৎ যেন থেমে যায়।

কি! আজ রাত্রেই কি!

এখান থেকে অন্যত্র কোথায় না কি তিনি তোকে নিয়ে যাবেন। বলে পাঠিয়েছেন, পাল্কী নিয়ে স্বয়ং তিনি রাত সাড়ে এগারটায় আসবেন।

এই কথা! এ কথা তুমি এতক্ষণ আমাকে জানাওনি কেন সরযু!

তোমাকে একথা জানাতে একেবারেই আমাকে নিষেধ করেছিলে কিন্তু—

চন্দ্রা স্তব্ধ হয়ে কয়েকটা মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। দ্রুত ত মনের মধ্যে অসংখ্য চিন্তা আনাগোনা করতে থাকে। এর অ কি! রাজশেখর রায় হঠাৎ এভাবে তাকে এস্থান থেকে অন্য স্থানান্তরিত করতে চান কেন? আর কি উদ্দেশ্যেই বা তা স্থানান্তরিত করতে চান? তবে কি! তবে কি শেখরের সঙ্গে তা গোপন সম্পর্কের কথাটা রাজশেখর রায় জানতে পেরেছেন? আ তাই কি তাকে এই ভাবে সরিয়ে দিতে চান অন্য কোথাও শেখরে নাগালের বাইরে? কিন্তু আজ তা যদি ভেবে থাকেন ত ভু করেছেন। আজ আর সে নিরীহ অসহায় বালিকামাত্র নয়। তার নিজের একটা সত্তা আছে।

চন্দ্রা! সরযুর ডাকে চন্দ্রা হঠাৎ চমকে ওর মুখের দিকে তাকাল। তারপর মৃদু ভাবে মাথা নেড়ে বললে, তা হবে না সরযু!

কি হবে না? ভয়ে ভয়ে সরযু চন্দ্রার মুখের দিকে তাকায়।

তোমার রাজশেখর রায় যা ভেবেছেন, তা হবে না। আমি তার ইচ্ছামত যে আজ তার আনীত পাল্কীতে গিয়ে উঠে বসবো, তা যদি তিনি ভেবে থাকেন ত ভুল করেছেন।

চন্দ্রা! চন্দ্রা—

না সরযু! অনেক দিন ধরেই তিনি আমার জীবনের ভাগ্য-বিধাতা হয়ে আমাকে নিয়ে যা ইচ্ছা তার তেমনি করেছেন। অকারণ এই ভাবে বন্দিনী করে রেখেছেন। কিন্তু আর তার সে যথেচ্ছাচারকে আমি মেনে নেবো না। আমি যাবো না।

অবুঝ হয়ো না চন্দ্রা!

অবুঝ!

হাঁ, তাই। তুমি তাকে জানো না, তাই এত বড় দুঃসাহসের কথা বলছো।

সাহস কি দুঃসাহস আমি জানি না সরযু! তবে এ-ও তুমি জেনে রেখো, আজ রাত্রে যদি সেই চরম মীমাংসার মুহূর্ত এসেই থাকে ত তার জন্য আমিও প্রস্তুত। আজকের চন্দ্রা সেই আট বছর আগেকার অসহায় বালিকা নয় যে, রাতারাতি তাকে ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় নিয়ে যাবেন তাঁর ইচ্ছা, তাঁর খুশি মত।

না। না চন্দ্রা, অমন কাজও করিস না।

তুমি যাও সরযু, তোমার ঘরে গিয়ে শুয়ে থাকগে নিশ্চিন্দি। যা করবার আমিই করবো। আগে না বলে এখন বলেও শেষ পর্যন্ত তুমি আমার উপকারই করেছো। আমি প্রস্তুত হয়েই থাকবো।

ভয়ে আশংকায় সরযুর বুকের মধ্যে কাঁপুনি শুরু হয়। সে কি করবে, কি বলবে যেন ভেবে পায় না।

ভয় নেই সরযু! তুমি তোমার রাজাবাবুর আদেশ মত কর্তব্য করো, আমি আমার যা করবার করবো। আমার জন্য তুমি চিন্তা করো না। যাও, নিজের ঘরে যাও।

সরযু চন্দ্রার মুখের দিকে তাকায়। ঘরের প্রদীপের আলোয় সে মুখের মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা সুস্পষ্ট দেখতে পায়।

চন্দ্রা, লক্ষ্মী, আমার কথা শোন! হয়ত রাজাবাবু যা করছেন তোর ভালোর জন্যই—

হাঁ, আমার ভালর জন্যই—এত কাল আমাকে অজ্ঞাত অপরিচয়ের অন্ধকারে বন্দিনী করে রেখেছেন। আজ পর্যন্ত জানতে দেননি, কে আমি, কি আমার পরিচয়! কি জাত, কি গোত্র, কার ঔরসে, কার গর্ভে আমার জন্ম। মহৎ, দয়ালু তোমার রাজাবাবু সরযু! অনেক ভালই তিনি আমার করেছেন কিন্তু আর ভাল তাঁর আমি চাই না। এবারে আমার নিজের ভাল আমি নিজেই দেখো নেবো। মরতেও যদি হয়, তবু আজ শেষ বোঝাপড়া আমার তাঁর সঙ্গে আমি করবোই।

পারবি না। ওরে পারবি না, লক্ষ্মীটি শোন আমার কথা। সে তোকে নিয়ে যাবেই। শুধু মাঝখান থেকে—

নিয়ে যাবেনই, তাই না! যদি তাই হয়, তবে জেনো সরযু, চন্দ্রাকে নয়, নিয়ে যাবেন তোমার রাজাবাবু চন্দ্রার প্রাণহীন দেহটাকেই।

চন্দ্রা! একটা আর্ত চীৎকার করে ওঠে সরযু।

ভয় নেই! মরতে আমিও চাই না। আর ইচ্ছাও নেই। এত দিন ত মরেই ছিলাম, তাই এবারে বাঁচতে চাই। আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে যাই সরযু, এত দিন তোমার রাজাবাবুর অত্যাচার নীরবে কি করে সহ্য করেছি! আজ আমার শরীরের সমস্ত রক্ত যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমনি করে তীব্র প্রতিবাদে আমার ধমনীতে শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত তুলেছে, এত কাল সে রক্ত ঘুমিয়ে ছিল কি করে? শেষের দিকে চন্দ্রার কণ্ঠস্বর কি এক আবেগে যেন কাঁপতে থাকে।

নির্বাক-বিস্ময়ে শুধু সরযু তাকিয়ে থাকে চন্দ্রার মুখের দিকে। বাইরে ঝড়-জলের প্রচণ্ড ভয়াবহ নিষ্ঠুরতা যেন প্রকৃতিকে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে বিদীর্ণ করে চলেছে, ঘরের মধ্যে প্রদীপ-শিখাটা থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

নিজের ছোট্ট ঘরটার মধ্যে প্রজ্বলিত কাঠের চুল্লীটার গণ-গণে আগুনের উপরে ভাতের হাঁড়িটা চাপিয়ে কুম্ভ সর্দার চুপ-চাপ একাকী বসে ছিল।

এই দুর্যোগে কি পাল্কী আসবে, আসবেন কি রাজাবাবু!···

ঘরের দরজার ঝাঁপটা প্রচণ্ড হাওয়ার দাপটে থেকে থেকে মড়-মড় করে শব্দ তুলছে। ভেঙ্গে পড়তে চায় বুঝি।

নিজের চিন্তায় কুম্ভ সর্দার এমন নিশ্চিন্ত হয়ে ছিল যে, দরজার সেই ঝাঁপ ঠেলে একটি দীর্ঘ মনুষ্য মূর্তি হাতে তীক্ষ্ণ একটা বর্শা নিয়ে যে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করছে, সে টেরও পেল না ঘুণাক্ষরে। আগন্তুকের চোখে-মুখে একটা ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরতা যেন হিংস্র দানবের ক্ষুধায় জেগে উঠেছে, আগন্তুক আর কেউ নয়, সূর্যকান্ত।

পা টিপে-টিপে সূর্যকান্ত পশ্চাৎ দিক থেকে এসে হাতের তীক্ষ্ণ বর্শাটা সমূলে দেহের সমস্ত শক্তি যেন হাতের কব্জীতে এনে চুল্লীর সামনে পিছন ফিরে উপবিষ্ট কুম্ভ সর্দারের পৃষ্ঠে গেঁথে দিল।

একটা আর্ত চিৎকার করে কুম্ভ সর্দার লুটিয়ে পড়লো মাটিতে। রক্তে মাটি ভিজে গেল।

ক্ষিপ্র হস্তে কুম্ভ সর্দারের কটিদেশ থেকে আরাম-কুটিরের বাইরের দরজার তালার চাবিটা বের করে নিয়ে সূর্যকান্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল। ঝাঁপটাকে ভাল করে বাইরে থেকে এঁটে দিয়ে পরমুহূর্তেই আরাম-কুটিরের সদর দরজায় তালা-চাবি দিয়ে খুলে দরজাটা ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। সৌভাগ্য সূর্যকান্তর, আগে থাকতেই রাজশেখরের আগমনের আশায় সরযূ দরজার ভিতরের অর্গল খুলেই রেখেছিল সে রাত্রে।

উত্তেজনায় সূর্যকান্তর সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। আর সেই উত্তেজনাতেই ভুলে গেল পশ্চাতের দ্বার বন্ধ করবার কথাটা। অন্ধকারে সে এগিয়ে চলেছে তখন অপরিচিত আরাম-কুটিরের মধ্যে।

বাইরে প্রচণ্ড ঝড়-জল। তা হোক, তবু তাকে এর মধ্যেই বের হতে হবে। বহির্মহল অতিক্রম করে শশাংক অশ্বশালার মধ্যে এসে প্রবেশ করলো, এতটা দীর্ঘপথ একেবারে নিরস্ত্র যাওয়া নিরাপদ নয়, তাই আসবার সময় ম্যাগাজিনে গুলী ভরে বন্দুকটাও সে সঙ্গে এনেছে।

দূর থেকে কাছারীঘরের আলোটা দেখা যাচ্ছে, বহির্বাটী অতিক্রম করবার সময় ওস্তাদজীর কক্ষের পাশ দিয়ে আসতে আসতে কানে এসেছিল, ওস্তাদজী মেঘমল্লার আলাপ করছেন।

বন্দুকটা কাঁধে ঝুলিয়ে লাফিয়ে অশ্ব-পৃষ্ঠে আরোহণ করল শশাংক। শিক্ষিত অশ্ব লাগামের ইংগিত পেয়েই সেই ঝড়-জল উপেক্ষা করেই এগিয়ে চলল। উঃ, কি হাওয়া! কি বৃষ্টি!

ফটক পার হয়ে একবার নিজের শয়ন-কক্ষের দিকে উর্ধে দৃষ্টি-পাত করল শশাংক। স্বর্ণময়ী এখনো শয়ন-ঘরে আসেনি। আর একটু পরেই হয়ত আসবে পুজা-ঘরের কাজ সমাপ্ত করে।

বিদায় স্বর্ণময়ী! বিদায়!

অতিকষ্টে সেই ঝড়-জলের মধ্যে এগিয়ে চললো শশাংক আরাম-কুটিরের দিকে, কাছারী-ঘরে তখন আসন্ন নিশি অভিসারের জন্য রাজশেখর রায় প্রস্তুত হচ্ছেন।

পুজা-ঘরে গোপীবল্লভের বিগ্রহের সামনে চক্ষু মুদে সুরেশ্বরী ধ্যানস্থ ছিলেন। পাশে বসে পুত্রবধূ স্বর্ণময়ী পুজারতির পঞ্চপ্রদীপটা পরিষ্কার করছিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় পুজা-ঘরের দ্বারটা খুলে গেল ও যেন একটা ফুৎকারে ঘরের প্রদীপটা দপ করে নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই স্বর্ণময়ীর হাত থেকে পঞ্চপ্রদীপটা ঠং করে পাথরের মেঝেতে পড়ে গিয়ে শব্দ তুলল।

ঘর নিমিষে নিশ্ছিদ্র আঁধারে ভরে গেল।

আচমকা সেই শব্দে ধ্যান ভঙ্গ হওয়ায় চোখ খুলে শংকিতা সুরেশ্বরী প্রশ্ন করলেন, কি, কি হলো বৌমা?

প্রদীপটা পড়ে গেল মা!

তার ঠিক সেই মুহূর্তে কাছারী-ঘরে দেওয়ালে টাংগানো রত্নেশ্বর রায়ের এনলার্জ ছবিটা মেঝেতে পড়ে গিয়ে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে তার কাচটা চুরমার হয়ে গেল।

ভূপতিত ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন রাজশেখর রায়।

রায়-বাড়ির পেটা-ঘটিতে ঢং ঢং করে রাত্রি দশটা ঘোষণা শুরু হলো।

এই ঝড়-জলের মধ্যে শেখর এলে পাছে সে তার ডাক না শুনতে পায়, তাই বার বার চন্দ্রা ঘর আর ছাদ করছিল।

হঠাৎ এক সময় মৃদু পদশব্দ পেয়ে সামনের দিকে তাকাতেই ওর চোখের দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেল।

খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সূর্যকান্ত! দরজার উপর দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছে সূর্যকান্ত!

বোবা হয়ে গিয়েছে যেন একেবারে চন্দ্রা!

অবাক হয়ে গিয়েছো চন্দ্রা দেবি, তাই না? এই ঝড়-জলের রাত্রে! শেখরের অপেক্ষায়ই বুঝি জেগে আছো? কিন্তু এই ঝড়-জলের মধ্যে কি আর সে আসবে? আর তাই বা বলি কেন, এ জীবনেও সে আর তোমাকে দর্শন দেবে না জেনো।

পায়ে পায়ে সূর্যকান্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে থাকে। চোখে-মুখে একটা নিষ্ঠুর উল্লাস। একটা হিংস্র নিষ্ঠুরতা।

সূর্যকান্ত আবার বলতে থাকে, হাঁ, আর সে আসবে না। সে পথে চিরজন্মের মতই আমি কাঁটা দিয়ে এসেছি। সব বলে দিয়েছি তার বাপের কাছে। তার ও তোমার গোপন নিশি অভিসারের সব কথা। সে হয়ত এখন তোমারই মত রায়বাড়ির কোন এক কক্ষে বন্দী!

নির্বাক তাকিয়ে থাকে শুধু চন্দ্রা সূর্যকান্তর মুখের দিকে।

সূর্যকান্ত তখনো বলে চলেছে, আর কেনই বা মিথ্যা তাকে নিয়ে টানাটানি করছো? বিবাহিত সে। ঘরে তার সুন্দরী স্ত্রী। এতক্ষণে হয়ত সেই স্ত্রীকে নিয়ে সে সুখশয্যায়—তার চাইতে চলো আমার সঙ্গে।

ঘটনার গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিল চন্দ্রা মনে মনে, ধৈর্য বা সাহস হারালে চলবে না। খুব সন্তর্পণে যা করবার করতে হবে। তাই সে ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, কোথায়?

কোথায়? যেখানে তুমি বলবে সেইখানেই নিয়ে যাবো।

যেখানে আমি যেতে চাইবো সেইখানেই নিয়ে যাবে? কিন্তু এই ঝড়-জলের মধ্যে যাবে কি করে সূর্যকান্ত!

ঝড় জল! কি বলছো চন্দ্রা! আকাশ যদি আজ ভেঙ্গেও পড়ে তবু ডরাই না আমি। বুকের ভিতরে জাপটে ধরে তোমাকে আমি নিয়ে যাবো।

সত্যি তুমি আমাকে এত ভালবাসো সূর্যকান্ত!

ভালবাসি! তুমি ত জান না চন্দ্রা, আজ নয় প্রথম কৈশোর থেকে তোমাকে ঘিরে আমার ভালবাসা তিল তিল করে এই বুকের মধ্যে জমে উঠেছে। এই বুকটার মধ্যে যদি কিছু থাকে ত সে তুমি! চন্দ্রা তুমি!

সূর্যকান্ত! সত্যি—সত্যি বলছো! সত্যি তুমি আমাকে এত ভালবাসো?

কিন্তু চন্দ্রার মুখের কথা শেষ হলো না। সহসা যেন খোলা দরজার উপরে বজ্রপাত হলো।

বাঃ, বাঃ! চমৎকার! অপূর্ব!

শশাংকর কণ্ঠস্বর শুনে যুগপৎ দু'জনেই চন্দ্রা ও সূর্যকান্ত চমকে খোলা দরজার দিকে তাকায় ততক্ষণে। ঠিক দরজার উপরে ইতিমধ্যে কখন এসে যে শশাংক দাঁড়িয়েছে, দু'জনের একজনও টের পায়নি। সর্বাঙ্গ ভিজে সপ সপ করছে শশাংকর। বৃষ্টিভেজা চুলগুলো কপালের উপর এসে লেপটে গিয়েছে। চোখে-মুখে অসংখ্য জলকণা! ডান হাতের মুষ্টিতে ধরা বন্দুকের ইস্পাতের ব্যারেলটা। সমস্ত দেহটা যেন কঠিন ধারালো একটা খাপমুক্ত তরবারির মত ঋজু তীক্ষ্ণ অনিবার্য।

অস্ফুট আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে চন্দ্রা, শেখর! শেখর!

বড় অসময়ে এসে পড়েছি চন্দ্রা, তাই না?

শেখর—

ভাবতে পারোনি যে, এই দুর্যোগের রাতেও আমি আসতে পারি, তাই না?

শেখর—

কি! কি বলবে সুন্দরি! সে সব মিথ্যা! সব ভাণ! কিন্তু মিথ্যাই হোক আর ভাণই হোক, সব কিছুর সমাপ্তি আজই করবো আমি। বলতে বলতে বন্দুকটা হাতে তুলে নেয় শশাংক। এবং প্রথমেই সূর্যকান্তর দিকে চেয়ে বলে, সূর্যকান্ত! সেদিন তোমাকে আমি প্রাণভিক্ষা দিয়েছিলাম কিন্তু আজ আর দেবো না! কিন্তু তোমার বিচার পরে—আগে ঐ স্বৈরিণীকে শেষ করি।

তারপর তুমি—

সহসা এমন সময় একটা ভয়ার্ত চিৎকার শোনা গেল সরযূর কণ্ঠে বাইরের অলিন্দ থেকে, চন্দ্রা! চন্দ্রা!

চকিতে শশাংক ঘুরে দাঁড়াল। এবং চক্ষুর পলক ফেলতে না ফেলতে সরযূ ছুটে এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চন্দ্রাকে দুহাতে আগলে ধরলো।

পশ্চাতে সিঁড়িতে তখন দ্রুত একটা পদশব্দ।

সেই পদশব্দ লক্ষ্য করে শশাংক তাকিয়ে দেখে, বাঘের মতই যেন বন্দুক হাতে ছুটে আসছেন তার পিতা রাজশেখর রায়!

কিন্তু ততক্ষণ শশাংক নিজেকে সামলে নিয়েছে। এবং এক লাফে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে আবার চন্দ্রাকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলেছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দপ্‌ করে চন্দ্রার ঘরের আলোটা নিবে গেল! এবং আলোটা নিবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দুড়ুম দুড়ুম করে দু'-দু'টো গুলীর আওয়াজ যেন একসঙ্গেই হলো।

শেষ গুলীর আওয়াজটার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল, অন্ধকারে একটা নারীকণ্ঠের দীর্ঘ চিৎকার ও ভারী একটা কিছু পতনের শব্দ। মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। অন্ধকার ঘরের মধ্যে ও তৎসংলগ্ন অলিন্দে যেন একটা জমাট স্তব্ধতা। এবং সেই স্তব্ধতার মধ্যেই কানে কানে কে যেন তাকে বললো, পালাও। পালাও শেখর! এখানে আর এক মুহূর্তও নয়।

অন্ধকারেই এগুতে গিয়ে হঠাৎ পায়ে বেধে মেঝেতে পড়ে গেল শশাংক। হাত থেকে বন্দুকটা পড়ে গেল। কিন্তু মুহূর্তে আবার উঠে বসে সেই অন্ধকারেই নিঃশব্দে হাতড়াতে হাতড়াতে ঘর থেকে বের হয়ে পড়ল শশাংক। তারপরই সিঁড়ির ধাপগুলো অতিক্রম করে চলে এলো নীচে। সদর দরজাটা তখনো হা-হা করছে খোলা। ঝড়ের তাণ্ডব অনেকটা বুঝি তখন কমে গিয়েছে। বৃক্ষের তলায় যেখানে অশ্বটা বাঁধা ছিল, সেখানে এসে এক লাফে অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অন্ধকারেই অশ্ব ছুটিয়ে দিল।

শয়নঘরের বাতায়নের সামনে চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে ছিল স্বর্ণময়ী। এই রাত্রে ঝড়-জলের মধ্যেও শশাংক বের হয়ে গিয়েছে! কুকুর-বিড়াল পর্যন্ত বের হতে পারে না অথচ সে বের হয়েছে! কোথায় সে যায় প্রতি রাত্রে?

আজ সে জিজ্ঞাসা করবেই। কিন্তু যদি বলেন তিনি, এ তোমার অনধিকার চর্চা? তবু, তবু সে জিজ্ঞাসা করবে।

হঠাৎ এমন সময় কানে এলো তার মৃদু একটি ডাক, স্বর্ণ!

কে! চকিতে ঘুরে দাঁড়াল স্বর্ণময়ী। কিন্তু স্বামীর দিকে তাকিয়েই স্বর্ণ যেন বিস্ময়ে বোবা হয়ে যায়। মাথার চুল জলসিক্ত এলোমেলো। চোখে-মুখে কি এক অস্বাভাবিক ভীতি! পরিধেয় সিক্ত, জামা-কাপড়ে রক্তের লাল ছোপ জায়গায় জায়গায়।

আমি। আমি খুন করেছি স্বর্ণ!

খুন করেছেন?

হাঁ। নারীহত্যা!—দারোগা সে হত্যার কথা জানতে পারলেই হয়ত আমাকে ধরতে আসবে।

স্বর্ণ ক্ষণকাল স্বামীর ভীতি-বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল ভিতর থেকে অর্গল তুলে। তারপর আলনা থেকে শুষ্ক বস্ত্র একটা এনে বললে, গায়ের জামা-কাপড়গুলো ছেড়ে ফেলুন এখনি।

শশাংক বোবার মতই তাকিয়ে থাকে। শশাংক তবু নিশ্চপ স্বর্ণর মুখের দিকে নির্নিমেষে তাকিয়ে।

হাঁ। ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে।

যন্ত্রচালিতের মতই যেন এবারে শশাংক সিক্ত রক্তমাখা পরিধেয় বস্ত্র পরিবর্তন করে শুষ্ক জামা-কাপড় পরল।

স্বর্ণ সেই পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি তুলে পালঙ্কের গদীর নীচে গুঁজে ফেলল। শশাংক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

কিন্তু এখানে আর এক মুহূর্ত নয়, এখুনি আপনি এখান থেকে চলে যান। স্বর্ণ বললে।

চলে যাবো?

হাঁ। যেখানে যত দূরে হোক! ওরা তাহলে আর আপনার নাগাল পাবে না।

ক্ষণকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে শশাংক তার অনাদৃতা অবহেলিতা সহধর্মিণীর মুখের দিকে। তারপর মৃদু কণ্ঠে ডাকে, স্বর্ণ!

বলুন?

কিন্তু তুমি ত কই একবারও জিজ্ঞাসা করলে না কা'কে আমি হত্যা করেছি? সেই নারীর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক ছিল আর কেনই বা তাকে হত্যা করলাম?

শশাংকর সে কথায় যেন কানই দেয় না স্বর্ণ। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, কিন্তু আর আপনি দেরি করবেন না! চলুন বের হয়ে পড়বেন চলুন!

না স্বর্ণ! তোমাকে অন্তত আমায় সব কথা বলে যেতে দাও। যাবার আগে তোমার কাছে অন্তত আমাকে ক্ষমা চেয়ে যেতে দাও!

ছিঃ ছিঃ, ও কথা বলবেন না। আমার কাছে আবার আপনার ক্ষমা কি? ও কথা শোনাও আমার পাপ। চলুন আর দেরি করবেন না।

যাবার জন্য শশাংক অতঃপর ঘুরে দাঁড়াতেই স্বর্ণ বললে, একটু দাঁড়ান। এইগুলো সঙ্গে নিয়ে যান। বলতে বলতে হাতের সোনার চুড়িগুলো খুলতে থাকে স্বর্ণ।

না। না—ও কি। ও আমি নিতে পারবো না স্বর্ণ! না। না।—

বুঝছেন না আপনি। অর্থের প্রয়োজন হতে পারে। এগুলো আপনি সঙ্গে রাখুন। বলতে বলতে স্বর্ণ চুড়িগুলো এক প্রকার যেন জোর করেই শশাংকর জামার পকেটে ভরে দিল। আজ আর কোন লজ্জা, কোন সংকোচই নেই তার স্বামীকে। আজ যে একান্ত আপন করেই পেয়েছে সে তার স্বামীকে।

চুড়িগুলো শশাংকর জামার পকেটে ভরে দিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে পায়ের ধূলো নিল স্বর্ণ স্বামীর। তার পর উঠে দাঁড়িয়ে কি একটা কথা মনে হওয়ায় বললে, আর একটু দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।

স্বর্ণ দ্রুতপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

শশাংকর চোখ ছাপিয়ে জল আসে। এই স্ত্রীকে সে এত দিন অবহেলা করেছে! মনে মনে ঘৃণা করেছে! স্বৈরিণী, চন্দ্রার মোহে তাকে নিষ্ঠুর আঘাতে জর্জরিত করেছে!

একটু পরেই ফিরে এলো স্বর্ণ।

একটা ফুল শশাংকর জামার পকেটে ভরে দিতে দিতে বললে, গোপীবল্লভের প্রসাদী পুষ্প। কোন ভয় নেই। চলুন এবারে, বাইরে কেউ এখন নেই। নীচের রাত-জাগা প্রহরীরাও ঘুমাচ্ছে।

ঝড়-জল তখনো একবারে থেমে যায় নি। টিপ-টিপ করে ক্লান্ত আকাশ প্রচণ্ড ঝড়ের পরে তখনো যেন কাঁদছে মৃদু বর্ষণের মধ্য দিয়ে। হাওয়াও বইছে সোঁ সোঁ করে, তবে আগের সে প্রখরতা নেই।

দেউড়ির দিকে এগুতে এগুতে বহির্মহলের অলিন্দ দিয়ে কানে এলো দরবারী কানাড়ায় আলাপ।

দবীর খাঁর চোখে কি আজ নিদ্রা নেই?

থমকে দাঁড়িয়েছিল শশাংক ক্ষণেকের জন্য কিন্তু স্বর্ণ তাড়া দিল, দাঁড়াবেন না, চলুন।

আবার দু'জনে এগিয়ে চললো পাশাপাশি।

দেউড়ির সামনেই শশাংকর অশ্বটা তখনো দাঁড়িয়ে ছিল, এগিয়ে গিয়ে অশ্বের বল্গা ধরলো শশাংক। জীবনে আর আমাদের দেখা হবে কি না, জানি না স্বর্ণ! তবে জেনো, তোমাকে আর আজকের এই রাত্তে কখনো আমি ভুলবো না। মনে থাকবে। চিরদিন মনে থাকবে

আঃ, এ সময়ে চোখের জল আসে কেন? দাঁত দিয়ে সজোরে ঠোঁটটা চেপে ধরে স্বর্ণ।

তবে আমি যাই স্বর্ণ?

যাই নয়, এসো।

আমার যোগ্যতা ছিল না বলেই এ জীবনে তোমাকে পেয়েও পেলাম না স্বর্ণ! যে ক'টা দিন বেঁচে থাকবো সেই যোগ্যতা অর্জনেরই এবারে চেষ্টা করবো, যেন আবার পেলে আর তোমাকে না হারাতে হয়। তবে আমি যাই?

এসো।

লাফিয়ে শশাংক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করল। তার পর বিদ্যুৎ গতিতে অশ্ব ছুটিয়ে অন্ধকারে হারিয়ে গেল।

মোকিমপুরে এসে শেষ রাত্রে ঠিক কলকাতাগামী ট্রেণটা ধরতে পেরেছিল শশাংক।

ঝড়-বৃষ্টি তখন একেবারে থেমে গিয়েছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে আসন্ন প্রত্যূষের আলোর ছোপ লেগেছে।

চোখে কিন্তু নিদ্রা ছিল না শশাংকর। চলমান গাড়ির খোলা জানালা-পথে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে কোথা থেকে কি হয়ে গেল! সমস্ত জীবনটাই যেন ওলোট-পালোট হয়ে গেল!

চন্দ্রা!

না। না—সে স্বৈরিণীর চিন্তা মাত্রও আর নয়। বুক ভরা ভালোবাসার সে বিষ ঢেলে দিয়েছে। জীবনের অন্ধকার স্রোত সে পার হয়ে এসেছে।

স্বর্ণ! স্বর্ণ!

অন্ধকার আকাশের প্রান্তে জেগেছে তার অরুন্ধতীটি।

দূরে, দূরে সে চলে যাচ্ছে। এক জীবন থেকে অন্য জীবনে! এক স্রোত থেকে অন্য স্রোতে। বেদনার কলঙ্কের স্রোত পার হয়ে চলেছে সে যেন এক প্রত্যূষের লগ্নে।

আরো দু'দিন পরে।

গভীর রাত্রে শয়ন-ঘরের দরজার গায়ে ধাক্কার শব্দে বিভূতির ঘুম ভেঙ্গে গেল।

কে?

বিভূতি! বিভূতি—দরজাটা খোল। আমি—

কে! উঠে এসে দরজাটা খুলে দিতেই বিভূতি তার বন্ধু ও সহপাঠী শশাংককে দেখে যেন ভূত দেখার মতই চমকে উঠে!

এক-মুখ দাড়ি-গোঁফ, এলো-মেলো চুল।

এ কি শেখর!

হাঁ। শশাংক তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দেয়, ঘরের ভিতর নিজেই এগিয়ে গিয়ে।

কিন্তু এত রাত্রে বাড়িতে ঢুকলি কি করে?

প্রাচীর টপকে এসেছি।

প্রাচীর টপকে! বিস্ময়ে যেন থ হয়ে যায় বিভূতি।

আগে কিছু খেতে দে ভাই আমার, দু'দিন কিছু খাই না।

[ক্রমশঃ।



ডি. এচ. লরেন্স

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ইতিমধ্যে এক পানশালায় ক্লারার স্বামী বাক্সটার ডয়েসের সঙ্গে পলের এক হাত হয়ে গেল। কয়েক দিন আগে বাক্সটার পলকে ক্লারার সঙ্গে থিয়েটার থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেছিল। সেই কথা নিয়ে পলের যে সব সঙ্গীরা পানশালায় ছিল, তারাও বেশ মজা পেল। ডয়েসকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তারা কথা বার করতে লাগল। পল রাগে জ্ঞানহারা হয়ে গেল ঐ সব শ্লেষাত্মক কথায়। ডয়েস গোঁফের প্রান্তে চাড়া দিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসতে লাগল। ক্লারাকে নিয়ে ওদের প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে পল উঠে পড়ে বলল, 'বেশ তোমরা থাক এখানে, আমি চললুম।'

একজন বন্ধু ওর কাঁধে হাত চেপে বসিয়ে দিল। বলল, 'যাচ্ছ কোথায় চাঁদ? সব কথা আমাদের খুলে না ব'লে অমনি উঠে পালাবে?'

—'শোন না তোমরা ডয়েসের কাছ থেকে।'

'ছি ছি ছি পল, নিজে কুকাজ ক'রে আবার নিজেই ঢাকবার চেষ্টা!'

সেই সময় ডয়েস এমন একটা বিশ্রী উক্তি করে বসল যে পল, আর নিজেকে সামলাতে পারল না। আধ গ্লাস-ভরা বীয়ারসুদ্ধ গ্লাস ওর মুখে ছুঁড়ে মারল।

পানশালার পরিচারিকা চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কি,. মিষ্টার মোরেল?' ব'লে ঘণ্টা টিপল বেয়ারার জন্যে।

ডয়েস্ মুখ থেকে থুতু ছিটিয়ে ছুটে গেল পলের দিকে। মাঝ থেকে এসে দাঁড়াল এক ইয়া জোয়ান চেহারা। জামার আস্তিন গুটানো, পায়জামা টেনে তুলেছে হাঁটুর উপরে। বলল, 'হয়েছে, হয়েছে।' ব'লে বুক চিতিয়ে দাঁড়াল ডয়েসের সামনে।

ডয়েস চেঁচাতে লাগল, 'আয় না, এগিয়ে আয়।'

পল দোকানের রেলিং-এ ভর করে কম্পিত চিত্তে, শুষ্ক মুখে দাঁড়িয়েছিল। ডয়েসের উপর রাগে সে ফেটে পড়ছিল, মনে হচ্ছিল, এখন যদি কেউ এসে ওকে কুচি-কুচি করে কেটে ফেলে তা'হলেও ভালো হয়।

ডয়েস সমানে চেঁচিয়ে যেতে লাগল, কই, আয় না; আয়'—

পানশালার পরিচারিকা চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'ঢের হয়ে গেছে, এখন থাম ডয়েস।'

বেয়ারা যথাসম্ভব গলা মোলায়েম করে বলল, 'এবার এখান থেকে কেটে পড়ো ত' বাছা।' ব'লে ডয়েসকে হটিয়ে হটিয়ে নিয়ে গেল দরজার কাছে।

ডয়েস মনে মনে বেশ ভয় খেয়ে গিয়েছিল। মুখে বলল, 'ওই— ওই ছোকরাই সব নষ্টের গোড়া।' ব'লে পলকে দেখিয়ে দিল।

পরিচারিকা বলল, 'বানিয়ে বলছ কেন, ডয়েস! তুমিই না সারাক্ষণ খোঁচাচ্ছিলে ওকে।'

বেয়ারাটা ওকে পিছু হটিয়ে দরজার বাইরে নিয়ে গেল। ডয়েস বাইরে থেকে বলল, 'আচ্ছা, বেশ। দেখা যাবে।'

পানশালার দুয়ার বন্ধ করে দিতে আর কোন গোলমাল রইল না। পরিচারিকা বলল, 'ওর ঠিক উচিত শাস্তি হয়েছে।'

বন্ধুটি বলল, 'তা বলে চোখে মদের গেলাস এসে পড়লে কারো ভাল লাগে না।'

পরিচারিকা বলল, 'আমি কিন্তু এতে খুশি হয়েছি। আক্কেল হয়েছে লোকটার। আপনাকে আর এক গ্লাস বীয়ার এনে দেব, মিষ্টার মোরেল?'

পল সম্মতি জানাল। এরই মধ্যে কে একজন বলল, 'ডয়েস সহজে ছাড়বার পাত্র নয়। কিছুতেই ওর কিছু হয় না।'

পরিচারিকা বলল, 'রেখে দিন। শুধু মুখেই ওর লপচপানি, কাজের বেলা লবডঙ্কা।'

বন্ধুটি বলল, 'কিন্তু, পল, তুমি একটু সাবধান হয়ে চলো বাপু! অন্ততঃ কিছু দিন একটু সাবধানে থেকো।'

পরিচারিকা বলল, 'মানে ও যাতে আর আপনার নাগাল না পায় সেইটুকু নজর রাখবেন।'

বন্ধুদের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বক্সিং জান, পল?'

পলের মুখে তখন রক্তের চিহ্ন নেই। সে বলল, 'বিন্দুবিসর্গও জানি না।'

বন্ধু বলল, 'না হয় দু'-একটা প্যাঁচ তোমায় দেখিয়ে দেব।'

—'ধন্যবাদ! অত সময় নেই আমার।' ব'লে সে যাবার জন্যে উঠে পড়ল।

দোকানের পরিচারিকা মহিলা চুপি চুপি গিয়ে বলল, 'তুমি ওঁর সঙ্গে একটু এগোও মিষ্টার জেন্‌কিন্‌সন্।' ব'লে চোখ টিপে জেন্‌কিনসনকে একটু ইশারা করল।

লোকটি পলের পেছন-পেছন গিয়ে বলল, 'একটু দাঁড়ান; এক পথ দিয়েই যখন যাব, চলুন এক সঙ্গেই যাই।'

এদিকে পরিচারিকা বলছিল, 'এ সব নোংরামি ওঁর পছন্দ নয়। আপনারা দেখবেন আর উনি বড়-একটা আসবেন না এদিকে। কী বিশ্রী ব্যাপার বলুন ত'? বেশ ভালো একটি খদ্দের, চমৎকার লোক। ওই ডয়েস লোকটাকে গারদে পুরে রাখে না কেন এরা?'

পল ভাবছিল, মা যদি আজকের ব্যাপারের কথা ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন—না, না, তার আগেই যেন তার মৃত্যু হয়। অপমানে

আর আত্মধিক্কারে তার মন বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। এখন আর সব কথাই মায়ের কাছে গিয়ে বলা যায় না। এখন তার একটা স্বতন্ত্র জীবন, মায়ের জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন একটা যৌন জীবন তার গড়ে উঠেছে। অবশ্য এ ছাড়া আর সব কিছুর খবর মা-ই রাখেন। কোন কিছু তাঁকে গিয়ে বলতে না পারলে মন খুঁৎখুঁৎ করতে থাকে। নীরবতার মধ্যে পল নিজেকে মায়ের কাছে অপরাধী বলে গণ্য করতে থাকে। মনে হয়, মা যেন তীব্র ভর্ৎসনা করছেন তাকে। মাঝে মাঝে মন বিদ্রোহ করে, এই বাঁধন খুলে ফেলতে চায়, মায়ের উপর মন বিরূপ হয়ে ওঠে। প্রাণ ছুটে চলে যেতে চায় মায়ের বাঁধন ছিঁড়ে কিন্তু পারে না। আবার ঘুরে ঘুরে আসতে হয় তাঁরই কাছে, এগিয়ে চলা আর হয় না। মা তাকে গর্ভে ধরেছেন, ভালবেসেছেন, স্নেহ দিয়ে লালন পালন করেছেন—তাই তার নিজের ভালবাসাও গিয়ে পড়েছে মায়ের দিকে। সেখান থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে নিজের আলাদা জীবনে একে সে মুক্তি দিতে পারে না—অন্য কোন মেয়েকেও প্রাণ দিয়ে সে ভালবাসতে পারে না। তবু আজকাল নিজের অজান্তেই সে মায়ের প্রভাব থেকে মুক্তি খুঁজে বেড়ায়। অনেক কথা তাঁকে গিয়ে আর আগের মত বলে না। দু'জনের মধ্যে একটি ব্যবধান গড়ে উঠেছে।

ক্লারা আজকাল খুশি, পলের সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিন্ত। জানে শেষ পর্য্যন্ত পলকে সে আপন করে পাবেই। এরই মধ্যে আবার অনিশ্চয়তার মেঘ ঘনিয়ে এলো। পল ঠাট্টা ক'রে গিয়ে বলেছিল তার স্বামীর সঙ্গে সেদিনকার সেই ঘটনার কথা। শুনে ক্লারার মুখ লাল হয়ে উঠল, ধূসর চোখ দুটি দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল। বলল, 'ওটা ওই রকম—গোঁয়ারগোবিন্দ। ভদ্দর লোকের মেশবার যোগ্য নাকি ওটা?'

পল বলল, 'তবু ত' ওকেই বিয়ে করেছিলে!'

এই কথা মনে করিয়ে দেওয়াতেই ক্লারার রাগ হয়ে গেল। বলল, 'হ্যাঁ। করেছিলাম। কিন্তু আমার জানবার উপায়টা কি ছিল?'

পল বলল, 'তা নয়। কিন্তু আমার মনে হয় ও ভাল হলে খুবই ভাল হ'তে পারত।'

ক্লারা উত্তেজিত হয়ে বললে, 'তার মানে তোমার মতে আমিই ওকে এ রকম করেছি।'

'তা নয়। ও নিজের দোষেই এমন হয়েছে। কিন্তু লোকটার মধ্যে জিনিস ছিল—'

ক্লারা ভাল ক'রে চাইল ওর দিকে। এ তাকে ভালবাসে, তবু আবার নিক্তি দিয়ে তাকেই যাচাই করে নিতে চায়। কোন মেয়ের মন এতে সায় দেবে? ক্লারার মন ওর দিকে বিরূপ হয়ে উঠল। বলল, 'তা তুমি কি করতে চাও ওকে নিয়ে?'

'কা'কে নিয়ে?'

'এই বাক্সটারকে।'

'করব আবার কী? কী করা যাবে?'

'দরকার হলে ওর সঙ্গে লড়াই করতে যেতে পারবে?'

'না। ঘুষোঘুষি আমার আসে না। মনে হলে হাসি পায়। বেশীর ভাগ লোককেই দেখেছি হাতাহাতি কিম্বা ঘুষি পাকানো যেন স্বভাব ওদের। আমার ঠিক উল্টো। লড়াই করতে হলেই আমার ছুরি কিম্বা পিস্তলের কথা মনে পড়ে।'

—'তবে একটা কিছু নিয়ে বেরুলেই পার।'

—'দরকার নেই।' পল হাসল, 'আমি ছুরি-চালানো গুণ্ডা নই।'

—'ও কিন্তু তাকে-তাকে থাকবে। তুমি চেন না ওকে।'

—'বেশ ত'। দেখাই যাক না।'

—'তুমি ওকে যা খুশি তাই করতে দেবে?'

—'উপায় কী। হয়ত তাই দিতে হবে।'

—'ও যদি মেরে ফেলে তোমাকে?'

—'আমার কষ্ট হবে। নিজের জন্যে ত' বটেই ওর জন্যেও। ক্লারা এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে আবার উগ্র হয়ে উঠল। বলল, 'এমন কিছু নতুন নয় সেটা।'

'অত বোকা কেন তুমি? তুমি চেন না ওকে?'

—'চিনতে চাইলে ত' চিনব।'

—'তা ব'লে তুমি ওকে যা খুশি তাই করে যেতে দেখেও কিছু বলবে না?'

—'কী করব বল?' পল হেসে ফেলল।

—'আমি হলে'—ক্লারা বলল, 'আমি হলে একটা রিভলবার নিয়ে বেরুতাম। জানি ত' লোকটা খুনে।'

পল বলল, 'তাতে নিজের আঙুলগুলো উড়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা।'

ক্লারা এবার অনুনয় শুরু করল। বলল, 'না, না, বলো তুমি—নিয়ে যাবে কি না।'

'না।'

'কিছুতেই নয়?'

'না।'

'তা'হলে ও যা খুশি করুক, তাই চাও?'

'হ্যাঁ।'

'তুমি একটা আস্ত বোকা।'

'খুব সত্যি কথা।'

ক্লারা রাগে দাঁতে দাঁত চেপে উত্তেজনায় অধীর হয়ে বলল, 'ইচ্ছে করছে তোমায় ধরে একটা আছাড় দিতে।'

'তাতে কী হবে?'

'কেন তুমি ওকে যা খুশি তাই করে যেতে দেবে? ও কি একটা মানুষ?'

পল বলল, 'বেশ ত', ও যদি জেতে, তুমি না হয় ওর কাছেই ফিরে গেলে।'

ক্লারা বলল, 'তুমি কি চাও আমি আর তোমার মুখ না দেখি?'

পল বলল, 'আমি একটা কথার কথা বললুম বই ত' নয়।'

'তবু তুমি বল আমায় তুমি ভালবাস।' ক্লারা রাগে জ্বলে গিয়ে বলল। যেন এত অপমান আর তার কোন দিন হয় নি।

পল বলল, 'তুমি কি চাও তোমার খুশির জন্যে ওকে আমি বধ করে আসি? তাতেই কি ওর হাত থেকে আমার বাঁচা হবে? আমি বরঞ্চ তাতে আরও বেশী করে গিয়ে পড়ব ওর পাল্লায়।'

ক্লারা বলল, 'তুমি কি আমায় বোকা বোঝাচ্ছ নাকি?'

'মোটেই নয়। শুধু বলছি তুমি আমার কথা একটুও বোঝ নি।'

দু'জনার মধ্যে একটু নীরবতা। শেষে ক্লারা মিনতি করে বলল, 'অন্ততঃ তুমি নিজেকে অমন জাহির করে বেড়িও না।'

পল অবজ্ঞাভরে, কাঁধের ভঙ্গী করল মাত্র। বলল, 'যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়ঃ।'

ক্লারা সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করল ওর দিকে। বলল, 'দিন দিন তুমি দুর্বোধ্য হয়ে উঠছ।'

পল বলল, 'বুঝবার কিছু নেই যে এতে?' ক্লারা মুখ নীচু করে ভাবতে লাগল।

কয়েক দিন ডয়েসের সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তারপর এক দিন সকালে পল নীচের তলার ঘর থেকে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে যাবে, হঠাৎ ওর সঙ্গে প্রায় ধাক্কা লাগবার উপক্রম আর কি! ডয়েস চীৎকার করে উঠল, 'কে রে?'

—'লাগল না কি?' বলে পল উপরে উঠে যাচ্ছিল, ডয়েস চেঁচিয়ে উঠল, 'দাঁড়া 'লাগল নাকি' বলা বার করছি!'

পল শিস দিয়ে একটা গানের কলি ধরল। ডয়েস বলল, 'বার করছি তোমার শিস দেওয়া।'

পল ভ্রূক্ষেপও করল না। ডয়েস চেঁচিয়ে বলল, 'সেদিন রাতের শোধ আজ দিতে হবে। শুনলি?'

পল নিজের ডেস্কে বসে লেজারের পাতা উল্টোতে লাগল। একটা বয়কে ডেকে বলল, 'যা ত' ফ্যানীকে গিয়ে বল, ১৭ নম্বরের অর্ডারটা আমি একবার দেখতে চাই। জলদি।'

ডয়েস তখন দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। বিশাল দেহ, বাস্তবিকই ওকে দেখলে ভয় হয়। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে পলের মাথাটার দিকে। যেন পেলেই গুঁড়িয়ে দেয়। পল সশব্দে যোগ করে চলেছে, 'পাঁচ আর ছয়ে হ'ল এগারো, হাতে রইল এক,—'

ডয়েস বলল, 'কানে কথা যাচ্ছে না নাকি?'

—'পাঁচ শিলিং ন' পেন্স।' পল লিখল একটা কাগজে। বলল, 'এটা আবার কী?'

—'এটা কি দেখাচ্ছি আমি।' ডয়েস গর্জ্জে উঠল।

পল উচ্চৈঃস্বরে যোগ করে চলেছে। ডয়েস বলল, 'এখন ত' একেবারে কেঁচোটি। আয় না বেরিয়ে, দেখি কেমন সাহস।'

পল হঠাৎ ভারী 'রুলার'টা উঠিয়ে নিল। ডয়েস চমকে উঠল। 'রুলার' দিয়ে কয়েকটা লাইন্ টানল পল। ডয়েসের মেজাজ ক্রমশঃ চড়তে লাগল। বলল, 'কতক্ষণ পালিয়ে থাকবে? আজ যেখানেই তোকে হাতের কাছে পাই, তোর পিঠের চামড়া আর আস্ত রাখব না।'

'বেশ ত'।' পল বলল।

পলের এ-জবাব ও আশা করে নি। হঠাৎ শুনে চমকে গেল। ঠিক তখনই একটা ক্রিং-ক্রিং আওয়াজ হ'ল। পল ফোনের কাছে গেল কথা বলতে।—'হ্যাঁ। ঠিক-হ্যাঁ।' অনেকক্ষণ কি যেন শুনল, তারপর হেসে বলল, 'একটু পরেই আসছি। আমার এখানে একটি লোক রয়েছেন কিনা।'

কথার ধরণ দেখে ডয়েসের বুঝতে বাকী রইল না ও নিশ্চয়ই ক্লারার সঙ্গে কথা বলছে। সে এগিয়ে এলো। বলল, 'ছুঁচো কোথাকার! এক্ষুনি তোর রসিকতা আমি বের করছি। লোক রয়েছেন! ইয়ার্কি হচ্ছে আমার সঙ্গে?'

ঘরের কেরাণীরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। পলের অফিসের ছোকরা এসে হাজির হ'ল একটা সাদা পুঁটলি নিয়ে। বলল, 'ফ্যানী বলে দিল ওকে আগে জানালে কাল রাত্রেই আপনার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারত।'

'ঠিক আছে।' মোজাটা দেখতে দেখতে পল বলল, 'এখন দিয়ে আয় গে।'

ডয়েস রাগে কাঁপছিল, কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। পল উঠে দাঁড়াল, বলল, 'আমি আসছি—এক মিনিট।'

বলে নীচে ছুটে যাচ্ছিল, ডয়েস খপ করে ওর হাত ধরে ফেলল। বলল, 'দাঁড়াও, তোমার ঘোড়দৌড়ের সখ আমি জন্মের মত ঘুচিয়ে দিচ্ছি।'

পলও চট্ করে মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল। অফিসের ছোকরাটা ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, এই, কর কি!'

চেঁচামেচি শুনে টমাস জর্ডন তাঁর কাচের ঘর থেকে ছুটে এলেন। গলা চড়িয়ে বললেন, 'হ'ল কি?' হল কি?'

ডয়েস মরিয়া হয়ে বলল, 'আমি ওর সঙ্গে একটা মিট মাট'—

মিঃ জর্ডন মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'বলছিস কি তোর মাথামুণ্ড'?

'ওই যা বললুম'। ডয়েস ভয়ে-ভয়ে বলল।

মোরেল কাউন্টারে গা এলিয়ে দাঁড়িয়েছিল। লজ্জায় তার মাথা কাটা যাচ্ছে, তবু একটু একটু খুশি না হয়েও পারছে না। মিঃ জর্ডন তাকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্যাপারটা কি হয়েছে'?

'কিছু বলতে পারি না'। পল অবজ্ঞা দেখিয়ে জবাব দিল।

শুনে ডয়েস আবার হাতের মুঠো পাকিয়ে এগিয়ে এলো। বলল, 'বলতে পারিস না, নয়' ?

বুড়ো মানুষ মিঃ জর্ডন, এগিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'হয়েছে ত' তোর ? এখন কাজে যা। আর সকালবেলায় মাতলামো করতে আসিস নি'।

'মাতলামো! কে মাতলামো করছে শুনি ? তোমার চেয়ে আমি একটুও বেশী মাতাল হইনি'।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কথা অনেক শুনেছি আমরা। এখন সরে পড়ো, দেরি করলে ভাল হবে না। এখানে এসে হল্লা শুরু করেছিস সকাল থেকে ?

ডয়েস চোখ পাকিয়ে চাইল মনিবের দিকে। টমাস জর্ডন মেজাজ দেখিয়ে বললেন, 'কি রে, তোকে না তাড়ালে তুই এখান থেকে যাবিনে নয়' ?

ডয়েস খেঁকিয়ে উঠল, 'ইস্, দেখি ত' কে আমাকে তাড়ায় এখান থেকে।'

মিষ্টার জর্ডন রাগে কাঁপতে লাগলেন। লোকটার সামনে গিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিলেন, তর্জ্জনী উঁচিয়ে বললেন, 'যা, দূর হ আমার বাড়ি থেকে'। ডয়েসের হাত ধরে মোচড় দিলেন একবার।

'ছাড় বলছি'। লোকটা হাতের এক ধাক্কায় মিষ্টার জর্ডনকে ঠেলে ফেলে দিল। কেউ গিয়ে তাকে ধরে ফেলবার আগেই তিনি দরজা ঠেলে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে একেবারে নীচের ঘরে গিয়ে পড়লেন। সারা কারখানায় একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। লোকজন ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগল। ডয়েস এক মুহূর্ত্ত সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বোধ হয় নিজের ভুল বুঝতে পারল; তাড়াতাড়ি সরে পড়ল সেখান থেকে।

টমাস জর্ডন বেশ একটু চোট পেয়েছিলেন। দু'-এক জায়গা ছ'ড়েও গিয়েছিল। অবশ্য কোনটাই খুব গুরুতর নয়। তবে রাগে ফেটে পড়েছিলেন এটা ঠিক। ডয়েসকে তৎক্ষণাৎ কাজ থেকে বরখাস্ত করলেন, আর আঘাত করার অভিযোগে মামলা দায়ের করলেন ওর নামে।

মামলার সময় পলকে বাধ্য হয়েই সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল হাঙ্গামার সূত্রপাত কি নিয়ে, তখন পল বলল, ডয়েস একদিন মিসেস ডয়েসকে আর আমাকে অপমান করেছিল। কারণ আমি একদিন সন্ধ্যাবেলা ওঁকে থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর আমি ওর মুখে 'বীয়ার' ছুড়ে মারি। তখন থেকেই সে শোধ নেবার চেষ্টা করতে থাকে'।

ম্যাজিষ্ট্রেট ঈষৎ হেসে মন্তব্য করলেন, 'cherchez la femme" সেই স্ত্রীলোক ঘটিত চিরন্তন ব্যাপার।' বলে ডয়েসকে গালাগাল দিয়ে মামলা ডিসমিস্ করে দিলেন। আদালত থেকে বেরিয়েই মিঃ জর্ডন পলের উপর খাপ্পা হয়ে উঠলেন, 'তুমিই মামলাটা ডোবালে।'

পল বলল, 'আমি আবার কি করলুম। তাছাড়া আপনি ত' আর সত্যিই চাননি যে ওর একটা শাস্তি হোক।'

—'তবে আমি মামলাটা করলুম কি জন্যে শুনি ?'

পল বলল, 'তাই যদি হয়, তবে আমার ভুল হয়ে গেছে। আমি সে জন্যে দুঃখিত।'

ক্লারাও রেগে ছিল। বলল 'তুমি আবার আমার নাম টেনে আনতে গেলে কেন ?'

পল বলল, 'কানাঘুষা হওয়ার চেয়ে খোলাখুলি বলে ফেলাই ভালো।'

'কিছু দরকার ছিল না এর।'

'হোক গে। আমাদের কিছু ক্ষতি হয়নি এতে।' পল অবহেলা দেখিয়ে জবাব দিল।

ক্লারা বলল, 'তোমার ক্ষতি না হতে পারে।'

—'আর তোমার ?'

—'আমার নাম উল্লেখ করা উচিত হয়নি তোমার।'

পল বলল, 'আমি দুঃখিত সেজন্যে।' কিন্তু তার কথার মধ্যে দুঃখিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না; নিজের মনকে এই ব'লে বোঝাল: ক্লারা সামলে নেবে সহজেই। আর সত্যি সত্যিই ক্লারা সামলেও নিল।

পল মাকেও গিয়ে বলল, মিঃ জর্ডনএর পড়ে যাওয়া আর ডয়েসএর মামলার কথা। মিসেস মোরেল তীক্ষ্ণচোখে চাইলেন ওর দিকে। বললেন, 'ব্যাপারটাকে কেমন মনে হচ্ছে তোমার ?'

পল বলল, 'আমি শুধু ভাবছি লোকটা কী ভীষণ বোকা।' বলল বটে, কিন্তু নিজের মনে মনেও তার দারুণ অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল।

মা বললেন, 'কিন্তু এর পরিণামটা কোথায় ভেবে দেখেছ ?'

'না। তবে সব জিনিসেরই শেষ আছে—এক ভাবে নয়ত, অন্য ভাবে।'

মা বললেন, 'হ্যাঁ। তা আছে। তবে সেই শেষটা সাধারণতঃ অবাঞ্ছিত আকার নিয়েই আসে।'

'তখন বাধ্য হয়েই সেটা মেনে নিতে হয়।'

মা বললেন, 'মুখে যতই বল না তুমি কাজে দেখবে মেনে নেওয়াটা এত সহজ নয়।'

পল তার ছবি আঁকার কাজে হাত চালিয়ে যেতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে মা বললেন, 'ওর মত কোন দিন তুমি জানতে চেয়েছ?'

'কী সম্পর্কে?'

'ধর, তোমার সম্পর্কে। আর এই সমস্ত বিষয়টার সম্পর্কে।'

'ওর মত যা খুশি তাই হোক, তাতে আমার কী এসে যাবে। ও আমাকে খুবই ভালবাসে, কিন্তু সে ভালবাসার মধ্যে যেন গভীরতা নেই।'

মা বললেন, 'ওর প্রতি তোমার মনের ভাব যেমন তার চেয়ে অন্ততঃ কম গভীর নয় ওর ভালবাসা '

পল আশ্চর্য্য হয়ে মায়ের দিকে চাইল। বলল, 'ঠিকই বলেছ তুমি। আমার মনে হয় ওটা আমার একটা দোষ—আমি ভালবাসা দিতে পারি না। যখন সামনে থাকে, আমি সত্যিই ওকে ভালবাসি। মাঝে মাঝে ওকে যখন নিছক একটি মেয়ে বলে দেখি, তখন ওর দিকে আমার ভালবাসা জাগে। কিন্তু তার ঠিক পর মুহূর্ত্তেই ও যখন কথা বলে কিম্বা কোন কিছু নিয়ে আলোচনা করতে আসে, তখন আমি উৎসাহ হারিয়ে ফেলি, ওর কথায় হয়ত কানও দিই না।'

মা বললেন, 'কেন? মিরিয়ামের চেয়ে কোন অংশে ওর বুদ্ধি কম নয়।'

'—তা হবে। মিরিয়ামের চেয়ে ওকে আমি বেশীই ভালবাসি। কিন্তু তাহলেও মা, এরা আমাকে ধরে রাখতে পারে না কেন? এদের বাঁধনে ত' আমি বাঁধা পড়ি না! শেষের কথাগুলো বিলাপের মত শোনাল যেন। মা সহ্য করতে না পেরে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন ঘরের দূর প্রান্তের দিকে চেয়ে। কেমন উদাস হয়ে গেছে তাঁর মন। তিনি বললেন, 'তা' হলে ক্লারাকে বিয়ে করার ইচ্ছে নেই তোমার?'

'—না। গোড়াতে হয়ত চেয়েছিলাম তাই। কিন্তু কেন—কেন আমি বিয়ে করবার কথা ভাবতেও পারি না? ওকেই হোক কিম্বা অন্য কাউকেই হোক—আমি পারি না বিয়ের কথা ভাবতে। আমার আজকাল মনে হয়, আমি বোধ হয় এই মেয়েগুলোর কাছে অপরাধ করেছি।

'অপরাধটা কি রকম?' মা প্রশ্ন করলেন।

'আমিই কি ছাই জানি।' পল আবার শুরু করল ছবি আঁকতে। মুখে হতাশার কালিমা। নিজের বেদনার মর্ম্মস্থলে এবার তার হাত পড়েছে।

মা বললেন, 'অত করে বিয়ের কথা ভাবছ কেন? এখনও ত' ঢের সময় আছে।'

'তুমি বোঝ না, মা! আমি মিরিয়ামকে ভালবেসেছিলাম—ক্লারাকেও ভালবাসি। কিন্তু বিয়ের মধ্যে নিজেকে আমি বিলিয়ে দিতে পারি না—পারব বলেও মনে হয় না। ওদের হাতে নিজেকে তুলে দিতে পারব না আমি। ওরা যেন আমাকে আত্মসাৎ করতে চায়—সেই জিনিসটাই ওদের আমি দিতে পারি না।'

'তার কারণ তুমি এখনও মনের মত মেয়ে খুঁজে পাও নি।'

'তুমি যত দিন বেঁচে থাকবে, মা, তত দিন আর আমি মনের মত মেয়ে খুঁজে পাব না।'

মিসেস মোরেল একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। চরম দণ্ডাজ্ঞা শুনে যেন তাঁর সর্ব্বাঙ্গ অবশ হয়ে এলো। বললেন, 'দেখাই যাক কি হয়।'

এই পাপচক্রের মধ্যে পড়ে পলের মন ক্রমাগত ছটফট করে মরতে লাগল।

ক্লারা অবশ্য ওকে ভালবাসে, গভীর আবেগ দিয়েই ভালবাসে। আর সে-ও ভালবাসে ক্লারাকে। অনুভূতির তীব্রতার দিক দিয়ে তাদের ভালবাসার কোন খুঁৎ নেই। দিনের বেলায় ওর কথা অনেকটাই মন থেকে মুছে যায়। একই দালানে ক্লারাও কাজ করছে, কিন্তু পলের যেন সে কথা মনেও পড়ে না। যতক্ষণ হাতে কাজ থাকে, ততক্ষণ ক্লারার অস্তিত্ব যেন তার কাছে নিরর্থক। কিন্তু ক্লারার সর্ব্বদা মনে পড়তে থাকে পল আছে দোতলায়, সারাক্ষণ ওর সঙ্গে একই দালানে থাকার অনুভূতি ক্লারার মনে সজাগ হয়ে থাকে, প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হতে থাকে এই বুঝি পল দরজা ঠেলে ভিতরে এসে ঢুকল, আর সত্যি সত্যি যখন পল আসে তখন ওর সারা দেহ-মন কেঁপে ওঠে। কিন্তু পল অকারণে সংক্ষিপ্ত ব্যবধান বজায় রেখে কথা বলে একটু-আধটু।

পল জানে, যেদিন সন্ধ্যায় ক্লারা তাকে দেখতে না পায় সেদিন ওর সারাটা দিন কি ভাবে কাটে, তাই অনেকটা সময় ক্লারার পেছনে সে ইচ্ছে করেই দেয়। দিনের বেলাটা ক্লারার কাটে তীব্র মর্ম্মবেদনার মধ্যে দিয়ে, কিন্তু সন্ধ্যা আর রাত্রিটা দু'জনারই মহা সুখে কেটে যায়। তখন ওদের কারু মুখেই কথা থাকে না। হয়ত দু'জনে শুধু পাশাপাশি বসে আছে, কিম্বা সন্ধ্যার অন্ধকারে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এমনি করে কেটে যাচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে মাঝে দু'-একটি কথা, তারও বেশীর ভাগ অর্থহীন। কিন্তু পলের মুঠোর মধ্যে ক্লারার হাত রয়েছে ধরা, পলের বুকে লেগে রয়েছে ক্লারার সুকোমল স্পর্শ; তার সত্তা নিজের পূর্ণতা খুঁজে পেয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় খালের ধার দিয়ে বেড়াচ্ছিল দু'জনে। কোন কারণে পলের মনটা আজ অপ্রসন্ন। ক্লারা তাকে প্রশ্ন করল, 'তুমি কি বরাবরই জর্ডনের কারখানায় চাকরি করবে?'

পল মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা না করেই বলল, 'না, না, না। আমি নটিংহাম ছেড়ে চলে যাব, চলে যাব অনেক দূর বিদেশে, আর ক'টা দিন যাক্।'

—'জানি না। আমার মন কেমন এখানে হাঁপিয়ে ওঠে।'

—'গিয়ে তুমি কি করবে?'

কিছুদিন ভালো করে ছবি আঁকার দিকে মন দিতে হবে। কয়েকটা ছবি বিক্রী হয়ে গেলেই হ'ল। আমার মনে হচ্ছে কি জানো? ক্রমশঃ যেন আমার হাত খুলে যাচ্ছে, আর সফল হতে দেরি নেই।'

—'তা কবে যাবে কিছু ভেবেছ?'

—'জানি না। মা যে পর্য্যন্ত বেঁচে আছেন, সে পর্য্যন্ত বাইরে গিয়েও বেশী দিন থাকতে পারব না।'

—'মাকে ছেড়ে তুমি থাকতে পার না?'

—'না, বেশী দিন ত নয়ই।'

ক্লারা চেয়ে রইল, কালো জলে তারার ছায়া পড়েছে তারই দিকে। তারাগুলো যেন জ্বলজ্বল করছে, তাদের শুভ্রতার তুলনা নেই। পল তাকে ছেড়ে যাবে ভাবতেও তার হৃদয় যাতনায় ছটফট করে উঠেছিল, কিন্তু এই যে পল তার একান্ত সান্নিধ্যে বসে আছে এর যাতনাও কি বড়ো কম?

ক্লারা বলল, 'ধর তুমি অনেক টাকা পেলে, তা দিয়ে কি করবে?'

—'লণ্ডনের কাছে সুন্দর দেখে একটি বাড়ি নেব, মাকে নিয়ে সেখানে থাকব।'

—'ও।' তার পর দীর্ঘ নীরবতা।

পল বলল, 'তখনও হয়ত তোমার সঙ্গে দেখা করতে মাঝে মাঝে আসব। কি যে করব তা কি আমি নিজেই জানি! আমাকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই।'

আবার নীরবতা। তারাগুলো জলের বুকে কাঁপছে, চকমক করে উঠছে। এক ঝলক বাতাস খেলে গেল হঠাৎ। পল সহসা ক্লারার কাছে গিয়ে ওর কাঁধে হাত রাখল, ক্লান্ত স্বরে বলল, আমায় কিছু জিজ্ঞেস করো না। ভবিষ্যতের কথা আমি কিছু বলতে পারব না। আমার শুধু এখানকার এই মুহূর্ত্তটুকু, এইটুকু সময় তুমি আমার পাশে পাশে থাকো।'

শুনেই ক্লারা ওকে বাহুর বন্ধনে গ্রহণ করল। হাজার হোক সে বিবাহিতা। পল তাকে যেটুকু দিয়েছে সেটুকুর উপরও তার কোন দাবী নেই। ক্লারা তার উষ্ণ হৃদয়ের সবটুকু স্নেহ, সবটুকু সান্ত্বনা দিয়ে ওকে ঘিরে রাখল। ক্ষণিকের মুঠিটুকু সে আজ ভরেই দেবে।

ক্ষণকাল পরে পল মুখ তুলে চাইল, যেন কত কথা তার বলবার রয়েছে। অনেক কষ্টে নাম ধরে শুধু ডাকল, 'ক্লারা!'

ক্লারা আবেগভরে ওকে আঁকড়ে ধরল, হাত দিয়ে ওর মুখখানা চেপে ধরল নিজের বুকে। ওর গলার স্বরে যে সুতীব্র যন্ত্রণা ক্লারার কানে তা অসহ্য হয়ে বাজতে লাগল। কী এক আশঙ্কায় তার মর্ম্ম অবধি কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। পল তাকে নিয়ে যা খুশি তাই করুক তার কাছ থেকে যা খুশি তাই নিক—শুধু তাকে যেন কিছু বুঝতে না দেয়। ভাবতে গেলে সে আর সহ্য করতে পারবে না। পল যেন তার মধ্যে শান্তি পায়, সান্ত্বনা পায়, শুধু এইটুকু তার কামনা। ওকে বুকে আগলে ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে আদর করতে লাগল, যেন পল তার পরিচিত কেউ নয়, ও যেন অন্য লোকের কোন আগন্তুক। আদর দিয়ে ওর মনে বিস্মৃতির শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিতে চাইল ক্লারা।

আস্তে আস্তে পলের হৃদয় শান্ত হয়ে এল, মনের দ্বন্দ্ব মিটল, সে আগের কথা ভুলে গিয়ে এক মনে শুধু ক্লারার দিকে চেয়ে রইল। কিন্তু এ ত' ক্লারা নয়! এ শুধু একটি নারী, হৃদয়ে যার ভালবাসার উষ্ণতা, যাকে সে ভালবাসে, এমন কি যাকে সে পূজা করে থাকে। অন্ধকারে ক্লারা বিলীন হয়ে গেছে। এই নারীটি নিজেকে তুলে দিয়েছে তার হাতে। একে না ভালবেসে তার উপায় নেই—এই আদিম ভালবাসা ভাল-মন্দ জানে না, এ ভালবাসা ক্ষুধার সমগোত্রীয়, তেমনি তীব্র, তেমনি অন্ধ, তেমনি দুরন্ত; পলের কাছে কী দুঃসহ হয়েই না দেখা দিল আজকের অন্ধকার রাতে! ক্লারার আজ আর বুঝতে বাকী নেই কী দুর্ব্বহ একাকীত্বের ভার বহন ক'রে পলকে চলতে হয়, ও যে আজ তার দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে সে এক বিপুল আয়াসের ফলে। ওকে আজ আর ফিরিয়ে দেওয়া চলে না, ওর প্রয়োজন আজ ক্লারার চেয়েও বড়ো, এমন কি পলের নিজের চেয়েও বড়ো, ক্লারার মন এখনও এতটা মরে যায়নি যে ওকে ফিরিয়ে দেবে। হয়ত পল তার কাছে বাঁধা পড়বে না, ছেড়ে চলে যাবে, তাই বলে ওর এই পরম প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে সে মুখ ফিরিয়ে থাকবে কেমন ক'রে? সে যে পলকে ভালবাসে।

এদিকে মাঠে ঝিঁঝি পোকার আসর বসেছে, সারাক্ষণ চলেছে তাদের ঐক্যতান। পলের সম্বিৎ যখন ফিরে এল, মনে হ'ল তার চোখের কাছে কী যেন সব আঁকা-বাঁকা জিনিস, অন্ধকারে তাদের প্রাণের সাড়া পাওয়া যায়। কানে শুনতে পেল কারা যেন কথা বলছে। ভালো ক'রে চেয়ে দেখল এগুলো ঘাস আর কান পেতে শুনল ঝিঁঝি পোকার ডাক। বুকে যে উষ্ণ স্পর্শটুকু এসে লাগছে সে আর কিছু নয়—ক্লারার ঘন আতপ্ত নিঃশ্বাস। পল মাথা তুলে ক্লারার চোখ দুটির দিকে চোখ রাখল। দেখল কালো চোখে অস্বাভাবিক দ্যুতি, অবাধ প্রাণ আজ যেন মূল থেকে উৎসারিত হয়ে উঠছে। তাকে দেখে অপরিচিত ঠেকে, তবু দুটি প্রাণ পরস্পরের দিকে উৎসুক নেত্রে চেয়ে থাকে। পলের কেমন ভয় করতে লাগল, সে ক্লারার বুকে মুখ লুকাল। ভাবল ক্লারা কে? ও ত' একটা দুর্ব্বার, দুরন্ত, বাধাবন্ধহীন প্রাণ, আজ রাত্রির এই পরমক্ষণে তার নিজের প্রাণের পাশে এসে এক সঙ্গে একই বাতাস থেকে নিঃশ্বাস টেনে

নিচ্ছে। তাদের দু'জনার চেয়ে এ রহস্য অনেক বড়ো ; এই বিপুল রহস্যের মুখোমুখি হয়ে পল স্তব্ধ হয়ে গেল। আজ দু'জনার পরিচয় হ'ল, সে পরিচয়ের মধ্যে কচি দূর্ব্বাঘাসের স্পর্শ, ঝিঁঝি পোকার ডাক, তারার আবর্ত্তন সব একাকার হয়ে মিশে রয়েছে।

দু'জনে যখন উঠে দাঁড়াল, দেখল ওপাশের ঝোপের আড়াল দিয়ে অন্য প্রেমিক-প্রেমিকারা মাঠের দিকে চলেছে। আজ ওদের আচরণকে অস্বাভাবিক বলে আর মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে এই তারা-ভরা রজনীর ওরা যেন অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

এমনি একটি সন্ধ্যা কেটে যাবার পর দু'জনেই নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে। আবেগের প্রচণ্ডতা তারা অনুভব করেছে। এখন নিজেদের প্রতিদিনের সত্তাকে মনে হয় অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ, তাদের ভয়-ভয় করতে থাকে, অবাক্ হয়ে তারা ভাবতে বসে। আডাম আর ইভ্ তাঁদের নিষ্পাপ সরলতা হারিয়ে যেদিন স্বর্গচ্যুত হলেন, সেদিন যে প্রচণ্ড শক্তি তাঁদের স্বর্গের বাইরে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, মানুষের দিন আর রাত জুড়ে তাঁদের অবিরাম চলতে বাধ্য করেছিল, সেই দুর্ব্বার মহাশক্তির কথা তাঁরা যেমন করে ভেবেছিলেন, আজ পল আর ক্লারার ভাবনাও হ'ল তাই। দু'জনারই আজ মন্ত্রদীক্ষা, দু'জনারই নতুন পরিতৃপ্তি। নিজেদের নিরর্থকতাকে এ ভাবে উপলব্ধি করা যে উন্মাদ স্রোত তাদের জীবনে অবিরাম প্রবাহের সৃষ্টি করে চলেছে এমন ক'রে মুখোমুখি তার পরিচয় লাভ করা, এতেই যেন ওদের মনের অস্থির ভাব অনেকটা দূর হয়ে গেল। এই উন্মত্ত মহাস্রোত যদি এমন ক'রে তাদের ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারে, এমন ক'রে নিজের সঙ্গে তাদের আলাদা অস্তিত্বকে মিলিয়ে দিতে পারে, যদি এমন ক'রে বিলীন হয়ে গিয়ে তারা উপলব্ধি করতে পারে যে এই উত্তাল তরঙ্গমালার বুকে তারা কচি ঘাস, গাছ, লতা কিম্বা অন্য যে কোন প্রাণবান বস্তুর মতই দুটি অসহায় জলবিন্দু মাত্র, তা'হলে আর নিজেদের ছোট-খাট ভাবনা নিয়ে বিব্রত হবার কারণ কি? এখন থেকে ওই প্রচণ্ড জীবন-স্রোতের হাতে নিজেদের ভাগ্যকে ছেড়ে দিলেই ত' শান্তি। দু'জনের এই মিলিত অভিজ্ঞতা—একে আর যাচাই ক'রে দেখবার প্রয়োজন নেই। এর আর অন্যথা হবার জো নেই। এখন থেকে এই হবে তাদের জীবন-বেদ।

তবু ক্লারা যেন পুরোপুরি তৃপ্তি পায় না। বুঝেছে একটা বৃহৎ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি এসে সে দাঁড়িয়েছিল, বুঝেছে এই রহস্যের দ্বারা কেন সে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল, তবু এ আর কতক্ষণ? সকাল-বেলা তার কিছুই রইল না। তবু মুহূর্ত্তটিকে ধরে রাখতে পারে নি। আবার তাকে ফিরে পাবার জন্যে, তাকে চিরদিনের মত ক'রে পাবার জন্যে, ক্লারার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল। তার বুঝবার মধ্যেও কিছু গলদ ছিল। ভেবেছিল সে বুঝি পলকেই চায়। কিন্তু ওকে নিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় কি! হয়ত আর কোন দিন ওকে এমন করে পাওয়া হবে না, হয়ত পল তাকে ছেড়ে চলে যাবে। ওকে নিশ্চিন্ত করে না পেলে ক্লারা খুশি হতে পারে না। ক্লারা একবার রহস্য-রাজ্যে এগিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু যার জন্যে তার আকুলতা তাকে সে শক্ত মুঠিতে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। আর কেন যে এই আকুলতা তাই কি সে ভাল করে জানে?

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে পলের মনে হ'ল, তার হৃদয় জুড়িয়ে গেছে। অকারণেই সে খুশি হয়ে উঠল। মনে হ'ল যেন কামনার মন্ত্রে তার অগ্নিদীক্ষা সমাপ্ত হয়েছে, মনের সমস্ত চাঞ্চল্য এবার শান্ত হয়ে এল। পল বুঝতে পারল ক্লারা এর মূলে নয়। ক্লারা শুধু উপলক্ষ্য। কালকের ঘটনায় ক্লারার সঙ্গে তার ব্যবধান একটুও ঘোচেনি। মনে হয় তারা দু'জনেই যেন একটা মহাশক্তির অন্ধ ক্রীড়নক।

সেদিন কারখানায় পলকে দেখে ক্লারার মন যেন বিন্দু-বিন্দু উষ্ণতায় দ্রব হয়ে যেতে লাগল। ওই ওর দেহ, ওই ললাট। বুকের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে। ধরে রাখতেই হবে ওকে। কিন্তু পল আজ শান্ত, বিন্দুমাত্র উত্তেজনা তার নেই। নানা জনকে নানা নির্দ্দেশ দিয়ে চলেছে। ক্লারা ওর পিছনে পিছনে নীচের অন্ধকার সুড়ঙ্গের মত ঘরটায় গিয়ে নামল, গিয়ে ওর দিকে বাহু মেলে দাঁড়াল। পল চুম্বন করল ওকে, আবার তীব্র কামনার আগুন জ্বলে উঠতে চাইল তার বুকের মধ্যে। দরজায় কে এসে দাঁড়াল যেন। পল ছুটে গেল দোতলায়। ক্লারা যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ফিরে এল নিজের ঘরে।

তার পর সেই আগুন ধীরে ধীরে নিবে এল। পল বুঝতে পারল, তার এই অভিজ্ঞতা ক্লারার জন্য নয়, এটা ব্যক্তিনিরপেক্ষ। ক্লারাকে সে ভালবাসে—একই গভীর অনুভূতির মধ্যে দু'জনে মিলিত হয়েছিল, তাই ক্লারার জন্যে অন্তরে সে কোমলতা অনুভব করে। কিন্তু জানে, ক্লারা তার অন্তরকে বেঁধে রাখতে পারবে না। সে ক্লারার কাছে যা চায় সে জিনিস ক্লারা তাকে কোন দিনই দিতে পারবে না।

কিন্তু ক্লারা আবেগে অধীর হয়ে উঠেছিল। দেখলেই পলকে স্পর্শ করতে ইচ্ছে করে,—কারখানায় পল যখন কাজের কথা বলে যায়, তখনও অতি সঙ্গোপনে ক্লারা হাত বাড়িয়ে দেয় ওর পাশ দিয়ে, নীচের ঘরে গিয়ে একটি দ্রুত চুম্বন লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে।

একদিন পল ওকে বলে ফেলল, 'তুমি এমন সর্ব্বদা চুমো খেতে আর গায়ে জড়িয়ে থাকতে চাও কেন বলো ত'? সবেরই একটা সময় আছে।'

ক্লারা চোখ তুলে চাইল ওর দিকে, সে চোখে গভীর বিতৃষ্ণা। বলল, 'কে বলেছে আমি সর্ব্বদা তোমাকে চুমো খেতে চাই?'

—'হ্যাঁ। সব সময়। যখন আমি কাজের কথা বলতে আসি তখনও। কাজের সময় ভালবাসা-টাসা আমার ভাল লাগে না। কাজের সময় কাজ।'

'তবে ভালবাসাটা কী? তার জন্যে আলাদা সময় দাগ দিয়ে রাখতে হয় বুঝি?'

—'হ্যাঁ। কাজের সময় নয়।'

—'ও, বুঝেছি। মিষ্টার জর্ডন কখন কারখানা খোলেন আর বন্ধ করেন, তাই দিয়ে মেপে মেপে তুমি ভালবাসবে?'

—'হ্যাঁ। যখন অন্য কোন কাজ থাকবে না তখন।'

'তার মানে ভালবাসা শুধু বাড়তি সময়টার জন্যে।'

'ঠিক তাই। আর তখনও কেবল ওই চুমো দেওয়া-নেওয়াই ভালবাসা নয়।'

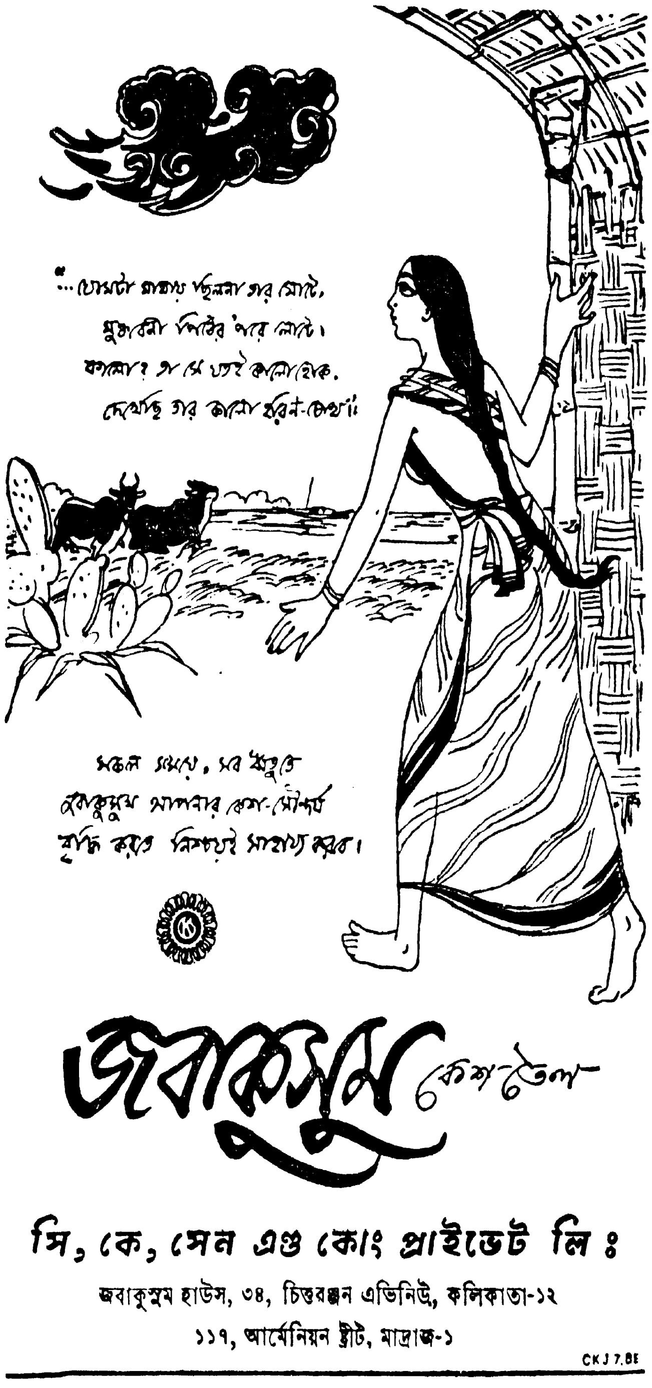
'এই পর্য্যন্ত বুঝি তুমি ভেবে ঠিক করেছ?'

'হ্যাঁ, এই পর্য্যন্তই যথেষ্ট।'

'শুনে খুশি হলুম।'

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য


"...ঘোমটা মাথায় ছিলনা তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।"
সকল সময়ে, সব ঋতুতে
জবাকুসুম আপনার কেশ-সৌন্দর্য
বৃদ্ধি করতে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।
জবাকুসুম কেশ-তৈল
সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, ৩৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-১২
১১৭, আর্মেনিয়ন স্ট্রীট, মাদ্রাজ-১
CKJ 7.BE

নাচ গান বাজনা



সংগীতানুক্রম ও সুরারোপ

বিশ্লেষকের তির্যক নিরীক্ষার বাহিরে সংগীতের মোটামুটি পরিভাষা করিলে এইরূপই প্রাণে একটি সুর অনুরণিত হইতে থাকে। "সংগীত মানব-জীবনের এক স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি" ইহা সঠিক কোন সন হইতে মানব-সমাজে স্থানলাভ করিয়া ক্রমশঃ এইরূপ গুরুত্বের কোঠায় উঠিল, তাহার তারিখ ও তিথি নিরিখ করিবার প্রয়োজন নাই। এতদ্দেশীয় সংগীতই যে আদিসভায় বেদ-সংগীতরূপে গীত হইত, তাহা প্রায় সর্ববাদিসম্মত। এ সম্বন্ধে প্রামাণিকতা আরোপ করিয়া এক বিখ্যাত গ্রন্থের ভূমিকাকার বলেন—'The elements of the art of music seem to have originated with the vedic songs called 'Samas' which were sung at the time of performing particular ceremonies during a sacrifice. The rules about the singing of these 'Samas' are recorded in some ancient sanskrit treatises'

তবে সেই গীতি-পদ্ধতি যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরণের ছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। সেই সংগীত ছিল সাত্ত্বিক ও পবিত্রতার সামগান। ঈশ্বর ও প্রকৃতিরই প্রাধান্য ছিল সেই সব সংগীতের মধ্যে। মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশে ও রুচির তারতম্যে সংগীতের বিভিন্ন ধারা বিভিন্ন পদ্ধতি সৃজিত হইল নূতন দৃষ্টিকোণে। নিজ প্রয়োজনে মানব সংগীতকে রূপ দিল নূতন নামে, নূতন ঐকান্তিক অনুভব-বেদ্যতায়। তাহারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ঈশ্বরকে উদ্দেশ করিয়া গাহিল :—

'মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুংসি
মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ।
বীরান্ মা নো রুদ্র
ভামিতোহবধীর্হবিষ্মন্তঃ সদসং ত্বা হবামহে।

মানবিক-আর্তি সুরে রূপায়িত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিল। এইরূপেই নিজেদের হর্ষ-বিষাদ, ভীতি-প্রীতির ইতিহাস তাহারা রাখিয়া [illegible] সংগীতে প্রার্থনায়।

মোটামুটি ভারতের সংগীতেতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, প্রায় বহুদিন হইতেই এই ভারতবর্ষে বিভিন্ন দুইটি সাংগীতিক ধারা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব হইতেই ইহা প্রচলিত। স্থূল দৃষ্টিতে দেখা যায়, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারতীয় সংগীত-জগতে বেশ একটি আলোড়ন অনুভূত হয় এবং উত্তরকালের সাংগীতিক ধারার উপর ইহা প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করে। প্রচলিত উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতীয় সংগীত যে আপাত বিভিন্ন, তাহা সুবিদিত। এই দ্বি-ধারার কালনির্ণয় সঠিক কষ্টসাধ্য হইলেও অনুমান করা যায়, ইহা 'সংগীতরত্নাকর' প্রণেতা সার্ঙ্গদেব-পূর্ব যুগ হইতে প্রবহমান। বিশেষজ্ঞেরা এ সম্বন্ধে বলেন—'At present there are two systems of music in vogue in India. The one is called the Hindusthani or northern India system which prevails in nothern India, Bengal, Sindha, Gujaratha, and Maharashtra. The other is called the Dakshinadi or Southern India system which prevails in the Madras Presidency including Tailangana, Karnataka and Malabar countries. At present we have no definite material to ascertain the time when these two systems grew differently from the original system of Bharata and other ancient musicians who founded the scientific system of Indian music.

যাহা হউক, এই উভয় সংগীতধারাই যে নিজ স্বকীয়তায় দেদীপ্যমান, তাহা বলাই বাহুল্য। আবার আমরা জানি, প্রত্যেক প্রদেশেই একটি নিজস্ব সংগীত বা গীতিধারার অনুক্রম রক্ষা করিয়া আসিতেছে। এই বিশেষ গীতিধারাই কালক্রমে দেশীয় লোকসংগীত নামে পরিগণিত হইয়া থাকে। আমরা এই লোকসংগীতের মাধ্যমে তদ্দেশীয় ইতিহ ও ঐতিহ্য অথবা সামাজিক নিয়ম-কানুনের পরিচয় পাই।

এই লোকসংগীত এখনও বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে পার্বণাদিতে গীত হইয়া থাকে। তবে অত্যন্ত দুঃখের কথা, বিভিন্ন চটুল সংগীত ও বৈদেশিক মিশ্রিত সুরের সহযোগে বাংলা গানের সপিণ্ডীকরণে যে 'খিচুড়ী-সংগীত' উৎপন্ন হইয়াছে—তাহার নিষ্পেষণে লোকসংগীত বড়ই পর্যুদস্ত। এতদ্ভিন্ন সবচেয়ে আশ্চর্য হই এই বিষয়ে সংগীতজ্ঞ ও সুরকারদের স্থাণুর ন্যায় আচরণ। লোকসংগীতের মধ্যেও নবীন সুরকারদের টাংগী, জাজ, রামবা, সামবা-র দৌরাত্ম্য। কোন জিনিষের শুদ্ধত্বের প্রতি (origin) তাঁদের নিন্দনীয় নিশ্চেষ্টতা। এ বিষয়ে একমাত্র সুরকারদেরই দায়ী করা যাইতে পারে। কারণ, বর্তমান পরিস্থিতির বিপর্যস্ত আধুনিক সাংগীতিক ধারা ও রুচির জন্য এঁরাই দায়ী। অবশ্য এ বিষয়ে কয়েক জন যথেষ্ট নিষ্ঠারও পরিচয় দিয়াছেন। এই বিভাব্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে আমি ব্যক্তিগত ভাবে কয়েক জন বিশিষ্ট সুরকারের সাথে আলোচনা চালাই কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, তাঁহাদের অধিকাংশের মধ্যেই সস্তায় কিস্তিমাৎ ধরণের এক নেশা যেন চাপিয়া ধরিয়াছে। যেন আমাদের কিছু নাই—অপরের কাছে ধার করিতেই হইবে। খোদায় মালুম, এই রুচিনিয়ন্তাদের বিকৃত স্বীয় রুচি কবে নিয়ন্ত্রিত হইবে?

বিভিন্ন লোকসংগীতের উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সহজতর

অবস্থায় ভারতীয় সংগীতের প্রয়োগ-পদ্ধতি, নিপুণতার সহিত যদি এই সুরকারেরা না করেন, তবে সাধারণের রুচি এবং এই বিষম-আধুনিক সংগীত অদূর ভবিষ্যতে যে কী পর্যায়ে পর্যবসিত হইবে—বোধ করি ঈশ্বরেরও অবিদিত! ভারতীয় বিশেষত: বঙ্গের ঐতিহ্য-পরিপন্থী এই বৈদেশিক সংগীত যত দিন বাংলা গানে ও লোকসংগীতে প্রবেশের অনুজ্ঞা-পত্র পাইবে তত দিন বাংলার দেশীয় সংগীতে আসুরিক দৌরাত্ম্যের বিরাম ঘটিবে না। এই নিদারুণ অরুচিকীর্ষার পুনরায়ণ যতক্ষণ বাংলার শিল্প-সাহিত্যে-সংগীতে থাকিবে ততক্ষণ বাংলার দুর্দশাবস্থা, সংকটাপন্ন অমানিশা। যত দিন না ইহার বিরুদ্ধে জনগণের উদ্ধত দ্রোহবাণী উচ্চারিত হইবে তত দিন এই অমানুষিকী চিন্তা হইতে স্রষ্টারা রেহাই পাইবেন না।

একটু লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, বিভিন্ন জাতীয় প্রবচনের নিমিত্ত প্রায় সর্বদেশেরই সাংগীতিক ভারসাম্যের কিছু রদ-বদল ঘটে। আমাদের দেশেও যে এরূপ কিছু ঘটে নাই বলা যায় না। প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ভারতীয় মার্গসংগীত পুনরায় ফুলে-ফলে সুশোভিত হইতে থাকে। এই মার্গসংগীতের ধারা লিখন-পদ্ধতি ব্যতীত শ্রুতাবস্থায় বিভিন্ন ঘরোয়ানার খাতে প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। এই ঘরোয়ানা কালক্রমে বিভিন্ন সংগীত-সাধকদের প্রচেষ্টায় এক একটি ধারা বা বৈশিষ্ট্যে অনুবর্তিত হইতে থাকে। বেদ বা পিঠকের ন্যায় ইহারা যুগান্ত অতিক্রম করিয়া সংক্রামিত বা হস্তান্তরিত হয়। আজিও প্রবহমান নদীর স্রোতের ন্যায় ইহা দুর্নিবার কলোচ্ছ্বাসে চলমান—জানি না, ইহার রোধ ও নিরোধ কবে, কোথায়?

—মলয় ভট্টাচার্য

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বেতার অনুষ্ঠান

১লা আষাঢ়—মেঘদূত-সঙ্গীত নক্সা, পরিচালনা—জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। ২রা—শ্যামল মিত্র—গীত ও আধুনিক। ৩রা—প্রতিমা চক্রবর্ত্তী—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ৪ঠা—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত, অনিল রায়চৌধুরী—স্বরোদ। ৫ই—অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত, কল্যাণী রায়—সেতার। ৬ই—অনীতা মজুমদার—রবীন্দ্র সঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গান। ৭ই—হিমাংশু বিশ্বাস—বংশী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত—স্বরোদ। ৮ই—রাধিকামোহন মৈত্র—স্বরোদ, শ্রীলা সেন—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ৯ই—মহম্মদ সারুদ্দিন—সারেঙ্গী। ১০ই—উমা দে—ঠুংরী। ১২ই—গীতা সেন—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ১৩ই—সবিতা সিংহ—রবীন্দ্র সঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গান। ১৪ই—শচীন গুপ্ত—রবীন্দ্র সঙ্গীত, মুস্তাক আলি—সেতার। ১৫ই—পূরবী চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত, নারায়ণ রাও—খেয়াল। ১৬ই—দ্বৈত যন্ত্রসঙ্গীত—সুজিতনাথ—গীটার, দক্ষিণামোহন ঠাকুর—দিলরুবা, পূরবী দত্ত—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ১৭ই—অপরেশ চট্টোপাধ্যায়—সেতার, সত্যেন ঘোষাল—রাগপ্রধান। ১৮ই—কমলা বসু। ১৯শে—সুমিত্রা সেন—রবীন্দ্র সঙ্গীত, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক। ২০শে—আরাধনা বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত ও রাগপ্রধান। ২১শে—রত্না বিশ্বাস—রবীন্দ্র সঙ্গীত ও অতুলপ্রসাদের গান। ২২শে—ইলা চক্রবর্ত্তী—রাগপ্রধান ও গীত, সুশীলকুমার চট্টোপাধ্যায়। ২৪শে—রেণুকা সাহা—সেতার। ২৫শে—চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল ও ঠুংরী। ২৭শে—দীপালি নাগ—খেয়াল ও রাগপ্রধান, গৌরী দাস—রবীন্দ্র সঙ্গীত। ২৮শে—মঞ্জু গুপ্ত—রবীন্দ্র সঙ্গীত, আষাঢ় সন্ধ্যা (শান্তিনিকেতন থেকে পুন: প্রচার) পরিচালনা—শান্তিদেব ঘোষ। ২৯শে—অখিলবন্ধু ঘোষ—রাগপ্রধান, কৃষ্ণচন্দ্র দে—কীর্ত্তন। ৩১শে—নীলিমা সেন—রবীন্দ্র সঙ্গীত, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক।

রেকর্ড-পরিচয়

'ঐ কুর-কুর-কুর মিষ্টি কি সুর মেঘেরা বাজায় ঢোলক'—আষাঢ়, আষাঢ়! 'আবার এসেছে আষাঢ় আকাশ ছেয়ে।' নদী ভরেছে, নালা ভরেছে, আর ভরে উঠেছে মানুষের মন, ভেজা মাটির ঘ্রাণে, আর মন-মাতানো গানে। এই দিনগুলিতেই বেশি করে মানুষ মাটির কথা মনে করে, মনে করে—'মাটিতে জন্ম নিলেম, মাটি তাই অঙ্গে মিশেছে'—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের দরদঢালা কণ্ঠের এই মর্মস্পর্শী গানটিও। রেডিওতে, জলসায় সর্বত্রই আজ-কাল এ গানটি অপূর্ব সমাদর লাভ করেছে, সুখের বিষয় গানটি রেকর্ডেও প্রকাশিত হয়েছে। অপর দিকে আছে—'কোথা যেন ভাসে'। কলম্বিয়া রেকর্ড নং—GE 24797। প্রবীর মজুমদারের রচনার কৃতিত্ব স্বীকার করতেই হয়। গৌরীপ্রসন্নের রচনা আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ একটির পর একটি বিস্ময় রচনা করে চলেছে। এদের নতুন উপহার—"অনেক দূরের ঐ যে আকাশ",

এবং "তোমারে হারানো এ তো নয়" ।—GE 24798 । কুমারী গায়ত্রী বসুর সুভাষিত সঙ্গীত—"রজনীগন্ধা সুরভি ঝরায়" এবং "গুন গুন গুন গুন" ।—GE 24799 । শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্মমূলক গান —"হে দেহে নিলাজ বঁধূ" (চণ্ডীদাস) এবং "জিতি কুঞ্জর গতি" (শশিশেখর) চমৎকার !—GE 24800 । কলম্বিয়ায় নতুন যন্ত্র-গীতি—অমর সিং-এর ক্লারিওনেট—"ভাই ভাই" বাণীচিত্রের দুটি বিখ্যাত গানের সুরে—"শরানী যা" এবং "দুনিয়া সেঁ" ।—GE 25832 । বাণীচিত্রের গান—"কি খেলা খেলেছি" এবং "ফুল সুন্দর চাঁদ সুন্দর"—(অনুপমা' GE 30332) এবং "নীল নীল তারা" এবং "এতোদিন পরে তোমার গুরথ"—('শঙ্করনারায়ণ ব্যাঙ্ক' GE 30333)—গেয়েছেন গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় । নতুন 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের মধ্যে আছে—শ্রীমতী উৎপলা সেন গীত—"এই ছায়াবীথি তলে" এবং "নীলপরীদের ইন্দ্রধনু"—N 82704 । তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "এক একদিন মেঘ করে" এবং "কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে"—N 82705 । শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষের নতুন গান—"ভ্রমর বাউল তোমার পাখার" এবং "এ ব্যথা জানি বলে"—N 82706 । কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের—"চরকা কাটে চরকা-বুড়ী" এবং "পৌষালী সন্ধ্যার ঘুম"—N 82707 । লক্ষ্য করবার বিষয়, এই 'হিজ মাষ্টার্স ভয়েস' রেকর্ডের গানগুলি কেবল যে বিশিষ্ট শিল্পীরাই গেয়েছেন তাই নয়, যার কণ্ঠে ঠিক যেমন গান সবচেয়ে ভালো মানায় তাকে তাই দেওয়া হয়েছে—এজন্য সবগুলি গানই বিশেষ উপভোগ্য হয়েছে ।

সাঙ্গীতিকী

সোবিয়েৎ রাষ্ট্র, চেকোশ্লোভাকিয়া বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, পোল্যাণ্ড, যুগোশ্লাভিয়া এবং হাঙ্গেরী হইতে আমন্ত্রিত হইয়া একটি ভারতীয় সংস্কৃতি প্রতিনিধি দল ঐ দেশসমূহে তিন মাস কাল সফর করিবেন । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র ৩০ জন শিল্পী লইয়া গঠিত এই দলের নেতৃত্ব করিবেন । আগামী ১০ই জুলাই তাঁহারা নয়াদিল্লী হইতে রওনা হইবেন । শিল্পীদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল :—কথক—কুমারী সিতারা দেবী (নৃত্যশিল্পী), শ্রীকৃষ্ণ পানিকের (ছেন্দা), শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্র (তবলা), শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ (নাগমা) সেতার :—শ্রীবিনায়েৎ খান । সুরবাহার :—শ্রীইমরৎ হোসেন । ভারত নাট্যম :—নৃত্যশিল্প কুমারী এ সারদা, কুমারী পুষ্প মাখিজানি । সঙ্গতকারী :—শ্রী বি লক্ষ্মণ (মৃদঙ্গ), শ্রী ডি পশুপতি (কণ্ঠ) । কথাকলি :—নৃত্যশিল্পী—শ্রীরমণ কুট্টি, শ্রীকৃষ্ণণ কুট্টি, শ্রীবালকৃষ্ণাণ নায়ার । সঙ্গতকারী :—শ্রী টি চন্দ্রন (ছেন্দা), শ্রী ই কে অচ্যুথান (মাদলম), শ্রীবসুদেবন নেতুঙ্গাদি ও শ্রী কে কুমারণ (সঙ্গীত) । শান্তিনিকেতনের শিল্পিবৃন্দ :—সঙ্গীত পরিচালক —শ্রীবীরেন পালিত, নৃত্য পরিচালক—শ্রীনরেন্দ্র কুমার । নৃত্যশিল্পী—কুমারী মিত্রা দত্ত, কুমারী উমা গান্ধী, কুমারী কিরণ মহাজন, কুমারী উয়ানা আরণ্যকম, শ্রীকুমারী মঞ্জুলা দত্ত । রবীন্দ্র-সঙ্গীত—শ্রীদ্বিজেন মুখার্জি তবলা—শ্রীশান্তাপ্রসাদ । পল্লীগীত—নির্মলেন্দু চৌধুরী । সঙ্গতকারী :—নিরেন্দু চৌধুরী । স্বরোদ—শ্রীবাহাদুর খান । হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত—শ্রীমতী ললিতা শিবরাম উভয়কর । পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আণ্ডার সেক্রেটারী শ্রীরমেশ ভাণ্ডারী, আই এফ এস সম্পাদক হিসাবে এবং শিক্ষামন্ত্রণালয়ের সহকারী শিক্ষা উপদেষ্টা কুমারী কপিলা মালিক প্রোগ্রাম ডাইরেক্টার হিসাবে যাইবেন । প্রতিনিধি দল আগামী অক্টোবর মাসে দেশে ফিরিয়া আসিবেন । লোকসংস্কৃতির প্রধান অভিব্যক্তি সংগীতে । গ্রাম-জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা ফুটে ওঠে লোকগীতির কথার সুরে । বাঙ্গলা দেশে এ কথার সত্যতা ষোল আনা । গরু-মোষ-চরা খোলামাঠ, পালতোলা দাঁড়টানা ভরানদী, হাসিকান্না ভরা পল্লীজীবন উজ্জ্বল ছবির মালায় ধরা দেয় গানের ভিতর, যে গান শুনলে অনেক নাগরিক-মনে শৈশব স্মৃতির পুনরুজ্জীবন না হয়ে যায় না । সম্প্রতি একটি সংগীতের আসরে নির্মলেন্দু চৌধুরীর আশ্চর্য কণ্ঠে অনেকগুলো বাঙ্গলা লোকগীতি শোনার সৌভাগ্য হয় এবং তাতে বাঙ্গলা লোকগীতির কাব্যময় ঐশ্বর্য নূতন করে অনুভব করা গেছে । তিনি বিভিন্ন ধরণের লোকগীতি, সারি, জারী, গাজী, ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, বাউল, ধামাইল, বেদের গান, ব্রতের গান অপূর্ব কণ্ঠমাধুর্যে পরিবেশন করলেন । তাঁর দরাজ গলায় সুরের আরোহণ, অবরোহণ দেখে বিস্মিত হতে হয় । ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান গেয়ে তাঁর যেমন ক্লান্তি আসে না, শ্রোতাদেরও তেমনি তা শুনে একঘেঁয়ে লাগে না । নির্মলেন্দু চৌধুরীর যথার্থ বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে লোকগীতির উচ্চারণ ও গায়নরীতি যথাযথ রাখার চেষ্টায় । 'গীটার ম্যাণ্ডেলিন সমৃদ্ধ' মিনমিনে গলায় চলতি লোকগীতির মধ্যে তাঁর গান সত্যিই এক ব্যতিক্রম । আশঙ্কা হয়, আধুনিক সিনেমার গানে কণ্টকিত সহরে হাওয়ায় তাঁর গলার সতেজ 'গ্রাম্যতা' নষ্ট হয়ে না যায় । গত বছর ওয়ারশ'তে বিশ্ব যুব-উৎসব লোকগীতির আসরে সবদেশের গাইয়েদের মধ্যে তিনি প্রথম হয়েছিলেন । এবছর জুলাই মাসে তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েট রাশিয়ায় যাচ্ছেন বাঙ্গলা দেশের লোকগীতির প্রতিনিধিত্ব করতে । তাঁর নির্বাচন উপযুক্ত হয়েছে ; আশা করা যায় বাঙ্গলা দেশের এই অপূর্ব সম্পদ পরিবেশন করে তিনি সেই দেশের শ্রোতাদের হৃদয় জয় করতে পারবেন । রবিবার ১৭ই জুন সন্ধ্যা ৬ টায় বেলেঘাটা "সান্ধ্য সমিতি হলে" সুরবিতান সঙ্গীতসঙ্ঘের ৫ম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে প্রফুল্লরঞ্জন রায়ের পরিচালনায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন হয় । উহাতে কণ্ঠ-সঙ্গীতে—ব্রজগোপাল দাস, কমলা সাহা, গৌরী রায়, লক্ষ্মী সাহা, সরস্বতী সাহা, চন্দন ব্যানার্জী, অনীতা দাস, যন্ত্র-সঙ্গীতে—চিত্তরঞ্জন ঘোষ, নিশীথ ঘোষ, নৃত্যে—পলী রায়, যন্ত্র সঙ্গীত পরিচালনায় বিধান দাস, এবং তবলা-সঙ্গতে নানকু মহারাজ, প্রভাত ঘোষ, পিটার-গোমেশ, কানাই মুখার্জী, অনিমেষ মজুমদার ও পাঁচ বৎসর বয়স্ক মাঃ তিনু প্রভৃতি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন । আগামী ৭ই ও ৮ই জুলাই আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজের উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত ও নৃত্যে "শিশু প্রতিভা সম্মেলন" নামে যে অনুষ্ঠানটি হওয়ার কথা ছিল সেই অনুষ্ঠানটি উক্ত সময়ে না হয়ে আগামী ১৪ই জুলাই শনিবার

ও ১৫ই জুলাই, রবিবার ৪৮, মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করবেন শ্রীবিজয়কুমার সারাওগী। অনুষ্ঠানটি উদ্বোধন করবেন কলিকাতার কলেক্টর শ্রী এন, । ঘোষ। "সাংস্কৃতিকীর" শিল্পিবৃন্দ তাঁদের প্রথম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবস সক্ষে আগামী ২১শে জুলাই সকাল ১০টায় কলিকাতাস্থ নিউ এম্পায়ার মঞ্চে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য "চিত্রাঙ্গদা" মঞ্চস্থ করবেন। সঙ্গীতে শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ, শচীন গুপ্ত, ধীরেন বসু প্রভৃতি এবং নৃত্যে কুমারী দীপিকা ও মঞ্জুলিকা দাস, জয়ন্তী বসু, জলি ব্যানার্জি প্রভৃতি অংশগ্রহণ করবেন। সঙ্গীত-পরিচালনা করবেন শ্রীধীরেন বসু, এবং নৃত্য-পরিচালনা করবেন শ্রীহিমাংশু গোস্বামী। আলোক-সম্পাতের ভার গ্রহণ করেছেন শ্রীতাপস সেন। আগামী ২২শে জুলাই রবিবার সকাল সাড়ে দশটায় নিউ এম্পায়ারে দক্ষিণীর নৃত্য বিভাগের বার্ষিক নৃত্যানুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। এই অনুষ্ঠানে 'দক্ষিণী' গোষ্ঠীর ও ত্রিশজনের অধিক নৃত্যশিল্পী অংশ গ্রহণ করবেন। 'ভারত-নাট্যম' ও 'কথাকলি' নৃত্যাংশ পরিচালনা করবেন শিক্ষায়তনের নবনিযুক্ত অধ্যাপক শ্রীগোপীনাথন্ নায়ার এবং 'মণিপুরী' নৃত্যাংশ শিক্ষাদান করবেন শ্রীমতী মাধবী চট্টোপাধ্যায়। পরিপূরক রবীন্দ্রসঙ্গীতাংশ তত্ত্বাবধান করবেন শ্রীশ্যামল মুখোপাধ্যায়।

আমার কথা (১৯)

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

অর্থ-যশ-প্রতিপত্তি—এক কথায় সৌভাগ্যের অমেয় ঐশ্বর্যে বিশিষ্ট হয়েও সৌজন্য-শিষ্টতা বিনয় আর অননুকরণীয় মধুভাষণে যিনি শুধু সংগীতশিল্পীদের নন, অন্য সকলেরও অনুকরণযোগ্য দৃষ্টান্তবিশেষ, নিরহংকার সদালাপী সেই শ্রুতকীর্ত্তি জনপ্রিয় শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় আমাদের বাসনা জানাতেই তাঁর সেই বিশিষ্ট শুভ্র-নির্মল মৃদু হাসি ছড়িয়ে দিলেন। অশেষ কর্মব্যস্ততার মধ্যেও সময় করে নিয়ে আমাদের প্রশ্নাবলীর উত্তরে বললেন :—

'আমার জন্ম বাংলা ১৩২৬ সালের মাঘ মাসে—সরস্বতী পুজার দিনে। জন্মেছি বেনারসে মামার বাড়িতেই। আমাদের আদিনিবাস চব্বিশ পরগণার জয়নগরের কাছে বহড় গ্রামে। শিক্ষারম্ভ গ্রামের স্কুলেই। কয়েক বৎসর ওখানে পড়ার পর কলকাতায় চলে আসি এবং ভবানীপুর মিত্র ইনস্‌ট্যুটশনে ভর্তি হই। তারপর ১১৩৮ সালে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে ভর্তি হই যাদবপুর ইন্‌জিনিয়ারিং কলেজে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে শারীরিক অসুস্থতার জন্যে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হই।

ছেলেবেলা থেকেই গান-বাজনার দিকে ঝোঁক ছিল। মার কাছ থেকেই এ-ব্যাপারে সব চাইতে বেশি উৎসাহ পাই। বস্তুত, মার কাছ থেকে উৎসাহ ও প্রেরণা না পেলে গানের ব্যাপারে কতদূর এগোতাম, সন্দেহ! এখানে বলে রাখি, সাহিত্যচর্চা মার অন্যতম প্রিয় খেয়াল; সম্প্রতি কোন একটি সিনেমা-পত্রিকায় তাঁর একটি দীর্ঘ গল্প বেরিয়েছে। যাই হোক, আমি যখন নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন থেকেই গাইয়ে হিসাবে মোটামুটি একটা সুনাম অর্জন করি। ঐ সময়ে আমি বেতারে এবং রেকর্ডে গান করি। রেকর্ড করার ব্যাপারে আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছিলেন শ্রীশৈলেশ দত্তগুপ্ত। তাঁরই শিক্ষাধীনে কলম্বিয়া থেকে আমার প্রথম রেকর্ড বেরোয়—'জানিতে যদি গো তুমি' ও 'বলো গো বলো মোরে'। এর কিছুদিন পরে সিনেমায় নেপথ্য-সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ আসে, সে সুযোগ দিয়েছিলেন 'নিমাই সন্ন্যাস' বাণীচিত্রের সুরকার শ্রীহরিপ্রসন্ন দাস। ঐ ছবিতে আমি তাঁর সহকারী হিসাবেও কাজ করেছিলাম। এর পরে 'প্রিয়বান্ধবী' ছবিতে গান করি এবং আমার গাওয়া গানের মধ্যে 'পথের শেষ কোথায়' এই রবীন্দ্র-সংগীতটি জনপ্রিয় হয়। 'প্রিয়বান্ধবী'র পর বহু বাংলা ছবিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছি। এদের মধ্যে 'পূর্বরাগ', 'অঞ্জনগড়' 'প্রিয়তমা', 'তুলসীদাস', 'সাত নম্বর বাড়ী' 'ঢুলী' 'শাপমোচন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ছবিতে আমার গাওয়া অনেকগুলি গান-ই জনপ্রিয় হয়, যেমন : 'পথের শেষ কোথায়' (প্রিয় বান্ধবী), 'ফেলে-আসা দিনগুলি মোর' (সাত নম্বর বাড়ী), 'স্মরণের এই বালুকাবেলায়' (প্রিয়তমা), 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস' ও 'সুরের আকাশে তুমি যে গো শুকতারা' (শাপমোচন)।

প্রথম যে হিন্দী ছবিতে আমি নেপথ্যে সংগীতশিল্পী হবার সুযোগ লাভ করি তা' হলো শচীন দেব বর্মণের 'সাজা' ছবিটি। এর পরে তাঁর সুর-যোজিত 'জাল' ছবিতেও গান করি এবং তার মধ্যে 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনী ফির কাঁহা' গানটি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। 'নাগিন' ছবির আগে যে সমস্ত হিন্দী ছবিতে আমি গান



হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

করেছি তার মধ্যে আনন্দমঠ, সাজা, জাল, আনারকলি, চক্রধারী, সবাব, পহেলী ঝলক, সর্ত, ফেরী প্রভৃতি উল্লেখ্য। এই সমস্ত ছবির বহু গানই জনপ্রিয় হয়েছে, যেমন 'ইয়ে রাত ইয়ে চাঁদনী' (জাল), 'জাগো দার্দ ইশ্ক জাগ' (আনারকলি), 'জমি চল্ রহি' (পহেলি ঝলক) ইত্যাদি। আর 'নাগিনে'র কথা নতুন ক'রে উল্লেখ করা তো বাহুল্যমাত্র। এ ছবির 'তেরে দ্বার খাড়া এক যোগী' বা 'জিন্দগী কী দেনেওয়ালে' প্রভৃতি গান তো, বলতে আনন্দ হয়, এক সময় লোকের মুখে-মুখেই ফিরেছে।

বাংলা ছবিতে সংগীত-পরিচালক হিসাবে আমি প্রথম অবতীর্ণ হই জ্যোতির্ময় রায়ের 'অভিযাত্রী' এবং প্রায় একই সময়ে গোবিন্দ রায় প্রযোজিত 'পূর্বরাগ' ছবিতে। তারপর থেকে যে-সব বাংলা ছবিতে আমি সুরযোজনা করেছি তার মধ্যে 'প্রিয়তমা' 'ভুলি নাই' '৪২', 'দিনের পর দিন', "জিঘাংসা', 'শাপমোচন' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আমারই সুর-যোজিত মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি হলো: 'সূর্যমুখী' 'তাসের ঘর' ও 'অন্তরাল'।

আমার সুরারোপিত প্রথম হিন্দী ছবি হলো 'আনন্দমঠ', আজ পর্যন্ত যে-সব হিন্দী ছবিতে সুরারোপ করেছি তার মধ্যে 'সর্ত' 'সম্রাট' 'জাগৃতি', 'ফেরী' 'নাগিন', 'তাজ', 'ইন্‌স্পেক্টার' প্রভৃতি উল্লেখের দাবী রাখে। আমার সুর-যোজিত মুক্তিপ্রতীক্ষিত ছবি হলো: 'দুর্গেশনন্দিনী', 'অঞ্জন', 'সওদাগর', 'মিসি আম্পা' ইত্যাদি।

চলচ্চিত্রে নেপথ্যে সংগীত ছাড়া আজ পর্যন্ত বহু আধুনিক গীত, রবীন্দ্র-সংগীত আমি রেকর্ড করেছি। বুঝতেই পারছেন, সবগুলি উল্লেখ করা অসম্ভব। মনেও আসছে না সব। কয়েকটি জনপ্রিয় গানের উল্লেখ করছি; 'কথা কয়ো না কো' (নিজের সুরে), 'পরদেশী কোথা যাও' (সুর শৈলেশ দাশ-গুপ্ত), 'শুকনো শাখার পাতা ঝরে যায়' ও 'আকাশ-মাটি ঐ ঘুমালো' (সুর অনুপম ঘটক), 'শুধু অবহেলা দিয়ে' (সুর সুধীরলাল চক্রবর্তী) 'গাঁয়ের বধূ', 'রাণার', 'অবাক পৃথিবী' 'পাল্কী চলে' ও 'ধিতাং ধিতাং বোলে' (সুর সলিল চৌধুরী), 'শান্ত নদীটি' (পরেশ ধর) এবং আমার ছোট ভাই অমল মুখোপাধ্যায়ের সুরে 'ছেলে-বেলায় গল্প শোনার দিনগুলি' ও স্বপ্নভরা স্বপ্নমায়ায়' ইত্যাদি। আধুনিক গানের মতো রবীন্দ্র-সংগীতও বহু রেকর্ড করেছি। রবীন্দ্র-সংগীতের বেলায় সহজ জনপ্রিয়তার কথা উঠতে পারে না, তাই তা আর উল্লেখ করলাম না। ব্যক্তিগত ভাবে রবীন্দ্র-সংগীত আমার খুব প্রিয়, এবং বলাই বাহুল্য, কয়েকটি আধুনিক গান ছাড়া রবীন্দ্র-সংগীতে আমি তৃপ্তি পেয়েছি সব চাইতে বেশী।

ভালো সংগীতশিল্পী হ'তে গেলে কণ্ঠস্বরের মাধুর্য অবশ্যই দরকার কিন্তু তার সংগে আরও একটা জিনিস দরকার, সেটি হলো নিষ্ঠা। কণ্ঠস্বর ভালো থাকা সত্ত্বেও এই নিষ্ঠার অভাবে অনেক শিল্পী বড়ো হতে পারেন না। একথা বলাই বাহুল্য যে, সংগীতবিদ্যা সাধনার বস্তু, কাজেই একাগ্র ভাবে সাধনা না করলে কখনোই কেউ বড়ো সংগীতশিল্পী হতে পারে না। অন্যান্য জীবিকার ক্ষেত্রে যেমন, গান-বাজনার ব্যাপারেও তেমনি সততা রক্ষা করা শিল্পীর পক্ষে অন্যতম কর্তব্য। সাধনার ক্ষেত্রে যেমন, সংগীতের পেশাগত বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তেমনি শিল্পীর সৎ হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। শিল্পীদের বেলায় যেমন, চলচ্চিত্রের প্রযোজকদের তেমনি সততা রক্ষা করা উচিত। কারণ আজ-কাল অনেক সময় দেখা যায় তাঁরা নেপথ্য সংগীত-শিল্পী বা সুরকারদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে কেন জানি না কুণ্ঠা বোধ করেন! বিশেষ ক'রে তাঁদের কাজ ফুরোলেই, তাঁরা তাঁদের সততার পরিচয় দিতে আশ্চর্যজনক ভাবে ইতস্ততঃ করেন।

কার কার গান ভালো লাগে বা কে কে ভালো সুরারোপ করেন, এ সম্পর্কে বিশেষ কোন মতামত দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মোটামুটি ভাবে সকলের গান-ই ভালো লাগে, অবশ্য এই ভালো লাগার মাত্রাভেদ নিশ্চয়ই আছে। ধরুন, অন্যের সুরে আমি এত যে গেয়েছি বা গাইছি তার সবই কী আমার সমান ভালো লেগেছে? নিশ্চয়ই না। তবে যে গানের সুর ভালো লাগে বা মনে ধরে, তাতে প্রাণসঞ্চার করা যায় সহজেই। যাই হোক, অপেক্ষাকৃত তরুণ শিল্পী সুরকারদের অনেকের মধ্যেই প্রতিশ্রুতির পরিচয় পেয়েছি। হয়তো একটু কেমন শোনাবে, তবু আমার ছোট ভাই অমলের কথা উদাহরণতঃ বলতে পারি। আগেই বলেছি, ওর সুরে দুটি গান আমি রেকর্ড করেছি এবং আমার সুরেও ও দুটি গান রেকর্ড করেছে—'যদি আজ রাতে' ও 'মোর জীবনের'। অমল আমার ছোট ভাই হয়েও আমার প্রভাব অনেকখানি এড়াতে পেরেছে, এতে আমি ওর সম্পর্কে আশাবাদী। আমার বিশ্বাস, সুরকার হিসাবে একদিন অমল প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে সমর্থ হবে। সম্প্রতি আমি তরুণ সুরকারদের সুরে অনেক রেকর্ড করেছি এবং করছি, তার কারণ, আগেই বলেছি, এঁদের শক্তিতে আমি বিশ্বাস রাখি এবং যথেষ্ট আশা পোষণ করি।

আগামী সংখ্যা থেকে

অঘোর-প্রকাশ

শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়, বার, এট, ল; স্বর্গত সাধনচন্দ্র রায় এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী মাননীয় ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ত্রয়ের পিতা ও মাতার আত্মকাহিনী ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।



কেনা কাটা

এদেশে চর্ম্মশিল্পের ভবিষ্যৎ

মনুষ্য-সমাজে চামড়ার ব্যবহার ঠিক কোন্ সময়টিতে আরম্ভ হয়, এর নিখুঁত হিসেব হয়তো এখন মিল্‌বে না। কিন্তু এ যে নিতান্ত প্রাচীন কালের একটি ব্যাপার, ইতিহাসেই তার বহুল প্রমাণ পাওয়া যায়। চর্ম্মের পোষাক, চর্ম্মের বর্ম্ম, চর্ম্মের তাঁবু এবং জল বা অপর কোন তরল পদার্থ রক্ষণ উপযোগী চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্র বা আধার এ ধরণের কত কি তথ্যের তাহার সন্ধান মিলে ইতিহাসের প্রথম দিকের পাতাগুলো উল্টালেই। চর্ম্মের দৌলতে আজ শুধু মনোহারী পাদুকা, দস্তানা কটিবন্ধ, পেটিকা, চশমার খাপ, ঘড়ির ব্যাণ্ড, মণিব্যাগ—এ সবই তৈয়ারী হচ্ছে না, পরন্তু বহু রকমারী জিনিস হচ্ছে—যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনের তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। সমর-সজ্জা, বই-বাঁধা, চিকিৎসার সরঞ্জাম, ঘোড়ায় চড়ার জীন (স্যাডল), সাইকেল প্রভৃতি আরোহীর বসবার আসন—এ সব কিছুতেই প্রচুর চর্ম্ম ব্যবহৃত হচ্ছে আজকের দিনে। বস্তুতঃ, মানুষের জীবন-যাত্রাকে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল করে তোলবার জন্যে অবিরাম চলেছে এর কী ব্যস্ততা!

বিজ্ঞানসম্মত নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আজ কাঁচা চামড়াকে পাকা করবার ব্যবস্থা চালু হয়েছে। আগে এ দেশে এই কঠিন কাজটি করতো চর্ম্মকার নামে একটি বিশেষ সম্প্রদায়। এখন উহা সম্পাদিত হচ্ছে কারখানায় কারখানায় বিভিন্ন ট্যানারী বা শোধনাগারে।

বহির্দেশের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, এই ক্ষুদ্র পরিসর পশ্চিমবঙ্গেও চর্ম্ম-শোধনের বিজ্ঞান-সম্মত পদ্ধতি প্রবর্ত্তনের কম চেষ্টা হয় নি সেদিনেও। বেঙ্গল ট্যানিং ইনষ্টিটিউটে ব্যাপক গবেষণার পর ক্রোম ট্যানিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে এখানে শেষ পর্য্যন্ত। এতদঞ্চলে বহুকালের অভাব ছিল যেটা, সেটা অনেকটা মিটেছে এই ব্যবস্থায়। প্রধানতঃ চীনা সম্প্রদায়ের লোকেরাই ক্রোম চামড়া শিল্প প্রবর্ত্তনে অগ্রণী হয়ে আসে এবং চীনা ট্যানার বা চর্ম্ম-শোধনকারীদের চেষ্টায় এক্ষণে এই শ্রেণীর প্রচুর পাকা চামড়া তৈয়ারী হচ্ছে এ পশ্চিমবঙ্গেই। কলকাতার সহরতলী ধাপা অঞ্চলে ছোটখাট অসংখ্য ট্যানারী বা চর্ম্মশোধনাগার স্থাপিত হয়েছে। সেখানে দিনরাত ক্রোম চামড়া তৈয়ারী করে চলেছে সাধারণতঃ চীনারা। এই কারখানাগুলোতে ছয় হাজারের অধিক শ্রমিক কাজ করে এবং উহাদের দৈনন্দিন উৎপাদনের হারও সামান্য নয়। এই দেশে এ চর্ম্ম-শিল্পটির সম্ভাবনা কতখানি, তাহাই বিচার্য্য বিষয়। পূর্ব্বে এখানকার বিপুলসংখ্যক লোক নগ্নপদেই চলা-ফেরা করতো। নারীদের পাদুকা ব্যবহারের কোন প্রশ্নই ছিল না এই সেদিনেও—এটি বাধতো তাদের সংস্কারেই। নগর-সভ্যতা যত বেশী ব্যাপক হয়ে চলেছে—চর্ম্ম-পাদুকার ব্যবহার ততই হচ্ছে বেশী। সকল দিকে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে মানুষের চিন্তাধারায়। আজ পাদুকা ব্যবহার না করার কথা ক'জন স্ত্রী-পুরুষ ভাবতে পারে? ফলতঃ চর্ম্ম-শিল্পের অগ্রগতির পথ প্রশস্তই হয়ে চলেছে দিন-দিন। শুধু পাদুকা কেন, চামড়ার স্যুটকেশ, হাতব্যাগ, পোর্টফলিও—এ সকল নানা জিনিসের চাহিদাও বেড়ে চলেছে ক্রমেই। তা ছাড়া এ সকল জিনিস বিদেশেও রপ্তানী হয়ে যাচ্ছে খুব কম পরিমাণে নয়। এ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে, চর্ম্ম-শিল্প সম্প্রসারণের পর্য্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে এই দেশে। এখান থেকে বিস্তর কাঁচা চামড়া আজও বিশ্বের নানা স্থানে রপ্তানী হয়ে যায়। কিন্তু এইখানেই যদি সবটা চামড়া ভাল রকম ট্যানিং বা শোধনের ব্যবস্থা হোত, তা হ'লে প্রচুর বেকার যুবকের কর্ম্ম-সংস্থান হ'তে পারে, অপর দিকে দেশের রাজস্বও বৃদ্ধি পেতে পারে অনেকখানি। শিল্পের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্যে শিল্পপতি, বিজ্ঞানী, কুটীরশিল্প কর্ম্মী, বণিক-সমাজ ও কর্ত্তৃপক্ষের মধ্যে গড়ে উঠা চাই একটা ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ভাব। অবশ্য নিজ গৃহে চর্ম্ম-শিল্প নিয়ে যারা কাজ করছে, এ সকল ক্ষুদ্র ইউনিট বা সংস্থাগুলোকে বিশেষ কার্য্যকরী মূল্যবান যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করার একটি পরিকল্পনার উদ্বোধন হয়েছে ১৯৫৪ সালে। বাটাদের সক্রিয় ও নিবিড় সহযোগিতা পেয়েই এ পরিকল্পনাটির সূত্রপাত হয় এবং উহাতে উৎসাহ যোগান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় স্বয়ং। উক্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করতে যেয়ে দুই শত বিশেষজ্ঞ কর্ম্মীর কর্ম্ম-সংস্থানেরও ব্যবস্থা হয়েছে। এই ধরণের নানা পন্থা অনুসরণ করে দেশের আরও বহু বেকার যুবক ও উদ্বাস্তুর কর্ম্ম-সংস্থান করা সম্ভব এ শিল্পে নিশ্চয়ই। কলকাতার ভেতরে ও উহার আশে পাশে যে সকল চর্ম্ম ও পাদুকা নির্ম্মাণ সংস্থা রয়েছে—শিল্পসংক্রান্ত বহু জিনিসের জন্য তাঁদের এখনও বাইরের আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়। এটাকে ঠিক স্বাভাবিক ও গ্রহণযোগ্য অবস্থা বা ব্যবস্থা বলা চলে না। সুতরাং এ শিল্পের সম্যক্ উন্নতি ও সম্প্রসারণের ব্যাপক পরিকল্পনার পূর্ব্বে উহার বাণিজ্য পরিস্থিতি এবং সুবিধা-অসুবিধাগুলো সম্পর্কে তদন্ত ও পর্য্যালোচনা করতে হবে। চর্ম্মশিল্পে নিযুক্ত কর্ম্মীদের যথোচিত ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থাও হওয়া দরকার। ট্রেনিং প্রাপ্ত হয়ে তরুণরা এ শিল্পে যোগদান করলে—শিল্পের সমৃদ্ধি যেমন হবে ত্বরান্বিত, কর্ম্মীদের অর্থোপার্জ্জনের পথও প্রশস্ত হবে এখন অপেক্ষা বেশী। মোটের উপর, সুষ্ঠু পরিকল্পনার ভিত্তিতে কাজ হয়ে চললে এবং আবশ্যক সরকারী সহযোগিতা সম্প্রসারিত হলে—এদেশে চর্ম্ম-শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হবেই, ইহা নিঃসন্দেহে সত্য।

সরল রেডি রেকনার

উপর হইতে নীচের কলমে যেখানে প্রদত্ত সংখ্যক আনার কোঠা আছে তাহা বার করুন। তারপর বাম দিকে প্রদত্ত সংখ্যক পাই যে কলমে আছে তাহা বার করুন। এই দুই কলম গিয়া যেখানে মিশছে সেই কোঠায় যে সংখ্যাটি আছে প্রদত্ত সংখ্যক আনা ও পাইয়ের পরিবর্তে তত নয়া নয়া পয়সা পাওয়া যাবে। একটি দৃষ্টান্ত দিয়া এই রেডি রেকনার ব্যবহারের প্রণালী বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে :—ধরুন ৫ আনা ৬ পাইয়ের পরিবর্তে কত নয়া পয়সা পাওয়া যাবে তা আপনি বার করতে চান। উপর হতে নীচের দিকের সারিতে "আনার" কলমে যেখানে ৫ আছে তা বার করুন। তারপর বাম দিক হতে ডান দিকে "পাইয়ের" সারিতে যে কলমটি ৬ দিয়া সুরু হইয়াছে তাহা বার করুন। এই দুইটি কলম গিয়া যেখানে মিলিত হয়েছে সেই সংখ্যাটি হল ৩৪। কাজেই বুঝতে হবে ৫ আনা ৬ পাইয়ের সমমূল্যের মুদ্রা হইল ৩৪ নয়া পয়সা।

আনা	পাই			
	০	৩	৬	৯
০	...	২	৩	৫
১	৬	৮	৯	১১
২	১২	১৪	১৬	১৭
৩	১৯	২০	২২	২৩
৪	২৫	২৭	২৮	৩০
৫	৩১	৩৩	৩৪	৩৬
৬	৩৭	৩৯	৪১	৪২
৭	৪৪	৪৫	৪৭	৪৮
৮	৫০	৫২	৫৩	৫৫
৯	৫৬	৫৮	৫৯	৬২
১০	৬২	৬৪	৬৬	৬৭
১১	৬৯	৭০	৭২	৭৩
১২	৭৫	৭৭	৭৮	৮০
১৩	৮১	৮৩	৮৪	৮৬
১৪	৮৭	৮৯	৯১	৯২
১৫	৯৪	৯৫	৯৭	৯৮
১৬	১০০	...	...	...

কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ আনা ও পাইয়ের সমমূল্যের নয়া পয়সা কত হইবে, তাহা বাহির করিবার নিয়ম

অল্প খরচায় ব্যবসা—রেশমশিল্প

বাঙলা দেশের রেশমশিল্প পৃথিবী বিখ্যাত। কত রাজা বাদশাহ আর বিদেশী পর্য্যটক যে এই শিল্পের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন তাদের বিবরণ দিতে হ'লে পুরা একখানি গ্রন্থ রচনা করতে হয়। আমাদের দেশের কুটীরশিল্প সমূহের মধ্যে রেশমশিল্পকে প্রধানতম বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি করা হবে না। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্পটি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত হয়েছে এবং সরকারও এই শিল্প-ব্যবসায় অধিকতর লাভবান হচ্ছেন। রেশমশিল্পের ব্যবসা যে কেউ করতে পারেন, অত্যন্ত অল্প মূলধনে। রেশমের চাষে প্রয়োজন হয় ন্যূনতম দশ কাঠা কিংবা এক বিঘা জমি, তুঁতের চাষের জন্য। এ জন্য চাই তুঁতের ডাঁটা সরবরাহ। ঠিক ভাবে লাগালে এক বৎসর পরেই, এমন কি ছ'মাস পরেই পাতা পাওয়া যায়, তবে তিন বৎসরের আগে পাতার ফসল যথেষ্ট হয় না। যথেষ্ট সার দিয়ে ভাল ক'রে চাষ করলে এক বিঘা জমি থেকে বৎসরে প্রায় এক শত মণ পাতা পাওয়া যায়। প্রতি ত্রিশ মণ পাতা থেকে গড়ে এক মণ কাঁচা গুটী পাওয়া যায়। এক বিঘা তুঁত থেকে কৃষক-পরিবার পলু পালনে কমপক্ষে বছরে তিন মণ গুটী পাবে। রেশম সূতার দাম অতি কম হলেও যদি প্রতি সের আট টাকাও হয়, গুটী ষোল টাকা মণ দরে বিক্রয় হবে। এই পরিমাণ গুটী উৎপাদনে চার পাঁচ টাকার ডিম লাগবে। যিনি গুটী কিনে কাটাই করাবেন তাঁর কি আয় হবে, মোটামুটি আভাস দেওয়া হচ্ছে। এক মণ গুটী কাটাই করতে একজন কাটানীর মোটা সূতার জন্য প্রায় সাত আট দিন সময় লাগবে। মাসে কিছু কিছু পারিশ্রমিক দিলে কত অসহায় বিধবা ও বালিকা এই কাজ অতি সহজেই করতে পারে। গুটী উৎপাদনের ওপর এই কাজ নির্ভর করে। পল্লীতে যদি পঞ্চাশ বিঘা তুঁতের চাষ হয় তবে আয় হয় নিম্নরূপ—

৫০ X ১০০ = ৫০০০ মণ পাতা

এই পাতা হইতে ৫০০০ + ৩০ = ১৬৬ মণ গুটী

এই গুটী হইতে ১৬৬ + ১৫ = ১১ মণ সূতা

প্রতি সের ৮৲ হিঃ মূল্য—৩৫২০৲

এবং ৩ মণ ঝুট মূল্য— ৬০৲

মোট ৩৫৮০৲

ব্যয়—মূলধন যাহা ফিরিতে থাকিবে—

১৬৬ মণ গুটী ক্রয়ের মূল্য ১৬৲ মণ হিঃ ২৭৫৬৲

১০ জন কাটানীর ৩৷ মাসের বেতন

৬৲ হিঃ ৬ X ১০ X ৩৷—২১০৲

২ জন কেরাণীর বেতন ২ X ৬ X ৩৷— ৪২৲

২ জন অপর লোক— ৪২৲

কয়লা কাটাই করিতে ও গুটী শুকাতে— ৩০৲

মোট ৩০৮০৲

মূলধন যাহা আবদ্ধ থাকবে—

১০ কাটাই পা-যন্ত্র— ৩৫০৲

২ ফেরাই-যন্ত্র— ৬০৲

চালাঘর ৫০৲

গুটী শুকান ও রাখার আসবাব এবং অপর খরচ ১৫০৲

মোট ৬১০৲

স্থান-বিশেষে এই মূল্যমানের তারতম্য হতে পারে। কাটাই পা যন্ত্র মান্দালয় এগ্রিকালচারাল কলেজের কারখানায় তৈরী হয়। একেকটির মূল্য প্রায় চল্লিশ টাকা। ফেরাই যন্ত্রও এখান থেকে সরবরাহ হয়। চারি খাই ফেরাই যন্ত্রের মূল্য বাইশ টাকা, আট খাইয়ের জন্য ত্রিশ টাকা। একটি ভাল বানাক যন্ত্রের প্রায় পাঁচশো

টাকা মূল্য। গুটী-উৎপাদক কৃষক-পরিবারগুলি মিলে-মিশে সমবায়ে যদি নিজেদের পুত্রকন্যাদের দ্বারা কাটাইয়ের ব্যবস্থা করেন, গুটী ক্রয় ইত্যাদির মূলধন খরচ করতে হয় না, অথচ কাটাইয়ের লাভ তাঁদেরই থাকে। জাপানে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এরূপ সমবায়ে কাটাই জন্য বড় বড় কারখানা আছে।

ভারতে মোটরযান শিল্পের সম্ভাবনা

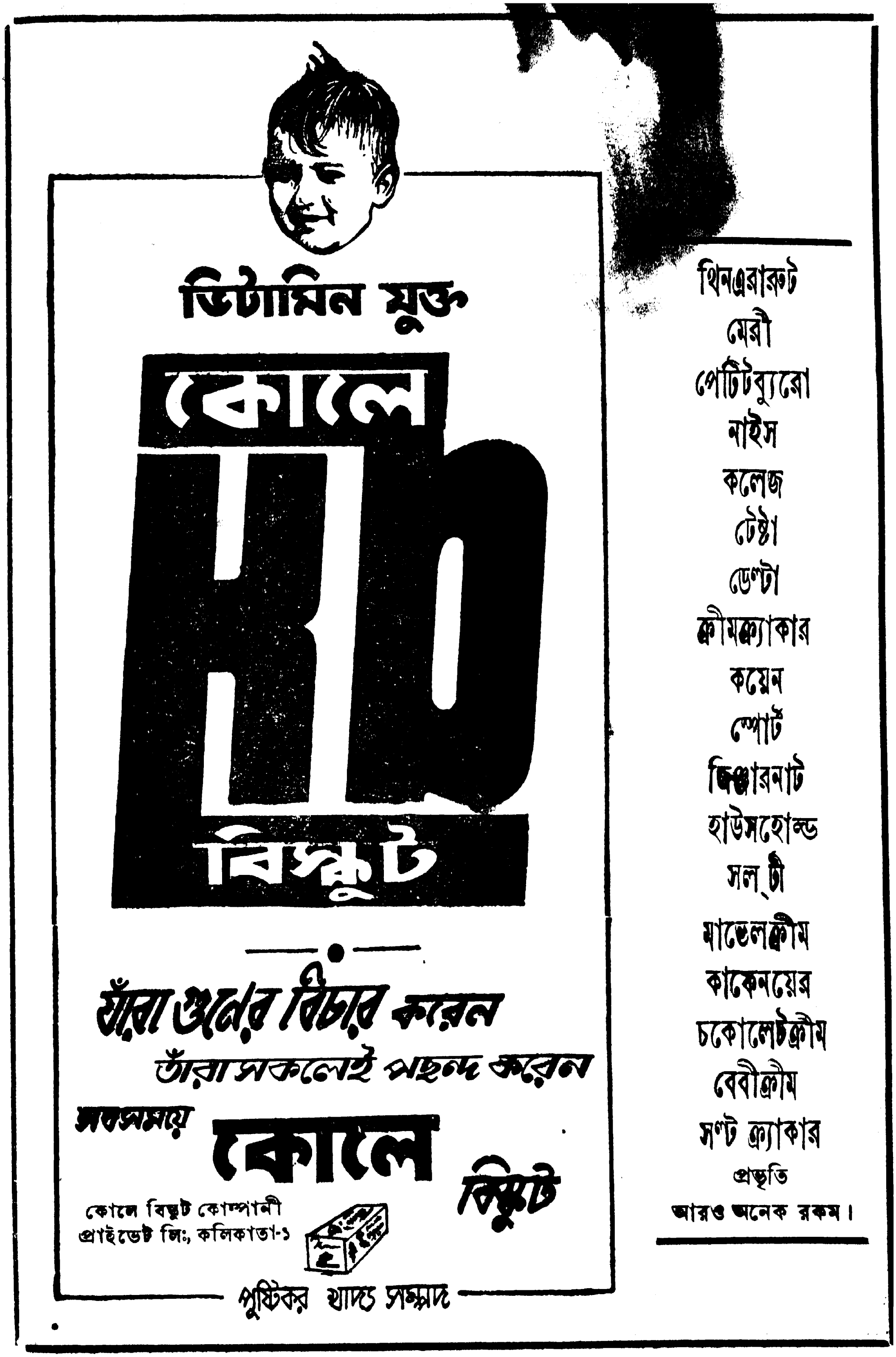
ভারতের বৃহত্তম মোটর ও অন্যান্য গাড়ী নির্মাতা, মেসার্স হিন্দুস্থান মোটর্স লিমিটেড মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ষ্টুডিবেকার প্যাকার্ড কর্পোরেশন-এর নির্মিত প্রেসিডেণ্ট ক্লাসিক নামক নূতন মডেলের অতি আরামপ্রদ মোটর গাড়ীটি বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থিত করিয়াছেন। বর্তমানে ঐ আরামপ্রদ মোটর গাড়ীটি এবং ষ্টুডিবেকার ট্রাক আংশিক ভাবে হিন্দুস্থান মোটর্স কারখানায় নির্মিত হইতেছে। ইহা ভিন্ন ঐ কারখানায় হিন্দুস্থান ল্যাণ্ডমাষ্টার্স মোটর গাড়ীও নির্মিত হইতেছে। এই গাড়ীটির শতকরা ৬০ ভাগ অংশ ইতিপূর্বেই এই দেশে নির্মিত হইতেছিল। হিন্দুস্থান মোটর্স কারখানায় ষ্টুডিবেকার গাড়ী ও ট্রাক নির্মাণের পরিমাণ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইতেছে। ষ্টুডিবেকার গাড়ীতে ও ট্রাকে যে ভি এস ইঞ্জিন ব্যবহৃত হয় তাহাও হিন্দুস্থান মোটর্স কারখানায় নির্মিত হইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২৩,০৮৪টি মোটর যান উৎপন্ন হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দুস্থান মোটর্সের অবদান এক-তৃতীয়াংশের বেশী। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা কালে ১৯৬০-৬১ সালের মধ্যে প্রতি বৎসর আনুমানিক ৫৭,০০০টি করিয়া মোটর যান প্রয়োজন হইবে বলিয়া পরিকল্পনা কমিশন ধরিয়াছেন। সুতরাং আশা করা যায়, মোটর যান ও মোটরের ফালতু অংশাদি নির্মাণের ব্যাপারে হিন্দুস্থান মোটর কোম্পানীর ব্যবসাও বিশেষ ভাবে বৃদ্ধি পাইবে। টেরিফ কমিশন ষ্টুডিবেকার ট্রাকের দাম মধ্যবর্তীকালীন ১,৫০০৲ টাকা বৃদ্ধির অনুমতি দিয়াছেন। প্রেসিডেণ্ট ক্লাসিকের দাম নির্ধারিত হইয়াছে ২০,৪৮০ টাকা। ল্যাণ্ডমাষ্টার কারের দাম সম্বন্ধে টেরিফ কমিশন বিবেচনা করিতেছেন। অদূর ভবিষ্যতে ইহার দাম বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা হইতে এবং মোটরের চাহিদা বৃদ্ধির কথা বিবেচনা করিয়া সহজেই বলা যায় যে, ভারতে মোটর যান শিল্পের ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ।

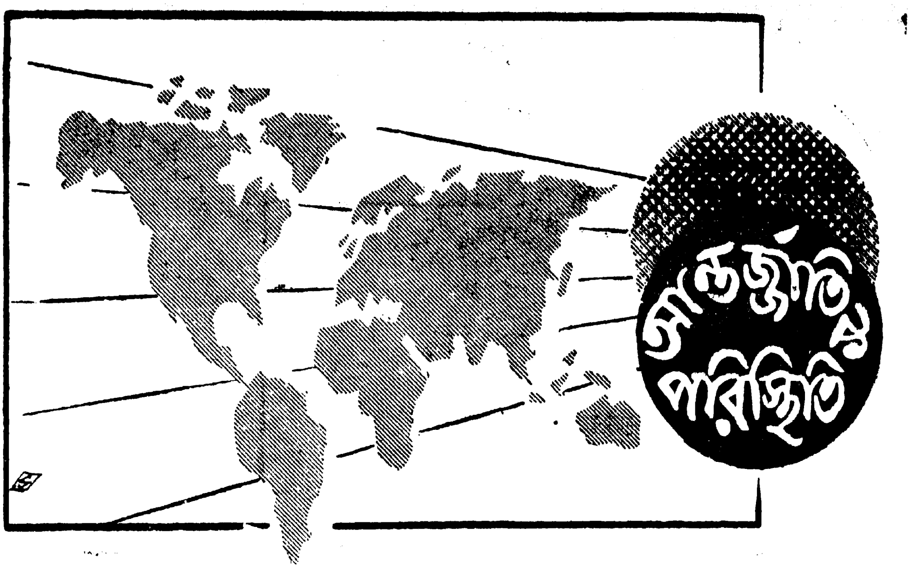
টুকরো কথা

মাছ জাতির একটি প্রধান খাদ্য। শুধু তাহাই নহে, সামুদ্রিক মাছ ধরিয়া জাতীয় ভাণ্ডারে প্রতি বৎসর ২৭ কোটি টাকা সংগৃহীত হয়। প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেখা গিয়াছে যে, ভারতের তিন হাজার মাইলব্যাপী সমুদ্র-উপকূলে মাছ ধরিয়া প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ জেলে রুজি-রোজগার সংগ্রহ করিয়া থাকে। উন্নত প্রণালীতে মাছ ধরিবার ব্যবস্থাদি করিবার জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় একটি কার্যসূচী স্থির হইয়াছে। ইহাতে খরচ পড়িবে আনুমানিক ১২ কোটি টাকা। পরিকল্পনাটি ঠিকমত কার্য্যকরী করিতে পারিলে সামুদ্রিক মৎস্য-শিকারের পরিমাণ দশ বৎসরের মধ্যে শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়া বার্ষিক ১৪ লক্ষ টনে উঠিবে। * * ভারত সরকার ১৯৫৭ সালের জুন মাস পর্যন্ত ভারতের বাহিরে তুষ ও গমের ভূষি রপ্তানী করিতে অনুমতি দিয়াছেন। * * ১৯৫৭ সালে ভারতে প্রায় তিন কোটি টাকা মূল্যের ইলেকট্রিক মিটার তৈয়্যারী করা হইয়াছে। * * রাশিয়া ভারত হইতে প্রায় কুড়ি লক্ষ পাউণ্ড সাদা ও ফিকা হলুদ রঙের পশম ক্রয়ের জন্য চুক্তি করিয়াছে। ইহার অধিকাংশই 'হরিয়া' ও "বিকানীর" শ্রেণীর পশম। জানা গিয়াছে যে, ইহার প্রথম চালান জুন মাসের শেষাশেষি বোম্বাই বন্দর হইতে রপ্তানী করা হইবে। * * ডাকঘরের সেভিংস ব্যাঙ্কে আমানতী হিসাবের সংখ্যা ১৯৫১ সালে ৪০,১০,০২০ হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ১৯৫৫ সালে ৫৩,৮৪,১৪৭ দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ আমানতকারীর সংখ্যা প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। * * ১৯৫৪ সালে ভারত হইতে ৫৬৩ কোটি টাকার দ্রব্য রপ্তানী হইয়াছিল। ১৯৫৫ সালে উহা অপেক্ষা ৪১ কোটি টাকা বেশী মূল্যের জিনিষ প্রথম রপ্তানী হইয়াছে। * * রাষ্ট্রসঙ্ঘ কর্তৃক প্রকাশিত জুন মাসের 'পরিসংখ্যান বুলেটিন' হইতে জানা যায়, ১৯৫৫ সালে বিশ্বের মোটর গাড়ী উৎপাদন পূর্বেকার সর্বোচ্চ অঙ্ক অতিক্রম করিয়াছে। ১৯৫৫ সালে উৎপন্ন মোট ১,২৯,৬৯,৭০০ মোটর গাড়ীর মধ্যে যাত্রীবাহী গাড়ীর সংখ্যা ছিল ১,০৭,৮২,৩০০ এবং মাল বহন ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত গাড়ীর (কমার্শিয়াল ভেহিকেল) সংখ্যা ছিল ২৯,৭৯,৪০০। ইতিপূর্বে ১৯৫০ সালে সর্বোচ্চ ১,০১,২৮,০০০ মোটর গাড়ী উৎপন্ন হয়।

বহুমুখীন খাদ্য উৎপাদনের জন্য মহীশূরে শীঘ্রই একটি কারখানা স্থাপন করা হইবে। কারখানাটিতে প্রতিদিন ঐ ধরণের ৫ টন করিয়া খাদ্য উৎপন্ন করার ক্ষমতা থাকিবে। এই খাদ্য প্রতি ২ আউন্স পাঁচ পয়সায় বিক্রীত হইবে। চিনাবাদামের ময়দা, ভাজা ছোলার ময়দা, ক্যালসিয়াম লবণ, এ ও ডি ভিটামিন, থিয়ামিন ও রাইবোফ্লাবিন সহযোগে এই খাদ্য প্রস্তুত হইবে। * * কোন আমেরিকান ফার্ম ভারতে কার্বন ব্ল্যাক উৎপাদনের কারখানা স্থাপনের জন্য ভারত সরকারের নিকট একটি প্রস্তাব দিয়াছেন। প্রস্তাবিত ফ্যাক্টরী স্থাপিত হইলে ভারতের প্রায় এক কোটি টাকার মুদ্রা বাঁচিয়া যাইবে। * * বর্তমানে ভারতে প্রতি মাসে ৫ শত টন সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ উৎপন্ন হয়। সঠিক হিসাব জানা না থাকিলেও যতদূর জানা যায়, ভারতে প্রতি বৎসর ৬০,০০০ টন করিয়া ঐ ধরণের কাগজ উৎপন্ন হয়। ১৯৫৪-৫৫ ও ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে ব্যবহারের জন্য যথাক্রমে ৭৮,৭৯১ ও ৭৮,৮৫৩ টন সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ আমদানী হয়। * * ভারতীয় পার্লামেণ্টের এক প্রশ্নোত্তরে জানা যায়, ভারতে মোট তাঁতের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ, ১৯৫৫ সালে ভারতে প্রায় ১৪৫ কোটি গজ তাঁতবস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। * * ভারতে মুদ্রণ-যন্ত্র প্রস্তুত করা যায় কি না, সে সম্বন্ধে ভারত সরকার তথ্যাদি সংগ্রহ করিতেছেন বলিয়া জানা যায়। ভারতে কি ধরণের মুদ্রণ-যন্ত্রের কত চাহিদা ভারত সরকার তাহাও খোঁজ-খবর নিতেছেন।

★


ভিটামিন যুক্ত
কোলে
Hb
বিস্কুট
যাঁরা গুনের বিচার করেন
তাঁরা সকলেই পছন্দ করেন
সবসময়ে
কোলে
বিস্কুট
কোলে বিস্কুট কোম্পানী
প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা-১
পুষ্টিকর খাদ্য সম্ভার
থিনএরারুট
মেরী
পেটিটব্যুরো
নাইস
কলেজ
টেষ্টা
ডেল্টা
ক্রীমক্র্যাকার
কয়েন
স্পোর্ট
জিঞ্জারনাট
হাউসহোল্ড
সল্ টী
মাভেলক্রীম
কাকেনয়ের
চকোলেটক্রীম
বেবীক্রীম
সল্ট ক্র্যাকার
প্রভৃতি
আরও অনেক রকম।



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন—

গত ২৭শে জুন হইতে ৬ই জুলাই (১৯৫৬) পর্য্যন্ত দশ দিন ধরিয়া লণ্ডনে যে বৃটিশ কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন হইয়া গেল, দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের পর ইহা অষ্টম সম্মেলন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এই সম্মেলন লইয়া মোট সাতটি কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদান করিলেন। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৯২৬ সালে বেলফুর ফরমূলায় সর্ব্বপ্রথম 'কমনওয়েলথ' কথাটি ব্যবহৃত হওয়ার পর এ পর্য্যন্ত, বিশেষ করিয়া ভারত প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পরও বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত থাকার পর হইতে উহার যে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের বৈঠকের আলোচনায় এবং গৃহীত সিদ্ধান্তে এই পরিবর্ত্তন যে বিশেষ ভাবেই প্রতিফলিত হয়, একথাও অনস্বীকার্য্য। একথা অবশ্য সত্য যে, কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনে কি পদ্ধতিতে আলোচনা চলে, কি ভাবে আলোচনা হয়, কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহা সমস্তই অত্যন্ত গোপনীয় ব্যাপার! প্রতিদিনের অধিবেশনের পর এবং সম্মেলনের শেষে ইস্তাহার প্রকাশ করা হয় বটে, কিন্তু এই ইস্তাহার হইতে আলোচনার গতিধারা এবং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে কে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কিছুই জানা যায় না। আনুষ্ঠানিক সম্মেলনের বাহিরে দ্বিপাক্ষিক এবং বহুপাক্ষিক আলোচনাও চলিয়া থাকে, এই সকল আলোচনা গুরুত্বহীন, একথা যেমন বলা চলে না, তেমনি এবারের কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের ফলাফলও পূর্ব্ববর্ত্তী সম্মেলনগুলির মতই গতানুগতিক হইয়াছে, প্রকাশিত ইস্তাহার হইতেও তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। বৃটিশ কমনওয়েলথের যে-পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তাহাতে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্র নীতির বিভিন্নতা এবং সর্ব্বোপরি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নির্ভরতার জন্ম কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের পক্ষে একবাক্যে কোন সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় নীতি ঘোষণা করা সম্ভব হয় না। এবারের সম্মেলনের শেষে প্রকাশিত ইস্তাহার পর্য্যালোচনা করিলেও ইহা বুঝিতে পারা যায়।

বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে যে স্থায়ী কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত রহিয়াছে, উহার মাধ্যমে যে কোন আন্তর্জ্জাতিক সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় করা সম্ভবই শুধু নয়, ঐ পন্থায় মতবিনিময় করাও হইয়া থাকে। কাজেই কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের সার্থকতা কি, উহা দ্বারা কি প্রয়োজনীয়তা সাধিত হইয়া থাকে, এই প্রশ্ন মনে জাগ্রত হওয়া স্বাভাবিক। এই প্রশ্নের উত্তর ইতিপূর্ব্বে যেমন পাওয়া যায় নাই, তেমনি আলোচ্য সম্মেলনের শেষে প্রকাশিত ইস্তাহার হইতে তাহা বুঝা যায় না। এবং প্রকাশিত ইস্তাহার এইরূপ সম্মেলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে লোকের মনে শুধু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতেই সমর্থ। অবশ্য আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যে একটা বিশেষ পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে, তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন হয় না। রাশিয়া যে-দিন পরমাণু বোমা এবং হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার বিলোপ করিল, সেই দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে এই পরিবর্ত্তনের সূচনা। কোন শক্তিশিবিরে যোগদান না করিতে ভারতের নীতি যখন সহ-অবস্থানের পঞ্চ নীতিতে রূপায়িত হইয়া উঠিল এবং কম্যুনিষ্ট চীন ও রাশিয়াও যখন গ্রহণ করিল সহ-অবস্থান নীতি, তখন হইতেই নিরপেক্ষ শিবির সিয়াটো ও বাগদাদ চুক্তির হুমকী সত্ত্বেও শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত হইতেছে। ইহা ব্যতীত রাশিয়ার পররাষ্ট্র নীতিতেও একটা বিপুল পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও রাশিয়া মধ্যপ্রাচীতে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং অনুন্নত দেশগুলিতে মূলধন সরবরাহের নীতি পশ্চিমী শক্তিবর্গের অস্ত্র ও মূলধন সরবরাহের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক মন-কষাকষি অনেকটা হ্রাস পাইলেও উহার মূল কারণগুলি এখনও দূর হয় নাই। আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার এই পটভূমিতে এবার কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সম্মেলনে প্রকৃত পক্ষে সমগ্র আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতিই পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে

বটে, কিন্তু আন্তর্জাতিক মন-কষাকষির অন্যতম দুইটি প্রধান কারণ উপনিবেশ ও বর্ণবিভেদ নীতি সম্পর্কে কোন উল্লেখ প্রকাশিত ইস্তাহারে নাই, ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইস্তাহারে মালয়, সিঙ্গাপুর এবং সাইপ্রাসের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু কেনিয়া, এডেন ও হংকংয়ের কথা উল্লেখ করা হয় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণপৃথকীকরণ নীতি, দক্ষিণ-আফ্রিকার বসুতোল্যাণ্ড, সোয়াজীল্যাণ্ড এবং বেচুয়ানাল্যাণ্ড গ্রাস করিবার নীতি সম্পর্কে সম্মেলনে কোন আলোচনা হইয়াছে, ইস্তাহার হইতে তাহা বুঝা যায় না। বস্তুতঃ, এ সম্পর্কে কোন আলোচনা হয় নাই বলিয়াই মনে হয়। কাজেই আন্তর্জাতিক মন-কষাকষির সকল বিষয়ই এই সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে এ কথা স্বীকার করা কঠিন।

পশ্চিমী শক্তিবর্গের দৃষ্টিতে যে সকল বিষয় আন্তর্জাতিক মন-কষাকষির প্রধান কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, সেইগুলিই সম্মেলনে আলোচিত হইয়াছে। পরমাণু অস্ত্রের ক্রমবর্দ্ধমান ব্যাপক ধ্বংসশক্তি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে যে নূতন অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ তাহা আলোচনা করিয়াছেন। রাশিয়ারও যখন পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা আছে তখন এ সম্পর্কে তাঁহাদের আলোচনা না করিয়া উপায়ও নাই। রাশিয়া পরমাণু বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করাতেই থারমোনিউক্লিয়ার অস্ত্রের ব্যাপক ধ্বংসশক্তি সম্পর্কে তাঁহারা সচেতন হইয়াছেন। এই জন্যই কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও এ বিষয়ে তাঁহারা একমত হইতে পারিয়াছেন এবং বিশ্বশান্তি রক্ষা করিতে এবং উহাকে সংহত করিতে তাঁহাদের নীতি ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু কি উপায়ে তাঁহারা শান্তিরক্ষা করিবেন, সে সম্পর্কে তাঁহাদের মতৈক্যের রূপ ও প্রকৃতি খুবই অস্পষ্ট। তাঁহারা ইহার জন্য এক দিকে নিরস্ত্রীকরণের উপর জোর দিয়াছেন এবং আশা করিয়াছেন যে, রাশিয়ার সহিত অন্যান্য বৃহৎ শক্তির সম্পর্কের উন্নতি সাধিত হইয়া যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করিবে এবং বিশ্বশান্তি রক্ষায় সহায় হইবে। অন্যান্য বৃহৎ শক্তি বলিতে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে বুঝান হইয়াছে, ইহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সুস্পষ্ট অভিমত ব্যতীত কি নিরস্ত্রীকরণ ব্যাপারে, কি রাশিয়ার সম্পর্কের উন্নতি সাধনে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পক্ষেও সমষ্টিগত ভাবেও কিছু করা যে সম্ভব নয়, ইস্তাহারে উল্লিখিত ঘোষণা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ইস্তাহারে দেখা যায়, কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাগুলির সমাধানকে চেষ্টা করিয়া যাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সকল সমস্যার মধ্যে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণ, ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন, মধ্য ও সুদূর প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন সম্পর্কে ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, তাঁহাদের বিগত সম্মেলনের পর এ পর্য্যন্ত এ বিষয়ে একটুকুও অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নাই। কেন সম্ভব হয় নাই, সে-সম্পর্কে সম্মেলনে আলোচনা হইয়া থাকিলেও উহার কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত ইস্তাহারে নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়। এক্ষেত্রেও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় ছাড়া অগ্রসর হইবার উপায় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছাড়া কমনওয়েলথ মন্ত্রিগণ ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠনের জন্য কোন পন্থা সম্বন্ধে একমত হইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছেন, তাহারও কোন আভাস ইস্তাহার হইতে পাওয়া যায় না। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি পশ্চিম-জার্ম্মাণীর চ্যান্সেলার ডাঃ এডেনার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে গিয়াছিলেন। যে সকল সর্ত্তে তিনি ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন দাবী করেন তাহা মিঃ ডালেসের সমর্থন লাভ করিয়াছে। এই সকল সর্ত্তে যে সোভিয়েট রাশিয়া রাজি হইবে না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীরা এই সকল সর্ত্ত সম্পর্কে সকলেই একমত কি?

মধ্যপ্রাচ্যের সমস্যা সম্বন্ধে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ আলোচনা করিয়া ঐ অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করিতে তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্কল্প পুনরায় ঘোষণা করিয়াছেন। বাগদাদ চুক্তি মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিয়াছে। যে রাশিয়ার প্রভাব নিরোধ করিবার জন্য বাগদাদ চুক্তির ব্যবস্থা করা হইয়াছে, এই বিভেদের সুযোগে ঐ অঞ্চলে সেই রাশিয়া অনুপ্রবেশ করিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ শেপিলভের মিশর ভ্রমণের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহার উপর আছে আরব-ইসরাইল বিরোধের সমস্যা। এই বিরোধের স্থায়ী মীমাংসা করিবার জন্য সমস্ত কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ করিতে তাঁহারা সম্মত হইয়াছেন। এ ক্ষেত্রেও তাঁহারা কোন কার্য্যকরী পন্থার সন্ধান দিতে পারেন নাই। সংশ্লিষ্ট সকলের গ্রহণযোগ্য করিয়া সাইপ্রাস সমস্যা সমাধান করিতে বৃটেনের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টার প্রশংসা করা হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের গ্রহণযোগ্য করিয়া মীমাংসা করিবার চেষ্টা করার অর্থ ঐ অজুহাতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা। বৃটেন সাইপ্রাস ছাড়িতে রাজী নয়, ইহাই আসল কথা।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যের সমস্যা সম্পর্কেও কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ আলোচনা করিয়াছেন। প্রচারিত ইস্তাহারে ফরমোসা অঞ্চলে বিরোধের তীব্রতা নিরবচ্ছিন্ন ভাবে হ্রাস পাওয়ার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা হইয়াছে এবং কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীরা এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, উহার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ভাবে চেষ্টা করা হইবে। ফরমোসা লইয়া বিরোধের মীমাংসা কি ভাবে হওয়া উচিত সে সম্পর্কে একমত হইয়া কোন পথ তাঁহারা নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। সুদূর প্রাচ্যের প্রধান সমস্যা কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে তাহার ন্যায্য আসন প্রদান করা। উহা না দেওয়া পর্য্যন্ত সুদূর প্রাচ্যে শান্তি স্থাপিত হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণের জন্য কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন একটি কথাও বলিতে পারেন নাই। ইস্তাহারে এই সমস্যাটিকে ধূম্রাচ্ছন্ন করিয়া রাখা হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে, কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যপদ এমন ভাবে আরও সম্প্রসারিত করা যাইতে পারে, যাহাতে পৃথিবীর আরও বৃহত্তর জনসংখ্যা উহার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে। তাঁহাদের এই আশা হইতে কম্যুনিষ্ট চীনকে জাতিপুঞ্জে গ্রহণের সুপারিশ করা হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় কি? যদি যায়, তবে স্পষ্ট করিয়া কম্যুনিষ্ট চীনের নাম তাঁহারা করিলেন না কেন? কম্যুনিষ্ট চীনকে গ্রহণের প্রশ্ন ধামাচাপা দিয়া, এইরূপ আশা প্রকাশ করার অর্থই বা কি? কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রিগণ কি মনে করেন যে, সুদূর প্রাচ্যের সমস্যাসমূহ মীমাংসিত হওয়া শুধু তাঁহাদের শুভেচ্ছা প্রকাশেরই অপেক্ষা করিতেছে? কম্যুনিষ্ট চীনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে গ্রহণ করা এবং ফরমোসায় কম্যুনিষ্ট চীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তাঁহারা যে একমত হইতে পারেন নাই, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। যদি একমত হইতে পারিয়া থাকেন তাহা হইলে কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অসন্তুষ্ট হওয়ার ভয়ে তাহা তাঁহারা প্রকাশ্যে বলিতে পারে নাই?

বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্গত নয়টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়কগণ একত্রে মিলিত হইয়াও কি নিরস্ত্রীকরণ, কি ঐক্যবদ্ধ জার্ম্মাণী গঠন, কি পূর্ব্ব ও পশ্চিম-শিবিরের মধ্যে মন-কষাকষির মীমাংসা, কি সুদূর প্রাচ্যের সমস্যার সমাধান কোন বিষয়েই কোন সুনির্দ্দিষ্ট পথ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই? এই সকল প্রশ্নে তাঁহাদের নিজেদের মধ্যেই মতবিরোধ রহিয়াছে, ইহাই কি কারণ নয়? কমনওয়েলথের অন্তর্গত কানাডা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজীল্যাণ্ড প্রকৃত পক্ষে বৃটেনেরই সম্প্রসারিত রাষ্ট্র। বৃটেনের সহিত তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু কমনওয়েলথের এশিয় দেশগুলির দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পাকিস্তান পশ্চিমী শিবিরের দিকে ঢলিয়া পড়িতে পারে। কিন্তু ভারত ও সিংহল পারে নাই। বস্তুতঃ, কমনওয়েলথের অন্তর্গত বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন বন্ধনসূত্র নাই, একথা বলিতে বাধা নাই। নেহরুজী অদৃশ্য বন্ধন-সূত্রের কথা অবশ্য বলিয়াছেন। বিনা সূতায় গাঁথা কমনওয়েলথ মাল্য দেখিতে সুন্দর হইতে পারে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীরা কোন বাস্তব পথ প্রদর্শন করিতে যে পারেন নাই, প্রচারিত ইস্তাহারই তাহার প্রমাণ। তাঁহারা গোপন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া থাকিতে পারেন। কোন গোপন সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে কি না কার্য্যক্ষেত্র ছাড়া তাহার পরিচয় পাইবার উপায় নাই।

ইস্তাহারে অবশ্য একটি বাস্তব বন্ধনসূত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। বলা হইয়াছে 'The peoples of Commonwealth all share the common heritage of Parliamentary democracy." অর্থাৎ কমনওয়েলথের জনগণ সকলেই পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের উত্তরাধিকারী। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র এংলো-সেক্সন জাতির দান হইতে পারে, কিন্তু উহা লইয়া গর্ব্ব করিবার কিছুই নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উহা পরিবর্ত্তিত আকারে গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু উহাকে Common heritage বলিয়া স্বীকার করে না। কম্যুনিষ্টরা পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রকে গণতন্ত্র বলিয়াই স্বীকার করে না। দক্ষিণ-আফ্রিকার পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র যে ভাবে শিং বাগাইয়া অশ্বেতকায় অধিবাসীদিগকে গুঁতো মারিতেছে, তাহাতে তাহাদের পক্ষে উহাকে common heritage বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নয়। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের এমন কোন মাহাত্ম্য নাই, যাহা জনগণকে দুঃখ-দুর্দ্দশা হইতে মুক্ত করিতে পারে। পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র অন্য দেশকে অধীনে রাখিয়া শাসন ও শোষণ করিবার সামান্য অন্তরায়ও সৃষ্টি করে নাই। উপনিবেশগুলিতে পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কোন আগ্রহ দেখা যায় কি? কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আক্রমণাত্মক অভিপ্রায় নাই, একথা ঘোষণা করা হইয়াছে। কিন্তু কেনিয়ায় ও সাইপ্রাসে বৃটেন কি করিতেছে?

কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনের শেষে প্রকাশিত ইস্তাহার হইতে এই প্রশ্নই শুধু মনে জাগে, এইরূপ সম্মেলনের প্রকৃত পক্ষে কোন সার্থকতা আছে কি? নেহরুজী এইরূপ সম্মেলনের সার্থকতা স্বীকার করিলেও, তাঁহার দৃষ্টিতে এই অদৃশ্য বন্ধনসূত্র অধিকতর সুদৃঢ় বলিয়া মনে হইলেও অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ মেঞ্জেস তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই। লণ্ডনে অষ্ট্রেলিয়ান ক্লাবের ভোজসভায় তিনি উহার বন্ধনসূত্রকে অত্যন্ত শিথিল ও অস্পষ্ট বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টিতে এইরূপ কমনওয়েলথ বিপর্য্যয়ের পথই শুধু প্রশস্ত করিবে। তাঁহার এই উক্তিতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নাই। বৃটিশ কমনওয়েলথের আদিম রাষ্ট্রগুলি অর্থাৎ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি বৃটেনেরই ছিটকাইয়া পড়া টুকরা ছাড়া আর কিছুই নয়। কমনওয়েলথের অন্তর্গত এশিয় রাষ্ট্রগুলির সহিত তাহারা ঐক্য অনুভব করিতে অসমর্থ। তাহাদের স্বার্থ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই জন্যই আন্তর্জ্জাতিক কোন সমস্যা সম্পর্কেই কোন ঐক্যবদ্ধ নীতি গ্রহণ করা কমনওয়েলথের অন্তর্গত রাষ্ট্রগুলির পক্ষে সম্ভব নয়। বৃটেন তাহার আন্তর্জ্জাতিক ক্ষীয়মাণ মর্য্যাদা পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারে কিন্তু কোন সুস্পষ্ট নীতি ঘোষণা করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেই উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় নাই। সর্দ্দার পাণিক্করের দৃষ্টিতে কমনওয়েলথের ক্রমবিকাশ আকস্মিক ঘটনা না হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ ভারতবাসীর দৃষ্টিতে উহা সাম্রাজ্যবাদের ছদ্মবেশ ছাড়া আর কিছুই নয়। তিনি কমনওয়েলথকে আরও সুসংবদ্ধ করিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ভারতকে আবার প্রত্যক্ষ ভাবে বৃটিশ উপনিবেশে পরিণত না করিয়া তাহা সম্ভব হইবে না।

পোজনানে হাঙ্গামা—

পোল্যাণ্ডের শিল্পপ্রধান সহর পোজনানে (অথবা পোসেন) গত ২৮শে জুন (১৯৫৬) যে ব্যাপক ও গুরুতর শ্রমিক-হাঙ্গামা হইয়া গেল তাহা ১৯৫৩ সালের জুন মাসের পূর্ব্ব বার্লিনের শ্রমিক হাঙ্গামার কথাই স্মরণ করাই দেয়। উভয় হাঙ্গামার মূল কারণ যে একই, ইহাও মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। ২৮শে জুন রাত্রে ওয়ারস রেডিও হইতে পোজনানের ঘটনা ঘোষণা করা হয় যে, দেশের শত্রুদের প্ররোচনায় এই হাঙ্গামা সৃষ্টি হইয়াছিল। ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, পোজনানে যাহা ঘটিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে পোল্যাণ্ডের শত্রুদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রবিরোধী কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু গত ৩০শে জুন (১৯৫৬) পোলিশ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান 'প্যান' পোজনানের হাঙ্গামা সম্পর্কে প্রথম যে বিস্তৃত সরকারী বিবরণ প্রকাশ করে তাহাতে বলা হইয়াছে যে, হাঙ্গামার কয়েক দিন আগে 'জিসপো' কারখানায় এবং আরও কতকগুলি কারখানায় বেতন সংক্রান্ত দাবী মীমাংসায় দেরী হওয়ায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। উহাতে আরও বলা হইয়াছে যে, হাঙ্গামার আগের দিন 'জিসপো' কারখানায় একটি প্রতিনিধিদল তাহাদের মূল দাবী সম্বন্ধে অনুকূল মীমাংসার সিদ্ধান্ত জানিয়া ওয়ারস হইতে পোজনানে প্রত্যাবর্ত্তন করে। কিন্তু শ্রমিকরা তাহাদের দাবী পূরণের কথা জানিবার পর হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছিল কি না, উক্ত সরকারী বিবরণ হইতে তাহা কিছুই বুঝা যায় না। তাহাদের দাবী পূরণ করা হইয়াছে, এই সংবাদ পাওয়ার পর তাহারা বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, একথা স্বীকার করা খুব কঠিন। পোল্যাণ্ডের শত্রুদের প্ররোচনায় তাহারা দাবী পূরণের পরও হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা মানিয়া লওয়া বড় সহজ কথা নয়। শ্রমিকদের বেতন সংক্রান্ত কতকগুলি অভিযোগ ছিল, একথা কার্যতঃ স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং কম্যুনিষ্ট শাসনের আমলেও শ্রমিকরা জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরী যে না-ও পাইতে পারে একথা অস্বীকার করা যায় না। শ্রমিকরা জীবিকা নির্ব্বাহের উপযোগী মজুরী না পাইলে তাহাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্ট হওয়া কম্যুনিষ্ট-শাসিত রাজ্যেও সম্ভব। তবে কম্যুনিষ্ট-শাসিত রাজ্য এই অসন্তোষ দাবাইয়া রাখিবার কঠোর ব্যবস্থা অসন্তোষ প্রকাশের পথ রুদ্ধ রাখিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া কম্যুনিষ্ট-শাসিত দেশে শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ কিছুই থাকে না, একথা স্বীকার করা যায় না। তবে ষ্টালিনবাদ বর্জ্জনের উৎসাহে পোল্যাণ্ডে অসন্তোষ দাবাইয়া রাখার কঠোর ব্যবস্থা কতক পরিমাণে শিথিল করা হইয়া থাকিলে বিস্ময়ের বিষয় না-ও হইতে পারে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে কি ভাবে এই হাঙ্গামার উদ্ভব হইয়াছিল তাহাই প্রধান প্রশ্ন।

হাঙ্গামার কারণ সম্পর্কে প্রকৃত বিবরণ পাওয়া যে খুব কঠিন তাহাতে সন্দেহ নাই। পোজনান যে পোল্যাণ্ডের একটি শিল্পপ্রধান সহর, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সহরে গত ২১শে জুন এক বৃহৎ আন্তর্জ্জাতিক শিল্পমেলার উদ্বোধন করা হইয়াছে। পৃথিবীর ৩৫টি দেশ এই মেলায় যোগদান করিয়াছে। পূর্ব্ব-ইউরোপে এই ধরণের মেলা এই প্রথম। এই শিল্পমেলার উদ্বোধনের পূর্ব্বদিন

এই হাঙ্গামা বাধিয়া উঠে। এই হাঙ্গামার বিবরণ যেটুকু পাওয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, ইহা শ্রমিকদের অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। এই হাঙ্গামা যে অত্যন্ত কঠোরভাবে দমন করা হইয়াছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। এই হাঙ্গামা দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনী তলব করা হইয়াছিল। পোল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী নিজেই বলিয়াছেন যে, যাহারা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল তাহাদের সকলকেই গুলী করিয়া হত্যা করা হইয়াছে। কিরূপ কঠোর ভাবে হাঙ্গামা দমন করা হইয়াছিল ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। সরকারী ঘোষণায় বলা হইয়াছে, ৩৮ জন নিহত হইয়াছে। কিন্তু হাঙ্গামা দমনের কঠোরতা হইতে মাত্র ৩৮ জন নিহত হইয়াছে, একথা স্বীকার করা কঠিন! নিহতের সংখ্যা কম করিয়া দেখানো শুধু বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই স্বভাব, একথা স্বীকার করা যায় না।

পোজনানের হাঙ্গামা সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে প্রাপ্ত যে-সকল সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ষ্ট্যালিন ফ্যাক্টরীর শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির দাবী করে। এই ফ্যাক্টরীতে শ্রমিকের সংখ্যা ১৫ হাজার। এই ফ্যাক্টরীতে রেলের কোচ, কৃষি-যন্ত্রপাতি ইত্যাদি তৈয়ার করা হয়। ঐগুলির অধিকাংশই রাশিয়ায় যায়। শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধির দাবী সম্পর্কে গবর্ণমেন্টের সহিত যে আলোচনা চলিতেছিল তাহাও স্বীকৃত। এই আলোচনার ফলে মীমাংসা যে শ্রমিকদের অনুকূলেই হইয়াছে একথাও স্বীকার করা হইয়াছে। খুব সম্ভব, এই মীমাংসার সংবাদ যখন পৌঁছে তখন অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে। প্রকাশ, ২৮শে জুন প্রাতে শ্রমিকরা যখন ফ্যাক্টরীর সভায় সমবেত হয়, তখন তাহাদের কয়েক জন নেতা গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ তাহারা পায়। পোলিশ সংবাদপত্র সমূহ ঐ সংবাদ মিথ্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কোন কোন প্রত্যক্ষদর্শী গ্রেফতারের সংবাদ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করে। অন্যান্য কারখানাতেও ধর্ম্মঘট হয়। ধর্ম্মঘটকারীরা সহরের কেন্দ্রস্থলে এক সভায় সমবেত হয় এবং অনেক গরম বক্তৃতাও দেওয়া হয়। ষ্ট্যালিনবাদ বর্জ্জনের বোধ হয় উহা প্রথম প্রতিক্রিয়া। সভার পর তাহারা রাজপথ দিয়া শোভাযাত্রা করিয়া চলিতে থাকে, যেমন আমাদের দেশে হয়। তাহারা জেলখানা ভাঙ্গে এবং দুই শত বন্দী এই সূত্রে মুক্ত হয়। জনতা কারারক্ষীদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া লয়। কয়েকটি সরকারী ভবনে অগ্নিসংযোগ করে। হাঙ্গামা দমনের জন্য সৈন্যবাহিনী ও ট্যাঙ্কবাহিনী তলবের কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সরকারী ইস্তাহারে বলা করা হইয়াছে যে, হাঙ্গামাকারীরাই প্রথম গুলীবর্ষণ করে। অতঃপর ষ্ট্যালিনবাদ-বর্জ্জন বর্জ্জন করা হইবে কি না, তাহাই লক্ষ্য করিবার বিষয়।

১৩ই জুলাই, ১৯৫৬।

ঠকালো যারা

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

ঠকালো যাহারা, করিল পীড়িত চঞ্চল যারা মন,
ব্যথা কমে ভাবি' তাদিকে আপন জন।
নেহাৎ অসৎ নহে কো—না হোক সৎ,
আমাকে ঠকানো ভাবিয়াছে নিরাপদ,
এড়াতে হয়ত বহু লাঞ্ছনা—দারুণ বিড়ম্বন।

যাতনা দিয়ে কি রোধ করা যায় যাতনার বাড়া-কমা?
বুক যে জুড়ায় করা যায় যদি ক্ষমা।
তখন দেখেছি ঠকাও যায় না বাজে,
ভবিষ্যতের আনন্দ হয়ে রাজে,
যাহা খোয়ায়েছি তার বহুগুণ অজ্ঞাতে হ'ল জমা।

ঠকায়ে ঠকেছে—বড়ই লজ্জা হয়ত পেয়েছে মনে,
মরম বেদনা সহেছে সঙ্গোপনে।
বেসেছিল মোরে ভাল—তা যাবে কি বৃথা?
এ অপব্যয় করায় আত্মীয়তা,
এ সকল দাগা মিলাইয়া যায় মমতার পরশনে।

বেশী আপনার ভাবিলে তাদিকে মোটেই রহে না ব্যথা,
ঠকার কাহিনী হয়ে ওঠে রূপকথা।
মনের এ সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষত—
পোষা ময়নার লাগে ঠোকরের মত,
দংশনের সে রূঢ়তা রহে না আনে যেন কোমলতা।

গাল পুড়ে যায় কত দিন দেখি, বেশী চূণ হলে পানে।
দাঁত জিভ কাটে সকলেই উহা জানে।
ফল ছাড়ানর ছুরিতে এ হাত কাটা,
পথ চলিবার বসনে এ চোরকাঁটা,
ছেঁড়া তার এরা নূতন মোচড়—দেয় সেতারের কানে।



সাহিত্য পরিচয়

সাহিত্যিকের স্বপ্নভঙ্গ

বিশ্ববিখ্যাত মার্কিন সাহিত্যিক হাওয়ার্ড ফাষ্ট পৃথিবীর প্রগতিশীল জনসাধারণের কাছে সুপরিচিত। সারাজীবন তিনি তাঁর তরবারিতুল্য লেখনী স্বদেশের ও বিদেশের নিপীড়িত মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে নির্ভীক চিত্তে প্রয়োগ করেছেন। স্বভাবতই সোভিয়েট রাশিয়ার মতন সমাজতান্ত্রিক দেশ ছিল তাঁর জীবনের সমস্ত স্বপ্ন ও কামনা-বাসনার অমরাবতী। কিছুদিন আগে তিনি সাহিত্যে ষ্টালিন পুরস্কারও পেয়েছিলেন। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার ক্রুশভ-মিকোয়ান গোষ্ঠীর বিচিত্র ষ্টালিনবিরোধী "আত্মসমালোচনার" ভঙ্গিতে, পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানুষের মতন, হাওয়ার্ড ফাষ্টও চমকিয়ে উঠেছেন। "রুশ মার্কা" মার্ক্সবাদের এরকম অত্যাশ্চর্য অভিনয় কেউ কোনদিন দেখতে পাবেন বলে কল্পনা করেন নি। আমরা জানি না, কার্ল মার্ক্স বা লেনিন কোথাও তাঁদের শাস্ত্রে এমন কথা লিখে গেছেন কি না, যে রাশিয়াতেই শ্রেষ্ঠ মার্ক্সীয় মস্তিষ্কের উদ্ভব হবে। কিন্তু বাইরের অন্যান্য দেশের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের কাণ্ডকারখানা দেখে মনে হয়, তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা তাই। সেইজন্য তাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ভুলে গেছেন। মস্কোকে তাঁরা মক্কা বলে মনে করেন। বিশ পার্টি কংগ্রেসের যে সমালোচনা তাঁরা করেছেন, তার মধ্যে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সব দেখে মনে হয়, স্বাধীন চিন্তা বা গণতান্ত্রিক অধিকার ইত্যাদি আদর্শ তথাকথিত মার্ক্সীয় বুলি কপচে তাঁরা পদে পদে ক্ষুণ্ণ করতে উদ্যত। হাওয়ার্ড ফাষ্ট এইজন্য সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। স্কন্ধকাটার স্বর্গে তাঁর মতন কোন বুদ্ধিজীবী বা লেখকই বসবাস করতে চান না।

হাওয়ার্ড ফাষ্ট তাই গভীর দুঃখের সঙ্গে বলেছেন: "জীবনে যে ভুল করেছি, অনুশোচনায় তার খেসারৎ দেওয়া যাবে না। যতদিন বেঁচে থাকব, আর কোনদিন এ ভুল করব না। সোভিয়েট রাশিয়াই হোক বা কমিউনিষ্ট পার্টিই হোক, সকলকেই স্বাধীনভাবে নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে তীব্রভাবে সমালোচনা করব। কারও কথাতে আর জীবনে বিশ্বাস করব না। এতে আমার আদর্শ আমি ত্যাগ করছি না। আগে যেমন আমি রাশিয়ার জনসাধারণের বা সমাজ-তন্ত্রের বন্ধু ছিলাম, ভবিষ্যতেও তাই থাকব। কিন্তু কাউকে সমালোচনা করতে ছাড়ব না।" হাওয়ার্ড ফাষ্টের এই উক্তি পৃথিবীর প্রত্যেক বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকের স্মরণীয়। স্বাধীন বিচার-বুদ্ধির বিকাশ আজ কেবল বুর্জোয়া দেশগুলিতেই অবরুদ্ধ বা বিপন্ন নয়, তথাকথিত সোশ্যালিষ্ট দেশগুলিতেও সঙ্কটাপন্ন। আদর্শের নামে, গণতন্ত্রের নামে, সর্বত্রই স্বেচ্ছাতন্ত্রের লীলা চলেছে। এই অবস্থায় স্বাধীনতাপ্রিয় বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের হাওয়ার্ড ফাষ্টের মতন নির্ভীক মতামত পোষণ করাই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক কর্তব্য ব'লে আমরা মনে করি।

ন্যাশনাল লাইব্রেরী

আমাদের "ন্যাশনাল লাইব্রেরী" বেলভেডিয়ার হাউসে স্থানান্তরিত হবার পর লাইব্রেরিয়ান শ্রীকেশবনের অক্লান্ত চেষ্টায় নানাদিকে তার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। লাইব্রেরির ব্যাবহারিক সুযোগ সুবিধাদির উন্নতিবিধানের দিকে শ্রীকেশবনের দৃষ্টিও সর্বদা সজাগ। লাইব্রেরির অন্যান্য কর্মিরাও নিজেদের কর্তব্যপালনে কোন ত্রুটি করেন না। পাঠকদের নানা বিষয়ে সাহায্য করতে সব সময় তাঁরা প্রস্তুত। তাঁদের শিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহারও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণীয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা দু' একটি অসুবিধার কথা (ঠিক অভিযোগ নয়) লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষের কাছে নিবেদন করছি। এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'লে লাইব্রেরির কার্যকারিতা আরও বাড়বে ব'লে আমাদের বিশ্বাস!

(ক) লাইব্রেরিতে বই 'রিকুইজিশন' করলে, বই আসতে এক ঘণ্টা তো বটেই, অনেক সময় দু' ঘণ্টার বেশিও দেরি হয়। ষ্ট্যাকরুমের কর্মিরা কাজে অবহেলা করেন, এমন কথা আমরা বলছি না। কিন্তু দৈনিক গড়পড়তা পাঠকের চাহিদা যোগান দেবার মতন যথেষ্ট সংখ্যক কর্মি সেখানে আছেন কিনা, তা ভেবে দেখা অবিলম্বে উচিত ব'লে মনে হয়। দূর থেকে যে সব পাঠক পড়তে যান, তাঁদের একটি দিনই এইভাবে অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়।

(খ) পাঠকদের মধ্যে, আমরা দেখেছি, অনেকে সাম্প্রতিক বাংলা নাটক-নভেল ইত্যাদি পড়তে যান। তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ অল্প নয়! বেলভেডিয়ার পর্যন্ত যাঁরা কষ্ট ক'রে নাটক-নভেল-ডিটেক্‌টিভ পড়তে যান, তাঁরা আরামে পাখার তলায় ব'সে পড়বার সুযোগ না পেলে, এবং অন্য কোন কাজকর্ম থাকলে, নিশ্চয় যেতেন না। কিন্তু এ সব বই পড়ার জন্য বহু পাঠাগার কলকাতায় আছে। যাঁরা প্রয়োজনের জন্য পড়েন, কেবল অবসর বিনোদনের জন্য পড়েন না, তাঁদেরও তার জন্য ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়ে ভিড় করার অর্থ হয় না। সবচেয়ে অসুবিধার সৃষ্টি করেন তাঁরা, যাঁরা লেণ্ডিং বিভাগে নাটক-নভেল নিতে যান। আমাদের মনে হয়, অন্যান্য সিরিয়াস পাঠকদের স্বার্থে কর্তৃপক্ষের কর্তব্য, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে বাংলা নাটক নভেল পড়া বা দেওয়া বন্ধ করা। নাটক-নভেলের পাঠকরা সিরিয়াস পাঠক হ'তে পারেন না যে তা নয়। আসল যুক্তি হ'ল, বাইরের বহু পাঠাগারে তাঁদের পড়বার সুযোগ আছে। অকারণে লাইব্রেরির কর্মিদের ব্যতিব্যস্ত করার এবং অন্যান্য পাঠকদের বিব্রত করার কোন সুযোগ তাঁদের দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আশা করি, লাইব্রেরির কর্তৃপক্ষ ও শ্রীকেশবন এ সম্বন্ধে অবহিত হবেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে ঋণ-স্বীকার

সাহিত্যক্ষেত্রে চিরকাল ঋণ-স্বীকারের একটা সুসভ্য ঐতিহ্য ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে কেন, সর্বক্ষেত্রে এই স্বীকৃতি শিষ্টতা ও শালীনতার

পরিচায়ক। কিন্তু সম্প্রতি গভীর আক্ষেপের সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করছি, অনেক পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখক নানাবিষয় নিয়ে লিখছেন, যা তাঁদের পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠিত লেখকরা কেউ কেউ লিখে গেছেন। এই সব লেখকের লেখার প্রেরণাও যে পূর্বের এই সব লেখা থেকে প্রত্যক্ষভাবে এসেছে, তাও কোন বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝতে কষ্ট হয় না। লেখার বিষয়-বস্তুরও আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। উপকরণও প্রায় একই। অথচ পূর্বের লেখকদের কাছে তাঁরা ঋণ-স্বীকারের কোন প্রয়োজনবোধ করেন না। আরও মারাত্মক সংবাদ হ'ল, ঋণ-স্বীকার ক'রে কারও নাম কোন রচনায় উল্লিখিত হলেও, কোন কোন সম্পাদক তা তাঁর নিজের ইচ্ছায় বাদ দিয়ে দেন। বাদ দেওয়ার যুক্তি হ'ল, সেই লেখক তাঁর দলভুক্ত নন এবং সেইজন্য তাঁকে প্রাধান্য দিতে তিনি নারাজ। রচনা-প্রকাশের সুযোগ পেয়ে নতুন লেখক সম্পাদকের এই 'ভ্যাণ্ডালিজম' সহ্য করেন, যদিও দুর্নাম তাঁরই হয়। দলাদলির ফলে বাংলাদেশের সাহিত্যপেশা ও সম্পাদনা ধীরে ধীরে অশিষ্টতা ও অসৌজন্যের কোন সীমায় নেমে আসছে, ভাবলে হতাশ হতে হয়। এর পরেও বাঙালীর 'ভবিষ্যৎ' সম্বন্ধে আমাদের দিবাস্বপ্ন দেখার শেষ নেই।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বুদ্ধদেব

রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে গৌতম বুদ্ধ, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যে-সব ভাষণ দিয়েছেন এবং রচনা লিখেছেন, 'বুদ্ধদেব' গ্রন্থে সেগুলি সংগ্রহ ও সংকলন ক'রে একত্রে প্রকাশ করা হয়েছে। শ্রীপুলিনবিহারী সেন রচনাগুলি নানাস্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে এই সংকলন-গ্রন্থখানি প্রকাশ ক'রে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। সম্পাদন ও সংকলনের কাজে তাঁর অসাধারণ নৈপুণ্যও বইখানির মধ্যে সুপরিস্ফুট। বইয়ের শেষে প্রত্যেকটি রচনা কোথা থেকে সংগৃহীত, কোন সময় কোথায় প্রকাশিত, তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেও তিনি ভোলেননি। বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই রচনাগুলি সাধারণ ভাবে ইতিহাস-অনুরাগী শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট নতুন চিন্তার খোরাক যোগাবে।—প্রকাশক: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। দেড় টাকা।।

পঁচিশ বছরের প্রেমের কবিতা

গত পঁচিশ বছরের বাংলা প্রেমের কবিতার একটি সংকলনগ্রন্থ আবু সয়ীদ আইয়ুবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে। আইয়ুব সাহেব যদিও "পূর্বলেখে" প্রথমেই উল্লেখ করেছেন যে "সাহিত্য আমার মূল সাধনার বিষয় নয়, শৌখিন, কাজেই অনধিকার চর্চার বস্তু", তাহ'লেও এদেশের সুধীমহলে তিনি সাহিত্যরসিক ও চিন্তাশীল লেখক হিসেবে সুপরিচিত। সুতরাং এক্ষেত্রে তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে সকলেই একমত হবেন। 'কবিতা ও প্রেম' নামে প্রথম প্রবন্ধটিও সুলিখিত। রবীন্দ্রনাথ, যতীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল থেকে অত্যাধুনিক তরুণ কবিদের নিয়ে প্রায় ষাট জন কবির নির্বাচিত প্রেমের কবিতা বইখানিতে সংকলিত হয়েছে। এই ধরণের কাব্য-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা অনেক দিক থেকেই আছে। কাব্যের ধারা নির্ণয়ে ও কাব্যশক্তির মূল্যায়নে এর মূল্য অনস্বীকার্য। সংকলনের আগাগোড়া যে কাব্যবিচারবোধ ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়, তাও সাম্প্রতিক কালে দলাদলির ফলে দুর্লভ হয়ে উঠেছে। দু'-একটি ত্রুটি আমাদের নজরে পড়েছে ব'লে উল্লেখ করছি। সংকলনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, যতীন্দ্র বাগচীর মতন কবির স্থান হয়নি দেখে অনেকে বিস্মিত হবেন। কবিতাগুলির রচনাকালও এই ধরণের সংকলন গ্রন্থে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন। তা না দেওয়াতে, সংকলনের অঙ্গহানি হয়েছে ব'লে মনে হয়। এ ছাড়া, পরিশিষ্টে প্রত্যেক কবির সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। আশা করি, ভবিষ্যতে এই ত্রুটিগুলি সম্পাদক মহাশয় সংশোধন করবেন। প্রকাশক সিগনেট প্রেস, কলিকাতা-২০। চার টাকা আট আনা।

জুয়া

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের একখানি বিচিত্র ধরণের উপন্যাস 'জুয়া।' উপন্যাসের নায়ক জগদীশ আর নায়িকা তরুবালা জীবনকে নিয়ে খেলতে চেয়েছিল জুয়া। জুয়ায় হার-জিত আছে। উপন্যাসে বর্ণিত নায়ক-নায়িকার জীবনেও শেষ পর্যন্ত ঘটেছে একজনের জয় ও অপর জনের পরাজয়। প্রবোধ বাবুর মিষ্টি হাতের লেখার গুণে উপন্যাসটি হয়ে উঠেছে অতি অপূর্ব! প্রকাশক; ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৪৫ বি সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা—২। দাম: তিন টাকা।

পুষ্পধনু

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যালের 'পুষ্পধনু' উপন্যাসটি গত বছর শারদীয়া দৈনিক বসুমতীর পাতায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক-পাঠিকা মহলে বিপুল আলোড়ন তুলেছিল। আমরা উচ্চকণ্ঠে বলতে পারি, ভাব, ভাষা,রূপ ও রসের সমন্বয়-সাধনে প্রবোধ বাবুর 'পুষ্পধনু' উপন্যাসটি সাহিত্যের আঙিনায় এক নতুন দিক নির্দেশ করতে সমর্থ হয়েছে। প্রকাশক: ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলকাতা। দাম: পাঁচ টাকা।

নিশিবিহঙ্গ

রহস্যোপন্যাসিক হিসেবেই শ্রীনীহাররঞ্জন গুপ্ত পাঠক সাধারণের কাছে অধিক পরিচিত। সদ্য-প্রকাশিত 'নিশিবিহঙ্গ' মোটেই রহস্যোপন্যাস নয়, একেবারে তার ব্যতিক্রম। 'নিশিবিহঙ্গ' রঙ্গমঞ্চের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের বিচিত্র জীবন নিয়ে লেখা নতুন ধরণের উপন্যাস। বিষয়বস্তুর গুণে উপন্যাসখানি একবার হাতে নিয়ে পড়তে বসলে শেষ না করে ওঠা যায় না। শিল্পী শ্রীঅন্নদা মুন্সীর হাতে আঁকা অপূর্ব প্রচ্ছদ। প্রকাশক: ন্যাশনাল পাবলিশার্স, ১৪৫ বি সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা—২। দাম: চার টাকা।

বাঙালী জাতি পরিচয়

শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাঙালী জাতি পরিচয়' গ্রন্থটির ভেতর কি আছে তা নৃতত্ত্ববিদ্ শ্রীনির্মলকুমার বসু মহাশয়ের গ্রন্থের ভূমিকার ভেতর সুন্দর ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ অনেক পরিশ্রম করে বাংলাদেশের ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, সুবর্ণবণিক, গন্ধবণিক আদি ষোলটি জাতির সমাজগঠনের সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রতি জাতির মধ্যে কি কি শাখা-উপশাখা আছে, তাদের সম্পর্কই বা

কিরূপ, উক্তবই বা কেমন ভাবে হয়েছে, প্রত্যেকের মধ্যে কোন্ কোন্ পদবী ও গোত্র বর্তমান, তদ্ভিন্ন জাতির শিক্ষা বা বৃত্তির বর্তমান অবস্থা কি, এ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় একত্রিত করে সমাজতত্ত্বের গবেষণাকারী এবং ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকমাত্রকে তিনি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। আকারে পুস্তকখানি ছোট হলেও তথ্যসম্ভারে ইহার গুরুত্ব কম নয়।' প্রকাশক: সাহিত্য-সংস্থা, ১৫৩।১ রাধাবাজার ষ্ট্রীট, কলকাতা। দাম: দু টাকা চার আনা।

অহল্যা

অমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অহল্যা' প্রথম উপন্যাস। লেখকের নিবেদন সংক্ষিপ্ত হলেও মূল্যবান। বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ডি এইচ লরেন্স, অলডাস হাক্সলি, ভার্জিনিয়া উলফ, নলিনীকান্ত গুপ্ত ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের নানা মত উদ্ধার করে লেখক উপন্যাসের প্রকরণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, চেতনার উত্তরণে উপন্যাস হবে ভাবী কালের মহাকাব্য। 'অহল্যা'র মধ্যে এই দুর্লভ গুণের আভাস পাওয়া যায়। এই প্রণয়-কাহিনীতে রূপায়িত হয়েছে কয়েক জন আধুনিক নরনারীর চেতনার বিচিত্র সংঘাত। সংলাপের ভেতর দিয়ে চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং গল্পও দ্রুত গতিতে এগিয়েছে। আখ্যানভাগের বাঁধুনি শিথিল নয় বলে এক নিশ্বাসে বইখানা পড়ে যেতে হয়। লেখার ষ্টাইল অপূর্ব, লেখকের ভাষার সঙ্গে সপ্ততন্ত্রী বীণার তুলনা করা চলে। বাংলা সাহিত্যে 'অহল্যা' নিঃসন্দেহে একটি মহৎ উপন্যাস। প্রকাশক: কথামৃত ভবন, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা-৬। মূল্য আড়াই টাকা।

সস্তায় বই

সন্তোষকুমার দে

হাতীর দাঁতের মিনার! কথাটা উচ্ছাশয় ব্যক্তির মতো শোনালেও ওই মোলায়েম তিরস্কারে অলঙ্কৃত হয়েছেন বহু দেশের বহু সাহিত্যিক। অপবাদ—তারা ভূমিস্পর্শ করেন না, বাস্তব জগতের মানুষের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন, বাস করছেন কল্পলোকে—আইভরি টাওয়ারে।

কিন্তু অপবাদটা আরো ব্যাপক হওয়ার অবকাশ আছে। সাহিত্য-ব্যবসায়ী অর্থাৎ প্রকাশকরাও কি নিজেদের 'উঁচ্ কপালে' (High brow) ভাবতে অভ্যস্ত নন? একটু অবজ্ঞা-মিশ্রিত অনুকম্পার দৃষ্টিতে তাকান না জনসাধারণের দিকে? নতুবা তারা চেষ্টা করে সংগ্রাম করে, একত্রিত হয়ে জাতীয় সরকারকে বাধ্য করছেন না কেন তাদের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল এমন সস্তা করতে যাতে, তারা সত্যিকারের সস্তায় বইপত্র সত্যিকারের জনসাধারণের হাতে তুলে দিতে পারেন।

এ কথা সত্য,—আমাদের দেশে বইএর কাটতি আশানুরূপ যথেষ্ট নয়, ফলে বই ছাপবার খরচা প্রায়শ আপেক্ষিক ভাবে বেশি পড়ে। পাঁচশ' থেকে এগারোশ' এর মধ্যে যেখানে অধিকাংশ বইএর প্রথম সংস্করণ ছাপতে হয়, সেখানে প্রত্যেকটি বইএর দাম বেশী পড়বেই। এগারো শ'কে এগারো হাজারে বা এক লক্ষে পরিণত করতে পারলে মোট খরচা যতই লাগুক প্রতি খণ্ডের খরচা প্রায় কাগজের দামের কাছাকাছি পড়বে। হায়, কবে সে দিন আসবে, যেদিন বাংলা বই প্রথম সংস্করণেই এক লক্ষ কপি, ছাপা হবে।

তা যত দিন না হচ্ছে, তত দিন কি জনসাধারণ উপবাসী থাকবে? প্রশ্ন করেছিলেন এক প্রাচীনপন্থী ব্রাহ্মণ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি সাহিত্য ব্যবসায়ী ছিলেন সত্য, কিন্তু ব্যবসায় বুদ্ধির অতিরিক্ত আরো কিছু ছিল তাঁর—যা দেখতে পাই তাঁর একটি উক্তিতে:—

"যে বাজারে অন্ন, জল, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা সমস্তই দুর্মূল্য হইয়াছে, সেই বাজারে সুলভ সাহিত্যস্রোত অপ্রতিহত বেগে ভারতের প্রতি জনপদ পল্লীতে প্রবিষ্ট হউক। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ব্যক্তিও স্বল্পায়াসে নিজের ব্যয়ভার না বাড়াইয়া এই অমূল্য রত্নরাজির অধিকারী হউন। সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায় একখানির মূল্যে এক সেট গ্রন্থ ক্রয় করিয়া নিজ পরিবারে সুশিক্ষার স্রোত প্রবাহিত করুন, এই জন্যই ত' বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠিত।"

বস্তুত, আমার তো মনে হয় শরৎচন্দ্রের অতুলনীয় জনপ্রিয়তার অনেকখানি গৌরব বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির দাবী করতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলা দেশ ভুলে গেলে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকতো না, যদি না বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির ঘরে ঘরে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পৌঁছে দিত। বৈষ্ণব সাহিত্য, অনুবাদে সেক্সপীয়র প্রমুখ বৈদেশিক মহাজনদের রচনা, কত কত দুষ্প্রাপ্য পুস্তক এত দিন আমাদের বিস্মৃতির গহ্বরে তলিয়ে যেত যদি না বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির সস্তা গ্রন্থাবলী মাধ্যমে তাদের সহজ ও ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করত। আজ মূল্যবান কাগজে পরিচ্ছন্ন মুদ্রণে যতই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হোক্ না কেন, বসুমতীর এই অবিস্মরণীয় কীর্তি বাংলা সাহিত্যের প্রকাশন ব্যবস্থার ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

আমরা দরিদ্র বলে আমাদের দেশেই যে কেবল সস্তা সাহিত্য গ্রন্থ প্রচারের প্রয়োজন তাই নয়, সমাজের সর্বস্তরে অবাধ ও ব্যাপক প্রচারের জন্য সস্তা বই সব দেশেই বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। পেঙ্গুইন, পেলিক্যান প্রভৃতি সিরিজের মতো একশো একটা ভিন্ন ভিন্ন সিরিজে ছেয়ে গেছে পশ্চিম দিগন্ত, ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া, পূর্ব দিগন্তেও তার ছোঁয়াচ লেগেছে। চীনের আধুনিক অভিযান বিশেষ লক্ষণীয়। রাশিয়া ও চীনের সস্তায় সাহিত্য প্রচারের যত অপব্যাখ্যাই করা যাক না কেন, রাজনৈতিক দিক ছাড়া এর শিক্ষণীয় দিকটাও আদৌ উপেক্ষার বস্তু নয়।

বাংলা বই প্রকাশকদের কাছে একটি বিশেষ নিবেদন আছে। ভালো লেখকের ভালো রচনা ভালো কাগজে ভালো ছাপায় ভালো প্রচ্ছদে মুড়ে তাঁরা বের করুন—দাম হোক ফর্মা-প্রতি চার আনা থেকে আট আনা। কিন্তু সস্তা বাঁধাই ও সস্তা কাগজে ওরই কিছু সুলভ সংস্করণও ছাড়ুন না। যত দিন একই বই-এর পৃথক আকারে সস্তা সংস্করণ চালু না হচ্ছে, অন্তত: এই ভাবে কিছু পরীক্ষা করা মন্দ কি?

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বইএর প্রচ্ছদ এক সময়ে সামান্য কভার-পেপারে মোড়াই হয়ে, প্রেস টাইপে ছাপা হয়েও কম জনপ্রিয় হয় নি। আজ পরস্পর প্রতিযোগিতায় কেবল মলাট বাড়িয়ে আসর গরম করবার পদ্ধতিতে আমরা যেন দিশাহারা হয়ে না পড়ি। বাংলা দেশ বই চায়, তা সস্তায় পেলে বাঙ্গালী আরো উপকৃত হবে, এ চিন্তাটা যেন প্রকাশকদের সবাই না করুন, কেউ কেউ করেন। সতীশচন্দ্রের উত্তরাধিকারী কি বাংলা দেশে বিরল হবে?

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুইনাইনের মূল্য

প্রতি পাউণ্ডের মূল্য (ট্রেড ডিস্কাউণ্ট বাদে)

১।—প্রোডাক্টস

		৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত টাকা আনা	৬ পাউণ্ড হইতে ৫৯ পাউণ্ড টাকা আনা	৬০ পাউণ্ড হইতে ৯৯ পাউণ্ড টাকা আনা	১০০ পাউণ্ড** এবং তাহার উপর টাকা আনা
১)	কুইনাইন সালফেট বি, পি, ১৯৫৩	৪৫৲	৪৪৲	৪২।।০	৪১৲
২)	কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড বি, পি, ১৯৫৩	৫০৲	৪৯৲	৪৭।।০	৪৬৲
৩)	কুইনাইন বাইহাইড্রোক্লোরাইড বি, পি, ১৯৫৩	৫২৲	৫১৲	৪৯।।০	৪৮৲
৪)	কুইনাইন বাইসালফেট বি, পি, ১৯৫৩	৪৩৲	৪২৲	৪০৲	৩৮৲
৫)	টোটাকুইনা বি, পি, ১৯৪৮	২২৲	২১৲	১৯।।০	১৪।।০
৬)	সিনকোনা ফেব্রিফিউজ আই, পি, এল, ১৯৪৬	২০৲	১৯৲	১৭।।০	১২।।০
৭)	ইউকুইনাইন (কুইনাইন এথিল কারবোনেট বি, পি,)	৪৸০	এক আউন্সের প্রতিটি প্যাকেট		
		৪।।৵০	৫ পাউণ্ড এবং তাহার উপর এক আউন্স প্যাকেটে		

২।—ট্যাবলেট—(প্রতিটি ৫ গ্রেণ)

		৫ পাউণ্ড পর্য্যন্ত টাকা আনা	৬ পাউণ্ড হইতে ৫৯ পাউণ্ড টাকা আনা	৬০ পাউণ্ড হইতে ৯৯ পাউণ্ড টাকা আনা	১০০ পাউণ্ড** এবং তাহার উপর টাকা আনা
১)	কুইনাইন সালফেট বি, পি, ১৯৩২	৪৩৲	৪১৲	৪০৲	৩৮৲
২)	কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড বি, পি, ১৯৫৩	৫২৲	৫০৲	৪৯৲	৪৮৲
৩)	কুইনাইন বাইহাইড্রোক্লোরাইড বি, পি, ১৯৫৩	৫৫৲	৫৩৲	৫২৲	৫১৲
৪)	কুইনাইন বাইসালফেট বি, পি, ১৯৫৩	৪৫৲	৪৩৲	৪১৲	৪০৲
৫)	সিনকোনা ফেব্রিফিউজ আই, পি, এল, ১৯৪৬	২৩৲	২১৲	২০৲	১৫৲
৬)	কুইনাইন সালফেট বি, পি, ১৯৫৩	।৶০	দশটি ট্যাবলেটের প্রত্যেকটি টিউব		
		।৵১০	১২টি টিউবযুক্ত বাক্সে প্রতিটি টিউব		
৭)	কুইনাইন হাইড্রোক্লোরাইড বি, পি, ১৯৫৩	১।০	২৫টি ট্যাবলেটযুক্ত প্রতি শিশি		
		১৵০	১২টি শিশিযুক্ত বাক্সে প্রতিটি শিশি		

** ১০ পাউণ্ড টিন প্যাকিংএ ১০০ পাউণ্ড এবং তাহার উপর মাল লইলে পাউণ্ড প্রতি ১৲ ডিসকাউণ্ট দেওয়া হয়।

কুইনাইন সালফেট বি, পি, ১৯৫৩, সিনকোনা ফেব্রিফিউজ এবং টোটাকুইনা বেশী পরিমাণ ক্রয় করিলে স্পেশাল ডিসকাউণ্ট দেওয়া হয়।

নিম্ন ঠিকানায় অনুসন্ধান করুন :—গভর্ণমেণ্ট কুইনাইন সেল ডিপো, ওল্ড হিন্দুস্থান বিল্ডিংস, কলিকাতা - ১৩

পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৭০—১৩

র ঙ্গ প ট



আত্মকথা

চার্লস্ চ্যাপলিন্

বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক বা ব্যাংক প্রেসিডেন্টরা তাঁদের সাফল্যের কারণ হিসাবে যে সব বড় বড় কথা বলেন তা আমার কাছে বেশ পরিষ্কার ঠেকে না। তাঁদের কারণ এবং যুক্তিগুলোকে আমরা অনেক সময় তাই ছাই-পাঁশ বলে উড়িয়ে দিয়ে থাকি। কিন্তু একথা অবশ্য আমার সম্বন্ধে খাটবে না। কেন না, আমি জানি কেন আমি বড় হয়েছি, আর সেই কথাই আজ বলবো।

গুটি তিন-চার কারণ আমি দেখাতে চাই—যার জন্যে কমেডিয়ান হিসাবে আমার বিশ্বখ্যাতি। বাড়িয়ে না বললেও সেগুলো কিন্তু ভারী মজাদার। সামান্য একটু ভাগ্য, সাধারণ লোক সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান আর ঠিক ঠিক জায়গায় মাথা ঠাণ্ডা রেখে ঠিক ঠিক কাজ করে যাওয়া—এই হলো আমার সাফল্যের কারণ।

এক কথায় বলতে কি, ১৯১৩ সাল থেকেই আমার উন্নতি আরম্ভ হয়। এই বছরের প্রথম দিকটা আমি ন্যুয়র্কে 'ভিডিভিল স্কেচেসে' অভিনয় করি, এবং তার পর লণ্ডনে ফিরে আসি। এর পর লণ্ডনেও 'ভিডিভিল স্কেচেসে' অভিনয় করি, তার পর আবার ন্যুয়র্কে ফিরে যাই। এই বছরেই একটি জিনিস আবিষ্কার করি আমি। তখন ফিলাডেল্ফিয়ায় বসন্তকাল, না, মোটেই কবিত্ব করছি না। একদিন Krnoa Pantomime কোম্পানীতে Night in a music hall অভিনয় করছি, এমন সময় একটি পিয়ন আমার হাতে একখানি টেলিগ্রাম গুঁজে দিয়ে গেলো। যে কেরাণী আমার নামে এই টেলিগ্রামটি লেখে, হয় সে অন্ধকারে কাজ করছিলো আর না হয় খুব উত্তেজিত হয়েছিলো কোন কারণে। কেন না, ওপরের নামটা ঠিক রেডিও সিগন্যালের মতো দেখাচ্ছিলো। খামের ওপর লেখা ছিলো : Mr C R Z Z X S O K K G D L N X C/o The Fred Karno Pantomime Co.—এ রকম গ্লাভস্‌চক বানানে নিশ্চয়ই [illegible] কোন এ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পেয়ে থাকবে। এখন টেলিগ্রামটি আসছিলো Keystone Comedy Company থেকে। এই কোম্পানীটি তখন প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে কতকগুলি মিলনান্তক ছবি তুলছিলো এবং মি: O K K G D-L N X যেহেতু তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তার জন্যে সপ্তাহে ১৫০ ডলার বেতনে তাঁকে চাকরী দেওয়া হয়েছে। আর এই আয়ের অংক আমার জীবনের সমস্ত রোজগারের দ্বিগুণ। এর ফলে আমার মনে যে সংঘর্ষ লাগলো তার পরিণাম অতি সংক্ষেপ ও সহজ। আমি অকুতোভয়ে আর দ্বিধাহীন চিত্তে চলে গেলাম।

এখন প্যান্টোমাইম কোম্পানীতে আর একজন ছিলেন, যিনি মনে করতেন চিঠিটা তাঁরই এবং আমি তাঁকে ঠকিয়েছি। কিন্তু ক্যালিফোর্নিয়ায় গিয়ে দেখলাম, সে চিঠি তাঁর বা আমার কারোরই নয়। এর থেকে প্রমাণ হয়, ভাগ্য আমার সংগে কি রকম ষড়যন্ত্র করে আমাকে সাফল্যের দিকে ঠেলে দিলো। তা বোলে সব কিছুরই জন্যে ভাগ্যকে ব্যাখ্যা করা চলে না। ভাগ্য সুযোগ দিতে পারে, কিন্তু গুণ না থাকলে শুধু ভাগ্যতে কিছু হয় না। এই যেমন আমার বেলায়। তখন আমি অত্যন্ত ভালো অভিনয় (স্ক্রীন এ্যাক্টিং)করতাম, অবশ্য এটাকেও আমি ভাগ্য বলেই মনে করি।

বহু দিন আগে এক ভ্রাম্যমান কোম্পানীর সংগে আমি চ্যানেল আইল্যাণ্ডস্‌এ যাই অভিনয় করতে। সেখানে গিয়ে দেখি, সেখানকার লোকেরা একেবারে ইংরেজী বোঝে না—কাজেই ইংরেজীতে কথা বলা ব্যর্থ হবে ভেবে আমি হাত-পা নেড়ে মূক অভিনয় করি। প্রয়োজনের খাতিরে যা করলাম তার ফল দর্শালো মারাত্মক! সেখানে তো প্রচুর খাতির-যত্ন পেলামই, উল্টে ইংরেজীজানা লোকেরাও মূক অভিনয় করার দাবী করতে লাগলো। এ ব্যাপারে নিজের প্রতিভা দেখে আমিও খুব অবাক হয়েছিলাম। এর পর এক প্যান্টোমাইম্ কোম্পানীতে যোগ দিই এবং সেখান থেকেই আমার সিনেমা-জীবনের সূত্রপাত। সে সময় সিনেমাতে মূক অভিনয়ের পালা, টকি হয়নি। তাই এ অভিনয়ে অন্য সকলের চেয়ে আমার বিশেষ সুবিধা হলো। তাঁদের অভিনয়ের বিষয়বস্তু লিখে লিখে দর্শকদের জানাতে হতো, কিন্তু আমি না লিখে হাত-পা-মুখ নেড়েই কার্য সমাধা করতাম। লিখে দর্শকদের মনে হাস্যোদ্রেক করার পক্ষপাতী আমি আজও নই। আমি বিশ্বাস করি না যে, কথার ঝুড়ি দিয়ে মনের অন্তর্নিহিত ভাবকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা যায়।

আমি আগেই বলেছি, ১৯১৩ সাল হচ্ছে আমার উন্নতির আরম্ভ। প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অভিনয় করার ফলে আমি অচিরেই বিখ্যাত হয়ে উঠলাম। কাগজে হতে লাগলো সুখ্যাতি, ফলে জনপ্রিয়তা বেড়ে উঠলো প্রধান মন্ত্রীর মতো। এর কারণ হিসাবে বললে বলতে হয় যে, প্রথম জীবনে আমি দর্শকদের সন্তুষ্ট করার চেয়ে নিজেকেই সন্তুষ্ট করার দিকে ঝোঁক দিয়েছি বেশি। কিন্তু কথাটা শুনতে এত সহজ লাগছে যে, ভয় হচ্ছে প্রত্যেকেই হয়তো একবার করে চেষ্টা করে না বসেন! জিনিসটা আরও একটু পরিষ্কার করে বলছি।

বেশির ভাগ অভিনেতা, প্রযোজক এবং নাট্যকারদের ধারণা থাকে যে তাঁদের ভালো ছবি দর্শকরা নিশ্চয়ই লুফে নেবে। একটা কথা বলার প্রয়োজন মনে করছি এখানে, কিন্তু বই, অভিনয়

নাটক বা ছবি যত ভালোই হোক না কেন, হয়তো তা দর্শক-সাধারণদের তৃপ্তি না-ও দিতে পারে। দর্শকদের নিজস্ব মতামত নেই, ভালো বই হওয়া সত্ত্বেও তাদের তৃপ্তি দেওয়া যায় না—ইত্যাদি মন্তব্য আমি বিশ্বাস করি না। আমি তাঁদের বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস রাখি। শৈশব থেকেই আমি জনসাধারণ বলে এই অস্পষ্ট ব্যক্তি সম্বন্ধে বহু চিন্তা করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, কিছু লোক আমার অভিনয় ভালো ভাবেই নেবেন, কিন্তু ভয় ছিলো সাধারণ দর্শক আমাকে কি ভাবে নেবেন। আমি এই ভয় সর্বক্ষণ দেখতাম যে, সেই অদ্ভুত দর্শকসাধারণ যেন অর্কেষ্ট্রার পাশ থেকে আমাকে ভ্রূকুটি করছে আর আমাকে চ্যালেঞ্জ করছে যে, তার গোমড়া মুখে হাসি ফোটাতে হবে! তবে সম্পূর্ণভাবে তাকে দেখতে পেতাম না, তবুও আমার মনে হতো যেন একটা পাতলা অস্পষ্ট লোক, ঢিলে-ঢালা নীল সার্জের স্যুট, পেটেন্ট লেদারের জুতো, নীলামের কেনা টাই এঁটে বসে রয়েছেন। এ হচ্ছে সেই ধরণের লোক যে তার স্ত্রীর বন্ধুদের অনুরোধে পড়ে সিনেমা দেখতে এসেছে এবং সিনেমা যে ভালো হবে না, সে সম্বন্ধে স্থিরবিশ্বাসী। আমি এই অদৃশ্য দর্শকটিকে ভয় করতাম। আশ্চর্য হয়ে এক-একবার ভাবি যে এই লোকটি হয়তো আমার মধ্যেই আছে আর তাকে খুশি করার ভার আমারই।

সিনেমা-জীবনের প্রথম বছরেই আমি এক অদ্ভুত জিনিস আবিষ্কার করলাম। আস্তে আস্তে এই অশরীরী দর্শকটির ভ্রূকুটি এক সহাস্য সুপরিচিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হলো। তার সেই বিরূপতা আর নেই, তার সম্বন্ধে ভুল বোঝারও আর কোন অবকাশ নেই। এখন মনে হয়, সে যেন আমার বহুদিনের পরিচিত। এক কথায়, এই গড়পড়তা জনসাধারণ, যাকে আমি বহু অভিনয়ের মধ্যে খুঁজেছি, সে আর কেউ নয়, আমি স্বয়ং নিজে!

আমি সব রকম মানুষের সংগেই মিশেছি, প্রতি লোকের দৃষ্টি-ভংগীর সংগেই আমি পরিচিত। আমি যেমন রাজপরিবারের সংগে মিশেছি তেমনি মিশেছি বৈজ্ঞানিক, সমাজতান্ত্রিক, ঐতিহাসিক ব্যবসায়ী। এমন কি লণ্ডনের কোচম্যানদের সংগেও। পুরোহিত থেকে পাষণ্ডদের মধ্যে সমান আমার গতিবিধি। যারা মদের বোতল পরিষ্কার করে আর যারা লর্ড-সভায় যায়, তাদের দু'দলের সংগেই আমার সমান পরিচয়। তাই বলছি, দর্শকসাধারণ বলে যে ব্যক্তিকে আমি উপলব্ধি করি সে আমি নিজেই। আমার এই সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্যে সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেলো। জনতা সম্বন্ধে আমার যে অহেতুক একটা ভয় ছিলো তা চিরতরে দূর হয়ে গেলো। কারণ, আমার মত লোক নিয়েই তো জনসাধারণ। সুতরাং নিজেকে খুশি করতে তৎপর হলেই সংগে সংগে জনসাধারণও খুশি হবে। এর প্রমাণও পেয়েছি বহু। যখনই নিজেকে খুশি করেছি তখনই বলতে কি জনগণও খুশি হয়েছে। এ পর্যন্ত আমি যে ৫০।৬০টি ছবি তুলেছি তাতেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নি। সম্ভবত আমিই একমাত্র অভিনেতা, যে নিজেকে খুশি করার জন্যই অভিনয় করি। এ থেকে এই কথাই বলতে চাই আমি যে, যাঁরা বাঁধাধরা পদ্ধতিতে দর্শকদের হাসাতে চান আর যাঁরা নিজস্ব ভংগিমায় দর্শকদের আনন্দ দিতে চান, তাঁদের মধ্যে তফাৎটা কোথায়?

আমি নিজেকে জনসাধারণের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ায় জনগণও, আমাকে তাঁদের বেসরকারী প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করেছেন। কারণ, গড়পড়তা লোক তাঁদের নিজেদের জীবনই পর্দায় প্রতিফলিত দেখতে চান। দুঃসাহসীকে প্রেমিকের ছবি কিছুক্ষণের জন্যে মনকে নাড়া দিলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কেন না, পর্দার জীবন আর দর্শকের জীবন সম্পূর্ণ পৃথক। অতখানি রোমান্টিক আবহাওয়া জীবন্ত মানুষের ক্ষেত্রে কখনই আসে না। বৈকালিক প্রসাধনের পর আমরা কখনই কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে ধরাশায়ী করে তরুণী নায়িকা লাভে সমর্থ হবো না! এ ধরণের চরিত্র জনতার নয়, আর জনতা জানেও সে কথা। সে ঠিক আমার মত, দৈনন্দিন জীবনে তার ভয়ংকর দুঃসাহসিক হওয়ার অবকাশ কোথায়? এডভেঞ্চার বলতে সে বোঝে, বেশি রাত্রি করে বাড়ী ফিরে বৌকে মিষ্টি কথায় শান্ত করা আর বীরত্ব বলতে বোঝে বড় জোর জমিদার বাবুর সংগে দেখা করা। তাই সাধারণ মানুষ হচ্ছে বেদনার প্রতিমূর্তি। খুব ভালো পোষাক তার জোটে না, তবুও ভালো ভাবে জীবন ধারণ করার চেষ্টা করে। নিজের সীমানা সম্বন্ধে সচেতন, সে জানে ভাগ্য তাকে কোন দিন 'ছাপ্পর ফুড়ে' দেবে না! আমি সাধারণ মানুষ সম্বন্ধে আর একটু বলতে চাই, কেন না এদের সম্বন্ধে আমি বহুদিন ভেবেছি। ভাগ্য সর্বদাই এদের সংগে পরিহাস করে চলে, এরা যা চায় তা পায় না কোন দিন। সাফল্য নাগালের বাইরেই থাকে, কিন্তু তাই বলে তারা কোন দিন হাত গুটিয়ে বসেও থাকে না। জীবন যখন তাদের কাছে পদে পদে এমনি ভাবে বিড়ম্বিত, তখন যদি তারা দেখে যে পর্দার বুকে তাদেরই মত কোন লোক জীবনের মধ্যে ঝড়ের মত এগিয়ে যাচ্ছে, তাহলে তাতে তাদের কোন সান্ত্বনা তো দেয়ই না উপরন্তু জীবনের সংগে পর্দার বৈপরীত্যে সিনেমা সম্বন্ধে তাদের বীতশ্রদ্ধই করে তোলে।

হঠাৎ সেই মুহূর্তে তারা যদি আমার নিজস্ব ব্যর্থ-লক্ষ্যহীন চরিত্র সৃষ্টি দেখে, তাহলে তাদের খানিকটা আশা জাগে। তারা দেখে, এই তো তাদেরই মত একজন রয়েছে, হয়তো তাদের চেয়েও বেশি দুঃখী। হাস্যকর পোষাক পরিহিত, বাউণ্ডুলে লক্ষ্যহীন কোন মানুষকে দেখলে সহানুভূতি চেপে রাখা কঠিন। তবুও এই অপদার্থ অদ্ভুত বাউণ্ডুলে লোকটি সাধারণ নায়কের কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও বেশ খাপ খাইয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। তার আছে মেকী আভিজাত্য বোধ, আছে এমন সব স্বাধীনতা যা তার মোটেই পাওয়া উচিত নয়। দুঃখ তার কাছে ফুলের মতো এমনি ধারা ভাবখানা! এক দিকে সে যেমন পুলিশকে ধোঁকা দিচ্ছে অন্য দিকে তেমনি নানা অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে। উ'চুদরের সামাজিক ভোজে খাচ্ছে, সুন্দরী তরুণীদের সংগে মিশছে, যাদের কাছে যেতে সাধারণ মানুষ ভয় করে, তাদেরও ওপর মাঝে মাঝে টেক্কা দিচ্ছে। নানান রকম ত্রুটি, ব্যর্থতা সত্ত্বেও সে এসব কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। একেই বলবো সার্থক বিদ্রোহ, সেই বহু প্রত্যাশিত মধ্যবিত্তের জয়যাত্রা। বহুদিন পরে মধ্যবিত্ত সমাজ তাদের নিজস্ব সত্তা খুঁজে পেলো, বুঝলো তাদের যতটা অপদার্থ বলা হয় ততটা ঠিক নয়। এই যে বিশ্বাস আমি মানবমনে সঞ্চারিত করেছি এতেই আমাকে এত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

আমার জনপ্রিয়তার তৃতীয় কারণ হচ্ছে: আমি আমার ছবিকে কোন দিন সস্তাদরের লোভনীয় সামগ্রী করে তুলিনি। প্রকৃত হাস্যরস আর সিনেমা কমেডীর মধ্যে যে পার্থক্য তার কথা আগেই বলেছি।

অনেকে মনে করেন, কমিক হচ্ছে কতকগুলি 'Gags'-এর সমষ্টি। এ ধরণের রসিকতায়, যা কতকগুলো হৈ-হুল্লোড় আর ফুর্তি-ফার্তিতে ভর্তি, মানুষ হাসলেও তাকে প্রকৃত সমঝদারের হাসি বলে কেউ মেনে নেয় না। প্রকৃত হাস্যরস হলো, আমি যা পরে অনুভব করেছি, শারীরিক বৈচিত্র। পোষাক বা আচরণের বিকৃতি ঘটিয়ে হাসানো নয়। এগুলি হাসির বহিরংগ রূপ, প্রকৃত হাস্যরস রয়েছে মানুষের গভীর সত্তায় অন্তর্নিহিত। হাস্যরসকে আমি মানব-মনের স্বতঃস্ফূর্ত অভিভাবকরূপেই দেখতে শিখেছি। জীবনের নিষ্ঠুরতা মানুষকে যখন প্রায় উন্মাদের পর্যায়ে এনে ফেলে তখন প্রকৃত হাস্যরসই মানুষকে বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। দুর্ভাগ্যের মধ্যেও সুখ আছে, ট্র্যাজেডীর মধ্যেও আনন্দ রয়েছে। দুঃখকে গভীর ভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, জীবন কৌতুক ছাড়া আর কিছু নয়। দুঃখ কারো একার নয় সমগ্র মানুষেরই। এই দিক থেকে ভাবলে পার্থিব সম্পদ, কর্তৃত্ব, অহংকার, আভিজাত্য প্রভৃতি সব কিছুই তার জৌলুস হারিয়ে ফেলবে। আমি হাস্যরসকে তাই দেখিয়েছি মানুষের দুঃখের সাথী হিসাবে। আরও দেখিয়েছি যে, হাস্যরস হচ্ছে নিরীহ রসিকতা যা মানুষকে বুঝিয়ে দেয় তার আদর্শ কত বড় অথচ সাফল্য কত কম। আমার হাস্যরসের মধ্যে দেখিয়েছি যে, সে জীবনকে বিদ্রূপ করবে অথচ জ্বালা দেবে না, জীবনে হুল ফোটাবে না।

আমার দার্শনিক গাম্ভীর্য দেখে হয়তো অনেকেই মনে আঘাত পাচ্ছেন। কিন্তু হাস্যরসিকরাও তো কবি ও দার্শনিকের মত সৌন্দর্যের পূজারী। তাঁরাও তো নিজস্ব দৃষ্টিভংগীর সাহায্যে জীবনকে রূপ দেন, কিন্তু একথা যদি কারো মনে হয় যে আমার এই দর্শন আর আমার ছবির মধ্যে বহু পার্থক্য (যেমন পার্থক্য সত্য ও সৌন্দর্যের সংগে আমার ঢিলেঢালা পাজামার) তাহলে আমি তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই মানুষের আদর্শ ও সাফল্যের পার্থক্যের মধ্যে যে হাস্যরসের আবহাওয়া রয়েছে আমি তারই মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে ফেলেছি।

অনুবাদক—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়।

আশা

সঙ্গীতসমৃদ্ধ আশা তার সুপুষ্ট সুরের অঞ্জলি নিয়েই দেখা দিয়েছে রসগ্রাহী দর্শকসাধারণের সামনে। সঙ্গীতেই এই ছবির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য, গল্প ও পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সঙ্গীতের সাহায্যেই। হরিদাস ভট্টাচার্য পরিচালিত আশা শুধু সঙ্গীতের জলসাই সৃষ্টি করেনি, সেই সঙ্গে প্রচারও করেছে কতকগুলি মহত্তম আদর্শ, যা জীবনের দুর্গম পথের সুবাঞ্ছিত পাথেয়ও। সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি—বিধি মিলাইবে পুরস্কার। কথাটি প্রকট হয়ে উঠেছে অরূপের লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত জীবনযাত্রার ভিতর দিয়েই, প্রতিভা কখনই চাপা থাকে না, একদিন না একদিন সে তার যোগ্য স্বীকৃতি পাবেই—বাস্তবিক রত্নেশ্বরের কাছে সম্মেলনে অরূপের স্বীকৃতিই এ কথা প্রমাণ করে, নয়েনের পরিণতি দেখেই মনে হয়—অন্যায় শত জয়লাভ করলেও একদিন তার মুখোস খসে পড়বেই।

বইটির নাম আশা স্বধর্মানুরূপ হলেও সুস্পষ্ট ও জোরালো নয়। প্রশান্ত বাবু বিশেষ করে প্রভাত-রায়েন অধ্যায়টি রূপ পেয়েছে তার অনবদ্য সংলাপের কল্যাণে। আশার সংলাপ রচনা করেছেন সাহিত্যিক সজনীকান্ত দাস। অভিনন্দন জানাই জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষকে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনার জন্যে। তবলা-তরঙ্গ এর দৃশ্যটি সত্যিই উপভোগ্য। এই উপলক্ষে পর্দার বুকে দেখা গেল বাঙলার দু'জন স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী জ্ঞানপ্রকাশকে ও শ্রীশিশিরশোভন ভট্টাচার্যকে। অভিনয়াংশে পুলকিত করেছেন কানন দেবী, ধরতে গেলে বছরে মাত্র একবার দেখা যায় কানন দেবীকে। কিন্তু সেই একটি অভিনয়েই কানন দেবী প্রমাণ করেন যে বাঙলার অভিনেত্রী-কাননের তিনিও অন্যতমা কানন-লক্ষ্মী। জহর গাঙ্গুলী, কমল মিত্রও যথেষ্ট জোরালো অভিনয়ই করেছেন। শিশির বটব্যাল, পুর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্ত্তী, আশু বসু, ডাঃ হরেন, পদ্মা দেবী, তৃপ্তি মিত্র, সুমন ভট্টাচার্য, গঙ্গাপদ, পঞ্চানন, বেচু, শৈলেন, ননী, খগেন ও অন্যান্যেরা ভালই। নায়ক আশীষকুমার "আশা"য় পুর্ব্বাপেক্ষা উন্নত অভিনয়ই করেছেন দেখা গেল, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনায় ভরা। নায়িকার ভূমিকায় অনেক দিন বাদে দেখা দিলেন ডি-জি-নন্দিনী মণিকা গাঙ্গুলী (অবশ্য শ্যামলীতেও তাঁকে দেখা গেছে)। প্রশান্তকুমারের এবার থেকে এই জাতীয় চরিত্রে অভিনয় করাই উচিত। কারণ দেখা গেল এই জাতীয় চরিত্রেই তাঁর দক্ষতা সমাদর লাভ করবে। আশা সব দিক দিয়ে এক সার্থক চিত্র।

ত্রিযামা

খ্যাতনামা সাহিত্যিক সুবোধ ঘোষ সাহিত্য-জগতে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, এ বিষয়ে আশা করি সকলেই নিঃসন্দেহ। তাঁরই বহুখ্যাত ত্রিযামা ছবি হয়ে দেখা দিয়েছে অগ্রদূত-গোষ্ঠীর পরিচালনায়। যতটা আশা নিয়ে দর্শক ত্রিযামা দেখতে যাবেন ততটা আশাহত হয়েই তাকে ফিরে আসতে হবে প্রেক্ষাগৃহ থেকে। চিত্রনাট্য রচনায় অন্যান্যের সঙ্গে সুবোধ বাবুও যুক্ত কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিনি ব্যর্থ। দেখা গেল, কুশলের পিঠে পড়ল লাঠি কিন্তু সে মাথায় বাঁধছে জলপটি, চিত্রনাট্যে খুব চমৎকার ভাবে সাজানো হয়েছিল বিজয় বাবুর মৃত্যু দৃশ্যটি ·কিন্তু তেমনই দৃশ্যটিকে ঐখানেই মেরে ফেলা হয়েছে, কুশলকে দিয়ে ঐ রকম করে বড়-বড় করে বকিয়ে। ওখানে কুশলের স্তব্ধতা আনলে ঐ দৃশ্যই হয়ে যেত অন্য ধরণের। Good Luck Club বলে যে ক্লাবটির কার্যাবলী দেখানো হয়েছে তাতে সেই জাতীয় ক্লাবের ও রকম রাস্তার ধারে কার্যালয় অসম্ভব, সে জাতীয় ক্লাব হবে সরু গলির মধ্যে ভয়ঙ্কর জায়গায়। প্রায়ই পর্দায় মাইকের ছায়া দেখা যাচ্ছিল, তা ছাড়া শান্তিদি কে? এর আবির্ভাব একেবারে গাছ থেকে পড়া নয় কি? হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়, কোথা থেকেই বা আসে, কোথায়ই বা যায়?

দেবী রায় যে আসলে জোচ্চোর বদমাস, তার আসল পরিচয় সম্বন্ধে সুবোধ বাবুর মূল গ্রন্থে যে রকম বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে ছবিতে কি তাই হয়েছে? তার সম্বন্ধে একটু অন্ধকার কি রয়ে গেল না ছবিতে? অভিনয়াংশে অপূর্ব কৃতিত্ব দেখিয়েছেন নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও গৌর শী, (খোসামুদে কেরাণীর ভূমিকাভিনেতা) এঁরা সকলকে অতিক্রম করে গেছেন। ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী

কমল মিত্র, জীবেন বসু, মিহির ভট্টাচার্য, হরিধন মুখোপাধ্যায় চন্দ্রশেখর দে, সুভেন মুখোপাধ্যায় (পুস্তিকাতে তাঁর নাম দেবার বোধ হয় প্রয়োজনই বোধ করেন নি কেউ), চন্দ্রা দেবী, ছায়া দেবী, শোভা সেন, কেতকী দত্ত প্রভৃতি স্ব-স্ব চরিত্রে নিজেদের দক্ষতা প্রকাশ করতে সক্ষমই হয়েছেন। মনোরম অভিনয়ে দর্শকমন ভরিয়ে তুলেছেন পরিপূর্ণভাবে শক্তিময়ী নায়িকা সুচিত্রা সেন, তাঁর প্রোজ্জ্বল অভিনয়ে ছবির অনেক দোষই ঢেকে যায়। সুচিত্রা সেন, তাঁর অভিনয়ে জীবন্ত স্বরূপার সৃষ্টি করেছেন। নায়ক উত্তমকুমার সু-অভিনেতা। ছবির সূচনাতেই (টাইটেল) শোনা যাবে ওস্তাদ আলী আকবর খাঁর স্বরোদ। সাধক পিতার শিল্পী পুত্র নতুন করে আবার প্রমাণ করলেন যে সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ভারতের দান অনন্যসাধারণ।

শ্যামলী

বোবা মেয়ে শ্যামলী। কালাও। তার জীবনের কোনগুলোকে কেন্দ্র করেই স্বর্গীয়া নিরুপমা দেবী রচনা করেছিলেন শ্যামলী? আজ দক্ষ আলোকচিত্রী পরিচালক অজয় করের পরিচালনায় ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়েছে শ্যামলী। বহুদিন বাদে একটি স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল ছবিটি সমাপ্ত হতে, 'বেশ ছবি' এ শব্দ আমরা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলুম, নাটকীয় রসের সঞ্চার করতে অজয় বাবু সক্ষম হয়েছেন এই ছবিতে। দৃশ্য-সংস্থাপনেও দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনয়াংশে কাবেরী বসু (বর্তমানে চট্টোপাধ্যায়) মনে ছাপ এঁকে গেলেন, বোবা ও কালা মানেই যে বদ্ধ উন্মাদ নয় (যা আমরা মঞ্চে দেখেছিলুম) এই কথাটিই কাবেরী প্রমাণ করে গেলেন, তাঁর অভিনয়ে বোবা ও কালার জীবনের অসহায়তার একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কাবেরীর পরেই উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের নাম। অন্যান্য যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের মধ্যে অহীন্দ্র চৌধুরী, সন্তোষ সিংহ, তুলসী চক্র, হরিধন মুখো, অমর বিশ্বাস, অনুপকুমার, মলিনা দেবী, রাণীবালা দেবী, অপর্ণা দেবী, অনুভা গুপ্তা, বেলারাণী দেবী প্রভৃতি ভালই করেছেন। সঙ্গীতাংশ খারাপ না হলেও কৃতিত্বের চিহ্ন বহন করে না। অনিলের বিয়ের দিন তার শ্বশুরবাড়ীতে গান গাওয়ার দৃশ্যে গায়কের ভূমিকায় স্বয়ং সঙ্গীত পরিচালক কালীপদ সেনকেই দেখা গেল। গেয়েছেনও তিনি নিজেই। আলোকচিত্র গ্রহণ এক কথায় বলছি—অপূর্ব! বাঙলা চিত্রজগৎ অজয় করের কাছে ক্যামেরার কাজে এখনও আরো অনেক কিছু আশা করে।

সাময়িক প্রসঙ্গ

ছাত্রভর্তি সমস্যা

"কলেজগুলিতে স্থানাভাবের জন্য বহু ছাত্রই ভর্তি হইতে পারিতেছে না। এ ব্যাপারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মনোভাব দেখিয়া আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সহিত দুঃখিত না হইয়া পারিলাম না। গত শনিবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট-সভায় এই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, নূতন করিয়া কোন কলেজে আর কোন সিফট খুলিতে দেওয়া হইবে না। তাঁহারা যে দয়া করিয়া বর্তমানে যে সকল কলেজে সিফট আছে, সেইগুলি বাতিল করিবার ব্যবস্থা করেন নাই, ইহাই পরম সৌভাগ্যের বিষয়! এবার স্কুল ফাইন্যাল ও ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় যে সকল ছাত্র-ছাত্রী পাশ করিয়াছে, আরও অতিরিক্ত সিফটের ব্যবস্থা না করিলে তাহাদের সকলের স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভব নয়। এই সকল ছাত্র-ছাত্রী অধিকাংশই যদি ভর্তি হইতে না পারে, তাহা হইলে তাহারা কি করিবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট-সভা তাহা ভাবিয়া দেখা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়াছেন। আমরা জানিতে পারিলাম, পশ্চিমবঙ্গ গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন কলেজে অতিরিক্ত সিফট চালাইবার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন। আরও অতিরিক্ত সিফটের ব্যবস্থা করা যে ভর্তি-সমস্যার সমাধান করিবার উপায়, আশা করি শাসকবর্গ তাহা বিবেচনা করিয়া বিভিন্ন কলেজে অতিরিক্ত সিফট চালাইবার অনুমতি প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অবিলম্বেই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া প্রয়োজন।"

—দৈনিক বসুমতী।

বিদ্রোহী নাগা

"বিদ্রোহী নাগাদের উপদ্রব দমনে ভারত সরকারের চেষ্টা কি ব্যর্থ হইতে চলিল? এই প্রশ্ন আজ অপরিহার্য হইয়াই উঠিয়াছে। সংবাদ আসিয়াছে যে, কোহিমা এলাকায় নাগা বিদ্রোহীরা দোভাষীদিগকে ভীতিগ্রস্ত করিতেছে। জুলাই মাসের প্রথম হইতে এ পর্যন্ত একজন দোভাষী নিহত এবং তিন জন অপহৃত হইয়াছেন। তাহার প্রতিকারকল্পে কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার কোন সংবাদ নাই। কিন্তু কোহিমায় আগত ২০০ জন নাগা স্ত্রীলোক, শিশু ও বৃদ্ধের সংবাদ আছে। এই সকল লোকই বিদ্রোহী নাগাদের দ্বারা উৎপীড়িত ও বিতাড়িত হইয়া আশ্রয়লাভের আশায় সরকারী আশ্রয়ে আসিয়াছে। সরকার পক্ষ তাহাদিগকে আশ্রয় দিয়াছেন, রুগ্ন ব্যক্তিগণের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ভালই করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু নাগা বিদ্রোহিগণের উপদ্রব যে ভাবে চলিতেছে, তাহাতে মনে হয় না যে, তাহারা আদৌ ভীতিগ্রস্ত হইয়াছে এবং ভারত রাষ্ট্রের প্রতি যথোচিত ব্যবহারে আদৌ অনুপ্রাণিত হইয়াছে। বরং প্রতিদিনের সংবাদ নিঃসন্দেহে জানাইয়া দেয় যে, নাগা বিদ্রোহিগণের দুরন্তপণা আরো বৃদ্ধি পাইতেছে।"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সমস্যা

"বিহার-পশ্চিমবঙ্গ সীমানা নির্ধারণ সম্পর্কে উভয় রাজ্যের আলোচনা বিবরণী পুস্তকাকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত হইয়াছে। উভয় রাজ্যের সিদ্ধান্ত পরস্পর-বিরোধী হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তটিই মুখ্য বিষয় এবং উহা কার্যে পরিণত করার প্রয়োজনও অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু এই ব্যাপারে বিহার বিধানমণ্ডলীর সদস্যগণ যে মনোভাব অবলম্বন করিয়া আছেন তাহা রহস্যজনক! তাঁহাদের আচরণে এইরূপ মনে হওয়াই স্বাভাবিক যে, দেশের স্বার্থ অপেক্ষা তাঁহাদের নিকট তাঁহাদের আগামী নির্বাচনের লক্ষ্যটিই প্রধান হইয়া আছে। বিহারের ইনফরমেশন মন্ত্রী শ্রীযুক্ত মহেশপ্রসাদ সিংহ বলিয়াছেন যে, বিহারে বিরোধী দলের ৮৭ জন সদস্যের মধ্যে ৮৩ জনই পদত্যাগপত্র হাতে করিয়া প্রস্তুত রহিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত লোকসভায় গৃহীত হইলে অর্থাৎ বিহারের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইলেই তাঁহারা পদত্যাগ করিবেন। ইহাও যে আগামী নির্বাচনে পুনঃনির্বাচিত হইবার একটা কৌশল মাত্র, তাহা সকলেই বুঝিতে পারে। সাধারণ নির্বাচনের চার পাঁচ মাস পূর্বে পদত্যাগপত্র দাখিল করা নিঃসন্দেহে অর্থহীন। তথাপি সদস্যদের হয়তো ধারণা যে, সেই সার্টিফিকেটের বলেই তাঁহাদের আগামী নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভের পথ সহজ হইবে। রাজনীতির এই মঞ্চাভিনয় স্বার্থ সন্ধানের সুযোগ মাত্র। ইহার দ্বারা দেশপ্রীতি কিংবা রাজ্যপ্রেম কোনটিরই আন্তরিকতা সূচিত হয় না। অতএব এই সহজিয়া কৌশলে কোন প্রকারের গুরুত্ব আরোপও অনাবশ্যক।"

—যুগান্তর।

নীতিহীন রাজ্যপুনর্গঠন নীতি

"কমিউনিষ্ট নেতা এ, কে, গোপালন গত ১০ই জুলাই অমৃতসরের এক জনসভায় হিন্দু ও শিখদের নিকট সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার যে আবেদন জানাইয়াছেন এবং সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার যে আশু আবশ্যকতার কথা বিবৃত করিয়াছেন, তাহাকে পাঞ্জাবের অধিবাসিগণ নিশ্চয়ই যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়া বিবেচনা করিবেন। পাঞ্জাবের এই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে শ্রীনেহরুও মাঝে মাঝে ক্ষোভ ও ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকেন। জানি ইহার মূল্য কম নহে। তথাপি, শ্রীনেহরুকে প্রশ্ন করি,

পাঞ্জাবের এই সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির জন্য সর্ব্বোচ্চ কংগ্রেস নেতৃত্বের কি কোন অবদান নাই? এই প্রশ্ন শ্রীগোপালনও তুলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, গত ২৫ বছর যাবৎ ভাষাভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের নীতি ঘোষণা করিতে করিতে হঠাৎ একদিন লোকসভায় শ্রীনেহরু এই নীতিকে উড়াইয়া দিলেন, ফলে যে চরম বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় তাহা নিঃসন্দেহে পাঞ্জাবের মানুষকে, এমন কি কংগ্রেসীদেরও বিহ্বল করিয়া ফেলিয়াছে এবং সাম্প্রদায়িকতার সুপ্ত শক্তিতে ইন্ধন যোগাইয়া জাগাইয়া তুলিয়াছে। সত্যই আজ একথা অস্বীকার করা যায় না যে, পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া সৃষ্টিতে কংগ্রেসের নীতিহীন রাজ্য-পুনর্গঠন নীতির অবদান কম নহে।"　　—স্বাধীনতা।



পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ শ্রীবিধানচন্দ্র রায় মহাশয়ের জন্ম-জয়ন্তী দিবসে, দৈনিক বসুমতীতে প্রকাশিত তাঁহার বিষয়ে লেখা ও ছবি দেখিতেছেন। পার্শ্বে বসুমতীর একজিকিউটর শ্রীভবতোষ ঘটক মহাশয়কে দেখা যাইতেছে।

মূল্যবৃদ্ধি

"মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে গবর্ণমেণ্ট যে মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা বজায় থাকিলে অরাজকতা আর কত দিন ঠেকাইয়া রাখা যাইবে বোঝা দুষ্কর। কেন্দ্রে কৃষ্ণমাচারী এবং প্রদেশে প্রফুল্ল সেন দুই জনে একই সুরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে, বর্ত্তমান মূল্যবৃদ্ধি এমন কিছু নয়। এবারকার মূল্যবৃদ্ধির একটি বিশেষত্ব এই যে, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের খুচরা দর ভয়ানক ভাবে বাড়িয়া যাইতেছে। প্রফুল্ল সেন বলিয়াছেন যে শুধু বাঙ্গলা দেশে নয়, বোম্বাই দিল্লী প্রভৃতি স্থানেও দাম বাড়িতেছে। ইহা কেহ অস্বীকার করে নাই। এবারকার মূল্যবৃদ্ধির দুইটি কারণ—ইনফ্লেশন এবং চোরাকারবার। প্রথমটির জন্য মূল্যবৃদ্ধি দেশের সর্ব্বত্র হইতেছে এবং দ্বিতীয়টি সর্ব্বত্র সমান নয় বলিয়া যেখানে চোরাকারবার বেশী সেখানেই দাম বেশী বাড়িতেছে। পূর্ব্ববঙ্গে চোরাকারবারীদের সায়েস্তা রাখিবার জন্য বেত্রদণ্ডের অর্ডিনান্স হইয়াছে, অথচ এখানে ডাঃ রায়ের আট বছরের রাজত্বে একটা চোরাকারবার আইন পাশ করানো গেল না! ডাঃ প্রফুল্ল ঘোষ পাঁচ মাসের কার্য্যকালেই চোরাকারবার বন্ধের জন্য বিল পাশ করাইয়াছিলেন, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার একটি গলদ ধরিয়া উহা আইনে পরিণত হইতে দেরী করিয়া দেন। ডাঃ রায়ের আমলে উহা আনুষ্ঠানিক ভাবে তুলিয়া দেওয়া হয়! বিধান-সভায় মূল্যবৃদ্ধি বিতর্কে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনা জোরের সঙ্গে বিবৃত করেন এবং সরকার উহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। ডেপুটি কমিশনার সত্যেন মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এনফোর্সমেণ্ট পুলিশ চোরাকারবার এবং ভেজাল বন্ধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু উপযুক্ত আইনের অভাবে সফল হইতে পারিতেছেন না। বরং দেখা যাইতেছে, চোরাকারবারের জন্য ধৃত ব্যক্তিরা সমাজে প্রতিষ্ঠা পাইতেছে এবং বিধান পরিষদে আসন লাভ করিতেছে। চট্টোপাধ্যায় বিধানসভায় ইহাও বলিয়াছেন।'চোরাকারবার এবং ভেজাল বন্ধ হইতে সাত দিন লাগিবে যদি এই কয়টি কাজ করা হয়। যথা, (১) কঠোর চোরা-কারবার এবং ভেজাল নিয়ন্ত্রণ আইন পাশ, (২) এই দুই পাপ পুলিশ-গ্রাহ্য অপরাধরূপে পরিগণন, (৩) চোরাকারবারের অপরাধে যাহারা ধরা পড়িবে তাহাদিগকে সমস্ত জনপ্রতিষ্ঠান হইতে বিতাড়ন, (৪) আইনজীবী এবং চার্টার্ড একাউণ্টেণ্টরা চোরাকারবারীর অপরাধ নিজেরা বুঝিতে পারিলে আদালতে তাহাদের পক্ষসমর্থন অস্বীকৃতি, (৫) সংবাদপত্রে উহাদের নাম প্রকাশ, (৬) চোরাকারবারে এবং ভেজাল দানে কোন শ্রমিক যাহাতে সাহায্য না করে তার জন্য ট্রেড ইউনিয়নের সতর্কতা, (৭) চোরাকারবার এবং ভেজালের অপরাধে যাহারা ধরা পড়িবে তাহাদিগকে ডালহৌসি স্কোয়ারে দাঁড় করাইয়া বেত্রাঘাত।"　　—যুগবাণী (কলিকাতা)।

গ্রামাঞ্চলে দৃষ্টি দিন

"সরকার আমাদের জাতীয়। জনগণের জন্য সরকারের দরদ আছে। এ দরদ থাকা স্বাভাবিক। জনকল্যাণের জন্য ডি. ডি. টি. দেওয়া হয়। বর্ষার সময় মশা-মাছি-কীট-পতঙ্গের উপদ্রব বেশী

হওয়ায় রোগও প্রায়ই বৃদ্ধি পায়, এই সময় যদিও সরকার থেকে ডি, ডি, টি, দেওয়ার প্রচেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সেখানেও গলদ রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে গাছপালা বেশী। বন সংরক্ষণার জন্য জঙ্গলের বৃদ্ধি হয়েছে সাথে সাথে মশা-মাছির বংশ বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে গ্রামাঞ্চলে রোগ সংক্রমণের আশঙ্কা বেশী বলে মনে হয়। তাই সহরাঞ্চলে ডি, ডি, টি, ছড়িয়ে দেওয়ার সাথে গ্রামাঞ্চলেও যাতে ভালভাবে ছড়ানো হয়, সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর লক্ষ্য দিলে গ্রামবাসীরা মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা পায়।" —বীরভূম বার্ত্তা।

সার চাই

"এবার বর্ষা কিছু আগেই আরম্ভ হওয়ায়, সর্ব্বত্র ধান চাষের কাজও আগাইয়া চলিয়াছে। এ সময় প্রভৃত সারের আবশ্যক। সরকার হইতে বিভিন্ন ডিলার মারফৎ সেই সার বিশেষ করিয়া ধানের মিশ্রসার যোগান দিবার কথা আছে। কৃষকগণ পাগলের মত তাহার সন্ধানে ফিরিতেছে। কিন্তু কোথাও সে মিশ্রসারের পাত্তা মিলিতেছে না! ইহার কারণ কি আমরা বুঝি না! সরকার কি এখনও সেই শীতে মশারি ও গ্রীষ্মে কম্বল সরবরাহের নীতি ভুলিতে পারেন নাই? যদি চাষের সময় লোক সার না পাইল তবে পরে যোগান দেওয়ার মূল্য কি? অতএব 'সরকারের সর্ব্বপ্রযত্নে অতি সত্বর সর্ব্বত্র উক্ত সার সরবরাহের ব্যবস্থা করা উচিত।"

—প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

আদিবাসিগণের জমি হস্তান্তরের অনুমতি প্রাপ্তির অসুবিধা

"আদিবাসীদের জমি বন্ধক এবং হস্তান্তরের জন্য অনুমতি লইতে হয়। এই অনুমতি দেন মেদিনীপুর জেলার স্পেশ্যাল অফিসার ফর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার্স মহাশয়। তাঁহার হেড কোয়ার্টার্স মেদিনীপুর সহরে, সপ্তাহে প্রতি বৃহস্পতিবার দিন তাঁহার ঝাড়গ্রামে আসিবার কথা। কিন্তু কোন কোন সপ্তাহে তিনি আসিতে পারেন না। ফলে আবশ্যকীয় অনুমতির জন্য আদিবাসীদের যথেষ্ট হয়রাণ পাইতে হইতেছে। ঝাড়গ্রামে একজন ট্রাইব্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার আছেন, তাঁহাকে যাহাতে আবশ্যকীয় অনুমতি দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহার জন্য আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহাকে এই ক্ষমতা দেওয়া হইলে মহকুমার আদিবাসীদের সুবিধা হইবে।" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

লাল ফিতার বন্ধন

"কুখ্যাত লাল ফিতার বন্ধন হেতু সদিচ্ছা-প্রণোদিত সরকারী সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থাও কি ভাবে ব্যাহত হইয়া থাকে, তাহা আমরা পদে পদেই লক্ষ্য করিতেছি। উদ্বাস্তুদের ঋণদান, উদ্বাস্তু ছাত্রদের সাহায্য মঞ্জুর, করিমগঞ্জ হাসপাতালে এক্স-রে প্ল্যান্টের জন্য স্বতন্ত্র গৃহ নির্ম্মাণ ইত্যাদি ব্যাপারে যে বিলম্ব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিশেষভাবে উদ্বাস্তু যক্ষ্মারোগীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানে এত অধিক বিলম্ব হয় যে, ততদিনে হয়তো সাহায্যের প্রয়োজনই শেষ হইয়া যায়। অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্মচারীর উদাসীনতা এবং লালফিতার বন্ধনই এই অস্বাভাবিক বিলম্বের হেতু। এই সব অবাঞ্ছনীয় ব্যাপারের প্রতি কর্ত্তৃপক্ষের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ আমরা আশু প্রতিবিধান দাবী করিতেছি।"

—যুগশক্তি (করিমগঞ্জ)

সংবাদপত্রের গ্লানি

"ভারতের সংবাদপত্র সমূহের মান কত অবনত হইয়াছে—তৎসম্পর্কে প্রবীণ জননায়ক চক্রবর্ত্তী শ্রীরাজাগোপাল আচরিয়া মহাশয় মাদ্রাজ হইতে সদ্য-প্রকাশিত একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকার জন্য লিখিত প্রবন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা ভারতের সংবাদপত্রসেবী ও সংবাদপত্র পাঠকের বিশেষ বিবেচনার বিষয়। ভারতের সংবাদপত্র সমূহের আদর্শচ্যুতি ও গ্লানি সম্পর্কে রাজাজী যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা নিছক সত্য। আমরা নিম্নে রাজাজীর সমালোচনার অংশ উদ্ধৃত করিলাম। সাংবাদিকগোষ্ঠী জোট পাকাইলে অঘটন ঘটাইতে পারে। সাদাকে কালো, কালোকে সাদা, খাঁটীকে মেকী মেকীকে খাঁটী বানাইতে সংবাদপত্রের খুব বেশী সময় লাগে না। এরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের বিরাগ ভাজন হইবার দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া রাষ্ট্র ও জাতির কল্যাণের জন্য রাজাজী যে রূঢ় সত্য অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য দেশবাসীর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা প্রসূত চারিত্রিক গ্লানি ও গোলামী মনোবৃত্তি যে জাতির অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য যে রক্তদান প্রয়োজন, তাহা না দিয়াই যে দেশ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সে দেশে স্বাধীন জনমত গড়িয়া তুলিবার গুরুদায়িত্বের অনেকখানি নির্ভর করে সংবাদপত্রের উপর।" —বীরভূম বাণী

ভাঙন!

সম্প্রতি স্থানীয় ফৌজদারী কোর্টের সম্মুখে ভাগীরথীর গর্ভে একটি চর উদ্ভূত হইয়াছে। চরটির দৈর্ঘ্য প্রায় এক মাইল। এইরূপ একটি অতিকায় চর উদ্ভূত হওয়ার ফলে নদীটি এই স্থলে প্রায় দ্বিখণ্ডিত হইয়াছে এবং ইহার প্রধান জলধারাটি জঙ্গীপুর সহর ঘেঁসিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এজন্য জলের চাপ ঐদিকে পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। গত দু'তিন বৎসর হইতে আমরা লক্ষ্য করিতেছি, বর্ষাকালে ভাগীরথী স্ফীতিলাভ করায় মিউনিসিপ্যাল এলাকার কিয়দংশ প্রতিবারই নদীগর্ভে বিলীন হইতেছে। ভাঙন এই ভাবে চলিতে থাকিলে আমাদের আশঙ্কা হয়, জঙ্গীপুর সহরের বসতি অঞ্চলও ভবিষ্যতে কাটিয়া যাইতে পারে। আরও উদ্বেগের বিষয়, এই যে জঙ্গীপুর কলেজের নবনির্ম্মিত ভবনটি একেবারেই নদীর তীরবর্ত্তী। কাজেই ভাঙন একটু তীব্রতর হইলেই এই মূল্যবান অট্টালিকাটিও আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা আছে। এ অবস্থায় আমাদের মনে হয়, এখন হইতে যদি ভাঙন প্রতিরোধ করিবার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে সহরটিকে রক্ষা করা দুরূহ হইতে পারে। আমাদের মনে হয়, নবোদ্ভূত চরটিকে যদি ড্রেজার দ্বারা সরকারী ব্যয়ে এখনই কাটিয়া ফেলা হয় তবে অতি সহজেই জঙ্গীপুরের পারে জলের চাপ রোধ করা যাইতে পারে ও সহরটিও রক্ষা পায়। আমরা এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি ও ইহার প্রতিকার প্রার্থনা করিতেছি।" —ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)

মধ্যবিত্তের বিপদ

"মধ্যবিত্তের সমস্যা আজ সমাজে বিশেষ ভাবে দেখা দিয়াছে এবং মধ্যবিত্তের অভাব-অভিযোগ ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির মূল্য বৃদ্ধি ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার জটিলতায় এই সমস্যা আরও ঘনাইয়া উঠিতেছে। ইহার সমাধান না হইলে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যে বিলুপ্তি ঘটিবে, এ বিষয়ে চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অভিমত পোষণ করেন। সমাজের ধারক ও বাহক হিসাবে এই সম্প্রদায় প্রধান অগ্রণী এবং শিক্ষা দীক্ষা ও রাজনীতি-ক্ষেত্রে মধ্যবিত্তের অবদানের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষিত গুণী, জ্ঞানী, ডাক্তার, চাকুরীজীবী, কেরাণী প্রভৃতি বিশেষ ভাবে এই শ্রেণীর মধ্য হইতেই আসিয়া থাকে। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সমতা রাখিতে গিয়া এই শ্রেণীকে বিপর্য্যস্ত হইতে হইতেছে। এই কারণে অনেক মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্তে পরিণত হইতেছে এবং এক দুঃসহ অবস্থায় উপনীত হইতেছে। সমাজের মেরুদণ্ডস্বরূপ এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়কে রক্ষা করা সর্ব্বাগ্রেই উচিত। এতদঞ্চলের সাম্প্রতিক দুর্বিপাকে যে ক্ষয়-ক্ষতি ঘটিয়াছে তাহাতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকে দারুণ বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হইয়াছে। ব্যবসা বাণিজ্য, চাকুরী সমস্ত ক্ষেত্রেই মন্দাবস্থার জন্য হতাশা ভাব দেখা দিয়াছে। সরকার দেশের এই দুর্গতি নিবারণের জন্য অবশ্য মধ্যবিত্ত লোনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা যথেষ্ট নহে। মধ্যবিত্তের লোনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। এই সঙ্গে ব্যক্তিগত লোনে (Special) লোকে উপযুক্ত সম্পত্তি বাঁধা দিয়া যাহাতে তুল্য পরিমাণ অর্থ লাভ করিতে পারে তাহারও বিহিত ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন"।

—নীহার (কাঁথি)।

শহরের বিদ্যায়তন

"পরীক্ষার উত্তর যাহা ছাত্রেরা খাতায় লিখিয়া দেয়, তাহা অতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। অধিকাংশ ছাত্রেরা উত্তর অতি নিম্নস্তরের এবং একাধিক ছাত্র নাকি সমস্ত প্রশ্নের প্রায় সঠিক উত্তর লিখিয়াও উচ্চ নম্বর পাইতে পারে নাই। আবার একাধিক ছাত্র নাকি সমস্ত প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া কোন নম্বরই পায় নাই। এরূপ কথায় সহজে আস্থা স্থাপন করা সম্ভব না হইলেও ইহা মধ্যশিক্ষা পর্ষদেরই কথা। ইহার পর আছে পাঠ্যপুস্তকের ব্যবসায়িক দিক,স্বার্থ বুদ্ধির বশে জাতির ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যাভ্যাসে বিমুখ করিয়া পরোক্ষে শিক্ষা বিষয়ে নিরুৎসাহ করিয়া তুলিতেছে, তাহা কি কাহারো চিন্তায় আসিতেছে না? মনে হয় মুষ্টিমেয় স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী কতকগুলি লোকের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া শিক্ষাপর্ষদও যেন ইহার যথাযথ প্রতিকার করিতে পারিতেছেন না। রবিবার, গরমের ও পূজার বন্ধ ও অন্যান্য স্কুলবন্ধের দিন সমস্ত বাদ দিলে বৎসরের মধ্যে নিয়মিত পঠন-পাঠন হয় বোধ হয় মাস চার হইতে বেশী হইবে না। এ অবস্থারও প্রতিকার বাঞ্ছনীয়। এখন অভিভাবকদের চিন্তা করিয়া দেখা প্রয়োজন যে—বর্ত্তমান দুর্দিনে অনর্থক অর্থ নষ্ট করিয়া মনস্তাপ ভোগ করার পূর্ব্বে সহরের মায়া কাটাইয়া মফঃস্বলের বা যে স্কুলের পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক মনে হইবে সেই সব স্থানে পুত্র,-কন্যার পাঠের ব্যবস্থা করা সম্ভব কি না। যে সব বিদ্যালয়ে পরীক্ষার ফল সন্তোষজনক নয় সে সব বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ও মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ও উপযুক্ত প্রতিকারোপায় নির্দ্ধারণে তৎপর হওয়া প্রয়োজন অতি সত্বর। মফঃস্বল স্কুলে যাহা হইবে সহরে কেন তাহা হইবে না? পরিশেষে শিক্ষকগণ সমীপে নিবেদন, তাঁহারা একটু সহৃদয়তায় দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হইয়া সত্য সত্যই কর্তব্যপালনে তৎপর হইলে ভবিষ্যৎ নিশ্চয়ই পুনঃ আশাপ্রদ না হইয়া পারে না"।

—নারায়ণ (কাঁথি)।

শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

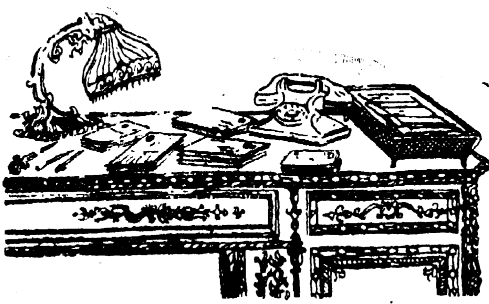
কলিকাতাস্থ 'মেসার্স জে টমাস এণ্ড কোং' প্রাইভেট লিমিটেডের টি (Tea) ডিপার্টমেণ্টের ম্যানেজার শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধিকতর ও উন্নততর জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্য গত ১২ই জুলাই বি ও, এ সি, বিমানযোগে লণ্ডন যাত্রা করিয়াছেন। বিদেশে অবস্থান কালে ইনি লণ্ডনের বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী টমাস, কম্বার্লেজ ইন্‌শকিপের অফিসে যোগদান করিবেন এবং ফ্রান্স, জার্মাণী ও আরও কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করিবেন বলিয়া আশা করা যায়। ১৯২৯ সালে শ্রী চট্টোপাধ্যায় অতি সাধারণ কেরাণীরূপে জে, টমাসে যোগদান করেন। কালক্রমে স্বীয় কর্মদক্ষতা, সততা ও নৈপুণ্যের গুণে টি



ডিপার্টমেণ্টের দায়িত্বশীল ম্যানেজারের পদে উন্নীত হন। অতি সাধারণ অবস্থা হইতে এইরূপ উন্নতি লাভ করা অত্যন্ত বিরল। বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে তাঁহাকে কয়েকটি সভায় সম্বর্দ্ধিত করা হয় এবং বিমানঘাঁটিতে বহু বিশিষ্ট নরনারী শুভ কামনা জানাইতে আসেন। শ্রী চট্টোপাধ্যায় হালিশহর পণ্ডিতবাটীর বিখ্যাত চিকিৎসক স্বর্গীয় বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র। ভারতবর্ষের চা ব্যবসায়ে সর্বপ্রথম ভারতীয় দালাল অফিসের মালিক শ্রীসুধীরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। আমরা শ্রী চট্টোপাধ্যায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ও সাফল্য কামনা করি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পাঠক পাঠিকার চিঠি

সাঁই পদবী কি ?

মাসিক বসুমতী সম্পাদক মহাশয়, গত ফাল্গুনের মাসিক বসুমতীর 'গ' পৃষ্ঠায় লেখা হইয়াছে, 'সাঁই পদবীটি নবাবী খেতাব। শাহ— শাহী। সাহী— সাঁই।' আমার যতদূর জানা 'সাঁই' কথাটা নবাবী খেতাব নহে। কথাটা 'স্বামী' (গুরু, দরবেশ অর্থে) থেকে এসেছে। যে রকম গোস্বামী থেকে গোঁসাই।—সৈয়দ মুজতবা আলী।

চণ্ডীদাসের একটি পদ

আপনার কথামত চণ্ডীদাসের পদটি পাঠাইলাম। পদটি 'সংগীত-সারসংগ্রহ' নামক একখানি সংকলনে পাইয়াছি। বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে প্রকাশিত মহাজন পদাবলীতে পদটি দেখিতে পাই নাই। আপনি আর একবার মিলাইয়া দেখিয়া লইবেন। 'সংগীতসার-সংগ্রহে' একটি 'রাগাত্মিক পদ' এর অন্তর্গত। আর একটি কথা, শুধু পাঠক-পাঠিকার চিঠিতেই নয় ইতিপূর্বে আর একখানি চিঠিতেও আপনি আমাকে 'আপনি' সম্বোধন করিয়াছিলেন। ইহাতে বড় লজ্জা পাই। আমি একজন সামান্য ছাত্র, ঐরূপ সম্বোধনে কেমন যেন লাগে। সুতরাং এইবার হইতে 'তুই' কিংবা 'তুমি' ('তুই'ই ভালো) সম্বোধনে উত্তর দিবেন। বিনীত—শ্রীকালীপদ সিংহ। গোয়ালা, মল্লারপুর, বীরভূম।

সুজনের সনে আনের পিরীতি
কহিতে পরাণ ফাটে।
জিহ্বার সহিত দন্তের পিরীতি
সময় পাইলে কাটে।
সখী হে কেমন পিরীতি লেহা।
আনের সহিত করিয়া পিরীতি
গরলে ভরিল দেহা।
বিষম চাতুরী বিষের গাগরী
সদাই পরাধীন।
আত্মসমর্পণ জীবন-যৌবন
তথাচ ভাবয়ে ভিন।
সকাম লাগিয়া ফেরয়ে ঘুরিয়া
পর তত্ত্বে নাহি চায়।
করিয়া চাতুরী মধুপান করি
শেষে উড়িয়া পালায়।
সখী না কর পিরীতি আশ।
ঝাটিয়া পিরীতি কেবল কুরীতি
কহে দ্বিজ চণ্ডীদাস।

পত্রিকা সমালোচনা

'চিত্রলেখা' উপন্যাসটি বেশ লাগছে। তবে লেখকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া উচিত ছিল। বিদেশী লেখকের লেখা পড়ার আগে তাঁর পরিচয়টা জানতে ইচ্ছে করে। 'রাজায়-রাজায়' উপন্যাসটি আমার বেশ লাগছে। ওর প্রথম দু-চার সংখ্যা আমার পড়া হয়নি। 'মাসিক বসুমতী'তে ঐ উপন্যাস কোন বছরে কোন মাস থেকে প্রথম প্রকাশিত হয়, জানালে বাধিত হব।—মৃণাল সেন। হাওড়া, রামকৃষ্ণপুর।

[গত ১৩৬১র চৈত্র সংখ্যা থেকে রাজায় রাজায় প্রথম প্রকাশ হয়। —স]

যৌনতত্ত্ব সম্পর্কে লেখা চাই

কিছু কাল ধরিয়া "মাসিক বসুমতী"র পাঠক-পাঠিকারা বর্ত্তমান সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও বহুল-প্রচারিত মাসিকে যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনার বিভাগ খোলা—না-খোলার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক মতামত জ্ঞাপন করিয়াছেন। বিষয়টি বড়ই বিতর্কমূলক এবং যেহেতু মাসিক বসুমতীর সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক-পাঠিকা আছে, সেই হেতু খুবই সতর্ক ভাবে এই বিষয়ে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। ১৯৪০-৪২ সালে যখন নৈনী সেণ্ট্রাল জেলে রাজ-বন্দীরূপে আটক ছিলাম, তখন যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে গভীর ভাবে পড়াশুনা করিয়াছিলাম। ভারতের বর্ত্তমান শিক্ষা-মন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেবও তখন নৈনী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সাথে আমরা অনেকেই (তাঁহাদের মধ্যে বেতার ও তথ্য-মন্ত্রী ডাঃ বি-ভি-কেশকারও ছিলেন) একমত হই যে, বিদ্যালয়ের নবম-দশম শ্রেণীর ছাত্রদের হইতে সুরু করিয়া কলেজের প্রথম-দ্বিতীয় বার্ষিক ছাত্র-ছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক প্রথায় ধাপে ধাপে যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। আজাদ সাহেব শিক্ষা-মন্ত্রী হইবার পরও এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা হইয়াছে। উনি এখনও এই মত পোষণ করেন। আপনাদের "রঙ্গপট" বিভাগ অপেক্ষা যৌন-বিজ্ঞান বিভাগের প্রয়োজনীয়তা যে অনেক বেশী, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইউরোপে ছাত্র-ছাত্রীদের সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক ধারাতে যৌন-বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ভার লন বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এবং পিতা-মাতারা। কিশোর-কিশোরীদের যৌন-বিজ্ঞান সরল-সুন্দর ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনেক মার্জ্জিত-রুচির পুস্তকও ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাতে আছে। আমাদের দেশে ইহার কোনটাই নাই। শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ কিংবা পিতা-মাতা এই বিষয়ে ভার লন না এবং বাজারের তথাকথিত যৌন-বিজ্ঞানের পুস্তকগুলির অধিকাংশই কুরুচিপূর্ণ ও উত্তেজনামূলক।

ঐ সব পুস্তক পাঠে কিশোর-কিশোরীরা শুধু যে উত্তেজিত হয় তাহাই নহে, ভুল-তথ্য পাঠে যৌন-বিজ্ঞান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভুল "জ্ঞান" লাভ করে। জীব-জগতের বিবর্ত্তনবাদে যৌন-বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা মূর্খতার পরিচয়। সহজ সরল ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া যদি আপনারা যৌন-বিজ্ঞান মাসিক বসুমতীর দ্বারা পরিবেশিত করেন, তবে সমাজের মহা উপকার করিবেন। মাসিক বসুমতীর হিতাকাঙ্ক্ষী ও ১৯ বৎসরের নিয়মিত ক্রেতা-পাঠক হিসাবে ইহাই আমার অভিমত। —অধীররঞ্জন দে। ৩।২এ, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯।

বাঁশবাড়িয়ার শ্রীযুত শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমি একমত। উপরন্তু আমার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আরও বলতে চাই যে, শৈশব হতেই বালক-বালিকার মধ্যে এবিষয় অন্ততঃ কিছু জ্ঞান সঞ্চয় হওয়া একান্ত আবশ্যক। শৈশবের শিক্ষা হতেই যৌবনের গুরুদায়িত্বের পিছল হতে মানব আত্মরক্ষা করে থাকে, যৌনতত্ত্বের সমুদয় খুঁটিনাটি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে অনেক বালক-বালিকা এর সুফল বা কুফল এর উপকারিতা ও অপকারিতা সম্বন্ধে সতর্ক হতে পারবে। আজ হয়তো যৌনতত্ত্বের শিক্ষা বিস্তার অনেকের কাছে লজ্জার বস্তু, কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই এমন দিন আসবে যখন ঐ বস্তুতে আর লজ্জা থাকবে না। S. K. Chakrabortty, Tabora, Tanganiska territory, East Africa.

কেরো না চেরো না কাইরো ?

বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'চেরো' প্রবন্ধের উচ্চারণ সম্পর্কে দু'টি পত্র আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পত্র লেখকেরা 'চেরোর' স্থলে 'কিরো' উচ্চারণ যে শুদ্ধ, এই অভিমত প্রকাশ করেছেন। ইংরেজী অনেক শব্দের ভাষান্তর করতে হলে দেখা দেয় উচ্চারণ ও বানান নিয়ে নানা বিভ্রাট ও বিতর্কের অবকাশ। শুধু 'চেরো' কেন, অনেক শব্দই আমরা নানা ভাবে উচ্চারণ করি, তার মধ্যে কোনটা যে ঠিক শুদ্ধ সে সম্পর্কে সঠিক মতামত দেওয়া শক্ত। 'ch' দিয়ে সব শব্দই ত' আমরা 'চ' দিয়ে লিখি এবং উচ্চারণও করি, 'ক' দিয়ে লিখিও না বা উচ্চারণও করি না। যদি করতাম তাহলে change এই শব্দটির উচ্চারণ 'চেনজ' না করে করতাম 'কেনজ'। 'চেরো' এই উচ্চারণটি তাই সাধারণ ভাবেই (ch-এ চ ; ক নয়) এই নীতির উপর লেখা হয়েছে। 'চেরো' তাঁর বইয়ে নিজের নামের উচ্চারণ লিখবেন তাই যে স্বতঃসিদ্ধ ভাবে শুদ্ধ, তার প্রমাণ কোথায় ? আজকাল 'Cawnpur'-এর বানান লেখা হচ্ছে 'Kanpur' (ca-এর স্থলে ka); উচ্চারণ কিন্তু বদলায় নি, সেটি আদি ও অকৃত্রিম 'কানপুরই' আছে। নমস্কার। ইতি শ্রীসোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১২৮, এন, কে, ব্যানার্জ্জী ষ্ট্রীট, রিসড়া।

পত্রিকার পুরাতন সংখ্যা চাই

কোন পাঠক-পাঠিকা যদি ১৩৫৯ হইতে ১৩৬২ পর্য্যন্ত ৪ বৎসরের মাসিক বসুমতীর পুরাতন সংখ্যাগুলি একসাথে চাহেন, তাহা হইলে আমি ন্যায্য দামে দিয়া দিতে পারি। ৬ মাসের সংখ্যা একসাথে বাঁধান আছে।—ডাঃ অনাদি ঘোষ। ২১এ, সুরেন ঠাকুর রোড। কলিকাতা—১৯।

আমাদের ক্ষুদ্র "পাঠচক্র" মাসিক বসুমতী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক। সুতরাং পুরাতন পত্রিকা প্রথমতঃ কোনও বিশিষ্ট সেবা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে বিনামূল্যে (মাত্র ডাক খরচার পরিবর্ত্তে) দিতে প্রস্তুত। দ্বিতীয়তঃ, কোনও ব্যক্তিবিশেষের প্রয়োজনেও কোন কোন সংখ্যা দিতে আপত্তি নাই। বর্ত্তমানে আমাদের নিকট যথাক্রমে মাসিক বসুমতীর :—'বৈশাখ' ৬১, আষাঢ়' ৬১ হইতে চৈত্র' ৬১ ও কার্ত্তিক' ৬২ হইতে মাঘ'৬২ পর্য্যন্ত আছে।*ইতি—মিঃ ডি, দে, ৭।৩।বি পুরুভি মর্গ। (আউট হাউস) নিউদিল্লী।

কোন সহৃদয় পাঠক বা পাঠিকা যদি মাসিক বসুমতীর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা (১৩৬২ সন) দেন, তবে বিশেষ উপকৃত থাকিব, উপযুক্ত মূল্য দিব। শ্রীরবীন্দ্রনাথ দে। ১১১এ, নারিকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা—১১।

পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার্থে জানাইতেছি যে, "মাসিক বসুমতী"র পুরাতন সংখ্যা সন ১৩৫৯—৬২এর মধ্যে ১৩৬০ সনের আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬১ সনের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা ও ১৩৬২ সনের আশ্বিন সংখ্যা আমার কাছে আছে। যদি কোন পাঠক-পাঠিকা কিনিতে ইচ্ছা করেন তবে উপযুক্ত মূল্যে অর্থাৎ ১৷০ প্রতি সংখ্যা পাইলেই দিতে পারি। শ্রীঅচিন্ত্যকুমার ঘোষ, ৫২৮।২ ডায়মণ্ড হারবার রোড, বেহালা, কলিকাতা-৩৪।

পাঠক-পাঠিকার চিঠি কলমে দেখি, বহু পাঠক-পাঠিকা পুরাতন সংখ্যা চাহিয়াছেন। আমাদের নিকট কিছু সংখ্যক পুরাতন সংখ্যা আছে। প্রয়োজনে হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্রালাপ করিতে পারেন। শ্রীহরিপদ সাহা, সংবাদপত্র এজেন্ট, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

আমার একখানি ১৩৬০ চৈত্রের মাসিক বসুমতীর বদলে ১৩৬২ বৈশাখ সংখ্যা চাই, যদি কাহারও নিকট থাকে অনুগ্রহ করিয়া জানাইবেন। খরচ লাগিলে তাহাও দিব, বদল ছাড়া ন্যায্য মূল্য দিতেও রাজী। শ্রীজীবনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। C/o চক্রবর্ত্তী অপটিকাল কোং। ১০, বৌবাজার ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১২।

আমি নিম্নলিখিত বসুমতীগুলি পূর্ণ মূল্যে দিতে পারি, ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের অবস্থা ভালই আছে। ১৩৫৯ সালের আশ্বিন ও পৌষ থেকে চৈত্র পর্য্যন্ত। ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ থেকে অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত। ১৩৬১ সালের বৈশাখ থেকে চৈত্র (ভাদ্র বাদে)। ১৩৬২ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন। সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯½ এ, এস, এন, ব্যানার্জী রোড। কলিকাতা,

যদি কোন সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ১৩৬০ সনের বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত ষাণ্মাষিক সূচীপত্র সহ (কার্তিক ১৩৬০ সংখ্যায় প্রাপ্তব্য) মাসিক বসুমতী উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করেন তবে বিশেষ উপকৃত হবো। প্রচ্ছদপটের ছবিগুলি অবশ্যই অবিকৃত অবস্থায় থাকা চাই। আমার ঠিকানায় পত্রালাপ করুন অথবা কি ভাবে পাবো জানান। —দেবব্রত অধিকারী। ২১ই বারোয়ারীতলা রোড। কলিকাতা—১০।

১৩৫৯ সালের পৌষ মাসের মাসিক বসুমতী একখণ্ড যদি কোন সহৃদয় পাঠক বা পাঠিকা দিতে পারেন, তো বড়ই উপকৃত হই। মূল্য যা লাগে দিতে প্রস্তুত। নমস্কারান্তে বিনীত—কমল মিত্র। ২৩।৭, রায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৫৭ সালের আষাঢ় সংখ্যা ক্রয় করিতে চাই। কোন গ্রাহক-গ্রাহিকার নিকট থাকিলে মূল্য সহ জানাইবেন।—বটকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য। অবধায়ক বসুমতী। কলিকাতা—১২।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

[বাংলা ভাষায় একমাত্র সর্ব্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহক-গ্রাহিকা ছড়িয়ে আছে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র দুনিয়ায়। প্রতি মাসেই আমরা শত শত নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও পাব। গত সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে কয়েক জন নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকার আবেদন-পত্র মুদ্রিত করি। প্রত্যেকের চিঠি প্রকাশের স্থানাভাব; সে জন্য বর্ত্তমান সংখ্যাতেও মাত্র কয়েক জনের আবেদন-লিপি প্রকাশিত হয়েছে।—স]

One year's subs. of the Monthly Basumati from Mrs. Sukumar Debi. C/o. Mr. B. Dey. Mati wadi. Ashapuri Nagar. Navsari.

১৩৬৩ সালের বৈশাখ থেকে শ্রীমতী সুধাময়ী গুপ্তাকে বার্ষিক গ্রাহিকা করিয়া লইবেন। ঠিকানা, C/o. এস, ডি গুপ্ত, কংগ্রেসনগর নাগপুর, এম, পি।—নীলিমা গুপ্ত। নাগপুর।

প্রথম ষাণ্মাষিক চাঁদা পাঠাইলাম।—প্রতিমা রাহা, ৭০। বি হিন্দুস্থান পার্ক। কলিকাতা।

বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম। শীঘ্র সংখ্যাটি পাঠাইবেন।—ইন্দুলেখা মিত্র (৫১৩৭৪)

এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইলাম। বৈশাখ সংখ্যা হইতে পত্রিকা চাই।—প্রীতি চক্রবর্ত্তী। পুসা, দ্বারভাঙ্গা।

Half-yearly subs. for. M. Basumati. Nomita Dasgupta. Jamshedpur—4.

পনেরো টাকা পাঠাইলাম।—শ্রীমতী শোভনা সেন C/o Amar Sen. Power House Rd, Jaipur.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাষিক মূল্য পাঠাইলাম।—শ্রীমতী অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডী ঘোষ রোড। কলিকাতা।

ষাণ্মাষিক চাঁদা পাঠাইলাম।—আরতি গঙ্গোপাধ্যায়। Nellore. Andhra State.

মাসিক বসুমতীর টাকা পাঠাইলাম। শীঘ্র মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। ঊষা মুখোপাধ্যায়। গ্রাহাম রোড, আলমবাগ। লক্ষ্ণৌ।

Kindly renew the membership and send M. Basumti regularly—Sm. Sudhira Mitra. Patna—

মনিঅর্ডারে পনেরো টাকা পাঠাইলাম। উমা কুশারী। দার্জ্জিলিং।

Sending the sum of Rupees fifteen only for one year's subs.—Hena De. Berhampur.W. Bengal.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা পাঠাইলাম—Sm. M. Sanyal. Madras.

Sending Rupees fifteen for annual subs.—Mrs. Bani Guha. (42193)

আমাকে গ্রাহিকা করিয়া লইয়া পত্রিকা পাঠাইবেন।—দীপ্তি বসু। N. E. W. Mills. Dhariwal. East Panjab.

Sending Rupees fifty as my annual subs.—Latikia Sen. C/o Principal D. N Sen. T. I. T. Bhiwani.

বার্ষিক মূল্য পনেরো টাকা পাঠাইলাম। মঞ্জুশ্রী দেবী। শান্তিপাড়া। ডিব্রুগড়, আসাম।

Please acknowledge receipt of the yearly subs. of M. Basumati—Nilima Bose. Khordgong. Upper Assam.

আগামী ছয় মাসের পত্রিকার টাকা মনিঅর্ডার যোগে পাঠাইলাম।—অন্নপূর্ণা রায়চৌধুরী। নৈহাটী, বীরভূম।

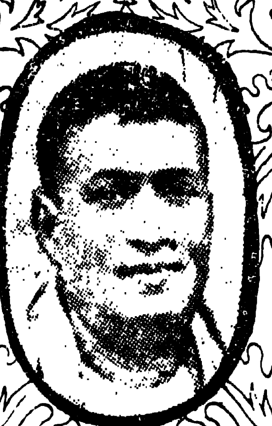
মনিঅর্ডার যোগে এক বৎসরের চাঁদা পাঠাইয়াছি। শ্রীমতী নির্মলা রায় "কল্পনা"; হাভলক রোড লক্ষ্ণৌ।



মাসিক বসুমতী (একটি দুষ্প্রাপ্য চিত্র) শ্রীকৃষ্ণ

শ্রাবণ, ১৩৬৩ জনৈক অজ্ঞাতশিল্পী অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—শ্রাবণ, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। "বেদান্ত বিচারের শেষে রূপ টুপ উড়ে যায়। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন, আর ঈশ্বরকে 'ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়। বেদান্ত বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই—ব্রহ্ম সত্য আর নাম রূপ জগৎ মিথ্যা। তখন ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ হয় না। কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বলবে? যিনি বলবেন তিনিই নাই, তাঁর আমি খুঁজে পান না। ব্রহ্ম কি মুখে বলবার শক্তি থাকে না। তখন ব্রহ্ম নির্গুণ! তখন তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বুদ্ধির দ্বারা তাঁকে ধরা যায় না। লুণের ছবি সমুদ্র মাপতে গিয়েছিল—কত গভীর জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হলো না। যাই নামা অমনি গলে যাওয়া—কে আর খবর দিবে? 'আমি' রূপ লুণের পুতুল সচ্চিদানন্দ সাগরে গেলে এক হয়ে যায়—আর একটুও ভেদবুদ্ধি থাকে না।"

"নেতি, নেতি অর্থাৎ এসব মায়া, স্বপ্নবৎ—এই বিচার জ্ঞানীরা করেণ এই জগৎ নেতি, নেতি—মায়া। জগৎ যখন উড়ে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব—আমি ঘট, রয়েছে। মনে কর দশটা জলপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হয়েছে—কটা সূর্য্য দেখা যাচ্ছে? ১০টা প্রতিবিম্ব-সূর্য্য, আর একটা সত্য সূর্য্য ত আছে। মনে কর একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে—এখন কটা সূর্য্য দেখা যায়?—নটা, আর একটা সত্য সূর্য্য ত আছেই। সব ঘট ভেঙ্গে দিলে কি থাকে?—একটা সূর্য্য? না, কি থাকে তা মুখে বলা যায় না—যা আছে তাই আছে। প্রতিবিম্ব-সূর্য্য না থাকলে, সত্য সূর্য্য যে আছে কি করে জান্‌বে? সমাধিস্থ হলে, অহংতত্ত্ব নাশ হয়। সমাধিস্থ ব্যক্তি নেমে এসে কি দেখেছে মুখে বলতে পারে না।"

"চৈতন্যলাভ না করলে চৈতন্যকে জানা যায় না। বিচার কতক্ষণ?—যতক্ষণ না তাকে লাভ করা যায়। শুধু মুখে বললে হবে না—এই আমি দেখছি, তিনি সব হয়েছেন। তাঁর কৃপায় চৈতন্য লাভ করা চাই। চৈতন্য লাভ করলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভুল হয়ে যায়, কামিনীকাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয়কথা শুনলে কষ্ট হয়। চৈতন্যলাভ করলে তবে চৈতন্যকে জানতে পারা যায়।"

অঘোর প্রকাশ

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবনকাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

[স্বর্গতা অঘোরকামিনী দেবী ও স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায় পরস্পরে জায়া এবং পতির সম্পর্কে অতি পরিচিত। এই আদর্শ স্বামি-স্ত্রীর পুণ্য জীবনকাহিনী অঘোরকামিনীর দেহত্যাগের পর প্রকাশচন্দ্র লিপিবদ্ধ করেন—তাঁদের দু'জনের অতীত জীবনের কথা ও ঘটনাসমূহের সহজ সরল বিবরণে। এই কাহিনী নানাদিক থেকে উল্লেখযোগ্য। এক বিখ্যাত দম্পতির এই আত্ম-কথায় বাঙলা দেশের অতীত যুগের এক ঐতিহ্যপূর্ণ সামাজিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়। অঘোরকামিনী ছিলেন রত্নগর্ভা। তাঁর পুত্রদিগের মধ্যে তিনজন, যথা শ্রীসুবোধচন্দ্র রায়, বার-এট ল; স্বর্গত সাধনচন্দ্র রায় (যন্ত্র-বিজ্ঞানী), এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এম, ডি; এম, আর, সি, পি; এফ, আর, সি, এস, (ইংল্যাণ্ড) প্রভৃতির পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত নয়। 'অঘোর-প্রকাশ'এর ধারাবাহিক প্রকাশে পাঠক-পাঠিকা অবশ্যই তৃপ্তিলাভ করবেন।—স]

উদ্বোধন

অঘোর-প্রকাশ !

তোমার দেহত্যাগের পর ত্রিশ দিনের দিনে তোমার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তুমি বলিয়াছিলে, শুদ্ধাচার, শুদ্ধচিন্তা, শুদ্ধ ব্যবহার না হইলে তোমার সঙ্গে আর অধিক মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। আরও বলিয়াছিলে, তোমার মত না হইলে উন্নত মিলনের ভূমিতে উপনীত হইতে পারিব না।

সেই দিন হইতে তোমার মত হইবার জন্য আরও ব্যাকুল হইলাম। আবার সেই দিন হইতে কি জানি কেন, তোমার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই জীবনীর সূত্রপাত। কত সময়ে তোমার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি। দেহে থাকিতে তুমি মিলিত জীবনের এই কাহিনী শুনিতে কত ভালবাসিতে। কত বার পত্রে সে কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছি। আজ তুমি আমার কত নিকটে! এস, দু'জনে আবার চিরপরিচিত সেই পবিত্র কাহিনীর আলোচনা করি।

যত দিন তুমি দেহে ছিলে, সদাই দু'জনা দু'জনার জীবনে যুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়াছি। এখনও তাহাই করিতেছি। ইহাতেই আমাদের উন্নতি, ইহাতেই আমাদের অনন্ত আশা। গঙ্গা ও যমুনার মত একেবারে আত্মহারা হইয়া পরস্পরে মিশিয়া গিয়া সাগরে মিলিবার এখনও বুঝি অনেক বিলম্ব আছে। তত দিন, দেখ, আমি তোমার প্রকৃতি লাভের জন্য যত্ন করিতেছি; এই বৃদ্ধ বয়সে যাহাতে তোমার মত সেবা-পাগল হইতে পারি, নিরন্তর সেই ভিক্ষা করিতেছি। ঈশ্বর করুন, এইরূপে যেন আমি মিশিয়া যাইতে পারি। ঈশ্বর করুন, এই যুক্ত জীবনের কাহিনী যেন নর-নারীর কাযে লাগে।

অঃ প্রঃ।

প্রথম খণ্ড—বধূ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিবাহ

তোমার পিত্রালয়ের কেহই তোমার জন্মের তারিখ ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই। ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে অথবা ইংরাজী ১৮৫৬ সালের মে-জুন মাসে জেলা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত মাইহাটী পরগণাভুক্ত শ্রীপুর গ্রামে তোমার জন্ম হইয়াছিল। একে তো কন্যাসন্তান, তাহাতে আবার পল্লীগ্রামে জন্ম, কেমন করিয়া ঠিক থাকিবে? তোমার পিতামহ হরচন্দ্র বসু মহাশয় বিচক্ষণ লোক ছিলেন। পল্লীতে তাঁহার সাহস, দানশীলতার বিষয় অনেক শুনা যায়; দেশীয় পূজা-পার্ব্বণ অনেক করিতেন। তোমাদের বাটীতে দুর্গোৎসব বড় ধূমধামে হইত। মনে হয়, ১৮৬২ সালে তোমাদের বাটীতে যে পূজা হয় তাহার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে আমি তোমাদের বাড়ীতে গিয়াছিলাম এবং ধূমধাম দেখিয়া একটু স্তম্ভিত হইয়া আসিয়াছিলাম। তখন জানিতাম না যে তোমার সহিত আমার পরিণয় হইবে। তোমার পিতা বিপিনচন্দ্র বসু মহাশয় নিজে উপার্জ্জন করিতেন। কনট্রাক্টারের কার্য্য করিয়া অনেকের সাহায্য করিতেন। তিনি স্বয়ং আমাদের বিবাহের কথা স্থির করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে বহরমপুরে আমার জন্ম হয়। আমার পিতা স্বর্গীয় প্রাণকালী রায় সেখানে কালেক্টরের আফিসে কার্য্য করিতেন। পরোপকার ও শুদ্ধাচারের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। আমি তাঁহার অষ্টম সন্তান। আমার সেজদাদা পূর্ণচন্দ্র রায়ও বহরমপুরে কর্ম করিতেন। আমাদেরও পৈতৃক নিবাস শ্রীপুর গ্রামে। আমাদের তখন কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল

আমার ১৬ বৎসর বয়সে পিতৃদেব স্বর্গারোহণ করেন। বালককালে আমার লেখাপড়ার সুবন্দোবস্ত হয় নাই। পড়া অপেক্ষা খেলাই অধিক ভালবাসিতাম। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া মন্দ ছেলেদের সঙ্গে

মিশিয়া অনেক কু-অভ্যাস শিখিয়াছিলাম। শৈশবে আমাদের বহরমপুরের বাড়ীর নিকটবর্ত্তী রঘুনাথ বিগ্রহের প্রতি আমার প্রগাঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। একবার স্কুলে পরীক্ষার সময় রঘুনাথের নিকট অনেক প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, যেন আমি প্রথম স্থান অধিকার করি। দৈবাৎ পরীক্ষার কিছু পূর্ব্বে আমি পীড়িত হইলাম। পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করিতে পারিলাম না। ইহাতে রঘুনাথজীর উপর আমার শ্রদ্ধা কমিয়া গেল।

পিতার মৃত্যুর পর সেজদাদা যশোহরে বদলী হইয়া গেলেন। আমাদের বহরমপুর ছাড়িতে হইল। পাঠের জন্য আমি কলিকাতায় আসিলাম। পরিবার পরিজন স্বদেশে গেলেন। হেয়ার সাহেবের স্কুল হইতে ১৮৬৪ সালে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়াছিলাম। কোনওরূপে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত হই। চরিত্র যেমন তেমনি রহিল। তার পরবৎসর এফ, এ পড়িতে আবার বহরমপুর গমন করি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই **Tom Payne** এর **Age of Reason** নামক পুস্তক পাঠ করি। তাহাতে ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ হয়। সেই সন্দেহ আরও বর্দ্ধিত হইল যখন দর্শনশাস্ত্র পড়িতে লাগিলাম। ক্রমে আমি একজন ঘোর ধর্ম্ম-বিদ্বেষী হইয়া উঠিলাম। সকলের সঙ্গে তর্ক করিতাম ও তর্কে যেন জয়লাভও করিতাম।

কিয়ৎকাল পরে সেজদাদা মহাশয় কলিকাতা রেভিনিউ বোর্ডের কর্ম্মচারী হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। একদিন আমি কলিকাতার বাসায় বসিয়া আছি, এমন সময়ে স্বর্গীয় গোপীনাথ রায়চৌধুরী খুড়ামহাশয় (তোমার প্রিয় পিসামহাশয়) সেজদাদার নিকট হইতে কি পরামর্শ করিয়া আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "প্রকাশ, তোমার বিবাহ করিতে কি কোন আপত্তি আছে?" আমি কেবল বলিলাম "না"। জানি না কেন আমি "না" বলিলাম। বিবাহ হইবে ঠিক হইল। দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইতে লাগিল।

বিবাহ এক নূতন ব্যাপার! আমার মন খুব উৎসুক হইল। বহরমপুর কলেজ হইতে ছুটি লইয়া শ্রীপুর গমন করিলাম। ঘরে ঘরে নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতে লাগিলাম। সকলেই অতি যত্ন করিলেন। কেবল এক স্থানে অন্যথা মনে হইল, তাহা আমাদের গুরুবাড়ীতে। এ সময়ে আমি নাস্তিক, কিছুই মানিতাম না। মাতার ইচ্ছায় ও আজ্ঞায় গুরুবাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইতে গেলাম। আমার পালকী গুরুবাড়ীতে আসিল; কেহ বড় অভ্যর্থনা করিল না। আমি বৈঠকখানায় উঠিলাম। ভিতরে যাইতে আজ্ঞা হইল, অন্তঃপুরে গেলাম। কতকগুলি স্ত্রীলোক গোলমাল করিতে লাগিলেন; তাহার পর কিছু মিষ্টান্ন দেওয়া হইল। সমস্ত দিনই তো আহার করিয়া বেড়াইতেছি, এখানেও একটু খাইলাম। খাইয়াই অব্যাহতি পাইব মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইল বটে, কিন্তু আদেশ হইল, "উচ্ছিষ্ট পাত উঠাইয়া লইয়া যাও"। সে বাটীতে ভৃত্য ছিল, আমার সঙ্গেও ভৃত্য ছিল। কিন্তু আমাকেই উঠাইতে হইবে! কি আশ্চর্য্য! যে বর সকল স্থানে আদর ও সম্মান পাইয়া আসিল, আজ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, গুরুবাটীতে তাহার এই দুর্দ্দশা! গুরুগিরিকে ধিক্কার দিলাম। যাহাতে এই গুরুগিরিতে আমার সহায়তা না করিতে হয় তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। কিন্তু কি করি? ভয়ে ভয়ে উচ্ছিষ্ট উঠাইয়া লইলাম।



স্বর্গতা অঘোরকামিনী দেবী

১২৭২ সালের ফাল্গুন মাসে (ইংরাজী ১৮৬৬ সালের ফেব্রুয়ারী—মার্চ মাসে) আমাদের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের কথা বলিতে ভাল লাগে। কেন না, বিবাহের সময় হইতেই আমার জীবনের স্রোত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। আমার বেশ স্মরণ আছে, বিবাহের রাত্রে যখন তোমার হাতে আমার হাতে এক করিয়া দেওয়া হইল, তখন আমার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে নিজের স্বভাব সংশোধন করিব ও এই রমণীর উপযুক্ত হইব। উহার পূর্বে কখনও তোমাকে ভাল করিয়া দেখি নাই। কেবল একদিন গ্রামের পথে চলিতে চলিতে তোমাকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। তুমি পলায়ন করিয়া চলিয়া গিয়াছিলে, আমি তোমার ছায়ামাত্র দেখিয়াছিলাম; যখন বিবাহের কথা হইল তখন তুমি একদিন তোমার ভাবী বরকে দেখিবার জন্য খোলা ছাতে উঠিয়াছিলে, এবং অন্যমনস্কতা বশতঃ পূর্ব্বদিকের বাগানে পড়িয়া গিয়াছিলে। যদি নীচে গাছ ও স্তূপাকারে কাষ্ঠ না থাকিত, তাহা হইলে বাঁচিতে কি না সন্দেহ! ইহার পর একেবারে সেই বিবাহ-রাত্রির শুভদৃষ্টি; ইহাতেই এমন ভালবাসার বীজ বপন হইল যে আর সকলই ভুলিয়া গেলাম। একই ধ্যান, একই জ্ঞান হইল। তখন আমার প্রাণের ঈশ্বরকে চিনিতাম না যে তাঁহাকে ভালবাসিব। ঘোরীকে* চিনিলাম, আর ঘোরীকেই ভালবাসিতে লাগিলাম। আমাদের বিবাহে বেশ ধূমধাম হইয়াছিল। আমাদের গ্রামের ও পার্শ্বস্থ গ্রামের অনেক লোক উপস্থিত ছিলেন। আহারাদিতে উভয় পক্ষের অনেক খরচ হয়। সে সময় আমাদের

* তোমার পিত্রালয়ের ডাক নাম।

বিষয়পত্র থাকাতে প্রজাবর্গও অনেক আসিয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রের মন্ত্র কি পাঠ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু বিবাহ চিরকালের মত হইল ইহা স্থির বুঝিলাম। বিবাহের রাত্রে তোমার সঙ্গে কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু বাসরঘর লোকে পরিপূর্ণ ছিল, সুতরাং তাহা ঘটে নাই। এমন কি তোমার হস্ত স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিলাম, তাহাও বিফল হইল। তুমি বালিকা, তোমার বয়ঃক্রম তখন দশ বৎসর মাত্র, আমার তখন আঠার বৎসর, তাই মনে হয়, বাল্য বিবাহের বাসরঘরে লোক থাকা ভাল, তাহাতে বালিকার প্রাণ বাঁচে। পরদিন গৃহযাত্রা করিলাম। তোমাদের বাড়ী হইতে আমাদের বাড়ী কতই বা দূর, কিন্তু যাত্রার সময় তোমার বড় পিসীমাতা এমন ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেখিয়া আমি অবাক হইলাম। তিনি তোমাকে এত ভালবাসিতেন তাহা জানিতাম না। তোমার পিতাঠাকুর মহাশয় প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সজল নয়নে আমাকে বিদায় দিলেন। আর তাঁহার সঙ্গে আমার ইহলোকে দেখা হয় নাই।

আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। বরণ করিয়া পুত্র ও বধূকে ঘরে লওয়া হইল। পরের দিন ভারে ভারে ফুলশয্যার দ্রব্যাদি আসিল। অনেক বস্ত্রাদি পাইলাম, কিন্তু আমার সে দিকে দৃষ্টি ছিল না। আমি কেবল চেষ্টা করিতেছিলাম যে, কিরূপে তোমাকে কথা বলাইব। কত চেষ্টা করিলাম, কত সাধ্য-সাধনা করিলাম, কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলাম না। পিত্রালয়ের কে যে তোমাকে কি শিখাইয়া দিয়াছিল তাহা জানি না! আমাদের বিবাহের নয় কি দশ দিন পরে আমাদের গ্রামে আর একটি বিবাহ হয়। তোমার হরনাথ জ্যাঠামহাশয়ের কন্যার বিবাহ। সেই বিবাহে টাকীর বিপিন বসু বরযাত্র আসিয়াছিলেন। তিনি বরযাত্রদিগের সঙ্গে শয়ন করিতে অসুবিধা জানিয়া আমাদের বাটীতে আসিলেন, ও তাঁহার দিদিকে (আমার মেজদাদার পত্নীকে) বলিলেন যে সে রাত্রি আমাদের বাটীতে শয়ন করিবেন। বাটীতে আর অধিক ঘর নাই। মধ্যম বধূ আমাকে বিরক্ত করিবার জন্যই হউক, কিংবা তাহার ভ্রাতার অভ্যর্থনার জন্যই হউক, সোজাসুজি বলিয়া দিলেন, "ছোট বাবুর সঙ্গে শয়ন করিও।" এ কথা আমার ভাল লাগিল না। একদিন পরে তুমি পিত্রালয়ে চলিয়া যাইবে, আমিও পাঠস্থানে চলিয়া যাইব, ইহার মধ্যে আবার এ কি বিপত্তি হইল! আমি আমার শয্যা ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু তোমার নৈকট্য ছাড়িতে পারিলাম না। মধ্যম বধূকে বলিলাম, "মাঝের বড় ঘরে মাটির উপরে আমার শয্যা প্রস্তুত হউক।" তাহাই হইল; কিন্তু এত চেষ্টার কোনও পুরস্কার পাইলাম না; তোমাকে একটিও কথা কহাইতে পারিলাম না। পিত্রালয়ে ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বরাত্রে কেবল বলিয়াছিলে, "কাল আমি চলিয়া যাইব।" ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম। তোমাকে কতই আশীর্ব্বাদ করিলাম। তুমি পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে। আমিও সঙ্কল্প করিলাম, এ স্ত্রীর উপযুক্ত হইব; চরিত্র পবিত্র করিব। তখন ধর্ম্মের ধার ধারি না; ঈশ্বরকে জানিতাম না; তোমার জন্য পবিত্রতা আমার বাঞ্ছনীয় হইল।

তখন সেজদাদা কলিকাতায় কর্ম্ম করিতেছেন। তিনি আমাকে নিজের কাছে রাখিবার জন্য অনেক বলিলেন। কিন্তু আমার মন তাহাতে প্রস্তুত হইল না। বহরমপুরের বাসায় একটু স্বাধীন ভাবে থাকিতে পাইব বলিয়া সেইখানেই চলিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শ্বশুর-পরিবার।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে দার্শনিক পুস্তক সকল পড়িয়া আমার ধর্ম্মভাব শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল। আমি নাস্তিক হইয়াছিলাম। যদি মনের ঐ গতি চিরস্থায়ী হইত, আমার এবং তোমার দশা কি হইত! কিন্তু ভগবান তাহা হইতে দিলেন না। বহরমপুরে তখন শ্রদ্ধাস্পদ এস জে হিল্ সাহেব পাদরী ছিলেন। তাঁহার সহিত আমার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইল। তিনি ও তাঁহার পত্নী আমাকে আপনার সন্তানের মত দেখিতেন। হিল্ সাহেবের নিকট বাইবেল পড়িতে লাগিলাম ও তাঁহার সাধু চরিত্র অধ্যয়ন করিতে লাগিলাম। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এবার বুঝিতে পারিলাম সাধু চরিত্র কাহাকে বলে। খৃষ্টকে ইনি জীবনে পাইয়াছিলেন; ভারতবাসীকে বড় ভাল বাসিতেন; এমন বাঙ্গলা বলিতেন, মনে হইত ঠিক যেন একজন বাঙ্গালী কথা কহিতেছেন।

ইহার পর দু'মাসের মধ্যে তোমাদের বাড়ীতে মহাবিপদ উপস্থিত হইল। তোমার পিতার ভীষণ বসন্তরোগ হইল। তিনি পরলোক-গত হইলেন। শোকের আবেগে প্রাঙ্গণে আসিয়া তুমি পিতার মৃতদেহ জড়াইয়া ধরিয়াছিলে। তাহাতে তোমারও বসন্ত হইল। ক্রমে তোমার ভগিনী যামিনী ও ভ্রাতা জ্ঞানেরও হইল। আমি সংবাদ পাইয়া দেখিতে যাইবার জন্য ব্যাকুল হইলাম। কিন্তু সেজদাদার অনুমতি না হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। মনে বড়ই কষ্ট হইল। মনের কষ্ট মনেই রাখিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

তোমরা দু'টি ভগিনী শীঘ্র নীরোগ হইলে কিন্তু ভ্রাতা জ্ঞানকে লইয়া টানাটানি পড়িয়া গেল। জ্ঞানের সেবায় তোমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইল। বিধবা মাতা অন্য সন্তানদের জন্য ব্যস্ত থাকিতেন। জ্ঞানের সমুদয় ভার তোমারই উপরে পড়িল। তখন তোমার বয়ঃক্রম ১০ বৎসর মাত্র। জ্ঞানকে লইয়া ভবানীপুরে তোমার মাতামহের বাটীতে আসিতে হইল। অনেক পরিশ্রম ও সেবার পর জ্ঞান বাঁচিলেন, কিন্তু একটি চক্ষু গেল।

বিবাহের কিছুকাল পরে তোমার চরিত্রের একটি সুলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম। তুমি অল্প বয়সেই রন্ধনপটু বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলে। কর্ম্মের বাটীতে অনেক কর্ম্ম করিতে পার বলিয়া তোমার সুখ্যাতি বাহির হইয়াছিল। একদিন কোন কর্ম্মোপলক্ষে পাড়ার কুটুম্বদের বাটীতে আহূত হইয়া গিয়াছিলে। রন্ধন শেষ হইয়া গেলে প্রাঙ্গণে নিমন্ত্রিত নারীরা কিরূপে সমাদর পাইতেছেন দেখিতে গেলে। আশ্চর্য্য ব্যবহার দেখিলে; যাঁহারা ভাল বস্ত্র, ভাল অলঙ্কার পরিধান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদের যত্ন হইতেছে, আর যাঁহারা সামান্য বস্ত্রে এবং বিনা অলঙ্কারে আসিতেছেন, তাঁহাদের আদর হইতেছে না। আহারের সময়ও এই বিভিন্ন আচরণ দেখা গিয়াছিল। বালিকা তুমি, তোমার মনে অত্যন্ত আঘাত লাগিল। ধনের প্রতি এত সমাদর? এ কি অন্যায়! সেই দিনই তোমার সংকল্প হইল, তুমি যথাসাধ্য দুঃখীর সহায়তা করিবে।

কয়েক মাস পরে আমিও বহরমপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম। তখন হিল্ সাহেবের চরিত্রের ছবি আমার হৃদয়ে পড়িয়াছে। ঈশার ধর্ম্মে যে মানুষ ভাল হইতে পারে তাহা বুঝিয়াছি। কলিকাতায় আসিয়া খৃষ্টীয় ভ্রাতাদের সঙ্গে আলাপ ও ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিতে লাগিলাম। এ সময় আমি ব্রাহ্মধর্ম্মের বিরোধী ছিলাম। যে ধর্ম্মে শাস্ত্র নাই সে ধর্ম্মে কিরূপে মুক্তি হইবে বুঝিতে পারিতাম না। স্বয়ং ঈশ্বরই যে শাস্ত্র এ কথা বুদ্ধির অগম্য ছিল। আর এক কারণ এই যে, ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁহারা ভাল লোক তাঁহাদের কাহারও সঙ্গে পরিচয় হয় নাই। বহরমপুরের ব্রাহ্মধর্ম্মে আমার মন উঠে নাই। সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ ছিল, কিন্তু তাহাতে গিয়া সুখ পাইতাম না। জীবন-শূন্য ধর্ম্মে আমার মনকে আকৃষ্ট করিতে পারিত না। সুতরাং হিল্ সাহেবের জীবনগত ধর্ম্মের জন্য লালায়িত হইতে লাগিলাম। অনেক খৃষ্টীয় পুস্তক পড়িতে লাগিলাম। খৃষ্টান হইবার জন্য মন প্রস্তুত হইতে লাগিল। মানুষের পরিত্রাণ ভিন্ন চলে না, বুঝিলাম। একদিন রাত্রি ১১টার সময় পাঠ-শেষ করিয়া বলিলাম, আগামী কল্য আমি খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত (baptised) হইব। আমার প্রকোষ্ঠে একজন বাল্যসখা শয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কতই প্রবোধ দিলেন। তোমার সঙ্গে তখন নূতন বিবাহ হইয়াছে, তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুতেই মন মানিল না। পরিত্রাণ কিসে হইবে এই চিন্তা তখন আমার মনকে অধিকার করিয়াছে। তাঁহার সঙ্গে কথায় কথায় মনে পড়িল যে আমার প্রিয় শিক্ষা-গুরু শ্রদ্ধেয় ঈশান বাবু বলিতেন, কোন গুরুতর কার্য্য করিবার পূর্ব্বে ২৪ ঘণ্টা সময় লইও। আমি ২৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে স্বীকার করিলাম। এত দিন যদি গিয়াছে তো ২৪ ঘণ্টা অতিবাহিত হইলে আর কি হইবে? এক দিনের জন্য নিরস্ত হইলাম। সেই রাত্রে যদি খৃষ্টান হইতাম তাহা হইলে কি হইত জানি না। যাহাই হউক, আমার এ ভাব তাহা হইলে দেখিতে পাইতে না। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে কি না, তাহাই বা কে জানে? সেই যে ২৪ ঘণ্টার সময় লইলাম তাহাতেই রক্ষা। পরদিন বৈকালে শুনিলাম, একজন খৃষ্টান সমপাঠী প্রশ্নের কাগজ চুরি করিয়াছেন। পরীক্ষার দিনে রেজিষ্ট্রার সট্‌ক্লিফ সাহেব তাহাকে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। আমাদের পরীক্ষা বন্ধ হইয়া গেল। পুনরায় পরীক্ষা লওয়া লইবে এই হুকুম হইল। যখন খৃষ্টান ভাইকে তাড়াইয়া দেওয়া হইল, আমার মন কেমন করিতে লাগিল। ভাবিলাম খৃষ্টান হইলেও চুরি করা হইতে রক্ষা পাওয়া যায় না; খৃষ্টান হইলেই তো নবজীবন লাভ হয় না। এই সকল চিন্তা করিয়া আমার খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষা লওয়া হইল না।

ইহার পর ১৮৬৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটীর সময় আমাদের গ্রামে তোমার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইল। বিবাহের পর তোমার সঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। তখনও তোমার সঙ্গে ভাল করিয়া পরিচয় হয় নাই। তুমি একেবারে একদিনে আমার হাতে আত্মসমর্পণ করিতে পার নাই। এমন কি, এই সময়ে আমার উপর বিরক্ত হইয়া এক দিন বলিয়াছিলে, "এ সকল শয্যাদি কোথায় পাইলে? আমার বাবা দিয়াছেন, তবেই তো পাইলে?"

১৮৬৭ সালের মধ্য ভাগে সেজদাদা দেশ হইতে সমুদয় পরিবার কলিকাতায় আনিলেন। ভবানীপুরে বাসা স্থির হইল। অন্যান্য সকলের সঙ্গে তুমিও আসিলে। বিবাহের পরে তোমার সঙ্গে এই দ্বিতীয় বার একত্র থাকা হইল। তোমার সঙ্গে একত্র থাকিতে ইচ্ছা করিত, কিন্তু তাহার উপায় ছিল না। এই সময়ে তোমার নামে বাটীর সকলে অনেক নিন্দা করিত। বধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া প্রথম প্রথম যেরূপ নিন্দিত হন, সেইরূপ নিন্দা। আমার কষ্ট হইত, আর ভাবিতাম, তোমার যা যা দোষ আছে মিষ্ট কথায় হয়তো সে সব ভাল করা যায়। এ সময়ে দিনের বেলা তোমার সঙ্গে দেখা হইত না। নিদ্রার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে দেখা হইত। এরূপ অবস্থায় ভালবাসা জন্মিতে যে কত দিন লাগে, তাহা বুঝিতেই পারিতেছ। তুমি একজন আর আমি একজন যেন স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র জীব হইয়া অবস্থিতি করিতাম।

এই সময়ে তুমি কত বুদ্ধি ধরিতে, তাহার একটি গল্প বলি। তৃতীয়া বধূর বৃদ্ধা ধাত্রী বাড়ীর খিড়কীর পুকুরে কাপড় কাচিতেছিল। তুমিও সে ঘাটে কাজ করিতে গিয়াছিলে। দৈবাৎ তোমার হাতের জলের ছিটা তাহার গায়ে লাগে। অল্পবয়স্কা নূতন বধূকে কেহই গ্রাহ্য করে না। তোমাকে সে বৃদ্ধা খুব বকিয়া দিল। তুমি কি বলিয়া তার উত্তর দিবে বুঝিতে না পারিয়া বলিলে "তুমি এত বকিতেছ কেন? তুমি কি আমার সতীন?" তুমি বুঝি "সতীন" অপেক্ষা তীব্র কথা পাইলে না। পাইবেই বা কিরূপে? "সেঁজুতি" ব্রত, আর আরও কত সব ব্রত করিয়া বাল্যকাল হইতেই সতীনকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলে। যাহা হউক, তোমার ঐ কথা লইয়া অনেক কথা শুনিতে হইল। তখন এইরূপ ছিলে, আর সেই তুমি পরে কত বুদ্ধিমতী বলিয়া পরিচিতা হইয়াছিলে।

যাহা হউক, এইবারেই তোমার সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। তুমি বুঝিতে লাগিলে যে আমি তোমার আপনার লোক। কিন্তু আমাদের একত্র থাকা অধিক দিন হইল না। সেজদাদার স্ত্রীর মৃত্যু হইল। পরিবারবর্গকে কলিকাতা হইতে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইল।

খৃষ্টান হইবার সঙ্কল্প ঘুচিয়া গিয়াছে আমার, কিন্তু অন্য কোন ধর্ম্মে তখন পর্য্যন্তও মন বসিতেছে না। এই অবস্থায় ১৮৬৭ সালের শীতের ছুটিতে দেশে গেলাম। একদিন বাটীতে বসিয়া আছি, এমন সময় আমাদের গ্রামের কয়েক জন সঙ্গী আসিয়া আমাকে ডাকিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতার হেয়ার ও হিন্দু স্কুলের ভাবী শিক্ষক কেদারনাথ রায়, মিটিওরোলজিক্যাল্ অফিসের ভাবী প্রধান কেরাণী (পরে রাও সাহেব) ফণীন্দ্রমোহন বসু ও পটলডাঙ্গার কবিরাজ পঞ্চানন ঘোষ কবিরত্নও ছিলেন। ইঁহারা বলিলেন, যোগীন্দ্র চৌধুরীদের বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য সভা হইবে, তুমিও চল। নাস্তিক হইলেও এইরূপ সামাজিক বিষয়ে আমার পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সভার কাজ যাহা ছিল করিলাম, তারপর সকলে নদীতীরে বেড়াইতে গেলাম। তাহারই কিছুদিন পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসের ঝড়ে বড় হইয়া গিয়াছে। হরি দত্ত মহাশয়ের বাটীর আটচালা পড়িয়া গিয়াছে। সকলেই সেই পোড়ো ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিলেন। আমিও দেখাদেখি প্রবেশ করিলাম। খান কতক তক্তপোষ ভিতরে ছিল, অন্ধকার ঘরে তক্তপোষের উপর সকলেই বসিলেন, আমিও বসিলাম। ব্রাহ্ম সমাজের দু'-একটা গান হইল, আমার তত ভাল লাগিল না। তারপর সকলেই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের মধ্যে আমি বিদ্যালয়ে সকলের উচ্চ শ্রেণীতে পড়ি। আমার মনে অভিমান হইল, "ইহারা প্রার্থনা করিতে পারে, আমি পারি না?" আমিও প্রার্থনা করিলাম। আমি বলিলাম, "ঈশ্বর তোমার নিকটে সকলে প্রার্থনা করিল, আমি তোমাকে চিনিও না, জানিও না, যদি তুমি থাক এবং তোমার ইচ্ছা হয় তো তোমাকে দেখিতে চিনিতে দাও।" এইরূপে অনিশ্চিত অজানিত অপরিচিত ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনার কারণ ছিল অভিমান,—সকলে প্রার্থনা করিবে, আমি করিব না? কিন্তু যেমন করিলাম অমনি ধরা পড়িলাম। সেই দিন হইতে ঐ প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গ আমার মনকে আকৃষ্ট করিতে লাগিল।

ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনে এইরূপ আন্দোলন চলিতেছিল। তোমার সঙ্গে তখনও এমন সম্বন্ধ হয় নাই যে তোমাকে আমার এ সকল সংগ্রামের অংশ দিই। অপর দিকে তুমি তখনও নূতন বধূ; তোমার সম্বন্ধে তখনও আমার বিশেষ কোন অধিকার ছিল না। একান্নবর্ত্তী পরিবারে যদি প্রেমের রাজত্ব না থাকে তাহা হইলে যে দশা হয়, আমাদের বাড়ীর দশাও তাহাই ছিল। যে যাহার লইয়াই ব্যস্ত; লাভের মধ্যে একত্র থাকাতে পরস্পরের সম্বন্ধে দাবী ও অভিযোগের ভাব অনেক সময় প্রকাশ পাইত। এরূপ পরিবারে নূতন অসহায়া বালিকা আসিয়া সহজে কাহাকেও আপনার বলিয়া ধরিতে পারে না। তোমার দশাও তাহাই হইল।

এই সময়ে আমাদের পারিবারিক দুরবস্থা আরও বর্দ্ধিত হইল। তোমাকেও তাহার ফল ভোগ করিতে হইল। বিষয় লইয়া বড়দাদা ও সেজদাদার মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। আমি মাঝে থাকিয়া অনেক চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কলহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল। আদালতে সাব্যস্ত হইল, বিষয়ে সকল ভ্রাতারই অধিকার আছে। কিন্তু বিচারালয়ে নির্দ্ধারিত হইলে কি হইবে? ইচ্ছা যখন হয়, তখন বিষয় নষ্ট করিতে কত দিন লাগে? দেখিতে দেখিতে অমন সুন্দর তালুক নষ্ট হইতে লাগিল। রক্ষার জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা করিলাম, তাহাতে আমার পাঠের অনেক ক্ষতি হইল। কিছুতেই কিছু হইল না। আমার চক্ষের সম্মুখে যাট-সত্তর হাজার টাকার বিষয় পাঁচ হাজার টাকায় দেনাডিক্রিতে বিক্রয় হইয়া গেল। তখন হায় হায় মাত্র বাকি রহিল। যাহা হউক, নশ্বর সম্পত্তি গিয়া আমার মঙ্গল হইল। থাকিলে হয়তো ঈশ্বরের দিকে মন আর অধিক আকৃষ্ট হইত না।

সম্পত্তি গেল; বাড়ীর অবস্থা খারাপ হইল। তোমাদের খাটুনি বাড়িল। আর তুমি তখনও বধূর উপযুক্ত ব্যবহার সব ভাল করিয়া শিক্ষা কর নাই। তাই বাড়ীতে অনেক গঞ্জনাও সহ্য করিতে হইত। মোকদ্দমার গোলমালে আমারও পড়াশুনা প্রায় ঘুচিয়া গেল।

সেজদাদা দ্বিতীয় বার বিবাহ করিলেন। ছোট বউটি একলা, বিদেশে কেমন করিয়া থাকিবেন, তাই সমুদয় পরিবার কলিকাতায় আনা স্থির হইল। সেজদাদার সুবিধায় আমারও সুবিধা হইল। আবার তোমার সহিত একত্র থাকিতে পাইলাম। কিন্তু এ বাড়ীতেও আমার কোন মর্য্যাদা নাই। কারণ পড়াশুনা প্রায় ঘুচিয়াছে, কাজ-কর্ম্ম আরম্ভ করি নাই; কাজেই তোমারও কিছু মর্য্যাদা ছিল না। এখানেও তোমার সম্বন্ধে আমার কোন ক্ষমতা ছিল না। সারা দিন তোমাকে রন্ধন প্রভৃতিতে নিযুক্ত থাকিতে হইত। কি আহার করিলে, তাহাও আমি সব সময় জানিতে পাইতাম না। আমার ইচ্ছা হইত তোমাকে লেখাপড়া শিখাই। দিনে তাহার সুযোগ হইত না। সকলে শয়ন করিলে, যখন তুমি শয়ন করিতে আসিতে, তখন তোমার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হইত। আমি গুরু হইয়া স্বতন্ত্র বসিতাম, তুমি ছাত্রী হইয়া ভয়ে ভয়ে দূরে বসিতে। অনুরাগের সহিত আপনার পাঠ শিখিতে। এইরূপে তোমার ক, খ, আরম্ভ হইল, ক্রমে প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ শেষ হইয়া গেল।

কিছু কাল পরে তুমি দেশে চলিয়া গেলে, আমি কলিকাতায় রহিলাম। তোমার সংবাদটি কিন্তু প্রয়োজন। খামের নিজের ঠিকানা লিখিয়া পত্রের মধ্যে করিয়া পাঠাইয়া দিতাম। এ খরচ কোথা হইতে জুটিত? ছেলে পড়াইতাম। কখনও ১০৲ টাকা, কখনও ১৫৲ টাকা পাইতাম। বিদ্যালয়ের বেতনাদি উহাতেই চলিত, বাকি যাহা কিছু থাকিত তাহা হইতে তোমাকে মাসে মাসে ৫টি টাকা পাঠাইয়া আপনাকে বড় সুখী মনে করিতাম। পাঠের সময় বিবাহ হইলে কি দশা হয় তাহা আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। তোমার কথা সদাই মনে হইত। পড়িতেছি, পড়িতেছি, হঠাৎ মনে তোমার একটা কথা উদয় হইল, আর পাঠ বন্ধ হইল। অনেকক্ষণ ধরিয়া চিন্তাই করিতে লাগিলাম। বই খোলাই পড়িয়া রহিল। বিশেষতঃ তোমার শ্বশুরালয়ের জীবন এ সময় বিশেষ সুখের জীবন ছিল না। তাই আমাকে অনেক সময় তোমার জন্য চিন্তিত হইতে হইত। এইরূপে আমার কত সময়ই নষ্ট হইত, তাহার ঠিক নাই। এই সময় আমি বি, এ, পড়িতেছিলাম। মোকদ্দমার পরেও সেজদাদা আমাকে অন্যান্য অনেক রকম কাজে নিযুক্ত করিতেন। সুতরাং আমি আর বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলাম না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবজীবন।

ধর্ম্মবিষয়ে আমার মনে যে আন্দোলন চলিতেছিল, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের গ্রামের সেই বন্ধুদের সঙ্গে আমার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যত বার দেশে যাইতাম, ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। এই সময়ে কেদার প্রচারক হইবেন বলিয়া শ্রীপুর গমন করেন। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, ব্যাকুলতা, ফণীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পঞ্চাননের সরলতা আমার অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। পঞ্চানন আমার সঙ্গ প্রায় ছাড়িতেন না। দুই জনে প্রায়ই নদীতীরে ভ্রমণ করিতাম। তিনি গান করিতেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিত। আমাকে ফিরাইবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কোথা হইতে দেবতা যেন ইঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ের আর একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একদিন শ্বশুর-বাটীতে আমার নিমন্ত্রণ হইয়াছে, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। তাহার পর শুনিলাম, টাকী ব্রাহ্ম-সমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে। আমি বলিলাম আমিও যাইব। যাইতে হইলে তোমাকে ছাড়িয়া যাইতে হইবে; সেই শীতে রাত্রি তিনটার সময় শয্যা পরিত্যাগ করিয়া নদী পার হইতে হইবে, নহিলে উৎসব স্থানে পৌছিতে বিলম্ব হইবে। রাত্রি ১১টার সময় আহার ও তারপর শয়ন করিয়া শীতকালে রাত্রি তিনটার সময় উঠা যে কি কষ্টকর তাহা বুঝিতেই পার। চিরবন্ধু

ফণীকে বলিলাম, "আমাকে ডাকিও।" ফণী স্বীকার করিলেন। তিনি আমার পরম সহায় ছিলেন। তোমার পিত্রালয়ের উপরের ঘরে নিদ্রিত ছিলাম। ফণী আসিয়া ডাকিলেন। সেদিনকার সেই ডাক যেন শুধু শরীরকে নয়, আত্মাকেও চেতনাযুক্ত করিয়াছিল। উঠিয়া তোমাকে না বলিয়াই আস্তে আস্তে পলায়ন করিলাম। প্রাণে এমন এক আবেগ আসিল, মনে হইল যেন কুহকিনী আসিয়া ডাকিলেন, আমিও ভুলিয়া সঙ্গে চলিলাম। যমুনা নদী পার হইতে হইতে একজন "বলিহারি তোমারি" এই গানটি ধরিলেন। ও গানটি তাহার পূর্ব্বে আর কখনও শুনি নাই। আমার প্রাণ মুগ্ধ হইল। মনে কত ভাবের তরঙ্গ উঠিতেছিল তাহা আর বলিয়া শেষ করিতে পারি না। তারপর যখন সঙ্গীতের এই অংশটুকু গাওয়া হইল, "না ছিল এ সব কিছু আঁধার ছিল অতি" তখন আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। টাকী পৌঁছিলাম। শ্রীযুক্ত হরলাল রায় তখন আমাদের অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্ম। তিনিই উপাসনা করিলেন। উপাসনার পরে দাঁড়াইয়া যে প্রার্থনা করিলেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য! হাত দুখানি তুলিয়া চক্ষু নিমীলিত করিয়া কি অপূর্ব্ব শোভায় শোভিত হইয়াই যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তাহা বলিতে পারি না। না দেখিলে বোঝা যায় না। সেদিন টাকীতেই আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিলাম।

ফণীদের বাড়ী আমাদের মিলনের স্থান ছিল। এক দিন সন্ধ্যার সময় ধর্ম্ম-বন্ধুরা সঙ্কীর্ত্তন করিলেন; আমিও এক পার্শ্বে বসিয়াছিলাম। তাঁদের একখানি ঘর তখন নূতন হইতেছিল, সব জায়গায় মাটী তখনও সমান করা হয় নাই, সেই ঘরেই সঙ্কীর্ত্তন হইল। প্রথমে বসিয়া সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, তাহার পর ক্রমে ক্রমে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। গান হইতেছে—"তুমি পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি, বামন জনায় চাঁদ ধরাও নাথ।" একটু পরেই প্রদীপ নিবাইয়া দেওয়া হইল। অন্ধকারে তাঁহাদের সেই প্রমত্ত কীর্ত্তন আমি কখনই ভুলিব না। তাঁহাদের সেই প্রমত্ত অবস্থা দেখিয়া আমি গোপনে বলিতে লাগিলাম, 'ভগবান্ ইহাদিগকে যে সুখ দিয়াছ, আমাকে কি তাহা দিবে না?' এ কথা যতই বলি ততই আমার চক্ষের জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এমন মিষ্ট ক্রন্দন আর কখনও কাঁদি নাই।

এইরূপে আমি ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিলাম। এক দিকে তোমার আকর্ষণ, অপর দিকে ব্রাহ্মবন্ধুদের আকর্ষণ, দুই-ই বাড়িতে লাগিল। কলিকাতায় আসিয়া ব্রাহ্মবন্ধুদের সঙ্গে উৎসবে যোগ দিলাম। ১৮৬৮ সালের মাঘোৎসব এক স্মরণীয় ব্যাপার। সেই বার প্রথম নগর সঙ্কীর্ত্তন হয়। "তোরা আয় রে ভাই এত দিনের দুঃখের নিশি হল অবসান, নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম" এই গান হইয়াছিল। আমার মন এই গানে মাতিয়া গেল। সেই সময় হইতে নিয়মিতরূপে ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের উপাসনায় যাইতে আরম্ভ করিলাম। বন্ধু ফণী এই সময়ে আমার অনেক সাহায্য করিতে লাগিলেন।

১৮৬৮ সালের শেষভাগে ছুটীতে দেশে গেলাম। এই সময়ে এক পরীক্ষায় পড়িতে হইয়াছিল। ১৮৬৯ সালের কলিকাতার মাঘোৎসবে আমি যাইব এই স্থির ছিল। সেই সময়ে তুমি একদিন বিষাক্ত কুল খাইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলে। দুই তিন জন ডাক্তার ডাকাইয়া চিকিৎসা করা হইল। বিষ উঠিল না, কিন্তু ঔষধের গুণে নষ্ট হইল। তাহার পর তোমার জ্বর হইল। সেই দিন আমার কলিকাতা যাইবার কথা। মনটা বড়ই ব্যাকুল হইল। কলিকাতা যাই, কি এরূপ গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত স্ত্রীর শুশ্রূষা করি! সকলে আহার করিয়া শয়ন করিল। তোমাকে যত্নে শয্যায় শায়িত করিয়া দিলাম। মশারি ফেলিয়া চারি দিক ঠিক করিয়া গৃহত্যাগ করিলাম। মাতা কত নিষেধ করিলেন, তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। উত্তরে বলিলাম, "নদীতে জোয়ার আসিয়াছে, আমি আর বিলম্ব করিতে পারিব না।" কলিকাতার উৎসব যায়, আমি কি থাকিতে পারি? তোমাকে ফেলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু নৌকায় আসিয়া অন্ধকারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে নিদ্রা হইল। সে বার উৎসব কলিকাতার অতীব আশ্চর্য্য বোধ হইতে লাগিল। সে বার নাকি বিধাতার জন্য প্রথম ত্যাগ স্বীকার করিলাম, তাই প্রভুর করুণা বেশী মাত্রায় ভোগ করিলাম।

যখন নূতন সেজবধূর সহিত তুমি কলিকাতায় আসিলে, তখন হইতে আমার ধর্ম্ম তোমাকেও দিতে যত্ন করিতে লাগিলাম। প্রতিদিন প্রভাতে একটি করিয়া গান করিতাম ও একটু প্রার্থনা করিতাম। "গাও তাঁরে গাও সদা তরুণ ভানু" এই গানটি প্রায় রোজ গান করিতাম। তুমি উঠিয়া বসিতে, তারপর প্রার্থনা হইত। এই সময় একদিন আমার মাতা তোমাকে ষষ্ঠী করিতে বলেন। ষষ্ঠীতে ভাত খাইতে হয় না, আমার ইহা কুসংস্কার মনে হইল। আমি বলিলাম, তোমাকে ভাত খাইতে হইবে। শাশুড়ীর কথা রক্ষা করি, কি স্বামীর কথা রক্ষা করি, এই উভয়-সঙ্কটে পড়িলে। আমি কিন্তু তখন একথা জানিতে পারি নাই। পরে শুনিলাম যে, তুমি দুই দিক রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলে। বৈকালে অন্ন গ্রহণ করিয়া রাত্রে পুরী খাইয়াছিলে। আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম তখন তুমি বলিলে ভাত খাইয়াছি। মাতার কাছে কি বলিয়াছিলে, জানি না। বালিকা বলিয়া তখন বুঝিতে পার নাই যে, দুই দিক রক্ষা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

ইহার কিছুদিন পরে মাণিকতলা হইতে মির্জাপুরে বাসা পরিবর্ত্তন হয়। মেয়েদের লইয়া আসিবার ভার আমার উপরে পড়িল। এরূপ ভার কিছু নূতন নয়। সকলেই আমাকে ভালবাসিতেন আর এরূপ ভার প্রায় আমাকেই দেওয়া হইত। এরূপ সেবায় আমি কখনও পরাঙ্মুখ হইতাম না। পদব্রজে আমি আগে আগে, মাতা ও অন্যান্য বধূরা পশ্চাতে যাইতেছিলেন। একবার ফিরিয়া দেখি যে তোমরা সকলে কাপড়ে কাপড়ে সংযুক্ত করিয়াছ। যেন এক গাছা মানুষের শিকল চলিতেছিল। দেখিয়া বড় হাসি পাইল। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, পথ ভুলিয়া যাইবার ভয়ে এইরূপ করিয়াছ। বাল্যকালে এই অবস্থা, আর শেষ জীবনে একাকী কত সময় রেলপথে চলিয়া গিয়াছ; যেখানে নির্ভীকতার প্রয়োজন হইয়াছে, তুমি কখনও পশ্চাৎপদ হও নাই।

কিছুকাল পরে তোমার সন্তান হইবে বলিয়া তুমি পিত্রালয়ে গেলে। সেখানে গিয়া তোমার জ্বর হইল। ৮ মাসের সময় অত্যন্ত অধিক জ্বর হইল ও দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এদিকে কলিকাতার বাসায় নূতন সেজবধূ মারা গেলেন। তোমারও অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন হইল। তোমার জীবনের আশঙ্কা হইল। অবশেষে তোমার মেসো মহাশয় ডাক্তার

শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দত্ত তোমার প্রাণরক্ষা করাই প্রয়োজন বলিয়া গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সমুদয় আয়োজন ঠিক হইল। কোন্ ঘরে ঐ কাজ হইবে, কোন্ কোন্ ঔষধের আবশ্যকতা, সমুদয় ঠিক হইল। এত বড় কাজ একাকী করা ভাল নয়, এই বলিয়া টাকী হইতে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী বড় ডাক্তার শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ঘোষ মহাশয়কে আনিতে পাঠান হইল। টাকী যাইতে হইলে নদী পার হইতে হয়। নদীতে তুফান উঠিল, সেই জন্য সে রাত্রে ডাক্তার আনিতে পারিলেন না। অতি প্রত্যূষে বড় ডাক্তার আসিবেন, ও ঔষধ প্রয়োগ করিয়া গর্ভস্থ শিশু বধ হইবে, এ বিষয়ের সকল আয়োজন ঠিক রহিল। মানুষেরা সন্তান বধ করিবার সমুদয় উপকরণ ঠিক করিলেন, কিন্তু ভগবান তো মানুষের মতে চলেন না! রাত্রেই বেদনা উপস্থিত হইল। প্রসূতি তুমি ডাক্তারদের সমুদয় ষড়যন্ত্র শুনিতে পাইয়াছিলে! কাহাকেও না বলিয়া রাত্রি দুইটার সময় একাকী দৌড়িয়া নীচের ঘরে আসিলে। অক্লেশে তোমার প্রথম সন্তান সুসারবাসিনী জন্মগ্রহণ করিলেন। যে ঘর তাঁহার মৃত্যু-গৃহ স্থির হইয়াছিল সেই ঘরে তাঁহার জন্ম হইল। গোবিন্দ ডাক্তার প্রাতঃকালে আসিয়া দেখেন, বাটীতে ধূম নির্গত হইতেছে। সকলেই আনন্দিত হইলেন। আমি সংবাদ পাইয়া ভগবানকে কতই যে ধন্যবাদ দিলাম তাহার আর ঠিক নাই। এইরূপে জানিতে পারিলাম যে, তিনি যাহা বিধান করেন তাহার আর অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই।

এ সকল কথা তোমারই মুখে শুনা, আবার তোমাকেই বলিতেছি। এই ঘটনায় তোমার ইচ্ছাশক্তির প্রথম জন্ম হয়। তোমার মনে যদি প্রবল বেগ না আসিত, শিশুর প্রাণরক্ষার জন্য এমন ব্যাকুলতা না আসিত, তাহা হইলে সে রাত্রে কন্যা সুসার কেমনে রক্ষা পাইতেন, বল? এই ইচ্ছাশক্তির বলেই পরবর্ত্তী জীবনে তুমি সংযম শিখিতে পারিয়াছিলে। শরীরের সমুদয় আসক্তি হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছিলে।

১৮৭০ সালের শীতের ছুটিতে দেশে গিয়াছিলাম। সেই সময়ে ৺রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের বক্তৃতা পড়িতে ভাল লাগিত। একদিন সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া নিদ্রার পূর্ব্বে উক্ত পুস্তক একমনে পাঠ করিতেছিলাম। ভীষণ শ্মশানের কথা পাঠ করিতেছি, এমন সময় তুমি শয়নগৃহে প্রবেশ করিলে, ও আমাকে নিবিষ্ট মনে পাঠ করিতে দেখিয়া বিদ্রূপচ্ছলে কি বলিতে লাগিলে। তাহাতে আমার মনে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হইল। ভাল ভাবে বলিলাম যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে কৌতুক করিলে অত্যন্ত ব্যথা পাই। সেই যে তুমি নিবৃত্তি হইলে আর তুমি কখনও আমার বিরোধী হও নাই। ইহার পর হইতে আমি তোমার চরিত্রের উন্নতির জন্য যাহা কিছু চেষ্টা করিতাম, তুমি সে সকলের পক্ষপাতিনী হইতে। বাল্যকাল হইতে গ্রামে প্রতিপালিতা বলিয়া গ্রামের লোকেদের মত তুমিও ছোট ছোট বিষয়ে সত্যের অপলাপ করিতে। আমার তাহাতে অত্যন্ত ক্লেশ হইত। আমার কথাতে তুমি তাহা একেবারে পরিত্যাগ করিলে। ক্রমে তুমি আমার ধর্ম্মবিশ্বাস সকল গ্রহণ করিতে লাগিলে. আমার মনে আর আনন্দ ধরিত না। এই সময়েও রাত্রিতে গোপনে শয্যাতে বসিয়া তোমাকে পড়াইতাম ও তোমাকে লইয়া প্রার্থনা করিতাম। তখনও তুমি ব্রাহ্মসমাজের মুখ দেখ নাই। ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকাদি অতি অল্পই পাঠ করিয়াছিলে। পাঠ করিবার ক্ষমতাও তত ছিল না।

আমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শীঘ্রই তোমাকে পরীক্ষায় পড়িতে হইল। ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস উপস্থিত হইল। সে সময়ে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্তর বিবাহের উদ্যোগ হইতেছে। বিবাহাদির সময় আমাদের দেশে জলসওয়া বলিয়া একটা অনুষ্ঠান করা হয়। পাঁচ বাড়ী হইতে জল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সেই জলে কন্যাকে বিবাহের পূর্ব্বদিন স্নান করান হয়। আমাদের দেশে জলভিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাদ্যকর বাদ্য বাজায় এবং কুলনারীরা কুৎসিত সঙ্গীত করিতে থাকে। এ প্রথা আমার অত্যন্ত দোষাবহ মনে হইত। আমি তোমাকে বলিয়া দিলাম, তুমি একার্য্যে যোগ দিও না। আমার কথা রাখিতে গিয়া তুমি অত্যন্ত তিরস্কৃত হইয়াছিলে। এ বিষয়ে কন্যা বসন্ত নিজেই লিখিয়াছেন :—"আমার বিবাহ ১২৭৭ সালে ১৬ই ফাল্গুন সোমবার হয়। আমার বয়স তখন ১১ বৎসর। জলসওয়ার জন্য কাকিমাকে অত্যন্ত নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল। বিবাহের পূর্ব্বদিন রাত্রে জলসওয়া এবং সকালে বড়ি দেওয়া ও ক্ষীর করা হয়। ঐ দিন ঠাকুরমা কহিলেন, 'বসন্তর মা নাই, এবং এখানে অন্য খুড়ী জেঠাই নাই; শাস্ত্রের সমুদয় তোমাকেই করিতে হইবে। যদি না কর, তাহা হইলে বাড়ী হইতে দূর হও। যদি কন্যার কোন অমঙ্গল হয়, জানিতে পারিবে'। এই সময় সেজ জেঠাইমাও আসিলেন ও বলিলেন, 'ছিঃ তোমার লজ্জা হয় না? আঘাটায় যাইয়া গলায় কলসী বাঁধিয়া ডুবিয়া মর,' এত নির্য্যাতনেও কাকিমার বিশ্বাস অটল রহিল। সেদিন সমস্ত দিন কাঁদিয়া অনাহারে কাটাইয়াছিলেন। কাকিমা কেন এরূপ সকলের অবাধ্য হইয়াছিলেন, তখন কিছুই বুঝিতাম না। রাত্রে যখন জলসওয়ার সময় হইল, প্রথমে সকলেই তাঁহাকে ডাকিল। তিনি যাইতে অস্বীকার করিলে সকলে বলপূর্ব্বক টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমি মাঝের দালানে বসিয়াছিলাম। যখন তাঁহাকে টানাটানি করা হয়, দেখিয়াছিলাম।"

তোমাকে তো এইরূপে বলপূর্ব্বক লইয়া যাওয়া হইল; আমি আমার মনের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করিবার অন্য উপায় না পাইয়া আমার ঘরের দ্বার বন্ধ করিয়া রহিলাম, রাত্রিতে যখন তোমাকে লইয়া সকলে ঘরে ফিরিলেন, আমি আর তোমাকে ঘরে আসিতে দিই নাই। তোমার দোষ ছিল না; আমি আর সকলের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে না পারিয়া তোমাকেই আরও একটু কষ্ট দিলাম। যাহা হউক, এই ঘটনার পর হইতে তোমাকে ও আমাকে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে অনেক বার দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তুমি আমার অনুগত হইয়া প্রত্যেক বারই বিশ্বাস রক্ষা করিতে যত্ন করিয়াছ। এইরূপ সংগ্রামের সম্মুখীন হইবার সময় ইহার পর হইতে আমি তোমার নিকটে আশ্চর্য্য সাহায্য পাইয়াছি। তুমি পূর্ব্বে কিছুই শিক্ষা পাও নাই, কিন্তু কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সময় তোমার যে দৃঢ়তা দেখিতে লাগিলাম, তাহাতে অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। পরবর্ত্তী জীবনে এই সাহসের এমন বিকাশ হইয়াছিল যে, দেখিয়া অন্যেরাও চমৎকৃত হইত।

ঐ অবস্থায় বিরুদ্ধ সমাজের মধ্যে, বিপুল পরিবারের মধ্যে, সকলের লাঞ্ছনা-গঞ্জনার মধ্যে তোমাকে একাকিনী রাখিয়া আমি

কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম। এমন সময় দেশে আর একটি হুলস্থুল উপস্থিত হইল। আমাদের বন্ধু কেদার ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করিলেন। কলিকাতায় আমরা একেবারে উল্লসিত হইয়া উঠিলাম। কয়েক দিন আমাদের সেই আনন্দে ও উৎসাহে কাটিল। পরলোকগত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয়ের কন্যার সহিত কেদারের বিবাহ হয়। আমাদের দেশের আর কোনও লোক এ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মবিবাহ করেন নাই। দেশের সকলে, বিশেষতঃ টাকীর বাবুরা, চেষ্টা করিলেন যাহাতে অপরাধীদিগকে একঘরে হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু অনুসন্ধানে তাঁহারা জানিলেন যে, প্রায় সকল ঘর হইতেই দুই-একজন করিয়া বিবাহে যোগ দিয়াছিলেন, শাস্তি দিতে হইলে অনেক ঘরকে একঘরে করিতে হয়। সুতরাং তাঁহাদের মনের সাধ মিটিল না। তুমি একজন প্রধান অপরাধীর স্ত্রী, নিজেও কয়েক বার দোষী হইয়াছ; তোমার লাঞ্ছনা বাড়িতে লাগিল। এই সময়ে আমাদের বন্ধু মোহিনীমোহনের সাধ্বী স্ত্রীও একাকিনী দেশের বাটীতে স্বীয় বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন। চারি দিকে বিরুদ্ধ দল, তাহারই মধ্যে তিনি কেমন নিত্য উপাসনা ও প্রার্থনা করিতেন, তাহা তুমি বিলক্ষণ অবগত আছ। তোমার সঙ্গে তাঁহার যে মিলন হইয়াছিল তাহাও ঈশ্বরের কৃপা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। তাহা না হইলে কে তোমাদিগকে মাঝের বাড়ীর পুকুরের ঘাটে একত্র করিয়া ধর্ম্মালাপ করিবার উপায় বলিয়া দিত? এ সকল তাঁহারই কৃপা!

এদিকে আমার জীবন-সংগ্রাম ঘনীভূত হইয়া আসিতে লাগিল। বি-এ পড়া ঘুচিয়াছে। কিছুদিন আইন পড়িয়াছিলাম। তখন ভাবিতাম উকীল হইব, অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিব, পরিবারদিগের ভরণপোষণ করিব, অনেকের সাহায্য করিব। পাগলের মত কতই কি ভাবিতাম; তোমাকে বলিতে কিছু সঙ্কোচ নাই, তাই বলিতেছি, হাইকোর্টের জজ হইবার কথাও ভাবিতাম। ব্রাহ্ম হওয়ার পর আইন-ব্যবসায় সম্বন্ধে সন্দেহ আসিল। আমাদের গ্রামের হরি দত্ত মহাশয় উকীল ছিলেন। তিনি বলিলেন, আইন-ব্যবসায়ে বিবেক ঠিক রাখা যায় না। কি করি! এদিকে সুসারবাসিনী জন্মগ্রহণ করিয়াছে, আমারও বয়স বাড়িয়া চলিয়াছে, পরিবারের মধ্যে অনুপার্জ্জক ভাইয়ের স্ত্রী বলিয়া ও ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়াছ বলিয়া তোমার অবস্থাও প্রীতিকর নয়। এই সকল চিন্তা মনকে বড়ই আন্দোলিত করিতে লাগিল। তোমাকে লইয়া একত্র থাকিবারও কোন উপায় নাই। তোমাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে, লেখাপড়া শিখাইতে, আমার মন ব্যাকুল হইত, তাহার কোনও উপায় দেখিতেছিলাম না। অবশেষে পোষ্ট আফিসের কার্য্য শিখিতে আরম্ভ করিলাম। দুই মাস শিক্ষানবীশ থাকিয়া ১৮৭১ সালের ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলাম ও অস্থায়িরূপে বর্দ্ধমানের পোষ্টমাষ্টার হইয়া গেলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথম গৃহস্থালী।

৫ই এপ্রিল ১৮৭২ বর্দ্ধমান গিয়াছিলাম। সেখানকার মাসিক আয় ছিল ৩৭॥৹ টাকা। বর্দ্ধমানে আসিবার জন্য তুমিও ব্যস্ত হইয়াছিলে, আমিও তোমাকে আনিতে ব্যস্ত হইয়াছিলাম। চলিবে কিরূপে, কিছু ভাবিলাম না; তোমাকে লইয়া আসিলাম। আনিয়া তোমার গুণের পরিচয় পাইতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণী রাখিয়াছিলাম, তুমি আসিয়াই তাহাকে ছাড়াইয়া দিলে। প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় বস্তু প্রতিদিন বাজার হইতে আসিত। ডাক-ঘরের কাজে অনেকক্ষণ আফিসে থাকিতে হয়। রাত্রি ৮টার সময় আমি বাসায় ফিরিয়া আসিতাম। তুমি সন্ধ্যার সময় কাজ শেষ করিয়া প্রদীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিতে। যখন আমি বাড়ী ফিরিতাম তুমি প্রদীপ জ্বালিয়া আহার দিতে। এইরূপে সুব্যবস্থার দ্বারা ঐ সামান্য আয় হইতে তিন জনের খরচ বাদে তিন মাসে ৫০৲ টাকা বাঁচাইয়াছিলে।

আহার করিয়াই নিদ্রা যাইতাম। তখনকার নিদ্রা আশ্চর্য্য ধরণের ছিল, আত্মাও যেন নিদ্রিত ছিল! উপাসনা সপ্তাহে একদিনও হইত না। শয়ন করিবার সময় একবার পিতাকে ডাকিতাম, উঠিবার সময় ভগবানকে ডাকিয়া উঠিতাম। সদালাপ সৎপ্রসঙ্গ কিছুই হইত না। মনটা শুকাইয়া যাইতেছিল। একদিন সন্ধ্যার সময় একটা মাঠের মধ্যে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। মধ্যে একদিন বন্ধু কেদার ও ফণী আমাকে দেখিতে আসিলেন ও আমার অবনতি দেখিয়া অত্যন্ত সন্তপ্ত হইলেন। আমিও আমার অবস্থা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু কি করিব? কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার আর তখন কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তোমার দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনী হইবার কিছুদিন পূর্ব্বে তোমার মা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। আমিও দেখিলাম, সেই অনুরোধ রক্ষা করাই মঙ্গল। তোমার পিত্রালয়ের গোমস্তা বেণী দাদা তোমাকে লইতে আসিলেন। যাইবার দিন সমস্ত রাত্রি ক্রন্দন করিলে এবং আমাকেও কাঁদাইলে। কে কাহাকে কাঁদাইল, তাহা বলিতে পারি না। প্রাতঃকালে রেলেও তুমি ক্রন্দন করিলে। তোমাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিয়া আমি যে কত ক্রন্দন করিলাম, তাহা এখন বলিতে লজ্জা হয়।

সেই তুমি পরে স্বেচ্ছাক্রমে আমাকে ছাড়িয়া জ্ঞানশিক্ষার জন্য কত দিন অন্যত্র ছিলে; বিদায়ের সময় একবিন্দু অশ্রুপাত কর নাই; ইহলোকের শেষ বিদায়ের সময়ও বিনা ক্রন্দনে চলিয়া গেলে!

পিত্রালয়ে তোমার দ্বিতীয় সন্তান সরোজিনী হইল। কিন্তু তোমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িল। দেহ প্রায় রক্তহীন হইল, তবু শোণিত কোনরূপেই বন্ধ হয় না। সকলের ভাবনা হইল। ডাক্তার হার মানিলেন, কোন ঔষধ কাজ করে না। তুমি স্বপ্ন দেখিলে যে গ্রামের বামা ধোপার কাছে ঐ রোগের ঔষধ আছে। বামা ধোপা আসিল, কিন্তু প্রথমে স্বীকার করিল না। পরে তাহার প্রদত্ত শিকড়ে শোণিত পড়া বন্ধ হইল।

সরোজিনীও হইল, বর্দ্ধমানের অস্থায়ী চাকরীও ফুরাইল। তুমি অতি যত্নে গৃহস্থালী করিয়া যে ৫০টি টাকা জমাইয়াছিলে, তাহা লইয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম। কলিকাতায় আসিবামাত্র কেদার বলিলেন, 'আমার ছাপাখানার অংশীদার হও'। তিনি তখন 'রায়' প্রেস বলিয়া একটি প্রেস খুলিয়াছেন। শূন্য বখরা,—টাকা তাঁহার, পরিশ্রম আমার। এই কাজ আমার বড়ই ভাল বোধ হইল। স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিব, অর্থও হইবে, ধর্ম্মও হইবে, কলিকাতায় ধর্ম্মবন্ধুদের নিকটে থাকিতে পাইব, তোমাদের উন্নতি করিব, এইরূপ অনেক আশা হইল। এই সময় শরীরকে শরীর জ্ঞান করিতাম না। কত যে পরিশ্রম করিতে পারিতাম তাহা এখন ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। নিত্য দুই তিন ক্রোশ চলা আমার কাছে কিছুই মনে হইত না। কত সাহেবের কাছে গিয়াছি, কত লোকের খোসামোদ করিয়াছি, তাহার ঠিক নাই। কিন্তু একটি পয়সা খরচ করিতাম না, ব্যবসায়ের পয়সা

খরচ করিতে যেন আমার মন চাহিত না। ব্যবসা বেশ চলিতে লাগিল। কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত ব্যবসা করিলে যে মানুষের লাভ হয়, তাহাতে আমার আর কোন সন্দেহ রহিল না।

আমি ছাপাখানার কাজ করিতে গেলাম বটে, কিন্তু তোমার দশা কি হইল? বর্দ্ধমানের গৃহস্থালীর অবসানের পর তোমার অবস্থা পূর্ব্বে যেমন ছিল আবার তেমনি হইল। পরের অধীনে, পিত্রালয়ে কিম্বা আমাদের বাটীতে কন্যা দুইটিকে পালন করা ও আমার জন্য আত্মীয়দের গঞ্জনা সহ্য করা এই তোমার কাজ ছিল। দেশে ঝি চাকর পাওয়া যায় না। কূলবধূর সমুদয় কাজ, চিড়ে কোটা, গরুর জাবকাটা, এ সকলই তোমাকে করিতে হইত। সকালে উঠিয়া বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, গোবর দেওয়া, এ সকল নিত্যকর্ম্ম ছিল। এদিকে ছাপাখানাতে যাহা কিছু আয় হইত তাহা মূলধনেই রহিয়া যাইত। তোমাকে কিম্বা বাড়ীতে কোন সাহায্য করিতে পারিতাম না। তোমার যদিও অনেক অভাব হইত, কিন্তু কখনও আমার কাছে টাকা চাহিতে না।

ঐ সকল কারণে আমার মন সব সময় ভাল থাকিত না। তোমারও মন স্থির থাকিত না। একদিন তোমাকে কি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার কোন অংশ পাঠ করিয়া তোমার মনে আশঙ্কা হইল যে, আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইব। যেমন পত্র পাঠ, অমনি বেণী দাদাকে ডাকিয়া বলিলে, বাবুজীকে আনিয়া দাও। তিনি বলিলেন, "তাহাও কি হয়? কার্য্যস্থানে কার্য্য করিতেছেন, হঠাৎ কিরূপে আসিবেন? বিশেষতঃ পয়সা কড়ির অভাব, আমি এখন কিরূপে কলিকাতা যাইব?" তোমার তখন মনের যেরূপ অবস্থা তাহাতে তোমাকে নিরস্ত করা ও পর্ব্বত-নিঃসৃত বেগবতীর বেগকে নিবারণ করা একই। পয়সা নাই শুনিবামাত্র গলার হার খুলিয়া তাহার হাতে দিয়া বলিলে, "ইহা দ্বারা সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ কর, কিন্তু দুই দিনের মধ্যে বাবুজীকে আনিয়া দাও।" কাজেই বেণী দাদা কলিকাতায় আসিলেন। তাঁহার মুখে সংবাদ শুনিয়া আমি অবাক। তোমার আজ্ঞা পালন করিতে হইল। বাটী গিয়া তোমাকে কত ভয় দেখাইলাম। বলিলাম, যদি বেণী দাদার পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি সন্ন্যাসী হইয়া চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে তুমি কি করিতে? তুমি বলিলে, গৃহ ছাড়িতাম, গেরুয়া পরিতাম, ভস্ম মাখিতাম, আর দেশে দেশে ঘুরিতাম, যতদিন তোমার সাক্ষাৎ না পাইতাম। আমি ভাবিলাম, ধন্য তোমার অনুরাগ!

১৮৭৩ সালের পূজার সময় বাটী গেলাম। বাটীতে গিয়া বড়ই ক্ষুব্ধ হইলাম। দেখিলাম, আমি যে তখনও বাড়ীর খরচের কিছুই সাহায্য করিতে পারিতেছি না, ইহাতে সকলে অসন্তুষ্ট, কিন্তু কথা শুনিবার বেলা তোমাকেই শুনিতে হয়। আমি চাকরী না করিয়া স্বাধীন ব্যবসা দ্বারা অর্থবান্ হই, এটা কাহারও ইচ্ছা নয়। সকলেই বলিতে লাগিলেন এক ভাইয়ের উপার্জ্জনে আর কত হইবে? এক দিন আমার সম্মুখে এমন কিছু কথা বলা হইল, যাহাতে আমার বড় অপমান বোধ হইল; মনে বড় ব্যথা পাইলাম। রাত্রিতে এইরূপ হইল, পরদিন প্রাতে টাকী চলিয়া গেলাম। পথে যমুনা নদীর বক্ষে একাকী কতই কাঁদিলাম, কেহই দেখিল না। প্রতিজ্ঞা করিলাম, ব্যবসা ছাড়িয়া চাকরী করিব। অন্যের গলগ্রহ হইয়া আর থাকিব না; অন্যের অর্থে আমার পরিবার প্রতিপালন হইতে আর দিব না। যদি চাকরী করিতে পারি, বাটী ফিরিব, নইলে আর ফিরিব না। সেই রাত্রে তোমার সঙ্গে বাটীতে শেষ বিদায়। সেই বিদায় হইতে আমার জীবনের গতি ফিরিল। সেই বিদায় ও ক্রন্দন আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। পরলোক হইতে তুমিও কি তোমার অতীত জীবনের সেই দিন স্মরণ কর না?

তোমাকে ছাড়িয়া আমি কলিকাতায় আসিলাম। সেজদাদা মহাশয়কেও বলিলাম না। ছাপাখানার লাভের টাকা হইতে ৪০৲ টাকা লইয়া কেদার, ফণী ও দেবেন্দ্রকে বলিয়া কলিকাতা ছাড়িলাম। এই যে ভাসিতে আরম্ভ করিলাম, দু তিন মাস কাটিয়া গেল, কত দেশে ঘুরিলাম, আমার নিরুদ্দেশ ভ্রমণ আর ফুরায় না। অনেক ক্লেশ সহিয়া, অনেক ঘুরিয়া, অন্ধকারের চূড়ান্ত দেখিয়া, অবশেষে বগুড়ার পোষ্টমাষ্টারের কাজ পাইলাম। সেটাও ভাল মনে হইল না বলিয়া ছাড়িলাম। তারপর হরিনাভিতে দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষে তথায় গমন করিলাম। বন্ধু শিবনাথ সেখানে তখন প্রধান শিক্ষক ছিলেন।

এত দিন যে তুমি বাড়ীতে একাকিনী ছিলে, আমার বন্ধু কেদার ও ফণী তোমাকে পত্র দিয়া, ও প্রয়োজন হইলে অর্থ দিয়া কত সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাদের সে ভালবাসা তুমি জীবনে কখনও ভুল নাই, আমিও যেন না ভুলি।

হরিনাভির এই কাজে আমি অধিক দিন থাকিব কিনা তাহা স্থির করিতে পারি নাই। অন্যত্র কাজকর্ম্মের চেষ্টাও করিতেছিলাম। এই জন্য তোমাকে সেখানে লইয়া যাইতে বিলম্ব হইল। ১৮৭৪ সালের মার্চ্চ মাসে তোমাকে ও কন্যা দুটিকে সেখানে লইয়া গেলাম। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তুমি মিশিতে লাগিলে। ব্রাহ্ম পরিবার যে কত উন্নত হয়, ও একত্র উপাসনার যে কত সুফল, তাহা অনুভব করিবার সুযোগ পাইলে। স্বামীর সঙ্গে ও স্বামীর ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে একত্র বাস করিবে, স্বাধীন ভাবে নিজের সংসার করিবে, ও সেই সংসারে নিজের প্রাণের ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলিবে, এই সকল আশা অনেক দিন হইতে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছিলে। এতদিন আমি বিদেশে ছিলাম, আমার জন্যও কত ব্যাকুল হইয়াছিলে। এইবার তোমার এ সকল বাসনা পূর্ণ হইতে চলিল। তাই এখানে আসিয়া তুমি অতিশয় সুখী হইলে। শিবনাথের পরিবারের সঙ্গে তোমার বন্ধুতা হইল। তাঁহার কন্যার আবদার রক্ষার জন্য স্বহস্তে একদিন আপন কন্যা সুসারের বড় চুল কাটিলে। আরও কত কি প্রেমের ব্যাপার হইবার সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমাকে শীঘ্রই হরিনাভি ছাড়িয়া যাইতে হইল। আমি মতিহারীতে দুর্ভিক্ষের রিলীফ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কাজ পাইলাম। এ কাজে বেতন অধিক, ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনাও অধিক, তা ছাড়া গবর্ণমেণ্টের কাজ, এই সকল কারণে তথায় যাওয়াই স্থির করিলাম। বন্ধু শিবনাথও বলিলেন, এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আসিবার সময় তুমি ও তোমার কন্যাগুলি ও শিবনাথের পত্নী ও কন্যা এত ক্রন্দন করিয়াছিলে যে, সে কান্নার রোল আমি ভুলিতে পারিব না। কান্নাকাটির ফল এই হইল যে, তাড়াতাড়িতে ধোপার কাপড়গুলি আনা হইল না। সন্ধ্যার সময় শিবনাথ সেই বস্ত্রগুলি নিজে বহন করিয়া আমাদের বাদুড়বাগানের বাটীতে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। তোমাকে সেখানে রাখিয়া আমি মতিহারী যাত্রা করিলাম। এইরূপে তোমার হরিনাভির গৃহস্থালীও অল্পদিনের মধ্যেই ফুরাইল।

[ক্রমশঃ।

লর্ড ক্লাইভের পত্র

[ওয়াট্‌সের পলায়নের পর নবাব বুঝিলেন, ইংরাজের শান্তি-কামনা মৌখিক মাত্র। তাই তিনি কাল-বিলম্ব না করিয়া ফরাসী লকে তাঁহার কাছে আসিতে পত্র লিখিলেন। যখন তিনি চরমুখে শুনিলেন, ইংরাজ সৈন্য-সামন্ত লইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আগমন করিতেছে, তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সৈন্যগণ সহ পলাশী অভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ক্লাইভ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে হুগলীর নবনিযুক্ত ফৌজদার সেখ আমীরউল্লাকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলেন যে,—]

"আমি মুর্শিদাবাদ যাইতেছি, তুমি হুগলীতে চুপচাপ করিয়া থাকিলে তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। যদি তুমি একটু এদিক ওদিক কর, তাহা হইলে তোমার সহর ধ্বংস করিয়া ফেলাইব। ইংরাজকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর। তাহা হইলে তাহারাও তোমাকে সেইরূপ দেখিবে। তুমি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিও না, নবাবের সহিত আমাদের মনোমালিন্য আপোষে অথবা যুদ্ধ করিয়া যে পর্যান্ত না মিটমাট হয়, সে সময় পর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর।"

[পাছে ফৌজদার ইংরাজদের সংবাদ আদান-প্রদানে কোনরূপ বাধা প্রদান করে, তাহার প্রতীকারের জন্য "ব্রীজওয়াটার" নামক জাহাজ হুগলীর সম্মুখে নোঙ্গর করিয়া অবস্থান করে। সেখ সাহেবের ইংরাজ ভয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। কাজেই তিনি ক্লাইভের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন। বরাহনগর হইতে কিলপাটিক নৌকাযোগে রাত্রি ১১টার সময় চন্দননগরে ক্লাইভের সহিত মিলিত হইলেন। ক্লাইভ ১৩ই জুন ৬ শত ৫০ জন গোরা, ১ শত মেটে ফিরিঙ্গি, ১৫০ জন গোরা গোলন্দাজ, ৮টা কামান এবং দুই হাজার এক শত কালা সেপাই লইয়া অদৃষ্ট-পরীক্ষা করিতে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। বলা বাহুল্য, সাদার দল নৌকা করিয়া আর কালার দল পদব্রজে গমন করিয়া অপরাহ্ন তিনটার সময় নওসরাই উপস্থিত হয়। ১৪ই প্রাতঃকালে কালার দল আবার চলিতে লাগিল, রাস্তাঘাট ভাল না থাকায় তাহাদের ক্লেশের সীমা রহিল না, অজ্ঞাত প্রদেশে সন্দেহজনক ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্ভর না করিয়া ১ জন জমাদার, ১ জন হাবিলদার এবং ২৯ জন তেলেঙ্গা সেপাই ইংরাজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গমন করে।]

মিরজাফরের চিঠি

[মিরজাফর ১৯শে রবিবার মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া এক দিন অমানিগঞ্জে অবস্থান করেন। এ স্থানে তিনি স্বীয় পক্ষীয় লোকজন সংগ্রহ করিয়া পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হন।

মিরজাফর ক্লাইভকে এই সময়ে একখানি পত্রে নবাবকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করে। ক্লাইভ ২২শে জুন মিরজাফরকে যে পত্র প্রেরণ করেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা অতি উত্তমরূপে সূচিত হয়। তিনি যে কি করিবেন, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া লিখিলেন,—]

"আমি আপনার জন্য সমস্ত দায় মাথায় লইয়াছি, অথচ আপনি একটুও গা ঘামাইতেছেন না। আজ সন্ধ্যার সময় নদীর ও-পারে যাইব। আপনি যদি পলাশীতে আমার সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে আমি অর্দ্ধেক রাস্তায় গিয়া আপনার সহিত মিলিত হইব। এরূপ হইলে আমি যে আপনার জন্য লড়াই করিতেছি, এ কথা নবাবের সৈন্য সকল অবগত হইবে। ইহাতে আপনার গৌরব রক্ষিত হইবে এবং আপনিও সুরক্ষিত হইবেন। এরূপ করিলে আপনি নিশ্চয়ই এ দেশের সুবা হইবেন। আমাদের এইটুকু সাহায্য করিতেও যদি আপনি পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে ভগবান দেখিবেন যে, ইহাতে আমার কোন দোষ নাই। আপনার অভিমত লইয়া আমি নবাবের সহিত সন্ধি করিব। আপনার সহিত আমাদের যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। আমি আর বেশী কি বলিব, আমি আমার বিষয় যেরূপ ভাবি, আপনার সফলতা ও মঙ্গলের কথা সেইরূপেই ভাবিয়া থাকি।"

[মিরজাফর ক্লাইভের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২২শে জুন বাঙ্গালার ভাগ্যহীন নবাব সিরাজদ্দৌলা, মধ্যাহ্নকালে পলাশী-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। ডচদিগের পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, পরদিন প্রাতঃকালে ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া মোহনলাল, মীরমদন, মাণিকচাঁদ, খোজা হাদি, নবসিং হাজারী ইংরাজদিগকে ঘোরতর বিক্রমে আক্রমণ করেন। সিনফ্রে তাঁহার অধীনস্থ জরমান, পর্টুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতীয় সৈন্য লইয়া ইংরাজদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুড়িতে লাগিলেন। মিরজাফর দুর্ল্লভরাম, ইয়ার লতিফ প্রভৃতি নবাবের নিমকের নফর সকল নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিল। প্রাতঃকালে যখন নবাবের বিপুল বাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ইংরাজদিগের ক্ষুদ্র সেনাদলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন বোধ হইল, এইবার বুঝি বাঙ্গালা দেশ হইতে ইংরাজদিগের অস্তিত্ব চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্লাইভের মনের ভাব এ সময় কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র চিঠিতে বেশ প্রকাশ পায়।]

লর্ড ক্লাইভের চিঠি

পলাশী ২৩শে জুন ১৭৫৭
প্রাতঃকাল ৭টা।

"কর্ণেল ক্লাইবের নিকট হইতে জাফর আলি খাঁর নিকট আমার যা করবার, তা করিয়াছি, এর বেশী আর কিছু আমি

করিতে পারি না। যদি আপনি দাদপুরে আসেন, তাহা হইলে আমি পলাশী হইতে আপনার কাছে গমন করি। যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি নবাবের সহিত একটা স্থির করিব।"

[নবাবের বিশ্বস্ত সেনানী এবং সিনফ্রে-পরিচালিত সৈন্যগণ ইংরাজকে আক্রমণ করিলে অগত্যা তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। এক জন ফরাসীস বলেন, নবাবের এই সেনাদলের সহিত ইংরাজদের কিয়ৎক্ষণ বেশ যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে ইংরাজদিগকে কলিকাতা অভিমুখে পলাইবার উপক্রম করিতে হইয়াছিল।

বিশ্বাসঘাতকদিগের কপট পরামর্শ এবং যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মীরমদন এবং মোহনলালের জামাতা বাহাদুর আলি খাঁ যদি মৃত্যু-মুখে পতিত না হইতেন, তাহা হইলে ইংরাজেরা কখনই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইত না। যদি বৃষ্টিতে নবাবের বারুদ ভিজিয়া না যাইত, তাহা হইলে ইংরাজ জয়যুক্ত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ! ক্লাইব নবাবসৈন্য আক্রমণ করিলে, সেই সময় নবাবের বারুদের বস্তায় আগুন লাগিয়া সকলকে সম্মোহিত করিয়া ফেলে। ইহা যদি না ঘটিত, তাহা হইলেও ইংরাজের নবাব-সৈন্য জয় করা বড় সামান্য কথা হইত না। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রাজদ্রোহী মিরজাফর ক্লাইভকে লিখিলেন :—]

মিরজাফরের চিঠি

"আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি এই ময়দানে নবাবের কাছে ছিলাম—দেখিলাম, সকলেই ভীত হইয়াছে। তিনি আমাকে ডাকাইয়া তাঁহার পাগড়ী আমার সম্মুখে রক্ষা করেন, এক দিন কোরাণ স্পর্শ করিয়া আমাকে দিয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন, সেই জন্যই আমি আপনার কাছে যাইতে পারি নাই। ভগবানের কৃপায় আপনি শুভদিন প্রাপ্ত হইবেন। মীরমদনকে গোলা লাগিয়াছিল, সে মরিয়া গিয়াছে। বক্সী হাজারীও মরিয়াছে। ১০।১৫ জন অশ্বারোহী হত ও আহত হইয়াছে। রায়দুর্ল্লভ, লতিফকাদের খাঁ, আর আমি বাম দিক হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিয়াছি। একবার অকস্মাৎ দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করুন, তাহা হইলে সব পলাইবে, তার পর আমাদের যা কর্ত্তব্য, তাহা করিব। কর্ণেল, রাজা, খাঁ, এবং আমি—এই চার জনে মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিব। এখন আমরা নিশ্চয়ই কার্য্য সমাধা করিব। বেলদার ও গোলন্দাজেরা কথা অনুসারে কার্য্য করিয়াছে। আমি মহম্মদের নাম লইয়া শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি যে, উপরের কথা সত্য। রাত্রি তিনটার সময় আক্রমণ করুন, তাহারা পলাইবে, আমারও সুবিধা হইবে। সৈন্য সকল সহরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। যে কোন প্রকারে হউক, রাত্রে আক্রমণ করুন। আমরা তিন জনে নবাবের বামভাগে থাকিব। খোজা হাদি দৃঢ়তার সহিত নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। আপনি আসিলে তাহাকে বন্দী করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। আমরা তিন জনে আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত আছি, ধীরে ধীরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। বক্সী মরিয়াছে, সংগ্রামে আহত হইয়াছিল। পদাতিক এবং তরবারধারী সেনানীরা গড়খন্দী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কামানগুলা সেই স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছে। তাহাদের যৎসামান্য ক্ষতি হইয়াছে। আপনি যদি সৈন্য সহ তথায় উপস্থিত হইতে পারেন, তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না। সে সময় আমি দূরে ছিলাম, এ জন্য আমি দুঃখিত আছি। এ ঘটনার সময় আপনার লোক আমার কাছে উপস্থিত ছিল। কদম হোসেন, মীরণ, মিরকাসীম, লতিফ খাঁ এবং রাজা দুর্ল্লভরাম সকলেই কর্ণেল এবং সমস্ত জেণ্টলম্যানকে সেলাম জানাইয়াছেন।"

[পত্রখানি ক্লাইভ অপরাহ্ণ ৫টার সময় প্রাপ্ত হন। পাঠক, পত্রখানি একটু ভাল করিয়া পাঠ করুন, স্বাধীন মিরজাফরের পরাধীন হইবার উপক্রমকালে তাঁহার ভাষা কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে সেলামের বহরও কেমন বর্দ্ধিত হইল, তাহাও দেখিবার জিনিস! মিরজাফর নবাবের কাছে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিলেন, এখন আর যুদ্ধের আবশ্যক নাই, মোহনলাল ও সিনফ্রেকে প্রত্যাবর্ত্তনে করিতে আদেশ করুন, সৈন্যগণ আজ বিশ্রাম করিয়া পুনরায় কাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এ সময় মোহনলাল ও সিনফ্রে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। নবাবের আজ্ঞায় অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলে, কিলপাট্রিক-পরিচালিত ইংরাজসৈন্য নবাবসৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ক্লাইভ এ সময় পলাশী-ভবনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন, কিলপাট্রিক তাঁহার অনুমতি না লইয়া শত্রু-সৈন্য আক্রমণ করিয়াছেন। বীরপুরুষের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ কিলপাট্রিককে যথেষ্টরূপে ভর্ৎসনা করিলেন।]

লর্ড ক্লাইভের চিঠি

[নবাব-সৈন্য পলাশী হইতে পলায়ন করিলে পর ক্লাইভ তাহাদিগকে দাদপুর পর্য্যন্ত অনুসরণ করেন। সে রাত্রি তাঁহাকে দাদপুরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। প্রভাত কালেই ক্লাইভ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী মিরজাফরকে হস্তগত করিবার জন্য স্ক্রাফটনের হাতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের পত্রখানি প্রেরণ করেন। ক্লাইভের নিকট হইতে মিরজাফরের কাছে।]

দাদপুর ২৪শে জুন, ১৭৫৭

"এ বিজয়ের জন্য আপনার কাছে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি। ইহা আপনার বিজয়, আমার নহে। খুব শীঘ্র করিয়া আমার সহিত মিলিত হইলে বড়ই সুখী হইব। ভগবৎকৃপায় আমাদের যে বিজয় হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কল্য যাত্রা করিব, এবং আপনাকে নবাব বলিয়া প্রকাশ করিতে মনন করিয়াছি। মিষ্টার স্ক্রাফটন আমার হইয়া আপনার কাছে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে। আমি যে আপনার কিরূপ পক্ষপাতী, তাহা তাহার কাছে আপনি অবগত হইবেন।"

[ক্লাইভ বুঝিয়াছিলেন যে, বর্ত্তমান সময়ও যদি মিরজাফর, রায়দুর্লভ প্রভৃতির সহায়তা না পান, তাহা হইলে তাঁহাদের অস্তিত্ব যে কোন সময়ে বিলুপ্ত হইতে পারে। সেই জন্য ক্লাইভ মিরজাফরকে "নবাব" প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ধ্বংস করিয়াছিলেন।

দাদপুরে ক্লাইভের সহিত মিরজাফরের সাক্ষাৎ হইল। ক্লাইভ অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নবাব বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মিরজাফরের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তিনি বিনা প্রয়াসে সুবে বাঙ্গালার নবাব বলিয়া গৃহীত হইলেন। সিরাজ মুর্শিদাবাদে

উপস্থিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। সৈন্যগণ-মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিতরণ করিলেন। কিছুতেই তিনি স্থির হইলেন না। বিশ্বাসঘাতকদিগের পৈশাচিক ব্যাপার তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হইল। তাহাদিগের পিশাচলীলা যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদে অবস্থান করা আর কল্যাণকর নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি গুপ্তভাবে তস্করের ন্যায় নিজের প্রাসাদ হইতে নিশীথরাত্রে পলায়ন করিলেন।]

[সিরাজের পতনের সহিত ফরাসীদের দুরবস্থার সীমা রহিল না। পলাশীর প্রাঙ্গণ হইতে বীরবর সিনফ্রে বন-জঙ্গলের ভিতর দিয়া বীরভূম অঞ্চলে গমন করেন। কামগার খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, আসাদুজ্জমা মহম্মদ সিনফ্রেকে হস্তগত করিয়া ক্লাইভের হস্তে অর্পণ করেন।

অসাধারণ কুর্ত্তিন, নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যবর্ত্তী হইয়াও তিনি নিজের প্রাধান্য-রক্ষার জন্য যেরূপ উদ্যম ও পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা পাঠ করিলে অলসও উৎসাহে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার সহচরগণ যখন একে একে প্রায় সকলেই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি অগত্যা প্রতিকূল দৈবের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বীরের ন্যায় ক্লাইভ-হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

অধ্যবসায়ের অবতার, স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি, বীরকুল-চূড়ামণি ল, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দৈব-বাধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিরাজের সাহায্যের নিমিত্ত যেরূপ দ্রুতগতিতে আগমন করিতেছিলেন, রাজমহলে নবাবের পরাজয়বার্ত্তা অবগত হইয়া সেইরূপ দ্রুতগতিতে পাটনা অভিমুখে পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। ক্লাইভ লর শক্তির কথা বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি লকে হস্তগত করিবার জন্য আইয়ার কুটকে পাটনা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। মিরজাফর লকে ধৃত করিবার জন্য পাটনার শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালী রামনারায়ণকে পত্র লিখিলেন। রামনারায়ণ লকে বন্দী করিয়া তাঁহার শত্রুহস্তে প্রেরণ করা ধর্ম্মবিগর্হিত বিবেচনা করিয়া, তাঁহাকে বাঙ্গালার সীমা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে গোপনভাবে অনুরোধ করেন।

ক্লাইভ মৌখিক সুজনতা দেখাইয়া লকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন।]

লর্ড ক্লাইভের চিঠি

"এ দেশের লোক এখন আপনার শত্রু হইয়াছে। আপনাকে ধরিবার জন্য এবং আপনার রাস্তায় বাধা দিবার জন্য সর্ব্বত্র হুকুম পাঠান হইয়াছে। আমিও আপনার উদ্দেশে লোক পাঠাইয়াছি। আপনাকে ধরিবার জন্য পাটনার নায়েব রাজনারায়ণের উপরও হুকুম গিয়াছে। এ দেশের লোকের হাতে পড়িলে আপনার পরিণাম কি হইবে, তাহা ভাবিবেন—তাহাদিগকে আপনি সহৃদয় বন্ধুরূপে কখন প্রাপ্ত হইবেন না। আপনার অধীনস্থ লোকদের বিষয় যদি আপনি একটুও চিন্তা করেন, তাহা হইলে আমার অনুরোধ, আপনি আমাদের সহিত সন্ধি করুন, আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সুবিধাজনক প্রস্তাব প্রদান করিব।"

[ল ক্লাইভ-কথিত সুবিধা উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গালার সীমানা ছাড়াইয়া গমন করিলেন। কুটের পাটনা অভিমুখে গমনকালে ক্লেশের সীমা রহিল না—তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইল—তিনি ক্লাইভকে পত্রের উপর পত্রে লিখিলেন, তিনি ইহা অপেক্ষা কঠোর ক্লেশসহনের কথা অবগত নহেন। ফরাসী বীর ল ইহা অপেক্ষা বেশী ক্লেশসহন করিয়াও তিনি তাহাকে ক্লেশ বলিয়া বিবেচনাই করেন নাই। শত্রুর পরাধীন হওয়ার ন্যায় দারুণ ক্লেশ জগতে আর নাই, ল তাঁহার বর্ত্তমান ক্লেশের সহিত সেই দারুণ ক্লেশের তুলনা করিয়া নিজেকে সুখী বিবেচনা করিয়াছিলেন।

ক্লাইভ বুঝিয়াছিলেন, ল বড় যে-সে লোক নহেন। তিনি উত্তর-ভারতে গমন করিয়া দিল্লীশ্বর আলমগীর সানী এবং প্রবল-পরাক্রান্ত অযোধ্যার অধিপতিকে বাঙ্গালা আক্রমণের জন্য নিশ্চয়ই উত্তেজিত করিবেন। তাঁহারা যদি লর প্ররোচনায় বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তাহা হইলে ইংরাজের বাঙ্গালা রক্ষা করা বড় সহজ কার্য্য হইবে না। এই ভাবিয়া ক্লাইভ তাঁহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবার জন্য পত্র লেখেন, পাঠক, তাহাতে ক্লাইভের ধূর্ত্ততা-বিষয়ক বুদ্ধিমত্তা বেশ দেখিতে পাইবেন। এজন্য আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদের লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইলাম।]

ক্লাইভের নিকট হইতে—হিন্দুস্থানের সম্রাট্ আলমগীর সানীর নিকট।

[সম্রাট্‌বর আলমগীর—পরমেশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে আসন প্রদান করুন—তাঁহার ফারমানবলে ইংরাজ-কোম্পানী বাঙ্গালায় প্রথম কুঠী স্থাপন করে। তদনন্তর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণের কৃপায় কোম্পানী বড় সওদাগর হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদা ব্যবসার দিকেই মন দিয়া থাকে। আমরা এ দেশে কত টাকা আনিয়াছি এবং তাহাতে এ দেশ কিরূপ পরিমাণে সমৃদ্ধি-সম্পন্ন হইয়াছে—বাদশার রাজস্বও কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এ সকল কথা আগেকার সুবেদারেরা অবগত ছিলেন এবং তাঁহারাও আমাদিগকে রক্ষা করিতেন। মহব্বৎজঙ্গের সময় পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়া আসিয়াছে। কলিকাতা বড় নগরীতে পরিণত হইয়াছে। এ স্থান হইতে কোটি কোটি টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার পর সিরাজদ্দৌলা সেই পদ অধিকার করেন। তিনি ফারমান পাইবার পূর্ব্বেই ইংরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি জগৎশেঠ, মহারাজ স্বরূপচাঁদের কথা এবং ইংরাজ গভর্ণরের আবেদন অগ্রাহ্য করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কলিকাতা আক্রমণের জন্য বহির্গত হন। ইংরাজ ব্যবসাদার, তাহাদের কাছে যুদ্ধের উপকরণ ছিল না, কাজেই সিরাজদ্দৌলা ২০শে জুন ১৭৫৭ খৃঃ অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অপরাপর লোক তাহার হস্তে পতিত হইয়াছিল, তাহার আজ্ঞায় এক রাত্রের মধ্যে তাহাদিগকে দম আটকাইয়া মারিয়া ফেলা হয়।]

"ইংলণ্ডেশ্বরের সেবক নৌসেনানী ওয়াটসন এবং আমি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া এই ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করি। প্রথমে কলিকাতা আমরা অল্পদিনের মধ্যে পুনরায় অধিকার করি। হুগলী হইতেও তাহার লোকজন তাড়াইয়া দিই। সিরাজদ্দৌলা তাহার সৈন্যের সংখ্যায় গর্ব্বিত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কলিকাতা-বিরুদ্ধে আগমন করে। পরমেশ্বরের কৃপায় আমি তাহাকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পরাস্ত করি। হে মহামহিমান্বিত, যুদ্ধ করিলে পাছে আপনার রাজ্যের অনিষ্ট হয়, এই ভয়ে এবং এ প্রদেশের সুবার সহিত বন্ধুভাব রাখিয়া অবস্থান করা উচিত বিবেচনা করিয়া আমি

তাহার সহিত সন্ধি করি। যে সকল বিষয় স্থির হয়, তাহা তিনি ঈশ্বরের এবং মহম্মদের নাম গ্রহণ করিয়া সন্ধির সর্ত্ত পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অল্পদিনের পর তিনি শপথ-ভঙ্গ করিয়া ইংরাজদের শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের ধ্বংস করিবার মতলব করেন। সন্ধির সর্ত্ত পূরণ করাইবার জন্য আমি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গমন করি। আমি বন্ধুভাবে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলাম—সন্ধির প্রস্তাব সকল পূর্ণ করিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার মিত্রতা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলাশীক্ষেত্রে আমাকে আক্রমণ করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় আমি সম্পূর্ণরূপে ২৩শে জুন ১৭৫৭ খৃঃ বিজয়লাভ করি। তিনি সহরে প্রত্যাগমন করেন, তথায় অবস্থান না করিয়া পলায়ন করিলেন। তাঁহার ভৃত্যবর্গ বেতনের জন্য তাঁহার অনুসরণ করে এবং তাহারাই তাঁহাকে হত্যা করে। অবশেষে সহরের জনগণের মতানুসারে মিরজাফর খাঁ বাহাদুর তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বকারটি যেমন বদমায়েস ও নিষ্ঠুর ছিলেন, ইনি তেমনি সদয় এবং ন্যায়পরায়ণ হন। তিনি আপনার কাছে প্রার্থনা করেন যে, আপনি তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া এই তিন প্রদেশের সুবেদারীর সনন্দ তাঁহাকে প্রদান করিবেন। আমি তাঁহার সহিত ২৫ হাজার অতুলনীয় সিপাহী লইয়া মিলিত হইয়াছি। ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন এবং প্রজা সকল সুখী হউক! আমার সৈন্যগণকে নগরের বহির্ভাগে রাখিয়া দিয়াছি, একটি সামান্য জিনিসও লুণ্ঠন করিতে দিই নাই। আমি জীবন দিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।"

[সত্য সীমাবদ্ধ, মিথ্যা অসীম—তাই মিথ্যা ক্লাইভের ইচ্ছা অনুসারে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি মিথ্যা কহিয়া প্রবঞ্চনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। ক্লাইবের পত্রের সকল অংশের আলোচনা অনাবশ্যক। একটি কথা আমরা উল্লেখ করিব, তাহা সিরাজের মৃত্যু-কথা। ক্লাইভ লিখিলেন, ভৃত্যগণ বেতন পায় নাই বলিয়া তাহারা সিরাজকে হত্যা করিয়াছে, লোকে অনুমান করে যে, ক্লাইভের ইঙ্গিত অনুসারে সিরাজের হত্যা সাধিত হয়। এই সত্যকে কি গোপন করিবার জন্য বুদ্ধিমান্ ক্লাইভ এই মিথ্যার অবতারণা করিয়াছেন?]

ক্লাইভ যখন ২৭৬ জন গোরা এবং ১ হাজার ৩ শত ৮ জন কালা লইয়া মান্দ্রাজ হইতে আগমন করেন, তখন লিখিয়াছিলেন, "আমি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া এ দেশ আক্রমণ করিতে আগমন করিয়াছি"। ক্লাইভ এখন লিখিলেন, "আমি তাঁর সহিত (মিরজাফর) ২৫ হাজার অতুলনীয় সিপাহী লইয়া মিলিত হইয়াছি।" অর্থাৎ ক্লাইভ মন্ত্র-প্রয়োগ করিলেন যে, সৈন্যবলে আমি বলীয়ান, তুমি সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে গর্ব্ব করিয়া অথবা অন্যের প্ররোচনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না, তাহা হইলে নিশ্চয় পরাজিত হইবে। এইরূপ পত্রে ক্লাইভ দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করেন। এইরূপ আর একখানি পত্র দিল্লীর উজীর গাজী উদ্দীন খাঁকেও প্রেরণ করেন।

পলাশীর লুঠের টাকা কত পরিমাণে যে ক্লাইভের হস্তগত হইয়াছিল, তাহা আমরা অবগত নহি। তিনি প্রকাশ্যভাবে দলপতিরূপে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রাপ্ত হন। মিরজাফর কৃতজ্ঞতার চিহ্ন-স্বরূপ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বক্‌সীস দিয়াছিল। এই হইল তাঁহার প্রকাশ্য টাকা, সকলের সুবিদিত কথা। ইহা ছাড়া তিনি আরও অনেক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সে টাকার কোন হিসাব-পত্র নাই। ক্লাইভ তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।—

"নবাবের কৃপায় আমি তখন যাহা মনেও ভাবি নাই, তাহা অপেক্ষায় ভাল ভাবে দেশে থাকিতে সমর্থ হইব।"

"ডচেরা বঙ্গদেশে ইংরাজদিগের ধূমকেতুর ন্যায় অকস্মাৎ উদয়ে ব্যথিত হন। বলপূর্ব্বক ইংরাজদিগকে এ দেশ হইতে অকস্মাৎ তাড়াইতে পারিলে, এ দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, বিবেচনা করিয়া ডচেরা বাটোভিয়া হইতে ৭।৮ শত ইউরোপীয় সৈন্য এবং বহুসংখ্যক সেই দেশবাসী সৈন্য লইয়া ৫ খানি জাহাজে নানাবিধ যুদ্ধের দ্রব্য-সম্ভারসহ এ দেশে উপস্থিত হয়। ক্লাইভ ডচদের আগমনের কথা অবগত হইয়াই তাহাদের এ দেশে সৈন্য আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। তাহারা হঠাৎ আসিয়াছি বলিয়া ক্লাইভকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা পায়। ডচসৈন্য স্থলপথে চুঁচুড়ায় গমন করে। ক্লাইভ ইতিপূর্ব্বেই ফোর্ডকে চুঁচুড়ায় সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। ফোর্ড ডচসৈন্যকে চুঁচুড়ায় তাড়াইয়াছেন, ইত্যবসরে বাটোভিয়ার সৈন্যদল ফোর্ডের নিকটবর্ত্তী হয়। তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য কাউন্সিলে অনুমতি প্রার্থনা করেন। ফোর্ডের পত্র যখন ক্লাইভের কাছে উপস্থিত হয়, সে সময় শ্রীমান তাস খেলিতে-ছিলেন। খেলা না ভাঙ্গিয়া তিনি এক টুকরা কাগজে লিখেন যে, "প্রিয় ফোর্ড, এখন লড়াই কর, কাল কাউন্সিলের হুকুম পাইবে।" দৈবক্রমে ফোর্ড ডচদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি ঘটনাক্রমে ইংরাজ এ ক্ষেত্রে পরাজিত হইতেন, তাহা হইলে ক্লাইভের তাস-খেলার সময় যুদ্ধের হুকুম দেওয়া যে বিশেষ গ্রহণীয় হইয়াছে, এ কথা বলিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইত না। অদৃষ্ট ভাল, তাই অনুকূল ঘটনা সকল তাঁহাকে বুদ্ধিমানের শিরোমণি বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। এই সকল সুশিক্ষিত ডচ ইংরাজ-হস্তে সে সময় নিগৃহীত হইল অথচ অন্য সময়ে কতকগুলি কৃষক ডচের কাছে সুশিক্ষিত ইংরাজসৈন্য কিরূপ ভাবে লাঞ্ছিত, পীড়িত ও পরাজিত হইয়াছে, তাহা পাঠক অবগত আছেন। ডচদের সাহায্য জন্য মীরণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে আগমন করিতেছিলেন—রাস্তায় তিনি ইংরাজের জয়ের কথা শুনিয়া ব্যথিত হন। তিনি অনন্যোপায় হইয়া ক্লাইভকে লিখিলেন যে, "আমি আপনার সাহায্যের জন্য গমন করিতেছি—আপনার জয়ে বড় সুখী হইলাম।"

কবি নজরুল ইসলাম

প্রথম সমরোত্তর যুগে ভারতে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনে যে জোয়ার আসে তারই পটভূমিকায় কবি নজরুলের অভ্যুদয় হয়। নজরুল বাংলার নব-যুগের নব-জাগ্রত মানুষের প্রথম কবি এবং বাংলা কাব্যে বিপ্লবী আন্তর্জাতিকতার প্রথম উদ্‌গাতা।

বর্দ্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ কাজী নজরুল ইসলামের জন্ম হয়। তাঁর বাবার নাম ছিল কাজী ফকির আহমদ।

ছেলেবেলায়ই নজরুল পিতৃহীন হন। ফলে শৈশব থেকেই তাঁর জীবনে দুঃখ নেমে আসে এবং অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যের সংগে তাঁকে একটানা লড়াই করতে হয়। দশ বছর বয়সে নজরুল গ্রামের মক্তব থেকে নিম্ন প্রাথমিক পরীক্ষা পাশ করেন। তার পর সেই স্কুলেই তিনি এক বছর শিক্ষকতা করেন।

নজরুল যে ভবিষ্যতে এত বড় কবি হবেন, ছেলেবেলায়ই তার সূচনা দেখা গিয়েছিল। বাল্য বয়সেই তিনি উর্দ্দু, ফার্সী এবং মিশ্রিত বাংলায় কবিতা রচনা শুরু করেন। অর্থ উপার্জ্জনের জন্য তিনি পল্লী অঞ্চলে "লেটোর নাচ" যাত্রাভিনয়ে যোগ দেন এবং লেটোর দলের জন্য গান, নাটক ও ছড়া রচনা করে যথেষ্ট সুনাম অর্জ্জন করেন। কৈশোরেই তাঁর কবিপ্রতিভা প্রস্ফুটিত হয়। লেটোর দলের জন্য পালা-গান লিখেও তিনি অর্থ উপার্জ্জন করেন।

মাত্র বার বছর বয়সে নজরুল গ্রাম থেকে পালিয়ে গিয়ে আসানসোলে এক রুটির দোকানে পাঁচ টাকা বেতনের চাকুরী আরম্ভ করেন। সেখানে কিছু কাল কাজ করার পর তিনি আবার পড়াশুনা করবার সুযোগ পেয়ে ময়মনসিংহের দরিরামপুর হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন। তাঁর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। এখানে এক বছর পড়বার পরই কিন্তু আর পড়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়।

সেই বছরই নজরুল ময়মনসিংহ থেকে ফিরে আসেন এবং রাণীগঞ্জের সিয়াড়শোল হাইস্কুলে ভর্ত্তি হন। পড়াশুনায় অদম্য আগ্রহ ছিল তাঁর, ক্রমে স্কুলের দশম শ্রেণীর একজন সেরা ছাত্র হয়ে উঠলেন তিনি।

আর্থিক অনটনের জন্য তাঁর পড়াশোনা আর বেশি দূর এগোতে পারল না। ছাত্র অবস্থায়ই সৈন্যদলে নাম লেখান তিনি এবং স্কুল ছেড়ে দিয়ে তাঁকে যুদ্ধে চলে যেতে হয়। তাঁর বয়স তখন মাত্র আঠারো বছর। সৈন্যদলে নজরুল যে পল্টনে যোগ দিয়েছিলেন সেটা ছিল "উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালী পল্টন"। সৈন্যদলেও নজরুল নিজের যোগ্যতার পরিচয় দেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই হাবিলদার পদে উন্নীত হন। কোয়ার্টার মাষ্টার [illegible] তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদলের রসদ ভাণ্ডারের তত্ত্বাবধান করতেন।

যুদ্ধে গিয়েও নজরুল কাব্যচর্চা ভোলেন নি। সেখানেও তিনি কবিতা রচনা করতেন এবং সুদূর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তিনি এখানকার পত্রিকার জন্য কবিতা পাঠাতেন। সাহিত্যের প্রতি কতটা মমতা থাকলে এটা সম্ভব, ভেবে বিস্মিত হতে হয়।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে নজরুল একের পর এক অনেকগুলো কবিতা লিখলেন। তাঁর এই সব কবিতা আগুনের ফুলকির মত চারি দিকে ছড়িয়ে পড়লো। "মোসলেম ভারত" পত্রিকায় তাঁর "বিদ্রোহী" ও "কামাল পাশা" কবিতা প্রকাশিত হল। বাইশ বছরের তরুণ কবির হাতে "বিদ্রোহী"র মত অপূর্ব্ব প্রাণবন্ত, সতেজ, অগ্নিগর্ভ ও বিস্ময়কর কবিতা বের হলে চারি দিকে একেবারে সাড়া পড়ে গেল, কবির খ্যাতিও দেশময় ছড়িয়ে পড়ল। সৈন্যদলে গিয়েছিলেন এবং কবিতা লিখতেন বলে নজরুলকে লোকে এত কাল "সৈনিক কবি" বলতেন, কিন্তু "বিদ্রোহী" প্রকাশিত হবার পর থেকেই তিনি "বিদ্রোহী কবি" নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯২২ সালে নজরুল "ধূমকেতু" পত্রিকা প্রকাশ করেন। "ধূমকেতু" ক্রমে দেশের নির্য্যাতিত তরুণদের মুখপত্র হয়ে উঠল। দেশপ্রেমে কবির প্রাণ চঞ্চল হয়ে উঠল, পরাধীনতার বেদনায় কবি উদ্বেল হয়ে উঠলেন। তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও গানে দেশের জনসাধারণ, তরুণ ও ছাত্ররাও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল।

বস্তুত, নজরুলই প্রথম বাংলা কাব্যে সমাজের নীচু তলার মানুষের ক্ষোভ ও ক্রোধের আগুনে কাব্যের মশাল জ্বালিয়ে বিদেশী শাসনের



কবি নজরুল ইসলাম

সিংহাসন পুড়িয়ে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। "অগ্নিবীণা" ও "বিষের বাঁশী"র কবিতাগুলোয় কবি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাংলার তরুণ-তরুণীদের স্বাধীনতা-যুদ্ধে এগিয়ে আসার জন্য আবেগময় আহ্বান জানিয়েছিলেন বলে বৃটিশ সরকার তাঁর "বিষের বাঁশী" কবিতার বইটি বাজেয়াপ্ত করেন। রাজদ্রোহের অপরাধে কবির এক বছর কারাদণ্ডও হয়। কিন্তু কবিকে জেলে পুরে ও তাঁর কাব্যকে বে-আইনী করে আত্মরক্ষা করতে চাইলেও অজেয় প্রাণশক্তি ও বিপ্লবী সত্তায় দীপ্যমান এই কবির কণ্ঠরোধ করা বৃটিশ শাসকদের পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয়নি।

কবি নজরুল ইসলাম শুধু বড়দের জন্যই কবিতা লিখে খ্যাতি অর্জন করেননি, ছোটদের জন্যও তিনি অনেক কবিতা রচনা করেছেন। তাঁর "লিচুচোর", "খুকী ও কাঠবেড়ালী", "প্রভাতী", "খাদু দাদু", "ঝিঙে ফুল" ইত্যাদি কবিতা ছোটদের চিত্ত জয় করেছে।

কবি নজরুল অজস্র গানও রচনা করেছেন। তিনি একজন বিশিষ্ট সুর-শিল্পীও, অনেক গানের সুর দিয়েছেন তিনি। তাঁর রচিত গানগুলো অপূর্ব এবং প্রাণস্পর্শী। কীর্ত্তন ও গজলে ভাটিয়ালী সুরের মূর্চ্ছনায় তাঁর গান প্রাণকে মুখর সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তোলে।

আমাদের পরম দুর্ভাগ্য যে, বাংলার এই প্রতিভাসম্পন্ন কবি আজ বহু বৎসর যাবৎ কঠিন রোগে ভুগছেন। এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে তিনি আজ জীবন্মৃত। স্মৃতিহীন অন্ধকারে তাঁর অনুভূতিহীন অসাড় দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। কবি কথা বলতে পারেন না, বন্ধু-বান্ধবদের চিনতে পারেন না, বোধশক্তি একেবারে হারিয়ে ফেলেছেন। অথচ এমন একদিন ছিল যেদিন তাঁর দরাজ গলায় এবং অট্টহাস্যে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতো! যৌবনের দুর্দ্দম দুঃসাহসী কবির এই অকাল অসাড়তা আজ বাংলা দেশের মানুষের কাছে এক অসহ্য বেদনাদায়ক দৃশ্য। আরও মর্ম্মান্তিক ঘটনা এই যে, কবির স্ত্রী প্রমীলা নজরুল ইসলামও অনেক দিন থেকে কঠিন পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগতা।

বাংলার এই প্রিয় কবি আজ বেঁচে থেকেও যে অসহায় অবস্থায় জীবন যাপন করছেন সে কথা মনে হলে অন্তর ব্যথায় ভরে ওঠে। সারা দেশের মানুষের সাথে আমরাও আজ সর্ব্বান্তঃকরণে কবির আরোগ্য কামনা করি। কবি নিরাময় হোন, দীর্ঘজীবী হোন, আবার তিনি তাঁর অফুরন্ত সৃষ্টির বিচিত্র জগতে ফিরে আসুন।

দানবীর রায় বাহাদুর শ্রীশশিভূষণ দে

কলিকাতার মধ্যস্থল বৌবাজারের একটা রাস্তার নাম "মদন-গোপাল লেন।" যাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই পথের নাম, তিনিই শশী বাবুর পিতৃদেব। শশী বাবু পিতা-মাতার তৃতীয় সন্তান। ১৮৬৮ সালে ইঁহার জন্ম হয়। পাঁচ বৎসর বয়স হ'তেই তিনি অত্যন্ত দুষ্ট-স্বভাবের ছেলে ছিলেন। এবং স্কুল পালান স্বভাবের জন্য শিক্ষকদের তাড়নায় তিনি হিন্দু হতে হেয়ার, তথা হতে বঙ্গবাসী ও পরে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে কোন ক্রমে বিদ্যালাভ করেন। আঠার বৎসর বয়সে তিনি সিনিয়র কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইলে, তাঁহার পিতা যখন F. W. Heilger's & CO-র বেনিয়ান ছিলেন তখন সেই আফিসে তাঁহাকে নীলের ওজন দেখিবার কাজে নিয়োগ করেছিলেন। ছয় মাস পরে নিজ ব্যবসায় সোনা-রূপার দোকানে তাঁকে কাজ শিখতে



শ্রীশশিভূষণ দে

দিলেন। পুনরায় ছ' মাস পরে যখন শেয়ার কেনা-বেচার দালালীর কাজে তাঁহার পিতা তাঁকে নিযুক্ত করেন তখন সোনা-রূপার শেয়ারের দাম ছিল এক টাকা। এক টাকার শেয়ার বিক্রয়ের দালালী তখন এক পয়সা ছিল! তখন প্রত্যহ তিনি ১০০০৲ টাকার শেয়ার বিক্রয় করে প্রায় ১৫৲ টাকা রোজগার করিতেন। তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মধুর ভাষণ ও অমায়িক ব্যবহার অল্প সময়ের মধ্যে তাঁকে ব্যবসায়ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করে তোলে। অনলস কর্ম্মপটুতা ও অকপট সাধুতাকে মূলধন ক'রে যে নবীন যুবক ব্যবসায়ে অবতীর্ণ হন, সেই শশিভূষণ দে-ই Share and Stock Exchange Association-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা-রূপে ব্যবসায়ী-সমাজে সুপরিচিত হন। এবং প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে ইনিই উপস্থিত ৮৮ বৎসর বয়সে জীবিত। এই Association-এর ১০০৲ Share এক সময়ে ৬০,০০০৲ বিক্রীত হয়েছে।

২১ বৎসর বয়সে শশী বাবু কলিকাতার কলুটোলা নিবাসী স্বর্গীয় দানবীর সাগরলাল দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় গোষ্ঠলাল দত্তের দ্বিতীয়া কন্যা রাজরাজেশ্বরীকে বিবাহ করেন। ২৩ বৎসর বয়সে শশী বাবুর একমাত্র পুত্র নিতাইচাঁদ জন্মগ্রহণ করেন। বিশেষ আড়ম্বর ও জাঁকজমকের সহিত ষোড়শ বৎসর বয়স্ক পুত্রের বিবাহ দেন এবং বিবাহের তিন বৎসর পরে পুত্রের স্ত্রী বিয়োগ হয় এবং এক বৎসর পরে পুনরায় পুত্রের বিবাহ দেন। ১৯১৫ সালে নিতাইচাঁদ ২৫ বৎসর বয়সে পিতামাতা ও ১২ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীকে রাখিয়া পরলোক গমন করেন। ইনি এখনও জীবিত আছেন এবং বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা ও পরিচর্য্যায় দিনাতিপাত করিতেছেন।

পুত্রবিয়োগের ছ'মাস পরে শশী বাবুর মাতৃবিয়োগ হয়। এই

সময়ে ইনি কার্শিয়াং-এ বসবাসের জন্ম ছয় একর জমি-সংলগ্ন বিরাট বাটী ক্রয় করেন। এই সময়ে তাঁহার পিতা তাঁহাকে তাঁহার কোন এক ভ্রাতুষ্পুত্রকে পোষ্যপুত্র লইতে আজ্ঞা করেন। ইহাতে শশী বাবু রাজী না হওয়ায়, পিতা ক্রুদ্ধ হয়ে মৃত্যুকালে উইলে তাঁহার বিরাট ধন-সম্পত্তির মাত্র ৫০০০৲ টাকা শশী বাবুকে দিয়াছিলেন—Saying "as he is well off".

১৯২১ সালে শশী বাবুর পিতৃবিয়োগ হয়। এই সময়ে Govt. of India Education officer Mr. Biss ও তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু শ্রী উদ্ধবচন্দ্র মল্লিকের পরামর্শ ক্রমে তিনি মধ্য কলিকাতায় ২৭।১, নেবুতলা লেনে প্রায় এক বিঘা জমির উপর শশিভূষণ দে অবৈতনিক বালক বিদ্যালয় ও রাজরাজেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয় নামে দুইটি স্কুল প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে নির্মাণ করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের তদানীন্তন চেয়ারম্যান স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক ও স্বর্গীয় ডাঃ হরিধন দত্ত এই স্কুল দুইটি তাড়াতাড়ি উন্মোচনের জন্ম সাহায্য করেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের নিকট উক্ত বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার দেন এই সর্ত্তে যে, কর্পোরেশনের নির্বাচিত পাঁচ জন ও শশী বাবুর মনোনীত পাঁচ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি Managing Committee স্কুল দুইটির পরিচালনা করিবেন। ত্রিশ বৎসর যাবৎ ইনি মাসিক ২০০৲ টাকা করিয়া স্কুল পরিচালনার জন্ম দিয়া আসিয়াছেন। এবং ১৯৫৪ সালে কর্পোরেশনের নিকট মাসিক ২০০৲ টাকার পরিবর্ত্তে মোট ৮০,০০০৲ এককালীন দান করেছেন। এবং প্রতি বৎসর পুরস্কার বিতরণের জন্ম ৫০০০৲ টাকার কোম্পানীর কাগজ গভর্ণমেন্টের কাছে জমা রেখেছেন। এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করে শশী বাবু এত পরিতৃপ্ত যে, তিনি বলেন, এক ছেলে হারিয়ে আমি হাজার হাজার ছেলে পেয়েছি।

১৯২৩ সালে গভর্ণমেন্ট এই জনহিতকর কাজের জন্ম তাঁহাকে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। এবং ঐ বৎসরে ৬ই জুলাই তারিখে তদানীন্তন বাঙলার গভর্ণর লর্ড লিটন এই স্কুল দুইটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। স্কুল প্রতিষ্ঠা হইতে প্রতি বৎসরই পুরস্কার বিতরণ সভায় দেশের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি শশী বাবুর উপস্থিতিতে পুরস্কার বিতরণ করেন। ১৯২৫ সালে কার্শিয়াং-এ তাঁহার স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং স্ত্রীর স্মৃতিরক্ষাকল্পে তথায় বহু অর্থব্যয়ে রাজরাজেশ্বরী পাবলিক হল, বালিকা বিদ্যালয় ও শ্মশান-বিশ্রামাগার স্থাপন করেন।

১৯২৬ সালে তিনি পাশ্চাত্যের বহু দেশে নয় মাস যাবৎ ভ্রমণ করেন। এই সময়ে কলিকাতার তদনীন্তন মেয়র স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত মহোদয় শশী বাবুকে gersy তে টেলিগ্রাম করে জানান যে, নেবুতলা লেন—শশিভূষণ দে ষ্ট্রীট নামকরণ করা হয়েছে।

১৯৩২ সালে তাঁহার বন্ধু শ্রী উদ্ধবচন্দ্র মল্লিক ও স্বর্গীয় পি, সি, করের পরামর্শে তিনি কার্শিয়াং যক্ষ্মা হাসপাতাল নির্মাণের সঙ্কল্প করেন। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, স্বর্গীয় স্যার নীলরতন সরকার ও স্বর্গীয় ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় কার্শিয়াং গিয়া তাঁহার সঙ্কল্প ফলবতী করেন। শশী বাবু ১৯৩৫ সালে দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করে হাসপাতালের নির্মাণ কার্য্য শেষ করেন এবং ১৯৩৬ সালে ইহার দ্বারোদ্ঘাটন হয়।

ইনি উপস্থিত কার্শিয়াং এস্, বি, দে স্যানাটোরিয়াম ও যাদবপুর কুমুদশঙ্কর রায় যক্ষ্মা হাসপাতালের পরিচালক—কলিকাতা মেডিক্যাল এড্ এণ্ড রিসার্চ সোসাইটির অন্যতম অছি (Trustee) এবং সহকারী সভাপতি। ইনি বৎসরের অধিকাংশ সময় কার্শিয়াংএ বাস করেন এবং তথায় হাসপাতালের যাবতীয় কর্ম্ম নিজে পরিচালনা করেন। ১৯৫০ সালে ইঁহার বিশেষ চেষ্টায় ও অর্থসংগ্রহে কার্শিয়াংএ একটি বিরাট হাসপাতাল ও ছয়টা কটেজ প্রায় নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহাতে ১৭৫ জন পুরুষ রোগী চিকিৎসিত হইতেছেন এবং পুরাতন হাসপাতালে ৪৬জন মহিলা রোগী আছেন।

হাসপাতাল নির্ম্মাণে বহু অর্থ দান করিয়াও শশী বাবু কাঁচড়াপাড়া, যাদবপুর ও কার্শিয়াং হাসপাতালে যথাক্রমে ২টি, ৫টি ও ২টি ফ্রি বেডের যাবতীয় খরচের ব্যবস্থা করেছেন।

তাঁহারই চেষ্টায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বাঙলার প্রতি গভর্ণরই এস্, বি, দে স্যানাটোরিয়াম পরিদর্শন করেন। ১৯৫৪ সালে ৩রা নভেম্বর তারিখে তাঁহার ৮৬তম জন্মতিথিতে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরু এই হাসপাতাল পরিদর্শন করেন।

১৯৪১ সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট তাঁকে এস্, বি, ই উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৪৫ সালে শান্তি ইনষ্টিটিউট, শশিভূষণ দে ফ্রী স্কুল ও রাজরাজেশ্বরী ফ্রি স্কুল তাঁহার হীরক জয়ন্তী জন্মোৎসব পালন করে। ১৯৫৩ সালে শান্তি ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে তাঁহার ৮৫তম জন্মোৎসব উপলক্ষে আহূত সভায় তিনি তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি দান করে এক অভূতপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্থাপনা করেছেন। তিনি বলেন—যাঁর জিনিষ তাঁরই অভিপ্রায়ে তাঁরই কাজে নিয়োজিত করিলাম। তিনি নিম্নলিখিত অভিমত দৃঢ় ভাবে পোষণ করেন :—

'What I spent, I had ; What I give I have !
What I save, I loose ; It is a sin to die rich.'

তিনি কার্শিয়াং-এর বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট আছেন এবং কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে অর্থ সাহায্য করেছেন। ইনি শান্তি ইনষ্টিটিউটের সভাপতি পদে প্রায় ২৭ বৎসর কাল অধিষ্ঠিত আছেন এবং ইহার Trust Board এর Chairman রূপে ইহার বহুবিধ উন্নতি করেছেন। এবং বিশেষ ভাবে ইনষ্টিটিউটের দাতব্য ভাণ্ডারের কাজ ইহারই পরিচালনায় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হইতেছে। ইনি পিতার উইলে যদিও সামান্য অর্থ পাইয়াছেন, তথাপি তাঁহার বিরাট ধনসম্পত্তির অন্যতম অছির কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাবধি এই দীর্ঘজীবনে শ্রীশশিভূষণের দানের পরিমাণ আনুমানিক দশ লক্ষ চুরানব্বই হাজার তিন শ পঞ্চাশ টাকা।

তিনি একজন কবি ও গায়ক। তাঁহার রচিত পরমার্থ বিষয়ক কবিতা ও গীত বড়ই হৃদয়গ্রাহী। গান ও গল্প বিষয়ে শশী বাবুর অনুরাগ ও দক্ষতা কম নয়।

বর্ত্তমানে দেশে তাঁহার ন্যায় কৃতী, ও বদান্য কর্ম্মী পুরুষের অত্যন্ত প্রয়োজন। বিত্তশালী সমাজে প্রায় দেখা যায় যে, তাঁহারা জীবদ্দশায় যাহাকে যাহা দিবার তাহা হাতে তুলিয়া দিতে চাহেন না। কিন্তু শশী বাবু লক্ষ লক্ষ টাকা স্বহস্তে বিতরণ করে কত না আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন! তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সহৃদয় দাতৃবর্গ যদি তাঁহাদের জীবনকালেই যাহা কিছু দান করিবার তাহা নিজ নিজ মনোনীত পাত্রে দিয়া যান, তাহলে কত অনর্থ, কত মামলা-মোকর্দ্দমা ও কত অপব্যয় নিবারিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা তাঁহাদের রোপিত তরুর ফলাস্বাদে পুলকিত হইতে পারেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন

[অধ্যক্ষ নরসিংহ দত্ত কলেজ, হাওড়া]

১৯২৫ সাল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্মরণীয় বৎসর। জ্ঞান ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, জ্ঞান মুখার্জি প্রমুখ বাংলা-দেশের কৃতী মনীষীরা ছিলেন এই বৎসরের ছাত্র। জ্ঞান সেন ছিলেন তাঁদেরই সহপাঠী। একই বছর ত্রয়ী জ্ঞান কেমিষ্ট্রীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। প্রথম, জ্ঞান ঘোষ। দ্বিতীয়, জ্ঞান মুখার্জি। তৃতীয়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন।

১৮৯৫ সালে যশোর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের মাটী ছেড়ে ১০ বৎসর বয়সে কলকাতায় এসেছেন, আর কৈশোর পেরিয়ে যৌবন কেটেছে এই কলকাতার বুকে। দেখেছেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগের কলকাতার রূপ। দেখছেন, বর্ত্তমানের আশা করছেন ভবিষ্যতের কলকাতার একটি মনোরম অবস্থান।

পিতা ৺ মহেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন যশোর জেলার একজন নামকরা উকীল। তিনি বলেছিলেন "মানুষ হতে হবে।" কিশোর-জীবনের সেই মন্ত্র বহন করে চলেছেন দীর্ঘকালীন জীবন-সংগ্রামের পথে। আশা ছিল জীবনে বৈজ্ঞানিক হবেন। দেশ ও দশের জন্য কাজ করবেন। কিন্তু বিধির বিধানে সে আশা কার্য্যে পরিণত হয়নি! বৈজ্ঞানিকের পরিবর্তে হলেন শিক্ষাব্রতী। এর জন্যে মনে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ নেই। বরং পেয়েছেন জীবনে এর অসীম সত্যের সন্ধান। যে দেশ ডুবে রয়েছে অজ্ঞানতার অন্ধকারে, সেখানে চাই প্রথমে জ্ঞানের আলো। আর সেই জ্ঞানের আলোর প্রদীপ নিয়ে একনিষ্ঠ সাধনায় মগ্ন এই সত্য শিব ও সুন্দরের পূজারী অধ্যক্ষ জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন। জ্ঞান বাবু গর্ব করেন তাঁর মাষ্টার মশাই ছিলেন শ্রীম। তিনি বলেছিলেন আগে মানুষ হতে হবে। পিতা আর মাষ্টার মশাই যে শিক্ষা দিয়েছেন তা তিনি আমরণ কাল পর্য্যন্ত বহন করে যাবেন।



জ্ঞানেন্দ্রনাথ সেন

১৯১৫ সালে পাশ করার পর আরম্ভ হল কর্মময় জীবন। তারকনাথ পালিত রিসার্চের কার্য আরম্ভ করার সময় শরীর হয়ে পড়ল অসুস্থ। জীবন-সোপানের প্রথম ধাপেই বাধা। তবু তিনি দমলেন না। একটি বৎসর পরেই কার্য আরম্ভ করলেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম জ্ঞান বাবু। আচার্যদেব স্নেহ করেন। অন্যায় দেখলে বকুনি দেন। প্রায়ই এম-এস-সি পাশ করার পর যান ওখানে। একদিন গিরিশ বাবু ধরলেন তাঁর কলেজে অধ্যাপনা করার জন্যে। যোগ দিলেন বঙ্গবাসী কলেজে। অধ্যাপকের জীবন সুরু হোল। আর এর সংগে চলল গবেষণা। মৌলিক প্রবন্ধগুলি American Chemical Society ও নানা বিদেশী পত্রিকায় যখন প্রকাশ হতে সুরু হোল, তখন তিনি প্রশংসা পেলেন প্রচুর।

বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করার সময়েই ডাক এলো হোলকার কলেজ থেকে। চললেন সেখানে।

১৯২৩ সাল। জীবনের একটি স্মরণীয় বৎসর। উন্নতির শিখরে উঠতে আরম্ভ করেছেন। বড় হবার নেশায় পেয়েছে। আগ্রায় Post graduate এর Lecturer রূপে নিযুক্ত হলেন। প্রথম দিন তিনি পড়াতে পড়াতে এমনি ভাবে মগ্ন হয়ে পড়েছিলেন যে ঘণ্টা বেজে যাওয়ার পরও তিনি পড়িয়ে চলেছিলেন। আর এরই সংগে যোগ দিলেন St. Jhon College এ। কর্মজীবনের মাঝে ডুবে গেলেন গভীর ভাবে। ভুলে গেলেন বাড়ীর কথা। শুধু জীবনের লক্ষ্য বড় হতে হবে। স্নেহময় পিতার ডাক এড়াতে পারলেন না। চলে এলেন আগ্রা থেকে হাওড়া নরসিংহ দত্ত কলেজে সহ-অধ্যক্ষ হয়ে।

কলকাতার পাশে হাওড়া। আলোর পাশে অন্ধকার। আজকে হাওড়া সহরের যে রূপ, পঞ্চাশ বছর আগে তা ছিল না। একটি বড় গ্রাম বললেই তাকে চলে। তার পর কালের পরিবর্ত্তনের সংগে পরিবর্তন সুরু হোল। ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল ইতস্ততঃ।

ছোট কলেজ। ছাত্রসংখ্যা কম। মনের মাঝে রয়েছে সেই আদর্শ। মানুষ হওয়ার। তার সংগে যোগ করলেন মানুষ করার।

শিক্ষাব্রতীর সাধনা। শুধু মনের মাঝে একটি চিন্তা—কেমন করে কলেজের উন্নতি করবেন। এই অনুন্নত জায়গায় একটি কলেজ চালান যাবে না, এই কথাই সবাই বলত। পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা মানুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। সুকুমার বৃত্তিগুলির পরিস্ফুটন চাই। শুধু লেখাপড়া নয় তার সংগে নাটক, সঙ্গীত, শরীরচর্চার সুযোগ দিলেন ছাত্রদের Social gathering এর সময়।...

বর্তমান শিক্ষাধারার পরিবর্তন চাই। আমাদের দেশে যে শিক্ষাধারার রীতি চলে আসছে তাতে ঠিক মত ছাত্ররা শিক্ষালাভ করতে পারে না। তাই বর্তমান যুগে ছাত্রদের মাঝে এসে পড়েছে যুগপ্রভাব। যে যুগের সংগে তাল রাখতে হলে ছাত্রদের দৃঢ় সঙ্কল্প করতে হবে, শিক্ষা আমাদের প্রাণ।...বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতিতে রয়েছে অনেক গলদ। ছাত্ররা প্রশ্ন-উত্তর মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় লিখে আসে। কিন্তু সে করলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা এমন ভাবে দিতে হবে, যাতে সে সমস্ত জিনিষটা উপলব্ধি করে। যদি কেউ কোন জিনিষের আস্বাদ উপলব্ধি করে, তাহলে তাকে সেই জিনিস থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যাবে না।

কালের পরিবর্তনের সংগে সংগে মানুষের জীবনযাত্রা হয়ে চলেছে সংক্ষেপ। এরই মাঝে মানুষকে কাজ করতে হবে। কিন্তু সে কাজের মাঝে কোন ফাঁকি থাকলে চলবে না।

বর্তমানে কলেজের উন্নতি হয়েছে প্রচুর। B. A. ও B. sc তে অনার্স আছে। প্রতি বছরই কিছু না কিছু ছাত্রদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সহস্র সহস্র পরীক্ষার্থীর মাঝে শীর্ষের দিকে থাকে।···হাওড়ার এই ছোট্ট শহরে শিক্ষা বিস্তারের যে প্রচেষ্টা ও তাঁর দান হাওড়াবাসীরা কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করে। জ্ঞান বাবু নিজে শিক্ষক বটে, তিনি বলেন শিক্ষার শেষ নেই। প্রতিদিনই তাঁকে বেশ কয়েক ঘণ্টা পড়াশুনার মাঝে কাটাতে হয়।

তখন কলকাতার ছাত্রমহলে জার্মাণ ভাষা শেখার একটা হুজুগ এল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পর্যান্ত জার্মাণ ভাষা শিখতে লাগলেন। এবং সব চেয়ে ভাল শিখলেন জ্ঞান ঘোষ ও জ্ঞান সেন। আচার্যদেব জ্ঞান বাবুর বড় মাথাটা দেখিয়ে বলতেন কথা প্রসঙ্গে—দেখছিস না ওর মাথাটা একেবারে জার্মাণ মাথা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন you are the second German head of Bengal.

জ্ঞান বাবুর ছাত্র ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশের নানান জায়গায়। তাঁদের মধ্যে দু' এক জনের নাম করছি, যাঁরা বর্তমান যুগে বাংলাদেশে স্বীয় প্রতিভা বলে তাঁদের আসন করে নিয়েছেন।

ডাঃ মণি চক্রবর্তী বর্তমানে সায়েন্স কলেজের অধ্যাপক। ডাঃ ঘোষ বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজের ম্যাথামেটিক্সের হেড অফ দি ডিপার্টমেন্ট, অপর একজনের নাম করছি তিনি হচ্ছেন ডঃ কানাই ভট্টাচার্য্য এম, এস, সি,। এঁরা ছাড়াও আছেন অনেক, যাঁরা বাংলাদেশের নানান কলেজের অধ্যাপক। কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার।

শিক্ষাব্রতীর আদর্শ আজও তিনি বহন করে চলেছেন। জীবনের মূল আদর্শ জীবনপথের পথিকৃৎ হিসেবে তাঁকে পথ দেখিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানের ছাত্র হলে কি হবে, সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম অনুরাগ। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, সেক্সপীয়র, কীটস তাঁর প্রিয় লেখক। আধুনিক কালের লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় অত্যন্ত অল্প। দু'চারটে লেখা মাঝে মাঝে পড়েন এবং বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যে দিন দিন উন্নতির পথে যাচ্ছে সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের প্রকাশিত বইগুলির প্রসঙ্গে বললেন, এঁরা বাংলা দেশের অনেক উপকার করেছেন। আর দুঃখ করলেন, বসুমতী সাহিত্য মন্দির তাঁদের পুরানো প্রকাশিত বইগুলির মধ্যে অনেক বই প্রকাশ করছেন না। সেইগুলির প্রয়োজনবোধ আজকে অনেকেই অনুভব করছেন।

শিশুর মত সরল এই মানুষটির সংস্পর্শে না এলে বোঝা যাবে না তিনি কত বড় গুণী। কিন্তু শিক্ষার কোন অহঙ্কার নেই। দীর্ঘদিন বাণীর সাধনা করে চলেছেন একটি কোণে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় আছে, আবার অনেকের সংগে নেই।

শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী

(ভূতপূর্ব কারমাইকেল অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সংগে কিসের তুলনা দেব? অন্ধকার ঘননিবিড় বনভূমির না গোধূলি-বেলার আলো-আঁধারি অল্পবিস্তর ঘন বনানীর? দু'টো তুলনাই চলে। তবে পঞ্চাশ বছর আগে বা তারও আগে প্রথম তুলনাটাই ছিল সব চাইতে উপযুক্ত। পরের তুলনাটা এখন চলতে পারে। বস্তুতঃ, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান এখনো গোধূলি-পর্বে, একেবারে অন্ধকারময় নয়, এইটুকু মাত্র। আলোর অভাব কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে, কোন কোন অংশ বেশ পরিষ্কারও প্রতীত হচ্ছে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের একদা তমসাবৃত রাজ্যে এই আলোকপাত করবার কৃতিত্ব বহুলাংশে জার্মাণ, ইংরেজ ও অন্যান্য ঐতিহাসিক ও গবেষকদের প্রাপ্য। তাঁদের পরেই যাঁদের নাম করতে হয়, সৌভাগ্য বশত তাঁদের অধিকাংশই বাঙ্গালী—উদাহরণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং এঁদের পরেই উল্লেখ্য নামাবলীর অন্যতম শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন ঘটনা সমূহকে একত্র সংগ্রহ করে যিনি প্রাচীন ভারতের একটি সার্থক-সুন্দর রাজনৈতিক ইতিহাস সংকলন করেছেন। শুধু সংকলন নয়, স্বীয় বৈদগ্ধ্যের প্রতিভায় তাকে সজীব-ভাস্বর ক'রে বিশ্বজনের ধন্যবাদ ভাজন হ'য়ে রইলেন।

বরেণ্য ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর জন্মও ঐতিহাসিক স্থানে—বরিশাল জেলার পোনাবালিয়ায়। বাংলার সংস্কৃতির ইতিহাসের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা জানেন, পোনাবালিয়া বাংলার অন্যতম শাক্তপীঠ, শাক্তদের অন্যতম তীর্থকেন্দ্র। এই পোনাবালিয়ায় এক বৈদ্যবংশে ১৮৯২ সালের ৮ই এপ্রিল শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরীর জন্ম হয়। পিতা স্বর্গীয় মনোরঞ্জন রায়চৌধুরী। অশ্বিনীকুমার দত্ত স্থাপিত বি এম স্কুল থেকে ১৯০৭ সালে হেমচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় পূর্ববংগ ও আসাম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার এবং প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন। এর পর তিনি জেনারেল এসেম্বলি (অধুনা স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) থেকে আই-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন এবং ১৯১১ সালে উক্ত কলেজ থেকে বি-এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে



শ্রীহেমচন্দ্র রায়চৌধুরী

ইতিহাসে সর্বপ্রথম 'ঈশান বৃত্তি' অর্জন করেন। এই ইতিহাসেই ১৯১৩ সালে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার ক'রে পূর্বখ্যাতি অক্ষুণ্ন রাখেন। এর পর ১৯১৯ সালে তিনি 'গ্রিফিথ বৃত্তি' অর্জন করেন এবং ১৯২১-এ তাঁর বহুবিখ্যাত 'Political History of Ancient India' গ্রন্থের জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ সম্মান ডক্টরেট বা পি-এইচ-ডি উপাধি লাভ করেন।

এম-এ পরীক্ষার অব্যবহিত পরেই তিনি বঙ্গবাসী কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। সেখানে কিছুদিন অধ্যাপনা করার পর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তাঁর আহ্বান আসে। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রায় তিন বছর অধ্যাপনা করার পর তিনি চট্টগ্রাম কলেজে বদলি হয়ে যান এবং কয়েক মাস সেখানে অধ্যাপনা করার পর তিনি এই সরকারী কাজে ইস্তফা দিয়ে ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে আসার মূলে ছিলেন আশুতোষ এবং এই নির্বাচনে আশুতোষের গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রমূর্ত। সাধারণ ইতিহাস বিভাগ সদ্যপ্রতিষ্ঠিত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস বিভাগেও হেমচন্দ্র অধ্যাপনার ভার প্রাপ্ত হলেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, পরে এক সময় তিনি মধ্য ও আধুনিক ইতিহাস এবং 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সংস্কৃতি' উভয় বিভাগেরই যুগপৎ প্রধান অধ্যাপক ছিলেন। যাই হোক, ১৯১৭ থেকে একটানা অধ্যাপনা করার পর ১৯২৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন এবং কিছু কাল সেখানে কাজ করার পরে পুনরায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে আসেন এবং ১৯৩৬-এ 'প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি' বিভাগের কারমাইকেল অধ্যাপক পদে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রায় ষোল বৎসর উক্ত পদে বৃত থাকার পর ১৯৫১ সালে তিনি কার্যক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

সংখ্যায় ডঃ রায়চৌধুরীর গ্রন্থসংখ্যা অধিক না হ'লেও মূল্যমিতির দিক থেকে তারা বিশিষ্ট রকমের গভীর। তাঁর বহুখ্যাত 'Political History of Ancient India'র কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। বলতে গেলে তাঁর আগে একমাত্র ভিনসেণ্ট স্মিথ ছাড়া আর কোন ঐতিহাসিক প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে নিত্যনতুন আবিষ্কৃত তথ্যসমূহকে একত্র সংগ্রহ ক'রে ও সুন্দর ভাবে সাজিয়ে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করবার বিশেষ একটা প্রয়াস পাননি। কিন্তু তিনি প্রচলিত গাথা (bardic) বা পুরাণসমূহের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ফলে 'কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী যুগকে উপেক্ষা করে সোজাসুজি খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় থেকে তিনি প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। কিন্তু ওয়েবার, ল্যাসেন, গ্রেগলিং, ওল্ডেনবার্গ, হপকিন্স, কীথ, পারজিটার ভাণ্ডারকর প্রমুখ ঐতিহাসিকগণের গবেষণার ফলে ভারত-যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী যুগ বা পরীক্ষিৎ ও পরীক্ষিতের পরবর্তী সময়ের বহু তথ্য জানা গেছে। ডঃ রায়চৌধুরীই সর্বপ্রথম এঁদের গবেষণালব্ধ ঐতিহাসিক উপাদান সমূহকে একত্র ক'রে পরীক্ষিৎ থেকে বিম্বিসার পর্যন্ত—এই সময়ের একটি সুন্দর বংশভিত্তিক রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন। এবং তাঁর গ্রন্থের এই অংশই সব চাইতে মূল্যবান। পরীক্ষিতের সিংহাসনারোহণ থেকে গুপ্ত-রাজবংশের পতন পর্যন্ত এই প্রায় তের শত বৎসরের একটি রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করা যে কী দুরূহ ব্যাপার, তা' প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সামান্য খোঁজখবরও যাঁরা রাখেন, তাঁরাই জানেন। বস্তুত, এই গ্রন্থ ডঃ রায়চৌধুরীর একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি হিসাবে চিরনন্দিত হবার যোগ্যতায় ভাস্বর। এবং যথার্থই তাই দেশ-বিদেশের মনীষীরা তাঁকে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনে ভূষিত করতে কুণ্ঠিত হননি। স্বীকৃতি দিয়েছেন তাঁর পাণ্ডিত্যের: Dr. Roychoudhury belongs to a set of young Hindu scholars...combining the traditional education of a Pundit with a thorough training in English. ডঃ রায়চৌধুরীর অপর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: The Early History of the Vaishnava sect. প্রাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মের বহু সম্প্রদায়ের অন্যতম বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ইতিহাসে চড়াই-উৎরাই অনেক, তার প্রাচীন ইতিহাস নানা দিক থেকেই জটিল। জটিল বিষয়ের আলোচনাতেই বোধ করি হেমচন্দ্রের আনন্দ, তাই পূর্বোক্ত গ্রন্থের মতো এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানিও তাঁর পাণ্ডিত্যের আভায় প্রদীপ্ত। কৃষ্ণের জীবনেতিহাস, কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা ভাগবতসম্প্রদায়ের উৎপত্তি, প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা-সমৃদ্ধ এই বইটিকেও বিদ্বজ্জনেরা সংবর্ধনা জানিয়েছেন প্রচুর। Indian Historical Quarterly, Indian Antiquary, Journal of the Asiatic Society of Bengal, মানসী ও মর্মবাণী, বিচিত্রা প্রভৃতি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের গ্রন্থনায় তাঁর আরেকটি গ্রন্থ হলো: Studies in Indian Antiquities র‍্যাপসন, বার্ণেট, কীথ হপকিন্স, ও, সি, গাঙ্গুলী প্রমুখ দেশ-বিদেশের পণ্ডিতরা এই বইটির জন্যেও লেখককে পূর্ববৎ অভিনন্দিত করেছেন। এই তিনটি বই ছাড়া অন্য লেখকের সহযোগিতায় তিনি আর দুটি বই লিখেছেন: An Advanced History of India এবং The Groundwork of Indian History. শেষোক্ত বইটি স্কুলপাঠ্য হলেও সুলিখিত। আর সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে একেবারে হাল আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের একটি সুন্দর ধারাবাহিক ইতিহাস জানবার পক্ষে প্রথম বইটি অপরিহার্য। এ-বইয়ের অন্য দুজন সহ-লেখক হলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার ও কালীকিংকর দত্ত। গ্রন্থরচনা ছাড়া কয়েকটি সংগ্রহগ্রন্থেও ডঃ রায়চৌধুরী প্রবন্ধাদি লিখেছেন, যেমন: ভারতীয় বিদ্যাভবন (বোম্বে) থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত History of Bengal (প্রথম খণ্ড), নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী সম্পাদিত Age of the Nandas and Mauryas এবং G. H. Yazdani-র সম্পাদনায় আশু প্রকাশিতব্য History of the Deccan. এ-ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতেও বহু প্রবন্ধ লিখেছেন তিনি, বর্তমান পরিসর তাদের উল্লেখের পক্ষে নিতান্ত সংক্ষিপ্ত।

ডঃ রায়চৌধুরীর পাণ্ডিত্য, আগেই বলেছি, বিশ্বগুণীজন স্বীকৃতি পেয়েছে। এবং সেই স্বীকৃতির সংগে বাস্তবক্ষেত্রে ডঃ রায়চৌধুরী পেয়েছেন প্রচুর সম্মান, খ্যাতি ও শিরোপা। উদাহরণত, ১৯৩৫ সালে তিনি মহীশূরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত প্রাচ্যবিদ্যা সম্মেলন-এর (All India Oriental Conference) ইতিহাস শাখার

সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপর ১৯৪১ সালে Indian History Congress-এর প্রথম শাখার (প্রাচীনতম ভারতীয় ইতিহাস) সভাপতির এবং ১৯৫০ সালে Indian History Congress এর মূল সভাপতির আসন অলংকৃত করেছিলেন। এ-ছাড়া ১৯৩৭-এ তিনি All India Oriental Conference-এর এবং ১৯৩৯ সালে Indian History Congress-এর কলকাতার প্রথম অধিবেশনে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। শেষের বার History Congress-এর অন্যতম স্থানীয় সেক্রেটারীও ছিলেন তিনি। ১৯৪৯ সালে তিনি Asiatic Society of Bengal এর Fellow মনোনীত হন, এবং ১৯৫১ সালে ভারত-তত্ত্ববিদ্যায় (Indology) প্রতি অগাধ পাণ্ডিত্যের সম্মানস্বরূপ তাঁকে এশিয়াটিক্ সোসাইটি বি, সি, লাহা-স্বর্ণপদক উপহার দেন।

শ্রীযুক্ত রায়চৌধুরী আজ বার্ধক্যের বেলাভূমিতে সমাসীন। শারীরিক অসুস্থতায় বিবশ হলেও তাঁর সম্পর্কে মুগ্ধ-বিস্ময়ে লক্ষ্য করবার মতো সব চাইতে উল্লেখ্য বিষয় হলো তাঁর অধ্যয়ন। দৃষ্টি ক্ষীণ হ'য়ে এলেও অধ্যয়নে এখনো তিনি বিন্দুমাত্র শিথিলদৃষ্টি নন, অধিকাংশ সময়ই অধ্যয়নে গভীর ভাবে মগ্ন থাকেন। কৃতী অধ্যাপক হিসাবেও তিনি ছাত্রমহলে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিলেন এবং দীর্ঘ প্রায় চল্লিশ বৎসরের অধ্যাপনায় বহু কৃতী ছাত্রের শিক্ষকরূপে তিনি নন্দিত। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, তাঁর সুযোগ্য সহোদর ডঃ গোলাপচন্দ্র রায়চৌধুরীও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস-বিভাগের কৃতী অধ্যাপক। বর্তমানে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বাণিজ্য কলেজের সম্পাদক (Secretary) যাই হোক, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের ছাত্ররা আদর্শ অধ্যাপক হেমচন্দ্রের মূল্যবান অধ্যাপনার সুযোগ যদি আরো কিছুদিন পেত, তবে যে খুবই উপকৃত হতো, সন্দেহ নেই। তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়কস্বরূপ রচনাবলী যদি এখনো তারা পেতে পারে, তাহলেও তারা অপার উপকৃত হবে। প্রার্থনা করি, তিনি সুস্থ হ'য়ে উঠুন, দীর্ঘজীবী হোন ; লিখুন নিত্যনতুন অমূল্য প্রবন্ধ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আলো-আঁধারি রাজ্যে প্রক্ষেপ করুন তাঁর মননভাস্বর সন্ধানী আলোক। ভারততত্ত্ববিদ্যার চর্চা ও গবেষণায় উদ্বোধিত করুন আগামী কালের তরুণ ঐতিহাসিক ও গবেষকদের।

মুক্তি-সবিতা

স্বামী বিবেকানন্দ

[স্বামীজির *'To The Fourth of July'* কবিতাটি আমেরিকার স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে রচিত হইলেও ইহার আবেদন সর্বদেশে, সর্বকালে। মানবতার মুক্তি-যোদ্ধৃদলের ইহা জাতীয় সঙ্গীত —স]

রাত্রির কজ্জল মেঘ—ধরিত্রীর শব আবরণ সরে গেছে,
সরে গেছে চেয়ে দেখ তোমারই যাদু-পরশনে,
ভূলোক জাগিয়া ওঠে, বিহগের কাকলিতে মঙ্গল-সঙ্গীত
শিশিরে সিনান করি দোলে ফুল এ অভিনন্দনে।

হের কুসুমের সাজ—প্রত্যেকের শিরে শিরে তারার মুকুট !
প্রেমভরে সরোবর চেয়ে রয় শত লক্ষ চোখে ;
সবার প্রণাম লহ, অন্তরের গভীর প্রণতি আলোকেশ
স্বাগত, হে সু-স্বাগত, মুক্তি বরষিছ বিশ্বলোকে।

তুমি কি জান না রবি, মোরা থাকি তব প্রতীক্ষায় নিশি-দিন
গৃহহারা বন্ধুহারা স্বেচ্ছা-নির্বাসন মেনে লই ;
নিতি নব সংগ্রামেরা অপেক্ষিছে জীবনের প্রতি পদক্ষেপে
তবু তো দুস্তর সিন্ধু, দুর্গম অরণ্য পার হই।

অবশেষে আমাদের সাধনায় ফল ধরে—ভক্তি-ত্যাগ-প্রেম
সকল কিছুর মূল্য সেই দিন হয় যে স্বীকৃত ;
তুমিও প্রসন্ন হও—দেশ দেশ লভে তব শুভ আশীর্বাদ,
নব আলোকের মন্ত্রে হে সবিতা, জগৎ দীক্ষিত।

নিখিল শরণ্য প্রভু, চলুক তোমার রথ অব্যাহত গতি
তোমার মধ্যাহ্ন-তেজ ব্যক্ত কর আকাশে আকাশে ;
তব বরে হয় যেন মানুষের জীবনের মান সমুন্নত
ভাঙ্গিয়া শৃঙ্খল সব বিশ্বে যেন নব দিন আসে।

অনুবাদ : জীবনকৃষ্ণ দাশ।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

ঝিকিমিকি কত তারা-ফুল মাটির গায়ে! তেলের খনির আলো, শহরের আলো। তারই উপর দিয়ে বিশাল এই জটায়ু পাখী ধীরে ধীরে সঞ্চরণ করছে, কোথায় তার বিশাল পাখা নিয়ে একটুখানি ঠাঁই পেতে পারে। কতক্ষণ ধরে কতবার ঘুরল এদিক-সেদিক কত চক্কোর দিল। তার পরে নেমে পড়ল।

সন্ধ্যারাত্রে বাকুর সঙ্গে দেখা হল। উঁহু, হয়নি এখনো। শহর বিশ মাইল এরোড্রোম থেকে। ওরা বলল বিশ মাইল, চলতে চলতে আমাদের তো মনে হল অনেক বেশি। প্লেন থামতে না থামতে জানলা দিয়ে দেখছি, কী সোরগোল পড়ে গেছে! জোরালো আলো চতুর্দিকে, সিনেমা-স্টুডিওয় যে ধরনের আলো দেখতে পান। দিনমান করে ফেলেছে। মোভি ও ক্যামেরা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি! কত দলে কত দিক দিয়ে যে ছবি তুলল, তার অবধি নেই। সে পর্ব চুকল তো বক্তৃতা। কত রকমে ভালবাসা দেখাবে, যেন ওরা ভেবে পাচ্ছে না। সম্প্রতি ভারতের সিনেমা-ছবি দেখানো হয়েছে, দেখে এঁরা বিমুগ্ধ হয়েছেন, সেই কথা বারবার উঠছে। তার পরে পরস্পারের সঙ্গে আলাপনের কী মর্মান্তিক মনোরম প্রয়াস! দোভাষি নেই তো কি হল, মুখের হাসি আছে—দুটো করে হাত আছে, কোলের মধ্যে টেনে নিতে বাধা কি? প্রাচ্য দেশে এসে পড়েছি—ম্যাপ দেখতে হবে না, অভ্যর্থনার রকম দেখেই মালুম হয়। ঠোঁটের উপর ঈষৎ মোলায়েম হাসি মেখে ভদ্রতাসঙ্গত সেকহ্যাণ্ড নয়, হৈ-হৈ করে লাফিয়ে পড়ে পালোয়ানেরা বুকে তুলে ধরছে। হাড় তেমন মজবুত না হলে মড়মড়িয়ে ভেঙে পড়া বিচিত্র নয়। এক গায়ক—নাম মিঞাজী—চলেছে আমাদের গাড়িতে। মানুষটা আধপাগলা, কিন্তু ভারি দরের শিল্পী—স্ট্যালিন পুরস্কার-পাওয়া। সবাই স্ফূর্তিবাজ, কিন্তু মিঞাজী দেখতে পাচ্ছি সকলের সেরা। গাড়ির অতটুকু গহ্বরে অত স্ফূর্তি আটক রাখা দায়—আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। গান গেয়ে উঠছে—সেটা ভালই, সুর বুঝতে ভাষা লাগে না। সুরও খানিকটা আমাদের দেশী-ঘেঁসা—অথবা এ তল্লাটেরই সুর চলে গেছে আমাদের দেশে। কথাও দু-চারটে চেনা লাগছে। আজার-বাইজান দেশ—ভাষাটা আজারবাইজানি, তুর্কির সমগোত্র, ফারসির দিব্যি আমেজ পাওয়া যায়। মোটরের রেডিও ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানান দেশের স্টেশন ধরছে; দিল্লি স্টেশন ধরে লাইন খানেক হিন্দি গান শুনিয়ে দিল একবার। দু-পাঁচটা ইংরেজি কথা জানা আছে, সেই সম্বলে বোঝাবার প্রয়াস পাচ্ছে—কোন জায়গা দিয়ে যাচ্ছি এখন আমরা।

তেলের শহর। যেদিকে তাকাই তেলের কুয়া। গাড়ি চলেছে কুয়ার কিনার ঘেঁসে—কখনো বা পাইপলাইনের উপর দিয়ে। কৃষ্ণপক্ষের রাত—কিন্তু বুঝবার জো নেই, বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল চারিদিক। সভ্যতা ও রাষ্ট্রশক্তির প্রাণকেন্দ্র আজ পেট্রোল যার অপর নাম তরল-সোনা। ধরণীর গূঢ় গর্ভ থেকে সেই সোনা হাজার হাজার ধারায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে। বারো ভূতে লুটে খেতো, ইদানীং আর একটি ফোঁটার অপচয় নেই। মাটির নিচে নল বসিয়ে দূর-দূরান্তরে তেল নিয়ে যাচ্ছে। মোটর একটুখানি থামাল খনির এক কর্মিকপাড়ার মধ্যে নিয়ে। আপনি আমি অমনধারা ঘরবাড়িতে থাকতে পাইনে মশায়!

গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল মিঞাজী। কাস্পিয়ান সাগরের কূলে কূলে যাবো। সকালবেলা চলে যাবো, কম সময়ের মধ্যে যতখানি দেখে নেওয়া যায়। শহরের পুব দিকে কাস্পিয়ান সাগর। একেবারে জল ঘেঁসে রাস্তা। রাস্তার আলো জলে ছায়া ফেলেছে, তা-ও নজরে আসছে। নৌকো বেঁধে আছে সারি সারি, চলাচল করছেও দশ-বিশটা এদিক-ওদিক। ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া দিচ্ছে, গাড়ির কাচ খুলে হাওয়ায় আমি নিশ্বাস নিচ্ছি। উঃ, কত কি উপভোগ হল আমার এই জীবনে!

আরে, কাণ্ড! কে গেয়ে উঠল কোন্ দিক থেকে—'আওয়ারা হো!' কূলে-বাঁধা ঐসব নৌকোর কোন একটি থেকে হয়তো। 'আওয়ারা' ছবি চলেছিল কিছুকাল ধরে, গান এখন মানুষের মুখে মুখে। স্বদেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে মধ্য-এশিয়ার বিশাল হ্রদপ্রান্তে রাত্রিবেলা পরিচিত লাইনগুলি হঠাৎ শুনতে পেলাম। গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে কিনা বলুন?

অনেক প্রাচীন এক দুর্গ আছে বাকুতে, আরবি পদ্ধতির কারুকর্ম। বছর পঞ্চাশ আগে একটা হিন্দু-মন্দিরের নিশানাও নাকি ছিল। আর আছে পুরানো রাজপ্রাসাদ—বাকুখান সরাই। ভিতরে মসজিদ। ভাঙাচোরা দেয়ালের গায়ে সাগরের জল ছল-ছল করে। ভাঙা দেয়ালের আড়ালে মাছের নৌকো সামলে রাখবার বড্ড জুত হয়েছে।

যেখানে নিয়ে তুলল সে এক প্রকাণ্ড বাড়ি। একেবারে কাস্পিয়ান সাগরের উপরে। ধীরেন সেন, হীরেন মুখুজ্জে, জ্ঞান মজুমদার ও আমি—চার বাঙালিকে এক ঘরে দিয়েছে। মস্কোয় এখন বরফ পড়ছে, আর এ জায়গা দস্তুরমতো গরম। এই অক্টোবরে কলকাতায় যেমনটা। গরম পোশাক গায়ে সইছে না, কিন্তু উপায়ও নেই কিছু। একটা রাত্রি কাটিয়ে যাব, সকালেই আবার রওনা—বাক্স-পেঁটরা সব প্লেনে পড়ে আছে। হাতে-মুখে জল দিয়ে একটু শীতল হব, তারও ফুরসৎ দেয় না। খাওয়ার তাড়া। তোমাদের জন্য হল—ভরা মানুষ হাত গুটিয়ে বসে আছে। খানাপিনা শেষ করে সারা রাত্তির ধরে যত খুশি হাত-পা ধুয়ো; কেউ মানা করতে যাবে না।

বিরাট ব্যাঙ্কুয়েট-হল, অগণ্য অতিথি। ঘরের নক্সা ছবি আসবাবপত্রে সেকেলে বনেদিয়ানা। বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন ঝুলছে ছাত

থেকে। পশ্চিমের জানালাগুলো খোলা—আকাশের তারা ও জলতরঙ্গ দেখা যায়। হু-হু করে সাগরের হাওয়া ঢুকে আলো দুলিয়ে দিচ্ছে এক একবার।

মুসলমানি আতিথ্যের কথা শোনা ছিল। কিন্তু সে যে কী বস্তু হাড়ে হাড়ে আজ টের পেলাম। আমার পাঠককুল তো নয়ই, অতি বড় শত্রুও যেন হেন আতিথ্যের পাল্লায় না পড়ে। ঘড়ি দেখে ঠিক আটটায় টেবিলে বসেছি। ভোজ শুরু হল। খিদমতগারেরা পদের পর পদ এনে হুড়দাড় করে পাতে ঢালছে। জিজ্ঞাসাবাদের পরোয়া করে না। পাতগুলো যেন বারোয়ারি জায়গা—যার যা খুশি ঢেলে গেলেই হল। সাহেবি ভোজের দস্তুর—জিনিষ এনে এনে সামনে ধরে, অতিথিরা উদরের চাহিদা মতো তুলে নেয়। এদের অত ধৈর্য নেই। দেওয়া-থোওয়া করতে এসেছে তো ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে; আপনার খাওয়ার কাজ—তীরবেগে হাত চালিয়ে যান। এক হাতে না কুলোয় তো দু-হাতে। রেওয়াজ হল, যা পাতে পড়বে খেতেই হবে আপনাকে; নয়তো গৃহস্থের অপমান করা হল। কী বিদ্‌ঘুটে রেওয়াজ ভেবে দেখুন। গোটা হিমালয়ই উপড়ে এনে যদি ভোজের পাতে রাখে, পলকে লোপাট করতে হবে। পারবেন?

বেশ খানিকক্ষণ ঝড় বইয়ে দিয়ে, হঠাৎ দেখা যায়, খিদমতগার-বাহিনী অন্তর্হিত হয়েছে। সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললেন, ইতি পড়ে গেল রে বাবা! খুব সাংস্কৃতিক মন্ত্রী—আজকের আসরের সভাপতি ইনি—বক্তৃতায় উঠলেন। ওঁদের নিজস্ব ভাষায় বলছেন, দোভাষি মানেও বুঝিয়ে দিচ্ছে—বিস্তর ভাল ভাল কথা, কিন্তু কান পেতে নিতে যাচ্ছে কে? সর্বত্র এসব হয়ে থাকে। মন্ত্রীর ডান পাশে আছেন সকলের সেরা গাইয়ে ‘বুলবুল’। বক্তৃতার পরে তাঁর পালা। একটু স্টেজ মতন করেছে হলের একদিকে; ধীরে ধীরে তার উপরে গিয়ে আসন নিলেন। চেহারায় বুলবুল পাখি নন আদপে। বয়স হয়েছে, মাথা-ভরা টাক—রং অবশ্য ফর্শা, সেটা ওদেশের আপামর সাধারণের। কী অপরূপ যে গাইলেন! কখনো গম্ভীর মেঘমন্দ্রে, কখনো এক কৌটা কচি মেয়ের গলায়। বারম্বার ফরমাশ আসে, আরো আরো—। গাইলেন তারপরে ওখানকার অপেরার নাম-করা গায়িকা আখনাদোয়া ফেরেজি।* আশ্চর্য কণ্ঠে আর একটি মেয়ে পর পর দুটো গান গাইলেন, মেয়েটির নাম সারা খাদিমোভা। গাইলেন মিএাজী এবং আরও জন তিনেক—তাঁদের নাম টুকে আনিনি।

দুনিয়ার মানুষ যখন তেলের মহিমা জানত না, সুরার জন্য এই বাকুর নামডাক ছিল। সে খ্যাতি এখনো। আসবার পথে মস্ত বড় চোলাই-এর কারখানা দেখে এলাম। সাকিরা ঐ তো একের পর এক গিয়ে বসছে স্টেজে—ঐ কাস্পিয়ান সাগরের মতোই সুর্মা-আঁকা অতল কালো চোখ, পাকা আপেলের মতো টুকটুকে অধর, ডালিমের কোয়ার মতন ঝিকঝিকে দাঁতগুলি। নানান চেহারার তারযন্ত্র তাদের হাতে, কয়েকটার নাম শুনুন—তার (সারেঙ্গি), কেমেনকা (স্বরোদ), কাবাল (তম্বুরিন)। গাইছে গজল, গাইছে রুবেইয়াৎ। ওমরখৈয়ামের বইয়ের ছবি থেকে মেয়ে ক'টি যেন উঠে এসে স্টেজে বসল।

বক্তৃতা হল, গান-বাজনা হয়ে গেল—যাওয়া যাক এবারে? ওরে বাবা, সুরের রেশ না মেলাতে সেই খিদমতগারের দল হুড়মুড় করে আবার এসে ঢোকে। ভূতপ্রেতের ইট-পাটকেল ছোড়ার গল্প শুনেছেন—দেখতে দেখতে সামনের পাত্রে নানা খাদ্য স্তূপাকার হয়ে উঠল তেমনি। সমস্ত নতুন নতুন পদ, আগের কোনটাই এর মধ্যে আসে নি। যেন এক ভোজ সেরেই সঙ্গে সঙ্গে নতুন ভোজে বসে গেলাম। এ ভোজের শেষ ভাগেও বক্তৃতা ও গীতবাদ্য। এবং পুনশ্চ এক নতুন পর্ব। কী কাণ্ড, ভোজের পরে ভোজ—অনন্ত কাল চালাবে নাকি? এখানকার পথঘাট এবং মানুষগুলোর গতিক জানা থাকলে এক্ষুণি এক ছুটে বেরিয়ে পড়তাম।

আমাদের মিএাজীরও একটু বক্তৃতা: তোমাদের গঙ্গায় স্নান করব, দিল্লি-বোম্বাই ঘুরব, বাল্যকাল থেকে আমার সাধ; আজকে এই রাত্রিবেলা তোমাদের সঙ্গে বসে সেই সাধ মিটে গেল। আধ-পাগলা মিএাজী কেমন কাব্য করে বলছে একবার শুনুন। আর বললেন আজারবাইজানের সব চেয়ে বড় লেখক সোলেমান রুস্তম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পড়েছেন তিনি তর্জমায়। মুগ্ধ হয়ে পড়েছেন, শতকণ্ঠে তারিফ করতে লাগলেন। ভারতের সকল লেখক অমনি ভাবে সর্ব মানুষকে বড় হবার প্রেরণা জোগান, এই তাঁর প্রার্থনা।

আমার দফা শেষ ঐ বক্তৃতার ফলে। কুমতলব চাগাল এক জনের মাথায়—চোখ ঠেরে বলে দিয়েছে, লেখক একটি এখানেও আছে; ঠাকুরেরই খাস এলাকার মানুষ। আমি এত সব জানিনে; ঘাড় গুঁজে নিজ মনে খাদ্য-সমস্যা নিয়ে আছি—শুধু মাত্র মুখ-বিবরে সম্ভব নয়, অন্য কোন কৌশল আছে কিনা খাদ্য পাচার করবার—হেন কালে দু-দিক দিয়ে বিশাল দুই

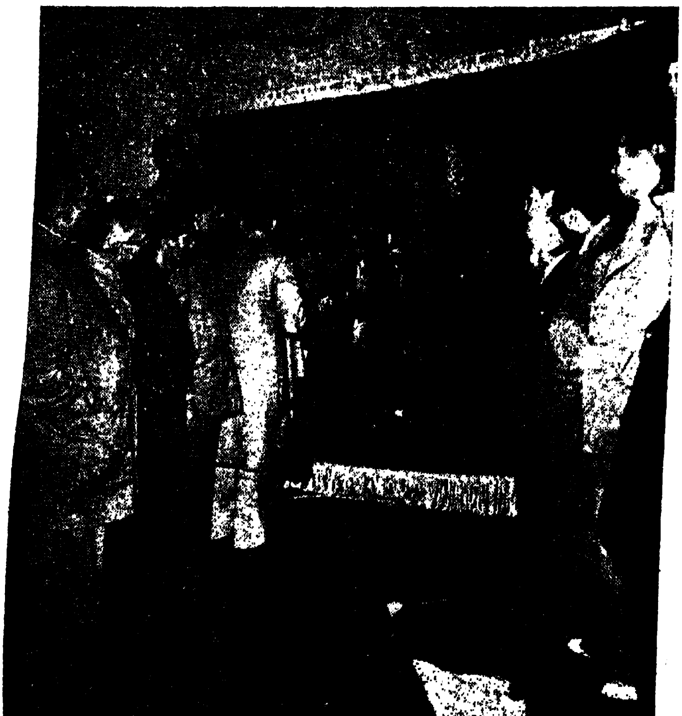


কৃষি-প্রদর্শনীতে ফল-পাকড় সাজিয়ে রেখেছে

রোষ্ট-মুরগি পাতে এসে পড়ল। আমার ডাইনে ও বাঁয়ে দুই নারী—লেখক বুঝতে পেরে এবারে স্বহস্তে তাঁরা সমাদরে প্রবৃত্ত হলেন। রামা-শ্যামা লোক নন তাঁরা—একজন সুপ্রিম-সোবিয়েতের মেম্বর, অপরজন ওখানকার শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী। তা সে যা-ই হোন, গদগদ হবার কিছু নেই। চেহারা সুন্দরই বলতে হবে, নাক-মুখ খাসা, কিন্তু রীতিমত তাগড়া জোয়ান। দু-জনেই। লম্বায় আমাদের সাধারণ মাপের দেড়া তো হবেনই, চওড়াতেও পাক্কা দেড় হাত ঘেঁসবেন। আমিও রোগা-পটকা নই, গতর দেখে হিংসাই তো করেন আপনারা—কিন্তু এই দুই বস্তুর মাঝখানে আমায় মাছি-পিঁপড়ের সামিল দেখাচ্ছে। এখন টের পাচ্ছি, টেবিলের ধারে খাবার এসে পড়লে পরিবেশনের লোককে এঁরা দিতে দিচ্ছেন না, কেড়ে নিয়ে দুজনে পাল্লা দিয়ে পাতের উপর ঢালেন। ইংরেজি জানেন না—ঠারেঠোরে খেতে বলেন, আর হাসেন মিটিমিটি। আমার কপালে ঘাম দিচ্ছে—ভোজের সুবিধা করতে পারছিনে বলে এতক্ষণ লজ্জা-সঙ্কোচ ছিল, এবারে আতঙ্কে দাঁড়িয়ে গেছে। সমাদরের আবেশে দু-দিক দিয়ে এই দুজন আরও কিঞ্চিৎ যদি চেপে আসেন, স্যাণ্ডউইচের ভিতরকার পুরের দশা হবে আমার।

রাত পৌনে-তিনটেয় বিরিয়ানি এলো। গন্ধ ভুরভুর করছে। তখন আমরা মরীয়া—কেটে কুচি-কুচি করে ফেল, এক কণিকা আর দাঁতে কাটতে পারব না। হাতজোড় করে অগত্যা স্বাস্থ্যপান চলল এদেশের-ওদেশের। মন্ত্রী মশায় ইঙ্গিত করতে উঠলেন: ভারি ভালো লাগছে। আড্ডা ভাঙবার ইচ্ছে ছিল না মোটে—কিন্তু প্লেনে সারাদিন তোমাদের ধকল গেছে, ভোরে আবার চলে যাচ্ছ, সকাল সকাল তাই শেষ করে দিলাম। যাও, বিশ্রাম করো গে।

আটটার সময় বসেছি, আর ভোজ চুকিয়ে রাত তিনটেয় এই ঘরে ফিরলাম। ভোরে যাবার তাড়া, সেই জন্য সকাল সকাল ছেড়ে দিয়েছে: নইলে বোধ হয় অষ্টপ্রহর অবিশ্রাম এই কয়াল ভোজ চালাত। শুতে গিয়ে এক ভাবনা, পশমি প্যাণ্ট পরে গরমে ঘুম হবে না তো! খেয়াল করে লুঙ্গি কি পায়জামা একটা যদি প্লেন থেকে নিয়ে আসতাম! কি করি, কি করি? বিছানার চাদর খুলে লুঙ্গির মতো পরে নিলাম—আমাদের ওক্ত পাড়াগাঁয়ের গতিক। ঠিক তখনই শুয়ে পড়তে মন যায় না। কাস্পিয়ান সাগর-কূলে তারা-ভরা আকাশের নিচে জীবনের পরম রাত্রি। একটি মাত্র রাত্রি এই। বাইরের বারাণ্ডায় বসে কতক্ষণ ধরে সাগর দেখছি। শুধু মাত্র তেল নয়, নানা খনিজে ভরা অঞ্চল। গন্ধক-জলের ঝরণা আছে, শুনেছি। সুরাখান পাহাড় থেকে যখন তখন দাউ-দাউ করে অগ্নিস্তম্ভ ওঠে আকাশমুখো। মাটি ফুঁড়ে আগুন ওঠে আরও নানান জায়গায়; বিস্ফোরণ হয়ে আগুন ছড়িয়ে যায়। আদিকাল থেকে এমনি হয়ে আসছে। ভয়-সম্ভ্রম আসে কি না বলুন হেন আগুনের উপর, পূজো করতে মন যায় কি না? জরথুস্ত্র এই অঞ্চলে জন্মেছিলেন অগ্নিপূজার বিধান দিলেন যিনি। কেন দিলেন, আজকে মালুম হচ্ছে। আপনি বলছেন, মাটির নিচের গ্যাস বেরুবার সময় আগুন ধরে গিয়ে এই সব হয়। বুদ্ধি-বিচার করে মেনে নিচ্ছি। কিন্তু সেকালের কর্তাদের বলতে গেলে বুঝতেন ঠেলা।···কাস্তের মতন চাঁদ উঠছে সাগরের প্রান্তে, জল ঝিলমিল করছে। আচ্ছা, কাস্পিয়ান সাগরের নাম নাকি কাশ্যপ মুনি থেকে! এদিকে চলাফেরা ছিল তাঁদের?



আজারবাদ মিউজিয়াম (গালিচার উপর প্রকাণ্ড ছবি বুনেছে)

ট্রাম চলতে শুরু করেছে রাত থাকতেই। কুয়াসার রহস্য-গুণ্ঠন খুলে সাগর আস্তে আস্তে মুখ খুলছে। চারিদিক স্পষ্ট হল। এ কোন জায়গায় এসে আছি! যে দিকে তাকাই, তেলের কুয়া। জাহাজের মাস্তলের মতো পাম্পের মাথা উঁচু হয়ে উঠেছে।

দিনের আলোয় সরকারি পাড়াটা একবার চক্কোর দিয়ে এরোড্রোমে ছুটলাম। মিলিটারি গাড়ির খুব চলাচল, পলকে

পলকে চোখে পড়ছে। অঞ্চলটা নিয়ে অতি সতর্ক এরা। ট্রাফিক-পুলিশ নেই, তবু দুর্ঘটনা হয় না; মানুষজন নিয়ম মেনে চলে। ঘোড়ার গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। মস্কোতেও দেখেছি এমনি এক-আধখানা। ক্রমশ আদি শহরে এসে পড়লাম। উঁচু-নিচু পথ। দেয়াল-ঘেরা নিচু ঘরবাড়ি। মসজিদ এদিকে সেদিকে। কাবুলেও অবিকল এমনিধারা দেখে এসেছি। তারপরে আর্মেনিয়ান পাড়ায় এসে পড়লাম। শহর আর নয়, গ্রামই বলুন এবারে। তেলের খনি ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে-পিছনে। পাইপে পাইপে জাল বুনে গেছে। মাটির নিচের পাইপ তবু দেখা যাচ্ছে না।

কত বড় তৈলক্ষেত্র, আকাশে উঠে আরও ভাল রকম মালুম হল। দিগ্‌ব্যাপ্ত পোড়ো জমি, জল জমে আছে এখানে ওখানে, খাল চলে গেছে, মাঝে মাঝে পিচ-দেওয়া বিসর্পিল কালো রাস্তা। তারপর কাস্পিয়ান সাগরের উপর এলাম। প্লেন নিচু হয়ে উড়ছে। জলের মধ্য থেকে তেলের পাম্প মাথা খাড়া করে উঠেছে, নিস্তরঙ্গ নীল জল নিচে। ডাঙা থেকে সাতচল্লিশ মাইল অবধি গেছে এমনি—জলের তলে কুয়া খুঁড়ে তেল আদায় করছে। প্লেন উপরে উঠছে এবার। উঁচুতে—অনেক উঁচুতে। আর জল দেখা যায় না, মেঘদল নিচে। মেঘও নয়, আকাশ ভরে পেঁজা-তুলো ছড়ানো।

কাস্পিয়ান সাগর পূব-দক্ষিণে কোণাকুণি পাড়ি দিয়ে অনেক মরু ও স্তেপভূমি পার হয়ে ঠিক দুপুরে হাঁপাতে হাঁপাতে আস্কাবাদে নেমে পড়লাম। তুর্কমেনিস্তানের রাজধানী। বাইশ শ বছর আগে পার্থিয়ানরা নিশা নগরী গড়েছিল—সেই নগরী ভেঙে-চুরে পড়ে আছে অনতিদূরে। ফাঁকা মাঠের এদিকে-সেদিকে শ্যামল সতেজ গাছ-পালা, মসজিদ আর বেঁটেখাটো ঘরবাড়ির মধ্যে এক-টা-দুটো দৈত্যাকার অট্টালিকা—এই হল জায়গাটা। বর্ষার মেঘের মতো ঘননীল কোপেতদাগ পাহাড় একটা দিক ঘিরে রয়েছে। পাহাড়টুকু পার হলে পারস্য। একেবারে সীমান্তের উপরে শহর।

আধঘণ্টা টাক এখানে থেকে জলটল খেয়ে আবার উড়বার কথা। অথচ, বসেই আছি। লোকগুলো ফুসফুস-গুজগুজ করছে, ব্যস্তসমস্ত ভাবে ছুটছে এদিক-ওদিক, ফোন করছে। বসেই আছি আমরা। অবশেষে ডাকল, রেস্তোরায় চলুন। খেয়ে নিন ভাল করে। তারপর শহরে যাবেন। আজকে আর প্লেন ছাড়বে না।

ব্যাপার কি গো? দোষ নাকি আমাদের—বাকু থেকে দেরি করে বেরুলাম কেন? আরও খানিক পরে গাঢ় কুয়াশা নামবে, সূর্য ঢেকে যাবে পাহাড়ের আড়ালে। পাহাড় পেরুতে ভরসা করছে না এখন; সকালবেলা অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। পাহাড় ভারি মজার এখানে—নতুন পাহাড় জন্মাচ্ছেন, পুরানোরা বেড়ে চলেছেন এখনও। ঐ যে কোপেতদাগ, উনিও বড় হচ্ছেন বছর বছর; ফুলে উঠছেন। আগ্নেয়গিরি হয়ে ফুঁসে উঠবেন কবে। পাঁচ বছর আগে এই অক্টোবর মাসেই বিরাট ভূমিকম্প হয়েছিল এখানে। একটা বাড়ি আস্ত ছিল না, নতুন করে শহর গড়তে হচ্ছে। মেয়র সেই ভয়ানক দিনের গল্প করতে করতে এরোড্রোমের হাতার ভিতরে রেস্তোরায় নিয়ে চললেন।

হয়েছে ভাল। মনে প্রাণে চেয়েছিলাম, মধ্য-এশিয়ার দেশগুলো একটু দেখব। অন্ধকারে পিছনে পড়েছিল, আলোর ধারায় এখন স্নান করছে। পাকেচক্রে প্রোগ্রামের বাড়তি দেশও অনেক দেখা হয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার মধ্যে সকলের পিছনে পড়ে ছিল এই অঞ্চল। উনিশ শ' পঁচিশ সালের হিসাবে পাচ্ছি, সারা দেশের মধ্যে পঁচিশটা মেয়ে একটু-আধটু লিখতে পড়তে পারে। মেয়ে কেনাবেচা ছিল এই সেদিন অবধি। মোটা পণ দিয়ে বউ ঘরে আনলাম—সে বউয়ের মরণ-বাঁচনের ষোল আনা হকদার আমি পুরুষ-মানুষ। মরুদ্যানে তুলো আর গমের অল্প-সল্প চাষ। স্তেপ-ভূমিতে ভেড়া-ছাগল চরানো। তাঁতের কাজের খুব নাম—গালিচা ও কার্পেট বানাই হাতের তাঁতে। এমনি করে অন্ন ও



অস্কাবাদ মিউজিয়ামে ছবি দেখছি

শীত-গ্রীষ্মের বস্ত্র হয়ে গেল—আবার কি ? নুনের ভাবনা নেই, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নুনের পাহাড় এই রাজ্যে। গন্ধকও প্রচুর। এবং পারা-সীসে। মরুদেশে কালো রঙের এক রকম বালু পাওয়া যায়। আর জোড়া-কুঁজওয়ালা উট দেখতে পাচ্ছেন ঐ পথে-ঘাটে—

ছোট এরোড্রোম, সামান্য রেস্তোরা। হালকা রকমের চায়ের ব্যবস্থা ছিল আমাদের জন্যে, গতিক বুঝে আয়োজনটা ভারী করতে হল। তাই কিছু সময় নিয়েছে। হাতি-ঘোড়া কিছু নয়—রুটি-মাখন, আধ-শুকনো আঙুর-আপেল—এবং খরবুজা। আমাদের দেশের খরমুজ আর কি, মরু অঞ্চলে জন্মানোর দরুন চেহারাটা অধিক নিরেশ। বড় বড় ফালি কেটে বারকোশে করে এনেছে। ও-বস্তু কে খেতে যাচ্ছে, পাতের কোল থেকে সবাই ফিরিয়ে দেয়। মেয়র মশায় অনুনয়-বিনয় করছেন : একটুখানি চেখেই দেখুন না! পুরো ফালি না নেবেন তো কেটে নিন। সন্তর্পণে একটুকু জিভে ঠেকাতে, বলব কি মশায়, মাখনের মতো গলে আপনা-আপনি নেমে গেল বস্তুটা। যেমন সুবাস তেমনি স্বাদ! আরও দাও, আরও দাও—রব উঠল টেবিলের সর্বপ্রান্ত থেকে। মেয়র মশায় মুচকি মুচকি হাসেন। খরবুজা ফল ভুবনের বিস্তর জায়গায় ফলে, কিন্তু এখানকার মতো নয়। এখান থেকে এই ফল ভিস্তির মশক চাপা দিয়ে হিমালয়ের অন্ধিসন্ধি ঘুরিয়ে লাহোরের মোগল-দরবারে পৌঁছে দেওয়া হত, নিদারুণ গ্রীষ্মে বাদশাহেরা খেয়ে পরিতৃপ্ত হতেন। এর পর ও-তল্লাটে যত ঘুরেছি—খানা-টেবিলে বসে সকলের আগে খোঁজ করি : খরবুজা কই মশায়, সেইটে নিয়ে আসুন—

সেই যে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে টেলিফোন করছিল, হোটেলের ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। অবেলায় নতুন করে সেখানে রান্নাবান্না চাপিয়েছে। জলযোগ অন্তে শহরে চললাম। ধুলোমাটি-ভরা রাস্তা দিয়ে চলেছি—দূর কম নয়। ঘোড়ার পিঠে চড়ে উটের পিঠে চড়ে যাচ্ছে অনেকে ; গাধা চড়েও যাচ্ছে। ধু ধু করছে মাঠ—মরুভূমি বলতে পারেন। শহরের কাছাকাছি এসে গাছপালা পাচ্ছি। পিচ-দেওয়া চওড়া রাস্তা। ভূমিকম্পের ধ্বংসাবশেষের উপর নতুন নতুন বাড়ি উঠছে। বেশির ভাগ বাড়ির দেখছি মাটির দেয়াল, ছাতও মাটির। বাড়ির চারিদিক ঘিরে পাঁচিল থাকবে অতি অবশ্য। বাড়ি তৈরি হয় নি, জমির চতুর্দিকে আগেভাগে পাঁচিল দিয়ে রেখেছে। গোটা অঞ্চল ধরে মুসলমান। বিশাল মসজিদ একটা, কারুকার্যখচিত বৃহৎ গম্বুজ—কিন্তু নিচের অংশটা ভেঙেচুরে ইট গাদা হয়ে আছে। কপাট জঙ্গল ভিতরে, লোহার শিকের ভারী দরজায় কুলুপ আঁটা—কেউ কোন দিন ঢোকে বলে তো মনে হয় না। মসজিদের পাশে জাতীয় মিউজিয়াম। খেয়েদেয়ে সন্ধ্যার দিকে বেড়াতে আসব এখানে, অনেক বস্তু দেখবার আছে।

মেয়রের কাছে গল্প শুনছি। ষষ্ঠ শতকের ইতিহাসে প্রথম এদেশের নাম পাচ্ছেন। আরবেরা জয় করল ; প্রাচীন সংস্কৃতি বিলকুল নষ্ট হয়ে গেল তাদের কবলে পড়ে। পার্থিয়ানদের শহর নিশা ধ্বংস করল মঙ্গোলিয়ানরা। কি অবস্থায় ছিলাম, আজকের চেহারা দেখে কিছু আন্দাজ করতে পারবেন না। বিপ্লবের আগে শতকরা ৭ জন লিখতে পড়তে পারত ; এখন কি পুরুষ কি মেয়ে একটি নিরক্ষর নেই। গোর্কি য়ুনিভার্সিটি আর অগণ্য ইস্কুল-কলেজ গড়ে উঠেছে। ম্যালেরিয়া ও প্লেগে গোটা মধ্য-এশিয়া উৎখাত হয়ে যাচ্ছিল, এ সব রোগ ঝাড়ে-বংশে নিপাত হয়েছে এখন। সিল্ক, কাপড় ও নানান রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি হয় ; বড় বড় মিল-ফ্যাক্টরি হয়েছে। যৌথখামার হাজার খানেক হবে—প্রতি চাষী-পরিবার গড়ে সত্তর আশী হাজার রুবলের ফসল ফলায়। তুলা বেশি। মেষপালনও খুব হয়। পঞ্চাশ-ষাট হাজার অষ্ট্রাখান ভেড়া প্রতি যৌথখামারে। আর কার্পেটের তো আদি জায়গা—কার্পেটের কথা আলাদা করে বলতে হবে না। কারাকুম মরুর মাঝখান দিয়ে খাল কাটা হচ্ছে ; দিনরাত যন্ত্রপাতি খাটছে ; দেড় বছর লাগবে আর। খাল কেটে আমুদরিয়ার জল নিয়ে আসবে, চাষবাস ডবল হয়ে যাবে তখন।

ভূমিকম্পের কথা উঠল। এখনো গা কাঁপে সেই দৃশ্য মনে উঠলে। একটা বাড়ি ছিল না শহরে, কত লোক মরেছিল গোনা-গুণতি নেই। খবর যখন চারি দিকে চাউর হল—বলব কি মশায়, বাকু তিবলিসি তাসখন্দ সর্বত্র হৈ-হৈ পড়ে গেল। খাবার, অষুধ ও রকমারি জিনিষপত্র আসতে লাগল সকল অঞ্চল থেকে। সাহায্য বয়ে নিয়ে এরোপ্লেন এত আসছে যে আকাশ দেখা যায় না। বুঝলাম, আমাদের তুর্কমেনিয়ার দুঃখ গোটা সোবিয়েত দেশ ভাগ করে নিয়েছে। সোবিয়েতের কেন্দ্র-সরকার একশ' মিলিয়ান রুবল মঞ্জুর করলেন। নতুন বাড়ি বানানোর সাজসরঞ্জাম ভারে ভারে এসে পড়ছে। কেন্দ্র-সরকার এখনও প্রতি বছর পঞ্চাশ মিলিয়ান রুবল দিচ্ছেন। কিন্তু লোকের অভাবে কাজকর্ম তাড়াতাড়ি এগোচ্ছে না। এবারে এমন ঘরবাড়ি হচ্ছে, ভূমিকম্পে যা ভাঙতে পারবে না। এই নতুন পদ্ধতি সকলে জানে না, শিখিয়ে পড়িয়ে লোক তৈরি করে নিতে হচ্ছে।

কালকের বিপাকে সেয়ানা হয়ে গেছি, মালপত্র প্লেনে নেই, সমস্ত এসে গেছে হোটেলে। লাঞ্চ শেষ হতে ঘোর হয়ে এলো। বেরুনো যাক, তাড়াতাড়ি এর মধ্যে যত কিছু দেখে নেওয়া যায়! লেনিন পার্ক। লেনিনের অতিকায় মূর্তি পার্কের ঠিক মাঝখানে। জায়গাটা গালিচার জন্য বিখ্যাত বলেই মূর্তির পদতলে পাথরের উপর গালিচার নানান রকমের নক্সা। যত ছেলেমেয়ে ঘোরাঘুরি করছিল, সবাই এক ঠাঁই হয়েছে এখন। আমাদের কাছে এসে দাঁড়াল, সম্বর্ধনা জানায় রুশ ভাষায়। আমরা ঘুরছি, তাদেরও এক দঙ্গল ঘুরছে পিছু পিছু। মিউজিয়াম যাবো এখান থেকে, গাড়িতে উঠেছি—গাড়ি ঘিরে তারা উল্লাস করছে, পথ ছেড়ে দিতে চায় না।

শহরটায় দ্রুত এক পাক দিয়ে এসে পড়লাম—মিউজিয়ামে। মেয়েরা লাল পোশাক বড্ড ভালবাসে ; লাল কাপড়ের টুকরো মাথায় বাঁধে গামছার মতন। এই হল জাতীয় সাজ। এই পোশাকে এখন রাত্রিবেলাও গোটা কয়েক মেয়ে মিউজিয়ামের পিছন দিককার বাগানে গল্পগুজব করছে, হাসছে খিলখিল করে। মিউজিয়ামে হরেক রকম গালিচা দেখাচ্ছে, জাঁক করে দেখাবার বস্তুই বটে। কার্ল মার্কস, লেনিন, ষ্টালিন ও স্থানীয় অনেক নেতার ছবি তুলেছে গালিচায়। পুরো এক ঘটনা ধরে তুলে ফেলেছে। পটে আঁকা ছবিতেও এমন নিখুঁত হয় না। নক্সা বোনে মেয়েরাই বেশির ভাগ ; কি ভাবে, কোন্ পদ্ধতিতে বোনে, তা-ও হাতে-কলমে দেখিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ের

অরণ্যে বাঘ ইত্যাদি জন্তুজানোয়ার; বিস্তর মরা জীবজন্তু সাজিয়ে রেখেছে একদিকে।

অপেরায় ছুটলাম এবারে। পায়োনিয়র-বাচ্চারা পথে এগিয়ে আছে অভ্যর্থনার জন্য। হাততালি দিয়ে ভিতরে নিয়ে চলল। ছুটে গিয়ে কোথা থেকে একগাদা ফুল নিয়ে এলো। ফুলের তোড়া হাতে হাতে গুঁজে দেয়। অপেরা-হলে ঢুকতে পুনশ্চ এক দফা হাততালি। হাততালি থামে না, হলসুদ্ধ মেতে গেছে। রোমাণ্টিক নাটক—নিছক প্রেমের গল্প। সোবিয়েতে যত পালা দেখলাম, বেশির ভাগ এমনি। ছেলেটার নাম তাহের; মেয়ে জোহরা। জোহরার বাপ মন্ত্রী; তাহেরের বাপ রাজা। অত্যাচারী রাজা—ক্রীতদাসদের নির্মম ভাবে খাটায়। তাহের বিরুদ্ধে দাঁড়াল—প্রিয়তমাকে পেতে বাধা ঘটল সেই কারণে। বিস্তর হুটোপুটির পর মিলন অবশেষে।

[ডায়েরির মন্তব্য: আজ আটাশে অক্টোবর শুক্রবার আস্কাবাদ শহরের হোটেলে আটাশ নম্বর ঘরে রাত্রি এগারোটায় এই অবধি লিখলাম। খুব ভোরে বেরিয়ে পড়ব। রোজ রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি ইতি করছি আজ। জীবনে আর কখনো আসব এখানে? লেখা থাক, রাতের চেহারাটা দু-চোখ ভরে দেখে নিই। ঘরের সামনে একটু ব্যালকনি, আপেল-গাছ ঝুঁকে পড়েছে। একটা ডাল ধরে দাঁড়ালাম সেখানে। এরই মধ্যে চারিদিক নিশুতি, কী রকম শহর রে বাবা! ছুটোছাটা দু'টি একটি মানুষ চলাচল করছে। কালো ওভারকোট গায়ে একটা মেয়ে ও এক পুরুষ হাত ধরাধরি করে চলেছে; গলে গলে পড়ছে দেখ দু'টিতে। আমার টেবিলের উপর ফুলের তোড়া—অপেরা থেকে নিয়ে এসেছি। সুবাসে মন ভরে গেল···]

[ক্রমশঃ।

তেশিরার স্বপ্ন

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তেশিরার কাঁটা-গাছ কে বা দেখে তাকে?
পঁড়ো এক পগারেতে থাকে।
থাকে বহু বহু দিন ধরে,
টাইটি আগল শুধু করে।
ফুল বড়—কদাচিৎ হয়,
সে ফুল পূজার ফুল নয়।
রাখালেরা তুলে করে খেলা
সকলেই করে অবহেলা।

শুভ প্রাতে সাধু এক সেই পথ দিয়া
যেতেছেন একাকী চলিয়া।
তেশিরার ফুল ফুটিয়াছে—
দেখিয়া গেলেন তার কাছে।
সোহাগে ফুলটি তুলি তায়—
পরিলেন নিজের জটায়।
গাছটি উঠিল শিহরিয়া
সে কি পেলে চেতনা ফিরিয়া?

সিদ্ধ সৌম্য সে সাধুরে চেনে নাক' কে বা?
আমি চিনি—তিনি বামাক্ষেপা।
দেখিনু কি দৃশ্য অভিরাম,
গুহকের গৃহে এ যে রাম।
পয়নালী স্থান পেলে কি রে—
একেবারে গঙ্গাধর-শিরে?
রে তেশিরে, কি সৌভাগ্য বল···
আজি তোর স্বপন সফল।

যুগপুরুষ

বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

—ষোল—

নূতন তরঙ্গ

নূতন শক্তির আঘাতে নিস্তরঙ্গ সমাজের বুকে যখন স্পন্দন জাগে, তখন তার ভিতরের অস্থিপঞ্জর পর্যন্ত অনুরণিত করে তোলে। বিদ্যাসাগরের কর্মজীবনের প্রারম্ভে, প্রাণহীন বাংলার সমাজের বুকেও এই অনুরণন শোনা গিয়েছিল। কেবল চিরাচরিত 'ধর্ম' সম্বন্ধেই যে মানুষের মনে নানাবিধ প্রশ্ন জেগেছিল, তা' নয়। সমাজ-জীবনের অন্যান্য ক্ষতস্থানও নবজাগ্রত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। এমন কোন সামাজিক সমস্যা ও প্রশ্ন ছিল না, যা মানুষের মনকে তখন নাড়া দেয়নি। সমস্যা যত জটিল হোক না কেন, তার মূল কুসংস্কারের যত গভীর স্তর পর্যন্ত জট পাকিয়ে থাকুক না কেন, নির্ভয়ে ইয়ংবেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজপন্থীরা তার মুখোমুখি দাঁড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, তার সমাধানের পন্থা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। সনাতনপন্থীদের সশব্দ সোরগোলে তাঁরা বিচলিত হননি, ভয় পাননি।

জীবন ও সমাজের নানাদিক নিয়ে এই দুঃসাহসিক প্রশ্নোত্তর ও তর্কবিতর্কের যুগে, বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম যৌবনের কর্মোন্মুখ অস্থির মনটিকে, এক-একটি লক্ষ্যের শিখরে স্থিরভাবে নিবদ্ধ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

শিক্ষা ও সমাজসংস্কার আন্দোলনের সমস্ত প্রেরণা তিনি বাইরের সমাজ-জীবনের নূতন তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাত থেকেই পেয়েছিলেন। কোনটাই তিনি নিজে উদ্ভাবন করেননি। তাঁর ব্যক্তিগত অনুভূতি ও কল্যাণবুদ্ধির সঙ্গে বাইরের সমাজচেতনার যে ঐতিহাসিক মিলন হয়েছিল, তার ফলেই তিনি নবযুগের বাংলার অন্যতম সারথী হতে পেরেছিলেন।

কলকাতা শহরের জনৈক বড়মানুষ 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকায় তাঁর রোজনামচার মধ্যে জীবনের যে চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন, সেইটাই সামাজিক সত্যের সবটুকু নয়। রোজনামচার বিকৃত রূপ ছাড়াও জীবনের আরও একটা দিক তখন বাইরের সমাজে ফুটে উঠেছিল, যার প্রভাব শহরের বড়মানুষদের প্রভাবের তুলনায় বেশি ছাড়া কম ছিল না।

ধর্ম ও ধর্মান্তরের সমস্যা তখন বড় হয়ে উঠলেও, সকলের মনপ্রাণ ধর্মের রাজ্যেই বন্দী ছিল না। ইয়ং বেঙ্গল ও ব্রাহ্মসমাজ দলের যুবকরা, জীবনের নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, কেবল ধর্মসংস্কারের কাজে নিজেদের হারিয়ে ফেলেন নি। সমাজের আরও নির্মম সত্যগুলিকে তাঁরা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ক্ষেত্রে টেনে নামিয়ে এনেছিলেন। যাঁরা এই কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, নবীন বাংলার সেই যুবসমাজের মধ্যে বিদ্যাসাগর ছিলেন অন্যতম। পরে বিদ্যাসাগরই শীর্ষস্থান দখল করেছিলেন।

বাংলার সমাজ-জীবনেও অনেক নূতন গতিশক্তি তখন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। একত্রে এমন কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হয়েছিল তখন যে তার প্রতিক্রিয়ায় সমাজের সবচেয়ে অসাড় অচৈতন্য দিকটাতেও নূতন সাড়া জেগেছিল, নূতন চৈতন্যের উদয় হয়েছিল। তার মধ্যে দাসত্বপ্রথার উচ্ছেদ, জর্জ টমসনের কলকাতায় আগমন ও নূতন সভাসমিতির বিস্তার, বিকাশ ও কর্মতৎপরতা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগর যখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ করছিলেন এবং মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে-সময়ে হিন্দু কলেজ থেকে পালিয়ে খৃষ্টধর্মে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সেই সময়, সেই বছরেই, ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে দাসত্বপ্রথা-নিরোধ আইন পাশ হয়।

বহুকাল ধরে দাসত্বপ্রথা আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল। দেশভেদে ও সামাজিক অবস্থাভেদে তার রূপ ভিন্ন হলেও, কেনা-গোলামি ছাড়া তাকে আর কিছু বলা যায় না। বাংলা দেশের নানাজায়গায় গোলাম কেনাবেচা হ'ত এবং বংশানুক্রমে গোলামি করত মানুষ। কলকাতা শহরেও উনিশ শতকের প্রথম দিক পর্যন্ত, অন্যান্য পণ্যদ্রব্যের মতন, গোলাম কেনাবেচা হয়েছে, ব্যবসায়ীরা গোলাম কিনে জাহাজ বোঝাই ক'রে বিদেশে চালান দিয়েছেন। সাহেবরা বাড়ীতে দাসদাসী রেখেছেন এবং গোলামের মতনই তাদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবনেও কেনাগোলামির এই কুৎসিত রূপ দেখেছেন কলকাতা শহরে। "ক্যালকাটা গেজেট," "সমাচার দর্পণ" প্রভৃতি সমসাময়িক পত্রিকায় মানুষ-বিক্রীর ও গোলাম কেনাবেচার অনেক বিজ্ঞাপন ও সংবাদ

প্রচারিত হয়েছে। ইংরেজরা প্রথম দিকে এই গোলামিকে প্রশ্রয় দিয়েছেন, এদেশের মানুষের সঙ্গে তাঁদের সাধারণ প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য। পরে ইংলণ্ডেই যখন সমাজের একদল মানুষের মধ্যে নূতন মানবতাবোধ জেগেছে, এবং উদার ধর্মান্দোলনের সঙ্গে যখন এই মানবতার আন্দোলন এক হয়ে মিশে গিয়ে শক্তিশালী সামাজিক আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছে, উইলবারফোর্সের (Wilberforce) ও বাক্সটনের (Fowell Buxton) মতন সমাজনেতাদের আবির্ভাব হয়েছে, তখন ইংরেজ শাসকরাও বর্বর গোলামিপ্রথাকে তাঁদের সাম্রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করতে সচেষ্ট হয়েছেন।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকেই ইংলণ্ডে দাসত্ববিরোধী আন্দোলন গ'ড়ে উঠেছিল। ১৮০৭ সালে দাস-ব্যবসা (Slave trade) রহিত হয় এবং ১৮৩৬ সালে বৃটিশ-সাম্রাজ্যের সর্বত্র তার ফলাফল কার্যকর হয়। সেই সময় যে সব ইংরেজ শাসক ও প্রতিনিধি এদেশে আসেন, তাঁরাও কতকটা এই সামাজিক মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আমাদের দেশে প্রত্যক্ষভাবে দাসত্বপ্রথাবিরোধী কোন আন্দোলন হয়নি বটে, কিন্তু রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথাবিরোধী আন্দোলনের মধ্যে এই নূতন মনোভাবই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। সতীদাহপ্রথার শাস্ত্রীয় নাম "দাসত্বপ্রথা" না হলেও, তাকে দাসত্বপ্রথারই সামাজিক 'প্রকরণ' ছাড়া কিছু বলা যায় না।

উইলবারফোর্সের দাসত্ববিরোধী আন্দোলন ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে যে সব নূতন শক্তি সঞ্চারিত করেছিল, যেসব যুগধর্মী বৈশিষ্ট্যের বিকাশে সাহায্য করেছিল, রামমোহনের সতীদাহবিরোধী আন্দোলনও বাংলার সমাজে তাই করেছিল। অন্ততঃ তার সূচনা করেছিল বলা যায়। পরে বিদ্যাসাগরের মানবধর্মী আন্দোলন তাকে সমগ্রতা দান করেছিল।

ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে উইলবারফোর্সের আন্দোলনের ফলাফল সম্বন্ধে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ট্রেভেলিয়ান (G. M. Trevelyan) বলেছেন :(১)

> Wilberforce and the anti-slavery men had introduced into English life and politics new methods of agitating and educating public opinion...Public discussion and public agitation of every kind of question became the habit of the English people... Voluntary association for every conceivable sort of purpose or cause became an integral part of English social life in the Nineteenth Century..."

উইলবারফোর্সের আন্দোলনের ফলে ইংলণ্ডের সমাজ-জীবনে যে আলোড়নের সৃষ্টি হ'ল তা যুগান্তকারী। জনমতকে সংগঠিত, পরিচালিত ও আন্দোলিত করার সামাজিক পদ্ধতিই বদলে গেল। আগেকার যুগে এই সামাজিক আন্দোলন সম্ভব ছিল না। যে কোন সমস্যা নিয়ে যত্রতত্র আলোচনা করা, তর্কবিতর্ক করা, আন্দোলন গড়ে তোলা যেন ইংরেজদের জাতীয় অভ্যাসে পরিণত হ'তে লাগল। সবরকমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ নিয়ে স্বাধীন সভা-সমিতিরও বিকাশ হ'তে লাগল চারিদিকে।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে, সতীদাহের বিরুদ্ধে, ধর্মের নামে চিরাচরিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, রামমোহন রায়ের আন্দোলনের ফলেও, উইলবার-ফোর্সের সমসাময়িককালে, বাংলার সমাজ-জীবনে নবযুগের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল। ইয়ং বেঙ্গল দলের প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টির ফলে আরও দ্রুত নবযুগের এই লক্ষণগুলি চারিদিকে প্রকট হয়ে ওঠে। পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতিতে সমস্ত বিষয় সকলের আলোচ্য ও বিচার্য হয়। ১৮৪৩ সালে আমাদের দেশে আইন পাশ করে যখন দাসত্বপ্রথা রহিত করা হয়, তখন ইয়ং বেঙ্গল দলের মুখপত্র "বেঙ্গল স্পেক্টেটর" অভিনন্দন জানিয়ে যা লেখেন তার মর্ম এই : (২)

> "আমরা জেনে আনন্দিত হলাম যে, এ বছরের পঞ্চম আইন অনুসারে এদেশে দাসত্বপ্রথা বেআইনী প্রথা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের দাসত্ব-পীড়িত অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবনে এই আইন নূতন আশীর্বাদ বহন ক'রে আনবে। যদিও আমরা জানি যে আমাদের দেশের (বাংলাদেশের) বিভিন্ন অঞ্চলে যে-ধরনের দাসত্বপ্রথা প্রচলিত আছে, তা পশ্চিম ভারতে প্রচলিত নিষ্ঠুর ও বর্বর প্রথার তুলনায় অনেক বেশি কোমল, তা হলেও এরকম অভিশপ্ত অমানুষিক প্রথার ফলাফল সমাজ-জীবনে অকল্যাণকর হতে বাধ্য বলে, আমরা তার অবলুপ্তি কামনা করি। কোমলতা বা কঠোরতা দিয়ে এপ্রথার বিচার করা যায় না, কারণ মানুষের ন্যায্য জন্মগত মানুষিক অধিকার থেকে দাসত্বপ্রথা মানুষকে বঞ্চিত করে এবং মানুষকে অমানুষ করে তোলে। কোমল বা কঠোর যাই হোক, আমাদের হিন্দু ও মুসলমান শাসকরা দাসত্বপ্রথা বর্জন করেননি। ইংরেজদের শাসনকালে এই বর্বর প্রথা রহিত হ'ল যখন, তখন ইতিহাসে তারা স্মরণীয়ও হয়ে রইলেন। এই উপলক্ষে আমরা তাদেরও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যাঁরা ইংলণ্ডের জনমতকে দাসত্বপ্রথার বিরুদ্ধে জাগিয়ে তুলে, সেই জনমতকে সংগঠিত ক'রে আইনপ্রণেতাদের দৃষ্টি এবিষয়ে আকর্ষণ করেছিলেন।"

মানুষ যে কেবল জীবনধারণের জন্য নিজের মানবিক সত্তাকে চিরকালের জন্য বন্ধক দিয়ে, দাসত্বের নিষ্ঠুর বন্ধন সহ্য করতে পারে, ছেলেবেলা থেকে বিদ্যাসাগর সে করুণ সামাজিক দৃশ্য তাঁর চারিদিকে দেখেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বৃদ্ধ পিতামাতারা তাঁদের সন্তানদের পণ্যের মত বিক্রী করবার জন্য কলকাতা শহরে নিয়ে আসতেন। উনিশ শতকের গোড়ার দিকের সংবাদপত্রে এরকম সংবাদ প্রায়ই প্রকাশিত হত। সভ্যসমাজে, মাত্র দেড়শ'-দুশ' বছর আগেও যে সাধারণ মানুষের সঙ্গে পশুর মর্যাদার কোন পার্থক্য ছিল না, একথা মনে ক'রে বিদ্যাসাগর নিশ্চয় ঘৃণায় শিউরে উঠতেন। সামাজিক প্রথা দীর্ঘকাল স্থায়ী হ'লে, কেবল

(১) G. M. Trevelyan: English Social History (London, 1948): ৪১৫—৪১৭ পৃষ্ঠা।

(২) The Bengal Spectator, Vol II, No 13, May 1, 1843.

বাইরে থেকে আইন পাশ ক'রে সহজে তাকে রহিত করা সম্ভব হয় না। প্রথা প্রায় জন্মগত সংস্কারে পরিণত হয়, এবং রাষ্ট্রীয় আইনের জোরে তাকে রাতারাতি নির্মূল করা যায় না। দাসত্ব-প্রথা বেআইনী ঘোষিত হবার পরেও কিছুকাল টিঁকে ছিল, কিন্তু তা থাকলেও, সমাজে মানুষের মর্যাদা যে স্বীকৃত হ'ল, কেবল দারিদ্র্যের অপরাধের জন্য মানুষকে যে পশুর মতন গোলামি করতে বাধ্য করা হ'ল না, অন্তত একটা আইনের অবলম্বন যে সে পেল, যার উপর খঞ্জের যষ্টির মতন ভর দিয়ে মানব-সমাজে সে সোজা হয়ে চলবার চেষ্টা করতে পারে—ইতিহাসে এইটুকুই একটা যুগান্তকারী ঘটনা।

ঘটনাটি 'আইনতঃ' ঘটলেও, যুগান্তকারী ঘটনা। আইনের অক্ষর থেকে মানুষের জীবনের স্তরে পৌঁছানো সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। যখন তা পৌঁছয় তখন অক্ষরবদ্ধ আইন জীবনের সত্য ও সামাজিক সত্য হয়ে ওঠে। একথা বিদ্যাসাগরও জানতেন। আরও কিছুদিন পরে, তিনি নিজে সমাজ-কল্যাণের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে, যে-সব আইন পাশ করিয়েছিলেন, সে-সব আইন একশ বছরেও সামাজিক সত্যে পরিণত হয়নি। না হলেও, তার স্বীকৃতিটাই বড় কথা। আইন হ'ল সেই প্রাথমিক স্বীকৃতি। রাষ্ট্রের কর্ণধাররা 'স্বেচ্ছায়' হঠাৎ কোন আইন পাশ করেন না, বিশেষ ক'রে সামাজিক আইন। যুগোপযোগী সামাজিক চেতনার প্রাথমিক স্বীকৃতি হ'ল আইন। দাসত্বপ্রথা-নিষেধ আইনের মধ্যেও বিদ্যাসাগর সেই প্রাথমিক স্বীকৃতিরই পরিচয় পেয়েছিলেন। মানুষের মানবিক মর্যাদার ও অধিকারের ঐতিহাসিক স্বীকৃতি।

১৮৪৩ সালে যখন এই আইন পাশ হ'ল, ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্রে তার সামাজিক গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা হ'তে লাগল, তখন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বিদ্যাসাগরের মাত্র বছর দেড়েক চাকরি হয়েছে। বয়স তাঁর তেইশ বছর। তেইশ বছরের যুবক গোলদীঘি থেকে বাংলার সমাজের মেঘাবৃত আকাশের দিগন্ত পর্যন্ত চেয়ে দেখলেন। দাসত্বপ্রথা রহিত হলেও, গোলাম কেনাবেচা আইনতঃ দণ্ডনীয় হলেও, দাসত্বের নানা রকমের বন্ধন থেকে সমাজের সর্বস্তরের ও সর্ব শ্রেণীর মানুষের মুক্তির এখনও অনেক দেরী। সংগ্রাম সবে মাত্র শুরু হয়েছে। সতীদাহ নিবারণ আইন, দাসত্বপ্রথা নিরোধ আইন, তার প্রথম পর্বের ফলাফল মাত্র। সংগ্রামের অনেক পর্ব এখনও বাকি আছে। অনেক অগ্রগতি ও পশ্চাদপসরণের ভিতর দিয়ে, সংগ্রামে এগিয়ে যেতে হবে। সংগ্রামের সেই চেতনাও জেগেছে বাইরের সমাজে। সেই সমাজ-চেতনার মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের চেতনাকে নিমজ্জিত ক'রে দিলেন।

এই সমাজ-চেতনার পুরোগামী মুখপাত্র ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের চোরাগলিতে তাঁদের নবীন উদ্যমের অনেকটা অপচয় হলেও, সমাজ সংস্কার আন্দোলনের আবশ্যকতাও তীব্র ভাবে তাঁরা অনুভব করেছিলেন। কেবল তাঁদের মুখপত্রে নয়, বিভিন্ন সভাসমিতির আলোচনার মধ্য দিয়েও তাঁদের এই অনুভূতির ও বোধশক্তির প্রকাশ হচ্ছিল বাইরে। ধর্মের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ খানিকটা উচ্ছৃঙ্খল হলেও, সমাজজীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তার যুগোপযোগী প্রকাশই হয়েছিল। ইয়ংবেঙ্গলের সমস্ত উচ্ছৃঙ্খলতা ও অসংযমের কথা স্বীকার ক'রেও তাঁদের এই যুগোপযোগী মনোভাবকে অস্বীকার করা যায় না। একদিকে তাঁরা যেমন ভেঙেছিলেন, তেমনি অন্য দিকে নূতন ক'রে গ'ড়ে তোলার মতন ভিত রচনা করতেও চেষ্টার ত্রুটি করেননি। তাঁদের এই মনোভাবটাই ছিল ঐতিহাসিক। অন্যায়ের বিরুদ্ধে, যুক্তি ও বুদ্ধির অগম্যের বিরুদ্ধে, বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব। সেই মনোভাবকে বাইরে সাহস ক'রে লোকসমাজে প্রকাশ করবার মতন চারিত্রিক দৃঢ়তাও ইয়ংবেঙ্গলের ছিল। বিদ্যাসাগরের মন এই বিদ্রোহ, প্রতিরোধ ও বলিষ্ঠতার পরিবেশের মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। তাঁর কর্মজীবনের গোড়াতে, যৌবনের প্রারম্ভে, তিনি ইয়ংবেঙ্গলের এই মানসিক বলিষ্ঠতা থেকে নিজের মনেও বলসঞ্চয় করেছিলেন।

ধর্মের ক্ষেত্র ছাড়াও, ইয়ংবেঙ্গলের এই বিদ্রোহী মনোভাব কি ভাবে অন্যান্য ক্ষেত্রেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, একই সময়ে, তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে, মধুসূদন যখন হিন্দু কলেজ থেকে পালিয়ে একদিন খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিতে গিয়েছিলেন, তখন 'দূর শ্বেতদ্বীপ তরে' যে ব্যাকুল বেদনা তাঁর মনে জেগেছিল, অতলান্তিকের 'অপার জলধি' লঙ্ঘন ক'রে যশলাভের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষায় তিনি বিচলিত হয়েছিলেন, তার পিছনে ছিল ঐ যুগমানসের প্রেরণা। সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রাচুর্যের মধ্যেও তাই পারিবারিক জীবনের গতানুগতিকতা ও সঙ্কীর্ণতা তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে তাঁর নবজাগ্রত মানবসত্তা বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহের সাময়িক 'প্রকাশ' ভুল হলেও, বিদ্রোহটা ভুল নয়, কালোত্তীর্ণ যুগসত্য। বিদ্যাসাগর এই যুগসত্যের দু'রকমের বহিঃপ্রকাশই দেখেছিলেন। মধুসূদনের ধর্মান্তরের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন তার 'সাময়িক' উদ্দাম প্রকাশ, কিন্তু তার অন্তরালে দেখেছিলেন, তাঁর বিদ্রোহী আত্মসচেতন মনোভাবের মধ্যে কালোত্তীর্ণ সত্যের প্রকাশ। কয়েক মাস পরে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাগ্রহণের মধ্যেও তিনি ঐ একই সত্যের 'সাময়িক' প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাননি। কিন্তু খৃষ্টধর্মী ও ব্রাহ্মধর্মী, ইয়ংবেঙ্গলের উভয় দলের মধ্যেই তিনি যুগসত্যের কালোত্তীর্ণ রূপটিও দেখতে পেয়েছিলেন। নবযুগের জীবনমন্ত্রটি উচ্চারিত হতে শুনেছিলেন তাঁদের মুখে।

এই জীবনমন্ত্র হ'ল, মানবমর্যাদাবোধ, অন্যায় অযুক্তি কুযুক্তি ও বুদ্ধিহীন মোহাচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও প্রতিরোধের মনোভাব। ১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মধুসূদন যখন খৃষ্টধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন, তখন, একই সময়ে, ঐ ফেব্রুয়ারী মাসেই, সভাসমিতির প্রকাশ্য অধিবেশনে ইয়ংবেঙ্গলের এই মনোভাব আরও তীব্রভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। একই সময়ের একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি।

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসেই "সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভার (Society for the Acquisition of General Knowledge) একটি অধিবেশন হচ্ছিল সংস্কৃত কলেজের (হিন্দুকলেজ) হলঘরে। সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ক্যাপটেন রিচার্ডসন ও আর একজন ইংরেজ দর্শক সভায় উপস্থিত ছিলেন। প্রধান বক্তা ছিলেন দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য বিষয় ছিল **Present State of the East India Company's Criminal Judicature, and police, under the Bengal Presidencey."** বক্তৃতা প্রসঙ্গে দক্ষিণারঞ্জন কোম্পানীর

কর্মচারীদের ক্ষমতার অপব্যবহার, পুলিসের অসাধুতা এবং বৃটিশের শাসনপদ্ধতি ও শোষণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কঠোর ভাষায় মন্তব্য করেন। মন্তব্য শুনে রিচার্ডসন সাহেব বক্তৃতার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলেন :

"To stand up in a hall which the Government had erected and in the heart of a city which was the focus of enlightenment, and there to denounce, as oppressors and robbers, the men who governed the country, did in his opinion, amount to treason...He could not permit, it therefore, to be converted into a den of treason and must close the doors against all such meetings."

"যে হলঘর গবর্ণমেণ্ট তৈরি করেছেন, কলকাতা শহরের মতন বিদ্যাকেন্দ্রের মধ্যস্থলে, সেই হলঘরে দাঁড়িয়ে, সেই গবর্ণমেণ্টকে অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী বলে কটুভাষায় আক্রমণ করা, আমি দেশদ্রোহিতা ব'লে মনে করি। এই বিদ্যামন্দিরকে আমি তাই দেশদ্রোহীদের গোপন আড্ডাখানায় পরিণত হতে দিতে পারি না এবং ভবিষ্যতে আর কোন সভার অধিবেশনও এখানে হতে পারবে না।"

সভায় কোন বক্তার বক্তৃতার মাঝখানে এইভাবে বাধা দিয়ে কিছু বলা, শিষ্টতা ও শালীনতা বিরোধী আচরণ। রিচার্ডসন ক্রোধের বশে সেই জ্ঞানটুকুও হারিয়ে ফেলেছিলেন। সভাপতি তারাচাঁদ চক্রবর্তী তাঁর এই অশোভন ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করে, সঙ্গে সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন :

Captain Richardson, with due respect I beg to say, that I cannot allow you to proceed any longer in this course of conduct towards our Society, and on behalf of my friend Baboo Dukhin, I must say that your remarks are anything but becoming. I am bound also to add that I consider your conduct as an insult to the Society and that if you do not retract what you have said and make due apology, we shall represent the matter to the Committee of the Hindu College, and if necessary to the Government itself."

"ক্যাপটেন রিচার্ডসন, সবিনয়ে এই কথা আপনাকে বলতে চাই যে এই সভায় আপনি যে আচরণ করেছেন এবং আমার বন্ধু দক্ষিণাবাবুকে লক্ষ্য ক'রে যে মন্তব্য করেছেন, তা শিষ্টাচার নয়। আমি একথাও বলতে চাই যে, আপনি আমাদের সোসাইটিকে অপমান করেছেন এবং তার জন্য আপনি যদি সকলের কাছে ক্ষমা না চান, তাহ'লে বিষয়টি আমি হিন্দু কলেজের কমিটিতে, এমন কি প্রয়োজন হ'লে, গবর্ণমেণ্টের কাছেও বিচারের জন্য পেশ করতে বাধ্য হব।"(৩)

গোলদীঘির বিদ্যালয়ের হলঘরে অনুষ্ঠিত একটি সভার ঘটনা। সাধারণত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বড় অক্ষরে লিখিত থাকবার মতন ঘটনা নয়। কিন্তু ইতিহাসের যে রূপটিকে আমরা এখানে ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছি, তার মধ্যে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির স্থান অনেক বড়। মধুসূদনের ধর্মান্তর এবং জ্ঞানোপার্জিকা সভার এই ঘটনা, একই সময়ে প্রায় যুগপৎ ঘটে। এই যুগপত্তা আকস্মিক নয়, ঐতিহাসিক। যে বিদ্রোহী মনোভাব মধুসূদনের মাধ্যমে ধর্মান্তরের মধ্যে ফুটে উঠেছিল, সেই বিদ্রোহী মনোভাব তখন বাইরের সমাজজীবনে সচেতন ও সজাগ একটি জনস্তরের মধ্যে সঞ্চরিত হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য ভাবধারায় উজ্জীবিত, নব্যশিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণী হ'ল সেই জনস্তর। জ্ঞানোপার্জিকা সভায় তারাচাঁদের দৃপ্ত উত্তর এবং সভার অধিকাংশ সভ্যের সেই প্রতিবাদ সমর্থন, তারই ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। বিদ্যাসাগর এই সঞ্চরমান বিদ্রোহী সমাজচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনার সংযোগ ঘটিয়ে, কর্মজীবনের গোড়াতে, নিজের ব্যক্তিসত্তাকে গ'ড়ে তোলবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

ইংলণ্ডের সমাজসংস্কার আন্দোলনের অন্যতম মুখপাত্র জর্জ টমসন (George Thamson) ঠিক এই সময়ে, ১৮৪৩ সালের গোড়ার দিকে দ্বারকানাথ ঠাকুরের সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে এদেশে আসেন। ভারতবর্ষে নবযুগের প্রধান জাগৃতিকেন্দ্র তখন কলকাতা শহর। টমসন কলকাতায় আসেন। কলকাতার সভা-সমিতির মধ্যে সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভাই' তখন নব্য-শিক্ষিতদের প্রতিনিধিস্থল ছিল। সভার পক্ষ থেকে রামগোপাল ঘোষ, টমসনকে অভিনন্দন জানাবার জন্য, সভার একটি অধিবেশনে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। ১১ই জানুয়ারী (১৮৪৩) হিন্দু কলেজে অধিবেশন হয় (পূর্বোক্ত ঘটনা ঘটবার মাসখানেক আগে), তারাচাঁদ চক্রবর্তীই সভাপতি হন। টমসন তাঁর অভ্যর্থনার উত্তরে যে ভাষণ দেন, তার উপসংহারে বলেন :(৪)—

"The only reward I seek for my efforts in your cause, is to see you qualifying yourselves to be hereafter the enlightened vindicators of the claims of your country-men to the sympathy and support of all the lovers of moral and political justice in England."

টমসন তাঁর ভাষণে যা বলেছিলেন, তার মর্ম এই : "আমি এসেছি, এদেশের মানুষ ও সমাজকে চিনতে। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে আমি আসিনি। আপনাদের এই সভার মতন ইংলণ্ডেও অনেক সভা-সমিতি গ'ড়ে উঠেছে এবং তার অনেকগুলির সঙ্গে আমি সংশ্লিষ্ট ছিলাম। আপনাদের সভার উদ্দেশ্য যে 'জ্ঞানোপার্জন', আমারও এদেশে আসার উদ্দেশ্য তাই। ইংলণ্ডের মানুষের কাছে আপনাদের দেশের কথা অনেক বলেছি আমি, অনেক কথা লিখে প্রচার করেছি। স্বপ্ন দেখেছি আমি ভারতবর্ষের! কিন্তু স্বপ্ন দেখে,

(৩) Bengal Hurkaru, February 13, 1843

(৪) The Bengal Spectator, Vol II, Nos: 4 and 5, February-March 1843

কথা বলে বা লিখে আমার সাধ মেটেনি। স্বচক্ষে একদিন ভারতবর্ষের মানুষ ও সমাজকে দেখব, এই আমার বাসনা ছিল। আজ সেই বাসনা আমার চরিতার্থ হ'ল। আমি আপনাদের সঙ্গে, বন্ধুর মতন, আপনাদের একজনের মতন মিশতে চাই। আপনাদের অবস্থা কি, দুঃখবেদনা কি, ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা কি, সব জানতে চাই, বুঝতে চাই। সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে, সেই বেদনা দূর করতে, আমি সাধ্য মতন আপনাদের সাহায্য করতে চাই। তার জন্ত আমি কোন পুরস্কার চাই না। আমি যদি দেখি যে আপনারা নিজেরাই দেশের দশ জনের দাবিদাওয়ার মুখপাত্র হয়ে উঠেছেন, তাহ'লেই আমি নিজেকে ধন্ত মনে করব এবং ইংলণ্ডের উদারমতাবলম্বী জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থনও আপনারা লাভ করবেন।"

একটি সভা, একটি বক্তৃতা নয়। সভার পর সভা হ'তে লাগল শহরের চারিদিকে এবং টমসন সাহেব প্রায় প্রত্যেক সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। প্রথম সভার পরেই রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহনের গৃহে সকলে নিমন্ত্রিত হলেন। সেখানেও সভা হ'ল, আলোচনা হ'ল। তারপর চন্দ্রশেখর দেবের বাড়ীতে সভা বসল। শ্রীকৃষ্ণ সিংহের বাগানবাড়ীতে সভা নিয়মিত আরম্ভ হ'ল। সাপ্তাহিক সভায় টমসন বক্তৃতা দিতে লাগলেন। মেকানিক্স ইনষ্টিটিউশনেও বক্তৃতা দিলেন। সভা-সমিতির ও আলাপ-আলোচনার বন্যা এল যেন কলকাতার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে। "বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটিও" স্থাপিত হ'ল, ১৮৪৩ সালে, টমসনের প্রেরণায়।

যে আত্মচেতনা শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজে ধীরে ধীরে আগে থেকেই জাগছিল এবং ক্রমে সমাজচেতনায় পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ছিল, জর্জ টমসন সেই চেতনাকেই আরও খানিকটা সজাগ ক'রে তুলতে সাহায্য করেছিলেন। তার বেশি কিছু তিনি করেননি। তিনি এদেশের মুক্তিদাতা বা মুক্তিকামীদের অগ্রদূত হয়ে আসেননি। যে বৃটিশ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখপাত্র হয়ে এদেশের মধ্যবিত্ত সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে তিনি এসেছিলেন, সেই বৃটিশ মধ্যবিত্তের প্রতিনিধিরাই তখন এদেশের শাসক হয়ে আসছিলেন। ইংরেজবিরোধী বা ইংরেজ শাসনবিরোধী কোন মনোভাব জাগিয়ে তোলার জন্ত টমসন এদেশে আসেননি। একথা পরিষ্কারভাবে 'বেঙ্গল বৃটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির' প্রতিষ্ঠাকালেই তিনি সকলের সঙ্গে আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন। একটি সভাতেও তিনি তাঁর এদেশে আসার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে পরিষ্কার ভাষায় বলেন: (৫)

"It was to rouse the intelligent natives themselves, to a sense of the necessity of becoming the narrators of their own grievances, as far as they suffered under any, that were removable by legislation. He had no wish to inflame the minds of the multitude, or to spread a spirit of disaffection through their ranks. He should sincerely deplore the dissolution (were it practicable) of the present connection between this country and Great Britain..."

"এদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিজেদের অভাব অভিযোগ যাতে নিজেরাই শাসকদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন এবং সেই সব অভিযোগ সত্য হ'লে, আইন প্রণয়ন ক'রে যাতে সেগুলি দূর করতে পারেন, তার জন্ত তাঁদের মধ্যে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি সাধারণ দেশবাসীর মনে বৃটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে কোন বিদ্বেষ বা বিদ্রোহের ভাব একেবারেই জাগিয়ে তুলতে চান না। বৃটিশের সঙ্গে ভারতবাসীর যে শাসক-শাসিতের সম্পর্ক তা কোন কারণে ছিন্ন হ'লে (বা হওয়া সম্ভব হলে) তিনি খুবই দুঃখিত হবেন।"

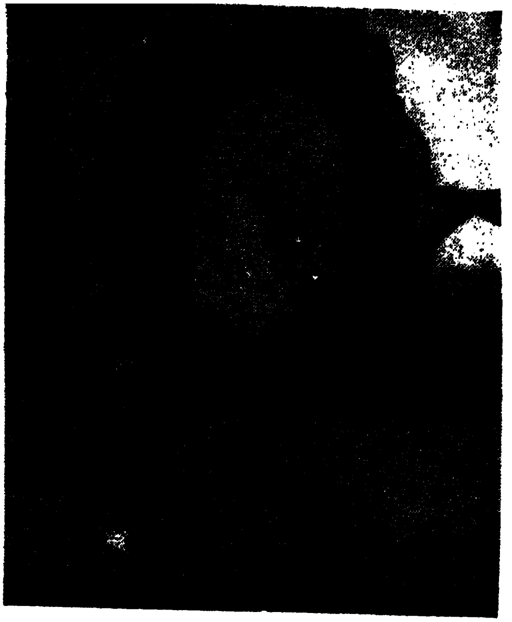
বিদেশ থেকে টমসনের মাধ্যমে এদেশে দেশপ্রেম আমদানি হয়নি। দেশপ্রেম দেশের মাটিতেই অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে। সমস্ত বিষয় নিয়ে স্বাধীন আলাপ-আলোচনার এবং প্রকাশ্যে সভা করার অধিকারকে টমসন অনেকখানি প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করেছিলেন। ১৮৪৩ সালে এইটুকু করাই যে অনেকখানি করা, তা স্বীকার করতেই হবে।

সভা-সমিতি, আলাপ-আলোচনা ও বক্তৃতার এই বন্যাস্রোতের মধ্যে বিদ্যাসাগর কি করছিলেন? তরঙ্গস্পর্শ থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি কি দূরে তীরে দাঁড়িয়েছিলেন, এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কেবল পণ্ডিতের চাকরি করছিলেন? সভা-সমিতির অধিবেশনে তিনি যোগদান করতেন কি না, টমসনের বক্তৃতা শুনতে যেতেন কি না, তার কোন লিখিত প্রমাণ বা দলিল কোথাও নেই। নেই বলেই তাঁকে সমাজের প্রাণচাঞ্চল্যের এই বন্যাস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে লালদীঘির কলেজে বা পঞ্চাননতলার বাসাবাড়ীতে নির্বাসনদণ্ডে দণ্ডিত করলে, তাঁর প্রতি সুবিচার করা হবে না। তা যদি না হয়, তাহ'লে তাঁকেও এই স্রোতের মধ্যেই দাঁড় করিয়ে দেখতে হয় এবং তা না দেখা কোনদিক থেকেই সঙ্গত নয়। কিন্তু তার প্রামাণ্য দলিল কোথায়?

দলিল নেই। থাকবার কথাও নয়। বিদ্যাসাগর তখন মাত্র তেইশ বছরের নবীন যুবক, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রজীবন সবেমাত্র শেষ ক'রে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন। কে তাঁকে চেনে? সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিতরা চেনেন, তাঁর সহপাঠীরা চেনেন, নূতন কলেজের সিবিলিয়ান সাহেব ছাত্র দু'চার জন চেনেন, আর চেনেন পাড়াপ্রতিবেশী কেউ কেউ। তাও যাঁরা চিনতেন, তাঁরা কেউ তাঁকে ভবিষ্যতের 'বিদ্যাসাগর' ব'লে চিনতেন না। তখনও তাঁরা তাঁকে বীরসিংহ গ্রামের দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান ব'লে চিনতেন এবং বিদ্বান ও বুদ্ধিমান ব'লে জানতেন। বাইরের সমাজে কোন পরিচয়ই তাঁর ছিল না। তারাচাঁদ চক্রবর্তী ছিলেন রামমোহনের সহযোগী, বয়সে বিদ্যাসাগরের চেয়ে অনেক বড়, সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী সমাজে "এজুবাজ" রামগোপাল ঘোষ ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি, তাঁর অগ্রজতুল্য। রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন তো বিদ্যাসাগরের ছাত্রজীবনের প্রারম্ভেই কলকাতার শিক্ষিত যুবসমাজের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিলেন এবং গোঁড়া হিন্দুসমাজের ভিত পর্যন্ত নড়িয়ে দেবার চেষ্টা

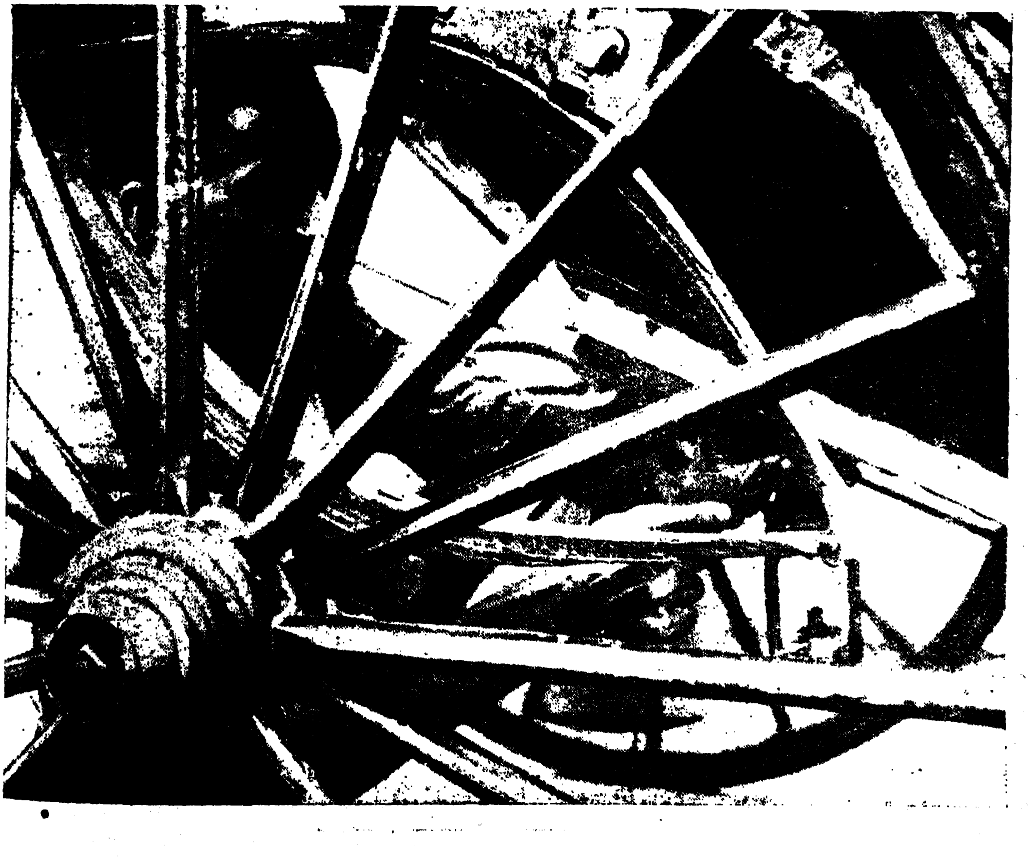
(৫) G. Thomson: Addresses etc (Calcutta 1843), ৮ পৃষ্ঠা।

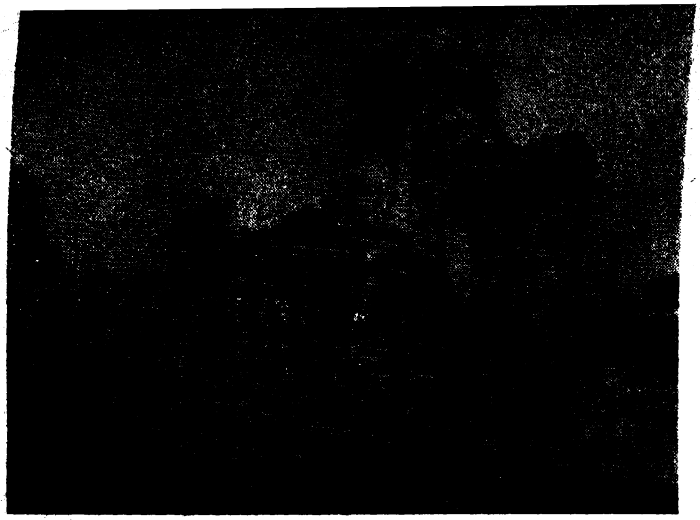
আলোকচিত্র



আললাহী-দরওয়াজা (কুতুব, দিল্লী)
—বাবলু ধর

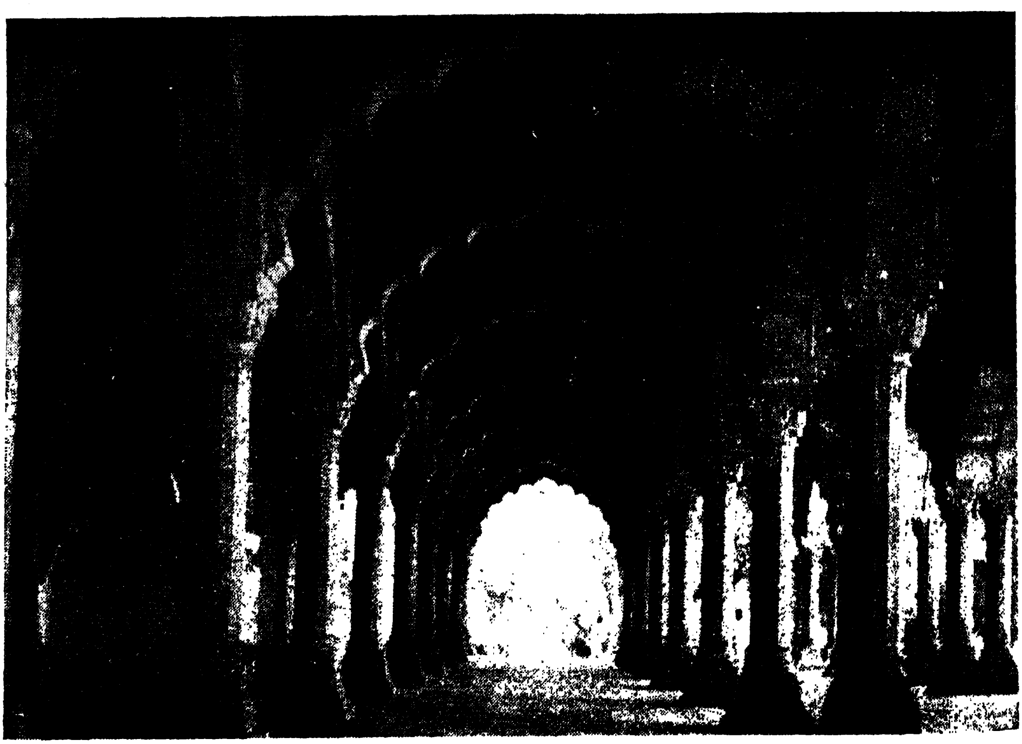
মেরামত
—সলিল গোস্বামী

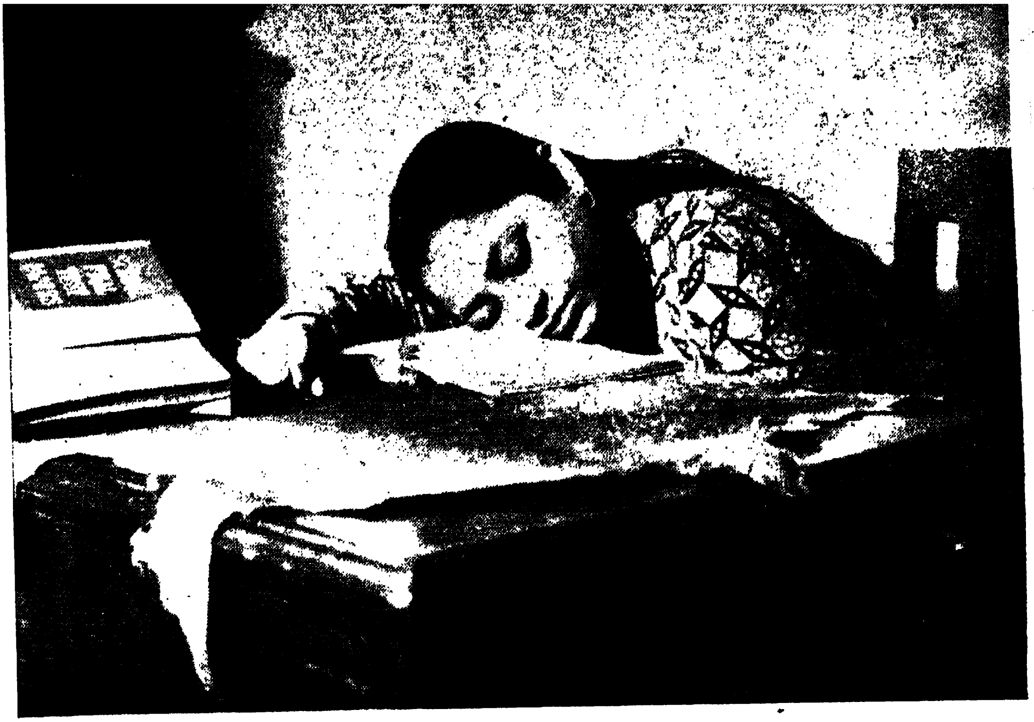




পৃথীরাজের মন্দির (কুতুব, দিল্লী) —প্রভাতরঞ্জন বিশ্বাস

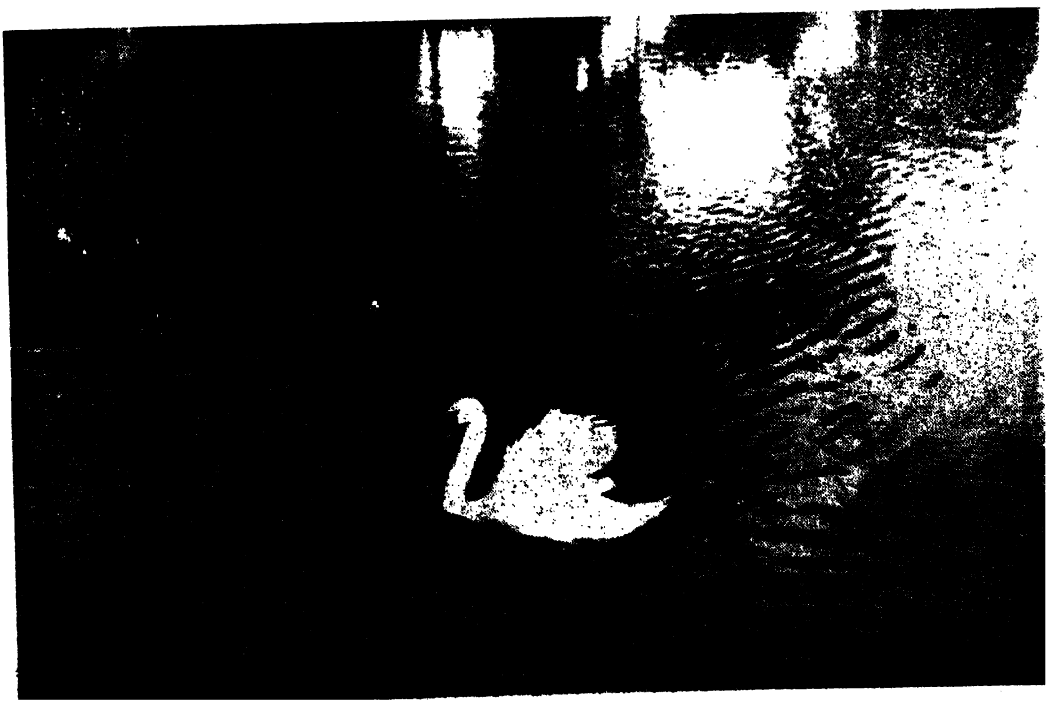
দেওয়ানী আম (দিল্লী) —মীরেন অধিকারী





ফাঁকি —নিমাইচাঁদ শীল

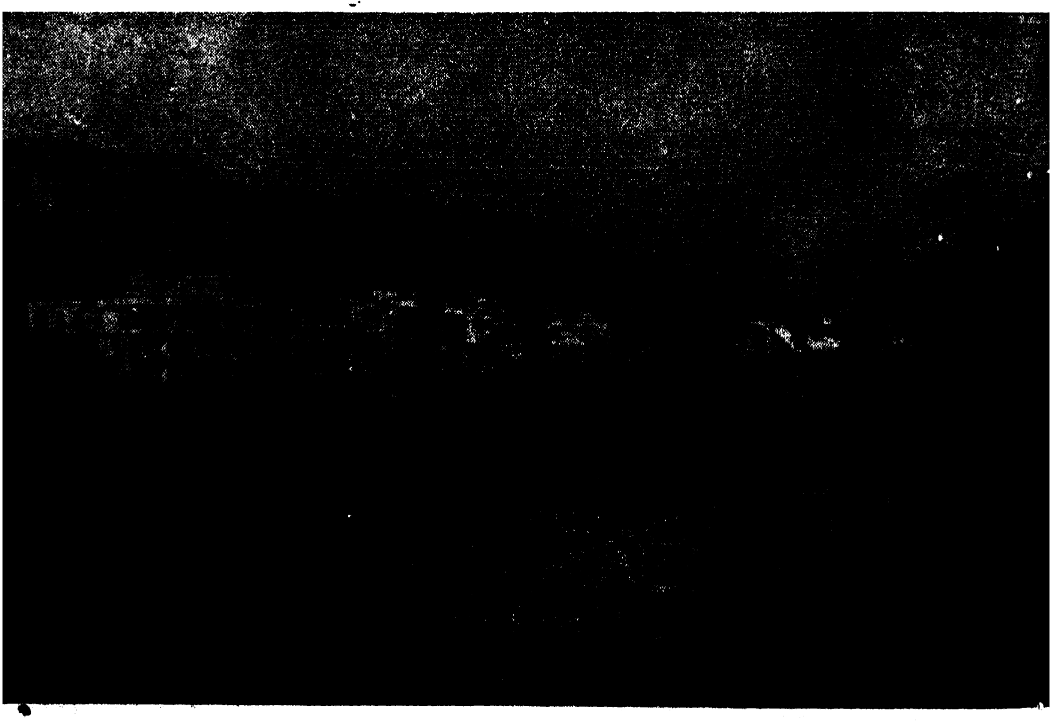
ঝিলিমিলি —গুরুচরণ সা





চাষীর মেয়ে —তারা মুখোপাধ্যায়

হরিদ্বারের গঙ্গা —বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ



করেছিলেন। বয়সে ও প্রতিষ্ঠায় তিনিও অনেক বড়। ইয়ং বেঙ্গল দলের নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে আরও যাঁরা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির দিক থেকে তাঁর অগ্রজতুল্য ছিলেন। বয়স ও প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আরও একটি কারণ ছিল, যার জন্য এই প্রতিষ্ঠিতদের কলরবমুখর প্রাঙ্গণের একটি কোণেও বিদ্যাসাগর তখনও কোন স্থান পান নি। সেই কারণটি হ'ল, তাঁর দারিদ্র্য। ইয়ংবেঙ্গল দলের কর্ণধারদের মধ্যে সকলেই অভিজাত ও ধনিক বংশের সন্তান ছিলেন। সামান্য আয়াসে শহরে সমাজে তাঁরা প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের প্রতিভা, কেবল আর্থিক প্রতিপত্তির জোরে, শতগুণ বেশি ফুলে-ফেঁপে বাইরের সমাজে প্রকাশিত হয়েছে। নবযুগের অর্থপ্রধান সমাজে, কেবল 'বিদ্যাসাগর' উপাধির জোরে, প্রতিষ্ঠা অর্জন করা, সহজ নয়। কলকাতা শহরের নূতন অভিজাত বংশের সন্তান হ'লে, তেইশ বছরের ঐটুকু কৃতিত্ব সম্বল ক'রে যতখানি প্রতিপত্তি অর্জন করা বিদ্যাসাগরের পক্ষে সম্ভব হ'ত, অপরিচিত দরিদ্র পরিবারের সন্তান ব'লে তার শতাংশের একাংশ অর্জন করাও তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই তিনি যদি সভা-সমিতির জনসমাবেশের মধ্যে একজন সাধারণ মানুষের মতন ঘুরে বেড়িয়ে থাকেন, সকলের অলক্ষ্যে ও অগোচরে, তাহ'লে বিস্মিত হবার কিছু নেই। সমসাময়িক পত্রিকায় তাঁর উপস্থিতির কোন সংবাদ না থাকা, এবং সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর নামোল্লেখ না করা, খুবই স্বাভাবিক। সামাজিক প্রতিষ্ঠার নিম্নতম ধাপটিতে তখনও তিনি চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন, কেবল বিদ্যাটুকু সম্বল ক'রে, তা-ও আবার সেকালের সংস্কৃতবিদ্যা। শুধু যে বিদ্যার পুঁজিটুকু, তা-ও সেকালের, একালের হিন্দুকলেজের নয়। বিত্ত একেবারেই ছিল না। সুতরাং সামাজিক প্রতিষ্ঠার কোন সম্ভাবনা পর্যন্ত তখনও তাঁর ছিল না। সংস্কৃতজ্ঞ তরুণ পণ্ডিত বিদ্যাসাগর নূতন নামগোত্রহীন শহরে সমাজে অজ্ঞাতকুলশীলের মতনই বাস করতেন। তাই সভাসমিতির বন্যা-স্রোতের মধ্যে দাঁড়িয়ে তিনি সমাজের নূতন প্রাণশক্তি অনুভব করেছিলেন কিনা, তার কোন লিখিত প্রমাণ নেই, এবং প্রমাণ না থাকলেও, সেইজন্য তাঁকে সেই গতিস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দেখবারও কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

•

সমাজের এই সব সচল ও সক্রিয় শক্তির ঘাতপ্রতিঘাত বিদ্যাসাগর প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন। যেকোন বিচার্য ও বিবেচ্য বিষয় নিয়ে প্রকাশ্যে সভা-সমিতিতে আলোচনার অধিকার যখন স্বীকৃত ও প্রসারিত হ'ল, তখন সামাজিক সমস্যাগুলিকেও ইয়ংবেঙ্গল দল তাঁদের পত্রপত্রিকা ও সভাসমিতির আলোচনার মাধ্যমে লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। এই সময় থেকেই, সমাজ-সংস্কারের আদর্শে তাঁরা জনমত সংগঠন করার কাজে অগ্রসর হলেন। শিক্ষার নানাদিক নিয়ে, বাল্যবিবাহ বহু-বিবাহ বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমাজসংস্কারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে, তাঁরা নির্ভয়ে প্রকাশ্যে বিচারবিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। ১৮৪২ সালেই (বিদ্যাসাগর তখন সবেমাত্র ছাত্রজীবন ছেড়ে চাকুরিজীবনে প্রবেশ করেছেন) ইয়ংবেঙ্গল দলের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' বিধবার পুনর্বিবাহ সমস্যা সম্বন্ধে একটি চিঠি প্রকাশ ক'রে, সমাজসংস্কারের চেতনাকে লোকসমাজে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। চিঠিখানি এই: (৬)

বিধবার পুনর্ব্বিবাহ

(কোন পত্রপ্রেরক হইতে প্রাপ্ত)

যে সকল বিষয়ের সাধারণে সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দুজাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে বোধ হয় যে উক্ত বিবাহের প্রতিবন্ধক যে সকল শাস্ত্র আছে তাহা অত্যন্ত যুক্তিবিরুদ্ধ, কারণ পুরুষ যদি স্ত্রীয় মরণানন্তর পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে তবে স্ত্রী কেন স্বীয় স্বামির পরলোক হইলে বিবাহ করণে সক্ষম না হয় এবং উক্ত প্রতিবন্ধকের সরলতায় কেবল পাপ ও ক্লেশের বৃদ্ধি মাত্র। এতদ্বিষয়ে প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে কিন্তু সূচনাবধি এতাবৎকাল পর্য্যন্ত অস্মদ্দেশীয় লোকের দ্বারা তৎপ্রতিবন্ধকের পোষকতায় কিঞ্চিন্মাত্র প্রকাশিত হয় নাই অতএব বোধ হয় যে তৎপ্রতি তাঁহারদিগের দ্বেষের ক্রমশঃ শেষ হইতেছে এবং কিঞ্চিৎ কালাতীতে নিঃশেষ হইতে পারে কিন্তু যে পর্য্যন্ত উক্ত প্রতিবন্ধকে সম্পূর্ণরূপে অনাস্থা হইয়া নূতন রীতির সংস্থাপন না হয় তদবধি আমরা তদাবশ্যকতার নিমিত্তে বারম্বার অনুশীলন করিতে নিবৃত্ত হইব না।"

"যে সকল বিষয়ের সাধারণের সর্ব্বদা আন্দোলন হয় তন্মধ্যে হিন্দু জাতীয় বিধবার পুনর্ব্বিবাহেরও বাদানুবাদ হইয়া থাকে" এবং "এতদ্বিষয়ে প্রস্তাব বহু বৎসরাবধি হইতেছে"—পত্রলেখকের এই উক্তি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। সংস্কারচেতনা যে ধীরে ধীরে স্বাধীন আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে জেগে উঠছিল এবং চতুর্থ দশকে অনেক বেশি প্রবল হয়ে উঠেছিল, তা পত্রলেখকের উক্তি থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। কেবল বিধবা বিবাহ নয়, প্রত্যেকটি সামাজিক প্রথা এই সময় আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় যোগ দেবার আগে অক্ষয়কুমার যখন 'বিদ্যাদর্শন' পত্রিকা পরিচালনা করতেন, তখন তার মাধ্যমেও তিনি নানা সমস্যার আলোচনার সুযোগ দিতেন সকলকে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা আরম্ভ হয়। প্রগতিশীল প্রত্যেক পত্রিকার রচনার ভিতর দিয়ে, সভা-সমিতির আলোচনার ভিতর দিয়ে, নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনস্তরের সমাজসংস্কার চেতনা প্রকাশ পেতে থাকে। উনিশ শতকের চল্লিশের প্রায় একমাত্র ধ্বনি হয়ে ওঠে—সমাজ সংস্কার, শিক্ষার সংস্কার।

এই সংস্কারোন্মুখ সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বিদ্যাসাগর তাঁর মানসিক প্রস্তুতির সুযোগ পেয়েছিলেন। সমাজের নূতন প্রাণশক্তির বন্যাস্রোতের মধ্যে তিনি তাঁর কর্মজীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন। শহরের নূতন অভিজাত শ্রেণী ও মধ্যবিত্ত "বাবুদের" বুলবুলির লড়াই, মেড়ার লড়াই আর ঘোড়দৌড় দেখে, বাইজী-প্রিয়তা দেখে, তিনি হতাশ হননি এবং তাকেই সামাজিক সত্যের

(৬) The Bengal Spectator, Vol I. No 5, July 1842.

সবটুকু বলে গ্রহণ করেননি। মধুসূদনের ধর্মান্তর, দেবেন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ, নব্যশিক্ষিত বাঙালীদের খৃষ্টধর্ম প্রীতি ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগ, প্রধানতঃ ধর্মকেন্দ্রিক বিদ্রোহ ও সংস্কারচেতনার প্রকাশ হলেও, তা দেখে বিদ্যাসাগর বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু বিভ্রান্ত হননি। সমাজ সংস্কারের যে চেতনা ক্রমেই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জনস্তরে প্রবল হয়ে উঠছিল, যুগোপযোগী শিক্ষার জন্য যে ব্যাকুলতা তাঁদের মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছিল, নূতন সামাজিক প্রাণশক্তির যে প্রাচুর্য বিদ্রোহ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ-স্পৃহার মধ্যে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও সভা-সমিতির স্বাধীন আলোচনার মাধ্যমে বাইরে ধ্বনিত হয়ে উঠছিল, বিদ্যাসাগর তার ভিতর থেকেই তাঁর চলার শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন এবং লক্ষ্যও স্থির করেছিলেন। যা বর্জনীয় তা বর্জন করেছিলেন এবং যা গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বাতন্ত্র্যের জন্যই তিনি বন্যাস্রোতে তৃণখণ্ডের মতন ভেসে যাননি এবং তাঁর সমাজ-চেতনার জন্যই তিনি সেই স্রোতের তরঙ্গাঘাত এড়িয়ে চলেননি। স্রোতের খরতা বাড়িয়ে সমাজজীবনের ঐতিহাসিক খাতে তাকে পরিচালিত করেছিলেন। [ক্রমশঃ।

তুমি এসেছিলে কাছে

জয়ন্তী সেন

তুমি এসেছিলে কাছে
দূরে দিগ্বলয়ের নীলাভ সত্তার ছায়া
শ্যামল বনানী প্রান্তে মনে-প্রাণে মিশে একাকার।
এত কাছে এসেছিলে তুমি।
সেদিন মৃত্যুর মত মুছে নিল অস্তিত্ব আমার
অতীত, চলতি দিন, ভবিষ্যু কালের ইংগিত
পৃথিবীর আবর্তন স্তব্ধ হল চিরন্তনী একটি নিমেষে।
দূর থেকে দেখেছি তোমাকে
অচেনা কুয়াশাঘেরা মোহ-ম্লান সূর্য্যের মতন।
অস্ফুট তোমার গীতি অদেখা কল্লোল এক মহাসমুদ্রের
শুনেছি জীবন ভরি।
সেই তুমি এলে
সহসা প্লাবিত কোন সারণীর শিঞ্জিত তালে
কালো রাতে অরুণিমা স্বপ্ন উন্মেষণ।
তোমার নয়নে মোর প্রতিবিম্ব দেখেছি সেদিন
আরণ্য সুরভি মেশা নিঃশ্বাস চেতন ব্যাপিয়া
এনেছিল প্রলয়-জোয়ার।
মধুক্ষরা বিম্বে তব তীব্র সুরা ফেনিল উত্তাল।
মুগ্ধ অনুভূতি তার উচ্ছ্বসিত ধমনীর মাঝে।
এসেছিলে এত কাছে তুমি।
সে দিনের স্বপ্ন যত মুঠো-মুঠো সোনালী আলোয়
ঝরে গেল হেমন্তের সায়ন্তনী সুরে।
তার পরে কক্ষচ্যুত গ্রহসম অবাস্তব পথ-প্রদক্ষিণ
মৃত সূর্য্যের লাগি নিরুপায় আকুল ক্রন্দন
আলোর উৎস হারা বিবর্ণ পৃথ্বীর।
মধু-মোহে মুগ্ধ মন রোমন্থন করে স্মৃতি যত
একটি দিনের।
বিস্মৃত বাসন্তী-বাণী মর্ম্মে-মর্ম্মে দিয়েছিল দোলা
রাত্রি-ভরা নক্ষত্রের প্রদীপ্ত ইশারা
পেয়েছি আকাশে।
অযাচিত দাক্ষিণ্য তোমার
রাশি-রাশি কীর্ণ কুসুম পথপ্রান্তে এনেছে সৌরভ
একটি দিনের লাগি।
সেদিন কৌস্তুভমণি সুদুর্লভ সহস্রাংশুময়
অসংখ্য বেদনাদগ্ধ তৃপ্তিহীন বাসনার মাঝে
শ্রান্ত মনে স্বপ্ন-পাওয়া ক্ষণিক বিশ্রাম।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

একশো আটায়

অল্পবয়সী ছাত্র, কিন্তু ঈশ্বরে দুরন্ত ব্যাকুলতা। ব্রাহ্ম, তবু এসেছে কালীমন্দিরে। কালীঘরের দরজার সামনে বসে প্রাণ ঢেলে গান গাইছে।

কে গায় রে?

ভূপতি। ভাই ভূপতি।

ঠাকুর কান পেতে শুনলেন গান। কি সুন্দর গাইছে! অপূর্বের দ্বার যেন খুলে গেছে নিমেষে :

'হরি কাণ্ডারী যেমন
এমন কি আর আছে নেয়ে!
পার করে দীনজনে
অভয় চরণ-তরী দিয়ে'।

ভাবাবেশে কাছে এসে দাঁড়ালেন ঠাকুর। 'এই নে'। বলে ভূপতির বুকের উপর পা তুলে দিলেন। ভূপতি চোখ চাইল। এ কে! এ যে তার সেই ইষ্টদেবতা, সচ্চিৎসুখ, পূর্ণসনাতন।

আর যায় কোথা! লেখাপড়ার মন উবে গেল আস্তে-আস্তে। সর্বক্ষণই সে পদচ্ছায়ার আশ্রয়ের কাছে ঘোরাফেরা করে। যদি সংসারের টানটুকু কাটিয়ে দেন! যদি টেনে রাখেন তাঁর কোলের কাছটিতে।

সেদিন বাহ্যশূন্য চিত্রার্পিতের মত বসে আছেন ঠাকুর। সর্ব অঙ্গে ঈশ্বর-আবেশ।

'দেখ, দেখ, কি নির্মল নিরাময় প্রেমমূর্তি'! গদগদ ভাবে বলে উঠল মহিমাচরণ।

ভূপতি স্তব সুরু করল। 'তুমিই স্বরাট বিরাট। নরোত্তম নারায়ণ। শাস্ত্রে-বাদে বনে-দুর্গে জ্বরে-ঘোরে সংগ্রামে-সংকটে বিজনে-শ্মশানে তুমিই একমাত্র রক্ষাকর্তা। পদ্মদলায়তলোচন, দয়াঘন, আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকো। সংসারদাবদহনাতুর আমি, সর্বত্রই আমার ভয়, তুমি আমাকে নিঃসংশয় করো। শরণাগতির শরদম্বরকান্তি আনো আমার মধ্যে'। পরে গান ধরল :

'চিদানন্দসিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রাসলীলা কি মাধুরী মরি মরি'।

সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর একটি সলজ্জ শিশুর মত হয়ে গেলেন। বললেন, 'কি যেন একটা হয় এই আবেশে। যেন ভূতে পায়, আমি আর আমি থাকি না। এখন ভারি লজ্জা হচ্ছে। এখন গুণতে বলো, গুণতে পর্যন্ত পারি না। এক, সাত, আট এই রকম হয়ে যায়।'

'সবই তো সেই এক।' বললে নরেন, 'একের সঙ্গে এক যোগ করেই সমস্ত।'

'না। এক আর এক, দুই। সমাধি হচ্ছে সেই এক-দুয়ের পার।'

'আজ্ঞে হাঁ, দ্বৈতাদ্বৈত বর্জিত।' বললে মহিমাচরণ।

'যাই বলো, হিসেব থাকে না, হিসেব পচে যায়।' বললেন ঠাকুর, 'হিসেব করে সে হিসেবের নিকেশ করে কার সাধ্যি? হাতে একখানা বই দেখি, বড়জোর রাজর্ষি বলতে পারি। কিন্তু ব্রহ্মর্ষি বলি কা'কে? ব্রহ্মর্ষির কোনো চিহ্ন নেই। চিহ্ন থাকবে কি করে? ব্রহ্ম বেদ পুরাণ তন্ত্র মন্ত্র সমস্ত কিছুর পার।'

আরেক দিন ঠাকুরের দিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে করজোড়ে বসে আছে ভূপতি। চোখের পলক ফেলতে দিচ্ছে না। যতই কেন না চক্ষুকে নিষ্পলক করি তুমি যদি না দেখাও, তুমি যদি না চক্ষুকে দ্যুতিমান করো, সাধ্য কি আমার দর্শন হয়! আর যতক্ষণ না দর্শন হয় ততক্ষণ আর কিছুই দেখব না চার দিকে। হে দীপপ্রদ, এই অন্ধতার অন্ধকার দীর্ণ-বিদীর্ণ করে দাও।

'এতই যখন সাধ দেখবার দ্যাখ চোখ মেলে।' ভাববিহ্বল মূর্তিতে ঠাকুর দাঁড়ালেন প্রকটিত হয়ে।

এ কা'কে দেখছে ভূপতি? তার হৃদয়সংকল্পিত প্রাণবল্লভকে? এ কি, এ তো এক জন নয়, এ যে তিন জন একাধারে। চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ আর পঞ্চবক্ত্র। হংস, গরুড় আর বৃষ।

তন্ময়ের মত প্রণাম করল ভূপতি। যা বলে-বুদ্ধিতে হবার নয়, না বা শাস্ত্রপাণ্ডিত্যে, সাধন-ভজনে, কর্ম-কাণ্ডে, যোগ-জপ-তপস্যায় তা সাধা হবে শুধু একটিমাত্র নমস্কারে।

নিজের দেহ-মন-প্রাণ একটি নমস্কারের পদ্মকোরকে সুসম্বদ্ধ করে তাঁর পায়ে নিবেদন করে দাও।

বিষ্ণুর বাহন গরুড়। গরুড়ই বেদ। বেদই বহন করে যজ্ঞপুরুষ বিষ্ণুকে। বিষ্ণুই জগদ্ব্যাপক চৈতন্য। পাখি যেমন দুই পাখা মেলে উন্মুক্ত আকাশের সন্ধান করে তেমনি গরুড়ের দুই পাখার এক হচ্ছে কর্ম, অন্য হচ্ছে জ্ঞান। আর উন্মুক্ত আকাশের নামই মোক্ষ।

গণেশের বাহন কি? গণেশের বাহন মূষিক। মূষিক কি করে? কেটে ছারখার করে। তেমনি তোমার কর্মফলগুলি কর্তন করো, ছেদন করো। কর্মফল মোচনের উপরেই সিদ্ধি প্রতিষ্ঠিত। আর গণেশই সিদ্ধির দেবতা, সিদ্ধিদাতা। কর্মফলগুলি না কাটা পর্যন্ত পৌঁছুবে না সিদ্ধিদ্বারে।

শিবের বাহন কি? শিবের বাহন বৃষ। বৃষ মানে ধর্ম। আর শিব মানে? শিব মানে মঙ্গল। ধর্মই কল্যাণকে বহন করে নিয়ে আসে। বৃষটি শুভ্র কেন? সত্ত্ব গুণের রঙটি শুভ্র। আর সত্ত্ব গুণের উদয়েই ধর্মের আবির্ভাব। বৃষের তো চার পা। ধর্মও চতুষ্পাদ।

শৌচ-দান দয়া ও তপস্যা এই তার চার ভিত্তি। যখন এই চতুষ্পাদ ধর্মের আচরণ করবে তখনই তোমার শিবদর্শন।

দুর্গার বাহন সিংহ। সিংহের ধর্ম কি? সিংহের ধর্ম হিংসা। অর্থাৎ তোমার জীবভাবকে হিংসা করো, হনন করো, জীবভাববিলয়ের মধ্যেই ব্রহ্মত্বের অভ্যুদয়।

এদিকে লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেচক দিবান্ধ। আর মানুষ দিবান্ধ। অর্থাৎ যতক্ষণ মানুষ আত্মজ্ঞানে অন্ধ ততক্ষণই লক্ষ্মী ধনেশ্বরী মূর্তিতে প্রতিষ্ঠিত। পার্থিব সুখের অধিষ্ঠাত্রী হলেও আসলে লক্ষ্মী ব্রহ্মশক্তি। কিন্তু যতক্ষণ আত্মজ্ঞানে দৃষ্টিহীন ততক্ষণ এই ব্রহ্মশক্তির উপলব্ধি কোথায়?

কিন্তু সরস্বতী? সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা। তার বাহন হংস। হংস মানে প্রাণবায়ু। হং মানে নিশ্বাস, স মানে প্রশ্বাস। নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে যে মন্ত্রোচ্চারণ তাকেই বলে অজপা। আর যে অজপা মন্ত্রে সিদ্ধ তাকেই বলে হংসধর্মী। প্রতি নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে জপ হচ্ছে এই উপলব্ধি হলেই ব্রহ্মবিদ্যা। আর হাঁসের গুণ কি? দুধে জলে মিশেল হয়ে থাকলে জল ত্যাগ করে দুধটুকু গ্রহণ করে। তুমিও তেমনি নশ্বর থেকে ঈশ্বরকে সংগ্রহ করে নাও। তারি জন্যে হংসপৃষ্ঠে সরস্বতী।

আরো ক'টি ছোকরা এসেছে। একটির নাম মণীন্দ্র গুপ্ত। বয়েস পনেরো-ষোলো। কবি ঈশ্বর গুপ্তের দৌহিত্র। একদিন কি মনে করে এক বন্ধুর সঙ্গে শ্যামপুকুরে এসে হাজির। আর এদিক-ওদিক উঁকি-ঝুঁকি মারতে-মারতে একেবারে ঠাকুরের ঘরে।

বিছানায় শুয়ে ছিলেন ঠাকুর, হঠাৎ উঠে বসলেন। কে যেন এক আপন জন চলে এসেছে বিনা নিমন্ত্রণে। ইঙ্গিত করলেন, কাছে আসতে। কাছে আসতেই গা-হাত-পা টিপে দেখতে লাগলেন লক্ষণগুলো। কানে-কানে বললেন, 'কাল আবার এসো। কেমন? কিন্তু কাউকে সঙ্গে এনো না। একা-একা এসো।'

রাত কি আর কাটে! দিন এলেও কাজ কি সহজে ফুরোয়?

সন্ধ্যের আগেই এসে হাজির হল মণীন্দ্র। ঠাকুর একেবারে তাকে কোলের মধ্যে তুলে নিলেন। বললেন, 'এত দিন ছিলি কোথায়?' বলেই সমাধিতে লীন হয়ে গেলেন।

সমাধিভঙ্গের পর কোল থেকে নামিয়ে দিলেন মণীন্দ্রকে। জিগগেস করলেন, 'কিছু একটা চাইবি?'

'চাইব।'

'চা।' সরল শিশুর মত বললেন ঠাকুর।

কি যেন খানিকক্ষণ চিন্তা করল মণীন্দ্র। তার কিশোর কল্পনা কতদূর তাকে সাহায্য করল কে জানে, সে বলে বসল, 'আমাকে প্রকাশক্ষমতা দিন।'

'সে আবার কী জিনিস?'

মণীন্দ্র বললে, 'চার দিকে কত লোক দেখি, জগতের কত সৌন্দর্য, কত বিচিত্র ব্যাপার, কিন্তু কিছুই প্রকাশ করে বলতে পারি না, লিখতে পারি না। আমার সেই দৈন্য মোচন করুন।'

ঠাকুর স্নিগ্ধমুখে হাসলেন। বললেন, 'তুই তাঁকেই নে না, তিনি সমস্ত কিছুর প্রকাশক। তাঁকে ধরলেই তো তিনি সব কিছু ধরিয়ে দেবেন।'

মণীন্দ্রর মনে হ'ল কি একটা শক্তি তাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করে ফেলছে। যেন মহাশূন্যে সে একাকী, কা'কে যেন খুঁজে-খুঁজে ফিরছে, যেন একা থাকবার উপায় নেই, অথচ খুঁজে পাচ্ছে না সেই মহা একাকীকে। তাই আকুল হয়ে কাঁদছে মণীন্দ্র। সে কান্না আর থামে না।

ঠাকুর বললেন, 'একে অন্য ঘরে নিয়ে যাও।'

অন্য ঘরে নিয়ে গেল। সেখানেও কান্না।

ঠাকুরের সেবা করছে মণীন্দ্র। মণীন্দ্রর ডাক-নাম খোকা। সেবা করছে খোকা ও আরেকটি ছেলে। তার নাম পতু। দু'জনে মিলে হাওয়া করছে ঠাকুরকে। একজনের হাত ব্যথা হলে আরেক জন।

দোল-পূর্ণিমার দিন। সবাই রঙের খেলায় মেতেছে, উড়ছে লাল আবিরের ধুলো। মণীন্দ্র আর হরিপদ, ডাক-নাম পতু—ঠাকুরের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে হাওয়া করছে।

'কি রে, রঙ খেলতে যাবিনে?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'না।' চোখ নামিয়ে নিল মণীন্দ্র।

'সে কি রে, সবাই খেলছে, হুল্লোড় করছে। তোদের বয়সী ছেলেরা কেউ আজ চুপ করে বসে নেই! যা না, খেল না গিয়ে।' ঠাকুর আবার তাদের তাড়া দিলেন।

'না, আমাদের রঙ খেলে দরকার নেই।' মণীন্দ্র জোরে পাখা করতে লাগল।

ঠাকুরের সেবা ফেলে কিছুতেই গেল না। তোমাকে সেবা করাই আমাদের রঙ-খেলা। তুমি যদি আমাদের চোখের দিকে তাকাও সানন্দ চোখে, তাতেই আমাদের রঙিন হয়ে ওঠা।

ঠাকুর বলেন, মণীন্দ্রর প্রকৃতি-ভাব। ভগবানের নাম গুণগান শুনেছে কি, অমনি ভাবে বিভোর হয়ে নৃত্য করতে থাকে।

'কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি'—মহিমা চক্রবর্তী বললে এসে ঠাকুরকে।

'কি স্বপ্ন?'

'যেন আপনি আমাকে আদেশ করছেন মণীন্দ্র গুপ্তকে মন্ত্র দিতে।'

'কি মন্ত্র বলো তো?'

মহিমা সেই স্বপ্নে-পাওয়া মন্ত্রটি উচ্চারণ করল। উচ্চারণ করা মাত্রই ঠাকুর সমাধিতে ডুবে গেলেন। সমাধিভঙ্গের পর বললেন, 'হ্যাঁ, এই মন্ত্র, এই মন্ত্রই তুমি দিও মণীন্দ্রকে।'

আমার কাজ আমি কা'কে দিয়ে কার জন্যে কখন করিয়ে নেব, তা আমিই জানি।

আরো একটি ছোট ছেলে এসেছে, বারো বছর বয়স, নাম ক্ষীরোদ।

মাষ্টার বললে, 'দেখুন, দেখুন, এই ছেলেটি বেশ। ঈশ্বরের কথায় খুব আনন্দ।'

'আহা, চোখ দুটি যেন হরিণের মত।' ঠাকুর তার দিকে নেত্রপাত করলেন। পা এগিয়ে দিলেন তার দিকে। ক্ষীরোদ পা-খানি তুলে নিল কোলের মধ্যে।

সেই ক্ষীরোদ গঙ্গাসাগর যাবে।

ঠাকুর বলছেন মাষ্টারকে, 'আহা, ক্ষীরোদ যদি গঙ্গাসাগরে যায়, তাকে তুমি একখানা কম্বল কিনে দিও।'

'দেব।'

একটু সুজির পায়েস খেতে বসেছেন ঠাকুর। আহা, যেন খেতে পারেন! খেতে যেন না কষ্ট হয়!

সত্যি খেতে পারলেন ঠাকুর। শিশুর মতন আনন্দ করে বললেন, 'খেতে পারলাম। মনটায় তাই বেশ আনন্দ হচ্ছে। তুমি ক্ষীরোদকে একটু দেখো। আমার অসুখ, আমি বলেছি তোমার কাছে গিয়ে উপদেশ নিতে। বেশ ভালো ছেলে। তুমি তার একটু যত্ন কোরো।'

'করব। আমার পাড়াতেই তো ওর বাড়ি।'

আর পূর্ণ? পূর্ণরও মোটে তেরো বছর বয়স কিন্তু বহ্নিময় অনুরাগ। ছাদ থেকে দেখেছে মাষ্টার মশাই যাচ্ছে ট্রামে করে, দেখেই পাগলের মত ছুটে এসেছে রাস্তার উপরে। রাস্তার উপরে দাঁড়িয়েই প্রণাম করছে মাষ্টার মশায়ের উদ্দেশে।

ঠাকুর শুনে বলছেন, 'আহা, কি অনুরাগ! কেন এই অনুরাগ? না, ইনি পরমার্থের সংযোগ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের জন্যে যে ব্যাকুল সেই পারে এমনি করে ছুটে আসতে।'

যদি একবার অন্তরে আসে সেই ব্যাকুলতা আর ফিরে যাওয়া নেই। যদি পাহাড় পড়ে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে। যদি মরুভূমি পড়ে শ্যাম, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠবে। যদি সমুদ্র পড়ে, বুকে করে তুলে নিয়ে যাবে তরঙ্গের উপর দিয়ে।

রায় বাহাদুর দীননাথ ঘোষের ছেলে, বাড়ি থেকে আসতে দিতে চায় না। বড়লোকের ছেলে কিন্তু বাবা না দিলে পয়সা কই?

ঠাকুর পূর্ণর চিবুক ধরে আদর করে বললে, 'যখনই সুবিধে হবে চলে আসবি এখানে। আমি তোর গাড়িভাড়া দেব।'

শুধু আমিই কি ওর জন্যে ব্যাকুল? ও ভীষণ চতুর। বলে, আমারও বুক কেমন করে আপনাকে দেখবার জন্যে।

তা হলেই আর কথা নেই। তা হলেই সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

নহবতখানায় নিয়ে এলেন একদিন। বললেন, 'এই পূর্ণ, একে পেট ভরে খাওয়াও।'

চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। ইনি কে? আনন্দময়ী ভুবনেশ্বরী! নম্রনেত্রা সমুৎফুল্লা!

'আগে মালা-চন্দনে সাজাও ছেলেটাকে, তার পরে ভোজনের আহুতি দাও।' ঠাকুর আবার বললেন সেই গৃহলক্ষ্মীকে। সর্বসম্পৎ-স্বরূপা রাজলক্ষ্মীকে।

মায়ের মত স্নেহ ভরে পূর্ণকে কাছে টেনে নিলেন সেই মহিলা। মালাচন্দনে সাজিয়ে খাওয়াতে লাগলেন কাছে বসে। ঠাকুর বারে বারে এসে উঁকি মারছেন, বলছেন, 'ওগো এই তরকারিটা একটু বেশি করে দাও।' আবার বাইরে যাচ্ছেন, আবার ঘরে আসছেন। 'ওরে, কেমন খেলি? পেট ভরল?' খাওয়া হয়ে গেলে বললেন, 'ওগো, একে হাত-মুখ ধোয়ার জল ঢেলে দাও।' আঁচানো হয়ে গেলে পর ফের বললেন, 'ওগো, একে ষোল আনা দিও।'

গৃহলক্ষ্মী একটি টাকা এনে পূর্ণর হাতে দিলেন। স্নেহার্দ্র স্বরে জিগগেস করলেন, 'বলো তো আমি কে?'

চিনত না, তবু চিনতে কি আর বাকি আছে? প্রাণ ঢেলে পূর্ণ বললে, 'তুমি আমার মা, সকলকার মা।'

ঘরে বসে পড়ছে পূর্ণ, দেখল জানলায় কার ছায়া। এ কি, মাষ্টার মশাই! পড়া ফেলে ঘরের বাইরে ছুটে এল পূর্ণ। চোখে-মুখে অনন্ত ঔৎসুক্য।

'ঠাকুরকে দেখবে?'

'কোথায়?'

'তোমার জন্যে দাঁড়িয়ে আছেন রাস্তার মোড়ে।'

'কোথায়? কোন মোড়ে?'

'শ্যামপুকুরের মোড়ে।'

ছুট দিল পূর্ণ। ঠাকুর ঠোঙায় করে সন্দেশ নিয়ে এসেছেন। দুই চোখে উজ্জ্বল সুখ নিয়ে বলছেন, 'ওরে তোর জন্যে সন্দেশ নিয়ে এসেছি। নে, খা'। বলে রাস্তার মাঝেই তার মুখে সন্দেশ তুলে দিলেন ঠাকুর।

ঠাকুর তখন অপ্রকট হয়েছেন, পূর্ণরও যাবার দিন এগিয়ে এসেছে। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে যখন পূর্ণ চোখ বোজে। রোগশয্যা ছেড়ে একা-একা বাইরে গেছে, পা টলে পড়ে গেছে মূর্ছিত হয়ে। কেউ বুঝি নেই ধারে-পারে। না, একজন আছেন। সবল বাহুতে শিশুর মত পূর্ণকে কোলে তুলে নিলেন। তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিলেন শয্যায়। চোখ মেলে তাকাল পূর্ণ। এ যে সেই ঠাকুর, সেই শ্যামপুকুরের রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে সন্দেশ খাইয়েছিলেন যিনি, সেই অহেতুক কৃপাসিন্ধু।

আরেকটি ছোট ছেলে আসে, সারদাপ্রসন্ন।

ঠাকুর বলেন, 'সারদার বেশ অবস্থা। আগে সঙ্কোচ ভাব ছিল, যেন ছিপের ফাতা টেনে নিত। এখন মুখে আনন্দ এসেছে।'

আর কি চাই। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি! যে আনন্দ আকাশে-আলোকে উদ্ভাসিত, আমাতেও সেই আনন্দেরই প্রকাশ। তাকিয়ে দেখ আমার মুখের দিকে। আমার মুখে সেই অমৃতনেত্রস্পর্শ পড়েছে কি না। পড়েছে বলেই তো আমি অকুণ্ঠিত, আমি উচ্চারিত, আমি উচ্ছ্বসিত।

প্রসন্ন বলছে দুঃখ করে, 'না হল জ্ঞান, না হল প্রেম। কি নিয়েয়ে থাকি?'

'জ্ঞান হল না বুঝি, কিন্তু প্রেম হল না কেমন করে?' তারক জিগগেস করল।

'কই কাঁদতে পারলাম কই। কাঁদতেই যদি না পারলাম তাহলে আর প্রেম হল কি করে?'

আহা, দেখ না একবার ঠাকুরের দিকে তাকিয়ে। জ্ঞান আর প্রেমের সমাহার। এক দিকে শঙ্কর আরেক দিকে গৌরাঙ্গ।

ঠাকুর বললেন, "জ্ঞানীর ভিতর টানা গঙ্গা। আর ভক্তের ভিতর জোয়ার-ভাঁটা'।

জ্ঞানপথ বড় কঠিন পথ। এ পথ কলিকালের পক্ষে নয়। কলিকালের পক্ষে ভক্তি। জ্ঞান যায় সদরমহল পর্যন্ত, ভক্তি একেবারে অন্তঃপুরে। জ্ঞানী আইন মানে, ভক্তি অকুতোভয়। জ্ঞানীর কামা ভক্তি, ভক্তের কামা ভালোবাসা। জ্ঞান সুখ, ভক্তি সুধাংশু।

আরেকটি ছেলে আসে, পল্টু। কিন্তু তার বাবার সায় নেই।

'তুই তোর বাবাকে কি বললি?'

'বললাম, ওঁর ওখানে যাওয়া কি অন্যায়?'

'না, না, ওরকম করে জবাব করিসনি। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে'।

পল্টু চলে যাচ্ছে, ঠাকুর সস্নেহকণ্ঠে বলছেন, 'ভরে এখানে আসিস এক-আধ বার।'

'সময় পেলে আসব।'

'ওরে কলকাতায় যেখানে যাব, যাস একটু।'

'দেখব, চেষ্টা করব।'

'ওরে, কি রকম কথা তোর!'

'তাছাড়া আবার কি। চেষ্টা করব না বললে যে মিছে কথা বলা হবে।'

'তোদের মিছে কথা আমি ধরি না।'

সে এক জ্ঞানী ছিল অথচ অজস্র মিথ্যে কথা বলে। লোকে প্রতিবাদ করে, তিরস্কার করে। বলে, এদিকে ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছে বলছ অথচ মিথ্যে কথা তো ঝুড়ি-ঝুড়ি। জ্ঞানী বললে, কেন জগৎ তো স্বপ্নবৎ। সবই মিথ্যে এ জ্ঞানই তো ব্রহ্মজ্ঞান! সবই যখন মিথ্যে তখন যাকে সত্য কথা বলছ সেটাও মিথ্যা। বুঝলে না, সত্যটাও মিথ্যা মিথ্যাটাও মিথ্যা।

হরীশ মুস্তফি এসেছে ঠাকুরের কাছে। যদি ক'টা আসন শিখিয়ে দেন।

ঘোরতর অসুস্থ রোগীকে কেউ এমন অনুরোধ করতে পারে? যখন করে ফেলেছে, প্রার্থনা পূরণ করতে হয়। বিছানার উপর উঠে বসলেন ঠাকুর। সাকার উপাসনার আসন শিখিয়ে দিলেন। নিরাকার উপাসনার আসন শেখাচ্ছেন, নিজেই সমাধিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। ডাক্তার এত করে বলে গেছে, আর সমাধি ভূমিতে যাওয়া চলবে না যদি বাঁচতে চাই। তুমি চাও কিনা জানি না আমি তো চাই বাঁচাতে। সুতরাং ডাক্তারের অনুরোধই বা তুমি রাখবে না কেন? শুধু তো আরোগ্যের বাধা নয়, দুর্বিষহ ব্যাধিযন্ত্রণা। ঠাকুর তাড়াতাড়ি নেমে এলেন সমাধি থেকে, প্রায় জোর করে। নেমে এসেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন।

লজ্জায় বিবর্ণ মুখে হরীশ বললে, 'আপনার এত কষ্ট হবে অথচ আপনি ও সব করতে গেলেন কেন?'

'করতে গেলুম কেন? না করলে শিখবে কি করে?' ক'ষ্ট?' ঠাকুর হাসলেন। 'সবই তো তোমাদের জন্যে।'

আমার কষ্ট তোমাদের জন্যে। আমার ধৈর্য তোমাদের জন্যে। আমার ত্যাগ তোমাদের জন্যে।

রন্তিদেবের কথা মনে করো। সর্বপ্রকার দানে বিশেষত অন্নদানে যে সদাব্রত। বহুদিন উপবাসে কেটেছে রন্তিদেবের, সেদিন কিছু জোগাড় হয়েছে ভোজ্য দ্রব্য। সেই মুহূর্তে এক ক্ষুধার্ত ব্রাহ্মণ এসে হাজির হল। সেই অন্নের পর্যাপ্ত পরিমাণ দিয়ে তার পরিতুষ্টি করল রন্তিদেব। বাকি অন্ন পরিজনদের বিভাগ করে দিয়ে নিজাংশ নিয়ে বসল। ভোজনে উদ্যত হয়েছে, এমন সময় শূদ্র জাতীয় আরেক অতিথি এসে উপস্থিত। নিজাংশ থেকে রন্তিদেব তাকেও দিয়ে দিল যথেষ্ট অন্ন। সামান্য পরিমিত অবশিষ্টাংশ নিয়ে বসেছে, চেয়ে দেখল চোখের সামনে আরেক জন দাঁড়িয়ে। তার সঙ্গে আবার কতকগুলি কুকুর। সে বললে, শুধু আমি নই, আমার কুকুরগুলিও বুভুক্ষু। আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করুন। হৃষ্টচিত্তে নত মস্তকে বাকি অন্ন তাদের দিয়ে দিল রন্তিদেব। তখন আর কিছুই খাদ্য নেই, শুধু খানিকটা জল রয়েছে পাত্রে। সেই জল খেয়েই ভোজন সমাধা করবে আজ। জলপাত্র মুখে তুলেছে, এক চণ্ডাল এসে সেই জলটুকু চাইলে। বললে ধারে কাছে কোথাও নদী বা সরোবর নেই, পথশ্রমে দারুণ পিপাসার্ত হয়েছি, ঐ জলটুকু আমাকে দান করুন।

তথাস্তু। নিজে ক্ষুৎপিপাসায় ম্রিয়মাণ, তবু রন্তিদেব সেই জলটুকু দিয়ে দিল চণ্ডালকে।

বললে, 'আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে অষ্টৈশ্বর্যান্বিতা পরাগতি চাই না, চাই না মোক্ষ বা অপুনর্ভব। আমি যেন অখিল জীবের অন্তরে বাস করে তাদের সমস্ত দুঃখ নিজের মধ্যে টেনে নিই, যাতে তারা দুঃখমুক্ত হয়। জীবিতকামী জীবের জীবনরক্ষার জন্যে আমার জীবন বলি প্রদান করলেই আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা শ্রান্তি-ক্লান্তি আর্তি-কাতরতা খেদ-বিষাদ শোক-মোহ সব অপগত হবে।'

তখন দেবতারা নিজ-নিজ মূর্তি ধরে দেখা দিল রন্তিদেবকে। বললে, তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করতে আমরাই এসেছিলাম ছদ্মবেশে।

আমার প্রণাম নিন। আমাকে নিঃসঙ্গ ও বিগতস্পৃহ করুন। শুধু ভগবান বাসুদেবেই যেন আমার চিত্ত-সমর্পিত থাকে। ঈশ্বর ছাড়া আমার আর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। যদি একমাত্র তাঁকেই আশ্রয় করতে পারি তাঁর গুণময়ী মায়া স্বপ্নের মতই বিলীন হয়ে যাবে।

'মায়াতে সৎকে অসৎ, অসৎকে সৎ বলে বোধ হয়।' বললেন ঠাকুর। 'এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে সেই তাঁকে দেখতে পায়। কামারপুকুরের একটা পুকুর দেখেছিলাম পানায় বোঝাই। একটা লোক তৃষ্ণার্ত হয়ে সে পুকুরের কাছে এসে দাঁড়াল। পানা সরিয়ে জল খেল, সেই জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। লোকটা কি বোঝাল? বোঝাল, সচ্চিদানন্দ জল মায়ারূপ পানাতে ঢাকা। বোঝাল, যে সরিয়ে জল খায় সেই পায়।'

আমাকে সরিয়ে দেখব তোমাকে। অহং-এর বৃন্তে ফোটাব আত্মার শতদল।

একশো উনষাট

'তোমরা কাঁদলে বলে এত ভোগ করছি।' ঠাকুর বলছেন ভক্তদের দিকে চেয়ে। 'নইলে সকলাই যদি বলো, এত কষ্ট, তবে দেহ যাক, তাহলে দেহ যায়।'

পাষাণেরও বুক ফেটে যায় কথা শুনে। ঠাকুরের কষ্ট চোখে দেখা যায় না অথচ এ কষ্টের অবসানের জন্যে দেহেরও অবসান হোক, এ ভাবলেও তো প্রাণ শতধা হাহাকার করে ওঠে।

প্রকাশ মজুমদার এক ডোজ নাক্সভমিকা দিয়েছে ঠাকুরকে। শুনে ডাক্তার সরকার খুব চটেছে। বললে, 'সে কি কথা! আমাকে না বলে নাক্সভমিকা দেওয়া! আমি তো মরিনি।'

'তোমার অবিদ্যা মরুক।' ঠাকুর বললেন পরিহাস করে।

পরিহাস ঠিক বুঝতে পারল না ডাক্তার। সে ভাবল অবিদ্যা মানে বোধ হয় গণিকা। গম্ভীর হয়ে বললে, 'আমার কোনো কালে অবিদ্যা নেই।'

ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন ডাক্তার কি বুঝেছে। বললেন, 'না গো, তা বলিনি। সন্ন্যাসীর জানো তো, অবিদ্যা মা মারা যায় আর বিবেক সন্তান হয়। মা মারা গেলে অশৌচ হয়, তেমনি অবিদ্যার মৃত্যুতে সন্ন্যাসীর অশৌচ! তারই জন্যে সন্ন্যাসীকে ছুঁতে নেই।'

'আচ্ছা মশাই, পাপের শাস্তি আছে শুনছি, অথচ ঈশ্বরই সব করেছেন, এ কেমনতরো কথা?' বলেছিল শ্যাম বসু। 'বুঝিয়ে দিন!'

'কি তোমার সোনারবেনে বুদ্ধি!' ঠাকুর রঙ্গ করে উঠলেন।

'সোনারবেনে বুদ্ধি মানে ক্যালকুলেটিং বুদ্ধি।' বুঝিয়ে দিল নরেন।

'তোমার অত মাথাব্যথায় কাজ কি! ফিলজফি ল'য়ে বিচার করে তোমার কি হবে? আধপো মদেই তুমি মাতাল', বলছেন ঠাকুর, 'শুঁড়ির দোকানের মদের হিসেবে তোমার কি দরকার?'

ডাক্তার সরকার বললে, 'আর ঈশ্বরের মদ অনন্ত। সে-মদের শেষ নেই।'

'তুমি তাঁকে সব ভার দিয়ে চুপ করে বসে থাকো না।' বললেন ঠাকুর, 'সৎলোককে যদি কেউ ভার দেয়, সে কি অন্যায় করে? পাপের শাস্তি তিনি দেন কি না দেন তিনি বুঝবেন। তোমার কিসে ঈশ্বরে ভক্তি হয়, তাই দেখ।'

'মানুষ হিসেব করে কি বলবে?' ডাক্তারও চলে এসেছে ভক্তি-বিশ্বাসের পথে। বললে, 'তিনি সমস্ত হিসেবের পার।'

'মানুষের নিজের মধ্যে যেমন, ঈশ্বরের মধ্যেও তেমনি দেখে।' বললেন ঠাকুর। 'বলে কি না ঈশ্বরের বৈষম্যদোষ। একজনকে সুখে রেখে আরেক জনকে দুঃখে রেখেছেন। নিজের গজ-ফিতে দিয়ে ঈশ্বরকে মাপতে যায়।'

ঠাকুরের বাহ্যিক দেহে দুর্দান্ত যন্ত্রণা, তবু তিনিই নিজে আবার ভক্তদের ভুলিয়ে রাখছেন। আমার কষ্ট দেখে ওদের মুখে ক্লেশচ্ছায়া দেখা দেবে, সে যে আমার ততোধিক কষ্ট।

সেই বড়বাজারে মাড়োয়ারী-ভক্তের বাড়ি গিয়েছিলেন, তার গল্প করছেন। হিন্দুস্থানী এক পণ্ডিতের সঙ্গে সেখানে আলাপ। তাকে ঠাকুর জিগগেস করলেন, 'আচ্ছা জী, কারু ভক্তি হয় কারু হয় না, এর মানে কি?'

পণ্ডিতজী কি সুন্দর করে বললে। বললে, ঠিক ঠাকুরের প্রতিধ্বনি: 'ঈশ্বরে বৈষম্য নেই। তিনি কল্পতরু, যে যা চায় সে তা পায়। তবে কল্পতরুর কাছে চাইতে হয়।'

আঠারো শ' ছিয়াশী সালের পয়লা জানুয়ারি ঠাকুর কল্পতরু হলেন।

বেলা প্রায় তিনটে, ছুটির দিন। গৃহস্থ ভক্তরা সমবেত হয়েছে কাশীপুরের বাগানে। ছুটির দিন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে। যদি এক ফাঁকে দেখা যায় একটু ঠাকুরকে।

অপেক্ষা করেই তো আছি। যেদিন সংসারে এসেছি তাঁর পদাশ্রয়-বিচ্যুত হয়ে সেই দিন থেকেই তো অনিকেত আমরা। এই সব মাটির ঘর কি আমাদের আশ্রয় হতে পারে? যে মুহূর্তে ডাক পড়বে সে মুহূর্তেই তো বিদায় হতে হবে। বাড়িঘরের মেরামত বাকি, দরজায় তালা লাগিয়ে আসি, কোনো ওজুহাতই শুনবে না। যে বাড়িতে শেষ পর্যন্ত কর্তৃত্ব নেই সে কি আমার বাড়ি? এই একটু বৃষ্টিটা ধরবার জন্যে ছাতার তলায় দাঁড়ানো। ডাকটি শোনবার আসায় একটু বসে যাওয়া। পথ চেয়ে অপেক্ষা করা। কখন আসবে সেই ডাকহরকরা কেউ জানে না। ষ্টেশনের মুসাফিরখানায় বসে আছি ট্রেণ ধরবার জন্যে। মুসাফিরখানা কি ঘর-বাড়ি?

'ওরে ওরা আমার জন্যে সব বসে আছে।' ঠাকুর হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন: 'আমাকে কাপড়-জামা দাও,' আমি পরব, সাজব, যাব আমি বাগানে বেড়াতে।'

এ কি অসম্ভব কথা! শয্যাসীন কঠিন রুগী, এ যাবে কি করে নিচে নেমে?

যাব, সহজেই চলে যাব, ওরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। এখানে ওদের আসতে বারণ, অনেক বিধি-নিষেধের কণ্টক। আমিই যাব আগবাড়িয়ে। রোদে ওদের ছায়া দেব।

মনোহর বেশ পরব। তেলধুতি নয়, ধোয়া ধুতি। নিয়ে এস আমার বনাতের জামা। আমার কানঢাকা টুপি। আমার ফুলকাটা মোজা।

একবার দু'খানা তেলধুতি কিনতে বলেছিলেন মাষ্টারকে। মাষ্টার তেলধুতি তো কিনলই, দুখানা ধোয়াও কিনল।

ঠাকুর বললেন, 'তেলধুতি দুখানি সঙ্গে দাও, আর ধোয়া দু'খানা তুমি নিয়ে যাও।'

'যে আজ্ঞে।'

'আবার যখন দরকার হবে তখন এনে দেবে। আমার সঞ্চয় করবার জো নেই। সেবার সিঁথির ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে বেণী পালের বাগানে গিয়েছিলাম। রাত দশটার পর কালীঘরে ফেরবার জন্যে গাড়িতে উঠছি, দেখি বেণী পালের হাতে লুচি-মিষ্টির চ্যাঙারি। কি ব্যাপার? রামলাল আসতে পারেনি তার জন্যে কিছু খাবার দিতে চাচ্ছে। ও বাপু বেণী পাল, আমি বললুম তাকে মিনতি করে, আমার সঙ্গে ও সব দিও না। আমার সঙ্গে কোনো জিনিস সঞ্চয় করে নিয়ে যেতে নেই।'

সিন্ধুবাসী হীরানন্দ ঠাকুরকে পাজামা উপহার দিতে চায়। বলে, আমার দেশের পাজামায় বেশি আরাম পাবেন। তার আগ্রহ দেখে ঠাকুর বলছেন, দিও পাঠিয়ে।

আমার আবার-আরাম-বিরাম! আমার আবার বসনভূষণ।

কোমরে কাপড় রাখতে পারছেন না ঠাকুর। প্রায় বালকের মত দিগম্বর। দুটি ব্রাহ্মভক্ত এসেছে হীরানন্দের সঙ্গে। তাই এক-আধবার কাপড়খানি টানছেন কোমরের কাছে। হীরানন্দকে বলছেন, 'কাপড় খুলে গেলে তোমরা কি অসভ্য বল?'

'আপনার তাতে কি।' বললে হীরানন্দ, 'আপনি তো বালক।'

প্রিয়নাথ ব্রাহ্ম। তাকে ইঙ্গিত করে ঠাকুর বললেন, 'উনি বলেন।'

'মাইরি কোন শালা ভাঁড়ায়।' মাঝে মাঝে এই বলে বালকের মত শপথ করেন ঠাকুর। 'মাইরি আমি সভ্য হয়েছি।' বলতে-বলতে কখন আবার বলে ওঠেন, "কত মনে করি সভ্য হব কিন্তু মহামায়া যে বসন রাখতে দেন না শরীরে। আমাকে বালকের মত করে রাখেন। সে বার একটা ছোট ছেলে ফুল নেব বলে বায়না ধরলে। বাপ বোঝালে, দিতে নেই, ও ফুলে ঠাকুরপুজো হবে। কে শোনে কার কথা। ছেলে কান্না জুড়ে দিল। আমি তখন তাকে দিলাম সেই ফুল। ফুল পেয়ে কি আনন্দ সেই শিশুর। তার পর? তার পর দূর যাঃ, বলে সে ফুল সে ফেলে দিল ছুঁড়ে।'

প্রিয়নাথ বললে, 'আজ্ঞে পায়ে বন্ধন, এগুতে দেয় না।'

'থাক না পায়ে বন্ধন, মন নিয়ে কথা। মনে কেন বাঁধন পরাও?'

'হায়, মন যে আমার বশ নয়।'

'মন অভ্যাসের বশ। অভ্যাস কর, মনকে যে দিকে খুশি নিয়ে যেতে পারবে।'

ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি পরলেন, গায়ে দিলেন সবুজ বনাতের

জামা। মোজা পায়ে চটিজুতো পরলেন। মাথায় আঁটলেন কান-ঢাকা কাপড়ের টুপি।

যার নাকি শয্যাশয়ন অসুখ, সে উঠে বসে সাজগোজ সমাধা করল। হেঁটে চলল। নেমে চলল সিঁড়ি দিয়ে। একেবারে এসে উপস্থিত হল সামনের মাঠে। সেখানে গৃহীভক্তরা জমায়েত হয়েছে। জমায়েত হয়ে তাকিয়ে আছে উর্দ্ধমুখে। চলে এলেন সেই গৃহীদের আহ্বানে যিনি স্বয়ং সন্ন্যাসী হয়েও গৃহস্থের শিরোমণি।

পর্বতচূড়ায় তুষার হয়ে বসে রইলেন না, নেমে এলেন সাধারণের সমতলে। পাপী তাপী দুঃখী দুর্গতদের মাঝখানে। যারা নানা বাধা বেদনায় জর্জর, সংশয়ে অবিশ্বাসে পীড়িত, আকাঙ্খায় অহঙ্কারে অভিভূত তাদের এলেকায়। প্রবৃত্তিতে শত তাড়িত হয়েও যারা অম্লান ভক্তিমান। যারা সংসার-কারাগারে বন্দী থেকেও সর্বদা সেই নীল আকাশের ভিখারী।

এসেছে গিরিশ ঘোষ, অতুল ঘোষ, রাম দত্ত, অক্ষয় সেন, হারান দাস, কিশোরী রায়, বৈকুণ্ঠ সান্তাল। নবগোপাল ঘোষ, হরমোহন মজুমদার আর মাষ্টার মশাই মহেন্দ্র গুপ্ত। আরো অনেক, হরীশ মুস্তফী, চুনীলাল বসু, উপেন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ওরে চেয়ে তাখ কে এসেছে!

শরীরে বেঁচে থেকে যে বিশ্বাস করা যায় না। এ কি সত্যি, না, দিবাস্বপ্ন? একসঙ্গে এতগুলি লোকের দৃষ্টিভ্রম হয় কি করে? ওরে এ যে তিনিই। মর্ত্তের ঘরে আকাশের দিনমণি!

কই তাঁর রোগ কই? কষ্ট কই? এ যে সর্বদীপ্ত প্রসন্নতা। সর্বশুভ্রা পরিতৃপ্তি।

দু'চোখে এত রূপ ধরে না। হৃদয়মৃৎপাত্রে ধরে না যে করুণার শ্রাবণ-উৎসার।

[ক্রমশঃ।

বোধিসত্ত্ব

স্বামী আত্মানন্দ

শ্রাবস্তী নগরোপরে জেতবন শ্রীবিহারে অনাথ পিণ্ডদ উপবন,
মহর্ষি মুলঙ্কপুত্ত, তথা বসি স্থির চিত্ত ধ্যানযোগে ছিল নিমগন।
সহসা সে ধ্যান ভাঙ্গি চাহিলা আকাশ পানে উন্মীলিয়া সে যুগল আঁখি,
মনে হোল কত কথা, দ্বিধা ও সংশয় ব্যথা জানিবারে রহিয়াছে বাকি।
প্রকাশ করিয়া কভু বলে নাই মোরে প্রভু এ জগত সত্য কিম্বা মায়া?
অসীম সসীম কিম্বা শুধুই প্রপঞ্চ এ জীবন শূন্য মিথ্যা ছায়া।
আমি তুমি এ প্রকৃতি মহাব্যোম গতি স্থিতি এই দেহ আত্মমন প্রাণ
দুই-এক ভিন্ন ভিন্ন অথবা অখণ্ড পূর্ণ এর কিছু আছে কি প্রমাণ?
অরহৎ সিদ্ধযোগী মরণের পরে সে কি মিশে যাবে অনন্ত ভূমায়?
অথবা সে মৃত্যুহীন রহিবে গো চিরদিন জগতের জীবন-সীমায়?
এ সমস্যা সমাধান নাহি হয় সপ্রমাণ কিবা লাভ হইয়া শ্রমণ
প্রভুর নিকটে থাকি, শুধুই তপস্যা এ কি বৃথা এই শ্রবণ-মনন?
জিজ্ঞাসি প্রভুরে গিয়া সংশয় ঘুচায়ে নিয়া নহে ফিরি সংসার-আশ্রম,
কেন এই পীতবাস শ্মশ্রুশির করিয়া মণ্ডন কেন এই বৃথা পরিশ্রম?
তেয়াগিয়া যোগাসন ধীরে অগ্রসর হন উপজিলা যথা তথাগত,
বসিয়া প্রশান্তি-মাথা সহাস বদন একা প্রণমিল হয়ে অবনত।
বুদ্ধের আশ্বাস পেয়ে তবে জোড়পাণি হয়ে নিবেদিল সংশয় আপন,
বুদ্ধদেব ক'ন হাসি তোমারে কি কভু আসি ডাকিয়াছি হইতে শ্রমণ?
আমি কি বলেছি কভু সত্য, মিথ্যা, অসীম, সসীম এই তত্ত্ব আত্মা-দেহ
তোমারে বুঝায়ে দিব হে সাধু মুলঙ্ক পুত্ত আমার শরণ আসি লহ?
চলিতে ধর্ম্মের পথে আপনার মনোরথে সত্যের সন্ধান যদি চাও,
এ সব সংশয় দ্বিধা কূটতর্ক বৃথা চিন্তা মন হতে মুছে ফেলে দাও।
তোমার এ প্রশ্নজাল এ শুধু কথার জাল শুন এক কহিব কাহিনী,
বিষদিগ্ধ তীক্ষ্ণশরে বিদ্ধ পড়ে এক ধারে মুখে নাহি সরিতেছে বাণী।
আত্মীয় স্বজনগণ ভিষক ডাকিতে মন ত্বরা চাহি বাণ উন্মোচন,
তখন জড়িত স্বরে বাণবিদ্ধ জন বলে "বল মোরে বল এইক্ষণ।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র চারি জাতি,
এর মধ্যে কোন জন হেনেছে শায়ক?
প্রশ্নের উত্তর দিয়া তারপর উৎপাটিয়া ফেল তীর বেদনাদায়ক।"
পরে প্রশ্ন করে পুনঃ স্থূল কিম্বা কৃশতনু
কোন গোত্র কি বা নাম এই ধনুর্ধর
গৌর, কৃষ্ণ, শ্যামকান্তি হ্রস্ব, দীর্ঘ, মধ্যকায় এ নগরে কিম্বা গ্রামে ঘর?
উড়ে যাবে প্রাণ-পাখী উত্তর রহিবে বাকি বিদ্ধ রবে তখনও যে তীর,
বিষের দহনে হায় নীলবর্ণ হবে কায় যন্ত্রণায় হইবে অধীর।
তোমারও সে দশা আজ যে কথায় নাহি কাজ
তুমি আসি জিজ্ঞাস আমায়।
চারিটি যা আর্য্য সত্য বলেছি মুলঙ্ক পুত্ত মহাদুঃখ জনম ধরায়।
এ জীবন দুঃখময় এ কথা তো ভুল নয় আর দুঃখ প্রিয়ের বিয়োগ,
অপ্রিয় সংযোগে দুঃখ, ইহার বিনাশ লক্ষ্য মুছে যায় জীবনের ভোগ।
শুনিয়াছ মোর কাছে জন্মমৃত্যু জরা আছে
যাতনার যত কিছু কার্য্য ও কারণ,
কামনার কিসে ক্ষয় কিসে দূর হয় ভয় দুঃখ হয় কিসে নিবারণ।
তোমায় মুলঙ্কপুত্ত এ কথা বলেছি সত্য কোন পথে বোধিলাভ হয়,
ধর্ম্মের সকল সত্য নির্ব্বাণের পতি নিত্য বাসনার যেখানে বিলয়।

অহিংসা ও সদাচার, পরিগ্রহ, পরিহার, জীবন যাপিও পরহিতে
বহুজন সুখে নিতি বহুজন হিতে প্রীতি প্রচার করিও চারি ভিতে।
জগতের নিত্যানিত্য অসীম সসীম-তত্ত্ব কিবা লাভ কূটতর্ক করি,
অভয় অশোক মন্ত্রে অজেয় সত্যের ছন্দে
দিও তুমি অমৃতের সুধায় সে ভরি।

রাজায় রাজায়

উদয়ভানু

তিমির-বলয় মান্দারণের চতুর্দ্দিকে। শোকের কালো ছায়ার মত থমথমে অন্ধকার। আমোদরের তীরে নিবিড় বনরেখা, আঁধারে আঁধারে আর দৃষ্টিপথে পড়ে না। আকাশের বিক্ষিপ্ত তারাদলের মত দু'টি কি একটি আলোকবিন্দু বনমধ্যে দেখা যায়। খদ্যোতের আলো যেন। বন্যপশুর চোখ যেন! তেমন আলোয় কাজ হয় না, অন্ধকারকে আরও যেন গাঢ়তর করে। রাত্রিকালে মান্দারণের পথঘাট জনশূন্য থাকে; চোর-ডাকাত আর ঠ্যাঙাড়ের ভয়ে ঘরের বার হ'তে চায় না কেউ। দিনের আলোতেও মান্দারণ গম্ভীর থাকে, কথা বলে না। পাখীর কাকলী, পশুর চিৎকার আর মনুষ্যকণ্ঠের কচিৎ ধ্বনিতে সেই স্তব্ধতা ক্ষুণ্ন হয় না। বনজঙ্গলময় ও হতশ্রী এক উপনগর গড় মান্দারণ—মহামারীর কশাঘাতে আর দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে অতিষ্ঠ হয়ে অধিকাংশ মানুষ এ স্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র বসতি গেড়েছে। শূন্যভিটা আর ভগ্ন দেবালয়ে বনের পশু বাসা বেঁধেছে। এখন যেন বোবা মান্দারণের চোখে সবে তন্দ্রা নেমেছে, ঘুমের নেশা লেগেছে। প্রকৃতির নীরব আঁধারে অচিরাৎ নিদ্রামগ্ন হবে। আমোদরের জল শুধু বাধা মানে না, নিষেধ শোনে না। প্রগলভার মত খিল-খিল হাসতে হাসতে ছুটে চ'লেছে অসংযত গতিতে। পশলা পশলা বারিধারা চ'লেছে আজ সকাল থেকে। আমোদর তাই যেন আজ কিঞ্চিৎ স্ফীতকায়, কিছু বা উচ্ছ্বসিত। দিন ফুরাতে পারাপারের নৌকাগুলি ফেরাফেরি করছে এতক্ষণে। মাঝনদীতে একেকটি চলমান আলো, নৌকার নিশানা—তৈলদীপ, এদিক থেকে সেদিকে এগিয়ে চ'লেছে। এক নৌকার মাঝি অন্য নৌকার মাঝির সঙ্গে হয়তো কিছু সদালাপ করছে ক্ষণেকের তরে। কর্ম্মবিরতির সময় এসেছে, তাই হাসাহাসি করছে। নদীর বুকের স্নিগ্ধ বাতাসে ভাসছে টুকরো টুকরো কথা আর হাসির শব্দ। জীবননদীর পথে যেন দুই মানুষের দেখা হয়েছে!

অন্ধকার কক্ষের, আড়কাঠ থেকে চোখ নামালো চৌধুরাণী। মুক্ত দ্বারপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। আনন্দকুমারীর কটাক্ষ যেমন স্থির, তেমনই মর্ম্মভেদী। যেন নীলমেঘমধ্যে বিদ্যুতের ঝলক। কিন্তু তার মুখকান্তিতে এক অনির্ব্বচনীয় শোভা, আত্মগরিমায় আরও যেন সুন্দর দেখায় চৌধুরাণীকে। কক্ষের দেওয়ালের ঊর্দ্ধে গবাক্ষ। হঠাৎ আকাশ দেখলো চৌধুরাণী, ঠিক যেন এক বৃহৎ চক্ষুর আকার দেখলো। কালো চোখে সোনালী তারা জ্বল-জ্বল করছে। শুক্লারজনীর আকাশে নক্ষত্রের দীপ্তি।

আকাশ থেকে পুনরায় চোখ ফেরালো আনন্দকুমারী। নিমেষ-শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকলো দ্বারমুখে। অস্বস্তি বোধ করছে যেন সে; মুহুর্মুহুঃ চঞ্চল হ'য়ে উঠছে তার সর্ব্বশরীর। পার্শ্বকক্ষে তিন তিনটি প্রদীপ জ্বলছ। সেই আলোকরাশির দ্যুতিতে চৌধুরাণীর চোখ পড়ে আপন দেহাভরণে। বেণের মেয়ের অঙ্গে অনেক অলঙ্কার! হাতে চুড়ি, কাঁকণ, তাবিজ। কানে ঝুমকো, মুক্তা-চুণীর ঝালর ঝুলছে। মেদভারী নিতম্বে মেখলা। পায়ে নূপুর! সীমন্তের হীরকতারা যেন মাথা ধরিয়ে দেয়।

গহনা কাঁটা হয়ে বিঁধছে থেকে থেকে। যেন কাঁটালতার অলঙ্কার প'রেছে আনন্দকুমারী। আসমানী ঢাকাই শাড়ী যেন সর্ব্বদেহে জ্বালা ধরায় আজ। জরিজড়ানো লতানে বেণী প'ড়ে আছে পিঠে, বিষধর ফণিনীর মত। তিনটি দীপের ছটায় অলঙ্কারসমূহ নজরে পড়তেই একটি তপ্ত শ্বাস ফেললো। চাহনি নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখ থেমে গেল যেন। দেখলো ফুলের মালা, যুঁই ফুলের মালা। জানু স্পর্শ করছে কণ্ঠ থেকে নেমে। কত কোমল আর কত শীতল এই মাটির দান যুঁইফুল, তাও মনে হয় কণ্টকমালা প'রেছে। কীটের দংশন অনুভব করছে কণ্ঠগ্রীবায়। কোমর থেকে লাল রেশমী রুমাল টানলো আনন্দকুমারী। সজোরে। কি এক বিতৃষ্ণায়! চৌধুরাণীর মুখ গম্ভীর। কি যেন ভাবতে ভাবতে আপন অঙ্গ থেকে একেকটি গয়না খুলতে লাগলো সে। ভূমিতে রুমাল পেতে একেক অলঙ্কার রাখলো একে একে। ঘন ঘন শ্বাস ফেলতে ফেলতে ধীরে ধীরে সকল স্বর্ণভূষা মোচন করলো। এমন কি, সীমন্তের হীরকতারাটি পর্যন্ত। শেষে এক পুঁটলী বাঁধলো রুমালে। বুকভরা শ্বাস টানলো চৌধুরাণী। জ্বালা জুড়িয়েছে তার। উজ্জ্বল আলোকময় কক্ষে চোখ ফিরালো আবার, মুখখানি ঈষৎ এগিয়ে দ্বারের পাশ থেকে সাবধানে দৃষ্টি চালিয়ে দিলো আলোকময় কক্ষে।

তিন-তিনটি প্রদীপের আলো। একটি শুধু কক্ষ আলোকিতের জন্য, অন্য দু'টি বিন্ধ্যবাসিনীর দুই পাশে। রাজকুমারীর দুই জানুপ্রান্তের কাছে।

আনন্দকুমারী দেখলো, বিন্ধ্যবাসিনীর পিঠে যেন অন্ধকার নেমেছে। অবন্ধ নিবিড় কেশরাশি পিঠের 'পরে। সামান্য গুণ্ঠন টেনেছে রাজকুমারী, পাশ থেকে তার মুখাবয়ব দেখা যায় না। চৌধুরাণী দেখতে পায় রাজকুমারীর মাত্র দু'ই শুভ্র বাহু। আর দেখতে প্রায় অঙ্গরেখা, বস্ত্রাবরণে ঢাকা।

বর্ষার লতা যেন বিন্ধ্যবাসিনী! পাতার ভারে দলমল করছে। পূর্ণচন্দ্র-কৌমুদীর মত দেহবর্ণ।

রাজকুমারীর ওষ্ঠাধরে কথা ফুটছে মিষ্টি মিষ্টি। চন্দ্রকান্তর কি এক প্রশ্নের উত্তরে, বিন্ধ্যবাসিনী যেন সলজ্জায় কথা বলছেন।—তখন আমার পঞ্চম বর্ষ বয়েস। তখন আমি বালিকা। এক

বৈষ্ণবীর নিকট তখনই আমি অক্ষরশিক্ষা করি। তার পর রাজগৃহের একজন স্বস্ত্যয়নী ব্রাহ্মণের স্থানে সংস্কৃত ভাষায় কয়েক গ্রন্থ শিক্ষা করি। তার পর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এটা সেটা পাঠ চ'লতে থাকে। এক সময়ে আমি প্রতি রাত্রে চারি ঘণ্টার পরে শয্যা থেকে উঠে পুরাণ পাঠ করতাম। তার পর একদিন রাত্রে, আমার বিবাহ হয়ে গেল আমাদের পিতাঠাকুর রাজার ইচ্ছায়। তার পর থেকেই আমার পাঠ-অভ্যাসে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। তখন থেকে এখনও পর্য্যন্ত প্রায় এক অক্ষরও আর পড়ি না।

—রামায়ণ এবং মহাভারত অপঠিত আছে কি?

চন্দ্রকান্ত কথা বললেন কি যেন লিখতে লিখতে। রাজকন্যার সরল স্বীকারোক্তিতে মৃদু মৃদু হাসলেন। দর্পভরা হাসি। বালুকায় লিখলেন কি এক পঙক্তি।

কিছুক্ষণ ভাবলেন বিন্ধ্যবাসিনী। থেমে থেমে ব'ললেন,—নিজের চেষ্টায় যা যতটুকু পড়া যায়। তবে রামায়ণ মহাভারতের আদ্যোপান্ত না প'ড়েছি এমন নয়। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ আর কাশীরাম দাসের মহাভারত, তাও পড়েছি। মূল সংস্কৃত পড়ার অবকাশ কৈ পেয়েছি?

পূজারী ব্রাহ্মণের দুই চোখ বস্ত্রখণ্ডে আবদ্ধ। তবুও বোঝা যায় বেশ, তিনি যেন বিস্ময়ের অভিব্যক্তি ফোটালেন মুখে। বললেন, —এই লিপিটুকু পাঠ করেন জমিদারনন্দিনী!

বিন্ধ্যবাসিনী একাগ্র দৃষ্টিতে দেখে দেখে প'ড়লেন,—আপনা মাঁসে হরিনা বৈরী।

বাঙলা ভাষার আদিযুগের এক কণা। সংস্কৃত-প্রাকৃত বন্ধনমুক্ত বাঙলা ভাষার সাবেকী নমুনা এক ছত্র। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের একটি পাতি।

আবার খানিক বাকহীন হয়ে থাকেন চন্দ্রকান্ত। তাঁর পার্শ্বে রক্ষিত পেটিকা হাতে তুলে ধরেন ধীরে ধীরে। বলেন,—হস্তলিপি দেখার প্রয়োজন। রাজকুমারী, আপনার যা খুশী হয় দু'এক কথা লিখেন। লিখা শেষ হ'লে কিয়ৎক্ষণ এই কক্ষের বাহিরে অবস্থান করেন, আমি দেখে লই বারেক।

লজ্জানম্র হাসি ফুটলো বিন্ধ্যবাসিনীর মুখে। শব্দহীন হাসি হাসলেন। বললেন,—যথাজ্ঞা।

কথার শেষে লেখনীদণ্ড ধারণ ক'রলেন। চাকচিক্যময় বালুকায় লিখলেন দু'-এক কথা। আঁকা-বাঁকা লেখা অনভ্যাসের। বললেন, —এই আমি কক্ষ ত্যাগ ক'রছি। লেখা শেষ হ'য়েছে।

রাজকুমারীর শ্বাসগতির শব্দ আর কানে আসে না। চোখে না দেখলেও, যেন অনুমানে বোঝেন, দ্বিতীয়া জন স্থান ত্যাগ ক'রলো এই মাত্র। চোখের আবরণ উন্মোচন ক'রে মনে মনে চন্দ্রকান্ত প'ড়লেন,—পাষাণে লেখতি মুছিলে নাহি ঘুচে!

কবি চণ্ডীদাসের কোন্ এক পদাবলীর একটি মাত্র শব্দ। রাজকন্যার লেখা দেখে যেন বাক্ হারালেন চন্দ্রকান্ত পণ্ডিত। আনন্দের আতিশয্যে কি যেন বলতে চেয়ে আর বললেন না। বস্ত্রখণ্ড আবার বাঁধলেন, চোখে যেন কিছু দেখা না যায়। একবার ভাবলেন, এই ভগ্নপুরীতে এত পুষ্পগন্ধ কোথা থেকে আসে! টাটকা যুঁই ফুলের সুবাস পান করেন তিনি। কাছাকাছি আছে নাকি কোথাও ফুলের মালঞ্চ। স্বগত করলেন নিজের মনে। বললেন, —কিমাশ্চর্য্যম্!

সত্যিই বিস্মিত হয়েছেন তিনি। রাজকুমারীর লিখন-পঠনের গুণ দেখে পৃথিবীর আরেক আশ্চর্য্য দেখতে পেয়েছেন যেন। নীরব দর্শকের মত ক্ষণেক স্তব্ধ থেকে বললেন,—দেখা শেষ হয়েছে, আপনি কক্ষে প্রবেশ ক'রতে পারেন।

—বহুকাল অভ্যাস নেই লেখাপড়ার, দোষ যেন না ধরেন।

কথা বলতে বলতে পরিত্যক্ত আসনে আবার এসে বসলেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—যা যতটুকু জানি তাতে কি নকলনবীশের কাজ চালাতে পারবো, আপনি কি মনে করেন?

হাতের পেটিকার আবরণ খুলতে খুলতে চন্দ্রকান্ত বললেন,—যথেষ্ট, যথেষ্ট। এই বা কে জানে! বৈষ্ণব পদাবলীও দেখি আপনার সুপঠিত!

মৃদু মৃদু হাসলেন রাজকুমারী। প্রসন্ন হাস্যরেখা তাঁর অধরকোণে। হাসি সম্বরণ ক'রে বললেন,—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস লোচনদাস প্রভৃতি পদকর্ত্তাদের রচনাবলী এককালে আমার কণ্ঠস্থ ছিল, এখন প্রায় সকল কিছুই স্মৃতির অতলে গেছে।

মেঘস্পৃষ্ট শীতল বাতাস বইছে থেকে থেকে। দূরে, বহুদূরে কোথায় হয়তো বর্ষণ চ'লেছে। বাতাস তাই হিমকণাবাহী। একেক দমকা হাওয়ায় প্রদীপের শিখাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে। দুই পাশের দু'টি দীপের প্রখর আলোয় জমিদারনন্দিনীর অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি আরও যেন সুন্দর দেখায়। তবুও সেই মুখের মোহময়ী শোভা আর নেই, পূর্ব্বের সেই লাবণ্য আর নেই, সেই চম্পকবর্ণ আর নেই। প্রতিমা নেই, আছে শুধু তার কাঠামো।

—মান্দারণের মধ্যে হরি বেণের দশকর্ম্ম ভাণ্ডারের নাম কারও অবিদিত নেই। চন্দ্রকান্ত কথা বললেন নিশ্চিত দৃঢ়তার সঙ্গে। বললেন,—হরি বেণের পণ্যশালায় তাবৎ সব কিছুই মিলে। তুলট কাগজও পাওয়া যায়। খাগের কলমও পাওয়া যায়। ভূসাকালিও পাওয়া যায়। আপনার পরিচারিকাকে হুকুম করলে সে তো গিয়া ক্রয় ক'রতে পারে।

—হাঁ পারে। পরিচারিকা যশোদা কেনাকাটায় খুবই পটু।

বিন্ধ্যবাসিনী ধীরকণ্ঠে কথা বলেন। পরিচারিকা রাহ্মণীর প্রশংসনে জমিদারণী যৎপরোনাস্তি খুশী হন।

যশোদা ছিল বাইরের দরদালানে। ঘুমে ঢুলু-ঢুলু আঁখি তার। সন্ধ্যাসমীরণে কেমন যেন ঘুম নামে চোখে। পাহারা দেওয়ার কাজ করে সে। একজন অজানা অচেনা মানুষ, রাত-বেরাতে এসে হাজির হয়েছে, তাই যেন দুয়োর আগলে ব'সে থাকে সে। নিশ্চুপ ব'সে থাকতে থাকতে ঘুমে ঢ'লে পড়ে। দিনের শেষে আঁধার নামতে না নামতে চোখে যেন তন্দ্রার ঘোর নামে। মনিবনীর মুখে উচ্চারিত তার নামটি কানে যেতেই উৎকর্ণ হয় সে। কান পেতে থাকে।

চন্দ্রকান্ত পেটিকা থেকে একটি পুঁথি নিয়ে এগিয়ে ধরেন। বলেন,—এটা ধারণ করেন রাজকন্যা! কীটদষ্ট পুঁথি এক। অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতের প্রথম দুই পর্ব্ব। দুই গ্রন্থ নকল্ করতে হবে। প্রথম পর্ব্বদ্বয় শেষ হওয়ার সঙ্গে আরও কয়েক পর্ব্ব দেবো।

ধীরে ধীরে নকল করা চাই, কিছু যেন ছাড় না হয়, সাবধান! লিপি অনুযায়ী নকল করা চাই।

—আপনি যা আদেশ করেন। পুঁথি হাতে ধ'রে সানন্দে বললেন রাজকুমারী। খানিক থেমে বললেন,—এই নকল করার কাজে কিছু কি আয় হবে? অর্থকরী যদি না হয় তবে এ তো পণ্ডশ্রম বৈ কিছুই নয়।

আনতমুখে বললেন চন্দ্রকান্ত,—হাঁ, তা হবে। আয় হবে সুনিশ্চিত। বংশবাটীর রাজবাটী থেকে এই কাজ পাই আমি। আমার সময় অত্যল্প, অবকাশ নাই বললেই হয়। অথচ দিন গুজরানের জন্য আয়ের প্রয়োজন। বংশবাটীর রাজবাটী অর্থদানে পেছপাও নয়। আমি যা পাবো তার তিন-চতুর্থাংশ আপনার হবে, বাকী আমি নেবো। কেন না অনুকৃতির পর আমাকে দেখতে হবে আদি-অন্ত, যাতে কিছু ভ্রম না থাকে, কিছু ছাড় না হয়।

—সেই ভাল, সেই ভাল। বিন্ধ্যবাসিনী পুঁথি রাখলেন সযতনে, আসন থেকে উঠে তেকাঠায় রাখলেন।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—সাবধান, উপদিকা না কাটে। ঐ একমাত্র প্রতিলিপি আমার সম্বল। আমি কখনও হাতছাড়া করি না এই পুঁথি, কেন না মহাভারতের আর কোন মূললিপি আমার নাই। অতি কষ্টে সংগৃহীত জানবেন।

—আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য। হৃষ্টচিত্তে বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—আপনার দেওয়া এই কাজেই আমার ভরণ-পোষণ চলবে। দেখবেন, যেন শত বিপদেও এই সিদ্ধান্ত অপরিবর্ত্তিত থাকে, নচেৎ আমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অবলা নারী আমি, আর তো কোন উপায় দেখি না। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

—আমি যাজক, আমি একজন শিক্ষাদাতা, কথাই আমার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র অবলম্বন। আমার কথার কখনও নড়চড় হয় না।

—শত বিপদেও নয়?

—না।

—নিশ্চিন্ত হলাম আমি। স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কথা বলতে বলতে রাজকুমারীর কণ্ঠস্বর যেন কিঞ্চিৎ কম্পিত হয়ে উঠে। বললেন,—আহার-নিদ্রা এক রকম ত্যাগ ক'রেছি অজ্ঞেয় ভবিষ্যতের আশঙ্কায়। আপনি জানবেন, আমি ভিক্ষাপ্রার্থী হ'য়ে বাঁচতে চাই না, কারও দয়ার পাত্রী হ'তে চাই না। দয়া আর ভিক্ষাকে আমি ঘৃণার চোখে দেখি। তদপেক্ষা মরণ-বরণ শ্রেয়ঃ মনে করি। আপনি যদি সহায় থাকেন, আমি হাসিমুখে বাঁচতে পারি। সহায় যদি না থাকেন, আমি গরল পান ক'রে পার্থিব জ্বালা থেকে মুক্ত হবো যথাশীঘ্র।

শিউরে শিউরে উঠলেন চন্দ্রকান্ত, রাজকন্যার ব্যথাতুর দীপ্ত কথায়। ভেবে ভেবে বললেন,—রাজকুমারী, অধীরা হবেন না। অধ্যবসায় আর অবিরাম চেষ্টায় মানুষই অসাধ্য সাধন করে।

—তার কিছু অভাব হবে না জানবেন। যথাসাধ্য চেষ্টার কোন' ত্রুটী হবে না। কথা বলতে বলতে বিন্ধ্যবাসিনীর অধর কেঁপে উঠলো। বুকে যেন তাঁর আহোরাত্র কিসের জ্বালা! অব্যক্ত কোন্ এক দুঃখের অন্তর্দাহে জ্বলছেন যেন সদাক্ষণ। রাজকুমারীর অপরূপ মুখবিম্বে তারই প্রতিচ্ছবি হয়তো। দুশ্চিন্তার কালিমা চোখের তলে। ভাবনায় শরীর শীর্ণ হয়ে পড়ছে দিনে দিনে।

—এই কথা থাকলো জমিদারনন্দিনী, আমি তবে যাই এখন? অনেকটা পথ অতিক্রম ক'রতে হবে আমাকে। পথ বড়ই দুর্গম, বড়ই ভয়ঙ্কর। বোম্বেটেরা ওৎ পেতে আছে।

—অভুক্ত যেতে নেই যে ব্রাহ্মণকে। বিন্ধ্যবাসিনী বললেন অনুরোধের সুরে। বললেন—সামান্য কিছু যদি মুখে দেন কৃতার্থ হবো আমি। নয়তো দুঃখ পাবো মনে।

—জপ-তপ সবই বাকী আছে এখনও। ত্রিসন্ধ্যার জপ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত জলগ্রহণ করি না আমি।

—তবে উপায়? কথা বলতে বলতে রাজকুমারী বস্ত্রাঞ্চল খুললেন ধীরে ধীরে।

ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। বললেন,—আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আর এই যৎসামান্য প্রণামী।

কথার শেষে চন্দ্রকান্তর পদপ্রান্তে কি যেন রাখলেন। ধাতুর শব্দ শুনলেন ব্রাহ্মণ। হাতড়ে হাতড়ে তুললেন একটি মুদ্রা। একখানি বাদশাহী মোহর, হাতের পরশে বুঝলেন হয়তো।

—শুভমস্তু! শুভমস্তু!

আশীষবাচন উচ্চারিত হয়। হাতে হাতে মোহর পেয়ে হর্ষোৎফুল্ল হয়ে ওঠেন চন্দ্রকান্ত। অর্থের বিশেষ প্রয়োজন, নয়তো দিন গুজরাণ হয় না। চতুষ্পাঠীর পরিচালনার কাজে কিছুই আর সঞ্চয় হয় না। যত্র আয় তত্র ব্যয়, হাতে কিছু থাকে না। চন্দ্রকান্তর কুটীরের চালে ফুটা, দুয়ারে কপাট নেই, বাঁশের মাচায় উই ধ'রেছে—সমুখে বর্ষাকাল আসন্ন। একখানি বাদশাহী মোহর লাভ হওয়ায় কত কি ভাবলেন। সহাস্যে বললেন,—এই অর্থে অনেক কাজ হবে। আমার পর্ণকুটীরের সংস্কার কাজ হবে। এ দেশের ঘোর দুর্দ্দিন, অর্থদানে সকলেই পরাঙ্মুখ। নবাবের রাজত্বে দেশবাসীর অবস্থা আদপেই ভাল নয়। যেদিকে তাকাই সেদিকেই দেখি দারিদ্র্য, অনটন, অনাহার। দুর্ভিক্ষ আর মহামারী তো দেশবাসীর নিত্যসঙ্গী। ঘরে ঘরে উনান জ্বলে না।

কান পেতে সকল কথাই শোনে আনন্দকুমারী। কখনও খুশী হয়, কখনও সহানুভূতির দুঃখ জাগে মনে। একবার ইচ্ছা হয়, বহুমূল্যের অলঙ্কারে পরিপূর্ণ লাল রেশমী রুমালের পুঁটুলীটা চন্দ্রকান্তর পদপ্রান্তে রেখে আসে। পরমুহূর্ত্তেই মনে হয়, না থাক। যার জন্য তার কষ্টভোগ, সেও দুঃখ পাক, কষ্টে থাক।

গবাক্ষপথে আকাশ দেখে উৎকর্ণা চৌধুরাণী। রাত্রি অন্ধকার, চারি দিক অন্ধকার। আকাশে ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্রের ধুকধুকি, গাছে গাছে জোনাকির চাকচিক্য, তবুও অন্ধকার! ঘনকালো মেঘের অনুগামী কৃষ্ণমেঘ, পালতোলা নৌকার মত বায়ুবেগে ধীরে ধীরে এগিয়ে চ'লেছে। জোনাকি স্বধর্ম্মে একবার জ্বলে একবার নিবে। আকাশের তারা গতিশীল মেঘের আবরণে একবার লুকায়, আবার দেখা দেয়। চৌধুরাণী দেখলো, দূরে নারকেল গাছের পত্রশাখার ঝিলিমিলি! পাতার ফাঁক থেকে দেখা যায় একখানি কানাভাঙা সোনার থালা। যেন ঈষৎ কম্পমান নিবিড় অন্ধকারের ভয়ে ঈষৎ ভয়ার্ত্ত, তাই হয়তো কাঁপছে।

চৌধুরাণীর বুক দুর-দুর করে। চন্দ্রকান্তর কথাগুলি যেন তার মর্ম্মে গিয়ে বিঁধে। চোখ ফিরিয়ে দেখলো বিন্ধ্যবাসিনীকে। রাজকুমারী কাছে এসে চুপি চুপি বললেন,—কি এত ভাবনায় মগ্ন, তা তো বুঝি না! মুখে এত ঘনঘটা কেন?

সাড় ফিরলো যেন। আনন্দকুমারী অল্প হাসলো। ফিসফিসিয়ে বললে,—আমিও যাই। রাত কত হ'ল কে জানে! নৌকায় ফিরতে হবে এই গহিন রাতে!

—রাত বেশী নয়। সবে তো প্রথম রাত্রি এখন! আলোকপক্ষ এটা, তবে আর ভয় কিসে?

—রাজকুমারী, তুমিই ধন্য। তোমার কত জ্ঞান, তুমি কত জানো!

চৌধুরাণীর কথা শেষ হ'তে না হ'তে তার মুখে চাপা পড়ে। বিন্ধ্যবাসিনী তাঁর কোমল হাতে কথকের মুখ চেপে ধরেন। বলেন,—থাক থাক, আমার গুণকীর্ত্তনে কাজ নেই আর। চন্দ্রকান্ত চ'ললেন তো, দেখা দিবি না? কথা ক'বি না?

স্তব্ধ হয়ে থাকলো আনন্দকুমারী। গৃহের ছাদে লক্ষ্মীপেঁচা হয়তো! ডাকাডাকি ক'রছে কা'কে! করালবদনা নিশীথিনী কেঁপে উঠলো সেই ডাকে!

—কি লো, মুখে কথা নেই কেন?

রাজকুমারী কথা ব'ললে ব'লতে চৌধুরাণীর চিবুক তুলে ধ'রলেন উর্দ্ধপানে।

চোখ বড় ক'রলো আনন্দকুমারী। ফিস-ফিস বললে,—জিজ্ঞেস ক'রতে পারিস রাজকন্যে, বলতে পারিস, শুধোতে পারিস এক-আধটা কথা, আমার পক্ষে?

সম্মতির ইংগিত যেন বিন্ধ্যবাসিনীর সহাস মুখে! বললেন,—হাঁ খুব পারি! কথাগুলি কি তাই শুনি?

—শুধোতে পারিস, জাতি উঁচু না মানুষ উঁচু?

রাজকন্যা তৎক্ষণাৎ কক্ষ ত্যাগ ক'রে পার্শ্বকক্ষে গেলেন। অধরে আঁচল চেপে ধ'রে ব'ললেন,—একটি কথা শুধাই, জাতিশ্রেষ্ঠ মানুষ না মনুষ্যশ্রেষ্ঠ জাতি?

কি এক মন্ত্র বলছিলেন চন্দ্রকান্ত। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠ স্পষ্ট শোনা যায় না। সন্ধ্যামন্ত্রের গুঞ্জন থেমে যায় বিন্ধ্যবাসিনীর কথায়!

যাজক ব্রাহ্মণ, কুলগর্ব্ব যে একেবারে নাই, তা নয়। তবুও কেন কে জানে চন্দ্রকান্ত যেন ক্ষণেক বিভ্রান্ত হ'লেন। মুখে যেন কথা ফুটলো না। কথা থামলো যেন জিহ্বাগ্রে।

বিন্ধ্যবাসিনী বললেন,—এ আমার জ্ঞাতব্য নয়। অন্য এক জন আছে এই কাছাকাছি, তারই কথা।

বিচলিত হয়ে উঠলেন যেন চন্দ্রকান্ত। বৈশাখী হাওয়ায় স্খলিত উত্তরীয় যথাস্থানে রাখতে রাখতে বললেন,—রাজা আর বাদশাহদের সুশাসনে দেশের জাত-অভিমান খোয়া গেছে। বহিরাক্রমণে ধর্ম্ম-কর্ম্ম আর গোষ্ঠীশ্রেণীতে ভাঙন ধ'রেছে। জাত নেই আমাদের, তবে মানুষ আছে এ দেশে। সাধু-সন্ন্যাসী আর ধার্ম্মিক বহু আছেন।

—আসল প্রশ্নের উত্তর মিললো না।

রাজকুমারী মৃদু-মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন। মুখে তাঁর আঁচল চাপা। অধর লুকানো।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—মানুষই শ্রেষ্ঠ, জাতি-বিচারে কাজ কি?

উৎকর্ণা আনন্দকুমারী। উত্তর শুনে দুই চক্ষু মুছলো আসমানী ঢাকাই-শাড়ীর আঁচলে। কি কারণে যেন চোখে জলের ধারা নেমেছিল। অশ্রুবন্যা বইছিল। আর চোখের জলের নাকি বাঁধ বাঁধা যায় না। চৌধুরাণী উঠে দাঁড়ালো ধীরে ধীরে। দ্বারের কাছে এগিয়ে দেখলো, তার এক শৈশব-সখাকে।

বেণের মেয়ে আনন্দকুমারী, তবুও যেন লক্ষ্মীস্বরূপিণী।

সাতমহলা বাস্তগৃহ। রাশি-রাশি ঐশ্বর্য্য। শত-শত মাটির জালাভর্ত্তি সোনারূপার দানা। কলসী কলসী মণিরত্ন। অলঙ্কার আর গহনায় সিন্দুক উপচে প'ড়ছে। চৌধুরী মশাইয়ের সদাগরী টাকায় কেনা বিশাল এক রাজত্ব যেন। আনন্দকুমারী বৈ আর কেউ উত্তরাধিকারিণী নেই সেই চাঁদ সদাগরের।

চৌধুরাণী জানে যে, সে-ই হবে একদিন একচ্ছত্র অধিরাজ্ঞী। কত কত দিন আদর-সোহাগের ক্ষণে চৌধুরীমশাই এই কথাই শুনিয়েছেন মেয়েয় কানে কানে। ব'লেছেন,—আনন্দময়ী, আমি একদিন থাকবো না। তোমার স্নেহের মা, তিনিও থাকবেন না। শুধু তুমি থাকবে। একা তখন তুমি, আমরা কেউ নেই। তুমি যাতে কোন' কালে কষ্টভোগ না কর', তাই আমার এই সঞ্চয়। তুমি যাতে সুখে থাকো তাই।

শুনতে শুনতে চৌধুরাণী খুশী হয় না, বরং দুঃখ পায়। চোখের জলের বাঁধ ভেঙে যায় তখন।

চৌধুরীমশাই আরও ব'লেছেন,—ব্যবসাবাণিজ্য পেশা আমার। ব্যবসার খাতিরে প্রচুর মিথ্যা ব'লেছি এ জীবনে। আরও কত ব'লতে হবে জানি না। তুমি যেন কখনও মিথ্যাচারে যেও না, সত্যকে ভুলো না। দেবদ্বিজে ভক্তি অক্ষুণ্ণ রেখো। আমার কুলদেবীরা যেন কখনও উপোসী না থাকেন। আমার সকল কিছু তুমিই রক্ষা করবে।

চৌধুরীদের দেবালয়ে নানাতন্ত্রের দেবীমূর্ত্তি। নিত্যপূজা হয় মহাসমারোহে। অন্নসত্রে পাত পড়ে শ'য়ে শ'য়ে। ভিখারী ভোজন হয় প্রতিদিন।

রক্ষা ক'রতে হবে আনন্দকুমারীকে। রাখতে হবে যা আছে তা। চৌধুরীমশাইয়ের নাম-ডাক যাতে ধুয়ে-মুছে না যায়, তৎপ্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু একা-একা চলতে পারবে না যে আনন্দকুমারী! মানুষের জীবনপথ কত যে দুর্গম তা মানুষই জানে! অন্ধকারে পথ দেখানোর আলো দেখাবে কে আনন্দকুমারীকে?

রাজকুমারীর কাছে গিয়ে কানে কানে কথা বলে চৌধুরাণী। বলে,—শুধাও তো, কথায় মিথ্যা নাই তো? অকপট কি না?

তৃতীয় জনের চুপিসাড়ে কথা চন্দ্রকান্তর কানে যায় হয়তো। বললেন,—মিথ্যা বলা আমার পেশা নয়। আমি বাণিজ্য ক'রে খাই না।

চৌধুরাণী আবার কথা বললে,—শুধাও তো, স্ত্রীপুরুষের মালাবদলে কি হয়? হিন্দুর ঘরের এই রীতির অর্থ কি? মূল্যই বা তার কত?

—মাল্যদান! বললেন চন্দ্রকান্ত। আনন্দকুমারীর উক্তির উত্তরে বললেন,—মাল্যদান আমাদের শাস্ত্রে এক মঙ্গলসূচক বিধি। মাল্যবিনিময়ে পরস্পরের দেহ-মনের বিনিময় হয়। এক অঙ্গের সত্তায় মিশে যায়। প্রজাপতি ঋষির এক অখণ্ড বিধান এই মালা-বদল।

ঘন কালোমেঘে সহসা বিদ্যুতের লহরী খেলে যেন। চৌধুরাণীর স্তম্ভিত মুখখানিতে ক্ষীণ হাস্যরেখা দেখা দেয়। তার হাত যেন চঞ্চল হয় কেন? রুমালের [illegible] শব্দ ভাসে ঘরে। তিন তিনটি প্রদীপের আলোয় রাজকুমারী দেখলেন, আনন্দকুমারীর চক্ষু ভেজা-ভেজা। ওষ্ঠপ্রান্তে তবু হাসির আভাষ। বললেন, চুপি চু পি বললেন,—তবে আর কালবিলম্ব কেন?

চৌধুরাণীর আয়ত চোখে লজ্জার ঝিলিক। সদ্য-তোলা সদ্য-গাঁথা যুঁইয়ের মালা তার কণ্ঠ থেকে কাঁচুলীমধ্যে নেমেছে। ইতস্ততঃ চিন্তায় যেন মনের স্থৈর্য্য হারিয়েছে সে।

—গয়নাগাটি কোথায় গেল আনন্দকুমারী? তোমার এমন বেশ কেন?

কথায় কথায় চৌধুরাণীর দেহগাত্রে নজর পড়ে রাজকুমারীর। বিন্ধ্যবাসিনী খুঁটিয়ে দেখলেন তার আপাদমস্তক। সীমন্তে নেই হীরার তারা। বাহুতে নেই চুড়ি কাঁকন তাবিজ। পায়ে নূপুর নেই। কণ্ঠহার নেই, আছে শুধু এক ছড়া ফুলের মালা। কটিতে মেখলা নেই।

আনন্দকুমারী মৃদু কণ্ঠে বললে,—গয়না খুলে রেখেছি। বলা যায় না, কখন কি বিপদ আসে! রাতের অন্ধকারে যেতে হবে এখন কতটা পথ, ডাকাতের দল যদি লুঠে নেয়! সেই ভয়ে—

বিন্ধ্যবাসিনী যেন মনঃক্ষুণ্ণ হন। বলেন,—নৌকায় তোমার যাতায়াত। লোকবলের অভাব নেই, মাঝিমাল্লা আর দেহরক্ষীরা আছে, তবে আর ভয় কেন?

—হাঁ, তবুও ভয় হয়। এত গয়না, দেখার লোক কৈ? কাকে দেখাবো?

ক্ষোভের সুরে বললে চৌধুরাণী। কেমন যেন ব্যথাতুর কণ্ঠে। দুই ভুরু বাঁকিয়ে। আসমানী ঢাকাই শাড়ীর আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে কথা বলে।

বৈশাখের বাতাসে যেন ঝড়ের ইশারা। দিকহারা দমকা হাওয়া বইছে থেকে থেকে। গাছে গাছে যেন কথা বলাবলি করছে, অস্ফুট শব্দে। মর্ম্মরধ্বনি ভেসে আসছে। প্রদীপের লেলিহান শিখা সর্পাকারে নেচে নেচে উঠছে। ছাদের আলসেয় লক্ষ্মীপেঁচা ডাকছে ঘন ঘন।

দু'জনের কথা-গুঞ্জনে চন্দ্রকান্ত যেন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন হয়ে থাকেন। রাত্রি অন্ধকার, দুর্গম ভয়ঙ্কর পথ। শাণানো অস্ত্র হাতে হাতে, চন্দ্রকিরণে হয়তো চিকচিকিয়ে উঠছে। আত্মগোপনকারী তান্ত্রিক-দল আমোদরের দুই তীরে, ওৎ পেতে ব'সে আছে বৈরীজ্বালায়। পরমত অসিহষ্ণু গুপ্তঘাতকদল হাসাহাসি করছে আঁধারে লুকিয়ে। অশ্লীল মন্তব্য করছে বিধর্ম্মীদের। রক্তের লালসায় যেন বন্য পশুর রূপ ধ'রেছে। আমোদরের এক তীরে শাক্ততান্ত্রিক, অপর তীরে বৌদ্ধতান্ত্রিক। দুই দলের শাণিত অস্ত্র যেন বড় বেশী চঞ্চল আজ। আলোপক্ষের স্বর্ণাভায় ক্ষণে ক্ষণে চকচকে চিকণ তুলছে।

—দাসী গেলেন কোথায়? বহির্গমনের পথটুকু দেখায়ে দিলে আমি যাত্রা ক'রতে পারি। অধিক বিলম্বে ভয়ের আশঙ্কা আছে যথেষ্ট। রাত্রি গভীরতর হওয়ার ভয়ে অবশেষে কথা বললেন চন্দ্রকান্ত।

—আছে, নিকটেই আছে দাসী।

বিন্ধ্যবাসিনী সম্ভ্রমের সুরে বললেন। কথার শেষে আর এক বার দেখলেন চৌধুরাণীকে। দেখলেন তার মুখে যেন হতাশা। চোখের চাউনিতে নির্লিপ্ততা। রুমালে লুকানো অলঙ্কার এক হাতে। লাল রেশমের মধ্য থেকে ঝলমল করছে দীপের তীব্র আলোয়।

—দাসীকে আদেশ দেন। আমি তার অনুগমন করি।

চন্দ্রকান্তর কথায় কর্ণপাত করে না আনন্দকুমারী। ম্লানহাসি হেসে বিন্ধ্যবাসিনীর কানের কাছে মুখ এগিয়ে ফিসফিস বললে,—বিদায় রাজকুমারি! পথে যদি কোন' বিপদ না হয় আবার দেখা হবে। তোমার মঙ্গল হোক।

উত্তরের প্রতীক্ষায় থাকে না চৌধুরাণী। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন ক্ষিপ্রগতিতে কক্ষ ত্যাগ ক'রলো। কস্তুরী আতরের সুগন্ধ রেখে গেল আনন্দকুমারী। যুঁই ফুলের গন্ধে যেন মিশে আছে মৃগনাভির উগ্র গন্ধ।

—দাসী! অ দাসী।

বিন্ধ্যবাসিনী ডাকলেন ঈষৎ উচ্চ স্বরে। সন্ধানী চোখে দেখলেন কক্ষের বাইরে। সাড়া মিললো না। কোথায় গেল যশোদা এই রাতের আঁধারে, রাজকন্যাকে ফেলে? বিন্ধ্যবাসিনীর কেমন যেন ভয়-ভয় করে! অকারণ, তবুও যেন রোমাঞ্চ। গায়ে কাঁটা দেয় যেন।

সাড়া না পেয়ে কক্ষের বাইরে গেলেন রাজকন্যা। পায়ের তলায় ভূমি কাঁপছে যেন। কাল রাত্রি, এ তল্লাটে আর তৃতীয় জন কেউ নেই, পাত্র ও পাত্রী ব'লতে তাঁরা দু'জন। অলীক ভয়ে বিন্ধ্যবাসিনীর কাঁপন লাগে। শঙ্কাজড়িত কণ্ঠ যেন। রাজকুমারী দেখলেন, দালানের এক পাশে যেন এক মৃতের শব। প্রথম দেখেই শিউরে উঠলেন। অনুমানে বোঝেন, দাসী গভীর নিদ্রায় জ্ঞানহারা। রাত্রি ঘন হওয়ায় ঘুম এসেছে যশোদার চোখে। নিদ্রিত আর মৃতে যেন কোন পার্থক্য নেই!

—অ দাসী! এ কি তোমার কালঘুম?

চাপা কণ্ঠস্বর বিন্ধ্যবাসিনীর। দাসীর শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে সামান্য রোষের সঙ্গে বললেন রাজকন্যা।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো পরিচারিকা। প্রথম ঘুমের আমেজ, চোখ মেলে উঠে ব'সতে যেন নিদ্রাজড়তা ভেঙ্গে গেল। ঘুমভাঙা চোখে দেখলো ইতি-উতি। ভয়ে ভয়ে বললে,—বৌ' তুমি কি ভয় পেয়েছো? চুরি-ডাকাতি হয়েছে নাকি? বেণের মেয়ে, আছে না গেছে? পূজারী, তিনিই বা কোথায়? তিনি লোক ভাল না মন্দ?

—চুপ, চুপ। বলতে বলতে দাসীর মুখে হাত চাপলেন বিন্ধ্যবাসিনী। লজ্জায় অধীর হয়ে উঠলেন যেন। বললেন,—তাঁকে এগিয়ে দিয়ে আয় আসমানের ঘাটে। ঐ পথে ফিরবেন হয়তো। তোমার অপেক্ষায় আছেন তিনি। চৌধুরাণী ঘরে ফিরলো। এই গেল সে।

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ালো যশোদা। বললে,—কোথায় পূজারী?

রাজকুমারী বললেন,—ঘরেই আছেন তিনি। আমি দালান ছেড়ে খানিক ছাদে যাই, তুমি তাঁকে বল'। চোখের ঢাকা খুলতে বল'। সঙ্গে নিয়ে যাও।

রাত্রি অত্যন্ত অন্ধকার! আকাশে অল্প অল্প মেঘ জ'মেছে। মেঘে ঢাকা চাঁদের আধখানা। যেদিকে মেঘ নেই, সেদিকের নীল

নভে তারার চুমকি। দপ-দপ জ্বলছে। গাছে গাছে জোনাকির আলো। রাজকুমারী দেখলেন, ছাদে যেন জ্যোৎস্না ছড়িয়েছে। সোনার পাত বিছানো যেন। ক্লান্ত চোখ তুললেন বিন্ধ্যবাসিনী। দেখলেন আধেক চন্দ্রমণ্ডল, দেখলেন মেঘের আড়াল থেকে অর্দ্ধচন্দ্র হাসছে যেন। বৈশাখের হাওয়া চ'লেছে সবেগে। বৃক্ষপত্রের মর্মর শব্দ ভেসে আসছে বাতাসের সঙ্গে। আমোদরের গর্ভে চলমান আলো! নাচতে নাচতে এগিয়ে চলেছে যেন! খেয়াপারের নৌকা চলেছে কয়েকখানি! আনন্দকুমারীর পত্রপুটা যে কোন্‌টি, এখন আর দেখা যায় না, চেনা যায় না। ছাদের এক কিনারায় ব'সলেন বিন্ধ্যবাসিনী। মাথার গুণ্ঠন খুলে ফেললেন। বাতাসের চঞ্চলতায় আলুলায়িত রুক্ষকেশ উড়তে থাকলো। রাজকন্যাকে দেখতে পেয়ে ছাদের আলসে থেকে উড়ে পালালো এক জোড়া লক্ষ্মীপেঁচা। বিন্ধ্যবাসিনী নিরীক্ষণ করেন কি যেন। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। আসমানের তীর ধ'রে কে যায় এমন দ্রুতগতিতে! রাজকন্যা দেখেন, চন্দ্রকান্তর শুভ্র উত্তরীয় উড়ছে বাতাসে। চন্দ্রকান্ত বনপথ ধ'রলেন। গাছের ভীড়ে অদৃশ্য হ'লেন মুহূর্ত্তমধ্যে!

আসমানের জলে মাছ লাফায়। মনে হয়, কে যেন কি এক ভারীবস্তু নিক্ষেপ ক'রলো জলে। কাৎলা মাছ ডিগি মারে হয়তো। লাফ দেয়। আসমানের কাকচক্ষু জল অতি অল্পই আন্দোলিত হয়। বিশাল দীঘিটার যেন শেষ নেই, সেই দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। আকাশের মেঘাবৃত অর্দ্ধচন্দ্রের ছায়া খেলছে দীঘির জলে।

কেমন যেন নির্জীবের মত ব'সে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। দীঘির জলে চোখ রেখে নিশ্চুপ ব'সে থাকেন। দেখতে দেখতে মেঘের আবরণ উন্মোচিত হয়। এক ভাসমান খণ্ডমেঘ, উত্তরাপথে চ'লেছে ধীর গতিতে। পূর্ণাকার চাঁদ আবার দেখা দেয়। কানাভাঙা সোনার থালা যেন। জ্যোৎস্নার আলো আরও জোরালো হয়।

রাজকুমারী উঠলেন। ছাদ ত্যাগ ক'রে চললেন নীরব পায়ে! গৃহের ফটকে একবার চোখ ফেরালেন। দেখলেন, ফটকের এক পাশে এক ভগ্নমূর্ত্তির 'পরে ব'সে আছে পাঠান-প্রহরী। তার লৌহপোষাকে চাঁদের আলো প'ড়েছে। শিরস্ত্রাণে জৌলুস খেলছে!

দাসী বললে দেখা হ'তেই,—বৌ, মুখে জল দাও। দুধমিষ্টি দিই, খাও।

ক্লান্তকণ্ঠ যেন বিন্ধ্যবাসিনীর। শয়নকক্ষে প্রবেশ করতে করতে বললেন,—হাঁ তাই দাও, খাই। তৃষ্ণায় যেন বুক ফেটে যায়!

ক্লান্তি এসেছে, তবুও স্বস্তি পেয়েছেন রাজকন্যা। সুখের চেয়ে স্বস্তি অনেক ভাল। ভিক্ষা চাইতে হবে না আর। পরের দয়ার পাত্রী হয়ে থাকতে হবে না আর। ভরণপোষণের যা হোক একটা উপায় মিলেছে যেন এতদিনে। উপার্জ্জনের পথ খুঁজে পাওয়া গেছে। নকলনবিশীর কাজ করতে পারলে বেশ দশ-বিশ কড়ি আয় হবে! কি এক স্বপ্নের আচ্ছন্নতা যেন বিন্ধ্যবাসিনীর জাগর-চোখে। ঘরের এক কুলঙ্গী থেকে দর্পণ তুলে নিলেন। প্রদীপের আলোয় একবার মুখখানা দেখলেন নিজের। কি দেখলেন কে জানে, দেখা শেষ হ'তে দর্পণ যথাস্থানে রাখলেন। কক্ষসংলগ্ন অলিন্দের ধারে এগোলেন। আমোদর কুলুকুলু শব্দে ব'য়ে চলেছে। নদীর বুকে সচল আলো ক'য়েকটি। আনন্দকুমারীর পত্রপুটা কোন্‌টি কে জানে! বিন্ধ্যবাসিনী গোপনে ইষ্টের কাছে প্রার্থনা জানালেন, চন্দ্রকান্তর গমনপথে যেন কোন' বিঘ্ন না হয়। চৌধুরাণী যেন ভালয় ভালয় ঘরে ফিরে যায়।

আসমানের তীরে ফুলঝরা বনপথ। মহাবৃক্ষবর্গের ছায়াবীথিতে সারি সারি পুষ্পবর্গ। বট, বরুণ, অশ্বত্থ আর শিশু, শাঁই, শিমুলের তলায় তলায় গন্ধফুলের গাছ। ঘাস-বিছানো মাটির 'পরে বৃন্তচ্যুত ফুল আর পাপড়ি। কনকচাঁপার কলি, অশোক আর টগরের ফুলদল। বাসি যুঁই আর বেলা।

দুরন্ত গতিতে চ'লেছিলেন চন্দ্রকান্ত। এই পথে ভয় খুব নেই, বৌদ্ধভক্তদের কেউ এ পথের ছায়া মাড়ায় না। তবে শাক্তজনেরা হয়তো আছে কেউ কেউ। পাহারাদানের কাজ করছে গাছের শিখরে থেকে থেকে। বিধর্ম্মীরা যদি আক্রমণ করে দলে দলে। নদী পেরিয়ে যদি আসে রাতের আঁধারে! প্রতিহিংসা জানাতে আসে যদি, ক্ষুরধার তরোয়ালের ভরসায়! শক্তির উপাসকদের যদি উচ্ছেদ ক'রতে আসে! মন্দির ধ্বংস ক'রতে আসে! প্রতিমার অঙ্গচ্ছেদ করে যদি!

রাতের ফুল ফুটেছে আসমানের তীরে। গাছে গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটেছে। সন্ধ্যা-সমীরণে ফুটে উঠেছে ঝাঁক ঝাঁক কুঁড়ি। আসমানের তীরে তাই সুগন্ধের ছড়াছড়ি। চাঁপার শাখায় শাখায় গন্ধ-মাতাল সাপের বেষ্টন। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় উন্মত্ত সাপে-সাপে জড়াজড়ি লেগেছে, কোমল তৃণশয্যায়।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে পথিকের দ্রুতগতিতে পূর্ণচ্ছেদ প'ড়লো সহসা। সমুখে কি যেন দেখে পাষাণমূর্ত্তির মত স্থির হয়ে গেলেন। অস্ত্র-শস্ত্র তেমন কিছু সঙ্গে নেই, ভয়ার্ত্ত শ্বাস ফেললেন তাই। দৃষ্টি প্রসারিত ক'রলেন, কিন্তু তেমন যেন স্পষ্ট দেখা যায় না। গাছের শাখাভেদী একফালি জ্যোৎস্না কি! যেন এক ঝলক আলো দেখলেন চন্দ্রকান্ত।

চোখের ভুল হয়তো। পীতবস্ত্রধারী এক বৌদ্ধতান্ত্রিক হয়তো। চন্দ্রকান্ত স্থির করলেন, অপঘাতে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা পলায়ন শ্রেয়ঃ। ভাবলেন, পিছু হ'টবেন। যেপথে এসেছিলেন সেই পথ ধ'রে দৌড় দেবেন, মৃত্যুভয়ের আত্মরক্ষায়।

—কস্ত্বং?

পলায়নের পূর্ব্বমুহূর্ত্তে সাহসে বুক বেঁধে গম্ভীরকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রকান্ত। কিন্তু আর যেন দেখা যায় না সেই পীতবস্ত্রধারী বৌদ্ধ-ভিক্ষুকে। সেই শ্রমণকে। চোখে যেন ধাঁধা লাগে। চন্দ্রকান্ত কি ভুল দেখলেন দৃষ্টির বিভ্রমে! মনের আশঙ্কাকে মিথ্যা দেখেছেন হয়তো, তাই আবার বললেন,—কে তুমি? কথা কও। লুকাও কেন?

ছায়ামূর্ত্তি যেন সমুখে। চাঁদের আলোর মত, এক ঝলক জোছনা যেন। আকাশ থেকে নেমে-আসা মুঠো মুঠো চন্দ্রভস্ম, কাঁচা সোনা রঙের।

ছায়া নয়, ছায়ামূর্ত্তিও নয়, কেবল মূর্ত্তি। তার পদপাতের শব্দ উঠলো সহসা। বনপথের শুষ্ক ঝরাপাতা মরমরিয়ে উঠলো। তুলসীর বনের আড়ালে লুকিয়ে প'ড়লো ছুটতে ছুটতে। ঘনকালো কৃষ্ণতুলসীর বন। মূর্ত্তি আর দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবলমাত্র একখানি মুখ নজরে পড়ে। একটি প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম যেন সেই মুখ, নীলসায়রে ফুটে আছে। মৃদু মৃদু হাসছে, চাঁদের হাসির মত। মুখ দেখিয়ে দেহ লুকিয়েছে তুলসীর ঝোপে।

চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—কে তুমি? উত্তর নাই কেন?

কে উত্তর দেয়, সেই চাঁদমুখে হাসি ফুটলো আবার। সেতারের ঝঙ্কার উঠলো যেন সেই হাসিতে।

চন্দ্রকান্ত অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। দৃষ্টির ভ্রম যদি দূর হয়।

আবার চোখ ফেরালেন সেই হাসিমুখে। দেখলেন, আবার সেই মূর্ত্তি, ছুটতে ছুটতে চললো আবার কোথায়, ঘাসফুল দ'লে মাড়িয়ে? ফুলঝরা পথ যেন আবার কথা বললে।

ভয় হয় যেন। মৃত্যু-ভয় নয়, এক ছায়া কুহেলিকা দেখে ত্রাস আসে মনে। আলেয়ার আলো নয়তো, ভাবলেন চন্দ্রকান্ত। ঐ ছুটন্ত আলেয়ার পিছু পিছু তাঁর দৃষ্টি ছুটলো যেন। কোথায় যায় আলেয়া! কোথায় জ্বলে আর কোথায় নেবে!

এক বৈজয়ন্তিকার ছায়াতলে আবার দেখা দেয় সেই এক ঝলক আলো। হলুদ-লাল আগুন যেন মুঠো মুঠো। কাছে নেই আর, অনেক দূরে।

আলেয়ার পিছু পিছু ছুটে যাওয়ার মত অবকাশ আর নেই! রাত্রি গভীরতর এখন। গড়মান্দারণ স্তব্ধ শান্ত।

আমোদরের অন্য তীর থেকে মিহি শব্দ ভেসে আসে তবু। বহুদূর থেকে ভেসে-আসা বাদ্যধ্বনি। বৌদ্ধদের সঙ্ঘারাম থেকে ভেসে আসে। ঢাকের বাজনা বেজে চ'লেছে অবিরাম। ঘণ্টা বেজে চ'লেছে। বুদ্ধমূর্ত্তির পদপ্রান্তে বাতি জ্বালার পর্ব্ব চ'লেছে। মঙ্গলদীপ জ্ব'লে উঠছে একে একে। ভিক্ষু আর শ্রমণরা গাথা গাইছে গানের সুরে। অগুরু ধূপ জ্বালছে সেবাদাসী নটীরা।

গড়-মান্দারণের স্তব্ধতা তবুও ভঙ্গ হয় না। ঘুম ভাঙ্গে না তার। কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যায় মাত্র একটি রাতের জন্য জেগে ওঠে মান্দারণ। শক্তিপূজার সেই গহন কালো নিশীথে।

আসমানের তীর ধ'রে পুনরায় চললেন চন্দ্রকান্ত। আলেয়ার পিছু পিছু যাওয়ার মত অবকাশ নেই, পথের অনেক বাকী এখনও। চতুষ্পাঠীতে যেতে যেতে মধ্য রাত না হয়। চলার গতি দ্রুত হয় আরও। চাঁদের আলোয় পথ চলার কাজ হয়।

খিল-খিল অট্টহাসি ভেসে এলো ঐ বৈজয়ন্তিকার ছায়া থেকে। বাতাসে ভেসে এলো জয়ন্তীর পত্রগন্ধ। বাদ্যযন্ত্র বাজলো যেন। হাসির সুরে যেন সাত তার বাজলো সিতারের।

কপালে কুঞ্চনরেখা অচঞ্চল হয়ে থাকে। সেই মধুঝরা হাসি থামতে চন্দ্রকান্ত আবার বললেন,—এই বনমধ্যে যেই থাকো, আমার যাত্রায় বাধা না দাও, এই মাত্র অনুরোধ।

আবার সেই হাসি। পরিহাসের হাসি যেন। হাসি শেষ হ'তেই মূর্ত্তি কথা বললে,—সর্প দংশনে আমি পীড়িতা। আমাকে রক্ষা করুন।

—দংশনজ্বালায় কৈ মানুষ তো হাসে না! চন্দ্রকান্ত বললেন নাতিউচ্চ কণ্ঠে। বললেন,—কে? কি-ই বা পরিচয়?

—নাম-গোত্র জানাতে চাই না। দংশন জ্বালা, রক্ষা করুন।

চন্দ্রকান্ত শুনলেন এক সুমিষ্ট নারীকণ্ঠের কথা। শুনে যেন বেশ বিস্মিত হ'লেন। বললেন,—ঐ দিকে যে গহন বন। যদি এই চাঁদের আলোয় আসেন, তবে কিছু রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়।

—তথাস্তু।

আলোর ঝলক ধীরে ধীরে চলতে থাকে। যেন নেচে নেচে এগিয়ে আসে। মূর্ত্তি যত নিকটে আসে তত যেন চোখ ঝলসায়। হলুদ-লাল আগুনের আভায় চোখে ধাঁধা লাগে। অন্য দিকে দেখেন চন্দ্রকান্ত। দেখলেন, শূন্য থেকে রাশি রাশি সাদা সাদা চোখ, উঁকিঝুঁকি দেয়। গাছের শাখায় শাখায় বাদুড় ঝুলছে নিম্নমুখী হয়ে। পলকের মধ্যে আবার দেখলেন, সেই আগুন তাঁর অতি নিকটে এসেছে। দেখলেন, সেই ফুটন্ত পদ্মমুখে কি মিষ্টি হাসি!

—কে তুমি? কাদের কুলবালা?

চন্দ্রকান্ত ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলেন ধীর কণ্ঠে।

হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে সেই ছায়ামূর্ত্তি এগিয়ে আসছে। কত কাছে এগিয়ে এসেছে! চাঁদের আলোয় তার নধর নরম শুভ্র বাহু দু'টি স্পষ্ট দেখা যায়। দেখা যায়, সেই হাতে যেন ফুলের মালা!

চন্দ্রকান্ত সহসা দেখলেন, সেই মালা তাঁর কণ্ঠে দিলো কে! বললেন,—তুমি আনন্দকুমারী! এ তুমি কি ক'রলে?

—হাঁ আমি। ঠিকই চিনেছো। আমার যা অভিরুচি তাই ক'রেছি।

চৌধুরাণী লুকিয়ে ছিল আসমানের তীরে, বনবীথিতে। মৃত্যু-ভয়কে উপেক্ষা ক'রে, সর্পাঘাতকে তুচ্ছ ক'রে এই পরম মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল। চৌধুরাণী হেসে হেসে কথা বলে। বলে,—জাত উঁচু নয়, মানুষই উঁচু, এ তোমারই মুখের কথা। খানিক আগেই শুনেছি। রাজকুমারীর কথার উত্তরে তুমিই শোনালে! মালা দেওয়ার অর্থ কি তাও শোনালে।

—হা হতোঽস্মি!

বিভ্রান্তের মত, হতচকিতের মত চন্দ্রকান্ত বললেন। বললেন,—এখন উপায়? আমি কোথায় যাই? আমার কর্ত্তব্য এখন? সমাজে যদি কেউ জানতে পারে? তুমি বণিককন্যা, আর আমি—

উত্তরীয়ের এক প্রান্ত নিজের হাতে ধ'রলো চৌধুরাণী। বললে,—উপায় আমি জানাবো। তুমি এখন আমার সঙ্গে সঙ্গে চল'।

চন্দ্রকান্তর উত্তরীয় চৌধুরাণীর হাতে। বললেন—কোথায় যাবে তুমি?

—আমার পত্রপুটা নৌকা বাঁধা আছে আমোদরের তীরে। আপাততঃ সেখানেই যাবো।

—আমি যে এখন চতুষ্পাঠীতে ফিরবো।

—আমার নৌকা তোমাকে পৌঁছে দেবে। সে জন্য কোন' কথা নেই।

চাঁদের আলোয় চন্দ্রকান্ত দেখলেন আনন্দকুমারীকে, আসমানী ঢাকাই শাড়ীতে অপূর্ব্ব রূপ খুলেছে তার! চোখে চিন্তাকুল দৃষ্টি, তবুও দেখছেন আজ এই রাতের বেলায়।

নদীতীরের বালিয়াড়িতে পাশাপাশি চলতে চলতে আনন্দকুমারী বললে,—কি দেখছো তুমি? এত চিন্তা কিসে?

—তোমাকে দেখছি আমি। তোমার মুখখানি কখনও দেখি নাই এত নিকট থেকে। যার মালা তারই কণ্ঠে শোভা পাক। কথার শেষে সেই মালা খুলে চৌধুরাণীর গলায় দিলেন।

আনন্দকুমারী হাসলো এক ঝলক। মুখখানি তুলে ধ'রলো নিজের। চন্দ্রকান্ত দেখলেন চৌধুরাণীর রাঙা অধর। ক্ষীণমধ্যা আনন্দকুমারীর ডমরুকটি ধরলেন চন্দ্রকান্ত, বাহু-বেষ্টনে তাকে বেঁধে এগিয়ে চললেন।

চৌধুরাণী বললে,—এই আমার গহনাপত্র। ধরো তুমি, আর আমি বইতে পারি না।

চন্দ্রকান্তর হাতে ধরিয়ে দেয় রেশমী রুমালের ঝুলি। আর এক ঝলক হেসে আবার চলতে থাকলো চৌধুরাণী। দেখলো, অদূরে আমোদর। শুক্লপক্ষের চাঁদের আলোয় ঝলমল।

[ক্রমশঃ।

আরব্যোপন্যাসের গল্প

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায়

হুজুরকে এইবার দেখলাম। তরুণ, সুন্দর, সুপুরুষ। চমৎকার! ভাবলাম, তাই তো, ইনি শুধু দুনিয়ার বাদশা নন তো, রূপের বাদশাও বটে! এমন সুপুরুষ কমই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু এ চাঁদে এত বড় কলঙ্ক কেন? দেখলাম—খানা সাজিয়ে চুপ করে তিনি বসে আছেন আমাদেরই প্রতীক্ষায়, আর ঘন ঘন গোঁফে চাড়া দিচ্ছেন। চোখে-মুখে তাঁর কেমন একটা উদাস, স্ফূর্তিহীন ভাব!

মনে হল, আমাদের দেখেও বা... যেন বেশ একটু অবাক হয়েই গেছেন। তাড়াতাড়ি উঠে এসে আদর করে আমাদের আসনে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কিন্তু ভাল লাগল না তাঁর এ সাদর অভ্যর্থনা। ভাবলাম, এ যে গেরস্তের মুরগী পোষা! রাত পোহাতেই জবাই! কি ভয়ানক!

খানা খেতে খেতে বাদশা আমাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। নাম বললাম, কিন্তু আর সব চেপে গেলাম, তাল সামলাতে গিয়ে এ-দিক ও-দিক দু'-একটা গোঁজামিলও অবিশ্যি দিতে হল। কিন্তু দেখলাম, সেদিকে তাঁর তেমন নজর নেই। আমাদের নিয়েই তন্ময়। তাকিয়ে তাকিয়ে শুধু আমাদেরই দেখছেন আর বাঁ হাতে ঘন ঘন গোঁফে তা' দিচ্ছেন। আর তাঁর মেজাজটিও যেন ক্রমে ধাপে ধাপে মধুর ও সরিফ হয়ে উঠছে।

কথাবার্ত্তা একটু জমে আসতেই কিন্তু মনে হল—না এ সুলক্ষণ! যা ভাবছিলাম তা' নয়—কাদামাটি! আর মাটিটাও সরেস। গড়তে জানলে, ভাল পুতুল হবে।

খানাপিনা শেষে গান-বাজনার মজলিস। গান-বাজনা সুরু হল, কিন্তু দেখলাম, বাদশার তাতেও অরুচি—তেমন মন নেই। শুনছেন, কি শুনছেন না—তা-ও ভাল বোঝা যাচ্ছে না। ওদিকে রাত এগিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় প্রশ্ন করে বসলেন তিনি—"হাঁ বেগম, তুমি গাইতে-বাজাতে জান?"

জবাবটা দিলে দিনার।

বললে—"হুজুর, ও সব জানে। আর জানেন? নাচতেও ও পটু। আর, আরো জানেন—ও যা কেচ্ছা বলতে পারে, শুনলে টের পাবেন।"

বাদশা খুসী হয়ে বলে উঠলেন—"আরে! কেচ্ছা শুনতে যে আমিও বড্ড ভালবাসি—কেচ্ছা শুনতে আমারো ভারি সখ। তাই নাকি? যাক্—বাকি রাতটা কাটবে ভাল। আচ্ছা, এখন তবে তা-ই শুনব—এসব থাক্। কিন্তু শয়ন-মঞ্জিলে চল বেগম, রাত হয়েছে, এখানে আর নয়।"

গানের আসর ভেঙে গেল। শয়ন-মঞ্জিলে এসে বাদশা পালঙ্কের ওপর পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন, আর ওর পাশেই আর একটা অল্প-নিচু পালঙ্ক দেখিয়ে বললেন—"ওইখানে তোমরা বসো, শুতে হয় শোও, শুয়ে শুয়ে গল্প বল, আমিও শুয়ে শুয়ে শুনচি। দিনার, ঘুমুবে? তা' ঘুমোও তুমি, তোমার আর কাজ কি?"

দিনারের সঙ্গে আমার একটা গোপন পরামর্শ ছিল। সে বললে—"হুজুর, ঘুম আর আমার আজ আসবে না। ওর মুখে এই সব চমৎকার চমৎকার কেচ্ছা শুনে শুনেই এত দিন কত আনন্দ পেয়েছি, কিন্তু আজ তার শেষ। এই শেষের দিনের শেষ আনন্দের লোভটুকু ছাড়তে পারছি না।"

বাদশা বললেন,—"আপশোস! কিন্তু শুনে আমি খুসীই হলাম দিনার, তোমার মধ্যে 'অন্তর' আছে দেখছি। আহা, দুনিয়ার সব মেয়ে মানুষগুলোই এই রকমের যদি হত!"

আমি বললাম—"সে কি জনাব, মেয়ে মানুষের 'অন্তর' নেই? তাই বলতে চান আপনি?"

বাদশা বললেন—"কই আছে? বরং তার উল্টোটাই তো এত কাল দেখে আসছি—দেখছি আমি। সব বেইমান, সব নিমকহারাম, সব অপদার্থ!"

দেখলাম, লড়াইটা আচম্বিতেই এসে গেছে। বললাম—"জনাব, গোস্তাকি মাফ হয়, একটা প্রশ্ন করতে পারি?"

বাদশা বললেন—"হাঁ, হাঁ, আলবৎ। নির্ভয়েই বল। আচ্ছা কি তোমার প্রশ্নটা শুনি?"

বললাম আমি—"হুজুরের অভিজ্ঞতা তুচ্ছ করিনে। আর ওটা যে খুবই মান্য তা-ও জানি। কিন্তু জনাব, দুনিয়ায় কত লাখো-লাখো কোটি-কোটি মেয়ে মানুষ রয়েছে, তা ওদের সবাই কি ঐ—নিমকহারাম, বেইমান, অপদার্থ? আমি অনেক দেশের অনেক জাতির ইতিহাস পড়েছি, মিশর, গ্রীস, ইটালী, চীন, ভারতবর্ষ, বোগদাদ আর এদেশটিরও কত কত বিখ্যাত রমণীর কাহিনীও জানা আছে আমার—ইতিহাস আর গল্পের ভিতর দিয়ে। এদেশেরই নিকটবর্ত্তী ববিলনের এক নারী—রাণী সমেরসিস্ এক দিন নাকি সারা দুনিয়া কাঁপিয়ে তুলেছিলেন নিজের বুদ্ধির বলে আর দোর্দণ্ড-প্রতাপে। বলতে হবে কি তাঁরাও ছিলেন ঐ? অপদার্থ? নিমকহারাম?"

দেখলাম, কথাগুলো শুনে হুজুর যেন 'থ' হয়ে গেলেন। শুয়ে পড়েছিলেন, হঠাৎ মাথা তুলে আর বুক অবধি ঘাড়টা উঁচু করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে বললেন—"বেগম, তুমি এত জানো? কোথায় শিখলে এত সব কথা! মেয়ে মানুষের মুখে এমন-ধারা কথা আর আমি শুনিনি! আশ্চর্য্য তো! এ যে আজ আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা হল!"

বললাম—"জনাব, ভেবে দেখুন। আজ তক এই লাখো-লাখো কোটি-কোটি মেয়ে মানুষদের ক'জনার সঙ্গে হুজুরের সংযোগ ঘটেছে! হয়ত ওদের মধ্যে এ তুচ্ছ বাঁদীর মতো কত কত আছে, কে বলবে?"

হুজুর বললেন—"কিন্তু নমুনা দিয়েই সব কথার আঁচ করে নিতে হয়। সারা দুনিয়া ঘুরে ঘুরে সব কিছু জেনে শুনে কে আর কবে কার কর্ত্তব্য স্থির করতে পেরেছে? আচ্ছা, তাই কি-না বল?"

একটু হেসে ফেলে বললাম—"কিন্তু জানেন জনাব, ও-পথে কখনো কখনো ঠকতেও হয় বেশ। আচ্ছা, তাই যদি, শুধু মেয়েদের বেলায়ই এত কঠোরতা কেন? পুরুষদের বেলায় কি হচ্ছে? ওদের ভিতরেও চের তো চোর-ডাকাত রয়েছে, খুনে-বদমাস আছে, ঠক-জোচ্চোর আছে।

কোটাল সাহেব হামেশা তাদের হুজুর-দরবারে এনে হাজির করিয়ে দিচ্ছেন, আর হুজুরও হামেশা তাদের দেখছেন! কিন্তু কই, গোটা পুরুষ জাতিটাকে তাই দেখেই বিচার করা হয় না তো? বলুন জনাব, এ-দুর্ভাগ্য, এ উল্টো হিসেব—শুধু কি নারীজাতটার জন্যেই?"

দেখলাম, কথার প্যাঁচে হুজুর বেশ একটু কাবু হয়েই পড়েছেন, জবাব দেন না। চুপ করে কিছু কাল কি ভেবে নিয়ে তার পর বললেন—"হাঁ, কথাগুলো তোমার খেলো নয়, ভেবে দেখবার মতো বটে, আচ্ছা আমি ভেবে দেখব বেগম!" তার পর আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন—"আর ছাখো, এ-ও আজ আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা। বিষয়টাকে এমন করে আজ পর্য্যন্ত কেউ আমার সামনে ধরে দেয়নি। আমি খুসীই হয়েছি বেগম, ভয় পেয়ো না তুমি। আচ্ছা, এবার তবে কেচ্ছা সুরু হোক্, রাত হল।"

খুসী আমিও হয়েছিলাম। আমারো একটা নতুন অভিজ্ঞতা জন্মাল সে দিন। দেখলাম, এত কাল মানুষটিকে যা ভেবে এসেছিলাম, ঠিক তা নয়। লোকটির বিবেচনা আছে, শিষ্টতা আছে, অসহিষ্ণুতা নেই, অন্ধ গোঁড়ামি নেই। শুনবার মতো কথা কান পেতেই শোনেন, আর তার ওপর বিচার বিবেচনা করবার গরজও আছে তাঁর। বললাম—"হুজুরের আদেশ শিরোধার্য্য। জনাব, ভাল-মন্দেই মানুষ—কি স্ত্রীজাতি, কি পুরুষ!—আশা করি, এ বাঁদীর কেচ্ছাতে তারও যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে। কেচ্ছার ঘটনাগুলি অলীক কিন্তু সমাজের ছবি, মানুষের মনের ও দুনিয়ার হালচালের ছাপ ফুটে উঠে তাতে বিস্তর। আফশোষ!—সব কিছু হুজুরকে উজাড় করে শোনাব—সে-অবকাশ—সে নসীব—এ বাঁদীর নেই যে!"

এর পর সুরু হল আরব্যোপন্যাসের গল্প—অদ্ভুত নারী-পুরুষের লড়াই! অদ্ভুত বই কি? কিন্তু দেখুন, আজ তক এ মূল সত্যটাই রয়ে গেছে আড়ালে! আপনারা বড় একটা ওর খবরই রাখেন না, কিন্তু কেন বলুন তো? মনে করেন, মরণ শিয়রে রেখেও সেদিন যে আমায় গতর ঠেলে ওই গল্পের আসর জমাতে হয়েছিল—সে শুধু ওই বাদশার হুকুমে আর নিজের প্রাণের দায়ে। ঐখানেই আপনাদের ভুল! প্রাণের দায়ে গতর ঠেলা যায়, কিন্তু বুদ্ধি, বিচার, কথার গাঁথুনি আর হাসি-কৌতুক চটুলতা দিয়ে শ্রোতাকে মসগুল করে রাখবার শক্তি—এগুলোকেও ঠেলে তোলা যায় না কি? কিন্তু সেদিনে এগুলোই যে হয়েছিল আমার পাথেয় আর সম্বল। কি করে হয়েছিল? নিজের প্রাণভয়ে নয়, একটা আরো অনেক উঁচু, অনেক ইমানদার ভাবের তাড়নায়—মুক্তি কামনায় আমার দেশের অগণিত আতঙ্কিত মা-বোনদের। এ ভাবটিই সেদিন জুগিয়েছিল আমার সমস্ত দেহে মনে সে অবাক করা শক্তি, মাতিয়ে তুলেছিল অদম্য এক লড়ায়ের নেশায় আমার আপাদ-মস্তক। ভুলে গিয়েছিলাম সেদিন নিজেকে, নিজের মরণ-ভয়কে। রসের বন্যা, কৌতুক, হাসি, রঙ্গ—উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল গল্পের কথায় কথায়, পংক্তিতে পংক্তিতে, ছন্দে আর সুরে।

সেদিন আমার কেচ্ছা শুনে শ্রোতারা শুধু অবাক হন নি, অবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি নিজেও। ভাবছিলাম, এ শক্তি কে আমায় দিলে! আমার অন্তরই আমায় বলে দিলে—আর কে? খোদা নিজে। তিনি যে সংকাজের বন্ধু! আর্ত্তের শরণ!

আজ বলতে বাধে না, সেদিন ইচ্ছে করেই গল্পটাকে টেনে-টুনে আমি যথেষ্ট বড় করে গিয়েছিলাম। রাতটা কেটে যাক্, কিন্তু গল্প আমার শেষ না হয়—এই ছিল আমার মতলব। আর এ মতলবটা হাসিল করতে আপনাদের সাহিত্যিকদের মতো আমাকেও সেদিন তাতে বেশ একটু কলাবিদ্যারও পরিচয় দিতে হয়েছিল, আর ওস্তাদ সেনাপতির মত ব্যূহ রচনার অব্যর্থ একটু কৌশলেরও। এদিক-ওদিক ছড়ানো ছোট-বড় কত টুকরো টুকরো গল্পকেই না সেদিন আমি অমন করেই এক সুতোয় গেঁথেছিলাম! আর তাতেই গড়ে ওঠে আপনাদের এ আরব্যোপন্যাসের বর্ত্তমান কাঠামো। কিন্তু যাক্ ও-কথা, শুনুন তার পর।

গল্প এগিয়ে চলেছে অবিরাম গতিতে, সময় কেটে যাচ্ছে অলক্ষ্যে, বাদশা তন্ময়, চোখ বুজে কান খাড়া করে শুনছেন, আর মাঝে মাঝে ভাবের আবেগে চেঁচিয়ে বলে উঠছেন—'সাবাস্', 'আচ্ছা', 'ঠিক-ঠিক', 'আরে গেল', 'আফশোষ!' 'আফশোষ'—এই রকম কত কি; এমন সময়েই কানে ভেসে এল নিকটবর্ত্তী কোন্ এক মসজিদের চূড়া হতে অলঙ্ঘ্য আজানের ডাক! আর সঙ্গে সঙ্গে রাজপুরীর চারপাশের বড় বড় ফটকগুলোর ওপর হতে টিকাড়া আর নহবতের ঘুম-ভাঙ্গানো জাগরণী-সঙ্গীত!

বাদশা হুট্ করে পালঙ্কের ওপর বসে পড়ে বললেন—"তাই তো, ভোর হয়ে গেল না কি?"

দিনারের হাত ধরে উঠে দাঁড়িয়ে, এক পাশে সরে গিয়ে সসম্ভ্রমে বললাম—"হাঁ জনাব, তাই তো মনে হচ্ছে, আজানের ডাক এসেছে যে!"

বাদশা একটু দুঃখের সুরেই বললেন—"খোদার মরজি! কেচ্ছাটা শেষ অবধি আর শোনা হল না।" আর তার পরই নিচে নেমে এসে বললেন, "যাক্‌গে, সে কথা এখন থাক্, খোদার নমাজ সবার ওপর। বেগম এবার মসজিদে যাবো চল। আর দিনার, তুমিও যাবে এস।"

বাদশাহের খাস মসজিদ। মসজিদে এসে বাদশা নমাজ পড়তে বসে গেলেন। আর তাঁরই একটু পিছনে আমরাও বসে গেলাম, আর আমাদেরও পিছনে আরো একটু তফাতে বসে গেল—বাঁদী আর খোজাদের দল সার সার।

এতক্ষণ লড়াইয়ের নেশায় মেতেছিলাম—সব ভুলে ছিলাম, কিন্তু এইবার বুকের ভিতরটা ভারি ঢিব-ঢিব করে উঠল। মনের ভিতরটায় কি যে হতে লাগল, বর্ণনার অতীত। আকুল হয়ে খোদাকে কেবলি ডাকছি, আর বলছি—খোদা, এবার তুমি জান, এ দুনিয়ার খেলা আমার খতম হয়ে আসছে। এ ভঙ্গুর দেহে যেটুকু শক্তি, আর যতটুকু বুদ্ধি দোয়া করে তুমি আমায় দিয়েছিলে, যথাসাধ্য তাদের ব্যবহার করেছি, কিন্তু এখন যে ফতুর। এবার তুমি মাত্র ভরসা।

দেখলাম, বাদশাও খুব তন্ময় হয়েই নমাজ পড়ছেন, নমাজ পড়া আর তাঁর শেষ হয় না! এটাও কিন্তু আমার একটা নতুন অভিজ্ঞতা! খোদার ওপর তাঁর এত টান, এত নির্ভর? অথচ বাইরের মানুষ কতই না তাঁকে ভীষণ আর নিষ্ঠুর বলে জানছে!

নমাজ শেষে বাদশা বেরিয়ে এসে বললেন,—"বেগম, এবার আমি দরবারে যাব, এ দিনের বেলাটা আর দেখা হবে না, কিন্তু রাত্তিরে আবার দেখা হবে। বাকি কেচ্ছাটা তখন কিন্তু আমায় শোনাতে হবে।"

তার পর যেতে যেতে আবার বললেন—"কাল সারা রাত জেগেছ, এবার একটু ঘুমিয়ে নাওগে যাও। কি? কিছু বলবার আছে তোমার বেগম?"

জবাবে বললাম—"জনাব, এ বাঁদীকে 'বেগম' বলে আজ আর মিছে পরিহাস কেন? আজ তো আর আমি বেগম নই, কিন্তু কোথায় আমি তা' জানতে পারি কি?"

দেখলাম, হুজুরের সারা মুখখানি একটা কৌতুকের হাসিতে চঞ্চল আর মুখর হয়ে উঠেছে। বললেন—"ওঃ! এই কথা? কিন্তু আজ আর তুমি বেগম নও—এ মিছে পরিহাসটাই বা তোমাকে নিয়ে আজ কে করলে? যাও, বেলা বেড়ে যাচ্ছে যে, দরবারের সময় হল, আমি চললুম।"

বাদশা চলে গেলেন, কিন্তু আমি দাঁড়িয়ে রইলাম ওইখানেই নিকটে। আরো অনেক কাল—হতবাক্ আর হতবুদ্ধি হয়ে!

বাদশা স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি, কিন্তু যেটুকু বললেন সেটুকুও কম আশ্চর্য নয় ত? বুঝলাম, অন্ততঃ সেদিনের মত বেঁচে গেছি আমি, আর বেগমগিরিটাও আমার ততক্ষণে কায়েম হয়েই আছে। এতখানি প্রত্যাশাই বা সে-দিনে কে করেছিল? কি করে এটা সম্ভব হল? ভাবলাম, এ-ও ঐ খোদার মরজি! খোদার ওপর, নিজের ওপর আমার বিশ্বাস আবার ফিরে এল। দেহে-প্রাণে আবার যেন আমি নতুন বল ফিরে পেলাম।

এর পর রঙমহালের বাঁদীরা দলবদ্ধ হয়ে ছুটে এসে আরো যে সব কথা বললে আর শোনালে, মনটা তাতে আরো একটু চাঙা হয়েই উঠল। দিনার বললে—"দিদি, বাদশা টোপ গিলেছেন, আর ভয় নেই। মানুষটা মন্দ নয়, কিন্তু মুখোস পরে লোককে এমনধারা ভয় দেখান কেন? আর নিজের ওপরেই বা অমন করে অযথা এমন সব অপবাদ টেনে আনছেন—এটাই বা তাঁর কোন্ খেয়াল?"

দিনারকে জবাব দিলাম—"রাজ-রাজড়ার খেয়াল—কে জানে বহিন! কার পেছনে কি মতলব আছে—কে বলবে? যাক্—ছেড়ে দে ও-কথা—ও বিচার আমাদের নয়।"

এক-পাল বাঁদী ছুটে এসে বললে—"হুজুর বেগম সাহেবা, আমরা হাজির। অনেক কাল দিনের আলোতে বেগমের মুখ দেখতে পাইনি, আর্জ পেলাম—কি ভাগ্যি! নিরানন্দ পুরীতে আজ আবার আনন্দ জেগে উঠেছে, আবার আমরা নতুন জীবন ফিরে পেয়েছি আজ। হুকুম ফরমাইয়ে।"

বললাম—"হুকুম আর কি? আচ্ছা, কাল রাতে মহলগুলো তো ভাল করে দেখতে পাইনি, এখন তবে তাই আমাদের দেখাবে চল।"

বাঁদীরা খুসী হয়ে উঠল! বললে—"হাঁ হাঁ, তাই চলুন—তাই চলুন, হুজুর বেগম সাহেবা!"

তখন চললাম রাজপুরী দেখতে। পারস্য-সম্রাটের হারেম! মনে হল, বেগম-মহল নয়ত, যেন স্বপ্নপুরী! কত ঘরের পর ঘর, কামরার পর কামরা, অলিন্দের পর অলিন্দ চার পাশে। আশে-পাশে সার সার কত ফুলের কেয়ারী, লতাকুঞ্জ, ফোয়ারা, হামাম, বুরুজ, চিড়িয়াখানা—আরো কত কি সব! ঘরগুলোর আসবাব-পত্তরের দিকে চাইলেও তাক লেগে যায়। এই রকম একটা সাজানো ঘরের সামনে এসেই বাঁদীরা বললে—"জানেন এটা কি বেগম সাহেবা? এটা হল 'হাওয়া মহল'!—আরাম করবার জায়গা। নেবেন একটু আরাম করে এ জায়গাটাতে? বেগমদের রাত জাগতে হয়, তাই পরের দিন আসতে হয় তাঁদের ছুটে এখানেই—ঘুম আর আরামের সন্ধানে। নেবেন একটু আরাম করে?"

বললাম—"তা বেশ! এ কথা মন্দ নয়, ঘুম একটু পাচ্ছে বটে।"

কিন্তু সর্দার বাঁদী বললে—"না না, ঘুম এখন নয়, ঘুমুবেন হুজুর সাহেবা আর একটু পরে—গোছল আর খানাপিনা—এ দু'টো সেরে নিয়ে। এখন গোছলখানায় যেতে হবে যে। খানা তৈরী। তা' বিশ্রাম একটু করে নিতে হয় এ ফাঁকে, তা নিন না।"

তাই হল। বাঁদীরা তখন আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকে একখানা রত্নপালঙ্কের ওপর বসিয়ে দিলে, তার পর কেউ আমাদের হাওয়া করতে লাগল আর কেউ চামর দোলাতে লেগে গেল।

কতক্ষণ এ ভাবেই কাটল। দেখলাম—সত্যই জায়গাটা ভারি আরামের! দেখতে দেখতে ক্লান্তি ছুটে গেছে, শরীর মন দুই-ই তাজা হয়ে উঠেছে। বললাম—"হাঁ, হয়েছে—এইবার চল, গোছল আর খানাপিনাটা আগে তো সেরে নি। তারপর আবার এখানে আসব।"

যেতে যেতে আরো দেখলাম,—পুরীটা সত্যই আজ আনন্দে মেতে উঠেছে! বাঁদীরা দল বেঁধে কোথাও ছুটোছুটি করে 'কানামাছি' খেলছে, কোথাও ফুলের মালা গাঁথছে, কোথাও বা সঙ্গীতের মহড়া দিচ্ছে। রংমহলের ভোজশালায় সে এক এলাহী কাণ্ড! কালিয়া, কোরমা, কোপ্তা, পোলাও-এর খোসবোতে চার দিক সরগরম। ঘুরে ঘুরে সবাই বার বার সেখানে আসছে, আর পেয়ালার পর পেয়ালা ভরতি আঙুররস গলাধঃকরণ করে দিল-দেমাক চাঙ্গা করে নিচ্ছে। গোছলখানায় রঙবেরঙের ফোয়ারা! তা' থেকে সুগন্ধি জলের রূপালী উৎস বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চার দিকে ফুলঝুরির মতো।

গোছলখানা থেকে গোছল সেরে বেরিয়েছি। সর্দার পরিচারিকা হঠাৎ এসে আমাদের দু'বোনের সামনে দু'প্রস্থ বহুমূল্য রেশমের পরিচ্ছদ, আর একটা বড় রকমের কৌটা-ভরতি চোখ-ঝলসানো জড়োয়া অলঙ্কার রেখে দিয়ে বললে—"এই নিন, খোদ হুজুরের দেওয়া যৌতুক। হুজুর নিজে এগুলো পাঠিয়ে দিলেন, এবার পরতে হবে এগুলো বেগম সাহেবাকে; আর"—দিনারকে লক্ষ্য করে বললে—"তোমাকেও ভাই বহিন!"

প্রস্তাবটা এমন কিছু অদ্ভুত নয়, আর বেজায়ও নয়—বেগম-মহলে বেগমের মতোই আমাদের থাকতে হবে বই কি? কিন্তু বাঁদীর ওই 'খোদ হুজুরের দেওয়া যৌতুক'—কথাটায় কেমন একটু খটকা লেগে গেল! কোথায় যেন কি একটু গোপন বিশেষ ইঙ্গিত আছে ওতে। আর দিনারের মুখের দিকেও চেয়ে দেখলাম তার চোখ দু'টিতেও কেমন একটু মধুর কৌতুকে ভরা হাসি! মনে হল, ইঙ্গিতে বলছে—'কেমন, বলেছিলাম কি না'? সত্যি কি তবে তাই? কিন্তু মনকে হুঁসিয়ার করে দিয়ে বললাম—"ধীরে মনুয়া, ধীরে, অত আকাশ-কুসুম দেখো না, অত দুরাশা ভাল নয়। এখনি হয়েছে কি?"

বাঁদী তাড়া লাগিয়ে বললে—"আচ্ছা, আসুন ওঘরে। পোষাক বদলে নেবেন, তারপর চুল আঁচড়ে আবার বেণী বেঁধে দেব আমি আর গয়নাগুলোও আমিই পরিয়ে দেব"।

বাঁদীটাকে আমার খুব ভালই লাগল—পেয়ার করবার মতো! একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, দেখলাম, ঘরে আর তখন অন্য বাঁদী-দাসী কেউ নেই। ভাব জমিয়ে ফেললাম তার সঙ্গে, পাঁচ-রকম কথাবার্তায় তার কাজের ফাঁকে ফাঁকে। তারপর সে যখন তার হাতের কাজ সেরে একটা কুর্নিস জানিয়ে বললে—"বেগম সাহেবা, এবার একটু উঠুন দেখি, ওই বড় আরসিটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে দেখুন তো, ঠিক হল কি না," হেসে বললাম—"থাক্, ও আর দেখতে হবে না। এত যে সাজিয়ে পরিয়ে দিলে ভাই, আচ্ছা বলতো এসবের শেষ-গতিটা কি?"

বাঁদী বললে—"কেন বেগম সাহেবা?"

বললাম—"বুঝতে পারছ না? ওই তো এক রাত্তিরের বেগম। তার পর"?

বাঁদী একটু চুপ করে থেকে বললে—"দেখুন বেগম সাহেবা, খোদার মনের কথা কে বলবে? কিন্তু আমার মন বলছে কি জানেন? ও ফাঁড়াটা কেটে গেছে। হাঁ, নিশ্চয়ই গেছে দেখুন না, এমনতর তো আর হয়নি। শুধু হুজুর বেগম সাহেবার বেলাই হল। আর ধরুন, যদি সেদিন আসেই—"

বলতে বলতে বাঁদী থেমে গেল। বললাম—"থামলে কেন, বল না।"

বাঁদী বললে—"না না, যেতে দিন ও-কথা। যা হবার নয়—"

বললাম—"তবু?"

বিপাকে পড়ে বাঁদী তখন একটা বড় কথা ফাঁস করে দিলে, যা আমি চাইছিলাম। বললে—"তবে শুনুন বেগম সাহেবা! কিন্তু কথাটা কর্ণান্তর না হয়। ও নিয়ে-আলোচনা করতে মানা আছে আমাদের। বেগম এখানে এর ভিতর অনেক এসেছেন আর আবার তাঁরা বরবাদ হয়েও গেছেন ঠিক, কিন্তু ওই পর্য্যন্ত। বাদশাহুজুর কোন কিছু তাঁদের কেড়ে-কুড়ে নিয়েছেন বা কোন রকমে আর তাঁদের কোন দুর্দ্দশা করেছেন—কেউ বলতে পারবে না। বরং যাবার বেলায় সঙ্গে তাঁদের আরো অনেক কিছু দিয়ে-থুয়েই দিয়েছেন—যাতে আখেরে না তাঁদের খাওয়া-পরার বা অপর কোন কষ্ট হয়,—জালা-ভরতি আসরফি, বাঁদীবান্দা, সৈনিক প্রহরী, উট ঘোড়া, আর যে যে দেশে পাঠাচ্ছেন তাদের রাজাদের বরাবরে জোর সুপারিশ চিঠি—এ রকম কত কি। হুজুর বেগম সাহেবা, এখন বুঝলেন ব্যাপারটা? হুজুর মালিক আমাদের মোটেই নিষ্ঠুর নন, আর যাকে বলে 'কঞ্জুস' তা-ও নন।"

বাঁদীর কথা শুনে আসমান থেকে পড়লাম। এত দিন কত কি-ই না ভেবেছি, কিন্তু এমন হতে পারে সকল কল্পনার অতীত। পিতাজীর কথা মনে পড়ল। ওঃ! তাই তিনি এত উদার হয়েছিলেন—কাল পাঠাতে পেরেছিলেন তাঁর চোখের দু'টো মণিকে প্রাণ ধরে এ পুরীতে এখানে। জানতেন তিনি সব—বাদশার প্রধান উজীর, এ রহস্য তাঁর জানাই ছিল। ওঃ, তাই! এমন বাদশা আমাদের!

আজও আমার একথাটি ভেবে ভারি দুঃখ হচ্ছে। এমন যে মানুষ, কি তাঁর নসীব! সেদিনে দেশের মানুষ তাঁকে ভুল বুঝলে, আর এদিনে আপনারাও তাঁকে ভুল বুঝছেন, কাদা ছড়িয়ে একটা সহজ সুন্দর মানুষকে গড়ে তুলছেন কিম্ভুত কিমাকার।

যাক্ এবার আসল কথায় আসুন। সেদিন দিনের বেলাটা এমনি করে করে—খেয়ে-দেয়ে ঘুমিয়ে, বাঁদীদের সঙ্গে গল্পগুজব করে আর তাঁদের সেবাযত্ন পেয়ে তো কেটে গেল, তার পর রাত এসে আমার দেখা দিলে। আবার চার দিকে রঙ-বেরঙের আলোর রোসনাই, ধূপদীপের প্রাণমাতানো গন্ধ, বাদ্যযন্ত্রের টুং-টাং!

রঙমহলের আবহাওয়াটা দেখতে না দেখতে পাল্টে গেছে। আর সে হৈ-হুল্লোড় নেই। বাঁদীরা, খোজারা সাজ-পোষাক প'রে যার যার জায়গায় হাজির। সর্দ্দার বাঁদী হঠাৎ কোথা হতে ছুটে এসে চুপি চুপি আমাদের বললে—"হুজুর গোছলখানায় ঢুকেছেন, শীগগির তৈরী হয়ে নিন, খাবার ডাক এলো বলে!"

আমি বললাম—"আমরা তৈরী।"

খানিকক্ষণ সে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলে, তার পর যেমনি ছুটে এসেছিল তেমনি ছুটে গিয়ে কোথা থেকে ক'ছড়া সুগন্ধি ফুলের মালা নিয়ে এসে আমাদের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললে—"বেগম সাহেবার জয়-জয়কার হোক, খোদা মঙ্গল করুন।"

বললাম—"বহিন, কালে কোথায় থাকব, কোথায় যাব জানিনে, কিন্তু তোমায় ভুলব না।"

বাঁদী আর দাঁড়ালে না, আবার ছুটে চলে গেল, মনে হল—পালালো। বুঝলাম, বাঁদী হলে হবে কি, অন্তরটা তার সোনা দিয়ে মোড়া।

একটু পরেই খানার ডাক এল। আদর-যত্নের আজো ত্রুটি নেই, কিন্তু দেখলাম—বাদশা যেন আজ কেমন একটু আনমনা আর চঞ্চল। খানা খেতে খেতে বললেন—"আজ আর গান-বাজনা হবে না। না, আজ শুধু নিরিবিলিতে শুয়ে শুয়ে আরাম করব, আর তোমার কেচ্ছা শুনব বেগম! মাথাটা গরম হয়ে আছে।"

ব্যাপার কি? বাঁদীরা জোরে জোরে হাওয়া চালাতে লাগল, দেখে বাদশা একটু মুচকি হেসে বললেন—"ও দাওয়াই এ রোগের নয়। তাপটা আমার শরীরে নয়, মেজাজে।" তার পর আমার দিকে চেয়ে বললেন—"মানুষ মনে করে, বাদশা না জানি বড় সুখী! বসত একবার এসে তারা এ গদীটার ওপর, টের পেত মজাটা। ওই কমবখত উজীরটা আজ আমার মাথা বিগড়ে দিয়েছে।"

চমকে উঠলাম। অলক্ষ্যেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"অ্যাঁ, উজীর! কেন বলুন তো?"

বাদশা বললেন—"কেন আবার কি, আজ উনি যে আছেন আমার তক্তাটি উল্টে দেবার ফিকিরে। বলেন, নকরি আর তিনি করবেন না। কেন? না, বুড়ো হয়েছেন, না-লায়েক হয়ে গেছেন—কোটাল খুঁজে পাচ্ছেন না। তা, কোটাল খুঁজে পাচ্ছেন না কেন? না, বেগম খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বললাম—চুলোয় যাক তোমার বেগম আর কোটাল! তোমার তাতে কি? জবাব হল—না, বড্ড না-লায়েক হয়েই পড়েছি, বুড়ো হয়েছি, এবার ফকিরী নেবো!" বুড়োর এ কি পাগলামো বল দেখি,? তা উনি পাগলই হোন, আর যাই হোন, আমার মাথাটা কিন্তু সত্যি গরম হয়ে উঠেছে। এত বড় রাজ্যটা, চালায় কে? সোজা কথা? লোক কই তেমন?"

বুঝলাম ব্যাপারটা। আর এ-ও বুঝলাম, পিতা-পুত্রীর দুটো নসীবই আজ এক সুতোয় গাঁথা। নসীবের ফেরে কাল আমায় দেশান্তরী হতে হবে হয়ত, তাঁকেও হয়ত ফকিরী নিয়ে তাই হতে হবে—আটকাতে পারবে না কেউ। আর তা

না হয়তো, বজায় রইল দুই-ই—আমার বেগমগিরি আর তাঁরও উজীরী।

বললাম—"তা শেষতক্ প্রশ্নটার কি মীমাংসা হল জনাব?"

বাদশা বললেন—"কিছু না। এক কথায় রাজ্যটাকে ভাসিয়ে দেব আমি!—পারি তা করতে?" তারপর আবার বললেন—"যাক্, ওকথা আর নয়। খানা শেষ হল, এবার কেচ্ছা শোনাবে চল বেগম। হাঁ, ওই ভাল। আমার কি মনে হয় জান বেগম! যদি আর সব ঝামেলা আর কারুর ওপর চাপিয়ে দিয়ে এমনি ধারা কেচ্ছা শুনতে শুনতেই দিন-রাতগুলো কাটিয়ে দিতে পারতুম, বেশ হত। কিন্তু কম্বলি ছাড়ে না যে!"

যাক্, সে-রাত্তিরে আবার গল্পের আসর জমল। আবার সেই রকমেরই সব। বাদশার—'তারপর কি—তারপর কি'—এই ভাব। তারপর বহু রাত্তিরে কেচ্ছা শেষ করে যখন শুধালাম—"কেমন লাগল জনাব?"—বাদশা তারিফ করে বলে উঠলেন—"তোফা-তোফা! চমৎকার!" কিন্তু এমন সময়েই দিনার টিপ্পনি কেটে বলে উঠলো—"কিন্তু আর একটা যা শুনেছি, তার কাছে এ নয়।"

এটাও আমাদের একটা গোপন শলা-পরামর্শের জের।

বাদশা অবাক হয়ে বললেন—"বলো কি? এর চেয়েও ভাল কেচ্ছা জান তুমি বেগম?"

দিনার বললে—"কত!"

আমি বললাম—"কি জানেন হুজুর, পসারীকে পুঁজি রাখতে হয়। খদ্দের আরো ভাল সওদা চাইলে তখন দেব কি?"

বাদশা বললেন—"তা তোমার সে ভাল সওদাটা এবার খুলতে হবে—খদ্দের মজুত। তা-ও আমি শুনবো।"

খুসী হয়ে বললাম—"এ তো বাঁদীর বহুত বহুত ভাগ্য। কিন্তু জনাব—"

বাদশা বললেন—"কি, বল তো?"

বললাম—"না, ভাবছিলাম কি, নতুন বেগম আসবার বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে যে!"

বাদশা পালঙ্কের এক ধারে সজোরে একটা চপেটাঘাত করে বললেন—"চুলোয় যাক্ নতুন বেগম! খবদ্দার! ওকথা আর নয়। আচ্ছা, আজ রাত হয়েছে, একটু ঘুমিয়ে নিলে হয়, আজ না-হয় থাক্, কাল আবার বলবে। দ্যাখো, ওই কেচ্ছা শুনতে শুনতেই মাথাটা আমার কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। মাথা ঠাণ্ডার ওটা চমৎকার দাওয়াই! হাঁ, আর আমার ভাবনা নেই!"

দেখতে দেখতে আবার রাত ভোর! ভোরের পাখী ডেকে উঠেছে, আবার মসজিদের চূড়া হতে আজানের ডাক নমাজের তাড়া নিয়ে এসেছে।

সেদিন নমাজ শেষে বাদশাকে বললাম—"হুজুর, বাঁদীর গোস্তাকি মাফ হয়, একটা কথা বলতে পারি?"

বাদশা বললেন—"আলবৎ! তুমি বলতে পারবে না তো কে পারবে? কি কথা শুনি?"

বললাম—"দরবারে যাচ্ছেন তো হুজুর? তা' ওই উজীর সাহেবটিকে একবার এনে এখানে হাজির করতে পারেন? সব ঠিক হয়ে যাবে। ওঁকে আমি জানি, আর ওঁর ওই মেজাজ খারাপের দাওয়াইটাও খোদার মরজিতে এ বাঁদীর বেশ জানা আছে। পারবেন হুজুর? কি, আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে? তা, দেখুন না একবারটি পরখ করে!"

বাদশা বললেন—"এ তুমি কি বলছ বেগম? উজীর সাহেবের বেহক্ মেজাজটা ঠিক করে দেবে তুমি? জান তাঁকে তুমি? কি করে জানলে? আর তাঁকে নিয়ে আসতে হবে এখানে? বাদশার হারেমে! বেশ তো!"

বললাম—"ক্ষতি কি হুজুর। বুড়ো মানুষ, তা এলেনই বা বাদশার হারেমে। আর হুজুরও তো সঙ্গে সঙ্গেই থাকবেন তাঁর, আর আমাদের সব কিছুই দেখতে শুনতেও পাবেন, কিসের ভয় তবে? আর বেশীক্ষণ তাঁকে থাকতেও হবে না এখানে—তাও জেনে রাখুন জনাব।"

বাদশা বললেন—"আচ্ছা, তোমার মতলবটা কি শুনি?"

বললাম—"কেন জনাব, বাঁদীকে এ প্রশ্ন কেন? উজীর সাহেবের মাথা গরম হয়েছে, আর সঙ্গে সঙ্গে হুজুরেরও মাথা গরম, বাঁদীর কিছু করবার নেই কি? বেগম হয়েছি, সে কি শুধু হারেমের ভোগ-বিলাসের জন্য?"

দেখলাম, জবাবটায় হুজুর যেন বেশ একটু খুসী হয়েই উঠেছেন। বললেন—"বহুৎ আচ্ছা! আজ তুমি একটা কথার মতো কথা শোনালে বেগম! এ আমি আশা করতেই পারিনি। কি আফশোষ! দুনিয়ার মেয়ে মানুষগুলো সবাই যদি এমনি ধারা হত! তা যাক, এখন শোন বেগম, তুমি যে কি ভাবে কতটুকু কি করতে পারবে, তা আমি জানিনে, কিন্তু তবু, কথা দিচ্ছি আমি, এ অনুরোধ তোমার ব্যর্থ হবে না। হাঁ, আজই। তুমি তৈরী হয়ে থেকো বেগম।"

বাদশা চলে গেলেন। আমি ভাবতে বসলাম। কোথাকার জল, কোথায় এসে গড়াল। এটা আমার হিসেবের মধ্যে ছিল না! তা না থাক, যা হল, ভালই হল—মনকে প্রবোধ দিয়ে বললাম। ভাবলাম, পিতাজী আসবেন, এবার এস্পার-ওস্পার একটা কিছু হবেই। কিন্তু কি করতে হবে আমাকে? কি তাঁকে বলব? কি জানাব?

ভাবছি, এমন সময় দেখি কি না সর্দ্দার বাঁদী আসছে, মুখে তার আনন্দ ধরে না। কাছে এসে হাসতে হাসতে বললে—"কেমন, বলেছিলাম কি না হুজুর বেগম সাহেবা। যাক, ফাঁড়াটা কেটে গেছে—বাঁচলাম। আচ্ছা, আজ নাকি উজীর সায়েব এখানে আসবেন—বেগম সাহেবার সঙ্গে ভেট করতে? তা কি করতে হবে আমাকে তাই বলুন, তাই যে জানতে এলাম আমি, হুকুম ফরমাইয়ে হুজুর বেগম সাহেবা।"

বললাম—"তেমন আর কি! এখানে তিনি বেশীক্ষণ থাকবেন না তো। দু'-এক পেয়ালা আঙ্গুরের সরবৎ, আর ভাল একটু বসবার জায়গা—এ হলেই হল—ব্যস। আর দ্যাখো, খোদ হুজুরও তাঁর সঙ্গে থাকবেন, আর একটা জালিকাটা পর্দ্দাও থাকবে ঘরের দরজায়—তাঁদের আর আসরে বসবার জায়গাটির মাঝে। বুঝলে তো?"

বাঁদী বললে—"যো হুকুম", আর তার পরই একটা কুর্নিশ করে সে চলে গেল; ভাল মন্দ কোন প্রশ্নই আর সে করলে না। দেখলাম—ভব্যতা জ্ঞানও তার বেশ আছে, ফালতু কৌতূহল এতটুকু নেই!

যাক, তার পর শুনুন।

দিনের আলো নিবে যায়নি তখনো। হঠাৎ খবর এসে গেল তাঁর

আসছেন—খোদ হুজুর আর পিতাজী। দুর-দুর করে বুকটা কেঁপে উঠল। দিনারকে বললাম—"আয় দিনার আয়, তুইও সঙ্গে থাকবি। কিন্তু খবরদার! তুই কোন কথা কোসনি যেন।"

দিনার বললে—"না দিদি!"

গোটা দুই বাঁদী এসে এগিয়ে নিয়ে চলল আমাদের—গোপন একটা পথ দিয়ে—প্রকাণ্ড একটা সাজানো ঘরের ভিতর পর্দ্দার আড়ালে। পর্দ্দার এপাশে ঘরের ভিতর দিনার আর আমি, আর পর্দ্দার ওপাশে প্রশস্ত খোলা বারাণ্ডায় দু'খানি আসনের ওপর বসে হুজুর আর পিতাজী। ঘরে তেমন আলো নেই, কিন্তু বাইরে আছে। কেউ আমাদের দেখতে পায় না, কিন্তু তাঁদের আমরা বেশই দেখতে পাচ্ছি—জালিকাটা মসলিনের পর্দ্দার ভিতর দিয়ে—সামনের বারাণ্ডায়। দেখলাম—মাথা গুঁজে বসে আছেন পিতাজী, আর তাঁরই এক পাশে বসে বসে গোঁফে তা' দিচ্ছেন হুজুর—আনমনে আর অধীর প্রতীক্ষায়।

আমরা এসেছি—সাড়া পেয়ে হুজুর বলে উঠলেন—"বেগম, উজীর সাহেব হাজির।"

ভিতর থেকে জবাব দিয়ে বললাম—"হাঁ, জনাব, খোদা আপনাদের মঙ্গল করুন।" আর তারপর এক মুহূর্ত্ত চুপ করে থেকে, গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে, বেশ পরিষ্কার আর স্পষ্ট ভাবেই ডাকলাম—"বাবাজান!"

পর্দ্দার ও-পাশ থেকে তেমনি একটা জোরালো গলায় জবাব এল—"বেটি!"

দেখলাম—ব্যাপার দেখে হুজুর চমকে উঠেছেন, কটমট করে পিতাজীর দিকে চাইছেন, আর কি যেন বলি-বলি করেও শেষ পর্য্যন্ত আর বলে উঠতে পারছেন না, চুপ করেই রইলেন—ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চাপা দিয়ে। হাসি পেল একটু বই কি। কিন্তু ওদিকে নজর দেব—তখন আমার সে-ফাঁক নেই। বললাম—"আমার জন্য আর তুমি মিছে ভেবো না বাবাজান, আমি বেশই আছি, হাঁ খুবই ভাল, আছি, কোন অভাব নেই, কোন দুঃখ নেই আমার। যাঁর হাতে সঁপে দিয়েছো আমাকে, তিনি শুধু দুনিয়ার বাদশা নন তো, আজ আমার অন্তরের বাদশাও বটে। যাক্, শোন এখন বাবাজান, খোদার দোয়ায় আজ আমি পারস্য সম্রাটের মহিষী—দেশশুদ্ধ জনপ্রাণী আজ আমাদের আজ্ঞাবহ প্রজা, আর সে-সঙ্গে তুমিও। তোমার ওপর আজ আমার কড়া হুকুম আছে—মানতে হবে তোমাকে। ওসব ফকিরী নেবার আর নকৃরি ছাড়বার মতলব ফতলব ছেড়ে দাও। কোন দুঃখে ফকিরী নেবে তুমি, আমাদের কোথায় ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, এদেশটার"—

কথা শেষ করতে পারলাম না। দেখি কিনা—হঠাৎ একটা বিপর্য্যয় ঘটে গেছে। দরজায় ঝুলানো পর্দ্দাটাকে একটা হেঁচকা টানে ছিঁড়ে ফেলে, আর দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খোদ হুজুর তেড়েমেড়ে হঠাৎ ভিতরে এসে ঢুকে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলছেন—"হুঁ, হয়েছে, আর বেগমগিরি ফলাতে হবে না, পর্দ্দার আড়ালে গা-ঢাকা হয়ে লুকিয়ে এবারটি বেরিয়ে এস, সব আমি বুঝে নিয়েছি"! তারপর আমাদের নিয়ে বাইরে এসে বললেন—"উজীর, এই নাও তোমার হারানো মাণিক। তোমার দান আমি সহজে ভুলতে পারব না"। তারপর আমার দিকে চেয়ে আবার বললেন—"কার ওপর হুকুমজারি করছিলে বেগম? তোমার সম্রাট, তোমার দেশ—সব যে আজ বাঁধা পড়ে গেছে। সবই যে আজ ওই মানুষটির কাছেই দেনার দায়ে খুঁইয়ে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছি আমি। তা বেশ, এ ভালই হল, ফুরসৎ খুঁজছিলাম—আজ হতে আমি নিশ্চিন্ত—খালাস! সব দায় ওর ওপর। যাঁর দায় উনি বুঝুন! মজা করে এখন আমি শুধু পালঙ্কে শুয়ে থাকব, আর আরাম করে তোমার কেচ্ছা শুনব। কি বল তুমি বেগম?"

তার পর আবার পিতাজীকে লক্ষ্য করে বললেন—"উজীর, এত দিন আমি যা হতাশ হয়ে খুঁজছিলাম কিন্তু পাইনি, তাই তুমি আমায় দিয়েছ! আজ হতে তোমার কন্যা আর শুধু পারস্য-সম্রাটের মহিষী নয়, তার পাটরাণী—পারস্য-সম্রাজ্ঞী। আর"—

এই পর্য্যন্ত বলে হুজুর একটু থেমে গেলেন, কিন্তু তারপরই হঠাৎ পিতাজীর বুকের ওপর একবারে ছিটকে গিয়ে পড়ে বললেন—"আর—আর,—তোমার তো সুসন্তান নেই উজীর,—এই নাও তোমার ছেলে"……

এর পর শাহারজাদী যে আর কি বলেছিলেন, শুনতে পাইনি, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিজেরই অজ্ঞাতে। তবে সে খুব বেশী কথাও নয়, আর তা নিয়ে কোথাও তেমন বিরোধ-বিসম্বাদ যে দেখা যাচ্ছে—তা-ও নয়। শোনা যায়, এর পর আবার ওদেশে শান্তি ফিরে এসেছিল, আর সত্য সত্যই পারস্যসম্রাট আরাম করে পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে তখন থেকে একটানা এক হাজার এক রাত্তির অবধি শাহারজাদীর মুখে কেচ্ছা শুনেছিলেন। আর তাই নিয়েই এই বিচিত্র গল্পপুস্তক আরব্যোপন্যাসের সৃষ্টি।

সমাপ্ত

ইউরোপে তৈয়ারী কাগজের হিসাব

ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলোতে ১৯৫৫ সালে কি পরিমাণ কাগজ ও কাগজের বোর্ড তৈয়ারী হয়েছে, এর একটা সংক্ষিপ্ত হিসেব মিলেছে এর ভেতর। তাতে করে দেখা যায়, একমাত্র ফ্রান্সেই এই একটি বৎসরে কাগজ ও কাগজের বোর্ড তৈরী হয়েছে ২০ লক্ষ টন। অপর দিকে এ সময় মধ্যে ইটালীতে তৈয়ারী হয়েছে প্রায় ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার টন কাগজ। ইটালীতে এত কাল গড়পড়তা বার্ষিক উৎপাদনের হার যা ছিল এক্ষণে তদপেক্ষা শিল্প-কারখানা সমূহের উৎপাদন-ক্ষমতা বেড়েছে এবং এই বাড়তি কাগজ উৎপাদনের পরিমাণ হবে প্রায় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন। বৃটেনের কাগজ-শিল্পের হিসেব থেকে দেখা যায়, সেখানে ১৯৫৫ সালে কাগজ ও কাগজের বোর্ড তৈয়ারী হয়েছে ৩২ লক্ষ টনের উপর। এতদ্ব্যতীত এই বৎসরটিতে বৃটেন ১০ লক্ষাধিক টন কাগজ বাহির হইতে আমদানীও করে। এই সময়ে রপ্তানীকৃত বৃটিশ কাগজের পরিমাণ মাত্র ২৯৮, ৭৪৮ টন।

গত বৎসর স্পেন যে কাগজ উৎপাদন করে, উহার মোট পরিমাণ হচ্ছে ২২৬, ৭০৮ টন। সুইজারল্যাণ্ডেও ১৯৫৫ সালে অনুরূপ পরিমাণ কাগজই তৈয়ারী হয়েছে বলে জানা যায়।

চিত্রলেখা



[উপন্যাস]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মা

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

বীজগুপ্তের মনে হয় যে, সে অকারণে আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়কে অপমান করেছে। পরের দিন সকালে শ্বেতাংক বীজগুপ্তের কাছে এলে, সেনাপতি বললে, "শ্বেতাংক, আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে কাল আমি বোধ হয় অনুচিত কিছু বলে ফেলেছি, কিন্তু এখনও পর্যন্ত বুঝে উঠতে পারছি না যে কি অনুচিত বললাম! তুমি তো ওখানে উপস্থিত ছিলে, তোমার নিশ্চয় সব কথা মনে আছে?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে শ্বেতাংক উত্তর দেয়, "কিন্তু প্রভু, আপনি কাল যা কিছু বলেছেন তা তো সবই উচিত। তবে আপনাদের কথাবার্ত্তা যে রকম পরিষ্কার ভাবে হয়েছিল তাতে আর্যশ্রেষ্ঠ মনে করতে পারেন যে, তিনি অপমানিত হয়েছেন কিন্তু তার জন্য চিন্তা কেন করছেন? সত্য তো শুধু সত্য, এতে এক জনের ধারণা অপরের ধারণার বিরোধী হতে পারে।"

কিন্তু আর্য্যের অপমানের কথা মনে না হয়ে তার ভাবনা হচ্ছিল যে, তার কথায় হয়ত যশোধরা অহেতুক দুঃখ পেয়েছে। কেবলি তার মনে যশোধরার অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানি ভেসে উঠছিল। সত্যই ভালবাসার মতই সুন্দর প্রতিমা যশোধরা, তার সারল্য, প্রশান্ত ও সুধামাখা চোখ, লজ্জা ও তেজোময় মুখমণ্ডল বার বার তার মনে পড়ছিল। কিন্তু সে তাকে ভালবাসতে পারে না। কারণ সে নর্ত্তকী চিত্রলেখাকে ভালবেসে ফেলেছে! সে ঠিক বুঝে উঠতেও পারছিল না যে, যশোধরার মধ্যে চিত্রলেখার হৃদয় আছে কি না। চিত্রলেখা তার স্ত্রী না হলেও স্ত্রী, নর্ত্তকী হয়েও সে তাকে ভালবাসতে পেরেছে; আর এ ভালবাসা শুধু ভালবাসবার জন্যে, অর্থের জন্য নয়। কারণ তার অর্থের কোন অভাব নেই। সেনাপতির সেই রাত্রের কথা মনে পড়ে, যে রাতে প্রথম বার চিত্রলেখার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। চিত্রলেখা ও যশোধরার মধ্যে কোন তুলনাই হয় না। তার স্থান অনেক উঁচুতে, তবুও সে কেন যশোধরার চিন্তা করছে? তার বড় আশ্চর্য্য লাগে। সে শ্বেতাংককে বলে, "শ্বেতাংক, কালকের কটু উক্তির জন্য আমার আর্য্যের কাছ থেকে ক্ষমা নেওয়া উচিত।"

"প্রভুর যেমন ইচ্ছে।"

"কিন্তু আমি ওখানে যেতে চাই না।" বীজগুপ্ত যশোধরার কথা ভুলে যেতে চায়, "আমি একটা চিঠি দিচ্ছি, সেটা আর্য্যের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।"

"প্রভু যেমন আদেশ করবেন।"

শ্বেতাংক চিঠিখানা নিয়ে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে আসে। প্রহরীকে জিজ্ঞেস করে, "আর্য্যশ্রেষ্ঠ কি গৃহে আছেন?"

প্রহরী উত্তর দেয়, "না, তিনি তো গৃহে নেই? কি এক জরুরী কাজে বাইরে গেছেন। বলুন, আপনার কি দরকার?"

"তাঁর নামে একটা চিঠি আছে।"

"আমাকে দিয়ে যান, তিনি এলে তাঁকে দিয়ে দেব।"

"না! এ চিঠি তাঁর নিজের হাতে পৌঁছিয়ে দিতে হবে।" একটু থেমে বলে, "অথবা তাঁর কন্যা যশোধরাকে দিলেও চলবে।" শেষের কথাগুলো সে হঠাৎ বলে ফেলে।

প্রহরী যশোধরার কাছে খবর পাঠিয়ে শ্বেতাংককে অতিথিগৃহে নিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে যশোধরা প্রবেশ করে। শ্বেতাংক উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করে। শ্বেতাংককে দেখে বসবার ইংগিত করে যশোধরা বলে, "বলুন, কি প্রয়োজনে এখানে আপনার এই শুভ আগমন?"

"সেনাপতি বীজগুপ্ত আপনার পিতার নামে একটি পত্র দিয়েছেন। তারই বাহকরূপে আমি দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি।" শ্বেতাংক কিন্তু বীজগুপ্তকে প্রভু বলে সম্বোধন করা উচিত মনে করলে না।

"পিতা হয়ত এখনই এসে পড়বেন, আপনি কি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবেন?" কোন দ্বিধা না করে যশোধরা একদৃষ্টে শ্বেতাংকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কোন রকম সঙ্কোচ না করে শ্বেতাংক বলে, "পাটালিপুত্র নগরের সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরীর সংগলাভে আমার কোন আপত্তিই থাকতে পারে না!"

যশোধরা আগে কোন দিন কারু কাছ থেকে এরকম ভাষা শোনেনি এবং তাও আবার এমন একজনের কাছ থেকে—যার সংগে কয়েক ঘণ্টা আগে কেবল তার পরিচয় হয়েছে। তবুও কথাগুলো শুনতে তার বেশ ভাল লাগে, লজ্জা পেয়ে তার কপোল দু'খানি আরও লাল হয়ে ওঠে। সে শ্বেতাংককে জিজ্ঞেস করে, "আপনি নিশ্চয় আর্য্য বীজগুপ্তকে বেশ ভাল করে জানেন?"

"হ্যাঁ, তা নিশ্চয় জানি। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের ভিতর তিনি যে একজন, সে বিষয়ে কেউ কোন দিন আপত্তি করবে না।"

"আর নর্ত্তকী চিত্রলেখা সম্বন্ধে আপনার কি অভিমত?"

"তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর নারী। আমি তো বলবো যে, তিনি এক দেবী! যে ব্যক্তি চিত্রলেখাকে জেনেছে, সে সৌন্দর্য্য ও সৌন্দর্য্য-প্রসূত কর্ত্তব্য যে কি, তা নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে।"

যশোধরা হেসে ওঠে, "তাহলে তো আমার ধারণা একেবারে ভুল নয়? আর্য্যের নাম বোধ হয় শ্বেতাংক, তাই না?"

"দেবীর অনুমান সত্য।"

"আর্য্য শ্বেতাংক! আর একটা প্রশ্ন করব। সত্যিই কি পাপকে জানবার জন্য আপনার গুরু আপনাকে এখানে পাঠিয়েছেন? যদি পাঠিয়েই থাকেন তাহলে কি সেনাপতি বীজগুপ্তের ব্যক্তিত্ব সেই পাপকে খুঁজে পাবার প্রকৃত ক্ষেত্র?"

শ্বেতাংক হাসে, "দেবী ঠিকই বলেছেন, আমার গুরু পাপের খোঁজ করবার জন্য আমাকে বীজগুপ্তের কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু কি করে আর্য্য বীজগুপ্তের ব্যক্তিত্ব পাপকে খুঁজে বার করবার উপযুক্ত ক্ষেত্র হ'ল, প্রশ্নের সম্যক্ অর্থ আমি আজও পর্য্যন্ত বুঝতে পারলাম না। কাল ভোজে যোগী কুমারগিরির শিষ্যরূপে যে এসেছিল সে আমার গুরুভাই, তাকেও পাপের খোঁজ করবার জন্য পাঠান হয়েছে। এ কথা শুনে তোমার নিশ্চয় আশ্চর্য্য লাগছে?"

সত্যিই যশোধরার শ্বেতাংকের কথায় খুব আশ্চর্য্য লাগে।

"কিন্তু দেবি, আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ নেই। এর কোন নিশ্চয়তা নেই যে আমাকে যে ব্যক্তির কাছে পাঠান হয়েছে, তিনি পাপী। হ'তে পারে যে, যে-সমস্ত ব্যক্তি তাঁর সংস্পর্শে আসেন তাঁদের ভিতর কেউ কেউ পাপী। এখন কথা হ'ল যে পাপ কি? পাপ যে কি, তা কে জানে? আমি যা পাপ মনে করি অন্য এক জন সেটাকে পাপ না-ও মনে করতে পারে; আবার এমন অনেক কিছু আছে যেগুলোর প্রতি আমরা কোন মন দিই না কিন্তু সেগুলোই অনেকের কাছে পাপ।"

শ্বেতাংকের উত্তরে যশোধরা সন্তুষ্ট হ'ল না। "আর্য্য শ্বেতাংক! আমি আপনাকে এজন্য প্রশংসা করব, যে ব্যক্তির গুণ দেখলে আপনি তাকে বিশ্বাস করেন।"

ইতিমধ্যে আর্য্যশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় গৃহে প্রবেশ করলেন। শ্বেতাংক উঠে তাঁকে অভিবাদন জানায়, যশোধরা ভিতরে চলে যায়।

শ্বেতাংককে বসবার আদেশ করে মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞেস করেন, "তুমি তো বীজগুপ্তের সেবক, কাল তার সংগে ছিলে?"

"আর্য্যশ্রেষ্ঠের অনুমান ঠিক। প্রভু আর্য্যশ্রেষ্ঠের নামে একটি পত্র দিয়েছেন।"

পত্র পড়ে তাঁর মুখে আনন্দের ভাব ফুটে ওঠে।

"সেনাপতি বীজগুপ্তকে বলে দিও যে, তার ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন নেই, তার সম্বন্ধে আমার ধারণা আগে যেমন নির্মল ও স্বচ্ছ ছিল এখনও তাই আছে। যদি তার কোন জরুরী কাজ না থাকে তাহলে আজ সন্ধ্যায় সে যেন এখানে আসে ও আহারাদি করে।" একটু থেমে মৃত্যুঞ্জয় বলেন—"শ্বেতাংক, তোমাকেও বীজগুপ্তের সংগে নিমন্ত্রণ করলাম।"

আনন্দে ও খুশীতে শ্বেতাংক উৎফুল্ল হয়ে ওঠে, "আর্য্যশ্রেষ্ঠের আদেশ যা'তে পালন হয় সে ব্যবস্থা নিশ্চয় করবো। যদি প্রভু আসেন তাহলে আমিও আসব। তিনি না বললে আমার এখানে আসা কতটা উচিত হবে জানি না!"

মৃত্যুঞ্জয় হেসে বলেন, "তুমি শান্ত, গম্ভীর ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠ যুবক। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি! তোমার বংশ, তোমার পিতার নাম ও তাঁর নিবাস কোথায় বল?"

"সূর্য্যবংশে আমার জন্ম, আমার পিতার নাম বিশ্বপতি এবং তাঁর নিবাস কোশল দেশে।"

"বিশ্বপতি? নিবাস কোশল দেশ! আচ্ছা, তিনি কি কাশীতে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য্য! জানো, বিশ্বপতি আমার গুরুভাই? শ্বেতাংক, তোমাকে স্বাগত জানাচ্ছি, তুমি আমার পুত্রের সমান।"

আপন পিতা ও মৃত্যুঞ্জয়ের পরিচয় পেয়ে শ্বেতাংকের আনন্দের সীমা থাকে না। তার হৃদয় এক অজানা আশায় দুলে ওঠে। সে ভাবে, "তাহলে কি যশোধরার সংগে আমার বিবাহ হওয়া সম্ভব?"

শ্বেতাংক জানত যে এ বিবাহ অসম্ভব! তার পিতার সমস্ত ঐশ্বর্য্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে, যার জন্যে তিনি গ্রাম্য-জীবন বেছে নিয়েছেন। সে উচ্চবংশের সত্য কিন্তু তা'তে কি আসে-যায়? ধন, বৈভব, শক্তি সব কিছুতেই আর্য্য মৃত্যুঞ্জয় তার পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিবাহের প্রস্তাবের সময় এ সব কিছুরই আলোচনা করা হয়। কিন্তু তবুও তার আশা একেবারে মিলিয়ে যায় না।

শ্বেতাংককে চুপ করে থাকতে দেখে মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "শ্বেতাংক! আমার গৃহকে তুমি নিজের গৃহ বলে মনে কোর। আমার আশ্চর্য্য লাগছে যে, বিশ্বপতি তোমার এখানে আমার কথা কেন জানায় নি?"

"আমার পিতা আজকাল বানপ্রস্থ জীবন অতিবাহিত করছেন—বোধ হয় সেই জন্য! আচ্ছা, এবার আর্য্যশ্রেষ্ঠ যদি অনুমতি দেন তাহলে···"

ভোজনের সময় হয়ে গিয়েছিল।···"আমার এখানে আহার সেরে নিতে তোমার বোধ হয় কোন আপত্তি হবে না?"

শ্বেতাংক হাসতে হাসতে বলে, "আর্য্যশ্রেষ্ঠ, আপত্তির কি কারণ থাকতে পারে, কিন্তু এখন আমি আর্য্য বীজগুপ্তের সেবক। তাঁর আদেশ ব্যতীত আমি কোন কাজ করতে পারি না। আচ্ছা, আজকে অনুমতি দিন, অনেক দেরী হয়ে গেল। আর্য্য বীজগুপ্ত নিশ্চয় আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

"অতি উত্তম! আপন কর্ত্তব্য তুমি বেশ ভালোভাবেই জানো। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি যেতে পার। কিন্তু বীজগুপ্তকে আমার কথা বলতে যেন ভুলে যেও না।"

শ্বেতাংক ফিরে এসে বীজগুপ্তকে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে নিমন্ত্রণের কথা বলে। সেনাপতি উত্তর দেয়, "আমি নিমন্ত্রণ পেয়েছি সত্য কিন্তু আমার ওখানে যাওয়া কি উচিত হবে?"

সেনাপতি সমস্ত দুপুর শুধু ভাবে যে, তার পক্ষে এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা উচিত কি না। তার মনে প্রশ্ন জাগে যে, তার ওখানে যাওয়া অনুচিতই বা কেন? অনেক তর্ক-বিতর্কের পর সে ঠিক করলে যে, সে মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে যাবে। সন্ধ্যার সময় শ্বেতাংককে বলে, "শ্বেতাংক, আমার মনে হয়, কোন ভদ্রপুরুষের

নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করা কি উচিত ?" সংগে সংগে যশোধরাকে আর একবার দেখবার, তার সংগে কথা বলবার ইচ্ছা তার মনকে চঞ্চল করে তোলে।

রাত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের ভবনে শ্বেতাংকের সংগে বীজগুপ্ত পৌঁছয়। গতরাত্রের মত আজ ভবনে কোন কোলাহল নেই, চারি দিক শান্ত-নিস্তব্ধ। বিশ্রামগৃহে সবাই উপবেশন করে। আগেই যশোধরা সেখানে অপেক্ষা করছিল।

মৃত্যুঞ্জয় বলে, "সেনাপতি, তুমি যে চিঠি লিখেছ তার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

"আর্য্যশ্রেষ্ঠ! আপন ভুল স্বীকার করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।"

মৃত্যুঞ্জয় হেসে বলেন, "তোমার সেবক শ্বেতাংক আমার গুরুভাই বিশ্বপতির ছেলে, এ কথা কেবল আজই জানতে পারলাম"।

"কিন্তু আর্য্যশ্রেষ্ঠ, শ্বেতাংক শুধু আমার সেবক-ই নয়, সে-ও আমার গুরুভাই।"

"আর্য্য বীজগুপ্ত, আজ আপনার আসতে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়ে গেছে।"

"আজ্ঞে, কাশী থেকে কয়েক জন অতিথি এসেছিলেন কি না?"

হঠাৎ যশোধরা বলে, "কাশী তো খুব প্রাচীন ও সুন্দর নগরী! আপনি কি কখনও কাশী গেছেন?"

সেনাপতি বলে: "আমার জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সময় তো কাশীতেই কেটেছে। আমার গুরু মহাপ্রভু রত্নাম্বরের নিবাস স্থান প্রথমে কাশীতেই ছিল। দেবী যশোধরা, কাশী তো এখান থেকে খুব নিকটে, আমি সমস্ত উত্তর-ভারত পর্য্যটন করেছি।"

"তাহলে তো আপনি হিমালয় পর্বত নিশ্চয় দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, আমি হিমালয় ও হিন্দুকুশ দুই পর্ব্বতই দেখেছি, পর্বতেই তো প্রকৃতির পূর্ণ রূপ দেখতে পাওয়া যায়। আর্য্যশ্রেষ্ঠ, কত অদ্ভুত জিনিষ আমি সেখানে দেখেছি কিন্তু একটি ঘটনা এখনও পর্য্যন্ত ভুলতে পারিনি, এখনও সেই ঘটনার কথা যখন ভাবি, ভয়ে শিউরে উঠি।"

কুতূহলী যশোধরা বলে, "সেই অদ্ভুত ঘটনাটা বলুন না, বলবেন?" "নিশ্চয়ই!"—বীজগুপ্ত শুরু করে, "প্রায় দশ বছর আগেকার কথা। তখন আমি শিক্ষার্থী। মহাপ্রভু রত্নাম্বরের সংগে দেশ-পর্য্যটনে বেরোই। বড় বড় নগর, উপবন ঘুরতে ঘুরতে আমরা গংগা নদীর পাড় দিয়ে চলতে চলতে হরিদ্বার পৌঁছলাম। সেখানে সমতল-ভূমি শেষ হয়ে গেছে। আকাশের মাথা ছুঁয়ে পর্বত-শৃংগ আমোদের সামনে। আমি মহাপ্রভু রত্নাম্বরকে জিজ্ঞেস করলাম, "এর পর কি আছে, প্রভু!" তিনি বললেন "অজানা দেশ!" গংগাতীরে এক ব্যক্তি বসেছিল, সে মহাপ্রভুর কথা শুনে বলে, "কি বললে, সামনে রয়েছে অজ্ঞাত প্রদেশ! ঠিক বলেছ! কিন্তু আমার বলে দেওয়া উচিত যে ঐ অজ্ঞাত-প্রদেশ দেবতাদের নিবাস স্থান। ঐ পর্বত-রাজ্যে কৈলাস অবস্থিত, ওখানে গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করে, অপ্সরাগণ ক্রীড়ারত থাকে। ব্যক্তিটির কথায় মহাপ্রভুর মুখে অবিশ্বাসের এক হাসি খেলে যায়, কিন্তু অনুভবহীন এই যুবকের কল্পনার সেই অবিশ্বাস কোন আঁচড় কাটতে পারে না।

আমি বললাম, "মহাপ্রভু, খুব সম্ভব তাই হবে। ঐ পার্বত্য-প্রদেশে যেতে আপনার কি কোন আপত্তি আছে?"—"না, যদি তুমি যেতে চাও তো আমিও প্রস্তুত আছি।"

"আমরা দু'জনা এগিয়ে চললাম। প্রকৃতির সেই অপরূপ সৌন্দর্য্য আমরা কল্পনা পর্য্যন্ত কখনও করিনি। বনে নানা রং-এর ফুল ফুটে আছে তার তাদের সংগে পার্বত্যাঞ্চলের শীতল বাতাস খেলা করে চলেছে। পাখীরা কলরব করে গান গেয়ে চলেছে। চারি দিকে শান্তির রাজ্য ছেয়ে। কোন কোলাহল নেই, জনমানবের সাড়া নেই, চারিদিকে কেবল পাহাড়ের পর পাহাড়, আবার পাহাড়, তারপর পাহাড় যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরংগ। মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম, লোকগুলোর রং ফর্সা, স্ত্রীলোকগুলি সুন্দরী, নানারকম সাজগোজ করে তারা হাসছে আর গাইছে। লজ্জা বা সংকোচের বালাই নেই। আমি তখন যুবক, তাদের সৌন্দর্য্য দেখে মোহিত হয়ে গিয়াছিলাম। দলে দলে স্ত্রীলোকগুলি মধুর গান গেয়ে চলেছে। আমি যদিও তাদের ভাষা বুঝতে পারলাম না কিন্তু এটা বেশ অনুমান করতে পারলাম যে, গানগুলো কবিত্ব ভরা এবং তাদের বিষয় হ'ল প্রেম। আমার মন জিজ্ঞেস করে উঠল৷ "তবে এই কি অপ্সরাদের দেশ?"

"আমরা আরও এগিয়ে চললাম। এখন এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রাম অনেক দূরে ও ছোট ছোট। খুব জোর ঠাণ্ডা লাগছিল এবং ফল-ফুলও অনেক কম নজরে পড়ছিল। পরের দিন সকালে দূরে সোনালী রং-এর এক পাহাড় দেখতে পেলাম। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "গুরুদেব, সামনে কুবেরের সুমেরু পর্বত!" মহাপ্রভু আমার মূর্খতায় হাসলেন, "না, ওটা হিমালয়। হিমের ওপর সূর্য্যের কিরণ ঝক্‌মক্ করছে, তাই সোনা বলে তোমার ভুল হয়েছে।" "নিজের মূর্খতায় আমি লজ্জা পেলাম। আমরা আরও ওপরে উঠতে লাগলাম। এখন মাটিও প্রায় বরফে ঢাকা, আমাদের শরীর ঠাণ্ডায় ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল।"

মহাপ্রভু রত্নাম্বর বললেন, "চল, এবার ফিরে যাওয়া যাক্।" কিন্তু আমি বললাম, "না প্রভু! ঐ বরফে ঢাকা পাহাড়ের নীচে পর্য্যন্ত আমাদের যেতেই হবে।" কিছু দূর এগিয়ে আমরা একটি কুটির দেখতে পেলাম। কুটিরের বাইরে বসে একটি স্ত্রীলোক কি ভাবছিল। আমাদের দেখে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "অতিথিদের স্বাগত করছি।"

মহাপ্রভু স্ত্রীলোকটিকে খুব ভাল করে দেখে নিয়ে আমাকে কানে কানে বললেন, "বীজগুপ্ত, এটা নিরাপদ স্থান নয়, এখান থেকে ফিরে যাওয়াই উচিত।" স্ত্রীলোকটি হেসে উঠলে, "বৃদ্ধ অতিথির অনুমান সত্য, কিন্তু যখন এতদূর এগিয়েই এসেছ তখন এখানকার সব কিছু জেনে যাও, সারা জীবনে এখানকার কথা ভুলতে পারবে না।"

স্ত্রীলোকটির কথায় মহাপ্রভু চমকে ওঠেন, কিন্তু বেশ বুঝতে পারলেন যে, এ সময় তার অনুরোধ উপেক্ষা করা মোটেই সমীচীন নয়। কিছু দূর গেলে আমরা দেখলাম যে, এক যোগী এক হিমশিলার ওপর বসে আছে। তার জটা পা পর্য্যন্ত নেমে এসেছে ও নখগুলো হিংস্র পশুর মত। আমরা যে পথ দিয়ে আসছিলাম সেই দিকে সে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। আমরা গিয়ে তাকে অভিবাদন করলাম। আশীর্বাদ করে সে আমাদের তার পাশে উপবেশন করালে। 'আজ কতদিন পর পুরুষের মুখ দেখলাম' বলে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। মহাপ্রভু তাকে বললেন, 'দেব, মনে হচ্ছে আপনি দুঃখী।' সে উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ, দুঃখীও আবার সুখীও বটে! এই বলে সে পিছনে দেখবার জন্য আমাদের ইশারা করলে।

উঠে পিছনে দেখতেই আমরা ভয়ে কেঁপে উঠলাম। পিছনে রক্তের এক কুণ্ড এবং তাঁতে সিঁড়ি লাগান! কুণ্ড থেকে ভীষণ দুর্গন্ধ বা'র হচ্ছে। মহাপ্রভু যোগীকে জিজ্ঞেস করেন, "আপনি এ রকম ক্লেদাক্ত স্থান ছেড়ে দেন না কেন?" সে উত্তর দেয়, "ছাড়তে তো চাই কিন্তু ছাড়তে পারি না। জানি না, কত বার এই স্থান পরিত্যাগ করবার কথা ভেবেছি কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে গেছে! এ স্থান থেকে আমার মুক্তি নেই—উঃ!"

"এর পর নানা রকম জ্ঞানের কথাবার্তা হ'ল। সাধনা ও উপাসনার মহত্ব সম্বন্ধে যোগী অনেক কিছু বললে। আমরা দেখলাম যে যোগীর জ্ঞান অনেক উচ্চ স্তরের, কাজেই দুর্গন্ধ সহ্য করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার কথা শুনতে লাগলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসে। হঠাৎ যোগী চিৎকার করে বলে ওঠে, 'সময় হয়ে গেছে'—বলেই দ্রুত পদ-নিক্ষেপে কুণ্ডের দিকে সে এগিয়ে যায়। কৌতূহল বশতঃ আমরাও তার পিছনে পিছনে চললাম। পাগলের মত যোগী কুণ্ডের ভেতর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর অবাক্ হয়ে দেখি যে, সেই কুণ্ডের ভেতর রক্তের লেশ মাত্র নেই, চারি দিকে স্বচ্ছ ও নির্মল জল। নারকীয় জন্তুগুলো পদ্মে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কুণ্ডের ভেতর যোগীর সংগে সেই স্ত্রীলোক যাঁকে আমরা প্রথমে কুটিরে দেখেছিলাম। তারা দু'জনা ক্রীড়ারত। স্ত্রীলোকটি হাসে, আমাদের ডেকে বললে, "মূর্খেরা! ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি দেখছ? এসো, নেমে এসো, এখানে স্নান কর ও জীবনকে উপভোগ কর।" স্নান করবার জন্য আমার বড় ইচ্ছে হয় কিন্তু মহাপ্রভু আমার হাত এমন ভাবে চেপে ধরলেন যে হাজার চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। তিনি আমাকে টানতে টানতে অন্য দিকে নিয়ে গেলেন। আমরা প্রায় দৌড়িয়ে সেখান থেকে আমাদের আগের রাস্তায় এসে পৌঁছলাম—মহাপ্রভু আমাকে বললেন, 'বৎস, ভগবানের অসীম কৃপা যে আজ আমরা বেঁচে ফিরে আসতে পেরেছি।' তারপর থেকে কয়েক বছর পর্য্যন্ত সেই স্ত্রীলোকটির চেহারা, সেই কুণ্ডের দৃশ্য আমার চোখের সামনে বার বার ভেসে উঠত।"

যশোধরা জিজ্ঞেস করে, "এর রহস্য সম্বন্ধে মহাপ্রভু আপনাকে কোনদিন কিছু বলেন নি?"

"না।" মহাপ্রভু শুধু বলেছিলেন, "পৃথিবীতে এমন অনেক বিষয় আছে যা বোঝা যায় না। এও ঐ রকম দুর্বোধ্য এক বিষয়।"

সবাই ভোজনগৃহের দিকে এগিয়ে চললেন। আজ যশোধরার এক পাশে বীজগুপ্ত ও অপর পাশে শ্বেতাংক! খেতে খেতে যশোধরা বীজগুপ্তকে জিজ্ঞেস করে, "আর্য্য, আপনার গল্প সত্যি বড় অদ্ভুত! শুনে সত্যিই আমার মন কেমন যেন চঞ্চল হয়ে উঠেছে! মনে হচ্ছে, আমিও যদি ঐ রকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখে আসতে পারতাম!"

বীজগুপ্ত হাসতে হাসতে বলে, "দেবি, মানুষ নিজে কোন অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে না, পরিস্থিতিই মানুষকে অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম করে।"

শ্বেতাংক যশোধরার সংগে কথা বলবার সুযোগ খুঁজছিল। "দেবি, অভিজ্ঞতা লাভ করবার জন্য এখন সমস্ত জীবন পড়ে আছে।"

যশোধরার মুখে এক অদ্ভুত ভাব দেখা যায়—"হয়তো তাই। কিন্তু ঐই ছোট্ট জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত কত মূল্যবান—এই মুহূর্ত্তগুলোকে ব্যর্থ চলে যেতে দেওয়া কি উচিত?"

বীজগুপ্ত হেসে ওঠে, "আমাদের প্রত্যেক কার্য্যে এক অদৃশ্য শক্তির হাত আছে। তারই ইচ্ছেতে সব কিছু ঘটে। পৃথিবীতে দু'রকম মতাবলম্বী লোক আছে। এক দলের মত হ'ল যে কলরব আলোড়নের অপর নাম জীবন, অন্যদলের মতে শান্তিই জীবনের একমাত্র কাম্য। দুই মতেরই অকাট্য যুক্তি এবং কোনটা সত্য ও ঠিক, তা নির্ণয় করা বেশ কঠিন।"

শ্বেতাংক দেখে যে, সে বীজগুপ্তের মত অমন সুন্দর ভাবে আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা যশোধরাকে প্রভাবান্বিত করতে পারছে না। সে বলে, "দেবী যশোধরা, মানুষকে সুখী ও সন্তুষ্ট রাখা জীবনের আবশ্যকতা হলেও তাঁতে সাড়া জাগাবার শক্তিও থাকা চাই। উচ্ছ্বাস ও উচ্ছ্বাসের ভেতর যে সুখ আছে, পিপাসা ও তৃপ্তির মধ্যেই প্রেমকে খুঁজে পাওয়া যায়। জীবনে প্রেম'ই মুখ্য। জীবনে প্রয়োজন হ'ল একজনের অপর আর একজনকে ভালো ভাবে জেনে নেওয়া, একজনের প্রতি অপরের সহানুভূতি দেখান এবং অপরের অস্তিত্বে নিজেকে বিলীন করে দেওয়াই হ'ল প্রেম-ভালোবাসা—এই হ'ল জীবনের একমাত্র সুন্দর ও চরম লক্ষ্য।"

যশোধরা এবার শ্বেতাংকের দিকে তাকায়—চোখের ভাষায় সে বুঝলে যে যশোধরা কিছু যেন বলতে চায়। শ্বেতাংকের সমস্ত শরীর আনন্দে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। অনেকক্ষণ ধরে যশোধরার দিকে তাকিয়ে থাকে, এই কয়েকটি মধুর মুহূর্তকে সে কিছুতেই ছেড়ে দিতে পারে না। সেনাপতি ধীরে বলে—"এই তো জীবন!"

যশোধরা শ্বেতাংকের দিক থেকে চোখ সরিয়ে নেয়।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

যশোধরার ভেতর আকর্ষণ আছে কিন্তু সুন্দর ও মধুর হলেও সে আকর্ষণ কেমন যেন প্রাণহীন। তার পাশে বসে মানুষ পবিত্রতার স্পর্শ পেতে পারে, নিজেও পবিত্র হতে পারে কিন্তু তবুও বীজগুপ্ত তার ভেতর পূর্ণসুখ খুঁজে পায় না, আনন্দ যেন তার কাছে সম্পূর্ণরূপে ধরা দেয় না। যশোধরার ভেতর সে এমন একজনের সন্ধান পায়, যার সংগে সে নিজেকে ঠিক মিশিয়ে দিতে পারে না। তার গাম্ভীর্য্য ও স্পষ্ট কিন্তু নীরস বার্ত্তালাপে এ নারী মৌন-সাধনার প্রতীক, কিন্তু বীজগুপ্ত তাকে শুধু সম্মানই দিতে পারে, নিজের করে নিতে পারে না!

যৌবন চায় আলোড়ন, হৃদয় উজাড় করে শুধু আহরণ করতে চায়, প্রতি পদবিক্ষেপে বাধাকে বেড়ায় খুঁজে ও সেই বাধাকে জয় করাই হয় যৌবনের একমাত্র লক্ষ্য। আপন ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করাই যৌবনের ধর্ম, আপন ব্যক্তিত্বকে সে লুপ্ত করতে চায় না, সে চায় না যে তার ব্যক্তিত্ব কখনও কোথাও হারিয়ে যায়। সে শুধু চেষ্টা করে যে কি করে তার ব্যক্তিত্বকে সে আরও স্পষ্ট ও আরও প্রভাবশালী করে তুলতে পারে। কতকগুলি বিভিন্ন শক্তির সমন্বয় হয়ে এক হয়ে যাওয়াকেই বিপ্লব বলে। কিন্তু এক্ষেত্রে শক্তিগুলির কেবল সমন্বয়-ই হয়, তারা পৃথক থাকে—যে কোন সময় তা'দের পার্থক্য অনুভব করা যায়।

তাই বোধ হয়, সেনাপতি বীজগুপ্তের মানস-পটে যশোধরার স্মৃতি ভয়-মিশ্রিত সুখের, ভ্রম-মিশ্রিত অনুরাগের ও জীবনহীন প্রেমের রূপে অঙ্কিত হয়ে যায়!

যশোধরা হৃদয়-মন্দিরে দেবীরূপে পূজার যোগ্যা, নারীত্বের আদর্শ,

পবিত্রতার প্রতীক ও ধর্মবিশ্বাসের প্রতিমূর্ত্তি! নয়ন সুধাময় শান্তি ও কারুণ্যে ভরা! কিন্তু অপর দিকে সেনাপতি চায় জীবন ও যৌবন, সে উন্মাদনার প্রত্যাশা, তার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। তাই সে যশোধরাকে নিজের জীবনের সংগে জড়াতে চায় না।

যে একবার সুরা পান করেছে—না, যে একবার সুরার মাদকতাকে অনুভব করেছে, সে কখনও সুরা ত্যাগ করতে পারে না। সেনাপতি বীজগুপ্ত চিত্রলেখাকে ভালবাসত, চিত্রলেখাকে ত্যাগ করা তার পক্ষে অসম্ভব!

গৃহে পৌছিয়ে বীজগুপ্ত চিত্রলেখার একটি চিঠি পেলে। চিঠিটা ছোট ও খুব সাধারণ কিন্তু একটা জীবনের বিস্তৃত কাহিনী, মনোবিজ্ঞানের যেন একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ! চিঠিটায় লেখা ছিল—

"পূজনীয়!—

আজ এমন একটা কাজ করতে চলেছি, যা কোন দিন করব ব'লে স্বপ্নেও ভাবি নি। আমি তোমাকে ভালবেসেছিলাম—আজও বাসি। কিন্তু জানো তো প্রেমেতে ত্যাগের প্রয়োজন হয়, আজ সেই ত্যাগ করতে চলেছি। আমি তোমার জীবনকে নষ্ট করে দিয়েছি, একজন যোগ্য পুরুষকে আমার প্রেম কর্ত্তব্যচ্যুত করে দিয়েছে। আজ তার'ই প্রতিকার করতে চলেছি। আমি এখন ভোগ-বিলাসকে বিসর্জন দিয়ে সংযম-ব্রত গ্রহণ করাই ঠিক করেছি। বিবাহ তোমাকে করতেই হবে, নিজের প্রয়োজন না হলেও আমার অনুরোধে তোমাকে বিবাহ করতে হবে।

"আমি জানি যে, আমি যত দিন থাকব তুমি কিছুতেই বিবাহ করবে না। তাই নিজেকে সরিয়ে নেওয়াই মনস্থ করেছি। এখন আমার কথা, আমি বিধবা ছিলাম, প্রেমের ডোরে বাঁধা পড়ে কর্ত্তব্যভ্রষ্টা হয়েছি—একবার আবার কর্ত্তব্য পালন করব—বৈধব্য-সংযম পালন করবার চেষ্টা করব।

তোমার—চিত্রলেখা।"

সেনাপতি চিঠিখানা পড়ে। সমস্ত পৃথিবীটা তার চোখের সামনে একবার ঘুরপাক খেয়ে যায়। চিঠিখানা শ্বেতাংকের হাতে দিয়ে ভিতরে চলে যায়। সে যা হবার ভয় করেছিল তাই হয়ে গেল—চিত্রলেখা ও কুমারগিরি। কি বিচিত্র যোগাযোগ! বীজগুপ্ত হঠাৎ বলে ওঠে,—"না, এ অসম্ভব! এ দু'জনা কখনও একসংগে থাকতে পারে না, এ কিছুতেই হ'তে পারে না, এ একেবারে অসম্ভব!"

কিন্তু এতে তার কি আসে-যায়? সম্ভব হ'ক বা না হ'ক—এতে তার কি সম্পর্ক? সে ভেবে কূলকিনারা করতে পারে না যে কি করে চিত্রলেখা যোগীর প্রতি আকৃষ্টা হ'ল! তবে কি একেই প্রেম বলে? তাহলে কি আত্মার সম্বন্ধ স্থায়ী নয়? তবে কি নর্ত্তকী যা বলেছিল তাই ঠিক বা আত্মার সম্বন্ধ অনন্ত নয়?

কিন্তু এরও তো কোন নিশ্চয়তা নেই যে চিত্রলেখা বীজগুপ্তকে আর ভালবাসে না—চিঠিতে তো সে এ কথা কোন যায়গায় বলে নি! চিঠিতে তো সে অন্য কিছু বলতে চেয়েছে—সে বলতে চেয়েছে যে প্রেমের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ ত্যাগ ও আত্ম-বলিদান এবং সে সেই পথ বেছে নিতে চলেছে। তাকে সুখী করবার জন্য নর্ত্তকীর এই মহান ত্যাগ! সে নর্ত্তকীকে কোন মতেই অবিশ্বাস করতে পারে না। চিত্রলেখা সত্যিই দেবী! কিন্তু সে এক ভীষণ ভুল করছে। বীজগুপ্তকে জীবনে সুখী না করে এতে সে শুধু তাকে দুঃখ দিয়েই যাবে? বিবাহ করা বীজগুপ্তের পক্ষে অসম্ভব—সে শুধু একজন স্ত্রীলোককেই পৃথিবীতে ভালোবাসে, আর সে হ'ল চিত্রলেখা—বিবাহ ও প্রেমের ভিতর এক গভীর সম্বন্ধ থাকে।

সেনাপতি কিছুতেই ঘুমোতে পারে না। সে সময় প্রায় অর্দ্ধরাত, সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ে ও পায়ে হেঁটে যোগী কুমারগিরির আশ্রমের দিকে চলতে থাকে।

যোগীর কুটিরে এসে দেখে যে, কুটিরে তখনও আলো জ্বলছে। আর আসনে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় যোগী উপবিষ্ট, এক কোণে কুশাসনের ওপর নর্ত্তকী চিত্রলেখা শায়িতা। এত দিন বীজগুপ্ত চিত্রলেখাকে শুধু ঐশ্বর্য্যের ভিতর দেখেছে কিন্তু এবারে তাকে দেখে প্রগাঢ় শান্তির আশ্রয়ে। দেহ আবরণহীন, কেশ অবিন্যস্ত ও চেহারায় মাদকতার লেশমাত্র নেই। সারা মুখখানিতে কে যেন শান্তির প্রলেপ দিয়ে গেছে! মনে হচ্ছে যেন কোন স্বপ্নলোকের শান্তিরূপী দেবীর চরণে সে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে। সেনাপতি নর্ত্তকীর মাথার কাছে বসে অনিমেষ পলকে তাকে দেখতে থাকে!

সকাল হয়ে যায়, যোগীর সমাধি ভাংগে, চিত্রলেখা ঘুম থেকে ওঠে। দু'জনা একসঙ্গে বীজগুপ্তকে দেখতে পায়, ও একসঙ্গে বলে ওঠে "আরে, এ যে বীজগুপ্ত!"

বীজগুপ্তকে দেখে যোগী আশ্চর্য্যান্বিত কিন্তু চিত্রলেখা ভীতসন্ত্রস্তা! সেনাপতি যোগীকে প্রণাম করে, যোগী আশীর্ব্বাদ করেন।

সেনাপতি ধীরে বলে, "চিত্রলেখা!"

নর্ত্তকী উত্তর দেয়, "বীজগুপ্ত!"

বীজগুপ্ত অনেক কিছু বলবার জন্য এসেছিল কিন্তু সব ভুলে যায়। সাহসে বুক বেঁধে বলে ফেলে, "চিত্রলেখা, তুমি এসব কি করলে?"

নর্ত্তকী মাথা নীচু করে নেয়, যেন সে এক কত বড় অপরাধ করেছে। তার চোখ দিয়ে দু' ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে। পরে আস্তে আস্তে বলে, "বীজগুপ্ত! তুমি যা কিছু দেখছ, এই আমার শেষ নির্ণয়।"

"কিন্তু নিজের নির্ণয়ের ওপর আবার বিচার করবার অধিকারও তোমার আছে—সিদ্ধান্তে পৌছবার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করবার কি প্রয়োজন ছিল না? আমাকে কি তোমার জীবনে এতই তুচ্ছ মনে করলে যে, একবার নিজের মনের কথা আমাকে জানাবার প্রয়োজনও বোধ করলে না? চিত্রলেখা, প্রেম পরস্পরের ভিন্নভাবকে দেখে না, দুটো হৃদয়ের অভিন্নতার প্রতীক হ'ল প্রেম। তুমি কি মনে কর যে, তোমার এ নির্ণয় দ্বারা আমাকে তুমি বিবাহ করতে বাধ্য করবে, যদি তাই মনে করে থাক, তাহলে তোমার ধারণা একেবারে ভুল! শুধু জেনে রাখ যে, এ নির্ণয় দ্বারা তুমি আমাকে সুখী করতে পারবে না—জীবনে আমি শুধু তোমাকেই ভালোবেসেছি এবং তোমাকে ছাড়া আর কী কাউকে ভালোবাসতে পারি না? আমার বিবাহ করা একেবারে অসম্ভব!

চিত্রলেখা বীজগুপ্তের পায়ে লুটিয়ে পড়ে,-একবার তার মনে হয় যে, এখনি উঠে সে বীজগুপ্তের সংগে চলে যায়, কিন্তু হঠাৎ থেমে যায়। অনেক দূর সে এগিয়ে এসেছে, এখন পিছনে ফিরে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব! বীজগুপ্তের পায়ে পড়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। বীজগুপ্ত তাকে তুলে নেয়। শান্ত হয়ে নর্ত্তকী বলে, "বীজগুপ্ত! তুমি পূজ্য, তুমি মানুষ নও, তুমি দেবতা! আমি তোমাকে জানি,

কিন্তু সংগে সংগে আমি এ-ও জানি যে, তোমাকে ভালবেসে আমি তোমার জীবন নিরর্থক করে দিয়েছি। বীজগুপ্ত, তোমাকে বিয়ে করতেই হবে। তুমি আমাকে ভালবাস, আমাকে সুখী করা তোমার কর্ত্তব্য। যত দিন না তুমি বিয়ে করবে, যত দিন না তোমার ছেলে আমাকে 'মা' বলে না ডাকবে, আমি সুখী হতে পারব না। তুমি বিয়ে কর কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে চিরকাল ভালবেসে যাব। প্রেমের প্রধান লক্ষ্য কী শুধু ভোগ-বিলাস, ভোগ-বিলাস ছাড়া প্রেম কি অসম্ভব? এখন থেকে আমি তোমার সংগে শুধু দৈহিক সম্বন্ধ ছিন্ন করে দিচ্ছি কিন্তু এর পর আমাদের দু'জনার আত্মার সম্বন্ধ আরও গভীর ভাবে বেড়ে যাবে।"

সেনাপতি শুধু বলে, "চিত্রলেখা! আর একবার ভেবে নাও। তুমি আমাকে যা করতে বলছ তা করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব!"

চিত্রলেখা সেনাপতির গলা জড়িয়ে ধরে বলে, "বীজগুপ্ত! কিছুদিন আমরা দু'জন আলাদা থেকে দেখিই না, হয়ত তুমি বিয়ে করলেও করে ফেলতে পার। প্রেমেতে কি বিচ্ছেদ নেই? সেই বিচ্ছেদকে-ই আমরা একটু সহ্য করি না কেন?"

বীজগুপ্ত উঠে দাঁড়ায়। যা কিছু বলবার ছিল বলেছি, এখন মানা-না-মানা তোমার ওপর।···আচ্ছা, তুমি যে রকম চাইছ তাই হ'ক, কিন্তু কিছু দিন পরে বুঝতে পারবে যে তুমি ভুল করেছ!" এই কথাগুলো বলে সে ওখান থেকে চলে যায়। রাজপথ পর্য্যন্ত এগিয়ে দেবার জন্য চিত্রলেখা সংগে সংগে আসে। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পথ একেবারে নির্জন, শুধু দু'জন চলেছে, হঠাৎ নর্ত্তকী বীজগুপ্তের হাত ধরে কাছে টেনে এনে আলিংগন করে ও সজোরে চুম্বন করে। এ যেন প্রিয়তমের কাছ থেকে তার বিদায়ের শেষ মৌন-বাণী। বীজগুপ্ত নর্ত্তকীর চুম্বনে এমন এক মাদকতা, প্রেমের এমন এক আস্বাদ পায়, যা সে কয়েক বছর অনুভব করেনি। বিদায় নেবার সময় নর্ত্তকী বীজগুপ্তের পা জড়িয়ে ধরে বলে, "বীজগুপ্ত! হয়ত আমি যা করেছি তা অনুচিত হয়েছে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।"

জীবনের দেবতাকে শেষ বারের মত প্রণাম করে নর্ত্তকী কুটিরে ফিরে আসে। ফিরে এসে দেখে যে, যোগী কুমারগিরি গভীর চিন্তায় মগ্ন—কিছুক্ষণ নর্ত্তকীকে আসতে দেখে যোগী তাকে বসতে ইংগিত করে বললেন, "চিত্রলেখা! তুমি একদিন আমাকে বলেছিলে যে তুমি আমাকে ভালবাস! বল, সে কথা কি সত্যি?"

যোগীর প্রশ্ন শুনে চিত্রলেখা অবাক হয়ে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ, কিন্তু তা'তে আপনার কি এসে-যায়?"

"কিন্তু এই মাত্র তুমি বীজগুপ্তকে বললে যে তুমি তাকে ভালবাস ও চিরকাল বাসবে?"

"হ্যাঁ, তা-ও ঠিক!"

"কিন্তু দু'জন ব্যক্তিকে একসংগে ভালবাসা কোন নারীর পক্ষে অসম্ভব!" যোগীর প্রশান্ত মুখে অবিশ্বাসের রেখা দেখা যায়।

"আপনি কেন মনে করছেন যে এ অসম্ভব? গুরুদেব, পুরুষে দুই বিবাহ করতে পারে এবং দু'জন পত্নীকে ভালবাসতে পারে, তবে স্ত্রীলোক-ই বা তা করতে পারবে না কেন? স্ত্রী যেমন নিজের স্বামীকে ভালবাসতে পারে ঠিক তেমনি ভালবাসতে পারে নিজের সন্তানকে। একই সময়ে কয়েক জনের সংগে আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়!"

"নর্ত্তকী! এমনও তো হতে পারে যে তুমি আমাকে অথবা বীজগুপ্তকে অথবা নিজেকে প্রবঞ্চনা করছ?"

"আমি আপনাকে প্রবঞ্চনা করছি না, এটুকু আপনি বিশ্বাস করতে পারেন গুরুদেব! হয়ত বীজগুপ্তকে কিংবা নিজেকেই প্রবঞ্চনা করতে চলেছি।"

"না, তা হতে পারে না, চিত্রলেখা! আর একবার ভাল করে দেখে নাও। এ তুমি নিশ্চয় জেনো যে আমার সংগে থেকে তুমি বীজগুপ্তকে ভালবাসতে পারবে না, আমার সংগে থেকে তোমাকে পার্থিব-জগতের উর্দ্ধে উঠতে হবে। আমার কাছে তপস্যার শুদ্ধ-ক্ষেত্র, হৃদয়-দুর্বলতার কোন স্থান নেই এখানে। আমি তোমাকে আর একবার ভেবে নেবার সময় দিচ্ছি।"

"ভেবে নিয়েছি গুরুদেব, ভাল করেই ভেবে নিয়েছি। তুমি যা বলবে তাই করব। তুমি বললে আমি আমার আমিত্বকে ছেড়ে দিতে প্রস্তুত আছি, পার্থিব জগতের মায়া, মোহ, ভোগ, বাসনা তো অতি সহজেই ছেড়ে দেব।"

যোগী নর্ত্তকীকে ঠিক বুঝতে পারে না। যোগী একবার ভাবে যে, চিত্রলেখা বুঝুক যে তার পক্ষে তাকে দীক্ষা দেওয়া অসম্ভব···সে বলে, "নর্ত্তকী! তোমাকে বুঝতে পারলাম না, তোমার ব্যক্তিত্ব আমার ব্যক্তিত্বের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, তাই আমার পক্ষে তোমাকে দীক্ষা দেওয়া কতটা সংগত হবে তা ঠিক করা দরকার, যতক্ষণ পর্য্যন্ত এর কোন নির্ণয় করতে না পারি···" যোগীর কথা শেষ হবার আগেই বিশালদেব কুটিরে প্রবেশ করলে। শিষ্যকে দেখে যোগী থেমে গেলেন। কথাগুলো শেষ করতে পারলেন না। শিষ্য গুরুকে প্রণাম করে চিত্রলেখাকে অভিবাদন জানিয়ে চলে যায়।

শিষ্য চলে যাবার পর কুমারগিরি হেসে উঠলেন—ভগবানের বোধ হয় এই ইচ্ছে যে আমি তোমাকে দীক্ষা দিই, তোমাকে আমার সংগে রাখি ও নিজেকে পরীক্ষা করি। নর্ত্তকী, এখন যা বললাম তা নিয়ে বেশী চিন্তা কোর না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

দিনের পর রাত আবার রাতের পর দিন।

সুখের পর দুঃখ আবার দুঃখের পর সুখ।

রাত না থাকলে দিনের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ হয় না, আবার দিন না হলে রাতের কোন মূল্যই থাকে না, ঠিক তেমনি করে দুঃখ বিনা সুখের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সুখ ছাড়া দুঃখের উপলব্ধি করাও সম্ভব নয়।

পরিবর্তনশীল জগতের এই-ই নিয়ম। জগৎ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে চলে, মানব সেই জগতের এক অংশ। বীজগুপ্ত সেই মানবজাতির একজন—সুখ কি তা সে অনুভব করেছে, এখন দুঃখ জানাও তার পক্ষে আবশ্যক। কিন্তু আপন দুঃখের কথা ভেবে সে বিচলিত হয়ে ওঠে। যে কথায় সে কোন দিন কল্পনা পর্য্যন্ত করে নি তাই ঘটে গেছে। তার আশ্চর্য্য লাগে যে, সে এখনও কি করে বেঁচে আছে!

তবুও সুখ-দুঃখ সহ্য করবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, দুঃখের কাছে হার মানা কাপুরুষতার পরিচায়ক। চিত্রলেখার বিচ্ছেদ-বেদনা সে যেমন করে হ'ক সহ্য করবে ঠিক করে ফেললে।

সে শুধু ভাবে যে, এই পথে তার একটি বাধা আছে। পাটলিপুত্রে থাকলে পর চিত্রলেখার সংগে তার দেখা হবে, তখন বিয়োগরূপা যে তপস্যা সে গ্রহণ করতে চলেছে তা হয়ত সম্ভব হয়ে উঠবে না।··· তার চেয়েও বড় আর একটা কথা—যখন অন্যান্য সেনাপতিরা জানতে পারবে যে চিত্রলেখা বীজগুপ্তকে ত্যাগ করে সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে তখন সে তাদের কাছে মুখ দেখাবে কি করে?···আরও একটা বিষয় তাকে চিন্তিত করে তোলে। যশোধরা যদি তার জীবনে এসে দাঁড়ায়?

সারা দুপুর সে এই সব সমস্যার সমাধান করবার চেষ্টা করে কিন্তু যতই সে সমাধানের চেষ্টা করে ততই যেন সমস্যা আরও জটিল হয়ে ওঠে। শেষে সে হাল ছেড়ে দেয়, তার হৃদয় দুঃসহ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। সন্ধ্যাবেলায় সে শ্বেতাংককে বলে, "শ্বেতাংক, তোমার সংগে একটা কথা আছে।"

"প্রভু, কি কথা?"

"চল, আমরা কাশী যাই—কিছুদিন দেশ-পর্য্যটন করবার ইচ্ছে হচ্ছে।"

শ্বেতাংক আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু প্রভু! এত তাড়াতাড়ি কেন?" শ্বেতাংকের ইচ্ছে যে, আরও বেশ কিছু দিন থেকে যশোধরার সংগে তার প্রেম নিবিড় করে তোলে। "আরও দশ বারো দিন অপেক্ষা করলে হয় না? এত অল্প সময়ে সব ব্যবস্থা করে নেওয়া কি সম্ভব হয়ে উঠবে?"

সেনাপতি উত্তর দেয়, "না শ্বেতাংক, আমাদের পর্শুর মধ্যে রওনা হতে হবে—ব্যবস্থা করতে কিছুই সময় লাগবে না।"

"প্রভুর যেমন আদেশ!"

প্রভুর এই সিদ্ধান্ত শ্বেতাংকের মনঃপূত হয় না কিন্তু সে করবেই বা কি? একবার ভাবলে যে, বীজগুপ্তের সংগে সে যদি রাজী না হয়, তাহলে কেমন হয় কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তার সাহসে কুলোয় না, তার মন বলে যে, এক্ষেত্রে অস্বীকার করা তার পক্ষে নীচতা হবে। সকালে উঠে সে সেনাপতিকে বলে, "প্রভু, একবার আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের সংগে দেখা করে আসবার অনুমতি চাইছি।"

"কেন? তার সংগে দেখা করবার তোমার কি প্রয়োজন?"

"এমনি, বাইরে যাচ্ছি আমরা, অনেক দিন হয়ত বাইরে থাকতে হবে। তাই তাঁর কাছে বিদায় নেবার জন্য যেতে চাইছি!"

"আচ্ছা, যেতে পারো!" বীজগুপ্ত মনে মনে হাসে আর ভাবে যে একজন প্রেম করে অনুশোচনার আগুনে জ্বলছে, আর একজন প্রেম করবার জন্য পাগল!

আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের গৃহে পৌঁছিয়ে শ্বেতাংক দেখে যে আর্য্য গৃহে নেই, দাসীকে বলে, "দেবী যশোধরার কাছে গিয়ে বল যে, সেনাপতি বীজগুপ্তের কাছ থেকে শ্বেতাংক এসেছে।"

কিছুক্ষণ পরে দাসী ফিরে এসে বলে, "দেবী আপনাকে ভিতরে ডাকছেন।" যশোধরার কাছে গিয়ে তাকে অভিবাদন করে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই বলে ফেলে, "দেবি, কাল আর্য্য বীজগুপ্তের সংগে পাটলিপুত্র ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হয়ত অনেক দিন পর্যন্ত বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে হবে। তাই যাবার আগে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিতে এসেছি।"

শ্বেতাংকের কথা শুনে যশোধরার মুখের বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় না—"আর্য্য বীজগুপ্ত বাইরে যাচ্ছেন কিন্তু কাল তো তিনি পাটলিপুত্র থেকে চলে যাবার কোন কথা বললেন না?"

যশোধরার তার প্রতি এই ঔদাসীন্য মোটেই ভাল লাগে না। সে এক রকম রেগেই বলে, "হ্যাঁ, আপনি বোধ হয় জানেন না যে, নর্ত্তকী চিত্রলেখা আর্য্য বীজগুপ্তকে পরিত্যাগ করে যোগী কুমারগিরির কাছে দীক্ষা নিয়েছে।"

এবারে যশোধরা চমকে ওঠে, "কি বললে? চিত্রলেখা বৈরাগ্য গ্রহণ করেছে? কি বলছ? তাহলে তো আর্য্য বীজগুপ্ত নিশ্চয় খুব দুঃখ পেয়েছেন? চিত্রলেখার সংগে সেদিন পরিচিত হবার পরেই বুঝতে পেরেছিলাম যে সে সাধারণ নারী নয়। সে দেবী! আর্য্য বীজগুপ্তের জন্য সে জীবনের সবচেয়ে বড় ত্যাগ করতে পারে!"

আঘাত দিতে গিয়ে শ্বেতাংক নিজেই আঘাত পায়, প্রতিহিংসা-অনলে সে জ্বলে ওঠে, "এবং আমি এ-ও জানি যে বীজগুপ্ত চিত্রলেখা ছাড়া অন্য কোন নারীকে ভালবাসতে পারে না। এবার বুঝতে পেরেছি কেন তিনি বিদেশ যাত্রা করছেন। এত দুঃখ তাঁর সইবে কেন? তাঁর মনের অবস্থা এখন এমন যে, পাটলিপুত্রে থাকলে হয়ত তিনি আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করে ফেলতে পারেন।"

"শ্বেতাংক, তুমি ঠিক বলেছ···আমিও আর্য্য বীজগুপ্তকে কিছুটা জানতে পেরেছি, আজ তোমার কথায় আমার সেই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়ে গেল। যে উচ্চস্তরে তিনি বিচরণ করেন তার তুলনায় আমি তাঁকে কোন দোষে দোষী করতে পারছি না। এর পর তাঁর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গেল।"

শ্বেতাংক রাগে পাগলের মত হয়ে যায়—"দেবি! এখনও আমি বুঝে উঠতে পারলাম না যে বীজগুপ্ত বা অপর কোন পুরুষের পক্ষে এক নর্ত্তকীর প্রেমে পাগল হয়ে যাওয়া কতটা সমীচীন! হ্যাঁ, আরও একটা কথা! দুঃখ হলে এত অধীর হয়ে ওঠা দুর্বল ব্যক্তিত্বের লক্ষণ নয় কি?"

তার এই অকারণ ক্রোধের কারণ যশোধরা বুঝতে পারে না। সে গম্ভীর হয়ে উত্তর দেয়, "আর্য্য শ্বেতাংক! হয়ত তুমি যা বলছ সব ঠিক, তোমার যুক্তি হয়ত খণ্ডন করতে পারব না কিন্তু তবুও বলব যে আর্য্য বীজগুপ্তের কোন দোষ নেই। চিত্রলেখা তাঁর দৃষ্টিতে ও তাঁর জীবনে শুধু এক নর্ত্তকী ন'ন, তিনি তাঁর পত্নীর সমান। এ কথা তুমিও জানো, আমিও জানি এবং সমস্ত জগৎ জানে। প্রত্যেক মানুষের ভিতর দুর্বলতা থাকে, সে কখনও স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় না। দুর্বলতার জন্য কোন ব্যক্তিকে মন্দ বলা বা তার সংগে শত্রুতা করা উচিত নয়। কারণ এভাবে একজন অপরের বন্ধু হতে পারে না। শুধু তাই না, সে জগতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে মন্দ বলবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি তার শত্রু হবে। পরিণামে তার জীবন ভারস্বরূপ প্রতীত হবে। মানুষের কর্ত্তব্য অপরের দুর্বলতার প্রতি সহানুভূতি দেখান"।

শ্বেতাংকের বিরোধী মন এ-সব কিছুই বুঝবার চেষ্টা করে না, কর্ত্তব্যের কাছে সহানুভূতি ও দয়ার স্থান নেই। দুর্বলতাকে দূর করে মানবের সেই দুর্বলতা দূর করে দেওয়াই উচিত। যশোধরা হেসে উত্তর দেয়, "কিন্তু আমার মনে হয় যে মানবের উচিত প্রথমে তার দুর্বলতাকে জয় করা। আর্য্য শ্বেতাংক, অপরের দোষ দেখা খুবই সহজ এবং আপন দোষকে গুণ মনে করা জগতের নিয়ম। সেই

মানবই শ্রেষ্ঠ যে কোথায় নিজের দুর্বলতা জেনে তাকে দূর করবার চেষ্টা করে"।

এই কথাগুলো শ্বেতাংকের হৃদয়ে শেলের মত গিয়ে বেঁধে। সে বুঝতে পারে না যে কথাগুলো যশোধরা তাকেই ব্যংগ করে বলেছে। কিন্তু যশোধরা যা বলেছে সবই ঠিক, এর ভিতর বৌদ্ধগুপ্তের প্রতি ইংগিত আছে। কারণ বৌদ্ধগুপ্ত তার নিজের দুর্বলতা কোথায় তা জানে এবং সে দুর্বলতা দূর করবার চেষ্টাও সে করছে। আবার শ্বেতাংকের প্রতিও কথাগুলো প্রযোজ্য। কারণ, সে অপরের দোষের মীমাংসা করবার চেষ্টা করছে এবং মনের ভিতর প্রতিহিংসাময় ভাব রাখা যে মন্দ তা সে মনে করছে না। বিমূঢ়ের মত কাঁপতে কাঁপতে শ্বেতাংক বলে, "দেবি, আমার ভুল হয়েছে, তোমার সামনে আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তকে মন্দ বলা আমার উচিত হয় নি—আমি ক্ষমা চাইছি ও কথা দিচ্ছি যে, ভবিষ্যতে আমার দ্বারা এরকম ভুল আর হবে না"।

'আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তকে তোমার সামনে মন্দ বলা উচিত হয় নি।' কথাগুলো শুনে যশোধরা রাগে জ্বলে ওঠে। কিন্তু পরক্ষণেই শ্বেতাংকের এই অকারণ ক্রোধের হেতু বুঝতে পেরে বলে, "আর্য্য শ্বেতাংক! তোমার ভুল ধারণা যে আমি আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তকে ভালবাসি।"

অনিচ্ছা বশতঃই শ্বেতাংক কথাগুলো বলে ফেলেছিল এবং তার জন্য সে অনুতাপও করছিল। কিন্তু যে কথাগুলো সে একবার বলে ফেলেছে, সেগুলোকে সে তো ফিরিয়ে নিতে পারে না! সে যশোধরার কাছে এসে করযোড়ে বলে, "দেবি, আমাকে ক্ষমা কর। আমি এক বিরাট অন্যায় করে ফেলেছি কিন্তু সে-সময়ে আমার কোন জ্ঞান ছিল না। তুমি বোধ হয় জানো না যে, আমি এত কঠোর হয়ে গেলাম কেন?"

"কেন?" কারণ অনুমান করেও যশোধরা শ্বেতাংকের নিজের মুখ থেকে শুনতে চাইলে।

"কারণ—আমি তোমাকে ভালবাসি।"

যশোধরা শ্বেতাংকের দিকে তাকিয়ে বলে, "ভারী আশ্চর্য্য তো, আর্য্য শ্বেতাংক!"

যশোধরার কথা শুনে শ্বেতাংকের সব আশা মিলিয়ে যায়। যশোধরা তাকে ভালবাসে না—কথাটার ভিতর যে কত গুরুত্ব, কত বড় সত্য লুক্কায়িত আছে, তা যদি কেউ বুঝতে পারত! সে বলে, "দেবি, আমি জানি যে তুমি আমাকে ভালবাস না, কিন্তু আমি তোমাকে ভালবাসি।" আমি তোমাকে এসব কথা বলতাম না, কারণ প্রেম শুধু করা যায়, বলা যায় না, কিন্তু এ সময় ঐ প্রসংগ চলছিল বলেই আমি কথাগুলো বলে ফেলেছিলাম। এই কঠোরতা ও দুঃসাহসের জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি।"

যশোধরা উঠে দাঁড়ায়, "আর্য্য! ক্ষমা চাইবার কোন প্রয়োজন নেই। আমি তোমাকে কোন দোষ দিচ্ছি না। জীবনে এরকম প্রত্যহ হয়ে থাকে, কত বার ক্ষমা চাইবে? আচ্ছা, এখন দেখি, বোধ হয় পিতা এসে গেছেন।"

যশোধরা চলে যায়। শ্বেতাংকের মনে হ'ল যে সে এক ভয়ানক ভুল করেছে। সে যশোধরার সংগে দেখা করতে এসেছিল। নিভৃতে অনেকক্ষণ তার সংগে কথা বলবার সুযোগও সে পেল। এ রকম মূর্খতা না করলে বোধ হয় আরও অনেকক্ষণ যশোধরাকে সে কাছে পেত। এখন আর ওখানে বসে থাকা নিষ্প্রয়োজন, যে কাজের জন্যে সে এসেছিল সে কাজ তো নষ্ট হয়ে গেছে। সে উঠবে উঠবে করছে, এমন সময়ে মৃত্যুঞ্জয় ঐ ঘরে প্রবেশ করলেন।

আর্য্যশ্রেষ্ঠ জিজ্ঞেস করেন, "বৎস শ্বেতাংক, শুনলাম যে বৌদ্ধগুপ্তের সংগে দেশভ্রমণে যাচ্ছ?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ, আর্য্যশ্রেষ্ঠ, আমরা কালই যাচ্ছি।"

"কোথায় যাবার ইচ্ছে আছে?"

"কাশী।"

"কবে ফিরবে?"

"তার কোন নিশ্চয়তা নেই, আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তের যখন ইচ্ছে হবে।"

যশোধরা পিতাকে বলে, "পিতা, আপনি কখনও দেশ পর্য্যটনে যান না কেন? আমি কখনও কাশী যাইনি, চলুন না আমরাও আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তের সংগে কাশী ঘুরে আসি।"

মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "কথাটা মন্দ নয়, কাশী পাটলিপুত্র থেকে বেশী দূরে নয়। কিন্তু মা, এত তাড়াতাড়ি সব ব্যবস্থা করে নেওয়া কি সম্ভব হবে?"

"সব কিছু সম্ভব। পিতা, আপনি যদি অনুমতি দেন তো সন্ধ্যার ভিতর যাবার সব ব্যবস্থা করে ফেলব।"

"মা, তোমার এই অনুরোধকে অগ্রাহ্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যদি ব্যবস্থা করে নিতে পার তো আমার কোন আপত্তি নেই। শুধু এই বৃদ্ধ বয়সে আমাকে বেশী টানাটানি কোর না।"

শ্বেতাংকের বিষণ্ন মন আরও বিমর্ষ হয়ে পড়ে। সত্যিই যশোধরা বৌদ্ধগুপ্তকে ভালবাসে, তাই এত তাড়াতাড়ি কাশী যাবার জন্য তার এই প্রস্তুতি। কিন্তু মনকে সে এই বলে বোঝায় যে, বৌদ্ধগুপ্ত তো যশোধরাকে ভালবাসে না, এ ক'দিন সংগে থেকে যশোধরা বুঝতে পারবে যে কে তা'কে ভালবাসে।

যশোধরা শ্বেতাংককে বলে, "আর্য্য শ্বেতাংক, আমরাও তোমাদের সংগে যাবো—এ কথা আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তকে জানিয়ে দিও।"

মৃত্যুঞ্জয় ইতস্ততঃ করতে করতে বলেন, "কিন্তু মা, তোমার ব্যবস্থা তো কর। যদি কালকের মধ্যে ব্যবস্থা করতে না পার তাহলে আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তের একটা দিন বৃথা নষ্ট হয়ে যাবে।"

"ব্যবস্থা আমি নিশ্চয় করে নেব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আর্য্য শ্বেতাংক, আমরা কাল নিশ্চয় যাব।"

"তাহলে এবার আজ্ঞা দিন, আর্য্যশ্রেষ্ঠ! আমি আর্য্য বৌদ্ধগুপ্তকে আপনাদের যাবার সংবাদ দেব।" যশোধরাকে বলে, "দেবি, যদি একা সব ব্যবস্থা করতে না পারেন আমাকে বলবেন, আমি সন্ধ্যার সময় আসতে পারি।"

"ধন্যবাদ আর্য্য! সন্ধ্যার সময় আসবেন, যদি আপনার করবার মত কোন কাজ থাকে তাহলে নিশ্চয় বলব।"

শ্বেতাংক বৌদ্ধগুপ্তকে গিয়ে বলে, "প্রভু, আর্য্যশ্রেষ্ঠ আমাদের সংগে তাঁর কন্যাকে নিয়ে কাশী যাত্রা করতে ইচ্ছুক, আমাকে দিয়ে বলে পাঠালেন যে, কাল আমাদের সংগে যেতে পারলে খুব ভাল হয়।"

এ রকম প্রস্তাবের জন্য বৌদ্ধগুপ্ত মোটেই প্রস্তুত ছিল না। যে সব কারণের জন্য সে বিদেশ যাত্রা করতে মনস্থ করেছে, তাদের মধ্যে একটি কারণকে সে তো কাটাতে পারলে না। কিন্তু এখন করাই বা কি যেতে পারে—অন্যমনস্ক হয়ে সে উত্তর দেয়—"বেশ, ভাল কথা।"

[ক্রমশঃ।

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বাইশ

বিভূতি ঘর থেকে বের হয়ে গেল। এত রাত্রে কোথায় কি পাবে? মাকে ডেকে তুললে হয়ত তিনি কিছু ব্যবস্থা করতে পারতেন কিন্তু কি জানি কেন, বিভূতি মাকে ডাকতে সাহস পেল না। ভাঁড়ারঘর থেকে খুঁজে খুঁজে গোটা দুই কলা, কিছু মুড়ি, খানিকটা গুড় নিয়ে ঘরে ফিরে এসে দেখে, চেয়ারের উপরে বসে বসেই শেখর ইতিমধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

ডেকে তুলল বিভূতি, শেখর! শেখর!

হ্যাঁ! কে! ও বিভু!···ঘুমজড়িত চোখ মেলে তাকাল শেখর অতি কষ্টে।

এই নে। এই যা পেলাম, আর ত কিছু পেলাম না ভাই!

এতেই হবে। দে—

দুই দিনের অনাহারী ক্ষুধার্ত শশাংক গোগ্রাসে যেন বিভূতির আনীত মুড়ি, কলা ও গুড় খেয়ে এক গ্লাস জল পান করে কিছুটা তৃপ্ত হলো।

একটা সিগারেট দে—

টেবিলের উপর প্যাকেট ছিল, সেটা ও দেয়াশলাইটা এগিয়ে দিল বিভূতি শশাংকের দিকে।

সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে টান দিতে দিতে শশাংক বললে, দুটো দিন ও একটা রাত রেলওয়ে ইয়ার্ডে একটা খালি ওয়াগনের তলায় লুকিয়ে কাটিয়েছি। তার পর হঠাৎ তোর কথা মনে হলো। মনে হলো আর কারো কাছে না পাই, তোর কাছে একটু আশ্রয় পাবোই! তাই চলে এলাম। সদর দিয়ে ঢুকতে সাহস হলো না, প্রাচীর টপকে ঢুকেছি। ভাবছিস্, এই মাঝ রাত্রে তোর বাড়িতে প্রাচীর টপকে এসে ঢুকে, তোর ঘুম ভাঙ্গিয়ে এই চেহারায়—এ-সব কি আমি বলছি, তাই না।···

না। মানে—

আজ নয় ভাই! একদিন সব বলবো। শুধু এইটুকু তোকে আমার বলা উচিত—আমি, আমি আজ একজন পলাতক খুনী আসামী।

সে কি! বিস্ময়ে যেন হাঁ হয়ে যায় বিভূতি।

হাঁ। সবই হয়ত একদিন জানতে পারবি। ধরা পড়বার ভয়েই আত্মগোপন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

কিন্তু—

ভয় নেই ভাই! তোকে বিপদে ফেলবো না। শুধু একটা দিন বিশ্রাম চাই। একটু ঘুমাতে চাই। তারপর চলে যাবো। একটা দিন আমাকে একটু জায়গা দিবি ভাই?

বেশ ত থাক না! বাবা কাশ্মীর বেড়াতে গিয়েছেন। বাড়িতে আমি আর মা দু'জনে আছি।

তোকে যে কি বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো ভাই!

আমাকে সব কথা খুলে বল শেখর!

বলবো। তবে বললাম ত আজ নয়। কারণ, ব্যাপারটা এখনো আমার কাছেও অস্পষ্ট দুর্বোধ্য—আর তা ছাড়া ঘুমে আমার দু' চোখ একেবারে জড়িয়ে আসছে। একটু ঘুমাতে চাই।

তুই আমার বিছানায় শো।

তুই?

পাশের ঘরে আমি গিয়ে শুচ্ছি। তুই ভিতর থেকে দরজা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমো।

পরের দিনই সংবাদপত্রে মফঃস্বল সংবাদে প্রকাশিত হলো।—

"লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড! কৃষ্ণসায়রে জমিদারের আরাম-কুটিরে লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড!!"

"কৃষ্ণসায়রে জমিদার রায়েদের বাগানবাড়ি আরাম-কুটিরে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড! জমিদারের একমাত্র পুত্র শশাংকশেখর রায়, তার পিতার আরাম-কুটিরে অবস্থিত রক্ষিতা এক নারীকে বন্দুকের গুলীতে হত্যা করিয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। জমিদারপুত্র শশাংকশেখর রায়ই যে হত্যাকারী, ব্যাপারটা হয়ত কোন দিনই জানা যাইত না। কারণ, হত্যার দিন রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়-জল হইতেছিল। এবং সেই রাত্রেই হত্যা করিয়া শশাংকশেখর রায় নিরুদ্দেশ হন। স্থানীয় দারোগা অবনী অধিকারী সেই দিনই শেষ রাত্রের দিকে রহস্যজনক ভাবে কোন এক অপরিচিত ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আরাম-কুটিরে গিয়া হাজির হন। হাজির হইয়া সেখানে দেখেন, জমিদার রাজশেখর রায় তখন সেই নিহত নারীর গুলীবিদ্ধ মৃতদেহটি রাতারাতি আরাম-কুটিরের পশ্চাতের বাগানে প্রোথিত করিয়া হত্যার নিদর্শনকে চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। যাহা হউক, সময় মত দারোগা অবনী অধিকারী অকুস্থানে গিয়া উপস্থিত হওয়ায় হত্যার ব্যাপারটা আর জমিদার রাজশেখর রায়ের পক্ষে চাপা দেওয়া সম্ভব হয়নি। পুলিশ সর্বত্র সেই হত্যাকারী, নিরুদ্দিষ্ট শশাংকশেখরকে অনুসন্ধান করিয়া ফিরিতেছে।"

তারপরই শশাংকশেখরের চেহারার একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিয়ে যদি কেহ ঐ চেহারার কোন ব্যক্তিকে দেখেন, অবিলম্বে নিকটবর্তী থানায় সংবাদ দেবার জন্য অনুরোধ করেছে পুলিশের কর্তৃপক্ষ।

উক্ত ঘটনা সংবাদপত্রে প্রকাশ হবার পরই স্বর্ণর দেওয়া সোনার চুড়িগুলোর দু'খানি রেখে বাকীগুলো বন্ধু বিভূতির সাহায্যেই এক ব্যাংকে বন্ধক রেখে, কিছু টাকা সংগ্রহ করে শশাংক দিন চারেক বাদে বিভূতির বাড়ি থেকে বের হয়ে পড়লো ভ্রাম্যমান এক দালালের ছদ্মবেশে চন্দ্রকুমার রায় নাম নিয়ে।

লক্ষ্ণৌ, লাহোর, দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন একটা বছর ছদ্মবেশে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো শশাংক। তার পর দীর্ঘকাল পরে ঘুরতে ঘুরতে একদিন আকস্মিক ভাবে মীরাট থেকে পাটনার পথে ট্রেণের মধ্যে আলাপ হলো, ডায়মণ্ড থিয়েটারের মালিক সীতানাথ ঘোষের সঙ্গে। সীতানাথ তখন তার থিয়েটারের মন্দা যাবার জন্য বড় বড় সব শহরে তার দলবল নিয়ে শো দিয়ে অর্থোপার্জন করে ফিরছিলেন।

পাটনায় নামলেন সীতানাথ তার দলবল নিয়ে। চন্দ্রকুমারকেও ছাড়লেন না। এক প্রকার জোর করেই পাটনায় তাকে নামালেন। চন্দ্রকুমার তাদের সঙ্গে এক হোটেলেই উঠলেন। সেইদিনই সন্ধ্যায় শো।

কিন্তু ঠিক দ্বিপ্রহরে দলের এক বিশিষ্ট অভিনেতা বরেন্দ্র মিত্র দাস্ত ও বমি করে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চলে গেলেন। অথচ দলে দ্বিতীয় আর এমন কোন ব্যক্তি নেই যে বরেন্দ্রর পার্টটা করে দিতে পারে। সমস্ত টিকিট পূর্বাহ্ণেই বিক্রি হয়ে গিয়েছে, সীতানাথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো।

চন্দ্রকুমার ঘরের মধ্যে বসে বসে একখানা বই পড়ছিল, সীতানাথকে সেই ঘরে প্রবেশ করে মাথায় হাত দিয়ে বসতে দেখে শুধাল, কি ব্যাপার সীতানাথ বাবু!

সংক্ষেপে সীতানাথ বিপদের কথা বর্ণনা করে বললেন, এখন আমি কি করি বলুন ত চন্দ্র বাবু! বিদেশ-বিভূঁই জায়গা! এমন একটা এক্সট্রা লোক সঙ্গে নেই যে বরেন্দ্রর পার্টটা করিয়ে নেওয়া যেতে পারে আজকের রাতের মত! অথচ পার্টটাও অত্যন্ত ইমপর্টেন্ট নাটকে।

তাই ত, বড় বিপদের কথা ত!

তবে আর বলছি কি মশাই! সব টিকিট এ্যাডভান্স বিক্রি হয়ে গিয়েছে দু'দিনেরই শোর।

সীতানাথ ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। চন্দ্রকুমার বসে বসে হাতের বইটার পাতা অন্যমনস্ক ভাবে উল্টাতে লাগলো। হঠাৎ এক সময় মৃদু কণ্ঠে চন্দ্রকুমার ডাকলো, সীতানাথ বাবু!

বলুন।

দেখুন, বরেন্দ্র বাবু যে পার্টটা করতেন, সেটা ঠিক কি টাইপের?

বিশেষ বড় না। ছোটই—তাহলেও নাটকের সব চাইতে ইমপর্টেন্ট পার্শ্ব-চরিত্র। বেশ সিরিয়াস ক্যারেকটার।

হুঁ! দেখুন, কলেজে দু-চার বার আমি থিয়েটার করেছিলাম, নামও হয়েছিল ছাত্র ও শিক্ষক-মহলে, প্রশংসাও যে কিছু পাইনি তা'ও নয়। বলেন যদি আমি না হয় বরেন বাবুর পার্টটা একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি।

কথাটা শুনেই ওর দিকে তাকিয়েছিলেন সীতানাথ। বললেন, পারবেন? সাহস হয়? আপনার চেহারা ত এমনিতেই রাজপুত্রের মত! মানাবেও চমৎকার!

তবে একটা রিহার্শেলের ব্যবস্থা করুন। দেখি একবার চেষ্টা করে।

সেই রাত্রে বার দুয়েক রিহার্শেল দিয়ে চন্দ্রকুমার শোতে নেমে পড়ল। এবং তার সুগঠিত সুন্দর চেহারা, রসঘন উদাত্ত সুরেলা কণ্ঠের অভিনয়ে দর্শকজন একবাক্যে তার প্রশংসা করে গেল।

শো ভাঙ্গবার পর সীতানাথ বললেন, আরে মশাই, আপনি দেখছি সত্যিকারের হীরা! দু'বার রিহার্শেল দিয়েই যা দেখালেন, আপনাকে আর আমি কিন্তু ছাড়চি না। আসুন, আমার দলে দুইশ' টাকা করে আপনাকে মাইনা দেবো।

সীতানাথ পাকা জহুরী! চন্দ্রকুমারের এক রাত্রির অভিনয়েই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, চন্দ্রকুমারের স্বভাবতই এক অভিনয়-প্রতিভা আছে। মাজাঘষা করলে যে অভিনয়-প্রতিভা সকলকে একদিন বিস্ময়ে অভিভূত করে দেবে।

প্রথমটায় চন্দ্রকুমার রাজী হয় না সীতানাথের প্রস্তাবে। সীতানাথও ছাড়বার পাত্র নয়। শেষ পর্যন্ত কি ভেবে চন্দ্রকুমারও রাজী হয়ে যায়। অনির্দিষ্ট ভাবে ঘুরে ঘুরে আজ এখানে কাল সেখানে বেড়ানর চাইতে এবং একটা কিছু নিয়ে স্থির হয়ে থাকা যাবে। ত ছাড়া হাতের সঞ্চিত অর্থও তখন শেষ হয়ে এসেছে প্রায়।

চন্দ্রকুমার ফিরে এলো কলকাতায় এবং এসে এক হোটেলে উঠলো ঠিক সেই সময় ডায়মণ্ড থিয়েটারের সুদর্শন নট মোহিত চৌধুরী সীতানাথের সঙ্গে মতান্তর হওয়ায় দল ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেন অন্যত্র।

সীতানাথ টুর থেকে ফিরে এসেই বর্তমান ডায়মণ্ড থিয়েটারের বাড়িটা দশ বছরের জন্য লীজ নিয়েছিলেন এবং নতুন নাটক মহলায় ফেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রধান চরিত্রে চন্দ্রকুমারকেই নতুন নাটকে নামাবেন বলে স্থির করে নাটক মহলায় ফেললেন মোহিত চৌধুরীর জায়গায়।

নতুন নাটক,, নল-দময়ন্তী। নলের ভূমিকায় চন্দ্রকুমার অবতীর্ণ হবেন বলে প্রাচীর-বিজ্ঞপ্তি পড়লো সারা শহরে।

এবং মাত্র কয়েক রাত্রি নলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েই চন্দ্রকুমার জনসাধারণের চিত্তকে জয় করে নিয়ে নবাগত এক প্রথম শ্রেণীর অভিনেতার স্বীকৃতি পেলো।

কৃষ্ণসায়রের জমিদারের একমাত্র পুত্র শশাংকশেখর নট চন্দ্রকুমারের পরিচয়ে আবার যেন নতুন করে বেঁচে উঠলো।

সেই প্রচণ্ড ঝড়-জলের রাত্রির পরের দিনই প্রত্যুষে কৃষ্ণসায়রের সর্বত্রই আগুনের মত এক সংবাদ ছড়িয়ে গেল, আরাম-কুটিরে জমিদারের যে রক্ষিতা ছিল তাকে হত্যা করে জমিদার রাজশেখর রায়ের একমাত্র পুত্র শশাংকশেখর রাতারাতি নিরুদ্দেশ! এবং পুত্রের দুষ্কর্মের চিহ্ন যখন রাজশেখর রায় রাতারাতি নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে তৎপর, এমন সময় দারোগা বাবু সদলবলে গিয়ে তাকে হাতে-নাতে ধরে ফেলেছেন কোন এক লোকমুখে পূর্বাহ্ণে সংবাদ পেয়ে।

সেই ভয়ানক সংবাদ পেয়ে সুরেশ্বরী ঠাকুরঘরে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। ঠাকুর, গোপীবল্লভ! এ কি করলে ঠাকুর! এ কি করলে!

কিন্তু আশ্চর্য! পুত্রবধূ স্বর্ণময়ীর চোখে কিন্তু এক ফোঁটা অশ্রুও যেন নেই। সে দাসীর মুখে সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে জ্ঞানহীনা শাশুড়ীর লুণ্ঠিত মস্তকটা কোলের উপরে তুলে নিল।

বিষাদের কালো ছায়া নেমে এলো সমস্ত রায়বাড়িতে।

গত রজনীর ভয়াবহ দুর্যোগ কৃষ্ণসায়রের অনেক বাড়িরই অনেক ক্ষতি হয়েছে কিন্তু রায়বাড়ির যে ক্ষতি হলো তার বুঝি তুলনা নেই! পুলিশ তখন রায়বাড়িতে শশাংকর খোঁজ না পেয়ে কৃষ্ণসায়রের সর্বত্র তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। দ্বিপ্রহরে যেন চোরের মতই ফিরে এলেন মাথা নীচু করে জমিদার রাজশেখর রায় থানা থেকে।

তার কোন কথাই দারোগা অবনী অধিকারী বিশ্বাস করতে চাননি। তিনি লোকমুখে সংবাদ যা পেয়েছেন তার সঙ্গে ঘটনার বিচার করলে অবিশ্বাসের কিছুই নেই। তাছাড়া শশাংক যখন পলাতক ও তার বন্দুকও আরামকুটিরে পাওয়া গিয়াছে, তখন তার অনুমান যে মিথ্যা নয়, সে সম্পর্কে তিনি সুনিশ্চিত। পলাতক শশাংকশেখরই চন্দ্রার হত্যাকারী নিঃসন্দেহে।

কাছারী-গৃহে প্রবেশ করেই রাজশেখর রায় সংবাদ পেলেন যে,

দুর্ঘটনার সংবাদ লোকমুখে পেয়ে সেই যে সুরেশ্বরী জ্ঞান হারিয়েছেন তাঁর সে লুপ্তজ্ঞান এখনো ফিরে আসেনি। কবিরাজ এসেছিল, সে-ও শংকা প্রকাশ করে গিয়েছে।

মুহ্যমানের মতই রাজশেখর কাছারী-গৃহের বিরাট চৌকীটার উপর সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইলেন।

এ কি হলো! কোথা থেকে এ কি হয়ে গেল? রায়বংশের নিয়তি শেষ পর্যন্ত মৃত্যু-ছোবল বসালোই! কেমন করে এখন তিনি গিয়ে দাঁড়াবেন পুত্রবধূর সামনে?

রত্নেশ্বর রায়ের পিতা শশিশেখরেরও তার পাপের ঋণই কি এমনি করে শোধ করল তাঁরই আত্মজ—তাঁর শশাংক আজ?

সন্ধ্যার অন্ধকার কখন চারি দিকে ঘনিয়ে এসেছে টের পাননি রাজশেখর। চৌকীর উপর বসেই ছিলেন। এবং কখন যে ভৃত্য নিঃশব্দে এসে ঘরের দেওয়ালগিরিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে তাও টের পান নি।

বাবা!

হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন বাবা ডাকটি শুনে। সামনের দিকে চোখ তুলে তাকিয়েই তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে গেল। সামনেই দাঁড়িয়ে তাঁর পুত্রবধূ স্বর্ণময়ী। রায়বাড়ির কুললক্ষ্মী, বধূরাণী, সোনার প্রতিমা স্বর্ণময়ী। ভিতরে চলুন বাবা! মার জ্ঞান হয়েছে।

না। না—মা, আর আমি ভিতরে যেতে পারবো না। এ আমি কি করলাম, এ আমি কি করলাম?···

কান্নায় রাজশেখরের কণ্ঠস্বর বুঝি রুদ্ধ হয়ে এলো।

স্বর্ণময়ী আরো একটু এগিয়ে এসে শ্বশুরের পাশে দাঁড়াল। বললে, চলুন বাবা, উঠুন! এ সময় আপনি অধৈর্য্য হলে—

অধৈর্য! ধৈর্যের শেষ বাঁধটুকুও যে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়েছে মা! আমার আকাশ-ছোঁওয়া রাজপ্রাসাদ যে, বালুর প্রাসাদের মতই ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়েছে মা!

চলুন বাবা, মার কাছে একবার চলুন। স্বর্ণ এবারে এসে শ্বশুরের একখানি হাত ধরলো। রাজশেখর দু'হাতে পুত্রবধূকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে হাউ হাউ করে এই বোধ হয় জীবনে প্রথম কেঁদে উঠলেন, বৌ মা! আমার মা! আমার মা রে! এমন লক্ষ্মী মা তুই আমার, তুই কেন পারলি না তবে সে হতভাগাটাকে ধরে রাখতে?

চোখ বুজে নিঃসাড়ে শয্যার উপর শুয়ে ছিলেন সুরেশ্বরী। শিয়রের ধারে এসে বসলেন রাজশেখর। বহুকাল পরে তার সমস্ত আভিজাত্যের গর্ব, ঔদ্ধত্য, মিথ্যা দম্ভ যেন আজ চূর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। আজ আর সেই গত কালের মদগর্বী জমিদার রাজশেখর রায় নয়। ভিতরের চিরন্তন মানুষটা যেন বহুকাল পরে আজ সব কিছুকে অতিক্রম করে জেগে উঠেছে। গভীর স্নেহে শায়িতা স্ত্রীর মাথায় একখানি হাত রেখে ডাকলেন, বড়বৌ!

চোখ মেলে তাকালেন সুরেশ্বরী। আমার শেখর?

তোমার শেখরকে আবার আমি ফিরিয়ে আনবো সুরো! আমি প্রতিজ্ঞা করছি—

বৌমা ! আমার বৌমা কই ?

এই যে মা আমি, এগিয়ে এলো স্বর্ণময়ী শাশুড়ীর শিয়রের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে।

আমার চাবিটা কোথায় বৌমা ?

আঁচল থেকে শাশুড়ীর চাবিটা খুলে হাতে তুলে দিল স্বর্ণময়ী।

কই দেখি তোমার আঁচলটা মা। স্বর্ণময়ীর আঁচলে চাবিটা বাঁধতে বাঁধতে সুরেশ্বরী বললেন, আমার শাশুড়ী একদিন যে ভার আমার হাতে তুলে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই ভার আজ তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম বৌমা।

মা ! মা !

কেঁদো না বৌমা ! আমি আশীর্বাদ করে যাচ্ছি, রায়বংশের শশাংকের জন্যই আবার আমার শেখর তোমার কাছে ফিরে আসবে। তার পর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি চললাম। বৌমাকে দেখো।

ধীরে ধীরে চক্ষু বুজলেন সুরেশ্বরী। ধীরে ধীরেই যেন পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লেন। সুরেশ্বরীর সে ঘুম আর ভাঙল না।

* * দিন দুই পরে সন্ধ্যার দিকে একাকী রাজশেখর রায় কাছারীঘরে যখন বসেছিলেন, পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে তাকিয়েই যেন তিনি চমকে উঠলেন।

বৃদ্ধ দবীর খাঁ ও তার পাশে দাঁড়িয়ে অপর্ণা। ওস্তাদজীর বগলে তার প্রিয় তানপুরাটি ধরা।

ওস্তাদজী !

হাঁ রাজশেখর ! মা-বেটাতে তোমার কাছ থেকে এবারে যাবার অনুমতি নিতে এসেছি রাজা ! বহুকাল আগে এক সময় দবীর খাঁ রাজশেখরকে রাজা বলে সম্বোধন করতেন, আজ আবার নামে কথা বললেন। রাজশেখর বারেক মাত্র অপর্ণার দিকে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দবীর খাঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনি, আপনিও তাহলে আমাকে ছেড়ে চললেন ওস্তাদজী ?

হাঁ রাজশেখর ! আর নয়। রায়বাড়িতে আর আমি টিকতে পারছি না। পঁয়তাল্লিশ বছর আগে এই অপর্ণার মা লক্ষ্মীবাঈয়ের সঙ্গে রাজপুতানা থেকে তোমার পিতামহ রত্নেশ্বর রায়ের সঙ্গে এখানে এসেছিলাম যখন, তাকে জবান দিয়েছিলাম কৃষ্ণসায়রের রায়বাড়ি ছেড়ে কখনো আমি যাবো না। তাই এসেছি রাজশেখর, তোমার কাছ থেকে আজ যাবার অনুমতিটুকু নিতে। আমাকে তুমি স্বচ্ছন্দ মনে বিদায় দাও রাজা !

এই বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যাবেন ওস্তাদজী ?...

খোদা তালার এত বড় দুনিয়ায় জায়গার ত অভাব নেই রাজা ! তাছাড়া শিল্পীর কি কোন নির্দ্দিষ্ট ঘর আছে ? যেখানে সে যাবে সেখানেই যে তার ঘর। তবে আমি চলি রাজা !

বেশ ! যান, আপনাকে আর আমি বাধা দেবো না।

এমন সময় অপর্ণা এসে গলায় আঁচল দিয়ে রাজশেখরের পদপ্রান্তে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, না জেনে না বুঝে আপনাকে আমি হয়ত অনেক কষ্ট দিয়েছি, আমাকে ক্ষমা করবেন।...

রাজশেখর অপর্ণার কথার কোন জবাবই দিলেন না। মুখটা শুধু ফিরিয়ে নিলেন।

ধীরে ধীরে দবীর খাঁ ও অপর্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল তারই চোখের সামনে দিয়ে।

দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসর আগে রত্নেশ্বর রায় যে দবীর খাঁ ও লক্ষ্মীবাঈকে রায়বাড়ির আরামকুটিরে এনে তুলেছিলেন, তারা আজ স্বেচ্ছায় বিদায় নিয়ে গেল। লক্ষ্মীবাঈই বৈ কি। অপর্ণা ত লক্ষ্মীরই আত্মজা ! তারই রক্ত আজো প্রবাহিত অপর্ণার শরীরে। তারই অসমাপ্ত রূপের ছায়া ঐ অপর্ণা। নিজ হাতে একদিন এই রায়গৃহেরই বহির্মহলে প্রাচীর তুলে যাদের চিরতরে বন্দী করে রাখতে চেয়েছিলেন, আজ তারাই তার চোখের সামনে দিয়ে চলে গেল ! তিনি নির্বাক শুধু তাকিয়ে রইলেন।

দবীর খাঁ বিদায় নিল। লক্ষ্মীবাঈও বুঝি এত দিনে রায়বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

গোপনে গোপনে পলাতক পুত্রের অনেক অনুসন্ধান নিলেন দীর্ঘ এক বৎসর ধরে রাজশেখর রায়। কিন্তু কোন সন্ধানই তার করতে পারলেন না। আর শুধু শশাংকই নয়। আরো একজন সেই দুর্যোগের রাত্রে ভয়াবহ দুর্ঘটনার পর যে আরামকুটির থেকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল তারও কোন সন্ধান করতে পারলেন না তিনি। অথচ আজ সব চাইতে বেশী প্রয়োজন যে তাকেই।

আর ওদিকে ! কোন নালিশ নেই ! কোন অভিযোগ নেই, তবু যেন স্বর্ণর মুখের দিকে আর তাকাতে পারেন না রাজশেখর রায়। চলন্ত বিষাদের প্রতিমূর্তি স্বর্ণর করুণ শান্ত মুখখানির দিকে তাকালেই যেন বুকটার মধ্যে হু হু করে ওঠে রাজশেখরের। সমস্ত শোক দুঃখ ও বেদনাকে বুকের মধ্যে নিয়ে যেন মেয়েটা একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছে ! এর চাইতে মেয়েটা যদি কাঁদতো, অভিযোগ জানাত ! কিছু বুঝি শান্তি পেতেন রাজশেখর।

একটা মুহূর্তও আর এখানে থাকতে ইচ্ছা করে না। মনে হয়, যেদিকে দু' চোখ যায় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যান। কিন্তু ঐ মেয়েটা পায়ে যেন তার পাষাণবেড়ি দিয়ে রেখেছে।

নিশ্চিন্দপুর থেকে কত বার বাপ নিতে এসেছে কিন্তু কিছুতেই যায়নি বাপের সঙ্গে।

হতভাগাটা এমন রতন চিনল না ? হতভাগা ছেলেটার একটা ছবি পর্যন্ত বাড়িতে নেই যে, দু'দণ্ড দেখবেন অন্তত সেই ছবিটাও !

স্বর্ণময়ীই কি জানত, এত বড় দুঃখের ভিতর দিয়ে যে ভালবাসাকে সে শেষ পর্যন্ত অর্জন করলো, সে ভালবাসার গুরুভার তাকে এমনি করে বহন করে বেড়াতে হবে ! তাই ত গভীর নিশীথে সমস্ত রায়বাড়িটা যখন নিদ্রার মধ্যে শান্ত হয়ে আসে, গোপীবল্লভের সামনে গিয়ে সে আপনাকে লুটিয়ে দিয়ে বলে, ঠাকুর ! তুমি ত অন্তর্যামী প্রভু, তাকে ত আমি পেয়েছি ! তার সমস্ত অমঙ্গলকে বুক দিয়ে যেন আমি বহন করে যেতে পারি, যত দিন বাঁচিয়ে রাখবে সেই শক্তিটুকুই কেবল আমাকে দাও। যেখানে যত দূরেই সে থাকুক না কেন, তার মঙ্গল করো। তাকে শান্তি দিও !...আমার দুঃখ দহনের মধ্যে দিয়ে তাকে ক্ষমা করো ঠাকুর !...

কিন্তু কোথায় শান্তি শশাংকের মনে ?

কৃষ্ণসায়রের জমিদারদের আরামকুটিরের নারীহত্যার কথা আজ লোকে ভুলে গিয়েছে। পুলিশের দপ্তরেও আজ সেই চাঞ্চল্যকর

কেসের ফাইলটা চাপা পড়ে গিয়েছে। চন্দ্রকুমারের ছদ্ম পরিচয়ের অন্তরালে অতীতের নারীহত্যাকারী শশাংকশেখরও আজ অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। দিনের পর দিন অভিনেতা চন্দ্রকুমারের খ্যাতি তাকে আজ নতুন এক পরিচয়ের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। কে চন্দ্রকুমার! কি তার সত্যকারের পরিচয়! কোথা থেকে এলো? সে সাধু না জাল-জুয়াচ্চোর খুনী? সে কথা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবার প্রয়োজনও বোধ করে না। মঞ্চজগতে আবির্ভূত হয়ে সে তার স্বকীয় অপূর্ব অভিনয়-প্রতিভার দ্বারা সকলকে বিস্মিত, চমৎকৃত ও মুগ্ধ করেছে, এইটাই আজকের সব চাইতে বড় কথা। সেইটাই তার আজকের একমাত্র পরিচয়। একমাত্র স্বীকৃতি। এক দিক দিয়ে আজ সে সত্যিই নিশ্চিন্ত! পুলিশের দুঃস্বপ্ন আজ আর তার পিছনে পিছনে দিবারাত্রি তাড়া করে ফিরছে না। স্বীকৃতি, অর্থ, মান প্রতিপত্তির যোগে আজ সমস্ত পুলিশের সন্দেহকে সে অতিক্রম করে এসেছে। কিন্তু তবু মনে তার শান্তি কোথায়?

কোন মানুষের সঙ্গে সে মেশে না। কারো সঙ্গে আলাপ করে না। কেউ সেধে আলাপ করতে এলেও প্রত্যাখ্যান জানায়। সামান্য একটুখানি সম্পর্ক মানুষের সঙ্গে রেখেছে সে ঐ মঞ্চেই। তাও সেই অভিনয়ের সময়টুকুতে। অভিনয়ের দিন ঠিক অভিনয় শুরু হবার মিনিট কুড়ি পঁচিশ আগে সে থিয়েটারে যায় এবং নিজের পার্টটি শেষ হয়ে গেলেই ফিরে আসে নিজের নিভৃত কোটরে। শহরের একেবারে প্রান্তে মানুষের সমাজকে এড়িয়ে গঙ্গার ধারে বরাহনগরে ছোট একখানি দোতলা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকে। একটি দারোয়ান, একটি চাকর ও ছোট্ট একটি গাড়ি। গাড়ি সে নিজেই চালায়।

অভিনয় যেদিন থাকে তবু কিছুটা সময় কেটে যায়। কিন্তু অভিনয় যেদিন থাকে না, নিজের ঘরের মধ্যে কেবলই পায়চারি করে বেড়ায়।

রাতের পর রাত নিদ্রাহীন কেটে যায় ঘরের মধ্যে একাকী পায়চারি করে করেই।

ঘরের দেওয়ালে চারি দিকে টাঙ্গানো বিভিন্ন নাটকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন যে সব চরিত্র সে অভিনয় করেছে, তারই সব এনলার্জ ফটোগুলো, তাদের সব কয়টি চক্ষু মেলে তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কি, বলতে চায়। বলতে চায় কি, তুমি খুনী নারীহত্যাকারী!…

কোন কোন নিদ্রাহীন রাত্রে ঘুরে ঘুরে কেবলই সেই দেওয়ালে টাঙ্গানো এনলার্জ ফটোগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।

নল, ভীম, কর্ণ, দুষ্মন্ত, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য, অশোক, আলাউদ্দীন, নাদীরশা, প্রবীর—! কত বিভিন্ন চরিত্র। নলের দুর্ভাগ্য, ভীমের অহঙ্কার, কর্ণের অভিমান, বুদ্ধের নির্বাণ, শঙ্করাচার্যের তপস্যা, অশোকের ত্যাগ, আলাউদ্দীনের হিংস্রতা, নাদীরের নিষ্ঠুর পাশবিকতা, প্রবীরের আত্মসমর্পণ—তার নিদ্রাহীন মস্তিষ্কের কোষে কোষে যেন বিচিত্র এক অনুভূতির তরঙ্গে তরঙ্গে তাকে অন্য এক লোকে নিয়ে যায়। বিড় বিড় করে কখনো আপন মনেই হাসতে হাসতে বলে, অভিনয়! অভিনয়ই করো শশাংক! …অভিনেতা তুমি, অভিনয়ই করো।

তেইশ

কালচক্র ঘুরে চলে। ঘূর্ণমান পৃথিবীর আবর্তনের পথে বর্ষপঞ্জী জানায় দিন ও রাত্রির পরিক্রমা।

দীর্ঘ ষোলটা বছর কেটে যায়।

যুবক শশাংকের দেহে দেখা দিয়াছে অকাল বার্দ্ধক্য। কপালের উপরে ভাঁজ পড়েছে। কেশে পাক ধরেছে। অভিনয়ের বাইরে দেখলে মনে হবে বুঝি বয়স তার পঞ্চাশোত্তীর্ণ! জীর্ণ ভগ্ন।

তবু অভিনয়-প্রতিভা তার আজো অটুট! এখনো সে নাটকে নায়কের ভূমিকায় যখন বেশভূষা করে অবতীর্ণ হয়, মনে হয় বুঝি নবীন যুবক সে।

এমন সময় হঠাৎ এক রাত্রে অভিনয় অন্তে চন্দ্রকুমারের ডাক পড়লো থিয়েটারের মালিক সীতানাথের ঘরে।

সীতানাথ তার নিজস্ব ঘরে টেবিলের সামনে বসে বসে একটি নাটকের হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির পাতা উল্টাচ্ছিলেন। চন্দ্রকুমার এসে সামনের একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো।

আমাকে ডাকছিলেন সীতানাথ বাবু?

হাঁ। বসুন, বলছিলাম যে, নাটক এমন চলছে তার সেল ত পড়ে গিয়েছে।

সেই রকমই ত মনে হচ্ছে, তা কোন নতুন নাটক পেলেন নাকি?

পেয়েছি। যদিও একজন অখ্যাতনামা নতুন নাট্যকারের লেখা নাটক, প্রচুর পসিবিলিটিস্ আছে কিন্তু নাটকটার মধ্যে। সম্পূর্ণ নতুন ধরণের একটা সোস্যাল ক্রাইম ষ্টোরি।

ক্রাইম ষ্টোরি!

হাঁ, তবে ক্রাইমটাই নাটকের আসল প্রতিপাদ্য নয়। অদ্ভুত সেনটিমেন্টাল একটা গল্প গড়ে উঠেছে সেই ক্রাইমকে কেন্দ্র করে। প্রত্যেকটি চরিত্র নাটকের অদ্ভুত সজীবতা ও স্বকীয়তায় যেন স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে উঠেছে। তাই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। নামকরা নাট্যকারদের কাছ থেকে যখন ভাল কোন নাটক আপাতত পাওয়া যাচ্ছে না, দেখাই যাক না এই নতুন নাট্যকারের নাটকটি নিয়েই একটা এ্যাটেম করে, কি বলেন?

বেশ ত! তবে ক্রাইম—

আগে পড়েই দেখুন না নাটকটা একবার। আরো দু'-চার জনকে আমি পড়িয়েছিলাম। তাঁরা কিন্তু একবাক্যে প্রশংসাই করেছেন।

বেশ। দিন পড়ে দেখবো'খন!

হাঁ পড়ে দেখুন। আমি বলছি আপনি সন্তুষ্ট হবেন। আরো একটা কথা—

কী?

আপনাকে সেদিন বলছিলাম না একটি নতুন মেয়ে পাওয়া গিয়েছে।

হাঁ—তাই কি!

ভাবছি এই নতুন নাটকেই তাকে ফার্ষ্ট এ্যাপিয়ার করাবো, নাটকের নর্তকীর চরিত্রটিতে।

মেয়েটি আগে কখনো থিয়েটার করেছে কি কোথায়ও?

না। তবে পার্ট পড়িয়ে দেখেছি, চমৎকার বলবার ভঙ্গীটি। গলায় একটা অদ্ভুত মড্‌লেশন আছে।

শুধু তাই নয়, অভিনয়ে যে দরদের প্রয়োজন সেই দরদটি যেন মেয়েটির কণ্ঠস্বরের সঙ্গে জড়িয়ে আছে!

চন্দ্রকুমার সীতানাথের আলঙ্কারিক কথায় হেসে ফেলে।

হাসছেন চন্দ্র বাবু! কিন্তু দেখবেন, মেয়েটির অভিনয় শুনলেই বুঝবেন। তাছাড়া জানেন ত, মানুষের বিশেষ করে অভিনয়-প্রতিভা চিনতে আমি আজ পর্য্যন্ত বড় একটা ভুল করিনি।

চন্দ্রকুমার আবার মৃদু হাসে।

তাকে আবিষ্কার করবার গর্বটা যে সীতানাথের এক মস্ত বড় গর্ব সেটা চন্দ্রকুমারের অজানা নয়। তবে সে যাই হোক, এ লাইনে নতুন আনকোরাদের মাঝ থেকে সত্যিকারের অভিনয়-শক্তি আছে এমন লোককে বেছে নেওয়ার সত্যিই লোকটার একটা ক্ষমতা আছে।

এই নিন্ তাহলে পাণ্ডুলিপিটা একবার পড়ে দেখুন।

হাত বাড়িয়ে চন্দ্রকুমার সীতানাথের হাত থেকে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা: কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী, নাটক। রচনা—সমরেন্দ্র ঘোষ।

পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে চন্দ্রকুমার উঠে দাঁড়াল, তাহলে চলি?

আচ্ছা।

তার দুই দিন পরে অভিনয়ের রাত্রে অভিনয় শেষে চন্দ্রকুমার সীতানাথের ঘরে এসে প্রবেশ করে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা সীতানাথের সামনে টেবিলের প'রে রাখল।

মুখ তুলে তাকালেন সীতানাথ। বসুন, পড়লেন? কেমন ভাল লেগেছে ত?

হাঁ পড়লাম। মৃদু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল চন্দ্রকুমার, কিন্তু আমার ভাল লাগলো না।

ভাল লাগলো না?

না। এ নাটক না করাই ভাল! ফিরিয়ে দিন।

কিন্তু—

জঘন্য মনোবৃত্তি! রক্ষিতা চিরদিন রক্ষিতাই হয় সীতানাথ বাবু! আর রক্ষিতার ভালবাসা কোন দিনই সত্যিকারের ভালবাসার পর্য্যায়ে উঠতে পারে না। তাই শেষ পর্য্যন্ত রক্ষিতাকে হত্যা করবার দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নয়। এবং সেই ব্যর্থতাকে নিয়ে আর যাই হোক, উঁচুদরের নাট্যরস জমে ওঠে না। কোন মৌলিকতা ও, কোন নতুনত্বই নেই নাটকের মধ্যে!

হয়ত ঘটনার মধ্যে বিশেষ কোন মৌলিকতা আপনি যেমন বলছেন না থাকতে পারে, কিন্তু নাটকীয় রস অপূর্ব দানা বেঁধেছে নাটকটির মধ্যে। আগাগোড়া অদ্ভুত একটা সাসপেন্স্, নাট্যকার নাটকটির মধ্যে এমন জমাট ভাবে সৃষ্টি করেছেন, আমার মনে হয় সেইখানেই নাটক জমে উঠবে। আমরা প্রচুর পয়সা পাবো।

না। দুঃখিত, আপনার সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না সীতানাথ বাবু! আচ্ছা চলি।

চন্দ্রকুমারের সুস্পষ্ট প্রতিবাদ সত্ত্বেও সীতানাথ কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' নাটকটি মহলায় ফেললেন।

প্রাচীর-বিজ্ঞপ্তিও দিলেন। নবাগতা মায়া দেবীকেও ঐ নাটকের মধ্যে ছদ্মবেশিনী নর্ত্তকী মীনার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধও করলেন।

নাটকের মহলা চলতে লাগলো।

নাটকে গল্পের সারাংশ হচ্ছে: এক নর্ত্তকীকন্যা, নাম কঙ্কাবতী, মীনা ছদ্মনাম নিয়ে একদিন এক থিয়েটারে 'বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ' নাটকে যখন নৃত্য করছিল, তার সেই নৃত্য দেখে এক জমিদার-নন্দন নীলাদ্রিভূষণ মুগ্ধ হন। এবং শুধু মুগ্ধই নয়, তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। যার জন্য তাকে নিয়ে এসে তার বাগানবাড়িতে স্থান দেন ও দিবা-রাত্রি বেশীর ভাগ সময়ই তার সঙ্গে অতিবাহিত করতে থাকেন। এদিকে তার সতী সাধ্বী স্ত্রী রমা গৃহকোণে বসে নিশি-দিন চোখের জল ফেলে। সেদিকে নীলাদ্রিভূষণের চোখই পড়ে না। এমনি যখন চলেছে হঠাৎ একদিন মধ্য রাত্রে বাগানবাড়িতে এসে দেখেন নীলাদ্রিভূষণ, মীনা তারই এক বন্ধুর কণ্ঠলগ্না হয়ে গদগদ ভাষায় তাকে প্রেম জানাচ্ছে। সে দৃশ্য দেখে নীলাদ্রিভূষণের হৃদয়ে যেন শত বৃশ্চিক দংশন করে। অপমান ও আক্রোশের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে গৃহে ফিরে আসেন নীলাদ্রিভূষণ। সারাটা রাত ছটফট করেন এবং মনে মনে এক ভয়ংকর সংকল্প নিয়ে পরের দিন বাগানবাড়িতে মীনার কাছে যান। এবং মদ্যপান শুরু করেন। মদের নেশা যখন শিরায় শিরায় অগ্নিস্রোত বহাচ্ছে মীনাকে বলেন নৃত্য করতে, সেই নৃত্য অপ্সরী মেনকা যে নৃত্য দেখিয়ে 'বিশ্বামিত্রের তপোভঙ্গ' নাটকে হতভাগ্য মুনিকে ভুলিয়েছিল এবং যে নৃত্য দেখে একদা তিনি নিজেও কঙ্কার প্রতি মুগ্ধ হয়ে তাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। সেই নৃত্যের মধ্যখানেই নীলাদ্রিভূষণ হত্যা করবে মীনাকে! তারপর ধরা পড়ে হবে তার দ্বীপান্তর এবং দ্বীপান্তর যাবার প্রাক্কালে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চেয়ে যাবে নীলাদ্রি। আর স্ত্রী বলবে, সে ফিরে আসা পর্য্যন্ত তারই অপেক্ষায় থাকবে স্ত্রী! আদর্শ সতী নারীর জয়!

যাহোক, নাটক মহলায় পড়বার পর কিন্তু প্রথম দু'-একদিন মহলায় এসে পরে আর মহলায় এলেন না চন্দ্রকুমার। কি জানি কেন কি এক অজ্ঞাত মানসিক বিপর্যয় ঘটে যেতো চন্দ্রকুমারের মনে। তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে, বাগানবাড়িতে নর্ত্তকী মীনার হত্যার দৃশ্য এলেই, সমস্ত ইচ্ছাশক্তিকে অতিক্রম করে যেন এক দুর্দমনীয় পশুবৃত্তি তার মনের মধ্যে রক্তলোলুপ এক দানবীয় জিঘাংসায় নখদন্ত বিস্তার করে তাকে বিকল করে ফেলতো। সমস্ত শরীর তার কাঁপতে শুরু করতো, তাই পর পর দুই দিনই মহলার সময় ঐ রকম হওয়ায় চন্দ্রকুমার মহলায় যাওয়াই বন্ধ করে দিল। বললে সে, ষ্টেজে অভিনয় সময়েই ম্যানেজ করে নেবে। সীতানাথ আপত্তি করতে পারলেন না। কারণ, চন্দ্রকুমারের অভিনয়-প্রতিভা সম্পর্কে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

চন্দ্রকুমার নিজেও প্রথমটায় ব্যাপারটা না বুঝতে পারলেও পরে বুঝতে পেরেছিল, এ আর কিছুই নয়, চন্দ্রার প্রতি তার বুকভরা ভালবাসা। যে নির্মম আঘাতে অপমানিত হয়েছিল, চরম আঘাত হেনেছিল এ তারই অবচেতন মনের বিষক্রিয়া। নাটকের ঘটনার সেই ঘটনার সঙ্গে অদ্ভুত একটা সামঞ্জস্যের জন্য।

শুধু তাই নয়। নবাগতা অভিনেত্রী মায়ার মুখের দিকে তাকালেই এবং তার কণ্ঠস্বর কানে এলেই নিজের অজ্ঞাতেই চন্দ্রকুমারের মনের মধ্যে যেন একটা কি রকম বিপ্লব শুরু হয়ে যেতো!

মনে হতো বুঝি, মায়ার কণ্ঠস্বরের ভিতর দিয়ে বহুকালের বহু পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর যেন বিস্মৃতির অতল অন্ধকার থেকে ভেসে আসছে। একটা অট্টহাসির মত হাহা করে।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ

...গোপনকারী শশাংকশেখরের ...টা পড়ে চমকে উঠলো স্বর্ণ।

...ওঠে, বাবা !

...দিয়ে নিমীলিত চক্ষে বসে ...স্ফুট আর্তকণ্ঠ কানে যেতেই ...কি ? কি হয়েছে মা ?

... কি লিখেছে।

...কুল কণ্ঠে শুধালেন

...!

... একটা হোটেলে ... ফোন করে ... গিয়ে তার ...

...সন,

কি বলছেন আপনি রাজশেখর বাবু ?

ঠিকই বলছি। দয়া করে আপনি একবার আমাকে মহিম বাবুর কাছে নিয়ে চলুন, তাঁর কাছেই সব আমি বলবো।

বেশ চলুন। কিন্তু আপনি যে রকম অসুস্থ দেখছি, কাল গেলে হতো না? বা ঠিকানা দিয়ে যান আমরাই না হয় যাবো, কেন না কেস উঠবে আবার পরশু দিন।

না। না—আমার অসুস্থতার কথা ভেবে চিন্তা করবেন না। আমি বুঝতে পারছি সময় আমার বড় অল্প! দেরি করবার আমার আর সময় নেই। চলুন উঠুন। তাড়া দিলেন রাজশেখর অস্থির কণ্ঠে।

বেশ। তবে চলুন যাওয়া যাক।

দু'জনে তখুনি একটা গাড়িতে করে মহিম হালদারের বাড়ীর দিকে চললেন।

ভবানীপুরে মহিম হালদারের বাড়িতে এসে দু'জনে যখন গাড়ি থেকে নামলেন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাইরের ঘরে মহিম হালদার মক্কেলদের নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত।

রাজশেখর রায়কে সঙ্গে নিয়ে সীতানাথকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মহিম হালদার বললেন, সীতানাথ বাবু যে, কি খবর আসুন। আসুন—আপনার কেস ত পরশু।

তা জানি। সেই কেস সম্পর্কেই কিছু বলতে এসেছি মিঃ ...লদার, বিশেষ প্রয়োজনীয়।

...াই নাকি, বসুন! উনি আপনার সঙ্গে···ওঁকে ত চিনতে ...?

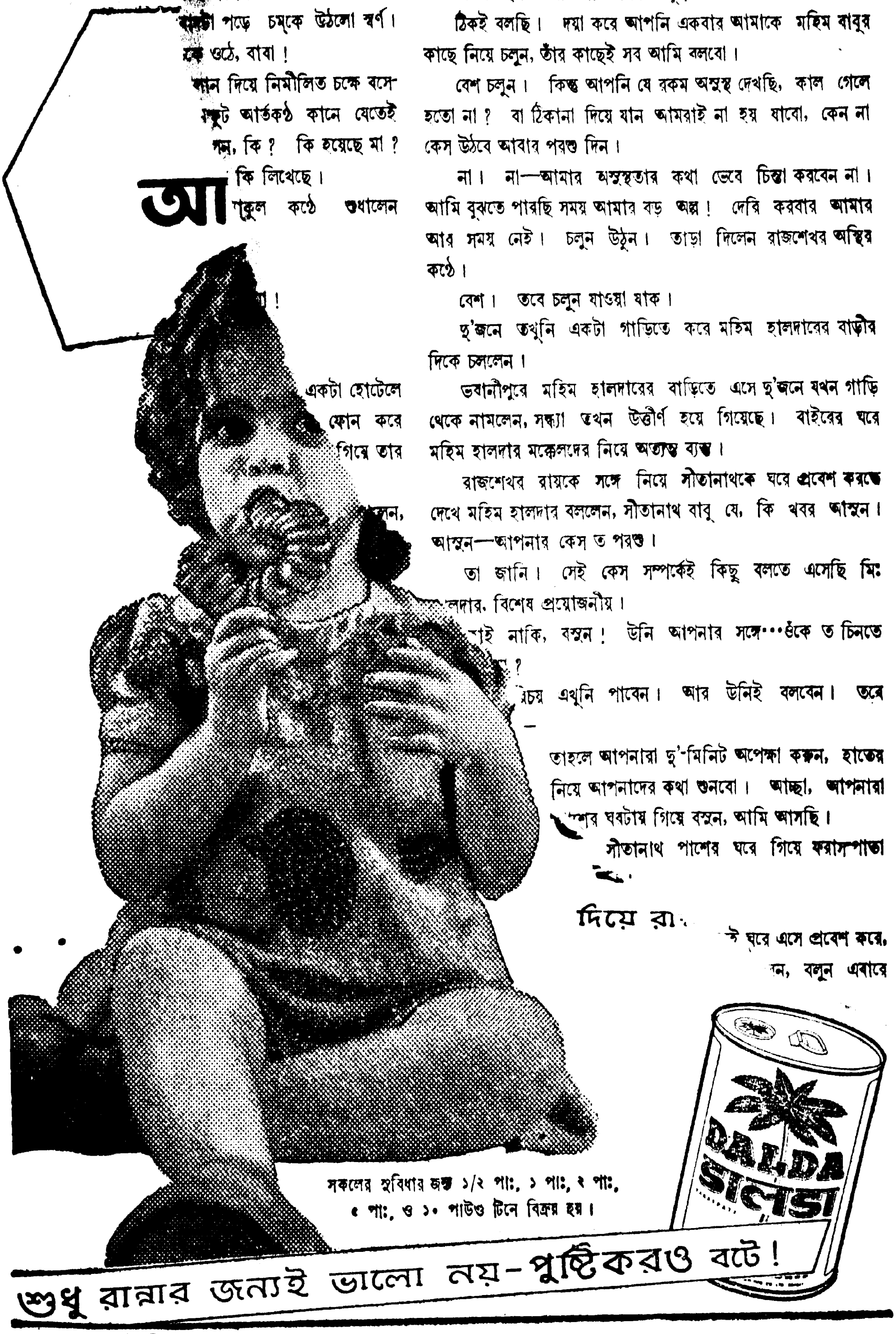
...িচয় এখুনি পাবেন। আর উনিই বলবেন। তবে

...

তাহলে আপনারা দু'-মিনিট অপেক্ষা করুন, হাতের ... নিয়ে আপনাদের কথা শুনবো। আচ্ছা, আপনারা ...শের ঘরটায় গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

সীতানাথ পাশের ঘরে গিয়ে ফরাসপাতা ...

...ই ঘরে এসে প্রবেশ করে, ...ন, বলুন এবারে



চন্দ্রকুমার সীতানাথের আলঙ্কারিক কথায় হেসে ফেলে।

হাসছেন চন্দ্র বাবু! কিন্তু দেখবেন, মেয়েটির অভিনয় শুনলেই বুঝবেন। তাছাড়া জানেন ত, মানুষের বিশেষ করে অভিনয়-প্রতিভা চিনতে আমি আজ পর্য্যন্ত বড় একটা ভুল করিনি।

চন্দ্রকুমার আবার মৃদু হাসে।

তাকে আবিষ্কার করবার গর্বটা যে সীতানাথের এক মস্ত বড় গর্ব সেটা চন্দ্রকুমারের অজানা নয়। তবে সে যাই হোক, এ লাইনে নতুন আনকোরাদের মাঝ থেকে সত্যিকারের অভিনয়-শক্তি আছে এমন লোককে বেছে নেওয়ার সত্যিই লোকটার একটা ক্ষমতা আছে।

এই নিন্ তাহলে পাণ্ডুলিপিটা একবার পড়ে দেখুন।

হাত বাড়িয়ে চন্দ্রকুমার সীতানাথের হাত থেকে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা নিয়ে আলোর সামনে মেলে ধরল। প্রথম পৃষ্ঠাতেই বড় বড় মোটা মোটা অক্ষরে লেখা: কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী, নাটক। রচনা—সমরেন্দ্র ঘোষ।

পাণ্ডুলিপিটা হাতে নিয়ে চন্দ্রকুমার উঠে দাঁড়াল, তাহলে চলি?

আচ্ছা।

তার দুই দিন পরে অভিনয়ের রাত্রে অভিনয় শেষে চন্দ্রকুমার সীতানাথের ঘরে এসে প্রবেশ করে নাটকের পাণ্ডুলিপিটা সীতানাথের সামনে টেবিলের প'রে রাখল।

মুখ তুলে তাকালেন সীতানাথ। বসুন, পড়লেন? কেমন ভাল লেগেছে ত?

হাঁ পড়লাম। মৃদু শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল চন্দ্রকুমা
আমার ভাল লাগলো না। ক যেন সে

ভাল লাগলো না?

না। এ নাটক না করাই ভাল! ফিরিয়ে দিন।

কিন্তু— অদ্ভুত একটা

জঘন্য মনোবৃত্তি! রক্ষিতা চিরদিন রক্ষিত লোকটার অদ্ভুত
বাবু! আর রক্ষিতার ভালবাসা কোন দিনই স প্রকার আকর্ষণ হতে
পর্য্যায়ে উঠতে পারে না। তাই শেষ পর্য গুণের জন্য সীতানাথ
দৃষ্টান্তও এদেশে বিরল নয়। এবং লো তা ছাড়া শশাংক তার
তোক, উ'চুদরের নাটকের জন্যে প্রচুর অর্থও সে উপায় করেছে এই
নতুনত্বই নেই নাটকেও তানাথই শশাংকর কোন কথায় কর্ণপাত
হয়ত ঘটন বিখ্যাত কৌঁশিলী মহিম হালদারকে শশাংকর
বসানোনের জন্য বহু টাকা দিয়ে নিযুক্ত করেছিলেন। সীতানাথ
মহিম হালদারকে বলেছিলেন, যেমন করে হোক ওকে বাঁচাতেই হবে মিঃ হালদার! যত টাকা চান আমি দেবো।

মহিম হালদার সব শুনে বলেছিলেন, চেষ্টার আমি কোন ত্রুটিই করবো না সীতানাথ বাবু! তবে আমার মনে হয়, আপনার শশাংক বাবু যে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেটাই সব নয়। আরো অনেক ব্যাপার হয়ত তিনি ইচ্ছা করেই প্রকাশ করেন নি, বা জানেন না, বা প্রক্ষিপ্ত হয়ে আছে। সে সব আমাদের সংগ্রহ করতে হবে। কারণ বুঝতেই ত পারছেন দু'-দুটো চার্জ তার বিরুদ্ধে।

নির্দিষ্ট দিনে মামলা শুরু হয়ে গেল।

মানুষের ভিড়ে আদালত-গৃহ যেন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল।

প্রথমেই সরকার পক্ষে পাবলিক প্রসিকিউটার কেস ওপেন করলেন, তার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে।

নাটকে গল্পের সারাংশ হচ্ছে
মীনা ছদ্মনাম নিয়ে একদিন এক য়ে শশাংকশেখর রায়, ধনী পিতার
নাটকে যখন নৃত্য করছিল, তার ও প্রাচুর্যের মধ্যে স্বেচ্ছাচারিতায়
নীলাদ্রিভূষণ মুগ্ধ হন। এবং য়েছিলেন। এবং ধনী জমিদারদের
ভালবাসেন। যার জন্য তাবে নারী পানাসক্ত ও উচ্ছৃংখল, তারই
দেন ও দিবা-রাত্রি বেশীর ভাগ ানবাড়িতে রক্ষিতা এক চন্দ্রা নাম্নী
থাকেন। এদিকে তার স ব দেখুন, সেই কুৎসিত জঘন্য মনোবৃত্তি!
দিন চোখের জল ফেলে। াকা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর পুরুষের এই যে
এমনি যখন চলেছে হ ধরণের বিকৃত বিলাস, যা এদেশের ধনিক
দেখেন নীলাদ্রিভূষণ, ম একটা অংশকে এত কাল ধরে শোষণ করে
ভাষার তাকে প্রেম হ শিচত্ত। সে যুগের বাপ-পিতামহদের পাপের
যেন শত বৃশ্চিক দংশ আজ অনেক শশাংক রায়েদেরই শোধ করতে
জ্বলতে গৃহে ফিরে ত
এবং মনে মনে সপৃহ স্তব্ধ।
মীনার কাছে য
শিরায় শির

চব্বিশ

নৃত্য অপ খর রায়ের শরীর ক্রমেই ভেঙ্গে পড়ছিল। তুষের আগুনের হৃতভাগ্যের বুকের ভিতরে জ্বলছিল দিবা-রাত্রি যে ব্যর্থতার দাহ, শরীর ক্রমশ যেন তাতেই ভেঙ্গে যাচ্ছিল আর বুঝি শেখর কোন দিনই ফিরবে না। স্বর্ণময়ীও রাজশেখরের অবস্থা দেখে দিন দিন শংকিতা হয়ে উঠছিল।

রাত্রে শয়নের পূর্বে অনেকক্ষণ ধরে স্বর্ণ শ্বশুরের পায়ে হাত বুলিয়ে দিত।

সেদিনও রাত্রে হাত বুলাতে বুলাতে মৃদু কণ্ঠে স্বর্ণ ডাকলো, বাবা!

কেন মা!

চলুন বাবা আমরা কিছু দিন না হয় তীর্থে তীর্থে ঘুরে আসি।

তীর্থ?

হাঁ বাবা, এখানে আপনার শরীর ও মন কোনটাই ত ভাল যাচ্ছে না।

শরীর আর মন! এবারে যেতে পারলেই বাঁচতাম মা, কেবল তোর মুখের দিকে তাকালেই মনে হয়, তোকে কার কাছে রেখে যাবো। বড়বৌয়ের কাছে যে বড় মুখ করে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম মা!

চলুন বাবা, কিছু দিন আমরা বাইরে ঘুরে আসি।

বেশ মা! তাই চল।

কয়েক দিন পরেই পুত্রবধূকে নিয়ে একজন দাসী ও চাকর সঙ্গে রাজশেখর কৃষ্ণসায়র থেকে বের হলেন।

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, বৃন্দাবন, সেতুবন্ধ রামেশ্বর, ঘুরে যেন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন আরো রাজশেখর। স্বর্ণর অবিশ্যি ভালই লাগছিল। কিন্তু শ্বশুরের দেহের অবস্থা দেখে স্বর্ণ আবার কৃষ্ণসায়রে ফেরাই মনস্থ করলো। এবং কাশীতে একজন ডাক্তার রাজশেখরকে পরীক্ষা করে বলেছিল, রক্তচাপ বৃদ্ধিতে রাজশেখর ভুগছেন। তার ঐ ভাবে ঘুরে না বেড়িয়ে কিছু দিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেওয়াই উচিত।

তাই আরো বিশেষ করে স্বর্ণময়ী শ্বশুরকে নিয়ে গৃহে ফিরে যাওয়াই স্থির করেছিল এবং ফিরবার পথে একদিন ট্রেণে পাটনা জংশন থেকে সেদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রটা কিনে পড়তে গিয়ে প্রথম

পাতাতেই বড় বড় হরফে ছদ্মবেশী আত্মগোপনকারী শশাংকশেখরের ধৃত হবার পর আদালতে বিচারের সংবাদটা পড়ে চমকে উঠলো স্বর্ণ। এবং অস্ফুট কণ্ঠে নিজের অজ্ঞাতেই ডেকে ওঠে, বাবা !

চলমান ট্রেণে একটা বালিশে হেলান দিয়ে নিমীলিত চক্ষে বসেছিলেন রাজশেখর রায়। পুত্রবধূর অস্ফুট আর্তকণ্ঠ কানে যেতেই তাড়াতাড়ি চোখ মেলে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি ? কি হয়েছে মা ?

এই দেখুন বাবা ! এই দেখুন, কাগজে কি লিখেছে।

কি ? কি লিখেছে মা ! ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে শুধালেন রাজশেখর।

স্বর্ণ সংবাদপত্রটা শ্বশুরের হাতে তুলে দিল।

আমার চশমা ? আমার চশমাটা দাও ত মা !

স্বর্ণ চশমাটা শ্বশুরকে এগিয়ে দেয়।

পরের দিন প্রত্যূষে রাজশেখর স্বর্ণকে নিয়ে গিয়ে একটা হোটেলে উঠলেন এবং সেই দিনই দ্বিপ্রহরে ডায়মণ্ড থিয়েটারে ফোন করে সীতানাথের বাসার ঠিকানাটা জেনে নিয়ে সোজা একেবারে গিয়ে তার বাসায় হাজির হলেন।

সীতানাথ রাজশেখরের পরিচয় পেয়ে সাগ্রহে আহ্বান জানালেন, আসুন। আসুন—বসুন রাজশেখর বাবু ! চন্দ্রকুমার বাবু, মানে শশাংক বাবুর আত্মপরিচয় দেবার পরই আমি নিজে গিয়েছিলাম কৃষ্ণসায়রে কিন্তু সেখানে গিয়ে শুনলাম, আপনারা মাস দুই আগে তীর্থ পর্যটনে বের হয়েছেন এবং আপনার নায়েব শ্যামাকান্ত বাবুও আপনাদের সঠিক ঠিকানাটা আমাকে দিতে পারলেন না। বললেন, কখন কোথায় থাকেন ঠিক নেই কিছু। যাওয়ার পর একখানা চিঠিও দেন নি নাকি তাকে।

না। তাকে আমরা চিঠি দিই নি। চিঠি দেবার মত ছিলই বা কি যে চিঠি দেবো ? বললেন রাজশেখর।

সে-ও এক কথা। আর তার সঙ্গে ব্যাপারটা আলোচনা করতে চাইনি বলেই তাকে কোন কথা বিশেষ না বলে কেবল আপনাদের সংবাদ পেলেই আমাকে অবিলম্বে জানাতে বলে ফিরে এসেছিলাম।

কিন্তু কেসের সংবাদ কি বলুন সীতানাথ বাবু ! আর উকীল বা ব্যারিষ্টার কা'কে দিয়েছেন ?

সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না রাজশেখর বাবু ! শহরের সব চাইতে বড় কৌন্সিলী মহিম হালদারকেই এ কেসে আমি নিযুক্ত করেছি। আর কেস সবে শুরু হয়েছে। সরকার পক্ষ কেবল তার সওয়াল শেষ করেছে। বলে একটু থেমে বললেন, কিন্তু থিয়েটারের ব্যাপারটার জন্য ত আমরা বেশী ভাবছি না, সেটা একটা এ্যাকসিডেণ্টাল ব্যাপার, মুস্কিল হয়েছে ষোল বছর আগেকার কৃষ্ণসায়রের হত্যার ব্যাপারটা নিয়েই। তিনি যে কেন হঠাৎ সেই অতীত কাহিনীকে এ ব্যাপারের মধ্যে টেনে আনতে গেলেন ! এবং এনে নিজেকে বিশ্রী ভাবে জড়িয়ে ফেললেন।

সে সম্পর্কে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন সীতানাথ বাবু ! রাজশেখর জবাব দিলেন।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবোই কেমন করে বলুন ? পুলিশের ফাইলে—যা আছে তার বিরুদ্ধেই সব কিন্তু সেটাই সব নয়। আরাম-কুটিরের হত্যার ব্যাপারে আর যে-ই দায়ী হোক, সে নয়।

কি বলছেন আপনি রাজশেখর বাবু ?

ঠিকই বলছি। দয়া করে আপনি একবার আমাকে মহিম বাবুর কাছে নিয়ে চলুন, তাঁর কাছেই সব আমি বলবো।

বেশ চলুন। কিন্তু আপনি যে রকম অসুস্থ দেখছি, কাল গেলে হতো না ? বা ঠিকানা দিয়ে যান আমরাই না হয় যাবো, কেন না কেস উঠবে আবার পরশু দিন।

না। না—আমার অসুস্থতার কথা ভেবে চিন্তা করবেন না। আমি বুঝতে পারছি সময় আমার বড় অল্প ! দেরি করবার আমার আর সময় নেই। চলুন উঠুন। তাড়া দিলেন রাজশেখর অস্থির কণ্ঠে।

বেশ। তবে চলুন যাওয়া যাক।

দু'জনে তখুনি একটা গাড়িতে করে মহিম হালদারের বাড়ীর দিকে চললেন।

ভবানীপুরে মহিম হালদারের বাড়িতে এসে দু'জনে যখন গাড়ি থেকে নামলেন, সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বাইরের ঘরে মহিম হালদার মক্কেলদের নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত।

রাজশেখর রায়কে সঙ্গে নিয়ে সীতানাথকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মহিম হালদার বললেন, সীতানাথ বাবু যে, কি খবর আসুন। আসুন—আপনার কেস ত পরশু।

তা জানি। সেই কেস সম্পর্কেই কিছু বলতে এসেছি মিঃ হালদার, বিশেষ প্রয়োজনীয়।

তাই নাকি, বসুন ! উনি আপনার সঙ্গে···ওঁকে ত চিনতে পারলাম না ?

ওঁর পরিচয় এখুনি পাবেন। আর উনিই বলবেন। তবে কথাটা একটু—

ওঃ বেশ ! তাহলে আপনারা দু'-মিনিট অপেক্ষা করুন, হাতের এই কাজটা সেরে নিয়ে আপনাদের কথা শুনবো। আচ্ছা, আপনারা না হয় ততক্ষণ ঐ পাশের ঘরটায় গিয়ে বসুন, আমি আসছি।

রাজশেখরকে নিয়ে সীতানাথ পাশের ঘরে গিয়ে ফরাসপাতা একটা চৌকীর উপরে বসলেন।

মিনিট কুড়ি বাদেই মহিম হালদার সেই ঘরে এসে প্রবেশ করে, একটা খালি চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললেন, বলুন এবারে সীতানাথ বাবু, কি বলছিলেন।

আমি নয় মিঃ হালদার। উনিই বলবেন। বলে ইংগিতে সীতানাথ পার্শ্বে উপবিষ্ট রাজশেখর রায়কে দেখিয়ে দিলেন।

কথা বললেন এবারে রাজশেখরই। মহিম বাবু, আমি আপনার আসামী শশাংকশেখরের হতভাগ্য বাপ রাজশেখর রায়।

আপনি ?—

হাঁ, বলে রাজশেখর রায় যেন একটু দম নিয়ে নিলেন।

তার পর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন, কথাটা যেমন লজ্জার, ততোধিক ঘৃণার। আমার যা বক্তব্য সব শুনলে আপনি হয়ত বলবেন, এত দিন এসব কথা আমি গোপন করে রেখেছি কেন ? কেন সব কথা পুলিশের কাছে প্রকাশ করিনি। তার প্রথম কারণ, কতকটা সে-রাত্রে একটি প্রাণীর আকস্মিক নিরুদ্দেশের ঘটনা বিপর্যয়ে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে শশাংকও নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যাওয়ায়। শশাংক যদি ঐ ভাবে

সে-রাত্রে আচমকা নিরুদ্দেশ না হয়ে যেত, তবে হয়ত সমস্ত ব্যাপারটা আমি পুলিশকে প্রমাণসহ বোঝাবার চেষ্টা করতে পারতাম। দ্বিতীয়তঃ, শশাংক নিরুদ্দিষ্ট হওয়ায় ও আমি হত্যার নিদর্শন রাতারাতি নিশ্চিহ্ন করে দেবো বলে যখন মাটি খুঁড়ে মৃতদেহটা পুঁতে ফেলতে ব্যস্ত, এমন সময় দারোগা অবনী অধিকারী লোকজন নিয়ে আরামকুটিরে উপস্থিত হয়ে আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলল। তার পর আমি যখন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, সে আমার কোন কথাতেই কান দিতে চাইলো না। সে কেবলই বলতে লাগলো, আমার ছেলেই হত্যাকারী, তাই সে পলাতক এবং আমি তাকে বাঁচাবার জন্যই একটা তৈরী গল্প শোনাচ্ছি। এবং পূর্বাহ্নে অন্য তৃতীয় ব্যক্তির মুখে সংবাদটা না পেলে কোন দিনই ঐ ব্যাপার পুলিশের গোচরে আসত না। তার পর ছিল সেই সঙ্গে আমার মিথ্যা জমিদারীর আভিজাত্য ও দম্ভও কিছুটা।

সমস্ত ঘটনাটাই সে-রাত্রে আরামকুটিরের আমাকে খুলে বলুন রাজশেখর বাবু! মহিম হালদার বললেন।

রাজশেখর এবারে বললেন, আমারই প্রথম যৌবনের দুষ্কর্ম ও পাপের ইতিহাস! শুধু আমারই নয়, আমার পিতামহ ও পিতারও দুষ্কৃতি। আর হতভাগ্য শশাংক, আমার একমাত্র ছেলেও সেই তার পূর্বপুরুষ ও পিতারই পাপ-রক্তের স্বাক্ষর বহন করেছে। অনিবার্য সেই দুষ্কৃতি ও পাপের মধ্যেই নিয়তির দুর্লঙ্ঘ্য টানে গিয়ে জড়িয়ে পড়েছিল। এই পর্যন্ত বলে রাজশেখর রায় আবার একটু থেমে যেন দম নিয়ে পুনরায় শুরু করলেন, কৃষ্ণসায়রের আরামকুটিরে আমারই পিতামহের এক রক্ষিতা নর্তকীর নাতনী ছিল আমারই নিযুক্তা এক যুবতী দাসীর প্রহরায় বন্দিনী, তারই নাম চন্দ্রা। আমার পিতামহ রত্নেশ্বর রায় আনীত নর্তকী লক্ষ্মীবাঈ কি কুক্ষণে যে এসে কৃষ্ণসায়রের আরামকুটিরে পদার্পণ করেছিল, সেই হতেই রায়-বংশে বিপর্যয়ের সূত্রপাত!

এই পর্যন্ত বলে সংক্ষেপে পূর্বকাহিনী বিবৃত করে গেলেন রাজশেখর রায় মহিম হালদারের কাছে।

মহিম হালদার ও সীতানাথ সে-কাহিনী শুনে নির্বাক হয়ে যান। বলেন, তার পর?

তার পর রূপ-মুগ্ধ আমি কিশোরী অপর্ণা ও দবীর খাঁকে নিয়ে এসে তুললাম একেবারে নিজের চোখের সামনে রায়-বাড়ির বহির্মহলে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টনী তুলে এক অংশে। অপর্ণাকে ভোগ করবার লালসায় তাকে সর্বতোভাবে আরো আকর্ষণীয়া করে তুলবার জন্য অস্ত্রবিদ্যা, সংগীতবিদ্যা প্রভৃতি নানা শিক্ষা দিতে লাগলাম। ক্রমে ক্রমে সে পূর্ণ যুবতী হয়ে উঠলো। এবং সেই সময়ই আমারই বেতনভুক এক রাজপুত লাঠিয়াল রঘুবীরের প্রেমে মুগ্ধ হয়ে অপর্ণা গোপনে তাকে আত্মদান করে। এবং আমার সমস্ত সতর্কতাকে এড়িয়ে তারা একদিন দবীর খাঁর সাহায্যে প্রাসাদ থেকে পালায়। সেই সময় অপর্ণা গর্ভবতী ছিল। পালাবার রাত্রে তাদের আমি অনুসরণ করি ও আমারই হাতের নিক্ষিপ্ত বর্শাঘাতে রঘুবীর প্রাণ দেয়। কিন্তু অপর্ণা পালিয়ে গিয়ে এক ব্রাহ্মণের আশ্রয়ে উঠে। গুপ্তচরের মুখে তিন বৎসর পরে সেই সংবাদ পেয়ে অপর্ণার শিশুকন্যাকে অপর্ণাকে না পাওয়ার ব্যর্থতার আক্রোশে ও প্রতিহিংসায় এক রাত্রে আমারই লোক চুরি করে নিয়ে আসে। রাজশেখর আবার থামলেন।

তার পর?—

[আগামী সংখ্যায় শেষ হবে।

কেন?

বিজয়লাল মজুমদার

সহসা গীতির কেন প্রথম চরণ
অকস্মাৎ নৈঃশব্দ্যের অতলে হারায়?
বিমুখ ঢালিতে রশ্মি হিরণ্যবরণ
তরুণ অরুণ কেন লুপ্ত কুয়াশায়?

ফুলের বাসরে কেন মধুপ মধুর,
থেমে যায় কেন তার গুঞ্জনের সুর?
শরৎ দেখায় তার সৌন্দর্য যখন,
কেন তাকে ঢাকে এসে সহসা শ্রাবণ?

কেন নম্র ফুলভারে তরু সে তরুণ—
কেন খিন্ন ছিন্নশাখ রীতি অকরুণ?
স্তিমিত সহসা কেন আলো যৌবনের,
ঘটিল বিরতি কেন সুখ-স্বপনের?

কুমুদ কৌমুদী যবে যাচে বারংবার
আচম্বিতে নীলাকাশে কেন জলধার?

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



একটি সংসারের কাহিনী

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীমতী সুধীরা বসু

বৃদ্ধ বিনোদনাথ মিত্রের মৃত্যু হয়েছে। পিতার মৃত্যুর পরে আশুতোষ পৈতৃক বাসভবন ত্যাগ করে কলকাতার প্রান্তে বিনোদনাথের বাগানবাড়িতে উঠে এলেন। বৃহৎ অট্টালিকা, চমৎকার বাগান, বাড়ীর সামনে বাঁধান ঘাটওলা তকতকে কালো জলে ভরা পুষ্করিণী। আশুতোষ পিতার মতন সৌখিন ছিলেন, অতি যত্নে বাগান ও বাড়ি সজ্জিত করেছিলেন। লক্ষাধিক মূল্যের প্রস্তর-মূর্ত্তি তৈরী করিয়ে বাগানে ফুলের কেয়ারির মধ্যে মধ্যে স্থাপন করেছিলেন। বহুমূল্য আসবাব ও চিত্রে কক্ষগুলি বিচিত্রতর হয়ে উঠেছিল। সে পাড়ার প্রতিবেশীরা এ বাড়িকে "রাজবাড়ি" বলে উল্লেখ করত। আশুতোষের একমাত্র পুত্র ত্রৈলোক্যনাথ এখন পিতার সহিত একই অফিসে বেরুচ্ছেন। আশা আছে, পিতা অবসর গ্রহণ করলে সে পদে তিনিই বসবেন। ত্রৈলোক্যনাথও পিতামহ ও পিতার ন্যায় সৌখিন। তাঁর প্রধান সখ পশুপক্ষী পোষা। বাগানে জালে-ঘেরা বড় বড় ঘরে কত রকমের দেশ-বিদেশের পাখী, কত রকম হাঁস, পায়রা, ময়ূর, সারস, কাকাতুয়া ইত্যাদি কোন রকম পাখীই বাদ যায়নি। ত্রৈলোক্যনাথ সকালে অফিসে যাবার পূর্ব্বে ও সন্ধ্যায় ফিরে স্বহস্তে এই পক্ষীগুলির পরিচর্য্যা করতেন। এখানে এসে কৃষ্ণবাসিনীর এক বৎসর পরম শান্তিতেই কেটে গেল। এক বৎসর পরে তিনি পেলেন প্রথম শোকের শেলাঘাত।

সেদিন সকালে কৃষ্ণবাসিনী তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনী ও জামাতাকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। পত্র লিখে নলিনীর শ্বশুরালয়ে লোক পাঠিয়েছিলেন। ঘণ্টা কতক পরে লোক ফিরে এল শুষ্ক মুখে, ঝিকে দিয়ে কৃষ্ণবাসিনীর লেখা নিমন্ত্রণ-পত্র বাড়ির ভিতর ফেরৎ পাঠিয়ে দিলে। বিস্মিতা কৃষ্ণবাসিনী ঝিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিঠি কেন ফিরে এল, জবাব কই? দরোয়ানকে ডাক বাড়ির ভিতর, কেমন আছে তারা শুনি।"

বহুদিনের পুরাতন বৃদ্ধ দরোয়ান এসে অন্দরের প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াল। কৃষ্ণবাসিনী দরোয়ান চাকরদের সঙ্গে কথা বলেন না। ঝিকে দিয়ে প্রশ্ন করালেন, "কেন তাঁর লেখা পত্র ফিরে এল? জবাব কই?" বৃদ্ধ দরোয়ান হাহাকার করে কেঁদে উঠল। কি বলবে সে, নলিনীকে সে যে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছে! এবার আর কৃষ্ণবাসিনী নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না, উদ্বিগ্নভাবে এগিয়ে এসে নিজেই প্রশ্ন করলেন। দরোয়ান আছড়ে পড়ল তাঁর পদতলে, "মা, মা, জামাইবাবু আর নেই, চিঠি নিয়ে আমি পৌঁছবার একটু পরেই তাঁর শেষ হয়ে গেল।" তখনও কৃষ্ণবাসিনী ব্যাপারটা ভাল করে বুঝতে পারেন নি, পুনর্ব্বার প্রশ্ন করলেন, "জামাইবাবুর কি হয়েছে?" চোখের জলে ভাসতে ভাসতে দরোয়ান বললে, "সকালবেলা জামাইবাবু বেড়াতে গিয়েছিলেন; আমি পৌঁছবার পরে তিনি ফিরে এলেন; আমি তাঁর হাতে চিঠি দিলাম। কিন্তু তাঁর বুকে একটা ব্যথা হচ্ছিল বলে তিনি চিঠিটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে পরে জবাব দেবেন বলে ওপরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আর বোধ হয় তার পনেরো মিনিট পরেই শুনলাম জামাইবাবু মারা গেলেন।"

এ কি শোনালে রাধামাধব! স্তম্ভিতা, মূর্চ্ছিতা কৃষ্ণবাসিনী লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতলে। রাধামাধব তুমি কি সত্যিই পাষাণ! তোমার পাষাণ মূর্ত্তির নীচে কি প্রাণের কোন স্পন্দন নেই? পাষাণের হৃদয় পাষাণেই গড়া হয়, কৃষ্ণবাসিনী তখন সে কথা জানতেন। সেই দিন থেকে কৃষ্ণবাসিনী আর জীবনে লেখনী স্পর্শ করেননি।

জ্যেষ্ঠ জামাতার মৃত্যুর পরে কয়েক বৎসর অতীতের গর্ভে বিলীন হয়েছে। সময়ে সবই সহ্য হয়, কৃষ্ণবাসিনীরও সেই নিদারুণ শোক ক্রমে সহ্য হয়ে এসেছে। ইতিমধ্যে ত্রৈলোক্যনাথের বিবাহ হয়েছে। বধূটি অতি সুশীলা, গুণবতী। নামটিও তার রূপ ও স্বভাবানুযায়ী মধুর। বউয়ের নাম অমিয়া। বাস্তবিক অমিয়া শ্বশুর-শাশুড়ীকে ভক্তিতে, সেবায় ও যত্নে মুগ্ধ করে ফেলেছিল। বাড়ীর দাস-দাসীরা সকলেই অমিয়ার একান্ত বশীভূত হয়ে উঠেছিল। ননন্দাদের অতি সাধের ও স্নেহের একমাত্র ভ্রাতৃজায়া অমিয়া সকলের আদরিণী হলেন। এমন গুণের বউ, কিন্তু এক যা দুঃখ, এত দিন হয়ে গেল, বউয়ের সন্তান-সন্ততি কিছুই হল না! আজকাল আশুতোষও চিন্তিত হন, এত সম্পত্তি কে ভোগ করবে? কৃষ্ণবাসিনী ও তাঁর কন্যারা এমন দেবদেবী নেই যেখানে মানসিক করেননি, পূজা পাঠাননি। কিন্তু ফল কিছু হোল না। অমিয়া সন্তানের জননী হলেন না। না হোক, তাতে অমিয়ার কিছুমাত্র দুঃখ নেই। তিনি শ্বশুরকেই সন্তানের মতন দেখেন। তাঁর খাওয়া-শোওয়া ও প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কার্য্য অমিয়ার নির্দ্দেশেই হয়। একরকম সুখেই কৃষ্ণবাসিনীর দিনগুলি কাটছিল। আশুতোষ অফিসের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এখন তাঁর অখণ্ড অবসর। কিন্তু এত বড় বাড়ী আশুতোষের শূন্য লাগে। তিনি মনে মনে চান একটি ক্ষুদ্র শিশুর সাহচার্য্য—যাকে নিয়ে তাঁর আর একটুও অবসর থাকবে না। কিন্তু রাধামাধবের ইচ্ছা অন্য রকম, মানুষের সাধ্য কি তা বোঝবার? এই সময়ে আশুতোষ ও কৃষ্ণবাসিনী দ্বিতীয় বার শোকের আঘাতে মুহ্যমান হলেন, তাঁদের জ্যেষ্ঠা কন্যা নলিনীর মৃত্যুতে। অমিয়ার কন্যাবৎ আচরণে তাও তাঁদের সহনীয় হয়ে উঠল। কিন্তু কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়ার ভাগ্য আরো ভয়ঙ্কর দুর্যোগের কালোমেঘে আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, তাঁদের ইষ্টদেবতা রাধামাধবই বোধ হয় শুধু তা জানতেন। অকস্মাৎ একদিন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আশুতোষ ইহলোক ত্যাগ করলেন।

সেদিন সকাল বেলা ত্রৈলোক্যনাথ যথারীতি অফিসে চলে গিয়েছেন, বাড়ীতে আছেন শুধু কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া। আশুতোষের মৃত্যুর পর অমিয়ার দিনগুলি যেন আর কাটে না! মাঝে মাঝে তিনি বলেন, "আমার ছেলে হয়নি, কিন্তু সে অভাব আমি এত দিন একটুও বুঝিনি, বাবাকে নিয়েই আমার সময় কেটে যেত।" এই এত বড় শূন্য বাড়ীতে শাশুড়ী ও বউ সারাদিন ত্রৈলোক্যনাথের অফিস থেকে ফিরে আসবার প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকতেন। ত্রৈলোক্যনাথ ফিরে এসে কৃষ্ণবাসিনীর কাছে সন্ধ্যাবেলা বসবেন, সারা দিনের গল্প বলবেন, উচ্চৈঃস্বরে হাসবেন, চাকরদের হাঁক দিয়ে ডেকে ফরমায়েস করবেন, জনহীন গৃহের ঘরে ঘরে তাঁর কণ্ঠের প্রতিধ্বনি উঠবে, মনে হবে তবু যেন বাড়ীতে মানুষের বাস আছে। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল, তখনও ত্রৈলোক্যনাথ ফিরলেন না। কৃষ্ণবাসিনী ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, বাগান ও বাড়ী গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল, সাতটা বেজে গেল, তখনও ত্রৈলোক্যনাথ ফিরলেন না। কৃষ্ণবাসিনী বার বার এসে বারান্দায় দাঁড়াচ্ছেন, দূরাগত গাড়ীর বংশীধ্বনি কান পেতে শুনছেন, কিন্তু কই পরিচিত মোটরের আওয়াজ কই? কখন আসবেন ত্রৈলোক্যনাথ? আজ আর কৃষ্ণবাসিনী সন্ধ্যাপূজাতেও নিবিষ্টচিত্ত হতে পারছেন না। অমিয়াকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"বৌমা, ত্রৈলোক্যনাথের ফিরতে কেন এত দেরী হচ্ছে? সে কি বলে গিয়েছে কিছু? সে কি আপিসের পরে আর কোথাও যাবে?"

অমিয়াও মনে মনে যথেষ্ট উৎকণ্ঠিতা হয়েছিলেন, তবুও শাশুড়ীকে আশ্বাস দিয়ে বলছিলেন—"না মা, কোথাও যাবেন না, হয়ত আপিসে কিছু কাজের চাপ পড়েছে তাই দেরী হচ্ছে, এমন কিছু রাত্রির তো হয়নি, কেন মিছে আপনি এত উতলা হচ্ছেন?" ক্রমে রাত্রি আটটা বেজে গেল, এমন সময়ে কখন যে নিঃশব্দে ত্রৈলোক্যনাথের মোটর এসে গাড়ীবারান্দায় দাঁড়িয়েছে, কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া তা জানতেও পারেননি। অমিয়া তখন নীচে রান্নাঘরে ত্রৈলোক্যনাথের রাত্রের আহারের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। সারা দিনের পর ক্ষুধার্ত্ত ত্রৈলোক্যনাথ হয়ত ফিরেই আহার্য্য চাইবেন, কিন্তু মনটা তাঁর বড়ই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল। কি এক অজানা কারণে বুকটা যেন তাঁর মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছিল। হঠাৎ বাইরে কয়েক জন অপরিচিতের কণ্ঠস্বরে উদ্বিগ্না হয়ে, অমিয়া দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। কিন্তু ওকি! তিনি কি দেখছেন? ত্রৈলোক্যনাথকে ধরাধরি করে কয়েক জন অপরিচিত লোক মোটর থেকে নামছে কেন? শুনলেন এক জন ভদ্রলোক বিমূঢ় ভৃত্যদের উদ্দেশ্যে বলছেন—"তোমাদের বাবু সন্ধ্যাবেলা আফিসের কাজ সেরে যেমন

বাড়ী ফেরবার জন্য উঠলেন, অমনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। আমরা ওঁর সঙ্গে কাজ করি, ঢের চেষ্টা করলাম, ডাক্তার আনলাম, কিন্তু আর জ্ঞান ফিরল না।"

কম্পিত চরণে অমিয়া দোতলায় উঠে এলেন, ঘরের বন্ধ জানলা উন্মুক্ত করে দিলেন, দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ভৃত্যকে আদেশ দিলেন, "ওঁকে ওপরে এনে শুইয়ে দাও।" আজ আর অমিয়া সেই লজ্জাশীলা শান্ত বধূ নন। তাঁর মুখের অবগুণ্ঠন খুলে গিয়েছে, চোখে-মুখে উত্তেজনা ফুটে উঠেছে, তবুও যেন কি এক অদৃশ্য শক্তিতে শক্তিময়ী হয়ে ভেঙে পড়েন নি! ত্রৈলোক্যনাথকে এনে শয্যায় শুইয়ে দেওয়া হল, আত্মীয়-স্বজনদের খবর দেওয়া হল, ত্রৈলোক্যনাথের ভগিনীরা পাগলিনীর মত ছুটে এলেন। সংজ্ঞাহীন ত্রৈলোক্যনাথের মাথার কাছে অমিয়া বসে আছেন স্থির ভাবে, তাঁর বাহ্য চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, অন্তরে যে কি তাণ্ডব চলেছে তা তিনিই জানেন। চিকিৎসকেরা মুখ ফিরিয়ে চলে গেলেন, সন্ন্যাস রোগ ত্রৈলোক্যনাথের, শিবের অসাধ্য রোগ, আর কোন আশা নাই। ধীরে, ধীরে তেমনি ভাবেই ত্রৈলোক্যনাথের জীবন-প্রদীপ নিবে গেল। কৃষ্ণবাসিনীর নয়নের মণি, একমাত্র পুত্র, ত্রৈলোক্যনাথ চলে গেলেন, ফিরেও দেখলেন না কি হোল বৃদ্ধা মাতার। স্থির ভাবে কৃষ্ণবাসিনী সব দেখলেন, কি যে হয়ে গেল তা যেন তিনি কিছুই বুঝতে পারলেন না। কে ছিল ত্রৈলোক্যনাথ? কি হোল তাঁর? শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে কৃষ্ণবাসিনী যেন তা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। আত্মীয়ারা অমিয়াকে এনে তাঁর কোলে দিয়ে বললেন, "ত্রৈলোক্যনাথ তোমার কেউ ছিল না, সে শত্রু ছিল তাই এত সহজে চলে গেল। এই তো তোমার ছেলে তোমার কোলেই রয়েছে।" ধীরে ধীরে যেন কৃষ্ণবাসিনীর চেতনা ফিরে এল, অমিয়াকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, "এই তো আমার ছেলে, কে বলে আমার ছেলে চলে গেল, মিথ্যা কথা! এই তো আমার হারানিধি আমার কোলে রয়েছে।"

ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর কৃষ্ণবাসিনীর দেওর ও আত্মীয়েরা তাঁকে এ বাড়ী ত্যাগ করে তাঁদের নিকটে বা পৈতৃক ঠাকুরবাড়ীতে কৃষ্ণবাসিনীর অংশেরও যে দু-একটা ঘর ছিল সে অংশে গিয়ে থাকতে বললেন। সত্যিই এই এত বড় নির্জন বাড়ী, এত বড় বাগান তাও আবার কলকাতার এক প্রান্তে। এখানে দুটি বিধবার পক্ষে থাকা অসম্ভব, কে তাঁদের দেখাশুনা করবে, বিপদে আপদে বা হঠাৎ প্রয়োজনে কে তাঁদের সাহায্য করবে! তাও আবার পাড়া-পড়শীও তেমন ভদ্রলোক কেউ নেই। আশে-পাশে, সামনে মুসলমান প্রতিবেশী সব, এটা মুসলমান পাড়া। বাগানের বাইরে বড়রাস্তার ওপারে প্রকাণ্ড মসজিদ। আশুতোষ ও ত্রৈলোক্যনাথ যখন জীবিত ছিলেন এই সব মুসলমান প্রতিবেশীরা তাঁদের খুবই অনুগত ছিল এবং যথেষ্ট সম্মানও করত। তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে তাঁদের উপদেশ মত তারা চলত। এখনও তারা এই দুই বিধবাকে তেমনই সম্মান করে। যদিও পাড়াপড়শী কেউ কোন দিন কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়ার ছায়া পর্য্যন্ত দেখেনি, তবুও এই সহায়হীনা বিধবাদের ওপর তাদের সহানুভূতি বেড়েছিল বই কমেনি। তাই অমিয়া যখন শ্বশুরের ভিটা ত্যাগ করতে আপত্তি করলেন, তখন কৃষ্ণবাসিনীও তাতে সম্মত হলেন। সন্তানহীনা অমিয়ার কি মমতা এ বাড়ীর ওপর, এ বাড়ীর প্রতিটি দ্রব্যের ওপর! এইখানে সে বধূরূপে প্রথম পদার্পণ করেছিল, এইখানেই সে কয়েক বৎসর সুখে-দুঃখে কাটিয়েছিল, এইখানেই সব হারিয়েছে! আশুতোষের নিজের হাতের সাজান প্রতিটি আসবাব, ত্রৈলোক্যনাথের পাখীগুলি, বাগানে তাঁদের স্বহস্তে রোপিত ফলের ও ফুলের গাছগুলি, এসব ছেড়ে অমিয়া কোথায় যাবে! প্রতিটি স্থানে তাঁদের স্পর্শ লেগে রয়েছে, তাঁদের স্মৃতিমাখা আনন্দময় গৃহ আজ নিরানন্দ হলেও অমিয়ার মনে হয়, তাঁরা যেন চারি দিকে ঘিরে রয়েছেন। তাঁদের অশরীরী আত্মা সর্ব্বদা যেন অমিয়াকে সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছে, অমিয়া তাঁদের সাধের, সখের গৃহ ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে কি না। না, অমিয়া আজীবন এখানেই থাকবে, এ গৃহ ত্যাগ করা তাঁর অসাধ্য। কৃষ্ণবাসিনীও নিঃসন্তানা, পুত্রবধূ যাতে শান্তি পান তাতেই চেষ্টিতা, তিনিও তাই এখানেই বাস করতে লাগলেন। রাধামাধব তাঁর পদপ্রান্তে এঁদের টেনে নিয়ে যেতে পারলেন না, তাই তাঁর অধিকতর কঠোর দণ্ড এই দুই ভাগ্যহীনা বিধবার শিরে বজ্রাঘাতের মতন এসে পড়ল।

* * * * সাল ১৬ই আগষ্ট। সকাল থেকেই অমিয়া লক্ষ্য করছেন বাড়ীর সামনের মসজিদে বহু লোকের ভিড়। অন্তরাল থেকে অমিয়া দেখছেন, দলে দলে মুসলমানেরা এসে মসজিদের সামনে জড় হচ্ছে, তাদের মধ্যে যেন একটা উত্তেজনা ভাবও রয়েছে। বিকেলে দরোয়ানের কাছে শুনলেন, কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের রায়ট আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু দরোয়ান ঐ টুকুই বলতে পারলে তার বেশী সে শোনে নি ও কোথাও যায়ওনি। রায়ট যে তখন কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করেছে এবং কি বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও লুণ্ঠন যে সহরে চলেছে অমিয়া তা জানতে পারলেন না। উদ্বিগ্না অমিয়া আত্মীয় স্বজনকে টেলিফোনে ডাকবার চেষ্টা করলেন, কোন উত্তরই পেলেন না। টেলিফোনের তার তখন বিচ্ছিন্ন হয়েছে, এই পাড়াটার সঙ্গে সহরের সমস্ত সংযোগ ছিন্ন হয়েছে এবং কোন হিন্দু বহিরাগতের আশা একেবারে স্থগিত হয়েছে। এদিকে রাত্রিও হয়ে গিয়েছে। অমিয়া শাশুড়ীকে গিয়ে সমস্ত সংবাদ দিয়ে কি করা যাবে পরামর্শ করলেন, এবং পরামর্শ মত মসজিদ থেকে মুসলমানদের দলপতি এক বৃদ্ধকে ডেকে পাঠালেন। বৃদ্ধ মুসলমান এসে নীচে দাঁড়ালেন। অমিয়া দরোয়ানকে দিয়ে প্রশ্ন করালেন, কেন এত দলে দলে মুসলমান এখানে জড় হচ্ছে? কি তাদের উদ্দেশ্য? বৃদ্ধ যদি মনে করেন অমিয়াদের কোন বিপদের আশঙ্কা আছে তাহলে তাঁরা এখান থেকে এক্ষুণি চলে যেতে পারেন।

কিন্তু অমিয়া তখন জানতেন না যে, তাঁদের এখান থেকে যেতে দেওয়া হবে না বলেই এই সব মুসলমানেরা ষড়যন্ত্র করছে। বৃদ্ধ সসম্ভ্রমে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "না মা, ব্যাপার এমন কিছুই নয়, গোটাকতক গুণ্ডা সহরে হিন্দুদের সঙ্গে মারপিট করেছে, একটু গোলমালও হয়েছে; তাই ভয় পেয়ে অনেক মুসলমান এ অঞ্চলে পালিয়ে আসছে। আপনাদের কোন ভয় নেই; আপনারা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকুন; আমি যতক্ষণ বেঁচে থাকব আপনাদের এতটুকু বিপদ বা কোন রকম অসম্মান হতে দেব না। এই বিশ্বাসঘাতক বৃদ্ধের আশ্বাসে অমিয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে রাত্রের আহারাদি শেষ করে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে শাশুড়ীর সঙ্গে শয়ন করতে গেলেন।

পরদিন ১৭ই আগষ্ট। সকাল দশটা পর্য্যন্ত বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে

কাটল। দশটার পরে একবার কি কাজে কৃষ্ণবাসিনী দোতলার বারান্দায় এসে দেখলেন, দলে দলে মুসলমান নিঃশব্দে বাড়ীতে প্রবেশ করছে। দরোয়ান বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে লাঠির আঘাতে আহত ও মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছে। আর এতগুলো মুসলমানের সঙ্গে, সে একা আর কি করতে পারত? কৃষ্ণবাসিনী কি করবেন ঠিক করতে পারলেন না। পাগলিনীর মত অমিয়াকে নিয়ে সিঁড়ির ও ঘরের দরজা বন্ধ করে দোতলার একটা ঘরে বসলেন। তাঁর যত চিন্তা অমিয়াকে নিয়ে। কি হবে! কি করবেন তিনি? রাধামাধব, প্রাণ নাও কিন্তু মান রক্ষা করো, তুমি যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে সতীর মানরক্ষা করেছ, আজ অমিয়াকেও বাঁচাও। কৃষ্ণবাসিনীর এই আকুল আহ্বানের কিছুটা বোধ হয় রাধামাধবের শ্রুতিগোচর হোল, যদিও তিনি আবির্ভূত হ'লেন না, তবে বোধ হয় তাঁর দয়াতেই বহুকষ্টে অমিয়া নিজের মান রক্ষা করলেন। নীচে মুসলমানদের উল্লসিত কণ্ঠের চীৎকারে অমিয়া জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে দেখলেন, নীচ থেকে হু হু করে ধোঁয়া উপর দিকে উঠছে এবং সামান্য সামান্য অগ্নিশিখাও দেখা যাচ্ছে। সর্ব্বনাশ, বাইরের ঘরগুলোতে আগুন ধরিয়েছে। দামী আসবাবগুলো টেনে নিয়ে বাইরে ফেলছে, বড় বড় আয়নাগুলো সশব্দে চূর্ণ করছে, লক্ষ লক্ষ টাকা মূল্যের পাথরের মূর্ত্তিগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে ধূলোয় মিশিয়ে দিচ্ছে, বড় বড় তৈলচিত্রগুলি ছুরি দিয়ে টুকরো টুকরো করে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে। কত যে মুসলমান আসছে! আসা তাদের বেড়েই যাচ্ছে। বহুমূল্য জিনিষপত্র প্রাণভরে তারা লুণ্ঠন করছে ও মধ্যে মধ্যে চীৎকার করে উঠছে: আল্লা হো আকবর! ভীতা কম্পিতা অমিয়া শাশুড়ীর হাত ধরে সিঁড়ির দরজা খুলে ছুটে নীচে নেমে এলেন। ভিতর-বাড়ীর কোণের দিকের একটা ছোট ঘরের ভিতর ঢুকে কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলেন দরজা ভাঙার শব্দ। অন্দরের দরজা ভেঙে কিছু সংখ্যক মুসলমান এইবার ভিতরে প্রবেশ করেছে। একজন চীৎকার করে বলে উঠল, "আগে ওপরে উঠে যাও, গিয়ে জেনানাদের ধরে বেঁধে ফেল"। কৃষ্ণবাসিনী অমিয়াকে সজোরে বক্ষে জড়িয়ে ধরে বললে, "কি হবে বৌমা"? অমিয়া হাঁসলেন, ঘরের কোণে রাখা একটা বড় কেরোসিনের টিন দেখিয়ে শাশুড়ীকে বললেন, "ভয় নেই মা, ওতে কেরোসিন ভরা আছে, আর আমার হাতের মুঠোয় আছে দেশলাই, মানরক্ষা আমার হবেই, কিন্তু তার আগে আমরা পালাবার চেষ্টা করব।"

মুসলমানেরা তখন দোতলায় উঠেছে, ঘরে ঘরে চলেছে লুঠ, তারা খুঁজে বেড়াচ্ছে চারি দিকে অমিয়া ও কৃষ্ণবাসিনীকে। ভৃত্যেরা যে যেদিকে পেরেছে পালিয়েছে, রন্ধনের পাচক ব্রাহ্মণকে মুসলমানেরা আগেই কেটে দু' টুকরো করে ফেলেছে। উন্মত্তের মত তারা বহুমূল্য অলঙ্কার জামা, কাপড় লুণ্ঠনে ব্যস্ত। অমিয়া দৃঢ়ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের পিছনে যে ছোট দরজাটা ছিল বাগানের পিছন দিকে যাবার, সেটা খুলে ফেলে দেখলেন, দরজার সামনে থেকে ঝোপ ও আগাছায় পিছনের খিড়কী দরজা পর্য্যন্ত খানিকটা অংশ ঢেকে ফেলেছে। কৃষ্ণবাসিনীর হাত ধরে সন্তর্পণে অমিয়া সেই ঝোপের ভিতর দিয়ে খিড়কী দরজা খুলে বাগানের পিছনে এসে পড়লেন। ত্রৈলোক্যনাথের মৃত্যুর পর এই অংশটা পাঁচিল তুলে আলাদা করে অমিয়া ভাড়া দিয়েছিলেন, এবং যারা ভাড়া নিয়েছিল তারা এতটা জমি পেয়ে সেখানে তাঁত বসিয়ে তাঁতশালা খুলেছিল। অমিয়া ও কৃষ্ণবাসিনী ছুটতে ছুটতে এসে তাঁতঘরের ভিতর দিয়ে গিয়ে সদর দরজা খুলে রাস্তায় বেরুবার আশায় দরজা টেনে ধরে দেখলেন, দরজা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। তাঁতের মালিকরা দু'দিন আগে দরজায় তালা বন্ধ করে চলে গিয়েছে, আর তারা এ দিকে আসতে পারেনি। নিরুপায় অমিয়া ও কৃষ্ণবাসিনী সভয়ে তাঁতের তলায় ঢুকে কোন রকমে লুকিয়ে বসলেন। ওদিকে বাড়ীতে লুণ্ঠন চলছে ও মধ্যে মধ্যে গুণ্ডাদের উল্লাসধ্বনিতে ভীতা হয়ে কৃষ্ণবাসিনী ভগবানকে ডাকছেন। কিন্তু মুসলমানেরা অমিয়া বা কৃষ্ণবাসিনীর কোন সন্ধান না পেয়ে ও আশাতীত মূল্যবান দ্রব্য পেয়ে তাই সংগ্রহে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এঁদের সম্বন্ধে তাদের আর কোন আগ্রহ রইল না। বেলা পড়ে এল, মুসলমান গুণ্ডাদের আর কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, বোধ হয় তারা চলে গিয়েছে। অপরাহ্ণও অতীত হোল, চারি দিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে এল, বাইরের কোলাহল নিস্তব্ধ হোল। অমিয়া ধীরে ধীরে তাঁতের তলা থেকে বেরিয়ে ঘরের বাইরে এসে দেখলেন, জমিটার চারিদিক কাঁটাতারের খুব উঁচু বেড়া ও জাল দিয়ে ঘেরা, হাত দিয়ে মুচড়ে টেনে দেখলেন ছিঁড়ে ফেলা অসম্ভব! কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া অমিয়া চিন্তিত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন, অবশেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে দাঁত দিয়ে সেই বেড়া কাটতে আরম্ভ করলেন। খানিকটা কাটেন, হাত দিয়ে মুচড়ে প্রাণপণে ঠেলে সরান, আবার দাঁত দিয়ে কাটেন। ঘণ্টা দেড় দুই পরে বহু কষ্টে একটু গলে যাবার মতন রাস্তা হোল। কিন্তু স্তম্ভিতা কৃষ্ণবাসিনী সভয়ে দেখলেন, অমিয়ার মুখখানি রক্তে ভেসে যাচ্ছে, সামনের দাঁত কটি ভেঙে গিয়েছে, কোমল হাত দুখানি তারের কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গিয়েছে। তখন আর কিছু দেখবার বা ভাববার সময় নেই। কৃষ্ণবাসিনীর হাত ধরে টেনে নিয়ে অমিয়া অতি কষ্টে বেড়া গলে বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন, তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। কৃষ্ণবাসিনীর ভাগ্যে কি এই ছিল! মহারাজকুমারের আদরিণী কন্যা, আশুতোষের সহধর্ম্মিণী, ত্রৈলোক্যনাথের মাতা, যাঁদের মুখ দর্শন করা তো দূরের কথা, ছায়া পর্য্যন্ত অপরিচিত কেউ কখনও দেখেনি, সেই কৃষ্ণবাসিনী নিঃসম্বলা, অনাথা কাঙালিনীর মত একবস্ত্রে অমিয়ার হাত ধরে আজ রাজপথে নেমে এলেন! আর অমিয়া—যে গৃহ তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ছিল সেই গৃহ ত্যাগ করলেন চির জীবনের মতন, আর কোন দিন অমিয়া সে গৃহে প্রবেশ করেননি।

অন্ধকারে মিশে গিয়ে কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া সতর্ক ধীর পদবিক্ষেপে একটু এগিয়ে গিয়েই ভীত ভাবে থমকে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে কে একজন তাঁদের দিকে এগিয়ে আসছে। নিকটবর্ত্তী হতে দেখলেন, একটি হিন্দু যুবক। এগিয়ে এসে মৃদু স্বরে যুবকটি বললে, "মা, আমি আপনাদের বেড়া গলে বেরুতে লক্ষ্য করেছিলাম, আমি এই গলিটায় পাহারা দিচ্ছি, আপনাদের কোন ভয় নেই, সামনেই আমাদের বাড়ী, আপনারা আমার সঙ্গে আসুন।" আর কোন উপায় ছিল না, কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া যুবকটির সঙ্গে গিয়ে তাদের বাড়ীতে ঢুকলেন। আশুতোষের বাগানের পিছনের সরু গলিতে চার-পাঁচ ঘর

ভদ্র হিন্দু গৃহস্থের বাস ছিল। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামায় সব কয়টি বাড়ীর পরিবার সবশেষের বাড়ীটিতে আশ্রয় নিয়েছিল এবং সব কয়টি পুরুষেরা মিলে ক'দিন ধরে গলির মুখে পাহারা দিচ্ছিল। তাদের এই নির্ভীক ভাব দেখে বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, তখন পর্য্যন্ত মুসলমানেরা এদিকটায় হানা দেয়নি। কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া আশ্রয় তো পেলেন, কিন্তু এই স্থান থেকে উদ্ধার পাবার কোন পথ দেখতে পেলেন না। সদর রাস্তায় মুসলমানেরা কারুকেই আসতে দিচ্ছে না, এবং এই সব লোকেদেরও সদর রাস্তা ছাড়া আর কোন পথে বেরুবার উপায় নেই। দু'দিন দু'রাত্রি এই ভাবে কাটাবার পরে অনেক কষ্টে একটি যুবক রাত্রের অন্ধকারে ছাত থেকে দড়ি ঝুলিয়ে বাড়ীর পিছনের একটা কারখানার বাগানে নেমে কোন রকমে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে গিয়ে পুলিশে সব সংবাদ দিতে সমর্থ হল। তৃতীয় দিন সকালে সুসজ্জিত পুলিশের গাড়ি এসে এই বাড়ীর বন্দীদের উদ্ধার করে নিয়ে চললো। কিন্তু কোথায় তাদের নিয়ে চললো, কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া বার বার প্রশ্ন করেও উত্তর পেলেন না। তাঁরা তাঁদের যে-কোন আত্মীয়ের দরজায় নামিয়ে দিতে বললেন, কিন্তু তাতেও তারা ভ্রূক্ষেপ করলে না। অবশেষে সকলকে নিয়ে গিয়ে পুলিশের গাড়ি একটা আশ্রয়শিবিরে নামিয়ে দিলে। কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়লেন, কি যে করবেন কিছুই ঠিক করতে পারলেন না। একে তো তাঁরা কখনও ঘরের বাইরে যাননি, তার ওপরে ক'দিন এ রকম অনাহারে, অনিদ্রায় ও দুশ্চিন্তায় কেটেছে, এত অপরিচিত লোকের মাঝে তাঁরা কি করবেন? কেউ তাঁদের কথা গ্রাহ্যও করছে না। এক দিন, এক রাত্রি এই উদ্বেগে কাটিয়ে দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণবাসিনী ও অমিয়া দুপুরে সকলে যখন স্নানাহারে ব্যস্ত সেই সময়ে সকলের অলক্ষ্যে আশ্রয়শিবির থেকে বেরিয়ে এক রকম ছুটতে ছুটতে রাস্তায় এসে পড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। কিন্তু রাস্তা তো তাঁরা চেনেন না, তাঁদের এই বিমূঢ়ভাব লক্ষ্য করে এক ভদ্রলোকের বোধ হয় দয়া হোল। তিনি অগ্রসর হয়ে এসে প্রশ্ন করে সব জেনে নিলেন, এবং কৃষ্ণবাসিনীর এক আত্মীয়ের নিকটবর্ত্তী গৃহে তাঁদের পৌঁছে দিলেন। সংবাদ পেয়ে কৃষ্ণবাসিনীর কন্যা ও জামাতারা এসে তাঁদের নিজেদের কাছে নিয়ে গেলেন। পরদিন বিভিন্ন সংবাদপত্রে অন্যান্য লুণ্ঠন কাহিনীর সঙ্গে আশুতোষের "রাজবাড়ি" লুণ্ঠনের কাহিনীও প্রকাশিত হোল। এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস কালের পৃষ্ঠায় চিরস্থায়ী হয়ে রক্তাক্ষরে লিখিত রইল। কত যে নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং কত যে লুণ্ঠন ও অত্যাচার নিরপরাধ মানুষের উপর হয়েছিল তা লিখে শেষ করা যায় না। কত যে নারী তাঁদের সব প্রিয়জনকে হারিয়ে অনাথা হয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কত যে ধনী ও গৃহস্থ নিঃস্ব হয়ে ভিখারীর মতন দ্বারে দ্বারে ঘুরেছিলেন ইতিহাসে তার সাক্ষ্য রইল।

কৃষ্ণবাসিনীর কন্যা ও জামাতারা বহু যত্নে ও সমাদরে তাঁকে ও অমিয়াকে নিজেদের কাছে রাখলেন, কিন্তু অমিয়া অকস্মাৎ এই বিপর্য্যয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন। অবশেষে বহু চিন্তার পরে কৃষ্ণবাসিনী স্থির করলেন যে, অমিয়া যাতে শান্তিলাভ করেন তাঁকে সে চেষ্টা করতেই হবে। কলকাতায় থাকলে সে গৃহের স্মৃতি অহরহ অমিয়াকে পীড়িত করে তুলবে। আত্মীয়-স্বজনের সমবেদনাও যেন অমিয়া আর সহ্য করতে পারছেন না। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে তিনি অমিয়াকে নিয়ে কলকাতা ত্যাগ করে কাশীবাস করাই স্থির করলেন। ক্রুদ্ধ রাধামাধবের নিষ্ঠুর খেলা কি শেষ হোল? বিশ্বনাথ কি তাঁদের শান্তি দেবেন? না কৃষ্ণবাসিনীর ভাগ্যকে নিয়ে বিশ্বনাথও আবার কি নতুন খেলা আরম্ভ করবেন? পুণ্যধাম কাশীতে এসে বিশ্বনাথের চরণে তাঁরা কতকটা শান্তি পেলেন বটে, কিন্তু অমিয়া মুখে কিছু প্রকাশ না করলেও পূর্ব্বস্মৃতি কিছুতেই বিস্মৃত হতে পারলেন না। কৃষ্ণবাসিনী দুঃখ পাবেন বলে তাঁর কাছে অমিয়া তাঁর এই মনোবেদনা প্রকাশ করে বলতেন না। কিন্তু অমিয়ার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে আরম্ভ হোল। অমিয়ার শরীর ক্রমেই খারাপ হতে লাগল এবং মধ্যে মধ্যে শিরঃপীড়ায় কষ্ট পেতে লাগলেন। কিন্তু যতটা পারতেন, কৃষ্ণবাসিনীর কাছে তা গোপন রাখবার চেষ্টা করতেন। নিজের পূজা ও কৃষ্ণবাসিনীর সেবা অমিয়ার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রাণপণে তিনি কৃষ্ণবাসিনীকে শান্তি দেবার চেষ্টা করতেন। সত্যিই অমিয়া কৃষ্ণবাসিনীর পুত্রের স্থান অধিকার করেছিলেন। সেবায় যত্নে অমিয়া যেন কৃষ্ণবাসিনীকে সর্ব্বদা পক্ষিমাতার ন্যায় আপনার পক্ষপুটে আবৃত করে রাখতেন। দুই বৎসর এই রকমে কেটে গেল, তারপরে অমিয়া নিদারুণ শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। সর্ব্বদা মাথায় যন্ত্রণা, অসহ্য হয়ে উঠল, কৃষ্ণবাসিনীর কাছেও আর তা গোপন রইল না। তিনি বার বার কলকাতায় ফিরে গিয়ে চিকিৎসার কথা বলতে লাগলেন কিন্তু অমিয়া কিছুতেই সম্মত হন না। অবশেষে কৃষ্ণবাসিনী একরকম জোর করে তাঁকে নিয়ে কলকাতায় চলে এলেন। অমিয়াকে তার পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দিয়ে কৃষ্ণবাসিনী কন্যার নিকট বাস করতে লাগলেন। প্রতিদিনই তিনি শোনেন অমিয়ার পীড়া বৃদ্ধির দিকেই চলেছে, উপশমের কোন লক্ষণ নেই! বহু চিকিৎসা ও প্রচুর অর্থব্যয় করেও কিছু সুফল পাওয়া গেল না। মাথার ভিতর টিউমার, কোন উপায়ই নেই। অমিয়া সংজ্ঞাহীন ভাবেই ক'দিন রইলেন। ধীরে ধীরে এলো সেই কালরাত্রি। অমিয়ার মৃত্যুরাত্রি! সব শেষ হয়ে গেল! ইহজীবনে রাধামাধবের রোষানল থেকে অমিয়া পরিত্রাণ পাননি, পরজীবনে কি রাধামাধব তাঁর শীতল চরণে অমিয়াকে স্থান দেবেন? মুছিয়ে দেবেন অমিয়ার সব দুঃখ?

কৃষ্ণবাসিনী অমিয়ার মৃত্যু-সংবাদ শুনলেন। জগৎ সংসার তাঁর কাছে যেন গাঢ় অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। বিধবার একমাত্র অবলম্বন পুত্রাধিক প্রিয়, অঞ্চলের নিধি, যাকে আশ্রয় করে তিনি দারুণ পুত্রশোকও ভুলতে প্রয়াস পেয়েছিলেন তাকেও অকালে হারাতে হোল! কি অসীম দুর্ভাগ্য নিয়ে কৃষ্ণবাসিনী পৃথিবীতে এসেছিলেন! তিনি জামাতাগৃহেই বাস করতে লাগলেন। এই বার্দ্ধক্যে, শোকতপ্ত, জীর্ণ, দুর্ব্বল শরীর নিয়ে তিনি কোথায় যাবেন? গল্পের প্রারম্ভে আমরা তাঁর এই শীর্ণ কাতর রূপ দেখেছি। কৃষ্ণবাসিনী বড় আশা করেছিলেন শেষ জীবনে বিশ্বনাথের চরণে আশ্রয় পাবেন বলে, কিন্তু বিশ্বনাথও তাঁকে ঠেলে দূরে সরিয়ে দিলেন। এই দুর্ভাগ্যের বোঝা মাথায় নিয়ে আর কত দিন কৃষ্ণবাসিনীকে অপেক্ষা করতে হবে? বৃদ্ধা তাঁর ঝাপসা চোখের ক্ষীণ দৃষ্টি সুদূরে মেলে দিয়ে কি দেখেন? তিনি কি দেখতে পান, আশুতোষ তাঁর অপেক্ষায় অধীর হয়ে রয়েছেন? তাঁর ত্রৈলোক্যনাথ,

নলিনী, অমিয়া তাঁর আসা-পথ চেয়ে, তাঁর সঙ্গে মিলিত হবার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন? কৃষ্ণবাসিনী আবার জীবনান্তে তাঁদের ফিরে পাবেন কি না জানি না! রাধামাধব—কৃষ্ণবাসিনীর ইষ্টদেবতা, ইহলোকে তাঁর সব কেড়ে নিয়ে হয়ত পরলোকে তাঁর হারানিধিগুলি দিয়ে তাঁর জন্য সুখের হাট সাজিয়ে রেখেছেন! রাধামাধব—তোমার নিষ্ঠুর খেলায় কৃষ্ণবাসিনী তার সবই আহুতি দিয়েছেন আর কিছুই বাকি নেই, এবার তোমার শীতল চরণে তাঁকে স্থান দাও!

শেষ

বিফলতা ?

[Richard Le Gallienne-এর হাফেজের অনুবাদ হইতে]

বয়স যখন ষাটের ঘরে দিলেম তারে লজ্জা
ভ্রান্তি মোহে দুঃখ অনেকখানি,
কিশোরী এক বক্ষে শ্যামল যৌবনেরি সজ্জা
অন্তরে মোর প্রেম সে দিল আনি।
শুভ্রকেশের বিড়ম্বনায় গোপন কারাকক্ষে
রেখেছিলেম সেই প্রণয়ে ঢাকি,
কিন্তু শেষে প্রবঞ্চনায় সরলতম চক্ষে
ধরা দিতে রইল না যে বাকি।
বিমূঢ় হৃদয় ছুটল পিছে যেথায় মূঢ় দৃষ্টি,
বন্দী, বিভোর বুদ্ধি-বিবেক বিনে,
কেনই বা হয় এই বয়সে এমন অনাসৃষ্টি
তরুণ জ্ঞানী ছিলেন অতীত দিনে।
কিশোরী যার এমন দেখি ঐন্দ্রজালিক শক্তি,
তারেই বলি—"নাই বা কেন হবে?
চিত্তে যদি পারলে দিতে গভীর অনুরক্তি
কালের চিহ্ন তারেও মেটাও তবে।
দু'টি গালে দাও না এনে তরুণ রূপের বন্যা,
কৃষ্ণ-ভ্রমর হউক শুভ্র কেশ,
তারুণ্যে মোর ফিরিয়ে দিলে জানব তুমি ধন্যা,
ক্ষীণ নয়নে আলাও আলোর রেশ।
বাহির আমার প্রকাশ করুক অন্তরে যা সত্য
যৌবনে যার নিত্য অধিবাস;
স্থবির তনু হায় কেমনে মানে সে ঔদ্ধত্য
কালের এ যে চরম পরিহাস।"
জানি এসেই পরিণতি যারাই মাসন চক্ষে
মগ্ন নিতুই স্বপ্নলোকের গানে,
হৃদয় বিলাস ফুলের মতই ঝরে যে অলক্ষ্যে
মর্মভাঙা নীরব অভিমানে।
হাফেজ! তবু ঘটল তোমার কতই পুলক ভ্রান্তি
এমনটি ত হয়নি কোন কালে!
বন্ধনে যার কল্পনাকে বাঁধল এসে শ্রান্তি
বিফল আশার মুগ্ধ কুহক-জালে।

অনুবাদিকা—শ্রীমতী প্রতিমা রায়।

নীলাচলে চার দিন

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীসংযুক্তা কর

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে কোণার্কের সূর্য্যমন্দিরের ছায়াতলে এসে আমাদের বাস থামল। দৃষ্টির সামনে বিশাল জগমোহনের চূড়া। মন্দিরটির চারি ধারে উঁচু পাঁচিল ছিল এক কালে। এখন বসে গেছে অনেকটা। চারি পাশে বিস্তীর্ণ বালুভূমি। তারপর ঝাউগাছের ঘন সমাবেশ। মন্দিরের ছোট-বড়-মাঝারি নানা আকারের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে ছড়িয়ে। বুকে তাদের সুনিপুণ কারুশিল্প। বিষণ্ণ-গাম্ভীর্য্যে আকাশে-বাতাসে যেন স্থির হয়ে আছে একটি করুণ মন্থরতা। ঝাউগাছের পাতায় পাতায় ফিস্-ফিস্ করছে মৃদু হাওয়ার কানাকানি। কোণার্ক এবং সমুদ্র······বিশ্বদেবতার দু'টি বিপরীত রূপের প্রতিচ্ছবি! এক দিকে মুহূর্তে মুহূর্তে সৃষ্টির ফেনা উঠছে উচ্ছল হয়ে। অন্য দিকে ধ্বংসের ভয়ালতার মৌন সংকেতে জেগে আছে জীবন-ধারার অনিবার্য্য ভঙ্গুরতার ইঙ্গিত। এক দিকে উন্মোচন অন্য দিকে অবসান। এক দিকে অনাদি পরিক্রমা, অন্য দিকে ক্লান্ত নিবৃত্তি।

কোণার্কের মন্দির নানা দৃষ্টিকোণ হতেই অভিনব। ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে সূর্য্যপূজার প্রচলন খুবই আশ্চর্য্য জনক। পারস্যাঞ্চল হতে সীমান্তদেশ অতিক্রম করে অগ্নি ও সূর্য্যপূজার যে প্রথা ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল—উত্তর-ভারতেই সে ছিল সীমাবদ্ধ। পূর্ব্ব-ভারতের আর কোথাও এর এত ব্যাপক আয়োজন আছে বলে জানা নেই। ভাস্কর্য্যের দিক দিয়ে মূর্ত্তিগুলিতে এবং সূর্য্যদেবের পায়ের পাদুকাতে বিদেশী প্রভাব সুস্পষ্ট। সূর্য্যমূর্ত্তি সবুজ পাথরের। এই সূর্য্য-মন্দিরের পিছনেই মায়ার মন্দির। সূর্য্য এবং মায়া দু'টি দেবতাই বৈদিক কল্পনা। পাথরের মূল মন্দিরটি সপ্তাশ্ববাহিত সূর্য্যরথের পরিকল্পনায় নির্মিত হয় আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীতে। বিদেশে এক কালে এটি না কি Black pagoda নামে পরিচিত ছিল। কিন্তু মন্দিরের পাথরের রং কৃষ্ণ নয়, বরং রক্তিম। বিশাল চত্বরের মাঝের এই মন্দিরের গর্ভগৃহে সূর্য্যদেবতা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মন্দিরের খুব কাছেই তখন প্রবাহিত ছিল অনন্ত জলধির উচ্ছল জলধারা। ভোরের অরুণ উদয়দিগন্তে যখন জেগে উঠত, তার প্রথম রশ্মি এসে স্পর্শ করত বিগ্রহের পদমূল। এই হল জনশ্রুতি। আমরা কিন্তু দেখলাম গর্ভবেদী সমেত সমস্ত মন্দিরটির পাদপীঠ অনেক নীচে বসান। সুতরাং আপাত বিচারে জনশ্রুতিটি নিতান্তই ভিত্তিহীন বলেই মনে হয়। কিন্তু আমাদের দু'জন সহযাত্রী ছাত্রবন্ধু পরে পুরীর রঘুনন্দন লাইব্রেরীতে একটি ষোড়শ শতাব্দীর তালপাতায় আঁকা পুরোনো পটুয়ার ছবি দেখেছিলেন—তাতে শিল্পিনিপুণ আখরে এঁকেছেন কোণার্কের মন্দিরের সম্পূর্ণাঙ্গ ছবি। এতে মূল মন্দিরটির তলদেশের ভিত প্রায় একতলা উঁচু করে আঁকা আছে। এই ছবিটি অন্য আরো একটি জটিলতার আলোকসম্পাত করে।

কোণার্কের মন্দিরটি আদৌ সম্পূর্ণ হয়েছিল কি না, সে সম্বন্ধে বহু মুনির বহু মত প্রচলিত। অনেকে বলেন, আকাশচুম্বী এই পরিকল্পনা শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হয় নি। অর্দ্ধেক পথে এগিয়েও মন্দিরের কাজ অসমাপ্ত রয়ে যায়।

অনেকে আবার বলেন যে, মন্দিরটি সমাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু এর সমাপ্তির সঙ্গে একটি তরুণ শিল্পীর দুর্ঘটনায় শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী জড়িত। তাই দেবালয় অপবিত্র হয়ে যাওয়ায় বিগ্রহ স্থাপিত হয় নি। অনেকের কিন্তু মত যে, এটি সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়েছিল, বিগ্রহও স্থাপিত ছিল। বেদীর নিচে নিত্য দেবার্চ্চনার জন্য যে জলের ব্যবহার হত তারও প্রমাণ আছে। দিল্লীতে যে বিগ্রহটি আছে সেটিই এই নিত্যসেবিত বিগ্রহ।

আমি শিল্পের পূজারীর দৃষ্টি নিয়ে গেছি। মন্দিরটির সমাপ্তি বা অসমাপ্তির সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই মনে এল না। শুধু পাথরের বুকে স্তব্ধ হয়ে থাকা সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর সুধাপানে বিভোর হয়ে গেল চিত্ত। তন্ময় হয়ে দেখলাম, কোণার্কের সেই সুপ্রসিদ্ধ উদ্ধতগতি বেগবান অশ্বযুগল আর হস্তিমিথুন। দেখলাম, ভাস্করের ধ্যানের প্রতিচ্ছবি অসংখ্য রূপের প্রকাশ। দেখলাম কলালক্ষ্মীর অপরূপ সুষমার ব্যঞ্জনা—সেই অসংখ্য নারীমূর্ত্তি। অপরূপ তাদের কেশ ও কেশবিন্যাস—অপূর্ব্ব তাদের বিলাসভূষণ! জগমোহনের চূড়ায় যে মূর্ত্তিগুলি আছে সেগুলি মানুষপ্রমাণ। নয়নলোভন ঠামে দাঁড়িয়ে আছে তারা। মিষ্টি হাসিটুকু যেন জমাট বেঁধে গেছে পাথরের ঠোঁটের কোণে। কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য্যজনক এই যে, যে মূর্ত্তিগুলি কাছে দেখলে গঠনে স্থূল মনে হয় সেগুলি নীচে হতে দেখলে অতি ললিত কমনীয় লাগে! ভাস্করের নির্মাণনৈপুণ্যের এই পরিমিত জ্ঞানে অবাক বিস্ময় লাগে। পুরাতত্ত্ববিভাগ জগমোহনটিকে আশু ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ভিতর "সিল" করে দিয়েছেন। পাশে ভাঙা মন্দিরটির গায়ে সিঁড়ি কেটে দেওয়া আছে। ঐ পথে চূড়ায় ওঠা যায়। এবং ঐ চূড়া হতে দিগন্ত-ছোঁয়া নীল সাগরবলয় দেখতে পাওয়া যায়।

আরো শুনলাম, এই মন্দিরের পরিকল্পনায় বিশ্বের জীবজগতের ক্রমিক বিবর্ত্তন ইতিহাস রচনার প্রয়াস আছে। জীবনের আদিম প্রেরণায় সে কোন সুদূর অতীতের প্রথম প্রভাতে একটি সুখনীড় রচনা করেছিল বিশ্বের প্রথম নরনারী। অস্ফুট চেতনায় সেদিন তাদের একটি বাঁচার ব্যাকুলতা ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। কিন্তু তারপরে যুগে যুগে কালে কালে চেতনার স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে এল সেই প্রেরণা—শুধু বাঁচা নয়, চাই আনন্দ, শুধু আনন্দ নয়, চাই কল্যাণ। চিত্তবৃত্তি শুধু ভোগেই তৃপ্ত হল না—কামনা করল নিবৃত্তির পরাশান্তিকে। তাই শুধু নীড় নয়—তারা রচনা করল সংসার, সমাজ। তারা সৃষ্টি করল শিল্প, সঙ্গীত, দর্শন। সীমার বাঁধনে তারা বাঁধতে চাইল অসীম অনন্তকে। এই বিবর্ত্তনের ক্রমিক প্রতিচ্ছবি আছে কোণার্কের মন্দিরের ধাপে ধাপে উৎকীর্ণ জীবন-লীলার অসংখ্য প্রতিচ্ছায়ার মধ্যে। মন্দিরের সব নিচে আছে প্রকৃত অন্তরের কামনা বাসনার ও জৈবিক প্রেরণার প্রতিলিপি। সবার উপরের শীর্ষদেশে আছে একটি পূর্ণ শতদল—পরিপূর্ণতার প্রতীক মানুষের আলোকাভিসারের শেষ তীর্থ। বালি ভেঙে অসংখ্য ভগ্নস্তূপ পেরিয়ে ফেরার পথ ধরে নিস্তব্ধ প্রদোষের ঝাউবন ব্যগ্র শাখাবাহু মেলে পথরোধ করতে লাগল। বারে বারে যেন নীরব প্রশ্নে তারা ব্যাকুল করে তুলল—বলে যাও, কি দেখে গেলে তুমি—দর্পিত মানবের লজ্জিত পরাজয়? না তার অন্তরের কালজয়ী সুধার স্বাক্ষর?

সেদিন রাত্রে আমাদের দলের অধিকাংশ অভিযাত্রী ফিরে এলেন কলকাতায়। সংসার-বিমুখ প্রাত্যহিকতার মলিনতাবর্জিত মাত্র তিনটি দিনের আলাপচারী। কিন্তু আন্তরিকতার নিবিড়তায় সে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল।

তিন দিন একটানা ঘোরাঘুরি হয়েছে। পুরীধামের শ্রীমন্দির ছাড়া অন্য কিছুই দেখা হয়নি। পরদিন সকালে সাইকেল-রিক্সা করে পুরীধাম পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়া গেল। প্রথমেই যবন হরিদাস গোস্বামীর আশ্রম। এখানে প্রসিদ্ধ সিদ্ধবকুল গাছটি বিশেষ দর্শনীয়। জানি না, বৃক্ষতত্ত্ববিদরা একে কি ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন! কিন্তু শুনেছি, বহু পণ্ডিত সুধীজন এসে বিশেষ ভাবে দেখেছেন একে। কিন্তু রহস্য সমাধানের কোনো সূত্র তাঁরা পান নি। অবশেষে নিশ্চয়ই প্রকৃতির খেয়াল বলেই এর উপর তাঁরা যবনিকাপাত করেছেন। কিন্তু প্রচলিত ভক্তিমতবাদে এর একটি অন্য ব্যাখ্যান আছে—কিম্বদন্তী হলেও শুনতে ভালই লাগে। তীর্থভূমির অলৌকিকতার সঙ্গে তার নাড়ির যোগ। সে ব্যাখ্যানটি পথপ্রদর্শক পাণ্ডাঠাকুরই আমাদের শোনালেন। আমি মুখ্যু নই মা! আমার চৈতন্যভাগবত পড়া আছে। আমি ফার্ষ্ট ক্লাশের ছাত্র। বছর ত্রিশের যুবক—আধুনিকতায় দুরন্ত, মণিবন্ধে ঘড়ি, নিপুণ টেরি-বাগানো আধুনিক নবীন পাণ্ডা! জানেন ত, মহাপ্রভুর শেষ দিন ক'টি এই নীলাচলেই কেটেছিল। হরিদাস গোস্বামী তাঁর বিশেষ কৃপাপাত্র ছিলেন। এই আশ্রমে ছিল তাঁর প্রায় নিত্য যাতায়াত। হরিদাস গোস্বামী সিদ্ধমহাপুরুষ ছিলেন।

একবার চৈতন্যদেব নিজের হাতে একটি বকুলের চারা রোপণ করেন এর প্রাঙ্গণে। অবশ্য পাণ্ডাঠাকুর আরো একটু রং চড়িয়ে দিয়েছিলেন। মহাপ্রভু যেখানে তাঁর দাঁতন-কাঠি ফেলেছিলেন সেখানে একটি চারা অঙ্কুরিত হতে দেখা যায়। তার পর হরিদাস গোস্বামী দেহরক্ষা করেন। লীলা সংবরণ করেন মহাপ্রভু। তাঁর অক্ষয় পুণ্য স্মৃতি বহন করে আশ্রমে বকুল গাছটি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। দিনের পর দিন কাটে—মাসের পর মাস। তার পর—বহুদিন পরের ঘটনা। একবার রথযাত্রার কিছু আগে পুরীর রথের চাকা ভেঙে যায়। আকস্মিক দুর্ঘটনায় সকলে বজ্রাহতবৎ। অবিলম্বে পবিত্র কাঠ পাওয়া যায় কোথায়? হঠাৎ রাজার মনে পড়ে এই বকুল গাছটির কথা। তৎক্ষণাৎ আদেশ গেল—কাল সকালেই ঐ গাছ কেটে আনবে। কিন্তু এক আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটল সেই রাত্রে। গভীর নিশীথে একটি প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে নাকি সকলে চমকে উঠেছিল। পরদিন সকালে আশ্রমে গিয়ে একটি অদ্ভুত দৃশ্যে সকলে আরো চমৎকৃত হয়ে গেলেন। গাছটির গুঁড়ি, কাণ্ড এবং যত দূর পর্য্যন্ত পুষ্ট শাখা ব্যবহারযোগ্য ছিল সব আগাগোড়া একেবারে নলের মত ফাঁপা হয়ে গেছে! আজ এত দিন পরে গাছটি দেখে বিস্মিত হলাম আমরাও। প্রায় তিন শতাব্দীর প্রাচীন গাছ। বিরাট আমগাছের মত দেখতে। মাথায় গাঢ় সবুজ পাতা এবং রসপুষ্ট ফলগুলি। কিম্বদন্তী যাই হোক, মহাপ্রভুর পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত গাছটিকে স্পর্শ করে ধন্য মনে হল নিজেদের, কিন্তু চৈতন্যদেবের ধর্মবিপ্লব সহচর হরিদাস গোস্বামীর আশ্রমটির রক্ষণা-বেক্ষণে আরো একটু ভাল ব্যবস্থা আশা করেছিলাম আমরা।

গম্ভীরা আশ্রমটির শান্ত পরিবেশ ভক্ত-মনকে স্পর্শ করে। এখানে

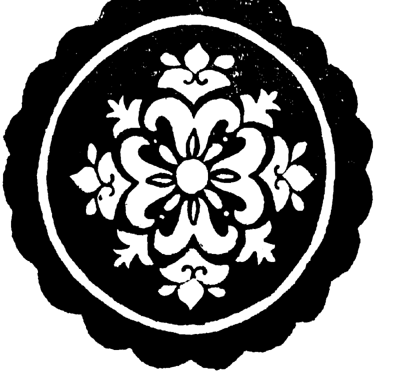
চৈতন্যদেবের খড়ম ও কমণ্ডলু এবং তাঁর মায়ের দেওয়া কাঁথার একটু অংশ আছে। বৈষ্ণব মোহান্তদের শান্ত আচরণ, প্রাঙ্গণের নিস্তব্ধতা এবং পাণ্ডার বিরলতা শান্তির অনুকূল পরিবেশ সৃজন করেছে। এখানেই একজন মোহান্ত গোস্বামীকে জিজ্ঞাসা করে 'নীলাচল' কথাটির অর্থগত তাৎপর্য্য পেলাম। গোস্বামীজি বললেন—সামুদ্রিক অঞ্চল, তাই নীলাঞ্চল হতে অপভ্রংশে নীলাচল কথাটির প্রচলন। এ ছাড়াও পুরীর মন্দিরটি একটি ছোট বালিয়াড়ির পাহাড়ের উপর বসান। কেন দেখেন নি, কতগুলি সিঁড়ি ভেঙে মন্দিরের চাতালে উঠতে হয়? অবশ্য বড় পাহাড় নয়। কিন্তু ছোট একটি পর্ব্বত নিশ্চয়ই। তারই উপর মন্দির বসানো।

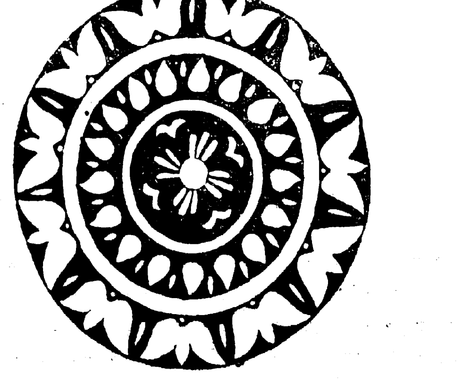
আগের দিন কোণার্কের পথের দু' পাশে পুকুরে দিনের বেলায় ফোটা অজস্র কুমুদ দেখেছিলাম। সেই প্রসঙ্গে পরিহাসও শুনতে হয়েছিল দাদাদের কাছে। দেখেছ ত? তোমাদের সংস্কৃত সাহিত্যে শুধু উপমা আর কল্পনা! এ নয় বাদ গেল। বল ত নীলাচলের অচল অংশটুকুর সঙ্গে পাহাড়ের সম্পর্ক কোথায়? বলতে পারিনি কিন্তু প্রশ্নটা শাণিয়ে রেখেছিলাম মনে মনে। আজ তার যুক্তি-যুক্ত উত্তরে খুসী হল মন।

পুরীর জগন্নাথের মন্দিরটি অতি সুপ্রাচীন। স্কন্দপুরাণে পুণ্য-তীর্থ ভূমি পুরুষোত্তমের উল্লেখ আছে। বহু ধর্মবিপ্লবের প্রত্যক্ষ সাক্ষী এ। মুসলমান অত্যাচার, বৌদ্ধধর্মের পতনকালীন অনাচার প্রমুখ বহু বিপরীত তরঙ্গের আঘাত অতিক্রম করতে হয়েছে তাকে। বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে মন্দিরের স্থাপত্যেও দুই তিনটি পর্য্যায়ের বা ধারার সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুরীর মন্দিরের প্রাচীরচিত্রে কয়েকটি শালীনতা-বর্জিত প্রতিকৃতির সম্বন্ধে বহু বাকবিতণ্ডা আছে, কিন্তু সে ছাড়াও প্রাচীরচিত্রের বহু অংশের নৈপুণ্য বিশেষ লক্ষণীয়। পুরীতে এসেই প্রথম যেদিন আমরা এখানে এসেছিলাম সেদিন পথ-প্রদর্শক ছিলেন ভীম পাণ্ডা। তিনিই নাকি এখন মন্দিরের পাণ্ডা কমিটির সেক্রেটারি। সেদিন খুঁটিয়ে সব দেখিয়েছিলেন আমাদের। পুরীর মন্দির-প্রাঙ্গণে নাকি তেত্রিশ কোটি দেবতার মন্দির আছে। অবশ্য তেত্রিশ কোটি না হলেও কয়েক শ' যে আছে সে ত দেখলামই। উপনিষদে আছে, মহাকালের ভয়েই সূর্য আলো দান করে, চন্দ্রকিরণ বর্ষণ করে, বাতাস বয়। ভয়েতেই ত্রিলোক শাসিত। ত্রিলোক শাসিত কি না দেখবার মত দূরদৃষ্টি আমাদের নেই। কিন্তু আমরা যে শাসিত সে বিষয় সুনিশ্চিত। জন্মলগ্ন হতে অশরীরী মরণের কালোছায়া শিকারীর মত আমাদের তাড়া করে ফিরছে। শঙ্কায় বিবর্ণ আমরা পাণ্ডুর বাহু মেলে একচোখো হরিণের মতই ভয়ার্ত্ত হয়ে বেগে ছুটেছি—বাঁচাও বাঁচাও। প্রবল আতঙ্কে কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না। তাই করেছি সবাইকেই বিশ্বাসের ছলনা। তাই তেত্রিশ কোটি দেবতার তেত্রিশ কোটি মন্দিরে তেত্রিশ কোটি বার করছি প্রণাম। পাণ্ডা ঠাকুর একের পর এক মন্দির দেখিয়ে নিয়ে চললেন। মূল মন্দিরের পিছনে কয়েকটি মন্দির অত্যন্ত প্রাচীন। এরি মধ্যে কয়েকটি প্রাচীনতম মন্দিরে নাকি আদিবিগ্রহ নীলমাধব ছিলেন। এ স্থানটি তখন ছিল অরণ্য-সমাকুল। সে অরণ্যে রাজত্ব করতেন শবরবংশ। ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি শবররাজ বিশ্বাবসুর দুহিতাকে বিবাহ করে বিগ্রহ পুনরুদ্ধার করেন। এবং মন্দির স্থাপনা করেন। আজো পর্যন্ত তাঁদেরই বংশধর মন্দিরের নিত্য সেবাইত। শোনা যায়, আদি দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন পদ্মপাদ শঙ্করাচার্য্য। মন্দিরে নিত্যসেবিত জগন্নাথের পরিচয় সম্বন্ধেও বহু মতান্তর আছে। কোনো কোনো মতে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তি বৌদ্ধধর্ম, সংঘ ও বুদ্ধের প্রতীক। বৈদান্তিকেরা বলেন জগন্নাথ ওঁকারের প্রতীক। বিষ্ণু পুরাণ মতে কিন্তু জগন্নাথ শ্রীবিষ্ণু বা কৃষ্ণ। বর্ত্তমানের বড় মন্দিরটি অনঙ্গ ভীমদেব নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

মন্দিরের অফিস-বাড়ি হতে দূরে লক্ষ্মী-কালী দেখা গেল। এই অফিস-বাড়ির এক পাশে জঙ্গলের মধ্যে জগন্নাথের নব কলেবরের সময় পুরাতন কলেবর সমাধিস্থ করা হয়। পাণ্ডা ঠাকুর বললেন, অত্যন্ত সদাচারী শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণে এই কর্ত্তব্য পালন করেন। কিন্তু তার কিছুদিন পরই নাকি তিনি দেহরক্ষা করেন। তিনি দিব্য দিয়ে বললেন যে তিনি স্বচক্ষে এই তিন বার এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। গত বার যিনি এই পুরান কলেবর সমাধিস্থ করেন তিনি তার দশ দিনের মধ্যেই দেহত্যাগ করেন। অফিস-বাড়ির সামনে বটগাছে কয়েকটি শিশু শাখামৃগ ডাল ধরে দোল খাচ্ছিল। আমরা হাতছানি দিয়ে ডাকতে তারাও হাতছানি দিতে দিতে মগডালে উঠে গেল। শুনলাম, উৎপাত বন্ধের জন্য সরকার নাকি আট শত বাঁদর গুলী করে মেরেছেন। কয়েকটি শিশু মাত্র আছে।

—ইন্দিরা রায় অঙ্কিত





ভীম পাণ্ডার সঙ্গে প্রধান মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলাম। অন্ধকারে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। স্তিমিত জ্যোতির ম্লান আভায় একটি রহস্যময় পরিবেশ! এখন শীতকাল। বিগ্রহ দেবতার সর্ব্বাঙ্গ গরম কাপড়ে ঢাকা। জগন্নাথ দেবের কপালে একটি বড় হীরে ও সুভদ্রার শিরে একটি বড় সবুজাভ পান্না জ্বল্ জ্বল্ করছে। বেদী প্রদক্ষিণ করে নাটমন্দিরে আসি আমরা। অতীতের পুণ্য সৌরভ একটি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের মন্থর বন্যায় ধীরে ধীরে ভেসে আসছে মনে। নদীয়ার সেই প্রেমিক ঠাকুরের স্মৃতিরেণু বিজড়িত অলিন্দের কোণে এসে থমকে দাঁড়াই। এই কোনটিতেই দাঁড়িয়ে মহাপ্রভু দর্শন করেছিলেন নীলাচলের অধিরাজকে। কৃষ্ণ বিরহের তীব্র জ্বরজ্বালা তাঁর শ্রীঅঙ্গে। শোনা যায়—সে উত্তাপে তার চাঁপার মত আঙুলের চিহ্ন আঁকা হয়ে গিয়েছিল মন্দিরের গায়ে, যেখানে হাত দিয়ে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। নিচে কঠিন পাথর সে উত্তাপে কোমল হয়ে বক্ষে ধারণ করেছিল দুটি পাদপল্লবের ছাপ। শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজি সেই পবিত্র পাথরখানিকে তুলে নিয়ে অঙ্গনে ছোট্ট একটি মন্দির তুলে দিয়েছেন। তার সামনে একজন বৈষ্ণব বাবাজি নীরবে বসে চৈতন্যভাগবত পাঠ করছেন—আগন্তুক ভক্তের হাতে তুলে দিচ্ছেন একটি তুলসীর প্রসাদ কণিকা। বেশ একটি হৃদয়গ্রাহী ভক্তিরসাশ্রিত শান্ত পরিবেশ!

মূল মন্দিরে প্রহরে প্রহরে নির্দ্দিষ্ট প্রথানুসারে পালাক্রমে নব নব বেশ ও ভোগ হয়। কিন্তু বাংলা দেশের মন্দিরের মত সন্ধ্যারতি হয় না। এই সন্ধ্যারতিটুকু বাঙালীর বড় একান্ত প্রিয়।

অতীতের বহু পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত মন্দিরের দীর্ঘ সোপান বেয়ে ফেরার পথ ধরেছি। তন্ময় মনে ইতিহাসের পাতাগুলি বিস্মৃতির রুদ্ধদ্বারের আগল ভেঙে ভেঙে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। আনন্দ-বেদনার ললিত-পঞ্চম মীড়ে মূর্চ্ছনায় কলস্বরা হয়ে উঠেছে সেখানে। হঠাৎ মায়ের ডাকে ফিরে দাঁড়াই। প্রবেশপথের পাশেই মন্দিরের মূল বিগ্রহের অনুকল্প একটি বিগ্রহ। পাণ্ডা ঠাকুর গদগদ হয়ে বলে চলেছেন—এই যে মা! ইনি পতিত-পাবন জগন্নাথ। যে সব পতিতের মন্দিরে প্রবেশাধিকার নাই তাঁদের জন্য তিনি এখানে নেমে এসেছেন। কথাগুলি বিদ্রূপের মত লাগল কানে। আশ্চর্য্য! অদ্বৈত-সাধনার পুণ্যপীঠ ভারতবর্ষে, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের বিপ্লবাত্মক প্রেমবাদের অন্যতম তীর্থক্ষেত্রে আজ 'হীন পতিতের ভগবান' তাদের সাথে ধূলায় এসেছেন নেমে—হীন পতিত জ্ঞানে তুচ্ছ করে তাদের আমরা দেবালয়ে তুলে ধরিনি। স্বাধীন ভারতের সংবিধানে সকলের মনুষ্যত্বের স্বীকৃতি দান মৌলিক অধিকাররূপে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু সে কি শুধু পুঁথিগত মাত্র? যে ভারত একদিনে তার সার্ব্বভৌম উদার মন্ত্রের বাণী প্রচারের জন্য দেশে বিদেশে প্রেরণ করেছিল তার ধর্মদূত—সুদূর চীনে, তিব্বতে, যবদ্বীপে, শ্যাম, কাম্বোজ, সিংহলে সে আজ মন্দির-দ্বার হতে প্রত্যাখ্যান করে ভক্ত আগন্তুককে—একমাত্র অপরাধ তার সে বিদেশী কিম্বা অন্ত্যজ। যে ভারতের ঋষি সত্য ভাষণের জন্য একদা জবালাতনয়কে ব্রাহ্মণতনয় বলে সাদরে আলিঙ্গন করেছিলেন, সেই ভারত কি আজ তার-আপন ঐতিহ্যকেও ভুলে গেছে? যে পুরীধামের পুণ্যক্ষেত্রে মহাপ্রভু চৈতন্যদেব প্রচার করলেন মানুষে মানুষে সাম্য প্রেম প্রীতির বন্ধন—পরম সমাদরে কোল দিলেন যবন ভক্ত হরিদাসকে, তাঁর সে পুণ্যভূমির মন্দির-দ্বার হতে বিতাড়িত হলেন আমাদের সহযাত্রী জার্মাণ অধ্যাপক বন্ধু! আজ মহাপ্রভুর জীবন সাধনা কি অতীতের গাথা হয়েই থাকবে বেঁচে? এ গাথা শুনে চোখের কোলে আনব দু ফোঁটা অশ্রু—কিন্তু কর্ত্তব্য সমাধান করব তাঁর স্মৃতিচিহ্নে দু'টি তুলসী-চন্দন দিয়ে?

চন্দনপুকুর আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রম দেখে যখন হোটেলে ফিরে এলাম, তখন অনেক বেলা। এসে দেখি আরেক ব্যাপার! দাদা দু'তিন জনকে নিয়ে sand dunes দেখতে গিয়েছিলেন। এই কিছুক্ষণ হ'ল তাঁরা ফিরেছেন। তাঁদের কাছে উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনেই মুগ্ধ! পুরীর এত কাছে ঝাউবনের মরূদ্যান-শোভিত এমন একটি মরুভূমি আছে, একথা আগে না জানা থাকায় ওঁদের সঙ্গে যাবার আগ্রহ প্রকাশ করিনি। এখন বঞ্চিত মনকে সান্ত্বনা দিই বিপুল এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!

বিকালে সদলে চক্রতীর্থে সোনার গৌরাঙ্গ দেখতে যাওয়া হল। ফিরে এলে পূর্ব্ববর্তনী পুরী প্রত্যাগতরা ঘাড় কাৎ করে গালে হাত দিয়ে বলবেন, সে কি দিদি! পুরী গেলেন আর সোনার গৌরাঙ্গ দেখলেন না? সেই অপবাদের ভয়েই গেলাম। নইলে বিদায় বেলায় সমুদ্র সৈকত ছেড়ে যাবার ইচ্ছা কারো ছিল না। সকলেরই মনের কথা বিদায়ের ক্ষণ আরো একটু দীর্ঘায়িত হোক—যাই যাই করেও ফিরে ফিরে চাওয়া! চক্রতীর্থের এই মন্দিরটিতে পড়ন্ত-বেলায় উপস্থিত হই সদলে। উঠানের করবী গাছ গুচ্ছ গুচ্ছ রক্তফুলভারে নত। কিন্তু কোথায় গৌরাঙ্গ? এ যে চাঁচর-চিকুর, সুবর্ণ মুরলীধারী বঙ্কিমঠামে নটবরবেশে আমাদের যশোদানন্দন! উঁকিঝুঁকি দিতে বালগোপাল দর্শন দিলেন। কিন্তু গৌরাঙ্গ? অবাক হয়ে বেরিয়ে আসছি আমরা—নিশ্চয়ই এই মন্দির নয়। ভুল হয়েছে আমাদের। বাইরে একজন বৃদ্ধাকে দেখে ভরসা হল। বলতে পারেন, সোনার গৌরাঙ্গের মন্দির কোনটি?—কেন?—অবাক্ হল বৃদ্ধা। ঐখান থেকেই ত আসছেন! —সে কি? সমবেত বিস্ফারিত নেত্রের আক্রমণে বোধ করি একটু বিব্রত হলেন তিনি। তারপর একগাল হেসে বললেন—গৌরাঙ্গ এখানে কৃষ্ণের ভাবেই আছেন কিনা।……শেষ সমুদ্রসন্ধ্যাটি হারিয়ে অনুতাপ হল।

আজই ফিরে যাব। স্বপ্নের মত কেটে গেল চারিটি দিনের মধুর অধ্যায়। প্রাত্যহিকতার শত অপূর্ণতা আর না-পাওয়ার বেদনার মধ্যে কে যেন একটি পূর্ণ সুধাকুম্ভের সংবাদ দিয়েছিল এনে। তার স্পর্শে অন্তরবাসী একটি বুভুক্ষু পেয়েছিল অধরার মাধুর্য্য। ধন্য হল সে —"অনেক চাওয়ার মাঝে মাঝে কখন একটুখানি পাওয়ার" মাত্র এই চারিটি দিনে। শেষ বারের মত তীরে এসে দাঁড়াই। অনন্ত জলধারার প্রবল উচ্ছ্বাস অনাদি কাল হতে তেমনি করে অচিন্রাগিণী বাজিয়ে এসেছে, আজও সে'বেজে চলেছে তেমনি সুরেই। কাল যখন আমরা থাকব না এখানে তখনও ত সে একই ছন্দে এমনি ভাবেই বেজে চলবে? বিয়োগবেদনায় মুহূর্ত্তকালের জন্যও বিমনা হবে না সে। অনাদি পরিক্রমায় শুধু গতি আছে যতি নেই। শুধু উচ্ছ্বাস আছে বন্ধন নেই। অনন্তরূপিণী সে সান্তের প্রতি নেই তার এক কণা ভীরু মমতা। সে কি নিষ্ঠুরা না মায়াবিনী? নৈশ সমুদ্রের প্রলয় গর্জনে কোনো উত্তর এলো না ভেসে। সাইকেল-রিক্সায় মোড় পেরিয়ে ষ্টেশনের পথে আসি—তাড়া আছে। ট্রেণ ৯টায়।

শেষ

আধুনিকা

[উপন্যাস]

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২২

হরগৌরীপুরে ফিরে সঙ্গের সেই ব্যাগ ও ছাতা হাতে করে পশুপতি বাড়ীর চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসেই থমকে দাঁড়ালেন। গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে এ সময় পশুপতিই জাঁকিয়ে বসতেন। প্রথমে হয়ত একাই আসতেন, কিন্তু পাঁজিপুঁথি খুলতে না খুলতেই লোকজনের আসা আরম্ভ হয়ে যেত। আবার, কোন কারণে তিনি উপস্থিত না থাকলে আর কারও টিকিও দেখা যেত না। হালদার মশাই গ্রামে নেই—এ খবরটা আগে থেকেই যেন লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে, কাজেই চণ্ডীমণ্ডপেও লোকের ভীড় জমে না। পশুপতিরও এ কথা অজানা নয়।

ভিতর থেকে বারাণ্ডা পর্যন্ত—ভদ্র ইতর নানা শ্রেণীর লোক, পাশের দিকে পাড়ার ঝিউড়ী-মেয়েরা পর্যন্ত আব্রু বাঁচিয়ে জড় হয়েছে। কি ব্যাপার? তিনি উপস্থিত থাকলেও সব দিন এত জনসমাগম হোত না! বিস্ময়ে তাঁর কণ্ঠও বুঝি অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

হালদার মশাইকে দেখতে পেয়ে চণ্ডীমণ্ডপ থেকে একসঙ্গে প্রায় সকলে সহর্ষে অভ্যর্থনা জানালেন—হালদার মশাই এসেছেন—হালদার মশাই।

পশুপতি মোটামুটি বুঝলেন, তাঁর সম্বন্ধেই কোন কথা নিয়ে সারা গ্রামের লোক এখানে জমায়েৎ হয়েছে এবং আলোচনার মুখেই তাঁকে উপস্থিত দেখে এদের মনে মুখে এখন আনন্দ ধরছে না। তাড়াতাড়ি চণ্ডী-মণ্ডপের সিঁড়ির নীচেই হাত-মুখ ধুয়ে হাত তুলে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে এবং ভিতরের ফরাসে উপবিষ্ট বয়োজ্যেষ্ঠ সত্য ঘোষালকে প্রণাম ও সমবয়স্কগণকে নমস্কার করতেই, সত্য ঘোষাল বললেন: তোমার জায়গাতেই এসে ব'স হে পণ্ডিত! এই তোমাকে নিয়েই আজকের ঝামেলা।

যথাস্থানে উপবেশন করতে করতে পশুপতি জিজ্ঞাসা করলেন: কি ব্যাপারখানা কও ত খুড়ো?

সত্য ঘোষাল বলতে আরম্ভ করলেন: তুমিও দুর্গা বলে কলকাতা রওনা হলে, তার ঘণ্টা দুই বাদেই বড় ডাকঘর থেকে তোমার নামে এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। যাবার আগে তুমি বগলার স্ত্রীকে লিখেছিলে—কলকাতায় যাচ্ছ। তারই জবাবে বগলা তোমাকে জানিয়েছে—কলকাতায় এখন এসো না। কেন—সে কথা পরের টেলিগ্রামে জানাচ্ছি।

গম্ভীর ভাবে পশুপতি বললেন: বুঝিছি। তার পর?

সত্য ঘোষাল বললেন: আমরা তখন ভেবেই অস্থির। তোমাকে এ খবর দিয়ে ফিরিয়ে আনতে পারলেই ভাল হয়—কিন্তু তোমাকে পাই কোথায়? তুমি ততক্ষণে রেলগাড়ী চেপে বসেছ—কাজেই নিরস্ত হতে হল। কিন্তু গেরামশুদ্ধ লোক তোমার তরে ভেবেই অস্থির! তার পর হলো কি রে বাপু—পরের দিন ঠিক ঐ সময় আর এক টেলিগ্রাম এসে হাজির। রাধা সে টেলিগ্রামখানা যত্ন করে তুলে রেখেছে তোমার জন্যে। তবে পণ্ডিত, আগেই বলি বাপু—বগলা তার নিজের মুখে, নিজের বংশের মুখে কালি লেপে দিয়েছে, সেই সঙ্গ হরগৌরীপুর গেরামের মুখখানা পুড়িয়ে দিয়েছে। তার ঐ লেখনের মোদ্দা কথা হচ্ছে—তার মেয়েরা কলেজে পড়ে উঁচু দরের লিখিয়ে পড়িয়ে হয়েছে। তারা এখন সহরের—কি বলে ঐ যে গো—হ্যাঁ, হ্যাঁ—আধুনিকা মেয়ে। তোমার ছেলে ললিতের খোঁজখবর নিয়ে নাকি জেনেছে—সে ব'য়ে গেছে, তার মাথার ঠিক নেই, কাশীর ছেলেরা তাকে কি একটা নাম করে পাগলা কবি বলে ক্ষেপায়।

রাধাও মেয়েদের দিকে ছিল। সে চাপা গলাটাকে এখন দরাজ করেই বলল: ওমর খৈয়ম।

সত্য ঘোষাল বললেন: তা হবে, এখন যা বলছিলুম—তারা বগলা সাহেবের বিবি মেয়ে তাকে কখনই বিয়ে করবে না। তা ছাড়া, সে নাকি তোমার ক্ষ্যাপা ছেলেকে ভুলেও গেছে। তারপর, যুদ্ধের সময় মস্ত সহায় হয়ে যে দুই সদাশয় ব্যক্তি বগলার অদৃষ্টের চাকাখানা ঘুরিয়ে দিয়েছিল—তাঁরা পালটি ঘর, আর তাদের ছেলেরাও আধুনিক আর উপযুক্ত বলে তাদের সঙ্গেই বগলার দুই মেয়ের বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে, তার প্রধান কারণ হোচ্ছে—বগলার দুই মেয়েই ঐ যে গো—হ্যাঁ, আধুনিকা। এই জন্যেই বগলা তোমাকে চিঠি দেয় না, আর তোমার যাওয়াও সে পছন্দ করে না।

সত্য ঘোষালের মুখে বগলার প্রেরিত টেলিগ্রামের মোটামুটি কথাগুলো শুনতে শুনতে পশুপতি পণ্ডিতের মনের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠছিল বগলার স্ত্রী, বগলা ও তার মেয়ে দেবীর আকৃতি ও প্রকৃতিগুলি একটার পর একটা। বগলার আগের আকৃতির বিকৃত রূপ, আর প্রকৃতির নব পরিচিতি-স্বরূপ বিশ্রী ও অভদ্র উক্তিগুলির কোনটিই পশুপতি বিস্মৃত হননি। টেলিগ্রাম বগলাই পাঠিয়েছে এবং ললিত ও দেবীর সম্বন্ধে যে-সব অবান্তর কথা তুলে সম্বন্ধটা কাটাতে চেয়েছে, সে যে তারই কল্পিত। স্ত্রী বা কন্যার অজ্ঞাতে নিজেই এই সব ভণিতা করে পাঠিয়েছিল, নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সেটা উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন পশুপতি—যেহেতু তিনি স্বচক্ষে তিন জনকেই দেখেছেন এবং বগলার পত্নী স্পষ্টই বলেছেন, পশুপতির কোন চিঠিই তাঁর হস্তগত হয় নি। তাঁর যত্ন ও সশ্রদ্ধ ব্যবহার থেকেই প্রতিপন্ন হচ্ছে, বগলার এ সব অবান্তর কথার সঙ্গে তাঁর মনের কোন যোগ নেই। আর দেবীকে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, মায়ের মুখে তার সুখ্যাতিই শুনেছেন, দেবীর সঙ্গে

কথাবার্ত্তায় তেমন সুযোগ না হলেও, তার আকৃতি দেখেই তিনি বুঝেছিলেন, মায়ের মধুর প্রকৃতিই কন্যা পেয়েছে। দেবীর মা যে তাঁর সঙ্গে চাতুরী করেছেন, এমন ধারণা তাঁর মনে কিছুতেই স্থান পেতে পারে না। যদি তিনি কলকাতায় না যেতেন, দেবীর মায়ের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ না হত, তাহলে বগলার এই টেলিগ্রামের বয়ান তিনি সত্য বলেই মেনে নিতে দ্বিধা করতেন না, অর্থাৎ—বগলা তার স্ত্রী কন্যার মতানুবর্ত্তী হয়েই টেলিগ্রাম পাঠিয়েছে বলে বিশ্বাস করতে বাধ্য হতেন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীরূপে ওখান থেকে তিনি যতটুকু তথ্য জেনেছেন, তাতে বগলার পর পর দু'খানা টেলিগ্রাম থেকে নিজের বিচার-বুদ্ধিতে তিনি এই সত্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন যে, এ বিবাহে বগলারই শুধু অনিচ্ছা ;- তাই সে নিজে থেকে পশুপতিকে পত্র দেওয়া বন্ধ করে এবং সেই সূত্রে পশুপতির পত্রের উত্তর দেওয়াও প্রয়োজন ভাবে না। এর পর পশুপতি তার পত্নীকে পত্র লিখলে, সে পত্র তারই হাতে পড়ায় চেপে রাখে। কিন্তু শেষের পত্রে পশুপতি কলকাতায় রওয়ানা হচ্ছে জেনে, পাছে পত্রের ব্যাপারে অপ্রীতিকর ব্যাপারগুলো জানাজানি হয়, তাই সে পশুপতির কলকাতা যাওয়া বন্ধ করবার জন্য প্রথম টেলিগ্রাম পাঠায়, তারপর একটা মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে দ্বিতীয় তারখানা পাঠায়—যাতে আর কোন চেষ্টা না হয়—পুরোনো ব্যাপারটা নিয়ে।

চণ্ডীমণ্ডপে সমাগত কৌতূহলী সাধারণ জনতা ও প্রতিবেশী বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে উদ্দেশ করেই পশুপতির বগলার বাড়িতে যাওয়া, তার সেখানে দপদপা, অতুল ঐশ্বর্য, বাড়ির আদব-কায়দা থেকে আরম্ভ করে—বগলার স্ত্রীর আন্তরিক শিষ্টাচার, আদর-আপ্যায়ন, গ্রামের সব কিছু খুঁটিনাটি করে জানবার আগ্রহ, তারপর—বগলার খাস কামরায় যেতেই সেখানকার ঘটনা, বগলার উদ্ধত ব্যবহার, তাঁর সঙ্গে বচসা, রাগ করে বেরিয়ে আসা, নিচে দেবীর সঙ্গে দেখা ও তার ভাবভঙ্গি সমস্তই—যেমন যেমন ঘটেছিল, আগাগোড়া সমস্তই পর পর দিব্যি গুছিয়ে শুনিয়ে দিলেন। শেষে বগলার দু'খানা টেলিগ্রামের কথা তুলে, জিজ্ঞাসা করলেন : সব ত শুনলে তোমরা, যেমন যেমন হয়েছে—নিজে জেনেছি, দেখিছি সবই বললুম। এখন তোমরাই বল—এর পর আমার কি উচিত।

পশুপতির মুখে বৃত্তান্তগুলি শুনতে শুনতে বগলার স্ত্রীর সম্বন্ধে যেমন অনেকেই অভিভূত হন—মেয়েরাও চাপা গলায় আহা-উহু করতে থাকেন গ্রামের ওপর তাঁর দরদের ব্যাপারে, তেমনি বগলার ঔদ্ধত্যে, নিজেদের গাঁয়েরই জানা লোক আজ সহরে বিশেষ করে—পশুপতি পণ্ডিতের মতন সাধু সজ্জন ঋষির মত মানুষটিকে ওভাবে হেনস্তা করায়, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভিভূত চিত্তও গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু চাষীদের উত্তেজনা বে-সামাল হয়ে একটা চাঞ্চল্য জাগিয়ে তোলে। প্রবীণ প্রৌঢ় তরুণ—প্রত্যেকেই ঝাঁঝিয়ে উঠে, এ হেনস্তার প্রতিকার দাবী করতে থাকে।

কুম্ভকণ্ঠে উদ্ধত ভঙ্গিতে একসঙ্গে রুখে উঠে প্রত্যেকেই প্রাণের কথা জানতে চায়। গ্রামের এই ভক্তিভাজন প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ সদাশয় মানুষটির প্রতি ধনীর কুব্যবহার তাদের উপরেও রীতিমত আঘাত দিয়েছে। এই অনুভূতিতেই গ্রামের এই অশিক্ষিত সাধারণ সমাজ বিক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকায় পশুপতিই সকলকে শান্ত করে সংযত স্বরে বললেন : আমি বুঝতে পারছি, হরগৌরী-মন্দিরে ওদের শিশু বয়সের কাণ্ডটা প্রবাদের মত এ অঞ্চলে জানা-জানি হয়ে আছে—কেউ ভোলেনি। সবাই ঠিক করে রেখেছে …আমার ছেলে ললিতের সঙ্গে বগলার মেয়ে দেবীর বিয়ে হবেই। যেহেতু, হরগৌরীর সামনে ছেলে-মেয়ে উভয়েরই মায়েরা বাগ্‌দত্তা হন। আমার মনেও এই ধারণা বরাবর দৃঢ় থাকে। মৃত্যুকালে ললিতের মা-ও আমাকে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিয়ে অনুরোধ করে গেছেন—মন্দিরে ঠাকুরের সামনে তাঁরা যে অঙ্গীকার করেছিলেন, যেন আমরা তা রক্ষা করি। সেই জন্যেই—ছেলের বাবা হয়েও আমিই বগলাকে বরাবর চিঠিতে জানিয়ে এসেছি। আজ সে বড়লোক হয়েছে বলে নয় ; আমি দরিদ্র হলেও কোন আর্থিক দাবী তার কাছে প্রত্যাশাও করিনি। আমার লক্ষ্য শুধু—সত্য রক্ষা, দুই মায়ের প্রতিশ্রুতি যাতে বজায় থাকে। সেই জন্যই চিঠিগুলোর জবাব ওরা না দিলেও আমি ওদের সামনে গিয়ে বোঝাপড়া করতে চেয়েছিলুম। বগলার সঙ্গে দেখা হবার আগেই তাঁর স্ত্রী দেবীর মার সঙ্গে দেখা হোতে, তিনি যেভাবে অভ্যর্থনা করেন, যে সব কথা বলেন, সারা গ্রামখানাকে যে ভাবে মনে রেখেছেন, তাতে আমার সমস্ত অন্তর জুড়ে এই ধারণাই স্পষ্ট হয় যে, অবস্থা পরিবর্তন হলেও দেবীর মায়ের মন একটুও বদলায় নি। কিন্তু বগলার সঙ্গে দেখা হতেই আমি কি ভাবে আকাশ থেকে যেন আছাড় খেয়ে পড়ি, সে সবই ত শুনেছ। কিন্তু এখানে এসে এই টেলিগ্রাম দুটো দেখে বুঝতে পারছি—সবই বগলার কারসাজি। সে আগের কথা রাখতে চায় না, স্ত্রীর কাছে—দেবীর কাছে সব চেপে রেখে পর পর টেলিগ্রাম দুটো পাঠিয়েছিল। প্রথমটায়—আমার যাওয়া

বন্ধ করা, দ্বিতীয়টায় জানিয়ে দেওয়া, দেবী ও রাণী দুই মেয়েরই বিয়ের কথা পাকা হয়ে গেছে। আমার যাবার আগে ও দুটো এলে, নিজে থেকেই আমাকে নিরস্ত হতে হোত, বগলার সঙ্গে আর ওভাবে মনান্তর ঘটত না। তবে এ-ও সত্য যে—তাহলে দেবীর মা বা দেবীর অবস্থাটা জানতে পারা যেত না। এইখানে জগদম্বারও চাতুরী প্রকাশ পাচ্ছে। জানিনে, তাঁর মনে কি আছে!

আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটাই মনে মনে আলোচনা করে পশুপতি অকপটে সবার সামনে ভাবার্দ্র স্বরে ব্যক্ত করলেন। তাঁর শেষের কথার উপর আপত্তি তোলবার মতন মনোবল কারও এখানে নেই। পল্লীঅঞ্চলে সংস্কারশীল ঈশ্বরবিশ্বাসী ব্যক্তি মাত্রেই দৃঢ় বিশ্বাসী যে, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের ব্যাপারে মানুষের কোন হাত নেই।

একথার পর সত্য ঘোষাল জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে বললেন: তোমার কথা থেকে বুঝতে পারছি পণ্ডিত, বগলার ওপর আস্থা হারালেও তাঁর স্ত্রীর উপর তোমার ধারণা এখনো ভালোই আছে। হোতে পারে বগলা পয়সার গরমে নিজের মাথাও গরম করে ফেলেছে, সে এখন তার যোগ্য ঘরে মেয়েদের দিতে চায়। কিন্তু তুমি ওখানে যেতে যে কাণ্ড ঘটে—তাতে সব ফাঁস হয়ে গেছে। এখন আর বগলার ইচ্ছাটাও চাপা নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে, ওর স্ত্রী সব জানতে পারলেও তার ক্ষমতা হবে কি বগলার মত ফিরিয়ে আবার তোমাকে যাবার জন্যে—

ঈষৎ উষ্ণভাবেই পশুপতি বললেন: আমি দরিদ্র হলেও, আমার মতিগতি তো তোমার অজানা নেই খুড়ো! আমি লাঞ্ছিত হয়ে যে বাড়ি থেকে চলে এসেছি, ওঁরা তু করে ডাকলেই সে বাড়ির সামনে দাঁড়াব—আবার সেঁধবার জন্য? সে পাত্রই এ শর্মা নয়। হ্যাঁ, তবে যদি জগদম্বার ইচ্ছায় বগলার ভুল ভেঙে যায়, ও যদি নিজের ত্রুটি বুঝতে পেরে এই গ্রামে এসে—শুধু আমার কাছে নয়—তোমাদের সবার, অর্থাৎ গ্রামের ষোলআনার কাছে হাত যোড় করে দাঁড়ায়, তখন তোমরা যদি বল—আমি তাকে ক্ষমা করব। এছাড়া আমার পক্ষ থেকে, কোন তদ্বির নেই, কোন যুক্তি নেই, কোন নালিশও নেই।

ইতিমধ্যে রাধা পশুপতির ঘরগৃহস্থালীর কাজগুলিকেও এগিয়ে দিয়েছিল। পাড়ারই কোন ব্রাহ্মণ-পরিবারের শুদ্ধাচারিণী এক প্রবীণা বিধবা তাঁর ক্ষুদ্র সংসারটি দেখাশোনা করতেন। তাঁরও আহারাদি এখানেই সম্পন্ন হত। পশুপতিও তাঁকে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সম্মান দিতেন। পশুপতির প্রত্যাবর্তনের সংবাদটা তাড়াতাড়ি তাঁকে জানিয়ে, বাড়ির পুরাতন পরিচারিকাকেও তাড়া দিয়ে রাধা উভয়কে কর্মব্যস্ত করে নিশ্চিন্ত হয়ে পুনরায় চণ্ডীমণ্ডপে ফিরে গিয়ে তার স্থানটিতে বসে পড়ে। সমগ্র মনটা নিবিষ্ট করেই সে পর পর দু'খানা টেলিগ্রাম সংক্রান্ত আলোচনা শুনছিল। এর প্রয়োজন বা সার্থকতা তার পক্ষেও কম নয়। মূল টেলিগ্রাম ও তাদের তর্জমা তারই কাছে গচ্ছিত আছে। উত্তেজনার বশে এরই মধ্যে রাধাও এক কাণ্ড করে বসেছে। পশুপতির কলকাতা যাত্রা এবং তার পরই টেলিগ্রাম দু'খানা আসার কাশীর বিদ্যাপীঠের ঠিকানায় ললিতকে লিখে জানিয়েছে এবং দুটো তারের বয়ান নিজের কথার না লিখে, টেলিগ্রাম দু'খানার ইংরিজী কথাগুলো নকল করিয়ে চিঠির সঙ্গে দিয়েছে। চিঠির উপসংহারে দু' ছত্রে লিখেছে—"এখন মামাবাবু ফিরে এসে ওঁদের সম্বন্ধে কি বলেন, ঠিক সময়ে সে-খবরও পাবে।"

পশুপতি চণ্ডীমণ্ডপ থেকে বাড়িতে গিয়ে দেখেন, নেত্যঠাকরুণ এরই মধ্যে রান্নায় লেগে গেছেন। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন: ব্যাপার কি, আসতে না আসতেই যে তোমরা—

নেত্যঠাকরুণ হেঁসেল থেকেই সাড়া দিলেন: রাধাই ত তাড়াতাড়ি এসে জানিয়ে গেছে—আপনি এসেছেন বাবা! তেতে-পুড়ে আসছেন, তাই তাড়াতাড়ি লেগে গেছি।

হাত-মুখ ধুয়ে পশুপতি বাইরের দিকের ঘরখানায় সবেমাত্র বসেছেন, এমন সময় রাধা হন হন করে এসে ঘরে ঢুকেই মুখখানা ভার করে তাঁকে প্রণাম করল। পরক্ষণে উঠেই বলল: এইজন্যেই আমরা বরাবর টিক্-টিক্ করতুম মামাবাবু, আগে থেকে খোঁজ-খবর নেবার জন্যে।

পশুপতি বললেন: তারও ত কসুর করিনি মা! ওদিকে বগলাই নিষেধ করেছিল, কটা বছর চুপ করে থাকতে। সময় হতে যেই লিখতে লাগলুম চিঠি, সে কোন সাড়া দিলে না। মনের ভিতরে যে অন্য মতলব ছিল, সে ত তখন বুঝিনি!

সব জেনেও কথাটা এভাবে পাড়বার একটা উদ্দেশ্য ছিল রাধার মনে। সেই সূত্রেই সে কথাটার পিঠে হঠাৎ ললিতের কথা তুলে একটু ব্যগ্রভাবেই বলল: এখন ভাবছি মামাবাবু, ললিতদা' হয়ত এ খবর শুনে—

এই পর্যন্ত বলেই রাধা চুপ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পশুপতির মুখের পানে তাকাল। পশুপতিও তৎক্ষণাৎ বললেন: ওর জন্যেই আমার যত ভাবনা, আমার ওপরেই নির্ভর করে সে নিশ্চিন্ত আছে। জানে, বাবাই সব ঠিক করবেন। কিন্তু আমি এখন কি করে তাকে লিখি—তার চেয়ে ঠিক করে রেখেছি, তাকে আসতেই লিখব। এখানে এলে তখন—

রাধার সর্বাঙ্গে একটা শিহরণ উঠল বুঝি! সে-ও তৎক্ষণাৎ গাঢ় স্বরে বলল: মামাবাবু! টেলিগ্রাম দু'খানা পর পর আসতে আমি আর নিজেকে সামলাতে পারিনি। তখুনি রাগের মাথায় ললিতদা'কে চিঠি লিখে জানিয়েছি।

কথাটা শুনেই পশুপতি বিস্ময়ে উল্লাসে বিহ্বল হয়ে অপ্রকৃতিস্থের মত প্রশ্ন করতে লাগলেন: 'য়্যাঁ—জানিয়েছ ললিতকে? সত্য বলছ মা, তুমি তাকে চিঠিতে—বল, বল—লুকিও না, সব বল। হ্যাঁ, কি লিখেছ মা—কি লিখেছ?'

কম্পিত কণ্ঠে রাধা বলল: আপনার কাছে কি আমি মিথ্যা বলতে পারি মামাবাবু? তখন আমার মনের এমনি অবস্থা যে, ভাল-মন্দ কিছু ঠিক করতে না পেরে ললিতদা'কে শুধু লিখি—'মামাবাবু কলকাতায় দেবীর বাবার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে গেছেন। যাবার আগেই তিনি যাবার কথাটা চিঠিতে জানিয়েছিলেন। কিন্তু দেবীর বাবা তাঁকে টেলিগ্রাম করে যেতে বারণ করেছেন। তিনি তখন মাঝ-রাস্তায়। পরের দিন আর একখানা টেলিগ্রাম আসে। দু'খানার নকল চিঠির সঙ্গে পাঠাচ্ছি। মামাবাবু এর পর ফিরে এসে কি বলেন, ঠিক সময়ে সে খবরও পাবে।' এখন আপনিই বলুন মামাবাবু, ললিতদা'কে খবরটা জানিয়ে কি অন্যায় করিছি?

নিজেকে এখন সংযত করে ধীর ভাবে পশুপতি বললেন : এর কি জবাব ত স্থির করতে পারছি না মা ! তবে আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না—ললিতকে কেমন করে খবরটা দেব। এখন দেখছি, আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির উপরে থাকেন যিনি—আমার দুশ্চিন্তা তিনিই ঘুচিয়ে দিয়ে তোমাকেই প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁকে নমস্কার করি।

২৩

এদিকে বগলা সাহেবের বাড়িতে সেই অপ্রীতিকর ব্যাপারটা নিয়ে যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, সেটা ক্রমশ বাড়তে বাড়তে হঠাৎ একদিন কালবৈশাখীর ঝঞ্ঝার মত প্রচণ্ড আবর্তে সব ওলট-পালট করে দেয়।

সেদিন দেবীর মুখে সর্বপ্রথম প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বিরুদ্ধ উক্তি শুনে বগলাপদ এতই বিস্মিত হয়ে ওঠেন যে, গৃহাগত দুই আত্মীয় কর্মযোগীকে নৈশ ভোজনে আপ্যায়নের সঙ্গে তাঁদের ভাবী বধূস্থানীয়া পাত্রীটিকে দেখাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কলেজ থেকে ফিরেই সে সহসা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এই অজুহাতে তিনি প্রস্তাব করেন, প্রশান্ত এলেই একদিন দেখাশোনার ব্যবস্থাটা উপলক্ষে ভাল ভাবে আনন্দ করবেন। তাঁরাও সানন্দে সম্মতি দিয়ে সেদিন বিদায় গ্রহণ করেন।

বগলার মুখের উপর অন্তরের অভিব্যক্তিটা অসঙ্কোচে বলে ফেলেই দেবী একরকম ছুটে ঠাকুরঘরে গিয়ে আশ্রয় নেয়। সেখানে কুল-দেবীর ঘটের সামনে বসে ভাবাবেগে প্রার্থনা জানাতে থাকে—মায়ের প্রসাদে আত্মোপলব্ধির আলোকপাতে যাতে তার অন্তরের অন্ধকার কেটে যায়।

জীবনে যত বড় সঙ্কটই আসুক, মনে বিশ্বাস রেখে ভক্তির সঙ্গে তন্ময় হয়ে গৃহ-দেবতার কাছে প্রার্থনা জানালে, তার আসান হবেই। মায়ের এই উপদেশ মনে রেখো। দেবী প্রতিদিনই নিষ্ঠার সঙ্গে দেবার্চনা করে আসছে, রাণী সপ্তাহে একটা দিন মাত্র ঠাকুরঘরে কিছুক্ষণ ব'সে মায়ের মন রাখে। সুলোচনা দেবী তাতেই প্রসন্ন হয়ে বলেন—এ-ও ভাল, এ থেকেই তোমার মনে বিশ্বাস আসবে। মাঝে একবার পরিচারিকাকে ডেকে বগলা দেবীর খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, ঠাকুরঘরে কন্যার পূজা-আহ্নিক চলেছে—ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। শুনেই বগলার মুখখানা শক্ত হয়ে ওঠে। তবে তিনিও এ অবস্থায় তাকে না ঘাঁটিয়ে, গৃহাগত ভাবী আত্মীয়দ্বয়কে শিষ্টাচারের সঙ্গে বিদায় দিতে বাধ্য হন।

অর্চনার পর দেবী ঠাকুরঘরে সন্ধ্যার প্রদীপ জেলে সুগন্ধি ধূপের সুবাস ছড়িয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল। তার মনে হতে লাগল, ভারাক্রান্ত দেহটা অনেকখানি যেন হাল্কা হয়েছে। সে পড়ার ঘরের দিকে যায়। পল্লীগ্রাম থেকে আজ যিনি এ বাড়িতে ওবেলা এসেছিলেন—তাঁকে মা জেঠামণি বলে উল্লেখ করেছিলেন, সেই মানুষটিকে নিয়ে বাবা ও মা'র মধ্যে কোন কারণে যে মতানৈক্য চলেছে, দেবী এ দিনের বিভিন্ন বৃত্তান্ত থেকে সেটা তার স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিতেই বুঝেছিল। সেই সঙ্গে এই চিন্তাটাও তার মনে দৃঢ় হয়ে ওঠে যে, ব্যাপারটির মূলে এমন কোন ঘটনা প্রচ্ছন্ন আছে—যার সঙ্গে দেবীও সংশ্লিষ্টা, কিন্তু সেই আসল ঘটনাটির কিছুই সে জানে না এবং যাতে সে প্রকৃত ব্যাপারটা জানতে না পারে, পিতারও সেই দিকে একান্ত আগ্রহ। তার বুদ্ধিদীপ্ত মনে এ ধারণাও সুস্পষ্ট হয়েছে যে, ব্যাপারটি মায়েরও অজ্ঞাত নয়। কিন্তু যে কারণেই হোক, তিনিও সেটা চেপে রেখেছেন, খুব সম্ভব পিতারই নির্দেশ অনুসারে বাধ্য হয়ে। সুতরাং এক্ষেত্রে দেবীও স্থির করেছে—নিজের চেষ্টাতেই সে এই জটিল রহস্যটির উদ্‌ঘাটন করে মূল সমস্যাটির সমাধানে প্রয়াস পাবে। এতক্ষণ ঠাকুরঘরে কুলদেবীর উদ্দেশে এই প্রার্থনাই সে নিবেদন করেছে।

পড়ার ঘরে কেদারাখানায় বসে দেবী নিজের মনেই এদিনের বিস্ময়কর ঘটনাগুলির পর্যালোচনা করতে থাকে। বার বার তার চিত্তে এই প্রশ্নটাই বড় হয়ে ওঠে—আচ্ছা, উনি যে বললেন—'ললিতদা'কে তোমার মনে পড়ে মা ?' কেমন আস্তে আস্তে মিষ্টি গলায় কথাটা জিজ্ঞাসা করলেন। ওঁর কথা শুনে, ওঁকে দেখে, সত্যই শ্রদ্ধা হয়, আমারও হয়েছিল। বাবা কিন্তু তাঁকে লোফার বললেন, ঐ সঙ্গে একথাও বললেন—ওঁর ক্ষ্যাপা ছেলের কথা। আমাকে যা বলেছেন—মন থেকে যেন মুছে ফেলি।' বাবার কথা থেকেই মনে হচ্ছে—ওঁকে আর ওঁর ছেলে সেই ললিতদা'টিকে উনিও জানেন। কিন্তু বাবা রেগে উঠলেন কেন, কথাটা শুনেই ? ইদানীং বাবা যেন কেমন হয়েছেন—রাগলে আর জ্ঞান থাকে না হয়ত, ওঁকেও যে 'লোফার'—ওঁর ছেলেকে 'ক্ষ্যাপা' বলেছেন, এসবও ওঁর ঐ বিশ্রী রাগের বশেই। তাহলে বোঝা যাচ্ছে—ঐ ভদ্রলোক ওঁর ছেলের সম্বন্ধে কিছু বলতে এসেছিলেন বাবার কাছে। খবর না দিয়ে ঘরে ঢুকতেই বাবা রেগে উঠে অপমান করেন। কিন্তু এ-যেন 'লঘু দোষে গুরু দণ্ড।' তবে কি আরও কিছু আছে এর পিছনে ? হ্যাঁ, হ্যাঁ—আছে—সেটা এতক্ষণ ভাবিনি ত—ভুলেই গিয়েছিলাম ! উনি খেলার কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে—খেলার কথা মনে পড়ে

কি না ? কৈ, আমার ত মনে পড়ে না ! তবে কি ভুল বলেছেন ?' কে জানে ! কিন্তু ওঁর কথাগুলো আমার মনে এত ভাল লাগল কেন ? মনের মধ্যে এমনি শক্ত হয়ে বসেছে, কিছুতেই ভুলতে পারছি না। তাই না—বাবা ও কথা মুছে ফেলতে বললেন, যখন, মনে হল—বাবা ভুল করেছেন ও কথা বলে! কিন্তু কেন উনি এসেছিলেন—কেন বললেন আমাকে ঐ কথাগুলো—এর পিছনে কি বৃত্তান্ত আছে, না জেনে ত স্বস্তি পাচ্ছি না ?

আপন মনে একলাটি এই সব ভাবতে ভাবতে সে ছবির খাতাখানা খুলে বসে। ড্রয়িংএ দেবীর হাত খুব ভাল দেখে ড্রয়িংয়ের মাষ্টার ওকে ছবি আঁকবার কৌশলগুলো দেখিয়ে দেন। সেই থেকে অবসর সময়ে দেবী আঁকার খাতাখানা খুলে বসে। আজ তার মনের মধ্যে যে মানুষটির সৌম্য মূর্তি ও মিষ্ট কথাগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছিল, সেই মূর্তিখানিই পেন্সিল দিয়ে খাতার পাতায় প্রাথমিক খসড়ার মত করে এঁকে ফেলল। হাতে ব্যাগ ও ছাতি, তার কাছে নূতন এমন এক অদ্ভুত ধরণের জামা গায়ে, পায়েও পেনেলার সেকেলে জুতো, মাথায় শিখা, সৌম্যমূর্তি, শান্ত মুখ। তার নিচে লিখল— 'ললিতদা'কে তোমার মনে পড়ে মা ? আমি তার বাবা।'

দরজার সামনে টাঙানো পরদাটা হঠাৎ নড়ে উঠতেই দেবী তাড়াতাড়ি খাতাখানা মুড়ে ফেলে তাকাল সে দিকে। মনে হল, কে বুঝি আসছে। বাবা নন ত ? কিন্তু আগন্তুককে দেখে সে আশ্বস্ত হল। সাংসারিক কতকগুলো কাজের ব্যাপারে এই তরুণী পরিচারিকাটি রাণীকে সাহায্য করত, রাণীর খুবই প্রিয়পাত্রী এই বাসনা মেয়েটি। বার মহলের কাপড় জামা জাজিম, সোফার আবরণ—প্রতি সপ্তাহে ধোলাই করবার কথা। বাসনার উপর এই ভার আছে। কর্তার নিত্যকার ছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদও তাকে গুছিয়ে নিতে হয়। এক হাতে কাপড়ের একটা পুলিন্দা ও অপর হাতে একটা প্যাকেট নিয়ে বাসনা পড়ার ঘরে ঢুকল এবং দেবীকে দেখেই সাগ্রহে বলল : এই যে বড় দিদিমণি এখানে আছেন—ভালই হয়েছে।

দেবী জিজ্ঞাসা করল : কি ব্যাপার বল ত ?

শক্ত সুতায় বাঁধা কাগজের তাড়াটি দেবীকে দেখিয়ে বাসনা বলল : সাহেবের গরম কাপড়গুলো ধোলাইখানায় পাঠাবার কথা ছোট দিদিমণি বলে গিয়েছেন। আজ ফুরসুদ পেয়ে ও কাজটায় হাত দিয়েছি। ওঁর জামার পকেট থেকে যে সব কাগজ পত্র ছিল, সেগুলো গুছিয়ে রেখেছি। হালের ছাড়া জামাগুলো থেকেও—

হাত বাড়িয়ে কাগজের তাড়াটা নিয়ে দেবী বলল : আচ্ছা, আমি রাখছি—তুমি এখন যাও।

বাসনা নীরবে চলে গেল। হঠাৎ কি ভেবে দেবীর মনে আগ্রহ জাগল—পুলিন্দাটা খুলে দেখলে হয় না ? সত্যই যদি দরকারী কিছু এর মধ্যে থাকে ?

দেবী দেখল, প্রাপ্ত কাগজগুলি রাণীর নির্দেশ মতই বাসনা পর পর সাজিয়ে রেখেছে ! প্রথমেই বেরুল—কতকগুলো ক্যাসমেমো, খুচরা জিনিসপত্র খরিদ করায় সেই সূত্রে এসেছিল। কয়েকটা বিজ্ঞাপন, মালপত্রের ফর্দ, সিনেমার টিকিট। সব শেষে রয়েছে— খান তিনেক খামে-ভরা চিঠি। দু'খানা বেশ পুরু-সুরু, একখানা পাতলা। তিনখানা খামেই মফঃস্বলের ডাকঘরের ছাপ পড়েছে— খামের টিকিটের উপর। একখানা পুরু চিঠির উপর বগলাপদর নাম-ঠিকানা বাঙলায় লেখা। অপর দুখানার শিরোনামায় লেখা নাম —মাননীয়া শ্রীমতী সুলোচনা দেবী, সুচরিতাসু। এর পর 'কেয়ার অফ' কথা দুটির পর বগলাপদর নাম ও ঠিকানা রয়েছে। তিনখানি চিঠির শিরোনামা একই হাতে লেখা। চিঠির উপর ডাক আফিসের মোহরের ছাপ থেকে তারিখগুলির পাঠোদ্ধার করে দেবী বুঝল—তার বাবার নামের খামখানার উপর প্রায় সাত মাস আগে নভেম্বর মাসের ছাপ পড়েছে। মায়ের নাম লেখা পর পর দুখানা খামেও যথাক্রমে ঐ বছরের ডিসেম্বর এবং শেষের অপেক্ষাকৃত পাতলা খামখানার উপর এ-বছরের জুলাই মাসের ছাপ রয়েছে। তিনখানা খামের এক দিক একই ভাবে কাটা। সুতরাং চিঠিগুলি যে পঠিত, তাতে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও, শেষের দু'খানা চিঠি যাঁকে উদ্দেশ করে লেখা—তাঁর হাতে যে পড়েনি, সে বিষয়ে কিন্তু যথেষ্ট সন্দেহ জাগল দেবীর মনে।

এখন দেবীর পক্ষে কঠিন সমস্যা—তার এখন কি কর্তব্য ? এই চিঠির মধ্যেই যে বর্তমানের সংশয়সূচক ঘটনাটির তথ্য আছে, চিঠিগুলির আয়তন ও অবস্থা দেখেই দেবী স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সেটা উপলব্ধিও করেছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন উঠছে—বাবা ও মায়ের উদ্দেশে লেখা চিঠি তাঁদের অজ্ঞাতে পড়া সঙ্গত কি না ?

কিন্তু যদি কোনো সত্যের সন্ধান পাওয়া যায় এই মনে করে প্রথমে সে বাবার নামের বেশী পুরু চিঠিখানা পড়তে আরম্ভ করল। ছোট ছোট অক্ষরে বাদামী রঙের কাগজের দু'পিঠে লেখা পশুপতি পণ্ডিতের দীর্ঘ চিঠি। বারো বছর পরে—অতীতের কথা ও তথ্যগুলি আগাগোড়া উল্লেখ করে—তিনি প্রাক্তন পল্লীবন্ধু অধুনা-বিখ্যাত ধনাঢ্য শিল্পপতি বগলাপদকে পূর্বপ্রতিশ্রুতি সম্বন্ধে অবহিত হবার জন্য লিখেছেন। লেখার মধ্যে প্রার্থীর মিনতি নেই, কর্তব্য সম্পর্কে সাগ্রহ আহ্বান অবশ্য আছে, কিন্তু তাকে আবেদন বললে ভুল হবে। উপসংহারে তিনি জানিয়েছেন—বারো বছর আগে হরগৌরী-মন্দিরে দেবতার সামনে ললিত ও দেবীর গর্ভধারিণীদ্বয় যে অঙ্গীকার করেছিলেন, তন্মধ্যে ললিতের মা তাঁর দায়িত্ব আমাকে অর্পণ করে পরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন। অতীতের সেই অপরূপ কাহিনীটি এ অঞ্চলে এত পরিচিত হয়ে পড়েছে যে, প্রত্যেকেই উন্মুখ হয়ে এদের মিলন-দিন প্রতীক্ষা করছে। ললিতের মায়ের অবর্তমানে আজ আমাকেই আহ্বান করতে হচ্ছে এ ব্যাপারে অবহিত হবার জন্য।

হঠাৎ যেন একটা ঝাঁকুনি খেয়ে দেবী ঘরের চার দিকটা দেখে নিল তার বিস্ফারিত চোখ দুটোর দৃষ্টি প্রসারিত করে। সে দৃষ্টি ঘুরে সামনে নিবদ্ধ হতেই অপঠিত দু'খানা খাম তাকে পুনরায় সক্রিয় করল। পড়া চিঠির কাগজগুলো ভাঁজ করে খামখানার মধ্যে রেখে পুরু খামখানাই প্রথমে তুলে নিয়ে মুখটার ভিতরে হাতের দুটো আঙুল ঢুকিয়ে দিল। বাবার নামের খামখানা থেকে চিঠি বার করবার সময় তার হাতখানা কেঁপেছিল, এখন কিন্তু চিত্ত একেবারে নির্বিকার—অকম্পিত হাতেই কাগজ ক'খানা বার করে পড়তে লাগল।

মায়ের নামে লেখা চিঠিখানা পড়তে পড়তে দেবীর মনে আগেকার মত রাজ্যের বিস্ময় এসে আর ছেঁকে ধরল না। এ পত্রের অধিকাংশই আগের পত্রের পুনরুক্তি। কর্তার কাছ থেকে কোন সাড়া না পাওয়ায় গৃহিণীকে এ পত্র লিখতে আগের কথাগুলির পুনরুল্লেখ করেন। কিন্তু এ চিঠিখানায় লেখা দুটি প্রসঙ্গ দেবীর চিত্তে ভাবের

এক নূতন তরঙ্গ বহিয়ে দিল। সে ছুটি হচ্ছে—নিজের গৃহিণী ও পুত্রের কাহিনী। আগের পত্রে এ ছুটি প্রসঙ্গ এমন গভীর ভাবে ব্যক্ত করেননি তিনি। খেলার সাথী দেবীর সঙ্গে পুত্র ললিতের খেলাঘরে খেলা, সবার অজ্ঞাতে ছুটিতে দুর্গম জাঙ্গালে সেঁধিয়ে ঘোরা-ফেরা, গাছে চড়া, নিজের জীবন তুচ্ছ করে সাথীকে রক্ষা করা, চড়িভাতির দিনের ব্যাপার—আড়ির পর মিলন, হরগৌরীর-মন্দিরে ঢুকে প্রসাদী মালা নিয়ে পরস্পরের গলায় দেওয়া; তার পর দেবীরা কলকাতায় গেলে দেবীর জন্যে ললিতের মনের অবস্থা, লুকিয়ে কান্না, জানতে পেরে বুকে তুলে নিয়ে মায়ের সান্ত্বনাদান, তারপর—সেই স্নেহময়ী মায়ের মৃত্যুতে ললিতের ভেঙ্গে পড়া—দেবীর ছবি নিয়ে খেলা, তাকে কবিতা পড়ে শোনানো। এ সব কাণ্ড দেখে ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি ছেলেকে কাশীর বিদ্যাপীঠে রেখে প্রকৃত মানুষ হবার তথা মনুষ্যত্ব অর্জনের জন্য কি ভাবে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেন, আর—তারই মধ্যে পঠদ্দশায় দেবীর সেই ছবি থেকে চিত্রবিদ্যা শিখে সে দেবীর ছবি আঁকতে থাকে—একেই অবসর সময়ের খেলা করে নেয়, আর সেই খেলা এখনো যে ভাবে চলেছে, তাতে মনে হয়, শিশুকাল থেকে ললিত একই ভাবে দেবীকে মনে করে রেখেছে, আর—এই ধারণা তার মনে দৃঢ় হয়ে আছে যে, দেবীও তাকে ভুলেনি, তাদের বিবাহে কোন বাধা নেই। এই সব কথার পর তিনি জানতে চেয়েছেন—'কিন্তু বগলাকে এ সম্বন্ধে চিঠি লিখিয়াও উত্তর না পাওয়ায় অতঃপর আপনাকেই বিস্তারিত লিখিতেছি। আমি যে ভাবে আমার পুত্রের অবস্থার কথা লিখিলাম, আপনিও দেবীর মানসিক অবস্থা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে লিখিয়া আমাকে আশ্বস্ত করিবেন। কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া যে ভাবে কৃতবিদ্য হওয়া যায়, কাশীর বিদ্যাপীঠ হইতে ললিতও সেই ভাবে উত্তীর্ণ হইয়া সংস্কৃতে গ্রাজুয়েট হইয়াছে। এখন এম-এ বা সর্বোচ্চ উপাধি পরীক্ষার পাঠ চলিয়াছে। উক্ত পরীক্ষার পর সে দেশে ফিরিবে। সেই সময়ই শুভকার্য বাঞ্ছনীয়!'—ইত্যাদি।

আগের চিঠিখানি পড়তে পড়তে শৈশব জীবনের অজানা একটা উপাখ্যানের আস্বাদ পেয়ে দেবী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। কলকাতা সহর থেকে অনেক দূরে একটা পল্লীগ্রাম তার জন্মস্থান, শিশুকালে সেই গ্রামের এক দেবালয়ে ছু'টি শিশুকে উপলক্ষ করে যে উপাখ্যানটি পল্লবিত হয়ে ওঠে, তার মোটামুটি পরিচয় অনুসন্ধিৎসু চিত্তের অন্ধকার দিকটার উপর আলোকপাত করে। কিন্তু মায়ের উদ্দেশে লেখা চিঠিখানির অধিকাংশ স্থান জুড়ে পূর্ব-পত্রের সেই ললিত ছেলেটি অপরূপ এক প্রেমিক নায়কের মত বিভিন্ন ভঙ্গিতে এতই স্বপ্রকাশ যে, চিঠিখানা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার বর্তমানের কুমারী জীবনের সবখানি আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। এবারও খানিকটা সময় তন্ময় হয়ে প্রসঙ্গটির অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করতেই অপূর্ব এক পুলকের আবেগে দেবীর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চ হয়ে উঠল। সে তৎক্ষণাৎ আত্ম-সচেতন হয়ে তৃতীয় পত্রখানার উপর মনঃসংযোগ করল। পূর্ব পত্রগুলির উত্তর না পেয়ে এ পত্রে পত্রপতির মোদ্দা কথা এই যে, তিনি কলকাতায় গিয়ে পুরাতন ব্যাপারটির সম্বন্ধে একটা বোঝাপড়া করতে চান, সেজন্য কলকাতায় রওনা হচ্ছেন। দেবী চিঠিখানার তারিখ দেখে বুঝল যে, এইখানিই সাম্প্রতিক লেখা পত্র। অল্প কয়েক দিন পূর্বে সুলোচনা দেবীকে লিখেছিলেন। দেবীর বুঝতে বিলম্ব হয়নি যে, পত্রখানি তার বাবার পকেটেই ছিল—মায়ের হাতে আসেনি এবং আগের পত্রের মত এখানিও তাঁকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি তার বাবা।

২৪

অন্য দিন নৈশ ভোজনের আগেই দেবী মায়ের কাছে এসে খুঁটিনাটি ছু'-একটা কাজে তাঁকে সাহায্য করে। পাকশালায় পাচককে গৃহিণীর কিছু নির্দেশ দেবার থাকলে, সুলোচনা দেবীকে উঠতে না দিয়ে দেবীই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে যাকে যা বলবার বলে আসে। কন্যার বিবেচনা দেখে মায়ের মন তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। কিন্তু এ রাত্রে দেবীকে অপরাহ্নের সেই ঘটনার পর থেকেই এদিকে দেখতে না পেয়ে উদ্বিগ্ন ভাবে সুলোচনা দেবী পরিচারিকাদের ডেকে দেবীর কথা জিজ্ঞাসা করতেই বাসনা মেয়েটি তার হাতের কাজ করতে করতেই বলল: দিদিমণি ত সন্ধ্যের সময় পড়বার ঘরে ছিলেন গিন্নীমা? দেখব?

সুলোচনা দেবী বললেন: না—আমি দেখছি, তুমি তোমার কাজ কর।

সন্দিগ্ধ ও কিছুটা উৎকণ্ঠিত ভাবেই সুলোচনা দেবী মেয়েদের পড়ার ঘরে প্রবেশ করে দেখেন, এক কাগজপত্রের তাড়ার সামনে দেবী তন্ময় হয়ে বসে আছে—ঠিক যেন ধ্যানমগ্ন অবস্থা। তার অচেতন মনোরাজ্যে তখন সদ্য-পরিচিত ললিত ছেলেটি দেবী নাম্নী সাথীর সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন পর্যায়ের যে-সব ছেলে খেলা করেছিল, যেমন—খেলাঘরে সংসার পাতা, জঙ্গলে ছুটোছুটি, লুকোচুরি, গাছে চড়া, চড়িভাতি,—আবার তারই মধ্যে মনকষাকষি, মান-অভিমান,

আড়ম্বর, শেষে হরগৌরীর মন্দিরে শিবের মাথা থেকে প্রসাদী উপচার তুলে পরস্পর মালা-বদলের পর্ব—চিঠিতে যেমন যেমন পড়েছিল দেবী—সেগুলির প্রত্যেকটি, যেন ছবির মত পর পর ভেসে চলেছে। তার পর আসে বিদায় দিনের মর্মন্তুদ ব্যাপারটি—ললিত নিজের হাতে রথ তৈরী করেছে তার সাথীকে উপহার দেবে বলে। রথ দেখে সাথীর মনে হর্ষ-বিষাদের ঢেউ খেলে যায়। রথ নিয়ে খেলা ত হবে না, তারা যে কলকাতায় যাবে বলে যাত্রা করে বেরিয়েছে। দেবীর ইচ্ছা রথ নেয়, কিন্তু তার বাবা বাধা দিয়ে বলেন—কলকাতায় গিয়ে বাহারী টিনের রথ কিনে দেবেন। উভয়ের চিত্তই এতে ব্যথাহত হয়ে পরস্পরের আর্ত চোখে সেটা ফুটিয়ে তোলে। সেই হর্ষবিষাদের সন্ধিক্ষণে দু'জনের শেষ দৃষ্টিবিনিময়, তার পর দীর্ঘ বিচ্ছেদ।

অবচেতন মনের মধ্যে দুটি শিশু-জীবনের বেদনাতুর অবস্থায় দেবীর চোখ দুটিও অশ্রুময় হয়ে উঠেছে তখন। তাড়াতাড়ি আঁচলের খুঁটটি টেনে চোখের উপর ধরেছে দেবী, এমনি সময় ভিতরের দিকের দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকেই সে দৃশ্য দেখে সুলোচনা দেবী সস্নেহে শুধালেন: কি হয়েছে রে?

মাকে দেখে চমকে ওঠে দেবী, চোখের জল আর মুছা হল না। মা সস্নেহে নিজের আঁচলে তার চোখ দুটি মুছে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: আমাকে বলবি মা তোর মনের কথা? বলবি রে, কি জন্যে তোর এ কান্না?

দেবী বলল: তুমি ত জান মা, মনে কেউ কষ্ট পেয়েছে জেনে আমি স্থির থাকতে পারি না—কেঁদে ফেলি। বিকেলে তুমি যায় জন্যে জলখাবার সাজাচ্ছিলে, আমাকে দেখেই বললে—তোর জেঠামণি ও ঘরে আছেন, নিয়ে যা। কিন্তু তার আগেই আমি তাঁকে দেখেছি, তাঁর মুখের মিষ্টি কথাও শুনেছি, সেই সময় তিনি বলেছিলেন—বাবার কু-ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে চলে যাচ্ছেন! বসে বসে তাই ভাবছিলুম, আর সেই জন্যেই—

অশ্রুর প্লাবনে এ সময় দেবীর কণ্ঠস্বরও রুদ্ধ হয়ে গেল। মায়ের বুকে মুখখানা গুঁজে ফুলে ফুলে সে কাঁদতে লাগল। সুলোচনা দেবী কন্যার মাথায় ধীরে ধীরে হাত বুলাতে বুলাতে প্রবোধ দিলেন। জানি মা, তুমি কারুর কষ্ট দেখতে পার না, কেউ ব্যথা পায়—চাও না; কিন্তু যাদের এমনি করুণ মন, সংসারে তারাই ওর জন্যে ভোগে, দুঃখ পায়।

দেবী এই সময় নিজেকে সামলে নিয়ে সুলোচনা দেবীর মুখের দিকে সঙ্কোচপূর্ণ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল চেয়ে থেকে বলল: একটা কথা মা—

মায়ের বুকের ভিতরটা ছাঁৎ করে উঠল, মেয়ের কথাটা শুনে। তিনি নিজের মনেই একটা অনুমান ঠিক করে নিয়ে তাড়াতাড়ি কথাটায় বাধা দিয়ে বলে উঠলেন: তার আগে আমি তোমাকে বলে রাখছি মা, আজকের ঐ ঘটনা সম্পর্কে যেটুকু জেনেছ, তার বেশী কিছু জানবার জন্যে ভুলেও যেন আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র না মা। ওঁর কাছে আমি কথা দিয়েছি মা, কোন কথা বলব না।

সংযত কণ্ঠে দেবী কথাটার উত্তর দিল: তুমি তাহলে ভুল বুঝেছ মা, ও সম্বন্ধে কিছু জানবার জন্যে কথাটা আমি তুলিনি। আমি তোমাকে বলছিলুম যে, বাবার শীতের জামাগুলো কাচতে যাচ্ছে। পকেটে যা যা ছিল, সন্ধ্যার সময় বাসনা আমাকে দিয়েছে। হালের ছাড়া জামার পকেটেও কিছু কিছু ছিল। এর মধ্যে তোমার নামে ছ'সাত মাস আগের একখানা, আর হালের একখানা, মোট দু'খানা চিঠি আছে।

কথাগুলো বলতে বলতে দেবী তাড়াটি খুলে দু'খানা চিঠি সুলোচনা দেবীর হাতে দিলেন। পর পর দু'খানা চিঠির শিরোনামা পড়ে সুলোচনা দেবী চমকে উঠে কন্যার মুখের পানে তাকালেন।

অপাঙ্গে কন্যার মুখের দিকে চেয়েই সুলোচনা দেবী বললেন: আমার নামের চিঠিগুলো আমাকে দিয়েই ভাল করেছ। ও গুলো তুমি নিজেই ওঁকে দিও।

দেবী বলল: সেই জন্যেই ত রেখেছি। কাল সকালেই বাবাকে দেব।

সুলোচনা দেবী মনে মনে কি যেন ভাবছিলেন, হঠাৎ বললেন: হ্যাঁ, ঐ সময় ওঁকে এ কথাটাও বলবে—আমার নামেও দু'খানা চিঠি ছিল, সে দু'টো আমাকেই দিয়েছে।

প্রসঙ্গটা এখানেই চাপা দেবার উদ্দেশ্যে সুলোচনা দেবী তার কথায় সঙ্গেসঙ্গেই বললেন: এখন খাবে চল। বামুন ঠাকরুণ খাবার নিয়ে বসে আছেন, রাতও অনেক হয়েছে। তোমার ত মা, এদিকে হুঁস ছিল না।

দেবীর মনে হচ্ছিল, খপ করে বলে ফেলে—মন ভাল নেই, খাব না। কিন্তু মায়ের প্রসন্ন মুখখানার অবস্থা দেখে সে কথা বলতে আর সাহস করল না—সুড় সুড় করে তাঁর পিছু পিছু চলল। যেতে যেতে তার মনে এই প্রশ্নই শুধু জাগছিল, মা ত জিজ্ঞেস করলেন না চিঠিগুলো পড়েছি কি না? তবে কি তিনিও অন্তর্যামীর মতন তারও মনের তথ্য সব জেনেছেন?

গভীর রাত। একই ঘরে মা ও মেয়ে নিদ্রামগ্ন। ঘরের একদিকে মায়ের স্বতন্ত্র শয্যা, অন্য দিকে পাশাপাশি দু'খানি খাটে দেবী ও রাণী শয়ন করে। মা অন্য কথার পরিবর্তে রাণীর কথা তুললে, অল্প আলোচনা চলে। তার পর নিদ্রার আবেশে মা ও মেয়ের কণ্ঠ নিস্তব্ধ হয়। গভীর রাত্রে দেবী সহসা ঘুমের ঘোরে আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠল: ললিতদা', ধরো-ধরো—পড়ে যাচ্ছি!

সুলোচনা দেবীর ঘুম ভেঙ্গে গেল, কন্যার চিৎকারে। তাড়াতাড়ি উঠে আলোর সুইচ টিপে দিয়ে পাশের শয্যায় গিয়ে কন্যার চোখে-মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপি দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন: কি হয়েছে রে! অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি যে?

তখনো কন্যার ঘুমের ঘোর কাটেনি, মায়ের প্রশ্নে উত্তর করল: দেখ না মা, ললিতদা'র কাণ্ড! আমাকে গাছে তুলে দিয়ে লুকিয়েছে কি করে নামব আমি?

কন্যা যে স্বপ্ন দেখে চিৎকার করেছে, সুলোচনা দেবী ঘুমন্ত কন্যার মুখে একথা শুনেই বুঝতে পারেন। কন্যা চুপ করতেই পুনরায় সুইচ টিপে আলো নিবিয়ে তিনি ভাবতে থাকেন: হঠাৎ মেয়ে ললিতকে স্বপ্নে দেখল কেন? পণ্ডিত মশায়ের মুখে একটি বার শুধু তাঁর ছেলের নামটি শুনেছিল দেবী। কিন্তু ওদের ছেলেবেলায় গাছে চড়ার গল্প ত তিনি বলেননি? তবে—

হঠাৎ তাঁর লেখা চিঠিখানার কথা সুলোচনা দেবীর মনে পড়ে। সেই চিঠিতে এদের দু'জনের খেলা-ধুলার যে-সব কথা আছে, তাতে দেবীকে গাছে তুলে দিয়ে ললিতের লুকিয়ে থাকার কথাও আছে।

সুলোচনা দেবী বুঝতে পারেন, চিঠিগুলো দেবীর মনের অন্ধকার ঘুচিয়ে দিয়েছে। অজানার সন্ধান সে পেয়েছে।

পরদিন সকালে সুলোচনা দেবী লক্ষ্য করলেন, দেবীর মুখখানা বেশ প্রসন্ন। বুঝলেন, রাতে ঘুমের ঘোরে চিৎকারের কথা তার মনে নেই। খানিক পরে বগলাপদ যখন চায়ের টেবিলে বসেছেন, দেবী তাঁর নামের সেই চিঠিখানা ও তার সঙ্গে অন্যান্য টুকিটাকি কাগজগুলো সামনে রেখে বলল: আপনার জামার পকেটে ছিল, বাসনা আমাকে দিয়ে গেছে।

স্বামীর প্রবর্তিত এ ব্যবস্থা বগলার অবিদিত নয়। অন্য কিছু হলে তিনি প্রফুল্লই হতেন, কিন্তু পরিচিত চিঠিখানা দেখে চমকে উঠলেন। কিছুক্ষণ নির্বাক ভঙ্গিতে চেয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: আর কোন চিঠি ছিল পকেটে?

দেবী বলল: হ্যাঁ, মায়ের নামেও দু'খানা চিঠি এসেছিল—তাঁকে দিয়েছি।

এরই মধ্যে দেওয়া হয়ে গেছে? ভগ্নস্বরে কথাটা বলেই বগলাপদ একটা নিশ্বাস ফেললেন। কিন্তু ইতিমধ্যে সুলোচনা দেবীও যে কক্ষদ্বারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেটা কারও চোখে পড়েনি। তিনি টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে, দেবী বেরিয়ে যায়। সুলোচনা দেবী মৃদু স্বরে বললেন: চিঠি দু'খানা চেপে না রেখে ঠিক সময়ে যদি আমাকে দিতে, তাহলে পণ্ডিত মশাই কাল হন্তদন্ত হয়ে আসতেন না, আর ঐ বিশ্রী কাণ্ডটাও ঘটত না।

শুষ্ক স্বরে বগলাপদ বললেন: পশুপতি লিখেছে বুঝেই খুলে পড়েছিলাম; তোমাকে দিতেই ভুলে যাই।

সুলোচনা দেবী মৃদু হেসে শুধালেন: দু'-দু'খানা চিঠিতেই একই ভুল! আমি যদি চিঠি পেতুম—অন্ততঃ শেষের খানা, তোমার সঙ্গে পরামর্শ করেই তাঁকে থামিয়ে দিতুম।

সহসা উত্তেজিত ভাবে বগলা বললেন: আমি ঐ চিঠি পেয়েই টেলিগ্রাম করে জানিয়েছিলাম তাকে—যাতে না আসে। তাই ত ওকে দেখেই গরম হয়ে উঠি। এখন বুঝছি—ঈশ্বর যা করেন ভালোর জন্যেই। হয়েছেও তাই। এর ফলে সব চুকেবুকে গেছে, আর কোন ভয় বা ভাবনা রইল না।

সুলোচনা দেবী গম্ভীর মুখে বললেন: কিন্তু আমি এর ঠিক উল্টো ভেবেছি।

বগলা শুধালো: কি রকম?

ধীরে ধীরে গৃহিণী বললেন: চিঠি তখন চেপে না রাখলে সে-চিঠি এভাবে দেবীর হাতে এসে পড়ত না। আমি ও-চিঠি পেলে লুকিয়ে ফেলতুম—তোমার নিষেধ জেনে। কিন্তু এখন ঐ চিঠিখানাই দেবীকে দেশের সব কথাই আগাগোড়া জানিয়ে দিয়েছে।

সবিস্ময়ে সোজা হয়ে বসে বগলা বলে উঠলেন: বল কি! দেবী ও-চিঠি তোমাকে দেবার আগে পড়েছিল নাকি? জিজ্ঞেস করেছিলে?

শান্ত কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন: জিজ্ঞেস করবার প্রয়োজন হয়নি—রাতে ঘুমের ঘোরে দেবী লক্ষিতকে নিয়ে যে-সব কথা বলেছে, তা থেকেই জেনেছি, চিঠিখানা ও না পড়লে এসব জানতে পারত না। এখন ঈশ্বর কার দিক দিয়ে ভাল করেছেন, ভেবে দেখ।

বগলাপদ কিছুক্ষণ গুম হয়ে থেকে তার পর শক্ত হয়ে বললেন: তাহলে আমিও দেবীকে স্পষ্ট করেই বলব, দেশের সম্পর্কে আগেকার যে-সব কথা শুনেছে, ওসব বাজে, ভুয়ো।

কিন্তু ওদিকে দেবীও চিন্তার উপাদান পেয়ে মননশক্তিকে এমনি সক্রিয় করে তুলেছে যে, তারই পরিবেশে ধীরে ধীরে পল্লীজীবনের সংস্পর্শে দূর অতীতের অংশবিশেষ স্মৃতির আয়ত্তে এসে তাকে চমৎকৃত করে তোলে। পথের সন্ধান পেয়ে আরও প্রখর ভাবে সে স্মৃতিশক্তির গতিবৃদ্ধি করতে থাকে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

লিভারপুলের বৈশিষ্ট্য

ইংল্যাণ্ডের লিভারপুল সম্পর্কে একটি কথা বলা হয়—সব সেরা জিনিষ নিয়েই এই মহানগরী। অর্থাৎ এখানে এমন ধরণের জিনিষ রয়েছে—আকারে যার মতো বড় কিংবা দেখতে যার ন্যায় সুন্দর সত্যি আর কোথাও নেই। কয়েকটি দৃষ্টান্ত সেখানকার তুলে দেওয়া যেতে পারে এই স্থলে। যেমন, লিভার ক্লক ইংল্যাণ্ডের সর্ব্ববৃহৎ ঘড়ি; মারসে টানেল—বিশ্বের সব চেয়ে বড় টানেল বা সুড়ঙ্গপথ; ষ্টেনলি টুবেকো ওয়ার-হাউস—বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ গুদাম; এ্যাংলিকান ক্যাথেড্রেল বৃটেনের সব চেয়ে বড় গীর্জ্জা; দি মামোথ বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ ভাসমান ক্রেণ; দি লেভিয়াথান পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড় ড্রেজার। অপর দিকে বিশ্বের প্রথম বৈদ্যুতিক রেলওয়ে চালু হয় লিভারপুলেই। সেখানকার রেলওয়ে ষ্টেশনটিও পৃথিবীর সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত রেলষ্টেশন। সেকানকার সেণ্ট গর্জ্জেস হলটি বিশ্বের সর্ব্ববৃহৎ স্মৃতি-সৌধ হিসাবে পরিচিত। সৌন্দর্য্যের সেরাকেন্দ্র বলে দুটি ভবনের নাম না করলে হয় না। এদের একটি হচ্ছে—ওয়াকার আর্ট গ্যালারী, সে দেশে এমন চমৎকার চিত্রকলা মন্দির নেই। আর একটি উল্লেখযোগ্য ভবনের নাম—অষ্টাদশ শতাব্দীর টাউন হল। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ডের বক্তব্য উদ্ধৃত করেই বলতে হয়—ইউরোপে এমন মনোরম কক্ষবিশিষ্ট হর্ম্ম্য বা অট্টালিকা নেই।



নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

কুড়ি

শ্রাদ্ধ চুকে গেল।

সমারোহ সাধ্যমত হয়েছিল। কিন্তু সুমিতার মন ভরেনি। তার আরও সমারোহ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু অর্থের অনটনে সম্ভব হয়নি। সমরেশ কয়েক বারই রামপ্রসাদকে খবর দিয়েছিলেন টাকার জন্যে। আবশ্যকীয় সমস্ত ব্যয় বহন করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কি কমলেশ, কি সুমিতা, কি রামপ্রসাদ কেউই তাঁর দেওয়া অর্থ স্পর্শ করতে চায়নি। তাদের যেমন সামর্থ্য, তারা সেই মত শ্রাদ্ধ করলো।

এর পরেও সমরেশ কিন্তু এসেছিলেন। সভার এক প্রান্তে নিঃশব্দে শান্ত ভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত বসে ছিলেন। তার পরে শ্রাদ্ধান্তে এ বাড়িতে জলস্পর্শ না করেই কখন এক সময় উঠে যান, কেউ টেরও পায়নি।

সকলেরই মন তাঁর সম্বন্ধে এমনই তিক্ত হয়েছিল যে, কেউ বোধ হয় তাঁর বিশেষ খোঁজ-খবরও নেননি।

তথাপি তিনি শেষ পর্যন্ত ছিলেন। কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলেনি। হয় তো সাহস করেনি। তিনিও কারও সঙ্গে কথা বলেননি। হয় তো প্রয়োজন বোধ করেননি।

পরদিন সকালে কেষ্ট অরুন্ধতীর বাক্সটা মাথায় করে নিয়ে এল।

—কী ওটা? কী ওটা?

সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে। আরও অনেকেই কৌতূহল ভরে জিজ্ঞাসা করলে।

—বড়মার বাক্সটা।

কেষ্টর কণ্ঠস্বর যেন লজ্জায় স্যাঁৎসেঁতে। অরুন্ধতীর মৃত্যু নিয়ে গ্রামে যে সব আলোচনা চলছে, সে তো বাইরে বেরয়, শুনতে পাচ্ছে।

—তাই বটে। বড়মার বাক্সটা। যেটা তিনি এখান থেকে শেষ বিদায়ের দিনে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

বলতে বলতে তার গলা বুঁজে এল। চোখ ছলছল করে উঠল। তা দেখে অন্য সকলেরও চোখ শুকনো রইল না।

এমন সময় কমলেশ এল।—এ বাক্স কিসের?

সুমিতা জবাব দিতে পারলে না।

পাশের একটি দাসী জবাব দিলে: বড়মার বাক্স।

এখানে কি করে এল?

ও-বাড়ী থেকে কেষ্ট নিয়ে এল।

তার সঙ্গে কেষ্ট সংযুক্ত করলে—ও-বাড়িতে ছিল। বড়বাবু পাঠিয়ে দিলেন।

ও-বাড়িতে ছিল, বেশ তো ছিল। আবার এ বাড়ি পাঠিয়ে দেওয়া কেন? কমলেশ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছে না। সুমিতা বুঝিয়ে দিলে। বললে, বড়মা যাবার সময় এইটে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই!

—থাম।

কমলেশ ধমক দিয়ে থামিয়ে দিলে সুমিতাকে। সমরেশকে সুমিতা জ্যাঠামশাই বলে, এটা সে সহ্য করতে পারলে না।

—বড়মার শোবার ঘরে রেখে দাওগে।

কমলেশ চলে যাচ্ছিল, কেষ্ট তার হাতে চাবিটা দিলে। বললে, বাক্সের চাবি!

—সেটাও মনে করে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে!

কমলেশ ব্যঙ্গ ভরে হেসে চাবির রিংটা সুমিতার হাতে দিয়ে বাইরে চলে গেল।

মেয়েমানুষের কৌতূহল, অরুন্ধতীর ঘরে বাক্সটা পৌঁছে দেওয়া হলে সকলকে সরিয়ে দিয়ে সুমিতা বাক্সটা খুললে। কৌতূহল সম্বরণ করতে পারলে না।

খুলেই অবাক হয়ে গেল!

কমলেশ এলে বললে, দেখ, বাক্সয় কি আছে!

সামনেই গহনায় বাক্সটা। ইদানীং অরুন্ধতী গহনা বড় একটা পরত না। হাতে দু'গাছি মকরমুখো বালা আর গলায় সরু একগাছি হার। বাকি যা কিছু গহনা সবই ওই বাক্সে। কিছু জড়োয়া, অবশিষ্ট সব ভারি ভারি সোনার। বেশির ভাগই বাপের বাড়ী থেকে পাওয়া। কিছু নিকট-আত্মীয়দের উপহার। কিছু হয়ত সমরেশরই দেওয়া।

সুমিতা সবিস্ময়ে বললে, এ তো অনেক গয়না। কত দাম হতে পারে?

কমলেশ জবাব দিলে না। অবাক হয়ে বসে রইল।

সুমিতা প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করতে কমলেশ বললে, 'জানি না। আমি ও কথা ভাবছি না।

—তবে কি কথা ভাবছ তুমি?

—ভাবছি, হাতে চাবি থাকা সত্ত্বেও এবং এত দিন ধরে বাক্সটা নিজের জিম্মায় থাকা সত্ত্বেও প্রেতটা বাক্স খোলেনি, গহনার বাক্সটা বার করেও নেয়নি!

সুমিতা এদিকটা ভাবেইনি। কথাটা শুনে বললে, আশ্চর্য! বোধ হয় খেয়াল করেননি।

—টাকা-পয়সা সম্বন্ধে খেয়ালের অভাব তো তাঁর কখনও দেখা যায়নি?

—তাহলে কারণটা কি তুমি মনে কর?

মাথা চুলকে কমলেশ বললে, কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। মাথাটা কেমন ঘুলিয়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা অদ্ভুত সন্দেহ নেই। যাই হোক, বাক্স যেমন আছে তেমনি রেখে দাও। প্রেতটার মনে আবার কি বুদ্ধি খেলছে কে জানে!

গহনা সম্বন্ধে মেয়ে-মানুষের আকর্ষণ চিরকালই দুর্নিবার। সুমিতা মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে বললে, গয়না হাত-ছাড়া করে লোকে আর কি বুদ্ধি খেলাতে পারে শুনি?

এমন একটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপারও কমলেশ কিন্তু স্বচ্ছন্দে মেনে নিতে পারলে না। বললে, লোকের কথা জানি না। কিন্তু ও বুড়ো কখন কোন পথে খেলে কেউ ধরতে পারে না। সুতরাং বাক্সের জিনিষপত্র যেমন আছে তেমনি থাক। তবে ওটা এখানে না রেখে আমাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে সাবধানে রাখতে হবে।

বাক্সের ডালা তখনও খোলা ছিল। ডালার ভিতরের দিকের খোপে কতকগুলো চিঠি ছিল। সেইগুলো বার করে সুমিতা বললে, কতকগুলো চিঠিও রয়েছে। এগুলো দেখে রাখা দরকার নয়? এ চিঠিখানা মনে হচ্ছে মায়ের।

—দেখি দেখি?

হ্যাঁ। মণিমালারই হস্তাক্ষর। কমলেশ চিঠিখানা পড়তে লাগল।

সেই চিঠি। যেটা অরুন্ধতীকে তার পিত্রালয়ে মণিমালা লিখেছিলেন খুব বিপন্ন অবস্থায়। সকাতরে অনুরোধ জানিয়েছিলেন, নাবালক কমলেশের ভার নেবার জন্যে। লিখেছিলেন, কমলেশকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম।

মৃত্যুপথযাত্রিনীর অন্তিম অনুরোধের মর্যাদা রাখতে গিয়েই অরুন্ধতী নিজেকে আহুতি দিলে!

কমলেশের বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল!

অরুন্ধতীর অত্যন্ত আকস্মিক, যদিও ঠিক অপ্রত্যাশিত বলা চলে না, মৃত্যুর পরে সমরেশের সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে গ্রামের লোকের এবং বিশেষ করে কমলেশদের ভয় এবং সন্দেহ আরও বেড়ে গেল। যে লোক নিজের ছোট-ভাইকে খুন করতে যেতে পারেন এবং নিজের স্ত্রীকে কাছে পাওয়া মাত্র খুন করতে পারেন, তাঁর সম্বন্ধে মানুষের মনে ভয়, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস জাগা তো স্বাভাবিক! যাঁর অতীত ইতিহাস কলঙ্কময় তাঁর স্বপক্ষে, হাতুড়ে ডাক্তার তো তুচ্ছ, স্বয়ং ভগবান এসে যদি সাক্ষ্য দেন, তথাপি কেউ বিশ্বাস করবে না, সমরেশ অরুন্ধতীকে খুন করেননি।

কমলেশের আক্রোশ সমরেশের উপর আরও বেড়ে গেল এই কারণে যে, অরুন্ধতী তারই কল্যাণের জন্যে প্রাণটা দিলে। সমরেশ একবার তাঁকে খুন করার ভয় সেখানর জন্যেই অরুন্ধতী এ-বাড়ি চলে এসেছিল। হরসুন্দরী তাকে এ-বাড়ির কর্ত্রীপদে মনোনীত করেছিলেন বলেই নয়। সে কাজটা অরুন্ধতী ও-বাড়িতে থেকেও করতে পারত। কমলেশকে সমরেশের আক্রোশ থেকে বাঁচাবার কোনো উপায় না পেয়েই, তাঁর সমস্ত বিষ নিজের দেহে টেনে নিয়ে কমলেশকে রক্ষা করবার জন্যেই সে ও-বাড়ি গিয়েছিল। সখ করে নয়, ইচ্ছা করেও নয়। বলতে গেলে, মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই সে গিয়েছিল।

এই কথাটা যখন সে ভাবে, তখন ক্রোধে তার সমস্ত দেহে জ্বালা ধরে যায়। একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করে। এই আলোচনাই রামপ্রসাদের সঙ্গে হচ্ছিল।

রামপ্রসাদ বলছিলেন, তিনটে আদালতে যে মামলাগুলো চলছে, ও-পক্ষের তদ্বিরের অভাবে তাঁর কতকগুলো ডিসমিস হয়ে গেল।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, তদ্বিরের অভাব হচ্ছে কেন?

—সেটা বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু মামলার দিন অপর পক্ষ হাজির হয়নি, তাদের উকিলের ওপরও কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি।

—হয়তো এত দিনে বুঝেছেন, মামলা চালিয়ে লাভ নেই।

রামপ্রসাদ হেসে বললেন, বড়বাবু একটা উকিলের চেয়েও মামলা ভালো বোঝেন। জেতবার আশায় তিনি এই অসংখ্য মামলা রুজু করেননি, আমাদের টাকার দিক দিয়ে জেরবার করবার জন্যেই করেছিলেন। তাছাড়া একটা মামলা খুব ভালোই সাজান হয়েছিল। সেটাতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হত।

—কি হল সেটা?

—গেল সপ্তাহে একতরফা সেটাও খারিজ হয়ে গেল।

—এর উদ্দেশ্যটা কি অনুমান করেন?

—কিছুই অনুমান করতে পারছি না।

একটু চিন্তা করে কমলেশ বললে, এমন তো হতে পারে যে, এদিকে সুবিধা হল না। হয়তো অন্য দিক দিয়ে আক্রমণের কথা ভাবছেন।

—অসম্ভব নয়।

—ছেড়ে দেবার পাত্র তো উনি নন?

—না।

—তাহলে পরের আক্রমণটা কোন দিয়ে আসতে পারে, ভাবছেন কিছু?

—ওঁর মনের কথা কি করে জানব? সে উনি জানেন আর ওঁর বিধাতা পুরুষ জানেন।

—আমরা তাহলে কি করব?

অপেক্ষা করব। যেদিক দিয়ে নতুন আক্রমণ আরম্ভ হবে, সেদিকে গিয়ে সাধ্য মত আটকাতে হবে। তাছাড়া আর কি করতে পারি?

দু'জনেই কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইলেন। এক সময় কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, বড়মার বাক্স পাঠিয়ে দেবার রহস্যটা কিছু বুঝতে পারলেন?

রামপ্রসাদ বললেন, তোমাকে তো বলেছি কমল, জমিদারী কাজেই আমি চুল পাকালাম, কিন্তু ওঁর একটা চালও আমি আগে থেকে অনুমান করতে পারিনি। কেউ পারে না। শুধু দেখেছি, বৌ-ঠাকরুণ পারতেন।

কমলেশ বললে, আচ্ছা এমন কি হতে পারে না যে, বাক্সের ভিতরে বড়মার সমস্ত গহনা ছিল, এ তিনি ভাবতে পারেননি। কিছু কাপড়-চোপড় আছে ভেবে আর বাক্সটা খুলে দেখার প্রয়োজন বোধ করেননি। হতে পারে না?

—পারে। আবার এমনও হতে পারে, বাক্স খুলে সমস্ত দেখেই তিনি ওটা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

কমলেশ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলে উঠল: দেখেই পাঠিয়ে দিয়েছেন! গয়নার বাক্সটা বার করে না নিয়েই! সে কি সম্ভব?

—অন্যের ক্ষেত্রে সম্ভব না হতে পারে। কিন্তু বড়বাবুর ক্ষেত্রে কি সম্ভব আর কি সম্ভব নয়, আমি আজও বুঝে উঠতে পারিনি।

—কিন্তু তার তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে?

—আছে নিশ্চয়ই। এখন বোঝা যাচ্ছে না। কিন্তু অনেক হয়রাণি, অনেক অর্থব্যয়ের পরে একদিন নিশ্চয়ই বুঝব।

কমলেশ এ-সব কথায় ভয় পেয়ে গেল। বললে, সে তো সাংঘাতিক কথা!

—হ্যাঁ। খুবই সাংঘাতিক কথা।

তার পর চিন্তিত ভাবে রামপ্রসাদ বললেন, রামায়ণে পড়েছি, মেঘনাদ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতেন। কেউ তাঁকে দেখতে পেত না। কেউ বুঝতে পারত না আক্রমণটা কোন্ দিক থেকে আসছে। এ-ও যেন তাই হয়েছে। কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সব সময় সকল দিকেই সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। সেই হয়েছে বিপদ। মানুষ কত দিকে দৃষ্টি রাখতে পারে বল?

একটু থেমে আবার বললেন, তার ওপর তুমি রয়েছ বাইরে। আমিও বুড়ো হয়েছি। সব তাল রাখতে পারি না।

সন্দেহ এমনি করেই জাগে। এবং যখন জাগে, গহনার বাক্স বার করে নিলেও জাগে, বার করে না নিলেও জাগে। মামলার তদ্বির করলেও জাগে, তদ্বিরের অভাবে মামলা খারিজ হয়ে গেলেও জাগে। বোধ হয় খারিজ হয়ে গেলেই আরও বেশি জাগে।

নিচে ভাঁড়ারের দিকের বারান্দায় বসে ওঁদের দু'জনে কথা হচ্ছিল। সুমিতা এসেছিল ভাঁড়ার থেকে কি একটা নিতে। ওঁদের কথা নিঃশব্দে শুনছিল। রামপ্রসাদের সঙ্গে সে কথা কয়, কিন্তু কমলেশের সামনে কয় না। এইটেই পল্লীগ্রামের প্রথা। এতে না কি গুরুজনের অমর্যাদা হয়। কিন্তু সুমিতা কলকাতার লেখাপড়া-জানা মেয়ে। এতটা পারে না। কমলেশ উপস্থিত থাকলে সে সামনে এসে রামপ্রসাদের সঙ্গে কথা কয় না, কিন্তু আড়াল থেকে কয়।

রামপ্রসাদ চুপ করতে ভাঁড়ার-ঘরের ভিতর থেকে সে বললে, এমন তো হতে পারে, বড়মার মৃত্যুর পরে জ্যাঠামশায়ের মন বদলাচ্ছে। আর এ-সব তাঁর ভালো লাগছে না হয়তো।

কথাটা এমনই অবিশ্বাস্য যে, রামপ্রসাদ এবং কমলেশ উভয়েই হো-হো করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন।

অপ্রস্তুত ভাবে সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে, হাসছেন যে?

হাসি থামিয়ে রামপ্রসাদ বললেন, হাসবারই কথা নাতবৌ! বরং চিতাবাঘ তার রং বদলাতে পারে, কিন্তু তোমার জ্যাঠামশায়ের মনের রং বদলাবে না। ওটা একেবারে পাকা রং।

—বড় রকমের আঘাত পেলে জ্যাঠামশায়ের মনের পাকা রংও বদলাতে পারে, এ আপনারা বিশ্বাস করেন না?

উভয়েই একসঙ্গে উত্তর দিলে, না।

কমলেশ বললে, চোখে দেখলেও না।

রামপ্রসাদ বললেন, বড় হোক, ছোট হোক, আঘাতটা তুমি কোথায় দেখলে নাতবৌ?

সুমিতা বললে, কেন, বড়মার মৃত্যু?

—ওকে তুমি মৃত্যু বলছ কেন? রামপ্রসাদ জবাব দিলেন,—বল হত্যা। তোমার জ্যাঠামশাই খোশ মেজাজে, বাহাল তবিয়তে, বিষ দিয়ে বড়মাকে খুন করেছেন। হঠাৎ যে খুন করে ফেলে তার

মনে অনুতাপ আসতে পারে। কিন্তু যে খোশ মেজাজে বাহাল তবিয়তে খুন করে, তার মনে অনুতাপ আসবার তো কোনোই কারণ নেই!

সুমিতা একথা অস্বীকার করতে পারলে না। চুপ করে রইল। অরুন্ধতীকে সমরেশ যে হত্যা করেছেন, অন্যান্য সকলের মতো সে-ও এ বিষয়ে নিঃসংশয়।

রামপ্রসাদ বললেন, তোমার ওই জ্যেঠামশাইটিকে বড় সোজা দেবতা ভেব না নাতবৌ! ওঁর পেটে অনেক রকমের বুদ্ধি। উনি বাঁচবেনও অনেক দিন, ভোগাবেনও অনেক দিন। তোমাদের সেরেস্তায় সারা জীবন কাটল। বুড়ো হয়েছি, এখন বিশ্রাম নিয়ে তীর্থবাস করার কথা। শুধু এই সব কথা ভেবেই তোমাদের ফেলে কোথাও যেতে মন সরে না। তাই আছি। খুব ভয়ে-ভয়েই আছি।

রামপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

একুশ

সমরেশ বাড়ির ভিতরই অধিকাংশ সময় কাটান। তাঁর নিচের সেরেস্তা-ঘরে। হয়তো কাজকর্ম করেন। নয়তো কিছুই করেন না, চুপ করে বসে বসে ভাবেন। কি ভাবেন, তিনিই জানেন! একলাই ভাবেন। তাঁর ভাবনার অংশ নেবার কেউ তো নেই?

সমস্ত দিন এমনি নিঝিবিলি বসে থাকা। তার পরে যখন সন্ধ্যা হয়ে আসে, তাঁর বাড়ির সামনেকার রাস্তা জনবিরল হয়, তখন বাগানে বেরোন। দুই হাত পিছনের দিকে সম্বদ্ধ করে ধীরে ধীরে পায়চারি করেন। প্রকাণ্ড দেহ একটু যেন বেঁকে যায়। মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তখনও ভাবেন এবং কি যে ভাবেন, তা শুধু তিনিই জানেন! সে ভাবনার আদিও নেই, অন্তও নেই।

কিংবা হয়তো সেটা ভাবনাই নয়। কোনো অপরিজ্ঞাত অনাদি উৎস থেকে উৎসারিত একটি অনাস্বাদিত-পূর্ব অনুভূতির অতি সূক্ষ্ম ধারা। রয়ে রয়ে তারই যেন আস্বাদ নেন। সেই সুস্নিগ্ধ রসধারায় নিজের রৌদ্রদগ্ধ শুষ্ক হৃদয়-মনকে স্নান করান। নববধূর মতো সংগোপনে।

এই ক'মাসে চেহারারও অনেক পরিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘ দেহ ঈষৎ ন্যুব্জ হয়ে গেছে। ক্ষৌরকর্মের অভাবে মুখে বড় বড় পাকা দাড়ি বেরিয়েছে। মাথায় বড় বড় পাকা চুল। দেহের গৌরবর্ণের সেই চিক্কণতা আর নেই। চোখের দৃষ্টিতেও সেই তীক্ষ্ণতা আর নেই। যেন স্তিমিত হয়ে এসেছে, যেন স্বপ্নালু। দৃষ্টি যেন বাইরের দিকে নয়, অন্তর্মুখিন। কথা আরও কমে গেছে। সমস্ত দিনের মধ্যে একটা কথাও বলেন কি না সন্দেহ!

কত রকমের ভাবনা: নিজের কথা, অরুন্ধতীর কথা।

দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে কিছুতেই পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে পারছিলেন না। সে কী অস্বস্তি! ভাসমান দু'টি পাতা দক্ষিণা বাতাসে যদি কোন দিন একটু কাছাকাছি আসত, কোথা থেকে ঝড় এসে আবার তাদের পরস্পরের থেকে দূরে সরিয়ে দিত। দু'জনের মধ্যে তরঙ্গিত হয়ে উঠত দুস্তর ব্যবধান।

দিনটা সমরেশের কাছে বড় স্পষ্ট, বড় তীব্র, বড় উজ্জ্বল মনে হয়। তার মধ্যে অন্তরালের অত্যন্ত অভাব। দিনে কোনো দিন তাঁর মনে অরুন্ধতীর সান্নিধ্য লাভের লোভ জাগেনি। দিন তাঁর কাছে চিরকাল কর্মময়। কাজের পর কাজ, তারপর আবার কাজ। কাজের মধ্যেই ডুবে থাকতেন।

তারপর যখন সন্ধ্যা নামত, দু'টি হৃদয়কে ঘিরে অস্পষ্টতার অন্তরাল রচিত হত তখন, মাঝে মাঝে, অরুন্ধতীর সান্নিধ্য লাভের ইচ্ছা সমরেশের হৃদয়েও জাগত। মনে পড়ে, কত রাত্রে চুপি চুপি সমরেশ এসেছেন অরুন্ধতীর শয়নকক্ষে।

নিভৃত শয়নকক্ষে অত্যন্ত কাছাকাছি দু'জন। কিন্তু সমরেশের পায়ের সাড়ায় চমকে উঠে বসেছে অরুন্ধতী। তার সমস্ত মুখ ভয়ে পাণ্ডুর, জ্যোতিহীন অধরোষ্ঠে রক্তের আভাস মাত্র নেই। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিত সমরেশের মুখে। তাঁর ছোট ছোট দু'টি চোখ ক্রূরতায় সাপের চোখের মতো চিক-চিক করে উঠত। শীতল কাঠিন্যে পাংলা দু'টি ঠোঁট সম্বদ্ধ হয়ে যেত। দক্ষিণা বাতাস মুহূর্ত মধ্যে একটা ভাপসা গরমে দুঃসহ হয়ে উঠতো।

মিলনের এই পরিহাসে তবু শেষ প্রয়াস হিসাবে, সমরেশ হয়তো বা একটু হাসবার চেষ্টা করতেন। কাশির মতো ছোট্ট এক ফোঁটা হাসি। তাতে করে দক্ষিণা বায়ুপ্রবাহ ফিরে আসা দূরে থাক, অরুন্ধতীর বুকের রক্তপ্রবাহ বরফের মতো জমাট হয়ে যেত। নীল হয়ে উঠত অরুন্ধতীর মুখ, যেন হাসিটা চাবুকের মতো পড়েছে তার মুখে।

সমরেশ ফিরে এসেছেন। কি হয়তো আসেনি! কিন্তু যে-দূরে সেই-দূরেই রয়ে গেছেন।

কিন্তু সেদিন কী হল? সেই শেষ দিন? মৃত্যুর আগের দিন?

কি যে হল সমরেশ ভেবে পান না। যত ভাবেন ততই যেন ঘুলিয়ে যায়। সমস্ত জিনিসটা যেন আরও জটিল হয়ে ওঠে। যতই প্রবেশ করার চেষ্টা করেন ততই গহন অরণ্যে যেন দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে যান।

কী হল সেদিন?

বলেছিল, তোমাকে আমি ভয় করি না। আমি তোমাকে একেবারেই ভয় করি না। বলেছিল, কী করতে পার তুমি? খুন? কর। আমার ওপর দিয়ে তোমার সমস্ত বিষ নিঃশেষ হয়ে যাক। পৃথিবী ঠাণ্ডা হোক। কমলেশ বাঁচুক। তুমিও বাঁচ।

কমলেশের কথা অরুন্ধতী বলেছিল কি? না কি এ তার নিজেরই মনের প্রতি প্রতিচ্ছায়া? ঠিক মনে পড়ে না। কিন্তু তুমিও বাঁচ, একথা যেন বলেছিল। কি বলেনি একথা?

বলেছিল। স্পষ্ট মনে পড়ে। বলতে বলতে ওর আয়ত দুই চোখে যেন হোমশিখা জ্বলে উঠেছিল। নাসারন্ধ্র ঘন ঘন স্ফুরিত হচ্ছিল। হ্রস্ব তনুদেহ প্রচণ্ড আবেগে বেতসপত্রের মতো কাঁপছিল। মাথার গুণ্ঠন কখন খসে গিয়েছিল টের পায়নি।

স্পষ্ট মনে পড়ে নির্ভীক সেই মুখচ্ছবি।

তার পরে কালবৈশাখীর পরে যেমন মুসলধারায় বৃষ্টি নামে তেমনি করে নামল ওর প্রেম। মহাদেব যেমন গঙ্গার প্রচণ্ড প্রেম ধারণ করেছিলেন, অরুন্ধতীর প্রেমের প্রচণ্ডতাও সমরেশ তেমনি শিরোধার্য করে নিলেন।

তা যেন নিলেন। কিন্তু নির্ঝরের উৎসমুখে যে জগদ্দল পাথরটা চাপা ছিল সেটা সরে গেল কি করে? কে সরিয়ে দিলে?

সমরেশ ভাবেন। ভেবে চলেন। অবশিষ্ট জীবনের জন্যে এই একটিই তাঁর ভাবনা রয়েছে। আর সমস্ত ভাবনাই তিনি পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর মাথায় ঘুরছে ওই একটি বিস্ময়কর রহস্য: প্রেম নামল কোন্ পথে? কি করে সরে গেল ওই জগদ্দল পাথরটা কে সরালে? ওই পাথরটা কি ভয়? সমরেশের সম্বন্ধে অরুন্ধতীর মনে যে আতঙ্ক ছিল, সেইটে? যে মুহূর্তে সে ভয় করতে ভুলে গেল, সেই মুহূর্তেই কি নির্ঝরের মুখ খুলে গেল, নামল প্রচণ্ড ধারা?

সমরেশ ভেবে চলেন। কিন্তু কিছুতেই রহস্যের সন্ধান পান না। এ যেন তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়ে গেছে। অহর্নিশি ক্ষ্যাপার মতো পরশ-পাথর খুঁজেই চলেছেন শুধু,—নিভৃতে, মানুষের সন্দিগ্ধ দৃষ্টির আড়ালে।

সেদিন সকালে সমরেশ যথারীতি তাঁর সেরেস্তায় বসে ছিলেন। এইখানটিতে বসে থাকলে পাশের জানালা দিয়ে ফটক পর্যন্ত, এবং তারও বাইরে কিছু দূর দেখা যায়। খোলা খাতা সামনে নিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে তিনি সেই দিকে চেয়ে ছিলেন।

হঠাৎ দেখলেন, ক'টি ছেলে ফটকে এসে দাঁড়াল। আরও কয়েকটি তাদের অব্যবহিত পিছনে রাস্তায়। সামনের ছেলেগুলি তাদের ডাকলে। কথা শোনা যাচ্ছে না, সকলেই আস্তে কথা বলছে। কিন্তু ঘাড় নাড়া থেকে বোঝা গেল, তাদের তাতে আপত্তি আছে। সামনের ছেলেগুলিও তখন পিছিয়ে গেল।

সমরেশ লক্ষ্য করলেন, ছেলেগুলি একবার এগোয়, একবার পিছোয়। নিজেদের মধ্যে কি যেন পরামর্শ করে। অবশেষে সকলেই, যেন মরীয়া হয়ে, একসঙ্গে ঘেঁসাঘেঁসি করে আসতে লাগল।

বোঝা গেল, তাঁর কাছেই নিশ্চয় কোনো গুরুতর প্রয়োজনে আসছে তারা। সমরেশ গম্ভীর ভাবে সামনের খোলা খাতায় মনোনিবেশ করলেন। কিন্তু উৎকর্ণ হয়েই রইলেন।

তাঁর কাছে কেউ কখনও আসে না। আসবার প্রয়োজনও হয়তো হয় না কারও। সবাই জানে, এখানে কোনো সুবিধার আশা নেই। অথচ এরা আসছে কেন?

যথেষ্ট কৌতূহলের সঙ্গেই তিনি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু ছেলেগুলি যেন দরজার আড়ালে বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল। এতদূর এসেও তারা বোধ হয় ভিতরে আসতে সাহস করছে না।

তখন নিজেই তিনি বাইরে গেলেন। ছেলেরা চুপি চুপি নিজেদের মধ্যে ওঁর ঘরে যাওয়া সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ণয়ে ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ ওঁকে নিজেদের একান্ত সন্নিকটে দেখে শিউরে চমকে উঠল। সমরেশ তা লক্ষ্য করলেন। ওদের অহেতুক ভয় দেখে মনে মনে একটা আশ্চর্য কৌতুক অনুভব করলেন। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করলেন না। মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, কা'কে চাও?

কা'কে চায়!

এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো লোক থাকলে ওরা অম্লান বদনে তাঁর নাম করে দিত। কিন্তু সে পথও বন্ধ। ওরা শুষ্কমুখে পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগল।

সমরেশ ওদের দেখে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আমার কাছে এসেছো?

ঢোঁক গিলে একটি অত্যন্ত সাহসী ছোকরা কোনো মতে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

সমরেশ বললেন, বাইরে দাঁড়িয়ে কেন? ভেতরে এস।

ওঁর পিছু পিছু ওরা ভিতরে ফরাসে এসে বসল।

—বল কি দরকার?—সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন।

ওরা পালাতে পারলে বাঁচে। একটি ছেলে তাড়াতাড়ি করে বললে, চাঁদা।

—চাঁদা!

সমরেশ যেন আকাশ থেকে পড়ল। চাঁদা! তাঁর কাছে চাঁদা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ। বলে ছেলেটি একখানা খাতা এগিয়ে দিলো।

খাতাখানা সমরেশ স্পর্শও করলেন না। অপাঙ্গে হতশ্রী মলাটের দিকে একবার চেয়েই জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের চাঁদা?

—আজ্ঞে ইস্কুলের। মেয়েদের জন্যে একটা ইস্কুল হচ্ছে কি না?

—তাই নাকি!—চাঁদার খাতাখানা দেখতে দেখতে সমরেশ বললেন,—কোথায়?

—আজ্ঞে আমাদের গ্রামেই।

—শুনিনি তো!

সমরেশ দেখতে লাগলেন, কে কত চাঁদা দিচ্ছে। প্রথমেই কমলেশের নাম। সে দিয়েছে পঞ্চাশ টাকা। তার পরেই একেবারে পাঁচ টাকা, দু'টাকা, এক টাকা। তার পরে আট আনা, চার আনা, দু' আনার দল!

সমরেশ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, এ সব টাকা পাওয়া গেছে?

—আজ্ঞে না। পরে আদায় হবে।

হুঁ!

সমরেশ হিসাব করে দেখলেন, সমস্ত চাঁদা পাওয়া গেলেও একশো টাকার বেশি হবে না।

—এই তোমাদের মোট চাঁদা?

—আজ্ঞে না। আরও কিছু হবে।

—এতেই ইস্কুল হবে?

—আজ্ঞে না। এই নিয়ে আমরা আরম্ভ করে দেবো। ঘর একটা পাওয়া গেছে। কম মাইনেতে দু'জন শিক্ষক পড়াতেও রাজি হয়েছেন।

—মেয়েদের মাইনেও আছে।—সমরেশ উস্কিয়ে দিলেন।

ছেলেরা তাড়াতাড়ি বাধা দিলে: আজ্ঞে না। মাইনে দিয়ে কেউ ইস্কুলে মেয়ে পাঠাবে না।

—সে আবার কি! যারা পড়বে তারা মাইনে দেবে না?

—কোথায় পাবে স্যার? গরীব লোক, পয়সার অভাবে ছেলেদেরই পড়াতে পারে না, তো মেয়েদের!

—তাহলে ইস্কুল চলবে কি করে?

বিজ্ঞ গোছের একটি ছেলে বললে, এমনি করেই চালিয়ে নিতে হবে স্যার! যা দিন-কাল পড়েছে!

—হুঁ। সমরেশ কি যেন ভাবতে লাগলেন। তার পর জিজ্ঞাসা করলেন, ইস্কুল কি তোমরা ছেলেরা মিলেই করছ?

—না স্যার! বড়রা আছেন। আমরা শুধু চাঁদা সংগ্রহ করছি।

—ও! বলে হাত-বাক্স খুলে একটি টাকা বের করে ওদের হাতে দিলেন। বললেন, বড়রা যদি আসেন, আমি এ বিষয়ে আলোচনা করব।

ছেলেরা অবাক হয়ে একটু বসে রইল। দেউড়িতে ঢোকবার সময় তাদের ধারণা হয়েছিল, বৃদ্ধ একটি পয়সাও দেবেন না। বারান্দায় উঠে তাদের মনে হয়েছিল, বড় জোর চার গণ্ডা পয়সা পাওয়া যাবে। তার চেয়ে ফিরে যাওয়াই ভালো। কিন্তু সুসজ্জিত কক্ষে ধবধবে ফরাসে বসে তাদের আশা হয়েছিল, গোটা দশেক টাকা নিশ্চয় পাওয়া যাবে। এই তিনটি ধারণার কোনটারই পিছনে কোনো কারণ নেই। বৃদ্ধ তাদের ধমকে তাড়িয়ে দিতেও পারতেন। তবু একটি টাকা পেয়ে ক্ষুণ্ণ হল। একজন বলতে গেল, স্যার?—

—বড়দের আসতে বোলো।

অত্যন্ত গম্ভীর কণ্ঠস্বর। যে কণ্ঠস্বরের সঙ্গে ওদের কখনও পরিচয়ের সুযোগ হয়নি, শুধু লোকমুখে শুনেছিল।

ওরা ঊর্ধ্বশ্বাসে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দাঁড়াল এবং গোটা কয়েক লম্বা লম্বা নিশ্বাস নিয়ে যেন বাঁচল।

ওরা চলে যেতে সমরেশ চশমাটা তুলে, কাপড়ের খুঁটে পরিষ্কার করে চোখে দিলেন এবং অভ্যাস মতো হিসাবের খাতার উপর ঝুঁকে পড়লেন। কিন্তু মন বসে না হিসাবে। অঙ্কগুলো কি রকম ঝাপসা হয়ে আসে! ঠিকে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

স্কুল যাঁরা করতে যাচ্ছেন তাঁরা কি আসবেন? ইঙ্গিতটা তাঁরা কি বুঝবেন যে, এলে স্কুলের জন্যে তাঁরা আরও বেশি পেতে পারেন? বুঝলে হয় তো আসবেন। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। আজ বিকেলেও এসে পড়তে পারেন। কিন্তু না বুঝলে?

সরকার এসে করযোড়ে দাঁড়াল। অত্যন্ত দুঃস্থ চেহারার একটি সরকার। শীর্ণ দেহ, মাথার ছোট-ছোট চুল এবং মুখের বড় বড় গোঁফ ধবধবে সাদা। গাল ভাঙা, সামনের দুটি দাঁত নেই। গায়ে একটি মলিন ফতুয়া। ইক্ষুকলের অপর প্রান্ত দিয়ে যে অবস্থায় বেরিয়ে আসে অনেকটা তেমনি অবস্থা। মনে হয়, সমরেশ তাঁর কলে এই লোকটিও সমস্ত রস নিংড়ে বার করে নিয়েছেন।

সমরেশ বোধ হয় অন্যমনস্ক ছিলেন। সরকারের উপস্থিতি লক্ষ্য করেন নি। ততক্ষণ বেচারা করযোড়েই দাঁড়িয়ে রইল।

একটু পরে সমরেশ তার দিকে চোখ তুলে চাইতেই বললে, জেলেরা এসে গেছে বাবু!

—জেলেরা! কি ব্যাপার?

সমরেশের বিস্মিত কণ্ঠস্বরে সরকার থতমত খেয়ে গেল। বড় বাবুর স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর। ভুল বড় একটা হয় না। তাহলে কি তারই ভুল হল?

সসঙ্কোচে বললে, বড় পুকুরে কি আজকেই মাছ ধরবার কথা নয়?

এতক্ষণে সমরেশের খেয়াল হল। পাশের গ্রামের একটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি বৌভাত। কিছু মাছের প্রয়োজন। সমরেশ নিজে মাছ খুব পছন্দ করেন না। কিন্তু তাঁর বড় পুকুরে প্রচুর মাছ এবং সেই মাছ মাঝে মাঝে এই রকমের ক্ষেত্রে বিক্রি করেন। যেটা ওবাড়ির সকলের কাছেই খুব লজ্জার ব্যাপার! রায়বংশে কেউ কখনও পুকুরের মাছ বিক্রি করেন না। কিন্তু সমরেশ করেন। তিনি তাতে লজ্জাবোধ করেন না।

বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। জাল নামিয়ে দাও। মণ তিনেক ওদের দরকার। সেই আন্দাজ ধরান হয় যেন।

সরকার চলে যাচ্ছিল। সমরেশ তাকে ডেকে বললেন, আর শোন?

সরকার করযোড়ে ফিরে দাঁড়াল।

একটু ভেবে সমরেশ বললেন, গ্রামের কয়েক জন ভদ্রলোক আসতে পারেন। এলে যত্ন করে এই ঘরে বসিও।—আমি থাকি আর না থাকি।

গ্রামের কোনো ভদ্রলোক এ বাড়ি কখনও বড় একটা আসেন না। তাঁরা আসবেন, শুধু তাই নয়, সমাদরের সঙ্গে ঘরে বসাতে হবে, এ যেন সরকারের কাছে একটা অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। সেটা তার বিস্ময়-বিমূঢ় মুখের দিকে চেয়ে বোঝা গেল।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

জাতীয়তায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

একটা কথায় আছে টাকায় টানে টাকা, তেমনি তীর্থে টানে তীর্থ। রামেন্দ্র বাবুর শরীর কিছু দিন থেকে ভাল থাকচে না, ডাক্তারগণ এসে বললেন—কোন তীর্থে গিয়ে জল-হাওয়া পরিবর্ত্তন ক'রে এলে ভাল হয়। শুনবামাত্র বাড়ীর লোক রামেন্দ্র বাবুকে পাগল ক'রে তুললেন। তিনি বললেন, আমার মন যে বলচে না কোথাও যেতে। বাড়ীর লোক সবাই বললে—দিন কতক পুরী চলো না, সমুদ্রের ধারে বাসা নিয়ে থাকলে শরীর মন বেশ ভাল থাকবে।

রামেন্দ্র বাবু বললেন—মন যে পুরী যেতেও ব'লচে না! স্ত্রী উত্তেজিত হ'য়ে ব'ললেন—মন বলচে তোমার রিপন কলেজ আর সাহিত্য-পরিষদ নিয়ে প'ড়ে থাকতে। শরীরের দিকে ত চাইবার অবকাশ নাই তোমার? কথা না ব'লে হাসতে লাগলেন রামেন্দ্রসুন্দর।

ভাবগতিক দেখে স্ত্রী ও আত্মীয়-স্বজনরা বুঝলেন তিনি বাড়ীর সীমানা পার হবেন না।

নিরুপায় হ'য়ে ত্রিবেদী-পত্নী ডাকতে পাঠালেন দেবর দুর্গাদাসকে। কলিকাতা এসে দুর্গাদাস বাবু বললেন—চলুন বাবু-দাদা, দিনকতক পুরী, শরীরটা ভাল ক'রে ফিরে আসা যাক্।

তোমাকে যখন আনলো আমার নাম ক'রে, তখন রাজি না হ'য়ে আর উপায় কি! কিন্তু মন বাড়ীর সকলের যাবার আমার নাম ক'রে। অ-মনেই রাজি হলেন বাবুদাদা।

পুরী এসেই দুর্গাদাস বাবু স্বর্গদ্বারের কাছেই এক জন বড় লোকের সুন্দর বাড়ী চাইতেই, দিলেন তিনি রামেন্দ্র বাবুর নাম শুনে।

ত্রিবেদী মশায় পুরী এসে সপরিবারে উঠলেন বাসায়। বললেন দুঃখ ক'রে—হাজার হাজার টাকা খরচ হবে, তা' সহ্য হয়, কিন্তু একশো কি দুশো টাকা বাড়ী ভাড়া সহ্য হবে না। কী যে এতে লাভ তোমরাই বোঝো।

ইন্দুপ্রভা বললেন—ঐ দুশোই বা দেয় কে? তখন হাসি দেখা গেল রামেন্দ্র বাবুর মুখে।

পুরীধামে পৌছেই বালির উপর খালি পায়ে বেড়াতে আরম্ভ ক'রলেন সকালে-বিকালে। সেই সময় দেখা হ'লো এক দিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। এক সাথে বেড়ান চলতে লাগলো দুই বন্ধুর। আলোচনার শেষ হয় না। নানা আলোচনা।

এক দিন জিজ্ঞেস ক'রলেন রবীন্দ্রনাথ—আপনার স্ত্রী এসেচেন কী ত্রিবেদী মশায়?

হ্যাঁ।

তাঁকেও সঙ্গে আনবেন। আমাদের সাথে পরিচয় হবে।

চিন্তা না ক'রেই বললেন—তিনি মিশতে পারবেন না শিক্ষিত সমাজে।

এ দেখচি আপনারই মত। এখনও আপনারা আঁকড়ে রেখেচেন আবরু-প্রথা?

মাথা নামিয়ে বললেন রামেন্দ্র বাবু—তা' একটু বটে।

মন্দিরে গিয়ে বীভৎস ছবির দিকে চেয়ে রয়েচেন রামেন্দ্র বাবু। কী জঘন্য মিলন স্ত্রী-পুরুষের; মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ রয়েচে বৃহৎ আকারে। অন্য লোকে চেয়ে দেখতে পারে না লজ্জায়। বিমূঢ়ের মত রামেন্দ্র বাবু চেয়ে দেখেন একটার পর একটা। ইন্দুপ্রভা দেবী ভয় পেয়ে গেলেন। যে স্বামী অন্য স্ত্রীলোকের মুখের দিকে চেয়ে দেখেন না কোন দিন, তিনি কি না প্রকাশ্য স্থানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে আছেন ঐ দিকে! জিজ্ঞেস করলেন অস্বস্তি বোধ ক'রে, হাঁ গা, কী দেখচো অমন ধারা ক'রে একদৃষ্টে?

চমকে উঠে বললেন—দেখচি কোন যুগে এই ধারা শিক্ষা ছিল। বৌদ্ধের না হিন্দুর, না গ্রীকদের? তাই ভাবছিলাম। মনে আসচে না।

বাড়ী গিয়ে বইএ দেখবে। এখানে এমন ভাবে দেখলে লোকে বলবে কী?

বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন—লোকের বলার মানে?

কী সব বিশ্রী ছবি দেখচো না, লোকে বলবে না?

কই, আমি তো কিছু বিশ্রী দেখচি না। আমি ভাবচি কোন্ যুগের এই চিত্র? মন্দির-গাত্রে স্থানই বা পায় কেন? তাই ভাবচি।

স্বামীকে টেনে ধ'রে নিয়ে গেলেন ইন্দুপ্রভা মন্দিরে। অন্ধকার ঘনঘোর। পাণ্ডার হাত ধ'রে যাচ্ছেন। এমন সময় দেখতে পেলেন বিরাট প্রদীপের আলো। তার সামনেই জগন্নাথ দেব। ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে উঠলেন। প্রদক্ষিণের সময় পাণ্ডা বলিয়ে চলেছেন—'পাপোঽহং পাপকর্ম্মাঽহং পাপাত্মা'—অমনি রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—অন্য কোনো শ্লোক জানা থাকে ত বলিয়ে চলুন।

পাণ্ডাজী ভেবে পান না—এ কেমনধারা নাস্তিক, বেদবাক্য ব'লতে চায় না!

স্ত্রী বললেন স্বামীকে—কী জগন্নাথ দেবের মন্ত্র তুমি ব'লে দাও না, তাই দশ বার ব'সে জপ করি।

নিজের ইষ্টদেবতার মন্ত্র জপ করলেই হবে। যে কোনো ঠাকুরকে নিজের ইষ্টদেবতা ব'লে প্রণাম করবে। তাহ'লেই তাঁকে পাবে। এগিয়ে চলো একের দিকেই।

মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে পাণ্ডাজী জিজ্ঞেস করলেন—পাপোঽহং মন্ত্রটা বলতে দিলেন না কেন বাবু?

হেসে রামেন্দ্র বাবু বললেন—মানেটা জানেন পাণ্ডাজী?

পাণ্ডাজী ব'ললেন—এ বেদবাক্য, এর মানে জানার প্রয়োজন আছে কী?

তখন বললেন রামেন্দ্র বাবু—জানলে ও মন্ত্র বলাতেন না। অর্থে ব'লচে—আমি পাপী, আমি কেবল পাপ-কাজই করচি, আমার আত্মা পাপী।

এতো অন্যায় লিখেচেন কেন মুনি-ঋষি?

উত্তর মুখস্থই ছিল রামেন্দ্র বাবুর—এ বৈষ্ণবদের অতি দীনতা।

তার পর অক্ষয় বটের কাছে গিয়ে প্রদক্ষিণ করলেন এক সঙ্গে উভয়ে।

কী আকাঙ্ক্ষা নিয়ে প্রদক্ষিণ করলে তুমি ?

উত্তর দিলেন গম্ভীর কণ্ঠে—মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। তুমি ?

তোমাকে যেন আবার এমনি ক'রে পাই ব'লে। তুমি তো আচ্ছা মানুষ, আমাকে চাও না।

বৈরাগ্যই যে মানুষের প্রধান কাম্য, তা তুমি বোঝো না কেন ? যে পথ ধরলে আর স্বামী, পুত্র, কন্যা, ধন, ঐশ্বর্য্য কিছুই যে আর মনে লাগবে না। এটুকু বোঝো না কেন ?

পুরী থেকে ফিরে এসে ত্রিবেদী মহাশয়ের একমাত্র চিন্তা—লিখতে হবে ঐ মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ শ্লীলতাহীন বীভৎস ছবির কথা। শক্তি নাই নিজের কলম ধ'রে লিখবার। মাথার অসুখে কাতর। মনে অদম্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করবার ওর তথ্য।

প্রায়ই বলতেন রামেন্দ্র বাবু—ঐ সমুদ্রের হাওয়া-বাতাসই আমাকে সেরেছে, মাথার যন্ত্রণাতে আর কিছুই করতে পারছি না। মাথার ভিতর চিন্তার রাশি, প্রকাশের জন্য উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, ব্যাকুল আগ্রহ।

মনে হ'লো তাঁর প্রিয় শিষ্য অধ্যাপক বিপিন গুপ্তকে দিয়ে লেখাবেন সব কথা। ডাক দিলেন গুপ্ত মহাশয়কে। রাজি হ'লেন সানন্দে বিপিন বাবু।

সম্পাদনা করলেন বিপিন বাবু "বিচিত্র-প্রসঙ্গ।" জীবতত্ত্ব হ'তে আরম্ভ ক'রে হিব্রু, গ্রীক, মিশরীয় বহু তথ্য নিয়ে গবেষণা চললো প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে। তার সঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি ও আলোচনা। ত্রিবেদী মহাশয় বিপিন বাবুকে যা বলেন, সংকলন করেন তিনি সেগুলি পরম আগ্রহে।

এই সব তথ্যের আলোচনা ক'রে ত্রিবেদী মহাশয় যখন লিখতে বলতেন বিপিন বাবুকে, তখন জ্ঞান থাকতো না বক্তার ও লেখকের সময় সম্বন্ধে। এ যেন বক্তা ব্যাসদেব আর লেখক গণেশদেব।

অবিরাম গতিতে চলেছে তাঁদের কাজ। অন্দর থেকে ডেকে পাঠাচ্ছেন স্ত্রী—অসুখ শরীর নিয়ে আর থেকো না, চ'লে এসো। সাড়া নাই আহ্বানে।

মা বেলা হ'তে দেখে ডেকে পাঠান। কে শোনে সে কথা! রামেন্দ্র বাবুর ভাব-মন্দাকিনীতে তখন এসেছে জোয়ার।

ভাই দুর্গাদাস থাকতে না পেরে বললেন, বিপিন বাবুকে একবার। উত্তরে শুনলেন—এই যাচ্ছি। উভয়েই তখন যেন তন্ময় সাধক, বাহ্যজ্ঞান নাই, সমাহিত-চিত্ত ভাবরাজ্যে। তুলনা নাই এ অপূর্ব্ব দৃশ্যের!

জ্ঞান নাই উভয়েরই, বেলা তিনটে বেজে গিয়েছে, স্নানাহারের কথা মনেই নাই দুই সমাহিত-চিত্ত সাধকের। আনন্দোদ্ভাসিত বদন, চ'লেছে অবিরাম গতিতে তাঁদের সে সাধনা।

নিরুপায় হ'য়ে দুর্গাদাস বাবু এসে পাঁজাকোলা ক'রে উঠিয়ে বাইরে রেখে এলেন বিপিন বাবুকে।

আশ্চর্য্য হ'য়ে চেয়ে দেখলেন ত্রিবেদী মহাশয় এই দৃশ্য। গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলেন স্থাণুর মত।

স্নানের জন্য ডাকতে এসে বললেন—প্রয়োজন নেই। আহারের

জন্য ডাকতে এলেও ঐ এক উত্তর। দুর্গাদাস বাবু যেতে সাহস করেন না বাবু-দাদার কাছে। অগত্যা রওনা হ'লেন বিপিন বাবুর বাড়ী। তাঁকে গাড়ী ক'রে নিয়ে এসে তবে রামেন্দ্র বাবুকে খাওয়ালেন।

ঐ "বিচিত্র-প্রসঙ্গ" প'ড়ে সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—

শ্রীহরি শরণং

নারকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা।

কল্যাণবরেষু,

"বিচিত্র-প্রসঙ্গে" আপনার কথাগুলি পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। কথাগুলি নিরভিমান পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নিপুণ চিন্তাশীলতাব্যঞ্জক। তাহার মধ্যে নূতন কথা অনেক আছে, কিন্তু নূতনত্বের··রামায়ণ ও মহাভারতের সমালোচনায় রাম-চরিত, কৃষ্ণচরিত ও অর্জ্জুন-চরিতের বিশ্লেষণে স্বল্প কথায় আপনি যাহা বলিয়াছেন, অমন বিশদ ভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব নয় বলিয়া মনে হয়। বৈদিকযুগে হিন্দু-সমাজের শিক্ষার কথা যাহা আপনি বলিয়াছেন, তাহা নূতন কথা ও আর্য্যজাতির অসাধারণ গৌরবের কথা। আর সেই উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক ভাবে বর্ণাশ্রমের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ শাস্ত্র এবং যুক্তিসঙ্গত। ঐ সমস্ত কথা হিন্দুসমাজ-সংস্কারক ও হিন্দুসমাজ সংরক্ষক উভয় পক্ষের বিশেষ প্রণিধান করিবার বিষয়। বিচিত্র-প্রসঙ্গ যথার্থই একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ।

শুভানুধ্যায়ী

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিঠি ও বই প'ড়ে ত শুনালে, সত্যি বল কেমন লাগলো পুরীধাম তোমার?

একটু চিন্তা করতে দেখে বললেন—তোমার পুরী গিয়ে মাথার অসুখ হ'লো ব'লে যেন নিন্দা ক'রো না।

রামেন্দ্র বাবু বললেন স্ত্রীকে—আমাকে ভাল বলিয়ে তবে ছাড়বে। আমাকে যদি কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে চাও তবে গঙ্গার জল আর বাতাস খাওয়াও। ও সমুদ্রের বাতাসে আমার ভেতর যেন শুকিয়ে যায়। বালি একটু তাতলে আমার মাথা যেন কেমন ক'রে ওঠে। বাঙলার গঙ্গাই আমার ভাল। ওর জল-বাতাস আমার সহ্য হয়। একটা কথা বলি, শুনে তুমি খুসী হবে। পুরী গেলে সমজ্ঞান হয়। মায়ের মত অমন আচারী, তিনিও ঝিদের হাতে অন্নগ্রহণ করেচেন। এটা সোজা কথা নয়, এত দিনের সংস্কার ওখানে গেলে একবারে লোপ পেয়ে যায়। হাজার জানা থাকলেও তাঁদের মত নিষ্ঠাবতীদের সংস্কার চূর্ণ করতে পারেন না আমাদের গঙ্গা। গঙ্গাজলে পাক অন্ন, ভেদ নাই চারবর্ণ। কে বোঝে সে কথা! যেদিন এই ভাব আসবে সে দিনই হবে ভারতের মুক্তি পরাধীনতা হ'তে।

পদ্ম-মা (রামেন্দ্রসুন্দরের মাতা) জিজ্ঞেস করলেন—হাঁ বাবা রাম, এ জাতিভেদ কে তুলেছিল? এ তো তোর বাবারাও মানতো।

রামেন্দ্রসুন্দর বললেন—মানতেন ঠিকই। তবে বাবাদেরও আগে থেকে যে লক্ষ্মীর কথা চলে আসছে আর পৌষ মাসে তোমরাও যে লক্ষ্মীর কথা ব'লে আসছো, ওটাতে কি শিক্ষা দাও জান তো? ওতে ব্রাহ্মণ ভিক্ষা চাইছে—ছুতোর ভায়া, ছুতোর ভায়া বাড়ীতে আছো হে? কে ডাকাডাকি করে? আমি ব্রাহ্মণ ছ' মাসের ছেলেটি, পথে কুড়িয়ে পেয়েছি, তার মুখে ভাত দেবো, চিঁড়া চাই, পিঁড়ে চাই, দীপগাছা চাই, খাট চাই—তখন ছুতোর ব'ললে খাট দেবো, চেয়ার দেবো, বেঞ্চি দেবো, দীপগাছা দেবো, পিঁড়ে দেবো, চিঁড়ে দেবো, যা চাও তাই দেবো, তুমি কোথা নিয়ে যাবে ঠাকুর, আমি নিজে গিয়ে সব দিয়ে আসবো। এই ভাবে সকল জাতিকে ভাই ব'লে জানিয়েছে স্নেহের আহ্বান; আর চেয়েচে সকল জাতির কাছেই দরকার মতো সব জিনিষ। যাকে বলো বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, সেই চেয়েচে সকল জাতির কাছে নিজে গিয়ে সব দরকারী জিনিষ। এতে কী বোঝায় না মা, কত বিরাট একটা জাতির সমবায় আমাদের এই হিন্দু সমাজ? উদার এই হিন্দু-সমাজ। ঘৃণ্য ছিল না কেও, অস্পৃশ্য ছিল না কেও হিন্দু সমাজে। অতি ঘৃণ্য প্রাণী কাক, সর্প ইত্যাদিকেও দেবতা জ্ঞানে পুজো ক'রে এসেচে হিন্দু জাতি। অতি অহিতকর ইন্দুরকেও গণেশের বাহন ব'লে ভক্তি ক'রে থাকে। তবে অনেক দিন পরাধীন থাকার জন্যই এই সব একটু হয় মা। এর মূলে কিন্তু কিছুমাত্র সত্য নাই, ধর্ম্ম নাই এ আচারে। যাঁরা করেন, তাঁরা মনে করেন খুব ধর্ম্ম ক'রচি, কিন্তু কিছুই না। বরং অন্য জাতিকে অস্পৃশ্য মনে ক'রে অধর্ম্মই করেন। ভেদ জিনিষটাই খারাপ। জাতিভেদ, ভাইএ ভাইএ ভেদ, এ কী ভালো ব'লতে চাও?

মা ব'ললেন—তাই ব'লে কী হাড়ী মুচির হাতে খেতে বলিস্?

অত দূর পারবে না মা! যারা তোমাদের বাড়ীতে আছে আজন্ম তাদেরকে শূদ্র ব'লে ঘৃণা ক'রবে কেন? গঙ্গাজল চণ্ডালে আনলে চলে, দুধ খাবে গোয়ালার জল দেওয়া জেনেও, আর তারাই যদি এনে দেয় জল, তখন তোমরা সে জল ছোঁবে না পর্য্যন্ত, কী আশ্চর্য্য!

হাঁ রে রাম, তাই ব'লে কী তুইও খাবি নীচ জাতির হাতে?

হেসে ব'ললেন—তোমরা যে জ্ঞান হবার আগে থেকে ভূত ভূত ব'লে ভয় দেখিয়েই এসেচো। হয় তো আমিও ভাববো, সঙ্কোচ ক'রবো। আচ্ছা মা, আমি তো নিজের চোখে দেখলাম, আমার ছোট ভগিনী হবার সময় তুমি হাড়ীমাকে নিয়ে ত বেশ চালালে। তার পাশে শুয়ে থাকলে, তার হাতের জলও খেলে। তখন তো বাধলো না?

ও তো আমার মায়েদেরও দেখেছি, ওতে কোন দোষ নাই। কথায় বলে আতুরে নিয়ম নাই। হাসি ধরে না তখন রামেন্দ্রসুন্দরের।

হাঁ বাবা রাম, নতুন বৌ এলে আমরা একটা ফুলের নাম রেখে দিয়ে তাকে সেই নামে ডাকি কেন?

ফুল যে সকলে ভালবাসে মা, ভগবান পর্য্যন্ত ফুলে তুষ্ট। সেই জন্য নতুন বৌ এলে তাকে ভগবানের ভালবাসা জিনিষের নাম দেয়। মনে ভাবে, এই বৌ আমার ফুলের মত সৌরভ বিলি করবে। দেখ না মা, আমার দিদিমারা কেও হয়তো পদ্মফুল ভালবাসতেন, তাই তোমার নাম রাখলেন পদ্ম-বৌ। কেমন সৌরভ বিতরণ ক'রচো, দেখচো ত। সারাটা পাড়া মাতিয়ে রেখেচো পদ্মফুলের সুগন্ধে। কাকীমার নাম রেখেছিলেন পঙ্কজ-বৌ। পঙ্কজ মানেও পদ্ম।

ও সব কথা বলিসনে, আমরা যে মূর্খ, জ্ঞান-গম্যি কিছুই নাই। আমাদিগকে আবার ঘুরে ঘুরে আসতে হবে নরকে। তোর আর জন্ম হবে না রাম, শাপভ্রষ্ট হয়ে এসেছিলি আমার কাছে।

দুঃখের স্বরে বললেন রামেন্দ্র—ও-কথা ঠিক নয় তোমার মা!

এতো প'ড়লাম, তবু তো আজ পর্য্যন্ত ঠিক পেলাম না মৃত্যুর পর কী হয়। তবে মা, এ ভারতভূমিকে নরক বলি না আমি। এ আমার স্বপ্নের স্বর্গ, আমার সাধনার ধন। এখানের তপস্যা এক মাত্র বৈরাগ্য ; সেই জন্যই মা ভারতকে আমি এত ভালবাসি। এই ভারতই একমাত্র দেশ—যে দেশের শিক্ষা নির্ব্বাণ মুক্তি ; এ ত আর অন্য কোন দেশে নেই ?

অতো-শতো বুঝিনে বাবা, তোর জ্ঞান হ'য়েছে, হয় তো না, হয় তো কেন, নিশ্চয়ই তোর মুক্তি হবে।

এ জন্যে তোমায় দুঃখ ক'রতে হবে না মা, তোমার ছেলেই ত রাম।

হাঁ বাবা রাম, তুই যে বার বার বলিস ছোঁওয়া-ছুঁয়ি ক'রতে নাই অতো, তা হ'লে ভগবানকে পাওয়া যায় না—এ কী বুঝিয়ে দে তো।

তোমার ছেলে রামের কাছে শুনলে ত তোমাদের বিশ্বাস হবে না মা! তার চেয়ে পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কি কৃষ্ণলাল ভট্টাচার্য্য আছেন। তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস ক'রো।

এতো বড় পণ্ডিত তুই, তবুও ভট্‌চাজ মশায়কে শুধাতে মন হয় কেন ব'লতে পারিস ?

রামেন্দ্র বাবু হেসে বললেন—এ অতি সোজা কথা মা, তোমাদের মনের মত বলেন কি না তাঁরা, সেই জন্য ভাল লাগে শুনতে।

তুই কী ক'রে বুঝলি রাম ?

আমার যে চোখে দেখা মা, তোমরা একাদশীর উপবাস ক'রে চৈত-বোশেখ মাসের কাঠ-ফাটা গরমে ম'রে যাচ্ছো, তবুও এক ফোঁটা জল খাবার অধিকার নেই। এ যে কী শাস্ত্র তা বুঝি না! যাঁরা বিধান দেন তাঁদেরকে জিজ্ঞেস ক'রে জানলাম—ঐ ত শাস্ত্রের বিধান, মানতেই হবে, তবে অনুকল্প আদেশ আছে শাস্ত্রেরই। সে অনুকল্পের কথা শুনে ত আমি অবাক্। মস্ত বড়ো পণ্ডিত, অনেক শাস্ত্র প'ড়েচে, তিনি বললেন কী জানো মা? অশীতিপর বৃদ্ধা, একাদশীর দিন যদি জল না পেলে প্রাণাত্যয়ের সম্ভাবনা হয়, আর তা' যদি কোনও সুচিকিৎসক বুঝতে পারেন তা হ'লে বিধবা গঙ্গাজল পান করতে পারেন, তবে একাদশীর পরে তাঁকে শাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হবে। কী এ বিধান বুঝতে পারি না মা! যত জোর কয়েকটা বিধবার উপর। শোনেনও তাঁরা ঐ সব ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথা এবং মেনেও চলেন। আমাদের মত ইংরাজিনবীশ পণ্ডিতের কথা ত শুনবে না তোমরা ?

শুনবো না কেন ? শুনবো, তুই বল্।

না গো মা শুনবে না, আমার বলাই বৃথা হবে। শুনতে দেবে না তোমাকে তোমার সংস্কার। তোমার ঐ পণ্ডিতগোষ্ঠী।

না, না, তুই বল্ রাম! আমি শুনবো।

তখন বলতে আরম্ভ করলেন রামেন্দ্রসুন্দর—আমাদের বাঙলার ও সর্ব্বত্র নাই এই ব্যবস্থা যে সকলকেই নিরম্বু উপবাস করতে হবে। কতকটা স্থানে মাত্র এই ব্যবস্থা চলে আসচে। ভারতের যে যে স্থানে বড় বড় পণ্ডিত আছেন সে সব স্থানেও নাই এমন নির্ম্মম ব্যবস্থা। আমাদের বাঙলার এই অঞ্চলটাতে শাসন চলচে রঘুনন্দনের। তিনিও নিজে এই শাস্ত্র রচনা করেন নাই। তিনি একজন ব্যাখ্যাতা মাত্র। মস্ত বড় পণ্ডিত ত ছিলেন তিনি।

মনুসংহিতা হ'চ্চে ঋষিপ্রণীত। এইটাই প্রামাণ্য গ্রন্থ। বেদগ্রাহী সমাজের সমস্ত বিধি-নিষেধ শ্রুতি-প্রমাণ। শ্রুতি অর্থে বেদের ব্রাহ্মণ-বাক্য। ওর বিরোধী হ'লে তাকে ত শাস্ত্রসম্মত বলা যায় না। দুর্ভাগ্য ক্রমে এ গ্রন্থ লুপ্ত হয়ে গিয়েচে। বেদের ব্রাহ্মণ-বাক্যে কিছুই পাওয়া যায় না বললেই হয়। এখন পুরাণাদির আশ্রয় নিতে হয়েচে। এই জন্য রঘুনন্দনকেও মহাভারতের আশ্রয় নিতে হয়েচে। কিন্তু এই সব পুরাণ নিয়ে অনেক গণ্ডগোল আছে। শঙ্করাচার্য্যের মত অত বড় মনীষীও পুরাণের আশ্রয় নিতে সঙ্কুচিত হয়েচেন। ঐ সব পুরাণের কোনখানা আদৌ ঋষিপ্রণীত নয়, আর কোনটাতে প্রক্ষিপ্ত আছে। এ নিয়ে পণ্ডিত-সমাজেও মতভেদ আছে। প্রক্ষিপ্ত কথাটা বুঝতে পারলে না হয় তো? আগেকার দিনে পণ্ডিতরা আজকালকার মত ছাপান শাস্ত্র ত পেতেন না। তখন ছাপাখানা হয়নি। নকল ক'রে নিতেন আগেকার পুঁথি। পুঁথির কোন অংশ হয়তো নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। তখন যিনি নকল করতেন তিনিও ত পণ্ডিত লোক। নিজে যা ভাল বলে মনে করলেন, সেই রকম একটা কিছু লিখে লুপ্ত অংশটা পূরণ করে নিলেন। এই হলো প্রক্ষিপ্ত। তা হ'লেই বুঝতে পারচো, এই প্রক্ষিপ্ত অংশ ঋষি-বাক্য নয়। দেখতে পাচ্চো বৈষ্ণবদের এক মত, শৈবদের আর এক মত, আবার শাক্তদের আর এক মত। দেশভেদে কালভেদে বহু মত। এটাকে ত সর্ব্ববাদিসম্মত বলা যায় না? যদি কেও এই মত মানতে না চান ক্ষুব্ধ হবার কিছু নাই। তোমাদের এই যে নিরম্বু উপবাস, এ ঘটনাচক্রে চলে আসচে। যদি কেও এই ভারতবর্ষেরই অন্য স্থানের মত নিয়ে চলে নিরম্বু উপবাস না করে, তাতে প্রত্যবায় ঘটে না। তবে সব ব্যবস্থাতেই মোটের উপর সংযম রক্ষা হয়। রঘুনন্দনের মতে ব্রাহ্মণ শূদ্র ছাড়া অন্য কোন বর্ণ নাই সংসারে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের মত আচার-নিয়ম পালন করেন ভাল, না করেন তাতেও ক্ষতি নাই।

তোর অত শাস্ত্রকথা আমি বুঝতে পারচি না রাম!

তবে যাঁর কথা বুঝবে তাঁরই আদেশ পালন করে চল, ধর্ম্ম হবে।

সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলতেন—রামেন্দ্রসুন্দর ডিরোজিও যুগের প্রতিক্রিয়া। সেদিন এক দল শিক্ষিত তরুণকে দেখা যেত আচার-ধর্ম্ম বিরোধী উচ্ছৃঙ্খলতা করতে। ডিরোজিওর মত প্রতিভাবান বাল্মীকির প্রভাব সংক্রমিত হয়ে এ দেশের তরুণগণকে দেশের আচার, দেশের ধর্ম্ম পালনে বিমুখ করে তুলেছিল। যাঁরা প্রকৃত মনীষী তাঁরাই সে প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন সেই ব্যতিক্রম। স্বদেশভক্তিতে, সমাজ-সেবায় একজন প্রাণবন্ত মানুষ ছি'লেন রামেন্দ্রসুন্দর।

[ক্রমশঃ।

নীলা ও অঞ্জনের ডায়েরী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

নীলার কথা

কেন আমার মন আজ এত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে? অন্তরের নিভৃত কোণে যে অশান্ত শিহরণ ব'য়ে যায়, তা' যে আমি আর থামিয়ে রাখতে পারি না! আমার চোখে নেই ঘুম; আহার-বিহারে রুচি নেই; নেই কোনো শৃঙ্খলা আমার কাজের মধ্যে! এ কিসের উন্মাদনা? কৈ, এত দিন তো আমার এমন ছিল না? আমি ছিলাম স্বপ্নে—চেতন ও অবচেতন লোকের সন্ধিক্ষণে। সেখানে ব'সে কল্পলোকের নীড় রচনা করেছি; সে ছবি মুছে দিয়ে আবার নতুন ক'রে ছবি এঁকেছি—রূপকথার রাজপুত্রের স্বপ্ন দেখেছি কতো দিন। এত কাল যে অজানা, অনাগত অতিথির জন্যে আমি বুকের রক্তে রাঙা ব্যথার কমল দিয়ে মালা গেঁথেছি, যার জন্যে পাঠিয়ে দিয়েছি ওই আকাশে আমার নীরব নিমন্ত্রণ, সে যখন এসে দাঁড়ালো, তখনও কী ভাবতে পেরেছিলাম যে, আমার এই হবে?—ওগো, এ যে অসহ আনন্দ!

পশ্চিমের আকাশে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ ম্রিয়মাণ রশ্মি মেঘগুলিকে রাঙিয়ে দিয়ে গিয়েছে। যেন তার দয়িতা নিশীথিনীর কপোলে আবেগভরা চুম্বন দিয়ে সে বিদায় নিয়ে চলে গেল! লজ্জায় সমস্ত আকাশখানা লালে লাল হ'য়ে উঠেছে আর লাজাবগুণ্ঠিতা রজনী ঢ'লে পড়েছে ধরণীর বুকে, নিদ্রার আবেশে বিহ্বল হ'য়ে—তারই সঙ্গে নেমে আসে সন্ধ্যার কালোছায়া—যেন তার আলুলায়িত ঘন কুন্তল এধার-ওধার ছড়িয়ে পড়ে! অন্তরালে যে অগণিত নক্ষত্র উঁকি দিয়ে দেখছিল দিন ও রাত্রির এই অপরূপ বিদায়-উৎসব—তাদের মাঝে কয়েকটি কৌতূহলভরে আকাশের বুকে উজ্জ্বল হ'য়ে ফুটে উঠল। আমিও তাদের এই চিরবিরহের লীলা, এই মুক্তির পণে আলো-আঁধারের পরিণয় অবাক হ'য়ে চেয়ে দেখছিলাম। তার পর তারকার দল কখন যে সব ডুবে গেছে, লক্ষ্য করিনি—সমস্ত আকাশখানা জুড়ে অবিচ্ছিন্ন কালো মেঘের অবকাশে স্তব্ধ নিশীথিনী চুপি চুপি ধরণীর বুকে তার মায়াজাল ছড়িয়ে দিলে। এমনি সময় সে এল। এ আমি কী দেখলাম! বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য-মূর্তি নিয়ে যেন আমার সামনে দাঁড়িয়েছে। এই উচ্ছল রূপ, এমন স্নিগ্ধ বহ্নিভরা দৃষ্টি—কৈ, আগে তো কখনও দেখিনি—সে যেন জন্ম-জন্মান্তরের বহু পরিচিত স্বপ্নলোকের ইঙ্গিত আমার কাছে নিয়ে এল! তাকে ত' কিছুই বলা হোল না—সে চ'লে গেল। কিন্তু আমার মনে কোনো ক্লান্তি এল না—এল একটা গভীর বিপ্লব। বিশ্ব তখন আমার কাছে নেচে উঠেছে বুকের স্পন্দনের তালে তালে; কে যেন কিসের আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গেল। আমার পিতা-মাতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-অনাত্মীয়, পশু-পক্ষী, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ—সবই আমার কাছে হয়ে উঠলো প্রিয়—অতি প্রিয়। এত ভালো লাগলো, মনে হ'ল বুঝি এত ভালো আমি এর আগে কাউকে বাসিনি! সবাই আমার দিকে নির্ব্বাক-বিস্ময়ে চেয়ে থাকে—আমার সমস্ত মুখে কে যেন আবির ছড়িয়ে দেয়! লজ্জা? হ্যাঁ, লজ্জারই অনুভূতি। এরই ছোঁয়া লেগে মানুষ হয়ে ওঠে অপূর্ব্ব সুন্দর!

অঞ্জনের কথা

কেন এমন হয়? যাকে চিনি না, জানি না কোনো দিন—এক নিমেষের দেখায় কেন তাকে এত প্রিয় বলে মনে হয়? বুকের মাঝখানে খুঁজে দেখি, আমার কল্পলোকের মানসী এত দিন ঘুমিয়েছিল, আজ জাগরণের প্রথম মুহূর্ত্তে যাকে দেখে, তাকেই বুঝি জীবন্ত, জাগ্রত, শাশ্বত বলে বরণ করে নিতে চায়! কোন্ অশরীরী সঙ্গীত তার বুকের তলে প্রবেশ ক'রে নাচন জুড়ে দিয়েছে—কী যেন একটা রঙীন ছায়া পরশকাঠির ছোঁয়ায় তাকে চঞ্চল ক'রে তোলে!

এ কী প্রলাপ বকে যাচ্ছি?—আশা নেই, উৎসাহ নেই—যেন কী এক অনাস্বাদিত ছন্দের দোলায় সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি উন্মুখ হ'য়ে উঠেছে! ওগো, আমার কল্পলোকের মানসী, দেখাই যদি দিলে, মূর্ত্ত হয়ে, তোমার নিবিড় সান্নিধ্যে আমাকে সচেতন ক'রে তোল। মিছে কল্পনার মায়ায় ভুলিয়ে রেখো না। আমার জীবনের নিঃসীম অন্ধকারে, তোমার বিদ্যুদ্দীপ্ত পথে আমায় হাত ধরে নিয়ে চল।

আমি শুধু ভাবি—সে কী একদিন! তাকে দেখে আমার মনে হ'ল, সুদীর্ঘ প্রতীক্ষায় চোখ যখন আমার অবশ হ'য়ে যাবার মত, তখনই সে দিল দেখা! হয়ত' এরই প্রয়োজন ছিল। দুঃখের মধ্য দিয়ে যাকে না পাওয়া যায়, তাকে তো পাওয়াই বলে না! তপস্যার আগুনে পরিশুদ্ধ হয়েই তো নিতে হয় দেবতার আশীর্ব্বাদ। তাই আজ তোমাকে আহ্বান করি—হে মানসী, হে আবিঃ, হে আমার অভ্যগ্র দেবতা, এসো, তুমি এসো! তোমার আবির্ভাবের আরক্ত প্রভায় আমার সকল কুণ্ঠার অবসান হয়ে যাক্। তোমার আলোর বন্যায় আমাকে প্লাবিত করে দাও। তোমার নিবিড় কালোচুলে আমার সকল লজ্জাকে আড়াল করে রাখো। তোমার ব্যগ্র বাহুর আকর্ষণে তুমি আমাকে আরো—আরো কাছে টেনে নাও। তোমার প্রেমের অনির্ব্বাণ শিখায় জ্বলে উঠুক আমার সমস্ত জীবন!

নীলার সঙ্গে পরিচয় হ'য়েছে। রূপ তার অনিন্দ্য, কিন্তু সে রূপের অন্তরালে যে এমন একখানি স্নিগ্ধ প্রাণ লুকিয়ে আছে—তা' ভাবতেও পারিনি। তার চলার পথে জেগে ওঠে রক্ত-পাগল-করা ছন্দ! লাল টুকটুকে ঠোঁট দু'খানি মৃদুহাস্যে অনুরঞ্জিত হয়ে ওঠে। কথা সে বেশী বলেনি—কিন্তু, কথাই ত' সব নয়। তার মধু সান্নিধ্য, তার কালো চোখের নীরব ভাষা, যে তার কথার চাইতেও বেশী। তার জন্মদিনে কয়েক লাইন কবিতা পাঠিয়েছিলাম—সে কী শুধু কথারই মালা? আর কিছু নয়?

> জ্যৈষ্ঠের খর তপ্ত নিদাঘে এলো কী ধরার মেয়ে—
> সঞ্চিত আশা—নন্দিত তনু—ছন্দিত পথ বেয়ে!
> কচি কিশলয় মুঞ্জরি ওঠে শুনি তা'র আহ্বান—
> নব বরষায় ইঙ্গিত ভরা তারি বন্দনা-গান!
> নয়নে যে তার স্বপনের খেয়া অনুরাগে উচ্ছল—
> আননে তরুণ অরুণ লাবণি নিঃশ্বাসে পরিমল!
> যুগ যুগ ধরি' ঝঙ্কার তোলে সঙ্গীত বসুধার—
> তারি মাঝে দোলে নাচের আরতি ছন্দ দুর্ণিবার!
> আকাশের নীল নেমে আসে যেন ধরিয়া স্নিগ্ধ কায়া—
> অনন্যা তুমি—এ মাটির বুকে অরূপের রূপছায়া!

সেদিন যখন সে আমার ঘরে এলো, দেখলাম, তার কবরী-রন্ধ্রে যুঁই ফুলের মালা জড়ানো। তার মিষ্টি গন্ধে মন ভ'রে গেল—আমি

উন্মনা হয়ে উঠলাম। আমার অন্তর যেন চোখ রাঙিয়ে, শাসন করে বলতে চায়,—এ কী সেই অঞ্জন ? চিরদিন যে নারীকে এড়িয়ে চলেছে সেই কি না আজ থমকে দাঁড়ালো ? এ কী তার জয়—না পরাজয় ? বিবেকের বাণী নিজের অন্তরেই শুনতে পেলাম—পরাজয় অসম্ভব ! আর যদি তাই হয়, তাকেই তুমি দু'হাত বাড়িয়ে মাথায় তুলে নাও, সেই, সেই হবে তোমার বিজয় টীকা বিধাতার আশীর্ব্বাদ—তোমার জীবনের পরম কল্যাণ !

মনে হ'ল, সে যেন কত দিনের চেনা। অনাদি, অনন্ত কাল হতে আমি যে তাকেই চেয়ে এসেছি—পলে পলে, দিনে দিনে, যুগে যুগে আমি যে তাকেই খুঁজে বেড়িয়েছি। যাকে জীবনে মরণে একবার শুধু দেখবার জন্যে, পথহারা পথিকের মত আমি ছুটে চলেছি। কত স্মরণাতীত কাল চলে গিয়েছে—কত জন্ম যে কেটে গেল—তবুও তার দেখা পাইনি। আজ সেই কি না আমার সামনে এসে দাঁড়ালো ! কে যেন আমার কানে কানে বলে গেল—

যুগ যুগ ধরি' যারে খুঁজে ফিরি সে-ও খোঁজে তার কান্তে—
গিরি নদী বনে, অন্তর-কোণে, জীবনের পর-প্রান্তে !

কী যে হ'ল আমার তখন,—না পারিলাম তাকে বসতে বলতে—না কোনও সম্ভাষণ জানাতে। সে দু'-চারটি কথা বলে চলে গেল—আমিও দু'-একটি কথা বলে তাকে বিদায় দিলাম। কতো যে কথা ছিল—তার কী শেষ আছে ? যুগ-যুগান্ত ধরে বললেও যে মনের সব কথা ফুরোয় না। সে চলে গেল—আমি শুধু তার দিকে বিহ্বলের মত চেয়ে রইলাম—কিছুই বলা হোল না ! কি দুর্ব্বলই না আমার হৃদয় ! ভিতরে রয়েছে অজস্র বেদনার দীপালি—আর তাকেই ঢাক্‌তে গেলাম—এটা ওটা তুচ্ছ এলোমেলো কথা দিয়ে ! বুকের তন্ত্রী গেল ছিঁড়ে, তবুও কি না আমার চিরবাঞ্ছিত প্রিয়ার কাছে শুধু কথার মালা গেঁথে পাঠিয়ে দিলাম ! কিন্তু এই নিয়ে কি ভুলে থাকা যায় ? আমি জানি, নীলার নিজ হাতে গড়া এটা-সেটা কাজের মধ্যে আমার স্থান নেই—নির্জ্জনে বসে আমার কথা এতটুকু চিন্তা করবার অবসরও তার নেই ! ব্যথা যে পাই না তা' নয়। বুকের ব্যথা বুকেই চেপে রাখি, মুখ ফুটে তাকে কিছুই বলা হয় না—এ কী তবে আমার ভুল ? আবার কখনো এই কথাই শুধু জেগে ওঠে—আমার সেই অকথিত বাণী যদি আর না-ই বলা হয়—ভ্রান্তির তরঙ্গ যদি কেবল আঘাতের পর আঘাত করে চলে, তবুও সেই নিষ্ঠুর ভ্রান্তিই আমার কাছে অভ্রান্ত হয়ে বেঁচে থাক, আমার বুকে নির্ম্মম সত্য হয়ে জেগে থাকুক। সেই ব্যথার সমুদ্রে আমি অবগাহন করে ধন্য হই।

নীলার কথা

আর পারি না ! অঞ্জনকে আমি ভালবাসি ; জানি, সে-ও আমায় ভালবাসে। তার প্রতি কথায়, প্রতি ভঙ্গীতে সে আমাকে এইটুকুই জানিয়ে দেয়। একটি বছর যেন কী এক স্বপ্নের আবেশে কেটে গেল, ফিরে এলো আমার জন্মদিনের লগ্ন। অঞ্জন আবারও পাঠিয়েছে ছন্দের দোলায় তার অসীম ব্যাকুলতা—

আবার এসেছে ফিরে
সেই হাসি গান, কলঝঙ্কার
প্রাণের সাগর-তীরে।
কত বেদনার না-বলা কাহিনী
কত কম্পিত মুগ্ধ রাগিণী,
কত চঞ্চল আশা-ভালবাসা
উচ্ছল তনু ঘিরে।
আবার এসেছে ফিরে।
স্বপ্ন-বিহ্বল ছায়াপথে কবে
রজনীর তন্দ্রায়
একটি হিয়ার জাগর ছন্দে
বাঁধন টুটিয়া যায়!
প্রথম দিনের সেই রূপলেখা
নীলিমার মাঝে দিয়ে গেল দেখা;
যুগান্তরের তমিস্রা ছেদি'
জাগে মনোমন্দিরে
তাহারি আরতি-ব্যাকুল বাসনা
প্রাণের সাগর-তীরে।
আমি ভুলি নাই সেদিনের কথা—
জীবনের পারাবারে
কত ভাঙ্গাগড়া কত না ঊর্ম্মি;
উৎসুক অভিসারে।
নিয়ে এলে তুমি বিমলানন্দ,
বিকচ-মরম-কমল-গন্ধ—
কী মহা করুণা এলো যেন নীল
আকাশের বুক চিরে!
আবার এসেছে ফিরে।
কোন্ অমরার স্বপ্ন-মাধুরী
এনেছো জ্যোতির্ম্ময়ী,
জন্মদিনের পুণ্য লগনে
হও তুমি চিরজয়ী!
এসো এসো আজি নৃত্যের তালে,
সিত-চন্দন রঞ্জিত ভালে—
বন্ধনহীন আলোক-তীর্থে
নেমে এসো ধীরে ধীরে—
যুগে যুগে ওই নব নব রূপে
প্রাণে প্রাণে এসো ফিরে।

আমি তো জানি, কতখানি আবেগ দিয়ে সে গেঁথেছে এই কবিতার ছন্দ—প্রতিটি অক্ষরে ফুটে ওঠে আমার প্রতি তার অফুরন্ত প্রেম। জন্মদিনে এই তো আমার পরম পাওয়া—এই তো আমার শ্রেষ্ঠ উপহার!

আর আমি? প্রতিদানে আমি কী দিয়েছি তাকে? শুধুই নীরবতা। সে হয়তো দুঃখই পেয়েছে, হয়তো বুঝতে পেরেছে আমি তাকে ভালবাসি—হয়তো পারেনি! কিন্তু এর বেশী আর আমি কী-ই বা করতে পারি! অঞ্জনকে আমি কী দিয়ে বোঝাবো? নীরবতার মধ্যেও কী আমার মনের ভাষা ফুটে ওঠে না? আমার চোখে কী জাগে না প্রাণঢালা ভালবাসার অতল-গভীর ইঙ্গিত? আমার দেহে কী জড়িয়ে থাকে না সেই অপরাজেয় প্রেমের সৌরভ?

আমি মাটির মানুষ। মাটিতে যে ফুল ফুটে হেসে লুটিয়ে পড়ে, তার জীবনে যে কোনো নতুন কথা আছে, মানুষ কী তা জানতে চায়, না, শুনতে পায়? ফুল আপনি ফোটে, আপনি ঝরে যায়, তার পরাগে পরাগে পরিচয় ঢালা আত্মনিবেদনের ছন্দ কে-ই বা বোঝে? মাটির বুকে যে রং লুকিয়ে থাকে—সেই তো ফুলের মুখে ছড়িয়ে পড়ে—আমার মনের রংও কী আমার চোখে-মুখে দেখা দেয় না?

দিগন্তে ছেয়ে আসে অন্ধকার, আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়ে থাকি। মনটা কেমন যেন উধাও হয়ে যায়। আমার প্রেম ওই আকাশের মত উদার হয় না কেন? মনে হয়, বাতাসের এই গভীর নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমার সকল বাসনা, সকল আন্তরিকতা মিশিয়ে, ছড়িয়ে দিই আকাশের বুকে। আর তা বয়ে যাক্, আমার প্রিয় দয়িতের কাছে আমার সর্ব্বস্ব নিয়ে। গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে কত দিন মনে হয়েছে—রজনীর এই সার্ব্বজনীন বিশ্রামের অন্তরালে আরও একটি প্রাণী কী ত'ার দু'চোখ দিয়ে ওই কালো আকাশের দিকে চেয়ে নেই? কিন্তু, কেন এমন হয়? যাকে ভালবাসি, যাকে ভালবেসে আমার আনন্দের সীমা নেই, দুঃখেরও অন্ত নেই,—কেন মনে হয়, সে-ও আমারই মত সুখ-দুঃখের অধিকারী হোক্! যাকৃগে—আর ভাবতে পারি না। আমি ত' ভালবাসি—সে জানে কি না—তাতে কি আসে যায়—আমি ঢেলে দেব হৃদয়-নিঙড়ানো অর্ঘ্য—আমার প্রাণের শ্রেষ্ঠ পূজা উপচার অন্তরতম প্রিয়তমের উদ্দেশে!

* * * *

কেমন একটা মাদকতা আমাকে অভিভূত করে দেয়—আমাকে বিবশ করে তোলে—আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি। [ক্রমশঃ।



—বিবেকানন্দ-স্তোত্র—

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুর্মাণ মিত্র

১৯

দু' বছর পরে
স্বপ্নলঘু যে-মনটা এনেছিলো রায়পুর থেকে,
'গৌর মুখার্জী ষ্ট্রীটে' এসে
হঠাৎ আহত হোলো
বাস্তবের রূঢ় বজ্রাঘাতে !

বিস্ময়বিপন্ন চোখে ছ্যাখে—
প্রবেশিকা পরীক্ষাটা
শাণিত আক্রোশ হোয়ে
ঝুলে আছে মাথার ওপরে !

অকস্মাৎ মনে হয় ওর
স্বপ্নায়িত দু-দুটো বছর
সুদূরিত মরু-মরীচিকা।
আজ থেকে তাকে
শিক্ষার সাহারায়
উট্ হোয়ে যেতে হবে
'ডিগ্রী'র কাঁটাগাছটাকে।

যন্ত্রণাক্ত মনে
শিকে থেকে বই-খাতা টেনে
মোহমুক্ত 'হোমাপাখী'*
সুরু করে পরীক্ষার পড়া।

সভ্যতার নির্বোধ শাসনে
অবিদ্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে
স্বাধীন সজীব বুদ্ধি তার
হঠাৎ আহত হয়
শিক্ষার অচলায়তনে।

বই-খাতা-ডিপ্লোমা
অসহ্য মনে হয় সব ;
তৃষিত চক্ষুর কাছে
ঠিক্ যেন জমাট্ বরফ !

২০

তা' সে যাই হোক,
মাত্র বারো মাসে
ছত্রিশ মাসের পড়া শেষ কোরে দিয়ে
প্রবেশিকা পরীক্ষার পাঁচিলটা টপকালো সে।*

* * * *

আশ্চর্য হবার কিছু নেই।
ছত্রিশ মাসের পড়া যদি
পোড়তে তার তিন বছরই যেতো,
তিনটে পাতা পোড়তে গেলে তার
তিন পাতাই পোড়তে হবে তো ?

কিন্তু ওর সবই গোলমেলে !
একটা পাতা বুঝে নিতে গেলে,
প্রথম ও শেষ থেকে তার
দুটো লাইন পোড়লেই চলে ;
—তার বেশি প্রয়োজন নেই !

আরো মজা এই—
যে-প্রসঙ্গ সাত পৃষ্ঠা ধোরে
লেখকের বোঝাতেই লাগে,
গোড়া থেকে দুটো লাইন পোড়ে
স্বচ্ছন্দে মাথায় ঢুকে যায় !

অবিশ্বাস্য যদি মনে হয়
স্বামিজীর মুখ থেকে তবে
নরেনের কাণ্ডটা শোনো,—

"It so happened
That I could understand an author
Without reading his book line by line.
I could get the meaning

---

* 'নিত্যসিদ্ধ' নরেন্দ্রনাথকে ঠাকুর প্রায়ই বেদোক্ত 'হোমাপাখী'র সঙ্গে তুলনা কোরতেন ; বোলতেন, এ-সব ছেলেরা কখনো সংসারে বদ্ধ হয় না, জাগতিক জিনিস এদের বিস্বাদ লাগে, একটু বয়েস হোলেই এদের চৈতন্য হয় আর একলক্ষ্য হোয়ে ভগবানের দিকে উড়ে যায়। [১৩৬২ সালের ভাদ্র সংখ্যা দেখুন]

* দীর্ঘ দু'বছর বাইরে থাকার জন্যে শিক্ষকেরা প্রথমে তাকে এন্ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি কোরতে রাজী হননি। অবশেষে অতি কষ্টে 'স্পেশাল পারমিশান' পেয়ে, তিন বছরের পড়া এক বছরে শেষ কোরে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছিলেন। 'মেট্রোপলিটান স্কুলে'র মধ্যে একমাত্র তিনিই সে-বছর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন !

By Just reading the first
And the last line of a paragraph.
As this power developed
I found it unnecessary
To read even the paragraphs.
I could follow
By reading only the first
And the last line of a page.
Further,
Where the author introduced discussion
To explain a matter
And it took him
Four or five or even more pages
To clear the subject,
I could grasp the whole trend of his arguments
By reading the first few lines."*

২১

ভবিষ্যতে কোনো একদিন
পরিব্রাজক স্বামী
মীরাটের গ্রন্থাগার থেকে
Sir John Lubbockএর গ্রন্থাবলী এনে
এক-একটা শেষ করে এক-একটা দিনে !

স্থূলদর্শী লাইব্রেরিয়ান্
স্বামিজীর দ্রুতপাঠ দেখে,
সংশয়ের ফণা তুলে
তরুণ পাঠকটিকে ছোব্‌লাতে যান্,—
তোমার এ-মেকীপাঠে কার লোকসান্ ?

সত্যের টানে
সন্ন্যাসী রুখে ওঠে,—
না-জেনে এমন কথা বলবার মানে ?
না-পোড়ে ফেরং দিই—তা' যদি ভাবেন,
এ-যাবং যত বই নিয়েছি তা' থেকে
প্রশ্ন করুন ছেঁকে ছেঁকে ।

জবাব না মনোমত হোলে,
তবেই যা' ভেবেছেন সশব্দে সেটা বলা চলে ।

* * *

রণ-ভেরী বেজে ওঠে হঠাৎ সেদিন ;
দু'জনেই সদর্পে তোলে আস্তিন্ ।
সদম্ভে আসে যত প্রশ্নের বাণ,
সশব্দে সন্ন্যাসী ভাঙ্গে অভিমান !
সোনার পাতের মত ঝক্‌ঝকে মেধা
তার বুকে প্রশ্নের সাধ্য কি বেঁধা !
দু'চোখ কপালে তুলে লাইব্রেরিয়ান
আর একটা সংশয়ে ভুরু কোঁচ্‌কান !
এবারের প্রশ্নটা ভিন্ন জাতের ;
শত্রুকে আঘাতের নেশা নেই এর ।
প্রশ্নটা নিজেকেই, স্বামিজীকে নয়,
মেধাবী না স্মৃতিধর ?—কি বলি তোমায় ?

২২

আরও একজন,
দর্শনের দিক্‌পাল
জার্মাণীর 'পল্ ডয়সন্'
স্বামিজীর মেধা আর দ্রুতপাঠ দেখে
একদিন ওঁরই মত বিস্ময়ে হতবাক্ হন ।

ঘটনাটা এই—
'জুলাই'এর শেষাশেষি,
আঠারো-শো-ছিয়ানোব্বোয়ে
একদিন নিমন্ত্রিত হোয়ে
'কিয়েল্' সহরে
স্বামিজী গ্যাছেন তাঁর পড়বার ঘরে ।

কি একটা বই ছিল টেবিলেতে রাখা,
সন্ন্যাসী দ্রুতবেগে ওল্টান্ পাতা ।
'ডয়সন্' ডাক ছান একাধিক বার,
তবুও পান্‌না সাড়া, এটা কি ব্যাপার !
বই পড়া শেষ হোলে 'পল্ ডয়সন্'
অবাক হবার আগে সংশয়ী হন্ !
এ-হেন একাগ্রতা সাঁচ্চা না মেকী,
দু-একটা কথা পেড়ে যাচালে ক্ষতি কি ?
তার পর ছাখা গ্যালো দ্রুতপাঠ, বই,
মুখস্থ হোয়ে গ্যাছে অধিকাংশই !
ফণা-তোলা সন্দেহ ফুস্‌মন্তরে
শ্রদ্ধায় মাথা নাড়ে হাত জড়ো কোরে !

"Dr. Deussen was dumb-founded,
And
Like the Maharaja of Khetri
Asked the Swami

---

* "এমন হোতো যে, কোনো বই পোড়তে ব'সলে তার প্রতিটি লাইন পোড়ে পোড়ে গ্রন্থকারের বক্তব্য বোঝবার আমার দরকার হোতো না । প্রতি প্যারার প্রথম ও শেষ লাইন পোড়লেই তার ভেতর কি বলা হোয়েছে তা' বুঝতে পারতাম । ক্রমে ঐ মেধাশক্তির এমনই বিকাশ হোলো যে, তখন আর প্রতিটি প্যারাও পড়বার প্রয়োজন হোতো না । প্রত্যেক পৃষ্ঠার প্রথম ও শেষ লাইন পোড়লেই সব বুঝে ফেলতাম । আবার বইএর মধ্যে যেখানে লেখক কোনো বিষয় বোঝাবার জন্যে যুক্তি-তর্ক ফেঁদেছেন আর বিষয়টা বোঝাতে যদি তাঁর চার-পাঁচ পাতা কিংবা তারও বেশি লেগে থাকে, প্রথম দু-এক লাইন পোড়েই তাঁর যুক্তি-তর্ক সমন্বিত সমগ্র বক্তব্য-বিষয়টা ঝাঁ কোরে বুঝে নিতাম ।"

—The life of swami Vivekananda.
By
His Eastern and Western disciples.

How he could accomplish
Such a feat of memory."*

২৩

বাস্তবিক তাই
স্বামিজীর মেধা দেখে পিলে চম্‌কায় !
আরও একদিন ।
"স্বামি-শিষ্য-সংবাদ"এর শিষ্যটি† লেখেন,—
স্বামিজী তখন
দিগ্বিজয় শেষ কোরে মঠেই থাকেন ।
দশ ভাগ "Britannica"‡ সবে শেষ কোরে
একাদশ খণ্ডটা সুরু কোরেছেন ।
শিষ্য তা' না-জেনেই বলেন—"মশাই,
একটা জীবনে একি শেষ করা যায় ?"

"কি বল্লি ? দশখানা শেষ কোরেছি যে,
সন্দেহ মিটে যাক্, যাচিয়ে নে নিজে ।"

পণ্ডিত শিষ্যটি ঠিক তাই চান্ ।
গুরুর আদেশ পেয়ে গুরুকে বাজান্ ।
সশব্দে আসে যত প্রশ্নের তীর,
মেধাবীর গুঁতো খেয়ে ভেঙ্গে চৌচির !
বিজিতের মুখে ওড়ে বিজয়-নিশান ।
স্বামিজী হারলে তারই বেশি লোক্‌সান্ ।

২৪

"I shall not live to be forty years old." ||

অতএব কি কোরবে বলো ?
পরমায়ু বরাদ্দ তোমার
মাত্র উনোচল্লিশ বছর ।
তিনপাতা বুঝতে যদি তাই
পোড়তে হয় তিন্‌টে পাতাই,
তা'-হোলে ও-পরমায়ু নিয়ে
আমাদের মনের ভাঁড়ারে
ক'দিনের খোরাক্ জোগাতে ?
—"দেড় হাজার বছরের" নয় । §

* * *

"The way is long,
The time is short,
Evening is approaching.
I have to go home soon.
I have no time
To give my manner a finish.
I cannot find time
To deliver my message...
In one word,
I have a message to give...
I have a truth to teach.
I, the child of God...

সব ধীরে ধীরে হবে ।

তবে

সময়ে সময়ে
I fret
And
Stamp like a leashed hound."*

* * *

বরাদ্দ সময় বড় কম
অথচ কাজের চাপ বেশি ।
সুতরাং সব কিছুতেই
তাড়াহুড়ো কোরতেই হবে ।
বিশ্বের 'অলকাপুরী'তে যে
বিদ্যুতের চিঠি দিতে চায়,
মেঘ-মন্থরতা নিয়ে তার
গড়িমসি কোরলে কি চলে ?
'মন্দাক্রান্তা' তালে কি কখনো
চমকানো যায় বিদ্যুৎ ?
মেঘাচ্ছন্ন পৃথিবীর মুখ
নইলে কি ঝলসানো যায় ?
স্বামিজীর প্রত্যেক কাজে
তাই এত তীব্র একাগ্রতা ;
পা যেখানে চলে দুটো লাইন,
মন ছুটে যায়' দশপাতা !

[ক্রমশ:

---

* ডাক্তার ওয়সন্ তাজ্জব ব'নে গিয়েছিলেন, ক্ষেত্রীর মহারাজার মত জিগ্যেস্ কোরেছিলেন,—"স্বামিজী, এমন সাজ্ঘাতিক স্মৃতিশক্তি আপনি পেলেন কি কোরে ?"—[The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples.]

† "স্বামি-শিষ্য-সংবাদ" প্রণেতা শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ।

‡ 'এন্‌সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকা' ।

|| "আমি চল্লিশের আগেই দেহ রাখব" ।

§ "'I have done enongh for fifteen hundred years" । [উনোচল্লিশ বছর বয়েসে দেহত্যাগ কোরলেও স্বামিজীর কর্মজীবন হোচ্ছে মাত্র আট বছর ! সেই আট বছরেই তিনি পৃথিবীর জন্যে দেড় হাজার বছরের রসদ রেখে গ্যাছেন । কিংবা তারও বেশি ! —১৮৯৪ সালে 'নিউইয়র্ক' থেকে স্বামিজী চিঠি লিখছেন শিষ্যদের,—

"My Brave Boys...Fifty centuries are looking on you, the future of India depends on you,"]

* "পথ দীর্ঘ, কিন্তু সময় অল্প আবার সন্ধ্যেও ঘনিয়ে আসছে । আমাকে শীঘ্রই ঘরে ফিরতে হবে ! আদব কায়দা পরিপাটি করবার আমার সময় নেই । যা বোলতে এসেছি তাই বোলে উঠতে পারছিনা । এক কথায়, দুনিয়াকে আমার কিছু দেবার আছে ।...আমার—ভগবানের সন্তান এই আমার জগৎকে একটা সত্য শেখাবার আছে ।...সব ধীরে ধীরে হবে ! তবে সময়ে সময়ে আমি বড়ো ছটফট করি, একটা শিকারী কুকুর শিকারের সামনে ছাড়া না পেলে যেমন করে, —তেমনি" ।—[পত্রাবলী]



ধর্মদাস মুখোপাধ্যায়

রাস্তায় চলতে চলতেই সুবোধ কথাটা ভাবছিলো। অন্য দিন এ সময় পথ চলতেও সে ভাবতো। কিন্তু সে ভাবনা ছিলো অন্য রকমের। বাড়ী গিয়ে শুনতে হবে 'এটা নেই, ওটা নেই'। আজকের জন্য অন্তত: সুবোধের মনে 'নেই নেই' এর ভাবনাটা চাপা পড়ে গিয়েছে। আজকে খবরটা শোনার পর থেকেই মনটা লঘুপক্ষ বিহঙ্গের মত কোন দূরে উধাও হোয়ে গিয়েছে। কল্পনার অবাধ রাজ্যে একটু সুখ-স্বপ্ন, ক্ষণেকের জন্যও মনকে এই কঠিন কঠোর বাস্তব থেকে বিশ্রামের জগতে নিয়ে গিয়েছে। সেখানে এই পৃথিবীর দুঃখ, কষ্ট, চিন্তা ভাবনা তাকে ছুঁতে পারবে না। সেখানে সে আর অনুপমা। অনুপমার কথাটা প্রথমে মনে আসেনি। শেষে তার বিষাদক্লিষ্ট মুখখানা হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। বেচারী সংসারের ঘানিগাছে কেবল পাক দিয়ে যাচ্ছে, বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। কোন দিন কোথাও একটু যেতে পর্য্যন্ত পায় না।

খুশী মনে সুবোধ বাড়ী ঢুকলো। আজকে কোন ক্রমেই মন খারাপ করবে না। ঝগড়া-ঝাঁটি বা রাগারাগির কথা নয় আজ। রাগের কিছু দেখলেও সে চেপে যাবে। কোন দোষ-ত্রুটির কথা নয় আজ।

বাড়ী ঢুকেই সে আশা করেছিলো অনুপমাকে দেখবে। কিন্তু দেখা মেলে না তার। ঘরে ঢুকেও দেখে, অনুপমা নেই। কোথায় গেল সে! এমন ভাল খবরটা তাকে বাড়ী ঢুকেই সুবোধ দেবে এই মনে কোরে আসছে সে রাস্তা থেকে। প্রথমেই ভাল কথা, ভাল খবর। প্রথমে এ খবর পেলে অনুপমারও মন রঙীন হোয়ে উঠবে। কোন অভিযোগ নিয়ে এলেও এ খবর শুনে সে অভিযোগ করতে ভুলে যাবে। ব্যথা, বেদনা থাকলে তা-ও লাঘব হোয়ে যাবে। কিন্তু কোথায় অনুপমা! তবে কি রান্নাঘরে তার জন্যেই চা করার ব্যবস্থা করতে গিয়েছে? নয়ত তার জন্যই বসে থেকে থেকে বিরক্ত হোয়ে পাশের বাড়ী বেড়াতে গিয়েছে?

জামাটা খুলে সুবোধ রান্নাঘরে ঢোকে। অনুপমা নেই কিন্তু চায়ের সরঞ্জাম ছড়ানো উনুনের পাশে। সত্যি অদ্ভুত মেয়ে এই অনুপমা! এত কষ্টের মধ্যেও তারই জন্য অনুপমার ভাবনা। এত অভাবের মধ্যেও অনুপমার কি আপ্রাণ চেষ্টা সুবোধকে একটু ভাল ভাবে একটু আরামে রাখবার! তার সামান্যতম অসুবিধাকে দূর করার জন্য অনুপমার সারা দিনের সাধনা চলে। অথচ বিনিময়ে সে অনুপমার দিকে কতটুকু দৃষ্টি দেয়? ক'দিন তাকে খুসী করার জন্য সে চেষ্টা করেছে? ক'বার তাকে কোথায় একটু বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে?

—এই যে! আমি তোমাকেই এসে পর্য্যন্ত খুঁজছি অনু! রান্নাঘর থেকে বার হবার মুখেই অনুপমা। এ-সব কি যত রাজ্যের কাঠি আর ডালপালা!

জবাব নেই। গম্ভীর মুখে সে ঘরে ঢোকার জন্য পা বাড়ায়।

—ও-সব চা-টা এখন করতে হবে না! আগে খবর শোনো! সু-খবর! বল কি খাওয়াবে?

তবু অনুপমা কোন সাড়া দেয় না। বরং সুবোধের পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করে।

সুবোধ জোর কোরেই এক রকম তার হাত থেকে ডালপালাগুলো নিয়ে উনুনের পাশে রাখে। তার পর তার হাত দুটো ধরে তাকে কথা শোনাতে চায়।

অনুপমা এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নেয়।

—আজ হঠাৎ এত চটলে কেন? ওঃ, ও-বেলার রাগ এখনও পড়েনি! ও-বেলা কি বলেছিলাম সে-কথা এখনও মনে কোরে রেখেছ? মনে পড়ে স্কুলে যাবার সময় জুতোটা পরিষ্কার না করার জন্য সুবোধ বকেছিলো অনুপমাকে। ঠিক বকা নয়, অনুযোগ। রান্নার এক ফাঁকে জুতোটা পরিষ্কার করা কি যেত না? তার দিকে অনুপমার কোন মনোযোগ নেই এটাই ছিল বক্তব্য।

ও-বেলায় বকার জন্য অনুতাপ হয় সুবোধের। সত্যি একটা ভাল কথা বলবার বেলায় সে নেই, কিন্তু পান থেকে চুণ খসলে আর রক্ষে নেই।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুবোধ। অনুপমা ঢুকতে পারে না। তবু সুবোধকে ঠেলে সে ঢুকতে যায়।

সুবোধ আবার তার হাত দুটো ধরে ফেলে।

—ছাড়, ভাল লাগে না, বোলে অনুপমা হাত ছাড়াবার জন্য সামান্য চেষ্টা কোরেই ক্ষান্ত হয়।

—পাণিগ্রহণ করেছিলাম কি ছেড়ে দেবার জন্য না কি? শোন, কথা শোন!

—তোমার কথা শোনার আমার সময় নেই।

—কি করবে চা তো? আমি যদি চা না খাই তবে চা কোরে কি হবে?

—আমার পিণ্ডি হবে! বন-বাদাড় খুঁজে কাঠ-কুটো নিয়ে এলাম আমার জন্যে। যা কিছু করি সবই আমার জন্যে।

—শোন আজ আর কোন কথা নয়! আমার মাইনে বাড়ছে এ মাস থেকে, তা শুনেছ কি? মাইনে বাড়ছে। বুঝলে?

—ওঃ, কি সুখবর ! তোমার মাইনে বাড়ছে তা আমার কি ?

—তুমি অর্ধেকের মালিক, অর্দ্ধাঙ্গিনী, তাই তোমারও দু'-পাঁচ-টাকা অংশ আছে এতে এবং সে পাঁচ টাকা আজই পাবে।

—আমাকে দেবে টাকা ! চোখ দুটো বিস্ময়ে বড় কোরে তাকায় অনুপমা। আধো রাগ আর আধো অনুরাগে অপূর্ব দেখায় অনুপমাকে।

—সত্যি তোমাকে দেব ! চল, আজই চল, সহরে যাই !

—সত্যি ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপমা ! চোখ দু'টো যেন রহস্যময় মনে হয় সুবোধের।

—সত্যি বলছি অনুপমা ! তোমাকে ছুঁয়ে বলছি ! আমার কত দিনের ইচ্ছা যে তুমি আর আমি দু'জনে সহরে যাব। সিনেমা দেখব। কত দিন যে সিনেমা দেখিনি ! চল, এখনই তৈরী হোয়ে নাও। অমত কোরো না লক্ষীটি ! আবেগ আর আনন্দে অনুপমার হাত দুটো নিবিড় কোরে চেপে ধরে সুবোধ।

—এখনই ? আমার যে কাজ পড়ে আছে। মুহূর্ত্তে বদলে যায় অনুপমা। তা হোলে দাঁড়াও, তোমার চা-টা কোরে ফেলি তাড়াতাড়ি ! তুমি ঘরে গিয়ে বস।

—তুমি শুধু চা কর ! তোমাকে অন্য কিছু করতে হবে না। অন্য যা কাজ থাকে পিসিমা করবেন। তুমি তাড়াতাড়ি কর। না হোলে ট্রেণ পাব না।

—তুমি পাঁচ মিনিট বস, আমি চা কোরে আনছি এখনই। নিমেষের মধ্যে অন্য মানুষ হোয়ে যায় অনুপমা। তাড়াতাড়ি উনুন জ্বালে। কাঁচা ডালপালা জ্বলতে চায় না। প্রাণপণে ফুঁ পাড়ে। ধোঁয়ায় চোখ লাল হোয়ে ওঠে। চোখ দিয়ে জল গড়ায় ! কোন অনুযোগ নেই তার। এ কষ্ট যেন কষ্টই নয়। এর চেয়েও বিশ গুণ কষ্ট ত সে হাসিমুখে সহ্য করতে রাজী আজ। আজ অনুপমার মন চলে গিয়েছে স্বপ্নের জগতে। উঃ, কত দিনের আকাঙ্ক্ষা !

হাসিমুখে চা এনে দেয় অনুপমা। সত্যি কত দিন সে সিনেমা দেখিনি ! বিয়ের পর একবার মাত্র তুমি দেখিয়েছিলে। সে-ও কত দিন আগে তোমার মনে আছে ?

—সে কি আর মনে থাকে ? কোন কালের কথা—

—ও মা সে কি ? পাঁচ বছর আগের কথা ভুলে গিয়েছ ?

—আঃ ! কি ভাল চা-ই যে আজ করেছ অনু ; তুমিও একটু খাও। খাও না লজ্জা কি, পিসিমা তো ও-ঘরে !

ওরা আনন্দে ছেলেমানুষ হোয়ে যায় আজ। সমস্ত চিন্তা ভাবনাকে ফেলে রেখেছে ওরা এক পাশে। এ শুধু আনন্দ নয়, এ যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছে অনুপমা। একটু আগে যে অনুপমা রাগের ঠেলায় সুবোধের হাত থেকে জোর কোরে হাত ছাড়িয়ে নিয়েছে, এ যেন সে নয়। যে অনুপমা বিকালে ভিজে কাঠ দিয়ে কি কোরে রান্না করবে এই ভাবনায় মুখ কালো কোরেছিলো সে অনুপমার সঙ্গে এর কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না এখন।

—সত্যি যাবে তো ? টাকা পেলে কোথায় ? অল্প দিনেই সংসারে ঘা খাওয়ায় অনুপমার যেন বাস্তব বুদ্ধি ফিরে আসে।

—টাকা ধার কোরেছি। স্কুলের সতীশ বাবুর কাছে। এই দেখ টাকা।

করকরে পাঁচ টাকার একখানা নোট বার করে সুবোধ।

—তুমি বস তাহলে—আমি দেখি পিসিমা কোথায়।

—তোমাকে দেখতে হবে না। তুমি কাপড়-জামা পর তো। আমি দেখছি পিসিমাকে ; তোমার জামা-কাপড় পর তো ?

—আজ্ঞে না, মশায় ! একটুও দেরী হ'বে না ! পাঁচ মিনিটে সব সেরে নেব।

পিসিমা শুনে বিশ্বাসই করতে চান না। যার দু'বেলা চালের যোগাড় হয় না, একটু চা খাবার ইচ্ছা হোলে একটু দুধের অভাবে যে সব দিন চা খেতে পারে না, পয়সার অভাবে দিনের পর দিন যে ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে স্কুলে যায়, সে যাবে সহরে বৌ নিয়ে সিনেমা দেখতে ! সত্যি যাবি সহরে ? না বৌমাকে রাগাবার জন্য এ সব বলছিস ? পিসিমা বিশ্বাস করতেই চান না।

—না পিসিমা ! কাউকে রাগাবার জন্য বলিনি। আমাদের যে মাইনে বাড়ছে এ মাস থেকে। দশ টাকা বাড়ছে একেবারে।

—তাই নাকি ! ঠাকুর মুখ তুলে চেয়েছেন এবারে ! দে দেখি আমায় পাঁচটা পয়সা, নারায়ণের নামে তুলে রাখি।

—এখনই চাই ? এই নাও।

পয়সা নিয়ে পিসিমা মাথায় ঠেকান। ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুর-প্রণাম সেরে আসেন।

—তা যা নিয়ে যা। কত দিন হোলো বাছা আমার একটু বাইরে বেরোতে পায় না। ছেলেমানুষ, এই বয়সে সাধ-আহ্লাদও তো একটা হয় ! আমাদের সময়ে অবিশ্যি সিনেমা-ফিনেমা ছিল না, তবে যাত্রা ছিলো। কত বড় বড় দল—তোরা তো তার সে সব দেখলি নে ! পিসিমা সেদিনের সে কথা স্মরণ কোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

ফিটফাট হোয়ে সেজে নেয় অনুপমা। বিয়ের সময়ের পাওয়া টাঙ্গাইলের একটা শাড়ী সে তুলে রেখে দিয়েছিল, কোথাও গেলে সেটা পরবে বোলে। আটপৌরে শাড়ীর অভাবে সেটাকে মধ্যে মধ্যেই পরতে হয়েছে ! এক জায়গায় একটু সামান্যই ছিঁড়েও গিয়েছে শাড়ীটা। তবু অনেক যত্নে সাবান দিয়ে কেচে ভাঁজ কোরে শাড়ীটাকে সে তুলে রেখেছিল। সেটাকে বার কোরে পরে। নানা ভাবে নানা রকমে দেহটাকে সাজাবার চেষ্টা করে। সেই সঙ্গে ছেঁড়াটাকেও ঢাকতে হয়। এমন জায়গায় ছেঁড়াটা, যেদিক দিয়েই পরুক সেটা সামনে বেরিয়ে থাকে। অনেক কসরৎ কোরে সেটাকে ঢাকে অনুপমা। তারপর ব্লাউজের ব্যাপার ! নিতান্তই দশ আনা ছিটের ব্লাউজ একটা। সাধারণ ভাবে বাইরের লোকজন এলে খালি গায়ে যখন থাকা চলে না, তখন এটাকেই পরতে হয়। কিন্তু আজ যে সেটাই আবার সহরে যাবার সময় পরতে হবে এটা কোন দিন মনে হয়নি। অন্ততঃ সকাল বেলায় জানলে সে ওটা ভাল কোরে কেচে ভাঁজ কোরে রাখতে পারতো। তাও হয়নি ! জামা-কাপড় পরার সময় মনটা তার খুঁতখুঁত করে। কিন্তু সে ভাব বেশীক্ষণ থাকে না। জামা-কাপড় পরা সারা হোলে আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নেয়। নাঃ, দেখতে খারাপ না তো সে। ভাল কোরে সাজলে আরো সুন্দর দেখায়। মুখখানা কেমন ঢলঢলে, টানা সুন্দর দুটি চোখ, ঠোঁট দুটো চাপা খুসীতে টুসটুসে। বার বার তাকিয়ে দেখে নিজেকে। ও মা ! মুখখানা কেমন তেল কুচকুচে মনে হচ্ছে। পাউডার দেওয়া হয়নি তো ! বাক্সের ভেতর থেকে ছোট্ট একটা পাউডারের কৌটো বার করে। বিয়ের সময়ের দেওয়া কৌটো। সে পাউডার কবে ফুরিয়েছে। তারপরে সুবোধকে

বোলেছে সে কত দিন এক কৌটো পাউডারের কথা। সুবোধ আনেনি। তাই মীরা ঠাকুরঝি গত বারে শ্বশুরবাড়ী থেকে ক'দিনের জন্য বাপের বাড়ী এলে তার কৌটো থেকে সে একটু লুকিয়ে এনে তার কৌটোয় রেখেছিলো সময়-অসময়ের জন্য। কৌটো খুলে ন্যাকড়া ভাঁজ কোরে মুখে বুলিয়ে নেয় একটু। কপালে লম্বা কোরে সরু একটা কাজলের কৌটো দিয়ে নেয়। এদিক-ওদিক নানা ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নেয় নিজেকে। মন্দ কি! সে কি খারাপ দেখতে? খারাপ তো নয়। নিজেকেই নিজেরই যেন ভাল লেগে যায়।

—পিসিমা, তা হোলে যাই? পিসিমার কাছে গিয়ে অনুমতি নেয় অনুপমা।

যাই বলতে যেই মা! বল আসি।

একটু হেসে কাপড়টাকে কাঁধের ওপরে ঠিক কোরে বসিয়ে নিয়ে তারপরে চলতে থাকে। স্বামীর দিকে একবার চেয়ে তার মতামতটা জেনে নিতে চায়। সুবোধকে তার দিকে হাঁ কোরে চেয়ে থাকতে দেখে যেন একটু লজ্জাই পায় অনুপমা।

—কি দেখছ অমন কোরে?

—দেখছি, তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা—

—থাক, আর ঠাট্টা করতে হবে না—এখন চল দেখি—ট্রেণ পাওয়া যায় কি না দেখ আবার।

রাস্তা দিয়ে চলার সময় দু'দিকে প্রাণ ভরে দেখে নেয় অনুপমা। কত দিন সে এ-সব দেখেনি। কত দিন বাড়ীর বন্দিশালার বাইরে সে পা বাড়ায়নি। বাড়ীর বাইরে এসে মনে হয়, খাঁচার পাখী যেন ছাড়া পেয়েছে। এ যেন অবাধে উন্মুক্ত আকাশে ডানা মেলে নির্ভাবনায় চলা। আর যেন খাঁচায় ফেরার কথা নেই। এ যেন জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যালব্ধ মুক্তি!

ষ্টেশনে এসে অনুপমার ভাল লাগে ট্রেণের অপেক্ষায় মেয়েদের জন্য পৃথক ওয়েটিং-রুমে বসে থাকতে। সুবোধ এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরা করছে। কখনও কারও সঙ্গে কথা বলছে। কখনও ষ্টেশন-ঘরের মধ্যে ঢুকে ঘড়ি দেখছে। এক একবার সুবোধকে খানিকক্ষণের জন্য দেখা যাচ্ছে না। আবার কিছু পরে দেখা যাচ্ছে তাকে। ভাল লাগছে অনুপমার, এ যে ক্ষণেক অদেখার পর আবার ক্ষণেকের জন্য দেখা। কত ভাল লাগছে তার।

প্লাটফর্ম নেই ষ্টেশনে। ট্রেণ এলে সুবোধ এক রকম তাকে দু' হাতে ধরে ট্রেণে উঠতে সাহায্য করে। সামান্যক্ষণ গাড়ি দাঁড়ায়। তাড়াতাড়ি উঠতে হয় এখানে। ট্রেণ ছাড়লে সুবোধের গা ঘেঁষে বসে সে। একথা-সেকথা নিয়ে গল্প করে। খুসীর আমেজে সবাইকে দেখাতে চায় তারা সুখী-দম্পতি। তারা সেকেলে নয়। স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে যাচ্ছে। এখানে আজ পিসিমা নেই, কেউ নেই, কোন বাধা নেই। যেন ট্রেণে তারা দু'জনে ছাড়া আর কেউ নেই।

সুবোধ এতটা সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারে না। একটু বিব্রত বোধ করে। কোথায় কে চেনা-জানা লোক দেখলে কি ভাববে? ভাববে বেহায়ার মত গাড়ির মধ্যে বসে স্বামি-স্ত্রীতে হাসাহাসি করছে। সে স্কুলের মাষ্টার। তার গাম্ভীর্য্য থাকা উচিত। যদি কোন ছাত্র দেখে এ সময় তাদের?

ট্রেণ থেকে নেমে তারা এসে দাঁড়ায় বাসের সুমুখে। দলে দলে লোক চলেছে। কয়েক জোড়া স্বামি-স্ত্রী চলেছে। সাজ-পোষাক তাদের অনুপমা আর সুবোধের চেয়ে ভালই। ক্ষণেকের জন্য পাশের বউটির দিকে তাকিয়ে মনটা খারাপ লাগে। তার হাত-ভরা গহনা আর নূতন ডিজাইনের জামা দেখে।

—কি, বাসে যাবে না রিক্সায়? অনুপমার মত নেয় সুবোধ।

—না বাসে নয়! ওখানে লোকের গাদাগাদি—তার চেয়ে রিক্সায় চল।

রিক্সায় চলে ওরা। কেউ নেই পাশে। তারা দু'জনে। রিক্সা চলে আর দু'পাশ থেকে হু হু করা হাওয়ায় চুল আঁচল এলোমেলো হোয়ে ওড়ে। ভারী ভাল লাগে অনুপমার। তার দু'-একগাছি চুল উড়ে গিয়ে সুবোধের মুখের উপর পড়ে। ভাল লাগে সুবোধেরও। সে আরও ঘনিষ্ঠ হোয়ে বসে। অনুপমা এক একবার সুবোধের মুখের দিকে তাকায়। রাস্তার লোকের দিকে তাকায় না। তাকাবে কি, তাদের দেখছে কত জনে! দেখুক! তারা দেখাবার জন্যেই এসেছে। স্বামীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে সহরে এসেছে, চোরের মত চুপি চুপি তো নয়!

সিনেমা-হলের সামনে এসে নামে। অনুপমা হলের এদিক-ওদিক চার দিক দেখে নেয়। ওরে বাবা, কত মানুষ! এত মেয়ে আর বৌ সিনেমা দেখতে এসেছে? রোজই কি এত লোক সিনেমা দেখে? এরা সবাই কি আজ তারই মত একদিনের জন্য মুক্তি পেয়েছে?

অনুপমাকে হলের সুমুখে দাঁড় করিয়ে রেখে সুবোধ টিকিট কিনে আনে। শো আরম্ভ হোতে দেরী আছে। বাইরে লাউড স্পীকারে গ্রামোফোন রেকর্ড বাজছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গান শোনে অনুপমা। ভাল লাগছে, সুবোধ হলে ঢোকবার তাগাদা দিলে অনুপমা সাড়া দেয় না। গানটা শেষ না হোলে সে নড়বে না।

—আরে সুবোধ বাবু যে! সিনেমা দেখতে নাকি?—অনুপমার দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক মন্তব্য করেন। সুবোধের সহকর্মী অবশ্য অন্য স্কুলের মাষ্টার, পাশের গ্রামের।

একটু হেসে জবাব দেয়—হাঁ, আপনিও কি সিনেমা দেখবেন নাকি?

—ভাবছি কি করি? আর ভাল লাগে না মশাই, ভাবলাম বুঝি মাইনে কিছু বাড়লো। এখন দেখছি যদি স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষ বাড়ায় তবে সরকার বাড়াবে। স্কুল বাড়াবে কি? কমাতে পারলেই ভাল হয়। আপনাদের স্কুলের অবস্থা তো শুনেছি আরো খারাপ!

ততক্ষণে গানটা থেমে গিয়েছে। কথার জবাব দেয় না সুবোধ, আড়চোখে অনুপমার দিকে তাকায়। জায়গায় জায়গায় ঘামে মুখের পাউডার গলে নামছে। কেমন বিশ্রী দেখাচ্ছে অনুপমার মুখখানা!



প্রস্তাব

চেখভ

নাটকের চরিত্র

সোবুকভ, ষ্টিপান ষ্টেপানভিচ, জমিদার। নাটালিয়া ষ্টেপানভনা (নাটাশা), ওর মেয়ে, বয়স ২৫। লমভ, ইভান ভাসিলিয়েভিচ, জমিদার এবং সোবুকভের প্রতিবেশী। স্বাস্থ্যবান, হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু বেজারমুখো।

সোবুকভের জমিদারীতে ঘটনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

(সোবুকভের বাড়ির বৈঠকখানা। সোবুকভ এবং লমভ। শেষোক্ত ব্যক্তিটি সান্ধ্য-পোষাক এবং শাদা রঙের দস্তানা পরে ঢুকলেন।)

সোবুকভ। (ওর দিকে অগ্রসর হয়ে) তোমায় দেখতে পেলাম, প্রিয়তম বন্ধু! আমি খুব আনন্দিত, ইভান ভাসিলিয়েভিচ! (করমর্দন করলেন) এটা সত্যিকার একটা বিস্ময় বটে!···কেমন আছ?

লমভ। ধন্যবাদ! জিজ্ঞাসা করি, আপনি কেমন আছেন?

সোবুকভ। আমরা মোটামুটি ভালোই কাটাচ্ছি। তোমার শুভকামনা ইত্যাদির জন্য ধন্যবাদ!···দয়া করে বসো!···বন্ধু, তুমি ত মারবে, প্রতিবেশীদের ভুলে যাওয়া তোমার উচিত নয়। কিন্তু এই সব শিষ্টাচার কেন, প্রিয় বন্ধু? ল্যাজওয়ালা কোট, দস্তানা, আরো কতো কী! প্রিয় বৎস, তুমি কি কোথাও দর্শন দিতে যাচ্ছ?

লমভ। না, প্রিয় ষ্টিপান ষ্টেপানভিচ, আমি কেবল আপনাকেই দেখতে এসেছি।

সোবুকভ। তাহলে, প্রিয় বৎস, ল্যাজওয়ালা কোট পরেছ কেন? যেন তুমি নববর্ষের দিনে আনুষ্ঠানিক দেখা দিচ্ছ!

লমভ। দেখুন, ব্যাপার হচ্ছে···(সোবুকভের হাত ধরে) প্রিয় ষ্টিপান ষ্টেপানভিচ, আমি আপনার কাছে একটি অনুগ্রহ যাচ্ঞা করতে এসেছি,—যদি আপনার সুখভংগের আমি খুব একটা কারণ না হয়ে থাকি। অতীতে অনেক বার আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করার সুযোগ গ্রহণ করেছি, আর বলতে গেলে, সব সময়ই আপনি··· কিন্তু ক্ষমা করবেন আমায়, আমি এমন এক অবস্থায় রয়েছি। প্রিয় ষ্টিপান ষ্টেপানভিচ, আমি জল পান করব (জল পান করলেন)।

সোবুকভ। (আড়ালে) ব্যাটা টাকার জন্য এসেছে! এক পয়সাও দেবো না আমি। (লমভ-কে) ব্যাপারটা কী, প্রিয় যুবক?

লমভ। দেখুন, প্রিয় ষ্টেপানভিচ···ক্ষমা করুন আমায়, প্রিয় ষ্টেপান···দেখতেই পাচ্ছেন আপনি—মানে, আমি এখন এক মানসিক অবস্থায় রয়েছি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, আপনিই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সম্ভবত আমায় সাহায্য করতে পারেন, অবিশ্যি—যদিও তা লাভ করার জন্য আমি কিছুই করিনি···আর আপনার সহায়তার ওপর নির্ভর করার কোন অধিকারই আমার নেই।

সোবুকভ। উফ, অমন ইনিয়ে-বিনিয়ে না। প্রিয় বৎস! বলে ফেলো! কী?

লমভ। হাঁ, হাঁ···একেবারে সোজা বলে ফেলছি আপনায়··· ব্যাপারটা হচ্ছে, আমি আপনার মেয়ে নাটালিয়া ষ্টেপানভনার পাণিগ্রহণ করার অনুমতি চাইতে এসেছি।

সোবুকভ (সানন্দে)। ইভান ভাসিলিয়েভিচ! প্রিয়তম বন্ধু আমার! কথাটা আবার বলো, ঠিক শুনতে পাইনি!

লমভ। সসম্মানে আমি জিজ্ঞাসা করছি···

সোবুকভ (থামিয়ে দিয়ে)। প্রিয়তম বৎস আমার! আমি কত যে আনন্দিত হয়েছি, কত যে আনন্দিত হয়েছি···হাঁ, নিশ্চয়ই, আমি এই রকম আরো অনেক কিছু বোধ করছি! (জড়িয়ে ধরে ও চুম্বন করে) দীর্ঘকাল ধরে আমি এইটে বাসনা করে আসছি। সব সময় এইটেই আমার ইচ্ছে ছিল। (আনন্দাশ্রু) প্রিয়তম যুবক, আমি সব সময়ই তোমায় আমার নিজের ছেলের মতো ভালোবেসেছি! ভগবান তোমায় ভালোবাসা আর সুমতি দিন, সংগে সংগে আর সব কিছু। আমি নিজে অন্তত: সব সময়ই ইচ্ছে করেছি···কিন্তু আহাম্মকের মতো আমি এখানে দাঁড়িয়ে আছি কেন? আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছি আমি! আত্মহারাই ঠিক! অ:, সমস্ত হৃদয় দিয়ে···আমি গিয়ে নাটাশাকে ডেকে আনছি। তার পর···

লমভ (অভিভূত হয়ে)। প্রিয় ষ্টিপান ষ্টেপানভিচ, ও কী বলবে মনে করেন আপনি? সম্মত হবে, আস্থা রাখতে পারি?

সোবুকভ। রাণী হবে না ও?—তুমি ত সুদর্শন-ও বটে! বাজী রাখছি, ও তোমার সংগে চুলের ডগা পর্যন্ত প্রেমে ডুবে আছে। আরো কত! আমি ওকে সোজা বলছি'গে। (বেরিয়ে গেলেন)

লমভ (একা)। হিম হয়ে গেছি আমি!···সর্বাংগে কাঁপছি, যেন পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি। আসল ব্যাপার হচ্ছে, মনকে ঠিক করা। যদি তুমি দীর্ঘকাল ধরে ভারতে থাক, খালি কথাই বলো আর দ্বিধাগ্রস্ত হও, আদর্শ নারী বা যথার্থ ভালবাসার অপেক্ষায় থাক, তাহলে কখনোই তোমার বিয়ে হবে না। হি-হি-হি!···হিম হয়ে গেছি।

নাটালিয়া ষ্টেপানভনা চমৎকার গৃহিণী, শিক্ষিতা,—শ্রীহীন-ও নয়।··· বেশি কি আর আমি চাই? কিন্তু এমন অবস্থা আমার যে, মাথায় কোলাহল আরম্ভ হয়।···(জলপান করলেন) তবু, আর একলা থাকবো না আমি। প্রথমত, ইতিমধ্যেই পঁয়ত্রিশ বছর বয়স হয়ে গেছে আমার—যাকে বলে একটা বয়ঃসন্ধিক্ষণ। দ্বিতীয়ত, একটা সুশৃংখল, নিয়মিত জীবন থাকা দরকার আমার।···বুকের ব্যামো আছে তার সংগে অবিরাম ধুকধুকানি···। চট্ করে আমি রাগে ফেটে পড়ি, আর সব সময়ই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়ি।··· এখনো আমার ঠোঁট কাঁপছে আর চোখের পাতা চমকাচ্ছে।··· কিন্তু সব চেয়ে বিশ্রী হচ্ছে ঘুমানো নিয়ে। যখনই বিছানায় পড়ি আর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসি, তখনই কিছু একটা আমার বাঁ-দিকে যেন ছুরি মারে! ছুরি মারে! আর সেটা ঘাড় হয়ে মাথা অবধি যায়।··· পাগলের মতো আমি লাফ দিয়ে উঠি, পায়চারি করি কিছুক্ষণ, তার পর আবার শুয়ে পড়ি।···কিন্তু ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আসার সংগে সংগে আবার আমার পাশ থেকে সুরু হয়—ছুরি মারা! তার পর, বার কুড়ি ধরে একই ব্যাপার চল্‌তে থাকে।···

(নাটালিয়ার প্রবেশ)

নাটালিয়া। অঃ, তা হলে আপনি! বাবা বললে, যাও, মালপত্তর কিন্‌তে খদ্দের এসেছেন এক জন। কেমন আছেন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ?

লমভ। তুমি কেমন আছ, প্রিয় নাটালিয়া ষ্টেপানভনা?

নাটালিয়া। ভালো ভাবে বেশবাস করিনি, তার ওপর একটা এপ্রন পরে আছি বলে ক্ষমা করবেন। কড়াইশুঁটির খোসা ছাড়াচ্ছিলাম, শুকোবার জন্য। এতো দিন ধরে কেন আপনি আমাদের দেখতে আসেননি? বসুন···

(তারা বসল)

লাঞ্চ করবেন?

লমভ। না, ধন্যবাদ! লাঞ্চ আমি করেই এসেছি।

নাটালিয়া। ধূমপান করবেন না? দেশলাই আছে এখানে।··· খুব সুন্দর দিন করেছে আজ। কিন্তু কাল এমন জোর বৃষ্টি হয়েছে, যে সারাটি দিন মানুষ কিছু করতেই পারেনি। কতগুলি গাদা আপনি তুলতে পারলেন? বিশ্বাস করবেন, এমনই আমায় পেয়ে বসেছিল যে গোটা মাঠটাই কেটে ফেলেছি। আর এখন আমি তার জন্যে দুঃখ বোধ করছি—আশঙ্কা হচ্ছে যে? খড়গুলো পচে যেতে পারে। অপেক্ষা করলে বোধ হয় ভালো হোত! কিন্তু এসব কী? ল্যাজওয়ালা কোট পরেছেন আপনি? নতুন কিছু! আপনি কি বল-নাচে যাচ্ছেন না অন্য কোথাও? ভালো কথা, বদ্‌লেও গেছেন আপনি—আগের চেয়ে আপনায় সুন্দর দেখাচ্ছে! ···কিন্তু সত্যি, এমন পোষাক-পরিচ্ছদ করেছেন কেন?

লমভ। (উত্তেজিত হয়ে) প্রিয় নাটালিয়া ষ্টেপানভনা, দেখো, তুমি···। ব্যাপার হচ্ছে আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব বলে ঠিক করেছি যে···আমার কথা রাখবে।···স্বভাবতই তুমি বিস্মিত

হবে, সম্ভবত ক্রুদ্ধও হবে, কিন্তু আমি···(আড়ালে) কী ভীষণ ঠাণ্ডা!

নাটালিয়া। কী, তারপর? (একটু থামল) কী?

লমভ। আমি সংক্ষেপ হতে চেষ্টা করব। প্রিয় নাটালিয়া ষ্টেপানভনা, অবশ্যই তুমি জান যে অনেক কাল ধরে তোমাদের পরিবারকে আমার জানার সৌভাগ্য হয়েছিল—সত্যি কথা বলতে গেলে, একেবারে আমার ছোটবেলা থেকে। আমার মৃত জ্যাঠাইমা ও তার স্বামী—তুমি ত জান, তাদের কাছ থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে আমি এই জমিদারী পেয়েছি—সব সময়ই তোমার বাবা ও স্বর্গত মার প্রতি গভীর সম্মান প্রদর্শন করতেন। লমভ-পরিবার আর সোবুকভ-পরিবার সবসময়ই খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যে ছিল। তার ওপরও তুমি জান যে আমার জমি তোমাদের জমির খুব কাছাকাছি। সম্ভবত, তোমার স্মরণে থাকবে যে, আমার ভলভিক্ষেতও তোমাদের ভূর্জবনের কাছাকাছি।

নাটালিয়া। ক্ষমা করবেন, এইখানে কিন্তু আমি আপনাকে বাধা দিতে বাধ্য হচ্ছি। আপনি বললেন 'আমার' ভলভি-ক্ষেত··· কিন্তু ওগুলো কি সত্যি সত্যি আপনার?

লমভ। হাঁ আমার···

নাটালিয়া: আচ্ছা, এর পর? ভলভি-ক্ষেত আমাদের, আপনার নয়।

লমভ। না, ওগুলো আমার, প্রিয় নাটালিয়া ষ্টেপানভনা!

নাটালিয়া। এটা নতুন খবর বটে আমার কাছে। কেমন করে সেগুলো আপনার হোল?

লমভ। কেমন করে? কী বলতে চাও তুমি? আমি তোমাদের ভূর্জবন আর পোড়া জলাভূমির মধ্যেকার, কীলকের মতো দেখতে, ভলভির ক্ষেতগুলোর কথা বলছি।

নাটালিয়া। কিন্তু, হাঁ ঠিকই···ওগুলো আমাদের।

লমভ। না, তুমি ভুল করছ, প্রিয় নাটালিয়া ষ্টেপানভনা! আমার ওগুলো।

নাটালিয়া। মাথা ঠিক রেখে কথা বলুন, ইভান ভাসিলিয়েভিচ। কত দিন ধরে ওগুলো আপনার হোল?

লমভ। 'কত দিন' বলতে তুমি কী বোঝাতে চাও? যতদূর আমি স্মরণ করতে পারি,—ওগুলো ও সব সময়ই আমার ছিল।

নাটালিয়া। হুঁ, আমি একমত নই বলে এইখানে আমায় মাফ করবেন।

লমভ। প্রিয় নাটালিয়া ষ্টেপানভনা, দলিলপত্রেই তুমি দেখতে পাবে। এটা সত্যি যে, ভলভির ক্ষেতগুলি এক কালে বাদ-বিবাদের বিষয় ছিল, কিন্তু এখন সবাই জানে, ওগুলো আমার। এ নিয়ে তর্ক করার দরকার পড়ে না। আমায় যদি বুঝিয়ে বলতে হয়,—আমার জ্যাঠাইমার ঠানদি, তার ইটগুলো পুড়িয়ে দেওয়ার জন্যে, ওই ক্ষেতগুলো, করমুক্ত করে, তোমার প্রপিতামহের চাষিদের অনির্দিষ্ট কাল ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। তোমার প্রপিতামহের চাষিরা এই বছর চল্লিশ ধরে করমুক্ত অবস্থায় এই ক্ষেতগুলোকে কাজে লাগিয়েছে। আর তাইতেই তারা ওগুলো তাদের নিজেদের বলে মনে করতে শুরু করেছে।···তার পর, 'মুক্তি'র পর যখন সেটলমেণ্ট বসল···।

নাটালিয়া। যে ভাবে বলছেন, ওটা সে ভাবে হয়নি কিন্তু! আমার ঠাকুর্দা আর প্রপিতামহ দুজনেই জানতেন যে, তাদের জমি পোড়া জলাভূমি পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়েছে—তাতে ভলভির ক্ষেতগুলো নিশ্চয়ই আমাদের। সুতরাং ও নিয়ে তর্ক করছেন কেন? বুঝতে পারি না আপনায়। সত্যি ওটা বিরক্তিকর!

লমভ। আমি তোমায় দলিলগুলি দেখাব, নাটালিয়া ষ্টেপানভনা!

নাটালিয়া। না, নিশ্চয়ই আপনি তামাসা করছেন, অথবা আমায় ক্ষেপিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন···। খুব আশ্চর্য ত? প্রায় তিনশো বছর ধরে জমিগুলো আমাদের ছিল, আর এখন কি না হঠাৎ একজন ঘোষণা করলেন যে, জমিগুলো আমাদের নয়? ইভান ভাসিলিয়েভিচ, ক্ষমা করবেন আমায়, কিন্তু নিজের কানকেও আমি বিশ্বাস করতে পারছি না···। ঐ ক্ষেতগুলোকে আমি কোন মূল্যই দিই না। পনেরো একরের বেশি হবে না ওগুলো, আর তিনশো রুবল-ও ওগুলোর দাম হবে না, কিন্তু অন্যায়পরতাই আমার বিরক্তি ধরিয়ে দিয়েছে। আপনার যা ইচ্ছে আপনি করতে পারেন, কিন্তু অন্যায় আমি সহ্য করতে পারি না।

লমভ। দোহাই তোমার, শেষ পর্যন্ত শোনো আমার কথা! ইতিমধ্যে বলেছি যে, তোমার বাবার ঠাকুর্দার চাষিরা আমার জ্যাঠাইমার ঠাকুরমার ইট পুড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের জন্যে আমার জ্যাঠাইমার ঠাকুরমা কিছু কর'বেন বলে···

নাটালিয়া। ঠাকুর্দা, ঠাকুরমা, জ্যাঠাইমা। এ সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না! ক্ষেতগুলো আমাদের, ব্যস্!

লমভ। ওগুলো আমার!

নাটালিয়া। ওগুলো আমাদের। আপনি দিন দুই ভর এটা প্রমাণ করবার জন্যে চেষ্টা করে যেতে পারেন, ইচ্ছে করলে আপনি পনেরোটা সান্ধ্য পোষাক পরতে পারেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওগুলো আমাদের, আমাদের, আমাদের!···আপনার যা, তা চাই না আমি, কিন্তু যা আমার নিজের, তা ছেড়ে দেবার আগ্রহ আমার নেই।··· তার জন্যে যা ইচ্ছে হয় আপনি করতে পারেন!

লমভ। নাটালিয়া ষ্টেপানভনা, ক্ষেতগুলি আমি চাই না, কিন্তু এটা হচ্ছে নীতির ব্যাপার। যদি তুমি চাও ত পুরস্কারস্বরূপ ওগুলো আমি দিয়ে দেব।

নাটালিয়া। কিন্তু, আমিও ত আপনায় এগুলো পুরস্কার দিতে পারতাম—কারণ ওগুলো ত আমার!···ইভান ভাসিলিয়েভিচ, কম করে বললেও বলতে হয় এ সব কিছু বড়ো তাজ্জবের কথা! এর আগে পর্যন্ত আমরা আপনাকে ভালো প্রতিবেশী, আমাদের একজন বন্ধু হিসেবেই গণ্য করে এসেছি। গত বছর আমরা আপনাকে আমাদের ধান-কাঁড়া যন্ত্র ধার দিয়েছিলাম, যে জন্যে আমাদের গিয়ে নভেম্বর মাসে ধান কাঁড়তে হয়েছিল। আর এখন আপনি এমন ব্যবহার করছেন যেন আমরা যাযাবর। আপনি আমায় আমার নিজের জমি পুরস্কার দিচ্ছেন! আমায় মাফ করবেন, কিন্তু এটা প্রতিবেশীর কর্ম নয়! আমার কাছে—যদি আপনি শুনতেই চান— এটা প্রায় একটা বে-আদপি।

লমভ। তুমি তাহলে বলতে চাও যে আমি একজন „জবর-দখলকারী? মহাশয়া, আমি কখনো অন্যের জমি চুরি করিনি আর আমি কাউকেই আমায় অভিযুক্ত করার অধিকারটি দেব না।

(ডিকেণ্টারের দিকে এগিয়ে গেলেন ও জলপান করলেন) ভলভির ক্ষেতগুলি আমার !

নাটালিয়া। সত্যি নয়। ও-গুলি আমাদের !

লমভ। আমার ওগুলি !

নাটালিয়া। সত্য নয়! আপনার কাছে এটা আমি প্রমাণ করব! আজই আমি আমার লোকদের ঐ ক্ষেতগুলোতে ধান কাটতে পাঠাব।

লমভ। অর্থাৎ ?

নাটালিয়া। আমার লোকগুলো ওখানে আজ কাজ করবে।

লমভ। ওদের আমি বলপ্রয়োগ করে তাড়িয়ে দেব।

নাটালিয়া। এমন সাহসটি করবেন না।

লমভ। (বুকের ওপর হাত ঠুকে) ভলভির ক্ষেতগুলি আমার ! সমঝাতে পারছ না তুমি এটা ? আমার।

নাটালিয়া। দয়া করে চেঁচাবেন না। আপনার বাড়িতে আপনি রাগে দম বন্ধ হয়ে যেতে পারেন, চিৎকার করতে পারেন, কিন্তু এখানে দয়া করে সীমা ছাড়িয়ে যাবেন না !

লমভ। মহাশয়া, যদি এই কঠিন, ক্লেশকর ধপধপানি না থাকত, থাকত না কপালে টিপ-টিপ যন্ত্রণা, আমি তাহলে একেবারে অন্য ভাবে কথা বলতাম আপনার কাছে ! (চিৎকার করে) ভলভির ক্ষেতগুলি আমার !

নাটালিয়া। আমাদের।

লমভ। আমার।

নাটালিয়া। আমাদের।

লমভ। আমার।

(সোবুকভের প্রবেশ)

সোবুকভ। এ-সব কী ? চেঁচাচ্ছ কেন তোমরা ?

নাটালিয়া। বাবা, দয়া করে এই ভদ্রলোককে বুঝিয়ে দাও। ভলভির ক্ষেতগুলো কাদের—ওর না আমাদের ?

সোবুকভ। (লমভকে) ক্ষেতগুলো আমাদেরই, প্রিয় বৎস !

লমভ। কিন্তু, ষ্টিপান ষ্টেপানভিচ, আমায় মাফ করবেন, ওগুলো আপনাদের হল কী করে ? আপনি অন্তত যুক্তিপূর্ণ হবেন ! আমার জ্যাঠাইমার ঠাকুরমা এই নিষ্কর মাঠগুলো সাময়িক ভাবে ব্যবহারের জন্যে আপনার পিতামহের কৃষকদের দিয়েছিলেন। চাষিরা চল্লিশ বছর ধরে জমিটিতে কাজ করেছে, আর তাইতেই ওগুলো তাদের নিজেদের মনে করতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। কিন্তু যখন সেট্‌লমেণ্ট হল···

সোবুকভ। প্রিয় বন্ধু, আমায় ক্ষমা করবেন···। তুমি ভুলে যাচ্ছ যে এই ক্ষেতগুলো নিয়ে ঝগড়া বিবাদ ইত্যাদি ছিল বলেই চাষিরা তোমার ঠাকুমাকে খাজনা দেয়নি। কতো কী ব্যাপার আরো···। এখন প্রত্যেক কুকুরটি পর্যন্ত জানে যে ওগুলো আমাদের—হাঁ, সত্যি সত্যি। তুমি নক্সাগুলো দেখোনি ?

লমভ। কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রমাণ করব যে ওগুলো আমার।

সোবুকভ। প্রিয় বন্ধু, প্রমাণ তুমি করতে পারবে না।

লমভ। পারব।

সোবুকভ। কিন্তু চেঁচাচ্ছ কেন, প্রিয় বৎস ? চেঁচিয়ে তুমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবে না। তোমার যা আমি তা চাই না, কিন্তু যা আমার তা ছেড়ে দিতে আমার কোন ইচ্ছে নেই। কেন ছাড়ব ? তাই যদি করতেই হয়, প্রিয় বন্ধু,—যদি তুমি ঐ ক্ষেতগুলি ও অন্য সব ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া শুরু করার কথা ভেবে থাক, আমি তাহলে ওগুলো তোমায় না-দিয়ে তাড়াতাড়ি চাষিদের পুরস্কার দিয়ে দেব। তাই সই !

লমভ। বুঝতে পারলাম না ! অন্য আরেক জনের সম্পত্তি দিয়ে দেবার কী অধিকার আপনার আছে ?

সোবুকভ। পারি কি না-পারি সেটা আমায় ভাবতে দাও ! কী বলব, হে যুবক, সত্যি আমি ঐ রকম কথা শুনতে অভ্যস্ত নই !···হে যুবক, আমি বয়সে তোমার দ্বিগুণ বড়ো। উত্তেজিত না হয়ে আলাপ করবার জন্য আমি তোমায় অনুরোধ করব, হুঁ তাই···!

লমভ। না, আপনি আমায় স্রেফ বোকা বানাচ্ছেন আর আমায় নিয়ে মজা মারছেন ! আমার জমি বলছেন আপনার, তার পরেও আপনি আশা করেন যে আমি ঠাণ্ডা থাকব আর সাধারণ ভাবে কথা বলব আপনার সংগে ষ্টিপান ষ্টেপানভিচ, ভালো প্রতিবেশীরা এ ধরণের ব্যবহার করে না ! আপনি প্রতিবেশী নন, আপনি একজন জবর-দখলকারী।

সোবুকভ। অর্থাৎ ? কী বললে তুমি ?

নাটালিয়া। বাবা, লোকদের এক্ষণি মাঠগুলোতে ধান কাটতে পাঠিয়ে দাও।

সোবুকভ। (লমভ-কে) কী বললে তুমি, মশাই ?

নাটালিয়া। ভলভির ক্ষেতগুলো আমাদের। কিছুতেই ওগুলো আমি ছাড়ব না ! ছাড়ব না ! ছাড়ব না !

লমভ। দেখা যাবে তা ! আমি আদালতে তোমাদের কাছে প্রমাণ করব যে ওগুলো আমাদের।

সোবুকভ। আদালতে ? তুমি এটা এবং অন্য সব-কিছু আদালতে নিয়ে যাবে, মহাশয় ! তাই করো ! আমি ত তোমায় জানি, আদালতে যাবার জন্য তুমি একটা ফিকির খুঁজে বসেছিলে, জানি জানি। তোমার পক্ষেই স্বাভাবিক—এমন সংকীর্ণতা। মামলা মোকদ্দমার দিকে তোমার পরিবারের সব সময়েই একটা দুর্বলতা ছিল। সব্বার !

লমভ। দয়া করে আমার পরিবারের অপমান করবেন না। লমভদের সবাই সৎ লোক ছিলেন। কেউই তাদের আপনার খুড়োর মতো টাকা তছরূপের জন্য সোপর্দ হননি।

সোবুকভ। লমভ পরিবারের প্রত্যেকটি লোক পাগল ছিল।

নাটালিয়া। তাদের প্রত্যেকটি—প্রত্যেকটি !

সোবুকভ। তোমার ঠাকুরদা ছিল পাঁড়-মাতাল, আর তোমার ছোট খুড়ি, নাসটাসিয়া মিহাইলভনা—হাঁ, সত্যি কথাই—একজন স্থপতিবিদের সংগে পালিয়ে গিয়েছিল। আরো কত কী সব !

লমভ। আর আপনার মা ছিলেন কদাকার ! (বুকের ওপর হাত চেপে) আবার এই কিনারে গুলী ছোঁড়ার মতো যন্ত্রণা ! রক্ত আমার মাথায় চড়েছে। ভগবান ! জল !

সোবুকভ। তোমার বাবা ছিল একটা জোয়াড়ে আর পেটুক !

নাটালিয়া। আপনার জ্যাঠাইমা ছিলেন কুৎসাবাজ—আর এ ব্যাপারে তার তুলনা বিরল।

লমভ। আমার বাঁ পা ধরে এসেছে। আর তুমি একজন চক্রান্তকারী। উঃ আমার বুক! এটা একটা গোপন সত্য যে নির্বাচনের আগে তুমি···চোখ আমার জ্বলে জ্বলে উঠছে···টুপিটা কোথায় আমার?

নাটালিয়া। এটা হচ্ছে নীচতা, অসাধুতা, পুরো শঠতা!

লমভ। এই যে টুপি আমার···আমার বুক···কোন দিকে যাই? দরজাটা কোথায়? ওঃ, মনে হচ্ছে মরে যাচ্ছি···যেন চলৎশক্তি রহিত হয়ে যাচ্ছি। (দরোজার দিকে হাঁটতে লাগলেন)

সোবুকভ (ডেকে)। আমার বাড়িতে ফের তোমার পা বাড়াতে বারণ করছি!

নাটালিয়া। যান না আদালতে। আমরাও দেখব!

(খোঁড়াতে খোঁড়াতে লমভ বেরিয়ে গেলেন)

সোবুকভ। নিপাত যাক্ (উত্তেজিত ভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগলেন)

নাটালিয়া। এ রকম অভদ্র কখনো দেখেছ? এর পরেও কি না ভালো প্রতিবেশীদের বিশ্বাস করা!

সোবুকভ। একটা হাস্যকর সং! বদমায়েস্!

নাটালিয়া। একটা দানব! অন্য লোকের জমি ছিনিয়ে নেয়! তারপর আবার তারই দরাদরিতে গালাগাল দিতে আসে!

সোবুকভ। হাস্যকর চেংড়া, চক্ষুশূল—হাঁ, কী তার দুঃসাহস যে, এইখানে এসে ও একটি প্রস্তাব করে বসে! আরো কত কী! বিশ্বাস করবে তুমি? প্রস্তাব!

নাটালিয়া। কিসের প্রস্তাব?

সোবুকভ। হাঁ, একবার ভাবো না, তোমার কাছেও কথা পাড়তে এসেছিল।

নাটালিয়া। কথা পাড়তে? আমার কাছে? কিন্তু কেন তুমি আমায় আগে বললে না?

সোবুকভ। সেই জন্যেই ত ও চোগা পরে এসেছিল। মাংসের কাবাব বিশেষ একটা বামন-অবতার!

নাটালিয়া। আমার কাছে? একটি প্রস্তাব? অঃ! (চেয়ারে বসে পড়ল ও গোঙাতে লাগল) নিয়ে এসো ওকে! ওকে নিয়ে এসো! অঃ, নিয়ে এসো ওকে!

সোবুকভ। কা'কে নিয়ে এসো?

নাটালিয়া। তাড়াতাড়ি করো! তাড়াতাড়ি! আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ব মনে হচ্ছে। নিয়ে এসো ওকে! (হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের মতো কেঁপে কেঁপে উঠল)

সোবুকভ। এ কী? কী চাই তোমার? (মাথা টিপে ধরল) কী যন্ত্রণা? নিজেকে নিজে গুলী করে মারব আমি! ঝুলিয়ে মারব! ওরা আমায় শেষ করে ফেললে!

নাটালিয়া। মরে যাচ্ছি আমি! ওকে নিয়ে এসো।

সোবুকভ। ধেৎ! নিয়ে আসছি! চেঁচামেচি করো না! (দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন)

নাটালিয়া (একলা, গোঙানোসুরে)। কী করছি আমরা? নিয়ে এসো ওকে! ওকে নিয়ে এসো!

সোবুকভ (দৌড়ে ঢুকলেন)। এক্ষুণি আসছে ও। আরো কতো কী! চুলোয় যাক্ ও! হুঁ! ওর সংগে তুমি আলাপ করতে পার। আমি চাই না! তাই ঠিক!

নাটালিয়া (গোঙানোসুরে)। নিয়ে এসো না ওকে!

সোবুকভ (চীৎকার করে)। বললাম ত, আসছে! হে ভগবান, বয়স্কা মেয়ের বাপ হওয়া কী ঝকমারি! নিজের গলায়ই ছুরি মারব আমি। হাঁ, নিশ্চয়ই! নিজের গলায়ই ছুরি মারব! লোকটিকে আমরা গালাগাল করেছি, অপমান করেছি, লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছি—এ সব কিছু তোমার কাজ—তোমার কাজ!

নাটালিয়া। না, তোমার এটা।

সোবুকভ। হুঁ, এখন আমার দোষ! তার পর?

(লমভের প্রবেশ)

লমভ (অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায়)। এই সাংঘাতিক ধপধপানি। পা অসাড় বোধ করছি।···কিনারের দিকে গুলী-ছোঁড়ার মতো যন্ত্রণা।

নাটালিয়া। ক্ষমা করবেন আমাদের, আমরা বড়ো চড়া-মেজাজে ছিলাম, ইভান ভাসিলিয়েভিচ! এখন মনে পড়ছে আমার: তৃণভির ক্ষেতগুলো সত্যিই আপনার।

লমভ। আমার হৃৎকম্পন বড়ো দ্রুত চলছে। ক্ষেতগুলো আমারই। আমার দুটো চোখের পাতাই পিট্-পিট্ করছে।

নাটালিয়া। হাঁ, ওগুলো আপনার, আপনারই···বসুন।

(তা'রা বসল)

আমরাই ভুল করছিলাম।

লমভ। আমার কাছে এটা নীতির ব্যাপার··জমির কোন মূল্য দিই না আমি, কিন্তু নীতির মূল্য দিই···

নাটালিয়া। সেইটেই নীতির। অন্য কিছু নিয়ে আমাদের আলাপ হোক।

লমভ। বিশেষত, আমার যখন প্রমাণ আছে। আমার জ্যাঠাইমার ঠাকুরমা তোমার বাবার ঠাকুর্দা'র চাষিদের দিয়েছিলেন···।

নাটালিয়া। অনেক, সে নিয়ে অনেক হয়েছে···। (না শুনিয়ে) কী ভাবে আরম্ভ করব আমি বুঝতে পারছি না···। (লমভকে) শীগগির'কি আপনি শিকারে বেরোবেন?

লমভ। নতুন ফসলের পর আমি বনমুরগী শিকারে বেরোবো বলে মনে করছি। প্রিয় নাটালিয়া ষ্টেপানভনা···। অঃ, শুনতে পেয়েছ তুমি? ভেবে দেখো—কী খারাপ কপাল আমার! আমার ট্রায়ার—ওটাকে তুমি জানো—ওটা খোঁড়া হয়ে গেছে।

নাটালিয়া। কী দুঃখের কথা! কারণ কী তার?

লমভ। জানি না···! থাবাটা বোধ হয় মচকে গেছে। কিংবা অন্য কুকুর হয়ত কামড়ে দিয়েছে···। (দীর্ঘশ্বাস) টাকার কথা বাদ দিলেও—আমার সবচেয়ে ভালো কুকুর! জানো তুমি, মিরনভকে আমি একশো পঁচিশ রুবল দিয়েছিলাম ওটার জন্য।

নাটালিয়া। ইভান ভাসিলিয়েভিচ, অপনি কিন্তু বেশি দাম দিয়েছেন।

লমভ। দেখো, আমি মনে করি, খুব শস্তা হয়েছিল। ওটা একটি চমৎকার কুকুর!

নাটালিয়া। বাবা তার ফ্লায়ারের জন্য পঁচাশী রুবল দিয়েছিলেন। আর ফ্লায়ার আপনার ট্রায়ারের চেয়ে অনেক ভালো।

লমভ। ফ্লায়ার ভালো ট্রায়ারের চেয়ে? রাখো, রাখো। (হাস্য) ফ্লায়ার ভালো ট্রায়ারের চেয়ে!

নাটালিয়া। নিশ্চয়ই ভালো! এটা সত্যি যে ফ্লায়ার এখনো

অপরিণত—এখনো একটা পরিণত কুকুর হয়ে ওঠেনি—কিন্তু একাগ্রতা ও চাতুর্যে এর'চেয়ে ভালো ভলকানিয়েসকি'র'ও নেই।

লমভ। নাটালিয়া ষ্টেপানভনা, আমায় মাফ করবে, তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে ওর চোয়ালটা খাটো, আর চোয়াল-খাটো কুকুর কখনো ঠিক মত কিছু ধরতে পারে না।

নাটালিয়া। চোয়াল-খাটো? এই প্রথম শুনলাম আমি এটা।

লমভ। জেনে রাখো বলছি, ওর নীচের চোয়াল ওপরের চেয়ে খাটো।

নাটালিয়া। কেন, ক্ষেপেছেন নাকি আপনি?

লমভ। হাঁ। ছোটার ব্যাপারে অবশ্যি ও ঠিক আছে, কিন্তু যখনি ধরার ব্যাপারে আসে, তখন আর কোন কাজের নয় ওটা।

নাটালিয়া। প্রথমত, আমাদের স্কায়ার ঠিকুজী-মেলানো কুকুর—হার্ণেস আর চিসেলের বাচ্চা—সে যায়গায় কিনা আপনার ট্রায়ারের চামড়ায় এমন সব রঙের মিশেল যে আপনি তার জাতটাই ঠাওরাতে পারবেন না। তার ওপর ও আবার ভাড়া-খাটা বুড়ো ঘোড়ার মতোই বুড়ো আর কুৎসিত।

লমভ। বুড়ো বটে ওটা, কিন্তু তোমাদের পাঁচটা স্কায়ার দিলেও ওর বদলে আমি নেবো না। তা আমি ভাবতেই পারি না। কুকুরের মতো কুকুর হচ্ছে ট্রায়ার, কিন্তু স্কায়ার। তর্ক করা মিছে। তোমাদের স্কায়ারের মতো অসংখ্য কুকুর প্রতিটি ক্রীড়ামোদীরই আছে। ওর জন্যে পঁচিশ রুবল্ দিলেই বেশি দেওয়া হোল।

নাটালিয়া। আপনাকে দেখছি আজ উল্টো-কথায় পেয়ে বসেছে, ইভান ভাসিলিয়েভিচ। প্রথমে ভাণ করছিলেন যে ক্ষেতগুলো আপনার, এখন আবার বলছেন যে স্কায়ারের চেয়ে ট্রায়ার ভালো। মানুষ যা সত্যি-সত্যি বিশ্বাস করে না, তা যখন বলে, তখন আসর ভালো লাগে না। হাজার হোক, আপনি এটা খুব ভালো করেই জানেন যে স্কায়ার শত গুণে ভালো, আপনার হাঁ, আপনার আহাম্মক ট্রায়ারের চেয়ে। তবে, উল্টো বলছেন কেন?

লমভ। নাটালিয়া ষ্টেপানভনা তুমি দেখছি আমায় কানা অথবা বোকা বলে মনে করছ। তোমার স্কায়ারের যে একটা চোয়াল খাটো, সেটা বোধগম্য হবে না?

নাটালিয়া। এটা ঠিক নয়।

লমভ। ওর একটা চোয়াল খাটো।

নাটালিয়া। (চিৎকার করে) ঠিক নয় তা!

লমভ। মহাশয়া, চিৎকার করছেন কেন?

নাটালিয়া। বাজে কথা বলছেন কেন আপনি? পিত্ত জ্বলে যায়! আপনার ট্রায়ারকে যখন গুলী করে মারা উচিত, তখন কিনা আপনি স্কায়ারের সংগে তার তুলনা দিচ্ছেন?

লমভ। মাফ করো আমায়, এ তর্ক আমি আর চালাতে পারব না। আমার বুক-ধড়ফড়ানি আছে।

নাটালিয়া যে মানুষগুলো শিকারের কিছুই জানে না তারাই দেখছি সে সম্বন্ধে সব চেয়ে বেশী তর্ক করে।

লমভ। মহাশয়া, থামুন দয়া করে। আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে পড়ছে। (চিৎকার করে) থামো!

নাটালিয়া। যতক্ষণ না আপনি স্বীকার করছেন যে স্কায়ার শতগুণে আপনার ট্রায়ারের চেয়ে ভালো, ততক্ষণ আমি থামবো না।

লমভ। শতগুণে খারাপ! এখন ওটার মরে যাওয়া উচিত ছিল—তোমার স্কায়ারের। উফ, আমার মাথাটা, আমার চোখ, আমার কাঁধ!

নাটালিয়া। আপনার আহাম্মক ট্রায়ারের জন্যে আমি তার মৃত্যু কামনা করছি না। ওটা অর্ধ-মৃত হয়েই আছে!

লমভ (সরোদনে) থাম! আমার হৃৎপিণ্ডটি এবার ফেটে যাবে।

নাটালিয়া। থাম্‌বো না আমি।

(সোবুকভের প্রবেশ)

সোবুকভ। কী হোল এবার?

নাটালিয়া। আমাদের বলো ত, ঠিক করে বলো। কোন কুকুরটি ভালো—আমাদের স্কায়ার না ওর ট্রায়ার?

লমভ। ষ্টেপান ষ্টেপানভিচ, অনুরোধ করছি আমি, একটা কথা আমাদের বলুন। আপনার স্কায়ারের একটা চোয়াল খাটো কিনা? হাঁ কি না?

সোবুকভ। আচ্ছা থাকলেই বা কী? তাতে যেন কিছু আসে-যায়! সে যাই হোক, এর চেয়ে ভালো কুকুর সারা জেলাতেই আর নেই। হুঁ তাই।

লমভ। কিন্তু আমার ট্রায়ার তার চেয়েও ভালো, নয় কী? ঠিক করে বলুন?

সোবুকভ। প্রিয় বৎস, উত্তেজিত হয়ো না। আমাকে ব্যাখ্যা করতে দাও। তোমার ট্রায়ারেরও অবশ্যি, কতকগুলি ভালো দিক আছে। ওর জন্মটা ভালো, জোরালো পা আছে ওর, মজবুত গড়ন, এমনি আরো সব। কিন্তু প্রিয় বন্ধু, যদি তুমি সত্যি সত্যি জানতে চাও কুকুরটির খুব মারাত্মক দুটো ত্রুটি আছে। ওটা বুড়ো হয়ে গেছে, আর ওটা একটা খেঁদি খুকুর।

লমভ। মাফ করবেন, আমার বুক-ধড়ফড়ানি হচ্ছে। আসল কথায় আমাদের আসা দরকার! সম্ভবত আপনার মনে আছে, সরুসকিন মাঠে শিকারের সময় আমার ট্রায়ার কাউন্টের স্পটারের সংগে সংগেই ছিল, আপনার স্কায়ার তখন পাকা আধ মাইল পেছিয়ে ছিল।

সোবুকভ। সে থেমে পড়েছিল, কারণ কাউন্টের শিকারীরা তাকে চাবকেছিল।

লমভ। এই-ই তার প্রাপ্য। অন্য সবগুলো কুকুর শিয়ালটাকে তাড়া করে ছুটছিল, কিন্তু স্কায়ার যেন একটি মেষের ভয়ে ভীত হয়ে ছুটছিল।

সোবুকভ। সত্য নয়!···সহজেই আমার মাথা চড়ে যায়, সেইজন্যে প্রিয় বন্ধু, আমি অনুরোধ করছি, এই তর্ক বাদ দিন। লোকটা ওকে মেরেছিল, কারণ, মানুষ সব সময়ই অন্য লোকের কুকুরের প্রতি ঈর্ষান্বিত থাকে! হাঁ, প্রত্যেকেই অন্যের কুকুরকে ঘৃণা করে। আর তুমিও মশাই, এইটে থেকে বাদ পড় না! হাঁ, যেমন, যখনই তুমি দেখলে যে তোমার ট্রায়ারের চেয়ে অন্য একজনের কুকুর ভালো, তখনই তুমি এটা সেটা শুরু করে দিয়েছ···আরো কত কী। দেখো, সব কিছুই আমি মনে রাখি!

লমভ। আমিও রাখি।

সোবুকভ (অনুকরণ করে)। আমিও রাখি। কী তুমি রাখো ?

লমভ। বুক-ধড়ফড়ানি···আমার পা অসাড় হয়ে এসেছে···পারছি না।···

নাটালিয়া (অনুকরণ করে)। বুক-ধড়ফড়ানি···কোন ধরণের খেলোয়াড় আপনি ? আপনার উচিত শেয়াল শিকার না করে রান্না-ঘরে উনোনের পাশে বসে আরশোলা মারা। বুক-ধড়ফড়ানি !

সোবুকভ। সহজ ভাবে বলছি, শিকার করাটা তোমার লাইন নয় আদৌ। তোমার এই বুক-ধড়ফড়ানি ইত্যাদি নিয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে দোলা খাওয়ার চেয়ে বাড়িতে থাকাই ভাল। শিকার করলে কিনা তাতে তোমার কিছুই যায়-আসে না, তুমি শুধু তর্ক করবার উদ্দেশ্য নিয়ে, অন্য লোকের কুকুরকে ছোট করবার জন্যে, আরো কত কী সব।···সহজেই রেগে যাই আমি, অতএব আমাদের এই আলাপ থামান দরকার। তুমি ঠিক খেলোয়াড় নও, এইটেই হচ্ছে মোদ্দা কথা।

লমভ। আর আপনি ? আপনি খেলোয়াড় নাকি ? আপনি শুধু কাউণ্টের অনুগ্রহ কুড়োবার জন্যে, আর অন্য লোকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করবার জন্যে শিকার করতে বেরোন।···উফ, হৃৎপিণ্ডটা ! আপনি একজন ষড়যন্ত্রকারী !

সোবুকভ। কী ? আমি—ষড়যন্ত্রকারী ? (চিৎকার করে) চুপ রও !

লমভ। ষড়যন্ত্রকারী !

সোবুকভ। বেয়াড়া ! ইতর !

লমভ। আপনি বুড়ো-ইঁদুর ! ভণ্ড !

সোবুকভ। মুখ সামলাও তোমার, নইলে বন্দুক দিয়ে তোমায় গুলী করে মারব, তিতির পাখীর মতো। বাচাল !

লমভ। প্রত্যেকেই জানে—উফ, আমার হৃৎপিণ্ডটা !—আপনার বৌ আপনাকে ধরে পেটাতেন। আমার পা···আমার মাথা···চোখের উপরের দিকে জ্বালা···পড়ে যাচ্ছি আমি···।

সোবুকভ। তোমার বাড়ির ঝি ত তোমায় বুড়ো-আঙুলের তলায় রেখেছে।

লমভ। উফ ! উফ ! উফ !···আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে পড়ছে ! আমার কাঁধ গেল।···কোথায় আমার কাঁধ ?···আমি মরে যাচ্ছি ! (আরাম কেদারায় ঢলে পড়লেন)

ডাক্তার। (সংজ্ঞাহীন)

সোবুকভ। বেয়াড়া ! ইতর ! বাচাল ! ঢলে পড়ব মনে হচ্ছে। (জল খেলেন) ঢলে পড়ব !

নাটালিয়া। খেলোয়াড় বটে ! কেমন করে ঘোড়ার ওপর বসতে হয় তাই জানে না ! (পিতাকে) বাবা ! কী হোল্ ওর ? বাবা ! দেখো না, বাবা ! (শিহরিত) ইভান ভাসিলিয়েভিচ ! মরে গেছেন !

সোবুকভ। ঢলে পড়ছি !···দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছি ! বাতাস নিতে দাও আমায় !

নাটালিয়া। তিনি মরে গেছেন ! (লমভের জামার হাতা ধরে নাড়তে লাগল) ইভান ভাসিলিচ ! ইভান ভাসিলিচ ! আমরা কী করলাম ? মরে গেছেন উনি ! (আরাম-কেদারায় ঢলে পড়ল) ডাক্তার ! ডাক্তার ! (হিষ্টিরিয়াগ্রস্তের মতো হাসতে ও কাঁদতে লাগল)

সোবুকভ। আবার কী ? ব্যাপার কী হোল ? কী চাই তোমার ?

নাটালিয়া। (ক্রন্দন) উনি মরে গেছেন !···মরে গেছেন !

সোবুকভ। কে মরে গেছেন ? (লমভের দিকে তাকিয়ে) সত্যিই ত ও মরে গেছে ! ভগবান ! জল ! ডাক্তার ! (লমভের ঠোঁটের কাছে জলের গ্লাস ধরলেন) জল খাও !···না, খাবে না ও জল।···তাহলে ও মরেই গেছে, ব্যস খতম !···কী আমার দুর্ভাগ্য ! কেন আমি আমার মাথার ভেতর দিয়ে গুলী ছুড়লাম না একটা ? কেন আমি গলায় ছুরি দিলাম না অনেক আগে ? কিসের জন্য অপেক্ষা করছি আমি ? আমাকে একটা ছুরি দাও ! একটা বন্দুক দাও আমায় !

(লমভ অল্প নড়লেন)

মনে হচ্ছে, সুস্থ হয়ে আসছে ও।···এক গ্লাস জল খাও ! ঠিক আছে···

লমভ। আমার চোখের সামনে কিসের ঝলক !···কুয়াশার মতো···আমি কোথায় ?

সোবুকভ। তাড়াতাড়ি তুমি একটা বিয়ে করো, আর—জাহান্নমে যাও।···ও রাজি আছে। (দুজনের হাত মিলিয়ে দিলেন) রাজী আছে ও, আর সব ঠিক আছে। তোমায় আমার আশীর্বাদ ইত্যাদি জানাচ্ছি। কেবল আমায় একলা হতে দাও !

লমভ। এঁ্যা ! কী ? (উঠে) কে ?

সোবুকভ। ও রাজী হয়েছে ! হ্যাঁ, দু'জনে দু'জনকে চুম্বন করো, আর··ধরে নিক তোমাদের।

নাটালিয়া। (ক্রন্দন) ও জীবিত !···হাঁ, হাঁ, মত দিয়েছি আমি।···

সোবুকভ। তাহলে এসো, দুজনে দুজনকে চুম্বন করো !

লমভ। এঁ্যা ! কে ? (নাটালিয়াকে চুম্বন করলেন) কী যে আমি খুশি হয়েছি !···মাফ করবেন আমায়, কিন্তু কেন এ সব ? এঁ্যা ! হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।···আমার হৃৎপিণ্ড··ঝলক··· আমি কী যে আনন্দিত, নাটালিয়া ষ্টেপানভনা··(হাতে চুম্বন করলেন) আমার পা ধরে আসছে।

নাটালিয়া। আমি···আমিও আনন্দিত···

সোবুকভ। কী বোঝা কমলো আমার কাঁধ থেকে !···আঃ !

নাটালিয়া। কিন্তু···নিশ্চয়ই এখন তুমি স্বীকার করবে: ট্রায়ার ফ্লায়ারের মতো এতো ভালো কুকুর নয়।

লমভ। ভালো।

নাটালিয়া। খারাপ।

সোবুকভ। এই যে ! পারিবারিক সুখ আরম্ভ হয়েছে ! শাম্পেন নিয়ে এসো !

লমভ। ওটাই ভালো।

নাটালিয়া। বাজে, বাজে, বাজে ওটা !

সোবুকভ। (চিৎকারে ওদের তলিয়ে দিয়ে) শাম্পেন ! শাম্পেন নিয়ে এসো !

—পদা।—

অনুবাদ : সুধাংশু গুপ্ত


প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY BRAND
PEARL BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LIMITED
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY BRAND BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
LILY BARLEY MILLS LTD
MURARIPUKAR ROAD
ULTADANGA CALCUTTA
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪



পরজ বসন্ত

কৃষ্ণ ধর

টুনডলাতে এসে আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসটা থামল সন্ধ্যায়। একটা তামাটে বিবর্ণতা আকাশটাকে ঘিরে রেখেছে। যাত্রীর কোলাহলে ষ্টেশনটা মুখর। বাক্স, প্যাঁটরা, লটবহর। নামবার কী ব্যস্ততা! লাইট-পোষ্টের গায়ে জ্বল-জ্বল আলোর চার পাশে এখনি ঘুরপাক খেতে সুরু করেছে কয়েকটা পতঙ্গ।

সঞ্জয় কামরার জানলা দিয়ে এই ধূসর সন্ধ্যাটা উপভোগ করছিল। একটা নির্লিপ্ত দৃষ্টি। ট্রেণের প্রতিটি মুহূর্তই তার কাছে পরমাশ্চর্য মনে হয়। প্রত্যেক ষ্টেশনেই এক নতুনতর অনুভূতি! আজকের সন্ধ্যাটা গভীর মমতাঘেরা মনে হচ্ছে তার কাছে।

একটা খুশির প্রশান্ত পরিব্যাপ্তি। অনেক দিন পর শর্মিলার সঙ্গে আজ আবার দেখা হবে। পিসিমণির সঙ্গে শর্মিলা আসছে আগ্রায়। চিঠিতে জানিয়েছে। তাজমহল দেখতে। দিন সাতেক থাকবে এখানে। তার পর উত্তর-ভারতের আরও কয়েকটি জায়গা দেখে বোম্বাই। এক লম্বা টুর প্রোগ্রাম।

অনেক ভাবল সঞ্জয় চিঠিটা পেয়ে। আকাশ-পাতাল অনেক। চিঠিটা আকস্মিক। চিঠির মানুষটিও। আজ দশ বছর ছাড়াছাড়ি শর্মিলার সঙ্গে। কলেজ থেকে বেরোবার গোড়াতেই। আউটরামের সেই বুফেতে সেই ভেজা বর্ষার কান্নাঘেরা সন্ধ্যার কথা আর্মির এ্যাডজুটেণ্ট সঞ্জয় সেন আজও ভুলতে পারেনি! রৌদ্রদীর্ণ উত্তর-ভারতের পীউষের ক্ষেতের মতোই সে হৃদয় বেদনার্ত।

কামরায় বসে সে কথাই ভাবছিল সঞ্জয়। কেমন রূঢ় ভাষাতেই প্রত্যাখ্যান করেছিল শর্মিলা। একটুকুও কি মনে লাগেনি তার?

বোনের সহপাঠিনী শর্মিলা স্কটিশে বি, এ, পড়ছিল তখন। সঞ্জয় পোষ্ট গ্র্যাজুয়েটের শেষ ভাগ মাড়িয়েছে সবে।

মাঝে মাঝে বোন বিনীতাকে দেখবার জন্য ডাণ্ডাস হোষ্টেলে যেতে হত। লোক্যাল সার্জিয়ানের তকমা এঁটে। ডাণ্ডাসের ওয়েটিং রুমেই একদিন সঞ্জয় আবিষ্কার করেছিল শর্মিলাকে। কী অদ্ভুত বেদনাস্নিগ্ধ তার চোখ! সে চাউনি সঞ্জয় আজও ভুলতে পারেনি।

বিনীতাকে ডেকে পাঠিয়ে সঞ্জয় অপেক্ষা করছিল। হোষ্টেলের ভিতরে লেবু গাছটা কচি পাতায় ভরে গেছে। কেমন একটা স্নিগ্ধতা। এই বিকেলটাকে অদ্ভুত ভাল লাগছিল সঞ্জয়ের, আনমনে সমারসেট মমের 'মুন এ্যাণ্ড সিক্স পেন্স'এর ওপর চোখ বুলোচ্ছিল।

কিছুক্ষণ পর দরজায় ছায়া পড়ল। সঞ্জয় ভাবল বিনীতা। কিন্তু না।

দাঁড়াল এসে একটি মেয়ে। বয়স যার কুড়ি পেরোয়নি। শান্ত সমাহিত চোখের চাউনিতে রাজ্যের ক্লান্তি। মৌন বিষণ্ণতা। কিন্তু তার অঙ্গের লাবণি ঢল-ঢল।

সমারসেট মম ভুলে গেল সঞ্জয়। তাকিয়ে রইল অবাক-বিস্ময়ে।

স্তব্ধতার বরফ কেটে শর্মিলাই প্রথম কথা বলল, আপনি বিনীতার দাদা?

সঞ্জয় ঘাড় নাড়ল।

শর্মিলা বললে, দেখুন বিনীতার একটু জ্বর মতোন হয়েছে। শরীর দুর্বল। নীচে নামতে বারণ। তাই আমি এলাম। চিন্তা করবার কিছু নেই। এই ইনফ্লুয়েঞ্জা আর কি!

সঞ্জয় একটু ব্যস্ততার ভাব দেখাল। জ্বর হলেও তো আপনারা রয়েছেন। ভাবনার কি আছে?

ছোট্ট একটা নমস্কার করে সঞ্জয় ডাণ্ডাসের দেয়াল পেরিয়ে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে এসে দাঁড়াল। ওর কেমন জানি মনে হল, সেই সলজ্জ বিনম্রতায় স্নিগ্ধ অপরিচিত মেয়েটিও যেন দোরগোড়া পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। সঞ্জয় কিন্তু পেছন ফিরে তাকাতে আর সাহস করে নি। যদি না এসে থাকে। এর পরে দেখা হল কবে? বিনীতাদের কলেজ সোস্যালে। নন্দিনীর অভিনয় করেছিল শর্মিলা।

রক্তকরবীর নন্দিনী। যার প্রেম রঞ্জনের ভালবাসার রঙে রাঙা। সঞ্জয় তো আজও সে অভিনয় ভুলতে পারে নি!

অদ্ভুত আগ্রহ জাগল তার। শর্মিলার সঙ্গে কথা বলবার আগ্রহ। তপশ্চারিণীর মতো দেখাচ্ছিল শর্মিলাকে। ভালবাসার দুশ্চর তপস্যায় যার দেহ-মন একটা উৎসবের পবিত্রতায় ঘেরা। শর্মিলার সঙ্গে সেদিন অনেকক্ষণ কথা হল। গ্রীণ-রুমে।

দু' দিন পর সঞ্জয় চিঠি লিখল শর্মিলাকে। তার পিসিমণির বাড়ির ঠিকানায়। লেক প্লেসে। অনেকটা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। শেষের কবিতার কাটা-কাটা কথায়। একটুও বা আত্মনিবেদনের ভঙ্গিতে। হয়তো প্রায় লিখেই ফেলেছিল, তোমার চোখে দেখেছিলাম আমার সর্বনাশ। লিখলে, তোমাকে চেয়েছি একথাটা আশ্চর্য্য রকম সত্যি। পাবো কি না তার হিসেব না-ই বা করলাম এখন। যদি ইচ্ছে হয় এসো ২০শে সন্ধ্যায়। বিশেষ তারিখের মর্য্যাদা আমার কাছে অল্প। তবু অনেকের কাছে "তারই মূল্যই" বা কম কী সে? ঐ দিনটা আমার জন্মদিন।

শর্মিলা জবাব পাঠাল না। হাজির হল এসে সশরীরে। হাতে একগুচ্ছ রজনী-গন্ধা। একটা ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি তার পরনে। এতো! সাজতে দেখেনি কোনো দিন সঞ্জয় ওকে। অবাক হল তাই। কিন্তু খুব একটা বিস্মিত হল না। কারণ, শর্মিলার এই খেয়ালীপণা তার অজানা নেই।

ওরা দু'জনে গেল আউটরামের বুফেতে। তখন শ্রাবণের সন্ধ্যা। গঙ্গার বুকে একটা নিথর ভেজা রাত্রির প্রতিচ্ছবি। তবুও বুফেতে লোকের অভাব নেই।

নদীর দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে আপন মনে হয়েছিল শর্মিলাকে। এত কাছে, এত তার মনের ঐশ্বর্য। এমন একান্ত করে সঞ্জয় আর কাউকে চায়নি। হাত ধরে সঞ্জয় বলেছিল, আমায় গ্রহণ করো তুমি শর্মি!

গলার স্বর আবেগে কাঁপছিল সঞ্জয়ের। পাশের টেবিলে বসেছিল

দুই বিদেশী প্রণয়ী। তাদের আলাপের দু'-এক টুকরো হীরে ঝকমক করছিল এই তরল সন্ধ্যায়। আউটরামের বুকেতে।

খুব ভাল লাগছিল দেখতে শর্মিলার। কী সুন্দর প্রাণোচ্ছল মেয়েটি!

কী নাম যেন? বিয়াত্রিচে।

ছেলেটিকে মিনতি করে বিয়াত্রিচে বলছিল, এ্যাকসেপ্ট মি মাই লভ। আই এডোর য়ু।

আই এডোর·····আই এডোর···

কথাগুলো বার বার ঘুরে-ফিরে কানে ভাসছিল শর্মিলার। কী সুন্দর আত্মনিবেদন! কই শর্মিলা তো কোনো দিন সঞ্জয়কে এমন করে প্রাণ-মন উজাড় করে দিতে পারেনি?

ততক্ষণে অধীর হয়ে উঠেছে সঞ্জয়।

—কথা বলো শর্মিলা! বলো তুমি আমায় গ্রহণ করলে?

শর্মিলার মনে তখন গঙ্গার স্রোতোধারা কলকলায়মান। অনেক দূরের উপল এসে জমেছে তার তীরে তীরে। বোটগুলো থেকে হ্যারিকেনের টিম-টিম আলো আসছিল ভেসে। ঢেউগুলো আছাড় খেয়ে পড়ছিল তার গায়ে।

অদ্ভুত অনুভূতিতে সঞ্জয়ের মনে পুলকের দোলা লাগছিল অকারণ। আর আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করছিল শর্মিলার জবাব।

শর্মিলা বলছিল, তুমি ভুল করেছো সঞ্জয় দা'! আমার সময় হয়নি। সময় আর হয়নি শর্মিলার! সঞ্জয় চলে গেল যুদ্ধে। সৈনিকের কড়া পোষাক চড়িয়ে লিবিয়ার ফ্রন্টে। মাঝখানে কেটে গেছে দীর্ঘ দশ বৎসর।

সঞ্জয় মাঝে মাঝে চিঠি পেতো শর্মিলার। শুভেচ্ছার চিঠি। নির্বিঘ্নে নিরাপত্তার প্রার্থনা। আর কিছু নয়। সঞ্জয়ের বার বার মনে হয়েছে শর্মিলা ভীরু। পিসিমণির লেক প্লেসের বাড়িতে শর্মিলা বন্দিনী। বদাউনের রাজকুমারীর মতো। লিবিয়ার মরুমৃত্তিকায় খেজুর বৃক্ষের তলায় পাতা ছাউনিতে বসে লেফ্টনায়েক সঞ্জয় সেনের বার বার এ কথাই মনে হয়েছে শর্মিলা ভীরু।

দুয়ারটুকু পেরোতেই যত সংশয় তার। কেন? সে তো হাত বাড়িয়েই আছে। এই দ্বিধা কাটাবার পথে তার এই প্রার্থিমনের আকুলতাই কি যথেষ্ট নয়?

কী এক অপার রহস্যে ঘেরা শর্মিলার জীবন! যুদ্ধের শেষে সঞ্জয় নানান জায়গায় ঘুরে এখন উদয়পুরে পোষ্টেড। আকস্মিক শর্মিলার চিঠি এল এমন সময়। তাই আজ সঞ্জয়ের এই আগ্রাযাত্রা!

আগ্রায় যখন এসে পৌছুল, সন্ধ্যা উতরেছে অনেকক্ষণ। শুক্লপক্ষে তাজমহল দর্শনার্থীদের ভীড়। অনেক দিন পর সঞ্জয়ের আগ্রা আসা। এই শহরটার ওপর সঞ্জয়ের কেমন জানি একটা দুর্বলতা জমে গেছে। এই ক'বছর উত্তর-ভারতে থেকে। আগ্রাতে লোকে আসে তাজমহলের আকর্ষণে। সঞ্জয় আসে ইতিহাসের মৌন প্রহরীর অনুভূতি নিয়ে।

এখানকার প্রতিটি পথ-ঘাট, ইট-পাথর ও মানুষগুলোর ওপর সঞ্জয়ের কেমন এক অদ্ভুত একাত্মতা! ফতেপুর সিক্রির ছায়াঘন চত্তরে বসে এখানেই সঞ্জয়ের জীবনের আরেকটি অবিনশ্বর অধ্যায় রচিত হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। যা শর্মিলার জানা নেই। আজ হয়তো সে কথা বলবার সময় হবে। আসবে সে নির্মম মুহূর্তের সুযোগ।

আধা আলো-ছায়ায় সঞ্জয় ষ্টেশন-গেটের পাশে বোগেন ভেলিয়া গাছের তলায় অপেক্ষা করছিল। আটটা পঁচিশে শর্মিলাদের গাড়ি ইন্ করল। সঞ্জয় ওভারকোটটা গায়ে চাপিয়ে তাকিয়ে রইল গাড়ীটার দিকে। দূর থেকেই লক্ষ্য করল। হ্যাঁ, শর্মিলাই। ওই তো তার স্বনামধন্যা পিসিমণি। একটা বন্ধ্যা নারীর রাহুদৃষ্টিতে যে শর্মিলার যৌবন নিঃশেষিত!

দূর থেকে দেখছিল সঞ্জয়। চেনা যায় না শর্মিলাকে। ত্রিশ বসন্তের হাহাকার তার নির্মম ছাপ এঁকে দিয়েছে শর্মিলার অবয়বে। চোখের নিচে পড়েছে দীর্ঘ নিশিজাগরণের ক্লান্তি। প্রতীক্ষায় শবরী তন্ময়তা।

এ-দিক ও-দিক তাকাতে তাকাতে শর্মিলা গেটের সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। মনে হল এখুনিই অঝোর কান্নায় ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু না। শর্মিলা নিজেকে শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। বিশালবপু পিসিমণি আসছিলেন পেছনে পেছনে কুলির মাথায় লটবহর চাপিয়ে। শর্মিলা ডেকে বললে, তুমি এসো পিসিমণি, আমি টাঙ্গা দেখছি।

সঞ্জয় তখনও দাঁড়িয়ে। বললে, কী মনে হচ্ছে! বলতে ইচ্ছে করছে না, মনে হল যেন 'পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ আসিতে তোমার দ্বারে।' নীচু গলায়। অনেকটা স্বগতোক্তির মত।

শর্মিলার ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ খেলে গেল। মনে হল, পথ যেন আর ফুরোয় না। এত দূরের পথ! এত দুর্গম!

কথা বলতে বলতে তারা এসে দাঁড়াল টাঙ্গা-ষ্ট্যাণ্ডে। ঘিরে ধরল কয়েকটা টাঙ্গাওয়ালা।

—আইয়ে বাবুজী! আইয়ে মেমসাহাব! বেঙ্গল হোটেল। বঙ্গালী বাবুলোগকোঁ লিয়ে বহুৎ মস্তুর মুসাফিরখানা।

একটা বিচিত্র কলরব!

তাদের থামিয়ে দিয়ে সঞ্জয় দুটো টাঙ্গা ভাড়া করল। ততক্ষণে পিসিমণি এসে গেছেন। শর্মিলা পরিচয় করিয়ে দিল।

—বিনীতার দাদা সঞ্জয়। তুমি দেখেছো তো? আমাদের বাড়ি গিয়েছিলেন মালার বিয়েতে? মালা শর্মিলার আরেক পিসির মেয়ে।

দোক্তাখাওয়া দাঁত বের করে পিসিমণি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, মনে পড়ছে তোমায়। পরে শর্মিলার দিকে তাকিয়ে বললেন, তা ভালোই হ'ল শমি! বিদেশে তবু যা হোক আপন জনার মুখ দেখা গেল!

শর্মিলার মনে লাগল কথাটা। একটা বিদ্যুৎ-ঝলকের মতো। সঞ্জয়দা' পিসিমণির কাছেও আপন জন।

শর্মিলাদের নিয়ে সঞ্জয় উঠলো বেঙ্গল হোটেলেই। এ হোটেলটা সঞ্জয়ের আগেকার চেনা। পাশাপাশি দু'টো ঘর।

সকালে চায়ের টেবিলে শর্মিলা বললে: ক'দিন থাকবে সঞ্জয় দা'! তাড়া নেই নিশ্চয়ই?

—তাড়া? তা আছে বৈ কি। সোমবার ফিরতে হবে আমাকে। হাতে মাত্র দু'টো দিন।

শর্মিলার চোখে ক্লান্তির ছাপ আরও গাঢ় হল।

শুক্লা ত্রয়োদশীর চাঁদের আলোয় সেদিন যমুনা টলমল। দীর্ঘ দশ বছর পর শর্মিলার সঙ্গে আবার মুখোমুখি বসল সঞ্জয় তাজমহলের সামনে। ভীড়ের কল-গুঞ্জন। কিন্তু সকলেই কেমন আপ্লুত! এক জ্যোৎস্না-প্লাবনের ধারায় আজকের সন্ধ্যাটিকে পরম রমণীয় মনে হচ্ছিল।

শর্মিলা কথা বললে না। বলতে গিয়ে বার বার কেঁপে উঠল তার ঠোঁট। কিন্তু আজকে তাকে বলতেই হবে। যার জন্যে এই সহস্র মাইল পথ চলা।

সঞ্জয় বুঝতে পারল। তাই নিজেই কথার চাড় ভাঙ্গল। কোনো কথা বলার নেই তোমার? আমি আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছি শর্মি! গ্রহণ করতে নয়। তোমায় মুক্তি দিতে।

শর্মিলা প্রায় চিৎকার করে সঞ্জয়ের মুখে চাপা দিল। বললে, চাই না। মুক্তি চাই না আমি। আমি ধরা দিতে এসেছি। নিয়ে চলো আমায়। আমার দশ বছরের প্রতীক্ষা। বুকে টেনে নিল শর্মিলাকে সঞ্জয়। চোখের জলে দু'-জনের বুক ভেসে গেল।

অনেক রাত্রিতে আগ্রার নির্জন পথে ধুলো মাড়িয়ে দু'জনে উঠে ফিরল হোটেলে। সে রাত্রে আর কোনো কথা হল না। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ঘুম নেই এই জ্যোৎস্নাস্নাত তাজমহলের মতোই সঞ্জয়ের চোখে। অস্থির পদ-চারণায় ঘরটিকে যেন কম্পিত করে তুলল সঞ্জয়।

প্রতারণা সে করবে না। কিন্তু আর তো উপায় নেই! তাকে বলতেই হবে। যতো রূঢ় হোক, যতো নির্মম হোক। শর্মিলা জানুক সঞ্জয় আর তার যোগ্য নয়। প্রতীক্ষার মর্যাদা সে দিতে পারেনি। তপশ্চারিণী নন্দিনীর সম্মান ধূলিসাৎ করেছে সে মুহূর্তের দুর্বলতা।

অনেক অস্থির ভাবনার পর মন স্থির করল সঞ্জয়। চিঠি লিখতে বসল সে। হাজার বার কুটি-কুটি করে দু'ছত্র লিখল—

"শমি,

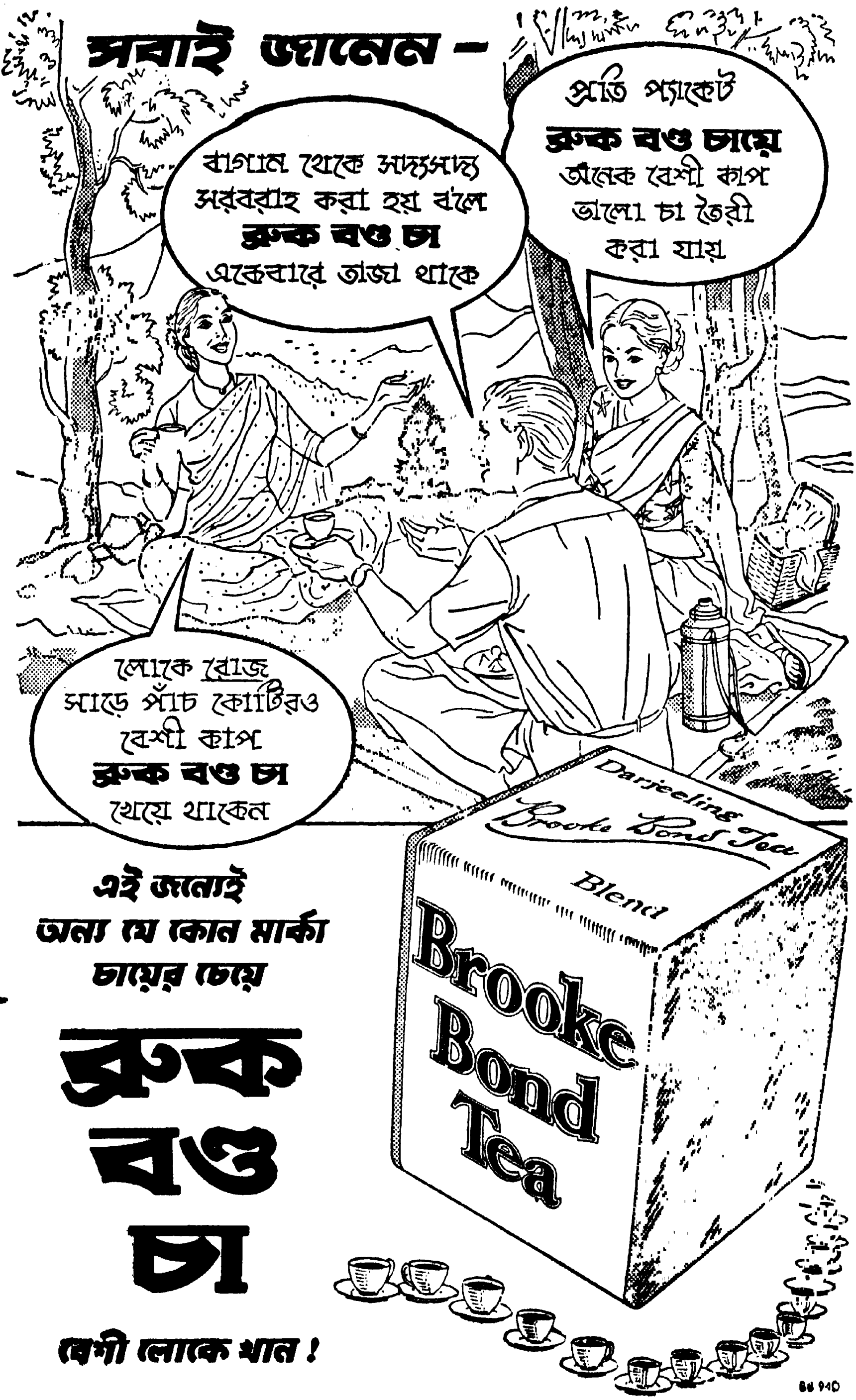
ক্ষমা করো আমায়। অসম্মান করেছি প্রতীক্ষার। আজ তিন বছর হল অনিচ্ছুক পিতৃদেব দায়িত্ব নিয়ে আমি পাঞ্জাবের একটি শরণার্থী মেয়েকে বিয়ে করেছি। গ্রাম্য মেয়ে। আবেগ নেই। আছে শুধু হৃদয়ের আকুলতা। উপায় ছিল না। বাধ্য হয়েই গ্রহণ করেছি। মানবিক করুণা বলতে পার। বলতে পার এক দুর্বল রজনীর প্রায়শ্চিত্ত। নাম তার রুক্মিণী।

তুমি আমায় হয়তো পশু ভাববে। রুক্মিণীও তাই ভাবতো না হলে।

সঞ্জয়।"

দোয়েল-ডাকা ভোরে কারো ঘুম না ভাঙ্গতেই সঞ্জয় কুয়াশার চাদর জড়ানো আগ্রার রাজপথে এসে নামলো। দ্রুত হেঁটে চলল ষ্টেশনের দিকে। ভোরের ট্রেণই ধরতে হবে।

শর্মিলা সারা রাত্রির জাগরণ-ক্লান্তিতে সবে ভোরের হিমছোঁয়া হাওয়ার দুলুনিতে ঘুমিয়েছে তখন। রোদ উঠবার অনেক দেরী।


সবাই জানেন—
বাগান থেকে সদ্যসদ্য সরবরাহ করা হয় বলে ব্রুক বণ্ড চা একেবারে তাজা থাকে
প্রতি প্যাকেট ব্রুক বণ্ড চায়ে অনেক বেশী কাপ ভালো চা তৈরী করা যায়
লোকে রোজ সাড়ে পাঁচ কোটিরও বেশী কাপ ব্রুক বণ্ড চা খেয়ে থাকেন
Darjeeling Brooke Bond Tea Blend
Brooke Bond Tea
এই জন্যেই অন্য যে কোন মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড চা
বেশী লোকে খান !

রূপালী পর্দার কাহিনী

পিকনিক

মূল লেখক : উইলিয়াম ইনজে

সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবারের পর আগামী কাল প্রথম মঙ্গলবার। লেবর ডে'র পরদিন প্রাতে উঠে তাই মনে হয় সবই আবার নতুন ক'রে সুরু করতে হবে, জীবনের সুরু, জীবনের শেষ, গ্রীষ্মের উত্তপ্ত দিনগুলি শেষ হয়ে এল।

কিন্তু সে ত' আগামী কাল, আজ ত' লেবর ডে, আজ এখনও গ্রীষ্মকাল, সোনালি দিনের শেষ মুহূর্ত, ম্যাজিক স্পর্শে সময় এখন স্তব্ধ, এখন সব ছেলেই তরুণ, সব মেয়ে তরুণী, যে কোনো মুহূর্তে যা কিছু ঘটতে পারে, এখনও গ্রীষ্মের উত্তাপ স্তিমিত নয়।

মিসেস্ পটস্ যখন তরুণী ছিলেন, সুন্দরী ছিলেন, সে অনেক দিনের কথা, কিন্তু এক দিন ত' তিনি যৌবন-ধন্যা ছিলেন আজকের দিনে সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে হয়। সকাল বেলা যে ছেলেটি কাজের সন্ধানে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল, সেই কথাই সে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। ছেলেটিকে ডেকে নিয়ে ব্রেকফাষ্টে পরিতৃপ্ত করেছেন মিসেস পটস্, এই তাঁর আনন্দ। বাড়িতে পুরুষ মানুষ থাকলে সবই কেমন বিচিত্র হয়ে ওঠে। নারী-রাজ্যে থাকলে নিজের নারীত্ব যেন ভুলে যেতে হয়।

হল কার্টার পেট ভরে খেয়ে মিসেস পটসের মুখের পানে তাকায়, চমৎকার মহিলা, আনন্দময়ী, দয়াময়ী সরলা নারী! দীর্ঘকাল এমন স্নেহের স্পর্শ সে পায়নি। প্লেটটি সরিয়ে রেখে হল বলে ওঠে—"এইবার আপনার বাগানের কাজ ধরবো।"

মিসেস পটস বললেন—"বাবা, এত খাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করলে ভালো হয় না?"

উঠে দাঁড়িয়ে ছ' ফিট লম্বা হল কার্টার বলে ওঠে—"কাজ করলে হজমের সুবিধা হবে ম্যাডাম!" এই বলে মিসেস পটস যেখানে আবর্জনা ফেলার টুল রাখেন মস্ত বোঝা নিয়ে সেই দিকে চলল, পিছনে চললেন মিসেস পটস।

কাঁধের ওপর টিনটি তুলে হল বলল—"আমার এক বন্ধুর সন্ধানে এসেছি, কলেজে একসঙ্গে পড়তাম, এইখানে থাকে, আপনি কি তাকে জানেন? তার নাম এলান বেনসন।"

মিসেস পটস বলে ওঠেন—"এলান বেনসন? সে ত' ঐ পাশের বাড়ির মেয়েটির কাছে আসে। জানি তাকে।"

পাশের বাড়ির প্রাঙ্গণের দিকে তাকিয়ে হল বলে, "তাই না কি?"

পাশের বাড়িটাও মিসেস পটসের বাড়ির মতই দেখতে, পাশাপাশি সব ক'টি বাড়িই এক ধরণের। সামনে পিছনে বারান্দা, বাংলো ধরণের বাড়ি। সামনেই রেল-রাস্তা, পাশের বাড়ির প্রাঙ্গণটি কিছু বড়ো, অসংখ্য হলিহক্ আর সূর্যমুখী ফুল ফুটে আছে। এক ধারে প্রকাণ্ড এক এল্‌ম গাছের ছায়ায় ষোলো বছরের মেয়ে মিলি সিঁড়িতে বসে বই পড়ছে।

তার মাথার ওপর একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ এসে পড়ল, সচকিত মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে—"ষ্টুপিড, এই বম্‌বার বাড়িটা কি ভেঙে ফেলবে নাকি?"

খবরের কাগজ-বোঝাই বাইকটা বাগানের দেয়ালে হেলান দিয়ে রেখে বম্‌বার গেট খুলে ভেতরে আসে, উদ্ধত ভঙ্গীর বালক, মুখে চটুল হাসি। হাসিটা পাঠরতা সরলা মিলির উদ্দেশ্যে নয়, তার চেয়ে তিন বছরের বড়ো দিদি ম্যাজে। উদ্দেশ্যে এই হাসি, সে এতক্ষণে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে। কিঞ্চিৎ সলজ্জ ভঙ্গীতেই ছেলেটি বলে ওঠে—"মর্নিং ম্যাজ!"

সদ্যধৌত চুল হাত দিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ম্যাজ সিঁড়ি বেয়ে নেমে

এল, অসংস্কৃত চুল আর উজ্জ্বল চোখ ছুটি দেখে মনে হয়, ম্যাজ কন্সাস অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী। সে উত্তরে বলে—"হ্যালো, বম্বার।"

বম্বার বলল—"বেনসন চলে যাওয়ার পর চলো এক দিন এক-সঙ্গে আমরা একটু বেড়িয়ে আসি।"

পাশের বাড়ি থেকে উৎকর্ণ হয়ে নামটি শুনলো হল কার্টার, আরো ভালো করে শোনার জন্য সে এগিয়ে আসে।

ম্যাজ বলল—"ভাঁড়ামি করতে হবে না, পালাও।"

বম্বার ছাড়বার পাত্র নয়, সে বলে ওঠে—"আমি বাবা দেখছি ওর ক্যাডিলাক গাড়িতে তুমি রাণীর মত বসে আছ। সব সুন্দরী মেয়েদের কি ওরাই শুধু টেনে রাখবে?"

ম্যাজ উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে—"আমি ওসব টানাটানির ভেতর নেই।"

বম্বার তার হাতটি ধরে বলে—"চলো ম্যাজ, ওকে না হয় এক দিন ছুটি দাও।"

রাগে চীৎকার করে ম্যাজ, "ছেড়ে দাও বলছি, ভালো হবে না।"

হল এদিকে এগিয়ে এল, সে বলে ওঠে—"ওহে, প্রেমিক-প্রবর, পথ দেখ।"

ম্যাজের ছোট বোন মিলি বইয়ের পাতা থেকে চোখ উঠিয়ে বেশ আগ্রহ ভরে দেখছিল, সে এইবার চেঁচিয়ে ওঠে, "পালাও, কাগজপত্র নিয়ে পালাও।"

বম্বার মুখ তুলে হলের দিকে তাকায়। কি চেহারা! তারপর তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে পালায়, বলে—"আমার দেরী হয়ে গেল।"

মেয়ে ছুটি সজোরে হেসে উঠল।

ম্যাজের চোখের পাতায় হলের চোখ পড়ল, হল বলল—"হাই।"

ম্যাজ জবাব দেয়—"হাই।"

সেই শান্ত এবং গ্রীষ্মতপ্ত সকালে সব যেন কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গেল, এমন কি নিষ্কম্প এলম গাছটিও। এমন সময় দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন ম্যাজের মা, ফ্লো ওয়েনস্। চমৎকার সতেজ ভঙ্গী, মেয়েদের চেয়ে বেশী বয়স বলে মনে হয় না। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় মিসেস্ ওয়েনস্ বলছিলেন—"এখন তোমরা একটু সাহায্য না করলে সব পিকনিকের স্যাণ্ডউইচ করি কি করে?" এমন সময় বিশালাকৃতি হলের দিকে নজর পড়তে তিনি চুপ করলেন। তারপর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করেন—"তুমি কি চাও বাছা!" তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ পরিস্ফুট।

অতি ম্লান গলায় হল বলে ওঠে—"কিছু না ম্যাডাম, এমনই ঘুরছি।"

অত্যন্ত বিরক্তি ভরে হলের মুখের পানে তাকিয়ে মিসেস ফ্লো বললেন,—"আমরা আজ বড় ব্যস্ত, অনেক কাজ আছে, বাজে কথা বলার সময় নেই।" মিলিকে বাড়ির ভেতর যেতে বলে মিসেস ফ্লো রান্নাঘরের দিকে চললেন।

ম্যাজও ভেতরে যাওয়ার উদ্যোগ করে, কিন্তু সেই সময় একটা গুডস্ ট্রেণ ছুটে চলেছে, থমকে দাঁড়িয়ে ম্যাজ সেই দৃশ্য দেখতে থাকে।

ম্যাজ বলল—"যখন ট্রেণ যায়, তখন আমার মনে হয় যেন সম্রাট চলেছেন।"

হলের বাণী স্তব্ধ হয়ে গেছে, সে ধীর গলায় শুধু বলল—"অমনই এক মাল-গাড়িতে চড়েই আমি এখানে এসে নেমেছি।"

অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ম্যাজ বলে ওঠে—"ও মা, তাই নাকি?"

"অভাবে পড়লে সবই করতে হয়।"

ম্যাজ অপ্রস্তুতের ভঙ্গীতে বলে—"না না, তা নয়, আমি ভাবছিলাম ব্যাপারটি কেমন মজার।"

এমন সময় রান্নাঘর থেকে মিসেস ওয়েনস হাঁকেন—"ম্যাজ!"

ম্যাজ পিছন ফিরে তাকায়, তার পর মার্জনাপ্রার্থী হয়ে বলে—"আমাকে যেতে হবে।"

হল ম্লান গলায় বলে—"আচ্ছা, আবার দেখা হবে।"

মিসেস পটসের কাজ সেরে হল এলান বেনসনের সন্ধানে ছুটলো। এলানকে খুঁজে বার করা যতটা কঠিন হবে মনে করেছিল তা নয়, এই অঞ্চলের সবাই ওদের বাড়ি জানে। বিরাট প্রাসাদ, 'বেনসন হাউসে'র চার পাশে প্রকাণ্ড সবুজ মাঠ। বিভিন্ন গাছপালা আর নানা রকমের ফুল। বাড়ি দেখলে ভয় করে। অতি কুণ্ঠিত চিত্তে বেলটা টিপল হল, কে জানে, এলান কি তাকে এত দিন পরে চিনতে পারবে?

দরজা খুলেই সামনে হলকে দেখে বুকে জড়িয়ে ধরল এলান—"আরে হল কার্টার!" তার পর কিছুক্ষণ চলল পারস্পারিক বিচিত্র

অভিবাদন, কলেজী-জীবনের বিচিত্র ভাষায় উভয়ের কথাবার্তার অর্থ বোঝা শক্ত, হাসি, ঠাট্টা আর মারামারি।

"হল কার্টার।" সেই হল, এক বছর রুমমেট হিসাবে কাটিয়েছে এরা। ফুটবল দলের হিরো, সকলের ভালোবাসা ও প্রীতির পাত্র। সেই প্রশস্ত কাঁধ, সেই পেশীবহুল হাত, রৌদ্রদগ্ধ মুখে সেই মনোহর হাসি। এলান প্রশ্ন করে—"কোথায় ছিলি ভাই এত দিন?"

গালে হাত বুলিয়ে ইতস্তত করে হল বলে—"বাড়ি ফিরে কিছু দিন পেট্রল-ষ্টেশনে কাজ করেছিলাম, তার পর লড়াই বাধলো, আর্মিতে যোগ দিলাম।" মনে মনে ভাবে হল, দাড়িটা কামানো থাকলে ভালো হত।

এলান প্রশ্ন করে, "আমি শুনেছিলাম তুই হলিউডে গেছিস্, মুভী হিরো!"

হল ম্লান গলায় বলে—"হ্যাঁ, ভাই, একটা ভালো চানস্ পেয়েছিলাম, ওরা নাম দিয়েছিল ব্রাস কার্টার।"

হলের মুখে সরল ও সলজ্জ হাসি। তার পর একটু থেমে আবার বলে—"নেভাদায় একটা কাজ পেয়েছিলাম, নেভাদা থেকে টেক্সাস, তার পর টেক্সাস্ থেকে,—" কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে হল, তার পর বলে, "ভাবছিলাম, তুমি বা তোমার বাবা যদি আমাকে একটা কাজকর্ম দাও।"

চিন্তিত মুখভঙ্গী করে এলান বলে, "আচ্ছা বাবাকে বলবো, বোধ হয় তিনি একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন।"

হল বাধা দিয়ে বলে—"একটা চমৎকার অফিস, টাই এঁটে বস্‌বো, সুন্দরী সেক্রেটারী থাকবে, টেলিফোনে বিষয়-কর্মের কথা বলবো—" স্বপ্ন থেকে সরে এসে ভীত-চকিত কণ্ঠে হল আবার বলে—"একটা কিছু আমাকে করতেই হবে।"

এলান ওর পিঠে চাপড় দিয়ে বলে—"নিশ্চয়ই। এখন চলো সাঁতার কাটতে যাবো। দু'-চার জন মেয়েও থাকবে।"

হলের মনটা আবার সজীব হয়ে ওঠে—"সে বলে, মেয়েরা থাকবে?"

এলানের চোখে আনন্দের ছাপ, সে বলে—"আমার বান্ধবীটিকে দেখলে অবাক হবি। একেবারে অবিশ্বাস্য!"

স্বপ্নাবিষ্টের মত মাথা নেড়ে হল বলে—"জানি, তার নাম ম্যাজ।"

এলান তার দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে।

ম্যাজের নতুন পোষাকটি পুরুষের দৃষ্টিতে বিচার করার চেষ্টা করছেন মিসেস ফ্লো। বললেন—"তোমার কি মনে হয়, এ পোষাক এলানের পছন্দ হবে?"

পোষাকটিতে হাত বুলিয়ে ম্যাজ বলে ওঠে—"নিশ্চয়ই, আমার ত' চমৎকার মনে হচ্ছে!"

ফ্লো ওয়েনস্ সন্তুষ্ট হলেন, কিন্তু মেয়ের পছন্দের চাইতে এলানের পছন্দটাই তিনি চিন্তা করছেন বেশী। এলান কি তাঁর মেয়েকে পছন্দ করবে? আজ-কাল এই একটি চিন্তাই তাঁর মনকে আকুল করে রেখেছে। ম্যাজের অঙ্গে জামাটি ফিট্ করতে বসে এই চিন্তাই প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর মনে। তিনি সোজাসুজি বলে ওঠেন—"এলানের সঙ্গে তোমার বিয়ে হ'লে চমৎকার হবে"। এই পর্য্যন্ত বলে চুপ করে রইলেন, ম্যাজ কিন্তু কিছুই বলল না। মিসেস ওয়েনস্ বললেন—"ম্যাজ, তুমি মা একটু উঠে-পড়ে লাগো"।

"উঠে-পড়ে আবার কি লাগবো মা?"

"চিরদিন কেউ সুন্দরী থাকে না, কয়েকটা বছর মাত্র, অল্প বয়সে যে সুযোগ আসে সেই সুযোগ নষ্ট হলেই সব গেল, সৌন্দর্য্যের আর কোনো দাম থাক্‌বে না।"

ম্যাজ আয়নার দিকে তাকায়, নিজের প্রতিবিম্ব ভালো করে দেখে। সহসা সচকিত হয়ে সে বলে ওঠে—"এই ত সবে আমার উনিশ বছর বয়স মা?"

"আস্‌ছে বছর এমন সময় কুড়ি, তারপর একুশ, তারপর চল্লিশ"।

ম্যাজ হাত দিয়ে মুখটা ঢাকলো।

পরবর্তী কথা সংহত করলেন মিসেস ওয়েনস। দরজা থেকে মুখ বার করে রোজমেরী সিডনী বললেন—"আমি আর দুপুরে খাওয়ার জন্য বাড়ি ফিরব না, মিসেস ওয়েনস্"। ওয়েনসদের বাড়িতে থেকে রোজমেরী হাইস্কুলে শিক্ষিকার কাজ করেন। "নতুন মেয়েদের সম্বর্দ্ধনা জানাবার জন্য হোটেলে পার্টি আছে।" ম্যাজের নতুন পোষাকটির দিকে নজর পড়তেই রোজমেরী বললেন—"লাভলী, ভারী চমৎকার। ম্যাজ, সবাই আজ তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে।"

মিলি এদিকে আসছিল, রোজমেরীর জন্য পথ ছেড়ে দিয়ে এক পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর যেন কাউকে উদ্দেশ না করেই বলে—"আপনার মতে তাহলে কে কি পরে, ছেলেরা সেইটাই দেখে?"

দিদির দৃষ্টিতে মিলির পানে তাকিয়ে ম্যাজ বলে—"মেয়েরা কি পরে, কি করে, কেমন দেখতে, এমন কি গায়ের গন্ধটি পর্যন্ত ছেলেরা বিচার করে।"

মিসেস ফ্লো হুঙ্কার দিয়ে বলে ওঠেন—"মেয়েরা, এখন থেকেই লড়াই সুরু কোরো না, অনেক কাজ আছে—"

কিন্তু লড়াই বেধে গেল।

মিলি ব্যঙ্গ করে বলে—"লা-ডে-ডা, ম্যাজ সুন্দরী,—কিন্তু মাথায় গোবর পোরা, তাই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে"।

ম্যাজ চীৎকার করে ওঠে—"কখনই নয়।"

"এমন কি মিস সিডনীর কাছে সর্টহ্যাণ্ড পাশ করতেও পারেনি।"

ম্যাজ ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বলে—"বেরো—বেরো বল্‌ছি।"

মিলি ম্যাজকে চেপে ধরে বলে—"শীগগির মাফ চাও, নইলে খুন করবো।"

মিলির মা বলেন—"ছিঃ, ও তোমার দিদি হয়, ও-কথা বলতে নেই।"

—"ও সুন্দরী, ওকে বাঁদর বল্‌লেও কিছু এসে-যায় না।" এই বলে মিলি ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মিসেস ওয়েলস্ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেন—"আহা, বেচারী মিলি!"

মিলির বরাতটা খারাপ, পিতৃহীন বাড়ীতে সে মানুষ হচ্ছে, ওর চেয়ে ম্যাজের অবস্থা অনেক ভালো, আজ বাদে কাল বিয়ে হয়ে যাবে।

ম্যাজ সখেদে বলে—"সবাই বলে বেচারী মিলি! আর চার বছর ধরে সে স্কলারশিপ পেয়ে আস্‌ছে।"

মিসেস ওয়েলস্ বললেন—"মিলির মত মেয়েদের জন্য উৎসাহও চাই। তোমার মত সুন্দরী হ'লে ভাবনা ছিল না।"

ম্যাজ বলে—"মা, শুধু শিমুল ফুলের মত সুন্দর হয়ে লাভ কি বলো ?"

মিসেস ওয়েলসের চোখে জল আসে, অতীত যেন আজ সামনে এসে প্রতিধ্বনিত। তাঁর নিজের ঠোঁটও যেন এই প্রশ্নই করছে, অনেক আগেও করেছে। নিজের হৃদয়ে তাই আজ ঝড় উঠেছে।

খাওয়ার সময় কিন্তু সব কলহ মিটে গেল। দুই বোনে আবার ভাব হয়েছে, ম্যাজ আর মিলি দুজনকে মিসেস ওয়েলস্ সাঁতারে পাঠালেন। নিরালায় বসে তিনি পিকনিকের সাজসজ্জায় বসলেন। তার পর বারান্দায় বসে মনে মনে প্রার্থনা করেন—মেয়েদের জীবন যেন তাঁর মত ব্যর্থ না হয়, অবুঝের মত ভালোবেসে ভালোবাসার খেলায় অতি উচ্চ মূল্য তাঁকে দিতে হয়েছে।

কিছুক্ষণ পরে রোজমেরী সিডনী ফিরে এসে মিসেস ওয়েলসের সামনে দোলনায় বসলেন।

মিসেস ওয়েলস্ বললেন—"হাওয়ার্ড ফোন করেছিল।"

নিষ্প্রাণ গলায় রোজমেরী শুধু বললেন—"তাই নাকি !"

মাথা থেকে টুপিটা খুললেন, পায়ের জুতো ছুঁড়ে ফেললেন, চোখ বুজে হাওয়া খাচ্ছেন রোজমেরী। মধ্যাহ্ন ভোজনটা একটু বেশী হয়েছে। এক ঘর সঙ্গিহীন মেয়ের সঙ্গে বসে প্রাণহীন ভোজ। এখনও রোজমেরীর অবশ্য সেই অবস্থা না হলেও, সে দিন আসন্ন। এই ত' হাওয়ার্ড রয়েছে, গোলগাল পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স। তবু সে পুরুষ। নিরীহ, গো-বেচারা মানুষ। এমন দিন আস্‌বে, যখন হাওয়ার্ডকেও আর পাওয়া যাবে না।

রোজমেরীর চিন্তিত মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকেন মিসেস ওয়েলস্, এত চুপচাপ থাকার মানুষ রোজমেরী নয়। তিনি বললেন—"তাড়াতাড়ি পোষাকটা বদলে নিন, এখনই হাওয়ার্ড এসে পড়বেন।"

রোজমেরী উঠে দাঁড়িয়ে জিনিষপত্র গুছিয়ে নেয়,—"হাওয়ার্ডের জন্য পোষাক বদলাতে আর কত সময় লাগবে ?" ঘরের ভেতর যেতে যেতে রোজমেরী মনে মনে ভাবে—ও যদি আজও মদ খেয়ে থাকে তাহ'লে ওর সঙ্গে আমি যাবো না কিছুতেই।

হাওয়ার্ড কিন্তু বলল—"এক ফোঁটা মদ না পান করলে পিকনিক, পিকনিকই নয়।" পিকনিক ক্ষেত্রে পৌছবার ভিতর রোজমেরীও কোটের আড়ালে দু' পাত্র মদ টেনে নিয়েছে।

ইতিমধ্যে আর সবাই পিকনিকের মাঠে পৌঁছে গেছে। যে যার খাদ্যদ্রব্যের বোঝা নামাচ্ছে, কেউ টিফিন ক্যারিয়ার খুলতে সুরু করেছে। একটা গাড়িতে এলান বেনসন, ম্যাজ, তার মা ফ্লো ওয়েলস আর প্রতিবেশিনী মিসেস পটস্ প্রচুর জিনিষ-পত্র নিয়ে এলেন, হল এলানের আর একটি গাড়িতে মিলিকে নিয়ে এল, দু' জনের ভারী ভাব হয়েছে। চমৎকার একটি ছায়াঘেরা অঞ্চল নির্বাচিত করে সবাই বসল। পাশেই একটি ছোট্ট নদী,—ওদিকে বেসবলের মাঠ, সেই-খানেই খেলাধুলার প্রতিযোগিতা বসবে। সন্ধ্যাবেলার বক্তৃতা এবং নৃত্যের জন্য চমৎকার ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ড আর পালিশ-করা নৃত্যভূমি।

হল দাড়ি কামিয়েছে, এলানের দেওয়া নতুন পরিচ্ছদে সেজেছে, মনে তার আনন্দ জেগেছে। এমন একটা আনন্দ-মেলা যে কখনও দেখেনি। ছোট ছেলের মত সে খুসী।

মিলিকে উদ্দেশ করে হল বলে ওঠে—"এই খুকী! সাবধান!"

মিলিও গাম্ভীর্য্য হারিয়ে 'গেট সেট, গো'—বলে চেঁচায়। আর হল দৌড়ায়। মিলি চেঁচায় "গো-গো"—

এর পর দীর্ঘ সময় ধরে পান-ভোজন চলে। হল সানন্দে বলে ওঠে—"আমার জীবনে এত আনন্দ অনেক দিন পাইনি।" এমন সময় সহসা চোখে পড়ে রোজমেরী অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

তার পর নেহাৎ অতর্কিত ভাবে হেসে বলে ওঠে—"অমন বুট-জোড়া কোথায় পেয়েছ ?"

হল সচকিত হয়ে বুটের দিকে তাকায়, হাতে পেটা চামড়ায় তৈরী, নতুন নয়, তবে অল্প দামেরও নয়। ম্লান গলায় হল বলে—"বাবা মৃত্যু কালে আমাকে দিয়ে গেছেন।"

রোজমেরী রূঢ় গলায় বলে ওঠে, "ব্যস, ঐ পর্য্যন্ত! একজোড়া বুট !"

হল এক মুহূর্ত রোজের মুখের দিকে তাকিয়ে ধীর গলায় বলল, "রাত্রে বিছানায় বসতেন, আমি পা থেকে বুটটা খুলে দিতাম, তিনি বলতেন খোকা, এমন দিন আসছে যখন শুধু 'মানুষ' এই পরিচয়টুকু ছাড়া গর্ব করার মত তোমার আর কিছুই থাকবে না।"

উঠে দাড়াল হল, শুকনো মাটিতে ওর ভারী বুটপরা পায়ের আওয়াজ শোনা যায়, মর্যাদামণ্ডিত মুখে দীপ্তভঙ্গীতে হল বলে—"এই বুট-জোড়া বাবা পরতে বলেছিলেন, লোকে পায়ের আওয়াজ পেয়ে বুঝবে কে আসছে, হাতের মুঠো শক্ত করে রাখবে, লোকে

বুঝবে কাজের লোক"। মাথা আনত করল হল, পরলোকগত পিতার ওপর তার অসীম শ্রদ্ধা।

সকলের মুখের দিকে তাকাল হল, কেউ কথা বলে না। রোজমেরীর দৃষ্টি অতি উজ্জ্বল। হাওয়ার্ডের স্বচ্ছ দৃষ্টি হলের মুখে নিবদ্ধ, এলান উদ্বিগ্ন, ফ্লো ওয়েলস্ কঠিন, পটস্ সস্মিত, আর মিলির চোখে প্রশংসা ও আনন্দ পরিস্ফুট।

সহসা ম্যাজের চোখে হলের চোখ পড়ল। কোমল গলায় হল বলে ওঠে—"হাই—!"

ম্যাজ হেসে বলে—"হাই"!

দিন শেষ হয়ে আসছে, দিনের আলো ম্লান গোধূলিতে পরিণত। ব্যাণ্ড ষ্ট্যাণ্ডের কাছে তারা গান করছে। জীবনের অনেক বসন্তের গান একে একে যেন ভেসে আসছে। ক্ষীণ এবং করুণ-মধুর! অরণ্যে ছায়া নামে, ক্রমে গভীরতর হয়ে ওঠে, সেই ছায়াঘেরা অন্ধকারে কারা যেন হাতে হাত ধরে বিচরণ সুরু করেছে।

হাওয়ার্ডের হাত ধরে দাঁড়িয়েছিল রোজমেরী, সহসা তার সারা দেহে কাঁপন লেগেছে। সে বলে ওঠে—"কি চমৎকার দৃশ্য, সূর্যাস্তের দিকে চেয়ে দেখ হাওয়ার্ড!" পশ্চিম আকাশে আগুন লেগেছে যেন, আকাশে, নদীতে, অরণ্যে সর্বত্র সেই লেলিহান বহ্নির উজ্জ্বল আলো। হাওয়ার্ড মাথা নেড়ে শুধু বলে—"সূর্যাস্ত চিরদিনই সুন্দর।"

রোজমেরী মৃদু গলায় বলে—"দিন যেন শেষ হতে চায় না, যেন মিনতি জানাচ্ছে।" সে আবার বেপথুমতী। এই দিনটির সঙ্গে বসন্তের দিনও চলে যায়। রোজমেরীর সহসা মনে হয় আর এক পাত্র মদ্যপান প্রয়োজন।

হল আর মিলি যখন ওদের কাছে এসে দাঁড়ালো তখন আর আলো নেই, এক একটি তারা ফুটে উঠছে। জলের ধারে মঞ্চে নাচ সুরু হয়েছে। একটু পরেই কুসুমাচ্ছাদিত ময়ূরপঙ্ক্ষী চড়ে এই বছরের "নীওল্লার রাণীর" আগমন বিঘোষিত হবে।

হল প্রশ্ন করে "নীওলাটা কি?"

মিলি জবাব দেয় "হ্যালো উইন" কথাটি উলটে দিলে ঐ হয়। প্রতি বছরই বিরাট করোনেশন উৎসব হয়।"

চড়া বাদ্যে কণ্ঠস্বর ডুবে যায়। তখন অতি উজ্জ্বল আলোক সম্পাতে 'ময়ূরপঙ্ক্ষী' নজরে পড়ল। মিলি চীৎকার করে ওঠে—"ম্যাজ।"

হলের মনে হল, ওর বুক বুঝি ফেটে যাবে। হাওয়ার্ড কনুই দিয়ে খোঁচা দেয়। বলে, "আমি তাই মনকে বলি,—বৎস হাওয়ার্ড যা চাও তা চোখ ভরে দেখে নাও, বামনের ত চাঁদে অধিকার নেই।"

হল মৃদু গলায় বলে "বুঝেছি, বেনসন নিশ্চয়ই ভাগ্যবান, এমন মেয়েকে বিয়ে করা ভাগ্যের কথা।"

রোজমেরী এগিয়ে এসে সন্দেহাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করে—"কি কথা হচ্ছে?

হাওয়ার্ড বলে—"এই আবহাওয়ার কথা—।"

"তাই নাকি! মিথ্যে কথা।"

ময়ূরপঙ্ক্ষী এখন চোখের আড়ালে—নদীও অন্ধকার, নাচের মঞ্চ থেকে কিছু আলো এসে তার ওপর পড়েছে। দূর থেকে সুর [illegible] ভেসে আসছে।

রাজকীয় কর্তব্য শেষ হতে ম্যাজ ব্রীজ পার হয়ে ধীরে ধীরে এপারে চলে এল। হলের কাণ্ড দেখে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই হলকে দেখছে। সবাই তার পানে তাকিয়ে আছে। মিলি, হাওয়ার্ড রোজমেরী। হল একাই নাচছে। এমন তার ছন্দোবদ্ধ নাচ যে মনে হয় যেন সুর তার সেই নৃত্যে তরঙ্গায়িত। ধীর মধুর, সে অতীন্দ্রিয়। সেই নৃত্য দেখে ম্যাজের মনে হল সুর যেন তার দেহেও সংক্রামিত হয়েছে। এই অবস্থা যে সম্ভব তা ম্যাজের জানা ছিল না।

তার দিকে চোখ পড়তেই হল চেঁচায়—"হাই।"

মন্ত্রমুগ্ধের মত স্বপ্নাবিষ্ট ম্যাজ হলের দিকে এগিয়ে আসে। তারপর পরস্পর বাহুলগ্ন হয়ে অপরূপ নৃত্যে মগ্ন হল, যেন দু'টি প্রাণী একাত্ম হয়ে গেছে, এই গ্রীষ্ম রজনীতে উভয়ে একা, আশেপাশে কেউ নেই।

রোজমেরী মৃদু গলায় হাওয়ার্ডকে বলে, "তুমি কেন অমন করে নাচতে পারো না?" হাওয়ার্ড সবিস্ময়ে রোজমেরীর দিকে তাকায়—বলে—"প্রিয়ে, আমি ব্যবসা করে খাই, নাচের কি বুঝি?" হলের নাচের অনুকৃতি করে রোজমেরী নাচ সুরু করে, তার নাচে কিন্তু সুর নেই, আছে ভয় আর হাওয়ার্ডের আনা মদ্য। পা টলে গেল, হোঁচট খেল, তার পর সহসা ম্যাজ যৌবনধন্যা বলে বিশেষ ঈর্ষিত হয়ে উঠল।

হাওয়ার্ডের আকৃতি বিশ্রী এবং তার বয়স হয়েছে বলে রোজমেরীর ভীষণ রাগ হয়। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার জানায়, এই মানুষটাকে ধরে থাকতে হয়েছে এই তার দুঃখ। হলকেও ঘৃণা করে, হলের তারুণ্য ওর কাছে পীড়াদায়ক, সমগ্র অতীতকে মনে করিয়ে দিচ্ছে হলের এই দেবশিশুর মত তরুণ দেহ। আজ রোজমেরীর যৌবন নেই, অনেক দেরী হয়ে গেছে।

পশুর মত হিংস্র থাবা মেলে রোজমেরী ম্যাজের বাহুবন্ধন থেকে হলকে মুক্ত করে টেনে নেয়, বলে—"এইবার আমার সঙ্গে নাচের পালা—আমি স্কুলটিচার বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে নাচতে পারব। এস—" ভয়ে হল পিছিয়ে যায়,—"মাদাম—"

কিন্তু রোজমেরী তাকে আঁকড়ে ধরেছে,—ধ্বস্তাধ্বস্তির ফলে সার্ট ছিঁড়ে যায়, অর্ধেক অংশ রোজমেরীর হাতে রইল।

চতুর্দিকে অসীম স্তব্ধতা! হাওয়ার্ড এগিয়ে এসে বলে—"ওদের ছেড়ে দাও, ওরা তরুণ।"

রোজমেরী বীভৎস দৃষ্টিতে তার পানে তাকায়—"তরুণ—কাঁচা বয়স—আশ্চর্য! ওরা তরুণ—।"

তার পর আবার হলের কাছে দৌড়ে গিয়ে বলে—"কি ভেবেছ তুমি?, ওই বুট পায়ে দিয়ে তুমি ঘুরে বেড়াবে, সারা দেশের মালিক তুমি। সব মেয়েমানুষ তোমার জন্য পাগল। আমি কিন্তু সে দলের নই। তোমাকে আমি গ্রাহ্য করি না।"

যা ঘটে গেল তারপর আর পিকনিক ক্ষেত্রে থাকা হলের পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিঃশব্দে এসে এলানের গাড়িতে বসল। হঠাৎ দেখে, ম্যাজ এসে দাঁড়িয়েছে। হল ম্যাজকে বলে—"দেখ, আমার মেজাজ আজ অতি খারাপ। তুমি বাড়ি যাও।"

ম্যাজ কিছু বলে না। নীরবে গাড়িতে এসে বসে।

হল বলে ওঠে, "বেশ, এ দায়িত্ব তোমার—"

সেই রাত্রের অন্ধকারে গাড়ি ছুটে চলে।

হলের মুখ থেকে তার অতীত কাহিনী শুনে মন্ত্রমুগ্ধের মত ম্যাজ তাকে চুম্বনে অভিষিক্ত করে।

"কি করছ খুকী!" বিস্মিত হল বলে ওঠে।

"সুন্দরী, সুন্দরী শুনে আমার কান পচে গেছে।"

দূরে নৈশ স্তব্ধতা ভেঙে মালগাড়ি ছুটে চলে।

ম্যাজ বলে, "এইবার আমাদের যেতে হবে।"

"তাই নাকি!"

ভোর হয়ে আসছে। ম্যাজ আর হল ওয়েনস্‌দের বাড়ি এসে পৌঁছল।

হল প্রশ্ন করে, "কি করে ভেতরে যাবে?"

"রান্নাঘরের দরজা খোলা থাকে।"

ম্যাজের হাতে চুমা খেয়ে হল বলে—"কেমন আছো? তুমি কি আনন্দে আছো? তোমাকে অসুখী দেখে আমি বাঁচবো না।"

এক মুহূর্ত পরে ম্যাজ বলে—"তুমি বরং এখন যাও।" মাটির দিকে চেয়ে ধীর গলায় ম্যাজ আবার বলে, "আমরা কেউ এত দূর হবে ভাবিনি।"

"কখন আবার দেখা হবে?"

"জানি না।"

পরদিন প্রভাতে হাওয়ার্ড এসেছে রোজমেরীকে নিতে। সেই সঙ্গে এসেছে হল।

ম্যাজের শুষ্ক মুখ এমন সময় সিঁড়ির নীচে দেখা গেল। মিসেস ওয়েনস বললেন—"ম্যাজ, এলান ফোন করেছিল—সে তোমাকে ক্ষমা করেছে।"

বাইরে হল দাঁড়িয়েছিল। সে বলে—"ম্যাজ, আমি চলে যাচ্ছি। তুলসায় গিয়ে একটা চাকরী পেয়ে যাব। কিন্তু ম্যাজ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। 'ভালোবাসি' এই কথাটা আরো আগে ভাবিনি।"

ম্যাজের কণ্ঠস্বর অশ্রুতে রুদ্ধ।

এদিকে একখানি গুডস্‌ ট্রেণ এসে গেছে। হল দৌড়ে গিয়ে সেই ট্রেণের ছাতে উঠে পড়ে। দূর থেকে তার কণ্ঠস্বর শোনা যায়—"ভালোবাসি—ভালোবাসি।"

কিছু পরেই স্যুটকেশ-হাতে ম্যাজ বেরিয়ে এল। মিসেস ওয়েনস অনেক অনুনয় করলেন। মিলি বলে, "দিদি, জীবনে একটা ভালো কাজ কর। টাকার কুমীরকে বিয়ে না করে, যাকে মন চায় তার কাছে যাও।"

ম্যাজ ধীরে ধীরে বাসে উঠে পড়ে। সেই বাস তুলসায় যাবে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরে বাস সেই সুদীর্ঘ মালগাড়ির কাছাকাছি পৌঁছেছে।

অনুবাদ : ভবানী মুখোপাধ্যায়।

অভিসার

শ্রীশান্তি পাল

এসেছে আষাঢ়, বলাকার হার
গলায় পরিয়া আজি।
বন-বীথি হ'ল স্নিগ্ধ-মেদুর
শ্যামপল্লবে সাজি।
নব বরষায় নয়ন-আসার
কোন্ প্রিয়া লাগি ঝরে বার বার,
বাতাসে হারান গানখানি কা'র
উঠে ক্ষণে ক্ষণে বাজি'?
আষাঢ় এসেছে আজি।
কোন্ সে তন্বী গোপন অধরে
বিজলী ঝলকে হাসে?
মেঘ-মাতঙ্গ বৃংহণ তুলি
কাহারে কী সম্ভাষে!
চম্পক-যূথী ভেবে হ'ল সারা,
কেতকী-কদম হ'ল রেণুহারা
পেয়ে অকরুণ ঝঙ্কার সাড়া
মল্লিকা মরে ত্রাসে!
বিজলী ঝলকে হাসে।
ধরণীর বুকে নেমেছে আজিকে
সজল অন্ধকার।
প্রেমবঞ্চিতা কোন্ সে বালার
সুরু হ'ল অভিসার?
কণ্ঠে দুলিছে মালতীর মালা,
যত লাগে বারি তত বাড়ে জ্বালা,
লুটে কর্দ্দমে অর্ঘ্যের ডালা—
পথ চলা হ'ল ভার।
সজল অন্ধকার।
কুঞ্জ-ভবনে কোথা প্রিয়তম
লগন বহিয়া যায়।
পীন-কুচ-ঘটে উভসঙ্কটে
যৌবন মুরছায়।
বৃথা হ'ল সাজ লাজ গেল ধুয়ে,
কূল ভেঙে নদী চর গেল থুয়ে,
কাঁদে হতাশায় লুটাইয়া ভুঁয়ে
গেহে ফেরা হ'ল দায়।
লগন বহিয়া যায়।
এমন বরষা বিফলে কি যাবে
ওলো বিরহিণী আজি?
অঞ্জন আঁকো খঞ্জন চোখে
চন্দনে তনু মাজি'।
শিখিসাথে তুমি নাচ হেলে-দুলে,
হেসে ফেল খুলে বেণী ও দুকুলে,
বাজুক কাঁকণ কম করমূলে
চরণে নূপুর রাজি।
মোর ফুল—সুরে ভরিয়া তুলিব
তোমার তনুর সাজি।



ডি. এচ. লরেন্স

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

কিছু দিন পর্য্যন্ত ক্লারার সমস্ত আবেগ একেবারে উবে গেল, পলের উপর তার ঘৃণার সঞ্চার হতে লাগল। এদিকে ক্লারার এই ভাবান্তর দেখে পলের মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল, ক্লারা তাকে ক্ষমা না করলে সে আর শান্তি পাবে না। ফলে আপোষ হ'ল দু'জনার, কিন্তু ক্লারা যেমন ছিল তেমনি দূরেই রয়ে গেল। ক্লারাকে বেঁধে রাখল পল, আর তার কারণ ক্লারার কাছে কোন দিনই সে পুরোপুরি নিজেকে মেলে ধরতে রাজী হ'ল না।

একদিন সন্ধ্যাবেলা আবার বেরোল তারা। দু'জনে অন্ধকারে খানিকক্ষণ সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়াল, তার পর তাদের বালিয়াড়ির আশ্রয়ে গিয়ে বসল। দু'জনে অন্ধকারে সমুদ্রের দিকে চেয়েছিল, হঠাৎ ক্লারা বলল, 'আমার কি মনে হয় জানো? তুমি যেন রাত্রেই শুধু আমাকে ভালবাস, দিনের বেলায় তোমার ভালবাসা যেন আর পাই না।'

পল এই অভিযোগ অস্বীকার করতে পারল না, অপরাধীর মত বসে আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালু তুলে ফেলতে লাগল।

তার পর বলল, 'রাতটা ত' তোমার রইলই, দিনের বেলাটা আমি নিজের হাতে রাখতে চাই।'

'কিন্তু কেন? এই ত' ক'দিনের ছুটি, তার মধ্যেও?'

'কেন জানি না। তবে দিনের বেলায় ভালবাসার খেলা খেলতে গিয়ে আমি হাঁপিয়ে উঠি।'

'সব সময় নাই বা দেখালে ভালবাসা।'

পল বলল, 'তা হয় না। দু'জনে একসঙ্গে থাকতে গেলেই ও এসে পড়ে।'

ক্লারা মনের বিরক্তি চেপে চুপ করে বসে রইল। পল জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে বিয়ে করবার কথা তুমি ভেবেছ কোন দিন?'

ক্লারা পাল্টা প্রশ্ন করল, 'তুমি কোন দিন ভেবেছ আমাকে বিয়ে করার কথা?'

'ভেবেছি বই কি। কত বার। বিয়ে হবে, ছেলেপুলে হবে দু'জনের'—পল আস্তে আস্তে জবাব দিল। ক্লারা মুখ তুলে আর চাইতে পারল না, বালুর উপর আঙুল চালাতে লাগল। পল বলল, 'কিন্তু তুমি সত্যিই বাক্সটারের কাছ থেকে বিয়ে ভাঙবার অনুমতি চাইতে যেতে পারো না—কী বলো?'

জবাব দিতে ক্লারার কয়েক মিনিট কেটে গেল। তার পর খুব জোর দিয়েই সে বলল, 'না। তা বোধ হয় আমি চাইব না।'

—'কেন, বল ত'?'

—'জানি না।'

—'একদিন তুমি তার ছিলে এই কথা ভেবেই কি?'

—'না। ও কথা আমি ভাবি নি।'

—'তবে কি?'

—'বোধ হয় ও এখনো আমার আছে, তাই বলে।'

এবার পল কয়েক মিনিট নীরব হয়ে রইল, অন্ধকার সমুদ্রের উপর দিয়ে অশান্ত গর্জ্জনে যে বাতাস বয়ে আসছে তার দিকে কান পেতে। তার পর বলল, 'তা'হলে তুমি কোনদিন আমার হবে এমন ইচ্ছে তোমার ছিল না?'

—'আমি ত' তোমারই। এখনও তোমার।'

—'না। তা না হলে তুমি কেন বিয়ে ভাঙতে চাইছ না?'

এ গ্রন্থি মোচন করা অসাধ্য বলেই তারা আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করল না। যতটুকু পেল তাই নিয়েই সন্তুষ্ট রইল। যা পেল না, তার দিকে আর ফিরে চাইল না।

আর একদিন পল বলল, 'বাক্সটার-এর সঙ্গে জঘন্য খারাপ ব্যবহার করেছ তুমি।' ক্লারা যে জবাব দেবে পল সে-কথা প্রায় ভাবেনি, ভেবেছিল ক্লারার মা হয়ত জবাব দেবেন, অন্যের কথা জানো না যখন তা নিয়ে কেন কথা বলো? নিজের কথাই ভাব। তাই ক্লারা যখন কোমর বেঁধে এলো তর্ক করতে, পল আশ্চর্য হ'ল একটু। বলল: 'কেন?'

—'আমার মনে হয় তুমি ওকে ভেবেছিলে একটি কোমল শ্বেতপদ্ম তেমনি করেই ওকে ব্যাঙ্কে রেখে যত্ন-আত্তি করতে গিয়েছিলে। ও যে লতানো ফুল হতে পারে তা তুমি ভাবতেও পারো নি। সে কথা ভাবলে তুমি আর ওকে গ্রহণ করতে পারতে না।'

—'আমি কোনদিন ওকে শ্বেতপদ্ম বলে ভাবিনি।'

—'যাই হোক, এমন কিছু তুমি ওকে ভেবেছিলে যা সে নয়। মেয়েদের দোষই ওই। তারা যেন বেশী বোঝে পুরুষের কী ভালো, তাই দিয়েই তাকে মানিয়ে রাখতে চায়। পুরুষ হয়ত খিদেয় মরে যাচ্ছে, হয়ত সে বসে তার মন যা চায় তাই শিস্ দিয়ে উঠছে। তবু মেয়েটি তাকে দখল করে বসবে, নিজের খুশিমতো জিনিস দিয়ে ঠাণ্ডা করে রাখতে চাইবে তাকে।

—'তাই না হয় হ'ল। কিন্তু তুমি নিজে কি করছ শুনি?'

—'আমি এখন ভাবছি কোন্ সুর ধরে শিস্ দেব।'

ক্লারার যেন একে আর ঠাট্টা বলে মনে হ'ল না। মনে হ'ল পল যেন গভীর সত্য কথাই বলছে। জিজ্ঞেস করল, 'আমি তা'হলে তোমার যাতে ভালো হবে তাই শুধু তোমাকে দিতে যাচ্ছি? এই তোমার ধারণা?'

—'হ্যাঁ, তাই। কিন্তু সত্যিকারের ভালবাসা দেবে মুক্তির আস্বাদ, বন্ধনশালার পীড়া তার জন্যে নয়। মিরিয়ামের কাছে যখন যেতুম,

মনে হত আমি যেন গাধার মত খোঁটার সঙ্গে বাঁধা। যেন শুধু তার দেওয়া ঘাস টুকুতেই আমার মুখ দেবার কথা, অন্য কোথায়ও নয়। গায়ে জ্বালা ধরে যেত আমার।'

—'এক পক্ষের কথা ত' বললে। কিন্তু মেয়েটিকেও কি তুমি যা খুশী তাই করে বেড়াতে দেবে?'

—'নিশ্চয়ই। আমি চেষ্টা করব যাতে আমাকে ভালবাসতে তার মন চায়। যদি না চায়, বেশ। আমি তাকে ধরে রাখব না।'

ক্লারা বলল, 'মুখে বলছ অনেক কিছু। কিন্তু সত্যি কি আর অমন অদ্ভুত তুমি হতে পারতে?'

পল বলল, 'তা কেন, নিজেকে একটা সৃষ্টি ছাড়া বিস্ময় বলেই ত' আমি জানি।'

একটা নীরবতা নেমে এল দু' জনার মধ্যে। মুখে দু' জনারই হাসি, কিন্তু অন্তরে পরস্পরের প্রতি গভীর বিরাগ। অবশেষে পল বলল, 'ভালবাসা জিনিসটা ঠিক সেই খড়ের গাদার কুকুরের মত—নিজেও খাবে না, অন্যকেও খেতে দেবে না।'

ক্লারা প্রশ্ন করল, 'আমাদের দু'জনার মধ্যে কুকুরটা কে?,

—'তা কি আর খুলে বলতে হয়? সেটা তুমি জানোই।'

এই ধরণের একটা ঠোকাঠুকি তাদের লেগেই রইল। ক্লারা জানে, পলকে তার সম্পূর্ণ করে পাওয়া হয়নি। ওর জীবনের একটা বড়ো আর মূল্যবান অংশ রয়ে গেছে তার নাগালের বাইরে। সে জিনিসটা যে কী তাও সে জানতে চায় না, কিম্বা তাকে আঁকড়ে ধরবার জন্যেও কোন চেষ্টা তার নেই। এদিকে পলও জানে ক্লারা আজও তার মিসেস ডয়েস পরিচয়টাকে নিঃশেষে মুছে দিতে পারেনি। ডয়েসকে সে ভালবাসে না, কোন দিনই বাসেনি। শুধু ক্লারার বিশ্বাস ডয়েস তাকে ভালবাসে, অন্ততঃ ডয়েস তাকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না। ওর সম্বন্ধে ক্লারার মনে কোন চিন্তা নেই, কিন্তু পলকে নিয়ে সে এতটা নিশ্চিন্ত হতে পারে না। পলের প্রতি গভীর ভালবাসায় তার হৃদয় গভীর পরিপূর্ণ, এতে এক ধরণের তৃপ্তি সে অবশ্যই পেয়েছে, নিজের উপর তার আস্থা ফিরে এসেছে, তার সন্দেহভঞ্জন হয়েছে। মনে মনে তার বিশ্বাস জেগেছে, নিজেকে সে আবার ফিরে পেয়েছে যেন। তবু তার জীবন যে একান্ত ভাবেই পলের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে গেল কিম্বা পলের জীবন গাঁথা হয়ে গেল তার সঙ্গে, এমন কথা সে ভাবতে পারেনি। শেষ পর্য্যন্ত তাদের ছাড়াছাড়ি হবে, আর বাকী জীবনটা পলের জন্যে বেদনা ব'য়েই তাকে কাটাতে হবে, এই সে ভেবে রেখেছে। তবু নিজেকে সে চিনে নিয়েছে, নিজের সম্বন্ধে আর তার সন্দেহ নেই। পলের বেলায়ও এ কথা খাটে। তা দু'জনে একসঙ্গে জীবনের দীক্ষালাভ করেছে বটে, কিন্তু জীবনের উদ্দেশ্য তাদের স্বতন্ত্র। পল যে পথে যেতে চায় সে পথে ক্লারার আসা অসম্ভব! আজ হোক, কাল হোক্, তাদের পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। যদি তাদের বিয়েও হয়, যদি তারা পরস্পরকে মেনে নিয়ে সংসার ধর্ম্ম করে চলে, তা'হলেও পলকে তার নিজের পথে একাই চলতে হবে। ক্লারার সঙ্গ সে পাবে শুধু বাড়ি ফিরে এলে। কিন্তু এ ত' সম্ভব নয়। দু'জনেই চায় একটি সারাক্ষণের সঙ্গী, যাকে সঙ্গে নিয়ে তারা পথ চলতে পারে।

ক্লারা যখন তার মায়ের সঙ্গে ম্যাপারলিতে থাকত, তখন এক দিনের কথা। সন্ধ্যাবেলা পল আর ক্লারা রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে, হঠাৎ ডয়েস-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। লোকটার চালচলন দেখে পলের চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল, তবু তার মন পড়েছিল অন্য কোথায়ও, তাই শুধু শিল্পিসুলভ উদাস দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে রইল, চিনতে পারল না! তার পর হঠাৎ হেসে ক্লারার দিকে ফিরে ওর কাঁধে হাত রেখে বলে উঠল: 'আমার কি হয়েছে বলো ত'। দু'জনে পাশাপাশি চলেছি আর আমি ভাবছি লণ্ডনের কথা! তোমার কথা যেন ভুলেই গেছি।'

ঠিক সেই মুহূর্তে ডয়েস সেই পথ দিয়ে চলে গেল, পলের প্রায় গা-ঘেঁষে। পল চমকে উঠে দেখল দু'টি কটা চোখ, সে চোখে গভীর ঘৃণা আর তার চেয়েও সুগভীর ক্লান্তি। ক্লারাকে জিজ্ঞেস করল, 'লোকটা কে গেল?'

—'ওই ত' বাক্সটার ডয়েস।'

পল ক্লারার কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে চারি দিক নিরীক্ষণ করতে লাগল। মনে পড়ল লোকটা যখন এদিকে আসছিল, তখন বেশ খাড়া হয়েই হাঁটছিল, কাঁধ দু'টি পেছনে হেলানো, মাথা সোজা। কিন্তু ওর চোখে ছিল ভীরু চাহনি, যেন সে লোকের কাছ থেকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে, লোকে তাকে কী ভাবছে তাই নিয়ে তার সঙ্কোচের সীমা নেই। হাত দু'টিকে যেন লুকিয়ে রাখতে চায়। কাপড়-চোপড় জীর্ণ, পরনের পায়জামাটা হাঁটুর কাছে ছেঁড়া, গলায় বাঁধা রুমালটা অপরিচ্ছন্ন। কিন্তু টুপিটা আগের মতই অবজ্ঞাভরে চোখের উপর পর্যান্ত হেলানো। ওকে দেখে ক্লারার যেন নিজেকে অপরাধী বলে মনে হতে লাগল। ওর মুখে ক্লান্তি আর হতাশার ছাপ অস্পষ্ট, দেখে আঘাত লাগল ক্লারার মনে, কিন্তু করুণার বদলে গভীর ঘৃণার সঞ্চার হ'ল।

পল বলল, 'দেখে ত' খুব ভালো মনে হচ্ছে না!'

পলের সুরে যেটুকু করুণা ছিল, তাতেই ক্লারার মনে হ'ল কেউ তাকে ভর্ৎসনা করছে। তার অন্তর রুখে দাঁড়াল। বলল, 'ও যে কত ছোট, তাই ক্রমশঃ প্রকাশ পাচ্ছে।'

পল প্রশ্ন করল, 'তুমি কি ঘৃণা কর ওকে?'

ক্লারা বলল, 'তুমি ত' মেয়েদের নির্মমতা নিয়ে অনেক কিছু বলে থাক। পুরুষরা তাদের শক্তির মত্ততায় কী যে নির্মম হয়ে ওঠে তা যদি তুমি জানতে! মেয়েটির কোন অস্তিত্বই যেন তারা স্বীকার করতে চায় না।'

—'আমিও কি স্বীকার করি না!'

—'না।'

—'তোমার নিজের অস্তিত্ব আমি মানি না?'

—'আমার নিজের কথা তুমি কিছু জানো না।' ক্লারা তিক্ত-কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমাকে চেন না তুমি?'

—'বাক্সটার যতটুকু জানত, তার চেয়ে কি তোমাকে আমি ভাল করে জানি না?'

—'না, ততটুকুও নয়।'

পল নির্বোধের মত, অসহায়ের মত শুধু রাগ করতে লাগল। দু'জনে তারা এই প্রচণ্ড অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে এক যোগে এসেছে, অথচ ওই যে মেয়েটি ওখানে হেঁটে বেড়াচ্ছে সে তার সম্পূর্ণ অচেনা! বলল, 'তুমি ত' আমাকে ভালো করেই জানো।'

ক্লারা জবাব দিল না। পল আবার প্রশ্ন করল, 'আমাকে তুমি যতটা জানো, বাক্সটারকে কি ততটা ভালো করে জানতে?'

ক্লারা বলল, 'সে আমাকে জানবার সুযোগ দেয়নি।'

—'কিন্তু আমি ত' সে সুযোগ দিয়েছি?'

ক্লারা ভেবে নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। কিন্তু তুমি কোন দিন আমার কাছে আসনি। নিজেকে ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে পার না তুমি। সেটা বাক্সটার তোমার চেয়ে ভাল পারত।'

পল ভাবতে ভাবতে অগ্রসর হ'ল। ক্লারার উপর তার রাগ হতে লাগল, কেন সে বাক্সটারকে তার উপরে স্থান দেবে? বলল, 'এখন কি না বাক্সটার তোমার কাছে নেই, তাই ওর দাম তোমার কাছে বেড়ে গেছে।'

'না। আমি স্পষ্ট দেখতে পাই ওর সঙ্গে কোন দিক দিয়ে তোমার পার্থক্য।'

তবু পলের কেন যেন মনে হতে লাগল, ক্লারা তার বিরুদ্ধে খানিকটা বিদ্বেষ পোষণ করে রেখেছে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা ক্লারা আর সে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরছে, হঠাৎ ক্লারার একটা প্রশ্নে পলকে চমকে উঠতে হ'ল। বলল, 'আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় এর খুব দাম আছে—এই—এই—শারীরিক বৃত্তিটার?'

পল বলল, 'ভালবাসার যা সত্যিকার রূপ, তুমি কি তার কথা বলছ?'

—'হ্যাঁ। তোমার কাছে ওর কোন দাম আছে কি?'

পল বলল, 'দুটোকে আলাদা করে দেখতে যাও তুমি কি ক'রে? এর মধ্যেই ত' সমস্ত পরিচয়ের পরিসমাপ্তি—আমাদের অন্তরঙ্গতার শেষ লক্ষ্য কি তাই নয়?'

ক্লারা বলল, 'অন্ততঃ আমার কাছে ত' নয়।'

পল কোন কথা বলল না। ক্লারার প্রতি ঘৃণায় তার মনে আগুন ধরে গেল যেন। যেখানে পল ভাবছে তাদের পূর্ণতা লাভ হ'ল, সেখানেও ক্লারা তাকে নিয়ে তৃপ্তিলাভ করতে পারল না, এ কেমন ক'রে হ'ল?

ক্লারার কথার কোন গভীর তাৎপর্য্য আছে, এটা সে অবিশ্বাস করতে পারল না। ক্লারা আস্তে আস্তে বলে চলল, 'আমার কেমন মনে হয় তোমাকে পেয়েও আমি পাইনি। যেন তুমি সমগ্র ভাবে ধরা দাওনি আমার কাছে। যখন কথা বল, তখনও যেন ঠিক বল না আমার সঙ্গে—'

—'তবে কার সঙ্গে বলি?'

—'সে যেন তোমার নিজের সঙ্গেই কথা বলা। তুমি আমাকে অনেক দিয়েছ, এ ত আমি ভাবতেও পারি না। কিন্তু ভেবে দেখ ত' এ কি আমার জন্যে, নাকি নিছক এরই জন্যে।

তখন পলের আবার নিজেকে দোষী বলে মনে হতে লাগল। সে কি ক্লারাকে বাদ দিয়ে শুধু একটি নারী বলেই তাকে গ্রহণ করেছে? কিন্তু এই চুলচেরা তর্কে ফল কি?

ক্লারা বলল, 'বাক্সটার যখন সত্যিই আমার ছিল, তখন এটুকু অন্ততঃ বুঝতে পারতাম আমি তাকে সম্পূর্ণ করেই পেয়েছি।'

—'তাই ছিল ভালো?'

—'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। তার মধ্যে একটি সমগ্রতা ছিল। তাই

বলে এমন কথাও আমি বলি না যে সে যা দিয়েছে, তার চেয়ে বেশী কিছু তুমি দাওনি।'

'এর বেশী দেবার মত ক্ষমতাই ছিল না।'

'তাও নয় মেনে নিলুম। কিন্তু তুমি নিজেকে কোন দিন আমার কাছে ছেড়ে দাওনি।'

পল ভ্রূকুঞ্চিত করল। বলল, 'তোমাকে ভালবাসতে গিয়ে আমার অবস্থা হয় ঠিক ঝড়ের মুখে শুকনো পাতার মত।'

—'তখন আমি যে একটি মানুষ, সে কথা আর তোমার মনে পড়ে না?'

পলের বিরক্তির সীমা রইল না। বলল, 'তাই ব'লে এটা তোমার কাছে একেবারেই তুচ্ছ হ'ল?'

'না খানিকটা একে স্বীকার করি, জানি মাঝে মাঝে তোমার আবেগের স্রোতে আমি ভেসে যাই, তখন মনে মনে প্রণাম জানাই তোমাকে কিন্তু তবু—'

'আর 'তবু' নয়', ব'লে পল তাড়াতাড়ি একটু চুমু খেয়ে দিল ওর মুখে, তার শিরায় শিরায় তখন আগুন ছুটছে। ক্লারা আর কথা বলল না, নীরবে ওর কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।

পলের কথার মধ্যে সত্য ছিল। সাধারণতঃ ওর ভালবাসা ছিল বন্যার জলের মত, সে নিজের বেগে সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেত। পল-এর সমস্ত বিচার-বিবেচনা, তার অন্তরের আকুলতা, তার রক্তস্রোতের উদ্দাম আবেগ সব ভেসে যেত সেই টানে। ছোটখাট জিনিষ নিয়ে খুঁৎ-ধরা, ছোটখাট জিনিষ নিয়ে বিব্রত বোধ করা, এসব কখন যে ভেসে যেত, কখন যে লোপ পেত তার চিন্তাশক্তি, সে নিজেও বুঝতে পারত না। তখন সে আর মন বুদ্ধি দিয়ে গড়া মানুষ নয়, শুধু একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। তার হাত দু'টি তখন যেন প্রাণবান হয়ে উঠত। তার দেহ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব কিছু যেন স্বতন্ত্র চেতনা লাভ করত, তাদের উপর পলের নিজের ইচ্ছা আর খাটত না। শীতের আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কগুলি যেমন প্রাণবন্ত, তেমনি প্রাণের প্রাচুর্য্য জাগত তার সারা দেহে মনে। একই প্রাণবহ্নির স্পন্দন তারা উভয়েই অনুভব করত। যে শক্তির আনন্দে তার চোখের সামনে কাঁটা ঘাস মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, সেই আনন্দে তার নিজের দেহও কণ্টকিত হয়ে উঠত। মনে হ'ত যেন ক্লারা আর সে, আর এই ঘন ঘাস, এই তারার মেলা, এরা সব একই আগুনের শিখার মধ্যে মিশে গিয়ে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা হারিয়ে ফেলেছে—সেই লেলিহান অগ্নি-শিখা প্রখর প্রচণ্ডতা নিয়ে দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। আশে-পাশে যা কিছু চোখে পড়ে সব যেন তার সঙ্গে জীবনের মহাস্রোতে ছুটে চলেছে, সব চাঞ্চল্য ঘুচে গিয়ে তারা তারই মত আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। বাইরের প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে অন্তরের এই আশ্চর্য্য শান্তি—পলের মনে হ'ল আনন্দের চরম সীমা এইখানেই।

ক্লারা জানত তাদের দু'জনার মিল শুধু ওইটুকুর জন্যেই, তাই এই আবেগকে সে আঁকড়ে ধরে রাখতে চাইত। তবু সর্ব্বদাই যে তার আশা মিটত এমন নয়। সেই যেদিন মাঠে ঝিঁঝিঁপোকা ডেকেছিল, সেদিনের সুর পুরোপুরি ফিরে পাওয়া প্রায়ই সম্ভব হ'ত না। ক্রমশঃ যেন তাদের ভালবাসায় গতানুগতিকতার ছাপ পড়ল। যদি দৈবাৎ কোন তীব্র আবেগের মুহূর্ত্ত আবার আসত তাদের জীবনে, তা'হলেও সেটা আসত দু'জনার কাছে স্বতন্ত্র ভাবে, তাতে সেদিনের সেই তৃপ্তি আর পাওয়া যেত না। কাজেই মাঝে মাঝে পলের মনে হ'ত সে যেন একই পথে চলেছে। মাঝে মাঝে দু'জনেই বুঝত তাদের চেষ্টা নিরর্থক, তারা যা চেয়েছিল তা পায়নি। ক্রমশঃ তাদের ভালবাসা যন্ত্রচালিতের মত হয়ে এল, তাতে আগের প্রসন্ন দীপ্তি আর রইল না। তখন দু'জনেই চেষ্টা করল জীবনে নতুনত্ব আনতে, যাতে সেই পুরোন দিনের আনন্দ আবার অনেকটা ফিরে আসে। হয়ত দু'জনে গিয়ে বসল নদীর কিনারায়, নদীর জল বিপদজ্জনক ভাবে তাদের গা-ঘেঁষে চলেছে, তাতেই একটু মনে সাড়া লাগল। কিম্বা হয়ত পথের বেড়ার নীচে একটা খোঁদলে দু'জনে গিয়ে মিশল, সেখান থেকে পথিকদের পদশব্দ শোনা যায়, তাদের কথাবার্তার টুকরো কানে ভেসে আসে। পরে দু'জনেই এই পাগলামির জন্যে একটু লজ্জা বোধ করে। তাদের ব্যবধান বাড়ে বই কমে না। পল ভাবে, ক্লারা মেয়েটা যে কী! যেন সব দোষ শুধু ক্লারার!

একদিন রাত্রে ক্লারার কাছে বিদায় নিয়ে পল মাঠের পথ ধরে ষ্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। ভারী অন্ধকার সেদিন। কালটা যদিও বসন্ত, তবু যেন হিম পড়বে পড়বে মনে হচ্ছে। পল-এর হাতে সময় বেশী ছিল না, সে হন হন করে হেঁটে চলেছিল। শহরের সীমানা একটা ঢালু খাদের কাছে এসে শেষ হয়ে গেছে—সেখান থেকে দেখা যায় অন্ধকারের বুকে বাড়ির বাতিগুলি দপ দপ করে জ্বলছে। পল পথের বেড়া ডিঙিয়ে মাঠে গিয়ে নামল। চারিদিক অন্ধকার, তার মধ্যে যেন বুনো জানোয়ারের তীক্ষ্ণ চোখের মত হলদে বাতিগুলো। হঠাৎ মনে হল উইলো গাছের নীচে কে একটা প্রাণী যেন নড়ে উঠল। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারে স্পষ্ট করে কিছু চোখে পড়ে না।

আর একটু এগিয়ে গিয়ে পল দেখল সামনের বেড়ার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে একটি অন্ধকারাবৃত মূর্ত্তি। লোকটি পথ ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়াল। বলল, 'নমস্কার!'

পল কিছু না দেখেই বলল, 'নমস্কার।'

—'কে? পল মোরেল?'

তখন পল বুঝল লোকটা ডয়েস। লোকটা এবার পথ রোধ করে দাঁড়াল। গলা বিকৃত করে বলল, 'এবার তোকে পেয়েছি কী বলিস্?'

পল বলল, 'আমার ট্রেনের দেরি হয়ে যাচ্ছে।' অন্ধকারে ডয়েসের মুখ নজরে আসে না। মনে হল কথা বলতে গিয়ে তার দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। বলল, 'এবার তোকে বাঁচায় কে?'

মোরেল এগিয়ে যেতে চাইল, ডয়েস এক লাফে গিয়ে তার পথ জুড়ে দাঁড়াল। বলল, 'কোটটা খুলে এগিয়ে আসবি না অমনি মাথা পেতে মার খাবি? কোনটা তোর ইচ্ছে?'

পলের এবার ভয় করতে লাগল। লোকটা উন্মাদ নয় ত?

পল বলল, 'কিন্তু···মারামারি করতে জানি না ত' আমি?'

'সাবাস্!' ব'লে পলকে সতর্ক হবার সময় না দিয়েই ডয়েস ঘুষি মেরে বসল ওর মুখে। পলের মাথা ঘুরে উঠল। তার চোখের সামনে রাতের অন্ধকার ঘন হয়ে এলো। তখন ওভারকোট আর কোট খুলে ডয়েসের দিকে ছুঁড়ে ফেলে পরের ঘুষিটা থেকে

নিজেকে সে বাঁচাল। ডয়েস অনর্গল গালাগাল দিয়ে চলেছে। পল এবার অনেকটা সতর্ক, রাগে তার অন্তরাত্মা জ্বলছে। তার দেহটা যেন এক-একবার বেড়ালের নখের মত তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। লড়াই করবার শক্তি তার নেই, বুদ্ধি খাটিয়েই বাঁচতে হবে। সামনে ডয়েসের চেহারাটা এবার তার ভাল করে নজরে পড়ল। আবার লোকটা তার দিকে তেড়ে আসছে। পলের মুখ দিয়ে রক্ত বেয়ে পড়ছে, অপর পক্ষের মুখে একটা ঘুষি বসিয়ে দেবার ইচ্ছে তীব্র বেদনার মত জুড়ে বসেছে তার মনে। ডয়েসকে আসতে দেখে সে বেড়ার মধ্যে দিয়ে ছুটে এসে আচমকা এক ঘুষি বসিয়ে দিল ওর মুখে। তৃপ্তিতে পল তখন থরথর করে কাঁপছে। ডয়েস থুতু ফেলতে ফেলতে এগিয়ে এলো আস্তে আস্তে। পল গুঁড়ি মেরে বেড়ার ওপারে চলে যেতে চাইছিল, হঠাৎ কানের কাছে একটি প্রচণ্ড ঘুষি পড়তেই সে টলতে টলতে পিছন দিকে পড়ে গেল। ডয়েস তখন বুনো জানোয়ারের মত ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস নিচ্ছে। আবার একটা ঘুষি এসে পড়ল পলের হাঁটুর উপর, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পল চোখ বন্ধ করে মরিয়ার মত ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডয়েসের কিল-ঘুষি সমানে চলেছে, কিন্তু পলের গায়ে যেন লাগছে না, সে প্রাণপণে বুনো বেড়ালের মত ওকে জাপটে ধরেছে। শেষ পর্য্যন্ত ডয়েস কেমন হতভম্ব হয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। পলও পড়ল তার সঙ্গে সঙ্গে। নিছক প্রবৃত্তির বশে চালিত হয়ে হাত দিয়ে সে ওর গলা চেপে ধরল। ডয়েস কোন বাধা দেবার আগেই পলের শক্ত মুঠি গিয়ে চেপে বসল ওর গলায়। পলের জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছে, শুধু তার দেহের মধ্যে সংহারের একটা অন্ধ প্রবৃত্তি জেগে উঠেছে। অনুভূতি, বিচার, বিবেচনা, সবই লোপ পেয়েছে তখন। তার দেহ ক্রমশঃ কঠিন হয়ে উঠছে, একটা শক্ত স্ক্রু-র মত সে তখন ডয়েসের গলায় ক্রমাগত চাপ দিয়ে চলেছে।

হঠাৎ কিন্তু তার মনে সংশয় জাগল, অবাক হয়ে পল ভাবল এ আমি কী করছি! তার দেহ শিথিল হয়ে এলো। ডয়েস একটু একটু করে নিজের আশা ছেড়ে দিচ্ছিল। কিন্তু পলের দেহ করুণায়, বেদনায়, বিহ্বলতায় আবার অবশ হয়ে উঠল। সেই সুযোগে ডয়েসও দেহের সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। পলকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সে উঠে দাঁড়াল, তার পর ক্রমাগত ঘুষি খেতে খেতে পলের চৈতন্য অবলুপ্ত হয়ে গেল।

ডয়েস তখনও তার প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহের উপর সমানে পদাঘাত করে চলেছে। হঠাৎ দূরে গাড়ির বংশীধ্বনি শোনা গেল। ডয়েস চমকে উঠল, চার দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। ওই কারা আসছে না? মনে হ'ল গাড়ি এসেছে, এখুনি লোকজন এসে পড়বে। সে তাড়াতাড়ি নটিংহ্যামের পথ ধরল। যেতে যেতে হঠাৎ মনে পড়ল একবার তার পায়ের বুট গিয়ে লেগেছিল ছেলেটার গায়ের হাড়ে। সেই আঘাতটা যেন তার মনের মধ্যে ঘুরে-ফিরে বাজতে লাগল। এই অনুভবের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই সে যেন হন হন করে ছুটে চলল।

পলের জ্ঞান ফিরে এলো ক্রমশঃ। মনে পড়ল সব কথা, কেন সে এখানে পড়ে রয়েছে, কী হয়েছিল তার, কিন্তু উঠে চলবার মত মনের জোর পেল না। স্থাণুর মত পড়ে রইল অনেকক্ষণ, হিমের কণাগুলো উড়ে এসে তার মুখে পড়তে লাগল। তবু স্থির হয়ে শুয়ে থাকতেই যেন ভাল লাগছিল। সময় কাটতে লাগল। হিমের কণাগুলোই জোর করে জাগিয়ে রাখল ওকে। তার পর এক সময় মনে পড়ল, এ কি, আমি এখানে শুয়ে কেন? কিন্তু তবু নড়াচড়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

আবার মনে মনে বলল: উঠে দাঁড়াব আমি? তবে দাঁড়াচ্ছি না কেন?

কিন্তু তার পরেও উঠে দাঁড়াতে বেশ খানিকটা সময় লাগল। যন্ত্রণায় দেহ দুর্ব্বল বোধ হচ্ছে, কিন্তু মন বেশ স্বচ্ছ। হাতড়ে হাতড়ে কোটটা তুলে নিয়ে গায়ে দিল, কান পর্য্যন্ত এঁটে দিল ওভারকোটের বোতাম। মাথার টুপিটা খুঁজে পেতে আরও কিছুক্ষণ লাগল। মুখ দিয়ে এখনও রক্ত পড়ছে কি না কে জানে? সেদিকে খেয়ালও রইল না। দিশেহারার মত হাঁটতে হাঁটতে ডোবার ধারে গিয়ে ডোবার জলে হাত-মুখ ধুয়ে নিল। প্রত্যেক বার পা ফেলবার সময় অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। ডোবার জল বরফের মত হিম, সেই জলের স্পর্শে পলের চেতনা যেন আবার ফিরে এলো। কোন রকমে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে উঠে সে ট্রাম ধরল। বাড়িতে গিয়ে মায়ের কাছে পৌঁছতেই হবে, এই একটা অত্যন্ত আকুল আগ্রহ তাকে নতুন বল এনে দিল যেন। নিশিতে পাওয়া লোকের মত সে টলতে টলতে এক সময়ে বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত হ'ল।

বাড়ির সকলে তখন ঘুমে অচেতন। পল আয়নার কাছে গিয়ে নিজের চেহারা দেখল—মুখ বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, জায়গায় জায়গায় রক্তের দাগ, যেন মরা মানুষের মুখের মত। ভাল করে

মুখ ধুয়ে সে শয্যায় আশ্রয় নিল। সারা রাতটা কাটল বিকারের ঘোরে। সকালে ঘুম ভাঙতেই চোখ চেয়ে দেখল, মা তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। ওই দুটি নীলপদ্মের মত চোখ, ওই চোখ দুটি দেখবার জন্যেই পল এতক্ষণ আকুল হয়েছিল। মা এসেছেন, এবার তাঁর হাতে নিজেকে তুলে দিয়ে সে খালাস। বলল, 'ও কিছু নয়, মা! ওই বাক্সটার ভয়েসের কাণ্ড'।

মা স্থিরভাবে বললেন, 'কোথায় কষ্ট হচ্ছে তোমার, তাই বলো।'

—'বুঝতে পারছি না। বোধ হয় এই কাঁধের কাছটায়। তুমি ওদের বলো, মা, সাইকেল থেকে পড়ে গিয়েছিলুম'।

হাতটা নাড়বার ক্ষমতা নেই। একটু পরে মিনি, সেই বাচ্চা চাকরাণী, উপরে এলো চা নিয়ে। বলল, ঘাবড়েই গিয়েছিলুম আমি—আপনার মা ত' ঘরে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন'।

পলের মনে হ'ল আর এই দুর্বিহ যন্ত্রণা সে সহ্য করতে পারবে না। মা যখন এলেন তার শুশ্রূষা করতে, তাঁকে সব কথা না বলে সে পারল না! মা শুধু শান্ত সুরে বললেন, 'আমি হলে এখানেই সব কিছু শেষ করে দিতাম'!

—'আমিও তাই করব মা, তাই করব'।

মা ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে দিলেন। বললেন, 'এখন ওসব না ভেবে ঘুমোও ত'। ডক্তার এগারোটার আগে আসবেন না'।

পলের কাঁধের হাড় স্থানচ্যুত হয়ে গিয়েছিল। দ্বিতীয় দিন থেকে বুকে আবার প্রচুর সর্দ্দি বসল। মায়ের মুখে আর রক্তের চিহ্ন নেই, এই ক'দিনেই কেমন শুকিয়ে গেছেন! ছেলের পাশে বসে একবার ওর দিকে তাকান, তারপর চেয়ে থাকেন শূন্যের দিকে। তাঁদের দু'জনের মধ্যে কি যেন একটা ঘটে গেছে, দু'জনের কারুরই সাহস নেই সে কথা মুখ ফুটে বলতে। একদিন ক্লারা এলো পলকে দেখতে। পরে পল মাকে ডেকে বললে, 'ওকে দেখলে আমার দেহ-মন কেমন যেন গুলিয়ে যায়, মা!'

মা বললেন, 'জানি। ও না এলেই ছিল ভাল'।

আর একদিন মিরিয়াম এলো, কিন্তু সে ত' এখন পলের কাছে প্রায় অপরিচিতের মত। পল বলল, 'এদের কাউকে আমি চাই না মা। এদের কথা আমার মনেও পড়ে না'!

সবাই জানল, পল সাইকেল-দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে। কিছু-দিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে সে কাজে বেরুল। কিন্তু মনের মধ্যে একটা উদ্বেগ, একটা দাহ অহর্নিশ তাকে পীড়া দিতে লাগল। ক্লারার কাছে গিয়ে যখন দাঁড়াল, মনে হ'ল, কই, সামনে ত' কেউ নেই, সব শূন্য, সব ফাঁকা। কাজে মন বসে না। মায়ের সামনে যেতেও সঙ্কোচ লাগে, মা'ও যেন তাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন।

ক্লারা বুঝতে পারে না পলের কি হয়েছে। এটুকু বুঝতে পারে যে পল আর আগের মত তার সম্বন্ধে সচেতন নয়। মনে হয় সে যেন পলকে ধরতে গিয়েও ধরতে পারে না। পল মনে মনে ক্লারার উপর বিরূপ হয়, তবু যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই আবার কে তাকে ঠেলে নিয়ে যায় ক্লারার কাছে। কিন্তু এখন বেশীর ভাগ সময়ই তার কাটে পুরুষ বন্ধুদের দলে—আজ এই পানশালায়, কাল অমুক হোটেলে। মায়ের শরীর সুস্থ নয়, পলের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নির্ব্বিবাদে সময় কাটাতে চান যেন। মনে হয় ক্রমশঃ যেন তিনি ছায়ার মত ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে যাচ্ছেন। পলের ভয় হয়; মায়ের দিকে চোখ তুলে যাইতে সাহস হয় না। চোখের কোলে ক্রমশঃ কালি পড়ছে মায়ের; মুখ দিন দিন মোমের মত সাদা হয়ে যাচ্ছে, তবু সারাদিন টুকটাক কাজ করে চলেছেন। কাজের তাঁর বিরাম নেই।

এক ছুটিতে পল বলল, চার দিনের জন্যে ব্ল্যাকপুলে বেড়াতে যাবে, সঙ্গে যাবে তার বন্ধু নিউটন। নিউটন ছেলেটি বেশ লম্বা-চওড়া, হাসি-খুশিতে ভরা। ভবঘুরের বাতাস যেন লেগেছে ওর গায়ে। পল মাকে বলল, 'তুমি গিয়ে এই সপ্তাহটা শেফিল্ডে অ্যানির বাড়িতে থেকে এসো। জায়গা বদলালে তোমার ভালই হবে।' মিসেস মোরেল তখন নটিংহাম-এ এক ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। ডাক্তার বলেছিলেন, ওঁর হজমের গোলমাল, হার্টটাও দুর্ব্বল। ইচ্ছে না থাকলেও মিসেস মোরেল ছেলের কথায় শেফিল্ড যেতে রাজী হলেন। এখন ছেলে যা বলে তাতেই তিনি রাজী। পল বলে গেল চার দিন বাদে সে-ও শেফিল্ডে যাবে, সেখান থেকে ছুটি ফুরোলে মাকে নিয়ে চলে আসবে। সেই মতোই ব্যবস্থা হ'ল।

ব্ল্যাকপুলে গিয়ে খুব ফূর্ত্তিতে দিন কাটতে লাগল পলের। এই কাঁচা বয়সে ব্ল্যাকপুলের মত জায়গায় ফূর্ত্তি লাগবে না ত' কি! আর এই সব কথার আড়ালে, অলক্ষ্য ছায়ার মত ছিল মায়ের জন্যে তার ভাবনা। পলের খুশির সীমা নেই; শেফিল্ডে গিয়ে মায়ের সঙ্গে ক'দিন কাটাতে পারবে, এই আনন্দে তার মন কানায় কানায় ভরে রয়েছে।

এখানে এ্যানিদের বাড়িটা চমৎকার! অল্পবয়সী একটি মেয়েও রেখেছে এ্যানি ঘরের কাজের জন্যে। ট্রেন থেকে নেমেই হৈ-চৈ করতে করতে ট্রামে চেপে পল চলে এসেছে এখানে। বাড়িতে পৌঁছেই দৌড়ে হুট্ হুট্ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে। গিয়ে হলঘরেই মাকে দেখতে পাবে ভেবেছিল, কিন্তু দরজা খুলে এসে দাঁড়াল এ্যানি। কেমন যেন অন্যমনা। পল কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় এক মুহূর্ত্ত থমকে দাঁড়াল। বলল, 'মায়ের শরীর কি খুব খারাপ?'

—'হ্যাঁ, এই—বেশী ভাল আর কি। একটু সামলে চ'লো। বেশী উত্তেজনা যেন ওঁর না হয়।'

'মা কি শুয়ে?'

—'হ্যাঁ।'

পলের মনে হ'ল, তার জীবন থেকে সমস্ত সূর্য্যালোক নিবে গিয়েছে, এখন শুধু নীরন্ধ্র অন্ধকার। হাতের ঝোলাটা ঝপাস করে ফেলে দিয়ে সে উপরে ছুটলো। দরজায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত্ত ইতস্তত: করল, তারপর দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল। মা বসে আছেন শয্যার উপর, পরনে গোলাপী রঙের একটা পুরোন ড্রেসিং গাউন। ছেলের দিকে একবার শুধু চাইলেন চোখ তুলে, যেন নিজেকে নিয়েই নিজে কত লজ্জিত! চোখে কুণ্ঠা, নিজের অসহায় অবস্থার জন্যে যেন ছেলের কাছে ক্ষমা চাইছেন। পল দেখল মায়ের মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে। ডাকল, 'মা!'

মা খুশিতে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'তুমি এলে? আমি ত' ভাবছিলুম, বুঝি আসতে পারলেই না।'

কিন্তু পল আর থাকতে পারল না। মায়ের শয্যার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে বিছানার চাদরে মুখ লুকিয়ে হৃদয়ের সব যাতনা উজাড় করে ঢেলে দিলে। ডাকল, 'মা, মা, মা গো!' অতি কষ্টে মুখ তুলে চেয়ে

পল জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি হয়েছে, মা?' যেন কিছু হাওয়াটা তাঁর অপরাধ।

মা মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে চেয়ে বললেন, 'ও কিছু নয়। একটা টিউমার। ওর জন্যে তুমি ভেব না। অনেক দিন থেকেই ওই জায়গাটা চাকা মত হয়ে আছে।'

আবার পলের চোখে অশ্রু উথলে উঠল। মনে কোন উদ্বেগ নেই, মন যথেষ্ট শক্ত, তবু বাইরেটা যেন কান্না সামলাতে পাচ্ছে না। জিজ্ঞেস করল, 'কোন্ জায়গাটায়?'

মা পেটের পাশটায় হাত দিয়ে দেখালেন। বললেন, 'এইখানে। তবে টিউমার ত'—এ কেটে সারিয়ে দিতে আর ওদের কতক্ষণ?'

পল যেন শিশু হয়ে গেছে। সে অসহায় মোহগ্রস্তের মত সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, হয়ত মায়ের কথাই ঠিক। হয়ত কেন, নিশ্চয়ই। কিন্তু মনে মনে, নিজের দেহের প্রত্যেকটি রক্তবিন্দু দিয়ে, সে অনুভব করছিল জিনিসটা কি রকম ভয়ঙ্কর! মায়ের শয্যার এক পাশে বসে সে তাঁর হাত তুলে নিল নিজের হাতে। হাতে তাঁর বিয়ের আংটিটি—জীবনে ঐ একটিমাত্র আংটিই তিনি পরেছেন। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার শরীর বেশী খারাপ হ'ল কবে?'

মা এবার ওর প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলেন না। বললেন, 'কালকেই শুরু হ'ল।'

'ব্যথা হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। বাড়িতে থাকতে মাঝে মাঝে হ'ত, তার চেয়ে এ তেমন বেশী কিছু নয়। এই ডাক্তারটি যেন একটু বেশী ভয় পাইয়ে দেন।'

'তোমার একা আসা উচিত হয়নি।' পল বলল। এ যেন তার নিজেকেই ভর্ৎসনা করবার জন্যে বলা। মা তাড়াতাড়ি বললেন, 'একা আসা না-আসার সঙ্গে এর সম্বন্ধ কি?' কিছুক্ষণ দু'জনেই চুপ করে ব'সে রইলেন। তার পর মা বললেন, 'যাও এবার। খিদে পায়নি নাকি এখনও?'

আরও খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে পল নীচে গেল। ভারী শ্রান্ত আর বিবর্ণ দেখাচ্ছে তাকে। খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল। পল এ্যানিকে জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই কি ওটা টিউমার?'

এ্যানি কাঁদতে শুরু করে দিল। বলল, 'কাল যে রকম ব্যথা হয়েছিল, উঃ, আমার জন্মে কাউকে অত কষ্ট পেতে দেখিনি! লিওনার্ড ত' পাগলের মত ডাক্তারের কাছে ছুটলো। আমি ওঁকে বিছানায় শুইয়ে দিতে গেছি, বললেন, 'এ্যানি, দেখ ত', আমার পেটের পাশে এই চাকাটা, এটা কী হয়েছে? আমি দেখব কি, মাথা ঘুরে পড়ে যাইনি এই ভাগ্যি! ঠিক এত বড় একটা চাকা বুঝলে পল! বললুম, কী সর্ব্বনাশ মা, ওটা কবে হ'ল কাউকে ত' বলনি! বললেন, 'এ ত' অনেক দিনের কথা। শুনে, তোমাকে কি বলব পল, আমার মনে হ'ল আমি মরে যাই না কেন। মাসের পর মাস এই যন্ত্রণা ভোগ করছেন, আর বাড়িতে কেউ ওঁকে দেখবার নেই!' এ্যানি আরো বলল, 'আমি বাড়িতে থাকলে এমনটি হতে দিতাম না।'

ডাক্তার বলেছিলেন রোগী ইচ্ছে করলে নীচের তলায় এসে চা খেতে পারেন। পল উপরে গেল মাকে ধরে ধরে নিয়ে আসতে। মা পরেছেন সেই পুরোন গোলাপী রঙের ড্রেসিং গাউনটা, লিওনার্ড যেটা এ্যানিকে দিয়েছিল। আজ যেন একটু রঙ দেখা দিয়েছে তাঁর মুখে। বয়সটা হঠাৎ কমে গেছে বলে মনে হচ্ছে। পল বলল, 'বা, এ পোষাক ত' বেশ মানিয়েছে তোমাকে!'

মা বললেন, 'হ্যাঁ। ওরা এমন ক'রে সাজিয়ে রাখে আমাকে, আমি নিজেকেই নিজে চিনতে পারি না।'

কিন্তু যখন নীচে নামবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন, তখন আর মুখে একবিন্দুও রক্ত নেই। পল ধরল তার হাতে, এক রকম কোলে করেই নিয়ে আসতে লাগল। সিঁড়ির গোড়ায় এসেই আর যেন তিনি নেই। পল তাড়াতাড়ি কোলে ক'রে ছুটে এলো নীচে, এনে কোচের উপর শুইয়ে দিল। অত্যন্ত হালকা দুর্ব্বল দেহ। ঠোঁটের দিকে চাইলে মনে হয় দেহে বুঝি আর প্রাণ নেই। রক্তহীন, নীলাভ দুই ওষ্ঠ পরস্পর সংলগ্ন। চোখ খুলে যখন চাইলেন, তখন সেই দুটি নীল চোখ যেন রাজ্যের মিনতি নিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে আছে, যেন ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে ছেলের কাছে। পল ব্র্যাণ্ডি ঢেলে দিতে গেল মুখে, কিন্তু মুখ হাঁ করতে পারলেন না। শুধু দুই চোখে স্নেহ ঢেলে দিয়ে ছেলের দিকে চেয়ে রইলেন।

পলের দুই চোখ বেয়ে অনবরত জল গড়িয়ে পড়তে লাগল, কিন্তু মুখের রেখায় কোন পরিবর্ত্তন নেই। একটু ব্র্যাণ্ডি মায়ের মুখে ঢেলে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল পল। অনেক চেষ্টার পর এক চামচ মায়ের পেটে গেল। মা অবসন্নের মত শুয়ে রইলেন, যেন কত শ্রান্ত। পলের চোখ দিয়ে তেমনি জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। মা অতি কষ্টে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, 'কেন, কেন কাঁদছ তুমি? এ এক্ষুণি সেরে যাবে। আর কেঁদ না।'

পল বলল, 'কই কাঁদছি না ত'?'

একটু পরে এ্যানি এলো। ভয়ে ভয়ে মার দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখন কেমন আছ?'

'ভালো। বেশ ভালো।' মিসেস মোরেল জবাব দিলেন। পল নীচে বসে তাঁকে ব্ল্যাকপুলের গল্প শোনাতে লাগলেন।

দিন দুই পরে পল নটিংহ্যামে গেল মায়ের পুরোন ডাক্তারের সঙ্গে একটা সময় ঠিক করে আসতে। এখানকার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করার জন্যে। মায়ের রোগ নির্ণয় করার জন্য তাঁর আসা প্রয়োজন। টাকার কথা পল ভাবল না। হাতে তার এক পয়সাও নেই। কিন্তু ধার চাইলে ত' পাবে।

পলের মা ডাক্তারের কাছে যেতেন শনিবার সকালে। সে সময়টা ডাক্তার সামান্য দর্শনী নিয়ে সমাগত দুঃস্থ রোগীদের চিকিৎসা করতেন। পল-ও গেল একই দিনে। ডাক্তারের বাইরের ঘরে তখন অনেক রোগী, তাদের অধিকাংশই গরীব মেয়ে মানুষ। পলের চোখে ভেসে উঠল তার মায়ের কালো পোষাকপরা মূর্ত্তি। তিনিও কত দিন এমনি ভাবে এখানে এসে বসে রয়েছেন। ডাক্তারের আসতে আজ দেরি হচ্ছিল। মেয়েদের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট। যে নার্সটি ঘোরাফেরা করছিল পল নিজের পরিচয় দিল, মায়ের নাম বলল, কিন্তু ডাক্তার মনে করতে পারলেন না। তখন নার্সটি বলল, 'ছেচল্লিশ এম নম্বরের রোগী।' ডাক্তার নোট-বই খুলে খুঁজতে লাগলেন।

পল বলল, 'পেটে টিউমার বা অন্য কিছু।...কিন্তু ডাক্তার অ্যানসেসের ত আপনার কাছে চিঠি দেবার কথা ছিল?'

'ও, হ্যাঁ। হ্যাঁ।' ডাক্তারের এতক্ষণে মনে পড়ল। পকেট থেকে চিঠিখানা খুলে পড়লেন আবার। অনেক ভদ্রতা আর সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, 'আগামী কালই তিনি যাবেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার বাবা কি কাজ করেন?'

'কয়লার খনির মজুর।'

'ও! তা'হলে খুব স্বচ্ছল অবস্থা নয় বোধ হয়?'

পল বলল, 'আপনি তার জন্যে ভাববেন না। এর ভার আমার।'

ডাক্তার হাসলেন। আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কোথায় কাজ করেন?'

—'আমি জর্ডন-এর কারখানার একজন কেরাণী।'

ডাক্তার ওর দিকে চেয়ে হাসলেন। বললেন, 'সে কিন্তু দূর ত' কম নয়।' তারপর হাতের আঙুল ক'টি জড়িয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'আট গিনি—কেমন?'

'ধন্যবাদ।' পল উঠে পড়ল। তার মুখ-চোখ তখন রাঙা হয়ে উঠেছে। সে বলল, 'কালকেই আসছেন ত'?'

'কাল—কাল হ'ল গিয়ে রবিবার। আচ্ছা, যাব। বিকেলের দিকে কখন গাড়ী পাওয়া যাবে বলতে পারেন?'

'সওয়া চারটের সময় একটা গাড়ি আছে।'

'বেশ তারপর বাড়ি যাবার উপায় কি? হেঁটে যেতে হবে না ত'? ডাক্তার হাসলেন আবার।

পল বলল, 'না ট্রাম আছে। ওয়েষ্টার্ণ পার্ক-এর ট্রাম।'

ডাক্তার নোট-বইতে টুকে নিলেন। হাত বাড়িয়ে বিদায় দিলেন পলকে।

তারপর পল তাদের বাড়ী গেল বাপের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়িতে মিনি আছে বাপকে দেখাশোনা করবার জন্যে। মোরেলের চুলে ক্রমশঃ বেশী করে পাক ধরছে। পল গিয়ে দেখল বাপ মাটি খুঁড়ছে বাগানে। আসবার আগে পল চিঠি লিখেছিল। গিয়ে হাত ধরে ঝাঁকানি দিল। মোরেল বলল, 'এই যে। এসে পড়েছ তা'হলে?'

—'হ্যাঁ। আজ রাত্রেই ফিরে যাব আবার।'

—'তাই নাকি! আশ্চর্য্য ত'। কিছু খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

—'না।'

—'তুমি কি বরাবরই এমনি ধারাই থাকবে! এসো, ভেতরে এসো।'

মোরেল স্ত্রীর কথা মুখে আনতেও ভয় পাচ্ছিল। দু'জনে বাড়ির ভিতরে গিয়ে বসল। পল নিঃশব্দে আহার শেষ করল। বাপ সামনের চেয়ারটায় বসে চেয়ে রইল ছেলের দিকে। তারপর ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'তা ও এখন আছে কেমন?'

'উঠে বসতে পারেন। চায়ের সময় পাঁজকোলা ক'রে নীচে নিয়ে যেতেও বারণ নেই।'

'বেশ, ভালো হলেই ভালো।' মোরেল মন্তব্যটা যেন ছুঁড়ে ফেলে দিল, 'আমি ত' ভাবছি শীগগিরই বাড়ি ফিরে আসতে পারবে। কী বলল তোমার নটিংহামের ডাক্তার?'

'কাল উনি যাবেন দেখবার জন্যে।'

'যাবেন নাকি! তা বেশ, বেশ। কত দিতে হবে ওঁকে? বেশ মোটা টাকা—কী বল?'

'আট গিনি।'

মোরেল যেন আকাশ থেকে পড়ল, 'আট গিনি! বল কি!' তার পর একটু থেমে বলল, 'তা যেমন করেই হোক টাকাটা যোগাড় ক'রে দিতেই হবে।'

পল বলল, 'আমিই না হয় দেব ও টাকাটা।' তার পর কিছুক্ষণ আর কেউ কোন কথা খুঁজে পেল না। অবশেষে পল আবার বলল, 'মা জিজ্ঞেস করেছেন, মিনি কেমন ক'রে চালাচ্ছে ঘরের কাজকর্ম্ম? তোমার কিছু অসুবিধা হচ্ছে না ত?'

'না, আমি খুব ভালই আছি। এখন ওর জন্যেই ভাবনা'।

'মিনি ছোট হলে কি হবে, খুব লক্ষ্মী মেয়ে—সে আমি আগেই বলেছি।'

পল গম্ভীর মুখে বসে রইল টেবিলের পাশে। বলল, 'আমি কিন্তু সাড়ে তিনটের সময় রওনা হব।'

'জানি বাপু! কী হাঙ্গামা তোমাকে পোয়াতে হচ্ছে! আট-আটটা গিনি! কবে নাগাদ ওকে বাড়ি নিয়ে আসতে পারবে কিছু বুঝতে পারছ?'

'দেখা যাক কাল ডাক্তাররা কি বলেন। তুমি বরং আসছে সপ্তাহে গিয়ে একবার দেখে এসো।'

মোরেল বলল, 'যাব ত' বটে। ভাবছি খরচের কথা। টাকা পাব কোথায়?'

—'আচ্ছা, আমি তোমাকে লিখব ডাক্তার যা বলেন।'

যথাসময়ে ডাক্তার এসে দেখে গেলেন।

এ্যানি মাকে ডেকে বলল, 'ডাক্তার বললেন এমন কিছু নয়। সামান্য একটা টিউমার। সহজেই সারিয়ে দিতে পারবেন।'

মা যেন ডাক্তারের বাহাদুরী ধরে ফেলেছেন। বললেন, 'এ আর নতুন কথা কি। আমি আগেই জানতুম।'

পল যে তাকে শুইয়ে দিয়েই ঘর ছেড়ে চলে গেছে, মা তা দেখেও না দেখার ভাণ করলেন। পল গিয়ে বসল রান্নাঘরে, একটা সিগারেট ধরিয়ে টানতে লাগল।

পরদিন পলের কাছে ফিরে যেতে হবে! যাবার আগে সে মাকে চুম্বন করতে গেল। তখনও ভাল করে রোদ ওঠেনি, ঘরে তারা দু'জনে ছাড়া আর কেউ নেই। মা বললেন, 'তুমি ভেব না, শুধু শুধু।'

—'না, মা'।

—'হ্যাঁ, ভেবে কী হবে? নিজের দিকেও একটু নজর রেখো।'

—'হ্যাঁ'। তারপর একটু থেমে বলল, 'আমি সামনের শনিবার আসব। বাবাকেও নিয়ে আসব, কি বলো?'

—'ও যদি আসতে চায়—আসতে চাইলে ত' আর ওকে বারণ করতে পারবে না?'

পল আবার চুম্বন করল মাকে। কপালের চুলগুলিকে সন্তর্পণে সরিয়ে দিল, যেন কত কালের প্রণয় তাদের। মা বললেন, 'তোমার দেরি হয়ে যাবে না ত?'

'এই যাচ্ছি আমি।' পল বলল। গলায় শব্দ যেন আর বেরোয় না। তবু আরও কয়েক মিনিট এমনি করেই বসে রইল পল, হাত বুলিয়ে দিতে লাগল মায়ের চুলে, মায়ের কপালে। বলল, 'অসুখের আবার বাড়াবাড়ি হবে না ত' তোমার?'

'না, আর কিছু হবে না।'

'বল তুমি ভাল হয়ে উঠবে?'

'বলছি রে। আর আমার অসুখ করবে না।'

পল চুম্বন করে এক মুহূর্তে মাকে বাহুপাশে নিয়ে বসে রইল, তারপর মুখ ফিরিয়ে ঘর ছেড়ে বাইরে চলে গেল। ষ্টেশনের পথটুকু সে যেন ছুটেই গেল, সারা রাস্তা গেল কাঁদতে কাঁদতে। কিসের কান্না, সে নিজেই তা জানে না। আর মা শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলেন ছেলের কথা, ক্ষণে ক্ষণে তাঁর নীল চোখ দুটি বিস্ফারিত হয়ে উঠতে লাগল, দূরের দিকে চোখ মেলে চেয়ে রইলেন শুধু।

বিকাল বেলা পল গেল ক্লারাকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে। ছোট জংলা জায়গাটি, নীল ফুলে ফুলে ভর্ত্তি, দু'জনে গিয়ে বসল সেখানে। পল ক্লারার হাত তুলে নিল নিজের হাতে। বলল, 'তুমি দেখো। আর মা ভালো হবে না। আর ভাল হবার কোন আশা নেই।'

ক্লারা বলল, 'কী যে তুমি বল!'

'ঠিকই বলি আমি। আমি জানি।'

ক্লারা আবেগ ভরে ওকে বুকে আঁকড়ে ধরল। বলল, 'ও কথা এখন ভুলে যাও। চেষ্টা করো অন্য কথা মনে করতে।'

পল বলল, 'তাই করব।'

ক্লারার উষ্ণ বুকের স্পর্শ পাচ্ছে পল, ক্লারার হাত ওর চুলে। গভীর সান্ত্বনায় বুক ভরে নিয়ে পল দুই বাহু প্রসারিত করে ক্লারাকে বেষ্টন করল। কিন্তু ভুলে যাবার তার সাধ্য কি? মুখে সে ক্লারার সঙ্গে অন্য কথা বলে চলেছে, কিন্তু আবার ফিরে ফিরে জাগছে সেই তীব্র বেদনা।

বার বার ক্লারা ওকে বুকে টেনে নিয়েছে, গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়েছে, শিশুকে লোকে যেমন আদর করে তেমনি আদর করেছে ওকে। ওর কাছে গিয়ে পল কিছুক্ষণের জন্যে ভাবনার বোঝা থেকে রেহাই পেয়েছে কিন্তু একা হলেই আবার সেই ভাবনা। ক্লারা শুধু তার মনকে অন্য দিকে রাখবার কাজে সামান্য সহায় মাত্র।

শনিবার দিন মোরেল গেল শেফিল্ডে। লোকটির চেহারা এ কয়দিনেই রুক্ষ হয়ে উঠেছে, যেন কারও হাত থেকে খসে সে ধূলায় পড়ে গেছে, এমনি সহায়-সম্বলহীন ভাব। পল ছুটে গেল খবর দিতে। দোতলায় মাকে গিয়ে বলল, 'বাবা এসেছেন যে।'

—'এসেছে?' মায়ের শান্ত স্বর পলের কানে বাজল। মোরেল এসে ঘরে ঢুকল, চোখে-মুখে একটা হতচকিত ভাব। কোনমতে আলগোছে একটা চুম্বন সেরে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি গো, কেমন লাগছে এখন?'

মিসেস মোরেল বললেন, 'এই—এক রকম!'

'তাই দেখছি।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মোরেল স্ত্রীকে দেখতে লাগলেন। তারপর রুমাল বার ক'রে চোখ মুছল। নিজেকে নিঃসম্বল আতুরের মত মনে হতে লাগল তার।

মিসেস মোরেলের কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছিল। টেনে টেনে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার কিছু অসুবিধে হচ্ছে না ত'?'

—'না। চলে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এক-আধটু দেরি হয়ে যায়, এই যা!'

—'তোমার রাত্রের খাবার ঠিক মত তৈরি করে রাখে ত'?'

—'রাখে। মাঝে মাঝে একটু-আধটু বকা-ঝকাও ওকে করে ফেলি।'

—'তা করবে বৈ কি। হাতের কাজ ফেলে রাখা ওর স্বভাব।'

মিসেস মোরেল স্বামীকে সাংসারিক দু'-একটা কথা আরও বললেন। মোরেল জবুথবু হয়ে মাথা নীচু করে বসে রইল।

মিসেস মোরেলের বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন আর দেখা গেল না। উনি শেফিল্ডে আরও দু'মাস রইলেন। কিন্তু শেষ দিকে অবস্থা যেন আরও খারাপের দিকে যেতে লাগল। বাড়ি ফিরে যাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। এ্যানিরও ছেলেমেয়ের ঘর। সেইজন্যই আরও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন বাড়ি যাবার জন্যে। ট্রেণে যাবার মত শরীরের অবস্থা আর নেই, কাজেই নটিংহ্যাম থেকে মোটর ভাড়া করে আনা হ'ল। তখন সবে বসন্ত শেষ হয়েছে—চারদিক ঝটঝটে পরিষ্কার। রোদের মধ্য দিয়ে চলল মিসেস মোরেল-এর গাড়ি। উপরে নীল আকাশ, নীচে এই মৃত্যুপথযাত্রিনী—কারুরই আর বুঝতে বাকী ছিল না যে ওঁর জীবনের আশা আর নেই। তবু মিসেস মোরেল নিজেই আজ অন্য দিনের চেয়ে বেশী উৎফুল্ল। সারা রাস্তা সবাই হাসি-গল্প করতে করতে এলেন। একবার মিসেস মোরেল বলে উঠলেন, 'এ্যানি দেখ ত', ঐ পাহাড়ে ওটা কি? গিরগিটিটা লাফিয়ে গেল না?' তাঁর চোখের দৃষ্টি যেন আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। প্রাণে এসেছে বন্যা।

মোরেল জানত, বাইরের দুয়ারটা সে খুলে রেখেছিল। সবাই উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে। পাড়ার অর্দ্ধেক লোক এসে জমায়েৎ হয়েছে মোরেলদের বাড়িতে। দূরে বড়ো মোটর গাড়িটার শব্দ শোনা গেল। মিসেস মোরেলের মুখে হাসি ধরে না। কতদিন পরে আবার তিনি নিজের ঘরে ফিরে এলেন। বললেন, 'দেখছ এরা সবাই এসে জুটেছে আমাকে দেখবার জন্যে। তা অমন হলে আমিই কি আর গিয়ে জুটতুম না? তারপর, মিসেস ম্যাথুজ, কেমন আছেন আপনি? আর ভাই, তুমি আছ কেমন?'

তাঁর কথা কারও কানে গেল না। সবাই দেখল উনি হাসছেন আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়ছেন। পরে সবাই বলল, 'ওঁর মুখে নাকি মরণের ছায়া ছিল সুস্পষ্ট। এ পাড়ায় এ রকম হুলুস্থুল কদাচিৎ ঘটে।'

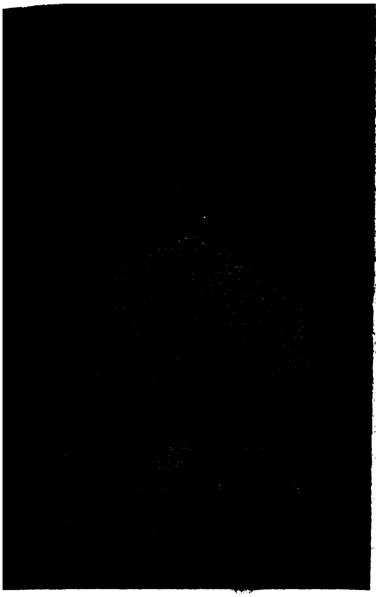
মোরেলের ইচ্ছে ছিল, সে নিজেই কোলে ক'রে ওঁকে ঘরে নিয়ে আসে। কিন্তু তারও ত' বয়স হয়েছে। আর্থারই নিয়ে গেল ওঁকে কোলে ক'রে—শিশুর মত হাল্‌কা। চিমনির পাশে যেখানে আগে দোলন-চেয়ারটা থাকত, সেইখানে একটা বড়, গদি-আঁটা চেয়ার পেতে রাখা হয়েছিল। সেইখানে বসে গায়ের চাঁদরটা খুলে একটু ব্র্যাণ্ডি পান করে নিয়ে মিসেস মোরেল ঘরের চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলেন। এ্যানিকে ডেকে বললেন, 'জানিস মা, তোর বাড়ি যে আমার ভাল লাগত না তা নয়, তবু এ যেন আমার নিজের বাড়ি। কত যে শান্তি এখানে।'

তখন মোরেল ধরা গলায় বলে উঠল, 'তুমি ঠিকই বলেছ গো, ঠিকই বলেছ!'

আর মিনি, সেই বাচ্চা চাকরাণীটি, বলে উঠল, 'আপনি এখানে না থাকলে কি আমাদের ভাল লাগে?'

বাগানে এক-ঝাড় সূর্য্যমুখী ফুটে রয়েছে, কী সুন্দর তাদের বর্ণ! পল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিল। মা বলে উঠলেন, 'আর এই সূর্য্যমুখীগুলো—এদেরও আজ আমার কত আপন বলে মনে হচ্ছে!' [ক্রমশঃ।

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

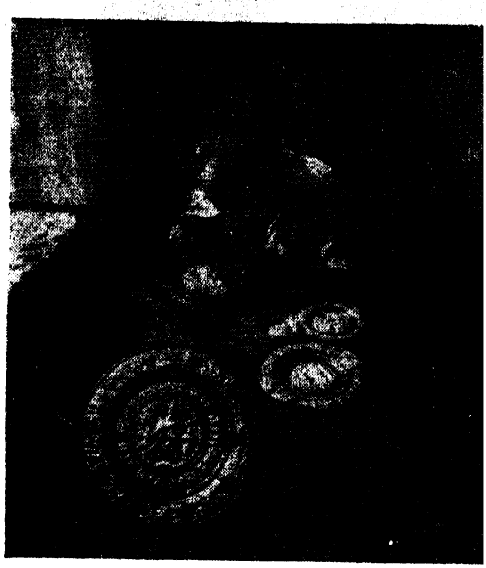


তাজমহল

—রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়

শিল্পকার্য্য

—জ্যোতির্ম্ময় ঘোষ

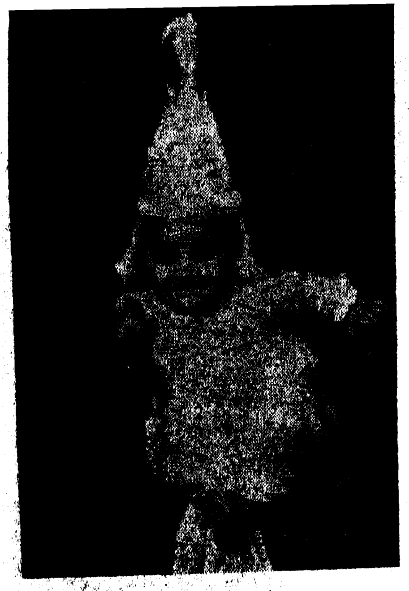


আলোকচিত্র ॥

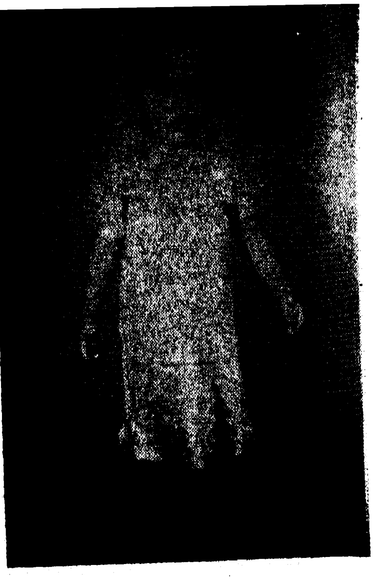
হাঁস-পাতাল

—অজিত ভট্টাচার্য্য





—আর্ট ইউডিও



—শঙ্কর বিশ্বাস

শিশু মহল

—গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়



—প্রদ্যোৎ দে





যাত্রা
—সুনীল সরকার

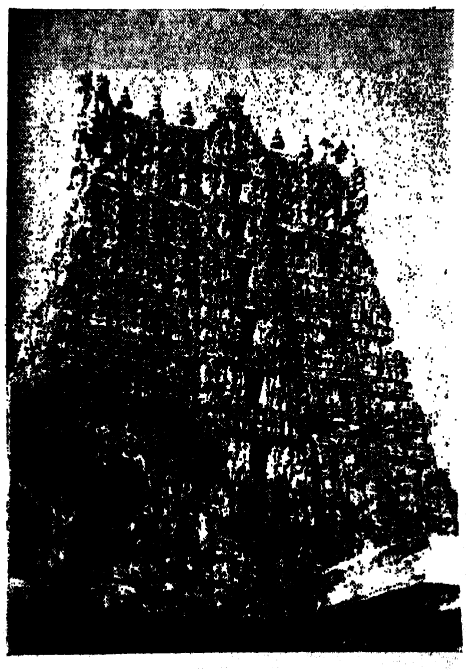
অবাক —পূর্ণিমা হাটী

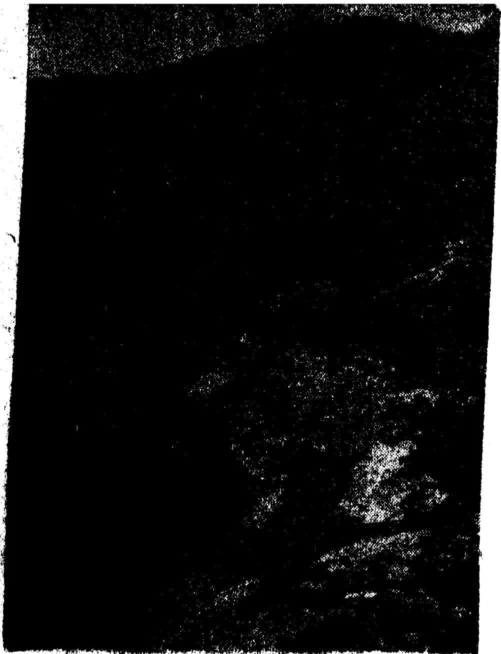




ফুলবালা
—সুলতা মিত্র

শাটীঅম্
মানবচন্দ্র মিত্র





জল-প্রপাত

—অমলকুমার রুদ্র

কন্যাকুমারী

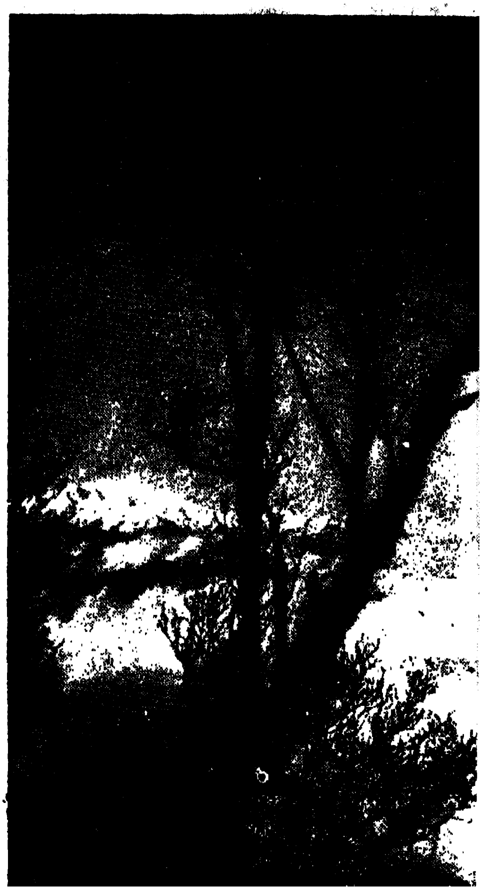
—গোপালদাস মজুমদার





পাঠিকা —যোগমায়া সরক

হিমালয় —কাজলী বন্দ্যোপাধ্য



সম্ভব হয়েছিল ঐ যাদুর কাটিরই দৌলতে। যে যাদুর কাটিটি আমি হাতে করে এনেছিলাম আসলে সেটি ছিল বিশেষ ভাবে তৈরী করা। দেখতে কাটির মতন মনে হলেও আসলে এটি ছিল একটি এক মুখ-বন্ধ টিনের চোঙ। বাইরে কাল রঙ করা থাকাতে এবং স্বাভাবিক ভাবে নাড়া-চাড়া করাতে কারও সন্দেহ হয় নি এটার সম্বন্ধে। নিজের ঘরে গিয়ে দুটো ডিম ভেঙে নিয়ে ভাল করে সাদা আর হলুদ অংশ মিশিয়ে নেবার পরে এই তরল পদার্থ আমি ভরে নিয়েছিলাম আমার যাদুর কাটির মধ্যে আর চোঙের খোলা মুখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম এক টুকরো 'চিজ' বা পনীর দিয়ে। সসপ্যানের ভেতরে গরম মাখন নাড়াবার জন্যে এই 'চিজ' দিয়ে বন্ধ করা দিকটাই ঢুকিয়ে দেবার ফলে উত্তাপে চিজ গলে যায় আর ডিমের তরল অংশ গড়িয়ে প'ড়ে আমলেট তৈরী হয়। সসপ্যানের তলাটা কানা থেকে অনেক নীচে থাকাতে দর্শকদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না এই কাণ্ড-কারখানা!



[পূর্বানুবৃত্তি]

(আধুনিক কালের এক দৈত্য কাহিনী)

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

[পূর্বানুবৃত্তি :—ম্যাজিক চশমা দিয়ে রাজু যখন বাষ্পের আবিষ্কার এবং ষ্টীমইঞ্জিন তৈরীর ধারাবাহিক কাহিনী ছবির মত দেখছিল তখনই বাষ্পরাজের দুই অনুচর তার কাছে হাজির হয়। তারা সসম্ভ্রমে রাজুকে ডাকলো খাবার জন্যে।]

রাজুকে নিয়ে চৌকোমাথা ও গোলমাথা সোজা একটি হলঘরে উপস্থিত। হলটি বড় অদ্ভুত! সোজা সোজা দেয়াল, গম্বুজের মত গোলাকার ফাঁক। জানলা-দরজায় পরদা আছে কিন্তু মাথায় সার্সিগুলি বন্ধ। ঘরটা বেশ গরম। মাঝে মাঝে কোথা থেকে যেন গরম হাওয়া আসছে মনে হ'ল।

গোলমাথা একটা গ্লাসে এক রকম পানীয় নিয়ে এসে রাজুর সামনে ধরল। 'তোমার নিশ্চয়ই গরম লাগছে?' বললে সে।

'সে কথা বলতে? এত গরমে মানুষ থাকতে পারে?' রাজু বললে।

হাসতে হাসতে গোলমাথা বললে, 'তাই ত এনেছি এটা, শীগ্‌গির খেয়ে নাও। আর গরম থাকবে না এটা খেয়ে নিলে।' হীঃ হীঃ হীঃ!

চৌকোমাথা চটে বলে উঠলো, 'এতে হাসবার কি আছে? তোর সবটাই বাড়াবাড়ি।' গোলমাথাও ছাড়বার পাত্র নয়। 'বেশ করেছি, বেশ করবো। তোর মত রামগরুড়ের বাচ্চা হতে পারবো না আমি। মানুষের মত আমরাও হাসবো না কেন? তোর ঠোঁটের ইস্ক্রুপগুলো একটু টিলে করা দরকার।'

'খবরদার! ঠোঁটের ওপর কথা কবি না।' চৌকোমাথা তেড়ে আসে। রাজু মাঝে দাঁড়িয়ে তাদের ঝগড়াথামানো ছাড়া আর কি করবে? সে হাসতে হাসতে বললে, 'তোমাদের আবার সেই ঝগড়া! আচ্ছা, আমি তাহলে খেলুম এটা।'

এমন সময় দরজার পর্দা নড়ে উঠলো। বাষ্পরাজের বিরাট মূর্ত্তি দেখা গেল। দুই অনুচর সরে দাঁড়ালো এবং পিছু হেঁটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল তারা।

'খাবার কথা মনে ছিল না তোমার?' গম্ভীর গলায় বললেন বাষ্পরাজ।

'এতক্ষণ আপনার কীর্ত্তি-কাহিনীর ছবি দেখছিলাম কি না, তাই খেয়াল ছিল না। এখন বুঝতে পারছি আমার পেটের নাড়ীগুলো বুঝি হজম হয়ে গেছে। কিন্তু কই? এখানে খাবার দ্রব্য কিছুই ত দেখছি না?'

'হা হা হা!' রাজা হাসিতে ফেটে পড়েন। তারপর বলেন, 'তার মানে? সবই আছে এখানে। ঐ ঢাকাটা তোল দেখি একবার। আচ্ছা, তার আগে বল ত তুমি কি কি ভালবাসো খেতে?'

রাজু বললে, 'লুচি, মাংস, সন্দেশ, রসগোল্লা, পায়েস…'

'আচ্ছা, এইবার ঢাকা তোল।'

রাজু একটা পিতলের চাপা খুলতেই দেখে, সত্যিই নানান খাবার সাজানো। আর সে যা যা বলেছিল সেইগুলোই ঠিক আছে।

পেট-চুঁই-চুঁই খিদের সময় ওসব দেখে তার জিভটা যে ভিজে উঠলো তা আর বলতে হবে না। তবে একটা ভদ্রতা ত আছে? রাজার খাদ্য কোথা?

'আপনি খাবেন না?'

'আমি ও-সব খাই না।'

'সন্দেশ রসগোল্লাও নয়?'

'না।'

'তাহ'লে কেক পুডিং বা স্যাণ্ডউইচ?'

'না।'

'তাহ'লে ফল-টল? যেমন আম, জাম, আপেল?'

'না, তা-ও নয়।'

'তবে, কি খাবার? কোন দেশের খাবার?'

'এই যে আমার খাদ্য।' বলেই রাজা হাসতে হাসতে একটা কমলা রঙের বড় কাচের গ্লাস তুলে ধরলেন। আর একটা ফ্লাস্ক থেকে ঢাললেন তরল ধূমায়িত পানীয়। 'এখন বুঝতে পারলে, এই আমার খাদ্য। এটা হচ্ছে ফুটন্ত জল।'

ঢক ঢক ক'রে গলায় ঢাললেন তিনি। ইতিমধ্যে রাজুও তার প্লেট থেকে সুখাদ্যগুলিকে শেষ ক'রে ফেলেছে। পানীয় নিঃশেষ করে রাজা বললেন, 'এই ফুটন্ত জলই আমাকে উত্তপ্ত রাখে, আমায় সবল করে, সচল রাখে।'

সত্যিই রাজা যেন উদ্দীপিত হয়ে ওঠেন। চেহারা বেশ ফুলতে থাকে যতক্ষণ না বিরাট দৈত্যের মত হয়ে ওঠে।

'দ্যাখ, দ্যাখ', বলেন রাজা। 'আমি বড়র চেয়েও বড় হতে পারি।

আসলে বড় হওয়াটাই আমার মজা লাগে। কুঁচকে থেকে, কুঁকড়ে থেকে আনন্দ নেই। জানো, আমি কত বড় হতে পারি? এক কৌটো জলের থেকে আমি ষোল শো কৌটোর আকার ধরতে পারি। ফুলতে যা মজা, আঃ। আবার, শোনো, সরু নলের মধ্যে দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে এমন চলে যাবো যে অবাক হয়ে যাবে। তবে সব সময়ই আমার জায়গা চাই। ছোট জায়গায় হাঁপিয়ে উঠি। জায়গা পেলেই দেহটাকে বেশ ছড়িয়ে দিই, এলিয়ে দিই। খাটো জায়গায় আটকা পড়লেই আমার দুঃখ। সত্যি কথাই বলছি শোন, ঐ যে তোমাদের কে মহাপুরুষও বলেছেন, সঙ্কীর্ণতাই হচ্ছে দুঃখের গোড়া। ঐটাই পাপ। যাই হোক, আমি কিন্তু সহ্য করি না। সর্বশরীর দিয়ে ঠেলা দিই, চাপ দিয়ে দেয়ালটা হয় সরাবো নয় ভাঙ্গবো। আমার প্রতাপে লৌহ-কারাগারও মাঝে মাঝে ফেটে চৌচির হয়ে পড়ে। তুমি কি দেখনি, ইঞ্জিনের পিষ্টনকে কী ভীমবলে আমি ঠেলি?'

'হ্যাঁ দেখেছি।' বললে রাজু।

'সে বড় অদ্ভুত কাণ্ড! পিষ্টনকে আমি একবার সামনে একবার পেছনে ঠেলি, আর তার ফলে চাকা ঘুরতে থাকে। আর কয়েক শো চাকায় জোড়া গাঁথা তোমাদের রেলগাড়ী অমনি চলতে থাকে। গাড়ী যতই ছোটে আমার কী আনন্দ! হুশ হুশ, হাউ'শ হাউ'শ··· পিক—পি-ই-ক··ঢং ঢং···

'আমারও ভীষণ মজা লাগে', রাজু বললে। 'সত্যি, আপনি আমাদের কত যে উপকার করেন তার ঠিক নেই! আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে শেষ করা যায় না।'

'আহা-হা! ধন্যবাদ দিতে হবে না। ধন্যবাদ না দিলেও আমি তোমাদের কাজ করবো। আহা, মহাসাগরের ওপর দিয়ে তোমাদের যখন জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাই—সাগরের কথা মনে পড়লেই আমার মনটা দুলে ওঠে। তুমি দেখবে? আমি ভাল নাচতেও পারি। অতি আনন্দে আমার গান পেয়ে যায়। শুনবে? তোমাদের শোনাতেই আমি ভালবাসি। বড়দের কাছে আমার মন খোলে না। তারা কেবল কাজ চায়···'



রাজা আর এক ফ্লাস্ক ফুটন্ত জল ঢক্ ঢক্ ক'রে গলায় ঢেলে দিলেন।

'তোমরা কাজ চাও না আমাকে চাও? আমার চেহারা দেখে তোমাদের চোখ বড় বড় হয়, আমার হাসি দেখে তোমরা খুশি। তাই বাচ্চাদের, কিশোরদের ভাল লাগে আমার।

তাদের শোনাই আমার হুশ,
যদি তাদের দিলটি হয় খুশ—;
হাউশ হুশ হাউশ হুশ···।
ঘটাং ঘট ঘটাং ঘট
গড় গড় গড় ফট্ ফট্
তাদের দিকে আমার হুঁস্
হাউশ, হুশ হাউশ, হুশ···
আমি ছোটর তালে নাচি
আমি লাটিম হয়ে বাঁচি···
হাউশ্, হুশ···'

আত্মহারা আনন্দে রাজা নাচতে শুরু করে দিল। ঘরের সমস্ত আসবাবও যেন তালে তালে নাচছে। চৌকোমাথা গোলমাথা ওরাও যোগ দিয়েছে কখন। রাজু জীবনে এরকম উদ্দাম আবেগের নৃত্য আর দেখেনি। তার মনটাও দুলে দুলে উঠছে। কোথায় লাগে এর কাছে থিয়েটারের সেই পানসে নাচ আর মিহি সুরের গান।

ঝন্ ঝন্ ঝণাৎ!

হঠাৎ উত্তর দিকের জানলার একজোড়া সার্সি সশব্দে খুলে গেল। নাচের ঝোঁকে চৌকোমাথা হয়ত বা ছিটকিনির ওপর টলে পড়েছিল। যাই হোক, সার্সি খোলার সঙ্গে এক ঝটকা ঠাণ্ডা উত্তরে হাওয়া ঘরে ঢুকলো শন-শন করে তীরের ফলার মত। রাজুর গা'টা কেঁপে উঠলো। গলার বোতামটা এঁটে মুখ তুলে চেয়ে দেখে রাজা নেই। কী আশ্চর্য! এ কি ভৌতিক ব্যাপার!

না তা ত নয়। ঐ ত অনুচর দু'জন ছুটে গিয়ে কাচের সার্সিগুলো বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে রাজা কোথা অদৃশ্য হলেন?

হলঘর আবার গরম হয়ে উঠলো। একটু পরেই আবির্ভাব হলো রাজার। সেই বেশ, সেই পরিচ্ছদ শুধু একটু বিষণ্ণ।

'আমি কি স্বপ্ন দেখলাম?' বলে রাজু। 'না কি আপনি কোনও যাদুবিদ্যার নমুনা দেখালেন?'

'উঁ হুঁ' 'রাজার কম্পিত কণ্ঠ। 'তুমি যা দেখলে এর চেয়ে সত্যি আর কিছুই হতে পারে না। আর আমার পক্ষে এটা নিষ্ঠুর সত্য।'

'বুঝতে পারলুম না।'

'দেখ, পৃথিবীতে এমন কোনও দৈত্য-দানব নেই যে, আমার সঙ্গে পাল্লা দেয়। সব চেয়ে ভারী রোলারকে আঙুল দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাবো হিড় হিড় করে। কিন্তু···ঐ ঠাণ্ডা, ঐ আমার শত্রু। ওই

শুধু চলে আমাকে অন্ধকার করে। ও আমায় পিষে মারতে চায়। ওর কবলে আমি কুঁকড়ে যাই—চুপসে যাই, গলে যাই।'

রাজুরও যথেষ্ট দুঃখ হলো। আহা, সত্যিই ত, এক মুহূর্তে ঐ ঠাণ্ডা হাওয়া রাজাকে গলিয়ে দিলে! আস্তে আস্তে রাজাকে যে রাজুর ভাল লাগছিল তা সে এখন বুঝতে পারলে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! মনের কথা বুঝতে পেরেই যেন রাজা বললেন, 'অবাক হয়ে গেছ খুবই? তাই না? এত বড় আমার শক্তি অথচ এত সহজে কোথায় উড়ে যায়! এই ত? আহা-হা-হাঃ··· শোন শোন, ভয় নেই, আমায় কেউ মারতে পারে না। এটা আমার দেবদত্ত বর। আবার বেঁচে উঠি আমি—যেমন ছিলাম তেমনি! আমাকে লুপ্ত করতে কেউ পারে না।'

'বড় আশ্চর্য ত'? রাজু অবাক হয়ে বলে। আপনাকে যতই দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। সত্যি বলতে কি পৃথিবীর যে কোনও রাজা বা দৈত্য আপনার কাছে দাঁড়াতে পারবে না।'

'শক্তিটাই আমার বড় নয় কিন্তু। কাজ করার মধ্যে আমার আনন্দ আরও বড়, তাই···'রাজার কথাটা শেষ হ'তে না হ'তেই একটা ঘন্টা বেজে উঠলো ঢং ঢং ঢং—মনে হ'ল কোনও বিপদ-সূচক ঘণ্টা।

রাজা স্যুট ক'রে একটা নলের মধ্যে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল। ত্বরিৎগতিতে রাজা অতুলনীয়। কিন্তু এটা ভয়ের চিহ্ন নাকি? রাজুর মনে বেশ একটা খট্‌কা লাগে।

হলঘর থেকে বাইরে এসে পড়তে তার দেরী হলো না। বাইরে এসে সে আরও অবাক হলো। রাজ্যের মিস্ত্রী মজুর ছেলে বুড়ো সবাই জড়ো হয়েছে একটা মাঠে। সবাই তাকিয়ে আছে মাঠের প্রান্তে একটা ধূসর রঙের পর্ব্বতচূড়ার দিকে।

কয়েকটি লোক দৌড়ে এসে বলতে লাগলো, 'পাহাড়টা নড়ছে।' অনেকে বিশ্বাস করলো না, কিন্তু সবার মধ্যে কৌতূহল। এগিয়ে যাচ্ছে অনেকেই দেখবার জন্যে।

একটু পরেই আর এগিয়ে যাবার দরকার হলো না। স্পষ্ট দেখা গেল, পাহাড়টা সত্যিই এগিয়ে আসছে এবং শুধু তাই নয়, বেশ যেন মানুষের আকার বলেই মনে হচ্ছে। এত দূরে অথচ যখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তখন ঐ দেহধারী জীবটি যে কত বড় তা কল্পনা করা শক্ত! শুধু তাই নয়, জীবটির নড়াচড়া যেন বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। আকাশের দিকে পেছন ফিরে আসছে সে। হাতেও কী যেন একটা রয়েছে। সেটা খানিকটা গদার মত। সেটা দুলিয়ে দুলিয়েই আসছে অতিকায় ঐ জীবটি।

ব্যস্ত-ত্রস্ত লোকেদের মধ্যে এতক্ষণ পরে প্রফেসারকে দেখতে পেলে রাজু। প্রফেসারকে বেশ চিন্তিতই দেখাচ্ছিল।

'আহা-হা, তোমাকেই ত খুঁজছি এতক্ষণ।' বলে উঠলো প্রফেসার। 'মানে কথা, মস্ত বিপদ।'

'কেন কি হয়েছে?'

'দেখছ না, ওদিকে আসছে কে? এখনও, মানে কথা, তোমার প্রশ্ন? ওদিকে আর একবার তাকাও'—

সত্যিই রাজু তাকালো, আর তার হৃৎকম্প হতে লাগলো! অতিকায় দৈত্যটি অনেক দূরে হেঁটে এসেছেন। পদভরে মাটি কেঁপে উঠছে। হাতের বিরাট শালদণ্ড কাঁধের ওপর। বাঁ হাতে এক খণ্ড মস্ত পাথর। ভয়-পাওয়া হাজার হাজার ছুটন্ত লোকদের দেখে ঐ দৈত্য খুব কৌতুক বোধ করছে! হাসির ধাক্কায় তার পাঁজরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। প্রাণ ভয়ে সমস্ত লোক ছুটলো বাষ্পরাজের যন্ত্রপুরীর মধ্যে।

'রাজাকে ডাকো, রাজাকে ডাকো। আর আজ নিস্তার নেই।' চীৎকার করছে সবাই।

রাজপুরীর পথে চলতে চলতে প্রফেসারের কাছে রাজু শুনলো যে, ঐ দৈত্যকে ওরা কেউই চেনে না। তবে ওরা শুনেছিল পুরীর পশ্চিমে অরণ্য-ঢাকা কয়েকটা পর্বত আছে, সেখানে একটা নীলাভ পাহাড়ের নাম ঘুম-পাহাড়। সেখানে নাকি এক বিরাট দৈত্য থাকে। সারা বছর সে থাকে ঘুমিয়ে, শুধু গ্রীষ্মের গরমে তার ঘুম ভেঙ্গে যায়—সে জেগে ওঠে।

'দেখছো না?' বললে প্রফেসার। ও'র গায়ে সবুজ শ্যাওলা জমে আছে—ঠিক যেন বর্ষাকালের বেলে পাথর। একবার বড় মজা হয়েছিল! ওদের পাহাড়ের ধার ঘেঁষে আমাদের রেল-লাইন গেছে ত। একদিন আমাদের একখানা গাড়ী যেতে যেতে ঐ পাহাড়ের গায়েই দাঁড়িয়ে পড়ে! দৈত্যরা এ দৃশ্য পাথরের ফাঁক থেকে দেখতে পেলে। ইঞ্জিনটা ছিল খুব জোবালো আর কালো কুচকুচে। দৈত্যরা ভাবলে এ নিশ্চয়ই আর কোনও দৈত্য। তারা অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে জব্দ করার জন্যে মোটা মোটা কাছি নিয়ে বেরিয়ে এলো। সেই দড়ি বাঁধলো ইঞ্জিনের বাফারে। আর এক প্রান্ত বাঁধলো তাদের গুহার ছাদ-ধরে-থাকা পাথরের থামের সঙ্গে। বেশ শক্ত ক'রেই বাঁধলো কাছিটা।'

তাদের তখন খুব আনন্দ! শত্রুকে বন্দী ক'রে যে আনন্দ হয়। এদিকে ঠিক সময় হ'তেই আমাদের ইঞ্জিনের ড্রাইভার ষ্টার্ট দিলে। কাছি টান হ'তে লাগলো এবং শেষে পাথরের থামশুদ্ধ উপড়ে এলো। দৈত্যদের ঘরের ছাদ পড়লো হুড়মুড় করে ভেঙ্গে। মানে কথা, জব্দ যা হলো ব্যাটারা, সে আর কি বলবো! সেই থেকে রাগ আমাদের ওপর।'

গল্প শুনতে শুনতে রাজুরা এসে পড়লো যন্ত্রপুরীর মধ্যে। মেঘ-গর্জনের মত কানে এলো, 'কে তুই?' গম্বুজের মত বিরাট চিমনির ওপর থেকে বাষ্পরাজ হাঁক দিলেন।

গিরি-শিখরের মত আকাশ-ছোঁওয়া মাথা আগন্তুক দৈত্য দাঁত কড়মড় করে বললে, 'মোরে চিনবি। এক গ্রাসে খেলে ত চিনবি। তোদের শব্দে আমি ঘুমুতে পারি না। আজ সব চুরমার করে দেবো·····'

বিরাট গদাখানা শূন্যে ঘুরিয়ে ছুঁড়লো সে। সেটা উল্কার মত ছুটে এসে বাষ্পরাজের হাতে এসে পড়লো। হাতের মধ্যে দিয়েই সেটা চলে গেল, কিছুই হলো না। এতে প্রতিপক্ষের রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। দৈত্য ক্ষেপে গেল। 'তবে এই পাথর দিয়েই তোকে শেষ করি!' গর্জন ক'রে বললে। ছোঁড়বার জন্যে বিরাট হাত দিয়ে এবার এক মস্ত পাথর শূন্যে তুলেছে সে। সকলে ত্রাহি ত্রাহি ক'রে উঠলো, কেন না রাজপুরীর অনেকখানিই চুরমার হয়ে যাবে সেটার পতনে। কিন্তু, লক্ষ্য ঠিক করার সময়েই ঘটলো এক বিভ্রাট। বাষ্পরাজকে দেখা গেল না।

[আগামী বারে সমাপ্য]



কেনা কাটা

দ্রব্যমূল্য (প্রাপ্ত)

সাধারণ মানুষের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা শুনিবার মত এক ভগবান ছাড়া আর কেহই নাই। ভগবান অবশ্য মানুষের ভিতর দিয়াই তাঁহার সকল কার্য্য করেন। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং' অবতাররূপে মানুষের আকারেই তিনি ধরায় অবতীর্ণ হন। ধর্ম্মভীরু মানুষ অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবর্ষে দেখা যায়। এই ভারত হইতেই যত মহামানব ও তাঁহাদের অনুগামীরা তাঁহাদের বার্ত্তাবাণী বহিয়া সারা পৃথিবীময় বেড়াইয়াছে। সেই ভারতবর্ষেই আজ ধর্ম্ম অবহেলিত! ধর্ম্মের নামে মানুষ নাসিকা কুঞ্চিত করে। ভগবানের নামে, অবতারের নামে হুজুগে মাতিয়া বন্দনা-শোভাযাত্রা করিলেও হৃদয়ে তাহার প্রতিষ্ঠা করে না। দৈনন্দিন জীবনে অধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেছে। প্রতারণা মিথ্যাচরণ জীবন ধারণের অবশ্য-প্রয়োজনীয় অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে! সাধারণতন্ত্র স্থাপন করিয়া কল্যাণের জন্য উচ্চ চিৎকারে দেশ প্রকম্পিত করিতেছে কিন্তু কুটির কুটিরে অকল্যাণ রোগ শোক দীনতার প্রভাব মৌরসী হইয়া উঠিয়াছে। সাধারণতন্ত্র স্বতন্ত্রতায় পর্য্যবসিত। 'আপকাবাস্তে' সকলেই মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে। অপরে বাঁচিয়া আছে কি না সে খবর লইবার গরজ কাহারও নাই। এতোক্ষণ শিবের গীত গাহিলাম, এবার ধান ভাণার কথায় আসি। বলিতেছি, বর্ত্তমান দ্রব্যমূল্যের উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কথা।

সাধারণ মানুষ অসাধু ব্যবসায়ীর জ্বালায় অস্থির। অবতার-বরিষ্ঠ সাধারণতন্ত্র নিয়োজিত সরকার ব্যতিব্যস্ত উদাসীন! এমতাবস্থায় সাধারণ মানুষ কণ্ঠাগতপ্রাণ। কিং কর্ত্তব্যং? কে মাথা ঘামায়? আমার আয়ের মাত্রা ঠিক রহিলেই হইল। আমার বিলাস-ব্যসন উপযোগী ব্যয়ের অনুকূল অর্থোপার্জ্জন ঠিক রহিলেই জগৎসংসার থাকিল বা না থাকিল তাহাতে কি বা আসে যায়? অথচ আমরা আমাদের কল্যাণ রাষ্ট্র গঠন করিয়াছি। আমাদেরই আত্মীয় বন্ধুকে এ রাষ্ট্রে ভারবাহক মন্ত্রী-উপমন্ত্রী দেশ-প্রদেশপাল করিয়া বসাইয়াছি। বলিতে পারেন, তাঁহাদিগকে এ সব বিষয় জানাইলেই তো প্রতীকার হইবে!

যদি জানাইতেই হয়, তবে তো এক একটি মানুষ না বসাইয়া মনুষ্যেতর প্রাণী, যাহারা শুধু শুনিতে পায় ও আকারে-ইঙ্গিতে বা নানা অবোধ্য শব্দে মনোভাব প্রকাশ করিতে পারে, তাহাদের বসাইলেই চলিত! তাঁহারা কি দেখিতেছে না? না তাঁহাদেরও সাধারণ মানুষের মতো আহার-বিহার করিতে হয় না?

শাসনের লাগাম ধরিয়া ভারত-অশ্বোপরি বসিয়া রহিলেই তো আর কল্যাণ করা হয় না? তার জন্য মস্তিষ্ক চাই, কল্যা করিবার উপযুক্ত হৃদয়ের অধিকারী হওয়া চাই। পেছনে কে মরি কে পড়িল, কে কি করিল, তাহা একটু লক্ষ্য রাখার মতো প্রবৃ না রহিলে আর চলে কি? সাধারণ চোরকে ধরিয়া বিচারের প্রহসন করিতেছি, জেলে রাখিয়া চরিত্র শোধনের ব্যবস্থা করিতেছি কিন্তু এই যে রাঘববোয়ালের দল, বড়ো বড়ো গুপ্ত ডাকাত, যাহারা মানুষের প্রাণের ভিতর অহরহঃ বিষ ঢুকাইয়া দিতেছে, যাহারা গরীবের পেট ও পকেট কাটিয়া আপনাদের ভুঁড়ি বিস্তৃত করিতেছে, তাঁহাদের শাস্তির কি ব্যবস্থা হইতেছে? প্রশ্ন আসিতে পারে, তোমরা জনসাধারণ ধরিয়া দাও, রাঘববোয়াল আমরা আছড়াইয়া মারিব। তবে এ্যান্টি করাপশন প্রভৃতি ডিপার্টমেণ্ট কেন খোলা হইয়াছে? যাহারা দিনের পর দিন নানা দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর নানা অজুহাতে বৃদ্ধি করিয়াই চলিয়াছে তাহারা কি ঐ ডিপার্টমেণ্টের আওতায় পড়ে না? আফিসে বসিয়া শুধু ফাইলের কাজের জন্য সুশিক্ষিতদের না লইয়া অল্পশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিতদের দিয়া এই সব লোককে নিত্য ধরিবার জন্য ও ব্যতিব্যস্ত করিবার জন্য কর্ম্মচারিবৃন্দকে লেলাইয়া দিতে হইবে। প্রত্যেক বাজারে বাজারে দোকানে দোকানে পণ্যদ্রব্যের নির্দিষ্ট মূল্যমান টাঙ্গাইয়া পুলিশ মোতায়ন রাখিলে ও সরকারী তীব্রদৃষ্টি এদিকে হানিলে কি অবস্থা আয়ত্তে আনা যায় না? বলিতে পারেন, সরিষার ভিতরও ভূত থাকিতে পারে। তবে বলিতে হয়, আমরা ওঝার নির্ব্বাচন ঠিকরূপে করি নাই। যাহারা ওঝা, তাহারা সবাই ভূতেরই অনুচর।

যদিও জানি, সরকারের সর্ব্বাঙ্গ এখনো উৎকোচের ঘায়ে জর্জ্জর, তবুও যদি প্রতি বাজারে একটি করিয়া বাজার-কার্য্যালয় ও বাজার-পুলিশফাঁড়ি খোলা হয়, যাহারা কেবল বাজারের মূল্যমান রক্ষায় ও সাধারণের কেনা-বেচার প্রতি দৃষ্টি রাখায় তৎপর হইবে, তবেই হয়তো মূল্যমান বৃদ্ধি তথা কালোবাজারী প্রচলনের আশঙ্কা তথা সাধারণের অতি সত্বর সমাধি প্রাপ্তির যোগ রুদ্ধ হইতে পারে। নচেৎ সরকারী দোকান খুলিয়া অল্পতর মূল্যে দ্রব্য বিক্রয়ের ব্যবস্থায় ইহা নির্ম্মূল হওয়া সুদূরপরাহত। গত যুদ্ধের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এ পরীক্ষা যে কিরূপ ফলপ্রসূ হইয়াছে—তাহা আপামর সাধারণের যথেষ্ট প্রত্যক্ষীভূত।

আর এক কথা, এই বাজার-কার্য্যালয় ও পুলিশফাঁড়ি সৃষ্টিতে হয়তো কর্ম্মহীন শিক্ষিত-অল্পশিক্ষিত অর্দ্ধশিক্ষিত-অশিক্ষিত বহুজনের এই ভাবে কর্ম্মপ্রাপ্তির শুভযোগ ঘটিয়া কল্যাণ রাষ্ট্রের শিরে একতন্ত্রিয়োজিত মূল্য বৃদ্ধি রহিত জনিত ও বেকারত্ব মোচনপ্রসূত শুভাশীর্ব্বাদ বর্ষণেরও কিঞ্চিৎ সম্ভাবনা আসিতে পারে।—দুর্ব্বাসা

ডিজেল ইঞ্জিন

ডিজেল ইঞ্জিনের প্রায় সবটা চাহিদাই বিদেশ থেকে আমদানী করে মেটাতে হয়। হিসেবে দেখা যায়, ১৯৪৯-৫০, ১৯৫০-৫১ ও ১৯৫২-৫৩ সালে ডিজেল ইঞ্জিনের চাহিদা ছিল যথাক্রমে ৩৯,৬১৪, ৪১,১১০ ও ৭৯,৬৬৫ এবং এই চাহিদা মেটাবার জন্য উপরিউক্ত বৎসর সমূহে বিদেশ থেকে ডিজেল ইঞ্জিন আমদানী হয় যথাক্রমে ৩৭,১৭৪, ৩৫,৫৭১ এবং ৭২,৩৬৫টি। টাকার অঙ্কে ইহাদের মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে ৮ কোটি ৬৪ লক্ষ, ৬ কোটি ৮৩ লক্ষ এবং ১৪ কোটি ৭৩ লক্ষ। এর মধ্যে ১০, ২৫ ও ৩০ অশ্বশক্তিসম্পন্ন ডিজেল ইঞ্জিন ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আরম্ভে ভারতে মাত্র ৫টি কারখানা ছিল, যারা ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ করত। এগুলি ছিল বেসরকারী প্রচেষ্টা, যাদের সমবেত উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৬৩২০ (১৯৫০-৫১)। এই পাঁচটির ৪টি সংস্থা ছিল বোম্বাইতে আর একটি ছিল দিল্লী-সাহদারাতে অবস্থিত। ঐ সংস্থাসমূহে মোট মূলধন খাটত ১ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা এবং আনুমানিক ৬০০০ কর্মী এই শিল্পে নিয়োজিত ছিল। হিসাবে দেখা যায়, ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে ১,২৯০টি ডিজেল ইঞ্জিন (প্রতি ইঞ্জিনের দাম ১৫০০৲ করে ধরে মোট মূল্য ১৯ লক্ষ টাকা), ১৯৪৯-৫০ সালে ২,৪৪০টি (মূল্য ৩৭ লক্ষ টাকা), ১৯৫০-৫১ সালে ৫,৫৪০টি (মূল্য ৮৩ লক্ষ টাকা) এবং ১৯৫১-৫২ সালে ৭৩০০টি ডিজেল ইঞ্জিন নির্মিত হয়েছে। ভারতে বাৎসরিক ১০ অশ্বশক্তির ৪০,০০০ ইঞ্জিন এবং ১০ অশ্বশক্তির বেশী শক্তিসম্পন্ন প্রায় ২০,০০০ ইঞ্জিন প্রয়োজন হবে। অবশ্য এর মধ্যে পুরাতন ইঞ্জিন পরিবর্তন করার ফলে যত নূতন ইঞ্জিন দরকার হবে তার হিসাবও ধরা হয়েছে। সেই হিসাব মতে ডিজেল ইঞ্জিন উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রথম পরিকল্পনায় উহার উৎপাদনক্ষমতা ও উৎপাদন যথাক্রমে ৬৩২০ ও ৫৫৪০ হতে বৃদ্ধি করে ১৯৫৫-৫৬ সালে অর্থাৎ প্রথম পরিকল্পনার শেষে যথাক্রমে ৩৯,৭২৫ ও ৫০,০০০ করবার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই উৎপাদন লক্ষ্য সমগ্রভাবে সাফল্যমণ্ডিত না হলেও উহা অনেকাংশে সফল হয়েছে। প্রকাশিত হিসাবে দেখা যায়, প্রথম পরিকল্পনার চতুর্থ বর্ষে (১৯৫৪-৫৫) ডিজেল ইঞ্জিন উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ৯২৭৩টি ১৯৫১-৫২, ১৯৫২-৫৩, ১৯৫৩-৫৪ সালে ডিজেল ইঞ্জিন নির্মিত হয়েছে যথাক্রমে ৭২৬৩, ২৯০৯ ও ৫২৪৪টি। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালেও ডিজেল ইঞ্জিন উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই পরিকল্পনা শেষে (১৯৬০-৬১) মোট ২০৫ হাজার অশ্বশক্তির ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ করা হবে বলে লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিন প্রস্তুতের জন্য প্রধানত অপরিশোধিত লৌহ, ইস্পাত, ব্রোঞ্জ, এলুমিনিয়াম, লৌহেতর ধাতু ও ব্রাস প্রয়োজন হয়। এই সব কাঁচা মালের বেশীর ভাগই ভারতে পাওয়া যায়। তাই ভারতে ডিজেল ইঞ্জিন নির্মাণ বিশেষ অসুবিধাজনক নয়।

প্লাষ্টিক শিল্পের অগ্রগতি

বিজ্ঞান-লক্ষ্মীর আশীর্বাদ মানুষ যে কত বিচিত্র ভাবে পেয়ে চলেছে, তার ইয়ত্তা নেই! সেই আশীর্বাদের ধারাতেই প্লাষ্টিক শিল্প নামে একটি মস্ত বড় জিনিষ আমরা পেলুম। সত্যি, সভ্যতার এক অপরিহার্য্য অঙ্গ হিসেবে প্লাষ্টিক আজ স্থান নিয়েছে এসে ঘরে ঘরে। শুধু সাধারণ প্রয়োজন মেটানই নয়, মানুষের জীবনকে সহজ, সুন্দর ও সাবলীল করে তোলার জন্য এ শিল্পের চলেছে অবিরাম প্রচেষ্টা।

বাণিজ্য ও শিল্প-ক্ষেত্রে যুগান্তর সৃষ্টি করল যে প্লাষ্টিক, মানুষের হাতে এ কি করে ধরা পড়লো, সে একটি চমৎকার কাহিনী! উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকায় 'আইভরি' বা হাতীর দাঁতের অভাব ঘটলো বড়রকম। ক্রীড়ামোদের সামগ্রী বিলিয়ার্ড বল আর কিছুতেই তৈরী হয় না। এমনি সঙ্কট-মুহূর্তে এগিয়ে এলো একজন যুববয়সী মার্কিণ মুদ্রাকর—নাম জন ওয়েসলি হায়াট। যেমন করেই হোক, অপর যে কোন নয়া পদার্থ দিয়েই হোক—বিলিয়ার্ড বল তাকে তৈরী করতে হবে। সঙ্কল্প ও সাধনা যুবকটির সফল হলো—আবিষ্কার করতে পারলো সে একটি কৃত্রিম 'আইভরি', যা অবশ্য পরিচিতি পেলো সেলুলয়েড নামে। বলতে কি, এই সেলুলয়েডের যেখানে জন্ম, সেখান থেকেই আজিকার সমুন্নত প্লাষ্টিক শিল্পেরও সূচনা।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রাজ্যে প্লাষ্টিকেরও উন্নতি হয়ে চললো দ্রুততর। আজ হাজার হাজার রকমের প্রয়োজনীয় পণ্য বা জিনিস তৈরী হচ্ছে এ প্লাষ্টিক দিয়ে। অনেক ব্যাপারে চামড়া, রবার, টিন, কাগজ এমন কি লৌহ প্রভৃতির স্থানও অধিকার করে নিচ্ছে উহা ক্রমেই। সস্তা দরে মনোরম অথচ মজবুত জিনিস পেতে প্লাষ্টিক না হলে যেন চলে না। বস্তুতঃ, গত দশ-পনেরো বছরের মধ্যে এ শিল্পের যতখানি অগ্রগতি হয়েছে, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আজ প্লাষ্টিকের স্থান শিল্প ও বাণিজ্য-জগতে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীতে।

প্লাষ্টিক নিয়ে গবেষণা ও কাজ-কারবার চলেছে এ যুগে বিশ্বের সর্ব্বত্র—আমেরিকায় তার মধ্যে বোধ হয় সবচেয়ে বেশী। হিসেব করলে দেখা যাবে—সমস্ত বিশ্বে প্রায় ৫০ সহস্র কোম্পানী রয়েছে এই একটিমাত্র শিল্পকে কেন্দ্র করেই। অপর দিকে এ শিল্প বিষয়ে উন্নততর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য আমেরিকাতেই আছে প্রায় ৭৫টি কলেজ ও টেকনোলজিকাল ইনষ্টিটিউট। শিল্প-সমৃদ্ধ ও উদ্যমশীল এমন একটি দেশও আজ নেই, যেখানে প্লাষ্টিকের কারখানা গড়ে ওঠেনি—বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা চলছে না একে নিয়ে।

ভারতে অবশ্য এ বিস্ময়কর শিল্পটির পত্তন হয়েছে খুব বেশী দিন আগে নয়। কার্য্যতঃ এইটি ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জ্জিত হওয়ার পর এই দেশে নিজস্ব সম্পদ হিসেবে স্থান পায়। কিন্তু সেই থেকে এই অল্প সময়ের মধ্যেই এর অগ্রগতি যতটুকু হয়েছে—এতটুকু উপেক্ষা করা চলে না। আজ প্রায় ৮ কোটি টাকা এই শিল্পক্ষেত্রে নিয়োজিত। ১৯৪৮ সালে ৫০টিরও কম প্লাষ্টিক-কারখানা ছিল ভারতে। সেই স্থলে আজ সুসজ্জিত কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক শতের অধিক। তা' ছাড়া এই শিল্পের কয়েক শত ক্ষুদ্র ইউনিট গড়ে উঠেছে দেশের স্থানে স্থানে—যেখানে এইটি নিয়ে অন্যান্য কুটীরশিল্পের অনুরূপ কাজ-কারবার হয়। এই সকল কেন্দ্রে দিন-রাতের চেষ্টার ভিতর দিয়ে প্লাষ্টিকের বহু পণ্যই নির্ম্মিত হচ্ছে। মান ও উৎকর্ষের দিক থেকে এগুলো হয়তো তেমন উল্লেখযোগ্য নয় কিন্তু দামে অনেকটা সস্তা এবং সেদিক থেকে অল্প আয়বিশিষ্ট সাধারণ ভারতবাসীর কাছে প্রিয়।

আজ বিশ্বে প্লাষ্টিকের জিনিসের চাহিদা যেমন বাড়ছে—তৈরীও হচ্ছে অসংখ্য রকমের নিত্য-নতুন দ্রব্য-সামগ্রী। বিচিত্র খেলনা, চিরুণী, চা-চামচ, কাপ, ডিস, গ্লাস থেকে আরম্ভ করে টেবিল-ঢাকনি,

জামা, বর্ষাতি, ব্যাগ বাদ্যযন্ত্রের অংশ প্রভৃতি কত কি নির্মিত হয়ে চলেছে, ধারণা করা যায় না! গৃহ-নির্মাণের বিভিন্ন সরঞ্জাম বিশেষ ভাবে ভাস্কর্য্যের ক্ষেত্রে প্লাষ্টিকের ব্যবহার আজকের দিনে খুবই বেশী রকম। শুধু ঘরেই কেন, ঘরের বাইরে অফিসে-আদালতে কোথায় বা প্লাষ্টিক তথা প্লাষ্টিকজাত পণ্য নেই! প্রাচ্যের মধ্যে জাপান এ শিল্প-ব্যাপারে কিছুমাত্র কম অগ্রসর নয়। মানুষের নিত্য-ব্যবহার্য্য নয়া নয়া পণ্য তৈরী হয়ে চলেছে তাদের কারখানায় কারখানায়।

প্লাষ্টিক শিল্পে আমেরিকা যে কতটা উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠেছে, ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের সাম্প্রতিক এক বিবৃতি থেকে তা স্পষ্ট জানতে পারা যায়। তিনি দেখে এসেছেন সেখানে স্বচক্ষে, স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও জল সরবরাহের ব্যাপারে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ প্লাষ্টিকের পাইপ পর্য্যন্ত ব্যবহার করছেন। এই অভিনব পাইপ নির্ম্মাতা মার্কিণ শিল্পপতিদেরই দাবী—প্লাষ্টিক পাইপ-গুলো এক দিকে সস্তা, অপর দিকে ইস্পাতের পাইপের মতোই দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু এর ভিতরও একটি মস্ত ব্যতিক্রম, ইস্পাতের পাইপের ক্রমিক ক্ষয়-ক্ষতি আছে কিন্তু প্লাষ্টিক সেদিক থেকে সম্যক নিরেট ও সক্রিয়। রাজকুমারী কাউর সেজন্যেই ঘোষণা করেছেন—ভারতে স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা ও জল সরবরাহের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর পাইপের পরীক্ষা চালানো হবে।

প্লাষ্টিকের 'ব্রিক' বা ইট তৈরী মার্কিণ বৈজ্ঞানিকদের অপর একটি অপূর্ব্ব আবিষ্কার। ভাস্কর্য্যের অধ্যাপক এমব্রোজ সি, রিচার্ডসন ও মার্কিণ বিমান বাহিনীর অফিসার মেজর জর্জ্জ এম ম্যাকলে এই 'ব্রিক' দিয়ে 'ডোম' বা গম্বুজাকৃতি একটি চমৎকার জিনিস নির্ম্মাণ করেছেন। এই 'ব্রিক'গুলোর প্রত্যেকটি ত্রিকোণ-বিশিষ্ট এবং একটির সঙ্গে অপরটি সংযোগ করে অনায়াসেই সম্প্রসারিত করা যায়। এইরূপ ১১২টি 'ব্রিক' দিয়ে তাঁরা তৈরী করেন আলোচ্য 'ডোম' বা গম্বুজাকৃতি জিনিসটি। প্রদর্শন ক্ষেত্রে দেখান হয়েছে এইটির ব্যাসার্দ্ধ ৬ ফুট এবং উহা ৩ ফুট উচ্চ। একে ভাঁজ করে একটি স্যুটক্যাসের মধ্যেও তুলে রাখা চলে। কারণ সমগ্র কাঠামোটির ওজন মাত্র ১০ পাউণ্ড। অথচ দাবী করা হচ্ছে প্লাষ্টিকের এই 'ডোম'গুলো অসম্ভব উপকারে আসবে আগামীদিনের মানুষের। বায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা এগুলোর এত বেশী যে, বিমান বা জাহাজ চলার কালে বিপর্য্যয় যদি এসেই যায়, তবুও এগুলোর সাহায্য নিয়ে বাঁচবার একটা পথ মিলবে।

গোড়ার দিকেই বলা হল—ভারতে প্লাষ্টিক শিল্পের এখনও প্রায় শৈশব অবস্থা। শিল্পোন্নত অন্যান্য দেশের তুলনায় প্লাষ্টিকজাত দ্রব্যাদির চাহিদাও এদেশে এখন পর্য্যন্ত সামান্যই বলতে হবে। নিখিল ভারত প্লাষ্টিক নির্ম্মাতা সমিতি এ শিল্পকে আরও জনপ্রিয় ও সম্প্রসারিত করে তুলবার জন্য অবশ্য ব্যস্ত। সেই সঙ্গে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা যদি পর্য্যাপ্ত থাকলো, তবে অন্যান্য দেশের ন্যায় স্বাধীন ভারতেও এই শিল্পের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল এবং অগ্রগতি সুনিশ্চিত।

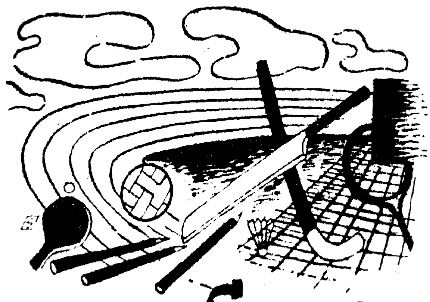
টুকরো কথা

সরকারী হিসাব হইতে জানা যায়, ১৯৫৪-৫৫ সালে যেখানে ভারতে ৪৫ লক্ষ টাকা মূল্যে ১,৫৯৭টি টাইপরাইটার যন্ত্র আমদানী হইয়াছিল সেখানে ১৯৫৫-৫৬ সালে আমদানী হইয়াছে ১২ লক্ষ টাকা মূল্যের ২৩১৭২টি। বর্ত্তমানে ভারতে টাইপরাইটার প্রস্তুত করা আরম্ভ হইয়াছে। তিনটি কারখানা ঐ কার্যে ব্যাপৃত আছে। তাহাদের সমবেত উৎপাদন ক্ষমতা বৎসরে ৩৩০০০টি টাইপরাইটার। ১৯৫৫ সালে ভারতে ৪৬৩০টি টাইপরাইটার প্রস্তুত হইয়াছে। * * সাপ্তাহিক ক্যাপিটাল পত্রিকার পরিসংখ্যান দপ্তর কর্ত্তৃক সংগৃহীত চলতি বৎসরের জুন মাসের কলিকাতার মধ্যবিত্ত পরিবারের বিভিন্ন দফায় জীবিকানির্বাহের ব্যয়ের যে সূচকসংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, মে মাসের তুলনায় জুন মাসে খাদ্যদ্রব্যের সূচকসংখ্যা ৫ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু অন্য সব বাবদ সূচকসংখ্যা অপরিবর্তিতই আছে। জুন মাসের যুক্তসূচক সংখ্যা পূর্ববর্তী মাস হইতে ৩ পয়েণ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে, ১৯৩৯ সালের আগষ্ট মাসের বাজার দরকে ১০০ ধরিয়া এই হিসাব করা হইয়াছে :—

	জুন ১৯৫৫	ডিসেম্বর ১৯৫৫	মে ১৯৫৬	জুন ১৯৫৬
খাদ্যদ্রব্য	৪৩৯	৪৫৫	৪৭০	৪৭৫
জ্বালানী ও আলো	২৩৯	২৩৯	২৩৯	২৩৯
পরিধেয়	৪৯৪	৫০৩	৫২৬	৫২৬
বিবিধ	২৮২	২৮২	২৮৩	২৮৩
যুক্তসূচক সংখ্যা	৩৯১	৪০১	৪১১	৪১৪

* * ১৯৫৪-৫৫ সালের শেষে ভারতের প্রায় ৫৫টি কেন্দ্রে বিভিন্ন ধরণের হস্তনির্মিত কাগজ উৎপন্ন করা হইতেছে। ঐ সব কেন্দ্রে মোট প্রায় ৫ শত টন কাগজ উৎপন্ন করা হইয়াছে এবং উহাতে কর্মীর সংখ্যা ছিল ২,০০০ জন। ১৯৫৫-৫৬ সালে উৎপাদন-কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ৬৩ হইয়াছে। * * খুব শীঘ্রই একটি সেন্ট্রাল ওয়ার হাউজিং কর্পোরেশন গঠিত হইতেছে। ইহার অনুমোদিত এবং বিলিকৃত মূলধন হইবে যথাক্রমে ২০ কোটি এবং ১০ কোটি টাকা। ভারতের প্রায় ১০০টি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে যে-সব পণ্যাগার বা গুদামঘর নির্মিত হইবে এবং যাহার প্রত্যেকটির গুদামজাত মালের পরিমাণ ১০ হাজার হইতে ২০ হাজার টন সেগুলি পরিচালনা করিবে। * * ভারত সরকারের আমন্ত্রণক্রমে পশ্চিম জার্মাণী হইতে তিন জন তৈল-বিশেষজ্ঞের একটি দল আগামী নবেম্বর মাসে ভারতে উপনীত হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। ইঁহাদের আগমনের উদ্দেশ্য হইতেছে তৈল উৎপাদন সম্পর্কে ভারত সরকারকে পরামর্শ দেওয়া। * * প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহ নির্মাণের জন্য যে ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল, রাজ্যসরকার সমূহ তাহার অর্দ্ধেক অর্থ মাত্র ব্যয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে গৃহনির্মাণ খাতে ব্যয়ের জন্য পরিকল্পনা কমিশন ১২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। * * ভারত সরকার তিন শ্রেণীর দীর্ঘমেয়াদী ঋণে, বাজার হইতে ১৫০ কোটি টাকা সংগ্রহ করিবার যে সঙ্কল্প জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধ হইয়াছে। এই বিষয়ে সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্ট এজন্য মোট ১৫৭ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার আবেদন পাইয়াছেন।





খেলাধূলা

অলিম্পিক প্রসঙ্গ

অলিম্পিক প্রসঙ্গ নিয়ে গত বার আলোচনা করেছিলাম। এবারে বর্ত্তমান বৎসরে অলিম্পিকের প্রস্তুতির উপর কিছু আলোচনা করবো।

মেলবোর্ণে আগামী ২২শে নভেম্বর থেকে ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত অলিম্পিক অনুষ্ঠান হবে, তার একটা কর্ম্মসূচী প্রস্তুত হয়ে গেছে। কর্ম্মসূচীতে শেষ দিনে ফুটবলের ফাইন্যাল খেলা হবে মেলবোর্ণের ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামে। এর দুই দিন পূর্ব্বে এই ষ্টেডিয়ামে হকি ফাইন্যাল হবে।

মেলবোর্ণের ক্রিকেট মাঠ ব্যতীত আর তেরটি স্থান প্রতিযোগিতার জন্য নেওয়া হয়েছে। আশীটি দেশের প্রায় ছ'হাজার প্রতিযোগী এবার অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যোগ দিবেন। প্রধান ষ্টেডিয়ামে সংলগ্ন অলিম্পিক পার্কে সাঁতার, ডাইভিং ও ওয়াটার পোলো, সাইক্লিং, হকি ও ফুটবলের প্রাথমিক খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হবে। সহরের উত্তর প্রান্তে একজিবিসন বিল্ডিং-এ মল্লযুদ্ধ ও ভারোত্তোলন, দক্ষিণ প্রান্তে জিমন্যাষ্টিক ও বাস্কেট বল। এবারের অলিম্পিক অনুষ্ঠানে এক নূতন কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। শিল্প, নৃত্য, নাট্যাভিনয়, সঙ্গীত প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়েছে। এবারের অলিম্পিক সূচী :—

২২শে—উদ্বোধন উৎসব (অপরাহ্ণ) ও বাস্কেট বল (রাত্রি) ২৩শে— এ্যাথেলেটিকস (সকাল ও অপরাহ্ণ) বাস্কেট বল (অপরাহ্ণ ও রাত্রি) ফেন্সিং (সকাল, অপরাহ্ণ ও রাত্রি) ফুটবল (অপরাহ্ণ) মডার্ণ পেণ্টাথলন (সকাল) ভারোত্তোলন (অপরাহ্ণ ও রাত্রি) মুষ্টিযুদ্ধ (রাত্রি) হকি (সকাল ও অপরাহ্ণ) ও রোয়িং (সকাল ও অপরাহ্ণ) ২৪-এর অনুষ্ঠানসূচী সবই ২৩ তারিখের মত শুধু ফেন্সিং-এর কোন অনুষ্ঠান নেই। আর কাস্কেট বল (সকাল, অপরাহ্ণ ও রাত্রি) ২৫শে বিশ্রাম। ২৬-এর অনুষ্ঠানসূচী ২৪এর মতই। শুধু ফেন্সিং ও ইয়াচিং সংযোগ করা হয়েছে। ফেন্সিং-এর অনুষ্ঠান (সকাল, অপরাহ্ণ ও রাত্রি) ইয়াচিং-এর অনুষ্ঠান (অপরাহ্ণ) ২৭-এর অনুষ্ঠান ২৬শের মত। বাস্কেট বল শুধু অপরাহ্ণ ও রাত্রি)। ২৮ তারিখের অনুষ্ঠানে রোয়িং বাদ দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্ত্তে সংযোগ হয়েছে সন্তরণ (অপরাহ্ণ ও রাত্রি) ও মল্লযুদ্ধ (সকাল ও রাত্রি)। ২৯-এর অনুষ্ঠানের সূচী ২৮ তারিখেরই অনুরূপ। তব [illegible] অনুষ্ঠানে সংযোগ হয়েছে স্যুটিং (সকাল ও অপরাহ্ণ) ও ক্যানোয়িং (অপরাহ্ণ)। ১লা এ্যাথেলেটিকসের ফ্যাইনাল (সকাল ও অপরাহ্ণ, মুষ্টিযুদ্ধ ফ্যাইনাল (রাত্রি)। ক্যানোয়িং (সকাল ও অপরাহ্ণ) ও খেলাধূলা প্রদর্শনী (অপরাহ্ণ) ছাড়া অন্যান্য অনুষ্ঠান হকি বাদে ৩০ তারিখের মতই। ২রা বিশ্রাম। ৩রা স্যুটিং (সকাল ও অপরাহ্ণ) হকি (অপরাহ্ণ) ইয়াবিং (অপরাহ্ণ), সন্তরণ (অপরাহ্ণ ও রাত্রি) সাইক্লিং (অপরাহ্ণ ও রাত্রি) মল্লযুদ্ধ (সকাল ও রাত্রি) জিমনাষ্টিক (সকাল ও অপরাহ্ণ) ৪ঠার অনুষ্ঠানে সংযোগ করা হয়েছে ফুটবল (অপরাহ্ণ) অন্যান্য অনুষ্ঠান ৩ তারিখের মত। ৫ই ইয়াবিং (ফ্যাইনাল রাত্রি) স্যুটিং ফ্যাইনাল (সকাল ও অপরাহ্ণ) অন্যান্য অনুষ্ঠান ৪ তারিখের মত। ৬ই হকি (ফ্যাইনাল —অপরাহ্ণ) মল্লযুদ্ধ (ফাইনাল—সকাল ও রাত্রি)। সাইক্লিং (রাত্রি) ও অন্যান্য অনুষ্ঠান ৫ তারিখের মত। ৭ই ফুটবল (সেমিফ্যাইনাল অপরাহ্ণ) সন্তরণ (ফ্যাইনাল অপরাহ্ণ ও রাত্রি) সাইক্লিং (ফ্যাইনাল অপরাহ্ণ) ও খেলাধূলা প্রদর্শনী (অপরাহ্ণ) ৮ই ফুটবল (ফ্যাইনাল অপরাহ্ণ) ও সমাপ্তি উৎসব (অপরাহ্ণ)। এর পর যে যার দেশে বিজয় মুকুট নিয়ে ফেরা।

উইম্বলডন

উইম্বলডন টেনিসের ৭০তম অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেল। বিশ্বের সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় টেনিসের এই অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ক্রীড়ামহলে যে সাড়া জেগেছিল তা অভূতপূর্ব্ব! উইম্বলডনের মনোরম ১৬টি টেনিস কোটে ১২ দিন ধরে চলে দেশ-বিদেশের খেলোয়াড়দের খেলা। নানান দেশের প্রায় আড়াই লক্ষ টেনিস রসপিপাসু প্রতি বছর দর্শক হিসাবে উইম্বলডনে উপস্থিত থাকেন। এবছরেও তার ব্যতিক্রম হয়নি।

এবারকার অনুষ্ঠানে অষ্ট্রেলিয়ারই প্রাধান্য প্রমাণিত হয়েছে। ফ্যাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন অষ্ট্রেলিয়ার দুই ধুরন্ধর কীর্ত্তিমান খেলোয়াড় লুই হোড, কেন রোজওয়াল। এর মধ্যে লুই হোড, কেন রোজওয়ালকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ান হয়েছেন। এই কীর্ত্তিমান খেলোয়াড়টির বয়স মাত্র একুশ বছর। কেনওয়ালের বয়স একুশ পার হয়নি। অষ্ট্রেলিয়ায় এই অল্পবয়সী খেলোয়াড়রা অতি অল্প বয়স থেকেই উইম্বলডন ক্রীড়াঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছেন। ১৯৫৩ সালে এরা উইম্বলডনের ডাবলসের বিজয়ী হয়েছিলেন। তবে এ বছরও তাঁদের ডাবলসের পুরস্কার অপর কেউ কেড়ে নিতে পারেনি। ১৯৫৪ সালের চ্যাম্পিয়ান ড্রবনী ভারতের পয়লা নম্বরের খেলোয়াড় কৃষ্ণানের কাছে পরাজিত হন। গত বারের রাণার্স ডেনমার্কের কর্ট নীলসন তৃতীয় রাউণ্ডে হার স্বীকার করেন চিলির তৃতীয় নম্বর খেলোয়াড় লুই আয়লার কাছে। ভারতের খেলোয়াড় কৃষ্ণাণ তৃতীয় রাউণ্ডে অষ্ট্রেলিয়ার মল এণ্ডারসনের কাছে হার স্বীকার করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস বিজয়ী হয়েছেন আমেরিকার টেনিস পটীয়সী মিস শার্লি ফ্রাই। দীর্ঘ ১৭ বছর পরে ইংলণ্ডের একজন মহিলা খেলোয়াড় উইম্বলডনের ফ্যাইনালে প্রতিযোগিতা করলেন মিস এ্যাম্পেলিকা বাক্সটকন। ইনি ষ্ট্রেট সেটে পরাজিত হয়েছেন শার্লি ফ্রাইয়ের কাছে। ভিস সেকসাসের জুটি হিসেবে ফ্রাই খেলে মিকসড ডাবলসে বিজয়িনীর সম্মান অর্জন করেছেন। আমেরিকার নিগ্রো পটীয়সী মিস আলথিয়া গিবসটন বৃটেনের এ্যাঞ্জেলিকা বাক্সটনের সংগে খেলে লাভ করেছেন ডাবলসের পুরস্কার। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য, উইম্বলডনের ইতিহাসে কোন নিগ্রো খেলোয়াড় ইতিপূর্ব্বে এ পুরস্কার লাভ করেনি।

ফ্যাইনাল খেলার ফলাফল :—

পুরুষদের সিংগলস

লুই হোড (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-২, ৪-৬, ৭-৫ ও ৬-৪ সেটে কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া)কে পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস

লুই হোড ও কেন রোজওয়াল (অষ্ট্রেলিয়া) ৭-৫, ৬-২ ও ৬-১ সেটে নিকোলা পেট্রাঙ্গেলী ও সিরলা অরল্যাণ্ডোকে (ইটালী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস

মিস শার্লি ফ্রাই (আমেরিকা) ৬-৩ ও ৬-১ সেটে অ্যাঞ্জেলা বাকসটনকে (বৃটেন) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস

ভিক্স সেমাস ও মিস ফ্রাই (আমেরিকা) ২-৬, ৬-২ ও ৭-৫ সেটে গার্ডনার মূলয় ও মিস গিবসনকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস

এ্যালসিয়া গিবসন (আমেরিকা) ও এ্যাঞ্জেলা বাকসটন (বৃটেন) ৬-১ ও ৮-৬ সেটে মিস কে মূলার ও মিস ড্যাফনে সিনেকে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ক্রিকেট

তৃতীয় টেষ্ট ম্যাচ আরম্ভ হোল লীডস মাঠে। ইংলণ্ড দলে তৃতীয় টেষ্টে জয়লাভ করলো। লীডস মাঠের এই সাফল্যকে ঐতিহাসিক ঘটনা বলা যায়। কারণ ইতিপূর্বে লীডস মাঠে ইংলণ্ড জয়লাভ করতে পারেনি। এবারকার টেষ্ট খেলায় খ্যাতনামা স্পিন বোলার জিম লিকারের কৃতিত্ব কম নয়। দুই ইনিংসে ১১৩ রাণের বিনিময়ে ১১টি উইকেট লাভ করেছেন। ইংলণ্ড দলকে ব্যাটিং-এ শক্তিশালী করার ওয়াশব্রুকের ডাক পড়লো। তিনি যা কঠিন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ঠিক ভাবেই পালন করেছিলেন। মাত্র ১৭ রাণের মাথায় তিন জন খেলোয়াড় আউট হয়ে গিয়ে ব্যাট করতে এলেন অধিনায়ক মে ও ওয়াশব্রুক। দলের পতন রোধ হলো। মে ১০১ রাণে আউট হয়ে গেলেন ও ওয়াশব্রুক ৯০ রাণ করে বসে রইলেন। মাত্র ২ রাণের জন্য ওয়াশব্রুক সেঞ্চুরী লাভে বঞ্চিত হয়েছেন। দ্বিতীয় দিনের চা-পানের কিছু পূর্বে ৩২৫ রাণে ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস শেষ করলো। ইহার পরে অষ্ট্রেলিয়া ব্যাট করে। কিন্তু ব্যাটিং-এ শোচনীয় বিপর্যয় ঘটে। দিনের শেষে ৬ উইকেটে ৮১ রাণ ওঠে। পরের দিন খেলা বন্ধ থাকে বৃষ্টির জন্য। তার পরদিন রবিবার খেলা বন্ধ। মিলার ও বিনাউড নট-আউট ব্যাটস্‌ম্যানদ্বয় ব্যাট করতে নামেন। শেষ পর্য্যন্ত ১৪৩ রাণে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলে অষ্ট্রেলিয়া 'ফলো অনে' বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ইনিংসের সূচনা ভাল হল না। তবু দিনের শেষে ২ উইকেটের বিনিময়ে অষ্ট্রেলিয়ার ৯৩ রাণ ওঠে। 'হার্ভে মিলার' জুটি ভাঙাবার পর অষ্ট্রেলিয়ার বাকী ৭টি উইকেটে ১২ রাণ যোগ হয়। অষ্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ৪২ রাণে পরাজিত হয়।

ইংলণ্ড প্রথম ইনিংস—৩২৫ (পিটার মে ১০১ ওয়াশব্রুক ৯৮, গডফ্রে ইভান্স ৪০, টি, বেলী ৩৩, লিণ্ডওয়াল ৬৭ রাণে ৩ উই:, আর্চার ৬৮ রাণে ৩ উই: বিনাউড় ৮৯ রাণে ৩ উই:)

অষ্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংস—১৪৩ (জিম বার্ক ৪১, মিলার ৪১, বিনাউড ৩০, লিকার ৪৮ রাণে ৫ উই: লক ৪১ রাণে ৪ উই:)

অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস—১৪০ (লেন হার্ভে ৬৯, মিলার ২৬ ; লেভার ৫৫ রাণে ৬ উই: লক ৪০ রাণে ৩ উই:)

(ইংলণ্ড এক ইনিংস ৪২ রাণে বিজয়ী)

চতুর্থ টেষ্ট ম্যাচ ম্যাঞ্চেষ্টারের মাঠে অনুষ্ঠিত হল। এই জয়লাভে জিম লেকারের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। লেকার ছাড়া ইংলণ্ডের আরও দুই জন কীর্তিমান ব্যাটসম্যানের নাম উল্লেখযোগ্য। রিচার্ডসন ও ডেভিড শেফার্ড। টেষ্ট খেলায় রিচার্ডসনের এই প্রথক সেঞ্চুরী ও শেফার্ডের দ্বিতীয়। অষ্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়রা এই টেষ্ট ম্যাচে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন।

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস—৫৪৯ (পি, রিচার্ডসন ১০৫, ডি শেফার্ড ১১৩, কলিন কাউড্রে ৮০ টি, ইভান্স ৪৭, পিটার মে ৪৩, জনসন ১৫১ রাণে ৪ উই: লিণ্ডওয়াল ৬৩ রাণে ২ উই:, বিনাউড ১২৩ রাণে ২ উই:)

অষ্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—৮৪ (ম্যাকডোলাণ্ড ৩২, জে বার্ক ২২, জিমলেকার ৩৭ রাণে ৯ উই:)

অষ্ট্রেলিয়া—দ্বিতীয় ইনিংস—২০৫ (ম্যাকডোলাণ্ড ৮৯, বার্ক ৩৩ ক্রোডা ৩৮, জিমলেকার ৫৩ রাণে ১০ উই:)

(ইংলণ্ড এক ইনিংস ১৭০ রাণে বিজয়ী।

ফুটবল

গত দুই বারের লীগ চ্যাম্পিয়ান মোহনবাগান দল এবারেও প্রথম ডিভিসন লীগে চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরব অর্জন করলো। এবার নিয়ে মোহনবাগান দল ৭ বার লীগবিজয়ী হলো। উপর্য্যুপরি ৩ বার লীগ পেয়েছিল ডারহামস লাইট ইনফ্যাণ্টি দল। তারপর মহমেডান স্পোর্টিং ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত। কলকাতার ফুটবল ইতিহাসে মোহনবাগান হল তৃতীয়, দল যে পর পর তিন বার লীগ পেল।

রেফারীদের ক্রটিপূর্ণ পরিচালনার জন্য লীগ খেলার যে জটিল পরিস্থিতি হয়েছিল তা কিছুটা সহজ হলেও রেফারীদের খেলা পরিচালনায় অনেক দোষ-ক্রটি লক্ষ্য করা গেছে। রাজস্থান ক্লাব উয়াড়ীর বিরুদ্ধে এরিয়ান ক্লাব মহামেডান স্পোর্টিং এর বিরুদ্ধে একটি পেনাল্টি নায্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক স্পোর্টিং ইউনিয়নের দুটি গোল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে অগ্রাহ্য করে দেওয়া হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গল শেষ পর্য্যন্ত অনেক ভাল খেলছে। মহামেডান ইষ্টবেঙ্গল দলের মধ্যে যে কেউ এক জন রাণার্স আপ হবে।

দীর্ঘ ২০ বৎসর বাদে হাওড়া ইউনিয়ন দ্বিতীয় ডিভিসনে চ্যাম্পিয়ান হওয়ায় সামনে বছর থেকে প্রথম ডিভিসনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো।

টুকরো খবর

ইংলণ্ডের কীর্তিমান ক্রিকেট খেলোয়াড় লেন হাটন রাণী এলিজাবেথের জন্মদিনে বৃটিশ সরকারের নিকট থেকে 'নাইট' উপাধি লাভ করেছেন। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে, ভারতীয় খেলোয়াড় মহারাজকুমার অফ ভিজিয়ানাগ্রাম এই উপাধি লাভ করেছিলেন। হাটনের এই সম্মান লাভে প্রত্যেক ক্রীড়ামোদী মাত্রেই আনন্দিত হবেন।

* * * *

মহিলাদের ২২০ গজ দৌড় পর্য্যায়ে রুশ মহিলা এ্যাথেলেট মেরিয়া ইটকিনা সম্প্রতি নূতন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন, গত ২২শে জুলাই কিয়েভের এক প্রতিযোগিতায় ২৩'৬ সেকেণ্ডে পার হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে অষ্ট্রেলিয়ার মার্জলী জ্যাকসনের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ড ছিল ২৪ সে:।

* * * *

আসন্ন অলিম্পিকের জন্য ৩১ জন মল্লবীরকে প্রাথমিক নির্বাচনে মনোনীত করা হয়েছে।



পি, কে, ব্যানার্জী (এ বছরের শ্রেষ্ঠ রাইট আউট)



চুণী গোস্বামী (মোহনবাগান)



সাত্তার (অধিনায়ক মোহনবাগান)

বিজ্ঞান বার্তা



পক্ষধর মিশ্র

মানুষ এবার গ্রহান্তরের যাত্রী হতে চায়। চন্দ্রে উপনিবেশ স্থাপনের কথা পুরোনো হয়ে গেছে, আর মাত্র ৫০ বছর অপেক্ষা করতে পারলে আপনি সুযোগ সুবিধে মতো কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে চন্দ্রপৃষ্ঠে তীর্থ এবং তার সঙ্গে স্বাস্থ্যোদ্ধার করে আসতে পারবেন। অতএব কবে যেতে পারবো মঙ্গল, বুধ অথবা শুক্রগ্রহে, সেই কথাই চিন্তা করা যাক্।

গ্রহান্তরের যাত্রার জন্য আমাদের এমন আরো কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে যা পৃথিবীর উপগ্রহ চন্দ্রবিজয়ে মোটেই বিবেচনা করতে হয় নি। চন্দ্রভ্রমণে কেবলমাত্র পৃথিবী ও চন্দ্রের আকর্ষণী শক্তির কথাই চিন্তা করতে হয়েছিল কিন্তু গ্রহান্তরের পথে এগুলির সঙ্গে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তির কথা অগ্রাহ্য করলে চলবে না। প্রশ্ন করতে পারেন, সূর্য্যের ক্ষমতা অসীম, সে পৃথিবীকে তার অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি দিয়ে বেঁধে রেখেছে, তবে কেন মানুষের চন্দ্রবিজয়ের প্রচেষ্টাকে এমন ভাবে শূন্যপথে অনাদর করলো? খুবই সত্যি কথা কিন্তু চন্দ্রবিজয়ে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি আমাদের অতি সামান্য প্রভাবিত করে। কারণ, চন্দ্র ও পৃথিবীর উপর তার টান প্রায় সমান। তাই ধরাপৃষ্ঠ থেকে চন্দ্রযাত্রায় যে পথ অতিক্রম করতে হয় তার মধ্যে সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তি শূন্যযানের প্রকৃতির উপর বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটায় না। গ্রহান্তরে যাত্রা করতে হলে আকর্ষণী শক্তির বিভিন্ন গ্রহের কক্ষপথ এবং মহাশূন্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উপর আধিপত্যের কথা বিশেষ ভাবে বিবেচনা করতে হবে। মহাশূন্যে যে কোন প্রবল আকর্ষণী শক্তিকেই একমাত্র প্রচণ্ড গতিশক্তির দ্বারা অগ্রাহ্য করা যায় কিন্তু এই প্রচণ্ডতম গতিশক্তির কল্পনাও বর্ত্তমান কালে মানুষের চিন্তাজগতের বাইরে। মানুষকে সর্ব্বদাই দেখতে হবে, কতো অল্প শক্তির সহায়তায় পৃথিবী ও মহাকাশের অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহের সঙ্গে তাল রেখে সংক্ষিপ্ততম পথে বাঞ্ছিত গ্রহে অবতরণ করা যায়। এই পথ বৃত্তাভাষক্ষেত্র, অনুবৃত্ত অথবা অতিপরবলয়;— সরল রেখায় গ্রহান্তরে যাত্রা করলে সুবিধা নিশ্চয়ই হয়, সময়ও লাগে অনেক কম কিন্তু এর জন্য শক্তির প্রয়োজন সহস্র গুণে বেশী।

মোটামুটি হিসাবে দেখা গিয়েছে, আমরা যদি প্রতি ঘণ্টায় ৩৬০০০ মাইল বেগে যাত্রা সুরু করি, তাহলে চন্দ্রে পৌঁছতে সময় লাগবে কমবেশী ১৪ থেকে ১৫ ঘণ্টা। লাগা উচিত অনেক কম কিন্তু শূন্যপথে গতিবেগের পরিবর্ত্তন হওয়ার জন্যই আনুমানিক ১৪ ঘণ্টাই বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন। ভ্রমণের এই সময়ের পরিমাণ মঙ্গল এবং শুক্রের জন্য সম্পূর্ণ আলাদা। পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহের দিকে প্রতি ঘণ্টায় কমপক্ষে ৪৫০০০ মাইল বেগে যাত্রা করতে হবে এবং এর জন্য সময় লাগবে প্রায় ২৫৯ দিন। শুক্র বিজয়ের জন্য কমপক্ষে গতিবেগের প্রয়োজন ঘণ্টায় ৫৮০০০ মাইল এবং সময় লাগবে কমবেশী ১৪৬ দিন। মঙ্গল অথবা শুক্রে যাবার জন্য যে পরিমাণ গতিশক্তির কথা আলোচনা করলাম, তার সাধনাতেই মানুষের কেটে যাবে বহু বছর। সুতরাং অন্য কোন গ্রহে যাবার চিন্তা করাও এখন বাতুলতা। সময় কতো লাগবে জানেন?— প্রয়োজনীয় গতি-শক্তিতে যদি যাত্রা করি, বৃহস্পতিতে পৌঁছতেই সময় লাগবে প্রায় ২ বৎসর ৯ মাস আর দূরান্তরের কোন গ্রহে অবতরণের সাধনায় আপনার আমার একটা জীবনই কেটে যেতে পারে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সরল রেখায় দূরান্তরের গ্রহে যাত্রা না করলে সেখানে পৌঁছবার চিন্তা না করাই ভাল। আগেই তো বলেছি, সরল রেখায় যাত্রা করা যায় একমাত্র প্রচণ্ড গতিশক্তির সাহায্যে; আণবিক শক্তির সহায়তায় সেই গতি-শক্তি সৃষ্টি করবার জন্য মানুষকে হয়তো আরো কয়েক শতাব্দী অপেক্ষা করতে হবে।

বৃহস্পতি গ্রহের উপর কোন কঠিন আবরণ নেই, কোথায় অবতরণ করবে মানুষের শূন্যযান? প্রচণ্ড উত্তাপে শূন্যযান একেবারে গলে আরোহী সমেত ধ্বংস হয়ে যাবে; তাই বৃহস্পতি বিজয়ের জন্য মানুষেরা খুব বেশী চিন্তিত নয়। বৃহস্পতিকে কেন্দ্র করে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে অনেকগুলি উপগ্রহ, স্বার্থ জড়িয়ে আছে সেইখানেই। এই উপগ্রহগুলির কয়েকটি বেশ বড়, এমন কি আয়তনে এদের মঙ্গলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। একবার যদি মানুষ কোনরকমে বৃহস্পতির কক্ষে পৌঁছতে পারে, তাহলে উপগ্রহগুলিতে যেতে কোনই অসুবিধা হবে না। বৃহস্পতির পর এক এক করে পথে পড়বে শনি, ইউরেনাস এবং নেপচুন—এদের সকলের অবস্থাই বৃহস্পতি গ্রহের মতো, অত্যন্ত ঘন একটি মিথেন এবং এ্যামোনিয়া গ্যাসের মিশ্রণ এই গ্রহগুলিকে রেখেছে ঢেকে এবং এই আবরণের প্রচণ্ড চাপে অন্তর্দেশের অন্যান্য গ্যাস সমূহ তরল পদার্থে পরিণত হয়েছে। তারা অত্যন্ত ঠাণ্ডা কিন্তু জমাট নয়, আর বৃহস্পতি এবং শনির বুকের উপর চলেছে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ! মানুষের শূন্যযান কোন দিনই এইগুলিতে অবতরণ করতে সমর্থ হবে বলে মনে হয় না, বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির মতোন অন্যান্য গ্রহের উপগ্রহগুলির প্রতিই মানুষের লোভ। বিশেষ করে টিটান নামক শনির একটি উপগ্রহ যথেষ্ট বড় এবং এর একটি বেশ বিস্তৃত বায়ুমণ্ডল আছে যা উপগ্রহগুলির মধ্যে থাকে না। এই উপগ্রহগুলির বিষয়ে মানুষের জ্ঞান খুবই কম, কেবলমাত্র এদের আয়তন এবং ব্যাস সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারণা আছে। তাই মানুষ দূর থেকেই সুন্দর সুন্দর পৌরাণিক নাম দিয়ে দিন গুণছে, কবে তার শূন্যযান এদের পৃষ্ঠে অবতরণ করবে।

আমরা আলোচনার মধ্যে ২টি গ্রহকে এতক্ষণ বাদ দিয়ে গিয়েছি; তারা যথাক্রমে বুধ এবং প্লুটো। একটি সূর্য্যের সবচেয়ে নিকটে এবং অপরটি সবচেয়ে দূরে কিন্তু প্রকৃতির দিক দিয়ে বিচার করলে এদের একদলেই ফেলা যায়। এরা মঙ্গল ও শুক্রসদৃশ গ্রহ; বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস অথবা নেপচুনের ন্যায় গ্যাস ও তরলপদার্থ মিশ্রিত প্রকাণ্ড শূন্যচারী দেহ নয়। বায়ুবিহীনতা এবং তৎসঙ্গে অন্যান্য গুণাগুণ বিচার করলে বোধ হয় এদের চন্দ্রের সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। বুধ সর্ব্বদাই এক দিক সূর্য্যের দিকে রেখে নিজ কক্ষপথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তাই এর এক পিঠ প্রচণ্ড

গরম এবং অন্য দিক সৌরজগতের মধ্যে সবচেয়ে ঠাণ্ডা। এই ঠাণ্ডা এবং গরম পিঠ দুটি যেখানে এসে একত্রে মিশেছে, সেখানে উত্তাপ মোটামুটি সহ্য করা যায়। শুক্রগ্রহ বিজয়ের পর মানুষ যদি কোন দিন প্রচণ্ড উত্তাপকে অগ্রাহ্য করে বুধ-বিজয়ের জন্য অগ্রসর হতে সাহস করে তাহলে তাকে বুধের দুই পৃষ্ঠের সংযোগস্থলে সহনীয় উত্তাপের মাঝে এসে নামতে হবে। প্লুটোও সূর্য্যের থেকে বহু দূরে অবস্থিত হওয়ার দরুণ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। প্লুটো আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র ১৯৩০ সালে। সুতরাং এই গ্রহ বিষয়ে মানুষের জ্ঞান অত্যন্ত অল্প, তবে যা জানা গেছে তাতে এর আয়তন প্রায় পৃথিবীর সমানই হবে। প্লুটো বা বুধ কোনটাতেই কোন উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া যায় নি।

বলা মুস্কিল, মানুষ আগে মঙ্গলগ্রহে যাবে, না যাবে শুক্রগ্রহে? এই উভয় গ্রহ বিজয়েরই সময়কাল আশা করা যায় খুবই কাছাকাছি হবে। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মঙ্গলগ্রহে যাওয়া শুক্রগ্রহে যাওয়ার চেয়ে অনেক বেশী লোভনীয়। বেশী দিন নয়, চন্দ্র বিজয়ের পরেই শুরু হবে মানুষের মঙ্গলগ্রহ বিজয়ের প্রস্তুতি। মঙ্গলগ্রহ বিজয়ের আকর্ষণ প্রধানতঃ দুটি, প্রথমটি হলো মঙ্গলে যাওয়া শুক্রে যাওয়ার চেয়ে সোজা এবং শক্তির খরচ কম; অন্যটি, অনেকেরই বিশ্বাস মঙ্গলগ্রহে প্রাণী বাস করতে পারে।

একবার মঙ্গলপৃষ্ঠে অবতরণ না করতে পারলে এই গ্রহ বিষয়ে সঠিক ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। দূরবীক্ষণের সাহায্যে অত্যন্ত বিচক্ষণতার দ্বারা বিচার বিবেচনা করে এই গ্রহে জালের মতো কতকগুলি সরলরেখা আবিষ্কার করেছেন, বিজ্ঞানী পার্সিভাল সোয়েলের মতে রেখাগুলি কোন বুদ্ধিমান প্রাণী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত খাল ছাড়া আর কিছুই নয়। মঙ্গলপৃষ্ঠে মরুভূমির আক্রমণ রোধ করার জন্যই মঙ্গলবাসীরা এই খাল খনন করেছেন। আবার অনেক বিজ্ঞানীই মঙ্গলে প্রাণি-বাসের সম্ভাবনাকে একেবারে গল্প বলে উড়িয়ে দেন। সঠিক ভাবে মানুষ এ বিষয়ে কোন মতামতই প্রকাশ করতে পারে না। তবে আশা রাখে, একবার চন্দ্রে পৌঁছোতে পারলে সেখানে একটি দূরবীক্ষণ বসিয়ে নিখুঁত ভাবে মঙ্গলগ্রহের চেহারাটা পরীক্ষা করে দেখবে।

যাই হোক, ধরে নিলাম মঙ্গলগ্রহে মানুষের সমপর্য্যায়ের অথবা উন্নততর কোন প্রাণী বাস করে না কিন্তু ঐ গ্রহে যে উদ্ভিদ আছে, একথা প্রায় স্থির নিশ্চিত। চিহ্ন ও রঙ দেখে মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগকে তিনটি নির্দ্দিষ্ট অংশে ভাগ করা চলে। প্রথমটি হলো সাদা বরফে ঢাকা মেরু অঞ্চল, দ্বিতীয়টি ঈষৎ লালচে মরুভূমি এবং তৃতীয় ছোট অঞ্চলটি নীলাভ সবুজ সমুদ্র। যদিও মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর থেকে ছোট, তবু সমুদ্র না থাকার দরুণ এর স্থলভাগ প্রায় পৃথিবীর সমান বলা যেতে পারে। যে নীলাভ সবুজ সমুদ্রের কথা এখন আলোচনা করলাম তাতে কিন্তু জল নেই এবং এই খানেই ঋতুর সাথে সাথে রঙের পরিবর্ত্তন দেখে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলে উদ্ভিদ-জগতের সন্ধান পেয়েছেন। মঙ্গলগ্রহে যখন শীতকাল তখন এই অঞ্চলের রঙ থাকে খয়েরি, গরম বা বসন্তকালে এলেই মেরু প্রদেশের বরফ যায় গলে, বরফ-গলা সামান্য জল নেমে আসে সমুদ্রে, সমুদ্রের রঙ হয় নীলাভ সবুজ। অর্থাৎ মঙ্গলের মেরুপ্রদেশ একটি পাতলা বরফের আবরণে ঢাকা, গরমকালে ঐ বরফ-গলা অতি প্রয়োজনীয় জলের সংস্পর্শে এসেই মেরু থেকে সমুদ্র পর্য্যন্ত উদ্ভিদ্-জগতের আবির্ভাব ঘটে। মঙ্গলগ্রহে দুপুরবেলা বেশ গরম, আবার রাত্রিবেলা এর যে কোন স্থান পৃথিবীর মেরু প্রদেশের চেয়েও ঠাণ্ডা। এই আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, এই গ্রহের উদ্ভিদের প্রাণ কতো কঠিন! পৃথিবীর মতো প্রাণীর বাস মঙ্গলে অসম্ভব, কারণ এখানকার গভীর বায়ুমণ্ডল খুবই পাতলা, এবং এর প্রধান উপাদান হলো কার্ব্বণ ডাই অক্সাইড। অক্সিজেনের সন্ধান এই গ্রহে পাওয়া যায়নি কিন্তু এর লালচে রঙ দেখে অনেকেই মনে করেন, মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগে প্রচুর পরিমাণে অক্সাইড জাতীয় যৌগিক পদার্থ বর্ত্তমান। সুতরাং মানুষকে যদি মঙ্গলগ্রহে বসতি স্থাপন করতে হয়, তাহলে হয় তাকে পৃথিবী থেকে অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যেতে হবে, অথবা মঙ্গলে অবস্থিত ঐ যৌগিক পদার্থ থেকে অক্সিজেনকে পৃথক করে করতে হবে ব্যবহার। মঙ্গলগ্রহের দুটি উপগ্রহ আছে কিন্তু তারা এতো ছোট যে, মঙ্গলে উপনিবেশ স্থাপনের পর ঐ উপগ্রহগুলিতে বসতির জন্য মনে হয় মানুষ আর শক্তি ব্যয় করবে না।

শুক্রগ্রহ মঙ্গলের চেয়ে পৃথিবীর নিকটে অবস্থিত, তবু এর সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান খুবই অল্প। ধূলোর একটা বিরাট মেঘ এই গ্রহটিকে একেবারে মুড়ে রেখে দিয়েছে এবং এই মেঘের মধ্যে জলের চিহ্নমাত্র নেই! সূর্য্যের দিকে অবস্থিত হওয়ায় পৃথিবী থেকে একে লক্ষ্য করার অসুবিধা যথেষ্ট বেশী; তার উপর আবার ধূলোর মেঘ! সব মিলিয়ে শুক্রকে একটি রহস্যময় গ্রহ বলা যেতে পারে। যদিও উত্তাপ এখানে খুবই বেশী, তবু ধূলোর মেঘ গ্রহটিকে আগাগোড়া ঢেকে রাখার জন্য উত্তাপের মোটামুটি একটা ক্ষমতা আছে। জল বা অক্সিজেনের কোন চিহ্নই ঐ গ্রহে নেই, বর্ণালী পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ঐ গ্রহ কার্ব্বণ ডাই অক্সাইডে একেবারে ভর্ত্তি। সুতরাং আয়তনে, ঘনত্বে এবং বহুবিধ প্রকৃতিতে শুক্র পৃথিবীর সমগোত্রীয় হলেও এখানে কোন প্রাণীর বাস কল্পনা করা যায় না। শুক্রের আহ্নিক গতির কথাও সঠিক ভাবে আমাদের জানা নেই। তবে মনে হয়, এই গ্রহের একটি দিন আমাদের পৃথিবীর কয়েক সপ্তাহের সমান। বিজ্ঞানীরা বলেন, লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীর চেহারাও বোধ হয় শুক্রের মতো ছিল, সময়ের সঙ্গে উত্তাপ কমে গিয়ে ধীরে ধীরে শুক্রও একদিন হয়তো আমাদের পৃথিবী মায়ের রূপ গ্রহণ করতে পারবে। উদ্ভিদ-জগতের হবে আবির্ভাব, তারা কার্ব্বণ ডাই অক্সাইডকে ভেঙে অঙ্গার গ্রহণ করে অক্সিজেনকে আবহাওয়ায় দেবে ছেড়ে—সুরু হবে প্রাণিজগতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির খেলা। শুক্র—পৃথিবী আর মঙ্গল, গ্রহজগতের বিবর্ত্তনের তিনটি প্রতীক, শুক্রের মধ্যে নিহিত রয়েছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা পৃথিবীর বুকে বর্ত্তমানের প্রাণচাঞ্চল্য আর মঙ্গলের চোখে অতীতের নীরব সাক্ষ্য।

রহস্যময় রাজ্য শুক্রে শূন্যযানে একেবারে অবতরণ করা মোটেই নিরাপদ নয়। মহাশূন্য থেকে রাডারের সাহায্যে তার বায়ুমণ্ডলের অন্তর্দেশে পর্য্যবেক্ষণ চালিয়ে শুক্রপৃষ্ঠের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে মোটামুটি একটা জ্ঞান অর্জ্জন না করে, সেখানে অবতরণ করলে মানুষ যে কোন অজানা বিপদের সম্মুখীন হতে পারে!

র ঙ্গ প ট



নট ও নাটক

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

নাটকের প্রত্যেক ভূমিকা যাহাতে বিকাশ পায়, তাহার প্রতি যত্নবান হওয়া নটের একটি প্রধান কর্ত্তব্য। অভিনয়ের প্রতি নটের প্রগাঢ় অনুরাগ থাকা আবশ্যক। অর্দ্ধেন্দুর এই অনুরাগ এতই প্রবল ছিল যে, রঙ্গালয়ে অভিনয় সম্বন্ধে আলোচনা উপস্থিত হইলে তিনি তাহার তর্কবিতর্কে এমনই মগ্ন হইতেন যে, আহারাদির কথা এক প্রকার ভুলিয়াই যাইতেন। এ স্থলে উপস্থিত অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের কাহারও পলাইবার উপায় থাকিত না। অর্দ্ধেন্দু তাহাদের সকলকে আটক করিয়া অভিনয় বিষয়ক তর্কবিতর্ক শুনাইতেন। অভিনয় সম্বন্ধে অর্দ্ধেন্দুর এই আদর্শ অনুরাগ আলোচনা করিয়া অনুরাগ শিখিতে হয়—তাঁহার অভ্যাস দেখিয়া নটের কার্য্য অভ্যাস করিতে হয়। দেহের উপর আধিপত্য থাকা যে নটের প্রয়োজন, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিনয়ে যে অভিনেতা অর্দ্ধেন্দুর 'বিদ্যাদিগ্‌গজ' দেখিয়াছেন, তাহার স্মরণ হইবে যে, আহারান্তে ও জলপান কালে 'বিদ্যাদিগ্‌গজে'র গলার নলী এরূপ ভাবে সঞ্চালিত হইতেছে যেন "গজপতি" সত্যই জলপান করিতেছেন। অভিনেতা নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখুন, এ সামান্য কার্য্যও কিরূপ অভ্যাস-সাপেক্ষ। বস্তুতঃ, অর্দ্ধেন্দুশেখরের নাট্যজীবন নটের আদর্শ।

অভিনয় সম্বন্ধে এত বলিবার কথা আছে, অভিনয়প্রিয় পণ্ডিতগণ এ বিষয়ে এত পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন এবং বিষয়টি সুধীগণের এতই আলোচনার যোগ্য যে, তৎসম্বন্ধে আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে এই এক প্রবন্ধে কিছুই বর্ণিত হয় নাই বলিলেও চলে। এক প্রবন্ধে এই বিশাল বিষয়ের সকল কথা বিবৃত করা অতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষেও দুঃসাধ্য। কারণ, রঙ্গভূমি পৃথিবীর ক্ষুদ্র অনুরূপ—সমস্ত পৃথিবী একটি রঙ্গালয় বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে।

অর্দ্ধেন্দুর শোকসভায় মাননীয় সভাপতি শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বলিয়াছিলেন যে—তিনি অভিনয়ে যোগদান করিতেন এবং নটের কার্য্য যদিও উপস্থিত ক্ষেত্রে সকলের নিকট সম্মানের নয়, তথাপি কালে অভিনয় কার্য্যের গরিমা প্রকাশ পাইবে এবং সর্ব্বসাধারণে নটের আদর করিবে। সভাপতি মহাশয়ের একথা সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু সে আদর লাভের পথ-পরিষ্কার বর্ত্তমান নটমণ্ডলী—আমাদিগকেই করিতে হইবে। অভিনয় কার্য্যের কেন, কোন কার্য্যেরই আদর প্রথমে হয় না। এই ইংরাজী চিকিৎসা, যাহার ইদানীং এত পূজা, আমরা বালককালে শুনিয়াছি, তাহা "মানুষ খুন" করা নামে অভিহিত হইত। উপস্থিত ক্ষেত্রে যে নটের আদর নাই তাহার কারণ—সাধারণ যাত্রা পাঁচালীতে ভাঁড়াম ও কুৎসিত রুচি দেখিয়া অনেকে মনে করেন, সাধারণ অভিনয়ও ঐ শ্রেণীর। কিন্তু যদি আমরা রঙ্গালয় হইতে বুঝাইতে পারি যে সমস্ত কলাবিদ্যার উন্নতি রঙ্গালয় দ্বারাই হইতেছে—কবি নাটক লিখিতেছেন, নট তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন, গায়ক সুর সৃষ্টি করিতেছেন, চিত্রকর তুলি ধরিয়াছেন, ভাস্কর রঙ্গস্থল সুসজ্জিত করিতেছেন, বৈজ্ঞানিকও যোগদান করিয়া অবাস্তবে বাস্তব-ভ্রম উৎপাদন করিতেছেন—যদি আমরা দেখাইতে পারি, রঙ্গালয় হইতে সর্ব্বপ্রকার কলাবিদ্যার উন্নতি হইতেছে, যদি আমরা বুঝাইতে পারি যে, অভিনয়-বিদ্যাও অন্যান্য বিদ্যার ন্যায় জাতীয় সভ্যতার পরিচয় স্থল—তবে নট সুধীজন সমাজে তাঁহার যোগ্য মর্য্যাদা—তাঁহার আজীবন পরিশ্রমের পুরস্কার—তাঁহার ঐকান্তিক সাধনার সিদ্ধি অবশ্যই লাভ করিবেন।

(অভিনেতার ধ্যান)

আমরা "বহুরূপী" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছিলাম যে, যে ভূমিকা যাহার আকারের উপযোগী, সেই ভূমিকাই তাহার গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। যথা, লম্বোদর, স্থূল, কুৎসিত, উচ্চদন্ত ব্যক্তি হাস্যরসের ভূমিকায় সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করিতে পারে, কিন্তু গভীর রসের ভূমিকায় (Serious part) সাফল্য লাভ তাহার পক্ষে একরূপ অসম্ভব বলাও অত্যুক্তি নহে। সে ব্যক্তি ভূমিকার ভার গ্রহণে অদ্বিতীয় হইতে পারে, হয়তো কাহাকেও শিক্ষা প্রদানে সক্ষম, যে শিক্ষা-বলে ছাত্র অত্যুৎকর্ষ লাভ করিবে, তথাপি স্বয়ং তাহার সে ভূমিকা গ্রহণ করা চলিবে না। দৈহিক অন্তরায় কলাবিদ্যায় দূর হইবে না। কিন্তু এমন ভূমিকাও অনেক আছে, যাহা সচরাচর দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে, এ অভিনেতা বা অভিনেত্রীর উপযোগী নহে,—কিন্তু সেই ভূমিকা সাধারণ-চক্ষে তাহার অনুপযোগিতা বোধ হইলেও বিশেষ ক্ষমতাশালী অভিনেতা বা অভিনেত্রী তাহা তাঁহার উপযুক্ত করিয়া লইতে পারেন। একটি সাধারণ ভ্রম আছে, যেন মাধুর্য্য দুর্ব্বলতার চিহ্ন, সুঠাম গঠন শ্রমশীল কার্য্যে অক্ষম, এই ভ্রম বশতঃই অনেক সময় আমরা বলিয়া থাকি যে, এ ভূমিকা এ ব্যক্তির উপযোগী নহে। কিন্তু অভিনয়-কলাবিদ্যায় সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি দেখিতে পান যে, সাধারণ-চক্ষে যাহার কোন ভূমিকা গ্রহণে অন্তরায় জ্ঞান হইতেছে, তাহা অন্তরায় না হইয়া অনেক সময়ে সেই অংশের নূতন বিকাশ প্রদান করে। অভিনয় ও নাটকের কথা হইলে প্রথমে সেক্‌সপিয়ারের নাম উঠে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা সেক্‌সপিয়ারের চরিত্র হইতে প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিব।

"মার্চেন্ট অফ্‌ ভিনিস" এর পোর্সিয়ার চরিত্র তিন অবস্থায় তিন রূপ। প্রথম যখন ব্যাসানিও সিন্দুক খুলিয়া তাহার অদৃষ্ট পরীক্ষা করিবে যে, সে পোর্সিয়াকে পাইবে কি না, সে সময়ে প্রেমিকা সরলা—যাহার প্রতি হৃদয় আকর্ষিত, সে তাহার হইবে কি না—এই ভয়ে অভিভূতা ব্যাকুল বিহ্বলা যুবতী। কিন্তু যথায় আণ্টানিওর পরীক্ষা হইতেছে, তথায় আইনজ্ঞ পোর্সিয়ার আর সে ভাব নাই। গম্ভীর মুখকান্তি তীব্রদৃষ্টি

হাবভাবে লোকের উপর আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম, যাহার বুদ্ধিশক্তি বলে "সাইলকের" কুটিলতাপূর্ণ ষড়যন্ত্র বিফল হইল—এ আর এক ভাবের পোর্সিয়া। আবার যখন স্বামীর নিকট যে অঙ্গুরী উকীলবেশে ছলপূর্ব্বক লইয়াছেন, সেই অঙ্গুরী লইয়া স্বামীর সহিত রসপ্রসঙ্গকারিণী পোর্সিয়া—পোর্সিয়ার অপর ছবি। এক্ষণে কিরূপ গঠনের অভিনেত্রীর পোর্সিয়ার ভূমিকা হওয়া উচিত, তাহা হয়তো বিভিন্নরূপে স্বীকৃত হইবে। কেহ প্রেমিকা পোর্সিয়ার ভাবে বিভোর হইয়া মাধুর্য্যসম্পন্না কৃশাঙ্গী কৃশোদরী পোর্সিয়া স্থির করিবেন। কেহ বা "আদালতদৃশ্যে" বিমুগ্ধ হইয়া দীর্ঘাকার পুরুষোপযোগী অবয়বসম্পন্না পোর্সিয়া মনোনীত করিবেন এবং কেহ বা রসিকা নাতিদীর্ঘ নাতিক্ষুদ্রদেহী স্বামি-মনোহারিণীচতুরা পোর্সিয়ার ছবি হওয়া উচিত স্থির করিবেন। কিন্তু কলাবিদ্যাবিদ্ অভিনেত্রী এই ত্রিবিধ আকারের যে আকারসম্পন্নাই হউন, পোর্সিয়ার ভূমিকায় যশস্বিনী হইতে পারিবেন। ব্যাণ্ডম্যান সম্প্রদায়ের মিস বুড়ে যখন পোর্সিয়া সাজিয়া দর্শকের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন,—"By my tooth Nerrissa"—দর্শকের মনে হইল যে, পোর্সিয়ার অপর আকার হওয়া কোনরূপেই উপযুক্ত নহে। কিন্তু পোর্সিয়ার ভূমিকায় এলেন টেরির বহু চিত্র আছে, তাহা দেখিবামাত্র মনে হয় যে, এলেন টেরি ব্যতীত পোর্সিয়া হওয়া আর কাহারও উচিত নহে। কিন্তু এলেন টেরি স্বয়ং বলেন যে, ঐ ভূমিকায় যিনি মিস্ মার্লোকে দেখিয়াছেন, তাঁহার বোধ হইবে যে, যেন সেকস্পিয়ার মিস মার্লোকেই চিত্রিত করিয়াছেন। প্রত্যেক দৃশ্যে প্রত্যেক অবস্থায় মিস্ মার্লো যেন কবি-কল্পনা-প্রসূত পোর্সিয়া। বেশ, চলন-বলন, ভাবভঙ্গী সমস্তই পোর্সিয়ার, মিস্ মার্লোর চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। মার্লোর পোর্সিয়া অভিনয় কলাবিদ্যার্থীর আদর্শ। এলেন টেরি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। অথচ এলেন টেরির পোর্সিয়াও দর্শককে মুগ্ধ করিয়াছিল। মিস্ মার্লো তাঁহার চক্ষে প্রশংসাভাজন, তিনিও বহু দর্শকের চক্ষে সেইরূপ প্রশংসাভাজন হন।

উক্ত অভিনেত্রীত্রয়ের আকার যদিচ ভিন্ন, তথাপি এক ভূমিকায় তাঁহারা তিন জনেই কি প্রকারে এতাদৃশ কৃতিত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন? তাহার কারণ কলাবিদ্যা-সমালোচক অনুমান করেন, যে কবির চিত্র প্রকৃতি অনুসারে কল্পিত হয় এবং সেই কল্পনা (ধ্যানই কলাবিদ্যায় উৎকর্ষতা লাভের একমাত্র উপায়), ধ্যান দ্বারা অভিনয়কালীন হৃদয়ে আকার সম্পন্ন হয়, তাহার হাবভাব চালচলন সমস্তই অনুভূত হয়। তাহার সহিত একরূপ কথা চলে। সেই ধ্যান-গঠিত মূর্ত্তির ছবির সহিত আপনাকে মিলাইয়া সেইরূপ সজ্জিত হইয়া—সেইরূপ হাবভাব সম্পন্ন হইয়া—রঙ্গমঞ্চে কলাবিদ্যাবিদ্ অবতারণ করেন। নাটক-চিত্রিত এক চরিত্র অপর অভিনেতা যেরূপ ধারণা করিয়াছেন, তাহা যিনি রঙ্গস্থলে উপস্থিত, তাঁহার হৃদয় ছবির সহিত পার্থক্য থাকিলেও তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন না। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের ছবি তাঁহার পক্ষে তৃপ্তিকর। যখন তিনি নিজে অভিনয় করিয়াছেন, তখন দর্শক মুগ্ধ হইয়াছে, কিন্তু তিনি তাঁহার হৃদয়ের ছবির অনুরূপ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং বিমুগ্ধ হন না, তবে তাঁহার চিত্তের অনুরূপ না হইলে ক্ষুণ্ণ হইতে পারেন। কিন্তু যখন সেই অভিনেতা অপর কোন কলাবিদ্যাবিদ্ অভিনেতাকে অভিনয় করিতে দেখেন, তখন তিনি অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হইবার অবসর পান।

আমরা পূর্ব্ব প্রবন্ধে মিস্ সিডন্সের "লেডী ম্যাকবেথের" অভিনয় উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আকার দীর্ঘ ছিল, দেখিলেই তেজস্বিনী রমণী অনুমান হইত। অনেকেরই ধারণা, সেই কারণেই লেডী ম্যাক্‌বেথের ভূমিকা উচ্চাভিলাষিণী রমণীর ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। এ ধারণা অতি অমূলক, কারণ "ফেটাল ম্যারেজ" নামক নাটকে তিনি প্রথম যশস্বিনী হন। সে নাটকে তাঁহার ভূমিকা প্রেমিকা নায়িকার ছিল। নায়ক তাঁহাকে বিবাহ করায় ধনী পিতা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত, তাঁহাকে রাখিয়া যুদ্ধে গিয়াছে; নায়িকার নিকট সংবাদ আসিল—নায়ক যুদ্ধে পতিত; নিরুপায় হইয়া নায়িকা শ্বশুরের আশ্রয় গ্রহণ করিতে গেল, আশ্রয় না পাইয়া নিরাশ হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসে। তখন তাহার প্রেমাসক্ত অপর ব্যক্তি আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখন তুমি কি করিবে?" নায়িকা উত্তর করিলেন—"Do—do nothing!" অর্থাৎ কি করিব—কিছুই নয়। এই একটি ছত্র এইরূপ ভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যাহাতে সমস্ত দর্শক মুগ্ধ এবং মিস্ সিডন্সের যশও দৃঢ়মূল হইল।

আমরা তাঁহার "লেডী ম্যাকবেথের" কথা বলিতেছিলাম। এই ভূমিকায় তাঁহার নাম আজও অতি উজ্জ্বল। তিনি এক ভাবে অভিনয় করিয়াছিলেন, কিন্তু উক্ত ভূমিকা সম্বন্ধে তিনি একটি মন্তব্য

রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সারা বার্ণহার্ট পান। এবং সেই মন্তব্য অনুসারে "সারা" অভিনয় করিয়াছিল। পূর্ব্ব-প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি যে, বার্ণহার্টের "লেডী ম্যাকবেথ" প্রেমিকারমণী, স্বামি-সোহাগিনী, স্বামীর সাহায্যকারিণী। মিস্ সিডন্‌সের অভিনয়ের এক ভাব ছিল, এই স্বতন্ত্র অভিনয় দেখিয়া সকলেই চমৎকৃত! এখন তর্কের বিষয়, সারা বা সিডন্‌স কাহার অভিনয় উৎকৃষ্ট? এ স্থলে বিচার্য্য যে, সিডন্‌স্ অন্য মত অভিমত লিখিয়া গিয়া কেন ভিন্নরূপে অভিনয় করিয়াছিলেন? তাহা মীমাংসা করিব—আমরা এরূপ স্পর্দ্ধা করি না; কিন্তু আমাদের ধারণা—যখন ভোজের অন্তে ম্যাকবেথ ও লেডী ম্যাকবেথের কথাবার্ত্তা হইতেছে, যেরূপ স্নেহপূর্ণ-ভাবে লেডী ম্যাকবেথ, ম্যাকবেথের সহিত কথা কহিতেছে, তাহাতে প্রেমিকা লেডী ম্যাকবেথ উজ্জ্বল হয়। কিন্তু যখন **"Out—out ye damn'd spot"** বলিয়া হস্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে পাপ-তাড়নায় নিদ্রিত অবস্থায় লেডী ম্যাকবেথ দর্শকের সম্মুখীন হন, তখন পাপীয়সী লেডী ম্যাকবেথের ছবি সম্পূর্ণ সার্থকতা লাভ করে। যাহা বলিয়াছি তাহাতে প্রকাশ যে, এক চরিত্রের কল্পনা এত দূর ভিন্ন হইতে পারে,—ধ্যানের কার্য্য ধ্যানের দ্বারাই সফলতা লাভ করে।

অহঙ্কার অভিনেতার ধ্যানের প্রধান অন্তরায়। সারা বার্ণহার্ট তাঁহার আত্মজীবনীতে তাহা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিনয় শিক্ষা হইত, শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে পর রঙ্গালয়ে নিযুক্ত করিত। অভিনয়ের পরীক্ষা ছিল। পরীক্ষার দিন উপস্থিত। সারা ও তাঁহার সহযোগিনী অপর বালিকা পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কোনও এক ভূমিকায় সারা ভাবিয়াছিলেন যে, সে ভূমিকায় তিনি সর্ব্বপ্রথমা হইবেন এবং পদক পাইবেন। এ সম্বন্ধে এতদূর নিশ্চয় হইয়াছিলেন যে, তিনি সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইয়া আছেন, পদক লইতে তাঁহাকে নিশ্চয় ডাকিবে। কিন্তু ডাক হইল—তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর। সারা মর্ম্মাহত হইলেন। মনে হইল—পরীক্ষকগণ পক্ষপাতী। গৃহে গিয়া ভাবিতে লাগিলেন, কোথায় তাঁহার ত্রুটি। এইতো যে রূপে যে পংক্তি উচ্চারণ করা উচিত, তাহা তিনি করিয়াছেন,—হস্ত সঞ্চালন, মুখভঙ্গি দর্পণে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, কোনও দোষ নাই। যেরূপভাবে শিক্ষা করিয়াছিলেন, ঠিক সেইরূপ হইয়াছে, তবে কিরূপে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হলাইজা তাঁহাকে পরাস্ত করিলেন? চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার মনে হঠাৎ উদয় হইল যে তিনি ঠিক বলেন, হস্তপদ সঞ্চালন করেন,—কিন্তু তাঁহার হৃদয় ভাবহীন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনীর আবৃত্তি ভাবপূর্ণ। ভাবের দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা লাভ হয়। তিনি কিছুদিন পরে পরীক্ষকগণের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে, তাঁহার উক্ত ভূমিকা আর একবার পরীক্ষিত হয়। তিনি পুরস্কার-প্রার্থিনী নন, তবে কত দূর শিখিয়াছেন, তাহা তিনি পরীক্ষা করিতে চান। পরীক্ষকেরা স্বীকার করিলেন। সারা আবৃত্তি করিলেন। পরীক্ষকগণ চমৎকৃত! সেই দিনই তিনি রঙ্গালয়ের কার্য্যে অভিনেত্রীরূপে নিযুক্ত হইলেন।

অভিনেতা অভিনেত্রীগণের বেশভূষা সম্বন্ধে সারা বলেন যে, যোগ্য অভিনেত্রীকে তাহার ইচ্ছানুরূপ বেশভূষা করিতে দেওয়া রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষের অতি কর্ত্তব্য। উদাহরণস্বরূপ বলেন, তাঁহার শিক্ষার সময় কোনও এক হাস্যোদ্দীপক ভূমিকা অভিনীত হইবে। পরীক্ষক মাত্রেরই ধারণা ছিল যে, এ ভূমিকায় কেহই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বিনী হইতে পারিবে না। সারার অভিনয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইবে নিশ্চয়। গৃহ হইতে সারা বেশভূষা করিয়া আসিবেন। তাঁহার মাতা অতি ব্যস্ত, সারা দীর্ঘকেশী ছিলেন। তাঁহার কেশবিন্যাস কিরূপে হইবে, পূর্ব্বরাত্রি হইতে আন্দোলন হইতেছে। সারার মাতার দীর্ঘকেশী ছিলেন; কোন এক ব্যক্তি তাহার কেশবিন্যাস করিয়া দিত। তাহাকেই ডাকা হইল। বিন্যাসকারী আসিয়া গম্ভীরভাবে সারাকে বসাইয়া একবার এদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়; একবার ওদিকে ঘাড় ফিরাইয়া লয়, একবার ঘাড় উঁচু করে, একবার ঘাড় নিচু করে। তাহার পর সারা বলেন, পরুষ্কটি বাঁধিয়া দিয়া কেশবিন্যাস শেষ করিল। তাহার মাতার প্রশংসার অবধি নাই—চমৎকার হইয়াছে, কিন্তু সারা দর্পণে মুখ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সারা বলেন, আমায় এক জন্তু সাজাইয়া দিয়াছে। পরীক্ষার্থে গিয়া রোদন সংবরণ করিতে পারেন না। তথায় গিয়া অন্যরূপ কেশবিন্যাস হইল বটে, কিন্তু প্রথমে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়ায় তাঁহার অভিনয় কিছুই হইল না।

অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিজ বেশ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত সত্য, কিন্তু যদি অযোগ্য অভিনেতা বা অভিনেত্রী এরূপ প্রশ্রয় পায়, তাহা অতি দোষের হইয়া ওঠে। রক্ষক বা দাসী সাজিয়াছে—অযোগ্য ব্যক্তি রাজ-রাণীর পোষাক মনোনীত করিবে, তাহার ভূমিকার ধ্যান নাই, কিসে তাহাকে ভাল দেখায়—সেই চেষ্টাই তাহার বলবতী হইবে। যোগ্য অধ্যক্ষ বুঝিতে পারিবেন, তাহাকে নিজের পরিচ্ছদ মনোনীত করিতে দেওয়া উচিত, এবং কাহার আকাঙ্ক্ষা দমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু যে অধ্যক্ষ রঙ্গালয়ের উন্নতি করিতে চান, তাঁহার প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য যে কোন পরিচ্ছদ তাহার ভূমিকার উপযুক্ত, সে বিবেচনা করে, পরিচ্ছদ নির্ণয় করিতে গিয়া অভিনেতার কতকটা ধ্যানের কার্য্য হইবে, অসঙ্গত ইচ্ছা দমিত হইবে। কেবল নিপুণ কলাবিদ্যাবিদ ব্যক্তিই আপন পরিচ্ছদ নির্ব্বাচিত করিতে পারে—অশিক্ষিত ব্যক্তির তাহা বিড়ম্বনা!

পাপ ও পাপী

বক্তব্য খুবই ভালো এবং সর্ব্ব-সাধারণের উপযোগী কিন্তু উপযুক্ত রচনা ও পরিচালনা দোষে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। চিত্রনাট্য পরিপূর্ণরূপে ব্যর্থ। ঘটনা-বিন্যাসে কোনও কৃতিত্ব নেই। নায়ক শঙ্কর চৌধুরী ভালো ছেলে ছিল, থিয়েটার করছিল দেখে তার জমিদার বাবা চটে যান ও সম্পর্কচ্ছেদ করেন প্রেমিকাও আঘাত দেয় বন্ধু পান্নালালের ফাঁদে পড়ে, মদ্যপ চরিত্রহীন হয়ে উঠে—কিন্তু বাঈজী বুলবুলের সহানুভূতিতে ও অধ্যাপক অমরনাথের মানুষ তৈরীর আশ্রম দেখে এবং তৎকন্যা কৃষ্ণার প্রেমের প্রভাবে শঙ্কর লুপ্ত মনুষ্যত্ব ফিরে পায় ও পান্নালালও তার পাপের ফলস্বরূপ গুলীতে প্রাণ হারায়। লাঠি খেলা যা দেখানো হয়েছে তা দেখলে একটি বাচ্চা ছেলেও হেসে ফেলবে। অসিতবরণ অনুভা গুপ্তার মুখ থেকে রূপকথার গল্প শুনছেন আর বাচ্চা ছেলের মত অসিতবরণ তারপর-তারপর বলে যাচ্ছেন—এ কি? এ কি সুস্থ মস্তিষ্কের পরিচায়ক? অনঙ্গ কি জলের মত স্বচ্ছ যে তার গায়ে গুলী লাগে না? শঙ্করের কয়েকটি গুলী ব্যর্থ হয়ে গেল, তবু তার কিছু হোল না! শশধরেরই


এক্ষণে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে চলিতেছে
হিন্দ, বসুশ্রী এবং বীণা
উচ্চ আদর্শের উজ্জ্বল নিদর্শন
দেবতা
নারায়নন্ কোম্পানীর চিত্র
শ্রেষ্ঠাংশে
অঞ্জলী দেবী · গনেশ
বিপিন গুপ্ত · আগা
কুমারী কমলা · রূপকুমার
ও
বৈজয়ন্তীমালা
সঙ্গীত · সি. রামচন্দ্র · পরিচালক · পট্টন্না
জেমিনী রিলিজ
এবং : সারা ভারতের
প্রধান কেন্দ্রসমূহে
চলিতেছে।

বা কি হোল—সে-ই বা কোথায় গেল—পান্নালালের প্রতি কি মৃত্যুবাণ সে প্রয়োগ করলে? যে লোকটি 'প্রতিশোধ নেব' 'প্রতিশোধ নেব' বলে চীৎকার করলে—সে-ই বা কি করলে, আর বিজন সেনের ঐ জায়গাটিই সব থেকে ভুল হয়ে গেছে। ঐ লোকটিকে দিয়ে ঐ রকম বীরত্ব না দেখিয়ে একেবারেই অনঙ্গের ছায়ামূর্ত্তি দেখালে বইটি সত্যিকারের 'সাসপেন্সিভ' হতে পারত, 'রহস্য-রোমাঞ্চে' সে সব কি—সে সব কি শুধু তর্জ্জন-গর্জ্জন এবং বিজ্ঞাপনেই সার? আসলে কেবল এক ছায়ামূর্ত্তিরই লম্ফঝম্ফ। যে বাগানবাড়ীকে কেন্দ্র করে এত ব্যাপার সে বাগানবাড়ীকে বিজন বাবু একবারও দেখালেন না! যেখানে কৃষ্ণাকে দিয়ে বলানো হোল 'পাপকে ঘৃণা করি—পাপীকে নয়' ও আশ্রমেও দেখানো হচ্ছে কত চোর-ডাকাত মানুষ হয়ে যাচ্ছে—সেখানে পান্নালাল ও শশধরই বা থেকে সংশোধিত হোল না কেন? তা হলে কি বই জমত না? অভিনন্দন জানাচ্ছি বিকাশ রায় ও অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে দু'জন এক নতুন ধরণের 'কুচক্রী'র রূপ সৃষ্টি করেছেন। অসিতবরণ যথাযথ, পাহাড়ী সান্যাল, আশীষকুমার, শিশির মিত্র, হরিধন, পঞ্চানন, মঞ্জু দে, অনুভা গুপ্তা, সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি যথাযথ।

চলাচল

বেশ কিছু কাল বাদে সত্যিই একখানি ভাল ছবি উপহার দিলেন নবীন পরিচালক অসিত সেন। চলাচল শুধু সুপরিচালিতই নয়—সুকল্পিতও। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের এই উপন্যাস নতুনত্বের চিহ্নবাহক। একঘেয়েমি চিরাচরিত ধরণের কয়েকটি বাঁধাধরা গতানুগতিক ছবি দেখতে দেখতে চলাচলের চলাচল শুধু আনন্দই দেয় না, ভারাক্রান্ত মনকেও সজীব ও প্রফুল্ল করে দেয়। একটি চিকিৎসিকার (সরমা) জীবনে আসে দুটি পুরুষ; একজন (বিপিন) তাকে বিয়ে করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠে আর একজন (অবিনাশ) নিজের পিতৃরোগের বিষয় চিন্তা করে পাণি-প্রার্থিনীকে বিমুখ করে শেষে অবিনাশই সরমাকে অনুরোধ করে বিপিনকে বিয়ে করার। বিয়ে হয়—দু'দিনের আনন্দ। তারপরেই সন্দেহ। বিপিনের বিষপান। শাশুড়ীর সাক্ষ্যে সরমার মুক্তি। তারপর? চলাচলের পরিচালনাও প্রশংসার দাবী রাখে। সরমাও বিপিনের বিবাহের আনন্দোৎসবের মধ্যে একা নিঃস্ব অবিনাশ ঘরে বসে—ট্রেনের আলো তার জানলার উপরে—এই দৃশ্য পরিকল্পনা অপূর্ব হয়েছে। অবিনাশ ও সরমার কথোপকথন—(বিপিনকে বিয়ে করার ব্যাপার নিয়েই) আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্ব ঘোষণা করছে। তবে 'ভাই রে' গানটি অত বার শোনানোর কোনও প্রয়োজন ছিল না। শিল্পীদের অনেকেরই নাম দেখা গেল না। পাঁচ বছর দাম্পত্য-জীবন যাপন করার পর সন্যমুক্ত স্বামীকে তার স্ত্রী নাম ধরে কেন সম্বোধন করবে? অভিনয়ে সর্বাগ্রে উল্লেখ করব অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়ের নাম। অসিতবরণ ও নির্মলকুমারও প্রশংসা পাবেন—তাঁরাও দর্শকচিত্ত জয় করতে পেরেছেন—তবে নির্মলকুমারের চলার ভঙ্গীটা ত্যাগ না করলে তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ অসম্ভব! পাহাড়ী সান্যালও ভালো অভিনয় করে গেছেন। চন্দ্রা দেবী, তপতী ঘোষ, জহর রায়, ও সমরকুমার প্রশংসার্হ। যাদুকর প্রতুলচন্দ্রকেও বারেকের তরে দেখা গেছে। মোটের উপর চলাচল একটি আকাঙ্খিত এবং সময়োপযোগী ছবি এবং ছবিটির সর্বাঙ্গীন শুভযাত্রাই আমরা কামনা করি এবং এর প্রত্যেকটি কর্মীকেও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মামলার ফল

শরৎচন্দ্রের গল্প। পাতা কয়েকের। তাই কেন্দ্র করে সংলাপ দিয়ে, ঘটনা দিয়ে, নাটক দিয়ে তার চিত্রনাট্য রচনা করেছেন শৈলজানন্দ। পশুপতি চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত মামলার ফল বাঙলার গ্রাম্য জীবনের একটি সাংসারিক চিত্রই তুলে ধরেছে। দুই ভাই, দুই বৌ, সুখ দুঃখ, হাসিকান্না, মান-অভিমানে ভরা তাদের সংসার। বাচ্চা গয়ারাম, কিছুতেই ছোট ভাই শম্ভুর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে মা বলবে না। কলহের মূল কারণ এই। ছোট বৌ দুঃখিত হয়, তা রূপান্তরিত হয় পৃথক হওয়ায়, তার পরিণতি গয়ারামের বিরুদ্ধে কুচক্রী শালকের সাহায্যে সিধু সামন্তের মামলা-লড়া ও পরে মধুর মিলন। চিত্রনাট্য ছবিকে প্রভূত সাহায্য করেছে স্তরে উঠতে। তবে সঙ্গীতের আধিক্য ছবির গতিকে থেকে থেকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। ছবির শেষাংশটি সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়েছে। তবে আমরা আশা করেছিলুম যে, সমস্ত ছবিতে বাঙলার একটি গ্রাম্যসুর পূর্ণমাত্রায় ধ্বনিত হবে। তা হয়েছে অবশ্য—তবে ঠিক আশানুরূপ হয়নি। গয়ারাম তার সৎমাকে দেখতে পারে না—তাই বলে বিমাতাকে আবাগী বলানোটা ছবিতে অন্ততঃ



নারায়ণন কোম্পানীর 'দেবতা,' ছায়াচিত্রে (জেমিনী পিকচার্স পরিবেশিত) অঞ্জলি দেবীকে একটি বিশেষ ভঙ্গিমায় দেখা যাচ্ছে। ছবিটি হিন্দ বীণা, বসুশ্রীতে দেখানো হচ্ছে।

শোভা পায় না, যে ছেলে ছোটবেলায় মাকে বা জ্যাঠাইমাকে 'তুমি' বলছে—বড় হয়ে সে তাদের 'তুই' বলতে আরম্ভ করলে। বিবাহ বাসরে সঙ্গিনীদের ঘন ঘন জিভ বার করার দিকে পরিচালকের নজর রাখা উচিত ছিল। চিত্র গ্রহণ ও সঙ্গীতাংশ মন্দ নয়। অভিনয়ে সব থেকে ভাল লাগবে জহর গঙ্গোপাধ্যায় ও মলিনা দেবীকে, বিশেষ করে প্রথম জনকে। তাঁর অভিনয়ে একটি চাষীর রূপ পরিপূর্ণ ভাবে জীবন্ত হয়ে উঠছে। শুধু অভিনয়েই নয়, চলনে-বলনে আলাপে-অভিব্যক্তিতে পর্যন্ত। অসিতবরণ ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনয় খারাপ করেননি বটে, তবে শরৎচন্দ্রের শম্ভু ও তার স্ত্রীর রূপটি এঁদের অভিনয়ে ফুটে ওঠেনি। বালক গয়ারাম খারাপ নয় কিন্তু শিশু গয়ারাম ভালো। শরৎচন্দ্র গয়ারামের বয়েস উল্লেখ করেছিলেন সতেরো, ছায়াচিত্রে কি তাই দেখানো হয়েছে? ছবি বিশ্বাস একবার দেখা দিয়েছেন। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তুলসী চক্রবর্তী, রেণুকা রায়, তুলসী লাহিড়ী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য সুঅভিনয় করেছেন। কুচক্রীর ভূমিকায় প্রেমাংশু বসু নিজের সুনাম বজায় রেখে গেছেন মাত্র।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

রাজ কাপুরের প্রথম বাংলা ছবি "একদিন রাতে"র চিত্রগ্রহণ শেষ হয়ে গেছে। এখন ছবিটির সম্পাদনা চলছে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন দু'জন—শ্রীশম্ভু মিত্র আর শ্রীঅমিত মৈত্র। ছবিটি কাহিনী এবং আঙ্গিকে একেবারে নতুন ধরণের হয়েছে বলে শুনা যাচ্ছে। এও শুনা যাচ্ছে যে, ভারতীয় চিত্রজগতের নাকি মোড়ও ঘুরিয়ে দিতে পারে। রাজ কাপুর যে ছবিটির শুধু প্রযোজনাই করছেন তা নয়, প্রধান ভূমিকাতে তিনি অভিনয়ও করেছেন। তাঁর সঙ্গে সুমিত্রা দেবী, ছবি বিশ্বাস, প্রদীপকুমার, স্মৃতিরেখা, নেমো, পাহাড়ী সান্যাল, ডি জি ইরাণী প্রভৃতিও অভিনয় করেছেন। সলিল চৌধুরী এতে সুর দিয়েছেন। লতা মুঙ্গেশকর আর সন্ধ্যা মুখার্জী এই ছবিতে গান গেয়েছেন। নেপচুন পিকচার্সের পরিবেশনায় আগামী মাসের গোড়ার দিকে মুক্তি পাবে। আগামী ১০ই আগষ্ট বাংলা চিত্রজগতে এক নতুন যুগের সূচনা করে প্রযোজক অসিত চৌধুরী, পরিচালক তপন সিংহ, চিত্রশিল্পী অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিনেতা ছবি বিশ্বাস কাবুল অভিমুখে যাত্রা করবেন। "কাবুলীওয়ালা" চিত্রের অন্তর্দৃশ্য গ্রহণের কাজ শেষ হয়ে গেছে। এবার কাবুল এবং আফগানিস্থানের বিভিন্ন স্থানের বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হবে। গত সপ্তাহে ষ্টুডিওর সেটেই ছবি বাবুর ৫৬তম জন্মদিন পালিত হয়। কাবুলীওয়ালার বিভিন্ন চরিত্রে রাধামোহন ভট্টাচার্য্য, মঞ্জু দে, টিংকু ঠাকুর, জহর রায় অভিনয় করছেন। ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রবিশংকর সঙ্গীতাংশ পরিচালনা করেছেন। ছবি বিশ্বাস এই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে তাঁর দীর্ঘ দিনের অভিনয়-জীবনের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাচ্ছেন এবং তাঁর চরিত্রাভিনয় সকলকে অভিভূত করবে বলে আশা করা যায়। ছায়াবাণী (প্রাঃ) লিমিটেড পরিবেশনা করছেন। নারায়ণন এণ্ড কোম্পানীর হিন্দী ছবি দেবতা জেমিনী পিকচার্সের পরিবেশনায় আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে মুক্তি পাবে। ছবিটির কয়েকটি রঙীন দৃশ্যের চিত্রগ্রহণ করা হচ্ছে বোম্বাই-এর মেহবুব ষ্টুডিওতে। দক্ষিণ-ভারতের তারকা অঞ্জলি দেবীকে নায়িকার ভূমিকায় দেখা যাবে। নায়কও দক্ষিণী। নাম গণেশ। অন্যান্য ভূমিকায় বিপিন গুপ্ত, আগা, রূপকুমার, ইন্দিরা, কৃষ্ণকুমারী ও খ্যাতনামা নর্তকী কুমারী কমলাকে দেখা যাবে। ছবিটি পরিচালনা করছেন পতান্না। এ এম প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিঃ মাইকেল মধুসূদনের অমর ব্যঙ্গনাট্য "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" এর চিত্ররূপ দিচ্ছেন। ছবিটি পরিচালনা করছেন শ্রীদেবব্রত সরকার। তুলসী লাহিড়ী, উৎপল দত্ত, জীবেন বসু, ভানু, জহর, তুলসী চক্রঃ, নৃপতি, হরিধন, নবদ্বীপ, রাজলক্ষ্মী, অমিতা, তারা ভাদুড়ী প্রভৃতিকে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে। ভারতচন্দ্র রচিত একখানি গান এই ছবিতে গাওয়ানো হয়েছে। বিশ্ববাণী পরিবেশক ছবিটি পরিবেশন করবেন। "মানরক্ষা" ছবিটি নারায়ণ ভট্টাচার্যের কাহিনী অবলম্বনে এবং প্রণব রায়ের চিত্রনাট্য অনুসারে গড়ে উঠেছে। এটি বনেদী জমিদার-বংশের চক্রান্ত আর ঘাত-প্রতিঘাতের পারিপার্শ্বিকে গড়া এক জীবনের কাহিনী। সবিতা চ্যাটার্জি, যমুনা সিংহ, নির্মলকুমার, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, অপর্ণা দেবী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, তুলসী, হরিধন এবং ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই ছবিতে অভিনয় করেছেন। কমল দাশগুপ্ত সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। বিজয় দে এর চিত্রশিল্পী। ছবিটি প্রযোজনা করেছেন শ্রীমা পিকচার্স। পরিচালনা করেছেন সতীশ দাশগুপ্ত। হিন্দ পিকচার্সের পরিবেশনায় শীঘ্রই মুক্তিলাভ করবে।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী

খ্যাতিমান অভিনেতা শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায়

বহু দিন থেকে চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত সংগ্রহ করে চলেছি। এজন্যে অনেক নাম-করা শিল্পীর সান্নিধ্যে আমাকে আসতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর ভেতর একদিন গিয়ে হাজির হলুম দক্ষিণেশ্বর ইষ্টার্ণ টকিজ ষ্টুডিওতে। জানা ছিল, আগে থেকেই এখানে স্বনামধন্য পরিচালক শ্রীসুশীল মজুমদার, শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'দানের মর্য্যাদা'র চিত্ররূপ দান করছেন এবং বর্ত্তমান কালের শক্তিমান ও জনপ্রিয় অভিনেতা শ্রীকানু বন্দ্যোপাধ্যায় একটি কঠিন চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন এ ছবিখানিতে। সরাসরি গিয়ে দেখা করলুম এবার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে—উদ্দেশ্য আর কিছু নয়। এ শিল্প সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত মতামত জেনে আসা।

যাবার আগে ভেবেছিলুম, তাঁকে দেখবো শিল্পীর ভাবগম্ভীর বাধা-বন্ধনের মধ্যে—একটা বেশ দূরত্ব হয়তো থাকবে সাধারণের সঙ্গে তাঁর। কিন্তু এ সহজ, সরল, সদালাপী লোকটিকে দেখে এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বুঝতে পারলুম, তাঁর জনপ্রিয়তা কেন এবং কোনখানে। বলতে কি, নিষ্ঠার সঙ্গে একটা জিনিষকে আঁকড়ে থাকলে বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে সাফল্য যে না এসে পারে না, জ্বলন্ত উদাহরণ তিনি।

আমার উদ্দেশ্য জানতে পেরে তিনি আর কোন ভূমিকার অবকাশ দিলেন না। সোজাসুজি বলতে শুরু করলেন, ২০ বছরের অধিক কাল এ লাইনে যোগ দিয়েছি। তখন ছিল ছায়াছবির নির্ব্বাক



কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

যুগ। সে যুগে প্রথম একষ্ট্রা হয়েই লাইন খুঁজে নিয়েছিলুম আমি। যে ছবিতে আমার প্রথম অভিনয়, স্পষ্ট মনে পড়ছে সেটি দুর্গেশনন্দিনী। তার কিছু কাল পরেই আরম্ভ হয় সবাক যুগ। সবাক যুগে প্রথম আমি অবতীর্ণ হই 'শুভ ব্রাহ্মস্পর্শ' ছবিতে একটি মাত্র দৃশ্যে। সেই থেকে কত ছবিতে কত ভূমিকায় অভিনয় করে আসছি, সব হয়তো মনেও পড়ছে না আজ। তবে এ বললে নিশ্চয়ই অত্যুক্তি হবে না যে 'সর্ব্বহারা'য় জামাল, 'রাত্রির তপস্যা'য় বিজয় মাষ্টার, 'জিঘাংসা'য় লক্ষ্মণ চাকর এবং 'ভগবান রামকৃষ্ণ' ছবিতে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে প্রচুর তৃপ্তিলাভ করেছি।

শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় বলতে থাকেন ধীরে ধীরে, এ লাইনে আসা আমার একটি সখই বলতে পারেন। ছাত্রজীবন থেকেই এ লাইনের উপর আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং তখন হতেই অভিনয়ের দিকে আমার মন যায়। এ লাইনে আসতে আমাকে কেউ প্রেরণা জোগান নি। সহজাত প্রেরণা থেকেই আমি এ লাইনে এসেছি, এটুকু বলবো।

ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর আপনার সামাজিক বা পারিবারিক জীবনে কোন পরিবর্ত্তন এসেছে কি?

সহজ সরল ভাষায় উত্তর করলেন কানু বাবু: গোড়াতে একটু অসুবিধে হয়েছিল বৈ কি! বাবা যত দিন বেঁচে ছিলেন ইচ্ছে থাকলেও চলচ্চিত্রে আমি যোগদান করতে পারিনি। কারণ, বাবা এটা পছন্দ করতেন না। তারপর চলচ্চিত্রে যোগ দেওয়ায় আমার দাদা একটু মনঃক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন মনে পড়ে। এ ছাড়া এ ধরণের আর কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হ'তে হয়নি আমায় এ লাইনে আসতে বা থাকতে।

সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচী কি এবং আপনার বিশেষ ধরণের কোন 'হ'বি' আছে কিনা জিজ্ঞেস করলুম আমি।

কানু বাবুর কণ্ঠে পরিষ্কার উত্তর—সাধারণতঃ খুব ভোরেই আমি ঘুম থেকে উঠি। পূজো-আহ্নিক সেরে সংসারের করণীয় সব কাজই করি একে একে। বাজার করা আমার দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর একটা অঙ্গ। ফল ও ফুলের গাছ লাগান আমি বেশ পছন্দ করি এবং এটাকেই আমার বিশেষ হবি বলতে পারেন। বই পড়তেও আমার ভাল লাগে যথেষ্ট। নাটক সংক্রান্ত পুথিপুস্তক পড়তেই আমি পছন্দ করি। খেলাধূলোর ভেতর ফুটবলেই আমার আনন্দ। এককালে খেলেছিও এ কম নয়। পোযাক পরিচ্ছদের কথা যদি জিজ্ঞেস করেন তবে বলবো—জমকালো পোযাকে আমার মন সায় দেয় না। বাঙালীর সাদাসিদে ধুতি-পাঞ্জাবীতেই আমি সন্তুষ্ট।

—চলচ্চিত্রে যোগ দিতে হলে কি কি বিশেষ গুণ থাকতেই হবে বলে আপনি মনে করেন? দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিলেন শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়—এ লাইনে আসবার আগেই সেটি অপরিহার্য্য ভাবে চাই, সে হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষা ও অভিনয়-দক্ষতা। ব্যক্তিত্ব, আত্মবিশ্বাস ও সকলের সঙ্গে মেলামেশার ক্ষমতা না থাকলেও নয়। সর্ব্বোপরি চাই শিল্পীর অফুরন্ত নিষ্ঠা ও সাধনা। যখনই যে চরিত্র অভিনয় করতে হ'বে, সেটি বুঝতে হ'বে ভাল ভাবে। এসব গুণের অধিকারী হলেই সার্থক শিল্পী হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে আরও একটি কথা বলবো, অভিনেতা অভিনেত্রীদের স্বাস্থ্যের প্রতি সর্ব্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে শিল্পিজীবন ব্যর্থ। বিশ বছর চাকরীর পর ডাক বিভাগ থেকে অবসর নিই 'invalid certificate' দিয়ে। ডাক বিভাগে কাজ করবার সময়েই আমি অভিনয় জগতে এসে পড়ি। এর জন্যে struggle ও কম করতে হয়নি আমাকে। পুরোপুরি শিল্পী আমি এখন, শিল্পিজীবন যাপনই আমার একমাত্র কাম্য।


"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল।
কোথা সে বাঁধা ঘাট অশথতল।"

নাচ গান বাজনা



নৃত্যের ইতিকথা

নৃত্যকলার মূল লক্ষ্য রসসৃষ্টি। নৃত্যকলার মাধ্যমে ভাব প্রকাশ লাভ করে এবং দর্শকের মনে সেই ভাব সঞ্চারিত হয়। কলাবিদ্‌রা নিম্নলিখিত রসের উল্লেখ করেছেন। (১) শৃঙ্গার—কামকলা, যৌবন প্রভৃতি বিষয়ক। বিশিষ্ট কলাতত্ত্ববিদ্ ভোজ বলিয়াছেন, শৃঙ্গারই একমাত্র বা আদিরস। ইহা হইতেই অন্যান্য রসের সৃষ্টি হইয়াছে। (২) হাস্য—আনন্দ, লঘুতা প্রভৃতি বিষয়ক। (৩) করুণ—বিয়োগ, বেদনা প্রভৃতি বিষয়ক। (৪) বীর—শৌর্য, বীর্য প্রভৃতি বিষয়ক। (৫) রুদ্র—প্রখর, কঠোর প্রভৃতি বিষয়ক। (৬) ভয়ানক—ভয়, মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ক। (৭) বীভৎস—নৃশংসতা বিষয়ক। (৮) অদ্ভুত—বৈচিত্র বিষয়ক। (৯) শান্ত—স্থির, নিষ্কাম প্রভৃতি বিষয়ক। ভরত ও কালিদাসের কালে 'শান্ত' অবশ্য রস হিসাবে গণ্য হইত না।

এক্ষণে ভরত নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত 'প্রবৃত্তি' সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। কবিরাজ রাজশেখর খৃষ্টীয় ৯ম ১০ম শতাব্দীতে তাঁহার বিখ্যাত 'কাব্যমীমাংসা' গ্রন্থে রীতি, বৃত্তি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি নাট্যশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পারিভাষিক শব্দগুলির অতি সুন্দর বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার মতে বচন-বিন্যাস-ক্রম (অর্থাৎ পদ-সঙ্ঘটনা), 'রীতি' (Style বা পদ্ধতি), বিলাস-বিন্যাস-ক্রম 'বৃত্তি' (Dramatic mode of presentation বা প্রয়োগকুশলতা) এবং বেশ-বিন্যাস-ক্রমের নাম 'প্রবৃত্তি' (news বা সংবাদ)। মহর্ষি ভরত বলেন যে, 'প্রবৃত্তি' শব্দের অর্থ 'নিবেদন' অর্থাৎ নিঃশেষে বেদন বা জ্ঞান। পৃথিবীর অন্তর্গত নানা দেশের বেশ, ভাষা, আচার, বার্তা যাহা প্রখ্যাপিত করে, তাহাই প্রবৃত্তি (News)। বিভিন্ন দেশের নানারূপ বেশ, বিবিধ ভাষা, বিচিত্র লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার (অর্থাৎ আচার), কৃষি ও পশুপালনাদির (বার্তা) বহু বৈচিত্র দৃষ্ট হয়। এই সকলের জ্ঞানই 'প্রবৃত্তি'। আচার্য অভিনবগুপ্তও (খৃঃ ১১শ শতাব্দী) বলিয়াছেন,—দেশবিদেশের বেশ, ভাষা, সমাচারের বৈচিত্র-প্রসিদ্ধিই প্রবৃত্তি। প্রাচীন নাট্যপ্রয়োগ কর্তৃবর্গ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি চতুর্বিধ। (১) আবন্তী,—(২) দাক্ষিণাত্যা, (৩) পাঞ্চালী (বা পাঞ্চাল মধ্যমা) ও (৪) ঔড্রমাগধী (বা উড্রমাগধী)।

নাট্যশাস্ত্রকার মহর্ষি ভরত দৃশ্যকাব্যের রসভাবাদির বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, 'বৃত্তি'ও চতুর্বিধ। (১) ভারতী, (২) সাত্বতী, (৩) আরভটী ও (৪) কৈশিকী। প্রবৃত্তির মূল আশ্রয় হইল বৃত্তি। অতএব বৃত্তির ন্যায় প্রবৃত্তিও চতুর্বিধ। সাধারণতঃ ভারতভূমিকে চারিভাগে বিভক্ত করা হয়। (১) দক্ষিণাপথ, (২) পূর্বদেশ, (৩) পশ্চিমদেশ ও (৪) উত্তরভূমি। এই চারিটি ভাগের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গাররসের প্রাচুর্য সর্বজনবিদিত। অতএব, দাক্ষিণাত্যে স্ত্রীপ্রযোজ্য, বহু নৃত্যগীতযুক্ত, শৃঙ্গার-রসবহুল কৈশিকীবৃত্তির প্রচলন অত্যধিক। আবন্তী প্রভৃতি পশ্চিমদেশে ধর্মভাবের কিছু প্রাধান্য বলিয়া কৈশিকীর সহিত সত্ত্ববহুল সাত্বতী বৃত্তির প্রাদুর্ভাব। প্রাচ্যদেশ সমূহে কেবল বাগাড়ম্বর ও বিকট আস্ফালনের বাহুল্যহেতু রাগাশ্রিত ভারতী ও উদ্ধতভাববহুল আরভটীর সম্মেলন। উত্তরভূমিতে ধর্ম ও শৌর্যাদির প্রভাব বশতঃ সাত্বতী ও আরভটীর যোগ থাকা সত্ত্বেও উহাতে কৈশিকীর ঈষৎ সংমিশ্রণ দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপে দেশভেদের সহিত বৃত্তি ও প্রবৃত্তিভেদের সম্বন্ধ-স্থাপনের বিশেষ প্রয়াস নাট্যশাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। এই সম্বন্ধ-স্থাপনের মূলে রহিয়াছে মানুষের চিত্তবৃত্তির বিভিন্নতা অর্থাৎ এই সকল ভেদ মনস্তাত্ত্বিক (Psychological) ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পৃথিবীতে ভিন্ন ভিন্ন দেশ, ভিন্ন ভিন্ন লোক ও ভিন্ন ভিন্ন রুচি, অতএব বেশ, ভাষা ও আচারে যে বহু বৈচিত্র থাকিবে, ইহা চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক।

প্রথমেই ধরা যাউক, দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তির কথা। এই প্রবৃত্তি দক্ষিণাপথে প্রচলিত ছিল। সে যুগে দক্ষিণাপথ বলিতে বুঝাইত মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, মেকল (মেলক বা মেখল) ও পালমঞ্জর (কালপিঞ্জর বা পলপিঞ্জর)।

ইহা ছাড়া কোসল, তোসল, কলিঙ্গ, যবন, খস, মোষল, দ্রমিড় (দ্রবিড়), অন্ধ্র, মহারাষ্ট্র, বৈন্না, বানবাসিক (বানবাসজ) প্রভৃতি দক্ষিণ সমুদ্র ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যস্থলে অবস্থিত সকল দেশই দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। এই সকল দেশেই দাক্ষিণাত্যার নিয়ত প্রচলন। বৃত্তি—কৈশিকী।

তাহার পর আবন্তী প্রবৃত্তি। তৎকালে আবন্তী বা উজ্জয়িনী পশ্চিম ভূভাগের কেন্দ্রস্থানীয় ছিল। এই পশ্চিমখণ্ড বলিতে বুঝাইত—আবন্তী (অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী), সুরাষ্ট্র, মালব, সিন্ধু, সৌবীর, আসত, দশার্ণ, ত্রিপুর ইত্যাদি। এই সকল দেশে আবন্তী (বা আবন্তিকী) প্রবৃত্তি প্রচলিত। বৃত্তি মূলতঃ সাত্বতী, অঙ্গরূপে কৈশিকী।

ইহার পর ঔড্রমাগধী (উড্রমাগধী) প্রবৃত্তি। ইহা প্রাচ্য ভূখণ্ডে পরিচিত। প্রাচ্যখণ্ড বা পূর্বদেশের অন্তর্গত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, বৎস, উড্রমাগধ, পুণ্ড্র, নেপালক, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্লবঙ্গ (প্রবঙ্গ), মহেন্দ্র, মলদা, মল্লবর্তক, ব্রহ্মোত্তর, ভার্গব, মার্গব, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, পুলিন্দ, বিদেহ, তাম্রলিপ্তক ইত্যাদি। এই সকল দেশ ও পুরাণাদিতে বর্ণিত অপর যে সকল দেশ প্রাচ্যখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত সেই সকল দেশেই ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তির আবির্ভাব। বৃত্তি—ভারতী ও আরভটী।

ইহার পর পাঞ্চালমধ্যমা প্রবৃত্তি। উত্তর ভূমিতেই এই প্রবৃত্তির প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। উত্তরাখণ্ড বলিতে বুঝায়—পাঞ্চাল বা (পঞ্চাল), শূরসেন, কশ্মীর (কাশ্মীর), হস্তিনাপুর, বাহ্লীক, মদ্রক, উশীনর ইত্যাদি। গঙ্গার উত্তর দিকে ও হিমাচলপ্রান্তে যে সকল দেশ অবস্থিত, সেইগুলিও উত্তরাপথের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল অঞ্চলে পাঞ্চালী বা পাঞ্চাল-মধ্যমা প্রবৃত্তির প্রচলন। বৃত্তি মূলতঃ সাত্বতী ও আরভটী। অল্পরূপে কৈশিকী। ইহাই হইল দেশানুসারে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিভাগ। ইহা মহর্ষি ভরত কৃত। এস্থলে উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল এই যে, দেশানুসারে বৃত্তি-প্রবৃত্তির বিভাগ করিলেও মহর্ষি ভরত প্রত্যেক প্রবৃত্তির পর্যাপ্ত বিবরণ কিছুই দেন নাই। তবে কবিরাজ রাজশেখর একটি রূপকচ্ছলে এই সম্পর্কে একটি অতি মনোহর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন,—

বাগ্‌দেবীর প্রিয়পুত্র কাব্যপুরুষ জননীর সহিত ব্রহ্মলোক গমনে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া যখন অভিমানে গৃহত্যাগ করেন, তখন তাঁহার বয়স্য কার্তিকেয়ের অনুরোধে ভগবতী গৌরী দেবী কাব্যপুরুষকে পুনরায় গৃহে ফিরাইয়া আনিবার ভার দেন নিজ মানসী কন্যা সাহিত্য-বিদ্যা-বধূর উপর। কাব্যপুরুষের অনুসরণ ক্রমে বধূ প্রথমে আসিয়া পৌঁছিলেন পূর্বদেশে। অঙ্গ, বঙ্গ, সুহ্ম, ব্রহ্ম, পুণ্ড্র প্রভৃতি জনপদ এই প্রাচ্যভূমির অন্তর্গত। ভাবী পতি কাব্যপুরুষের মনোরঞ্জনার্থ সাহিত্য-বিদ্যা-বধূ এ সকল দেশে আসিয়া স্বেচ্ছায় যেরূপ বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, রাজশেখর বলেন, (তাঁহার সময়েও) ঐ সকল দেশের রমণীগণ তাঁহার অনুকরণে বেশবিধান করিত। এই বেশক্রিয়ার নামই ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি। ইহার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা আছে,—

"অপূর্ব এই দেশ! ঈষদার্দ্র চন্দনলিপ্ত স্তনমণ্ডলে সূত্রহার অর্পিত। সীমন্তচুম্বিত বস্ত্রপ্রান্ত। বাহুমূল উন্মুক্ত। অগুরু উপভোগ হেতু নবদূর্বাদলশ্যামা গৌড়রমণীগণের শরীরে এই বেশ বড়ই মনোহর দেখায়।" ইহা ছাড়া কাব্যপুরুষও এই দেশে যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্দেশীয় পুরুষগণের তাহা অনুকরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাও উক্ত ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তির অঙ্গ।

পূর্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া কাব্যপুরুষ চলিলেন উত্তরে পাঞ্চালের দিকে। পাঞ্চাল, শূরসেন, হস্তিনাপুর, কাশ্মীর, বাহ্লীক, বাহীক প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া সাহিত্য-বিদ্যা-বধূ তাঁহার অনুসরণ করিয়া চলিলেন। ঐ সকল প্রদেশে ভ্রমণকালে ভাবী বরবধূ যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন পরবর্তী যুগের নরনারীগণ সেই প্রকার বেশের অনুকরণ করিত। এইরূপ বেশবিধির নামই পাঞ্চালমধ্যমা প্রবৃত্তি। বধূর বেশ বর্ণনায় আছে,—

"মহোদয় (কান্যকুব্জ) সুন্দরীগণের বেশ অতি মনোহর! তাটঙ্কের ঈষৎ আন্দোলনে গণ্ডদেশের চন্দনলেখা তরঙ্গিতপ্রায়। আনাভিলম্বিত তারাদল দলদল দুলিতেছে। শ্রোণী ও গুল্ফ দেশ পর্যন্ত উত্তরীয়ে পরিমণ্ডলিত।"

ইহার পর কাব্যপুরুষের অনুসরণে সাহিত্য-বিদ্যা-বধূ বিদিশা, সুরাষ্ট্র, মালব, ভৃগুকচ্ছ প্রভৃতি ঘুরিয়া অবন্তীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল জনপদে দিব্য বরবধূ যে বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তাহাই আবন্তী প্রবৃত্তির আদর্শ। বর্ণনায় বলা আছে,—

"পাঞ্চাল দেশের নরগণ ও দাক্ষিণাত্যের নারীগণের বেশবিধি সর্বাপেক্ষা মনোরম। অবন্তীর বেশ, ভাষা ও আচার, এই উভয় দেশের বেশ, ভাষা ও আচারের মিশ্রণে উদ্ভূত।"

অবন্তী হইতে উভয়ে আসিলেন দাক্ষিণাত্যে। মলয়, মেকল, কুন্তল, কেরল, মহারাষ্ট্র, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে তাঁহারা ভ্রমণ করিলেন। এই সকল দেশে তাঁহারা যে বেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তির আদর্শ হইয়া উঠিল। এই দাক্ষিণাত্যার বর্ণনায় আছে,—

"কেরল কামিনীগণের বেশ চিরদিন জয়যুক্ত হউক। আমূল-চঞ্চল-কুটিল-কুন্তলদামে তাহাদিগের চারুচূড়া রচিত। ললাট-দেশ চূর্ণালককলাঞ্ছিত। মেখলার নিপুণ নিবেশে নীবিবন্ধ সুনিবিড়। এ বেশ দর্শনে মুনিরও মন টলিয়া যায়।" প্রবৃত্তি সম্বন্ধে বর্ণনা এইখানেই শেষ করা হইয়াছে।

প্রবৃত্তির ভেদ বুঝিতে হইলে বৃত্তি ও রস সম্বন্ধে জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজন। অতএব, সংক্ষেপে কোন্ প্রবৃত্তি কোন্ কোন্ বৃত্তি ও কোন্ কোন্ রসের অনুকূল তাহা দেখান হইতেছে—

(১) দাক্ষিণাত্যা প্রবৃত্তি—কৈশিকীবৃত্তি; শৃঙ্গার ও হাস্যরস। শ্যাম অথবা শ্বেতবর্ণের মৃদু-কোমল-সূক্ষ্ম-বিচিত্র-মনোরম বেশ ইহাতে ব্যবহার্য; স্ত্রীগণেরই ইহাতে প্রধান অধিকার। কান্ত-কোমল পদাবলী ও নৃত্য-গীতিবহুল সৌন্দর্যোপযোগী (A'sthetic) ব্যাপার ইহাতে প্রচুর।

(২) আবন্তীপ্রবৃত্তি—সাত্বতী ও কৈশিকী বৃত্তি; বীর, রৌদ্র,

অদ্ভুত, হাস্য ও শৃঙ্গার রস। গৌর, হেম, রক্ত, পীত, শ্বেত ও শ্যামবর্ণের ঈষং উজ্জ্বল ও অল্প মৃদু বেশ ইহাতে পরিধেয়। সত্ত্বভাব অর্থাৎ শৌর্যবীর্যাদি মনোব্যাপার প্রদর্শনেই ইহার প্রধান উপযোগিতা। অবান্তররূপে সৌন্দর্য ব্যাপারও প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

(৩) ঔড্রমাগধী প্রবৃত্তি—ভারতী ও আরভটী বৃত্তি; করুণ, অদ্ভুত, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রস। কপোত (Grey), পীত, রক্ত, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণের উজ্জ্বল ও উগ্রবেশ ইহাতে ব্যবহার্য। নানাবিধ বাগব্যাপার ও উদ্ধতকায় ব্যাপার যুগপৎ ইহার সাহায্যে প্রদর্শিত হইতে পারে।

(৪) পাঞ্চালমধ্যমা প্রবৃত্তি—সাত্বতী, আরভটী ও কৈশিকী বৃত্তি; বীর, রৌদ্র, ভয়ানক বীভৎস, হাস্য ও শৃঙ্গারের অল্পাধিক সংমিশ্রণ। এইজন্য বেশেরও বৈচিত্র্য। হেম, গৌর, রক্ত, কৃষ্ণ, নীল, শ্বেত, শ্যামবর্ণের দীপ্ত, উজ্জ্বল, উগ্র, উৎকট, হাস্যজনক ও মৃদু মনোরম বিচিত্র বেশ ইহাতে ব্যবহার্য। সত্ত্বভাব, কায়ব্যাপার ও মধ্যে মধ্যে সৌন্দর্য্য ব্যাপার প্রদর্শনে ইহার উপযোগিতা দৃষ্ট হয়। (শ্রীগোপী ভট্টাচার্য্য ও শ্রীদেবপ্রসাদ বসু লিখিত নৃত্যের ইতিকথা থেকে)

সাঙ্গীতিক

দক্ষিণীর বাৎসরিক নৃত্যানুষ্ঠান গত ২২শে জুলাই নিউ এম্পায়ারে দক্ষিণীর ছাত্রছাত্রীদের একটি নৃত্যানুষ্ঠান হয়। দক্ষিণী রবীন্দ্র সংগীত ও নৃত্য শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে ইতিমধ্যে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। রবীন্দ্র নৃত্য-রীতির বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন উচ্চাঙ্গ নৃত্যের সঙ্গে অবস্থা অনুসারে অন্যান্য নৃত্যের মিশ্রণসাধন। সে কারণে তাঁর নৃত্যকলায় কথাকলি, মণিপুরী, ভরতনাট্যম প্রভৃতি নৃত্যভঙ্গীর ছাপ স্পষ্ট। এই ধারা দক্ষিণী পুরোপুরিই গ্রহণ করেছে। সমগ্রভাবে দাক্ষিণীর অনুষ্ঠানটি ভালই হয়েছে। বিশেষ করে 'কল অব ফ্লুট' নৃত্যের কম্পোজিশন প্রশংসনীয়। এবং এর সঙ্গে গাওয়া গানগুলির মধ্যে অমল নাগের 'বাঁশরী বাজাতে চাহে, বাঁশরী বাজিল কই' গানটির উল্লেখ প্রথমেই করতে হয়। মাধবী চট্টোপাধ্যায় ও গোপীনাথ নায়ারের মিলিত নৃত্যে মাধবী চট্টোপাধ্যায়ের অংশ প্রশংসনীয়। যাদবপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের ১২শ বার্ষিক পারিতোষিক উৎসব গত ১৫ই জুলাই, রবিবার, সন্ধ্যা ৪॥ টায় উদ্‌যাপিত হয় স্থানীয় কলেজ জিমনাসিয়াম হলে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক শ্রীহেমচন্দ্র গুহ বি-এস-সি (এডিন) ও প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। পুরস্কার বিতরণের পর ছাত্রীগণ কর্তৃক কবিগুরুর ঋতু-সঙ্গীত অবলম্বন করিয়া একটি নৃত্যনাট্য অভিনীত হয়। নাটকটির পরিকল্পনা, প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র। নৃত্যাংশ পরিচালনা করেন, নৃত্য-শিক্ষক শ্রীসমর চট্টোপাধ্যায়। সূত্রধরের ভূমিকা গ্রহণ করেন, সঙ্গীতবিদ ডাঃ বিমল রায় এম বি। ছাত্রীদের অভিনয়, নৃত্যগীত, সাজসজ্জার দিক দিয়ে খুবই প্রশংসনীয় হয়েছিল। শ্রীমতী কৃষ্ণা সরকার ও ইলা সেনের কণ্ঠ-সঙ্গীত এবং শ্রীমতী শোভা গোস্বামী ও কৃষ্ণা বসুর নৃত্য বিশেষ ভাবেই উল্লেখযোগ্য। তানসেন সঙ্গীত কলেজে গত ১লা জুলাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতার কয়েক জন বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করেন তানসেন সঙ্গীত কলেজের অধ্যক্ষ ওস্তাদ মহম্মদ দবীর খান সাহেব। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল "গৌড় সারং" রাগের ঠাট সম্বন্ধে। কয়েক জন শিল্পী উক্ত রাগ "কল্যাণ" ঠাটের অন্তর্গত বলে বর্ণনা করেন। কিন্তু অধিকাংশ শিল্পী—যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা এটাকে "বিলাবল" ঠাটের অন্তর্গত বলে মত পোষণ করায়—অনুরূপ একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আলোচনার শেষে ওস্তাদ দবীর খান সাহেব বলেন যে, কলিকাতায় যে সকল সঙ্গীত শিক্ষায়তন আছে, তাদের উচিত মাঝে মাঝে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে এইরূপ আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান করা। তার ফলে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রসার আরও সহজসাধ্য হবে। সম্প্রতি কলিকাতায় মুক্তারামবাবু ষ্ট্রীটে আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের উদ্যোগে রাগ-সঙ্গীত এবং নৃত্যকলার শিশু প্রতিভা সম্মেলন আরম্ভ হয়। এই অনুষ্ঠান দুই দিন ধরিয়া চলিবে। চার হইতে বার বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদের রাগসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত এবং নৃত্যকলা সম্পর্কে যথোচিত উৎসাহ ও প্রেরণা সঞ্চারই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। গত বৎসরও এই ধরণের সম্মেলন হইয়াছিল এবং উহা সাফল্যমণ্ডিতও হইয়াছিল বলিয়া জানান হয়। শনিবারের অধিবেশনে উল্লিখিত বয়সের ২৫ জন শিল্পী অংশ গ্রহণ করে। কলিকাতার কালেক্টর শ্রীএন, সি, ঘোষ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। আলাউদ্দিন সঙ্গীত সমাজের সম্পাদক শ্রীআলী আহম্মদ খান সম্মেলনের উদ্দেশ্য বিবৃত করেন। গত ২৫শে জুলাই গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট হলে এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়া ডীলার্স এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় বার্ষিক সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। শ্রীএম, এস, শর্মা সভাপতি এবং শ্রীএস, কে, বসু সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছেন। ওয়াটারলু ষ্ট্রীটে এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়ার বিবিধ সামগ্রীর একটি সুসজ্জিত প্রদর্শনী ডিলারদের দেখানো হয়।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?"—শেষ নাই, সুরের শেষ নাই, মূর্ছনারও শেষ নাই। শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্তার ললিতমধুর কণ্ঠে কবিগুরুর এই গানটিও যেন প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। অপর দিকে রয়েছে—"হেথা যে গান গাহিতে আসা"। দু'টি বাছাই রবীন্দ্র-সঙ্গীত—N 82708.

কুমারী যূথিকা রায়ের গানের ভক্ত অগণিত, দিকদেশব্যাপী তাঁর খ্যাতি। এবার তিনি অতুলপ্রসাদের দু'খানি বিখ্যাত ধর্মসঙ্গীত গেয়েছেন—"একা আমি জীবনতরী" এবং "আমারে এ আঁধারে।"—N 82709.

রিক্সার গান গেয়ে যিনি সারা বাংলার মনে রাতারাতি স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন, সেই দিলীপ সরকার এবার দু'টি নতুন আধুনিক গান গেয়েছেন—"আমলকী বনে" এবং "যত গান ছিল"।—N 82710.

কলম্বিয়া

পান্নালাল ভট্টাচার্য কেবল শ্যামাসঙ্গীত নয়, আধুনিক গানেও দিনে দিনে জনপ্রিয় হয়ে উঠছেন। তাঁর এবারের দু'টি আধুনিক গান—"জীবনের এই ক'টি দিন" এবং "তীরে তীরে গুঞ্জন" অতি চমৎকার হয়েছে।—GE 24801.

প্রবীণ রসরচনাবিশারদ ও কৌতুকাভিনেতা তুলসী লাহিড়ী এবার একটি 'সিরিওকমিক' রচনা উপহার দিয়েছেন—"চৌর্যানন্দ"। এতে অংশ গ্রহণ করেছেন তুলসী লাহিড়ী স্বয়ং, বরদা গুহ এবং অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ।—GE 24802.

নতুন প্রকাশিত চিত্রগীতির মধ্যে রয়েছে "মামলার ফল" চিত্রের গান—শ্যামল মিত্র ও আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কোন্ পাপে মোর এমন হলো" এবং "দু'টি হিয়া যেথা এক হয়ে যায়" N 76037 ; কুমারী গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও কুমারী আরতী মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"অতি চঞ্চল গোপাল আমার" এবং "উমা কাঁদে মা বলে।"—GE 30337.

জনপ্রিয় চিত্র "ত্রিযামা"র গান—"ধূপ চিরদিন" এবং "ঝিরি ঝিরি পিয়ালের"—GE 30338 এবং "মাটিতে চন্দ্রমল্লিকা" এবং "পাখীর কূজন শুনে"—GE 30339 [illegible] গেয়েছেন কোকিলকণ্ঠী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়।

"গোবিন্দদাস" চিত্রের গানগুলিও ইতিমধ্যে রেকর্ডে বেরিয়েছে। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছেন—"গোরথ জাগয়ি"—দুই খণ্ডে—GE 30334 এবং "বিনোদিনী রাধা"—দুই খণ্ডে—GE 30335, "সখি রে হামার দুখর" এবং "ও মোর [illegible]বদনী"—GE 30336.

রবীন্দ্র-তিরোভাব তিথি

• রবীন্দ্র-তিরোভাব তিথিতে রবীন্দ্রনাথের গান আবার কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের অগণিত গান রেকর্ডে প্রকাশিত হয়েছে, তার একটি বিস্তারিত তালিকার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। "হিজ মাষ্টার্স ভয়েস" ও "কলম্বিয়া" রেকর্ডে ধৃত রবীন্দ্র-সঙ্গীত এবং কবিগুরুর নিজ কণ্ঠের গান ও আবৃত্তির বিস্তারিত তালিকা সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। দি গ্রামোফোন কোম্পানি লিঃ, পোষ্ট বক্স ৪৮, কলিকাতা-১ ঠিকানায় পত্র দিলেই বিনামূল্যে তালিকাটি পাওয়া যায়। আমরা দেখে আনন্দিত হলাম, তালিকাটি লাইনো টাইপে পরিচ্ছন্ন ভাবে মুদ্রিত ও কবিগুরুর সুন্দর আলোকচিত্রমণ্ডিত প্রচ্ছদ ; গীতিরসিকদের পক্ষে সংগ্রহ করা অবশ্য কর্তব্য ॥

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বেতার অনুষ্ঠান

১লা শ্রাবণ—রেণুকা অধিকারী—গীটার। শ্যামল মিত্র—গীত। ২রা সুবিনয় রায়—রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ৩রা পণ্ডিত প্রতাপনারায়ণ—ঠুংরি। ৫ই রাজেশ্বরী দত্ত—রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ৬ই আলি আকবর খাঁ স্বরোদ। ৭ই কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ৯ই দেবব্রত বিশ্বাস—রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ১০ই সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—খেয়াল। কল্যাণী রায়—সেতার। ১১ই রাধারাণী—কীর্তন। ১২ই প্রতিমা চক্রবর্তী—রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ১৩ই চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সঙ্গীত ; শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়—স্বরোদ। সুপ্রীতি ঘোষ—আধুনিক। ১৪ই গীতা সেন—অতুলপ্রসাদের গান ও রবীন্দ্র-সংগীত। সন্তোষ সেনগুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান। ১৭ই সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—রবীন্দ্র সঙ্গীত, সত্যেন ঘোষাল—খেয়াল। ১৯শে শীলা সেন—রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ২০শে আলি হোসেন ও সম্প্রদায় সানাই। ২১শে রত্ন বিশ্বাস—অতুলপ্রসাদের গান ও রবীন্দ্র-সঙ্গীত। ২২শে দ্বৈত-যন্ত্র সংগীত। সুজিতনাথ—গীটার। দক্ষিণামোহন ঠাকুর—দিলরুবা। ২৪শে রাধিকামোহন মৈত্র—স্বরোদ।

আমার কথা (২০)

গোপাল দাশগুপ্ত

(আকাশবাণী, কলিকাতা)

সংগীতজীবী হিসাবে আমার কথা বলতে গেলে প্রথমেই আমার সংগীত-জীবনের সুরুর কথা বলতে হয়। কিন্তু সে-কথা আমার মনে পড়ে না, যেমন মনে পড়ে না কখন হাঁটতে শিখেছি বা কখন কথা বলতে শিখেছি। শুধু স্মরণ হয় আমাদের বাড়িতে প্রতিদিন সকালে বৈষ্ণব ভিখারির বেহালা বাজিয়ে মিষ্টি গান, বাউল বাবাজীর একতারার সংগে উদাত্ত কণ্ঠ আর অনেক শ্রোতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি। অথবা দুপুরে অনেক মহিলার মধ্যে আমার মা অর্গান বাজিয়ে গাইছেন আমি দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে শুনছি। এই



গোপাল দাশগুপ্ত

গানগুলি আমি পরে গেয়েছি কিন্তু কখন সুরু করেছি মনে নেই। শৈশবের দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখতে পাই, নগর-কীর্তনের পুরোভাগে আমি গান গেয়ে চলেছি, স্কুলের পুরস্কার বিতরণী উৎসবে গান গেয়ে আমি পুরস্কার নিয়ে যাচ্ছি, মাতুলালয়ের প্রতি সন্ধ্যার বৈঠকী গানের আসরে মাতুল মহাশয়ের (শ্রীমণীন্দ্রচন্দ্র রায়) গানের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শেষ হবার সংগে সংগে ডাক পড়ে আমার। আজ মনে হয়, আমার সংগীতানুশীলনের আক্ষরিক শিক্ষার হাতে-খড়ি বোধ হয় মাতুল মহাশয়ের কাছেই।

চট্টগ্রামের (অধুনা পাকিস্থানে) এক বিখ্যাত পরিবারে আমার জন্ম ১লা মাঘ ১৩১৬ সাল। পিতৃদেব পুলিনচন্দ্র দাশ আমার শৈশবেই পরলোক গমন করেন। পিতামহ কবি গুণাকর ৺নবীনচন্দ্র দাশ উচ্চ সরকারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বনামধন্য তিব্বতী পর্যটক ও লেখক ভাষাবিদ্ রায় বাহাদুর শরৎ চন্দ্র দাশ সি, আই, ই, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পরিবারের অন্যান্যরাও সবাই খ্যাতিমান, সম্মানিত। এই রকম পরিবারের যে ছেলে সকাল-বিকাল গান-বাজনায় দিন কাটায় তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হিতৈষীরা আশংকা প্রকাশ করছেন, কিন্তু আমার এই সম্পর্কে উপদেশ দেবার পর একটা গান কিংবা বাঁশি শোনাবার আগ্রহ প্রকাশ করতেন। আমি যেদিন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সংবাদ পাই, সেদিন জেঠামশায় একটি বেহালা উপহার দেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর আমি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হই। এই সময়ে আমি কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসি এবং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর বিশেষ স্নেহভাজন হয়ে উঠি। তিনি তাঁর লেখা অনেক জাতীয় সংগীত আমায় শেখান। কলেজ-জীবনের কথা আমার মনে পড়ছে, সে এক বিচিত্র ছবি! সভা-সমিতি, সাহিত্যালোচনা খেলাধূলো, রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক ও গুপ্ত সমিতির কাজের সংগে মিশে ছিল আমার সংগীত চর্চা। আদর্শ ছিলেন পরলোকগত আপ্তাউদ্দীন, ৺গিরিজাশংকর, জ্ঞান গোস্বামী, ৺সুরেন্দ্রলাল দাস, কৃষ্ণচন্দ্র দে ও দিলীপকুমার রায়। চট্টগ্রামের আর্যসংগীত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শ্রীসুরেন্দ্রলাল দাশ মহাশয়ের সাহচর্যের ফলে অনেক দিন থেকেই উচ্চাংগ সংগীতের জন্য আগ্রহ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। কোলকাতার গুণীজনের গান শুনে আমি স্বর্গত নগেন্দ্র দত্ত মহাশয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করি। তাঁর কাছে আমি কয়েক বছর গান শিখেছি এবং তাঁর অকৃত্রিম স্নেহে ধন্য হয়েছি। বছর চার পরে রাজনৈতিক কারণে আমাকে বাংলার বাইরে নির্বাসিত থাকতে হয়েছিল। পূর্ব থেকেই আমি ইংরেজ সরকারের সন্দেহ ভাজন ছিলাম। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর থানা, হাজত, গৃহান্তরীণ ইত্যাদি নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে কয়েক বছর কেটেছে, তখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ ও ল-কলেজের ছাত্র। প্রবাস থেকে ফিরে এসে জানতে পারলাম যে আমার জন্যে পুলিশ ও গোয়েন্দার আনাগোনায় ও জিজ্ঞাসাবাদে ৺নগেন বাবুকে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে। আমি নিজে থেকেই তাঁর কাছে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিলাম। গান শিখতে গিয়ে শিক্ষককে বিব্রত করেছি, এ-দুঃখ আমার অনেক দিন ছিল। এর পর আমি ওকালতি পাশ ক'রে চট্টগ্রাম জেলা আদালতে ওকালতি সুরু করি। সেই সময় Bombay Broadcast Companyর (অধুনালুপ্ত) আমন্ত্রণে শিল্পী ও সংগীত পরিচালকরূপে বোম্বাই যাই এবং কয়েকখানি রেকর্ড করি। সেই উপলক্ষে বোম্বাই রেডিয়োতেও সংগীত পরিবেশন করি।

আমার ওকালতি জীবনেও সংগীত থেকে আমি বিচ্ছিন্ন থাকতে পারিনি। নানাবিধ সংগীত প্রতিষ্ঠান ও সংগীত সম্মেলনের সংগে আমি জড়িত হয়ে পড়লাম এবং ঢাকা রেডিয়ো কর্তৃপক্ষ আমাকে শিল্পী নির্বাচিত করে সম্মানিত করলেন। কিন্তু কিছু দিন পর ওখান থেকে সরে এলাম, মানে সরিয়ে দেওয়া হলো। কারণ, আমি রাজনৈতিক ব্যাপারে সন্দেহ ভাজন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়ায় এ-সময় লোকের জীবন বিপর্যস্ত—বিশৃংখল।

এতেও কিন্তু আমি সংগীতকে এড়িয়ে থাকতে পারিনি। যুদ্ধ-ব্যস্ত কয়েক জন উচ্চপদস্থ ইউরোপীয় ও আমেরিকান সামরিক কর্মচারী তাঁদের অবসর কাটানোর একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা করেন। একটি সান্ধ্য বৈঠকে মধ্য যুগে ভারতীয় সাধকদের গান শুনিয়ে আমায় ব্যাখ্যা করতে হতো আর তার ওপর তাঁরা আলোচনা করতেন। তার মাঝখানেই বেজে উঠত সাইরেণ, বোমা পড়ত, কোথাও আগুন ধরে উঠত আর we meet this time next ব'লে তাঁরা ছুটে বেরিয়ে যেতেন। তাঁদেরই এক জনের আগ্রহে এবং চেষ্টায় ঢাকা রেডিয়ো থেকে আবার ডাক আসে। আর কিছু দিনের মধ্যেই ওকালতিতে জলাঞ্জলি দিয়ে ঢাকায় চলে আসি এবং সংগীতকে জীবনের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করি। এর পর ঢাকা রেডিয়োতে আমি সংগীত পরিচালকের পদে নিযুক্ত হই এবং ১৯৪৭ সনের ৭ই আগষ্ট পর্যন্ত সেখানে কাজ করি। ১৪ই আগষ্ট সেখানে কাজে ইস্তফা দিয়ে ভারতে চলে আসি এবং নতুন করে জীবন সুরু করি। বর্তমানে আমি কলকাতা বেতার কেন্দ্রের সংগীত বিভাগে অন্যতম সহকারী পরিচালকের পদে নিযুক্ত আছি। আমার বহু প্রচেষ্টা ঢাকা এবং কলকাতা কেন্দ্র থেকে নিয়মিত প্রচারিত হয়েছে।

সংগীতই আমার জীবনের প্রধান অবলম্বন, বরং বলা যায়, সংগীতই আমার প্রাণসম্পদ। আগে গান গাইতাম, কিন্তু পরে নানা কারণে গান গাওয়া ছেড়ে দিয়ে শিক্ষকতা ও পরিচালনার কাজেই নিজেকে ব্যস্ত রেখেছি। কিছুদিন খ্যাতিমান চিত্রপরিচালক শ্রীহীরেন বসুর সহকারিরূপে চিত্রপরিচালনার কাজ শিখেছি। এর আগে সংগীতপরিচালক শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসের সহকারিরূপে চিত্রজগতের সংগে কিছুটা পরিচয় আমার ঘটেছিল। আমার পরিচালনায় কিছু গান ও আমার লেখা 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাটিকাটি হিন্দুস্থান রেকর্ডে প্রকাশিত হয়, কলকাতার প্রসিদ্ধ রংগমঞ্চে আমার পরিচালনায় কয়েকটি নৃত্যনাট্য অনেক বার মঞ্চস্থ হয়েছে। তার মধ্যে আমার লেখা 'মীরা বাঈ' নৃত্যনাট্যটি বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল।

আমার সংগীত-জীবনের কয়েকটি অবিস্মরণীয় মুহূর্তের কথা এই প্রসংগে বলতে ইচ্ছা করে। অতি শৈশবে সাধু তারাচরণের সামনে গান গাইবার মাঝখানে তিনি হঠাৎ আমাকে বুকে টেনে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কেন জানি না, আমি নিজেও কেঁদেছিলাম সকলের সংগে। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু মহাপ্রভুর শিষ্য 'মতিচ্ছন্ন মহেন্দ্র' আমার গান শুনতে শুনতে সমাধিস্থ হয়েছিলেন—তখনো আমি অত্যন্ত ছোট, কিছুই বুঝতে পরিনি। আর মনে পড়ছে স্বর্গত কিরণশংকর রায়ের কথা, একদিন রাত্রে তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে গাড়ি পাঠিয়ে দেন। তিনি তখন মৃত্যুশয্যায়।

টাকা/আনা/পাই

(চিত্রনাট্য)

জ্যোতির্ময় রায়

[গত জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে নিয়মিত ভাবে "টাকা-আনা-পাই" প্রকাশিত হচ্ছে। ত্ব' সংখ্যায় "টাকা-আনা-পাই" চিত্রনাট্যাকারে প্রকাশিত হয়েছিল। মূলতঃ এটি নাটকই, কোন অনিবার্য কারণে প্রথম ত্ব' কিস্তিতে দেখা দিয়েছিল চিত্রনাট্যাকারে, বর্তমান সংখ্যা থেকে আবার নাটকের আকারেই দেখতে পাওয়া যাবে "টাকা-আনা-পাইকে" ।—স]

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

সময় ত্বপুর। বস্তিতে বিশুর ঘরের অভ্যন্তর। পেছন দিকে একটা দরজা, দরজার ত্ব'-পাশে ছোট ত্ব'টি জানলা। দরজা খুললে দাওয়া এবং আঙিনার খানিকটা অংশ দেখা যায়।

দরজা বন্ধ অবস্থায় দৃশ্যের প্রারম্ভ। ঘরের জিনিসপত্রের মধ্যে একটা তক্তাপোষ—ঘরের ঠিক মাঝে বা ধারে নয় এমনি ভাবে টেরছা অবস্থায় পড়ে আছে, এক পাশে কেরোসিন কাঠের একটা টেবিল, তার ওপরে বিছানো বহুদিনের ধূলিমলিন বিবর্ণ কয়েকখানা দৈনিক কাগজ, তাতে তেলের শিশি, সস্তা আয়না-চিরুণী আরও ত্ব'-একটা টুকিটাকি ছড়ানো রয়েছে। এদিক-ওদিক মুখ করে চেয়ার, একটা কাঠের, যার ত্ব'টো হাতলই ভাঙা, অন্যখানার উপাদান লোহার বর্তমানে জং ধরে বেঁকে বিদঘুটে তার চেহারা। এক পাশে বড় একটা তোবড়ানো ট্রাঙ্কের ওপর টিনের একটা স্যুটকেশও রয়েছে। বাইরে থেকে তালা খোলার শব্দ হয়। ধীরে দরজা খুলে যেতেই দেখা যায়, দাঁড়ানো মৃগাঙ্ক ও রচনা। তাদের পেছনে বস্তির ছেলে-মেয়ে ও স্ত্রীলোকের একটি কৌতূহলী ভীড়। মৃগাঙ্ক তাকায় রচনার দিকে, রচনার হতবুদ্ধি দৃষ্টি তখন ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে—এক লহমা দেখে নিয়ে মৃগাঙ্কের দিকে চোখ ফেরাতেই দেখতে পায়, তার বেদনাক্লিষ্ট সসঙ্কোচ দৃষ্টি।

রচনা। [নিজেকে সামলে নিয়ে, সহৃদয় স্বরে] এই ঘরে!

মৃগাঙ্ক। [মুখ ফিরিয়ে, স্বীকার করতে না পারলে খুসী হতো এমনি ভাবে] এই ঘরে।

রচনা। [মৃগাঙ্কের ফেরানো মুখের দিকে তাকিয়ে] চলো, ভেতরে চলো। মৃগাঙ্ক কিছু না বলে, রচনার দিকে অপরাধীর মতো তাকিয়ে ভেতরে ঢোকে—রচনা তার অনুসরণ করে।

মৃগাঙ্ক। বসো রচনা! [তক্তাপোষটা দেখিয়ে দেয়। অপরিচ্ছন্নতার জন্য দ্বিধা করে রচনা] এটায় আমি শুই।

রচনা। [ম্লান হেসে বসে] আর যাদের কথা বলছিলে?

মৃগাঙ্ক। ওরা এখানটায় মাত্বর বিছিয়ে।

রচনা। [দরজার দিকে তাকায়, সেখানে কয়েক জনকে দাঁড়ানো দেখে] দরজাটা—

মৃগাঙ্ক বন্ধ করে দেয় দরজাটা। ঘরের মধ্যে একবার পায়চারী করে কি যেন স্থির করে বলে—

মৃগাঙ্ক। তুমি বসো, আমি একটু আসছি।

রচনা। [পরিবেশ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মনোভাবটা অকস্মাৎ যেন ভয়ের আকারে ঝাঁকি দিয়ে উঠে। উঠে দাঁড়িয়ে। ন,—না, তুমি এখন কোথাও যেও না।

[রচনার উত্তেজনায় মৃগাঙ্ক তাকায়। রচনা সামলে নিয়ে সহজ হবার ভঙ্গিতে]

না, কোথায় যাচ্ছো?

মৃগাঙ্ক। পাশেই বিণুদি' বলে এক মহিলা থাকেন,—তাকে একবার ডাকি। ত্বপুরের কিছু একটা ব্যবস্থা তো—

রচনা হেসে মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়। মৃগাঙ্ক বেরোবে বলে দরজা খুলতেই দেখা যায়, যে ছেলেটা দরজায় চোখ লাগিয়েছিল, সে ছুটে পালায়। বাইরে কয়েক জন লোক কৌতূহলী হয়ে দাঁড়িয়ে। মৃগাঙ্ক বাইরে থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। মিলিয়ে যায় রচনার মুখের হাসি। চোখ তুলে সমস্ত ঘরটা দেখে নেয়। হতাশার ছায়া পড়ে মুখে। একটু এদিক-ওদিক পায়চারী— মাথাটা হাতের ওপর রেখে আবার এসে বসে তক্তাপোষে।

'খুঁট' করে দরজাটা ফাঁক হয়ে যায়। রচনা দেখে কতকগুলো ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। রচনা এগিয়ে যেতে ওরা খিল-খিল করে হেসে পালায়। রচনা আবার দরজাটা বন্ধ করে আসে।

একটু পরে বাইরে বিণুদি'র গলা শোনা যায়—

বিণুদি'র কণ্ঠ: এইখানে আইসা ভীড় করছেন ক্যান,—গেলি এইখান থেইকা—

ছুটোছুটি করে ছেলে-মেয়রা ছুটে যায়, বিণুদি' আর মৃগাঙ্ক এসে ঢোকে।

মৃগাঙ্ক। [পরিচয় করানোর ভঙ্গীতে] বিণুদি'—

বিণুদি। [বিস্ময়-বিমুগ্ধ] এই বুঝি বউ, আহা বড় সুন্দর তো মুখখান—রাজরাণী হওনের কপাল—না না পোড়া কপাল আমার—আমার—তোমাগো মঙ্গল হউক, সুখী হও তোমরা। স্বামীর লাইগ্যা যে পথে নামছে তার বালো একদিন অইবই। আর তাই বা কই ক্যামনে—বগবান কি আছে—আমিও তো কম করি নাই কিন্তু পাইলাম কি [দীর্ঘশ্বাস ফেলে] রোগে-শোকে—[চোখে

জল আসে, কথা ঘুরিয়ে] যাউক সে সব কথা—আমার আবার বড় প্যাচাল পাড়নের অভ্যাস। যাই দেখি তোমাগো খাওন দাওনের ব্যবস্থাটা করি গিয়া।

বিনুদি' বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে শোনা যায় তার কণ্ঠস্বর—"মধু—অ মধু—আরে পোলাটা কই থাকে—কই যায়—সারাদিন—"

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বিনুদি' চলে যাবার পর মৃগাঙ্ক-রচনা দু'জনে একটু চুপ করে থাকে।

মৃগাঙ্ক। চমৎকার! কি ভাগ্য! বিয়ের পর প্রথম এনে তোমাকে তুললাম, কোথায়—না এই ঘরে।

রচনা। [সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে] কয়েকটা দিন কোনো রকম কাটুক তো—তার পর তোমার একটা কাজের সুবিধা হলে কোনো একটা বাড়ী দেখে উঠে যাওয়া যাবে। আর চেষ্টা করলে আমিও একটা কাজকর্ম কিছু পেতে পারি তো।

মৃগাঙ্ক। পারো বই কি, তবে তাও হাত বাড়ালেই জুটবে এমন নয়। আমাদের জীবনে জীবিকার চেয়ে অনিশ্চিত আর কি আছে—আর তাছাড়া ট্রামে-বাসে ঘুরে চাকরীর উমেদারী করাটা তোমার পক্ষে কতখানি অসম্ভব সে তো আমি জানি।

বলে মৃগাঙ্ক বেশ একটু অস্থির ভাবেই ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে থাকে।

রচনা। সে যাক—যা হবার হবে, তা নিয়ে তুমি এতো অস্থির হয়ে উঠো না।

মৃগাঙ্ক। অস্থির হয়ে উঠবো না? তার চেয়ে জিজ্ঞেস করো রচনা, পাগল হয়ে উঠছি না কেন? [আরও বেশী বিচলিত হয়ে] আজ কি না তোমাকে এনে এমনি একটা বস্তির ঘরে—

[কথাটা শেষ করতে পারে না। মুখে-চোখে বেদনা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে।]

রচনা। [তাকে শান্ত করতে মাথা নেড়ে অস্বীকারের ভঙ্গীতে কথাগুলোকে থামিয়ে দিতে চায়—পরমুহূর্তেই একটা উপায়ের আভাষ চোখে-মুখে ফুটে ওঠে]। কিন্তু—কিন্তু, তার চেয়ে একথা তুমি একবারও ভাবছো না কেন—[খুব কাছে গিয়ে] বিয়ের পর এই প্রথম একটা আশ্রয়ে আমরা দু'জন এত কাছাকাছি আছি।

মৃগাঙ্ক। [মুখভাব ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে আসে] সত্যি রচনা, একথা তুমি ভাবতে পারছো?

রচনা। [চাপা কণ্ঠে] পারছি—

মৃগাঙ্ক। [রচনার মুখের দিকে বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে] ভালোবাসা, প্রেম—কতো সুন্দর, কতো মহৎ। [রচনার দু' কাঁধ চেপে ধরে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দেয় অনির্দিষ্ট ভাবে। আত্মসমাহিত অবস্থায়] আত্মীয়তা না আত্মত্যাগ।

আলো নিবে যায়। সময় পরিবর্তন। সন্ধ্যা।

রচনা মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। অন্ধকার ঘর। দরজা ঠেলে লণ্ঠন হাতে ঢোকে বিনুদি'।

বিনুদি'। এই কি! ভর সন্ধ্যায় মাথায় হাত দিয়া বইয়া রইছো ক্যান। [লণ্ঠনটা রেখে] মুখ-হাত ধোওন নাই, চুল বান্ধন নাই। আর হইবই বা না ক্যান, বুঝি তো সবই। তা আমার ভাই কই?

রচনা। হাত-মুখ ধুতেই গেছেন।

বিনুদি'। ভালো। তুমিও ওঠতো। অমন মন খারাপ কইরা থাইকো না। আমার আর কি সাধ্যি কও। তবো কমু, তোমার যাতে অসুবিধা না হয়, তা আমি দেখুম।

রচনা। [দাঁড়িয়ে ম্লান হেসে] আসার পর থেকে আপনি তো কতই করছেন।

বিনুদি'। কত কি, এরে আবার করণ কয় নাকি? আমাগো মধ্যে একজন যদি আর একজনেরে না দেখে তো আমরা বাচুম ক্যামনে? এতো তোমাগো বড়লোকের কাণ্ডকারখানা না। এই ধরো না, তোমাগো বাড়ীগুলি মস্তবড় জমীনের মধ্যখানে ঠায় খাড়া হইয়া থাকে। কেউ কারো ধারও ধারে না; মানুষগুলোও তেমন। আর আমাগো দেখো, একখান ঘর যেন আর একখান ঘরের ওপর ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তেমন লোকগুলিরও গলাগলি কইর‍্যাই বাঁচতে হয়।

[রচনা একটু হাসে]

কেমন কথাখান ঠিক কইলাম না?

[হেসে ঘাড় হেলিয়ে সমর্থন জানায় রচনা]

আইচ্ছা, আমি আসি এখন। মানুষটা আবার একটুক্ষণ না দেখলে খেইপা যায়। [যাবার জন্য পা বাড়িয়ে] ভাইবো না। আসুক না বিশু, দেইখহনে, তোমারে দেইখ্যা কি করবো দিশা পাইবো না। [গলার স্বর নরম করে] পোলাটা বড় ভালো। এই দ্যাখো, আবার খারইয়া কথা কইতাছি, আমি যাই।

বিনুদি' বেরিয়ে যায়। রচনা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে সরে আসে, ঠিক এমনি সময় দরজাটা খুলে যায়। দরজায় দাঁড়ানো বিশু।

বিশু। দাদা—[ব্যস্ত হয়ে ঢুকতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। হতবাক অবস্থায় মুহূর্ত দাঁড়িয়ে] দাদা বুঝি?

রচনা। [বিব্রত হয়ে] উনি একটু বাইরে গেছেন, হাত-মুখ ধুতে।

বিশুর পাশ কাটিয়ে মৃগাঙ্ক এসে ঢোকে ঘরে।

মৃগাঙ্ক। [দ্বিধার সঙ্গে] কোনো উপায় ছিল না বিশু! তোর বৌদিকে এখানেই তুলতে হলো। অবশ্যি তোদের খুবই অসুবিধেয় ফেললাম—তবে আমি যত শীগগির পারি—

বিশু নীরব ভ্রূকুটির সঙ্গে মৃগাঙ্ককে হাত দিয়ে এক পাশে ঠেলে দিয়ে প্রথমেই ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যায়, তার আর ভোলার গুটানো বিছানাটার দিকে। সেটা তুলে নিয়ে ধপাস করে ফেলে দাওয়ায়!

বিশু। [হাঁক দেয়] ভোলা—ভোলা—[আবার এসে ঢোকে ঘরে] বৌদি একটু সরতে হবে [রচনা সরে দাঁড়ায়। চৌকিটাকে এক পাশে ঠেলে সোজা করে পাতে, এমন সময় দরজায় এসে দাঁড়ায় ভোলা] ভোলা, তোর ছিটকাপড়ের গাঁটরী থেকে বেশ ভারী দেখে একটা টুকরো এনে তক্তাপোষটায় বিছিয়ে দে—[এবার এগিয়ে যায় টেবিলটার কাছে]

ভোলা। [অবাক দৃষ্টিতে রচনাকে দেখে নিয়ে] দাদা, এই বুঝি বৌদি?

বিশু। [ঘুরে দাঁড়িয়ে] না তো—দাদার পিসশাশুড়ী। আহম্মক কোথাকার, এটাও জিজ্ঞেস করে জানতে হয়—যা যা—যা বললাম তাই কর।

[রচনা ও মৃগাঙ্ক এ অবস্থায়ও হাসি চাপতে পারে না। ভোলা সরে যায়।]

বিশু। [রচনাকে লক্ষ্য করে] আর এই ঘর কি-ই বা সাফ করবো বৌদি, তবু যেটুকু করা যায়।

মৃগাঙ্ক। এ নিয়ে তুই ব্যস্ত হসনে বিশু—আমি ভাবছি তোরা থাকবি কোথায়?

বিশু। [ভ্রূ কুঁচকে] কেন, দেখলে না বিছানাটা কোথায় রাখলাম? দাওয়ায় থাকা যায় না বুঝি?

রচনা ও মৃগাঙ্ক উভয়ের মধ্যে একবার দৃষ্টি-বিনিময় হয়। বিশু মুঠোয় ধরা টেবিলের কাগজগুলো নিয়ে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। রচনা ও মৃগাঙ্ক দু'জনেই বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

বাতি নিবে যায়। সময় পরিবর্তন। পরের দিন দুপুর।

মৃগাঙ্ক সার্ট গায়ে চড়াচ্ছে।

রচনা। [অনুনয়ের স্বরে] আজ না বেরোলেই কি নয়? নতুন জায়গা একা থাকতে—

মৃগাঙ্ক। [জামাটা পরে নিয়ে] কিন্তু একবার বেরোনো যে বড় দরকার রচনা! বিশু ভোলা রান্না থেকে সুরু করে সবই করছে, আমাদের নড়ে বসতে পর্য্যন্ত দিচ্ছে না, এর পর খরচটাও যদি গরীব বেচারাদের ঘাড়ে চাপাতে হয় তো ওদের মুখ দেখাবো কি করে!

রচনা। তা ঠিক।

মৃগাঙ্ক। যে করেই হোক আজ টাকা কিছু জোগাড় করতেই হবে। তুমি এক-কাপড়ে চলে এসেছো, তোমার জন্যও কিছু কেনাকাটি দরকার। তাছাড়া ভালো-মন্দ চাকরী না জুটুক, ঝটপট গোটাদুই টিউশনী জোগাড়ের চেষ্টাও তো দেখতে হবে।

রচনা। [অপ্রস্তুত হয়ে] না না আমি অতো ভেবে বলিনি—তুমি যাও [ম্লান মৃদু হেসে] একটু তাড়াতাড়ি ফিরতে চেষ্টা করো কিন্তু।

মৃগাঙ্ক। এ-ও কি তোমাকে বলে দিতে হবে? [স্নিগ্ধ চোখে একবার রচনার দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে যায় সে]

মৃগাঙ্ক বেরিয়ে গেলে রচনা দরজা ধরে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এসে বসে পড়ে হাতল-ভাঙা চেয়ারটিতে। এবার তার চোখ ছাপিয়ে জল দেখা দেয়। টেবিলের ওপর দু'হাতে সে মাথা রেখে কেঁদে ফেলে, এমন সময় দরজাটা খুলে যায়, সেখান দিয়ে গলা বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছে মধু। রচনা দ্রুত চোখ মুছে নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করে। এগিয়ে আসে মধু।

মধু। [সামনে দাঁড়িয়ে অবাক দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে] তুমি কানতেছো ক্যান?

রচনা। [মাথা ঝেঁকে, আবার চোখ মুছে] না তো!

মধু। হ্যাঁ তো! ঐ যে চোখে জল?

রচনা। বিণুদি' কোথায় মধু?

মধু। মা—? মা ঘরে ঠোঙা বানায়—কাগজের ঠোঙা।

[হঠাৎ রচনার পায়ের দিকে নজর পড়ায় মধু মাটিতে বসে পড়ে। বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে রচনার পায়ের মূল্যবান খড়ম-চটির দিকে তাকিয়ে থাকে।

মধু। ওইটা কি?

রচনা। [হেসে] চটি।

মধু। খড়ম না? কি সুন্দর—আমারে একটা কিনা দিবা?

রচনা। কেন, তুমি পরবে?

মধু। না বাক্সয় তুইল্যা রাখুম

[রচনার মুখে হাসি দেখা দেয়। হঠাৎ সে হাসি আবার মিলিয়ে যায়। রচনার কানে আসে বাইরের কথাবার্তা। দু'-একটি স্ত্রীলোককে দেখা যায় উঠোনে দাঁড়িয়ে খোলা দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে।]

একটি স্ত্রী-কণ্ঠ। কে জানে কোথা থেকে ভাগিয়ে এনেছে!

অপর কণ্ঠ। না, শুনলাম তো বড়লোকের মেয়ে, বিয়ে করে এনেছে।

অন্য কণ্ঠ। হ্যাঁ বিয়ে না আর কিছু! সাজ-পোষাক দেখেই চমকে গেলি? ভদ্দরলোক কিনা, তাই বা কে জানে!

রচনা। [মধুর দিকে ফিরে] মধু, তুই যা।

মধু রচনার মুখের দিকে তাকিয়ে আর দাঁড়াতে ভরসা পায় না, বেরিয়ে যায়। কথা আবার কানে আসে।

সেই কণ্ঠস্বর। ঐ যে সে বার দেখলি না, এক ছুকরীকে ভাগিয়ে আনলো—তা নিয়ে কত থানা-পুলিশ—

রচনা উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করে দেয়। সেই কণ্ঠস্বর: ও বাবা, রেগে গেছে রে, পালিয়ে আয়—বিণুদি'র কানে লাগালে আর রক্ষে থাকবে না।

[বাইরে থেকে আর কোনো শব্দ আসে না—রচনা উত্তেজিত অবস্থায় ঘরে পায়চারী করতে থাকে]

বাতি নিবে যায়। সময় পরিবর্তন। রাত্রি। টেবিলের ওপর হ্যারিকেনটা জ্বলছে। রচনা হাতের ওপর মাথা রেখে শুয়ে আছে তক্তাপোষে—আলুথালু চুলগুলো এদিক-ওদিক ছড়ানো। দরজা খুলে ঢোকে মৃগাঙ্ক। খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায় বিশু আর ভোলা দাওয়ায় বসা। দরজা খোলার শব্দ পেয়েই রচনা উঠে বসে, মৃগাঙ্ক দরজাটা আধ-ভেজানো অবস্থায় রেখে এগিয়ে যায় টেবিলের সামনে। হাতের প্যাকেটটা রেখে জামা ছাড়তে ছাড়তে কোনো দিকে লক্ষ্য না করে আপন মনে বলে চলে—

মৃগাঙ্ক। জানো রচনা, জীবনে এতোখানি আশ্চর্য কখনো হয়নি—উমেদারী অনেক করেছি, কিন্তু আজকের মতো নয়। নানা জায়গায় নিরাশ হয়ে এক ব্যবসায়ী বন্ধুর কাছে গেলাম, ধার চাইলাম। দিলে না। শেষ অবধি এ পর্যন্ত বললাম—আমার বিদ্যে বুদ্ধি, এমন কি গোটা মানুষটাকে ছ'মাস—এক বছর—যতদিনের জন্য খুসী বাঁধা রেখে, কিনে নিয়ে—যেমন করে হোক আজ কিছু টাকা তুমি আমাকে দাও—তাও দিলে না। একটা গোটা মানুষ বিক্রী হয় না, কিন্তু কি অদ্ভুত কাণ্ড, রচনা, বিয়ের আংটিটা খুলে দেওয়া মাত্র নগদ পঁচিশটা টাকা পেয়ে গেলাম। [বলে বিশেষ করে রচনার দিকে তাকিয়ে চমকে ওঠে।] ও কি! তোমার কি শরীর খারাপ করছে?

রচনা। না।

মৃগাঙ্ক। স্নান করোনি বুঝি?

রচনা। কোথায় করবো?

মৃগাঙ্ক। ও হ্যাঁ, তাইতো—আচ্ছা দেখি, কাল এর ব্যবস্থা একটা কিছু করতে হবে।

রচনা। [অত্যন্ত বিরক্তির সুরে] থাক আর ব্যবস্থা করার দরকার নেই—ভাঙ্গা ঘরে আমি থাকতে পারি—কিন্তু এখানে আমি থাকতে পারবো না। একা-একা এত ভয় করে—তা ছাড়া তুমি জানো না, এখানকার লোকেরা কি সব কুৎসিত কথা বলে—এই সব ছোট-লোকের মধ্যে থাকা—

মৃগাঙ্ক। [ব্যস্ত হয়ে নীরবে হাত নেড়ে বাধা দেয়। চাপা গলায় বলে] ছি ছি রচনা! বিশু বারান্দায়—ও শুনলে—

মহা একটা অস্বস্তির সঙ্গে চেয়ার টেনে সে বসে পড়ে। দু' জনেই কিছুক্ষণের জন্যে চুপচাপ। এমন সময় দাওয়া থেকে বিশুর কণ্ঠ শোনা যায়—

বিশু। [দরজায় দাঁড়িয়ে] কই দাদা—আর যে সাড়াশব্দই নেই? আসবো বৌদি?

মৃগাঙ্ক। আয় বিশু!

বিশু। [ঢুকতে ঢুকতে] আয় রে ভোলা। বৌদির সঙ্গে একটু গল্পসল্প করা যাক।

[দু'জনে ভেতরে ঢোকে]

ঘরে ঢুকে বিশু মোড়ায় আর ভোলা উটকো হয়ে বসে মাটিতে। ভোলার হাত থেকে দু'খানা শাড়ী নিয়ে রচনার দিকে বাড়িয়ে দেয় বিশু।

বিশু। এই যে বৌদি—ভোলা আপনার জন্যে দু'খানা শাড়ী এনেছে—

ভোলা। যাঃ, আমি আনলাম কোথায়? তুই তো বললি।

বিশু। আমি না বললে, তুই আনতিস না?

ভোলা। উঁহুঁ, যদি না নেয়?

মৃগাঙ্ক হাসে। রচনার বিষাদক্লিষ্ট মুখেও ভোলার কথায় হাসি আসে।

মৃগাঙ্ক। এখন তো প্রাণের দায়েই নিতে হবে—কোনো দরকার না থাকলেও, এ দেওয়া মানুষ ঠেলতে পারে না।

রচনা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ে।

ভোলা। [নিজের হাতের পুটলীটা বাড়িয়ে ধরে] এটার মধ্যে তোয়ালে চিরুণী আরও সব টুকিটাকি কিছু জিনিস আছে—রেখে দিন বৌদি! আমি বৌদি বুঝি কম—কি-ই বা বলবো—লোকে গাল দিয়ে বলে, যা বস্তিতে গিয়ে থাকগে, আপনার মতো মানুষেব পক্ষে এ যে কি শাস্তি বৌদি—

বিশু। তবে একটা কথা বৌদি, এখানে ভয়ের কিন্তু কিছু নেই। অবশ্যি এখানকার মানুষগুলোর বাইরেটা দেখে বাপ-দাদার পরিচয় আর চেনা যায় না। ভেতরটা কিন্তু নেহাৎ খুব খারাপ না। কেউ ট্রাম-কণ্ডাক্টর, কেউ মোটর-মেকানিক আবার কেরাণীও আছে—

সবাই ভদ্রলোক—এই আমারই মত আর কি! যেমন পিসেমশাই ছিলেন ডেপটি ম্যাজিষ্ট্রেট, কাকা ডাক্তার, বাবা কাজ করতেন কোর্টে আর আমি ঠেলা চালাই—হকার। ভদ্রলোক ছোটোলোক দুই-ই বলা চলে।

রচনা মৃগাঙ্কের দিকে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে মাথা নীচু করে, মৃগাঙ্কও অস্বস্তিতে নড়ে চড়ে স্থির হয়ে বসে। এমন সময় আকাশে মেঘের গর্জ্জন শোনা যায়, বিদ্যুৎ চমকায়।

বিশু। এই রে সেরেছে, বৃষ্টি নামবে দেখছি। সন্ধ্যে থেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে এই ভয়ই করছিলাম।

রচনা। [মৃদু উৎসাহের সঙ্গে] কেন বিশু, বৃষ্টি নাবলে তো আরও ভালো—যা গরম, তাছাড়া টিনের চালে বৃষ্টির আওয়াজ শুনতে আমার ভারী ভালো লাগে।

বিশু। বাজনাটা আমাদের চালও খারাপ বাজায় না—কিন্তু ঐ যে গরমের কথাটা বললেন না বৌদি, সেখানেই ভাবনা। বৃষ্টি আবার আমাদের ঘরেই ঠাণ্ডা করার জন্যে ক্ষেপে ওঠে কি না, চালও তাকে সামাল দিতে পারে না—নাবলেই দেখবেন 'প্রিং-প্রাং' 'টুপ-টাপ' এখান-সেখান দিয়ে ঝরছেই, বাটি-বালতি বসিয়েও কূল পাবেন না।

[আবার বিদ্যুৎ চমকানি ও মেঘের গর্জ্জন। বৃষ্টি সুরু হয়। অস্বস্তি নিয়ে একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে বিশু আবার বলে]

নাবে নাবুক বৃষ্টি, কুছ পরোয়া নেই—বৌদি আজ্ঞা করেন তো ছেড়ে গলায় একটা গান ধরি—সময়টা তো কাটানো যাবে একরকম করে।

রচনা। [সোৎসাহে] নিশ্চয়ই ওতো ভারী মজা হবে, এ আবার তুমি জিজ্ঞেস করছো?

ভোলা। [আবদারের সুরে] ও আবার বিড়ি না খেয়ে গাইতে পারে না বৌদি, একটা ধরাই?

রচনা। তা ধরাও না—

বিশু। ধরিয়ে দিন কিন্তু—

বলে চোখ বুজে গান ধরে। ভোলা বিড়ি ধরিয়ে, গোটা দুই টান দিয়ে গানের মাঝেই তার হাতে তুলে দেয়।

॥ বিশুর গান ॥

হায় হায় হায় হায়
আমার ভাঙা চালের ঘর
তুই রোদে আপন ঝড়ে কাঁপন
বৃষ্টিতে হ'স পর
বাদল মাথায় আমার ভাঙা চালের ঘর।

তোর হাত ছড়ানো আড়ালে মোর
গা ছড়ানো বাসা
দুঃখ আছে অভাব আছে
তবু জাগাস আশা
যেন অট্টালিকার পা ঘেঁষে তুই
অট্টহাসির ঝড়

মেহনতির বন্ধ রুজি
তোরই কোলে মাথা গুঁজি
মোর নেবা উনুন পেটের আগুন
জ্বলে নিরন্তর।

তোর শতেক চোখের জল ঝরে হায়
যায় ভেসে মোর ঘুম
গুটি শুটি এ-কোণ সে-কোণ
বসেছি নিঝুম
জানি এই নিঝুম বুকেই ঝিমিয়ে আছে
পাগলা দামোদর।

গান শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় রচনার মাথা বরাবর ঝরঝর করে খানিকটা জল ঝরে পড়ে চাল থেকে—প্রকৃতির এই কৌতুকে রচনাই প্রথম হেসে ওঠে, আর সবাই প্রাণ-খোলা হাসি নিয়ে যোগ দেয় তার সঙ্গে। [ক্রমশঃ।

বৃটিশ কর ব্যবস্থার আদিযুগে

বৃটেনে আজকের দিনে যে ধরণের আয়কর ব্যবস্থা চল্‌তি, এর প্রথম প্রবর্ত্তন হয় কিন্তু উইলিয়াম পিটের আমলে ১৮০৩ সালে। অবশ্য ওয়াটারলু যুদ্ধের পর দীর্ঘ ২৬ বৎসর এই ব্যবস্থা সে দেশে কার্য্যতঃ চালু ছিল না। তার পর জনগণের ইচ্ছানুসারেই ইহা পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। তখনকার দিনে চালু অপরাপর কর ব্যবস্থাগুলো একটু অদ্ভুত ধরণের ছিল বলেই তাহা উক্ত আয়কর ব্যবস্থাটি পছন্দ করে নেন।

সেকালের ইংলণ্ডে প্রচলিত কয়েকটি অদ্ভুত কর ব্যবস্থার এক্ষণে উল্লেখ করা যায়। ১৬৯৫ সালে তৃতীয় উইলিয়মের আমলে অবিবাহিতদের উপর কর ধার্য্য ছিল। এর পর ১৬৯৬ সালে আর একটি নতুন ধরণের কর চালু করা হয়—যার নাম ছিল গবাক্ষ বা বাতায়ন-কর। এ করভার থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে সে যুগে অনেকেই ইট দিয়ে বাড়ীর জানালা সব বন্ধ করে দেন, এরূপ জানতে পারা যায়। ১৭৮৪ সালে উইলিয়ম পিটের শাসনকালে আবার একটি নয়া কর বসান হয় এবং সেটি ঘোড়ার উপর। ঘড়ির উপর একটি কর ধার্য্য হয়েছিল ১৭৯৭ সালে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে ব্যর্থ প্রমাণিত হলে এক বৎসর পরই এইটি বাতিল হয়ে যায়। ইংলণ্ডে বিভিন্ন খাদ্য-খাবার ও মাদক দ্রব্যের উপর কর বা ট্যাক্স ধার্য্য হয়।

আয়কর প্রসঙ্গে উইলিয়াম গ্লাডষ্টোনের একটি কথা মনে পড়ে যায়। ১৮৭৪ সালে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্ব্বাচন চলছে। গ্লাডষ্টোন তাঁর নির্ব্বাচনী ভাষণে ঘোষণা করলেন, ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত হলে তিনি চিরকালের জন্য এ ব্যবস্থাটির বিলোপসাধন করবেন। কিন্তু সে বার তিনি জয়লাভ করতে পারলেন না। ফলতঃ আয়কর ব্যবস্থাটিও চালু থেকে গেল। দশ বৎসর পর শাসন ক্ষমতার অধিকারী হলেন অবশ্যি তিনি কিন্তু তখন নির্ব্বাচকমণ্ডলীকে তিনি বললেন, তাঁরা নিজেরাই তাঁদের সুযোগ নষ্ট করেছেন একবার, আর সত্যি কখনই তা ফিরে আসবে কি না কে জানে! সে সুযোগ কার্য্যতঃ আর ফিরে আসে নি ইংল্যাণ্ডে অর্থাৎ সে দেশে আয়কর বা ইনকাম-ট্যাক্স সেই থেকে আজও চল্‌তি।



বাংলা সাহিত্যে মহামারীর লক্ষণ

বিচক্ষণ সমালোচকরা যখন দলাদলির বিকৃত রূপ দেখে ভয়ে সাহিত্যক্ষেত্র থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছেন, সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন যখন প্রায় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেছে, তখন সাহিত্যের বাজার যে 'মগের মুল্লুক' হয়ে উঠবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বাংলা দেশে সাহিত্যক্ষেত্রে চিরকালই লোকসংখ্যা বেশি ছিল, কিন্তু অতীতে যাঁরা এক্ষেত্রে আসতেন তাঁরা সাহিত্য-সাধনার ঐকান্তিক নিষ্ঠা নিয়েই আসতেন, ক্ষমতা বা প্রতিভা তাঁদের যাই থাকুক না কেন। সম্প্রতি সাহিত্যক্ষেত্র এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী ও জুয়াড়ীদের 'দু' দিনের সরাইখানা হয়ে উঠেছে। এ রকমটি অতীতে কখনও হয়নি এবং এ-ও ঠিক যে, অদূর ভবিষ্যতে সাহিত্যের এই ফাট্‌কা-বাজারী অবস্থা থাকবে না। পাঠকরা অল্পদিনের মধ্যেই সকলের "স্বরূপ" বুঝতে পারবেন এবং নিজেরাই ভেজাল ও জুয়াচুরি ধরতে পারবেন। ইত্যবসরে যাঁরা দু' দিনের ব্যবসায়ে নেমেছেন, তাঁদের কোন ভয় নেই।

সাহিত্য করে সম্প্রতি কিছু অর্থ রোজগার করা যায়, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অনেকে তাঁদের দীর্ঘ কালের পেশা ও নেশা পরিত্যাগ করে, লিখতে আরম্ভ করেছেন। পূর্বের পেশা ও নেশার কথা লিখেই তাঁরা সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। "যখন ক্যাবলা ছিলাম," "যখন পাগলা ছিলাম"—এই ধরণের বিচিত্র সব স্মৃতিকথা! এই গেল একশ্রেণীর কথা। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁরা যে বিষয়বস্তু যখন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে নানাকারণে, সেই বিষয় নিয়ে, "আদার ব্যাপারী" হলেও, রাতারাতি বই লিখে দু'পয়সা রোজগারের চেষ্টা করছেন। অর্থাৎ সাহিত্যটা সংক্রামক ব্যাধির মতন মহামারী হয়ে উঠছে। সাম্প্রতিক কালের জনপ্রিয় বিষয়বস্তুর মধ্যে "প্রাচীন কলকাতা শহর" অন্যতম। দু-একজন সাহিত্যিকের একনিষ্ঠ অনুশীলনের ফলে "কলকাতা শহরের" ইতিহাস যখন বহু পাঠকের প্রিয় বিষয় হয়ে উঠল, তখন হুড়্ হুড়্ ক'রে সকলেই প্রাচীন কলকাতা নিয়ে নানারকমের বই লিখতে লাগলেন। কোন বিষয়ের প্রতি অনুরাগ, বা সেই বিষয়ে অনুশীলনের অধিকার কারও একচেটিয়া নয়, একথা একশ' বার ঠিক। যে কেউ তা নিয়ে লিখতে পারেন, অনুশীলন করতে পারেন। কিন্তু তার জন্য নিষ্ঠা থাকা ও অধিকার অর্জন করাও প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা একাজ সম্প্রতি করছেন, তাঁরা 'দুপয়সা' ক'রে নেবার জন্যই যে ফাঁকতালে "মহৎ" কাজ করবার চেষ্টা করছেন, তা তাঁদের কাজের নমুনা দেখলেই বোঝা যায়।

এই দুই শ্রেণী ছাড়াও, তৃতীয় শ্রেণীর আর একদল লোক আছেন, যাঁরা সোজাসুজি চুরি-জুয়াচুরি ক'রে সাহিত্য-ব্যবসা করতে দ্বিধা করছেন না। এমন কি, দু-একজন, যাঁরা এতদিন পরিচিতদের বাড়ী বাড়ী ঘুরে কলমটা বইটা চুরি করে চালাচ্ছিলেন, তাঁরা ওপথে বিপদ বেশি দেখে, সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন। যখন যে 'মওকা' আসছে, সেই মওকায় তাঁরা অন্যের লেখা থেকে চুরি-চামারি ক'রে, নির্লজ্জের মতন যে কোন বিষয়ে বই লিখে ফেলছেন। তাঁরা জানেন, এ-চুরি নিয়ে আদালতে নালিশ হয় না। কারণ, লেখার ভাষা একটু-আধটু বদলে দিলে, অন্যের লেখা আগাগোড়া চুরি করে ব্যবহার করা যায়। যেমন, বুদ্ধজয়ন্তী গেল, তাঁরা সেই সময় হয়ত রাতারাতি বুদ্ধদেব সম্বন্ধে বই লিখে ফেললেন। 'স্বামী বিবেকানন্দ', কি 'রামকৃষ্ণ' সম্বন্ধে বাজারে চাহিদা বাড়ল, তাঁরা জীবন-চরিত প্রকাশ করলেন। "বিদ্যাসাগর" যখন আলোচ্য হয়ে উঠলেন, তখন বিদ্যাসাগরের জীবনচরিতও লেখা হয়ে গেল। "অ্যাটমবোমা" থেকে "হরিসঙ্কীর্তন", "উত্তমকুমার" থেকে "বিদ্যাসাগর", কোন বিষয় নিয়ে লেখাতেই তাঁদের আপত্তি নেই, ক্ষমতারও ঘাটতি হয় না। বাইরে হাত সাফাই ক'রে যাঁরা অভিযুক্তও হয়েছেন, তাঁদের মধ্যেও দু'-একজন এক্সপার্ট সম্প্রতি কলম সাফাইয়ের ও লেখা সাফাইয়ের ব্যবসায়ে নেমেছেন। কারণ, এ ক্ষেত্রে আদালতের ভয় নেই। আর বাইরের পাঠকরা এত কিছু বিচার করেন না বা জানেন না, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে 'চোরাই মাল' ধরতে পারা খুবই কঠিন! সুতরাং বই বেচে তাঁরা পয়সাও পান। এক শ্রেণীর প্রকাশক সব জেনে-শুনেও এঁদের সাহায্য করেন, ঐ পয়সার লোভে।

এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের অনেক আশাপ্রদ লক্ষণের মধ্যেও এই চেহারা নানা দিক থেকে সম্প্রতি অত্যন্ত কদাকার হয়ে উঠছে। নির্দোষ পাঠকদের পকেট লুণ্ঠন করা ছাড়া, এ সাহিত্যের আর অন্য কোন লক্ষ্য নেই। নিষ্ঠা বা সাধনার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তার উপর সাহিত্যক্ষেত্রে যাঁরা খানিকটা 'পাহারা-দারের কাজ করেন, সেই বিচক্ষণ সমালোচকরাও আজ নানা কারণে বিদায় নিয়েছেন। সুতরাং যত দিন না পাঠকগোষ্ঠী এ-সম্বন্ধে সচেতন হবেন, সাহিত্যের ভাল-মন্দ, জাল-জুয়াচুরি নিজেরা বিচার করতে পারবেন, তত দিন সাহিত্যের এই মারাত্মক উপসর্গের উপশম হবে না।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

বাংলা দেশের সকলেই জানেন, "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ" প্রাচীন সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান এবং প্রত্যেক বাঙ্গালীর গৌরবের বস্তু। বাংলা দেশের মনীষী ও সাহিত্যিকরা এই প্রতিষ্ঠানটিকে প্রাণ দিয়ে গ'ড়ে গেছেন বললেও ভুল হয় না। পরবর্তী কালে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজনীকান্ত দাস, সেকালের সাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলী ও জীবনচরিত প্রকাশ করে পরিষদের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন এবং বাঙালী বিদ্যোৎসাহীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কিন্তু তা সত্ত্বেও গত কয়েক বছরের মধ্যে, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তার মূল আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে ধীরে ধীরে বিচ্যুত হয়ে, সর্বাঙ্গীন অবনতির চূড়ান্ত সীমায় নেমে এসেছে। বাইরের লোকের অভিযোগ, সাহিত্য পরিষৎ একটি মুষ্টিমেয় গোষ্ঠীর 'সম্পত্তিতে' পরিণত হয়েছে। এ অভিযোগ কতটা সত্য বা মিথ্যা, তা নিয়ে অনুসন্ধান বা আলোচনা করতে আমরা চাই না। তবে, বাঙালী পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশেরই পরিণতি তাই হয়। ইতিহাসে তার অনেক নজীর আছে। আমরা প্রত্যহ সাহিত্য পরিষদের যে রূপ দেখছি, তা এই :

(ক) এত বড় একটি প্রতিষ্ঠান এবং বাঙালীর জাতীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবার মতন সুযোগ্য কর্মী নেই। পরিষদের বিশাল লাইব্রেরী আছে, কোন ট্রেন্‌ড লাইব্রেরিয়ান নেই। বইয়ের কোন 'বিজ্ঞানসম্মত' ক্যাটালগ নেই। অর্থসাহায্য নিয়ে যে ক্যাটালগ তৈরি করা হয়েছে, তার সঙ্গে বাজারের পঞ্জিকার কোন তফাৎ নেই।

(খ) বাইরের সাধারণ পাঠাগারের মতন, সাহিত্য পরিষৎ নাটক-নভেল পড়ার স্থান হয়ে উঠেছে। যাঁরা রিসার্চ বা গবেষণার কাজ করতে চান, আগে তাঁদের ঢুকতেই দেওয়া হ'ত না। কারণ দু'-একজন কর্মকর্তা, যাঁরা পরিষদের দুষ্প্রাপ্য বইয়ের নকল ক'রে বাইরে খ্যাতি অর্জন করছিলেন, তাঁদের একচেটিয়া অধিকার খর্ব হবে, এই ছিল তাঁদের ভয়। দুষ্প্রাপ্য বই বা পত্রিকা চাইলে কখনই পাওয়া যেত না, যে কোন অজুহাতে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ত। সম্প্রতি অবশ্য সে-বাধা দূর হয়েছে, কিন্তু পরিষদে কি বইপত্র আছে না-আছে তা জানবার উপায় নেই। পরিষদে বহু প্রাচীন পত্রিকা আছে, তার কোন ক্যাটালগ নেই। বইয়ের ক্যাটালগ তো অব্যবহার্য। সবচেয়ে বিস্ময়কর হ'ল, রিসার্চ কর্মীদের জন্য নিশ্চিন্তে ব'সে কাজ করবার মতন কোন জায়গার ব্যবস্থা নেই, চেয়ার-টেবল-ডেস্ক নেই।

(গ) বহু বিখ্যাত ব্যক্তির সারাজীবনের গ্রন্থসংগ্রহ পরিষদে তাঁরা দান ক'রে দিয়েছেন। তার কোন ক্যাটালগ নেই। পরিষদের কোন কর্মকর্তা সে-সব সংগ্রহ আজও ভাল করে নেড়েচেড়ে দেখেননি। তাতে কি আছে না-আছে, কেউ জানেন না। সেগুলি আলমারীতে বন্দী হয়ে, অব্যবহারের ফলে কীটের খোরাক হয়ে উঠছে।

(ঘ) পরিষদের মূল্যবান মিউজিয়মটি সম্প্রতি সাজানো-গোছানো হয়েছে, এত দিন বিপর্যস্ত অবস্থায় পদদলিত হচ্ছিল। কিন্তু মিউজিয়মের কোন ভাল ক্যাটালগ নেই, কোন ট্রেন্‌ড কিউরেটর, বা কিপার নেই। গোয়াল-ঘরের মতন ঐতিহাসিক নিদর্শন সব স্তূপাকার করা রয়েছে।

(ঙ) বাংলার মনীষীদের যে সব ব্যক্তিগত সংগ্রহ ও নিদর্শন সাহিত্য পরিষদে রয়েছে, তা জাতীয় সম্পত্তি। দেশের দশজনকে তা দেখতে দেবার কোন ব্যবস্থা নেই। প্রতি বছরে দু'-একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ক'রে সাধারণ লোককে দেখালে, তাতে তাঁরা উৎসাহিত হতে পারেন এবং পরিষদের সঙ্গে দেশের সংযোগও স্থাপিত হয়। কিন্তু তা নিয়ে কারও মাথাব্যথা নেই!

যাঁরা সাহিত্য পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ও গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা সাহিত্য পরিষদের এই শোচনীয় রূপ একদিন দেখবেন ব'লে করেন নি। শ্রীসজনীকান্ত দাসের মতন নিষ্ঠাবান সাহিত্যকর্মী যাঁরা দীর্ঘকাল ধরে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন, তাঁরা এই শোচনীয় পরিণতির কি ব্যাখ্যা দেবেন? সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রখানিও নিয়মিত প্রকাশিত হয় না, এবং ক্রমেই সেটি 'অপাঠ্য' হয়ে উঠছে, তারই বা কারণ কি? যদি "অর্থাভাব" কারণ হয়, তাহলে তার চেয়ে বেদনার কথা আর কিছু হতে পারে না। বাংলার ও বাঙালীর অন্যতম জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য, সরকারী বেসরকারী সব দিক থেকেই অকৃপণ অর্থ সাহায্য পাওয়া উচিত। যদি "লোকাভাব" কারণ হয়, তাহলে তা-ও কম দুঃখের কথা নয়। সুযোগ্য কর্মী ও সদস্য সংগ্রহের জন্য কর্তৃপক্ষ কোন আন্তরিক চেষ্টা করেছেন কি? সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক শ্রীনির্মলকুমার বসুর সততায়, নিষ্ঠায় ও কর্মশক্তিতে অনেকেরই সশ্রদ্ধ আস্থা আছে। শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্মকর্তাদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কর্মক্ষমতা ও সাহিত্যনিষ্ঠা তাঁর বিরুদ্ধবাদীরাও স্বীকার করবেন। তাঁদের কাছেই আজ আমরা সাহিত্য পরিষদের ক্রমিক অবনতির এই চিত্র উদ্‌ঘাটিত ক'রে, সবিনয়ে প্রশ্ন করছি—বাঙালী জাতির এই ঐতিহাসিক দুর্দিনে, এত বড় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠানকে এই ভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে না দিয়ে, তার লুপ্তগৌরব ও আদর্শ পুনরুদ্ধার ক'রে পরিষদকে কি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায় না?

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

আধুনিক বাংলা সাহিত্য

সত্য আর সুন্দরের একনিষ্ঠ উপাসক মোহিতলাল শুধু কবি ছিলেন না, প্রথম শ্রেণীর সমালোচক হিসাবেও তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় স্বর্গত লেখক বলছেন "এই গ্রন্থ আধুনিক বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক পদ্ধতিমূলক গবেষণা নহে, অর্থাৎ পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'থীসিস্' নহে। এই রচনাগুলি একটি যুগবিশেষের বাংলা সাহিত্যের কথা হইলেও এ সাহিত্যের প্রকৃতি ও মূল্যনির্ণয়ে আমি সর্ব্বকালের সাহিত্যের আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াছি।" যাই হোক, আধুনিক বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে সুষ্ঠু সমালোচনা আজও পর্যন্ত হয়নি। বর্তমানে কয়েক জন সমালোচক (!) বর্তমান বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই দলগত বা স্বার্থগত অভিসন্ধিতে প্রায় অন্ধ বললেই হয়। মোহিতলালের এই গ্রন্থটিতে আছে বঙ্কিমচন্দ্র, বিহারীলাল, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির প্রতি আলোকপাত। পরিশিষ্টে আছেন রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, মধুসূদন প্রভৃতি। লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত না হ'লেও এ বই সাহিত্য বিচারের সুষ্ঠু এক পরাকাষ্ঠা। প্রকাশক জেনারেল প্রিন্টার্স। কলিকাতা—১৩। দাম পাঁচ টাকা।

প্রভাস

কবি নবীনচন্দ্র সেনকে আজ আমরা প্রায় ভুলতে ব'সেছি, নেহাৎ ছাত্রছাত্রীরা ছাড়া। প্রকাশক এম. এল. দে এণ্ড কোং [illegible]

কবির প্রভাস কাব্যখানির একটি অভিনব সটীক সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র একদা ব'লেছিলেন, "ইংরেজীতে বাইরণের কবিতা তীব্র তেজস্বিনী, জ্বালাময়ী অগ্নিতুল্যা। বাঙ্গালাতেও নবীন বাবুর কবিতা সেইরূপ তীব্র তেজস্বিনী, অগ্নিতুল্যা। তাঁহাদিগের হৃদয়নিরুদ্ধ ভাব সকল, আগ্নেয় গিরিনিরুদ্ধ অগ্নিশিখাবৎ—যখন ছুটে তখন তাহার বেগ অসহ্য।" কবির 'প্রভাস' মহাভারতের ভিত্তিতে রচিত।'বাঙলা কাব্যধারার' মধ্যে 'প্রভাস' মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যের মতই সমাদৃত হয়েছে। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই চিত্তাকর্ষক।

ভক্ত কবীর

সিদ্ধভক্ত কবীর দাসের জীবনী সম্পর্কে পূর্ব্বে কয়েক জন বিখ্যাত লেখক বিভিন্ন সাময়িক পত্রে কিছু কিছু আলোচনা ক'রেছেন, কিন্তু কবীর ও কবীরের বাণীর আলোচনায় কোন পুস্তক বাঙলায় এ যাবৎ প্রকাশিত হয়নি। লেখক বহু পরিশ্রমে কবীরের নানা বিষয়কে গ্রন্থাকারে রূপ দিয়েছেন। এই গ্রন্থের কতকগুলি লেখা মাসিক বসুমতীতে পূর্ব্বে প্রকাশ হয়। আমাদের উপাসক সম্প্রাদায়ের মধ্যে কবীরপন্থীও অন্যতম। 'ভক্ত কবীর' লেখার গুণে এক মহৎ সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। লেখক অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ দাস। ওরিয়েণ্ট বুক কোং। কলিকাতা—১২। দাম পাঁচ টাকা।

মানুষ চিত্তরঞ্জন

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম বাঙলার সাহিত্য ও রাজনীতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর যোগ্যতমা কন্যা, বিখ্যাত কীর্ত্তনীয়া অপর্ণা দেবী মানুষ চিত্তরঞ্জনকে আঁকতে গিয়ে দেশবন্ধুর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী রচনা ক'রেছেন—যা অন্য কোন লেখক আজও লিখলেন না। দেশবন্ধুর জীবন বাঙলা তথা ভারতের রাজনৈতিক ইতিবৃত্তের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকবে, সে জন্য এই বইকে সত্যিই এক মূল্যবান দলিল মনে করা অন্যায় হবে না। অপর্ণা দেবীর কাব্যময়ী ভাষা, অনুসন্ধিৎসা ও পিতার প্রতি নিষ্ঠা গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে খুঁজে পাওয়া যায়। বইখানি প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। সচিত্র। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড। কলিকাতা-৭। দাম সাড়ে পাঁচ টাকা।

আড্ডা

সুলেখক গোপাল হালদারকে অনেকে জানেন গুরুগম্ভীর প্রবন্ধলেখক। 'আড্ডা' তাঁদের সেই ভুল ভেঙ্গে দেবে। ঔপন্যাসিক গোপাল হালদার 'আড্ডা-রসিক'—তা অনেকেই জানেন। আড্ডা নামক গ্রন্থে লেখক আড্ডার বিভিন্ন দিককে আমাদের চোখে তুলে ধ'রেছেন। 'আড্ডা'র পৃষ্ঠায় যেমন আছে বহু বিখ্যাত আড্ডাবাজদের পরিচয়, তেমনি আছে দেশ-বিদেশের আড্ডাধারীদের কথা। লেখক যে সুরসিক ও রসজ্ঞ তার প্রমাণ এই 'আড্ডা'। আড্ডা থেকে আজ আমরা আসরে এসে পৌছেছি, তবুও এই লঘু নিবন্ধগুলি পড়তে পড়তে মনে হয়, যেন আমরা আবার সেই আড্ডাঘরে ফিরে গেছি। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২। দাম দু'টাকা।

সৈনিক

বিখ্যাত গল্পলেখক মনোজ বসু উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সমান দক্ষ—যার প্রমাণ 'সৈনিক।' এ দেশের সাহিত্যিক হয়ে বহু সাহিত্যিক এই দেশটিকে ভুলে অন্য দেশের প্রতি দৃষ্টি ফিরিয়ে নাজেহাল হয়েছেন 'সৈনিক' উপন্যাসে লেখক এই দেশেরই সর্ব্বাপেক্ষা এক ভয়ঙ্কর যুগের অনুপম নিখুঁত চিত্র। ভারতের মুক্তিযুদ্ধের কথায় পরিপূর্ণ সুলিখিত উপন্যাস 'সৈনিক'এর সপ্তম সংস্করণ প্রকাশে লেখকের জনপ্রিয়তা সপ্রমাণ হয়। বেঙ্গল পাবলিশার্স। কলিকাতা-১২। দাম চার টাকা।

চার দৃশ্য

বুদ্ধদেব বসুর নাম কবি হিসাবেই প্রধানতঃ পরিচিত। কিন্তু তিনি একাধিক উপন্যাস লিখেছেন, যেগুলি ঠিক উপন্যাস না হলেও ভাষার উৎকর্ষতায় ও মন-বিশ্লেষণের মুন্সিয়ানায় পড়তে ভালই লাগে। 'চার দৃশ্য' কয়েকটি গল্পের সঙ্কলন। বুদ্ধদেব একদা বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। চার দৃশ্যে লেখক সেই ভ্রান্তি দূরীকরণের চেষ্টা ক'রেছেন। জিজ্ঞাসা। কলিকাতা-২৯। দাম আড়াই টাকা।

ইস্পাতের স্বাক্ষর

ইস্পাত নগরীর পটভূমিকায় লেখা বৃহৎ এই উপন্যাসে অসংখ্য পাত্র-পাত্রীর আশা-নৈরাশ্য সুখ-দুঃখ স্বপ্ন-বেদনার বেদ রচনার প্রয়াস করেছেন লেখক। এবং বিস্ময়কর ভাবে এই দুরূহ সাধনায় তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার আয়তনে যে কাহিনীর জাল বোনা হয়েছে তার পরিচয় দু-এক কথায় দেওয়া যায় না। তবে বইখানি পড়লে মনে হয় যে লেখকের সঙ্গে কারখানা শহরের নিগূঢ় পরিচয় রয়েছে, অত্যন্ত অন্তরঙ্গ দরদী লেখনীর স্পর্শে নায়ক, নায়িকা থেকে শুরু ক'রে প্রতিটি তুচ্ছ চরিত্রও সজীব হয়ে উঠেছে। গত পনের বছরে বাংলার শ্রমিক আন্দোলনের ধারাক্রম এ উপন্যাসের পশ্চাৎপট। লেখকের ধারণা, রাজনৈতিক দলের প্রভাবে পড়ে সর্বক্ষেত্রের শ্রমিকের স্বার্থ আংশিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। শ্রমিকের পরিত্রাণ তার গোষ্ঠীর নায়কের হাতে, বইয়ের ভাড়াটে নেতার হাতে নয়। গোটা উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য এ-ই নয়: শ্রমিকরা যে মানুষ, তাদেরও সত্তার মর্যাদা আছে, তাও প্রতিপাদ্য এবং প্রমাণিত। শ্রমিক-সমাজের সম্পূর্ণাঙ্গ জীবনপরিচয় আঁকার গুরুদায়িত্ব সার্থকায়িত এই ইস্পাতের স্বাক্ষর আয়তনে বৃহৎ এবং বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্যেও বৃহৎ। ভাষা অত্যন্ত সাবলীল, স্বচ্ছন্দ। দেবজ্যোতি, সীতানাথ, মন্দাকিনী, মল্লিকা, মুকুল, মল্লিক সাহেব প্রত্যেকেই যেন অত্যন্ত পরিচিত মনে হয়। এ ধরণের উপন্যাস বাংলার রসিক জনসমাজে সমাদর পাবে সন্দেহ নেই। লেখক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য। ৯৮০ পৃষ্ঠা দশ টাকা। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী ৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

দিগন্ত

বর্তমান সাহিত্য থেকে মিষ্টি গল্প এক রকম বিদায় নিয়েছে বললেই হয়। 'দিগন্ত' অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের এই মিষ্টি গল্পের অন্যতম নিদর্শন। মণিকা, নন্দ, হীরালাল, প্রদোষ, প্রফুল্ল, গগন, সুনীলাবালা প্রভৃতি চরিত্রগুলি লেখকের অতুলনীয় লেখনীর আঁচড়ে জীবন্ত রূপ ধারণ ক'রেছে যেন। চরিত্রসৃষ্টি, ঘটনা ও পরিবেশ রচনা, এবং ঘরোয়া কথোপকথনের অনবদ্য সন্নিবেশে 'দিগন্ত' যেন স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। কলকাতার পটভূমিতে রচিত 'দিগন্ত' সর্বজন-সমাদৃত হবে, তা আমরা জানি। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। কলিকাতা ২। দাম দু'টাকা চার আনা।

লালবাঈ

সর্ব্বাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে যে ক'জন গদ্য রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়ে সুখ্যাতি অর্জ্জন ক'রেছেন, রমাপদ চৌধুরী তাঁদেরই অন্যতম। সামান্য কিছুকালের মধ্যে কোন গ্রন্থকে এত অধিক জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করতে দেখা যায়নি 'লালবাঈ' উপন্যাসের মত। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশই তার জাজ্বল্য প্রমাণ। 'লাল বাঈ' ঐতিহাসিক উপন্যাস—বাঙালা দেশেরই এক মহান ঐতিহ্যপূর্ণ অধ্যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় অধুনা কোন লেখককে অগ্রসর হ'তে দেখা যায় না। কারণ, শুধু লেখার গুণ থাকলে এই জাতীয় উপন্যাস লেখা সম্ভব নয়, সেই সঙ্গে চাই ইতিহাসের প্রতি নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা এবং বলতে বাধা নেই ইতিহাসের জ্ঞান। লাল বাঈয়ের অধিক পরিচয় দেওয়া অন্ততঃ মাসিক বসুমতীর পাঠকদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। সেজন্য আলোচনায় বিরত থেকে আমরা বলবো, লাল বাঈ আরও অধিক পঠিত হোক। বাঙলা দেশ জানুক তার অতীত ইতিহাস। দ্বিতীয় সংস্করণে লেখক আরও কিছু কিছু তথ্য সংযোজন ক'রেছেন—যার ফলে উপন্যাসটি আরও অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। প্রচ্ছদ অভিনব। ডি. এম. লাইব্রেরী, কলিকাতা। দাম পাঁচ টাকা।

ছোটদের ছোটগল্প

অধ্যাপক শশিভূষণ দাশগুপ্ত শুধু নীরস অধ্যাপক নন, তিনি কবি, সমালোচক ও ঔপন্যাসিকও বটেন। ছোটদের ছোট গল্পে লেখক শিশু-পাঠকের মনের খোরাক দিয়েছেন প্রচুর। লেখক বলছেন, "মানুষ ছেলেবেলায় দুগ্ধপোষ্যও থাকে, গল্পপোষ্যও থাকে।" গ্রন্থটি সানন্দে শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া যায় ভাষা ও বিষয় বৈচিত্র্যের গুণে। চমৎকার প্রচ্ছদ। ভারতী লাইব্রেরী। কলিকাতা-১৪। দাম দেড় টাকা।

স্বপ্নবাসবদত্তা

রঙ্গমঞ্চ বলতে আজকাল আমরা যা দেখতে পাই, পুরাকালে তা ছিল না। ভাস ছিলেন প্রধানতঃ নাট্যকার। সে যুগের উপযোগী নাটক 'স্বপ্নবাসবদত্তা' আজও সাহিত্যরূপে এক অমূল্য সম্পদ—ভাসের ভাষার সরলতায়, সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে আর নাটকীয় সদ্গুণে। আলোচ্য গ্রন্থটি প্রশংসালাভের যোগ্য। ভাসের নাটক গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে লেখা। অনুবাদক যেন মূল লেখকের সুরটুকু অক্ষয় রেখেছেন। বাসবদত্তা ও উদয়নের বৃত্তান্ত কথাসরিৎসাগর থেকে উৎপন্ন। নাটকটিতে সেযুগের চিত্র সুস্পষ্ট। বইটির মুদ্রণপরিপাট্য লক্ষণীয়। প্রকাশক বিজয়পদ বসু। ৪৪, বিদ্যাসাগর ষ্ট্রীট। কলিকাতা—৯। মূল্য দু'টাকা চার আনা।

যক্ষ্মা রোগ ও প্রতিরোধ

'যক্ষ্মারোগ ও প্রতিরোধ' গ্রন্থের লেখক শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ এগারোটি অধ্যায়ের ভেতর যক্ষ্মারোগ ও তার প্রতিরোধের কথা বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছেন। শ্রীঘোষ তাঁর মূল্যবান এই গ্রন্থের ভেতর এ কথাই বলতে চেয়েছেন 'প্রতিরোধের ভেতর দিয়েই এই রোগের প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করতে হবে'। এই মতটিকে ভিত্তি করে তিনি আলোচ্য গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের ভেতর যা বলতে চেয়েছেন তা বেশ স্পষ্ট ও যুক্তিসঙ্গত। প্রকাশক: প্রকাশন কেন্দ্র, ৪৫ এ রাসবিহারী এভিন্যু, কলকাতা ২৬। দাম: তিন টাকা।

সতু বক্সির রোজনামচা

অল্পকালের ভেতর যে সব গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যের পরিধিকে বিস্তৃত করেছে, রূপে এনেছে এক সহজ সাবলীল মনোমুগ্ধকর আবেশ, তাদের ভেতর আমরা 'সতুবক্সির রোজনামচা'র নাম নির্ভয়ে উল্লেখ করতে পারি। 'কত ভালো করে গুছিয়ে সতু বক্সি ও আর সব জাতবক্সিরা মানুষের স্বাস্থ্য গড়ে তুলতে পারতো অথচ তারা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে,'—তার জন্যে গ্রন্থকার নালিশ জানিয়েছেন 'তার মায়ের কাছেই, মা অর্থাৎ তার দেশের লোকের কাছে।' সতু বক্সির এই কান্না আর নালিশকে একসঙ্গে মিশিয়ে হয়েছে 'সতু বক্সির রোজনামচা।' প্রকাশক: নতুন সাহিত্য ভবন, ৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, কলকাতা। দাম: দু টাকা বারো আনা।

মীরা বাঈ

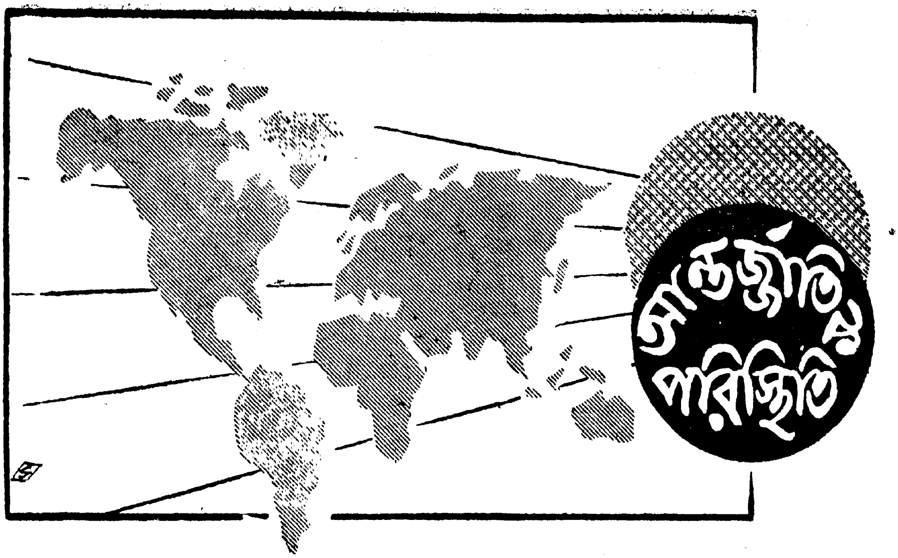
রাজার ঘরণী জীবন কাটালেন সাধনার মধ্যে দিয়ে। ত্যাগের ভিতর দিয়েই প্রত্যক্ষ করলেন তাঁর জীবনের স্বপ্ন গিরিধারীকে। অনাথনাথ বসু মহোদয় তাঁর গ্রন্থে মীরার জীবনের এই দিকগুলি বিকশিত করে তুলেছেন। মীরার ভজন সম্বন্ধেও রীতিমত তথ্যপূর্ণ আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। সমগ্র পুস্তকটি লেখকের আন্তরিক পরিশ্রমের চিহ্ন বহন করে। মীরা বাঈ-এর স্বামী রাণা কুম্ভ বলে যে সকলের গভীর ধারণা, সেই ধারণা ঐতিহাসিক প্রমাণ-পঞ্জীর দ্বারা ভুল বলে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন লেখক। মীরার আসল স্বামী ছিলেন রাণা সংগ্রাম সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র যুবরাজ ভোজ। আজকের সঙ্গীতের এই বিপ্লবময় যুগে মীরাবাঈ ও তাঁর অমর ভজনগুলির প্রচার প্রশংসনীয়। ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ—৯৩ হ্যারিসন রোড কলিকাতা—৭, মূল্য দুই টাকা মাত্র।

চার দেয়াল

যতদূর জানি, 'চার দেয়াল'ই সত্যপ্রিয় ঘোষের প্রথম উপন্যাস। সম্প্রতি প্রকাশিত 'চার দেয়াল' উপন্যাসটি অসাধারণত্বে চিহ্নিত না হলেও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষরে প্রোজ্জ্বল। কাহিনীর স্বাভাবিকতা ও বিন্যাসের স্বাচ্ছন্দ্যে বিশিষ্ট এই উপন্যাস সাম্প্রতিক কথা-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সুমুদ্রিত ও সুশোভিত এই গ্রন্থটির প্রকাশক নাভানা, ৪৭ গণেশচন্দ্র এভেন্যু কলিকাতা; এর দাম তিন টাকা মাত্র।

বুদ্ধপ্রসঙ্গ

বৌদ্ধধর্ম দর্শন সংস্কৃতি সম্বন্ধে বাংলা দেশে যে সব চিন্তাশীল মনীষী অনুশীলন করেছেন, তাঁদের মধ্যে মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০) যে অন্যতম, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন না। দুঃখের কথা, তাঁর অধিকাংশ রচনাই সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠায় সমাবিষ্ট ছিল, বাইরের বহু পাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়নি। ১৩৩০, ১৩৩১ ও ১৩৩৪ সনের "প্রবাসী" পত্রিকা থেকে মহেশচন্দ্রের কয়েকটি রচনা 'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' গ্রন্থমালায় প্রকাশ ক'রে বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় যে কর্তব্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। "গোতম বুদ্ধের আত্মচরিত", "গোতমের সাধনা ও সিদ্ধি" এবং "নির্বাণতত্ত্ব" নামে তিনটি প্রবন্ধ এই বইয়ে সংকলিত হয়েছে।—প্রকাশক: বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা। আট আনা।



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত—

মিশরের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল জামাল আবদুল নাসের গত ২৬শে জুলাই (১৯৫৬) আলেকজান্দ্রিয়ার লিবারেশন স্কোয়ারে এক বিরাট জনসভায় সুয়েজ খাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার যে-সিদ্ধান্ত বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা এক দিকে যেমন ডাঃ মোসাদ্দেক কর্তৃক ইরাণের এ্যাংলো-ইরাণী তৈল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার কথা স্মরণ করাইয়া দেয়, আর এক দিকে তেমনি এই ঘোষণা বৃটেনের ও ফ্রান্সের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতই মনে হইয়াছে। বৃটেন তৈলবাহী জাহাজ চলাচল বন্ধ করিয়া দিয়া ইরাণের তৈল শিল্পের উৎপাদন একরূপ বন্ধই করিয়া দিয়াছিল এবং পরিণামে উহাই ডাঃ মোসাদ্দেকের পতনের অন্যতম কারণে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু ঠিক ঐ পন্থায় কর্ণেল নাসেরকে জব্দ করা যে সহজ বা সম্ভব নয়, তাহা বৃটেন ও ফ্রান্স ভাল করিয়াই জানে। সুয়েজ খাল দিয়া যে-সকল জাহাজ যাতায়াত করে সেগুলির মধ্যে তৈলবাহী জাহাজের সংখ্যাই বেশী। ঐ পথে তৈলবাহী জাহাজ যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিলে রাষ্ট্রায়ত্ত সুয়েজ খাল কোম্পানীর আয় অবশ্য খুবই কমিয়া যাইবে এবং ঐ অল্প আয় হইতে আসোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যয় সঙ্কুলান করা বড় সহজ হইবে না। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমস্যাও বড় কম কঠিন হইবে না। তৈলবাহী জাহাজগুলিকে যদি উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া যাইতে হয় তাহা হইলে তৈলের দাম চড়িয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গকেই নূতন সমস্যার সম্মুখীন করিবে। তা ছাড়া ইরাণে ছিল, এখনও আছে মার্কিণ সামরিক মিশন, কিন্তু মিশরে মার্কিণ সামরিক মিশন নাই। ইরাণে ছিল এবং আছে রাজতন্ত্র, কিন্তু কর্ণেল নাসের মিশর হইতে রাজতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়াছেন। কাজেই কর্ণেল নাসেরের পতন ঘটাইবার জন্য মিশরের অভ্যন্তরে কোন সুযোগ সুবিধা লাভ করা বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার পক্ষে সম্ভব নয়। এই জন্যই বৃটেন ও ফ্রান্স ক্রোধে এবং নিষ্ফল আক্রোশে একরূপ দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। কর্ণেল নাসেরকে শায়েস্তা করিবার জন্য বৃটেন প্রথম আঘাত হানিয়াছে মিশরের প্রাপ্য ১১ কোটি ষ্টার্লিং আটকের সিদ্ধান্ত করিয়া। ফ্রান্সও বৃটেনের দৃষ্টান্তই অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেই নাসেরের পতন ঘটিবে, সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার কোন কারণ না থাকায় বৃটেন ও ফ্রান্স একদিকে সামরিক তোড়জোড় আরম্ভ করিয়াছে এবং আর এক দিকে বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণযুক্ত মিলিয়া সুয়েজ খালের পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আন্তর্জ্জাতিক করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছে। এ সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে মিশর সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করায় বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হওয়ার কারণ কি, তাহা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ইঙ্গ-মিশর চুক্তি অনুযায়ী সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে শেষ বৃটিশ সৈন্য অপসারণের শেষ তারিখ ধার্য্য হইয়াছিল ১৯৫৬ সালের ১৮ই জুন। কিন্তু উহার পাঁচ দিন পূর্ব্বেই ১৩ই জুন শেষ বৃটিশ সৈন্য সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে চলিয়া যায়। ইহার প্রায় দেড় মাস পরেই মিশর গবর্ণমেণ্ট সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উভয়ের মধ্যে কোন কার্য্যকারণ সম্বন্ধ নাই, একথা নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়। সুয়েজ খাল অঞ্চলে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী থাকিলে সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করা মিশরের বড় সহজ হইত না এবং রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে উহা কার্য্যকরী পক্ষে করা কঠিন হইয়া পড়িত। এই প্রসঙ্গে ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, আসোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অর্থ সাহায্যের যে-প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহা প্রত্যাহারের পর মিশর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু আসোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রতিশ্রুত অর্থ সাহায্য দিলেও সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে মিশরের কোন অসুবিধা হইত না। সুয়েজ খাল মিশরের ভিতর দিয়া প্রবাহিত। সুয়েজ খাল কোম্পানী মিশরে রেজেষ্ট্রীকৃত বে-সরকারী কোম্পানী। সুয়েজ খাল এবং সুয়েজ খাল কোম্পানী এই দুইটিকে পৃথক করিয়া দেখা প্রয়োজন। ১৮৮৮ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী সুয়েজ খালকে ইণ্টারনেশনে-

লাইজড, অর্থাৎ আন্তর্জ্জাতিক করা হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে সকল দেশের জাহাজকেই বিনা বাধায় সুয়েজ খাল দিয়া যাইতে দিতে হইবে। যে-সময়ে এই চুক্তি করা হয় সে-সময় প্রত্যেক রাষ্ট্রের তথা মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকারের কথা কেহ জানিত না, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। পানামা খালকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছে। উহা লইয়া কোন কথা উঠে নাই। মিশর সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিলে আপত্তি উঠিবে কেন? কর্ণেল নাসের ১৮৮৮ সালের চুক্তির সর্ত্ত রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। তাঁহার এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন না করিবার কোনই কারণ নাই। মিশর নিজের অর্থ নৈতিক স্বার্থের খাতিরেই সকল দেশের জাহাজকেই সুয়েজ খাল দিয়া যাইতে দিবে। না দিলে তাহারই হইবে গুরুতর ক্ষতি। মিশর এইরূপ ক্ষতি স্বীকার করিতে চাহিবে না। সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার একমাত্র ফল এই যে, অতঃপর সুয়েজ খাল দিয়া যে সকল জাহাজ যাইবে সেগুলির মাশুল কোম্পানীর তহবিলে না যাইয়া যাইবে মিশর গভর্ণমেণ্টের তহবিলে।

সুয়েজ খাল কোম্পানীকে মিশর রাষ্ট্রায়ত্ত করায় কোম্পানীর অংশীদাররা আর লভ্যাংশ পাইবে না, একথা সত্য। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এবং ফরাসী নাগরিকরাই এই কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের মালিক। গত ৮৬ বৎসরে তাহারা অংশীদাররূপে প্রচুর লাভ করিয়াছে, কিন্তু মিশরের বাড়িয়াছে শুধু দারিদ্র্য। সুয়েজ খাল কোম্পানীর অংশীদারদিগকে কর্ণেল নাসের শেয়ারের বাজার দরে ক্ষতিপূরণ দিতেও রাজী হইয়াছেন। তাছাড়া মিশরের সহিত সুয়েজ খাল কোম্পানীর ৯৯ বৎসরের যে চুক্তি হইয়াছিল তাহার ৮৬ বৎসরই পার হইয়া গিয়াছে। কিছু দিন পূর্ব্বে মিশর গবর্ণমেণ্ট ইহাও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, সুয়েজ খাল কোম্পানীর ইজারার মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হইবে না, উহা পরিচালন ভার স্বয়ং মিশর গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন। আর ১৩ বৎসর পরে মিশর যে-সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতই, তাহাকে চুক্তি মেয়াদ শেষ হওয়ার ১৩ বৎসর পূর্ব্বে রাষ্ট্রায়ত্ত করায় বৃটেন ও ফ্রান্সের এত ক্রুদ্ধ হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুয়েজ খাল কোম্পানীকে মিশরের রাষ্ট্রায়াত্ত করা আইন সঙ্গত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন কিন্তু উত্থাপিত হয় নাই। বৃটেন ও ফ্রান্সের রাগের কারণও উহা নহে। সুয়েজ খাল পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ব্যাপারের উপরেই তাহারা বিশেষ জোর দিয়াছে। কিন্তু ইহারও কোন সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। কর্ণেল নাসেরের গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী হইবে কি না এইরূপ সন্দেহ উহার কারণ বলিয়া স্বীকার করা সম্ভব নয়। ফরাসী পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ পিনো মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করাকে হিটলারের রাইনল্যাণ্ড অধিকারের সহিত তুলনা করিয়াছেন। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী

স্যার এণ্টনী ইডেন কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, একটি মাত্র দেশ কর্তৃক সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণ বৃটেন মানিবে না। এই সকল উক্তির তাৎপর্য্য উপেক্ষার বিষয় নয়।

স্যার এণ্টনী ইডেনের দৃষ্টিতে সুয়েজ খাল আজ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে এবং বিশ্বের চলাচল ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ সংযোগসূত্র। সুয়েজ খাল খননের জন্য ফ্রান্সের কূটনীতিবিদ ডি লীজেপ যখন কোম্পানী গঠন করেন তখন উহার একটি শেয়ারও ক্রয় করিতে বৃটেন রাজী হয় নাই। তদানীন্তন বৃটিশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টোন মনে করিতেন সুয়েজ খাল কাটা হইলে প্রচলিত বাণিজ্য ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিবে। তিনি সুয়েজ খাল খনন কার্য্য বন্ধ করিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। ১৮৫৪ সালে সুয়েজ খাল খননের কাজ আরম্ভ হয়। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৪ সালে তুরস্কের সুলতানের নিকট খেদিবের বিরুদ্ধে খাল খননের জন্য বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগের অভিযোগ উপস্থিত করিলে সুলতান বাধ্যতামূলক শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করিয়া দেন। ফলে খাল খননের কাজ বন্ধ হইয়া যায়। উহার জন্য খেদিব সুয়েজ খাল কোম্পানীকে ৩০লক্ষ পাউণ্ড ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শেষে যন্ত্রদ্বারা খাল কাটার কাজ শেষ করা হয় বটে, কিন্তু খালকাটার অর্দ্ধেক ব্যয়ই মিশরকে বহন করিতে হয়। ক্ষতিপূরণ দেওয়া, সুয়েজ খাল খননের অর্দ্ধেক ব্যয়বহন, তাছাড়া খাল উদ্বোধন উপলক্ষে ৯৪হাজার পাউণ্ড ব্যয় বহন করিয়া খেদিবের আর্থিক অবস্থা এমন হইল যে, সুয়েজ খাল কোম্পানীতে তাঁহার যে-সকল শেয়ার ছিল সেগুলির প্রায় সমস্তই বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮৭৫ সালে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী নামমাত্র মূল্যে ঐ সকল শেয়ার ক্রয় করেন। ১৭৬৬০২ শেয়ারের মাত্র ৪০ লক্ষ পাউণ্ড মূল্যে বৃটেন ক্রয় করে। আজ সুয়েজ খালের ব্যাপারে মিশর কেউ নয়, এই কথাই বৃটেন বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চাহে। কিন্তু সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের পরে মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করায় বৃটেন এত উত্তেজিত হইয়াছে কেন?

বৃটেন এবং মিশরের মধ্যে প্রধান বিরোধীয় বিষয় ছিল দুইটি: একটি সুদান, অপরটি সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ। দুইয়েরই সন্তোষজনক সমাধান হইয়া গিয়াছে।' সুদানের উপর মিশরের দাবী রক্ষিত হয় নাই, কিন্তু সুদান স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। সুদান অপেক্ষাও সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের প্রশ্নটি কঠিনতর হইয়া উঠিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ইহা স্মরণ করা আবশ্যক যে, ১৯২২ সালে জাতীয় আন্দোলনের ফলে বৃটেন যখন মিশরকে আশ্রিত রাজ্যের অধীনতা হইতে মুক্তি দিল তখনও চারিটি ব্যাপারে বৃটেনের কর্তৃত্ব অব্যাহত রাখা হইয়াছিল। এই চারিটি বিষয় মধ্যে একটি বৃটিশ সাম্রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার নিরাপত্তা। সুয়েজ খালই এই যোগাযোগ ব্যবস্থা। উহার নিরাপত্তার জন্যই বৃটিশ সৈন্য মিশরে রহিয়া গেল। মিশরবাসী এইরূপ ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হয় নাই। তাঁহাদের আন্দোলন চলিতেই লাগিল। অবশেষে ১৯৩৬ সালে বৃটেন ও মিশরের মধ্যে এক মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়। সেদিন পর্য্যন্তও এই চুক্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। এই চুক্তির ৮নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে যাতায়াতের পথ হিসাবে সুয়েজ খাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যে পর্য্যন্ত না মিশরীয় সৈন্যবাহিনী নিজের শক্তিতে খালপথে জাহাজ চলাচলের নিরাপত্তা বিধান করিতে সমর্থ হয় সে পর্য্যন্ত বৃটেন সুয়েজ খালের নিকট মিশরীয় ভূমিতে সৈন্যবাহিনী রাখিতে পারিবে। উক্ত মৈত্রীচুক্তি বা সন্ধিতে ইহাও বলা হয় যে, ২০ বৎসর পর পরিস্থিতি পুনর্ব্বিবেচনা করা হইবে এবং সুয়েজ খাল রক্ষা করিতে মিশরীয় বাহিনীর সামর্থ্য সম্পর্কে বৃটেন এবং মিশরের মধ্যে মতভেদ হইলে জাতিসঙ্ঘের (League of Nations) মধ্যস্থতা গ্রহণ করা হইবে। উহার আরও একটি ধারায় বলা হইয়াছে যে, উভয় পক্ষের সুবিধার জন্য ১০ বৎসর পর সন্ধি সর্ত্তের পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে আলোচনা আরম্ভ করা যাইতে পারিবে। এই ধারা অনুসারেই মিশর গবর্ণমেণ্ট ১৯৪৬ সালে এই সন্ধির পরিবর্ত্তনের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। এই আলোচনা ফাঁসিয়া যায় এবং ১৯৪৭ সালের আগষ্ট মাসে মিশর নিরাপত্তা পরিষদে এই সমস্যা উত্থাপন করে। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। অতঃপর আলোচনা আরম্ভ হয় '১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে। সন্ধির পরিবর্ত্তনের জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে যে-প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় মিশরের তাহা পছন্দ হয় নাই। ১৯৫১ সালের ৮ই অক্টোবর মিশর গভর্ণমেণ্ট আদেশ জারী করিয়া উক্ত সন্ধি বাতিল করিয়া দেন। বৃটেন এইরূপ একতরফা বাতিলকে মানিয়া লইতে অস্বীকার করে এবং সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের উদ্দেশ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা-ব্যবস্থার প্রস্তাব করেন। মিশর উহাও অগ্রাহ্য করে। অতঃপর মিশরের বে-সরকারী মুক্তিফৌজের সহিত বৃটিশ সৈন্যের দৈনন্দিন সঙ্ঘর্ষও বৃটিশ সৈন্য ও মিশরীয় পুলিসের মধ্যে তাহার সঙ্ঘর্ষ হয় বিবরণ উল্লেখ করিবার স্থান এখানে আমরা পাইব না। উহা পূর্ণ পরিণতি লাভ করে ১৯৫২ সালে ২৬শে জানুয়ারী কায়রো সহরে বৃটিশবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভের মধ্যে। উহার পরিণতিস্বরূপ নাহাস পাশার প্রধান মন্ত্রিত্বই শুধু গেল না, ফারুকের সিংহাসনও টলটলায়মান হইয়া উঠিল। জুলাই মাসের (১৯৫২) সামরিক বিদ্রোহের ফলে রাজা ফারুক বিতাড়িত হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত মিশর হইতে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হইল।

১৯৫২ সালের জুলাইয়ের বিপ্লবের পরবর্ত্তী ঘটনাবলী এখানে উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। বিপ্লবের পর জেঃ মহম্মদ নাজিবকেই নেতৃত্ব করিতে বাহির হইতে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু বিপ্লবের মূলে যেমন ছিলেন কর্ণেল নাসের, তেমনি জেঃ নাজিবের পিছনে প্রকৃত ক্ষমতাও ছিল তাঁহারই। শেষ পর্য্যন্ত ১৯৫৪ সালের প্রথম ভাগে জেঃ নাজিব অপসারিত এবং কর্ণেল সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া বসিলেন। মিশরের এই পরিবর্ত্তন সত্ত্বেও সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ সম্পর্কে আলোচনায় অচল অবস্থার অবসান ১৯৫৪ সালের জুলাই মাসের পূর্ব্বে হয় নাই। ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুলাই সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণের চুক্তি বৃটেন ও মিশরের মধ্যে সম্পাদিত হয়। বৃটিশ সৈন্য অপসারণের চুক্তি সমর্থন করিয়া তদানীন্তন বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার উইনষ্টন চার্চ্চিল কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন, "I am convinced that it is absolutely necessary".

অর্থাৎ "আমি নিশ্চিতরূপে বুঝিয়াছি যে, ইহা একান্ত প্রয়োজন।" তাঁহার কথা এক হিসাবে খুবই ঠিক। বৃটেন যখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, সুয়েজ খাল অঞ্চলে আরও দীর্ঘকাল বৃটিশ সৈন্য রাখিলে মধ্যপ্রাচীতে তাহার স্বার্থ একেবারেই নিশ্চিহ্ন হওয়ার সম্ভাবনা, তখনই সুয়েজ খাল অঞ্চল হইতে সৈন্য সরাইয়া লইতে সে রাজী হইয়াছে। ইতিমধ্যেই অবস্থা বৃটেনের আয়ত্তের বাহিরে যাইতে আরম্ভ করিয়াছিল। সৈন্য অপসারণ দ্বারা তাহার প্রতিবিধান করা আর সম্ভব হয় নাই। কর্ণেল নাসের ক্রমেই নিরপেক্ষ নীতির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। তাঁহার নিরপেক্ষ নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইরাক ব্যতীত অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলি মিশরের নেতৃত্বে বাগদাদ চুক্তি বিরোধী সামরিক চুক্তিতে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়াছে। এইখানেই উহার শেষ হয় নাই। মিশর কম্যুনিষ্ট দেশ হইতে অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতে আরম্ভ করিল। রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ শেপিলভ মিশর ও আরও কয়েকটি আরব রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করিয়া গেলেন। রাশিয়া, মিশর ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিল। পশ্চিমী বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় বুঝিতে পারিলেন, কর্ণেল নাসেরকে মোয়া দেখাইয়া দলে ভিড়াইবার উপায় নাই। কাজেই তাঁহারা ধরিয়া লইলেন যে, কর্ণেল নাসের রুশ শিবিরে যোগদান করিয়াছে। কর্ণেল নাসেরের পতন ঘটিলে মধ্যপ্রাচ্যে তাঁহাদের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবে, পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের মনে এই ধারণা জাগিয়া থাকিলে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। কিন্তু মিশরে এবং মিশরের বাহিরে তাঁহার প্রভাব ও মর্য্যাদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও মিশরের জনগণের আর্থিক দুরবস্থার অবসান হয় নাই। উহার সুযোগ গ্রহণ করিয়া জেঃ নাজিব কর্ণেল নাসেরের পতন ঘটাইতে পারিবে, এতখানি দুরাশা পশ্চিমী শক্তিবর্গ বোধ হয় পোষণ করিতে পারেন নাই। সম্ভবতঃ এই কারণেই বৃটেন ও আমেরিকা আসোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণে অর্থ সাহায্য দানের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্কও ঋণ দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিল। উদ্দেশ্য আসোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণে বাধা সৃষ্টি করিয়া মিশরের আর্থিক দুর্গতি বৃদ্ধি করা ও পরিণামে নাসেরের পতন ঘটানো। এই উদ্দেশ্য সফল হওয়া সম্ভব নয়।

আসোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহারের পাল্টা জবাব হিসাবে কর্ণেল নাসের সুয়েজ খাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছেন কি না, সে সম্পর্কে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ আছে। সুয়েজ খালের আয় হইতে আসোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণের ব্যয় সঙ্কুলান করা সম্ভব কি না, তাহাতেও মতভেদ থাকিতে পারে। হয়ত কর্ণেল নাসের অনেক পূর্ব্ব হইতেই সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিবার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। ইহাতে অন্যায় কিছু করা হইয়াছে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে এবং সুয়েজ খাল পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করিতে মিশরের ন্যায়সঙ্গত অধিকার রহিয়াছে। প্রেঃ আইসেনহাওয়ার তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার দৃষ্টিতে পানামা খালের সহিত সুয়েজ খালের তুলনা চলিতে পারে না। ইহা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, পানামা খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। তাই বলিয়া মিশরও সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করিবে, ইহা তাঁহার পক্ষে অসহ্য। তবে সুয়েজ খাল লইয়া বৃটেন ও ফ্রান্সের অবিমৃষ্যকারিতায় যুদ্ধ বাধিয়া উঠে ইহাও তিনি চাহেন না। উহার ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য চেষ্টা করাই তাঁহার অভিপ্রায় বলিয়া তিনি ঘোষণা করিয়াছেন। বৃটেন একটা গুরুতর কিছু না করিয়া বসে সেইজন্যই তিনি তাড়াতাড়ি মিঃ ডালেসকে লণ্ডনে প্রেরণ করেন। লণ্ডন হইতে ওয়াশিংটনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মিঃ ডালেস বলিয়াছেন, "আমরা হিংসাত্মক কার্য্য দ্বারা হিংসাত্মক কার্য্যের প্রতিরোধ করিতে চাহি না।" মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত-করণ হিংসাত্মক কার্য্য কল্পনা শক্তিকে উদাস করিলেও ইহা স্বীকার করা সম্ভব নয়। তথাপি যুদ্ধের কিনারায় যাওয়ার নীতিতে বিশারদ মিঃ ডালেসের 'হিংসাত্মক কার্য্যদ্বারা প্রতিরোধ' করিতে অনিচ্ছা হইতেও ইহা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সহজে সুয়েজ সঙ্কটকে যুদ্ধে পরিণত করিতে চাহে না। কিন্তু মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করণ উপলক্ষ করিয়া বৃটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকাই যে সঙ্কট সৃষ্টি করিয়াছে এবং উহাকে ঘনীভূত করিতেছে, একথা অস্বীকার করা অসম্ভব! ইহার কারণ, কর্ণেল নাসের সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ হইতেই বৃটেনকে শুধু বঞ্চিত করেন নাই, সুয়েজ খালের আয় হইতেও বৃটেনকে বঞ্চিত করিয়াছেন। বৃটেনের মনের কোণে আরও একটি গোপন উদ্দেশ্য রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করণকে বৃটেন আবার মিশরে ফিরিয়া যাওয়ার সুযোগে পরিণত করিতে চায়।

সুয়েজ খাল ও পশ্চিমী শক্তিত্রয়—

সুয়েজ খাল সম্পর্কে লণ্ডনে যেমন বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক সম্মেলন হইয়া গিয়াছে তেমনি বৃটেন ও ফ্রান্সে চলিতেছে সামরিক অভিযানের তোড়জোড়। গত ২রা আগষ্ট (১৯৫৬) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে বৃটিশ শক্তি বৃদ্ধি করিবার জন্য সতর্কতামূলক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। 'সতর্কতামূলক সামরিক ব্যবস্থা' কথাটা ব্যবহার করা হইলেও উহাকে শুধু বল প্রয়োগের মহড়া বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মিশরস্থ বৃটিশ নাগরিকদিগকে অবস্থা শান্ত থাকিতেই মিশর ত্যাগ করিতে এবং মিশরে ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছুক বৃটিশ নাগরিকদিগকে মিশরে ফিরিয়া না যাইবার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ফরাসী গবর্ণমেণ্টও মিশরস্থ ফরাসী নাগরিকদিগকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন। বৃটিশ সমর-দপ্তর জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য মধ্যপ্রাচ্যে স্থল, নৌ ও বিমান ইউনিটগুলির চলাচলের পরিকল্পনা করিতেছেন। রিজার্ভ-সৈন্যদের তলব করা হইয়াছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে নূতন বৃটিশবাহিনী প্রেরণ করা হইতেছে। অভিযানের প্রয়োজনে কতকগুলি ট্যাঙ্কবাহী জাহাজ প্রস্তুত করা হইতেছে। কতকগুলি ক্যানবেরা জেট-বিমান ইতিমধ্যেই মাল্টা রওনা হইয়া গিয়াছে। বৈমানিকদের ছুটি বাতিল করা হইয়াছে। 'রেড ডেভিল' নামে বিখ্যাত প্যারাসুটবাহিনীর প্যারাট্রুপারদের লইয়া বৃটিশ বিমানবাহী জাহাজ লণ্ডন হইতে যাত্রা করিয়াছে। এমন কি ফ্রান্স পর্য্যন্ত ভূমধ্যসাগরের তীরবর্ত্তী তুলোঁ বন্দর হইতে ফরাসী নৌবহরকে কোনও অজ্ঞাত স্থানে যাওয়ার নির্দ্দেশ দিয়াছে। এই সকল ব্যবস্থাকে শুধু মিশরকে ভয় দেখাইবার জন্য সামরিক মহড়া বলিয়া অভিহিত করা যায় না। যুদ্ধের জন্যই শুধু এইরূপ সামরিক সমাবেশের প্রয়োজন হয়। মিশরও অবশ্য চুপ করিয়া নাই। প্রেসিডেণ্ট নাসের ঘোষণা করিয়াছেন যে, মিশরে সাধারণ ভাবে সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে, মিশর বৈদেশিক হস্তক্ষেপ সহ্য করিবে না, শক্তি দিয়া শক্তি প্রতিরোধ করিবে।

বৃটেন এবং ফ্রান্স সামরিক শক্তিদ্বারা সুয়েজখাল দখল করিতে চেষ্টা করিবে কি না, সে-সম্পর্কে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন, সহযোগিতা ও সাহায্য ছাড়া বৃটিশ ও ফ্রান্স সুয়েজ আক্রমণ করিয়া বসিবে, এরূপ সম্ভাবনাও আছে বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মার্কিণ ষষ্ঠ-নৌবহর পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগরে অবস্থান করিলেও সুয়েজ খাল লইয়া যুদ্ধ বাধিয়া উঠে ইহা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চায় না, অহিংসার প্রতি নিষ্ঠার জন্য নয়, নিজের স্বার্থের খাতিরে। পশ্চিমী শক্তিবর্গ সুয়েজ আক্রমণ করিলে সমগ্র মধ্য প্রাচ্যেই আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। সমস্ত আরব রাষ্ট্রই, এমন কি ইরাক পর্য্যন্ত, মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করণ সমর্থন করিয়াছে। যুদ্ধ বাধিলে সৌদীআরবে আমেরিকার তৈলস্বার্থ বিপন্ন হইয়া পড়িবে। সর্ব্বোপরি সমগ্র মধ্য প্রাচ্য সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন হইয়া পড়িবে এবং তৃতীয় বিশ্বসংগ্রামও বাধিয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে। এই সকল কারণেই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বলপ্রয়োগে সুয়েজ অধিকার করিবার বিরোধী। ক্রুদ্ধ বৃটেন ও ফ্রান্স তাড়াতাড়ি হঠকারিতা করিয়া কিছু করিয়া না বসে সেই জন্যই মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ডেপুটি আণ্ডারসেক্রেটারী ও মধ্য-প্রাচ্য বিশেষজ্ঞ মিঃ রবার্ট মার্ফিকে লণ্ডনে প্রেরণ করেন। কিন্তু হাওয়ার গতি বুঝিয়া প্রেঃ আইসেনহাওয়ার ইহাতে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। তাড়াহুড়া করিয়া মিঃ ডালেসকে লণ্ডনে প্রেরণ করা হয়। ১লা আগষ্ট (১৯৫৬) মিঃ ডালেস লণ্ডনে পৌছেন। ঐদিন রাত্রে বৃটিশ সমরদপ্তর ঘোষণা করেন যে, পূর্ব্ব-ভূমধ্যসাগর এলাকায় বৃটেনের শক্তিবৃদ্ধি করিয়া যে-কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইবার জন্য কয়েকটি সতর্কতা মূলক সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ডালেস লণ্ডনে পৌছিবার পরই পূর্ব্ব-ভূমধ্য সাগরে বৃটেন তাহার স্থল ও নৌশক্তি বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

পাঁচ দিনব্যাপী আলোচনার পর তিন বৃহৎ পশ্চিমীশক্তি যে যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহারা সুয়েজ খাল এবং সুয়েজ খাল কোম্পানীকে এক করিয়া দেখিয়াছেন। তাঁহারা মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করণের নিন্দা করিয়া বলিয়াছেন যে, ইহা দ্বারা ১৮৮৮ সালের কনষ্টাণ্টিনোপলের চুক্তিতে উক্ত খালের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার যে গ্যারাণ্টী দেওয়া হইয়াছে তাহা বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কিরূপে বিপন্ন হইল যৌথ ইস্তাহার হইতে তাহা কিছুই বুঝা গেল না। মিশর সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করার পর সুয়েজ খালের ভিতর দিয়া বিভিন্ন দেশের জাহাজ নির্ব্বিঘ্নে চলাচল করিতেছে। তবে একথা ঠিক যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের স্বার্থ বিপন্ন হইয়াছে এবং উহাকেই কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তির গ্যারাণ্টী বিপন্ন হওয়া বলিয়া তাঁহারা বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক প্রকৃতির (international character) উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং আন্তর্জ্জাতিক এজেন্সীর বৃটিশের নিকট দায়িত্বশীল থাকার কথা উল্লেখ করিয়া ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, মিশর এই খালকে তাহার জাতীয় উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করিবে, এই জন্যই উহা রাষ্ট্রায়ত্ত করার তাৎপর্য্য অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক প্রকৃতি কি শুধু সুয়েজ খালেরই আছে, আর কোন চলাচল ব্যবস্থার নাই?, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পানামা খালকে আন্তর্জ্জাতিক করিতে রাজী আছে কি? জিব্রাল্টার, এডেন, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি বন্দরের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব কিছু কম নয়। সুয়েজ খাল যদি আন্তর্জ্জাতিক হয়, তবে এই সকল বন্দরও আন্তর্জ্জাতিক হওয়া উচিত। বৃটেন তাহাতে রাজী আছে কি? সুয়েজ খাল মিশরের ভূমিতে অবস্থিত। উহা মিশরেরই সম্পদ। এই সম্পদ যদি মিশর তাহার জাতীয় প্রয়োজনে ব্যবহার করে এবং তাহার ফলে বৃটেন ও ফ্রান্সের আর্থিক ক্ষতি হয় তাহাতে তাহারা ক্ষুব্ধ হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া মিশরকে তাহার সম্পদের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত করা চলিতে পারে না। সুয়েজ খালের আয় হইতে বৃটেন ও ফ্রান্স বঞ্চিত হওয়া কি আন্তর্জ্জাতিক অপরাধ? যদি আন্তর্জ্জাতিক অপরাধ হয় তবে সে সম্বন্ধে বিচার করিবার অধিকার আন্তর্জ্জাতিক আদালতের অথবা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের। পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় সে সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত করিবার অধিকারী নহেন। পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের দাবী শুনিয়া প্রসন্ন গোয়ালিনীর গাভী সম্পর্কে কমলাকান্তের দাবীর

কথাই মনে পড়ে। কমলাকান্তের দাবীর কথাই মনে পড়ে। কমলাকান্ত বলিয়াছিলেন, "এই গাই আমার। প্রসন্ন বলুক তো উহার দুধ কোন দিন খাইয়াছে?"

সুয়েজ খাল সম্পর্কে পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা আসলে সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে আনিবার চক্রান্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। তাঁহারা মনে করেন যে, কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তিতে যে গ্যারাণ্টি দেওয়া হইয়াছে তাহা নিশ্চিত করিবার জন্য সুয়েজ খালের পরিচালন কার্য্য আন্তর্জাতিক ব্যবস্থাধীনে আনা প্রয়োজন। শেষ পর্যন্ত এই আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব যে বৃটেন ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছাড়া আর কিছুই হইবে না, সে কথা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। তাঁহাদের এই দাবী সমর্থনের জন্য লণ্ডনে চতুর্বিংশতি রাষ্ট্রের এক সম্মেলন আহ্বান করা হইয়াছে। এই চতুর্বিংশতি রাষ্ট্রের নাম এখানে উল্লেখ করা হইল:—মিশর, ফ্রান্স, ইটালী, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, তুরস্ক, বৃটেন, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, পশ্চিম জার্মাণী, গ্রীস, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, জাপান, নিউজিল্যাণ্ড, নরওয়ে, পাকিস্তান, পর্তুগাল, সুইডেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। এই চব্বিশটি রাষ্ট্রের মধ্যে নিম্নলিখিত রাষ্ট্রগুলি ১৮৮৮ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল সম্মেলনে যোগদান করিয়া সুয়েজ খাল সম্বন্ধে চুক্তি করিয়াছিল:—মিশর, ফ্রান্স, ইটালী, নেদারল্যাণ্ডস, স্পেন, তুরস্ক, বৃটেন এবং রাশিয়া। আন্তর্জাতিক আদালতে না যাইয়া কিম্বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে বিষয়টি উত্থাপন না করিয়া এই ধরণের সম্মেলন আহ্বান করা হইল কেন? ইঙ্গ-ইরাণী তৈল কোম্পানী সম্পর্কে আন্তর্জাতিক আদালতের রায়ের পর বৃটেনের আন্তর্জাতিক আদালতে যাইবার ইচ্ছা না থাকাই স্বাভাবিক। নিরাপত্তা পরিষদে আছে রাশিয়ার ভেটোর ভয়। ইহাই যে সম্মেলন আহ্বানের কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মেলনের ব্যবস্থাও এমন ভাবে করা হইয়াছে যাহাতে পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের দাবীই ভোটের সংখ্যাধিক্যে গৃহীত হয়।

সুয়েজ খাল সম্মেলন—

সুয়েজ ক্যানেল সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার তারিখ ১৬ই আগষ্ট, ১৯৫৬। আমাদের এই প্রবন্ধ ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বেই এই সম্মেলন হয়ত শেষ হইয়া যাইবে। আমন্ত্রিতদের মধ্যে কোন্ কোন্ দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করিবে না তাহা এখনও কিছুই জানা যায় নাই। যতটুকু বুঝা যাইতেছে, মিশর এই সম্মেলনে যোগদান করিবে না এবং যোগদান করিতে পারেও না। যে পদ্ধতিতে এই সম্মেলন আহূত হইয়াছে তাহাতে মিশরের আপত্তির কারণ আইনসঙ্গত। কনষ্টান্টিনোপল চুক্তির ৮নং ধারা অনুযায়ী সুয়েজ খাল দিয়া স্বাধীন ভাবে জাহাজ চলাচলের বিঘ্ন সম্বন্ধে আলোচনার জন্যই শুধু এই ধরণের সম্মেলন আহূত হইতে পারে এবং চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের মাত্র তিনটি রাষ্ট্র—মিশর, বৃটেন এবং ফ্রান্স—এই সম্মেলন আহ্বান করিতে পারে। সুতরাং শুধু বৃটেন এবং ফ্রান্স এইরূপ সম্মেলন আহ্বান করিতে পারে না। চুক্তি বহির্ভূত রাষ্ট্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের এইরূপ সম্মেলন আহ্বান করিবার কোন অধিকার নাই। তা ছাড়া সুয়েজ খাল দিয়া স্বাধীন ভাবে জাহাজ চলাচলের কোন বিঘ্নও সৃষ্ট হয় নাই। ইসরাইলগামী ট্যাঙ্কার বা তৈলবাহী জাহাজ গত কয়েক বৎসর ধরিয়াই মিশর সুয়েজ খাল দিয়া যাইতে দিতেছে না। এ ব্যাপারে মিশরের ন্যায় বৃটেনও সমান ভাবে দায়ী। কারণ, এতদিন পর্য্যন্ত সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণে পূর্ণ কর্তৃত্ব ছিল বৃটেনের।

সুয়েজ খালের আয় বৃটেন এবং ফ্রান্স পাইবে না পাইবে মিশর, পশ্চিমী শক্তিত্রয়ের কাছে ইহা অসহ্য বোধ হইয়াছে। তাই তাঁহারা সুয়েজ খালের আয় মিশরের জাতীয় প্রয়োজনে নিয়োজিত হওয়ার বিরুদ্ধে ধ্বনি তুলিয়াছেন। গত ৮ই আগষ্ট বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেন বেতার ও টেলিভিশন মারফৎ বক্তৃতায় মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণকে 'লুণ্ঠন বৃত্তি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু এতদিন সুয়েজ খালের আয় লুণ্ঠন করিয়াছে কাহারা? সুয়েজ খালের জন্য মিশর ভূমি দিয়াছে, ৬৫ হাজার মিশরীয় শ্রমিক বেগার খাটিয়া এই খাল খনন করিয়াছে। কিন্তু ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত ৭০ বৎসর ধরিয়া মিশর গবর্ণমেণ্ট এই খালের জন্য এক কপর্দ্দকও রাজস্ব পায় নাই। ১৯৩৬ সালে সুয়েজ খাল কোম্পানী মিশরকে বার্ষিক ৩ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব দিতে এবং দুই জন মিশরীকে সুয়েজ খাল বোর্ডে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হয়। ১৯৪৯ সালের চুক্তিতে স্থির হয় যে, মোট লাভের শতকরা ৭ ভাগ মিশর গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব-স্বরূপ পাইবেন। আজ মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করাই 'লুণ্ঠন বৃত্তি' হইয়া গেল বিশ্ববাসী একথা স্বীকার করিবে কিরূপে?

১০ই আগষ্ট, ১৯৫৬।



কয়লাকুঠির দেশ

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

চা নিয়ে মালা কিছুতেই ও-ঘরে যাবে না। দু' পেয়ালা চা আর দু' প্লেট হালুয়া।

কাঞ্চন বললে, যা তবে কাপড়-জামা বদলে আয়।

মালা একটু হাসলে। বললে, তুমি কী মা!

—কেন রে?

মালা বললে, ভাবছো বুঝি সেই জন্যে যাচ্ছি না!

কাঞ্চন সে-কথার জবাব দিলে না। হাত বাড়িয়ে একটা প্লেট আর চায়ের একটা পেয়ালা তুলে নিয়ে বললে, ততক্ষণে সব ঠাণ্ডা জল হয়ে যাবে।

বলেই সে বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে।

মালা চট্ করে উঠে গিয়ে কাঞ্চনের পথ আগলে দাঁড়ালো। বললে, অমনি তোমার রাগ হয়ে গেল মা? দাও, আমিই নিয়ে যাচ্ছি।

না। ব'লে মেয়েকে পাশ কাটিয়ে মা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

মালা বললে, বেশ যাও। আমিও চললাম।

কাঞ্চন ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, যাসনে, খাবার করতে হবে।

কার জন্যে করবে? ওরা থাকলেই তো!

মালা সত্যিই চলে গেল তার নিজের ঘরের দিকে।

ঘরে আলো নেই। অন্ধকার ঘরে সে তার বিছানার ওপর গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো। এতক্ষণ পরে তার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে এলো। ভগবান শুনেছেন তার ব্যাকুল প্রার্থনা! যে মৃত-দেহটা নিয়ে এত কাণ্ড, সেটা সে দেখেছে। বেশ ভাল করেই দেখেছে। দেখেই সে তার মাকে বলেছিল—মা, আর যেই হোক, এ রঞ্জন নয়।

কিন্তু তার কথা তখন কে-ই বা শোনে, আর কে-ই বা বিশ্বাস করে?

এত দিন পরে কথাটা তার সত্য হলো।

কিন্তু সত্য হয়েই বা কি লাভ? এরই সূত্র ধরে তার বাবার সঙ্গে হলো রঞ্জনের বাবার বিরোধ। তার বাবা রইলো হাজতে। অপমানের চরম হয়ে গেল তার বাবার। তাদের এত দিনের প্রাচীন অভিজাত বংশের।

এ অপমান তার বাবা নিশ্চয়ই সহ্য করবেন না।

চোখের জল মুছে ফেলেছিল মালা। কিন্তু কি জানি কেন, তার চোখ দুটো আবার জলে ভরে এলো।

শাড়ীর আঁচলে চোখ দুটো ভাল করে মুছে সে উঠে দাঁড়ালো।

মা তাকে কাপড়-জামা বদলাবার কথা বললে। কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট! মা তো জানে না—এর চেয়েও খারাপ কাপড়-জামা পরে সে রঞ্জনের সঙ্গে দেখা করেছে মুখুজ্যে-পুকুরে।

তা হোক, তবু সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকার ঘরের মধ্যে চাবি দিয়ে তার আলমারি খুললে, আন্দাজে হাতড়ে হাতড়ে বের করলে তার একখানা রঙীন শাড়ী। যেটা পরেছিল সেটা বদলে ফেললে।

জামা-শাড়ী দুই-ই বদলে আর্শী-দেওয়া আলমারির সুমুখে দাঁড়িয়ে দেখবার চেষ্টা করলে নিজেকে। কিন্তু এক ফালি চাঁদের এক ঝিলিক আলোয় দেখা কিছুই গেল না। ঘরের বাইরে এসে দু'হাত দিয়ে মাথার চুলগুলো ঠিক করে নিয়ে, আঁট-সাট করে পরনের শাড়ীটা টেনেটুনে ছুটলো মায়ের ঘরের দিকে।

—এই ভ্যাখো মা, কাপড়-জামা বদলে···

বলতে বলতে ঘরে ঢুকতে গিয়ে দোরের কাছে থম্‌কে থামলো। দেখলে, ঘরের মেঝের ওপর তারই হাতের তৈরি কার্পেটের আসনটি বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার ওপর বসেছে রঞ্জন, আর তার মা তার সুমুখে বসে বসে তাকে খাওয়াচ্ছে।

বুড়োশিবকে বোধ হয় পাশের ঘরে খেতে দিয়ে রঞ্জনকে এ-ঘরে ডেকে আনা হয়েছে কথা বলবার জন্যে।

মালা যেমন এসেছিল আবার তেমনি ফিরে যাচ্ছিল।

কাঞ্চন বললে, যাস্‌নে মালা, শোন্!

মালা শুনেও শুনলে না কথাটা। সত্যিই চলে গেল।

রঞ্জন মুখ তুলে এক বার তাকিয়ে দেখলে। দেখেই চোখ নামিয়ে নিলে।

কাঞ্চন বললে, ওই মেয়ের আর বিয়ে না দিলে চলে? কই, তুমিই বল তো বাবা!

রঞ্জন চুপ করে রইলো। নীরবে শুধু চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিলে হাত দিয়ে।

কাঞ্চন বললে, হালুয়াটুকু ফেলে রাখলে কেন বাবা ?

রঞ্জন বললে, আর খাব না।

—রাত্রে লুচি খাবে তো ?

—কেন আপনি অত-সব হাঙ্গামা করছেন বলুন তো ? আমি বাড়ী চলে যাই।

দোরের কাছে বুড়োশিবের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। বললে, না। বাড়ী তোমার যাওয়া হবে না। আমি এখন চলে যাচ্ছি, সুলতানপুরের হাল-চালটা কাল দেখবো, দেখে এসে বলবো তোমাকে—তুমি কি করবে।

রঞ্জন বললে, আমাকে একা ফেলে রেখে চলে যাচ্ছেন ?

বুড়োশিব বললে, একা ফেলে রেখে যাচ্ছি না বাবা, যার কাছে তোমাকে রেখে যাচ্ছি, তিনি তোমাকে মায়ের মত স্নেহ-যত্ন করবেন। তোমার মা নেই, মায়ের দুঃখু উনি তোমাকে ভুলিয়ে দেবেন দেখো। আমি চলি।

কাঞ্চন বললে, আপনি চললেন ?

বুড়োশিব বললে, হ্যাঁ মা যাই। আমার কাজ আছে।

বলেই বুড়োশিব পিছন ফিরে চলে গেল।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়তেই কাঞ্চন ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালো। বললে, দেখলে ? আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেলাম।

বাইরে বেরিয়ে এসে চীৎকার করে বললে, আপনি চলে গেলেন নাকি ?

বুড়োশিব ততক্ষণে সিঁড়ি ধরে নীচে নেমে গিয়েছিল। কাঞ্চন সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালো।

—শুনুন। একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

—আমাকে বলছো ? বুড়োশিব ফিরে দাঁড়িয়ে ওপরের দিকে তাকালে।

—হ্যাঁ, আপনাকেই বলছি।

আবার তাকে উঠে আসতে হলো দোতলায়।

কাঞ্চন বললে, মালার বাবাকে খবরটা এক বার দিলে হ'তো না ?

বুড়োশিব বললে, কোন্ খবর ?

কাঞ্চন বললে, রঞ্জনের খবর। রঞ্জন এসেছে শুনলে তবু খানিকটা আশ্বস্ত হবে।

বুড়োশিব হো-হো করে হেসে উঠলো। পবিত্র নির্ম্মল হাসি !

বললে, একেই বলে অর্দ্ধাঙ্গিনী। চট্ করে অমনি মনে হয়েছে—আনন্দটা আমি একাই ভোগ করবো ? আর একজনকে অর্দ্ধেক ভাগ দিতে হবে যে ! দুঃখই শুধু ভাগাভাগি করে নিলাম, সুখের বেলা একাই-বা কেন নেবো ? এই তো ?

ঈষৎ হেসে কাঞ্চন মাথা হেঁট করলে।

অন্ধকারে কোথায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মালা। ছুটে মায়ের

পাশে এসে দাঁড়ালো। বললে, তুমি তো বিয়ে করনি জ্যেঠা, তুমি এ সব জানলে কেমন করে?

বুড়োশিবের মুখে আবার সেই হাসি!

—সে দুঃখের কথা আর বলিস্‌নি মা, বিয়ে আমাকে কেউ করতে চাইলে না তো আমি কি করবো বল্‌? যাও মা, রঞ্জন ওদিকে একা বসে আছে। আমাকে ও-সব কিছু বলতে হবে না মা, আমি জানি। সীতারাম সব খবরই পাবে। তোমরা শুধু রঞ্জনকে কোথাও যেতে দিও না। আমি চল্লি।

বুড়োশিব চলে গেল।

মালা ছিল কাঞ্চনের পাশেই দাঁড়িয়ে। কাঞ্চন তার একটা হাত চেপে ধরে বললে, আয় না ও-ঘরে। কি হয়েছে কি? অত লজ্জা কিসের?

মা তাকে এক রকম জোর করে টেনে নিয়ে যেতে চাইলে, কিন্তু ঘরের দোর পর্য্যন্ত এসে মালা তার মায়ের হাতখানা ছাড়িয়ে নিলে। রঞ্জনের সুমুখে দাঁড়িয়ে বললে, কেন আমাকে এ রকম টানাটানি করছো মা? আমি তো রাজার মেয়ে নই! আমি কে কোথাকার একটা—

কথাটা আর শেষ হ'লো না। কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো তার কণ্ঠস্বর। আবার সে তেমনি ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।



কাঞ্চন বললে, দেখলে বাবা, কি রকম অভিমান দেখলে? তুমি এসেছো, আজ ওর আনন্দের সীমা নেই। কিন্তু—

বলেই সে বসলো তার কাছ ঘেঁষে। চুপি-চুপি বললে, আজ একটি কথা তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করি বাবা! তোমার কি ইচ্ছে আমাকে সেই কথাটি বল।

রঞ্জন মাথা হেঁট ক'রে নীরবে বসে রইলো। মুখ ফুটে কিছুই সে বলতে পারলে না। কি বলবে সে? তার মনের কথা সে তো জানিয়েই দিয়েছে। রাজার মেয়েকে বিয়ে সে করবে না—সে কথা তার বাবার মুখের ওপর বলতে না পেরেই তো সে পালিয়েছিল গ্রাম ছেড়ে।

জবাব না পেয়ে কাঞ্চন আবার বললে, বল বাবা বল। আমি নিশ্চিন্ত হই।

রঞ্জনও বলবে না, কাঞ্চনও ছাড়বে না।

রঞ্জনকে বলতেই হবে।—বল বাবা বল, আমাকে আবার খাবার তৈরি করতে হবে। উনোন্ পুড়ছে।

রঞ্জন তখন লজ্জা-সরমের মাথা খেয়ে বললে, আপনার মেয়ে জানে সে কথা।

কাঞ্চন তাইতেই খুশী হলো। ডাকলে, মালা! মালা!

আসা দূরে থাক্‌, মালা সাড়াও দিলে না।

রঞ্জন বললে, আমি ও ঘরে গিয়ে বসি। আমি থাকলে ও আসবে না।

—একা-একা বসে থাকবে?

রঞ্জন বললে, অনেক বই রয়েছে ও-ঘরে। পড়ি গিয়ে।

বলেই সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে রঞ্জন পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কোথায় মালা? একটি বারও কি সে আসবে না তার কাছে? অভিমান করে যে রাজকন্যার কথা সে বলে গেল, তার জবাব দেবার জন্য মন তার উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে, তবু সে আস্‌ছে না!

ঘরখানা মস্ত বড়, মোজেক্‌-করা মেঝের ওপর দামী দামী আসবাবপত্র, কারুকার্য্য করা মেহগনী কাঠের প্রকাণ্ড পালঙ্ক, মার্বেল পাথরের টেবিল, দেয়ালের গায়ে পালিসকরা কাঠের র‍্যাকে ইংরেজি, বাংলা অনেকগুলি বই। সীতারাম যে এককালে সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ ছিল—তার পরিচয় সর্ব্বত্র।

রঞ্জন র‍্যাক্ থেকে বেছে বেছে একখানা বই নিয়ে সোফায় গিয়ে বসলো। পড়বার জন্যে বইখানা আলোর সুমুখে খুলে ধরলে। মনে মনে খানিকটা পড়েও ফেললে। কিন্তু হঠাৎ এক জায়গায় গিয়ে থমকে থামলো। মনে হ'লো যেন কিছুই তার পড়া হয়নি।

আবার সে প্রথম লাইন থেকে পড়তে আরম্ভ করলে।

কিন্তু এবারও তাই!

একটা লাইনই রঞ্জন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বার বার পড়তে লাগলো। মানেটা কিছুতেই তার মাথায় ঢুকলো না।

বইটা তার চোখের সুমুখে খোলাই রইলো।

খানিক পরে বুঝতে পারলে, চোখ দুটো তার বইএর পাতায় রয়েছে বটে, কিন্তু মন রয়েছে অন্যত্র। বই খুলে সে মালার কথা ভাবছে।

খুট্ করে একটা আওয়াজ হ'লো।

ওই বুঝি এসেছে।

রঞ্জন মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে রইলো সেই দিকে।

কিন্তু কোথায় মালা ?

রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। পা টিপে টিপে গেল সেই জানলার কাছে। খোলা জানালা। আকাশে কোথায় যেন একফালি চাঁদ উঠেছে। বাইরের গাঢ় অন্ধকার ফিকে হয়ে এসেছে। ঘোলাটে আলোয় আবছা আবছা সবই দেখা যাচ্ছে।

জানলার বাইরে ছাতের কোথাও লুকিয়ে হয়ত দাঁড়িয়ে আছে ভেবে রঞ্জন চুপি চুপি ডাকলে, মালা !

কারও কোনও সাড়া পাওয়া গেল না।

আবার ডাকলে। কিন্তু এবারও তাই। কোথায় যেন একটা টিকটিকি ডেকে উঠলো শুধু।

রঞ্জনের ইচ্ছা করতে লাগলো ছুটে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে। তারপর যেখানে হোক্ মালাকে খুঁজে বের করে তার মান-অভিমান ভাঙিয়ে দিয়ে তাকে বলে আসে, তুমি নিশ্চিন্ত থাকো মালা, তুমি আমার, আমিই তোমাকে বিয়ে করবো। তার জন্যে বাবা যদি রাগ করে আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, হাসিমুখে আমি তা-ও সহ্য করবো।

রঞ্জন ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো অধীর আগ্রহে।—যদি সে আসে ! একবারটি যদি মালার সঙ্গে দেখা হয়।

দেয়ালের বড় ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। নিজের কাছেও ঘড়ি নেই। রাত কত হ'লো কে জানে !

কাঞ্চন এলো। এসো বাবা খাবে এসো।

এবার মালার সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা হবে। হাত-পা ধুয়ে রঞ্জন খেতে বসলো।

কিন্তু কোথায় মালা ?

পরিপাটি করে আসন বিছিয়ে গেলাসে জল গড়িয়ে, খাবার থালা সাজিয়ে দিয়ে মালা পালিয়েছে সেখান থেকে। দুষ্টু মেয়ে! মনে মনে রাগ হ'তে লাগলো রঞ্জনের। মালার সঙ্গে দেখা না করে সে এ বাড়ী থেকে যাবে না।

খাবার পর চাকর এসে হাতে আঁচাবার জল ঢেলে দিলে।

পাশের ঘরে তার শোবার ব্যবস্থা হয়েছে। কাঞ্চন নিজে তাকে নিয়ে এলো পথ দেখিয়ে। দোরের কাছে আসতেই দেখা গেল—মালা চট করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। চোখে চোখে দেখা হয়ে গেল দু'জনের। মালার মুখে দুষ্টু হাসিটুকু রঞ্জনের চোখ এড়ালো না।

মা রয়েছে পাশে দাঁড়িয়ে, নইলে রঞ্জন তার পথ আগলে দাঁড়াতে পারতো। ধরতে পারতো তাকে দু'হাত বাড়িয়ে। কিন্তু কিছুই তার করা হলো না। মালা পালিয়ে গেল বিদ্যুতের মত শুধু একটুখানি হাসির ঝিলিক হেনে।

মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধে ঘর ভরে গেছে।

পালঙ্কের উপর বিছানা পেতে দিয়েছে মালা নিজের হাতে। চমৎকার একটি রঙিন চাদর বিছিয়েছে, বালিস দিয়েছে। টেবিলের ওপর রূপোর গ্লাসে জল রেখেছে ঢাকা দিয়ে, পানের বাটায় পান। কোথাও এতটুকু ত্রুটি নেই।

কাঞ্চন বললে, জল দিয়েছিস মালা ?

জলের গ্লাসটা ছিল বাতির আড়ালে। কাঞ্চন বোধ হয় দেখতে পায়নি।

রঞ্জন দেখেছিল। দেখেও কিছু বললে না। চুপ করে রইলো। মালা বলুক না কি বলবে! ঘরে এসে দেখিয়ে দিয়ে যাক্ না—জলের গ্লাসটা কোথায় রেখেছে।

কিন্তু কোনও জবাব পাওয়া গেল না মালার কাছ থেকে।

পারলে রঞ্জন হয়তো সরিয়ে রাখতো গ্লাসটাকে। কিন্তু সে সুযোগ সে পেলে না। কাঞ্চন একটু এগিয়ে আসতেই দেখতে পেলে। বললে, হ্যাঁ দিয়েছে।

রঞ্জন বললে, সব ঠিক আছে। আপনি যান।

কাঞ্চন চলে গেল। যাবার আগে দোরের কাছ থেকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলে গেল, ইচ্ছে করলে দোরের ছিটকিনিটা বন্ধ করে দিতে পারো। দক্ষিণ দিকের জানলাটা খোলা থাক্, হাওয়া আসবে।

দোর জানলা সব কিছুই খোলা রেখে দিলে রঞ্জন।

মালা যদি আসে তো আসুক্ !

[ক্রমশঃ ।

• • • এ মাসের প্রচ্ছদপট • • •

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে সম্রাট সাজাহানের হারেমের একটি 'মর্মর উৎস' প্রকাশিত হয়েছে। আলোক-চিত্রশিল্পী শ্রীনির্মলচন্দ্র মিত্র।

সাময়িক প্রসঙ্গ

নষ্টামির পরিচায়ক

"রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাজ সুরু হওয়া হইতে আজ পর্য্যন্ত যদি সমস্ত বিষয়টি বিচার করিয়া দেখা যায় তবে বাঙ্গালাকে বঞ্চিত করার একটানা চিত্র ছাড়া বিশেষ কিছু চোখে পড়া শক্ত। বিহারের বাঙ্গালা ভাষাভাষী সমস্ত অঞ্চল বাঙ্গালার জনমত একবাক্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দাবী জানাইয়াছিল। রাজ্য কমিশন সে দাবীতে কর্ণপাত করিলেন না। ধলভূমের বাঙ্গালীদের দাবী এবং মানভূমের বিরাট অংশের দাবী অবহেলিত হইল। রাজ্য কমিশন যাহা সুপারিশ করিলেন তাহাতে বিহারের ৩৮০০ বর্গমাইল এলাকা বাঙ্গালার সহিত যুক্ত করার সুপারিশ করা হইল! কিন্তু এটুকু "দাক্ষিণ্য" দেখাইতেও বিহার ও কেন্দ্রের কংগ্রেস নায়করা সম্মত হন নাই। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটী এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করিলেন রাজ্য কমিশনের সুপারিশের ভিতর হইতে কিছুটা অংশ কাটিয়া লওয়া দরকার। সুতরাং পুরুলিয়ার চাষ থানা ছাড়াও চাণ্ডিল ও পতমদা বিহারেই থাকিয়া যাইবে। অতএব রাজ্য কমিশনের সুপারিশ হইতেও ৬০০ বর্গমাইল এলাকা বাদ গেল। কিন্তু সিলেক্ট কমিটী ইহাতেও তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা আরও ২০০ বর্গমাইল এলাকা হইতে বাঙ্গালাকে বঞ্চিত না করিয়া তুষ্ট হইতে পারেন নাই। সিলেক্ট কমিটী হয়ত বলিতে পারেন যে, বিলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সুতরাং এই যোগাযোগের ব্যবস্থা করার বিনিময়ে আরও দুই শত বর্গমাইল এলাকা বিহারের উদরগহ্বরে রাখিতে হইয়াছে। কিন্তু এ যুক্তি শুধু অচল নয়, নষ্টামির পরিচায়ক!" —দৈনিক বসুমতী

কাশ্মীর প্রসঙ্গে

"কাশ্মীর প্রসঙ্গ লইয়া পাকিস্থানের ভাগ্যবন্তেরা পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই ভারতের বিরুদ্ধে যে কুৎসা প্রচার করিয়া এবং নিজেদের জয়ঢাক পিটাইয়া বেড়াইতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত মাঝে মাঝেই পাওয়া গিয়া থাকে। কয়েক বার এই খেলা খেলিতে গিয়া পাকিস্থান ধরাও পড়িয়াছে। কিন্তু তথাপি প্রবাদ অনুসারে যেমন 'দু'কান কাটার লজ্জা নাই, তেমনি পাকিস্থানেরও লজ্জা নাই! সে তাহার সত্য বিকৃতি ও অসত্য প্রচারের অপকর্মে লাগিয়াই আছে। সম্প্রতি সে পৃথিবীর লোককে খুব বড় রকমের একটা ধাপ্পা দিতে গিয়া আবার ধরা পড়িয়াছে। কিছুদিন পূর্বে পাকিস্থান পার্লামেন্টের এক প্রতিনিধিদল সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে পাকিস্থানের কয়েকটি পত্রিকায় এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, মস্কোতে পাকিস্থানী প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনাকালে কমিউনিষ্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নিকিতা ক্রুশ্চেভ বলিয়াছিলেন যে, গত বৎসর কাশ্মীর ভ্রমণকালে কাশ্মীর সরকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তাঁহার কাছে বর্তমান কাশ্মীর সরকারের নিন্দা করিয়াছেন। এ ব্যক্তিরা নাকি অভিযোগ করিয়াছিলেন যে, বর্তমান কাশ্মীর গভর্ণমেন্ট কাশ্মীরের অধিবাসীদের প্রতিনিধিমূলক নহে। অর্থাৎ ভারত গভর্ণমেন্ট জোর করিয়া উহা কাশ্মীরের উপর চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' পাকিস্থানী পত্রিকায় প্রকাশিত এই সংবাদে প্রতিবাদ করিয়াছেন। 'তাস' রাশিয়ার দায়িত্বশীল সংবাদ প্রতিষ্ঠান হিসাবেই বলিতেছেন যে, পাকিস্থানী পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত সংবাদ সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। বাস্তবিক, ইহা একটি কাল্পনিক কাহিনী মাত্র। 'তাস' কর্তৃক এ বিবৃতি প্রকাশ অবশ্য পাকিস্থানকে লজ্জিত করিতে পারিবে না। কারণ, ভারতের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিতে গিয়া অনেক দিন পূর্বেই সে লজ্জা-সরম বিসর্জন দিয়াছে। কিন্তু অন্য যে কোন সভ্য দেশের ক্ষেত্রে হইলে ইহা হইত চরম বেইজ্জতি। যাহা হউক, 'তাসের' দ্বারা হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গা হইবার পরেও পাকিস্থান কি বলে, তাহা জানিতে নিশ্চয়ই সকলেরই কৌতূহল হইবে।"

—যুগান্তর

বস্ত্র সমস্যা

"ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমাচারী আশ্বাস দিয়াছেন, বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির উপর সরকার সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছেন। আবশ্যক হইলে সরকার এ বিষয়ে সতর্ক ব্যবস্থা অবলম্বনে দ্বিধা করিবেন না। বর্তমান বস্ত্রের মূল্য কিছুটা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বৃদ্ধিকে তিনি প্রধানতঃ তুলার মূল্য বৃদ্ধির ফল বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়া বস্ত্রমূল্য বৃদ্ধির আর কোন কারণ আছে বলিয়া তিনি মনে করেন নাই। তুলার মূল্য যাহাতে অযৌক্তিকরূপে বৃদ্ধি না পায়, তাহার জন্য খাদ্য ও কৃষি মন্ত্রণালয় তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহার কথা তিনি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিয়াছেন। শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীযুত কৃষ্ণমাচারী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কথাও শুনাইয়াছেন। এই পরিকল্পনার আমলে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ১৭০ কোটি গজ অতিরিক্ত বস্ত্র উৎপন্ন হইবে। তাহার জন্য কাপড়ের কলগুলির টাকুর সংখ্যা বৃদ্ধির অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। ভালই করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতবাসী তাঁহাদের প্রয়োজনীয় বস্ত্র সংগত মূল্যে পাইবেন, এই পর্য্যন্ত না হয় ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিন্তু বর্তমান সমস্যার প্রতিকার তো ইহাতে সূচিত হয় না! ভবিষ্যতে সুখ-সুবিধা হইবে, অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে কাপড় পাওয়া যাইবে, এই ভরসায় বসিয়া থাকা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নয়। সুতরাং ভবিষ্যতের

সুরাহার চেষ্টা করিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান অসুবিধা নিরসনের প্রতিও যথাসম্ভব দৃষ্টি দান করা সরকারের কর্ত্তব্য।" —আনন্দবাজার পত্রিকা।

অহিংসার বাণী ?

"আমেদাবাদের পথে পথে কংগ্রেসী সরকারের পুলিশ যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা করিয়া ফিরিতেছে, ঠিক সেই সময় লোকসভায় ভারতের প্রধান মন্ত্রী গণতন্ত্রের বাণী ও হুমকি দিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রীর মতে পার্লামেণ্টারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামিয়া এই ভাবে প্রতিবাদ করা অন্যায়। কথাটা তিনি যে ভাবে বলিয়াছেন তাহাতে ইঙ্গিত স্পষ্ট যে, দেশের জনসাধারণের মধ্যে এই ধরণের বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঝোঁক বিদ্যমান। ইহা যে বিদ্যমান অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কংগ্রেস সরকারের পুলিশ বাহিনীর মধ্যেই সহিংস পথে জনসাধারণের সম্মুখীন হওয়ার প্রবণতা বিদ্যমান। আমেদাবাদে অশান্তির জন্য পুলিশী উস্কানির অভিযোগ উঠিলে প্রধান মন্ত্রীর নিকট তাহা অদ্ভুত যুক্তি বলিয়া মনে হয়। হোসিয়ারপুর, কাঙ্কা, বোম্বাই, পাটনা প্রভৃতি স্থানে গুলীচালনা সম্পর্কে তদন্ত কমিটীর রিপোর্টের রায় কি ভারতের প্রধান মন্ত্রী এত শীঘ্র ভুলিয়া গেলেন ?" —স্বাধীনতা

যোগ্যতা বিচার

"সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। যাঁহারা নির্ব্বাচনে নামিবেন তাঁহারা তোড়জোড় সুরু করিয়া দিয়াছেন। কংগ্রেস অফিস সরগরম হইয়া উঠিয়াছে! প্রত্যেকেই নিজ নিজ কৃতিত্ব দেখাইবার আগ্রহে কে কতখানি পরিশ্রম করিয়াছেন, কে দিনে কয় ঘণ্টা চরকা কাটেন, কতক্ষণ খদ্দর পরিয়া থাকেন তার বিশদ বিবরণ পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমাদের একটি পুরানো ঘটনা মনে পড়িয়া গেল। বঙ্গীয় পুরানো আইনসভার আমলে ঢাকায় কিরণশঙ্কর রায়ের বিরুদ্ধে একজন কর্ম্মী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। এক সভায় উভয়ে বক্তৃতা করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কর্ম্মী ভদ্রলোকটি বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলিলেন—কিরণ বাবু বড়লোক, তিনি মোটরে করিয়া আসিয়াছেন, আমি দরিদ্র, সাত মাইল পথ হাঁটিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছি···। কিরণশঙ্কর উঠিয়া বলিলেন,—কাউন্সিলের সভ্যদের যদি হাঁটার প্রতিযোগিতায় নামিতে হয় তবে আমি স্বীকার করিতেছি ইনি আমার চেয়ে অনেক যোগ্যতর ব্যক্তি, ইহাকেই আপনারা ভোট দিবেন"। —যুগবাণী (কলিকাতা)

কমনওয়েলথভক্ত নেহেরু কি করিবেন ?

"প্রশ্ন এই—ভারত কি করিবে? নেহেরুর শান্তির নীতির চরম পরীক্ষা সম্মুখে। এক দিকে কমনওয়েলথে থাকার জন্য, অংশীদার হিসাবে বৃটিশ সিদ্ধান্ত পালনের দায়িত্ব, অন্য দিকে মিশর তথা এশিয়ার নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের সম্মান এবং পররাজ্যলোভীদের হস্ত হইতে এশিয়ার আত্মরক্ষার সমস্যা। নেহেরু কি করিবেন? শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী হাইকমিশনাররূপে কি বলিবেন? ঘর-জ্বালাইয়া, আভ্যন্তর রাজনীতিতে অসাম্য আনিয়া বিশ্বের অপরের কল্যাণের জন্য নেহেরুর শান্তি-নীতির এইবার পরীক্ষা হইবে। শরৎ বসু বহু পূর্ব্বে কমনওয়েলথে থাকার বিপদ সম্পর্কে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করা সত্ত্বেও নেহেরু তাহা গ্রাহ্য করেন নাই। কঠিন অগ্নিপরীক্ষার মুখে পড়িয়া ভারত কি করিবে, তাহাই ভাবিতেছি। শ্রীরাজা গোপালাচারীর ন্যায় পরিষ্কার ভাষায় নেহেরু সরকার নাশেরকে সমর্থন জানাইতে পারেন নাই। যুদ্ধ যদি আসে, মধ্য প্রাচ্য লইয়া যদি তাহার সুরু হয় (বিশ্ববিখ্যাত জ্যোতিষী "কিরো" ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্য প্রাচ্য লইয়াই সূচনার কথা বলিয়াছিলেন) ভারত কি তখন কোনও পক্ষ অবলম্বন করিবে না নিরপেক্ষ থাকিবে? নিরপেক্ষ থাকাই ভারতের স্বার্থের উপযোগী। কিন্তু তাহা সহজসাধ্য নহে। ইহার জন্য আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজন। তাহা শ্রীনেহেরুর বক্তৃতার দ্বারা হইবে না। মানুষকে মানুষের দাম না দিলে সে-চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। সুতরাং "দেওয়ালের লিখনের" ন্যায় সুয়েজ যে ভয়াল ভবিষ্যতের আভাস দিতেছে তাহা হইতে ভারতকে রক্ষার জন্য সরকারকে অতি সত্বর অবহিত হইতে হইবে।" —মেদিনীপুর হিতৈষী।

ভোটার তালিকায় গলদ

"আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের খসড়া ভোটার তালিকা জেলার বিভিন্ন স্থানে জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে টাঙাইয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা জানিলাম যে, জেলার বহু ইউনিয়ন বোর্ড এই তালিকা এমন জায়গায় রাখিয়াছেন বোর্ডগৃহ সব দিন না খোলার জন্য সাধারণের পক্ষে তাহা দেখা সম্ভব হইতেছে না। তাহাদের নাম তালিকাভুক্ত হইয়াছে কি না তাহাও জানা যাইতেছে না। আপত্তি বা নাম তালিকাভুক্তিকরণের জন্য ফরমের অভাবের সংবাদও আসিতেছে। সরকার আগামী ১৪ই আগষ্ট পর্য্যন্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ভোটারদের নাম তালিকাভুক্তর মেয়াদ বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আমরা এই সঙ্গে জেলার এই বিষয় সম্পর্কেও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বিলম্ব হইলে বহু লোকের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা আছে। সুতরাং কর্ত্তৃপক্ষ সত্বর অবহিত হইবেন আশা করি।" —বীরভূমবার্ত্তা

উদ্দেশ্যপ্রসূত ভোটার তালিকা

"স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনের ভোটার তালিকা গত ১লা আগষ্ট সাধারণের অবগতির জন্য শহরের বিভিন্ন স্থানে টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মিউনিসিপ্যাল কর্ত্তৃপক্ষ এক

বিজ্ঞপ্তির দ্বারা জানাইয়া দিয়াছেন যে, যদি কোন যোগ্যতাসম্পন্ন ভোটারের নাম বাদ পড়িয়া থাকে বা যদি কোন অযোগ্য ব্যক্তির নাম ভুলক্রমে ভোটার তালিকাভুক্ত হইয়া থাকে, তবে তাহার বিরুদ্ধে ১৫ দিনের মধ্যে মিউনিসিপ্যাল অফিসে আপত্তি দাখিল করিতে হইবে। যোগ্যতাসম্পন্ন ভোটারের নাম বাদ পড়া বা অযোগ্য ব্যক্তির নাম তালিকাভুক্ত হওয়া এবম্বিধ ভোটার তালিকার ত্রুটি-বিচ্যুতি একটি অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক ব্যাপার এবং সর্ব্বত্রই এই ত্রুটি-বিচ্যুতি কম বেশী পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। যে সব কারণে এই ধরণের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কারণগুলি অন্যতম :—(১) দলীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত দল বিশেষের মনোনীত ও আস্থা-ভাজন কমিশনারের তত্ত্বাবধানে ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও সংশোধন। (২) নির্ব্বাচনী বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী আর্থিক বৎসরের ট্যাক্স আদায়ে বিভিন্ন প্রকারের কারচুপি বা ভোটার হইবার নিম্নতম যোগ্যতা সম্বন্ধে কর্ত্তৃপক্ষের প্রচারের অভাব। (৩) সাধারণ মানুষের ভোটাধিকার সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা এ সম্বন্ধে তাহাদিগকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য স্থানীয় শক্তিশালী সংগঠনের অভাব।" —ভারতী (রঘুনাথগঞ্জ)

পথ পরিত্যক্ত কেন ?

"কৈলাসহর—ফটিকরায় ১৬ মাইল সড়কটি স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর হইতে পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উক্ত সড়কটির মেরামত এবং পুল নির্ম্মাণ কেন করা হয় না, তাহার কোন কারণ আমরা খুঁজিয়া পাই না। কুমারঘাট—কৈলাসহর সড়কটি নির্ম্মাণ করায় পুরাতন সড়কটির প্রয়োজনীয়তা শেষ হইয়া গিয়াছে, ইহা মনে করিলে দুঃখের কারণ হইবে। কৈলাসহরের জনবহুল গ্রামগুলি ফটিকরায় সড়কটির পার্শ্বে অবস্থিত। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে উক্ত সড়কটির গুরুত্ব কোন অংশেই কম নহে। এই বিষয়ের প্রতি আমরা প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি!"

—সেবক (আগরতলা)

পাঠের সুযোগ নেই

স্বাধীন দেশে সুযোগ-সুবিধার অভাবে ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীগণ পড়িতে পারিবে না, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? দেশের ছেলেরা উচ্চ শিক্ষা পাইতে চায়। অথচ তাহারা যদি সুযোগ-সুবিধা না পায় তবে কেমন করিয়া শিক্ষা-বিস্তার হইবে? শিক্ষা-সঙ্কোচ করিলে দেশ রসাতলে যাইবে। আমাদের সামনে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা আছে। এই পরিকল্পনার ক্ষেত্রকে আরও ব্যাপকতর করিতে হইবে। কলেজের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। গ্রামাঞ্চলে নূতন নূতন কলেজ খুলিতে হইবে। অধ্যাপকদের সংখ্যা বাড়াইতে হইবে। হোষ্টেল-নির্ম্মাণ করিতে হইবে। দলে দলে ছাত্রগণ পড়িতে আসিতেছে—ইহা জাতি-গঠনের দিক হইতে সুলক্ষণ। ছাত্রদের প্রথম উৎসাহ যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায় সে দিকে লক্ষ্য রাখা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। এ দিকে সরকারকে আগাইয়া আসিতে হইবে"। —মুর্শিদাবাদ পত্রিকা

জমিদারী বিলোপের পর

"বড় জমিদারদের কথা এখানে আনা নিষ্প্রয়োজন। জমিদারী চলিয়া গেলেও তাঁহারা বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন। কিন্তু ছোটখাট জমিদারীর আয়ে যে মধ্যবিত্ত সংসারের দিন গুজরাণ চলিত, বিকল্প আয়ের অভাবে এবং ক্ষতিপূরণ দিবার এই টালবাহানা পদ্ধতিতে অনেকের অবস্থা আজ দুর্গতির চরম সীমায় উঠিয়াছে। ইহাদেরই কথা আজ সরকারকে সুস্থ এবং ধীরভাবে ভাবিয়া দেখা উচিত। জমিদারী ছিল বলিয়া ইহারা 'বুর্জোয়া' বা 'ক্যাপিটালিষ্ট' নহে। সেই মনোবৃত্তিও ইহাদের নাই। তাহাদের দুর্গতি ও ধ্বংসে কেহ-ই লাভবান হইবেন না ; না, সরকার—না, সমাজ। বরং এই ধ্বংসোন্মুখ সমাজকে বাঁচাইয়া রাখিলে দ্রুত পরিবর্ত্তনশীল সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপকে ইহারাই প্রগতির পথে চালিত করিতে পারিবে। সরকারী নীতি যাহাদের অপটুতায় এবং গাফিলতিতে বানচাল হইয়া সরকারকে লোকচক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতেছে—সেই অকর্ম্মণ্যদের 'বিশ্রামাগার' হইতে টানিয়া আনা ভুল হইয়াছে—বিশ্রামাগারেই তাহাদের পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। 'ডেপুটি' কিংবা 'সাব-ডেপুটি' না হইলে কোনো কাজ হইবে না—এই গোঁড়ামি হইতে সরকারকে মুক্ত হইতে হইবে। সৎ, কর্ম্মঠ এবং সমাজসেবায় অভিজ্ঞ শিক্ষিত সাধারণ দেশের মানুষকে যদি সামান্য 'ট্রেণিং' দিয়া দায়িত্বপূর্ণ কাজে বসান যায়—তাহারা 'ডেপুটি' 'সাবডেপুটি'র চাইতে কোনো অংশে কর্ম্মে ও দায়িত্ববোধে ন্যূন হইবে না। তাহারা প্রাণের টানে কাজ করিবে। সরকারী পরিকল্পনা যদি কার্য্যকরী করিতেই হয় সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীরও সাথে সাথে পরিবর্ত্তন করিতে হইবে"। —বীরভূমের ডাক

পথিপার্শ্বে বৃক্ষরোপণ প্রয়োজন

"সরকারী প্রচেষ্টায় এতদ্দেশে যে সকল রাজপথ পীচরাস্তায় উন্নীত হইয়াছে ঐ সমূহ পথের ধারে বৃক্ষরোপণ একান্ত প্রয়োজন। কারণ বৃক্ষরাজি রাস্তার ক্ষয়ক্ষতি নিবারণের বিশেষ উপকারী এবং বৃক্ষচ্ছায়া পীচরাস্তা সংরক্ষণের পক্ষে প্রধান সহায়ক। কলিকাতা মহানগরীর ন্যায় গ্রীষ্মকালে এতদ্দেশের সমস্ত পীচরাস্তায় জল দেওয়া সম্ভবপর নহে বলিয়াই একমাত্র বৃক্ষচ্ছায়ার উপরই নির্ভর করিতে হয়। কাঁথি—বেলদা, দীঘা, কাঁথি—তমলুক রাস্তার কার্য্যভার সরকারী ডব্লিউ, বি, বিল্ডিংসের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে। কিন্তু ঐ সকল রাস্তার পার্শ্বে প্রতি বৎসর 'রোডস' কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক যেরূপ বৃক্ষরোপণ করা হইত এবার তাহা দেখা যাইতেছে না। কাঁথির প্রাকৃতিক দুর্য্যোগেও এ বৎসর এই সমূহ প্রধান রাস্তার পার্শ্বস্থিত মাটি অনেকাংশে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া পুনর্গঠনের কাজ বহুলাংশে বাড়িয়া গিয়াছে। তা' ছাড়া পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষ সকলও ভাঙ্গিয়া চুরিয়া উৎখাত হইয়াছে। এই কারণে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তা অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি ভারপ্রাপ্ত বিভাগের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বোস মহাশয়ের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।" —নীহার (কাঁথি)

এত চুরির হিড়িক কেন ?

তমলুক সহরে ইদানীং ছোটখাট চুরি প্রায়ই হইতেছে। কিন্তু থানা বা পুলিশ বাহিনীর তাহাতে বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না! প্রকাশ, গত কয়েক মাস হইতে ইহাদের হাল-চাল দেখিয়া সহরবাসীদের মনে এমন একটা ধারনা জন্মিতেছে যে, চুরি-চামারীর খবর থানায় দিলে চোর বা মালের সন্ধান হওয়া দূরে থাক, যাহার ঘরে চুরি হইয়াছে সেই যেন চোর

সাজিয়া যায়। ফলে এই সব হায়রাণীর জন্তই অনেকে আজকাল আর থানায় সংবাদ দেয় কি না সন্দেহ! নচেৎ চুরির কামাই নাই। কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েক দিন অন্তর দুটি তুলার দোকানে চুরি হয়। তারপর পাঁশকুড়া এসোসিয়েশনের কয়েকটি মোটর বাস হইতে রাত্রিতে অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্র চুরি যায়। গত মঙ্গলবার রাত্রিতে বড় রাস্তার পাশেই দণ্ডায়মান পরিতোষ বসুর ট্রাক হইতে এইরূপ অগ্নিনির্ব্বাপক যন্ত্রটি চুরি গিয়াছে। গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে শঙ্করআড়া মেছোবাজারে চন্দ্রদের ভূষিমাল দোকানে চুরি হয়। গত কাল ৫ই আগষ্ট রাত্রিতে বড় রাস্তার উপর, ডাইভার্সন রোড বা মদের দোকানের রাস্তার প্রবেশমুখে পণ্ডাদের মুদি দোকানের কপাট ভাঙ্গিয়া ক্যাশ বাক্স ভাঙ্গিয়া চোরে কিছু নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, আজকাল পূর্ব্বের মত থানার দারোগা বাবুদের সহরের অলিতেগলিতে রাত্রিতে ভ্রমণ করিতে ও হোটেলাদি সন্দেহজনক স্থানে তল্লাসী লইতে কেহ দেখিতেছে না। কয়েক জন কনষ্টেবল বাজারের এধার-ওধার দিনমানে ও সন্ধ্যার পর ঘোরাফিরা করে বটে কিন্তু তাহারা রাত্রিতে কি করে কেহই জানে না! এ অবস্থায় সহরবাসিগণ কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিবে?"

—প্রদীপ (তমলুক)

সত্যমেব জয়তে

"খাদ্যমন্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে, মূল্যসমতা রাখিবার জন্ত কেন্দ্রীয় সরকার দশ লক্ষ টন চাউল ও দশ লক্ষ টন গম মজুদ রাখিয়াছেন। মজুদ চাউল ও গমের কি অবস্থা হয় তাহা সকলেই হাড়ে হাড়ে জানেন। অল্পদিনের মধ্যেই এগুলি অখাদ্য হইয়া যায় ও এই খাদ্য জনসাধারণের মধ্যে বিক্রয় করা হয়—রেশন দোকানি মারফত। মন্ত্রী মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে, চাষী, ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা যাহাতে মজুদ না করেন এই ব্যবস্থা করিতে পারিলে মূল্যের সমতা রক্ষা হওয়া সম্ভব। সরকার চাষী ও ক্রেতার উপর জুলুম করিতে পারেন। কারণ, তাহারা দরিদ্র ও অসহায় কিন্তু ব্যবসায়ীদের নিকট গেলে হয়তো মন্ত্রিত্বই টিকিবে না—চাঁদা বন্ধ হইবে। সরকার এই দুইটির তোয়াক্কা না রাখিয়া সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিলে কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য থাকিবে। মন্ত্রী মহাশয় আরও জানাইয়াছেন যে, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যের উৎপাদন শতকরা কুড়ি ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাতেও খাদ্যের অনটন বাড়িয়াছে। যদি আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় খাদ্যের উৎপাদন পঞ্চাশ ভাগ বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে মন্ত্রী মহাশয়ের হিসাবে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ হওয়ার আশঙ্কা আছে। ইহা মন্ত্রী মহাশয়ই বলিয়াছেন যে 'খাদ্য ও জিনিষপত্রের মূল্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব্ব অবস্থায় ফিরিয়া যাওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই।' ইহাও আর একটি অপ্রিয় সত্য। অতএব 'সত্যমেব জয়তে।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)

সরকারী গাড়ীর অপব্যবহার

"সরকারী গাড়ীর ব্যবহারের যথেচ্ছচারিতা সম্পর্কে বোধ হয় সরকারেরও লজ্জা হইয়াছে। গত ৭ই মে পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের হোম (ট্রান্সপোর্ট) ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারী জেলা অফিসারদের এই সম্পর্কে এক নির্দ্দেশ দিয়াছেন। এই নির্দ্দেশে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রীদের সফরের সময়ে মন্ত্রীদের গাড়ী ছাড়া অন্য কোন সরকারী গাড়ীতে কোন বে-সরকারী ভদ্রলোককে ভ্রমণ করিতে দেওয়া চলিবে না। সরকারী কাজ ছাড়া যদি কোন অফিসার নিজস্ব জরুরী কার্য্যে কোন সরকারী গাড়ী ব্যবহার করেন তবে তাঁহাকে কলিকাতায় প্রতি মাইলে আট আনা এবং মফঃস্বলে প্রথম ২০ মাইলে ছয় আনা এবং তাহার পর প্রতি মাইলে চারি আনা করিয়া ভাড়া দিতে হইবে। ব্যক্তিগত কাজকে সরকারী কাজে রূপান্তরিত করার কলাকৌশল বহু অফিসারের জানা আছে, কাজেই সেখানে বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না। কিন্তু মন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর পিছনে যে কংগ্রেসী রাবণের গুষ্টি সরকারী গাড়ী চড়িয়া কংগ্রেসের আড়ম্বর ও নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন, তাহাদের বেলায় কি পদ্ধতি অবলম্বিত হইবে তাহা এখনও জানা যায় নাই। নির্ব্বাচনের মুখে কংগ্রেসী কর্ম্মীদের

সরকারী গাড়ীতে চড়া সম্পর্কে নূতন সরকারী আদেশের জারী হইতে আর বিশেষ দেরী হইবে বলিয়া মনে হয় না।"

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)

শোক-সংবাদ

আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

গত ২১শে জুলাই (রবিবার) রাত্রি ১২-১৫ মিনিটে বাঙ্গালার প্রখ্যাত মনীষী ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাঁকুড়া সহরে তাঁহার বাসভবন 'স্বস্তিকা'য় পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৯৭ বৎসর। আচার্য্য রায় রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় করোনারী থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হন এবং ইহার কয়েক ঘণ্টা পরই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাঁহার জ্ঞান ছিল। বাঙ্গালার খ্যাতনামা মনীষী আচার্য্য শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৮৫৯ সালের ২০শে অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা বাঁকুড়ার সদর-আলা (বর্ত্তমান সাব্‌জজ) ছিলেন। এম-এ পাশ করিবার পর আচার্য্য রায় কটক কলেজে বিজ্ঞানের লেকচারায় নিযুক্ত হন। তিন বৎসর সেখানে কাজ করার পর তিনি কলিকাতায় মাদ্রাসা কলেজে যোগ দেন। এই কলেজে তিনি দুই বৎসর কাজ করেন। তারপর মাদ্রাসার কলেজ বিভাগ প্রেসিডেন্সী কলেজের সঙ্গে যুক্ত হইয়া যায়। প্রেসিডেন্সী কলেজেও তিনি প্রায় ৫।৬ মাস নিযুক্ত থাকেন। তৎপরে তিনি আবার কটক কলেজে যান এবং ৩০ বৎসর কাল সেখানে অধ্যাপনা করেন। তারপর ১৯১৯ সালে তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ইহার পর হইতে তিনি বাঁকুড়ায় বসবাস করিতেছিলেন। ১৯১০ সালে পুরীর পণ্ডিতসভায় আচার্য্য রায়কে 'বিদ্যানিধি' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত সাহিত্যিক ও বিজ্ঞান-সাধক। তাঁহার মূল্যবান রচনাবলী বঙ্গ-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ৩৬ বৎসর কাল তিনি শিক্ষকতা করেন এবং তাহারই মধ্যে অবসর সময়ে বাঙ্গালা ভাষা, জ্যোতির্বিদ্যা ও দেশীয় কলাচর্চ্চা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর নাম:— সরল পদার্থ-বিজ্ঞান, সরল প্রাকৃত ভূগোল, সরল রামায়ণ, আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ, রত্নপরীক্ষা, বাংলা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ, রাণী বিশ্বেশ্বরী, শিক্ষা প্রকল্প, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংস্কার, প্রাকটিক্যাল ক্যামিষ্ট্রী ফর বিগিনার্স, পূজা-পার্ব্বণ, প্রাচীন ভারতীয় জীবন শব্দ নির্ম্মাণ প্রভৃতি। সম্পাদিত গ্রন্থ— সিদ্ধান্তদর্পণ, চণ্ডীদাস চরিত। গত ১৭ই এপ্রিল বাঁকুড়ায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিশেষ সমাবর্ত্তন উৎসবে আচার্য্য বিদ্যানিধিকে অনারারী ডি-লিট ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় রাজ্যপাল ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত ৭ই আগষ্ট মঙ্গলবার অপরাহ্ণ ৫-৫০ মিনিটে রাজভবনে পরলোক গমন করেন।

মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৯ বৎসর হইয়াছিল। ডাঃ মুখোপাধ্যায় তাঁহার পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালাকে রাখিয়া গিয়াছেন।

ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার প্রখ্যাত খৃষ্টান-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সিটি কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং ১৯১৪ সাল পর্য্যন্ত তিনি এই কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের সেক্রেটারী, কলেজসমূহের ইন্সপেক্টর এবং ইংরাজী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবে তিনি প্রায় ২৫ বৎসর কাল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্য করেন। ডাঃ মুখোপাধ্যায় কিছুদিন 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে ডাঃ মুখোপাধ্যায় ছিলেন অজাতশত্রু। স্বাধীনতা লাভের পর তিনি ভারতীয় গণপরিষদের সহ-সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। কিছুদিন তিনি ভারতীয় সংসদের সদস্যও ছিলেন। ১৯৩৭-৪২ সাল পর্য্যন্ত ডাঃ মুখোপাধ্যায় বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন।

তিনি ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। জনহিতব্রতী ডাঃ মুখোপাধ্যায় রাজ্যপালের পদলাভের পর হইতে বিভিন্ন জনহিতকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। রাজ্যপাল হইয়াই তিনি তাঁহার মাসিক বেতন সাড়ে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র পাঁচ শত টাকা রাখিয়া বাকী পাঁচ হাজার টাকা উচ্চতর ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে অর্পণ করেন। এই ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা তহবিল তাঁহার স্ত্রীর নামে খোলা হয়।

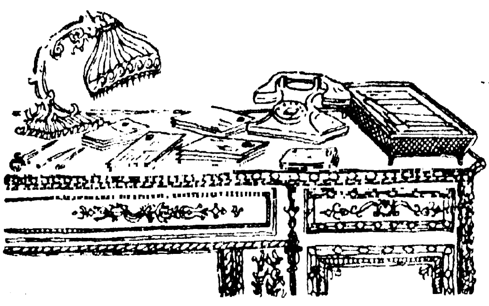
আদর্শ চরিত্র, ত্যাগব্রতী রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিয়া দেশবাসীর বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেন। যক্ষ্মারোগীদের জন্য আরোগ্যোত্তর কলোনী স্থাপনের উদ্দেশ্যেও তিনি বহু অর্থ সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন।

তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন; তন্মধ্যে 'হি ফলোস ক্রাইষ্ট', 'ইণ্ডিয়ান ইন বৃটিশ ইণ্ডাষ্ট্রী,' এবং 'কংগ্রেস এণ্ড দি মাসেস' বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক

কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী রোটারী মেসিনে" শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পাঠক পাঠিকার চিঠি

একটি হারানো সঙ্গীতের ইতিহাস সম্পর্কে

গত ১৩৬২ সালের অগ্রহায়ণ মাসের মাসিক বসুমতীতে শ্রদ্ধেয় নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় মহাশয়ের 'একটি হারানো সঙ্গীতের ইতিহাস" নামে একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ল। গানটির সম্বন্ধে আলোচনাটি পড়ার পর আমার নিজের গানের খাতায় সম্পূর্ণ গানটি খুঁজে পেলাম। স্বদেশীর যুগে সে সময়ে আমরা বেশী বড় হইনে, ছিলাম প্রবাসে জয়পুরে। তার পর পাটনায় (তখন বাঁকিপুর) আসি। সেইখানে কেমন করে সঙ্গোপনে প্রকাশিত ঐ "যুগান্তরের" সংখ্যাটি পেয়েছিলাম আজ আর মনে নেই, সেই সময়ই গানটি খাতায় তুলে নিই। মনে হয়, যিনি, "যুগান্তর"টি এনেছিলেন ফিরিয়ে নিয়ে যান। আমার মনে হয় গানটি এই শেষ দুই কলি ছাড়া অসম্পূর্ণ হয়। অবশ্য বহু শ্রদ্ধাস্পদ ব্যক্তিরাও গানটি নিশ্চয় পড়েছেন, তবুও মনে সবটাই থাকার কথা নয়। যাই হোক, আমি আমার পুরানো খাতার পাতা থেকে শেষ দুইটি কলি তুলে দিলাম। কেউ যদি অন্যত্র পেয়ে থাকেন মিলিয়ে দেখে নিতে পারবেন। একটি হারানো সঙ্গীত 'না হইতে মাগো বোধন তোমার' গানটির উপরে কিছু লেখা ছিল, গানের নাম বা লেখকের নাম, কিন্তু কেন যে সেটি কেটে দিয়েছিলাম বলতে পারি না। সুতরাং কার লেখা ও গানটি, শ্রীযুক্ত গুহরায় মহাশয় ও চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ই জানতে পারেন।

একটি হারানো সঙ্গীত

না হইতে মাগো বোধন তোমার ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গলঘট
জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার, আবার পুজিব চরণতট।
এসো রণচণ্ডী এসো রণসাজে, এসো মা নাচিয়া সন্তানের মাঝে,
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার
শিখাও জননী সমর উৎকট।
নরমুণ্ড ছিঁড়ি পরাইব গলে, সর্ব্বাঙ্গ তোমায় সাজাব কঙ্কালে,
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন,
জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার আবার পুজিব চরণতট।

—জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী। ২ডি, কার্ত্তিক বসু লেন। কলিকাতা-১৬।

পুরীর ফ্ল্যাগষ্টাফ,—বহুবর্ণ চিত্র

শ্রদ্ধেয়, আষাঢ় মাসের বসুমতীর প্রচ্ছদপট দেখিলাম। প্রচ্ছদ-চিত্রের ব্লক ও মুদ্রণপারিপাট্য অতি পরিচ্ছন্ন ও উচ্চাঙ্গের হইয়াছে। সচরাচর বাঙলা দেশের পত্রপত্রিকায় এরূপ দেখা যায় না। বসুমতীর ঐতিহ্যকে ধন্যবাদ! আমার নিজের নির্ম্মিত কোন মূর্ত্তির এরূপ অভিনব প্রতিলিপি ইতিপূর্বে দেখা নাই। আপনার স্বহস্তে অঙ্কিত পুরীর সমুদ্রতীরের 'প্যাষ্টেল' চিত্র দেখিয়া বিস্মিত ও পুলকিত হইলাম। আপনি কেবল মাত্র সুসাহিত্যিক নয়, চিত্রাঙ্কনেও যে আপনার রীতিমত দখল পূর্ব্বে জানিতাম, এখন চোখে দেখার সৌভাগ্য হইল। আশা করি কুশলেই আছেন। আমিও একপ্রকার। নমস্কার। ইতি,—শ্রীরমেশচন্দ্র পাল (শিল্পী ও ভাস্কর)। রূপ-ভারতী। কলিকাতা—৫।

মাননীয়, আষাঢ় সংখ্যার মাসিক বসুমতীতে আপনার প্যাষ্টেলে অঙ্কিত পুরীর ফ্ল্যাগষ্টাফের ছবিখানির জন্য আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। সত্যিই অপূর্ব্ব হয়েছে ছবিখানি। এ অধমের রোম এবং প্যারিসের চিত্রশালাসমূহের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে পরিচয় লাভের সুযোগ হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, রঙের মিশ্রণ সম্বন্ধে আপনার অদ্ভুত জ্ঞান আছে। আপনার লেখনী যে ভালই চলে তার সর্বপ্রথম প্রমাণ পেয়েছি 'আকাশ পাতাল' গ্রন্থে। আর চিত্র-রচনার কাজেও যে আপনি সমান সুদক্ষ, তার প্রমাণ পেলাম ফ্ল্যাগষ্টাফের ছবিতে। এত চমৎকার Realistic Painting আমি খুব অল্পই দেখেছি। শুভেচ্ছান্তে ইতি—রণজিৎ সেন। আর্ট এণ্ড লেটারস পাবলিশার্স। জবাকুসুম হাউস। কলিকাতা—১২।

পত্রিকা সমালোচনা

মাসিক বসুমতী যে বর্ত্তমান বাঙলা ও বাঙালীর একমাত্র প্রিয়তম মুখপত্র, একথা সকলেই স্বীকার করছেন। পত্রিকাটির প্রথম পৃষ্ঠা থেকে শেষ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত কোথাও এতটুকু একঘেয়েমি নেই। পত্রিকাটির বৈশিষ্ট্য সুস্থ ও সুষ্ঠু সম্পাদনা। সত্যিই কথামৃতের কথা সাজানো থেকে সামান্য একটি পাদপূরণও যে পাঠক-পাঠিকাদের জ্ঞান ও তৃপ্তি দিতে পারে, সে কথাটি সপ্রমাণিত। বসুমতীর মারফৎ আমরা যা যা পেয়েছি তাদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি লেখার নাম করি। যেমন, যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত' ও 'জনান্তিক'; রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'; অচিন্ত্য-কুমারের 'পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'; প্রাণতোষ ঘটকের 'আকাশ পাতাল'; বিনয় ঘোষের 'যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর'; রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ'; সরোজ রায়চৌধুরীর 'নীলাঞ্জন' এবং উদয়ভানুর 'রাজায় রাজায়'। আপনাদের নিয়মিত বিভাগগুলির মধ্যে 'পত্রগুচ্ছ' সত্যিই অতুলনীয়। 'কেনাকাটা' 'নাচ গান বাজনা', 'সাহিত্য পরিচয়' অনন্যসাধারণ। 'সাময়িক প্রসঙ্গে' যেন বাঙলা দেশের

একখানি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেখা যায়। এমন সুন্দর আলোকচিত্র আর কোন বাঙলা মাসিক পত্রিকায় দেখাই যায় না। আমরা বিদেশে থাকি। কলেজের দশ জন বান্ধবী মিলে একখানি মাসিক বসুমতী প্রতিমাসে পড়ি। এত তৃপ্তি আর কিছুতে পাই না আমরা। সর্ব্বশেষে পত্রিকার অহঙ্কারশূন্য ও ভয়লেশহীন তরুণ সম্পাদককে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।—কুমারী প্রীতি সেন। লালবাগ, লক্ষ্ণৌ।

ধারাবাহিক রচনা 'রাজায় রাজায়'; 'নীলাঞ্জন'; 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী'—যদিও বেশ কিছুকাল চলছে, তবুও রচনার গুণে এতটুকু ক্লান্তির অবকাশ নেই। বরং উত্তরোত্তর আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে। এজন্য লেখকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।—উমা মজুমদার (গ্রাঃ নং ৪৮২৪৮) গোয়ালপাড়া।

'চিত্রলেখা' উপন্যাসটি বেশ সুন্দর লাগছে। আপনারা 'চারজন' নামে দেশের মনীষীদের জীবনী প্রকাশ করছেন, এটি খুবই আনন্দের বিষয়। এই বিভাগে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে দেখতে চাই।—গে চক্রবর্ত্তী। সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

পুরাতন সংখ্যা চাই

পাঠকদের সুবিধার্থে জানাইতেছি যে, আমার কাছে ১১৫১ সনের পৌষ হইতে চৈত্র। ১৩৬১ সনের বৈশাখ হইতে আশ্বিন এবং চৈত্র। ১৩৬২ জ্যৈষ্ঠ হইতে চৈত্র এই সংখ্যাগুলি উপযুক্ত মূল্য পাইলেই পাঠকগণকে দিতে পারি। ডাকখরচ আলাদা দিতে হবে। তরুণ দাশগুপ্ত। ৪।২, মেহের আলী রোড। পার্কসার্কাস, কলিকাতা—১৭।

নিম্নলিখিত মাসিক বসুমতীগুলি আমার ষ্টকে অতিরিক্ত আছে। ৬০ সালের বসুমতীর মূল্য প্রত্যেকখানি ১৲, '৬২ সালের বসুমতীর মূল্য প্রত্যেকখানি ১।০। যে সংখ্যা প্রয়োজন, সেই সংখ্যার মূল্য পাঠাইলে (মনিঅর্ডারযোগে) সঙ্গে সঙ্গে পাঠাইয়া দিব। নমস্কার, ইতি। অধ্যক্ষ, সাহিত্য নিলয়। পোঃ হাউর, জেলা মেদিনীপুর।

১৩৪৯-এর বৈশাখ হইতে (জ্যৈষ্ঠ বাদে) চৈত্র পর্য্যন্ত পূর্ণ তিন শেট পত্রিকা আছে। ১৩৬০-এর বৈশাখ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত দুই শেট এবং ১৩৬২-এর জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা আছে। এছাড়া ১৩৫৮ সালের কয়েক কপি আছে। ক্রয়েচ্ছুক গ্রাহকগণ নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন। শ্রীহরিপদ সাহা, সংবাদপত্র এজেণ্ট, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

পাঠক-পাঠিকাগণের সুবিধার্থে জানাইতেছি যে, ১৩৬২ সনের বৈশাখ হইতে চৈত্র (জ্যৈষ্ঠ বাদে) এবং ১৩৬৩ সনের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাগুলি পাঠক-পাঠিকাগণ আমার নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারেন। সমস্ত সংখ্যা একত্রে লইলে, আমি ৮০ আনা হিঃ দিতে প্রস্তুত। ৩টি সংখ্যা একত্রে লইলে ১৲ দরে দিতে প্রস্তুত। দুই বা একটি সংখ্যা লইলে পুরো দাম লাগিবে। উপরি লিখিত দর সমূহের উপর ডাক মাশুল লাগিবে। আর, এন মিত্র। ৫, রাজমোহন গোস্বামী লেন, শ্রীরামপুর—

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

[বাংলা ভাষায় একমাত্র সর্ব্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহক-গ্রাহিকা ছড়িয়ে আছে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র দুনিয়ায়। প্রতি মাসেই আমরা শত শত নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও পাব। গত সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে কয়েক জন নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকার আবেদন-পত্র মুদ্রিত করি। প্রত্যেকের চিঠি প্রকাশের স্থানাভাব; সে জন্য বর্ত্তমান সংখ্যাতেও মাত্র কয়েক জনের আবেদন-লিপি প্রকাশিত হয়েছে।—স]

মাসিক বসুমতী নিয়মিত পাঠাইবেন। এক বৎসরের মূল্যবাবদ টাকা পাঠাইলাম।—ইউনুস আলী। লাইব্রেরীয়ান, বাঁশবাটি এম, ই, স্কুল। বাশকান্দি। কাছাড়, আসাম।

Please send M. Basumati as usual.—Mrs. H. Ganguly. Dinatarani.

Yearly subscription sent herewith. Please accept and send the magazine.—Mrs. B. Singha. Hazaribagh Town.

মাসিক বসুমতীর ষাণ্মাষিক চাঁদা পাঠাইলাম। যথারীতি পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—রমেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (কবিরাজ), গৌহাটি, আসাম।

বার্ষিক মূল্য হিসাবে পনেরো টাকা পাঠাইলাম। দয়া করিয়া পত্রিকা যথাশীঘ্র পাঠাইবেন।—শ্রীমতী বাণী রায়। নিজামুদ্দীন, ওয়েষ্ট। নিউ দিল্লী—১৩।

ষাণ্মাসিক চাঁদা পাঠালাম। বিশেষ কারণে বাইরে চ'লে যাওয়ার সময়ে গ্রাহকমূল্য পাঠানো সম্ভব হয়নি।—কুমারী গীতা মিত্র। অবধায়ক মিঃ এ, এল মিত্র। হিউয়েট রোড। লক্ষ্ণৌ।

আমার গ্রাহকমূল্য পাঠালাম। মাসিক বসুমত নিয়মিত পাঠাবেন।—শ্রীমতী রেণুকা মজুমদার। পুরুলিয়া, আসাম।

ছয় মাসের সডাক চাঁদা সাড়ে সাত টাকা পাঠাইলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন। বীণা সিকদার। মোহন পার্ক। মোদীনগর। মীরাট। উত্তরপ্রদেশ।

বসুমতীর বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য পাঠাইলাম। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন ও পত্রিকা পাঠাইবেন।—শোভনা ঘোষ। C/O মিঃ এ, সি, বোস। পুরাণা কিল্লা। লক্ষ্ণৌ।

এক বৎসরের চাঁদা পাঠাচ্ছি। পত্রিকা যেন নিয়মিত পাই।—শ্রীমতী পুণ্যরাণী দাশ। পানিতলা। আসাম।

দয়া করিয়া গত বৈশাখ থেকে প্রকাশিত সমস্ত সংখ্যাগুলি যত শীঘ্র হয় পাঠিয়ে বাধিত করবেন।—শ্রীমতী ছায়া চৌধুরী। নবাবগঞ্জ, কানপুর।

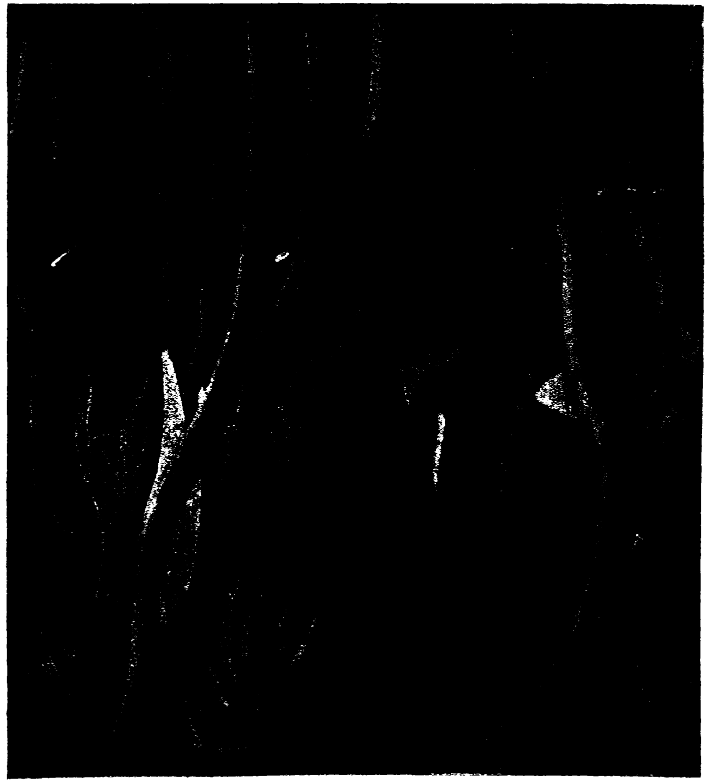


(তৈলরং)

পশমের কাজ

—কে, চৌধুরী অঙ্কিত

(গভর্ণমেন্ট কলেজ অব আর্টস এণ্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌স)



কুলী রমণী

—ভুট্ট প্রধান অঙ্কিত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—ভাদ্র, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "সাধনার প্রয়োজন বটে, কিন্তু দু'রকম সাধক আছে। এক রকম সাধকের বানরের ছার স্বভাব। আর এক রকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব। বানরের ছা নিজে যো-সো করে মাকে আঁকড়িয়ে ধরে। সেইরূপ কোন কোন সাধক মনে করে, এত জপ করতে হবে, এত ধ্যান করতে হবে তবে ভগবানকে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে চেষ্টা কোরে ভগবানকে ধরতে যায়।"

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধরতে পারে না। সে পড়ে কেবল মেউ মেউ করে ডাকে, মা যা করে। মা কখনও বিছানার উপর রেখে দিচ্ছে, কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে। মা তাকে মুখে করে এখানে-ওখানে লয়ে রাখে—সে নিজে মাকে ধরতে জানে না। সেইরূপ কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন করতে পারে না—এত জপ করবো এত ধ্যান করবো ইত্যাদি। সে কেবল ব্যাকুল হয়ে কেঁদে কেঁদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কান্না শুনে আর থাকতে পারেন না, এসে দেখা দেন।"

"কি আর করবে? তাঁকে আমমোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার দেয়, সে লোক কি তার মন্দ করে? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। তিনি যে কাজ করতে দিয়েছেন তাই করো। কিন্তু ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। সংসারে রেখেছেন তা কি করবে? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্ম-সমর্পণ করো—তিনি যা হয় করুন। তাহলে আর কোন গোল থাকবে না। তখন দেখবে তিনিই সব করছেন। সবই রামের ইচ্ছা। সংসার করা সন্ন্যাস করা সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারের কাজ করো। তা না হলে আর কিই বা করবে!"

"গীতায় তিনি বলেছেন,—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত করবো" তাঁর শরণাগত হও, তিনি সদ্‌বুদ্ধি দেবেন—তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দূরে যাবে। এ বুদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা যায়? এক সের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায়? তাই বলছি, তাঁর শরণাগত হও, তাঁর যা ইচ্ছা তিনি করুন। তিনি ইচ্ছাময়—মানুষের কি শক্তি আছে?"

শ্রীরামকৃষ্ণের আশা-বাণী—

"সকলে তাঁকে জানতে পারবে। সকলেই উদ্ধার হবে। তবে কেউ সকাল-সকাল খেতে পায়, কেউ দুপুর বেলা, কেউ বা সন্ধ্যার সময়। কিন্তু কেহই অভুক্ত থাকবে না। সকলেই আপনার স্বরূপকে জানতে পারবে।"

সজ্জাদ সম্বুল

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হিন্দী বি-এর পাঠ্যপুস্তক হিসাবে "সজ্জাদ সম্বুল" নামে যে নাটকটি মনোনীত ক'রেছেন, সেটি যে আসলে "শরৎ-সরোজিনী" নামে একটি বাংলা নাটকের হুবহু অনুবাদ মাত্র, তাই এই প্রবন্ধে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। —স]

বাঙ্গালীর বাহু সত্যই এক দিন ভারতের বাহুতে বল দিয়েছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে বাংলা ছিল অগ্রণী, হয়েছিল অগ্রগণ্য। আজ রাজনীতির পরিস্থিতিতে তার ভাগ্যের চাকা আবার ঘুরেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক কেন অস্বীকার করবেন সত্যকে··চিন্তার ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর অন্ততঃ একশ বছরের অগ্রগতির সত্যকে? নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করতে গেলে এ দুঃখ আমার মনে অত্যন্ত তীব্র হয়ে বাজে যে, উনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্য পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ যে একান্ত প্রয়োজন, এটা বিশেষ কেউ স্বীকার করতে চান না। অথচ বাংলা-সাহিত্য সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান না থাকলে আধুনিক হিন্দী-সাহিত্য পঠন-পাঠন যে অসম্ভব, একথা ঐতিহাসিক সত্য। তাই হিন্দী-সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রে স্মরণ করি পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্লকে। যিনি তাঁর গ্রন্থে বাংলা-সাহিত্য বর্তমান হিন্দী-সাহিত্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা নিয়ে সামান্য আলোচনা ক'রেছিলেন। আর শ্রদ্ধা জানাব পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদীকে। যিনি বাংলা ও হিন্দীতে গভীর ভাবে প্রবেশ ক'রেছেন। তাঁর কাছ থেকে এই ধরণের ইতিহাস আমরা আশা ক'রে আছি। আর স্মরণ করি ডক্টর মহাদেব সাহাকে। জাত হিন্দুস্থানীর এতখানি বাংলাপ্রীতি সুদুর্লভ! এ বিষয়ে কাজও তিনি কিছু করেছেন।

তবু কি বাংলা-সাহিত্যে কি হিন্দী-সাহিত্যে ঐতিহাসিকেরা নিরপেক্ষ বিচারের কর্ত্তব্য ভুলে গেছেন দেখতে পাই। বর্ত্তমান হিন্দী-সাহিত্য যে বাংলার কাছে কতখানি ঋণী, তার বিচার ক'রতে ভুল করলে চলবে কেন? কোনও ঐতিহাসিক হিন্দী-সাহিত্যিকে বাংলার প্রগাঢ় জ্ঞান দেখিয়ে বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ শেলী টলষ্টয়ের নকল করেছেন। নবীনচন্দ্রের তিন খণ্ড 'প্রভাস' গ্রন্থের কথা তাঁরা স্মরণ করেন। মেঘনাদবধে মহাসতী মন্দোদরীর গুণগান হয়েছে বলে তাঁরা মত প্রকাশ করেন। হায় রে রবীন্দ্রনাথ! নবীনচন্দ্র বলে যে কবিকে আমরা জানি, তিনি তিন খণ্ড প্রভাস লিখেছেন আমরা জানি না। ত্রয়ী গ্রন্থের একটি প্রভাস। আর মেঘনাদবধে মহাসতী মন্দোদরীর গুণগান আছে শুনলে, মধুসূদন এই হিন্দী-সাহিত্যের ঐতিহাসিকের 'দুর্দ্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্তে' বিচলিত হ'য়ে 'আত্মবিলাপ' না লিখে আত্মহত্যা করতেন। আবার কোনও হিন্দী-বিশারদ বলেন, যদিও আমার মূল মেঘনাদবধ পড়া নেই তবুও বলতে পারি, মেঘনাদবধের হিন্দী অনুবাদ মূল বাংলার চাইতেও ভাল। এঁর কথার প্রতিধ্বনি কোনও হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে ও দেখেছি!

সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "সজ্জাদ সম্বুল" নামে একটি নাটককে হিন্দী বি-এর পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত করেছেন। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বেশীর ভাগ ঐতিহাসিকই ভুল পথে চলেছেন। তাঁদের ধারণা, গ্রন্থটি মৌলিক। অথবা বাংলা থেকে কিছুটা ছায়া নিলেও আসল জিনিষ খাঁটি হিন্দী! এ নাটকটি পূর্ব্বেও এক বার পাঠ্য ছিল হিন্দীতে এম-এতে। বি-এতে এবার পাঠ্য করা হয়েছে। বোধ হয় তাঁদের ধারণা বদলায় নি। তাই মৌলিক নাটক 'সজ্জাদ সম্বুল'কে পাঠ্যতালিকাতে স্বাগত জানাতে তাঁদের ইচ্ছা মন্দাক্রান্তা হয়নি মোটেই।

কিন্তু 'সজ্জাদ সম্বুল' নাটকটি সত্যই কি মৌলিক?

যদি অভয় দেন ত বলি আমার বিচার কি. নকল লেখা আসল বলা বিশ্রী রকম ইয়ারকি। বইটা নকল··ভেজাল। ভেজাল প্রমাণে পুরস্কার না থাকলেও পরিষ্কার ক'রে বলতে আগ্রহ কম হচ্ছে না।

'সজ্জাদ সম্বুল' গ্রন্থের লেখক (?) উনবিংশ শতাব্দীর (১৮৫৪-১৯০৪) দ্বিতীয়ার্দ্ধের নাট্যকার! সেই যুগের হিন্দী নাট্যকারদের মধ্যে তাঁর স্থান অবিসংবাদিত রূপে সর্ব্বাগ্রে। এই নাট্যগ্রন্থটির ভূমিকাতে একটি সংস্করণের সম্পাদক পণ্ডিত ব্রজভূষণলাল শর্মা বলছেন, "অপনে জমানে মেঁ পণ্ডিত কেশবরামজী ভট্ট কো জো সফলতা মিলী. নাটক মেঁ তো উস বক্ত তক্ উসে কোই ন পা সকা!" ভূমিকা, সজ্জাদ সম্বুল, পৃষ্ঠা 'ক'। বিদগ্ধ ঐতিহাসিক পণ্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল অতখানি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন নি। তবে কেশবরাম ভট্টের গ্রন্থাবলীকে মৌলিক বলেই স্বীকৃতি জানিয়েছেন, অন্ততঃ অনুবাদ একথা কোথাও জানান নি। আর এক জন সমালোচক, শ্রীব্রজরত্ন দাস এই নাট্যকার বিরচিত গ্রন্থ 'সজ্জাদ সম্বুল' এবং 'শমশাদ সৌসন' প্রসঙ্গে বলছেন যে, "জানা যায় যে এ দু'টি গ্রন্থে বাংলা উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে" ("ঐসা জ্ঞাত হোতা হৈ কি বংগলা উপন্যাস কো নাটক কা রূপ দিয়া গয়া হৈ"—হিন্দী নাট্য সাহিত্য: ব্রজরত্ন দাস: পৃষ্ঠা ১৩১) আর এ দু'টি রচনায় মৌলিকত্ব অত্যন্ত স্পষ্ট (ঐ, পৃষ্ঠা ১৩২)!

'সজ্জাদ সম্বুল' গ্রন্থের সম্পাদক পণ্ডিত ব্রজভূষণ লাল শর্মা বল্লেন, 'নাটক দু'টির মূল বাংলার দুটি বিখ্যাত নাটক। কিন্তু হিন্দীতে তাদের 'রূপ' 'রং' একেবারে বদলে গেছে। আর 'সজ্জাদ সম্বুল' এবং তার মূল বাংলা নাটকটি মিলিয়ে দেখলে বোধ হয় এর বেশী কেউ বলতে পারবেন না যে, কাহিনী ত আলবৎ বাংলার, কিন্তু হিন্দীতে তার রং আর রূপ একেবারে আলাদা। ভট্টজী পুরানো কাহিনীতে নবজীবন দান করেছেন।'

[দোনোঁ কা মিলান করনে কে বাদ শায়দ ইস্‌সে অধিক কোই ন কহ সকেগা কি কহানী তো অলবত্তে বংগলা কী হৈ লেকিন উসকা রং রূপ বিলকুল দুসরহী হৈ ঔর ভট্টজী নে তো উসমেঁ দুসরী জান হী ডাল দী হৈ।' ভূমিকা: পৃষ্ঠা খ)।

সম্পাদক ভূমিকাতে জানিয়েছেন যে, তিনি নাট্যবিশারদ। তিনি বাংলা, মারাঠী আর হিন্দী ভাষায় নাটকের অনুসন্ধিৎসু পাঠক। তিনি এই ত্রিবিধ ভাষায় নাটক অধ্যয়ন ক'রে দেখেছেন যে, বাংলা নাটকের 'কোয়ান্টিটি' আছে 'কোয়ালিটি' রদ্দি—"বংগলা মেঁ সংখ্যা তো বহুৎ অধিক হৈ লেকিন কলা কা বিকাশ বহুৎ অধিক নহীঁ" (ঐ ভূমিকা 'খ')। সম্পাদকের কথামৃতে আমরা সঞ্জীবিত। বলতে ইচ্ছা ক'রে, 'আমার মাথা নত ক'রে দাও হে

তোমার চরণ-ধূলার তলে।' নাটক বাংলাতে কিছু নেই তা জানি, কিন্তু তবু গিরিশচন্দ্রের, ক্ষীরোদপ্রসাদের, দ্বিজেন্দ্রলালের, অমৃত-লালের বা রবীন্দ্রনাথের যা আছে, তা সম্পাদক হয় পড়েন নি, নচেৎ পড়ার সময় মানে বুঝতে পারেন নি। কারণ বাংলার নাটক যা আছে, তা হিন্দীর তুলনায় বেশ 'ইয়ে' ধরণেরই আছে। আজ 'সজ্জাদ সম্বুল'—প্রশংসামুখর-সম্পাদক যদি নাটকটির মূল বাংলা 'শরৎ-সরোজিনী' নাটক পড়তেন এবং পড়ে বুঝতে পারতেন তাহ'লে হিন্দী নাটকটি সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত ভাষণের ফাঁকে বাংলাকে একটু কৃপাকটাক্ষ পাতে ধন্য করতেন।

বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের কাছে একটি মথুরানিবাসী ছাত্র কয়েক বছর আগে হিন্দী এম-এতে বিশেষ ক'রে ভাষাতত্বের জন্য আসতেন। আমার ছাত্র-বন্ধুটি কোলকাতার কোনও একটি স্কুলের শিক্ষক। এম-এতে তিনি সেকেণ্ড ক্লাস ফার্ষ্ট বা সেকেণ্ড হবার পর মিষ্টান্ন এবং তাঁর পড়ার কিছু বই আমাকে দিয়ে যান। তখনও 'সজ্জাদ সম্বুল' বইটি আমি ভাল ক'রে পড়ি নি। পড়ে তাজ্জব বনে গেলাম! বাংলা 'শরৎ-সরোজিনী' নাটকের হুবহু অনুবাদ এ যে। আমি তখন 'আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের উপর বাংলার প্রভাব' নিয়ে গবেষণায় নিরত। এই সম্বন্ধে যা কিছু জানতে পারলাম, আমার নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিবেদন করলাম। আমার নিবন্ধের বিচার করলেন ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ এবং কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দীর বিভাগীয় অধ্যক্ষ সর্ব্বজনমান্য ডক্টর হজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী। তাঁদের পরীক্ষায় পাশ করল আমার নিবন্ধ। পণ্ডিত দ্বিবেদী বিশেষ খুসী হয়েছেন আমার নাটক সম্বন্ধীয় আলোচনায়। তাঁকে সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি। নিরপেক্ষ মন নিয়ে বিচার করার লোক ভারতবর্ষে নেই। বাংলার যাঁরা হোমরা-চোমরা তাঁরা হিন্দী সাহিত্য সম্বন্ধে কোনও খবর না রেখেই বলেন যে হিন্দী সাহিত্য বাঙ্গালীর পাঠ্য নয়। এত বড় নির্বুদ্ধিতা এবং অজ্ঞতা যে কি ক'রে তাঁরা প্রকাশ করেন, আমি জানি না। কেন না পণ্ডিত বলে তাঁদের কেউ সম্মানিত, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে তাঁরা অনেক দিন উজ্জ্বল ক'রে রেখেছেন। অথচ নিরপেক্ষ মন তাঁদের নেই এবং হিন্দী সম্বন্ধে কৌতূহলও নেই!

এই সমস্ত পণ্ডিতদের জানা দরকার যে প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য এবং সাহিত্যের (অাউধী, ব্রজভাষা সাহিত্যকে ধ'রে) তুলনামূলক আলোচনা করলে ভারতী স্বয়ম্বরা হ'য়ে হয়ত হিন্দী সাহিত্যকেই বরমাল্য দেবেন, বাংলাকে নয়। এই সব বাঙ্গালী-পণ্ডিতদের জানা উচিত যে, প্রাগাধুনিক বাংলা সাহিত্য যতখানি দীন, সমসাময়িক হিন্দী সাহিত্য ততখানিই সমৃদ্ধ। আবার আধুনিক হিন্দী (খড়ীবোলী) সাহিত্যের বিচারে যে সমস্ত হিন্দী সাহিত্য বিশারদেরা 'প্রেমচন্দ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সাথ ভারতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাহিনীকার হেঁ' বলেন তাঁরা মিছিমিছি গলাবাজি করেন। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প বিস্ময়ের বস্তু। জানি না, পৃথিবীর আর কোন দেশে এমন জিনিষটি পাওয়া যায়। প্রেমচন্দ ছোট গল্প লেখক হিসেবে রবীন্দ্র পরবর্ত্তী অনেক শক্তিশালী বাঙ্গালী ছোট গল্প লেখকের সঙ্গেও যে সমমর্য্যাদা পাবেন, নিরপেক্ষ বিচারে একথা মনে করি না। উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রিয়রঞ্জন বাবু সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রেখেও একথা বলা যেতে পারে যে, শরৎচন্দ্র এবং প্রেমচন্দ সমপর্য্যায়ভূক্ত মনে করার কোনও কারণ নেই। শরৎচন্দ্র সত্যিকার শিল্পী। তাই আধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে বাংলার প্রতিধ্বনি এবং প্রাগাধুনিক হিন্দী সাহিত্যকে বাংলার প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। এই নিরপেক্ষ বিচার নিয়ে এগিয়ে এলে দেখা যাবে যে, আমরা যে নাটকটি আলোচনা করব, তাকে অনুবাদ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আমি বাংলা 'শরৎ-সরোজিনী' এবং হিন্দী 'সজ্জাদ সম্বুল' পাশাপাশি রেখে পড়ে তাজ্জব বনে গেলাম।

অনুবাদকের মৌলিকত্ব নিম্নলিখিত পরিবর্ত্তনের মধ্যে :—

(ক) পাত্র-পাত্রীর নাম পরিবর্ত্তন—আব্বাস (হিন্দী), বিনয় (বাংলা); সজ্জাদ (হি), শরৎ (বাং); শমশের বাহাদুর (হি), মতিলাল (বাং); হেমচন্দ্র (হি), হরিদাস (বাং); সম্বুল (হি), সরোজিনী (বাং); গুলশন (হি), সুকুমারী (বাং) প্রভৃতি···

(খ) গ্রন্থের নাম পরিবর্ত্তন :—'সজ্জাদ সম্বুল' (হি), 'শরৎ-সরোজিনী' (বাং)।

(গ) ঘটনাস্থলের নাম পরিবর্ত্তন :—

প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্যে বাংলায় "কলিকাতা, বৌবাজার, শরৎকুমার বাবুর বাসাবাটী," হিন্দীতে "পটনা, বাকরগঞ্জ, সজ্জাদ কা ডেরা।" দ্বিতীয় দৃশ্যের "কলিকাতা, ইডেন গার্ডেন" পরিবর্ত্তিত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে 'পটনা, বাগ হ'য়ে।' তৃতীয় দৃশ্যের "আনারপুর, মতিলাল বাবুর বাটী" হিন্দীতে "বিহার খানকাহ, শমশের বাহাদুর কা মকান" রূপে পরিবর্ত্তিত হ'য়েছে। এই রকম সকল দৃশ্যের ঘটনাস্থল হিন্দীতে বদলে 'লোক্যাল কালার' দেবার চেষ্টা হয়েছে।

হিন্দীতে লেখক বাংলা থেকে নিছক অনুবাদই করেছেন। কেবল 'শরৎ-সরোজিনী' গ্রন্থের বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিক হরিদাস হিন্দীতে হেমচন্দ্র নামে বাঙ্গালী বৈজ্ঞানিকই রয়ে গিয়েছেন। এতে জাত রক্ষা হয়েছে, কিন্তু মান রক্ষা হয়নি। কারণ হিন্দী নাটকে বাঙ্গালীর বাংলা কথায় যে হাস্য সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছে, তা ঠিক শোভন হয় নি। আর একটা পরিবর্ত্তন স্মরণযোগ্য। মূল নাটকের হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালাকে হিন্দী নাটকে (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্যে) বাঙালী সার্ভেয়ার রূপে উপস্থিত করা হয়েছে। মূল নাটকের হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালাকে বাঙ্গালী নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস (দুর্গাদাস দাস) হাজির করেন নি হিন্দুস্থানীদের হাস্যাস্পদ করার জন্য। হিন্দুস্থানী পাহারাওয়ালাই সচরাচর দেখা যায় বলেই তিনি ঠক-পাহারাওয়ালাকে হিন্দুস্থানী করেছিলেন। কিন্তু হিন্দী নাটকটিতে ঠক-বাঙ্গালী সার্ভেয়ার যখন বাংলা কথার সাহায্যে এবং ধূর্ত্ততার দ্বারা আব্বাসকে ঠকাতে গিয়ে হিন্দুস্থানী দর্শক বা শ্রোতৃমণ্ডলীতে হাসির তুফান তোলে তখন মনে করতে কষ্ট হয় যে অনুবাদক বাংলা থেকে কেবল অনুবাদই করছেন না, চরিত্রের নাম এবং জাতি পরিবর্ত্তন ক'রে বাঙ্গালীর উপর এক হাত নিচ্ছেন। বড় কষ্ট হয় ভাবতে যে,—

"ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি শুধু ব্যঙ্গ করে,
ধ্বনি কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে।"

বাংলা "শরৎ-সরোজিনী" এবং হিন্দী "সজ্জাদ সম্বুলে"র মধ্যে কি ধরণের সম্বন্ধ, তা দেখাবার জন্য দু'টি উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথম অনুবাদটিতে (ক) হিন্দুস্থানী (বা উর্দু) ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ সজ্জাদ-সম্বুলকে মুসলমান রূপে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার

হিন্দীতে। বাংলাতে শরৎ বা সরোজিনী (সরোজ) হিন্দু। দ্বিতীয় অনুবাদটির (খ) ভাংগা হিন্দী।

(ক) শরৎ-সরোজিনী

প্রথম অঙ্ক : প্রথম গর্ভাঙ্ক

কলিকাতা, বহুবাজার, শরৎকুমার বাবুর বাসাবাটী। শরৎকুমার টেবিলে বসিয়া পত্র লিখিতেছেন।

শরৎ। (পত্র লিখন সমাপ্ত করিয়া) বড় তাড়াতাড়ি লেখা হয়েছে, এক বার পড়ে দেখি কি লিখলেম। (পত্র পাঠ)—

কলিকাতা

২রা ফাল্গুন, সন ১২৮০ সাল।

সরোজ,

তোমরা ভাল আছ শুনিয়া সুখী হইলাম। আমিও এক প্রকার ভাল আছি। আগামী শনিবারে আমাদের বিজ্ঞানালোক বিস্তারিণী সভার অধিবেশন। সেই দিন হরিদাস বাবু—ইনি কলিকাতার এক জন প্রসিদ্ধ বিদ্বান—'মনুষ্য কপিবংশোদ্ভূত' এই বিষয়ে একটি দীর্ঘ রচনা পাঠ করিবেন। অনেক তর্ক বিতর্ক হইবার সম্ভাবনা। আমাদিগের সভাপতি মহাশয় এই মতের ভয়ানক বিরোধী। আমার নিজের মতের কিছু স্থির নাই। তর্কে কি সিদ্ধান্ত হয় পরে লিখিব। ইহার পরের অধিবেশনে বোধ হয় আমাকে রচনা পাঠ করিতে হইবে।

* * * *

(ক) সজ্জাদ সম্বুল

পহলা অঙ্ক : পহলী ঝাঁকী

স্থান—পটনা, বাকরগঞ্জ, সজ্জাদ কা ডেরা। সজ্জাদ মেজপর চিট্‌ঠী লিখ রহা হৈ।

সজ্জাদ। (চিট্‌ঠী লিখ কর) বড়ী উতাবলী মেঁ খৎ লিখা হৈ। জরা পঢ় তো জাউ। (চিট্‌ঠী কী পঢ়না)

বাঁকীপুর

৪থী মার্চ ১৮৭৫

হমারী প্যারী সুম্বুল,

তুম লোগোঁ কী খৈরোআফিয়ৎ সুন কে বহুৎ খুশ হু'আ। মৈঁ ভী য়হাঁ খুশ হুঁ। আইন্দা শনীচরকো অঞ্জুমান 'সাইন্টিফিক এ্যাসোসিয়েশন' মুনকিদ হোগী। উস দিন বাবু হেমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী জো পটনে কে আলিমোঁ মেঁ সে হৈঁ, ইস মজমূন কা এক লেকচর পঢ়েঙ্গে কি 'আদমী বন্দর কী ঔলাদ হৈ'। মুমকিন হৈ কি উস দিন বড়ী বহস হো। ক্যোঁ কি মীর মজলিস ইস রায়কে বিলকুল বরখিলাক হৈঁ। অভীতক মৈঁ নে অপনী রায় কোঈ কায়ম নহীঁ কী হৈ। আখির অঞ্জুমান মেঁ জো বাৎ তয় হোগী উয়হ ভী তুম্হেঁ মৈঁ লিখ ভেজুঙ্গা। ইসকে বাদওয়ালী অঞ্জুমান মৈঁ মুঝী কো কহীঁ জবাব-মজমূল ন লিখনা পড়ে।

* * * *

আর একটি অংশ বাংলা ও হিন্দী নাটক থেকে উদ্ধার করছি। প্রথম উদ্ধৃত অংশ (ক) যদি বুঝতে অসুবিধে হয়ে থাকে সাধারণ বাঙ্গালী পাঠকের, এই (খ) অংশটুকু বুঝতে কোনও পাঠকেরই নিশ্চয় কোনও অসুবিধে হবে না। কারণ এখানে পাত্রের মুখে সরস হিন্দী দেওয়া হয়েছে।

শরৎ-সরোজিনী

প্রথম অঙ্ক : তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

আনারপুর, মতিলাল বাবুর বাটী।

মতিলাল বাবু খাটোপরি শয়ন করিয়া আলবোলায় ধূমপান করিতেছেন। এক জন ভৃত্য পদসেবা করিতেছে—নিকটে বিনয় দণ্ডায়মান।

মতিলাল। এই পা-টা টেপ, এই পা-টা টেপ—আরে বেটা ভাল ক'রে টেপ। ভাত খাসনে নাকি? উঁহু-হু, বেটাচ্ছেলে মেরে ফেলেছে। (ভৃত্যকে এক চপেটাঘাতপূর্ব্বক) বেটাচ্ছেলে, পাজী, দু'বছর আমার বাড়ী রয়েছিস, এখনও পা টিপতে শিখলি নে? বেটাচ্ছেলে পাজী? (ভৃত্যের অশ্রুমোচন) হাঁ, হাঁ, অমনি কোরে টেপ, তোর মাইনে বাড়িয়ে দেবো। (চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) আঃ বেশ হচ্ছে, বেশ হচ্ছে। ঐখানটা টেপ। আঃ (সুখানুভব ও মধ্যে মধ্যে আলবোলা টানন) (কিয়ং বিলম্বে) আরে ঘটকী মাগী বিষড়ে গিয়েছে?

* * * *

(খ) সজ্জাদ সম্বুল

পহলা অঙ্ক : তীসরী ঝাঁকী

স্থান—বিহার, খানকাই, শমশের বহাদুর কা মকান।

(শমশের বহাদুর চারপা পর সোয়ে লিহিফ তানে সটক সড়সড়া রহে হৈঁ, ঔর এক নৌকর পাঁও (পাঁব) দাব রহা হৈ—হাথ জোড়ে সব নীচা কিয়ে অব্বাস সামনে খড়া হৈ।)

শমশের—আরে ইস্ পাঁও (পাঁব) কো দাব, ইস্ পাঁও কো। বহরা হৈ ক্যা? জোরসে রে জোরসে। আজ ভরপেট খায়া হৈ কি নহীঁ। আহ হা হা, হরামজাদে নে হমারী জান লী, লী হমারী জান। (উঠকে ঔর নৌকর কো এক তমাচা জড়কে।) সুঅর হরামজাদা দো বরসসে হমারে য়হাঁ কাম কর রহা হৈ, অভীতক হমারী কে পিল্লে নে পাঁও দাবনা নহী সিখা হৈ। (নৌকর আঁসূ পোছতা হৈ) হাঁ হাঁ ওহী ওহী (বহীঁ বহীঁ)। জরা ঔর জোরসে (বীচ বীচ সেঁ সটক সড়সড়াতা জাতা হৈ। আঁখ বন্দ করকে) হাঁ দেখতো ঐসে হী, অব তেরা মহীনা বঢ়া দুঙ্গা। আঃ (কুছ দের কে বাদ) ক্যোঁরে করিমন বুঢ়িয়া অম্বের গই?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী বিভাগ বি, এর এই পাঠ্য-পুস্তককে আশা করি মৌলিক বলবেন না।

কেন?

'হায় মা ভারতি, চির দিন তোর কেন এ কুখ্যাতি ভবে,
যে জন সেবিবে ও পদ-যুগল সেই সে দরিদ্র হবে?'

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

[illegible] পথে বিলেত

দেবেশ দাশ

প্রশ্ন—মিষ্টার দাশ, আপনি ত প্রায় দু' যুগ পরে ইয়োরোপে আবার এলেন। তখন আপনি ইংলণ্ডকে যে রকম দেখে' ছিলেন, তার বর্ণনা আমরা আপনার ইংরেজী "ইয়োরোপা থ্রু ইণ্ডিয়ান আইজ" বইয়ে পেয়েছি। তার তুলনায় ইংলণ্ডকে আপনি এখন কেমন দেখছেন?

উত্তর—তখন আমি ছাত্র ছিলাম আর বিলেত ছিল ভারতের ছাত্রদের কৈশোর স্বপ্নের তীর্থ, সাংসারিক সাফল্যের সোনার-কাঠি। বিলেতের মাটিকে মনে হত সোনা আর আকাশ ছিল ইন্দ্রধনুর রঙে উজ্জ্বল। অনেক কল্পনা তার সঙ্গে মেশান ছিল।

প্রশ্ন—আজ অবশ্য আপনি আকাশে এরোপ্লেন চলাচলের জন্য আমাদের সরকারের সঙ্গে বিমান-চুক্তির জন্য স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধি-নেতা হয়ে এসেছেন। কিন্তু বিলেতের মনের আকাশের দিকেও নিশ্চয়ই নজর রেখেছেন? এদেশের মাটির উপরেও আপনার লক্ষ্য আছে?

উত্তর—এখন আমার কাছে মাটির সংসার আর মনের আকাশ দু'টো মিলিয়ে তবে সম্পূর্ণ পৃথিবী ও সার্থক মানুষের ছবি ফুটে ওঠে। আপনাদের দেশের প্রত্যেকটি অগ্রগতি উন্নতি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমার দেশের জন্য আহরণ করে নিতে চাই। কাজেই আরো বেশী বাস্তব দৃষ্টিতে বিলেতকে এখন দেখছি। ১৯৩১ সন থেকে বিলেতে বাণিজ্যের মন্দা চলছিল। বেকারের সংখ্যা ছিল খুব বেশী। লোকের মনে ছিল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সংশয় আর বর্তমান সম্বন্ধে হতাশা। মুখেও ছিল তার ছাপ। তবু দেখে আশ্চর্য লাগত যে, সে ছাপকে ওরা মুছে ফেলত রোজকার জীবনের হাসি-ঠাট্টা আনন্দ-পরিহাস দিয়ে।

প্রশ্ন—ভারতবর্ষে বোধ হয় আপনারা ঠিক এমনটি করতে পারেন না?

উত্তর—সে কথা অনেকটা ঠিক। তার কারণ এদেশে জীবনের বিস্তার অনেক বেশী। এই ধরুন না—মানুষের জীবনে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে প্রেম, জীবনকে যা দেয় প্রেরণা, মরণকে দেয় সান্ত্বনা। সেই প্রেম ইয়োরোপে বড় বিচিত্রমুখী, চঞ্চল, অনেক মিষ্ট। জীবন্ত [illegible], চায় জীবন্ত প্রেম। পথে পথে কত নব পরিচয়, নব অনুভব, স্মৃতির পথ চেয়ে কত মূর্তির আনাগোনা। তাকে অস্বীকার করে নি ইয়োরোপ। সে দিকে চোখ বুজে থাকে নি মানুষের মন। তাকে অস্বাভাবিক মনে করে মুখ ঘুরিয়ে নেয় নি মানুষের সমাজ। কাজেই এক বার আঘাত পেলেই মানুষ নুয়ে পড়ে না, অশ্রু মুছে জীবনে আবার আরম্ভ করে নতুন অধ্যায়।

প্রশ্ন—সেটা কি সব ক্ষেত্রেই?

উত্তর—হ্যাঁ, সব ক্ষেত্রেই। এদেশের জীবনের পিছনে এটাই হচ্ছে দার্শনিক তথ্য। পরলোকের চিন্তা নয়, ইহলোকের সার্থকতার বাসনাই এই দার্শনিকতার ভিত্তি। তাই এত বড় যুদ্ধ গেল, এত হানাহানি, হাহাকার। কিন্তু আজ মাত্র দশ বছরের মধ্যেই তার কতটুকু ছাপ বাকি আছে? এমন কি লণ্ডনের সব চেয়ে বেশী বোমায় বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলিতে পর্য্যন্ত পড়েছে নূতনের প্রলেপ, নব পরিকল্পনার স্পর্শ। যেথায় যেটুকু ভাঙ্গাচোরা আছে, তার দিকে তাকায় না পর্য্যন্ত কেউ। কি ভাবে নতুন গড়া হচ্ছে তার দিকেই সকলের নজর। ইংলণ্ডের মনের প্রসার এত বেশী যে, যাদের অস্ত্রের আঘাতে জীবনে পড়েছে এত ক্ষতচিহ্ন, তাদেরই অকুণ্ঠ ভাবে সহায়তা করছে ইংলণ্ড। যাতে গত দিনের শত্রুও এখন মিত্র হয়ে দাঁড়ায়, জীবনের [illegible] সহকর্মী। অতখানি প্রসার আছে বলেই যুদ্ধের ধ্বংস ও শোকের মূর্তি আজ ইংলণ্ডে নেই। লোকে তেমনি সহজ ভাবে হাসছে। মুখে জ্যোতি, জীবনে গতি। তার আকাশে-বাতাসে সমৃদ্ধির ছোঁয়া ফিরে এসেছে। এখানে বেকার বলতে গেলে বোধ হয় কেউ নেই। চার দিকে কর্মখালির বিজ্ঞাপন। কর্মীর চেয়ে কাজ বেশী।

প্রশ্ন—আমরা ত বেকার থাকতেও চাই না।

উত্তর—সম্পূর্ণ সত্য। কর্মই যাদের ধর্ম তারা বেকার থাকবে কেন? কাজেই যে অসহায় বা পঙ্গু সেও একটা বাজনা বাজিয়ে, বা রাস্তায় ছবি এঁকে বা দেশলাই বিক্রী করে উপায় করে যাচ্ছে। ভিক্ষায় ভরণপোষণ চালাবার লোক বিলেতে পাই না। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মবাদের আদর্শকে এরাই যথার্থ রূপ দিয়েছে। দরিদ্রকে ইংলণ্ড সেবা করেছে ভিক্ষা দিয়ে নয়, কাজ জুগিয়ে। মানুষকে সমান পর্য্যায়ে সমাজবাদের আদর্শে এনে দিচ্ছে—উঁচুকে নীচে নামিয়ে নয়, নীচুকে উঁচুতে উঠে আসতে সহায়তা করে। তাই এদেশে এত গুরুভার ট্যাক্স সত্ত্বেও চার দিকে এত সমৃদ্ধি দেখছি। আজ কোন থিয়েটারের বা অপেরা ব্যালের জন্য সীট খালি পাবেন না। এরা শুধু নিজে সুখী হতে চায় নি, সে সুখের ভাগী করে নিয়েছে দেশের সবাইকে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "হতে হবে তাহাদের সবার সমান"। তাই এরা হতে চলেছে—কিন্তু অপমানে নয়, সম্মানে। মানুষের মত মানুষ হয়ে, সচ্ছল মানদণ্ডের জীবন-যাত্রায়। এখানে লোকে অসুখে পড়লে অচিকিৎসায় থাকবে না; বার্ধক্যে অকর্মণ্য হয়ে পড়লে অসহায় হবে না। এমন কি মনের দিক থেকে একলা হয়ে পড়লেও নিঃসঙ্গ হবে না। কত বড় ভরসার কথা! চাই না আমার ভাবী পরলোকের ভরসা। আজকের দিনের আশা ইহলোকের বাসাই আমার কাছে বড় কথা।

প্রশ্ন—তবে কি আমরা পরলোক সম্বন্ধে ভাবি না বলে মনে করেন? অথবা যুদ্ধের পর এদিকে এদেশের দৃষ্টি আরো বেড়ে গেছে বলে মনে হয়?

উত্তর—সে কথা মনে করি না। আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমি আবার রবীন্দ্রনাথের শরণ নেব।

> বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়,
> অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
> লভিব মুক্তির স্বাদ।

বিলেতের মানুষ যে এই জীবন-বন্ধনের মধ্যে মানসিক মুক্তির আস্বাদ লাভ করছে, জীবনের সঙ্গে বাসর জাগাবার জন্য মানসে আসর পেতেছে, এই আনন্দ-বাণীই হোক উপনিষদের ভাষায় আমাদের জীবনে ব্রহ্মবাণী। আনন্দং ব্রহ্ম; আনন্দেই জীবন জন্মলাভ করে। সেই জীবন আমাদের দেশে যেন মুকুলিত হয়, এই কামনাই এদেশে এসে বার বার করছি।

প্রশ্ন—'ইয়োরোপাতে' কিন্তু আপনি লিখেছিলেন, যে মনে শান্তি নেই তার সমৃদ্ধি আছে, সংহতি নেই। শক্তি আছে, শান্তি

। তাহলে পশ্চিমের এই জীবনবাদের উপর আপনার এত কর্ষণ কেন ?

উত্তর—কারণ অতি সোজা। আমরা ত' এত দিন শান্তি ও সংহতির সাধনা করে মাথ্ আর্ণল্ডের কবিতার ভাষায় আমাদের মাথার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে আর আমরা মাথা নীচু করে সে ঝড়কে নির্বিবাদে বয়ে যেতে দিয়েছি। কিন্তু এখন ত আর সে ভাবে দিন কাটান চলবে না ? পশ্চিমের শিক্ষার ঢেউ, অহরহ বিজ্ঞানের আবিষ্কার দূরত্বকে মুছে দিয়ে ভারতকে ইয়োরোপের কাছে টেনে আনছে। কাজেই শুধু মনে শান্তিমগ্ন হয়ে বসে থাকাই এ যুগে শান্তির পথ নয়। তা ছাড়া স্বাধীন ভারতবর্ষের পৃথিবীর কাছে দায়িত্ব আরো বেড়ে গেছে।

প্রশ্ন—তা হলে আপনারা নতুন কি পথ খুঁজছেন ?

উত্তর—আমাদের আজ সারা পৃথিবীর সঙ্গে সমানে পা ফেলে এগিয়ে যেতে হবে। যেখানে সমস্ত প্রগতিশীল দেশে নিত্য নূতনের সাধনা চলছে সেখানে ভারত ত শুধু স্থাণু হয়ে থাকতে পারে না ! কাজেই আমরাও নতুনকে যাচাই করে দেখতে চাই। সেই যাচাই রোজ হচ্ছে পশ্চিমে। বিশেষ করে বিলেতে। এদেশে কখনো বিপ্লব হয় না, কারণ রোজ রোজ একটু একটু করে অলক্ষ্যে বিপ্লব হয়ে যাচ্ছে। মনে, সমাজে, রাষ্ট্রব্যবস্থায়। সেটাই সব চেয়ে বেশী লক্ষ্য করবার জিনিষ। সেই রূপান্তর হচ্ছে দুঃখের অশ্রুনিষেকে নয়, সহজ আনন্দের উজ্জ্বলতার মধ্যে। পশ্চিমের সেই উজ্জ্বলতা আমাদের পূর্বাচলকে উদ্ভাসিত করে তুলুক।*

---

* লেখক এ বৎসর (১৩৬৩) ভারত সরকারের প্রতিনিধি-দলের নেতা হয়ে ইংলণ্ডের সরকারের সঙ্গে বিমান চলাচল সম্বন্ধে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ চুক্তির জন্য বিলেতে যান। বি, বি, সি তাঁকে বেতারে বর্তমানের বিলেত সম্বন্ধে আলোচনার জন্য আহ্বান করে।

১৯৪০-এর এক তরুণ সৈনিকের প্রতি

হার্বার্ট রীড্

তুষারাচ্ছন্ন প্রভাতে আবার এক সৈনিকের সাথে দেখা,
সৈনিকের সজ্জায় সজ্জিত, মুখে তার অশরীরী ধূসরতা ;
সমস্ত অন্তরাত্মা চমকে উঠলো আমার
যেন পঁচিশ বছর আগের প্রেত আবার দেখছি !
চীৎকার করে বললাম : থামো !
সেদিনও যেমন সকলে শুনেছিলো, আজও তাকে শুনতে হলো।
সেই অন্ধকারময় দিনে
এক তরুণ সৈন্যদলের সংগে আমরাও মার্চ করে গিয়েছিলাম
অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মাঝে।
আমি বললাম : তোমার আগে আমিও গিয়েছিলাম
পঁচিশ বছর আগে।
সেই যারা গিয়েছিলো আর ফেরেনি।
যারা ফিরেছিলো তারাও হয়েছিলো জীবন্মৃত।
বৃষ্টি আর কর্দমাক্ত পথে তোমরা আজ চলেছো,
যেখানে আমরা গিয়েছিলাম,
মৃত্যু, হতাশা ও অন্ধকারের সংগে
তোমরা চলেছো যুদ্ধ করতে ;
এরই জন্যে আমরাও গিয়েছিলাম।
আমাদের বুদ্ধি ও রক্ত তোমরা দিতে চলেছো !
অনেক আগে এ যে আমরাও দিয়েছি !
সমস্ত কিছু ব্যর্থ হয়েছিলো। পৃথিবী নতুন হয়নি।
নতুন আশা আসেনি।
সেই পুরাতন পৃথিবীর হতাশার মধ্যেই ফিরেছিলাম,
আমাদের জয় আমাদের পরাজয়েরই প্রতীক !
কিন্তু একটা জিনিস শিখেছি আমরা :
সৈনিকের জয় শূন্যগর্ভ, তারা প্রতারিত !

হে ভ্রাত ! হে আমার প্রেতাত্মা !
যদি যুদ্ধে যাবার আগে এ কথাটা শুধু জানো যে,
এতে কোন পুরস্কার নেই, কোন গৌরব নেই,
আত্মত্যাগের কোন মহিমা নেই
তবেই সার্থক হবে তোমার এই যুদ্ধ-যাত্রা।

আশাহীন যুদ্ধই প্রকৃত যুদ্ধ,
স্বপ্নহীন সংগ্রামেই গৌরব নিহিত,
তাতেই জন্ম নব আত্মার
কৃত্রিম হৃদয়ের সেইখানেই পরিসমাপ্তি।

আশাহীন ভবিষ্যতের মাঝেই
আজকের সৈনিকের যাত্রা সুরু !

অনুবাদক—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

পত্রগুচ্ছ

[১৮২১—১৮৮১—মস্কোর দরিদ্রদের হাসপাতালের এক ডাক্তারের পুত্র দস্তোয়েভস্কির জন্ম হয় ১৮২১ সালের ১১ই নভেম্বর। ১৮৩৭ হইতে ১৮৪৩ সাল পর্য্যন্ত তিনি মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ার্স স্কুলে অধ্যয়ন করেন ও গ্রাজুয়েট হইয়া ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগে চাকুরী গ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থকেই নিঃস্ব ও দরিদ্রদের জীবনের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় ও ১৮৪৬ সালে "গরীব মানুষ" গল্পটি রচনা করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করেন। ১৮৪৯ সালের এপ্রিল মাসে পেত্রাশেভস্কির বিপ্লবী চক্রের কার্য্যে যোগ দেওয়ার অভিযোগে তিনি অপর ৩৩ জনের সহিত ধৃত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। কিন্তু দণ্ড মকুব হইয়া সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত হন। ১৮৬০ সালে তিনি পিটার্সবর্গে ফিরিয়া আসেন এবং দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম, পত্রিকা প্রকাশ ও সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হন। ১৮৬৭ সালে তিনি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেন। তাঁহার "অপরাধ ও শাস্তি," "আহম্মক", "কারামাজফ ভাইরা" প্রভৃতি উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যের নামকরা বই। সমাজের নীচের তলার মানুষদের প্রতি তাঁহার অসাধারণ দরদ, গভীর মনস্তাত্ত্বিক অন্তর্দৃষ্টি ও বিশ্লেষণী শক্তিতে তাঁহার শাশ্বত সাহিত্য রচনা অনন্যসাধারণ। আধুনিক ইউরোপীয় লেখকদের উপর তাঁহার অসীম প্রভাব বর্ত্তমান। ১৮৮১ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী দস্তোয়েভস্কির মৃত্যু হয়। এতৎসহ প্রকাশিত গল্পটি চিঠির আকারে লেখা, যে জন্য আমোদের 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে প্রকাশিত হয়েছে।—স]

থিওডর ডষ্টওয়েভস্কি রচিত আইভান পেট্রোভিচ ও পিটার আইভানিচের পত্র

এক

আমার অন্তরতম সুহৃদ ও বন্ধু,

গত তিনদিন ধরে একটা জরুরী কাজের জন্য তোমাকে খুঁজছি! তোমার কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু হায়! আমার দুর্ভাগ্য! তোমার দেখা পেলাম না। গত কাল এক জায়গায় নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম। তোমার বিষয়ে আমার পত্নী মন্তব্য করল যে, তুমি এবং তোমার পত্নী তাতিয়ানা একই পাখীর পালক। পত্নীর এই মন্তব্য শুনে আমরা সকলে হোহো করে হেসেছিলাম। যাই হোক, সেই তরল পরিহাসের কথা বাদ দিলাম। হাাঁ, শুনলাম বিয়ে করবার তিন মাস যেতে না যেতেই তুমি গৃহস্থালী কাজগুলিতে অবজ্ঞা করতে সুরু করেছ। তুমি আমাকে দেখছি বিপদে ফেললে। লোকের মুখে শুনলাম, তুমি একটা বলনাচের আসরে গিয়েছ। আমার পত্নীকে না নিয়েই একা তোমার খোঁজে বলনাচের আসরে গেলাম। কা কস্য পরিবেদনা! বলনাচের আসরে আমাকে কল্পনা কর তো! প্রিয়তমা পত্নী ছাড়া বলনাচের আসরে আমাকে কেমন বে-মানান লাগে! সেখানে এক বন্ধুর সাথে দেখা। সে ভাবল বলনাচের প্রতি বুঝি আমার প্রবল আকর্ষণ আছে। আমাকে একা অবস্থায় পেয়ে টানতে টানতে সে আমাকে বলনাচের আসরে নিয়ে গেল। সে বলল, আমার মত রসিক লোক বলনাচের আসরে প্রবেশ করলে সেখানে এক অদ্ভুত ঘটনার সৃষ্টি হবে। সেখানে তোমাকে দেখলাম না। তোমার পত্নীরও হদিস নাই। সেই বন্ধুপ্রবর বলল, তুমি থিয়েটার দেখতে গেছ। নির্দ্দিষ্ট থিয়েটারে গিয়েও তোমার পাত্তা পেলাম না। এর পর অনেক জায়গায় গিয়ে তোমার খোঁজ করেছি—তবু তোমার পাত্তা নাই। তোমাকে না পেয়ে আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছি! তুমি আমার বর্ত্তমান অবস্থাটা কল্পনা কর তো এক বার? এই জন্যই তোমাকে লিখছি, লেখা ছাড়া আর কোন পথ পেলাম না। সাহিত্যিক মানুষের এ লেখা নয়। আমার সাধারণ কথাগুলো তোমাকে জানাব, তা তুমি নিশ্চয়ই আঁচ করতে পারছ।

আমার ইচ্ছে তোমার সামনা-সামনি আমার কথাগুলো জানাব একটা ছোট্ট চায়ের আসরে। তোমার পত্নী তাতিয়ানাকেও নিয়ে আসবে সন্ধ্যাবেলায়। আমার আনা খুসী হবে তোমাদের দেখে। যা হোক, তুমি এসে আমাকে বাধিত করবে। কলম যখন ধরেছি তখন সহজে ছাড়ছি না। আমাকে তুমি খেলিয়ে মারছ। রাস্কেল কোথাকার! না, তোমার দেখছি একটুও বুদ্ধি হল না। গত মাসের মাঝামাঝি সময়ে তুমি তোমার পরিচিত বন্ধু ইয়েভগেনাকে এনেছিলে। তার হ'য়ে তুমি অনেক কিছু সওয়াল করেছ। তাকে বাহুর মাঝে টেনে আমি আমার আন্তরিক ভালবাসা জানিয়েছিলাম। তখন কী আমি জানতাম যে, তাকে টেনে নিয়ে আমি নিজেই নিজেকে জালে ফেলেছি? তা হলেও এ চক্রান্ত আমি ছিন্ন করব। কোন চক্রান্ত আমাকে কাবু করতে পারবে না।

সব কিছু বিশদ ভাবে বলবার আমার সময় নেই। লিখে সব মনের ভাব প্রকাশ করা যায় না। তুমি কী ইয়েভগেনীকে কানে কানে বলতে পার না? এই আজব সহরে আমাদের বাড়ী ছাড়া আরও অনেক বাড়ী আছে। আমি বলছি না যে ইয়েভগেনীর সাধারণ জ্ঞানের অভাব আছে, বলছি না, তার ব্যবহারে অসৌজন্য প্রকাশ পায়। সেই যুবকের অন্যান্য গুণের অভাব নেই। সত্য কথা বলতে কী সুন্দর ও উদার ইয়েভগেনীর হাব-ভাব। চাল-চলনও ভাল। তবু সেই ছেলেটির সাথে তোমার যদি দেখা হয়, তাকে এ বিষয়ে একটু ইংগিত দিও। আমি এইগুলো লিখছি এই জন্য যে, ইয়েভগেনীর সাথে তুমিই আমার পরিচয় করিয়ে দাও। সন্ধ্যাকালীন

চায়ের আসরে তোমাকে এ বিষয়ে আরও দু'-চারটে কথা বলব। তোমার শুভকামনা করি। ইতি—

পুঃ আমার বাচ্চাটা গত সপ্তাহ থেকে ভুগছে। অবস্থা তার দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে। সে শুধু দাঁত কড়-মড় করছে। আমার পত্নী সব সময় ইয়েভগেনীর সেবা নিয়েই ব্যস্ত। তা হলে তুমি নিশ্চয়ই আসছ? আমাদের মাঝে তোমাকে পেলে আনন্দিত হব। ইতি—

দুই

পিটর আইভানিচকে লিখিত আইভান পেট্রোভিচের পত্র

বন্ধুবরেষু আইভানিচ,

গত কাল তোমার পত্র পেয়ে সব কিছু জানলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে অবাকও হলাম। আমাকে তুমি বৃথাই খুঁজেছ। আমার এক পরিচিত বন্ধুর অপেক্ষায় আমি দশটা পর্যন্ত বাড়ীতেই ছিলাম। তোমার পত্র পেয়েই আমি পত্নীকে নিয়ে মোটরে করে তোমার বাড়ীতে প্রায় সাড়ে-সাতটার সময় পৌঁছাই। ট্যাক থেকে ট্যাক্সি-ভাড়া দিতে হল, অথচ তোমার সঙ্গেই দেখা হল না। যা হোক, তোমার পত্নীর সাথে আমাদের দেখা হয়েছে। সাড়ে-দশটা পর্যন্ত তোমার বাড়ীতে অপেক্ষা করে আর সেখানে বসে থাকা আমি সমীচীন মনে করলাম না। তার পর আবার ট্যাক্সি-ভাড়া করে পত্নীকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে তোমার উদ্দেশ্যে বার হলাম। যে সব জায়গায় তুমি সাধারণতঃ থাক সে সব জায়গায় গিয়ে তোমার পাত্তা পেলাম না। ভেবেছিলাম তোমার সাথে হয় ত দেখা হবে! আমার অনুমান ভুল হল। বাড়ীতে ফিরে রাতে ঘুমাতে পারলাম না। সারা রাত আমি অস্বস্তি অনুভব করেছি। সকালে এক বার তোমার বাড়ীতে ন'টায় যাই। তার পর যাই দশটায়, তারপর আবার যাই বেলা বারোটায়। তিন বার গাড়ী-ভাড়া করে তোমার বাড়ী গিয়েও তোমার দেখা পেলাম না!

তোমার চিঠি পড়ি আর অবাক হই। তুমি ইয়েভগেনীর বিষয়ে লিখে আমাকে অনুরোধ করেছ তাকে আমি কিছু বলি। কী বলবো সে বিষয়ে কিছু তুমি লেখ নি। তোমার সাবধান-বাণী আমার মনে আছে। সব কিছু ঘটনাকে আমি আমল দিই না—বিশেষতঃ যার কোন বিশেষ মূল্য নাই, সেগুলো আমি পত্নীকে পর্যন্ত বলি না। কী উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি যে আমাকে চিঠি লিখেছ, তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। অপরের বিষয়ে আমি নাক গলাতে চাই না এবং হস্তক্ষেপও করি না। মোট কথা, ইয়েভগেনীর উপর তুমি মোটেই প্রীত নও। এ বিষয়ে আমাদের পরস্পর সামনা-সামনি আলোচনা করাই ভাল। সময় বয়ে যাচ্ছে অথচ আমরা পরস্পর মিলিত হতে পারছি না। খোলাখুলি ভাবে ফয়শালা করা ভাল। তোমার কাছে গেলে আমার আবার খরচ হবে—কারণ গাড়ী করে যেতে হবে। এ দিকে আমার নববিবাহিতা পত্নী নতুন ডিজাইনের পোষাকের জন্য বায়না ধরেছে। আমার পরিচিত ইয়েভগেনীর বিষয়ে এইটুকু বলতে পারি যে, সে অভিজাত ঘরের ছেলে। তার পাঁচ হাজার প্রজা আছে। মস্কোর পাশে আর একটি ভূ-সম্পত্তির সে সরিক। মাতামহীর মৃত্যুর পর সে এটা পাবে। আর কত অর্থ আছে জানি না। তবে এ বিষয়ে ভাল করে তোমারই জানা উচিত ছিল। যা' হোক, আমাদের কোথায় দেখা হবে, তা লিখে জানিও। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে তোমার দেখা হয়েছিল—সে বলেছিল আমি পত্নীকে নিয়ে থিয়েটারে গিয়েছি। আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু যদি এই বলে থাকে, তা হলে বলব, সে তোমাকে মিথ্যে কথা বলেছে। তা' ছাড়া সে বন্ধু এক জন বৃদ্ধা মাতামহীর কাছ থেকে কয়েক শত রুবল মিথ্যা কথা বলে ঠকিয়ে এনেছে। এই সব পরিপ্রেক্ষিতে তোমার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।

পুঃ—আমার পত্নী সন্তানসম্ভবা। সে বড় ভয় পাচ্ছে, বড্ড ভীতু হয়ে পড়েছে সে। থিয়েটারে আতসবাজী আর পটকা ফাটান হয়। আমার পত্নীর স্নায়ুতে যাতে আঘাত না লাগে, তাই তাকে থিয়েটারে নিয়ে যেতে চাই না। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে লিখছি, থিয়েটারের প্রতি আমার কোন আকর্ষণই নেই। ইতি—

তিন

আইভান পেট্রোভিচকে লিখিত পিটর আইভানিচের পত্র

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয় বন্ধু আইভান পেট্রোভিচ,

আমাকে তুমি হাজার বার দোষ অবশ্যই দিতে পার, তবু আমারও কিছু বক্তব্য আছে। গত কাল আমরা যখন তোমাকে কেন্দ্র করে গল্প করছি, সেই সময় এক দুঃসংবাদ এসে হাজির। এক পত্রবাহক-দূত মারফত জানলাম, আমার খুড়িমার অবস্থা খুব সঙ্কটজনক। পাছে এই সংবাদে আমার পত্নী ভীত হয় সেই জন্য পত্নীকে খুড়িমার অসুস্থতা সংবাদ না দিয়েই অন্য এক অছিলায় সেই পত্রবাহক-দূতের সাথে কাকার বাড়ী সটান মোটরে করে চলে এলাম। খুড়িমার খারাপ অবস্থা। এমন সময় ডাক্তার এসে জানালেন, রোগিণীর অন্তিম দশা; এমন কি রাতে মারাও যেতে পারেন। আমার অবস্থাটা তখন অনুমান কর তো? সারা রাত উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে কাটালাম। সকালে উঠে বুঝলাম, মনের এবং দেহের সমস্ত শক্তি রাতের উত্তেজনায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে। সোফায় গা এলিয়ে দিলাম, আমাকে ডেকে কেউ যাতে বিরক্ত না করে সে জন্য ঘুমাবার আগে নির্দেশ দিলাম। সাড়ে এগারটার সময় ঘুম থেকে জেগে দেখি, খুড়িমা অপেক্ষাকৃত সুস্থ আছেন। তাই দেখে মোটরে করে বাড়ী ফিরলাম। অসুস্থ সন্তানকে নিয়ে পত্নী আমার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। অসুস্থ সন্তানকে কোল থেকে তুলে নিয়ে আদর করেই তোমার বাড়ী ধাওয়া করি। তোমার বাড়ীতে তোমার পাত্তা পেলাম না। তোমার বাড়ীতে ইয়েভগেনীকে দেখলাম। তোমার বাড়ী থেকে ফিরেই তোমার উদ্দেশ্যে এই চিঠি লিখছি। বন্ধু, প্রিয়তম বন্ধু, তুমি আমার উপর রাগ কর না। আমাকে তুমি আঘাত কর, দোষারোপ কর কোন ক্ষতি নাই—তবু তোমার স্নেহ ও প্রীতি থেকে আমি যেন বঞ্চিত না হই। তোমার স্ত্রীর কাছ থেকে জানতে পারলাম, তুমি শ্লাভানভে যাচ্ছ। আমি সেইখানে থাকব। তোমাকে দেখবার জন্য আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ইতি—

পুঃ—বাচ্চাটার উপর আর কোন আশা রাখতে পারছি না। সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। তার পর আমিই ডাক্তার ডাকি। জ্ঞান হওয়ার পর সে বাবা-মা বলে আধো-আধো শব্দে আমাদের ডাকতে সুরু করে। সারা সকাল থেকে অপত্যস্নেহে বিগলিত হয়ে পত্নী চোখের জল ফেলছে।

চার

পিটর আইভানিচকে লিখিত আইভান পেট্রোভিচের পত্র

আমার অন্তরঙ্গ সুহৃদ,

তোমার ঘরে বসে চিঠি লিখছি। চিঠি লেখার আগে তোমার জন্য একটানা আড়াই ঘণ্টা অপেক্ষা করেছি। এখন তুচ্ছ ঘটনার উপর আমার মতামত খোলাখুলি ভাবে বলবার সুযোগ দাও। নির্দ্ধারিত সময়ে আমি প্লাভানভে গিয়েছিলাম। পাঁচ ঘণ্টা তোমার জন্য অপেক্ষা করেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারলাম না। তুমি কী চাও আমি লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হই? এই কথা বলার জন্য আমাকে ক্ষমা কর। আজ সকালে তোমার কাছে এসেছিলাম। আশা করেছিলাম তোমার সাথে সাক্ষাৎ হবে। তবু তোমার সাথে দেখা হল না। কবে যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে, তা বোধ করি ভগবানও বলে দিতে পারবেন না! সরাসরি মুখোমুখি দেখা না হলে সেই তুচ্ছ কাহিনীর সুরাহা হবে না। এ বিষয়ে ফয়শালা না হলে আমার মনে শান্তি আসছে না। তোমার মনেও বেশ একটা দোলন চলছে। আমাদের ব্যবসায়ের চুক্তির কী হল? আমার মনে হয় বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়া থেকে তুমি দূরে সরে যাচ্ছ। এটা আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেছি। আমার মনে হওয়ার কারণ এই যে, গত সপ্তাহে তুমি আমার হাত থেকে অভদ্র ভাবে চিঠিটা কেড়ে নিলে—যে চিঠিটা তুমি আমাকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলে।

ব্যবসায়ের চুক্তির কথা ছিল সেই চিঠিতে। এ সব কথা উচ্চারণ না করে কতকগুলো হেঁয়ালি আর অস্পষ্টতার মাঝে আমাকে রেখে আমার উপর তুমি দোষারোপ করছ। আমাকে বোকা বলে লোকের কাছে তুমি জাহির করবে, তা আমি মোটেই মেনে নিতে পারি না। আমাকে বোকা বানাতে এর আগে অনেকে চেষ্টা করেছিল। তারা জেনেছে আমি আর যাই হই না কেন, বোকা নই। চোখ বুজে আমি ছিলাম, তুমি আমাকে ধাঁধা লাগাবার চেষ্টা করেছিলে। ইয়েভনের বিষয়ে কোন কিছু অপ্রীতিকর ইংগিত করে আমার মনে তুমি ধোঁকা লাগাতে চাও। সকালে তোমার চিঠি পেয়ে কোন অর্থই বুঝতে পারলাম না। এ সব ঘটনা আমার জানা দরকার—সেই জন্য তোমাকে আমি জবাবদিহী করতে বলছি। তোমার আত্মম্ভরিতা প্রকাশ পায়, যখন তুমি ঘটনার সঙ্গে তাল রাখতে পার না। তুমি কল্পনা করতেই পার নি যে, আমি চারি দিকে দৃষ্টি রাখতে পারি। তুমি আমাকে পুরস্কৃত করতে চেয়েছিলে, আমার কন্যার জন্য। তুমি খুব ভালভাবেই বোঝ যে নানা লোকের সাথে পরিচয় ও মেলামেশার সুযোগ নিয়েছ তুমি আমার মাধ্যমে। সে সব এখন থাক। আমার কাছ বেশ মোটা পরিমাণ অর্থ তুমি আদায় করেছ। তার জন্য একটা লিখিত রসিদ পর্য্যন্ত তুমি দাও নি। টাকা নেওয়ার পর এখনও সপ্তাহ অতীত হয় নি। আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে তুমি আর দেখা করতে এলে না। ইয়েভগেনীর সাথে তোমার আমি পরিচয় করিয়ে দিই। তুমিই অনুরোধ করেছিলে। সেই পরিচয়-পর্ব শেষ হওয়ার পর আমাকে তুমি ভাল চোখে দেখতে পারছ না। আমার সব কিছু কাজ ও স্বার্থত্যাগ তুমি অস্বীকার করছ। তুমি এই ভেবে নিশ্চিন্ত আছ যে, আমাকে জরুরী ব্যবসায়ের কাজের জন্য সিমব্রিস্কে চলে যেতে হবে।

সেখানে চলে গেলেই ব্যবসার চুক্তি, দলিল, দস্তাবেজ এবং অন্য সমস্ত আনুষঙ্গিক ব্যবসায়ের কাগজ-পত্তরের আর কোন সুরাহা হবে না। তবে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, অন্য দিক থেকে আমি ক্ষতি সইতে রাজী আছি, কিন্তু তোমার সাথে বৈষয়িক কাগজ-পত্তর ও চুক্তি বিষয়ে আমাকে চূড়ান্ত ফয়শালা করতেই হবে। অনেক ক্ষতি আমি সহ্য করেছি, না হয় আরও এখানে দু'মাস থাকতে হবে অনেক কিছু ক্ষতি স্বীকার করে। তোমার সাথে আমাকে দেখা করতেই হবে। ভাল লোকের সাথে কেমন করে ব্যবহার করতে হয়, তা ইতিপূর্বে দু'বার আমার জানাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। পরিশেষে লিখিত ভাবে ও বিনীত ভাবে জানাচ্ছি যে, আজকে তুমি যদি আমাদের চুক্তি নতুন করে পূরণ না কর এবং ইয়েভগেনীর বিষয়ে তোমার পূর্ণ মতামত না জানাও, তা হলে আমাকে এমন একটা উপায় অবলম্বন করতে হবে—যেটা আমার ও তোমার পক্ষে খুব প্রীতিজনক হবে বলে মনে হয় না। তোমার বিরুদ্ধে কিছু করতে হলে আমারই আত্মসম্মানে লাগবে। ইতি—

পাঁচ

আইভান পেট্রোভিচকে লিখিত পিটর আইভানিচের পত্র

আমার সম্মানীয় বন্ধু,

তোমার চিঠি পেয়ে আমার হৃৎপিণ্ড ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছে। আমি আশ্চর্য্য হচ্ছি—তুমি তো লজ্জিত হও নি; উপরন্তু রাগের মাথায় আমাকে ভুল বুঝেছ। সৌহার্দ্যকে এমনি করে যে তুমি বন্ধু হয়ে আঘাত করবে, তা ভাবতেও পারিনি! কোন কিছু না বুঝে এই রকম বিদ্বেষপ্রসূত ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে আমাকে অপমান করবার তোমার কী সার্থকতা থাকতে পারে? তোমার অভিযোগের উত্তর আমি নিজেই দিচ্ছি। তুমি আমার সাথে গত কাল দেখা করতে পার নি। আমি খুব আঘাত পেয়েছি। খুড়িমার মৃত্যুশয্যায় আমাকে উপস্থিত থাকতে হয়েছিল। গত কাল রাত সাড়ে এগারটার সময় আমার খুড়িমা মারা গিয়েছেন। আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে তাঁর অন্তিম লোকাচার আমাকেই করতে হয়েছিল, তাই এ কাজেই আমাকে ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এমন কি, সকালে চেষ্টা করেও তোমাকে এক লাইনও লিখতে পারি নি। তোমার এবং আমার মাঝে যে অপ্রীতিকর মনোমালিন্য চলছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। ইয়েভগেনীর বিষয়ে সাধারণ ভাবে আমি তোমাকে লিখেছিলাম। আমার উপর রাগ করে আমার উপর তুমি ভুলের বোঝা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছ।

তোমার লিখিত পত্রের ভাষা আমার আত্মসম্মানে আঘাত করেছে। টাকাকড়ি বিষয়ে তুমি উল্লেখ করেছ। তোমার আর্থিক বদান্যতার কথাই আজ ভাবছি। আমিও তোমার সাথে ব্যবসায়ের চুক্তি চূড়ান্ত ভাবে ফয়শালা করতে রাজী আছি। তুমি লিখেছ যে, তোমার কাছ থেকে আমি টাকা ধার নিয়েছি—এর বিনিময়ে কোন রসিদ দিই নি। তুমি ভুলে গেছ যে, একটা বিশেষ চুক্তি পালন করেছি বলেই, ও টাকাটা আমার প্রাপ্য। টাকা ধার নিলে নিশ্চয়ই তোমাকে রসিদ সই করে দিতাম। অন্যান্য বিষয়ে আমার আর কোন বক্তব্য নাই, আমাদের মাঝে কোথায় যেন ভুল বোঝাবুঝি

হয়েছে। তোমার মাঝে চঞ্চলতা ও একগুঁয়েমি ভাব আমি কিছু দিন আগে থেকে লক্ষ্য করছি। তবু তোমার সরলতা আছে, খোলা মন তোমার। এই সরলতা আর খোলা মন দিয়ে তোমার বদ অভ্যাস দূর করে ফেলবার চেষ্টা কর। এগুলো তোমার মন থেকে দূরীভূত হলেই তোমার সাথে হাত বাড়িয়ে নতুন করে পরিচয় করব। আমাকে তুমি ভুল বুঝেছ বন্ধু! তোমার পত্র পেয়ে আঘাত পেয়েছি সন্দেহ নাই, তবু তোমার সাথে আমি আজকেই দেখা করতে রাজী আছি। আমার ভুল, দোষ ও ত্রুটি জন্য তোমার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নেব। গত কাল থেকে এত তাড়াহুড়ার মাঝে আছি যে, আমার উত্থানশক্তি রহিত হয়ে গেছে। দেহে একটুও জোর পাচ্ছি না। দুর্ভাগ্যেরও শেষ নেই, পত্নীও শয্যাগত। ভগবানের কৃপায় সন্তান আমার ভালই আছে। অনেক গৃহস্থালী কাজ জমে গেছে—এগুলো আমাকেই করতে হবে। তাই এখানেই কলম থামাচ্ছি। ইতি—

ছয়

পিটর আইভানিচকে লিখিত আইভান পেট্রোভিচের পত্র

আমার প্রিয়বন্ধু,

আমি তিন দিন ধরে অবাক হয়ে ভাবছি। আমার চরিত্রগত গুণাগুণের কথা বিচার করে বুঝতে পারছি যে, ভদ্রতাই মানুষের শ্রেষ্ঠ অলংকার। গত দশ তারিখে তোমাকে চিঠি লেখবার পর তোমাকে আমি ইচ্ছে করেই বিরক্ত করিনি। তোমাকে বিরক্ত করিনি এই জন্য যে, আদর্শ খৃষ্টান হিসাবে লৌকিক ক্রিয়াকলাপ তোমার করবার ছিল ও আছে। নানা রকম খুঁটিনাটি বিচার-বিবেচনা ব্যবসা সম্বন্ধে আমাকে করতে হচ্ছে! নিজেকে তোমার কাছে সহজ ও সরল ভাবে মেলে ধরছি।

আমি স্বীকার করছি, তোমার প্রথম দু'টি চিঠি পেয়ে এই ভেবেছিলাম যে, আমি যা করতে চাইছি তা তুমি বোঝ নি। এই জন্যই মুখোমুখি সামনাসামনি আলোচনা করতে চেয়েছিলাম। প্রথমে লিখতে আমার ভয় ও সঙ্কোচ হয়েছিল। নিজেকেই এখন নিজে দোষারোপ করছি, কারণ মনের ভাষা লিখে হয়তো সহজ ভাবে সব কিছু প্রকাশ করতে পারি নি। তুমি জান, শিক্ষার পরিবেশ আমি ভাল পাই নি, এই জন্যই বোধ হয় ভাল ব্যবহার শিখতে পারি নি। সেজন্য বাইরে ভদ্রতার ভড়ং করতে হয়। তা ছাড়া জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এই শিখেছি যে, সবেতেই ভাঁওতা আছে, বুদ্ধির বেসাতি আছে। এমন কি কুসুমের মাঝ থেকে সাপও বেরিয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও তুমি আমাকে বুঝতে পেরেছ। তোমার দোলায়মান বিক্ষুব্ধ মন আগে থেকেই আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে যে, তোমার কথামত আমি কাজ করতে পারি নি, কোথায় যেন আমার বিচ্যুতি ঘটেছে। তবু রক্ষে, আমাদের বন্ধুত্বের মাঝে কোন ফাটল ধরে নি। তোমার সহৃদয়তার জন্যই এ সম্ভব হোল—এখন এ কথাটা বেশ বুঝছি। আমার পক্ষে এই ভুল বোঝা সাংঘাতিক হয়ে উঠত। আমি নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করতে পারি নি—কোথায় আমি যেন তলিয়ে গিয়েছিলাম। আমাকে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দিয়ে প্রথম পরিচয়েই তুমি জয় করেছিলে। তোমার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তোমার ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রসার তুমিই আমার মাঝে সঞ্চারিত করেছিলে। আমি ভেবেছিলাম, অনেক ভাগ্যে জনৈক শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু পেয়েছি। তবে এখন বুঝছি, বাইরে কথার সুবাস এবং মোলায়েম ব্যবহার করে অন্তরে অনেক কালসাপ পুষে রাখি। তারা তোষামোদ করে—ভণ্ডামী-সর্বস্বতা দিয়ে সব কিছু তারা গ্রাস করে! সুযোগ পেলেই তারা চক্রান্তজাল বিস্তার করে, প্রতিবেশীকে সর্বস্বান্ত ও নিঃশেষ করতে ছাড়ে না। এসব লোক কাগজ ও কলমের ধার ধারে না, কথা দিয়ে বাজীমাৎ করে। এই সব কুটিল লোকেরা এমন চক্রান্তজালের মাঝে লোককে বন্দী করে,যেখানে থেকে মুক্তি পাবার কোন আশা থাকে না। তুমি আমার সঙ্গে কোন কোন জায়গায় প্রতারণা করেছ, তা বুঝতে পারবে নীচের লাইনগুলো থেকে।

নিজের কথাগুলো ভেবে ইয়েভগেনীর বিষয়ে আমার মনের ভাব তোমার কাছে পরিস্ফুট করতে চেয়েছিলাম। তার বিষয়ে তুমি কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে নীরব ছিলে। এই নীরবতা—ইয়েভগেনীর বিষয়ে নীরবতা আমাকে সন্দেহ ও ভ্রান্তির মাঝে ফেলেছিল। আমার মনের ভাব তখন এমন অবস্থায় পৌঁছেছিল—যেগুলো শুধু শব্দ চয়ন করে লিখে প্রকাশ করা, অন্ততঃ মনের দিক হতে সম্ভবপর হত না। চিঠিতে যখন তুমি লিখলে তুমি আহত হয়েছ, তখন আমিও ব্যথা পেয়েছিলাম। আমি ঝানু ব্যবসায়ী—প্রতিটি মুহূর্ত আমার কাছে মূল্যবান। বাজে সময় নষ্ট করতে পারি না আমি। তোমার পিছনে আমি ছুটেছি, অথচ তোমার দেখা পাই নি। তোমার নীরবতাও আমাকে অসহিষ্ণু করেছিল। ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের দাবী করে 'ছদ্ম-আবরণের' মাঝে আত্মগোপন করে তুমি জানালে তোমার ছেলে অসুস্থ। ডাক্তার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছে, তোমার ছেলে দাঁত কড়মড় করছে। তোমার পত্নীও অসুস্থ—যার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে।

অবশ্য একথা ঠিক যে, পুত্রের অসুখে পিতার মন খারাপ হওয়া স্বাভাবিক। সন্তানের অসুস্থতা ছাড়াও ব্যবসায়ের এমন সঙ্কটজনক ও জরুরী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ওই সব কথা কী চিঠিতে লেখা সমীচীন হয়েছে? অবশ্য নীরবে আমি সবই সহ্য করেছি। সেই জন্যই লিখছি যে প্রতিটি ছত্রে, চিঠির মাঝে তোমার অহংসর্বস্ব ভাব ধরা পড়েছে। এটা আরও প্রকট হয়েছে, যখন তুমি আমাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হবার জন্য বলেছিলে। আমাকে তুমি বোকা ভেবে লোকের কাছে হাস্যাস্পদ করবার চেষ্টা করেছিলে। এরকম ভাবে অপরের কাছে নিজেকে হাস্যাস্পদ করতে আমি মোটেই রাজী নই। প্রথম বার তুমি আমাকে দেখা করতে বললে, কিন্তু আমাদের দেখা হল না। তার পর তুমি আত্মগ্লানি থেকে বাঁচবার জন্য আর একটা গুজব তুললে—তোমার খুড়িমার অবস্থা পাঁচটার সময় আকস্মিক ও দ্রুত খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অনুসন্ধান করে জানলাম সাত তারিখের আগের দিন মধ্যরাত্রে তোমার খুড়িমার রোগের প্রকোপ বেড়েছিল। এ আত্মপ্রবঞ্চনা করতে গিয়ে নিজেকে তো তুমি নীচু করেছই, তার সাথে তোমার পরিবারের সম্মানও ক্ষুণ্ণ করেছ।

অবশ্য একথা ঠিক, তোমার পরিবারের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নাই, তবুও এক জন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবেই তোমাকে লিখলাম। তোমার শেষ চিঠিতে জানলাম, তোমার খুড়িমা ঠিক এমন সময় মারা গিয়েছেন যে সময় হয় তো আমি তোমার

কাছে ব্যবসায়ের চুক্তির কথা তুললাম। ঘটনাচক্রে জানতে পারলাম যে, তোমার খুড়িমা আমাদের নির্দ্ধারিত সময়ে দেখা করবার প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা পরে মারা গিয়েছেন। জ্ঞান এবং বিচারবোধ বলে সে সময় তোমার হয়ত আর কিছু ছিল না। তোমার মত হীন কাজ আমি এই রকম ভাবে কোন মতেই করতে পারতাম না। ঘটনাচক্রে এসব সত্য জানতে পেরেছি—তা না হলে তোমার চক্রান্ত আমি কোন কালেই ধরতে পারতাম না। অথচ তুমি প্রতি চিঠিতে আমাকে প্রিয় ও অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে লিখেছ। মোলায়েম সুরে আন্তরিকতা জানিয়েছ। আমার আত্ম-সচেতন মনকে ঘুম পাড়িয়ে রাখবার জন্য নানা ভাবে আমাকে তুমি ভূষিত করবার চেষ্টা করেছিলে। তোমার শঠতা ও প্রতারণা আমাদের উভয়ের পক্ষে হানিকর। আমার কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সরাসরি তুমি সব কিছু অধিকার করছ। ইয়েভগেনীকে তুমি কী ভাব? ছ'তারিখে লিখিত চিঠিতে আমাকে জঘন্য-ভাবে অপমান করেছ তুমি। ইয়েভগেনীকে তুমি কী রামছাগল ভাব—যে রামছাগল দুধ দেয় না—যার কাছে থেকে পশমও পাওয়া যায় না।

সে সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ঘরের সন্তান। ছেলেটার মাথায় কী করে কাঁটাল ভাঙ্গা যায় তার তুমি চেষ্টা করছিলে। দু'-এক দিন ধরে নয়, দীর্ঘ পনের দিন ধরে পকেটে টাকা পুরে তার সাথে ভাগ্যপরীক্ষা করছিলে, কী করে তার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের দাঁও মারতে পার। এ সব কথা তুমি অস্বীকার করছ। ব্যবসায়ে পার্টনার হিসাবে তুমি আমাকে নেবে—এই বলে আমাকে লোভ দেখিয়ে আমার কাছ থেকে তুমি টাকা আত্মসাৎ করেছ। এ সব অস্বীকার করছ, ব্যবসায়ের ক্ষতিপূরণও তুমি দেবে না। নানা রকম সুবিধে করে দেবে বলে আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে। ইয়েভগেনীর এবং আমার টাকা তুমি বে-আইনী ভাবে আত্মসাৎ করে, সে টাকা আমাকে তুমি ফেরং দিতে চাইছ না। আশ্চর্য! অথচ তুমি বলেছিলে ব্যবসায়ে অনেক সুযোগ-সুবিধা তুমি করে দেবে। ইয়েভগেনীকে তুমি ঠকালে, যার সঙ্গে আমিই তোমার পরিচয় করিয়ে দিই! বন্ধুমহল থেকে জানতে পারলাম ইয়েভগেনীকে তুমি খুব জপিয়েছিলে। অথচ তাকে ঠকিয়ে বলছ, পৃথিবীর মধ্যে তোমার সে অন্তরঙ্গ বন্ধু। লোকে এখন হয় তো জানে না, তোমার মধ্যে কী জঘন্য মনোবৃত্তি খেলা করছে। এ হচ্ছে তোমার শঠতা, বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রতারণা। ভগবানের রাজ্যে এর কোন স্বীকৃতি নেই। এ কাজগুলো খুব খারাপ। তুমি নিজেই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আমি তোমার কাছে কি অপরাধ করেছি, যার জন্য তুমি বিশ্বাসঘাতকতা করলে?

শেষ কথা জানাচ্ছি। তুমি যদি সাড়ে তিন শো রুবল আমাকে ফেরং না দাও এবং যে বকেয়া টাকা তোমার কাছ থেকে পাব তা যদি শোধ না কর, তা হলে আমি বলপ্রয়োগ করব, এমন কী প্রয়োজন হলে আইনের শরণাপন্ন হতেও রাজী আছি। আমার কাছে এমন কতকগুলো প্রমাণ আছে, যেগুলো লোকের কাছে ও আদালতের সামনে দাখিল করলে সারা পৃথিবীর লোক তোমাকে অবিশ্বাস করবে আর তুমি হেয় হয়ে পড়বে। ইতি—

সাত

আইভান পেট্রোভিচকে লিখিত পিটর আইভানিচের পত্র

১৫ই নভেম্বর

তোমার অদ্ভুত ও অশোভন পত্র পেয়ে রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ রি-রি করছে! মনে হল চিঠিগুলো টুকরো-টুকরো করে ফেলি। কিন্তু তা করি নি, কারণ তোমার পত্রটা আমার কৌতুকের খোরাক হিসাবে যত্ন করে রেখেছি। আমাদের মধ্যে এই ভুল বোঝাবুঝি ও অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হয়েছে বলে আমি সত্যই দুঃখিত। চিঠির উত্তরটা দিতেই চাইছিলাম না, তবু দিতে বাধ্য হলাম—আমার গরজ কতটা তা হলে নিশ্চয়ই বুঝেছ। তুমি আমার বাড়ীতে এলে আমি মোটেই প্রীত হব না। আমার ভগিনীরও সেই মত। তার শরীর ভাল নেই, হৈ-হট্টগোল বা হাল্কা রসিকতা তার মোটেই সইবে না। আন্তরিক প্রীতি জানিয়ে এই পত্রের সাথে আমার পত্নী তোমার পত্নীকে একখানা বই পাঠাল। আমার বাড়ীতে তুমি জুতোর শুকতলা না জুতোর দস্তানা ফেলে গেছ। সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। সেগুলো খুঁজছি—না পাওয়া গেলে এক জোড়া কিনে পাঠিয়ে দেব। ইতি—

আট

পিটর আইভানিচ ষোলই নবেম্বরে দু'টি পত্র পেল। তাকে উদ্দেশ্য করেই ঠিকানা লেখা হয়েছে। ফিকে-সবুজ পাতায় লিখিত তার পত্নীর হস্তাক্ষর—ইয়েভগেনীকে উদ্দেশ্য করে লিখিত নভেম্বর মাসের তারিখ। তারিখটা হচ্ছে দোস্‌রা নভেম্বর। খামে আর কিছু ছিল না। পিটর আইভানিচ পড়ল:—

আমার প্রিয়তম—ইয়েভগেনীকে

গতকাল সন্ধ্যায় আমার পক্ষে বার হওয়া একবারেই সম্ভব ছিল না। স্বামী সারাক্ষণ বাড়ীতেই ছিলেন। আগামী কাল তুমি বেলা এগারটা নাগাদ আসবে, কারণ স্বামী সাড়ে-দশটায় বেরিয়ে যাবে। আর তিনি সন্ধ্যার আগে ফিরবেন না। চিঠির সাথে অন্যান্য খবর পাঠিয়ে তুমি আমাকে অনুগৃহীত করো। তোমার হাতের মিষ্টি চিঠির পরশ পেয়ে বুঝছি, তুমি আমাকে ভালবাস এখনও। আমার ওপর রাগ কোরো না। লক্ষীটি, আগামী কাল আসছ তো—

অপর চিঠিটা ছিঁড়ে পিটর আইভানিচ পড়ল:

তোমার বাড়ীতে আমি আর কখনই আসতাম না। চিঠি মারফত আমাকে খামকা এক নাগাড়ে দোষারোপই করেছ। আমি সিমব্রিস্কে আগামী সপ্তাহে যাচ্ছি। ইয়েভগেনী তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়েই রইল। তোমার শুভকামনা করি—আমার জুতোর শুকতলা বা জুতোর দস্তানার জন্য তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না।

নয়

সতেরই নভেম্বর আইভান পেট্রোভিচ দু'টি পত্র পেল। তারই নামে চিঠি দু'টি এসেছে। প্রথম পত্রটি খুলেই তাড়াতাড়ি এক নজরে চিঠির উপর চোখ বুলিয়ে নেয়—ইয়েভগেনীকে উদ্দেশ্য করে ক'মাস পূর্বে লিখিত তার পত্নীর পত্র। খামে আর কিছু ছিল না।

প্রিয়তম ইয়েভগেনী, বিদায়! আমার কপাল মন্দ—এ বোধ করি ভগবানের দান। খুড়িমা যদি তোমার উপর বিশ্বাস না করতেন, তাহলে আমিও তোমার উপর বিশ্বাস করতাম না। তোমার মনে এই ছিল! খুড়িমা এবং আমাকে তুমি ঠকিয়েছ, উপহাস করেছ। আগামী কাল আমাদের বিয়ে। খুড়িমা মনে করেন উপযুক্ত পাত্র পাওয়া গিয়েছে, কারণ পাত্র বিনা যৌতুকে আমাকে বিয়ে করছে। এই প্রথম আজ তাকে দেখলাম—আমাকে সকল আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধব বিয়ের জন্য তৈরী হতে বলছে। বিদায় বন্ধু—কোন দিনই তোমাকে ভুলতে পারব না—তোমাকে যখন প্রথম চিঠি লিখি তখন আমার নাম সই করেছিলাম—ইতি দিয়ে নাম সই করছি—এই আমার শেষ লেখা। বিদায় বন্ধু—

তাতিয়ানা

দ্বিতীয় চিঠি হচ্ছে :

আইভান পেট্রোভিচ,

আগামী কাল দু' জোড়া জুতোর শুকতলা বা জুতোর দস্তানা পাবে। পরের পকেট হাতড়ানো আমার স্বভাব নয়—রাস্তার আবর্জনা আমি কোন'কালেই কুড়াই নি, বা কুড়াব না।

ইয়েভগেনী তার মাতামহীর সম্পত্তি তদারক করতে দু'-এক দিনের মাঝে এখান থেকে রওনা হচ্ছে। তার ভ্রমণের সঙ্গী হিসাবে আমাকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করল। তুমি তার সহযাত্রী হও না?

অনুবাদক—শ্যামাদাস সেনগুপ্ত।

চিঠি দাও

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

চিঠি দাও, চিঠি দাও! তোমার চিঠির খোঁজে-খোঁজে
সকাল বিকেল হয়! বিকেল যে রাত্রিতে গড়ায়!
তবুও আসে না চিঠি! নিস্তরঙ্গ হৃদয়ের নদী
কান্নার ব্যথায় দোলে! কুসুমিত বসন্তের বন
বৈশাখের সূর্য্যে জ্বলে! মন পোড়ে! পোড়ে যে ফাল্‌গুন!

ফাল্‌গুন সুদীর্ঘ নয়! মানুষের জীবনে ফাল্‌গুন :
জলের লেখার মত! সেই জলে বসন্তের রঙ
যদি বা মিশাতে পারো, জীবনের দু'টি দিন তবু
হ'তে পারে দু'টি ফুল! হয়তো সে-ফুল ঝরে যাবে
দলগুলি জমা রবে! ঝরা দলে আজিকার ঘ্রাণ
সেদিন শুঁক্‌বো তবু—এই দেহ যেদিন স্থবির!

চিঠি দাও—চিঠি দাও! আরো আরো আরো চিঠি দাও
হৃদয় নিঃশেষ করে মেঘদূত বারতা পাঠাও
অন্তর উজাড় করে বসন্তের সংগীত পাঠাও
আমি বসে পান করি! পান করি সারা দিবাযামী!

সারা দিবা-রাত্রব্যাপী—সঞ্চিত সে মধুভাণ্ড থেকে
অমিয় বিলাই আমি! সৃষ্টি করি নূতন ভুবন।
কে বলে বসন্ত নেই? কে বলে সে নেই সংগীত?
আমি রচে যাবো সেই স্মরণীয় সংগীতের ডালি···
আমি দিয়ে যাবো সেই বাঁধভাঙা প্রেমের আবির
পৃথিবী মাখবে যাকে! পৃথিবীর নবজন্ম হ'বে।
শুধু রুটি—রুটি আর দুই মুঠো তণ্ডুলের তরে
আমরা আসিনি কেউ! জীবনের আরো অর্থ আছে।
জীবন অনেক বড়ো! এ জীবন ঘাসের শিশিরে :
সীমাহীন আকাশের ছবি! সে আকাশ হ'বে নাকি কেউ?

আমি হ'বো—আমি হ'বো—সে আকাশ হ'বে মোর মন!!

মাটির মানবী ওগো—দিবারাত্রি বৃষ্টির মতন
স্নেহ দাও—প্রীতি দাও—চিঠি দাও—আরো চিঠি দাও!
তোমার প্রেমের মন্ত্রে এ হৃদয়-আকাশ রাঙুক!

আকাশ দেখেছ কেউ? ঘন-রাত্রি-গূঢ় অন্ধকারে?
শুনেছ প্রেমের গান? গ্রহে-গ্রহে প্রেমের সংগীত···!
আমি কক্ষচ্যুত তারা—ধূলি-ম্লান পৃথিবীর তীরে!
আমি দু' দিনের ফুল, ঝরে যাবো! আমার সৌরভ
মিশে যাবে! তবু আহা যতক্ষণ আছি
হেসে যাই—গেয়ে যাই—বনে বনে রঙ ঢেলে যাই!

চিঠি দাও—চিঠি দাও—আরো আরো—আরো চিঠি দাও—
স্নেহ দাও—প্রীতি দাও—এ হৃদয়-আকাশ রাঙুক!
হেসে যাই—গেয়ে যাই—মনে মনে রঙ ঢেলে যাই।

যুগপুরুষ

বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

সতের

প দ ক্ষে প

বাইরের সমাজ-জীবনে যখন এই সব নাটকীয় ঘটনা ঘটছিল, তখন বিদ্যাসাগরের চাকুরিজীবনের দিনগুলি বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির মধ্যেই কেটে যাচ্ছিল। আর্থিক স্বচ্ছলতা ও অবসর খানিকটা পরিমাণে না থাকলে তখনকার সামাজিক রঙ্গমঞ্চে প্রত্যক্ষ অভিনেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া কঠিন ছিল। ইয়ং বেঙ্গল দল বা ব্রাহ্মসমাজ, কোথাও বিত্তহীন অসহায় যুবকদের অবাধ প্রবেশাধিকার ছিল না। কাগজে-কলমে থাকলেও, কার্যক্ষেত্রে ছিল না। বিদ্যাসাগরের মতন অসহায় যুবকরা দর্শকের মতন সামাজিক ঘটনাক্রম লক্ষ্য করতেন। তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার সময় তখনও তাঁদের আসেনি। বিদ্যাসাগরেরও আসেনি। সঙ্কীর্ণ চাকুরিজীবনের চারদেয়ালের মধ্যেই তিনি বন্দী ছিলেন। সেই চারদেয়ালের সীমানার মধ্যেই তিনি বাইরের লোকজীবনের কোলাহলের প্রতিধ্বনি শুনেছেন। নির্লিপ্ততা তাঁর কাম্য ছিল না কোনদিন। তাই চাকুরিজীবনকে তিনি শেষ পর্যন্ত চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে পারেননি। ধীরে ধীরে তাকে সামাজিক কর্মজীবনে রূপান্তরিত করেছেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সিবিলিয়ান ছাত্ররা মধ্যে মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য বিদ্যার লেনদেন হত, পণ্ডিত ও ছাত্রদের মধ্যে। ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে তরুণ সিবিলিয়ানরা কেবল তাঁর সঙ্গে যে অন্তরঙ্গভাবে আলাপ-আলোচনা করতেন তা নয়, তাঁকে দিয়ে নিজেদের নামে সংস্কৃত শ্লোক রচনা করিয়ে নিতেন। রবার্ট কষ্ট নামে এক সিবিলিয়ান ছাত্র সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র লিখেছেন: (১)

"১৮৪২ খৃষ্টীয় শাকে, রবর্ট কষ্ট নামে, একটি সম্ভ্রান্ত বংশোদ্ভব সিবিলিয়ান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। আমি, সেই সময়ে, ঐ কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ হইলে, তিনি মধ্যে মধ্যে, কালেজে আসিয়া, আমার সহিত নানা বিষয়ে কথোপকথন করিতেন। তিনি বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বিদ্বান, সুশীল ও সৎস্বভাব ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, আমি সাতিশয় সুখী হইতাম। একদিন তিনি বিলক্ষণ আগ্রহপ্রদর্শন পূর্বক, সবিশেষ অনুরোধ করিয়া, আমায় বলিলেন, যদি তুমি, আমার বিষয়ে, সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিয়া দাও, তাহা হইলে আমি অতিশয় আহ্লাদিত হই। তদীয় অনুরোধের বশবর্তী হইয়া, তাঁহাকে কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে বলিয়া, আমি নিম্নমুদ্রিত শ্লোকদ্বয় তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি শ্লোক লইয়া, প্রফুল্ল চিত্তে প্রস্থান করিলেন।

> শ্রীমান্ রবর্ট-কষ্টোহস্ত বিদ্যালয়মুপাগতঃ।
> সৌজন্যপূর্ণৈরালাপৈর্নিতরাং মামতোষয়ৎ॥
> স হি সদ্‌গুণসম্পন্নঃ সদাচাররতঃ সদা।
> প্রসন্নবদনো নিত্যং জীবত্বব্দশতং সুখী॥"

বাইরে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের নিয়ে, এইভাবে তাঁর দিন কাটত। বাড়িতেও তিনি ইংরেজীশিক্ষিত বন্ধুবান্ধবদের সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন এবং নিজে তাঁদের কাছে ইংরেজী শিখতেন। বিদ্যাসাগরের চাকুরিজীবনের এই প্রথম পর্বটিকে তাঁর নিজের জীবনে, পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্যবিদ্যার লেনদেনের প্রথম পর্ব বলা যায়। যুগোপযোগী জ্ঞানার্জনের ফলে এই পর্বে অনেকটা তাঁর মানসিক ভিত্ রচিত হয়েছে বললে ভুল হয় না।

চাকুরি করেও বিদ্যাসাগর কোনদিন তাঁর সামাজিক কর্তব্য অবহেলা করেননি। কেবল স্বার্থের ধান্ধায় তিনি কালাতিপাত করতেন না। তাঁর মতন দরিদ্র চাকুরিজীবীর পক্ষে তাই করাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু মধ্যবিত্তসুলভ সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা কোনদিন তাঁকে বৃহত্তর মানবিক কর্তব্য থেকে বিচলিত করতে পারেনি। প্রাত্যহিক কাজকর্মের মধ্যেও তিনি সেই কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদাই সচেতন থাকতেন। সংস্কৃত কলেজের পূজনীয় শিক্ষকদের সেবা-শুশ্রূষা করা, আদেশ পালন করা, অগ্রজ ও

(১) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা: সংস্কৃত-রচনা।

অনুজতুল্য বন্ধুবান্ধবদের কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করা, বিপদে-আপদে প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য সাহায্য করা,—এসব তাঁর চাকুরিজীবনেও নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। চাকুরি তাঁকে যন্ত্রে পরিণত করতে পারেনি।

সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণশ্রেণীর অধ্যাপক গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ১৮৪৩ সালের গ্রীষ্মকালে কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। তর্কবাগীশ মহাশয় ঈশ্বরচন্দ্রকে পুত্রের মতন স্নেহ করতেন। অসুখের খবর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র দু'জন ডাক্তার সঙ্গে ক'রে তর্কবাগীশের বাড়ি গেলেন। দু'জনেই তখনকার বিখ্যাত ডাক্তার, একজন নবীনচন্দ্র মিত্র, আর একজন তাঁর বিশেষ বন্ধু, তালতলানিবাসী দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির পিতা)। তিনদিন ধ'রে সারাক্ষণ তিনি তাঁর পূজনীয় পণ্ডিতমহাশয়ের চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করলেন। তর্কবাগীশের পুত্রকন্যারা কেউ সে সময় উপস্থিত ছিলেন না। ছাত্রদের মধ্যে দু'-চারজন যাঁরা ছিলেন তাঁরা দর্শকই ছিলেন। বিসূচিকা রোগের সংক্রমণের ভয়ে কেউই তাঁকে শুশ্রূষা করতে এগিয়ে যাননি। বিদ্যাসাগর গিয়েছিলেন, কেবল গুরুর প্রতি ছাত্রের কর্তব্য করবার জন্য নয়, মানুষের প্রতি মানুষের কর্তব্য পালনের জন্য। এই মানবিক কর্তব্যবোধ আজীবন তাঁর মধ্যে সজাগ ছিল।

তর্কবাগীশের মৃত্যুর কিছুদিন পরে পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চাননের নারিকেলডাঙ্গার বাড়িতে, তাঁর ভাগনে ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্যের কলেরা হয়। তখনকার দিনে কলেরা হলে রোগীর চিকিৎসা বা সেবাশুশ্রূষা না ক'রে তাকে গৃহের এককোণে সরিয়ে রাখা হত। অনেকে গৃহের বাইরে রোগীকে রাস্তার ধারে শুইয়ে রাখতেন। মৃত্যু নিশ্চিত এবং রোগ সংক্রামক জেনে, কেউ রোগীর পরিচর্যা করতেন না। তর্কপঞ্চানন মহাশয়ও ভাগনেটিকে গৃহের এককোণে দরমা পেতে শুইয়ে রেখেছিলেন। ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে খবরও দেওয়া হয়েছিল। খবর পেয়ে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর বন্ধু ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে নারকেলডাঙ্গায় যান এবং রোগীর সেবা ও চিকিৎসা করতে থাকেন। তাঁর মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্ন বহুবাজারের বাসা থেকে, তাঁর নির্দেশে, বালিশ তোষক মাদুর মাথায় করে নিয়ে নারকেলডাঙ্গা যান। অল্পদিনের মধ্যেই রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে চাকুরি করতে করতে বিদ্যাসাগর এই সব কাজ করতেন। রোগব্যাধি হলে তার চিকিৎসা করা উচিত, রোগীর পরিচর্যা করা উচিত—এই বোধটুকুও যখন এদেশের লোকের ছিল না, তখন বিদ্যাসাগর এইভাবে রোগীর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার ব্যবস্থা ক'রে, তাদের মধ্যে সেই বোধটুকু জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কোন সমাজসেবকসঙ্ঘের ভলান্টিয়ারের কর্তব্য তিনি করেননি। তখনকার দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্ব পালন করেছেন। কোন আন্দোলনের চেয়ে, প্রত্যক্ষ আচরণের ভিতর দিয়েই এই বোধশক্তি মানুষের মধ্যে জাগিয়ে তোলা সহজ। বিদ্যাসাগর-নিজের আচরণের মধ্য দিয়ে লোককে শিক্ষা দিতেন। বহু রোগীর সংক্রামক ব্যাধির চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন তিনি, এবং নিজের হাতে পরিচর্যা করে তাদের রোগমুক্ত করেছেন। নিজের সেবাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির জন্য নয়, অজ্ঞ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন এদেশের লোকের মনে স্বাভাবিক ও সুস্থ মানবতাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য।

চাকুরিজীবনেও ঈশ্বরচন্দ্র নিজের পদোন্নতির কথা চিন্তা করতেন না। যে-কাজ তাঁকে চাকরির জন্য করতে হত, সেই কাজ তিনি মনপ্রাণ দিয়ে করবার চেষ্টা করতেন। চাকরির পদমর্যাদার চেয়ে কাজটাই ছিল তাঁর কাছে বড়। চাকুরিজীবনে তাই পদে-পদে তাঁকে বাধা পেতে হয়েছে এবং যখনই বাধা পেয়েছেন, তখনই কাজের খাতিরে চাকরি ত্যাগ করতে দ্বিধা করেননি। আরও একটা বড় কাজ তাই তিনি চাকুরি করেও করতে পেরেছিলেন। যখনই সুযোগ হয়েছে তখনই যোগ্য ব্যক্তিদের উপযুক্ত পদে নিয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। তার জন্য নিজের স্বার্থবুদ্ধি ত্যাগ করতে একটুও ইতস্তত করেননি। এরকম দৃষ্টান্ত তাঁর জীবন থেকে অনেক সংগ্রহ ক'রে দেওয়া যায়। মধ্যবিত্ত সমাজের ভদ্রলোক হয়ে জন্মগ্রহণ ক'রে এই স্বার্থত্যাগ ও পরোপকারের জন্য, সারাজীবন তাঁকে কুৎসা ও কৃতঘ্নতা কুড়োতে হয়েছে। তাতে তিনি ব্যথিত হলেও, বিচলিত হননি। যখন যা করা কর্তব্য মনে করেছেন, তাই করেছেন।

১৮৪৪ সালের কথা। সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিত হরনাথ তর্কভূষণের মৃত্যুর পর শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী ময়েট সাহেব, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ মার্শাল সাহেবকে উক্ত পদে একজন যোগ্য পণ্ডিত মনোনয়ন করে দিতে অনুরোধ করেন। মার্শাল সাহেব বিদ্যাসাগরকে অনুরোধ করেন, ঐ পদ গ্রহণ করবার জন্য। বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হন না। তিনি বলেন, "আমি তো একটা চাকরি করছি। আমার চেয়েও যোগ্যতর ব্যক্তি আছেন, যাঁকে ঐ পদে আপনি স্বচ্ছন্দে নিযুক্ত করতে পারেন।" পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতির নাম তিনি প্রস্তাব করেন। তর্কবাচস্পতি মহাশয় তখন অম্বিকাকালনায় নানারকমের স্বাধীন ব্যবসা করছেন। তার জন্য পণ্ডিতসুলভ শাস্ত্রব্যবসাও তিনি ছাড়েননি, কালনায় চতুষ্পাঠী স্থাপন করে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্তাবে মার্শাল সাহেব জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি চাকরি করতে রাজী আছেন কি না আগে জানা দরকার। সেইদিনই বাসায় ফিরে ঈশ্বরচন্দ্র হাটখোলার গঙ্গার ঘাটে গঙ্গা পার হয়ে, পদব্রজে কালনা রওনা হন। পরদিন কালনায় পৌঁছে তিনি বাচস্পতি মহাশয়কে চাকুরি গ্রহণ করতে রাজী করান এবং তাঁর প্রশংসাপত্রাদি নিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। মার্শাল সাহেব তাঁর নাম অনুমোদন করে পাঠান। ১৮৪৫ সাল থেকে তারানাথ তর্কবাচস্পতি মাসিক ৯০্ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

এই সময় ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক ও পুস্তকাধ্যক্ষের দু'টি পদও খালি হয়। সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারী বাবু রসময় দত্ত প্রস্তাব করেন যে, গ্রামের চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতদের ঐ পদে নিযুক্ত করা হোক। ময়েট সাহেব এ বিষয়ে মার্শাল সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করেন। মার্শাল সাহেবের প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন তখন বিদ্যাসাগর। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই বিশ্বাস অর্জন করেছিলেন। মার্শাল সাহেব তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করেন। বিদ্যাসাগর বলেন, "গ্রাম্য টোলের পণ্ডিতরা সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনা করতে পারবেন না। তাঁদের দিয়ে এ কাজ ভালভাবে করানোও সহজ হবে না। সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন কৃতী ছাত্রদের মধ্যে অনেক যোগ্য ব্যক্তি আছেন, যাঁদের এই কাজে নিযুক্ত করা উচিত।" মার্শাল সাহেব ময়েট

সাহেবকে এই পরামর্শ দেন। ব্যাকরণের পরীক্ষা নিয়ে লোক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। পরীক্ষায় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রথম এবং গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ (শিবনাথ শাস্ত্রীর মাতুল) ১৮৩২ সাল থেকে ১৮৪৪ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ১২ বছর ৭ মাস সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন ক'রে, কলেজের গ্রন্থাধ্যক্ষ নীলমাধব শর্মার মৃত্যুর পর, মাসিক ৩০৲ টাকা বেতনে তাঁর শূন্য পদে নিযুক্ত হন। মাত্র দেড় মাস তিনি গ্রন্থাধ্যক্ষের কাজ করেন। তার পর ব্যাকরণের দ্বিতীয় শ্রেণীর অধ্যাপক নিযুক্ত হন, মাসিক ৫০৲ টাকা বেতনে।

গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন সংস্কৃত কলেজে ১২ বছর ৫ মাস অধ্যয়ন করে ১৮৪৪ সালের জানুয়ারী মাসে কলেজ ত্যাগ করেন। এই সময় তাঁর পিতৃবিয়োগ হয় এবং প্রায় দু' মাস তিনি নিজে কঠিন রোগ ভোগ ক'রে গ্রাম থেকে কল ্তায় ফিরে আসেন। তখন তাঁর চরম দুরবস্থা। গিরিশচন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র লিখেছেন(২)—"দুই এক মাস দেশে বাস করিয়া পিতৃদেব পুনরায় কলিকাতায় আসিলেন। কিন্তু তখন আর আয় নাই, টোলঘরে থাকিয়া কি খাইবেন, কিরূপেই বা খাজনা দিবেন; সুতরাং টোলঘরটি ছাড়িতে হইল। ছাড়িয়া যান কোথায়? দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। তৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, এবং ৺হৃদয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে একটি বাসাগৃহে বাস করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে আশ্বস্ত করিয়া কহিলেন: 'গিরিশ, ভাবিস না; যতদিন তোর কোন চাকরি না হয়, আমার বাসায় থাক'।"

গিরিশচন্দ্রের পুত্র হরিশচন্দ্র লিখেছেন—'দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসায় গিয়া তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।' তখন হরিশচন্দ্রের পিতা গিরিশচন্দ্রের বয়স ১১ বছর এবং বিদ্যাসাগরের বয়স ২৪ বছর। বিদ্যাসাগর তখনও 'দয়ার সাগর' বলে পরিচিত হননি। 'দয়ার সাগর' বলে পরিচিত হবার বাসনাও তাঁর মনে ছিল না। গিরিশচন্দ্র ছিলেন তাঁর অনুজতুল্য ও ছাত্রজীবনের বন্ধু। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণও তাই ছিলেন। সংস্কৃত কলেজে উভয়েরই চাকুরি তাঁর পরামর্শেই হয়েছিল। অসহায় গিরিশচন্দ্রকে তিনি তাঁর বাসায় স্থান দিয়েছিলেন, সুস্থ মানবতাবোধ থেকে। সামান্য বেতনে নিজের পোষ্যবহুল বাসার খরচ চালানো তাঁর পক্ষে তখন রীতিমত সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তা সত্ত্বেও তিনি যে গিরিশচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'গিরিশ, তুই ভাবিস না; যতদিন না তোর কোন চাকরি হয়, তুই আমার বাসায় থাক',—তার কারণ, সুস্থ মানবহৃদয়ের অধিকারী ছিলেন তিনি। ঈশ্বরচন্দ্রের অবস্থায় দিনযাপন ক'রে, কেবল দয়া-বোধ থেকে এরকম উদারপ্রাণ আহ্বান জানানো যায় না। একমাত্র মানবমর্যাদাবোধ থেকেই জানানো যায়, যে-বোধ ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে সারাজীবন সবচেয়ে বেশি প্রবল ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের সহোদর শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন লিখেছেন: (৩) "তর্কবাচস্পতি, বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যারত্ন এই তিনজন উপযুক্ত লোক সংস্কৃত কলেজে নিযুক্ত হইলেন। দাদা, সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন; এ কারণ কৌশল ও অনুরোধ করিয়া, তিনজন উপযুক্ত লোককে কলেজে প্রবিষ্ট করাইয়া দিয়া, পরম আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। মার্শেল সাহেব, মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনের উক্ত পদ অগ্রজকে দিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকার না পাইয়া, বাচস্পতি মহাশয়ের দেশে গিয়া, তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া আনাইয়া, কর্মে প্রবিষ্ট করাইয়া দেন, ইহাতে বিষয়ী লোক মাত্রেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন"।

'বিষয়ী লোক মাত্রেই' ঈশ্বরচন্দ্রের আচরণে বিস্মিত হয়েছিলেন। নিজের লোভ ও স্বার্থ ত্যাগ ক'রে, ডেকে-ডেকে, অনুরোধ ক'রে, যোগ্য ব্যক্তিদের চাকুরি দেওয়া, বিষয়ী লোকের কার্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র বৈরাগী ছিলেন না, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি তার কাম্য ছিল না কোনদিন! বৈষয়িক বুদ্ধি তাঁর যে কোন সামাজিক সুস্থ মানুষের মতন স্বাভাবিক ছিল। জীবনে তাঁর আর্থিক স্বাচ্ছল্যের প্রয়োজনও ছিল খুব বেশি। সব থাকা সত্ত্বেও, কোনদিন তাঁর বৈষয়িক বুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধি তাঁর বৃহত্তর সামাজিক ও মানবিক বুদ্ধি বা স্বার্থকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। 'বিষয়ী লোক মাত্রেই' বৈষয়িক বুদ্ধিকে অন্যান্য 'বুদ্ধির' উপরে স্থান দেন। বিদ্যাসাগর তা দেননি! সাধারণ বিষয়ী লোকের সঙ্গে এইখানেই তাঁর পার্থক্য ছিল, যদিও বিষয়বুদ্ধি তাঁর কম ছিল না।

প্রায় পাঁচ বছর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে একটানা কাজ করবার পর বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করার সুযোগ পান। ১৮৪৬ সালের মার্চ মাসে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কারের মৃত্যু হয়।* যে বিদ্যালয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষালাভ করেছেন, সেই বিদ্যালয়ের উন্নতিসাধনের ইচ্ছা তিনি ছাত্রজীবন থেকেই মনে মনে পোষণ করতেন। শিক্ষাকৌন্সিলের সেক্রেটারী ময়েট সাহেব এর মধ্যেই ঈশ্বরচন্দ্রের পাণ্ডিত্যে, কর্মদক্ষতায় ও চারিত্রিক সততায় মুগ্ধ হয়েছিলেন। মার্শাল সাহেবের কাছে তিনি রামমাণিক্যের শূন্য পদে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়োগ করার প্রস্তাব করেন। মার্শাল সাহেব সম্মত হন, এবং ঈশ্বরচন্দ্রও এই চাকুরির প্রস্তাব সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন। পদপ্রার্থিরূপে তিনি যে আবেদনপত্রটি লিখে পাঠান, তার খানিকটা উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধৃত করছি:

"...Besides I have the honor to hold the

(২) হরিশচন্দ্র কবিরত্ন: গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্নের জীবন-চরিত (কলিকাতা ১৯০৯) ৩৪ পৃষ্ঠা।

(৩) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: বিদ্যাসাগর-জীবন-চরিত (৩য় সং ১৩২১) ৬৪ পৃষ্ঠা।

* রামমাণিক্য বিদ্যালঙ্কার ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মাতামহ। বরিশাল জেলার কলসকাঠি গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথমে সেখানেই টোল স্থাপন করে শাস্ত্রচর্চা করতে থাকেন। পরে কলকাতার কাছে কাশীপুরের জমিদারের সভাপণ্ডিত হন। ১৮৪৫ সালে তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৩৮ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)।

ffice of Sheristadar of the Bengalee Department of the College of Fort William, to which I was appointed in 1841 since which time from the nature of my duties and the institution being a seat of learning I have improved my knowledge to a considerable degree and in addition I have given much attention to acquire proficiency in the System of Sankhyha Philosophy and the Puranahs, branches which do not fall within the regular course of education afforded by your College.

......This, together with my long connection with the College as a student has given me an intimate knowledge of the System of education pursued there, and inspires me with confidence that in any case my services are accepted I shall prove useful to the institution. But I confess that in offering my services it is in the hope that the emoluments attached to the situation may be increased to a higher degree, for it would not be prudent that I should quit my present office for one so troublesome without an adequate remuneration, and I respectfully submit that the present salary is very small for a duly qualified person who is expected to give his whole time to the duties."

আবেদনপত্রটির এই অংশ উল্লেখযোগ্য তিনটি কারণে। প্রথম কারণ, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পাঁচ বছর সেরেস্তাদারের চাকুরিজীবন ঈশ্বরচন্দ্র কি ভাবে কাটিয়েছিলেন, তার আভাস এই পত্র থেকে পাওয়া যায়। তিনি লিখেছেন যে এই সময় তিনি নিজের চেষ্টায় বিদ্যাচর্চা ক'রে যতদূর সম্ভব জ্ঞানবৃদ্ধি করেছেন, বিশেষ মনোযোগ দিয়ে সাংখ্যদর্শন ও পুরাণশাস্ত্র পাঠ করেছেন। সংস্কৃত কলেজে পাঠকালে যে বিদ্যার্জনের কোন সুযোগ পাওয়া যায় না এবং তিনিও পাননি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি সেই সুযোগ পেয়েছেন এবং সাধ্য মতন তার সদ্ব্যবহারও করেছেন। দ্বিতীয় কারণ হ'ল, এই পত্রের মধ্যে তাঁর সংস্কৃত কলেজের শিক্ষাপ্রণালী সংস্কারের বাসনাও ইঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন যে সংস্কৃত কলেজের তিনি ছাত্র ছিলেন এবং সেইজন্য কলেজের শিক্ষাপ্রণালীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। সহকারী সম্পাদকের কাজ পেলে তিনি কলেজের অনেক উপকার করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করেন। তৃতীয় কারণটি সাধারণ হলেও, উল্লেখযোগ্য। ঈশ্বরচন্দ্রের যে স্বাভাবিক বৈষয়িক বুদ্ধির কথা আগে বলেছি, সেই বুদ্ধিও তাঁর এই আবেদনপত্রের মধ্যে পরিষ্কার প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন যে, সহকারী সম্পাদকের মাসিক বেতন অত্যন্ত অল্প, কাজ ও তার অনুরূপ দায়িত্বের উপযুক্ত বেতন নয়। তাই তিনি যোগ্য কাজের যোগ্য বেতন জন্য আবেদন করতেও ভোলেননি। প্রসঙ্গতঃ একথাও উ করেছেন, বেতন না বাড়ালে তাঁর পক্ষে বর্তমান চাকুরি ছে কলেজের সহকারী সম্পাদকের চাকুরি গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের ক হবে না। পঞ্চাশ টাকা মাসিক বেতন তিনি ফোর্ট উইলি কলেজে পাচ্ছিলেন। সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকেরও প বেতন পঞ্চাশ টাকা। সুতরাং আবেদনপত্রে বেতনবৃদ্ধির জ চাপ দেওয়ার সুযোগ ছিল তাঁর। সেই সুযোগ তিনি ছাড়েন নি এ তাঁর সজাগ বৈষয়িক বুদ্ধিরই পরিচায়ক। এটুকু বৈষয়িক বু প্রকাশ করতে, সাংসারিক জীবনে ও চাকুরিজীবনে, তিনি কখন কুণ্ঠিত হতেন না।

তথাকথিত নিঃস্বার্থ সেবাধর্ম, আত্মভোলা বৈরাগ্য, সাংসারি বুদ্ধিহীনতা, চারিত্রিক শিথিলতা ও আধপাগলামি ইত্যাদি যে স অস্বাভাবিক স্বভাবধর্মের প্রতি আমাদের মতন অনুন্নত দেশে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিতদের একটা আধ্যাত্মিক আকর্ষণ আছে, তা কোনটারই এক কাণাকড়ি মূল্য দিতেন না বিদ্যাসাগর। এগুলিকে তিনি কোন সুস্থ সামাজিক মানুষের স্বাভাবিক চারিত্রিক গু বলেই মনে করতেন না। তিনি জানতেন, এ সমাজে এসব গুণে প্রয়োজন ভণ্ডদের হয়, মুখোস তৈরির জন্য এবং সমাজের সাধারণ মানুষ অজ্ঞ ও অশিক্ষিত বলে এই মুখোস দেখে মুগ্ধ হয়। জীবনে যাঁর মুখোস পরার প্রয়োজন হয়নি কোনদিন, বাস্তব-জীবনে বৈষয়িক বুদ্ধি পরিত্যাগ করে সমাজসেবক সন্ন্যাসী হতে তিনি চাইবেন কেন?

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেক্রেটারী মার্শাল সাহেব তাঁকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। তাতে তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য গুণের প্রশংসা করে, শেষকালে লিখেছিলেন:

"On the whole, I consider, that he unites in an unusual degree, extensive acquirements, intelligence, industry, good disposition, and high respectability of character." প্রশংসাপত্রটিতে তাঁর কাজ হয়েছিল, কারণ এটি গতানুগতিক ভঙ্গিতে লেখা প্রশংসাপত্র নয়। ১৮৪৬ সালে ৬ই এপ্রিল ঈশ্বরচন্দ্র মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হন।

এই সময় কলেজের সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপক পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যু হয়। কলেজের সেক্রেটারী রসময় দত্তের ইচ্ছা ছিল, ঈশ্বরচন্দ্র সাহিত্যের অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। এ ইচ্ছা সম্পূর্ণ সদিচ্ছা কিনা নিঃসংশয়ে বলা যায় না। পরিচালনার কাজ থেকে অধ্যাপনার কাজে তাঁর সহকারীটিকে সরিয়ে দিতে পারলে হয়ত তিনি নিশ্চিন্ত হতেন। তিনি বুঝেছিলেন, সহকারী সাধারণ সহকারী নন, কেবল চাকুরি করতেও তিনি আসেননি। তাঁর সঙ্গে নানাব্যাপারে পদে পদে বিরোধ হবার সম্ভাবনা। বুঝে-সুঝেই মনে হয় তিনি জয়গোপালের শূন্যপদে ঈশ্বরচন্দ্রকে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র অনেক বেশি বুদ্ধিমান ও দূরদর্শী। তার চেয়েও বড় কথা তিনি আদর্শবাদী কর্মী, অর্থলোভী চাকুরিজীবী নন। আবেদনপত্রে তিনি যে বেতনবৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেছিলেন, বোঝা যায়,

শিক্ষা-সংসদ তা অগ্রাহ্য করেছিলেন। পঞ্চাশ টাকা বেতনেই তিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিষ্টাণ্ট সেক্রেটারীর পদ গ্রহণ করেছিলেন কেন? নিশ্চয় অকারণে করেননি। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই করেছিলেন।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের মৃত্যুর পর সাহিত্যশ্রেণীর অধ্যাপকের পদ ঈশ্বরচন্দ্র গ্রহণ করতে রাজী হননি। তার বদলে তিনি তাঁর বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ করেন। মদনমোহন তখন কৃষ্ণনগর কলেজে প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত ছিলেন। এ-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র নিজে লিখেছেন: (৪)

"ইঙ্গরেজী ১৮৪৬ সালে, পূজ্যপাদ জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের লোকান্তরপ্রাপ্তি হইলে, সংস্কৃত কালেজে সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। সংস্কৃত কালেজের সেক্রেটারি বাবু রসময় দত্ত মহাশয় আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন, স্থির করিয়াছিলেন। আমি, বিশিষ্ট হেতু বশতঃ, অধ্যাপকের পদ গ্রহণে অসম্মত হইয়া, মদনমোহন তর্কালঙ্কারকে নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত, সবিশেষ অনুরোধ করি।"

১৮৪৬ সালের ২১ জুন থেকে মদনমোহনই সাহিত্যের স্থায়ী অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। শিক্ষাবিভাগের রিপোর্টে ঈশ্বরচন্দ্র ও মদনমোহনের নিয়োগ সম্পর্কে উল্লেখ দেখা যায়: (৫)

"The Institution has suffered severe loss by two casualties during the year, viz the death of Rammanikya Vidyalankar, the Assistant Secretary, in March, and of Joygopal Tarkalankar, the Professor of Sahitya, in April last...

"The vacancies however have been very satisfactorily filled up by the appointment of two of the most distinguished ex-students of this Institution, viz Ishwarchandra Vidyasagar to the post of the Assistant Secretary, and Madanmohan Tarkalankar to the Sahitya chair."

ঈশ্বরচন্দ্রের নিজের ভাষায়, "বিশিষ্ট হেতু বশতঃ" তিনি সহকারী সম্পাদকের পদ ছেড়ে সাহিত্যের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করতে রাজী হননি। বোঝা যায়, হেতু একটা কিছু ছিল। প্রথমেই তা বোঝা গিয়েছিল, যখন বেতন বৃদ্ধির অনুরোধ গ্রাহ্য না হওয়া সত্ত্বেও তিনি একই বেতনে সংস্কৃত কলেজে চাকরি নিয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য তিনি মার্শাল সাহেবকে বলে তাঁর মধ্যম সহোদর দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে তাঁর পদে নিযুক্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। পরিষ্কার তিনি বলেছিলেন সাহেবকে: "যদি আমার মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধু ন্যায়রত্নকে আমার পদে নিয়োগ করেন, তাহ'লে আমি সংস্কৃত কলেজের চাকরি নিতে পারি। তার কারণ আমার যা কাজ হবে তখন, তাতে কলেজের সম্পাদক রসময় দত্তের সঙ্গে আমার কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে মতান্তর হতে পারে এবং মতান্তর মনান্তরেও পরিণত হতে পারে; তা যদি হয় তাহ'লে পদত্যাগ করা ছাড়া আমার উপায় থাকবে না। হঠাৎ বেকার হয়ে পড়লে বিপন্ন হব। সুতরাং দীনবন্ধু যদি আমার পদে নিযুক্ত হয়, তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে সংস্কৃত কলেজে যেতে পারি।"

এই প্রস্তাবের মধ্যেও ঈশ্বরচন্দ্রের দূরদর্শিতা ও বৈষয়িক বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তা ছাড়াও, আর একটি অন্তরালবর্তী বাসনার আভাস পাওয়া যায়, তাঁর এই ব্যবস্থাদির মধ্যে। সেই বাসনা হ'ল, সংস্কৃত কলেজে তিনি কেবল চাকুরি করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁর ইচ্ছা ছিল, নানাবিষয়ে কলেজের উন্নতিসাধন করা। সহকারী সম্পাদকের পক্ষে সেরকম সুযোগ পাওয়া সম্ভব হবে মনে করেই তিনি একই বেতনে ঐ পদ গ্রহণ করেছিলেন এবং পূর্বে ও পরে অধ্যাপকের কোন পদ গ্রহণ করতে চাননি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ থেকে সংস্কৃত কলেজে যোগদান করা, এই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে একটা স্মরণীয় ঘটনা। এতদিন সেরেস্তাদারের চাকরি করছিলেন এবং জ্ঞানবিস্তার ক্ষেত্রে আত্মোন্নতির চেষ্টায় নিমগ্ন ছিলেন। এবারে তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন, সংস্কারের সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিয়ে। সহকারী সম্পাদকের পদ তাই তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল। বেতনের বিচার করলেন না। এমন কি, মধ্যম সহোদর দীনবন্ধুর চাকুরির ব্যবস্থা করেও, তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারেননি এবং নিরাপত্তার কথা চিন্তা না করেও চাকুরি গ্রহণ করলেন। জীবনের প্রথম সুযোগ ছাড়লে ভুল করা হবে, বুঝতে পারলেন।

সহকারী সম্পাদকের দায়িত্ব অনেক, কাজও অনেক। সর্বত্র যেমন, সংস্কৃত কলেজেও তাই। কলেজের শিক্ষাপ্রণালী ও কার্য-প্রণালীর উন্নতি কি ক'রে করা সম্ভব, সে-সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র চিন্তা করতে লাগলেন। এ বিষয়ে একটি সুচিন্তিত পরিকল্পনা ক'রে তিনি একটা খসড়া তৈরি করলেন। খসড়াটির কথা মার্শাল সাহেব তাঁর রিপোর্টে, শিক্ষাসংসদের কাছে উল্লেখ করেছিলেন। খসড়াটির প্রশংসা ক'রে তিনি সংসদের সদস্যদের কাছে বিবেচনা করবার জন্য অনুমোদন করেছিলেন। মার্শাল সাহেব এই খসড়া-পরিকল্পনা সম্বন্ধে তাঁর রিপোর্টে বলেন: (৬)

The Assistant Secretary consulted me sometime ago on a plan of study which he had prepared at a great sacrifice of time and labour. The suggestions therein contained appeared to me highly judicious and the scheme altogether seemed well adopted to produce order, to save time, and to secure to each subject of study the degree of attention which it deserves; as such I would beg strongly to recommend the council to

---

(৪) ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা: নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস।

(৫) General Report on Public Instruction in the lower provinces of the Bengal Presidency for 1846-47: ৩৮ পৃষ্ঠা।

(৬) General Report etc for 1846-47: ৪১ পৃষ্ঠা।

give it a trial. If I am not much mistaken, the result will prove highly satisfactory."

সহকারী সম্পাদকের এই সক্রিয়তায় সকলেই সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। তিনি ব্যাকরণের বিভিন্ন শ্রেণীর অধ্যয়নের প্রণালী বদলে দিলেন। পণ্ডিত মশায়রা টোল-চতুষ্পাঠির ধারা বজায় রেখে, চেয়ারে বসেও ঘুমুতে অভ্যস্ত ছিলেন এবং ছাত্ররা পাখা নিয়ে তাঁদের বাতাস করত। গুরুশিষ্যের এই সম্পর্ক তিনি কলেজ থেকে তুলে দিলেন। অধ্যাপকরা যখন ইচ্ছা কলেজে আসতেন ও যেতেন। নতুন নিয়ম হ'ল, বেলা সাড়ে দশটায় শিক্ষক ও ছাত্রদের কলেজে আসতে হবে। সেক্রেটারির অনুমতি না নিয়ে, কি শিক্ষক কি ছাত্র কেউ বাড়ি যেতে পারবে না। ছাত্ররা ঘন ঘন খুশি মতন মালীর ঘরে যাতায়াত করত, ক্লাশ থেকে বাইরে বেরিয়ে যেত। নতুন নিয়ম হল, এইভাবে যখন ইচ্ছা ক্লাশের বাইরে যাওয়া চলবে না, এবং যেতে হলে 'পাশ' বা ছাড়পত্র নিয়ে যেতে হবে। কাঠের পাশ তৈরি হল তার জন্য। আগে কলেজে অনুপস্থিত হলে শিক্ষক বা ছাত্র কাউকেই কোন কৈফিয়ৎ দিতে হত না, কৈফিয়ৎ চাইতও না কেউ। নিয়ম হল, আগে অথবা পরে আবেদন ক'রে, অনুপস্থিতির কারণ জানাতে হবে, তা না হলে ছুটি সবেতন মঞ্জুর হবে না শিক্ষকদের ক্ষেত্রে, এবং ছাত্রদের জরিমানা দিতে হবে বা শাস্তি পেতে হবে। এই সব ব্যবহারিক নিয়মকানুন ছাড়াও, শিক্ষাপ্রণালীরও সংস্কার করা হল।

অল্পদিনের মধ্যেই সংস্কৃত কলেজের শিক্ষক ছাত্র, এমন কি মালী ও ভৃত্য পর্যন্ত সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। সকলেই জানল, কলেজের প্রাক্তন ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সহকারী সম্পাদক হয়েছেন। ছাব্বিশ বছরের যুবক তিনি। তাঁর সংস্কারোদ্যমের অন্ত নেই। সংস্কৃত কলেজকে তিনি সেকেলে টোল-চতুষ্পাঠীর পরিবেশমুক্ত করে আধুনিক যুগের আদর্শ শিক্ষায়তনে পরিণত করতে চান। সবেমাত্র সামান্য ক্ষমতা তিনি হাতে পেয়েছেন। সম্পাদকের সহকারী হয়েছেন। সেই ক্ষমতাটুকু সম্পূর্ণ ভাবে প্রয়োগ করে তিনি কয়েকদিনের মধ্যেই কলেজের আভ্যন্তরিক পরিবেশ বদলে দিয়েছেন। ছাত্ররা অবাক হয়েছে। হবারই কথা। তার চেয়েও বেশি অবাক হয়েছেন প্রবীণ পণ্ডিত মশায়রা, বিশেষ করে বিদ্যাসাগরের অধ্যাপক ছিলেন যাঁরা, তাঁরা। তাঁদের প্রাক্তন ছাত্রের কীর্তি-কলাপে তাঁরা সকলে হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। সাহেবী কায়দায় সংস্কৃত কলেজে 'ডিসিপ্লিন' ও 'মেথড্' প্রবর্তন করার প্রচেষ্টা তাঁদের অনেকেরই ভাল লাগেনি।

সবচেয়ে অসহায় বোধ করতে লাগলেন সম্পাদক রসময় দত্ত নিজে। ছোট আদালতের জজ ছিলেন তিনি, কলেজের সম্পাদকের চাকরিটা ছিল তাঁর ঠিকা কাজের মধ্যে। দত্ত মশায় দেখলেন ঠিকে কাজটা আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। সহকারীর খুঁটির জোর বেশি। মার্শাল সাহেব, ময়েট সাহেব সকলেই ঈশ্বরচন্দ্রকে ভালবাসেন, বিশ্বাস করেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁর সংস্কার পরিকল্পনাও তাঁরা তারিফ করেন। সুতরাং ক্রমে সহকারী সর্বেসর্বা হয়ে উঠবেন এবং তিনি প্রধান হয়েও কিছু করতে পারবেন না। অতএব, সহকারীর সহকারিতায় বাধা দেওয়া প্রয়োজন।

সম্পাদক রসময় দত্ত সহকারীর প্রস্তাবে পদে পদে বাধা দিতে লাগলেন। তাঁর সংস্কার-প্রস্তাব তিনি শিক্ষাসদের কাছে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠাতেন না। সরাসরি নিজেও অনেক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতেন এবং কলেজে কোন নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতে দিতেন না। ক্রমে ব্যাপারটা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছল যে কলেজের উন্নতির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র যা-কিছু বলতেন বা করতে চাইতেন রসময় বাবু তাতেই বাধা দিতেন। তিনি ভেবেছিলেন, সহকারী তাতেই সতর্ক হবেন এবং সমঝে চলবেন। ছোট আদালতের জজ ভুল বুঝেছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের কাছে চাকুরিটা কোনদিনই বড় ছিল না, তার চেয়ে অনেক বড় ছিল কাজ। সেই কাজে বাধা পড়লে, তিনি চাকুরি স্বচ্ছন্দে ছেড়ে দিতে পারেন, রসময় বাবু তা ভাবতে পারেননি। সম্পাদকের বাধায় সহকারীর সমস্ত উৎসাহ নিবে গেল। চাকুরি মুহূর্তের মধ্যে নিছক গোলামি ব'লে মনে হল তাঁর এবং অন্ন-বস্ত্রের জন্য গোলামি। সম্রাটের মতন মন নিয়ে জন্মালে, অন্ন-বস্ত্রের জন্য গোলামি করা যায় না। ঈশ্বরচন্দ্র আর সহকারীর চাকুরি করতে পারলেন না, পদত্যাগ করলেন।

চাকুরি গ্রহণের আগে মার্শাল সাহেবের কাছে যে আশঙ্কা তিনি প্রকাশ করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তাই সত্য হল। আদর্শের মিল হল না, মতের মিল হল না বলে চাকুরি তাঁকে ছাড়তে হল। ১৮৪৭ সালের ১৬ই জুলাই তাঁর পদত্যাগপত্র গৃহীত হল। রসময় বাবু অন্যদের কাছে আড়ালে বলতে লাগলেন—

"বিদ্যাসাগর যে চাকরিটা ছেড়ে দিলে, এখন খাবে কি?"

লোকমুখে কথাটা যখন ঈশ্বরচন্দ্রের কানে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন: "বলো রসময় বাবুকে, বিদ্যাসাগর আলু-পটল বেচে খাবে।"

[ক্রমশঃ।

আমার রয়েছে দিন

জয়ন্তী সেন

আমার রয়েছে দিন, ফেলে-আসা অতীতের স্তূপে
বিদগ্ধ প্রান্তর-পথে—অনাগত স্বপ্নের রূপে,
কত দিন—কত তৃষ্ণা বুক-জ্বলা প্রখর দহনে
তৃষ্ণা-মেটা সুধা কত,—হলাহল জীবন-মন্থনে।

আমার রয়েছে রাত, সুনিবিড় চিরতৃপ্ত নিশা
অতল উর্মির স্পর্শ—কালো ঢেউ—ঘুমের পিপাসা।
দুঃসহ দিনের শেষে ভুলে-যাওয়া দুরাশার মায়া
তারা ফুল নীল মেঘে, তন্দ্রালীন মনে তার ছায়া।

আমার রয়েছ তুমি, দিনে-রাতে স্বপ্নে জাগরণে
কুসুম সৌরভময় প্রতি পল প্রতি অনুক্ষণে
তোমার নিবিড় প্রেম কূলহারা সাগর পিয়াসী
কোমল ঘুমের মত দেহে-মনে দোলা স্বপ্নরাশি।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

(১৪)

ভোরবেলা আবার পাখা মেলেছি। মরু আর পাহাড়—ঈশ্বর, দুনিয়ার এত জায়গা জুড়ে গেরুয়া বালি বিছিয়ে রেখেছ! উঠতে উঠতে তেরো হাজার ফুট উপরে তখন। তাকিয়ে আছি নিচের দিকে। হঠাৎ চোখ জুড়িয়ে যায়। দু-কূল প্লাবিনী নদী—স্নিগ্ধশ্যাম গালচে বিছানো নদীর এপারে-ওপারে। পাহাড়ের গায়ে সবুজ সিঁড়ি উঠে গেছে—সবুজ ঠাকরুন পা ফেলে ফেলে শিখরে উঠে যাচ্ছেন হাতের ঝাঁপি উপুড় করে দিয়ে। তুষার-গিরির বেড়া-ঘেরা ফসলের রাজ্যে পৌঁছে গেছি। মানুষের রাজ্যে।

ভালমানুষ প্রীতির বাহু বাড়িয়ে আকাশমুখো চেয়ে আছেন। কত মানুষ এসে জুটেছেন এরোড্রোমে! পুরুষেরা তো আছেনই—আর এই মুসলমানি দেশে সেদিন অবধি ঘোড়ার পুচ্ছলোমে-বোনা কড়া বোরখায় যাঁদের চন্দ্রমুখ ঢাকা থাকত, বোরখা ছুঁড়ে দিয়ে তাঁরাও কত জনে চলে এসেছেন! মস্কোয় ফুলের কল্পস্বপনা—নেতা ও নারীদের শুধু ফুল দিয়ে খাতির করেছিল। এখানে জনে জনের হাতে ভারী ওজনের তোড়া দিয়ে ফুরাতে পারে না; এক গাদা বাড়তি থেকে যায়। সেগুলো তখন আমরা দখল করে নিয়ে ওদের উপহার দিই। পরের ধনে পোদ্দারি করি। ফুল দিয়েই শেষ নয়—সে উপহার হাত ছুঁতে না ছুঁতে, দেখি, বুকের মধ্যে লুকে নিয়েছেন। একই সোবিয়েত দেশের মধ্যে ঘুরছি বটে—বুঝতে পারলাম, এ এক ভিন্ন এলাকা। নিখুঁত ভদ্রতাসঙ্গত সেকহ্যাণ্ডের ধার ধারেন না এই মশায়েরা, বীরবিক্রমে বুক চেপে ধরেন। ম্যালেরিয়াজর্জর পিলে-সর্বস্ব কেউ নেই ভাগ্যিস আমাদের মধ্যে; ভালবাসার দারুণ চাপে তবে তো পটাশ করে পিলে ফাটবার কথা। যেদিকে তাকাই, শুনতে পাচ্ছি—'সালাম' 'সালাম'। ঐ 'সালাম' শুনে আরও মনে হয়, দেশভুঁইয়ে ফিরে এসেছি। তা স্বদেশ আর কত দূরই বা! ক'টা পাহাড় পাড়ি দিয়ে আফগানিস্তান; তার পরে পাকিস্তানের উপর দিয়ে সাঁ করে ভারত এলাকায় ঢুকে পড়তে পারি।

তুরসুন-জাদে মির্জা—তাজিক দেশের সেরা কবি। তিনি সকলের আগে দাঁড়িয়েছেন। আশেপাশে বিস্তর হোমরা চোমরা ব্যক্তি। কবিবরের সঙ্গে চীনের পিকিন শহরে সেবার আলাপ হয়েছিল। ছোটখাট একটু বক্তৃতা ছাড়লেন—অভ্যর্থনার প্রথম মুখে যেমন রেওয়াজ। তাজিক ভাষা আর ফারসির মধ্যে তফাৎ সামান্য; বুঝতে তত বেশি আটকায় না। বললেন, ফেরদৌসি-সাদি-হাফেজের ভূমিতে পা দিয়েছেন মশায়েরা—আমরা জানি, পূর্ব অঞ্চলের বাংলা দেশ অবধি আমাদের দেশের এই সব কবির সমাদর। রবীন্দ্রনাথ প্রেমচন্দ ও ইকবালের লেখা থেকে এ দেশে আমরাও তেমনি আনন্দ ও প্রেরণা ছেঁকে নিই···

আর এই এক ব্যাপার—ঘড়ির কাঁটা ঘোরানো। মস্কো থেকে তিন ঘণ্টার ফারাক এই জায়গায়। সোবিয়েত দেশটা কত বড় বুঝে দেখুন তবে, কত অঞ্চল জুড়ে আমরা চক্কোর দিচ্ছি। কাঁটা ঘোরাতে ঘোরাতে জ্বালাতন হয়ে গেলাম। মস্কোয় বরফ পড়ছে, আর এখানে



সামনের সারিতে বসে আমরা উৎসব দেখছি।

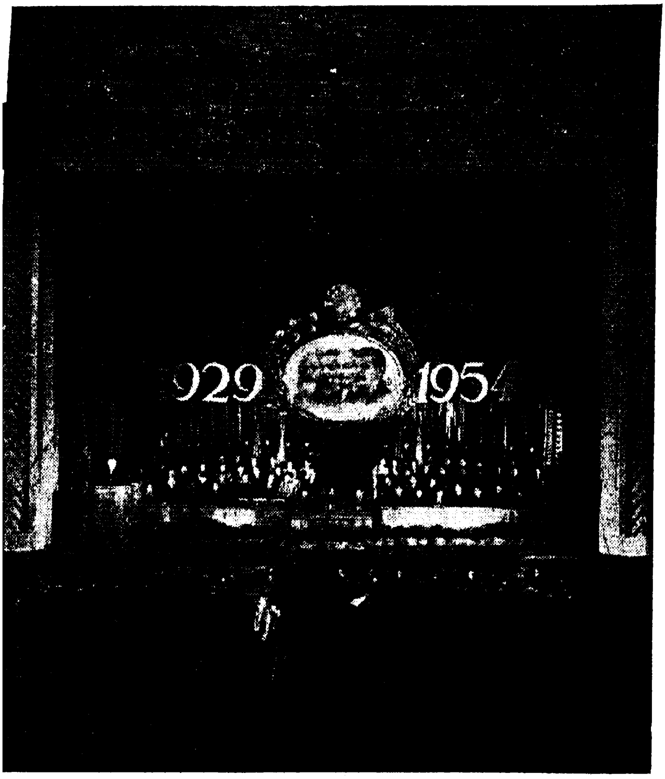
দুপুর বেলাটা রীতিমত আইঢাই করতে হয়। রাত্রে অবশ্য ঠাণ্ডা পড়ে—বেশ ঠাণ্ডা, মরুদেশের যা দস্তুর।

তাজিকিস্তান অনেক পরে—১৯২৯ অব্দে সোবিয়েত গণতন্ত্রে মাথা ঢুকাল। আজ ১৯৫৪-য় রজত-জয়ন্তী। জোরদার উৎসব—দেশবিদেশে নিমন্ত্রণ গিয়েছে। নানান চেহারায় ও নানান পোশাকে মিলে শহরের পথে পথে বিজলী খেলে যাচ্ছে। একাশি বৎসর বয়সের তরুণ ডীনকে জানেন আপনারা—মস্কোর বিল্ডিং-একজিবিশনে যাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল—মস্ক্বে তিনিও চলে এসেছেন। তুরসুন বক্তৃতায় সেই সমস্ত বললেন—ধ্বংস থেকে ঐশ্বর্যে এসেছি আমরা, মৃত্যু থেকে আনন্দে। ভুবনের তাবৎ বন্ধুদের ডেকে ডেকে জাঁক করে আজ দেখাবো।

তাই বটে! আনন্দ সাগরতরঙ্গের মতো উচ্ছলিত চতুর্দিকে। এরোড্রোম থেকে শহরে যাচ্ছি। যে দিকে তাকাই—নিশান উড়ছে, ছবি সাজিয়ে দিয়েছে। দশ-বিশ পা গিয়েই লেনিন আর ষ্টালিনের মূর্তি। দোকানপাট ঘরবাড়ির দেয়াল দেখবার জো নেই—পতাকায় পতাকায় ঢেকে গেছে। তাজিকিস্তান গণতন্ত্রের আলাদা পতাকা। সোবিয়েতের ষোলটা গণতন্ত্র—ভিন্ন পতাকা সকলেরই। মার্চ করছে একেবারে বালখিল্য একদল পায়োনিওর। এদের চেয়ে একটু বড় আর একদল মার্চ করছে পিছন-দিকে। তারও পিছনে মার্চ করছে—তারা আর একটু বড়। এমনি চলল। কালকের মহোৎসবে মিছিল হবে, শহর ভরে তার তোড়জোড়। চীনেও ঠিক এই ব্যাপার দেখেছি, সে আয়োজন অবশ্য অনেক বড় এর চেয়ে। এত বড় যে তুলনাই চলতে পারে না।

খাসা শহর। ছবির মতো। তুষারধবল হিসার পর্বতমালা ঘিরে ধরেছে—পর্বতের পদতলে ওয়েসিসের মধ্যে একটি যেন সাজানো বাগান। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা লেনিন ষ্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছি—পপলার-উইলো-থুজা-এলম নানান গাছের ছায়ায় স্নিগ্ধ রাজপথ। পথের দু-পাশে বড় বড় গাছ—আবার ঠিক মাঝখানেও গাছের তিন চার সারি। এদিকে ওদিকে পিচের রাস্তা। ফুলের বাগান এখানে ওখানে। বাড়িগুলো পাহারাদারের মতো বুক চিতিয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে নয়—খানিকটা পিছনে সরে। মানুষের আরাম-আনন্দের নীড় এক একটি। রাস্তাঘাট ঘর-দুয়োর খেয়ালখুশি মাফিক নয়, রীতিমতো হিসাবপত্র করে বুদ্ধি খাটিয়ে বানানো।

অথচ কী ছিল এই পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগেও! নগণ্য এক আধা-শহর—দিউশাম্বে। নিচু-ছাত নিচু-দরজা মানুষ নামক পশুর ইতস্তত-ছড়ানো বাসগুহা। বাহনের মধ্যে গাধা ও খচ্চর—মালপত্র ও মানুষ পিঠে নিয়ে বেড়াচ্ছে ধূলো-ভরা রাস্তায়। রেলরাস্তা আড়াই'শ মাইলের এদিকে নয়। শহরের পাশেই কুষ্ঠরোগির আস্তানা—কুষ্ঠীরা অবাধে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ায়। গোঁড়া মোল্লাদের কড়া শাসনে সন্ত্রস্ত ইতর-ভদ্র সর্বজন। বনেদি বে মশায়দের বাড়ি অহোরাত্রি জুয়ার হুল্লোড়। আর হামেশাই দেখতে পেতেন, সৈন্যরা একজন দু-জনের হাত-পা বেঁধে কোতল করতে নিয়ে যাচ্ছে। বাজারটা ঘুরিয়ে নিয়ে যায়, লোকে দেখে দুটো-চারটে পয়সা দেয়, সৈন্যদের উপরি রোজগার সেটা। এই ছিল সেদিনের চেহারা।



জয়ন্তী-উৎসবে তাজিক সুপ্রীম-সোবিয়েতের অধিবেশন।

আমাদের মোটরগুলো সারবন্দি ঢুকে পড়ল মামুলি কোন হোটেলে নয়, মস্ত বড় এক বাগিচার ভিতরে। কত রকমের ফুল ও ফল, গণে পারবেন না। মাঝখানে বাংলো প্যাটার্নের দুটো বাড়ি। অনেকগুলো ঘর—ছিমছাম সাজানো-গোছানো। নতুন করে রং দিয়েছে—হয়তো বা আমরা আসছি বলেই—রং এখনো কাঁচা। দলটা দু-ভাগ হয়ে সেই দু-বাড়ির ঘরে ঘরে আমরা ঠাঁই নিলাম।

একটি মেয়ের উপর আমাদের বাড়ির খবরদারির ভার। তার নিচে আরও সব। মেয়েটি বেশ ভালো; সুশ্রী প্রসন্ন মুখ। আলস্য নেই, মুখের কথা মুখে থাকতে ষোল জন আমাদের খেদমত করে বেড়াচ্ছে। নতুন জায়গায় পয়লা দিন নানান রকমের ফাই-ফরমাস—খেটে তবু যেন হয় না

মেয়েটার। এক খাটনি এসে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে। করো তার-কিছু হুকুম। পলকের মধ্যে সেটা সেরে ফেলে আবার এসে দাঁড়াবে। বলো আর কিছু। খাটনির এই হ্যাংলাপনা দেখে কষ্টও হয় মনে মনে। কিন্তু মুশকিল হল, একদম ইংরেজি জানে না, এক কথা বললে অন্য রকম বোঝে। বাথরুম কোন দিকে গো? বিছানার চাদর পালটে দিল এসে তাড়াতাড়ি। জুতোয় বুরুষ দিতে বলো কাউকে—দৌড়ে এক কাপ কফি বানিয়ে আনল। এমনি গতিক। তখন সেই আদিম পদ্ধতির শরণ নিতে হল—মুখের কথা নয়, চোখ ঘুরিয়ে হাত নেড়ে ঠারেঠোরে বলা।

চায়ে চলে আসুন তাড়াতাড়ি—। পৌঁছুতে দেরি হয়েছে, একটা রাত আস্কাবাদে আটক থাকতে হল। সুপ্রীম সোবিয়েতের অধিবেশন বসে গেছে, এক ঢোক চা মুখে দিয়ে ছুটতে হবে এখনই।

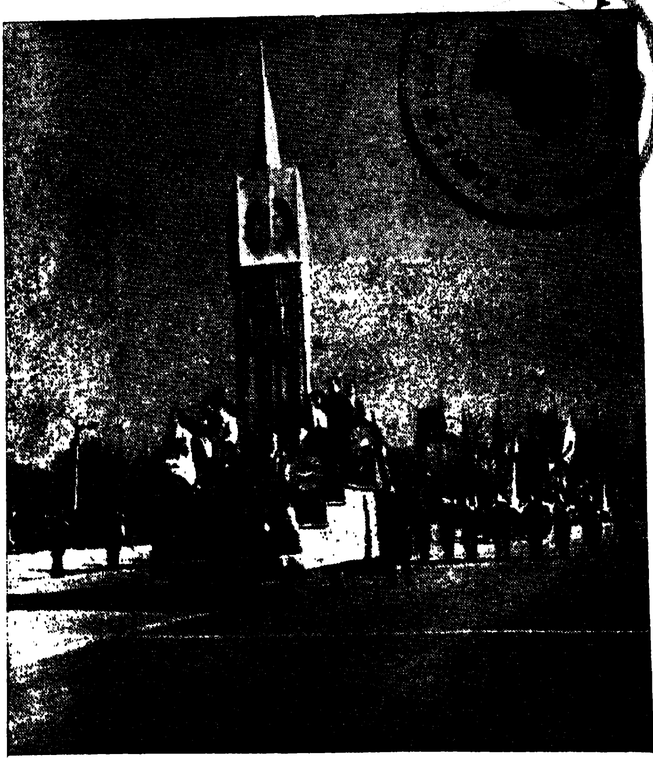
টেবিলে থরে থরে চায়ের আয়োজন—বড় ভয়ানক চা দেখতে পাচ্ছি। মৎস্য-মাংসের রকমারি তরকারিও চায়ের অন্তর্গত। তাহলে এর পর লাঞ্চে কি ব্যাপার হবে—হিমালয় পর্বতমালার এক একখানা চূড়া তুলে এনে টেবিলে স্থাপনা করবে না কি? যাই হোক সে পরের ভাবনা। টেবিলেই আমাদের হাতে-হাতে চিঠি দিল—সুপ্রীম সোবিয়েতের কর্তারা দাওয়াত পাঠিয়েছেন। নোটবুক দিল, ফাইল দিল—অধিবেশনের কাজকর্ম টুকে আনতে চান যদি।

তাজিক অপেরা ও ব্যালে হল। বাড়িটা আনকোরা নতুন। মস্ত বড় উদ্যান—মাঝখানে অনেকগুলো ফোয়ারায় উঁচু হয়ে জল পড়ছে; ফুলগাছ ও লতাগুল্মে সাজানো অবিকল মস্কো স্কোয়ারের মতন। নামও দিয়েছে মস্কো স্কোয়ার। হলের মধ্যে অধিবেশন বসেছে। সাজিয়েছে খুব। অগুন্তি গাড়ি একদিকে, আর এক দিকে বিস্তর মানুষ। পুলিশ ও মিলিটারি ঘোরাফেরা করছে। সসম্ভ্রমে তারা আমাদের পথ দেখিয়ে দিল। সিঁড়ি দিয়ে উঁচুতে উঠে নিচু হয়ে—আবার কিছু উঁচুতে উঠে হলে ঢুকলাম। ভিতরে আরও আহা-মরি সজ্জা। উঁচু প্লাটফরম পতাকা দিয়ে সাজানো, মাঝখানে মর্কস-এঙ্গেলস লেনিন-ষ্টালিনের সম্মিলিত ছবি। লম্বা-আঁশ মিশরীয় তুলার বিস্তর ফলন এখানে—সেই তুলা এঁকে দিয়েছে; ধান ফলে বলে ধানের শীষ এঁকেছে; ফল-পাকড়ের দেশ, সেজন্য তারও ছবি; আর ফুলের পাহাড়—প্লাটফরম কাঠের না লোহার না পাথরের বোঝবার জো নেই, শুধুই ফুল। সামনের সারিতে চার জন সভাপতি—রমণী হলেন তার একটি। পিছনে অপর নেতৃবৃন্দ। বক্তৃতার জায়গা আরও আগে—বক্তারা এক এক করে মাইকের কাছে এগিয়ে এসে বক্তৃতা পড়ছেন। চায়ের গেলাস ঘন ঘন বদলে দিয়ে যাচ্ছে বক্তার পাশে। বক্তা চুমুক মেরে গলা ঠিক করে নিচ্ছেন, আর পড়ছেন।

আমরা গিয়ে দাঁড়াতে বিষম হাততালি। কাজকর্ম বন্ধ, হাততালি আর থামে না। মোভি ও অসংখ্য ক্যামেরা নানান দিকে। জোরালো বাতি জ্বলে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে—সেই আলোয় কত বার কত রকমে যে ছবি তুলছে তার অবধি নেই। এক ক্যামেরাম্যানের ডানহাত কাটা—বাঁ-হাতে অবলীলাক্রমে টকাটক ছবি তুলে যাচ্ছে।

শ্রোতাদের মধ্যে কারো কারো সেকেলে সাজ-সজ্জা, মাথায় ফুল-কাটা চৌকো টুপি। মেয়েরা আছেন, তবে মস্কোর মতন সংখ্যাধিক্য নয়। আগে একেবারে তো হারেমবর্তিনী ছিলেন, প্রতাপ কিছু কম তাই পুরুষের চেয়ে। কিন্তু হাওয়া যে রকম দেখলাম, এ সুখ পুরুষের বেশি দিন আর থাকছে না। বক্তৃতার পর বক্তৃতা—তাজিকি ভাষায় বলছে, দু-চার কথা যে না বুঝছি এমন নয়। নানা কৃতিত্বের কাহিনী। অপর গণতন্ত্রের মুরুব্বিরা উপহারের পর উপহার এনে ঢালছেন, আর বাহবা দিচ্ছেন তাজিকিদের।

আজও এক ঘুমের রাত থাকতে উঠেছি ব্যস্তবাগীশ ধীরেন সেন মশায়ের পাল্লায় পড়ে; তার উপরে এই ধকল—মাথা ধরেছে, বসতে পারছি না। হীরেন মুখুজ্জে মশায়ের তো পাশাপাশি



স্তালিনাবাদ রেড স্কোয়ারে জয়ন্তী-মিছিলের একাংশ।

জ্বর নাড়িতে ; তিনি আসতে পারেন নি, ঘরে শুয়ে আছেন। ফাঁক বুঝে ক'জন আমরা সরে পড়লাম।

ঐ নির্দয় চা-সেবনের পরে লাঞ্চের আর তাগত নেই। ঘরে এসে সটান শুয়ে পড়েছি। রেডিও-য় রীলে করছে—শুয়ে শুয়ে অধিবেশনের বক্তৃতা ও হাততালি শুনছি। চোখ বুজেছি দেখে মেয়েটি এক সময় রেডিও-র জোর খুব কমিয়ে দিয়ে গেল। ঘুমিয়ে পড়েছি, বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছি। সকলে ফিরে আসতে ঘুম ভাঙল। কত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম তবে বুঝুন।

হীরেন মুখুজ্জে মশায়কে ডাক্তার দেখে গেছে। নিউমোনিয়ার অবস্থা। পেনিসিলিন দিয়ে নার্স মোতায়েন করে গেছে। জোরজার করে আমাদের সান্ধ্য ভোজে নিয়ে বসাল, হাত এড়ানো গেল না। রীতরক্ষার মতো হবে বাপু। আয়োজন তোমাদেরই বটে, কিন্তু পাকযন্ত্র নিজের। বিদেশ-বিভূঁয়ে যন্ত্রটা বিকল হতে দিচ্ছিনে। রাগ করলে নাচার।

খাওয়ার পরে আবার সেই অপেরা হলে। কনসার্টের আসর। সারাদিন তা-বড় তা-বড় মানুষ ভারী ভারী আলোচনা করলেন, রাত্রির ফুরফুরে হাওয়ায় এখন সেখানে নাচ আর গান। একালের অনেক রকম তো আছেই—কিন্তু আজকের বিশেষ আয়োজন, বিদেশি অতিথিদের পুরাণো কিছু দেখানো। পাহাড়ের উপত্যকায় আর মরুভূমির ওয়েসিসে নরনারী চিরকাল ধরে যে সব গান গায়, যে সমস্ত নাচ নাচে। এক বয়সে আমারও বাতিক ছিল—গাঁয়ে গাঁয়ে আসল বাংলাদেশকে খুঁজে ফিরেছি। কত পট-কাঁথা, কাঠের কাজ, ইটের কাজ, মাটির কাজ—কত কত লোক-নৃত্য ও সঙ্গীতের আসর! অমৃতে একদিন চুমুক দিয়েছিলাম, অন্তরাত্মাকে হাজার পেষণেও মেরে ফেলতে পারেনি তাই। যাকগে, যাকগে—নিজের কথা দশ কাহন করে বলছি, বেজার হচ্ছেন আপনারা।

পুরানো রীতির সাজ-পোশাক, সঙ্গতের মধ্যে শিঙা বাজাচ্ছে ঘন ঘন। সারা বলে একটা মেয়ে রুবাইয়াৎ গাইল—আহা মরি, কী মিষ্টি গলা! নানা চেহারার তারের বাজনা বাজাচ্ছে—পরশু রাতে বাকুর আসরে যেমন হয়েছিল। সারার গানের পর করতালি আর থামে না। মধ্য-এশিয়ার নানান দেশে এই ক'দিন অনেক আসরে তো বসলাম। নাচ-গানের ব্যাপারে আধুনিকতার চেয়ে পুরানো ধারাই মানুষকে বেশি মাতোয়ারা করে ; শ্রোতায় আর শিল্পীতে ফারাক থাকে না।

অনেক রাত্রি অবধি কনসার্ট চলল। পাঁচ শ' পুরুষ ও মেয়ে নামল কয়েকটা গানে নাচে—পাকা-দাড়ি বুড়ো মানুষ থেকে চঞ্চলা তরুণী কিশোরী। কেউ এরা পেশাদার নয়, জয়ন্তী-উৎসব ব্যাপারে নানান অঞ্চল থেকে এসেছে। আর এক দল ঝিকমিকে মেয়ে, লিখতে লিখতে, এই আমার চোখের সামনে ঘুরছে যেন। মাথায় লাল টুপি, দুটো করে লম্বা বিনুনি, সবুজ কাঁচুলি, সবুজ পায়জামা, সাদা সেমিজ—এই সাজে নাচগান করল একটি পালা—'আপেল গাছে ফুল ধরেছে'। পালার শেষে বুকের উপর বাঁ-হাত রেখে তনুলতা বাঁকিয়ে অভিনন্দন গ্রহণ করে, নাচতে নাচতে তারপর আড়াল হয়ে যায়। ভারি মিষ্টি ভঙ্গিটা।

বিরাম-সময়ে বিরাট জলযোগ—আঙুর, বেদানা, আপেল গাদা গাদা দিচ্ছে। [কনসার্ট অন্তে ঘরে ফিরে নিশিরাত্রে এই সারা-দিনের ব্যাপার টুকে রাখছি। আমার ঘরের টেবিলেই বা কত ফল! কলম ছুঁড়ে ফেলে এই হাত দিয়ে মধুরতর ক্রিয়া-সম্পাদনের লোভ হচ্ছে এক একবার।] শিল্পীরা ষ্টেজ থেকে নেমে এসে সেকহ্যাণ্ড করছে ভারতীয় অতিথিদের সঙ্গে। একজন শ্যামবর্ণের মানুষ—রঙে চেহারায় অবিকল ভারতীয়—প্রিমিয়ার এখানকার। ময়লা রঙের মেয়েও অনেক দেখছি। ঘন কালো চুল—ভারতীয় বলে ভুল হয়ে যায়।

মফস্বলের মানুষ বিস্তর এসে জমেছে শহরে। বাস ভরতি হয়ে হয়ে আসছে, পথের মধ্যে অনেকবার দেখেছি। কনসার্ট-হলেও অনেকে তারা। তাজিকদের পুরানো সাজে এসেছে কেউ কেউ—অনেকটা কাবুলিওয়ালার মতো। পাহাড়ের ঠিক ওপারে আফগানিস্তান। বিনা পাশপোর্টে এখনো কিছু যাতায়াত চলে। দু-জাতের মধ্যে বড্ড মিল সেইজন্য।

২৪ অক্টোবর, রবিবার। মজা বেশ জমেছে। ষোল জন আমরা এই বাড়িতে—একটা মাত্র পায়খানা। গোসলখানাও একটা। স্নান প্রক্রিয়াটা এরা বিলাসের সামিল মনে করে, মরু অঞ্চলে জলের অপব্যয় বরদাস্ত করে না—একটা গোসলখানার অতএব মানে বোঝা যায়। কিন্তু প্রাতঃকালীন ভারমুক্তিটাও বাহুল্য ব্যাপার এদের কাছে? আসল উৎসব আজকে, রকমারি মিছিল বেরুবে—বিস্তর দিন ধরে যার তোড়জোড় চলছে। সকাল সকাল গিয়ে অতএব জায়গা নেওয়ার দরকার, নয়তো মুশকিল হতে পারে—কাল থেকে এই সব শোনাচ্ছে। বাথরুমের সামনে লাইন দিয়েছে তাই শেষরাত্রি থেকে। ধীরেন সেন মশায়ের অসীম অধ্যবসায়—রাত তিনটেয় উঠে পড়েছেন ; উঠে স্নানাদির কাজ সেরে আবার লেপমুড়ি দিলেন। আমাদেরও বুদ্ধি দিচ্ছেন : উঠে পড়ুন—অন্য কেউ টের না পেতে সেরে আসুন নিরিবিলি।

চোখ মেলে তাকাচ্ছি—ঘুম ছাড়ে না চোখের পাতা থেকে। বাড়িসুদ্ধ নিশুতি হয়ে যাবার পরেও অনেক রাত্রি অবধি লেখাপড়া করেছি। শুয়ে শুয়ে বলছি : কাল থেকে এক কাজ করুন না ডক্টর সেন—শোবার সময়টা যাবতীয় প্রাতঃক্রিয়া সেরেসুরে একেবারে লেপমুড়ি দেবেন, মাঝরাতে আর ওঠাউঠি করতে হবে না।

জ্ঞান মজুমদার মশায়ও সেরে এলেন। দু'জনের হয়ে গেল তো উঠে পড়েছি এবার। অনেক রাত তখনো। কিন্তু অন্য ঘরেও সাড়া পড়ে গেছে ইতিমধ্যে। একে দুয়ে বেরুচ্ছেন। এক ছুটে রাও গিয়ে গোসলখানার দরজা দিলেন আমার আগে। তারপরে আর সাড়াশব্দ নেই—ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভদ্রলোক? তেল-টেল মেখে তৈরি হয়ে দাঁড়িয়েছি—পশমের পোশাক গায়ে রাখা চলে না এই অবস্থায়, হি-হি করে কাঁপছি। দরজায় টোকা দিলাম তো 'ইয়েস' বলে ভিতরে তেমনি আবার চুপচাপ। কি করি, চেয়ার টেনে এনে গুটিসুটি হয়ে বসলাম। ভাগ্যবশে ঠিক পরের জায়গাটা পেয়েছি, ছেড়ে যাওয়া চলে না। কিউ দেখতে দেখতে বেশ লম্বা হয়ে দাঁড়াল। এ-ও ধীরেন সেন মশায়ের কীর্তি, পরে শোনা গেল ; রাতে ওঠার বুদ্ধিটা

ডাইনে-বাঁয়ে অবাধ বিতরণ করেছেন। ফলে সবাই সকলকে মারবার তালে ব্যস্ত। রাতে শুয়েও সোয়াস্তি নেই, হায় ভগবান!

পরের দিন আরও সঙ্গিন অবস্থা। তিন প্রহর রাতে উঠেও দেখি, আমার আগে আট জন। যা হবার হোক, রেগে-মেগে আবার বিছানায় পড়লাম। ঘুম ভাঙল, তখন দিব্যি সকাল হয়ে গেলে। বাথরুমে এসে দেখি, একেবারে ফাঁকা। আরাম করে দীর্ঘক্ষণ ধরে স্নান করা গেল। তাড়ায় পড়ে রাতের মধ্যে অন্য সবাই সারা করে নিয়েছে।

যাকগে, আজকের কথায় আসি আবার। কোন রকমে হাঙ্গামা চুকিয়ে প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়া গেল। আগে পিছে ছ-খানা গাড়ি আমাদের নিয়ে চলেছে! একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, আমাদের গাড়ি দেখলে শশব্যস্তে পথ ছেড়ে দেয় সকলে। রাস্তায় লাল আলো লহমার মধ্যে সবুজ হয়ে যায় আমরা দাঁড়াতে না দাঁড়াতে। পিছন থেকে একটু আওয়াজ দিলে আগের গাড়ি ত্রস্ত ভাবে পাশে চলে যায়। ব্যাপার কি গো? প্রশ্ন করে ঠিকমতো জবাব পাওয়া যায় না। বলে, শহরের মানুষ তোমাদের জেনে ফেলেছে; বিদেশি বলে খাতির।

সারা তাজিকিস্তান আজকে বুঝি পথে বেরিয়ে পড়েছে। বাচ্চারাও বাদ নেই। চলেছে ফুল নিয়ে আর নিশান উড়িয়ে। সে নিশান আয়তনে ছোট—লাল কাপড়ের উপর সোনালি বুনানি। দলছাড়া হয়ে পড়ছে কেউ কেউ, ছুটোছুটি করে দলে ভিড়ে যায় আবার। যত এগোচ্ছি, মিছিলের দল সামনে পড়ে মোটরের পথ আটকাচ্ছে। প্রতি দলের সঙ্গে নানা রকমের লেখা—তুলোর দেশ বলে মোটা মোটা তুলোর হরপে লেখা বেশির ভাগ।

এক বিশাল মাঠের ধারে এসে নামলাম। এর নাম রেড স্কোয়ার—মস্কোর দেখাদেখি! এইখানে জাতীয় উৎসব। খানিকটা সামনের জায়গা পাকা কনক্রিট, বাকি সব মাটি। বিস্তর দল জমায়েত হয়েছে, আরও সব জমছে। মাঠের সুদূর প্রান্তে মানুষে আর মোটর-ট্রাকে ভরে গেল। পিকিনের সেই অক্টোবর-উৎসব মনে পড়ে। ঢের ঢের বড় অবশ্য পিকিনের আয়োজন।

দেরি হলে জায়গা মিলবে না—নিতান্তই ভয় দেখানো কথা, তাড়াতাড়ি যাতে সকলে বেরিয়ে পড়ি। পয়লা সারিটা পুরোপুরি খালি রেখে দিয়েছে আমাদের জন্য। শ্রীযুত দাগে হায়দরাবাদের মানুষ, পার্লামেন্টের মেম্বর। মাথায় বিশাল পাগড়ি বাঁধা শুরু করেছেন ক'দিন থেকে। সাধারণ লোকের একটা ঝাপসা মতন ধারণা, ভারত হল সন্ন্যাসী-ফকির ও রাজা-মহারাজার দেশ। পাগড়ির দরুন অতএব সমস্ত ক্যামেরার নজর তাঁর দিকে। আমরাও ডাকছি তাঁকে 'মহারাজ' বলে। আর ধীরেন সেন মশায় বলেন 'মহারাজ বনবন'।

সারা মাঠে নানান দলে সৈন্য সাজানো। কম্যাণ্ডার চিংকার করে উঠলেন। মাঠ জুড়ে সৈন্যদের মুখে মুখে তার প্রতিধ্বনি—ঠিক আছি, তৈরি আছি আমরা সকলে।

কাঁটায় কাঁটায় দশটা, নেতারা সেই সময় মঞ্চের উপর দাঁড়ালেন। মঞ্চটা সদ্য বানিয়েছে। দু-জন ঘোড়সওয়ার হুকুম নিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দূর প্রান্তে চলল। ব্যাণ্ড বেজে উঠল। বিপুল উল্লাস সৈন্যদলের মধ্যে।

জাতীয় সঙ্গীত। মাঠের যে যেখানে বসে ছিল, উঠে দাঁড়িয়েছে। মার্চ শুরু এবারে। তার আগে বিদেশি প্রতিনিধিদের সম্বর্ধনা জানিয়ে চীফ-কম্যাণ্ডার পঁচিশ বছরের কাহিনী শোনাচ্ছে। কেমন ছিল, আর কি পেয়েছে এখন।

বন্দুকধারী এক দল বন্দুক উঁচিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে গেল; পিছনে ড্রামের দল। পাইলট ও প্যারাট্রুপ। বন্দুকধারী আবার এক দল। ট্যাঙ্ক। ঘোড়সওয়ার। মোটর-বাহিনী। বিমান-ধ্বংসী কামান। ট্যাঙ্কধ্বংসী কামান। দলের পর দল চলেছে, আওয়াজে আকাশ বিদীর্ণ হবার জোগাড়।

বেলুন উড়িয়ে দিল; জয়ন্তী-উৎসবের কথা লেখা বেলুন। আকাশ ভরা উড়ন্ত বেলুনই শুধু। ব্যাণ্ডের দল সাদা পোশাকে মিছিল করে বেরিয়ে গেল।

প্রিমিয়ার ছোট্ট একটু বক্তৃতায় সৈন্যদের অভিনন্দন জানালেন।

আবার মিছিল। ট্রাইসাইকেলে করে বাচ্চারা যাচ্ছে—সাদা পোশাক, মাথায় তাজিকি টুপি; সাদা নিশান বাঁধা সাইকেলের মাথায়।

ট্রাক পর পর যোলখানা। যোলটা গণতন্ত্র নিয়ে সোবিয়েত দেশ, প্রত্যেকে আলাদা ট্রাক নিয়ে আসছে—আলাদা পোশাকের মানুষ, আলাদা নিশান। শিশুরা টপাটপ নেমে পড়ছে ট্রাক থেকে, ফুল ও নিশান নিয়ে এক ছুটে মঞ্চের উপর উঠে নেতাদের হাতে দিয়ে আসে।

এর পিছনে আরও ট্রাক আসছে। একটার উপর মেয়েরা কসরতের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে। স্বাস্থ্যে ফেটে পড়বে, এমনি মালুম হয়। ঘোড়ায় চড়ে একদল মেয়ে নিশান দোলাতে দোলাতে গেল। এলো তারপর পুরুষ খেলোয়াড়রা; তলোয়ার খেলতে খেলতে এক দল চলে গেল!

মস্ত বড় জলের ট্যাঙ্ক বয়ে নিয়ে চলেছে ট্রাকে। সাঁতারুরা ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে তার ভিতরে, জল ছিটকে পড়ছে রাস্তায়। ডালপালায় ঢাকা মেটে রঙের গাড়ি চলল এক সারি—লড়াইয়ের সময় যে কায়দায় গাড়ি ও অস্ত্রশস্ত্র ঢেকেঢুকে নিয়ে বেড়ায়।

খেলোয়াড় মেয়েরা—লাল ও গোলাপি ইউনিফর্ম—কাগজের ফুল দোলাতে দোলাতে চলে গেল। কালো ও সবুজ ইউনিফর্মের একদল। নেভি-ব্লু ও কালো ইউনিফর্মের আর এক দল। পরের দল আগাগোড়া সাদা ইউনিফর্মের।

মল্লযুদ্ধের মহড়া দিতে দিতে ছেলেরা যাচ্ছে। ভার উত্তোলন দেখাচ্ছে। নানান কৃষিবস্তু হাতে নিয়ে যৌথখামারের ছেলেমেয়েরা চলেছে—রঙিন পোশাকের ভারি বাহার, হেন রঙ নেই যা অঙ্গে ধারণ করেনি। সাইকেলের দল চলেছে। কালো রঙের পোষাকে বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী, কারিগরি ইস্কুলের ছাত্রছাত্রী—প্রতি দলের সঙ্গে আলাদা ব্যাণ্ডপার্টি। অনাথ ছেলেমেয়েদের মিছিল—হাতে নিয়েছে নেতাদের ছবি আর নিশান। মিডল্ ইস্কুলের ছেলেমেয়েরা: ছেলেদের মাথা কামানো। ফুটফুটে পায়োনিয়ারের দল ফুল নিয়ে চলেছে—সত্যিকার ফুল আর কাগজের ফুল!

জাহাজ-এরোপ্লেন তৈরি করছে—তারই সব নমুনা ট্রাকের উপর। ছেলেমেয়ে মিলিতভাবে কাস্তে-হাতুড়ি ধরে আছে; তুলা, গম ও ধানের শীষ তাদের অন্য হাতে।

মাঠের দূর প্রান্তে লোকারণ্য। মিছিল ধরে এগিয়ে এসে দলের পর দল আমাদের সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। এত যাচ্ছে, তবু তো কমে না পিছনের জমায়েত। বরঞ্চ বেলার সঙ্গে সঙ্গে ফেঁপে ফুলে উঠছে যেন। চড়া রোদ, টেঁকা যাচ্ছে না, অস্থির হয়ে উঠছি।

প্রাচীন তাজিকি সাজসজ্জায় একজন নাচতে নাচতে বাজাতে বাজাতে চলে গেল। অসম্ভব রকমের বড় কার্পাসফল বানিয়েছে—পুষ্পসজ্জিত। তরুণী মেয়ে সেই ফলের ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে। আরও একটা ফল—তার ভিতরে নিশান দোলাচ্ছে এক-জোড়া বাচ্চা মেয়ে। লোকে কাঁধে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই সব অতিকায় কার্পাসফল, খুব হাততালি পড়ছে। শিশুর দল শান্তির পায়রা নিয়ে—সকল দেশের মধ্যে সকল মানুষের মধ্যে শান্তি আসুক, গলা ফাটিয়ে বলতে বলতে যাচ্ছে; কাগজের শ্বেত পায়রা উঁচু করে তুলে ধরেছে। হঠাৎ জীবন্ত পায়রার ঝাঁক উড়িয়ে দিল, উড়তে উড়তে আকাশ-প্রান্তে মিলিয়ে গেল।

সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে বিস্তর এসেছে, তারা মিছিলে নামল এইবার। চেহারায় সাজসজ্জায় গ্রাম্যতা বোঝা যায়। কোলের বাচ্চা নিয়ে মায়েরা অবধি এসেছেন। গমের শীষ, কাঁচা-ধানের গুচ্ছ, ডাল-পাতা সমেত তুলো শিশুরা নিয়ে চলেছে। আর বিস্তর ফুল—আমাদের অপরাজিতা ফুলের মতন অমনি নীল দেখতে।

ভিন দেশি দলও এসেছে, দেখছি। চীন, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লো-ভেকিয়া, হাঙ্গেরি রকমারি পতাকা নিয়ে নিজ নিজ ভাষায় শ্লোগান দিচ্ছে—দুনিয়ার সব মানুষ আমরা এক। তাজিকির নাচ—সানাই তম্বুরিন আর শিঙায় মিলে সঙ্গত করছে। থিয়েটারের নানান সজ্জায় সেজে চলেছে অভিনেতৃদল। সার্কাসের দল খেলা দেখাতে দেখাতে আসছে। সিংহ অবধি নিয়ে এসেছে ট্রাকের উপরে—সিংহের খাঁচায় ঢুকে হরেক খেলা খেলছে।

যৌথখামারের দল এর পরে। ফসলে বোঝাই ট্রাকের সারি—গোণাগুণতি নেই। একা লেলিন-কোলখোজই দেড়-শ গাড়ি এনে ফেলেছে। কারা কি রকম ফসল ফলাচ্ছে, তারই কিছু নমুনা। গাড়িতে গাড়িতে প্রতিজ্ঞাপত্র ঝোলানো—উৎপাদন আরও কত বাড়াবে, নেতা ও দেশের মানুষদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যাচ্ছে। মঞ্চের নেতারা হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন, তারাও পালটা হাত নাড়ছে।

যৌথখামারেরা গেল তো ফ্যাক্টরি। দুটো করে ট্রাক পাশাপাশি জুড়ে ফ্যাক্টরির মালপত্র দেখাচ্ছে। সিমেণ্ট, মোটরের কলকব্জা, সিল্ক, সুতি-কাপড় আরও কত কি! তাদের পিছনে ফুলের গয়নায় সর্বাঙ্গ মুড়ে গাঁয়ের মেয়েরা; রকমারি গ্রাম-নৃত্য দেখাচ্ছে।·····

দুপুর গড়িয়ে গেছে। জনসমুদ্র উল্লাসে আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে যেন। যা গতিক, সমস্ত দিন ধরে চালাবে। সূর্য আগুন ছড়াচ্ছে মাথার উপরে।

দোভাষি যেন দৈবীপ্রেরিত হয়ে এসে বলল, ক্লান্ত হয়ে পড়েছ—উঠবে নাকি এবার?

[ক্রমশঃ।

যখন তুমি কল্পনায় ছিলে যখন তুমি বাস্তবে এলে

মৈত্রেয়ী দত্ত-চৌধুরী

তখন আমার হৃদয়-সারী তোমার বুলি নিয়ে,
আধো-আধো ভাষার সুতোয় চলতো গেঁথে মালা,
মানস-প্রিয়া মন-পেয়ালা ভরিয়ে দিতে সুরে,
চলতো মোদের উদাস ক্ষণের কাব্যলেখার পালা,
যখন তুমি ছিলে আমার কল্পনায়,
তরুণ-মনের অলস বিলাস আল্পনায়।
আবেশ-মাখা মদির আঁখি দুটি,
বুনতো স্বপন তোমায় ঘিরে ঘিরে,
বুকের মাঝে তুলতো মাতন তোমার উপস্থিতি,
দখিণ হাওয়া জাগায় যেমন উদাস ধরণীরে।
তেমনি করে একটুখানি মিষ্টি কথার ছিটে,
হাস্যমাখা সুরমা-চোখের আকুল ভাষাগুলো,
ঠুনঠুনিয়া চুড়ির সুরে মদির কোরে দিতে,
ঝুমকো দুলের দোল-দোলানোয় উড়তো প্রেমের ধুলো।
তখন ছিল শুধু:
স্বপ্ন তোমার কল্পনা মোর দোঁহের সমন্বয়,
আবেগ-ভরা ভাষার ধারায় হৃদয় বিনিময়।
এমনি করেই কাটতো মোদের দিনগুলো·····
যখন মোরা ছিলেম দোঁহের কল্পনায়
পার্কে-লেকের ভাবুক মনের জল্পনায়।

প্রথম দিনই দিয়েছিলেম হৃদয় সমর্পিয়া
চাওয়া-পাওয়ার যবনিকার পারে,
এলে যবে বধূবেশে মন-ভোলানো প্রিয়া
মোর জীবনের বাস্তব সংসারে।

আজকে তোমার চুড়ির সুর আর ঝুমকো দুলের মাতন
মোর আকাশের চিন্তাধারায় হারা,
অঙ্কগলির ফ্ল্যাটে বসে ভাবি,—আসছে মাসের বেতন,
গোয়ালার হিসেব, আর বাকী মাসের ভাড়া।

একদিন যে কণ্ঠ তোমার কল্লোলিনীর সুরে
আবেশ ব্যাকুল কোরত তরুণ-মন,
খাপছাড়া তা শোনায় আজি যেন অনেক—দূরে,
চমকে উঠি উগ্র কথায় নিজের অকারণ।

তীক্ষ্ণ তোমার চোয়াল আর "কলারবোনে"র হার,
ক্লান্তি-মাখা নয়ন-ভরা ঘোর,
জানায় পৃথক কল্পনা আর বাস্তব সংসার,
প্রকাশ করে অক্ষমতা মোর।

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

হে ঈশ্বর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে ভালো, সকলের চেয়ে মহৎ, সকলের চেয়ে মধুর, বলতে পারো তুমি আমার কে? সকলের চেয়ে কঠিন আবার সকলের চেয়ে করুণাময়। সকলের চেয়ে স্থায়ী, সমস্ত বিচারের শেষ বিচার। সমস্ত অর্থের শেষ অর্থ। নতনম্র হয়েও প্রচণ্ড। এত কাছে অথচ কোন দুষ্প্রবেশ্য প্রচ্ছন্নে যেন গা ঢেকে আছ। অচঞ্চল, অথচ তোমাকে ধরতে পারছি না। নিজে বদলাচ্ছ না অথচ বাকি সমস্ত জিনিস বদলে-বদলে দিচ্ছ। এত পুরোনো হয়েও নিত্য-নতুন। এত ব্যস্ত অথচ কি সুন্দর বিশ্রাম করছ! এত কষ্ট করছ অথচ মুখে কি অম্লান হাসি! এত সঞ্চয় করছ অথচ কিছু তোমার প্রয়োজন নেই! বলো তোমাকে ছাড়া কী আর আমার চাইবার আছে! আর সমস্ত পেলেও আমার তৃপ্তি নেই। তোমাকে চাইতে পারলেই আমার তৃপ্তি।

কিন্তু কি করে তোমাকে চাই, তুমি যদি না চাওয়াও। কি করে তোমাকে দেখি যদি তুমি না দেখা দাও দয়া করে?

তাই তুমি নিজের থেকেই চলে এলে নেমে এলে আমাদের মধ্যে। তোমার দুয়ারে কত রক্ষী, কত পাহারাওয়ালা, কত নিয়মকানুনের অস্ত্রশস্ত্র। সমস্ত বিধিনিষেধ তুমি নস্যাৎ করে চলে এলে। তুমি বুঝলে আমাদের দুঃখ, আমাদের অসামর্থ্যের অসাফল্যের বেদনা, তাই তুমি নিজের থেকে এসে ধরা দিলে। সৈন্য-সান্ত্রীরা লজ্জায় মুখ লুকোলো!

তুমি যে আমাদেরই একজন। তুমি যে আমাদের কাছে সংসারীর চেনা পোশাকে দেখা দিলে, গেরুয়া পরে এলে না। তোমার সন্ন্যাস তো সংসারের সঙ্কোচন নয় সংসারের সম্প্রসার! আমার ঘরের আঙিনাকে বিশ্বের প্রাঙ্গণে বড় করে দেওয়া! পরিবারকে পল্লীতে পল্লীকে নগরে নগরকে দেশে দেশকে পৃথিবীতে পৃথিবীকে তিন ভুবনে নিয়ে আসা। স্বদেশং ভুবনত্রয়ং। একটি-একটি করে পাপড়ি উন্মোচিত করা। অহং-এর বৃন্তে বিশ্বাত্মার শতদল ফোটানো!

আর সকলে আমাদের পরিত্যাগ করেছে। কেউ গিয়েছে অরণ্যে, কেউ সমুদ্রে, কেউ শৈলশৃঙ্গে, কেউ বা কঠিন কৃচ্ছ্রসাধনে। সাধ্যি নেই তাদের আমরা অনুসরণ করি! কি করে ছাড়ব রাজ্য, ছাড়ব স্ত্রী-পুত্র, কি করে বা সংসার নিবাস? তুমিই একমাত্র বললে, তোকে কিছু ছাড়তে হবে না, তুই বসে থাক তোর নিজের জায়গায়, নিজের কোটে, নিজের আয়ত্তি-অধিকারের মধ্যে। আমিই সমস্ত তীর্থ ঘুরে তীর্থোদকে কুম্ভ পূর্ণ করে তোর ঘরে এসে উঠছি। তোর ঘরেই তাঁর কোল পাতা। তোর সংসারই তাঁর পীঠস্থান। তুই ঠিক থাক, তুই ঠাঁই-নাড়া হসনি, যা আছে ভুবনে তাই তোর ভবনে, যা ব্রহ্মাণ্ডে তাই তোর ভাণ্ডে, যা হোথায় তাই হেথায়।

যত মত তত পথ। এ কথা কে বলতে পারে? যে সমস্ত মত আচরণ করেছে সমস্ত পথ বিচরণ করেছে। আর, সমস্ত মত সাধন করে সমস্ত পথ ভ্রমণ করে তুমি কোথায় এসে উঠলে? কোনো মঠে নয়, আখড়ায় নয়, গুহায় নয়, তরুতলে নয়, উঠলে এসে সংসারে, মা-মন্ত্রের প্রতিচ্ছবি নিয়ে। তুমি মাতৃভক্ত, তুমি বিবাহিত—এ তো সংসারীর লক্ষণ। আর সকলে হয় স্ত্রীকে ত্যাগ করেছে নয় পরিহার করেছে। তুমি তাকে অচলপ্রতিষ্ঠ মহিমা দিয়েছ। বিবাহের কি মহত্তম আদর্শ তাই দেখালে জগৎকে। বললে, আমি ষোল আনা করে যাচ্ছি যাতে তোরা অন্তত এক পয়সা করিস। সাড়ে পনেরো আনা চাওনি—মোটে এক পয়সা বললে, একটি দুটি সন্তান হবার পর স্বামি-স্ত্রী ভাই-বোন হয়ে যাস। স্ত্রী কত বড় শক্তি কত বড় শ্রী তাই বোঝালে তাকে পুজো করে। এত প্রকাণ্ড মহাভারত, কোথাও এর দৃষ্টান্ত নেই। তুমি মহাভারতকে অতিক্রম করলে। নারীকে কত বড় সম্মান কত বড় স্বীকৃতি। এ সবই তো সংসারকে স্বর্গ করার জন্যে। যে ঘরে নারীর মান নেই সে ঘর তো শ্মশান। যে জায়া সেই জননী। তোমার মা-মন্ত্র তো সংসারীর কান্না দিয়ে লেখা। যে 'মাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছে সংসার ছেড়ে, তার মুখে মা-ডাক আর ফুটবে কি করে? তাতে থাকবে কি করে সত্যের সুর, সারল্যের সুর? এ মা ডাক তো তোমার আমার। যেহেতু তুমি-আমি দু'জনেই সংসারী।

এক হিসেবে সংসারীই তো মুক্ত। ঈশ্বরের জন্যে সে সবখানে যাবে, যেমন তুমি গিয়েছিলে। তোমার কাছ থেকেই তার সব শেখা। তার মধ্যে কোনো গণ্ডি নেই, গোষ্ঠী নেই, সম্প্রদায় নেই। সব কিছু সে মানে, যেমন তুমি মানতে, হাঁচি টিকটিকিও মানতে। সে পাদরির কাছেও যাবে, পীরের দরগায়ও যাবে। ফোঁটা-তিলকের কাছে যাবে, যাবে ত্রিপুণ্ড্রকের কাছে। বেলতলায়, ষষ্ঠীতলায়। অশ্বত্থ-পাকুড়ের নিচে, হয়তো বা কোনো জলাশয়ে। যে যা বলবে তাই শুনবে। একগুঁয়ে হবে না, একঘেয়ে হবে না। সর্বত্র তার রিক্ত পাত্রটি বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে যেটুকু মধু পায়, যেটুকু রস পায়, তাই নিচ্ছে সংগ্রহ করে। সর্বত্র মধু। সর্বভূতে মধু। তুমিই বলেছ, সব যে বিশ্বাস করবে তার শীগগির হবে।

ঠাকুর গিরিশের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তুমি আমার সম্বন্ধে কী বলছ এখানে-সেখানে? আমার মধ্যে তুমি কি দেখলে?'

গিরিশ নতজানু হল। ঊর্ধ্বমুখে তাকাল ঠাকুরের দিকে।

করজোড়ে বলল, 'ব্যাস-বাল্মীকি যাঁর ইয়ত্তা করতে পারেনি, আমি তাঁর বিষয়ে আর কি বলব ?'

চার দিকে জয়-জয় পড়ে গেল।

ঠাকুর হাত তুললেন। বললেন, 'তোমাদের চৈতন্য হোক।'

চার দিকে চৈতন্যের ঢেউ পড়ে গেল। দেশকাল দিকবিদিক মুছে গেল নিমেষে। প্রণামের প্রেমপুষ্পাঞ্জলি পড়তে লাগল পায়ের উপর। কত সবাই প্রতিজ্ঞা করেছিল ঠাকুর সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কেউ তাঁকে ছোঁবে না, তাদের কলুষস্পর্শে ক্লিষ্ট করবে না। সে দিব্য দেহ, সব ভুলে গেল। মনে হল এ নিত্যদীপপ্রদ চৈতন্য, কিছুতেই এতে মালিন্যস্পর্শ নেই, সর্বাবস্থায়ই এ জ্যোতি বিশুদ্ধতম, এ জ্যোতি নির্মলতম। স্পর্শ করে অস্তিত্বের মধ্যে নিয়ে নাও সেই চৈতন্যপ্রবাহ বিদ্যুৎ-প্রবাহ। রুদ্ধদ্বার বিদীর্ণ করে দাও। নিঃশস্য বন্ধ্যাভূমিতে নিয়ে এস প্রবল জলস্রোত। জাগিয়ে দাও কুলকুণ্ডলিনী।

এ কাকে দেখছি! শিউরে উঠল রামলাল। ইষ্টমূর্তির ধ্যান করতে বসে কখনো তাকে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করে দেখতে পায়নি। যখন পা দেখছি মুখ দেখতে পাইনি। যখন মুখ দেখছি তখন কোথায় পা দুখানি! এখন মনে হল সে মূর্তি যেন আশিরপদ নখ স্পষ্ট ও স্থির হয়ে উঠেছে, হয়ে উঠেছে সর্বগঠনসুন্দর। হৃদয়পদ্মে আবির্ভূত হয়ে গোটা মূর্তি আলোকে পুলকে ঝলমল করে উঠেছে।

রাম দত্ত অঞ্জলিভরে ফুল দিতে লাগল পায়ে। ঠাকুর তাকে স্পর্শ করলেন।

দু'টি জহুরি চাঁপা নিয়ে এল অক্ষয়-সেন। ফুল দুটি পায়ে দিতেই ঠাকুর তার বুক ছুঁয়ে দিলেন।

বেলেঘাটার হারাণ দাস পায়ের কাছে প্রণাম এনে রাখতেই ঠাকুর ভাবাবেশে তাঁর পাদপদ্ম রাখলেন তার মাথার উপর।

কৃপায় কল্পতরু হয়েছেন ঠাকুর। আত্মপ্রকাশ করেছেন। করেছেন অভয়প্রকাশ।

এই সেই মহাভাগ ভাগবতবৃক্ষ। গোচারণ করতে-করতে শীতলছায়ান্বিত গাছ দেখে শ্রীকৃষ্ণ বললেন বয়স্যদের, 'এই সব মহৎ বৃক্ষকে দেখ। পরার্থেই এরা একান্তজীবিত। পরের উপকার করবার জন্যেই এরা জীবনধারণ করে। বাত বর্ষা হিম তাপ কত সহ্য করেছে অক্লেশে। সহ্য করে রক্ষা করছে আমাদের। এরাই সর্বপ্রাণীর জীবনধারণের হেতু, এদেরই বরজন্ম, কোনো যাচকই ওদের কাছে বিমুখ হয় না। পত্র-পুষ্প ফল ছায়া মূল বল্কল কাঠ গন্ধ নির্যাস ভস্ম অস্থি পল্লব—সব দিয়ে সকলের কামনা পূরণ করে। তেমনি প্রাণ মন বুদ্ধি বাক্য দিয়ে সর্বদা জীবের কল্যাণসাধন করাই মানুষজন্মের সার্থকতা।'

'ওরে কে কোথা আছিস এই বেলা চলে আয়, মুঠো মুঠো অভয় কুড়িয়ে নে, আশ্বাস কুড়িয়ে নে।' সানন্দে চীৎকার করে উঠল অক্ষয়। 'চৈতন্যের বন্যা বয়ে যাচ্ছে। কুড়িয়ে নে ভারে-ভারে। জ্ঞান ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য, যার যা খুশি, ঠাকুর কল্পতরু হয়েছেন। এমন দিন আর পাবি না রে। কৃপার পাত্র উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন প্রভু। আয়, নিয়ে যা দেখে যা।'

দেখে যা এই অমৃত ও অভয়ের অধিপতিকে। যাঁর চরণযুগলই সকল কর্মের ও সকল মঙ্গলের নিদান। স্পর্শ করে ধন্য হ সকলে।

ছুঁলেন নবগোপালকে, অতুলকে, হরমোহনকে। গিরিশকে, কিশোরীকে, রামলালকে।

বৈকুণ্ঠ বললে, 'আমাকে কৃপা করুন। আমাকে স্পর্শ করুন।'

ঠাকুর বললেন, 'তোমার তো সব হয়ে গিয়েছে।'

'আপনি যখন বলছেন হয়ে গিয়েছে, তখন আর তাতে ভুল কি।' তবু মুখের উপর যেন একটু কোথাও বিষাদছায়া লেগে আছে। 'কিন্তু অল্পবিস্তর একটু বুঝতে পারি তার ব্যবস্থা করে দিন।'

'বেশ, কাছে এস।'

কাছে এসে দাঁড়াল বৈকুণ্ঠ। ঠাকুর তার বুকের উপর হাত রাখলেন।

একটা বিরাট ভাবান্তর হল বৈকুণ্ঠের। দেখতে পেল চতুর্দিকে যেন ঠাকুর হাসছেন। গাছপালা বাড়িঘর লোকজন—এরা যেন গাছপালা বাড়িঘর লোকজন নয়, সবই ঠাকুর, ঠাকুরের সুহাস মূর্তি।

বিশ্বরূপ দেখে ভয় পেয়েছিল অর্জুন। শ্রীকৃষ্ণকে বললে, প্রতিসংহার করো এই মূর্তি, এ আমি সইতে পারছি না। আবার তুমি তোমার মানুষরূপটি ধরো। তোমার সেই সকল সুন্দর সন্নিবেশ সৌম্যমূর্তি।

বৈকুণ্ঠও তেমনি ভয় পেয়ে গিয়েছে। বললে, 'প্রভু, এ ভাব ধরতে পারছি না। দীর্ণ-বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছি, এ ভাবের উপশম ঘটিয়ে দাও।'

ঠাকুর হাসলেন। বৈকুণ্ঠ শান্ত হল।

সন্তোষ অভ্যাস করবে। সন্তুষ্ট নিরীহ ও আত্মারাম ব্যক্তির যে সুখ কামধাবমান লোকের সে সুখ কোথায়? কামক্রোধের বরং অন্ত হয়, লোভের অন্ত হয় না। সঙ্কল্পত্যাগ দ্বারা কামকে, কামত্যাগ দ্বারা ক্রোধকে, অর্থে অনর্থ দর্শন দ্বারা লোভকে জয় করবে। আত্মানাত্মবিবেক দ্বারা শোক ও মোহকে, মহৎ লোকের সেবা দ্বারা দম্ভকে, মৌন দ্বারা যোগপ্রতিবন্ধককে কামনা বিষয়ে অচেষ্টা দ্বারা হিংসাকে জয় করবে। যার থেকে ভয় তার হিতাচরণ করে সেই ভয় নিবারণ করবে। মনঃপীড়া ও দুঃখকে সমাধি দ্বারা আত্মজনিত দুঃখকে যোগের দ্বারা চাঞ্চল্যকে নির্জন বাস দ্বারা জয় করবে। অভ্যাসেই চিত্ত কাষ্ঠশূন্যবহ্নির মত শান্ত হয়ে যাবে। সর্ববৃত্তিতিরোহিত চিত্তই ব্রহ্মসুখ স্পর্শ করতে পারে। সেই পরাস্ত করতে পারে দুর্জয়া মায়াকে।

ওরে তোরা কে কোথা আছিস ছুটে আয়।

ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তরা ছিল ঘরের মধ্যে, তারা সে ডাকে সাড়া দিল না। ঠাকুর নিচে নেমে যেতেই তারা ঠাকুরের বিছানাপত্র রোদে দিতে লাগল, মেতে উঠল ঘর গুছোতে। কত দিন ঝাড়া-পোঁছা হয়নি, এবার এই সুযোগে সংস্কার করে নি। মার্জনা করে নি। তাই উপরের বারান্দা থেকে ঘটনাটা দেখলেও তাদের মধ্যে কোনো আগ্রহ-আবেগের ঢেউ জাগল না।

ওরে আর লোক কই, বেলা যে বয়ে গেল। কোথায় কে আছিস আর্ত-বঞ্চিত অন্ধ-বিভ্রান্ত, ছুটে আয়, কল্পতরুকে দেখে যা, বোস এসে তাঁর ছায়ার আশ্রয়ে, তাঁর করুণার নিকেতনে। চতুর্বর্গ ফল নিয়ে যা। জীবনে যা তোর অভীষ্টতম সে পরমধন স্পর্শমণিকে একবার স্পর্শ কর। লোহার কালো তনু কাঞ্চন করিয়ে নিয়ে যা।

রান্নাঘর থেকে হিড়হিড় করে রাঁধুনি বামুনকে টেনে আনল গিরিশ।

'এ কি, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?'

'ওরে চেয়ে ভাখ, প্রভু আজ অকাতর হয়েছেন, নিয়ে যা কৃপার কণিকা।'

রাঁধুনি বামুনও এসে কুড়িয়ে নিল মহাস্পর্শ।

প্রাণ ঢেলে প্রাণ ভরে চা। আনন্দৈকমাত্র ভগবান সদাব্রত খুলেছেন, তুইও তোর প্রার্থনায় অবারিত হ। চা না কি তোর চাইবার!

আমি কিছু চাই না। তোমার ফুল চাই না, ফল চাই না, ছায়া চাই না, কাঠ চাই না। হে মহাভাগ বৃক্ষ, আমি শুধু তোমাকে চাই।

একশো ষাট

ঠাকুর আবার তাঁর বিছানায় এসে শুলেন।

কলিমলহন্তা অখিলপাপনাশন হরি সকলের পাপ টেনে নিলেন নিজের মধ্যে। আমরা, আমাদের কী হল? আমরা তো পাইনি সে পরমস্পর্শ। আমরা যে ঘোর কলিপীড়িত, কালপীড়িত। আমাদের উপায় কি ?

কলিতে সর্বপ্রকার ধর্মাচারের নাশ, ধন আর বলেরই মাহাত্ম্য-প্রাবল্য। অভিরুচিমত স্বামি-স্ত্রী সম্বন্ধ, প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়, সূত্রধারণ দ্বারা ব্রাহ্মণের পরিচয়, দণ্ড-অজিন দ্বারা আশ্রম, চটুলবাক্য প্রয়োগ দ্বারা পাণ্ডিত্য আর দম্ভ দ্বারা সাধুতা প্রমাণিত হবে। উদরপূর্তিই একমাত্র প্রয়োজন, কুটুম্বভরণই দক্ষতা, যশোলাভের জন্যেই ধর্ম। বলবত্তমই রাজা হবে আর করভারক্লিষ্ট অপহৃতধন প্রজারা পাহাড়ে-কাননে আশ্রয় নেবে। দুর্ভিক্ষে প্রাণত্যাগ করবে। হিমে-রৌদ্রে বিবাদে ব্যাধিতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় বেশি দিন বাঁচবে না। তমোগুণের প্রাধান্য হেতু মায়া, মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, শোক ও মোহ সকলকে আচ্ছন্ন করবে। তবে আমাদের উপায় কি ? কলিকৃত অশুভের খণ্ডন হবে কি করে ?

একমাত্র হরিকীর্তনে। সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে বিষ্ণুসেবা, কলিতে হরিকীর্তন।

একমাত্র কেশবকে হৃদয়স্থ করো। তাতেই মিলবে তোমার পরমা গতি, পরমা প্রতিষ্ঠা।

চুণীলাল বসুর আসতে দেরি হয়েছে। এখন এসে শোনে, ঠাকুর শুয়ে পড়েছেন আর তাঁর কাছে বর চাওয়া চলবে না। পা স্পর্শ করা দূরস্থান। কিন্তু একবারটিও কি দেখতে পাব না চোখের দেখা!'

না। দ্বাররক্ষী নিরঞ্জন। সে আর কাউকে ঢুকতে দেবে না। অনেক ঘাঁটাঘাঁটি হয়েছে, অনেক হুলুস্থুল। এবার প্রভুকে একটু বিশ্রাম করতে দাও নির্জনে।

এই চুণীলালের কত দুঃখ ঠাকুর বুঝেছেন। ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হবার আগে থেকেই তার কুলগুরুর থেকে তার দীক্ষা হয়েছিল! দুর্বল ফুসফুসে প্রাণায়াম করতে গিয়ে হাঁপানি হয়ে গেল তার। অনেক দিন যেতে পারে নি ঠাকুরের কাছে। একটু সুস্থ হয়ে সেদিন এসেছে, ঠাকুর তাকে দেখে তিরস্কার করে উঠলেন: 'তোমরা গৃহী মানুষ, তোমাদের ও সব কেন!' ওসব যোগটোগ তোমাদের জন্যে নয়। অমন কাজ আর কোরো না, যাও গোপাল ব্রহ্মচারীর কাছ থেকে তিন মাত্রা ওষুধ চেয়ে নাও গে। সেরে যাবে হাঁপানি।'

ঠাকুর কি করে জানলেন যে যোগ করে চুণীলাল? আর ঐ যোগের জন্যেই তার ব্যাধি ?

আরো আশ্চর্য, গোপালের তিন মাত্রা ওষুধেই সেরে গেল হাঁপানি।

কত বুঝেছেন দুঃখদৈন্য। একটি গ্লাশ চেয়ে ফেলেছেন চুণীলালের কাছে, কিন্তু রূপো বা কাঁসার গ্লাশ কিনে দেয় চুনীলালের সাধ্যি কি? তখুনি তখুনি বলে ফেললেন, 'তুমি শুধু একটা কাচের গ্লাশ দিও।'

প্রণব উচ্চারণের অধিকার নেই চুণীলালের। তাই মুখখানি ম্লান করে বসে আছে।

ঠাকুর বললেন, 'সে কি-রে, নাই-বা হল প্রণবমন্ত্র। ভগবানের যে কোনো একটি নাম ধরে ডাক, অজস্র তাঁর ডাক নাম, দেখবি ঠিক সাড়া পাবি। মন্ত্রের জন্যে নামের জন্যে ভাবনা ?'

কত বুঝেছেন!

কি তার নাম জানি ঈশ্বরের? একমাত্র তোমাকে জানি। তোমার নাম রামকৃষ্ণ। সুতরাং রামকৃষ্ণই আমার জপমন্ত্র, আমার ধ্যানবস্তু।

নরেন এসে বললে, 'আজ যা বুঝলাম ঠাকুরের শরীর বেশি দিন থাকবে না। এই বেলা যা চাইবার চেয়ে নিন।'

'কিন্তু নিরঞ্জন ঢুকতে দেয় না যে।'

ঢের হয়েছে, অনেক তোলপাড় করেছ। কেশব সেন বলেছিলেন গ্লাশ-কেশে তুলে রাখতে, গ্লাশ-কেসের বাইরে তাঁকে ফুল দিতে, সে গ্লাশ কেস তোমরা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছ। আর কোনো প্রশ্রয়-প্রার্থনা শুনব না তোমাদের।

আমরা কি করব! ঠাকুর তো করুণায় নিজের থেকে নেমে এসেছেন। তিনিই তো বইয়ে দিয়েছেন অমৃতস্পর্শের বন্যা, চৈতন্যের মহাপ্লাবন।

ও-সব কথায় কান পাততে নিরঞ্জন রাজি নয়। ঢের শুনেছি। যাও ফিরে যাও। যেতে পাবে না উপরে। দেখা হবে না কিছুতেই।

কি একটা কাজে নিরঞ্জন একটু সরে গেল দরজা থেকে। ঠাকুরই সরিয়ে দিয়েছেন সন্দেহ কি। অন্তরের ব্যাকুলতার কাছে কিসের কি বাধার প্রহরা!

নিরঞ্জন সরে যেতেই নরেন ইসারা করল চুণীলালকে। আর অমনি চুণীলাল টুক করে ঢুকে পড়ল। একেবারে সটান দোতলায়। পা ছুঁয়ে প্রণাম করল ঠাকুরকে।

'আসতে দেরি হল বুঝি ?' জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আমার সব তাতেই দেরি।'

ধর্মের রাজ্যে ঈশ্বরের রাজ্যে কোনো দেরি নেই। দেরিতে এসেছ বলে তুমি পাত পাবে না, এ হতে পারে না। তোমার খাবার ঠিক তোলা আছে।

'তাতে কি।' ঠাকুর ইসারা করে চুণীলালকে কাছে ডাকলেন: 'তুমি কিছু চাও ?'

'চাইব না, এ কখনো হতে পারে ?'

'চাই।'

'বেশ তো বলো না কি চাইবে ?'

সত্যিই, কি চাইল কিছুই মনে এল না চুণীলালের। কোন চাওয়াটা সেরা চাওয়া, কোন বস্তুর তার তীব্রতম অভাব, কি চাইলে আকাঙ্ক্ষাকে মর্য্যাদাবান করা যায়, কিছুই বুঝে উঠল না। ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

শোন, কিছুই চাইতে হবে না, শুধু এইটেতে ভক্তি-বিশ্বাস রাখিস, তা হলেই হবে। ঠাকুর নিজের দেহের দিকে সঙ্কেত করলেন, 'শুধু তোর হবে না, সকলের হবে।'

জয় রামকৃষ্ণ! আর কি চাই। সাধ্যি কি বলি আমাদের খুশি দেয়!

শুধু বিশ্বাস। শুধু নাম। অভ্যাসে অনুরাগ। অনুরাগই ভক্তি। অনুরাগই স্পর্শমণি।

পতিত, স্খলিত, আর্ত, ক্ষুধিতও যদি 'হরিকে নমস্কার' একবার বলে তা হলেই তার সর্ব পাতকের মোচন ঘটে। সূর্য্য যেমন তমসাকে ও ঝড় যেমন মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি হরিনামও সকল দুঃখ-কুজ্ঝটিকা বিদীর্ণ করে ফেলে। যে কথায় হরির প্রসঙ্গ নেই সে কথা মিথ্যা, সে কথা অসৎ। সেই কথাই সত্য সেই কথাই মঙ্গল সেই কথাই পুণ্য যে কথায় ভগবানের গুণের কথার বর্ণনা আছে। উত্তম-শ্লোক শ্রীকৃষ্ণের জয়গানই রমণীয় ও রুচির ও নিত্য নবীন আর তাই মানস মহোৎসব। 'তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং।' হরিনামই মানুষের শোকার্ণবশোষণ।

আবার আরেক দিন রোগশয্যা থেকে উঠে পড়লেন ঠাকুর।

লাটু রাখাল নরেন নিরঞ্জন ঠিক করেছে বাগানের মধ্যে ঐ যে খেজুর গাছ আছে, শেষ রাত্রে তারা রস চুরি করে খাবে। ঠাকুর তা টের পেয়েছেন। কিন্তু ঐ খেজুর গাছের তলায় যে একটা কালসাপ। কি করলেন! উঠে পড়লেন বিছানা ছেড়ে। যে পথ দিয়ে ছেলেরা যাবে সে পথ দিয়ে নয়, অন্য পথ দিয়ে তিনি রওনা হলেন গাছের দিকে। সাপটা তাড়িয়ে দিয়ে আবার এসে বিছানা নিলেন। যেমন বেগে গিয়েছিলেন তেমনি বেগে চলে এলেন।

অতন্দ্রা প্রার্থনার মত শ্রীশ্রীমা ছিলেন জেগে। তিনি দেখলেন ব্যাপারটা।

আর ছেলেরা? ছেলেরা সেই খেজুর গাছই খুঁজে পায় না। বাগানের প্রতিটি গাছ যাদের চেনা, চেনা সমস্ত আনাচ কানাচ, তাদেরই চোখের কাছ থেকে গাছ আজ উধাও হয়ে গেল। ঘুরে-ঘুরে সবাই ক্লান্ত কিন্তু গাছের পাত্তা নেই।

সবাই বুঝল এ প্রভুর কৌতুক।

পরদিন পথ্য খাওয়াবার সময় শ্রীমা জিগগেস করলেন, 'কাল রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে ছুটেছিলে কোথায়?'

'তুমি দেখেছ বুঝি?' ঠাকুর তখন বললেন কি হয়েছিল। তার পর বললেন অন্তরঙ্গের মত, 'তুমি যেন এই কথা কাউকে বোলো না।'

[ক্রমশঃ।

ক্ষুধিত স্বপন

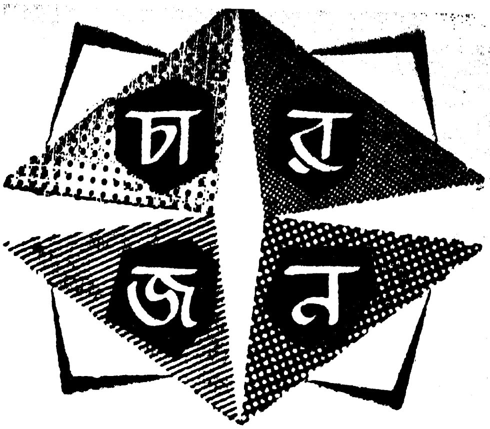
বন্দে আলী মিয়া

আমার প্রসন্ন দিন উড়ে গেল দূর সিন্ধুকূলে
উড়ে গেল অকস্মাৎ চিরমৌন নিশীথের ধ্যানে,
আদিম ওঙ্কারধ্বনি মহাশূন্যে ধায় শিখা তুলে—
নীড়ভ্রষ্ট বিহঙ্গম গুমরায় ক্ষুব্ধ অভিমানে।

আমার বসুধা কাঁপে—চক্ষে তার রৌদ্রদগ্ধ জ্বালা
আজিও হলো না শেষ যৌবনের ক্ষুধিত স্বপন—
ফুঁসিছে আগ্নেয়গিরি—ভস্ম ধূম গন্ধক গাল'
অশনিবহ্নিদাহে মূর্চ্ছাতুর প্রদোষ গগন।

জীবন-মৃত্যুর সনে দেখা মোর হলো বারম্বার,
তিমির রহস্য তলে পূর্ণ হলো শেষের সঞ্চয়।
কালের আহ্বান ধ্বনি শুনিবারে পেয়েছি আবার—
দিনের মিছিল চলে জনতার সৌরলোকময়।

নিরন্ধ্র অমরাবতী—জ্যোতির্গেহে বন্দী কঙ্কাবতী,
নয়নে সশঙ্ক দীপ জ্বলিতেছে চির রাত্রি-দিন।
সপ্তসিন্ধু গরজায়—ক্রুদ্ধ ফণা ধায় ঊর্দ্ধগতি
আমার অতীত স্বপ্ন ফিরে আসে বিষণ্ণ মলিন।



ডাক্তার সতীনাথ বাগচী

[বর্তমানকালের বিখ্যাত স্ত্রী-রোগ বিশেষজ্ঞ]

সেদিন ছিল কর্মের যুগ। মানুষ মানুষকে চিনতে পারত কর্মের মধ্যে দিয়ে, নিজেদের তারা উৎসর্গিতই করেছিল কর্মের পাদমূলে, স্বীয় কর্মের জমা-খরচই তাদের বাঁচিয়ে রাখত ভবিষ্যতের ইতিহাসে। কর্মেই ছিল আনন্দ, কর্মেই ছিল জীবন। আজ? আজ কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুরই ঘটে গেছে আমূল পরিবর্তন। ঘূর্ণমান চাকা নরেই চলেছে নবীন বেগে। আর তার ঘূর্ণনের ছন্দে ছন্দে ধ্বনিত হচ্ছে পরিবর্তনের সুর। আজকের দিনের মানুষের জীবনে এসেছে ভেজালের ছাপ, তার কথা বলা, পথ চলা, মায় ভালবাসায় পর্যন্ত জুড়ে আছে কৃত্রিমতার গন্ধ। আজ প্রচারের যুগ। মানুষ কাজ করে কম, কথা বলে বেশী। যতটুকু কাজ সে করে তার থেকে লক্ষগুণ নিজের ঢাক নিজেই বাজায় বা অন্যকে দিয়েও বাজিয়ে থাকে। মানুষ আজ কর্মময় জীবনের সারমর্মরূপে গ্রহণ করেছে আত্ম-প্রচার-ধর্মকে। যেটুকু কাজও সে করে থাকে বোধ হয় তাও এই প্রচারের লোভেই সে করে। এমনি আত্মপ্রচারের স্পৃহা আজ কর্মের প্রতি সেদিনকার মত ঐকান্তিক অনুরাগকেও পরাস্ত করেছে। সুতরাং এই পরিস্থিতির মধ্যে যদি শোনা যায় যে, কয়েকজন এখনও বর্তমান যাঁরা কর্মকেই অদ্যাপি বৃহৎ আসন দিয়ে থাকেন, মনে প্রাণে যাঁরা আজও কর্মের পূজাই করে চলেছেন। নাম-যশের প্রতি নেই কোন অনুরাগ বা আকর্ষণ। তা হলে থিতিয়েপড়া বালুচরের বুকেও আবার যেন নতুন করে জাগে আলোড়ন, মরা গাঙে আবার যেন নতুন ছন্দে আসে জোয়ার। যে ক'জন নীরব নিস্পৃহ কর্মসাধক আজও দেশ আলো করে আমাদের মধ্যে বর্তমান, বর্ষীয়ান ধাত্রীবিদ্যাবিদ ডাক্তার শ্রীসতীনাথ বাগচী মহাশয় তাঁদেরই অন্যতম।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের ৮ই মার্চ জন্ম। বাবা—৺ব্রজগোপাল বাগচী। খ্যাতনামা আইনজীবি। পিতৃভূমি—রাজসাহী। কাকা ছিলেন বিখ্যাত চক্ষুরোগ-বিশেষজ্ঞ ৺ডাঃ কালীকৃষ্ণ বাগচী। উত্তরকালে কাকার প্রভাবই স্থায়ী আসন করে নিল ভাইপোর আকাঙ্খার হৃদয়াসনে। সতীনাথের মনে দৃঢ় বাসনা জন্মাল চিকিৎসক হবার। নর-নারায়ণকে সেবা করবার। মুমূর্ষুর প্রাণে জাগাতে আশা। শমনের সঙ্গে মানুষের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধ করবার প্রবল বাসনা।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল বেরোল। দেখা গেল সমগ্র রাজসাহী বিভাগের মধ্যে প্রথম হয়েছেন সতীনাথ বাগচী। এফ-এ পরীক্ষাতেও সমগ্র রাজসাহীর মধ্যে সতীনাথ বাগচীই লাভ করেছিলেন প্রথম জনের আসন। এই দু'বারই সমগ্র বিভাগের মধ্যে প্রথম হওয়ায় বিভাগীয় স্কলারশিপ পেলেন সতীনাথ বাগচী। ডাক্তার বাগচীর ছাত্রজীবন এমনই গৌরবের এমনই কৃতিত্বপূর্ণ। গ্রাজুয়েট হলেনও অঙ্কশাস্ত্রে (যা এঁর অনার্স ছিল) প্রথম শ্রেণীর প্রথম হয়ে। এম-এস-সিতে হলেন প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয়। ডাক্তারীতে প্রাথমিক এম-বিতে প্রথম, প্রথম এম-বিতে শরীরতত্ত্বে (যা এঁর অনার্স ছিল) সম্পূর্ণরূপে প্রথম হলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে নন-কলেজিয়েট ছাত্ররূপে ধাত্রীবিদ্যায় এম-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ডাঃ বাগচী। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন বিশেষ স্বর্ণপদক। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এম-ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ডাঃ সতীনাথ বাগচী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনিই প্রথম এম-ও। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ থেকে পেলেন গুডিভ স্কলারশিপ। এম-বি পাশ করার পর থেকে ১৯২১ খৃষ্টাব্দ অবধি নানা দায়িত্বপূর্ণ পদে ইডেন হাসপাতালে অধিষ্ঠিত ছিলেন সতীনাথ, তারপর দু'বছরের জন্য কারমাইকেলে (বর্তমানে আর-জি-কর) তিনি যোগ দেন জুনিয়ার ভিজিটিং অবসট্যাট্রিশান ও জিনোকোলজিষ্ট রূপে। তারপর বারো বছর ছিলেন ন্যাশনাল মেডিক্যাল ইনষ্টিটিউটে পূর্বোক্ত দুটি বিষয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে। তখন সেখানে অধ্যক্ষ ছিলেন চিকিৎসক কুলগৌরব স্বর্গীয় ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়। ১৯৩৬ থেকে আবার কারমাইকেলে (আর-জি-কর) অধ্যাপকরূপে তখন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন আর এক বরেণ্য চিকিৎসক স্বর্গীয় ডাক্তার বামনদাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করলেন বামনদাস—তাঁর স্থান পূর্ণ করলেন সতীনাথ। ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে সতীনাথ আর-জি-কর মেডিক্যাল কলেজের এমারিটাস অধ্যাপকের সম্মানলাভ করলেন।

সতীনাথের কর্মদক্ষতা শুধু অধ্যাপনা ও চিকিৎসার ক্ষমতাতেই সীমাবদ্ধ নয়। তা আরও ব্যাপ্ত এবং বহুমুখীও। ১৯৪৯-৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সতীনাথ ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ফেলো। তা ছাড়া বেঙ্গল জিনোকোলজিকাল সোসাইটির সভাপতি (১৯৩১ এবং ১৯৪৪-৪৮), ক্যালকাটা মেডিক্যাল জার্নালের সম্পাদক (১৯৩০-৩৬) ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাবের গ্রন্থাগারিক (১৯২৭-৩২), সায়েণ্টিফিক কমিটি অফ দি অবসট্যাট্রিশান য়্যাণ্ড জিনোকোলজিকাল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান (১৯৪১ ও ৫২) পাটনা মেডিক্যাল কলেজের রজতজয়ন্তী উৎসবে অবসট্যাট্রিশান ও জিনোকোলজিকাল শাখার চেয়ারম্যান (১৯৫২), ভারতীয় মেডিকাল কাউন্সিলের পরিদর্শক, রামকৃষ্ণ শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের কনসালটিং অবসট্যাট্রিশান ও জিনোকোলজিষ্ট প্রভৃতি দায়িত্বপূর্ণ কর্মভার গ্রহণ করেছেন সতীনাথ।

সংস্কৃতভাষাতে বেশ দখল আছে সতীনাথ বাবুর। অধ্যয়নের প্রতি অনুরাগও তাঁর সীমাহীন।

যেটুকু জানা গেল তুলে ধরলুম আপনাদের সামনে। নিজের সম্বন্ধে কোন কিছুই বলতে চান না সতীনাথ। সম্মানের ও শিক্ষার উচ্চশিখরে আরোহণ করেও তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাতের হেতু জানতে পেরে মৃদু হেসে বললেন, আমার জীবনী আর কি লিখবে কিই-বা

করেছি আমি। সতীনাথের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন মানুষের দেওয়া শত-সহস্র সম্মানে বিভূষিত হলেও তাঁর সৌজন্যবোধ, অমায়িকতা ও আত্ম-সঙ্কোচন একটি মাত্র ঐশ্বরিক আশীর্বধারায় স্নিগ্ধস্নাত, আলোকোজ্জ্বল, শুভ্রশান্ত।

ডক্টর প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী

[সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ও প্রতিষ্ঠাবান শিক্ষাব্রতী]

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ডক্টর প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী পাবনা জেলায় তাঁহার পিতার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত অধ্যাপক স্বর্গত অভিলাষচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয় রাজসাহী সহরে নিজ টোলে কাব্য, ব্যাকরণ, বেদ, বেদান্ত, সার্বভৌম উপনিষদ, পুরাণ, সাংখ্য প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। ডক্টর লাহিড়ী নিম্ন-প্রাইমারী হইতে আই-এ, পর্য্যন্ত রাজসাহীতে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি কৃতিত্বের সহিত নিম্ন-প্রাইমারী ও মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন। মাইনার স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার পিতার নিকট সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করেন এবং ক্রমে ব্যাকরণ, কাব্য ও বেদের বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময় সেখানকার প্রধান সংস্কৃত শিক্ষক এবং পরে কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অধ্যাপনা নৈপুণ্যে পাণিনি ব্যাকরণের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েন। মেধাবী এবং সুশীল ছাত্র বলিয়া শিক্ষকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। তাঁহার পিতার অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। কঠোর দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া অতীব কায়ক্লেশে এই পরিবারের দিনাতিপাত হইত। রাজসাহী ডিভিসনের গবর্ণমেণ্ট স্কুলগুলির টেষ্ট পরীক্ষার খাতা বদলাবদলি করিয়া পরীক্ষিত হয়। রাজসাহীর খাতা রংপুরে যায়। পরীক্ষার পর সেখানকার হেডমাষ্টার রাজসাহীর হেডমাষ্টারকে এক পত্রে প্রবোধচন্দ্রের সম্বন্ধে লেখেন—"...Specially the Pandit Mahashay who says that the boy is gifted with heavenly genius" প্রবোধচন্দ্র ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিবার মাত্র দুই মাস পূর্ব্বে তাঁহার পিতার অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। পিতার শবদেহ সংস্কারের সময় হইতেই তাঁহার মাতা ভ্রাতা ভগিনীদের প্রতিপালনের জন্য প্রবোধচন্দ্রকে তাঁহার পিতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ভদ্রসাধারণের সদয় সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়। তিনি এবং তাঁহার ভ্রাতা (ডক্টর প্রকাশচন্দ্র লাহিড়ী) তাঁহার পিতার দুই জন ব্রাহ্মণ যজমানের বাড়ীতে দেড় মাইল



প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী

দূরে দুই বেলা আহার করিতেন। সংস্কৃত (আবশ্যিক ও ঐচ্ছিক) এবং ইতিহাসে letter সহ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশান পাশ করেন। সংস্কৃতে কৃতিত্বের জন্য রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুলে কুঞ্জলাল বৃত্তি পান। রাজসাহী কলেজে I-A. পড়িবার সময় তাঁহার পিতার সহিত সুপরিচিত স্বনামখ্যাত অধ্যাপক পণ্ডিত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পুত্র নির্বিশেষ স্নেহভাজন হয়েন। তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে বদলি হওয়ায় প্রবোধচন্দ্রকেও তাঁহার সহিত লইয়া আসেন এবং কলিকাতা সংস্কৃত কলেজে ভর্ত্তি করাইয়া ছেন। সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ পণ্ডিত (পরে মহামহোপাধ্যায়) আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়ের অতীব প্রিয় ছাত্র হইয়া উঠেন এবং ঐ কলেজে পরীক্ষায় প্রথম হইয়া কুড়ি টাকা সিনিয়ার বৃত্তিলাভ করেন।

অধ্যক্ষ-পণ্ডিত আশুতোষ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ তর্কবেদান্ততীর্থ, মঃ মঃ পণ্ডিত শিতিকণ্ঠ বাচস্পতি, মঃ মঃ পণ্ডিত সকলনারায়ণ শাস্ত্রী প্রভৃতি অধ্যাপকবর্গের অধ্যাপনায় বিশেষ উপকৃত হয়েন। বি-এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত অনার্স-এ একটি পত্রে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে মাত্র ৪৭ নম্বর পাওয়ায় প্রবোধচন্দ্র প্রথমশ্রেণীর অনার্স পাইলেও তাঁহার স্থান হয় সপ্তম। ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অধ্যক্ষ আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয় প্রবোধচন্দ্রকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন সংস্কৃত-বাঙ্গলা বিভাগের অধ্যক্ষ বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের হস্তে সমর্পণ করেন। প্রবোধচন্দ্র পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট বৃত্তি পাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে Sanskrit studiesএ এম, এ অধ্যয়ন করেন। এই পরীক্ষার জন্য বেদ ব্যাকরণ, অলঙ্কার, কাব্য, নাটক, পালি, প্রাকৃত Philology Elpigrafhy প্রভৃতি বিষয় কঠোর পরিশ্রমের সহিত অধ্যয়ন করিয়া এম-এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁহার আশ্রয়দাতা অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের নিকট আত্মীয় অচিরস্বর্গগত অধ্যাপক হরিদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আশ্রয়ে বাস করিয়া তাঁহার অসীম স্নেহ লাভে ধন্য হলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাণিনি ব্যাকরণে প্রখ্যাত পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বিখ্যাত গবেষক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাক প্রভৃতির নিকট নানা বিষয় অধ্যয়নের সুযোগলাভ করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে এম, এ, পরীক্ষায় পাশ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতে সহকারী-অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েন। এই সময়ে সেখানকার সংস্কৃত-বিভাগের অধ্যক্ষ সুশীলকুমার দে মহাশয়ের পরিচালনায়, সুবন্ধুর বাসবদত্তা নামক গদ্য কাব্যখানি স্বর্গীয় হরিনাথ দে কর্ত্তৃক সংগৃহীত জগদ্ধরের অপ্রকাশিত সম্পূর্ণ টীকা ও অন্য দুইটি বাঙ্গালী দ্বারা কৃত টীকার সন্দর্ভসহ সম্পাদন করেন। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ডক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, রমেশচন্দ্র মজুমদার, সুশীলকুমার দে, হরিদাস ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি অধ্যাপকগণের বিশেষ উৎসাহে প্রবোধচন্দ্র সংস্কৃতে State Scholarshipএর জন্য আবেদন করেন এবং গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে, School of Oriental Studiesএ Professor Turner এর পরিচালনায় বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত অশোকলিপি অনেক স্থলে বাঙ্গলা ভাষায় ও Syntax বা পদবিন্যাস প্রণালী সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা করিয়া Ph.D. ডিগ্রী লাভ করেন। ইহার পর পাণিনি ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছু কাজ

করিবার জন্য জার্মাণীর ব্রেসলাও নগরীতে প্রাচীন অধ্যাপক ডক্টর ব্রুণো লিবিশের নিকট গমন করেন এবং প্রায় তিন মাস কঠোর পরিশ্রম করিয়া কীলহর্ণের সম্পাদিত মহাভাষ্যের অনুসরণে concardance Panini-Patanjali (Mahabhashya) নামক একখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সংকলন করেন। সসম্মানে দেশে ফিরিয়া ডক্টর লাহিড়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক রাধাগোবিন্দ বসাকের স্থলে সংস্কৃতে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ডাঃ সুশীলকুমার দে সংস্কৃত বিভাগের অধ্যক্ষের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করায়, ডক্টর লাহিড়ী তাঁহার স্থলে ঐ বিভাগের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন এবং ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী রায় শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে ঐ পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃত বিভাগে প্রধান অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। ১৯৫০ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে প্রেসিডেন্সী কলেজের সহিত সংস্কৃত কলেজের Co-ordination এর ফলে প্রেসিডেন্সীর সংস্কৃত বিভাগ সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে যুক্ত হয়। ফলে ডাঃ লাহিড়ী ও অন্যান্য অধ্যাপকগণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হন। ১৯৫৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সদানন্দ ভাদুড়ী অবসরপ্রাপ্ত হইলে ডাঃ লাহিড়ী তাঁহার স্থানে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বাল্যকালেই ডাঃ লাহিড়ী তাঁহার পিতার নিকট সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করেন। কাব্য এবং অলঙ্কারে তিনি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের একেবারে হাতে-গড়া। ব্যাকরণে অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তী, মঃ মঃ সকলনারায়ণ শাস্ত্রী ও ডাঃ ব্রুণো লিবিশের অন্তেবাসী। Philologyতে Prof Sir R. L. Turner. Prof T. W. Thomas ও Prof, H. W. Bejlyর ছাত্র। পালি, প্রাকৃত, প্রত্নতত্ত্ব ও অর্থশাস্ত্রে ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাকের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন। শিক্ষকরূপে ডাঃ লাহিড়ী মঃ মঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আশুতোষ শাস্ত্রী, অধ্যাপক শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ও ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়দিগকেই তাঁহার আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছেন।

ডাঃ লাহিড়ীর বিশেষ আনন্দ, তিনি আজীবন ছাত্রই আছেন। এখনও নিয়মিত পড়াশুনা করিয়া আনন্দ পান।

নাটকের প্রতি ডাঃ লাহিড়ীর বিশেষ অনুরাগ। বাল্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বহু অভিনয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রের ভূমিকা সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়াছেন। সভায় বক্তৃতা করিবার অভ্যাসও স্কুলে থাকিতেই আরম্ভ করেন।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ এবং লেক্সিন ও নিপোলিনের আবিষ্কারক]

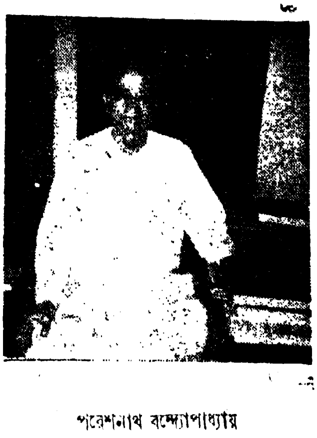
প্রথম যেদিন ডাক্তার বাবুর দর্শন পাই, তখন আমি নিতান্ত বালক। বোধশক্তি তখনও স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সেই স্বল্প বিচার-বিবেচনার মধ্যে তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব আমার মনের মণিকোঠায় গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। অনাড়ম্বর বাহ্যিক জীবনের মধ্যে অন্তরের পুরুষাকারের রূপ ফুটে উঠেছিল।

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে পিতামহ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসস্থানে ১৮৯০ সালে তাঁর জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পিতৃকুলে প্রত্যেকেই হোমিওপ্যাথী ভাবধারায় অভ্যস্ত ছিলেন। জ্যেষ্ঠতাত বিদ্যাসাগর মহাশয় স্বয়ং প্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথ হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁহার হোমিওপ্যাথীকে গ্রহণের প্রেরণার মূলে এই বংশ কৌলিন্যকে প্রাধান্য দেওয়া যায়। জ্ঞানান্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে হোমিওপ্যাথীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ইহা ছাড়াও পদার্থবিদ্যার প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ আছে। তিনি আণবিক বিজ্ঞানের বহু বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং ইহার সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পোষণ করেন। ছাত্রাবস্থায় এবং বর্ত্তমানেও পূর্ণোদ্যমে সংস্কৃতচর্চ্চা করিয়া থাকেন।

কুষ্টিয়ায় থাকাকালীন সর্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন এবং ১৯১৭ সালে মাত্র ২৭ বৎসর বয়সে দিবারাত্র কঠোর পরীক্ষা ও গবেষণার পর সর্পদংশনের প্রতিকার লেক্সিন আবিষ্কার করেন; ১৯২৮ সালে বহু পরীক্ষার পর মধ্য আমেরিকায় ইহা স্বীকৃত হয়।

১৯২৮ সালে মিহিজামে সর্প দংশনের প্রাচুর্য্য দেখিয়া সেখানে মিহিজাম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করিলেন এবং বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা সুরু করিলেন। খুব অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। বহু দুঃস্থের অকালে জীবন নাশের একটি প্রতিকার হইল।

দেখিতে দেখিতে তাঁহার হোমিওপ্যাথী এত উন্নত হইয়া পড়িল যে, বর্ত্তমানে আমেরিকাতেও ইহা এত উন্নত হইতে পারে নাই। মিহিজাম হোমিওপ্যাথীর পীঠস্থানে পরিণত হইল। তাঁর মতে হোমিওপ্যাথী এক সম্পূর্ণ চিকিৎসা-বিজ্ঞান। ইহাতে তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ও পূর্ণ আস্থা আছে। অন্য কোনোও চিকিৎসা শাস্ত্রে আজও Poieomylitics দুরারোগ্য—কোনো চিকিৎসাই নাই। কিন্তু মিহিজামের হোমিওপ্যাথীতে শতকরা ৯৯ ভাগই এই রোগ সারিতেছে। Leucoderma, Gastric ulcers, Gall stone, (পিত্ত পাথরী) Kidney stone, Appendicities, Fracture of bones ইত্যাদি আরও বহু জটিল দুরারোগ্য ব্যাধি যাহা Allopathy or Homeopathyর শীর্ষস্থানীয় চিকিৎসকগণের "সারিবে না," Operation করিয়া দেখা যাইতে পারে" কিংবা "না করিলে মারা যাইতে পারে" ইত্যাদি মন্তব্যের পরও আরোগ্যলাভ করিয়াছে—এমন বহু রোগী আজও বর্ত্তমান কাহারও একটি পয়সাও খরচ হয় নাই। কলিকাতার বহু স্বনামধন্য ব্যক্তি অ;জও তাঁহার



পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

চিকিৎসার প্রত্যক্ষ সুফলের সাক্ষীস্বরূপ আছেন। এখানকার হোমিওপ্যাথী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অন্যান্যদের সঙ্গে মিল খুবই কম।

বহু রোগী তাঁহার কাছে আসে এবং তিনি তাহাদের সম্বন্ধে বলেন, "এ আমাদের জন্য নয়, এ হোমিওপ্যাথীর নিশ্চিন্ত ফল।" তাঁকে এক বার জিজ্ঞাসা করা হয়, "আপনি হোমিওপ্যাথী কোথায় শিখলেন?" তার উত্তরে তিনি বলেন, "হোমিওপ্যাথী অন্য কেউ শেখাতে পারে না—রোগীরাই আমায় এই সব শিখিয়েছে। কোন অসুস্থতায় কোন বড়ি পড়বে তা রোগীরা নিজেরাই বলে যাবে।"

বর্ত্তমানে মিহিজামের লোকসংখ্যা হাজারের কিছু বেশী। কিন্তু তাঁর দাতব্য চিকিৎসালয়ে রোগীর সংখ্যা প্রত্যহ ১২০০ থেকে ২২০০ পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেক অসুস্থ রোগী শুধু হোমিওপ্যাথীকে ঔষধ বিনা পয়সায় এখানে পেয়ে থাকে। ভারতের প্রায় প্রত্যেক গ্রাম ও নগর থেকে কাতারে কাতারে রোগী আসে তাঁর চিকিৎসালয়ে। ধনী, দরিদ্র ও সকল জাতি নির্ব্বিশেষে সবাই সমভাবে এখানে চিকিৎসিত হয়ে থাকে। এখানে কোন রোগীরই খরচ করতে হয় না।

বর্ত্তমানে তিনি রোগী বা অন্যান্য কাজকর্ম্ম দেখিতে পারেন না। অধুনা তাঁর চিকিৎসালয়ে পাঁচ জন ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসাধারা অনুসরণ করিয়া থাকেন।

শুধু ঔষধই নয়, বহু দুঃস্থ ব্যক্তি বহু ভাবে তাঁহার সাহায্য পাইতেছে। বহু ছাত্রের অধ্যয়নের সমুদায় ব্যয়ভার তিনি আজও বহন করিয়া থাকেন। বহু বিধবা ও অনাথ ছেলেমেয়ের ভরণপোষণ তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য।

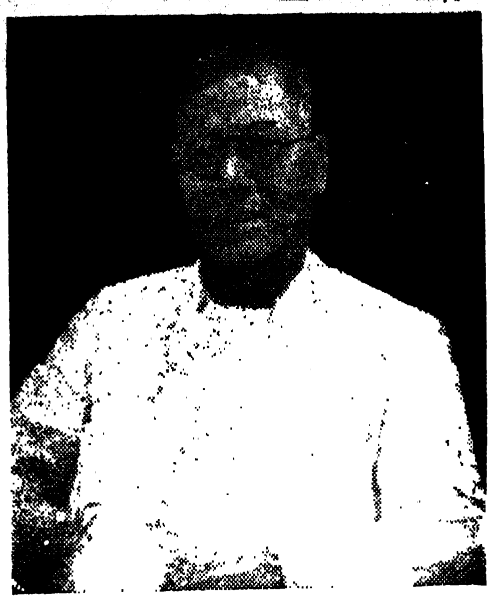
তাঁহার Laboratoryটিও মিহিজামে অবস্থিত। সেখান হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রে ভারতের একমাত্র দান লেপ্সিন প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীভূপতি মজুমদার

[বিশিষ্ট দেশসেবী ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী]

দেখতে এ মানুষটি ছোটখাট বটে, কিন্তু এঁর ভেতর এমন একটি বিরাট মন ও প্রাণ রয়েছে যা সচরাচর বিরল! সমগ্র জীবনটাই তাঁর বলতে গেলে দেশের কাজে ও জাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত। স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক জন নির্ভীক সৈনিক তিনি—ভ্রূক্ষেপ করেন নি কোন দিন কোন বিঘ্ন-বিপদকে, জেল ও নির্যাতনকে। নানা দিক থেকেই শ্রীভূপতি মজুমদার সেদিনও যেমন ছিলেন যুব বাংলার আদর্শস্থানীয়, আজকের দিনেও রয়েছেন ঠিক তেমনি।

১৮৯১ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে হুগলীর গুপ্তিপাড়ার একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে শ্রীমজুমদার জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত ব্যবহারজীবী স্বর্গতঃ নীলমাধব মজুমদারের মধ্যম পুত্র ইনি। বাল্যজীবনেই রাজনৈতিক কার্য্যকলাপের সঙ্গে জড়িত হওয়ার তাঁর সুযোগ ঘটে। পারিবারিক নিবিড়তা ও পরিচয়ের ফলে প্রথমে তিনি সংস্পর্শে আসেন স্বনামধন্য বিপ্লবী বাঘা যতীনের (যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়)। তৎকালে দেশহিতব্রতী সুরেন্দ্রনাথ বড়াল) পরবর্ত্তী জীবনে 'মরওয়ে'-প্রবাসী আনন্দ আচার্য্য) পল্লী অঞ্চলে ছোট-ছোট ছেলেদের কর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতেন। সেই ছেলেদের দলে বালক ভূপতিকেও দেখা যেত। এ ভাবে তাঁর সতেজ মাধুর্য্য প্রাণে



ভূপতি মজুমদার

রাজনৈতিক চেতনার উদ্বোধন হয় এবং খুলে' যায় তাঁর সম্মুখে দেশসেবার প্রশস্ত রাজপথ।

বিদেশী শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য শ্রীমজুমদারের যে প্রস্তুতি আরম্ভ হয় বাল্য বয়সে, যৌবনে পদার্পণের পর তা আরও ব্যাপকতা লাভ করে। এ সময় তিনি গোপন আড্ডায় ছোরাখেলা, লাঠিখেলা, তরবারি চালনা, রাইফেল ও রিভলবার ছোঁড়া এ সব ব্যাপারে নিজেকে পারদর্শী করে তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে চলে তাঁর বিশেষ ভাবে সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনীতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ। জনসেবার জন্য যেখান থেকেই আহ্বান আসতে থাকে, তিনি ছুটে যান এগিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের সুন্দর ভূমিকা নিয়ে।

ইত্যবসরে (১৯০৫) ভূপতি বাবু যুগান্তর বৈপ্লবিক সংস্থার ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং সক্রিয় ভাবে আত্মনিয়োগ করেন ভারতের বাহিরে ও ভিতরে বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক কাজে। ১৯১২ সালে তিনি চলে যান বিদেশে, উদ্দেশ্য—ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ সাধন। এর পর ১৯১৫ সালে যতীন্দ্রনাথ (বাঘা যতীন) ও তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্ম্মীদের উড়িষ্যার বালেশ্বরে তিনিই পৌঁছে দিয়ে আসেন এবং এ কাজটি করেই জার্ম্মাণ জাহাজ 'মেভারিকে'র সন্ধানে তিনি চলে যান যবদ্বীপে। তাঁর যাবার পূর্ব্বে এ জাহাজটির সন্ধানে বেরিয়েছিলেন নরেন ভট্টাচার্য্য (এম, এন, রায়,) ও ফণী চক্রবর্ত্তী। জাহাজের সন্ধান যখন মিললো না কিছুতেই, তখন তাঁরা তিন জনেই রাসবিহারী বসুর নিকট যাবার চেষ্টা করেন জাপানের ওসাকাতে। কিন্তু তাঁরা সমুদ্রপথে ওলন্দাজ জাহাজ থেকে বৃটিশ ক্রুজার কর্ত্তৃক ধৃত হন।

শ্রীমজুমদার দীর্ঘ সাড়ে চার বছর কাল বন্দি-জীবন যাপন করেন সিঙ্গাপুর দুর্গে। তার পর কয়েকটি রাজনৈতিক মামলার আসামী হিসেবে তাঁকে ভারতে আনা হয়। এসময় সকল রাজবন্দীদের

বো

—অমরেশ দাস

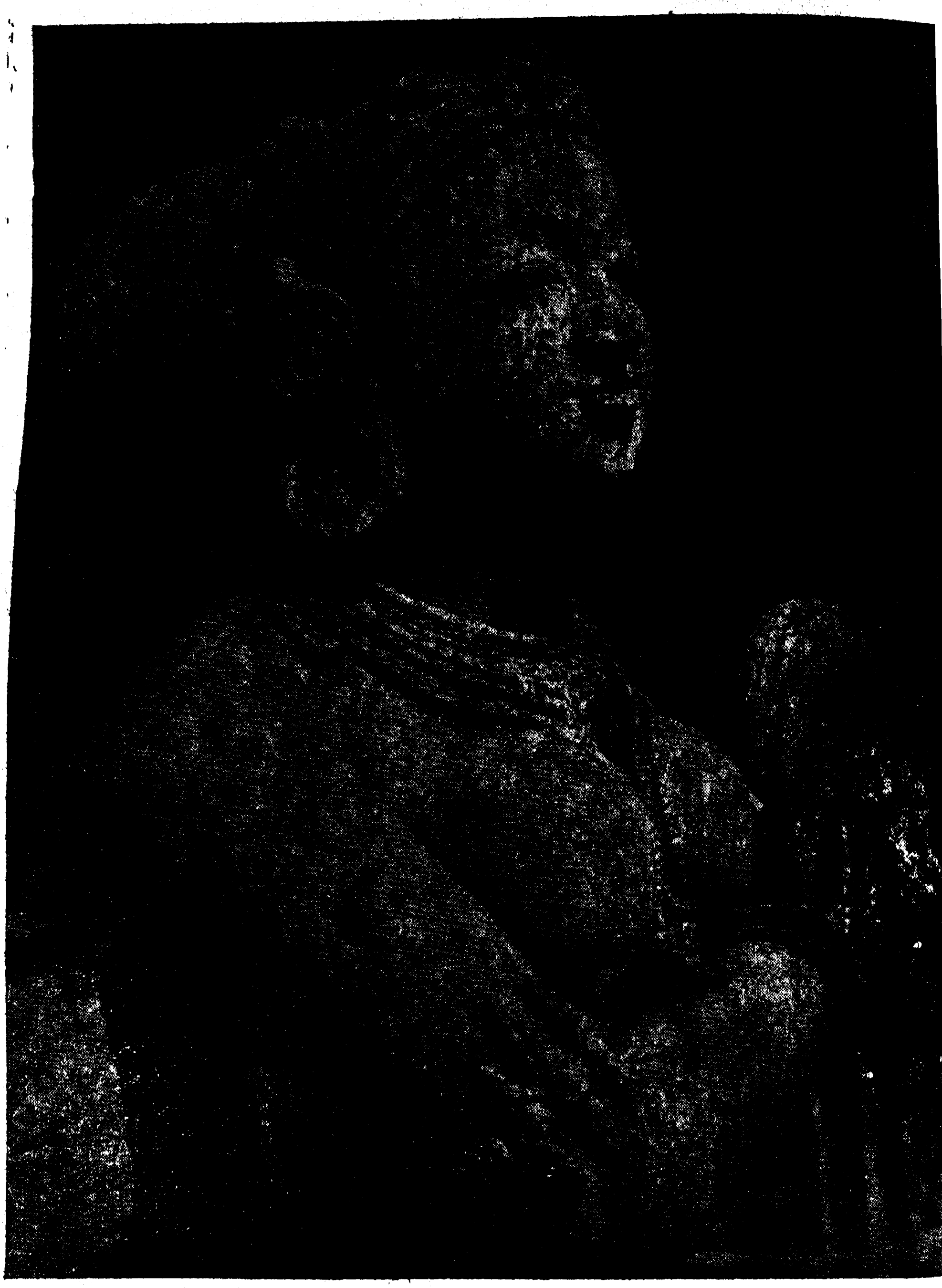




অপত্য

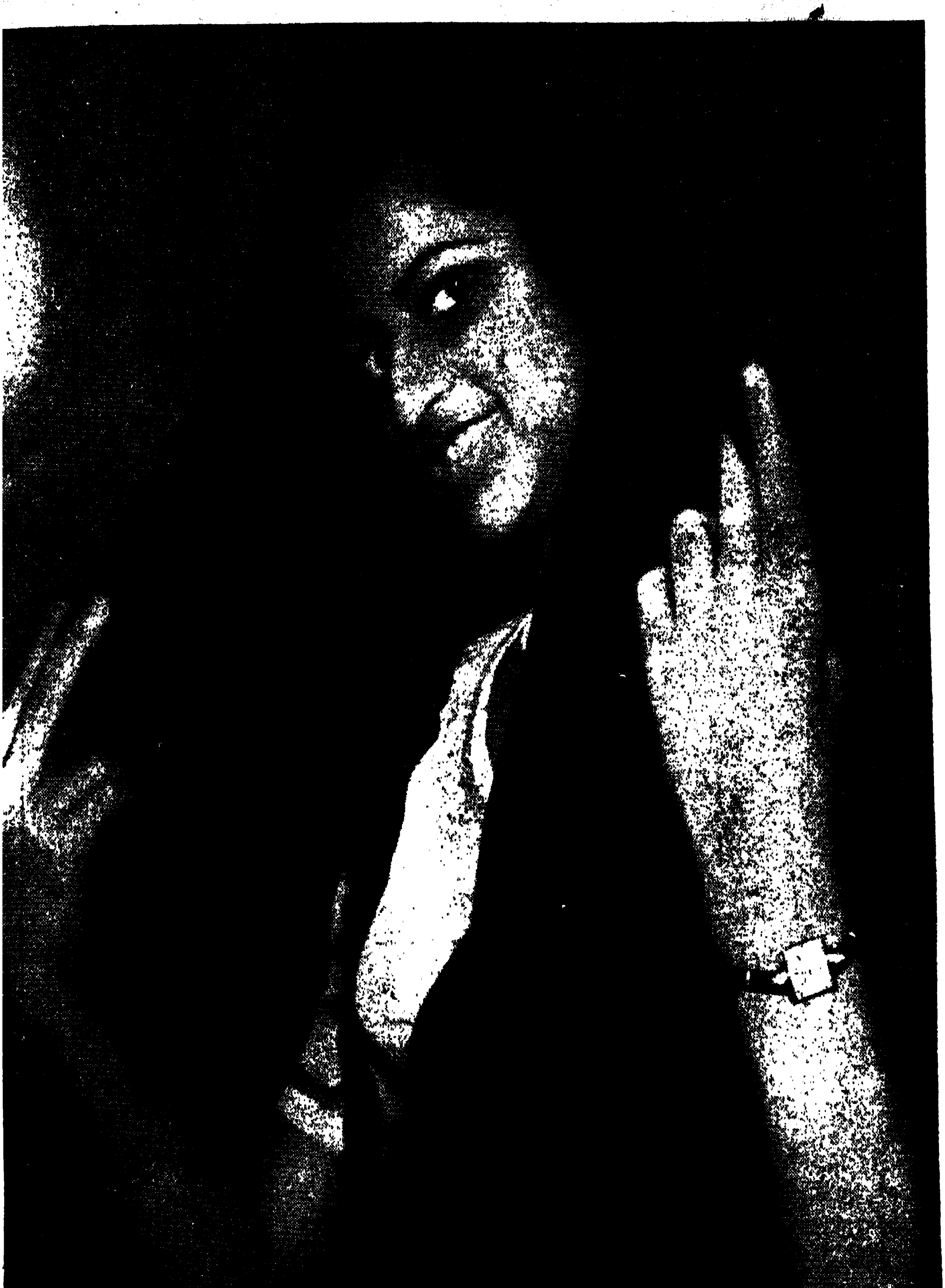
—প্রণব কুমার





বিগতা —আশুতোষ সিংহ

আধুনিকা —ত্রিদিব রায়





জলের জালে —তারা মুখোপাধ্যায়

জলের জালে —গুরুচরণ সা



Royal Clemency' দেওয়ায় কয়েক মাস মধ্যে তিনিও মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার অল্প দিন পরেই নাগপুর কংগ্রেসে ১৯২১) তিনি যোগদান করেন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের রাজনৈতিক মতবাদ ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। এর পর থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ তাঁর বরাবরই চলেছে। ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু যখন নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত, তিনি সে সময় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। ১৫ বছর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির তিনি সহ-সভাপতি এবং ১১ বছরের অধিক কাল দক্ষিণ-কলিকাতা জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পদে নিযুক্ত ছিলেন। মাঝে দুই বার প্রদেশ কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতির গুরু-দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। বর্ত্তমানে তিনি হুগলী জিলা কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ও প্রদেশ কংগ্রেসের এক জন সক্রিয় সদস্য। ১৯৫০ সাল পর্য্যন্ত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির তিনি সভ্য ছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্বে পরিচালিত সর্ব্বপ্রকার গঠনমূলক কাজেও তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বর্তমানে তিনি হুগলী জেলার একটি জাতীয় সম্প্রসারণ এলাকার কাজে সক্রিয় ভাবে যুক্ত এবং কংগ্রেস উন্নয়ন কর্ম্মী কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত আছেন। জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী (এন, ডি, এফ) ও অগ্রগামী দল তাঁরই সৃষ্টি। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের প্রাক্কালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নির্দ্দেশে তিনি প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসেবে 'বঙ্গীয় জনরক্ষা সমিতি' স্থাপন করেন।

দেশের বিভিন্ন আন্দোলন ও সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করায় ভূপতি বাবুকে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়। তাঁর জীবনের প্রায় ২৪ বছর কাল কারান্তরালেই কাটে। '৪২'এর আন্দোলনের সময়ও তিনি রাজরোষ থেকে রেহাই পেলেন না। এ সময় তাঁকে সাড়ে তিন বছরের অধিক কাল কারাবাস করতে হয়। মুক্তি পেয়ে এই দেশপ্রেমিক যখন বের হলেন তখন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আইন-সভার সদস্য নির্ব্বাচিত হলেন। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও দেশরক্ষা বিভাগের এবং সাময়িক ভাবে পূর্ত্ত ও যোগাযোগ বিভাগের মন্ত্রীর আসন অলঙ্কৃত করেন। তাঁরই সময়ে দামোদর পরিকল্পনায় পুনরুজ্জীবন, ময়ূরাক্ষী ও বৃহত্তর কলকাতার পয়ঃপ্রণালী পরিকল্পনা, গঙ্গা-বাঁধ তদন্ত প্রভৃতি পরিকল্পনা গৃহীত হয় এবং কাজও দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ হবার পূর্ব্বেই সীমান্তের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাঘাট এবং বিভিন্ন জেলার যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন ও নির্ম্মাণকার্য্য তাঁরই মন্ত্রিত্ব-কালে সম্পন্ন হয়।

দেশের বহু জনহিতকর এবং শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের সহিত ভূপতি বাবু সংশ্লিষ্ট আছেন নিবিড় ভাবে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সহ-সভাপতিরূপে তিনি কয়েক বছর কাজ করছেন এবং আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক আছেন। ভারতীয় মূক-বধির শিক্ষক-সংস্থার সভাপতি ও কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ের উন্নয়ন কমিটির তিনি চেয়ারম্যান। এ ছাড়া তিনি বিভিন্ন সভায় ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, লীলা-কীর্ত্তন প্রচারক নববৃন্দাবন-সংঘের সভাপতি, হুগলী জেলা কৃষ্টি পরিষদের সভাপতি, বৈতানিকের (রবীন্দ্র সঙ্গীত) সভ্য, হুগলী সংস্কৃত মহাসম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল রাইফেল এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, ওয়েষ্ট বেঙ্গল কবাডি ও খো খো ফেডারেশনের সভাপতি, ইণ্ডিয়ান ফুটবল এ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান ক্রিকেট এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ছিলেন বা আছেন।

ভূপতি বাবু এক্ষণে পরিণত বয়সে পদার্পণ করেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয়, যুবকের কর্ম্মশক্তি ও প্রেরণা তিনি আজও হারান নি। নিরহঙ্কার, সদালাপী ও মিষ্টভাষী শ্রীমজুমদার আরও দীর্ঘ দিন বেঁচে থেকে দেশ ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করুন এবং জনসমাজকে কল্যাণ ও সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যান—এ দাবী রাখবো।

রজায় রজায়



উদয়ভানু

চৌধুরাণীর নৌকার মাঝি-মাল্লারা সাবেকী লোক। বহুকাল আগে থেকে, আনন্দকুমারীর জন্মের অনেক আগে থেকে তার পিতার অন্ন খেয়ে তারা প্রতিপালিত হয়েছে। মাঝিদের মধ্যে কেউ-কেউ লজ্জায় মুখ লুকিয়ে ফেলে। কেউ ক্রোধে আত্মহারা হয়। কেউ আবার হাসি চাপে, বেনের মেয়ের সঙ্গে এক পরপুরুষকে দেখে। চৌধুরীমশাইয়ের দূর-পাল্লার বাণিজ্যযাত্রায় বাঙলা দেশ থেকে বেরিয়ে, বঙ্গোপসাগর ছাড়িয়ে মালাবার থেকে কুমারিকা, লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জ থেকে সিংহল আর সুমাত্রায় পাড়ি জমিয়েছে মাঝিরা। কত ঝড়ের দিনে, বৃষ্টি আর বজ্রপাতের কালরাত্রে সদাগরের ময়ূরপঙ্খী যখন সাগরের ঠিক মাঝ-দরিয়ায়, ঐ মাল্লার দল তখন চৌধুরীমশাইকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা ক'রেছে। মরণকে তুচ্ছ ক'রে নৌকার মাস্তুলশীর্ষে উঠে পালের দড়িদড়া খুলেছে, যখন ঠিক মাথার 'পরে বজ্র আর বিদ্যুতের মিলনলীলা চলেছে। কোটি কোটি তীরের মত বৃষ্টি-জলের আক্রমণ! প্রকৃতির করাল গ্রাস থেকে ছিনিয়ে এনেছে সদাগরকে; লক্ষ লক্ষ টাকার পণ্যসম্ভার বাঁচিয়ে দিয়েছে সামুদ্রিক তুফানের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে। আরাকানের জলদস্যুরা যখন ছ'শো হাত গভীর জলের নীচ থেকে, ঝাঁক ঝাঁক হাঙ্গরের মত এসে নৌকা ঘিরে ফেলেছে, তখন ঐ মাঝিদের প্রতিরোধে বেঁচে গেছেন চৌধুরীমশাই।

—মাঝি-সর্দার, নৌকার বাঁধন খুলে দাও।

আমোদরের ঠাণ্ডা জলে দুই ক্লান্ত পা ডুবিয়ে কেমন যেন হুকুমের সুরে কথা বললে চৌধুরাণী। চাঁদের জোরালো আলোয় মাঝির দল লক্ষ্য করে, তাদের অন্নদাতার মেয়ের মুখে আনন্দের চাপা-হাসি। তার অঙ্গবাস কেমন আলুথালু। বৈশাখী রাতের ঝড়ো-হাওয়ায় আসমানী ঢাকাই আঁচল উড়ছে। আলগা হয়েছে জরি-জড়ানো বিনুনী।

নোঙরের শেকল খোলার ঝন-ঝন শব্দ উঠলো জলের তীরে। এক জোড়া শিয়াল সেই ধাতব ঝঙ্কারে ছুটে পালিয়ে গেল নদীর তীর থেকে। গেরস্থের মুরগী খেয়ে পালিয়ে এসে শুষ্ক কণ্ঠে জলে মুখ দিতেই শেকল ঝনঝনিয়ে ওঠে।

পৈঠায় পা দেয় আনন্দকুমারী। তার চরণাঘাতে পত্রপুটা দোদুল্যমান হয়। ফুলের মালা থেকে যুঁই খ'সে পড়লো নৌকার পাট-পত্তনে। নৌকায় একটি মাত্র কক্ষ। দুই পাশে সারি সারি বাতায়ন। দূর থেকে দেখা যায় কক্ষাভ্যন্তর সুসজ্জিত। স্ফটিক-দীপ জ্বলছে ভেতরে! মহার্ঘ আসন, চিত্র, পুতুল প্রভৃতি চোখে পড়ছে। শ্বেতপদ্ম-আঁকা লাল শালুর চন্দ্রাতপ শীর্ষে!

—ঘরে ফিরবে না কি হুজুরের মেয়ে?

মাঝি-সর্দার নৌকার গলুই ধ'রে ঠেলা মারলো এক, আর বললে সম্ভ্রমের সুরে। হাঁটুভর জল থেকে একটু গভীর জলে ভাসলো পত্রপুটা। টলমলিয়ে উঠলো।

চৌধুরাণী, কক্ষের দুয়োর থেকে বললে,—আসমান দীঘির শেষ বরাবর চল' এখন, ঘরে ফেরার তাড়া নাই তত।

বৈশাখের জ্যোৎস্না আকাশে। যেমন উজ্জ্বল তেমনি মধুর! চাঁদের আলো ছড়িয়েছে, সোনার চাকচিক্য নদীজলে, এখানে-সেখানে। এখন জলের গতি অতি তীব্র! ঝড় আর বৃষ্টিতে সামান্য স্ফীত হয়েছে আমোদর!

নৌকার ছাদের 'পরে গালিচা পাতা! নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার এক পাশে কয়েকটি লৌহ-অস্ত্র, চন্দ্রকিরণে আভা ঠিকরোয়।

মাঝি-সর্দার বললে,—রাত গহিন, নাই বা যাও আর। হুজুর সুতোনুটিতে গেছেন, ঘরে ফেরাই মঙ্গল এখন। পথ-ঘাটও ভাল নয়।

চৌধুরাণী, খানিক স্তব্ধ থেকে বললে,—তোমার কোন' ভয় নাই মাঝি। সজ্জারামে যাবো, নৌকা সেদিকে চালাও। চাঁদের আলো আছে আজ।

এক কলকে তামাক খেয়েছে মাঝি-সর্দার। তার বুড়িয়ে-যাওয়া পেশী এখন বেশ তাই চাঙ্গা হয়ে আছে। গলুয়ে দু'হাত আর জলে পা, সর্দার তার পিঠের পেশী ক'খানা ফুলিয়ে ফুলিয়ে শরীরের জড়তা ভঙ্গ করলো। আর এক ঠেলা দিতে যাবে, এমন সময় চৌধুরাণী আবার কথা বললে,—মাঝি, খানিক থামো।

চাঁদের আলো আনন্দকুমারীর কোমল দেহপ্রভায়। মিহি ঢাকাই শাড়ীতে জরির ফুল; বুকে যুঁইয়ের মালা; লাল-রাঙানো মিষ্টি অধর—চাঁদের আলোয় যেন চিকচিকিয়ে উঠছে একেক বার। চৌধুরাণী চিবুক নামিয়ে সঙ্গের সাথীকে ডাকলো। মুখ ফুটে বলতে পারলো না কথা, তাই ইশারায় ডাকলো।

—সজ্জারামে আজ আর নাই যাও। মাঝি-সর্দার কথা বললে আবার। বললে,—খানিক আগে ম্যালেট্ সায়েবের বজরাকে যেতে দেখেছি ওদিকে।

—ম্যালেট্ সায়েবের বজরা!

একবার যেন চমকে উঠলো আনন্দকুমারী, কি এক অজানা আশঙ্কায়। বললে,—ম্যালেট্ সায়েবের বজরা! কোথায় যেতে দেখলে মাঝি?

—ম্যালেট্ চাঁদের আলোয় হাওয়া খেতে বেরিয়েছে হয়তো। গেছে ঐ দিকে।

হেসে-হেসে কথা বললে মাঝি-সর্দার। ম্যালেটের বজরা যেদিকে গেছে সেই দিকে চোখ দেখালো। বললে,—ম্যালেটের সঙ্গে জন দশেক তেলেঙ্গী সিপাই।

চন্দ্রকান্ত দেখলেন নৌকার পাটাতনে যেন এক রূপবতী, মূর্তিমতী লক্ষ্মীপ্রতিমা!

আজকের আমোদরের মত যেন কূলে কূলে পূর্ণ, যৌবন-বর্ষার চার পোয়া বন্যার জল সেই কমনীয় আধারে। আনন্দকুমারী আজ যেন কেমন চঞ্চল, ঐ অস্থির নদী-জলের মতই। ম্যালেটের নাম শুনে অবাক হওয়ার বিস্ময় কাটিয়ে চিবুক নামিয়ে নামিয়ে ডাক দেয় চৌধুরাণী। মুখে হাসি ফুটিয়ে ফুটিয়ে ডাকে।

অস্ফুট বাদ্যধ্বনি ভেসে আসছে আমোদরের অন্য তীর থেকে। সন্ধ্যাগ্রাম থেকে তাসা আর ঢাক বাজানোর শব্দ ভাসে উড়ন্ত বাতাসে। এক নাগাড়ে ঘণ্টা বেজে চলেছে মঠে। সারা মান্দারণে আর কোন সাড়া শব্দ নেই এই নিশীথ রাতে। তবুও কিছুক্ষণ আগে কেউ ডেকেছে কাছাকাছি কোথায়। যেন এক জনশূন্য উপনগর এই মান্দারণ, মনুষ্য-বিরহে স্তব্ধ শান্ত হয়ে আছে। চাঁদের আলো ভিন্ন আলোর চিহ্ন নেই কোথাও।

চন্দ্রকান্ত নৌকায় উঠতেই মাঝি-সর্দার বললে,—সাদা কাপড়ের মানুষকে সাথে লয়ে সন্ধ্যারামে যাবে হুজুরের মেয়ে? আমরা কেউ ধড়ে জান নিয়ে ফিরবো না আর। কেটে কেটে ভাসিয়ে দেবে এই আমোদরের জলে।

কক্ষমধ্যে গেলেন চন্দ্রকান্ত। অল্প হাসলো চৌধুরাণী। বললে,—ভয় নাই মাঝি। আমি বলছি, ভয় নাই।

—ভরসাও নাই হুজুরের-মেয়ে। রাত-বেরাত তাই বলছি।

গলুই ধ'রে সজোরে এক ঠেলা দিতে দিতে বললে মাঝি। অন্যান্য মাঝিরা ততক্ষণে নৌকার আগে আর পিছনে উঠে প'ড়েছে। তবুও সর্দার ইতি-উতি দেখে মাঝিদের মাথা গুণে নেয়। নিজেও উঠে পড়ে নৌকা হেলিয়ে।

—ভরসা তুমি, তাই আমার ভয় নাই।

হাসতে হাসতে বললে আনন্দকুমারী। কক্ষের দুয়োরে দাঁড়িয়ে কথা বললে।

জলের বুকে ছপ-ছপ শব্দ দাঁড় টানার। তীর ছেড়ে নৌকা এগিয়ে চললো মাঝনদীতে। পেছনের গলুইয়ে বসলো সর্দার। বললে,—সাদা আর হলুদ রঙের মধ্যে লড়ালড়ি চলেছে তা জানো? খোলাখুলি যুদ্ধ নয়, চোরাগোপ্তা মারামারি!

মাঝির কথাগুলি চন্দ্রকান্তর কানে যায়। তিনি যেন শিউরে উঠলেন। অনুমানে বোঝেন, ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধতান্ত্রিকদের গুপ্তযুদ্ধের কথা কারও আর অবিদিত নেই। শ্বেত-বস্ত্র আর পীত-বস্ত্রধারীদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ চলেছে পরমত-অসহিষ্ণুতায়! শক্তিতন্ত্র থাকে না বুদ্ধতন্ত্র থাকে, তারই কঠিন পরীক্ষা চলেছে। বাঙলা দেশের জেলায় জেলায় ছড়িয়েছে এই দাবানল। মঠ আর মন্দির বিধ্বস্ত হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। মৃত্যুর ভয়ে কত লোক রাতারাতি স্বধর্ম ত্যাগ করছে। সন্ন্যাসী-সন্তানের দল ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। ভিক্ষু আর শ্রমণরা মত্ত হয়ে আছেন। মঠ আর মন্দির পুড়ছে, বৈরী-বৈশ্বানরে। পুঁথির স্তূপে আগুন জ্বলছে। দেব-দেবীর অঙ্গচ্ছেদ হচ্ছে ধারালো অস্ত্রাঘাতে। কত বুদ্ধমূর্তি ধূলায় লুটিয়েছে।

—মাঝি যথার্থই বলেছে চৌধুরাণী। দিন-কাল ভাল নয়। তুমি ঘরে যাও।

কক্ষের মধ্যে থেকে বললেন চন্দ্রকান্ত। কেমন যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে। বিপত্তারিণীর মন্ত্র থামিয়ে বললেন। কথার শেষে কক্ষের অভ্যন্তর খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। দেখলেন কাঠের দেওয়াল বিচিত্র চিত্রিত। পট আর পুতুলে সাজানো। দশভুজা প্রতিমা, দশ অবতার, মহিষাসুর বুদ্ধ, ৬৪ নায়িকা, দশ মহাবিদ্যা, কৃষ্ণের বস্ত্রহরণলীলা— পাশাপাশি সাজানো—বুদ্ধের বরাভয় মূর্তি।

কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে আনন্দকুমারী। এক ঝলক হাসি হেসে বলে,—মরতে হয় এক সঙ্গেই মরি, তাতে আর ভয় কি! মরণকে আমি ভয় করি না।

কক্ষের মেঝের পুরু গালিচা। মখমলের কামদার বিছানা, তাকিয়া বালিশ। সোনার আতরদান, গোলাপ-পাশ, বাটা আর পুষ্পপাত্র। সুগন্ধি ফুল আর আতরের গন্ধে স্বপ্নের আবেশ আসে যেন।

—দুঃসাহস তো কম নয়! চন্দ্রকান্ত এটা-সেটা লক্ষ্য করেন আর বলেন। বলেন,—ম্যালেটকেও ভয় কর'না চৌধুরাণী? ম্যালেটের বন্দুকের বারুদকে?

—ঝাঁটা মারি ম্যালেটকে। সে মরুক না, আমি হরির লুট দেবো।

তাচ্ছিল্যের সুরে বললে আনন্দকুমারী। মখমলের বিছানায় বসে পড়লো পথক্লান্তিতে।

—ম্যালেট কিন্তু আশা ত্যাগ করে নাই। তোমার আশায় সে এখনও মান্দারণেই আছে। জমিদারীদের কাজ শেষ হয়েছে তবুও অন্যত্র যায় না। শুনতে পাই, ম্যালেট তোমার জন্য জীবন পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে পারে।

—মুখে ছাই পড়ুক ম্যালেটের। তার মাথায় বজ্রাঘাত হোক। ইংরেজদের কুঠিতে আগুন লকুক। ম্যালেটের জ্বালায় আমি যে মলাম। খেয়ে-ঘুমিয়ে ঘুরে বেড়িয়ে সুখ নাই আমার। যেখানেই যাই ম্যালেট ঠিক পিছু-পিছু আছে।

—কৃপা কর'না তাকে। ম্যালেট যা চায় তাই দাও না।

—তার আগে আগুনে ঝাঁপ দেবো আমি; আমোদরের জলে ডুবে ম'রবো। আফিম খেয়ে জ্বালা জুড়োবো।

দাঁড় টানার ছপ-ছপ শব্দ আসে কানে। পত্রপুট সবেগে এগিয়ে চলছে জলপথে। আশ-পাশ দিয়ে আরও নৌকা যায় আসে। যাত্রিবাহী নৌকা, জেলেদের গহনা নৌকা যাওয়া আসা করে। নর্ত্তকীর দল এক সঙ্গে যেন পা ফেলছে। দাঁড় টানার শব্দ, ঐকতানের মত শোনায়। মাঝিদের ছাড়া-ছাড়া কথার টুকরো ভাসে হাওয়ায়।

—ম্যালেট কত সুখে রাখবে তোমাকে। সাগরপারে নিয়ে যাবে।

—ম্যালেটের নাম মুখে আনাও পাপ। ম্লেচ্ছ দেশে যেতে চাই না আমি। আমার এই মান্দারণই ভাল। মান্দারণ আমার কাছে স্বর্গের সমান। কথা বলতে বলতে খানিক থেমে আবার বললে আনন্দকুমারী,—ম্যালেটের প্রসঙ্গ যেতে দাও, অন্ততঃ আজকের রাতে। আজ আমার খুবই সুদিন।

চন্দ্রকান্ত মৃদু হেসে বললেন,—তা না হয় যেতে দিলাম। কিন্তু আমার কি উপায় হবে এখন? সমাজে জানাজানি হবে, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়বে। একঘরে হয়ে থাকতে হবে আমাকে। চতুষ্পাঠীতে ছাত্রশিষ্য মিলবে না আর।

—আমার ঘরে থাকবে তুমি। লোকের কথাকে ডরাই না তত। কথার শেষে চৌধুরাণী একটি তাকিয়া টেনে নেয়। বুক চিতিয়ে দেহ এলিয়ে বসে পথক্লান্তিতে।

—আত্মবন্ধুজন যে পরিহার করবে আমাকে! কোথাও ঠাঁই পাবো না।

হাতী-দাঁতের হাতপাখা তুলে নেয় আনন্দকুমারী। বাতাস খায় নিজে। কথার সুর নামিয়ে বলে,—সকলে তোমাকে ত্যাগ করুক, আমি তোমাকে গ্রহণ করবো। তোমার ঠাঁই এখানে।

কথার শেষে নিজের বক্ষদেশ দেখিয়ে দেয় সে। দীপের আলোয় তার কাঁচুলীর জৌলুস তোলে।

—উপবীত ত্যাগ করতে হবে। তন্ত্রমন্ত্র ভুলতে হবে। গ্রাসাচ্ছাদন চালাই কোথা থেকে?

—এই লও আপাততঃ, ঘর বাঁধো, দিন চালাও।

লাল রেশমী রুমালের পুঁটলীটা চৌধুরাণী এগিয়ে দেয় কথা বলতে বলতে।

—চৌধুরীমশাই জানতে পারলে যদি বিপদ আসে তোমার!

—সে ভাবনা আমার। আমি দান করছি, তুমি গ্রহণ কর' হাসি মুখে।

চন্দ্রকান্ত চিন্তিত হয়ে আছেন। তাঁর চিন্তাজাল বারে বারে ছিন্ন হয়ে যায় চৌধুরাণীর কথায়। চন্দ্রকান্ত বললেন,—আনন্দকুমারী, তোমার জিদ বড় বেশী। যা মন চায় তুমি কর'। ঈশ্বর তোমার সহায় হোন।

—তুমি আমার সহায় হও তো ঈশ্বরের পরোয়া করি না আমি।

কথা বলতে বলতে চৌধুরাণী এক বার কটাক্ষ হানলো দ্বারপ্রান্তে। চুপি চুপি বললে,—তোমার কাছে যাওয়ার অনুমতি দাও।

—দ্বার উন্মুক্ত যে। মাঝিরা যদি দুর্নাম দেয়, তখন কি হবে?

উত্তরে কোন কথা বলে না আনন্দকুমারী। মখমলের শয্যা ছেড়ে উঠে পড়ে। দুয়োরের পাল্লা বন্ধ ক'রে দেয় ধীরে ধীরে। ভেতর থেকে অর্গল তুলে দেয়। হেসে হেসে বলে,—মাল্লামাঝিরা আমাদের অন্নদাস, মরবে তবু কথা ছড়াবে না। কেটে ফেললেও গোপন কথা ফাঁস করবে না।

পত্রপুটা গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে চলেছে। কখনও স্থির থাকে, কখনও দু'লে দু'লে ওঠে জলের আবর্তে। কক্ষমধ্যে থেকে বোঝা যায় না, নৌকার অগ্রগমন। নৌকা স্থিতিশীল না গতিশীল?

—আমার প্রতি তোমার এত দয়া কেন বুঝি না। তুমি ঐশ্বর্য্য আর বৈভবে লালিত পালিত, আর আমি এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কায়ক্লেশে দিন কাটাই।

—দয়া নয় চন্দ্রকান্ত। তোমাকে আমি দেখছি জ্ঞান হওয়ার পর থেকে, সেই শিশুকাল থেকে। চৌধুরাণী কথা বলতে বলতে আবার বসলো মখমলের শয্যায়। তাকিয়ায় দু'হাত রাখলো। সমুখে ঝুঁকে বললে,—তুমি উদ্যমী, তুমি জ্ঞানবান, আত্মনির্ভর তোমার আছে, মানুষ তুমি ভালই, তাই তোমাকে শ্রদ্ধাভক্তি করি। এক দিন তুমি ছিলে আমার খেলার সাথী, আজ থেকে তুমি আমার জীবনের সঙ্গী হও।

—বিবাহ করবে তুমি, সংসার ধর্ম প্রতিপালন করবে, তোমার পিতার ভূসম্পত্তি রক্ষা করবে, আমি এস্থলে বাধা হই কেন?

চোখ ছলছলিয়ে ওঠে আনন্দকুমারীর। তবুও ম্লান হেসে বললে- বিবাহ আমার হয়ে গেছে আজ, তুমি মানো আর না মানো আমি যাকে মালা দিয়েছি, সেই আমার—

—চৌধুরীমশাই দেখো শেষে আপত্তি জানাবেন। তিনি কি চাইবেন আমার মত দরিদ্রের ঘরে তোমাকে পাঠাতে! চালচুলো নেই আমার, তিন মহলা বাসগৃহ নেই, ডাইনে আনতে আমার বাঁয়ে কুলায় না, চৌধুরীমশাই কি রাজী হবেন তোমার এই খেয়াল-খুশীতে?

—অধিক কথার কোন প্রয়োজন দেখি না চন্দ্রকান্ত! বৃথা বাক্য ব্যয় কর কেন? তোমাদের চৌধুরীমশাইকে আমার অপেক্ষা কেউ বেশী জানে না। তিনি পাকা ব্যবসায়ী, কিন্তু মন তাঁর খুবই উদার আমার কোন কথা তিনি এড়াতে পারবেন না। তাঁর স্নেহ-আদরে কোন ভেজাল নাই জানবে। কবে কোন কালে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন আমাকে, আমার বিবাহের পাত্র আমিই বেছে নেবো।

—তা এক জন সৎপাত্র বাছবে না তুমি? আমার মত সামান্য টুলো-ব্রাহ্মণকে শেষ পর্য্যন্ত বাছাই করবে?

—মনটা আমার একেই ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে চন্দ্রকান্ত। তুমি কোথায় ভাঙা মনে আশার আলো জ্বালাবে, তা নয় শুধুই আক্ষেপ জানাও।

—মন ভেঙেছে কেন? কি এমন আঘাত পেয়েছো, জানতে চাই।

নিশ্চুপ হয় চৌধুরাণী। নতমস্তকে থাকে কতক্ষণ। শাড়ীর অঞ্চলপ্রান্ত পাকাতে থাকে চিন্তায় আকুল হয়ে। স্পর্শ-চাঞ্চল্যে ঢাকাই আসমানী আঁচলের তারাফুল চিকণ তোলে ক্ষণে ক্ষণে। একবার মুখ তুলে তাকায় স্থির দৃষ্টিতে। চোখ নামিয়ে বললে,—তুমি হয়তো ঐ জমিদার-গিন্নীকেই মনে মনে চাও।

—ছি ছি! এমন কথা আর মুখে এনো না। পাপ হবে যে তোমার। জমিদার কৃষ্ণরামের অর্দ্ধাঙ্গিনী তিনি, কৃচ্ছ্রসাধনে আছেন। তেমন মানুষ তিনি আদপেই নয়। দুঃখকষ্টে থেকে থেকে তিনি মর্ম্মাহত হয়ে আছেন।

—তার প্রতি তোমার কোন আসক্তি নাই বলতে চাও?

নকল হাসি হেসে হেসে প্রশ্ন করে চৌধুরাণী। তার দীর্ঘ দুই চোখে যেন কত আকুলতা।

—তিলমাত্র নয়। ঈষৎ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন চন্দ্রকান্ত। বললেন,—এখনও পর্য্যন্ত তাঁর মুখখানিও আমার চোখে পড়ে নাই।

—সেজন্য কি তুমি দুঃখ পাও?

—কদাপি নয়।

কথায় কথায় কখন কাছে স'রে এসেছে আনন্দকুমারী। হাতীর দাঁতের হাতপাখার বাতাস লাগে চন্দ্রকান্তের দেহে। চন্দ্রকান্ত দেখলেন চৌধুরাণীকে। বেশ কিছুক্ষণ ধ'রে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখলেন। চন্দ্রকান্তর চোখে বিহ্বলতা নেই, আছে বিস্ময়।

—আমার মুখে কি লিখা আছে, তাই শুনি? কি দেখো কি?

আনন্দকুমারী বললে ক্ষীণ হাসির সঙ্গে। চোখে যেন কৌতূহল ফুটলো। কথার সুরে যেন আগ্রহ।

মৃদু মৃদু হাসলেন চন্দ্রকান্ত! সহযাত্রিনীর একটি হাত নিজের হাতে ধারণ করলেন। করনিপীড়ন অনুভব করে চৌধুরাণী। তার তনুলতা যেন বসন্তবাতাসে কেঁপে-কেঁপে ওঠে। বিরহশাতুর মুখে হাসির আভাব উঁকি দেয়। চোখের দৃষ্টিতে যেন বিলাসলালসা ফুটে ওঠে।

মৃদু হেসে চন্দ্রকান্ত বললেন,—ব্রজসুন্দরী, তোমার মুখচন্দ্রের সুষমা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়েছি আমি। মুখপদ্মসৌরভে নেশাচ্ছন্ন হয়েছি।

ভ্রূপল্লব নেচে উঠলো যেন। কি এক মর্ম্মব্যথার বিষাদ নামলো যেন মুখে! বিরহ-ব্যাধির রোগিণীর মত ক্ষীণ কণ্ঠে আনন্দকুমারী বললে,—আমার আশা কি পূর্ণ হবে? তুমি কি আমার হবে?

দীপের আলো কক্ষমধ্যে। বাইরে চাঁদের উজ্জ্বল আলো। আমোদরের সোনা-গলা জলে চোখ রাখলেন চন্দ্রকান্ত। খরস্রোতে বয়ে চলেছে আমোদর। ক্ষণস্থায়ী বর্ষণেই যেন আজ কূলে কূলে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে আমোদর। নদীর স্রোতে, আবর্তে, তরঙ্গে চাঁদের কিরণ খেলছে। পারঘাটের যাত্রীদের কথা ভেসে আসছে। মাঝিদের তামাসার হাসি! দাঁড়ের ছপ-ছপ।

—চিন্তার অবকাশ মিলে নাই, তাই আমি এখন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়! স্বজাতি আর সমাজকে ভয় হয়। চন্দ্রকান্ত বললেন কথায় চিন্তার জড়তা কুটিয়ে। বললেন,—তুমি কুবেরকন্যা, আমার কুটিরে কি শোভা পাবে? আমার ঐ চালা ঘরে?

চৌধুরাণী দন্তে অধর দংশন করে। হৃদয়মন ব্যথায় কাতর হয় যেন। ভ্রূভঙ্গিমায় অন্তর্দাহ ফুটে ওঠে। চোখের উজ্জ্বল কাজলে দীপের আলোর চাকচিক্য। জরি-জড়ানো বিনুনী এক হাতে সরিয়ে দেয় আনন্দকুমারী। বক্ষ থেকে পিঠে ফেলে দেয়। কণ্ঠের সুর নামিয়ে বলে,—পাকা ঘর হবে তোমার। দালান উঠান বাঁধিয়ে দোবো! মূল্য যা লাগে আমিই দোবো। খানিক থেমে আবার বলে—বৈশাখ শেষ হ'লেই বিয়ের তারিখ স্থির করবো।

—আড়ম্বর ত্যাগ করতে পারবে আনন্দকুমারী? তারায়-ভরা আকাশ থেকে চোখ ফিরিয়ে প্রশ্ন করলেন চন্দ্রকান্ত। ঈষৎ হাসির সঙ্গে।

সুধামধুরধ্বনিতে হাসলো চৌধুরাণী। কটাক্ষশর হানলো। প্রথমমিলনলজ্জায় চোখের কটাক্ষ ফিরিয়ে নিয়ে আনত মুখে মৃদু হাসলো। বললে,—হাঁ, খুব পারি। কাক-পক্ষীও টের পাবে না।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—তবে আমিও সম্মত জানবে। কথা বলতে বলতে চৌধুরাণীর আর একখানি হাত ধরলেন। ফুলের মত কোমল হাত। সহাস্যে বললেন,—ত্বমসি মম ভূষণং, ত্বমসি মম জীবনম্।

ঠিক তখনই কোথায় যেন বারুদ ফাটলো আকাশ-কাঁপা শব্দে!

গজেন্দ্রগামিনী পত্রপুটার গতি শিথিল হয়। মাঝিদের মধ্যে কে যেন চিৎকার করলো। মরণ-চিৎকারের মত শোনালো যেন! আবার এক শব্দ, আবার সেই চিৎকার। আমোদরের জল চলকে উঠলো সশব্দে। নৌকা থেকে জলে ঝাঁপ দেয় কারা!

আনন্দকুমারীর দুই হাত মুহূর্তের মধ্যে হিম হয়ে যায়। চোখের যেন পলক পড়ে না।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—চৌধুরাণী, বিপদ আসন্ন। দীপ নিবাও সর্ব্বাগ্রে। তোমার নৌ আক্রান্ত হয়েছে!

সাপের মত লাফিয়ে উঠলো যেন আনন্দকুমারী। মখমলের শয্যা থেকে স্ফটিক-দীপের কাছে আছড়ে পড়লো। তার আঁচলের বাতাসে আলোর শিখা হঠাৎ নিবে গেল।

কক্ষে অন্ধকার ছড়িয়ে পড়লেও; চাঁদের আলো আছে। সোনার আতরদান আঁধারে দেখা যায়। শয্যাপ্রান্তে একফালি জ্যোৎস্না।

—এখন উপায়? চৌধুরাণী কথা বলে শুষ্ককণ্ঠে।

আবার সেই বজ্রপাত, শব্দ। কাছাকাছি কোথাও থেকে বন্দুক দাগার শব্দ আসে। মনুষ্যকণ্ঠের চিৎকার শোনা যায় মাঝিদের চাঞ্চল্যে পত্রপুটা আড়াআড়ি দুলতে থাকে কলকল্লোলের মত।

আনন্দকুমারী চুপিসাড়ে বাতায়নের কাছে এগিয়ে চুরিয়ে চুরিয়ে দেখলো ইদিক-সিদিক। দেখলো, চন্দ্রালোকে দেখলো দূরে নদীতীরের এক বনানীর কালো অন্ধকারে ম্যালেটের বজরা। বজরার ছাদে তেলেঙ্গী সিপাইরা যেন আঁধারে মিশে আছে। অন্ধকারে বারুদ জ্বলসানের আগুন ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে—একের পর এক বজ্রপাতের শব্দ তুলে।

ম্যালেটের শ্বেতমূর্ত্তি স্পষ্ট দেখা যায়। সিপাইদের পেছনে ম্যালেট। তদারক করছে সিপাইদের কাজের। হো-হো শব্দে হাসছে। বিদেশী মদের নেশায় মত্ত এখন ম্যালেট। বজরার মধ্যে ম্যালেটের নীলাভ কাট-গ্লাসের ভিনিশিয়ান ডিকেণ্টারে স্কচ পানীয় চলকে চলকে উঠছে। পানপাত্র উলটে প'ড়ে গেছে। ডিকেণ্টারের পাশে ম্যালেটের ব্যাঞ্জোটা প'ড়ে আছে। চাঁদের আলোকসুধা খেতে খেতে, বিদেশী মদে চুমুক দিতে দিতে, ম্যালেট তার ব্যাঞ্জোয় এতক্ষণ সেরিনেডের সুর বাজিয়ে চলেছিল।

অনেক দিনের লোভ ম্যালেটের। চাপা লালসা হঠাৎ আজ বিদ্রোহ করেছে। চৌধুরাণীকে ম্যালেট দেখছে বেশ কিছুদিন ধ'রে। এখানে-সেখানে দেখেছে। দিনের আলোয় দেখেছে। আজ দেখবে জ্যোৎস্নারাতের অন্ধকারে।

—সাঁতার জানা আছে চৌধুরাণী? চল', জলে ঝাঁপ দিই।

বারুদ-অস্ত্র আছে কি তোমার মাল্লাদের কাছে?

রুদ্ধশ্বাসে যেন কথা বলে আনন্দকুমারী। বললে,—সাঁতার জানা নেই। বারুদ-অস্ত্র নেই। আছে কয়েকটা লোহার অস্ত্র। বর্শা, ভল্ল আর তরোয়াল।

চন্দ্রকান্ত কক্ষের দ্বার মুক্ত করলেন সভয়ে। দেখলেন, নৌকায় মাঝিরা কেউ নেই। নৌকার অদূরে একটি মৃতদেহ ভেসে উঠেছে। চিৎ সাঁতার দিয়ে ভেসে চলেছে যেন কে এক যোগী। জলের বুকে উচ্ছ্বাস। আহত মানুষের বৃথা আস্ফালনে, মৃত্যুকে পিছিয়ে দেওয়ার অদম্য কামনায় কারা যেন ছটফট করছে জলে।

চন্দ্রকান্ত দেখলেন, চাঁদের প্রভা ঘন ঘন চিকচিকিয়ে উঠছে বিক্ষিপ্ত নদীতে।

ম্যালেট হো-হো শব্দে হেসে উঠলো তার বজরার ছাদে। বনানীর কালো ছায়ায় ম্যালেটের শুভ্র পোষাক স্পষ্ট দেখা যায়। বজরার ছাদ থেকে সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নামলো ম্যালেট। ডিকেণ্টার আর পানপাত্র চাই। কড়া স্কচ হুইস্কি চাই। উত্তেজনায় ম্যালেটের কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে। একেকটা মাল্লাকে বৃন্তচ্যুত ফলের মত গভীর জলে খ'সে খ'সে পড়তে দেখে প্রচুর হেসেছে সে।

চৌধুরাণী কাঁপছে ঠকঠকিয়ে। আঁৎকে উঠছে যেন। কাঁচুলী আঁটা বুক স্ফীত হয়ে ওঠে থেকে থেকে। দুই হাতে চোখ ঢাকলো চৌধুরাণী। আর যেন দেখতে ইচ্ছা হয় না এই পৃথিবীকে!

—চৌধুরাণী, ম্যালেটের বজরা এদিকেই অগ্রসর হয়েছে।

মুক্ত দুয়ার থেকে দেখতে দেখতে চন্দ্রকান্ত কথা বললেন শঙ্কিত কণ্ঠে। বললেন,—চৌধুরাণী, আত্মসমর্পণ ভিন্ন তোমার জীবনের কোন' আশা দেখি না।

[১৪৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

কয়লাকুঠির দেশ

(উপন্যাস)

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

১৫

মালা কিছুতেই এলো না।

রাত্রিটা যে রঞ্জনের কেমন করে কাটলো তা একমাত্র সেই জানে। মন বলছে, সে আসবে না। কেনই-বা আসবে? অবিবাহিতা এক কুমারী যুবতী রাত্রির অন্ধকারে চুপি-চুপি চোরের মত কেনই-বা আসবে তার কাছে? কি বিশ্বাসে?

তবু তার প্রতীক্ষার অন্ত নেই।—এই বুঝি আসে!

খুট করে আওয়াজ হয়, আর সেই দিকে তাকায়। চোখে ঘুম আসে না। ভাবতে বেশ লাগে! ভাবে সে এসেছে। এসে দাঁড়িয়েছে ওইখানে। লজ্জায় অবনত মস্তক। অভিমানে নীরব।

দু'হাত বাড়িয়ে রঞ্জন তাকে যেন কাছে টেনে নিলে। মালা যেন তার বুকে মুখ গুঁজে পড়ে রইলো।

রঞ্জন তার মুখখানি তুলে ধরে দেখতে লাগলো। পৃথিবীতে এত সুন্দর মুখ বুঝি আর দু'টি নেই!

কিসের যেন একটা আওয়াজ হ'লো।

কাছাকাছি কোন গাছের ডালে বোধ করি একটা রাত-চরা পাখী এসে বসলো।

ধ্যান ভেঙ্গে গেল রঞ্জনের।

না। চুপি চুপি চোরের মত আসবার মেয়ে নয় মালা।

বিজয়িনী সে আসবে তার গর্ব্বোদ্ধত মস্তক উন্নত ক'রে। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়বে তার বুকের ওপর। বলবে, তুমি আমার। কার সাধ্য তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়! এসেছ যখন, তোমাকে আর আমি ছেড়ে দেবো না।

এমনি করে সেই একই কথা নানা রকম করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলো রঞ্জন। দেখতে লাগলো তার বিচিত্ররূপিণী মালাকে।

মনোরমা মালা তার মনের দর্পণে ছায়া ফেলতে লাগলো বিচিত্র বর্ণে।

রঞ্জনের ক্লান্তবর্ষণ মনের আকাশে মনে হলো যেন রামধনু উঠেছে। বিমুগ্ধ-বিস্ময়ে সেই দিকে তাকিয়ে রইলো সে। মিলিয়ে যাবার আগে তাকে সে ধরবে হাত দিয়ে।

ক্লান্ত অবসন্ন তার বিনিদ্র চক্ষু দু'টি কখন কোন সময় যে আপনা থেকেই মুদ্রিত হয়ে গেছে তা সে বুঝতেও পারেনি।

ঘুম কি ছাই মালার চোখেও এসেছিল নাকি!

কত হাবিজাবি প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে মা তাকে জাগিয়ে রেখেছিল অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত।

দুঃসহ এক সর্ব্বনাশা চিন্তার ভার নেমে গেছে কাঞ্চনের মন থেকে। তার মন আজ লঘুপক্ষ বিহঙ্গমের মত—ছুটে চলে যেতে চায় শুধু সেই জায়গায়—যেখানে হয়ত কোন রুদ্ধদ্বার কারাকক্ষে তার যথাসর্ব্বস্ব—তার প্রাণসত্তা মুক্তি প্রতীক্ষায় দিন গুণছে।

—হাঁ রে মালা, এই কথা শুনলে তোর বাবা খুব খুশী হবে, না?

মালা জবাব দিলে না।

কাঞ্চন আবার বললে, চুপ করে রইলি কেন, বল্?

মালা তখনও চুপ করে আছে দেখে কাঞ্চন এক বার হাত বাড়িয়ে তার গায়ে হাত দিয়ে বললে, ঘুম পেয়েছে? আচ্ছা ঘুমো।

কিন্তু ঘুম তার সত্যিই পায়নি। চোখ বুজে চুপ করে সে শুয়ে শুয়ে ভাবছিল অন্য কথা। মা'র ওই একই প্রশ্নের জবাব আর কত দেবে?

বাবা তার খুশী হবে সে তো সবাই জানে। তা' ছাড়া যাকে নিয়ে এত আন্দোলন, সেই রঞ্জনই যখন ফিরে এসেছে তখন তার বাবাকে আর আটকে রাখবারও দরকার হবে না। ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। গ্রামের চারি দিকে যে অস্বস্তিকর উত্তেজনা চলছে তারও অবসান হয়ে যাবে চিরদিনের জন্য।

কিন্তু তার বাবা—সম্ভ্রান্ত বংশের এক নিরীহ ভদ্রলোক, এই যে বিনা কারণে চরম অপমান আর অবাঞ্ছিত লাঞ্ছনা ভোগ করলেন যার জন্য, যে তাকে তার সন্তানের হত্যাকারী বলে সন্দেহ করলে, সেই রঞ্জনের বাবাকে তিনি ক্ষমা করবেন কি না তাই-বা কে জানে!

কাঞ্চন ভাবলে, মালা ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু ঘুম তার চোখে এলো না। পাশের ঘরে শুয়ে আছে রঞ্জন। অনেক কথা তাকে বলবার ছিল। কিন্তু বলবে কেমন

করে? দুরন্ত লজ্জা এসে বাধা দিলে। বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারলে না।

যে-রঞ্জনকে একটি বার দেখবার জন্য মালা ছুটে যেতো মুখুজ্যে-পুকুরে, সেই রঞ্জন আজ তার হাতের কাছে। সে-ও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলো তার প্রেমাস্পদকে। তারও চোখে লেগেছে প্রেমের অঞ্জন। তারও মনের আকাশে উঠেছে ইন্দ্রধনু।

কখন যে রাত্রি প্রভাত হয়েছে, মা যে কখন বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে জানতেও পারেনি সে। জানলার পথে রৌদ্র এসে তার বিছানায় পড়েছে। রৌদ্রের তাপ গায়ে লাগতেই ধড়মড় করে উঠে বসেই মালা ডাকলে, মা!

কাঞ্চন স্নান করেছে এরই মধ্যে। চওড়া লাল পাড় শাড়ী পরে একপিঠ ভিজে চুল এলিয়ে দিয়ে পেছন ফিরে বোধ হয় চা করতে বসেছিল।

মালা তার কাছে এসে বললে, আমাকে তুলে দাওনি মা? কত বেলা হয়েছে বল দেখি?

কাঞ্চন বললে, তা হোক্ না, কি হয়েছে?

মালা বললে, ছি, ছি, লজ্জা করে না?

—যাকে লজ্জা করবি, সে ত্যাখগে এখনও ঘুমোচ্ছে।

মালা বললে, যাও! আমি যেন ওর কথা বলছি?

এই বলে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

স্নানের ঘরে যেতে হ'লে রঞ্জন যে-ঘরে শুয়েছিল, সেই ঘরের পাশ দিয়ে যেতে হয়। মালা যেতে যেতে থমকে থামলো খোলা জানালার পাশে। মনের অদম্য কৌতূহল চাপতে পারলে না। উঁকি মেরে দেখলে, রঞ্জন তখনও ঘুমুচ্ছে।

দোরের বাইরে ছিল তার মুখ ধোবার জল। মালার হঠাৎ কি যেন মনে হ'তেই সেইখান থেকে এক আঁজলা জল নিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালো, তার পর গরাদের ফাঁকে হাত বাড়িয়ে ছুঁড়ে মারলে রঞ্জনের দিকে।

গায়ে জলের ছিটে লাগতেই, রঞ্জন হাউমাউ করে উঠে বসলো।

মালা কিন্তু না হেসে থাকতে পারলে না।

মালার হাসির আওয়াজ কানে যেতেই রঞ্জন চমকে সেই দিকে ফিরে তাকালে, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলে না।

খাট থেকে নেমে রঞ্জন জানলার কাছে গেল। কেউ নেই সেখানে।

মালা পালিয়েছে।

এরকম ভাবে গায়ে জল ছিটিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হেসে ছুটে পালাবার মত মেয়ে আর কেউ তো নেই এ-বাড়ীতে! এ নিশ্চয়ই মালা ছাড়া আর কেউ নয়।

এতক্ষণ পরে রঞ্জনের মনে হলো যেন এখানে আসা তার সার্থক হয়েছে।

মুখ-হাত ধুয়ে রঞ্জন ঘরে গিয়ে বসতেই কাঞ্চন এলো চা নিয়ে।

—কিন্তু আপনি কেন মা?

—তাতে আর কি হয়েছে বাবা?

যে-কথাটা সে বলতে চায়, লজ্জায় সে-কথাটা বলবে না বলবে না ভেবেও শেষে নির্লজ্জের মত বলে বসলো, মালা কোথায়?

কাঞ্চন বললে, তোমার জন্যে খাবার তৈরি করছে দেখে এলাম।

রঞ্জন বললে, না না, এখন আমি কিছু খাব না। খাবার কি হবে?

ভাত খেতে অনেক বেলা হবে। কিছু না খেলে চলে? মালাই তো বললে, এখন শুধু এক পেয়ালা চা দিয়ে এসো। জল-খাবারের সঙ্গে আবার এক পেয়ালা চা দেবো।

রঞ্জন বললে, হ্যাঁ, চা আমি দু'বার খাই।

দেখি কি হ'লো? বলে কাঞ্চন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

এবার রঞ্জন ভেবেছিল কাঞ্চনের বদলে মালা আসবে তাকে খাবার দিতে। কিন্তু হায় রে অদৃষ্ট, মালা এবারও এলো না।

মালাকে পাঠাবার চেষ্টা কম করলে না কাঞ্চন। কিন্তু মালা কিছুতেই গেল না।

ওদিকে প্রতীক্ষার অন্ত নেই রঞ্জনের।

রাগ হতে লাগলো তার। এ কি রকম মেয়ে মালা! সকালে গায়ে জল ছিটিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারে, অথচ একটি বার কাছে এসে কথা বলতে পারে না?

দুপুরে খেতে গিয়ে রঞ্জন দেখলে, পরিপাটি ক'রে আসন বিছিয়ে জল গড়িয়ে ঠাঁই করে দিয়ে পালিয়েছে মালা। তার মনে হতে লাগলো—এই বাড়ীরই আনাচে-কানাচে কোথায় যেন সে লুকিয়ে রয়েছে, মনে হতে লাগলো—একজোড়া চোখ যেন সর্বদাই অন্তরাল থেকে তার দিকে স্থির নিবদ্ধ, অথচ কোথাও তাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

এই অস্বস্তিকর লুকোচুরি খেলা খুব যে মন্দ লাগছে তার, তা নয়।

খেলুক লুকোচুরি যত পারে, এর শাস্তি এক দিন সে পাবে।

আর একটা কথা তার মনে হতে লাগলো—তবে কি মালা এখনও তাকে সন্দেহ করে? এখনও কি সে ভাবছে—বিয়ে তাদের না-ও হ'তে পারে?

এই যে তার বাবার অমতে বিয়ের আগেই লুকিয়ে তাদের বাড়ীতে এসে বাস করা, এই যে বন্দীর মত একাকী চুপ করে বসে থাকা, এই যে বুড়োশিবের পরামর্শে বাড়ীর বাইরে না যাওয়া—এ-ও কি মালা দেখতে পাচ্ছে না? এতেও কি সে তার মনের কথা বুঝতে পারছে না?

রঞ্জনের এই ব্যাকুলতা কাঞ্চন বুঝতে পারলে। হাবে-ভাবে কথায়-বার্তায় রঞ্জনই তাকে বুঝিয়ে দিলে।

নিতান্ত ছেলেমানুষ! কাঞ্চন মুখ টিপে আপন মনেই একটু হাসলে। তার পর রঞ্জনকে খাইয়ে দিয়ে মা ও মেয়ে দু'জনে যখন একসঙ্গে খেতে বসলো, কথাটা সরাসরি মেয়ের কাছে পেড়ে বসতে চাইলে কাঞ্চন। কিন্তু কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করতে লাগলো। কথাটা তাই সে একটু ঘুরিয়ে বললে, কাল রাত্রে তোর শিবু জ্যেঠা সেই যে চলে গেল, এখনও তো কই এক বারটি এলো না?

মালা বললে, কি জানি মা, শিবু জ্যেঠা কি যে করে কিছু বুঝতে পারি না!

কাঞ্চন চুপ করে রইলো।

মালা নিজেই কথাটা পেড়ে বসলো। বললে, এই যে ওকে আমাদের বাড়ীতে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল, বলে গেল বাড়ী থেকে

বেরুতে পারবে না তুমি, আচ্ছা বলতো, কি দরকার ছিল এ সব করবার ?

কাঞ্চন বললে, কেন ? এতে খারাপটা কি হ'লো শুনি ?

খারাপ হ'লো না ?—মালা বললে, আমাদের বাড়ীতে এমন একটা লোক নেই যার সঙ্গে কথা বলতে পারে। একা একা বসে থাকতে ওর কষ্ট হচ্ছে না ?

কাঞ্চন বললে, তা নিজেও তো এক-আধ বার গিয়ে দু'টো কথা বলতে পারিস !

কথাটার জবাব দিলে না মালা। উঠে দাঁড়ালো।

কাঞ্চন জিজ্ঞাসা করলে, খাওয়া হয়ে গেল ?

হ্যাঁ। বলে মালা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

আমার কথাটার জবাব দিলি না যে ?

কথাটা মালা শুনেও শুনলে না।

ধন্যি মেয়ে বাবা !

কাঞ্চনও উঠলো। মালাকে ধরলে গিয়ে আঁচাবার জায়গায়।

—মুখুজ্যেপুকুরে যাবার জন্যে তো পাগল হয়ে উঠতিস, এখন আবার এ কি হ'লো তোর ?

মালা মুখ টিপে টিপে হাসছে।

—হাসছিস কেন ?

মালা বললে, হাসতেও পাব না ?

কাঞ্চন বললে, জানি না মা ! আমার হয়েছে এক মুস্কিল। এত দিন পরে ছেলেকে যদি-বা পেলাম, মেয়ে বিগড়ে বসলো।

কোনও জবাব না দিয়ে মালা চলে গেল সেখান থেকে। কাঞ্চন তার পিছু পিছু গেল।

ও মা ! এ কি ? মালা ঢুকলো গিয়ে রঞ্জনের ঘরে।

[ক্রমশঃ।

আলিপুর জেলে বাসকালে আহ্বান

(শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ লিখিত "*Invitation*" কবিতার ভাবানুবৃত্তি)

প্রভঞ্জন অশনি হুঙ্কার চারি দিকে আসিয়াছে ঘেরি,
বিশাল প্রান্তর অতিক্রমি' আরোহিব পর্ব্বত উপরি।
কে আসিবে মোর সাথে আজ, কে চলিবে মোর পায় পায়,
বক্ষে ভেদি' খর স্রোতস্বিনী নাহি টলি' তুষার-ধারায়।

নগরের প্রান্তরেখা মাঝে ক্ষুদ্র, হীন, সীমার বন্ধনে,
শতেক দুয়ার দিয়ে ঘেরা নাহি রহি' প্রাচীর-বেষ্টনে।
ঊর্দ্ধে মম অনন্ত আকাশ, বিশ্বদেব অসীম সুনীল,
বিকট বিদ্রোহে সদা নাচে মোরে ঘেরি' প্রমত্ত অনিল।

দূরে হেথা আলয়ে আবার নির্জ্জনতা সাথে আমি খেলি
বিপদ ও দুঃখ দুঃসাহসে বরণ করিছে বন্ধু বলি।
কে চাহে গো মুক্তির জীবন কে বাঁচিবে স্বাধীন সমীরে ?
ঊর্দ্ধে হেথা এস তবে চলি, ঝটিকাপ্রহত গিরি-শিরে।

ঝঞ্ঝা-বায়ু আমি তার রাণী শৈলমালা সেবক আমার,
আমিই তো স্বাধীনতা-দেবী প্রাণময়ী মূর্ত্তি গরিমার।
লভি প্রাণ আমার সম্পদে, যে রহিবে পার্শ্বে মোর ঘেরি',
নববলে বাঁধিয়া হৃদয় বিপদেরে লইবে সে বরি'।

অনুবাদক—শ্রীসন্তোষকুমার বসু।

অঘোর প্রকাশ

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবনকাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

একাকিনী

বর্দ্ধমান হইতে ফিরিয়া একাকিনী আসিয়া কত কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে দেশের বাটীতে পড়িয়া ছিলে। তারপর এত কষ্টের পুরস্কারস্বরূপ একটু সুখের দিন দেখিয়াছিলে। হরিনাভিতে আমার সঙ্গে ও ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে আনন্দে কয়েক দিন কাটিয়া গেল। আমি মতিহারী চলিলাম, তোমাকে আবার আমার সঙ্গছাড়া হইতে হইল। এবারকার পরীক্ষা আরও সুদীর্ঘ ; এক বৎসর কাল একাকীত্বে কাটিয়া গেল। দেবি, এ এক বৎসর তুমি যে কষ্টে কাটাইয়াছ, তাহা স্মরণ করিয়া এখনও চক্ষে জল আসে। অথবা এই সময় হইতে তোমার ও আমার আত্মা পরীক্ষার অনলে শুদ্ধ হইতে চলিল। তুমি এ সময়ে নিজেও তোমার পত্রে তাহা স্বীকার করিয়াছ। প্রথম প্রথম মনে করিয়াছিলাম যে কয়েক দিন পরই আমি তোমাকে মতিহারী লইয়া যাইতে পারিব। কিন্তু সেখানকার কাজটি দুর্ভিক্ষের কাজ। স্থায়ী হয় কি না কিছু স্থির ছিল না ; তাই তোমাকে লইয়া যাওয়া হইল না। তোমাকে দেশের বাটীতে পাঠাইয়া দিবার কথা হইল। সেজ দাদাই তখন বাড়ীর কর্ত্তা। তাঁহার কাছে অনেক কাকুতি-মিনতি করিয়া তুমি কলিকাতার বাসায় দু'দিন রহিলে। কারণ, পল্লীগ্রামে চলিয়া গেলে আর শীঘ্র আসা হইবে না ; আমার কাছে যাইবার যে ক্ষীণ আশাটুকু, তাহা তখনও নির্ব্বাণ হয় নাই। কিন্তু সে দু'দিন ফুরাইয়া গেল, তারপর ভবানীপুরে তোমার পিসামহাশয়ের বাটীতে গিয়া কিছুদিন থাকিবার অনুমতি ভিক্ষা করিলে। বিরক্তি মিশ্রিত সম্মতি পাইলে। পিসামহাশয়ের বাটীতে গিয়াও কিছুকাল ছিলে, কিন্তু অবশেষে সেই দেশের বাটীতেই যাইতে হইল।

দেবি, এ সময়ে তুমি যে পত্রগুলি লিখিয়াছিলে তাহা পড়িয়া মন এখনও কাতর হইয়া উঠে। ৫ই এপ্রিল ১৮৭৪ লিখিয়াছিলে —"তোমার পত্র পাইলাম। তুমি কোথায়? আমাকে ফেলে তুমি কোথায় গেলে? আমি যে অন্ধকার দেখছি। আমার যে আর কেহ নাই। তুমি কই"?—এইরূপ কাতরোক্তিতেই পত্রখানি পরিপূর্ণ। তোমার মন তখন এমন একাকী হইয়া পড়িয়াছে যে, পত্রে প্রবোধ মানিত না। আমার পত্রগুলি পাঠ করিয়া দর্শনের পিপাসা আরও বাড়িয়া যাইত। আগুনে ঘৃত ঢালিলে কি তাহা নির্ব্বাণ হয়? তখন তো তুমি কেবল শরীরই জানিতে। আত্মাকে তখনও চিনিতে শেখ নাই। তোমার দোষ ছিল না। এ সেবকই তখনও শরীরের জন্য ব্যস্ত ছিল। তুমি তো কিছু উচ্চ শিক্ষা পাও নাই। আমার নিজেরও তখন ধর্ম্মবল কিছু ছিল না। বিদেশে ধর্ম্মবন্ধুহীন হইয়া আমিও অন্ধকারে বেড়াইতেছিলাম। ঐ পত্রে তুমি লিখিয়াছিলে, "সর্ব্বদা ঈশ্বরকে ডাকিও···যেন একটুও ভুলিও না"। আমার সেই অবস্থায় তোমার এরূপ এক একটি কথা আমার কত যে উপকার করিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। তুমি আবার জিজ্ঞাসা করিলে, "মতিহারী জায়গা কেমন, বন্ধু কেমন? সমাজ আছে কি না? ধর্ম্মবন্ধু আছেন কি না? তোমাকে শিবনাথ বাবুর মত কেহ স্নেহ করিবার লোক আছেন কি না, শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়। তোমার যে কষ্ট হইবে সমুদায় আমাকে দিও ; আমি তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব"। এমন করিয়া আমার মনের সকল ভারের অংশ না লইলে, আমার আত্মার কল্যাণের সং... না লইলে সে সময় আমি কোথায় থাকিতাম? দেবি, তখন তুমিও অনেক নিম্নভূমিতে ছিলে, আমিও অনেক নীচে ছিলাম। শরীরের বিচ্ছেদে উভয়েই কাতর হইতেছিলাম। কিন্তু ভগবান দেখাইলেন যে পরস্পরের ভালবাসা ও সহানুভূতির গুণে দুটি নিম্নস্তরবাসী আত্মাও পরস্পরের কত সাহায্য করিতে পারে।

শ্রীপুরের বাটী গিয়া তোমার সেই পুরাতন জীবন আবার আরম্ভ হইল। প্রতিদিন সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, দুটি কন্যা পালন, তাহাদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ও সঙ্গে সঙ্গে অবসর পাইলে নিজেও একটু পড়া, ও আমাকে পত্র লেখা এই তোমার দৈনিক জীবন ছিল। এ সময় ধানভানার দিন পড়িল, তাহাতে অত্যন্ত অধিক সময় যাইত, ও পরিশ্রম হইত। কত দিন এমন হইয়াছে যে আমার পত্র আসিয়াছে, তখন ধান ভানিবার ঘরে কাজে ব্যস্ত রহিয়াছ, পত্র পাঠের ঔৎসুক্যে বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছে, কিন্তু পত্র পড়িতে পাও নাই ; সমুদয় কার্য্য শেষ করিয়া তবে পত্রের দিকে মন দিয়াছ। কত কষ্ট ও অসুবিধা ছিল, তবুও পত্র লিখিতে ছাড়িতে না। প্রায়ই তিন চারি পৃষ্ঠার পত্র আসিত।

তোমার মনের কষ্টের আর একটি কারণ হইয়াছিল। প্রয়োজন হইলে তোমাকে শ্বশুরালয়ে আনা হইত, আবার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলেই কিম্বা শ্বশুরালয়ে থাকিবার অসুবিধা হইলেই, বাপের বাটী পাঠান হইত। একবার এইরূপে পিত্রালয়ে বাস করিতেছিলে ; হঠাৎ শ্বশুরালয়ে আসিবার আদেশ হইল। তখন তোমার পিত্রালয়ে কেবল তোমার মাতা ও দাদা ছিলেন। সেদিন একাদশী, মাতাকে একা ফেলিয়া আসিতে তোমার কষ্ট হইতে লাগিল। আর তখনও তোমার দাদার আহার হয় নাই ; তুমি একবেলা পরে যাইবার অনুমতি ভিক্ষা করিয়া পাঠাইলে। শ্বশুরালয় হইতে উত্তর আসিল, "না, এখনই আসিতে হইবে।" ইহাতে তোমার মাতা ও তুমি বড় ক্লেশ পাইয়াছিলে। তোমার মাতা দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমার কন্যা কিম্বা বধূ কাহারও দ্বারা আমার উপকার হয় না।" তোমার মাতার এই কথাটুকুর জন্যও তোমাকে শ্বশুরালয়ে অনেক অপ্রিয় বচন শুনিতে হইয়াছিল।

পরিবারের এইরূপ ব্যবহারে যখন কষ্ট পাইতে, সেই সময়ই আবার আমার ধর্ম্মবন্ধুদের পত্র ও সময়োচিত অর্থসাহায্য পাইয়া তোমার ম

বিস্ময়াপন্ন ও কৃতজ্ঞ হইত। বাস্তবিক, তুমি ও আমি সে সময়ে অমন বন্ধু না পাইলে আমাদের জীবন কত দুঃখময় হইত। তুমি এই হইতে বুঝিতে পারিয়াছিলে যে দুঃখীর কাছে সহানুভূতির মূল্য কত; সেইজন্য নিজেও সেই সহানুভূতি চিরদিন অন্যকে দিয়া আসিয়াছ।

এই সময়ে সেজদাদা মহাশয় আসামের একজন বড় জমিদারের দেওয়ান হইয়া গৌহাটী গেলেন। আমাকেও কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেখানে গিয়া কাজ লইতে বলিলেন। আমার ভাল লাগিল না। হাজার কেন টাকা হউক না, যেখানে ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া কাজ করিবার সম্ভাবনা নাই, সেখানে আমার প্রাণ থাকিতে চাহিল না। দাদাকে লিখিলাম, আমার আসাম যাওয়া হইবে না। ইহাতে বাটীর সকলেই অসন্তুষ্ট হইলেন। ভগবানের ইচ্ছায় এই সময় আমার মতিহারীর কাজটি পাকা হইল। তোমাদের মতিহারী আসিতে পত্র লিখিলাম, কে সঙ্গে করিয়া আনিবে? একজন বন্ধু আমার সঙ্গে একত্র কার্য্য করিতেন, তিনি পরিবার আনিতে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। তাঁহাকেই বলিয়া দিলাম, আমারও পরিবার কেদারের বাসা হইতে লইয়া আসিও। দেশের বাটী হইতে ভ্রাতৃ-জামাতা শ্রীমান রামলাল দত্ত তোমাদের কলিকাতায় কেদারের বাসায় পৌঁছিয়া দিলেন। কেদার ও কেদারের স্ত্রী তোমার প্রতি যে ভাল ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা কখনও ভুলিব না। তুমি একে অশিক্ষিতা বঙ্গনারী, বিদেশে কখন যাওয়া অভ্যাস নাই, তাহাতে অপরিচিত লোকের সঙ্গে আসিবে, বয়ঃক্রম তখন ১৯ বৎসর বই নয়; মা ভাই বোন ও যত পরিচিত বন্ধু সকলকেই ছাড়িয়া আসিতে হইতেছে; সুতরাং কেদারের দয়া ও আদর তোমার অত্যন্ত মিষ্ট লাগিয়াছিল; আমিও কৃতার্থ হইয়াছিলাম। সেই সময়েই কেদার তোমার মহত্ত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পত্রে লিখিয়াছিলেন, "প্রকাশ, তুমি জান না অঘোর কি রত্ন!"

এইরূপে ১৮৭৫ সালে তুমি তোমার দুই কন্যা, আমার ভাইজি বসন্ত ও ভাইজি-জামাই রামলাল দত্তকে লইয়া মতিহারী পৌঁছিলে। আবার তুমি একটি সংসারের সমুদয় ভার গ্রহণ করিলে।

দ্বিতীয় খণ্ড—গৃহিণী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মতিহারীতে প্রথম বার

মতিহারীতে আমার মাসিক আয় ছিল ৮০৲ টাকা। তাহা হইতে মাসে ৩০৲ টাকা দেশে মার নিকটে পাঠাইতে হইত। বাকী ৫০৲ টাকায় বিদেশে অত বড় সংসার চালান কঠিন; কিন্তু দেখিলাম, তুমি বেশ গুছাইয়া চলিতে লাগিলে। টানাটানি বলিয়া কখনও ক্ষুণ্ণ হও নাই। শেষ মাসে প্রায়ই টাকা হাতে থাকিত না, কিন্তু তুমি একবারও মুখ মলিন করিতে না।

এইবার আমরা ব্রাহ্ম-পরিবারের মত জীবন যাপন করিতে লাগিলাম। ১৮৭৬ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে নিত্য পারিবারিক উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলাম। নিজ বাটীতেই সমাজ স্থাপন করা হইল। নারীদের সহিত জুটিয়া তুমি সামাজিক উপাসনায় যোগদান করিতে। সমাজ কাহাকে বলে তাহা বুঝিলে। পরের জন্য চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলে। এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গে বড় ঝড় হইয়া অনেক লোক মারা যায় ও লোকের অন্নকষ্ট হয়। সে বিষয়ে আচার্য্য কেশবচন্দ্র কলিকাতার মন্দিরে হৃদয়ভেদী আবেদন করেন। মতিহারীর সমাজে ১৮৭৭ সালের ১ই সেপ্টেম্বর সামাজিক উপাসনার পরে পাঠ করি। তুমি আবেদন শুনিবামাত্র তোমার হাতের বাজু দিতে প্রস্তুত হইলে। রাত্রে আমি গৃহে আসিলে তুমি যে কি স্বর্গীয় ভাবে পূর্ণ হইয়া আমার সঙ্গে কথা বলিলে, তাহা ভুলিবার নয়। তোমার বাপের বাটীর বাজু, আমি দিই নাই, তাহা দান করিবার জন্য আমার নিকট বিনয় করিবার প্রয়োজন কি ছিল? এ সময় তুমি বুঝিয়াছিলে তোমার ও আমার ধনে প্রভেদ নাই। পাছে কোন অন্যায় দান করিয়া ফেল, এই আশঙ্কা। বাজুর দাম সাহায্য-ফণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া গেল। আমি দেখিতে লাগিলাম, ও দেখিয়া দেখিয়া দেবতার কাছে কৃতজ্ঞ হইতে লাগিলাম, যে আমার প্রিয় ধর্ম্ম তোমারও জীবনকে অধিকার করিতেছে।

কত ঔৎসুক্যের সঙ্গে আমি এ সময়ে তোমার চরিত্রের বিকাশ, কার্য্যদক্ষতার বিকাশ, হৃদয়ের বিকাশ লক্ষ্য করিতাম! এমন করিয়া তুমি ও আমি আর তো কখন সংসার করি নাই? তাই প্রতিদিন আমাদের দু'জনারই কত শিক্ষা লাভ হইতে লাগিল। পিত্রালয়ে থাকিতে তুমি কাপড় সম্বন্ধে খুব পরিপাটী ছিলে। দেশী ধুতি না হইলে তোমার মন উঠিত না। কলিকাতায় আসিবার পর প্রথমে ছোপান সাড়ী, তারপরে বিলাতী ধুতি আনিয়া দিতাম। মতিহারীতে আসিয়া বিলাতী ধুতিও জুটিত না। থান ক্রয় করিয়া তাহাতে নীলের ছোপ দিয়া সাড়ী করিয়া লইতে এবং সেই অপূর্ব্ব পাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করিলে তোমাকে বড়ই ভাল দেখাইত। এইরূপে বস্ত্রের তারতম্য অগ্রাহ্য করিতে লাগিলে। ইহার পরিণাম এই হইল যে, অবশেষে বেহারের "মুটীয়া", যাহা সে দেশীয় দুঃখীরা ব্যতীত আর কেহই পারে না, তাহাই আদরের সহিত পরিধান করিতে। ঐ কাপড় পরিয়া বড় বড় স্থানে যাইতেও কুণ্ঠিত হইতে না। মতিহারীতে তোমার নিজের হাতে টাকা হইল, কিন্তু অলঙ্কার প্রস্তুত করিলে না। অলঙ্কারের জন্য একদিনও আমাকে বিরক্ত কর নাই। প্রথম প্রথম শাঁখা পরিধান করিতে, শেষে চুড়ি পরিতে, কিন্তু জীবনের শেষ কয় বৎসর শূন্য হস্তেই থাকিতে। হাতে "নোয়া" না থাকিলে স্বামীর অকল্যাণ হয়, এ কুসংস্কার তোমার ছিল না। কোন শ্রদ্ধেয়া ব্রাহ্মিকার হাতের নোয়া তুমি খোয়াইয়াছিলে এবং ব্রাহ্মিকাদের মধ্যে যিনি "নোয়া" পরিতেন তুমি তাঁহাকে কতই তিরস্কার করিতে!

এই সময়ে এক দিন একটি ফুলকপি পাইয়াছিলে। তখন মতিহারী পর্য্যন্ত রেল হয় নাই; সে দেশে কপি জন্মিত না, অন্য স্থান হইতেও সহজে আসিত না। পাটনা হইতে এক জন বন্ধু ঐ ফুলকপি উপহার দিয়েছিলেন। আমি তোমাকে বলিলাম, এ কপি সকলকে ভাগ করিয়া দাও। প্রেম যে অল্প বস্তু উপহার দিতে সঙ্কুচিত হয় না, তখনও তুমি তাহা জানিতে না। তাই তুমি প্রথম বলিয়াছিলে, "ছোট কপি, পাঁচ জনার বাড়ীতে দিলে তারাই বা কি খাইবে আমরাই বা কি খাইব?" অবশেষে সেই

কপিটুকু টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া সকলকে বিলাইলে। বুঝিলে যে যেখানে আত্মীয়তা আছে, সেখানে অল্প সামগ্রী উপহার দিলেও সেই আত্মীয়তা বৃদ্ধি হয়। ইহার পর হইতে দেখিতাম, তুমি গৃহের সামান্য সামান্য ভাল বস্তুও সকলকে একটু একটু করিয়া না দিয়া গ্রহণ করিতে না। ক্রমে ক্রমে তোমার দিবার প্রবৃত্তি তোমার ক্ষুদ্র দানশক্তিকে অনেক অতিক্রম করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

মতিহারীতে ৫ই মে ১৮৭৬ তোমার প্রথম পুত্র সুবোধচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। পুত্র সন্তান হইল বলিয়া আমার মাতার কতই আনন্দ! লক্ষণ সব ভালই বোধ হইতেছিল, তবুও ডাক্তার ডাকিয়া আনিয়াছিলাম। মা বলিলেন, আমি সূতিকাগৃহের নিকটে থাকিলে প্রসূতির যন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইবে, এ দিকে বাড়ীতে ঘরও বেশী নাই, তাই আমি নিমবৃক্ষের তলে দাঁড়াইয়াছিলাম। তখন সন্ধ্যা কাল। পুত্র সন্তান হইয়াছে শুনিয়া আমার মস্তক কৃতজ্ঞতায় অবনত হইল। কোথায় আনন্দে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিব, তাহা না করিয়া রোদন করিতে লাগিলাম। আমার দায়িত্ব কত বাড়িয়া গেল! পুত্র সন্তানকে শিক্ষা দেওয়া, ধর্মে জ্ঞানে, প্রেমে বর্দ্ধিত করা এক দুরূহ ব্যাপার মনে হইতে লাগিল। তোমার অগোচরে একাকী ক্রন্দন করিয়া প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। প্রথম দুই সন্তানের জন্মের সময়ে যেরূপ বিঘটন ঘটিয়াছিল এবার সেরূপ কিছুই ঘটিল না।

আমরা মতিহারী থাকিতেই বন্ধু—বাবুর জীবনে পরিবর্তন আরম্ভ হইল। তিনি সুরাপান পরিত্যাগ করিলেন। কিন্তু অনেক দিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করিয়া শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল, লিভার ফুলিল। অবশেষে ছুটী লইয়া তাঁহাকে বায়ু পরিবর্তনের জন্য অন্যত্র যাইতে হইল। তাঁহার নিরাশ্রয়া পত্নী তোমার নিকটে আশ্রয় লাভ করিলেন। তাঁহাকে তুমি আপনার সহোদরার মত আদরে গ্রহণ করিলে। তোমার বাটীতে তিনটি মাত্র ঘর; তাহার একটি রাম ও বসন্তের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছিলে। স্থানের টানাটানি সত্ত্বেও আর একটি ঘর ইঁহাদিগকে ছাড়িয়া দিলে। আহারাদির জন্য স্বতন্ত্র ঘর রহিল না। এ অসুবিধাকে তুমি অসুবিধা জ্ঞান করিলে না। শুধু তাহাই নহে; টানাটানির সংসারে অম্লান বদনে ইঁহাদিগের ভরণ-পোষণের সমুদয় ভার নিজ মস্তকে লইলে। যথাসাধ্য 'তন্ মন্ ধন্' দিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলে।

ইহার তিন মাস পরে যখন সেই বন্ধু ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহার নবজীবন লাভ হইয়াছে। পূর্ব্বের মত তাঁহাকে দেখিয়া আর ভয় করিত না। একত্রে উপাসনা, একত্রে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। মতিহারীতে যেন একটা নূতন যুগ উপস্থিত হইল। ক্রমে তিনি যজ্ঞোপবীত পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিলেন। নগরে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। আমরা এখন ৪।৫ জন ব্রাহ্ম হইলাম। ইহার কিছুকাল পরে শ্রদ্ধেয় সাধু অঘোরনাথ এখানে আসিলেন। কত উপদেশ, কত নাম সঙ্কীর্ত্তন হইল। তিনি পদ্মবনে গিয়া যোগে মগ্ন হইতেন, দেখিয়া আমরা মুগ্ধ হইতাম। আমরা সাধন ভজন কি করি, কি না করি, তিনি সমুদয় জিজ্ঞাসা করিতেন। আমাদের পরিত্রাণের জন্য ব্যাকুল হইয়া এমন করিয়া আর বোধ হয় কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না। পুত্র সুবোধের নামকরণ অনুষ্ঠান তিনিই করিলেন। এই নামকরণ, এবং—বাবুর, তাঁহার স্ত্রীর, তোমার, ও বসন্তের দীক্ষা এবং মতিহারী সমাজের উৎসব একবারে হওয়াতে একটা ভারী তুমুল ব্যাপার উপস্থিত হইল।

এই সময় সাধু অঘোরনাথ প্রত্যহ দুই বার স্নান করিতেন। সন্ধ্যার সময় স্নানান্তে যোগে বসিতেন। তারপর নামগান করিতেন। অতিশয় মিষ্ট লাগিত। আহার করিয়া কত ভাল ভাল কথা কহিতেন। একদিন তাঁহার একজন বন্ধুর বিষয়ে বলিলেন, যে এমনি তাহার দুর্দ্দশা যে পত্নীর নিকটে ভিন্ন তাহার নিদ্রাই হয় না। আরও বলিলেন যে অনাসক্ত না হইলে পরিত্রাণ নাই। যে রাত্রে সাধুর মুখে এই সংবাদ শুনিলাম, সেই রাত্রেই নিজকে পরীক্ষা করিয়া দেখিব, ভাবিলাম। আপনার শয্যা সাধুর নিকটে করিতে আদেশ দিলাম। তোমার তাহাতে আপত্তি হইল না। এমনি অভ্যাসের গুণ, দেখিলাম সাধু অকাতরে নিদ্রা গেলেন, কিন্তু আমার নিদ্রা হইল না। সেখান হইতে পলায়ন করিয়া তোমার ঘরে গেলাম, তবে নিদ্রা হইল। আপনার দুর্ব্বলতা বুঝিলাম। তোমার সঙ্গে কত পরামর্শই করিলাম। কিসে এ আসক্তি চলিয়া যায় তাহার জন্য কত চেষ্টাই আরম্ভ হইল। এই যে সাধন আরম্ভ হইল, ক্রমে এ পথে গিয়া কত সঙ্কল্প করিতে হইয়াছে ও আবার কতবার পতন হইয়াছে সকলই তুমি অবগত আছ। তোমার সহায়তা ভিন্ন আমি এ দুর্গম পথে একাকী কখনই চলিতে পারিতাম না।

কয়েক মাস পরে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী বসন্ত প্রসূতি হইলেন। তাঁহার ঘরে একটি ঘটীর প্রয়োজন হইল। বাটীতে একটি মাত্র ঘটী ছিল, সেই ঘটীর জন্য বসন্ত তোমাকে কিছু শক্ত কথা বলিলেন। তুমিও প্রত্যুত্তর দিলে। আমি শুনিবামাত্র তোমাকে বলিলাম, তুমি বসন্তের পায়ে ধরিয়া তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তুমি বয়সে ও সম্পর্কে বড়, এবং তোমার দোষও ছিল না, তাই তুমি প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলে, কিন্তু ভালবাসার খাতিরে তুমি আত্মমর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইলে। সেই দিন আপনাকে জয় করিতে তোমার অনেক কষ্ট হইয়াছিল। ভবিষ্যতে আমাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলে— "সেই দিন যে কি কষ্টে ক্ষমা চাহিয়াছিলাম তাহা অন্তর্যামী জানেন, আর তুমি জান।" আমি তোমার আত্মজয় দেখিয়া ধন্যবাদ দিলাম। এই যে ত্রুটি-স্থলে অবনত হইতে শিখিলে পরবর্তী জীবনে এই শিক্ষা কখনও বিস্মৃত হও নাই।

মতিহারীর যে বাড়ীটিতে আমরা ছিলাম, অনেক দিন তাহার সংস্কার হয় নাই বলিয়া অন্য বাড়ীতে উঠিয়া যাইতে বাধ্য হইলাম। তোমার চরিত্রের আকর্ষণ এই সময় হইতে অনুভূত হইতেছিল। তাই যখন নূতন বাড়ীতে যাইব ঠিক হইল, অমনি বন্ধু—বাবুও বলিলেন, আমাদের সঙ্গে থাকিবেন। এ বাড়ীর ভিতরে তিনটি ঘর, বাহিরে একটি ঘর। সকলের অপেক্ষা অধম ঘরটিই তোমার ভাগ্যে পড়িল। সকলে আপনার ঘর পছন্দ করিয়া লইলেন; শেষ যাহা থাকিল তাহাই তোমার রহিল। সে ঘরে বায়ুর গতিবিধি নাই, পাইখানার নিকটবর্ত্তী, তবুও তুমি একদিনও অসুখী হও নাই। এই সময় আবার আমার সেজদাদা মহাশয় নিরাশ্রয় হইয়া আমাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। বাহিরের ঘরটিতে তিনি রহিলেন। বাড়ীটি যেন টলমল

করিতে লাগিল। সুখের বিষয় যে, তখন প্রতিদিন সকলে একত্র উপাসনা করিয়া বড়ই তৃপ্ত হইতাম। কিছুদিন পরে আমি পাটনার আবগারী ইন্‌স্পেক্টার পদে বদলী হইলাম। তোমাকে মতিহারীতেই রাখিয়া আমি বাঁকিপুরে চলিয়া গেলাম।

আমার চলিয়া যাইবার পর মতিহারীর উৎসব উপস্থিত হইল। কিন্তু বাড়ীতে আমার দাদা রহিয়াছেন। তাঁহার মত ছিল না যে তুমি উৎসবে যাও। এদিকে উৎসবও অন্য বাড়ীতে (উমাচরণ বাবুর বাড়ীতে) হইবে। তুমি ধর্ম্মের আহ্বানে আর স্থির থাকিতে পারিলে না। কয়েক দিন উৎসবের পর যখন বাড়ী ফিরিয়া গেলে, তখন নিজের বাটীতে নিজেই একঘরে হইলে। তোমার সঙ্গিনী বসন্তও তোমার সঙ্গে একঘরে হইলেন। সকলের আহারাদি হইলে তোমরা দু'জনে নিজের অন্ন নিজে প্রস্তুত করিয়া আহার করিতে। কেবল আমার উৎসাহ, আমার প্রার্থনা এবং সান্ত্বনা তোমাকে উচ্চ করিয়া দিত। তুমিও প্রতিদানে অবহেলা করিতে না। এ মিলনের পূর্ব্বাভাস মাত্র।

ইহার কয়েক দিন পরে মতিহারীর বাস তুলিয়া দিতে হইল। তোমাকে আবার দেশে যাইতে হইল। দেশে গিয়া সকলই পীড়িত হইলে। বিশেষতঃ সুবোধ রক্তামাশয়ে কষ্ট পাইতে লাগিলেন। তাই অনন্যোপায় হইয়া তোমাদিগকে বাঁকিপুরে আনিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বাঁকিপুরে প্রথম বার

আমার বাঁকিপুরে আগমনের প্রায় এক বৎসর পরে আবার মতিহারীর উৎসব উপস্থিত হইল। সুবোধচন্দ্র তখনও ভুগিতেছেন। উৎসবেও থাকা হইবে, ও বায়ু পরিবর্ত্তনও হইবে, এইজন্য চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে উঁহাকে লইয়া মতিহারী চলিলাম। সেখানে গিয়া প্রথম প্রথম উঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইল। একমাত্র পুত্রসন্তান, অতি আদরের ধন; মনে হইল তাঁহাকে বুঝি বাঁচাইতে পারা যাইবে না। একদিন নাড়ী আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছিল না। আমি তোমাকে ডাকিয়া আনিয়া তোমার সঙ্গে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা বিষয়ে কথা কহিতে লাগিলাম। দেখিলাম, তোমার ধৈর্য্য ও নির্ভর আমা অপেক্ষা অধিক। এমন স্থিরচিত্তে, তত্ত্বজ্ঞানীর মত কথা কহিলে যে শুনিয়া আমি অবাক হইলাম। বুঝিলাম, আমরা দুজনে ভগবানের সকল বিধিকেই চিরদিন অবনত মস্তকে গ্রহণ করিতে পারিব।

চিকিৎসা করিতে করিতে ক্রমে সুবোধ ভাল হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তুমি শয্যাগত হইলে। চিকিৎসক বলিলেন, উদরে গুল্ম রোগ হইয়াছে। অতি কষ্টে তোমাকে মতিহারী হইতে বাঁকিপুরে ফিরাইয়া আনিলাম। বাঁকিপুরের ডাক্তারেরা কলিকাতা লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। কলিকাতার কয়েক জন ডাক্তারের চিকিৎসার পর কবিরাজ দেখান হইল। দুই জন কবিরাজ দেখিয়া বলিলেন, রক্তজ গুল্ম হইয়াছে, বিশেষ চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হইবে। বুঝিলাম রোগ সহজ নয়। তখন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের চিকিৎসা হইতে লাগিল। তিনি সপ্তাহে সপ্তাহে ভবানীপুরে আসিতেন ও চিকিৎসা করিতেন। কিন্তু কিছুই উপকার হইল না। পূজার ছুটীতে আমি তোমাকে দেখিতে গেলাম। এমন রোগা তোমাকে কখনও দেখি নাই। এ অবস্থায়ও তুমি আমার সেবা করিবার জন্য ব্যস্ত হইতে দেখিয়া আমার চক্ষে জল আসিত। ভবানীপুরে থাকিয়া চিকিৎসা ভাল হইত না বলিয়া বন্ধু ফণী কলিকাতায় তোমার জন্য বাসা ভাড়া লইলেন। বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার সময় আমি নিজে একদিন গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন, রোগ "অষ্ঠিলা" আরোগ্য হইবার নহে। চেষ্টা করিয়া খাড়া করিয়া দিব, কিন্তু আরোগ্য হইবে না। তখনকার আমার মনের অবস্থা তুমিই বুঝিতে পারিবে। এদিকে আমার ছুটী ফুরাইল। আমাকে বাঁকিপুর চলিয়া আসিতে হইবে। ভারাক্রান্ত মনের সাধু অঘোরনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনিও তোমাকে দেখিতে আসিলেন। দেখিয়া বলিলেন, অনেক টাকা ব্যয় হইয়াছে, আরও কিছু ব্যয় করিয়া সাহেব ডাক্তার দেখান; নইলে ক্ষোভ থাকিবে। আমার আর ছুটী ছিল; বন্ধু ফণীকে বলিলাম, ডাক্তার চার্লস্ সাহেবকে দেখাইও। আমি যে দিন বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাইব তাহার পূর্ব্বরাত্রে তুমি আমি দুজনেই ক্রন্দন করিলাম। এ জীবনে এমন ক্রন্দন করিয়াছি কি না মনে নাই।

চিকিৎসার কিছু ফলও হইতেছে না, চিকিৎসকগণও একমত হইতেছেন না। ডাক্তার মহাশয় বলিলেন, তোমার 'টিউমার' হইয়াছে। অবশেষে সুবিজ্ঞ চারলস্ সাহেব আসিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, কোনও রোগ নয়, উদরে ছয় মাসের সন্তান আছে। শুনিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইলেন। এত ডাক্তার, এত কবিরাজ কেহই ত সন্তানের কথা উল্লেখও করেন নাই!—মহাশয় তবুও বলিতে লাগিলেন, সন্তানও আছে, টিউমারও হইয়াছে। ডাক্তার চারলস্ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে তোমাকে বাঁকিপুরে লইয়া যাইতে পারা যায় কি না। তিনি বলিলেন, কোনও রোগ নাই, কাজেই লইয়া যাইতেও কোন দোষ নাই; শ্রীযুক্ত কেদারনাথ রায় তখন বাঁকিপুরে মুনসেফ ছিলেন। তাঁহার পত্নী স্বর্গীয়া সৌদামিনী দেবী তোমাকে তাঁহার বাটীতে আসিয়া থাকিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ১৮৭৯ সালের শেষে বাঁকিপুরে প্রত্যাগমন করিলে ও সৌদামিনী দেবীর সহিত একত্রে বাস করিতে লাগিলে। দুই বৎসর কাল তোমরা একত্রে ছিলে। কোনও দুই বঙ্গনারীর মধ্যে এমন সদ্ভাব আমি দেখি নাই। তিনি বিদ্যাবতী, তুমি নিরক্ষরা বলিলেই হয়। তিনি ভাবী জজপত্নী, তুমি দুঃখিনী আবগারী ইন্‌স্পেক্টারের স্ত্রী মাত্র, কিন্তু আত্মা দুজনেরই আশ্চর্য্য ভাবে উন্নত। দুজনেরই সন্তানাদি ছিল, কিন্তু সন্তান লইয়া কিম্বা অন্য কোন বিষয় লইয়া দুজনার মধ্যে মনোমালিন্য কখনও দেখি নাই। দুই জনারই ভগবানে মতি, ভাবান্তর হইবে কেন? একটিমাত্র ঘরে তোমার ভাঁড়ার, শয়ন, উপাসনা সকলই হইত। কিন্তু তুমি বড়ই সুখে থাকিতে। একদিন আমি কার্য্যোপলক্ষে সীতামারী গিয়াছি, এমন সময়ে তোমার দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইলেন। মিষ্টার রায় ও তাঁহার স্ত্রী এই সময় তোমার যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে না থাকিলে তোমাকে অনেক কষ্ট পাইতে হইত। সন্তান হইল, টিউমার, অষ্ঠিলা, রক্তজ গুল্ম, কিছুরই চিহ্ন দেখা গেল না। প্রথমে কিছুই বোঝা যায় না, শেষে এইরূপই হয়। ভগবানের গুণানুকীর্ত্তনে আমরা সকলেই তৃপ্ত হইলাম। সমুদয় আশঙ্কা চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ।

মালবিকাগ্নিমিত্র

(নৃত্যনাট্য)

[মহাকবি কালিদাস অবলম্বনে]

প্রথম দৃশ্য

স্থান—অরণ্য

[মরু আলো-আঁধারে ঢাকা, দস্যুদলের উল্লাস-কলরোলে চারি
ক সচকিত। ছায়ার মতো দস্যুদল মরুপথ অতিক্রম করে
কারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে : নেপথ্যে আর্তনাদ, ভীতা
ন্তা মালবিকার চকিতে প্রবেশ]

এ কী গহন অরণ্য !
এ কী দুর্গম জটি[illegible] !!
মরি হায়, মরি হায় !
কোন্ অজানা অপরাধে
আমার জীবনে পথ
দিলে আঁধারিয়া—
মরি হায়, মরি হায় !
নাহি জানি কোন গ্রহদোষে
পড়েছি বিধির রোষে,
কাহার অজ্ঞাত অভিশাপ
আমারে করেছে অসহায়
মরি হায়, মরি হায় !

[ব্যাধদম্পতীর প্রবেশ]

ব্যাধ।

চুপ, চুপ—
ঐ যে কাহার পদধ্বনি আসে,
কোন ভীতা হরিণীর ?

ব্যাধপত্নী।

কক্ষণো নয়, কক্ষণো নয়
এ বনস্থলীর—পাতার মর্মর !

ব্যাধ।

চুপ, চুপ,
কান পেতে শোন ঐ যে ভেসে আসে
কাহার দীর্ঘশ্বাস—সে কি
হরিণ-বালিকার ?

ব্যাধ-পত্নী।

কক্ষণো নয়, এ নিশ্চয়
উত্তরে বাতাস।

[মালবিকাকে দর্শন ও উভয়ের বিস্মিত নয়নে জিজ্ঞাসা]

মালবিকার প্রতি—

কে তুমি, কহ, কে তুমি—
আঁধার অরণ্যে বিষাদ নয়না একাকী,
কোন্ শাপভ্রষ্টা দেবী ?
আজি কোন বেদনায় তুমি ব্যথিত
এ কী করুণাধারে বক্ষ তোমার উন্মথিত,
কোন্ অশুভ আশঙ্কায় অশ্রুধারায়
ভাসে আঁখি ?

মালবিকা।

নহি, নহি আমি দেবী।
আমি অসহায় বনপথচারী।
আশ্রয়হীনা আমি নারী।

ব্যাধদম্পতী।

করো না, করো না বৃথা ছলনা, বনদেবি !
ছলনা করো না অধমেরে।
মোরা কিরাত, অরণ্যবাসী—
হয়তো বা অজানিতে
দিয়েছি তোমার সুখ নাশি'
নিষ্ঠুর শরসন্ধানে—
হয়তো দিয়েছি ব্যথা করুণাঘন প্রাণে ;
অজ্ঞান জনে তব উদার ক্ষমা রবে নাকি ?

মালবিকা।

নহি, নহি আমি দেবী।
আমি অসহায় বনপথচারী
আশ্রয়হীনা আমি নারী।

ব্যাধপত্নী।

মরি হায় রে, হায়—
রাহুতে গ্রাসিল চন্দ্রমায় !
মোরা নিষ্ঠুর কিরাত, তবু
কী করুণায় আজি অকস্মাৎ
অশ্রুতে আঁখিপল্লব ছায়,
মরি হায় রে হায় !

ব্যাধ।

হে প্রিয়জন-বিচ্ছেদ-তপ্তা
কহ মোরে কে তুমি,
কোন্ অপরাধে অভিশপ্তা ?

মালবিকা।

শুধায়ো না, শুধায়ো না মোর কথা,
শুধায়ো না মোর পরিচয়
মোরে বিধাতা হয়েছে নির্দয়।
আমি তৃষিত, ক্ষুধাতুর
অসহায় আশ্রয়হীনা—
শুধু কহ মোরে আশ্রয় মিলিবে কি না।

ব্যাধদম্পতী।

মোরা কিরাত, হীনজাতি ;
তোমারে যে দিব ঠাঁই
হেন সংগতি কিছু নাই।

তুমি নন্দন-স্বর্গকানন-বিহারী
সৌভাগ্যের দীপ্তি অঙ্গে নেহারি
তোমারে করিব দান হেন আশ্রয়
এই কলুষ-কণ্টকিত অরণ্যভূমি নয় !

মালবিকা।

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা—
সৌভাগ্য গিয়েছে মোরে ছাড়িয়া ;
দস্যুর বেশে আসি—
নিয়ে গেছে শেষ ধন কাড়িয়া,
আজি দাও মোরে যাহা কিছু।
কুলিশ-কঠোর,
যাহা নির্দয় অকরুণ—
আজিকে তোমার তূণ, ধরেছে যতো তীক্ষ্ণশর,
তারাও হয়নি কভু
নিদারুণতর তার লক্ষ্যের উপর
হয়নি নিদারুণতর !

ব্যাধদম্পতী।

হয়ো না হয়ো না বিচলিতা, হে দেবি !
হয়ো না হতাশায় ম্রিয়মাণ—
শোন শোন মোর মিনতি
দয়ালু মোদের নরপতি,
পরম গুণবান।
ধার্মিক বলে তারে জানি,
বিদিশা তাহার রাজধানী—
অগ্নিমিত্র নাম।
প্রজাপালক তারে জানি,
প্রেম-করুণার অবতার।
তাহার আশ্রয়ে তুমি,
আপনারে কর ধন্য
পূরিবে মনস্কাম।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বিদিশার রাজপ্রাসাদ

[দৃশ্যসজ্জায় প্রসাদের ইঙ্গিত, বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য নিদর্শন ও পশ্চাতে ঠিক মাঝখানে একটি গোলাকার বাতায়ন]

মালবিকা।

পরাণ মম হলো উতল অকারণে ;
জানি নে ওগো কাহারে খুঁজি আপন মনে !
আজিকে মোর বুকের মাঝে
কাহার চরণধ্বনি বাজে,
চমকি' চাহি পথের পরে খনে খনে।
কে আজি মম মনের আগল দিল খুলি
যাক্ না ভেসে সঙ্কোচের বাঁধনগুলি।
যে এলো আজি আভাসে আমার
প্রাণের দ্বারে—
আমার প্রাণের দোসর সে যে,
ওগো তারে
চিনিতে যদি না পারি আমি
চিনিবে সে কি আপন-মনে ?
আমার প্রাণের গোপন কথা
পাবে কি সাড়া সঙ্গোপনে ?

(বকুলাবলিকার প্রবেশ)

সে গোপন বেদন রবে না, সখি,
রবে না ঢাকা।
সে যে নয়নে তোমার কাজল-রেখায়
রয়েছে আঁকা—
সে গোপন বেদন রবে না।
তব আঁখির পলকে পলকে
সে যে উঠিছে কাঁপিয়া
প্রাণের ঝলকে ঝলকে—
ঢাকা রবে না।
আজি হৃদয়তলে সে থাক্ না ঢাকা
সে যে পরশরতন ;
যখনি আসিবে দ্বারে
পরশিয়া যাবে তারে
স্বপ্নের মতন।

বকুলাবলিকা।

তব গোপন প্রাণের অভিসার
সফল হবে—সে যে
বিরহে মিলনে মাখা,
ঢাকা রবে না।

[রূপসজ্জার উপকরণ লইয়া প্রতিহারীর প্রবেশ]

রাজার কাননে হবে বসন্তের আবাহন,
তুমি হবে তার দূতী ;
অন্তঃপুর-মাঝে তুমি সুন্দরীতমা
তাই হে নিরুপমা—
অন্তঃপুরিকার সুন্দরীশ্রেষ্ঠার সম্মান
মহিষী তোমারেই করেছেন দান।
পঞ্চদিবসে যদি বসন্তের হয় আগমন
মহিষী পূরায়ে দেবে—
তোমার যাহা কিছু বাসনা।
লহ এই লহ রূপসজ্জার সম্ভার
সাজাইয়া দাও সখি উর্বশী রম্ভার
রূপগর্ব কর হতমান।

[মালবিকার রূপসজ্জা সাধন
ও গান : বকুলাবলিকা]

অভিসারের লগন এলো বুঝি
বনে বনে বইল দখিণ হাওয়া ;
মনের কোণে বিফল যোঝাযুঝি—
শেষ করে দাও পিছন পানে চাওয়া।
চক্ষে আঁকো স্বপ্নলোকের অঞ্জন
নিখিল হৃদয়-রঞ্জন,

প্রাণের পরশ মাগিছে আজ নিখিল বসুন্ধরা।
অঙ্গনে আজ সাজাও প্রাণের অর্ঘ
পূর্ণ প্রেমের স্বর্গ।
দুঃখ-দিনের রুক্ষতার মাঝে
যে সান্ত্বনা অলক্ষিতে বাজে
মিলন-মহোৎসবের আঙ্গিনাতে
হবে তারই জয়ধ্বনি গাওয়া

মালবিকা।

অমরাবতীর সুখ-স্বপ্ন—
আমি মনেই আনিনে যে মনেই আনিনে ;
যা পাইনি তার লাগি নিষ্ফল ক্রন্দন কাঁদিনে।
উতল হাওয়ায়
আজি মোর সহজ সাধন,
রাখিনে দুরাশা মাগিনে মায়ার বাঁধন ;
ঝড়ের বুকে আমি ঝরা-পাতার নীড় বাঁধিনে

বকুলাবলিকা।

সখি, নয়ন তব অসীম রোদনে ভরা
অধরে হাসিছ হাসি,
আপনারে ঘেরি রচিয়াছ মনোহরা
মোহন ছলনা-রাশি।

মালবিকা।

আমি ভাবিনে শেষের ভাবনা
রাখিনে সঞ্চয়—
ক্ষণিক মাঝে মোর চিরজীবনের যাপনা
ক্ষণিক আনন্দেই করি ক্ষয়।
বকুল-শাখায়—
যেমন দখিণ সমীরণ,
ক্ষণিক দোলায় দোলা দিয়ে যায় অকারণ—
পরশ করি যায় ক্ষণিকে প্রেম সাধনে।

বকুলাবলিকা।

সখি, নয়ন তব অসীম রোদনে ভরা...
মরম তলে পলে পলে
দহিছ অনল দহনে—
যে কথা আজো হলো না বলা
কাঁদিছে মনের গহনে,
জানি গো জানি বেদনা তারই
পাষাণ সম হয়েছে ভারি—
গোপনে যতো রাখিছ তারে
উঠিছে পরকাশি।

মালবিকা।

থাম্ দেখি থাম তুই বালা,
থামা পরিহাস রঙ্গ
হয়েছে মরিবার পালা
এ সকলি তারি অনুসঙ্গ।

মালবিকা।

রাজমহিষীর আশ্রিতা আমি
সামান্যা পুরবাসিনী—
মোরে নিয়ে এই পরিহাস তোর
যায় যদি মহিষীর শ্রবণে
ঘটাইবে অনর্থ গোলযোগ।

বকুলাবলিকা।

কপালে থাকে যদি দুর্ভোগ
কে করিবে খণ্ডন ?
তারি লাগি' আগে থেকে
ক্রন্দনে নাহি ফল ;
শোন সখি, রাজ-অভিনন্দনে
ত্বরা চল্, ওই
শঙ্খধ্বনি ওঠে গগনে।

(মালবিকার নৃত্য)

আমায় ডাক দিলো কে প্রাণের উৎসবে,
ধরণীতল হলো উতল সে আহ্বান-রবে।
এসো এসো আনন্দিত প্রাণ
প্রসন্ন অম্লান—
তোমার আগমনী যে ওই
বাজলো শঙ্খরবে।
আমার এ দেহ মন হলো মগন
এ কোন্ সঙ্গীতে ?
চিত্ত আমার নাচে রে কার
নাচের ভঙ্গিতে ?
এ কোন দুঃসাহসের রথে
আমায় আনলে টেনে পথে
কোন সে নিরুদ্দেশে আমার
যাত্রা সাঙ্গ হবে।

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজোদ্যানে বসন্তের আবাহন, মালবিকাকে কেন্দ্র করিয়া সমবেত নৃত্য-গীত]

কাননভূমি রয়েছে জাগি
নিমেষহত তোমার দ্বারে,
হে ঋতুরাজ ! পরি লহ সাজ,
বরণ করি লও না তারে।
মোহন তোমার উত্তরীয়
পলাশ রঙে রাঙায়ে নিয়ো
চম্পক-বন ধ্যাননিমগন
হলো যে আপন গন্ধভারে॥
বকুল পারুল যূথী জাতি
চামেলী শিরীষ রজনীগন্ধা,
মালতীর বন জেগেছে কখন
বহি গেল অভিসার-সন্ধ্যা !
নব পল্লবিত মাধবী-শাখায়
আজি যৌবন জাগে কিসের বেদনায় ?

এসো এসো নবীন বসন্ত
এসো নূতন প্রাণবন্ত
আনো কদম্ব-কেশররেণু দখিণ বাতাসে।
মল্লিকা-বন চকিত নয়ন চাহিছে আশ্বাসে
এমন মধুমাসে—
ওগো জাগো জাগো জাগো,
জাগাও বনবীথি
বনবিহঙ্গের কাকলিতে
জাগাও কলগীতি।

মালবিকা।

আহা বসন্ত এলো বুঝি বনে,
এলো চঞ্চল চপল চরণে!
এলো গুঞ্জন তুলি লঘু পাখায়
কল-কূজন-মুখর নীপশাখায়
এলো শ্যামল লীলায়িত আবেশে
পরশ-মধুর সমীরণে!

মালবিকা।

এলো মঞ্জুলিকার মধুগন্ধে
নূতনের অভিনব ছন্দে।
এলো মর্মরিয়া ঝরা পাতায়
চির-নবীনের আগমনী গাথায়
এলো মিলন-রাগিণীর আলসে
স্বপন-মদির নয়নে।

(অগ্নিমিত্রের প্রবেশ)

এ কোন হালকা হাওয়ায় চরণ ফেলে এলে—
আমার আঙ্গিনাতে ?
আমার ফুলগুলি তাই উঠলো ফুটে,
ফুটলো তোমার ইশারাতে।
পাতায় পাতায় লাগলো শিহরণ
তাই তো অকারণ—
উতল হাওয়া তোমার খুসির
অর্ঘ বহে আপন হাতে।
দেবার মতো ধন কিছু তো নাই,
আমার আনন্দ আজ কী দিয়ে জানাই ?
তাই তোমারি ছন্দ আজি কণ্ঠে মম
নিলেম গেঁথে ওগো আমার প্রিয়তম,
তাই তোমারি সুরে আমি
গান গেয়ে যাই দিবস-রাতে ;
আমার মনের একতারাতে।

(ইরাবতীর প্রবেশ)

মোর পুর-পরিচারিকারে এ কী সম্ভাষণ ?
হে রাজন, ধিক্ তব আচরণ ধিক্ !
ধিক্কৃত আজি মোর এ জীবন—
ধিক্ তব আচরণ ধিক্।

অগ্নিমিত্র।

শান্ত হও মহারাণী !
নহে নহে এ সামান্যা সহচরী রমণী
শান্ত হও মহারাণী !
যারে আপনার হাতে সম্মান
বিধাতা করেছেন দান—
অন্ধের মতো আজি যদি হায়
অবহেলা করি তারে ঐশ্বর্যের অহমিকায়,
মার্জনা নাহি তার কোন দিন
আমি স্বীকার করেছি শুধু তারি ঋণ,
প্রীতিবিকাশিত সাধুবচনে
অয়ি বাষ্পাকুললোচনে !
তুমি তার পাও নাই পরিচয়।

ইরাবতী।

ধিক্কৃত, ধিক্কৃত,
ধিক্কৃত আজি মোর এ জীবন।
ধিক্কৃত আজি মোর নারী :
অন্যায় অন্যায় সহিব না কিছুতেই নীরবে ;
কোথা প্রতিহারী ?
বন্দী কর মায়াবিনীরে।
নিয়ে যাও পাতালের পুরীতে
যেথা ধনরত্নের ভাণ্ডার,
মোর নির্দেশ ছাড়া
কীট যেন নাহি পশে কারাগার।
এই সর্পমুদ্রার অঙ্গুরীয়
সংকেত নিলে শুধু মুক্তি দিয়ো
অন্যথা নাহি পাবে নিস্তার।

অগ্নিমিত্র।

শান্ত হও, শান্ত হও
শান্ত হও হে মহিষী !
শান্ত কর ক্রোধবহ্নি ;
মোর লাগি আশ্রিত জনেরে
অকারণ করেছ দোষী !

ইরাবতী।

ধিক্ মোর ভাগ্যেরে ধিক্,
বাড়ায়ো না আর মম ধিক্কার
ধিক মোর ভাগ্যেরে ধিক !

অগ্নিমিত্র।

অন্যায়, অন্যায়, অন্যায়—
মোর লাগি' সুন্দরী অসহায়
সহিবে অকারণ দুর্ভোগ ?

বকুলাবলিকা।

তবু কোন্ প্রাণে হে রাজন ! আছ চুপ ?
তুমি যদি নাহি কর প্রতিকার
কোথা মোরা যাবো বলো,
কার দ্বার ?

অগ্নিমিত্র।

অন্তঃপুরে শাসনভার
অর্পিত মহিষীর 'পরে।
সেথা মোর রাজার নাহি অধিকার ;
বুদ্ধিমতী তুমি
তোমারেই করিতে হবে উপায়
নির্দোষীর মুক্তির।

বকুলাবলিকা।

অভয় দাও, অভয় দাও,
অভয় দাও তবে, হে রাজন!
পূর্ণ করিব তব অভিলাষ
বিরহ-বিধুর সখীরে মোর
এনে দেব অচিরে তব পাশ।

চতুর্থ দৃশ্য

ইরাবতীর কক্ষ

[ত্রস্ত ভাবে বকুলাবলিকার প্রবেশ]

রক্ষা কর মহারাণী,
দংশিল মোরে কালসর্প,
কী হবে উপায়, হায় ভগবান!
মৃত্যুর করাল আতঙ্ক।
তোমারি মালার ফুল তুলিতে
গিয়েছিনু প্রাসাদ কাননে,
দংশিল কুটিল ভুজঙ্গ
ভাগ্যহীনারে সেই সুযোগে ;
কী হবে উপায়, হায় ভগবান!
মোরে ডাকে মৃত্যুর কালো ছায়াতে।

[বিষসঞ্চারে বকুলাবলিকার বিবস ভঙ্গী]

ইরাবতী।

হায়, হায়,
মোর লাগি' অবলা হারাল প্রাণ!
ত্বরা করি যা লো প্রতিহারী,
বিষবৈদ্যেরে সাথে ডেকে আন্।
ধ্রুবসিদ্ধিরে মোর নাম করি গিয়া বল
দংশেছে কাল সাপে, মহিষীর
সহচরী-প্রধানায়। [প্রতিহারীর প্রস্থান।

[ধ্রুবসিদ্ধির প্রবেশ ও বকুলাবলিকাকে প্রদক্ষিণ করিয়া নৃত্য]

প্রয়োগের দেখি যাহা লক্ষণ
বাঁচিবার নাহি কোন আশ্বাস ;
তক্ষক করিয়াছে দংশন
চিকিৎসা নাহি তার শাস্ত্রে।

ইরাবতী।

হায় হতভাগিনী!
দংশিল তোরে কালনাগিনী ;
কী কুক্ষণে গেলি কাননে ?

ধ্রুবসিদ্ধি।

এক উদকুম্ভের বিধানে—
লেখা আছে শাস্ত্রের নিদানে,
মোর বিষবিদ্যায় যা আছে—
শেষ চেষ্টা করিব আমি প্রাণপণ।
তারি লাগি চাহি অঙ্গুরীয়
সর্পমুদ্রায় খচিত
বিশুদ্ধ স্বর্ণে রচিত
সর্বাগ্রে তারি প্রয়োজন।

ইরাবতী।

লহ এই, লহ অঙ্গুরীয় মোর
রাখিও অতি সাবধানে।

[অঙ্গুরীয় দান]

ধ্রুবসিদ্ধি।

আজিকার শর্বরী হলে ভোর
পাঠাইব তোমার নিধানে।

[ইরাবতীর প্রস্থান।

(বকুলাবলিকাকে ধ্রুবসিদ্ধির অঙ্গুরীয় দান)

বকুলাবলিকা।

চলে গিয়েছিনু কোন সুদূরে
কে তুমি ফিরায়ে মোরে আনিলে ?
কোন সঞ্জীবনী মন্ত্রে, মোর
এ দেহে নবজীবন দানিলে ?
লহ লহ মোর প্রণিপাত
তুমি ধ্রুবসিদ্ধি
সুখে কর তুমি দিনপাত
হোক সমৃদ্ধি
কৃতজ্ঞ আমি তব করুণায়।

পঞ্চম দৃশ্য

কারাগার

(দ্বারদেশে প্রহরারত কারারক্ষী মাধবিকা)

হোই হোথা দাঁড়াও হুঁসিয়ার
কী সাহসে কারাগারে ঢুকিলে,
শোননি কি আদেশ রাণীমার ?

বকুলাবলিকা।

ধৈর্য্য ধর কারারক্ষী
আসিয়াছি তারি বার্তা নিয়ে।
পণ্ডিত করিয়াছে গণনা
পড়েছে শনির কোপদৃষ্টি
রাজ্যের 'পরে ; তাই অনাচার
ধরণীরে গ্রাসিছে, রাজ্যের
শান্তি নাশিছে।
রাজজ্যোতিষীর বিধানে
গ্রহশান্তির তাই প্রয়োজন ;

মহারাজ তারি তরে নির্দেশ
দিয়েছেন অমাত্য-প্রধানে—
রাজ্যের কল্যাণে সারাদেশ
পাবে তার শুভফল
সর্ব অমঙ্গল
দূর হয়ে যাবে তার অচিরে।
শুভকর্মে রাজা আদেশ দিয়েছে
সেনাপতিরে—
মুক্তি দিতে সব বন্দী
আমি তাই আসিয়াছি পাতালে।

মাধবিকা।

আঁটিয়াছ সুচতুর ফন্দী
তবু ছাড়া নাহি পাবে বন্দী
সারাদেশ জানে এই কারাগার
রাজ-অনুজ্ঞার বাহিরে
হেথা মহিষীর কথা নহিলে
খাটিবে না আর কারো অধিকার।

বকুলাবলিকা।

অবাক করিলে তুমি আমারে
মোর কাছে অজ্ঞাত কিছু নয়;
আগে শোন আমি যা বলি
আমারে মিথ্যা দেখাও ভয়।
এই লহ রাণীমার সংকেত
সর্পমুদ্রার খচিত
অঙ্গুরীয় কাঞ্চনময়।

[কারারক্ষীর পথ প্রদান ও মালবিকাকে মুক্তিদান]

মালবিকা।

সত্য কিবা তুমি স্বপ্ন—
কে তুমি বল মোরে!
কম্পিত দীপশিখা সম
এ কী নিদারুণ উদ্বেগ কাঁপিছে
তোমার চক্ষে!
কে তুমি বল মোরে?

বকুলাবলিকা।

নাহি জানি মায়া, আমার
মোহন বিদ্যা নাহি।
মুখপানে দেখো চাহি—
তোমার অঙ্গে আর
নাহি শৃঙ্খলভার, নাহি।
অন্তবিহীন দুঃখের দিন,
বিচ্ছেদ-ব্যথা তার নাহি নাহি;
মোর মুখপানে দেখো চাহি।

মালবিকা।

এ কী অভিনব রহস্যের জালে
বাঁধিলে আমারে?

আপনার ভাগ্য নিয়ে
আমি ছিনু কারাগারে
অজ্ঞাত জীবনের আঁধারে।
রাজপ্রাসাদের সুখ ফেলে
কোন্ অনাগত বিপদেরে
ডেকে নিয়ে এলে?

বকুলাবলিকা।

আমি মিলনের মালা গেঁথে চলি
হে বিরহী—
দুঃখ তিমিরতলে আশার
প্রদীপ হয়ে জ্বলি হে বিরহী!
ফিরি আমি দক্ষিণের বায়ে
মর্মরিত তরুছায়ে-ছায়ে,
প্রেমিকের কণ্ঠে আমি
প্রণয়-কাকলি—
হে বিরহী!

মালবিকা।

আমি দুঃখের সাগর করি মন্থন
পেয়েছি যে ধন,
তাহারি সুধায় আজি ভরুক জীবন
মোর প্রাণ-মন।
হতাশার ক্রন্দন আজি শেষ হয়ে যাক্
শেষ হোক—
সুখের স্বপ্নেরে দিনু মোর শেষ অভিনন্দন
নাহি করি শোক;
দুঃখের বরমালে সাজাব বরণডালা
করি প্রাণপণ,
একই মালা দিয়ে আমি করিব বরণ
মোর জীবন-মরণ।

অগ্নিমিত্রের প্রবেশ।

জীবন-বসন্তে তুমি যে
এলে হৃদয়কুঞ্জে,
অয়ি লাবণ্যপুঞ্জে!
তব কল্যাণ করে
সুধাপাত্রখানি লহ ভরে
দীপ্ত প্রেমের অভিষেকে।
তোমারে হেরিয়া কানন ঘেরিয়া
মোর প্রেমের মধুকর গুঞ্জে;
তুমি এলে হৃদয়কুঞ্জে।

মালবিকা।

হে মহানুভব রাজন!
অপরিচিতারে তব অযাচিত করুণা
রহিল স্মরণ।

অগ্নিমিত্র।

নহ, নহ তুমি অপরিচিতা
হে সুচরিতা—
নহ তুমি মোর অচেনা।
মোর প্রথম ফাল্গুন-দিনে
গোধূলি-আলোকে, তোমায়
নিয়েছিনু চিনে—
শুধু জানি নাই তোমার পরিচয়।

মালবিকা।

চেয়ো না চেয়ো না তাহা জানিতে,
আমি যা নিয়েছি মেনে
দাও মোরে মানিতে।
ফাগুনের ফুলবনে যথা
কুসুমের পরিচয় রহে
শুধু মধুপের কানাকানিতে।

অগ্নিমিত্র।

এ কী বিচিত্র ছলনা-জালে
আপনারে রেখেছ আড়ালে
হে ছলনাময়ি!
ঘুচাও ঘুচাও দ্বন্দ্ব
ভীষণ মৌনীর বন্ধ
ভেঙ্গে দাও উদ্দাম নৃত্যে;
সংশয়-ব্যাকুলিত চিত্তে
প্রেম হোক সর্বজয়ী।
অন্ধ-আঁধার ভেদি'
আপনারে করো উন্মোচন,
অয়ি রহস্যময়ি!

মালবিকা।

মালবিকা আমি বিদর্ভ-রাজকন্যা
কৃতজ্ঞ আমি তব করুণারসে চিরধন্যা।
[নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি ও বসন্তের আগমনে
অন্তঃপুরবাসিনীগণের আনন্দ-সংগীত]

—বসন্তের আহ্বান—

বিশ্বভুবন খুলেছে দ্বার
আয় ছুটে তার অঙ্গনে
আজিকে সব ভাবনা রেখে
বাঁধনহারার সঙ্গ নে।
আয় ছুটে আয়,
আয় ছুটে তার অঙ্গনে।
বিশ্বজুড়ে কোন সে পাগল
খুলে দিলো রূপের আগল,
আজিকে কে রইবে বাঁধা
ঘরের মায়াবন্ধনে,
আয় ছুটে আয়—
আয় ছুটে তার অঙ্গনে।
আজিকে অরুণ আলোয় প্রাণের খেলা,
প্রতিদিনের মন্দ-ভালোয়
নিয়ন্ত্রিত চরণ ফেলা—
রইলো পড়ে।
ফুলের গন্ধ বনে বনে,
যায় ছড়িয়ে এই পবনে
মৌমাছিরা বাহির হলো
তাহারি আমন্ত্রণে;
আয় ছুটে আয়—
আয় ছুটে তার অঙ্গনে।

অনুবাদকঃ—পরিমল হোম

গতিবেগের দিক থেকে মানুষ

সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ—এ দাবী আজকের নয়, অনাদি কালেরই। কিন্তু কথাটি কি সর্বাংশে সত্য অর্থাৎ সব দিক থেকেই কি মানুষ অপরাপর জীব থেকে বড়? গতিবেগের জন্যই যদি তোলা ধরা হয়, দেখা যাবে, মানুষের অহংকার অমনিতে টিকবে না।

মানুষের চলার গতি যত বেশীই হোক, সে আর কতটুকু? দৌড়ের বিশ্ব রেকর্ড ঘণ্টায় ২৪ মাইল পর্যন্ত পাওয়া যায়। এর চেয়ে অধিক বেগে ছুটবে, সাধ্য হয়নি এখনও মানুষের। অথচ বিলেতী শিকারী কুকুরগুলো বা রেসের ঘোড়া সব ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইল দৌড়াতে সক্ষম। অপর দিকে উটপক্ষীও ঘণ্টায় ৪০ মাইলের উপর এবং হরিণ ৫৫ থেকে ৬০ মাইল পর্যন্ত ছুটতে পারে। হরিণ-শিকারী চিতাবাঘগুলো নাকি ঘণ্টায় ৭০ মাইল পর্যন্ত দৌড়াতে অভ্যস্ত। আর পশুরাজ সিংহ—মানুষের চেয়ে কম গতিরোধ হলে তার ইজ্জত থাকবে কেন? তাই দেখা গেছে, অল্প দূর হলেও ঘণ্টায় ৬০ মাইলের উপর যেতেও তার বাধবে না।

এক জন সাঁতারু মানুষের সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ৪ মাইলের বেশী নয়। অথচ দেখে মনে হ'বে—চোখের নিমিষে কোথায় বুঝি চলে গেল লোকটি! অবশ্য যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে চলার বেগ বাড়ানো চলে। যেমন, তুষার-পাদুকা বা বাই-সাইকেল ব্যবহার করলে খানিকটা 'দ্রুত' যাওয়া সম্ভবপর বৈ কি! বাই-সাইকেল চড়ে একজন মানুষ ঘণ্টায় প্রায় ৪০ মাইলও যেতে পারে। অপর দিকে মোটর সাইকেলে চেপে তার পক্ষে ঘণ্টায় ১ শত মাইলের উপর যাওয়াও বিচিত্র নয়। মাত্র এ ভাবেই অর্থাৎ যন্ত্রের সাহায্য অবলম্বনে মানুষ গতিবেগের দিক থেকেও অন্য সব জীবকে হারাতে পারে এবং বজায়ও রাখতে পারে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী।

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

পঁচিশ

রাজশেখর রায় বলতে লাগলেন, আজ বলতে লজ্জা নেই মহিম বাবু, যে নারীকে ভোগ করবার জন্য অত্যুগ্র এক লালসা আমার বুকের মধ্যে দীর্ঘ দিন ধরে লালন করেছি সংগোপনে, সেই যৌবনোদ্ভিন্না নারী আমার ভোগে আসবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যখন আমার নাগালের বাইরে চলে গেল, দুঃখে আক্রোশে ও হতাশায় বুকের মধ্যে যেন আমার আগুন জ্বলে উঠলো। তাই যখন সংবাদ পেয়েছিলাম অপর্ণার একটি সন্তান হয়েছে, সেই শিশুকে হত্যা করে অপর্ণার উপরে প্রতিশোধ নেবার জন্যই আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে, আমার লোকের দ্বারাই শিশুটিকে হরণ করে নিয়ে আসি। কারণ, অপর্ণার প্রতি তখন আর আমার ভোগের স্পৃহা ছিল না, ছিল শুধু তাকে প্রতিহিংসার চরম আঘাতে চূর্ণ করবার একটা নিষ্ঠুর জিঘাংসা। কিন্তু আমার লোকেরা যখন সেই তিন বৎসরের অসহায় শিশু কন্যাটিকে আমার সামনে এনে রাখল, পারলাম না তাকে হত্যা করতে। আমার অন্তরের সহজাত পিতৃত্ব, স্নেহ যেন আমার দু'হাত পশ্চাৎ দিক থেকে টেনে ধরতে লাগলো। কিন্তু হায়, পরে বুঝতে পেরেছিলাম, সে দিন অন্ধ স্নেহে যদি না অত-বড় ভুলটা করতাম তবে হয়ত আজ সেই ভুলের জন্য এত বড় মাশুল দিতে আমায় হতো না। যাক, যা বলছিলাম, সেই মেয়েটিকে একটি দাসী ও পাইক সর্দারের তত্ত্বাবধানে আমারই জমিদারীর অন্তর্গত দূরপ্রান্তের এক নির্জন কুটিরে রেখে দিলাম। রাজশেখর এই পর্য্যন্ত বলে আবার থামলেন।

তারপর? আবার প্রশ্ন করলেন মহিম হালদার।

দশ বছর সেখানে কেটে গেল, তারপর আবার আমারই গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেলাম, অপর্ণা তার অপহৃতা সন্তানের সন্ধান না কি উপায়ে আবার পেয়েছে। কালবিলম্ব না করে তখুনি একদিন গভীর রাত্রে সেই নির্জন কুটিরে গিয়ে আক্রোশের বশে সেখানকার আমার পাইককে হত্যা করিয়ে তার কাজের গাফিলতির জন্য রাতারাতি অশ্বপৃষ্ঠে সেই কন্যাটিকে নিয়ে এসে তুললাম আমারই কৃষ্ণসায়রের পরিত্যক্ত নির্জন কুটিরে। একবার চন্দ্রাকে হত্যা না করে ভুল করেছিলাম আবার ভুল করলাম তাকে। আরাম-কুটিরে এনে তুলে, তখন বুঝিনি মহিম বাবু যে, আমারই মায়ের হাতে নিহত সেই নর্তকী লক্ষ্মী বাঈয়ের প্রেতাত্মাই তার নাতনীকে আরাম-কুটিরে আকর্ষণ করেছিল তার হত্যার প্রতিশোধ নিতে আমারই একমাত্র পুত্র শশাংকর উপর দিয়ে। বলতে বলতে যেন একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন রাজশেখর। গলাটাও বুঝি ধরে এসেছিল তাঁর, গলাটাকে পরিষ্কার করে নিয়ে আবার বলতে সুরু করলেন।

আরাম-কুটিরেই চন্দ্রা বড় হতে লাগলো, সরযূ দাসী ও পাইক কৃষ্ণ সর্দারের প্রহরায়। কৈশোর ছাড়িয়ে একদিন সে যৌবনে পা দিল, এমন সময় আমার একমাত্র পুত্র শশাংক কলকাতার পাঠ সমাপ্ত করে কৃষ্ণসায়রে ফিরে এলো এবং সেই সময়ই বোধ হয় কোন এক সময় আরাম-কুটিরে বন্দিনী চন্দ্রার সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। অথচ আশ্চর্য কি জানেন? এত কড়া প্রহরার ব্যবস্থা ছিল আমার আরাম-কুটিরের 'পরে—তা সত্ত্বেও কি করে যে, শশাংক সেখানে প্রবেশ করেছিল সেটা আজও আমার অজ্ঞাত! তাই ত মনে হয়, নিয়তিই বুঝি তাকে সেখানে আকর্ষণ করেছিল!

আমি জানি সে কাহিনী রাজশেখর বাবু! মহিম হালদার বললেন।

আপনি জানেন?

হাঁ, শশাংক বাবুর জবানবন্দী থেকেই জেনেছি। আপনার দাসী সরযূও জানতো।

পরে আমিও তাই ভেবেছিলাম কিন্তু বুঝতে পারিনি এত বড় দুঃসাহস সরযূর কি করে হতে পারে! যাক সে কথা। এখন বুঝি সবই ভবিতব্য! আর ভবিতব্য কেউ খণ্ডাতে পারে না।

কিন্তু আপনি আপনার পুত্রের চন্দ্রার সঙ্গে পরিচয়ের কথাটা জানলেন কি করে?

সে'ও এক বিচিত্র ঘটনা। সূর্যকান্ত নামে এক যুবকের মুখে! যদি চ সূর্যকান্তর মুখে সেই সংবাদ পেলেও তাকে আমি মুক্তি দিইনি। তাকে আমার গুমঘরে চিরতরে নির্ব্বাসন দিই।

আমার কি মনে হয় জানেন রাজশেখর বাবু! সূর্যকান্ত নিশ্চয়ই পরে আপনার গুমঘর থেকে পালিয়েছিল।

সে কি! না, না—তা কেমন করে সম্ভব?

কারণ শশাংক বাবুর মুখেই শুনিছি, হত্যার রাত্রে সে নাকি আরাম-কুটিরে শশাংক বাবু সেখানে যাবার পূর্বেই উপস্থিত হয়েছিল এবং পূর্বে একবার সে শশাংক বাবুর হাতে লাঞ্ছিতও হয়েছিল আর শশাংক বাবু সে রাত্রে তাকে হত্যা করতেন যদি না ঘটনা বিপর্যয়ে অন্য রকম হয়ে যেতো, এই ত আমার মনে হয়। সেই সে হত্যার রাত্রে অবনী অধিকারীকে নিয়ে আরাম-কুটিরে চন্দ্রা নামে এক যুবতী নারীকে আপনার পুত্র শশাংক বাবুই হত্যা করেছেন বলে জানায়। হুঁ সূর্যকান্ত! সেই শয়তানটাই তার দারোগাকে সংবাদ দিয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি তাহলে সেই সে রাত্রে চন্দ্রাকে নিয়ে পালায় কৃষ্ণসায়র থেকে।

চন্দ্রাকে নিয়ে পালায়, কি বলছেন আপনি রাজশেখর বাবু? চন্দ্রাই ত সে রাত্রে নিহত হয়েছিল।

না, সে রাত্রে চন্দ্রা আরামকুটিরে নিহত হয়নি, নিহত হয়েছিল সরযূ! সেই দাসী।

কিন্তু অবনী অধিকারী ত বলেন—

না, তিনি জানেন না। তিনি সূর্যকান্তর মুখে সংবাদ পেয়ে যে নারীর মৃতদেহ সে রাত্রে আরাম-কুটিরে গিয়ে দেখেছিলেন তাকেই তিনি চন্দ্রা ভেবেছিলেন। আমিও তার প্রতিবাদ করিনি, কারণ আমি ভেবেছিলাম, আশে-পাশেই কোথায়ও চন্দ্রা হয়ত আত্মগোপন করে আছে। অবনী অধিকারী চন্দ্রা জীবিতা আছে জানতে পারলে খুঁজে তাকে বের করবেন, তখন হয়ত সব সত্যি কথাই প্রকাশ হয়ে যাবে। তার চাইতে আমিই গোপনে তাকে সময় মত চিরদিনের মত একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেবো মনে মনে ভেবেছিলাম। অবনী বাবু তখন শশাংকর কথা জিজ্ঞাসা করে। সে কোথায়

জানতে চায়। আমি মিথ্যা কথা বলি, শশাংক দু'দিন আগেই কলকাতা চলে গিয়েছে। তাতে অবনী বলে, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন রাজশেখর বাবু! গত কাল রাত্রে সে যখন পাল্কীতে করে নিশ্চিন্দপুর থেকে তার স্ত্রীকে নিয়ে পাশে পাশে ঘোড়ায় চেপে আসছিল আমার একজন চৌকিদার তাকে দেখেছিল। এখনও সত্যি বলুন, সে কোথায় গা-ঢাকা দিয়েছে। জবাবে তখন আমি বলি, জানি না। আমার কথা বিশ্বাস না করলে আমি নিরুপায়। যা হোক, তারপর যখন প্রমাণ হলো যে, শশাংক সত্যি সত্যিই সেই রাত্রেই কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছে, অবনী অধিকারীর বিশ্বাস দৃঢ় হলো। সে তার নামে চন্দ্রার হত্যাপরাধ হুলিয়া বের করলো। এ দিকে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করেও চন্দ্রাকে কোথায়ও আমি খুঁজে পেলাম না। এবং কে যে সে রাত্রে গিয়ে অবনী অধিকারীকে থানায় সংবাদ দিয়েছিল তারও কোন মীমাংসা করে উঠতে পারলাম না। ওদিকে নিরুদ্দিষ্ট শশাংককে আমার লোকদের দ্বারা সর্বত্র গোপনে গোপনে অনুসন্ধান করেও কোন হদিসই তার করতে পারলাম না। সে সময় মধ্যে মধ্যে এমন কথাও আমার মনে হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত শশাংকই চন্দ্রাকে নিয়ে পালায় নি ত! ফলে শশাংক ও চন্দ্রার কোন সন্ধানই যখন করতে পারলাম না, এবং তাদের না খুঁজে পেলে সে রাত্রের সত্যকারের ঘটনাটাও অবনী অধিকারীকে বিশ্বাস করান যাবে না বুঝেই আমাকে কতকটা বাধ্য হয়েই চুপ করে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু আপনার কথামত সরযুই যদি সে রাত্রে নিহত হয়ে থাকে আরাম-কুটিরে, তবে কে তাকে হত্যা করলো! আপনি বলছেন শশাংক বাবু হত্যা করেনি। মহিম হালদার আবার প্রশ্ন তুললেন।

না। সে হত্যা করেনি, করেছিলাম আমিই!

আপনি?

হ্যাঁ। সেই ব্যাপারেই এবারে আমি আসছি। যে রাত্রে সরযু নিহত হয় সেই রাত্রেই আমি মনস্থ করেছিলাম রাতারাতি চন্দ্রাকে আরামকুটির থেকে সরিয়ে ফেলবো আমারই জমিদারীর এলাকাভুক্ত ময়নামতীর নীলকুঠীতে। এবং সেই ভেবেই ব্যবস্থা করে পূর্বাহ্ণে আমি পাল্কী সমেত আমার লোকদের পাঠিয়ে দিই আরাম-কুটিরে। এদিকে শশাংক যে আগেই আরাম-কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল তা জানতাম না। আমার অনুচরেরা আরাম-কুটিরের প্রহরী পাইক কুম্ভ সর্দারের ঘরে গিয়ে দেখে, বর্শাবিদ্ধ রক্তাক্ত অবস্থায় কুম্ভ সর্দার মাটিতে মরে পড়ে আছে। তারা কি করবে বুঝতে না পেরে হতভম্ব হয়ে যায়। তারই কিছুক্ষণ বাদে আমি আরাম-কুটিরে গিয়ে হাজির হতেই তারা কুম্ভ সর্দারের মৃত্যুর কথা আমাকে জানায়। আমিও সংবাদটা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাই। আমার লেঠেল পাইক তখন বলে, মৃতদেহটা সে কি করবে। মাটির তলায় পুঁতে ফেলবে কি? আমি তাই দিতে বলে চিন্তিত মনে বন্দুক হাতে আরাম-কুটিরে গিয়ে প্রবেশ করি। সরযু নিশ্চয়ই সে সময় নীচেই কোথায়ও ছিল, সে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে থাকে। আমার সাড়া পেয়ে আমিও দ্রুতপদে তাকে অনুসরণ করি। শেষ সিঁড়িতে উঠেই দরজার গোড়ায় শশাংককে বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে আমি দেখি। মাথার মধ্যে তখুনি আমার যেন খুন চেপে গিয়েছে। ছুটে ঘরের দিকে যাই এবং দরজার গোড়ায় আমি পৌঁছাবার আগেই শশাংক ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়ে। আমি দরজার গোড়ায় পৌঁছে দেখি, শশাংক ফায়ার করবার জন্য বন্দুক তুলেছে, সরযু চন্দ্রাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও ফায়ার করবার জন্য বন্দুক তুলি। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের আলোটা দপ করে নিবে গেল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি ততক্ষণে ট্রিগার টিপে দিয়েছি। দুড়ুম দুড়ুম করে একই সঙ্গে দু'দুটো গুলীর শব্দর সঙ্গে সঙ্গে একটা নারীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার ও একটা ভারী বস্তু পতনের শব্দ হলো।

দু'দুটো ফায়ারিংয়ের শব্দ!

হ্যাঁ, তাতেই মনে হয় আমি আর শশাংক বোধ হয় একই সঙ্গে ফায়ার করেছিলাম। এবং আমি নিশ্চিত যে, আমারই বন্দুকের গুলীতে সরযু মারা গিয়েছে। কারণ আমারই বন্দুক তার পৃষ্ঠদেশ লক্ষ্য করেছিল। শশাংক এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার বন্দুক থেকে গুলী বের হলেও সেটা সরযুর পৃষ্ঠদেশে লাগতে পারে না।

তাহলে দেখা যাচ্ছে শশাংক বাবুও ফায়ার করেছিলেন।

হ্যাঁ! মৃদুকণ্ঠে বললেন রাজশেখর রায়।

আচ্ছা আপনাদের দুটো বন্দুকই কি এক মেকেরই ছিল?

অবিকল এক।

হুঁ! তারপর বলে যান।

তার পর ফায়ার করবার সঙ্গে-সঙ্গেই আমি যেন কেমন বিমূঢ় হয়ে যাই কিছুক্ষণের জন্য। কি করবো কি না করবো ভেবে ঠিক করতে পারি না। এমনি যখন আমার অবস্থা টের পেলাম, কে যেন দ্রুতপদে ঘর থেকে বের হয়ে গেল অস্পষ্ট ছায়ার মতই অন্ধকারে। বুঝতে পারলাম, সে আর কেউ নয়, শশাংকই। আমিও তাকে বাধা দিলাম না, পালাবার সুযোগেই ছিলাম। আরো কিছুক্ষণ পর নীচে গিয়ে অনেক কষ্টে একটা আলোর জোগাড় করে উপরে এসে ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখি, ঘরের মধ্যে দ্বিতীয় কোন প্রাণীই নেই। একমাত্র সরযুর রক্তাক্ত মৃতদেহটা ছাড়া! সেই ফাঁকেই চন্দ্রা ও সূর্যকান্ত পালিয়েছিল বলে আমার ধারণা, আরাম-কুটির থেকে।

সেই রকমই আমারও মনে হয়। তার পর?

ইতিমধ্যে কুম্ভর মৃতদেহটা মাটির তলায় সমাধি দিয়ে আমার অনুচর রাঘব ও শম্ভুচরণ উপরে এসে হাজির হলো। তাদের মধ্যে শম্ভুকে চন্দ্রার খোঁজে পাঠিয়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি আমি রাঘবের সাহায্যে মৃতদেহটা নীচে নিয়ে এসে ফেললাম। মৃতদেহটার কি ব্যবস্থা করা যায়। রাঘবই বললে, আরাম-কুটিরের পিছনের বাগানে মাটি খুঁড়ে ঐ দেহটাকেও চাপা দেওয়া যাক অন্য এক জায়গায়। কি ভেবে আমিও বললাম, তাই কর। রাঘব যখন মাটি খুঁড়ছে সদলবলে দারোগা আরাম-কুটিরে এসে হাজির হলো।

রাজশেখরের মুখে সমস্ত কাহিনী শুনে মহিম হালদার বললেন, এখন মনে হচ্ছে শশাংক বাবুকে হয়ত বাঁচাতে পারবো কিন্তু—

আপনি আমার কথা ভাবছেন মহিম বাবু! সরযুকে যখন আমি হত্যা করেছি তখন সে হত্যাপরাধের শাস্তি আমাকে পেতে হবে বৈ কি। আমার পাপের ঋণ আমি শোধ না করলে কে করবে! বলেই মহিম হালদারের একখানি হাত ধরে কাঁদো-কাঁদো গলায় রাজশেখর বললেন, আমার কথা আপনি ভাববেন না মহিম বাবু! কেবল আপনি আমার ছেলেকে যাতে বাঁচাতে পারেন তাই দেখুন।

আমি চিরকৃতজ্ঞ হয়ে থাকবো আপনার কাছে। আমার জীবনও শেষ হয়েই এসেছে, ফাঁসি যদি হয় তু'দিন আগেই না হয় যাবো, আর দ্বীপান্তর যদি হয়, ক'টা দিনের জন্তই বা!

মহিম হালদার বললেন, আমাকে কেসটা এবারে নতুন করে আগাগোড়া গড়ে নিতে হবে। আপনি তাহলে কলকাতা থেকে এখন যাবেন না।

না। এখানেই আছি। আপনি যদি বলেন ত আমি পুলিশের কাছে গিয়ে সব বলে ধরাও দিতে পারি।

ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। আপনাকে যেদিন সাক্ষী দিতে ডাকা হবে, সেদিন আপনার স্বীকৃতি শুনে আদালত যে ব্যবস্থা করবে তাই হবে।

কিন্তু সেটা কি অন্যায় হবে না? আসলে আমিই ত চন্দ্রার হত্যাকারী।

সেটা আপনি বলছেন বটে, তবে সেও আদালতের বিচারসাপেক্ষ। আপনি যে আপনার পুত্রকে রক্ষা করবার জন্তই নিজের ঘাড়ে দোষটা নিচ্ছেন না, আদালত সে যুক্তিও ত দেখাতে পারে?

না। না—আমি শপথ করে বলছি, আমিই চন্দ্রাকে হত্যা করেছি। আমি আজই গিয়ে ধরা দিই।

না। ব্যস্ত হবেন না। হঠাৎ এখন একটা কিছু ঝোঁকের মাথায় না করে পরশু পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। আপনি এখন বাসায় যান। কাল এই সময় একবার আসবেন।

রাজশেখর ও সীতানাথকে বিদায় দিয়ে মহিম হালদার শশাংকর কেসেরই ফাইলটা নিয়ে বসল।

নির্দিষ্ট দিনে আদালত-গৃহে জাস্টিস্ চৌধুরীর এজলাসে কেস শুরু হলো। সরকার পক্ষ থেকে পাবলিক প্রসিকিউটার তার সওয়াল যখন প্রায় শেষ করে এনেছেন এমন সময় দেখা গেল, আসামী পক্ষের কৌঁসিলী মহিম হালদারের সঙ্গে সঙ্গে এক অবগুণ্ঠনবতী নারী ও এক বৃদ্ধ আদালত-কক্ষে প্রবেশ করল।

চারি দিকে একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হলো।

মহিম হালদার সরকার পক্ষের সওয়াল শেষ হতেই ধীরে ধীরে উঠে এগিয়ে গেলেন।

বললেন, ইওর অনার! আজ যে দুজন বিশেষ সাক্ষীর কথা আপনাকে বলেছিলাম আদালতে তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন, আপনার অনুমতি পেলে তাঁদের সাক্ষী গ্রহণ করা চলতে পারে।

মহিম হালদারের কথায় সহসা কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান আসামী শশাংকশেখর অদূরে বেঞ্চে উপবিষ্ট তার পিতাকে দেখেই চমকে ওঠে এবং তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট অবগুণ্ঠনবতী নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে বুঝতে তার কষ্ট হয় না সে কে! তখুনি সে মনে মনে ভাবে, না, না—তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তাকে করতেই হবে। নইলে সে যে তার ধর্মপত্নীর কাছে এ জীবনে ক্ষমা পাবে না। স্বর্ণময়ীর ক্ষমা যে তাকে পেতেই হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে বলে ওঠে, না। না, কারো কোন সাক্ষ্যেরই আমার প্রয়োজন নেই! আমি অপরাধী, তু'টি নারীকে আমি হত্যা করেছি। আমাকে শাস্তি দিন।…

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জজ সাহেব সাক্ষীকে কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াবার জন্ম আদেশ দিলেন। ধীর পদে রাজশেখর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন।

চিৎকার করে ওঠে ঐ সময় আবার শশাংক, বাবা! বাবা!… আমি অপরাধী, আমাকে শাস্তি নিতে দিন।

রাজশেখর রায় ফিরেও তাকালেন না পুত্রের দিকে, জজ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন তাঁর কাহিনী। সমস্ত আদালত স্তব্ধ হয়ে শুনতে লাগলো সেই বিস্ময়কর কাহিনী। সমস্ত কাহিনীর বিবৃতির শেষে রাজশেখর যখন বলতে লাগলেন, আমি ভগবানের নামে শপথ করে বলছি, সরযুকে হত্যা শশাংক করে নি। সে আমারই বন্দুকের গুলীতে সে রাত্রে নিহত হয়েছিল। সরযুর হত্যার ব্যাপারে দোষী আমি! আমি—আমিই সে রাত্রে আরাম-কুটিরের নারী হত্যাকারী! সরযুর হত্যাপরাধে মৃত্যুদণ্ড আমায় দিন। শশাংক নির্দোষ! নি—আর বলতে পারলেন না রাজশেখর রায়। দীর্ঘ এক ঘণ্টার উত্তেজনায় অকস্মাৎ রক্তচাপ বৃদ্ধি হওয়ায় মাথার শিরা ছিঁড়ে জ্ঞান হারিয়ে কাঠগড়ার উপরে টলে পড়লেন।

শশাংক চিৎকার করে উঠলো, বাবা! বাবা!

স্থান-কাল ভুলে ছুটে এলো স্বর্ণ কাঠগড়ার পাশে। মাথার গুণ্ঠন খসে পড়েছে। সে-ও চিৎকার করে ওঠে, বাবা! বাবা!

চারি দিকে একটা বিশ্রী গণ্ডগোল শুরু হয়ে গিয়েছে তখন। পাশের একটা ঘরে হতজ্ঞান রাজশেখরকে ধরাধরি করে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেদিনকার মত বিচার কার্য বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন জজ সাহেব। ডাক্তারকে সংবাদ পাঠানো হলো।

এদিকে তখন অকাল বার্দ্ধক্যে পীড়িত এক ব্যক্তি জনতার মধ্যে থেকে মুহ্যমানের মত এক পার্শ্বে দণ্ডায়মান পাবলিক প্রসিকিউটারের সামনে এগিয়ে এসে বললে, আরাম-কুটিরের সে রাত্রের হত্যা ব্যাপার সম্পর্কে আমিও কিছু জানি। মুখ তুলে তাকালেন আগন্তুকের দিকে সবিস্ময়ে পাবলিক প্রসিকিউটার জীবন ঘোষাল।

আগন্তুকের এক কালে বলিষ্ঠ চেহারা ছিল বোঝা যায় কিন্তু অকাল বার্দ্ধক্যে এখন কতকটা ন্যুব্জ হয়ে পড়েছে। মাথায় পাগড়ি। কাঁচা-পাকা একজোড়া গোঁফ। পরিধানে ধুতি ও একটা গলাবন্ধ কোট।

কে আপনি?

আমারই নাম সূর্যকান্ত।

সূর্যকান্ত!

হাঁ, আমিই সে রাত্রে প্রত্যক্ষদর্শী দারোগাকে আরাম-কুটিরে চন্দ্রার হত্যা-সংবাদ দিয়ে গিয়েছিলাম। রাজশেখর রায়ের কথা মিথ্যা! তিনি হত্যা করেন নি সরযুকে। শশাংকই সরযুর হত্যাকারী।

ওদিকে ডাক্তারের পরামর্শ মত তখুনি হতজ্ঞান রাজশেখর রায়কে এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হলো। স্বর্ণময়ী ও সীতানাথ সঙ্গে সঙ্গে গেলেন।

পরের দিন সূর্যকান্ত এসে দাঁড়ালো কাঠগড়ায় পাবলিক প্রসিকিউটার জীবন ঘোষালের আহ্বানে।

সূর্যকান্ত তার আত্মপরিচয় দিয়ে সেই শুরু থেকে অর্থাৎ শশাংকের অপর্ণার তাদের গৃহে আশ্রয় নেবার পর থেকে সমগ্র কাহিনী ধীরে ধীরে বলে চলল। কি ভাবে তার মন কৈশোরে চন্দ্রার প্রতি আকর্ষিত হয়, তার পর কাশী থেকে অধ্যয়ন শেষ করে ফিরে এসে অপর্ণার মুখে চন্দ্রার অপহৃত হওয়ার সংবাদ পেয়ে চন্দ্রার অনুসন্ধান শুরু করে ও শেষ পর্যন্ত চন্দ্রার সন্ধান পেয়ে ও কিশোরী চন্দ্রাকে দেখে তার মন প্রলুব্ধ হয়ে উঠে চন্দ্রার প্রতি, সব বলে গেল।

রাজশেখর রায় তখন আবার চন্দ্রাকে সরিয়ে ফেললেন আরাম-কুটিরে, সেখানকার প্রহরীকে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করে, তার পর আবার সে কেমন করে দীর্ঘ দিন অনুসন্ধান করে আরাম-কুটিরে কেমন করে তার দর্শন পায় ও যুবতী চন্দ্রার প্রতি মন তার আরো প্রলুব্ধ হয়ে ওঠে কিছুই সে গোপন করলো না। শশাংকর হাতে কি ভাবে সে লাঞ্ছিত হয় ও শেষ পর্যন্ত একদিন আবার আরাম-কুটিরে প্রবেশ করে, এক রাত্রে চন্দ্রার হাতে ও কি করে লাঞ্ছিত হয়, বলে গেল। শেষে বললে, চন্দ্রাকে লাভের আশায় রাজশেখরের মনকে পুত্রের প্রতি বিষাক্ত করবার জন্য কি ভাবে একদিন রাত্রে সে রাজশেখরকে সব কথা বলবার পর তার গুমঘরে বন্দী হলো এবং সেখান থেকে দুই রাত্রি পরে কি ভাবে এক মহিলা তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

এই পর্যন্ত বলে একটু যেন থেমে সূর্যকান্তর আবার তার কাহিনী শুরু করলো, গুমঘরের সাক্ষাৎ মৃত্যুর মাঝ থেকে সেদিন রাত্রে মুক্তি পাবার পর আমার শিক্ষা হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তা হলো না। আমার সমস্ত শুভ বুদ্ধিকে তখনো আচ্ছন্ন করে রয়েছে চন্দ্রার দুর্দমনীয় আকর্ষণ! আমি তাই চন্দ্রা লাভের শেষ চেষ্টায় শেষ সংকল্প নিলাম। আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। আরাম-কুটিরের সদরের তালার চাবি থাকতো কুম্ভ সর্দারের কাছে। তাই তাকে সেই ঝড়-জলের রাত্রে তার ঘরে ঢুকে অতর্কিতে পশ্চাৎ দিক থেকে জোর করে তার কোমর থেকে চাবি নিয়ে আরাম-কুটিরে গিয়ে প্রবেশ করলাম, কুম্ভ সর্দারকে আমি হত্যা করিনি। করেছেন রাজশেখর রায়ই। আমার কাঁধে মিথ্যা করে চাপিয়াছেন হত্যাপরাধটা। সরযু যখন নিহত হয় তখন আমি সেই ঘরের মধ্যে এক ধারে দাঁড়িয়ে, শশাংকর জবানবন্দীতেই সে কথা আপনারা শুনেছেন। কিন্তু রাজশেখর ঘরের মধ্যে সে সময় আমার উপস্থিতিটা টের পাননি। রাজশেখরের কথাই ঠিক নয়। শশাংকর গুলীতেই সরযু নিহত হয়েছিল, তারই বন্দুকের গুলীতে। শশাংকর ঘর থেকে বের হয়ে যাওয়া ও রাজশেখরের নীচে নেমে যাওয়া আমি টের পেয়েছিলাম। আমার পকেটে দেশলাই ছিল, ফস্ করে একটা কাঠি জ্বালাতেই আমার নজরে পড়লো ক্ষণেকের সেই আলোয় সরযুর মৃতদেহের পাশেই চন্দ্রার জ্ঞানহীন দেহটা পড়ে আছে। বুঝলাম ভয়ে চন্দ্রা জ্ঞান হারিয়েছে। মুহূর্ত কাল ইতস্তত করে চন্দ্রার জ্ঞানহীন দেহটা কাঁধের উপর তুলে নিয়ে অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। চারি দিকে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। বাইরে তখনো টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। চন্দ্রাকে পিঠের উপর নিয়ে আরাম-কুটির থেকে বের হলাম। বকুল গাছের নীচে একটা ঘোড়া দেখতে পেয়ে আর কালবিলম্ব না করে চন্দ্রার সাড়ীর আঁচলের প্রান্ত দিয়ে তার হাত-পা ও মুখ বেঁধে প্রথমে তাকে ঘোড়ার উপর তুলে নিজেও ঘোড়ার উপরে উঠে বসলাম। ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে একটা কথা আমার মনে হলো, সরযুর হত্যার কথাটা আমার কর্তব্য পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। সঙ্গে সঙ্গে তাই ঘোড়ার মুখ ফিরিয়ে থানার অনতিদূরে এসে ঘোড়া থেকে নেমে থানার দিকে এগিয়ে গেলাম। থানার বাইরে একজন চৌকিদার শুয়ে ঘুমাচ্ছিল, তাকে ডেকে তুলে সংবাদটা দিলাম। সে বললে, দাঁড়াও দারোগা বাবুকে ডেকে আনি। আমি তাকে বললাম, তাই যাও, চৌকীদার যেই দারোগা বাবুকে ডাকতে গিয়েছে আমি ছুটে এসে ঘোড়ায় চেপে উধাও হলাম।

চন্দ্রার জ্ঞান তখন ফিরে আসছে। দীর্ঘ পথ ঘোড়া ছুটিয়ে আমি একেবারে মোকিমপুরে গিয়ে হাজির হলাম। চন্দ্রার সম্পূর্ণ জ্ঞানই তখন ফিরে এসেছে। তার হাত-পা ও মুখের বাঁধন খুলে দিয়েছিলাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে যেন কেমন ঝিম্ দিয়ে ছিল। কেমন যেন অদ্ভুত শান্ত ও নির্জীব। ঘণ্টা খানেক বাদেই একটা কলকাতাগামী ট্রেণ ছিল, সেই ট্রেণে চেপেই পরদিন চন্দ্রাকে নিয়ে কলকাতায় এসে হাজির হলাম। পথেই চন্দ্রার কম্প দিয়ে জ্বর এসেছিল। কলকাতায় নেমে চন্দ্রারই গলার একটা সোনার হার বিক্রি করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে হাটখোলায় একটা ছোট ঘর ভাড়া নিলাম। চন্দ্রা তখন জ্বরে বেহুঁস। দীর্ঘ পনের দিন ভুগবার পর চন্দ্রার ভাল করে যেদিন জ্ঞান হলো, আমাকে জিজ্ঞাসা করলো, আমি কোথায়?

আমি বললাম, তুমি ভাল জায়গাতেই আছো, চিন্তা করো না। ইতিমধ্যে সংবাদপত্রে শশাংকর নিরুদ্দেশ সংবাদ পেয়েছিলাম। এবং এ-ও জেনেছিলাম, চন্দ্রার হত্যাপরাধে তার নামে সরকার হুলিয়া বের করেছে। শশাংক সম্পর্কে এত দিনে নিশ্চিন্ত বোধ করলাম। ক্রমে ক্রমে চন্দ্রা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলো, তার পর একদিন আমাকে প্রশ্ন করলো, কেন তাকে আমি ঐ ভাবে চুরি করে এনেছি।

আমি বললাম, তোমাকে ভালবাসি, তাই। সে তখন বললে আরাম-কুটিরে তাকে রেখে আসবার জন্য। আমি তখন তাকে বললাম, সেখানে গিয়ে আর কোন লাভ হবে না। সরযু নিহত হলেও লোকে জানে তুমিই সে রাত্রে নিহত হয়েছো এবং শশাংকই তোমাকে হত্যা করে আজ প্রাণভয়ে পলাতক। সে তখন বললে, থানায় গিয়ে সে সব সত্য কথা প্রকাশ করে দেবে। তাতে আমি জবাব দিলাম, কেউ তোমার কথা বিশ্বাস করবে না। আর এটা তোমার কৃষ্ণনগর নয়, কলকাতা শহর। তাছাড়া তুমি কি চাও যে তোমার জন্য শশাংক ধরা পড়ুক? তোমাকে না হত্যা করলেও সে ত সরযুকে হত্যা করেছেই! সে ত হত্যাকারীই।

ঐ কথায় চন্দ্রা হঠাৎ চুপ করে গেল কি জানি কি ভেবে। ঐ ঘটনারই কিছু দিন পর জানতে পারলাম, চন্দ্রা মা হতে চলেছে! শশাংকর সন্তান তার গর্ভে। যথাসময়ে একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করে চন্দ্রা মারা গেল, কিন্তু যে কয় মাস সে বেঁচে ছিল বুঝেছিলাম তাকে জোর করে নিয়ে এসে কি ভুলই না করেছি! তার সমস্ত মন জুড়ে ছিল শশাংকই! আমার সমস্ত আকর্ষণ সেই প্রেমের কাছে বার বার পরাভূত হয়ে ফিরে এসেছে। চন্দ্রা ত মারা গেল কিন্তু তার

কন্যাটিকে আমার কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে গেল। সেই কন্যাকে বড় করেছি দীর্ঘ পনের বছর ধরে। তারপর তার নিজের অভিনয়ের ইচ্ছাতেই তাকে একদিন ডায়মণ্ড থিয়েটারে নিয়ে যাই। সীতানাথ বাবু তার কথাবার্তা ও চেহারা দেখে তাকে পছন্দ করেন। চন্দ্রার মেয়ের নাম আমিই রেখেছিলাম মায়া। শশাংকর হাতে সে রাত্রে থিয়েটারে দুর্ঘটনায় কে নিহত হয়েছে এ কথাটা আজ তার জানা দরকার। সে জানুক যে, তারই ঔরসজাত কন্যাকে সে সেদিন অভিনয়ের উত্তেজনার মধ্যে হত্যা করেছে। সে রাত্রে আরাম-কুটিরে শশাংক সরযূকে হত্যা করেছিল আর শুধু সরযূরই নয়, চন্দ্রার অকাল মৃত্যুর জন্যও সেই দায়ী এবং শেষ পর্যন্ত সেই হত্যা করেছে মায়াকে তার নিজের সন্তানকে।

একটানা সূর্যকান্ত-বর্ণিত দীর্ঘ কাহিনী শোনার পর তখন আদালতকক্ষের চারি দিকে শুরু হয়েছে একটা মৃদু গুঞ্জন।

ছাব্বিশ

তিন দিন পরে জজসাহেব কেসের রায় দিলেন।

দীর্ঘ ষোল বৎসর পূর্বে আরাম-কুটিরের দুর্ঘটনা হতে শুরু করে ডায়মণ্ড থিয়েটারে সে রাত্রের দুর্ঘটনা পর্যন্ত সমগ্র কাহিনী পূর্বাপর বিবেচনা করে জুরিগণের সঙ্গে একমত হয়ে এই সিদ্ধান্তেই আমি উপস্থিত হয়েছি যে, আসামী শশাংকশেখর ওরফে চন্দ্রকুমার রায় সত্যিই হতভাগ্য ও বিড়ম্বিত। গৃহে প্রেমময়ী সতী সাধ্বী স্ত্রী থাকা সত্বেও অন্য এক নারীতে আকর্ষিত হওয়ায় দুষ্কৃতির ফলভোগ গত ষোল বৎসর ধরে তার পলাতক জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত অনুতাপানলে জর্জরিত হয়েছে। বিভিন্ন সাক্ষীদের সাক্ষ্য থেকে ও ঘটনা পর্যালোচনা করে নিঃসংশয়েই একথা প্রমাণ হয়েছে যে, আরাম-কুটিরে সরযূর হত্যাকারী সে নয়। তারপর মায়া দেবীর হত্যার ব্যাপারটাও সম্পূর্ণভাবেই একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়। গত ষোল বৎসর ধরে দিবারাত্র যে দুঃস্বপ্নের মানসিক ক্লেশে সে জর্জরিত হয়েছে, অভিনয়ের পারিপার্শ্বিক ও উত্তেজনার মধ্যে সেই দুঃসহ যাতনাই তার অজ্ঞাতে ও সম্পূর্ণ অনিচ্ছাতেই তাকে অভাবনীয় এক দুর্ঘটনার মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে। যে দুর্ঘটনায় সত্যিই তার কোন হাতই ছিল না। তার প্রথম যৌবনের একটি অতি বেদনাদায়ক স্মৃতি যা তাকে অহোরাত্র দুঃস্বপ্নের মতই তাড়া করে নিয়ে ফিরছিল দীর্ঘকাল ধরে এবং সেটা 'কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী' নাটকের কাহিনীর মধ্যে অদ্ভুত একটা সামঞ্জস্যের সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছিল এবং শুধু তাই নয়, নাটকের কন্যা বা মীণার চরিত্রে ঘটনা পরম্পরায় অবিকল চন্দ্রারই মত দেখতে চন্দ্রারই মেয়ের আবির্ভাব, এই দুটি ব্যাপার একসঙ্গে হতভাগ্য শশাংকশেখরের মনের মধ্যে জাগিয়ে ছিল অদ্ভুত এক জটিল পরিস্থিতি ও অনুভূতি। যার ফলে অভিনয় কালীন উত্তেজনার মুহূর্তে শশাংকশেখরের অজ্ঞাতে ও অনিচ্ছাতেই শেষ পর্য্যন্ত দুর্ঘটনাটা ঘটে যায়। সেই দিক দিয়ে বিচার করে দেখতে গেলে, মায়া দেবীর হত্যার জন্যও শশাংকশেখরকে দোষী করা নিশ্চয়ই যায় না। তাছাড়া দীর্ঘ ষোল বৎসরের অনুতাপানলে দগ্ধ শশাংকশেখর আর সেই যুবক শশাংকশেখর এক নয়। আজ সে অকাল প্রৌঢ়ত্বে জর্জরিত, ভগ্নস্বাস্থ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যক্তি, সম্পূর্ণ অন্য এক শশাংকশেখর রায়। এ অবস্থায় তাকে আমি জুরিগণের সঙ্গে একমত হয়ে মুক্তিই দিলাম। সে মুক্ত। সূর্যকান্তই যে কৃষ্ণ সর্দারের হত্যাকারী এবং আক্রোশের জ্বালায় মিথ্যে সাক্ষী দিয়েছে সে বিষয়েও আমি নিঃসন্দেহ। আর সেই হত্যাপরাধের জন্য তাকে দীর্ঘ পনের বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হলো। আর রাজশেখর বাবু ত তার মৃত্যুর মধ্যে দিয়েই প্রায়শ্চিত্ত করে গিয়েছেন। আইন ও শাস্তির বাইরে।

আদালতের গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল শশাংক। শূন্য ভাবলেশহীন দৃষ্টি।

শশাংক বাবু!

কে?

চমকে মুখ তুলে চেয়ে দেখে সামনে দাঁড়িয়ে সীতানাথ বাবু।

চলুন।

কোথায়?

আপনার বাড়িতে।

বাড়িতে!

হাঁ, বলে সীতানাথ শশাংককে আর কোন কথার সুযোগ না দিয়ে সোজা তাকে নিয়ে গিয়ে অদূরে দণ্ডায়মান একটা গাড়িতে উঠলেন।

দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এসে গাড়িটা তারই বরাহনগরের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়াল।

সীতানাথ গাড়ির দরজা খুলে আগে নামলেন, তারপর হাত ধরে শশাংককে নামালেন। যান বাড়ির মধ্যে যান। আপনার স্ত্রী এইখানেই আছেন।

আমার স্ত্রী!

হাঁ। যান।

মন্ত্রমুগ্ধের মতই যেন শশাংক নিজের বাড়ির দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করে। মন্থর পদে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যায়। তারপর এসে প্রবেশ করে নিজের শয়ন ঘরে। ঘরের মেঝের পরে লুটিয়ে পড়ে ফুলে-ফুলে কাঁদছিল স্বর্ণময়ী।

কয়েকটা মুহূর্ত নির্বাক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে দেখলো শশাংক ভূলুণ্ঠিতা রোরুদ্যমানা স্ত্রীকে। তার পর ধীরে ধীরে এক সময় এসে ভূলুণ্ঠিতা স্ত্রীর পাশটিতে বসে তার মাথায় একখানি হাত রেখে মৃদু-কণ্ঠে ডাকল, স্বর্ণ!...

স্বর্ণ কোনই জবাব দেয় না, ফুলে-ফুলে কাঁদতেই থাকে।

কেঁদো না স্বর্ণ! বাবা মা স্বর্গ থেকে নিশ্চয়ই আজ আমাদের আশীর্বাদ করছেন। শুধু একবার বল, তুমি আমাকে ক্ষমা করেছো! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত যে নইলে সম্পূর্ণ হবে না। বাবা মার আশীর্বাদও মিথ্যে হয়ে যাবে।

না না ও-কথা বলো না, আমার যোগ্যতা ছিল না, তাই হয়ত এই দুঃখ আমার প্রাপ্য ছিল।

না স্বর্ণ! যোগ্যতা আমারই ছিল না, তাই এই দুঃখ আমারই প্রাপ্য ছিল। বলে শশাংক ধীরে ধীরে স্বর্ণময়ীর মাথাটা নিজের বক্ষের উপরে টেনে নিয়ে নিঃশব্দে সাশ্রুনেত্রে তার মাথায় হাত বুলাতে লাগলো।

শেষ



অজিতকৃষ্ণ বসু

অম্লান বাড়রী আজ চলে গেল অনেক দূরে আর অনেক উঁচুতে। জানি নে কবে ফিরবে! জানি নে আর ফিরবে কি । । রাত্রি গভীর, তবু ঘুম আসছে না চোখে। খোলা জানালার বাইরে ।লকা অন্ধকার হাওয়ায় ভাসছে। কালো আকাশে ঝিকমিক রছে সোনালী তারা। চলে-যাওয়া দিনের টুকরো টুকরো কথা নে পড়ছে।

"কোনো মেয়েকে কখনো ভালো বেসেছেন দাদা?" হঠাৎ ।কদিন গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করেছিল অম্লান বাড়রী।

জবাব খুঁজছি মনে মনে, তখন হঠাৎ অম্লান বললে "থাক দাদা। বাব শুনেই বা কি করব?"

তার পর অতীত-স্বপ্ন-ছলছল চোখে বললে, "বিশ বছর আগের কথা। পদ্মা পারের দেশ থেকে ফিরছি গঙ্গাতীরের দেশে। বয়স শৈশব পেরিয়েছে, মন শৈশব পেরোয় নি। দু'চোখ জুড়ে ভালো লাগার নেশা। নারাণগঞ্জ থেকে গোয়ালন্দ অনেকটা পথ। এক ঘেয়ে জল, জল, আর জল। সেই জলের বুকে ভাসছে ষ্টীমার। বুকের আগুনের জ্বালা তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে গোয়ালন্দর দিকে। বুকে তার চেয়ে বড়ো জ্বালা নিয়ে চলেছেন এক বিধবা ভদ্র মহিলা। সঙ্গে তার একমাত্র সন্তান, বছর সাতেকের মেয়ে। সে হলো আমার, আমি হলুন তার, খেলার সাথী। আমার মা হলেন ওর মা'র সহযাত্রিনী দিদি।

সদ্যবিধবা তিনি, চলেছেন অনাথা কন্যাকে নিয়ে, মাসতুতো দাদার আশ্রয়ে। দাদাটির হৃদয় ভালো হলেও অবস্থা ভালো নয়; তবু অকূল পাথারে এখন তিনিই অনাথার একমাত্র আশ্রয়।

"জীবনবীমা করেন নি ভদ্রমহিলার স্বামী?" বললে অম্লান বাড়রী। মৃত্যুর মাস খানেক আগে বাড়ী থেকে তিনি এক রকম অপমান করেই তাড়িয়ে দিয়েছিলেন এক জীবনবীমার দালালকে। ভদ্রলোক বীমাটি করে মারা গেলে ঐ বীমার টাকা তাঁর বিধবার আর অনাথা মেয়ের কত বড় সহায় হতো একবার ভেবে দেখুন তো দাদা! অমন অকূলে ভাসতে হতো না তাদের। আবার ছলছলিয়ে উঠলো জীবনবীমার দালাল অম্লান বাড়রীর দু'টি চোখ! হয় তো মুহূর্ত্তেকের জন্যে জ্বল-জ্বল করেও উঠলো সেই স্বামীটির অদূরদর্শিতা আর দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কথা ভেবে। বন্ধুর কাজ করতে গিয়েছিলেন জীবনবীমার দালাল, তাকে তিনি আপদ ভেবে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন!

"আমিও তখন পিতৃহারা। মেয়েটিও পিতৃহারা।" বলতে লাগলো অম্লান বাড়রী। "পিতৃহারা হওয়াটা জীবনে যে কত বড়ো ট্র্যাজেডি সেটা বুঝবার বয়স তখন আমার হয়েছে কিন্তু ঐ মেয়েটির হয়নি। বাবা আর তার নেই, এইটে সে বুঝেছিল, কিন্তু সে না থাকা যে কত বড়ো না-থাকা সেইটে বোঝার মতো বুদ্ধি তখনো তার হয়নি। আমার সারা হৃদয় সমবেদনায় টনটন করে উঠলো! সেই সমবেদনার মাত্রা ছাড়িয়ে কখন অনেক উঁচুতে উঠে গেল নিজেই টের পেলুম না। ভুলে গেলুম সে আমার ক্ষণিকের সহযাত্রিনী, তার সঙ্গে পরিচয়ের পালা সদ্য সুরু, অচিরেই সারা হয়ে যাবে। মনে হলো এ পরিচয় যেন নতুন নয়, যেন এর সুরু নেই শেষ নেই। গুরুদেবের কবিতার সঙ্গে ভালো পরিচয় থাকলে তাঁরি ভাষায় মনে হতো: 'তোমারেই যেন ভালবাসিয়াছি শতরূপে শত বার, জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার। আপনি হাসছেন নাকি দাদা?"

"এ তো হাসির কথা নয়, অম্লান বাবু, যে হাসবো?"

আমার কথা শুনে আশ্বস্ত হয়ে অম্লান বলতে লাগলো, "প্রেম বুঝবার বয়স তখনো হয় তো, হয়নি, কিন্তু আমার মনে হয় আমার অজানতেই মেয়েটিকে আমি ভালোবেসে ফেলেছিলুম। রূপ বিচার করবার বয়স নয় তখন, মনের অবস্থাও নয়। তার মুখের আদলটিও এতদিন পরে একেবারেই মনে নেই। তবু মনে হয় রূপের অভাব হয়তো ছিলো না মেয়েটির;"

"মেয়েটির নামও কি আপনার মনে নেই অম্লান বাবু?"

"নাম তার শুধাইনি দাদা! হয়তো সংকোচ হয়েছিলো। অথবা হয়তো ভেবেছিলেম পরিচয়ের এই তো শেষ নয়, পরে নামটা জেনে নেওয়া যাবে। কিন্তু সে সুযোগ আর হলো না। শুনলুম ওর মা ওকে ডাকলেন 'খুকু' বলে। কিন্তু ও নামে বাংলা দেশের হাজারো মা ডাকেন তাদের মেয়েদের। গোয়ালন্দের আগেই এক ষ্টীমার-ষ্টেশনে নেমে গেল মেয়েটি তার মা আর মামার সঙ্গে। তারপর আর তার সঙ্গে দেখা হয় নি। জানি নে তার নাম, ভুলে গেছি তার চেহারা, জানি নে সে কোথায়। তবু সে-ই আছে আমার সারা হৃদয় জুড়ে।"

তারপর বছরের পর বছর যেতে যেতে বালক অম্লান সাবালক হয়ে উঠলো। হায়, তখন কোথায় তার সেই ষ্টীমারের সঙ্গিনী? তাকে একবার, শুধু একবার দেখতে পেলে, অন্ততঃ কোথায় কেমন সে আছে জানতে পেলেও সুখী হতো অম্লান, কিন্তু উপায় নেই, কোনো উপায় নেই তার সন্ধান পাবার।

"জীবনে যখন এলো জীবিকা বেছে নেবার প্রশ্ন," বললে অম্লান বাড়রী, "আমি বেছে নিলুম জীবনবীমার দালালী। মনে পড়লো আমার ষ্টীমারের সঙ্গিনীরব বাবার কথা, যিনি জীবনবীমার দালালকে অপমান করে তাড়িয়ে কপর্দ্দকহীন অসহায় করে ভাসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন স্ত্রী-কন্যাকে। তা সম্ভব হয়েছিলো ঐ দালালটির আনাড়িপণার জন্যে। সে হতে পারেনি যথেষ্ট পরিমাণে নাছোড়বান্দা। হতে পারে নি বীমাদালালীর আর্টে পাকা আর্টিষ্ট। তার সেই অপরাধে এক বিধবাকে অনাথা মেয়ে নিয়ে অকূলে ভাসতে হলো।

জানি নে সে কোন্ বীমা কোম্পানীর দালাল, কি তার নাম। কিন্তু তার এ অপরাধ কখনো ক্ষমা করব না। অবহেলা অপমানকে খৃষ্টের মাথার কাঁটার মুকুটের মতোই শিরোধার্য করে নিতে হবে প্রত্যেক বীমা-দালালকে। তাদের ত্যাগ, অধ্যবসায়, একাগ্রতা, একনিষ্ঠা, আন্তরিকতা আর দক্ষতার ওপর নির্ভর করছে অসংখ্য ভাবী বিধবা আর ভাবী পিতৃহীন পিতৃহীনার ভবিষ্যৎ। এ এক মহান দায়িত্ব। বীমার দালালী শুধু অর্থকরী পেশা নয় দাদা! একে আমি জীবনের এক মহান ব্রত বলেই গ্রহণ করেছি।"

অম্লান বাড়রীর বীমা দালাল-জীবনের প্রথম মক্কেল হলেন মহেশ মুস্তফী, বড় ব্যাংকের ছোটো কেরাণী। লেজার-কীপার। মোটা লেজার খাতায় পরের টাকার নির্ভুল হিসাব লেখেন, বয়স চল্লিশের কিছু বেশী। চেহারা পঞ্চাশের মতো। বারুইপুর থেকে যাতায়াত করেন চাকরীতে, খানিকটা ট্রেনে, খানিকটা ট্রামে-বাসে। একদিন চেক ভাঙাতে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো অম্লান বাড়রীর, আর সামান্য পরিচয় থেকে দ্রুতবেগে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠতে অম্লানের দক্ষতা অসামান্য! অচিরেই অম্লানের জানা হয়ে গেল নিঃসন্তান বিপত্নীক অবস্থায় তিনি সংপ্রতি দ্বিতীয় বার বিবাহ করেছেন। সহরের চড়া বাড়ীভাড়া পোষাতে পারেন না, তাই বারুইপুরে রেল-ষ্টেশনের ধারে একটা ছোট বাড়ীতে বাস করেন। পত্নী মালতী মুস্তফী সেলাই শেখান বাড়ীর পাশেই একটি মেয়ে-ইস্কুলে। বেতন যা পান তা না বলাই ভালো। বেশী বয়সে দ্বিতীয় বার বিয়ে করে'ফেলে একটু অনুতপ্ত, একটু চিন্তিত ছিলেন মহেশ মুস্তফী। ব্যাংকে তো পুঁজি কিছুই নেই, অসময়ের সম্বল হতে পারে এমন অলংকারও কিছু দিতে পারেন নি স্ত্রীকে। হঠাৎ একজন তরুণ সহকর্মী মারা গেল দুদিনের অসুখে! অমনি মুস্তফীর মনে হলো মানুষের জীবন পদ্মপাতার জলের মতো, এই আছে এই নেই। হঠাৎ তিনি চোখ বুজলে তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের কি গতি হবে? কিছুই তো ব্যবস্থা করতে পারেন নি এদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যে। বারুদ তৈরিই ছিলো, তাতে স্ফুলিঙ্গ যোগালে অম্লান বাড়রী। ফলে মহেশ মুস্তফীর জীবন অম্লানের মধ্যস্থতায় পাঁচ হাজার টাকার জন্যে বিশ বছরী মেয়াদে বীমায়িত হয়ে গেল। ভারী পয়মন্ত মক্কেল তিনি, দোকানদারী ভাষায় "ভাল বউনি"। মুস্তফীর পরে জীবনের পর জীবন দ্রুতবেগে বীমায়িত হতে লাগলো অম্লানের হাতে, অম্লানের কমিশন অ্যাকাউন্ট জমা হতে লাগলো কমিশনের পর কমিশন, কোম্পানী খুশী হলো করিৎকর্মা অম্লান বাড়রীর করিৎকর্মণ্যতা দেখে। কিন্তু এর জন্যে অম্লান ধন্যবাদ দিলে মহেশ মুস্তফীর পয়মন্ততাকে। মনে মনে চিরজীবনের জন্যে মুস্তফীর কাছে ঋণী হয়ে গেল অম্লান।

তারপর ব্যাংকের সেই শাখা থেকে আরো দূরে অন্য শাখায় বদলি হয়ে চলে গেলেন মহেশ মুস্তফী। দৈনিক যাতায়াতের দূরত্ব অনেকখানি বেড়ে গেল। অম্লান বাড়রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। এ শহরে মহেশ বাবুর একমাত্র যাতায়াত হলো ব্যাংক থেকে বারুইপুরের বাড়ী, আর বারুইপুর থেকে ব্যাংক। যেতেন না কোনো সভা-সমিতিতে, লাইব্রেরীতে, সিনেমা থিয়েটারে, গান-বাজনার জলসায়, বা তাস-পাশার আসরে। ধীরে ধীরে তাই বছর ভিড়ে অম্লানের স্মৃতির পর্দা থেকে হারিয়ে গেলেন মহেশ মুস্তফী।

তারপর বলতে লাগলো অম্লান—"জীবনবীমা আমার দিন-রাতের নেশা হয়ে উঠলো। যারা গরীব, যারা মধ্যবিত্ত, তাদের জীবন-বীমা করাতে লাগলুম তাদের পোষ্যদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যে। যারা গরীব নয়, মধ্যবিত্তও নয়, তাদের জীবনবীমা করাতে লাগলুম তাদের দেওয়া মোটা মোটা প্রিমিয়ামগুলো বারোয়ারী বীমা ভাণ্ডারকে ফাঁপিয়ে তুলবে বলে। বীমার কমিশনের টাকায় আমার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউণ্ট ভরে' উঠতে লাগলো। আইবুড়ো মানুষ, বাবুয়ানা নেই, নেশা নেই। খরচা সামান্য। কষে চালাতে লাগলুম পরের জীবন-বীমা করানো। আর নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমানো। ময়রা যেমন নিজের সন্দেশ খায় না, আমার জীবন তেমনি আমি। বীমা করিনি দাদা!"

"করেন নি কেন?"

"করবো কার জন্যে বলুন? আমি মলে কাঁদবার তো কেউ নেই।"

মরলে কাঁদবার লোক রেখে যাবার জন্যে অনেকে ব্যস্ত হয়। কিন্তু ব্যস্ত হয় নি অম্লান বাড়রী। তার স্মৃতি আচ্ছন্ন করে রয়েছে বিশ বছর আগে ষ্টীমারে দেখা সেই সদ্য-পিতৃহারা মেয়েটি।

সেই ষ্টীমারে অম্লানের হৃদয়ের জমিতে পড়েছিল প্রেম-বটের ছোট বীজ। এই বিশ বছর ধরে সেই বীজ থেকে অংকুরিত হয়ে প্রেমের বটবৃক্ষ শাখায়-প্রশাখায় বিস্তৃত। তার মন জুড়ে জ্বলছে আশার প্রদীপ, একদিন হয়তো দেখা হবে তার সেই ষ্টীমার-সঙ্গিনীর সঙ্গে, তখন তার কাজে লেগে হয়তো ধন্য হতে পারবে অম্লানের জমানো টাকা। সেই দিনের প্রতীক্ষা নিয়ে ব্যাংকে টাকা জমছে অম্লানের।

কেটে গেল দশ বছর। তার পর একদিন অম্লানের বীমা কোম্পানীর কাছে চিঠি এলো মহেশ মুস্তফীর! তিনি জানতে চেয়েছেন, তাঁর জীবনবীমার পলিসিটা আর চালু না রেখে কোম্পানীর কাছে সমর্পণ করে দিলে তিনি কত টাকা এখনই পেতে পারেন। সে চিঠি কোম্পানী পাঠালে অম্লান বাড়রীর হাতে; কেন না অম্লানেরই মক্কেল মহেশ মুস্তফী বারুইপুর থেকে চিঠি লিখেছেন মহেশ বাবু, অম্লানের বীমা-জীবনের সর্বপ্রথম মক্কেল। অসাধারণ দুরবস্থায় না পড়লে চালু বীমা মেয়াদের মাঝপথে বন্ধ করে দেবার লোক তিনি নন! এতদিন তাঁর খোঁজ নেয়নি বলে লজ্জিত অনুতপ্ত হয়ে অম্লান সটান চলে গেল বারুইপুর। মহেশ মুস্তফীর বাড়ী খুঁজে পেতে দেরী হলো না। ষ্টেশন থেকে মিনিট খানেক দূর ছোট্ট একতলা পশ্চিমমুখো পুরোনো জরাজীর্ণ ইটের পাঁজর-দেখানো বাড়ী। সেই বাড়ীর সামনে দিকে বারান্দায় ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আছেন জরাজীর্ণ এক ভদ্রলোক। পশ্চিম দিগন্তে ঢলে-পড়া গোধূলির সূর্য্যের দিকে দুর্বল দৃষ্টি মেলে হয়তো ভাবছেন তাঁর জীবনসূর্য্যের পশ্চিম দিগন্তের কথা। ভদ্রলোকের অনতিদূরে একটা ছোট্ট নীচু টুল দাঁড়িয়ে আছে।

রাজরোগে আক্রান্ত চেহারা। ভুল হবার জো নেই। বছর দশেক পর এই প্রথম মহেশ বাবুকে এমনটি দেখবে ভাবতে পারে নি অম্লান। শিউরে উঠলে ভেতরে ভেতরে কিন্তু বাইরে তা প্রকাশ করলে না। মুখে সহজ হাসি আনবার চেষ্টা করে বললে, "আপনাকে দেখতে এলুম মহেশ বাবু! অনেক দিন পর"। অকারণ শুধালে না "কেমন আছেন"? তার পরিবর্তে বললে "চিনতে পারছেন তো? আমি অম্লান বাড়রী। সেই জীবনবীমার"—,

"বড় সুখী হলুম অম্লান বাবু"! "বললেন ক্ষীণ কণ্ঠে মহেশ মুস্তফী।

তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, "বীমাঅফিস থেকে পাঠিয়েছে বুঝি ?"

এতদিন খোঁজখবর নেয় নি বলে, লজ্জিত বোধ করে অম্লান বললে, "কোম্পানীর তরফ থেকে আমি আসিনি মহেশ বাবু! এসেছি নিজের তরফ থেকে। কবে অসুখ হলো, কবে চাকুরী ছাড়লেন কিছুই জানি নে। হঠাৎ কোম্পানীতে আপনার চিঠি যেতেই—" অদূরের টুলটা দেখিয়ে মহেশ বাবু বললেন "আগে বসে নিন অম্লান বাবু। না না, আর কাছে এগোবেন না। বড় মারাত্মক ব্যাধি। গ্যালপিং নয় যে চট করে ফুরিয়ে যাব। তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছি আর চোখের সামনে বেড়ে যেতে দেখছি স্ত্রী-কন্যার দুর্দশা। আমি মৃত্যু চাই, কিন্তু মৃত্যু পাইনে অম্লান বাবু!"

"ও কথা ভাবছেন কেন মহেশ বাবু?"

অম্লান বললে। "টি বি আজকাল আকছার ভালো হচ্ছে।"

ম্লান হেসে মহেশ বাবু বললেন, "এ টি বি আর ভালো হবার নয় অম্লান বাবু! ডাক্তারও জবাব দিয়ে গেছে। ধরা পড়েছে আড়াই বছর হলো, কিন্তু বুকে গোপন বাসা বেঁধেছিলো অনেক আগে। গোড়ার কারণ ম্যালনিউট্রিশান—পুষ্টির অভাব। আর সে জন্যে দায়ী হয়তো আমার এই জীবনবীমা।"

চমকে উঠলো অম্লান বাড়রী। তবে কি তাঁর এই কাল ব্যাধির জন্য জীবনবীমার দালাল অম্লান বাড়রীকেই প্রকারান্তরে দায়ী করছেন মহেশ মুস্তফী ?

"দশ বছর আগের কথা ভাবছি অম্লান বাবু।" বলতে লাগলেন মহেশ মুস্তফী। "হঠাৎ ভাবলুম আমি চোখ বুজলে আমার স্ত্রী-পুত্রকন্যার উপায় হবে কি? তাদের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্যে চোখ বুজে জীবনবীমা করে ফেললুম পাঁচ হাজারী। প্রিমিয়াম যোগাতে দুধ বন্ধ করে দিতে হলো, মাছ খাওয়াও এক রকম ছেড়েই দিলুম—সুরু হলো কোনোরকমে ডাল-ভাত খেয়ে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি। হয়তো বীমা না করে ঐ প্রিমিয়ামের টাকায় একটু দুধ-মাছ খেয়ে দেহের পুষ্টি বাঁচালে আমার টি বি হতো না।"

এই দৃষ্টিকোণ থেকে অম্লান জিনিসটাকে ভেবে দেখেনি কখনো। আত্মপক্ষ-সমর্থনী জবাব চিন্তা করছে, এমন সময় মহেশ মুস্তফী বললেন, "কিন্তু সে জন্যে আমি আফশোষ করি নে অম্লান বাবু!"

সত্যিই সেজন্যে তাঁর কোনো আফশোষ বা নালিশ নেই, সেটা নিঃসংশয়ে বোঝা গেল তাঁর কণ্ঠস্বর এবং বলার ভঙ্গী থেকে। কিন্তু মহেশ মুস্তফীর নিজের মনে কোনো আফশোষ বা নালিশ না থাকলেও অম্লান বাড়রীর মনে হ'তে লাগলো মহেশ বাবুর এই দুর্গতির জন্য সেই দায়ী, এ ক্ষতি যথাসম্ভব পূরণ না করলে তার বিবেক তাকে কোনো দিন ক্ষমা করবে না।

"এক দিকে বীমার পাঁচ হাজার টাকা, অন্য দিকে আমার স্ত্রী মালতী—যে এখন রসুইখানায় আমার খানা বানাচ্ছে, আর আমার সাত বছরের মেয়ে, যে এখন ঘুমিয়ে আছে ও ঘরে। মাঝখানে উঁচু দেয়ালের মতো ব্যবধান দাঁড়িয়ে আছি আমি, ব্যবধানটি সরে গেলেই, এই পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে ওরা বেঁচে যায়। আমার সঙ্গে এরাও তিলে তিলে কেন মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাবে? এরাও যদি আমারই সঙ্গে রওনা হয়, তাহলে আমার এই বীমার যে কোনো সার্থকতাই থাকবে না অম্লান বাবু।" বলে' দম নিতে লাগলেন মহেশ মুস্তফী। কাশি চেপে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পুরোপুরি চেপে রাখতে পারলেন না।

"অত কথা বলবেন না মহেশ বাবু।" বললে অম্লান। "কথা কইতে কষ্ট হচ্ছে আপনার, দেখতে পাচ্ছি।"

"কথা না কয়ে থাকতে তার চেয়ে বেশী কষ্ট হয় অম্লান বাবু!" বললেন মহেশ মুস্তফী। "আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব কেউ তো আসে না, সবাই বয়কট করেছে। ডাক্তার বলে দিয়েছে এখানকার চিকিৎসায় আর কিছু হবার নয়; চলে যাও উঁচু হিলষ্টেশনে, স্যানাটোরিয়ামে। এদিকে ছ' মাসের ভাড়া বাকী, বাড়ীওয়ালা গলাধাক্কার শাসানি দিয়েছে। মুদী দোকানের বাকী না শুধলে আর জিনিষ দেবে না। মালতীর ইস্কুলের চাকুরীরও এই শেষ হপ্তা। তার পর পতির মতো সতীও বেকার।"

করুণ তিক্ত হাসি হেসে উঠলেন মহেশ মুস্তফী, আসন্ন নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে বেপরোয়া শেষ হাসির মতো। সে হাসির ব্যথা বিঁধলো এসে জীবনবীমার দালাল অম্লান বাড়রীর বুকে। কিন্তু এমনি করুণ কাহিনী অনেক ছড়িয়ে আছে বাংলা দেশ জুড়ে। মহেশ মুস্তফীর মতো অসহায় টি-বি গ্রস্তের অভাব আর যে দেশেই থাক বাংলা দেশে নেই। সোনার বাংলার লাখো হতভাগ্যের অন্যতম হতভাগ্য এই মহেশ মুস্তফী। এর জন্য কত বেশী আর মাথা ঘামাতে পারে অম্লান বাড়রী? কিন্তু না। অম্লান বাড়রীর কাছে মহেশ মুস্তফী লাখের ভেতর তুচ্ছ অন্যতম নয়; এঁকে দিয়েই হয়েছিল তার বীমা-জীবনের শুভ সূত্রপাত। এঁর জীবনের, আর এঁর স্ত্রী-কন্যার মঙ্গল-অমঙ্গলের দায়িত্ব তো এড়িয়ে যেতে পারে না অম্লান! ধর্মে সইবে না। আর ধর্মে যদি বা সয়, বিবেক রেহাই দেবে না তার হৃদয়কে।

বাড়রীর ভাবনার কুয়াসা ঠেলে এগিয়ে এলো মহেশ মুস্তফীর হঠাৎ প্রশ্ন—"কিন্তু আমার চিঠির জবাবটা তো বললেন না অম্লান বাবু? আমার বীমাপত্র কোম্পানীর কাছে সারেণ্ডার করে দিলে তার বদলে এখখুনি কত পাওয়া যাবে? কিছু টাকা যেমন করে হোক চাই-ই যে অম্লান বাবু! দশ বছরে প্রায় হাজার তিনেক টাকা প্রিমিয়াম দিয়েছি। তার বদলে এখন শুধু নগদ কয়েক শো টাকা চাই।"

ব্যাপারটা হাল্কা নয়। তবু তাকে হাল্কা করে দিয়ে অম্লান হেসে বললে, "নিতান্ত সহজ ব্যাপারকে আপনি অকারণ শক্ত করে দেখছেন মহেশ বাবু! বীমা সারেণ্ডার করে দিলে আপনার তাহা লোকসান, আমার রেকর্ড খারাপ আর লোকসান দুই-ই। বীমাপত্র কোম্পানীর জিম্মায় জমা রেখে কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা ধার নিতে পারেন আপনি, শতকরা ছ' টাকা সুদে। তার কোন দরকার নেই মহেশ বাবু! শতকরা মাত্র দু' টাকা সুদে আমার অনেক টাকা ব্যাংকে পড়ে আছে। আমি আপনাকে ধার দিচ্ছি আপনার যত টাকা লাগে। শোধ দেবেন যখন খুসী, সুদ না দিলেও চলবে। নেহাৎ যদি দিতেই চান তো ঐ শতকরা দু' টাকা ব্যাঙ্কের সুদটাই দেবেন। এই নিন আমার কাছে এখন তিনশো টাকা আছে। পরে আরো—ও কি মহেশ বাবু?"

হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলেন মহেশ বাবু। তারপর বোধ হয় লজ্জা পেয়ে সামলে নিয়ে কোঁচার ডগা দিয়ে চোখ মুছে ফেললেন।

বললেন "কিছু নয় অম্লান বাবু! হঠাৎ মনটা কেমন করে' উঠেছিলো একটু। আপনজনে আমাদের ছেড়েছে, একটা পোষ্টকার্ড লিখেও খোঁজ নেয় না। আপনার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই, অথচ আপনি—"

আবার হেসে উঠে অম্লান বললে, "এতে যে আমার পুরো স্বার্থ রয়েছে মহেশ বাবু! সেটা আপনাকে খুঁটিয়ে বোঝাবার চেষ্টা না-ই বা করলুম। বীমা কোম্পানী বড়লোক, তার কাছ থেকে চড়া সুদে ধার নিয়ে তেলা মাথায় তেল না ঢেলে বরং আমার কাছ থেকে ব্যাংকের অল্প সুদেই ধার নিন। তাতে আমাদের দুজেরই সুবিধে। ধরুন টাকাটা।"

"রান্না সারা হলে একটু পরেই মালতী আসবে অম্লান বাবু!" বললেন মহেশ মুস্তফী। "টাকাটা ওর হাতেই দেবেন। লক্ষ্মীর জিনিষ আর এ লক্ষ্মীছাড়া হাতে নিতে চাই নে।"

টাকাটা অম্লান রেখে দিলে বুকপকেটে, শ্রীমতী মুস্তফীর হাতেই দেবে বলে। মনে মনে একটু ভেবে দেখলে ব্যাপারটা। ডাক্তার যে বলে দিয়েছেন এখানকার চিকিৎসায় আর কিছু হবার নয় তার কারণ হয়তো এই যে, দক্ষিণা আর ওষুধের দাম দেবার সামর্থ্য মুস্তফীদের আর নেই; নইলে দক্ষিণা প্রাপ্তির সম্ভাবনা যত দিন থাকে তত দিন ডাক্তাররা তো সহজে হাল ছাড়েন না! অবশ্য কথাটা যে তাঁরা সত্যিই বলেছেন, মহেশ মুস্তফীকে দেখে সে বিষয়ে আর সন্দেহ ছিল না অম্লানের মনে। এ দারুণ যক্ষ্মা থেকে রক্ষা নেই মহেশ বাবুর; এই জীবন্মৃত অবস্থায় তাঁকে টিকিয়ে রাখা অমার্জনীয় অপরাধ হবে বলেই মনে হলো অম্লান বাড়রীর—বরং অবিলম্বে যন্ত্রণাহীন মৃত্যুর কোন ব্যবস্থা করে দিতে পারলে আরো ভালো। অতএব আর চিকিৎসা নয়। আর ছ' মাসের ভেতর না হোক অন্তত: বছর খানেকের ভেতর ৺গঙ্গাপ্রাপ্তি হোক মুস্তফীর, এই কামনা করলে অম্লান বাড়রী। যন্ত্রণাময় জীবন থেকে শান্তিময় চিরবিশ্রামের দেশে চলে যান মুস্তফী—বীমার পাঁচ হাজার টাকা তাঁর স্ত্রী-কন্যার কল্যাণ করুক। সীঁথির সিঁদুর মুছে যাবে শ্রীমতী মুস্তফীর; তা মুছুক। ঐ সিঁদুর বজায় রাখবার জন্য দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত স্বামীকে এ ভাবে তিলে তিলে যন্ত্রণা সইবার জীবনে টিকিয়ে রাখা সতীর ধর্ম নয়, এ স্বার্থপরতা।

অম্লানের চিন্তাধারার আভাষ পেয়েছিলেন কি মহেশ মুস্তফী? তিনি বললেন "ভেবেছিলুম আত্মহত্যা করে সব চুকিয়ে ফেলবো। রাতের আড়ালে চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে শুয়ে থাকবো ঐ রেললাইনের ওপর আড়াআড়ি ভাবে, রেলগাড়ীর তলায় কাটা পড়বো বলে। মুখটা লাইনের বাইরে এগিয়ে রাখবো যাতে করে চাকার তলায় মুখটা থেঁৎলে না যায়, লাশটাকে মহেশ মুস্তফীর বলে সনাক্ত করতে অসুবিধে না হয়। কিন্তু ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলাম; আত্মহত্যা টের পেয়ে সেই অজুহাতে বীমা কোম্পানী যদি বীমার টাকা আটকে দেয়?"

"ঠিকই ভয় করেছিলেন মহেশ বাবু! বীমাকারীর আত্মহত্যা নিষেধ।" বললে অম্লান।

"কিন্তু তার চাইতে বড়ো ভয় কি জানেন?" বললেন মুস্তফী। "মালতীর বৈধব্য। সীমন্তে সিঁদুর মুছে যাবে মালতীর, ভেঙে যাবে হাতের শাঁখা, সাড়ীতে থাকবে না পাড়, মুখে থাকবে না হাসি। তবু তাকে বাঁচতে হবে মেয়েটার জন্যে। নির্মম পৃথিবীর সমস্ত নির্মমতার সঙ্গে একা লড়াই করে তাক বেঁচে থাকতে হবে। সে যন্ত্রণা যে মালতীর পক্ষে কী মর্মান্তিক, তা আমি ভাবতেও শিউরে উঠি অম্লান বাবু!"

সে বিষয়ে অম্লানের সন্দেহ রইলো না মহেশ মুস্তফীর মুখের পানে তাকিয়ে। দেখলে মুস্তফীর গভীর দুটি চোখের ওপর নেমে এসেছে চোখের দুটি পাতা, আর দুটি চোখের কোণ থেকে নেমে আসছে ক্ষীণ অশ্রুধারা। আবার মুছে ফেললেন দু'চোখ মহেশ মুস্তফী। আবার বলতে লাগলেন "সেকালের বেহুলার কথা বইতে পড়েছিলাম। আর একালে মালতীকে চোখে দেখছি। বেহুলা তার মৃত স্বামীকে নিয়ে ভেলায় ভেসেছিলো স্বামীর দেহে প্রাণ ফিরিয়ে আনবে বলে। আর এই অকরুণ সংসার-সমুদ্রে মুমূর্ষু স্বামীকে নিয়ে আশার ভেলায় ভাসছে মালতী। পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ সমস্ত ব্যথা সইতে সে রাজী, তার বিনিময়ে যদি বাঁচিয়ে রাখতে পারে আমাকে। এর চাইতে বরং মালতী যদি আমার মৃত্যু-কামনা করতো অম্লান বাবু, আমি তা'হলে হাসিমুখে মরে যেতে পারতুম। আমি মৃত্যু চাই, বিশ্বাস করুন। আমি মৃত্যু-কামনা করি, কিন্তু শুধু ওরই মুখের দিকে চেয়ে আমি মৃত্যু প্রার্থনা করতে পারিনে।"

অম্লান বললে, "প্রার্থনা করবার প্রয়োজনও নেই মহেশ বাবু! অকারণ কেন এসব ভাবনা ভাবছেন?" আর মনে ভাবলে সত্যিই মৃত্যু প্রার্থনার প্রয়োজন নেই, দুয়ারে মৃত্যু আপনিই এসে দাঁড়িয়েছে।

রাজরোগগ্রস্ত মৃত্যু-পথযাত্রী একাধিক দেখেছে অম্লান বাড়রী, তারা সবাই ব্যাকুল ভাবে কামনা করছে বেঁচে থাকবার। মৃত্যু-ভীতি অনেক দেখা, চোখে মহেশ মুস্তফীর মৃত্যু-প্রীতি দেখে একটু বিস্মিত হলো অম্লান বাড়রী।

মহেশ বাবুর পিছনে ঘরের জানালাটা ছিল খোলা। সেই জানালার ভেতর থেকে প্রশ্ন এলো নারী-কণ্ঠে, "হ্যাঁ গো, তুমি এখন খেয়ে নেবে কি? রান্না হয়ে গেছে।"

টুলের ওপর যেখানে বসে ছিল অম্লান, সেখান থেকে ঘরের ভেতরে দৃষ্টি যায় না, তাই প্রশ্নকারিণীকে সে দেখতে পেলে না। কিন্তু ঐ কণ্ঠস্বরের স্পর্শ লেগে তার হৃদয়ের তন্ত্রী যেন সহসা ঝংকৃত হয়ে উঠলো।

"এখখুনি কি যেতে হবে মালতী?" শুধালেন মহেশ মুস্তফী। "পাঁজিতে ক'টা পর্য্যন্ত আছে আজ খাবার লগ্ন?"

নারী-কণ্ঠের জবাব এলো "সাতটা বেজে দশ মিনিট পর্য্যন্ত। এখন বাজে ছ'টার কাছাকাছি।"

"তা'হলে একটু পরেই খাবো মালতী! এখনো ঘণ্টাখানেকের ওপর সময় হাতে আছে। তুমি একটু এদিকে এসো। অম্লান বাবু এসেছেন, আমার পুরাতন বন্ধু।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়ালেন ভদ্রমহিলা। সুন্দরী তাঁকে কোনো মতেই বলা চলে না, কিন্তু তাঁকে সুশ্রী না বলে হৃদয় তৃপ্তি পায় না। ললাটের মাঝখানের টিপে আর সীঁথিতে জ্বল্-জ্বল্ করছে সিঁদুর। দুঃখে যে আছেন বোঝা যায়, কিন্তু দুঃখ তাঁকে দমাতে পারে নি। চেহারা দেখে আন্দাজ করা যায় বয়স তিরিশ পেরোতে দু'-তিন বছর এখনো বাকী।

দাঁড়িয়ে উঠে দু' হাত জুড়ে নমস্কার জানালো অম্লান। স্মিতমুখে প্রতি-নমস্কার জানিয়ে মালতী মুস্তফী বললেন, "আপনি বসুন। আমি এইখানে বসছি।" বলে বারান্দায় সিঁড়ির ধারে বসে পড়লেন। অপরিচয়ের সংকোচ অনায়াসে কাটিয়ে দেবার অসামান্য ক্ষমতা ভদ্রমহিলার।

তাঁর পানে একবার তাকিয়েই অম্লানের মনে পড়ে গেল বিশ বছর আগেকার সেই ষ্টীমারের সহযাত্রিনীর কথা। এত দিনের প্রতীক্ষা কি আজ শেষ হলো? হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠলো অম্লান বাড়রীর। ঘুচলো না সংশয়ের দ্বন্দ্ব। প্রশ্ন এলো মনে "মনে কি পড়ে আপনি ছোটোবেলায় কখনো ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ থেকে—" কিন্তু সে প্রশ্ন মুখে আনতে ভরসা পেলো না অম্লান। জবাবে মালতী মুস্তফী যদি বলেন "না", তাহলে সেই নিদারুণ আশাভঙ্গের ব্যথা বড়ো দুঃসহ হয়ে বাজবে অম্লানের বুকে—তীরের কাছে এসে নৌকোডুবির মতো। আর যদি বলেন "হাঁ", যদি নিঃসংশয়ে অম্লান জানে মৃত্যুপথযাত্রী রাজরোগীর দুর্ভাগাবতী এই জীবন-সঙ্গিনীই তার সেই হারিয়ে-যাওয়া ষ্টীমার-সঙ্গিনী, তাহলে সে দুঃখই বা কেমন করে সইবে অম্লান? কোনো প্রশ্ন তাই সে করলে না। সংশয়মোচন যখন দুঃখ ঘোচাবে না, দুঃখই দেবে, তখন তার চাইতে বরং থাকুক হৃদয়ে সংশয়ের দোলা।

"চরম দুঃসময়ে পরম বন্ধু এসে পড়েছেন, মালতী।" মুস্তফী বললেন। "সামনে অকূল দেখে ভেবে আকুল হয়েছিলুম; পেলুম কূলের ভরসা। এঁকেই বলছিলুম, মালতী আমার জন্যে কত দুঃখই না তুমি হাসিমুখে সয়েছো, সইছো। এ শুধু আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষেই সম্ভব।"

"মেয়েরা স্বামীর জন্যে দুঃখ সইবে না, তো সইবে কার জন্যে বলো?" বললেন মালতী মুস্তফী। "আর স্বামীদের সত্যিকারের ভালোবাসতে শুধু এ দেশের মেয়েরাই জানে, অপর দেশের মেয়েরা জানে না, এও আমি বিশ্বাস করিনে। ও-কথা শুধু তারাই বলে যারা অপর দেশের অকারণ নিন্দে করতে ভালোবাসে।"

বিস্মিত আর মুগ্ধ হলো অম্লান বাড়রী। এত দুঃখ, এত বিপদের ঝাপটা সয়ে, অকরুণ ভবিষ্যৎ সামনে জেনেও এমন সহজভাবে মালতী মুস্তফীকে কথা কইতে দেখে বিস্ময়ের সীমা রইলো না অম্লানের।

"এই দু'বছর ধরে এত দুঃখ আপনারা সয়েছেন, অথচ আমি লাগতে পারি নি আপনাদের কোনো কাজে, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না মহেশ বাবু!" কথাটা মহেশ মুস্তফীকে বললে বটে অম্লান, কিন্তু মালতী মুস্তফীকে শুনিয়ে।

"দুঃখ সয়েছে মালতী, কিন্তু তবু ওর মুখের হাসিটুকু এক দিনের তরেও ম্লান হতে দেখিনি অম্লান বাবু!" বললেন মুস্তফী। "দুঃখকে যেন দুঃখ বলে কেয়ারই করে না। আশ্চর্য্য!"

আবার হাসলেন মালতী মুস্তফী তাঁর তুলনাবিহীন হাসি। বললেন "দুঃখকে ভয় পেলেই তো আর দুঃখ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবে না? তাছাড়া ভেতরের কান্না বাইরে কেঁদে লাভ কি?"

অস্তোন্মুখ সূর্য্যের লাল আলোয় চক্ চক্ করে উঠলো মালতী মুস্তফীর চোখ দুটি। আর ঐ দু'টি চোখের দিকে তাকিয়ে অম্লানের চোখের সামনে আবার ভেসে উঠলো বিশ বছর আগে পদ্মানদীর বুকে সেই ষ্টীমারের সঙ্গিনীর সঙ্গে প্রথম দেখার সেই একটি পরম মুহূর্ত্ত। আর আজকের সূর্য্যাস্তবেলায় আরেকটি পরম মুহূর্ত্ত! সেই মুহূর্ত্তে কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেল অম্লান বাড়রীর। মনে হলো তার এত দিনের সযত্ন সঞ্চয় হয় তো এত দিনে সার্থকতার সুযোগ পেলো।

তার পরের কাহিনীটুকু সংক্ষেপে বলা যায়, আর সংক্ষেপে বলাই ভালো। অম্লান বললে "আমি ছ' মাসের ছুটি নিয়ে যাচ্ছি উঁচু স্বাস্থ্যকর হিল্-ষ্টেশনে। আপনারা চলুন আমার সঙ্গে, এ বাড়ীর পাট তুলে দিয়ে। আমার এক বন্ধুর চমৎকার বাড়ী খালি পড়ে থাকে সেখানে—যত দিন খুসী থাকতে পারবেন, এক পয়সা ভাড়া নেবে না বন্ধুটি; বাড়ী ভাড়া সে দেয় না। আমি সব বন্দোবস্ত করে দেবো।" বন্ধুর ভাড়াহীন বাড়ীর কথাটা মিছে কথা। মুস্তফীরা ঐ বাড়ীতে গেলে বাড়ীওয়ালাকে মাসের পর মাস নিয়মিত ভাবে বাড়ী ভাড়া গোপনে দেবার ব্যবস্থা করবে অম্লান।

তারপর বললে, "নিরালা বাবার একটি শাখা-আশ্রমও সেখানে আছে। আশ্রমের সেবকদের কাছ থেকে সব রকম সাহায্যও সর্ব্বদাই পেতে পারবেন, যখন যা দরকার। আশ্রমের সবাই আমার চেনা।" এ কথাটা সত্যি। "তাছাড়া" বললে অম্লান "খুব উঁচুদরের একটি স্যানাটোরিয়াম আছে সেখানে, মিশনারীদের। সেরা ডাক্তারদের চিকিৎসার সুযোগ চাইলেই পাওয়া যাবে। স্যানাটোরিয়ামের মিশনারীদের প্রায় সবাইকে আমি খুব ভালো চিনি। ডাক্তারের ফী, ওষুধের দাম কিছুই লাগবে না।" এও সত্য, শুধু শেষ কথাটা ছাড়া। খরচা লাগবে ঠিকই, সেটা গোপনে দেবার ব্যবস্থা করবে অম্লান।

শ্রীমতী মুস্তফী বললেন "কিন্তু···কিন্তু···"

অম্লান বললে, "এর ভেতর আর কিন্তু নেই। ওখানে আশ্রমের একটা স্কুল আছে ছোটদের জন্য, সেখানে আপনি সেলাই, খেলাধূলো, পড়ালেখা শেখাতে পারবেন। অল্প মাইনে, কিন্তু তাতেই আপনাদের চলে যাবে। ওখানে জীবন ধারণের খরচা বেশী নয়।" ঐ অল্প মাইনেটাও আশ্রম মারফৎ অম্লানই দেবে।

রাজী করাবার ক্ষমতা অসাধারণ অম্লান বাড়রীর। রাজী করিয়ে ফেললে সে মুস্তফীদের। তারপর জানা লোকদের চিঠি আর টাকা পাঠিয়ে সব আগে ঠিক করে ফেলে মুস্তফীদের নিয়ে আজ রওনা হয়ে চলে গেল উঁচু পাহাড়ী স্বাস্থ্যনিবাসে। চলে গেল পিছে ফেলে তার জীবনবীমার দালালী। জানি নে কবে সে ফিরবে! জানিনে আর ফিরবে কি না! শুধু এইটুকু জানি যে, মনের সংশয় ঘোচাতে কখনো সে প্রশ্ন করবে না শ্রীমতী মালতী মুস্তফীকে। "আপনার কি মনে পড়ে খুব ছোটবেলায় কখনো ষ্টীমারে চড়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে আপনি···" ইত্যাদি।

চিত্রলেখা



[উপন্যাস]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মা

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

যশোধরা কথায় কাজে ঠিক। সন্ধ্যার মধ্যেই যাবার সমস্ত ব্যবস্থা করে নেয়। পরের দিন সবাই কাশী রওনা হয়ে যায়।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। গ্রীষ্মের স্নিগ্ধ রাত। বীজগুপ্তের কিন্তু একটুও ভাল লাগে না। পূব-আকাশে চতুর্দশীর চাঁদের আলো ঝলমল করছে, ওদিকে বীজগুপ্ত এক অব্যক্ত বেদনার জ্বালায় জ্বলছে। মশাল হাতে দাস-দাসীরা পাহারা দিয়ে চলছে, মশালের আগুনে তার হৃদয়ের প্রজ্বলিত শিখা দেখতে পায়। সে একেবারে মৌন—নিস্তব্ধ!

একটি রথে বীজগুপ্ত ও শ্বেতাংক, অপরটিতে মৃত্যুঞ্জয়ের সংগে যশোধরা। রাস্তার পাশের বাগান থেকে বেলা ও চামেলীর গন্ধে চারি দিক ভরে উঠছে। নিস্তব্ধতা ভংগ করে শ্বেতাংক বলে, "রাত অনেক হয়েছে, এবার বোধ হয় আমাদের বিশ্রাম করতে যাওয়া উচিত।"

সেনাপতি ভেবে চলেছে, তার মনের ভেতর একের পর এক চিন্তার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। তার সময়ের কোন খেয়াল নেই। যশোধরা তার কাছে এসে বলে, "আর্য্য! চলুন, এবার বিশ্রাম করা যাক্।"

সেনাপতির হুঁস হয়। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, চন্দ্রমা পূর্বাকাশ ছেড়ে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে চলেছে। শ্বেতাংককে বলে, "শ্বেতাংক, রথ থামাও, দেখ কাছাকাছি কোন গৃহ আছে কি না, যেখানে থাকবার ব্যবস্থা করা যায়।"

মৃত্যুঞ্জয়কে বলে, "আর্য্যশ্রেষ্ঠ! ক্ষমা করবেন। সময়ের কোন খেয়াল ছিল না আমার, আপনাদের অনেক কষ্ট হ'ল। কিন্তু রাতের প্রায় অর্দ্ধেক তো কেটেই গেছে, যদি মনে করেন তাহলে আমরা আরও খানিকটা এগিয়ে যেতে পারি। কোন গ্রামে পৌঁছিয়ে সেখানে কাল সারা দিন বিশ্রাম করব। কারণ, এস্থানে দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড গরম থেকে বাঁচবার কোন উপায় বোধ হয় করা যাবে না এবং সকালে রৌদ্রে চলাও ঠিক হবে না।"

"বীজগুপ্ত, তুমি ঠিকই বলেছ, আমাদের রাতেই আরও এগিয়ে যাওয়া উচিত।"

কিছুক্ষণ পরে শ্বেতাংক ফিরে এসে বলে, "কাছেই একটা সুন্দর স্থান দেখে এলাম, বাড়ী তো নয় যেন রাজপ্রাসাদ, আমার মনে হয় যে, ওখানে সেনাপতিরা থাকতেন। সব-কিছুর বেশ সুন্দর ব্যবস্থা আছে।"

মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "হ্যাঁ, এবার আমার মনে পড়েছে, এই স্থানে আমি থেকে গেছি, চমৎকার বন্দোবস্ত, আমাদের কোন অসুবিধেই হবে না।"

রথ প্রাসাদে এসে পৌঁছলে সেখানকার মালী সবাইকে স্বাগত করে ভিতরে নিয়ে চলল। উদ্যানে অতিথিগণের শোবার বন্দোবস্ত করা হ'ল। সবাই ক্লান্ত ছিল, শোবার সংগে সংগে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু বীজগুপ্তের ঘুম আসে না।

সে কোথায় চলেছে? কেনই বা চলেছে? এই প্রশ্নগুলি মনে জাগতেই তার সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। সে কাশী চলেছে কিসের জন্য—শান্তি পাবার জন্য? মানসিক ব্যাধি দূর করবার জন্য? আপন কর্তব্যপথ থেকে বিচ্যুত না হবার জন্য সে আজ কাশী চলেছে। তাকে পাটলিপুত্র ছাড়তে হয়েছে শুধু চিত্রলেখার কাছ থেকে দূরে সরে যাবার জন্য। কিন্তু যশোধরার কাছ থেকে তো সে মুক্তি পেলে না! যশোধরা তার আরও কাছে এসে পড়েছে, তাকে না চাইলে সে এত কাছে কিছুতেই আসত না। কিন্তু··· না, এ অসম্ভব! সে যশোধরাকে কিছুতেই ভালবাসতে পারে না, তার চোখের সামনে চিত্রলেখার ছবি ছাড়া আর কারু ছবি তো ভেসে ওঠে না! কিন্তু চিত্রলেখা কে, তার জীবনের সংগে চিত্রলেখার কী সম্বন্ধ? চিত্রলেখা তার প্রেমিকা, তার পত্নী। সে তাকে ভালবাসে, চিত্রলেখাও তাকে ভালবাসে। কিন্তু···এখনও কি সে ভালবাসে? হয়ত বাসে, আবার হয়ত না-ও বাসতে পারে। বাসে এ জন্য, কারণ তারই মংগলের জন্য সে তাকে ত্যাগ করেছে, আর সে যে তাকে ভালবাসে সে কথা যোগী কুমারগিরির সামনে সে স্বীকারও করেছে। কিন্তু আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার জীবনকে দুঃসহ করে দিয়ে সে চলে গিয়েছে, এত বড় আঘাত দেওয়া কি ভালবাসার লক্ষণ?

এমনি সব কত কি ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে যায়, চারি দিক কলরব-মুখরিত হয়ে ওঠে। পূর্বাকাশে আলোকের প্রথম রশ্মি তার রক্তিম আভা ছড়িয়ে দিয়ে বাতাসের সংগে খেলা করতে আরম্ভ করে দেয়, ওদিকে একটির পর একটি তারা আপন অস্তিত্ব লুপ্ত করে অন্তর্হিত হয়ে যায়। বীজগুপ্ত দেখে যে, কিছু দূরে অর্দ্ধ-উন্মীলিত বেল ফুলের ওপরের শিশির-বিন্দুর দিকে আনমনা ভাবে

তাকিয়ে যশোধরা দাঁড়িয়ে! বাইরের সুগন্ধ ও শীতল বাতাসে আপন তপ্ত হৃদয়কে শান্ত করবার জন্য সে বেড়িয়ে আসে। যশোধরা তাকে দেখতে পেয়ে একটা ফুল নিয়ে এসে বলে, "আর্য্য বীজগুপ্ত! দেখ প্রকৃতির কি অপরূপ রূপ! এখানে কত আনন্দ, কত শান্তি, কত সৌন্দর্য্য! পৃথিবীর চিন্তা, তৃষ্ণা ও অভিশাপগ্রস্ত জীবনের থেকে মুক্ত এক নিষ্কলঙ্ক জীবনের রং কে যেন প্রজাপতিদের পাখার ওপর এঁকে দিয়েছে!···"

বীজগুপ্ত যশোধরার পাশে এসে দাঁড়ায়; এক বার চার দিক তাকিয়ে নিয়ে বলে, "কিন্তু দেবি, প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য্যই তো আমার চোখে ধরা পড়ছে না?"

যশোধরা আশ্চর্য্য হয়ে বলে, "সে কি! প্রকৃতির কোন সৌন্দর্য্যই আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আপনি সত্যি কথা বলছেন না আপনি ঠাট্টা করছেন?"

"না, না, ঠাট্টা করব কেন, সত্যিই বলছি। তুমি প্রকৃতিকে সুন্দর দেখছ, কিন্তু আমার কাছে প্রকৃতি একেবারে কুরূপা মনে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, আর্য্য, এই দূর্বাদল কত কোমল, কত সুন্দর! তোমার এদেরও ভাল লাগছে না? আমার তো ইচ্ছে হচ্ছে যে, অনন্ত সময় পর্য্যন্ত এদের মাঝখানেই থাকি।"

"আরে সর্বনাশ! ও কাজটি করো না। এখানে কাছে কোন ডাক্তারও পাওয়া যাবে না, তোমার চিকিৎসাও করা যাবে না। তোমার কাছে দূর্বাদল কোমল ও সুন্দর লাগছে। কারণ, তুমি উন্মুক্ত স্থানে কখনও জীবনকে উপভোগ কর নি। কিন্তু এদের ভেতর কত কীট-পতংগ আছে, তাদের কথা কি কখনও চিন্তা করেছ? আর এদের ওপর কিছুক্ষণ থাকলেই তোমার ঠাণ্ডা লেগে যাবে। প্রকৃতি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, তার ভেতর অনেক অসুবিধে আছে।"

যশোধরার কাছে এ-সব কথা একেবারে নতুন হলেও বাজে ও অযৌক্তিক নয়। সে জিজ্ঞেস করে, "প্রকৃতি কেন পূর্ণ নয়?"

"প্রকৃতি পূর্ণ নয় এবং এই অপূর্ণতার জন্যই তো মানব কৃত্রিমতার আশ্রয় নিয়েছে। দূর্বাদল কোমল ও সুন্দর বটে, কিন্তু তারা শীতল ও তাদের ভেতর কীট-পতংগ বাস করে। তাই তো মানুষ মখমল তৈরি করেছে, যা ঠাণ্ডাও নয় এবং যার ভেতর কীট-পতংগও নেই অথচ দূর্বাদল অপেক্ষা কোমল! শীতের সময় এই সব স্থানে প্রকৃতির কুরূপ দেখতে পাবে, চারি দিক কুয়াসায় ঢাকা থাকে এবং এত ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করে যে সমস্ত শরীর কাঁপে। গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে এত প্রচণ্ড 'লু' চলে যে সারা শরীর ঝলসিয়ে যায়। প্রাকৃতিক এই অসুবিধে থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষ গৃহ নির্মাণ করেছে। সেই সব গৃহে উত্তরের বাতাস আটকাবার জন্য আগুন জ্বেলে তাপ উৎপন্ন করে, যা'তে ঠাণ্ডা না লাগে, আবার সেই সব গৃহে জবা ও খসখসের টাটা লাগিয়ে গরমের দিনে এত ঠাণ্ডা উৎপন্ন করে যে, সে বসন্তকালের সুখ অনুভব করে। প্রকৃতি মানবের সুখ-সুবিধে দেখে না, তাই সে পূর্ণ নয়!"

"কিন্তু ফুলগুলি কত কোমল ও তাদের কেমন মন-মাতান সুগন্ধ! চারি দিকের এই কলরব-গান কত মধুর! অপূর্ব সংগীতে মন কেমন মুগ্ধ হয়ে যায়। কোকিলের স্বর কত মিষ্টি ও কত করুণায় ভরা!"

"হ্যাঁ, ফুল কোমল হলেও তার বুকে কাঁটাও আছে। তা ছাড়া কত ছোট ছোট কীট এর ভেতর ঢুকে আছে! যে কোমলতা ও সুগন্ধের কথা বলছ তা তো ক্ষণিক! তবে সে সুগন্ধের দাম কি? অনেক সময় এই সুগন্ধ ব্যর্থ ছড়িয়ে যায়, কেউ তাকে গ্রহণও করে না। কলরব-গানের মাধুর্য্যের কথা বলছ—সে তো শুধু স্বরের ভেতর। এই গানে কোন নির্দ্ধারিত ভাষা নেই, কাজেই সে গান ভাবহীন, তার ভেতর স্বরের কোন ওঠা-নামা নেই! এ গানে সাতটা সুর একসংগে ঝংকৃত হয়! মানব-কণ্ঠের গান এ গান থেকে অনেক ভাল। কোকিল শুধু পঞ্চম স্বরে গান করে, বেশিক্ষণ শুনলে বিরক্তি আসে। কেউ বুঝতে পারে না কোকিল কি বলতে চায়—হয়তো সে কিছুই বলে না।"

যশোধরা স্তব্ধ হয়ে যায়। উদ্যানে প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু বীজগুপ্তের যুক্তি শুনে তার মনে হয় যে সে প্রকৃতির সত্যিকারের রূপ দেখতে পায়নি। তবুও তার মনে কেমন যেন একটা সন্দেহ থেকে যায়। সম্মুখে একটি কৃত্রিম প্রপাতে মরালীরা আনন্দে স্নান করছিল। সে সেই দিকে এগিয়ে গিয়ে বীজগুপ্তের কথাগুলো ভাবতে থাকে। বীজগুপ্ত তার পিছনে এসে দাঁড়ায়। যশোধরা বলে, "কিন্তু আর্য্য, এই কপোত-কপোতীরা কত সুখী, এ তো তুমি অস্বীকার করতে পারবে না? দেখ, তারা পরস্পরে কেমন খেলা করছে—এদের মধ্যে হিংসা নেই, ঘৃণা নেই, শঠতা নেই! আমার ইচ্ছে হচ্ছে যে, আমার যদি পাখা থাকত আর আমি যদি কপোতী হ'তাম।"

বালিকা-সুলভ সরলতায় বীজগুপ্ত হেসে বলে, "কিন্তু দেবি, আমি তোমাকে জোর করে বলতে পারি যে, তুমি যদি কপোতী হতে তাহলে মানুষ হবার আকাঙ্ক্ষা তোমার নিশ্চয় হ'ত। তুমি মনে করছ যে এরা সুখী, এদের কোন চিন্তার বালাই নেই, এদের কোন শত্রু নেই। কিন্তু সে তোমার ভুল। ইচ্ছার পূর্ত্তিকে সুখ বলে আর দুঃখ হ'ল ইচ্ছার অপূর্ণতা। তুমি কি করে জানলে যে এদের সব ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে গেছে? পশু-পক্ষী অপেক্ষা মানব এজন্য শ্রেষ্ঠ, কারণ মানবের ভেতর ইচ্ছা থাকে এবং সেই ইচ্ছাকে পূর্ণ করে তবে তারা সন্তুষ্ট হয়। কিছু করবার জন্য মানুষ পৃথিবীতে এসেছে, জন্মগ্রহণ করে অকর্মণ্য ভাবে জীবন কাটিয়ে দেবার জন্য মানুষের সৃষ্টি হয়নি। খাদ্যের জন্য পশুপক্ষীরা পরস্পরে কী ভীষণ ভাবে ঝগড়া করে। খাদ্য আহরণ করবার জন্য মানুষকে কঠিন পরিশ্রম করতে হয়, তাকে ক্ষেতে লাঙল চালিয়ে অন্ন উৎপন্ন করতে হয়। কিন্তু পশুপক্ষীকে খাদ্যের জন্য প্রকৃতির ওপর নির্ভর করতে হয়। পাখীরা পৃথিবীর কীট-পতংগ খেয়ে বেঁচে থাকে—পশুদের ভিতর তো একে অপরকে পর্য্যন্ত খেয়ে ফেলে। যখন বাজপাখী এই কপোত-কপোতীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে তখন এদের কি অবস্থা হবে, একবার ভেবে দেখ দেখি? তাহলে দেখ, এরা চিন্তা ও ভয় থেকে মুক্ত নয়। আসলে এরা বড় দুর্বল।"

কিছুক্ষণ পরে সেনাপতি আবার বলতে আরম্ভ করে, "তুমি হয়তো ভাবছ যে প্রাকৃতিক জগতে যে-সব মানুষ থাকে তারা খুব সুখী। কিন্তু একটা কথা ভুলে যেও না। মানুষ নিজের অবস্থায় কখনও সন্তুষ্ট হয় না। এই ধর না তোমার নিজের কথা, তুমি রাজপ্রাসাদে লালিত-পালিত হয়েছ, অথচ রাজপ্রাসাদের প্রতি তোমার কোন রুচি নেই, রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য্য ও সার্থকতার প্রতি তুমি একেবারে

উদাসীন-ই নও, ঐ পরিস্থিতি ছাড়বার বাসনাও হয়ত তোমার মনে জাগে। তুমি প্রকৃতির কোলে এই কুটিরে সুখ খুঁজে পাচ্ছ, গ্রামের উন্মুক্ত বাতাসে প্রকৃতির সংগে পশুপক্ষীদের খেলার সুখপ্রদ কল্পনায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছ। কিন্তু তুমি যদি এক বার এখানকার গ্রামবাসীদের জিজ্ঞেস কর, তাহলে দেখবে যে, তারা বলবে, সুখ তো দাসদাসী পরিবেষ্টিত প্রাসাদেই খুঁজে পাওয়া যায়। তবুও আমাদের প্রপিতামহেরা যাঁরা প্রাসাদ-অট্টালিকা নির্মাণ করিয়েছেন তাঁরা নিশ্চয় এক দিন গ্রামবাসী ছিলেন। তবে তাঁরা গ্রাম ছেড়ে নগরের সৃষ্টি করলেন কেন? কারণ, প্রকৃতির কুরূপতা ও অসুবিধে কৃত্রিম ভাবে দূর করবার ঐ একমাত্র পথ খোলা ছিল। এই যে কুটির, যাকে তুমি এত ভালবাসছ এ-ও তো কৃত্রিম। যদি প্রকৃতির আসল রূপ দেখতে চাও তো জংগলে যেতে হবে, যেখানে সিংহ রক্তলোলুপ জিভ বার করে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে বড় বড় ঘাসের ভেতর থেকে অকারণেই বিষাক্ত সাপেরা লোকেদের দংশন করে মৃত্যু ঘটায়। এই কৃত্রিম খালকে পরিত্যাগ করে নদীর দিকে তাকাও, সেখানে মানুষ ধরবার জন্য কুমীর হাংগর জলের ভেতর লুকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই সব স্থানে গেলে বুঝতে পারবে যে সুখ ও সৌন্দর্য্য প্রকৃতির ভেতর আছে না কৃত্রিমতার ভেতর।"

বীজগুপ্ত একটানা বলেই চলেছে আর যশোধরা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। এত দিন পর্য্যন্ত যশোধরা বীজগুপ্তকে এক চরিত্রবান পুরুষ বলেই জানত, আজ সে বুঝতে পারে যে উঁচু চরিত্রের সংগে সংগে সে অতুল জ্ঞানেরও অধিকারী। তার বুদ্ধি, মৌলিকতা ও অকাট্য যুক্তিতে যশোধরা বিহ্বল। সেনাপতির প্রতি তার ভক্তি ও শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যায়। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে সে বলে, "আর্য্য, আমার ধৃষ্টতার জন্য নিজ গুণে ক্ষমা করে দেবেন, শুধু একটা প্রশ্ন করছি—আপনি এ সব কোথায় ও কেমন করে শিখলেন?"

এ রকম প্রশ্ন করা সত্যই অনুচিত, তবুও বীজগুপ্ত কিছু মনে না করে উত্তর দেয়, "জগতরূপী পাঠশালায় অভিজ্ঞতারূপী শিক্ষা দ্বারা যে সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, তার থেকেই এ-সব জ্ঞান হয়েছে। কিন্তু দেখি, এখন যে জলপান করবার সময় হয়ে গিয়েছে, আমাদের এখানে বিলম্ব করা কি উচিত হবে?" দু'জনাই একসংগে গৃহের দিকে ফেরে। বীজগুপ্তের মুখ দেখে স্পষ্ট অনুমান করা যাচ্ছিল যে সে মোটেই সুখী নয়। যশোধরা জিজ্ঞেস করে, "আর্য্য, আজ আপনি অন্যমনস্ক কেন? মনে হচ্ছে আপনি দুঃখ পেয়েছেন, দুঃখের কারণ আমি কি জানতে পারি?"

দীর্ঘশ্বাস নিয়ে বীজগুপ্ত উত্তর দেয়, "তুমি ঠিক ধরেছ যশোধরা! আমি সত্যি দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু আমার দুঃখের কারণ শুনে তোমার কী লাভ? আমার দুঃখের কারণ তোমার না জানাই উচিত।"

"কেন, সে কারণ কি খুব গোপনীয়?"

"না, তা ঠিক নয়। আমার জীবনে এমন কিছু নেই যা গোপন রাখা দরকার। গোপন তো সেই সব ব্যাপার রাখা হয়, যা করা উচিত নয়, মানুষ তখনই গোপন রাখে যখন সে প্রকাশ করতে ভয় পায় এবং অপরাধ করলে তবে আমরা ভয় পাই। আমি যা কিছু করি উচিত বলেই করি, তাই কিছুই গোপন রাখি না। আমার দুঃখের কারণ এ জন্য বলতে চাই না, কেন না নিজের দুঃখের জন্য অপরকে দুঃখী না করা অনুচিত।"

যশোধরা চুপ করে থাকে। তার মনে হয় যে, সে এই প্রসংগ তুলে বীজগুপ্তকে আরও দুঃখ দিয়েছে। আর্য্যশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় এবং শ্বেতাংক তাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তারা ফিরে এলে জলপানের বন্দোবস্ত করা হ'ল। যশোধরা গৃহে প্রবেশ করেই মৃত্যুঞ্জয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বীজগুপ্তের দিকে তাকিয়ে বলে, "পিতা, আজ আর্য্য বীজগুপ্ত কতকগুলো কথা বলে আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। আমার অনেক ধারণা ভুল প্রমাণ করে দিয়েছেন—আজ জানতে পারলাম যে আর্য্য বীজগুপ্ত এক জন বড় বিদ্বান"।

যশোধরা শ্বেতাংকের দিকে তাকিয়ে দেখে যে, তার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেছে, মনে হচ্ছে সে যেন অসুস্থ। শ্বেতাংকের হাত ধরে বলে, "আর্য্য শ্বেতাংক! তোমার কি অসুখ করেছে? দেখি, তোমার নাড়ীটা দেখি···না, তোমার তো জ্বর হয় নি, তবে তোমাকে এত অসুস্থ দেখাচ্ছে কেন?"

বীজগুপ্ত বলে, "হয়ত ঠিক মত বিশ্রাম করতে না পারায় শ্বেতাংক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। শ্বেতাংক, দুপুরে কোথাও বেরিও না, ঘুমিয়ে নাও, শরীর ঠিক হয়ে যাবে"।

যশোধরা কিন্তু তখনও শ্বেতাংকের হাত ধরে দাঁড়িয়ে—শ্বেতাংক বলে, "না, আমার কোন অসুখ করে নি। এমনি একটু ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। বিশ্রাম পেলেই ঠিক হয়ে যাবে।"

জলপান করবার পর বীজগুপ্ত শ্বেতাংককে বলে, "আমারও খুব ক্লান্তি লাগছে, এখন গিয়ে শুয়ে পড়ব। খাবার তৈরী হ'লে আমাকে জাগিয়ে দিও। তুমি এখন একটু আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে বস, তিনি যেন না মনে করেন যে আমরা তাঁদের কোন খেয়াল করছি না।"

মৃত্যুঞ্জয় ও যশোধরার সংগে শ্বেতাংক গল্প করতে থাকে। সকালে বীজগুপ্তের সংগে প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সব কথাবার্ত্তা হয়েছিল যশোধরা পিতাকে সেই সব কথা শোনাতে আরম্ভ করে। মৃত্যুঞ্জয় বীজগুপ্তের যুক্তির কথা শুনে অবাক। তিনি বলেন, "শ্বেতাংক, আজ আর্য্য বীজগুপ্তকে কিঞ্চিৎ অসুস্থ মনে হচ্ছে।"

শ্বেতাংক উত্তর দেবার আগেই যশোধরা বলে, "হ্যাঁ বাবা, আমারও তাই মনে হচ্ছে, আমি আর্য্যকে জিজ্ঞাসাও করেছিলাম। তিনি স্বীকার করলেন যে, তিনি দুঃখ পেয়েছেন, কিন্তু কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন যে, কারণ তিনি বলতে পারবেন না।" মৃত্যুঞ্জয় বলেন,—"এমন অনেক কথা থাকে যা বলা যায় না।" "বোধ হয় তাই—যদিও কোন কিছু গোপন রাখা মানুষের কলুষিত প্রবৃত্তির পরিচয় দেয়। মানুষ গোপন রাখতে চায় তখন যখন সে এই ভেবে ভয় পায় যে সমাজ সে সব কথা জেনে তার তীব্র সমালোচনা করবে এবং তাকে মন্দ বলবে। কিন্তু আমি জানি যে আর্য্য বীজগুপ্তের দুঃখের কোন গোপন কারণ নেই, তিনি এ কথা আমাকে নিজেও বলেছেন।"

শ্বেতাংক ব্যংগপূর্ণ হাসি হেসে বলে, "তিনি বোধ হয় একথাও বলেছেন যে, মানুষের ভিতর গোপন কিছু রাখা তার কলুষিত প্রবৃত্তির পরিচায়ক।"

যশোধরা ঠিক তেমনি ভাবে বলে "হ্যাঁ, আর কথাগুলো একেবারে ঠিক। এতে নিশ্চয় কোন ভুল নেই!"

"না, না, তা কেন? সমর্থন করার পর কি সে কথার

ভেতর কোন ভুল থাকতে পারে? সমাজকে অবহেলা করে যে ব্যক্তি বেঁচে থাকতে পারে তার পক্ষে এরকম সিদ্ধান্ত করা খুবই যুক্তিসংগত। আমার কথাই তাই, আমি আর্য্য বীজগুপ্তের সেবক। তাঁর আদেশ তোমার ইচ্ছা—আমার কর্ত্তব্য। আমার ভিতরও ব্যক্তিত্ব আছে, কিন্তু সে ব্যক্তিত্বের দাম কি? আমি পরাধীন। কখনও কখনও বিদ্রোহের স্বাভাবিক আগুন আমার হৃদয়ে প্রজ্জলিত হয়ে ওঠে। প্রশ্ন জাগে যে, সে সময় বিদ্রোহের আগুন প্রজ্বালিত করে কলহ করা উচিত, না সেই আগুনকে নির্ব্বাপিত করে আপন কর্ত্তব্য করা উচিত?" মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "বৎস শ্বেতাংক! এ রকম বিরোধী ভাব মনে পোষণ করা তোমার পক্ষে অনুচিত এবং সে জন্য এই সব ভাবকে প্রকাশ না করাই তোমার উচিত।"

যশোধরা ধীরে বলে, "তোমার মনে এরকম বিরোধী ভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক! শ্বেতাংক! তোমার অবস্থা দেখে আমার সত্যি খুব দুঃখ হচ্ছে!" শ্বেতাংক দেখে যে যশোধরা তার দিকে সহানুভূতিভরা চোখে দেখছে, মনে হচ্ছে যেন সে তাকে ভালবাসে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পৃথিবীতে কিছু লোকের এমন ব্যক্তিত্ব থাকে যাঁরা অপরকে নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করে। যাঁরা এই আকর্ষণের দ্বারা ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে দিয়ে অপরকে নিজেদের অধীন করে নেয়। নর্ত্তকী চিত্রলেখারও এরকম ব্যক্তিত্ব ছিল। যদিও নিজের এই আকর্ষণী-শক্তির সংগে চিত্রলেখা পরিচিত ছিল না তবুও অজ্ঞাতসারে সে এই শক্তির ব্যবহার করে ফেলত, এমন কি যোগী কুমারগিরিকেও সে শক্তির কাছে হার মানতে হয়েছিল।

কুমারগিরির কুটিরে এ দু'জনার যোগাযোগ হয়। যোগীর বড় আশ্চর্য্য লাগে যে, কেন সে যতই চিত্রলেখার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে চায় ততই তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। নর্ত্তকী যোগীর কুটিরে একসংগে বসবাস আরম্ভ করে। যোগী যখন ধ্যানে বসে নর্ত্তকী ঘরের গৃহিণীর মত ঘরের সমস্ত কাজের ব্যবস্থা করে। কিন্তু নর্ত্তকী সামনে থাকলে একাগ্রচিত্তে ধ্যানে বসা যোগীর পক্ষে অসম্ভব হয়ে ওঠে, নর্ত্তকীকে দেখবার লোভ সে সমলাতে পারে না।

আর চিত্রলেখা? সে যোগীর সংগে প্রেম করবার জন্যই তার আশ্রমে গিয়েছিল কিন্তু আশ্রমে যাবার পরই তার এই ধারণা বদলিয়ে যায়। সে ধারণা ও তপস্যার শিক্ষা লাভ করতে চায়, যোগীর পথে সে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চায় না।

এক রাতের কথা।

আলোর জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে আসছে, অর্দ্ধ রাত্রি প্রায় শেষ। যোগীর ধ্যান-মগ্ন হবার সময় হয়ে এসেছে, সে নিজের আসনে গিয়ে বসে। যোগী চোখ বন্ধ করে নিলেও ধ্যানে কিছুতেই বসতে পারে না। নর্ত্তকী যখন দেখলে যে যোগী ধ্যানে বসেছে, সে ভেতরে এসে নিজের আসনে বসে পড়ে।

নর্ত্তকীর পায়ের শব্দে যোগী চোখ মেলে ধীরে বলে, "দেবি চিত্রলেখা!" নর্ত্তকী চমকিয়ে ওঠে, সে ভেবেছিল যোগী ধ্যানমগ্ন, "ক্ষমা করবেন, গুরুদেব! আপনি ধ্যানমগ্ন হবার আগেই আমি এখানে চলে এসেছি—আমি চলে যাচ্ছি, যাতে আপনার পথে কোন বাধা না আসে!"

যোগী হেসে বলে, "না, না যেতে হবে না, তুমি এখানেই বস। এখন ধ্যানে বসব না, তোমার সংগে কিছু কথা বলব।"

"আচ্ছা চিত্রলেখা! আমি ভাবছিলাম যে মানুষ কি কর্ম-মার্গ ও ধর্ম-মার্গ দুটিকে একসংগে গ্রহণ করতে পারে না?"

"ঠিক বুঝতে পারলাম না, গুরুদেব!"

"তুমি যেদিন দীক্ষা নিতে এসেছিলে সেদিন বলেছিলে যে তুমি আমাকে ভালবাস।"

"হ্যাঁ, সত্য কথাই বলেছিলাম।"

"কিন্তু ভালবাসার অর্থ, কি বল?"

"ভালবাসার অর্থ দুটো আত্মার সম্বন্ধ স্থাপন করা।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে যোগী আবার জিজ্ঞেস করে, "তাহলে তোমার পরিভাষা অনুসারে ভালবাসার অর্থ হল শুধু আত্মার সম্বন্ধ। দুই ব্যক্তির মধ্যে প্রেম হ'তে পারে, ব্যক্তি ও ব্রহ্মের মধ্যে প্রেম হ'তে পারে না?"

নর্ত্তকী উত্তর দেয়, "কিন্তু আপনিই তো বলেছেন যে আত্মা ব্রহ্মেরই এক অংশ, অতএব এ পরিভাষার দ্বারা ব্রহ্মের সংগে প্রেমকেও বোঝায়।"

"চিত্রলেখা, আজ আমি একটা নতুন কথা ভাবছি। বৈরাগ্য মানবের পক্ষে অসম্ভব। কারণ, বৈরাগ্যে 'না' এরই প্রাধান্য। বৈরাগ্যের কোন আধার নেই, কোন 'কিছু' কে তার ভেতর খুঁজে পাওয়া যায় না। এমত অবস্থায় যদি কেউ বলে যে সে বৈরাগী, তাহলে সে ভুল বলে। কারণ, ঐ সময় তার বক্তব্য হ'ল যে সংসারে তার বৈরাগ্য; কিন্তু দেখবে যে কারও না কারুর প্রতি তার অনুরাগ নিশ্চয় আছে এবং তার অনুরাগের কেন্দ্র হ'ল ব্রহ্ম। জীবনের কার্য্যক্রম রচনা বা সৃষ্টি করে চলে, বিনাশ করে না, মানবের কর্ত্তব্য হ'ল অনুরাগ, বৈরাগ্য নয়। 'ব্রহ্মের প্রতি অনুরাগের' অর্থ হ'ল পৃথক বস্তুকে উপেক্ষা করা অথবা সেই বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য। কিন্তু বস্তুতঃ দেখা যাবে যে, যাঁকে আমরা বৈরাগী বলি সে বৈরাগী নয়। কারণ সে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগী। কিন্তু এর চেয়ে দামী কথা হ'ল যে সংসারের প্রতি বৈরাগ্য ও ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ, এ দুই কি এক?"

যোগীর কথাগুলো শুনে চিত্রলেখা ঘাবড়িয়ে যায়। সে যোগীর মন ও প্রবৃত্তির কথা জানে, তার দুর্বলতার আভাষও সে পেয়েছে। সে বলে, "গুরুদেব! এর উত্তর দিতে আমি অক্ষম। আমি আপনার কছে জ্ঞান-প্রাপ্তির জন্য এসেছি, আপনার কাছে জীবনের লক্ষ্যকে উপলব্ধি করতে এসেছি। ব্রহ্মকে জানবার জন্য এসেছি।"

যোগী বোধ হয় লজ্জায় মাথা নীচু করে নেয়, তার মনে হয়, সে এক ভয়ানক অপরাধ করে ফেলেছে। "চিত্রলেখা, তুমি ঠিকই বলছ। জ্ঞান তর্কের বস্তু নয়, অনুভব করবার বস্তু। আমি নিজেই বুঝে উঠতে পারছি না যে, কেন এই অহেতুক তর্ক করছিলাম। কিন্তু সত্যিই এ খুব কঠিন তর্ক, প্রশ্ন হ'ল যে জগতের প্রতি উদাসীন থেকে ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ দেখান যায় কি না! এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে না পাওয়া পর্য্যন্ত আমি শান্তি পাব না।"

নর্ত্তকী নিজেকে বুঝবার চেষ্টা করে, তার মনে হয়, যেন তার

ভেতর এক বিচিত্র পরিবর্তন হয়েছে। প্রথমে সে যোগীর সংগে প্রেম করতে এসেছিল—এখন সে বুঝতে পারলে যে যোগীকে সে ভালবাসে না, তাকে পূজাও করতে পারে না, তার কাছ থেকে কিছু শেখাও তার পক্ষে অসম্ভব! নগরের অশান্ত জীবনে বিচলিত হয়ে নির্জনতার শান্তি ও সাত্বিকতার প্রচ্ছদপটে সে শান্তি ও সুখ পেতে চেয়েছিল; জীবনের উল্লাস-বিলাস, ভোগ-সুখের আতিশয্য সে বইতে পারছিল না, তাই যোগীর আশ্রমের শান্ত পরিবেশে সে সুখ ও তৃপ্তিকে খুঁজে পেতে চেয়েছিল।

কিছুক্ষণ চিন্তা করে যোগী বলে, "চিত্রলেখা! এখনও তোমাকে আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমার মন বলছে যে আমাদের সম্বন্ধ জন্ম-জন্মান্তরের।"

যোগীর কাছে আসবার আগে নর্ত্তকীও তাই ভেবেছিল—'হয়ত তাই! কিন্তু বিগত জীবনের স্মৃতি এত অস্পষ্ট যে তাকে দেখতে পাই না'।

"হতে পারে আমার ধারণা ভুল! কিন্তু দেবি! একটা কথার উত্তর দাও তো? তোমার ভেতর এক আকর্ষণী-শক্তি আছে, সে শক্তি তুমি কোথা থেকে পেলে?"

নর্ত্তকীর মুখ লাল হয়ে ওঠে। অনেক বছর পর এই প্রথম সে লজ্জা বোধ করলে, মুখ নত করে নিয়ে বলে, "গুরুদেব! আমি তো জানি না যে আমার ভেতর কোন আকর্ষণী-শক্তি আছে?"

"···আজকে ধ্যানে মন বসছে না—নিরাকারের প্রতি আজ কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না। কেন এমন হচ্ছে?" যোগীর স্বর তীব্র হয়ে ওঠে, "নিরাকারের উপাসনা আজ কেন কঠিন মনে হচ্ছে? আজ হৃদয় কেবলই বলছে 'সাকারের উপাসনা কর'।" যোগী চিত্রলেখার কাছে এসে থেমে দাঁড়ায়, "নর্ত্তকী! এত দিন পর্য্যন্ত আমি নিরাকারের উপাসনা করেছি এখন সাকারকে পাবার বাসনা মনে জাগছে। আমি সাকারকে পাবার চেষ্টা করতে যাচ্ছি, সেই চেষ্টায় তোমাকে সাহায্য করতে হবে, ওঠো।"

চিত্রলেখা কেঁপে ওঠে। যোগীর মুখ কালো ছায়ায় ঢেকে গেছে। তার শান্ত ও সুন্দর মুখশ্রী বিকৃত হয়ে উঠেছে। নর্ত্তকী তার ভেতর যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে সেই আগুনের শিখা দেখে সে ভয়ে শিউরে ওঠে। যোগীর সমস্ত তেজ-শক্তি লুপ্ত হয়ে যায়।

হঠাৎ যোগী চিত্রলেখার হাত ধরে ফেলে—মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত নর্ত্তকী কেঁপে ওঠে। তার মনে হয় যেন কেউ তার হাতে জ্বলন্ত আগুনের শিক পরিয়ে দিলে।···"সাকারকে পাবার চেষ্টা করছি নর্ত্তকী! সাকারকে পাবার আকাঙ্খা তুমিই আমার হৃদয়ে জাগিয়েছ, সেজন্য আমার এই চেষ্টায় তোমাকে সাহায্য করতে হবে। তোমাকেই আমার সেই বাসনা-আকাঙ্খার বস্তু হতে হবে! বুঝলে?"

চিত্রলেখা সবই বুঝতে পারছিল আর সেই কারণে সে ওখানে এসেওছিল। কিন্তু যে বিষয়ের কল্পনা সে করেছিল তা সে পায়নি। সে মুক্ত বাতাসের সংগে খেলতে এসেছিল, আগুনে জ্বলবার জন্য নয়। সে বলে, "গুরুদেব!"

যোগী চিত্রলেখাকে আলিংগন-পাশে আবদ্ধ করে নেয়, সজোরে চুম্বন করে বলে, "নর্ত্তকী! আমি তোমাকে ভালবাসি। যোগীর গরম নিশ্বাসে নর্ত্তকীর মুখ জ্বলে যায়, সে জোর করে যোগীর মুখ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়ে বলে, "গুরুদেব! আপনি পথভ্রষ্ট হচ্ছেন! নিজের সাধনা থেকে বিরত হয়ে পড়ছেন।" যোগীর হাতের বাঁধন ছিঁড়ে যায়, চমকিয়ে পিছনে সরে আসে। এক মুহূর্তে চোখের নেশা কোথায় উড়ে যায়, চেহারা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে।···"সত্যি, এ আমি কি করছিলাম, দেবি, আমাকে ক্ষমা কোর!" এই বলে যোগী ঝড়ের মত আশ্রম থেকে বেরিয়ে যায়।

চিত্রলেখা বসে ভাবে—এ সব কি হয়ে গেল! এক দিন সে যোগীর কাছে আসবার জন্য পাগল হয়েছিল আজ কিন্তু তার কাছ থেকে দূরে চলে যাবার জন্য তার মন অশান্ত হয়ে উঠেছে। সে মাটিতে শুয়ে ফুঁপিয়ে-ফুপিয়ে কাঁদে। সে বেশ বুঝতে পারে যে, সে খারাপ কাজ করেছে, নিজেও বহু নীচে নেমে গেছে, অপর এক জনকেও নামিয়ে দিয়েছে। এ সব নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

আশ্রম থেকে বেরিয়ে যোগী খোলা ময়দানে বেড়াতে থাকে। কিছুক্ষণ আগে শুধু সারা শরীর জ্বলছিল, এখন তার মাথাও জ্বলতে থাকে। প্রথম জ্বালায় সুখে ছিল কিন্তু পরের জ্বালায় কেবল দুঃখ। আপন কর্মক্ষেত্র ও সাধনা থেকে সে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে। আপন দুর্বলতাকে জয় করা তার কর্ত্তব্য।

সম্মুখে গভীর অন্ধকার—পিছনে পাটলিপুত্রের দীপমালা টিমটিম করে জ্বলছে—সেই অন্ধকারের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে চলে যোগী কুমারগিরি—"না, এখন আমার পক্ষে থামা একেবারে অসম্ভব, পতন অনিবার্য্য! নিজেকে বাঁচাতেই হবে।"

হঠাৎ কে যেন তার ভেতর থেকে বলে ওঠে, "তুমি কি কাপুরুষ নও?"

সে জিজ্ঞেস করে, "কেন?"

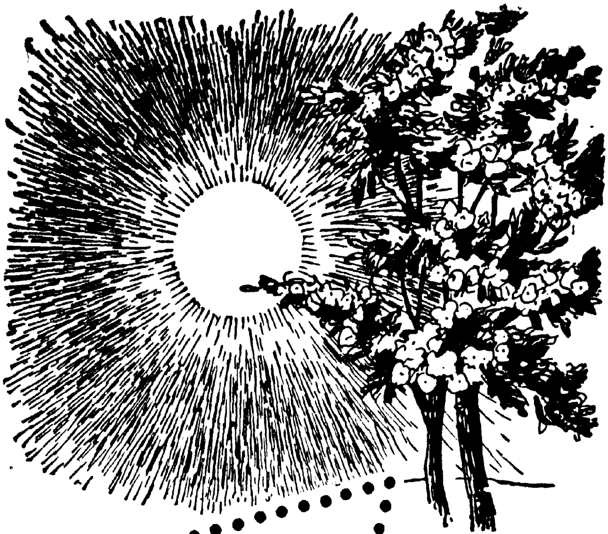
উত্তর পায়, "তুমি কোথায় চলেছ? আপন দুর্বলতাকে জয় করাই তো সবচেয়ে বড় সাধনা। যতক্ষণ তুমি নিজেকে জয় না করতে পারবে ততক্ষণ তুমি অপূর্ণ। আর এই জন্যই তো নর্ত্তকী চিত্রলেখা তোমার কাছে এসেছে, যাতে তুমি নিজেকে জয় করতে পার। তুমি কি তাকে ভয় পাও? সে তো চায় না যে তোমার পতন হ'ক। না তুমি নিজেই ভয় পাচ্ছ? দুর্বলতা তোমার-ই ভেতর আছে। তাকে দূর কর। সাধনা তোমার হাতে, তুমি চলেছ কোথায়?"

যোগী থেমে যায়, "তাহলে তাই হ'ক।" সে আশ্রমের দিকে ফেরে। যখন আশ্রমে পৌছিয়ে দেখে যে চিত্রলেখা ঘুমিয়ে পড়েছে, গালের ওপর চোখের জল শুকিয়ে গিয়েছে। যোগী কিছুক্ষণ তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ধীরে ধীরে তার মাথার কাছে বসে তার মুখের কাছে মুখ নিয়ে যায়—নিদ্রিত নর্ত্তকীর অধর হাসিতে মাখা, যোগী তার অধরে নিজের অধর মিলিয়ে দেয়, কিন্তু স্পর্শ করবার সংগে সংগে চমকিয়ে পিছনে সরে আসে। নর্ত্তকীর অধর একেবারে ঠাণ্ডা!

যোগী ওখান থেকে উঠে গিয়ে সমাধিস্থ হবার চেষ্টা করে কিন্তু ধ্যানে কিছুতেই বসতে পারে না। তার পর শুয়ে পড়ে এবং ভবিষ্যতে নিজেকে জয় নিশ্চয় করবে, ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ে।

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক: অমল সরকার



নীলা ও অঞ্জনের ডায়েরী

শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

অঞ্জনের কথা

নীলা! নীলা! নীলা! আর কোনও কথা নেই—আর কোনও কাজ নেই—এর বাইরে আর কিছু ভাবতেও পারি না যেন। মনকে বারে বারে প্রশ্ন করি—কেন এই কল্পনার দাসত্ব? ভাল লেগেছে—ভালবেসেছি বলেই কী এমনি করে নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে? পৃথক সত্তা কী কিছুই থাকতে নেই? যে দিন তা'কে প্রথম দেখেছিলাম—যেদিন তা'কে প্রথম পেয়েছিলাম আমার আমিত্বের মাঝে, সেদিন বুঝি আকাশ, বাতাস, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সেই মন হারানোর সাক্ষী হয়েছিল, তাই আজ আর নীলাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও সরিয়ে রাখা চলে না! আমার দেহের নীলশিরায় যে রক্তপ্রবাহ, সে-ও যে নীলারই প্রতি আমার অখণ্ড প্রেমের বারতা!

নীলাকে কাছে পাওয়ার জন্যে আমার এই আকুলতায় কখনও বা আমি নিজের কাছে নিজেই সঙ্কুচিত হ'য়ে পড়ি। কিন্তু বন্যা যখন আসে, নদীর দু'কূল ভাসিয়ে দিয়ে সে গেয়ে যায় তার অশান্ত গান—আমার প্রেমের স্রোতেও বুঝি তারই প্রতিধ্বনি! তাকে কাছে পেলে, এই কথাই একবার জিজ্ঞেস করে দেখতাম, ওগো আমার কবিতা-কুঞ্জের মানসী, রূপে, রসে, রঙের খেলায়, তোমার যে পরিচয় তুমি আমারি কাছে রেখে গিয়েছ—সে কী শুধুই কল্পনার জাল-বোনা তাকে কী বাস্তবে ফুটিয়ে তুলবে না কোনো দিন? এই মাটির পৃথিবীতে তার কী ধরা-ছোঁয়া মিলবে না? আজ আমার ছন্নছাড়া এলোমেলো জীবনে কে নিয়ে এলো এই অপার্থিব ঝঙ্কার! কে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী, অনন্ত আলোর বন্যায় যে আমাকে নিয়ে চলে এক অলৌকিক বৈচিত্র্যের মাঝে!

নীলা, তোমার মুখের একটি কথায় তুমি আমার জীবনের ধারাকে বদলে দিয়েছ। কিন্তু, তবু আমার এই চাওয়াকে তুমি হয়তো মেনে নিতে পারোনি—হয়তো এ'কে উচ্ছলতা বলেই উপেক্ষা করে যাও—কিন্তু, আমি কী দিয়ে বোঝাবো—আমার এ প্রেম শুধু তোমাকেই ঘিরে—শুধু তোমাকে নিয়েই তার বেঁচে থাকা। তুমি কী জান না, ঝড়ের বাঁশী যখন বেজে ওঠে, ঈশানের কোণে যখন কাল-বৈশাখীর ঘনঘটা দেখা দেয়, তখন বনানীর অবিচ্ছিন্ন শ্যামলিমা তাকে তো ফিরিয়ে দেয় না—নূতনের আহ্বানকে সে বুক পেতে ডেকে নেয়। তবে কেন আমাকে তুমি নিষ্ঠুর অবহেলায় ফিরিয়ে দাও?

মনের বিভিন্ন স্তরে কতো যে যাওয়া-আসা—কত না উত্থান-পতন, তার কী ঠিক আছে? কখন কোন মন নি'য় ঘর করি, তাও বুঝি না! যখন তোমাকে কাছে পাই—মনে হয়, এই বুঝি আমার আসল রূপ, আর যখন তুমি দূরে সরে যাও, তখনই বুঝি আমার ওপর নেমে আসে অভিশাপের পর্ব্বত-ভার! তখনই বুঝি সুরু হয় নকল রূপের কারবার। আবার কখনও চলে যাই—পাওয়া-না-পাওয়ার বাইরে, এক অস্বাভাবিক, দুঃখ-সুখের অতীত রাজ্যে! এ কী দুস্তর প্রহেলিকা? কে সে আমায় বুঝিয়ে দেবে—কোন স্তরে আমার জীবন, কোথায় আমার মৃত্যু—কী এর সৃষ্টি-রহস্য!

নীলাকে বোঝাতে পারি না কেন, ভালবাসা তার পূর্ণ সার্থকতা চায়, নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে, দয়িতার মর্ম্মমুকুরে তার প্রতি-ফলিত রূপ। অন্তরের ধ্যান-লোকেও যে এই জীবনকে অসীমতায় ছড়িয়ে দেয়, সেই তো ইহকাল পরকালের সাথী! তাই, যখনই তোমার চিন্তায় আমি নিজেকে হারিয়ে ফেলি, ডুবিয়ে দিই—নিখিল জগৎ আমার কাছে লুপ্ত হয়ে যায়। কখনও মনে হয়, পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখায় নিজেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ ক'রে দেয়—তেমনি ক'রেই কী প্রেমের বহ্নিতে আমিও নিজেকে আহুতি দেব? তোমাকে যে আমার সর্ব্বস্ব দিয়েছি—সেই কথাটাই জানিয়ে দিয়ে আজ আমি নিজের কাছেও মুক্তি চাই।

ভাবই সৃষ্টির বৈচিত্র্যের মূল—তারি সঙ্গে হয়তো আমার অবিচ্ছেদ্য আত্মীয়তা—হয়তো সেই আমার নিত্য-সহচর। কতো যে ভাবরাশি আমার প্রাণের তীরে আছড়ে পড়ে, যদি শিল্পী হতাম, কথার ফ্রেমে বাঁধিয়ে, তোমার সামনে তুলে ধরতাম। কিন্তু, যা' আমার যথার্থ রূপ, তাই যদি ফুটে না ওঠে—তাই আমার এত ভয়, এত সংশয়। আমি কী জন্ম-প্রেমিক? প্রেমই যদি আমার স্বরূপ হয়, আমার জীবনের ধর্ম্ম হয়, সেই দুর্দ্দমনীয় প্রেমকে আবিষ্কার করেছে কে? কে আমাকে এমন সুন্দর ক'রে তুলেছে—তুমি ছাড়া আর কেই বা সে কথা বলে দেবে? আমার এই দুর্জ্জয় আবেগ ভরা মনের কানায়-কানায় উপচে পড়া বেদনার অর্ঘ্যে হোক তোমার আরতি। বিরহের বৈতরণী-তীরে দেখা দিক মিলনের স্বর্গলোক, বসন্তের গুঞ্জরণে, প্রাণে জাগুক কম্পিত শিহরণ, ফুলে-ফুলে, দুলে-দুলে, অলখ জনের চরণ-স্পর্শে, জাগ্রত হোক নূতন উল্লাস—দেখা দিক নব-জীবনের অভ্যুদয়—মন দেওয়া-নেওয়ার খেলায়, ভ্রমরের আবেগ ভরা চুম্বনের মত, আমিও প্রাণ ভ'রে তোমার প্রাণের মদিরা পান করে যাই—ধন্য হোক আমার বেদনার অধিবাস। সফল হোক আমার স্বপ্নায়িত প্রেমের অভিসার। নীলা, তুমি তো জান না—

আমি কখনো ভুলেছি, কখনো তুলেছি মর্ম্মের ইতিহাস
ভরা রক্ত-আখরে লেখা থরে থরে বিরহ-দীর্ঘশ্বাস!
মন সংশয়ে চেয়ে রয়—
তার কভু যেন মনে হয়,
কেন এই চাওয়া-পাওয়া, এই ভুলে যাওয়া, মিছে এই বিস্ময়,
হায়, কেন নাহি জানে, তবুও পরাণে স্বপনের অধিবাস!

নীলা, অসীম নীলকে আমি সসীমে টেনে আনতে চাই—তাই বুঝি এই অপরিসীম দুঃখই আমার পাওনা। আজ তুমি যদি দূরেই থাকো—অবহেলার নির্ম্মম আঘাতে তোমার দাক্ষিণ্য হতে যদি বঞ্চিত কর, তবে কী নিয়ে বেঁচে থাকবো আমি? কী ক'রে জীবনের ছোঁয়া পাব? তুমি কী জান না, মানুষের জীবন তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন সে খুঁজে পায় তার আদর্শকে। তোমার নীরবতার মাঝে মাঝে মনটা কেমন যেন বিদ্রোহ করে বসে। তোমাকে কাছে পাওয়ার প্রবল আকর্ষণ আমি কী জয় করতে পারি না? ত্যাগের আনন্দ কী আমার প্রেমের উচ্ছলতার হাত ধরে চলতে পারে না? কেন পারি না ত্যাগের মন্ত্রে জীবনযজ্ঞে আমার পার্থিব প্রেমকে বিসর্জ্জন দিতে? সে শক্তি পাই না কেন? তার আধার কোথায়? এ কী আনন্দ-নিরানন্দের দ্বৈতলীলা! তবে কী ব্যথার সমুদ্র-মন্থন করে উঠবে অমৃত আর হলাহল? সুধার পাত্রখানি তুলে ধরবো তোমার অধরে—কম্পিত আগ্রহে, তুমি আকণ্ঠ পান করে যাবে—আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখব—আর শুধুই গরল নিয়ে কী আমি হয়ে উঠবো নীলকণ্ঠ?

কিন্তু মনের কামনাকে যদি বিদায় দিতে হয়, তবে সেই শূন্য স্থান পূর্ণ হবে কী দিয়ে? মন তো কখনও ফাঁকা থাকে না! তবে কী

থাকবে শুধু ত্যাগের অহমিকা ? বিস্মৃতির অতলগর্ভে ডুবে না গেলে ত' এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই ? কিন্তু ত্যাগের অহঙ্কারই যদি আমায় আঁকড়ে থাকে, তবে তার মহিমা রইলো কোথায় ? তবে আর নিজেকে বঞ্চিত করি কেন ? ভালবাসা চায় স্বীকৃতি—জীবন চায় প্রিয় ঈপ্সিতের মাঝে তার কল্পনার রূপায়ণ ! সেই ঐশ্বর্য্য, সেই সম্পদ নিয়েই যে মানুষ বেঁচে থাকে। আজ আমার বুকে যে রক্তলেখা, নীলার অন্তরেও কী পড়েনি তার জ্বলন্ত স্বাক্ষর ? এ কী দুর্দম, অতৃপ্ত অনুভূতি ? এ কী দুর্জ্জয় অশান্ত অভীপ্সা ? যৌবনের প্রভাতে এ কী দুরন্ত বিদ্রোহ-বহ্নি ? এ কী অনন্ত পিপাসা—এ কী বিপুল বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা, এ কী উগ্র সুরা—যা'র নেশায় আমার সমস্ত দেহমনকে গ্রাস করতে ধেয়ে আসে ? পাবকের তীব্র দহনে সুবর্ণ যেমন উজ্জ্বলতম প্রভায় জ্বলে ওঠে—তার সমস্ত মালিন্য দূর হয়ে যায়—চিরবিরহের আগুনে তবে কী তেমন নিজেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে পরখ করে নিতে হ'বে ? এ কী তবে আমার নিজেকে কুড়িয়ে পাওয়া, না ফুরিয়ে যাওয়া ? মনকে উপবাসী রেখে, কী নিয়ে থাকবো আমি ? শুধুই বিশ্বাস ? কিন্তু বিশ্বাসের মূল্যই বা কী, যদি না তার পেছনে থাকে বাস্তবের ছোঁয়াটুকু—যদি না থাকে প্রাণের সজীবতা ?

আজ সকালে আকাশের কালো মেঘের বুক ফেটে যে কান্না ঝরে পড়ে, তার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় প্রভাতের কচি অরুণ কিরণ —আলোর হাসিতে আবার ভ'রে যায় সমস্ত পৃথিবী। কিন্তু আমার জীবন ? চোখের জল তো বাধা মানে না—ধারায় ধারায় বয়েই চলেছে—কৈ, বুকের গুমোট তবু তো কাটলো না—নিরবচ্ছিন্ন জমাট ব্যথার বাঁধ ভেঙ্গে দেখা দিল না প্রসন্নতার নবীন সূর্য্য ! কী এক অলস মন্থরতায় আমার সমস্ত ভাষা হারিয়ে যায়—এ কী আমার জীবন্ত সমাধি, না মৃত্যুর ছায়া ?

আজ অশ্রুনদীর কূলেই যদি আমায় নীড় রচনা করতে হয়—জীবনে যদি দুঃখের পারাবার নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকে, গোধূলির অস্তরাগে যদি সব-হারানোর বাঁশী বেজে ওঠে—তবে তোমার স্মৃতিটুকু ছাড়া আর কী নিয়ে ঘর বাঁধবো আমি ? শুধু একবার তুমি এসো, নীলা, একবার শুধু বুঝিয়ে দিয়ে যাও—একবার শুধু জানিয়ে যাও—কী আমার পরিণতি—জীবনে কী বেজে উঠবে বিজয়-বিষাণ, না জ্বলে উঠবে প্রলয়-নাচন ? ক্রম-বিকাশ হবে—না ক্রম-নিকাশের স্রোতে ঢলে পড়ব আমি ? নৈরাশ্যের নিষ্ঠুর আঘাতে কী আমার স্বপ্নসৌধ ভেঙ্গে পড়বে ? আমার চলার পথে মুহূর্ত্তের জন্য এসে তুমি সেই সমস্যার সমাধানটুকু আমায় বলে যাও। আমি এই জানি, শুধু যখন তোমাকে হারিয়ে ফেলি, তখনই হয় আমার অনন্ত সুষুপ্তি, আর যখন চিত্তের জ্যোতির্মঞ্চে তুমি দেখা দাও—তখনই হয় আমার অনন্ত জাগরণ। হয়তো কেউ আমার এ কথার মূল্য দেবে না—উদ্দাম ভাবপ্রবণতা বলেই উড়িয়ে দেবে, কিন্তু আমি ত' জানি,—এই আমার রক্তের কাহিনী !

আমি জানি নীলা, তুমি ভালবাসো আমার কবিতা। কাব্যের মধুবৃন্দাবনেই তুমি থাকতে চাও। এ কী অসঙ্গতি তোমার জীবনে ? ফুল ফুটবে, অথচ ফলের সম্ভাবনায় ভরে উঠবে না মন—এ কী উদ্ভট খেয়াল তোমার ? সে কোন্ গিরিগুহায় বিন্দু বিন্দু বারি সঞ্চিত হয়ে জাগ্রত হ'ল গঙ্গোত্রীর ধারা—তরঙ্গের পর তরঙ্গ, আবর্ত্তের পর আবর্ত্ত—কত না সঙ্গীত রচনা ক'রে সেই ঝরণা ছুটে চলে যায় পথে প্রান্তরে, চলার আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে। তোমারই প্রেরণা নিয়ে আমারও প্রাণের ধারা ছুটে চলেছিল কাব্যের লহরী তুলে—ছন্দে, সুরে, আর কথার কলঝঙ্কারে। আজ, তোমাকে না পেয়ে বুঝি আমার কাব্যের উৎসই শুকিয়ে গেল—অমানিশার অন্তরালে হোল তার চির-নির্ব্বাসন—

এবার ফাগুনে মোর ফুলবনে
আসে নি দখিণ হাওয়া—
মরু-মালঞ্চে গানের গোলাপ
মিছে মোর কাছে চাওয়া।

তাই আমি এসেছি এই অনন্ত নীলের কাছে। নীলা, তোমারই নীলিমা উর্দ্ধে উঠে সারা অম্বরতল ছেয়ে ফেলেছে—আর তারই ছোপ লেগেছে সাগরিকার উচ্ছল বুকে। আমি শূন্যপ্রেক্ষণে চেয়ে থাকি। ওই নীলের মধ্যেই আমি যে তোমায় দেখতে পাই—তবে, তোমার হাস্যে, তোমার লাস্যে কেন জাগে না সাগরের উত্তাল আলোড়ন ? নীলাম্বুর অন্তঃস্থলে যে প্রশান্ত স্তব্ধতা বিরাজ করে, সেই কী শুধু তোমার রূপ ? ঐ যে দিগন্তে নীলিমায় নীলিমায় মহা-আলিঙ্গন, সে কী শুধুই দৃষ্টি-বিভ্রম ? তোমার সঙ্গে আমার মিলনও কী তবে চিরসুদূর ? যতই এগিয়ে যাই—দিগন্তরেখার মতই সে এক দুর্জ্ঞেয় রহস্যের অন্তরালে কোথায় যেন মিশে যায় ! আমার সাধনায় কী তোমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না কোনো দিন ? যুগান্তের তমিস্রা ভেদ করে, দেখা দেবে না প্রেমের স্বর্ণরাজ্য ? অক্ষয়, অনন্ত হয়ে রইবে এই অপরিসীম নিষ্ঠুর ব্যবধান ?

মাঝে মাঝে কী যেন একটা এসে আমাকে আচ্ছন্ন করে দেয় ! তুমি কী সেই নীলা—সেই দুর্লভ বস্তু—যা সবার ভাগ্যে সয় না—যাকে ধারণ করলে কেউ বা গৌরবের উচ্চ শিখরে ওঠে, কেউ বা অবলুপ্তির অতল অন্ধকারে ডুবে যায় ! জানি না, তুমি কোন্ নীলা ? কে তুমি ? কোত্থেকে এসেছো ? কী তোমার পরিচয় ? কিছুই জানতে চাই না—শুধু আমার জীবনকে আজ উর্ম্মিমুখর করে তোলো—তোমার নিস্তরঙ্গ বুকে জাগুক প্রাণের স্পন্দন—সুরে, লয়ে, ছন্দে, নেচে উঠুক আমার বিশ্বভুবন।

তুমি যখন মুখ ফিরিয়ে চলে যাও, তোমার আননে যখন দেখা দেয় একটা নিদারুণ অবসাদের চিহ্ন—আমার উচ্ছলতায় যখন তুমি বিরূপ হ'য়ে ওঠো—আমার মনে হয়, আমি কী তবে ধূমকেতুর মত তোমার জীবনে দেখা দিয়েছি ? কিন্তু, সত্যিই কী তাই ? ধ্রুবতারার মত তুমি যে আমার জীবনে চিরভাস্বর হ'য়ে আছো ! তোমায় চেয়েছি আমি প্রতিমুহূর্ত্তে, আমার জাগ্রত তন্দ্রায়, আমার ধ্যান-গম্ভীর অনুভূতির মাঝে। তবু যদি তুমি দূরেই থাকো—তবে এ গানের পালা শেষ করে দাও—জীবনের মরুভূমিতে আর মিছে মরীচিকার সৃষ্টি কোরো না। কখনও মনে হয়, যে দিকে দু'চোখ যায়, কোথাও চলে যাই—কিন্তু পালিয়ে বাঁচাটাই কী জীবনের লক্ষণ ?

নীলা, তবে কী তুমি সেই—
নীল সাগরের ঢেউ—
কেন আসে আর কেন ফিরে যায়,
সে কোন্ অসীম দূর নীলিমায়,
কোথায়, জানে না কেউ ?

আর ভাবতে পারি না। আমার সব চিন্তাকে নিশ্চিহ্ন করে মুছে দিয়ে হোক্ তোমার সঙ্গে আমার মৃত্তিকার পরিচয়। আর যদি তা' না-ই হয়, তবে মুক্তি দাও। আমি মুক্তি চাই—অসীম শূন্যে, অনন্ত নীলের মাঝে বিচরণ করুক আমার এই মনের মুক্ত বিহঙ্গম।

নীলার কথা

অঞ্জন নেই; সে চলে গেছে বহুদূরে! বিবাগী মনের বেদনাভরা একখানি চিঠিতে শুধু জানিয়েছে—

দূর হ'তে দিনু মঙ্গলদীপে
জ্বালিয়া প্রাণের ভাষা,
মরম নিঙাড়ি মুগ্ধ হিয়ার
শঙ্কিত ভালবাসা!

কিন্তু সে আমাকে ভুল বোঝে কেন? কী প্রয়োজন ছিল তার এই পথে পথে ঘুরে বেড়ানোর? সে কী তবে মনে করেছে, আমি তাকে চাই না? সে জানিয়েছে তা'র শঙ্কিত ভালবাসা—কিন্তু কেন? প্রেম কী শুধু কাছেই টানে? দূর হ'তে কী তার তপস্যায় আনন্দ নেই? কী জানি কেন, দেহকে আমি কিছুতেই মনের কোণে স্থান দিতে পারি না—অন্তরলোকে যে শান্তি, যে তৃপ্তির মাধুর্য্য ক্ষরিত হয়, তার আস্বাদ যে পেয়েছে, সে কী আর কখনো বাইরের চাওয়া-পাওয়াকে বড় আসন দিতে পারে? কী জানি, পুরুষের মন কেমন? কত দিন তার উদ্‌ভ্রান্ত ভাব দেখে আমার মনে হয়েছে, আমি কী কঠিন! আমার কঠোর নীরবতায় যে ব্যথা সে পেয়েছে—তার চেয়েও বড় ব্যথা কী আমি নিজেও পাই নি? যত দুঃখ তা'কে দিয়েছি—তা'র চেয়ে বেশী দুঃখ কী নিজেও ভোগ করিনি? নিজের মঙ্গলকে পদদলিত ক'রে আমি কী ছিন্নমস্তার মত নিজের রক্ত নিজেই পান করিনি? কিন্তু তবু তো তাকে দিতে পারিনি আমার নিজেকে—যেমন ক'রে সে আমাকে চেয়েছে। আমি তা'কে যা দিতে চাই,—সে নিতে জানে না! ওগো আমার অন্তরের দেবতা, আমার প্রিয়তম চিরসাথী, তুমি কাছেই থাকো আর দূরেই যাও, তুমি যে আমার মনের সঙ্গে মিশে আছো! আমি যে তুমি-ময়, তোমার মাঝেই ধরা দিয়েছে আমার অতীত, আমার বর্ত্তমান, আমার ভবিষ্যৎ। লজ্জাবতী লতা দেখেছি, পরশ পেলেই তার পাতাগুলিকে গুটিয়ে নেয়—যেন তার আবেগভরা প্রাণটিকে নিজের মধ্যেই লুকিয়ে রাখে। আমিও আমার প্রাণের ব্যথাটুকু গোপনেই রাখতে চাই। তাকেই ভুল বুঝে অঞ্জন গেল চলে—দূরে—বহুদূরে—আমার প্রতি একটা প্রকাণ্ড অভিমান নিয়ে। আমায় ভুলে থাকার জন্যে তার এ কী সৌখীন খেয়াল? এতই কী সহজ? দূরে গেলেই কী কখনো ভোলা যায়? আমি যদি সত্য হই আর যদি সত্য হয় আমার এই অখণ্ড প্রেম, যতই সে দূরে যাক্ না কেন, আমার এই নীরব ভালবাসাকে অস্বীকার করবার ক্ষমতা তার নেই। এ কী আমার দম্ভ না আত্মবিশ্বাস? সে লিখেছিল, সুদূর দক্ষিণে কন্যাকুমারীর চরণস্পর্শ করে, ভারতের উত্তর সীমান্তে, কাশ্মীর হয়ে, সে এগিয়ে চলেছে তুষারতীর্থ অমরনাথের পথে। আর তো তাকে চিঠি দেবার উপায় নেই? জানি না, আজ সে কোথায়! নইলে, লিখতাম অসীমের পথে যাত্রা তোমার সার্থক হোক—আমার প্রেমের সীমায় তোমার শৃঙ্খলিত রূপ আমার ভাল লাগে নি—তাই বাঁধিনি তোমাকে কোনও কঠিন বাঁধনে—না-পাওয়ার দুঃখের চেয়ে পাওয়ার ব্যথাই যে অনেক বড়। দুঃখের নদী পার হয়েই বুঝি অমৃতলোকের দেখা পাওয়া যায়। মানুষের জীবনেও সেই একই প্রকাশ। তরঙ্গসঙ্কুল নদী যেমন কত ওঠা-পড়া, কত ভাঙ্গাগড়া, কত আবর্ত্ত, উত্থান-পতন এড়িয়ে, সাগরের বুকে কল্লোল-কলতানে ছুটে যায়—অঞ্জনের জীবনেও ঠিক তাই—সীমার মাঝে অসীমের ধ্যানে ডুব দিয়ে, সে-ও ছুটে চলেছে, যাঁকে পাওয়া যায় নি—তারই সন্ধানে! হয়তো আমার প্রতি তার এই অচঞ্চল প্রেমের মধ্যে দিয়েই সে একদিন খুঁজে পাবে অনন্তের ভালবাসা!

অঞ্জন কবি। তার রক্তের অণু-পরমাণুতে কবিতার ছন্দ। আমি জানি, ধরা দিলে তাকে ধরা যাবে না। সে ভালবাসে তার কল্পনার বিলাস। আমি তো জানি তার চির-বৈরাগী মনকে—সে যে ঘর বাঁধতে জানে না। তাই অঞ্জনকে আমার এত ভয়! আর আমি? থাক্—আমার কথা!

অঞ্জনের কথা

আর মাত্র এক দিনের পথ! কোন দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটে চলেছি, কে জানে! যে আনন্দলোক হ'তে নেমে এসেছি, এ কী তারই আহবান? কাশ্মীরের উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে ধ্যানমগ্ন পর্ব্বত-গুহায় তুষারতীর্থ অমরনাথ। স্তম্ভাকার জলধারায় বিরাজমান দেবাদিদেব মহাদেব অনাদিকাল হ'তে নরনারীর প্রাণে যে বিরাটের স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে, সুদূর কন্যাকুমারীর ফেনিল বারিধি-বন্দিত পাদপীঠ হ'তে এ কী তারই আশায় আমিও ছুটে এসেছি—? এ কী সেই চিরসুন্দরের ইঙ্গিত? এই অন্তহীন পথ চলায়, নিখিল বিশ্ব আজ যেন আমার কাছে খুলে দিয়েছে তার অবাধ উন্মুক্ত দ্বার! জীবনের নিষ্ঠুর গ্রন্থিগুলোও বুঝি এমনি করেই সরল হয়ে আসে! নীলার কথাও আজ আমার কাছে তেমনি সহজ হয়ে গিয়েছে। আজ বুঝতে পারি, কেন তার চোখে সেদিন ছিল অতল গভীর স্তব্ধতা! চঞ্চলতা দেখা যায়নি বলেই কেন ধরে নিয়েছিলাম তার বুঝি প্রাণ নেই! আজ প্রকৃতির এই মুক্ত-অঙ্গনে বসে এই কথাই শুধু মনে হয়, চারি দিকে এই যে তুহিন-স্পর্শ,—এই যে তুষারের মাঝে মৃত্যুশীতল নীরবতা—এর মাঝেও তো দেখা দিয়েছে সেই বিরাটের অভিব্যক্তি—অনির্ব্বচনীয় তার রূপ! নীলার মাঝেও আমি দেখতে পাই তার এই স্বভাব-গম্ভীর স্তব্ধতা! আমার বুকভরা ভালবাসার প্রতিদানে, নীলার নীরবতায় আমি ব্যথা পেয়েছি—কত দিন চিত্ত আমার উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে। আজ আমার সব সংশয় ঘুচে গেল—মনে হয়, ভালই যদি কেউ কাউকে বাসে—তাই কী মুখ ফুটে বলা যায়, না ভাষা দিয়ে তার রূপ দেওয়া সম্ভব? আমার এ পথিক-জীবনে, কত যে অভিজ্ঞতা হ'ল—কত বিচিত্র হাসি-কান্নার খেলাই না দেখতে পেলাম—আর সেই জন্যে হয়তো আজ এই মৌন, মূক প্রকৃতির মধ্যেই খুঁজে পেয়েছি নীলার শান্ত জীবনের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি!

সে চেয়েছিল প্রেমেই প্রেমের পরিসমাপ্তি—আজ আমারও তাই; শুধু এই মূলধন নিয়েই সুরু হোলো আমারও পথচলা! যাকে ভালবাসি, তার সঙ্গে সমস্ত বিষয়ে যদি মিলতে পারি, সেই তো

পরম সৌভাগ্য ! যে এসেছে জীবনের কূলে সহস্র দীপের দেয়ালী সাজিয়ে, যার ললাটে প্রতিভার দীপ্তি, যার হস্তে জয়শ্রীর মঙ্গলশঙ্খ, কণ্ঠে যা'র অভয় বাণী, নয়নে যার শতেক সূর্য্যের প্রশান্ত জ্যোতি, তার কাছে কুণ্ঠা এসে আমার কণ্ঠরোধ করে কেন ? তাকে চিঠি দেব, বলব—তাই হোক, তুমি দূরেই থাকো, সেই ভাল। আমার প্রেম-আত্মা তোমার সঙ্গেই মিশে যাক্। চেয়ে দেখ, আজ সমস্ত আকাশ জুড়ে নীলের ঢেউ বয়ে যায় ; এই অঞ্জনের চোখেও লেগেছে সেই নীলাঞ্জনের স্বপ্ন—তাই আমার সমস্ত সত্তায় রচিত হয়েছে তার অক্ষয় প্রেমের মর্ম্ম-ইতিহাস।

আমার এ ভালবাসা তোমারে করিল আবিষ্কার
তমাবস্যা পারে—
আলোয় আকাশ ভরা উচ্ছসিত লীলা পূর্ণিমার
জ্যোতি পারাবারে।
সেথা শুধু তুমি আমি, আর কেউ জেগে নাহি রয়
মিলন-মেলায়—
উৎসবের বাঁশী বাজে আনন্দ কল্লোলময়
ছন্দের দোলায় !
তোমারে বেসেছি ভাল, এই মোর পরিপূর্ণ সুখ,
আর কিছু নয়—
তোমারে পাইনি কাছে—আছো তুমি চিরমৌন মূক—
সেই পরিচয় !
কোনো দিন ক্লান্তিভরা উদ্বেলিত নিঃশ্বাস তোমার
পড়িবে না ঝরে—
আমার এ স্বপ্নায়িত, অন্তহীন বাসর জাগার
মুহূর্ত্তের 'পরে।
মোর বুকে ভালবাসা—তটিনীর কুলু-কুলু ধ্বনি
অসীমের সুরে—
প্রেমের পতাকা বহি' চলে সেথা তোমার তরণী
দূরে, কোন্ দূরে—
সে কোন্ অজানা দেশে, বল সখি, বল আর বার,
ক্ষণেক চাহিয়া ;—
আরো কত দূরে যাবে অঞ্জনের নীলা-অভিসার
তরঙ্গ বাহিয়া !
এই শুধু রেখে যাই, জীবনের গোধূলি-বেলায়
এইটুকু আশা—
পেয়েছিনু বুকে যারে রেখেছিনু স্মৃতির ভেলায়
সেই ভালবাসা !

ভাষা যেখানে মূক, হৃদয় যেখানে পরিপূর্ণ আনন্দে স্তব্ধ, সেই নীরব, নিভৃত অন্তরলোকে তোমায় আহ্বান করে বলতে চাই—হে রাজেন্দ্রাণি, তুমি ছিলে কোন্ রহস্যময় জগতে—সেখান হ'তে এসেছিলে তুমি—আমার জীবনে সে এক বিরাট আবির্ভাব !—আজ দূরে যেতে চাও,—সেও আমার বিরাট সৌভাগ্য ! তোমার উপস্থিতি আমি উপলব্ধি ক'রবো প্রতি দিনে—প্রতি মুহূর্ত্তে। বাতাসে তোমার কেশের সুগন্ধ আমার কাছে ভেসে আসবে। বন-কুন্তলা পবিত্রীর বুকে, প্রতি ধূলিকণায় আমি দেখতে পাব তোমার কোমল চরণ-চিহ্ন ; রামগিরি আশ্রমের বিরহী যক্ষের মত আমি নব মেঘ-ভারে পাঠিয়ে দেব তোমার আলয়ে আমার আকুল নিমন্ত্রণ, হিমালয়ের কুন্দ-কাননস্থিত কুসুম-পেলব যক্ষ-প্রিয়ার উদ্দেশে, যক্ষ যেমন পাঠিয়েছিল তার অমর বিরহের অশ্রুলিপি !

তোমাকে পাওয়ার চেয়ে না-পাওয়াটাই আমার কাছে বড় হ'য়ে রইলো ! তাই আজ তোমাকে স্মরণ করি সেই অসীম ঘন নীরবতায়, তোমাকে বরণ করি মনের উজ্জ্বল মণিপুরে, তোমাকে বোধন করি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে !

বার্ণার্ড শ

পীযূষকান্তি চট্টোপাধ্যায়

বার্ণার্ড শ—
মাস-পিছু বাদশাহী আয় উনষাট শ' !
ছবি লেখে গান গায় রচে খাসা কাব্য
ভালো আর মাঝারি কিছু অশ্রাব্য,
সমালোচনাও লেখে ব্যংগ ও নাট্য :
যশোঘড়ি ঘরপাক—প্রমাণ অকাট্য।
শোন্ খোকা, শোন্—
প্রখ্যাত জি, বি, এস লেখে 'সেণ্ট জোন' ;
সরস বিরস কত নাটকের ঝুমকি
বিদ্রূপ কৌতুকে রোশনাই চুমকি।
সাদা চুল পাকা দাড়ি বার্ণার্ড জর্জ শ'
বেঁচেছিল ছয়-কম এক শত বর্ষ।

আধুনিকা

[উপন্যাস]　　　　**শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**

২৫

কয়েক দিন পরে বগলাপদ খামেভরা একখানা ডাকের চিঠি হাতে করে সুলোচনা দেবীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। তিনি তখন ভিতরের বসবার ঘরে রাণীকে চিঠি লিখছিলেন। বগলাপদ খামখানা পত্নীর দিকে উপেক্ষার সঙ্গে নিক্ষেপ করে বললেন: তোমার সেই গেঁয়ো পণ্ডিত এখান থেকে গিয়েই এই চিঠি লিখেছে তোমাকে। কি দরকার ছিল সেদিন ঐ গেঁয়ো ভূতটাকে খাতির করে ওপরে এনে গুরুর আদরে অভ্যর্থনা করবার? আমরা কোন্ সোসাইটিতে আছি, কি ভাবে চলি, আমাদের আভিজাত্য কতখানি—এ সব তুমি বুঝবে না। যদি বুঝতে, তাহলে ওকে নিচেই বসতে বলে আমার প্রতীক্ষা করতে।

সুলোচনা দেবী চিঠিখানা পড়ছিলেন। স্বামীর কথাগুলি শেষের দিকে অসহ্য মনে হওয়ায় চিঠি থেকে চোখ তুলে ক্ষুব্ধস্বরে বললেন: তোমার ঐ আভিজাত্য নিয়ে তুমিই থাক, আমার ওসব সহ্য হবে না। সমাজে থেকে মানুষকে যদি মানুষ বলে না ভাবি, বাড়িতে পরিচিত লোক এলে অভ্যর্থনা না করে যদি মুখ ফিরিয়ে থাকি, তাহলে সমাজের লোক আমাদের কি বলবে?

মুখখানা বিকৃত করে বগলাপদ বললেন: ও! সমাজ কি বলবে, সেই ভয়ে ত আমার ঘুম হচ্ছে না! জানো, যেখানে টাকা আছে, সম্মান-প্রতিপত্তি আছে—সমাজ সেখানে কেঁচো।

একটা হুঙ্কার তুলে বগলাপদ লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে গেলেন সেখান থেকে। পশুপতি তাঁর চিঠিতে সুলোচনা দেবীর আতিথেয়তার ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছেন যে, বাড়ির আদর্শ গৃহিণীর কর্তব্যই তিনি করে যে মহত্ত্ব দেখিয়েছেন, তিনি আজীবন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবেন। কিন্তু তাঁর বাল্যবন্ধু, চণ্ডীমণ্ডপের প্রিয়সঙ্গী বগলা যে টাকার মোহে তার মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে, এটা তাঁর জানা ছিল না। আরও একটা মজার কথা বলি, আমার যাওয়া বন্ধ করবার জন্য তিনি টেলিগ্রাম করে জানান যে, কলকাতায় আমার যাওয়া যেন বন্ধ রাখি। কেন, তিনি পরে জানাচ্ছেন। সেই পরের টেলিগ্রামে খুলেই জানিয়েছেন—এ বিয়ে হতে পারে না। যেহেতু তাঁর দুই মেয়ের বিয়ের কথা তাঁর কারবারি বন্ধুপুত্রদের সঙ্গে পাকা হয়ে গেছে, আর এ বিয়েতে মস্ত বাধা হচ্ছে, তাঁর মেয়েরা—আধুনিকা। সুতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে—আপনাদের দুই বান্ধবীর প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন সম্ভাবনা নেই।

চিঠিখানা পড়ে সুলোচনা দেবীও যেন ভেঙে পড়লেন। তাঁর চিত্তটি যেন হাওয়ায় ভর করে হরগৌরীপুরের সেই নীলোৎসবের দিনটিতে ফিরে গেল—সেদিনের সব ঘটনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, কানের কাছে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল সেই প্রতিশ্রুতির পরম উক্তি!

খোলা চিঠিখানা হাতে করে অনেকক্ষণ ধরে একই ভাবে বসে রইলেন তিনি। কাছেই পড়ে রইল রাণীকে লেখা অসমাপ্ত চিঠিখানা। এমনি সময় দেবী এসে পিছন থেকে এসে জিজ্ঞাসা করল: কার চিঠি মা! কে লিখেছেন?

শান্ত কণ্ঠে সুলোচনা দেবী বললেন: সেই জ্যেঠামণি দেশ থেকে আমাকে লিখেছেন। পড়ে দেখলেই বুঝতে পারবে সব কথা।

ক্ষুদ্র চিঠি, বক্তব্য কথা ভিন্ন বিশেষ বাহুল্য নেই। এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়েই দেবী খামের মধ্যে ভরে সামনের চিঠির বাক্সে রেখে দিল। সুলোচনা দেবী লক্ষ্য করলেন, চিঠির খবর পড়ে কন্যার মুখখানা আরক্ত হয়ে উঠেছে।

একটু পরে দেবীই বলল: একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে ছুটে এসিছি মা! আচ্ছা, ছেলেবেলায় সেখানে রাধা বলে একটা মেয়ে ছিল কি?

প্রশ্ন শুনেই সুলোচনা দেবী চমকে উঠে বললেন: এ নাম তুই কার কাছে শুনেছিস্ রে? পণ্ডিত মশাই আমাকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তাঁর ছেলের নাম ছাড়া আর কারও নাম ত লেখেন নি তিনি?

দেবী বলল: এমনি। গ্রামের কথা ভাবতে ভাবতে অনেক কিছুই আমার মনে পড়েছে মা! ঐ রাধা মেয়েটা আমার সঙ্গে খুব ঝগড়া করত, প্রায়ই ওর সঙ্গে আড়ি হয়ে যেত; আবার সেই-ই সেধে ভাব করত!

সুলোচনা দেবী শিউরে ওঠেন, সঙ্গে সঙ্গে সস্নেহে বলেন: হ্যাঁ রে! তুই ঠিক ভেবে পেয়েছিস্। রাধা তোরই বয়সী, ঝগড়াও হ'ত দু'জনে, আবার ভাবও হয়ে যেত।

সেই রাধা ও-গাঁয়ে এখনো আছে? তুমি জান মা?

সুলোচনা দেবী বললেন: তোমার জ্যেঠামণির কাছে শুনিছি মা, রাধার বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতে অভাগীর কপাল পুড়ে গেছে। এখন সে মামা সত্য ঘোষালের কাছে থাকে।

দেবীর মুখখানা ম্লান হয়ে গেল দুঃসংবাদটি শুনে। মা বুঝলেন, কপাল ভেঙেছে শুনে ওরও কোমল মনটি ব্যথায় ভরে উঠেছে।

এই দিনই বাগানবাড়ীর কাজ শেষ করে প্রশান্ত এ বাড়িতে উপস্থিত হল। বগলা তাঁর খাস কামরায় বসে নূতন ব্যবসায়টির কাগজপত্রগুলো দেখছিলেন। প্রশান্তর সাড়া পেয়ে নিজেই উঠে দরজা খুলে মুখখানা বাড়িয়ে প্রশান্তকে ডেকে নিলেন। বগলার কাছে রাণী শান্তিনিকেতনের উৎসবে যোগ দিতে গেছে শুনে সে হতাশ হয়ে পড়ল। ভগ্ন স্বরে সে জিজ্ঞাসা করল: তাহলে আমাদের বাগানবাড়ির উৎসবের কি হবে?

বগলা এ অবস্থায় যুক্তি দিলেন : দেখ, এ উৎসবটা তোমার বাগানবাড়ির বদলে আমার বাড়িতেই করতে চাই। উপস্থিত ঐ দিনে তোমার দুই আত্মীয় কর্তৃপক্ষরূপে আমার কন্যা দেবীকে দেখে, আশীর্বাদ করবেন। আর, এর পর তোমার বাগানবাড়ির উৎসবে আমরা তোমাকে আশীর্বাদ করব।

এ প্রস্তাবে প্রশান্ত তার সশ্রদ্ধ সমর্থন জানাল।

বগলা এর পর বললেন : তোমার এখন যাওয়া হবে না প্রশান্ত! রাতে আমার সঙ্গে খাবে—তার পর বাড়ি যেও।

প্রশান্তও এরই প্রত্যাশা করছিল। খুসি হয়ে বলল : তাহলে আমি একবার ওঁদের সঙ্গে—

বগলাও সাগ্রহে বললেন : দেবী বোধ হয় ওর পড়ার ঘরেই আছে, দেখ ত?

পড়ার ঘরেই দেবী রাণীর পত্র পড়ে সুলোচনা দেবীকে শোনাচ্ছিল। প্রশান্তকে দেখে সুলোচনা দেবী তৎক্ষণাৎ কিছুটা দূরের কেদারা-খানা দেখিয়ে সস্নেহে সম্ভাষণ করলেন : ব'স বাবা!

প্রশান্ত নীরবে কেদারাখানায় বসতেই শুধালেন : কবে এসেছ—সেখানকার কাজকর্ম সব সারা হল?

প্রশান্তও এতক্ষণে আত্মসচেতন অবস্থায় এসে সবিনয়ে বলল : আজ্ঞে হ্যাঁ, অনেক দিন বাড়ি বাগান সব পড়েছিল, সারিয়ে সুরিয়ে রঙচঙে করতে একটু দেরী হয়ে গে—খরচও অনেক পড়ল।

সুলোচনা দেবীও কথাসূত্রে বললেন : খরচপত্র করে সারিয়ে ভালোই করেছ, কিন্তু ফেলে রেখো না বাবা, তাহলেই ভূতের বাসা হবে।

কথাটা এই ভাবে শেষ করেই তিনি দেবীকে বললেন : বামুন ঠাকরুণকে বলগে দেবী, তাড়াতাড়ি কচুরির নেচিগুলো তৈরী করে ফেলতে, তুমিও যোগান দাও, সব হোলেই আমাকে ডেকো। আমি ততক্ষণ প্রশান্তর সঙ্গে কথা কই।

প্রশান্তর ইচ্ছা নয় যে, দেবী ঘর থেকে চলে যায়। কিন্তু সুলোচনা দেবী তাকে যাবার জন্যে বলেই এমন ভাবে নির্দেশ দিতে লাগলেন—প্রশান্ত আর বাধা দেবার ফুরসদ পেল না। প্রশান্তও এই সুযোগে বাগানবাড়িতে একটু ঘটা করে উৎসবের প্রসঙ্গটা তুলে সেই প্রসঙ্গে সাহেবের পর পর দুটো প্রস্তাবই শুনিয়ে দিলেন সুলোচনা দেবীকে। তিনিও স্তব্ধ ভাবেই শুনলেন স্বামীর নূতন সঙ্কল্পটা, বর্তমানের অপ্রীতিকর ব্যাপারটাকে একেবারে নস্যাৎ করবার জন্যই যে তাঁর এই ব্যবস্থা, সেটা বুঝতে তাঁর বাধল না। সুলোচনা দেবীকে নিরুত্তর দেখে প্রশান্তই শুধাল : আপনি যে কিছু বললেন না—চুপ করে রইলেন?

মৃদু হেসে সুলোচনা দেবী বললেন : উনিই যখন ব্যবস্থার কথা সব বলেছেন, আমি আবার আলাদা কি বলব বল?

এই সময় পরিচারিকা কুসুম তাড়াতাড়ি এসে খবর দিল : যোগাড় সব হয়ে গেছে মা, আপনি আসুন।

অগত্যা গৃহিণীকে উঠতে হল। খোলা চিঠিখানা গুছিয়ে নিয়ে তিনি বললেন : ও-ঘরে বসবে চল বাবা, সেখানেই তোমার চা জলখাবার পাঠাচ্ছি।

গৃহিণীর সঙ্গেই প্রশান্তকে উঠতে হল এবং তিনিই তাকে সঙ্গে করে সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমের দরজার কাছে এনে ভিতরে গিয়ে বসবার জন্যে বলে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। প্রশান্ত ড্রয়িংরুমে ঢুকে এটা-ওটা দেখা ও নাড়াচাড়া করতে লাগল।

হঠাৎ বগলার প্রশ্নে প্রশান্তর চিন্তা ভেঙে গেল : তুমি একলা রয়েছ এখানে? দেবী কোথায়?

প্রশান্তর নীরবতা ও মুখের নৈরাশ্য ভাব দেখেই বগলা উষ্ণ হয়ে কলিংবেলটা বাজিয়ে দিলেন। একটু পরেই কৈলাস ছুটে এসে দাঁড়াতেই, বগলা বললেন : ভিতরে গিয়ে বল—দিদিমণি যেন এখনি ড্রয়িংরুমে এসে বসে, প্রশান্ত বাবু একলা রয়েছেন।

কৈলাস তৎক্ষণাৎ হুকুম নিয়ে ভিতরে চলে গেল। প্রশান্তকে সামনের সোফায় বসিয়ে বগলা বললেন : একটা কথা তোমাকে বলে রাখি প্রশান্ত, সেটা সর্বদা মনে রাখবে :—দেখ লড়াই আর প্রণয়—এ দু'টোই শক্তের ভক্ত, এদের জয় করতে চাই হিম্মত। এখানে ন্যায় সং সত্য ধর্ম বলে কিছু নেই—ছলে কৌশলে কায়দা করে যে ভাবেই হোক হয় করা চাই। দেবীর ব্যাপারে ওর মায়ের দিক থেকে হয়ত বাধা আসবে; কিন্তু নিজের হিম্মতে সে সব সরিয়ে তোমাকে কাজ উদ্ধার করতে হবে। আমি তোমাকে পাসপোর্ট দিয়ে রাখলাম।

কথার শেষে প্রশান্তর পিঠে ও হাতে নিজের বলিষ্ঠ হাতের ঝাঁকুনি দিয়ে বগলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। প্রশান্ত ভাবতে লাগল।

২৬

কয়েক দিন পরের কথা।

গৃহস্বামীর কাছে তাঁর অনূঢ়া কন্যা দেবীকে যে কোনো প্রকারে বাধ্য, আয়ত্ত ও বশীভূত করবার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাবার দিনটি থেকেই প্রশান্তর অনধিকার অগ্রগতির পথ নিরঙ্কুশ হয়। এই সূত্রেই একান্তে দেবীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটায় উভয়ের মধ্যে যে-সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তাদের প্রত্যেকটি পরস্পরের পক্ষে সেগুলি এতই বিস্ময়াবহ যে, চমৎকৃত অবস্থায় পরস্পরকে নূতন করে জানবার প্রয়োজন দেখা দেয়। এর পর, এই বোঝা-পড়ার ব্যাপারেই যে ভাবে উভয়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ-সংগ্রাম বা 'ডাইরেক্ট অ্যাকসন' আরম্ভ হয় একটির পর একটি করে, তার কাহিনীগুলি থেকে এই ধারণাই স্বাভাবিক যে, কোনও বিশিষ্ট পরিবারের কুমারী কন্যার পক্ষে পিত্রালয়ে স্থিতিশীলা অবস্থায় এই ধরণের উপর্যুপরি সংঘাতের সম্মুখীন হওয়া যেমন সাধারণ ব্যাপার নয়, পক্ষান্তরে কোনও ভদ্র শিক্ষিত অবিবাহিত তরুণের দিক দিয়েও সুযোগের সহায়তায় শুদ্ধান্তের এক সরলা ভদ্রকন্যার দেহ ও মনের উপর আঘাতের পর আঘাত হেনে যাওয়াও তেমনি অসম্ভব ও বিস্ময়াবহ! কিন্তু পর পর কয়টি দিনেই বগলা-ভবনের শুদ্ধান্তে উক্ত দ্বিবিধ অসাধারণ ও অসম্ভব ব্যাপারগুলিই সম্পাদ্য ও সম্ভাব্য হয়ে ওঠে, অথচ উভয় পক্ষের এই সংঘাত প্রসঙ্গ সংগোপিত থাকে। প্রশান্ত ভেবেছিল, তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম ধাক্কাতেই দেবীর মত ঠাণ্ডাপ্রকৃতি লাজুক মেয়ের মনোবল ভেঙে দিয়ে তাকে জয় করে ধন্য হবে। কিন্তু ধাক্কার পর বার বার নবোদ্যমে বড় বড়

ধাক্কা দিয়েও ব্যর্থ হয়ে শেষে পরাজিতের মনোভাব নিয়ে সে ভেবে পায় না—'মাত্র গোটা কয়েক দিনের মধ্যেই সেকেলে রুচিশীলা শান্ত প্রকৃতির সেই শিষ্টা মেয়েটির দেহে ও মনে এমন প্রচণ্ড শক্তি কোথা থেকে এল'? দেবীও উক্ত বিশ্রী ঘটনাগুলির পর এক দীর্ঘ পত্রে অসঙ্কোচে ও নির্ভীক ভাবে রাণীকে যে পত্র লেখে, তার মধ্যেই ব্যাপারটার বিশ্লেষন করে জানিয়ে দেয়—কি সূত্রে স্বল্পসময় মধ্যে নৈতিক শক্তি পরিপূর্ণ ভাবে সে অর্জন করতে সমর্থ হয় এবং সেই সঙ্গে তার কুমারী-জীবনেও একটা পরিবর্তন আসে।

পত্রের প্রথমেই রাণীর দিদির উপযুক্ত বিজ্ঞতা, অভিজ্ঞতা ও যুক্তি দিয়ে দেবী তার নবজীবন প্রাপ্তির বৃত্তান্তটি জানায়—শান্তিনিকেতনে রাণীর যাবার পর সে সুযোগটি আশ্চর্য ভাবে এসে পড়ে। এর আগে রাণীই তাকে বুদ্ধিবিবেচনা যুক্তি দিয়ে চালিয়ে এসেছে—যদিও তাদের মায়ের নির্দেশটাই চলার পথের সন্ধান দিত। রাণী অনেক সময় সেটা মানতে চাইত না, কিন্তু দেবী এ অবস্থায় রাণীকেও অগ্রাহ্য করে মায়েরই মতানুবর্তিনী হত। এরই ফলে, ধীরে ধীরে তার শিশুর মত কচি মাথার মধ্যে বুদ্ধির আলো পড়তে থাকে। এখন তার ধারণা যে, মায়ের কাছে পুরাণের গল্প শুনে, মেয়েদের পক্ষে উচিত ও অনুচিতের উপদেশগুলি মাথায় নিয়ে, অতীতের হারানো মাথাটাকেও ক্রমে ক্রমে সহজ করে আনা সম্ভব হয়। কিন্তু তবুও অতীতের দিকটা তার কাছে বরাবরই চাপা থাকে, কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত, কিছু বলতে পারত না। মেয়েরা হাসতো, ঠাট্টা করে বলত—বি, এ পড়ছেন মেয়ে, অথচ শৈশবের কিছু জানেন না—ন্যাকা! বাড়ী এসে জিজ্ঞাসা করলে কেউ বলত না কিছু। মাকে জিজ্ঞাসা করতেই কাজের অছিলায় উঠে যেতেন। তখন কি জানত দেবী, কেন তিনি মুখ বন্ধ করেছিলেন! তারপর একদিন হঠাৎ এমন এক আলোর ঝলকানি তার মাথায় পড়ল—মাথার মাঝখান থেকে একটা পাথর যেন সরে গেল আর সেই আলোয় সব দেখতে পাওয়া গেল। কথায় আছে, ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

পত্রের এক স্থানে দেবী পশুপতি পণ্ডিতের ব্যাপার থেকে তাঁর মুখে শোনা কথার উল্লেখ করে লিখে: 'অজ পাড়াগাঁ, সেখানে ললিতদা'র সঙ্গে খেলা—তোমার মনে পড়ে না? আমি ললিতের বাবা'। এই ক'টি কথাই আমার মাথার সেই পাথরখানা সরিয়ে দেয়। মাকে জিজ্ঞাসা করতেই বাবা ছুটে এসে বললেন—'ঐ লোকটার মুখে যা শুনেছ, সব ভুলে যাও'। কিন্তু আমি যেন তখন আর সে দেবী নই—এইটুকু সময়ের মধ্যেই যেন বদলে গেছি, নৈলে বাবার মুখের ওপরেই—ভুলতে পারছি না যে, পারব না ভুলতে' বলে ছুটে ঠাকুরঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে তাঁর কাছে ধর্ণা দিয়ে পড়ি, জানতে চাই আমার অতীত—কে ঐ ললিত দা'টি? মা যে বলতেন তন্ময় হ'য়ে ঠাকুরকে ডাকলে, মনের ব্যথা জানালে, তিনিই আলো দেখান, তাই সত্য হল আমার জীবনে।

এর পর এই দিনই পুরানো চিঠি থেকে অতীতের সমস্ত বৃত্তান্ত জানবার কাহিনী আগাগোড়া লিখে সে সম্পর্কে দেবী তার পরিবর্তনের কথা জানালো। গ্রামের হরগৌরী মন্দিরে দুটি শিশুকে উপলক্ষ করে মায়েদের অঙ্গীকার, তাদের খেলাধূলা, মান-অভিমান, চড়িভাতি সবই জানা হয়ে গেল, মনে হল—চোখের সামনে যেন দেখছি। ভাবতে ভাবতে মাথার ও মনের সব জড়তা কেটে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে এমন একটা নৈতিক শক্তি এসে গেল, দেহ-মন দুটোই অদ্ভুত রকমে শক্ত হয়ে আমাকেই অবাক করে দিল। এখন থেকে অন্যায়কে ঠেকাবার জন্য নৈতিক শক্তিকে নিয়েই পড়লুম। এ যে কত বড় শক্তি তার কিছু কিছু উদাহরণ দিচ্ছি:

ড্রয়িংরুমে প্রশান্ত বাবু বসে। মা গরম গরম কচুরি ভেজে ডিসে করে সাজিয়ে দিয়েছেন, নিয়ে এসে তার সামনে রাখতেই সে খপ করে হাতখানা ধরে পাশে বসাবার জন্যে জোরে টান দিল। টেবিলখানা ধরে নিজেকে সামলে নিয়েই দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে জোরে একটা থাপড়া বসিয়ে দিলুম তার গালে। এত জোরে চড়টা পড়েছিল যে একটা শব্দ উঠল,—উঃ! এর পরেই মা একটা পাত্রে আরও খানকতক কচুরি ও চা নিয়ে উপস্থিত। চড় খেয়ে বাবুর মাথা তখনো ঘুরছে, গালে হাত বুলোচ্ছে জ্বালার যাতনায়। তখুনি সেই হাতে একখানা কচুরি তুলে মুখে হাসি এনে মাকে দিব্যি বলল—'দেখুন দেখি মা, দেবীকেও সাধছি খাবার জন্যে, কিছুতেই কথা রাখছে না'! মা একটু গম্ভীর হয়ে বললেন—'আগেই ত বলেছি বাবা, পুরুষদের সঙ্গে বসে খাওয়ার অভ্যাস ওদের নেই, আর—সেটা উচিতও নয়। কিন্তু এ থেকেও ঐ নির্লজ্জ পুরুষটির আক্কেল হয়নি। এর পর হল কি, পড়ার ঘরে বসে লিখছি, এমন সময় চুপি চুপি একেবারে পাশে এসেই ঝাঁ করে গলাটা আমার দু'হাতে জড়িয়ে ধরল প্রশান্ত। হঠাৎ এ কাণ্ড হতেই প্রথমে হতচকিত হয়ে পড়ি, সে তখন আমার মুখখানা জোর করে ধরে ওর মুখের কাছে টেনে তুলছে, নাক দু'টোর তপ্ত নিশ্বাস আমার মুখখানাকে যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু ওর মুখখানা আমার মুখে পড়বার মুখেই হাতের কলমটা ওর নাকের মধ্যে দিলুম গুঁজে। তখনি চীৎকার করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল। চেয়ে দেখি, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে আসছে। এত জোরে চেঁচিয়েছিল প্রশান্ত, যে বাবা শুনতে পেয়ে ছুটে এসে শুধালেন—'কি ব্যাপার?' কিন্তু নাকের রক্ত দেখেই তাঁর চক্ষু স্থির! তবে প্রশান্তই মিথ্যা কবুল করল, 'পেন দিয়ে নাকটা খুঁটতে গিয়েই এ কাণ্ড বাধিয়েছে।' তিনি তৎক্ষণাৎ এ বদ্-অভ্যাসটির নিন্দা করে নাকে আয়োডিন দেবার জন্যে তাকে নিয়ে গেলেন।

এর পর চিঠিতে লিখছে—'তুই হয়ত বলবি, বাবাকে কি মাকে কেন বলিনি ওর কথা—সহ্য করি কেন? এর জবাব হচ্ছে—বাবা জানেন, প্রশান্তই তাঁর বড় জামাতা, কাজেই তার সাত খুন মাপ! আর মা যদি শোনেন, কখনই প্রশান্তকে ক্ষমা করবেন না এটা ঠিক, কিন্তু এই নিয়ে বাবার সঙ্গে হয়ত কথা বন্ধ হবে। তাই আমি কাউকেই বলিনি। তার পর, বাইরের ছেলে প্রশান্ত, সে যদি আমাদের বাড়িতে এসে এ ভাবে আমাকে অপমান করতে সাহস পায়, অথচ বিপাকে পড়লে আসল ব্যাপারটা চেপে গিয়ে অন্য কথা পাড়ে—নালিশ করে নিজেকে ছোট করতে চায় না; আমিই বা তাহলে কোন মুখে বাপ মা'র কাছে তার ইতরামির কথাগুলো তুলে বিচার চাইতে যাব? আমার বাড়িতে অপরে এসে জোর করে আমাকে জব্দ করতে চাইছে—এ অবস্থায় আমার কি উচিত নয় নিজেই তাকে রীতিমত জব্দ করে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া? আগে হয়ত এ সব চিন্তা আমার ধারণারও

বাইরে ছিল। কিন্তু বলেছি ত, আমি এখন আলাদা মানুষ—আপনাকে চিনিছি, আত্মশক্তিকে জাগাবার মন্ত্র পেয়েছি।

অবশেষে উপসংহারে লিখছে—আসছে রবিবার আমাদের বাড়িতে আর এক উৎসব হবে। ঐ দিন প্রশান্ত বাবুদের পক্ষ থেকে আমাকে তার আত্মীয়স্বজন ভাল করে দেখে আশীর্ব্বাদ করবেন। এর পর তুই ও অরুণা শান্তিনিকেতন থেকে এখানে এলে প্রশান্ত বাবুর বাগান-বাড়িতে আর এক উৎসব বসিয়ে বাবার পক্ষ থেকে তাকেও আশীর্ব্বাদ করা হবে।

তুই ত জানিস, আমাদের মনস্বিনী মা তাঁর আগের প্রতিশ্রুতির উপর বাবার কাছেও বিপরীত প্রতিশ্রুতি দিয়ে এ-ব্যাপারে মুখ বন্ধ করতে বাধ্য হয়েছেন। বাবা এখন কালা পাহাড়ের মত উদ্ধত, উদ্দাম, আর যাকে জানতিস্—অতীত সম্বন্ধে তার চোখে সবই অন্ধকার। কিন্তু বাবারই ভুলের মাশুল স্বরূপ ঠাকুর তারই চোখে জাগৃতির আলো দিয়েছেন। সুতরাং এ উৎসবের ফলাফল আত্মবুদ্ধির আলোকে অনুমান কর। অবিশ্যি, প্রথম উৎসবটা 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হল কি না, সে সম্বন্ধে সঠিক সংবাদ বাবার কাছ থেকেই পাবি। এখন আমি তোকে বলছি রাণী—যদি বুঝে থাকিস্, আমাদের মায়ের কথাই খাঁটি, তাঁর কথা পুরোপুরি মেনেছিলুম বলেই আজ আমি জেগে উঠেছি, আর—আমার এই জাগরণকেই অসাধারণ ভেবে তুইও এই পথে আয়। অর্থাৎ, বাবাকে তুষ্ট রাখতে সাধারণ আধুনিকার বাহ্য দিকটা বজায় রেখে—আমাদের মায়ের শিক্ষামত ভিতরটা বদলে ফেল্—ভিতরটাই হোক আধুনিকার আসল রূপ। আমার শিল্পীকে দিয়ে তোর ভিতরের রূপটি আঁকিয়ে আমিই তোকে উপহার দেব। যেমন করে আমার অজ্ঞাতে আমার ও কুমারী-জীবনের রূপলেখা তারই তুলি ও কালিতে ধরা দিয়েছে।

২৭

রবিবার প্রত্যুষেই বোগলা-ভিলার অপূর্ব রূপসজ্জা দেখে পল্লীর বাসিন্দারা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েন! রাতারাতি এ কি অদ্ভুত কাণ্ড করেছেন বোগলা সাহেব? এত বড় বাড়ি, সুবৃহৎ লন, প্রকাণ্ড ফটক, সর্বত্রই মনোরম সজ্জার বিচিত্র ছটা। শুভক্ষণ সাপেক্ষে পূর্বাহ্ণেই অনুষ্ঠান-উৎসব, তদুপলক্ষে প্রাতরাশের বিস্ময়কর আয়োজন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা। সারারাত্রি কর্মব্যস্ত শ্রমিক ও শিল্পীদের কলরব, ভিয়ানঘরে মিষ্টান্ন প্রস্তুতকারী পাচক ও পর্যবেক্ষকদের পাকচর্চা বোগলা-ভিলাকে যেমন সরগরম করে রাখে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তেমনি বিশিষ্ট আমন্ত্রিতদের আগমনে সারা পল্লীতে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে। গাড়ীগুলি ভিতরে ঢুকে গাড়ীবারান্দার নিচে আরোহীদের নামিয়ে দিয়ে সারিবদ্ধ ভাবে রাস্তার শোভাবর্দ্ধন করে। এমনি গাড়ীর পর গাড়ী আসতে থাকে। বগলা তাঁর ব্যবসায় সংক্রান্ত বিশিষ্ট সহকর্মীদের প্রায় প্রত্যেককেই আমন্ত্রণ করেছেন। পক্ষান্তরে, সহরের স্বনামধন্য বহু সুধী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাব্রতী, কলাবিদরাও শুভানুষ্ঠানটিকে সার্থক করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। শরদিন্দু ও সতীনাথ প্রশান্তর অভিভাবক বা পাত্রপক্ষের পরিচিতির দুটি স্তম্ভের মত সভার মধ্যস্থলে বসেছেন। পাত্রী দেখা অনুষ্ঠানে পাত্র সাধারণতঃ উপস্থিত থাকে না। কিন্তু প্রশান্তকে সর্বসমক্ষে পরিচিত করবার

উদ্দেশ্যে বগলাপদর ব্যবস্থায় তাকে সভাস্থলে দুই স্বনামখ্যাত শিল্পপতি অভিভাবকদের উভয় পার্শ্বে বসানো হয়েছে।

বাড়িতে এত বড় উৎসব, এত ঘটা, অসময়ে ভোজনপর্বের বিরাট আয়োজন, একই সঙ্গে বহু জনের পরিচর্যা, এসব ব্যাপারে গৃহস্বামী বা বাড়ির গৃহিণীর কোন দায়িত্বই নেই। করিৎকর্মা বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর যাবতীয় ভার অর্পণ করে বগলাপদ নিশ্চিন্ত। তাঁরই নির্দেশ মত বিবিধ শ্রেণীর খাদ্যগুলি বোগলা-ভবনেই প্রস্তুত করিয়েছেন সেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিমন্ত্রিতদের সংখ্যার অনুপাতে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে সুলোচনা দেবীরও কোন দায়িত্ব না থাকায় প্রত্যূষেই স্নানান্তে ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করে সেই যে দ্বার বন্ধ করেছেন, এ পর্যন্ত সেই ভাবেই আছেন। অন্দরমহলের সবাই জানে, যতক্ষণ তিনি ঠাকুর-ঘরে থাকবেন, তাঁকে বিরক্ত করলেই অনর্থ। তিনি সংসারের কাজকর্মের সব ব্যবস্থা করেই নিশ্চিন্ত হয়ে ঠাকুর-ঘরে আশ্রয় নেন—যতক্ষণ সেখানে থাকেন, জগৎ-সংসার ভুলে যান। এদিনের উৎসব তাঁর চিত্তে কোন আনন্দ, উৎসাহ বা আগ্রহ জাগায়নি, তিনি একে নিদারুণ এক উপদ্রব ভেবেই আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন! ইদানীং দেবী কয়েক দিন ধরেই তার নিজস্ব ছোট ঘরখানিতেই একা রাত্রিবাস করে। অনেক রাত্রি পর্যন্ত তাকে পড়াশোনা করতে হয়, আলো জ্বললে পাছে মায়ের ঘুমের ব্যাঘাত হয়, তাই মায়ের মত নিয়েই এ ব্যবস্থা করেছে দেবী। মা অবিশ্যি তার আসল উদ্দেশ্যটি জেনেই মত দিতে বাধ্য হন। মেয়ের মনের মধ্যে যে কি দারুণ সংগ্রাম চলছে, তার জন্যে দীর্ঘ রাত্রি ধরে তাকে যে মন নিয়ে বোঝাপড়া করতে হয়, সে যে পড়াশোনার চেয়েও বেশী শক্ত সাধনা, তাঁর ত অজানা নয়! তাই তিনি মেয়ের প্রস্তাবে সম্মত না হয়ে পারেননি। তার পর এই উৎসবের ব্যবস্থা শুনে অবধি তিনি দেবীর মুখের পানে তাকাতে পারেননি—ক'দিনই তাঁকে অতি সন্তর্পণে তফাতে রেখে সরে এসেছেন—যাতে সামনে এসে না পড়ে! কিন্তু দেবীর মনোভাব জানলে তিনি বুঝতেন—দেবীরও এই একই অবস্থা; তাকেও যাতে মায়ের চোখের সামনে পড়তে না হয়, সেজন্যে মায়ের সংস্পর্শ কাটিয়ে চলতে হচ্ছে। সুলোচনা দেবী যেমন বুঝেছেন, এই উৎসবের ব্যাপারে মেয়ে সামনে এলে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না—তারও বুক ভেঙে যাবে; দেবীরও তেমনি দুশ্চিন্তা—এ অবস্থায় কি করে সে মাকে মুখ দেখাবে, আর—তাকে দেখে মা কি স্থির থাকতে পারবেন? পরস্পরের মনের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পরের মধ্যেই লুকোচুরি চলেছে কয় দিন ধরেই। উৎসবের আগের দিন—সুলোচনা দেবী অনেক রাত পর্যন্ত শয্যায় আচ্ছন্নের মত পড়ে থাকেন। কর্মব্যস্ত লোকজনের কলরব সে অবস্থায়ও কানে ভেসে আসে। কত আনন্দের অধিবাস—কিন্তু এই উৎসব যেন উপদ্রবের মত তাঁকে পরিহাস করছে। সেই আচ্ছন্ন অবস্থাতেই অল্পক্ষণের জন্য উভয় চোখের পাতাগুলি মুড়ে এসেছে; নিদ্রার ঈষৎ ছায়া পড়েছে চোখে, সেই অবস্থায় মনে হল—তাঁর সই যেন মাথার কাছে এসে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করছেন—তোমার দেবীর বিয়ের কথা নতুন করে কেন পাকা হচ্ছে সই? হরগৌরী-মন্দিরে তো আমরা দু' সই আগেই ও কথা পাকা ক'রে রেখেছি! তবে?

এর পরই ধড়মড় করে শয্যায় উঠে বসেন সুলোচনা দেবী—'সই' বলে চীৎকার করতে যাচ্ছিলেন; কিন্তু তখনই স্বপ্ন দেখেছেন বুঝতে পেরে একটা নিশ্বাস ফেলে আবার শুয়ে পড়েন। কিন্তু স্বপ্নে দেখা সই-এর মূর্তি, তাঁর সেই কথাগুলি, তাঁর মনের মধ্যে যেন জেঁকে বসে—তিনি আবার অতীতে যেন ফিরে যান!

ওদিকে দেবীর ঘরে তার অবস্থা অনুরূপ। খাবার রেখে যায় পাচিকা। দেবী সে সময় তাকে বলে দেয় যে, সে যেন সবাইকে বলে রাখে—বেলা ন'টা আগে কেউ যেন আমাকে ডেকে বিরক্ত না করে। ন'টার পরও না উঠলে বরং ডাকতে পারে—কিন্তু তার আগে নয়।

* * * *

পত্নীর বিষণ্ণ মনোভাব দেখে বগলাপদর চিত্ত এতই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে যে, এদিনের উৎসব সংক্রান্ত সব কিছুর ভার ও দায়িত্ব তাঁর বিশ্বস্ত সরবরাহকারীর উপর সমর্পণ কালে সুদর্শন ও শাস্ত্রজ্ঞ এক পণ্ডিত ব্যক্তিকেও সংগ্রহ করবার ভার দেন পৌরোহিত্য করবার জন্য। যথাসময় নির্দেশ মত সুপুরুষ ও সুপণ্ডিত এক শিক্ষাব্রতীকেও উপস্থিত করা হয়। ন'টার কিছু পূর্বেই তিনি পাত্রীকে সুসজ্জিতা করবার নির্দেশ দেন, যেহেতু কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টার সময় পাত্রীকে সভাস্থ করা হবে, তিনিও ঠিক ঐ সময় স্বস্তিবাচনের সঙ্গে মঙ্গলাচরণ করবেন।

কথাটা শুনেই বগলা কৈলাসকে ডেকে বলে দিলেন: দিদিমণিকে তৈরী হতে বলে আয়। সাড়ে ন'টার একটু আগেই তাকে সভায় আনা হবে।

কৈলাস কিন্তু ভিতর মহলে গিয়ে মহা সমস্যায় পড়ল। গৃহিণী তখনও ঠাকুরঘরে; তাঁকে ডাকবে কে? দিদিমণিও রাত্তিরে শোবার সময় বলে দিয়েছেন, ন'টা বাজবার আগে যেন কেউ তাঁকে ডেকে বিরক্ত না করে! এ-অবস্থায় কৈলাসকেই প্রতীক্ষা করতে হলো এবং ন'টা বাজতেও দিদিমণির কক্ষদ্বার রুদ্ধ দেখে তাঁরই গত রাত্রের নির্দেশ অনুসারে কৈলাস ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করল। কিন্তু ভিতর থেকে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। কৈলাস তখন অধৈর্য হয়ে রুদ্ধ দরজার কড়া দুটো বাজিয়ে শব্দটাকে আরো তীব্র করল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। এবার খুব জোরে দুটো ধাক্কা দিতেই দরজা আপনি খুলে গেল। দিদিমণি বেরুচ্ছেন বুঝে কৈলাস দরজার পাশে সরে দাঁড়াল। ইতিমধ্যেই অন্দর মহলের অনেকেই ঘরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে কৌতূহলী হয়ে। তাদের ভিতর থেকেই বাসনা বলল: কোথায় দিদিমণি? ঘর ত খালি দেখছি!

কৈলাস উঁকি দিয়ে দেখল, দরজার চৌকাঠের উপর এক দলা ভাঁজ করা কাগজ চেপ্টে রয়েছে। তা থেকেই বুঝল যে, এর ওপর বাইরে থেকে দরজাটা জোরে টানতেই শক্ত হয়ে এঁটে যায়। পরে জোরে ঠেলতেই খুলে পড়ে। কিন্তু এভাবে কৌশল করে দোঁকা দিতে গেলেন কেন দিদিমণি? তিনি কি তাহলে লুকিয়ে মজা দেখছেন? কিছুক্ষণ এমনি আলোচনা চলল, উন্মুক্ত ঘরের দরজার সামনে। কেউ কেউ তার সন্ধানেও ছুটল—যদি মায়ের ঘরে বা আর কোথায় থাকেন? কিন্তু কোথাও যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন কৈলাস ও বাসনা ঘরের মধ্যে সেঁধিয়ে ঘরখানা আগাগোড়া সন্ধানী দৃষ্টিতে উভয়েই দেখতে লাগল। হঠাৎ বাসনার চোখে পড়ল একখানা সাদা লেফাফা—শয্যার উপর মাথার বালিসটির সাদা ওয়াড়ের সঙ্গে পিন দিয়ে আটকানো রয়েছে। তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে পিনের মুখ খুলে খামখানা মুক্ত করতেই, কৈলাস এগিয়ে গিয়ে

সাগ্রহে বলল: এ যে চিঠি! সর্বনাশ! এ নিশ্চয়ই দিদিমণির কাজ!

যা ভেবেছিনু—সর্বনাশ হয়েছে! সাহেবের নামে এই চিঠি লিখে রেখে দিদিমণি তাহলে—

কথাটা শেষ করতেও বুঝি বাড়ির পুরানো ভক্ত ভৃত্য সঙ্কুচিত হল। তাঁর চোখ দু'টিও বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে। জোর করে রুদ্ধ কণ্ঠকে আয়ত্তে এনে সে বলল: কি করে এ খবর তাঁকে দেব? চিঠিখানা খুলে পড়া ত পরের কথা, কিন্তু দিদিমণিকে পাওয়া যাচ্ছে না, তাঁর বিছানার বালিসের গায়ে সেপটিপিন দিয়ে গেঁথে এই চিঠিখানা—উ! শুনেই সাহেব···আমি যে ভাবতে পারছি না! এক-বাড়ি লোক—একটু পরেই যে তাঁর আশীর্বাদ! এত ঘটা—কিন্তু—হ্যাঁ, কে—কে সাহেবের কাছে যাবে এ চিঠি নিয়ে?

বাসনা বলল: তোমাকেই যেতে হবে কৈলাসদা'! তুমি শক্ত মানুষ, পারবে।

কপালে জোরে করাঘাত করে ভক্ত দরদী ভৃত্য সরোদনে বলল: শক্ত ত বটেই দিদি—আমি যে ভৃত্য! হা ভগবান—শেষে কৈলেস পর্বতকেই নিমিত্ত করলে—এত ঘটা, এত আনন্দের উৎসবটা ভেঙে তছনছ করবার—ওঃ!

চোখের জল মুছতে মুছতে কৈলাস ছুটল সুসজ্জিত উল্লাসমুখরিত উৎসব-মণ্ডপের অভিমুখে।

সকলেই যখন সাগ্রহে পাত্রীর আগমন প্রতীক্ষা করছেন, আধুনিক যুগের শিক্ষাব্রতী পুরোহিত ঘন ঘন হাতে-বাঁধা ঘড়ির বড় কাঁটাটির গতি দেখছেন, শত চক্ষু আগ্রহ উন্মুখ—সেই পরম অবস্থায় বহুজনপূর্ণ সভাস্থলে সহসা যেন একটা বোমা বিদীর্ণ হল—সকলকে স্তব্ধ ত্রস্ত ও অভিভূত করে।

গৃহস্বামীই সহসা সোফা থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন: বন্ধুগণ! 'বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের কথা শুনেছেন, আপনারা, আজ সেটা প্রত্যক্ষ করুন। এই মাত্র জানলাম, যাকে উপলক্ষ করে এই উৎসব, আমার সেই কন্যা—দেবী অন্তর্ধান করেছে বোগলা-ভিলা থেকে।

সঙ্গে সঙ্গে নানা কণ্ঠের সপ্রশ্ন মিশ্র স্বরের একটা গভীর গুঞ্জনে জনাকীর্ণ সভাস্থল আচ্ছন্ন হলো। তারই মধ্যে বগলাপদর আর্তস্বর পুনরায় সকলকে আকৃষ্ট করল। বগলাপদ বললেন: দেবীর বিছানায় যে পত্রখানি পাওয়া গেছে, এই সভাস্থলে আপনাদের সামনেই আমি পড়ছি:

'শ্রীচরণেষু,

পূজনীয় বাবা, সম্প্রতি আপনি আপনার বাল্যবন্ধু ঋষিকল্প সুধী পশুপতি পণ্ডিত মহাশয়কে এই ভাষায় পত্রাঘাত করেছিলেন—যে হেতু অধুনা আপনার কন্যা শিক্ষিতা ও আধুনিকা। সুতরাং বহু পূর্বের একটা মৌখিক কথার উপর গুরুত্ব দিয়ে, সেই সূত্রে—পাড়াগাঁয়ের একটা অতি সাধারণ পাত্রের হাতে তাকে সম্প্রদান করতে পারেন না। এখন, আপনার সেই বাগ্‌দত্তা কন্যার কথা হচ্ছে—বহুকাল আগের সেই মৌখিক কথাটিই প্রতিশ্রুতির আকারে তার অন্তরে সত্যের আলোকপাত করায়—সেই সাধারণ পাত্রকেই অসাধারণ জেনে তাঁরই কাছে তাঁকেই সে আত্মসমর্পণ করতে চলেছে—যেহেতু, সে শুধু এ যুগের নয়—যুগে যুগে সমুৎপন্না যথার্থই—আধুনিকা।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে হেঁট হয়ে পিতাকে ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করে রাণী উত্তর করল: হ্যাঁ বাবা! এ উৎসবের খবর পেয়েই আমি চলে এসেছি। আপনি যখন দিদির চিঠি পড়ছিলেন, তারই একটু আগেই—

কন্যার কথায় বাধা দিয়ে তার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে বগলাপদ জিজ্ঞাসা করলেন; কিন্তু তুমি যে দেখছি শান্তিনিকেতনে গিয়ে বেশভূষাতেও নিজেকে বদলে ফেলেছ!

রাণী বলল: ওখানকার অনুকরণে নয় বাবা, দিদির এক চিঠিতে আমারও সব দিকে পরিবর্তন হয়েছে। সেই চিঠিতে দিদি আমাকে জানিয়েছিলেন, আমিও যেন তাঁরই মতন আধুনিকা হই।

বিস্ময়ের সুরে বগলাপদ শুধালেন: আধুনিকা?

স্নিগ্ধ স্বরে রাণী উত্তর করল: হ্যাঁ বাবা! দিদিই জেনেছেন, আধুনিকা বলতে কি বুঝায়—সত্যিকার আধুনিকা কি করে হওয়া যায়। আধুনিকা শুধু এ-যুগের নয়, যুগে যুগে এই ভারতে আধুনিকার অভ্যুদয় হয়েছিল, তাঁরা নিজস্ব নারীত্বের প্রভায় নূতন পথে সত্যের সন্ধান দিয়ে চিরদিনের জন্যে দেশ ও জাতির নমস্যা হয়ে আছেন।

সমাপ্ত

তুমি আর আমি

মিস্ কাজী লাইলী আশরাফী

ঈশানী-প্রলয়ে উদ্ধত সমুদ্রের ঢেউয়ের উন্মত্ততা আনি
রিক্ত-হাহাকারে নিথর জমাট হৃদয়ের ক্ষুব্ধ ফরিয়াদ শুনি
সীমাহীন রুদ্ধ কঠোর বেদনার পরিমাপে, আঁধার জমেছে
ভয়াল রুদ্র জীবনের পারে। কঠোর কঠিন ব্রতে এঁকেছে
আপন অস্তিত্ব, উত্তাল প্রমত্ততায়, গুম্ফিত ক্রন্দনের সুরে
নিৰ্জীব পাষাণ চোখে: অগ্নির মূর্চ্ছনায় কাঁপা সুদীর্ঘ প্রহরে
তখন কি তুমিও শুনেছ নিথর জমাট হৃদয়ের কাহিনী করুণ।
নিদ্রাক্রান্ত চোখের পাতায় জেগেছে সংশয়, অকথিত দারুণ।
উদাসীন আঁখি উদ্‌ভ্রান্ত করেছে বারেক দৃষ্টিতে তোমার
ভালোলাগা সে যে চিরন্তন মুখ্যদাবী, শাশ্বত ন্যায্য অধিকার।
এলো-মেলো ক্লান্তিক্রমা শুষ্কপথে ব্যথাদগ্ধ তাপ-তৃষা-মরু
আনে সীমাহীন উত্তাপ, অজানিত ভয়ে বক্ষ কাঁপে দুরু।
নিভৃত প্রাণের বন্দরে শুনেছি করাল মহাসমুদ্রের ডাক
আলোর সায়র হাতড়িয়ে মরা বিফল-জীবন, বেদনায় হতবাক,
তৃষ্ণার্ত্ত রৌদ্রের দাহে, ধূসর আকাশে জমে যদি হিংসা-করাল
তবু জেনো স্থির, তুমি আর আমি রচে যাবো সৃষ্টির মহাকাল।

জাতীয়তায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

সুপণ্ডিত ঈশানচন্দ্র ঘোষ মহাশয় রামেন্দ্রসুন্দরের বৈদিক যজ্ঞ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ প'ড়ে ব'লেছিলেন—এমন লেখা বাঙলার মধ্যে আর কারও লিখবার সাধ্য নাই। এমন কি, সারা পৃথিবীতে আছে কি না সন্দেহ!

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী তৎকালে ভাইস্‌-চ্যান্সেলার ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। পাঠ ক'রতে বললেন বেদ বিষয়ক কতকগুলি প্রবন্ধ রামেন্দ্রসুন্দরকে। পাঠ শুনে বলেছিলেন—অতি সুন্দর মনোজ্ঞ ব্যাখ্যা! মনে হচ্ছিল, যেন ব'সে রয়েছি আমরা সেই তপোবনে শান্ত-সমাহিত মুনি-ঋষিদের মধ্যে। আর শাস্ত্রব্যাখ্যা ক'রছেন ঋষি রামেন্দ্রসুন্দর।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ব'লতেন—আমি রামেন্দ্রকে নাস্তিক ব'লে জানতাম। এখন দেখছি হারবার্ট স্পেনসার হ'তে অনেক এগিয়ে চ'লেছেন রামেন্দ্র। বেদের মর্ম্মকথা আত্মস্থ ক'রেছেন তিনি।

রামেন্দ্রসুন্দর "শব্দকথা" নামে একখানি বই প্রকাশ ক'রেছেন। তার মধ্যে "ধ্বনিবিচার নামক অংশটি তাঁর মননশীলতা ও প্রজ্ঞার বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্রনাথ "ধ্বনিবিচার" পাঠের আগ্রহ নিয়ে লিখেছিলেন আপনার "শব্দকথা" কী একখানি পেতে পারি? "ধ্বনিবিচার" সম্পর্কে কী লিখেছেন দেখবার ইচ্ছা আছে।

তখুনি পাঠিয়ে দিলেন "শব্দকথা", আরও জানিয়ে দিলেন—চাইবার আগেই পাঠান উচিত ছিল আমার। কর্ত্তব্য হানির জন্য তিনি লজ্জিত ও দুঃখিত। "ধ্বনিবিচার" পাঠ ক'রে বিশ্বকবি যে পত্র দিয়েছিলেন তার অবিকল নকল দিলাম নিম্নে।

শিলাইদহ

"সবিনয় নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,—

"ধ্বনিবিচার" পড়িয়া আপনাকে পত্র লিখিব স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু পাপ আলস্য আসিয়া বাধা দিল। আমিও এই বিষয়টা এই ভাবে আলোচনা করিব বলিয়া এক দিন স্থির করিয়াছিলাম, সেই জন্য আপনার প্রবন্ধের আরম্ভ ভাগ পড়িয়া মনে মনে আপনার সঙ্গে ঝগড়া করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। তাহার পরে সমস্তটা পড়িয়া দেখিলাম, আমি এতটা পরিষ্কার করিয়া এবং এমন বিজ্ঞান-সম্মত শৃঙ্খলার সহিত কখনই বলিতে পারিতাম না। আমি কেবল একটা আভাসমাত্র দিতে পারিতাম। আপনার এই প্রবন্ধ পড়িয়া ধ্বন্যাত্মক শব্দতত্ত্ব গভীরতর ও নূতনতর করিয়া দেখিতে পাইলাম। এক্ষণে এই পন্থা ধরিয়া আলোচনাটিকে আরও অনেক শাখা প্রশাখায় বাহিত করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইবে বলিয়া মনে করি। * * * প্রত্যেক ধ্বনিরই একটা বিশেষ মূর্ত্তি আছে, এবং সেই জন্য এই সকল ধ্বনির সমবায়ে অনুভূতিমূলক ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্ততঃ বাঙলা ভাষায় রচিত হইয়াছে, এ তত্ত্বটি আপনার প্রবন্ধে সুন্দর করিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। * * *

১১ই ফাল্গুন ১৩১৪।

ভবদীয়

(স্বাক্ষর) শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

রবীন্দ্রনাথ কথা কইলে, হাসলে, কোনও কবিতা কিংবা গান লিখলে রামেন্দ্রসুন্দরের অন্তঃকরণ আনন্দে উদ্বেল হইয়া পড়িত। রবীন্দ্রনাথের সব কিছু তাঁর কাছে ছিল মধুর, সুন্দর, পবিত্র। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের গান মুখস্থ করাতেন তাঁর দৌহিত্র-দৌহিত্রীদিগকে এবং ছাদে ব'সে শুনতেন সেই গান তাদেরই কণ্ঠ হ'তেই। গান শুনতে শুনতে চক্ষু সজল হ'তো তাঁর। দৌহিত্রী মুরলা দেবী গাইতেন—"তোমার আমার মিলন হবে সেই মোহনার পারে" শুনতে শুনতে ভাবে অভিভূত রামেন্দ্রসুন্দর যেন এ জগৎ থেকে অন্য জগতে। ধীর, প্রশান্ত মূর্ত্তি রামেন্দ্রসুন্দর কখনো বা ব'লতেন—গাও তো দিদি—"আমার মাঝে তোমার···" সেই গানটা। নাতনী গাইছে—"তোমায় আমায় মিলন হ'লে—" তখন ধ'রে রাখা যায় না রামেন্দ্রসুন্দরকে, এতো ভাবাবেগ!

একদিন রবীন্দ্রনাথ এসেছেন রামেন্দ্রসুন্দরের বাড়ী। ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন ত্রিবেদী মহাশয়—আপনার জন্য কী আয়োজন ক'রবো?

স্মিতহাস্যে সঙ্গে ব'ললেন—আপনি কাছে থাকলেই আমার সব আয়োজন।

রবীন্দ্রনাথেরই গান শুনালেন নাতনীদের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে।

ব'ললেন রবীন্দ্রনাথ—খুবই ভাবের উপর দরদ দিয়ে গেয়েছে আমার দিদিমণিরা, কিন্তু তোমাদের দাদামশায় ভুলে গেছেন, আমার একটা বিশেষ সুর আছে। যাতে আমাকে চিনতে পারবে ব'লে এই সুর আমার দেওয়া। কবে ম'রে গেছেন, রামপ্রসাদ! আজও জীবিত ক'রে রেখেছে তাঁকে তাঁর সুর। আউল বাউল কেওই মরেনি। এখনও কীর্ত্তন-আসরে বেঁচে রয়েছে। আমিও বাঁচতে চাই আমার সুর ধ'রে।

দুঃখিত হ'য়ে ব'ললেন রামেন্দ্রসুন্দর—আমার ভুল হ'য়েছে আপনার নিজস্ব সুরে শিক্ষা না দেওয়ান।

নানা রকম আহার্য্য এসে উপস্থিত হ'লো। দেখে রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমায় একটা কোন জিনিষ দিন তুলে, তাই খাবো আমি। এ আয়োজন সব উদরস্থ ক'রলে আমি মারা যাবো।

শরীর ভাল ক'রবার জন্য প্রতি বছর শীতকালে বোটে গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ ক'রতেন রামেন্দ্রসুন্দর বাড়ীর সকলকে সঙ্গে নিয়ে। কী মধুর দৃশ্য সন্ধ্যার আগে! তখন তিনি ব'সতেন আকাশের দিকে চেয়ে। আকাশ তখন সিঁদুরের রঙে রঞ্জিত। তপস্বী দেখছেন সেই দৃশ্য নির্নিমেষ নেত্রে। ক্রমে সন্ধ্যার অবসান হচ্ছে, তখনও আকাশের দৃশ্য কম মনোহর নয়!

কি দেখছো উপরের দিকে মুখ ক'রে?

বিরাটের উপলব্ধি ক'রছি উপরের দিকে চেয়ে। কী সুন্দর, কী বিশাল' উপলব্ধিতে আসে না আমাদের। মনে হয় ঐ দিকেই চেয়ে থাকি।

হঠাৎ নিচে থেকে খবর এলো—আগুন! আগুন!

চাকর-বাকর ঝি চীৎকার ক'রে বড় বাবুকে বললো—নেমে আসুন। নেমে আসুন। নেমে আসুন, বোটে আগুন লেগেছে। তখন তন্ময় ঋষির বাহ্যজ্ঞান নাই। একজন এসে বললো—ঐ দেখুন বোটে আগুন!

নেমে গিয়ে দাঁড়ালেন বোট থেকে দূরে। দেখতে দেখতে বোটখানা আগুনে পুড়ে গেল।

তখন রামেন্দ্রসুন্দরের সম্পূর্ণ জ্ঞান হ'য়েছে, জিজ্ঞাসা করলেন—ছেলেরা সব নেমেছে ত? জিনিষ-পত্র সব রক্ষা পেয়েছে ত?

সকলকে সুস্থ দেখে বললেন প্রসন্ন হ'য়ে—আমার একটা বড় ফাঁড়া গেল।

তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন ক'রলেন স্ত্রী ইন্দুপ্রভা—তুমি যে ফাঁড়া বিশ্বাস করো না, এখন কেমন দেখলে ত? এবার তোমার কোষ্ঠীটা পাঠাও একবার কোনও একজন বড় জ্যোতিষী পণ্ডিতের কাছে।

. তিনি কী-বিধাতা পুরুষ? মৃত্যু থাকলে পিছিয়ে দিতে পারবেন তিনি?

তোমার ও কথা শুনে আমি চুপ থাকতে পারবো না। কোষ্ঠী বিচার করাতেই হবে তোমাকে। বড় বড় পণ্ডিতরা কোষ্ঠী দেখে ব'লতে পারেন সব, আর কী ক'রলে অশুভ কেটে যায় তারও ব্যবস্থা দিতে পারেন। শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করালে অনেক বিপদ কেটে যায়, এ আমি ভাল লোকের কাছে শুনেছি।

কী করেন, অগত্যা কোষ্ঠী পাঠালেন কটক কলেজে আচার্য্য যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কাছে, সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত পত্র।

জন্ম ১৭৮৬ শকাব্দা, ৫ই ভাদ্র শনিবার কৃষ্ণপক্ষ চতুর্থী, কর্কট লগ্ন, রেবতী নক্ষত্রাশ্রিত মীন রাশি, রাত্রি, একুশ দণ্ড সাঁইত্রিশ পল।

কটক

২রা আশ্বিন, ১৩২১ সাল

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আমি রেজেষ্টারি ডাকে আপনার কোষ্ঠীখানি ফেরৎ পাঠাইলাম। কোষ্ঠী ঠিক কিনা কে জানে! ঠিক হইলেও সব মেলে না। কোষ্ঠীতে দেখা যাইতেছে চারি বৎসর দুই মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ৪৬ বৎসর ২ মাস বয়সের পর অজীর্ণমূলক রোগ জন্মিয়াছে। অদ্যাপি ঐ রোগে কষ্ট পাইতেছেন। বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য ধন, শৌর্য্য বীর্য্য খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা অধিকার—সব থাকিতেও নাই। স্বোপার্জ্জিত ধন ব্যতীত পৈতৃক ধনেরও কিছু ক্ষয় পাইয়াছে। যাহা হউক, ধনে মানে কি করিতে পারে, স্বাস্থ্যধনই প্রধান ধন। শান্তি ও ধর্ম্মশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিলে আর কিছু না হউক মনে শান্তি আসে। দেশের লোক মঙ্গল কামনা করিতেছে। আশা করি মঙ্গল হইবে। —ইতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

কি লিখেছেন এইবার দ্যাখো।

সেই গতানুগতিক।

ঠিকই ত বলেছেন, মনের শান্তি আসে ধর্ম্মের কাজ ক'রলে।

এ তো আমার কেন, অতি সামান্য লোকেরও জানা আছে। হাসতে হাসতে আবার বললেন—ধর্ম্মকাজ ক'রলে মনের শান্তি আসে কে না জানে? আমার জিজ্ঞাসা—পণ্ডিত মহাশয়, তুমি ব'লতে পারো—দৈবকে খণ্ডন ক'রতে পারো? তখন তুমি ব'লবে তা পারি না, তবে তরবারির আঘাত যেখানে ছিল সেখানে সূচের আঘাতও হইবে। সে কেমনধারা কথা তোমার? জ্ঞান পূর্ণমাত্রায় এলে সেই কঠিনতম আঘাতও মনেই আসবে না। দেখলে ত আমাকে বাঁচাতে পারলো দৈবের হাত থেকে? তোমার কোষ্ঠী-বিচারক বললেন মাত্র ধর্ম্মকাজ করো, তাহ'লেই মনে শান্তি আসবে।

অশান্ত মন রামেন্দ্রসুন্দরের, কিছুতেই শান্ত হ'তে চায় না। কবে স্বাধীনতার বাণী ধ্বনিত হ'য়ে উঠবে সারা দেশে সেই চিন্তা তাঁর দিন-রাত।

প্রায়ই ব'লতেন—আমাদেরই দেশের একজন আসবেন ভারতকে ত্রাণ ক'রতে। আসছেন তিনি। সে-দিনের আর বেশী বিলম্ব নাই।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গাদাস উপস্থিত থাকতেন প্রায়ই সব আলোচনার সময়। জিজ্ঞেস ক'রলেন—কবে তিনি আসবেন মনে হয়?

ভাবগম্ভীর স্বরে বললেন—দিন-ক্ষণ ত ব'লতে পারবো না, তবে তিনি আসবেনই। হয়তো তিনি এসেছেন। এখনও প্রকট হয়নি তাঁর নাম। যখন দেখবে বালক, যুবক, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেই ব'লছে একবাক্যে একজনের নাম, তখন বুঝবে তিনি এসেছেন। তখনই বুঝবে আমার ভারতের স্বাধীন হ'তে আর বিলম্ব নাই।

বাবুদাদা, আপনাদের মত পণ্ডিত সব মনে-প্রাণে স্বাধীনতা চাচ্ছে, তবে আর দেরী কিসের?

হাসলেন রামেন্দ্রসুন্দর ভাইএর কথা শুনে। ব্রিটিশ সরকারের কত বন্দুক-কামান দেখছো না? মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্যে সূর্য্য অস্ত যায় না, জানো ত? অত বড় দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ব্রিটিশ কি সহজে এই সোনার ভারতের অধিকার ছেড়ে দেয়? কবি ব'সে কবিতা লিখবেন, আমি বহাল তবিয়তে অধ্যক্ষের কাজ ক'রে যাবো, তাহ'লে কী ভারতের স্বাধীনতা আসবে কোন্ দিন? স্বাধীনতা আনতে হ'লে চাই এমন একজন সর্ব্বত্যাগী সাধক—যিনি ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে ব'লবেন—তোমরা ত্যাগ করো, আমি এবার এসেছি। ঐ একমাত্র ত্যাগের মন্ত্রেই জেগে উঠতে পারে সমগ্র ভারত। চাই ত্যাগের আদর্শ, যা ভারতের সনাতন বাণী। এই দেখ না রবীন্দ্রনাথের নিজের হাতে লেখা একখান পত্র—"কনফারেন্সে আমাকে সভাপতির পদে আহ্বান করার সংবাদ পাইবা মাত্র নানা পক্ষ হইতে এত বেনামী পত্র পাইয়াছি যে আমি কোন দলের লোক তাহা স্থির করা আমার পক্ষে কঠিন হইয়াছিল। মনে করিয়াছিলাম কনফারেন্স মঞ্চে যখন কেহ চৌকি ছুঁড়িয়া মারিবে তখন তাহাকে হাত জোড় করিয়া বলিব—বাবা তুমি বলিয়া যাও কোন্ পথের লোক—তাহা হইলে আমি যে কোন দলে আছি সে সম্বন্ধে সন্দেহ ঘুচিয়া যায়। চৌকি কেহ মারে নাই; এবং দুই দলেই আমাকে বেতন চুকাইয়া দিয়াছেন, সুতরাং আজও নিষ্পত্তি হইল না আমি কোন দলের।

১১ই ফাল্গুন ১৩১৪ সাল। তাই বলছি ধরা-ছোঁওয়া দেওয়া চাই। এক জন এমন সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দরকার যিনি ফুটিয়ে তুলবেন ভারতের অনাদি কালের স্বর—ত্যাগ। আমরা কয়েকটা কেবল ভয়ে অগ্রসর হ'তে পারছি না! মনে হয়, গভর্ণমেণ্ট যদি আমাদেরকে ধরেন, দেহের কষ্ট কি সহ্য ক'রতে পারবো? যদি বিষয় আশয় কেড়ে নেন তবে যে অনাহারে মারা যাবো। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী-পরিজন নিয়ে কোথায় দাঁড়াবো? এই সব নানা রকম ভয়েই ত আমরা অগ্রসর হ'তে পারছি না! মন যে আমাদের দুর্ব্বল! যিনি আসবেন ভারতকে স্বাধীন ক'রতে, তাঁর ত্যাগই হবে মূলমন্ত্র। ত্যাগের দ্বারাই হয় বীর্য্যের প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রনাথ আমাকে সে দিন কী বলছেন শোন—বিজ্ঞানের সূত্র ধ'রে আপনি দেশকে জাগিয়ে তুলুন, আমি আমার বীণা যন্ত্র নিয়ে চারণের গান

গাই। আমাদের প্রত্যক্ষ নামতে গেলে শুভ ফলের চেয়ে অশুভ আসবে বেশী। আমি এ সম্বন্ধে কবিগুরুকে যা লিখেছি তার উত্তর কী দিয়েছেন শোন :—

"শান্তিনিকেতন, বোলপুর।

সবিনয় নমস্কার নিবেদন—

আমাদের দেশে নেশন ছিল না এবং নাই এ কথা সত্য। তার বদলে কি আছে বা ছিল সেইটাই বিচার্য্য। কারণ, ধরিয়া রাখিবার মত কিছু একটা না থাকিলে ভারতবর্ষ আজ পর্য্যন্ত যাহা আছে তাহা কি আশ্রয় করিয়া থাকিত? আপনার এই জিজ্ঞাস্য বিষয়টি একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যদি খোলসা করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তবেই কতকটা সন্তোষজনক উত্তর আশা করিতে পারেন। ১৪ই বৈশাখ ১৩১২ সাল।

ভবদীয়
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

এ বিষয়ে আমি তাঁর কাছে আর কিছু জানবার চেষ্টা করিনি! উত্তর আমি নিজের কাছেই পেয়েছি।

কী বাবুদাদা?

প্রশ্ন ক'রতেই ব'ললেন—অনধিকারীকে ব'লতে নেই। তবে জেমোকান্দীতে কাওকে বাকী রাখিনি কংগ্রেসের সদস্য ক'রতে।

তবে বাবুদাদা, বেশীর ভাগ সদস্যই হ'য়েছে বড় লোক, আপনার ভগিনীপতিরা।

তখন হাসি ধরে না রামেন্দ্র বাবুর—বড় লোককে না ধ'রলে সাধারণকে পাওয়া যাবে কেন? বড় লোকরাই ত জনসাধারণের প্রতিনিধি। রামায়ণ মহাভারত হ'তে আজ পর্য্যন্ত যত সব ইতিহাস পুরাণ লেখা হ'য়েছে সে সবে কাদের কথা আছে জানো? সবই সে কালের বড় লোকদের ইতিহাস। তারই মধ্যে সে কালের সমাজের, সংস্কারের ধারার সব কিছু পাওয়া যেতো। আজকালকার ধারা যদি কেহ লেখে তা' হ'লে ভবিষ্যতের মুখ উজ্জ্বল হবে না।

কেন বাবুদাদা?

কেন জিজ্ঞেস ক'রছিস্? দুঃখ হয় না, কালী মল্লিকের মত লোক আমার বাড়ী এলো; সে আমার পরম বন্ধু। আমাদের থালা বাসনে খেতে দেওয়া হ'লো তাকে; তার পর শুনলাম সেই বাসনগুলো নাকি আগুনে পোড়ান হ'য়েছে। কারণ সে সোনার বেণে, তার খাওয়াতে বাসনগুলো অপবিত্র হ'য়েছে, ও সব অগ্নিশুদ্ধ ক'রে না নিলে আর আমাদের ব্যবহার করা চ'লবে না। হয়তো কোন কালে কোনও রাজা শাসনবিধি দিয়ে গেছেন, আজও কী তার শেষ নাই? আমি বলতে পারি জোর গলায়, ধর্ম্মে কর্ম্মে, নিষ্ঠায় ভক্তিতে, আচারে নিয়মে ও জাতি কোন ব্রাহ্মণের চেয়ে কম নয়। তবে হিন্দু সমাজে ওরা আর লাঞ্ছনাই বা সইবে কেন আর সকলের কাছে হীন হ'য়েই বা থাকবে কেন? এই সব কুসংস্কার দেখে আমার ভেতরটা জ্বালা ক'রে ওঠে। মনে হয়, হায় রে এই সব অনাচার অত্যাচারই আমাদেরকে পরাধীন ক'রে রেখেছে। দেশবাসী সত্যের সন্ধান লাভের জন্য চেষ্টাও করে না, ফলে সত্যকে জানতেও পারে না। সত্যের উপলব্ধি ছাড়া কোনও জাতি বড় হ'তে পারে না। স্বাধীনতা লাভ ত দূরের কথা। তাই সময় সময় ভাবি, কবে কত দিনে দেশ পাবে সত্যের সন্ধান!

ব্যাকুল হ'য়ে আছেন রামেন্দ্রসুন্দর প্রিয় বন্ধুর অদর্শনে। তিনি নাকি বিদেশ গিয়েছেন। দেশে ফিরে এসেই পত্র দিয়েছেন বন্ধুকে। পত্র পেয়ে মহাখুসী। বাড়ীর সকলকে ডেকে প'ড়ে শুনাতে লাগলেন,—

শান্তিনিকেতন
২১ মার্চ্চ, ১৯১৭।

"প্রীতি নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

দেশে ফিরিয়া আসিয়াই আপনার প্রীতি-সুধাপূর্ণ পত্রখানি আমার কাছে মরুভূমির উৎসধারার মত লাগিল। আপনাদের মত সুহৃজ্জনের কাছ হইতে চিরদিন যে সমাদর পাইয়া আসিয়াছি নানা দুর্য্যোগের মধ্যেও আজও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। ইহা যে আমার পক্ষে কি গম্ভীর সান্ত্বনা তাহা অন্তর্যামীই জানেন। বিদেশে আপনার কথা বার বার স্মরণ করিয়াছি। কলিকাতায় দিন দু'য়েক থাকিবার অবকাশ পাইলেই নিশ্চয়ই আপনার দরবারে গিয়া হাজির হইতাম। * * * অনেক গল্প করিবার বিষয় জমিয়াছে, সেগুলো হাতে হাতে খোলসা করিতে পারিলে ভাল হয়, নইলে কালক্রমে লোকসান হইতে পারে।

আপনার
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

হা বাবুদাদা, ওঁর যে একটা বিরাট বিরুদ্ধ পার্টি আছে। আপনার উপরও সন্তুষ্ট নন তাঁরা, আপনি রবীন্দ্রনাথের আর রবীন্দ্রনাথ আপনার প্রিয় ব'লে।

ভার হ'য়ে ব'ললেন রামেন্দ্রসুন্দর—ভাই, তাঁদেরকে জানাবে, আমি একজন গোটা মানুষের সহিত আলাপ আলোচনা ক'রছি।

এতে তাঁদের কোন ক্ষতির কারণ নাই। আর দোষ-গুণে ত মানুষ; ঐ মানুষটির এতো গুণ চোখে প'ড়েছে যে একটু দোষ যদি থাকেও চোখে পড়ে না। জানো ভাই, সূর্য্যের আলো ক্ষুদ্র তুচ্ছ জিনিষের উপর প'ড়লেও তার মহত্ব খোওয়া যায় না। আমাদের রবি বাবু যে সূর্য্য! কয়েক মাস আগে একটা গান লিখে রবি বাবু আমাকে শুনিয়েছিলেন। কী ব'লবো, সে গান আমার প্রাণকে গভীর ভাবে স্পর্শ ক'রেছিল। তুমি শুনলেই বুঝতে পারবে কী সুন্দর তার ভাব আর ভাষা! তুলনা নাই তাঁর লেখার—"জগৎ জুড়ে উদার সুরে কি গান বাজে, সে গান কবে গভীর সুরে বাজিবে হিয়া মাঝে। আকাশ জল বাতাস আলো, সকল কবে বাসিবে ভালো, হৃদয় সভা জুড়িয়া তারা বসিবে হিয়া মাঝে।···আপনি কবে তোমার নাম বাজিবে সকল কাজে।" সব ঠিক মনে নাই, তবে এতেই তুমি বুঝবে—রাত-দিন রমণ হচ্ছে তাঁর ভগবৎ প্রসঙ্গে। কী বলবো, যদি না বোঝে সকলে তাঁর সুগভীর আত্মদর্শন। তবে একদিন তাঁরাও বুঝবেন নিশ্চয়ই।

একদিন রাধাকুমুদ বাবুর চিঠি পেয়ে ব'ললেন বাড়ীর সকলকে, এই দেখো কী লিখেছেন আমাদের দেশের একজন লোক, মুর্শিদাবাদেরই একজন লোক। চিঠি দেখে সকলে ব'ললেন—ও তো ইংরাজীতে লেখা চিঠি, কী বুঝবো আমরা ওর?

ব'ললেন রামেন্দ্রসুন্দর—ঐ যে তোমরা নিষেধ ক'রলে কাশীতে চাকরী নিতে, তাই লিখেছেন কাশীর চাকরী আপনি নেবেন কি না?

ব্যস্ত হ'য়ে ব'ললেন সকলে—আমরা আবার কবে নিষেধ ক'রেছিলাম? এখুনি চলো না। তুমিই তো ব'লেছিলে ক'লকাতা ছেড়ে গেলেই আমি মারা যাবো। সেই জন্য ত আমরা আর সে কথা তুলি না।

পাঠকগণের কৌতূহলের চরিতার্থতা জন্য চিঠিখানি উদ্ধৃত করিলাম।

26, Sukeas Street, Calcutta
11. 6. 17

My dear Ramendra Babu,

I have been asked by the Hon. Pandit Madan Mohan Malavia in a confidential letter to ascertain whether you will accept the Principal ship of the Hindu University College if it is offered to you, and if so, on what terms—kindly send me a reply as soon as you can by the above address. Trusting you are quite well,

yours affly—Radha Kumud.

ক'লকাতা আমার লীলাভূমি, আমার সাধনার স্থান। জল ছাড়লে যেমন মাছ বাঁচে না, কলকাতা ছাড়লে আমারও সেই অবস্থা।

স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় নিজের অপরাধ স্বীকার ক'রে একখানি চিঠি লিখলেন:—

ঘোড়ামারা, রাজসাহী,
২৬।৭।১০

"প্রীতি নমস্কার নিবেদন,

পত্র পাইয়া প্রীতি লাভ করিলাম, আপনার মত কর্ণধার আছে বলিয়াই ভরাডুবি হয় না। বঙ্গদর্শন পড়িয়া এখানকার সকলে আপনাকে পত্র লিখিবার জন্য যে পত্র রচনা করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই আমি লিখিয়াছিলাম। তজ্জন্য ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না। আপনার উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে। আপনার দ্বারায় এরূপ ঘটিয়াছে কেহই এরূপ ভাবেন নাই। তবে আপনাকে একবার জানান উচিত, ইহাই সকলের সিদ্ধান্ত হইয়াছিল। আপনাকে যে মধ্যে মধ্যে এরূপ উপদ্রব সহ্য করিতে হয় তাহা জানি। আপনি সদাশিব—নীলকণ্ঠের ন্যায় বিষ জীর্ণ করিয়া অমৃত উদ্গিরণ করিয়া থাকেন। তাহা জানি বলিয়াই পত্র লিখিয়াছিলাম। তজ্জনিত ত্রুটি বা অপরাধ কখনই গ্রহণ করিবেন না। * * *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।"

রামেন্দ্র বাবু বলেন—এক দিন আসবে যে দিন সকলেই আপন আপন ভুল বুঝতে পারবেন। অক্ষয় মৈত্রেয়র চিঠিখানা অমূল্য সম্পদ ব'লে রেখে দিয়েছি।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর নিজের লেখা দু'খানা বই মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের কাছে পাঠানতে তিনি লিখেছিলেন:—

২৫, রামমোহন সাহার লেন
ডাফ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
১১ই আশ্বিন, ১৩২০

"* * * * অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনি যে ঐতরেয় ব্রাহ্মণ বঙ্গানুবাদ পাঠাইয়াছেন তাহা আমি সাদরে ও সাগ্রহে পাঠ করিব। এই গ্রন্থ এবং কর্ম্মকথা উপহারের জন্য আমি কৃতজ্ঞ রহিলাম। আপনার প্রত্যেক গ্রন্থই আমাদের সাহিত্যে রত্নস্বরূপ। প্রভূত গবেষণা ও চিন্তার ফল।

ভবদীয়
শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।"

জটিল প্রবন্ধ লিখে কখন কখন জানতে চাইতেন—কেমন ব'লছে পাঠকেরা? তাঁরা কি বুঝতে পারছেন? এই ভাবে পত্র লেখায়, তার উত্তরে লিখেছিলেন তদানীন্তন "ভারতবর্ষ" সম্পাদক জলধর সেন:—

২৭ জুন ১৯১৭

"শ্রীচরণেষু

আমি দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি এবং এখন একটু সুস্থ আছি। গত কল্য আপনার প্রেরিত Proof পৌঁছিয়াছে। এবার ত আপনি বেশী কিছু করেন নাই। তাই আমি নিজে প্রুফ দেখিয়া অর্ডার দিতে সাহসী হইতেছি। * * * * যদি এক-আধটা ভুলই থাকে তাহা প্রবন্ধের গৌরবে ঢাকিয়া যাইবে।

আষাঢ়ের প্রবন্ধে যে কি মত প্রকাশ ক'রেছেন জানিতে চান। বাঙ্গালা দেশে যাঁহাদিগকে আমরা শ্রদ্ধা করি তাঁহাদের কয়েক জনের সঙ্গে দার্জ্জিলিংএ এবং এখানে দেখা হইয়াছে,—তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন, বহুকাল এরূপ প্রবন্ধ তাঁহারা পড়েন নাই। আষাঢ়ের ঐ প্রবন্ধটি বিগত কয়েক বৎসরের সাময়িক সাহিত্যের সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ, আষাঢ়ের প্রবন্ধেই যদি লোকে এই কথা বলেন, তবে শ্রাবণের প্রবন্ধ পড়িয়া যে তাঁহারা

কি বলিবেন তাহা ত আমি ভাবিয়াই পাই না। আমার মনে হইতেছে, শ্রাবণের প্রবন্ধ আষাঢ়কেও ছাড়াইয়া গিয়াছে; তাই আশা হইতেছে ভাদ্রেরটি আরও সুন্দর হইবে। আমার সম্পাদিত পত্রে যে এমন জিনিষ বাহির হইল ইহাতে আমার সম্পাদক-জীবন সার্থক হইল। এখন শুধু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আপনার শরীর সুস্থ থাকুক, আপনি আপনার কথা শেষ করিবার সুযোগ পান। শ্রীচরণে নিবেদন মিতি।

প্রণত: শ্রীজলধর সেন।"

জিজ্ঞেস ক'রলেন শাস্ত্রী মহাশয়—তুমি রামেন্দ্র শুনতে চাও দেখছি আত্মপ্রশংসা; তবে তুমি কেন আপত্তি ক'রেছিলে পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হ'লে সম্মান নিতে দেশের লোকের কাছ থেকে?

সহাস্যে ব'ললেন রামেন্দ্রসুন্দর—প্রশংসা নেওয়া কি সোজা কথা? ও যে শূকরী বিষ্ঠা! তাতে আমি ব্রাহ্মণ। আর একটা কথা শাস্ত্রী মশায়, আমার লেখা সাধারণে ত বোঝে না তাই মাঝে মাঝে জানতে চাই, অনর্থক লিখে চ'লেছি না কিছু ফল হ'চ্ছে।

তুমি ব্রাহ্মণ ব'লে গর্ব্ব করো রামেন্দ্রসুন্দর? প্রশ্ন ক'রলেন শাস্ত্রী মহাশয়!

তখন গম্ভীর দেখা গেল রামেন্দ্রসুন্দরকে। তিনি বললেন ধীর কণ্ঠে, আমার কয়েকটা গর্ব্ব আছে, তার মধ্যে এটাও একটা।

আর কী জানতে পারি কী?

একটা জেনে রাখুন আমি ভারতবাসী, আমি বাঙালী। বাঙলার মানুষ ব'লে আমি গর্ব্ব অনুভব করি। এই বাঙলা ভাষাকে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রতে আমি কী কম যুদ্ধ ক'রেছি! হয়তো একদিন যথাযোগ্য স্থান পাবে আমার মাতৃভাষা, আমি হয়তো সে দিন থাকবো না—

বাধা দিয়ে শাস্ত্রী মহাশয় বললেন—তুমি আমার চেয়ে কত ছোট জানো ত?

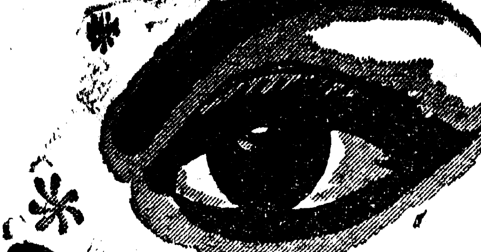
না না, বলবেন না। আমার পিতা পিতামহ আমার বয়স পান নি। আমি তাঁদের চেয়ে কত বেশী বয়স পেয়েছি জানেন ত সব। জ্ঞানের নিকট কখনো সান্ত্বনা মেলে না। স্নেহের পিপাসা কখনো জ্ঞানে মেটে না। ঐ উর্দ্ধে মহাবাহগণ আমার দিকে চেয়ে আছেন। আমার অজ্ঞান নেত্র কিছুই আবিষ্কার ক'রতে সমর্থ হ'চ্ছে না। আমার পূর্ব্বপিতামহ সূরিগণ দিব্য চক্ষে তা' দেখছেন। "তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" সেই স্বরূপ দেখবার জন্য ক্লান্ত হৃদয়ে উৎসাহ জেগে উঠত। ভয় নাই, ভয় নাই—সেই স্নেহসিক্ত বচন সম্বল নিয়ে আমার যাত্রা আরম্ভ শাস্ত্রী মহাশয়!

অভিভূত হয়ে বললেন শাস্ত্রী মহাশয়—ধন্য, ধন্য তুমি রামেন্দ্রসুন্দর! এখনও কেও তোমাকে বুঝতে পারলে না।

নিজেকে প্রকাশ করা ত ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নয়, তাই চাই আত্মগোপন ক'রে সব কাজ ক'রে যেতে। আমি ব'লে রেখেছি আমার ভাই দুর্গাদাসকে—আমার মৃতদেহ নিয়ে যেন কোন সমারোহ না করা হয়।

গভীর দুঃখে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন শাস্ত্রী মহাশয়—আমার সম্মুখে তুমি এ সব ব'লবে না রামেন্দ্রসুন্দর! একদিন এ দেহের পতন আছে জানি, কিন্তু আমি দেখতে চাই না।

[ক্রমশঃ।



নীলাঞ্জন

শ্রীসরোজকুমার রায়-চৌধুরী

একুশ

আরও কয়েক বৎসর পরের কথা।

গ্রামে মেয়েদের জন্যে মাইনর স্কুল একটি হয়েছে। কিন্তু সমরেশের কাছে গ্রামের কোনো ভদ্রলোকই যেতে সম্মত হননি। নিজেদের চেষ্টাতেই তাঁরা প্রথমে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং তারপরে সেটিকে মাইনর স্কুলে পরিণত করেন। সমরেশ যে-দূরে সেই-দূরেই পড়ে রইলেন। গ্রাম্য-সমাজে মেশবার কোনো সুযোগই পেলেন না।

তাঁর নিঃসঙ্গ জীবন এত দিন যে ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে, এখনও সেই ধারাতেই প্রবাহিত হচ্ছে। সমস্ত দিন সেরেস্তা-ঘরে, সন্ধ্যার পরে বাগানে পদ-চারণা। সে বাগানও আর নেই। ফুল-গাছ কবে শুকিয়ে মরে গেছে। তরকারীও আর লাগান হয় না। শুধু ফলের গাছগুলি অযত্নে মরবার নয় বলেই এখনও রয়েছে। বরং তাদের যেন শ্রীবৃদ্ধিই হয়েছে। ডালে-পাতায় নিচেটা অন্ধকার করে রয়েছে।

অনিমেষ আরও খানিকটা বড় হয়েছে। তার মুখে যেন অনেকখানি সমরেশের আদল। অমনি লম্বা-চওড়া, অমনি স্বাস্থ্যবান এবং অমনি দুরন্ত প্রকৃতির। তাদের বনেদী জমিদারী চাল আর নেই। জমিদার-বাড়ির ছেলেরা আগে বাইরে বেরুত না। অনিমেষ বাড়িতেই কম থাকে। রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে বেশির ভাগ সময় রাস্তাতেই ধুলা-কাদায় খেলা করে বেড়ায়।

কমলেশ সপ্তাহের ছ'টা দিন কলকাতায় থাকে। সুমিতা এমনিতেই নিরীহ শান্ত-প্রকৃতির। তার উপর গৃহকর্মের চাপ যথেষ্ট বেড়েছে। সুতরাং অনিমেষকে শাসন করবার কেউ নেই। তার দুরন্তপণা দিন দিন বেড়ে চলেছে।

পাঁচ বছরের ছেলে। ভয় কা'কে বলে জানে না। জমিদারী আভিজাত্যের গৌরবও দিয়েছে ধূলিসাৎ করে। আশে-পাশের নিম্ন শ্রেণীর যত দুরন্ত ছেলে-মেয়ে তার বন্ধু। মায়ের নিষেধ মানে না। তাদেরই সঙ্গে সকাল-বিকালে তার খেলাধুলা।

একদিন বিকেলে রবারের একটা বল নিয়ে খেলতে খেলতে গিয়ে পড়ল সমরেশের বাড়ির সামনেকার রাস্তায়।

খেলার তন্ময়তায় ওদের কারোই লক্ষ্য পড়েনি, সমরেশ বাগানে বেড়ার অনতিদূরে পায়চারি করছেন। লক্ষ্য পড়ল, যখন একটা অপেক্ষাকৃত বড় ছেলের পায়ে লেগে বলটা বাগানের ভিতরে গিয়ে পড়ল। তখন সমরেশের দিকে চোখ পড়তেই তারা প্রাণভয়ে দিলে দৌড়। দাঁড়িয়ে রইল অনিমেষ একা। সঙ্গীদের অনুকরণে কিছুই না বুঝে সেও হয়তো ছুট দিত। কিন্তু বলটা তার এবং সেটা চাই। সুতরাং পালিয়ে যেতে পারলে না।

সমরেশও অন্যমনস্ক ভাবেই বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু অনেকগুলি ভীরু পায়ের ত্রস্ত পদশব্দে রাস্তার দিকে চাইলেন। তিনি জানেন, এখানকা'র বড়-ছোট সবাই তাঁকে ভয় পায়। কেন পায় যদিও জানেন না। কিন্তু বড়রা নিঃশব্দে নতমুখে তাঁকে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। পারতপক্ষে তাঁর চোখে চোখ ফেলে না। আর ছোটরা, তাদের শালীনতাবোধ কম এবং চাপল্য বেশি, তারা প্রাণভয়ে ছুটে পালায়।

এ তাঁর জানা। জানতেন না, কেউ তাঁকে ভয় না করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আর সে বড় নয়, নিতান্ত শিশু।

সমরেশ আস্তে আস্তে বেড়ার ধারে গিয়ে সেই শিশুর মুখোমুখি দাঁড়ালেন।

অনিমেষ নির্ভীক, নিষ্কম্প। সকৌতুকে দেখছে ওঁর আবক্ষলম্বিত শুভ্র শ্মশ্রু বিস্মিত চোখ মেলে।

সমরেশ জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি পালালে না যে?

অনিমেষ প্রশ্নটা ঠিক বুঝল বলে মনে হল না। ডান হাতের তর্জনীটা মুখের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর বললে, আমার বল?

—বল। বল কি?

—ওই তো। তোমার পায়ের কাছে। দেখতে পাচ্ছ না?

অনিমেষ অঙ্গুলি-সংকেতে বলটা দেখিয়ে দিলে।

সমরেশ বলটা তুলে নিলেন। বললেন, এই বলটা?

অনিমেষ ঘাড় নেড়ে জানালে, হ্যাঁ।

—এটা তোমার বল?

—হ্যাঁ।

অনিমেষ সাগ্রহে হাত বাড়ালে।

বেড়ার ওপাশ থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ছেলেটির দিকে চেয়ে সমরেশ বলটি ওর হাতে দিতেই সে ব্যস্ত ভাবে চলে গেল। এখনও বেলা আছে, এখনও কিছুক্ষণ খেলা চলবে।

কিন্তু ওর তুলোর মতো নরম করতলের স্পর্শে সমরেশের লোহার মতো আঙুলগুলো যেন ঝিন্‌ঝিন্ করে অবশ হয়ে গেল! শিশুদের করতল কী-কোমল! কী অসহ্য মিষ্টি!

পরদিন সেই সময়ে সমরেশ আবার সেইখানে এসে দাঁড়ালেন।

অনিমেষদের খেলার কোনো সীমাবদ্ধ মাঠ নেই। খেলাটা আরম্ভ হয় এক ফালি জায়গায়। তার পরে চলতে আরম্ভ করে। কিন্তু চলাটা ওদের হুকুমে নয়, বলের খেয়াল-মাফিক চলে। সুতরাং খেলাটা কোন পথ দিয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে কেউ জানে না।

সমরেশ ওদের কলকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছেন,—এখনি ওদিকে, পরক্ষণেই অন্য দিকে। কিন্তু ওদের বল সমরেশের বেড়ার এপারে তো এলই না, সামনের রাস্তাটা পর্যন্তও এল না।

যতক্ষণ ওদের কলকণ্ঠ শোনা গেল ততক্ষণ সমরেশ বেড়ার

ঘায়ে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। ছেলেরা যে-যার বাড়ি চলে গেল। কলকণ্ঠ আর শোনা গেল না। সমরেশ একটা নিশ্বাস ফেলে বাগানে পায়চারি করতে লাগলেন।

এমনি করে কয়েক দিনই গেল।

সমরেশের যেন আফিমের মৌতাত ধরে গেছে। প্রতিদিন অপরাহ্ণে নির্দিষ্ট সময়টিতে সর্বকর্ম পরিত্যাগ করে তিনি বেড়ার ধারে এসে দাঁড়ান। যদি ভাগ্যক্রমে বলটি এসে বাগানের মধ্যে পড়ে।

কিন্তু ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হয় না। সেদিনের কাণ্ডের ফলে ছেলেরা সতর্ক হওয়ার জন্যেই হোক অথবা অন্য কোনো কারণেই হোক, ছেলেরাও এদিকে আসে না, বলও বাগানের মধ্যে পড়ে না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ব্যর্থমনোরথ সমরেশ অভ্যস্ত পায়চারি সুরু করেন।

কিন্তু ছেলেটি কে, কোন্ বাড়ির, এ প্রশ্ন একবারের জন্যেও তাঁর মনে আসে না। অনিমেষ তাঁর কাছে একটি ছেলে মাত্র। কোনো একটি বিশেষ বাড়ির বিশেষ একটি ছেলে নয়। সমগ্র পৃথিবীর শিশু-সমাজের প্রতীক, যার করতল অনাদিকালের শিশুদেহের কোমলতা বহন করছে। সেই কোমলতার অনির্বচনীয় স্বাদ তাঁকে উন্মনা করে তুলেছে। তারই নেশায় তিনি মশগুল হয়ে রয়েছেন এবং নেশাতুরের কাছে ছেলেটির পরিচয় অবান্তর।

অবশেষে অনেক দিন ব্যর্থ-প্রতীক্ষার পর এক দিন সমরেশের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল।

তখন সকাল বেলা। শরতের সোনালি রোদে ঝলমল করছে সমরেশের বাগান। ঘাসে-ঘাসে কেমন একটা মখমলের আভা লেগেছে। গাছের পাতাগুলি যেন হাসছে। শিউলি গাছটি ফুলে ছেয়ে গেছে। গাছের তলায় অজস্র ফুল যেন আলপনা দিয়েছে। ভয়ে এ বাগানে তো ছেলেরা আসে না। পূজার কাপড় রং করার জন্য শিউলি-বোঁটা সংগ্রহ করে ওরা অন্য স্থান থেকে। গাছের ডাল ঝরিয়ে ফুল সংগ্রহ করা দূরের কথা, নিচের ঝরা-ফুলও কেউ কুড়োতে আসে না। সেখানে নানা রকম মাছির ভিড় শুধু।

শিউলি গাছটি তাই ফুলে ছেয়ে রয়েছে। কে জানে, ছেলেদের উৎপাতের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গাছটি খুশি কি না। অথবা মৃত-বৎসা জননীর দুগ্ধ-ভারাতুর স্তনবৃন্তের ভারও বৃন্ত-বেদনায় টন-টন করছে কি? এমনি একটি শরতের প্রভাত।

সমরেশ তাঁর সেরেস্তায় চুপ করে বসেছিলেন, দূরের মাঠে পুষ্পধন্বুর তীরের মতো কাশের গুচ্ছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই দিকে চেয়ে।

হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়ল একটি ছেলে চারি দিকে সন্তর্পণে চাইতে চাইতে বাগানের মধ্যে ঢুকছে!

সেদিনের সেই ছেলেটি না?

সমরেশ চমকে উঠলেন। সেই ছেলেটির মতোই মনে হচ্ছে। রাস্তায় অন্য ছেলেগুলি সেদিনের মতোই ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। আজ আবার বল পড়েছে নিশ্চয়। বাগানে সমরেশকে না দেখে ওরা ওই ছেলেটিকে ভিতরে পাঠিয়েছে বলটি কুড়িয়ে আনবার জন্যে।

সমরেশ উঠে দাঁড়ালেন। চটিটা পায়ে দেবারও তাঁর তর সইল না। খালিপায়েই বাগানের দিকে চললেন।

যে ছেলেগুলি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল, সমরেশকে দেখতে পেয়েই তারা প্রাণভয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে চম্পট দিলে, বন্ধুকে তার ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে। তাকে একটা ডাক দিয়ে যাবারও ফুরসুত পেলে না।

অনিমেষ বলটা খুঁজে পাচ্ছিল না। হেঁট হয়ে ঝোপের নিচেগুলো খুঁজছিল। সমরেশের আসা সে টের পায়নি। বলটা পেয়ে চ'লে আসবার জন্যে পিছু ফিরতেই দেখে সমরেশ সামনে দাঁড়িয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন!

তার ভয় পাবার কথা। বন্ধুরা ইতিমধ্যেই প্রচলিত অনেক আজগুবি গল্প করে শুনিয়ে সমরেশ সম্বন্ধে তার একটা ভয়ের ভাব জাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু সে ভয় পেলে না ওই হাসি দেখে। যে হাসি দেখে অরুন্ধতী ভয় পেত, পৃথিবীশুদ্ধ ভয় পেত, এ সে হাসি নয়! এ যেন যে হাসতে জানে তারই সহজ, স্বাভাবিক হাসি।

—বল পেলে?

—হ্যাঁ।

—কই দেখি?

অনিমেষ বলটা নিঃশব্দে ওঁর হাতে তুলে দিলে।

—এ কী বল? ময়লা হয়ে গেছে! রং উঠে গেছে!

—হাঁ। ওই ওরা অমনি করে দিয়েছে।

বলে অনিমেষ তাকিয়ে দেখে সঙ্গীরা কেউ ওখানে নেই। ওদের জন্যে সে একটু চঞ্চল হয়ে উঠল। তাড়াতাড়ি ওদের কাছে ফিরে গিয়ে খেলা আরম্ভ করবার জন্যে। বলটা ফেরৎ নেবার জন্যে হাত বাড়ালে।

—এর চেয়ে ভালো বল আমার আছে। সমরেশ বললেন।

—কই দেখি!

—আমার কাছে নেই। ওই ঘরে আছে। নেবে?

অনিমেষের মন নতুন বলের জন্যে উসখুস করতে লাগল।

—এখনি দেবে?

—নিশ্চয়। চল আমার সঙ্গে।

প্রথমে একটু অবশ্য দ্বিধা করে অনিমেষ ওঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগল। একেবারে উপরের ঘরে। ব্যাপারটা এমনই অভিনব যে, কেষ্ট পর্যন্ত অবাক হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল।

সমরেশের বাড়িতে ছেলেপুলে নেই। বল থাকবার কথা নয়। কিন্তু একটা বল ছিল। সেইটে তাঁর হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

অনেক দিন আগের প্রথা। সমরেশের বিবাহে অরুন্ধতীর কোনো পরিহাসকুশলা বৌদি একটি বড় রবারের বল উপহার দিয়েছিলেন। এর মধ্যে পরিহাসের হুল এইখানে যে, অরুন্ধতীর সন্তান হলে এই বলটি নিয়ে সে খেলা করবে। এই সম্ভাবনা এবং তার অন্তর্নিহিত পরিহাস উভয়ই এই বিবাহের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছিল। পরিহাস ক্ষুরধার বস্তু। সমরেশের যে ধারা, সে হচ্ছে তলোয়ারের ধার। পরিহাস সেখানে ব্যর্থ হয়ে যায়।

কিন্তু এই বিবাহের ক্ষেত্রে হলেও, বলটি একেবারে নিরর্থক হল না। অনেক দিন পরে আলমারী থেকে বেরিয়ে এসে সেটি অনিমেষের হাতে পৌঁছুল। বল তো নয়, যেন আস্ত একখানা স্বর্গ এসে পৌঁছুল তার হাতে। আনন্দে তার সমস্ত শরীর তরঙ্গিত হয়ে উঠল। কিন্তু পাওয়া সম্বন্ধে তখনও সে নিশ্চিত হতে পারছিল না। মনের মধ্যে উদ্বেগ এবং আশঙ্কাও দেখা দিল।

জিজ্ঞাসা করলে, এটা তুমি আমাকে একেবারে দিয়ে দিলে ?

—নিশ্চয়।

—একেবারে ? আর কোন দিন ফিরে নেবে না ?

—না।

—বাড়ি নিয়ে যেতে পারব ?

—কোথায় তোমার বাড়ি ?

—তুমি চেন না আমাদের বাড়ি ?

—না।

তাদের বাড়ি সমরেশ চেনেন না, এ যেন অনিমেষ বিশ্বাস করতে পারছিল না। একটু ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বললে, সবাই চেনে।

সমরেশ ব্যস্ত ভাবে বললেন, আমিও চিনতে পারি। কোন্‌টা বল তো ?

—দেখবে ? ওই যে দেখা যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।—সমরেশের ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিল।

অনিমেষ বাক্যটি শেষ করলে : ওইটে।

সমরেশ নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাবার নাম কি ?

—কমলেশ।

সমরেশ স্তব্ধ, নির্বাক।

হাওয়া বইতে বইতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে যেমন হাঁফিয়ে উঠতে হয়, এই কয়েকটি মুহূর্তের আত্মাও তেমনি হাঁফিয়ে উঠল। এবং সেই মুহূর্ত কয়টিকে সচকিত করে অনিমেষের কণ্ঠে অকস্মাৎ ধ্বনিত হল : খেলবে ?

আর সঙ্গে সঙ্গে বলটি ঘরের মেঝেয় নাচতে লাগল। সেই সঙ্গে একটি শিশু এবং একটি বৃদ্ধও।

দেখতে দেখতে খেলা জমে উঠল। শুধু সেদিনের খেলা নয়, তার পরে অনেক দিনের খেলা। অনিমেষ সকালে-বিকেলে সবাইকে লুকিয়ে পালিয়ে আসে এখানে। বন্ধুদের কথাও ভুলে গেল ! এত রকমারি খেলা আর কোথাও নেই। তার আকর্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে খেলার আকর্ষণের চেয়ে অনেক বেশি।

দেখতে দেখতে সমরেশের আলমারী খেলনায় ভর্তি হয়ে গেল। কখনও নিজে গিয়ে, কখনও বা সরকারকে পাঠিয়ে শহর থেকে খেলনা নিয়ে আসেন। কত রকমের খেলনা ! স্প্রিং-এ দম-দেওয়া রেলগাড়ি, মোটর গাড়ি যেদিন এল সেদিন তো অনিমেষের আহার-নিদ্রা ভুল হবার উপক্রম ! তা ছাড়া আরও কত রকমের খেলনা !

সারা সকাল এবং সারা বিকেল দু'জনে খেলা চলে।

শহরে গেলে কত রকমের খাবার নিয়ে আসেন সমরেশ। বাড়িতেও প্রতিদিনই কিছু-না-কিছু খাবার তৈরি হয় অনিমেষের জন্যে।

সবই হয় গোপনে। বাড়ির চাকর-ঠাকুরকে নিষেধ করা আছে, তারা যেন অনিমেষের এ-বাড়ি আসার খবর বাইরের কাউকে না জানায়। খেলনাগুলো এ-বাড়িতেই থাকে। অনিমেষ যখন খুশি আসে, নিজের ইচ্ছামত খেলনা আলমারী খুলে বার করে, খুশিমত খেলা করে, আবার আলমারীতে রেখে দেয়। নিয়ে যেতে পায় না। পাছে সুমিতা জানতে পারে। কিন্তু তথাপি সুমিতা জানতে পারে।

পল্লীগ্রামে এক বাড়ির কথা আর এক বাড়িতে গোপন বড় থাকে না। ঠাকুর-চাকর হয়তো বললে না। কিন্তু যে-বাড়িতে বাইরের একটা বেরাল পর্যন্ত ভয়ে ঢোকে না, সেই বাড়িতে একটি ছোট ছেলে যাওয়া-আসা করছে, এটা একদিন কারও-না-কারও চোখে পড়েই।

অনিমেষের এবাড়ি আসা এমনি একদিন চোখে পড়ে গেল এক জেলেনীর। সে বেরিয়েছিল মাছ বেচতে। যখন সে এবাড়ির ফটকের কাছ বরাবর তখন ওদিক থেকে প্রচণ্ড বেগে ছুটতে ছুটতে অনিমেষ সুরুৎ করে ওবাড়ি ঢুকে গেল।

দেখে কাঠের মতো শক্ত হয়ে জেলে-বৌ দাঁড়িয়ে পড়ল। তার আর মাছ-বেচা হল না। এত বড় কাণ্ড দেখে কোনো মা স্থির হয়ে থাকতে পারে না। সে-ও ছেলের মা। ওই ছোট ছেলের এবাড়ি আসার পরিণাম কি হতে পারে ভেবে তার বুকের ভিতরটা গুর-গুর করে উঠল। সে খবরটা দিতে তখনই ছুটল ও-বাড়ি।

—ওগো মা, শীগগির এস। তোমাদের সর্বনাশ হয়ে গেল !

সুমিতা অনিমেষকে খাইয়ে নিজে দুটি খেয়ে নিয়ে আঁচাতে আসছিল। হাতে তার জলপূর্ণ ঘটি। জেলেনীর চিৎকারে তার হাতের ঘটি গেল পড়ে। বুকের ভিতরটা কি রকম করে উঠল।

—কার সর্বনাশ হল রে ! কি সর্বনাশ হল ?

—তোমাদের। তোমার খোকা ওদের বাড়ি গেল !

—আমার খোকা ? কাদের বাড়ি গেল ?

—সেই ওদের বাড়ি গো ! যাদের বাড়ি কেউ যায় না। সেই খুনেটা গো ! ও মা কি হবে গো !

জেলেনী উঠানময় দাপাদাপি করতে লাগল। তার ভয় হয়েছে ভীষণ।

কিন্তু অনিমেষ কোথায় গেল, কি হয়েছে, জেলেনীর দাপাদাপির মধ্যে সেটা বুঝতেই সুমিতার কিছুক্ষণ গেল। যখন বুঝল অনিমেষ সমরেশের বাড়ি গেছে, তখন ভয়ে তারও বুক শুকিয়ে গেল। তাঁকে বিশ্বাস নেই। বুড়ো সব করতে পারেন।

মুখটা কোনো মতে ধুয়ে সুমিতা বললে, তুই চল তো আমার সঙ্গে। দেখি সেখানে কি করছে !

জেলেনী সোজা জবাব দিলে : ও মা গো ! আমি যেতে পারব না গো ! আমি যেতে পারব না।

সুমিতা কাঁপতে পড়ল। কোনো দিন ও-বাড়ি সে যায়নি। কোথায় ঘর, কোথায় সিঁড়ি কিছুই জানে না। কিন্তু তখন তার পাগলের মতো অবস্থা। হয়তো একাই সে চলে যেত। কিন্তু জেলেনীর চিৎকারে অনিমেষের ক'টি বন্ধু এসে দাঁড়িয়েছিল।

তারা বললে, চল মা। আমরা যাব।

এবং তাদেরই সঙ্গে সুমিতা খিড়কির পথে ও-বাড়ি চলে গেল। পাগলের মতো চলেছে। বেশ আলুথালু, মাথার ঘোমটা বারে বারে খুলে যায়।

সমরেশের ফটক পেরিয়ে একটু দূর যেতেই অনিমেষের উচ্চকণ্ঠ শোনা গেল। কিন্তু কথা বোঝা গেল না। সেই শব্দে সুমিতার বুকের স্পন্দন যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। মুহূর্তের জন্যে সেইখানে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। অজ্ঞাতসারেই একবার বোধ করি সে উপলব্ধি

করলে, বেঁচে আছে, অনিমেষ বেঁচে আছে। এবং তখনই সে ছুটতে লাগল।

সিঁড়ির নিচে যখন-তখন আবারও যেন অনিমেষের গলা পাওয়া গেল। এবারও কথা বোঝা গেল না, কিন্তু মনে হ'ল উপরে যেন কিছু একটা হাসির ব্যাপার ঘটছে।

সিঁড়ির রেলিং ধরে সুমিতা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার সমস্ত দেহ থর-থর কাঁপছে। ভগবান! খোকা তাহলে বেঁচে আছে, খোকা তাহলে বেঁচেই আছে। সে যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারছে না।

পিছন থেকে অনিমেষের বন্ধুরা নিম্নকণ্ঠে তাড়া দিলে: চল না। দাঁড়ালে কেন?

কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে সুমিতা ধীরে ধীরে সন্তর্পণে উপরে উঠতে লাগল।

হেট! হেট!

অনিমেষের কণ্ঠস্বর। সুমিতা আবার একবার থমকে গেল। এই কণ্ঠস্বরে তার ভয় কেটে গেছে, কিন্তু বুকের কাঁপন তখনও থামেনি। সন্তর্পণে, অতি সন্তর্পণে সে উপরে উঠতে লাগল।

যখন সিঁড়ির মাথায় তখন আবার সে দাঁড়িয়ে পড়ল:

সমরেশ ঘোড়া হয়েছেন, আর তাঁর পিঠে সোয়ার হয়ে অনিমেষ করছে হেট, হেট!

সুমিতার দিকে প্রথম চোখ পড়ল অনিমেষের। বললে, মা এসেছে।

মা!

সমরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বোকার মতো হাসতে লাগলেন। বললেন, কী উৎপাত দেখতো বৌমা! আমি বুড়ো মানুষ, তোমার ছেলেকে পিঠে নিয়ে সারা বারান্দা ছুটোছুটি করতে পারি?

সুমিতার কথা বার হচ্ছিল না। ঠোঁট দুটো অব্যক্ত অনুভূতিতে কাঁপছিল। চোখ ফেটে জল আসবে বুঝি। অত্যাচারের হাত থেকে অসহায় বৃদ্ধকে বাঁচাবার জন্যে সে শুধু অনিমেষের দিকে হাত বাড়ালে।

অনিমেষ কিন্তু ফিক করে হেসে দাদুর পিছনে লুকিয়ে পড়ল। মায়ের কাছে যাওয়ার কিছুমাত্র আগ্রহ নেই তার!

বাইশ

আরও মাসখানেক কেটে গেল।

কলকাতা দূরে নয়। কমলেশ শনিবারে অফিসের শেষে বাড়ি আসে। সেই রাত্রি এবং রবিবার দিন-রাত্রি থাকে। রবিবার ভোরেই আবার চলে যায়। বাড়ির সঙ্গে এই তার সম্পর্ক। যে সময়টুকু থাকে, তার মধ্যেও সে ঘর-সংসারের কিছুই দেখতে পারে না। সারা দিন কাটে স্কুল আর লাইব্রেরী আর ছেলেদের নিত্যনতুন জনহিতকর কাজ নিয়ে।

এর মধ্যে সুমিতার সঙ্গে যা-ও বা দেখা হয়, সাংসারিক কথা বড় একটা হয় না। আর অনিমেষের সঙ্গে তার চোখের দেখাটাই বড় জোর হয়। যা দুষ্টু ছেলে! বাপের তোয়াক্কা বড় একটা করে না। তার অধিকাংশ সময় কাটে ও বাড়িতে, সমরেশের সঙ্গে খেলায়।

সুমিতা কমলেশকে চেনে। সুতরাং সমরেশের সঙ্গে অনিমেষের ঘনিষ্ঠতার খবরটা কমলেশের কাছে চেপে গেছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত চাপতে পারলে না।

সেবারে শনিবারে বাড়ি ফিরে কমলেশ রাত্রে যখন খেতে বসেছে, তখন ধীরে ধীরে জানালে, জ্যাঠামশায়ের অসুখ বেশি।

কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, কবে চিঠি এল?

সুমিতা সবিস্ময়ে বললে, চিঠি কি গো! পাশের বাড়ি থেকে জ্যাঠামশায়ের অসুখের খবর কি ডাকে আসবে?

এবার কমলেশও বিস্মিত হল। বললে, পাশের বাড়ি কি বলছ? তোমার জ্যাঠামশাই ভাগলপুরে থাকেন না?

সুমিতা স্বামীর ভুল বুঝতে পারলে। তার এক জ্যাঠামশাই ভাগলপুরেই থাকেন এবং তিনিও অনেক দিন থেকেই ভুগছেন।

বললে, আমার জ্যাঠামশাই নয়, তোমার জ্যাঠামশাই। জগৎপুর থেকে বিধু ডাক্তার এসেছেন। বাঁচবার আশা নাকি কমই।

নির্লিপ্ত কণ্ঠে কমলেশ শুধু বললে, ও!

একটু পরে সুমিতা আবার বললে, তোমার কিন্তু একবার তাঁকে দেখতে যাওয়া উচিত। কাল সকালে যেও বরং।

—আমি? কি দুঃখে?

—পর তো নয়। নিজের জ্যাঠামশাই।

তিক্ত কণ্ঠে কমলেশ বললে, হ্যাঁ। যিনি ছেলেবেলায় বাবাকে খুন করতে গিয়েছিলেন! শেষ পর্যন্ত বড়মাকে যিনি খুন করেই ফেললেন! জ্যাঠামশাই বটেন! সেদিন পর্যন্ত আমাকে বিব্রত করবার কম চেষ্টা করেননি। ওঁর কথা তুমি কোনো দিন আমার কাছে তুলবে না।

সুমিতা চুপ করে রইল তখনকার মতো। কিন্তু শোবার সময় কথাটা আর একবার না তুলে পারলে না।

বললে, দেখ ওঁর সম্বন্ধে তোমার মনের অবস্থা যাই হোক, সামাজিকতা বলেও তো একটা কথা আছে!

কমলেশ বললে, কিসের সামাজিকতা! বাবা গেলেন, ঠাকুমা গেলেন, বড়মা গেলেন, তিনি তো ওঁর নিজের স্ত্রী,—তাঁদের শ্রাদ্ধে কি সামাজিকতা উনি রেখেছিলেন?

—উনি তো এসেছিলেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু জলগ্রহণ করেন নি।

সুমিতা শৈলেশ গোবিন্দ কিংবা হরসুন্দরীর শ্রাদ্ধের কথা জানে না। তখন সে এবাড়ি আসেইনি। এলে বলতে পারত, হরসুন্দরীর শেষ অসুখের সময় সমরেশ প্রায়ই আসতেন। কিন্তু মণিমালা এবং অরুন্ধতীর কাছে সমরেশ যে জলগ্রহণ করেননি তা সে দেখেছে। সুতরাং চুপ করে রইল।

একটু পরেই আবার বললে, কিন্তু দেখ, তুমি ছাড়া ওঁর আর কে আছে? তুমিই ওঁর শ্রাদ্ধাধিকারী। সম্পত্তির অধিকারীও তুমি। অন্ততঃ সেজন্যেও।

বাধা দিয়ে কমলেশ শান্তকণ্ঠে বললে, সেই জন্যেই আরও আমি যেতে পারি না। উনি হয়তো ভাববেন, জীবনে কোনো দিন ওঁর বাড়ির ফটক পার হলাম না, এখন মৃত্যুকালে সম্পত্তির লোভে এসে উপস্থিত হয়েছি। রায়বংশের ছেলের পক্ষে সে হীনতা স্বীকার করা অসম্ভব!

সুমিতা আর জেদ করলে না।

রায়বংশকে সে জানে। কমলেশকেও সে চেনে। সমরেশ গোবিন্দের মৃত্যুর পূর্বে সে যে কোনো মতেই ওবাড়ির ফটক পার হতে পারে না, এ বিষয়ে তার লেশমাত্র সংশয় নেই। কিন্তু মৃত্যুপথযাত্রী যে বৃদ্ধ পাশের বিরাট অট্টালিকায় স্বজন-বান্ধবহীন অসহায় অবস্থায় একাকী বাস করছেন, তিনি যে কমলেশের নিজের জ্যাঠামশাই, এ কথা ভেবে তার নারীহৃদয় কিছুতেই স্বস্তি বোধ করতে পারলে না। একটি দীর্ঘশ্বাস চেপে সে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল।

সোমবার ভোরের ট্রেনে কমলেশ কলকাতা চলে গেল। তার ভয়ে সুমিতা রবিবার সমরেশকে দেখতে আসেনি। তবে অনবরত খবর নিয়েছে। সোমবার দুপুরে অনিমেষকে সঙ্গে নিয়ে লতাগুল্ম-পরিবেষ্টিত পিছনের মাঠটুকু অতিক্রম করে সুমিতা সমরেশের খিড়কির দরজায় উপস্থিত হল।

সমরেশের সম্বন্ধে সুমিতা কত কথাই না শুনেছে! তিনি অত্যন্ত রাশভারি এবং কঠোর প্রকৃতির লোক। তাঁর স্নেহ নেই, দয়া-মায়া নেই। খুন করা তাঁর কাছে নিতান্ত সহজ কাজ। শুনেছে, তাঁর বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, আত্মীয়-স্বজন কিছু নেই। প্রেতের মতো তিনি একা-একা বিচরণ করেন। কথা বলেন না, হাসেন না, কিছু করেন না। লোকে তাঁকে ভয় করে, ঘৃণা করে, সযত্নে তাঁর সান্নিধ্য পরিহার করে চলে।

এখন সুমিতার মনে হয়, অজ্ঞ লোকে নিজের অজ্ঞাতসারে মানুষের কত মিথ্যে ছবিই না আঁকে!

মস্ত বড় একখানা খাটে দেওয়ালের দিকে মুখ করে সমরেশ গোবিন্দ শুয়ে ছিলেন। সুমিতার পদশব্দে মুখ ফিরিয়ে সাগ্রহে বললেন, বৌমা! এস মা, এস। আমার দাদুভাইকে আননি?

সুমিতা নম্র ভাবে ওঁর পা-তলার দিকে এসে দাঁড়াল।

বারান্দাতেই একখানা ট্রাই-সাইকল বেকার দাঁড়িয়েছিল। অনিমেষ সেটায় চড়বার চেষ্টা করছিল।

সুমিতা ডাকল, অনু, ঘরে এস। দাদু ডাকছেন।

দাদুর নামে অনিমেষ লোভনীয় ত্রিচক্রযানকে ফেলে সটান সমরেশের মুখের কাছে এসে দাঁড়াল। মাথা নেড়ে বললে, কি বল?

তাকে দেখে, তার কণ্ঠস্বর শুনে সমরেশ একেবারে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। খপ করে ওর ফুলের মতো নরম ছোট্ট হাতখানি ধরে বললেন, কিছুই বলিনি ভাই! শুধু খুঁজছিলাম, তুমি আসছ না কেন?

—এই তো এলাম। আবার কোথায় আসব? তোমার বিছানার ওপরে?

—হ্যাঁ। নইলে ভালো লাগবে কেন?

—বকবে না তো?

এ আশঙ্কা অনিমেষের মনে কেন এল, তার একটা ইতিহাস আছে। অনিমেষ সমরেশের উপর রীতিমত অত্যাচার করে। বকা দূরে থাক, কোনো দিন তার জন্যে তিনি সামান্যমাত্র বিরক্তিও প্রকাশ করেননি। কিন্তু এবারে কমলেশ এলে অনিমেষ ধুলোপায়ে তার বিছানায় উঠতে গিয়ে তিরস্কৃত হয়েছিল। তার ফলে তার শিশুমনে ধারণা হয়েছে, ধুলোপায়ে বিছানায় উঠতে গেলে তিরস্কৃত হওয়ার আশঙ্কা আছে।

কিন্তু এই গোপন ইতিহাস বৃদ্ধের অপরিজ্ঞাত। তিনি হেসে বললেন, তোমাকে বকি এত বড় বুকের পাটা আমার নেই। শুনেছ বৌমা, তোমার ছেলে কি বলে?

সুমিতা লজ্জিত ভাবে বললে, ও ভারি দুষ্টু।

সমরেশ হেসে বললেন, হবে না? রায়-বংশের ছেলে দুষ্টু না হলে মানাবে কেন? তোমাকে বলি শোন, একেই আমি মনে মনে খুঁজছিলাম। মানে আমাকে যে হুকুম করবে তাকে। এত দিন পরে জীবনের প্রায় সন্ধ্যা-বেলায় তাকে পেলাম। আমার মনে আর কোনো ক্ষোভ, কোনো দুঃখ নেই। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন বৌমা?

কেষ্ট তাড়াতাড়ি একটা আসন আনছিল সুমিতার বসবার জন্যে।

বিরক্ত ভাবে সমরেশ বললেন, আসন কি হবে হতভাগা! তুমি আমার কাছে বোস বৌমা!

সুমিতা আর সঙ্কোচমাত্র করলে না। ওঁর খাটের শিয়রে এসে বসল।

—কেমন আছেন জ্যাঠামশাই?

—ভালো মা, খুব ভালো। ঘাটের কাছে এসে এত সুখ যে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি।

—বুকের সে যন্ত্রণাটা?

তার চিহ্নও আর নেই মা! বুক আমার জুড়িয়ে গেছে।

সুমিতা নীরবে ওঁর বড়-বড় পাকা চুলে ধীরে-ধীরে হাত বুলিয়ে

দিতে লাগল। আরামে সমরেশের চোখ বন্ধ হয়ে এল। মনে হল অস্ফুট স্বরে একবার যেন বললেন, আঃ!

—কিছু বলছেন জ্যাঠামশাই? ওঁর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে সুমিতা জিজ্ঞাসা করলে।

জড়িত মৃদুকণ্ঠে সমরেশ বললেন, না মা!

তার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

অনিমেষ নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল। জিজ্ঞাসা করলে, দাদু ঘুমিয়ে গেলেন, না মা?

—হ্যাঁ।

—আমি গাড়িখানা নিয়ে খেলা করব মা?'

—একেবারে নিচে গিয়ে। গোলমাল করবে না। দাদু ঘুমুচ্ছেন।

রোগীর ঘরে নিঃশব্দে বসে থাকতে অনিমেষের ভালো লাগছিল না। মায়ের হুকুম পেয়ে তৎক্ষণাৎ সে ত্রিচক্রযানটা নিয়ে নিচে চলে গেল। কেষ্ট সেটা নামিয়ে দিয়ে এল। এসে চুপি চুপি সুমিতাকে বললে, আজ সাত দিন অসুখ হয়েছে, এর মধ্যে একটিবার চোখের পাতা বোঁজেননি। এতক্ষণে ঘুমুলেন!

বুধবারে অসুখটা বাড়াবাড়িতে দাঁড়াল।

জগৎপুরের বিধু ডাক্তার তো রোজই আসছেন, তাছাড়া শহর থেকে এক'জন বড় ডাক্তার এলেন।

এ সমস্ত ব্যাপারের কিছুই কমলেশ জানে না। কয়েক জন প্রতিবেশী পরামর্শ দিলে তাকে টেলিগ্রাম করতে। মুখাগ্নি তো তাকেই করতে হবে। কিন্তু টেলিগ্রাম পেলেই সে যে আসবে সে বিষয়ে সুমিতার সন্দেহ ছিল। সে করছি-করব বলে কৌশলে পাশ কাটিয়ে গেল।

সুতরাং কমলেশ সে বারে এসে সেই যে অসুখের খবর সুমিতার কাছ থেকে শুনে গিয়েছিল, তার বেশি আর কিছুই জানে না। বস্তুতঃ সমরেশের অসুখ নিয়ে তার মনে কিছুমাত্র উদ্বেগ বা দুশ্চিন্তা ছিল না। ব্যাপারটা সে এক প্রকার ভুলেই গিয়েছিল।

শনিবার রাত্রে যথারীতি বাড়ি এসে কমলেশ দেখলে, সুমিত্রা বাড়িতে নেই। ঝিকে জিজ্ঞাসা করলে, এরা কোথায়?

ঝি জবাব দিলে: বৌমা তো সেই সোমবার থেকেই ও-বাড়িতে।

সবিস্ময়ে কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, কোন বাড়িতে?

সমরেশের বাড়িটার দিকে ইঙ্গিত করে ঝি বললে, ও বাড়িতে। খবর দোব?

কমলেশ তেমনি বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে, ও বাড়িতে কি?

—বড় বাবুর তো অসুখ।

হ্যাঁ। এ খবরটা সে গেল বারে শুনে গিয়েছিল। 'কিন্তু তার জন্য সুমিতার ও-বাড়ি যাওয়ার কি আবশ্যক হতে পারে, ভেবে পেলে না।

জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন এখন?

ঝি বললে, বুধবারে তো খুবই বাড়াবাড়ি হয়েছিল। বিষ্যুৎবার থেকে একটু ভালোর দিকে। বৌমাকে খবর দোব?

কি ভেবে কমলেশ বললে, না থাক।

হাত-মুখ ধুয়ে সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। সুমিতা এল না। ক্ষুধা বিশেষ ছিল না, কিন্তু একটু চা পেলে ভালো হত। অন্য অন্য বার কমলেশ বাড়ি পৌঁছুবার আগে থেকেই খাবার তৈরী থাকে, চায়ের জল উনানে বসানই থাকে। সেই প্রথার প্রথম ব্যতিক্রম হল আজ।

কমলেশ আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলে। তারপর কি মনে করে ও বাড়ির দিকে রওনা হল।

গিয়ে দেখে, এক পাশে একটা হারিকেন জ্বলছে। আর নিচে মেঝে-জোড়া একটা ফরাসে তাকিয়া ঠেস দিয়ে সমরেশ বসে। তাঁর সামনে অনিমেষ। একটা মোটর গাড়ি নিয়ে দু'জনে খেলা হচ্ছে!

এই দৃশ্য কমলেশ অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

অনিমেষ মোটর গাড়িটায় দম দিচ্ছিল। কিন্তু মেঝেতে নামিয়ে দেবার আগেই দম ফুরিয়ে যাচ্ছিল। আবার দম দিচ্ছিল। সমরেশ স্মিত কৌতুকে ওর পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতা নিঃশব্দে উপভোগ করছিলেন। দু'জনেরই দৃষ্টি মোটরের দিকে। কমলেশের আসা কেউই টের পায়নি।

তার উপর প্রথম দৃষ্টি পড়ল অনিমেষের।

তার দিকে চেয়ে অনিমেষ ইসারায় বললে, দাদু!

অর্থাৎ কমলেশ যেন অনিমেষের দাদুকে চেনে না। সে যেন উভয়কে পরিচিত করিয়ে দিচ্ছে!

এতক্ষণে সমরেশ দ্বারপ্রান্তে চাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের অজ্ঞাতসারে, বোধ করি পূর্ব অভ্যাস বশে, ললাটে ভ্রূকুটিরেখা ফুটে উঠল।

ভিতরে এসে কমলেশ জিজ্ঞাসা করলে, কেমন আছেন?

সমরেশ সংক্ষেপে উত্তর দিলেন, ভালো।

কিন্তু কমলেশকে বসতেও বললেন না, কোনো কুশল-প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করলেন না।

কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে কমলেশ অনিমেষের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আসবি অনু? ও বাড়ি যাবি?

মোটর গাড়িটাকে কিছুতেই বাগে আনতে না পেরে অনিমেষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বিরক্ত ভাবে বললে, না। তুমি যাও।

তারপরে সমরেশকে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, 'গাড়িটা চলছে না যে দাদু! তুমি দাও না চালিয়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সমরেশের ললাটের ভ্রূকুটি এবং অন্যমনস্কতা 'কেটে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মোটর গাড়িটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, চলবে বই কি ভাই! মোটর গাড়ি বন্ধ হলে তো লোকের যাওয়া-আসাই বন্ধ হয়ে যায়! দাঁড়াও, আমি চালিয়ে দিই।

বলে চাকা দুটো ধরে দম দিয়ে নামিয়ে দিতেই গাড়িটা গড়-গড় করে চলতে আরম্ভ করল। আর সমস্ত ক্রোধের কুয়াসা কেটে গিয়ে অনিমেষের মুখখানি প্রকাণ্ড সূর্যের মতো হেসে উঠল।

কমলেশ 'কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুইটি অত্যন্ত অসমবয়সী মানবের মধ্যে এই খেলা দেখলে। তারপর চলে আসবে, এমন সময় দেখে, ওদিকের দরজা দিয়ে সুমিতা গরম দুধের বাটি আঁচলে ধরে সন্তর্পণে আসছে।

তাকে দেখে সুমিতা এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

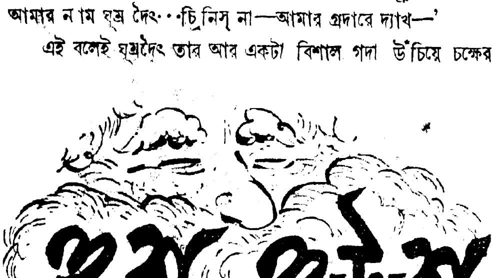
তার পরেই সহাস্যে ইসারায় জানালে, তুমি চল, আমি যাচ্ছি।

সমাপ্ত


নির্ম্মলা শিক্ষা পেলো...
মালতীর ছোট্ট ছেলে মুন্না সবসময় নিচের বাসাতে খ্যালনা ফেলতো·
মুন্না! দুষ্টু ছেলে! আবার তুমি খেলনা ফেলেছো।
নির্ম্মলার বাসা
না এখন না - ছেলেটাকে ভালমত শিক্ষা দিতে হবে...
মুন্নার খ্যালনা টা মালতীকে ফিরিয়ে দাওনা কেন?
পরে
দেখ! এবার ফেলেছে একটা তোয়ালে!
ভাবলো কিন্তু কি পরিষ্কার করে কাচা! সত্যিই আশ্চর্য্য...
মালতির বাসা
নির্ম্মলা! তুমি বুঝি মুন্নার খ্যালনা নিয়ে এসেছো...!
হ্যাঁ- আর তোমার তোয়ালে-টাও নিয়ে এসেছি - আচ্ছা আমায় একটা কথা বলবে-
বলতো, তোয়ালেটা এত ধবধবে সাদা কি করে করলে? আমি তো কখনও তোমার বাড়ী থেকে কাপড় আছড়াবার আওয়াজ পাইনি।
কিন্তু আমি তো আছড়াইনা, - আমি যে সানলাইট সাবান ব্যবহার করি।
আছড়ালে কাপড়ের বুনুনী ফেঁসে যায় আর সেইজন্যে ছেঁড়েও তাড়াতাড়ি।
আছড়ে কাচা কাপড় বড় করে দেখানো হয়েছে।
সানলাইট সাবানের প্রচুর ফেনা বিনা আছাড়েই পরিষ্কার করে কাচে – আর সেইজন্যে কাপড় টেঁকেও বেশী দিন।
সত্যিই। সানলাইট সাবানে বিনা আছাড়েই সাদা আর ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার হয়-কাপড় টেঁকেও বেশী দিন আর আমার খরচও বাঁচে।
SUNLIGHT SOAP
সান্‌লাইট সাবান
ভারতে প্রস্তুত
কাপড়কে আরও টেঁকসই করে।

ছোটদের আসর





[পূর্বানুবৃত্তি]

(আধুনিক কালের এক দৈত্য কাহিনী)

শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

[মস্ত এক পাথর শূন্যে তুলে ধরলে দৈত্য ছোঁড়বার জন্যে। এক মুহূর্ত্ত লাগলো তার লক্ষ্য স্থির করতে। সকলে ত্রাহি ত্রাহি ক'রে উঠলো, কেন না রাজপুরীর অনেকখানি চুরমার হয়ে যাবে সেটার পতনে। কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ঘটলো এক বিভ্রাট, বাষ্পরাজকে দেখা গেল না।]

লক্ষ্যবস্তু অদৃশ্য হওয়ায় দৈত্য মুহূর্ত্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল। ধীরে ধীরে প্রস্তরখণ্ড নামিয়ে নিল সে।

সেই মুহূর্তেই দৈত্যের বাঁ পাশে বাষ্পরাজের বিপুলকায় মূর্ত্তি দেখা গেল। দৈত্য চকিত হয়ে বাঁ পা পিছনে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ালো।

'কে তুই ? কিসের জন্যে এসেছিস ?' বলে উঠলেন বাষ্পরাজ।

'আমারে চিনিস না ? আমার নাম ঘ্রম্র দৈৎ—হ্রে হ্রে···ত্রিন হাজার ব্রছর আমি ঐ প্রাহাড়ে থাকি-ই-ই···। আমারে ঘ্মুতে দ্রিস না তুই—তাই ত্রোদিগে আজ ঠাণ্ডা ক্রোরবো···ঠ্রাণ্ডা ক'রে ঘ্মুবো।

'তার চেয়ে একেবারেই ঘুমিয়ে পড় না।" একটু হেসে বললে বাষ্পরাজ। 'তাতে আরো মজা পাবি।'

'অ্যাঁ ?' দৈত্য চমকে উঠলো।' ব্রুঝেছি ত্রুই ম্ররার কথা ব্রলছিস ! ত্রে-ত্রে-ত্রেরে আমায় ম্রারবে···? আমি পৃথিবীর স্রব প্রাহাড় প্রর্বত জুড়ে প্রড়ে থাকবো। দ্রিন রাত ঘ্ম—তাইতো আমার নাম ঘ্রম্র দৈৎ···চ্রিনিস্ না—আমার গ্রদারে দ্যাখ—'

এই বলেই ঘ্রম্রদৈৎ তার আর একটা বিশাল গদা উঁচিয়ে চক্ষের নিমিষে বাষ্পরাজের ওপর আঘাত করলো। সশব্দে গদা মাটিতে পড়ে চূর্ণ হয়ে গেল। মাটিটা গর্ত্ত হয়ে ধূলো উড়লো ধোঁওয়ার পাহাড়ের মত। সেই ধোঁওয়ার মধ্যে বাষ্পরাজকে দেখা গেল না।

'হ্রেঃ হ্রেঃ হ্রেঃ' আনন্দে ফেটে পড়লো ঘ্রম্রদৈৎ। 'এই তো এক ব্রারে শ্রেষ ক্ররেছি। গ্রদাটা ভেঙ্গে গ্রেল—এবার প্রাথর দিয়ে ব্রাকীটা শ্রেষ ক্ররি।' সে এক পা বাড়িয়েছে অমনি পেছন থেকে হাত ধরে কে টানলো—'খবরদার ! এক পা এগুবি না !'

'উহু-হু—হু !' দৈত্য পেছন ফিরে দেখে বাষ্পরাজ তার হাত ধরে টানছে। আর হাতটা যেন পুড়ে যাচ্ছে আগুনে।

'উ-হু-হু ? হাত ছাড়, প্রুড়ে গেল, প্রুড়ে গেল ! জোর করেই সে হাত ছড়িয়ে নিল আর দাঁত কড়মড় করে তেড়ে এলো। খুদে খুদে চোখগুলো তার জ্বলছে—গালের মাংসগুলো ঝল্ ঝল্ করে ঝুলছে। বুকখানা ফুলে ফুলে উঠছে আর নিঃশ্বাস পড়ছে যেন হাপর চলছে—শোঁপ শোঁপ শোঁপ···

পুরীর সমস্ত লোক দেখছে এই দৃশ্য। কেউ ছাদে, কেউ বারান্দায় কেউ রাস্তায় কেউ মাঠে। হাজার হাজার লোক কিন্তু তাদের করবার কি আছে ! দৈত্যের তুলনায় তারা নেহাৎই তুচ্ছ। যেন বালখিল্য, যেন লিলিপুট। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুধু দেখছে সবাই।

প্রোফেসার হঠাৎ রাজুর হাত ধরে টান দিল।

'এসো, এসো, আমাদের কাজ আছে।' এই বলে তাকে নিয়ে চললো। রাজু বললে 'কোথায় যাব এখন ? তার চেয়ে আসুন দৈত্যকে মারবার একটা ফন্দি করি।'

'সেইজন্যেই ত তোমায় ডাকছি। মানে কথা, সেইটেই বড় কাজ হবে।'

সোজা চললো তারা যন্ত্রপুরীতে, একেবারে যেখানে থাকে কয়লা জল আর বয়লার।

প্রোফেসার বলে উঠলো 'রাজু, তুমি ঐ কয়লাগুলো আগুনের মধ্যে ঢালতে থাক। দেখছো না, কেউ নেই এখানে।'

'কিন্তু তা ক'রে কি হবে ?'

'হবে ? মানে কথা, বুঝতে পারছো না, আমাদের রাজার শক্তিবৃদ্ধি হবে। যতই জল ফুটবে ততই বল বাড়বে রাজার !'

দু'জনে কাজে লেগে গেল। রাজু কয়লা ঢালে আর প্রোফেসার বয়লারের কলকব্জা কন্ট্রোল করে।

এদিকে বাষ্পরাজ আর দৈত্যের লড়াই চলছিল। দৈত্য যতই তাকে ধরতে যায় ততই সে কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর যতই সে বিফল হয়, ততই দৈত্য ক্ষেপে ওঠে। সে গর্জন করে আর আস্ফালন করে।

হঠাৎ বাষ্পরাজের চোখে পড়লো একটা মস্ত বড় লোহার ট্যাঙ্ক। সেটা জলের ট্যাঙ্ক নয়। সেখানে বাষ্প জমা হতো। মোটা নল জোড়া ছিল তার গায়ে। আর সেই নলের একটা এঁকে-বেঁকে চলে গিয়েছে বয়লার ঘরের দিকে।

আস্ফালন করতে করতে দৈত্য বললে, 'ত্রুই যদি হাওয়ার মত ন্রা হতিস ত্রা হলে ত্রোকে গুঁড়ো ক্ররে ফেলতুম।' জানিস, কোনও ম্রানব দৈত্য আমার স্রঙ্গে প্রারে না।'

বাষ্পরাজ বললে 'বেশ, তাহলে আমি এই ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকছি। তুই এটাকে গুঁড়ো কর দেখি।'

ধূম্রদৈৎ আনন্দে লাফিয়ে উঠলো। বললে 'তা হলে ত ভালোই হয়। হাঃ হাঃ হাঃ, ওটা গুঁড়িয়ে গুলো করে দেবো। এক হাতেই পিষে ফেলবো ওটা।'

বাষ্পরাজ সুট করে ট্যাঙ্কের মধ্যে ঢুকে গেল। দাঁত কড়মড় করে দৈত্য তখন ধরলো সেই লোহার ট্যাঙ্কটাকে, প্রথমে এক হাতে ধরে বিরাট চাপ দিল সে। যেন কিছুই নয়। কিন্তু কিছু হলো না দেখে দু'হাতে তুলে সেটাকে বুকে জাপটে ধরলো সে। কিন্তু, যেমন চাপ দেওয়া অমনি ভীষণ শব্দে ট্যাঙ্কটা ফেটে চৌচির হয়ে গেল। দৈত্য সেই বিস্ফোরণে বিশ হাত দূরে ছিটকে পড়লো। তার হাত দুটো ছিন্নভিন্ন। সে আর উঠলো না।

ট্যাঙ্কের মধ্য থেকে বাষ্পরাজ বেরিয়ে পড়লেন। তিনি সকলকে ডেকে বললেন 'আর দৈত্য আমাদের কোনও অনিষ্ট করতে পারবে না। সে এমন ঘুম ঘুমিয়েছে যা থেকে সে আর জাগবে না।'

সত্যই দৈত্যের দেহটা দূরে পড়েছিল পাহাড়ের মত নিস্পন্দ, নিঃসাড়।

কয়লা ঘেঁটে রাজুর সর্বাঙ্গ কালিঝুলি মাথা। সে পরিচ্ছন্ন হয়ে যখন নিজের ঘরে এসেছে এমন সময় রাজার দূত এসে জানিয়ে দিলে, রাজা তাকে ডেকেছেন।

রাজকক্ষে প্রোফেসারও ছিলেন। রাজু আসতেই প্রোফেসার বললেন, 'রাজুই আমাকে সাহায্য করেছিল কয়লার ঘরে—'

রাজা খুশি হয়ে বললেন, 'তোমাকে ধন্যবাদ দেবার পালা এবার। তুমি আমাদের অনেক উপকার করেছ।'

'আমি আর কি এমন করেছি! আপনার অনেক পরিচয় পেয়েছিলুম, আজ আপনার শক্তির পরিচয় পেলুম।'

রাজা বললেন, 'আমার শক্তির মূলে যে তোমাদেরই হাত ছিল তা আমি জানি। তোমরাই আমাকে জাগিয়ে দাও। কি বল প্রোফেসার?'

'নিশ্চয়ই। মানে কথা, ঘুমানো শক্তিকে আমরাই ত জাগিয়ে তুলি। আকাশে বাতাসে কত রকম শক্তিই যে খেলা করছে সবার হদিশ কি মানুষ আজও পেয়েছে? আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলুম, তা তোমায় আগেই বলেছি রাজু।'

'না, সব কথা আপনি বলেন নি ত?' বললে রাজু।

'ওঃ, মানে কথা, ভুলে যাই কিনা। নিজের কথা বলতে ভীষণ ভুলে যাই। আর সব সময় নিজের কথা বলতে থাকলে অন্য কথা হারিয়ে যায়! অন্য চিন্তা মাথায় ঢুকবে কোথা দিয়ে? হ্যাঁ, এই ত মনে পড়ে গেল, কাল তোমার পরীক্ষা না?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ তাই ত। তিন দিন হয়ে গেল।' রাজু বললে।

পরদিন সত্যিই রাজুর পরীক্ষা হলো। চেকার এবং বিচারকেরা দীর্ঘ এক প্রশ্নপত্র দিল রাজুর হাতে।

রাজু চোখ বুলিয়ে দেখলে এবং দেখলে তার সবই জানা প্রশ্ন। এ কয় দিনে সে যা দেখেছে এবং শুনেছে তাতে বাষ্প সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানা হয়ে গেছে তার। সে একমনে লিখতে আরম্ভ করলো এবং সব শেষ ক'রে মাথা তুললো।

পরীক্ষকেরা উত্তর দেখে খুবই খুশি। চেকার মশাই শুধু ভুরু কুঁচকে রইলো। শেষে মন্তব্য করলে 'লেখা টা কিন্তু খুব ভাল নয়। হাতের লেখা। হাতের লেখা ভাল না হ'লে সবই মাটি'। এই বলেই বদ্‌খত চেহারার টিকিট-চেকার খটাং খট্ করে তার হাতের পাঞ্চিং কলটা টিপতে লাগলো।

বিচারকরা কিন্তু ফুল মার্ক দিয়ে দিয়েছে। তাদের মত হলো, জানবার জিনিষটা ঠিক মত জানা হলেই হলো। আর তা ঠিক মত লিখে প্রকাশ করতে পারলেই হলো। পরীক্ষার্থী যখন বাষ্প সম্বন্ধে সবই জেনে ফেলেছে তখন সে ফুলমার্ক পাবে না কেন?

খুব ভাল একটা সার্টিফিকেট পেয়ে গেল রাজু।

প্রোফেসর এ সংবাদে খুবই খুশি। 'মানে কথা, আমি ত তোমায় বলেছিলাম রাজু, পরীক্ষার জন্যে তোমার কোনও ভাবনা নেই। নাই হোক, রাজার কাছে আমি সংবাদটা পৌঁছে দিই।'

বাষ্পরাজ বললে, 'রাজুকে সম্মানিত করা চাই। প্রকাশ্য সভায় তার ব্যবস্থা করো'।

পরদিন সন্ধ্যায় সভা বসেছে। তার এক ধারে আছে ষ্টেজ। ষ্টেজের আলো জ্বলে উঠলো। ঘটাং ঘট, টুং টাং টুট্ টুট্ পিক্‌···বাজনা বেজে উঠলো।

চৌকোমাথা আর গোলমাথা সুন্দর পোষাক পরে আবির্ভূত হলো ষ্টেজে। সুরু হলো তাদের নাচ আর গান। যেমন অদ্ভুত সুর, তেমনি ভঙ্গী এবং তেমনি ভাষা! সবই কলের মানুষের মত! রাজুর কিন্তু বেশ ভাল লাগছিল।

রাজু একটু একটু বুঝলো তাদের গান—

ইক্‌টিপটস চিটিং
মেজাজ খিটিংখিটিং
কলের মানুষ আমরা যে ভাই
হৃদয়টি রিপিটিং



চট্ খটাখট্ খট্
চলবো খটাখট্
কাজ করে যাই ডিনং রাটং
নইলে যাবো ফট্।

গান শেষ হ'তে না হ'তেই মিস্ত্রী ফোরম্যান এল। তার হাতে এক হাতুড়ি। এসেই সে চৌকো আর গোলমাথার মাথায় পিটে এক এক ঘা বসিয়ে দিলে।

এত কি রে বকর বক
রাইট অ্যাণ্ড লেফ্ট ঠকাঠক
আনবো কাতুরি মারবো হাতুড়ি
র‍্যাঞ্চ দিয়ে এঁটে ইস্ক্রু সেঁটে
ঘসৃটি ঘসাং ইস্টুপিড যাঃ।
মারবে নাকি ঘাঃ ?

এমন সময় কালো জামাপরা একজন এল মাথায় কয়লার ঝুড়ি। আর তার পেছনে ফায়ারম্যান। ফায়ারম্যানের কাঁধে কয়লা-তোলা শাবল। সে গাইল।

ঘ্যাঁসর ঘ্যাস ঘ্যাঁসর ঘ্যাস
ঘবড়ে চলে তালগুলি
কয়লা তুলি কয়লা তুলি
এক চাপড়ে কয়লা জ্বলে
তিন চাপড়ে দাউ দাউ
ঘ্যাঁসব ঘ্যাস ঝাউ ঝাউ
ঘ্যাঁসর ঘ্যাস ঘ্যাঁসর ঘ্যাস
ঠকর ঠাঁই ঠ্যাস্ ঠ্যাস
আমার বুলি
কয়লা তুলি
জলবে আগুন দপ।

তারপরে এলো সেই ড্রাইভার। মাথায় তার ময়লা কাপড়ে ফেট্টি বাঁধা। ফ্যায়রম্যানকে ঠেলে দিয়েই সে দাঁড়ালো ছুটো পা ফাঁক করে বীরের ভঙ্গীতে। নতুন তালের বাজনা বেজে চলেছে। সে গান সুরু করলে :

টুটাং টুট্ টু—উ-ট্
পিকির ঝিকির পিক্‌টি নট
বাজাই বাঁশী টু-উ-ট্।
ফুলিয়ে ছাতা ঘোরাবো হাতা
হোয়াট ডু আই কিয়ার
লাইনিজ ক্লিয়ার—
ঝিকির ঝিক ঝিকির ঝিক্
ছুটছে ধোঁয়া বাজছে পিঁক।
ভুগুর ভুশ ভুগুর ভুশ
সামনে ভাগো মারবো ঢুশ
হটিকোট হটিকোট ছটিকটি যান
এসে গেল মাটি কাটি ইস্‌টিশান্।

এরই মধ্যে ট্রেনের ওপর সেই গজবপু চেকার সায়েব এসে দাঁড়িয়েছে। ড্রাইভারের সামনে দাঁড়িয়েই সে হাঁক দিয়েছে—

পাকিট খুঁজে টিকিট দাও
হারি আপ টিকিট আভি দাও।
করে দিই পান্‌চু
এখনি খেতে লান্‌চু
নইলে রক্ষেটি নেই
জিভটি কেটে করে দেবো ভেন্‌চু।

ড্রাইভারের পকেটে হাত দিতেই সে মরীয়া হয়ে তবে রে চেকা আমি না ড্রাইভার, বলেই এক ঘুষি চেকারের টুপিতে। টুপি তার নেমে পড়লো চোখের ওপর। আর সে চোখে দেখতে না পে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। হো-হো ক'রে সব লোক হেসে উঠলো রাজুও খুব হেসে নিল।

তার পরেই আবার নতুন সুরের বাজনা সুরু। পেছন থেকে ঐক্যতানে গান হচ্ছে :

ঠাণ্ডি সরবৎ চাই, গরম বেয়াড়া
পান বিড়ি চা চাই, গরম সিঙ্গাড়া ?

এমন সময় রাজার আবির্ভাব হলো। সাদা সাদা চুল-দাড়ি গুলো পেঁজা তুলোর মত লালচে আলোয় বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। মাথার মুকুট ঝল্‌মল্ করছে। রাজা দাঁড়িয়ে বললেন, আমাদের এই শেষের অঙ্ক। আমি একটি কথা বলেই শেষ করবো। তবে কথাটা সুর দিয়েই বলি, কেন না সুর দিয়ে কথা বললেই ত গান হয়। আর সেটাই রঙ্গমঞ্চের জিনিষ। রাজার চতুর্দিকে নানান আকারের পাইপ দিয়ে ভুশ ভুশ ক'রে বাষ্প নির্গত হচ্ছে। তারই সুরে রাজা গান ধরলেন।

হুশ-হাশ ভুশ-ভাশ
ফূর্তি যদি চাস্
তোরা যেন আমার মত এমনিই লাফাস্ !
হৃদয়টিকে রাখ না গরম
সচল সবল সপ্ত নরম
কাজ দিয়ে সব জীবনটাকে কেবলই ভরাস।
হুশ হাশ ভুশ ভাশ
ঠাণ্ডাটাকে ডরি
আমি জমতে ভয়ে মরি'
তোরা যেন আমার মত এমনই লাফাস্।
ফূর্তি যদি চাস।

রাজার মুখটি আবেগে ও আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'ধূম্রদৈৎকে বধ করার উপলক্ষেই আমাদের আজ উৎসব ; আর এই সঙ্গে আমাদের বন্ধু রাজুকে আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। রাজুর হাতে একখানা সুন্দর রূপোর বাক্স দেওয়া হলো। বাক্সটির চেহারা ইঞ্জিনের মত, ওপরে বেশ নক্সা করা। রাজা বললেন, 'এই উপহারটি আমরা দিচ্ছি তোমায়। আমার শক্তির মূল কথা আছে এর মধ্যে।'

সভা ভঙ্গ হলো। দর্শক শ্রোতা চলে গেল সবাই। এমন সময় ঢং ঢং ক'রে ঘড়িতে সাতটা বাজলো। সাতটা ঘণ্টা শুনে রাজু যেন চমকে ওঠে। সে বলে উঠলো, 'আমার মাষ্টার মশাই আসার সময়

হয়েছে। আমি ত আর থাকতে পারবো না। আমাকে মার কাছে যেতে হবে।'

'কি পড় তুমি?' রাজা জিজ্ঞেস করলেন।

'ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, বিজ্ঞান···কিন্তু আপনাদের ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।'

'ঐ তো, তোমার বিজ্ঞানের মধ্যেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।' হাসতে হাসতে বললেন রাজা। 'আচ্ছা, আমি তোমাকে মায়ের কাছে যাবার ব্যবস্থা করছি।'

একটি সুন্দর গাড়ীতে বসলো রাজু। গাড়ী থেকে রাজু সকলকে বিদায় জানালো। চৌকোমাথা, গোলমাথা মিস্ত্রী ফায়ারম্যান সবাই বিদায় নিল। প্রোফেসার ঘণ্টেশ্বর এসে দাঁড়ালেন, চোখ দুটো জলে ভারী। রাজুও চোখ মুছলো। প্রোফেসার বললেন, 'গুড বায়! আবার দেখা হবে। আমি যাচ্ছি। সেই রকেটটা···মানে কথা, সেই চাঁদে পৌঁছবার যন্ত্র নিয়ে আজই পরীক্ষা শেষ করতে হবে।'

পিক করে বাঁশী বাজল, গাড়ী ছাড়লো। বাষ্পপুরী ছেড়ে গাড়ী চলতে লাগলো। রাজু আশে-পাশে তাকায় আর তার মন ভার হয়ে ওঠে। সেই ছোট বড় সুন্দর সুন্দর গাড়ীগুলি আঁকা-বাঁকা রেলের ওপর দিয়ে এদিক সেদিক যাচ্ছে। এর মধ্যে রাজু অনেক মাঠ প্রান্তর নদী পর্বত পার হয়ে চললো।

রাজুর হঠাৎ মনে হলো রাজার উপহারের কথা। কি আছে ওর মধ্যে? কি থাকতে পারে? ছোট্ট রূপোর ইঞ্জিনটি খুললো সে। তার মধ্যে দেখে একটি পাকানো কাগজ। কাগজের লেখা পড়লো সে। ও মা, এ ত সেই রাজার সেই গানটি:

হুশ-হাশ ভুশ-ভাশ,
হৃদয়টিকে রাখ না গরম
সচল সবল সভ্য নরম
কাজ দিয়ে সব জীবনটাকে কেবলই ভরাস।
ঠাণ্ডাটাকে ডরি
শুধু জমতে ভয়ে মরি
তোরা যেন আমার মত এমনই লাফাস
ফূর্তি যদি চাস
হুশ হাশ ভুশ ভাশ।

গাড়ী চলেছে। ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্···দাদা কোথা, দিদি কোথা··· উঁচু নীচু পার হয়ে, নদীর ধার ঘেঁসে, গাছ-পালা ঝোপ-ঝাপের পাশ দিয়ে চলেছে···ঘটাঘট ঝাং, ঘটাঘট ঝাং শব্দ করতে করতে চলেছে।

পিছন ফিরে রাজু তাকালো। বাষ্পপুরীর চিমনির চূড়োগুলি এখনও দেখা যাচ্ছে দূরে। সরু-মোটা গম্বুজগুলোর অস্পষ্ট আভাস আঁকা রয়েছে আকাশে। খাড়া-খাড়া সিগন্যালের অসংখ্য পোষ্টগুলি এখনও দেখা যাচ্ছে।

রাজুর মনে পড়ে বাষ্পরাজের কথা। তার অদ্ভুত শক্তির কথা। আর মনে পড়ছে সেই ধূম্রদৈত্যের কথা। কী বিকট চেহারা! যেন একটা পাহাড়। সে শব্দ সহ্য করতে পারে না। পাহাড়ের মতই সে পড়ে পড়ে ঘুমোয়। কাজ সে দেখতে পারে না, ছুটোছুটি দেখলে সে কাঁপতে থাকে। বাষ্পরাজের সঙ্গে তাই তার বিরোধ। কিন্তু, বাষ্পরাজের কাছে তাকে হার মানতে হলো। শেষ পর্য্যন্ত প্রাণ দিতে হলো তাকে। আর তা না হলে, বাষ্পপুরীর চিহ্নও থাকতো না, গুঁড়ো ক'রে দিত সব। কিন্তু—রাজুর মনে ভয় হলো। ঐ দৈত্যের চেলা-চামুণ্ডা বা তার আত্মীয়-স্বজনও ত থাকতে পারে। তারা যদি এই সময় এসে হাজির হয়—তাহলে কি হবে? এই গাড়ীখানাকে শূন্যে তুলে পোকার মত মুচড়ে দিলে কে আর কি করবে?

ভয়ে ভয়ে রাজু গাড়ীর জানলা দিয়ে বাইরে তাকালো। কোনও পাহাড়-পর্বত চোখে পড়লো না তার। তখন সমতল মাঠের ওপর দিয়ে যাচ্ছে গাড়ী।

হঠাৎ এক কান-ফাটা শব্দে সে চমকে উঠলো। 'দুম'···বিকট বিস্ফোরণের আওয়াজ!

ও মা ও কি? রাজু দেখলে শূন্যে একটা উড়ন্ত কলের মধ্যে কি যেন ফেটে গেছে। ঐখান থেকেই ঐ বিস্ফোরণের শব্দ এসেছে। ভাঙ্গা লোহা-লক্কড়ের টুকরো যন্ত্রপাতির অংশগুলো ছিটিয়ে পড়ছে শূন্যে।

ধোঁয়ার মধ্যে থেকে দেখা গেল—ঐ ত প্রোফেসার ঘণ্টেশ্বর! সেও ছিটকে পড়েছে। তা হ'লে এই নিশ্চয়ই প্রোফেসারের সেই ওড়া-কল। চাঁদে যাবার জন্যে যা তৈরী করছিল সে। আহা, রাজুর মনটা টন্ টন্ ক'রে উঠলো। লোকটি বুঝি মারাই পড়লো!

কিন্তু, তা নয়। প্রোফেসারকে দেখা গেল বেশ হাসিখুশি মুখ। প্যারাস্যুটে ঝুলছেন। আর বেশ চীৎকার করেই বলছেন, 'সবই ঠিক ছিল, মানে কথা, সবই ঠিক ছিল। শুধু একটা ভুল, নাটটা ঠিক ফিট করা হয়নি। রাজুর গাড়ীর দিকে মুখ ক'রে চেঁচিয়ে বললে, গুড বায়, রাজু! এবার যদি কোনও দিন আস তা'হলে দেখবে যন্ত্রটা আমি কতখানি ইমপ্রুভ করেছি। তোমাকে নিয়েই পাড়ি দেব আকাশে। প্যারাস্যুট আস্তে আস্তে নীচে নামতে লাগলো।

রাজুর গাড়ীও একটা জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলো। দু'পাশে এত ঘন গাছের ঝোপ যে অন্ধকার হয়ে এল। কিছুই দেখা যায় না।



শুধু ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্ শব্দ, আর তালে তালে মৃদুমন্দ ঝাঁকুনি।

কতক্ষণ কেটে গেছে রাজু জানে না! কেউই জানে না। হঠাৎ কার হাতের ঝাঁকানিতে রাজু তাকিয়ে দেখে, দিনের আলো—পাশে তার মা।

'রাজু উঠে পড়, উঠে পড়। আমরা এসে গেছি।' বলে উঠলেন মা।

'কোথা?' বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে বললে রাজু।

'এই ত বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট। আমাদের নামতে হবে। আমি জিনিষপত্রগুলো গুছিয়ে নিই। তুমি তাড়াতাড়ি জামাটা পরে নাও। চুলগুলো একেবারে ঘেঁটে গেছে—এই নাও চিরুণী, মাথাটা আঁচড়ে নাও।'

সত্যিই গাড়ী এসে থেমেছে ষ্টেশনে। গাড়ীর মধ্যে ব্যস্ততার অন্ত নেই। কুলি, কুলি শব্দ। মাল উঠাও, মাল নামাও। হামারা সমান, এই বাক্সটা জলদি চল, ছে-আনা, দো-আনা, একঠো গির গোয়া······ইত্যাদি কলরব। রাজু যেন স্বপ্ন দেখছে।

গরম চা, গরম সিঙ্গাড়া, পান চাই পান, সিগারেট—সম্মিলিত কণ্ঠের ধ্বনি উঠছে। যেন অর্কেষ্ট্রা বাজছে। হঠাৎ সপ্তম সুরে একটা আওয়াজ এসে চড়াও করলো 'কেলা-আ চাই কে-লা-আ।' মাথায় পাগড়ি, কোমরে বেল্ট, সাদা ধোপদুরস্ত লম্বা জামা কয়েক-জন এসে জিগেস করছে; 'খানা চাই? ভাত খাবেন? মাংস ভেজিটেবল······'

ইতিমধ্যে রাজুর মা মালপত্তর নামিয়ে নিয়েছেন। কুলির মাথায় বেডিং এবং কুলির হাতে স্যুটকেশটা দিয়ে তিনি হাতে নিয়েছেন খাবারের কেরিয়ারটা। মার সঙ্গে গাড়ী থেকে নামলো রাজু।

ষ্টেশন ত নয়, যেন জনারণ্য! কী ভীড়! কী কলরব!

আগে কুলি, পরে মা এবং মার পাশে পাশে চলছে রাজু। তার কাঁধে ঝুলছে একটা শান্তি-নিকেতনী ব্যাগ।

'তোর মামার আসার কথা ছিল, কিন্তু এখনও তো দেখতে পাচ্ছি না তাকে। জানিস না, তোর বড়মামা এখন এলাহাবাদে ফিজিক্সের প্রোফেসার?' মা বললেন।

রাজু বললে, 'ঠিকানা ত জানি, চল না, আমরাই টাঙ্গা ক'রে চলে যাব ঠিক বাড়ীতে।'

কথায় কথায় চলতে চলতে সমস্ত ট্রেণটির পাশ দিয়ে চলছে ওরা। প্ল্যাটফর্ম্মের প্রায় শেষের দিকে এসে পড়লো। গাড়ীও শেষ হয়ে ইঞ্জিনে এসে পড়লো। মস্ত বড় ইঞ্জিন, ষ্টীমলাইনড্। অষ্ট্রেলিয়ান। কালো কুচকুচ করছে তার গা—আর দেখেই মনে হয় কত মস্তৃণ। যেন মূর্ত্তিমন্ত দৈত্য এটি··কী দুর্দ্ধর্ষবেগে·হাজার হাজার মানুষকে উড়িয়ে নিয়ে যায় মাইলের পর মাইল। মাঠ ঘাট নদী প্রান্তর পার হয়ে যায় অবলীলাক্রমে। এক দেশ থেকে অন্য দেশ—দূরত্ব যেন কিছুই নয় তার কাছে।

ঠিক ইঞ্জিনের কাছাকাছি এসেছে ওরা, আর একটু দূরেই ফেন্সিং, বাইরে যাবার পথ, যেখানে দাঁড়িয়ে টিকিট কলেক্টার টিকিট নিচ্ছে—এমনি সময় ইঞ্জিনের মধ্যে থেকে ভস্-শ ক'রে একটা শব্দ উঠলো। সেই সঙ্গে একটা নল থেকে রাশি রাশি ষ্টীম বেরুতে লাগলো। বাষ্পরাশি ফুলে ফুলে উঠে বিরাট আকার ধারণ করলো। সমস্ত ইঞ্জিনকে প্রায় আচ্ছন্ন ক'রে ফেললো সে।

রাজু মায়ের হাত ধরে টেনে দাঁড়িয়ে পড়লো। এক মুহূর্তের জন্য সে নিস্তব্ধ হয়ে রইলো।

'ঐ ঐ ঐ দেখ মা, সেই বাষ্পরাজ!' বলে উঠলো রাজু।

বাষ্পরাশির মধ্যে থেকে সত্যিই যেন রাজু দেখলো বাষ্পরাজ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছেন। সেই তেজঃপুঞ্জ চেহারা, সেই হাসি।

জলদগম্ভীর সুরে বাষ্পরাজ গাইছেন:—

হুশ্ হাশ ভুশ-ভাশ!
হৃদয়টিরে রাখিস গরম
সচল সবল সস্থ নরম
ফূর্তি যদি চাস্
কাজ দিয়ে তোর জীবনটারে
কেবলই ভরাস্।
হুশ হাশ ভুশ ভাশ।

সমস্ত ষ্টেশন যেন প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো সেই সুরে। রাজু মন্ত্রমুগ্ধের মত দাঁড়িয়ে।

'কুলিটা যে চলে গেল।' বলেই মা রাজুর হাত ধরে টান দিলেন।

ফেন্সিংএর গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এক বিকটদর্শন চেকার। তার হাতে টিকিট দু'খানা তুলে দিয়ে রাজুর মা বেরিয়ে পড়লেন বাইরে।

তার পরে নানা লোকজনের ভীড়ে আর টাঙ্গাওয়ালা রিক্সাওয়ালার কলরবের মধ্যে রাজু আর তার মাকে আমরা আর দেখতে পেলাম না। নিশ্চয়ই তারা রাজুর মামার বাড়ী সাত নম্বরের 'মনোরমা কুটিরে' পৌঁছেছিল, কিন্তু এইখানেই আমাদের গল্প শেষ।

সমাপ্ত

এক যে ছিল বুড়ী!

(বিদেশী উপকথা)

ছবি মুখোপাধ্যায়

আজ তোমাদের কাছে যাদের দেশের গল্প বলব, তাদের কথা নিশ্চয়ই তোমরা জান না। কেন না, তারা থাকে আমাদের দেশ থেকে বহু দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরী করে। সুতরাং তাদের কথা তোমাদের মত ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে না জানাই সম্ভব। তবে এইটুকু তাদের বিষয় জেনে রেখো যে, তারা তোমাদের মতই ভগবানের সৃষ্ট মানুষ, এবং জীবনযাত্রার প্রণালীতেও বিশেষ কোন পার্থক্য নেই সাধারণ মানুষ থেকে। অতএব তাদের দেশের একটা গল্প নিয়ে আজ আলোচনা করা যাক্। কেন না, এই দেশটি আমাদের দেশ থেকে যদিও বহু দূরে, কিন্তু তাদের দেশের লোকেরাও যে আমাদের মতই ছোটদের জন্য নানা গল্প, কাহিনী, শাশ্বত যুগ ধরে চিরনতুন ভঙ্গিতে ছোটদের জন্য সৃষ্টি করে গেছে, শুনলে তোমরা শুধু বিস্মিতই হবে না, মুগ্ধও হবে। যেন পৃথিবীর সর্ব্বত্রই এই সব সুনিপুণ কথাশিল্পীরা তোমাদের জন্য একই ভাবধারায়

একই মালমশলা মিশিয়ে, বিরাট এক গল্পের প্রাসাদ গড়ে তুলেছে। শুধু স্থান কাল পরিবর্ত্তনে গল্পের যেটুকু সামান্য অদল-বদল হয়। তা ছাড়া, সবই মূলতঃ যেন শেষ পর্য্যন্ত একই বক্তব্য দেখা যায়। সুতরাং এখানে যে গল্পটা বলব, সেই গল্পটাও আমাদের দেশের কোন একটি গল্পের প্রায় সম্পূর্ণ ভাবভঙ্গিটা কিনা, তোমরাই বিচার করে দেখবে।

অবশ্য, এটা যাদের গল্প, তাদের "টোলো" বলা হয়। অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরের জলে কৃত্রিম দ্বীপ যারা তৈরী করে তাদের মধ্যে আবার অনেকে ডাঙ্গাতেই থাকে। সুতরাং তাদের উদ্দেশ্যে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরী করে যারা, তারা ঠাট্টা করে "টোলো" বলে। অর্থাৎ 'টোলো' শব্দের মানে হ'ল পাহাড়ী।

এক ছিল রাক্ষসী বুড়ী। সে যখনই কোন ছোট ছেলে-মেয়েকে একলা দেখতে পেত, অমনি তাদের ধরে থলের মধ্যে পুরে ফেলত। তার পর করত কি, তার যে চকমকী পাথরের ছুরি আছে, তাই দিয়ে কেটে-কুটে বুড়ী তাদের খেয়ে ফেলত।

বুড়ীটা তার ঐ চকমকী পাথরগুলো একটা পুঁটলীতে বেঁধে ঘরে ঘরে বেড়াত। সুতরাং এই জন্য বুড়ীটার নামকরণ হয়েছিল "কাল চকমকী পাথরের পুঁটলী" বলে।

একবার দুটি ছোট ছেলেকে বুড়ী ধরলে। তারপর বুঝতেই পারছ ব্যাপারটা কি হ'ল। মানে, তাদের শক্ত করে বেঁধে রেখে বুড়ী গেল বাগানে "ট্যারো" নামে কচু জাতির এক প্রকার উদ্ভিদ মূল তুলতে। কেন না এদের মাংসের সঙ্গে ট্যারো মিশিয়ে সে খাবে। এখন, এদের পাহারার ভার সে ত দিয়ে গেছে তার নাতির কাছে। কিন্তু এদিকে হয়েছে কি, বারে বারেই একটা পাখী কেবল উড়ে আসছে দেখে, ছেলে দুটি তাদের প্রহরীকে বললে, "দ্যাখো, তুমি যদি আমাদের যেতে দাও, তবে তোমাকে ঐ পাখীটা আমরা মেরে দেব।"

ছেলে দু'টির এই কথা শুনে, বুড়ীর নাতি পাখীর লোভে তখনই তাদের বাঁধন খুলে দিয়ে, ছেলে দুটির পালাবার সুযোগ করে দিলে। কিন্তু তারা পালাবার আগে বুড়ীর নাতিকে মারলে, তারপর ঐ মৃতদেহটা উনুনের মধ্যে গুঁজে দিয়ে দু'জনে একেবারে যাকে বলে দে—ছুট—।

এদিকে কিছু বাদে বুড়ীটা যখন বাগান থেকে ফিরে এল, তখন সে উনুনের মধ্যে গোঁজা ছোট ছেলের একটা দেহ পেয়ে, দিব্বি আরামে বসে খেতে সুরু করে দিলে।

এখন, খেতে খেতে মৃতদেহটার বাহুতে হঠাৎ সে যখন একটা লাল বেতের বালা দেখতে পেলে, তখন এই বালাটাই যে বুড়ী একদিন তার নাতির জন্য তৈরী করেছিল, সেটা সে চিনতে পারলে। বুড়ী তখন স্পষ্টই বুঝতে পারলে যে, সে তার নিজের নাতিকেই আজ পুড়িয়ে খেয়েছে! কিন্তু এর পর ত আর কিছু করার নেই। অর্থাৎ যা হবার তা ত' হয়েছেই। সুতরাং সে তখন বেরিয়ে পড়ল সেই ছেলে দুটির খোঁজে।

পথ চলতে চলতে এক সময় এক ধেড়ে ইঁদুরের সঙ্গে বুড়ীর দেখা! বুড়ী তাকে যখন ছেলে দু'টির খোঁজ জিজ্ঞাসা করলে, তখন ধেড়ে ইঁদুরটা জানালে যে, এই সব খবর দেওয়ার জন্য তাকে কড়ি দিতে হবে।

ইঁদুরের কথা শুনে বুড়ী বললে, "তাই ত, আমার কাছে একটি কড়িও ত' নেই!"

ধেড়ে ইঁদুরটা বললে, "তবে শুশুকের দাঁত দাও।"

কিন্তু বুড়ীর কাছে তা-ও ছিল না। তখন ধেড়ে ইঁদুরটা বললে, "বেশ তবে তোমার মাথা থেকে আটটি চুল তুলে আমার নাকের তলায় বসিয়ে দাও।"

অতঃপর তাতে বুড়ী রাজি হ'ল, এবং ইঁদুরের নাকের তলায় নিজের মাথা থেকে আটটি চুল তুলে সে লাগিয়ে দিলে। এইবার ধেড়ে ইঁদুরটা বুড়ীকে দেখিয়ে দিলে সেই ছেলে দু'টি কোন খানে লুকিয়ে আছে।

এদিকে ছেলে দুটি করেছে কি, বিরাট একটা গাছের চতুর্দ্দিক ঘিরে ছুঁচাল মুখের কতকগুলো খুঁটি, মাটিতে গেড়ে রাখলো, তার পরে ঐ গাছটার উপরে উঠে দু'জনে তারা বসে রইল।

এখন, ছেলে দুটিকে গাছের উপর দেখে বুড়ীও তাদের মত গাছের উপর উঠতে চাইল। তখন কি আর করে ছেলে দুটি! অগত্যা, বুঝতেই পারছ বুড়ীকে তারা গাছের উপর টেনে তুললে। কিন্তু যেই না বুড়ী তাদের নিকটবর্ত্তী হ'ল অমনি তারা চট্ করে আবার বুড়ীকে নামিয়ে দিলে।

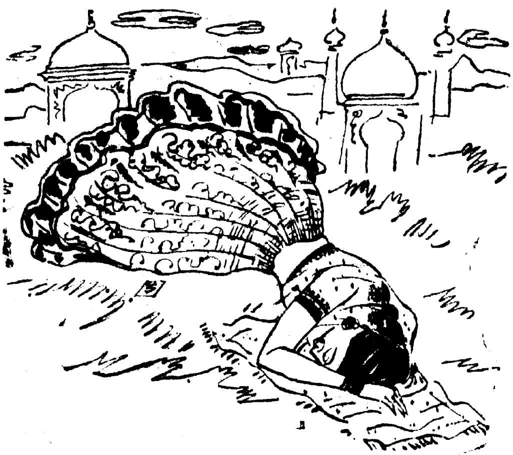
অতঃপর ব্যাপারটা হ'ল কি, নিচেতে যে ছুঁচাল মুখের খুঁটিগুলো ছিল, সে গুলোতে খোঁচা খেয়ে বুড়ী চেঁচিয়ে বলে উঠল, "আমার গায়ে যে এগুলো লাগছে! আরে! তোমাদের কাল পিঁপড়ে আমায় কামড়াচ্ছে যে!"

কিন্তু বুড়ীর সে চিৎকার শোনে কে? সে ত' চেঁচিয়েই যাচ্ছে আর এদিকে ছেলে দু'টি বুড়ীকে একবার টেনে তোলে, আবার ফেলে দেয়। এই ভাবে বার বার তিন বার তারা বুড়ীকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করার ফলে শেষ পর্য্যন্ত কি হ'ল বোধ হয় আর ভেঙ্গে বলতে হবে না। মানে, ততক্ষণে বুড়ীর প্রাণবায়ু ধারাল খুঁটির খোঁচা খেয়ে বেরিয়ে গেছে।

অবশ্য, তারপর কি হ'ল জানতে চাও ত'? হ্যাঁ, তারপর খুবই আনন্দের সাড়া পড়ে গেল দেশে, এবং ঐ ছেলে দু'টিকে সকলে বহু টাকা পুরস্কার দিলে ঐ বুড়ী রাক্ষসীটাকে হত্যা করার জন্য। এখন আমার কথাটি ফুরুল যদিও, কিন্তু বলত' এই গল্পটা কোন গল্পের কথা মনে করিয়ে দেয়? সেই "রাখালের পিঠের" কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে না কি?

১০৯—১৩

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ



দীঘায় তিন দিন

ঊষা বিশ্বাস

মানুষের মনের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে চিরন্তন এক যাযাবর, যাকে দূর-দূরান্তর নিরন্তর হাতছানি দিয়ে ডাকছে। কবি ঠিকই বলেছেন—

"আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।"

এই "সুদূরের ব্যাকুল বাঁশরি" শুনেই মানুষ নিশ্চিন্ত জীবনের পরম আরাম ছেড়ে ঘরছাড়া হয়ে বেরিয়ে পড়ে অজানা পথে—পাড়ি দেয় দেশ-দেশান্তরে। সে নিয়তই চায় অজানাকে জানতে—অদেখাকে দেখতে—নতুনের দুর্নিবার আকর্ষণে। শহরে ইট-কাঠের চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী আমাদের অনেকেরই কর্মজীবন। তার মধ্যে কর্মক্লান্ত মন সময়ে সময়ে যেন হাঁপিয়ে ওঠে! শহরের যান্ত্রিক সভ্যতার কুৎসিত কৃত্রিমতা থেকে সে তাই চায় ক্ষণিক মুক্তি। বিশ্বপ্রকৃতির মুক্ত, অবারিত পরিবেশে সে যখন ক্ষণেকের জন্যেও ছাড়া পায়, তখন তার অফুরন্ত সৌন্দর্যভাণ্ডার থেকে সে যেন লুঠে নিতে চায় তার সবটুকু রস, সবটুকু আনন্দ—কাঙালের মতোই। সারা বছর ধরে—

"একটানা এক ক্লান্ত সুরে
কাজের চাকা চলছে ঘুরে ঘুরে।"

তাই ছুটির অনেক আগে থেকেই মন বিভোর হয়ে থাকে—বিরামের স্বপ্নে। কল্পনা-জল্পনা চলতে থাকে—অবসরটা কোথায় কাটানো যায়। আসলে আনন্দ বোধ হয় এই কল্পনা-বিলাসেই। "Less pleasing when possessed"—কবির এই উক্তি অনেক সময়েই সত্যি হয়। কর্মজীবনেও যাযাবর বৃত্তি অবলম্বন করেছি। নিত্যই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গা। ভ্রমণের বিরাম নেই। তাই বোধ হয়—"মোর ঠিকানা নেই, আছি এক ঠাঁই, সে কথা যে যাই পাসরি।"

অনেক দিন থেকেই মনে দীঘা দেখবার বাসনা। সে বার কল্যাণী প্রদর্শনীতে দেখে এলাম দীঘার একটি সুন্দর মডেল। মনের অপূর্ণ বাসনা আবার জেগে উঠলো। তারপর দু'বার দীঘা যাবার চেষ্টা হ'লো ব্যর্থ। তাই এবার ভাবলাম—বার বার তিন বার—এবার আর একবার চেষ্টা করা যাক। মনে মনে ঠিক করলাম, এবার পুজোর ছুটীর কয়েকটা দিন দীঘাতেই কাটানো যাবে। এক বন্ধু ও সহকর্মিণীকেও পত্রাঘাত করলাম। তাঁরও বেশ উৎসাহ দেখলাম। ক্রমে পুজোর ছুটী নিকট হয়ে এলো। ভয় হয় যদি এবারেও শেষ পর্যন্ত দীঘা যাওয়া না ঘটে! বন্ধু-বান্ধবেরা জিজ্ঞেস করলে বলি—"দীঘা যাবার ইচ্ছে আছে তো, দেখি কদ্দূর কী হয়।" কেউ কেউ একবারে নিরুৎসাহ করে দেন, বলেন—"দীঘা আবার একটা জায়গা! কেন মিছিমিছি পুজোর ছুটীটাই মাটি করবেন?" কেউ বা বলেন—"দীঘা দেখতে খুবই সুন্দর। পুরীর সমুদ্রের চেয়েও ঢের বেশী ভালো।" কেউ আবার বলেন—"দীঘা পুরীর সমুদ্রের কাছে লাগেই না। অতো বড়ো বড়ো ঢেউ নেই। এর সৌন্দর্য অতি শান্ত।" সকলের মতই শুনি। ভাবি, গেলেই চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হবে।

শুনলাম, ছুটীর অন্ততঃ মাস খানেক আগে থেকেই বাংলোতে ঘরের ব্যবস্থা না করলে জায়গা পাওয়া কঠিন। বন্ধুকে লিখলাম—তাঁর দীঘা যাবার সংকল্প এখনও অটুট আছে কি না জানাতে। উত্তরে তিনি জানালেন, নিতান্ত দৈব বাধা না হ'লে তাঁর যাওয়া স্থির। জনৈক বন্ধু একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললেন, তিনি দীঘায় একটি ভালো বাড়ী ঠিক করে দিতে পারেন—বাড়ীটি একেবারে সমুদ্রের ধারেই। তার পর আর একদিন এসে বলে গেলেন—বাড়ী ঠিক হয়ে গিয়েছে, মালিকের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়েছে—শীগগিরই তাঁর কাছ থেকে একখানি চিঠি এনে দেবেন। এর পর আর কোনও খবর নেই। ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। ভয় হলো এবারও বুঝি শেষ পর্যন্ত যাওয়া ভেস্তে যায়। টেলিফোন করলাম শ্রীমতী আভা মাইতি এম-এল-একে। তিনি বললেন—"একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। যা হোক, আমি এক্ষুণি টেলিফোন করছি, বিকালের দিকে আপনাকে জানাবো—ঘর পাওয়া যাবে কি না।" বিকালে টেলিফোন করে জানলাম, ইরিগেশান বাংলোতে একখানি ঘর পাওয়া যাবে। নিশ্চিন্ত হ'লাম। বন্ধুকেও খবরটি জানালাম। ভাবলাম—এতো দিন "yarrow unvisited" ছিল, এবার "yarrow visited" হবে।

শুনলাম, ২২শে অক্টোবর, ষষ্ঠীর দিন—যাত্রার পক্ষে শুভ নয়। তাই ২৩শে অক্টোবরই যাওয়া স্থির করে বন্ধুকেও জানিয়ে দিলাম। ভাবলাম, একদিন পরে রওনা হলে হয়তো ভিড়টাও একটু কমবে। যাত্রার সব আয়োজন সম্পূর্ণ—টিকিটও কেনা হয়েছে। হঠাৎ ২২শে তারিখ শেষ রাত্রে আরম্ভ হলো মুষলধারে বৃষ্টি—সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন মেঘগর্জন ও মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎস্ফুরণ। মনটা বড়ই দমে গেল। ভাবলাম, এবারেও বুঝি প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত বাদ সাধেন। মনে পড়লো, ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরের শেষে দীঘা যাবার সব আয়োজন ঠিক। হঠাৎ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। শেষ মুহূর্তে যাওয়া বন্ধ হলো। যা হোক, ২৩শে তারিখে সকালে যাত্রাকালে আকাশের অবস্থা খানিকটা আশাপ্রদ হলো। রওনা হয়ে পড়লাম হাওড়া ষ্টেশনে—নাগপুর প্যাসেঞ্জার ধরবার জন্যে। যথাসময়ে বন্ধুও এসে পৌঁছালেন—আর একজন সহযাত্রিনী সহ। হাওড়া ষ্টেশন ছাড়বার খানিক পরেই আবার সুরু হলো অবিরাম বর্ষণ—কখনও কম, কখনও বা বেশী। মন শংকাকুল হয়ে উঠলো। খড়গপুর ষ্টেশন থেকে বাসে ৮০ মাইল পথ। বৃষ্টিতে বিছানাপত্র সব ভিজে যাবে। বন্ধু বললেন,

কিছু দিন থেকে যখনই কোথাও তিনি ট্রেণে যাওয়া-আসা করেন, তখনি ওঠা-নামার সময়ে ষ্টেশনে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হতে থাকে। তাঁকে 'বাতুলে' আখ্যা দিয়ে পরিহাস করলাম—বললাম, "তবেই হয়েছে! আজ তাহলে আমাদের কপালেও অশেষ দুর্ভোগ আছে—এক যাত্রায় তো আর পৃথক ফল হয় না।" ট্রেণে বসে ব্যাকুল হয়ে বার বার হাতঘড়িতে সময় দেখি আর ভীতনয়নে চাই আকাশ পানে। দেখি আকাশের অবস্থা শংকাজনক।

বৃষ্টি থামবার কোনও লক্ষণই নেই। কামরাটিতে সহযাত্রিনীদের মধ্যে ছিলেন কয়েকটি অল্পবয়স্কা মেয়ে। তাঁদের সঙ্গে আলাপ হলো। শুনলাম তাঁরাও কাঁথি যাবেন। তাঁদের কাছ থেকে দীঘার খবরও কিছু সংগ্রহ করলাম। তাঁরা সবাই দীঘার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন—ইরিগেশান বাংলোর অবস্থানটি ভারী সুন্দর—একবারে সমুদ্রের ধারেই প্রায় এবং ব্যবস্থাদিও খুব ভালো। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী ট্রেণেই তাড়াতাড়ি কিছু জলযোগ করে নিলাম। শুনলাম, খড়গপুর ষ্টেশনে নেমে আর খাবার সময় পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি না করলে নাকি এক্সপ্রেস্ বাস ধরা যাবে না। যথাসময়ে খড়গপুর ষ্টেশনে নামলাম। আকাশ পানে চেয়ে দেখলাম তার অবস্থা "যথা পূর্বং তথা পরম্।" ছুটলাম বাস ধরতে। ভাগ্য ক্রমে বাসে জায়গা পেতে বিশেষ অসুবিধা হলো না। পুজোর সময় বলে যাত্রীদের সুবিধার জন্যে কয়েকখানি স্পেশাল বাসের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। খড়গপুর ষ্টেশন থেকে কাঁথি ৫৮ মাইল। গাড়ী ছুটে চলেছে—রাস্তার দু' পাশে গাছপালা, দিগন্ত-প্রসারিত জনহীন প্রান্তর, দোকান বাজার, বাড়ী ঘর পিছনে ফেলে। যাত্রীদের ওঠানামার জন্যে মাঝে মাঝে গাড়ী দাঁড়ায়। আকাশের অবস্থা মাঝে মাঝে একটু ভালো হয়—আবার সুরু হয় অল্প অল্প ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ভাবলাম যাক, ধূলোর হাত থেকে বাঁচা গেল—বেশ ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় যাওয়া যাবে। কাঁথির কাছাকাছি আসতেই আবার আরম্ভ হলো মুষলধারে বৃষ্টি; বিধি যেন আজ নিতান্তই বাম।

কাঁথিতে বাস থেকে নামলাম। কণ্ডাক্টর পরামর্শ দিলেন টিকিট-অফিসে গিয়ে বসতে। টিকিট-অফিস নিকটেই। টিকিট-অফিসের ভদ্রলোকটির ব্যবহার অতি সৌজন্যপূর্ণ। তিনি সাদরে আমাদের বসবার জায়গা দিলেন। চায়ের অর্ডার দেওয়া হ'লো। খানিক পরেই এলো গরম চা। সঙ্গেই ছিলো খাবার। তাই দিয়ে জলযোগ পর্বটা সেরে নিলাম। শুনলাম, দীঘার বাস বিকাল ৪-৪৫ মিনিটের আগে ছাড়বে না—বাঁধা সময়। ঘড়িতে তখন মাত্র তিনটে। ভাবি, এতোক্ষণ কি করে কাটানো যায়! এই দারুণ

দুর্যোগে সাইকেল-রিকসায় শহর পরিক্রমায় বেরুলে তো 'কাকভেজা' হয়ে যাবো। টিকিট-অফিসেই বা কতোক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা যায়? তবু সেখানেই খানিকক্ষণ বসে রইলাম—একথা সে-কথা বলে। সময় আর কাটে না। ঘড়ির কাঁটাটা যেন আর সরেই না! ক্রমে সাড়ে তিনটে বাজলো। উঠে পড়লাম। ভাবলাম এবার বাসে গিয়েই জায়গা দখল ক'রে বসা যাক। ক্রমে অন্য যাত্রীরাও সব এসে জুটতে লাগলেন। যাত্রীসংখ্যাও নেহাত কম নয়। বেশীর ভাগই যুবক—তরুণ বয়স্ক। তাঁরা কেবলি বাস-চালককে তাগিদ দিতে থাকেন—গাড়ী ছাড়বার জন্যে। ভদ্রলোকের এক কথা—বাস-চালকেরও এক কথা—৪-৪৫ মিনিটের আগে বাস নাই। ৪-৪৫ মিনিটের আগে বাস ছাড়বার উপায় নেই।

ক্রমে যাত্রীরা আরও অধীর হয়ে ওঠেন। কিন্তু বাসচালক অচল, অনড়। এধারে আকাশ অঝোরে বারি বর্ষণ করেই চলেছে—অবিশ্রান্ত। শুনলাম কাঁথি থেকে দীঘা ২২ মাইল—প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের রাস্তা। অজানা অচেনা জায়গায় হয়তো পৌছাতে সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তাতে আবার এই দারুণ দুর্যোগ। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলাম। অবশেষে ঘড়িতে ৪-৪৫ মিনিট বাজলো। যাত্রীরা আবার অধৈর্য হয়ে উঠলেন। অগত্যা বাসচালক গাড়ী ছাড়তে বাধ্য হলেন। খানিক দূর এসেই বাস থামলো। এবার খেয়া পার হতে হবে। প্রথমে শুনলাম মেয়েদের গাড়ী থেকে নামতে হবে না। পরক্ষণেই আবার শুনলাম সকলকেই বাস থেকে নেমে যেতে হবে। এই অন্ধকারে ও দুর্যোগে খালের উপর দিয়ে বাস পার করা সম্ভব নয়। ওপারে গিয়ে আর একখানি বাসে চড়তে হবে। বাসে থাকতে থাকতেই পায়ের জুতো ভিজে সপ সপ করছিল—বৃষ্টির ছাঁটে কাপড়-চোপড়ও কিছু কিছু ভিজেছিল। বাস থেকে নামতে হবে শুনেই তো—চক্ষু চড়ক গাছ! বন্ধুকে চুপি চুপি বলি—"দীঘা দেখবার সখ মিটেছে—চলো, এখান থেকেই ফিরে যাই।" তিনি বললেন—"একটু কষ্ট না হলে দীঘা যাবার কথা মনে থাকবে কেন?"

বাস থেকে তো নামলাম। এঁটেল মাটি—বৃষ্টির জলে পথ অত্যন্ত পিছল হয়েছে। একটু অসাবধানে পা ফেললেই "পা পিছলে আলুর দম"। অতি সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে চললাম। খেয়াঘাটের কাছেই একটি চালা। তার নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে জিনিষপত্রও রাখা হলো। চারি দিক খোলা—মাথার উপর শুধু একটুখানি ছাদ। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে—সেই বাতাসের হিমেল পরশে হাড়ের ভিতরেও যেন কাঁপুনী ধরে। খানিক পরে খেয়া নৌকো এসে ঘাটে লাগলো। তখন দিনান্তের আলোর শেষ রশ্মিটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গিয়েছে। বাদল-সন্ধ্যা। অসময়েই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। টর্চের আলোতে পথ দেখে আস্তে আস্তে অতি সাবধানে পা ফেলে কোনও রকমে নৌকোতে গিয়ে উঠলাম। খালটি বিশেষ বড়ো নয়। পরে শুনেছি এইটিই নাকি পিছাবনির খাল—যেখানে মহাত্মা গান্ধীর বিখ্যাত দাণ্ডী অভিযান হয়েছিল—লবণ আইন ভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। মাঝিরা গুণ টেনে টেনে নৌকো পার করলো। বৃষ্টির জন্যে খালের স্রোতোবেগ বেড়ে গিয়েছিল। ওপারে আর একখানি বাস অপেক্ষা করছিল। তাড়াতাড়ি তাতে গিয়ে জায়গা দখল করলাম। কিন্তু গাড়ী আর ষ্টার্ট নেয় না! অতি কষ্টে যদি বা এঞ্জিন চললো তো খানিকটা গিয়েই আবার বন্ধ হলো। অনবরত হ্যাণ্ডেল মারা হচ্ছে। বাস ঘর-ঘর শব্দ করে, আবার বন্ধ হয়ে যায়। দৈব আজ নিতান্তই প্রতিকূল! কী কুক্ষণেই না যাত্রা করা হয়েছে! জ্যোতিষ শাস্ত্রে তখন ঘোরতর অবিশ্বাস হ'লো। বাসে বসে বসেই অধীর হয়ে উঠি। বাসের তরুণ যাত্রীদের কথাবার্তা কানে আসতে লাগলো। দীঘায় তাঁদের থাকবার আস্তানাও ঠিক নেই। যেখানে পাবেন ঢুকে পড়বেন। মাথার উপরে একটু ছাদ পেলেই হ'লো। তাঁদের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন—"দীঘাকে নিকুচি করেছি। কাল সকালে প্রথম বাসেই ফিরে যাবো। আজ রাত্তিরটা কোনও রকমে কাটাতে পারলে হয়!" বন্ধু পরিহাস করলেন—"ঐ যে, তোমার একজন সঙ্গী জুটলো তাহলে! খানিক আগেই তুমিও তো ফিরে যেতে চাইছিলে।"

অনেক চেষ্টার পরে অবশেষে বাস ষ্টার্ট নিলো, বাসচালক আশ্বাস দিলেন—দীঘা পৌছাতে আর বেশী দেরী হবে না, মধ্যে রামনগর থানায় শুধু একবার বাস দাঁড়াবে। আমরা প্রায় ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই দীঘায় পৌছালাম। নীরন্ধ্র, জমাট অন্ধকার। বাস থেকে নেমে যেন দিশাহারা হয়ে পড়লাম। অজানা, অচেনা জায়গা। কোথায় ডাকবাংলো? কোন্ দিকে? কোন্ পথে? তখনও বৃষ্টি পড়ছে—টিপ টিপ করে। বৃষ্টির যেন আর বিরাম নেই, অস্থির মন। হাতের ছাতাটা যে খুলতে হবে তাও খেয়াল নেই। ডাকবাংলোর কাছে এসে দেখলাম গেট বন্ধ। অনেক ডাকাডাকির পর বেরিয়ে এলো একজন লোক। আন্দাজে বুঝলাম সেই চৌকীদার। বললাম—"শ্রীমতী আভা মাইতির চিঠি নিয়ে আসছি, তাঁর জন্যে যে ঘর রিজার্ভ আছে সেখানে থাকবো।" জবাব পেলাম—"চিঠি না দেখালে ঢুকতে দেবো না।" বললাম—"অন্ধকারে তো আর চিঠি দেখানো যাবে না। বারান্দায় উঠি—চিঠি দেখাবো।" লোকটির তবুও অবিশ্বাস। শেষে অনেক বলা-কওয়ার পরে যেন নিতান্ত অনিচ্ছাতেই গেট খুললো। শ্রীমতী মাইতির চিঠিখানা দেখাতে লোকটি একটি ঘর খুলে দিয়ে একটি লণ্ঠন দিলো। চারি দিকে ঘোর অন্ধকার। সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। দেখলাম অদূরে একটি আলো জ্বলছে। শুনলাম, সেটি নাকি একটি চায়ের দোকান। চায়ের অর্ডার দিয়ে ভিজে কাপড়-চোপড় ছেড়ে ফেললাম। চা পানান্তে শারীরিক শ্রান্তি ও ক্লান্তি খানিকটা দূর হলো। তখন রাত্রি প্রায় ন'টা। শুনলাম, কাছেই শ্রীযুক্ত মুরারি খাঁড়ার হোটেল, তাতে ভাত পাওয়া যাবে। খাবার অর্ডার দিয়ে দুই বন্ধুতে বারান্দায় খানিক পায়চারি করলাম। অন্ধকারে শুধু কানে আসছিল সমুদ্রের অশ্রান্ত গর্জন। মনটা বড়োই খারাপ। ভাবলাম—যা দুর্যোগ! দীঘা আসাই হয় তো বৃথাই হবে। ঘর থেকে হয়তো বেরুনোই যাবে না—এ তিন দিন!

সে রাতে তাড়াতাড়ি খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম ভাঙতেই বন্ধু আশ্বাস দিলেন—আকাশ বোধ হয় পরিষ্কার হয়ে গেল—আর বৃষ্টি হবে না বলে মনে হ'চ্ছে। বিছানা ছেড়ে তখুনি উঠে পড়লাম। সামনের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনেই রাস্তা। তারপর উঁচু-নীচু বন্ধুর জমি। তার আড়ালে আবছা-আবছা দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের নীল জল। চা পানান্তে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম—সমুদ্র-সৈকতের

পানে। পথে যেতে যেতে দেখলাম, একখানি সুন্দর নবনির্মিত লালরঙের দ্বিতল বাড়ী। পরে শুনলাম, ওখানে নাকি শীগগিরই একটি কাফেটেরিয়া খোলা হবে, যেখানে দেশ-বিদেশের যাত্রীরা এসে থাকতে পারবেন। পায়ের জুতো খুলে রেখে বেলাভূমির বালুকারাশি পার হয়ে গেলাম জলের ধারে। সমুদ্র-সৈকতটি মস্তো বড়ো চওড়া—চওড়ায় প্রায় ২০০ গজ হবে। এখানে এরোপ্লেনও এসে নামতে পারে। এতো চওড়া বেলাভূমি নাকি পৃথিবীতে আর নেই। জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটা সুরু করলাম। দিনটি বেশ মেঘমেদুর—বেড়ানোর পক্ষে খুবই উপযোগী। আকাশে চলছে মেঘ ও রৌদ্রের অবিশ্রান্ত লুকোচুরি খেলা। সূর্যদেব মাঝে মাঝে দুষ্টু ছেলের মতো মেঘের আড়ালে মুখ লুকোচ্ছেন, আবার ক্ষণপরেই হাস্যোজ্জ্বল মুখটি বার করছেন—খুশীতে ঝলমল। দিগন্ত-বিস্তৃত তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সুনীল জলধি। তার এক একটি উত্তাল তরঙ্গ যেন সরোষে মাথা তুলে আমাদের দিকে গর্জে আসছে। তটের উপর আছড়ে পড়ে আমাদের কাপড় ভিজিয়ে দিয়ে কৌতুকভরে যেন আবার পিছু হটছে। কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা—"সমুদ্রের প্রতি"র পংক্তিগুলি মনে পড়লো—

"একি সুগম্ভীর স্নেহখেলা
অম্বুনিধি! ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা
ধীরে ধীরে পা টিপিয়া পিছু হটি চলি যাও দূরে,
যেন ছেড়ে যেতে চাও; আবার আনন্দপূর্ণ সুরে
উল্লাসি ফিরিয়া আসি কল্লোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে,
রাশি রাশি শুভ্র হাস্যে, অশ্রুজলে, স্নেহগর্ব সুখে
আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট
আশীর্বাদে।"

সমুদ্রের পানে ফিরে ফিরে চাই। দেখে দেখে যেন নয়ন তৃপ্ত হয় না। শুনি তার ক্লান্তিহীন কল-কল্লোল! মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দেখি তার অনন্ত উল্লাস। মনে হয় যেন 'খল জল ছলভরা তুমি লক্ষ ফণা' বিষধর ফণীর মতোই নিত্য ফুঁসিছে গর্জিছে। মাথার উপরে নিঃসীম শূন্যে অন্তহীন নীল আকাশ। দূরে আকাশের নীলিমা সাগরের জলের নীলিমার সঙ্গে মিতালি পাতিয়েছে। নীলে নীলে একাকার। জলের উপরে সূর্যের আলো চিক্ চিক্ করছে—সৃষ্টি করছে অপূর্ব বর্ণ-বৈচিত্র্য ক্ষণে ক্ষণে। পায়ের নীচে অগভীর স্ফটিকস্বচ্ছ জলের মধ্যে নীল আকাশের প্রতিবিম্ব। সকাল বেলায় জেলের দল মাছ ধরতে বেরিয়েছে। তাদের ডিঙিগুলি জলের উপরে দুলছে—ঢেউএর তালে তালে। মাঝে মাঝে সেগুলি এক পাশে হেলে পড়ে। দেখে বুক দুরু-দুরু করতে থাকে। ভয় হয় এই বুঝি তরী ডুবলো। অমনি মুহূর্তের মধ্যেই টাল সামলে নিয়ে জলের উপরে আবার ভেসে ওঠে। ঢেউএর সঙ্গে ডিঙিগুলির এই অসীম উল্লাস ভরা মাতামাতি দেখতে ভারী সুন্দর! কেউ কেউ স্বল্পগভীর জলে মাছের জন্যে জাল ফেলছে। দু'-একজন জাল তুলে বেলাভূমির দিকে এগিয়ে আসে। কাছে আসতেই কৌতূহল ভরে জিজ্ঞেস করি—'কি মাছ?' দেখায় জাল খুলে। বেশীর ভাগই ছোট ছোট মাছ—ট্যাংরা, পার্সে, চাঁদা ইত্যাদি। একজনের জালে ধরা পড়েছে একটি বেশ বড়ো মাছ। দেখতে অদ্ভুত—সমস্ত গায়ে রঙ-বেরঙের ফুটকি। এ মাছ কখনও দেখি নি। নাম জিজ্ঞেস করতে জেলে বললো—"ব্যাঙ মাছ।" নামও শুনি নি কখনও। আবার জিজ্ঞেস করি—"এ মাছ লোকে খায়?" জেলে বলে—'না'। মাছের গলার কাছটা আঙুল দিয়ে টিপে দেখায়—সেখানটা ফুলে উঠলো গোল হয়ে। ঠিক যেন একটি বল।

আমাদের তরুণী সহযাত্রিনীটির এই প্রথম সমুদ্র দর্শন। তাঁর উল্লাসের ও উৎসাহের যেন সীমা নেই। শামুক ঝিনুক কুড়াতেই তিনি ব্যস্ত। এক একটি ঢেউ এসে চলে যায়। ভাসিয়ে আনে অসংখ্য শামুক ঝিনুক—নানা আকারের। বালিয়াড়ী দীঘা-সৈকতের আর একটি বৈশিষ্ট্য। এগুলি ছোট ছোট বালির পাহাড় বা ঢিবি। এই বালিয়াড়ীগুলিই যেন দীঘা-সৈকতের নৈসর্গিক সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। বেলাভূমির অপর পারে অল্প দূরে দূরেই এগুলি দেখা যায়। রুক্ষ, উষর, শ্যামলতালেশহীন, বাদামী রঙের রাশি রাশি বালির স্তূপ। কেবল মাঝে মাঝে দু'-একটি বনলতা বালির উপর দিয়ে লতিয়ে গিয়েছে—নামগোত্রহীনা। তাতে ফুটে রয়েছে বেগুনী রঙের কতোগুলি সুন্দর ফুল। সাগর-সৈকতে বেড়িয়ে বেড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ি একটি বালিয়াড়ীর উপরে। আশে-পাশে কতোগুলি ধানক্ষেত! খানিক দূরে দেখা যায় ঝাউবন—দেখতে অনেকটা যেন পাইন বনের মতোই। খানিক বসে বাংলোতে ফিরলাম। দারুণ ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে তখন। খাবার সহ আর এক দফা চা পর্ব চললো। শুনলাম মধ্যাহ্ন ভোজনের কিছু দেরী আছে। হোটেলে নাকি বেজায় যাত্রীর ভিড়। বন্ধু ও তাঁর সহযাত্রিনী স্নানের উদ্যোগ

করতে লাগলেন। হাঙরের ভয় দেখিয়ে তাঁদের সমুদ্রস্নানে নিরস্ত করবার চেষ্টা বৃথা হ'লো। তাঁরা সেকথা কানেই তুললেন না। উপরন্তু আমাকেও টানলেন তাঁদের সঙ্গে। দেখলাম দলে দলে স্নানার্থী তরুণেরাও ঢেউ-এর সঙ্গে মাতামাতি সুরু করেছেন—পরম উল্লাসে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা আবার বেরুলাম। পূর্বদিনের সেই নিদারুণ শ্রান্তি ও ক্লান্তির কথা আর যেন আমাদের মনেই নেই! পথে যেতে যেতে চোখে পড়ে কতো অজানা, অচেনা ঝোপ-ঝাড়, গাছপালা। সঙ্গিনী মেয়েটি একটি ঝাড় দেখিয়ে বললেন সেটি নাকি কেয়া-ঝাড়। একটি হোটেলের পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম, সেখানে দারুণ যাত্রীর ভীড়। দিনটি ছিল মেঘলা মেঘলা। আমরা সমুদ্রের ধারে এদিক ওদিক আবার খানিকটা ঘুরে বাংলোতে ফিরলাম। বিছানায় খানিক গড়িয়ে নিয়ে বিকালের দিকে চা পানান্তে আবার বেরিয়ে পড়লাম—সমুদ্রের দিকে। সকাল বেলাকার মতো জলের মধ্যে দিয়ে খানিক বেড়ালাম—উদ্দেশ্যহীন ভাবে। আকাশ মেঘমুক্ত। প্রসন্ন দিন। মনটাও তাই বেশ উৎফুল্ল। বালির উপর পড়ে রয়েছে কতোগুলো সেই ব্যাঙ-মাছ। ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে এসেছে। এবেলাও সহযাত্রিনী মেয়েটি শামুক ঝিনুক কুড়াতে ব্যস্ত। বালির উপরে কাঁকড়ারা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে তৈরী করেছে বিচিত্র নক্সা। ভারী সুন্দর লাগছে সেগুলি দেখতে। বন্ধু মন্তব্য করলেন—'ঠিক যেন বম্বে প্রিন্ট।' বললাম—'উপমাটি কিন্তু নিতান্তই মেয়েলি। "Eternal feminine" তো কথাই আছে।' সমুদ্রে সূর্য্যাস্ত দেখবো মনের বাসনা। আগ্রহ ভরে মাঝে মাঝে আকাশ পানে চাই। পশ্চিম দিগন্তে দিনান্তের ক্লান্ত রবি ক্রমে একটি অগ্নি-গোলকের রূপ ধরে আস্তে আস্তে বিলীন হ'লো—দূর দিগ্বলয়ের মধ্যে। পশ্চিম আকাশে সিঁদুরে রঙের ছোপ লাগলো। প্রদোষান্ধকারের কালো ছায়া ঘনিয়ে আসবার আগেই আমরা বাংলোতে ফিরে গেলাম। তখন শুক্লপক্ষ। দু'খানি ইজিচেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসলাম। চেয়ে রইলাম সমুদ্রের পানে। রূপোলি জ্যোৎস্নালোকে সমুদ্রের আর এক রূপ দেখলাম—অস্পষ্ট, রহস্যঘন। দেখলাম দূরে সাগরের জলের উপর চাঁদের আলোর ঝলমলানি। তার পরের দিনও সকালে ৬টার মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম—সমুদ্রের দিকে। সেদিনও জলের মধ্যে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বেড়ালাম—গল্প করতে করতে। তখন দলে দলে যাত্রীরাও সব বেরিয়েছেন। বেশীর ভাগই অল্পবয়স্ক যুবক। তাঁদের অনেকের হাতেই বন্দুক। সমুদ্রের সৌন্দর্য উপভোগ করবার চেয়ে তাঁদের শিকারের দিকেই লক্ষ্য বেশী। ঝাঁকে ঝাঁকে পাখীর দল জলের উপর এসে বসছে পরম নির্ভয়ে। অমনি বন্দুকের গুড়ুম গুড়ুম শব্দ। বুক যেন কেঁপে ওঠে সে-শব্দে! পাখীর ঝাঁক উড়ে পালাতে লাগলো ভয়ে। দু'-একটি গুলীবিদ্ধ হয়ে পড়ে গেল বালির উপরে। শিকারীদের কী উল্লাস! গুলীবিদ্ধ পাখীগুলি দেখে মন বিষাদে ভরে গেল। মনে পড়লো, আদিকবি বাল্মীকির মুখনিঃসৃত অমর শ্লোকটির কথা। খানিকক্ষণ উদ্দেশ্যহীন ভাবে বেলাভূমিতে বেড়ালাম। তার পর বাংলোতে প্রত্যাগমন ও চা'পান। চা'পানান্তে আবার বেরুলাম বন-বিভাগের বাংলোর দিকে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা-অধিকর্তা ডাক্তার পরিমল রায় তখন সস্ত্রীক সেখানে অবস্থান করছেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করাটাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বন-বিভাগের বাংলোতে যাবার পথটি বড়ই সুন্দর! ছায়াস্নিগ্ধ ঘনসন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে দিয়ে সরু পায়ে-চলা পথ। দু'পাশে গাছপালার শ্যামসমারোহ যেন নয়ন জুড়িয়ে দেয়। পরিবেশটি স্নিগ্ধ, সুদৃশ্য ও নিরালা। ঠিক যেন বন-বিভাগের বাংলোরই উপযোগী। মনোরম পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত বাড়ীটি—নবনির্মিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সেদিন দুপুরে মধ্যাহ্ন ভোজনের পরে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসলাম। দেখলাম, যাত্রীর দল যাচ্ছেন ও আসছেন। কেউ আসে, কেউ যায়—এই তো দুনিয়ার চিরন্তন রীতি। দেখলাম ভ্রমণ-বিলাসীর দল সব আসছেন জীপে, ষ্টেশন ওয়াগনে, বাসে, প্রাইভেট মোটরগাড়ীতে—দীঘা-সৈকতে চড়িভাতি করতে।

শুনেছিলাম, দীঘা জায়গাটা খুবই নির্জন। কিন্তু আমরা তা বিশেষ বুঝতে পারিনি। বাংলোর গেটের কাছেই দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। পূজামণ্ডপে লোকজনের অবিরাম আনাগোনা। পূজোর বাজনাতেও অহরহ কান ঝালাপালা। পূজো উপলক্ষে একটি ছোট মেলাও বসেছিল। তাতে বেচাকেনাও মন্দ চলছিল না। বিক্রী হচ্ছিল তেলেভাজা কতোগুলি খাবার ও নানা রকম মনিহারী জিনিষ। তাইতে মেয়ে-পুরুষ, ছেলে-বুড়োর কী ভিড়!—দুপুরে বিশ্রাম করে আমরা আবার বিকালের দিকে সমুদ্র-সৈকতে ঘুরতে গেলাম। এই দু'দিনে সমুদ্রের সঙ্গে আমাদের যেন একটি গভীর আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অনেকেই বলেন, সমুদ্র বেশী দিন ভালো লাগে না—এর দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য বড়ই একঘেয়ে মনে হয়। কিন্তু দীঘায় আমাদের যেন সমুদ্র দেখায় ক্লান্তি নেই। যতোই দেখি ততোই এর নতুন নতুন রূপ চোখে পড়ে। দেখে দেখে নয়নের যেন আর আশ মেটে না। জানি না আরও বেশী দিন থাকলে কেমন লাগতো! সমুদ্র ও সমুদ্র-সৈকত ছাড়া দীঘায় দর্শনীয় আর বিশেষ কিছুই নেই। সমুদ্র সেখানে অনন্য এবং একক। তাই দীঘার সমস্ত আকর্ষণ কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে সমুদ্রেই। যাঁরা দীঘা দেখতে যান তাঁরা শুধু সমুদ্র দেখতেই যান। শেষ দিন কেবলি মনে হ'চ্ছিল দিনগুলি বৈচিত্র্যহীন হ'লেও মন্দ কাটলো না। এত শীগগির দীঘা ছেড়ে যেতে হবে বলে মনটাও একটু কেমন কেমন করছিল। শেষ দিন সকালে সমুদ্রের ধারে অনেকক্ষণ বেড়ালাম। তারপর একটি বালিয়াড়ীর উপর গিয়ে খানিক বসলাম। ফিরবার সময়ে বন্ধু বললেন—"চলো, নাড়াজোলের রাজবাড়ীটিও একটু ঘুরে দেখে যাই। এসেছি যখন এখানকার সব কিছুই দেখে যাবো।" মস্তো বড়ো সুন্দর বাড়ীটি—একটি সুন্দর বাগানের মধ্যে। শুনলাম সেদিনই রাজা বাহাদুর আসছেন কয়েক জন অতিথি-সহ। চাকর বাকর, কর্মচারীরা সবাই ভীষণ ব্যস্ত। ঘর-দোর পরিষ্কার করা হ'চ্ছে। কর্মচারীদের অনুমতি নিয়ে নীচের তলার ঘরগুলি একটু ঘুরে দেখলাম। বাড়ীটি দ্বিতল—আধুনিক আসবাবাদিতে সুসজ্জিত। ঠিক করলাম সেদিন বিকালে সমুদ্রের ধারে খানিক বেড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে রচিত বনটি (afforestation scheme) দেখতে যাবো। বনের ভিতর ঢুকলাম না। বাইরেই দেখা হলো একজন রক্ষীর সঙ্গে। তার কাছে শুনলাম এখানকার অনেক বাড়ী-ঘরই নাকি বালুকাগর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। বালুকাগ্রাসের কবল থেকে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভূমিকে রক্ষা করবার মানসেই সরকারের এই কৃত্রিম বন-রচনার প্রয়াস।

এই উদ্দেশ্যে প্রতি বছরই নাকি কিছু কিছু গাছ লাগানো হ'চ্ছে এবং সেগুলি বাঁচিয়ে রাখবার জন্তেও যথেষ্ট যত্ন ও চেষ্টা চলছে।

প্রকৃতির তাণ্ডব লীলার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের জয়যাত্রা ঘোষণা—ধরণীর বুকে নিয়ত ভাঙাগড়ার বিচিত্র খেলা! সামনেই একটি বালিয়াড়ী। বসলাম গিয়ে তার উপরে। সেখান থেকে সমুদ্রের রূপটি বাস্তবিকই অপরূপ মনে হ'লো। সামনেই অন্তহীন নীল জলরাশির সীমাহীন বিস্তার। অপার, অবারিত বারিধির বুকে মুহুর্মুহুঃ বিপুল তরঙ্গ-বিক্ষোভ—বড়ো বড়ো ঢেউগুলির উল্লসিত মাতামাতি। কানে বাজে সমুদ্রের অক্লান্ত, নিরলস কলতানের অপূর্ব মূর্চ্ছনা—বিরামহীন, সুগম্ভীর। তার অতল গভীরতা, উদার বিশালতা, উদ্দাম উচ্ছলতা ও শুভ্র ফেনিল উচ্ছ্বাস সব মিলিয়ে মনের মধ্যে এক বিচিত্র কুহক সৃষ্টি করছিল। বিশ্ব-প্রকৃতির এই রূপসাগরে ডুব দিয়েই বোধ হয় সাধক কবি "অরূপ রতন"কে দেখতে চেয়েছিলেন—এর মধ্যেই অনুভব করেছিলেন ভূমার স্পর্শ। তার এই রূপ দেখেই একদিন পাগল হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্য।—ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আনতে লাগলো—দিনের আলো নিবে এল। ফিরে চললাম বাংলোর দিকে। সমুদ্র-সৈকত আজ এখন প্রায় জনহীন। যাত্রীর দল বোধ হয় অধিকাংশই ফিরে গিয়েছেন। আজ ৺বিজয়া দশমী। পূজা শেষ—বিসর্জন পর্ব।

বিসর্জনের বিষাদ-করুণ সুরটি আজ প্রত্যেক বাঙালী হিন্দুর মনেই বাজছে, আমার মনেও যেন বিদায়ের সেই করুণ সুরটিই আজ অহরহ বাজছে। দীঘায় আজ আমাদের শেষ দিন। পরদিন সকালেই দীঘা ছাড়বো। সন্ধ্যেবেলা বাংলোতে ফিরেই শুনলাম সামনেই পূজামণ্ডপে ৺বিজয়া দশমী উপলক্ষে যাত্রার আয়োজন করা হ'য়েছে। উদ্যোক্তারা সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে যাত্রা শুনতে গেলাম। আয়োজন অতি দীন,—অনাড়ম্বর। কিন্তু সে দৈন্য পূরণ করলো আমাদের অন্তরের অকুণ্ঠ আগ্রহ ও অভিনেতাদের উৎসাহের প্রাচুর্য্য। বন্ধু বেশ তন্ময় হয়ে দেখছেন ও শুনছেন বলে মনে হ'লো। কিন্তু পরদিন ভোরে উঠতে হবে। সকাল ৬টায় বাস ছাড়ে। বেশী রাত জাগা ঠিক নয়। খানিক পরেই উঠে পড়লাম। বিছানায় শুতেই ক্লান্ত দেহ এলিয়ে পড়লো ঘুমে। রাতে কতোক্ষণ পর্য্যন্ত যাত্রা চললো জানি না। হঠাৎ নিশীথ রাতে ঘুম ভেঙে গেল বারিপাতের শব্দে। ভয় হলো যাত্রারম্ভের সে ঘটনাগুলিরই পুনরভিনয় না জানি হয়।

যা হোক, ভোরের দিকে আকাশ অনেকটা পরিষ্কার হলো। সকাল বেলায় যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। দীঘার সমুদ্রকে মনে মনে শেষ বিদায় জানালাম। "ভরা থাক বিদায়ের পাত্রখানি স্মৃতির সুধায়।" বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"কেমন লাগলো দীঘা?" তিনি বললেন—"খুব ভালো লাগলো।" বললাম—আসবার সময় যা কষ্টটাই পেয়েছি। "All's well that ends well." যথাসময়ে বাসে উঠলাম। মনে খেদ রইলো—যাবার আগে চা পেলাম না। চায়ের দোকান তখনও বন্ধ। বোধ হয় সব এখন ঘুমুচ্ছে—সারা রাত যাত্রা শুনেছে। পিছাবনিতে এসে সবাই এক গ্লাস করে চা খেলাম। এবারে খালটি দিনের আলোতে নির্ঝঞ্ঝাটেই পার হ'লাম। শুনলাম, খালের উপর একটি পুল তৈরী করবার পরিকল্পনা চলছে। তাহলে দীঘা যাওয়া-আসার পথটি আরও সুগম হবে ভবিষ্যতে। যথাসময়ে কাঁথিতে এসে খড়গপুরের বাসে চাপলাম। এবারকার যাত্রা নির্বিঘ্নই হলো। দিনটি বেশ মেঘলা মেঘলা থাকলেও পথে বৃষ্টি হয় নি।

দীঘা থেকে ফিরে আসবার পরে বন্ধু-বান্ধবেরা সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন—"দীঘা কেমন লাগলো?" দীঘা সম্বন্ধে দেখি অনেকেরই ঔৎসুক্য। কয়েক বছর আগে অনেকেই হয়তো দীঘার নামই শোনেন নি। সত্যিই দীঘার একটি মনোরম ছবি যেন মনের মধ্যে চিরমুদ্রিত হয়ে রয়েছে। তাই বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে বলি, —"খুব ভালো লাগলো দীঘা"। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি মনে পড়ে—

"বহু দিন ধ'রে বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বত-মালা,
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির-বিন্দু"।

বাস্তবিকই আমরা বাংলা দেশের অনেকেই বহু অর্থ ব্যয় করে বহু ক্লেশ স্বীকার করে দূর-দূরান্তরে ছুটি ভ্রমণে—দেখি দেশ-বিদেশের পাহাড় সমুদ্র। অথচ বাংলাদেশের মধ্যেই—নিতান্ত ঘরের কাছে যে সুরম্য স্থানটি বনফুলের মতোই লুকিয়ে আছে—লোকচক্ষুর অন্তরালে, তার অনুপম সৌন্দর্যসম্ভার আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। অথবা অতি-পরিচয়ের অবহেলায় তার দিকে ফিরেও চাই না। অদূর ভবিষ্যতে

দীঘায় একটি স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তুলবার পরিকল্পনা আছে। পরিকল্পনাটি বাস্তবে রূপায়িত হ'লে বাংলাদেশের লোকেরা বিশেষ উপকৃত হবেন বলেই মনে হয়।

কাহিনী শোনাই শোন

শোভনা দেবী

হাতে কোন কাজকর্ম নেই—না স্বর্গে, না মর্ত্যে—অগাধ ক্ষমতার অধিকারী হয়েও ব্রহ্মা অস্থির হয়ে উঠছেন কলকাতার বেকার গ্র্যাজুয়েটদের মতোই। তবুও তো তারা রোয়াকবাজী (রোয়াকে বসে রাজনীতির চর্চা) করে দিন কাটায়—ব্রহ্মা করেন কি? বিষ্ণুর ডাক পড়লো।

"কি সংবাদ পিতামহ?" বিষ্ণু এসে শুধোলেন।

"ওহে—আর তো পারা যায় না, তোমার না হয় ঘরে লক্ষ্মী আছেন, তাঁকে সামলানোই তোমার একটা কাজ, কিন্তু আমি করি কি? বর্তমানের কর্তাদের হাতে পড়ে পৃথিবী যে ভাবে লয়ের পথে দ্রুত এগোচ্ছে তাতে ভয় হয় যে কোন দিন আমাদের সৃষ্টি-স্থিতির লাইসেন্স বাতিল হয়ে যাবে—তাই ওতে আর রস পাই না। কিন্তু দিন তো কাটে না আর—বড়ই একঘেয়ে ঠেকছে। বৈচিত্র্য নেই কোথাও"।

বিষ্ণু আশ্বাসের স্বরে বললেন—"বৈচিত্র্যের অভাব কি দেব? বাংলাদেশের দিকেই দৃষ্টিপাত করুন না—'এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙ্গ ভরা'—ঐ সে দেখুন না—" ব্রহ্মার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কলেজ স্কোয়ারের কফির টেবিলে তরুণ-তরুণীর ক্লাস পালিয়ে আলাপনের দিকে—আবার অঙ্গুলী সংকেত করে দেখান যেখানে কমিউনিষ্ট পার্টির দুটি ছেলে আর মেয়ের মুখে 'মজদুর ভাই'র দুঃখে বিগলিত অশ্রুস্রাব বার হচ্ছে—আবার আঙুল ঘোরে লেকের দিকে যেখানে জোড়ায় জোড়ায় কপোত-কপোতীর মতো ছেলেমেয়েদের বিশ্ব-সংসার ভুলে কূজন চলেছে।"

বিষ্ণু বলতে থাকেন—"সংসারের লোক আপনার সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছে পিতামহের। কম রসিকতার সম্পর্ক! এ সব দেখে শুনে আপনার তো খুবই রস উপভোগ করার কথা"—হাই তুলে ব্রহ্মা ক্লান্ত স্বরে বলেন—"আরে রাখো বাপু তোমার বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের প্রেমের গপ্পো। প্রতিবেশীর চোখ-রাঙানী আর [illegible] কানমলা খাবার ভয়ে যাদের মন জানলাজানলি করতে করতেই অর্দ্ধেক জীবন পেরিয়ে যায়। তা ছাড়া কলকাতায় প্রেম করবার জায়গা কই হে? বড়লোকের মেয়ে হলে তবু ড্রইংরুমে "হৃদয় আমার হারালো"—টারাগো গোছের দুই একটা গান শোনা যায়, আর ঐ লেকের অন্ধকারে কিংবা কফির টেবিলে? আরে ছোঃ। সেখানে আবার প্রেম জমে? ও কফির সাথেই ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়" হঠাৎ আলস্য ত্যাগ করে ব্রহ্মা চঞ্চল হয়ে ওঠেন।

বিষ্ণু সচকিতে নীচের দিকে তাকান বটে, কিন্তু মহাশূন্যে পশ্চিম-ইউরোপের আকাশে **Pan American Airways**এর [illegible] গোলমাল খুঁজে পান না।

"Idea টা মন্দ বাতলাওনি হে!" ব্রহ্মার চিন্তান্বিত স্বর কানে আসে—"কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে আমরা দুই বুড়ো তো কিছু করতে পারব না—কন্দর্পকে একবার খবর দেওয়া দরকার।"

"তা না হয় দিচ্ছি কিন্তু ব্যাপারটা বুঝলাম না তো?"

"Planeএর ভিতরে দৃষ্টি চালাও। সীট নং ২০ আর ২১,—কিছু মালুম হচ্ছে?"

"ও!"—এতক্ষণে বিষ্ণুর বোধগম্য হয়। "কিন্তু বাঙ্গালী বলে মনে হচ্ছে যেন"!

"হ্যাঁ—বাঙ্গালী-ই। ওদের আর যাই-ই দোষ থাকুক না কেন—মন বলে পদার্থ টা আছে। বেচারীদের দোষ, কি বলো? পরিবেশের চোটেই ওদের প্রেম ওষ্ঠাগত হয়। কিন্তু ওরকম অসীম মুক্তির প্রসারতার ভিতর প্রেমের experiment করতে গেলে বাঙ্গালী ছাড়া অন্য কোন জাতকে নিয়ে হাতের সুখ হবে না"—ব্রহ্মা যেন খানিকটা স্বগতোক্তিই করেন।

'কিন্তু পিতামহ'! বিষ্ণু একরকম আঁৎকেই ওঠেন—'কাজটা বিশেষ সুবিধার হবে বলে মনে হচ্ছে না। দু'জনকেই জানি। মেয়েটি ভা—রী লক্ষ্মী, দারু—ণ রকম ভালো। বাংলা দেশে এমন মেয়ে লাখে একটা মেলে, আহা হা। এমন মেয়েকে আপনি অমন ডাকাত ছেলের পাল্লায় ফেলবার মতলবে আছেন! সাংঘাতিক ছেলে! স্কুল-কলেজের দিনগুলোতে শুধু গুণ্ডামী—আর ভলিবল পিটিয়েই হাত পাকিয়েছে। আর বাকী দিনগুলি কাটিয়েছে Science Collegeএর ১ হাত/১½ হাত Loboratary র মধ্যে শিশি টিউব ভাঙ্গাভাঙ্গি করে। আর অত আশা করে বাঙ্গালীর মেয়ে বিদেশ পাড়ি দিচ্ছে লেখাপড়া শিখবে বলে—আপনি কি না এমন ভাবে তাতে বাদ সাধবেন! পিতামহ রসিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গেলো যে। তা ছাড়া দেখুন মেয়েটি যে ভাবে বাইরের দিকে মুখ করে বসে আছে তাতে মনেই হয় না, তার খেয়াল আছে যে পাশে একটা মনিষ্যি বসে আছে আর ছেলেটি যে ভাবে সতৃষ্ণনয়নে বার বার চটুল Air Hostessএর দিকে তাকাচ্ছে তাতে বোধ হচ্ছে ঐ বিদেশিনী মনকে দারুণ দুলিয়ে তুলেছে। অমন উন্মুখ চিত্তকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে আনা কি চাট্টিখানি কথা? সাধ্য কি কন্দর্পের? আর planeএর এই অপরিসর জায়গাকে কন্দর্পের পাদপীঠ করে তোলা কি সম্ভব? বসন্তের সমাবেশই বা কি করে হবে, এই ম্লেচ্ছ-পরিচালিত বিমান-পোতে?"

শুভ কার্য্যের প্রারম্ভেই ব্যাগড়া পড়াতে ব্রহ্মা মহা চটে ওঠেন—"থামো বাপু, মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ কোর না। বলি রবি ঠাকুরের কাব্যে পড়োনি কি—"পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কি সন্ন্যাসী, দিয়েছো তারে বিশ্বময় ছড়ায়ে"। তুমি কি ভাবছ plane এর অভ্যন্তর প্রেমের অবতারণার পক্ষে দারুণ dry? তা নয় হে! পঞ্চশরের ভস্ম সর্ব্বত্রই আছে—নাই বা রইলো মলয় বাতাসের দোলা কি কুহু-কেকার কলরব কিংবা তোমাদের আধুনিক কবিদের যত সব ছাই-ভস্ম—ভাখো না কেমন কাণ্ডটি ঘটিয়ে তুলি। মেয়েটি সত্যিই ভাল কিন্তু যন্ত্রটা যতো ভালই হোক না কেন, বিদ্যুৎশক্তি না থাকলে সে অনড়। **life force** চাইতো! আর ছেলেটির কথা যা বলছো—সে প্রেমে পড়লেই সব ঠিক হয়ে যাবে—জানোই তো মহাদেবের জটার ভিতর থেকে যখন জাহ্নবীর স্রোত নামলো তখন

তিনি হয়ে উঠলেন রসময়—সন্ন্যাসী ছিলেন আগে, তখনই হলেন শিব।

কথাগুলো যে বিষ্ণুর অন্তর কিছু স্পর্শ করতে পারলো তা ঠিক নয়—বিরস বদনে তিনি ভাবতে লাগলেন, প্রবোধ সান্যালের গোটা-কতক নভেল টভেল পড়ে নির্ঘাৎ পিতামহের রসাধিক্য ঘটেছে।

ব্রহ্মা হাঁক পাড়েন—"কই হে মদন, তুমি এদিকে এসো তো বাপু, দুটি ভালো দেখে বাণ বেছে নাও আর একটু কাছাকাছি থেকেই নিক্ষেপ কোরো—আবার দেখো, ভুল করে যেন ঐ ছেলেটি আর ঐ দিঙ্গী hostessকে তাগ করে বোসো না—অথবা ঐ মেয়েটি আর পিছনের চীনা সাহেবটি—তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের বিশ্বাস নেই, তোমরা সব পারো—ছোঁড়ো বাপু আমার চোখের সামনেই ছোঁড়ো"

কন্দর্প রীতিমতো অসন্তুষ্ট হলেন—"কী যে বলেন প্রভু, চশমাটা এবার আপনার বদলানো প্রয়োজন, দেখছেন না air hostessএর বাঁ হাতের মধ্যমিকায় plane bond অর্থাৎ বিয়ের আংটি আর চীনা সাহেবের পাশে জলজ্যান্ত তার আড়াই মণি বৌ বসে। ওদের কাউকে ভুল করে মেরে শেষ কালে পরের সম্পত্তি অপহরণের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে মোকদ্দমার দায়ে ধরা পড়ি আর কি? এত ভেবে-চিন্তে, দেখে-শুনে, বুঝে-টুঝে কাজ করি তবু তো পৃথিবীর দোষ দিতে ছাড়ে না—Cupid is blind বলতে বলতে শন্ শন্ শব্দে কন্দর্পের হস্তচ্যুত দু'টি তীর গিয়ে যথাস্থানে বিদ্ধ হয়।

ব্রহ্মা আরামের নিশ্বাস ছাড়েন—"যাক্ বহুদিন বাদে একটা কাজের মত কাজ হোল। বেঁচে থাকো তুমি চিরসবুজ কন্দর্প, তোমার সোনার তীর-ধনুক হোক। চলো হে বিষ্ণু, বাড়ী যাওয়া যাক্!"

"শেষটা না দেখেই যাবেন প্রভু?" বিষ্ণু নিবেদন করেন।

ব্রহ্মা তিন মুখে তিনটা বিরাট হাই তোলেন। তিনটি তুড়ির তিনটি চটচট্ আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য একটি ঐক্যতানের সৃষ্টি করে—"ওর আর কি দেখব? ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই plane মিউনিকের মাটি ছোঁবে। আমাদের যা করবার তা ত করলামই। বাকী যা হবে তা করবে এরাই। ভাবনার কিছু নেই। ইউরোপের আকাশে পোঁতা হ'ল বীজ, আমেরিকার জল-বাতাসে বর্দ্ধিত হবে তার অঙ্কুর—ভারতের মাটিতে লাভ করবে প্রতিষ্ঠা। ইউরোপ থেকে ব্যোম, আমেরিকার মরুৎ আর অপ, আর এশিয়ার ক্ষিতি—এই বিশ্বজনীন পঞ্চভূতকে আশ্রয় করে যে প্রেম সৃষ্টি. করলাম কি না, একেবারে খা—সা। নিজের কৃতিত্বে ব্রহ্মা নিজেই আত্মহারা, "চলো চলো এবার ওদের একলা থাকতে দাও। বিদেশে পাড়ি দিলেও লজ্জা-সরমের মাথা খায়নি তো"—ব্রহ্মা তার বাহন হংসকে স্মরণ করলেন।

বিষ্ণুও মেয়েটির খারাপ বরাতের কথা ভাবতে ভাবতে দুঃখিত অন্তঃকরণে বৈকুণ্ঠের দিকে যাত্রা সুরু করেন। আর দেরী করা ভাল নয়। লক্ষ্মীর আবার আজকাল যা মেজাজ হয়ে উঠেছে সত্যি কথা বললেই ঝাঁঝিয়ে উঠবেন—"যতো দরদ আজকাল দেখি কুমারী মেয়েদের জন্যই"—নাঃ অন্য একটা বাহানা খুঁজে বের করা দরকার এই দেবীর জন্য—তাই ভাবতে ভাবতেই পা চালান নারায়ণ। ভালো কথা, ঘটনাটা ঘটেছিল কবে? ঠিক পাঁচ বছর আগে ১৯৫০-এর সেপ্টেম্বরে। হ্যাঁ আজকের তারিখেই অর্থাৎ ৭ই। আজ আবার আরও এক শুভ-উৎসব। সেই যোগাযোগেই আজ তাদের মেয়ের জন্মদিন।

চিঠি

উমা মজুমদার

প্রবল বরষা নাহিক ভরসা সূর্য্যালোকের,—
সপ্তাহ যায়, মাস গত হয় ক্যালেণ্ডারের।
আসাম প্রদেশে ভীষণ প্রয়াসে হরষ ভরে,
শুধু একধারা পাগল-পারা বরিষ করে।
জলে জলময়, সকল সময়, সকল দিকে;
ভেক-কুল-দল হরষে চপল সদাই ডাকে!
ভেজা তরুলতা নাড়িয়া মাথা বিনয় ভরে,—
চকিত বাতাসে নুয়ে এক পাশে প্রণাম করে।
খাবার খুঁজিয়া জলেতে ভিজিয়া পাখীরা ঘুরে—
মাঝে মাঝে ডাকে আকাশের দিকে কাতর স্বরে।
মাসাবধি ধরে ঘরের ভিতরে বন্দী থাকি,
দার্শনিক-বৎ সকল জগৎ মিথ্যা দেখি।

দূরে আছ যারা, রমা আর মীরা, কল্‌কাতাতে—
তোমাদেরে স্মরি, এন্‌ভেলাপে মুড়ি, কাগজ পাতে;
বরষার কিছু পাঠায়েছি পিছু চিঠির সাথে।
চিঠি পড়া শেষে অতি অবশেষে নিশীথ রাতে।

বাতাসের বোলে বাদলের রোলে উঠিয়া জাগি—
ঘুম-ভাঙ্গা-রাতে, ভাবিবে চকিতে,—"সত্যি, একি!
চিঠির পাত্রে আজিকে রাত্রে পাঠাল দিদি,
বহু দূরান্তে আসাম হইতে বরষা নিধি।"



নীলিমা দাশগুপ্ত

সকাল সাড়ে দশটা। মোট-ঘাট বাঁধা-ছাঁদা সব শেষ। এক মাস পর কলকাতা থেকে আজ আবার ফিরে চলেছি দিল্লীতে। দো'তলার করিডোরের সামনে দাঁড়িয়ে টুকি-টাকি জিনিষ ভরছিলাম বেতের বাস্কেটে। হঠাৎ আমার ছোট দেবর সুধাবিন্দু হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটো-তিনটে সিঁড়ি টপকে-টপকে আমার সামনে এসে হাঁপাতে-হাঁপাতে বললে, "বৌদি, আজ দিল্লী যাওয়া বন্ধ কর। তোমার অম্বলের অসুখ আমি এক দিনে সারিয়ে দেব, ছোড়দা' ডাক্তার হোয়েও এক মাসে যা পারলে না, আমি পারবো তা এক দিনে"—সুধাবিন্দুর মুখে গাঢ় উত্তেজনার আভাস। আমি বেশ বিস্মিত হলাম। কণ্ঠস্বরেও তার প্রকাশ হলো সুস্পষ্ট, "সে কী বিন্দু? হলো কী? তোমাদের দর্শনশাস্ত্রে কী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের শাখা খুলেছে নাকি?"

সুধাবিন্দু আমার বিস্ময় গায়ে মাখলো না। সামনের মোড়াটা টেনে ধীরে-সুস্থে বসে বললে, "না বৌদি, ঠাট্টা নয়। সত্যি বলছি তুমি শুধু আর একটা দিন থাকো।"

উত্তরে বললুম, "না বিন্দু, থাকার আর কোনো মতে যো নেই। বার্থ রিজার্ভ হ'য়ে গেছে।"

"আহা, তার জন্য ব্যস্ত হচ্ছো কেন বৌদি! আজ টিকিট ক্যান্সেল করে আবার কালকের বার্থ রিজার্ভের ভার আমিই নিলুম"।

উত্তরোত্তর বিস্মিত হচ্ছিলাম আমি। "ব্যাপারখানা কী খুলে বলো তো বিন্দু?" কণ্ঠস্বরে ঔৎসুক্য। সুধাবিন্দু সিগারেট ধরিয়ে লম্বা করে টান দিলে একটা। সামান্য একটু ইতস্ততঃ করে বললে, "বৌদি, তোমার দেব-দ্বিজে ভক্তি কেমন?"

"হঠাৎ এত বড় শক্ত প্রশ্ন?"

"না, মানে—আজ এক জন স্বামীজির খবর পেলুম কি না—মহারাজ স্মরণানন্দ ঠাকুর। আমাদের স্কুল-কলেজের ফার্ষ্ট বয় নিখিলের গল্প করেছি না তোমার কাছে? হঠাৎ তার সঙ্গে আজ দেখা, জগুবাবুর বাজারের মোড়ে। কুলির মাথায় ক'রে এক ঝুড়ি চন্দ্রমল্লিকা নিয়ে যাচ্ছে। ফুলের কথায় মহারাজের কথা উঠলো। এক ঘণ্টারও ওপর ফুটপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মহারাজের অত্যাশ্চর্য্য অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনলুম নিখিলের কাছে, আমি একবারে অভিভূত। ইচ্ছে করলে উনি সব কিছু পারেন, সমস্ত অসুখ সারাতে পারেন, মেটাতে পারেন সমস্ত রকম গোলমাল ঝঞ্ঝাট। তা ছাড়া, শুনলুম, অম্বলের ওষুধটা উনি একেবারে স্বপ্নে পেয়েছেন। নিখিলের মায়েরই মারাত্মক রকম অম্বলের অসুখ ছিলো, ঠাকুরের ওষুধ খেয়ে সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে গেছেন।"

কৌতূহল জাগ্রত হলো। প্রশ্ন করলাম, "আচ্ছা, স্বপ্নে-পাওয়া ওষুধটা ঠিক কী বলো তো বিন্দু? ঘুমের মধ্যে দেবতা হাতে ওষুধ দিয়ে যান?"

"হ্যাঁ। সে রকমও অনেকে পেয়েছেন বলে শুনেছি, তবে ওঁরটা কিছু অন্য রকম। উনি থাকেন বিবেক-নগরে। দমদমের ওদিকে"। তারপর একটু থেমে বিন্দু বলে, "তাহলে নিখিলের মুখ থেকে শোনা হিষ্ট্রীটা শুনেই ফেল, বৌদি! পনেরো-ষোলো বছর আগে ওখানে ছিলো নিবিড় জঙ্গল, হালে উপনগর হ'য়ে নাম হ'য়েছে বিবেক-নগর। জঙ্গলের এক প্রান্তে ছোট টিনের ঘরে মহারাজ তখন বাস করতেন, সে সময় অম্বলের অসুখে উনি নিজেই ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছিলেন, একদা, মধ্যরাত্রে স্বপ্ন দেখলেন—শিয়রে দাঁড়িয়ে দেবাদিদেব মহাদেব বলছেন, 'বৎস! তোমার আরাধনায় আমি তৃপ্ত। মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শ্রবণ করো—আজ মাহেন্দ্র ক্ষণে, এ বাড়ির ঈশান কোণ উদ্দেশ্য ক'রে তুমি চলতে থাকবে সামনের দিকে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তেবটের কাছে গিয়ে পৌঁছুচ্ছো। তেবটের কাছে পৌঁছুতে সময় লাগবে প্রচুর। কিন্তু, অধৈর্য্য হয়ো না বৎস! মনে অটুট বিশ্বাস রেখো। ঘন নিবিড় জঙ্গল, আগাছা, কাঁটাঝোপ, এবড়ো-খেবড়ো গর্ত, উঁচু-উঁচু ঢিবি সব অগ্রাহ্য ক'রে শুধু চলতেই থাকবে। ঝোপড়া তেবটের মাঝখানে বিরাট ফণা বিস্তার করে আছে স্থির অকম্পিত এক গোখরো। অর্দ্ধচন্দ্রের রূপ নিয়ে তার মাথায় লুকিয়ে আছে দিব্যজ্যোতি। সেই আলোই পথ দেখাবে তোমায়। দেখবে, গোখরোর মুখে একটি সবৃন্ত ধুতরো ফুল। তুমি নির্ভয়ে নতজানু হ'য়ে হাত বাড়াবে মুখের সামনে। ফুলটি হাতে পাওয়া মাত্রই পেছন ফিরে ধরবে বাড়ির পথ। ভ্রমেও আর সামনে তাকাবে না। দিবা অবসানে, একটি উত্তম আধারে জল দিয়ে ভিজিয়ে দেবে ঐ ফুলটি। প্রত্যূষে উঠেই দেখবে, ফুলটির তলায় ঠিক ঐ একই আকারের আর একটি সবৃন্ত ধুতরো ফুল বিরাজমান! ওপরের ধুতরোটি হাতে তুলে নিয়ে, নিত্য আমার পূজো অন্তে পূজোর ফুল বেলপাতা যে স্থানে নিক্ষেপ করো, সেইখানে ফেলবে। তাচ্ছিল্যের সঙ্গে নয়। পরম ভক্তি ভরে। যেন—দেবাদিদেবের পায়ে বিল্বপত্র অঞ্জলি দিচ্ছো। দ্বিতীয় ফুলটি তুলে রেখে ঐ জল এক গণ্ডূষ পান করলেই সম্পূর্ণ নিরাময় হবে তোমার ব্যাধি। আধার শূন্য হ'লেই আবার পূর্ব্ব নিয়ম মতো ধুতরোটি ভিজিয়ে দেবে। একই ফল দর্শাবে। আগামী পরশু থেকেই তুমি ওষুধ বিতরণ শুরু করবে আমার নাম নিয়ে। এর অন্যথা না হয়।'—এই ব'লে অদৃশ্য হ'লেন দেবাদিদেব। তারপর সেই ওষুধের গুণে ওঁর নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেলো। আরো কয়েক বছর শিব আরাধনার পর উনি অদ্ভূত ঐশ্বরিক ক্ষমতা অর্জ্জন করলেন। শুধু সমস্ত রকম ব্যাধি আরোগ্যই নয়, সব কিছু গোলমাল উনি যে কোনো মুহূর্ত্তে থামিয়ে দিতে পারেন।"

সুধাবিন্দুর কথা থামলে আমি রহস্য-ঘন কণ্ঠে বললাম, "সুধা! আজ কি কালো কুল্‌পি খেয়েছো?" আহত হ'লো সুধাবিন্দু।


সবাই
জানেন —
বাজারে
ব্রুক বণ্ড
চায়েরই কাটতি
সব চেয়ে বেশী
লোকে রোজ
সাড়ে পাঁচ কোটিরও
বেশী কাপ
ব্রুক বণ্ড চা
খেয়ে থাকেন
চট্‌পট সরবরাহ
করা হয় বলে
ব্রুক বণ্ড চা
একেবারে তাজা থাকে
Brooke Bond Tea
Brooke Bond
Leaf Tea
এই জন্যেই
অন্য যে কোন
মার্কা চায়ের চেয়ে
ব্রুক বণ্ড
চা
বেশী লোকে খান !

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললে, "তোমরা মেয়েরা দেব-দ্বিজের ওপর অখণ্ড বিশ্বাস নিয়ে জন্মাও বলেই আমার ধারণা ছিলো বৌদি !"

আমার আবার দেব-দ্বিজে বিশ্বাস নিতান্তই কম, একেবারে নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না। সমস্ত বিশ্বাস কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে একই যায়গায়—তা আমার নিজের ওপর। মেয়েদের পক্ষে এ ধরণের মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু, আমার স্বামী কোনো দিন এ নিয়ে কোনো অনুযোগ করেন নি বরং সমর্থনই করেছেন। অথচ, নিজে তিনি বিলাত ফেরং হয়েও দপ্তরে যাওয়ার আগে ব্রেকফাষ্টে কলা এবং ডিম খান না। ওগুলো নাকি অযাত্রা এবং দেব-দ্বিজে ভক্তি অটুট। কিন্তু, তবু সুধাবিন্দুর চোখে-মুখে এমন এক নোতুন ধরণের আলোর আভা দেখলাম, অবিশ্বাস তখনকার মতো সম্পূর্ণ ডুব মারলো, সুধাবিন্দুর দিকে তাকিয়ে হেসে বললাম, "কী যে তোমার পাগলামি বিন্দু ! তা, খেয়াল যখন চেপেছে, চল ! আমার অম্বল যদি সত্যি সারে, তাহলে মহারাজ-ভক্তিতে কি আপত্তি ? এখন তো বেলা সবে এগারোটা, তুমি যদি এখুনি নিয়ে যাও আমাকে, তাহলে আমি মহারাজের সঙ্গে দেখা করে ছুটোর মধ্যেই ওষুধ নিয়ে ফিরে আসতে পারি। আজকে দিল্লী মেইল ধরার কোনই অসুবিধে হবে না তাহলে, চাপরাশী হংসরাজের কাছে শুনলে তো দিল্লীর সংসারের অবস্থা ! বয়-বাবুর্চি এন্তার মনের সুখে চুরি করছে—আর হংসরাজও মাত্র তিন দিনের ছুটিতে নিতে এসেছে আমাকে।"

সুধাবিন্দু স্মিতমুখে বললে, "নিয়ে যেতে আমার কোনই আপত্তি নেই বৌদি, কিন্তু, এখন মহারাজ কারোর সঙ্গে কোনো কারণেই দেখা করেন না। শুধু বিকেল পাঁচটা থেকে সাতটা। অনেকে সকালে দেখা করার অনেক চেষ্টা ক'রে বিফল হ'য়ে ফিরে এসেছেন, এ কথা নিখিল বারে বারে বলে দিয়েছে আমাকে।"

সেই দুর্জয় আত্মবিশ্বাস ভুরু কোঁচকালো। বললাম, "বিন্দু, নিয়ে তো চলো, সাক্ষাতের সুযোগ আমি নিজেই করে নিতে পারবো।" সুধাবিন্দু রাজি হ'য়ে গাড়ি বার করতে নিচে নেমে গেল।

গাড়ি চললো। সারা রাস্তা বাবার অলৌকিক ক্ষমতার নমুনা ছড়াতে ছড়াতে এলো সুধাবিন্দু, আমিও প্রায় অভিভূত, তবু, পাজি অবিশ্বাসটা মাথা উঁচু করতে চায় মাঝে মাঝে। মনকে চোখ রাঙাই, বারে বারে মনে মনে আওড়াই,' দেয়ার আর মোর থিংস্…। মনের মেরুদণ্ড প্রাণপণে খাড়া রাখতে চেষ্টা করি।

বেশ কিছুটা দূর থেকেই আশ্রমের প্রাচীর দৃষ্টিগোচর হলো। আশ্রমের চারি দিকে সুরক্ষিত উঁচু প্রাচীর, বেলা বেড়েছে, ঝক্‌ঝকে সুদৃশ্য আশ্রমটি ঝলমল করছে সূর্যের আলোতে। গাড়ি থামলো গেটের কাছে। নামতে আপত্তি জানালে সুধাবিন্দু, আমি সহাস্যে বললাম, "তোমায় নামতে হবে না, তুমি গাড়িতেই থাকো, কিন্তু, আশ্রমের দোতলায় শাড়ি ঝুলতে দেখছি কেন বিন্দু ?"

সুধাবিন্দু বললে, "ওহো ! তোমাকে বুঝি বলা হয় নি বৌদি, উনি গৃহস্থ-সন্ন্যাসী। উনি বলেন ভগবানকে পেতে হ'লে তোমাকে যে সংসার ত্যাগ করে বনে যেতে হবে এর—" বাধা দিয়ে বললাম, "থাক্ বিন্দু, এর থেকে কী কী কথার এবং কত কথার সৃষ্টি হতে পারে তা আমি জানি। তবু, গৃহস্থ-সন্ন্যাসী শুনে আমার সোনার পাথরবাটির কথা মনে পড়লো।"

সুধাবিন্দু বিজ্ঞ দার্শনিক ভঙ্গি করে বললে, "নিখাদ ভক্তি নিয়ে না গেলে কিন্তু ফল মিলবে না বৌদি—"

"আচ্ছা গো আচ্ছা—" গাড়ি থেকে নেমে ক্ষিপ্র পায়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকলুম, গেটের সামনে পেলাম না কাউকে। গতিতে ঢিল দিয়ে এদিক-ওদিকে তাকাতে তাকাতে পায়ে পায়ে চললাম এগিয়ে। আশ্রমের চারি পাশে নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা আর পাতাবাহারের গাছ, মাঝখানটায় কোনো গাছগাছালি নেই, শুধু সবুজ ঘাসের গালিচা, ভ্রমরকুল পরস্পরকে তাড়া দিয়ে চন্দ্রমল্লিকার ফুলে ফুলে ছুটোছুটি লাগিয়েছে। ফুলের দিকে একটু তাকিয়ে ছিলুম, মুহূর্তের জন্য দিল্লীর বাড়ির বাগানখানা চোখের সামনে ভেসে উঠলো। আর তার মাঝখানে—

আশ্রমের সামনে প্রশস্ত টানা-বারান্দা, বারান্দায় উঠে বন্ধ দরজায় মৃদু-মৃদু টোকা দিলাম, দোর খুললো না, দেরি করা চলে না আমার। জোরে ধাক্কা দিলাম, দড়াম্ করে হুড়কো খুলে কপাটের পাল্লা মেলে ধরলো একটি দীর্ঘাকৃতি ঝুঁটি-বাঁধা উড়িয়া-নিবাসী, এতই লম্বা আর এতই কালো যে, দিনের আলোয় না দেখলে আঁতকে উঠতাম, কুতকুতে চোখ গোল গোল করে, বাঙলা-উড়িয়ার জগাখিচুড়ি করে বললে, "আপুনি কেনে আসুছন্তি ! এখুন বাবা দেখা দিবে নি বটে—"

"তুই থাম ব্যাটা—" প্রচণ্ড ধমক দিয়ে এক রকম জোর করেই ঘরে ঢুকলাম, হকচকিয়ে গেছে উড়িয়া-নিবাসী, "হেই মা, এখুন দেখা হবে নি, তুমি চালি যাও, গোঁসা করিবি বাবা"—নরম গলায় বললাম, "বেশি দেরী করবো না বাপু, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই চলে যাব, তুমি বাবাকে খবর দাও।"

"বাবা তো চান করুছন্তি ! এক ঘণ্টা লাগিবে পারা"—

ভুরু কুঁচকে বললাম, "তাহলে শীগগির মাকে খবর দাও—"

"কোন মা ?" ধবধবে সাদা দাঁত বার করলে বিচলিত উড়িয়া-নিবাসী ! আমি তো অবাক। "কোন মা মানে ? ক'জন মা এখানে আছেন ?"

"এজ্ঞে, পাঁচ মা আছন্তি"—

আমি বিস্ময় চেপে রেখে সহজ গলায় বললাম, "যে কোনো এক জন মাকে ডাকো।" উড়িয়া-নিবাসী প্রায় ছুটে চলে গেলো।

ঘরটার দিকে তাকালাম একটু। বেশ বড় হলঘর, জানলা-কপাটে রেশমি গেরুয়া পর্দা, নানা রঙের বহু চন্দ্রমল্লিকা দিয়ে সাজানো ঘরখানা। মনে হয়, আজ কোনো বিশেষ কিছুর আয়োজন চলছে আশ্রমে। ঘরের দক্ষিণ দিকে উঁচু একখানি বেদি। বেদির পাশে ঝকঝকে পিলসুজের ওপর সলতে এবং ঘি দিয়ে সাজানো ঘৃত-প্রদীপ। তার পাশে ধুনুচি, বেদির পেছনের দেয়ালে খুব বড় আকারের মহাদেবের তৈলচিত্র একখানা। ছবির তলায় বড় বড় ক'রে লেখা শিবশঙ্কর। বাকি তিন দেয়ালে শুধু মহারাজার ফটো। অনেকও বটে, বিচিত্রও বটে, সব ছবির অর্থ ঠিক মতো বোঝা যায় না, তেবটের তলায় গোখরো সাপের মুখে ধুতুরো-ফুলের ছবিখানাই শুধু আমার বোধগম্য হলো। ভেতরে দ্রুত পায়ের খস্‌খস্ শব্দ, তার পর মৃদু তিরস্কারের গুঞ্জন,…"তুমি করেছো কী নব ? এ সময়ে

কেন আসতে দিলে ভেতরে? আমরা কী কারো সামনে বার হই।"...

..."হেই বকুল মা, তুমর দয়া আছে, তুমর পায়ে পড়ছি।" তুমি একটি বার যাও। আমার কথা মানলানি মা। বাবা মোকে খেয়ে ফেলিবি।"

আমি হতভম্ব। পায়ের শব্দ ক্রমশঃ স্পষ্ট হলো; তিনি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন। একটি তন্বী গৈরিক-বসনা। কী অদ্ভুত আশ্চর্য্য রূপ! কী অপরূপ লাবণ্যময়ী! অবাক-বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। গৈরিক-বসনার কথায় চমক ভাঙে। "আপনি এখন ফিরে যান, পাঁচটার সময় আসবেন। ঠাকুর এখন দেখা দেবেন না।"

আহা! কী মিঠে কণ্ঠস্বর! নিজের প্রয়োজন ভুলে গেলাম। ঠাকুরের কথা ভুললাম। মুখ তুলে সুন্দর চোখ-জোড়ার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি আশ্রমের মা?"

"হাঁ, বকুল-মা—" উত্তর দ্বিধা-জড়িত।

"আপনি কি মহারাজের সহধর্ম্মিণী?" ফস্ করে প্রশ্নটা বেরিয়ে গেলো মুখ দিয়ে।

জিভ কাটলেন বকুল-মা। যেন কথাটা শুনেই উনি মস্ত অপরাধ করে ফেলেছেন। এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললেন, "সহধর্ম্মিণী শুধু বড়-মা। বহু জন্মের তপস্যালব্ধ ফলে তিনি ঠাকুরের গলায় মালা দিতে পেরেছেন, আমরা মালা দিয়েছি পায়ে—"

"পায়ে...?" আমার কণ্ঠ চিরে সুস্পষ্ট বিস্মিত স্বর বার হ'ল। বকুল-মা সরল চোখে চুপ করে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন, আমি আরো ভাল ক'রে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম বকুল-মাকে। অত যে আগুনের মতো সৌন্দর্য্য, অত যে নিষ্পাপ ফুলের মতো মুখের আকৃতি, কিন্তু আয়ত কাল চোখের সৌন্দর্য্য একেবারে ম্লান। চোখের দৃষ্টিতে একটা অসহায় বিহ্বলতা, আয়ত চোখের পল্লব দু'টি যেন কিসের ভারে ভারী হ'য়ে আছে। তবু কী সুন্দর! লম্বা সোনার চাঁপার মতো আঙ্গুলগুলিতে হলুদের দাগ। বোধ হয় রান্না করছিলেন, বকুল-মার চাউনিতে আর একটা জিনিষ আবিষ্কার করলাম যে, বকুল-মা, নিতান্তই সরলা এক জন গ্রাম্য কিশোরী, তাই বুঝি আবার ঐ প্রশ্ন করতে মুখে বাধলো না, "পায়ে মালা দিয়ে কি কি অঙ্গীকার আপনাদের করতে হয়?" প্রশ্ন ক'রে আগ্রহী দু'টো চোখ মেলে তাকিয়ে রইলাম আমি।

চুপ করে কত কী যেন ভাবতে লাগলেন বকুল-মা। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। মনে হ'ল, চোখের দৃষ্টি যেন কিছু হাতড়ে বেড়াচ্ছে। কয়েক মুহূর্ত পর আবিল দৃষ্টিতে তাকালেন আমার দিকে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা গলায় জবাব দিলেন, "মালা দেওয়ার পর আশ্রমবাসীদের সামনে ঠাকুর আমার হাতে লোহা পরিয়ে দিলেন আর সীঁথিতে টেনে দিলেন ওঁর মন্ত্রপূত সিঁদুর। প্রতিজ্ঞা আমাদের একটি মাত্রই করতে হয়—তনু-মন-প্রাণ দিয়ে আমরণ সেবা করে যাব ঠাকুরের—"

"সর্ব্বনাশ! বাকী আর তবে রইলো কী?" মনে মনে শিউরে উঠি আমি, "এ যে দেখছি মডার্ণ রাক্ষস বিবাহ।"

বকুল-মা কথা বলার সময় বাঁ হাত দিয়ে বারে বারে মুখ চেপে ধরছিলেন, আমি ভাবলাম—ওটা বোধ হয় ওঁর মুদ্রাদোষ। একটু নিস্তব্ধতা। বকুল-মা ছোট্ট করে একটু কাসলেন, বুঝলাম, কাসিটা আমাকে চলে যেতে বলার সিগন্যাল। কিন্তু, কৌতূহল উগ্র হ'লে ভদ্রতার মাত্রারও বুঝি ঠিক থাকে না। একটা অবান্তর অভদ্র প্রশ্ন করে বললাম, "আপনাদের ছেলে-পুলে হ'য়েছে?"

"হ্যাঁ—না, মানে, আর সকলেরই হ'য়েছে, তবে স্বামীজির সন্তানের জননী হওয়ার সৌভাগ্য আমার এখনও হয় নি। অত্যন্ত কড়া কি না বড়-মার হুকুম, তাঁর অনুমতি ছাড়া—" থেমে গেলেন বকুল-মা, তার পর ক্ষীণ করুণ হাসলেন একটু, "তবে পূর্ণিমা, অমাবস্যা এবং একাদশীর জো'তে বাতে বড্ড কষ্ট পান বড়-মা। দু'তিন দিন নাগাড়ে থাকে সে কষ্ট। তখন—তখন ঠাকুর স্বাধীন"!

"বাত...? বাতে কষ্ট পান"? হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠে নিজেই আমি নিজের কাছে লজ্জিত হ'য়ে পড়লুম। কিন্তু বকুল-মা তখন বহু দূরে। সামনে থেকেও অনেক দূরে চলে গেছেন তিনি। ফেলে-আসা জীবনের কয়েকটি স্মৃতিরেখা বুঝি জীবন্ত হ'য়ে উঠলো বকুল-মা'র চোখে-মুখে। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে শুধু ভাবতে লাগলাম: এঁদের জীবনের কী বিচিত্র পরিণাম! এই যে চারটি মেয়ে, সব কিছু ফেলে, সব কিছু ছেড়ে স্বামীজির পায়ে মালা দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন, এঁদের আনন্দের উৎস কী? কোথায়? এঁরা কী মোহাবিষ্টা? এঁরা কী জীবন্মুক্তা? নাকি মনের গভীরে মিলেছে কোনো অপার্থিব আনন্দের অস্পষ্ট নিশানা? দেয়াল, ঘর, ছবি, বকুল-মা সব যেন আবছা আবছা হ'য়ে গেলো আমার চোখের সামনে থেকে। দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো বকুল-মার কণ্ঠস্বরে।

"···হ্যাঁ বাত। আজ পূর্ণিমা, আজও কষ্ট পাচ্ছেন"। কত দূর থেকে যেন কথা ক'টি বললেন বকুল-মা।

আমি ওঁর সহজ ভাব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টায় বললাম, "আজ আপনাদের আশ্রমে বুঝি উৎসব? পূর্ণিমা উপলক্ষে?"

"হ্যাঁ। শুধু পূর্ণিমা তিথির উৎসবই নয়, আজ এক জন নবীনা ঠাকুরের প্রসাদী মালা দেবেন"। ভেতরে ভেতরে আর এক বার কেঁপে উঠলাম আমি। ঘরের ভেতর বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া যেন আসছে। আমার কাঁপুনি শুরু হ'য়ে গেলো। মনের ভেতর থেকে কে যেন চুপি চুপি বলতে লাগলো, যুঁথি—জাতি—মল্লিকা—বকুল পায়ে দলেও আশ মেটেনি ঠাকুরের। এবার বুঝি শিউলি ঝরানোর পালা এলো! হঠাৎ একটু বেশি মাত্রায় বিব্রত হ'য়ে পড়লেন বকুল-মা। চকিত হ'য়ে বললেন, "আপনি এখন তাহলে আসুন—আমার ঠাকুরভোগের রান্না বাকি আছে"। এক পা গিয়েই ঘুরে দাঁড়ালেন। দরজার ফাঁক দিয়ে আধখোলা গেটের সামনে আমাদের গাড়িখানার দিকে তাকালেন একটু, "ওটা আপনাদের গাড়ি?"

"হ্যাঁ"। বোধ করি খুবই আনমনা হ'য়ে পড়েছিলেন বকুল-মা।

'হু—উক্, হুউ—ক্' করে দু'বার ঢেকুর তুলে ফেললেন সশব্দে। তাড়াতাড়ি বাঁ হাত তুলে মুখে চাপা দিলেন। আমার অন্তর চমকানির খবর একমাত্র জানলেন অন্তর্যামী! তবু কম্পমান ঠোঁট উচ্চারণ করে বসলো, "আপনারও অম্বল?" বকুল-মা উত্তর দিতে গিয়ে পারলেন না। শুধু ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ—জানালেন। ঘুলঘুলি দিয়ে সূর্যের আলো তেরছা হ'য়ে পড়েছে বকুলমা'র মুখে। কপোলের অশ্রুধারা দু'টি চিক্-চিক্ করে উঠলো সেই আলোতে। আমি ক্ষিপ্র পায়ে দরজা পর্যন্ত এগিয়েছি। "শুনু—ন!" আবার নিজের যায়গায় ফিরে এলাম। "পঞ্চাননতলা লেন চেনেন?"

"না" বলতেই হলো আমাকে। চেনা তো দূরের কথা, ও রাস্তার নামই আমি শুনি নি। বকুল-মা একটু হতাশ হ'য়ে বললেন, "ঢাকুরিয়া চেনেন নিশ্চয়ই?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চিনি। কত দিন গিয়েছি সেখানে"—

দেখলাম, দুরন্ত আবেগী ইচ্ছার ছায়া ফুটে উঠলো বকুলমা'র টলটলে কালো দীঘল চোখ দু'টিতে। কাঁপা কাঁপা হাত দু'খানি বাড়িয়ে আমার হাত ধরতে গিয়ে পিছিয়ে গেলেন। হাতে হলুদের দাগ। অবরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,···"একবার যাবেন সেখানে? যাবেন একটি বার? সেখানে আমার সব আছে। পঞ্চান্নর একের এ বাই—এ"

অদূরে কাষ্ঠপাদুকার শব্দ হলো। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে কে যেন প্রশ্ন করলেন, "হবাঘরে কে রে নব?" নিমেষে পাশ দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বকুল-মা। আমি বাইরের দরজার কাছে পৌঁছুবার আগেই রূঢ় কঠিন কণ্ঠে ধ্বনিত হলো, "ভদ্রে, কোন্ প্রয়োজনে এসেছেন জানতে ইচ্ছে করি?" ঘুরে দাঁড়ালাম। ঠাকুর এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে। অত্যন্ত বেশি কাছে। নাতিদীর্ঘ নাতিপুষ্ট নধর দেহ। ফোটোয় দেখে ঠিক ধারণা হয় না। ধবধবে ফর্সা রং। মুখ একেবারে গোল। চোখ দু'টি বড় এবং আরক্ত, নজর ধারালো—তাতে বন্য উজ্জ্বলতার আভাস। নাকের তীক্ষ্ণতা প্রথমেই চোখে পড়ে। তারপর চোখে পড়লো কপালের আর নাকের চন্দন-তিলকের কারুকলা। দাড়ি-গোঁফ-মাথা সব কামানো, বয়সে প্রৌঢ়, মূল্যবান রেশমি গেরুয়া পরনে, মোটা গোড়ের চন্দ্রমল্লিকার মালা গলায়।

আমি আমার প্রয়োজন বলতে চেষ্টা করলুম, ঠোঁট নড়লো কয়েক বার কিন্তু কণ্ঠস্বর রুদ্ধ, শক্ত ডেলা মতন কি যেন একটা গলায় আটকে গেছে। ঠাকুরের চোখের দীপ্তি ক্রমশঃ যেন অস্বাভাবিক হ'য়ে উঠলো। মুখে কালবৈশাখীর ভীষণ আয়োজন। স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন মহারাজ স্মরণানন্দ। আমার মনে হলো চুম্বকের মতো প্রবল বেগে আমাকে কে যেন সামনে দিকে আকর্ষণ করছে। একেই কী বলে অলৌকিক ক্ষমতা? কোথায় কোন অলক্ষ্য স্থান হ'তে একটা অচেনা ভীতি দ্রুত আমার সারা দেহ-মন আচ্ছন্ন করে ফেললো। পা যেন পাথর। মুখ যেন বন্ধ হ'য়ে বোবা হ'য়ে গিয়েছে। তবে কী আমি চেতনা হারিয়ে ফেলবো? তবে কী আমিও—? আমার দৃঢ় আত্মবিশ্বাস তবে আমায় কী দিলো?—কয়েক মুহূর্ত পর আমার কণ্ঠ বিদীর্ণ করে হঠাৎ বিদ্যুৎ বিস্ফোরণের মতো একটা অমানবিক স্বর ফেটে পড়লো। তারপরই ছুট দিলাম রুদ্ধ শ্বাসে। "বিন্দু, বিন্দু! গাড়ি চালাও শীগগির—শীগগির গাড়ি চালাও—"ঝপ করে বসে পড়ে দেহ এলিয়ে দিলাম গাড়ির পেছনে। বিন্দুর কোনো প্রশ্নের কোনো উত্তর তখন আমি দিতে পারি নি। একটা গোখরো সাপ ফণা উঁচিয়ে হেলে দুলে আমার সামনে এগিয়ে আসছে। কী অদ্ভুত সম্মোহনী তার দৃষ্টি! সভয়ে হাত দুটো তুলে জোরে চোখ দু'টো চেপে ধরলুম।

এ কী? গাড়ির চাকায় চাকায় কা'র যেন আর্তনাদ হচ্ছে! বিন্দুও শেষে এ্যাক্সিডেণ্ট করলো! কা'র প্রাণ নিলে না জানি! অকালে অসময়ে হয়তো ফুল ফুটবার আগেই, দুমড়ে-মুচড়ে পিষে দিলো সুন্দর কোমল কোরকখানি। না—। ঐ তো—এখনও শোনা যাচ্ছে সকরুণ অসহায় কণ্ঠস্বর!

"এক বার যাবেন সেখানে? যাবেন একটি বার? সেখানে আমার সব আছে—পঞ্চান্নর একের এ বাই—"

তার পর থেতলে গেলো সব

প্রতীক্ষার শেষে

অশোক ভট্টাচার্য্য

ঐশ্বর্য্যের আশায় চেয়েছি কখন কবে
সে তো মনে নেই, মনে আছে শুধু পথের বাঁকে
একদা যখন তোমার সঙ্গে আমার দেখা
তুমি বলেছিলে, 'স্থির থেকো তুমি প্রতীক্ষাতে।'
তার পর কত দিন গেছে কত কেটেছে রাত
কত শুকতারা জ্বলেছে আকাশে নেবার আগে
স্মরণের দীপ জ্বেলে দিতে শুধু আমার মনে।
বুঝি তাই আজো নির্জনে ভাবি তোমাকে পাবো।
জানি না জানি না সে আশা আমার মিটবে কিনা
জানি না তোমার হৃদয়ে আমার কতটা দাম—
শুধু এই জানি স্বপ্নলোকের প্রেয়সী তুমি
আশা দিয়েছিলে, ভাষা দাওনি কো ভালোবাসার।


শোভা সেন
সর্ব্বদা ব্যবহার করে থাকেন
লাক্স
টয়লেট
সাবান
"একমাত্র বিশুদ্ধ সাবানই
এত শুভ্র হতে পারে"
তিনি বলে থাকেন
লাক্স টয়লেট সাবান বিশুদ্ধ। এই সাবানটীর দুধের মত শুভ্রতাই আপাত দৃষ্টিতে এর বিশুদ্ধতার পরিচায়ক। এই শুভ্র বিশুদ্ধ সাবানটী নিজে পরীক্ষা করে দেখুন। অল্প সময়ের মধ্যেই আপনি দেখবেন সরের মত মোলায়েম, সুগন্ধী এই ফেণা কি ভাবে আপনার ত্বকের যত্ন নেয়··· কি ভাবে ত্বককে সুন্দর করে তোলে! সর্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্যের জন্যে এবং খরচ সাশ্রয়ের জন্যে বড় সাইজের সাবান ব্যবহার করুন।
LUX
TOILET SOAP
AP



নিখোঁজ সম্পত্তির অফিস

বোরিস প্রিভ্যালভ

—আমি তো বুঝতেই পারি না যে, নিজেদের অন্যমনস্কতায় মসগুল হয়ে লোকে কি করে এ ভাবে পথ চলাফেরা করতে পারে !

—ব্যাপারটা অসুবিধা জনক ঠিকই। তবে···বুঝতেই তো পারছ, ওটা হোল গিয়ে মানুষের একটা স্বাভাবিক দুর্বলতা। আর তাছাড়া ব্যাপারটা আমাদের চরিত্রের একটা মিষ্টি দিক নয় কি ?

—এর মধ্যে মিষ্টতা কোথায় পেলে হে ? এ বিষয়ে আমার দৃষ্টিভঙ্গী কিন্তু উল্টো রকমের। তুমি যদি তোমার জিনিষপত্তর সহরময় ছড়িয়ে না বেড়াও, তাহলে অনেক লোককে তুমি অনেক কিছু ঝামেলা পোহানোর হাত থেকে বাঁচাতে পার—এই হোল আমার নীতি।

দুটো ষ্টপেজের মাঝামাঝি জায়গায় একটা 'অতিরিক্ত ষ্টপেজে' গিয়ে বাস যখন আবার এগিয়ে চলল, আমি তখন আমার বন্ধুকে ঐ কথাগুলোই বলছিলাম। একটা 'অতিরিক্ত ষ্টপেজ' কেন জিজ্ঞেস করছেন ? ঘটনাটি ঘটল একটি তরুণীর জন্য। উঠলেন দুটো বাণ্ডিল নিয়ে, নামলেন কেবল একটি নিয়ে। একেবারে যেন একটি খুকি—এই প্রথম ইস্কুলে চলেছেন। কে একজন সিটের ওপর বাণ্ডলটা দেখতে পেলেন। গাড়ী থামল। এবং তরুণীকে ডেকে বাণ্ডলটি ফিরিয়ে দেওয়া হোল। আর কমপক্ষে ঐ পনের জন যাত্রী ঘটনাটা নিয়ে বেশ একটু জমিয়ে তোলার মত খোরাক পেয়ে গেলেন। আমি তাই আমার বন্ধুকে বলছিলাম "ভাগ্যিস অন্যমনস্ক তরুণী এখানে এই একজনই ছিলেন। আরও তো থাকতে পারতেন। এরকম ডজন খানেক থাকলেই হয়েছিল আর কি! গন্তব্যস্থলে গিয়ে কোন দিন আর আমাদের পৌছতে হোত না।"

বন্ধুবর জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার আজ হয়েছে কি বল ত ? মানুষের এই সামান্য দুর্বলতাটুকু নিয়ে এতখানি সোরগোল তোলার কি আছে ? আমাদের কি কখনও কিছু হারায় না এবং আমরা কি সে সব জিনিস আবার খুঁজে পাই না ?"

দশ মিনিট ধরে তিনি বকর বকর করে চললেন। বুদ্ধির এক এক টুকরো রত্ন তাঁর কণ্ঠ থেকে উৎসারিত হতে লাগল। এই রত্নরাজির কয়েকটি নমুনা দেখুন : "কখন যে তুমি কি হারাচ্ছ, অথবা কি পেয়ে যাচ্ছ, তা তো তুমি জানতেই পারবে না।···এক সময় না এক সময় আমরা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু হারিয়ে থাকি।" কিন্তু হলে কি হবে ? এতে করে তো আমাদের একটা অভিজ্ঞতা হয়।"

মাথার ওপর দুপুরের গরম ঝরছিল নিশ্চয়। এ ধরণের দুর্বলতা আগে তো তার মধ্যে কখনও লক্ষ্য করিনি। আমাদের ভয় হচ্ছিল, সে এবার কাব্যজগতে বিচরণ করতে সুরু না করে। জানেন তো ? "বর্ষ আসে, বর্ষ যায়, প্রেম তবু মৃত্যুহীন।" বন্ধুবর হয়ত কাব্য-জগতেই পদচারণা সুরু করতেন, যদি না সেই সময়ের মধ্যে আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছে যেতাম। গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম এবং গাড়ীখানা মোড় ঘুরে চলে গেল। বন্ধুবরকে আগাগোড়া এক নজর দেখে নিলাম।

"ভিক্টর, তোমার ব্রিফকেসটা কোথায় ?"

সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। ডান পকেটটা চাপড়ে দেখল, তার পর বাঁ পকেট। ব্রিফকেস রাখার উপযুক্ত জায়গাই বটে! শেষ পর্য্যন্ত ঘোষণা করলেন, নিশ্চয়ই ওটা গাড়ীতে ফেলে এসেছেন।

আমি বললাম, "ঠিক তাই। এবং এখানে ল্যাম্পপোষ্টের মত দাঁড়িয়ে থাকলে কোনই লাভ হবে না। এখন যদি তুমি এখান থেকে মানে মানে কেটে না পড়, তাহলে ওরা এসে তোমার গলায় একটি নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়ে চলে যাবে। আর তাতে লেখা থাকবে : 'বাস থামিবে। বি এবং ১০ নম্বর।' একটা ট্রলিবাসে উঠে পড় এবং আমাদের ঐ গাড়ীটার পেছন পেছন চলে যাও। বাসরুট আর কতটুকু! আর হ্যাঁ, দেখ, তোমার ফিলজফি-টিলজফি এখানে রেখে যেতে পার, ইতিমধ্যে আমিই ওসবের দেখাশোনা করব।"

বিশ মিনিট পরে একটা ফিরতি ট্রলিবাস থেকে ভিক্টর নামলেন। বিজয়ীর মত তিনি ঘোষণা করলেন, "মিল্ গিয়া, মিল্ গিয়া। ব্যাপারটা একবার ভাবো তো ভাই, একেবারে গিয়ে গাড়ীখানা ধরে ফেললাম। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকেই দেখি, আমার ব্রিফকেস। কণ্ডাকটর রেখে দিয়েছিল। ফ্ল্যাপের ওপর আমার নামের প্রথম অক্ষরগুলো পর্য্যন্ত লেখা রয়েছে। ঠিক যেমনটি ফেলে এসেছিলাম। পরের ফিরতি ট্রলিবাসটি ধরলাম এবং দেখতেই পাচ্ছ, এখানে সশরীরে হাজির হয়ে গেছি।"

—"হ্যাঁ, হাজির তো হয়েইছো। কিন্তু তোমার ব্রিফকেসটি কোথায় ?"

ভিক্টর প্রথমে আমার দিকে তাকাল, তারপর তার শূন্য হাতের দিকে। এবং হতাশ হয়ে ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিল একটা।

—"যাঃ শালা! আবার গেল! ট্রলিবাসেই ফেলে এলাম নিশ্চয়।"

—"এখন করবে কি ? ট্যাক্সি নিয়ে আবার ট্রলিবাসের পেছনে দৌড়বে ? বলিনি তোমায় ফিলজফি একটু ত্যাগ করতে ?"

—"আরে বাবা, ফিলজফি-টিলজফি নয়। ফুটবলের ফার্ষ্ট রাউণ্ডে কোন টিম জিতবে তাই নিয়ে একটা তর্ক বেধেছিল 'স্পার্টাকের' এক সাপোর্টারের সঙ্গে। এত দল থাকতে সাপোর্ট করে কিনা 'স্পার্টাককে'! আর কি গোঁড়া! বাছাধনকে বুঝিয়ে দিলাম তার ঐ অমূল্য 'স্পার্টাক' সম্পর্কে আমার ধারণা কি।"

—"হ্যাঁ, হ্যাঁ খুব বুঝেছি। কিন্তু ব্রিফকেসের কি হোল তোমার ?"

—"দাঁড়াও দাঁড়াও বলছি তোমাকে। আপাতত: চল এক

বার বাসবিভাগের নিখোঁজ সম্পত্তি-অফিসে যাই। সেখানে ইতিমধ্যে ব্রিফকেসটি পৌঁছে গেছে নিশ্চয়ই।"

—"বাসের অফিসে কেন? তুমি তো ওটা ট্রলিবাসে ফেলে এলে।"

—"হুঁ···তুমিই বোধ হয় ঠিক বলছ। কিন্তু সে যাই হোক, প্রথমে আমরা বাসেই চেষ্টা করে দেখি। সেখানে হয়ত কণ্ডাকটরের কাছেই রেখে এসেছি। ওখানে কিছু না হলে ট্রলি-বাস অফিসে দেখা যাবে।"

নিখোঁজ সম্পত্তির অফিসে ঢুকতেই একজন ছোটখাট্ট বৃদ্ধা মহিলা কর্ম্মচারী সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের জিজ্ঞেস করলেন: —"ছাতা না বর্ষাতি?

—"এঁ্যা?"

—"ছাতা না বর্ষাতি? আজ তো ছাতা আর বর্ষাতিরই দিন। সকালটা ছিল ভিজে-ভিজে, এখন আবার রোদ উঠে গেছে। সেজন্য সব জায়গাতেই লোকে ছাতাকাতার কথা ভুলে যায়। হ্যাঁ দেখুন, ডান দিকের প্রথম দরজা দিয়ে ভেতরে চলে যান।"

ডান দিকের প্রথম দরজা দিয়ে আমরা ভেতরে ঢুকে পড়লাম। ডেস্কের পেছনে হাসিখুসিমাখা একটি মেয়ে বসে। চুলগুলোও বেশ! হাসছে। তার দিকে একটা নজর পড়তেই ভেতরে ভেতরে একটা আলোড়ন অনুভব করলাম। কয়েকটা শব্দ ঠোঁট পর্য্যন্ত উঠে এল—কাব্যলোকেরই কয়েকটি ধ্বনি-তরঙ্গ যেন। কিন্তু ঠিক তখনই 'ম্যানেজার'-লেখা ভেতরের দরজাটা হঠাৎ করে খুলে গেল। মোটা-সোটা এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন। মোটা এবং খোশমেজাজী চেহারা, মাথায় একটা তুর্কী টুপি। খুশিতে মোটা লোকটির চোখ পিটপিট করছিল, কিন্তু ভিক্টরের দিকে নজর পড়তেই তাঁর চোখ পিটপিটানি থেমে গেল এবং পরম দুঃখের একটা নিঃশ্বাস তাঁর বুক ঠেলে উঠল। আমার দিকে ফিরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি এই যুবকটির সঙ্গে এসেছেন? তা যদি হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে আমার অফিসে এক মুহূর্তের জন্য আসুন।"

ঐ অফিসে ভিক্টর গেলেই তো অনেক ভালো হত। অনেক ভালো হোত যেখানে আমি আছি সেখানেই যদি থাকতে পেতাম, যদি বোঝাতে পারতাম নিখোঁজ সম্পত্তি অফিসের ঐ সুকেশা নীলাক্ষী কর্ম্মচারিণীটিকে যে আমার আশঙ্কা হচ্ছে, যদিও আশঙ্কাটা হয়ত একটু-আটটু—তবুও খুবই সম্ভাবনা রয়েছে, হয়ত অদূর ভবিষ্যতে আমি হারিয়ে বসব আমার···। কিন্তু ম্যানেজার তো ভিক্টরকে চান না। তিনি চাইলেন আমাকে।

পেছনে দরজাটা বন্ধ হয়ে যেতেই তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি ঐ ছোকরাটিকে ভাল ভাবে চেনেন?"

—"দেখুন মশায়, এক দিন আমাদের মায়েরা পেট্রভস্কি পার্কে আমাদের গাড়ীগুলো পাশাপাশি ঠেলে নিয়ে যেতেন। সেই সময় থেকে আমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব।"

ম্যানেজার বললেন, "উত্তম কথা। গত মাস বা তারও বেশী সময় যাবৎ আপনার এই বন্ধুবর প্রতি রাত্রে আমার স্বপ্নের মধ্যেও হামলা করছেন—এ খবরটি কি আপনার জানার সুযোগ ঘটেছে?"

ম্যানেজারের স্বপ্নের চরিত্র সম্পর্কে আমি যে একেবারেই অজ্ঞ সেটা আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম। তিনি আবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

বললেন, "আমার জীবনে আমি হাজার হাজার লোকের সঙ্গে কারবার করেছি মশায়, কিন্তু আপনার বন্ধুবরের মত একজনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ ঘটেনি আগে, কোন দিন না। প্রায় রোজই তিনি এখানে আসেন এবং সপ্তাহে অন্ততপক্ষে দু'বার তিনি কিছু না কিছু হারানোর নোটিশ ফাইল করেন। সমস্ত রেকর্ড তিনি ব্রেক করেছেন! ইতিমধ্যে নিশ্চয় পরনের পোষাকটি ছাড়া আর সব কিছুই তিনি হারিয়ে বসেছেন। মস্কোর বাসগুলোতে কি কি জিনিস তিনি ফেলে গেছেন জানেন? নানা জিনিসের মধ্যে তিনি হারিয়েছেন তিনটে ছাতা, দুটো বর্ষাতি, একটা ব্রিফকেশ, পাঁচটা বাণ্ডল, একটা ন্যাপস্যাক, একটা টেনিস র‍্যাকেট আর একটা শিকারী কুকুর। তাকে শয়তান বলে ডাকলে নাকি সাড়া দেয়। কিন্তু তিনি যে এত-এত জিনিস হারাচ্ছেন তার জন্য আমি চিন্তিত নই। তাঁর যদি খুশি হয়, যা কিছু তিনি হারান না কেন! অনেক লোক এর চেয়েও বেশী মূল্যবান জিনিস হারিয়ে থাকেন। এক জন কীর্ত্তমান দপ্তরী গাড়ীতে একটা হ্যাণ্ডব্যাগ ফেলে গেলেন এবং তাতে রেখে গেলেন একটি পে-রোল আর নগদ দশ হাজার রুবল! তারপর সেটা খুঁজে বের করে ফেরৎ দেওয়া হোল। না পাওয়ার কি আছে? না মশায়, দেখুন, আপনার বন্ধুকে নিয়ে মুস্কিলটা হোল এই যে, তাঁর যা কিছু হারায়, তার একটিও খুঁজে পাওয়া যায় না। এ-ক-টি—ও নয়! 'শয়তান' না কি নাম কুকুরটার? তিনি না হয় দৌড়েই পালিয়ে গেলেন। কিন্তু ন্যাপস্যাক অথবা ছাতা তো আর দৌড়তে পারে না।"

ম্যানেজার কপালের ওপরের টুপিটা ঠেলে দিলেন, এক চুমুকে এক গেলাস জল খেয়ে নিলেন এবং "ভয়ঙ্কর গরম" বলে কি যেন বিড়-বিড় করলেন! একটু ঠাণ্ডা হয়ে আবার সুরু করলেন:

"সাদা কথায় ব্যাপারটা হোল অসম্ভব। শুধু অসম্ভব বলব কেন? ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য। আর শুধু অসহ্যই বা কেন? জঘন্য ব্যাপার মশায়, জঘন্য ব্যাপার। আপনার ঐ ভোলানাথ বন্ধুটির জন্য শান্তি সোয়াস্তি কি কিছু রইল আমার! ঘুমের মধ্যেও দুঃস্বপ্ন দেখি। আমার সমস্ত বিভাগের কাজকর্মকে উনি বানচাল করে দিয়েছেন। ধাতে আর সইছে না মশায়! আপনি কি কখনও কিছু হারিয়েছেন? আপনাকে অনুরোধ করছি, হারিয়ে দেখুন কিছু; রেকর্ড সময়ের মধ্যে আপনাকে যদি তা খুঁজে বার করে না দিতে পারি তো কি বলেছি। কিন্তু আপনার এই বন্ধুবর?—ছাতা থেকে শুরু করে শিকারী কুকুর পর্য্যন্ত একটি হারানো মালও কি পাওয়া গেল?"

ম্যানেজার আর এক গ্লাস জল খেলেন। সামনের দিকে ঝোঁকার ফলে ডেস্কের সঙ্গে চাপাচাপিতে তাঁর গোলগাল পেটটি চ্যাপ্টা হয়ে এল। একান্ত গোপনীয়তার সঙ্গে তিনি ফিসফাস করে বললেন; হয়ত বা···হয়ত আপনার এই বন্ধু আদপেই কিছু হারান নি। আপনি কি বলেন? হয়ত এটা একটা ঠাট্টা-মস্করা করছেন।"

আমি কড়া ভাবেই বললাম, "আজকে সকালেই তিনি একটা ব্রিফকেশ নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন এবং নামলেন খালি হাতে। আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম।"

ম্যানেজার দু'হাতে তাঁর মাথাটাকে আঁকড়ে ধরে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন এবং শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এবং তাঁর দপ্তরের যাদুমন্ত্রটি বিড়বিড় করে আওড়ালেন অন্যমনস্ক ভাবে: "যো কুছ হারান, ভিতরমে আ যান"। দ্রুত বেরিয়ে এলাম।

নীলাক্ষী কেরাণীটিকে এক সুদীর্ঘ বিদায় অভিবাদন জানিয়ে আমার বন্ধু এবং আমি নিখোঁজ সম্পত্তির অফিস থেকে বেরোলাম। পেছনের দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলে ভিক্টর জিজ্ঞেস করল, "এবার তোমার মত কি বল।"

—"কি, ম্যানেজার সম্পর্কে? সে তো একেবারে শেষ দশায় পৌঁছে গেছে।"

—"চুলোয় যাক ম্যানেজার। আরে নিনার কথা জিজ্ঞেস করছি।"

—"ঐ মেয়েটা?"

—"ঠিক ধরেছ। ঐ মেয়েটা। ওই আমার ভাগ্যলক্ষ্মী ভাই! সন্দেহ কি? কেবলমাত্র এত দিন নির্জনে তার সঙ্গে একটু কথা কয়ে উঠতে পারিনি। যে মুহূর্তে ম্যানেজার আমার গলার আওয়াজ শুনবে, অমনি সে একেবারে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়ে। আর আমি··· আরে ভাই বলত, কি করতে পারে একটা লোক তখন? প্রতিবারই নতুন করে একটা অজুহাত বানিয়ে নিতে হয়। মোটরে কিছু হারিয়ে ফেলেছি ইত্যাদি ধরণের"।

তার হাতটা চেপে ধরে আমি চেঁচিয়ে বললাম, "থাম, থাম। তার মানে সত্যি সত্যি কিছু হারাওনি তুমি? এসব তাহলে বানানো ব্যাপার?"

—"নিশ্চয়ই! আর কি করতে পারতাম তাছাড়া? যতবারই সে বেড়িয়ে আসে, তত বারই তাড়াতাড়ি মাথা খাটিয়ে কিছু বের করে নিতে হয়। এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, গত কয়েক দিন যাবৎ একই ধরণের জিনিসের পুনরাবৃত্তি হচ্ছিল। একবার একটা ভাল আইডিয়া মাথায় এল: 'শয়তান' কুকুরের ব্যাপারটা। বেশ চালাকি করেছিলাম। তাই না?"

ঠিক ঠিক অবস্থা বিবেচনা করে আমি দেখলাম যে, ন্যায়ত: বন্ধুকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারি না! আমি কেবল মন্তব্য করলাম যে বেচারা ম্যানেজারের সংখ্যাতত্ত্বকে এভাবে বানচাল করে দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না। একটা মাত্র হারানোর কথা আবিষ্কার করলেই যথেষ্ট হোত এবং সেটার সম্পর্কে রোজ রোজ খোঁজ নিতে এলেই হোত। ভিক্টর একথা মেনে নিল।

সে বুঝিয়ে বলল, "আমার মাথায় ওটা আসেই নি। যাই হোক, এখন সব চুকে-বুকে গেছে। তুমি যখন ম্যানেজারের সঙ্গে ভেতরে ছিলে, নিনা তখন আজ রাত্রে আমার সঙ্গে পার্কে দেখা করতে রাজী হয়ে গেল। এবার আর হারানোরও কিছু নাই, খোঁজারও কিছু নাই।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "খোঁজারও কিছু নাই মানে? তোমার ব্রিফকেশের কি হোল?"

—"আমার ব্রিফকেশ? ওঃ হো, একেবারে ভুলে বসে আছি। ঠিক আছে, আজ রাত্রে না হয় নিনাকে বলা যাবে।"

তিন সপ্তাহ কেটে গেছে। নদীর ধার দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে বাস-বিভাগের নিখোঁজ সম্পত্তি অফিসের ম্যানেজারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছিলাম, আর কি। তাঁকে কেমন যেন একটু করুণ-করুণ দেখাচ্ছিল।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হোল? ছাতা-হারানোর সূচকরেখায় কোন গণ্ডগোল হোল নাকি? সততার ব্যাপারে কোন সমানুপাতিক অবনতি ঘটছে নাকি?"

তিনি জবাব দিলেন, "না মশায়, না। সমানুপাতে কোন গণ্ডগোল নাই। যাই হোক, আপনার বন্ধুবরের খবর কি?—সে যে ছাতা-হারানেওয়ালাদের চ্যাম্পিয়ন? জানেন মশাই, যা ভেবেছিলাম, ব্যাপার ঠিক তাই। কিছু সে হারায় নি। পরে এসে ক্ষমা চেয়ে গেলেন। এখন যা নিয়ে মুস্কিলে পড়েছি, তা হোল জনকয়েক নাগরিকের নির্লিপ্ত মনোভাব। ভয়ানক ব্যাপার মশায়, ভয়ানক ব্যাপার! লোকে জিনিসপত্তর হারিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ তা ফিরে পাবার ব্যাপারে কি এতটুকু মাথা ঘামাচ্ছে? একবার খোঁজ নিতেও আসে না? স্পষ্টতই তারা ভুলে গেছে, দুনিয়ার কোন্ অংশে তারা বাস করছে। তারা মনে করে, আমাদের দেশটাও অন্যদের মতই; যিনি পেলেন তিনি হাতিয়ে নিলেন আর যে হারাল সে চোখের জল ফেলতে লাগল। একটা ব্রিফকেশের ঘটনাই বলি। জিনিসটা নিশ্চয়ই হবে কারোর। এমন কি ফ্ল্যাপের ওপর নামের প্রথম অক্ষরগুলোও লেখা আছে: ভি, এস। তবু তিন সপ্তাহ ধরে জিনিসটা আমার অফিসে পড়ে রয়েছে এবং সেটা চেয়ে নিয়ে যেতে কেউই আসছেন না। জিনিসটার মালিক কি ভেবেছেন বলুন তো?···আচ্ছা, আপনি হাসছেন? না না, ব্যাপারটা মোটেই হাসির নয়। মানব-চরিত্রের ওপর এ রকম বিশ্বাসের অভাব যখন লোকে প্রকাশ করতে থাকে, আমার তখন কাঁদতে ইচ্ছা করে।"

আমি বললাম, "মনে হচ্ছে, মালিককে বোধ হয় আমি চিনি। মরচে-পড়া ধূসর রঙের ছেঁড়াখোঁড়া একটা ব্রিফকেস। বি-বাসে পেয়েছেন। তাই না?"

—"ঠিক বলেছেন।"

—"আগামী কাল আপনার কাছে মালিককে পাঠিয়ে দেব। আমারই এক বন্ধু।"

ম্যানেজার আমার দিকে সন্দিগ্ধ ভাবে একটা দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মন্তব্য করলেন, "বিচিত্র সব বন্ধুর সঙ্গে মেলেন তো আপনি? তাদের এক জন আমাদের হারানো ও পুনঃ প্রাপ্তির সব হিসেব বানচাল করে দিলেন। আর এক জনের আবার প্রতিবেশী নাগরিকদের প্রতি কোন আস্থাই নাই শুনুন মশায়, বন্ধু-নির্বাচনের ব্যাপারে আর একটু বেশী মনোযোগী হবেন। 'যো কুছ হারান, ভিতর মে আ যান।' গুড ইভনিং।"

মনে হয়, ইতিমধ্যে নিখোঁজ সম্পত্তি অফিসের সব কিছু ঠিক-ঠাক হয়ে গেছে। ভিক্টরকে আমি ব্রিফকেস সম্পর্কে বলেছিলাম এবং নিনা অর্থাৎ তার স্ত্রী ঠিক পরের দিনেই সেটা বাড়ী নিয়ে এসেছিলেন। বরাত জোর আছে ছোকরার। আহা, ব্রিফকেসটা যদি আমার হোত আর সে যদি হোত আমার স্ত্রী!

যাই হোক, আমার নীতি এখনও সেই একই আছে। তুমি যদি তোমার জিনিস-পত্তর সবসময় ছড়িয়ে না বেড়াও, তাহলে অনেক লোককে তুমি অনেক কিছু ঝামেলা পোহানোর হাত থেকে বাঁচাতে পার।

অনুবাদক: সত্যেন সমাজদার।



শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

বিব্রত হবার মত কথা নয়, তবু একটু ইতস্ততঃ করলেন ডাঃ ডাউসান। অপারেশন টেবিলের ওপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে একটা দেহ। মুখখানা ঢাকা, অপারেশনের সময় পেসেন্টের মুখের ওপর চোখ পড়লে দৃষ্টি-বিভ্রমের সম্ভাবনা থাকে, তাই।

ছুরিখানা এক বার উল্টে-পাল্টে দেখলে। সাড়ে পাঁচ শত পাওয়ারের তীব্র আলো পড়ে ঝকমক্ করছে ফলাটা।

চোখের তারা দু'টো ঝলসে উঠলো এক বার ডঃ ডাউসানের। তার পর শক্ত মুঠিতে ছুরিটা চেপে পেটের ঠিক নিচে আড়াআড়ি ভাবে ওপর থেকে নিচে প্রায় ইঞ্চি চারেক টেনে দিলে।

গোটা দেহটা একবার শির-শির করে উঠলো। আশ্চর্য্য রক্ত-ক্ষরণ হচ্ছে ক্ষতস্থান থেকে। তীব্র আলোর সামনে দাঁড়িয়েও আচমকা কেমন আবছা নীল নেশায় জড়িয়ে এলো তার চোখের তারা।

কিন্তু এমন তো হয় না বড় একটা! অপারেশন তো আজ এই প্রথম নয়? গত কুড়িটা বছরে তিল-তিল করে তার মনে কাঠিন্ন এসেছে, ছুরির ধার ক্ষয় হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেছে মনের তীব্র অনুভূতির বোধ। নিজে তাই কশাই ছাড়া আর কিছু কল্পনা করতে পারে নি কোন দিন ডঃ ডাউসান।

বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে কপালের খাঁজে খাঁজে, মুখের পরতে পরতে। কিন্তু হাত তুলে কপাল স্পর্শ করতে গিয়েও পারলেন না, ক্রমশঃ কেমন অসাড়, আচ্ছন্ন হয়ে আসছে বোধশক্তি।

বিহ্বল ভাবে দু'পাশে তাকালো এক বার, তার পর ছুরিটা ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে চেপে ধরলো কপালের দু'পাশ।

পাশেই এক জন নার্স ছিল। হাতে ধরে-থাকা ফরসেফটা টেবিলে রেখে ত্রস্তে ধরে ফেললে ডঃ ডাউসানকে। তারপর আস্তে আস্তে পেছনে সরিয়ে এনে বসিয়ে দিলে একখানা কুশন-চেয়ারে।

প্রায় মিনিট দুই চোখ বুজে বসে রইলো ডঃ ডাউসান। যখন চোখ খুললো, দেখলো দ্রুত হাতে কাজ সেরে যাচ্ছে ফার্ষ্ট এ্যাসিষ্ট্যান্ট। দেহটা তেমনি নিথর হয়েই পড়ে আছে টেবিলের ওপর। শুধু তার দু'পাশে ছড়িয়ে থাকা সাদা কাপড়টায় চাপ-চাপ রক্তের ছোপ।

চোখ নামিয়ে নিতেই এক বার ধমক খেলে। হাতের দস্তানায় চকচক্ করছে ক'ফোঁটা রক্ত। যেন সাড়ে পাঁচ শত পাওয়ারের আলোটা একবার দপ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেল চোখের ওপর।

বার করেক মাথা ঝাঁকালো, টেনে টেনে নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলো ক'বার, কিন্তু হোলো না কিছু। সুস্থ বোধ হলো না দেহ-মন। ক্রমশঃই যেন অন্ধকারের একটা গাঢ় পর্দা নেমে আসছে চোখের পাতায়। পেণ্ডুলামের মত দুলে-দুলে ঘা পড়ছে বুকের পাঁজরে!

বহু দিন আগের একটা দৃশ্য মনে পড়লো। রিসার্চটা তখন নেশার মত ছিল তার কাছে। ডাক্তারী বিদ্যায় অনেক অসাধ্য সাধন করেছে বিজ্ঞান, ক্রমশঃ মানুষ জয় করে আসছে জরা-ব্যাধি। তবু যেন তৃপ্তি নেই। দেহ-মনের প্রতিটি স্তর চিরে চিরে বিচার করে দেখবার নেশা চেপে বসেছে বিজ্ঞানীদের মস্তিষ্ক-কোষে।

আর সেই নির্ভয় আনন্দেই তখন উন্মাদ ডঃ ডাউসান। মৃত্যুকে জয় করবার, দেহ-মনকে চিরে চিরে অনন্ত রহস্যের আবিষ্কারের নেশা তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে।

লেবরেটরীতে তাই প্রচুর সংগ্রহ গিনিপিগ থেকে খরগোস আর বড় ইঁদুরের। মিস মার্গারেটা তখন এ্যাসিষ্ট করতো তাকে। প্রথম প্রথম মুখ বুজে দেখে যেতো। কিন্তু পরে মুখ খুলেছিল। বলতো "এ নেশা তুমি ছেড়ে দাও ডাউসান! বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে এমনি করে আর জীবন নিয়ে নির্মম ছেলেখেলা কোরো না। এ আমার সহ্য হয় না।"

ডঃ ডাউসান হাসতো, বলতো "জীবন তো নয়? নিছক জীব নিয়ে এক্সপেরিমেণ্ট চলেছে আমার এবং তা মানুষেরই কল্যাণের জন্যে। মানুষ নিয়েই তো পৃথিবী।"

সে কথার আর উত্তর যোগাতো না মিস মার্গারেটার মুখে। অস্ফুট আর্তনাদ করে চুপ করে সরে যেতো কাছ থেকে!

তখন এক-এক বার ইচ্ছে হোতো ডঃ ডাউসানের চিৎকার করে হাসে। হেসে মার্গারেটার চিফ সেণ্টিমেণ্টটাকে বিধ্বস্ত করে দেয়। অন্ততঃ একটা মেয়েরও দৃষ্টি স্বচ্ছ হোক, বিজ্ঞানের চুল-চেরা বিচারের মনোবৃত্তি আসুক।

সেই, তারই আগু-পিছু ঘটেছিল ঘটনাটা। টেবিলের সার্চলাম্প দু'টো জেলে, 'নেটের খাঁচা থেকে একটা ভীরু খরগোসকে ধরে এনে প্লেটের ওপর, খানিক চেপে ধরে তীক্ষ্ণ ভাবে নিরীক্ষণ করলে তার অসহায়তা। তারপর মিস মার্গারেটার কাঁপা-কাঁপা হাতের "ফাঁকে রেখে, ছোট্ট ছুরিখানা তুলে, তলপেটে আঙুল বসিয়ে চরচর করে টেনে গেল ওপর থেকে নিচে।

তার পর মাত্র একটা মুহূর্ত। পরক্ষণেই থতমত খেয়ে গেল তার দৃষ্টি। খরগোসের চেরা পেট থেকে গলগল করে বেরিয়ে আসছে রক্ত। আশ্চর্য্য! এতটুকু একটা প্রাণীর দেহে এত রক্ত ছিল!

ঝুঁকে পড়ায় আর একবার ধমক খেলে। শুধু রক্ত নয়, নাড়ী-ভুঁড়ির সঙ্গে জড়িয়ে বেরিয়ে আসছে কচি কচি দু'টো বাচ্চা।

চমকে ওঠার মতই দৃশ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু বিভ্রান্ত হয় নি, তখন ডঃ ডাউসান! ঠিক আগের মতই তীক্ষ্ণ গতিতেই টেনে তুলে নিয়েছিল ছুরিটা। কিন্তু তার পর?

সেই তার পরের টুকুর জন্যেই আজো মনে আছে ঘটনাটা।

মিস মার্গারেটার দিকে চোখ ফেরাতেই থমকে গেল দৃষ্টি। থরথর করে কাঁপছে তার দেহ, ভয়ে বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত।

তাড়াতাড়ি ছুরিটা রেখে ধরে ফেললে তাকে। বসিয়ে দিলে একটা চেয়ারে। মার্গারেটা ততক্ষণে মূর্ছা গেছে।

পরের দিনই মার্গারেটা কেঁদে ফেললো। বললে, "বাই কর' ডাউসান। মেয়েদের শরীরে সব সহ্য হয়, কিন্তু এমন করে আমি নিজেকে তোমার জন্যে গড়ে তুলতে পারবো না।" তার পর আর দু'দিনও থাকেনি সে সেখানে।

অথচ এই মার্গারেটাই এক দিন তাকে ভালোবেসেছিল। আশ্চর্য্য! ভাবতে গিয়ে সেদিন প্রচুর হাসি পেয়েছিল তার।

অনেক পরে যখন নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ মনে হোলো ডঃ ডাউসানের, তখন অপারেশন টেবিলের কাজ শেষ! নিজে থেকেই উঠে গিয়ে দেখলো এক বার, পরিপুষ্টরূপে কিছু পাওয়া যায় নি পেটে! পাওয়া গেছে শুধু মাত্র এক তাল রক্ত-মাংস। সেটা না মানুষের আকৃতি, না লিভার-ষ্টোন। হাত দু'টো ভাল করে ধুয়ে থিয়েটারের বাইরে এসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো বার কয়েক ডঃ ডাউসান। চোখ মেলে সামনের দিকে তাকাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। বিকেলের পড়ন্ত রোদের ছোঁয়ায় আশ্চর্য প্রাণবন্ত মনে হচ্ছে সামনের শিরিষ গাছ আর তার আশ-পাশ। চৈত্রের মাঝামাঝি, অথচ এখনও সবুজের বাহার, রঙ-বেরঙের ফুলের খেলা শাখায় শাখায়!

ওপাশের টিলার ওপরকার চার্চের চূড়ার খাঁজে-খাঁজে শ্বেত-কপোতের ঝাঁক। নিচের কম্পাউণ্ডে কচি-কচি ছেলে-মেয়ের দল কলরব করছে মাদার ফ্রিবেলকে ঘিরে। ফাদার মরিসনকে দেখা যাচ্ছে না।

দৃশ্যটা খুব ভালো লাগলো তার। কচি কচি একগুচ্ছ ফুল যেন ওরা। ভবিষ্যতের কত সম্ভাবনার মুকুল সুপ্ত রয়েছে ওদের মধ্যে।

নিজের ছেলেবেলার কথা স্মরণ করবার চেষ্টা করলে সে। কিছুই মনে পড়লো না। আবছা, যেন জলে ধুয়ে ম্লান হয়ে এসেছে সে স্মৃতির রঙ!

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখে এক সময় পা বাড়ালে। কিন্তু সেই মুহূর্তেই আবার দাঁড়িয়ে পড়তে হলো তাকে। পেছন থেকে অস্ফুটে কে যেন ডাকছে।

চোখ ফেরাতেই ত্রস্তে কাছে এসে দাঁড়ালো এক প্রৌঢ়া। সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে এক নজর এপাশ-ওপাশ তাকিয়ে গলা খাটো করে বললে: মেয়েটা কি বাঁচবে ডাক্তার সাব?

: কে? ঘুরলে না, শুধু ঘাড়টা বেঁকিয়ে প্রশ্ন করলো ডঃ ডাউসান।

: আমার মেয়ে মরিয়ম—মিস মরিয়ম টিরকী।

প্রথমে আবছা আবছা, ক্রমে স্পষ্ট হোলো প্রৌঢ়ার মুখখানা। কেমন কঠিন হয়ে উঠলো মুখের সর্পিল রেখাগুলি ডঃ ডাউসানের, কিন্তু সামলে নিলে। অস্ফুটে দাঁত চেপে বললো গড নোস্'!

: বাঁচবে না? অনেকটা আর্তনাদের মত শোনালো প্রৌঢ়ার স্বর।

: ডোণ্ট নো ! ডোণ্ট নো ! মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে করিডোর ছেড়ে নেমে এসে দাঁড়ালেন ডঃ ডাউসান।

পেছন পেছন নেমে এলো প্রৌঢ়া। কুণ্ঠিত স্বরে বললে : এবারটি ওকে বাঁচিয়ে দাও ডাক্তার সা'ব। ওর কোন অপরাধ নেই।

খচ করে একটা শব্দ হোলো। থমকে দাঁড়ালেন ডঃ ডাউসান।

: বিশ্বাস কর ডাক্তার সা'ব, স্বেচ্ছায় এ কাজ করে নি মরিয়ম, কিন্তু উপায় ছিল না যে। তুমি তো জান—

তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো আবার ডঃ ডাউসানের দৃষ্টি। মাথাটা ঝিমঝিম করছে। শ্বাস টানতে যেন কষ্ট হচ্ছে। হাওয়া চাই, নির্মল মুক্ত হাওয়া। নইলে নিশ্চিত বন্ধ হয়ে যাবে ফুসফুসের রন্ধ্র পথ।

কথার খেই হারিয়ে ফেলেছিল প্রৌঢ়া। জিভ দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেটে আমতা আমতা করে শ্বাস টেনে বললে : ডাক্তার সা'ব!

কেমন অসহায় মনে হোলো ওকে ডঃ ডাউসানের। চোখের দৃষ্টি নরম করে বললে : এই কি প্রথম?

এক বার যেন ঢোক গিললে প্রৌঢ়া। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে : না, এর আগে আর এক বার হয়েছিল। সে বার মাদার রিবিল ওষুধ দিয়ে—

কথাটা শেষ করতে দিলে না ডঃ ডাউসান। হাত তুলে বললে : ষ্টপ! তার পর চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার নিচে নিচে। চার পাশে ছায়ার আলপনা, গাছের শাখায় পাখীদের অশ্রান্ত কলগুঞ্জন চলছে।

প্রৌঢ়া তখনও পেছন পেছন আসছিল। কেমন কৌতূহল হোলো, থেমে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলে, তোমরা খৃষ্টান?

: হ্যাঁ। অস্ফুটে, প্রায় না শোনার মত করে উত্তর দিলে প্রৌঢ়া।

: কি নাম?

বিব্রত হয়ে মুখ তুলে তাকালো প্রৌঢ়া। বললে : রহিল। রহিল টিরকী। ফাদার মরিসন চেনেন।

চোখ টেনে এক বার হাসলো ডঃ ডাউসান, কিন্তু দাঁড়ালো না আর। সামনের টিপিটা ডিঙিয়ে ছবছব করে, নেমে গেলো ও-পাশের ডি, বি রোডে।

বলতে বলতে আপন মনেই আবার হাসলো। ভুল বলেছে রহিল টিরকী। শুধু ফাদার মরিসনই নয়, সে-ও তাকে চেনে। অবশ্য আজকের কথা নয়। হয়তো মনেও নেই মেয়েটার। অথবা, থাকলেও বলতে ভরসা পায় নি।

ডঃ ডাউসান তখন লেপরডীগঞ্জের সরকারী হাসপাতালের জুনিয়ার সার্জন। নতুন কাজ নিয়ে এসেছে। সেখানকার চার্চের ফাদার ছিল জন কার। মরিসন তখন বাইবেল পড়াতো। হঠাৎ এক দিন রাত্রের অন্ধকারে আলাপ করতে এলো সে। প্রথমেই সহজ সুরে বললে : শুনলুম তুমি আমার দেশের লোক, তাই আলাপ করতে এলাম।

সেই আলাপ। মিথ্যে নয়, একবারেই ভাল লেগেছিল তাকে ডঃ ডাউসানের। একে ইয়ংম্যান, তার ওপর শান্ত সৌম্য চেহারা। হাই পাওয়ারের চশমার নিচে দু'টি বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল চোখ, মুখে মিষ্টি হাসি।

কিন্তু কয়েক দিন পরেই ধারণা বদলে দিলে লোকটা। সে কাছে এসে হাত চেপে ধরলে তার। বললে : তুমি আমার ঘরের লোক। কেসটা টেকআপ না করলে আর মান থাকে না আমাদের।

তারপরই ঘটনাটা বললে। মেয়েটাকে প্রথম আনে মেরি ব্রিষ্ট। লাপরার পুয়োরস মিশনের মাদার। সেখান থেকে চালান হয় রাঁচি। সেখান থেকে হাত বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত লেপরডীগঞ্জে। ব্যাপারটা বুঝতেই পারছো! প্রথম দু'এক বার অবশ্য ফাদারের ওষুধেই কাজ হয়েছিল, কিন্তু এবার সে বাইরে থাকায় বড় মুস্কিল হয়ে পড়েছে।

: তুমি বুদ্ধিমান, তার ওপর ইয়ং। বলেছিল মরিসন। কেসটা হাতে না নিলে বোঝই তো, মিশনের সম্মান থাকে না। একটি চাইল্ড পেলে অবশ্য আমাদেরই লাভ। কিন্তু—

সেই 'কিন্তু' টুকু আর খুলে বলে নি মরিসন। তবু তার হাত ধরার মর্যাদা রেখেছিল সে বার ডঃ ডাউসান। কিন্তু পরের বছর আর মরিসনের বিনয়কে প্রশ্রয় দেয় নি। কেশটা নিয়েই মেয়েটাকে দিয়ে এমন শাস্তি দিয়েছিল তাকে, যা আজো মনে আছে। সুযোগ পেলেই মরিসন সে স্মৃতির রোমন্থন করে।

আর সেই থেকেই মেয়েটি জন্মের মত অক্ষম, বন্ধ্যা। এই সেই রহিল টিরকী। আর সেই শেষ বারের চিকিৎসার ফল আজকের পেসেণ্ট।

নিজের বাঙলোর গেটটা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই ব্যস্তে একটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে এলো তার দিকে। কাছাকাছি আসতেই স্পষ্ট হোলো। ফাদার মরিসন।

: গুড ইভনিঙ। চোখাচোখি হতেই হাসবার চেষ্টা করে হাত তুলে বললে মরিসন। তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে এলুম ডক্টর।

হাসলো ডঃ ডাউসান। পা বাড়াতে বাড়াতে বললো : তুমি আসবে জানতাম। এসো।

বারান্দায় উঠে একটা বেতের চেয়ার দেখিয়ে বললে : বোসো। আমি ড্রেসটা চেঞ্জ করে আসছি।

এলো একটু বাদেই। মরিসনের পাশের একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললে : বল কি বলবে?

প্রথমটা একটু ইতস্তত: করলে ফাদার মরিসন। তার পর হাসবার চেষ্টা করে বললে : কেশটা কি রকম মনে হয় তোমার? খুবই কি সিরিয়স?

সামনের দিকে চোখ রেখেছিল ডঃ ডাউসান। তেমনি ভাবেই ঘাড় নেড়ে বললে : মনে হয়। হঠাৎ যেন চুপ করে গেল ফাদার মরিসন। প্রায় মিনিট দুই-তিন পর মুখ খুললে। বললে : তোমার কাছে তো লুকোবার কিছু নেই, সবই তো তুমি জান। তবে কেশটা এমন ভাবে টার্ন নেবে এতটা ভাবতে পারি নি আগে।

জোছনা উঠেছিল বাইরে। সেই জোছনার আলো পড়ে দূরের পাহাড়টা চকচক করছে ছুরির ফলার মত। সেদিকে চোখ রেখে খানিকক্ষণ কথা বলতে ভুলে গেল ডঃ ডাউসান।

: আর মেয়েটাও তেমনি। একটু চুপ করে আবার শুরু করলে ফাদার মরিসন।—ঠিক মায়েরই মত। যেমন ছটফটে তেমনি

অবাধ্য। নিকলসের আর দোষ কি বল? টাটকা যৌবন। সংযমেরও একটা মাত্রা আছে!

চোখ ফিরিয়ে এক নজর ফাদার মরিসনকে দেখলো ডঃ ডাউসান।. মিথ্যে নয়, অপারেশান টেবিলে তুলবার সময় দেখেছিল মেয়েটাকে। আশ্চর্য্য রূপ! আঁটসাট গড়ন। টলটল করছে সমস্ত দেহ যৌবনে। মুখশ্রী অপূর্ব। বুকটা বড় বড় নিঃশ্বাসে উঠানামা করছিল। বেশীক্ষণ দেখতে পারেনি। চোখের ডিম ছু'টো টনটন করতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছিল সে।

তার আগেও অবশ্য ছু'চার বার দেখেছিল মেয়েটাকে, ক্রিট ধাওড়ার সড়ক ধরে মিশনের বাচ্চা ছেলেমেয়ে নিয়ে পেরাম্বুলেটর ঠেলে চলতে। আচমকা দেখা হয়েছিল হসপিটাল কম্পাউণ্ডে। তখন অবশ্য জানতো না, রহিল টিরকীর মেয়ে ও। আজ মনে হোলো, মুখের একটা আঁচ যেন ছুঁই-ছুঁই করছে ওর মুখে।

: আমি অবশ্য বহু বার সাবধান করেছিলাম নিকলসনকে। বললে: ফাদার মরিসন।—এ ভালো নয়। বাইবেল স্পর্শ করে যিশুর ধর্মপ্রচার করতে এসেছ তুমি এদেশে। তোমার কাছে স্বার্থের চেয়ে ধর্মই বড় হওয়া উচিত। কিন্তু সে-কথায় কান দিলে না ছোঁড়াটা তখন।

একটু দম নিলে ফাদার মরিসন। তার পর আবার বললে: জানো তো, ইংরিজিতে একটা কথা আছে—ক্যাণ্ডেলে হাওয়া না লাগলে, যতক্ষণ সলতে থাকবে পুড়বেই। এও হয়েছে তাই।

ঘুরে বসলো ডঃ ডাউসান। বললো: এ কাহিনী আর কত বার শোনাবে। তার চেয়ে একটা বিয়ে দিয়ে দিলেই পারতে ছোকরাকে, দেশ থেকে আনবার পর? ইংরেজের ঘরে তো তখনও মেয়ের অভাব হয়নি?

: বিয়ে? যেন শিউরে উঠলো ফাদার মরিসন। মাই লর্ড। সে কি করে সম্ভব?

: নয় কেন? ঝাঁঝিয়ে উঠলো ডঃ ডাউসান। তুমি করনি? যখন ঠেকেছ, তখনই তো দেশে গিয়ে ভাল ছেলে সেজে বিয়ে করে বৌ নিয়ে এসেছ।

সহসা কথা বলতে পারলে না ফাদার মরিসন। প্রায় মিনিট পাঁচেক চুপ করে থেকে এক সময় বললে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কি জান, আসলে ছেলেটার স্বভাবেরই ঠিক নেই। নইলে এমন একটা কেলেঙ্কারী করবার প্রবৃত্তি হয় ওর? স্কাউণ্ড্রেল।

কথাটা শেষ করেই ঝুঁকে পড়লো ডঃ ডাউসানের কানের ওপর। চাপা স্বরে প্রশ্ন করলে: খুব ষ্ট্রং কেশ কি? কোন্ নার্ভ-টার্ভ—

আচমকা লাফিয়ে সিধে হয়ে বসলো ডঃ ডাউসান। তীক্ষ্ণস্বরে বললে: ষ্ট্রং? পিষে ফেলেছ তোমরা ওটাকে। বিষ্ট।

: ও লর্ড! বিস্ময়ে আপনি হাঁ হয়ে এলো ফাদার মরিসনের মুখ। কিন্তু এতটা তো ধারণা ছিল না আমার? তুমি ভাল করে পরীক্ষা করে দেখেছ? তার পরই কথা ঘুরিয়ে বললে: অবশ্য ছোঁড়াটার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

সেই মুখের ওপর জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকালো ডঃ ডাউসান। দাঁত চেপে বললে শুধু নিকলসনই বুঝি দায়ী হোলো তার জন্যে?

যেন চড় খেয়ে থেমে গেল ফাদার মরিসনের দৃষ্টি। কথা বলতে ভুলে গেল সে।

: আমি কি তোমায় আজ থেকে চিনি ফাদার মরিসন! আবার অস্ফুটে চিৎকার করে উঠলো ডঃ ডাউসান।—নেহাৎ তোমার কপাল ভাল যে, তুমি-আমি ছু'জনেই এক জাতের। নইলে—কথাটা শেষ না করেই উঠে পড়লো ডঃ ডাউসান। ফাদার মরিসন ঘোলাটে চোখ তুলে এক পলক তার মুখের দিকে তাকিয়ে, স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

ডঃ ডাউসান বাগানে নেমে এসেছিল। অনেক পরে উঠে পায়ে-পায়ে সেখানে এসে দাঁড়ালো ফাদার মরিসন। অস্ফুটে অনুনয়ের স্বরে বললে: তোমার কথার ওপর বলবার মত কোন কথাই নেই আমার! তবে স্ক্যাণ্ডালটা যাতে ছড়িয়ে না পড়ে, তাই। না হয় ট্রান্সফার করে দাও কেশটা সদরে। ওখানে ডঃ ডানহাম আছেন। তিনি এসব কেশে রিক্তিনেবল্।

বড় বড় চোখ তুলে তাকালো ডঃ ডাউসান। একটু চুপ করে থেকে বললে: সেখানে গেলে কি হবে?

: অন্তত:—

: ননসেন্স! চাপা গর্জন করে উঠলো ডঃ ডাউসান।

চমকে সিধে হয়ে দাঁড়ালো ফাদার মরিসন। স্থির হতে গিয়ে আর এক বার বিব্রত হোলো। চার্চের ঘণ্টার আওয়াজ হচ্ছে। প্রার্থনার ঘণ্টা। অকারণেই ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলো সে। টু লেট। বড্ড দেরী হচ্ছে আজকাল ইভনিং প্রে'র ঘণ্টা দিতে।

ঘণ্টা শুনে ডঃ ডাউসানও স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শেষ হতেই বুকে ক্রশ আঁকলে এক বার। তার পর চোখ নামিয়ে বললে: মেয়েটা বোধ হয় রহিল টিরকীর?

বিহ্বল ভাবে চোখ তুলে আলতো করে ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ফাদার মরিসন।

: লেপরস্বীগঞ্জের সেই কেশটার বিষফল?

আর এক বার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটলো ফাদার মরিসনের। কিন্তু সামলে নিলে। তার পর ঠিক সেই আগের মতই ঘাড় নেড়ে সায় দিলে।

ছু' চোখ কুঁচকে এসেছিল ডঃ ডাউসানের। সরস হোলো এবার দৃষ্টি। হেসে ফেলে বললে: তবু আবার সেই ভুল কর তোমরা। লোভের প্রায়শ্চিত্ত কি কোন দিনই সম্ভব হবে না তোমাদের দ্বারা?

ফাদার মরিসন আর মুখ তোলেনি। এবারও তেমনি দাঁড়িয়ে রইলো।

ছু' চোখের দৃষ্টি যেন ক্রমশঃ স্বচ্ছ হয়ে আসছে ডঃ ডাউসানের। ঠাণ্ডা হাওয়ায় আমেজ লাগছে দেহ-মনে। সমস্ত দেহটা পাখীর ডানা-ঝাড়ার মত ঝেড়ে নিলে এক বার। তার পর আলতো করে ফাদার মরিসনের কাঁধে চাপ দিয়ে বললে ভয় নেই—মেয়েটা বাঁচবে। আফটার অল যিশুর করুণা তো ঘটেছে তার ওপর।

যেন সর-সর করে খানিকটা অস্বস্তির বৈরফক্তিল ঝরে গেল দেহ-মন থেকে ফাদার মরিসনের। ত্রস্তে মুখ তুলে উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে: ইজ ইট্?

ঘাড় নেড়ে হাসলে ডঃ ডাউসান। বললে: তবে, মেয়েটা বোধ হয় আর সুস্থ হয়ে চলে-ফিরে বেড়াতে পারবে না।

ধমক খেয়ে চোখ বুজলো ফাদার মরিসন। এতক্ষণে তার হাত উঠে এলো বুকে ক্রশ হয়ে।

প্রথম শিক্ষা

শ্রীগণেশচন্দ্র ঘোষ

ছোট শিশুকে লেখা ও পড়া শেখানো একটি কঠিন সমস্যা! আমরা তার প্রথম শিক্ষা বলতে চাই তার বিদ্যারম্ভকে অর্থাৎ যখন তাকে মুখে মুখে ও হাতে-কলমে অ, আ, ক, খ, শেখাতে আরম্ভ করা হয়।

শিশুকে লেখা ও পড়া শেখানো মানে সে যাতে লিখতে ও পড়তে পারে তাই করা। সেই শিক্ষা যা'তে সরল, সহজ ও সুন্দর ভাবে হতে পারে তারই চেষ্টা করা আমাদের বিশেষ দরকার। লেখা এবং পড়া কি ভাবে কখন আরম্ভ করা উচিত—শিশুর বয়স, স্বাস্থ্য, সংসর্গ মনোবৃত্তি ইত্যাদি বিষয় সম্যক্ বিবেচনা করে কিরূপ কি করা উচিত, সে সম্বন্ধে আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সাধারণ ভাবে শিশুকে লেখা ও পড়া শেখানো সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য।

লেখাই আগে আরম্ভ করা উচিত কিংবা পড়াই আগে আরম্ভ করা উচিত সে সমস্তও বিবেচনার বিষয়। "লেখাপড়া"—আগে লেখা পরে পড়া। আমাদের মতে যদি লেখা শেখানো আগে আরম্ভ করা সম্ভব না হয়, অন্তত: একসঙ্গে লেখা ও পড়া শেখানো আরম্ভ করা উচিত। লেখা অভ্যাস করতে একটু দেরি হয়; কেন না, লেখা হাতের কাজ এবং পড়া মনের ও মুখের কাজ। মন এবং মুখ দুই-ই হাত অপেক্ষা দ্রুত চলে। সেই জন্য অনেক সময় দেখা যায়, অনেক শিশু বেশ পড়তে পারে কিন্তু লিখতে পারে না এবং লেখাও সুন্দর হয় না। কাজেই লেখা শেখানোর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত।

আমাদের দেশে পূর্বকালে একটা ভাল দিনক্ষণ দেখে শিশুর বিদ্যারম্ভ করার একটা প্রথা ছিল। কোন কোন পরিবারে সে প্রথা এখনও আছে। এই বিদ্যারম্ভের সময় শিশুর "হাতে-খড়ি" দেওয়া হতো। এই প্রথাকে "হাতে-খড়ি" ও বলে। এই "হাতে-খড়ি" দেওয়ার অর্থ বিদ্যারম্ভের সময় লেখা আরম্ভ করতে হয়। অবশ্য বিদ্যারম্ভের পূর্বে শিশুকে ছোট ছোট ছড়া ও কবিতা শেখানো হতো ও এখনও হয় এবং শেখানো উচিতও। কিন্তু সর্বদাই লক্ষ্য রাখা দরকার, শিশু যেন কথা স্পষ্ট করে বলে—মিন মিন না করে।

কেহ কেহ বলেন, অক্ষর পরিচয় না হ'লে শিশু লেখা আরম্ভ করবে কি করে? কিন্তু অক্ষর পরিচয় না হলেও শিশু লেখা আরম্ভ করতে পারে—সোজা সোজা দু'-চারটা অক্ষর সে লিখতে অভ্যাস করতে পারে; যেমন ব ত ঠ ইত্যাদি। প্রথমত: 'ব' লেখাটা অভ্যাস হয়ে গেলে ক র ধ ঝ ঋ ইত্যাদি লেখা খুব সোজা হয়। আসল কথাটা হচ্ছে—এই লেখাটা অভ্যাস করানো যায় কি উপায়ে। প্রত্যেক শিশুই পেনসিল বা কলম দিয়ে হিজিবিজি করতে ভালবাসে। এই হিজিবিজিটা যাতে লেখায় পরিণত হয় সেই চেষ্টা করা উচিত। অনেক ভাবে এই চেষ্টা করা হয়—শিশুর হাতে পেনসিল কিংবা কলম দিয়ে তার হাত ধরে লেখানো, অক্ষর লিখে দিয়ে তার ওপর মকশো করানো, ফুটকি ফুটকি (......) দিয়ে অক্ষরের আকৃতিটা করে দিয়ে তার ওপর দিয়ে লাইন টানানো ইত্যাদি অনেক রকম উপায় সব দেশেই করা হয়ে থাকে।

আমরা ছেলেবেলায় কলার পাতায় ওপর লেখায় মকশো করেছি—যাঁর লেখা ভাল তিনি একখণ্ড খাপরা দিয়ে কলার পাতার ওপর অক্ষরগুলির দাগ বসিয়ে দিতেন, আমরা কঞ্চির কলম দিয়ে তার ওপর হাত ঘোরাতাম।

এই সব উপায়ের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে শিশুর হাত ঠিক করা—হাত যাতে ঠিক ভাবে লাইনগুলি বসাতে পারে—শিশুর পেনসিল বা কলম যাতে লাইন ছেড়ে এদিক ওদিক না যায় তাই করা। আমাদের মতে এই হাত ঠিক করবার শ্রেষ্ঠ উপায় অক্ষরের লাইনগুলি একটু গর্ত করে বসিয়ে দেওয়া। কলার পাত' কিংবা তাল পাতার ওপর খাপরা কিংবা অন্য কোন শক্ত কিছু দিয়ে অক্ষরগুলি লিখে দিলে এই উদ্দেশ্য কতকটা সাধিত হয়। কাঠের ওপর কিংবা মোটা কার্ডবোর্ডের ওপর ঠিক ভাবে অক্ষরগুলি খুদে দিতে পারলে শিশুর পক্ষে খুব সুবিধা হয়—কলম বা পেনসিল এদিক ওদিক যেতে পারে না। এক খণ্ড মোটা কার্ডবোর্ডের ওপর ছুরি বা নরুণ দিয়ে অক্ষরগুলি গর্ত করে কেটে দিয়ে আমরা কয়েকটি শিশুর লেখা অভ্যাস করিয়ে দেখেছি, তারা খুব শীঘ্রই লিখতে শিখে গেলো; প্রচলিত পদ্ধতিতে চেষ্টা করে' তারা শিখতে পারছিল না।

আমরা একটু আভাস দিলাম মাত্র শিক্ষক ও অভিভাবক মহাশয়রা আরও উপায় ঠিক করে নিতে পারেন। যাতে শিশুর লেখা সুন্দর হয় এবং যাতে সে একটু তাড়াতাড়ি লিখতে পারে, সে দিকে দৃষ্টি রাখাও বিশেষ দরকার। অক্ষরগুলির মাত্রা দেবার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত—কোন কোনও শিশু অক্ষরে মাত্রা না দিয়েই লেখে। "যা কিছু করবে তা' সুন্দর করে' করবে" এ শিক্ষা যাতে শিশু গোড়া থেকেই পায় সেটা করা আবশ্যক। এ বিষয়ে একটি মায়ের উৎসাহ চেষ্টা, যত্ন ও ধৈর্য দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। শিশুর প্রথম শিক্ষা তার মায়ের কাছেই সুন্দর ভাবে হতে পারে, যদি মায়ের সেদিকে আগ্রহ ও চেষ্টা থাকে।

লেখা খারাপ থাকার জন্য কোন কোনও ছাত্রকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হ'তে দেখেছি, যদিও তারা প্রশ্নের উত্তর বেশ ভাল দিয়েছিল। পরীক্ষক যদি লেখা পড়তেই না পারলেন, তবে নম্বর দেবেন কি করে!

শিশুকে আমরা যতোটা অজ্ঞ মনে করি বাস্তবিক সে ততটা অজ্ঞ নয়। তার দিকে একটু ভালো করে লক্ষ্য রাখলে এবং তাকে একটু ভালো ক'রে বুঝাবার চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাই সে অনেক কিছু বোঝে। তার ভিতরে অনেক কিছুই আছে। সেইগুলিকে স্বাভাবিক ও সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলাই তার শিক্ষা।

শিশুকে পড়তে শেখানোর বেলায়ও একথা আমাদের বেশ মনে রাখা উচিত। শিশুকে পড়া শেখানোর প্রথম এবং প্রধান কাজ, তাকে ঠিক ভাবে অক্ষরগুলি শেখানো—অর্থাৎ একটি অক্ষর দেখা মাত্রই সে যাতে তার ঠিক উচ্চারণ স্পষ্ট সহজ ও সুন্দর ভাবে করতে পারে—তাই করা। কিন্তু অক্ষরগুলি ঠিক ঠিক উচ্চারণ না করে আমরা কতকগুলি অবান্তর কথা দিয়ে শিশুর স্মরণশক্তিকে ভারাক্রান্ত করি এবং তার মনকে বিভ্রান্ত করে দিই।

সংস্কৃত ও হিন্দি ভাষায় অক্ষরগুলির ঠিক ঠিক উচ্চারণ শেখাবার চেষ্টা করা হয় এবং সেই জন্য অবান্তর কথাও অক্ষরের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় না। বাঙলা ভাষায় অক্ষরগুলির ঠিক ঠিক উচ্চারণ আমরা করি না; তাহলেও যে ভাবে আমরা সাধারণত: উচ্চারণ করি, সেই ভাবেই উচ্চারণ করতে শেখালেই চলে।

অনেক স্থলেই দেখেছি, যখন অক্ষর পরিচয় আরম্ভ করা হয় তখন প্রথমেই শিশুকে বলতে শেখানো হয় স্বরবর্ণের বেলায় 'স্বরে অ' 'স্বরে আ', 'হ্রস্ব ই', 'দীর্ঘ ঈ' হ্রস্ব উ', দীর্ঘ ঊ' ইত্যাদি। এই ভাবে শিশু শেখে 'অ' কে 'স্বরে অ', আ'কে 'স্বরে 'আ' ইত্যাদি বলতো। ব্যঞ্জন বর্ণের বেলায়ও তেমনি শেখানো হয় 'জ' কে 'বর্গীয় জ', 'য' কে 'অন্তস্থ য', 'ণ' কে 'মূর্ধণ্য ণ' 'ন' কে 'দন্ত্য ন', 'র'কে 'বয়ে শূন্য র, সেইরূপ 'ডয়ে শূন্য ড়', 'ঢয়ে শূন্য ঢ়' 'তালব্য শ,' 'মূর্ধণ্য ষ, 'দন্ত্য স,' 'খণ্ড' ত ইত্যাদি। এইরূপে শিশু কতকগুলি অক্ষরের প্রকৃত উচ্চারণ না শিখে, শেখে তাদের বিকৃত নাম। অবশ্য বাঙলা ভাষায় এ রকম করে অক্ষর শেখানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে একই ভাবে উচ্চারিত দুই-তিনটি বর্ণের বিভিন্নতা দেখানো। কারণ বর্ণের শুধু প্রচলিত উচ্চারণটি শেখালে শিশুর অসুবিধা হয় শব্দের বানান বলতে।

আমরা সাধারণতঃ দেখতে পাই, অক্ষর পরিচয়ের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যই যেন ঠিক ভাবে বানান বলতে পারা এবং শিশু কি রকম লেখা-পড়া করে তার পরীক্ষাই হচ্ছে তাকে শব্দের বানান জিজ্ঞাস করা। কোন ভদ্রলোক শিশুকে জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কি বই পড়?" শিশু যখন বলে, 'বর্ণ পরিচয়,' তখন ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা, বানান করতো অজ?" শিশু বলে, "স্বরে অ, বর্গীয় জ—অজ," তখন শিশুকে বাহবা দেওয়া হয়। সেই শিশুকেই যখন 'শরণ' শব্দটা দেখিয়ে পড়তে বলা হলো, তখন সে ঘাভাতে লাগলো—"তালব্য শ, বয়ে শূন্য র, মূর্ধণ্য ণ—অ্যা—অ্যাঁ" ইত্যাদি। পড়তে আর সে পারলো না। তখন তাকে বলে দেওয়া হলো 'শরণ'। সে সেটা ঠিক মনে করে রাখলো। শিশুদের স্মরণশক্তি ও অনুকরণ শক্তি খুবই প্রবল। পরে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো "শরণ বানান করতো?" শিশু বললো, "তালব্য শ, বয়ে শূন্য র, মূর্ধণ্য ণ—শরণ"; শিশুকে বাহবা দেওয়া হ'লো। অবশ্য শিশু বাহবা পাবার যোগ্যই; কেন না, তাকে যা শেখানো হয়েছে সে তা ঠিক বলতে পেরেছে—বানান বলতে সে পারে; পড়তে সে পারে না; শব্দগুলি সে মুখস্থ করে এবং বানানও মুখস্থ বলতে ও পড়তে পারে। মোটের ওপর শিশুকে শেখানো হয় কতকগুলি বানান মুখস্থ করতে, যাতে সে মোটেই আনন্দ পায় না।

শিশুকে এই ভাবে অক্ষর পরিচয় করানো ও বানান শিক্ষা দেবার আমরা বিরোধী। আমাদের মতে অক্ষর পরিচয় করানোর প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে শিশুকে পড়তে (Reading) শেখানো; বানান শিক্ষা পরে হ'তে পারে। একখানা বই হাতে পেলে শিশু সেখানা পড়তে চায়—এই ইচ্ছাটা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছাটা যতো শীঘ্র পূর্ণ হয় ততোই তার আনন্দ বেশী হয় এবং পড়বার উৎসাহও বেড়ে যায়। কিন্তু শুষ্ক বানান মুখস্থ করায় তাকে আবদ্ধ রেখে তার উৎসাহ ও আনন্দ নষ্ট করা হয়। প্রথম হতেই পড়তে শেখানোর পদ্ধতির দিকে লক্ষ্য রেখে শিশুকে শিক্ষা দিয়ে অনেক স্থলেই আমরা বেশ সুফল পেয়েছি।

অক্ষরগুলির উচ্চারণ শেখাবার সময় যে সব অক্ষরের উচ্চারণ একই ভাবে করা হয়, সেই সব অক্ষরের বিভিন্ন আকার বোঝাবার

হ্রস্ব, দীর্ঘস্বর বর্গীয়, অন্তস্থ ইত্যাদি কতকগুলি অবান্তর কথা বলবার ও শেখাবার দরকার নাই—ণ এবং ন একই ভাবে উচ্চারিত হোক, সেইরূপ জ ও য একই ভাবে এবং শ, ষ, স একই ভাবে উচ্চারিত হোক এবং ই, ঈ একই ভাবে এবং উ, ঊ একই ভাবে উচ্চারিত হোক তাতে ক্ষতি নাই। পরে যখন শিশু বানান বলতে শিখবে তখন বিভিন্নতা বলে দিলেই চলতে পারে। তখন গোলমাল হবার আশঙ্কা থাকে না ; কেন না, তখন শিশু পড়তে শিখে যায়। ঋ, ৯, ৠ বাঙলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় না ; কাজেই এই তিনটি বাদ দিলেই চলে।

অক্ষরগুলির সাংকেতিক চিহ্ন শিশুকে বুঝিয়ে দিতে হয়। বোঝালেই সে বুঝতে পারে। 'অ'এর সাংকেতিক চিহ্ন নাই। 'আ' এর সাংকেতিক চিহ্ন ' া ' আকার ; সেইরূপ ি, ী, ু (গ ু = গু, শ ু = শু, র ু = রু, হ ু = হু,) ূ (র ূ = রূ), ৃ (হ ৃ = হৃ,) ে, ৈ, ো, ৌ। স্বরবর্ণের এই সাংকেতিক চিহ্নগুলি কি ভাবে ব্যঞ্জন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কিরূপ উচ্চারিত হয়, তা একটু সাহায্য পেলেই শিশু বুঝতে ও বলতে পারে। ব্যঞ্জন বর্ণের মধ্যেও যুক্তাক্ষরের কতকগুলি সাংকেতিক চিহ্ন আছে, যেমন ট্র, ত্ত, ঙ্গ, দ্দ, ন্ধ, ্য, স্থ, হ্ন, ত্র, ক্র, ভ্র, ভ্রূ ইত্যাদি। ং, ঃ, ঁ, ৎ এইগুলির উচ্চারণ অনুস্বর, বিসর্গ, চন্দ্রবিন্দু খণ্ড ত না বলে শুধু যে ভাবে উচ্চারিত হয় অর্থাৎ অং, অঃ, অঁ, ত বললেই চলে।

অক্ষর পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে ১ হইতে ২০ বা ততোধিক সংখ্যা পরিচয় করানোও দরকার।

শিশু যখন বর্ণগুলির উচ্চারণ, আকৃতি ও সাংকেতিক চিহ্নগুলির সহিত বেশ ভাল ভাবে পরিচিত হয়, তখন সে নিজেই পড়তে পারে ; অবশ্য সময় সময় তাকে একটু সাহায্য করতে হয়—কোথায় শব্দের কোন অক্ষরের উচ্চারণ হসন্ত হবে, কোথায় হবে না, কোথায় জোর দিতে হবে ইত্যাদি বিষয় বলে দিতে হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে শিশু যেন না ঘ্যাঙায় ও সুর করে না পড়ে ; শিশুকে দিয়েই শব্দগুলি পড়াতে চেষ্টা করতে হবে, তাকে একটু একটু সাহায্য করে।

এমনি করে সব জিনিসই শিশুকে দিয়ে করাতে চেষ্টা করলে দেখা যায় শিশু অনেক কিছুই করতে পারে, কেবল মাঝে মাঝে একটু সাহায্য আবশ্যক হয়। প্রত্যেকটি জিনিস শিশুকে বলে দিয়ে তাকে দিয়ে সেইটি মুখস্থ করানো তাকে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া নয়, তার নিজেকে দিয়ে যতোটা করানো যায় সেইটাই তার আসল শিক্ষা।

শিশু যে সব শব্দ পড়ে তাদের কোন কোনটার মানে মাঝে মাঝে বলে দেওয়া উচিত—মুখস্থ করবার জন্য চাপ দেওয়া উচিত নয়। যখন সে পড়ে যাবে তখন সে নিজেই অনেক কথার মানে জিজ্ঞাসা করবে। আগে থেকে মানে কিছু কিছু জানা থাকলে সে পড়তে বেশ আনন্দ পাবে। যখন সে পড়তে (Reading) আরম্ভ করবে, তখন বিরাম-চিহ্নগুলির (, ; । ? ! — " ") সহিত তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার সময় শিশুকে শব্দের বানান জিজ্ঞাসা না করাই উচিত। তাকে কথাটা লিখে দেখাতে বলাই ভালো। সেই জন্য পূর্বে বলা হয়েছে লেখা যতো শীঘ্র শেখাতে আরম্ভ করা যায় ততোই ভালো। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখতে পারলে খুবই ভালো হয়। তা'হলে শ্রুতলিপি লেখা প্রথম থেকেই চলতে পারে এবং তাতে বানানও অনেকটা ঠিক হয়। প্রথম থেকেই শ্রুতলিপি লেখানো বিশেষ দরকার এবং এই কাজটি অনেক দিক দিয়েই বিশেষ উপকারী।

এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি, অল্প সময়ের মধ্যেই সুফল পাওয়া যায়—অনেক শিশু এমন ভাবে (Reading) পড়তে পারে, যা তাদের চেয়ে বড় শিশুরাও অনেকে পারে না।

আমাদের বক্তব্যটা আমরা সংক্ষেপেই শেষ করলাম। কেন না, খুঁটিনাটি সব বিষয় লিখে প্রকাশ করা শক্ত। জিনিসটা হলো Practical—কাজে দেখাবার। আমরা মোটামুটি কথাটা বললাম।

এতেই শিক্ষক ও অভিভাবক মহাশয়রা ঠিক করে নিতে পারবেন, কি করতে হবে। তাঁদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই পদ্ধতিটা অনুগ্রহপূর্বক একটু চিন্তা করে দেখেন। তা'হলে তাঁরাও এর ভিতর অনেক তথ্য বের করতে পারবেন, যাতে শিশুদের শিক্ষার ধারা আরও সুগম হবে। তাঁরা যেন শিশুর আনন্দ ও মনস্তত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন।

ব্লটিং পেপারের জন্মবৃত্তান্ত

আজকের যুগে ব্লটিং পেপার বা শোষ কাগজের ব্যবহার সর্বব্যাপক। অথচ এই কাগজটি কোন্ কালে কি ভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল, এ তাকিয়ে দেখছে ক'জনা ?

ষোড়শ শতাব্দীতেও কোন না কোন ধরণের ব্লটিং পেপার ছিল, প্রমাণ পাওয়া যায়। তখনকার দিনের এটনের ভাইস-প্রভোষ্ট উইলিয়ম হোরম্যান এক স্থলে লিখে গেছেন—লেখা যেন ছড়িয়ে বিশ্রী না হয়ে যায়, সেই জন্যই ব্লটিং পেপারের ব্যবহার। কিন্তু আধুনিক জগতে যে ধরণের ব্লটিং পেপার বা শোষ কাগজের চলতি অর্থাৎ দিন-রাত তার ব্যবহার চলছে আমাদের ঘরে ও বাইরে, সে আবিষ্কৃত হয়েছে, আসলে গত শতাব্দীর প্রথম পাদে মাত্র এবং শুনলে আশ্চর্য্য হ'তে হবে যে, এ আবিষ্কারটি হয় ঘটনাচক্রে ও একটি ভুলের দরুণ। অভিশাপ যে আশীর্বাদও হয়ে দাঁড়ায়, কখনও কখনও, এ ক্ষেত্রে তাই হয়েছিল।

ঘটনাটি এই ভাবে ঘটেছিল জানতে পারা যায়। বার্কসায়ার কাগজের মিলে একজন কর্ম্মী কাজ করে চলছিল। লিখবার কাগজ তৈয়ারী করাই ছিল তার তখনকার কাজ। কিন্তু এই কাজের সময় তার একটি মজাদার রকমের গলতি হয়ে যায়। লিখবার কাগজ তৈয়ারী করতে একটি রাসায়নিক পদার্থ মিশাতে হয়। সেদিন মিলের এই কর্ম্মীটি কাগজে এই পদার্থ মিশাতে ভুলে গিয়েছিল। এর ফলে এমন একটি কাগজ তৈয়ারী হ'ল—যার উপর ঠিক ঠিক লেখা চলে না। এই কাগজটি ব্লটিং পেপারে পরিণত হল, শেষ পর্য্যন্ত বাজারে এর চাহিদা হতে লাগল দিন দিন। এই থেকেই দেখা যাচ্ছে—সেকালের মিলকর্মীর অনিচ্ছাপ্রসূত একটিমাত্র ভুলের পরিণতিতে ব্লটিং পেপারকে অগত্যা এতখানি আপনার করে পেতে পারলাম।



—বিবেকানন্দ-স্তোত্র—

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সুমণি মিত্র

২৫

স্বামিজীর মেধা দেখে পল্ ডয়সন্
পেট ভরে ভড়কানি খান্ ;
ক্ষেত্রীর সিংহাসনে
মহারাজ হড়কানি খান্,
ঘাবড়ান্ মীরাটের লাইব্রেরিয়ান্,
হরিপদ মিত্র মহাশয়
চোখ দুটো কপালে তুলুন,
'মানুষের শক্তি নয়' বোলে
স্বামি-শিষ্য ১ নিশ্চিন্ত হোক্,
তাবোলে পাঠক,
স্বামিজীর শক্তিমত্তায়
রুগ্ন কৌতূহল নিয়ে
মোহগ্রস্ত হোয়োনাকো তাতে।
স্বামিজীর শক্তিকে অলৌকিক বোলে
লাঞ্ছিত কোরোনাকো
স্বামিজীর মহাসত্তাকে,
লাঞ্ছিত কোরোনাকো
মানুষের মনুষ্যত্বটাকে,
লাঞ্ছিত কোরোনা তোমাকে !

* * *

"সর্বনেশে স্মৃতিশক্তি পেলেন কি ভাবে ?"
ডয়সনের প্রশ্নের জবাবে
স্বামিজী যা বোল্লেন, তার মানে এই—
একাগ্রমনের কাছে
অলৌকিক বোলে কিছু নেই।
"There upon
The conversation
Turned upon
The subject of concentration
Of the mind
As practised by the Indian Yogi,
And that
With so much perfection
That
In that state
He would be unconscious
Even if
A piece of burning charcoal
Were placed on his body."২

* * *

এখানে প্রশ্ন ওঠে এই—
স্বামিজীর আছে যেটা
আমাদের কেন সেটা নেই ?
দুর্নিরোধ মনটা যে অজস্র বাসনার দাস,
অনেকের মোহ ছেড়ে
একাগ্রতা আসে কি হঠাৎ ?

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্।"৩

লৌকিক প্রশ্নটা 'মহাবাহু' তুল্লেন যাঁকে
'দৈবের কৃপা' বোলে 'ভগবান' ভোলাননি তাঁকে।

"অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে।"৪

১। 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' প্রণেতা স্বামিজীর গৃহীশিষ্য শ্রীশরৎচন্দ্র চক্রবর্তী।

২। তার পর তাঁদের (স্বামিজী ও দার্শনিক ডয়সন্) কথাবার্তায় মনঃসংযোগের কথা উঠলো, যা' ভারতীয় যোগী চর্চা কোরে থাকেন। সিদ্ধাবস্থায় তাঁর গায়ে এমন কি একটা জলন্ত কাঠ-কয়লাও যদি রেখে দেওয়া হয়, তাহলেও তাঁর কোনো হুঁসই আসবে না।

—The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples.

৩।—"হে কৃষ্ণ, মন অতি চঞ্চল, প্রবল এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিক্ষেপ আনে। এই মনকে বিষয়বাসনা থেকে নিবৃত্ত করা অত্যন্ত কঠিন। সেই জন্যে ওর নিরোধ আকাশের বাতাসকে পাত্রবিশেষে আবদ্ধ করার মত দুঃসাধ্য বোলে আমি মনে করি।"

৪।—"হে মহাবাহো, মন যে দুর্নিরোধ ও চঞ্চল, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়, ধ্যানাভ্যাস এবং বিষয়-বিতৃষ্ণার সাধনার দ্বারা মনকে সংযত করা যায়।"—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

দু'জনের দু'টো কথা ঐ ভাখো মিলে গ্যাছে ঠিক,—
কৃষ্ণের 'অভ্যাসেন' স্বামিজীর 'as practised.'

২৬

তবু কথা আছে।
ইন্দ্রিয়ে আসক্ত মন
এক ছেড়ে অনেককে চাটে;
'অভ্যাসে' যে দৃঢ় হবো,
সে-শক্তিটা আসে কোথা থেকে?
অভ্যেসের চাবিকাঠি বলো কিসে পাবো?

"ব্রহ্মচর্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্যলাভঃ"।৫

* * *

শাস্ত্র যা বোলেছেন
সেইভাবে চোলে,
শাস্ত্রের সত্যতা হাতে নাতে অনুভব কোরে
স্বামিজী তা বোলছেন সাদা বাংলাতে,—
"খাদ্যের সারভাগ থেকে
প্রস্তুত হয় যে রেত,
ফের তাকে কর assimilate. ৬
তা যদি পারিস,
বারো বছরেই,
মেধা-নাড়ি খুলে যাবে যেই,
মুহূর্তে আয়ত্ত হবে সমস্ত বিদ্যেই;
শ্রুতিধর স্মৃতিধর হোবি।
ব্রহ্মচর্যে পাকা হোলে
তার চেয়ে আরো বড়ো হোবি;
সংক্ষেপে সর্বশক্তিমান।
তোদের বিবেকানন্দ তারই পরিণাম"।

* * *

বাস্তবিকই তাই,
নইলে 'বেদান্ত-বাদ' ভূয়ো হোয়ে যায়।
অলৌকিক বোলে কিছু নেই
লৌকিক অলৌকিক
প্রকাশের তারতম্যেই।
ঋষিত্ব দেবত্ব শুধু স্বামিজীরই নয়,
আমাদেরও আছে।
উপযুক্ত চর্চা নেই বোলে
আমাদের দেবসত্তা
আপাতত ঢোলে!
অভ্যেস ও চেষ্টা নেই তাই
আমাদের সিংহসত্তা বিকশিত নয়।

ব্রহ্মচর্যে, একাগ্রনিষ্ঠায়,
তপস্যা বা লৌকিক চেষ্টায়
ব্রহ্মসত্তা যেদিন জাগাবো,
মাথায় পাগড়ি পোরে এই আমরাও
হুহুংকারে পৃথিবী কাঁপাবো।

২৭

যে যা ভাবে তাই হয়—এটা মনে রেখো।
নিজেকে যে ভাবে হীন—সেই জুতো-খেকো!
সব চেয়ে সেরা পাপ স্বামিজীর মতে
নিজেকে বা অন্যকে 'পাপী' ভাবাটাতে।
আসলে যা নই তাকি বোললেই মানি?
'পাপবাদ' ইংল্যাণ্ড মানে কতোখানি?
নিজেদের 'পাপী' বোলে যদি মেনে নিতো,
দুনিয়া শাসন করা কবে ঘুচে যেতো!
এতদিনে নিগ্রোর জাত ভাই হোয়ে
ক্রীতদাস বোনে যেতো নিঃসন্দেহে!

* * *

শক্তি-সবল এক প্রকাণ্ড বাঘ
'চিকাগো'র মেষপালে সেদিন হঠাৎ
ঘাস-খেকো বাঘেদের নিরিমিষ মনে
রক্তের স্বাদ দিয়ে নিয়ে যায় বনে।
যবনের মূঢ়তার যবনিকা ঠেলে,
কান ধোরে বোলে দ্যায় তারা কার ছেলে;— ৭
"Hindu refuses to call you sinners.

৫। "ব্রহ্মচর্যে প্রতিষ্ঠিত হোলে বীর্যলাভ হয়"।—রাজযোগ।
৬। হজম।

৭। ঠাকুর স্বামিজীদের সিংহসত্তা জাগাবার জন্যে, তাৎপর্যে তীক্ষ্ণ অপূর্ব একটা গল্প বোলতেন: 'একটা ছাগলের পালে বাঘিনী পোড়েছিলো! একটা শিকারী তাকে মেরে ফেল্লে। অমনি তার প্রসব হোয়ে ছানা হয়ে গ্যালো। ছানাটা ছাগলের পালের সঙ্গে মানুষ হোতে লাগলো। ছাগলও ঘাস খায়, বাঘের ছানাও ঘাস খায়। তারাও ভ্যা-ভ্যা করে, সেও ভ্যা-ভ্যা করে। ক্রমে ছানাটা বড়ো হোলো। একদিন ঐ ছাগলের পালে আর একটা বাঘ এসে পোড়লো। বাঘ তো ঘাসখেকো বাঘটাকে দেখে অবাক! সে দৌড়ে এসে তাকে ধোরলে। সেও প্রাণপণে ভ্যা-ভ্যা কোরতে লাগলো! বাঘটা তাকে টেনে-হিঁচড়ে জলের কাছে নিয়ে গ্যালো। বোল্লে,—এই জলে তোর মুখ ভাখ, আমারও যেমন হাঁড়ির মত মুখ, তোরও তেমনি। আর এই নে, খানিকটা মাংস—খা। সে প্রথমে কিছুতেই খাবে না, শেষে রক্তের স্বাদ পেয়ে খেতে লাগলো। বাঃ, বেশতো খেতে—এ যে দেখছি একেবারে স্বভাবের খাদ্য! তখন আততায়ী বাঘটা বোল্লে, এখন বুঝেছিস তো, আমিও যা তুইও তাই। এখন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।' [ছাগলের পালে বাঘের ছানা মানে আত্মবিস্মৃত অমৃত-পুত্র। ঘাস খাওয়া মানে অসার কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে থাকা। আততায়ী বাঘ আসা মানে সদ্‌গুরু লাভ। জলে প্রতিবিম্ব দর্শন মানে স্বরূপ-দর্শন।]

Ye are the children of God,
Sharers of immortal bliss,
Holy and perfect beings.
Ye are the divinities on earth.
Sinners ?—
It is a sin to call a man so.
It is a standing libel
On human nature.
Come up, O lions,
And shake off the delusion
That you are sheep," ৮

২৮

আমরা যে 'ভেড়া' নই, জাতে 'পশুরাজ'
প্রথমেই চাই এতে দৃঢ়বিশ্বাস।
তুচ্ছ বালির মত ছোটো বীজটাই
একদিন বটগাছে বিকশিত হয়।
ডারউইন্-কল্পরা ঘাবড়োনা যেন,
বলো দেখি, বালি থেকে হয়নাকো কেন ?
তার মানে বীজে ঐ বটমহাশয়
ন্যাকা সেজে নিঃসাড়ে থাকে নিশ্চয়।
তাই তার ছায়া-ঘন ক্রম-পরিণাম
বাঁদর ও মানুষের—দুয়েরই আরাম।
এবার যা বোলি সেটা শোনো ভালো ভাবে
'ডারউইনি থিওরির' লাঞ্ছনা যাবে।
আমরা যে বাঁদরের 'ক্রমপরিণাম',
তাহোলে তো আমরাও বাঁদরে ছিলাম।
আমাদের বুদ্ধও ছিলেন যখন,
বাঁদরের বোধিটাও মানো বাছাধন।
বুদ্ধের বীজ যদি বাঁদরে না থাকে,
বুদ্ধের সাধ্য কি বাঁদরামি ছাড়ে।
যেটা নেই, তার আবার পরিণতি কিসে ?
বেকারের 'প্রোমোশান' হয় কি আপিসে ?
যেটা যার নেই তার আগাগোড়া নেই,
বালি শাখায়িত নয়—সেই কারণেই।
স্বামিজীর 'থিওরি'টা আরো পালোয়ান,
'ডারউইনি থিওরির' 'evolution'. ৯

'ক্রম-পরিণামবাদ' 'ক্রম-সঙ্কোচে',
বুদ্ধ ও বাঁদরের সীমারেখা মোছে।
"Every evolution
Presupposes an involutiou.
Nothing can be evolved
Which is not already there...
If purity
Has not been the nature of the soul,
It can never attain to purity...
If impurity is the nature of man
Then
He will have to remain impure,
Even though
He may be pure for five minutes.
The time will come
When this purity will wash out,
And the old natural impurity
Will have its sway once more."১০

২৯

স্বামিজীর দৌলতে জানা গ্যালো আজ,
আমরা 'বাঁদর'ও নই, জাতে 'পশুরাজ'।

জানলেই হবে শুধু ? বাঁদরামি যাবে ?
দুধেতে মাখন আছে, জানলেই হবে ?
দুধটাকে দই পেতে করো মন্থন,
তবে তো মাখন খেয়ে মোটা হবে ধন।
সিদ্ধি সিদ্ধি বোলে চ্যাঁচালে কি হবে ?
সিদ্ধিটা কিনে এনে বেটে খেতে হবে।
নিজেকে চিনতে হবে তপস্যা বলে ;
বড়ো মাছ চাও যদি চার ফ্যালো জলে।

স্বামিজীও একদিনে হননিকো বড়ো।
দয়া কোরে মন দিয়ে ইতিহাস পড়ো।
পাগড়ি-পরার ঐ চাপরাস্ পেতে
কালঘাম ছুটে গ্যাছে ছেলেব্যালা থেকে।

---

৮ "হিন্দুরা তোমাদের 'পাপী' বোলতে নারাজ। তোমরা হোচ্ছো ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র এবং নির্দোষ। মর্ত্যলোকের দেবতা তোমরা। কি ? তোমরা পাপী ?—মানুষকে পাপী বলাটাই হোচ্ছে এক মহাপাপ। বিশুদ্ধ মানবাত্মায় মিথ্যে কলঙ্ক আরোপ করা। তোমাদের সিংহসত্তা জাগাও, আর নিজেদের ভেড়া মনে করার মিথ্যে জ্ঞানটাকে দূর কোরে দাও।"—The Chicago Addresses. (চিকাগো বক্তৃতা)

৯। ডারউইনের 'ক্রম-পরিণামবাদ', 'ক্রম-বিকাশবাদ' বা 'ক্রম-বিবর্তনবাদ'। Darwin's theory of Evolution.

১০। "প্রত্যেক ক্রম-বিকাশের গোড়াতেই একটা ক্রম-সঙ্কোচ প্রক্রিয়া আছে। যে জিনিষটা গোড়া থেকেই নেই, তার কখনো ক্রম-বিকাশ হোতে পারে না।" (জ্ঞানযোগ)

পবিত্রতা যদি আত্মার স্বরূপ না হয়, তবে তা' কখনোই পবিত্র হোতে পারে না। মানুষ স্বভাবতই যদি অশুদ্ধ হয়, তবে ক্ষণিকের জন্যে শুদ্ধ হোলেও, চিরকাল তাকে অশুদ্ধই থাকতে হবে। এমন সময় আসবে যখন তার এই পবিত্রতা ধুয়ে-মুছে যাবে, আর সেই প্রাচীন স্বাভাবিক অশুদ্ধতা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে।"
—Lectures from Colombo to Almora. পৃঃ ৩১২।

It took me thirty years...
Thirty years of hard struggle.
Sometimes I worked at it
Twenty hours during the twentyfour,
Sometimes I slept
Only one hour in the nights,
Sometimes I worked whole nights...
Sometimes
I had to live in caves...
Met starvation face to face
For fourteen years...
Dared to live
Where the thermometer registered
Thirty degrees below zero...

Many times
I have been in the jaws of death,
Starving, footsore, and weary;
I would sink down under a tree,
And life would seem ebbing away;
Bt at last
The mind reverted to the idea:
'Assert thy strength...
Regain thy lost empire!'

And I would rise up,
Reinvigorated,
And here am I living today." ১১

৩০

স্বামিজীও চেষ্টার 'ক্রম-পরিণাম'।
তাই বোলছিলাম
লৌকিক চেষ্টার সেরা ফলটাকে
অলৌকিক ভেবে
মানুষের সীমাহীন শক্তিমত্তায়
অনাস্থাপর হওয়া
আহম্মকি ছাড়া কিছু নয়।
চেষ্টাবিমুখ যারা, সমাজের ক্লীব,
তাদেরই রিক্ত মনে
সব কিছু অতি প্রাকৃতিক।
ঘর্মাক্ত তিরিশ দিন পার হোয়ে গেলে
আপিসের মাইনেটা যেই হাতে পেলে
অলৌকিক পেলে কিছু হাতে?
খেটেখুটে গাছে চোড়ে
'আমলকী হাতে পেলে'
আর কি সে অলৌকিক থাকে?
অতএব, দোহাই পাঠক,
অলৌকিক ভেবোনাকো
স্বামিজীর মহাশক্তিটাকে।

* * *

একথাও ভুলো না তাহোলে,
"ইহাসনে শুষ্যতু" ১২ বা
"Assert the reality" ১৩ বোলে,
যে যেটুকু স্বামিজী বা বুদ্ধদেব হবে,
তল-পিঠ থেকে তারই
'ডারউইনি থিওরির'
লোমাক্ত লাঞ্ছনাটুকু যাবে। [ক্রমশঃ।

১১। "এই অবস্থা অর্জন কোরতে আমায় তিরিশটা বছর কঠিন সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে কাটাতে হোয়েছে। কখনো কখনো এর জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়িটা ঘণ্টা খেটেছি; কখনো কখনো সারা রাতের মধ্যে মাত্র এক ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, কখনো বা সারারাতই এই উদ্দেশ্যে খাটতে হোয়েছে। সময়ে সময়ে আমায় গিরিগুহায় কাটাতে হোয়েছে। চোদ্দো বছর ধোরে অনাহারের সম্মুখীন হোয়েছি। তাপের মান যেখানে শূন্য ডিগ্রীরও তিরিশ ডিগ্রী নীচে, সেখানেও থাকতে আমি সাহস কোরেছি। অনাহারে, রুগ্ন পায়ে এবং ক্লান্তিতে কতবার আমায় মৃত্যুর কবলে পোড়তে হোয়েছে; মনে হোয়েছে—কোনো গাছতলায় মরে পোড়ে থাকবো, প্রাণটা এই বুঝি বেরিয়ে গ্যালো। শেষটায় মন মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো,—'আত্মশক্তিকে জাগাও, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার কর!' ব্যাস, অমনি আমি নতুন শক্তিতে খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়েছি, আর এই ভাখো, সেই আমিই আজ সশরীরে বেঁচে।" —**Realisation and its methods**

১২। 'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু;' অর্থাৎ শরীর শুকিয়ে যাক, ত্বক অস্থি মাংস ক্ষয় হোয়ে যাক, কিন্তু এই আসন থেকে আমায় কেউ টলাতে পারবে না—এই অজেয় সঙ্কল্প নিয়েই বুদ্ধদেব বোধি লাভ কোরেছিলেন।

১৩। 'আত্মশক্তিকে প্রকাশ করো।'

বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য্যের তুলনায় আমাদের স্বদেশী সাহিত্যের দারিদ্র্যের পরিচয় লাভ করে হতাশ হবার অবশ্য কোনই কারণ নাই। লোকভাষা যে, কোন দেশেই রাতারাতি স্বরাট্ হয়ে ওঠে নি, তার প্রমাণ বর্ত্তমান ইউরোপের সকল সাহিত্যের ইতিহাসেই পাওয়া যায়। অপর ভাষা অপর সাহিত্যের অধীনতাপাশ থেকে, ইউরোপের কোন নব ভাষাই একদিনে মুক্তিলাভ করতে পারে নি। সাহিত্যে সম্পূর্ণ আত্মপ্রতিষ্ঠ হবার পূর্ব্বে ইউরোপের অনেক দেশেই দেশী-ভাষাকে পর পর তিনটি বাধাকে অতিক্রম করতে হয়েছে। মোটামুটি ধরতে গেলে, লোকভাষার ক্রমোন্নতির ইতিহাস হচ্ছে এই:—প্রথমত কোনও মৃতভাষার, দ্বিতীয়ত কোনও বিদেশী ভাষার এবং তৃতীয়ত কোনও কৃত্রিম ভাষার চাপ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। —প্রমথ চৌধুরী।



পদ্মধর মিশ্র

মহীশূরের সেন্‌ট্রাল ফুড টেকনোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্‌টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এমন একটি খাদ্যের উদ্ভাবন করেছেন, যা একসঙ্গে বহু উদ্দেশ্য সাধন করতে পারবে। খাবারটি একাধারে পুষ্টিকর, সস্তা এবং সহজপাচ্য। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, প্রতিদিনের নিয়মিত খাদ্যের শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগ আমরা এই বস্তুটি দিয়ে অক্লেশে পূরণ করতে পারি। বস্তুটির স্বাদ ভাল এবং দেহ-গঠন ও শরীর-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব পুষ্টিকর পদার্থের সমতাসম্পন্ন অবস্থিতি খাদ্য হিসাবে এর মর্য্যাদাকে আরও অনেক বৃদ্ধি করেছে। ১০০ গ্রাম খাদ্যে প্রোটিন আছে প্রায় ৪২ গ্রাম এবং সমবেত ভাবে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও অন্যান্য খনিজ পদার্থের পরিমাণ দেড় গ্রামের সামান্য কিছু বেশীই হবে। এছাড়াও একশ' গ্রাম খাদ্যে নিকোটিনিক এ্যাসিড, ভিটামিন এ, ভিটামিন ডি, থায়ামিন, রিবোফ্লেভিন প্রভৃতিও যথেষ্ট পরিমাণে বর্ত্তমান। এই খাদ্যটির সাহায্যে ঝোল, পুডিং, মিষ্ট পদার্থ সব কিছুই তৈরী করা চলবে। দামও খুব বেশী নয়, প্রতি সের পাঁচ সিকায় পাওয়া যাবে বলে মনে হয়।

* * *

ক্যানসার রোগের চিকিৎসায় তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহারের কথা আপনারা সকলেই জানেন। সম্প্রতি জানা গিয়েছে, তেজস্ক্রিয় ইট্রিয়াম এই চিকিৎসায় অত্যন্ত সুফলদায়ক। শান্তিপূর্ণ উপায়ে পরমাণু শক্তি ব্যবহারের গবেষণায় এই আবিষ্কার আশা করা যায়, এক মহান অবদান বলে স্বীকৃত হবে। তেজস্ক্রিয় ইট্রিয়াম দ্বারা ক্যানসারের চিকিৎসা-পদ্ধতির কথা সাধারণ ভাবে আলোচনা করছি। একটি সরু সূতোর মতো প্লাষ্টিক 'জাতীয় খোলে সামান্য একটু ইট্রিয়াম ক্যানসার আক্রান্ত স্থানে স্থাপন করা হবে। এই তেজস্ক্রিয় মৌলিকের বিকিরিত রশ্মিসমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত দেহ-কোষগুলিকে স্পর্শ করে রোগ নিরাময়ে সাহায্য করবে। কিছু দিনের মধ্যেই ঐ বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত প্লাষ্টিক জাতীয় খোলটি দেহমধ্যে বিলীন হয়ে গেলে, তেজস্ক্রিয় মৌলিকটি রোগাক্রান্ত স্থানের সংস্পর্শে এসে রোগ উপশমের জন্য চেষ্টা করবে। দেহের সাধারণ কার্য্যাবলীর ফলে দেহমধ্যে কোন কিছু স্থাপন করলে, তা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে স্থান পরিবর্ত্তন করে। কিন্তু দেখা গিয়েছে, তেজস্ক্রিয় ইট্রিয়াম তা করবে না, তাই আশা করা যায়; নিকট ভবিষ্যতেই এই ভয়াবহ রোগের চিকিৎসায় এই তেজস্ক্রিয় মৌলিকটি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করতে পারে।

* * *

আবার নতুন করে পৃথিবীকে পরিমাপ করা হয়েছে। আমেরিকার সমর-বিভাগের মানচিত্রাঙ্কন শাখার বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি পর্য্যবেক্ষণ করেছেন যে, মানুষ আগে যা পৃথিবীর পরিধি বলে জানতো, সত্যিকারের পরিধি তার চেয়ে আধ মাইল কম। ১৯০৯ সালের হিসাবে জানা গিয়েছিল যে, পৃথিবীর নিরক্ষীয় অঞ্চলের ব্যাসার্দ্ধ ৬৯৭৫৪৭৬ গজ, কিন্তু সাম্প্রতিক জরিপে দেখা যায়, বর্ত্তমানের ব্যাসার্দ্ধ আগের চেয়ে ১৪০ গজ ছোট। এই ছোট ব্যাসার্দ্ধের সাহায্যে হিসাব করেই ঐ শাখার গণিত-বিজ্ঞানী বারনার্ড চোভিটস্ পৃথিবীর পরিধি পরিমাপের নতুন ফলাফল আমেরিকার ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-সমিতির বার্ষিক-সভায় পেশ করেন। এই বিজ্ঞানী পশ্চিম-গোলার্দ্ধে আলাস্কা থেকে চিলি এবং পূর্ব্ব-গোলার্দ্ধে ফিনল্যাণ্ড থেকে দক্ষিণ-আফ্রিকা পর্য্যন্ত বহু বৃত্তখণ্ড পরিমাপ করে পৃথিবীর আকার বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন। আমেরিকা পৃথিবীর চতুর্দ্দিকের কক্ষপথে পরিভ্রমণশীল একটি রকেট স্থাপন করতে চায়। বিজ্ঞানী চোভিটস্ মনে করেন, তাঁর এই আবিষ্কারের ফলাফল মহাশূন্যে রকেট স্থাপনের গবেষণায় আমেরিকাকে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে।

* * *

যাঁরা চিংড়ী মাছ খেতে ভালোবাসেন তাঁদের এক সুখবর শোনাচ্ছি। দক্ষিণ-ভারতের মালাবার উপকূলে প্রায় ১৪০ মাইল দীর্ঘ সমুদ্রতীরে চিংড়ী মাছের এক বাসস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। 'ফুড এ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল অরগ্যানাইজেসনের' মাদ্রাজ দেশে প্রেরিত এক মৎস্য-শিকারী দলের সভ্য আইসল্যাণ্ডের প্রবীণ মৎস্য-শিকারী মিঃ জি, এস, ইললুগাসন এই অতুলনীয় আবিষ্কারটি করেছেন। 'ফুড এ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল অরগ্যানাইজেসনের' প্রধান কার্য্যালয় রোমে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে মিঃ ইললুগাসন বলেন, "সমুদ্রতীরে দেড় থেকে পাঁচ মাইল দূরে কিছু কম চার মাইল চওড়া চিংড়ীর বাসস্থান প্রায় ১৪০ মাইল দীর্ঘ উপকূল বরাবর সজ্জিত রয়েছে। ঐ অঞ্চলে জলের গভীরতা বিভিন্ন স্থানে আধ থেকে পাঁচ ফ্যাদম মাত্র। চিংড়ী মাছগুলি গড়ে চার-পাঁচ ইঞ্চি লম্বা এবং একটি যন্ত্রচালিত খোলা নৌকার সাহায্যে ঘণ্টায় সওয়া মণ মাছ ধরা সম্ভব।"

এই আবিষ্কারের দ্বারা ঐ অঞ্চলের দরিদ্র মৎস্য-শিকারীরা আর্থিক দিক দিয়ে সবচেয়ে বেশী উপকৃত হবেন। এত দিন তাঁরা জাল দিয়ে বর্ষাকালে সামান্য কিছু মাছ ধরতেন, এখন অন্যান্য ঋতুতেও দশ গুণ বেশী মাছ ধরা কষ্টকর হবে না। এর জন্য যন্ত্রচালিত খোলা নৌকার প্রয়োজন, তাই 'ফুড এ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল অরগ্যানাইজেসনের' যন্ত্রবিজ্ঞানীরা ৩০ অশ্বশক্তি সমন্বিত নৌকার নক্সাও করে দিয়েছেন। এর মধ্যেই এই চিংড়ী মাছ সংরক্ষণ এবং বিদেশে চালান দেবার জন্য একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান তৈরী হয়ে প্রাথমিক কার্য্যকলাপও সুরু হয়ে গিয়েছে।

প্রবীণ মৎস্য-শিকারী মিঃ ইললুগাসন একটি ২২ ফুট নৌকাতে মাছ ধরতে বার হয়ে এই আবিষ্কারটি করেন। তার পর স্থানীয় মৎস্য-শিকারীরা ঐ নৌকাটি নিয়ে প্রায় এক মাসে ১১৩০৬ পাউণ্ড চিংড়ী মাছ ধরেন। ঐ এক সময়েই মিঃ ইললুগাসন কর্ত্তৃক শিক্ষিত মৎস্য-বিভাগের নাবিকেরা 'ইউনাইটেড ষ্টেটস টেকনিক্যাল এসিস্‌টেন্‌স্ মিশন' কর্ত্তৃক প্রদত্ত একটি ১২ টন নৌকাতে ২০১১১ পাউণ্ড মাছ ধরতে সক্ষম হয়েছেন।

* * *


স্বাস্থ্যবান লোকেরা নিয়মিত
লাইফবয় সাবান দিয়ে
চান করে—
LIFEBUOY SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY SOAP
—এতে দৈনন্দিনের* ময়লা বীজাণু ধুয়ে সাফ করে দেয়!
* যে সব সাধারণ ময়লার সংস্পর্শে আমরা প্রত্যহ আসি, তাতেও বীজাণু থাকে আর তার থেকে রয়েছে আমাদের প্রত্যেকেরই রোগের বিপদ। সেইজন্যে স্বাস্থ্যবান লোক মাত্রেই লাইফবয় সাবান দিয়ে নিত্য ময়লা ও বীজাণু ধুয়ে নিজের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত রাখেন। লাইফবয় সাবান সেই ঝরঝরে তাজা ভাব এনে দেয়।

সম্প্রতি জেনেভাতে অনুষ্ঠিত 'ওয়ার্লড হেলথ অর্গানাইজেসন' কর্তৃক আহূত এক বিরাট সভায় খ্যাতনামা আণবিক এবং চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা পরমাণু গবেষণাগারের কর্মীদের উপর তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্ষতিকারক প্রভাবের বিষয় বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেন। সেই সভায় স্থির করা হয় যে, তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ শিক্ষাপ্রাপ্ত বিজ্ঞান-কর্মীরা ছাড়া আর কেউই ব্যবহার করতে পারবেন না। পৃথিবীতে পরমাণু-বিজ্ঞানের কার্যকলাপ যে ভাবে বেড়ে চলেছে, তাতে অনেক প্রতিনিধিই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন—ইউরোপের নদীগুলি যে কোন সময়েই তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংস্পর্শে এসে মানব-বসতিপূর্ণ এই বিরাট অঞ্চলে ভয়াবহ বিপদের সঞ্চার করতে পারে। তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলিকে নিরাপদ স্থানে পাঠানোর দায়িত্ব গ্রহণের জন্যও অনেক বিজ্ঞানী 'ওয়ার্লড হেলথ অর্গানাইজেসন'কে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণের জন্য ঐ সভায় অনুরোধ জানান। এই সভায় তেজস্ক্রিয়তার আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বনের কথাও প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কেবল সমস্ত বিজ্ঞানকর্মীকেই তেজস্ক্রিয় পদার্থের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার শিক্ষা দিলেই চলবে না;—বিজ্ঞানীদের অভিমত আগামী আণবিক-যুগে স্যানিটারী ইঞ্জিনিয়ার, নাগরিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার দায়িত্ব গ্রহণকারী পৌর-প্রতিষ্ঠান সমূহের সমস্ত কর্মীদেরই এই বিষয়ে শিক্ষা দেবার জন্য ব্যাপক ভাবে ব্যবস্থা করতে হবে।

সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান

বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান মনে করতেন, পৃথিবীর ওপর আমরা যে বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও উদ্ভিদ দেখতে পাই, মাটির সঙ্গে তার চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী অথবা উদ্ভিদ বিরাজ করছে। এদের মধ্যে সর্বদাই চলেছে গৃহযুদ্ধ, নিজেদের দেহ থেকে রাসায়নিক পদার্থ বার করে অপরকে ধ্বংস করাই এদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। মানুষ যদি এই সব প্রাণী ও উদ্ভিদের রাসায়নিক অস্ত্রসমূহকে সংগ্রহ করতে পারে, তাহলে আশা করা যায় তাদের প্রয়োগে মানবদেহের ক্ষতিকারক অনেক বীজাণুও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।

প্রায় ২৮ বছর ধরে বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান একাগ্রচিত্তে রাটজারস্ ইউনিভারসিটি কলেজ অফ এগ্রিকালচার-এতে তাঁর এই ধারণা প্রতিপন্ন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম দিকে অসাফল্যের গ্লানি স্পর্শ করেছিল এই বিরাট প্রতিভাকে—অনেকের কাছেই তিনি উপহাসের পাত্র বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। এমন কি, রাটজারস্ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জন উচ্চপদস্থ কর্মচারী আর্থিক ক্ষতি নিবারণের জন্য বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যানকে বরখাস্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন! সমগ্র মানব জাতির সৌভাগ্যের কথা যে, সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ঐ বুদ্ধিমান কর্মচারীর উপদেশ গ্রহণ করেন নি,—ওয়াক্সম্যানকে বরখাস্ত করলে অতুলনীয় মহৌষধ স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কার কবে হতো, তা বলা কঠিন।

স্ট্রেপ্টোমাইসিনের আবিষ্কর্তা সেলম্যান আব্রাহাম ওয়াক্সম্যান ১৮৮৮ সালের ২রা জুলাই রাশিয়ার প্রিলুকা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা রান্না ও অন্যান্য কাজের জন্য তামার পাত্র নির্মাণ করতেন। ছেলেবেলায় ওয়াক্সম্যানের ইচ্ছে ছিল—তিনি 'ডাক্তার হবেন, কিন্তু ১৯১০ সালে এই কণীয় পরিবার স্থায়ী ভাবে আমেরিকায় বসবাস করবার জন্য যাত্রা করায়, তিনি রাটজারস্ কলেজ অফ এগ্রিকালচারেতে মাইক্রোবায়োলজির ছাত্র হিসাবে ভর্তি হলেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে ১৯১৫ সালে স্নাতক উপাধি নিয়ে ওয়াক্সম্যান ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা শুরু করেন, এবং ১৯১৮ সালে বিজ্ঞানে ডক্টর অফ ফিলজফি উপাধি পান। এর পর রাটজারস্ ফিরে এলে শিক্ষক এবং গবেষক হিসাবে তাঁর নতুন জীবন আরম্ভ হয়। ইতিমধ্যে ১৯১৬ সালেই তিনি বার্থা ডি. মিটনিক নামক এক মহিলার পাণিগ্রহণ করেছেন।

তাঁর জীবনে শুরু হলো অসাফল্যের বিরাট ইতিহাস। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বীজাণু এবং উদ্ভিদ-কণিকার দেহ থেকে এক মহাশক্তিশালী রাসায়নিক অস্ত্র আবিষ্কার করে তিনি মানব জাতিকে রোগের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করতে চান, কিন্তু প্রতিপদেই তাঁকে বহন করতে হয় ব্যর্থতার গ্লানি।

১৯৪৩ সালে এক জন কুক্কুটপালক একটি রোগাক্রান্ত মুরগীর ছানার রোগ নির্ণয়ের জন্য রাটজারস্ কলেজ অফ এগ্রিকালচার-এতে নিয়ে এলেন। ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক মুরগীর ছানাটির দ্বিতীয় পাকাশয়ে নতুন ধরণের বীজাণুর সন্ধান পেয়ে, সেটা কি, তা' পরীক্ষা করার জন্য ওয়াক্সম্যানের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ওয়াক্সম্যান পরীক্ষা করতে গিয়ে দেখলেন, ঐ বস্তুটি একটি শক্তিশালী রোগ-বীজাণু ধ্বংসকারী অ্যান্টিবায়োটিক্স সৃষ্টি করে। এর নাম তিনি দিলেন স্ট্রেপ্টোমাইসিন—দেখা গেল মারাত্মক যক্ষ্মারোগের বীজাণুও স্ট্রেপ্টোমাইসিনের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। গবেষণার ফলাফলে আরও জানা গেল যে, এই অ্যান্টিবায়োটিক্স সাংঘাতিক রকমের গণোরিয়া, নিমোনিয়া, রক্ত-আমাশয় প্রভৃতি রোগ নিরাময় করতে পারে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের জগতে এক বিরাট পরিবর্তন এলো—বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান তাঁর এই মহান আবিষ্কারের জন্য ১৯৫২ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করলেন। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানসমূহ ওয়াক্সম্যানকে নানা ভাবে সম্মানিত করে গৌরবান্বিত হলেন।

স্ট্রেপ্টোমাইসিনের রয়্যালটি থেকে বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান কোটি কোটি ডলার উপার্জ্জন করতে পারতেন, কিন্তু এর সমস্ত আয় রাটজারস্ বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করে দিয়েছেন। হিসাবী বন্ধুদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন,—"ভয় নেই—রাটজারস্ আমাকে উপোস করে মরতে দেবে না"। মাইক্রোবায়োলজির একটি গবেষণা-মন্দির নির্মাণ করে তিনি মানব কল্যাণের গবেষণায় নতুন করে করেছেন আত্মনিয়োগ।

ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানী ওয়াক্সম্যান খুবই সাদাসিধে মানুষ। ইতিহাস ও সাহিত্যের বই পড়তে তিনি খুব ভালোবাসেন, শিল্পকর্মের প্রতিও অনুরাগ অসাধারণ। রাশিয়ার একাডামি অফ সায়েন্স কতকগুলি বক্তৃতা প্রকাশ করার অধিকারের জন্য ওয়াক্সম্যানকে ১৫০০০ রুবল দিয়েছিল, চুক্তি ছিল, ঐ রুবল রাশিয়াতেই ব্যয় করতে হবে। তিনি ঐ অর্থ, একখানি রাশিয়ান চিত্র কিনতে ব্যয় করেন।


ডালডা
আমার
পক্ষে
ভালো
DALDA
ডালডা
ডালডা মার্কা বনস্পতি
দিয়ে রান্না করুন
শুধু রান্নার জন্যই ভালো নয় — পুষ্টিকরও বটে!



খেলাধুলা

অলিম্পিক প্রসঙ্গ

এবারেও অলিম্পিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা সুরু করছি। কারণ, বর্ত্তমানে প্রতি দেশেই অলিম্পিকের তোড়জোড় চলেছে।

বাইশে নবেম্বরের অপরাহ্নে মেলবোর্ণের ক্রিকেট মাঠে আরম্ভ হবে ষোড়শ অলিম্পিকের উদ্বোধন। আর মাত্র তিন মাসেরও কিছু কম দিনের ব্যবধান মাত্র।

যোগদানকারী দেশের সংখ্যা এবারে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। অন্যান্য-বারের তুলনায় প্রতিযোগীর সংখ্যাও অনেক বেশী। তাই এবারের অলিম্পিকের অনুষ্ঠান যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মেলবোর্ণে অলিম্পিকের যে আয়োজন হয়েছে তা যে কত ব্যাপক তা আমার ধারণার বাইরে। শুধুমাত্র সংবাদ সংগ্রহ করে আপনাদের কাছে পৌছে দেওয়া। তাই মোটামুটি ষোড়শ অলিম্পিক অনুষ্ঠানে মেলবোর্ণে আনুমানিক সাড়ে চার কোটি টাকা খরচ করে এই অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত করার প্রচেষ্টা চলেছে।.....

এত দিন ইউরোপ ও আমেরিকার বুকের উপর দিয়ে অলিম্পিক অনুষ্ঠানের আনন্দোচ্ছল দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। দক্ষিণ গোলার্দ্ধে এই সর্ব্বপ্রথম অলিম্পিকের অনুষ্ঠান।

১৯৪৯ সালের জুন মাসে রোম অধিবেশনে অলিম্পিক অনুষ্ঠানে যে আবেদন গ্রহণ করা হয়, তা ১৯৫৩ সালে মেক্সিকো ও ১৯৫৪ সালে এথেন্সের সভায় সে আবেদন চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। তারপর থেকেই ছোট্ট দেশ অষ্ট্রেলিয়ার হৃৎস্পন্দনের গতিবেগ বেড়ে গেছে। মনে হচ্ছে, শব্দের গতি অপেক্ষা এ অনুষ্ঠানের গতি অনেক দ্রুত। এই অনুষ্ঠানকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ৫০ জন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়েছে। চেয়ারম্যান নিযুক্ত হয়েছেন অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ত্ত ও আভ্যন্তরীণ বিভাগের মন্ত্রী ডাব্লিউ এস কেট ইউক্রেস। ইনি অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান ক্রীড়াবিশারদ। ১৯২০ সালে এণ্টয়াপ অলিম্পিকে তিনি প্রতিনিধিত্ব করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার দুই জন প্রতিনিধির অন্যতম মিঃ লুইস লাক্সটন অর্গানাইজিং কমিটির ডেপুটি চেয়ারম্যান। ১৯৩২ সালের অলিম্পিকে ইনি গ্রেট বৃটেনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

অলিম্পিক অর্গানাইজিং কমিটির প্রধান কর্মকর্তা হলেন লেঃ কেঃ উইলিয়ম ব্রিজফোর্ড। দীর্ঘ সামরিক জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই ব্যক্তিটি ১৯৫৩ সালে সামরিক বিভাগ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া ষোড়শ অলিম্পিকের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন।

মিঃ ইজি-হোণ্ট অর্গানাইজিং কমিটির টেক্‌নিক্যাল। ইনি ১৯৪৮ সালের লণ্ডন অলিম্পিক কমিটির ডিরেক্টর ছিলেন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক এমেচার এ্যাথেলেটিক ফেডারেশনের প্রাক্তন সম্পাদক।

অলিম্পিকের অনুষ্ঠানের জন্য অলিম্পিক নগর যে তৈরী হচ্ছে তা সত্য সত্যই নয়নাভিরাম! হোটেল,রেঁস্তোরা ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামের উন্নতি সাধন, রাস্তাঘাট, জল সরবরাহের ব্যবস্থা, অতিথিদের বাসস্থান। এক এলাহি কাণ্ড!...

মেলবোর্ণের পৌরসভা এক বিশেষ অলিম্পিক সিভিক কমিটি গঠিত হয়েছে।

এত আশা উদ্দীপনায় ভরা অলিম্পিক জয়তু।

হায় ষ্টেডিয়াম

কলকাতায় ষ্টেডিয়ামের জল্পনা-কল্পনা অনেক দিন ধরেই চলেছে; কিন্তু তার কোন আজ মীমাংসা হোল না। এটা যেমন দুঃখের তেমনি মর্মান্তিক কথা। কলকাতাই হোল ভারতের খেলাধূলার তীর্থভূমি অথচ সেখানে আজ পর্য্যন্ত কোন ষ্টেডিয়াম প্রতিষ্ঠা হোল না! এ নিয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় আলোচনা চলেছে। এর প্রয়োজনীয়তা যে কতদূর তা কাউকে নতুন করে বুঝিয়ে বলতে হবে না। ষ্টেডিয়ামের অভাবে বছরের পর বছর ধরে কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের যে ভাবে হায়রাণি সহ্য করতে হয়, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

সম্প্রতি দিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ, কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্যে একটি করে "ষ্টেডিয়াম" এবং খেলাধূলার প্রয়োজনে একটি করে 'গেষ্ট হাউস' নির্মাণে উদ্যোগী হয়েছেন। উদ্যোগী হওয়াটা নিঃসন্দেহে সুখপ্রদ কিন্তু এটা কি প্রতিবারের মতই সংবাদেই প্রকাশ হয়ে থাকবে না কার্য্যে পরিণত হবে? অনেক দিন আশা করে থেকে এ আশার কথায় আর বিশ্বাস হয় না। জানি না, কলকাতার ক্রীড়ামোদীদের ষ্টেডিয়াম প্রতীক্ষা কত দিনে শেষ হবে! হায় ষ্টেডিয়াম!

খেলোয়াড়ের জাতীয় সম্মান

সুধীজন সম্বর্ধনায় ১৯১১ সালে শীল্ডবিজয়ী মোহনবাগান দলের রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জ্জিকে গত ১৭ই আগষ্ট কংগ্রেসের তরফ হইতে সম্বর্ধনা জানানো হয়।

১৯১১ সালের মোহনবাগান দলের ব্যাক সুধীর বাবু বর্ত্তমানে উত্তর-ভারতের ইউনাইটেড 'চার্চে'র সাধারণ পরিষদের 'মডারেটর'।

১৮৮৩ সালে সুধীর বাবুর জন্ম। কলকাতার লণ্ডন মিশনারী স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৬ সালে সসম্মানে এম, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯১১ সালে ঐতিহাসিক শীল্ডের ফাইনাল খেলার সুযোগ ঘটে। দীর্ঘদিন তাঁর খেলোয়াড় জীবন পরিবহন করা সম্ভব হয়নি। পায়ে আঘাত লাগায় ১৯১৪ সালেই খেলোয়াড়-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

১৯০৩ সালে তিনি মোহনবাগান দলে যোগদান করেন বিজয় ভাদুড়ীর সাহচর্য্যে। তিনি বুট পরেই খেলতেন। ১৯১৩ সাল পর্য্যন্ত কৃতিত্বের সংগে মোহনবাগান দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

ধর্মপ্রাণ মানুষ সুধীর বাবু। বর্ত্তমানে তিনি ধর্ম্মযাজকের জীবন যাপন করছেন।

গুণীজন সম্বর্ধনায় দেশের শিক্ষা-দীক্ষায়, শিল্পে, বীর্য্যে, সংগীত সাধনায় যাঁরা জাতির অগ্রগতির পথিকৃৎ তাঁদের এ সম্মান লাভ সত্যই আনন্দের। গত বার গোষ্ঠ বাবুকেও সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। তবে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নয়। সুধীর বাবুই হলেন প্রথম জাতীয় সম্মানের অধিকারী!

ক্রিকেট

ঐতিহাসিক কেনিংটন ওভাল মাঠে ১৭৩তম ইংলণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়ার পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচের খেলা শেষ হয়ে গেছে। আর খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় ইংলণ্ড দল 'রাবার' লাভ করলো। এবারের পাঁচটি টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড দুটি খেলায় অষ্ট্রেলিয়া একটি খেলায় বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। ও দুটি খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়েছে।

১৯৫৩ সালে হাটনের নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল এই মাঠেই "এ্যাসেস" পুনরুদ্ধার করেছিল।

আজ থেকে চুয়াত্তর বছর পিছনে এই দুই দলের খেলা উপলক্ষে এক করুণ ঘটনা সৃষ্টি হয়েছিল এই "এ্যাসেস" বা "ছাই"।

১৮৮২ সালের এমনি আগষ্ট মাসের উজ্জ্বল দিনে অষ্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ড টেষ্ট খেলা নিয়ে উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব নেই। ওভাল মাঠে অষ্ট্রেলিয়া দলের প্রথম ইনিংস শেষ হলো মাত্র ৬৩ রাণে। ১০১ রাণে শেষ হলো ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস। দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো অষ্ট্রেলিয়ার ১২২ রাণে। ৮৫ রাণ করতে পারলেই ইংলণ্ডের জয়লাভ সুনিশ্চিত।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ডের দু'উইকেটে ৫০ রাণ ওঠার পর জয়লাভ সুনিশ্চিত। ৩৫ রাণ তুললেই হলো। ইংলণ্ডের অনেক সমর্থকরা জয়লাভ অবধারিত জেনে, মাঠ ছেড়ে চলে যান।

কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার বোলার স্পোফোর্থ এমন মারাত্মক ভাবে বল দিলেন যে, ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানেরা স্বচ্ছন্দ ভাবে খেলতে পারলেন না। পর পর আউট হতে লাগলেন। ১০ রাণ করতে পারলেই ইংলণ্ডের জয় অবধারিত। হাতে তখনও দুইটি উইকেট। মাঠে এত উত্তেজনা যে এক জন লোক উপর থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। মাত্র তিন রাণের মধ্যে দুইটি উইকেটের পতন ঘটলে অষ্ট্রেলিয়া ৭ রাণে ইংলণ্ডকে পরাজিত করে।

ইংলণ্ডের ক্রিকেটের গর্ব ভেঙ্গে যায়। এই পরাজয় কতখানি বেদনাদায়ক, তা তখনকার দিনের ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'স্পোর্টিং টাইমস" কালো বর্ডার দিয়ে ছাপলো—

"In affectionate remembrance
of
English Cricket
which died at Oval
on
29th August, 1882.
Deeply lamented by a large
circle of sorrowing friends and
acquaintances
R. I. P.
N.B. The body will be cremated and
the ashes taken to Australia"

পরের বছর আইভো ব্লাই (লর্ড ডার্ণলে) অধিনায়কের দায়িত্ব গ্রহণ করে ইংলণ্ড দলকে অষ্ট্রেলিয়ায় খেলতে নিয়ে যান। প্রথম টেষ্টে অষ্ট্রেলিয়া দল জয়লাভ করে। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় টেষ্টে ইংলণ্ড জয়লাভ করলে, এক দল অষ্ট্রেলিয়ান তরুণী ক্রিকেট খেলার "ষ্টাম্প" পুড়িয়ে আইভো ব্লাইকে একটি পাত্র উপহার দেন। ঐ ছাইভর্তি পাত্রের নিচে লেখা আছে—

"When Ino goes back with the urn
the urn,
Studs, Steel, Read and Tylecote, return,
return,
The welkin will ring loud,
The great crowd will feel proud,
Seeing Barlow and Bates with the urn,
the urn,
And the rest coming Rome with the urn "

আইভো ব্লাই মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত পাত্রটি রেখেছিলেন। ১৯২৮ সালে মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবকে ওই পাত্রটি উপহার দেওয়া হয়। এখনও পর্য্যন্ত সেটি ওখানে সযত্নে রক্ষিত আছে।

এ্যাসেজ পাওয়া একটি চলতি সম্মান। কোন দলই এই ছাইপূর্ণ পাত্রটি পায় না।

এ্যাসেজের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায় নিয়ে ইংলণ্ড-অষ্ট্রেলিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এবারে পঞ্চম টেষ্ট ম্যাচ অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায়, এবারের মত ক্রিকেটের এ্যাসেজ যুদ্ধের যবনিকা পতন হল।

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—২৪৭ (কম্পটন ৯৪, মে ৮৩ রিচার্ডসন ৩৭, সেফার্ড ২৪, আর্চার ৫৩ রাণে ৫ উইঃ মিলার ৯১ রাণে ৪ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—২০২ (মিলার ৬১, হার্ভে ৩৯, বিনাউড ৩২, লিণ্ডওয়াল ২২, লেকার ৮০ রাণে ৪ উইঃ ষ্ট্যাথাম ৩৩ রাণে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—(৩ উইঃ ডিক্লেঃ) ১৮২—(শেফার্ড ৬২, মে নট আউট ৩৭, কম্পটন নট ৩৫, রিচার্ডসন ৩৪, লিণ্ডওয়াল ২৯ রাণে ২ উইঃ)

অষ্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস (৫ উইঃ) ২৭—(মিলার নট আউট ১০, লেকার ৮ রাণে ৩ উইঃ ষ্ট্যাথাম ১ রাণে ১ উইঃ লক ১৭ রাণে ১ উইঃ)

[অমীমাংসিত]

ফুটবল

প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা শেষ হওয়ার সংগে ক'লকাতা মাঠে ফুটবল খেলায় মন্দা পড়েছে। যদিও ২২শে আগষ্ট থেকে আই, এফ, এ শীল্ডের খেলা আরম্ভ হয়েছে তবুও প্রাণহীন। কারণ, ত্রিবান্দ্রামে জাতীয় ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে কলকাতার কুশলী খেলোয়াড়রা চলে গেছেন। তাই আই, এফ, শীল্ডের মন্দাভাব।

খড়গপুরে আন্তঃ-রেল ফুটবল প্রতিযোগিতার শেষ হয়ে গেছে। এবারের প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছে বোম্বাইয়ের ওয়েষ্টার্ণ রেল দল। এরা বোম্বাইয়ের অপর রেল টীম সেণ্ট্রাল দলকে ৪-০ গোলে পরাজিত করেছে।...

১১টি রেলের ১৩টি দল এ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে।

খড়গপুর ষ্টেডিয়ামে ১৪।১৫ হাজার দর্শক একসঙ্গে বসে খেলা দেখতে পারেন।

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার আলোচনা আগামী বারে করার ইচ্ছা রইলো। কারণ, এখনও জাতীয় প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান শেষ হয় নি।

টুকিটাকি

ভারতীয় একমাত্র সাঁতারু মিহির সেন যিনি ইংলিস চ্যানেল পার হওয়ার আশা রাখেন, তিনি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য এবারে বিরত থাকেন। ২২ জন সাঁতারুদের মধ্যে মাত্র ৮ জন নেমেছিলেন। কিন্তু তাঁদেরও সকলকে জল থেকে উঠে পড়তে বাধ্য করেন ইংলণ্ডের প্রকৃতি দেবী।

* * * *

আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলার সময়ের সংগে সামঞ্জস্য রাখার জন্যে ৫০ মিনিটের পরিবর্তে ৭০ মিনিট স্থায়িত্ব করা হয়েছে। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের পরামর্শক্রমে আই, এফ, এ, শীল্ডে ধার্য্য করা হয়েছে।

* * * *

সি, এ, বি-র জয়ন্তী উপলক্ষে স্যার লেন হাটনের ভারতে আসার সম্ভাবনা আছে বলে শোনা যাচ্ছে।

* * * *

বিশ্ব ভলিবলে যোগদানের জন্য ১২ জন খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত হয়েছেন। ৩০শে আগষ্ট থেকে এই খেলা সুরু হবে।

ফুল-শয্যা

[ওয়াল্টার স্কট্ হইতে]

অমল মুখোপাধ্যায়

গরবিনী মঞ্জুলা কিশোরিণী বালিকা,
তুলিতে সে ছিল ফুল গাঁথিবারে মালিকা।
তরু-শাখে র'য়ে র'য়ে ডাকে এক পাপিয়া
পুছে তারে, "বল পাখী, কবে হবে মোর বিয়া?"

পাখী কয়, "জেনো সেই তব বিবাহের দিন,
ডুলি চ'ড়ে যাবে যবে শ্মশানেতে জনহীন।"
"সাঁচি কহ, সাজাবে কে মোর ফুল-শয্যা?"
—"চণ্ডালে সাজাবে তা,' কিবা আছে লজ্জা!"

জোনাকীরা সমাধিতে জ্বালবে গো পিদ্দিম,
কালপেঁচা গা'বে গান স্বাগতম্ অন্তিম।


লাক্‌মে
ট্যালকম পাউডার
সারাক্ষণ
সতেজ রাখে
লাক্‌মে — টাটার একটি শিল্পোদ্যম
LKM.14B BG



কেনা কাটা

ঝর্ণা কলমের দেশী কালি

ভারতীয় মূলধনে ও ভারতীয় প্রচেষ্টায় ঝর্ণা কলমের (ফাউন্টেন পেন) কালি তৈরী খুব বেশী বছর বলা চলে না। কিন্তু এরই ভিতর এই শিল্পটির যা উন্নতি ও অগ্রগতি হয়েছে, নিঃসংশয়ে গর্ব্ব করবার মতো। মান ও উৎকর্ষের দিক থেকে নামজাদা যে কোন বিদেশী ফাউন্টেন পেন কালিরই সমকক্ষতা দাবী করবার সাহস রাখে, আজকের দিনের ভারতীয় কালি।

ফাউন্টেন পেনের ব্যবহারও অবশ্যি যুদ্ধোত্তর ভারতে বেড়ে গেছে খুব বেশী রকম। দেশে লেখা-পড়া নিয়ে আছে এমন ক'জন আজ পাওয়া যাবে, যাদের কোন না কোন ধরণের ফাউন্টেন পেন নেই? আর ফাউন্টেন পেন থাকার অর্থই সেই পেনের কালির অব্যাহত চাহিদা। কালি বা মসী-শিল্প বিশেষ করে ফাউন্টেন পেনে ব্যবহার-যোগ্য কালি-শিল্পের প্রসার হয়ে চলেছে দিন দিন এই কারণেই।

এইমাত্র বলা হ'ল—ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতে হলে তদুপযুক্ত কালি প্রতিমুহূর্ত্তে চাই-ই। সাধারণ কালিতে এর প্রয়োজন বা উদ্দেশ্য কখনই মিটতে পারে না। ফাউন্টেন পেন কালি তৈরী ব্যবস্থাও সাধারণ কালি থেকে বলতে গেলে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। আলোচ্য কালিটি (ফাউন্টেন পেন কালি) নির্ম্মাণকালে বেশী রকম সজাগ দৃষ্টি না হলেই নয়। দেখতে হয়—যেন এই কালিতে কোনক্রমেই সেডিমেণ্ট বা তলানি না পড়তে পারে, কলমে সব সময়ই সুযোগ থাকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে কালি নিঃসরণের, কালি ব্যবহারের দরুণ নিবের ক্ষতির কারণ না হয় এবং শুকিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুটে উঠে এর নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে, গোড়ায় ভারত যে ফাউন্টেন পেন কালি উৎপাদনের দিকে এতটা ঝোঁকে নি, তার একটা বিশেষ কারণ আছে। সেদিনে ফাউন্টেন পেন আজকের দিনের মতো এতখানি অপরিহার্য্য হয়ে উঠেনি। পরন্তু এইটি ছিল একটি মস্ত বিলাস সামগ্রী—সৌখিন পণ্য। ১৯২০ সাল পর্য্যন্ত এই ভাবেই কেটে যায়, দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টাবার সহসা কোন কারণ ঘটেনি তখন পর্য্যন্ত। ফলতঃ মুষ্টিমেয় যে কয় জন ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করতো, বিদেশী কালিতেই তাদের চলতো বেশ—দেশীয় কালির জন্য কোন রূপ তাগিদও আসেনি তাদের মনে।

ক্রমে এলো ১৯২১ সাল—আরম্ভ হলো দেশব্যাপী গান্ধীজীর অসহযোগ ও বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন। দেশী-কালির চাহিদা তখন দেখা দেয় আপনি এবং ভারতে মসীশিল্পের সূত্রপাত ও প্রকৃত প্রস্তাবে এইখান থেকে। শিল্প গড়ে তোলবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় কলকাতা ও মাদ্রাজে। তার পর ক্রমশঃ দেশের আরও কয়েকটি স্থলে ছড়িয়ে পড়ে এই শিল্পোদ্যোগ। প্রথম দিকে নানা অসুবিধার দরুণ দেশীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো উৎকৃষ্ট ধরণের তথা মান-সম্পন্ন কালি তৈরী করতে পারেন নি। একটা প্রধান অসুবিধা ছিলো—দেশে ফাউন্টেন পেন যাঁরা সে দিন ব্যবহার করতেন, তাঁদের মনে মনে এই ভ্রান্ত ধারণাটি বদ্ধমূল হয়ে থাকলো বহু দিন—বাইরের কালি না হলে তাঁদের লেখাই চলে না, লিখলেও সেই লেখার পরমায়ু খুব কম সময়, আর তাঁদের সুন্দর কলম-গুলো নষ্ট হয়ে যাবে দু'দিন যেতে না যেতেই। এই রুচি বা সংস্কার পাল্টাবার জন্যে দেশীয় কালিকে বিদেশী মার্কা কালির সঙ্গে বহু সংগ্রাম দিতে হয়েছে। দেশের বুকের উপর বিদেশী শাসন-ব্যবস্থা এত কাল চেপে ছিল বলেই আরও এমনটি হয়, এইটুকুও বলতে হয় নিঃসঙ্কোচে।

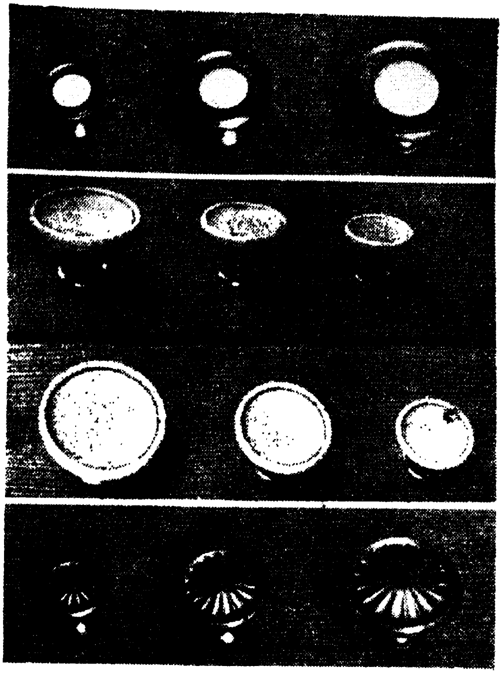
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই শিল্পক্ষেত্রে অবশ্যি ১২টির অধিক ইউনিট সক্রিয় ভাবে কর্ম্ম-নিযুক্ত ছিল। যুদ্ধকালে বাইরের অন্যান্য পণ্যের ন্যায় কালি সরবরাহও যায় কমে বহু পরিমাণে। বিদেশী সরবরাহ যেটুকুও হয় আসলে, তাতে দেশীয় ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা আর কিছুতেই মিটে না। কালির প্রতিষ্ঠান-গুলো তাঁদের উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগী হলেন, দেখতে দেখতে আরও কত নয়া প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলো এ শিল্পটিকে কেন্দ্র করে। কালি উৎপাদনের জন্য অত্যাবশ্যক কাঁচা মালের সরবরাহ ক্ষেত্রে দারুণ সঙ্কট দেখা দিলেও দেশীয় সংস্থাগুলো উদ্যমে হঠকারিতা স্বীকার করেন নি। তাই দেখা গেলো—সে দিনে তাঁরা শুধু অসামরিক জনসাধারণেরই নয়, সামরিক বিভাগের সদস্যদেরও বিপুল প্রয়োজন মিটিয়েছেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয় কালি (ফাউন্টেন পেন) এর ভিতর একটা বিশিষ্ট মানেও উন্নীত হয়ে যায়, সগর্ব্বে উহা দাবী করতে সমর্থ হলো বিদেশী কালির সমকক্ষতা ও সমদক্ষতা।

সম্প্রতি কয়েক বৎসর মধ্যে ভারতে তৈরী ভারতীয় ফাউন্টেন পেন কালির সাফল্য সত্যি আরও উল্লেখযোগ্য। সেন্ট্রাল গ্লাস এণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউট দেশী ও বিদেশী দুই শ্রেণীর কালিই পাশাপাশি রেখে পরীক্ষা করে দেখেছেন। তাঁদেরই গবেষণাপ্রসূত পরিষ্কার অভিমত—দেশীয় ফাউন্টেন পেন কালি নিম্নমানের তো নয়ই, পরন্তু অনেক বিদেশী মার্কা কালির চেয়েও উহা উন্নততর। তাঁদের এই অভিমত প্রকাশিত হয়েছে—জার্ণাল অফ সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ-এর দ্বিতীয় খণ্ড দ্বাদশ সংখ্যায় (১৯৫২)। ১৯৫৩ সালে সরকারী টারিফ (শুল্ক) কমিশনও ফাউন্টেন পেন কালি-শিল্প বিষয়ে তদন্ত চালান এবং তদন্ত শেষে

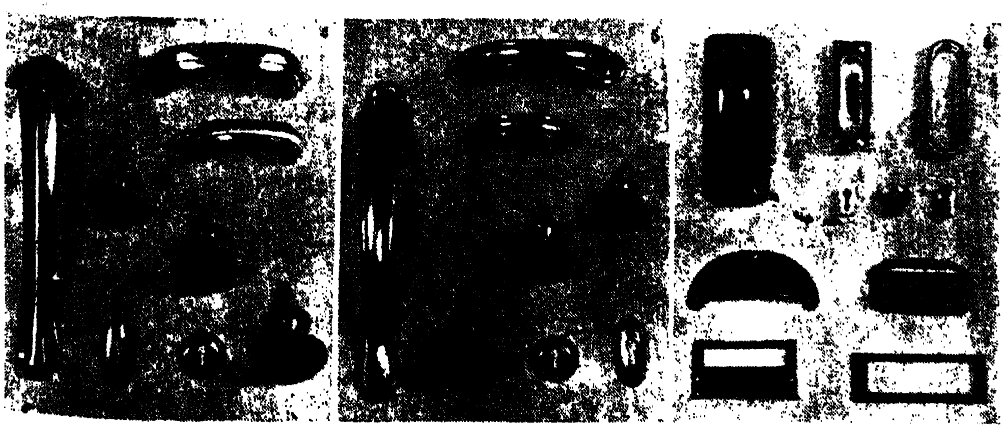
সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের মন্তব্যেরই সমর্থন করেন তাঁরা খোলাখুলি।

ভারতীয় মসী-শিল্পের এই অব্যাহত অগ্রগতি সত্ত্বেও ভারতের মাটিতেই বিদেশী-কালির সঙ্গে ওর প্রতিযোগিতা এখনও যায় নি। এ শিল্পটিকে ঘিরে আজ অবধি নানা ধরণের সঙ্কট ও অসুবিধা রয়েছে এই ভারতে। কালি যে-ক্ষেত্রে সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, জাতীয় সরকারের দিক থেকে উচিত এই শিল্পটির প্রতি সমধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা এবং এর উপযুক্ত প্রসার ও উৎকর্ষ সাধনে সহায়তা করা। দেশীয় শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলো নিরাপদে এবং পরিকল্পনাসম্মত পন্থায় চলবার সুযোগ পেলে বাইরের কালি আমদানীর কিছুমাত্র প্রয়োজন হবে বলেই মনে হয় না। অপর দিকে দেশে কালি উৎপাদনের যে সব কাঁচা মাল পাওয়া যাবে না, সেগুলো বাইরে থেকে আনবার যথোচিত সুযোগ দিতে হবে দেশীয় সংস্থাগুলোকে।

গত জুলাই মাসে পার্লামেণ্টে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প-সচিবরূপে শ্রীটি, টি, কৃষ্ণমাচারী প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ভারতীয় ফাউণ্টেন পেন কালি উৎপাদনের একটা হিসাব পাওয়া গেছে। তাতে তিনি বলেছেন গত বর্ষে (১৯৫৫) ভারতে তৈরী হয়েছে দুই আউন্সের ৩৩১, ৬৮৬ ডজন ফাউণ্টেন পেনের কালি। পক্ষান্তরে ইহার পূর্ববর্তী দুইটি বৎসরে কালি উৎপন্ন হয় যথাক্রমে ৫১৭, ৬০৬ ডজন এবং ৪৪২,৮০০ ডজন বোতল। ইঙ্ক ম্যানুফাকচারার্স এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া অবশ্যি কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিক্ষা-সচিবের এই হিসাব সঠিক ভিত্তি ও তথ্যের উপর রচিত হয় নি বলে দাবী করেছেন। তাঁদের মতে, দেশে এক্ষণে ফাউণ্টেন পেন কালির প্রকৃত উৎপাদন প্রদত্ত সরকারী হিসাব অপেক্ষা বহুগুণে বেশী। ছোট-খাট অন্ততঃ এক শতটি সংস্থা আছে—যাদের কালির চাহিদাও বাজারে কম নয়, অথচ তাদের উৎপাদন এই হিসাবের আওতায় পড়ে নি। মোটের উপর, পরিমাণ ও উৎকর্ষের দিক থেকে ভারতীয় মসী-শিল্প বিশেষতঃ ঝর্ণা কলমের (ফাউণ্টেন পেন) কালি একটি ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছে—এইটুকু আজ অনায়াসেই বলতে পারা যায়।



দরজা, জানলা, আলমারী, টেবিল কিম্বা যে-কোন আসবাবের জন্য প্রয়োজন হয় কাঠ শুধু নয়, ধাতু আর প্লাষ্টিকের হ্যাণ্ডেল বা হাতল। আপনার ঘরের আসবাবগুলিতে (প্রয়োজন বোধ ক'রলে) এই ধরণের ধাতু আর প্লাষ্টিকের দ্রব্যাদি কাজে লাগাতে পারেন।



টুকরো কথা

গৃহপালিত পশুর আদমসুমারী সংক্রান্ত হিসাবে জানা যায় যে, গত পাঁচ বৎসরে পশুর সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৫১ সালে সংখ্যা ছিল মোট ২৯ কোটি ২০ লক্ষ। আলোচ্য বর্ষে ইহা ৩০ কোটি ৭০ লক্ষে পৌছায়। বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৫ শতাংশ। গাভী ও ষাঁড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী—মোট ১৫ কোটি ১০ লক্ষ, ছাগল ও পাঁঠা সাড়ে পাঁচ কোটির কিছু বেশী, মহিষ প্রায় ৪॥ কোটি, ভেড়া ৪ কোটির কিছু কম এবং ঘোড়া ও টাটু-ঘোড়া ১॥ কোটির মত। * * * পরীক্ষা করিয়া দেখিবার উদ্দেশ্যে ভারত সরকার ১৯৫৪ সালে রাশিয়া হইতে চারিটি কলের-লাঙ্গল আমদানী করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটির জন্য খরচ পড়িয়াছিল ৪৩৮৫৲ টাকা। রাশিয়া সরকার ১৯৫৫ সালে ভারত সরকারকে একটি এবং ১৯৫৬ সালে ৬৬টি কলের লাঙ্গল ও উহার উপযুক্ত পরিমাণে অতিরিক্ত অংশ উপহার দিয়াছিলেন। ভারত সরকার কয়েকটি বে-সরকারী আমদানী কারককে রাশিয়া হইতে কলের-লাঙ্গল আমদানী-লাইসেন্স বিলি করিয়াছেন। যদি এই প্রতিষ্ঠানগুলি সময় মত লাইসেন্সের সদ্ব্যবহার করে, তাহা হইলে শীঘ্রই বাজারে রাশিয়ার তৈয়ারী কলের-লাঙ্গল কিনিতে পারা যাইবে। * * * ইণ্ডিয়ান সুগার মিলস্ এসোসিয়েসনের একটি বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ, ১৯৫৬ সালের জুন মাসে ভারতবর্ষে ৫৯,৯৩৩ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। এ বৎসর চিনির মরশুম আরম্ভ হইতে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত মোট ১৮,৪৮,৮৮৯ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। পূর্ববর্তী বৎসর একই সময়ে উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১৫,৮৩,০০০ টন। জুন মাসে চিনির কলগুলি হইতে ১,৪৯,০০০ টন। (পূর্ব বৎসরে একই সময় অপেক্ষা ২৬ হাজার টন বেশী) চালান দেওয়া হইয়াছিল। মরশুমের আরম্ভ হইতে জুন মাসের শেষ পর্যন্ত এবার মোট চালান ১০,৯৪,০০০ টন পূর্ববর্তী মরশুমের তুলনায় উহা ৩ লক্ষ ৮৪ হাজার টন বেশী। ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন তারিখে কলগুলিতে মজুত চিনির পরিমাণ ছিল ১১,৫৮,০০০ টন, পূর্ববর্তী বৎসর একই তারিখে মজুত চিনির তুলনায় ২,৪৭,০০০ টন বেশী। * * * অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ভারতবর্ষে আবাদযোগ্য জমির শতকরা হার অনেক বেশী। ভারতবর্ষে মোট জমির মধ্যে শতকরা ৪৫ ভাগ আবাদযোগ্য। অষ্ট্রেলিয়ায় ও ব্রাজিলে আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ শতকরা মাত্র ২.৫, কানাডায় শতকরা ৪ ভাগ, চীনে ও রাশিয়ায় শতকরা ৯ হইতে ১১ ভাগ এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ২৫ ভাগ। মোট আয়তনের দিক দিয়াও ভারতবর্ষ আবাদযোগ্য জমিতে বিশ্বের তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই ধরণের জমি ভারতে প্রায়—৩৬.৬ কোটি একর, রাশিয়ায় ৫৫.৬ কোটি এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭.৮ কোটি একর। গত ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতবর্ষে প্রতি একর জমিতে প্রায় ৬৩০ পাউণ্ড গম উৎপন্ন হয়। ইহাই ভারতের সর্বোচ্চ রেকর্ড। কিন্তু অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের তুলনায় ভারতে ফলনের হার অনেক কম। ১৯৪৯-৫১ সাল পর্যন্ত ভারতে গড়পড়তা গম ফলন, একর-প্রতি মাত্র ৫৮৬ পাউণ্ড। কিন্তু ঐ সময় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একর প্রতি ৯৪৯ পাউণ্ড, রাশিয়ায় ৮৩০ পাউণ্ড ও চীনে ৮৭৪ পাউণ্ড গম ফলিয়াছিল। * * * বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্গত সুরাটের কৃষি গবেষণা-কেন্দ্রে পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যে, তুলা-চাষে নাইট্রোজেনঘটিত সার প্রয়োগে শুধু যে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় তাহা নহে, যন্ত্রের সাহায্যে বীজ ছড়াইবার সময়ও বেশী তুলা পাওয়া যায়। একর-প্রতি চল্লিশ পাউণ্ড নাইট্রোজেন প্রয়োগই শ্রেয়ঃ। উহা অ্যামোনিয়াম সালফেট অথবা চিনাবাদামের খইল হিসাবে দেওয়া যাইতে পারে। তুলা রোপণের সময় সার না দিয়া গাছগুলি খাড়া হইয়া উঠিবার পর গর্ত খুঁড়িয়া (ড্রিলিং) বা ছিটাইয়া সার প্রয়োগেই সুফল পাওয়া যায়। * * * প্রায় ষাটটি দেশ বা অঞ্চলের হিসাব বিশ্লেষণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে, পুরুষ শ্রমিকদের ক্ষেত্রে ২৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত বয়ঃসীমার বিভিন্ন স্তরে, শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। বালকরা বিভিন্ন বয়সে পাঠাভ্যাস ত্যাগ করিয়া জীবিকা অর্জনের কাযে নিযুক্ত হওয়ার জন্যই এইরূপ ঘটিয়া থাকে। প্রায় সকল দেশেই মধ্যবয়স্ক পুরুষদের প্রায় সকলেই কোন না কোন ভাবে জীবিকা অর্জন করে। ৪৫ বৎসর বয়সের পর হইতে ধীরে ধীরে এবং ৬৫ বৎসর বয়সের পর অতি দ্রুত হারে পুরুষ-শ্রমিকের হার হ্রাস পায়। অগ্রসর ও অনগ্রসর দেশভেদে কর্মরত বালক, যুবক ও বৃদ্ধ পুরুষের সংখ্যার তারতম্য দেখা যায়। ব্রেজিলে ১০ হইতে ১৪ বৎসর বালকদের মোট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এবং ইকোয়েডার ও প্যারাগুয়ে প্রভৃতি দেশের ৬৫ বৎসর বয়স্কদের তিন-চতুর্থাংশ জীবিকা অর্জনের কাজে নিযুক্ত থাকিতে দেখা যায়। অপর পক্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনে মাত্র ৫ শতাংশ বালক (১০-১৪) এবং বৃটিশ যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামে প্রৌঢ়দের (৬৫ ও তদূর্ধ্ব) মাত্র এক-তৃতীয়াংশ কর্মরত আছে। অনগ্রসর দেশগুলিতে কৃষিকার্যই প্রধান উপজীব্য বলিয়া এই সকল দেশে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক এবং অধিক বয়স্কদের কাজ করিবার সুযোগ থাকিয়া যায়। অপর পক্ষে অগ্রসর দেশগুলিতে অধিকাংশ অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক স্কুল-কলেজে পাঠাভ্যাসে সুযোগ পায়—এই বয়ঃসীমায় (১০-১৪) তাহাদের জীবিকা অর্জনের কোন তাগিদ থাকে না। এই সকল দেশে রাষ্ট্রই কর্মজীবনের শেষে প্রৌঢ় ও বৃদ্ধদের ভার গ্রহণ করে বলিয়া এই বয়ঃসীমার (৬৫ ও তদূর্ধ্ব) অধিকাংশ ব্যক্তিই কর্মশক্তি হ্রাস পাইবার পূর্বেই কর্মজীবন হইতে অবসর গ্রহণ করে। * * * ১৯৫৫ সালে ভারতে প্রায় ৪১ লক্ষ টাকা মূল্যের শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র তৈয়ারী হইয়াছিল। * * * মৎস্যশিল্পের উন্নতিকল্পে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত সরকার ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে পুরীর আধুনিক প্রস্তর-শিল্পের একটি প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। চিত্রটি শ্রীসলিল গোস্বামী অঙ্কিত।

তুষার-স্নিগ্ধ ক্রিম আপনার মুখশ্রী কমনীয় রাখবে

দাগ ও রুক্ষতা ঢেকে দিয়ে মুখখানি মসৃণ ও স্বাভাবিক সুষমামণ্ডিত ক'রে তুলবে

মুখশ্রী মনোরম রাখতে কখনো ভুলবেন না! পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম অতি সহজেই মুখের লাবণ্য ফুটিয়ে তোলে — পণ্ড্‌স লাবণ্যের যাদুকর।

রোজ সকালে হাল্‌কা হাতে **পণ্ড্‌স** ভ্যানিশিং ক্রীম মুখে মাখুন। **মাখার** কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মিলিয়ে যাবে কিন্তু তার অদৃশ্য একটি আবরণ ত্বকের সব কিছু ত্রুটী ঢেকে দিয়ে এমন **মসৃণ ও** রেশমের মতো সুষমাময় **স্বাভাবিক মুখশ্রী** ফুটিয়ে তুলবে যা দেখে কেউ চোখ ফেরাতে পারবে না।



এর উপর পাউডার লাগালে ··· পাউডার **উঠে যায় না।** পাউডার লাগাবার বা মেক্‌-আপ করবার আগে পণ্ড্‌স ভ্যানিশিং ক্রীম মেখে নিতে ভুলবেন না। **পণ্ড্‌স** চটচটে নয়, কিন্তু এর ওপর পাউডার লাগালে তা বহুক্ষণ **নিখুঁতভাবে** লেগে থাকে। তুষার-স্নিগ্ধ **পণ্ড্‌স** ভ্যানিশিং ক্রীম ব্যবহারে আপনার মুখখানি সারাদিন লাবণ্যে সমুজ্জ্বল দেখাবে।



পণ্ড্‌স
ভ্যা নি শিং ক্রী ম

বিনামূল্যে প্রসাধন পুস্তিকা! আমাদের প্রসাধন পুস্তিকা 'লাভলিয়ার উইথ পণ্ড্‌স' বিনামূল্যে পাঠানো হয়। স্বাভাবিক সৌন্দর্য বাড়াবার সুপরীক্ষিত সব কৌশল এতে পাবেন। এই ঠিকানায় চিঠি লিখুন — জি পি ও বক্স নং ১৬১২, বোম্বাই ১

2797

হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ

গত ৭ই আগষ্ট অপরাহ্নে শিক্ষাব্রতী, জনকল্যাণে উৎসৃষ্ট জীবন, দানবীর, পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের অতর্কিত ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যু সমগ্র সমাজে শোকের নিবিড় ছায়াপাত করিয়াছে। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালরূপে কাজ করিতে করিতে সহসা লোকান্তরিত হইয়াছেন। কিন্তু রাজ্যপাল বলিয়াই তাঁহার পরিচয় দিলে তাহা অসঙ্গত হইবে। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র স্বায়ত্ত-শাসনশীল ভারতের ব্যাপারে আর পূর্ব্বের মত মনোযোগ দেন না - কারণ, ভারত আর ইংলণ্ডের অধীন—বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি নহে। কিন্তু হরেন্দ্রকুমারের মৃত্যু ইংলণ্ডের 'টাইমস' পত্র অবজ্ঞা করিতে পারেন নাই; সেই জন্য মন্তব্য করিয়াছেন:

"পাণ্ডিত্যে ও শাসনকার্য্যে তিনি যত সাফল্যই কেন লাভ করিয়া থাকুন না, লোক তাঁহার মহৎ সরল জীবনযাত্রার জন্য ও বিরাট দানের জন্যই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে স্মরণ করিবে।

"জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়—এ সব তাঁহার নিকট তুচ্ছ ছিল; কারণ, তাঁহার হৃদয় সে সকল অনায়াসে অবজ্ঞা করিত—তিনি সে সকলের অনেক উর্দ্ধে ছিলেন।

"রাজ্যপালরূপে তিনি যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার পরবর্ত্তীর পক্ষে তাহার অনুসরণ করা দুঃসাধ্য হইবে। কিন্তু তিনি মনুষ্যত্বের যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের পক্ষে প্রেরণার কারণ হইবে।"

এ কথা কে অস্বীকার করিতে পারিবে? মনুষ্যত্বের সমুচ্চ আদর্শ হইতে যে সংযমের উদ্ভব সেই সংযমে তিনি অপরাজেয় ছিলেন, বলিলেও অসঙ্গত হয় না। সে বিষয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত তাঁহার কত প্রভেদ ছিল, তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। প্রধান মন্ত্রী স্বীকার করিয়াছেন—তিনি সংযম রক্ষা না করিয়া কথা বলেন—মনে যাহা আসে তাহাই বলেন এবং সে জন্য সময় সময় তাঁহাকে বিব্রত হইতে হয়। তিনি আরও স্বীকার করিয়াছেন, তিনি সহজে ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া থাকেন। আপনার সেই ধৈর্য্যহীনতার সমর্থনে তিনি সমগ্র পঞ্জাবের লোককে ক্রোধপরায়ণ বলিয়া তাঁহার সেই দৌর্ব্বল্যের জন্য তাঁহার পঞ্জাবীর সন্তান জননীকেও দায়ী করিয়াছেন! কিন্তু হরেন্দ্রকুমারের দীর্ঘ জীবনে কেহ কখন তাঁহাকে অসংযতবাক বা ধৈর্য্যচ্যুত দেখেন নাই। মহত্বের মহিমা অনুশীলনে পুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অজাতশত্রু করিয়াছিল। কিন্তু তিনি কখন, কোন কারণে আপনার মতবিরোধী কাজ করেন নাই—কোন দিন অন্যায় সহ্য করেন নাই। তাঁহার দীর্ঘ জীবন পুণ্যপূত, করুণাস্নিগ্ধ, লোকহিত-সমুজ্জ্বল।

হরেন্দ্রকুমার কাজ করিতে করিতে শেষ শ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যু কখন আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়াছিল, যেন—চিকিৎসকগণও তাহা বুঝিতে পারেন নাই—সে বুঝি নিঃশব্দে আসিয়া তাঁহাকে স্পর্শ করিতে ইতস্ততঃ করিতেছিল। সে যখন তাহার নির্দ্দিষ্ট কাজ—নির্ম্মম হইলেও—করিয়াছিল, তখনও তিনি কার্য্যে ব্যাপৃত—টেবলের উপর কলম পড়িয়া আছে—বুঝি কোন পত্রে স্বাক্ষর দিবেন। আগামী ৩১শে অক্টোবর নিয়মানুসারে তাঁহার রাজ্যপালের কর্ম্মকাল শেষ হইবার কথা। হয়ত তাহার পরে তাঁহাকে আর সে পদে থাকিতে বলা হইত না। কারণ, তিনি ত্যাগের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা অনেকের পক্ষে অনধিগম্য বলিয়া তাঁহারা তাঁহাকে মুখে প্রশংসা করিলেও মনে মনে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইতে পারিতেন না। তাঁহার জনপ্রিয়তাও হয়ত অনেকের ঈর্ষার কারণ হইয়াছিল। আমরা জানি, যখন সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়, তিনি রাজ্যপালের মাসিক বেতন ৫,৫০০ টাকার মধ্যে ৫০০ টাকা মাত্র স্বয়ং লইয়া অবশিষ্ট ৫,০০০ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিবেন, তখন বহু রাজ্যপাল তাঁহার সহিত তুলনায় আপনাদিগের ক্ষুদ্রত্ব উপলব্ধি করিয়া বিচলিত হইয়াছিলেন। এমন কি সংযম হারাইয়া প্রধান মন্ত্রী অনুযোগের ভাবে বলিয়াছিলেন, "ডক্টর মুখোপাধ্যায় এ সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইল কেন?" যেন তাহা "অপরাধ"! কিন্তু তিনি উত্তরে কেবল বলিয়াছিলেন, তিনি সংবাদপত্রে কোন সংবাদ দেন নাই। এ দিকে বার্দ্ধক্য আসিয়া পড়িয়াছিল—জরা দেহের শক্তি ক্ষুণ্ণ করিতেছিল; সুতরাং নবোদ্যমে নূতন কোন কাজ করা আর সম্ভব হইত না। সেই অবস্থায় যে পদ তিনি গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন, সেই পদের সম্মানের মধ্যে, রোগযন্ত্রণা ভোগ না করিয়া, সকলের সম্মানভাজন অবস্থায় কাজ করিতে করিতে তাঁহার মৃত্যু কাম্য। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুতে দেশের ও দেশবাসীর যে ক্ষতি হইল, তাহা কি কখন পূর্ণ হইবে? ইতিহাসে আছে, দীর্ঘকাল সুশাসনে প্রদেশে শান্তি ও প্রাচুর্য্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালার শাসক শায়েস্তা খাঁ যখন ঢাকা ত্যাগ করেন, তখন তিনি যে পুরদ্বার পথে ঢাকা ত্যাগ করিয়াছিলেন, নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন—সে দ্বার যেন রুদ্ধ করা হয় এবং তাহাতে লিখিয়া দেওয়া হয়, যে শাসক তাঁহার মত টাকায় ৮ মণ চাউল বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন, তিনি যেন তাহা অনর্গল করেন—আর কেহ নহে। তেমনই কি বলা যায় না—রাজ্যপালরূপে তিনি লোকহিত সাধন করিয়া যে সম্প্রীতি ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন, তাহা যে রাজ্যপাল অর্জ্জন করিতে না পারিবেন, তিনি যেন আপনাকে রাজ্যপাল হইবার উপযুক্ত মনে না করেন? কয় জন সে যোগ্যতা লাভ করিবেন?

দেশ যখন দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইবার চেষ্টা করিতেছে, দেশে যখন শিক্ষা, শিল্প, সেচ, স্বাস্থ্য—এ সকলের উন্নতি-সাধন একান্ত প্রয়োজন, তখন দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে ত্যাগী হইতে হইবে। যে বিদেশী শাসকরা এ দেশকে শাসনের দ্বারা দুর্ব্বল ও শোষণের দ্বারা নিঃস্ব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট অর্থই পরমার্থ ছিল এবং সেই জন্য বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশে সচিব হইয়া মধুসূদন দাস যখন বিনা বেতনে কাজ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন নির্লজ্জ ইংরেজ শাসকরা বলিয়াছিলেন, তাহা নিয়মবিরুদ্ধ। গান্ধীজী সচিবদিগের জন্য যে বেতন নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন, ক্ষমতার আসনে আসীন হইয়া তাঁহার কয় জন "শিষ্য" তাহাতে

সন্তুষ্ট থাকিতেছেন? সে বিষয়ে হরেন্দ্রকুমারের আদর্শ অতুলনীয় বলা যায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিতে পারি। কলিকাতার রাজভবনে যে সকল অতিথি আসিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের জন্য অতিথি-সংকার বাবদে বার্ষিক লক্ষাধিক টাকা বরাদ্দ থাকে। প্রথা দাঁড়াইয়াছিল (ইংরেজ শাসনে কি ছিল বলিতে পারি না—ভারতীয় শাসনে এই প্রথা ছিল) রাজ্যপালের পরিবারের ব্যয়ও এই তহবিল হইতে গৃহীত হইত। হরেন্দ্রকুমার রাজ্যপাল হইলে যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, ঐ তহবিল হইতে তাঁহার পারিবারিক ব্যয়ের জন্য কত টাকা রাখিয়া অবশিষ্ট সংকারের টাকা লওয়া হইবে, তখন তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর ত সরকারী ব্যয়ে আহারই হয়। তবে তিনি আবার সেজন্য টাকা লইবেন কেন? তিনি বন্ধুবান্ধবকে এক পেয়ালা চা দিবেন—সে জন্য ত বেতনের ৫ শত টাকা রাখিয়াছেন। তিনি ঐ তহবিল হইতে—তাঁহার পূর্ব্ববর্তীদিগের মত—কোন অর্থগ্রহণ করেন নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে ঐ তহবিল হইতে বার্ষিক ৩১ হাজার টাকা পর্য্যন্ত রাজ্যপাল কর্তৃক গ্রহণের নজির গ্রহণ করিতে পারিতেন। অথচ বন্ধুবৎসল হরেন্দ্রকুমার তাঁহার পুরাতন বন্ধুদিগকে আহ্বান করিতে—আহার করাইতে ভালবাসিতেন এবং বয়সের সঙ্গে বন্ধুর সংখ্যা কত কমিয়া গিয়াছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিতেন।

এমন কি, তিনি তাঁহার জনহিতকর কার্য্যে অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য যাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেন, তাঁহাদিগকে "মিষ্টমুখ" করাইবার ব্যয়ও তিনি স্বয়ং বহন করিতেন। একবার তিনি কৃষ্ণনগরের পথে রাণাঘাটে একটি চিকিৎসাগারের উদ্বোধন করিবেন শুনিয়া রাণাঘাটের ব্যবসায়ীদিগের প্রতিনিধি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি আমার পরলোকগত বন্ধু "নদীয়া কাহিনী"-লেখক কুমুদনাথ মল্লিকের পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্র আসিয়া আমাকে বলিলেন, রাজ্যপাল যেন একবার তাঁহাদিগের প্রতিষ্ঠানের সম্মেলনে গমন করেন। তাঁহারা রাজ্যপালের দার্জ্জিলিং দেশবন্ধু চিকিৎসাগারের প্রতিষ্ঠাকল্পে ১,০০১ টাকা দিতে প্রস্তুত জানাইলে আমি রাজ্যপালকে তাহা জানাইয়া সম্মেলনে যাইতে সম্মত করাইয়াছিলাম। তথায় তাঁহার জন্য চা'র বিপুল আয়োজন ছিল। মিতাহারী হরেন্দ্রকুমার বলিলেন, তিনি মধ্যাহ্নের আহার ও নৈশভোজন—ইহার মধ্যে গুরুভোজন করেন না। একজন মিষ্টান্নকার তাঁহার জন্য একটি প্রায় আড়াই সের ওজনের পানিতোয়া প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া তিনি বলিলেন, উহা নষ্ট করিয়া কাজ নাই। সন্তানহীন হরেন্দ্রকুমার ও তাঁহার নিঃসন্তান পত্নী শ্রীমতী বঙ্গবালা বালকবালিকাদিগকে অবারিত স্নেহ দিয়া তৃপ্ত হইতেন। আমার দৌহিত্রীর কন্যার কথা সহসা হরেন্দ্রকুমারের মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, "ঐটি দাদাকে দাও—আমাদের নাতিনীর মেয়ে গৌরী আসে নি: উনি তার জন্য নিয়ে যাবেন।" তাহাই হইল। পরদিন কৃষ্ণনগর হইতে গভর্ণরের টেলিফোন আসিল—তিনি সেই বালিকাকে ডাকিতেছেন—জিজ্ঞাসা করিলেন, সে পানিতোয়া পাইয়াছে ত? মিষ্টান্নকারের কিন্তু আক্ষেপ রহিল, রাজ্যপাল তাঁহার উপহার ব্যবহার করিলেন না। তিনি কলিকাতায় আমার কাছে আসিলেন, আর একটি আড়াই সের পানিতোয়া তিনি আনিবেন, রাজভবনে রাজ্যপালকে দিতে যাইবেন। তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া যাইলে হরেন্দ্রকুমার হাসিমুখে উপহার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলে—তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কক্ষ ত্যাগ করিলেন। তখন হরেন্দ্রকুমার আমাকে বলিলেন, "পয়সা বেঁচে গেল; আজ বারাকপুরে যা'ব ইটখোলার মালিকদের নিমন্ত্রণ করেছি, দার্জ্জিলিং-এ আরোগ্যাগারের জন্য টাকা আদায় করতে হ'বে। মিষ্টি আর কিনতে হ'বে না—এতেই হ'বে।" সেরূপ অনুষ্ঠানেও তিনি সরকারী অর্থ ব্যয় করিতে দিতেন না।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা অক্টোবর খৃষ্টান-পরিবারে হরেন্দ্রকুমারের জন্ম হয়। বাঙ্গালায় ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ে বহু মনীষী খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ স্বয়ং খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন—যথা কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। আর কেহ কেহ খৃষ্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—যথা বিখ্যাত অধ্যাপক হিউ মেলভিল পার্সিভ্যাল, আলফ্রেড নন্দী, দিল্লীর বিখ্যাত অধ্যাপক—অ্যাণ্ড্রুজের গুরুস্থানীয় সুশীলকুমার রুদ্র প্রভৃতি। কৃষ্ণমোহন বিদ্যায় যেমন রাজনীতিতেও তেমনই প্রসিদ্ধ ছিলেন। কলিকাতা কর্পোরেশনে সদস্য নির্ব্বাচন প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র ভোটারের মুখে তাঁহার বর্ণনা দিয়াছিলেন:—

"কেহ বলে আমি চাই ওই সুব্রাহ্মণ,
পাকা দাড়ী—সাদাচুল ঋষিটি যেমন।
বিদ্যের জাহাজ বুড়ো, বুদ্ধের নবীন,
খৃষ্টানের মুখপাত চোখালো সঙ্গীন।
আমার পছন্দ এই খৃষ্টভেকধারী—
সাপোর্ট দিলাম কেটে, জিতি আর হারি।"

রাজনীতিতে কালীচরণ তাঁহার অনুগামী। দিল্লীর রুদ্র মহাশয়কে যাঁহারা জানিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তাঁহার গুণে মুগ্ধ। হরেন্দ্রকুমার সেই সম্প্রদায়ের গৌরব বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন।

হরেন্দ্রকুমারের পিতামহ নদীয়া জিলায় (বীরনগরে) নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। কোন সূত্রে কাজের সন্ধানে তিনি শ্রীরামপুরে গিয়াছিলেন। অন্য কোথাও আশ্রয় না পাইয়া তিনি এক খৃষ্টান পরিবারের ঘরের দাওয়ায় রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। রাত্রিকালে প্রাঙ্গণ পার হইবার সময় অন্ধকারে নালায় পড়িয়া তিনি

আঘাত পা'ন। তাঁহার পতন শব্দে গৃহস্বামী আসিয়া তাঁহাকে নালা হইতে তুলিয়া তাঁহার আঘাত-বেদনার জন্য স্থানীয় ধর্ম্মযাজকদিগকে সংবাদ দিলে তাঁহারা আসিয়া ঔষধ দেন। দারিদ্র্যের সম্বন্ধে তাঁহাদিগের মনোভাবের এই পরিচয় তাঁহাকে খৃষ্টধর্ম্মে আকৃষ্ট করে এবং খৃষ্টের উপদেশ ও চরিত্রকথা শুনিয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হ'ন। লালচাঁদ তাঁহার অন্যতম পুত্র। লালচাঁদ পিতৃহীন হইলে তাঁহার অধ্যয়নের সুযোগের অভাব ঘটে। সেই সময় তাঁহার ভ্রাতৃজায়া একদিন দেবরের হাত ধরিয়া ধর্ম্মযাজকদিগের নিকট যাইয়া বলেন—বালকের শিক্ষার কোন ব্যবস্থা হইল না—সে কি করিয়া অন্নার্জ্জন করিবে?—এরূপ হইলে কি লোক আর খৃষ্টান হইবে? ধর্ম্মযাজকরা বালককে সামান্য ইংরেজী ও পারস্য ভাষা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি সেই শিক্ষালাভ করিয়া কলিকাতায় ভারত সরকারের দপ্তরখানায় মাসিক ১০ টাকা বেতনে কাগজপত্র রাখার কাজে নিযুক্ত হন। সুশিক্ষিত কর্ম্মচারীরা এই খৃষ্টান তরুণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন না। কিন্তু লালচাঁদ প্রতিবাদ করিতেন না। তাঁহার হস্তাক্ষর সুন্দর ছিল। পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও ধৈর্য্য—পুরস্কার আনিয়া দেয়; তিনি ক্রমে চাকরীতে উন্নতি লাভ করেন। তিনি প্রথমে হাওড়ায় "চেঁচাবেড়া" চালা ঘরে সপরিবারে বাস করিতেন—মাসিক ভাড়া ২ বা ৩ টাকা। তিনি বলিতেন, রেলগাড়ী প্রবর্ত্তিত হইলে স্বামিস্ত্রী অবসরকালে বিস্ময় সহকারে ট্রেণ গতাগাত লক্ষ্য করিতেন। তখন সাধারণ লোক মনে করিত—"কলিতে পুষ্পকরথ এনেছে ইংরাজ।" ক্রমে তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে এবং তিনি সন্তানদিগকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া—ডিহি শ্রীরামপুরে কিছু জমী কিনিয়া তাহাতে গৃহনির্ম্মাণ করেন—অবশিষ্ট জমীতে বসতি ছিল। ডিহি শ্রীরামপুর তখন কলিকাতায় নহে—কলিকাতার উপকণ্ঠে—মারহাট্টা খাতের (লোয়ার সার্কুলার রোড) পূর্ব্বদিকে—বিরলবসতি স্থান—তথায় জমীর মূল্য অল্প। দরিদ্র পরিবারকে তখন মধ্যবিত্ত বলা যায়। কিন্তু পরিবারে বাহুল্যের অবসর ছিল না—বিলাস বর্জ্জিত হইয়াছিল—মিতব্যয়িতার অনুশীলন ছিল।

অর্থের যখন প্রাচুর্য্য ছিল না, তখন হরেন্দ্রকুমার পরিবারের পরিবেষ্টনে যে মিতব্যয়িতা শিক্ষা করিয়াছিলেন—তাহাতে তিনি অবিচলিত বিশ্বাস রাখিয়াছিলেন এবং যখন অর্থের অভাব দূর হইয়া গিয়াছিল, তখনও অন্য কারণে অর্থাৎ দেশের লোকের কল্যাণকল্পে, তাহা শিথিল না করিয়া আরও দৃঢ় করিয়াছিলেন। তাহা যেন তাঁহার ধাতুগত হইয়া গিয়াছিল। তিনি যখন রাজ্যপাল তখন, পূর্ব্বেরই মত, সময় সময় কোন কোন বিষয়ে তথ্য জানিবার জন্য আমাকে টেলিফোন করিতেন—সঙ্গে সঙ্গে বলিতেন, তিন বা চারি দিনের মধ্যে তথ্য পাইলেই চলিবে—"পোষ্টকার্ডে লিখে পাঠিও—টেলিফোনে খরচ করবার দরকার নাই।"

পিতা লালচাঁদও মিতব্যয়িতাহেতু ও সতর্কতা সহকারে সঞ্চিত অর্থ "খাটাইয়া" কিছু অর্থ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছিলেন।

ভারতীয় খৃষ্টানদিগের মধ্যে যাঁহারা কিছু অধিক উপার্জ্জন করিতেন, তাঁহারা কেহ কেহ "সাহেব ঘেঁসা" ভাব বেশে ও বাসে প্রকাশ করিতেন বটে, ঠিক সাধারণতঃ সকলেই প্রতিবেশী হিন্দুদিগেরই (মুসলমানরাও তখন লুঙ্গী বা পা'জামা ও টুপী ব্যবহার করিতেন না) মত ব্যবহারে থাকিতেন। কলিকাতা পটলডাঙ্গা অঞ্চলে ডক্টর প্রাণধন বসু প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ছিলেন—বিখ্যাত অস্ত্রচিকিৎসক ডক্টর ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার ভাগিনেয়। তিনি যে খৃষ্টান তাহা পল্লীর অনেকেই জানিতেন না। লালচাঁদ বাবুর পরিবার হিন্দু পরিবারেরই মত ব্যবহার করিতেন। এমন কি তিনি অসবর্ণ বিবাহও ভালবাসিতেন না।

পাঠদশায় হরেন্দ্রকুমার প্রথমে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই—বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, এ, পরীক্ষায়ও তিনি সাধারণভাবে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তখন কেবল প্রেসিডেন্সী কলেজে এম, এ, অধ্যাপনার ব্যবস্থা ছিল। হরেন্দ্রকুমার ইংরেজী সাহিত্যে এম, এ, পরীক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন ও এত মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করিতে থাকেন যে, পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। তাহা এমনই অপ্রত্যাশিত যে তিনি রাজ্যপাল হইবার পরে সেই সময়ে তাঁহার অন্যতম সতীর্থ প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব শ্রীনরেন্দ্রকুমার বসু রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলেন, জীবনে দুইটি সংবাদ তাঁহাকে স্তম্ভিত করিয়াছিল—সতীর্থ হরেন্দ্রকুমারের এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান লাভ, আর তাঁহার রাজ্যপাল পদপ্রাপ্তি।

হরেন্দ্রকুমার সংখ্যাল্প খৃষ্টান সম্প্রদায়ের লোক। তিনি যখন এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলে সরকারী চাকরী পাইতে পারিতেন—হয়ত ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া পেন্সন ও ভগ্নস্বাস্থ্য লইয়া জীবন শেষ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না—তাঁহার কাজ যে সরকারী চাকরীর সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বদ্ধ হইয়া থাকিবে, তাহা তাঁহার ভাগ্যবিধাতার অভিপ্রেত ছিল না। তিনি শিক্ষকের কাজ বাছিয়া লইলেন। তখন সরকারী চাকরীয়ারাও শিক্ষাবিভাগে দুই ভাগে বিভক্ত ছিলেন—এক ভাগ ইংরেজ প্রভৃতির জন্য, তাহাতে বেতনের পরিমাণ অধিক; আর এক ভাগ দেশীয় সাধারণ শিক্ষকদিগের জন্য, তাহাতে বেতন কম। কিন্তু হরেন্দ্রকুমার সরকারী চাকরীও লইলেন না—বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের কাজ লইলেন। অধ্যয়নে ও অধ্যাপনায় তিনি আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ করিতেন। যে শিক্ষক অধ্যাপনার বিষয়াতিরিক্ত কিছু জানেন না, সে শিক্ষক যেমন ভয়াবহ, যে ছাত্র মনে করে শিক্ষার শেষ আছে সে তেমনই ভ্রান্ত। শিক্ষকের যেমন জ্ঞাতব্য বিষয়ের শেষ নাই, ছাত্রের তেমনই শিক্ষা কখনও শেষ হয় না। শিক্ষক হরেন্দ্রকুমারের অধ্যাপকখ্যাতি অল্পদিনেই বিস্তৃতি লাভ করে এবং তিনি ছাত্রদলে আদর ও শ্রদ্ধা লাভ করেন। ছাত্রদিগকে তিনি অধ্যয়নে আনন্দলাভ করিবার মত শিক্ষা দিতেন।

এই সময় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া পরীক্ষক প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাদানের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন। তিনি ক্ষমতাবলে—কৌশলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন-ক্ষমতা অর্জ্জন করিয়া লইতেছিলেন। ইংরেজ সরকার যখন এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষাও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে অসম্মতি জানাইলেন, তখন আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিক প্রভৃতি শিক্ষার মান খর্ব্ব করিয়া ছাত্র আকৃষ্ট করিয়া দেশে শিক্ষার বিস্তার সাধন করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কেন না, শিক্ষার বিস্তার না হইলে দেশের

কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি অনবহিত ছিলেন না এবং সেইজন্য "পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট" শিক্ষার বিস্তৃত ব্যবস্থা করেন। হরেন্দ্রকুমারের যোগ্যতা আশুতোষের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে নাই। তিনি সেই যোগ্যতার সদ্ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় পুত্র দুই জনের শিক্ষাদানভারও তাঁহাকে প্রদান করিলেন। তখন হরেন্দ্রকুমারের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সম্বন্ধ স্থাপিত হইল, তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইয়াছিল।

এই সময় হরেন্দ্রকুমারের জীবনে শোকের অন্ধকার ব্যাপ্ত হয়। তাঁহার একমাত্র পুত্র দুরন্ত টাইফয়েড জ্বরে প্রাণত্যাগ করে এবং অল্প দিন পরেই পুত্রহারা জননীর জীবনান্ত হয়। হরেন্দ্রকুমার শোকে অধীর হইয়া পড়েন, সান্ত্বনা লাভের উপায় সন্ধান করিতে পারেন নাই। তিনি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিয়া সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করিয়া যখন ব্যর্থকাম হইলেন, তখন তাঁহার মনে হইল—তিনি কেন সকল ছেলেকে আপনার পুত্র মনে করিয়া শান্তিলাভের উপায় করেন না? শুনিতে পাওয়া যায়, যখন দুই পুত্রের শোকে রাজা সীতারাম রায় রাজকার্য্যে অবহেলা করিতে থাকেন তখন তাঁহার গুরুদেব তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন—তুমি বহুজনহিতার্থে জলদানের জন্য দুই পুত্রের নামে—সরোবর খনন করাও। বিনয়ী হরেন্দ্রকুমার কোন দিন বলেন নাই, তিনি প্রত্যাদেশ বা অন্তরের আলোক লাভ করিয়াছিলেন; তিনি বলিতেন, ঐ কথা তাঁহার মনে হইয়াছিল। তিনি কিরূপ নিষ্ঠাসহকারে তাহাই করিয়াছিলেন—নানা ভাবে আপনাকে বঞ্চিত করিয়াও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার ১৪ লক্ষ টাকা দানে, রাজ্যপাল পদ পাইয়া ব্যাধিতের জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় ও উদ্বাস্তুদিগের জন্য তাঁহার কৃত কার্য্যেই তাহা বুঝিতে পারা যায়।

তাঁহার বৃদ্ধ পিতার তখন সেবাশুশ্রূষা প্রয়োজন; মাতা পরলোকগতা। পিতার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে হরেন্দ্রকুমার আবার বিবাহ করেন। পত্নী বঙ্গবালা যে কন্যার মতই লালচাঁদ বাবুর সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাহা হরেন্দ্রকুমারের বন্ধুবান্ধবরা অবগত আছেন। কিন্তু তদপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য, তাঁহার স্বামীর জনকল্যাণব্রত গ্রহণ, তাঁহার ত্যাগের অংশগ্রহণ ও তাঁহার জীবনের বিরাট আদর্শ স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাঁহাকে সাহায্য দান।

মহত্তের মহত্ত্ব সম্যক সমুজ্জ্বল করিবার জন্য তাঁহাকে শোকদুঃখের বহ্নিতে কালিমাশূন্য করিতে হয়। শোকে হরেন্দ্রকুমারের তাহাই হইয়াছিল। হরেন্দ্রকুমার যে মুহূর্ত্তে স্থির করেন, তিনি সকল সন্তানকে আপনার সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তখনই সঙ্কল্প করেন, তাহাদিগের জন্য উচ্চ শিক্ষালাভ সুকর করিবার চেষ্টা করিবেন—সেজন্য আপনাকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়া সেই অর্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিবেন। কি ভাবে তিনি আপনাকে বঞ্চিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। কলেজ পরিদর্শন জন্য তিনি কাঁথী যাইতেছিলেন—সঙ্গে তাঁহার সহকারী অধ্যাপক জীতেন্দ্র নিয়োগী। ষ্টেশন হইতে কাঁথী সহর দূরে অবস্থিত। নিয়োগী মহাশয় হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন, উভয়ে নিয়মানুসারে যে টাকা পাইবেন, তাহাতে ট্যাক্সীতে যাতায়াত করিলেও কিছু থাকে। তিনি ট্যাক্সী ভাড়া করিবার প্রস্তাব করিলে হরেন্দ্রকুমার বলিয়াছিলেন, "তোমরা বড় মানুষ, ট্যাক্সীতে যেতে চাও—যাও; আমি যাত্রিবাহী বাসেই যা'ব।" বলা বাহুল্য, উভয়েই যাত্রিপূর্ণ বাসে গতায়াত করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকুমার ভাড়া বাবদে প্রাপ্য অর্থের অবশিষ্টাংশ সঞ্চয় করিয়াছিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়কে দিবেন। গৃহে তিনি ও তাঁহার পত্নী দরিদ্রের মতই বাস করিতেন—বিলাসের কোন চিহ্ন তথায় ছিল না। ব্যয় কিছু অধিক হইত—পুস্তক ক্রয়ে। দীর্ঘ জীবনে সঞ্চিত পুস্তকগুলিও তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। রাজ্যপাল হইয়া তিনি যে প্রথমেই আয়ের অধিকাংশ টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তিনি রাজ্যপাল হইবার কয় মাস পরে, তিনি যখন দার্জ্জিলিং-এ, তখন একদিন তিনি নিত্য-পরিবর্ত্তন-বিলাসী প্রধান মন্ত্রীর নিকট হইতে টেলিফোনে সংবাদ পান—তাঁহাকে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলা হয়, ভারত সরকার স্থির করিয়াছেন, কোন লোককে তাঁহার নিজ প্রদেশে রাজ্যপাল করা হইবে না। তাঁহার নিয়োগকালে ত এ নিয়ম ছিল না, বলায় প্রধান মন্ত্রী উত্তর দেন, নিয়ম করিবার বিষয় বিবেচিত হইতেছে। হরেন্দ্রকুমার বলেন, যদি এমন কোন নিয়ম করিবার প্রস্তাব হয় এবং তিনি

তাহাতে বাধা হইয়া দাঁড়ান, তবে তাহা বলিলে তিনি দার্জ্জিলিং হইতে ফিরিয়া কলিকাতায় "রাজভবনে" না যাইয়া আপনার গৃহেই যাইবেন। সে প্রস্তাব অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। হরেন্দ্রকুমার পত্রে ঘটনাটির আভাস মাত্র দিয়া পরে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তিনি উত্তর প্রদেশে রাজ্যপাল হইয়া বেতনের ৫ হাজার টাকা প্রতি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দিলে উত্তর প্রদেশের অধিবাসীরা অসন্তুষ্ট হইবেন এবং তাহাতে প্রাদেশিক ঈর্ষ্যার উদ্ভব হইবে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। আর তিনি যদি পূর্ণবেতন গ্রহণ করিয়া পরে তাহা হইতে মাসিক ৫ হাজার টাকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেন, তাহা হইলে আয়করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কতক টাকা ক্ষতি হয়।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল নিযুক্ত হইবার বিষয় উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম রাজ্যপাল—রাজাগোপালাচারী; দ্বিতীয়—কৈলাসনাথ কাটজু। যখন কৈলাসনাথের পরবর্তী নিয়োগের বিষয় আলোচিত হয়, তখন প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছা ছিল—আসফ আলীকে মনোনীত করেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সচিব তাহাতে বলেন, সে ব্যবস্থা হইলে তিনি আসন্ন নির্ব্বাচনে কংগ্রেস পক্ষের জয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন না। পণ্ডিত জওহরলাল তাহাতে বলেন, তবে কি সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের লোক রাজ্যপাল হইবার সুযোগ লাভ করিবেন না? তখন হরেন্দ্রকুমারের নামোল্লেখ হয়। তিনি কেবল সংখ্যালঘিষ্ঠ ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিই নহেন, পরন্তু তাঁহারই চেষ্টায় সেই সম্প্রদায় রাজনীতিক্ষেত্রে কোনরূপ বিশেষ অধিকার দাবী করিতে বিরত হইয়া জাতীয়তার পুষ্টি সাধন করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য যে সমিতি গঠিত হইয়াছিল, তাহার সভাপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রায় সকল অধিবেশনেই অনুপস্থিত ছিলেন এবং সহকারী সভাপতি হরেন্দ্রকুমারই তাহার কার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন! সেই জন্যই তাঁহাকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মনোনীত করা হয়। তিনি সে পদ গৌরবান্বিত করিয়া গিয়াছেন।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষক হরেন্দ্রকুমার ভারতীয় খৃষ্টানদিগের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় 'ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য নির্ব্বাচিত হ'ন। ম্যাটসিনী বলিয়াছিলেন—জাতীয় সমস্যার সমাধান ব্যতীত দেশের কোনরূপ উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। দেশের লোকের রাজনীতিক অধিকার লাভই জাতীয় সমস্যা। ইহা বুঝিয়াই অরবিন্দ শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া রাজনীতি ক্ষেত্রে কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। আর সেই জন্যই হরেন্দ্রকুমার অসঙ্কোচে রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ব্যবস্থাপক সভায় তিনি দেশের সমস্যা সম্বন্ধে অধ্যয়ন করিতে থাকেন। তিনি প্রায় কোন বিতর্কে যোগ দিতেন না—অন্য সদস্যদিগের সহিত নানা সমস্যার আলোচনা করিতেন।'

এদিকে একটি নূতন সমস্যা ইংরেজের সমর্থনে ও সম্প্রদায়বিশেষের স্বার্থপরতায় দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া যে আন্দোলন ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল, তাহা ইংরেজ শাসকদিগকে বিচলিত করিয়াছিল—তাঁহারা মুসলমান সম্প্রদায়কে স্বার্থের প্রলোভন দেখাইয়া জাতীয়তার শক্তিক্ষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ফলে ঢাকার হতভাগ্য নবাব সলিমুল্লাকে পুরোভাগে লইয়া যে সাম্প্রদায়িকতা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, তাহা দেশের পক্ষে অকল্যাণের সৃষ্টি করে। ইংরেজ হেনরী কটন লিখিয়াছেন,—

"For the first time the principle was in-unciated in official circles: Divide and Rule! The hope was held out that the Partition would invest the Mohammedans with 'a unity they had never enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and Kings'. The Mohammedans were officially favoured in every possible way. 'My favourite wife' was the somewhat coarse phrase used by Sir Bampfylde Fuller (Lieutenant-Governor of East Bengal) to express his feelings."

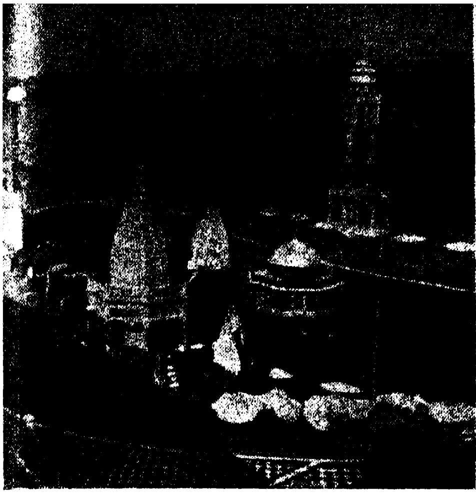
ইহার পূর্ব্বে কংগ্রেস দেশে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলে ইংরেজ শাসকরা (সার অকল্যাণ্ড কলভিন প্রভৃতি) নানা উপায়ে জমীদার সম্প্রদায়কে ও মুসলমানদিগকে কংগ্রেস বর্জ্জন করাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয় নাই। এ বার বাঙ্গালায় ক্ষতি অধিক হয়। তদবধি ইংরেজ শাসকরা হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ সৃষ্টি নীতি হিসাবে পরিচালন করিতেছিলেন। বঙ্গবিভাগের পরে বড়লাট হইয়া আসিয়া লর্ড মিণ্টো সাম্প্রদায়িকতার বহ্নিতে ইন্ধনযোগ করিলেন। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কারে সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা হইল। দুঃখের বিষয়, শেষে কংগ্রেসও তাহার বিরোধিতা না করিয়া সমর্থনই করিলেন। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারে সে নীতির নিন্দা করিলেও তাহার উচ্ছেদসাধন করা হইল না। মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও হিন্দুসম্প্রদায় পর্য্যন্ত বিভাগবিস্তার করিতে সম্মত হইলেন। উদ্দেশ্য যত ভালই কেন হউক না, দেশে বিভেদের বিষ বিসর্পিত হইতে লাগিল। হরেন্দ্রকুমার তাহা লক্ষ্য করিলেন—রাজনীতিকরা উত্তেজনার ধূমে তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। তিনি দুইটি বিষয়ে মনোযোগ দিলেন:—

(১) হিন্দুদিগকে বুঝাইতে চাহিলেন, সাম্প্রদায়িকতার বিস্তারে সমাজশক্তি ক্ষুণ্ণ ও ক্ষীণ হইবে:

(২) ভারতীয় খৃষ্টান সম্প্রদায়কে বুঝাইতে চাহিলেন, স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক অধিকার লাভে অনিষ্ট ব্যতীত উপকার হইতে পারে না।

এই সময় তিনি পূর্ব্বের রাজনীতিক সাহিত্য—বিশেষ সংবাদপত্রে আলোচনা ও অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন আমি 'বসুমতী' সম্পাদক। তিনি দিনের পর দিন 'বসুমতী' সাহিত্য মন্দিরে যাইয়া উপকরণ সংগ্রহ ও আমার সহিত আলোচনা করিতেন—প্রবন্ধ লিখিতেন। কত দিন তাঁহাকে সংবাদপত্রের "কাটিং" খাতা ও পুস্তিকাদি দিয়া বলিয়াছি, তিনি সেগুলি বাড়ীতে লইয়া যাইয়া ব্যবহার করুন—কাজ শেষ হইলে ফিরাইয়া দিবেন। কিন্তু তিনি কিছুতেই তাহাতে সম্মত হইতেন না—বলিতেন, "এ সব উপকরণ যদি কোনরূপে হারায় বা নষ্ট হয়, তবে আর সংগ্রহ করা সম্ভব হইবে না। দাদা, তুমি কাজ কর, আমাকে স্বতন্ত্র টেবল দাও, আমি বসিয়া কাজ করি।" তিনি হাসিয়া বলিতেন, "তোমরা সাংবাদিক, গল্প করিতে করিতে লিখিতে পার—প্রয়োজন হইলে তোমাকে

।। আ লো ক চি ত্র ।।



হরকিপ্যারী (হরিদ্বার)

—গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়



রমণীয়া —দেবদত্তা রায়



ধানকাটা (মৃৎশিল্পী—শচীন পাল) —আলোকচিত্র কনক দত্ত



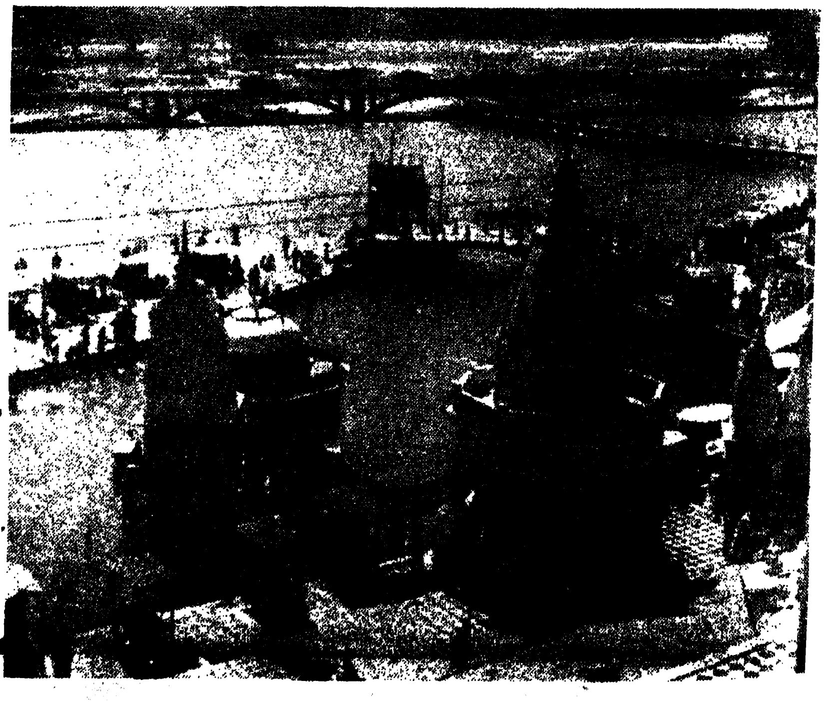
দুই বোন

—কল্পনা দত্ত

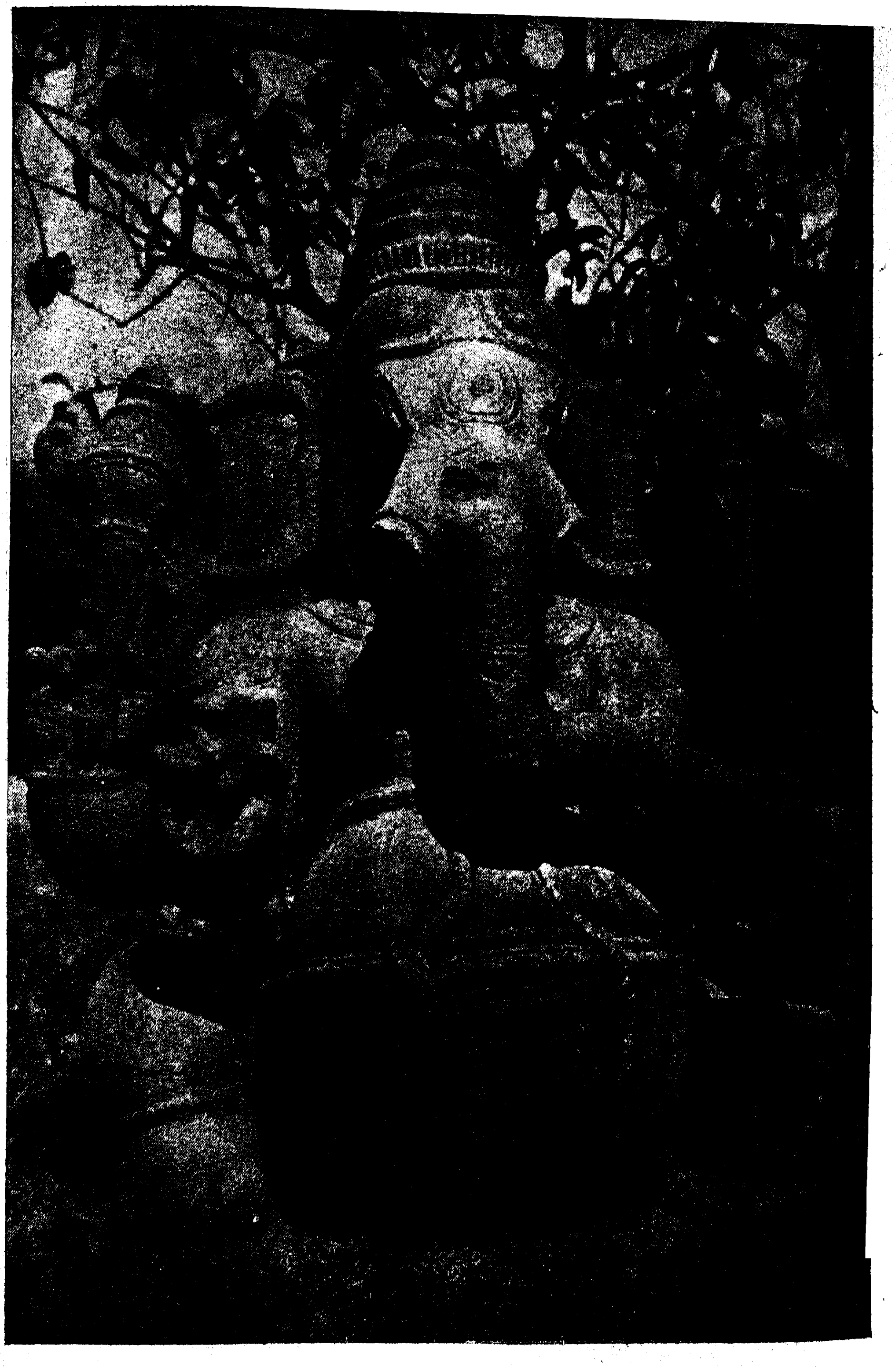
[ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা ও বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।]

হরকিপ্যারী (হরিদ্বার)

—অরুণ মুখোপাধ্যায়







গণেশ (মহাবলীপুরম সংগ্রহশালা) —চঞ্চল মিত্র

জিজ্ঞাসা করিব।" পুস্তকাদি সম্বন্ধে তাঁহার এই সতর্কতা দুর্ল্লভ। একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার জন্য আমার পুস্তক বা খাতা লইয়া যাইয়া আর ফিরাইয়া দেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে পরম স্নেহভাজন কর্মীদিগের নামোল্লেখ করিতে পারি। হরেন্দ্রকুমার সে বিষয়ে নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পুস্তকসমূহের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়খানি পুস্তক দেখিয়া সেগুলি ফিরাইয়া দেন—বলেন, তিনি বহিচোর হইতে পারিবেন না। 'বসুমতী কার্য্যালয়ে' আমার বসিবার ঘরের পাশে একটি ছোট ঘেরা স্থান ছিল। তথায় টেবল দিয়াছিলাম। তিনি তন্ময় হইয়া প্রদত্ত উপকরণ পরীক্ষা করিতেন ও প্রবন্ধ লিখিতেন। সে সকল প্রবন্ধ জাতীয়তার ভাবে পরিপূর্ণ। সেগুলি তাঁহার রাজনীতিক দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। তিনি বুঝিয়াছিলেন, জাতীয়তার জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করিতে না পারিলে জাতি কখন স্বাধীনতা লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করে না।

হরেন্দ্রকুমার ভারতের নানা স্থানে যাইয়া খৃষ্টানদিগকে বুঝাইতে থাকেন, যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারিলে রাজনীতিক ক্ষমতা লাভ করা যায়—সেজন্য কোন স্বতন্ত্র অধিকারলাভচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। তাঁহার এই কাজ কিরূপ সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ, তিনি ভারতের বৃহৎ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে ঘোষণা করিতে পারিয়াছিলেন—সে সম্প্রদায় জাতীয়তা চাহে—সাম্প্রদায়িকতার মোহাবিষ্ট হইয়া জাতির ক্ষতি করিতে অসম্মত। এই রাজনীতিকোচিত উক্তিতেও যাহারা হীন সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধিতে লজ্জানুভব করে নাই, তাহারা লজ্জা জয় করিয়া ঘৃণ্য হইয়াছে।

কংগ্রেস তখনও সংগ্রামশীল প্রতিষ্ঠান এবং জনমতের উপর তাহার শক্তি প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য কংগ্রেস দেশের জনগণের কল্যাণকল্পে কি করিয়াছেন, দেশের লোককে তাহা বুঝাইয়া কংগ্রেসে আকৃষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে তিনি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন।

হরেন্দ্রকুমার প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে অর্থ প্রদান করেন, তাহা বাঙ্গালী খৃষ্টানদিগের জন্য ব্যবহার করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল। তাহার কারণ তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা তাহার উল্লেখ করিতেছি—টাকা তাঁহার পরলোকগত পিতামাতার স্মৃতি রক্ষার্থ প্রদত্ত হয়; তাঁহারা নিষ্ঠাবান খৃষ্টান ছিলেন; আর এ দেশে খৃষ্টানরা সাধারণতঃ দরিদ্র—দারিদ্র্যের জন্য তাহাদিগের শিক্ষালাভে অসুবিধা ঘটে, অথচ তাহারা সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ—সমাজের একাংশ অনুন্নত থাকিলে সমগ্র সমাজের উন্নতি বিঘ্নবহুল হয়। পরে ভারত স্বায়ত্তশাসনশীল হইলে—শিক্ষাবিস্তারের ভার জাতীয় সরকারের, এই কারণে তিনি ঐ অর্থপ্রয়োগের নিয়ম শিথিল করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি সামরিক শিক্ষা প্রদানেরও পক্ষপাতী ছিলেন এবং সকল ক্ষেত্রে আদর্শ উপদেশ অপেক্ষা ফলোপধায়ক মনে করিয়া অর্থ প্রদান করিতেন।

পর পর দুইটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে দুর্ব্বল ও সুভাষচন্দ্রের কৃত কার্য্যে ইংরেজ ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু তাহার দুরভিসন্ধিতে ও নেতৃস্থানীয় কতকগুলি ভারতীয়ের ক্ষমতালাভের জন্য অধীরতায় ভারত বিভক্ত হইল—সাম্প্রদায়িকতার জয় হইল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। রাজাগোপালাচারী প্রমুখ কংগ্রেস নেতারা পূর্ব্বেই সাম্প্রদায়িক-সমস্যাসঙ্কুল পঞ্জাব ও বাঙ্গালা বাদ দিয়া ভারতের অবশিষ্ট অংশগুলিতে স্বায়ত্ত-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়া মুসলমানদিগের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রলাভের আকাঙ্ক্ষায় উৎসাহ দিয়াছিলেন। শেষে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীও—দেশবিভাগ পাপ এ কথা বলিয়াও—তাঁহার নাম লইয়া যাঁহারা রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করেন, তাঁহাদিগকে দেশবিভাগে সম্মতি দিতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই এবং তাঁহাদিগের নেতৃত্ব ত্যাগ করিতেও অগ্রসর হ'ন নাই। হরেন্দ্রকুমার সাম্প্রদায়িকতার গতিরোধ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু একটি সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িকতার পাপ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন।

হরেন্দ্রকুমার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করিলেন। এই গৃহী-সন্ন্যাসী তথায় বাক্‌চাতুর্য্যে সদস্যদিগকে মুগ্ধ ও দেশের লোকের নিকট আদৃত হইবার চেষ্টা করিলেন না—প্রকৃত কর্ম্মযোগীর মত দেশের—খণ্ডিত, দুর্দ্দশাগ্রস্ত, বিব্রত দেশের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করিলেন। ইংরেজী সাহিত্যের এই অধ্যাপক রাজনীতিক ব্যাপার কিরূপ যত্নসহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ভারত সরকারের সংবিধান অর্থাৎ শাসন-পদ্ধতি রচনাকালে তাহা বুঝিতে পারা গেল। রচনার ভার যে সমিতির উপর অর্পিত হইল কংগ্রেসে সুপরিচিত ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাহার সভাপতি হইলেন। তিনি কিন্তু সমিতির কার্য্যে আবশ্যক সময় দিলেন না। সে কাজ সহকারী সভাপতি ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়কেই করিতে হইল। ভারতীয় সংবিধান রচনার কৃতিত্ব অনেকাংশে হরেন্দ্রকুমারের প্রাপ্য।

ইহার পরে হরেন্দ্রকুমার পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল মনোনীত হইলেন। তাঁহার মনোনয়নের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি জানিতেন, সংবিধানের নিয়মানুসারে রাজ্যপালের ক্ষমতা যাহাই কেন হউক না, তাঁহার কার্য্যের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ—সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের আড়ম্বর তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া থাকিলেও তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজ্যপাল—শাসনকার্য্যের দৈনন্দিন ব্যাপারে তাঁহার হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু তিনি এই পদ কেবল শোভার্থ রাখিয়া স্বয়ং আরাম সম্ভোগ করিতে অসম্মত হইলেন—এই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লোকহিতের বিস্তৃত ও অসীম ক্ষেত্র সৃষ্টি করিয়া লইলেন। সে ক্ষেত্রে তাঁহার শ্রম যেমন অসীম—সাফল্য তেমনই অসাধারণ। তিনি বিশেষ ভাবে কয়টি কাজ চাহিয়া লইলেন—

(১) শিক্ষাবিস্তার
(২) পীড়িতের চিকিৎসা
(৩) দরিদ্রের সেবা
(৪) উদ্বাস্তুদিগের দুঃখদূরীকরণ।

হরেন্দ্রকুমারের রাজ্যপালরূপে এই বিভাগচতুষ্টয়ের কাজের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে সামাজিক জীবনে তাঁহার কাজের উল্লেখ করিব। তিনি যখন রাজ্যপাল মনোনীত হ'ন, তখনও তাঁহার অধ্যাপকদিগের মধ্যে আচার্য্য যদুনাথ সরকার সুস্থ ছিলেন। রাজ্যপাল হইয়া তিনি তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে একদিন রাজভবনে আসিতে আমন্ত্রণ করেন; বলেন, "এতদিন যে বাড়ীতে কাজ ক'রে এসেছি, তা'তে আপনাকে যেতে বলতে পারি নি; এখন বড় বাড়ী পেয়েছি—আপনাকে একদিন সেখানে যেতে হ'বে।" তিনি কিরূপ বন্ধুবৎসল ছিলেন, তাহার কিছু পরিচয় দিতেছি। তিনি মধ্যে মধ্যে পুরাতন বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আহারের সময় নানা বিষয়ের আলোচনা করিতেন—তাঁহাদিগের গৃহে যাইতেন ও আহার করিতেন। কালে পুরাতন বন্ধুদিগের সংখ্যা কত কমিয়া আসিয়াছিল, তাহা বলিতেন। সতীর্থদিগের মধ্যে ভূতনাথ কর অন্যতম ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য সতীর্থদিগের তালিকা দিয়াছিলেন। ভূতনাথ বাবুর পুত্রের বিবাহে নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি বিবাহকারীকে বলিয়াছিলেন "আমরা আর অল্প ক'জন বেঁচে আছি। তুমি নিজে গিয়ে তাঁ'দের সকলকে নিমন্ত্রণ ক'রে আসবে—আমরা সকলে, তোমার পিতৃবন্ধুরা, তোমার স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ ক'রে আসব।" এক জন সতীর্থ রক্ষণশীল বলিয়া তিনি একবার সতীর্থদিগকে নিমন্ত্রণকালে তাঁহার জন্য সকলেরই রক্ষণশীলের উপযোগী আহার্য্যের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং তিনি আসিতে না পারায় বিশেষ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিংএ যাইলে তিনি সতীর্থ নরেন্দ্রকুমার বসুর সহিত মিলিত হইতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহার নিকট আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এ সুযোগ আমি ত্যাগ করিতে পারি না। যে সন্ধ্যায় আমি করোণারী থ্রম্বসিস হৃদরোগে আক্রান্ত হই, তাহার পরদিন প্রভাতে এক ব্যক্তি আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া সংবাদ পাইয়াই টেলিফোনে হরেন্দ্রকুমারকে সে সংবাদ দেন। সংবাদ পাইয়াই তিনি নির্দ্দেশ দেন—আমার গৃহসম্মুখস্থ পথে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া কোলাহল ও শব্দ নিবৃত্ত করিতে হইবে—পথের দুই প্রান্তে পুলিস মোতায়েন করিয়া যানযাত্রীর নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে—গৃহদ্বারে পুলিস দিয়া যাহাতে ভীড় না হয় সে ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি আমাকে দেখিতে আসিয়া—চিকিৎসকগণ সাক্ষাৎ নিষিদ্ধ বলায়—নিঃশব্দে পার্শ্বের কক্ষে আসিয়া ভগবানের নিকট আমার আরোগ্যলাভ জন্য প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "আমাদের শেষ বন্ধু ভগবান, আমি দাদার ঘরের পাশে বসে তাঁ'র জন্য ভগবানকে ডেকে যা'ব।" তিনি দুইটি মাল্য আনিয়াছিলেন—বলিয়া গিয়াছিলেন, "একটি দাদার ছবিতে, আর একটি দৌদি'দির ছবিতে দিবে।" আমি সুস্থ হইয়া উঠিলে তিনি আমার জন্ম-জয়ন্তী করিবার সঙ্কল্প করিয়া তাঁহার ভূতপূর্ব ছাত্র ডক্টর কালিদাস নাগকে ডাকিয়া ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করেন—শ্রীমান তাপসকুমার শাস্তা প্রমুখ তরুণদিগের সাগ্রহ চেষ্টায় ডক্টর নাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে উৎসবের ব্যবস্থা করিলে তিনি আপনি আসিয়া তাহাতে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন,—সেজন্য দার্জ্জিলিং গমনে বিলম্ব করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে তিনি আমাকে গত ২ শত বৎসরের বাঙ্গালার ইতিহাস রচনা করিতে উৎসাহিত করেন। ঐ ইতিহাসের যে অংশ যখন 'কলিকাতার রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত হইত তখন তাহা পাঠ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেন। তাঁহার স্মৃতি আজ তাঁহার অবশিষ্ট পুরাতন বন্ধুদিগকে পীড়া দিতেছে।

তিনি রাজ্যপাল হইলে পদাধিকারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য হ'ন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার যে প্রিয়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার দান অসাধারণ। যে দিন তাঁহার মৃত্যু হয়, সে দিন বেলা সাড়ে ১১টার সময় তিনি—১লা সেপ্টেম্বর কনভোকেশনে আচার্য্যের অভিভাষণ রচনার জন্য উপকরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন—সেদিনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার চিত্ত অধিকার করিয়া ছিল। তাঁহার আচার্য্যের অভিভাষণগুলি দীর্ঘ বহুতথ্যসম্বলিত—শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার মত সে সকলে অভিব্যক্ত। শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অভিমত যেমন অভিজ্ঞতাসঞ্জাত, তেমনই অধ্যয়নের ও চিন্তার ফল এবং সেই কারণে অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রবন্ধ ও অভিভাষণ একসঙ্গে প্রকাশিত হইলে ভাল হয়। তিনি যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের সম্পাদক ছিলেন, তখন সম্পাদকের কার্য্যে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। কারণ, তিনি মনে করিতেন, যাহা করণীয়, তাহাই যত্ন-সহকারে করণীয়।

পীড়িতের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সরকারের কর্ত্তব্য এবং নাগরিক মাত্রেরই সে বিষয়ে সরকারকে যথাসম্ভব সাহায্য করা প্রয়োজন, ইহাই তাঁহার মত ছিল। এ প্রদেশে ইংরেজ রাজ্যপালদিগের মধ্যে লর্ড রোণাল্ডশে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াই—অবস্থা দেখিয়া—প্রদেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ ও তাহার ফল সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং প্রতীকার-চেষ্টা করিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকুমার এ দেশের লোক—লোকের অবস্থা-ব্যবস্থা তিনি অবগত ছিলেন। তিনি এ দেশে—বিশেষ পশ্চিমবঙ্গে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাবে শঙ্কিত হইয়া প্রতীকার-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে দার্জ্জিলিং তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র করেন। তথায় পাহাড়ীদিগের মধ্যে ক্ষয়রোগ দ্রুত বিস্তারলাভ করিতেছে। চিত্তরঞ্জন দাশ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব করিয়া ইংরেজের ও এক সম্প্রদায় স্বদেশীয়ের আক্রমণে

ক্ষত-বিক্ষত হইয়া—অনভ্যস্ত ত্যাগে বিব্রত অবস্থায় দার্জ্জিলিংএ যে গৃহে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইয়াছিলেন, সেই গৃহে তাঁহার মৃত্যু যে কক্ষে হয়, তাহা দেখিবার চেষ্টা করিয়া অনেকে বিফল-মনোরথ হইতেন।' কারণ, গৃহটি বহু লোককে ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল—ভাড়াটিয়ারা দর্শনার্থীদিগের মনোভাব শ্রদ্ধা সহকারে বুঝিতে পারিতেন না—সে কৌতূহল তৃপ্ত করিবার জন্য কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে চাহিতেন না। সে কথা হরেন্দ্রকুমারের কর্ণগোচর হইলে তিনি এক দিন—রাজ্যপাল পরিচয় না দিয়া, কক্ষটি দেখিবার চেষ্টা করিলে অভিযোগকারীদিগের অভিযোগের যাথার্থ্য অনুভব করেন। তখন তাঁহার মনে হয়, তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া ঐ গৃহ কিনিয়া—তাহাতে আবশ্যক পরিবর্তন, পরিবর্দ্ধন ও পরিবর্জ্জন করিয়া তাহা আরোগ্যশালায় পরিণত করিবেন।

কালবিলম্ব না করিয়া তিনি কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন; কাজের জন্য একটি সমিতি গঠিত করেন—টাকা সংগ্রহ করিতে থাকেন। সে কাজে তাঁহার আন্তরিক আগ্রহের পরিচয়—সেই সমিতির অন্যতম সদস্যরূপে—তাঁহার সহিত কাজ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সভায় সমিতিতে বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠানে রাজ্যপালের গমন সাধারণ ঘটনা ছিল না—তিনি অসাধারণকে সাধারণ করিয়া সেই সকল উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকেন। সেই চেষ্টার ফলে তিনি বুঝিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় দানের উৎস শুষ্ক হইয়া যায় নাই, সহজেই তাহা উৎসারিত করা যায়—তবে বাঙ্গালীর অর্থের প্রাচুর্য নাই। অর্থ সংগ্রহের জন্য চলচ্চিত্রের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের সাহায্যও তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। সে জন্য তিনি কোন কোন লোকের নিকট নিন্দিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি দুঃস্থের সেবাকার্য্যে নিন্দা-প্রশংসার অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত ছিলেন—নিন্দা-প্রশংসা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। সে বিষয়ে তিনি কবি গোল্ডস্মিথের ধর্ম্মযাজকের মতই ছিলেন—

"—To relieve the wretched was his pride,
And e'en his failings lean'd to virtue's side."

কোথায় কিরূপে সেবা কাজের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যায় সে জন্য তিনি বন্ধুদিগকে যে সকল পত্র লিখিতেন, সে সকলে যে মনুষ্যত্বের পরিচয় সপ্রকাশ তাহা মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারে। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ব্যর্থ হয় নাই, ৫ লক্ষেরও অধিক টাকায় দার্জ্জিলিং-এ ঐ আরোগ্যশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে সকল রোগী যক্ষ্মায় আক্রান্ত হইয়া হাসপাতালে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যলাভ করে, তাহাদের স্বজনগণও তাহাদিগকে গৃহে লইতে দ্বিধানুভব করে এবং আরোগ্যান্ত চিকিৎসার অভাবে অনেকে আবার রোগাক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহা বিবেচনা করিয়া—ভগবানের অনুগ্রহে নির্ভর করিয়া—আরোগ্যান্ত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হরেন্দ্রকুমার করিয়াছিলেন। যাদবপুরে কুমুদশঙ্কর যক্ষ্মা হাসপাতালে একটি অনুষ্ঠানে তিনি সে কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলেন, কিন্তু সে কাজ ব্যয়সাধ্য—তিনি দার্জ্জিলিং-এ আরোগ্যশালার জন্য ভিক্ষা করিতেছেন—আর ভিক্ষা চাহিতে সাহস হয় না। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইলে

আমি দাঁড়াইয়া বলি—"পেশাদার ভিখারীরও কি ভিক্ষা চাহিতে সঙ্কোচ হয়? পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলিতেন, ভারতে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বড় ভিখারী। তিনি পরলোকগত; নহিলে তিনি বড় ভিখারী কি এই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বড় ভিখারী তাহা বিবেচনার বিষয় হইত। যাহা তিনি ভাল মনে করেন, তাহা করুন—সঙ্কোচের কোন কারণ থাকিতে পারে না।" শুনিয়া তিনি বলেন, "দাদার কথাই ভাল—আমি ঐ কাজের জন্য ভিক্ষা চাহিতেছি।" সে দিন অতি অল্প টাকাই সংগৃহীত হয়। কিন্তু পরে কোন প্রতিষ্ঠান এক লক্ষ টাকা প্রদান করায় কাজ আরম্ভ হয়—ব্যয়ের 'বরাদ্দ ৩০ লক্ষ টাকা। হরেন্দ্রকুমার তাঁহার আরব্ধ কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই। বাইবেলে লিখিত আছে, ডেভিড যে মন্দির নির্ম্মাণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তাহা প্রতিষ্ঠার কার্য্য অন্যকে দিয়া যাইতে হইয়াছিল। হরেন্দ্রকুমারের আরব্ধ কার্য্য তাঁহার দেশবাসীকে—সরকারকে ও ধনী দরিদ্র সকলকে সম্পন্ন করিতে হইবে। তিনি দরিদ্র ছাত্রের দত্ত এক আনা পয়সা ধনীর সহস্র টাকা অপেক্ষা অধিক মূল্যবান মনে করিতেন। আমরা তাঁহার দেশবাসীকে সেই কর্ত্তব্যে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান করিতেছি।

তাহার পরে দরিদ্রের সেবা। কত দরিদ্র যে কতরূপে তাঁহার নিকট সাহায্য পাইয়াছে, তাহা জানা যায় না। সে জন্য তিনি অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র তহবিলে রক্ষা করিতেন—প্রার্থীদিগকে দান করিতেন। আজ মনে পড়িতেছে, যে দিন "দাদা ঠাকুর" শ্রীশরৎচন্দ্র পণ্ডিত আমার সঙ্গে যাইয়া রাজ্যপালকে দানের জন্য কিছু অর্থ এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য চকমকী-পাথর দিয়াছিলেন, সে দিন কি আনন্দে ও আগ্রহে তিনি তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যপালের মধ্যে হরেন্দ্রকুমারকে দেখিয়া ফিরিবার পথে মুগ্ধ শরৎচন্দ্র আমাকে বলিয়াছিলেন—"দাদা, একটা মানুষ দেখালেন বটে। দেখে ধন্য হইলাম।"

সত্যই পরিচয় পাইলে কেহ আর হরেন্দ্রকুমারে রাজ্যপালের সন্ধান পাইতেন না। বিদেশী শাসনে জাঁকজমক ও আড়ম্বর

দিয়া পদের সম্ভ্রম-সৃষ্টির চেষ্টা ছিল। আমাদের রাজভবনে এখনও তাহারই অবশেষ রহিয়াছে। সেই জাঁকজমক—সেই আড়ম্বর সত্যসত্যই হরেন্দ্রকুমারকে পীড়িত করিত। একদিন তাঁহাকে নূতন এক জোড়া জুতা ব্যবহার করিতে দেখিয়া, রঙ্গ করিয়া বলিয়াছিলাম, "রাজ্যপালের অবস্থা যে ভাল হয়েছে!" তাহাতে তিনি বলেন, তিনি যেন বন্দী—রাজভবনের প্রাঙ্গণে নুড়ী-বিছান পথেই তাঁহাকে বেড়াইতে হয়—জুতা অল্পদিনে নষ্ট হয়। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এক দিন বেড়াইতে বেড়াইতে তিনি রাজভবনের দক্ষিণ দ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন। দ্বার রুদ্ধ। তিনি প্রহরীকে দ্বার মুক্ত করিতে বলিলে সে উত্তর দেয়—"হুকুম নেহি হ্যায়।" শুনিয়া তিনি বলেন, তিনি "লাটসাহেব"—হুকুম করিতেছেন—দ্বার খুলিতে হইবে। প্রহরী তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়াছিল কি না বলিতে পারি না—তবে দ্বার মুক্ত করিয়া দিয়াছিল। তিনি বাহিরে গমন করেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "সে যেন মুক্তির আনন্দ। হাঁটিতে হাঁটিতে ভবানীপুর পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিয়া আসিলাম।" তখন দ্বারে কর্ম্মচারীরা তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন—"যেন লাটসাহেব হারিয়ে গেছে"; রাজভবনে পুলিস কমিশনার সংবাদ পাইয়া আসিয়াছেন। পুলিস কমিশনার বলিলেন, "আপনি এমন ভাবে একা বাহির হইবেন না।—বিপদ ঘটিতে পারে। আমাদেরও ত কর্ত্তব্য আছে।" তিনি হাসিয়া বলিয়াছিলেন—"পলাতক আসামী ত ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু ভয় কেন? বিপদ ঘটিবে কেন? তবে আপনাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য আপনারা করিবেন, আমাকেও তাহা মানিয়া লইতে হইবে।"

সময় সময় কর্ত্তব্যের আহ্বানে তিনি নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়া পারিতেন না। এক দিন তিনি সংবাদ পা'ন, উদ্বাস্তু-পুনর্ব্বাসন বিভাগের "সুব্যবস্থায়" আগন্তুক উদ্বাস্তুদিগকে কাশীপুরে পাটগুদামে রাখা হইয়াছে—গুদামে সূর্য্যালোক প্রবেশ করে না, বায়ু ভয়ে ভয়ে বিচরণ করে; আবার তাহারই মধ্যে উনানে রন্ধন হইতেছে—কেরসিনের খোলা দীপশিখা ধূম সৃষ্টি করিয়া যে অবস্থা করিতেছে, তাহাতে আলো নাই আছে "darkness visible."ঐ অবস্থায় কয়টি শিশুর মৃত্যুও হইয়াছে। শুনিয়া হরেন্দ্রকুমার আর

স্থির থাকিতে পারেন নাই—মোটরে তথায় যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন—রাজ্যপালরূপে নির্দেশ দিয়াছিলেন, সেই দিনই উদ্বাস্তুদিগকে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। শিবিরের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীরা বলিয়াছিলেন, এক দিনে অত লোক স্থানান্তরিত করিবার যান তাঁহাদিগের নাই। তাহাতে হরেন্দ্রকুমার বলিয়াছিলেন, কলিকাতায় যানের অভাব নাই—যদি অতিরিক্ত যানের প্রয়োজন হয়—তাহা ভাড়া করা হউক—ভাড়ার টাকা তিনি দিবেন।

সে দিনও পুলিস কমিশনারের "তিরস্কার" তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি তাহাতে হাসিয়াছিলেন। ঐ কাশীপুর গুদামে ১৫ দিনে ১২৪টি শিশুর মৃত্যু হইয়াছিল। রাজ্যপালের পরিদর্শন-সম্ভাবনায় ১৪ জন যক্ষ্মারোগগ্রস্ত উদ্বাস্তুকে স্থানান্তরিত করিয়া শিয়ালদহ ষ্টেশনে "অসহায় অবস্থায়" রাখা হয়—সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সংবাদ তাঁহাকে দেখাইলে হরেন্দ্রকুমার অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই।

দেশ বিভাগের ফলে যে সকল নরনারী পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাহাদিগের জন্য হরেন্দ্রকুমারের উদ্বেগের অন্ত ছিল না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু কোন উদ্বাস্তু নারীর বাম প্রকোষ্ঠে সাধব্যের চিহ্ন স্বর্ণমণ্ডিত "লোহা" দেখিয়া বলিয়াছিলেন—তাহারা সর্ব্বস্বান্ত নহে! সেরূপ মনে করা হরেন্দ্রকুমারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তিনি ভিক্ষা করিয়া উদ্বাস্তুদিগের জন্য কত টাকা ব্যয় করিয়া গিয়াছেন, তাহার হিসাব কখন প্রকাশিত হইবে কি না, বলিতে পারি না। তবে আমাদিগের বিশ্বাস, সে অর্থের পরিমাণ অন্ততঃ ৩ লক্ষ টাকা। তদ্ভিন্ন কত বস্ত্র, কম্বল প্রভৃতি যে তিনি দিয়া গিয়াছেন, তাহা বলা যায় না, আমার এক জন স্নেহভাজন ব্যবসায়ী—শ্রীবৈজনাথ ভিয়ানীওয়ালার সহিত আমি হরেন্দ্রকুমারের পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলাম, তিনি উদ্বাস্তুদিগের জন্য রাজ্যপালের অনুরোধে সহস্রাধিক কম্বল ও প্রায় ঐরূপ সংখ্যক গেঞ্জী দিয়াছিলেন; সে জন্য হরেন্দ্রকুমার তাঁহাকে কেবল ধন্যবাদই দেন নাই—অবারিত স্নেহও দিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন হইলেই তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

রাজ্যপালের পদ তিনি কেবল গৌরবান্বিতই করেন নাই, সে পদের সুযোগ লইয়া কিরূপে লোকহিত সাধন করা যায় তাহা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন—তাঁহার পরবর্ত্তীদিগের জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সে আদর্শ গ্রহণ করিবার যোগ্যতা কয় জন লাভ করিতে পারেন? তাহা সহজসাধ্য নহে—সাধনার দ্বারা লভ্য।

স্নেহ দিয়া যে স্নেহলাভ করিতে হয়, তাহাও হরেন্দ্রকুমার দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি যখন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কার্য্যভার গ্রহণ করেন, তখন কতকগুলি স্বার্থপর ব্যক্তির ষড়যন্ত্রে দার্জ্জিলিং অঞ্চলের পাহাড়ীরা বাঙ্গালীবিদ্বেষী—পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত থাকিতে অসম্মত। তিনি পাহাড়ী নেতৃগণকে বুঝাইয়া দেন—"পশ্চিমবঙ্গ ত্যাগ তাঁহাদিগের পক্ষে স্বার্থহানিকরই হইবে; কারণ, দার্জ্জিলিং-এর রাজস্বে তাহার পথগুলি রক্ষার ব্যয়ও সঙ্কুলান হয় না—বিদ্যালয়, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি রাখা ত পরের কথা। সে সকলের ব্যয় পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের আয় হইতে নির্ব্বাহ করিতে হয়। দার্জ্জিলিং সহরে, কার্সিয়ং-এ, যে পাহাড়ীদিগের উপদ্রবে বাঙ্গালীরা তথায় যাইতে বিরত হইতেছিলেন এবং তাহার ফলে পাহাড়ীদিগের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটিতেছিল, তাহাতে পাহাড়ীরা হরেন্দ্রকুমারের কথার যাথার্থ্য অনুভব করিল—আপনাদিগের ভুল বুঝিল। আর তিনি পাহাড়ীদিগের জন্য যে সকল জনকল্যাণকর কাজ করিলেন, সে সকলে তাহারা মুগ্ধ হইল। যাহারা রাজ্যপাল বায়োজকে অপমানিত করিয়াছিল, তাহারা হরেন্দ্রকুমারকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিল।

নেপালীরাও তাঁহার স্নেহে বঞ্চিত হয় নাই। তাহারা হিন্দু কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে গীতার প্রচলন ছিল না—রামায়ণ মহাভারত তাহাদিগের অজ্ঞাত ছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। হরেন্দ্রকুমার নেপালী ভাষায় গীতার অনুবাদ করাইয়া বিতরণের ব্যবস্থা করেন ও রামায়ণকথা প্রচারের সুবিধা করিয়া দেন। তিনি তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া নেপালী ভাষায় মহাভারত প্রচারের আয়োজন করিতেছিলেন। কাহার সংক্ষিপ্ত মহাভারত অবলম্বন করিলে ভাল হয়, তিনি সে বিষয়ে আমার মত জানিতে চাহিয়াছিলেন। আমি সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তক ও বন্ধুবর শ্রীরাজশেখর বাবুর পুস্তক মিলাইয়া তাঁহাকে শেষোক্তের উৎকর্ষের উল্লেখ করিয়া পত্র লিখিয়াছিলাম—পুস্তক পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। হরেন্দ্রকুমারের সে কার্য অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই—আর হইবে কি?

হরেন্দ্রকুমারের জীবন কর্মবহুল এবং তিনি কর্মযোগী ছিলেন।

শারীর চর্চা হিসাবে তিনি "যোগের আসন" করিতেন এবং তাহাতে উপকৃতও হইয়াছিলেন।

হরেন্দ্রকুমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন এবং সেই জন্য রাজ্যপালের যে সকল কাজ নিয়মানুগ—রাজ্যপাল না করিলেও চলে, সে সকল সম্বন্ধেও কখন অনবহিত হইতেন না। সে জন্য তাঁহাকে বিশেষ শ্রম করিতে হইত। সামাজিক কর্ত্তব্যও তিনি নিষ্ঠা সহকারে সম্পাদন করিতেন।

শুনিয়াছি, তাঁহার বিলাসবর্জ্জিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহপদ্ধতি ও অনড়ম্বর রীতি কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির অপ্রীতির কারণ ছিল। তাঁহারা তাঁহার বেশবিষয়ে তাঁহার পারিপাট্যের অভাব সম্বন্ধেও অপ্রিয় মন্তব্য করিতেন। তাহাতে তাঁহাদিগেরই সঙ্কীর্ণতার পরিচয় প্রকট হয়।

আজ আমরা সেই ত্যাগী, উদার, সরলচিত্ত, পূতচরিত্র, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, মনুষ্যত্বে গৌরবান্বিত পুরুষের জন্য শোক করিতেছি।

হরেন্দ্রকুমার রোগযন্ত্রণা ভোগ না করিয়া কাজের মধ্যে তিরোহিত হইয়াছেন। তিনি সত্য সত্যই—কবি টেনিসনের কথায়—বলিতে পারিতেন:—

"Sunset and evening star
And one clear call for me;
And may there be no moaning of the bar
When I put out to sea.

* * * *

Twilight and evening bell,
And after that the dark!
And may there be no sadness of farewell
When I embark

For tho' from out our bourne of Time and Place
The flood may bear me far,
I hope to see my Pilot face to face
When I have crost the bar."

যে জন্মভূমিতে তিনি জননী মনে করিয়া তাঁহার সন্তানদিগের কল্যাণকর কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি হরেন্দ্রকুমারকে অঙ্কে তুলিয়া লইয়াছেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে তাঁহার গৌরবের আসন চিরস্থায়ী হইয়া বিরাজ করিবে।



ডি. এচ. লরেন্স

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পলরা যখন সেফিল্ডে তখন একদিন ডাঃ অ্যানসেল এসে বললেন, 'একটা কথা আপনাদের বলব ভাবছি। এখানকার হাসপাতালে একটি লোক এসেছে নটিংহাম থেকে—নাম বলছে ডয়েস। লোকটার যেন চালচুলো কিছুরই ঠিক নেই!'

পল বলল, 'বাক্সটার ডয়েস নয় ত?'

—'হ্যাঁ। ওই লোকটাই। বেশ জোয়ান সুপুরুষ—তবে ইদানীং যেন খুব সুবিধের জায়গায় ছিল বলে মনে হচ্ছে না। আপনি চেনেন নাকি?'

—'আমাদের কারখানায় কাজ করত ও।'

—'তাই নাকি। ওর কথা কিছু জানেন আপনি? লোকটা অমন মনমরা হয়ে থাকে কেন, তা' নইলে অনেক দিন আগেই ও ভাল হয়ে যেত।'

—'ওর বাড়ির অবস্থা আমি বিশেষ কিছুই জানি না। শুধু জানি, ওর স্ত্রীর সঙ্গে ওর বিচ্ছেদ হয়েছে, আর ইদানীং লোকটা নানা জায়গায় যেতে আরম্ভ করেছিল। তবে ওকে আপনি আমার কথা বলে দেখবেন। বলবেন, আমি যাব ওকে দেখতে।'

এর পর যেদিন ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল, পল জিজ্ঞেস করল, 'আপনার ডয়েস-এর খবর কি?'

—'সেদিন ত' বলেছিলাম ওকে। বললাম, নটিংহামের মোরেলকে চেন? লোকটা যেন আমাকে তেড়ে আসতে চাইল। আমি বললাম, পল মোরেলকে কি তুমি চেন না? সে তোমাকে দেখতে আসবে বলেছে। শুনে তার কি রাগ! বলে, কেন, ও কি চায় আমার কাছে? যেন আপনি কোন পুলিসের লোক আর সে যেন ফেরারী আসামী।'

পল বলল, 'তার পর ও বলল কি? যেতে বলল আমাকে?'

'কিছুই বলল না, না ভাল, না মন্দ।'

'কেন বলুন ত?'

'আরে আমিও ত' তাই জানতে চাই। ওখানে শুয়ে সারাদিন শুধু গুমরে মরছে লোকটা। তবু পেটের কথা কাউকে খুলে বলবে না।'

—'আমি গেলে কেমন হয়?'

—'যেতে পারেন। কোন আপত্তি নেই আমার।'

এই দু'জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল। যেদিন লড়াই হয়েছিল দু'জনার, সেদিন থেকে দু'জনেই যেন এই আকর্ষণটাকে আরও প্রবল ভাবে অনুভব করছিল। পলের কেমন মনে হ'ত সে ওর কাছে অপরাধী, ওর সব দুঃখ-দুর্দ্দশার জন্যে সে দায়ী। নিরাশার অতলে যে লোকটা ডুবে যেতে বসেছে, তার কাছে বসে তার বেদনার ভাগ নিতে পলের ইচ্ছে হ'ত এক একবার। তা'র নিজের জীবনেও আশার আলো বড় বেশী ছিল না। তার বুকেও সেই একই জ্বালা। তা ছাড়া যে নিবিড় ঘৃণা সেদিন তাদের দু'জনাকে একসঙ্গে মিলিয়েছিল, তারও একটা নিজস্ব আকর্ষণ ছিল। দুটি আদিম মানুষ যেন সেদিন মিলেছিল প্রচণ্ড আবেগের পথ ধরে।

সুতরাং একদিন পল গিয়ে হাজির হ'ল হাসপাতালে। ডাঃ অ্যানসেল একটা কার্ড দিয়েছিলেন, সেটা দেখাতে নার্স তাকে ভিতরে নিয়ে গেল। বলল, 'এই যে মশাই, একটি ভদ্রলোক এসেছেন আপনার কাছে।'

ডয়েস মুখ ফিরিয়ে শুয়েছিল, চমকে উঠল। মুখ দিয়ে অস্ফুট বিস্ময়ের একটা শব্দ নির্গত হ'ল মাত্র। নার্সটি ঠাট্টা করে বলল, 'বাবা রে বাবা! দিনরাত শুধু হুঁ আর হাঁ। আর কোন কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে? নাও এবার এই ভদ্রলোকটি এসেছেন ধন্যবাদ দাও ওঁকে, একটু আদর-আপ্যায়ন কর।'

ডয়েস চোখ ফিরিয়ে চাইল। নার্স-এর পেছনে পল দাঁড়িয়ে ছিল। ডয়েস তার ভয়ার্ত কালো চোখ দুটি রাখল তার দিকে। তার দৃষ্টিতে ভয়, সন্দেহ, ঘৃণা, আর গভীর আকুতি।

পল সেই তীব্র দৃষ্টির সামনে খানিকটা হতভম্ব হয়ে গেল। দু'জনেই দু'জনার নগ্ন পরিচয় পেয়েছে, সে কথা স্মরণ করে উভয়েরই মন শঙ্কায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। পল হাত মেলে দিয়ে বলল, 'ডাঃ অ্যানসেলের কাছে খবর পেলাম তুমি এখানে।'

ডয়েস যন্ত্রচালিতের মত করমর্দ্দন করল।

—'শুনে ভাবলুম দেখে আসি।' পল বলে যেতে লাগল। কিন্তু ডয়েসের তরফ থেকে কোন জবাব নেই। সে বিপরীত দিকের দেয়ালে চোখ রেখে শুয়ে আছে। নার্স ঠাট্টা করে বলল, 'কি গো, তোমার বুলি দু'-একটা ছাড়ো।'

একটু পরে নার্স চলে গেলে ঘরে রইল শুধু তারা দু'জন। ডয়েস আগের চেয়ে রোগা হয়ে গেছে। এখন ওকে দেখতে সুন্দর লাগে, কিন্তু কেমন যেন নিস্তেজ। ডাক্তার ঠিকই বলেছেন, ও অমন গুমরে পড়ে থাকে বলেই ভাল হয়ে উঠতে পারছে না। হার্ট-এর প্রতিটি চলার তালের সঙ্গে সঙ্গে ওর পুঞ্জীভূত বিদ্বেষ যেন ঝরে পড়ছে।

পল প্রশ্ন করল, 'কি হয়েছিল তোমার? খুব কষ্ট গিয়েছে বুঝি?'

ডয়েস আবার অগ্নিদৃষ্টি হানল ওর দিকে। বলল, 'শেফিল্ডে কি করছিস তুই?'

'আছি আমার বোনের বাড়িতে। থার্সটন ষ্ট্রীটে। মায়ের অসুখ শুনে এসেছি। তুমি কি করছ এখানে?'

ডয়েস নিরুত্তর।

পল প্রশ্ন করল, 'এখানে ভর্ত্তি হয়েছ, কত দিন?'

ডয়েস যেন নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে বলল, 'ঠিক বলতে পারব না।'

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে আছে লোকটি, পাছে পলের উপস্থিতিতে সে স্বীকার ক'রে বসে এই ভয়ে। পলের মন হঠাৎ বিরূপ, বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলল, 'ডাঃ অ্যানসেল বলেছিলেন, তাই এলাম।'

কোন উত্তর নেই। পল চেষ্টা ছাড়ল না, বলল, 'টাইফয়েড রোগটা সহজ নয়, তা'ও জানি।'

হঠাৎ ডয়েস বলে উঠল, 'তুই এখানে এসেছিস কেন?'

—ডাঃ অ্যানসেল বলেছিলেন 'এখানকার কাউকে তুমি চেন না, তাই। সত্যি কিনা?'

'আমি কোনখানেই কাউকে চিনি না।'

'অসম্ভব নয়। তুমি যদি চিনতে না চাও চিনবে কি করে?'

আবার সাময়িক নীরবতা। পল বলল, 'শীগগিরই মাকে নিয়ে আমরা বাড়ি চলে যাব।'

—'কি হয়েছে ওঁর?' ডয়েস প্রশ্ন করল।

—'ক্যানসার।'

আবার চুপচাপ। শেষে পল বলল, 'বাড়ি নিয়ে যেতে হলেও একটা মোটর গাড়ি চাই। তাই বা পাই কোথায়?'

ডয়েস চিন্তা করে বলল, 'কেন? টমাস জর্ডনের গাড়িখানা চেয়ে আনতে পারো না?'

—'ও ত' ছোট—ওতে ধরবে না।'

পল বলল, 'ভাবছি একটা ভাড়া-গাড়িই ঠিক করব।'

ডয়েস বলল, 'তাতে লোকে তোমাকে বোকা ছাড়া কিছু বলবে না।'

অসুখে পড়ে ডয়েস আবার তার ছিম-ছাম, সুন্দর চেহারাখানা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু ওর চোখ দু'টিতে কী অপরিসীম শ্রান্তি! দেখে পলের কষ্ট হ'ল। সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি কোন কাজ পেয়েছিলে এদিকে?'

'এখানে এসে একদিন দু'-দিন পরেই ত' অসুখে পড়লাম।'

'তোমার এখন দরকার একটা ভাল সেবাশ্রমে গিয়ে থাকা, যাতে সেরে উঠতে পার।'

ডয়েস চোখের কোণ দিয়ে একবার ওকে দেখে নিল। সোজাসুজি কারো দিকে চাইতেও যেন তার ভয়! তবু পলের গলায় সত্যিকারের যে বেদনা আর নিরুপায়ের আভাস ছিল, তাতেই তার মনের বোঝা অনেকটা নেমে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'উনি কি খুব ভেঙে পড়েছেন?'

'মিলিয়ে যাচ্ছেন মোমের মত। কিন্তু খুব হাসি-খুশি—মুখ দেখে কিছু বুঝবার জো নেই।'

নিজের ওষ্ঠ দংশন করে পল নিজেকেই এবার সামলে নিল। আর একটু বসে সে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আমি যাচ্ছি এখন। এই আধ-ক্রাউনটা রইল, তুমি নিও।'

ডয়েস চাপা প্রতিবাদ করল, 'চাই না, আমার।'

পল তার প্রতিবাদের জবাব না দিয়ে আধ-ক্রাউনটা টেবিলে রেখে দিল। বলল, 'আবার যদি শেফিল্ডে আসি, তোমার সঙ্গে দেখা করে

যাব। বলো ত' আমার ভগিনীপতির সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। সে এখানেই কাজ করে।'

ডয়েস বলল, 'আমি ত' চিনি না তাঁকে!'

—'খুব ভালো মানুষ। বলব ওকে আসতে? তোমার জন্যে কিছু কাগজপত্র বই-টই যোগাড় করে আনবে'খন।'

ডয়েস কোন কথা বলল না। পল চলে গেল।

মাকে পল ডয়েসের কথা কিছু বলল না, কিন্তু পরদিন যখন ক্লারার সঙ্গে দেখা হ'ল তখন তার কাছে সব খুলে বলল। তখন দুপুরের খাওয়ার ছুটি হয়েছে। ইদানীং দু'জনে আর বড় একসঙ্গে বেরোত না, কিন্তু আজ পল ক্লারাকে তার সঙ্গে কেল্লার বাগানে বেড়াতে যেতে বলেছিল। সেখানে লাল জিরেনিয়ম আর হলদে গুঁটি ফুল সূর্য্যকিরণে ঝলমল করছে। দু'জনে গিয়ে সেখানে বসল। আজকাল ক্লারা যেন নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে, পলের দিকে একটা নিরুদ্ধ রোষ যেন তার মনে।

পল জিজ্ঞেস করল, 'ডয়েস যে শেফিল্ডের হাসপাতালে টাইফয়েডে ভুগছে, তা তুমি জানতে?'

ক্লারার ধূসর চোখজোড়া যেন কেঁপে উঠল, মুখে রক্ত রইল না এক বিন্দু। সভয়ে বলে উঠল, 'না ত'!'

'ভয় নেই। ক্রমশঃ সেরে উঠছে। কাল আমি দেখতে গিয়েছিলাম ডাক্তারের কাছে শুনে।'

খবরটা শুনে অবধি ক্লারা যেন মর্ম্মে মর্ম্মে দংশন অনুভব করছিল। অপরাধীর সুরে বলল, 'ওর অবস্থা কি খুব খারাপ?'

'খারাপই হয়েছিল। এখন সেরে উঠছে।'

'তোমাকে দেখে কী বলল?'

'বলল আর কি? কেমন যেন মন গুমরে রয়েছে।'

ওদের দু'জনার মধ্যে নেমে এসেছে একটা দুস্তর ব্যবধান। পল ডয়েস সম্বন্ধে আরও খবর তাকে বিস্তারিত করে বলল। ক্লারার মুখে যেন আর কথা নেই। চুপচাপ হয়ে গেছে অনেকক্ষণ ধরে। এবার পথে চলতে গিয়ে ক্লারা আর পলের বাহুতে ভর না দিয়ে দূরে দূরে হেঁটে চলতে লাগল। পলের ক্লারাকে প্রয়োজন ছিল, নইলে তার সান্ত্বনা পাবার আর ঠাঁই কোথায়? সে বলল, 'তুমি আজ আমার সাথে অমন মুখ ভার করে রয়েছ কেন?'

ক্লারা জবাব দিল না। পল ওর কাঁধে নিজের বাহু জড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কী হয়েছে তোমার?'

ক্লারা নিজেকে মুক্ত করে নিল। বলল, 'না, ভালো লাগে না আমার।'

পল ওকে ছেড়ে নিজের ভাবনায় ডুবে গেল আবার। অবশেষে প্রশ্ন করল, বাক্সটার-এর জন্যেই তোমার মন এমন উদাস হয়ে গেল নাকি?'

ক্লারা বলল, 'আমি—আমি সত্যিই খারাপ ব্যবহার করেছি ওর সঙ্গে।'

মনে মনে দু'জনেই দু'জনার উপর বিরূপ হয়ে উঠল। নিজের নিজের ভাবনা ভাবতে লাগল দু'জনেই। ক্লারা বলল, 'আমি সত্যি খারাপ ব্যবহার করেছি ওর সঙ্গে। আর এখন তুমি তার শোধ নিচ্ছ আমার উপর দিয়ে। আমার ঠিক শাস্তি হয়েছে।'

পল বলল, 'আমি কি খারাপ চোখে দেখি তোমাকে?'

ক্লারা আবার বলল, 'উচিত শাস্তিই হয়েছে আমার। আমি যেমন ওকে আমার যোগ্য বলে মনে করতে পারিনি, তেমনি তুমিও আজ আমাকে যোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারছ না। আমার এমনি হওয়া উচিত ছিল। ও আমাকে তোমার চেয়ে সহস্র গুণ বেশী ভালবাসত।'

পল তীব্র প্রতিবাদ করে উঠল, 'কক্ষণো নয়।'

'বাসত বৈ কি। আর ভাল বাসুক আর না বাসুক, অন্ততঃ সম্মানের চোখে দেখত। তোমার কাছে আমি তাও পাই নি।'

পল ঠাট্টা করে ব'লে উঠল, 'হ্যাঁ, সম্মানের নমুনাটা বেশ বোঝা যাচ্ছে!'

—'তুমি জানো না। সত্যি ও আমাকে শ্রদ্ধা করত। আমি—আমিই ওকে টেনে নিচে নাবিয়েছি। তুমি ঠিকই বলেছিলে। ও যে এমন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠেছে সে আমারই জন্যে। নইলে ও আমাকে সহস্রগুণ বেশী ভালবাসত তোমার চেয়ে।'

—'বেশ ত'। ভাল কথা।'

পল এখন চায় শুধু একা একটু শান্তিতে থাকতে। তার নিজের দুঃখ-দাহের অবধি নেই। ক্লারা সঙ্গে থাকলে সে দাহ আরও তীব্র হয়ে ওঠে। পল সেই দুর্বিষহ ভারে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আজ ক্লারাকে ছেড়ে চলে আসার সময় তার একটুও দুঃখ হ'ল না।

ক্লারা যত শীগগির পারলে একদিন সময় ক'রে শেফিল্ডে গেল স্বামীকে দেখতে। দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটা খুব সাফল্যমণ্ডিত হ'ল না। তবু স্বামীর জন্যে গোলাপ, ফলমূল আর কিছু টাকা সে রেখে এল। প্রায়শ্চিত্তের জন্যে উন্মুখ হয়ে রয়েছে তার মন।

পলও আরও দু'-একদিন গেল ডয়েসকে দেখতে। দু'জনে দু'জনের প্রতিযোগী হলেও এক ধরণের বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল তাদের মধ্যে। কিন্তু যে মেয়েটি তাদের দু'জনার যোগসূত্র, তার কথা কেউ ভুলেও উল্লেখ করত না।

এদিকে মিসেস মোরেলের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। তখনও প্রথম দিকে তাঁকে চেয়ারে তুলে নীচের তলায় কিম্বা মাঝে মাঝে বাগানেও নিয়ে যাওয়া হ'ত। সোজা হয়ে চেয়ারে বসে থাকতেন, মুখে তাঁর সেই স্নিগ্ধ হাসিটুকু লেগে থাকত। পাণ্ডুর হাতে ঝিকমিক করত সোনার আংটিটা, তাঁর বিয়ের সময়ের আংটি। চুলগুলো ব্রাশ দিয়ে পরিপাটি করে গোছানো। বসে বসে তিনি দেখছেন সূর্য্যমুখী ছিন্ন পাপড়ি হয়ে ঝরে পড়ছে, আর দোলন-চাঁপার গাছে বেরিয়েছে নতুন ফুল।

পল আর তিনি, দু'জনে দু'জনকে ভয় করে চলছিলেন। পল জানে মা ক্রমশঃ মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছেন, মা-ও জানেন সে কথা। তবু দু'জনেই মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখেন—ভাণ করেন আনন্দের। সকালে উঠে পল প্রথমেই যায় মায়ের ঘরে, গিয়ে বলে: 'কেমন ঘুমিয়েছিলে মা?'

—'হ্যাঁ, বাবা, বেশ।'

—'খুব ভাল নয়, কেমন?

—'না, কেন, বেশ ঘুমিয়েছি।'

তখন পল বুঝতে পারে মা সারা রাত জেগে কাটিয়েছেন।

দেখে, ঢাকা চাদরটার তলায় মা পেটের ব্যথার জায়গাটায় হাত চেপে রেখেছেন।

পল বলে, 'খুব কষ্ট হচ্ছে কি?'

'না। এই একটু যন্ত্রণা, উতলা হবার মত কিছু নয়।' ব'লে মা সেই আগের মত অবজ্ঞাভরে নাক দিয়ে ফোঁস-ফোঁস শব্দ করেন। শুয়ে শুয়ে মাকে মনে হয় যেন ছোট্ট একটি মেয়ে। সারাক্ষণ তাঁর নীল চোখজোড়া ফিরিয়ে রাখেন পলের দিকে। কিন্তু চোখের নীচে দুঃসহ যন্ত্রণার কালো কালো ছাপ দেখে পলের মন আবার টন-টন করে ওঠে। বলে, দিনটি ত' বেশ। কেমন রোদ উঠেছে দেখেছ?'

'হ্যাঁ, চমৎকার!'

'নীচে যাবে না তুমি?'

'দেখি, যাব পরে।'

পল গেল সকালের খাবার খেতে। সারা দিন মায়ের ভাবনা ছাড়া আর কোন কথাই তার মনে উঠল না। যেন একটা একটানা বেদনা, সেই বেদনার সন্তাপে জ্বর উঠেছে গায়ে। সন্ধ্যায় তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে এসে রান্নাঘরের জানালা দিয়ে চাইল। মা নেই,—সারাদিন বিছানা ছেড়ে আজ ওঠেন নি। সোজাসুজি উপরে গিয়ে পল মাকে চুম্বন করল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আজ বুঝি আর ওঠ নি তুমি?'

'না। ওই মরফিয়া দিয়ে এমন কাবু করে রাখে আমাকে।'

'বড্ড বেশী করে যেন দেয়। নয় মা?'

—'হ্যাঁ। তাই ত' দেখছি।'

পল বিছানার ধারে গিয়ে বসে পড়ল; মনের মধ্যে যেন ঝড় বইছে। মা ঠিক শিশুর মত কুঁকড়ি মেরে কাত হয়ে শুয়ে রয়েছেন। কানের উপর আধ-পাকা বাদামী চুলগুলো দুলছে। চুলগুলি সরিয়ে যথাস্থানে রাখতে রাখতে সে বলল, 'তোমার কানে সুড়সুড়ি লাগে না?'

'লাগেই ত'।' মা বললেন জবাবে। মায়ের মুখখানার পাশেই তার মুখ। মায়ের নীল চোখ দু'টি হাসছে ওর চোখ চেয়ে। যেন একটি কচি মেয়ের মুখ—তেমনি স্নেহে উষ্ণ, প্রেমে সুকোমল। চেয়ে চেয়ে পলের শ্বাস ঘন বইতে লাগল—ভয়, বেদনা আর ভালবাসা সব মিলে তার অন্তর মথিত হতে লাগল। সে বলল, 'তোমার চুলগুলো বেণী বেঁধে দিই এসো। চুপ করে শুয়ে থাক দেখি।'

রাত্রে পল মায়ের ঘরে বসেই কাজ করত। মাঝে মাঝে চোখ তুলে চাইত মায়ের দিকে। সর্ব্বদাই দেখত, মা তার নীল চোখ দু'টি নিবদ্ধ করে রেখেছেন তার দিকে। ছেলের সঙ্গে চোখা-চোখি হলে একটু হাসতেন। আবার পল এক মনে কাজ করে যেত, নিজের অজ্ঞাতেই তার আঁকা ছবিতে লাগত নতুন মাধুরীর ছোঁয়া।

মাঝে মাঝে পল বাড়ি আসত বদ্ধ মাতালের মত, চোখের দৃষ্টি প্রখর, ম্লান মুখে চেয়ে থাকত মায়ের দিকে। দু'জনেই বুঝতে পারতেন যে, ছলনার পর্দাটা ছিঁড়ে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে, সেই ভয়ে দু'জনেই শঙ্কিত হয়ে উঠতেন।

তখন মা এমন ভাব দেখাতেন যেন তিনি ক্রমশঃ সুস্থ হয়ে উঠছেন, কথা বলতেন অনর্গল, সামান্য কোন ঘটনা নিয়ে হয়ত বৃহৎ একটা আলোচনা সুরু করে দিতেন। দু'জনারই তখন এমন অবস্থা যে সামান্য জিনিসকে বড়ো করে তোলা ছাড়া আর তাদের উপায় নেই—তা নইলে যে বড়ো জিনিসটাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না আর তাকে ঠেকিয়ে রাখতে না পারলে তাঁদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, তাঁরা আর পরস্পরকে আলাদা করে ভাবতে পারবেন না। সেই ভয়েই হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে দু'জনে হালকা হয়ে উঠতে চাইতেন।

মাঝে মাঝে মা যখন ঘুমোবার ভাণ করে শুয়ে থাকতেন, পল বুঝত উনি নিশ্চয়ই অতীত দিনের কথা ভাবছেন। এ কয় দিনে মায়ের মুখে একটি কঠিন রেখার সৃষ্টি হয়েছে। নিজেকে উনি প্রাণপণে সংযত করবার চেষ্টা করছেন, যাতে মৃত্যুর মুহূর্ত্তেও তাঁর মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদ বুক ভেদে বেরিয়ে পড়তে না পারে। মুখখানাকে যথাসাধ্য শীর্ণ আর সঙ্কুচিত করে পড়ে রয়েছেন দিনের পর দিন, একান্ত নিরুপায়ের মত দুর্ব্বিষহ জ্বালা চেপে রেখেছেন বুকে। পল ভুলতে পারত না ওর সেই মুখচ্ছবি। মাঝে মাঝে মনের ভার লঘু হয়ে এলে, স্বামীর কথা বলতেন। প্রতিটি কথায় ঘৃণার ছাপ। স্বামীকে তিনি আজও ক্ষমা করতে পারেন নি। সেই ঘরে এলে তাঁর গা শির-শির করে উঠত। অতীত দিনের বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা ঘুরে ঘুরে মনে পড়ত, উত্তেজনার মুহূর্ত্তে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তার দু'এক টুকরো ছিটকে বেরিয়েও যেত।

পলের মনে হ'ত যেন তার প্রাণের নিভৃত প্রদেশে ঘুন করেছে, দিন দিন সে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অনিবার্য্য গতিতে। মাঝে মাঝে চোখ ফেটে জল আসত। কাজে মন বসত না। কলম থেমে যেত। বোবা দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকত সামনের শূন্যতার দিকে। কিছুক্ষণ পরে আবার সম্বিৎ ফিরে আসত। তখন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব অবশ হয়ে গিয়েছে, থর-থর করে কাঁপছে। কোন দিন ভাবত না এ কি, কেন এমন হয়।

মায়ের অবস্থাও তাই। শুয়ে শুয়ে ব্যথার কথা ভাবতেন, মরফিয়ার কথা ভাবতেন, কিন্তু মৃত্যুর কথা বড় একটা ভাবতেন না। জানতেন, মৃত্যু এগিয়ে আসছে, জানতেন এর হাত থেকে নিস্তার নেই। কিন্তু একে স্তোকবাক্য দিয়ে ভুলোতে কিম্বা এর সঙ্গে ভাব জমাতে কোন চেষ্টা করতেন না। মুখের ভাব কঠিন, কোন কৌতূহল বা প্রশ্ন নেই, যেন নিঃসহায় অন্ধকে কেউ জোর করে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। এমনি ক'রে দিন, সপ্তাহ, মাস কেটে যেতে লাগল।

মাঝে মাঝে পল ক্লারার কাছেও যেত। কিন্তু ক্লারা কেমন বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিল। পল গিয়ে সোজাসুজি বলত, 'চলে এসো আমার কাছে।'

ক্লারা মাঝে মাঝে ওর কথা শুনে আসত। কিন্তু একটা আশঙ্কা ওর সারা অন্তর জুড়ে থাকত। পলের একান্ত সান্নিধ্যে গিয়েও ক্লারার মনে হত, কেন যেন তার সারা দেহ সঙ্কুচিত হয়ে উঠছে—কী একটা অস্বাভাবিক জিনিস যেন আছে ওর মধ্যে। ক্রমশঃ পলকে সে ভয় করতে শিখল। ও এত উদাসীন, অথচ এত আশ্চর্য্য কঠোর! ও যেন শুধু প্রেমের ভাণ করছে, মুখোসটা খুলে ফেলে দিলেই ওর আসল চেহারা বেরিয়ে পড়বে—সেই আসল মানুষটির নাগাল কোন কালেই পাওয়া যাবে না, সে যেমন কুটিল, তেমনি ভয়ঙ্কর! ক্রমশঃ ক্লারার মনে পল সম্বন্ধে একটা দুরন্ত আতঙ্কের সৃষ্টি হ'ল। যেন পল একটা দুর্দ্দান্ত খুনী বা অন্য কিছু। পল ক্লারাকে চায়, মাঝে মাঝে পায়ও, কিন্তু ক্লারার মনে হয় সে যেন মৃত্যুর করাল কবলে গিয়ে পড়ছে। আতঙ্কে অবশ হয়ে সে পড়ে থাকে। পলকে সে তার প্রণয়ী বলে ভাবতেও পারে না। মনে মনে ওকে তীব্র ঘৃণা করে। মাঝে মাঝে মনে কোমল ভাবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখনও পলকে প্রীতি দিয়ে ধুয়ে-মুছে নিতে তার সাহস হয় না।

ইতিমধ্যে ডয়েস এসে বাসা নিল নটিংহামের কাছে কর্ণেল সীলির আরোগ্য-নিকেতনে। সেখানে পল মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে দেখা করতে যেত। ক্লারাও যেত কচিৎ-কদাচিৎ। কিন্তু পল আর ডয়েসের মধ্যে একটা অদ্ভুত বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠল। ডয়েস এখনও দুর্ব্বল, সেরে উঠতে বেশ সময় নিচ্ছে, সে যেন নিজের ভার সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে দিল পলের হাতে।

নভেম্বরের গোড়ার দিকে ক্লারার জন্মদিন। ক্লারা পলকে সে কথা মনে করিয়ে দিল। পল বলল, 'তাই না কি! আমি প্রায় ভুলেই যাচ্ছিলাম।'

ক্লারা বলল, 'প্রায় কেন? সম্পূর্ণই বলো।'

পল বলল, 'না। সপ্তাহের শেষের দিকে সমুদ্রের ধারে যাবে নাকি তাই বলো।'

ওরা গেল দু'জনে। কিন্তু যাত্রাটা সার্থক হ'ল না। সব কিছু আনন্দ আর আবেগ যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল। ক্লারা প্রাণপণে কামনা করতে লাগল, পল আবার আগের মত উজ্জ্বল, উদ্দাম হয়ে উঠুক, প্রীতির টানে তাকে টেনে নিক্। কিন্তু পল যেন ওর কথা ভুলেই রইল। রেলের কামরায় বসে সে বাইরের দিকে চেয়ে রইল, ক্লারা যখন কথা বলতে গেল তখন ধ্যান ভেঙে যেন চমকে উঠল। পল যে কিছু ভাবছিল তা নয়। সব জিনিস তখন তার কাছে অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছিল। ক্লারা উঠে গেল ওর কাছে, আদর করে ডেকে বলল, 'কী হয়েছে তোমার, কী ভাবছ?'

'কিছু নয়,' পল বলল, 'শুধু দেখছি ওই বাতাস-চলা কলের পাখাগুলো কী একটানা বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে!' ব'লে বসে রইল ক্লারার হাত ধরে। কথা বলতেও পারল না। তবু ক্লারার হাতের স্পর্শে মনে জাগল সান্ত্বনা। কিন্তু ক্লারার মন অশান্তিতে ভরে উঠল, তার হৃদয় হাহাকার করে উঠল। পল তার কাছে কোথায়? সে ওর কেউ নয়, কিছু নয়।

সন্ধ্যা। দু'জনে বালিয়াড়ির ধারে বসে আছে। অন্ধকার নেমে এসেছে সমুদ্রের তরঙ্গমালার বুকে। পল যেন আপন মনেই বলে উঠল, 'কী যে হয়েছে ওঁর, কিছুতেই ত' হার মানবেন না।'

ক্লারার বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। বলল, 'তাই ত' দেখছি।'

পল বলল, 'দেখ, মানুষ মরে, তাও কত রকম। আমার বাপের দিক দিয়ে দেখেছি, মরবার আগে তাদের কত ভয়, যেন গলায়


প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY
BRAND
PEARL
BARLEY
LILY BARLEY MILLS LIMITED
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY
BRAND
BARLEY
TRADE MARK
FOR INFANTS & INVALIDS
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪

দড়ি টেনে তাদের গরু-জবাই করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর আমার মায়ের দিক দেখ, তাদের কিছুতেই ঠেলে সরানো যাবে না। আস্তে আস্তে এগুবে, মরতে তারা কেউ রাজী নয়।'

ক্লারা শুধু বলল, 'হ্যাঁ।'

'এঁরও তাই হয়েছে। মরতে চাইছেন না। সেদিন পাদ্রী সাহেব এসেছিলেন, বললেন, 'ভেবে দেখুন, পরলোকে গিয়ে আপনার বাবা, মা, ভাই, বোন, ছেলে সবাইকে ফিরে পাবেন। সেই কথা চিন্তা করুন।' তাতে মা কি বললেন জানো? বললেন, 'অনেক দিন ত' তাদের মায়া কাটিয়েছি, আর তাদের মনে না করলেও চলবে আমার। যারা বেঁচে আছে তাদেরই ত' চাই, মরে যে গেছে সে ত' চুকেই গেছে।' এখনও বাঁচবার জন্যে ওঁর কি গভীর আকাঙ্ক্ষা!'

ভয়ে ক্লারার মুখ দিয়ে কথা সরছিল না, বলল, 'অমন ক'রে বলো না তুমি।'

পল শুনল না, বলে চলল, 'এখনও আমার দিকে চেয়ে থাকেন, চির দিন আঁকড়ে রাখতে চান আমাকে। আর কী শক্ত মন, যেন কোন দিন এক পা-ও নড়বেন না জায়গা ছেড়ে।'

ক্লারা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে বলল, 'আর ও সব কথা ভেব না তুমি।'

—'আমি দেখেছি বরাবরই ধর্মের দিকে ওঁর মন ছিল। এখনও যে নেই তা নয়। তবু এ সময়ে কাজে আসছে না। কিছুতেই হার মানবেন না যেন। সেদিন বলেছিলাম, 'মা, আমার যেদিন মরতে হবে, সেদিন চেয়ে-চিন্তে স্ব-ইচ্ছায়ই মরব।' শুনে ফট করে বলে বসলেন, 'আর আমি বুঝি চাই নি? চাইলেই মরণ হয় নাকি?'

ক্লারা বিরক্তির সুরে বলল, 'থামো। আমি চললুম এখন।'

পল ওকে অনুসরণ করে চলতে লাগল সমুদ্রের বালুকারাশির মধ্যে দিয়ে। চারি দিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার! ক্লারার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারল না পল। চাইলও না পৌঁছতে। ক্লারার অস্তিত্বও এখন নিরর্থক তার কাছে। আর ক্লারা চাইল তার কাছ থেকে দূরে সরে যেতে, পলকে সে এখন ভয় করতে সুরু করেছে।

সেই একটা বিভ্রান্ত অবস্থার মধ্যে দিয়ে দু'জনে ফিরে এল নটিংহামে। পল কাজের মধ্যে ডুবিয়ে রাখল নিজেকে। সর্ব্বদাই সে কোন-না-কোন কাজ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, নয় ত' কোন বন্ধুর বাড়ি চলেছে এতটুকু তার ফুরসৎ নেই।

সে দিন রাত্রে আর কোন কাজ না থাকায় পল হেঁটেই বাড়ি ফিরল নটিংহাম থেকে। কয়লার খনিগুলো থেকে লাল আগুনের আভা উঠছে আকাশের দিকে; কালো কালো মেঘগুলো যেন নীচু ছাদের মত। সেই দশ মাইল রাস্তা হেঁটে পাড়ি দিতে গিয়ে পলের মনে হ'ল যেন সে জীবন অতিক্রম ক'রে চলেছে কোন্ সুদূরে, যেন আকাশ আর মৃত্তিকার মাঝখানে একটা শূন্য পথ বেয়ে সে পথ চালিয়েছে। কিন্তু পথের শেষ শুধু একটা রোগীর ঘর! যতই জোরে সে পা চালাক, যতই কেন না সে হাঁটুক, তার পথের শেষ হবে গিয়ে ওইখানে।

বাড়ির কাছে এসেও বিন্দুমাত্র শ্রান্তি বোধ হ'ল না তার। সব বোধ যেন তার লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। মাঠের ওপার থেকে দেখা যায়, মায়ের ঘরের জানালা দিয়ে লাল আগুনের শিখা দপদপ করে জ্বলছে। হঠাৎ তার মনে হ'ল, মা মরে গেলে এই আগুনের শিখা আর জ্বলবে না।

চুপি চুপি জুতো খুলে পল দোতলায় উঠল। মায়ের ঘরের দরজা খোলা পড়ে আছে—মা আজও একা-একাই ঘরে ঘুমোন। আগুনের লাল আভা সিঁড়ি পর্যান্ত ছড়িয়ে পড়েছে। পল নিঃশব্দে দরজায় গিয়ে উঁকি দিল। মা শ্রান্ত সুরে ডেকে উঠলেন, 'পল!'

আবার পলের হৃদয় চূর্ণ হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। ধীরে ধীরে গিয়ে বিছানায় বসল মায়ের পাশে! মা বললেন, 'কত দেরি হ'ল আজ তোমার?'

'কই বেশী দেরি ত' নয়!'

'নয়? ক'টা বেজেছে বল তো।' মা অসহায় আর্তনাদে ভেঙে পড়লেন।

'এই ত' সবে এগারোটা।'

পল ইচ্ছে করেই মিথ্যে বলল। রাত তখন প্রায় একটা। মা বললেন, 'তাই নাকি। আমি ভেবেছিলুম আরও কিছু বেশী রাত হয়েছে।'

পল জানে, মায়ের কাছে এই দীর্ঘ রাত্রির কী দুর্ব্বহ যন্ত্রণা! রাত যেন তাঁর কাটে না। সে বলল, 'তুমি ঘুমোতে পার না, মা?'

মা বিলাপ করে উঠলেন, 'না, ঘুম আসে না আমার।'

পল আদর দেখিয়ে বলল, 'তুমি ভেব না কিছু! না এলো ঘুম। আমি আছি তোমার কাছে। আধ ঘণ্টাটাক বসে থাকি, তাহলে অনেকটা ভাল লাগবে তোমার।' পল বসে রইল বিছানার পাশে। মায়ের কপালে হাত বুলিয়ে, চুলে আঙুল চালিয়ে, নানা ভাবে তাঁকে শান্তি দেবার চেষ্টা করতে লাগল। বাড়ির সবাই অন্য ঘরে ঘুমোচ্ছে। তাদের নিঃশ্বাসের শব্দ এ ঘর অবধি ভেসে আসছে। মা পলের কোমল আঙুলে আদরের স্পর্শ পেয়ে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে রয়েছেন। বললেন, 'তুমি শুতে যাও এবার।'

'এবার তুমি ঘুমোবে তো?' পল প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ, ঘুম পাচ্ছে যেন।'

'এখন অনেকটা ভাল লাগছে, নয়?'

'হ্যাঁ।' মা বললেন। শিশু যেমন আদর ভুলে গিয়ে তার কান্না থামায়।

এমনি করে দিন গেল, সপ্তাহ গেল, মাস যেতে লাগল। পল [ক্লা]রার কাছে যাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু কি একটা [অ]সহায় আকুলতা তাকে ছটফটিয়ে মারে, কার কাছে গেলে এর [হা]ত থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে, তাও বুঝতে পারে না। মিরিয়াম ইতোমধ্যে একখানা চিঠি লিখেছে অনেক সমবেদনা জানিয়ে। পল তার কাছেই একবার গেল। পলের পাণ্ডুর মুখ, কৃশ দেহ, কালো চোখের উদ্‌ভ্রান্ত চাউনি, দেখে মিরিয়ামের হৃদয় থেকে রক্তক্ষরণ হতে লাগল। করুণায় উদ্বেল হয়ে উঠল তার বুক, বলল, 'কেমন আছেন উনি?'

'একই রকম। যেমন ছিলেন তেমনি। ডাক্তার বলেছেন বেশী দিন বাঁচবেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, আরও অনেক দিন টিকবেন। বড়দিনে হয়ত একবার এখানেও আসতে চাইবেন।'

ওর কথা শুনে মিরিয়াম চমকে উঠল। দুই বাহু দিয়ে পলকে জড়িয়ে ধরল নিজের বুকে, চুম্বনে চুম্বনে ওকে ভরে দিল। পল বাধা দিল না। কিন্তু তার বুকের জ্বালা এতে শান্ত হ'ল না, বরং আরও দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। মিরিয়ামের চুম্বন তার

মুখে লেগে সারা রক্তে যেন আগুন ধরে গেল, কিন্তু তার অন্তরের অন্তস্তলে তখনও মৃত্যুযন্ত্রণা জেগে রয়েছে। সেখানে মিরিয়ামের চুম্বন গিয়ে পৌঁছতে পারল না। ক্রমশঃ মিরিয়ামের স্পর্শ অসহ্য হয়ে উঠল তার কাছে, সে সরে এলো। এখন এ সব জিনিস সে চায় না, আরও তার মন অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু মিরিয়াম সে কথা বুঝতে পারল না। ভাবল 'পলকে আদর 'করে সে তার মন ভাল ক'রে দেবে!

দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাস এলো। কয়েক দিন বরফ পড়ল চারি দিকে। আজ-কাল পলকে সারাক্ষণ বাড়িতেই থাকতে হয়। মাইনেকরা নার্স রাখবার ক্ষমতা নেই। মাকে দেখাশোনা করবার জন্মে এ্যানি এসে বাড়িতে রইল। গ্রাম্য-সমিতির নার্সটি সকাল-বিকাল এসে দেখে যায়। পল এ্যানির সঙ্গে ভাগাভাগি করে মায়ের শুশ্রূষা করতে লাগল। মাঝে মাঝে সন্ধ্যার দিকে পলের বন্ধুরা এসে আড্ডা দিত রান্নাঘরে, তাদের হাস্য-পরিহাসে ঘরটি সরগরম হয়ে উঠত। এ অবশ্য নিছক প্রতিক্রিয়া। পল যে এত রহস্যপ্রিয় তা আগে কে জানত? আর এ্যানিই বা এমন খাপছাড়া হ'ল কবে থেকে? তার পর হাসতে হাসতে সে হাসি রূপান্তরিত হ'ত কান্নায়, তখন সকলে মিলে সেই কান্নার শব্দকে চেপে রাখতে চাইত। এতে মিসেস মোরেল একাকী অন্ধকারে শুয়ে সেই শব্দ শুনে তাঁর শত দুঃখের মধ্যেও একটু শান্তি পেতেন।

তার পর পল আস্তে আস্তে অপরাধীর মত উপরে যেত, দেখতে পেত, মা তাদের হাসিগল্পের শব্দ শুনতে পেয়েছেন কি না। গিয়ে জিজ্ঞেস করত, 'একটু দুধ দেব তোমায়?'

'দাও একটুখানি।' মা কান্নার সুরে বলতেন।

পল দুধের সঙ্গে অনেকটা জল মিশিয়ে দিত, যাতে দুধ খেয়ে ওঁর দেহের পুষ্টি না হয়। অথচ এই মাকে সে নিজের জীবনের চেয়ে বেশী ভালবাসত।

রোজ রাত্রেই মরফিয়া দিতে হ'ত বলে ইদানীং মায়ের হার্ট মাঝে মাঝে আর যেন চলতে চাইত না। রাত্রে এ্যানি মায়ের সঙ্গেই শুত। সকালে এ্যানি উঠে গেলে পল গিয়ে বসত মায়ের পাশে। সকালবেলা মরফিয়ার প্রতিক্রিয়ায় মায়ের ক্ষীণ দেহ ছাইয়ের মত ফ্যাকাসে দেখা যেত। চোখের কোলে গাঢ় হয়ে কালি পড়ছে দিন দিন, শুধু চোখের তারা দু'টিই যেন জেগে আছে। দৃষ্টিতে সেই আগের মত অব্যক্ত যন্ত্রণা। প্রতিদিন সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই এই ক্লান্তি আর সঙ্গে সঙ্গেই এই বেদনা। তবু মায়ের কোন অভিযোগ নেই। কান্না যেন তিনি ভুলে গেছেন, অথবা কাঁদতে চান না বলেই কাঁদেন না। এক-এক দিন পল গিয়ে বলত, 'আজ সকালে যেন একটু বেলা অবধি তুমি ঘুমিয়েছিলে।'

—'তাই কি?' মা বলতেন। কৃত্রিম ঘুমের ক্লান্তিতে তাঁর কান্না পেতে থাকত!

—'হ্যাঁ। এখন ত' ঘড়িতে আটটা।'

পল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে দেখত। বরফে-ঢাকা চারি দিক, ধূ-ধূ করছে শাদা। তারপর মায়ের হাত তুলে নিয়ে নাড়ী দেখত। একবার শক্ত আঘাত হাতে লাগত, পরের বার ক্ষীণ একটু স্পর্শ মাত্র। এই নাকি আসন্ন মৃত্যুর লক্ষণ! মা জানতেন পল কেন বার বার তাঁর নাড়ী পরীক্ষা করে। তিনি হাত সরিয়ে নিতেন না।

মাঝে মাঝে চোখে চোখ পড়ে যেত দু'জনার। তখন যেন একটা বোঝাপড়া হ'ত তাঁদের মধ্যে। পল যেন জানাতে চাইত সে-ও মরবার জন্মে রাজী। কিন্তু মায়ের তাতে সম্মতি নেই। মরতে চান না তিনি। দেহ তাঁর ভেঙে পড়েছে, বর্ণ মলিন হয়ে গেছে, কালি-মাখা চোখে গভীর যাতনা। তবু মৃত্যুকে তিনি চাইবেন না।

শেষ পর্যন্ত পল একদিন ডাক্তারকে বলে ফেলল, 'আচ্ছা, আপনাদের কি এমন কিছু ওষুধ নেই, যাতে ওঁর এই যন্ত্রণার শেষ হয়?'

ডাক্তার মাথা নাড়লেন। বললেন, 'আর ক'দিন? একটু ধৈর্য্য ধরুন, মিষ্টার মোরেল।'

পল বাড়ির ভিতরে গেল। সেখানে এ্যানি বলল, 'আর ত' সহ্য হয় না পল। বাড়িশুদ্ধ আমরা সব পাগল হয়ে গেলুম যে।'

দু'জনে খেতে বসল। এ্যানি ডেকে বলল, 'মিনি, আমরা খেতে বসেছি, তুই গিয়ে মার কাছে একটু বোস।' মেয়েটাও যেন যেতে ভয় পায় আজ-কাল।

পল বরফের উপর দিয়ে বনে বেড়াতে যেত। শাদা তুষারের উপর খরগোস আর পাখীর পথ-চলার চিহ্ন। মাইলের পর মাইল চলতে থাকত পল। কুয়াশার আড়ালে ম্লান সূর্য্যাস্ত দেখতে দেখতে পলের মনে হ'ত, হয়ত মা আজকেই শেষ হয়ে যাবেন। বনের মধ্যে থেকে একটা গাধা এসে তার সঙ্গ নিত। পল ওরই গলায় হাত দিয়ে আদর করতে থাকত।

মায়ের জীবন-দীপ তবু নিবু-নিবু হয়েও জ্বলে রইল। মুখে কোন কথা নেই, সর্বদা ঠোঁট চেপে শুয়ে আছেন, কেবল তাঁর কালো চোখ দু'টিতে যন্ত্রণা ফুটে বেরুচ্ছে; জীবনের চিহ্ন শুধু ঐটুকুই।

মিসেস মোরেল জীবনকে এখনও আঁকড়ে ধরে রয়েছেন। কোন জিনিসই তাঁর নজর এড়াতে পারে না। একদিন এ্যানিকে ডেকে বললেন, 'তোমার বাবার খনির পোষাকগুলো একটু শুকোতে দেওয়া দরকার।'

'তার জন্মে তুমি ভেব না মা!' এ্যানি প্রবোধ দিল মাকে।

সেদিন রাত্রে এ্যানি আর পল ছাড়া ঘরে কেউ নেই। নার্স আছে দোতলায়। এ্যানি বলল, 'উনি ত' যেন খৃষ্টমাস অবধিও টিঁকে যাবেন।' দু'জনার মনে একই ভয়। পল দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'না। আমি তার ব্যবস্থা করব, মরফিয়া দেব ওঁকে।'

'কোন মরফিয়া?'

'সেই যে শেফিল্ড থেকে পাঠিয়েছিল—তার সবটাই দিয়ে দেব।'

'তাই করো পল, তাই করো।'

পরদিন পল শোবার ঘরে ছবি আঁকছিল। মা ঘুমিয়ে আছেন বলে মনে হচ্ছে। পল এক-একবার ছবিতে আঁচড় দিচ্ছিল আর ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছিল। মা সকাতর সুরে বলে উঠলেন, 'অমন করে হেঁটো না, পল।'

পল চমকে উঠল। দেখল, মা তার দিকে চেয়ে আছেন, মুখের মধ্যে চোখ দু'টি যেন দু'টি কালো বুদ্বুদ। বলল, 'না, মা, আর হাঁটব না।' সঙ্গে সঙ্গে তার হৃদয়ের একটা তন্ত্রী যেন ফট্ করে ছিঁড়ে গেল। [ক্রমশঃ]

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য

নাচ গান বাজনা



ঝুমুর গান

শ্রীজয়দেব রায়

ঝুমুর গান সাঁওতালী প্রভাবে রচিত এক প্রকার গান। মানভূম জেলার পল্লী অঞ্চলের বাঙ্গালী গৃহস্থদের ঘরে ঘরেও এ শ্রেণীর গান শোনা যায়। ঝুমুরের গীতি-রীতি, সুর, ছন্দ সমস্তই বাঙলার অন্যান্য পল্লীসঙ্গীত হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ঝুমুর গানের সঙ্গে আড়বাঁশীর সুর এবং সমবেত নৃত্য অঙ্গাঙ্গী ভাবে সন্নিবিষ্ট—একটির অভাবে অন্যটি প্রায় নিরর্থক। মানভূম অঞ্চলের ঝুমুর গান এইরূপ—

দশ হাত তসর কাপড়, তিলে ডিবা জয় রে।
তের হাত ধুতি বাগাতে হিলায় রে।
গিরি গিলটি গীত গাও রে!
চুটিয়া হি মাদল বাজে, সেতো তামাক সাজে।
করে হি করে কন্যা বিরলে কান্দে গো।
মশা ঝুমুর খোলাব রে॥

আর বাঙলা দেশের রচিত একটি বিশিষ্ট ঝুমুর গান—

চল সই বাঁধা ঘাটে যাই।
আষাঢ়ের জলের মুখে ছাই॥
ঘোলা জল পড়লে পেটে,
গা-টা অমনি ঘুলিয়ে ওঠে,
পেট কাঁপে আর ঢেকুর ওঠে,
হেউ, হেউ, হেউ॥
চোখের জল চোখে মরে,
বেড়াই আমি আমোদ করে,
জ্বালায় জ্বলি, তবু রসে ঢলি,
আমি হেলে দুলে চলেছি।
পোড়া গয়না বুঝি সয় না আর,
পাঁচ আবাগীর নজরের ছায়,
পোড়া বিধির বিষম মার,
কার যেন ধার ধেরেছে।

এই শ্রেণীর ঝুমুর গানের কথায় রস পাওয়া যায় না, কিন্তু সুরঝঙ্কৃত ঝুমুর গান বনমালা-শোভিত সাঁওতাল যুবতীর মতই মনোহরা।

ঝুমুর শব্দের উৎপত্তি 'ঝুমরি' রাগিণীর নাম হইতে। তাছাড়া, এই রাগিণী ঝুমুর ঝুমুর শব্দে মল বা নূপুর বাজাইয়া নৃত্য সহযোগে গীত হইত বলিয়া এই শ্রেণীর গানের নাম হইয়াছে ঝুমুর।

প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
একৈব ঝুমরী লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা।
(সঙ্গীতদামোদর)

পদকল্পতরুতে আছে—

মদনমোহন হেরি মাতল মনসিজ।
যুবতী যূথ শত গায়ত ঝুমরি॥

পরবর্তী কালে আভিধানিক অর্থে ঝুমুর অশ্লীল গীতবিশেষ বলিয়া কথিত হয়। ঝুমুর গান সাধারণতঃ গ্রাম্য নরনারীদের দ্বারা রচিত বলিয়া তাহার মধ্যে রাগ-রসের কিঞ্চিৎ আধিক্য ছিল। কিন্তু ক্রমে ঝুমুর একটি বিশেষ গীতিভঙ্গীতে পরিণত হয়, তাহার মধ্যে সঙ্গীতকলার একটি পরিপূর্ণ রূপের বিকাশ হইল।

সাঁওতালী ঝুমুরের গঠন-কৌশলে যথেষ্ট বৈচিত্র্য আছে। এ সকল গানের কথাংশ অল্প, চারিটি মাত্র পদ থাকে, অধিকাংশ গানে অন্ত্যানুপ্রাস বা মিল নাই। প্রায় সকল গানের বিষয়বস্তু লৌকিক পল্লীজীবনকে কেন্দ্র করিয়া রচিত। সাঁওতালী ভাষায় 'সিরিং' অর্থে গান। ঝুমুর সিরিঙের মধ্য দিয়া আদিবাসীদের আত্মচেতনা কি ভাবে সঞ্চারিত হইতেছে, তাহার নিদর্শনস্বরূপ একটি গান উদ্ধৃত করা হইল—

উপর দিকে জল হইলো গো
নেমু দিকে জল হইলো নেই,
কেন, নেমু দিকে জল হইলো নেই,
শুকনো ডাঙ্গালে চাষা হাল চাষা বরো হে,
ধান চাষা আঁকুর হেয়ে গেল।
এত বড় আকাল হইলো এত বড় মুস্কেল গো
ধেরতি মানেওয়া কি খেয়ে রেখিল জীবন?
পানচেত পাহাড়ে নয়া নয়া বেলপাত
সেই খেয়ে রেখিল জীবই।

তাহাদের ঝুমুরের সঙ্গে বাজে মাদল কলরোলে—

ধাতাড় হিতাড় তিড়দা হিতাড়
তিড় হিতা দাক ধাহিতো
তিড়দা হিতাড় দড়াং॥

কিন্তু বাঙলা ঝুমুরের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের সেই চিরপরিচিত প্রেমকাহিনী অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, সেই পুরাতন গীতি সূত্রে ছন্দে ও মিলের নব নব পুষ্প যোজনা করিয়া এক চিরন্তন প্রেমকাহিনীকে একটি পূর্ণাঙ্গ গানে পরিণত করা হইয়াছে। এই শ্রেণীর একটি স্বরচিত ঝুমুর—

সই, সাধে বাদে আগুন জ্বেলেছি,
আদর ক'রে কালনাগিনী বুকে নিয়ে খেলেছি।

নাহি জানি সুধার আশা, পিয়াসে চাই পিয়াসা
জলে মরি তবু করি শ্যাম-প্রেমের আশা।
বিরহে যতন করে আশা জলে ফেলেছি।

সাঁওতালী ঝুমুর গান কি ভাবে বাংলা গানে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহার সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য বলিয়াছেন—

—"বাঙ্গালী অল্প দিনের মধ্যেই সাঁওতালী ঝুমুরগুলিকে নিজস্ব সংস্কৃতির অঙ্গ করিয়া লইল। বাংলা লোকসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ইহাদের সংক্ষিপ্ততা দূর করিয়া, পদান্তে মিত্রাক্ষর যোজনা করিয়া, ইহাদের মধ্যে রাধাকৃষ্ণের নাম যোগ করিয়া অথচ ইহাদের মৌলিক সুরটুকু যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পশ্চিম বাঙ্গালার পশ্চিম সীমান্তবর্তী পল্লী-অঞ্চলে বাঙ্গালী নূতন ঝুমুর সঙ্গীত রচনা করিল। তাহা স্বভাবতই বাঙ্গালার আঞ্চলিক লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হইল। আদিবাসীর সাংস্কৃতিক উপাদান বাঙ্গালী এই ভাবে নিজের লোক-সংস্কৃতির মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইল।"

তর্জা-ঝুমুর ও কবির গানের ন্যায় চাপান ও উতোরের গালি-গালাজের রসান দিয়া গাওয়া হইত। অনেকে অনুমান করেন, বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তির শেষ যুগে যখন এক শ্রেণীর বিকৃত চর্যা গানের মধ্য দিয়া হিন্দু ধর্মের কুৎসা প্রচার করা হইত, সে সময় তাহাদের উত্তর দিবার জন্য আক্রমণাত্মক ঝুমুর শ্রেণীর গানের সৃষ্টি করে হিন্দুরা। কালক্রমে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের দ্বন্দ্ব মিটিয়া গিয়াছে, কিন্তু বিদূষণ-রীতির মাধ্যমে রসের গান বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে।

বাঙলা দেশে যাত্রাগানের অঙ্গস্বরূপও এক শ্রেণীর ঝুমুর গান প্রচলিত ছিল। বিখ্যাত যাত্রাওয়ালাদের দলের সঙ্গে বালকদের দ্বারা গঠিত একটি করিয়া ঝুমুরের দল থাকিত, তাহারা পালা আরম্ভের পূর্বে এই শ্রেণীর গান গাহিয়া মুখবন্ধ করিত—

ও যার অঙ্গ বাঁকা, বচন বাঁকা, বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণ ও তার শোন গো বিধুমুখি।
ও মন চুরি করে বাঁশীর স্বরে, ও তো জানে গো জগৎজনে।
তার সঙ্গে রাই প্রেম করে, সে কি প্রেমের মরম জানে।

উপরের গানটি বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা পরমানন্দ অধিকারীর দলের গান। * সুরুচি সঙ্গত ঝুমুর গানের তিনিই প্রবর্ত্তক ছিলেন।

কিন্তু ক্রমে এক শ্রেণীর শ্রোতাদের নিকট মূল যাত্রাগানের অপেক্ষা এই ঝুমুর গানই বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। যাত্রাওয়ালারা তখন স্বতন্ত্র ঝুমুরের দল গঠন করিলেন।

কবির গানের দলের সঙ্গে সঙ্গে ঝুমুরের গানের ধারা বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত বহিয়া আসিয়াছে। মানভূমের সন্নিকটস্থ বীরভূম ও বর্ধমান জেলায় আসল ঝুমুরের দল গঠিত হয়। কবির গানের ন্যায় ঝুমুর গানেও রসকলহের ও বাদপ্রতিবাদের সূত্রপাত হয়। এক দল হয়ত নন্দ ঘোষের জবানীতে গাহিয়া প্রশ্ন করিল—

নন্দঘোষ বলে, ও কুতূহলে।
আজি কানাই বলাই যাব সঙ্গে লয়ে, যাব মধুমণ্ডলে।

যশোদা উত্তর করিল—

কেঁদে যশোমতী কয়, ও নন্দ মহাশয়,
কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে কংসালয়?

এক দল গান গাহিয়া সখীদের জবানীতে প্রশ্ন করল—

হ্যাঁ লা রাধিকে,
কালা কালা করিস বটে,
তার গুণ কি আছে লা বল না শুনিগা?

অপর দল রাধিকার জবানীতে তাহার উত্তরে গাহিয়া শোনায়—

কালার গুণের কথা বলব তোরে কি তা!
বলব কি বল, আর তোরে
জলকে যে যাই ছল করে।
যমুনার ওই তীরে,—কলসী কাঁখে ধীরে ধীরে।
ননীচোরা নামটি ধরে বেড়ায় ঘুরে,
আবার কদমতলায় চুপটি করে
বসে থাকে গোপিনীদের বসন হরে।

'মানভঞ্জন' ঝুমুরের সুপ্রচলিত পালা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার পা ধরিয়া অনুনয় করিয়া গাহিত—

তোমা বিনে বিধুমুখি! চারি দিকে শূন্য দেখি,
প্রাণ বিরহে অঙ্গে জ্বালায় রে।
ফুলশরে হানে হিয়া পরে মোরে জোরে মর্দনায় রে।

অভিমানিনী তাহাকে ধিক্কার দিয়া বলিত—

ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না কপট আমারে
পাপিনী সম্ভোগ করেছে তোমারে
ধিক্ হে নিঠুর কালা।
শুন হে অশুচি! উচ্ছিষ্টেতে রুচি, না করে ব্রজেন্দ্রবালা।

ঝুমুরের পালাও সাধারণত চার ভাগে বিভক্ত ছিল—ব্রজলীলা, আগম, লহর ও খেউড়। আগমে ভবানী বন্দনা করা হইত। বিবাহোৎসবে পল্লীললনাদের দ্বারা গীত একটি ঝুমুরের শেষাংশ এই—

কি বরণ বরে লো ও রামের সোহাগিনী
সোহাগী বরণ ব'রে।
হাতের কঙ্কণ ঝিকমিক করে লো। (ধুয়া)
হেলেকে চুলে মাজা পড়েলো।
কি বরণ বরেলো ও রামের সোহাগিনী
সোহাগী বরণ বরে।
গলার হার টলমল করে,
মুখেতে মধুর হাসি
দশনেতে খেলে দামিনী লো।
কি বরণ·····(ধুয়া)।
বুকের কাপড় খসে পড়ে
পৃষ্ঠেতে খোঁপা দোলে
পায়ের নূপুর খসে পড়ে লো।
কি বরণ বরে লো ও রামের সোহাগিনী।

রেকর্ড-পরিচয়

হিজ মাষ্টার্স ভয়েস

হিজ মাষ্টারস ভয়েস ও কলম্বিয়ার নিম্নের বাংলা রেকর্ডগুলি নূতন বেরিয়েছে:—এইচ এম, ভি (আধুনিক): শ্রীমতী উৎপলা সেন—"এই ছায়া-বীথি তলে" ও "নীল পরীদের ইন্দ্রধনু"—এন্ ৮২৭০৪; তরুণ ব্যানার্জ্জী—"এক একদিন মেঘ করে" ও "কোথায় তুমি হারিয়ে গেলে"—এন্ ৮২৭০৫; শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ—"ভ্রমর বাউল তোমার পাখার" ও "এ ব্যথা জানি বলে"—এন্ ৮২৭০৬; দিলীপ সরকার—"আমলকী বনে" ও "যত গান ছিল"—এন্ ৮২৭১০। ঘুমপাড়ানি গান: কুমারী আলপনা ব্যানার্জ্জী—"চরকা কাটে চরকা বুড়ি" ও "পৌষালি সন্ধ্যায় ঘুম ঘুম তন্দ্রা"—এন্ ৮২৭০৭। রবীন্দ্র-সঙ্গীত: শ্রীমতী মঞ্জু গুপ্ত—"শেষ নাহি যে" ও "হেথা যে গান গাইতে আসা"—এন্ ৮২৭০৮। ভক্তিমূলক গান: কুমারী যূথিকা রায়—"একা আমি জীবন তরী" ও "আমারে এ আঁধারে" (অতুলপ্রসাদ)—এন ৮২৭০১।

কলম্বিয়া

আধুনিক: ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য—"মাটিতে জন্ম নিলেম" ও "কোথা বেনো ভাসে"—জি-ই—২৪৭১৭; গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখার্জী—"অনেক দিনের ওই যে আকাশ" ও "তোমারে হারানো এতো নয়"—জি-ই ২৪৭১৮; কুমারী গায়ত্রী বসু—"রজনীগন্ধা সুরভি" ও "গুন্ গুন্ গুন্"—জি-ই ২৪৭১৯। ভক্তিমূলক: শ্রীমতী নীলিমা ব্যানার্জ্জী—"দে দে হে নিলাজ বধূ" ও "যিতি কুঞ্জর গতি"—(চণ্ডিদাস ও শশিশেখরের কীর্ত্তন)—জি-ই ২৪৮০০; পান্নালাল ভট্টাচার্য্য "জীবনের এই ক'টি দিন" ও "তীরে তীরে গুঞ্জন"—জি-ই ২৪৮০১; হাস্ত-কৌতুক: তুলসী লাহিড়ী—"চৌর্য্যানন্দ"—জি-ই ২৪৮০২। ফিল্ম সঙ্গীত: ফিল্ম "গোবিন্দ দাস"—ধনঞ্জয় ও প্রতিমা ব্যানার্জ্জী—জি-ই ৩০৩৩৪-৩৫-৩৬; ফিল্ম: "মামলার ফল"—সন্ধ্যা মুখার্জী-ধনঞ্জয়-আরতি মুখার্জী—জি-ই ৩০৩৩৭; ফিল্ম: "ত্রিযামা"—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখার্জী—জি-ই—৩০৩৩৮-৩৯।

সাংগীতিকী

সঙ্গীতের নামে দেশের কোথাও কোথাও এবং কোন কোন ছায়াচিত্রে বিদেশী সুরের সস্তা অনুকরণের দ্বারা জন-চিত্ত জয়ের যে চেষ্টা চলিতেছে, তাহার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের বেতার ও তথ্য বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকার সঙ্গীতশিল্পী এবং সঙ্গীতানুরাগীর নিকট সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। বাংলাদেশের সঙ্গীতানুরাগ সম্বন্ধে তিনি সপ্রশংস উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই বাংলাদেশ ধ্রুপদ গানের দ্বারা মার্গসঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। * * * গত ২৫শে আগষ্ট শনিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গোখেল মেমোরিয়ল বিদ্যালয়ে, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত আকাডেমির ছাত্র-ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক এক বিচিত্র সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়। সঙ্গীত-নাটক আকাডেমির সঙ্গীত বিভাগের সর্বাধিনায়ক শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকিয়া অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি, ভদ্রমহিলা এবং বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে সমবেত কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত বর্ষার আবাহন সঙ্গীত "ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে", গানটি অতিশয় শ্রুতিমধুর হয়। তানসেন রচিত 'মেঘ-মল্লারে'র ধ্রুপদ (সমবেত) শ্রীমতী প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঠুমরী এবং বিশেষ করে সমবেত পল্লী 'সারি' গান এবং শ্রীমনিলাল নাগের সেতার শুনিয়া শ্রোতৃবর্গ মন্ত্রমুগ্ধ হন। শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'সুর-সিঙ্গারে' দেশ রাগের আলাপ ও গৎ এবং শ্রীসুবোধ নন্দীর তবলা সঙ্গত অতি উচ্চাঙ্গের হইয়াছিল। গোখেল বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা আকাডেমির ছাত্র-ছাত্রী ও অধ্যাপকগণকে এইরূপ সঙ্গীত পরিবেশনের জন্ম আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আশা করেন, ভবিষ্যতে আকাডেমি এইরূপ মনোজ্ঞ এবং আকর্ষণীয় সাংস্কৃতিক-অনুষ্ঠান দ্বারা তাঁহাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিবেন। রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠান শেষ হয়। * * * ভারতীয় মার্গসঙ্গীতের অনুশীলন ও উন্নতির জন্ম বাঙ্গলার বিষ্ণুপুর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য থেকে বিষ্ণুপুর সমগ্র-ভারতের অন্যতম সঙ্গীতকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। বিষ্ণুপুরের স্বাধীন নৃপতিগণ রাজধানীকে সর্বতোভাবে শিল্পকলায় সমৃদ্ধ করে তোলেন। সঙ্গীত, স্থাপত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি নানাবিধ 'শিল্পকার্য্যে তার খ্যাতি বিস্তৃত হয়! এই বিষ্ণুপুর, এক সময়ে বৈষ্ণবধর্ম, সাহিত্য এবং কীর্ত্তনের পীঠস্থান ছিল। বিষ্ণুপুররাজের কুলদেবতা মদন-মোহনের বহু লীলা-মাহাত্ম্য স্থানীয় সাহিত্য ও গানের মধ্যে বর্ণিত আছে। ব্যবসা ও বাণিজ্যেও বিষ্ণুপুর খুব প্রসার লাভ করেছিল। বিষ্ণুপুরের খনামধন্য শিল্পিগণ সঙ্গীতকে বিস্মৃতির কবল থেকে উদ্ধার করে, তার মহিমা দিকে-দিকে প্রচার করে গেছেন। পদাবলী

কীর্ত্তনের ভাবে অনুপ্রাণিত বিষ্ণুপুরের গীতিকারগণ সঙ্গীতে কাব্যভাবের যথারীতি মর্য্যাদা দিয়েছেন। তানসেন প্রবর্ত্তিত মার্গ-সঙ্গীতধারার যথার্থ সংরক্ষণের জন্য বিষ্ণুপুর আজও মহিমান্বিত। ইহা অতি আনন্দের বিষয়, বেতার-কর্ত্তৃপক্ষ এই বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজন করেছেন। আগামী ৯ই সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১২টা এবং বেলা ৩টা থেকে ৫টা, এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে। ভারতবরেণ্য সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদ সঙ্গীত দ্বারা এই সম্মেলন উদ্বোধন হবে। অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী দীপালি নাগ, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাব সগীরুদ্দিন কেরামতুল্লা খাঁ, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ নন্দী প্রভৃতি এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন। * * * আলাউদ্দীন সঙ্গীত-সমাজের ভবানীপুর কেন্দ্র গত ১৯শে আগষ্ট—৫৫, হরিশ মুখার্জি রোডে স্থাপিত হয়। অনুষ্ঠানের সভানেত্রী ছিলেন লেডী রাণু মুখার্জি। স্বাগত ভাষণে শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রাণ দিয়ে সঙ্গীত শিক্ষা করা উচিত। লেডী রাণু মুখার্জি (সভানেত্রী) বলেন—শিক্ষার্থীদের আত্মপ্রচার অপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ শিক্ষার জন্য আত্মনিয়োগ করা উচিত। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন—রূপাঞ্জলি দেবী (৪ বৎসর) খেয়াল-বাগেশ্রী; আলী আহম্মদ খাঁ—সেতার, পুরিয়া, ঠুংরী; (পান্নু—তবলা সঙ্গত); অরুন্ধতী ভট্টাচার্য—খেয়াল-ভীমপলশ্রী; ব্রজগোপাল দাস—খেয়াল-ভূপালিনী; তবলা—অনিমেষ মজুমদার। * * * কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইণ্টারমিডিয়েট ও ডিগ্রী স্তরে সঙ্গীত-বিদ্যার যে নূতন পাঠক্রম রচনা করিয়াছেন, তদনুসারে দক্ষিণ-কলিকাতার বেঙ্গল মিউজিক কলেজকে সর্বপ্রথম অনুমোদিত শিক্ষালয়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গীত-বিদ্যালয়রূপে অনুমোদন দিবার জন্য আরও চারটি আবেদন এখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনাধীন আছে। * * * প্রার্থনা-সঙ্গীত-চক্রের মাসিক সঙ্গীত অধিবেশন গত ২৫শে আগষ্ট দক্ষিণ-কলিকাতায় লোকমান্য তিলক হলে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীতারাপদ চক্রবর্ত্তী পুরিয়া রাগে একটি খেয়াল গাহিয়া সকল শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করেন। তাঁহার সহিত তবলা-সঙ্গত করেন জনাব কেরামতুল্লা এবং সারেঙ্গী বাজান সাগিরুদ্দীন। অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল। * * * এবার সদারঙ্গ সঙ্গীত-সংসদ আগামী ২৭শে সেপ্টেম্বর হইতে তাঁহাদের বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনের যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহা নানা দিক হইতে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহে সঙ্গীত সম্মেলন অনুষ্ঠানের যে রেওয়াজ কলিকাতায় প্রচলিত আছে, সদারঙ্গ সঙ্গীত-সংসদ তাঁহাদের পূর্ববর্ত্তী বৎসরগুলিতে তাহা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছেন। এই ব্যবস্থায় বহু স্বল্প-সঙ্গতিসম্পন্ন সঙ্গীত-পিপাসুকে সারা রাত্রি ধরিয়া রাজপথের উপর বসিয়া যে ভাবে সঙ্গীতরসের আস্বাদন করিতে হয়, সংবাদপত্র ও জনসাধারণের নিকট তাহা কঠোর সমালোচনার বিষয়ে পরিণত হয়। এবারকার সঙ্গীত-সম্মেলনে প্রধানতঃ সেই অসুবিধা দূরীকরণের চেষ্টা করা হইয়াছে। এতদুদ্দেশ্যে সদারঙ্গ সঙ্গীত-সংসদ বহু অর্থ ব্যয়ে চৌরঙ্গী রোডের উপর যে বিশাল মণ্ডপ নির্মাণ করাইয়েছেন, তাহাতে অন্ততঃ আড়াই হাজার দর্শকের আসন সঙ্কুলান হইবে এবং স্বল্পবিত্তদের জন্য অল্প মূল্যের টিকিটেরও ব্যবস্থা থাকিবে। কলিকাতায় সঙ্গীত-সম্মেলনগুলির আর একটি বিশেষ অসুবিধার প্রতিও এবার সদারঙ্গ সঙ্গীত-সংসদ বিশেষ মনোযোগ দিয়াছেন। প্রতি বৎসর প্রতিটি সম্মেলনের সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান সারা রাত্রিব্যাপী হওয়ায়, বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের অসুবিধার অন্ত থাকে না। এই অসুবিধা দূর করার জন্য এবার সদারঙ্গ সংগীত-সংসদ প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। সর্বোপরি এ বৎসর তাঁহারা স্থানীয় ও বহিরাগত অসংখ্য প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর সঙ্গীতানুষ্ঠানের যে আয়োজন করিয়াছেন, তাহাও কলিকাতায় শ্রোতৃমহলকে তৃপ্ত করিবে বলিয়া মনে হয়। * * * গত ২৬শে আগষ্ট রবিবার "সুর সঙ্গীতায়ন" প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনের মাধ্যমে স্বর্গতঃ সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ দত্তের স্মৃতি-স্মরণে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের (উচ্চাঙ্গ) আয়োজন হইয়াছিল। প্রথমে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ প্রেরিত বাণী পঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে বহু প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী যোগদান করিয়াছিলেন।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বেতার অনুষ্ঠান

১লা ভাদ্র—অমিয় অধিকারী—গীটার, অনাথনাথ বসু—ঠুংরী। ২রা—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত। ৪ঠা—রেণুকা সাহা—সেতার। ৫ই—সুবিনয় রায়—রবীন্দ্র-সংগীত। ৬ই—গীতা সেন—অতুলপ্রসাদের গান ও রবীন্দ্র-সংগীত, অনীতা মজুমদার—অতুলপ্রসাদের গান ও রবীন্দ্র-সংগীত। ৭ই—দেবব্রত বিশ্বাস—রবীন্দ্র-সংগীত, আলি আকবর খাঁ—স্বরোদ। ৯ই—নীলিমা সেন—রবীন্দ্র-সংগীত। ১০ই—মহম্মদ দবীর খাঁ—বীণা, সন্তোষ সেনগুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান। ১১ই—শোভা রায়চৌধুরী—রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান, আলি আহম্মদ খাঁ—সেতার। ১৫ই—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়—গীত ও আধুনিক। ১৬ই—চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত ও রাগপ্রধান। ১৭ই—শচীন গুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত ও আধুনিক। ১৯শে—কাজী অনিরুদ্ধ—গীটার। ২০শে—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—আধুনিক। ২১শে—রাধিকামোহন মৈত্র—স্বরোদ।

আমার কথা (২১)

দক্ষিণামোহন ঠাকুর

যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরকে মনে পড়ে? বিংশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম মুহূর্তে যে অগ্নি-শিশুর দল শপথ করেছিলেন জননীর শৃঙ্খল-মুক্তির, ঘরে ঘরে শুনিয়েছিলেন বন্ধন-মোচনের গান, প্রবলপ্রতাপান্বিত ইংরেজ সরকারের সারা অঙ্গ যাঁরা ক্ষত-বিক্ষত করে তুলেছিলেন বিদ্রোহের চিমটি কেটে, আজ তাঁদের অনেকেই তলিয়ে গেছেন বিস্মৃতির অতল গহ্বরে। মেকি আভিজাত্য এদের রাখতে পারে নি মানুষ থেকে সরিয়ে দূরে, দেশবাসীর বুক-ঝরা রক্ত দিয়ে এরা কেনেনি খেতাবরূপী বিলিতি রাজার অপাঙ্গের এঁটো, ফিরেও তাকায় নি প্রভাবশালী ধনকুবের পিতৃ-পিতামহের বহু যত্নে সংরক্ষিত লোহার সিন্দুকের দিকে। সেই হারিয়ে-যাওয়া মুছে-যাওয়া প্রভাত তরুণদের মধ্যে যোগেন্দ্রনন্দন ঠাকুরও অন্যতম, স্বাধীন দেশে আজ যাঁকে আমরা স্মরণ করছি বিস্মৃতির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রেখে।

শ্রীমন্ত-চাঁদসদাগর-ধনপতিরই দেশে জন্মেছিলেন দর্পনারায়ণ

ঠাকুরের ছেলেরা। মেজ ছেলে গোপীমোহন, হরিমোহন ছোট। মোহিনীমোহন (কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ও প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার ভাগে বাঙলার সাগর-সঙ্গম উদ্বেলিত হয়ে উঠত একের পর এক রত্নময়ী বাণিজ্যিক অর্ণবপোতের গমনাগমনে, যে বাণিজ্যের কর্ণধার ছিলেন ঠাকুর-ভ্রাতৃবৃন্দ অর্থাৎ কলকাতার ঠাকুর বাবুরা। হরিমোহন ঠাকুরের ছেলে উমানন্দন ঠাকুর। দমদমের গুপ্ত বৃন্দাবন বা দ্বিতীয় বৃন্দাবন শিল্প-চমৎকারিত্বের পশরা নিয়ে আজো বহন করে চলেছে যাঁর শিল্পবোধের অপূর্ব সাক্ষ্য। এঁর প্রপৌত্র সতীন্দ্রমোহন। সারা দেশ যে দিন আচ্ছন্ন ছিল সুরার যাদুজালে—ঠিক সেই সময়ই সুরের যাদু মন্ত্রে দেশের আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলছেন ঠাকুর-পরিবার। বারাঙ্গনাদের পদতলে যে দিন নগরসন্তানেরা পতিত দিগঙ্গনারা সে দিন জেগে উঠছে ঠাকুরবাড়ীর মেয়েদের, বধূদের আগল-ভাঙ্গার গানে, প্রতিযোগিতা দু' দলেই ছিল এঁরা চালাচ্ছেন ধ্বংসের প্রতিযোগিতা—ওঁরা চালিয়ে চলেছেন সৃষ্টির প্রতিযোগিতা। ত্রিযাম রাত্রির অবসানে অরুণ-রবির অভ্যুদয়—বিশ্বজোড়া সৃষ্টির পশরা বহন করে ধীরে ধীরে চোখ চাইছেন কবি-রবি রবীন্দ্রনাথ। বংশের প্রদর্শিত পথেই পা দিলেন সতীন্দ্রমোহন, নিলেন সঙ্গীতের পথ—পুত্র, যোগেন্দ্রনন্দন গেলেন বিপ্লবের পথে—পৌত্র দক্ষিণামোহনের করস্পর্শে আবার সজীব হয়ে ওঠে থেমে-যাওয়া সুরের রেশ।

১৩২২ সালের ১৯এ ভাদ্র, (সেপ্টেম্বর ১৯১৫) জন্ম হয় দক্ষিণামোহন ঠাকুরের। পিতামহের সেতার বাজনা—মা শ্রীযুক্তা প্রেমিকা দেবীর রবীন্দ্র-সঙ্গীত শৈশব থেকে মনে এনে দেয় সঙ্গীতের প্রতি অনুরক্তি। যথাসময়ে ব্যবস্থা হয় পাঠাভ্যাসের। পাঠ নেবে কে? বাজিয়ে ঠাকুর্দার নাতি, বিপ্লবী বাপের ছেলে—সঙ্গীত যে স্থায়িভাবে আসন করে নিয়েছে মনের মধ্যে। সুরলোকের আহ্বান এসেছে—ব্যাকরণের নির্ধারিত গণ্ডীর মধ্যে বিচরণ করতে কি আর ভাল লাগে? ইতিহাসের খুনোখুনি, ষড়যন্ত্র আর অবাধ হত্যার বীভৎস বর্ণনার থেকে মধুর লাগে তখন সুরের বেহালার উপর ঝুলিয়ে যেতে সৃষ্টির ছবি, সঙ্গীতের মাঝ দরিয়ার কোন অতলে ডুবে গেছে যে বালক, আর কি তার পক্ষে সম্ভব জ্যামিতিক উপপাদ্য-সম্পাদ্যের পাদমূলে পাদ্য-অর্ঘ দেওয়া? পরিণতি—সরস্বতীর পুস্তক-লোকের সিংদরজায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন, সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর সুরলোকের বেদীমূলে তনু-মন-যৌবন— সর্বসমর্পণ। পুস্তকও যেমনই দেবীর এক হাতে তেমনই বীণাও শোভিত তাঁরই আর এক হাতে।

এস্রাজ শেখা শুরু হোল। কৃষ্ণসখা শর্মার কাছে। শ্রীহীরু গঙ্গোপাধ্যায়ের সাহায্যে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর কাছেও অল্পদিনের জন্যে। সাত বছর দিলরুবা শেখা চলল, ছোটে খাঁ সাহেবের কাছে—১৯২৯ খৃঃ অবধি। ১৯৩২ খৃঃ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র নিয়ে গেলেন ইণ্ডিয়ান ষ্টেট ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীতে (বর্তমানে যার নাম অল ইণ্ডিয়া রেডিও)। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে পরিচিত হলেন সংগীতশাস্ত্রী সুরেশ চক্রবর্তীর সঙ্গে, নিলেন তাঁর শিষ্যত্ব। সেতার ও দিলরুবা। ১৯৩৫ খৃঃ ৺সুরেন্দ্রলাল দাসের পরিচালনায় যন্ত্রীসংঘে দিলেন যোগ। ক্লাসিকাল অর্কেষ্ট্রায় অনেক দিন এর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। সঙ্গীত পরিচালকরূপে ছায়াচিত্রে যোগদান। প্রথম ছবি রবীন্দ্রনাথের শেষরক্ষা। অদ্যাপি বহু বিখ্যাত ছবিতে সঙ্গীত পরিচালকরূপে পর্দায় ফুটে ওঠে দক্ষিণামোহনের নাম। হীরেন্দ্রনাথ, প্রমথেশচন্দ্র, দেবকীকুমার প্রমুখ বহু খ্যাতিমান পরিচালকের ছবিতে সুর দিয়েছেন দক্ষিণামোহন। দক্ষিণামোহনের সানাই বাজনা বিশ্বখ্যাত পথের পাঁচালীর শোভা বহুলাংশে করেছে বর্ধিত। সঙ্গীত-জীবনে আজও তিনি অকুণ্ঠ সাহায্য পাচ্ছেন শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের কাছে।

অনেক দিন আগে। সুরেন্দ্রলালের নায়কত্বে কাজ করে যাচ্ছেন। নগেন্দ্রনাথ মণ্ডল এস্রাজে সাউণ্ড বক্স লাগানো একটি বাদ্যযন্ত্র এনে হাজির করলেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সুরেন্দ্রলাল, সুরেশচন্দ্র ও কাজী নজরুল ইসলাম। সেই নবজাত যন্ত্রটির নাম হোল তার সানাই। আজকের দিনে সারা ভারতে আবহ সঙ্গীতে গান অনুকরণের প্রধান যন্ত্ররূপে পরিগণিত। দেখলেন তরুণ দক্ষিণামোহন। মাথায় ঢুকল এস্রাজে যদি এ জিনিষ হয় সেতারে হবে না কেন? চলল গবেষণা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফলরূপে দেখা দিল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাদ্য তড়িৎবীণ। এ কার্যে রেডিও সাপ্লাই ষ্টোর্সের জ্যোতিপ্রকাশ-জ্ঞানপ্রকাশ-চারুপ্রকাশ ঘোষেরা প্রভৃত সাহায্য করেছিলেন। এ বাজনা বিজলীর সাহায্যে বাজে। নাম দিলেন তিনজনে—সুরেন্দ্র-সুরেশ-নজরুল। অর্কেষ্ট্রা সম্বন্ধে দক্ষিণামোহনের উঁচু ধারণা—এ যে বহুর সমাবেশ—আনন্দও তাই আসে বর্ধিত পরিমাণে। কিন্তু এ বিষয়ে সরকার বিশেষ উদাসীন আর স্বাধীন দেশে সঙ্গীত তার আশানুরূপ স্থান তো পায়নি। দক্ষিণামোহন বলেন—সঙ্গীতে গলদও আছে কিন্তু তার উপশম সার্বজনীন সহযোগিতা ও সর্বপ্রকার গোঁড়ামী পরিত্যাগ। অনেকে ভাবেন যে, চেপে রাখলে বুঝি চাপা থাকবে—কিন্তু বিদ্যা কি কখনও চাপা থাকে? আমাদের প্রাচীন সঙ্গীতের ধারা অবশ্য এখন সম্পূর্ণ অবলুপ্ত।

'সঙ্গীত' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় উত্তর আসে, এ একটি সম্পূর্ণ পৃথক জগৎ, এখানে ভেদাভেদের বালাই নেই, সকল কামনা-বাসনার অতীত আনন্দের তোরণ দ্বার এখানে চিরমুক্ত। জিজ্ঞাসা করি—শিক্ষক হতে হলে কি কি গুণ থাকা দরকার? উত্তর এলো—তা কি করে বলি—নিজেই এখনও শিক্ষার্থী—শিক্ষককে বিচার করব কি করে—তবে হ্যাঁ দীর্ঘদিনে যেটুকু দেখছি তারই একটা অভিজ্ঞতা-স্বরূপ বলতে পারি—যে শিক্ষকের প্রয়োজন সর্বাগ্রে মাত্রা জ্ঞান। নানান অসুবিধেতে পড়তে হবে যদি স্বরলিপি সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে একটা ধারণা না জাগানো হয়। বাজানো ও শেখানোয় অনেক প্রভেদ। শোনার কান থাকার বিশেষ দরকার।

বর্তমান দিনের শিল্পীদের মধ্যে সাধকশিল্পী আলাউদ্দীন খাঁ, আলি আকবর খাঁ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, বিলায়েৎ খাঁ, গজানন্দ যোশী, বন্দু খাঁ, রাধিকমোহন মৈত্র, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, সুজিৎ নাথ, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজনা ও চিন্ময় লাহিড়ী, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুখেন্দু গোস্বামী মালবিকা রায়, মীরা চট্টোপাধ্যায়ের গান গভীর ভাবে প্রভাবান্বিত করে দক্ষিণামোহনকে।

স্ত্রী—শোভনা ঠাকুরও উল্লেখযোগ্য সেতার-অভিনেত্রী। তিন ছেলে—সুনন্দন, অভিনন্দন, আলোকনন্দন, মেয়ে বাঁশরী।

বিপ্লবী বাপের ছেলে। বিপ্লব আর আগুন দেহে রক্তে রক্তে! বাবা আগুন জ্বালিয়ে গেছেন বিপ্লবের সামগানে, ছেলে আগুন জ্বালালেন—সুরের ইন্ধনে।

টাকা/আনা/পাই

জ্যোতির্ময় রায়

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

অবিনাশের শোবার ঘর। অবিনাশ রাত-কাপড় পরা অবস্থায় অস্থির পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ঘরের মধ্যে, এমন সময় ঘরে এসে ঢোকে সুরমা।

সুরমা। (বিরক্তির সঙ্গে) কি, সেই উঠে থেকে ঘরের মধ্যে এমন ঘুরপাক খাচ্ছ কেন—রাত-কাপড়টাও পাল্টাবে না নাকি?

অবিনাশ। পাল্টাবো বৈ কি—(আর একবার পায়চারী করে আপন মনে) আশ্চর্য! এক মাস হয়ে গেল, মেয়েটার একটা খোঁজ পর্যন্ত কেউ করছে না!

সুরমা। কি করে করবে, কেউ কি তার ঠিকানা জানে?

অবিনাশ। জানতে চেষ্টা তো করতে হবে?

সুরমা। হবে, তা অন্যের জন্যে বসে না থেকে নিজে করো না কেন?

অবিনাশ। করি না—করি না—তবে আমি সকাল-বিকাল কেন ঘুরে মরি—খোঁজ কে করে, তার খোঁজ তুমি রাখ কি? তুমি আবার মা!

সুরমা। হ্যাঁ আমি মা; কিন্তু যে মেয়ে অবাধ্য হয়ে অন্যায় করে তাকে আমি ক্ষমা করি না।

অবিনাশ। ক্ষমা—কিসের ক্ষমা! সারা জীবন সব কাজে সন্তান শুধু আমাদের বাধ্য হয়েই চলবে, এ অন্যায় দাবী তুমি কেন করবে—ভুলে যেও না। শিশুও একদিন একটা গোটা মানুষ হয়েই দাঁড়ায়। মঙ্গলের দোহাই দিয়ে নিজেদের জেদ ফলানোকে মনুষ্যত্ব বলে না—

সুরমা। (ক্রুদ্ধ কণ্ঠে) চুপ করো, বক্তৃতা তোমাকে দিতে হবে না। এই সব পাকা-পাকা কথা শিখিয়েই তুমি মেয়েটার মাথা খেয়েছো। তোমার মতো বাপ না হলে মেয়ের এতখানি সাহস হয়?

অবিনাশ। (বিস্ফারিত চোখে আঙুল তুলে কাঁপতে কাঁপতে) সাবধান! সাবধান সুরমা! অন্যায় কথা তুমি বলবে না—তোমার—তোমার অনেক অপরাধ আমি ক্ষমা করেছি। মেয়েটাকে তুমি প্রতিদিন পীড়ন করেছো। একটা শিক্ষিত ছেলেকে শুধু তার টাকা নেই বলে অভদ্র, কুৎসিত ব্যবহার করে বাড়ী থেকে বার করে দিয়েছো।

সুরমা। (উত্তেজিত কণ্ঠ চড়িয়ে) তুমি অত মেজাজ—

অবিনাশ। (ধমকে ওঠে) চুপ করো। চিরদিন তোমার মেজাজ আমি সয়ে এসেছি—আজ তোমাকে—তোমাকে বোঝাবো, মেজাজ আমারও আছে; রাগ আমিও করতে জানি।

[ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে বেরিয়ে যায় ঘর থেকে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বস্তির ঘর। ঘরের মাঝখানে একখানা গামলায় সাবান-মাখানো জামা-কাপড়। পাশেই একটা বালতিতে জল। সাবান-জলে মেঝেটা ছপ-ছপ করছে। রচনা মহাবিরক্তির সঙ্গে গামলায় জামা-কাপড়গুলো দু'হাত দিয়ে ঠাসছে, পরনের শাড়ীটা আধময়লা, চুল উস্কখুস্ক, ক্লিষ্ট মুখে রুক্ষতার ছাপ। হাতে খান দুই বই নিয়ে ঘরে এসে ঢোকে মৃগাঙ্ক।

মৃগাঙ্ক। (ঘরের অবস্থাটা একবার দেখে নিয়ে ভ্রূ কুঁচকে) এ কি অবস্থা করছো ঘরটার! এটা কি কাপড় কাচার জায়গা?

রচনা। (রুক্ষ স্বরে) তবে কি কলতলায় গিয়ে কাচবো?

মৃগাঙ্ক। কলতলায় না হোক, বারান্দায় তো হতে পারতো।

রচনা। না পারতো না—ওখানে একবস্তি লোকের সামনে বসে কাপড় কাচতে আমি পারবো না। পারবো না তোমাদের ঐ কলতলা থেকে জল টেনে আনতে।

মৃগাঙ্ক। তিনটে টিউশনী সেরে গলদ্‌ঘর্ম হয়ে আমি তাহলে জল টানি?

রচনা। সে তুমি করবে তুমিই জানো।

মৃগাঙ্ক। বাঃ কি উত্তর! দিনকে-দিন মেজাজটা কি হচ্ছে তোমার?

রচনা। হচ্ছেই তো। মান-সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে আর এভাবে থাকতে আমি পারছি না।

মৃগাঙ্ক। পারছি না—পারছি না—পারছি না—না-পারার কি গৌরব! তুমি কিছুই পারো না। আর আমরা সব পারি—দু'বেলা সহরের এ-মাথা, ও-মাথা ঘুরে চারটে টিউশনী করতে পারি—সারা দুপুর রোদ মাথায় করে চাকরীর পিছনে ঘুরতে পারি—বিভারা তোমার আমার রান্না সেরে হকারি করতে বেরুতে পারে; ঘর ছেড়ে দিয়ে দাওয়ায় থাকতে পারে। বাঃ, পারা-না-পারার কি অদ্ভুত বাটোয়ারা!

রচনা। (উঠে দাঁড়িয়ে) কে কি পারে জানবার আমার দরকার নেই—আমি পারবো না—পারবো না—পারবো না।

(কেঁদে ফেলে)

মৃগাঙ্ক। (ক্রুদ্ধ স্বরে) পারতে হবে। মন-মেজাজ শুধু তোমারই নেই, আমারও আছে। অনেক দিন যাবৎ এই কেঁদে কেঁদে তুমি আমাকে পাগল করে তুলেছো—(দু কাঁধ ধরে ঝটকা, নিজের দিকে ফিরিয়ে ধমকের সুরে) শোনো—

(হঠাৎ রচনার চোখে-মুখে আতঙ্কের ভাব লক্ষ্য করে)

এ কি! এ কি তুমি ভয় পাচ্ছ রচনা? না—না (হাত নামিয়ে নিয়ে দ্বিধার সঙ্গে) তুমি কি ভেবেছো, আমি তোমার গায়ে—(হাতের ভঙ্গীতে) না—না (একটু থেমে দীর্ঘশ্বাস

ছেড়ে) আজ কোথায় আমরা নেমে এসেছি। তুমি আমায় ভয় পাও—আমি তোমাকে এড়িয়ে চলি। খুঁটিনাটি যে-কোনো কথায় উত্তেজিত হয়ে উঠি দু'জনে। দু'বেলা পেটের আগুনে পুড়ে ছাই হচ্ছে জীবনের সব আনন্দ। মানুষের সমাজ—কি তার অপূর্ব ব্যবস্থা—Fools! চোর, ডাকাত, রোগ জন্তু এদের হাত থেকে সবাইকে বাঁচানোর জন্যে সমাজের কত কৌশল। কিন্তু সকলের খেয়ে-পরে বাঁচার কৌশলটা আজও আয়ত্তে আনতে পারলো না। (আবার একটু থেমে এগিয়ে যায় রচনার কাছে) তবু—তবু আমাদের বাঁচতে হবে রচনা! (রচনার মুখ তুলে ধরে) রচনা করতে হবে একটি সুন্দর জীবন।

তৃতীয় দৃশ্য

[সময় রাত্রি। বস্তির উঠোনে বিশুর ঘরে দাওয়ার সামনে বস্তির মালিক এবং তার নায়েবকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে বস্তির বাসিন্দারা।]

বস্তির মালিক। (চারি দিক দেখে নিয়ে) কি নোংরা করে রেখেছো জায়গাটা? মানুষ থাকে বলে মনে হয় না।

ভোলা। মানুষ তো এখানে থাকে না—আমরা থাকি।

মালিক। তোমাদেরও মানুষের মতো থাকতে হবে—শোনো, সহরে আমার যে-কটা বস্তি আছে, দেখবার জন্যে আমি স্বাস্থ্য-মন্ত্রীকে নিমন্ত্রণ করেছি—চার দিনের মধ্যে সব সাফ করে একেবারে তকতকে করে রাখতে হবে।

ভোলা। যাক, তবু হুজুর আপনি আমাদের মানুষ মনে করলেন—একটা ড্রেন করে দেবার জন্য বাড়ীশুদ্ধ লোক আপনার বাড়ীতে ধন্না দিয়ে পড়ে থেকেছে—দেখাই পায়নি।

মালিক। বাজে কথা বলো না, যা বলছি শোনো। কাল আমার মিস্ত্রী আসবে ঘর-দোর সব মেরামত করতে। বস্তির প্রত্যেকটি ঘর দুপুরে তিন-চার ঘণ্টার জন্যে খালি করে দিতে হবে।

(বস্তির সমস্ত লোকের মধ্যে প্রতিবাদসূচক একটি গুঞ্জন শুরু হয়।)

বিশু। তা কি হবে, আমরা পুরুষরা তখন বাইরে থাকি—মেয়েরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর ছেড়ে দুপুরের রোদে গিয়ে থাকবে কোথায়?

মালিক। তর্কো করো না, কাল আমার সরকারের সঙ্গেও তুমি নাকি লম্বা লম্বা কথা বলেছো—রাত্তে সবাইকে পাওয়া যাবে বলেই আমি নিজে এসেছি হুকুম দিতে। রোজ—কেন একটা দুপুর গাছতলায় কাটানো যায় না? পরে তো তোমাদেরই ভালো হবে।

বিশু। না, ঘর আমরা ছাড়বো না। ঘরে লোক রেখে মেরামত করতে পারেন তো করবেন।

মালিক। তোমার তো বড় আস্পর্দ্ধা ছোকরা! সবাই চুপ করে আছে, তুমি অতো লম্বা-চওড়া কথা বলছো কেন?

বিশু। (হাতের তালুতে কিল দিয়ে) সবাই বলতে পারে না বলেই আমাকে বলতে হচ্ছে।

[এমন সময় মৃগাঙ্ক বাড়ী ঢোকার মুখে ভিড় দেখে বিশুর কাছে এসে দাঁড়ায়।]

মৃগাঙ্ক। কি বিশু, ব্যাপার কি?

বিশু। এই ভাখো না দাদা, বলে কি না দুপুরে ঘর ছেড়ে সব গিয়ে গাছতলায় থাকো, বস্তি মেরামত হবে—কত বড় অন্যায় কথা!

মৃগাঙ্ক। (সপ্রশ্ন ভাবে বিশুকে) ইনি—?

বিশু। জমিদার—বস্তির মালিক।

মৃগাঙ্ক। (মোটামুটি সবাইকে লক্ষ্য করে) তা ইনি যেই হোন, এ তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়!

মালিক। (তীব্র দৃষ্টিতে দেখে নিয়ে একটু দ্বিধার সঙ্গে) তুমি—তুমি এখানে থাকো?

মৃগাঙ্ক। ভদ্র ভাবে কথা বলুন।

মালিক। আরে, বলে কি? (সু-উচ্চ পরিহাসের হাসি)

[এমন সময় বিশুর ঘরের জানালায় এসে দাঁড়ায় রচনা। তখন নায়েব মালিকের কানে কানে কি যেন বলছে।]

মালিক। ও, এই সেই! তুমিই একটি ভালো ঘরের মেয়েকে ভাগিয়ে এখানে লুকিয়ে আছো?

(রচনার জানালা বন্ধ হয়ে যায়)

বিশু। (উত্তেজিত, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অবস্থাতে এগিয়ে আসে) সাবধান, এ সব অন্যায় কথা এখানে দাঁড়িয়ে বলবেন না—বলতে আমি দোবো না।

(সঙ্গে সঙ্গে ভোলাও হাত গুটিয়ে এগিয়ে আসে—সঙ্গে আরও অনেকে।)

ভোলা। নেহি দেঙ্গা—

মালিক। (সজোরে ধমকে ওঠে) চুপ করো তোমরা।

বিশু। না করবো না—কে আপনার তোয়াক্কা রাখে?

মালিক। (কণ্ঠস্বর নামিয়ে চাপা ক্রোধের সঙ্গে) তোয়াক্কা রাখো কি না বোঝাবো কাল। (নায়েবের দিকে ঘুরে) শোনো, ম্যানেজারকে আজ রাতেই জানিয়ে দেবে, কাল সকালে দারোয়ান নিয়ে এসে যেন এই ছোকরার ঘরের সবাইকে বস্তি থেকে বার করে দেয়। আমার হুকুম।

[বলে গটগট করে বেরিয়ে যায়। পেছনে নায়েব।

ভোলা। ওঃ তুলনেওয়ালা! গজকাঠি দিয়ে ক্ষমতার দৌড়টা তোমার মেপে ছেড়ে দেবো—পাঠিও তোমার দারোয়ান।

জনৈক যুবক। কুছ পরোয়া নেই বিশুদা, আমরা আছি না?

[বাইরে সমবেত বস্তীবাসীর গোলমাল চলতে থাকে।

বিশু। আচ্ছা ভাই, তোমরা এখন যে যার ঘরে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে একটু সমঝে দেখি কি করা যায়। দরকার হলে সবাইকে দাঁড়াতে হবে বই কি।

সমবেত বস্তিবাসী। নিশ্চয়—আলবৎ—

বিশু। আচ্ছা, যাও ভাই সব।

[এপাশ ওপাশ দিয়ে বস্তিবাসীরা চলে যায়। থাকে বিশু, ভোলা আর মৃগাঙ্ক। মৃগাঙ্ক ঘরে না ঢুকে দাওয়ায় মোড়াটায় বসে পড়ে—অপমানে, দুশ্চিন্তায় মাথার চুলগুলো মুঠো করে চেপে ধরে সে। সে জানে রচনা সবই শুনেছে। বিশু আর ভোলার দুশ্চিন্তা-মেশানো উত্তেজনা, তারাও দাওয়ায় এসে বসে। তিন জনেই চুপচাপ। এমন সময় দরজা খুলে দাঁড়ায় রচনা]

মৃগাঙ্ক। (রচনার দিকে চোখ না তুলে) তোমার শেষ মর্য্যাদাটুকুও বুঝি রাখতে আমি পারলাম না রচনা—কাল সকালে—এর চেয়ে তুমি বরং তোমার বাবার ওখানেই ফিরে যাও। এ ছাড়া আর তো কিছু ভাবতেও পারছি না?

বিশু। (উঠে দাঁড়িয়ে) বৌদি নিজে যেতে চান তো বলবার কিছু নেই—কিন্তু ও-বেটার শাসানীর জন্যে যদি হয়, তবে আমি বলবো বৌদি, আপনি কিছু ভাববেন না—আজও বিশু ঘোষের এক হাঁকে সমস্ত বস্তির লোক রুখে দাঁড়াবে।

মৃগাঙ্ক। (সস্নেহ স্বরে) কিন্তু বিশু, সেও যে আর এক কেলেঙ্কারী।

বিশু। (একটু ভেবে নিয়ে) তা বটে! কিন্তু এমন মাথা উঁচু করে তোমার জন্যে যে মানুষটা বাড়ী থেকে বেরিয়ে এল—তাকে তুমি ফিরে যেতে বলো না দাদা—আমরা আছি, তুমি আছ, একটা উপায় আমরা বার করতে পারবো না?

রচনা। (চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে) হ্যাঁ বিশু, যে করেই হোক উপায় একটা বার করো তোমরা। আমি ফিরে যেতে পারবো না—ফিরে যাবো না। [আঁচলে মুখ চেপে কেঁদে ফেলে]

বিশু। (বিব্রত হয়ে) ঠিক আছে বৌদি, কাঁদবেন না আপনি—আপনাকে কথা দিচ্ছি আমি, কাল কোনো কিছু হবার আগে এর একটা ব্যবস্থা আমি করবোই। যাও দাদা, ওঠো তো, ঘরে যাও।

মৃগাঙ্ক। (উঠে দাঁড়িয়ে) কিন্তু রাতারাতি তুই যা যে কি করবি।

বিশু। আঃ এই তোমার দোষ। বলছি নিশ্চিন্ত বসে থাক গে—যান বৌদি ভেতরে যান।

[মৃগাঙ্ক ঘরে ঢোকে, রচনা ধীরে দরজাটা ভেজিয়ে দেয়। বিশু ফিরে এসে বসে ভোলার পাশে।]

ভোলা। (একটু সময় চুপ করে থেকে বিশুর খুশীর ভাবটা দেখে নিয়ে) এখন কি করবি বিশু?

[বিশু হাতের ইঙ্গিতে ভোলাকে থামিয়ে ঘর থেকে খানিকটা দূরে সামনের দিকে এসে দাঁড়ায়। ভোলাও সঙ্গে আসে।]

ভোলা। অত ভাবছিস কেন, এক হাত দাঙ্গাই হয়ে যাক না, পরোয়া কিসের?

বিশু। যাঃ, কি বাজে বকছিস! দাঙ্গা-ফাঙ্গা চলবে না—বৌদি এখানে রয়েছে না?

ভোলা। তবে?

বিশু। তাইতো ভাবছি, দেখি মান-ইজ্জত বাঁচিয়ে কি করা যায়। আঃ কাল একটা সকালের জন্য বৌদিকে অন্য কোথাও রেখে আসার মত যদি একটা জায়গা পেতাম, দেখে নিতাম দারোয়ান দিয়ে বিশু ঘোষকে ওরা কি করে তোলে! (হঠাৎ মঞ্চের এক পাশে লক্ষ্য পড়তেই অনতিদূরে কি যেন দেখে, বিশুর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, মুখ হয় থমথমে।)

দু'জন ভদ্রলোক এগিয়ে আসে। [ক্রমশঃ।

মাসিক বসুমতীর বর্ত্তমান মূল্য

ভারতের বাহিরে (ভারতীয় মুদ্রায়)

বার্ষিক রেজিঃ ডাকে	২৪৲
ষাণ্মাসিক " "	১২৲
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিঃ ডাকে (ভারতীয় মুদ্রায়)	২৲

চাঁদার মূল্য অগ্রিম দেয়। যে কোন মাস হইতে গ্রাহক হওয়া যায়। পুরাতন গ্রাহক, গ্রাহিকাগণ মণিঅর্ডার কুপনে বা পত্রে অবশ্যই গ্রাহক-সংখ্যা উল্লেখ করবেন।

ভারতবর্ষে

ভারতীয় মুদ্রামানে) বার্ষিক সডাক	১৫৲
" ষাণ্মাসিক সডাক	৭॥০
প্রতি সংখ্যা	১।০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা রেজিষ্ট্রী ডাকে	১৸০

(পাকিস্তানে)

বার্ষিক সডাক রেজিষ্ট্রী খরচ সহ	২১৲
ষাণ্মাসিক " " "	১০॥০
বিচ্ছিন্ন প্রতি সংখ্যা " "	১৸০


"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
কোথা সে ছায়া সখি, কোথা সে জল।
কোথা সে বাঁধা ঘাট অশথতল।"

সাহিত্য পরিচয়

বাংলা শিশুসাহিত্যের দুর্গতি

এক দল বুড়োখোকা ও বুড়ীখুকীর পাল্লায় পড়ে বাংলা শিশুসাহিত্যের দিনে দিনে যে কি চরম হাল হচ্ছে, তা শিশুরা এবং তাঁদের বাপ-মা'য়েরা হাড়ে-হাড়ে বুঝতে পারছেন। কর্মক্ষেত্রে যাঁর কোন কাজ করবার নেই, তিনি যেমন শেষ পর্যন্ত ইনসিওরেন্সের এজেন্ট হয়ে পোর্টফোলিও হাতে করে, মস্তবড় কর্মী পুরুষের ভাব দেখিয়ে ঘুরে বেড়ান, সম্প্রতি বাংলা দেশেও তেমনি এক দল ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা, যাঁদের লেখাপড়া চাকরিবাকরি, এমন কি বিনা মূলধনে ফোকটে গল্প কবিতা লিখে 'সাহিত্যের ব্যবসা' পর্যন্ত কিছুই করা হল না, তাঁরা অবশেষে 'ডেস্পারেট' হয়ে শিশুসাহিত্যিক হবার সিদ্ধান্ত করেছেন। তাঁদের ধারণা, সহজ কথা ন্যাকামি করে, ঘরিয়ে পেঁচিয়ে, অশিক্ষিত গ্রাম্য ধাইমাদের মতো ইনিয়ে-বিনিয়ে না বলতে পারলে শিশুরা শোনে না বা পড়ে না। তাই 'সূর্যিমামার বিয়ে' নাম দিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা, 'শোন বলি, বাবার বাবা, তার বাবাদের কথা' নাম দিয়ে জীবজগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাস, 'মানুকে যাচ্ছে মস্কোয়' নাম দিয়ে দেশবিদেশের কাহিনী ইত্যাদি অনর্গল লেখা হচ্ছে, এবং তাই বাধ্য হয়ে পড়ে বাংলা দেশের শিশুদের কোন মানসিক বয়সবৃদ্ধি হচ্ছে না। ন্যাকানেকীর সংখ্যা এবং বয়স্ক খোকাখুকীর সংখ্যা সমাজে যে কি হারে বাড়ছে, তা সকলেই জানেন। একেই তো বাঙালী জাতির পৌরুষ সম্বন্ধে অনেক কিছু ভাববার আছে, তার উপর জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদের যদি এই ভাবে ক্লীবে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর হন শিশুসাহিত্যিকরা, তাহলে আরও দশ পনের বছর পরে বাঙালীর যা অবস্থা হবে তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। বাংলার ভবিষ্যৎ বংশধরদের মুখের দিকে চেয়ে শিশুসাহিত্যিকরা অবিলম্বে কলম সংযত করুন! অনেক বিষয় নিয়ে লেখবার আছে। আজ-কাল লেখক হওয়াও খুব কঠিন নয়। তাঁরা শিশুসাহিত্য ছেড়ে ধেড়েসাহিত্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁদের কল্যাণ হবে তাতে, শিশুরা বাঁচবে এবং শিশুদের বাপমায়েরা স্বস্তি পাবেন।

রেডিও ও সংবাদপত্রের শিশুসাহিত্য

কিন্তু স্বস্তি পাবার উপায় নেই। বাড়িতে রেডিও খুললে বুড়োখোকাখুকীরা শিশুদের যেভাবে তালিম দিতে থাকেন, তাঁতে মনে হয় না যে বাঙালী শিশুদের মুক্তি পাবার সম্ভাবনা আছে। আশ্চর্য হল, রেডিওতে বা সংবাদপত্রে যাঁরা 'শিশুমহল' বা 'বিভাগ' পরিচালনা করেন তাঁরা কোন দিন এক মুহূর্তের জন্যও ভেবে দেখেন না যে, 'শিশু' বলতে কাদের জন্য তাঁরা এত কাণ্ড করছেন। যারা হামাগুড়ি দিচ্ছে, মাতৃস্তন্য পান করছে, তাদের জন্য কি? তা কখনই নয়, রীতিমত কিশোর-কিশোরীদের জন্য। এ যুগের [illegible] মানসিক বিকাশের স্তর বা শিক্ষাদীক্ষা সম্বন্ধে তাঁদের কোন ধারণা নেই; তা যদি থাকত, তাহ'লে রেডিও ও সংবাদপত্রের 'বুড়ো'রা এত ন্যাকামির লহরা তুলতেন না। কি সব নামের বাহার! লজ্জা-সরমের বালাই নেই। কেউ 'প্রজাপতি', কেউ 'বোলতা', কেউ 'কাব্যদাদু', কেউ 'স্বপনবুড়ী'। তার উপর, বলবার আগে বা লেখবার আগে, কত রকমের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ঢলাঢলি ও ন্যাকামির মহড়া। পনের মিনিটের গল্প, তার প্রথম পাঁচ মিনিট ন্যাকামির মহড়া চলল, মধ্যের পাঁচ মিনিট গল্পের সঙ্গে ন্যাকামির বেলা চলল, শেষের পাঁচ মিনিট কথার ঢঙ ও ঢলাঢলিতে শেষ হল। কিন্তু, এত 'দাদু' 'দিদি' ও 'বোলতা' 'স্বপনবুদ্ধার' আমদানি কেন? গল্প কি কেবল দাদুরাই বলেন? এ যুগের দাদু-দিদিরা সাধারণত কোন সাধুবাবার সঙ্গে ভিড়ে যান, নাতি-নাতনি নিয়ে তাঁদের গল্প বলার অবসর বা মেজাজ, কোনটাই নেই। বাবারা ও মায়েরাই গল্প বলেন। সুতরাং ঐ রকম নামকরণই যদি করতে হয়, তাহলে "গল্পবাবা" বা "গল্প-গর্ভধারিণীর আসর" করা উচিত। রেডিও ও সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ স্থির মস্তিষ্কে কথাটা ভেবে দেখবেন। তার সঙ্গে একথাও চিন্তা করবেন যে, অশিক্ষিত বাক্‌পটুতা ও ন্যাকামিটাই 'শিশুসাহিত্য' কি না। এই জাতীয় লজ্জাকর-জনক ন্যাকামি সুস্থ মানুষের কুলকুণ্ডলিনীকে যে কি ভাবে মোচড় দিয়ে মারমুখী করে তোলে, তাও তাঁদের ভেবে দেখা উচিত।

সাহিত্যজীবনের শিক্ষানবীশী

অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতন, সাহিত্যক্ষেত্রেও শিক্ষানবীশীর প্রয়োজন আছে। তার একটা প্রস্তুতির পর্ব আছে। এ কথা আজকাল অনেকেই ভুলে যান, এবং মনের আনন্দে দিস্তে দিস্তে কাগজে গল্প, কবিতা লিখে, সম্পাদকের দপ্তরে হানা দেন। তার পর ধৈর্য হারিয়ে দিয়ে দিনের পর দিন এসে, সম্পাদককে ছাপার প্রশ্ন নিয়ে বিব্রত করে তোলেন। লেখার কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা বললে, তাঁরা অনেকেই ক্ষুণ্ণ হন। দু'-চারজন ত্রুটি সংশোধন করে দিতে এবং কি করলে লেখা প্রকাশযোগ্য হয় তা বলে দিতে পীড়াপীড়ি করেন। এই সব নতুন লেখকদের আমরা নিরুৎসাহ হতে বলছি না। তাঁদের সাহিত্যানুরাগের প্রতি আমাদের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা দুই-ই আছে। তবু তাঁরা ভেবে দেখবেন, আজ-কাল যে কোন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য-পত্রিকার সম্পাদকের কর্তব্য ও দায়িত্ব কত বেশি। লোকসংখ্যার মতন লেখকসংখ্যাও অনেক গুণ বেড়েছে আগের তুলনায়। তার উপর এমন অনেকে আছেন, যাঁরা সম্প্রতি সাহিত্যচর্চাকে বেকার সমস্যার সহজ ও অনায়াস সমাধান বলে মনে করেন। তাঁদের সকলকে 'সাহিত্য' বোঝানো, বা 'লেখা শেখানো' কোন সম্পাদকের পক্ষেই সম্ভব নয়। এই অবস্থায় নতুন লেখকরা সম্পাদকের উপর কৃপাদৃষ্টি যদি না রাখেন,

তাহলে সম্পাদককে নিরুপায় হয়ে অনেক সময় 'অপ্রীতিকর' ব্যবহার করতেই হয়। আমরা তাই নতুন লেখকদের সবিনয়ে অনুরোধ করছি, তাঁরা আগে লেখা নিজেরা চর্চা করুন। লেখারও একটা কারিগরির দিক আছে, বিদ্যা হিসেবে সেটা আয়ত্ত করতে হয়। লেখকদের যখন কোন স্কুল বা কলেজ নেই, তখন তা আয়ত্ত করার একমাত্র উপায় হল, প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত অভিজ্ঞ সাহিত্যিকদের রচনা মন দিয়ে পাঠ করা, রচনাকৌশল অনুশীলন করা, নিজেরা লেখা এবং সেই লেখা নিজেদের বন্ধুমহলে পড়ে আলোচনা করা। যা খুশি লিখে নিয়ে এসে, সম্পাদকদের ছাপবার জন্য বিব্রত না করে, যদি কিছু দিন ধৈর্য ধরে এই কাজটুকু তাঁরা করেন, তাহলে তাঁরা নিজেরা তো উপকৃত হবেনই, সম্পাদকরাও উপকৃত হবেন। কারণ, নতুন শক্তিমান লেখক পাওয়া সম্পাদকদের সৌভাগ্যের কথা। নতুন ভাল লেখা ছাপতে পারলে সম্পাদকরা যে রকম খুশী হন, লেখকরাও তা হন কিনা সন্দেহ! আশা করি, নতুন লেখকরা আমাদের এই নিবেদন বিবেচনা করে দেখবেন।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

সুজাতা

গল্প-লেখক সুবোধ ঘোষের নাম বাঙলা-সাহিত্যের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে অবিদিত নয়। বিগত কয়েক বছরের মধ্যে তিনি এই সুনাম অর্জন করেছেন বেশ কয়েকটি উচ্চ জাতের গল্প ও উপন্যাস রচনায়। আলোচ্য গ্রন্থ লেখকের অন্যতম একটি উপন্যাস—যাতে প্রেমরস এবং বাৎসল্যরস পাশাপাশি ফুটিয়েছেন লেখক, তাঁর স্বভাবসুলভ উন্নত ধরণের ভাষা-মাধুরী মিশিয়ে। নিজের মেয়ে আর পালিতা কন্যাকে লালন-পালনের মধ্যে যে কত হৃদয়াবেগ থাকতে পারে, সুজাতা তারই নিশানা বলা যায়। বইটির গল্পাংশ, লিপি-কুশলতা ও ভাষা-সম্পদ লেখকের ব্যক্তিগত, যেমনটি বর্তমানে আর কোন বাঙালী-সাহিত্যিকের লেখায় খুঁজে পাওয়া যায় না। সুজাতা সমাদৃত হবে নিশ্চয়ই। ক্যালকাটা পাবলিশার্স। ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিঃ-১২। মূল্য আড়াই টাকা। প্রচ্ছদ-পট প্রথম শ্রেণীর।

উদাত্ত ভারত

কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের লেখায় ফাঁক বা ফাঁকি নেই। এই বিপ্লবী কবির লেখা ছন্দ, অলঙ্কার আর ভাবের জারক রসে টইটম্বুর। আধুনিক বাঙলা কাব্য-সাহিত্যে শব্দ-চটুলতা আর কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব-ভঙ্গী প্রকাশের একটি রেওয়াজ চলেছে। এই প্রচেষ্টায় কবির কাব্যলেখায় সত্যের আর সুন্দরের যেন অভাব লক্ষ্য করা যায়। জীবন আর জীবন-দর্শন সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রকাশ পায়। আশার কথা এই, বহু হুঁসিয়ার কবি ইতিমধ্যে এই পলায়নীবৃত্তি পরিহারে আবার সজাগ হয়েছেন এবং হচ্ছেন। উদাত্ত ভারতের প্রথমেই কবি বলছেন, "শুধু চিরন্তনী দুর্বলতার বশে এ-যাবৎকাল ব্যক্তি ও সমাজ-জীবনের কল্যাণ ও অকল্যাণ, ইতিহাস, প্রকৃতি ও প্রেম সম্বন্ধে যা কিছু ভেবেছি, স্বপ্ন দেখেছি এবং সাধ্যমত ভেবেছি প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি, সেগুলির মধ্যে বাছা বাছা কিছু লেখা দেশবাসীর কাছে পৌঁছে না দিয়ে পারলুম না।" মোদ্দা কথা, এই কাব্যগ্রন্থে কবির নিজের বাছাইকরা বহু উল্লেখযোগ্য কবিতা আছে—যেগুলি কবির স্বধর্মের স্বাক্ষর বহন করে। কবি বিমলচন্দ্রের কাব্যে কত যে ব্যাপকতা, জ্ঞানগরিমা, দেশাত্মপ্রীতি, প্রেমিকতা আর সূক্ষ্ম-অনুভূতি সদ্য প্রকাশিত 'উদাত্ত ভারত'এ তার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'কাব্যলোক', ১, যদু ভট্টাচার্য্য লেন, কলিকাতা-১। মূল্য ছয় টাকা।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক ; সাহিত্যে ছোট গল্প

কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সাহিত্য-পাঠককে দু'খানি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন, 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' এবং 'সাহিত্যে ছোটগল্প'—যাদের আমরা বর্তমান বাঙলা সাহিত্যের দলিলের পর্যায়ে এগতে পারি অক্লেশে, যদিও আলোচনা বিস্তারিত নয়। বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে সত্যিকার ভাল লেখক অনেক আছেন, কবিও আছেন অনেক, নিছক গল্পলেখকও কম নেই, কিন্তু নেই এমন সমালোচক যিনি দল বা স্বার্থকে ত্যাগ ক'রে স্বাধীন মতামত জাহির করতে পারেন। সুসাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অধ্যাপনাবৃত্তি আর সাহিত্যিক বৃত্তির অনুশীলনে সমান কৃতকার্য। শুদ্ধ আলোচনার খাতিরে বাঙলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রচুর মূল্যবান এবং জ্ঞাতব্য কথা বলেছেন তাঁর অপূর্ব লিপি-কুশলতায়। প্রথমোক্ত গ্রন্থে বিভূতিভূষণ, মোহিতলাল, নজরুল, যতীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো, এবং পরশুরামের সম্পর্কে অনেক খাঁটি কথা ব'লেছেন। কালীপ্রসন্নর, হুতোম, ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথ, বাঙলা গদ্য এবং আধুনিক সাহিত্য সমালোচক এই গ্রন্থের অঙ্গ অঙ্গ। দ্বিতীয় গ্রন্থে ছোট গল্পের পটভূমিকায় ছোট গল্প এবং গল্প-লেখকদের লেখার বিশ্লেষণ উল্লেখযোগ্য। বাঙলা ছোট গল্পের মান অনেক নীচে নেমেছে বর্তমানে, সুতরাং লেখকের আলোচনা সময়োপযোগী হয়েছে। সাহিত্যের পাঠক ছাড়া সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীরা দু'খানি বইকে 'প্রামাণ্য' গণ্য করতে পারেন। শিল্পী হৈমন্তী সেনের আঁকা প্রচ্ছদ লিপি প্রশংসনীয়। ডি, এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মূল্য যথাক্রমে দুই টাকা ও আড়াই টাকা।

কাল-পরিক্রমা

স্মৃতিকথা কিন্তু সাধারণ স্মৃতিকথা নয়। বিচিত্র আমাদের পৃথিবী আর বিচিত্র এর সব নর-নারী। প্রতিদিনের জীবন-সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত মানুষের জীবন। কিন্তু তার মধ্যে কি নেই রসের নির্ঝর? লেখক তারই সন্ধান করে এগিয়ে গেছেন বহু দূর। সমগ্র বইটি এক সরস ভঙ্গিতে যেন টলমল করছে। লেখক এক সময় সাংবাদিক ছিলেন। বহুভঙ্গিম জীবনকে বিচিত্র পরিবেশে দেখার সুযোগ হয়েছিল তাঁর। সাহিত্য, রাজনীতি এবং সাংবাদিক জগতের বহু খ্যাতিমান পুরুষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন তিনি। কাল-পরিক্রমায় সেই সব খ্যাতিমান ব্যক্তিদের বহু বিচিত্র কাহিনী স্থান পেয়েছে। গ্রন্থটির মধ্যে পূর্বে অপ্রকাশিত অনেক তথ্য সন্নিবেশিত হওয়ায় এটি সম্প্রতি প্রকাশিত বাঙলা বইয়ের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হিসাবে পরিগণিত হবে সন্দেহ নেই। লেখক যে শক্তিশালী কলমের অধিকারী, গ্রন্থটি পাঠ করার পর সে বিষয় দ্বিমত হবার অবকাশ থাকে না। প্রচ্ছদ সুন্দর। ছাপা ও বাঁধাই প্রশংসনীয়। কাল-পরিক্রমা। লেখক ব্রজমোহন চৌধুরী।

প্রকাশক ন্যাশনাল পাবলিশার্স। বিক্রয়-কেন্দ্র পুঁথিঘর, ২২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাম—চার টাকা।

বাংলার পত্রসাহিত্য

পত্রসাহিত্য যে সাহিত্যের দরবারে সত্যিকার কায়েমী আসন করতে পারে, মাসিক বসুমতী গত কয়েক বছরে তাই প্রমাণ করেছে অসংখ্য বিখ্যাত চিঠি 'পত্রগুচ্ছ' ছাপিয়ে। বাঙলা গদ্য ভাষার আদিকালে, যখন 'সাহিত্য' শব্দ বাঙলায় চালু হয়নি, তখন আমাদের চিঠি এবং দলিল-দস্তাবেজেই প্রথম বাঙলা গদ্য ভাষার নমুনা খুঁজে পেয়েছেন ভাষার গবেষকরা। যাই হোক, বাঙলা বইয়ের বাজারে রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র ব্যতীত পুস্তকাকারে আর তেমন কারও পত্র-সঙ্কলন প্রকাশিত হয় নি। ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন সঙ্কলিত পুরানো বাঙলা চিঠিপত্রের গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায় কি না আমাদের জানা নেই। চিঠিপত্র বা পত্র-সাহিত্যের মূল্য আছে অনেক কারণে। আলোচ্য সঙ্কলনটিতে বাঙলার পত্রসাহিত্যের এক ধারা রক্ষা করা হয়েছে। বহু বিখ্যাত ব্যক্তির চিঠির ক্রমপ্রকাশে। সঙ্কলনে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত কয়েকটি চিঠি উদ্ধৃত হয়েছে। সম্পাদক সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদচিত্র উল্লেখযোগ্য। ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ৮৯, হ্যারিসন রোড। কলিকাতা—৭। দাম চার টাকা।

মেঘলা প্রহর

উপন্যাসটি লেখিকার কবিজনোচিত ভাষার জন্য বেশ সুখপাঠ্য হয়েছে। একটি অতি সহজ সাধারণ গল্প পাঠককে রুদ্ধশ্বাস করবে শুধু লেখার গুণে। কাহিনী অভিনব না হলেও, উপন্যাসের সুষ্ঠু অগ্রগতিতে পড়তে বেশ ভালই লাগে। নীলা ও অমিতার চরিত্র সুন্দর আঁকা হয়েছে। লেখিকা আশা দেবীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। ডি, এম, লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২। দাম আড়াই টাকা।

প্রাণবহ্নি

সম্প্রতি প্রকাশিত গল্পসাহিত্যে প্রাণবহ্নি নিঃসন্দেহে একটা উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সুনীল ঘোষ তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে সম্প্রতি কালে নাম করেছেন কয়েকখানি উপন্যাস রচনা করে। প্রাণবহ্নি তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পগ্রন্থ। বিভিন্ন রসের কয়েকটি জমাট গল্প স্থান পেয়েছে প্রাণবহ্নিতে। প্রতিটি গল্পের রস স্বতন্ত্র কিন্তু তার মধ্যে একটা মিলনসূত্রও খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাণবহ্নি পাঠক-সমাজে সমাদৃত হবে বলেই আশা করা যায়। শ্রীঅন্নদা মুন্সীর আঁকা ত্রিবর্ণ প্রচ্ছদ বইটির মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেছে। প্রকাশক বাণীপীঠ গ্রন্থালয় —৩১।১ রামতনু বোস লেন; কলিকাতা ৭ দাম—আড়াই টাকা।

নীলকণ্ঠের দু'টি নূতন বই

'চিত্র ও বিচিত্র' মাধ্যমে মাসিক বসুমতীর পাতায় নীলকণ্ঠের প্রথম আকস্মিক আবির্ভাব। মাসিকের পাতায় প্রকাশ কালীনই তা যে প্রশ্নের জন্ম দেয় তা'হলো: 'নীলকণ্ঠ কে'? নীলকণ্ঠ যিনিই হ'ন প্রথম বইতেই তিনি প্রমাণ করেন যে, তিনি কখনো উপন্যাস, কিছু মামুলী ছোট গল্প লিখে, এর আবর্জনা বাড়াতে আসেন নি। এতই অভাবিত তাঁর আগমন এবং এমন অদ্ভুত তাঁর আঙ্গিক যে, তাঁর লেখাকে না বলা যায় প্রচলিত উপন্যাস, না অধুনা-চলতি রম্যরচনা। বলা যায় না তার কারণই হচ্ছে নীলকণ্ঠের বক্তব্য ও ঢং সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর নিজস্ব এবং এর আগে এমন কণ্ঠস্বর বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ অশ্রুত ছিলো। 'চিত্র ও বিচিত্র' বই হয়ে বেরুবার পর 'তারা তিনজন'-ই নীলকণ্ঠের দ্বিতীয় গ্রন্থ; বাংলা সাহিত্যের একমাত্র উপজীব্য ন্যক্কারজনক তথাকথিত 'প্রেম' বর্জন করেও যে উপন্যাসের উপাদান খুঁজে পাওয়া যায় নীলকণ্ঠ তারই চিরকালের মতো সাক্ষ্য রেখে গেলেন ভিখারীদের নিয়ে এই বিচিত্র রচনা 'তারা তিনজন'-এ; বইটির দাম দু'টাকা; প্রকাশক এশিয়া পাবলিশিং কোং। নীলকণ্ঠের তৃতীয় বই, 'বসন্ত কেবিন' তাঁর সব চেয়ে প্রতিনিধিমূলক রচনার সংকলন। এই জায়গায় বাংলা সাহিত্যে তিনি একক ও প্রতিদ্বন্দ্বিহীন। যে রচনা হাসানোর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদায়; কাঁদবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবায় সে রচনা-শৈলীতে নীলকণ্ঠের না আছে পূর্বসূরী, না আছে উত্তর পুরুষ। বইটির দাম দু'টাকা, প্রকাশক ষ্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। জীবনের সকল ক্ষেত্রে যেমন সাহিত্যেও তেমনি, অনেকে অনর্থক হাঁক-ডাকে প্রথম থেকেই বাজী মেরে দিতে চায় অত্যন্ত জোলো, সস্তা আর বাজে চটকে; তারপর ধরা পড়ে যায়; শেষ প্রহরে তাদের আর খুঁজে পাওয়া যায় না; এই সব লেখকের ব্যতিক্রমও আছে; নীলকণ্ঠ এমনই একজন উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

সঙ্গীত ও কাহিনী

সঙ্গীতের মূল আদর্শ প্রচার করা হয়েছে এই গ্রন্থটির মাধ্যমে ঔপন্যাসিক পট-ভূমিকায় কয়েকটি চরিত্র কেন্দ্র করে। সঙ্গীতের যে মহৎ আদর্শ আজ লুপ্তপ্রায়, তাকেই নতুন করে বাঁচিয়ে তোলবার প্রচেষ্টা করেছেন লেখক এই গ্রন্থে। লেখক বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশের সন্তান, অতএব সঙ্গীতের ঝঙ্কার এঁর রক্তে। তা'ছাড়া নিজেও একজন যশস্বী সঙ্গীত-শিল্পী। সুতরাং সঙ্গীত-বিষয়ক অনেক তথ্য এই গ্রন্থে পরিবেশিত হয়েছে যা পাঠক সাধারণকে নির্মল আনন্দই পরিবেশন করবে। তবে সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় যে, লেখক সম্পূর্ণ দোষমুক্ত নন। সঙ্গীত সম্বন্ধে অনুসন্ধানেচ্ছুরা নানা তথ্য পেয়ে এ গ্রন্থ থেকে উৎকৃত হবেন সত্য, তবে সাহিত্য-সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা দেখা গেছে এই বইটিতে সেই প্রচেষ্টা সার্থকতা লাভ করতে পারে নি। লেখকের আদর্শ ফলবতী হোক—এই কামনাই করি। লেখক শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

যখন নায়ক ছিলাম

ধীরাজ ভট্টাচার্যের অভিনয়-খ্যাতি সর্বজনবিদিত, কিন্তু তিনি যে একজন সুলেখক, এ কথাও অস্বীকার করবার উপায় নেই। সম্প্রতি প্রকাশিত তার নিজের নায়ক-জীবনের স্মৃতি-কথা 'যখন নায়ক ছিলাম' গ্রন্থটিই সে কথা প্রমাণ করছে। চলচ্চিত্রের গোড়ার যুগ থেকেই ধীরাজ ভট্টাচার্যের প্রতিষ্ঠা, দীর্ঘ দিনে এ জগতের বহু ঘটনা করেছেন প্রত্যক্ষ। ছায়াচিত্র-জগতের অনেক কিছু অজানা তথ্য এতে যুক্ত হয়ে বইটিকে চিত্রামোদীদের কাছে একটি প্রামাণ্য পুস্তক করে তুলেছে। নিজেকে কেন্দ্র ক'রে এ জগতের বহুবিধ ঘটনা বইটিকে পরম উপভোগ্য করে তুলেছেন ধীরাজ ভট্টাচার্য তাঁর সুরসাল লেখনীর মাধ্যমে। গ্রন্থটির আমরা বহুল প্রচার কামনা করি। লেখক ধীরাজ ভট্টাচার্য। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ। ৯৩, হ্যারিসন রোড। দাম পাঁচ টাকা।

কপিরাইটের কবলে

সন্তোষকুমার দে

নিজের গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে এমন দুর্ঘটনা শুনেছেন? সত্যিই এমন ঘটনাও ঘটেছে। সে দিন এক ভদ্রলোক তার মোটরে যেই হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে 'ষ্টার্ট' দিয়েছেন অমনি গাড়ি চলতে সুরু করে এবং সোজা সেই চালক অর্থাৎ স্বয়ং গাড়ির মালিককেই চাপা দেয়। ঠিক এমনতর দুর্ঘটনার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে সাহিত্যিকদের কপালেও। এবার বুঝি লেখক নিজেই নিজের কপিরাইটের কবলে পড়বেন। প্রস্তাব হয়েছে ভারতীয় কপিরাইট আইন সংশোধিত হবে এবং তাতে "লেখক বা শিল্পীকে তার প্রত্যেকটি রচনা পৃথক ভাবে রেজেষ্ট্রি করিয়ে নিতে হবে, অন্যথায় মূল রচয়িতার স্বত্ব সংরক্ষণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবেন না।" যাঁরা পূজার বাজারে ছেচল্লিশখানা পূজাসংখ্যায় রচনা বণ্টন করেন, তাঁদের দুরবস্থাটা ভাবুন একবার! ছেচল্লিশ বার তার রেজিষ্ট্রেশন করাতে হবে এবং তাও কি রেজিষ্ট্রেশন করতে চাইলেই করা যাবে? তার জন্য 'ফি' লাগবে। অর্থাৎ পরিশ্রম করে শুধু লিখেই খালাস পাবেন না, গাঁটের কড়ি ফেলে তা আবার রেজেষ্ট্রি করাতে হবে। তারপর সরকারের যিনি রেজিষ্ট্রার থাকবেন তাঁর দরোজার ভিড় ঠেলে যদিও দপ্তর পর্যন্ত পৌঁছুলেন তিনি আবার "ইচ্ছে করলে আপনার বইকে রেজিষ্ট্রেশনের অযোগ্য বলে বাতিল করতে পারেন।" তখন উপায়? উপায় খুব সোজা—লেখাটা ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেলা। তাতে রাজি না থাকেন তো যান হাইকোর্টে, টাকা-পয়সা আরো কিছু দণ্ড দিয়ে সুবিচার আদায় করুন।

এত ঝঞ্ঝাট পোহাবার পর যে স্বত্ব আপনার অধিকারে আসবে, তাতে লেখকের মৃত্যুর পরও ২৫ বছর পর্যন্ত গ্রন্থস্বত্ব বজায় থাকবে। এটি প্রস্তাব মাত্র, এখন যে আইন বলবৎ আছে তাতে গ্রন্থস্বত্ব লেখকের মৃত্যুর পরও ৫০ বছর পর্যন্ত বর্তায়।

কপিরাইট বা গ্রন্থস্বত্ব অস্থাবর সম্পত্তি, এর মালিকানা নিয়েও আইনের অনেক জটিল ও সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ আছে। এ জন্য আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ গ্রহণীয়। কিন্তু বাংলা তথা ভারতে আইনজ্ঞ লেখক ও সাহিত্যিকের অভাব নেই। আমাদের প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং একজন পৃথিবীখ্যাত লেখক এবং আইনজ্ঞ। সুতরাং ভারতে কপিরাইট সংশোধনের নামে এমন কোন ব্যবস্থা প্রবর্তনের উপলক্ষ যেন না ঘটে যাতে সৃষ্টিশীল লেখক ও শিল্পীরা ক্ষতিগ্রস্ত এবং অনর্থক হয়রাণির মধ্যে পড়তে বাধ্য হন।

লেখক অনেক আছেন—তাঁদের সকলের সাহিত্য সৃষ্টিই গ্রন্থস্বত্বের আইন অনুসারে নিজ নিজ সম্পত্তিতে পরিণত হচ্ছে, কিন্তু বোধহয় সকলে 'গ্রন্থস্বত্ব' আইন বিষয়ে অবহিত নন। তাঁদের জ্ঞাতার্থে প্রবীণ আইনজ্ঞ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন দত্ত মহাশয়ের আলোচিত 'কপিরাইট' আইন বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য উল্লেখ করছি।

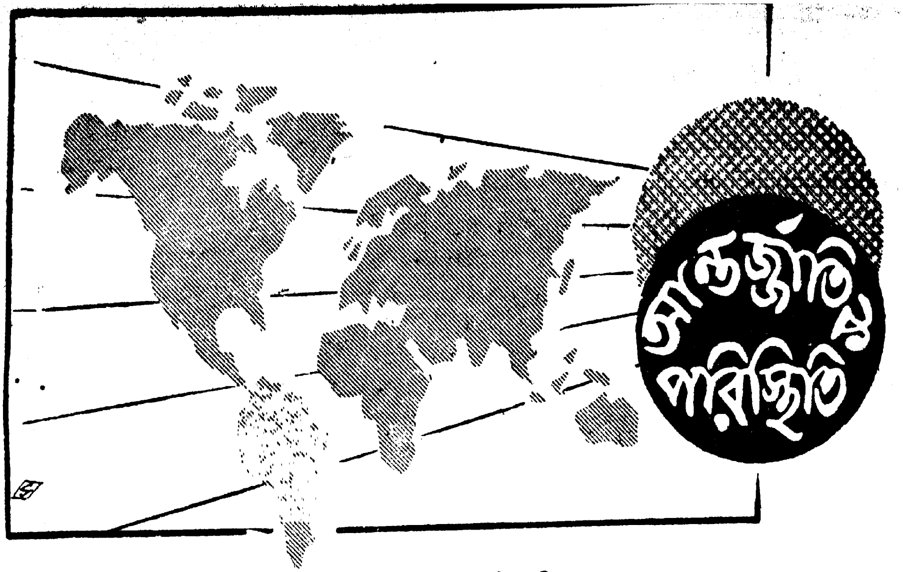
লেখকের সাহিত্যকর্মের মতো আরো অনেক প্রকারের প্রতিভার সৃষ্টি কপিরাইট আইনের আওতায় পড়ে—যথা, মানচিত্র, নক্সা, প্ল্যান, অভিধান, বিশ্বকোষ, হিসাবের চার্ট, বক্তৃতা, ভাষণ, ধর্মোপদেশ, নাটক, নাটকে অভিনয়ের বিশেষ ইঙ্গিত সমূহ, চলচ্চিত্র, আবৃত্তি, নৃত্যভঙ্গিমা, ছায়াবাজি, ছবি, খোদাই, ভাস্কর্য, আলোকচিত্র, গান, রেকর্ড প্রভৃতি।

পূর্বে আমাদের দেশে গ্রন্থস্বত্বের পরমায়ু ছিল গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরও সাত বছর অথবা গ্রন্থের প্রথম প্রকাশ থেকে ৪২ বছর—যেটি বেশি হয় সেটি। এটি ১৮৪৭ সালের ২০নং ভারতীয় কপিরাইট আইন। এই আইন পরিবর্তিত হয় ১৯১৪ সালের ৩নং ভারতীয় কপিরাইট আইন দ্বারা। তাতে লেখকের মৃত্যুর পরও ৫০ বছর পর্যন্ত গ্রন্থস্বত্বের মেয়াদ বর্ধিত হয়। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই এই ব্যবস্থা—যেমন অষ্ট্রিয়া, বেলজিয়ম, জেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মাণি, গ্রেটবৃটেন, গ্রীস, হাঙ্গেরী, ইটালী, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, পোর্টুগাল, যুগোশ্লোভিয়া। লেখকের মৃত্যুর পরেও ৩০ বছর গ্রন্থস্বত্ব বজায় থাকে—বুলগেরিয়ায়, জাপানে, রুমানিয়ায় সুইডেনে, সুইজারল্যাণ্ডে, থাইল্যাণ্ডে, আর্জেন্টাইনে, বলিভিয়ায় এবং মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে। ব্রেজিলে ৬০ বছর এবং স্পেনে ও কলম্বিয়ায় ৮০ বছর পর্যন্ত লেখকের মৃত্যুর পরেও তার গ্রন্থস্বত্ব বজায় থাকে। অপর পক্ষে চিলিতে ২০ বছর এবং সোভিয়েট রুশিয়ায় ১৫ বছর পর্যন্ত এই অধিকার বজায় থাকে। আমেরিকায় প্রথম প্রকাশ হতে ২৮ বছর পর্য্যন্ত গ্রন্থস্বত্ব বজায় থাকে। তবে ২৭ বৎসর পূর্ণ হতে হতে গ্রন্থকার বা তার মৃত্যু হলে তার ওয়ারিশগণ সরকারের কাছে আবেদন করলে আরও ২৮বছর এই মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু তার বেশি নয়। ফলে কোন দীর্ঘজীবী লেখক তার জীবৎকালেই নিজ গ্রন্থের স্বত্ব হারাতে পারেন।

গ্রন্থস্বত্ব বিক্রয় করা চলে এবং তার জন্য লিখিত, আইনানুগ দলিল রেজেষ্ট্রীও হতে পারে। কিন্তু নিব্যূঢ় স্বত্বে বিক্রয় করলেও গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর ২৫ বছরের বেশি এই স্বত্ব ক্রেতার থাকে না।

গ্রন্থস্বত্ব ক্রয়-বিক্রয় বা বন্ধক দেওয়া চললেও ক্রোক করা বা নীলাম করা চলে না। তবে গ্রন্থকার দেউলিয়া হলে তার গ্রন্থস্বত্ব সরকারি রিসিভারকে বর্তায়।

গ্রন্থস্বত্ব আইনের মূল উদ্দেশ্য গ্রন্থকার তথা সৃষ্টিশীল শিল্পী মানুষের সাধনার ফল হতে যাতে সে বা তার আইনত ওয়ারিশগণ বঞ্চিত না হন। অপর পক্ষে আইন আবার এমন কঠিনও যেন না হয়, যাতে সমগ্র মানবসমাজ চিরদিনের জন্য কোন শিল্পবস্তুর অধিকার হতে বঞ্চিত থাকে। সেই দিকে দৃষ্টি দিয়ে ভারতীয় কপিরাইট আইন সংস্কারে গ্রন্থকারের মৃত্যুর পরেও পঁচিশ বছর (পঞ্চাশ বছরের বদলে) তার গ্রন্থস্বত্ব বজায় রাখার প্রস্তাব অবাস্তব বা বিশেষ ক্ষতিকর বিবেচিত হবে না। কিন্তু প্রতিটি রচনা রেজিষ্ট্রেশন, তার 'ফি' ও রচনা নির্বাচনের ব্যবস্থায় সরকারের অবাঞ্ছিত ঝঞ্ঝাট সৃষ্টির আশঙ্কা অমূলক নয়। এতে করে শিল্পীর সাধনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি হলে সেটা কেউই কাম্য মনে করবে না। দেশের আইনজ্ঞ ব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করি।



শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

দ্বাবিংশতি রাষ্ট্রের সুয়েজ সম্মেলন—

লণ্ডনে বাইশটি রাষ্ট্রের সুয়েজ খাল সম্মেলন দুইটি প্রস্তাব লইয়া শেষ হইয়াছে। একটি প্রস্তাব মিঃ ডালেসের। উহার পক্ষে রহিয়াছে ১৮টি রাষ্ট্রের সমর্থন। উহাই সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব নামে অভিহিত হইয়াছে। এই আঠারটি রাষ্ট্রের মধ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গ ব্যতীত আছে পাকিস্তান, তুরস্ক, ইথিওপিয়া এবং জাপান। আর একটি প্রস্তাব ভারতের। উহা রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও সিংহলের সমর্থন পাইয়াছে। ভারতের প্রস্তাবটিই সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রস্তাব নামে অভিহিত। এই সম্মেলনে সর্ব্বসম্মত কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই। উহাকে সম্মেলনের প্রধান বিশেষত্ব বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাবই যে সম্মেলনের প্রস্তাব বলিয়া গৃহীত হয় নাই, ইহাই সম্মেলনের প্রধান বিশেষত্ব। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কোন প্রস্তাব সম্পর্কেই সম্মেলনে ভোট গ্রহণ করা হয় নাই। কিন্তু মিঃ ডালেসের প্রস্তাব যে আঠারটি রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিয়াছে এবং অবশিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ যে ভারতের প্রস্তাবের সমর্থক, তাহা নিঃসন্দেহরূপেই অবধারিত হইয়াছে। উভয় প্রস্তাবেরই স্বতন্ত্র সত্তা রহিয়াছে; সংখ্যালঘিষ্ঠের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় নাই, ইহাও এই সম্মেলনের একটি বিশেষত্ব। সম্মেলনের শেষের দিন নিউজীল্যাণ্ডের প্রতিনিধি প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রসমূহের প্রস্তাব বা অভিমত মিশর গবর্ণমেণ্টকে জানাইবার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, ইরাণ, সুইডেন ও ইথিওপিয়াকে লইয়া একটি কমিটি গঠন করা হউক। ভারত ও রাশিয়া এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে। এই বিরোধের মীমাংসা করিয়া সম্মেলনের সমগ্র কার্য্য-বিবরণী মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের জন্য ফ্রান্সের পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ পিনো যে প্রস্তাব করেন, সম্মেলনে তাঁহাই অনুমোদিত হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গ ইহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তাঁহারা সম্মেলনের বাহিরে স্থির করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব পঞ্চশক্তির কমিটির মারফৎ স্বতন্ত্রভাবে মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করা হইবে। নিউজীল্যাণ্ডের প্রতিনিধি তাঁহার উল্লিখিত প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে সম্মেলনকে ইহাও জানাইয়া দেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রদল তাঁহাদের প্রস্তাব একটি কমিটির মারফৎ স্বতন্ত্রভাবে মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণ করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেখানে সম্মেলনের সমগ্র কার্য্য-বিবরণীই মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, সেখানে স্বতন্ত্রভাবে একটি কমিটির মারফৎ মিশর গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা বাহুল্য বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উহার মূলে পশ্চিমী শক্তিবর্গের যে বিশেষ উদ্দেশ্য রহিয়াছে, এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না। এ-সম্পর্কে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সুয়েজ খাল সম্মেলন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করা আবশ্যক।

সুয়েজ খাল সম্মেলন ১৫ই আগষ্ট (১৯৫৬) আরম্ভ হয় এবং ২৩শে আগষ্ট এই সম্মেলন শেষ হয়। নিম্নলিখিত ২২টি রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগদান করে। ফ্রান্স, ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, স্পেন, তুরস্ক, বৃটেন, রাশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, সিংহল, ডেনমার্ক, ইথিওপিয়া, পশ্চিম জার্ম্মাণী, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, জাপান, নিউজীল্যাণ্ড, নরওয়ে, পাকিস্তান, পর্ত্তুগাল, সুইডেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। আমন্ত্রিত হইয়াও মিশর ও গ্রীস এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই। মিশর যে এই সম্মেলনে যোগদান করিতে পারে না, তাহা মাসিক বসুমতীর শ্রাবণ সংখ্যায় (১৩৬৩) আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সাইপ্রাস লইয়া বৃটেনের সঙ্গে বিরোধের জন্যই যে গ্রীস এই সম্মেলনে যোগদান করে নাই তাহা মনে করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। এই সম্মেলনে যে-সকল রাষ্ট্রের আমন্ত্রিত হওয়া উচিত ছিল তাহাদের অনেকে—যেমন ব্রহ্মদেশ ও যুগোশ্লাভিয়া—আমন্ত্রিত হয় নাই, ইহাও বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। এই সম্মেলনে যোগদান করিলেই পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয়ের ইস্তাহারে ঘোষিত নীতি আমন্ত্রিতদের উপর বাধ্যকর হইবে না এবং সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহা দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা বাধ্য হইবেন না, বৃটেনের নিকট হইতে এই ব্যাখ্যা

পাওয়ার পর ভারত সম্মেলনে যোগদান করিতে সম্মত হয়। সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বাধীনে আনাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। খেদিব মহম্মদ পাশা আল-সৈয়দ যে-ফরমান দ্বারা ফর্দিনান্দ ডা লীজেপকে সুয়েজ খাল কোম্পানী গঠনের অনুমতি দিয়াছিলেন, তাহার ১০নং ধারায় বলা হইয়াছে যে, মেয়াদ অন্তে মিশর গবর্ণমেণ্ট কোম্পানীর স্থান গ্রহণ করিবেন এবং কোম্পানীর সমস্ত অধিকার নির্ব্বিবাদে ভোগ করিবেন। সুতরাং এই দিক দিয়া পশ্চিমী শক্তিবর্গের বলিবার কিছুই নাই, সে সম্বন্ধে তাঁহারা কিছু বলেনও নাই। তাঁহারা যে-দুইটি ধুয়া তুলিয়াছেন, তাহার একটি—সুয়েজ খাল দিয়া অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা। তাঁহারা ১৮৮৮ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তির দোহাই দিয়াছেন। মিশরের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসের চুক্তি মানিয়া চলিবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় তাহাকে মোটেই আমল দিতেছেন না। সুয়েজ খাল সম্মেলন আরম্ভ হওয়ার কয়েকদিন মাত্র পূর্ব্বে গত ৮ই আগষ্ট (১৯৫৬) বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন বেতার ও টেলিভিশন মারফৎ যে বক্তৃতা দেন তাহাতে তিনি বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, মিশর বা আরব দেশগুলির সহিত তাঁহাদের কোন বিরোধ নাই। তাঁহাদের বিরোধ কর্ণেল নাসেরের সহিত। তাঁহার এই উক্তির মধ্যে কর্ণেল নাসেরের বিরুদ্ধে মিশরবাসী এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্রকে উত্তেজিত করিবার একটা প্ররোচনা রহিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী বেতার বক্তৃতায় ইহাও বলিয়াছিলেন যে, বৃটেন বলপ্রয়োগ দ্বারা কোন সমাধান চাহে না। সুয়েজ খাল সম্মেলনে একটা সমাধান হইবে, এই আশাও তিনি প্রকাশ করেন। কিন্তু পশ্চিমী বৃহৎ শক্তিত্রয় যে ভাবে এই সম্মেলনের সমাপ্তি চাহিয়াছিল, সে ভাবে সমাপ্তি হয় নাই।

সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জাতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই এই সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। ভোটাধিক্যে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে সেই সিদ্ধান্তই পশ্চিমী শক্তিবর্গ গ্রহণ করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহাদের অভিপ্রায় এবং ভোটাধিক্য যাহাতে তাঁহাদের দাবীর অনুকূল হয়, সেই ভাবেই বিভিন্ন রাষ্ট্রকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন সুয়েজ খাল সমস্যাকে যুদ্ধোত্তর বিশ্বের অন্যতম গুরুতর সঙ্কট বলিয়া অভিহিত করেন। মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার ব্যাপারটি বৃটেন ও ফ্রান্স কিরূপ গুরুতর সঙ্কটে পরিণত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা তাহাদের সামরিক প্রস্তুতি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জাতিক কর্তৃত্বশক্তি প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে যেমন সম্মেলনে গৃহীত হয় নাই, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থিত ঐ প্রস্তাব সম্মেলনের প্রস্তাব বলিয়াও মিশর সরকারের নিকট উপস্থিত করিতেও তাঁহারা অসমর্থ হইয়াছেন। ভারত চাহিয়াছিল, মিশর ও পশ্চিমী শক্তিবর্গ উভয় পক্ষের গ্রহণোপযোগী একটি প্রস্তাব রচনা করিতে। উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পথে একটা মীমাংসা যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা করাই ছিল ভারতের অভিপ্রায়। কিন্তু পশ্চিমী শক্তিবর্গের অনমনীয় মনোভাবের জন্যই ভারতের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে, একথা বলা যায় না। পশ্চিমী-শক্তিবর্গ ভারতের প্রস্তাবে রাজী হয় নাই বটে, কিন্তু ইহা মিশরের সমর্থন লাভ করিয়াছে। শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসা করিতে হইলে ভারতের প্রস্তাবই হইবে উহার মূল ভিত্তি।

মিঃ ডালেস ও ভারতের প্রস্তাব—

সুয়েজ খাল সম্মেলনের প্রথম দিনের অধিবেশনেই মার্কিণ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ ডালেস চারি দফা বিশিষ্ট একটি প্রস্তাব পেশ করেন। পরে উহাই পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে সম্মেলনে পেশ করা হয়। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে রুশ পররাষ্ট্র-মন্ত্রী মঃ শেপিলভ সুয়েজ খাল সম্পর্কে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। সুয়েজ খালের উপর মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকারের স্বীকৃতিই তাঁহার প্রস্তাবের মূল নীতি। এই মূল নীতির ভিত্তিতে তিনি প্রস্তাব করেন যে, সুয়েজ খালটি সমান সর্তে সকল জাতির জাহাজ চলাচলের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং এই দায়িত্ব বহন করিতে হইবে মিশরকে। খালটি অবরোধ করা চলিবে না। শুল্ক বৃদ্ধির আশঙ্কা সম্পর্কে এই প্রস্তাবে মিশরের সহিত আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হইয়াছে। কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি সম্পর্কে তাঁহার প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, এই চুক্তি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির বর্ত্তমানে যে দায়িত্ব আছে, তাহা বজায় রাখা বাঞ্ছনীয়। মঃ শেপিলভের প্রস্তাবে আরও বৃহত্তর একটি সম্মেলন আহ্বানের কথা ছিল। সম্মেলনের সভাপতি বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সেলুইন লয়েড অনেক বিলম্ব হইবে এই অজুহাতে উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এই সম্মেলনেই সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সদস্যদিগকে অনুরোধ জানান। পাকিস্তান কোন পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব উপাপন করে নাই, মাত্র তিনটি দাবী জানাইয়াছিল। মিঃ ডালেস পাকিস্তানের ঐ দাবী তাঁহার প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করিয়া লন। উহাতে মিঃ ডালেসের প্রস্তাবের মূলবিষয় যে বিন্দুমাত্রও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, তাহা বৃটেনও স্বীকার করিয়াছে। পাকিস্তানের প্রতিনিধি যে-ভাবে মিঃ ডালেসের প্রস্তাব সংশোধন করিয়াছেন, সে-সম্পর্কে কায়রোর দৈনিক পত্রিকা 'আল জোমহোরিয়া'র লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন, "She (Pakistan) not only supported

the West and stood against Egypt, but its delegate at the conference modified Mr. Dulles's proposal in a manner which rendered these proposals worse than they were before" অর্থাৎ পাকিস্তান শুধু পশ্চিমী শক্তিবর্গকে সমর্থন এবং মিশরের বিরুদ্ধাচরণ-ই করে নাই, সম্মেলনে তাহার প্রতিনিধি মিঃ ডালেসের প্রস্তাবকে এমন ভাবে সংশোধিত করিয়াছেন যে, উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর খারাপ হইয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত সুয়েজ খাল সম্মেলনের সম্মুখে দুইটি মাত্র প্রস্তাব উপস্থাপিত থাকে। একটি প্রস্তাব মিঃ ডালেসের, আর একটি ভারতের প্রস্তাব। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা মিঃ মেনন প্রস্তাব উত্থাপন করেন। মিঃ ডালেসের প্রস্তাব এবং ভারতের প্রস্তাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, উভয় প্রস্তাবের মুখ্য উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই। উভয় প্রস্তাবেই সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। সকল দেশের জাহাজই যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে এবং বিনা বাধায় সুয়েজ খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারে এবং সুয়েজ খালের সংরক্ষণ ও পরিচালন কার্য্যে যাহাতে সুষ্ঠু ভাবে নির্ব্বাহ হয় উভয় প্রস্তাবের উহাই মূল উদ্দেশ্য। আরও একটি বিষয়ে উভয় প্রস্তাবের মধ্যে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ভারতের প্রস্তাবে তেমনি মিঃ ডালেসের প্রস্তাবেও মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। সুয়েজ খাল কোম্পানীকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে মিশরের কোন অধিকার নাই, এমন কোন কথাই মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে নাই। বস্তুতঃ, এই অধিকারের স্বীকারের ভিত্তিতেই তাঁহার প্রস্তাব রচিত হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। এইখানেই উভয় প্রস্তাবের মধ্যে সাদৃশ্যের শেষ বলা যাইতে পারে, যদিও সুয়েজ খাল পরিচালন সংক্রান্ত রিপোর্ট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিকট পেশ করার প্রস্তাবের মধ্যেও আর একটি সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব হইতেই উহার সংরক্ষণ ও পরিচালন কার্য্যের ব্যবস্থার কথা আসিয়া পড়ে। এইখানেই মিঃ ডালেসের প্রস্তাবের সহিত ভারতের প্রস্তাবের মৌলিক পার্থক্য। মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে একথা অবশ্যই বলা হইয়াছে যে, মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকারের প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশের ব্যবস্থা থাকিবে, কিন্তু পরক্ষণেই এই সার্ব্বভৌমত্ব কাড়িয়া লওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, খালের সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করিয়া বিশ্ববাণিজ্যের স্বার্থে এই খালে জাহাজ চলাচল বৃদ্ধির দায়িত্ব সুয়েজ খাল বোর্ডের উপর বর্ত্তিবে এবং মিশরের পক্ষ হইতে আবশ্যকীয় সকল অধিকার ও সুযোগ এই বোর্ডকে দিতে হইবে। কি ভাবে মিশর এই বোর্ডকে উল্লিখিত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা দিবে, সে-সম্পর্কে ডালেসের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, স্থায়ী ও নির্ভরযোগ্য বন্দোবস্তের জন্য চুক্তি সম্পাদন করা হইবে। খালের সংরক্ষণ, পরিচালন ও উন্নয়নের জন্য এবং সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রসমূহের স্বার্থের নিরাপত্তা ও সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে মিশর ও অন্যান্য স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতার জন্য প্রাতিষ্ঠানগত ব্যবস্থা করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব বর্ত্তিবে সুয়েজ খাল বোর্ডের উপর। কি ভাবে সুয়েজ খাল বোর্ড গঠিত হইবে তাহাও ডালেসের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে। এই বোর্ডে মিশরের প্রতিনিধি অবশ্যই থাকিবে। তা' ছাড়া চুক্তির অন্তর্গত অন্যান্য রাষ্ট্র যে ভাবে সদস্য মনোনয়ন করিতে স্বীকৃত হন, সেই ভাবে সদস্য মনোনীত হইবেন। কিন্তু এই মনোনয়নের ব্যাপারে উক্ত রাষ্ট্রগুলি কর্ত্তৃক খালের ব্যবহার, তাহাদের বাণিজ্যিক গতি ও ভৌগোলিক অবস্থানের বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে।

মিঃ ডালেসের প্রস্তাব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, সুয়েজ খাল সংরক্ষণ ও সুষ্ঠু ভাবে পরিচালন, সুয়েজ খাল দিয়া সকল দেশের জাহাজ নিরাপদে ও অবাধে যাতায়াতের মূল উদ্দেশ্যটা একটা অবান্তর মাত্র। সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জ্জাতিক অর্থাৎ পশ্চিমী-শক্তিবর্গের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই আসল উদ্দেশ্য। মিঃ ডালেস তাঁহার প্রস্তাব দ্বারা এই কথাই বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জ্জাতিক অর্থাৎ পশ্চিমী শক্তিবর্গের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হইলে সুয়েজ খাল সংরক্ষণ ও পরিচালন ব্যবস্থা সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইবে না এবং অবাধে ও নির্ব্বিঘ্নে জাহাজ চলাচলও অসম্ভব হইবে। মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সাদৃশ্য সত্ত্বেও মিঃ ডালেসের প্রস্তাবের সহিত ভারতের প্রস্তাবের পার্থক্যটা মৌলিক। ভারতের প্রস্তাবেও সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, স্বীকার করা হইয়াছে খালটি সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বসময়ে উপযুক্ত রাখিবার প্রয়োজনীয়তা এবং ১৮৮৮ সালের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী সকল জাতির অবাধে খাল ব্যবহারের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতের প্রস্তাবে মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকার শুধু মৌখিক ভাবেই স্বীকৃতি দান করা হয় নাই, কার্য্যতঃ উহা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া কি ভাবে সুয়েজ খালকে উপযুক্ত অবস্থায় রক্ষা করা যায় এবং সকল দেশের জাহাজ অবাধে ও নিরাপদে সুয়েজ খাল দিয়া যাতায়াত করিতে পারে, তাহারও প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতের প্রস্তাব আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বের পরিবর্ত্তে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এইখানেই মিঃ ডালেসের প্রস্তাবের সহিত ভারতের প্রস্তাবের মৌলিক পার্থক্য।

আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব ছাড়া পশ্চিমী-শক্তিবর্গ আর যা কিছু চাহেন, সমস্তই ভারতের প্রস্তাবে দিবার ব্যবস্থা আছে। ১৮৮৮ সালের কনষ্টান্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী সকল জাতির অবাধে যান ব্যবহার করিবার অধিকার থাকিবে, কোন বাছবিচার না করিয়া সকল জাতিকেই খালের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের অধিকার দিতে হইবে। খালটি সকল সময় উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারযোগ্য অবস্থায় রাখিতে হইবে এবং খাল-ব্যবহারকারীদের স্বার্থের প্রতি যথোপযুক্ত দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সুয়েজ খাল দিয়া অবাধে এবং নিরাপদে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থাই যদি পশ্চিমী শক্তিবর্গের একমাত্র অভিপ্রায় হয়, তবে ভারতের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে তাহাদের আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না। সুয়েজ খাল সংরক্ষণ, পরিচালন এবং ঐ খাল দিয়া সকল দেশের জাহাজ যাহাতে অবাধে যাতায়াত করিতে পারে, সে-সম্বন্ধে শুধু প্রেসিডেন্ট কর্ণেল নাসেরের প্রতিশ্রুতির উপর ভারতের প্রস্তাবে নির্ভর করা হয় নাই। উল্লিখিত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ভারতের পরিকল্পনায় কনষ্টান্টিনোপল চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীদের এবং সমস্ত খাল ব্যবহারকারীদের এক সম্মেলন আহ্বানের এবং মিশরীয় কর্পোরেশনের সহিত সংযোগ রক্ষার জন্য একটি উপদেষ্টা বোর্ড গঠনেরও প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই উপদেষ্টা বোর্ড ভৌগোলিক দিক হইতে প্রতিনিধিত্বের

ভিত্তিতে খালের ব্যবহারকারীদের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইবে এবং এই বোর্ডের উপর সংযোগরক্ষা এবং পরামর্শ দানের দায়িত্ব অর্পণ করা হইয়াছে। ভারতের প্রস্তাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, উহাতে সুয়েজ খালের উপর মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকার যেমন রক্ষিত হইয়াছে তেমনি সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক স্বরূপ রক্ষারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিশর সুয়েজ খালের মালিক থাকিবে, উহা নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং উহার সমস্ত লাভ গ্রহণ করিবে। সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনের জন্য মিশর গবর্ণমেণ্ট একটি মিশরীয় কর্পোরেশন গঠন করিবেন এবং এই কর্পোরেশনের সহিত সংযোগ রক্ষা করিবার জন্য এবং উহাকে পরামর্শ দিবার জন্য গঠিত হইবে খাল ব্যবহারকারী একটি উপদেষ্টা-বোর্ড। এই উপদেষ্টা বোর্ড গঠনের দ্বারা পশ্চিমী-শক্তিবর্গের সমস্ত অমূলক আশঙ্কাই দূর করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একথা সত্য যে, এই উপদেষ্টা-বোর্ডের কোন কর্ত্তৃত্বশক্তি থাকিবে না, ভেটোর ক্ষমতা থাকিবে না। কিন্তু মিশরের সহিত চুক্তি এবং উপদেষ্টা-বোর্ডের আন্তর্জ্জাতিক প্রতিনিধিত্বই উহার উপদেশ বা পরামর্শকে শক্তিশালী করিয়া রাখিবে। বিশ্ববাসীর বিশ্বাস হারাইবার আশঙ্কাতেই মিশর গবর্ণমেণ্ট উপদেষ্টা বোর্ডের পরামর্শ উপেক্ষা করিতে পারিবেন না।

মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার কথা আছে এবং যে ভাবে এই আন্তর্জ্জাতিক বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে এই বোর্ডে প্রাধান্য থাকিবে পশ্চিমী-শক্তিবর্গের। কিন্তু ভারতের প্রস্তাবে আন্তর্জ্জাতিক উপদেষ্টা-বোর্ড গঠনের কথা বলা হইয়াছে এবং যে-ভাবে এই বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে এই বোর্ডে পশ্চিমী-শক্তিবর্গের প্রাধান্য থাকিবে না। উভয় প্রস্তাবের মধ্যে আরও কিছু পার্থক্য আছে, তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতের প্রস্তাব আলোচনা করিলে বুঝা যায়, সুয়েজ খাল হইতে অর্জ্জিত আয় সমস্তই মিশর পাইবে। কিন্তু মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, খালের ব্যবহারের জন্য মিশরকে ন্যায়সঙ্গত ও সুসম (fair & equitable) অর্থ দেওয়া হইবে এবং খালের সম্প্রসারণ ও ব্যবহার বৃদ্ধির সহিত এই অর্থের হার বর্দ্ধিত হইবে। কিন্তু তাঁহার প্রস্তাবে খালের শুল্ক ধার্য্যের যে নীতির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে খাল হইতে মিশর গবর্ণমেণ্ট অতি সামান্য অর্থই পাইবেন, এইরূপ আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, প্রস্তাবিত প্রয়োজন সঙ্কুলান হওয়া সাপেক্ষে খালের শুল্ক কম এবং মুনাফা-বর্জ্জিত ভাবে ধার্য্য করা হইবে। ভারতের প্রস্তাবে খালকর ন্যায়সঙ্গত ভাবে ধার্য্য করার কথা আছে। মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে সুয়েজ খাল কোম্পানীকে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ ন্যায়সঙ্গত হারে দিতে হইবে। ভারতের প্রস্তাবে এ সম্পর্কে কোন কথা নাই। এ সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মিঃ মেনন বলিয়াছেন যে, মিশর ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

মিঃ ডালেসের প্রস্তাব এবং ভারতের প্রস্তাবের তুলনামূলক আলোচনা করিলে দেখা যায়, ভারতের প্রস্তাবে মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকার ক্ষুণ্ণ না করিয়াই এই সার্ব্বভৌম অধিকারের সহিত সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব এবং স্বরূপের সামঞ্জস্যবিধান করা হইয়াছে। মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে মিশরের সার্ব্বভৌম অধিকারের উপর international consortium বা আন্তর্জ্জাতিক যৌথ কর্ত্তৃত্ব চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। মিশরের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসের এই ব্যবস্থাকে সমবায়মূলক সাম্রাজ্যবাদ (Co-operative imperialism) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইরাণে রাষ্ট্রায়ত্ত এংলো-ইরাণী তৈল কোম্পানীর উপর এইরূপ Consortium প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহা সম্ভব হইয়াছে মার্কিণ সামরিক মিশনের প্রভাবিত ইরাণের সামরিক শক্তি কর্ত্তৃক ডাঃ মুসাদ্দেক উৎখাত হওয়ার পর। কর্ণেল নাসেরের পতন সম্পর্কে বৃটেন ও ফ্রান্সের মনের কোণে একটা আশা যে লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই অনিশ্চিত সম্ভাবনার উপর তাহারা নির্ভর করিতে পারিতেছে না। নাসেরের পতন ঘটাইবার জন্য চেষ্টা করাও বড় সহজ নয়। মিঃ ডালেসের প্রস্তাবে এমন ব্যবস্থার কথা আছে, যাহাতে সুয়েজ খালের অর্জ্জিত আয় হইতে মিশর বিশেষ কিছুই না পায়। সুয়েজ খাল হইতে অর্জ্জিত আয় মিশর যাহাতে আশোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণের জন্য না পায়, তাহার জন্যই এই ব্যবস্থা করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়। সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করাই শুধু মিঃ ডালেসের প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নয়, সুয়েজ খালের আয় মিশর যাহাতে আশোয়ান বাঁধ নির্ম্মাণে ব্যয় না করিতে পারে, তাহাও উক্ত প্রস্তাবের লক্ষ্য।

সুয়েজ খালের উপর পশ্চিমী-শক্তিবর্গের প্রকৃত অধিকার কি এবং কতটুকু, তাহা আলোচনা করিলে দেখা যায়, কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি অনুযায়ী সুয়েজ খাল আন্তর্জ্জাতিক জলপথরূপে বজায় থাকিবে, সুয়েজের উপর ইহাই একমাত্র অধিকার। কর্ণেল নাসের এই অধিকার রক্ষা সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, তাহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন না। উল্লিখিত চুক্তিতে ইহা বলা হইয়াছে যে, যেমন শান্তির সময়ে তেমনি যুদ্ধের সময়েও দেশ নির্ব্বিশেষে সকল দেশের জাহাজকেই সুয়েজ খাল দিয়া বিনা বাধায় যাইতে দিতে হইবে। উক্ত চুক্তির ৪নং ধারায় একথাও বলা হইয়াছে যে, যুদ্ধের সময়ে যুযুধান দেশগুলির যুদ্ধ জাহাজকেও সুয়েজ খাল দিয়া নির্ব্বিবাদে যাইতে দিতে হইবে। আরও বলা হইয়াছে যে, সুয়েজ খালকে কখনও অবরুদ্ধ করা চলিবে না। বৃটেন দীর্ঘকাল সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণ করিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে বৃটেন কনষ্টাণ্টিনোপল

চুক্তি মানিয়া চলিয়াছে কি? বিগত দুইটি মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন যে এই চুক্তি লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা কাহারও অজানা নয়। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইতেই বৃটেন মিশরকে আশ্রিতরাজ্যরূপে ঘোষণা করে এবং বৃটেনের নির্দ্দেশ অনুসারে মিশর গবর্ণমেণ্ট সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চলাচল নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্ব সংগ্রামের সময় ১৯৪০ সালে চার্চ্চিল বৃটিশ বাহিনীকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, বৃটেন যদি অধিকৃত হয়, তাহা হইলে সুয়েজ খালকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে হইবে। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মকালে রোমেল সুয়েজ খাল দখল করিতে পারেন এইরূপ আশঙ্কা যখন দেখা দিয়েছিল তখন ১৯৪২ সালের ৩০শে জুন মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট জেনারেল মার্শালকে এই নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন যে, নীল নদের উপত্যকা বিপন্ন হইলে সুয়েজ খালকে খুব ভাল করিয়া অবরুদ্ধ করিতে হইবে। ইহা-ই কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি রক্ষার নমুনা। আজ পশ্চিমী-শক্তিবর্গ সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের অধিকার কর্ণেল নাসের কর্ত্তৃক বিন্দুমাত্র লঙ্ঘিত না হওয়া সত্ত্বেও শুধু অমূলক সন্দেহের বশে সুয়েজ খালের উপর আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবার দাবী করিতেছেন। পুনরায় সুয়েজ খাল দখলের অভিপ্রায়েই এই অমূলক সন্দেহের অজুহাত সৃষ্ট করা হইয়াছে।

কাইরো আলোচনার ব্যর্থতা—

কাইরোতে পঞ্চশক্তির মেঞ্জিস মিশনের দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছে, সুয়েজ খাল আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্য অষ্টাদশ শক্তির প্রস্তাব গ্রহণে, প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসেরকে এই মিশন রাজী করাইতে পারেন নাই। যিনি কর্ণেল নাসেরকে হিটলার আখ্যা দিয়াছেন সেই অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ আর, জি, মেঞ্জিস এই মিশনের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন বলিয়াই উহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, ইহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতি এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগের হুমকীর পটভূমিতে কর্ণেল নাসের এবং মেঞ্জিস কমিটির মধ্যে আলোচনা হওয়াই ব্যর্থতার কারণ, এ-কথাও স্বীকার করা যায় না। এ-কথা অবশ্য সত্য যে, কর্ণেল নাসেরকে ভয় দেখাইয়া মিঃ ডালেসের অষ্টাদশ শক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করাইবার উদ্দেশ্যেই সামরিক-প্রস্তুতি ও বলপ্রয়োগের হুমকী দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই। বস্তুতঃ, প্রস্তাবটি-ই এমন যে, মিশর উহা কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারে না। এই প্রস্তাবের একটি শব্দ বা একটি কথা পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করার কোন অধিকার পঞ্চ-শক্তি কমিটির ছিল না। প্রস্তাবটি কর্ণেল নাসেরের নিকট পেশ করা এবং ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া কর্ণেল নাসেরকে দিয়া উহা গ্রহণ করাইবার চেষ্টা করিবার দায়িত্বই শুধু এই কমিটির উপর অর্পিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটির অর্থ ও উদ্দেশ্য স্বতঃপ্রকাশিত। নিতান্ত গণ্ডমূর্খও উহা বুঝিতে পারে। ব্যাখ্যা করিবার উহাতে কিছুই নাই। মিঃ মেঞ্জিসের পত্রের উত্তরে কর্ণেল নাসের যে পত্র দেন তাহাতে বলা হইয়াছে, "খোলা মন লইয়া ঐ প্রস্তাব পাঠ করিলে যে কোন পাঠকই নিঃসন্দেহ হইবেন যে, উহার উদ্দেশ্য হইল সুয়েজ খালটিকে মিশরের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া অপর কাহারও হাতে তুলিয়া দেওয়া।" তথাপি মিঃ মেঞ্জিস যে প্রাণপণে এই প্রস্তাবের মাহাত্ম্য প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসেরকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা কর্ণেল নাসেরের নিকট লিখিত তাঁহার ৭ই সেপ্টেম্বরের পত্র হইতেই বুঝিতে পারা যায়।

এমন এক দিন ছিল যে-দিন কায়রোস্থিত বৃটিশ হাই-কমিশনারের ইচ্ছায় মিশরের প্রধান মন্ত্রীর উত্থান-পতন ঘটিত, তাঁহার অঙ্গুলি হেলনে মিশরের রাজার সিংহাসন পর্য্যন্ত টলটলায়মান হইয়া উঠিত। সে দিন এখন আর নাই। ঐরূপ কোন আশা লইয়া মেঞ্জিস মিশন প্রেরিত হইয়াছিল কি না তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু কর্ণেল নাসের অষ্টাদশ শক্তির প্রস্তাবকে 'self defeating' এবং provocative to the people of Egypt' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উক্তি যে খুবই সত্য একথা অস্বীকার করা যায় না। মিঃ মেঞ্জিস তাঁহার পত্রে অষ্টাদশ শক্তির প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করা সঙ্গত হইয়াছে কি না সে সম্বন্ধে অষ্টাদশ রাষ্ট্র যৌথ অভিমত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন নাই। মিঃ মেঞ্জিস এখানে প্রকৃত অবস্থার ভুল ব্যাখ্যাই শুধু করেন নাই, বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, অত্যন্ত অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াই যে অষ্টাদশ শক্তি মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করা বে-আইনী হইয়াছে কি না সে-সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিতে বিরত রহিয়াছেন। সুয়েজ খালকে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বাধীনে আনার প্রস্তাবটিকে মিঃ মেঞ্জিস ভূম্যধিকারী ও প্রজার সম্পর্কের সহিত তুলনা করিয়া এবং বিশ্বব্যাঙ্কের উপমা দিয়া বুঝাইবার যে হাস্যকর চেষ্টা করিয়াছেন, সে-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার স্থান এখানে আমরা পাইব না। উহার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়াও আমরা মনে করি না। কোনও জমিতে প্রজা বসাইবেন কি না, কিম্বা কাহাকে প্রজা বসাইবেন তাহা ভূম্যধিকারীর ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। কোন ব্যক্তিই তাহাকে কোন বিশেষ জমিতে প্রজা বসাইতে হইবে-ই, ভূম্যধিকারীর নিকট এইরূপ অন্যায় দাবী করিতে এবং দাবী পূরণ না করিলে বলপ্রয়োগের হুমকী দিতে পারে না। বিশ্বব্যাঙ্কের উপমাটাও অচল। বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশ্ব-ব্যাঙ্ক গঠন করা প্রয়োজন মনে করিয়াছে বলিয়াই তাহারা একমত হইয়া বিশ্ব-ব্যাঙ্ক গঠন করিতে পারিয়াছে। সুয়েজ খাল সংক্রান্ত অবস্থাটা সেরূপ নহে। বরং মিশরের উইং কমাণ্ডার সাবরী দোকান এবং ক্রেতার সম্পর্কের সহিত সুয়েজ খাল ও খাল-ব্যবহারকারীর সম্পর্কের যে উপমা দিয়াছিলেন, তাহা কতকটা সঙ্গত বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

প্রেসিডেণ্ট নাসের অষ্টাদশ রাষ্ট্রের প্রস্তাব দৃঢ়তার সহিত অগ্রাহ্য করিলেও সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব যে তিনিও স্বীকার করেন, তাহা মিশর গবর্ণমেণ্টের সুয়েজ খাল সংক্রান্ত বিরোধের মীমাংসার জন্য সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী দেশগুলির প্রতিনিধি লইয়া একটি আলোচনাকারী সংস্থা গঠনের প্রস্তাব হইতেই বুঝিতে পারা যায়। মেঞ্জিস কমিটি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া কাইরো ত্যাগের কয়েক ঘণ্টা পরেই মিশর গবর্ণমেণ্ট একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিয়া উক্ত প্রস্তাব ঘোষণা করেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে ইহাও বলা হইয়াছে যে উক্ত আলোচনাকারী সংস্থা ১৮৮৮ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তিটিও পর্য্যালোচনা করিতে পারিবেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে সুয়েজ খাল বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ এবং পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহের নিকট আবেদন জানানো হইয়াছে। মিঃ মেঞ্জিস তাঁহার পত্রে যে সকল যুক্তি উত্থাপন করিয়াছেন কর্ণেল নাসের তাঁহার উত্তরে সমস্তই খণ্ডন করিয়াছেন। সুয়েজ খাল দিয়া যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে, সেগুলির

শতকরা ৯০ ভাগই ১৮টি রাষ্ট্রের, মিঃ মেঞ্জিসের এই উক্তিকে কর্ণেল নাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক বাহুল্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। খাল ব্যবহারকারী দেশ সম্পর্কে কর্ণেল নাসের বলিয়াছেন যে, যে-সকল দেশের জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়া যায় না, কিন্তু তাহাদের প্রচুর বাণিজ্য পণ্য খালপথে যাতায়াত করে, তাহারাও খাল ব্যবহারকারী। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সৌদী-আরব, অষ্ট্রেলিয়া, থাইল্যাণ্ড, পাকিস্তান, ইরাণ, ইরাক, ইথিওপিয়া এবং সুদানের নাম করেন। তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, ১৮৮৮ সালের চুক্তি দ্বারা মিশর নিজেকে বাধ্য মনে করে। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, সুয়েজ খাল সম্পর্কে মিশর আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালন করে নাই, এরূপ কোন সময় প্রদর্শন করা যাইতে পারে না। বরং বৃটেন, ফ্রান্স এবং প্রাক্তন সুয়েজ খাল কোম্পানীর কতক অংশ বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও গত ৫০ দিন ধরিয়া মিশর দক্ষতার সহিত সুয়েজ খালে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা পরিচালনা করিতেছে। কর্ণেল নাসের এই পত্রে সুয়েজ খাল পরিচালনে আন্তর্জাতিক দায়িত্ব কি ভাবে পালন করিবেন তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই পত্রে সুয়েজ খাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করিতে মিশরের পূর্ণ অধিকার ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন এই অধিকার কেহ ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না। সঙ্কট এবং তথাকথিত গুরুতর অবস্থাকে তিনি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করেন। কর্ণেল নাসের এই পত্রে বৃটেন ও ফ্রান্সের সৈন্য সমাবেশ ও প্রতিশোধাত্মক অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন।

কায়রো আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরে—

প্রেসিডেণ্ট নাসেরের সহিত পঞ্চশক্তি কমিটির আলোচনা সাফল্যমণ্ডিত হইবে, এতখানি দুরাশা কেহই করেন নাই। কিন্তু অতঃপর কি হইবে, ইহাই এখন প্রধান প্রশ্ন। মেঞ্জিস মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর ১০ই ও ১১ই সেপ্টেম্বর লণ্ডনে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন এবং ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ মলে মিলিত হইয়া সুয়েজ খাল সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই আলোচনার শেষে গত ১১ই সেপ্টেম্বর তাঁহারা যে ইস্তাহার প্রকাশ করেন তাহাতে বলা হইয়াছে যে, প্রেসিডেণ্ট নাসের তাঁহাদের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আলোচনা চালাইতে অস্বীকৃত হওয়ায় গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। ইস্তাহারে বলা হইয়াছে যে, আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অধিকারে স্বৈরাচারী হস্তক্ষেপ এবং চুক্তি ও আন্তর্জাতিক আইনের অন্য সূত্রে উদ্ভূত দায়িত্ব ন্যায়সঙ্গত ভাবে মানিয়া চলার সহিত অসামঞ্জস্যকর কার্য্যকলাপ প্রতিরোধ করিতে মন্ত্রিগণ তাঁহাদের সহযোগিতা বৃদ্ধির দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্ত করিতেছেন। ইস্তাহারে আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রিদ্বয় অতঃপর কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে সে সম্পর্কে আলোচনা করিয়া পূর্ণ মতৈক্যে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে, তাহা বলা হয় নাই। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর গত ১১ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে, সুয়েজ খাল উন্মুক্ত রাখিতে বৃটেন ও ফ্রান্সের শক্তিপ্রয়োগের অধিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বীকার করে। কিন্তু উহার সহিত দুইটি সর্ত্ত তিনি যুক্ত করিয়াছেন। একটি সর্ত্ত সুয়েজ বিরোধ মীমাংসার সমস্ত শান্তিপূর্ণ পন্থা ব্যর্থ হওয়া। আর একটি সর্ত্ত মিশরের দিক হইতে যদি কোন আক্রমণাত্মক পন্থা গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত যে, কোনরূপ শক্তিপ্রয়োগের পূর্ব্বে সুয়েজ সমস্যাটি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হইবে। তাঁহার উল্লিখিত উক্তি হইতে এ-সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, সুয়েজ সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপিত হইবে। কিন্তু কে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিবে এবং কি অজুহাতে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে? মিশর কর্ত্তৃক সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করায় শান্তিভঙ্গ হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় না। বরং মিশর এই পাল্টা অভিযোগ উত্থাপন করিবে যে, সাইপ্রাসে বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্য সমাবেশ করিয়া এবং পূর্ব্ব ভূমধ্যসাগরে বৃটেন নৌবহর আমদানী করিয়া বৃটেন ও ফ্রান্স শান্তিভঙ্গের কারণ ঘটাইয়াছে এবং তাহাদের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

উপযুক্ত ব্যবস্থার (appropriate meaus) মধ্যে বিদেশী পাইলটের অভাব সৃষ্টি যে একটি নয়, সে কথা বলা যায় না। সুয়েজ রাষ্ট্রায়ত্ত করার সময় পাইলটের মোট সংখ্যা ছিল ১১৩জন। তন্মধ্যে ৬১জন বৃটিশ এবং ৫৩জন ফরাসী। মিশরীয় পাইলটের সংখ্যা ছিল ৩৬জন। তাছাড়া ১৪জন গ্রীক, ১২জন ডাচ, ৮জন নরওয়েবাসী পাইলট ছিল। আর ৯জন ছিল অন্যান্য দেশের পাইলট। বৃটেন ও ফ্রান্স বৃটিশ-ফরাসী পাইলটদিগকে কাজ পরিত্যাগ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া জাহাজ চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিতে অবশ্যই পারে। ইহাতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অভিযোগ উপস্থিত করিবার একটা ভাল কারণ পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তবে মিশর নিরপেক্ষ দেশগুলি হইতে যথেষ্ট সংখ্যক পাইলট পাইতে পারে। মিশরেও দ্রুত গতিতে পাইলটের কাজ শিক্ষা দেওয়া সুরু করা হইয়াছে। কাজেই এই পন্থা তেমন কার্য্যকরী না-ও হইতে পারে। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে অভিযোগ উত্থাপন করিলে উহার ফল কি হইবে তাহা বলা বড় সহজ নয়। সামরিক শক্তি প্রয়োগের মঞ্জুরী একমাত্র নিরাপত্তা পরিষদই দিতে পারে। কিন্তু সেখানে আছে রাশিয়ার ভেটোর ভয়। এই ভেটো উপেক্ষা করিয়া যদি সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয়, তবে সুয়েজ খালের জলেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ভরাডুবী হইবে।

প্রেসিডেণ্ট নাসের কায়রোতে একখানি গ্রীক পত্রিকার প্রতিনিধির নিকট ইঙ্গ ফরাসী সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ অবস্থার জন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছেন। তিনি আশা করেন, আরবরাষ্ট্রগুলি মিশরের পক্ষাবলম্বন করিবে। তিনি ইহাও মনে করেন যে, সুয়েজ খাল সমস্যায় মিশর আক্রান্ত হইলে আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত সারা বিশ্বে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। কর্ণেল নাসেরের অনুমান যে ঠিক, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করার গোড়াতেই বৃটেন ও ফ্রান্স যে রণহুঙ্কার ছাড়িয়াছে তাহা নিছক ধাপ্পা কি না এই বার তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। ধাপ্পা না হইলে সশস্ত্র আক্রমণ দ্বারা সুয়েজ খাল দখলের চেষ্টাকে police action বলিয়া অভিহিত করিলেও উহা আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিবে, সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা নাই। আঞ্চলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী-শক্তিবর্গের তৈলস্বার্থ তো বিনষ্ট হইবেই, সুয়েজ খালও ধ্বংস হইবে।

—১২ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬।

রঙ্গপট



সূর্য্যমুখী

সু-সাহিত্যিক গজেন্দ্রকুমার মিত্রের গল্প, 'অর্দ্ধাঙ্গিনী' খ্যাত জনপ্রিয় পরিচালক বিকাশ রায়ের পরিচালনা। অন্যায়ের প্রতিবাদে সদ্যবিবাহিত স্বামী জেলে যায়, প্রিয় বন্ধুকে ভার দিয়ে বাড়ীর দেখাশুনোর। বন্ধু করলে বিশ্বাসঘাতকতা। স্বামী ফিরে এল —স্ত্রী বললে "ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাকো"···ব্যাপার শুনে স্বামীর মন গেল বিগড়ে। লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি। তার পর অনেক রকম ঘটনার পর পুনর্মিলন। তাও আবার স্ত্রীর পায়ে ধরে (ঠিক পা অবশ্য নয়, হাঁটু ধরে)। জেল থেকে ফিরে এল রমানাথ সেই বিয়ের দিনের মতই দিব্যকান্তি চেহারায়, এতটুকু কালিমা পড়ল না! স্ত্রী চেয়ারে বসে, স্বামী হাঁটু গেড়ে মাটিতে বসে পড়ল, স্ত্রীর হাঁটু ধরে ক্ষমা ভিক্ষা করলে,—কোনো মহিলা পরিচালক হলে না হয় বোঝা যেত নারীকে তিনি উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করছেন, কিন্তু বিকাশ রায় এ কি কাণ্ড করলেন? চিত্রনাট্য অত্যন্ত দুর্বল, ছবির আরম্ভই হচ্ছে এক বার সন্ধ্যারাণী এক বার ফুল, দর্শকরাও ক্রমাগত এই দেখতে দেখতে বলে ওঠেন 'ফুল'। ছবির গতিও স্বচ্ছ নয়। অভিনয়ে সন্ধ্যারাণী ও বিকাশ রায়কে ভাল লাগবে। অভি ভট্টাচার্য ভালোই তবে একটু যেন আড়ষ্ট, বিশেষ করে তাঁর অভিব্যক্তিগুলি অত্যন্ত কাঠখোট্টা। চমৎকার অভিনয় করেছেন বাঙলার সত্যিকারের এক জন প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী মঞ্জু দে। সু-অভিনয়ে চরিত্রগুলির মর্যাদাবৃদ্ধি করেছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, সন্তোষ সিংহ (পুস্তিকাতে নামই নেই) তুলসী চক্রবর্তী, মিহির ভট্টাচার্য, জীবেন বসু, বাণী গাঙ্গুলী, রেবা বসু, অপর্ণা দেবী, পঞ্চানন ভট্টাচার্য। নতুনত্ব সৃষ্টি করেছেন রস-সাগর ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরযোজনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

রাজপথ

যা হবার তা একেতেই হয় আর যা হবার নয় তা একশো এক কেন—হাজার এক দিয়েও হয় না—তা যে সত্যিই হয় না, তারই জীবন্ত প্রমাণ একশো এক তারকা অভিনীত "রাজপথ।" বর্ষীয়ান সর্বজনশ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক উপেন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের বিখ্যাত কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এই কথাচিত্রের সারাংশ। নায়ক সুরেশ্বর এক আশাবাদী দেশসেবী শিক্ষিত তরুণ, সংসারে আছে তার মা ও বোন, নায়িকা সুমিত্রা এক শিক্ষিতা অর্থবান ম্যাজিস্ট্রেট-নন্দিনী, বাবা তার প্রত্যেকটি কাজের সমর্থক; মা ভালবাসেন সোসাইটিকে সব কিছুর চাইতে—তিনি চান মেয়ের সঙ্গে তরুণ ম্যাজিস্ট্রেট বিমানের বিয়ে দিতে—সুরেশ্বরের আদর্শ হাসিমুখে গ্রহণ করে সুমিত্রা, কিন্তু তাকে নিরস্ত করতে যান তার মা ও বিমান, শেষে বিমানও নত হয় সুরেশ্বরের কাছে। তারও বহু পরে সুমিত্রার মা জয়ন্তী প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করে সুরেশ্বরকে মেনে নেন সুমিত্রার স্বামী হিসাবে। কিন্তু এরই মধ্যে আছে বহুতর চরিত্র, আছে বহুতর ঘটনা, আছে বহুতর পরিণতি। হাজারো রকমের ঘটনা ঢোকাতে গিয়ে মূল কাহিনীই বাধা পেয়েছে তার প্রসারের পথে। ছবিতে দেখানো হচ্ছে সুমিত্রার ব্যবহারে কষ্ট পেয়ে জয়ন্তী বলছেন—'আমি কাশী চলে যাব' তাঁর মতন 'সোসাইটি-লেডী'র পক্ষে কাশী বাস কল্পনাও সম্ভব কি? অন্ধ ভিখারী ও তার স্ত্রীকে দেখতে পাচ্ছি প্রমদারঞ্জনের বাড়ীর অভ্যন্তরে গিয়ে একটি উদ্যানে গান শোনাচ্ছে সুমিত্রাকে। এ জিনিষ পল্লীগ্রামে সম্ভব; সেখানে বাউল-ভিখারী অন্ধ প্রভৃতির অবারিত দ্বার, যেখানে খুশী গিয়ে তারা গান শোনাতে পারে কিন্তু এখানে প্রমদারঞ্জনের মত ধনী ব্যক্তির গৃহে অন্ধ ভিক্ষুকের ঢোকা অসম্ভব নয় কি? দ্বারবান তাকে ছাড়বে কেন? যে বিপিন বোসের অন্ন খেয়ে কালাতিপাত করে তার শ্যালক ও চাটুকারের দল—সেই বিপিন বোসেরও সামনে তাঁর নাম শুনে 'দুর্গা দুর্গা' ক'রে সেই নাম শ্রবণ খণ্ডন করা কি সেই সব আশ্রিতদের পক্ষে সম্ভব? বলাই-নীলিমা-মানসী অধ্যায়টিতে হঠাৎ সুরেশ্বর এসে পড়ল কোত্থেকে? অমর মল্লিক অভিনীত চরিত্রটি কি 'প্রফুল্ল'র ভজহরিকে স্মরণ করায় না? নীতীশ মুখোপাধ্যায় ও স্বাগতা চক্রবর্তীকে ভূমিকাভুক্ত করার প্রয়োজন ছিল কি? তবু নীতীশ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে কিছুটা কাজ করানো হয়েছে, তবে স্বাগতা চক্রবর্তী একেবারে নির্বাক, দু'চারটে বাক্যি তাঁর মুখে জুড়ে দিলে খুব অশোভন হোত না। অভিনয়ে বহু খ্যাত ও অখ্যাত শিল্পীর সমাবেশ ঘটেছে। সর্ব প্রথমেই অভিনন্দন পাবেন নায়ক বসন্ত চৌধুরী, সমস্ত ছবিটি তাঁর অভিনয়ে একটি সম্পদ বিশেষ। এঁর পরেই অভিনন্দনের অধিকারী জহর গঙ্গোপাধ্যায়, ধীরাজ ভট্টাচার্য, অসিতবরণ ও মলিনা দেবী। অন্যান্যেরাও নিজেদের সুনাম বজায় রেখে গেছেন। শৈলেশ দত্তগুপ্ত নিজের সুনাম বজায় রেখেছেন মাত্র, তবে বিশেষ কিছু কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন সুপ্রতিষ্ঠ পরিচালক গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, আমরা এঁর আগামী উপহার 'ছায়াপথ' ও 'মীরাবাঈ'এর প্রতীক্ষায় রইলুম।

একদিন রাত্রে

যেমনই চমৎকার গল্প তেমনই সুন্দর তার গতি। বর্তমানকালের শোচনীয় দিনগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের গল্পের আবেদন সার্বজনীন সহানুভূতি ও সম্বর্ধনা যে লাভ করবে, তা সুনিশ্চিত। আজকের সমাজে মানুষ কি অবস্থায় বাস করছে, একটি নিরীহ লোককে ধরবার জন্যে পুলিশ আসে, আসে সাংবাদিকদের দল, বাড়ীর

বাসিন্দাদের মধ্যে সৃষ্টি হয় স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী, একটি রাত্রে সারা বাড়ীতে একটা দুর্দান্ত সাড়া পড়ে যায় অথচ সেই বাড়ীতেই সভ্য-সম্মানিত নাগরিকের মুখোস পরে যাঁরা বাস করছেন তাঁরা প্রত্যেকেই এক-একটি নরপিশাচ গোছের। কেউ রেসের জন্যে স্ত্রীর গহনা করেন চুরি, কেউ গভীর রাত্রে বাড়ী এসে সাধ্বী স্ত্রীকে আদেশ করেন অশ্লীল গান গাইতে, কেউ ফোঁটা-তিলক কেটে রাধামাধব করছেন—ও কোন ঘোড়া কত নম্বর বাজীতে জিতবে সেকথাও চিন্তা করছেন, আবার কেউ করছেন মদ-চোলাই, কেউ চালে মেশাচ্ছেন কাঁকর, কেউ চায়ে মেশাচ্ছেন কাঠের গুঁড়ো, কেউ গুপ্তঘরে ছাপাখানা বসিয়ে ব্লক তৈরী করে ছাপাচ্ছেন প্রচুর জাল নোট, কেউ ব্যবসা করছেন চোরাই আফিমের—নানা ভাবে, নানা উপায়ে মানুষের বন্ধু সেজে মানুষের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন অবাধে, তাদের ধরতে, তাদের শাস্তি দিতে কারোর উদ্ধত হস্ত প্রসারিত হয়ে আসে না। অথচ একটি সরল চাষী তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি বিরাট বাড়ীতে ঢুকে পড়ে জল খেতে, 'চোর চোর' করে চেঁচিয়ে ওঠে দ্বাররক্ষক, পরে যা হৈ-হৈ ব্যাপার। (যার বিশদ বর্ণনা আগে করে গেছে) কি করবে সে বেচারা? ভয়ে সে ঢুকে পড়ে এক-একটি ঘরে এবং ঘরেই প্রত্যক্ষ করে হরেক রকমের চুরি (এগুলিরও বর্ণনা আগে করা হয়েছে)। তার পর পুলিশই প্রথম বের করে চোলাই মদ, একে একে প্রত্যেকেই পড়ে ধরা—মুখোস পড়ে খুলে, নায়ক ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায়, নিকটস্থ এক মন্দিরে এক তরুণী নিবারণ করে তার দুর্বার সারারাত্রির তৃষ্ণা। গল্পের শেষের দিকটা অপূর্ব জমে উঠেছে—একটি বালিকার সারল্য মন একটি নারীর দয়া করুণা ছবিটির সম্পদ বিশেষ। তবে প্রথমেই দেখানো হচ্ছে, রাত পৌনে একটায় ট্রাম চলেছে, রাত পৌনে একটায় বাস চলে কিন্তু ট্রাম চলে কি? সুমিত্রা দেবীর ভূমিকাংশ পটেশ্বরী'র চরিত্রই মনে করায়। একটি প্রশ্ন দেখা গেল হঠাৎ একের পর এক শয়তানের দল ধরা পড়েছে। ওটা কি করে হোল ঐ জায়গাটা একটু অস্পষ্ট থেকে গেছে। যে বালিকা নায়ককে প্রবোধ দিলে মুছিয়ে দিলে তার অশ্রু—সেই ফ্ল্যাটটিতে আর কাউকে দেখা গেল না কেন সমস্ত ফ্ল্যাটটিতে মেয়েটি একলাই থাকে না কি? অভিনয়াংশে রাজ কাপুরকে কি বলে অভিনন্দন জানাব ভেবে পাচ্ছি না। অল্প সংলাপ এবং শুধু অভিব্যক্তি—এত নিখুঁত ভাবে চরিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন রাজ কাপুর তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। সরল গ্রাম্য চাষীর যে রূপ তিনি ফোটালেন তা দেখে মনেই হয় না যে এই চাষীর রূপসজ্জার আড়ালেই লুকিয়ে আছেন বোম্বাইয়ের সুশিক্ষিত অভিজাত নাগরিক শ্রীরাজ কাপুর তাঁর খুকুমণিকে আমি চোর নই আমি চোর নই এ অভিনয় ভোলবার নয়। ছবি বিশ্বাস বোম্বাইয়ের দরবারে বাঙলার মুখ উজ্জ্বল করেই এসেছেন। নটপার্থের অভিনয় অনবদ্য হয়েছে। চমৎকার অভিনয় হয়েছে ভেজী ইরাণীর। সুন্দর হয়েছে সুমিত্রা দেবীর অভিনয়। দুঃখহরণ রামকৃষ্ণের আলেখ্যের কাছে আত্মসমর্পণ, এই জায়গাটি অপূর্ব করেছেন সুমিত্রা দেবী। প্রদীপকুমার ও স্মৃতিরেখা বারেকের জন্যে দেখা দেন। পাহাড়ী সান্যাল, কালী সরকার, গঙ্গাপদ বসু, ইফতিকার, নেমো,

সুলোচনা চট্টোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী নন্দ বাবু দর্শক-মন ভরিয়ে দিয়েছেন তাঁদের সু-অভিনয়ে. নার্গিসের অভিনয় ভালোই হয়েছে, নাই বা রইল সংলাপ, তার মধ্যেই তো কৃতিত্ব—প্রচারবিদরা যে কেন নার্গিসের নামটা বাদ দিলেন বোঝা গেল না। পরিশেষে আবার অভিনন্দন জানাই প্রযোজক কাপুর ও পরিচালকদ্বয় শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্রকে, এ-রকম একটি সারবান গল্প ছায়াচিত্রের মারফৎ দর্শক সাধারণকে উপহার দেবার জন্যে। ছবিটির শেষের দিকে যে কল্পনা বা আশা এরা করেছেন, কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি শিল্পীদের এ স্বপ্ন সফল হোক।

গ্রন্থের নাম চুরি !

কিছু কাল থেকে দেখা যাচ্ছে যে, কোন একটি বিখ্যাত লেখকের বইয়ের নাম বেমালুম ভাবে অনুকরণ করে বাঙলা ছায়াছবির নামকরণ করা হচ্ছে। এই মনোবৃত্তি কতটা ক্ষতিকর, সে কথা আলোচনা ক'রে কাজ নেই, তবে এ অত্যন্ত হীনতার লক্ষণ। এমনও দেখা গেছে, একটি বইয়ের মূল নাম বদলে দিয়ে ছবিতে রবীন্দ্রনাথের একটি নৃত্যনাট্যের নাম হুবহু রাখা হয় (শাপমোচন)। তেমনই কবিগুরুর 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নামেই আর একখানি ছবিও মুক্তি প্রতীক্ষিত বলে শোনা গেছে। এ ছাড়া সম্প্রতি বছর তিনেক আগে 'পথিক' বলে যে ছবিটি এসেছিল—ঐ নামেই গোকুল নাগের একটি জনপ্রিয় উপন্যাস ছিল। ইদানীং চোখে পড়ল যে, আধুনিক সাহিত্যিকদের রচনা থেকেও ছায়াছবিতে নাম নেওয়া হচ্ছে। জনপ্রিয় সাহিত্যিক প্রাণতোষ ঘটকের 'খেলাঘর' বইটি সম্প্রতি প্রকাশলাভ করলেও আজ প্রায় বছর খানেক ধ'রে তা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে। হঠাৎ দেখা গেল, অজয় কর একটি ছবি পরিচালনা করছেন ঐ নামেই। আমাদের প্রশ্ন যে, সাহিত্যিকদের কাছে ছায়াচিত্র যে কি পরিমাণে ঋণী, তার তো তুলনাই হয় না ; তার উপর আবার এই নামকরণটুকু পর্যন্তও কি তাঁদের দেওয়া নাম ভাঙিয়েই চলবে ? যাঁরা এত কাণ্ড করে পূর্ণ-দৈর্ঘ ছবি তৈরী করছেন—একটিমাত্র নামকরণ করতে কি তাঁরা একেবারে অপারগ ? এ চৌর্যবৃত্তি ত্যাগ করা কি তাঁদের পক্ষে নিতান্তই অসাধ্য ? আমাদের মনে হয়, এখনও সময় আছে, খেলাঘরের নামটি বদলে অন্য কিছু নাম রাখা হোক।



বিনতা রায় (টাকা-আনা-পাই চিত্রের একটি বিশেষ ভূমিকায়)

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

রমাপদ চৌধুরীর সাহিত্যিক খ্যাতি আজকের দিনে সর্বজন-পরিচিত। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর অবদান কারো অজানা নয়। তাঁর উপন্যাস 'প্রথম প্রহর' এবার পর্দার বুকে দেখা দেবে বাণী চিত্রমের প্রযোজনায়। শোনা যাচ্ছে ছবিটি তপন সিংহই পরিচালনা করবেন। প্রথম প্রহরের উপাদান রেলকুঠীর পরিবেশে একটি শিশুর যৌবন-সন্ধিক্ষণে উপনীত হওয়ার কাহিনী। ভারতে প্রথম রেললাইন পত্তনের অনেক তথ্যই পরিবেশিত হয়েছে রমাপদ চৌধুরীর সুরসাল লেখনীর মাধ্যমে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে কত যে আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগের স্মৃতি বিজড়িত তার তুলনা নেই। বিপ্লবী বীর বাঘা যতীনের নামও সেই সব মুক্তিকামী সন্তানদের নামের মধ্যে অমলিন হয়ে আছে। বিপ্লবী নেতার জীবন কাহিনী অনেক পরিশ্রম করে তুলেছেন পরিচালক হিরণ্ময় সেন। এই ছবির জন্যে শ্রী সেন বহু জায়গায় ঘুরে বহু উপকরণ সংগ্রহ করে এই দুরূহ কাজে হাত দিয়েছেন। এই চিত্রে রবীন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, শ্রীঅরবিন্দ, বিপিন পাল, তিলক, সুরেন্দ্রনাথ, রাসবিহারী, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল, যাদুগোপাল, মানবেন্দ্রনাথ রায়, চার্লস্ টেগার্ট, ডেনহাম প্রভৃতি বহু চরিত্রের সমাবেশ ঘটবে। শ্রদ্ধেয় পরিচালক নটশেখর শ্রীনরেশ মিত্রের পরিচালনায় ও শ্রীমতী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় নীহার গুপ্তের মঞ্চ সফল নাটক 'উল্কা'র চিত্ররূপ গড়ে উঠছে। সঙ্গীতের ভার পেয়েছেন সুধীন দাশগুপ্ত। রূপায়ণে থাকছেন—কমল মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেশ্বর সেন, অনিল চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু, জহর রায়, সুনন্দা দেবী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, যমুনা সিংহ এবং বিলিতি পাড়ার বিখ্যাত নর্তকী লিন ও লিজ। এম-ডি-পি পিকচার্সের নবজাতক এর কাজ এগিয়ে চলেছে, মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় দেখা দেবেন রবীন মজুমদার ও সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যাংশে আছেন মহেন্দ্র গুপ্ত, দীপক মুখোপাধ্যায়, জহর রায়। বাদল পিকচার্সের তৃতীয় ছবি 'পরের ছেলে'র পরিচালনা করছেন উদীয়মান তরুণ পরিচালক অর্ধেন্দু সেন। অর্ধেন্দু সেন শক্তিমান পরিচালক, তাঁর পরিচালিত এই ছবিটিতে শিল্পিরূপে দেখা দেবেন জহর গাঙ্গোপাধ্যায়, অসিতবরণ, মলিনা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী প্রভৃতি। চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ। এইচ-এন-সি প্রোডাকসন্সের আগামী ছবি 'পৃথিবী আমারে চায়'। সঙ্গীতের ভার পড়েছে নচিকেতা ঘোষের উপর ও পরিচালনা করেছেন নীরেন লাহিড়ী। উত্তমকুমার, অসিতবরণ, অনুপকুমার, গঙ্গাপদ বসু, শ্যাম লাহা, তুলসী চক্রবর্তী, চন্দ্রা দেবী, সন্ধ্যারাণী দেবী, মঞ্জু দে, মালা সিন্‌হা, রেণুকা রায়, অপর্ণা দেবী। শ্যামের প্রথম ছবি "শেষ পরিচয়", বিমল ঘোষের

কাহিনী অবলম্বনে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত পরিচালনায় এই কাহিনী চিত্রায়িত হচ্ছে। রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, ছায়া দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, তপতী ঘোষ প্রভৃতি।

শুক্রবারের বেতারনাট্য

কলকাতা বেতার-কেন্দ্রের নাট্য পরিবেশন বর্তমানে বেশ উন্নতি করেছে, নিশ্চয়ই বলা যায়। নাটক মনোনয়ন, অভিনেতা-অভিনেত্রী নির্বাচন এবং প্রযোজনা পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রগতিশীল হয়েছে। কিছুকাল আগেও বেতার-নাটকের জন্যে বাছা হয়েছে যত বস্তা-পচা মঞ্চ-ঘেঁষা নাটক, যাদের প্রশংসা করতে পারা যায় নি। বেতারের কর্মীদের শিশির-অহীন্দ্র বানিয়ে বাদশাহ থেকে ভিখারীর পর্যন্ত পার্ট করানো হয়েছে। অধুনা এই সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনে আমরা খুশী হয়েছি। বেতার-কেন্দ্রের বাইরেও যে অনেক সুঅভিনেতা-অভিনেত্রী আছেন, বেতার-কর্তৃপক্ষ তাঁদের প্রতি দৃষ্টি দেওয়ায় বর্তমানে নাটকও বেশ ভালই জমছে। সাম্প্রতিক অনুষ্ঠিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের নাম আমরা উল্লেখ করছি।

১লা ভাদ্র—নিরুদ্দেশ, কাহিনী—প্রেমেন্দ্র মিত্র, নাট্যরূপ—মন্মথ চৌধুরী, পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য্য, রূপায়ণে—অনিল চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, গোকুল মুখোপাধ্যায়, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, চন্দ্রশেখর দে, শঙ্করপ্রসাদ ঘটক, শচীন গোস্বামী, কানাই কুণ্ডু, শ্যামল ঘোষ, আরতি মৈত্র নমিতা হালদার, কণিকা মজুমদার, অরুণপ্রভা চট্টোপাধ্যায়। * * ৮ই ভাদ্র—দ্বৈরথ, কাহিনী—বনফুল, নাট্যরূপ—অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রূপায়ণে—রামকৃষ্ণ রায়-চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত ভট্টাচার্য, মণীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ব্রজসুন্দর দাস, কেষ্ট দাস, গোপী দে, দক্ষিণারঞ্জন ঘোষাল, জগবন্ধু ঘোষ, পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়, সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোৎস্না চট্টোপাধ্যায়, নীলিমা দাস। * * ১৫ই ভাদ্র—রাহু, কাহিনী ও নাট্যরূপ—নীহার গুপ্ত, পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য, রূপায়ণে—ধীরাজ ভট্টাচার্য, তড়িৎ রায়, বলীন সোম, অজিত রায়, শিপ্রা মিত্র, গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা সিং, ব্রততী মুখোপাধ্যায়। * * ২২শে ভাদ্র—নারীজন্ম, কাহিনী—নাট্যরূপ—সলিল সেন, পরিচালনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রূপায়ণে—অমরেশ ঘোষ, পবিত্র মিত্র, রাধারমণ পাল, সুধা রায়, গোপা পাল। * * ২৯শে ভাদ্র—নারায়ণী, কাহিনী—ডক্টর নরেশ সেনগুপ্ত, পরিচালনা—শ্রীধর ভট্টাচার্য, রূপায়ণে—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, হরিমোহন বসু, মণি চক্রবর্তী, সত্য রায়, কালীপদ চক্রবর্তী, মোহনদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, পশুপতি কুণ্ডু, শ্যামল ঘোষ, সরযূবালা দেবী, অমিতা বসু, বেলারাণী দেবী, লীলাবতী দেবী। উপরিউক্ত নাটকগুলির প্রযোজক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে শিল্পীদের মতামত

উদীয়মান অভিনেতা শ্রীবসন্ত চৌধুরী

এ যুগের উদীয়মান শিল্পী শ্রীবসন্ত চৌধুরী। সে দিন আলোচনা চললো আমাদের দু'জনার ভেতর—আলোচনা অন্য কিছু নিয়ে নয়, চলচ্চিত্র-শিল্পকে কেন্দ্র করেই।

"—বরাবরই আমার ইচ্ছে ছিল অভিনয় করবো এবং অর্থ উপার্জ্জন করবো সৎপথে থেকে। সে ইচ্ছের তাগিদেই সিনেমা-লাইনে আমার আসা,"—ধীরে ধীরে বলতে থাকেন শ্রীচৌধুরী। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের দিকে আমার বিশেষ ঝোঁক ছিল এবং অভিনয় আমি ভালই করতুম। আমার অভিনয় দেখে স্কুলের প্রধান-শিক্ষক আমাকে উৎসাহিত করেন। অভিনয়-জগতে আসবার প্রেরণার প্রথম উৎস বোধ হয় এইখানেই।

কোন ছবিতে কোন ভূমিকায় অভিনয় করে আপনি সব চেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন?—জানতে চাইলুম আমি।

—পাঁচ বছর মাত্র হ'লো আমি এ লাইনে এসেছি। নিউ থিয়েটার্স-এর 'মহাপ্রস্থানের পথে' আর এর হিন্দি রূপায়ণ 'যাত্রিক' ছবিতে আমি অবতরণ করি শিল্পী হিসেবে। সেটি ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি। এর পর কতকগুলো ছবিতেই আমি অভিনয় করলুম এবং এখনও করছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, অভিনয়ে পুরোপুরি তৃপ্তি আজও বুঝি আমার পাওয়া হ'লো না।

ছবিতে আত্মপ্রকাশের পর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে পরিবর্তন কিছু ঘটেছে কি না, যদি প্রশ্ন করেন তবে বলবো, শ্রীচৌধুরী নিঃসঙ্কোচে বলে চলেন,—সিনেমা-লাইনে এলুম বলে পারিবারিক জীবনে খুব একটা পরিবর্তন বুঝি নি। সামাজিক জীবনের প্রসঙ্গে বলতে পারি সেখানে আমার movement restricted করতে হ'য়েছে। অপর দিকে চলচ্চিত্রে যোগদানে ব্যক্তিগত দ্বিধা বা আপত্তির প্রশ্নই ওঠেনি আমার মনে কোন কালেই।

—সাধারণতঃ আপনার দৈনন্দিন কর্মসূচী কি এবং আপনার বিশেষ কোন Hobby আছে কি না?



শ্রীবসন্ত চৌধুরী

—দৈনন্দিন কর্ম্মসূচীর মধ্যে বিশেষত্ব কিছু নেই আমার। সকালে উঠে মুখ-হাত ধুয়ে প্রথমেই ব্যায়ামচর্চ্চা করি। স্যুটিং আমার প্রায়ই থাকে। তাই সকাল সকাল স্নান ইত্যাদি সেরে বেরিয়ে পড়তে হয় ষ্টুডিওতে। কোন কোন দিন ষ্টুডিওর কাজ শেষে ছবি দেখতে যাই। শীতকালে রাত্রিতে টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলে থাকি। বিশেষ হবি বলতে আমার কি আছে? ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন প্রাচীন শিলালিপি, মূর্ত্তি, মুদ্রা ইত্যাদি নানা ধরণের পুতুল যাতে থাকবে শিল্প-চাতুর্য্য, এ সকল সংগ্রহে আমি প্রচুর আনন্দ পাই এবং আমার Hobby এটাকেই বলতে পারেন। খেলাধূলোর ভেতর দেখতে ভাল লাগে আমার ফুটবল। আর খেলতে ভালবাসি ব্যাডমিন্টন, টেনিস, বিলিয়ার্ডস্ আর মেগং (চীনেদের জনপ্রিয় খেলা)। পোষাক পরিচ্ছদের ভেতর কি আমার পছন্দসই জিজ্ঞেস করলে, সোজাসুজি বলবো—I like oriental costume than the western.

বসন্ত বাবু নানা আলোচনার মধ্যে তাঁর রুচি ও জীবনধারা সম্পর্কে আরও কিছু জানালেন আমাকে। বললেন—সব রকম পুঁথি পুস্তক, পত্র-পত্রিকা পড়বার আমার অভ্যাস আছে। ছোট গল্প ও কবিতা পড়ার আমার বিশেষ ঝোঁক, এটুকুও বলবো। আর বলবো দেশী-বিদেশী ম্যাগাজিনগুলোর ভেতর 'মাসিক বসুমতী'ও আমি পড়ে থাকি বিশেষ ভাবে।

চলচ্চিত্রে যোগদানের জন্য কি কি বিশেষ গুণ না থাকলেই নয় বলে আপনি মনে করেন?

দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর করলেন শ্রীচৌধুরী—first and fore most qualification-ই, হলো অভিনয়দক্ষতা অর্থাৎ to know how to act, সে সঙ্গে অপরিহার্য্য ভাবে চাই চেহারা, voice এবং কাজের sincerity,

এ' তো হলো কুশলী শিল্পী হতে যা যা চাই। এবারে জানতে চাইব—ভাল ছবি তৈরী করতে হলে কি করা প্রয়োজন? বসন্ত বাবুর দিকে তাকিয়ে আমি প্রশ্নটি তুললুম।

—ভাল ছবির জন নিঃসংশয়ে চাই ভাল গল্প। এটা প্রথম দাবী। তার পরেই চাই ভাল অভিনয় ও ভাল technical work, এ সবের সমন্বয় হলে ছবি ভাল না হ'য়েই পারে না, অন্ততঃ আমার ধারণা এই।

—চলচ্চিত্রে শিক্ষিত ও অভিজাত পরিবারের ছেলে-মেয়েদের যোগদান সম্পর্কে আপনার নিজস্ব মতামত কি?

বেশ জোর গলায় উত্তর করলেন বসন্ত বাবু—এ লাইনে যিনিই আসতে চাইবেন, আসতে বাধা নেই। এ ব্যাপারে শিক্ষিত অভিজাত বলে differentiate আমি করতে চাইনে। পুরুষই হ'ন আর নারীই হন এ পেশাকে seriously নেবার আগ্রহ যাঁর থাকবে, অনায়াসেই তিনি এ লাইনে আসতে পারেন। আজকের দিনে পরিবেশ ও আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে আরও এটি improve করবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্রের স্থান কোথায়? জানতে চাইলুম আমি শ্রীচৌধুরীর কাছে।

—চলচ্চিত্র সমাজ-জীবনে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে অন্ততঃ এ যুগে। আমাদের দেশে তো বটেই, অন্যান্য দেশেও এটা হচ্ছে best medium of entertainment. শুধু তাই নয় it has much educative value—এর মাধ্যমে অনেক বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষালাভ করা যায়। আজকাল সরকারও এ শিল্পটির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন এবং এটি আশার কথা।

বাঙ্গালা ছায়াচিত্রের কোন কোন পরিচালক ও অভিনেতা অভিনেত্রীকে আপনার বিশেষ ভাবে ভাল লাগে?

আমার এ হালকা প্রশ্নটি শুনে বসন্ত বাবু একটু চিন্তা করলেন দেখলুম। তার পর ইতস্ততঃ ভাব নিয়ে ব'ললেন—এ ধরণের প্রশ্নের উত্তর করা যে খুব সহজ নয়। পরিচালক ও অভিনেতা অভিনেত্রীদের মধ্যে ভাল আমার অনেককেই লাগে। সকলের সঙ্গে অবিশ্যি আমি কাজের সুযোগ পাইনি, তবে ছবিতে দেখেছি ও বুঝেছি অনেককে, বিশেষ ভাবে কারো সম্পর্কে বলা আমার ঠিক হবে না। তবু যদি একান্তই বলতে হয় সকলের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলবো, পরিচালকদের ভেতর দেবকী বাবু (শ্রীদেবকী বসু), সুশীল মজুমদার, নীরেন লাহিড়ী, নির্ম্মল দে এবং এখনকার সত্যজিৎ রায়, অসিত সেন, বিকাশ রায়—আর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, উত্তমকুমার, মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, সন্ধ্যারাণী এঁরা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বিশেষ ভাবে।

এভাবে আলোচনার শেষ পর্য্যায়ে আসা গেল। আমার একটিমাত্র প্রশ্ন তখন বাকী—আপনার প্রথম জীবন কি ভাবে কাটে এবং ভবিষ্যৎ জীবনই বা কি ভাবে কাটাতে চান?

ধীর কণ্ঠে উত্তর দিয়ে বললেন শ্রীচৌধুরী—নাগপুরে আমার জন্ম হয় ১৯২৮ সালে; তার পর নাগপুরে স্কুল-কলেজেই আমার পড়াশুনো। ১৯৪৯ সাল পর্য্যন্ত আমার ছাত্রজীবন চলে এবং বি, এ পরীক্ষা দিয়েই সেটি শেষ হলো। তার পর একটি বছর কাটে বেকার-জীবন। আমার বহু দিনের স্বপ্ন সফল হলো যখন ১৯৫১ সালে সিনেমা-জগতে আমি নামলুম। প্রথম জীবন বলতে আমার পরিচয় আর কি দেবার আছে? ভবিষ্যৎ জীবন কি ভাবে কাটাতে ইচ্ছে করি সে আমার নিকট কোন প্রশ্ন নয়। শিল্পী আমি, শিল্পি-জীবন কাটানই আমার উদ্দেশ্য। লোককে আনন্দ বিতরণ করে এবং সে সঙ্গে নিজেও কিছুটা পেয়ে জীবন কাটিয়ে দেওয়াই আমার চরম লক্ষ্য।

শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী



দেখি দেখি, শীগ্‌গির 'ডেটল' টা দেখি!

কোথাও কেটেকুটে গেলে, এমনকি আঁচড় লাগলেও মারাত্মক রোগে পড়তে পারেন। গায়ের চামড়া ছ'ড়ে বা কেটে গেলে সেখান দিয়ে পিলপিল ক'রে জীবাণু আপনার শরীরের ভেতরে ঢুকে পড়তে পারে। আমাদের চারদিকে হাওয়ায়, জিনিষপত্তরে, এমন কি আমাদের গায়ের চামড়ায় সব সময় লক্ষ লক্ষ জীবাণু ছড়িয়ে আছে। তার মধ্যে অনেক জীবাণুই রোগ ব'য়ে আনে। এদের হাত থেকে—রোগ-সংক্রমণের হাত থেকে—বাঁচতে চান তো কাটা-ছেঁড়ায় চট্‌পট্ 'ডেটল' লাগাবেন। ডাক্তাররা 'ডেটল' লাগাতে বলেন, কারণ 'ডেটল' এর মতো শক্তিশালী জীবাণুনাশক আর নেই। এর গন্ধটিও ভালো। আজই এক শিশি 'ডেটল' কিনে নিন।

প্রতিকারের আগেই প্রতিরোধ করা ভালো

'DETTOL'

ডাক্তাররা এই জীবাণুনাশকই ব্যবহার করেন

বাড়ীতে সব সময় 'ডেটল' রাখবেন

যাতে দরকার হলেই সবাই হাতের গোড়ায় পান। হাতমুখ ধোয়া কি বাড়ীর জিনিষপত্তর ধোয়ামোছায় 'ডেটল' ব্যবহার করবেন। রুগীর ঘরে স্প্রে ক'রে ছিটিয়ে দেবেন। ঘরের মেঝে বা নর্দমায় ময়লা জ'মে দুর্গন্ধ বেরুলে 'ডেটল' ছিটিয়ে দেবেন, নইলে অসুখ-বিসুখ হ'তে পারে।



'ডেটল' সম্পূর্ণ নিরাপদ—মেয়েদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আদর্শ। ছেলে হওয়ার সময় ডাক্তাররা 'ডেটল' ব্যবহার করতে বলেন, কারণ প্রসবপথে কোথাও এতটুকু কেটে-ছ'ড়ে গেলে প্রসূতি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন, এমন কি বলা যায়না, বন্ধ্যা হওয়াও আশ্চর্য নয়।



ছেলেমেয়েদের কোথাও কেটেকুটে গেলে কাল-বিলম্ব না ক'রে 'ডেটল' লাগাবেন। 'ডেটল' সম্পূর্ণ নিরাপদ, জীবাণুনাশক, গন্ধটিও ভালো। স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য শিশুদের 'ডেটল' ব্যবহার করতে শিখিয়ে দিলে খুব সহজেই ওদের অভ্যাস হয়ে যাবে।



বিনামূল্যে

"প্রতিকার অপেক্ষা প্রতিরোধ করা শ্রেয়ঃ" পুস্তিকাটি বিনামূল্যে পাওয়া যায়—
রেকিট অ্যাট্‌লান্টিস (ইস্ট) লিঃ, ডিপার্টমেন্ট এফ বি-১, পোঃ বক্স ৬৬৪, কলিকাতা-১ ঠিকানায় চিঠি লিখুন।

ATL 190

রাজায় রাজায়

[৭১৭ পৃষ্ঠার পর]

আনন্দকুমারীর কণ্ঠ কেঁপে উঠলো। বললে,—তার আগে একটুক বিষ দাও আমাকে। ম্যালেট আমার দেহকে পাবে, আমাকে নয়। তুমি কোথায় চললে? আমাকে একা ফেলে যাও কেন?

নৌকার পাটাতন থেকে একটি দাঁড় টানলেন চন্দ্রকান্ত। নিজের শুভ্র উত্তরীয় বাঁধলেন সেই দাঁড়ে। শত্রুপক্ষের যাতে দৃষ্টিগোচর হয়, তাই বন্ধুত্বের, আত্মসমর্পণের শুভ্রচিহ্ন তুলে ধরলেন চাঁদের আলোয়। যুদ্ধ নয়, শান্তি। মৈত্রী।

ম্যালেটও অর্ডার দিয়েছে তখনই। তেলেঙ্গী সিপাইরাও বন্দুক নামিয়ে নিয়েছে। কিন্তু ম্যালেটের বজরার গতি থামলো না। বজরা এই দিকেই আসছে, অতি ধীরে ধীরে।

নীলাভ কাচের ভিনিশিয়ান পানপাত্র রেখে দিলো ম্যালেট। ডিকেণ্টার উঁচিয়ে ধরলো। স্কচ দেশের চোলাই, যেমন স্বাদ তেমনি কাজ। মাপামাপি নেই, তাই একটু বেশী গলাধঃকরণ করতে হয় ম্যালেটকে। পাকস্থলীতে পৌছেই লাথি মারে যেন ঐ সোনালী জল! সারা অঙ্গে নেশা ছড়িয়ে পড়ে। হাসতে ইচ্ছা হয়।

বজরা যত নিকটে আসে ম্যালেটের হাসিও তত স্পষ্ট হয়।

চৌধুরাণীর কানে যেন বিষ ছড়ায় সেই বিকট হাসি। কানে হাত চাপে চৌধুরাণী; মরণ-বরণের কাতরতা তার ভয়ার্ত মুখে। রুদ্ধশ্বাসে বললে চৌধুরাণী,—আমাকে একা ফেলে তুমি কোথা যাও?

—তোমার জীবন রক্ষা পাবে আনন্দকুমারী। আমি রক্ষা পাবো না।

চন্দ্রকান্ত কথা বলতে বলতে কক্ষের বাইরে গেলেন আবার। বললেন,—ইংরাজের কাছে ন্যায়বিচারের মূল্য আছে। তুমি যীশুর নামে জীবনভিক্ষা চাও, ইজ্জৎভিক্ষা চাও, হয়তো মিলে যাবে। আমার মৃত্যু ছাড়া আর কোন' গতি হবে না। তুমি নারী, তাই তোমার প্রার্থনা হয়তো বৃথা যাবে না। আমি—

জলে ঝাঁপ দেওয়ার শব্দ শুনলো আনন্দকুমারী! অসম্পূর্ণ কথা শেষ হয় না আর। মখমলের শয্যায় লুটিয়ে পড়লো চৌধুরাণী, বিষম যন্ত্রণায়। অস্থিরতায় শিথিলবাস।

চন্দ্রকান্ত পাতালমুখে চলেন। ডুব-সাঁতারে জলের গভীরে চললেন তীরের বেগে। ম্যালেটের বারুদ যেন না স্পর্শ করতে পারে আর! চন্দ্রকান্ত গভীরতর জলে যেন মনুষ্যদেহের স্পর্শ অনুভব করেন। চন্দ্রকান্ত স্পর্শে বুঝলেন, সাড় নেই সেই দেহে। মাঝিদের এক জন হয়তো। আঘাত সামলাতে পারলো না?

মৃতদেহ ত্যাগ ক'রে আবার চললেন ফল্গু-সাঁতারে। এখন একটি বার জল থেকে শূন্যে মুখ তুলতে হবে। একবুক শ্বাস চাই। তার পর আবার নীচে নামতে হবে। তল থেকে অতলে যেতে হবে! জলের বেগ বিপরীত, সাঁতরাতে কষ্ট হয় বেশ। জল কাটতে বিলম্ব হয়। চন্দ্রকান্তের গতি যেন রুদ্ধ হ'তে থাকে বারে বারে। জলের বুকে মাথা তুলে শ্বাস ফেললেন অতি কষ্টে। পিছনে তাকিয়ে দেখলেন, ম্যালেটের বজরা কত দূরে? কান পেতে শুনলেন, বন্দুকের গগনভেদী শব্দ শোনা যায় কি না যায়। ঝাপসা দৃষ্টি চোখে। দেখলেন, চৌধুরাণীর নৌকার অতি নিকটে পৌছেছে ম্যালেটের বজরা। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যায়, তেলেঙ্গী সিপাইরা বজরার ছাদে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের নিকষ কালো দেহাকৃতি দেখা যায়।

চন্দ্রকান্ত তাঁর গৃহাভিমুখে এগোতে পারলেন না। পিছিয়ে আসতে হয়। এক বার ভাবলেন শাস্ত্রকথা, পথি নারী বিবর্জ্জিতা। চৌধুরাণীর আহ্বানে সাড়া না দিলেই ভাল ছিল। কুক্ষণে, তিনি সাড়া দিয়েছেন। আনন্দকুমারীর কাতর কথা শুনেছেন। তার কণ্ঠের মালা গ্রহণ করেছেন। শেষে তার সহযাত্রী হয়েছিলেন একই নৌকায়। অদৃষ্ট বিধাতা তাই হয়তো অলক্ষ্যে হেসেছেন! বিপদের আবর্ত্তে ঠেলে দিয়েছেন তাকে! চন্দ্রকান্ত দেখলেন, রাত্রি গভীর হয়েছে! ঘন হয়েছে জ্যোৎস্না! নক্ষত্রখচিত আকাশে রাত্রির পাখী উড়ছে। দেখলেন, নদীর দুই তীরে, বালুভূমির শেষে, নিবিড় জঙ্গল। চন্দ্রকান্ত আবার ডুব দিলেন জলের গহনে।

বজরা পত্রপুটার কাছাকাছি যেতেই ম্যালেট এক লাফ দেয় হনুমানের মত। বজরার ছাদ থেকে চৌধুরাণীর নৌকার ছাদে! বজরার মাঝিরা উল্লাসধ্বনি করলে। সিপাইরা ম্যালেটের জয়ধ্বনি শোনালে। মাল্লারণের স্তব্ধতা, গাম্ভীর্য্য সেই কলরোলে ভঙ্গ হয় না তবু। রাতের মাল্লারা যেন মৃতবৎ। বজ্রপাতেও সাড় ফেরে না তাদের!

পত্রপুটার কক্ষমধ্যে নামলো ম্যালেট। এক জন সিপাই তেলের লণ্ঠন ধ'রলে। সেই লণ্ঠনের আলোয় ম্যালেট দেখে, কক্ষ সুসজ্জিত। মখমলের শয্যা! সাদা পদ্মকাটা লাল শালুর চন্দ্রাতপ। সোনার আতর-দান, গোলাব-পাশ। পানীয় জলের পাত্র—রূপার কলস। মখমলের শয্যায় সাদা যুঁইফুল ছড়ানো। চৌধুরাণীর কণ্ঠমালা ছিন্নভিন্ন হয়ে ইতস্তত ছড়িয়েছে। শয্যার এক প্রান্তে লাল রেশমী রুমালে বাঁধা কয়েকখানি স্বর্ণালঙ্কার। আর শয্যার অপর প্রান্তে আনন্দকুমারী। যেন গভীর নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছে। নিদ্রা নয় মূর্চ্ছা, চৌধুরাণীর কোমল দেহে জ্ঞান নেই।

ম্যালেট সন্তর্পণে আনন্দকুমারীর কাছে এগিয়ে গেল। লণ্ঠনের আলোয় দেখলো তার আকাঙ্ক্ষিতাকে। তার কামনার হোমকুণ্ডকে! ম্যালেটের নেশাচ্ছন্ন চোখে আরও যেন নেশা ধরে। সাগ্রহে লক্ষ্য করে, আনন্দকুমারীর শ্বাস আছে না নেই। দেখলো, চৌধুরাণীর বক্ষদেশের উত্থান-পতন। আনন্দের হাসি ফুটলো ম্যালেটের লাল মুখে। শব্দহীন হাসি হাসতে হাসতে ম্যালেট রূপার কলসী থেকে জল গড়িয়ে নেয় এক পাত্র। জল ছিটাতে থাকে চৌধুরাণীর অনিন্দ্য মুখে। নিমীলিত চোখেও জল দেয়। চৌধুরাণী যেন বরফ-ঠাণ্ডা!

মখমলের শয্যায় ব'সে পড়লো ম্যালেট। হাসি থামিয়ে আনন্দকুমারীর উর্দ্ধদেহ তুলে নেয় নিজের জানুতে। পদ্মের মত কোমল যেন চৌধুরাণী। ম্যালেট আবার জল দেয় তার মুখে-চোখে, সীমন্তে। হঠাৎ যেন হাতের পরশে কঠিন ঠেকলো চৌধুরাণীর অকঠিন বুকে। আর এক বার হেসে ফেললো ম্যালেট। চৌধুরাণীর কাঁচুলীর মধ্যে থেকে টেনে বের করলো লুকানো অস্ত্র। [illegible] একখানি ভোজালী। অস্ত্রটি সিপাইকে হস্তান্তরিত করলে হাসতে হাসতে।

সময়ের গতি আছে। নদীর যেমন গতি, নদী যেমন থামে না, মহাকালও তেমনি গতিশীল। ম্যালেট জাতিতে খাস ইংরাজ, সময়ের মূল্য বোঝে। মুহূর্তমধ্যে ম্যালেট দুই হাতে তুলে নেয় চৌধুরাণীর অসাড় অঙ্গ। পুতুলের মত বুকে তুলে ধরে। চৌধুরাণীর শুভ্র মুখে মুখ ছোঁয়ায় ম্যালেট। তার নধর-নরম গ্রীবায় মুখ রাখে। জলের অতল থেকে যেন এক মৎস্য-কন্যাকে পেয়ে গেছে ম্যালেট। পত্রপুটা থেকে বজরার পাটাতনে আবার লাফ দেয়। চুরি-করা পুতুল নিয়ে পালায়। চৌধুরাণীকে বজরার ভেতরে শায়িত রেখে ম্যালেট বললে,—সিপাইলোক, লুঠ লেও বিলকুল!

সিপাইরা অর্থাভাবে পরাধীনে অস্ত্র ধারণ ক'রেছে। দারিদ্র্যের কশাঘাতে দেশ ছেড়ে এসেছে। তেলেঙ্গী সিপাইদের মধ্যে যেন ছোটাছুটি লাগলো। আনন্দকুমারীর পত্রপুটার কক্ষমধ্যে যা যা ছিল মহার্ঘ্য লুণ্ঠন ক'রলো যার যা মন চাইলো।

ম্যালেট সাদরে শুশ্রূষার কাজ করে। কাছেই লণ্ঠন জ্বলছে। তার অনেক আশার, অনেক লালসার কাম্যবস্তুকে পেয়েছে হাতের মুঠোয়। ম্যালেট ভাবছিল, ডিকেণ্টার থেকে এক ঝলক যদি কোন মতে খাওয়ানো যায় এই জ্ঞানহীনাকে! উগ্র মদের নেশায় জ্ঞান ফিরতে আর দেরী হবে না। কিন্তু ম্যালেট তো চৌধুরাণীর সত্তাকে চায় না, হয়তো বা চায়, যাকে চায়, তাকে ম্যালেট পেয়ে গেছে স্বাধিকারে।

হঠাৎ নজরে প'ড়েছিল ম্যালেটের। দেখছিল আনন্দকুমারীর নৌকা-কক্ষের মখমলের শয্যায় কি এক গ্রন্থ যেন। পরম অনাদরে প'ড়েছিল ছিন্ন অবস্থায়। ম্যালেট সেই গ্রন্থ তুলে নিয়ে দেখেছিল, এক খণ্ড বাইবেল। মথি লিখিত সুসমাচার। লাতিন ভাষায় লেখা। বহির্ভারতের মুদ্রণলিপি। গ্রন্থটি পায়জামার পকেটে ভ'রেছিল ম্যালেট। এখন লণ্ঠনের আলোয় খুলে দেখলো বই। পৃষ্ঠা উল্টে-উল্টে দেখে। সূচির শীর্ষে কার হস্তলিপি! দেশী কালিতে লেখা এক ছত্র। ম্যালেট পড়লে, Presented to revered Pundit Chandrakanta by one of his pupils, Mackpherson.

অবাক মানে যেন ম্যালেট। ভেবে ভেবে ঠাওরাতে পারে না, কে চন্দ্রকান্ত, কে ম্যাকফার্সন!

সহসা চঞ্চল হয় চৌধুরাণী। জ্ঞান ফিরতেই চোখ মেলে তাকিয়ে আবার হয়তো মূর্ছা যায়! চমকে শিউরে ওঠে।

ম্যালেট হাসে দেহে সজীবতার লক্ষণ দেখে। শব্দহীন হাসি হাসে। ডিকেণ্টারটা তুলে ধরে নিজের মুখেই। আকণ্ঠ পান করে যেন।

বাইবেল উপহার পেয়েছিলেন চন্দ্রকান্ত। হিব্রু আর লাতিন ভাষা শিক্ষায় সম্প্রতি মন দিয়েছেন। ম্যাকফার্সন তাঁকে বিদেশী ভাষা শেখায়। তিনি দেবভাষার শিক্ষা দেন ম্যাকফার্সনকে।

আরও অনেক দূর এগিয়ে আবার জলের বুকে মাথা তুলেছিলেন চন্দ্রকান্ত। বুকভরা শ্বাস নিয়েছিলেন। সাঁতার দেওয়ার নিয়মিত অভ্যাসের অভাবে ক্লান্ত হয়েছিলেন যেন। চন্দ্রকান্ত দেখেছিলেন, বালুতীরের শেষে নিবিড় বনরেখা। আর যেন জমিদার কৃষ্ণরামের ভগ্ন-আলয়।

জল থেকে ভয়ে ভয়ে তীরে উঠেছিলেন চন্দ্রকান্ত। আসমানের ঘাটে পৌঁছে ডেকেছিলেন কা'কে যেন।

রাত্রি গভীর। অমাবস্যার আঁধার রাত নয়, জ্যোৎস্না প্লাবিত সোনালী রাত, পথে এখন মানুষ চলা দায়।

ডেকে ডেকে কারও সাড়া মিললো না। চন্দ্রকান্ত গৃহমধ্যে গেলেন। সিঁড়ির কাছাকাছি আবার ডাকলেন! বিন্ধ্যবাসিনীর ব্রাহ্মণী পরিচারিকার নামটি তাঁর জানা ছিল। সেই নাম ধ'রে ডাক দিলেন। বাতাসে ভেসে গেল সেই ডাক। বৈশাখের এলোমেলো বাতাসে।

তবুও সাড়া মিললো না। চন্দ্রকান্ত অনুমানে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে চললেন। দোতলায় উঠে দেখলেন, দালানের অদূরে এক কক্ষে যেন আলো জ্বলছে। আলোকে সম্মুখে রেখে চন্দ্রকান্ত এগিয়ে চললেন দালান ধ'রে।

কক্ষের মুক্ত বাতায়ন থেকে দেখা যায়, ঘরের কোণে দীপ জ্বলছে। পরিচারিকা যশোদা ভূমিতে গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। রাজকুমারী বিন্ধ্যবাসিনী একমনে পুঁথি পড়ছেন। নকল করতে হবে যথাযথ, তাই পড়ছেন আগেভাগে। বাঙলা অক্ষরে লেখা সংস্কৃত ভাষা পড়ছেন। মহাভারতের প্রথম আদি পর্ব্ব পড়ছেন।

চন্দ্রকান্ত দালান থেকে ধীর কণ্ঠে ডাকলেন,—যশোদা আছেন?

চমকে উঠেছিলেন রাজকন্যা। কর্ণ-কুহরকে যেন বিশ্বাস হয় না। বললেন,—কে?

—আমি চন্দ্রকান্ত। পথে বিপদ হওয়ায় প্রত্যাবর্ত্তনে বাধ্য হয়েছি। চৌধুরাণী অপহৃতা হয়েছে।

মাথায় গুণ্ঠন টানলেন বিন্ধ্যবাসিনী। পুঁথি রেখে উঠে পড়লেন। ডাকলেন,—যশো! যশোদা!

চন্দ্রকান্ত আবার কথা বললেন,—ম্যালেট সাহেব চৌধুরাণীর মাঝি-মাল্লাদের হত্যা করেছে। চৌধুরাণীকে জীবন্ত না মৃত অপহরণ করলো, তা জানি না।

বিন্ধ্যবাসিনী যেন ভয়ার্ত হন। আবার ডাক দেন। বলেন,—কি সৃষ্টিছাড়া ঘুম! যশোদা—আ—আ!

ব্রাহ্মণীর ঘুম ভেঙ্গে যায় আচমকা। ডাকাত পড়েছে যেন, তেমন আশঙ্কা তার মুখে। ঘুম জড়ানো চোখ। বললে,—কি হয়েছে? চেঁচাও কেন?

—আনন্দকুমারী আর নেই। চুরি ক'রেছে তাকে। ভয়ে ভয়ে ফিসফিস কথা বললেন বিন্ধ্যবাসিনী। বললেন,—চন্দ্রকান্ত এসেছেন। দালানে আছেন। যাও শোন তাঁর মুখে। কি হবে যশোদা?

—কি আবার হবে। কথা শুনে খেঁকিয়ে উঠলো যেন পরিচারিকা। বললে,—যেমন মেয়ে সে, ঠিকই হয়েছে। মেয়ে তো নয়, যেন মর্দ্দা!

কথা বলতে চলতে যশোদা ঘরের বাইরে বেরোয়। দেখা দেয়।

চন্দ্রকান্ত বললেন,—ব্রাহ্মণী, আজকের রাতের মত নীচের এক ঘরে আমাকে আশ্রয় দাও।

যশোদা বললে,—বেশ কথা। তাই চল। ফেলের মেয়েকে সায়েব চুরি করলে?

—হাঁ, তাই তো মনে হয়। কথা বলতে পরিচারিকাকে অনুসরণ করেন চন্দ্রকান্ত।

রাজকুমারীর বুক কাঁপতে থাকে যেন। বিন্ধ্যবাসিনী শিউরে শিউরে ওঠেন। [ক্রমশঃ।

সাময়িক প্রসঙ্গ

মূল্যবৃদ্ধির মহিমা কীর্ত্তন

"মুদ্রাস্ফীতি নিরোধের জন্য নয়া অর্থনৈতিক নীতির কাঠামো নাকি ভারত গভর্ণমেন্ট তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছেন। এই নূতন অর্থনৈতিক নীতির মূল কথা নাকি পরোক্ষ-কর ধার্য্য করা এবং এই পরোক্ষ-কর প্রধানতঃ হইবে উৎপাদন-শুল্ক। উৎপাদন-শুল্ক দ্বারা কি ভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিরোধ হইবে সে সম্বন্ধে সরকারী যুক্তিটা সত্যই অত্যন্ত উদ্ভট! তাঁহারা মনে করেন যে, শিল্পপতিদের হাতে যে প্রচুর মুনাফা জমিতেছে উৎপাদন-শুল্ক ধার্য্য করিয়া তাঁহাদের হাত হইতে উহা কাড়িয়া লওয়া হইবে। দ্বিতীয়তঃ উৎপাদন-শুল্ক জিনিষপত্রের দামকে এত বর্দ্ধিত করিবে যে, ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত জিনিষপত্র ক্রয় করিবার আগ্রহ আর লোকের থাকিবে না। গভর্ণমেন্ট আরও আশা করেন যে, পণ্যের ব্যবহার হ্রাস পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের হাতে টাকা-পয়সা জমিবে এবং বিভিন্ন রকমের স্বল্পসঞ্চয়ের মারফৎ ঐ টাকা পয়সা সরকারী কোষাগারে প্রবেশ করিবে। উৎপাদন-শুল্ক দ্বারা শিল্পপতিদের হাত হইতে তাঁহাদের মুনাফা কাড়িয়া লওয়ার আশা যাঁহারা করেন, তাঁহাদের হয় সাধারণ বুদ্ধির অভাব ঘটিয়াছে, না হয় তাঁহারা অতিমানবে পরিণত হইয়াছেন। তবে জিনিষপত্রের দাম যে আরও অনেক বেশী বাড়িবে সে সম্বন্ধে আমাদেরও কোন সন্দেহ নাই। শাসকবর্গ হয়ত নিজেদের ন্যূনতম প্রয়োজন দ্বারা দেশের সাধারণ মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজন পরিমাপ করিয়াছেন। দেশের অধিকাংশ লোকই যে ন্যূনতম প্রয়োজনও মিটাইতে পারে না, একথা তাঁহারা জানেন না। জানিলে মূল্যবৃদ্ধির মহিমা কীর্ত্তন করা সম্ভব হইত না।" —দৈনিক বসুমতী

বস্ত্রহরণ লীলা

"গবর্ণমেন্ট এই বিষয়ে অবহিত নহেন, এ কথা বলিলে অন্যায় বলা হইবে। কিন্তু ভারতের নূতন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারি এই ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা কতটা কার্যকরী হইবে, তাহা সন্দেহের বিষয়। সম্প্রতি তিনি দেশবাসীর পরিধেয় বস্ত্রের উপর যে উৎপাদন-শুল্ক ধার্য করিয়াছেন, তাহার ফলে দেশের কাপড়ের কলসমূহের অর্জিত লাভের একটা অংশ গবর্ণমেণ্টের হস্তগত হওয়া হেতু দেশে মুদ্রাসঙ্কোচ ঘটিবে বলিয়া তিনি মনে করিতেছেন। কাপড়ের কলগুলির হাতে যদি দেশের প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্রের যোগান থাকিত এবং এই বস্ত্র বিক্রয়ের জন্য যদি উহারা ব্যগ্র থাকিত, তাহা হইলে উৎপাদন-শুল্ক উহারা নিজেদের লাভ হইতেই প্রদান করিতে বাধ্য হইত। এরূপ অবস্থায় কলের লাভের একটা অংশ গবর্ণমেন্ট পাইতেন এবং দেশের বস্ত্রের মূল্য বাড়িত না। কিন্তু বর্তমানে দেশে চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত পরিমাণ বস্ত্রের যোগান নাই। ফলে কলওয়ালাগণ উহাদের লাভ হইতে একটি পয়সারও ক্ষতি স্বীকার না করিয়া নূতন ট্যাক্সের বোঝা সম্পূর্ণ ভাবে ধনি-দরিদ্র নির্বিশেষে দেশবাসীর ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছেন। এ জন্য যে সমস্ত সম্পন্ন ব্যক্তি প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্ত্র ব্যবহার করিতেছেন, তাঁহারা উহার ব্যবহার হয়ত কমাইয়া দিবেন। কিন্তু দেশের যে কোটি কোটি দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক গজ কাপড়ও ব্যবহার করেন না, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়াই পূর্বের মত হারে বস্ত্র ক্রয় করিতে হইবে। সুতরাং আলোচ্য ব্যবস্থা দ্বারা কলওয়ালাদের অতিরিক্ত লাভের টাকাও গবর্ণমেন্টের হাতে যাইবে না এবং দেশে বস্ত্রের চাহিদাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পাইবে না। ফলে দেশবাসীর হস্তস্থিত অতিরিক্ত অর্থ টানিয়া লইয়া দেশে বস্ত্রের চাহিদা হ্রাস তথা বস্ত্রের মূল্য হ্রাসের উদ্দেশ্যে যে আলোচ্য ট্যাক্সের প্রবর্তন করা হইয়াছে, সেই উদ্দেশ্যই পণ্ড হইবে। বর্তমান অর্থমন্ত্রী দেশে মুদ্রাস্ফীতির কুফল দূরীকরণের জন্য আর্থিক ব্যাপারে যদি এই ধরণের ভ্রান্ত নীতি অবলম্বন করেন তাহা হইলে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক উহাদের রিপোর্টে গবর্ণমেন্টকে আর্থিক ব্যাপারে অব্যবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিবার জন্য যে উপদেশ দিয়াছেন, তাহার কি ফল হইবে?"

—আনন্দবাজার পত্রিকা।

মৃত্যুদণ্ড!

"ভারতবর্ষে যে পরিমাণ খুনখারাবি হইতেছে, তাহাতে যদি হত্যাকারীর নিজের জীবন হারাইবার ভয় না থাকে, তাহা হইলে এই অপরাধের অনুষ্ঠান আরও বাড়িয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এককালে ভারতবর্ষে (বৃটিশ আমলে) যখন নারী হরণের এবং নারী ধর্ষণের মাত্রা সংক্রামক রোগের মত বাড়িয়া গিয়াছিল, তখন কোন কোন বিচারক স্থলবিশেষে ধর্ষণকে প্রাণদণ্ডযোগ্য অপরাধ বলিয়া ঘোষণা করার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন। আজও নারীধর্ষণ কম ঘটে না—যদিও বৃটিশ-ভারতের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পাইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস। অর্থাৎ কেবল খুনখারাবির জন্যই প্রাণদণ্ডের প্রয়োজন এমন নহে সময় সময় অন্যান্য কার্যের জন্যও—যেমন, রেলওয়ে সেতু নষ্ট করা, রেল লাইন উপড়াইয়া ফেলা ইত্যাদি ভয়ঙ্কর কার্য এবং যে কার্যের ফলে বহু মানুষের প্রাণ যাইতে পারে, তেমন অপরাধের ক্ষেত্রেও মৃত্যুদণ্ড দান বাঞ্ছনীয় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। একথা সত্য যে, ফাঁসির ভয় আছে বলিয়াই ভবিষ্যৎ "খুনীরা" প্রতিরুদ্ধ হইয়া থাকে এবং এক বার যদি এই ভয় কাটিয়া যায়, তাহা হইলে খুনেদেরও হাত খুলিয়া যাইবে। সেই অবস্থায় সমাজে আরও দুর্বিপাক বৃদ্ধি পাইবে। অতএব বর্তমান ভারতে প্রাণদণ্ড দান রহিত করা কোন মতেই চলিতে

পারে না। এখনও আমাদের সমষ্টিগত সামাজিক মন এতটা উর্দ্ধে উঠিতে পারে নাই, যখন প্রাণদণ্ড রহিতের মত এতটা বিপজ্জনক পরীক্ষা আমরা গ্রহণ করিতে পারি।" —যুগান্তর।

সংগ্রামের আহ্বান

"নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির ভয়াবহ মূল্যবৃদ্ধির ফলে শুধু গ্রামের কৃষকরা নহেন, শহরের কর্ম্মচারী, শিক্ষক সকলেই প্রচণ্ড ভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীরা এবং রাজ্যের সরকারী দপ্তরের কর্মচারীরা এবার যে ভাবে সংগঠিত আন্দোলনে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা আগে খুব কমই দেখা গিয়াছে। তৎসত্ত্বেও তাঁহাদের ভাতা বৃদ্ধি, অথবা অন্তর্বর্ত্তীকালীন সাহায্য কোন কিছুই দেওয়ার ব্যবস্থা হইল না। এমতাবস্থায় অনন্যোপায় হইয়া আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গত ৯ই সেপ্টেম্বর সারা পশ্চিমবাংলার প্রতিনিধি সম্মেলনে দাবি পূরণ না হইলে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তাব করেন। রাজ্যের প্রায় সমস্ত শ্রমিক, কৃষক সংগঠন, রাজনৈতিক ও অন্যান্য গণপ্রতিষ্ঠানের আট শতাধিক প্রতিনিধির সমাবেশ হইতে মূল্য বৃদ্ধি হ্রাস করার কয়েকটি আশু পন্থা সরকারের নিকট সুপারিশ করা হয়। সম্মেলন ইহাও প্রস্তাব করে যে, সরকার অবিলম্বে এই সব কার্য্যকরী পন্থা গ্রহণ না করিলে রাজ্যব্যাপী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করা হইবে। আগামী ২৫শে সেপ্টেম্বর ধর্মঘট ও সর্ব্বাত্মক হরতাল পালন করিয়া এই আন্দোলনের সূচনা হইবে। সুতরাং, মানুষের চরম দুর্গতি অপনোদনের জন্য যদি ধর্মঘট, হরতাল ও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় তাহা হইলে ইহার সমগ্র দায়িত্ব সরকারের উপর বর্ত্তাইবে। সরকারের অমার্জনীয় ঔদাসীন্য ভাঙ্গিতে হইলে জনসাধারণের আর কোন পথ নাই"। —স্বাধীনতা।

শ্রমিক ট্রাইবুনাল

"বিড়লাদের ওরিয়েন্ট পেপার মিলের অধীনে অনেকগুলি কোম্পানী আছে। উহাদের একটি বিজয়লক্ষ্মী ট্রেডিং কোম্পানী। এই সমস্ত কোম্পানীর কর্ম্মীদের একটি ইউনিয়ন আছে। বিজয়লক্ষ্মী কোম্পানীর কয়েক জন কর্ম্মচারীকে ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে শ্রমিক ট্রাইবুনালে মামলা চলিতেছে। শিল্পবিরোধ আইনের ৩৬ (৪) বলা হইয়াছে যে, উভয়পক্ষের সম্মতি ভিন্ন কোন আইনজীবী কোন পক্ষ সমর্থন করিতে পারিবেন না। এই মামলায় মালিকপক্ষে একজন এডভোকেট ডিরেক্টর হিসাবে উপস্থিত হন। ইউনিয়ন বলেন যে, বিরোধের উৎপত্তি হইয়াছে ১৮ই নবেম্বর ১৯৫৫। ৮ই ডিসেম্বর লেবার কমিশনার সালিশীতে হাত দিয়াছেন। ঐ তারিখে একজন ডিরেক্টর পদত্যাগ করিয়াছেন এবং তাঁহার স্থলে উপরোক্ত এডভোকেটকে ডিরেক্টর নিযুক্ত করা হইয়াছে। ইঁহার নিয়োগের সংবাদ ১৪ দিনের মধ্যে অর্থাৎ ২২শে ডিসেম্বরের মধ্যে কোম্পানী রেজিষ্ট্রারকে দেওয়ার কথা, দেওয়া হইয়াছে ২৭শে ডিসেম্বর। ইঁহার নিয়োগের পর কোম্পানীর নিয়মাবলী সংশোধন করিয়া বলা হইয়াছে, ডিরেক্টর হইতে গেলে বেশী শেয়ার নেওয়ার যোগ্যতা প্রয়োজন হইবে না। ইউনিয়ন বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, ইনি আসলে এডভোকেট, ডিরেক্টরের ছদ্মবেশে আসিয়াছিলেন। ট্রাইবুনালের জজ রায়ে বলিয়াছেন যে ডিরেক্টর আইনজীবী হইলেও মামলা চালাইতে পারেন। আইনের ধারা এড়াইবার জন্য বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ডিরেক্টর নিয়োগ হইয়াছে বলিয়া ইউনিয়ন যে অভিযোগ করিয়াছেন এবং তার জন্য যে সব তথ্য প্রমাণ দিয়াছেন তাহা আর একটু সহানুভূতির সহিত বিচার হইলে এবং জজের রায়ে তার বিস্তৃত উল্লেখ থাকিলে ভাল হইত। রায় যেরূপ হইয়াছে তাহাতে ইউনিয়নের মতে ন্যায়বিচার হয় নাই, এই সংশয় জাগা আশ্চর্য্য নয়। ন্যায়বিচার শুধু হইলেই হয় না, বিচার ঠিক মত হইয়াছে রায়ে তাহা সুস্পষ্ট হইবে, ইহাই ন্যায়বিচারের মূলনীতি। —যুগবাণী (কলিকাতা)।

বাহিরে সফল, ঘরে বিফল

"অন্য দিকে ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অশান্ত, অস্থির, অভাব, অনটনে, অকর্মণ্য অবস্থায় প্রায় একেবারেই বিফল হইতেছে সকল স্তরের সমস্তকে সন্তুষ্ট করার বৃথা প্রচেষ্টায়। দেশের জনসাধারণ অন্ন-বস্ত্র সমস্যায় জর্জ্জরিত হইয়া সরকারকে দোষারোপ করিতেছে যে—সরকার জনসাধারণের স্বার্থ সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষা করিয়া ধনিকগোষ্ঠী, শিল্পপতি, কোটিপতি বা ভূস্বামী, রাজা-মহারাজাদের স্বার্থরক্ষায় বদ্ধপরিকর ইত্যাদি, অন্য দিকে উপরোক্ত শ্রেণীরাও এখন প্রকাশ্যে আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন যে, স্বাধীন ভারতের মধ্যে আমরাও সরকারের কাছে অনাদৃত, বঞ্চিত, অবহেলিত, এক অনুন্নত সম্প্রদায়-বিশেষ। উপরোক্ত খেদোক্তি বোম্বাইয়ের এক বিশিষ্ট কোটিপতি শিল্পপতি তাঁহাদের এক সভায় প্রকাশ করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকদের মুখে এ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য লাগে না কি? কিন্তু ইহা অতি সত্য কথা যে, সর্ব্বশ্রেণীর সুবিধা করিতে যাওয়ায় কেহই সুবিধা পায় নাই বা কাহারো সুবিধা করা সম্ভব হয় নাই। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা বা কংগ্রেসী নেতারা দেশের সর্ব্বস্তরের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্খা ও মনোভাবের দাবী পূরণের স্বল্পতম পথের কোন সন্ধানও কেহ দিতে পারেন নাই। অবশ্য প্রত্যেক দলই দাবী করেন যে—একমাত্র তাঁহারাই দেশের জনসাধারণের মনোভাবের সহিত গভীর ও বিশেষ ভাবে পরিচিত, যদি তাহাই হইত তাহা হইলে দেশে অশান্তি অভাব-অনটনের অত্যল্পও সুবিধা হইত ও সমালোচকদের মুখ বন্ধ হইয়া যাইত। দেশের মধ্যে মানুষ অভাব অনটনে কষ্টে-সৃষ্টে কোন মতে বাঁচিয়া থাকিতে হয় থাকুক! বাহির বিশ্বে ত' আমার দেশের নাম হইতেছে? ঐ কথাই প্রতিধ্বনিত করা হয় সকলকে সন্তুষ্ট করার কার্য্যে। ফলে সকলেই হতাশ হইয়াছেন। অসন্তুষ্ট বৃহৎ জনসমষ্টির বোঝা স্কন্ধে লইয়া রাষ্ট্রতরীর কর্ণধারের পক্ষে তরী চালনা কত কাল সম্ভব হইবে?"

—নীহার (কাঁথি)।

স্কুল-শিক্ষার গলদ

"বিশ্বস্তসূত্রের সংবাদ—পশ্চিম-বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে প্রায় ১৬ শত উচ্চ বিদ্যালয় কিশোর বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের মাধ্যমিক শিক্ষাদান করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার ব্রত সম্পাদন করিতেছেন। কিন্তু এই সব স্কুলের অধিকাংশই যেরূপ শিক্ষা দান করিয়া ছাত্র-ছাত্রীদের পর্ষদের স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার জন্য প্রেরণ করিতেছেন, তাহাতে প্রতি বৎসরই অধিকাংশ হারে স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানের মানে ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। গত স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল বাহির হইবার কয়েক দিন পূর্ব্বে ঐ পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের প্রধান পরীক্ষকগণ এক বৈঠকে মিলিত

হইয়া পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের মান বিচার করিয়া পর্ষদের নিকট যে রিপোর্ট পেশ করেন, তাহাতেই উপরোক্ত তথ্য উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রধান পরীক্ষকদের মতে বিভিন্ন প্রশ্নের যথোচিত উত্তর লিখিতে ছাত্রছাত্রীদের যে-সব ত্রুটি-বিচ্যুতি পাওয়া গিয়াছে, সেগুলির জন্ম সংক্ষেপে বলিতে গেলে মাধ্যমিক বিভালয়সমূহে নিরুৎসাহ ও প্রাণহীন পাঠন-ব্যবস্থাই প্রধানতঃ দায়ী। তাই তাঁহারা বলেন, শিক্ষা-ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই এই উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সম্যক অবহিত হইয়া ঐ অবনতি রোধের জন্ম সম্ভাব্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা ও উপায়াদি অবলম্বন করিবার সময় আসিয়াছে।" —প্রদীপ (মেদিনীপুর)।

নজর দাও

"প্রথম পাঁচশালা, দ্বিতীয় পাঁচশালা ইহাদের সুদূরপ্রসারী ফল যখন আসিবে, তখন আসিবে। কিন্তু তাহাদের চাপে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। নির্ব্বাচনের ঠিক প্রারম্ভে মানুষের এই দুঃখ দেখিয়া অসহায়ত্বের ভাব দেখাইলে ইহার ফলও সুদূর প্রসারী হইয়া দেখা দিবে। যেমন করিয়া হউক, যে ভাবে হউক, সাধারণ মানুষের এই অসন্তোষকে এখুনি প্রশমিত করিতে হইবে। কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রায় সর্ব্বত্রই কংগ্রেস-শাসন বর্ত্তমান। একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা লইয়া এক বিরাট কর্ম্মপ্রেরণায় এখুনি অগ্রসর হইতে হইবে। দেশের লোক যেন বুঝিতে পারে সরকার তাহাদের সম্বন্ধে সচেতন। আমাদের বিবেচনায় বিলম্বেও আর কোনো প্রয়োজন নাই। নেতিবাচক দায়িত্বহীন উক্তি এবং আচরণ দেখিয়া মুষ্টিমেয় এক দল আসর মাত করিবার চেষ্টা করিবে—জাতীয় জীবনে ইহার চেয়ে গ্লানিকর আর কিছুই নাই। আমরা সরকারকে, তথা কংগ্রেসকে তাঁহাদের তুষ্ণীভাব ত্যাগ করিয়া সাধারণ মানুষের এই ক্রমবর্দ্ধমান অসন্তোষের প্রতি পূর্ণ নজর দিবার জন্ম আহ্বান জানাইতেছি।" —বীরভূমের ডাক।

উদ্বাস্তু ও নির্ব্বাচন

"আমরা সংবাদ পাইয়াছি, সার্টিফিকেট ইস্যু ব্যাপারেও দুর্নীতি-পরায়ণ কর্ম্মচারীর লালসা বৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। বহু লোক সার্টিফিকেটের জন্ম আবেদনপত্র পূরণ করিতে সরকারের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতেছে। যদি উদ্বাস্তুগণকে প্রকৃতই আগামী নির্ব্বাচনে ভোটাধিকার দিতে হয়, তবে আবেদন-পত্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাগজপত্র পূরণ বিষয়কে আরো সহজতর ও সহজলভ্য করা প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠিয়াছে, সার্টিফিকেট না লইলে ভোটাধিকার ও ও রাষ্ট্রের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাইবে না। আইনানুসারে ১৯৪৯ সনের ১৯শে জুলাইর পর যাহারা আসিয়াছে এবং ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চের পূর্ব্বে হইতে ২১ বৎসরের অধিকবয়স্ক ব্যক্তি ভারতে বসবাস করিতেছে তাহাদিগকেই নাগরিক অধিকার সম্পর্কীয় সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৯ সনের ১৯শে জুলাইর পর আগত উদ্বাস্তুদের অনেকে ভোটাধিকার পাইয়া গিয়াছে এবং অনেক এখনও বাদ পড়িয়া আছে। কিন্তু যে সমস্ত লোক ভোটাধিকার পাইয়া গিয়াছে, তাহাদিগকেও সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে হইবে কি না, এই অনাগত প্রশ্নটিও উত্থাপিত হইতেছে। আমাদের মনে হয়, ভোটাধিকার যাহারা পাইয়াছে তাহাদিগকে আবার নাগরিক অধিকারের আবেদন করার প্রয়োজন থাকে না। কারণ, যে লোক ভোট প্রদান করিয়া তার সরকার গঠন করার ক্ষমতা পাইয়াছে, সে ভারতীয় সংবিধানানুসারে রাষ্ট্রের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা অনায়াসেই পাইবার অধিকারী। এই আইনগত প্রশ্নের বিরোধ অতি সত্বর মীমাংসা হওয়ার প্রয়োজন।"

—সেবক (আগরতলা)।

নামমাত্র বেতনবৃদ্ধি

"পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রাইমারী শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি করিলেন। ৪৫৲ টাকার স্থলে ৫০৲ হইতে সুরু করিয়া সর্ব্ব উর্দ্ধ বেতন ৭৫৲ টাকা হইল। আশা করি তাঁহারা এই বার নিশ্চয় খুশী হইবেন। তাঁহারা যদি এই বার চাউলের মূল্য, তৈলের মূল্য, বস্ত্রের মূল্যের কথা বলিতে থাকে তবে ভুল করিবে। কারণ প্রাইমারী শিক্ষকদের স্ত্রী-পুত্র লইয়া সকল দিন, সকল বেলা পেট ভরিয়া খাইতে হইবে তাহার কোন কথা নাই। শিক্ষকদের মিহি কাপড় পরিবার কোন প্রয়োজন নাই। স্ত্রীলোকরা গৃহে থাকে, কাজেই একখানা কাপড় হইলেই চলিবে—আর পুত্র-কন্যার শিক্ষা, তাহার জন্ম কোন চিন্তার কারণ নাই, অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষা রহিয়াছে। নূতন পুস্তক না পড়িলেও শিক্ষকদের পুত্র কন্যার শিক্ষা হইয়া থাকে।"

—জনমত (জলপাইগুড়ি)।

বামপন্থীদের ভুল পন্থা

"বামপন্থী দলগুলি যতই মিতালি করুন, যত দিন তাঁহারা নিজেদের ভিতরকার মতভেদ রাখিয়া মাত্র নির্ব্বাচনের খাতিরেই একটি সাময়িক চুক্তিবদ্ধ হইতেছেন, তত দিন লোকে তাঁহাদের উপর কখনই নির্ভর করিতে পারিবে না। কারণ ঘটনাচক্রে তাঁহারা সংখ্যাগরিষ্ঠতা যদি বা লাভই করেন, তাহা হইলেও তো ঐক্যমতে শাসন-দণ্ড চালনা করিতেই পারিবেন না। বারো রাজপুতের তের হাঁড়ি লইয়া কখন কি ঐক্যমতের সরকার গঠন করা সম্ভব? আমরা অকপট ভাবে আজও স্বীকার করিতেছি—একটি সুদক্ষ বিরোধী দলের প্রয়োজন আছে। কংগ্রেস জয়যুক্ত হইলেও এই সুপ্রতিষ্ঠ বিরোধী দলের প্রয়োজন থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু যে ভাবে আপন আপন কোলে ঝোল টানিয়া বামপন্থী দলগুলি নির্ব্বাচনী মৈত্রীর পাঁয়তারা ভাঁজিতেছেন, তাহাতে তাঁহারা দেশবাসীর আস্থাভাজন হইবেন কেমন করিয়া? আমরা আশা করি, বামপন্থী দলগুলি অতঃপর ভুল পথ ছাড়িয়া পরিচালনায় দক্ষতার পরিচায়ক কর্ম্মসূচী রচনার দিকেই মনোনিবেশ করিবেন।"

—পল্লীবাসী (কালনা)

সংবাদের সার্থকতা

"গত ৬ই আগষ্ট তারিখের "বীরভূম" পত্রিকায় রামপুরহাট সহরের বুকে বহু পরিবারের অনাহার ও অর্দ্ধাহারে দিনাতিপাতের এক সংবাদ প্রকাশিত হয়। তাহার প্রতি মহকুমা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষিত হওয়ার ফলে তিনি এ-সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া, ঐ সংবাদে যে চারটি পরিবারের দুরবস্থা চরমে উঠিয়াছে বলিয়া কথিত ছিল তাহা সত্য জানিতে পারিয়া অবিলম্বে তাহাদের চারটি পরিবারকেই আর্থিক সাহায্য দিবার ব্যবস্থা করেন। আমাদের প্রকাশিত সংবাদ দ্বারা সরকারী দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়া দুঃস্থ পরিবার চারটি যে সাহায্য পাইয়াছে, তাহার জন্ম বীরভূম নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করিতেছে

ও মহকুমা শাসক ও অনুসন্ধানকারী রেভিনিউ অফিসারকে তৎপরতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া খয়রাতী-সাহায্য ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করার অনুরোধ জানাইতেছি।”

—বীরভূম।

কি জানি আর কত কাল ?

“বৃদ্ধি জনিত অবস্থায় মানুষ যে সঙ্গতি হারাইতেছে তাহার ফলে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা কঠিন হইবে। সরকার মাগগী ভাতা অথবা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি জনিত শোচনীয় অবস্থার জন্য বিশেষ ভাতা কত বাড়াইতে পারিবেন তাহা জানি না। মানুষ খাইতে পাইবে না অথবা উলঙ্গ থাকিবে, এরূপ অবস্থা কাহারও পক্ষে সুখের নয়। এই অবস্থার দিকেই দেশ চলিতে সুরু করিয়াছে। সুতরাং কেবল হিংসা-নীতির ফলে দেশের আভ্যন্তরীণ অবনতির কথাই যদি নেতাদের মনে হইয়া থাকে তবে আমরা তাহাদের এই কথাই বলিতে চাই যে, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধিহেতু যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাও আদৌ সুখের নহে। পূজার অব্যবহিত পূর্ব্বে বস্ত্রের মূল্য বাড়াইয়া দেওয়ায় কয়েক কোটি টাকা বাংলার বাইবে এবং সরকারী কোষাগারেও কয়েক কোটি টাকা জমিবে, কিন্তু তথাপি এই নীতির ফলে মানুষকে যে অপরিসীম দুর্দ্দশার সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহাতে ইহা আমরা সমর্থন করি না এবং যে অবস্থায় বস্ত্রের মূল্য বাড়ান হইল তাহাকে আমরা হঠকারিতা বলিয়া মনে করি। জানি না এই ভাবে আর কত কাল কাটিবে।”

—ত্রিস্রোতা (জলপাইগুড়ি)।

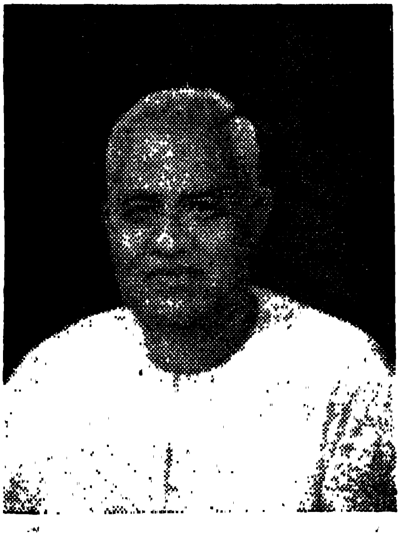
পাকা রাস্তার দাবী

“ঝাড়গ্রাম সহর হইতে মেদিনীপুর সহরে যাতায়াতে নিকটতম রাস্তা হইতেছে ঝাড়গ্রাম হইতে বাধগোড়া দিয়া যে রাস্তাটি দহিজুড়ি-মেদিনীপুর পাকা রাস্তার সহিত দেউলডাঙ্গা (১৩ মাইল পোষ্ট) গ্রামে মিলিয়াছে। ইহার মোট দূরত্ব মাত্র ২১ মাইল। অন্য দিকে দহিজুড়ি—ধেড়ুয়া দিয়া ২৮ মাইল। এবং লোধাশুলি খড়গপুর দিয়া মেদিনীপুরের দূরত্ব হয় ৩৪ মাইল। ঝাড়গ্রাম হইতে কংসাবতী ঘাট (নারাণপুর) রাস্তাটি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বাধগোড়া পর্য্যন্ত ৪ মাইল পাকা রাস্তা করা হইয়াছে আর ২ মাইল মাত্র রাস্তা পাকা করিলে কংসাবতী নদী ঘাট পর্য্যন্ত পুরাপুরি পাকা হয়। নদীর অপর পার হইতে জেলা বোর্ডের পাকা রাস্তা রহিয়াছে। দুই মাইল রাস্তা বর্ত্তমানে বৎসরের ছয় মাস গরুর গাড়ী এমন কি মানুষ চলাচল করিতে পারে না। এই দুই মাইল রাস্তা পাকা করিলে ঝাড়গ্রাম সহরের সহিত মেদিনীপুর সহরের নিকটতম যোগাযোগ হয় এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাষীদের উৎপাদিত কাঁচা মালের কেনা-বেচা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। উক্ত রাস্তাটিই পূর্ব্বকালে ঝাড়গ্রাম-মেদিনীপুর যাতায়াতের এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের মালপত্র পরিবহনের একমাত্র রাস্তা ছিল। বর্ত্তমানে ঐ রাস্তাটির পুনরুদ্ধার করিলে ঝাড়গ্রাম সহরের এবং উক্ত রাস্তার উভয় পার্শ্বের গ্রামগুলির অধিবাসিগণের বহুলাংশে উন্নয়ন সম্ভব হইবে। আমরা এবিষয়ে ঝাড়গ্রাম মহকুমা শাসক, মেদিনীপুর জেলা শাসক ও মেদিনীপুর জেলা ডেভলাপমেণ্ট অফিসার মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।”

—নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)।

শোক-সংবাদ

গত ৬ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার স্বর্গীয় কার্ত্তিকচন্দ্র ঘটক মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র এবং বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের অন্যতম একজিকিউটার শ্রীভবতোষ ঘটক মহাশয়ের কনিষ্ঠ সহোদর চারুতোষ ঘটক মহাশয় ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তিনি বিধবা পত্নী, বৃদ্ধা মাতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর, বহু ভ্রাতুষ্পুত্র-ভ্রাতুষ্পুত্রী ও নাতি-নাতনী এবং আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন সন্তানাদি ছিল না। তিনি বিশিষ্ট লৌহব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মেসার্স কে সি ঘটক এণ্ড সন্স (প্রাইভেট) লিমিটেড, কুসুমিকা আয়রণ ওয়ার্কস (প্রাইভেট) লিমিটেড, কুসুমিকা

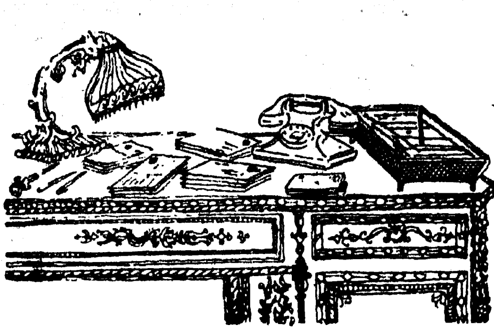


চারুতোষ ঘটক

কনষ্ট্রাকশন এণ্ড আয়রণ ওয়ার্কস (প্রাইভেট) লিমিটেড, ঘটক প্রপার্টিজ কোম্পানী (প্রাইভেট) লিমিটেডের অন্যতম সিনিয়র ডাইরেক্টার এবং চন্দননগরস্থ জ্যোতি টকিজের সিনিয়র পার্টনার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র ক্যালকাটা আয়রণ মার্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন, টাটা স্টীল ডিলার্স এসোসিয়েশন, টাটা স্টীল ডিলার্স কনট্রোলড্ ষ্টক লিমিটেড, বড়বাজার, বহুবাজার, জগন্নাথ ঘাট-ষ্ট্রীটস্থ লোহাপটী এবং অন্যান্য যে সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই সব প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করিতেছি।

বাঙলার প্রাচীনতম চিত্র-প্রযোজক প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় গত ২৭এ ভাদ্র বুধবার ৭০ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। তিনি প্রথমে ম্যাডান কোম্পানীতে একটি সামান্য চাকুরীতে যোগদান করিয়া আপন প্রতিভাবলে ঐ কোম্পানীর যাবতীয় বাঙলা চিত্রের প্রযোজকের দায়িত্ব লাভ করেন। সুবিখ্যাত কালী ফিল্মস্ ষ্টুডিও স্বীয় পরলোকগত পুত্রের নামানুসারে তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতেও তাঁহার অবদান অনস্বীকার্য।

সম্পাদক—শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, “বসুমতী রোটারী মেসিনে” শ্রীতারকনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পাঠক পাঠিকার চিঠি

ন্যাশানাল লাইব্রেরী, কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর আষাঢ় সংখ্যায় আপনি জাতীয় গ্রন্থাগার এবং তাহার কর্মীদের সম্বন্ধে যে সপ্রশংস মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার জন্য আমাদের কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করিবেন। পাঠকদের অসুবিধার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও আপনি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন। পুস্তক সরবরাহ করিতে বিলম্ব হইলে পাঠকদের মূল্যবান সময় নষ্ট হয় এবং যথেষ্ট বিরক্তির কারণও ঘটে। এ বিষয়ে আমরা আপনার সহিত সম্পূর্ণ একমত। তবে সাধারণতঃ এক ঘণ্টা কিংবা দুই ঘণ্টা বিলম্ব হওয়া স্বাভাবিক নয়। যদি কোন পাঠককে এত দীর্ঘ সময় পুস্তকের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় তাহা হইলে তিনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে জানাইলে আমি প্রতিকারের ব্যবস্থা করিব। জাতীয় গ্রন্থাগারে নাটক-নভেল পড়া সম্বন্ধে আপনাদের মন্তব্য আমরা বিশেষরূপে ভাবিয়া দেখিয়াছি। এই গ্রন্থগার সরকারী অর্থে পরিচালিত এবং নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগরিক এই গ্রন্থাগারের সুযোগ পাইবার অধিকারী। সুতরাং গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ নাটক-নভেল পড়িতে দিব না বলিয়া কোন পাঠকের নাগরিক অধিকার সঙ্কোচ করিতে পারেন না। এই অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র উপায় কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা সহ একটি পাবলিক লাইব্রেরির প্রতিষ্ঠা। বাড়ীর নিকটে সহজে বই পড়িবার সুযোগ পাইলে কেহ জাতীয় গ্রন্থাগারে অনাবশ্যক রূপে ভিড় করিবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কলিকাতার ন্যায় বিরাট নগরীতে একটি উল্লেখযোগ্য পাবলিক লাইব্রেরি নাই, ইহা বাস্তবিকই পরিতাপের বিষয়। বিশেষ করিয়া ভারতের অন্যান্য অঞ্চল অপেক্ষা কলিকাতার জনসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা অনেক বেশি। সুতরাং এখানে অবিলম্বে একটি প্রথম শ্রেণীর পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত। জনসাধারণ এবং আপনার ন্যায় বিদ্যোৎসাহী সম্পাদকরা যদি ইহার জন্য ক্রমাগত দাবী জানাইতে থাকেন তাহা হইলে কলিকাতা নগরীতে অদূরে জনসাধারণের জন্য একটি উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার স্থাপনের আশা আছে। পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জাতীয় গ্রন্থাগার সুষ্ঠু রূপে নিজের কর্তব্য করিতে পারিবে। আমরা এখন প্রকৃতপক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগার ও পাবলিক লাইব্রেরী,—এই উভয়ের কর্তব্য করিতে বাধ্য হইয়াছি। যে-সব পাঠক গবেষণার উদ্দেশ্যে অধ্যয়ন করিতে আসেন তাঁহাদের সর্বপ্রকার সুযোগ দেওয়াই জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু এই দায়িত্ব এখন হইতে কঠোর ভাবে পালন করিতে আরম্ভ করিলে ছাত্র এবং সাধারণ পাঠক বই পড়িবার সুযোগ হইতে একেবারেই বঞ্চিত হইবে বলিয়া আমরা আশঙ্কা করি। তাই যত দিন কলিকাতায় সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত না হয় তত দিন পর্যন্ত সাধারণ পাঠকদের বই পড়িবার দাবীকে স্বীকার করিতেই হইবে। তা ছাড়া পূর্বেই বলিয়াছি, এই গ্রন্থাগারের উপর প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকেরই সমান অধিকার রহিয়াছে। আপনি জাতীয় গ্রন্থাগারের আলোচনা করিয়া ইহার কার্যকলাপ সম্বন্ধে যে আগ্রহ ও ঔৎসুক্যের পরিচয় দিয়াছেন সে জন্য আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিবেন। ইতি—নিবেদক—বি, এস, কেশবন (গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ)। জাতীয় পাঠাগার, কলিকাতা।

একটি হারানো সঙ্গীতের ইতিহাস

আমার লিখিত প্রবন্ধটি মাসিক বসুমতীর ১৩৬২ সনের অগ্রহায়ণ মাসে (১১৫৫ পৃঃ ডসেম্বর প্রকাশিত হইলে পর প্রবীণ শিক্ষাব্রতী পণ্ডিত শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ, কাব্য-সাংখ্যতীর্থের একখানা পত্র মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই পত্রে তিনি সঙ্গীতের অবশিষ্ট কলি উদ্ধার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের ঋণ স্বীকার করিতেছি। এই কয়েক মাসের মধ্যে হয়তো অনেকেরই তাহা মনে নাই। সুতরাং তাঁহার উদ্ধার-করা কলিটি পুনর্বার প্রদত্ত হইল :—

"এস, রণচণ্ডি ! এস রণসাজে, এস মা, নাচিয়া সন্তানের মাঝে ;
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রচার, শিখাও জননি ! সময় উৎকট।
নরমুণ্ড ছিঁড়ে পরাইব গলে, সর্বাঙ্গেতে তোমায় সাজাবো কঙ্কালে,
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন তুলিয়া আনিব 'স্বাধীনতা' ধন,
জাগো রণচণ্ডি ! জাগো মা আমার আবার পূজিব চরণ-তট।"

পণ্ডিত মহাশয়ের পত্রের প্রতি বিপ্লবী নেতা শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তিনি তদুত্তরে গত বৈশাখ মাসে আমাকে একখানা পত্র লিখিয়া পাঠান। মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটককে তাহা জানাই এবং প্রতিলিপি প্রকাশার্থ দিব, বলিয়া আসি। কিন্তু ইতোমধ্যে পত্রখানি আর খুঁজিয়া পাইলাম না, কোথায় যে রাখিয়া দিয়াছি মনে পড়িতেছিল না। সম্প্রতি পত্রখানি পাওয়া গিয়াছে। সঙ্গীতটির প্রকৃত রচয়িতা ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী কিংবা আর কেহ, সে সম্পর্কে বলিতে পারেন আমাদের অমরদা'। সেই জন্য তাঁহার মূল পত্রখানি সম্পাদক মহাশয়কে দেখাইয়া প্রতিলিপি নিয়ে দিতেছি :—

৮ রামনিধি চ্যাটার্জী লেন
উত্তরপাড়া
৩-৫-৫৬ (২০-১-৬৩ বঙ্গাব্দ)

ভাই নগেন—

'একটি হারানো সঙ্গীতের ইতিহাস' সম্বন্ধে ১৩৬২ সালের মাঘ সংখ্যা মাসিক বসুমতীতে যে পত্রখানি প্রকাশিত হয়েছে—তাতে তুমি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে ভালই করেছ। শ্রীযতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্গীতটিকে দেবদুর্লভ বলে সত্যি সত্যি তাঁর গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি এই মহাসঙ্গীতের শেষাংশটুকু বাদ পড়ে যাওয়াতে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এ গানটি যখনই আমার পরলোকগত বন্ধু ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী লেখেন, তখনই আমার কাছে উত্তরপাড়ায় চলে এসে গানের সুর দেবার জন্য আমায় অনুরোধ করেন এবং তার পর এ গানটি প্রকাশিত হয়। এ গান রচনা সম্বন্ধে মনে হয়, ৺অন্নদা কবিরাজ মহাশয় জানতেন; এবং সঠিক বলতে পারি না, বন্ধুবর শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায় জানতেন কি না। তাঁর জানার সম্ভাবনা আছে বলেই মনে হয়। আমি ছাড়া এই দুই জনের সঙ্গে ক্ষীরোদ গাঙ্গুলীর বিশেষ সম্বন্ধ ছিল।

যতিপ্রসাদ বাবু যা লিখেছেন সঙ্গীতটির রচয়িতা সম্বন্ধে, সে-বিষয় আমি তাঁকে নিশ্চিত করে বলতে চাই যে,—এ গান ক্ষীরোদচন্দ্রের রচনা, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের নয়। এ নিয়ে আর কোন তর্ক আমি করব না। তবে যে কয়টি লাইন তোমাকে আমি দিতে পারি নি, সে কয়টি লাইনও এই সঙ্গীতেরই শেষাংশ ছিল, এখন আমার বেশ মনে পড়ছে। আমার বিস্মৃত হবার কারণ ছিল; আমি ক্ষীরোদকে বলেছিলাম, গানটি সহজ ভাবে গাইবার জন্য—"জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার, আবার পূজিব চরণতট" ঐ গাইয়েই শেষ করা হউক। মুখে-মুখে অত বড় গান গাওয়ার অসুবিধা ছিল বলেই বলা হয়েছিল। গানটি গাইতে লোকে তখন ভয় পেতো, তাই সংক্ষেপে করা হয়। বহুকালের কথা, আমার স্মৃতি-শক্তি হ্রাস হয়েছে, কাজেই তোমাকে সমস্ত লাইনগুলি দিতে পারি নি। যতিপ্রসাদ বাবুর গুরুদেবের বিষয় আভাসে আমার কিছু কিছু জ্ঞান ছিল, কিন্তু কখনও সাক্ষাৎ হয়নি। তিনি যদি বলে থাকেন যে, ডি, এল, রায় গানটি লিখে দিয়ে কাকেও বলতে নিষেধ করে দেন, তাহলে সেটা তিনি আন্দাজেই বলেছিলেন। কারণ গানটির রচনা এত ভাল যে, ঐ রকম উঁচু দরের লোকের হাতেরই হওয়া সম্ভব মনে হবে। বন্ধুবর ক্ষীরোদচন্দ্র আমার বাংলা "কর্মযোগিন"-এর সম্পাদক ছিলেন এবং তিনি বহু সঙ্গীত, বহু কবিতা রচনা করে প্রকাশ করেছিলেন; এবং যুগান্তরের ভাষায় বহু প্রবন্ধও রচনা করেছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ অকালেই আমরা তাঁকে হারিয়েছি; নতুবা সাহিত্যিকের মধ্যে তাঁর ত বিশিষ্ট স্থান থাকত। যতিপ্রসাদ, বাবুকে জানিও যে, এ গানের রচয়িতা যে ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী—সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ইতি অমরদা'

(২)

মাসিক বসুমতীর গত শ্রাবণ সংখ্যায় "একটি হারানো গানের" সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে এক আত্মীয় আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বহু দিন পূর্ব্বে আমার আবৃত্তি থেকে তিনি সম্পূর্ণ সঙ্গীতটি আয়ত্ত করেছিলেন—পরে চর্চ্চা না থাকলেও ভোলেন নাই। এক দিন ছিল যখন এ আহ্বান-সঙ্গীতের ভাব ও ভাষা বাংলা দেশে অভূতপূর্ব্ব উন্মাদনার সৃষ্টি করত। এ যুগে এরূপ জাতীয় সঙ্গীত হয়তো অর্থহীন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা চিরস্মরণীয়। জানি না, জাতীয় ইতিহাস লেখকরা (সরকারী বা বে-সরকারী) এ জাতীয় সঙ্গীতের কোন সন্ধান রাখেন কি না। আমার যতদূর স্মরণ হয় তারকা চিহ্নিত কয়েকটি কপি যোগ করিলেই গানটি সম্পূর্ণ হয়।

না হইতে মা বোধন তোমার ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গলঘট,
জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার, আবার পূজিব চরণতট;
* ঐ গঙ্গাজল রয়েছে পড়িয়া
* জবা বিল্বদল গেছে শুকাইয়া
* পূজার সময় যায় যে বহিয়া
'এসো না মা কেন সময় নিকট।
এস রণচণ্ডী এসো রণসাজে, এসো মা নাচিয়া সন্তানের মাঝে,
মহাশক্তি হৃদে করিয়া প্রকট (প্রচার)
শিখাও জননি সমর বিকট (দুর্ব্বার)
নরমুণ্ড ছিঁড়ি পরাইব গলে, সর্ব্বাঙ্গ তোমার সাজাব কঙ্কালে।
রক্তাম্বুধি আজ করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা-ধন।
জাগো রণচণ্ডী, জাগো মা আমার, আবার পূজিব চরণতট।

সঙ্গীতটির রচয়িতা কে, জানা নাই—তবে ইহা প্রথম রচিত হয় ১৯০৮ সালের মে বা জুন মাসে—মজঃফরপুর হত্যা, প্রফুল্ল চাকির মৃত্যু, ক্ষুদিরামের পুলিশের হাতে বন্দী—কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দ, বারীনদা,' উপেনদা' প্রভৃতি মুরারিপুকুর বাগানে ধরপাকড়—আদি যুগান্তর দলের ছত্রভঙ্গ ও যুগান্তর পত্রিকার প্রকাশ্য ছাপা বন্ধ হবার অব্যবহিত পরে প্রকাশ ও প্রচার হয়েছিল গোপনে। আমার যতদূর মনে হয়—৺ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ বা ৺পণ্ডিত মোক্ষদাচরণ সামাধ্যায়ী ইহার রচয়িতা। অমরদা' হয়তো জানিতে পারেন।

দেবব্রত বসু (পরে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ) রচিত ঐ সময়কার আর একটি সঙ্গীতও এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত অক্ষরে দেখি নাই এবং ঐ সমসাময়িক আর কাহারও স্মরণে আছে কি না জানা নাই। রচয়িতার মুখেই গানটি আমার শুনবার সৌভাগ্য হয়েছিল আলিপুর (এখন প্রেসিডেন্সি) জেলের ২৩নং ওয়ার্ডে নরেন গোঁসাই হত্যার কিছু পূর্ব্বে। ঐ সময় অল্প কয়েক দিনের জন্য শ্রীঅরবিন্দ, বারীন্দ্র, উপেন্দ্র, হেমচন্দ্র, দেবব্রত, উল্লাসকর প্রভৃতি ৩৬ জন আলিপুর বোমার মামলার আসামীদের একত্রে বাস ঘটেছিল। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী হল এখনও সেই সাধকের মুখনিঃসৃত অপূর্ব্ব সঙ্গীত ভুলিতে পারি নাই। সেকালের দেশমাতৃকার জগতজননীরূপে সাধনা এখনকার বাস্তববাদী দেশহিতব্রতীদের হয়তো উপহাসের বস্তু, কিন্তু তখনকার তাঁরা নিঃস্বার্থ সাধকভাবেই এ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। গানটি এই—

অধোবদনে কেন নীরবে বসি
নে মা অসি.
সন্তানে অক্ষম ভেবে, বল মা গো কত সবে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি—
নে মা অসি।
আদিতে যেরূপে মা গো আর্য্যভূমে দাঁড়ালি
দানবোপ্ত বাধাবিঘ্ন নাশিতে মা করালী—

নিজ স্বত্ব রাখিবারে ডাকি মা আজি হুঙ্কারে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি
নে মা অসি।
গাণ্ডীব রচেছিলি যে হাতে মা অতীতে
শৃঙ্খল-কিঙ্কিণী আজি বাজিছে সে হাতে,
সন্তানের শিরাতে এক বিন্দু থাকিতে
অধোবদনে কেন নীরবে বসি,
নে মা অসি।
তোল মা তোল মা আঁখি বিজলী খেলিবে তায়
কোটি কোটি সূর্য্য তব খড়গে ঝলসিয়া যায়,
রণমত্ত-সুত মাঝে দাঁড়া রণচণ্ডী-সাজে—
অধোবদনে কেন নীরবে বসি,
নে মা অসি।
গুরু-গুরু দূরে ঐ রণবাদ্য বাজিছে
মহাকোপ ইঙ্গিতে মা গো সমরেতে ডাকিছে—
কালী যেন রণমাঝে নব যুগে নব সাজে
নাচিছে ভারতে পুন রুধিরে মিশি,
নে মা অসি।

গানটি যদি কোথাও পাওয়া যায় বা আর কাহারও স্মরণে থাকে মিলাইয়া দেখিবেন।

আরও একটি ঐ সময়কার সঙ্গীত মনে পড়ছে—ইহাও বোধ হয় দেবব্রত বসুর রচনা, বারীনদা' হয়তো জানিতে পারেন।—গানটি হচ্ছে—

উঠিয়া দাঁড়াল জননী।
বঙ্গ বিহার উৎকল মারাঠা গুর্জ্জর রাজপুতানা
দাক্ষিণাত্য পাঞ্জাব সিন্ধু উত্তর-পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ
বীর সাজে সব সাজিল।
উঠিয়া দাঁড়াল জননী।
রক্তে আবরিল রক্তিম সবিতা
রক্তিম চন্দ্রিকা তারা
রক্তবর্ণ ডালি রক্তিম অঞ্জলি
অসুররক্ত মেখে ধরা কি বা শোভিল!
উঠিয়া দাঁড়াল
উঠিয়া দাঁড়াল জননী।

গানটি খুব সম্ভব সম্পূর্ণ নয়। আশা করি, যদি কেহ সম্পূর্ণ করিতে পারেন। ইতি—শ্রীপূর্ণচন্দ্র সেন। ১৮।১৮ ডোভার লেন, কলিকাতা-২৯। ৪ঠা সেপ্টেম্বর-১৯৫৬।

বইকেনা

আমি এক জন আপনার মাসিক পত্রিকার গুণমুগ্ধ পাঠক। সাহিত্যানুরাগী পাঠকশ্রেণীর মধ্যে এক জন হিসেবে একটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। প্রশ্নটি হচ্ছে—প্রখ্যাত লেখকদের হাত দিয়ে যে সব বই বাজারে বের হচ্ছে, সেই সব বই পড়বার সৌভাগ্য ও সুযোগ-সুবিধা ইচ্ছা থাকলেও ক'জনের ভাগ্যে ঘটছে? সকলেই জানেন, আজকাল সাহিত্যের কাননে আগাছা-পরগাছার অভাব নেই। ভেজালে বাজার ছেয়ে গেছে। এখানেও বণিকবৃত্তি দেখা দিয়েছে। তবুও আমাদের দেশে একমাত্র এই বাঙলা ভাষাতেই সৎ ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের উৎস অম্লান আছে, কারণ বাঙালীর মনীষা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ভাল বই বলতে যা বোঝায় তাকে ঘরে ঢোকানো তো দূরের কথা, তার গায়ে হাত দেয় এমন সাহস খুব অল্পেরই আছে। মুষ্টিমেয় জনকতক ছাড়া, ক'জন এ সব বই কিনতে পারেন? সহরের লাইব্রেরীগুলোতে দু'-এক কপি ভাল বই কিছু কিছু রাখা হয় বটে, কিন্তু লাইব্রেরী থেকে বাড়ীতে বই যোগাড় করে এনে সময় মত ও খুসীমত পড়ার কত যে অসুবিধা, তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। একখানা ভাল বই লাইব্রেরীতে এসে পৌঁছল তো অন্তত পঁচিশ জন হাত বাড়াল। কার ভাগ্যে কখন পড়ে কে জানে! আর মফঃস্বলের লাইব্রেরীর তো কথাই নেই। দু-একটা ছাড়া সচরাচর যা দেখতে পাওয়া যায় সেগুলো না থাকারই সামিল। তা ছাড়া সকলেই চায় ভাল বই দু-চারখানা বাড়ীতে সংগ্রহ করে রাখতে, নিজের রুচি ও অবকাশমত পড়বার জন্তে। এই দুর্মূল্যের দিনে সাবেকি আমলের মত সস্তায় বই কেনার আশা করা ধৃষ্টতা সন্দেহ নেই। কিন্তু বইগুলোর দাম কিছু কি কমান যায় না? কিছু দিন থেকে দেখা যাচ্ছে, প্রথম শ্রেণীর যে সব বই বাজারে প্রকাশ পাচ্ছে, সেইগুলোর মলাট নিয়ে ঘসামাজার কড়াকড়ি। এই যে প্রচ্ছদপটের ওপর আর্টের রকমারি কায়দা আর অহেতুক বাহুল্য, এটা কি একান্তই প্রয়োজন? আতিশয্য খানিকটা কমালে ক্ষতি কি? এইজন্যে বইগুলোর অবাঞ্ছিত মূল্যবৃদ্ধি হচ্ছে না কি? আর্ট ও আর্টিষ্টদেরও পুষ্টি ও স্বীকৃতি হোক সকলেই কামনা করে, কিন্তু ক্রেতাদের প্রতি একটু সহানুভূতিশীল হওয়া যায় না কি? আর একটা কথা, বিলাতে ও মার্কিণ দেশে নামকরা সাহিত্যিক ও চিন্তানায়কদের লেখা বইগুলোর সুদৃশ্য ও ভাল ভাবে বাঁধাই সংস্করণ ছাড়াও অনেক বইয়ের সস্তা সংস্করণ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ পেনগুইন পেলিকান ব্যানটাম প্রভৃতি সিরিজগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ প্রকাশকগণ ও নামকরা লেখকেরা এ বিষয়ে কি অগ্রসর হতে পারেন না? ভাল ভাল বইগুলোর বিদেশের মত দু-রকম সংস্করণই যদি তাঁরা প্রকাশ করেন, মনে হয় বিক্রয়ের দিক থেকে তাঁদের ক্ষতি স্বীকার করতে হবে না। প্রচলিত সংস্করণের সংগে সস্তা সংস্করণ প্রকাশ হলে বইগুলোর চাহিদা বেশ বাড়বে এবং সব রকম পাঠকই পড়ার সুযোগ পেয়ে লাভবান হবেন। আশা করি, আমার এ আবেদন যথাস্থানে পৌঁছাবে। নমস্কার।—শ্রীহরেন্দ্রনাথ মজুমদার। ২১৬ নং জি, টি, রোড নর্থ। হাওড়া।

পুরাতন সংখ্যা কিনতে চাই

১৩৫৫ থেকে ১৩৫৮ সালে মাসিক বসুমতীর প্রত্যেকটি সংখ্যা। শ্রীসুবিনয় সরকার, উকীল, সরকারপাড়া, পুরুলিয়া, জেলা মানভূম।

১৩৬২ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এবং ১৩৬৩ সালের বৈশাখ থেকে আষাঢ়ের সংখ্যাগুলি। শ্রীঅরুণকুমার রায়চৌধুরী, ৪ শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

১৩৫৭ সালের বৈশাখ ও আষাঢ়ের, ১৩৫৯ সালের আষাঢ়ের

ও ১৩৬১ সালের ভাদ্রের সংখ্যাগুলি। শ্রীরণজিৎ মুখোপাধ্যায়, ১ প্রতাপাদিত্য রোড. কলকাতা-২৬।

১৩৬২ সালের আশ্বিন থেকে ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ মাসের মাসিক বসুমতীর সংখ্যাগুলি প্রতি সংখ্যা বারো আনা হিসাবে বিক্রী করতে পারি।—শ্রীসুধীর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫০ পাঠকপাড়া রোড, পোঃ বেহালা, কলকাতা-৩৪।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

[বাংলা ভাষায় একমাত্র সর্ব্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্র 'মাসিক বসুমতী'র গ্রাহক-গ্রাহিকা ছড়িয়ে আছে বাঙলা তথা ভারতবর্ষ, তথা সমগ্র দুনিয়ায়। প্রতি মাসেই আমরা শত শত নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকা পেয়ে থাকি এবং ভবিষ্যতেও পাব। গত সংখ্যায় পাঠক-পাঠিকার চিঠি বিভাগে কয়েক জন নূতন গ্রাহক-গ্রাহিকার আবেদন-পত্র মুদ্রিত করি। প্রত্যেকের চিঠি প্রকাশের স্থানাভাব; সে জন্য বর্ত্তমান সংখ্যাতেও মাত্র কয়েক জনের আবেদন-লিপি প্রকাশিত হয়েছে।—স]

Sending money for Monthly Basumati, Please being from Sraban Number.—Sm. Kanak Lata Dass, C/o, G. K. Dass, Goombira Tea Estate. Oliviacherra. Cachar, Assam.

মাসিক বসুমতীর চাঁদার টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত পত্রিকা পাঠাবেন।—মহম্মদ মহসীন।

Here I am sending Rs 15/- in advance for supplying me the Monthly Basumati after enlisting my name as a permanent member of the same.—Mrs. Kanak De, C/o, R. K. De. Bandh. Phulbari, Orissa.

শ্রাবণ মাস হইতে ছয় মাসের টাকা পাঠাইলাম। আশা করি, নিয়মিত বসুমতী পাইব।—শ্রীবেলারাণী রায়। অরণ্যকুটীর। আসানসোল।

মণি-অর্ডারযোগে পনেরো [illegible] পাঠাইলাম। এক বৎসরের পত্রিকা যথারীতি পাঠাইবেন। [illegible] Malatirani [illegible] Parleshwar Housing [illegible]d. Building [illegible] Block No. 88, P[illegible]rle, [illegible]ay—[illegible]

Subscription for A[illegible] 1956 [illegible] '57.—[illegible]ali Library. Mission Road, [illegible]sawal.

Herewith sending money being the subscription of M. Basumati for one year, Please send the magazine regular.—Hindi Pustakalaya. Jamunamukh. Nowgong.

মাসিক বসুমতীর আগামী বারো সংখ্যার মূল্য বাবদ ১৫ টাকা পাঠাইলাম। জমা করিয়া লইবেন।—শেফালিকা দেবী। অবধায়ক শ্রীদেবকুমার সেন। হাজারীবাগ।

বার্ষিক চাঁদার পুরা টাকা পাঠাইলাম। শ্রাবণ সংখ্যা হইতে পাঠাইবেন।—

Sm. S. Banerjee. C/o, Sri A. K. Banerjee. Manager Estate Collieries, Po. Korba, Bilaspur M. P.

চাঁদা পাঠাইলাম। ১৩৬৩ সালের শ্রাবণ মাস হইতে আমাকে গ্রাহিকা করিয়া লইবেন। শীঘ্র সংখ্যাটি পাঠাইবেন।—চিন্ময়ী দাস। C/o, Sri A. Das, I. A. S. Park Road, Lucknow.

আগামী এক বৎসরের গ্রাহকমূল্য পাঠাইলাম। গ্রহণ করিয়া বাধিত করবেন। নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইতে অনুরোধ জানাই।—আশালতা ভট্টাচার্য্য। নদীয়া, খাজুড়িয়া, ২৪ পরগণা।

মাসিক বসুমতীর মূল্য পাঠাইলাম।—মিসেস এস, পাল। ২০, ডি, রাজপুর রোড। সিভিল লাইনস। দিল্লী—৮।

শ্রাবণ সংখ্যা হইতে ষাণ্মাষিক মূল্য পাঠাইলাম। ডাঃ পাঁচুগোপাল দে। P. O. Ziro N. B. F. A.

মাসিক বসুমতীর বাৎসরিক গ্রাহকমূল্য সডাক পাঠাইলাম। Sm. Sumita Mallik. Narmada Nivas. Block, 10. Parel. Bombay—12.

কলিকাতায় অবস্থানের সময় ষ্টল হইতে নিয়মিত পত্রিকা নিতাম। বাঙলার বাইরে আসায় নিয়মিত পত্রিকা পাওয়ার জন্য আপনার কাছে লিখিতেছি। শ্রীমঞ্জরী সেনগুপ্ত। C/o. Sri B. K. Sengupta. Communication station. Jodhpur. Rajasthan.

Sending Rs. 15/—only as my annual subscription.—Mrs. M. Mahanti. Buxi Bazar. Cuttack.

এই বর্ষ হইতে মাসিক বসুমতীর গ্রাহিকা হইতে চাই। শ্রীমতী ভারতী রায়। ৪৫, বালীগঞ্জ গার্ডেনস। কলিকাতা—১১।



মাসিক বসুমতী
॥ আশ্বিন, ১৩৬৩ ॥

ওয়েলার
—সুনীলমাধব সেনগুপ্ত

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত



মাসিক বসুমতী

৩৫শ বর্ষ—আশ্বিন, ১৩৬৩] ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ [প্রথম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা

কথামৃত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব। "সকলেরই যে বেশী তপস্যা করতে হয় তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কষ্ট করতে হয়েছিল। মাটির ঢিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাকতাম, কোথা দিয়ে দিন চলে যেত,—কেবল মা, মা, বলে ডাকতাম—কাঁদতাম।"

"আমি মা, মা, বলে এমন কাঁদতাম যে লোক দাঁড়িয়ে যেত।"

"যখন এই অবস্থা হলো, দিন-রাত কোথা দিয়ে যেত বলতে পারি না। সকলে বললে পাগল হলো।"

"কৃষ্ণকিশোর আমায় বলেছিল—পৈতেটা ফেললে কেন? যখন আমার এই অবস্থা হলো, তখন আশ্বিনে-ঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে গেল,—আগেকার চিহ্ন কিছুই রইল না। হুঁস নাই, কাপড় পড়ে যাচ্ছে, তা পৈতে থাকবে কেমন করে?"

"ভগবানের দিকে যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্য্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা ঈশ্বরীমূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যের বেশী প্রকাশ। তার পর দর্শন দ্বিভুজা,—তখন দশহাত নাই, অত অস্ত্র-শস্ত্র নাই। তার পর গোপালমূর্ত্তি দর্শন,—কোনও ঐশ্বর্য্য নাই, কেবল কচি ছেলের মূর্ত্তি। এরও পারে আছে,—তখন কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।"

"মা! এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; আমি কিছুই চাই না, তুমি আমাকে শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না, তুমি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম, আমি ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।"

"প্রেম কি সামান্য জিনিষ গা! প্রেম হওয়া অনেক দূরের কথা। চৈতন্যদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের দুটি লক্ষণ। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিষ ভুল হয়ে যায়। জগৎ ভুল হয়ে যায়, নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায়। দেহের উপরও মমতা থাকবে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।"

দানবীর মতিলাল শীল

শ্রীরমেশচন্দ্র দে

বীজটি মাটিতে ফেলা হোক ; এবং যেমন ক'রেই ফেলা হোক, অংকুর উপরে উঠবেই, শিকড় যাবেই নীচু পানে। বিধাতারই পরিপূর্ণ আশীর্বাদে মানবের কল্যাণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকবে সেই অংকুরটি চিরকাল পৃথ্বী-জননীর সুকোমল স্নেহ-ক্রোড়-বিলসিত, সুপুষ্টকাণ্ড মহীরুহরূপে, সুশীতল সুনিবিড় ছায়া প্রসারিত ক'রে চারিদিকে, সঞ্জীবনী শক্তি নিয়ে সু-রসাল ফল দান ক'রে উচ্চ নীচ সকলকেই বিশেষতঃ তাদেরকে যা'রা তৃষ্ণারুক্ষ, দুঃস্থ, আর্ত্ত, দুর্গত বা তাপিত।

যে বালকটি একদিন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে ব্রহ্মসংগীত শুনিয়ে সংমুগ্ধ করেছিল, দেবতারই পরম ইচ্ছায় দেবতারই অব্যক্ত ইংগিতে, মানসিক চরম আকুলি নিয়ে, একদিন এসে জিজ্ঞেস ক'রলে সেই কিন্তু—

ভগবান ভগবান করেন যে আপনি এতো, ভগবানকে আপনি কি দেখেছেন ? ভগবান কী আছেন ব'লতে পারেন ?

আছেন বৈ কি রে। এই যেমন আছি আমি তুই, আর আর সকলেই। তাঁর সংগে আমি হাসি, খেলি, রসালাপ করি, আবদার করি, চুমু খাই, কোটি কোটি তাঁর রাঙা পায়ে···এই যেমনটি, বুঝলি কি না, যুবকটিকে কোল দিয়ে তিনি ব'ললেন, কথা বলি, স্নেহ-ব্যবহার করি তোর সংগে।

—দেখাতে পারেন ?

—পারি অবশ্যই।

বেশ তো, দেখান।

ঐ—ঐ দেখ···ধ্যান-নিমীলিত চ'ক্ষে ব'ললেন ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। কই ? কিছুই তো নেই কোথাও ?

—আমার মতো হ', ব'ললেন ভগবান শ্রীশ্রীপরমহংসদেব। ধ্যানে ব'স। দেখা পাবি। দেখা না দিয়েই পারেন না তিনি।

ধ্যানে বসলেন সুনিবিড় ভাবে ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। নরেন্দ্রও ব'সলেন না কি ?

* * * *

মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে তিনি। বয়সে যুবক। নাম মতিলাল। জাতিতে সুবর্ণবণিক। উত্তর সময়ে দানবীর আখ্যায় ভূষিত।

বিবাহের পূর্বের মতোই, বিবাহের পরেও, শ্বশুর মশাই-এর সংগে কাশী বৃন্দাবন প্রভৃতি ধর্মস্থান ভ্রমণ ক'রেও পুনরায় হ'য়ে পড়লেন উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতির। কাশীতে প্রভু বিশ্বেশ্বরের পায়ে প্রণাম লুটিয়ে, বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে অতীন্দ্রিয় প্রেম-সর্বশক্তিমান শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দদেবের বংশীধ্বনি শুনে শুনে, ভগবান রাধাগোবিন্দদেবের উদ্দেশে সমর্পিত ও স্বীকৃত ভিক্ষু বালিকার কামগন্ধহীন নিকষিত হেম, ভাবদ্যুতি নৃত্য দেখে যে-পরম পুণ্যটুকুর অব্যক্ত সংস্পর্শে ঘটেছিল তাঁ'র চিত্ত-পরিশুদ্ধি, তা'র খোঁজ মানুষের মধ্যে, জানতো না কেউই ; লক্ষ্যও করেনি কিন্তু কেউ।

তবুও সে সত্য জানতেন একমাত্র একজন। একমাত্র তিনি, যিনি তাঁ'র প্রিয়তম সৃষ্টি মানুষকে ডাক দেন তাঁ'রই নিজের অসমাপ্ত কাজের একটু একটু অংশ সু-সম্পন্ন ক'রতে ; ডাক দেন তাঁরই নিজ হাতে রচা পৃথিবীকে আরো সুমনোজ্ঞতর ক'রতে ; আরো ভালো ক'রে উৎপ্রতিনাদ তুলতে তাঁ'রই-সুর ভাঁজা অমৃত-নিস্যন্দী সংগীতিটুকুর···

ধীবরেরা মাছ ধ'রছিলো। জাল ফেলেছিলো তা'রা বারে বারে, তবু উঠছিলো না কিন্তু কোন মাছ। সায়রের কোলে কী কোনো মাছ জন্ম নেয়নি সেখানে ? না কোনো অদৃশ্য দৈত্য তাদের সকলকে পুরে রেখেছিলো মায়াময় স্ফটিক পাত্রের গোপন মহলে ?

ধীরে ধীরে সৌম্যমূর্ত্তি একটি যুবক এসে দেখা দিলেন সেখানে, পরিধানে তা'র সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য-বসন, তিনি উঠলেন তাদের নৌকোয়। ব'ললেন, এবার একটু ফেলো দিকি জালগুলো তোমাদের···

জালগুলো প'ড়লো···ঝুপ—প, ঝুপ—প, ঝুপ—প···

জেলেদের হাতে খুব টান লাগে। তাদের বিশ্বাস জাগে, প'ড়েছে নিশ্চয়ই বড়ো বড়ো মাছ। বহু বহু বার টান প'ড়ছিলো, সামান্য একটু টানে মাছগুলো উঠে এলো, নৌকোর গলুই-এ, বিস্ময় জাগিয়ে জেলেদের, তারা পায়ে প'ড়ে প্রশ্ন ক'রলে, আপনি কে প্রভু ?

ভগবানের পুত্র। আমার সঙ্গে এসো। মানুষের মধ্যে জাল ফেলবে তোমরা···ব'ললেন পুত্র ভগবানের।

দেবতা যখন ডাক দেন,—কী ক'রে, কী ভাবে যে ডাক দেন, কেউই ব'লতে পাবে না ; কা'কে যে ডাক দেন, কেউই জানে না, কোটি কোটি লোকের ভিতরে।

ডাক পৌঁছুলো। পৌঁছুলো কাসটমস্ দারোগার কাছে। কাসটমস দারোগা মতিলাল শুনবেন কি না ডাক, ভাবছেন তিনি।

শ্রীকৃষ্ণের মুরলীধ্বনি তা'র মর্মের প্রতি কোণে আনাচে কানাচে, অন্তরের ভিতরে এবং বাহিরেও মূর্চ্ছা খেয়ে খেয়ে তা'কে আকুল ক'রছে।

চাকুরী ছাড়তে হয় তা'কে তবে···কিসের লোভেই বা চাকুরী ছাড়বে সে ? যা'র চাকুরী র'য়েছে, বা চাকুরীই ভরসা। যদি সে আরো বড়ো চাকুরী পায়···ম্যাজিষ্ট্রেট, জজ হয়।

বাণী এলো, আমার চাকুরী করো এসে।

তাঁ'র কাছে চাকুরী তো কেউ সংসারে করে না কখনো, তুমিই বা ক'রবে কেনো ? অবিবেক শোনায় বিবেককে।

মতিলাল ভাবছেন। ভাবনার সমাপ্তি ঘটিয়ে ঠাকুর চাকুরী দিলেন তা'কে।···ঘ'টিয়ে দিলেন ভাগ্য-বিবর্ত্তন।

মতিলালের কাকাবাবু গৌরমোহন শীল। ইহলোকের পথ-খরচা চুকিয়ে নিয়েছেন কাছাকাছি সময়েই। ছেলে ছিলো না তা'র কোনো। ছিলো একমাত্র কন্যা। কন্যাই হ'লেন পিতার সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র অধিকারিণী। ব্যথাও পেলেন।

ভগবান কখন যে কী ক'রেন কেউই ব'লতে পারে না।

ঐশ্বরিক খেয়ালে ও ইচ্ছায়, মতিলালের খুল্লতাতভগিনী—৺কমললোচন মল্লিক মহাশয়ের পত্নী—দু'টি নাবালক পুত্র নিয়ে হ'লেন বিধবা।

বোন ভাইকে ক'রলে অনুরোধ। জানালে, সম্পত্তি দেখাশুনা করো। ভাই এড়াতে পারলে না বোনের আগ্রহ ও অনুরোধ। দেবতা যখন ডাক দেন।

শিশি-বোতল বিক্রী, চাই শিশি-বোতল···

ধূলিমূল্যে শিশি-বোতল ক্রয় ক'রে হকারেরা। যাঁ'র কাছে এনে মজুদ দিচ্ছিলো তাঁ'রা, তিনি পাইকারী শিশি-বোতল ক্রয় ক'রছিলেন খুবই সুলভে। দূরদর্শী যুবক ইংগিত পেয়েছিলেন, "এগুলো কিনে নাও।" যুবক সেগুলো খুবই সস্তায় কিনে নিলে। শুধু তাই-ই নয়, উপযুক্ত কর্ক ফিট ক'রে বিক্রী ক'রলে যখন দাম গেল শুভক্রমে চ'ড়ে··

কিন্তু দেবতা যখন ডাক দেন, শিশি-বোতল ও কর্ক বিক্রী করা ছেড়ে··হ্যাঁ, সেটাও যুবক ছাড়লেন।

শিশি-বোতল ও কর্কগুলো তোলা হ'য়ে গেছে যথাস্থানে। কিন্তু এ কী? সোফাতে এসে ব'সতে না ব'সতেই···

সিন্দুকের থেকে টাকাগুলো উড়তে উড়তে নেমে এলো যেনো। নানা ধরণের মূর্তি তেমনই মনে হ'লো।

ইউরোপীয় বণিক-সমারোহ। কিন্তু তা'র মধ্যে কে ঐ একজন কিরাতের মত ফিরছে! সকলের চেয়ে সুন্দর, সকলের চেয়ে ঢেঙা, পরনে বাঘের ছাল, মাথায় টুকটুকে খণ্ড চাঁদ, জটায় সর্প অলংকার, দেহে ভস্ম···ডাকছেন ইংগিত ক'রে, এসো, এসো, আমার পেছনে পেছনে···

কী একটা অনাস্বাদিতপূর্ব সংগীতের ধ্বনি তা'র কর্ণপুটে এলো।

মতিলাল পেছনে পেছনে অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছেন। কে এসে হুংকার দিয়ে বাধা দিলে। প্রকাণ্ড তার মাথাখানি, অদৃশ্য তার সর্বাংগ, কবন্ধের মতো শক্তিমান। ছায়া করে ধনুর্বাণ।

কিরাতটি শরক্ষেপ ক'রে আক্রমণকারীর শুধু শরভংগই করলে না, ভেঙে ফেললে তার ধনু ও বাণ, উভয়ই। তার তেজ বিদ্ধ ক'রলে সুর-দেহ। ফিনকি ফিনকি বেরুতে লাগলো আগুনের হল্কা।

কী সুন্দর সেই সংগীতের ধ্বনি। কিরাতটি অগ্রসর হ'য়ে চলেছে। মতিলাল চলেছেন পেছনে পেছনে। কিরাতটি সেই সুরের আগুনের পথে পথে এগিয়ে চলেছে। এবং অবাধেই। গেল সে মিলিয়ে এক মহাদ্যুতি-পুঞ্জে।

সুরের আগুন জ্বলছিলো। মতিলাল চলেছেন। কিন্তু তিনি কতো দূর, যিনি সংগীতের সুরে সুরে বান ডাকাচ্ছেন?

পাহাড়িয়া পথ। ভীষণ দুর্গম। আগুন মনে হ'লো, একটা গিরি-পল্লীকে দগ্ধ ক'রে ছুটে আসছিলো হাওয়ায়, লক্ষ লক্ষ পায়ে ভর দিয়ে। ছড়িয়ে পড়লো সে আগুন গিরি-পথটির অন্য পাশে।

মতিলাল ঢালু পথটির ঢালে ঢালে নামছিলেন। এক পাশ দিয়ে নেমে পড়লেন, লহমার মধ্যে। দেখলেন, আগুনের লেলিহান জিহ্বা থেকে বাঁচবার আশা করে, আরো বেশী ক'রেই যেনো জড়িয়ে পড়েছেন তার আওতায়।

দগ্ধ হ'য়ে তিনি গড়াতে গড়াতে নামছেন। নামছে তো আরো কতো কতো। কখনো কখনো তাদের আর্ত করুণ চীৎকার কানে আসছে।

পাশেই, নীচেই ছিলো একটা প্রকাণ্ড সরোবর। মতিলাল গড়িয়ে পড়লেন তার জলে। প'ড়লো আরো কেউ কেউ। তবে তারা ভেসে ভেসে আসছিলো। যে পথ দিয়ে পার্বত্য ঝর্ণাটি ব'য়ে আসছিলো, তৃণ-গুচ্ছ প্রভৃতির ন্যায় ভেসে ভেসে আসছিলো তারা। কেউ কেউ আসছিলো ফুলের মতই ভেসে ভেসে।

সুরের আগুন কিন্তু তার ওপরেও আক্রমণ চালিয়েছে। ডুব দিয়ে সুশীতল হ'য়ে, যারা একটু নিশ্বাস নেবার আশায় মাথা তুলতে লাগলো। আগুনের লোল জিহ্বা ছড়িয়ে পড়লো তাদের ওপরেও। হয় নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসে, নয় জলের নীচেই হয় ডুবে থাকতে।

অভিজ্ঞ মতিলাল সুপ্রকাণ্ড ডুবসাঁতারে অগ্রসর হ'য়ে চ'লেছেন। শেষে এক সময়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন।

হাতীর পাল এসেছিলো বন থেকে। সরোবরে স্নান করছে। পদ্মরসে দেহ গন্ধাঢ্য ক'রছে। আগুনের তাপ কিন্তু তাদের ঝ'লসাতে পারছিলো না। শুঁড় দিয়ে তারা জল ছিটোচ্ছিল আগুনের হ'লকার ওপরে, যখনই আগুনের শিখা-স্রোত বায়ুপথে আসছিলো সাপের মতই ছুটে ছুটে তাদের দিকে।

নিঃসংজ্ঞ হাতীদের রাজারাণীর মুখের ছায়ায় ভাসছেন মতিলাল। হাতীদের রাজা তা'কে নিজের মুখে পুরলে, রাণী শুঁড় দিয়ে তাকে জড়িয়ে ঢোক-গেলা জল পেট থেকে নিঙড়ে বের করে সংজ্ঞা ফেরালে। রাজার পিঠের ওপরে বসিয়ে দিয়ে আদর করতে লাগলে।

মতিলাল সংজ্ঞা ফিরে পেয়েছেন। দেখছেন, হাতীরা ফিরে যাচ্ছে, প্রসরিষ্ণু লেলিহান অগ্নি-শিখার ওপরে জলবৃষ্টি ক'রতে ক'রতে।

স্বপ্নাবেশ গেল ভেঙে।

করুণার পরশ পাথরীর ছোঁওয়া লাগলো। সুকৃতি ছিলো, তাই। মতিলাল ইউরোপীয় বণিক-সমাজে বেনিয়ান বা মুৎসুদ্দি হ'য়ে প'ড়লেন। বহুদর্শিতা, ভূয়োদর্শন, অভিজ্ঞতা, সুবিবেচিত বিচার-প্রতিভা চতুরতা, পুরুষকার প্রভৃতির সংগে সুখ্যাতি ও দিব্য-করুণার মণিকাঞ্চন সংযোগের ফল ফললো। আমদানী রপ্তানী ও বার-তেরখানি জাহাজের মালিক হ'য়ে প'ড়লেন ভাবী দানবীর মতিলাল। শুধু তাই নয়·····

বহু ভূ-সম্পত্তি ক্রয় ক'রলেন, হ'য়ে প'ড়লেন সারা বাংলার একজন কুবের-প্রতিম জমিদার।

* * * *

"আমার মন্দির তৈরী করো।"·····

যুবকটি দু'টি আঁখি তুলে সামনের দিকে তাকালে, দেখলে মন্দিরটি একেবারে গেছে ভেঙে। হাজার হাজার বছরের দাসত্ব ও পরাধীনতার গ্লানি বোধ হয় সইতে পারছিলো না, তাই। যুবকটি সেই মুহূর্তেই নদীর দিকে ছুটলে, আনতে লাগলে, পাথর-টুকরো, একটির পরে একটি।

যে কেউ সেই পথ দিয়ে যায়, জিজ্ঞেস করে, "সৌম্য, কী করবে ঐ পাথরের টুকরোগুলো দিয়ে?"

"মন্দির গ'ড়বো", ব'ললে যুবকটি। "আদেশ পেয়েছি 'আমাদের পরম প্রভুর।"

শুধু পথিকমাত্রই নয়, যে কেউ শুনলো সে বাণী, যারই ছিলো শুনবার কান, দেখবার চোখ, অনুভব ক'রবার দরদী হৃদয়, সেই লাগলো পাথর-টুকরো বইতে। কবি, শিল্পী ও কারিগরেরা এলো। কবি

দিলে আদর্শ ও বাণী, শিল্পী দিলে ধ্যান ও পরিকল্পনা, কারিগরেরা দিলে পরিশ্রম।

অচিরেই তৈরী হ'লো মহামন্দির, সমুচ্চ ও অভ্রভেদী চূড়।

মন্দির গ'ড়লেন রূপ সনাতন। হিংস্র অ-ভারতীয়দের লোভী দ্বেষী হাতে ভাঙা বৃন্দাবন ও মথুরা। উভয়ই হ'লো পুনরুজ্জীবিত। প্রভু স্বপ্ন দিয়ে ব'লেছিলেন, আমি এখানে আছি।" গোপী যারা সুবিশ্বাসী যাঁ'রা তা'দের সুখের জন্য, আনন্দের জন্য ব'লেছেন, "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।"

রূপ-সনাতন কাঁদেন। জীর্ণ মন্দিরের ধ্বসা ছাদ দিয়ে জল পড়ে। স্তূপের তলায় র'য়েছেন বংশীধারী মদনমোহন। যিনি বিশ্ব-সংসারকে গৃহ দিয়েছেন, তাঁ'র গৃহের অবস্থা এই ধরণের।

বৃন্দাবনে টিলার গা ঘেঁষে বালির প্রসার। এ থেকে প্রমাণ হয়, যমুনা একদিন কুলুকুলু গানে, চিত্তিতের কানে কানে, কতো কথা ক'য়ে ক'য়ে এখান দিয়েই ব'য়ে যেতো।

ব'য়ে চ'লেছে সদাগরের নৌকো, ব্যবসা-বাণিজ্য ক'রতে। আটকে গেছে নৌকো টিলার ঠিক নিচে এসে। ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি সব কিছু ব্যর্থ। সদাগরের ভাবনার অন্ত নেই······ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে প'ড়েছেন, এমন সময় শুনলেন, কে যেনো অদৃশ্য থেকে তা'কে ডাকছেন, "এসো তুমি একবার আমার এখানে।"

সদাগর নামলেন। এগিয়ে চ'ললেন। লোকেরা যাঁ'রা ঠেলাঠেলি, ক'রছিলো, ব'ললে, "কেমন কর্ত্তা, ব'লছিনু কি না। হোথা যে সাধুটি থাকেন, তিনি পরম শক্তিমান।"

সদাগর ব'ললেন, "আগে অবিশ্বাস ক'রে কী ক্ষতিই না ক'রেছি।"

সাধুর নিকটে এসেছেন সদাগর। ব'ললেন, যা চাইবেন তাই দেবো, নৌকো ছাড়িয়ে দিন আমার।

সাধু ব'ললেন, "ঐ ভাঙা মন্দিরের স্তূপের তলায় র'য়েছেন একটি বালক। সুড়ঙ্গ দিয়েই নীচে নেমে যাও। তিনিই উপায় ক'রবেন, যা' কিছু ক'রতে হয় তোমার নৌকো-মুক্তির।"

সদাগর দেখা পেলেন না বালকের। দেখা পেলেন বংশীধারী মূর্ত্তির।

"মন্দির গ'ড়ো"···শুনলেন সদাগর।

সদাগর ব'ললেন, "আমার সর্ব্ব পাপ গ্রহণ ক'রো, সুপবিত্র করো আমায়। নৌকো ছাড়ুক। আজকের যাত্রার সমস্ত লাভই তোমার মন্দিরের জন্য তোলা রইলো, প্রভু!" নৌকো ছাড়লো।

ষোল গুণ লাভ হ'লো ব্যবসায়ে সদাগরের। মন্দির গ'ড়লো অবশ্যই। যাঁ'র মন্দির, তিনিই গড়েন, তিনিই গড়ান।

রূপ সনাতন দু'টি ভাই ছিলেন গৌড়ের নবাবের প্রধান অমাত্য। নবাব ভোগের জয় গা'ন, রূপ-সনাতন বৈরাগ্যের।

নবাব দক্ষিণ-বিজয়োৎসুক। ব'ললেন, "উড়িয়া মারতে যাচ্ছি। এসো। বিজয়ান্তে তোমার সংগেই বৈরাগ্যের পথে বেরিয়ে প'ড়বো। তুমি যে বালক প্রভুর সন্ধান ক'রছো, তারই উদ্দেশে।"

দক্ষিণে শ্রীক্ষেত্র। উড়িয়া মারার অর্থই শ্রীক্ষেত্র ধ্বংস করা।

রূপ-সনাতন অস্বীকার ক'রলেন।

"ভোগের জৌলুস শ্রীক্ষেত্রের মহিমা নষ্ট করে। বৈরাগ্যের আলো ভিন্ন তাঁ'র রূপ কারো চোখে ফোটে না; সম্রাট। প্রভু যে-পথে অমৃত বিলিয়ে অগ্রসর হ'য়েছেন অহিংসার বাণী শুনিয়ে শুনিয়ে, সেই পথই আমাদের।" ব'ললেন রূপ-সনাতন।

নবাব নৈতিক সমর্থন না পেয়েই যাত্রা ক'রলেন। শ্রীক্ষেত্রের বিরুদ্ধে।

শ্রীক্ষেত্র কিন্তু আজো বর্ত্তমান। বর্ত্তমান যেমন প্রত্যেকটি জাতির মধ্যেই এক অদ্বিতীয় ভগবান। রূপ ভিন্ন হ'তে পারে, সত্তা, পরমাত্মা কিন্তু এক। প্রভুর মন্দির নির্ম্মাতা'রা এমনই।

"মন্দির আমার গ'ড়ে তোলো," পুনরায় ধ্বনিত হ'লো সেই বাণী। আত্ম-নিবেদিত-প্রাণ যুবকটি এ গভীর বাণীর গভীর রহস্য অন্তরের অন্তস্তলে অনুভব ক'রলেন·····এ মন্দির নয়·····জীবন্ত মন্দির··· মানুষের দেহ-মন্দির, যা সকলেরই গ'ড়ে তোলা প্রয়োজন। "কোরাপসন" বা কালুষ্যের ধূলি হবে ঝেঁটিয়ে ফেলতে, শুকনো শুকনো হাড়গুলো ক'রতে প্রাণ-সচঞ্চল, রক্ত-সুমেদুর দিব্য আত্মার নিঃশ্বাস পবনের ফুৎকার ব'য়ে যাবে জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, পূর্ণ-পরিপূর্ণ ক'রে সকলকেই।

পবিত্রকুমারী দিব্য স্বপ্ন দেখেছিল। শুনেছিলো দেব-বাণী। নৃপতিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করো।

নৃপতি কে? তিনি ছাড়া আর কেই-বা নৃপতি এই বিশ্ব-সংসারে? যখন বিশ্ব-সংসারের এই সমস্তই তাঁ'র সৃষ্টি।

রাজারও রাজা তিনি।

পবিত্রকুমারী আপন মনোমন্দিরের স্বর্ণ-সিংহাসনে পরম দেবতাকে ক'রলেন প্রতিষ্ঠিত। প্রতিষ্ঠিত করলেন তাঁকে বিশ্বাস ও ভক্তির মধ্যে মানুষের প্রতিটি হৃদয়ে হৃদয়ে, পাছে অকৃতজ্ঞ মানুষ ভোগের লালসায় তাঁকে ভুলে যায়। রক্তমাংসের শরীর রক্তমাংসের মধ্যেই তাঁকে ধ'রতে ও ছুঁ'তে পারে যেনো, এই জন্যে মানুষের মধ্যে তাঁর প্রতীকের অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন ক'রলেন।

সকল মানুষের মধ্যে যিনি একটু একটু ক'রে রয়েছেন; সাধু-সন্তদের মধ্যে তিনি রয়েছেন এতো বেশী ক'রে যে, সাধারণ মানুষ তাকে নাগালের মধ্যেই পায় না। পবিত্রকুমারী সেজন্যই যুগ-যুগান্তের সুপবিত্র লাল রক্তের মধ্যেই গ'ড়লেন দেবতার পরম আসন; ভগবানের মর্ত্ত্য প্রতিচ্ছবি রাজাকেই কেন্দ্র ক'রে স্বদেশাত্মাকে ক'রলেন বিদেশীয়দের কবল থেকে পরিমুক্ত।

হৃদয়-দুয়ারে আঘাত ক'রছে সেই সুগভীর বাণী। "মন্দির আমার গ'ড়ে তোলো।" বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে মানুষ একদিন পর্ব্বত চালিয়েছে। সমুদ্র-মন্থনে মন্দর-পর্ব্বতকে দেখুন। দেবতা অসুর উভয়েই একত্র হ'য়েও স্থানচ্যুত ক'রতে পারেনি, কিন্তু বিষ্ণুর সুপ্রসন্ন হাসিটুকুতেই তা' হ'য়েছিলো সু-সম্ভব। গরুড়ের পিঠে চড়ে মন্দর এসেছিল বাসুকির বেড়ী-বদ্ধ হ'তে।

* * * *

মতিলালও হৃদয়ের রাজাকে সিংহাসনে ব'সিয়েছিলেন। সকলেই যেনো তা'কে দেখতে পায়, সেজন্য মন্দিরেও তাঁকে ক'রেছেন সিংহাসনস্থ ও প্রতিষ্ঠিত।

অন্তিম সময় স্বপ্রতিষ্ঠিত গঙ্গাঘাট। দেবতার হাত ধ'রবার জন্য আসছেন মতিলাল। তা'র আনন্দের সীমা নাই। একটা পরম পুলক-আবেশে তা'র সর্ব্বতনু কদম্বের শিহরণ অনুভব ক'চ্ছে। সুমধুর বংশীধ্বনি শোনা যাচ্ছে যুগ্মমূর্ত্তি গোলোকেশ শ্রীশ্রীরাধামাধবের।

একজন বন্ধু জিজ্ঞেস ক'রলেন, "আপনি কী কোনো ভয় পাচ্ছেন ওপারের যাত্রাপত্র পেয়ে?"

মতিলাল ব'ললেন, ভয়? না, ভয় কি? মতিলাল এ পৃথিবীকে জানে না, পরবর্ত্তী জীবনেও জানবে না।'

নিউটন যিনি মাধ্যাকর্ষণ-তত্ত্বের প্রবর্ত্তক, বালক বয়সে তিনি একদিন এমনই উত্তর দিয়েছেন।

খাবার সময়। খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না তাঁকে। সন্ধ্যাবেলা খুঁজে পাওয়া গেল। নদীর ধারেই একমনে কী ভাবছেন তিনি। সান্ধ্য অন্ধকার রাক্ষসীর মতো গ্রাস ক'রতে আসছে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। জিজ্ঞেস করলেন স্নেহময়ী দিদি-ভাই, "বাছা তোর ভয়-ডর কিছু নেই কী?"

"ভয়-ডর কী? ভয়-ডর কা'কে বলে? দেখতে কেমন, দিদিমা?" ব'ললেন তরুণ নিউটন।

মতিলালকেও যদি বন্ধু সেদিন জিজ্ঞেস ক'রতেন, "তুমি কেন একথা বললে?" তবে নিশ্চয়ই মৃত্যু-পূর্ব্বে তা'র আত্মা স্বপ্নাবেশে যে চলচ্চিত্র দেখছিল, তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও ইংগিত উত্তরকালের জীবনীকারদের জন্য লিপিবদ্ধ ক'রে যেতে পারতেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ ও মহাপ্রভুর উদ্দেশে প্রণাম করছেন মতিলাল। বিস্মিত হ'লেন। এ কা'কে দেখছেন? সেই কিরাতই কী নয়?

কিন্তু এ যে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বেশ। কেন? কেন? কেন?

সন্ন্যাসীর উত্তরীয় প'ড়েছে মতিলালের অঙ্গে।

মুহূর্ত্তের জন্য সম্বিৎ ফিরে এলো। আত্মা বেরিয়ে প'ড়লো চারি দিক দেখতে দেখতে, অসম্পূর্ণতা যদি কোথাও বা একটু চোখে ধরা পড়ে।

দিনের আলো নিবে আসছিলো। আত্মা আশ্রয়ের জন্য চ'লেছে সম্মুখের ঐ গ্রামের দিকে। প্রদীপের সারি জ্বলছে ঐ।

গুটিকয় বালক বেরিয়ে এলো।

"কোন স্কুলে পড়ো?" প্রশ্ন ক'রলেন তিনি।

"আজ্ঞে, স্যর, শীলস ফ্রী স্কুলে।" সভ্য-ভব্য উত্তর চমৎকার!

ফিরলেন তিনি, বনের ভিতর দিয়ে হ্রস্ব পথে। বন পেরুতেই শুনলেন বজ্রধ্বনি। মহামেঘদের প্রতি আরতি জানাচ্ছিল বনস্পতিগণ, তাদের মাথায় প'ড়ছিল বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত। ভিতরে জ্বলছিলো বাত্যার সংঘর্ষে প্রসূত দাবানল।

গাঢ় অন্ধকার ঘনিয়ে আসছিলো ভয়ংকর সর্ব্বগ্রাসী মূর্ত্তি নিয়ে।

আশ্রয়ের জন্য পুনরায় বনের দিকেই ছুটতে চাইছিলো মন, কিন্তু তবু এগিয়ে চলেছেন তিনি। বনের বাইরে আসবেন, মনে এই ইচ্ছাই প্রবল। বৃষ্টিপাতে নিশ্বাস আসছে বন্ধ হ'য়ে। তবুও এগিয়ে চ'লেছেন।

ভোরের পাখীরা গান গাইছে। অন্ধকার কাঁদছিলো! কোথায় পালাবে? ভাবছিলো, কী রকম হয় যদি প্রদীপের তলায়, খাটিয়ার নীচেয়, সিন্দুকের পেছনে বা ভাঁড়ার-ঘরেই সে ঠাঁই নেয়। শিশু বা গিন্নীরা ছাড়া আর কেউ তাকে বিরক্ত ক'রবে না। ভাবছিলো সে, বনের ভিতরে যদি আশ্রয় নেয়, আশ্রয় নেয় গাছের শাখায়, খনির ভিতরে, হিমালয়ের গুহায় গুহায়, মনের গহন মহলে মহলে, চিন্তিতের কপালে কপালে অলসের বা অজ্ঞের চোখে চোখে···

ভোর-আলো তীর হানতেই সে গেলো পালিয়ে। রবিদ্যুতিতে চারদিক ঝলমল ক'রে উঠলো।

ঘুম ভেঙে শিশু যেমনটি দেখে মা'কে, ভক্ত দেখে তা'র আরাধ্য দেবতাকে, মতিলাল দেখলেন মন্দিরের চূড়া, শ্যামল মাঠের মধ্য দিয়ে গ্রাম্যপথটিকে রয়েছে গৌরবাঢ্য ক'রে।

দেবালয়। রথতলা। ত্রিশ বিঘে জমি। ফলের বাগান ও পুষ্করিণী আছে। এরই ওপরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব ও গৌর-নিতাই।

সদামুক্ত দেবতার অন্নসত্র। পাঁচশোর থেকেও বেশী, আরো বেশী, প্রায় হাজার বারোশো লোক জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে ভোগ করে দেবতার কৃপান্ন।

কাছে এলে চোখে পড়ে বিদ্যাবীথিগুলি ছাত্র ও শিক্ষকে পরিপূর্ণ—কেউ শিক্ষা নিচ্ছে কৃষি বিদ্যালয়ে, কেউ তাঁতঘরে, কেউ লৌহ বা পেতল-কাঁসার শিক্ষা আয়তনে, কেউ কাষ্ঠ-কারখানায়, কেউ গেঞ্জি-গামছার কলে, কেউ দুগ্ধজাত প্রতিষ্ঠানে।

প্রতিদিনের শিক্ষা অন্তে দুঃস্থ কর্ম্মীদল এসে দেবতার কৃপান্নে হয় সঞ্জীবিত। সরকারী খরচায় কাজ শিখছে তা'রা, ভোগ ক'রছে দেবতার কৃপান্ন। ভালোবাসতে শিখছে দেবতাকে। পরম আত্মীয়কে ক'রেছে আরো পরম আত্মীয়।

মতিলাল তাকালেন······

জাতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় তাঁ'রই প্রতিষ্ঠিত মন্দির অগণিত হ'য়েছে প্রতিটি গ্রামে গ্রামে, কেন্দ্রীভূতরূপে শিক্ষাক্ষেত্রগুলিরই। গুটিকয় লোক পাকারাস্তাটির ধারে খেজুর গাছের নীচে ব'সে আলাপ ক'রছিলো।

এক জন ব'ললে "জমিদারদের জমিদারি গেলেও জমিদারত্ব অস্তমিত হবে না কখনো, যদি তা'রা ব্যাঙ্ক ভর্ত্তি টাকা ব্যবসায়ে খাটান; কারণ বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, একথা যদি সত্য হয়, তবে লক্ষ্মীপতি রাজা তা'রা থাকবেনই।"

আরো একজন ব'ললে, "লক্ষ্মীপতি রাজা তা'রা থাকবেই, যদি দানবীর মতিলাল শীলের আদর্শে মন্দিরকেন্দ্রিক গ্রাম তা'রা গ'ড়ে তোলেন, নিজেদের চেষ্টায়। এবং প্রয়োজন হ'লে সরকারী সাহায্যেও।"

তৃতীয় ব'ললে, "অভাব তাদের কিছুই নেই: ব্যাঙ্কভর্ত্তি আছে, কোটি কোটি ছেলেরা মেয়েরা যাচ্ছে বৃত্তি নিয়ে দেশবিদেশে শিক্ষা নিতে, নিজেরা ক'রছেন জাতীয় সরকারে বড় বড় চাকুরী বা সংশ্লিষ্ট র'য়েছেন কোন না কোন ব্যবসায়ে।"

চতুর্থ ব'ললে, "যদি তা'রা হৃদয়কে কৃপণ না করেন, গ'ড়ে তোলেন দেবতার অন্নসত্র, যা'কে ঘিরে টেকনিকাল শিক্ষায়তনগুলি কিংবা দুগ্ধজাত প্রতিষ্ঠানগুলি শ্রী-সমৃদ্ধি ছড়াবে, সমাজের সুখে ও কল্যাণে, তবে কলিকাতা নগরী বা অন্যান্য নগরের জনতা-বাহুল্য লঘু হ'য়ে যাবে, গ্রামে যারা থাকে, দুটি অন্নের জন্য, কর্ম্মের জন্য, জীবিকার সন্ধানে সন্ধানে আশ্রয়ের লালসায় গ্রাম ছেড়ে তা'রা আসবে না সহরে সহরে ভীড়ের সমুদ্র সৃষ্টি করতে, বাড়াতে সহরের ক্লেশপূর্ণ অস্তিত্ব, চূর্ণ ক'রতে নগরীর লালসার ক্ষুধা, এ কথা ভাবী বক্তা না হ'য়েও বলা যায়।"

ইট-চুল্লী দেখে ফিরছেন রাজাবাবু।

—"আজ্ঞে, প্রণাম হই," ব'লে প্রথম বক্তা পদধূলি নিলে।

দ্বিতীয় ব'ললে, "আপনিই গ্রামের অন্নদাতা, কর্ম্মদাতা, ধর্ম্মত্রাতা!"

রাজাবাবু ব'ললেন, "আমি এমন কীই-বা ক'রছি গ্রামের জন্য?"

"কেন ?" বললে চতুর্থ, "আপনার প্রচেষ্টায় আমাদের গ্রাম সহরের "এপিটোম" বা প্রতিচ্ছবি হ'য়েছে, অথচ সহর হয়নি, সহরের জ্বালা নিয়ে।

তৃতীয় ব'ললে, "দুগ্ধ মাখনের প্রতিষ্ঠান, কারখানা প্রভৃতি কর্ম্ম যোগাচ্ছে গ্রামবাসীদের, কৃষিবিদ্যালয়গুলি ধান বা অন্যান্য ফসল ফলাচ্ছে ভূরি ভূরি।"

গ্রামের লোকের ধার্ম্মিক ও সচ্চরিত্র ধর্ম্মদেবের মন্দিরের ছায়ে ব'সে, অন্নসত্রে প্রসাদ ভোগ করে প্রতিদিন।

রাজাবাবু ব'ললেন, "দানবীর মতিলাল শীলের উত্তরীয় প'ড়েছিল আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের অঙ্গে···তিনি যে আদর্শ রেখে গেছেন সে আদর্শকে ভিত্তি ক'রে চ'লতে পারলে, গ্রামগুলি হবে স্বর্গস্থলী।"

মতিলাল ভাবছেন, "আদর্শ চিরস্থায়ী, স্বার্থ নিমেষেই পড়ে ঝ'রে।

ফুলগাছগুলি ফুলে ফুলে ভরা। ফুটফুটে বালক একটি, আরো ফুটফুটে একটি বালিকাকে কাঁধে তুলেছে, ফুল তুলতে। বহু বহু শাখাই র'য়েছে উর্দ্ধে নাগালের বাইরে। সব ফুলই ফুটেছে উঁচু ডালে ডালে।

সাজি পূর্ণ ক'রে ফুল নেবে দু'টি শিশুরই এই আকাঙ্ক্ষা।

মতিলাল তাদের ব্যর্থতা দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পেলেন। ব'ললেন, "আমার কাঁধের ওপরে তোমরা এসে ওঠো। যে-রকম ভাবে ফুল তুলছো, সে-রকম ভাবেই তোলো।"

মতিলাল ঘাড় শক্ত ক'রে বসলেন। বালকটি বালিকাটিকে কাঁধে বসিয়ে নিজে চ'ড়লে মতিলালের কাঁধে। ফুল তোলা হলো, ইচ্ছে মতো থেলো-থোলো রঙ-বেরঙের ফুলগুলো।

বিদায় নেবা'র ক্ষণ আসতেই বালকটি একটি কাঁটা দিয়ে মালা গাঁথতে লাগলো। তার হাত কাঁটা বিঁধে লাগলো রক্ত ঝরতে। মতিলাল নিজ উত্তরীয় ছিঁড়ে বেঁধে দিলে তার হাতখানি। বালকটি সকৃতজ্ঞ ভাবে ব'ললে, "আজকের মালা আমাদের স্মৃতিচিহ্ন-রূপে অক্ষয় থাকুক।"

পরিয়ে দিলে বিনিসুতোর মালাখানি মতিলালের কণ্ঠে।

বলিকাটি বললে, "কপালে তোমার চন্দনের ফোঁটা দিলুম। আমার দেওয়া ও তিলক অক্ষয় হয়ে থাকবেই।"

"এ তিলকের নাম কি জানো?"

মতিলাল কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকালে তার দিকে।

ভ্রূ বাঁকিয়ে বলিকা বললে, রাধাদ্যুতি।

"আর এই মাল্যের নাম?"

"মাধব-নির্ম্মাল্য"।

পরিচয় চাইতে যেয়ে লজ্জায় প'ড়বার আগেই বালক-বালিকা বললে, "ঐ আমাদের রথ এলো। আজ রাসোৎসব আমাদের। এসো কিন্তু। বালক-বালিকা গেল চ'লে। সত্যই রথ আসছিল। মতিলাল বিস্ময়-বিমুগ্ধ।"

গ্রামের শেষ সহরের আরম্ভ। এই সন্ধিস্থলে সুপ্রকাণ্ড রথ, সুপ্রকাণ্ড সৌধের মতই, যেনো মায়াবীর মন্ত্রস্পর্শেই তার রূপায়ন, অপেক্ষা করছিল।

সহরে উঠবার সিঁড়িগুলি বেয়ে জনতা উঠছে, মতিলালও উঠলেন। দেখলেন, শোভাযাত্রা বেরিয়েছে।

আজ রাস-পূর্ণিমা।

ভগবান রাধামাধব সিংহাসনে ব'সে রয়েছেন।

রাধামাধবের দিকে তাকালেন মতিলাল। দেখলেন, দে রহস্য ক'রেই যেনো নিজের আঙুলটা দেখছেন, লেগে রয়েছে তা চন্দনের পংক যেমনই সরস সতেজ। দেবতার আঙুলটি ছি তেমনই বাঁধা। উত্তরীয় ন্যাকড়ায় বাঁধা। বিনিসুতোর মালা তিনি গেঁথেছিলেন। সাজি-ভর্ত্তি ফুলগুলো সবই রয়েছে তাদে পাশে।

মহামহিমার দেবতা এমনই ছলনা করেন, সুকৃতিমানকে করুণা করেন এমনই। শিশুবেশে শ্রীশ্রীমাধব যে মাল্য পরিয়ে দিয়েছেন মতিলাল-কণ্ঠে, আজো তা' রয়েছে তেমনই অম্লান ও দ্যুতিমান; শ্রীশ্রীরাধিকা দেবী যে রাধাদ্যুতি তিলক পরিয়ে দিয়েছেন, আজো র'য়েছে তা' তেমনি জয়-উর্জ্জ্বল। বহু বহু লোক এগিয়ে আসছে নম্র নতি পরায়ণ ভাবে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন ক'রে দেবতাকে। চলচ্চিত্র চ'লছে বিদ্যুৎ, ঝলকানিবৎ। শোভাযাত্রায় দেখা যাচ্ছিলো মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের। তারা ব'ললে, আপনারই দেওয়া ভূমিতে আমাদের কলেজ গ'ড়ে উঠেছিল। মতিলাল শীল অনাথ ও বিধবা সাহায্যভাণ্ডার তুলোর নাম লেখে ব'য়ে ব'য়ে আনাথা বিধবারা এগিয়ে আসছে। তারা বললে, আমরা আপনারই ট্রাষ্ট-ফণ্ড অর্থে প্রতিপালিত। প্রথম বিধবাকে বিবাহ ক'রে ধনকুবের হ'ল একজন। আপত্তি জানালেন তিনি। ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা হ'চ্ছে। দেখলেন, একজন বক্তা বলছেন: দান ও বদান্যতা যদি উল্লেখ করতে হয়, তবে তা মতিলালশীলের। বক্তাকে ঠিক চিনতে পারা যাচ্ছিল না। প্রসূতিরা শিশু কোলে তা'র কপালে তিলক পরিয়ে দিচ্ছে। গঙ্গাস্নান ক'রতে লোক চ'লেছে। "কোন ঘাটে স্নান করবো? বলাবলি করছে স্নানার্থীরা। প্রিয় ঘাটটির কথাই ব'লছে তা'রা সকলেই, সুখে স্নান ক'রে মতিলাল শীলের ঘাটেই। মরণাপন্ন ব্রাহ্মণকে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে স্নানঘাটে। "বাবুর বাড়ীর পথ দিয়ে যাবো" ব'ললে আসন্ন-মরণ ব্রাহ্মণটি। তাই হবে। জীবনের শেষ ইচ্ছে তা'র পূর্ণ হোক। ব্রাহ্মণের ইচ্ছে ম'রবার আগে বাবুর সংগে একবার দেখা ক'রবে। সাক্ষাৎ হ'লো। বাবুর নিকটে ব্রাহ্মণের বাড়ী ছিল মর্টগেজ। মর্ত্তে সুদুর্লভ কৃপাময় বাবু সর্ব্বদায় থেকে ব্রাহ্মণকে শুধু মুক্ত ক'রলেন, তাই-ই নয়, প্রয়োজনীয় অর্থও দান ক'রলেন তাঁ'র আসন্ন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া কাজে। ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী ছায়ার মতই তা'র সংগী। যদিও এতক্ষণ দেখা পাচ্ছিলেন না, সন্ন্যাসীর উত্তরীয় স্কন্ধে নিয়ে তিনি তা' বেশ অনুভব ক'রছিলেন। সন্ন্যাসী দেখা দিয়ে ব'ললেন, "দু'টি শিশু তোমারই জন্যে অপেক্ষা ক'রছে।"

"কোথা তা'রা?"

শিশু দু'টি এলো। একটি বালক, একটি বালিকা। একজন নীলকান্তি, অপরটি শুভ্রশোভা। উভয়েই এসে হাত ধ'রলে। বললে আমাদের সংগে গোলোকে যাবে এসো।

মতিলাল চিনতে পারলেন, তাদের উভয়কেই। বালকটির পাদস্পর্শ র'য়েছে এখনো তার স্কন্ধে, কর-স্পর্শ ছাপ রয়েছে, মাথায় ও দেহে। বালিকাটির হাতের স্পর্শ আজ যা পাওয়া গেল—গোলোকে যাত্রাকালে, রাধাদ্যুতি কপালে এঁকে দেবার সময়েও সেই স্পর্শ ছিলো। হাত ধ'রেছেন স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ দেব।

মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে লিখিত বিভিন্ন সুধিবৃন্দের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

[শতাব্দীর ইতিহাসের পাতায় উনবিংশ শতাব্দীর মত রত্নপ্রসূ শতাব্দী আর একটিও চোখে পড়ে না। উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ ক'রে যে গণিত দিকপাল সন্তানের দল দেশ ও জাতিকে দিয়ে গেলেন সত্যিকারের পথের নির্দেশ, মাতৃভূমিকে জয় করে দিয়ে গেলেন জ্ঞানের, মনীষার ও মেধার রাজ্য, পাণ্ডিত্যের শুভ্রস্নাত আলোকের ঝরণাধারায় ঝলমলিয়ে দিয়ে গেলেন সারাটি দেশকে। সেই সৃষ্টিধর্মী মনীষীদের মধ্যে কবি-বিদ্যোৎসাহী-রাষ্ট্রবিদ মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুরের (১৮৩১-১৯০৮) নাম অন্যতম। যতীন্দ্রমোহন এমন একটি বংশের সন্তান, যে বংশের সমকক্ষ সারা বিশ্বে দুটি-একটি পাওয়া যায়। মহারাজার পিতামহ ৺গোপীমোহন ঠাকুর (১৭৬১-১৮১৮) সেদিনকার সমাজে একজন বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। বাণিজ্যে বাঙালীর জয়ধ্বজা সুদৃঢ় ক'রে ব্যবসাক্ষেত্রে একটি অপূর্ব রেকর্ড রেখে গেছেন গোপীমোহন ঠাকুর। তাঁর পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুত্র যথাক্রমে শাস্ত্রজ্ঞ হরকুমার ঠাকুর (১৭৯৬-১৮৫৮) ও রাষ্ট্রজ্ঞ প্রসন্নকুমার ঠাকুর (১৭৯৮-১৮৬৮)। হরকুমার ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, শিল্প-বিশেষজ্ঞ, সামাজিক বিধানাচার্য্য,—প্রসন্নকুমার ছিলেন রাষ্ট্রনেতা সাংবাদিক, সংবিধানাচার্য। তাঁদের তৃতীয় অগ্রজ ৺নন্দকুমার ঠাকুরের পুত্র ৺যোগেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮১০-১৮৩২) ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত "সংবাদ-প্রভাকর" এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রসন্নকুমারের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮২৬-১৮৮৯) প্রথম ভারতীয় ব্যারিষ্টার। হরকুমারের পুত্রদ্বয় যতীন্দ্রমোহন ও শৌরীন্দ্রমোহন (১৮৪০-১৯১৪)। সঙ্গীতনায়ক রাজা স্যার শৌরীন্দ্রমোহনকে সঙ্গীতের একজন যুগস্রষ্টা বললেও অত্যুক্তি হয় না।

যতীন্দ্রমোহনের সারাজীবন অতিবাহিত হয়েছে কর্মে, জ্ঞানানুশীলনে ও পরোপকারিতায়। বাঙলাদেশের আদর্শ জমিদার, শিষ্টতা ও বিনয়গুণের মূর্ত প্রতীক, দেশহিতব্রতী মহারাজার বিস্তৃত জীবনকাহিনী ব্যক্ত করা এখানে সম্ভব নয়। তখনকার দিনে কোনো গঠনমূলক কাজে কি রাষ্ট্রীয়, কি সামাজিক যে কোনও ব্যাপারে মহারাজার উপদেশ ও নির্দেশ অপরিহার্য ছিল। সেদিন যতীন্দ্র-মোহনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দেশের এক সম্পদের বিষয় ছিল। শুধু বাঙলাদেশ কেন, তার বাইরেও তাঁর প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তারই নিদর্শনস্বরূপ তাঁকে লেখা বিভিন্ন মনীষীদের পত্রাবলীর মধ্যে থেকে মাত্র কয়েক জনের কয়েকখানি অপ্রকাশিত চিঠি তুলে ধরা হয়েছে। এই চিঠিগুলির মধ্যে কবি নবীনচন্দ্র ও মহারাজার ভ্রাতুষ্পুত্র কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের চিঠি দু'টি ব্যতীত অন্যান্য পত্রগুলি মূলতঃ ইংরাজী ভাষায় লিখিত। রাজা প্যারীমোহনের পত্রে উল্লিখিত নবীন বাবু ছিলেন মহারাজার বৈবাহিক নাট্যকার ৺নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৩-১৮৮৯)। ইনি বেলগাছিয়া নাট্যশালায় অভিনীত মাইকেল 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মহারাজার সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এই পত্রগুলি মহারাজার বিশ্বখ্যাত পারিবারিক গ্রন্থাগার থেকে প্রাপ্ত। এই চিঠিগুলি প্রকাশ ক'রতে অনুমতি দেওয়ার জন্য মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের পৌত্র আমাদের পরম শুভানুধ্যায়ী মহারাজা শ্রীযুক্ত প্রবীরেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়কে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।—স]

বঙ্কিমচন্দ্রের চিঠি

বহরমপুর, ২৭শে মার্চ্চ ১৮৭২

প্রিয় মহাশয়,

আমার পত্রিকা সম্বন্ধে আপনার সাহায্যের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার মত ব্যক্তি যদি এ বিষয়ে আগ্রহশীল হন তাহা হইলে সফলতা যে আসিবেই তাহাতে সন্দেহ নাই।

ইংরাজী পত্রিকার জন্য আমি আপনাকে উপন্যাস, গল্প, নক্সা সরবরাহ করিতে পারি। আপনার ইচ্ছানুযায়ী চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ও দেওয়া যাইতে পারে। ব্রহ্মবিদ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া কবিতা পর্য্যন্ত সব কিছুই আমি চালাইতে পারি। লেখা হয়ত ভাল হইবে না, তবে আপনার জন্য আমি যথাসাধ্য করিব। উপন্যাস আমার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন বলিয়া মনে হয়, কারণ মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সমস্ত ঘটনাবলী ও চরিত্র বিশ্লেষণের জন্য অখণ্ড মনোযোগের দরকার হয়।

পত্রিকাটি মাসিক হইলেই ভাল হয়।

বর্ষার পূর্ব্বে কলিকাতা যাইতে পারিব বলিয়া মনে হয় না। ইতি—

ভবদীয়

বঙ্কিমচন্দ্র চাটার্জী।

রবীন্দ্রনাথের চিঠি

শান্তিনিকেতন

বৈশাখ, ১৩১৪

প্রণামাবহবঃ নিবেদনম

আপনার আশীর্ব্বাদীপত্র নানা স্থান ঘুরিয়া অদ্য শান্তিনিকেতনে এইমাত্র আমার হস্তগত হইল। আপনি এক্ষণে আমাদের মাতৃশ্রেষ্ঠ

কুলপতিরূপে বর্ত্তমান। আপনার আশীর্ব্বাদীপত্র আমার নিকট নববর্ষের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া আনিল। ইতি

সেবক
শ্রীরবীন্দ্রনাথ শর্ম্মণঃ

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিঠি

৪, ওয়েলেসলী ফার্ষ্ট লেন
১০ই নভেম্বর, ১৮৭১

প্রিয় মহাশয়,

আমি অবশ্যই আপনার অনুরোধ রক্ষা করিব। কিন্তু একমাত্র অসুবিধা এই যে, ভাইস-চ্যান্সেলার সিমলা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর প্রথম শনিবার সিণ্ডিকেটের অধিবেশন হইবার কথা আছে। সম্ভবতঃ ১৮ই তারিখে সভা হইতে পারে। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে এবং ১৮ই তারিখে যদি সিণ্ডিকেটের সভা না হয়, তাহা হইলে আমি ঐ তারিখে তুলনামূলক সংস্কৃত এবং গ্রীক ও ল্যাটিন ব্যাকরণ ও উহাদের কথ্য ভাষা সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দিতে চাই। সেমেটিক ভাষার সঙ্গে সংযোগ রাখিয়া বিষয়গুলি বর্ণিত হইবে। ইতি

ভবদীয়
কে, এম, ব্যানার্জ্জী

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের চিঠি

১৫ই জুন, ১৮৮৬

প্রিয় যতীন্দ্র,

কয়েক দিন যাবৎ তোমার সঙ্গসুখে বঞ্চিত রহিয়াছি। আজ সন্ধ্যায় যদি একবার এদিকে আস তাহা হইলে বাধিত হইব। আমি বাহির হইব না। ইতি

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১৭ই আগষ্ট, ১৮৮৪

প্রিয় যতীন্দ্র,

'লিখিতং' শব্দটি আমারও ভাল লাগে না। আমার সরকার উহা লিখিয়াছেন। কয়েক দিন তোমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। আমার শরীর এখনও ভাল নয়। ইতি

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

৩১শে জুলাই, ১৮৮৪

প্রিয় যতীন্দ্র,

গত রাত্রিতে যে বই তিনখানা রাখিয়া গিয়াছিলে, সেগুলি পড়িয়া ফেরৎ দিলাম। একখানা ভালই লাগিল, কিন্তু অপর দু'খানায় আমাদের স্বর্গত বন্ধু ক'র নাম নাই। সেজন্য ওগুলি রাধাচরণকে স্বীকার করার কথা বলিতে পারিলাম না।

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

১ই ডিসেম্বর, ১৮৮৪

প্রিয় যতীন্দ্র,

গত তিন দিন যাবৎ আমি বিষয়টি সম্বন্ধে চিন্তা করিতেছি, কিন্তু কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারি নাই। আমরা একই নৌকায় যাত্রী এবং বরাবর তাহাই থাকিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু বিরুদ্ধপক্ষীয় সংবাদপত্রগুলি পুনঃপুনঃ আমার নাম প্রকাশ করিয়া আমার যথেষ্ট ক্ষতি করিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে লর্ড রিপণের নিকট আমি সুপরিচিত। তিনি কি মনে করিবেন? কোন রকম অসদ্ভাব হইলে আমি খুব বেকায়দায় পড়িব এবং তিনি আমাকে পরিহার করিয়া চলিবেন। আমার অনুপস্থিতি কেহ লক্ষ্য করিবে না কিন্তু উপস্থিতির ফলে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। কথাটা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিও। ইতি

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

২০শে আগষ্ট, ১৮৮৪

প্রিয় যতীন্দ্র,

তোমার লেখা অনুচ্ছেদটি খুব আগ্রহ সহকারে পড়িয়াছি। বাস্তবিকই তুমি একটি genius, তোমার লিখিবার ভঙ্গী অপূর্ব্ব! তুমি বাবু জগদানন্দ মুখার্জ্জীর ব্যাপারটা লক্ষ্য কর নাই। তিনি জজিয়তি পান নাই। আমি এ বিষয়ে প্যারীকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছি। তুমিও আসিবে। ইতি

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

৮নং মাণিকতলা
৩১শে জুলাই, ১৮৮৬

প্রিয় যতীন্দ্র,

তুমি যে সভায় যোগদানের কথা দিয়াছ তাহা আজ অপরাহ্নে তিন ঘটিকায় আরম্ভ হইবে। আমি জানি তোমার সময় খুবই কম, কিন্তু তোমার বিনা উপস্থিতিতে কোন সভাসমিতি বা অনুষ্ঠান আমি কল্পনাই করিতে পারি না। যতীন্দ্র, তোমাকে আসিতেই হইবে। ইতি

ভবদীয়
রাজেন্দ্রলাল মিত্র

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের চিঠি

প্রিয় মহাশয়,

আমার ভ্রাতা গত শুক্রবার জীবনী সম্পর্কে অনেকখানি লেখা আমাকে দিয়াছেন। কিন্তু তাহা কিছু অদল-বদল করিতে হইবে বলিয়া আমি আপনার নিকট পাঠাই নাই। যথাযোগ্য সংশোধনের পর দুই-এক দিনের মধ্যেই আমি উহা আপনার নিকট প্রেরণ করিব। আপনি অসুস্থ হইয়াছিলেন শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। আশা করি ইতোমধ্যে সুস্থ হইয়াছেন। ইতি

ভবদীয়
কেশবচন্দ্র সেন

লিলি কটেজ
৭২, আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা
১লা মার্চ্চ, ১৮৮৩

প্রিয় মহাশয়,

সেদিনকার অনুপস্থিতির জন্য মার্জ্জনা চাহিতেছি। সেদিন রবিবার ছিল এবং আবহাওয়াও ভাল ছিল না। আপনার অতিথি হইতে পারা আমার পক্ষে সম্মানের বিষয়। ব্যক্তিগত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনার আশা রহিল। ইতি

ভবদীয়
কেশবচন্দ্র সেন।

কলুটোলা, ২৫শে এপ্রিল
১৮৭৬

প্রিয় মহাশয়,

অদ্য অপরাহ্ণ দুই ঘটিকায় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের কক্ষে এলবার্ট হল ফণ্ডের চাঁদা-দাতৃগণের এক সভা হইবে। আশা করি আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক সভায় যোগদান করিবেন। ইতি

ভবদীয়
কেশবচন্দ্র সেন

বিধানাচার্য মহেন্দ্রলাল সরকারের চিঠি

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি
কাল্টিভেশন অব সায়েন্স
২১০ বহুবাজার ষ্ট্রীট
৭ই অক্টোবর ১৮৯০

প্রিয় মহারাজ,

বহুকাল পরে আপনাকে বিরক্ত করিতেছি। অনুগ্রহপূর্ব্বক সঙ্গের চেকখানি সামনে ও পিছনে সই করিয়া দিবেন এবং আমাদের কন্‌ট্রাক্টর মহেন্দ্রলাল চন্দ্রের নামের চেকখানি কেবল সামনে সই করিবেন। ইতি

ভবদীয়
মহেন্দ্রলাল সরকার

কবি নবীনচন্দ্র সেনের চিঠি

কলিকাতা, ১০ গোমেস লেন
২-১২-৯৬

পূজনীয় মহারাজ,

দীন উপাসক যেরূপ নির্গন্ধ পুষ্পচয় উপাস্য দেবতার পাদপদ্মে অর্পণ করে আমিও আমার এই গুণহীন কার্য্যাবলী মহারাজার শ্রীচরণে সমর্পণ করিলাম। মহারাজা আমায় যেরূপ স্নেহ করিতেছেন, ভরসা করি আমার এই পূজা গ্রহণ করিবেন।

"পলাশীর যুদ্ধ" আমার কৈশোররচিত কাব্য। অমিতাভ শ্রীবুদ্ধদেবের অন্যতম নাম। "রৈবতক" ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আদি লীলা, "কুরুক্ষেত্র" মধ্যলীলা এবং "প্রভাস" অন্তিমলীলা লইয়া রচিত। আমি মূর্খ, যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি এই মহালীলা এবং কিরূপে খণ্ড ভারতে 'মহাভারত' বা গীতোক্ত ধর্মসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল তাহা কাব্যাকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি। "খৃষ্ট" সরল কবিতায় "মেথু"র ধর্মাংশের অনুবাদ। "প্রবাসের পত্র" উত্তর ও মধ্যভারতের নানাস্থানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা।

এতাদৃশ সামান্য কাব্যাবলী পাঠ করিতে মহারাজ অবসর পাইবেন এরূপ আশা করি না। তবে লক্ষ্মী-সরস্বতীর যেই বরপুত্র বঙ্গ-কবিতার কৈশোর সঞ্চার সময়ে তাহার মাথায় শ্রীহস্ত দিয়া বিধাতাপুরুষের মত আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন তাঁহার শ্রীচরণে যে এই কাব্যচয় উপহার প্রদান করিতে পারিলাম, ইহা আমার মত বঙ্গের ক্ষুদ্র কবির পক্ষে সামান্য গৌরব ও সান্ত্বনার কথা নহে। যদি কিঞ্চিৎ ক্লেশ স্বীকার করিয়া 'খৃষ্ট' ও অমিতাভ' কাব্যের আরম্ভে যে সূচনা পত্র আছে এবং অমিতাভ ও কুরুক্ষেত্রের পশ্চাৎভাগ যে পরিশিষ্ট আছে তাহা অবসর মত একবার পাঠ করেন তবে বঙ্গ-সাহিত্যক্ষেত্রে আমি ক্ষুদ্রজীব যে তৃণরাশি রোপণ করিয়াছি তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইবেন। এই তৃণরাশি শ্রীভগবানের লীলাশ্রিত বলিয়া থাকিবে, কি তাঁহার চরণাশ্রয়ের অযোগ্য বলিয়া ভাসিয়া যাইবে তাহা তিনিই জানেন।

স্নেহাকাঙ্ক্ষী বিনীত
শ্রীনবীনচন্দ্র সেন

সাহিত্য-সাধক রমেশচন্দ্র দত্তের চিঠি

(বিষয়—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ)

সানি-পাক, দার্জ্জিলিং
২৬শে জুন, ১৮৯৫

প্রিয় মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন,

যেরূপ সদয় ভাবে আমার শেষ পত্রের উত্তর দিয়াছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ। আমি আপনার নিকট হইতে এইরূপই আশা করিয়াছিলাম, কারণ আপনাদের পরিবার ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মধুসূদন দত্তের সময় হইতেই বঙ্গ-সাহিত্যকে উৎসাহ দিয়া আসিতেছেন।

আপনি পরিষদের সভ্য হইলে বিশেষ আনন্দিত হইব। চাঁদা অতি সামান্যই, হয়ত মাসে এক টাকা। তবে আপনার ক্ষেত্রে হয়ত বেশী হইবে। মাসে পাঁচ-টাকায় আপনার আপত্তি হইবে কি? আমাদের সভায় আপনাকে আসিতে হইবে না, কিন্তু আপনার নামের জন্য আমরা উপকৃত হইব বলিয়া আশা করি। সভ্য হিসাবে আপনি একখানি ত্রৈমাসিক পত্রিকা পাইবেন এবং আমরা কি করিতেছি তাহাও দেখিবেন।

৩৭ নং পার্ক ষ্ট্রীটের ঠিকানায় পত্র দিবেন। ঐ সময় আমি কলিকাতায় যাইব।

রমেশচন্দ্র দত্ত

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের চিঠি

বেঙ্গলী অফিস
৭-৮-৮৬

প্রিয় মহাশয়,

পত্রবাহক বাবু রামগোপাল সান্যাল বেঙ্গলীর ম্যানেজার এবং তিনি আমাদের বিশেষ বন্ধু। স্বর্গত বাবু কৃষ্ণদাসের তিনি একজন ভক্ত তিনি ঐ মহাপুরুষের একটি জীবনী লিখিতে উৎসুক হইয়াছেন এবং এ বিষয়ে আপনার সাহায্য চান। সেই হেতু আমি আনন্দের সহিত তাঁহাকে এই পরিচয় পত্র প্রদান করিলাম।

আপনার বিশ্বস্ত
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী

শিক্ষাসূর্য আশুতোষের চিঠি

ভবানীপুর
১ই সেপ্টেম্বর ১৯০৭

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর

দুঃখের সহিত জানাইতেছি, আমার পুত্রের গুরুতর পীড়ায় জন্য আজ অপরাহ্ণের অনুষ্ঠানে যোগদান করা আমার পক্ষে সম্ভব হইবে না।

আপনার
আশুতোষ মুখার্জী

৭৭ রসা রোড নর্থ, ভবানীপুর
১লা এপ্রিল ১৯০৬

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর,

আপনার পত্রের জন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার নিকট আপনার পত্রের মূল্য খুবই বেশী। কারণ আপনি আমাদের সম্প্রদায়ের নেতা এবং এজন্য আমরা গর্ব্ববোধ করি। আমি যদি, বিশেষ সফলতা লাভ করিয়া থাকি তবে বিভিন্ন সময়ে আপনার নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্যই সেজন্য দায়ী। আশুতোষ মুখার্জী

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর,

আপনার আন্তরিক অভিনন্দনের জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার নিকট ইহার বিশেষ মূল্য আছে, কারণ আপনি আমার পরম বন্ধু এবং আমাদের সম্প্রদায়ের নেতা।

আশুতোষ মুখার্জী

লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের চিঠি

বার লাইব্রেরী
২৩-৩-১৯০৬

প্রিয় মহারাজা,

এ পর্য্যন্ত বহু অভিনন্দনজ্ঞাপক পত্র পাইয়াছি, কিন্তু আজ আপনার পত্র পাইয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ লাভ করিলাম। আমার পরিবারকে আপনি বহুদিন হইতেই জানেন এবং ব্যক্তিগতভাবে আপনি আমাকে বরাবরই সর্ব্বাধিক অনুগ্রহ করিয়াছেন। আমাদের সম্প্রদায়ের সর্ব্বজন-পরিচিত নেতা আপনি। আপনার এই পত্র আমার নিকট গৌরবের বস্তু। অল্পকালের জন্য হইলেও সরকার আমাকে যে মহান পদ অর্পণ করিয়াছেন তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য বজায় রাখিতে যেন সক্ষম হই, ইহাই আমার একমাত্র কামনা। ইতি আপনার

এস, পি, সিংহ

কৃষ্ণদাস পালের চিঠি

প্রিয় মহারাজা, ২৩-৪-৭৯

আমরা সঙ্কটের আবর্ত্তে পড়িয়াছি এবং ক্রমশঃ পরস্পরের মধ্যে বিবাদ ঘনাইয়া আসিতেছে। এমতাবস্থায় পথ দেখাইবার একজন লোক চাই এবং সকলে একবাক্যে আপনাকেই নেতৃপদে নির্ব্বাচিত করিয়াছে। আপনিই বর্ত্তমান সমস্যার সমাধান করিতে পারিবেন—ইহাই আমাদের একান্ত আশা। সশ্রদ্ধ নমস্কার সহ

আপনার একান্ত অনুগত
কে, ডি, পাল

শুক্রবার

প্রিয় মহারাজা,

ডাঃ হাণ্টারের একখানি চিঠি এই সঙ্গে পাঠাইলাম। তিনি খুব প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং আমার চীৎকার নিরর্থক হয় নাই। ইহাতেই আমার সন্তোষ। ডাঃ হাণ্টার বক্তৃতাটি পুনর্মুদ্রণের যে প্রস্তাব করিয়াছেন সে সম্বন্ধে কি মনে করেন? আমি সরকারী রিপোর্টের তিন শত কপি মুদ্রণের কথা চিন্তা করিতেছি। অতিরিক্ত ব্যয় যাহা হইবে তাহা আমরা দিব। আপনি কি বলেন? আমার মনে হয় তিন শত কপিতেই হইবে। কৃষ্ণদাস পাল

প্রিয় মহারাজা,

আমার পুনর্নিয়োগে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। কোনও বে-সরকারী সদস্যকে ইতঃপূর্ব্বে কখনও এই সম্মানে ভূষিত করা হয় নাই। আমি আপনার কার্য্যাবলীর প্রশংসা কেবল মনের আবেগেই করি নাই। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে সুস্থ রাখেন, আর আপনাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, দেশ আপনার নিকট হইতে অনেক কিছু আশা করে।

কৃষ্ণদাস পাল

রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের চিঠি

প্রিয় মহাশয়,

ওয়ার্ডস বিল সম্বন্ধে সরকারকে লিখিত আমার উত্তরের খসড়া আপনার নিকট প্রেরণ করিলাম। প্রয়োজনীয় সংশোধনের পর আপনি উহা আগামীকল্য এসোসিয়েশনের অফিসে প্রেরণ করিলে বাধিত হইব, কারণ আগামী বৃহস্পতিবারের মধ্যে আমাদের সরকারের নিকট উত্তর প্রেরণ করিতে হইবে। আমাদের সভাপতির নিকট খসড়ার এক কপি প্রেরণ করিয়াছি। অনুগ্রহ করিয়া নবীনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, আমার ভাই মনোহর পীরপাহাড় ভবনটি তিন-চার সপ্তাহের জন্য ব্যবহার করিতে পারে কি না। সশ্রদ্ধ নমস্কার সহ

ভবদীয়
প্যারীমোহন মুখার্জী

স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষের চিঠি

৩ এলবার্ট রোড

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর, ২১শে

৩১শে শনিবার অপরাহ্নে আমার এখানে একটি ছোট পার্টিতে যোগদানের জন্য আপনাকে ও আপনার পুত্রকে অনুরোধ জানাইতেছি। কপূর্রতলার কুমার হরনাম সিং এই পার্টিতে যোগ দিবেন বলিয়া আশা করিতেছি। তিনি আপনাদিগকে দেখিতে উৎসুক। ভবদীয়

চন্দ্রমাধব ঘোষ

হাইকোর্ট, ৯ই

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর,

আপনি সম্ভবতঃ অবগত আছেন স্বর্গত স্যার আর, সি, মিত্রের আত্মার সম্মানার্থে সম্প্রতি ভবানীপুরে ভবানীপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা এবং কলিকাতার বাহিরের অনেকেরই ইচ্ছা আদালতের ছুটি হইবার পূর্ব্বে টাউন হলে একটি বৃহত্তর এবং অধিকতর প্রতিনিধি স্থানীয় জনসভা হয়। আপনি ও কলিকাতার অপর কতিপয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সহায়তা ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এসোসিয়েশনের সম্পাদকের নিকট পত্র দেওয়া হইয়াছে। মৃতের আত্মার সম্মানার্থে টাউন হলে জনসভা অনুষ্ঠানে আপনার সম্মতি একান্ত প্রয়োজন। ভবানীপুরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের অভিলাষ এই যে, আপনি এই সভা সংগঠনের ভার গ্রহণ করুন।

আপনার বিশ্বস্ত
সি, এম, ঘোষ (নাইট)

স্যার রমেশচন্দ্র মিত্রের চিঠি

ভবানীপুর
২৩শে এপ্রিল ১৮৯৪

প্রিয় মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর,

আমার জামাতা মিঃ এস, সি, বিশ্বাসকে আপনার সহিত পরিচিত করাইয়া দিতে চাই, সে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ব্যারিষ্টারী করিতেছে। সে মুখেই আপনাকে সব বলিবে। অনুগ্রহ করিয়া যথাবিহিত করিবেন। ইতি রমেশচন্দ্র মিত্র

রাজা দিগম্বর মিত্রের চিঠি

প্রিয় রাজা, ২৫শে জানুয়ারী

যে সব চিঠিপত্রের নকল চাহিয়াছিলাম তাহা সঙ্গে সঙ্গে পাইয়া বাধিত হইলাম। আপনি আজ সকালে কাউন্সিলে যোগদান করিতে যাইতেছেন শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার বিশ্বস্ত
দিগম্বর মিত্র

অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের চিঠি

সংস্কৃত কলেজ
২১শে জানুয়ারী ১৮৯৫

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর

ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ান মিঃ এ, গোবিন্দ পিল্লাইকে আপনার সহিত পরিচয় করাইয়া দিতে চাই। তাঁহার সহিত আমারও আপনার নিকট যাইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কাজের চাপে যাইতে পারিলাম না। তিনি আপনার প্রতিকৃতি চাহেন। ইতি মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন
মহামহোপাধ্যায়, অধ্যক্ষ

স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারীর চিঠি

১৩ জেলেপাড়া লেন, বহুবাজার
১০ই জুন ১৯০৭

প্রিয় মহাশয়,

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনের জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোনীত প্রার্থী হইতে চাই।

এ বিষয়ে আপনার সমর্থন আশা করিতে পারি কি? সেনেটে আপনার যে সকল বন্ধু আছেন তাঁহাদের যদি আপনি একবার বলেন তাহা হইলে আমার অনেক সাহায্য হইবে। শীঘ্রই আপনার নিকট শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে যাইব। আপনার বিশ্বস্ত
দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

রাধাচরণ পালের চিঠি

মাননীয় মহাশয়, সোমবার

কুমার শরৎচন্দ্র সিংহ অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার গৃহে এক সান্ধ্য পার্টিতে আমাকে আমন্ত্রণ করিয়াছেন। শোকের জন্য কিছুদিন কোন সামাজিক অনুষ্ঠান বা আমোদ-প্রমোদাদিতে যোগদান না করার জন্য আপনি যে উপদেশ দিয়াছেন আমি তাহা পালন করাই উচিত বলিয়া মনে করি। সেই কথাই আপনাকে জানাইতে চাহি। আপনাকে ইহাও জানান প্রয়োজন বলিয়া মনে করি যে, মাননীয় ডাঃ দ্বারকানাথ মিত্র বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমার সহিত সাক্ষাতের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে চিঠিতে লিখিয়াছেন, "আমার পুরাতন বন্ধুর পুত্রের সহিত পরিচয় স্থাপন করিতে পারিলে খুবই আনন্দিত হইব।" গতকল্য আমি তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। তিনি আমাকে খুব খাতির করিলেন। মনে হইল তিনি আমাকে দেখিয়া খুব খুসী হইয়াছেন। তিনি আমার অবস্থা, বয়স, শিক্ষা, বৃদ্ধা ঠাকুরমার অবস্থা প্রভৃতি সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় জানিতে চাহিলেন। শুনিতেছি পেটি্রয়ট সম্বন্ধে রাজকুমার বাবুর সহিত শীঘ্র একটা চুক্তি হইবে। আমি কি এই আশা প্রকাশ করিতে পারি যে আপনি এবিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখিবেন? আপনার মত শুভাকাঙ্ক্ষী আমার আর কেহ নাই। আপনার ব্যক্তিত্বের উপর আমি বিশেষভাবে নির্ভর করি। ইতি

আপনার স্নেহের
রাধাচরণ পাল

প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের চিঠি

৭৩ আপার সার্কুলার রোড

প্রিয় মহাশয়, ১১ই এপ্রিল, ১৮৮২

আপনার সহিত সাক্ষাতের বড় আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া পূরণ করিবেন কি? প্রতাপ মজুমদার

স্যার কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের চিঠি

বোর্ড অব রেভেনিউ দার্জ্জিলিং

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর ১৩-৬-৫

হুগলী জলনিকাশ বিভাগটি হাওড়ায় স্থানান্তর সম্বন্ধে আপনার পত্র পাইলাম। ইহা মাননীয় মিঃ হেয়ারের অধীন এবং তাঁহার নিকট আপনার পত্র প্রেরণ করিয়াছি। কে, জি, গুপ্ত

ডাক্তার অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি

৪১।১, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট,

প্রিয় মহারাজা, জানুয়ারী, ১৮৮৭

কয়েকটি বিষয়ে আলোচনার জন্য আপনার সহিত সাক্ষাতের অনুমতি পাইলে খুবই আনন্দ লাভ করিব। এ বিষয়ে আপনার মতামত একান্ত প্রয়োজন। ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার জানিবেন।

অঘোরনাথ চ্যাটার্জী

রাজকুমার সর্বাধিকারীর চিঠি

২৭ মটস্ লেন

প্রিয় মহাশয়, ২রা এপ্রিল, ১৮৯৪

আগামীকল্য প্রাতে যথাসময়ে আপনার জন্য অপেক্ষা করিব। কমন্স সভায় প্রেরণের জন্য প্রস্তাব ও আবেদনগুলির খসড়া, সংশোধন ও পুনর্লিখন কয়েক বার ধরিয়া করা হইয়াছে। এই সমস্ত প্রস্তাব ও আবেদন বিবেচনার জন্য তিন বার সাবকমিটির সভা হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সেগুলি আপনার নিকট পেশ করার উপযুক্ত হয় নাই। আমি এই সঙ্গে প্রুফ পাঠাইতেছি আপনি দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন যে, উহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। মিঃ পিউ ইভান্স, মিঃ আলান আর্থার ক্লার্ক, রাজা প্যারীমোহন এবং আমি নিজে এগুলির খসড়া প্রস্তুত করিয়াছি। আগামীকল্য সাক্ষাতে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিব। সকলের ইচ্ছা আপনি সভাপতির

আসন গ্রহণ করুন। বস্তুতঃ ইউরোপীয়গণ ইহাই চাহেন এবং মিঃ পিউ ও আমি আমাদের সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দকে আশ্বাস দিয়াছি যে আপনি সভাপতিত্ব করিতে সম্মত হইয়াছেন। আপনার

রাজকুমার সর্বাধিকারী

ভাওয়ালের কুমার রণেন্দ্রনাথ রায়ের চিঠি

ভাওয়ালরাজ

১০ই মে, ১৯০৫

প্রিয় দাদামহাশয়,

কলিকাতা হইতে বাড়ী ফিরিবার পর আপনাকে পত্র দিতে দেরী করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আপনি আমাকে যেরূপ ভালবাসেন ও স্নেহ করেন তাহাতে আমি আশা করি, এই বিলম্বের জন্য আপনি আমাকে মার্জ্জনা করিবেন। আমরা আশা করি, আপনি আমাদের সকল ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ ও উপদেশ দানে সাহায্য করিতে থাকিবেন। আপনি আমার দাদুর একজন পুরাতন বন্ধু। সুতরাং আপনার স্নেহ ও ভালবাসার উপর আমার দাবী আছে। মহারাজকুমারকে আমার প্রীতি জানাইবেন এবং আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। ইতি আপনার

রণেন্দ্রনাথ রায়

দাদাভাই নৌরোজীর চিঠি

প্রিয় মহাশয়, লণ্ডন, ৩০শে মে ১৮৬৭

আপনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশনের সভ্য হইবেন, এই আশায় উক্ত এসোসিয়েশনের প্রথম নিয়মিত সভার বিবরণী, উহার নিয়মাবলী এবং সভ্যবৃন্দের তালিকা এই সঙ্গে প্রেরণ করিলাম। পদস্থ ও প্রভাবশালী ইংরেজগণ যখন ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হইয়াছেন—তখন তাঁহাদের পর্য্যাপ্ত সাহায্য না করিলে আমাদের কর্ত্তব্যচ্যুতি হইবে। আমি আশা করি, আপনি অপরাপর বন্ধুবর্গকেও এই সমিতিতে যোগদানে রাজী করাইবেন। ইতি

আপনার বিশ্বস্ত

দাদাভাই নৌরজী

১৬ মেরিন ষ্ট্রীট, ফোর্ট বম্বে

প্রিয় মহাশয়, ২রা মার্চ্চ ১৮৮৩

'ভয়েস অব ইণ্ডিয়া'র জন্য আপনি যে এক শত টাকা দান করিয়াছেন মিঃ বি, এম, ম্যালবুরি মারফৎ তাহা পাইয়াছি—এই দানের কথা আমাদের চিরকাল মনে থাকিবে।

দাদাভাই নৌরজী

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের চিঠি

সনাতন ধর্ম্ম মহাসভা কার্য্যালয়, প্রয়াগ

মহামান্যবরেষু— ১০ই জানুয়ারী ১৯০৬

আমি আপনাকে সনাতন ধর্ম্ম মহাসভার (হিন্দুধর্ম্ম সম্মেলন) কার্য্যসূচী প্রেরণ করিতেছি। আগামী ২০শে জানুয়ারী হইতে ২১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত কুম্ভমেলার সময় এলাহাবাদে এই সম্মেলন হইবে। মহারাজ অবশ্যই অবগত আছেন হিন্দুধর্ম্মের স্বার্থ রক্ষা ও উন্নতি সাধন করে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়াছে। প্রস্তাবিত মহাসভা সেই প্রয়োজন মিটাইবার চেষ্টা মাত্র। আশা করি আপনি এই প্রস্তাব সমর্থন করিবেন এবং ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য উপদেশ ও সাহায্য প্রদান করিবেন। কমিটির একান্ত অনুরোধ আপনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনার রাজ্যের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে সঙ্গে লইয়া এই মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করেন। কমিটি আশা করেন যে, হিন্দুধর্ম্মকে পতন হইতে রক্ষা করার জন্য ইহার উন্নতিকল্পে আপনি এই আমন্ত্রণ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ হইবেন।

সকল সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ সভায় যোগদান করিবেন এবং এই সভার আলোচনা হইতে অনেক উপকার হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আপনার পাঠের জন্য একখানি সনাতনধর্ম্ম সংগ্রহ পৃথক ভাবে প্রেরিত হইল। আপনার বিশ্বস্ত মদনমোহন মালব্য

সম্পাদক

রুস্তমজী ধানজীভাই মেহটার চিঠি

(প্রথম ভারতীয় রাষ্ট্রপ্রতিভূ বা Consul)

৫৫ ক্যানিং ষ্ট্রীট,

মাননীয় মহাশয়, ২৮-১২-১৯০৬

মিঃ দাদাভাই নৌরজী আপনাকে জানাইতে বলিয়াছেন যে তিনি আজ অপরাহ্ণ সাড়ে পাঁচটায় আপনাকে আপ্যায়িত করিতে চাহেন। আপনাকে আন্তরিক সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা ইহার উদ্দেশ্য। ইতি— আর ডি, মেটা

আমিরুদ্দীনের চিঠি

(লাহারুর নবাব)

৮০ লোয়ার সার্কুলার রোড

প্রিয় মহারাজা বাহাদুর, ১২-৩-১৭

১৪ই তারিখে অপরাহ্নে ৫ ঘটিকায় আপনার প্রাসাদে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাইলে আনন্দিত হইব। আমি আমার বন্ধু মহারাজকুমারকে বাঙলা ভাষার কয়েকখানি কাগজ সরবরাহ করিতে বলিয়াছি। আমার মনে হয় তিনি তাহা সংগ্রহ করিতেছেন। আমার এক বন্ধু ইংলণ্ড হইতে সকল ভারতীয় সংবাদপত্র তাঁহাকে প্রেরণ করিতে লিখিয়াছেন। আমি অনেক কাগজ সংগ্রহ করিয়াছি এবং বাঙলার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।

আমিরুদ্দীন

লাহারুর নবাব

কাশীর রাজা মাধোলালের চিঠি

চৌখাম্বা, বেনারস, ইউ, পি

প্রিয় মহারাজা সাহেব, ২৬শে মে, ১৯০৬

সংস্কৃতচর্চ্চার জন্য বারাণসীর মহারাজার উদ্যোগে একটি ফণ্ড খোলা হইয়াছে এবং আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক এই ফণ্ডে দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইতিমধ্যে যে চাঁদা উঠিয়াছে তাহা দিয়া একটি সংস্কৃত গ্রন্থাগার ভবন নির্ম্মাণ করিতে হইবে। শীঘ্রই সস্ত্রীক যুবরাজ (প্রিন্স অব ওয়েলস) বারাণসীতে আসিবেন, সেজন্য যুবরাজের নামানুসারে গ্রন্থাগারের নামকরণের প্রস্তাব করা হইয়াছে এবং যুবরাজ গ্রন্থাগারের সহিত তাঁহার নাম সংযুক্ত করিতে সম্মত হইয়াছেন। আপনার চাঁদা অবিলম্বে প্রেরণ করিয়া আমাদের সাহায্য করিবেন। ইতি আপনার বশংবদ

মাধোলাল

পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

রামলালকে ডেকে পাঠালেন ঠাকুর। বললেন, 'এই অসুখ, খাজাঞ্চী-টাজাঞ্চী বলবে, প্রায়শ্চিত্ত করলে না। তুই দশটা টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা-কালীকে নিবেদন করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে।'

সারদামণিকে কাছে ডাকলেন। বললেন, 'আমার ইষ্ট-কবচ তুমি নাও, তোমার কাছে রেখে দাও।'

'না, না,' অন্তরে হাহাকার করে উঠলেন শ্রীমা, 'তোমার জিনিস তোমার কাছেই থাক।'

বলা বৃথা। ঠাকুর বাহু থেকে খুলে ফেলেছেন ইষ্ট-কবচ। শ্রীমার হাতে সঁপে দিয়েছেন।

'তবে কি মহাপ্রস্থানের আর দেরি নেই? চলে যাবেন বলেই কি দেহে আর ইষ্ট-কবচ রাখতে চাচ্ছেন না?'

'আমি আর তবে কি করতে পারি? কাঁদতে পারি মনের নিরালায়। প্রভু, তুমি শোনো। তুমি বিধান করো। তুমি আমাকে অবসন্ন হতে দিও না।'

দ্রৌপদী খেয়ে-দেয়ে সুখাসীন হয়েছে, অযুত শিষ্য নিয়ে দুর্বাসা কাম্যক বনে এসে উপস্থিত। আতিথ্য-গ্রহণে নিমন্ত্রণ করল যুধিষ্ঠির। আহ্নিক সমাধান করে আসুন।

সশিষ্য স্নান করতে গেল দুর্বাসা। দ্রৌপদীর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। এত লোককে খাওয়াব কি করে?

অনন্যোপায় হয়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকতে লাগল: হে বাসুদেব, হে জগন্নাথ, প্রণতার্তিবিনাশন, হে বিপন্নপাল, হে পরাৎপর, হে সর্বসাথী পরাধ্যক্ষ, আমাকে রক্ষা করো। হে শরণাগতবৎসল নীলোৎপলদলশ্যাম, পদ্মারুণেক্ষণ, দুঃশাসনের থেকে যেমন এক দিন মুক্ত করেছিলে, আজ আবার এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ করো।

ভক্তবৎসল কৃষ্ণ পার্শ্বশায়িনী রুক্মিণীকে ত্যাগ করে চলে এলেন ত্বরিত গমনে। প্রণাম করে দ্রৌপদী বললে তাকে দুর্বাসার কথা।

কৃষ্ণ বললে, 'দ্রৌপদী, আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, আগে আমাকে ভোজন করাও।'

লজ্জায় অধোমুখ হল দ্রৌপদী। কাতরকণ্ঠে বললে, 'আমার ভোজন পর্যন্ত থালা অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, কিন্তু আজ আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, কিছু নেই আর থালাতে।'

বাসুদেব বললে, 'আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত পীড়িত, এখন কি পরিহাস করা উচিত? শীগগির সেই থালা এনে আমাকে দেখাও।'

নির্বন্ধাতিশয় লঙ্ঘন করতে পারল না দ্রৌপদী। থালা এনে দেখাল। থালার কণ্ঠে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল, বাসুদেব তা খেয়ে কৃষ্ণাকে বললেন, 'এতে বিশ্বাত্মা প্রীত ও পরিতুষ্ট হোক।' ভীমকে বললেন, 'যাও, ব্রাহ্মণদের ডেকে আনো।'

দেবনদীতে স্নান করছে দুর্বাসা ও তার শিষ্যরা, ভীমসেন ডাকতে এল। দুর্বাসা বললে, 'আমাদের আর খেয়ে দরকার নেই, পেট ভরে গিয়েছে। পেট ভরে গিয়েছে।' উদ্গার তুলতে লাগল সকলে। বললে, 'আমাদের জন্যে আর রাঁধতে হবে না। পাকক্রিয়া বন্ধ করুন।'

বৃথা পাকের জন্যে হয়তো অপরাধী হলাম। পাণ্ডবের কোপদৃষ্টিতে আমরা না ভস্মসাৎ হই। ব্রতধারী তপস্বী সদাচাররত নারায়ণপরায়ণ পাণ্ডবেরা ক্রোধোদ্দীপ্ত হলে আমরা তুলোর মত পুড়ে মরব। অতএব শীঘ্র পালাই চলো।

পাঞ্চালকুমারী, ভয় নেই। বললে কৃষ্ণ, যারা ধর্মের অনুগত তারা কখনই অবসন্ন হয় না।

ঠাকুর বললেন, সেখানে সন্তোষ করলেই সকলেই সন্তোষ।

মূলে জলসেচন করো। শাখায়-পল্লবে কে জল দেয়, গোড়ায় জল পেলেই বৃক্ষ পল্লবিত, কুসুমিত ও ফলান্বিত হয়ে উঠবে।

ডাক্তার সরকার বলছে ঠাকুরকে দেখিয়ে, 'ইনি যা বলেন তা অত অন্তরে লাগে কেন? ওঁর সব ধর্ম দেখা আছে। হিঁদু, মুসলমান, খৃষ্টান, শাক্ত, বৈষ্ণব—সব ইনি নিজে করে দেখেছেন। মধুকর নানা ফুলে বসে মধু সঞ্চয় করলে তবে চাকটি বেশ হয়।'

যত মত তত পথ কে বলতে পারে? যে সব মত আচরণ করেছে সব পথ বিচরণ করেছে। সব পথই পৌঁছেচে গিয়ে ঈশ্বরে। সব পথে হেঁটে সেই চূড়ান্তকে স্পর্শ করে ফিরে ফিরে এসেছে।

ফিরে এসেছেন আমাদের জন্যে। ছেড়ে যাওয়াতেও ঈশ্বর, ফিরে আসাতেও ঈশ্বর। সন্ন্যাসেও ঈশ্বর, সংসারেও ঈশ্বর। যেখানে থাকো সেখানেই রামের অযোধ্যা।

মহিমাচরণ বললে, 'আপনার যখন অসুখ তখন ডাক্তারেরা তার কি করবে? এ হচ্ছে ডাক্তারদের অহঙ্কার বাড়ানো।'

ঠাকুর মহেন্দ্র সরকারকে দেখিয়ে বললেন, 'ইনি খুব ভালো ডাক্তার, আর এঁর খুব বিদ্যা।'

'তা কে সন্দেহ করে।' বললে মহিমাচরণ, 'উনি জাহাজ আর আমরা ডিঙি। কিন্তু ওখানে, ঠাকুরের পায়ের দিকে ইঙ্গিত করলে, 'ওখানে সবই সমান।'

আমি তো চিকিৎসা করতে আসিনি, আমি নিজেই চিকিৎসিত হতে এসেছি। আমার তিনি অহঙ্কার বাড়াবেন কি, আমার অহঙ্কার তিনি ধুলো করে দিলেন। জড়বাদী ছিলুম, জড় যে চৈতন্যের ছদ্মবেশ ছাড়া কিছু নয় তাই দেখলুম শিখতে।

অবতার জানতুম না কিন্তু দেখলুম গোষ্পদীকৃত যে জল তাই আবার সমুদ্রায়িত। বিজ্ঞানী ছিলুম কিন্তু দেখলুম জানার বাইরে অজানা কি বিশাল! সেই মহৎ অজানাকে স্বীকার করলুম, প্রণাম করলুম। শুষ্ক ছিলুম, ঠাকুর আমাকে 'রসিয়ে' দিলেন। বললেন, শুকনো আছ কিন্তু তুমি রসবে। আমি রসাস্বাদপরিপূর্ণ হয়ে উঠলুম।

চিরপুরাতনের মধ্যে দেখলুম সেই নিত্যনতুনকে। যিনি সর্বদা অনুভূয়মান হয়েও আপন মাধুর্যের দ্বারা অননুভূতের মত বিস্ময় জন্মিয়ে থাকেন, তিনিই তো নিত্যনতুন।

হে অপরিমেয় অমৃত, তোমাকে বুঝতে না দাও, দাও আস্বাদ করতে। অন্তত এটুকু যেন বুঝি তোমার সর্বব্যাপী ভূমামূর্তির কাছে সকলে পরাভূত। তোমার বিশ্বরূপ দেখলে পৃথিবীকে মনে হবে পরমাণু, সমুদ্রকে জলবিন্দু, জ্যোতির্মণ্ডলকে অগ্নিকণা, বায়ুমণ্ডল ক্ষণিক শ্বাসক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী আকাশ সূচীছিদ্র, জগৎ-উৎপত্তি-প্রলয়কারী ব্রহ্মা ও রুদ্র প্রভৃতি দেবতা সামান্য জীব আর অন্যান্য দেবদেবী ক্ষুদ্র কীটাণু।

হে পূষণ, হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করেছ। সত্যধর্মের জন্য যে উন্মুখ তার দৃষ্টিতে তুমি একে উন্মুক্ত করো।

তিন জনকে পরাভূত করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

প্রথম, নীরন্ধ্র সংশয়—নরেন্দ্রনাথ; দ্বিতীয়, দুরপনেয় পাপ—গিরিশচন্দ্র; তৃতীয়, স্পর্ধোদ্ধত বিজ্ঞান—মহেন্দ্র সরকার।

নিশাচর একটা পাখি ডেকে উঠল রাতের অন্ধকারে। অমঙ্গলের ভয়ে শ্রীমার মন শিউরে উঠল। না, অমঙ্গল কোথায়! সর্বত্র শিব, সর্বত্র শুভ। সর্বত্র শান্তি। সমস্ত বিশ্বের স্বস্তি হোক। খল প্রসন্ন হোক, অনুকূল হোক। সমস্ত প্রাণী পরস্পরের হিতচিন্তা করুক। শুধু ভজনা করুক মৃত্যুঞ্জয় মঙ্গলকে। আর কিছু নয়, ঈশ্বরে মতি হোক অহৈতুকী।

একশো একষট্টি

অসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু দেবসৈন্য মারা গেল। দুর্বাসার শাপেও স্বর্গ শ্রীহীন, যাগযজ্ঞ লুপ্তপ্রায়। নিরুপায় হয়ে দেবতারা সুমেরু পর্বতে ব্রহ্মার শরণ নিলে। ব্রহ্মা তাদের নিয়ে এল ক্ষীরোদ-সাগরের পারে, বিষ্ণুর কাছে। বিষ্ণু বললে, অসুরদের সঙ্গে সন্ধি কর, তারপর সমুদ্রমন্থন করে উদ্ধার করো অমৃত। সেই অমৃতেই স্বর্গের পুনরুজ্জীবন হবে।

মন্দরপর্বতকে মন্থনদণ্ড ও বাসুকিকে রজ্জু করে নাও। প্রথমে বিষ উঠবে তাতে ভয় কোরো না। অনেক হয়তো কামনীয় বস্তু উঠবে তাতে লোভ কোরো না। লোভের জিনিস না পেলে ক্রোধ কোরো না। যদি কোথাও শান্তি থাকে তা অক্রোধে।

অসুররাজ বলির কাছে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে হাজির হল দেবতারা। সন্ধিতে সম্মত হল বলি। কিন্তু এ কি কাণ্ড, জলে নেমেই মন্দর ডুবে গেল অতলে। ভগবান তখন কচ্ছপশরীর ধারণ করে মন্দরকে পিঠে তুললেন। তাকে দাঁড়াবার আধার দিলেন।

সুরু হল মন্থন। প্রথমেই হলাহল উঠল। দেবতারা ভয় পেয়ে গেল, সর্বপ্রাণীর সুহৃদ শঙ্করের শরণ নিল। অন্যের বিপদে এগিয়ে যাওয়া, অন্যের দুঃখে সন্তপ্ত হওয়াই অখিলাত্মা পরমপুরুষের আরাধনা। যারা আত্মমায়ায় মুগ্ধ, পরস্পর বৈরভাবে আবদ্ধ তাদের প্রতি কৃপা করলেও ভগবান প্রীত হবেন। সুতরাং আমি এই বিষ পান করব। প্রজাগণের স্বস্তি হোক।

মহাদেব অঞ্জলি করে পান করল হলাহল। তীব্র বিষের প্রভাবে কণ্ঠ নীল হয়ে গেল।

আবার মন্থন চলল। ক্রমশ উঠল সুরভি নামে গাভী, উচ্চৈঃশ্রবা নামে অশ্ব, ঐরাবত নামে হস্তী, পুষ্পদন্ত প্রভৃতি অষ্ট দিগগজ, কৌস্তুভ নামে পদ্মরাগমণি আর পারিজাত নামে সর্বকাম-বরদ বৃক্ষ। সর্বশেষে উঠলেন শ্রীদেবী।

দেবী নিজের জন্যে আশ্রম খুঁজতে লাগলেন। তাকালেন ব্রহ্মার দিকে। উচ্চপদ আছে কিন্তু কামজয় নেই। তাকালেন শুক্রাচার্যের দিকে। জ্ঞান আছে কিন্তু অনাসক্তি নেই। তাকালেন সনকের দিকে। সর্বসঙ্গবর্জিত বটে কিন্তু সমাধিলীন। তাকালেন পরশুরামের দিকে। ধর্ম আছে কিন্তু দয়া নেই। তাকালেন মার্কণ্ডেয়ের দিকে। দীর্ঘ আয়ু আছে কিন্তু শীল নেই, মঙ্গল নেই। তাকালেন দুর্বাসার দিকে। তপস্যা আছে কিন্তু ক্রোধজয় নেই। কোথায়, কোথায় আমার আশ্রম?

তাকালেন মুকুন্দের দিকে। আত্মারাম, জ্ঞানকর্মপ্রেমের মূর্তির দিকে। তাকেই বরণ করলেন। তার পর উঠল সুরা নামে আরেক কন্যা। অসুরেরা তাকে আয়ত্ত করল। তোমরা শ্রীকে নাও আমরা সুরাকে নেব। এবার অমৃতকুম্ভ হাতে উঠে এল ধন্বন্তরি। তার হাত থেকে অসুরেরা ছিনিয়ে নিল সুধাভাণ্ড।

দেবতারা হতভম্ব হয়ে গেল। ম্লান মুখে দাঁড়াল এসে শ্রীহরির সামনে। শ্রীহরি মোহিনী মূর্তি ধরলেন। মোহিনীকে দেখে অসুরেরা কামোন্মত্ত হয়ে উঠল। বললে, ভামিনি, অমৃতের অভিলাষে আমরা পরস্পর কলহে প্রবৃত্ত হয়েছি, তুমি আমাদের এই গৃহকলহ ভঞ্জন করো। এই অমৃতকুম্ভ তুমি নাও, তুমিই বণ্টন-বিতরণ করে দাও।

মোহিনীর হাতে অমৃতকুম্ভ তুলে দিল অসুরেরা। এক পঙক্তিতে দেবতা ও আরেক পঙক্তিতে অসুরদের আলাদা করে বসিয়ে দিল মোহিনী। এবার যাকে যোগ্য মনে করি তাকেই দেব এই অমৃত, জরামরণহারিণী সুধা।

শুধু চাটুবাক্যে অসুরদের তৃপ্ত রাখল মোহিনী। অমৃত পান করাল দেবতাদের।

অসুর রাহু দেবচিহ্ন ধারণ করে বসেছিল দেবতাদের পঙক্তিতে। সেও অমৃত পান করলে। চন্দ্র-সূর্য চিনতে পারল রাহুকে। ছদ্মবেশী, তুমি এখানে? চক্র দ্বারা তার মাথা কেটে ফেলল তক্ষুনি। মাথা কাটলে কি হবে, অমৃত পান করেছে রাহু, তাই মরল না। চন্দ্র-সূর্যের চিরশত্রু হয়ে রইল।

শ্রীহরি তখন স্ত্রীরূপ ত্যাগ করলেন।

এই কাণ্ড?

অসুরেরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। দেবতাদের আক্রমণ করলে। সুরু হল তুমুল যুদ্ধ। দেবতারা অমৃত পান করেছে, তাদের সঙ্গে কে পারবে? বলি বৈমানসংগ্রামে ইন্দ্রকে আহ্বান করলে। এত বড়

কথা ? ইন্দ্র তার শতপর্ব বজ্র উত্তোলন করে বলির দিকে ধাবমান হল। স্পর্ধা করে বললে, এখুনি আমি তোর শিরচ্ছেদ করছি।

বলি হাসল। বলল, বৃথা হর্ষ রাখো। আমরা সকলে কাল-প্রেরিত হয়ে কর্ম করছি, তুমি যদি জয়ীও হও, মনে কোরো না তুমি তোমার জয়ের বা আমার পরাজয়ের কর্তা। কর্তা স্বয়ং বিভু। তুমি নিতান্ত অজ্ঞ, তাই স্পর্ধান্বিত রূঢ়বাক্য প্রয়োগ করছ।

তর্ক রাখো। বজ্রাঘাতে বলিকে ভূতলে নিক্ষেপ করল দেবরাজ। অসুরেরা বলিকে অস্তপর্বতে নিয়ে গেল। শুক্রাচার্য তাঁর সঞ্জীবনী দিয়ে বলিকে বাঁচিয়ে দিলেন। লোকতত্ত্বে বিচক্ষণ বলি, পরাজয়েও খিন্ন হল না, পরাভূত হল না।

পিতামহ প্রহ্লাদকে প্রণাম করে বিশ্বজিৎ যজ্ঞ আরম্ভ করল। যজ্ঞের হুতাশন থেকে রথ অশ্ব ধ্বজ ধনু তূনীর কবচ উত্থিত হল। শুক্রাচার্য দিব্য শঙ্খ দিলেন। ইন্দ্রপুরী অবরোধ করল। ধ্বনিত করল সেই মহাস্বন শঙ্খ। দেবগুরু বৃহস্পতি ভয়চকিত হয়ে ইন্দ্রকে গিয়ে বললেন, স্বয়ং শ্রীহরি ছাড়া কেউ বলিকে নিরস্ত করতে পারবে না। তোমরা দ্রুত অদৃশ্য হও, অর্থাৎ পলায়ন করো।

পালিয়ে গেল দেবতারা। বলি স্বর্গপুরী অধিকার করে বসল।

দেবমাতা অদিতি স্বামিত্যক্ত আশ্রমে অনাথার মত বাস করতে লাগল। অদিতিপতি কশ্যপ একদিন ফিরে এলেন আশ্রমে। দেখলেন আশ্রম আনন্দশূন্য, অদিতি দীনাহীনার মত বসে আছে এক কোণে। কি, সমস্ত কুশল তো ? কোনো অতিথি ফিরে যায়নি তো অনাদৃত হয়ে ?

কুশল ? এর চেয়ে ঘোরতর দুর্দিন আর কি হতে পারে ? শত্রুরা আমার পুত্রদের লাঞ্ছিত করেছে, তাদের শ্রী হরণ করেছে, রাজ্য অধিকার করে নিয়েছে, আপনি যদি এর প্রতিবিধান না করেন তো কে করবে ?

কিসের রাজ্য, কিসের শ্রী ? কে-বা কার পতিপুত্র ? কশ্যপ হাসলেন। সমস্তই বিষ্ণুমায়া। সেই মায়াতেই এই জগৎ স্নেহবদ্ধ, মোহাক্রান্ত। যদি কিছু সত্যবস্তু থেকে থাকে তা হচ্ছে ঈশ্বরভক্তি। ঈশ্বরভক্তিই অমোঘা, নিশ্চিতফলপ্রদা।

সুতরাং বাসুদেবপরায়ণ হও। পয়োব্রত নামে ব্রত উদ্‌যাপন করো। যে ব্রতের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে অসদালাপ বর্জন, উচ্চ-নীচ সমস্ত রকম ভোগ-ত্যাগ, সর্বভূতে অহিংসা আর ঈশ্বরে নিশ্চল একাগ্রতা।

ব্রত উদ্‌যাপন করল অদিতি। আদিপুরুষ ভগবান তার কাছে আবির্ভূত হলেন। প্রীতি-বিহ্বল হয়ে অদিতি ভূমিতে দেহ রেখে দণ্ডবৎ তাঁকে প্রণাম করল। রোমাঞ্চিতকায়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখ ছাপিয়ে নেমে এল আনন্দাশ্রু। প্রভু, দাঁড়াও, তোমাকে আরো একটুকু দেখি।

শোনো। বলপ্রয়োগে অসুররা এখন পরাজিত হবে না। আমি নিজে তোমার পুত্রত্ব গ্রহণ করে তোমার পুত্রদের রক্ষা করব। বলে অন্তর্হিত হলেন শ্রীহরি।

ভাদ্র মাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে অভিজিৎ মুহূর্তে অদিতির গর্ভে বামনদেবের জন্ম হল। বটুরূপ ধারণ করলেন। কত জনে কত উপহার নিয়ে এল। সূর্য দিল সাবিত্রীমন্ত্র, বৃহস্পতি যজ্ঞোপবীত, পিতা কশ্যপ মেখলা, মাতা অদিতি কৌপীন। স্বর্গ দিল ছত্র, সোম দণ্ড, সরস্বতী অক্ষমালা, ব্রহ্মা কমণ্ডলু, কুবের ভিক্ষাপাত্র আর ভগবতী ভিক্ষা।

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণবটু চলল বলির যজ্ঞক্ষেত্রে। প্রতি পদক্ষেপে ভূমিকে অবনমিত করতে করতে।

এ কে তুমি অভিনব ? তেজোদৃপ্ত রূপচ্ছটায় বলি অভিভূত হয়ে গেল। এস তোমার পা দুখানি নিজ হাতে ধুয়ে দিই।

নিজ হাতে পা ধুয়ে দিয়ে সেই পাদশৌচ জল মাথায় তুলে নিল বলি। বললে, আজ আমার যজ্ঞ ফলান্বিত, আমার পিতৃপুরুষ তৃপ্ত আর আমার কুল পাবিত হল। আপনার পদজলে আমার পাপ প্রক্ষালিত হল, আপনার পদন্যাসে ভূমিতল তীর্থীকৃত হল। আপনি যা ইচ্ছা করেন, তাই গ্রহণ করুন। আপনাকে প্রার্থী বলেই অনুমান করছি। গাভী কাঞ্চন গজ তুরগ রথ গৃহ অন্ন পেয় সমৃদ্ধ গ্রাম বিপ্রকন্যা যা আপনি অভিলাষ করেন, তাই আপনাকে দেব অকাতরে। দেব ভূরি-ভূরি।

তোমার এই বাক্য সুনৃত, ধর্মান্বিত, তোমারই কুলোচিত। বললে বামনদেব। তোমাদের বংশে এমন কেউ নিঃস্বত্ব কৃপণ জন্মেনি যে, প্রতিশ্রুতি দিয়ে কোনো ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে করো তোমার পিতা বিরোচনের কথা। শত্রু দেবতা ছদ্মবেশ ধরে এসেছে জেনেও তাকে তার পরমায়ু দিয়ে ফেললে। তুমি যোগ্য কুলভূষণ। শোনো আমার যাচনীয় বিশেষ কিছু নেই, আমি তোমার কাছে শুধু তিন পদ ভূমি প্রার্থনা করছি।

বলি পরিহাস করে উঠল। বললে, আপনার আকারের মতই, আপনার বুদ্ধি ! বালকের মত কথা বলছেন কেন ? যে ত্রিলোকের একেশ্বর তার কাছে আপনি শুধু তিন-পা মাটি চাইছেন ? ভূমিই যদি নিতে হয় অন্তত জীবিকা ধারণের উপযুক্ত পরিমাণ গ্রহণ করুন ?

আমার যাবন্মাত্র প্রয়োজন, ততটুকুই আমি নেব। তার বেশি নিলে আমার পাপ হবে। বললে বামনদেব। যা যদৃচ্ছাক্রমে আসে তাতে যে সন্তুষ্ট, সেই যথার্থ সুখী। যে অসন্তুষ্ট অজিতাত্মা তার ত্রিভুবনেও সুখ নেই। তিন-পা ভূমিই আমার যথেষ্ট, তাতেই আমার অভীষ্ট সিদ্ধি। সুতরাং তার অতিরিক্ত আমার কামনীয় নয়।

বেশ, তবে তিন-পা ভূমিই আপনাকে দেব।

ভূমিদানের জন্যে বলি জলপাত্র হাতে নিয়েছে, শুক্রাচার্য ছুটে এল। বললে, মহারাজ, ক্ষান্ত হোন।

সে কি ?

আপনি জানেন না এই বামনবেশী ব্রাহ্মণ স্বয়ং বিষ্ণু। মায়াবলে আপনার সমস্ত কেড়ে নিতে এসেছে। আপনার স্থান শ্রী যশ বিত্ত—সমস্ত। সমস্ত কেড়ে নিয়ে দিয়ে দেবে ইন্দ্রকে, আপনার প্রতিপক্ষকে। এ আপনি কিছুতে সহ্য করবেন না। ইনি বিশ্বকায়, ত্রিপাদ দিয়ে ত্রিলোক আক্রমণ করবেন। অবহিত হও, এঁকে কিছু দান করবেন না। দৈত্যকুলের মহা অনর্থ ডেকে আনবেন না। তিন লোক দিয়ে এঁর তিন-পদ পূরণ করতে পারবেন না, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে নিরয়গামী হবেন। যে দানে দাতার জীবন বিপন্ন হয় সে দান অদেয়।

কিন্তু মিথ্যাকথনের পাপে লিপ্ত হব ? বলি প্রতিবাদ করে উঠল।

শুক্রাচার্য বললে, স্ত্রীর কাছে, কৌতুকে, বিবাহ ব্যাপারে,

জীবিকার জন্তে, প্রাণসঙ্কটে, সর্বস্বাপহরণ কালে, গোব্রাহ্মণের হিতার্থে, কারু প্রাণহিংসা নিবারণকল্পে মিথ্যাকথন দূষণীয় নয়। যে সত্য ও অসত্যের বিশেষ মর্ম অবগত না হয়ে সত্যানুষ্ঠানে উন্মত্ত হয় সে নিতান্ত বালক। আর যে সত্য ও অসত্যের যাথার্থ্য নির্ণয় করতে পারে সেই প্রকৃত ধর্মজ্ঞ। অকৃতপ্রজ্ঞ লোক ধর্মাভিলাষী হয়ে কৌশিকের মত মহাপাপে নিমগ্ন হয়।

কে কৌশিক ?

এক বহুশ্রুত তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। গ্রামের অনতিদূরে অরণ্য-প্রান্তে বাস করতেন। একমাত্র ব্রত ছিল, সে হচ্ছে সত্যকথন। সর্বদা সত্যবাক্য প্রয়োগ। একদা কতকগুলি লোক দস্যুতাড়িত হয়ে বনের মধ্যে ঢুকে আত্মগোপন করল। পশ্চাদ্ধাবিত দস্যুরাও খুঁজতে খুঁজতে এল সেই বনপ্রান্তে। কৌশিককে জিগগেস করলে, কতকগুলি লোক ভীত-ত্রস্ত হয়ে এই দিকে এসেছিল আপনি দেখেছেন ? দেখেছি। কোন পথে গিয়েছে যদি জানেন সত্য করে বলুন। সত্যব্রতরত কৌশিক বললেন, ঐ বৃক্ষলতাগুল্ম বেষ্টিত অটবীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। ক্রূরকর্মা দস্যুরা অরণ্যে ঢুকে লোকগুলির সন্ধান পেল ও তাদের আক্রমণ ও বিনাশ করল। সূক্ষ্মধর্মে অনভিজ্ঞ কৌশিক সত্যবাক্যজনিত পাপে লিপ্ত হয়ে ঘোর নরকে নিপতিত হল।

বলি বললে, প্রভু, যা বললেন তা গৃহস্থদের ধর্ম। কিন্তু আমি প্রহ্লাদের বংশধর, দেব বলে কথা দিলে সে কথা ফিরিয়ে নিতে পারব না। বিত্তের বিবেচনা আমার কাছে বিবেচনাই নয়। তার নাশে-লাভে আমার সমান অস্পৃহা। পৃথিবী বলেছে, অসত্যের চেয়ে বড় অধর্ম আর কিছু নেই। অসত্যপর নর ছাড়া আর সকলের ভারই সহ্য করতে পারি, মিথ্যাবাদীর সংস্পর্শই অসহ্য। নরককে ভয় করি না, সর্ব-দুঃখের আকর দারিদ্র্যকে ভয় করি না, মৃত্যুকে না, স্থানচ্যুতিকে না ; একমাত্র ভয় করি মিথ্যাকে, বঞ্চনাকে, প্রতিশ্রুতি-পালনের পরাঙ্মুখতাকে। সুতরাং ইনি বিষ্ণুই হোন আর শক্রই হোন, এই বটুর প্রার্থিত ভূমি আমি দান করব।

শুক্রাচার্য বিফলমনোরথ হয়ে শাপ দিল বলিকে।

গুরু কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েও সত্য থেকে বিচ্যুত হল না বলি। বামনকে অর্চনা করে ভূমিস্পর্শ করে প্রথমে জলদান করল।

বলিপত্নী বিন্ধ্যাবলী স্বর্ণকুম্ভ ভরে আরো জল নিয়ে এল। সে জলে বলি স্বয়ং বামনের পদযুগল ধুয়ে দিল। আর সেই বিশ্ব-পাবন জল মাথায় ধরল।

এবার নিন আপনার ত্রিপাদ ভূমি।

এক পদে সমস্ত মর্তমহী আকাশ ও দিগ্‌দিগন্ত আক্রমণ ও আচ্ছন্ন করল বামন। যখন দ্বিতীয় পদ ক্ষেপণ করল স্বর্গ পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মহর্লোক ও তপোলোক ছাড়িয়ে পৌঁছুল গিয়ে শেষলোকে, সত্যলোকে। তৃতীয় পদের জন্তে আর অণুমাত্র স্থান রইল না।

বামন বললে, দুই পদে সমুদয় স্বর্গমর্ত ঢাকা পড়েছে, এবার তৃতীয় পদের জন্তে স্থান দাও। নিজেকে আঢ্য মনে করে দানের অঙ্গীকার করেছ, এবার পূরণ করো অঙ্গীকার। অর্থীকে প্রতিশ্রুত বস্তু না দিয়ে যে বঞ্চনা করে তার মনোরথ বৃথা, তার স্বর্গ দূরস্থ এবং তার পতন অনিবার্য।

আমার বাক্য কখনো মিথ্যে হবার নয়। বললে বলি। হে উত্তমশ্লোক, আপনার তৃতীয় পদের জন্তেও আমি স্থান দেব। আমি কখনোই ভঙ্গ করব না প্রতিজ্ঞা। আমার এই মাথাই আপনার তৃতীয় পদের স্থান। 'পদং তৃতীয়ং কুরু শীর্ষ্ণি মে নিজং।' পদচ্যুতি পাশবন্ধন বা নরককেও আমি ভয় করি না, আমার ভয় অপযশে। আমার মাথায় রাখুন আপনার তৃতীয় পদ। অন্তে যে দেহের অবসান হবে তাতে কি প্রয়োজন ? বিত্তাপহারী দস্যু স্বজনবর্গেই বা কি প্রয়োজন ? সংসারহেতুভূতা স্ত্রীতেই বা কি দরকার ? এ আমার কি সৌভাগ্য, যে সম্পদ কৃতান্তকে ভুলিয়ে রাখে সে সম্পদ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে আপনার সামীপ্য পেলুম। পেলুম আপনার পদস্পর্শের অধিকার।

সেখানে তখন প্রহ্লাদ এসে উপস্থিত হল। পিতামহকে পূজোপহার দিতে পারছে না, বলি ব্রীড়ামণ্ডিত অধোমুখে অশ্রুবিলোল নয়নে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

শ্রীহরিকে প্রণাম করে প্রহ্লাদ বললে, ভগবন, আপনিই বলিকে ইন্দ্রপদ দিয়েছিলেন, আপনিই আবার সেই মোহকর সম্পদ প্রত্যাহার করলেন। এর চেয়ে বলির আর কি ভাগ্য হতে পারে ?

কৃতাঞ্জলি হয়ে বললে বিন্ধ্যাবলী। হে ঈশ্বর ! আপনি নিজ খেলার জন্যে এই ত্রিজগৎ রচনা করেছেন। যারা কুবুদ্ধি তারাই কর্তৃত্বের অভিমান করে। যতই অহঙ্কার করুক তাদের সাধ্য কি দান করে আপনাকে ?

ব্রহ্মা বললে, হে ভূতেশ, হৃতসর্বস্ব বলিকে মোচন করুন। এ নিগ্রহযোগ্য নয়, সত্যরক্ষার জন্তে সর্বস্ব দান করেছে আপনাকে। দান করেছে নিজেকে, নিজের মাথা আপনার পায়ে বিকিয়ে দিয়েছে। আর কি চাই ?

তাই তো হয়। বললেন শ্রীহরি। যাকে আমি কৃপা করি তার সকল সম্পদ আমি কেড়ে নিই। যে লোক সম্পদে মত্ত ও স্তব্ধ, সে যে আমাকেও অবজ্ঞা করে। দৈত্যকুলের কীর্তিবর্ধন এই বলি দুর্জয়া মায়াকে পরাভূত করেছে। জ্ঞাতিরা একে ত্যাগ করেছে, গুরু অভিসম্পাত দিয়েছে, তবুও আমার ছলনা বুঝতে পেরেও সত্য থেকে বিচলিত হয়নি। একে আমি দেবদুর্লভ স্থান দিচ্ছি। বলি, তুমি সুতলে গিয়ে বাস করো। সেখানে দেবদানব কেউ তোমাকে অতিক্রম করতে পারবে না। আমি সানুচর তোমাকে রক্ষা করব। তুমি সর্বক্ষণ আমাকে তোমার কাছে সন্নিহিত দেখতে পাবে। তোমার মঙ্গল হোক।

ঠাকুর বললেন, 'ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত আর সংসারী ভক্ত অনেক তফাৎ। ঠিক ঠিক সন্ন্যাসী, ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত—মৌমাছির মত। মৌমাছি ফুল বই আর কিছুতে বসবে না। মধু বই আর কিছু পান করবে না। সংসারী ভক্ত অন্য মাছির মত, সন্দেশেও বসছে আবার পচা ঘায়েও বসছে। বেশ ঈশ্বরভাবেতে রয়েছে আবার কামিনী-কাঞ্চন নিয়ে মেতেছে। ঠিক ঠিক ত্যাগী ভক্ত চাতক পাখির মত। চাতক স্বাতী নক্ষত্রের মেঘের জল বই আর কিছু খাবে না। সাত সমুদ্র তেরো নদী ভরপুর, সে অন্য জল ছোঁবে না। ছোঁবে না কামিনী-কাঞ্চন। পাছে আসক্তি হয় কাছেও রাখবে না।'

ডাক্তার সরকারকে এবার লক্ষ্য করলেন ঠাকুর, 'কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ তোমাদের পক্ষে নয়। তবে এ জানবে টাকাতে ডাল-ভাত হয়, পরবার কাপড় হয়, থাকবার একটি স্থান হয় আর ঠাকুরের ও

ভক্তদের সেবা হয়। বাস এই পর্যন্ত। আর যা — ব্যবহার মন লোকের নয়। একটি ছুটি তবে ছেলেপুলে হ'য়ে গেলে ভাই-বোনের মত থাকবে।'

কিন্তু সন্ন্যাসী ?

'সন্ন্যাসীর পক্ষে ত্যাগ। তারা স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যন্ত দেখবে না। 'সন্ন্যাসী নারী হেরবে না' এই সন্ন্যাসীর ধর্ম। ছোট হরিদাস ভক্ত মেয়ের সঙ্গে আলাপ করেছিল, চৈতন্যদেব হরিদাসকে ত্যাগ করলেন। কালো পাঁঠা মার সেবার জন্যে বলি দিতে হয়, কিন্তু একটু খুঁত থাকলে হয় না। সন্ন্যাসী রমণীসঙ্গ তো করবেই না, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ পর্যন্ত করবে না। জিতেন্দ্রিয় হলেও না, লোকশিক্ষার জন্যেও না। তার এমন স্থানে থাকা উচিত যেখানে স্ত্রীলোকের মুখ দেখা যায় না বা অনেক কাল পরে দেখা যায়।'

আর টাকাকড়ি ?

'টাকাও সন্ন্যাসীর পক্ষে বিষ। টাকা কাছে থাকলেই ভাবনা। হিসাব, দুশ্চিন্তা, অহঙ্কার, লোকের উপর ক্রোধ, দেহের সুখের চেষ্টা, এই সব এসে পড়ে। সূর্য দেখা যাচ্ছিল, মেঘ এসে সব ঢেকে দিলে। সন্ন্যাসীর পক্ষে গেরো দেওয়া সেলাইকরা পরদা গুটানো দোরবাক্সে চাবি দেওয়া এই সব চলবে না। সন্ন্যাসীর পক্ষে কামিনীকাঞ্চন থুতু ফেলে থুতু খাওয়া। সন্ন্যাসীর পক্ষে টাকা নেওয়া মানে ব্রাহ্মণের বিধবা হবিষ্য খেয়ে বাগদি উপপতি করা। সন্ন্যাসীর এ কঠিন নিয়ম কেন ? সন্ন্যাসীর ষোল আনা ত্যাগ দেখলেই তো লোকের সাহস হবে।'

বলে ঠাকুর গল্প গাঁথলেন।

একজন সস্ত্রীক বিবাগী হয়ে বেরুল তীর্থ করতে। পথে যেতে স্বামী দেখতে পেল এক জায়গায় কয়েকটা হীরে পড়ে আছে। ভাবলে এগুলোকে মাটি চাপা দিয়ে রাখি, নইলে যদি স্ত্রী দেখতে পায় তবে তার লোভ হতে পারে। মাটি চাপা দিয়ে রাখছে, স্ত্রী পিছন থেকে এগিয়ে এসে বললে, ও কি করছ ? স্বামী থতমত খেয়ে গেল। স্ত্রী ছাড়বে কেন, নিজেই পা দিয়ে মাটিগুলি সরাতে লাগল। যেই সরিয়েছে দেখতে পেল, হীরে! তখন বললে, আশ্চর্য, এখনো হীরে-মাটি তফাৎ দেখছ, তবে তুমি মরতে বনে এলে কেন ?

তেজচন্দ্র মিত্রকে ডেকে পাঠান ঠাকুর। কিন্তু তার কি আসবার সময় আছে ? তার কেবল কাজ, কেবল আপিস!

'তোকে এত ডেকে পাঠাই আসিস না কেন ?' সেদিন আসতেই জিগগেস করলেন ঠাকুর।

'আপনিই ডাকেন, আপনিই আবার আটকান। মন্দিরও আপনি আপিসও আপনি।'

'আমি তোকে আপনার জন বলে জানি, তাই ডাকি।'

'কিন্তু সাড়া দেবার মত প্রাণ দিচ্ছেন না কেন ? অবসর নেই, অবসর নেই, এই তো প্রাণের কান্না।'

'অবসর নেই, অবসর নেই!' প্রতিধ্বনি করলেন ঠাকুর।

এই অনবসরের মধ্যেও ঈশ্বর। ঈশ্বর যখন তিন পায়ে স্বর্গমর্ত্য পাতাল আচ্ছন্ন করেছেন, তখন আর স্থানে-কালে অবসরে-অনবসরে কোথায় আর ব্যবধান ? আমার ধ্যানে যেমন ঈশ্বর আমার বিক্ষিপ্ততায়ও তেমনি ঈশ্বর। আমার নামে যেমন ঈশ্বর, বিস্মৃতিতেও তেমনি ঈশ্বর। যেমন ঈশ্বরচিন্তনে তেমনি ঈশ্বর-বিভ্রান্তিতে।

তোমাকে যদি আমি ভুলে থাকি সে তুমিই আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ বলে। আমার মধ্যে উচ্ছ্বসিত যে এই নিশ্বাস এ তোমারই তপ্ত প্রাণস্পর্শ। আমি এই যে লিখছি এ-ও তোমাকেই লেখা। এই যে পড়ছি এ-ও তোমাকেই দেখা।

'দিবীব চক্ষুরাততং।' এক-সঙ্গে অতি সহজেই সমস্ত আকাশকে চোখ দেখে। তেমনি তোমাকে দেখতে দাও।' ভেঙে-ভেঙে নয়, টুকরো-টুকরো করে নয়, জীবনের ছোট-ছোট প্রকোষ্ঠের মধ্যে নয়, সম্মিলিত করে এক-সঙ্গে দেখা, সমগ্র করে এক-সঙ্গে আস্বাদ করা।

ঈশ্বরের পদতলে বলি হওয়া। [ক্রমশঃ।

কালের রাখাল

অশোক ভট্টাচার্য

কাল আমি গান শুনিয়েছি গান
মগ্ন নিঝুম মধ্যাহ্নের বুকে।
আগুনের গান ফাল্গুনের গান
গেয়েছি একাকী প্রদীপ্ত সেই
নীল আকাশের নিচে।

আজ তুমি ফিরে, বন্ধু আমার
শোনাও তোমার বাঁশি—
ভরা দুপুরের নিথর হৃদয় স্পন্দিত হোক
তার ভারী সুর শুনে।
বন্ধু আমার! উদাসী রাখাল তুমি
বাজাও তোমার বাঁশি।

শঙ্খচিল সে আকাশে উড়ুক
বাতাস চিরুক তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তার—
যাক না তোমার ধবল গাভীটি
কোমল ঘাসের টানে
পায় পায় দূরে চলে।
তুমি শুধু প্রাণ ঢেলে দাও শুনি
তোমার বাঁশির বুকে, বন্ধু আমার
চিনবো তোমায় কালের রাখাল বলে।

কাল আমি গান শোনাবো তোমায় কাল
আমার হাতের একতারা ঝংকারে—
কাল আমি সখা সন্ধ্যার তীরে
তোমার ফেরার পথে
তুলবো সুরের ঢেউ।
আজ তুমি এই স্তব্ধ দুপুরে
বাজাও তোমার বাঁশি—
কণ্ঠহারার হৃদয়-তন্ত্রী কাঁপুক সুরের ঘায়।

যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

আঠার

বিদ্যার বণিক বিদ্যাসাগর (১)

মুদির দোকান বা আলুপটলের ব্যবসায় বিদ্যাসাগরের মন ওঠেনি। প্রয়োজন হলে সে-ব্যবসাও অবশ্য তিনি করতে পারতেন, কিন্তু তার প্রয়োজন হয়নি। জীবিকার জন্য যে কোন স্বাধীন বৃত্তি অবলম্বন করতে তাঁর কুলগত বা শ্রেণীগত কোন সংস্কারে বাধত না। স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতাই ছিল তাঁর আত্মমর্যাদা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড। মুদির দোকান করলে বা বাজারে আলুপটল বেচলে সেই মানদণ্ডটি বর্জন করতে হ'ত না। রসময় দত্তের মন্তব্যের উত্তরে তাই তিনি ঐ কথা বলেছিলেন।

তখন তাঁর বাসায় পোষ্যের সংখ্যা অনেক। অসহায় দরিদ্র আত্মীয়স্বজনের প্রায় কুড়িটি বালককে তিনি খাইয়ে-পরিয়ে লেখাপড়া শেখাচ্ছিলেন। চাকরি ছাড়লেও তাদের ছাড়া সম্ভব হয়নি। ভরসা কেবল মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরির আয় পঞ্চাশ টাকা। তা দিয়ে কলকাতার বাসার খরচ চলে যেত, বীরসিংহে কর্জ করে টাকা পাঠাতে হ'ত। এই দুশ্চিন্তার মধ্যেও তাঁর নিজের বিদ্যানুশীলন থেকে তিনি বিরত হননি। ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনের জন্য তিনি শোভাবাজারের রাজবাড়ীতে নিয়মিত যাতায়াত করতেন। বিদ্যানুশীলনের মধ্যে অর্থোপার্জনের কথাও চিন্তা করতে হ'ত।

কিন্তু স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জনের পথ কোথায়? স্বাধীন বাণিজ্যের পথই একমাত্র পথ এবং যুগোপযোগী পথ। নবযুগের বণিকশ্রেণীই ব্যক্তিস্বাধীনতার অগ্রদূত। কিন্তু বাণিজ্যের মূলধন কোথায়? তাঁর নিজের কোন আর্থিক মূলধন ছিল না, মুদির দোকান করার মতনও না। পণ্যদ্রব্যের বাজারের খবরও তিনি রাখতেন না। তিনি বিদ্যার ব্যাপারী। বিদ্যাই তাঁর একমাত্র স্বোপার্জিত মূলধন। কিন্তু বিত্তের সঙ্গে বিদ্যার সাদৃশ্য কোথায়, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে?

বিত্ত দান করলে কমে যায়, বিদ্যা যত দান করা যায় তত বাড়তে থাকে। বিত্ত অপহরণ করা যায়, বিদ্যা করা যায় না। বিত্তের মূলধন বাণিজ্যে খাটালে মুনাফার আকারে তা বাড়তে থাকে, কিন্তু বিদ্যাকে মূলধন করে বাণিজ্য করা যায় কি? করা যায়। নবজাগরণের যুগের (Renaissance) মূলমন্ত্র হল অবাধ বাণিজ্য এবং তার প্রধান মূলধন হ'ল দুটি—বিত্ত (Money) ও বিদ্যা (Intellect)। নবযুগ কেবল পণ্যবণিকের যুগ নয়, বিদ্যাবণিক ও বুদ্ধিবণিকেরও যুগ। পণ্যবণিক হবার মতন আর্থিক সামর্থ্য বা মানসিক প্রবণতা বিদ্যাসাগরের ছিল না, কিন্তু নবযুগের বণিকের ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্বাতন্ত্র্যবোধ তাঁর পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। সুতরাং বিদ্যার মূলধন নিয়োগ করে তিনি বিদ্যাবণিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন। কেবল লক্ষ্মীর আরাধনার জন্য নয়, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অর্চনার জন্যও। বিদ্যাসাগর মুদ্রক (Printer), প্রকাশক (Publisher) ও গ্রন্থকার (Author) হলেন।*

বণিক না হয়েও স্বাধীন বাণিজ্যবৃত্তির প্রতি অনুরাগ তৎকালে কেবল যে বিদ্যাসাগরেরই ছিল তা নয়। এ-পথ তিনি প্রথমে দেখান নি। তাঁর আগে, রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের অনেকে এ-পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। অবাধ বাণিজ্যের উদ্যম তাঁদের অনেকের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। সমাজের বিদ্যাবুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে (Intellectual Class) নবযুগের বণিকশ্রেণীসুলভ এই স্বাধীন বাণিজ্যিক উদ্যোগের প্রকাশ হয়েছিল, 'রিনেস্যান্সের' অন্যতম ঐতিহাসিক লক্ষণ হিসেবে। বাংলার নবজাগরণের ধারা-বিচারকালে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে এই বাণিজ্যবৃত্তির উন্মেষের তাৎপর্য আজ পর্যন্ত প্রায় অবহেলিত হয়ে এসেছে

---

* ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জীবনের এই বাণিজ্যবৃত্তির ঐতিহাসিক তাৎপর্য আজ পর্যন্ত তাঁর কোন চরিতকার বা গুণগ্রাহী লেখক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। সেইজন্য তাঁর কর্মবহুল জীবনের এই দিকটাকে তাঁরা প্রায় উপেক্ষা করেছেন বলা চলে। আমার বিশ্বাস, এই বিশেষ বৃত্তিনির্বাচনের মধ্যে বিদ্যাসাগরের যে মনোভাব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তা রিনেস্যান্স-যুগের আদর্শ মানবচরিত্রের মনোভাব। বিদ্যাসাগর ছিলেন নবযুগের 'intellectual entrepreneur.'—লেখক

বলা চলে। এই অবহেলার ফলে আমরা নবজাগরণের যুগের বাঙালী চরিত্রের বিশ্লেষণে অনেকটা ব্যর্থ হয়েছি।

ইয়োরোপীয় রিনেসাঁন্সের মানসিক পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ফন মার্টিন বলেছেন : (১)

> The new conditions of life brought with them new attitudes and new valuations. The assertive self-consciousness of the *novus homo* made him reject any power which would impose limits. The free individual, free to dispose of his property, be it material or intellectual, as he thought fit, was the order of the day.

কথাগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য গভীর। নবযুগের নতুন সামাজিক পরিবেশে নতুন করে যে রূপায়ন ও মূল্যায়নের সূচনা হ'ল, তার ভিত্তি হল প্রখর আত্মচেতনা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা। মানুষের এই নতুন ঐতিহাসিক আত্মচেতনা কোন বাধাবন্ধনের শাসন মানতে চাইল না। স্বাধীন মানুষ সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে তার ব্যক্তিগত সম্পত্তির ব্যবহারে উৎসাহী হল। এই ব্যক্তিগত সম্পত্তি 'মেটিরিয়াল' ও 'ইনটেলেকচুয়াল' দুই-ই হতে পারে। এই সম্পত্তির যদৃচ্ছা ব্যবহারে ও ভোগবিলাসে সমস্ত বাহ্য বন্ধন মানুষ অস্বীকার করল। বিত্তবান যে সে তার বিত্তের মূলধন অবাধে বাণিজ্যে খাটাতে পারে। বিদ্বান যে সে তার বিদ্যার মূলধন যদৃচ্ছা স্বাধীন ভাবে নিয়োগ করতে পারে। বিত্ত বা বিদ্যা, যাই মূলধন হোক না কেন, তার নিয়োগের পথে সমস্ত নিগড় ছিন্ন করাই হল যুগ-ধর্ম। বিত্তবান ও বিদ্বানের এই মনোভাবের সাদৃশ্য উভয়শ্রেণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য যোগসূত্র স্থাপন করেছিল। মার্টিন তা উল্লেখ করতে ভোলেননি—"Thus in many ways there was a close correlation between the mercantile classes and the intelligentsia." (২)

বণিকশ্রেণী ও বিদ্বানশ্রেণীর এই আনুরূপ্য উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজজীবনেও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।* নবযুগের বাঙালী বণিকশ্রেণীর মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর, মতিলাল শীল, রামদুলাল দে প্রমুখ অনেকে অবাধ বাণিজ্যের পথে দুঃসাহসিক অভিযান করেছিলেন। সদাগরী স্বার্থে নিমজ্জিত হয়ে তাঁরা সাংস্কৃতিক জীবনের কর্তব্যের কথা ভুলে যাননি। সে ক্ষেত্রেও তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিয়েছিলেন। যাঁরা মূলত বণিকবৃত্তি অবলম্বন করেননি, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রের কর্মী ছিলেন, বিদ্যানুশীলনে ও সামাজিক আন্দোলনে ব্যাপৃত ছিলেন, তাঁরাও অনেকে স্বাধীন বাণিজ্যের জন্য উদযোগী হয়েছেন। রামমোহন রায় বণিক ছিলেন না, কিন্তু তবু তিনি তাঁর সমাজসংস্কারকের দুরূহ কর্তব্য পালনের ফাঁকে ফাঁকে বাণিজ্য করতে কুণ্ঠিত হননি। কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা, বেনিয়ানি ও মহাজনী করে তিনি প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। রামগোপাল ঘোষ ছিলেন তৎকালের বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের অগ্রগণ্য ব্যক্তি। নব্যশিক্ষিতদের সম্রাট বলে সকলে তাঁকে সম্মান করতেন। বাণিজ্য তাঁর পেশা ছিল না। কিন্তু তবু তিনি স্বাধীন বাণিজ্যের জন্য তাঁর জীবনের কতখানি সময় ব্যয় করেছিলেন, ভাবলে অবাক হতে হয়। বিদ্বৎ-সমাজের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা যিনি, তিনি বাণিজ্যক্ষেত্রের অবাধ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করে, সার্থক বণিকের সম্মানও লাভ করেছিলেন সমাজে। জোসেফ ও কেলসল (Joseph and Kelsall) সাহেবের কোম্পানীতে সহকারীরূপে কাজ করে, ক্রমে নিজের বুদ্ধি ও নিষ্ঠার জোরে তিনি তার অংশীদার হয়েছিলেন। সাহেব কোম্পানীর নাম 'মেসার্স কেলসল অ্যাণ্ড ঘোষ' নামে পরিবর্তিত হয়েছিল। পরে সাহেবের সঙ্গে মতান্তর হওয়াতে তিনি নিজে স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে আরম্ভ করেন। চালের ব্যবসা করে তিনি প্রচুর ধনোপার্জন করেন। আকিয়াব, রেঙ্গুন প্রভৃতি স্থানে তাঁর চালের আড়ৎ ছিল। ব্যবসায়ীরূপে তিনি এতখানি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন যে ইংরেজ বণিকরা তাঁকে ১৮৫০ সালে 'বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সের' সদস্যরূপে নির্বাচন করতে দ্বিধাবোধ করেননি। বাঙালী ব্যবসায়ীর পক্ষে এই সম্মান তখন দুষ্প্রাপ্য ছিল। রামগোপাল ঘোষ বাঙালী বিদ্বৎ-সমাজের সম্রাট হয়েও বণিক-সমাজের এই সম্মান অর্জন করেছিলেন। (৩)

প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের দুজন প্রধান মুখপাত্র ছিলেন। সাহিত্য সংস্কৃতি ও সমাজনীতির অনুশীলনই তাঁদের জীবনের অন্যতম ব্রত ছিল। প্রধানত তাঁরা বিদ্যাবুদ্ধিজীবী ছিলেন। কিন্তু বাণিজ্যক্ষেত্রে উভয়েই যথেষ্ট প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। প্যারীচাঁদ প্রসঙ্গে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন : (৪)

> তাঁহাতে যেমন সাহিত্যানুরাগ তেমনি বিষয়কর্মে দক্ষতা দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি একদিকে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে লাইব্রেরিয়ানের কর্ম করিতেন, অপরদিকে তাঁহার বন্ধু তারাচাঁদ চক্রবর্তীর সহিত সম্মিলিত হইয়া বিষয় বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নানাবিধ দ্রব্যের আমদানী ও রপ্তানীর কাজ করিতেন। এই কারবারে তাঁহাকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে তিনি ভগ্নোদ্যম হন নাই। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তারাচাঁদ চক্রবর্তীর মৃত্যু হইলে, তিনি আপনার দুই পুত্রকে অংশীদার করিয়া নিজে কারবার করিতে প্রবৃত্ত হন। এই

---

(১) A. V. Martin : Sociology of the Renaissance, P.P. 39-40.

(২) Martin : ঐ, ৪১ পৃষ্ঠা।

* নবযুগের বাংলার ইতিহাস নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁরা কেউ বাঙালী বণিকশ্রেণী ও বিদ্বানশ্রেণীর এই আনুরূপ্যের কথা উল্লেখ করেননি এবং তার অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করেননি। মনে হয়, তাঁদের সমাজবিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবের জন্যই এই ত্রুটি ঘটেছে।—লেখক

(৩) Lokenath Ghose : Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zamindars etc. (1881) : Part II, P.P. 78-80.

(৪) শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৩য় সংস্করণ), ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কারবারে তিনি যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার প্রতি কলিকাতার বণিকসমাজের এমনি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি একাদিক্রমে অনেকগুলি কোম্পানীর ডাইরেক্টর পদে বৃত হইয়াছিলেন।

নবযুগের এই স্বাধীন বাণিজ্যস্পৃহা যে কেবল নব্য ইংরেজীশিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়েছিল তা নয়। পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাশিক্ষার ফলে এবং পাশ্চাত্ত্য বণিকশ্রেণীর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা যে নবযুগের অবাধ বাণিজ্যনীতির অনুসরণে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কিন্তু সেকালের শিক্ষাদর্শে যাঁরা মানুষ হয়েছিলেন, সেই সব শাস্ত্রজ্ঞ ও সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালী পণ্ডিতদের মধ্যেও দু'চারজন এই অবাধ বাণিজ্যনীতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। যুগধর্মের সংক্রমণ থেকে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারেননি। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন অম্বিকাকালনার তারানাথ তর্কবাচস্পতি। পণ্ডিত তারানাথকে ঈশ্বরচন্দ্র অগ্রজতুল্য মনে করতেন এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। কি ভাবে বিদ্যাসাগর কলকাতা থেকে কালনা পর্যন্ত হেঁটে গিয়ে তারানাথকে সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপনার কাজ গ্রহণ করতে রাজী করিয়েছিলেন, সেকথা আগে বলেছি। সংস্কৃত কলেজে ও কাশীর পণ্ডিতদের কাছে সর্বশাস্ত্রে অনুশীলন শেষ করে, তারানাথ কালনায় ফিরে এসে বিদ্যাদানের জন্য যেমন টোল খুলেছিলেন, তেমনি বিত্তোপার্জ্জনের জন্য স্বাধীনভাবে বাণিজ্য করতেও আরম্ভ করেছিলেন। কাপড়ের ব্যবসা করে তিনি তাঁর সমসাময়িক বহু ব্যবসায়ীর চেয়ে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। কেবল বস্ত্রের ব্যবসায়ে নয়, কাঠের ও ঘৃতের ব্যবসায়েও তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। তাঁর জীবনচরিতকার এ-সম্বন্ধে লিখেছেন: (৫)

"তিনি প্রথমতঃ একখানি বস্ত্রের দোকান খুলিলেন। ঐ সময়ে বিলাতী বস্ত্রের আমদানী ছিল না। অতএব বিলাতী সুতা ক্রয় করিয়া অম্বিকা কালনায় প্রায় দ্বাদশ শতসংখ্যক তন্তুবায়গণকে সুতা দিয়া ইচ্ছানুরূপ বস্ত্র প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহা নানাদেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করিতেন। ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই। কিছুদিন পরে তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রামেও বস্ত্র প্রস্তুত জন্য এক কুঠি প্রস্তুত করেন।...ঐ সকল বস্ত্র কাশী, মির্জাপুর, কানপুর মথুরা, গোয়ালিয়র ও মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। তৎকালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গমনের জন্য রেলের পথ প্রস্তুত হয় নাই। অধিক কি, তৎকালে এরূপ সুগম পথও ছিল না, যে রাধানগর হইতে গোযান দ্বারা বস্ত্র প্রেরণ করেন। সুতরাং মুটের দ্বারা ঐ সকল বস্ত্র নানাদেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবসায় করিতেন।.....

"বাচস্পতি মহাশয় কেবল বস্ত্রের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কিছুদিন ঐ ব্যবসা করিতে করিতে কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। তিনি নেপাল হইতে শালকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন। এবং এই কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্রায় লক্ষ টাকা উপার্জন করেন। ঐ সময়েই কালনায় প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। কালনা গ্রামের মধ্যে ওরূপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ সময়েই তিনি অসংখ্য ঢেঁকী বসাইয়া, ধান্য ক্রয় করিয়া তণ্ডুল প্রস্তুত করাইতেন ও ঐ সকল তণ্ডুল বিক্রয় করিতেন। ঢেঁকীর শব্দে প্রতিবেশিবর্গের নিদ্রা হইত না। এজন্য প্রতিবেশীরা বাচস্পতির পিতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিতেন। দিবারাত্র ঐ সকল ঢেঁকীর শব্দে লোকের কষ্ট হয় জানিয়া পিতার আদেশানুসারে তিনি গ্রামের দক্ষিণাংশে মাঠের মধ্যে ঐ সকল ঢেঁকী স্থাপন করিয়াছিলেন।

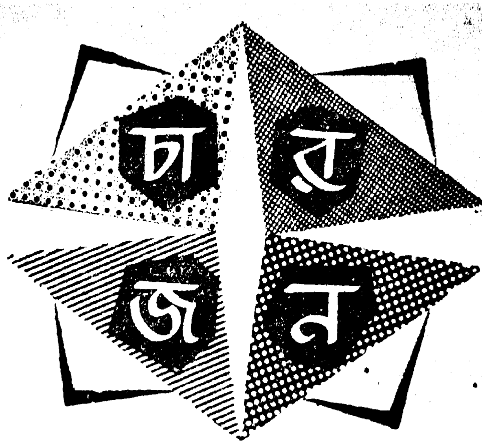
পণ্ডিত-বণিক তারানাথের দৃষ্টান্ত নবযুগের বাংলার ইতিহাসে বিরল।

বাংলার সমাজ-জীবনে রিনেসাইন্সের ঐতিহাসিক লক্ষণ কি ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল, তৎকালে কয়েকটি বাঙালী-চরিত্রের এই দৃষ্টান্তগুলি থেকে তা পরিষ্কার বোঝা যায়। 'Individual entrepreneur' কেবল বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যেই দেখা দেয়নি, বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজীবী বাঙালীদের মধ্যেও দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য অর্থনৈতিক জীবনের অবাধ বাণিজ্যের আদর্শে বাঙালী বুদ্ধিজীবীরাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং অনেকে বাণিজ্যক্ষেত্রে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও এই যুগাদর্শের প্রেরণায় স্বাধীন বাণিজ্যের পথে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর বাণিজ্যের সঙ্গে তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য বিদ্যাজীবীদের বাণিজ্যের পার্থক্য ছিল। তাঁরা বিত্ত মূলধন করে পণ্যের বাণিজ্য করেছিলেন, বণিকদের মতন। বিদ্যাসাগর বিদ্যাকেই মূলধন করে, তারই যুগোপযোগী বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। মুদ্রক প্রকাশক ও গ্রন্থকার হিসেবে তিনি যে স্বাধীন বাণিজ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন, তা তাঁর সমসাময়িক সমশ্রেণীভুক্তদের মধ্যে আর কেউ তখন করেননি। এদিক দিয়ে বিদ্যাসাগরই ছিলেন পথপ্রদর্শক। [ক্রমশঃ।

(৫) শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্ন: তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত (১৩০০ সাল), পৃষ্ঠা ১৪-১৭।

... এ মাসের প্রচ্ছদপট ...

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে তিব্বতী বালিকার কলিকাতায় পদ্মশালার আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়েছে। আলোকচিত্র সুনীল জানা গৃহীত।



শ্রীসুকুমার সেন আই, সি, এস

[ভারতের চীফ ইলেকশন কমিশনার]

তখন রাজধানীর আকাশে অস্তগামী সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়েছিল। অদূরে রাষ্ট্রপতি-ভবনের পতাকা হাওয়ায় নৃত্যের তালে তালে দিনান্তের ক্লান্ত রবিকে প্রণতি জানাচ্ছিল। ইয়র্ক রোডের কৃষ্ণচূড়ার শাখায় শাখায় রক্তাভ সূর্যচ্ছটা সন্ধ্যাকে সম্ভাষণ জানাচ্ছিল।

সহস্র মাইল দূরে, বাংলার কথা ভাবতে ভাবতে চলছিলাম। বাংলা সেই শ্যামলিম আর্দ্র স্নেহসিক্তি ভূখণ্ড, যার হাওয়ায় বাতাসে নেতৃত্বের সুর। সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, রাজনীতিতে। বাংলার এক ক্ষণজন্মা সন্তানের সঙ্গে দেখা করতে চলেছি। শুধু সম্পাদকের হুকুমেই নয়, আপন বিবেকেরও নির্দেশে।

হ্যাঁ এই ত' ছ'নম্বর বাড়ী। বাইরে লেখা—"সুকুমার সেন।"

সুকুমার সেন। গণতান্ত্রিক ভারতে নির্বাচন কালে যে নাম শুধু সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতেই নয়, বিশ্বভুবনে অতি পরিচিত আত্মজন হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। স্বাধীন ভারত বিশ্বদরবারে যে দিন গণতন্ত্রের মহান্ যজ্ঞের নিমন্ত্রণ জানাল, কাশ্মীর থেকে কুমারিকা পর্য্যন্ত সেদিন খোঁজ পড়ল অগ্নিরক্ষক পুরোধার। পৃথিবীর গণতন্ত্রের ইতিহাসে সে এক পরম শুভলগ্ন। ত্রিশ কোটি জনতার নির্বাচন। শুধু ত্রিশ কোটিই নয়, সদ্য নিদ্রোত্থিত। নব জাগ্রত। চোখে ঘুমের আমেজ। নির্বাচন-রঙ্গমঞ্চে এ যে তাদের প্রথম অবতরণ। সেদিনের পুরোধা চিরদিনের ঐতিহ্য পতাকা ঠিক তুলে ধরলেন। বঙ্গসন্তানই এ গণতন্ত্র-যজ্ঞের অগ্নি রক্ষা করলেন। নাম তাঁর সুকুমার সেন। সেই সুকুমার সেন—যিনি স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম ইলেকশন-কমিশনার।

গেট দিয়ে ভিতরের দিকে অগ্রসর হতেই অতি আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন শ্রীমতী জয়ন্তী সেন—সুকুমার বাবুর বিদুষী কন্যা। মিসেস সেনও এলেন। এক মিনিটের মধ্যে সমস্ত আবহাওয়াটা অন্তরঙ্গ করে ফেললেন এঁরা। আমি এক জন বাঙ্গালী, সে পরিচয়ই যথেষ্ট এঁদের কাছে।

মিসেস সেন বললেন—"ও হ্যাঁ, শ্রদ্ধেয় ভবতোষ বাবু ('মাসিক বসুমতীর' সম্পাদক শ্রীযুত প্রাণতোষ ঘটক মহাশয়ের পিতৃদেব) বলেছিলেন বটে এক বার ওঁর জীবনীর কথা।—হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই কথা ছিল বাবার জীবনী লিখবার কথা" মাঝখানে বললেন কুমারী জয়ন্তী সেন। কিন্তু আমার লিখতে যেন কেমন সঙ্কোচ এলো জানেন? মনে হল যেন সব একতরফা হয়ে যাবে।

আমি বললাম, একতরফা মানে? এ কি আদালতের একস্ পার্টি নাকি? আজ-কাল যত দূর জানি মেয়েরাই পিতৃ-জীবনীর খবর দিতে পারেন সব চেয়ে ভালো।

'বসুমতী-সম্পাদক' মশাইয়ের চিঠিখানা খুলে দেখালাম। প্রশ্নের বালাই নেই। নিছক জীবনী বলুন। যাতে করে বাংলার সাত কোটি সন্তান এই পুরুষসিংহের আত্মকাহিনী থেকে নব প্রেরণা লাভ করতে পারে।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করি নি। মিসেস সেন মনোযোগ দিয়ে সব শুনে চলেছিলেন। বললেন, নির্বাচন সম্বন্ধে লিখবেন? বললাম—"না শুধু নির্বাচন সম্বন্ধেই নয়। একেবারে শৈশব থেকে।"

১৮৯৮ সালের ২রা জানুয়ারী ঢাকা জিলার সোনারঙ গ্রামে সুকুমার বাবু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার সেন স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল পুরুষ ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন অক্ষয়কুমার আপন মেধাবলে বরাবর বৃত্তি লাভ করে জীবনে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের সুযোগ্য ভাবে বিভিন্ন জেলা শাসন করেন।

ছাত্রজীবনে সুকুমারমতি বালক সুকুমার পিতৃ-সান্নিধ্যে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরবার অবকাশ পান। বাংলার পল্লীর প্রকৃত রূপ এখানেই সুকুমারের মনে এক পরম রমণীয় দৃশ্যপট তুলে ধরে। সে দৃশ্য সদাজাগ্রত। বাংলার নদ-নদী, শ্যামল তৃণখণ্ড, ঘন বৃক্ষরাজির অরণ্যানী, বর্ষণমুখরিত শ্রাবণসন্ধ্যা বালককে এক নতুন আর্টিষ্ট সৃষ্টি করে। ভবিষ্যৎ জীবনে তাই এক জন সরকারী চাকুরে হয়েও সুকুমার বাবু সাহিত্যকলা শিল্পের প্রতি প্রবল অনুরাগ পরিত্যাগ করতে পারেন নি। দিনের কর্মব্যস্ত মুহূর্তের ফাঁকে-ফাঁকে তাই আজও তিনি সঙ্গীত সাধনা করে থাকেন—কণ্ঠ ও যন্ত্র। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে



শ্রীসুকুমার সেন

ইনি বিশেষ পারদর্শী। মিসেস সেন চর্চা করেন কি না, জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ বোধ করলাম। পিতা-কন্যার সুকণ্ঠ দিল্লীতে সর্বমহলে বিশেষ সমাদৃত। সেতারেও সুকুমার বাবু বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন। বাংলার নিভৃত পল্লীর মুক্ত বাতাসের ছোঁয়া যাঁকে এক বার স্পর্শ করেছে, সঙ্গীত শিল্প-সাহিত্য আরাধনার মহান্ মাদকতা কি জীবনে সে ভুলতে পেরেছে? কোটি কোটি জনগণের নির্বাচনের পুরোধাও তাই আজ আষাঢ়-সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে যন্ত্রটা পাশে নিয়ে আকাশ-বাতাসের সঙ্গে মিলে বর্ষামঙ্গলকে সাদর অভ্যর্থনা জানাতে বিস্মৃত হন না।

রাজসাহী, নোয়াখালি, ফরিদপুর, বরিশাল, বাঁকুড়া, কলকাতা ও লণ্ডনে শ্রীযুত সেন বিদ্যা শিক্ষা লাভ করেন। শুনে পরম আনন্দ লাভ করলাম যে, শ্রীযুত সেন "বাংলার অক্সফোর্ড" বরিশালের স্বর্গীয় অশ্বিনী দত্ত মশাইর ব্রজমোহন কলেজের প্রাক্তন ছাত্র। এই কলেজ থেকে আই, এ পরীক্ষায় সুকুমার বাবু বিশ্ববিদ্যালয়ে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। ১৯১১ সালে কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে গণিত শাস্ত্রে অনার্সে সুকুমার বাবু প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯২১ সালে বিলেতে আই সি এস পরীক্ষায় পারদর্শিতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। আই-সি-এস পরীক্ষায় সুকুমার বাবু ঘোড়া চড়াতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

১৯২২ সালে সুকুমার বাবু কুমিল্লার ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হয়ে সর্বপ্রথম সিভিল সার্ভিস গ্রহণ করেন। তারপর চুয়াডাঙ্গা (নদীয়া) ১৯২৪-২৫; সিরাজগঞ্জ (১৯২৫-২৭); এস-ডি-ও ছিলেন। ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট জজের পদ অলঙ্কৃত করেন।

স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৭ সালে সুকুমার বাবু পশ্চিম বাংলার চীফ সেক্রেটারী পদে উন্নীত হন। বাংলার কুখ্যাত দাঙ্গার ঘনঘোর ঘটায় বিশেষ দক্ষ হাতে ইনি সমস্ত প্রদেশ রক্ষা করেন।

এখানে একটা কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা প্রয়োজন। একমাত্র স্বাধীনতার পরই ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সুকুমার বাবুকে "একজিকিউটিভ" লাইনে নিয়ে আসেন। এর পূর্বে ইংরেজ রাজত্ব-কালে বিদেশী শাসক বরাবরই শ্রীযুত সেনকে "জুডিশিয়াল" লাইনে নিযুক্ত করেছে।

১৯৫০ সালে সুকুমার বাবু স্বাধীন ভারতের সর্বপ্রথম ইলেকশন-কমিশনার নিযুক্ত হন। ইলেকশন-কমিশনার পদে শ্রীযুত সেন যে দক্ষতার পরিচয় দেন, তাতে সর্বভারতে আকুমারিকা হিমাচল সর্ব জাতি সর্ব জনের কাছে তিনি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এ তথ্য সর্বপরিচিত। নয় কি? ভারতবর্ষের' নির্বাচনের পর সুদানে নির্বাচন কালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর নির্দেশে ও সুদান-ইংরেজ নিমন্ত্রণে শ্রীযুত সেন সুদানে সস্ত্রীক গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার জন্য বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। এই নির্বাচন কমিটিতে সদস্য ছিলেন আমেরিকা, ইংরেজ, উত্তর ও দক্ষিণ সুদান, মিশর, ভারতবর্ষ (চেয়ারম্যান শ্রীযুত সুকুমার সেন।)

আনন্দের বিষয় এই যে, সফলতার সহিত নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে বিভিন্ন দেশ থেকেই তিনি আন্তরিক অভিনন্দন লাভ করেন। এ বিষয়ে এ্যান্টনি ইডেনের বিখ্যাত অভিনন্দনপত্র সর্বভারত বিখ্যাত। কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ মিশরবাসী নাইল নদীর তীরে অন্দুরমান নামক জায়গায় একটা মেইন রাস্তার নামকরণ করে—সুকুমার সেন রোড। সহস্র যোজন দূরে এক জন ভারতীয়ের প্রতি এ সম্মানে মিশর ভারত-বর্ষকে সম্মানিত করেছে।

সুকুমার বাবুকে ভারত সরকার সম্প্রতি "পদ্মভূষণ" উপাধিতে বিভূষিত করেছে। সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ সুকুমার সেন অপরিসীম শ্রদ্ধা-ভক্তি অর্জন করেছেন। আগামী নির্বাচনের জন্য আজ এ কর্মঠ চিরযৌবনসম্পন্ন পুরুষসিংহের নিঃশ্বাসটুকু ফেলার অবসর নেই।

একটা বড় কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। বিলেত যাবার সময়ে সুকুমার বাবু নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে এক জাহাজে গিয়ে-ছিলেন। এঁর সমসাময়িকদের ভিতর বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন দিলীপ রায়, কে পি এস মেনন, বি, আর সেন, সুধাংশু দাস, এন আর পিল্লে। জেনারেল নাজীব, কর্ণেল নাসের এঁর ব্যক্তিগত বন্ধু। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ছাড়া ইনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রেরও বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন। সুকুমার বাবু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, চক্রবর্তী রাজা গোপালাচারি, বিধানচন্দ্র রায়ের বিশেষ স্নেহ ও প্রীতি অর্জন করেছেন।

শ্রীযুত সেন টেনিস খেলতে, ঘোড়ায় চড়তে ও ফটো তুলতে ভালবাসেন। সুকুমার বাবু 'মাসিক বসুমতীর' বিশেষ অনুরক্ত পাঠক। মিসেস সেনও। মিসেস সেন জানালেন, বর্তমান সম্পাদক মশাইর চেষ্টায় 'মাসিক বসুমতী' যে নব রূপ ও ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধারণ করেছে, বাংলা সাহিত্য ও বাঙ্গালী সেজন্য গর্ব অনুভব করতে পারে। কন্যা জয়ন্তী 'মাসিক বসুমতীর' একজন বিদুষী লেখিকা।

সাহিত্যিক তারাশঙ্কর

[তারাশঙ্করের 'আরোগ্য নিকেতন' সাহিত্য একাদেমী কর্তৃক শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। সেই উপলক্ষে লিখিত।]

খ্যাতনামা সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি এবার সাহিত্য একাদেমী কর্তৃক বাংলা ভাষায় শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছে। তারাশঙ্করের এই সম্মানে বাংলার সাহিত্যামোদী জনসাধারণ আনন্দিত হবেন।

দীর্ঘ সাহিত্যিক-জীবনে তারাশঙ্কর যে বিপুল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সাহিত্য রচনা করেছেন তা সত্যই বিস্ময়কর! তাঁর সাহিত্য প্রধানত বাংলার বৃহত্তম সমাজে পল্লীগ্রামকে কেন্দ্র করে। আভিজাত্য-দর্পিত ক্ষয়িষ্ণু ব্রাহ্মণ জমিদার-পরিবার, কুঠিয়াল ও লাঠিয়াল, সাধারণ চাষী ও সাঁওতাল-বাউরী, ক্ষেতমজুর-মজুরণী, যাত্রাদলের কবি ও সহজিয়া বাউল, দুর্ভাগ্যের অভিশাপ ও প্রকৃতির উপদ্রব, সামাজিক প্রথার প্রাচীন বন্ধন ও সমাজ-বিরোধী প্রবৃত্তির অদম্য প্রকাশ ইত্যাদি উপাদান নিয়ে গল্প ও উপন্যাস রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। এই অনন্যসাধারণ সাহিত্য-স্রষ্টার জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক।

বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ তারাশঙ্করের জন্ম হয়। লাভপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষা লাভ করেন এবং সেখান থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন।

প্রবেশিকা পাশের পর তারাশঙ্কর কলকাতার সেণ্ট জেভিয়াস কলেজে ভর্ত্তি হন, কিন্তু কলেজের পড়াশোনা তাঁর বেশি দূর এগোতে পারে না। আই-এ পড়বার সময় রাজনৈতিক কারণে তিনি পল্লীগৃহে অন্তরীণ হন। বন্দিদশার অবসানের পর তিনি আবার তৎকালীন সাউথ সুবার্কান কলেজে পড়াশোনা আরম্ভ করেন, কিন্তু খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য কিছু দিন পর তা বন্ধ করে দিতে হয়। শেষ পর্য্যন্ত গ্রামে ফিরে গিয়ে বৈষয়িক কাজকর্ম্মের সংগে দেশ ও দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন তিনি। ১৯৩০ সালের অসহযোগ আন্দোলনে স্থানীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে কারাবরণও করেন তারাশঙ্কর।

ছেলেবেলা থেকেই সাহিত্যের প্রতি তারাশঙ্করের প্রগাঢ় আকর্ষণ ছিল। অবশ্য প্রথম দিকে তা গ্রামের সাহিত্য-সভায় স্বরচিত কবিতা পাঠ বা বিয়ের প্রীতি-উপহার লেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে সাহস বেড়ে গেল, মাসিক পত্রিকায়ও কবিতা পাঠাতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই সব কবিতার একটাও ছাপা হল না। অমনোনীত হয়ে কোনটা হয় তো ফেরৎ এল, কোনটা আবার তাও এল না। অবস্থা এমনি দাঁড়াল যে, প্রায়ই তাঁকে গ্রামের পোষ্টাপিসে যেতে হত শুধু ফেরৎ লেখাগুলো পিওনের কাছ থেকে নিয়ে গায়ের কাপড়ে ঢেকে বাড়ী নিয়ে আসার জন্য।

এই যখন অবস্থা, তখন কবিতা ছেড়ে তারাশঙ্কর এলেন নাট্য-বিভাগে। তাঁদের গ্রামেই সখের থিয়েটার ছিল। 'মারহাটা-তর্পণ' নাম দিয়ে একটি নাটক রচনা করলেন তারাশঙ্কর এবং সেটি সেখানে মহাসমারোহে মঞ্চস্থও হল। গ্রামের নাট্যসভার সভাপতি তার পর সেই নাটক নিয়ে গেলেন কলকাতার তদানীন্তন আর্ট থিয়েটারে। নাটকটি তাঁরা অভিনয়ের জন্য বিবেচনা করবেন এই ছিল তাঁর আশা। কিন্তু থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ অভিনয় করার কথা দূরে থাক, নাটক ও নাট্যকার সম্বন্ধে তাঁর কাছে যে মন্তব্য প্রকাশ করলেন, তা শুনে রাগে দুঃখে তারাশঙ্কর জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করলেন নাটকের পাণ্ডুলিপি! তার পর বেশ কিছু কাল হতাশার মধ্যে কাটালেন।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত নিজের পথ চিনে নিলেন তারাশঙ্কর। তৎকালীন 'কালিকলম' পত্রিকায় এক দিন হঠাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দের গল্প চোখে পড়ল তাঁর। গল্প দু'টি পড়ে তারাশঙ্কর যেন জেগে উঠলেন, হতাশা কাটিয়ে আবার নতুন করে লেখার প্রেরণা পেলেন তিনি। সারা দেশের পুঞ্জীকৃত অজ্ঞান ও অসহায়তার মধ্যে তিনি দেখতে পেলেন কত গল্প—আকাশে-বাতাসে, মাঠে-মাটিতে, হাটে-বাজারে।

তার পর গ্রামেরই এক বৈষ্ণবীকে অবলম্বন করে তারাশঙ্কর তাঁর প্রথম গল্প রচনা করলেন। গল্পের নাম দিলেন 'রসকলি।' 'প্রবাসী' পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন সেই গল্প। তার পর মাসের পর মাস যায়, ক্রমে বছরও ঘুরে গেল। কিন্তু 'প্রবাসী'র কাছ থেকে কোন খবরই আসে না। বছরখানেক বাদে শেষ পর্য্যন্ত পত্রিকার অফিসে খবর নিতে গিয়ে শুনলেন, গল্পটা নাকি এখনও তাঁদের দেখাই হয়ে ওঠে নি, আর কত দিনে যে হবে তাও নাকি ঠিক করে কিছু বলা শক্ত!

ব্যাপার দেখে গল্পটা শেষ পর্য্যন্ত ফেরৎ নিয়ে এলেন তারাশঙ্কর। কিছু দিন এমনি ফেলে রাখবার পর সেটা আবার পাঠালেন অধুনালুপ্ত 'কল্লোল' পত্রিকায়। তার পর, যে গল্প 'প্রবাসী'র সম্পাদক এক বছরের মধ্যে পড়বার সময় করে উঠতে পারেন নি, চার দিনের মধ্যেই 'কল্লোল' থেকে তার মনোনয়ন সংবাদ এসে গেল, আর পরের সংখ্যায়ই 'রসকলি' ছাপা হয়ে গেল 'কল্লোলে'। বাংলা সাহিত্যের আসরে তারাশঙ্করের প্রথম আবির্ভাব ঘটল।

'রসকলি'র পর তারাশঙ্কর লিখলেন 'হারানো সুর' ও 'স্থলপদ্ম'। গল্পগুলি প্রকাশিত হবার পর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হলেন তিনি। তার পর অসহযোগ আন্দোলনে কারাবরণের পরের বছর প্রকাশিত হল তাঁর রাজনৈতিক প্রভাবে প্রভাবান্বিত বিখ্যাত উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণী।'

'চৈতালী ঘূর্ণী'র পর তারাশঙ্করের 'পাষাণপুরী', 'নীলকণ্ঠ' ইত্যাদি উপন্যাসে বাংলার ক্ষয়িষ্ণু পল্লীর দারিদ্র্যলাঞ্ছিত, ব্যাধি-গ্রস্ত জীবনের চিত্র ফুটে উঠল, আর ঘোষিত হল কথা-সাহিত্যে এক নবযুগ সৃষ্টির প্রতিশ্রুতি।

তার পর অল্পকালের ব্যবধানেই তারাশঙ্কর রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা' ও 'কালিন্দী'। কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্ব সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যে এবার দেশের সামন্ততান্ত্রিক সমাজের চিত্র পরিস্ফুট হয়ে উঠল।

বাংলা সাহিত্যের আসরে 'কালিন্দী'র পদক্ষেপের মধ্য দিয়েই তারাশঙ্করের প্রথম ব্যাপক পরিচিতি। কিন্তু 'কালিন্দী' পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। পরবর্ত্তী কালে 'গণদেবতা' ও 'পঞ্চগ্রাম' উপন্যাসে তিনি শুরু করলেন সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়। এক বিরাট জনপদের পটভূমিতে সমাজের প্রায় সর্ব্বস্তরের মানুষের সামগ্রিক জীবনের রূপ উপন্যাসের বিপুল আয়তনে প্রকাশিত হল।

পরবর্ত্তী কালে তারাশঙ্কর যে সব উপন্যাস রচনা করেছেন, তার মধ্যে 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসটির জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শরৎ-স্মৃতি' পুরস্কার লাভ করেছেন এবং 'আরোগ্য নিকেতন' উপন্যাসটি ইতিপূর্ব্বে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার'ও লাভ করেছে।

সাহিত্য একাদেমী 'আরোগ্য নিকেতন'কে শ্রেষ্ঠ উপন্যাস হিসাবে নির্ব্বাচিত করেছেন। এই প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, 'আরোগ্য নিকেতন' তারাশঙ্করের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস কি না, সে-বিষয়ে মতভেদ উঠবার অবকাশ আছে।



তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

[প্রধান অধ্যাপক, প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব ইতিহাস, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা]

আজকাল প্রায়ই ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা ও বিশেষত্ব সম্বন্ধে কথা শুনতে পাওয়া যায়। অনেক বড় বড় ভাবুক ও দেশনেতা আমাদের সভ্যতার গৌরবের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেন। ভারতের বাইরেও অনেক মনীষী এরূপ মত প্রকাশ করে থাকেন। এরূপ কথা যে বলা যাচ্ছে তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি নিয়ে অনেক বছর ধরে অনেক য়ুরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত গবেষণা চালিয়ে গেছেন। বাংলা দেশে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস [illegible] ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি দেশবরেণ্য ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক ও ললিতকলা-বিশারদদের মধ্যে যিনি বিশেষ প্রসিদ্ধ হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় ডক্টর শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত।

উত্তরবঙ্গে দিনাজপুরে ইংরেজী ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই সেপ্টেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদিনিবাস ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়। যে পরিবারে চারুচন্দ্রের জন্ম, পাণ্ডিত্যের জন্য তা' বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রপিতামহ ৺রামলোচন দাশ উনবিংশ শতাব্দীর এক জন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথম বাংলা পদ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও কল্কিপুরাণ রচনা করেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে তাঁর অবদান সমস্ত সাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থে স্বীকৃত হয়েছে। তাঁর পিতৃদেব ভারতবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ প্রেসিডেন্সী কলেজের ভূতত্ত্বের অধ্যাপক ৺হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত ভারতের সর্ব্বপ্রথম ভূতত্ত্ববিদ্। যিনি তাঁর বহু বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করে ও ছাত্রদের অনুপ্রেরণা দিয়ে ভারতে ভূতাত্ত্বিক গবেষণার সূত্রপাত ও প্রচলন করেন। "এরূপ পণ্ডিতবংশে জন্মগ্রহণ করে ও এরূপ পিতার সন্তান হয়ে তিনি যে গবেষণার ক্ষেত্রেই অগ্রসর হবেন, সে বিষয়ে আর আশ্চর্য্য কি?"



শ্রীচারুচন্দ্র দাশগুপ্ত

ডক্টর দাশগুপ্তের ছাত্রজীবন সুরু হয় কলিকাতার ভবানীপুর অঞ্চলের সাউথ সুবার্বণ স্কুলে। বাড়ীতে গবেষণার আবহাওয়ায় মানুষ হ'য়ে অতি শৈশব কাল থেকেই তাঁর ইচ্ছা হত যে, তিনি ভবিষ্যতে এক জন গবেষক হবেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু। প্রায়ই তাঁর পিতা তাঁকে বলতেন, তিনি যেন ভবিষ্যতে রাখালদাসের মতো এক জন ঐতিহাসিক হন। সে জন্য তখন থেকে তাঁর মনে চিন্তা জাগল যে, তিনি কি করে এক জন ঐতিহাসিক হবেন। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হন ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। ইতিহাসে সব চাইতে বেশী নম্বর পাওয়ার জন্য তিনি রৌপ্যপদক পুরস্কার পান। তার পর তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই-এ ও ইতিহাসে অনার্স সহ বি-এ পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃত বিষয় নিয়ে এম, এ ক্লাশে ভর্ত্তি হন। এ সময় তিনি প্রসিদ্ধ অধ্যাপক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের সান্নিধ্যে আসেন। ক্রমে ক্রমে তিনি অধ্যাপক ভাণ্ডারকরের অতি প্রিয় ছাত্ররূপে পরিগণিত হন। এম, এ পড়বার সময়ই তিনি উড়িষ্যার ভঞ্জ রাজবংশগুলি নিয়ে একটি প্রামাণিক প্রবন্ধ লেখেন। এটি পরবর্ত্তী যুগের গবেষকগণ ব্যবহার করেছেন ও উল্লেখ করেছেন। তিনি ১৯৩৩ সালে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিষয়ে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণ-পদকও পুরস্কার পান। তার পর থেকে আরম্ভ হয় তাঁর গবেষণা-জীবন। ১৯৩৩ সালে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ললিতকলার বাগেশ্বরী অধ্যাপক জনাব সহীদ সুরাবর্দ্দীর অধীনে গবেষণা করতে সুরু করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ ও মোয়াট-স্বর্ণ-পদক অর্জ্জন করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি প্রাচীন ভারতীয় পোড়ামাটির মূর্ত্তির উৎপত্তি ক্রমবিকাশ নিয়ে গ্রন্থ রচনার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি, এইচ, ডি, উপাধি লাভ করেন।

গবেষণা-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "১৯৪৪" সালে তাঁকে স্যার রাসবিহারী ঘোষ বৃত্তি দান করেন। এর সাহায্যে তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করেন এবং কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। তিনি কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেণ্ট পলস্ কলেজে প্রবেশ করেন এবং সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপক বিশ্ববিশ্রুতকীর্ত্তি ডক্টর এইচ, বেইলীর নিকট গবেষণা সুরু করেন। ভারতে ও মধ্য এশিয়াতে প্রাচীন মারাঠী লিপির উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেন এবং ১৯৪৬ সালে এই গ্রন্থের জন্য কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পি, এইচ, ডি, উপাধিতে ভূষিত করেন।

কেম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি অনেক বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। তাঁরা সকলে তাঁর পাণ্ডিত্য ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হন। তিনি ওখানকার ছাত্র-সমাজে বিশেষ পরিচিত ছিলেন এবং ভারতীয় মজলিসের সম্পাদক ছিলেন। তিনি

ওখানকার ঠাকুর-সমিতির একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং সেন্ট জনস্ কলেজ থেকে গবেষণার জন্য বৃত্তি পান।

১৯৪২ সালে তিনি রংপুর কারমাইকেল কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। দেশ-বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে কাজ করতে আরম্ভ করেন। এখানে তিনি কয়েক বছর প্রশংসার সঙ্গে কাজ করার পর ১৯৫১ সালে গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে প্রাচীন ভারতীয় ও বিশ্ব-ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকপদে প্রতিষ্ঠিত হন। বর্তমানে তিনি উক্ত পদেই বৃত রয়েছেন।

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণা-ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন। তিনি য়ুরোপ, আমেরিকা ও ভারতের বহু প্রসিদ্ধ গবেষণা পত্রিকাতে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রাচীন ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাস, মুদ্রা, শিলালিপি, প্রত্নলিপিতত্ত্ব, ভাস্কর্য্য, মূর্তিতত্ত্ব, পুঁথি প্রভৃতি বিষয়ে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এদের ভেতরে পোড়ামাটির মূর্তি ও মারাঠী লিপি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি বিশেষ খ্যাত। তিনি দুটি বড় বই লিখেছেন—The Origin and Evolution of Indian Clay-sculpture ও The Development of the Kharos the script শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

এ ছাড়া তিনি ভারতীয় নৃতত্ত্ব সম্বন্ধেও অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। এগুলি সাধারণতঃ ভারতীয় খেলা নিয়ে। বৃটিশ মিউজিয়াম এবং প্যারিসে মুজেগিয়েতে রক্ষিত প্রাচীন ভারতীয় পোড়ামাটির মূর্তি সম্বন্ধে তাঁর দু'টি প্রামাণিক প্রবন্ধ য়ুরোপের শিল্পকলার বিখ্যাত পত্রিকা Artist Asiaতে প্রকাশিত হয়েছে।

গত ১৯৫৫ সালে তিনি চিদম্বরমে অনুষ্ঠিত নিখিল-ভারত প্রাচ্য বিদ্যা মহাসম্মেলনের (All India Oriental Conference) অষ্টাদশ অধিবেশনের ললিতকলা শাখার সভাপতিত্ব করেছেন। এতে তাঁর গবেষণার মূল্য স্বীকৃত হয়েছে।

মানুষ হিসেবেও তিনি বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁর মতো বন্ধুবৎসল, নিরহংকার ও অমায়িক ব্যক্তি আজকালকার দিনে বিরল।

রায় বাহাদুর সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ

১২৮১ সালের ১১শে বৈশাখ বুদ্ধপূর্ণিমা দিবসে বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম শুঁড়ি পুষ্করিণীতে সত্যকিঙ্করের জন্ম হয়। তিনি তাঁহার পিতা প্রাণকৃষ্ণ সাহানার একমাত্র পুত্র। প্রাণকৃষ্ণ ছিলেন ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারী।

সে সময়ে গিরিডি জনবিরল ছিল। বাঙ্গালী খুব কম ছিল। সত্যকিঙ্কর ও তাঁহার সমবয়সী পাঁচ-ছয় জন বাঙ্গালী বালকের শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। দুই-তিন জন বিদ্যোৎসাহী উদার চরিত্র বাঙ্গালীর চেষ্টায় রেল-ষ্টেশনের নিকটে একটি কুঁড়ে ঘরে বাঙ্গালী বালকদের শিক্ষার জন্য একটি পাঠশালা শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহাতে শিক্ষা ভাল হইতেছে দেখিয়া স্থানীয় লোকেরা তাঁহাদের শিক্ষার্থী বালকগণকে তথায় পাঠাইতে থাকেন। ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে থাকিলে যখন স্থান সঙ্কুলান হইল না এবং উহা স্কুল আখ্যা লাভ করিল তখন নিকটবর্ত্তী শ্বেতাম্বরী জৈন মন্দিরের ধর্মশালার চালাগুলিতে বেঞ্চ পাতিয়া স্কুল চলিতে থাকে। সেই সময়ে পাঁচবার স্কুলটি বন্ধ হইয়া যাইলে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যোৎসাহী মহোদয়গণ গিরিডি স্কুলের প্রথম গৃহটি নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাতেই স্কুল বসিতে থাকে। গিরিডি স্কুলের আদি ছাত্রগণের মধ্যে সত্যকিঙ্করই ঐ স্কুল হইতে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে এণ্ট্রান্স পাশ করেন।

তাহার পর তিনি কলিকাতায় জেনারেল এসেম্বিজ কলেজে প্রবেশ করেন। ঐ কলেজ হইতে বি-এ পাশ করিয়া ঐ কলেজে ইংরাজীতে এম-এ এবং রিপণ কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতে থাকেন। যদিও ঐ দুই বিষয়েই তিনি কলেজের পাঠ শেষ করেন এবং পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হন, ঘটনাচক্রে তিনি ঐ দুই পরীক্ষাই দিতে পারেন নাই। গিরিডি স্কুলে পড়িবার সময় ১৩।১৪ বৎসর বয়সের সময় সত্যকিঙ্কর পাঠ্য বহির্ভূত অনেক বাংলা বই পড়িতেন এবং অভিভাবক ও শিক্ষকগণকে লুকাইয়া কিছু কিছু কবিতা লিখিতেন। তাঁহার কবিতা সখা, সাথী, প্রদীপ প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইত এবং গদ্য রচনা সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী ও হিতবাদীতে প্রকাশিত হইত।

১৩১৪ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে সত্যকিঙ্করের মাতৃবিয়োগ হয়। ঐ বৎসরই শীতারম্ভে তাঁহার পিতা ও পিতৃব্য রাজকৃষ্ণ পীড়িত হইলে চিকিৎসার জন্য তাঁহাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাওয়া হয় এবং ডাঃ স্যর নীলরতন সরকার ও স্যর প্যাড্‌লিউকিসের দ্বারা চিকিৎসা করান হয়। বিধিনির্ব্বন্ধে ঐ ১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাসে ত্রিশ ঘণ্টা ব্যবধানে দুই সহোদরের মৃত্যু হয়।

১৩২১-২২ সালে তিনি যখন পিতৃব্য-পুত্রগণের ও নিজের পরিজনবর্গ সহ গিরিডিতে বাস করিতে ছিলেন, সেই সময়ে আত্মীয়রূপী কোন কোন স্বার্থান্বেষীর প্ররোচনায় রাজকৃষ্ণের প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রগণ সত্যকিঙ্করের সহিত পৃথকান্ন হন এবং গিরিডিতে তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন বাড়ীতে বাস করিতে থাকেন।

পূর্ব্বোক্তরূপ তিক্ততার মধ্যে পড়িয়াও সত্যকিঙ্কর সাহিত্য-চর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। উহারই মধ্যে তিনি শুক্র, মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্ব, এবং দুইখানি কবিতা পুস্তক—কলিকা ও যুথিকার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের



সত্যকিঙ্কর সাহানা

গীত

(অপ্রকাশিত)

সুকান্ত ভট্টাচার্য্য

আমরা জেগেছি আমরা লেগেছি কাজে
আমরা কিশোর বীর
আজ বাংলার ঘরে ঘরে আমরা যে
সৈনিক মুক্তির।

সেবা আমাদের হাতের অস্ত্র
দুঃখীকে বিলাই অন্ন-বস্ত্র
দেশের মুক্তি-দূত যে আমরা
স্ফুলিংগ শক্তির।

আমরা আগুন জ্বালাবো মিলনে
পোড়াবো শত্রুদল

আমরা ভেঙেছি চীনে সোভিয়েটে
দাসত্ব-শৃঙ্খল।

আমার সাথীরা প্রতি দেশে দেশে
আজো উদ্যত একই উদ্দেশে—
এখানে শত্রু নিধনে নিয়েছি প্রতিজ্ঞা গম্ভীর।

বাঙলার বুকে কালো মহামারী মেলেছে অন্ধপাখা
আমার মায়ের পঞ্জরে নখ বিঁধেছে রক্তমাখা
তবু আজো দেখি হীন ভেদাভেদ!
আমরা মেলাবো যত বিচ্ছেদ;
আমরা সৃষ্টি করবো পৃথিবী নতুন শতাব্দীর।

সংস্কৃতের অধ্যাপক শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সময় স্বাস্থ্যলাভের জন্য গিরিডিতে গমন করেন এবং সত্যকিঙ্করের সহিত বন্ধুত্বাবদ্ধ হ'ন। তিনি মহাভারতে অনুশীলনতত্ত্বের পাণ্ডুলিপি পাঠ করিয়া উহা মুদ্রনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। তাঁহার কথামত উহা তাঁহারই সহায়তায় মুদ্রিত ও সুধীগণের মধ্যে বিতরিত হয়।

১৩২২—২৩ সালে বাঁকুড়া হইতে রায়না পর্য্যন্ত B. D. R. R. বা বাঁকুড়া দামোদর নদ রেলপথটি নির্ম্মিত হয়। উহা শুঁড়ি পুষ্করিণীর অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে রচিত হওয়ায় বাঁকুড়া হইতে ঐ গ্রাম সুগম হয়। বহুস্মৃতি বিজড়িত পল্লীবাসটি সত্যকিঙ্করের খুবই প্রিয়। তিনি ১৩২৩ সালে বাঁকুড়ার কেন্দুয়াডি মহল্লায় আনন্দকুটীর নামক একটি গৃহ ক্রয় করেন এবং তাহার সংস্কার ও পরিবর্দ্ধন করিয়া ১৩২৪ সালের শ্রাবণ মাস হইতে তাহাতে সপরিবারে বাস করিতেছেন। বাঁকুড়ায় আসার পর কর্ম্মক্ষমতা ও চরিত্রগুণে তিনি বাঁকুড়ার সরকারী ও বে-সরকারী জনগণের প্রীতি আকর্ষণে সক্ষম হ'ন। কয় বৎসরের মধ্যেই তিনি বাঁকুড়া জেলাস্কুলের ও ওয়েসলিয়ান কলেজের governing bodyর সদস্য, মিউনিসিপ্যালিটির vice-chairman, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নিযুক্ত সদস্য, বোর্ড্রাল স্কুলের পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য, Boy Scoutsএর চালক, civic guardsএর captain, জেল পরিদর্শক এবং অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হ'ন। তিনি Co-operative Bank এবং Co-operative Storesএর অংশ ক্রয় করিয়া ঐ দুই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হ'ন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে সত্যকিঙ্কর বিষ্ণুপুর মহকুমা হইতে তদানীন্তন Bengal Legistative Councilএর সদস্য নির্ব্বাচিত হ'ন এবং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ১৯৩৫এর বিধানানুসারে নির্ব্বাচনের জন্য B. L. C. ভাঙিয়া দেওয়া পর্য্যন্ত ছয় বৎসরের অধিক কাল বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য থাকেন। তিনি আইন সভার নীরব সদস্য ছিলেন না। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য কেহ কেহ দর্শকদের টিকিট সংগ্রহ করিয়া দর্শকের আসনে আসিয়া বসিতেন। তিনি স্বতন্ত্রপন্থী এবং নিজেকে rationalist বলিতেন। কাউন্সিলে থাকা কালে তিনি ইংরাজ শাসনের তীব্র সমালোচক ছিলেন। ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে তিনি বৈষ্ণব কবির ভাষায় বলিতেন, "পিত্তলক কাটারী কামে নাহি আওল, উপরহি ঝক্‌মকি সার"।

ঐ ভাবে বহু সামাজিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে থাকিলেও সত্যকিঙ্কর পরিজনবর্গের জীবনমান উন্নয়নের জন্য অর্থার্জনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। বাঁকুড়ায় আসিবার পরে তিনি শ্রীধর রাইস মিল এবং প্রাণকৃষ্ণ রাইস মিল নাম দিয়া দুইটি ধান কল এই সহরে স্থাপন করেন।

কৃষি সম্বন্ধেও সত্যকিঙ্কর উৎসাহশীল ও অনুসন্ধিৎসু। ১৩২৪ সালে তিনি যখন এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিবার জন্য আগমন করেন তখন এখানে বহু পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত মূলা, বেগুন, কুমড়া ও কয় প্রকার শাক ভিন্ন নব নব সবজী উৎপাদনের কোন চেষ্টাই ছিল না। পটল, ফুলকপি, বাঁধাকপি প্রভৃতি বাঁকুড়বাসিগণ যাহা ব্যবহার করিতেন তাহা সমস্তই ভিন্ন স্থান হইতে আমদানী করা হইত। আনন্দকুটীরে কম্পাউণ্ডের ভূমি কঙ্করময় হইলেও বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয়ে কিছু জমি সবজী চাষের উপযোগী করিয়া সত্যকিঙ্কর তাহাতে ফুলকপি, ওলকপি, বাঁধাকপি, শালগম, বীট, গাজর এবং পটোল, ফ্রেঞ্চবীন প্রভৃতির চাষ করিতেন এবং সবজী চাষীদিগকে ডাকিয়া দেখাইতেন ও District Agricultural Association-এ নানা জাতীয় সবজীর বীজ আনাইয়া বিনামূল্যে চাষীগণের মধ্যে বিতরণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় বীজ বিতরিত হইলে চাষীগণের উৎসাহ বর্দ্ধিত হয় এবং তাঁহারা নানা জাতীয় সবজী উৎপন্ন করিতে সচেষ্ট হন।

মাসিক বসুমতীর পক্ষ থেকে সর্ব্বশ্রী বিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, কল্যাণ দাশগুপ্ত, সুখেন্দু দত্ত ও রমেন্দ্র গোস্বামী লিখিত।

সোবিয়েতের দেশে দেশে

মনোজ বসু

মিছিল সারা হতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। সন্ধ্যার খানাপিনা। নানান অঞ্চলে আমরা সব গিয়ে জুটেছি, আর এখানকার তা-বড় তা-বড় মাতব্বরেরা। তাড়িয়েতুড়িয়ে বিরাট এক হলের ভিতর নিয়ে সবাইকে পংক্তি-ভোজনে বসিয়ে দিল। হলটা সবে আগের বছর গেঁথে শেষ করেছে, এদিকে ওদিকে আরও সব দালানকোঠা উঠছে—নাম দিয়েছে সংস্কৃতি-ভবন (House of Culture)। ভোজের আসরে বেশ মতলব খাটিয়ে চারিয়ে বসিয়েছে; এই ধরুন—আমি ভারতীয়, আমার পাশে এক রুশ-পুঙ্গব, তার পাশে কাজাক, তার পাশে ইংরেজ, তার পাশে তাজিক, তার পাশে জার্মান—এমনিধারা চলল। কত চেহারার মানুষ—ভাষা পোসাক আদবকায়দা সমস্ত আলাদা—অথচ একটি ছাতের নিচে টেবিলের এক পাত্রের খাবার এপাশ দিয়ে ওপাশ দিয়ে কেটে নিয়ে দিব্যি মুখবিবরে চালান করছেন। এবং মনে মনে অনুভব করছেন, ভুবন নামক একটুকু ছোট্ট জায়গার বাসিন্দা আমরা সকলে।

এক প্রান্তে যথারীতি ষ্টেজ বানানো। হাতে ও মুখে ভোজ খাচ্ছেন; আর নাচ-গান-বাজনা চলছে, তারও মজা নিচ্ছেন চোখ দিয়ে কান দিয়ে। এক একখানা কসরৎ অন্তে শিল্পী নেমে আসছেন; ঘুরে ঘুরে খানিকটা আলাপ-পরিচয় করে হঠাৎ বসে পড়ছেন কোন এক ভাগ্যবানের পাশে। অপর এক দল ইতিমধ্যে লেগে গিয়েছে ষ্টেজের উপরে। এ-ও ঐ দিনমানের মিছিলের মতো, স্ফূর্তির আর শেষ হতে চায় না। গান দিয়ে শুরু—'আমার দেশের মানুষ'। তিরিশটা মেয়ে এক সঙ্গে গাইছে আর বাজাচ্ছে। মাথায় মুকুট, হাতে তারের যন্ত্র 'রুবাব'।

আলবেনিয়ার লোকনৃত্য। তুলাচাষীদের গান ও নাচ [illegible]ছে তিনটি মেয়ে—ভাল ঘরের মেয়ে, হাবেভাবে মালুম। হাসছে আর দাঁতের সোনা ঝিকমিক করছে। সোনা দিয়ে দাঁত বাঁধানো ফ্যাসান বুঝি এ তল্লাটের!

ইউক্রেনের লোকনৃত্য: নাচের ভিতর মাঝে মাঝে হৈ-হৈ করে উঠছে। একটা গান গুঁজে দিল এর ফাঁকে—'আমার দেশ, আমার মানুষ—হোক না যতই হীন—ভালবাসি, ভালবাসি'। তাজিকিস্তানের এক বুড়া কবি চারণের ঢঙে নিজের এক কবিতা পড়লেন। উঠলেন তারপর উজবেকিস্তানের কবি—তাঁর কবিতা হল 'তুলাচাষীদের প্রতি'। তাজিক নাচ এবারে—সুখের নৃত্য (Dance of Happiness)। নাচছে একটি মাত্র মেয়ে, বাজনা শুধুমাত্র তম্বুরিন। অবিকল ভারতীয় মুদ্রা দেখাচ্ছে হাতের ভঙ্গিতে। কিরঘিজ লোক-সঙ্গীত—বড় বগি থালার সাইজের গোলাকার মুখ নর্তকীর, চোখ আছে কিম্বা নেই, খাঁটি তিব্বতী চেহারা।

ষ্টেজে কিঞ্চিৎ বিরাম দিয়ে শ্রোতাদের ডাক পড়েছে এবারে। দলের নেতা তেজা সিংকে রঙিন আলখেল্লা চৌকো টুপি ও লাল স্কার্টে সাজাল। এবং সর্দারজীর নিজস্ব কাঁচা-পাকা দাড়ি, চুলের বিনুনি ও হাতের লোহা তো আছেই। অপরূপ দেখাচ্ছে। তারিপ করছি সকলে। কিন্তু বিপদ ঘনিয়ে আসছে আমাদের দিকেও, সেটা ঠাহর করিনি। ভারে ভারে নিয়ে আসছে ঐ সব বস্ত্র—সকলকে পরাবে। কেমন, হাসিমস্করা করুন এবার সর্দারজীর সজ্জা নিয়ে! আপাদমস্তক পোশাক পরিয়ে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে দুই গালে দুর্দান্ত দুই চুমু। আওয়াজে ভাববেন, বোমা পড়ল বুঝি মুখে। তাজিকি উৎসবের জাতীয় পোষাক—অতিথিদের আদর করে উপহার দিচ্ছে।

কাজাকিস্তানের এক মস্ত গুণী উঠলেন গান করতে। তাঁকেও ঐ পোশাক পরিয়ে দিয়েছে। লম্বা সাদা দাড়ি; এক হাতে রুবাব। বড় বড় মেডেল-গাঁথা মালা দুলছে গলায়।

নৃত্য নানা রকমের। মেয়েটার হাতে একগাদা চুড়ি—পায়ে ঘুঙুর নেই, হাতের ঐ চুড়ি বাজাচ্ছে নাচতে নাচতে। আর এক রকম নৃত্য হল—কার্পাস বোনা, তুলো তোলা, চরকা কাটা, তাঁত বোনা। তাঁতে বুনে কাপড় বানাল—স্ফূর্তিতে নাচিয়েগুলো পাগল, ওড়াচ্ছে নতুন কাপড়, গায়ে জড়াচ্ছে ওড়নার মতো—কি করবে যেন ভেবে পায় না। নাচের সঙ্গে বাজনা বাজছে—ঠিক আমাদের ঢাকের বাজনা। যশোরের রাজঘাট গ্রামে এমনি ধরনের নাচ পেয়েছিলাম আমরা—তুলোর নাচ নয়, ধানের। ধান.রোয়া, ধান কাটা, ধান ঝাড়া, ধান তোলা এবং ধান ভানা—নবান্নের আমোদ-স্ফূর্তি



তাজিকিস্তানের উপহার-দেওয়া পোশাকে লেখক

তার পরে। সঙ্গে ঢাক বাজে। গৃহস্থ-ঘরের মেয়ে-বউরা সেই নৃত্য করেন; নাচ বলেন না তারা—ব্রত।

থাক তুলনার কথা। রুশীয় গান ধরেছে ঐ তরুণ। তারপরে একটা কাজাক গান—গানের নাম 'বুলবুল'। তানকর্তব ছেড়ে দিয়ে এক-একবার কোকিল ডেকে উঠছে গানের মাঝখানে। তম্বুরা বাজনার খেলা দেখাচ্ছেন এক ব্যক্তি—আমাদের জলতরঙ্গের মতো কতকটা।

পরদিন ঘুরতে বেরিয়েছি। কোলখোজ অর্থাৎ যৌথখামারে যাবো। দুপুরের খানাপিনা সেখানে—তার আগে শহরে একটা চক্কোর দিয়ে নিচ্ছি। কে বলবে, মাত্র পঁচিশটা বছর আগেও নিতান্ত সাদামাঠা জনবিরল গ্রাম ছিল। মাটির কুঁড়ে ঘর—অজস্র নমুনা তার এখনো। পৌনে তিন শ' কিলোমিটার দূরে রেলস্টেশন, রাস্তাঘাট নেই। শহর বানানো ঠিক হয়ে গেল তো উট ঘোড়া গাধা, খচ্চরের পিঠে অত দূর থেকে মালপত্র আসছে। সিমেন্ট সেই তো একটা পুরো ফ্যাক্টরি বসে গেল ঐ বাবদে। এখন সেটা মস্ত বড় ফ্যাক্টরি—তাজিকিস্তানের যাবৎ সিমেন্টের সরবরাহ ওখান থেকে। ইটের ফ্যাক্টরি—ইট পোড়াবার সময় ছিল না গোড়ার দিকে, কাঁচা ইটে একতলা গেঁথেছিল। এখন যে সব বাড়ি ভেঙে দিচ্ছে।

শহরের উত্তর ভাগে আমরা। ডিউশাম্বে দরিয়া—এ-পারে ফাঁকা মাঠ অনেক। সোমবারে সোমবারে হাট বসত। ঘরবাড়ি বানিয়ে মাঠ ক্রমশ ভরতি করে ফেলছে, রাস্তা বের করছে, ট্রলি-বাসের লাইন বসাচ্ছে। শহর অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে। আর দরিয়ার ওপারে, দেখুন, দিগব্যাপ্ত সবুজ ক্ষেত পাহাড়ের কোল অবধি চলে গেছে। বরফে-ঢাকা পাহাড়-চূড়া—ক্ষেতখামার সেই মুখো এগিয়ে চলেছে। রুক্ষ উলঙ্গ অনুর্বর পাহাড়—গাছপালারা দখল করে ফেলছে।



স্ট্যালিন কোলখোজ দেখে বেড়াচ্ছি। ক্যান্টারবেরির ডীন আমাদের সঙ্গে।

আপনাআপনি হচ্ছে না, নানান কায়দায় গাছ বসানো হচ্ছে পাথরের উপর। কত গবেষণা, কত অর্থব্যয়! এক লরী করে মাটি লেগেছে প্রতিটি গাছের গোড়ায়। তা সার্থক হয়েছে সকল চেষ্টা। জল দিয়ে দিয়ে আর গাছ বাঁচাতে হবে না, শিকড়ের জোরে নিজেরাই টানবে। আর কি! ক' বছরের মধ্যে কসাড় বন হয়ে যাবে ওখানে।

ইস্কুল কলেজ হাসপাতাল দেখতে দেখতে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে শহরের ভিতরেই চষা ক্ষেত। টালির ঘর—আমাদের রাণীগঞ্জের টালির মতো অবিকল। ঢেউটিনের ঘর। খোড়োঘর—মটকার উপর মাটি লেপা। এই সব ভেঙে ফেলে বড় বড় ইমারত বানানো হচ্ছে। গরিব লোকও দেখছি পথে,—মাথায় ময়লা টুপি, ময়লা চেহারা, গাধার পিঠে যাচ্ছে। টেক্সটাইল কর্মিকদের বসতিস্থান হবে এই তল্লাটে,—তার ছবির নক্সা দেখাল। বড় বড় রাস্তা বেরুবে। বিরাট কর্মকাণ্ড—ছোটখাট পরিকল্পনায় সুখ পায় না এরা যেন। তাজিক বিপ্লবীদের মনুমেন্ট—এ জায়গা থেকে সরিয়ে বড় পার্কে স্থাপনা হবে; সৌধ হবে সেই মনুমেন্ট ঘিরে।

নতুন পুলের উপর দিয়ে নদী পার হলাম। আগে এ পুল ছিল না, বিস্তর ঝামেলা পারাপারে। সেকালের সেই সব ছবি দেখাল। পার হয়ে গিয়ে ক্রমশ উঁচুতে উঠছি। অরণ্য শুরু হয়ে গেল। ঐ যা বললাম—কষ্ট করে আর্জানো এই সব গাছ। ছোট ছোট গাছ—এখনো বড় হয়ে ওঠেনি তেমন।

মোড় ঘুরে গাড়িগুলো সারবন্দি দাঁড়িয়ে গেল হঠাৎ। খানিকটা নেমে গিয়ে লেক। লেনিনের বিশাল মূর্তি সামনে। স্ট্যালিনের মূর্তিও অদূরে। খাড়া উঁচু পাড় ধরে উঠে জলের ধারে গেলাম। কোল-খোজের জোয়ান পুরুষরা স্বেচ্ছায় কোদালি মেরে এই লেক বানিয়েছে। তখন যন্ত্রপাতির বেশি যোগাড় ছিল না—যা কিছু ছিল, খাটছিল অন্যান্য জরুরি কাজে। গাছে সাজানো চারিধার। নদী থেকে জল নিয়ে এসে লেক ভরতি করে। সাঁতারের চমৎকার ব্যবস্থা। সাঁতারু জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে—ঘাটের উপরে সেই মূর্তি। পাশে পাশে খাল চলেছে—কলকল করে লেকের বাড়তি জল উপচে পড়ছে খালে। উঁচু পাড়ের উপর দিয়ে দেখছি, একদিকে ধু-ধু করছে পতিত জমি। অঞ্চল জুড়ে সর্বত্র পতিত ছিল নাকি এমনি। অনেক দূরে নদী-কূলে সুপ্রাচীন এক গ্রামের চেহারা দেখা যাচ্ছে।

লেক ছেড়ে নদীর দিকে এলাম। কূলে কূলে চলেছি। কোলখোজ—যৌথখামারের এলাকা। দশে মিলে কী কাণ্ড করা যায় দেখুন একবার নয়ন মেলে। সরকারি প্রতিষ্ঠান নয়—চাষীদের নিজেদের ব্যাপার পুরোপুরি, সরকার পিছনে আছেন এই পর্যন্ত। জমি সরকারের—সেই বাবদ খাজনার চুক্তি আছে। যা ফসল উঠবে তার শতকরা তিন ভাগ। বেশি ফসল হলে বেশি দেবেন, কম হলে কম, না হলে শুন্তি।

স্ট্যালিনের নামে খামার—স্ট্যালিন কালেকটিভ ফারমস্। পাথুরে পাকা রাস্তা দিয়ে মোটরে যাচ্ছি—ভুল হয়ে যায়, জাহাজে চেপে যাচ্ছি যেন সবুজ রঙের সমুদ্রের উপর দিয়ে। যেদিকে তাকাই, কূল দেখি না। সেই সবুজে ঢেউ দিয়েছে সমুদ্র-তরঙ্গের মতো। গাড়ি থামাতে বলি, নেমে একটুখানি দাঁড়াবো। ঢেউঠাকরুন ঝাঁপি

একেবারে উপুড় করে ফেলেছেন—চারিদিকের সীমাহীন এই শস্যপ্রান্তর দু'চোখ ভরে একবার দেখে নেবো।

আগে ছিল পতিত জলা জায়গা। আর ঊষর পাহাড়। এখন দেখুন সমতল অঞ্চল ছাড়িয়ে পাহাড়ের উপরেও থরে থরে সবুজ লেপে রয়েছে। সবুজও নয়, এমন তেজের ফসল যে রং কালো হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯২৯-এর আগে, যেমন হামেশাই দেখে থাকেন, টুকরো টুকরো জমি চাষীদের—আ'ল-ঠেলাঠেলি, সীমানা-সরহদ্দ নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা মামলামোকদ্দমা, ফসল গিয়ে ওঠে জমিদার-মহাজনের গোলায়, চাষীর সম্বল চোখের পানি।

১৯২৯ অব্দে যৌথখামার হল। হাঃ, খামার না আরো কিছু—গুচ্ছের মানুষের গুলতানি। বারোয়ারি কাজে গতর খাটায় নাকি কেউ? বাজবুদ্ধির সেই দুধপুকুর! প্রজাদের 'পরে হুকুম হয়েছে—এক ঘটি করে দুধ ঢেলে যাবে পুকুরে। সবাই ভাবছে আর সকলে দুধ দেবে—আমি এক ঘটি জল ঢেলে যাই চুপিচুপি। শেষটা দেখা গেল, জলের পুকুর—একটি ফোঁটাও দুধ পড়েনি। এ-ও হবে তাই। কেউ খাটবে না। এতদিন তবু আধপেটা চলছিল, পুরোপুরি উপোস এবার থেকে।

অনেক চেষ্টাচরিত্রের ফলে গোড়ায় মেম্বার হল ১২৫ ঘর। আজকে কত আন্দাজ করুন দিকি? সেই সওয়া শ' এখন ২৮০০ পরিবারে দাঁড়িয়েছে। কোলখোজের আওতায় মানুষের সংখ্যা এখন ১১৫৪৭; বাচ্চা-বুড়ো ও অসমর্থ বাদ দিয়ে পুরোপুরি কাজের মানুষ ৭৮৪৭ জন। গোড়ায় জমি ছিল পৌনে দু'শ হেক্টারের মতন (হেক্টার = সাত বিঘের কিছু বেশি)। এখন ৫২১৪ হেক্টার জমিতে চাষ চলছে। আরও দশ হাজার হেক্টার দাগ দিয়ে রেখেছে, ভাল সেচের বন্দোবস্ত হয়ে ওঠেনি, বছর দুই-তিনের মধ্যে হয়ে যাবে—হলেই চাষে লেগে যায়। তুলা ডালকলাই ও আঙুর হবে বেশির ভাগ জমিতে। আপাতত কিছু তরমুজ হচ্ছে। আর ঘাস—গোচারণের কাজে লাগছে। গরুর সংখ্যা ২৬৩৩; তার মধ্যে ৭০১ গরু দুধ দেয়। ৯০০ ঘোড়া; ১৭২৩৩ ভেড়া; দু-হাজারের বেশি ছাগল।

ট্রাক্টরের চাষ; পাহাড়ের ঢালু জায়গায় ট্রাক্টর চলে না বলে সেই তল্লাটে লাঙল। ১৯৫২ অব্দে আয় হয়েছিল ৫৪ মিলিয়ান রুবল। ১৯৫৩ অব্দে নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আয় কমে গিয়ে দাঁড়াল ৪৩ মিলিয়ান। এ বছরের প্রত্যাশা ৬০ মিলিয়ান অন্তত। আয়ের ষাট শতক চাষীদের মজুরি বাবদ যায়। বাকি চল্লিশের মধ্যে সরকারি খাজনা তিন শতক, সরকারি মেশিন বাবদ সাত শতক, ইনস্যুরেন্স ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মের খরচ; এবং বাদ বাকি অবিভাজ্য ভাণ্ডার—খাল কাটা ঘরবাড়ি তৈরি জমির উন্নয়ন ইত্যাদির জন্য। রোগ-চিকিৎসা ও ছেলেপুলের পড়াশুনোর ব্যবস্থা সরকারের—কোলখোজের কোন দায় নেই এই ব্যাপারে।

কাজের ইউনিট ভাগ করা। যে যত ইউনিট খাটবে তার তেমনি মজুরি। প্রতি ইউনিটের মজুরি মোটামুটি বাইশ রুবল। হিসাবে পাওয়া যাচ্ছে, জন হিসাবে বছরে ৩৭০ ইউনিটের মতো কাজ হয় (সর্বনিম্ন তিন শ' ইউনিট, সর্বোচ্চ সাত শ'; সাত শ' ইউনিট কাজের লোক খুবই কম)। মজুরি কতক নগদ পয়সায়, কতক ফসলে। দুধ-মাখন এমনি দেবে না, দরকার মতো কিনে নেবে; কোলখোজ এগুলো মেম্বারদের কাছে বিনা মুনাফায় বিক্রি করে।

এক সঙ্গে ফসল ফলায়; তবু একটুকু নিজস্ব জমির উপর চাষীর বড় লোভ। তাই বুঝে এক ফালি করে জমি দিয়েছে বাড়ির লাগোয়া। সামান্য জায়গা, সওয়া বিঘের মতো—গায়ে খেটে চাষীরা সেখানে খুশি মতন তরিতরকারি আবাদ করে। একেবারে নিজস্ব বস্তু, বাড়তি হলে বিক্রি করতে পারে। তা ছাড়া প্রতি পরিবারে একটা দুটো গাই গরু ও কিছু ভেড়া-মুরগি পোষবার বিধি আছে।

একটা হাই-ইস্কুল ও বাইশটা প্রাথমিক ইস্কুল এই কোলখোজের এলাকায়। পড়ে ২১৭৭ মেয়ে আর ১৭০৮ ছেলে। মেয়ের সংখ্যা বেশি। গোটা সোবিয়েত দেশ জুড়ে এই কাণ্ড। লড়াইয়ে ছেলেরা হাজারে হাজারে মরেছে; জন্মাচ্ছেও কম। এ ছাড়া ১৪৭টি ছেলে-মেয়ে কলেজ ও নানান কারিগরি ইস্কুলে পড়ে। কোলখোজের বাইরে দেশের নানা অঞ্চলে থেকে তারা পড়ে, মস্কোতেও থাকে। পড়াশুনো মাতৃভাষা তাজিকে। রুশ ভাষাটা শেখে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে।

বারোটা দোকান কেনাকাটার জন্য। দুটো চিকিৎসাশা'লা, সাতটা টেলিফোন-কেন্দ্র। সাতটা বেতার-কেন্দ্র; কোলখোজের যাবতীয় খবরাখবর সকলের কাছে পৌঁছে দেয় বেতারযোগে। সরকারি বেতারও রীলে করে শোনায়। ইলেকট্রিসিটি সর্বত্র; কোলখোজ সরকার থেকে জলবিদ্যুৎ কিনে সরবরাহ করে। ২৭টা ট্রাক আর ৬টা মোটরকার কোলখোজের; মেম্বারদের কার, মোটর-সাইকেল ও বাইসাইকেল আলাদা। কৃষকবীর অর্থাৎ চাষের কাজে যাঁরা সর্বোচ্চ সম্মান পেয়েছেন, তাঁদের সংখ্যা বাইশ। এ ছাড়া ৩৭৬ জন নানান ছোটখাট সম্মান পেয়েছেন। একজন সুপ্রীম সোবিয়েতের মেম্বার; ৬৪ জন স্থানীয় সোবিয়েতের মেম্বার। নিরক্ষর শতকরা ১৩ জন—কারা বুঝতে পারলেন? যে সব বাচ্চার ইস্কুলে যাবার বয়স হয়নি; আর বুড়োথুথ্‌ড়ে কয়েক জন—লেখাপড়ার ঝামেলায় নেওয়া গেল না যাঁদের। একটা মসজিদ আছে ষ্টালিনাবাদের কোল ঘেঁসে—



ষ্টালিনাবাদের কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলে

শুক্রবার বুড়োরা জমায়েত'হয়ে নমাজ পড়েন। অন্যান্য দিন বাড়িতে পড়েন। সবাই মুসলমান এখানে—খৃষ্টান নেই, গির্জাও নেই সেজন্য।

খুচরো চাষী নেই আর এদিকে—কোন-না-কোন যৌথখামারে ভিড়ে পড়েছে। ভবিষ্যতের কাজ হল, ছোট ছোট কোলখোজ জুড়ে গেঁথে একত্র করা। তাতে কাজের সুবিধে, উৎপাদনও বাড়বে। কেউ জায়গা বদল করল কিম্বা কোন মেয়ে বিয়ে করল—সে অবস্থায় তার কোলখোজও বদল হয়ে যায়। ছোটখাট মেশিন কোলখোজ কিনে ফেলে। যেমন এই ষ্ট্যালিন কোলখোজ তুলো তোলার কল কিনেছে সাতাশটা। ভারী ভারী মেশিন প্রায়ই কেনে না। সরকারি ডিপো আছে, সেখান থেকে ভাড়া নিয়ে কাজ চালায়। কম খরচ তাতে। সরকারেরও সুবিধা—এক মেশিন এখানে পাঁচ দিন ওখানে দশ দিন ভাড়া খাটিয়ে বারো মাস চালু রাখতে পারে।

কোলখোজের হর্তাকর্তা হলেন বোর্ড। মেম্বাররা বোর্ড নির্বাচন করে। বোর্ডের মীমাংসা মনঃপূত না হলে সাধারণ সভা ডাকা যায়। তাতেও সুবিধা না হলে স্থানীয় সোবিয়েত আছে। ষ্ট্যালিন-কোলখোজ বোর্ডের চেয়ারম্যান মাইনে পান চার শ' রুবল এবং এক শ' কুড়ি ইউনিট। ডেপুটি চেয়ারম্যানের মাইনে শতকরা দশ ভাগ কম চেয়ারম্যানের চেয়ে।

আহারাদির আগে অতি-দ্রুত একটা চক্কোর মেরে নিচ্ছি। একজিবিসন হল—যাবতীয় উৎপন্ন-দ্রব্য সাজানো, দেয়ালে কৃষক-বীরদের ছবি, বিবিধ নক্সা ও সংখ্যাতত্ত্ব। কনসার্ট হল—জৌলুষে ঝিকমিক করছে, উঁচু বেদি একদিকে, নানাবিধ বাজনার সরঞ্জাম, দেয়াল-ভরা দেয়ালচিত্র ও সোবিয়েত-নেতাদের ছবি। দোতলা ছোট্ট এক বাড়িতে লাইব্রেরি—উঁকিঝুঁকি দিয়ে দেখছি। সদরউদ্দিন আইনি তাজিকিস্তানের সব চেয়ে বড় লেখক—ছবিটাও তেমনি বড়। চেকভের ছবিও প্রকাণ্ড। আর ছবি আছে ফেরদৌসি, ওমর খৈয়াম, রুদকি, গর্কি, পুশকিন ইত্যাদি অনেকের। লাইব্রেরিয়ানের মাইনে দৈনিক এক ইউনিট হিসাবে। লাইব্রেরি-বাড়ির পাশে টেনিস-লন। মাঠের ভিতরে পাকা মেজের খুব লম্বা ঘরে ঘোড়ার আস্তাবল, গরুর গোয়াল। সাড়ে তিন হাজার রুবল এক একটা গরুর দাম—এমন সব গরু,'না বলে হাতিও বলতে পারেন। শাক আলুর মতো এক রকম জিনিষ মেশিনে কুচি কুচি করে জলে ভিজিয়ে খোসা তুলে ফেলছে। গরুর খাবার। তুলো শুকোতে দিয়েছে খোলা মাঠে। গাধা বাঁধা রয়েছে ওদিকে কয়েকটা।

পথের পাশে একটা মেডিকেল ইউনিট। ঢুকে পড়লাম। জন দুই-তিন নার্স মিলে চালায়—ডাক্তার আসেন সপ্তাহে তিন বার। নার্সের মাইনে ৭৭৫ রুবল।···খর রৌদ্র, সূর্য ঠিক মাথার উপরে। আর নয়, আর দেরি চলবে না—বিষম ডাকাডাকি লাগিয়েছে: টেবিল সাজিয়ে বসে আছে, খেতে আসুন।

নেমন্তন্নে বসেছি। তন্দুরায় সেঁকা বড় বড় টার্কি। কশাইর দোকানে ছাল-ছাড়ানো ছাগল দেখেন, তেমনি বস্তু পাত্রে পাত্রে সাজানো। ছুরি দিয়ে একটু-আধটু কেটে নিয়ে আমরা গালে ফেলছি। ঘুরে ঘুরে ওরা তদ্বির-তদারক করছিল—হাসতে লাগল হিহি করে। অর্থাৎ, কাণ্ড দেখ হে আনাড়িগুলোর! সবই কোলখোজের—বাইরের কিছু নয়। আমাদের সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হয়ে শেষটা মিজরাই লেগে পড়ল। সে কি ব্যাপার, না দেখলে প্রত্যয় পাবেন না। আমরা তো এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চির টুকরো কেটে কেটে নিচ্ছিলাম, ঐ মশায়েরা ঠ্যাং ধরে আস্ত এক টার্কি মুখে তুলে কড়মড় করে হাড় চিবোচ্ছেন। স্তূপাকার আয়োজন লহমার মধ্যে যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ এর মধ্যে গান ধরে বসল একজন। মানে বুঝিয়ে দিল, দেশপ্রেমের সঙ্গীত। কিন্তু আড়াল থেকে শুনলে মনে করতেন, ভর্ৎসনা করছে কে বুঝি কাকে। প্লেগ-বসন্তর মতো গানও সংক্রামক, দেখতে দেখতে সবগুলিকে গানে পেয়ে বসল। শেষটা শুধু গানে আর সামাল মানে না—নাচ। যেমন দৈত্যাকার চেহারা, নাচও ঠিক সেই ধাঁচের। রক্ষা এই, একতলার ঘর—পদদাপে ছাত ভেঙে পড়বার শঙ্কা নেই, বড় জোর মেজে বসে যেতে পারে দু-এক হাত। ক'টি মেয়ে পরিবেশন করছেন, বেটাছেলেদের এই হুল্লোড় কাণ্ড দেখছেন তাঁরা। লুব্ধ চোখে দেখছেন তাকিয়ে তাকিয়ে। থমকে দাঁড়াচ্ছেন কখনো বা আধ মিনিট, আবার পরিবেশন করছেন। তার পরে, ও হরি, পাত্রের বস্তু এর-ওর পাতে ঢেলে দিয়ে ঐ চামচে মাথার উপরে ধরেই নাচ শুরু করে দিলেন। উঃ, এমন কাণ্ড হতে পারে দুনিয়ার উপর! খাওয়া আর স্ফূর্তি—বাধাবন্ধন নেই। ঘরের প্রতিটি লোক ঠাট্টা-রসিকতা করছে। সকলের অলক্ষ্যে নিশ্বাস চেপে নিই আমি একটা। গ্রাম্য চাষীর এত খাওয়া, প্রাণখোলা এমন আনন্দ! ছোটবেলা থেকে চাষীর গাঁয়ে বড় হয়েছি—কেউ দাদা কেউ চাচা। বিশাল পামিরের পরপার থেকে আজকে রমজান মোল্লা নৈমদ্দি সরদার নকুল দাস—কত জনের কথা মনে আসছে। এমনি আহার আর আনন্দ চাই তো সকলের জন্য!

খাওয়ার পর মুখশুদ্ধির জন্য বড় সাইজের একটা করে ডালিম দিল। দাঁড়াতে দেয় না, পাড়ায় নিয়ে বের করল। হাই ইস্কুল। হেডমাষ্টার ও অনেক হোমরাচোমরা রাস্তা অবধি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন। দশ বছরের কোর্স—পঞ্চম বর্ষ থেকে উঁচু ক্লাস, তখন ইংরেজি ফরাসি ইত্যাদি কোন একটা বাইরের ভাষা শিখতে হয়। গোড়ায় মাতৃভাষা তাজিকি, দ্বিতীয় বর্ষ থেকে অল্প স্বল্প রুশ ভাষার পাঠ। ৪২৩ জন ছাত্র এই ইস্কুলটায়; তার মধ্যে ৫৬১ জন মেয়ে। ১৪ জন শিক্ষক—দুই জন তাজিকি পড়ান, আর দু'জন রুশীয়। ক্লাস চলে বেলা ন'টা থেকে দু'টা, আবার আড়াইটা থেকে সাতটা। মাষ্টার মশায়দের মাইনে হাজার থেকে ষোল শ' রুবল; খাটনি পাঁচ থেকে ছয় ঘণ্টা। ছাত্রদের বয়স সাত থেকে সতের। লেনিনের ছবি মাষ্টার মশায়দের বসবার ঘরে। হেড মাষ্টার লাল কামিজের উপর বুকখোলা কোট চাপিয়েছেন। ছটফটে মানুষটি—ক্লাস দেখাতে সঙ্গে করে নিয়ে চললেন।

আমরা ক'জন দ্বিতীয় মানের বাচ্চাদের ঘরে ঢুকে পড়েছি। মোট বাইশটি—ছেলে মাত্র পাঁচটি। একটির গায়ে ছেঁড়া জামা। ক্লাসে পড়াচ্ছেন একটি মেয়ে। পড়ানো আর কি—ছবি আঁকছেন হরেক রকম, ছবি নিয়ে বাচ্চাদের প্রশ্ন করছেন। কেমিষ্ট্রি, ফিজিক্স আর বায়োলজির ল্যাবরেটারি। বাপরে বাপ! এই তো এক ইস্কুল, কিন্তু যন্ত্রপাতির কী সমারোহ! তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। [ক্রমশঃ।

রাজায় রাজায়

উদয়ভানু

চোখে আর পাতায় এক হয় না রাজকুমারীর।

তন্দ্রা আসে, দেহ অবশ হয়, কিন্তু আঁখিপাতে ঘুম নামে না। শয্যায় আশ্রয়, তবুও অধিকক্ষণ স্থির থাকতে পারেন না। কত-শত দুশ্চিন্তায় মন চঞ্চল হয় থেকে থেকে। ভয়-ভাবনায় বুকে কম্পন লাগে। চোখের দৃষ্টি চলে না ঘন অন্ধকারে, যার চোখ আছে তাকেও অন্ধ সাজতে হয়। কক্ষমধ্যে যেন সীমাহীন আঁধারের বিস্তার। রাজকুমারীর যুগল চোখের ব্যর্থ দৃষ্টিতে কিছুই ধরা পড়ে না। ভয়ের শ্বাস পড়ে ঘন ঘন। দুঃখের এই তিমির রাত কখন পোহাবে কে জানে! আনন্দকুমারীর জন্য থেকে থেকে মনটা যেন আনচান করতে থাকে। মেয়েকে হারিয়ে চৌধুরীমশাই কি করবেন কেউ বলতে পারে না। একমাত্র মেয়ে, চোখের মণি, আদরের দুলালী। চৌধুরী হয়তো বুকে শেলের আঘাত পাবেন। সহ্য করতে পারবেন না। তন্দ্রার আবেশ আর দুর্ভাবনায় বিন্ধ্যবাসিনী জড়সড় হয়ে থাকেন। রাজকুমারী যেন চমকে উঠলেন সহসা, এক মুক্ত বাতায়নে চোখ পড়তেই। দেখলেন আলোর আভাষ। বাইরে কার চোখ এমন জ্বল-জ্বল করছে আগুনের ফুলকির মত! জ্বলন্ত অঙ্গারের টুকরো যেন, দানবের চোখের মত! মান্দারণের শ্মশানভূমি থেকে হয়তো পালিয়ে এসেছে কোন্ অতৃপ্ত প্রেতাত্মা! মানুষের ঘরে ঘরে হানা দিয়ে ফিরছে শান্তির আশায় আশায়। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন বিন্ধ্যবাসিনী। রুদ্ধশ্বাসে দেখেন। যেন মূর্তিমান মৃত্যুকে দেখেন। মুখে কথা নেই, কণ্ঠ যেন শুকিয়ে গেছে। কি করবেন রাজকন্যা? ডাক ছেড়ে কাঁদবেন? কিন্তু কথা ফুটলো না মুখে।

চোখ কর-কর করে। চোখের পাতা জলে ভারী হয়ে থাকে। মনের কষ্ট আর বুকের ব্যথায় পৃথিবীর প্রাকৃতিক অস্তিত্বকে যেন ভুলে গেছেন আজকের রাতে। তারায় দীপ্ত একফালি আকাশ দেখে ভয়ে যেন আড়ষ্ট। সপ্তর্ষিদের দু'জনকে দৃষ্টিপথে দেখা যায়, আকাশের বুকে যেন একজোড়া ধুকধুকি জ্বলছে। একজোড়া চোখ, ভ্রম হয় রাজকন্যার। ডুকরে ওঠেন একেক বার। আঁধার ঘরে একা-একা চোখের জল ফেলেন। কাঁদতে কাঁদতে ঘুম আসে কি? চৌধুরীকন্যার পোড়া কপালের কথা ভাবতে ভাবতে বিন্ধ্যবাসিনীর ঘুম-ঘুম চোখে স্বপ্ন ভেসে ওঠে—

দিন ফুরোতে ফুরোতে, রাত কাটতে কাটতে একদিন আনন্দকুমারীকে তার অজানা পাপের শাস্তি ভোগ করতে হয়। সব কিছু হারিয়ে খুইয়ে আনন্দকুমারী পথের ভিখারিণী হয়েছে। ম্লেচ্ছ সাহেব, ভোগের পর ত্যাগ ক'রে হয়তো উধাও হয়। তখন মেয়ের কেশে তেল নেই, পেটের ভাত মেলে না, পরনের বাস কে দেয় তার ঠিক নেই। অপ্সরীর মত রূপ বেণের মেয়ের, ঝ'লে গেছে অত্যাচারে। গায়ের রঙ কালিয়ে গেছে। ডাগর দেহ কাহিল হয়েছে। গাছের ফল ছাড়া খাওয়া নেই, সরোবরের জল ছাড়া পানীয় নেই, পথের তৃণ ছাড়া শয্যা নেই। সাজা ভোগ করছে আনন্দকুমারী। পরনে ছিন্ন কাঁথা। আনন্দকুমারী এ দুয়ারে যায়, শোনে—'দূর দূর!' ও দুয়ারে যায়, শোনে—'ছেই ছেই!'

পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে চৌধুরীর মেয়ে একদিন নদীর কিনারে যায়। কেঁদে কেঁদে আকাশ ফাটায়। নদীতীর জনশূন্য, কেউ কর্ণপাত করে না সেই আকুল কান্নায়। বুকে আর কপালে চাপড় দেয় আনন্দকুমারী। দুঃখ আর শোকে উন্মাদিনীর মত সকল জ্বালা জুড়াতে শেষে না নদীর জলে ঝাঁপ দেয়! তখন তার দুঃখে পিঁপড়াটিও কাঁদে না, কুটাটুকুও নড়ে না। কুম্ভীর আর হাঙরের করাল দংশনে আনন্দকুমারীর কোমলকায়া খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যায় নদীর অতল গর্ভে।

আর যেন ভাবতে পারছেন না রাজকন্যা। শয্যায় উঠে বসলেন চোখে আঁচল চেপে। কেমন ভয়-ভয় করে কালো অন্ধকারকে। মনে মনে রামনামের মন্ত্র জপ করেন। অন্ধকারের অদৃশ্য বাহুর আলিঙ্গন অনুভব করেন যেন। ইতি-উতি দেখেন, শুধু আঁধার আর আঁধার। আলোর চিহ্ন নেই কোথাও। মুক্ত বাতায়ন থেকে শুধু অনেক দূরের আকাশ দেখা যায়। দানবের চোখের মত তারা জ্বলছে দপ দপ। যেন ডাকছে চোখের ইসারায়।

পরিচারিকা বাইরের দালান থেকে হঠাৎ কথা বললে চাপা কণ্ঠে। বললে,—বৌ, তুমি জেগে আছো নাকি? ঘুমাও নাই এখনও?

বিন্ধ্যবাসিনী যেন আশার আলো দেখলেন চোখে। মিহি সুরে বললেন,—না গো না। ঘুম কি আর আছে এ পোড়াচোখে! রাতটা জেগেই কেটে যাবে হয়তো। খানিক থেমে আবার বললেন,—চন্দ্রকান্ত থাকলেন না চলে গেলেন এই গভীর রাতে?

—থাকলেন গো থাকলেন। যশোদা কথা বললে ঘুম-জড়ানো সুরে। বললে,—নীচের তলায় মাঝের ঘরে আছেন তিনি। বলছেন যে, সূর্য্য উঠলেই চ'লে যাবেন।

—অনাহারে থাকলেন? রাজকন্যার স্তিমিত কণ্ঠ।

যশোদা হয়তো ঘুমে কাতর। একটু যেন বিরক্ত হয়। বলে,—আমি ফল মিষ্টি দিয়ে এসেছি। খায় খাবে, না খায় না খাবে।

স্বস্তির শ্বাস ফেললেন রাজকুমারী। আকাশের তারা দেখতে থাকলেন। পরিচারিকার কথা শুনে যেন তাঁকে জয় করলেন এতক্ষণে।

কেউ ডাকছে কোথায়, অনেক দূরে। বাঘ বেরিয়েছে হয়তো জঙ্গলের ঝোপ থেকে। মান্দারণের আকাশ কেঁপে কেঁপে উঠছে বন্যপশুর আর্ত চীৎকারে। খোলা জানালা থেকে সেই বিকট শব্দ ভেসে আসছে হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

—আনন্দকুমারীর জন্যে বড্ড কষ্ট হচ্ছে যশো! সে এখন কোথায় কে জানে!

ঘরের মধ্যে থেকে কথা শোনা যায় অস্ফুট শব্দে। সহানুভূতির কাতর স্বরে।

ঘুম আসে আর বাধা পড়ে। তন্দ্রা ছুটে যায়। যশোদা নীরব থাকতে থাকতে বললে,—কোথায় আবার! ম্লেচ্ছ অজাত কুজাতের আদর খা:চ্ছ এখন। সায়েবের বিবি হয়েছে। শাড়ী ছেড়ে ঘাগরা পরেছে হয়তো। কত অখাদ্য-কুখাদ্য খাচ্ছে কে জানে!

—চৌধুরীমশাইয়ের তরেই যত ভাবনা!

আপন মনে কথা বলেন বিন্ধ্যবাসিনী। কেমন যেন চিন্তাকুল সুরে। বললেন,—চৌধুরীমশাই হয়তো আর বাঁচবেন না। গণ্ডায় গণ্ডায় ব্যাটা-বেটী তো তাঁর নেই, ঐ একজনই ছিল। তাকেও হারালেন এই শেষ বয়েসে।

—যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল পেয়েছে চৌধুরীর মেয়ে। যশোদা বললে রাগের সুরে। ঘুমের জড়তা যেন কথায়। পাশ ফিরে শুয়ে আবার বললে,—মেয়ে তো মেয়ে নয়, সদাই যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে আছে। মেয়ে-মর্দ্দানী, ঢেউ-নাচানী—

রাজকন্যা আর কথা বলেন না। ধীরে ধীরে শয্যায় এলিয়ে পড়েন। ঘুম আসে না; চোখে-পাতায় এক হয় না। নীচের তলার মাঝের ঘরে চন্দ্রকান্ত আছেন আজ রাতটুকুর মত, ভাবলেও শিহরণ লাগে যেন! এক অব্যক্ত আনন্দের ব্যথা বাজে যেন বুকে। রক্তের ধারায় সুখের নাচন লাগে। কত দিনের সুপ্ত অনুভূতি জেগে ওঠে আজ, রাতের অন্ধকারে। কষ্টে অর্জ্জিত কাহিল দেহটা যেন বিদ্রোহ করে সহসা। আগুনের জ্বালা ধরে। বুক দুরু দুরু করে। মাথা ঝিম-ঝিম করে।

বাঁধ-বাঁধা নদী, বানের জলে ফুঁসতে থাকে! বর্ষাজলে উপচে ওঠে। বিন্ধ্যবাসিনীর ইচ্ছা হয়, এখনই গিয়ে একটি বার দেখে আসেন, দেখা দিয়ে আসেন। চন্দ্রকান্ত ঘুমন্ত না জাগ্রত কে জানে! আসমানে গিয়ে ক'টা ডুব দিয়ে এলে হয়তো দৈহিক শান্তি পাওয়া যাবে।

জমিদার কৃষ্ণরামকে মনে পড়ে রাজকন্যার। কঠিন প্রকৃতির মানুষ তিনি, দয়া-মায়ার ধার ধারেন না। অর্থলোলুপ, টাকা ছাড়া আর কিছুকে চেনেন না। বিন্ধ্যবাসিনীর মত ডাকসাইটে রূপসীকে সমাদর করলেন না কখনও! দূরে সরিয়ে রাখলেন অবহেলায়। আরও দশ জনকে নিয়ে মেতে থাকলেন!

অবাধ্য মন। কি সব এলোমেলো দুশ্চিন্তায় মন অস্থির হয় বারে বারে। রাজকুমারী ধিক্কার দেন নিজেকে। হরিনাম স্মরণ করেন। নিজের কাছে নিজেই যেন লজ্জা পান। জানালার বাইরে আকাশে চোখ তোলেন। দানবের জ্বলন্ত চোখ, দেখছে শূন্য থেকে। কয়েকটা ফুটফুটে তারা জ্বলছে আকাশে। শয্যায় কণ্টক যেন, আবার উঠে বসলেন রাজকুমারী।

নীচের তলায় চন্দ্রকান্ত। তিনিও জেগে ব'সে থাকেন, আকাশে চোখ তুলে!

আনন্দকুমারী নিশ্চয়ই অপহৃতা হয়েছে, সেই ভাবনায় চন্দ্রকান্ত

[১১১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

আকাশে অনেক মেঘ

জয়ন্তী সেন

আকাশে অনেক মেঘ ভীড়করা ভাবনার মত
এলোমেলো ধরা দেয় বিচিত্র সম্ভারে
তারা আসে রঙনটী ঝিলমিল ডানা ভর দিয়ে
আসে আর চলে যায় দ্রুতগামী দিনের মতন।
আকাশ কিন্তু নীল—কোন ছায়া পড়ে না সেখানে
আকাশ রাখে না মনে ক্ষণিকের ভাললাগা মোহ।
জীবন-প্রাঙ্গণে আসে কত ফুল-ফোটা শুভক্ষণ
কত দুঃখ-রজনীর তিমির নিশ্বাসে
আশার দীপ্ত দীপ নিবে যায় গভীর আঁধারে।
কত-সূর্য্য আলো দেয় দুকূল-প্লাবী স্রোতস্বিনী পারে।
তুমি মোর বিস্তৃত আকাশ
অপূর্ব্ব নীলের মত চিরন্তনী সুদূরের ধন।
স্বপ্নের অস্তিত্ব বুঝি ক্ষণে ক্ষণে বাতায়ন তলে
নীলশূন্যে পলাতকা বিহঙ্গীর নিমেষ স্পন্দন
পলকে উধাও ছায়া অন্য কোন দিগন্তের পারে।
প্রভাতের প্রখর আলোকে
শর্ব্বরীর নেশা যত ঘুমের ঝরোকা
খোলা কোথায় বিলীন।
সন্ধ্যা স্বর্ণ-সৈকতের নীলান্তে হাওয়ায় দোলা ভীরু পদক্ষেপে
সোনালী মেয়ের মত লঘুছন্দে রঙের ঝলকে
ভেসে-আসা খণ্ড-মেঘ তোমার নয়নে
এসেছিল মোহমুগ্ধ একটি নিমেষ
রূপে রসে ভরা।
ফুলের পাপড়ী-দিন ঝরে পড়া সময়ের পক্ষ বিধূনন
রাত্রির বিবর্ণ ছায়া—মেঘহীন স্বপ্ন অবসানে
স্মৃতির বেদনা তব করুক নিঃশেষ।
অমলিন তোমার আকাশে
লক্ষ্যভ্রষ্ট পথভোলা মলিন মেঘের ছায়া বিলুম্বিত করি
নির্ম্মল সুন্দরতর সত্যের প্রকাশ
হোক পূর্ণতর।

আলোকচিত্র



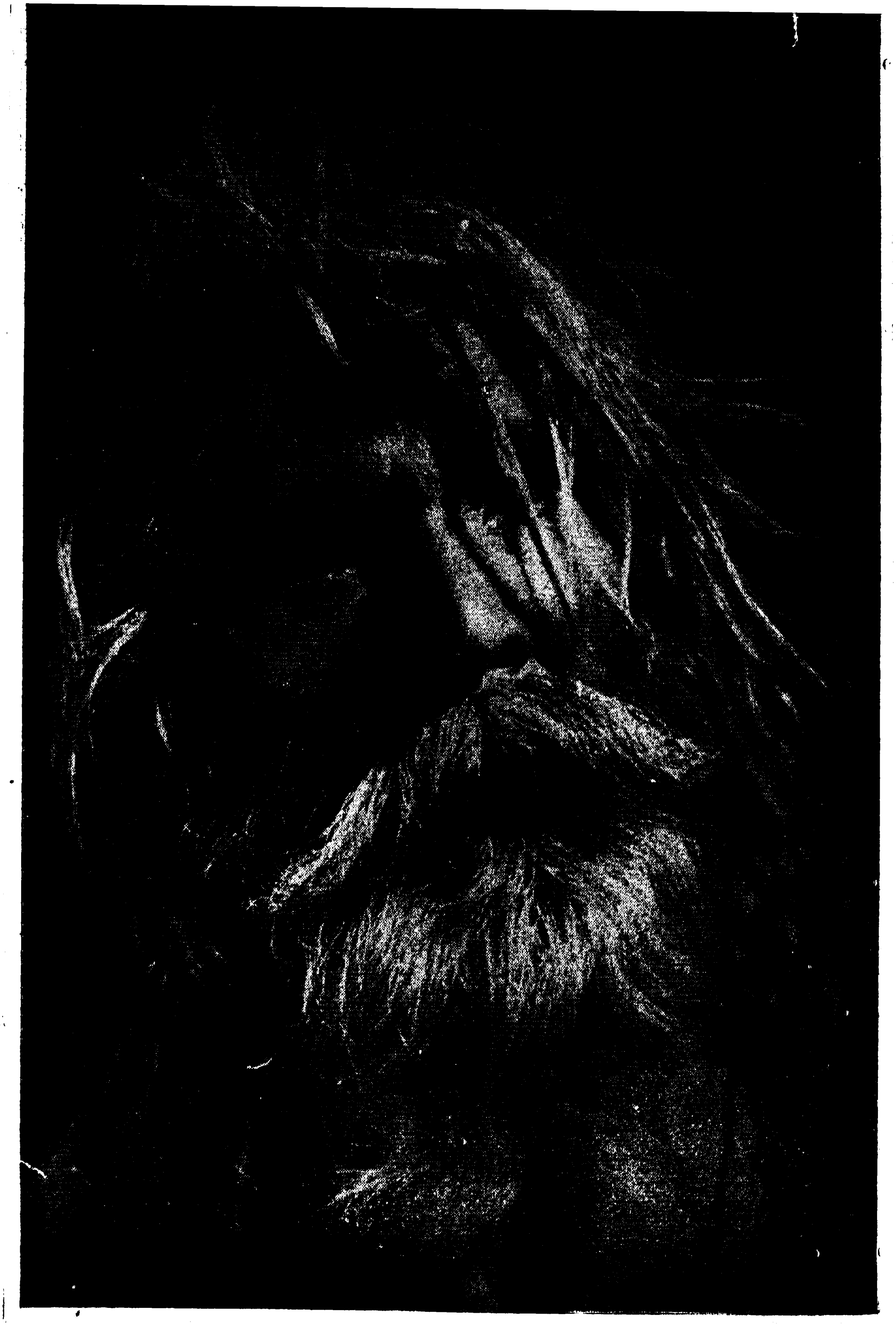
হ্যালো !

—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

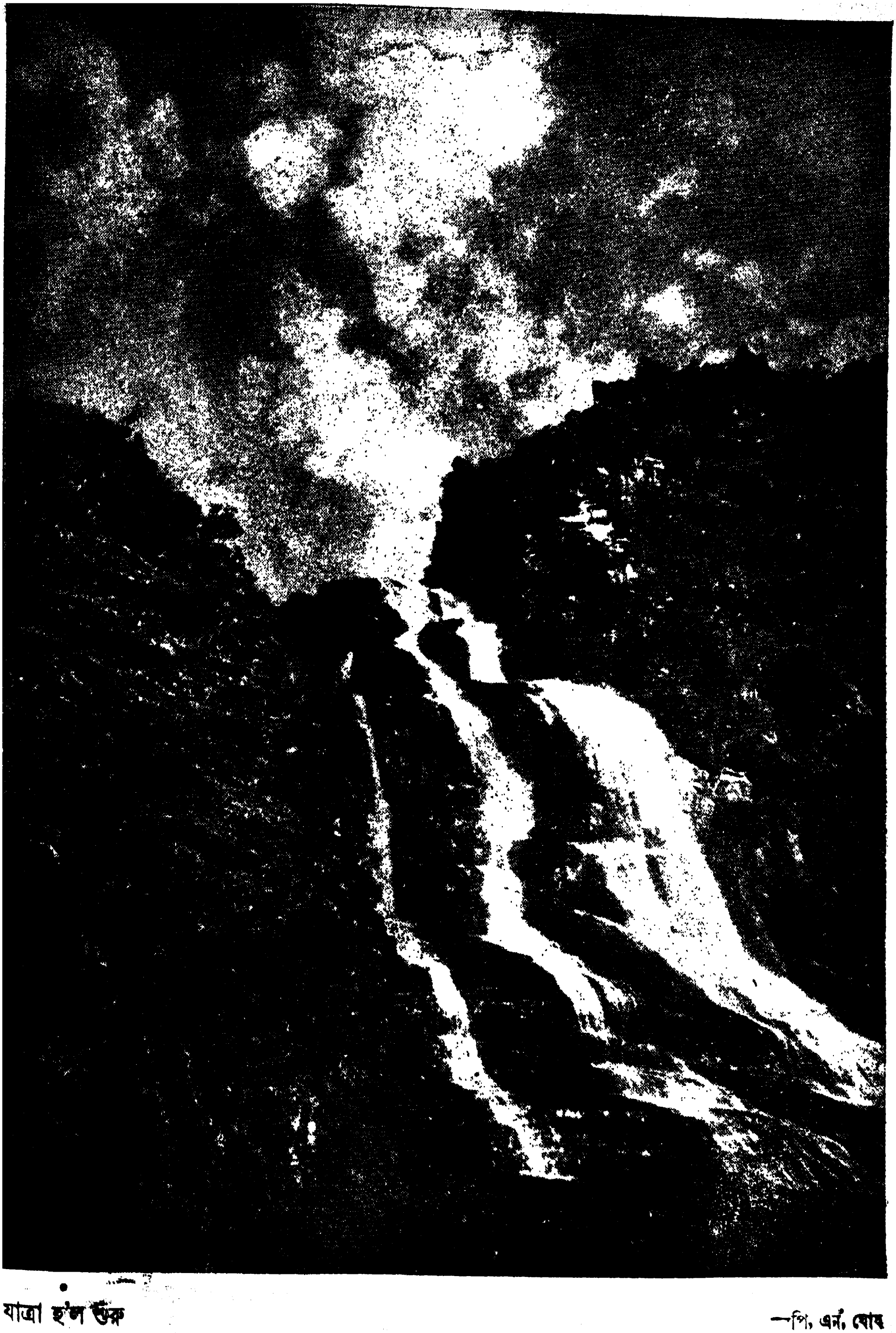


ভবিষ্যতের মা

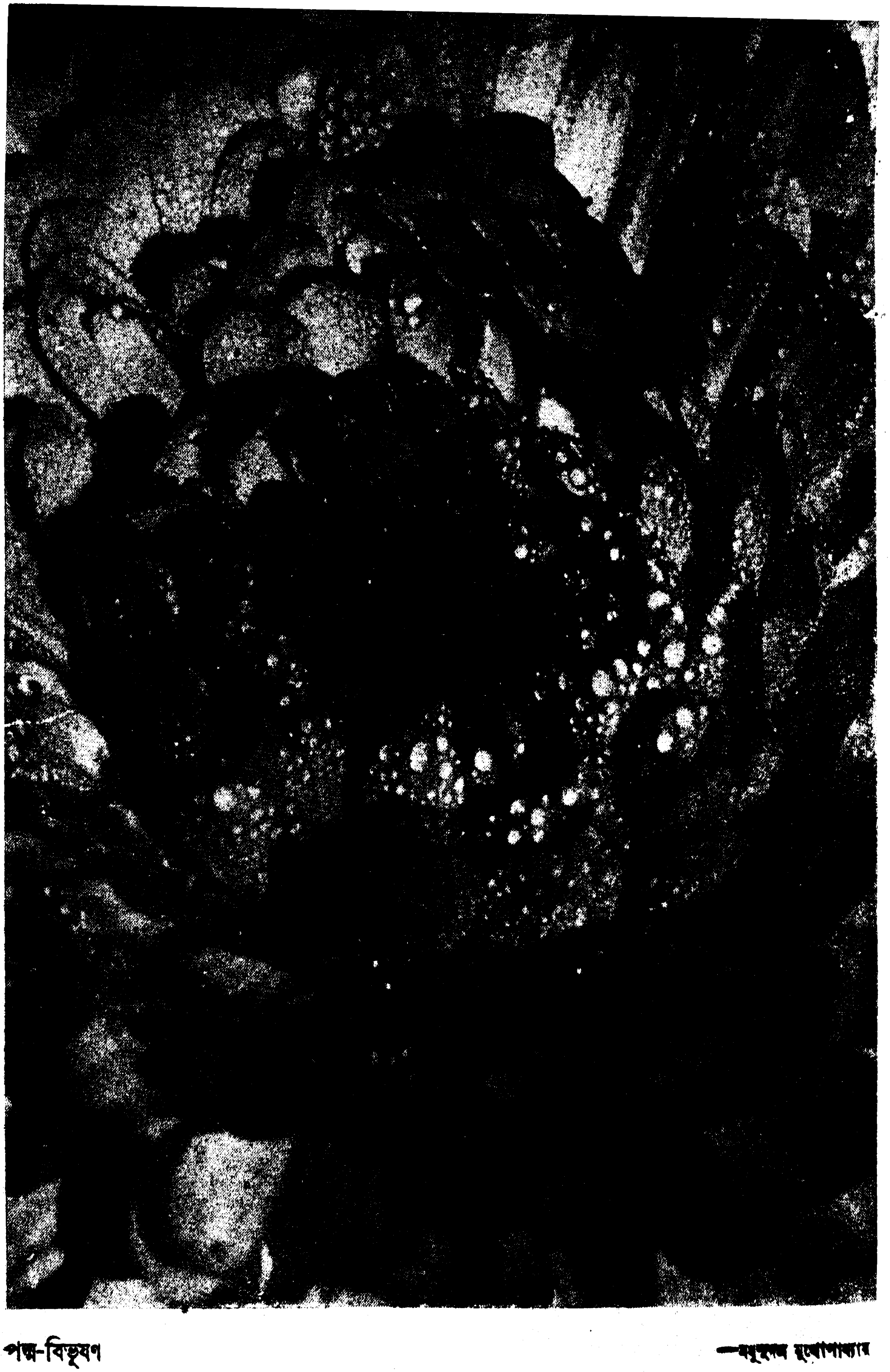
—গীতা সরকার



পারের যাত্রী —অজিত আচার্য্য



যাত্রা হ'ল শুরু —পি. এন. ঘোষ



পদ্ম-বিভূষণ —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

আকাশ ফাটলো!

না, এক জড় পাষাণ-স্তূপের পাঁজর ফাটল। একটা ভরাট স্তব্ধতার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে গেল। যুগ যুগ ধরে জড়ের সাধনা চলেছিল ওখানে। স্থিতি আর স্থাবরতার উপাসনা চলেছিল। নিঃশব্দ, সমাহিত। শুকনো, মরু-নীরস। পাথরের পর পাথর গেঁথে চলেছিল কে! উর্দ্ধ পথে। সূর্যোদয়ের পথে।

প্রলয়ের ক্ষেত্রে বিধাতার সৃষ্টি। প্রলয়ের ক্ষেত্রে মানুষেরও সৃষ্টি। মৃত্যু থেকে জীবনকে ছিনিয়ে ছিনিয়ে উদ্ধার করছে সে-ও। এমনি একটা উদ্ধার-সমারোহ সব প্রথম কল্পান্তক আঘাত হেনেছে ওই জড়দানবের বুকে। আকাশ ফাটেনি। ওটা তার অভ্রভেদী আর্তনাদ। খান-খান হয়ে গেছে তার শিলামন্ত্রের গাম্ভীর্য। কড়-কড় মড়-মড় শব্দে খসে গেছে তার জড়-বাঁধন। শূন্যপথে ছিটকে উঠে মাটির বুকে মুখ থবড়ে পড়েছে তার রাশি রাশি বিপুলায়তন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। আকাশ ফাটেনি। ওটা দিগন্তের কাঁপুনি।

কিন্তু কেন গো, কেন? কে বটে গো তোমরা? পাহাড়গুলোর অমন ধারা অঙ্গ চোটাচ্ছ কেন? জঙ্গল কেটে, মাটি খুঁড়ে সব নাড়ি-ভুঁড়ি বার করে দিচ্ছ কেন? এমন লণ্ডভণ্ড কাণ্ড করছ কেন সব?

বিজ্ঞান চেনে না এই মানুষেরা। বিজ্ঞানের দূত দেখেনি কখনো। ওদের কালো মুখ অবিশ্বাসে কালো হয়ে ওঠে আরো। ভয়ে আর সংশয়ে ধারালো হয়ে ওঠে ওদের চোখের দৃষ্টি।

—নিগড় দিবি? ওই মড়াইয়ের পায়ে? কিন্তু মড়াই তো মরেই আছে! ধারা কই? কাকে আটকাবি? কাকে বাঁধবি? জল পাবি কোথা? তোরা কি পাগল? তোরা দস্যু?

মড়াইয়ের এপার-ওপার দু'পারে পাহাড়। পাহাড়ের একেবারে নীচে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে এঁকে-বেঁকে গেছে মড়াইয়ের বিশীর্ণ একটা রেখা মাত্র। তার হাড়-পাঁজর বার করা জঠরের ক্ষীণ স্রোত শুকনো উপল-পথে ঠোক্কর খেতে খেতে ধারা হারিয়েছে সেই কোন যুগে! তার গতিপথের একটা টান-ধরা আভাস আছে শুধু। মরেছে বলেই তো মড়াই! যুগ যুগ ধরে মরে আছে বলেই তো মড়াই! মরে সকলকে মারছে বলেই তো মড়াই! আগে কি একটা নাম ছিল যেন নদীটার। সেই নামও মরেছে।

বর্ষায় জল আসে বটে খানিকটা। আর দু'-পাঁচ বছর অন্তর অন্তর দু'কূল ছাপিয়ে বন্যাও হয় এক-এক বার।

কিন্তু বর্ষার জল? কলসীর জলে মরুভূমির 'তেষ্টা' মেটে? বর্ষা না ফুরোতেই মাটির আগুন টেনে নেয় সব বর্ষা। তারপর আবার যেই কে সেই।

—আর বন্যা? গড় করি গো তোর বন্যার পায়ে। আকাশের 'বজ্জ' আলো দেয় না আঁধার বাড়ায়? 'জেবন' দেয় না আগুন জ্বালায়? গড় করি গো 'বজ্জের' পায়ে। গড় করি তোর বন্যার পায়ে। মড়াই শুকিয়ে মরুক! মড়াই শুকিয়ে মারুক। মড়াইয়ের ডুবে মরে কাজ নেই। মড়াইয়ের ডুবিয়ে মেরে কাজ নেই।

সেই 'দুর্ঘটনার' পিত্যেশে বসে আছিস নাকি তোরা? নয়? তবে বাঁধবি কারে? কার পায়ে নিগড় দিবি? কার পায়ে 'ছেকল' পরাবি?

পাথরের দেয়াল দিবি এপার-ওপার দু'পাহাড়তক? মড়াইয়ের বুক খুঁড়ে শতেক হাত তলা থেকে দেয়াল তুলবি এই দুই পাহাড়ের কাঁধ-তক?



পঙ্কতপা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

কিন্তু কেন? কেন রে তোরা মরা মড়াইকে মারতে লেগেছিস? কেন রে তোরা 'পিথিবী'র অঙ্গ চোটাচ্ছিস? তোরা কি পাগল? তোরা দস্যু? কে বটে তোরা? এমন 'পেলয়' কচ্ছিস কেন? কি হবে? কি করবি? কি গড়বি?

মুখে বলে না কিছু। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে চেয়ে চেয়ে দেখে। বোবা জিজ্ঞাসায় চোখের পাতা পড়ে না।

—ব্যাঙ্ক দেখেছ? ব্যাঙ্ক? যেখানে টাকা জমা রাখে গো, টাকা জমা রাখা হয়! দেখনি, কিন্তু বুঝেছ তো? আচ্ছা, সেই জমানো টাকা কখন তুলি আমরা? যখন অভাব হয়, যখন খরচ চলে না, যখন হাতের পুঁজি ফুরিয়ে যায়। এখানেও তেমনি জলের ব্যাঙ্ক হবে একটা। জল জমা করে রাখা হবে। বর্ষার জল, বানের জল, পাহাড়ী স্রোতের জল, সব বাড়তি জল। তার পর যখন জলের অভাব হবে, আকাল হবে, এখানকার এই জমানো জল খরচ করা হবে তখন। বিশ, ত্রিশ, পঞ্চাশ ক্রোশের মধ্যে আর জলের অভাব হবে না কখনো। চুপ করে দেখ দু'টি বছর। মরা মড়াই তোমাদের কূলে কূলে ভরে উঠবে, কেঁপে উঠবে—যত দূর চোখ যায় জলে জলাকার হয়ে যাবে সব।

সঠিক বোঝে না। তবু কালো মুখে আশার আলো লাগে একটু। জলের অভাবটা বোঝে। জলের অভাব কা'কে বলে বোঝে। জলের অভাবে তাদের নাড়ি শুকিয়েছে। এ-ওর মুখের দিকে তাকায়। ভাবে! মনের মত করে অর্থ করে নেয়। জল যাবে! যেখানেই আগুন মাটি খেয়েছে সেখানেই জল যাবে! কথা দু'টোয় যেন যাদু আছে। আশাটুকুতে যেন যাদু আছে। জল যাবে! কাছে! দূরে! দূরান্তে!

কর্মকর্তাদের কল্পিত নক্সা আর ছক ধরে জল কবে যাবে, সেটা দূর ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু সেই নক্সা আর ছক ধরে জল যাওয়ার খবরটা চলাচল হতে থাকে এই সদ্য-বর্তমানেই। কাছের থেকে দূরে, দূর থেকে আরো দূরে।

মাসির বাড়িতে একদিন সান্ত্বনার কানেও এলো খবরটা। ওভারসিয়ার অবনী বাবুর মেয়ে সান্ত্বনা। বছর চারেক আগেই এরকম একটা জল্পনা-কল্পনা শুনেছিল সে। সাগ্রহে বুঝতেও চেষ্টা করেছিল কি হবে। কিন্তু সবারই আঠের মাসে

বছর হতে দেখে কৌতূহলে মরচে পড়ে গিয়েছিল। ভুলেও গিয়েছিল প্রায়।

এত দিন বাদে হঠাৎ আবার খবরটা শুনে ভিতরে ভিতরে কেমন একটা উত্তেজনা হতে লাগল। এবারে আর তোড়জোড় নয়, হাতে-কলমে কাজ শুরু হয়ে গেছে না কি।

কি কাজ? কেমন ধারা কাজ? সে জবাব আর কে দেবে তাকে? যেটুকু শুনেছে তার বার্তাবহ ছোট মাসতুত ভাই। শহরের হাইস্কুলে পড়ে। ভাসা-ভাসা শুনে এসেছে সে-ও। এ সব খবরে কান দেবার মত তার আগ্রহ বা কৌতূহল কিছুই নেই। খবরটা শুনলে দিদি খুশি হবে জেনেই বলা। কেন খুশি হবে তা-ও জানে না।

সামান্য একটা খবরের বদলে দশটা প্রশ্ন শুনে ফাঁপরে পড়ে যায় মাসতুত ভাই। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ে, মান-সম্ভ্রম আছে একটা। তাচ্ছিল্য করে জবাব দেয়, অত খবর কে রাখতে গেছে, জানার ইচ্ছে থাকলে কাগজ পড়লেই পারো, কাগজেই তো বেরোয় সব—বারো মাসে খবরের কাগজ ওলটাবে না, জানবে কি!

খবরের কাগজ যে একটা পড়ার বস্তু, কোন দিন সান্ত্বনা তা উপলব্ধি করেনি, সেটা যথার্থ। দুপুরের নিরিবিলি অবকাশে ঘরের দরজা বন্ধ করে একরাশ খবরের কাগজ নামিয়ে বসল সে। সকাল থেকে চুপি চুপি সংগ্রহ করেছে। দেখলে হাসাহাসি করবে শুধু মাসতুত ভাই-বোনেরা নয়, মাসি আর মেসোও হাসবেন মুখ টিপে।

মেঝেতে কাগজ ছড়িয়ে মহানিষ্ঠা সহকারে প্রায় দু'-তিন ঘণ্টা হাতড়ে বেড়াল জ্ঞাতব্য তথ্য। বিরক্তি ধরে গেল। খবর একটু-আধটু যাও আছে সে শুধু খবরই। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে তার কোন হদিশ পেল না। চুপি-চুপি হাইস্কুলে পড়া মাসতুত ভাইয়েরই শরণাপন্ন হল আবার। দেখ খোকা, তোদের মাষ্টার মশাইদের কাছ থেকে খবরটা নে না, কি হচ্ছে না হচ্ছে—যদি পারিস সিনেমা দেখার জন্য আস্ত একটা টাকা দেব তোকে।

প্রলোভনের ব্যাপার বটে এটা! আস্ত একটা টাকা যদি কেউ দেয় তো বাড়ির মধ্যে এই সান্নু দিদিই দিতে পারে। মাসে মাসে বাবার কাছ থেকে দশটা করে টাকা আসে সান্নুদি'র নামে, সেটা কারোই অজ্ঞাত নয়। ভাই-বোনদের ওপর সান্নুদি'র অনেক প্রতিপত্তিও খাটে এই জোরেই।

কিন্তু মাষ্টার মশাইদের কাছ থেকে খবর আনবে কি, তাঁদের জানার পরিচয়টাও এমন কিছু বড় নয়। তবু চেষ্টা-চরিত্র করে যেটুকু খবর সংগ্রহ করল তাই বেশ করে রঙ চড়িয়ে সান্ত্বনার কাছে পেশ করে দিল। ময়ূরাক্ষী নদী বাঁধা হচ্ছে, ডিনামাইট দিয়ে চার দিকের পাহাড় ভেঙে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি।

সান্ত্বনা অবাক, নদী বাঁধছে তো পাহাড় ওড়াচ্ছে কেন?

বাঃ রে! সংবাদদাতা বিরক্ত মুখে জবাব দেয়, নদী বাঁধতে হলে পাথর দরকার। এন্তার পাথর দরকার, ওই জন্যেই পাহাড় ভাঙছে।

সান্ত্বনা দাঁতে করে নখ খুঁটতে-খুঁটতে বুঝতে চেষ্টা করল ব্যাপারটা। দু' চোখ সংবাদদাতার মুখের ওপর এক চক্কর ঘুরে এলো। আর কি শুনলি? এই, মানে—আমাদের ওখান দিয়ে জল যাবে শুনলি?

টাকার আশা বড় আশা। তা' ছেড়ে পারে, জল তো গড়ান জিনিস, এক বার গড়াতে শুরু করলে আর আটকাবে কে?

সান্ত্বনার গোপন অস্বস্তিটা আর চাপা থাকল না বেশি দিন। উড়ো-খবর আসে একটা-দু'টো। আর সদা হাসি-খুশি চঞ্চল মেয়েটা হঠাৎ যেন সচকিত হয়ে ওঠে! শোনে কান খাড়া করে। বুঝতে চেষ্টা করে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে মাসি আর মেসোকেই এসে জিজ্ঞাসা করে এটা-সেটা। মনে মনে তাঁদের হাসির খোরাক হচ্ছে বুঝেও না জিজ্ঞাসা করে পারে না।

মাসির কথা কানে এলো সেদিন, মেসোকে বলছেন, আ-হা, এ নিয়ে কিছু বোলো না ওকে, জানই তো ওদের বংশের ধারা।

বংশের ধারা!

সান্ত্বনারই হাসি পায়। ঠাকুমার কথা, মায়ের কথা মনে হতে শিউরে ওঠে। সে বিভীষিকা ভুলবে না কোন দিন। ভোলবার নয়। বিশেষ করে মায়ের কথা। কিন্তু তারা কোন বংশের থেকে এসেছিল? অবশ্য ঠাকুরদা'র কথা শুনেছে, ঠাকুরদা'র বাবার কথাও—তাদেরও মাটির রোগ ছিল—তাদের না হয় বংশের ধারা বলা যেতে পারে, কিন্তু বাইরের মেয়ে ওর মা-ঠাকুমা—তাদের অমন হল কেন? মনে মনে বলল, মাসিমার যেমন বুদ্ধি! বংশের ধারা! কই তার বাবার তো কোন তাপ-উত্তাপ নেই? আর ঠিক তেমন বাপেরই মেয়ে সান্ত্বনা, তার নিজেরও নেই কোন তাপ-উত্তাপ। কেনই বা থাকবে?

যা গেছে সে তো বরাবরকার মতই গেছে। গেছে বলে কোন দুঃখও নেই তার। গেছে ভালই হয়েছে। আর কি সেখানে থাকতে যাচ্ছে তারা? জল গেলে ওদের নিজেদের কি আর লাভ? তবু জানতে ইচ্ছে হয় শুধু। যে আগুন বছরের পর বছর ধরে বুকে করে টেনে নিয়ে, শুষে নিয়ে শেষ হয়ে গেছে ঘরে ঘরে কত মানুষ—সেখান দিয়ে জল যাবে শুনলে কার না জানতে ইচ্ছে হয়? জল যাবে, আগুন নিববে এটুকুই আনন্দ তার। বংশের ধারা আবার কি!

হঠাৎ ছোটবেলার একটা দৃশ্য মনে পড়ে গেল সান্ত্বনার। খুব ছোটবেলার। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে। বুড়ী ঠাকুমা সকাল থেকে কি একটা যজ্ঞ শুরু করিয়েছে খোলা বাইরে। আকাশের নীচে, কাঠফাটা রোদ্দুরে। কাঠ, শুকনো পাতা, ঘি, পুরানো কাপড়, সব এনে এনে ফেলা হচ্ছে সেই যজ্ঞের আগুনে। দমবন্ধ ধোঁয়ায় একাকার হয়ে যাচ্ছে চার দিক। আর সেখানে সকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছে বুড়ী। শাস্ত্রকারের ভাষ্য, ধোঁয়ার জ্বলুনিতে আর সেই সব জ্বলানো সূর্যের তাতে চোখ দিয়ে যে জল ঝরবে তা মাটিতে ফেললে মাটি শীতল হবে। চোখের জল বাষ্প হয়ে আকাশে উঠবে, তারপর বৃষ্টি হয়ে মাটিতে ঝরবে। সূর্যের দিকে মুহুর্মুহু চেয়ে চেয়ে চোখে জল আনার তাগিদে প্রায় অন্ধ হতে বসেছিল বুড়ী। তার সেই ভাঙা গলার ছড়া পাঁচালীও ভোলেনি সান্ত্বনা।—

'চোখের জল আকাশে যা,
যাগের ধোঁয়া আকাশে যা,
সেথায় গিয়ে মেঘ হ',
পৃথ্বি ঢেকে মেঘ হ'।

আয় রে পবন ধেয়ে,
মেঘ করেছে ছেয়ে,
পবন-মেঘে মিতালি,
মাটি হল শীতালি।'

শুধু এই? আরো কত কি করতে দেখেছে কত ঘরে। মায়ের কথা মনে পড়ছে আবারও। তাড়াতাড়ি অন্য কিছু ভাবতে চেষ্টা করল সান্ত্বনা। কাজ নেই মায়ের কথা মনে পড়ে। ভালই হয়েছে তারা ও জায়গা ছেড়ে এসেছে বরাবরকার মত। ভালই হয়েছে বাবা তার বাইরে-বাইরে কাজ করে। ভালই হয়েছে মাসির বাড়িতে চলে এসেছে সে। সবই ভালো হয়েছে। তবু কেবল একটুখানি জানতে ইচ্ছে করে, কি হচ্ছে, কি হবে, কেমন করে হবে। আহা, এখনো তো লোক বাস করছে সেখানে। কত লোকই তো আছে। তাদের দুঃখ-কষ্ট ঘুচবে কি না জানতে ইচ্ছে করে না! কিন্তু ঘুচবে কী? জল তো আটকানো হচ্ছে সেই কোথায় কত দূরের কোন পাহাড়ের গায়ে!

কিন্তু গোড়ার দিকের এই আলোড়নে লম্বা একটা ছেদ পড়ে গেল আবার। আর কোন খবর-বার্তা পায় না সান্ত্বনা।

প্রথম প্রথম রাগ হত। লোকগুলো কি এখানকার! কোন কিছুতে যদি আগ্রহ থাকত। সেই থেকে রোজ দুপুরে খবরের কাগজ নিয়ে বসছে। কিন্তু খবর-আর পায় না। উল্টে চোখে মাথা ধরে যায়। ঘুম পেয়ে যায়। কি সুখে যে লোকে পড়ে এই বাজের ছাইভস্ম ভেবে পায় না। ক্রমশঃ ওর নিজের আগ্রহও একটু একটু করে চাপা পড়ে গেল আবার। বছর ঘুরে এলো।

ঘুম ভেঙে সেদিন কার মুখ দেখেছিল সান্ত্বনা! আনন্দে আর উত্তেজনায় ভেতরটা যেন একেবারে উপচে উঠতে লাগল তার। বাবার চিঠি এসেছে।

সেটা আনন্দের কারণ হলেও এমন কিছু বিচিত্র ব্যাপার নয়। বাবার চিঠি প্রায়ই আসে। ব্যতিক্রম হলে এখান থেকে এমন কিছু লেখে সান্ত্বনা, যাতে করে বেশ ভালো মতই টনক নড়ে তাঁর।

বাবা লিখেছেন, এখানে দু'-তিন দিনের মধ্যেই আসছেন।

সেটা আরো আনন্দের কারণ বটে। কিন্তু বছরে এমন এক বার দু'বার এসেও থাকেন তিনি। সেই জন্যেও সান্ত্বনা এমন বিহ্বল হয়ে ওঠেনি আজ।

চিঠিতে আর একটা ছোট্ট সংবাদ আছে। যা বাড়ির সকলকে ডেকে বলার মত। বা বিশ্বসংসারে সকলকেই ঢাক পিটিয়ে বলার মত।

বাবা লিখেছেন, মড়াইয়ের কাজে বদলী হয়েছেন তিনি। সেখানে যাওয়ার পথে এ জায়গা হয়ে যাবেন!

এমনিতেই সান্ত্বনার লাগাম-ছাড়া হাসিখুশির দাপটে বাড়িটা ভরাট থাকে সারাক্ষণ। মাসি সত্যি সত্যি রেগে ওঠেন এক এক সময়, দস্যি মেয়ে, বাইশ বছর বয়েস হল তোর খেয়াল আছে? বারো বছরের খুকিটির মত করে বেড়াস—বাপ তো ওদিকে খুব চাকরী কচ্ছেন—যেন বিয়ে-থাওয়া আর দিতে হবে না মেয়ের—যেন এই করেই কাটবে চিরকাল, আসুক এবার।

আর আজ?

আজ আর কোন কথা বলারই ফুরসত পেলেন না তিনি। রান্নার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। সান্ত্বনা দৌড়ে এসে দু'হাতে জাপটে ধরে সরাসরি একেবারে শূন্যে তুলে ফেলল তাঁকে।

—ছাড় ছাড়। কি হল? এঁটো-কাটায় সব একাকার করে দিলি!

আর ছাড়। চিঠিখানা তাঁর সামনে থেকেই সান্ত্বনা ছুটল আর এক দিকে।

স্নান করে বেশ যত্নসহকারে চুল বাঁধাটা প্রায় সেরে এনেছে মাসতুত বোন। প্রসাধনের ব্যাপারে বেশ একটু রুচি আছে তার। বয়সে প্রায় বছর চারেক ছোট সান্ত্বনার থেকে। কিন্তু সে-ই বড় বুদ্ধির বিচারে। ছোট যেন সান্ত্বনাই। ঝড়ের মত এসে একটানে তার চুল খুলে সব এলোমেলো করে দিয়ে রাগিয়ে-হাসিয়ে অস্থির করে তুলল তাকেও। প্রসাধন-গাম্ভীর্য রসাতলে গেল তার। লুটোপুটি সুরু করে দিল দুই বোনে।

তার পর এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে ভাবতে বসল সান্ত্বনা।

কিন্তু এরকম একটা যোগাযোগ ভাবতেও পারছে না। বাবা যেন কি! কোথায় বেশ করে গুছিয়ে লিখবে দু'লাইন, না এক কথাতেই শেষ। যেন জল গড়িয়ে খাচ্ছে এক গেলাস।

আজকের আনন্দের আঁচ খানিকটা মেসোও পেলেন।—সান্তুর আজ কি হল, এত খুশি কেন?

সমীহ যা একটু মেসোমশাইকেই করে সান্ত্বনা। মুখ আড়াল করে চার আঙুল জিব কাটল।

মাসি রাগ করে জবাব দিলেন, ওর বাবা মড়াইয়ের কাজে বদলী হয়েছে, খুশি এই জন্যে। একেবারে দিগ্বিজয় করে ফেলেছে। যাওয়ার পথে এখানে হয়ে যাবে। আসুক, খুশি বার কচ্ছি।

বস্তুতঃ মাসি এবং মেসো দু'জনেই সম্প্রতি সান্ত্বনার বাবার ওপর ক্ষুণ্ণ হয়েছেন একটু। যথার্থ কারণও আছে। আর সেই কারণে সান্ত্বনাকেই স্বচক্ষে দেখার কথা নয় তাঁদের। শুধু তাঁদের কেন, মাসতুত বোনেরও হয়ত কিছুটা মনোবেদনার কারণ সে-ই। কিন্তু এক ঝলক আলোর পরে একঘর অন্ধকারের ক্ষোভই বা আর কতটুকু টেকে!

প্রত্যাশিত দিনেই সান্ত্বনার বাবা ওভারসিয়ার অবনী রায় এলেন।

সান্ত্বনার ইচ্ছে, তাঁকে নিজের ঘরে টেনে এনে ঘরের দরজা বন্ধ করে জেরা করতে বসে। কিন্তু নিরিবিলিতে পায় তাকে সাধ্য কি?

প্রাথমিক যা কিছু সম্পন্ন হল। খাওয়া-দাওয়া সারা হল ধীরে-সুস্থে। ধৈর্য্য ধরে থাকা দায় সান্ত্বনার। কিন্তু এদের গপ্পই শেষ হয় না। মাসিটি বড় সহজ নন, এ-কথায় সে-কথায় ঠিক আসল কথায় চলে এলেন।

লোহা পিটবে তখন, দগদগে লাল যখন। বললেন, চাকরী তো খুব কচ্ছ নিশ্চিন্ত মনে, তোমার মেয়ের বিয়ে দেবে কে?

ভিতরে ভিতরে শঙ্কিত হয়ে উঠল সান্ত্বনা। মাসি-মেসোর মনে যে বেশ একটু ক্ষোভ আছে বাবার ওপর, তার কারণটা এবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে বুঝি। অথচ, বাবা বেচারি তার কিছু জানেন না, সম্পূর্ণ নিরপরাধ। সকলের অগোচরে কল-কাঠিটা সেই ঘুরিয়েছে—এক বার নয়, দু'বার। কিন্তু আবার রাগও হয়ে গেল মাসির ওপর। কোন কিছুরই সময়-অসময় নেই, ভিতরে ভিতরে একেবারে শাণ দিচ্ছিলেন

যেন। অবনী বাবু কিছু জবাব দেবার আগেই সে বলে উঠল, আমার জন্যে ভাবতে হবে না, নিজের মেয়ে আছে, ধরে বিয়ে দাওগে যাও না।

অবনী বাবু বিব্রত হলেন। অন্য সময় হলে মা-মরা আদরের বোন-ঝি'র কথা শুনে হয়ত হাসতেন মাসি, নয়ত, ছদ্মরাগে ধমক দিয়ে বলতেন কিছু। সান্ত্বনাও সে রকম কিছুই প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে দাঁড়াল কেমন। মাসি স্বল্পক্ষণ তার মুখের দিকে চেয়ে থেকে বললেন, তোকেও আমি নিজের মেয়ে বলেই ভাবতুম···তা তোরা বাপ-মেয়ে দু'জনেই যখন অন্য রকম ভাবিস তখন আমার মাঝখানে পড়ে বার বার ঘ্যানর-ঘ্যানর করা কেন? খুব ঘাট হয়েছে, আর বলব না।

হঠাৎ এরকম আবহাওয়ার পরিবর্তনে অবনী বাবু হকচকিয়ে গেলেন। মেয়েকে বললেন, তুই সবেতে আগবাড়িয়ে কথা বলতে আসিস কেন? মাসিকে বললেন, আপনিও যেমন, ওর কথা আবার শোনেন।—বড় হয়েছে, বিয়ে তো দিতেই হবে, তা আপনারা ছাড়া ওর আর আছে কে, দেখে-শুনে ঠিক করুন কিছু।

এরই প্রত্যাশায় ছিলেন যেন মাসি।—আমরা দেখে-শুনে ঠিক করব কি রকম? আমাদের ওপর তোমার বিশ্বাস কতটুকু যে আমরা দেখে-শুনে ঠিক করব? অমন দু'-দুটো ভালো সম্বন্ধ পেয়ে চিঠি লিখলাম তোমায়, দু'বার করে লিখলাম—একটা চিঠিরও জবাব দেওয়া পর্যন্ত দরকার মনে করোনি তুমি, আবার আমরা দেখতে যাব কেন শুনি?

একেবারে আকাশ থেকে পড়লেন অবনী বাবু। চিঠি! আমাকে! কবে—! কই আমি তো একটাও পাই নি!

মাসিও থতমত খেয়ে গেলেন কেমন। চিঠি পাওনি? সব চিঠি পাও আর এ দু'টোই পেলে না, সে আবার কেমন কথা?

সকলের অগোচরে সান্ত্বনা পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে। আর সেখানে অবস্থান করাটা নিরাপদ নয়, সেটা তার থেকে ভালো আর কে জানে!

একটুখানি বিবৃতি প্রয়োজন।

মাসি ওর বিয়ের প্রসঙ্গ চার-পাঁচ বছর আগেই উত্থাপন করেছিলেন। একাধিক বার করেছিলেন। কিন্তু অবনী বাবু সত্যিই তখন কোন গা করেন নি। এ সম্বন্ধে ভাবার মত তখন তাঁর মনের অবস্থাও ছিল না খুব। যাই হোক, মাসিও শেষে এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেন নি কিছু। যার দায় তারই যখন ভাবনা নেই, তিনিই বা কাঁহাতক পিছনে লেগে থাকবেন? মাঝখানের এই ক'বছরের ব্যবধানে মাসির নিজের মেয়ে বড় হয়েছে। সেই দায়িত্ব পালনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি। তাঁর কন্যার সম্বন্ধ দেখা হতে লাগল। যে দু'টো সম্বন্ধের কথা একটু আগে উল্লেখ করলেন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটেছিল মাসির নিজের মেয়েকে উপলক্ষ করেই।

মাসতুত বোনকে দেখতে আসছে শুনে হেসে-নেচে আটখানা হয়ে সান্ত্বনা সেই বেচারাকে প্রথমে নাস্তানাবুদ করে পরে পরিপাটি করে তাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে দিল। জনা দুই ভদ্রলোক আর জনা তিনেক মহিলা এলেন মেয়ে দেখতে। ভদ্রলোক দু'জন বাইরের ঘরে বসলেন, মেয়েরা ভিতরে। মাসতুত বোনকে বাইরের ঘরে চালান দেওয়া হল প্রথম। উজ্জ্বল কৌতূহলে আড়ি পেতে রইল সান্ত্বনা। সবেতেই তার অপার কৌতূহল, এ ব্যাপারে তো কথাই নেই। তাঁদের দেখা হতে মেয়েকে ভিতরে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনা ছুটে এসে তাকে এক রকম জাপটে ধরে নিয়ে গেল মেয়েদের ঘরে। তাকে তাঁদের সামনে বসিয়ে দিয়ে নিজেও পাশে বসল গ্যাঁট হয়ে। যেন সে-ই মুরুব্বি।

মেয়েরা মেয়ে দেখলেন। যাকে দেখার কথা তাকেও, যাকে দেখার কথা নয় তাকেও। এটা-সেটা জিজ্ঞাসা করলেন মেয়েকে। কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি জিজ্ঞাসা করলেন তার পাশে যে বসে আছে তাকে। মাসিকেও গল্পগুজবের ছলে এটা-ওটা জিজ্ঞাসা করলেন তাঁরা, কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে যত না, বোনঝির সম্বন্ধে অনেক বেশি।

হঠাৎ কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগল সান্ত্বনা। অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন মাসিও।

দু'-চার দিনের মধ্যেই পাত্রপক্ষ খবর পাঠালেন। ছেলের বয়েস আন্দাজে মেয়ের বয়স একটু কম হয়ে যায়। সেদিক থেকে বোন-ঝিটিকে বিশেষ পছন্দ তাঁদের। অতএব, ইত্যাদি।

বোনঝি'কে পছন্দ হয়েছে বয়সের জন্য কি, কি জন্য, সে চোখ মাসির আছে। মায়ের মনে একটু লাগার কথা। কিন্তু যে মেয়ে পছন্দ তাঁদের, সেই মেয়ে সান্ত্বনা বলেই তেমন লাগল না। মেসোর মনে যাই থাক, তিনিও মন্তব্য করলেন না কিছু।

কিন্তু লজ্জায় অস্বস্তিতে একেবারে আড়ষ্ট হয়ে গেল সান্ত্বনা।

ওদিকে মাসি এবং মেসোর টুকরো কথাবার্তাও কানে এলো তার। মেসো বললেন, অবনীকে চিঠি লিখে দাও আজই, যদি হয়ে যায়, তো হয়ে যাক।

মাসিও সায় দিলেন। দুপুরে নাকের ডগায় নিকেলের চশমা এঁটে চিঠি লিখতে বসেছেন তিনি, তাও দেখল সান্ত্বনা।

সেই দিনই চিঠি একটা সে-ও লিখল তার বাবাকে। এমনি সাদামাটা চিঠি। লিখে খামে এঁটে প্রতীক্ষা করতে লাগল।

তার পর ছোকরা চাকর আধ মাইল দূরের ডাকবাক্সে কর্ত্রীর চিঠি ফেলতে গেল যখন, তখন তার হাতের ওই চিঠি সান্ত্বনার চিঠির সঙ্গে বদল হয়ে গেল কি করে, সে শুধু একমাত্র সান্ত্বনাই জানে। আর কেউ না।

পরের ঘটনাও প্রায় অনুরূপ।

এবারে যাঁরা মাসির মেয়ে দেখতে এলেন, সান্ত্বনা আর ধারে-কাছেও ঘেঁষল না তাঁদের। মাসিকে বলল, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সব এবারে আমি দেখছি, তুমি ওদিক আগলাওগে যাও।

মাসি খুশিও হলেন না, দুঃখিতও হলেন না। খুশি হলেন না, কারণ, এই বোনঝি'টিও মেয়ের থেকে খুব কম নয় তাঁর কাছে। দুঃখিত হলেন না, কারণ, মেয়েও কম নয়।

যথাপূর্ব মেয়ে দেখা হল। মোটামুটি মেয়ে পছন্দও হল বোধ হয়। কারণ, মহিলারা বিদায়ের আগে মেয়ের বাপের ঘর-বাড়িও দেখলেন। আর এই দেখতে গিয়েই রান্নাঘরে আটপৌরে গাছ-কোমর শাড়ীপরা সান্ত্বনাকে দেখলেন তাঁরা। গরমের তাতে আর ঘামে তখন টুসটুসে লাল হয়ে উঠেছে সান্ত্বনার মুখ। থতমত খেয়ে হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে সে টিপ-টিপ করে প্রণাম সারল গোটা দুই-তিন। আগন্তুকেরা আবার প্রশ্ন শুরু করলেন মাসিকে। বেশ খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। তারপর জিজ্ঞাসাবাদে বিব্রত করে তুললেন সান্ত্বনাকেও।

যথাসম্ভব সংক্ষেপে জবাব দিয়ে সান্ত্বনা একগাল হেসে ফস করে বলে বসল, আমার বোনকে কেমন দেখলেন বলুন ?

একজন জবাব দিলেন, ভালোই তো—।

মহা খুশি হয়ে মাথা দুলিয়ে সান্ত্বনা বলে উঠল, পছন্দ হয়েছে তাহলে ? হবে না তো কি, যে বাড়ি যাবে সেই বাড়ি আলো করবে, অমন কাজের মেয়ে ক'টা হয় ? আপনারা নিশ্চিন্দি মনে নিয়ে যান।

সকল কথা সকলের মুখে ভালো শোনায় না। সেটা জেনেই বোধ হয় বলা। কিন্তু অনেকের মুখে আবার যা বলা যায় তাই শোনায়ও ভালো। সকলেই হেসে উঠলেন। মাসি বললেন, তুই থামি তো, বোনের হয়ে তোকে আর উমেদারী করতে হবে না।

সান্ত্বনা মুখরার মত ফর-ফর করে বলল, বোনের জন্য আমি উমেদারী করব না তো কি তোমার মতি গয়লানী করবে ?

আগন্তুকদের এক জন বললেন, তুমিও তো কম কাজের নও দেখছি ?

ঠোঁট উল্টে সান্ত্বনা জবাব দিল, হ্যাঃ, ওর সঙ্গে আমার তুলনা ! মাসিমা ওঁদের এখানে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন, এখানটায় বেজায় গরম—.

মাসিমা সহাস্যেই জবাব দিলেন, তুই গরমে সেদ্ধ হয়ে কাজ করছিস আর ওঁদের একটু দাঁড়াতেও দিবিনে ?

ভিতরে ভিতরে আবারও অস্বস্তি লাগছে সান্ত্বনার। আগন্তুকাদের মধ্যে বর্ষীয়সী যিনি, তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেললেন, আপন বলতে যখন শুধু আপনিই—এরও তো বিয়ে দেওয়া দরকার আপনার ?

মাসিমা হাসিমুখেই বললেন, আপন হলেও ওর বিয়ে দেওয়ার সত্যিকারের মালিক তো আমি নই—ওর বাবাকে বলে বলে হার মেনেছি।

সান্ত্বনার ইচ্ছে হল বেশ করে মুখের ওপর দু'কথা শুনিয়ে দেয়। পারেও। কিন্তু মাসির জন্যেই সাহস হচ্ছে না। কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অন্য দিকে চেয়ে।

দিনকতক বাদে চিঠি এলো এবারও। রান্নাঘরের সেই মেয়েটিকেই বিশেষ পছন্দ তাঁদের, তার বাবার কাছে যদি কথাবার্তা তোলা হয় তাঁরা খুশি হবেন।

এক বার যেটা উড়িয়ে দেওয়া যায়, বার বার সেটা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মেসো বিরক্ত হয়ে বললেন, মেয়ের বাবার যদি এখন ঘুম না ভাঙে তো আমরা কি করব ? এক বার একখানা চিঠি লিখলে, তার জবাব পর্যন্ত দিলে না।

দু'টো দিন একেবারে গুম হয়ে রইল সান্ত্বনা। অকারণ রাগে জ্বলতে লাগল মনে মনে। সেটা লক্ষ্য করেই বোধ হয় হালকা হেসে মাসি এক সময় বললেন, তুই অমন করে আছিস কেন, লোকের তো চোখ আছে না কি—তুই থাকতে তোর বোনের বিয়ে হবে না।

সান্ত্বনা ঝাঁঝিয়ে উঠল, তা'হলে আমাকেই দূর করে দাও।

—দেবই তো। এবারে তোকেই দূর করব আগে। বেশ ভালো হাতে মজা দেখাচ্ছি তোর বাবাকে।

মজাটা যে কি সান্ত্বনা জানে। আগের ব্যাপারটারই পুনরাবর্তন ঘটল। চুপি চুপি মাসির চিঠি বদল করতে হল আবারও।

পাঁচ-সাত দিন অপেক্ষা করে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন মাসি। বললেন, দেখেছ কাণ্ড ! একটা জবাব দেওয়া পর্যন্ত দরকার মনে করে না সে !

তাড়াতাড়ি সান্ত্বনা বাবাকে চিঠি লিখল আবার।—শীগগির মাসির কাছে চিঠি লেখো একখানা, আমি এখানে আছি, মাঝে-সাজে তাঁদের খোঁজ-খবর করা তো উচিত তোমার, না কি—?

চিঠি পেয়েই অবনী বাবু বিনীত চিঠি লিখলেন গৃহকর্ত্রীর নামে। মাসি রেগে আগুন আরো। আসল কাজের কথার একটা উল্লেখ পর্য্যন্ত নেই ! অর্থাৎ, আমার মেয়ে নিয়ে তোমরা মাথা ঘামাও কেন, কেমন—? আচ্ছা, এই আমি চুপ করলাম, আর যদি বলি তো···

আড়াল থেকে সান্ত্বনা এ দিকের হাওয়াটা এক-এক বার বুঝে যেতে লাগল। মাসির রাগ পড়েছে। পোষ্ট অফিসের বিরুদ্ধে একযোগে দু'জনে খানিকটা অভিযোগ বর্ষণ করার পর অবনী বাবু সখেদে বললেন, এ রকম দু'-দুটো ভালো ভালো সম্বন্ধ হাতছাড়া হয়ে গেল, অথচ আমি এক বার জানতেও পারলুম না, একেই বলে বরাত—।

মাসি বললেন, তা'ছাড়া আর কি, নিয়তি-নির্বন্ধ না থাকলে কি করে আর কি হবে কিন্তু তোমাকেও বলি, এ না হয় সেধে এসেছিল, কিন্তু তোমারও একটু চিন্তা ভাবনা থাকা উচিত—অতবড় মেয়ে থাকলে চোখে-পাতায় এক করতে পারতুম না আমি, আর তোমার কোন চিন্তাই নেই।

নীরব থেকে অবনী বাবু অভিযোগ স্বীকার করে নিলেন বোধ হয়। মাসি আবার বললেন, অবশ্য মেয়ে তোমার পছন্দের মেয়ে, যে দেখবে সেই নিতে চাইবে—তবু চেষ্টা চরিত্র না করলে সবাই কি আর সেধে আসবে ! তোমার বরাত ভালো অমন বাড়ন্ত গড়নেও বয়সের ছাপ পড়েনি মেয়ের, আমার মণির থেকেও কচি দেখায়—তা' বলে সব কিছুরই একটা সময় আছে তো !

আড়াল থেকে মাসির উদ্দেশে বেশ করে মুখ ভেঙচালো বাড়ন্ত গড়নের পছন্দের মেয়েটি। চিঠি সংক্রান্ত অপকীর্তিটা পাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, সেই ভয়ে ধারে-কাছে ঘেঁষছে না। নইলে বাবার সামনে মাসিকে আর এক দফা শুনিয়ে আসতে পারত অনায়াসে। অত লজ্জা সম্রমের ধার ধারে না, তা সে নিজের বিয়ের প্রসঙ্গেই হোক বা যারই হোক।

বাবাকে সান্ত্বনা হাতের মুঠোয় পেল সেই সন্ধ্যার পরে। কিন্তু মেয়ের কাছেও অবনী বাবু প্রথমেই চিঠি না পাওয়ার খেদ প্রকাশ করেই ফাঁপরে পড়ে গেলেন। একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল সান্ত্বনা। ব্যস্ ব্যস্ ব্যস্—বেশ হয়েছে চিঠি পাওনি, খুব ভালো হয়েছে, পোষ্ট অপিসকে আমি এক হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়ে দেব। এনে পর্যন্ত আর কোন কথা নেই, বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে—বিয়ে !

বাবা মেয়ের সম্পর্ক নয় তাদের। মা-মেয়ে সম্পর্ক বলা যেতে পারে। সান্ত্বনার মা মারা যাওয়ার অনেক আগের থেকেই তাই। ভালো হোক, মন্দ হোক, কোন একটা ধারা থেকে অবনী বাবু মেয়েকে আড়ালে রাখতে চেয়েছেন সেই ছোটবেলা থেকেই। চেয়েছেন দুই বাহু বিস্তার করে আগলে রাখতে। বাবা মেয়ের ব্যবধান ঘুচে গেছে এক যুগ আগেই। সেই আদরেই সম্ভবত মেয়ের আজও বয়েস বাড়েনি।

অবনী বাবু বললেন, আমি কি করব, তোর মাসি বলছে একুশ বাইশ বছর নাকি বয়েস হয়ে গেল তোর—

—তবে আর কি। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই যাকে পাও গলায় গামছা বেঁধে নিয়ে এসো, বিয়ে করে ফেলি—!

হেসে ফেলল। রাগ মিলিয়ে গেল। অবনী বাবুও হাসলেন। সান্ত্বনা তাঁকে নিরীক্ষণ করে দেখল কিছুক্ষণ। বলল, তুমি একটু রোগা হয়ে গেছ বাবা!

অবনী বাবু হালকা হেসে জবাব দিলেন, তোর বিয়ের ভাবনাতেই তো—।

—হুঁ। তোমার একটা মেয়ে আছে তাই মনে থাকত কি না সন্দেহ, ভাবনা না ছাই।

—আচ্ছা, থাকত না। তুই কেমন আছিস বল্।

—খুব ভালো। দিব্বি খাচ্ছি-দাচ্ছি আর মাসির ওপর তম্বি করে বেড়াচ্ছি, কেমন মোটা হয়েছি দেখ না!

অবনী বাবু মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন। কিন্তু সান্ত্বনার ভিতরটা তখন অন্য কিছু জানার জন্য আঁকুপাঁকু করছে। ভাবল একটু। নীরবে দুই চোখ বাবার মুখের ওপর ঘুরে এলো এক প্রশ্ন।

—আচ্ছা বাবা, মড়াইয়ের কাজে তুমি নিজে বদলী হলে না তোমাকে বদলী করা হল?

হঠাৎ এরকম একটা প্রশ্নের জন্য তৈরী ছিলেন না অবনী বাবু। চকিতে তাকালেন এক বার মেয়ের দিকে।—কেন রে?

—এমনি, বলোই না।

—পাঁচ জায়গায় ঘুরে-ঘুরেই তো চাকরী, এত বড় কাজ হচ্ছে সেখানে, কত পোষ্ট খালি পড়ে আছে, চলে এলাম।

খুব সত্যি কথা বললেন না। বললেন না বলেই বিব্রত হলেন মনে মনে।

এত বড় কাজ হচ্ছে শুনে সান্ত্বনা সোৎসাহে বলে উঠল, খুব মস্ত কিছু হচ্ছে বাবা, তাই না? আচ্ছা যেখানে কাজ হচ্ছে সেই জায়গাটা আমাদের ওখান থেকে কত দূর?

নিজের অজ্ঞাতেই আবার একটা চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন অবনী বাবু। পরে হেসে বললেন, তুইও যেমন, কোথায় মড়াইয়ের ড্যাম আর কোথায় আমাদের সে জায়গা।

নিমেষে ম্লান হয়ে গেল সান্ত্বনার মুখ। সব উৎসাহ স্তিমিত হয়ে গেল যেন। বলল, তা'হলে আর কি হল বাবা—সেখানে তো আর তা'হলে জল যাবে না?

অবনী বাবু হেসে উঠলেন।—তুই বুঝি এই সব ভাবিস এখনো? জল যাবে না কেন, ড্যাম হলে ওর ডবল দূরেও জল যাবে—কিন্তু জল যাক না যাক আমাদের কি, আমরা কি আর সেখানে ফিরে যাচ্ছি, সব তো বেচে দিয়েছি।—

সান্ত্বনার সমস্ত মুখ খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল আবার। বলল, যেতে বয়ে গেছে আর সেখানে, মা গো! সেখানে আবার কেউ থাকে! কিন্তু তুমি তো ভারী স্বার্থপর বাবা, নিজেরা থাকব না বলে এত কালের জলের কষ্টটা দূর হবে সেটা কিছু নয়! তুমি এখান থেকে যাচ্ছ কবে?—

—দাঁড়া, দু'টো দিন জিরোই, আমি গেলেই কি তাড়াতাড়ি জল এসে যাবে?

লজ্জা পেয়ে হেসে ফেলল সান্ত্বনা।—না তা' কেন, আমাকে তো সব গোছগাছ করে নিতে হবে, এর পর হুট করে তুমি বলে বসবে, চল।—

দু'চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল অবনী বাবুর।—তোকে বলব! তুই কোথা যাবি?

ততোধিক বিস্ময়ে হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল সান্ত্বনা।—আমি যাব না? এক বছর ধরে এত বড় একটা ব্যাপার হচ্ছে সেখানে, এখন তুমি একলা যাবে আর আমি এখানে বসে থাকব? তুমি বলো কি বাবা!

যেন এই এক বছরই যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে, এখনো সে গিয়ে পৌঁছুতে না পারলে এত বড় একটা ব্যাপারের সব কিছুই পণ্ড।

মনে মনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন অবনী বাবু। কণ্ঠস্বরে একেবারে উড়িয়ে দিতে চাইলেন সান্ত্বনার ইচ্ছেটা।—হ্যাঁ, সাত-তাড়াতাড়ি এখন তোকে সুদ্ধু নিয়ে গিয়ে উপস্থিত হই আমি—কোথায় থাকব কি ব্যবস্থা কিছুই ঠিক নেই। পরে না হয় এক সময় ঘুরে দেখে আসিস, এখনো দু'-তিন বছর তো লাগবেই সেখানকার কাজ শেষ হতে।

—না না না না না! আমি কিছুতে থাকব না এখানে, আমি যাবই তোমার সঙ্গে—আজ তিন বছর ধরে আমাকে নিয়ে যাবে নিয়ে যাবে করে ভোলাচ্ছ—তোমার শরীর খারাপ হয়েছে, তোমারও দেখাশুনা দরকার, যাবই আমি—।

আলটিমেটাম দিয়ে এক ঝটকায় সান্ত্বনা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিপদগ্রস্তের মত বসে রইলেন অবনী বাবু। কিন্তু তবু সহজে রাজি হলেন না তাকে নিয়ে যেতে। মাসিও তাঁর দিকেই সায় দিলেন। মেয়ে নিয়ে যাওয়া কোন কাজের কথা নয়। দু'জনে মিলে অনেক বোঝালেন তাকে, পরে নিয়ে যাওয়া হবে বলে আশ্বাসও দিলেন। বাধ্য হয়েই হাল ছাড়লেন শেষে।

—চলুক তা'হলে। অবনী বাবু বললেন, মোটে তিন-চার ঘণ্টার পথ মোটরে—একটা কথা বলারও লোক পাবে না যখন আপনিই পালিয়ে আসতে চাইবে।

মাসির বাড়িতে শোকের ছায়া নামল যেন। মাসি তো মাসি, মনে মনে একটু বিরূপ হয়ে উঠেছিল যে মাসতুত বোন সে পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে চোখ ফোলাল। কিন্তু একটুও কাঁদতে পারছে না, এতটুকু লোকদেখানো মন খারাপও করতে পারছে না শুধু সান্ত্বনাই। সেই জন্যেই বরং খারাপ লাগছে তার, অপরাধী মনে হচ্ছে নিজেকে। কেমন করেই বা পারবে সে মন খারাপ করতে! মাসির বাড়ী ভালো। খুব ভালো।

এত ভালো হয় না। কিন্তু সে যাচ্ছে কোথায়? ওই দূর আকাশের গায়ে মেঘের মত মিশে আছে যে পাহাড়গুলো—যাচ্ছে তাদেরই একেবারে বুকের ডগায় বাস করতে। যাচ্ছে ওই দুর্বোধ্য বিরাট বিস্ময়ের মধ্যে নিজেকে মিশিয়ে দিতে। সেখানে বিজ্ঞানের যে কারিগরি চলেছে যুগ-যুগান্তের মাটির তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে, যাচ্ছে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে। একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে, সঙ্গে দাঁড়িয়ে, মধ্যে দাঁড়িয়ে। যাচ্ছে, মানুষের হাতে-গড়া বিধাতার দণ্ডের এক সার্থক প্রতিবাদ দেখতে। যাচ্ছে মড়াই নদীর ড্যাম দেখতে। ছায়াপথ নয়, আকাশগঙ্গা নয়। মন খারাপ সে কেমন করে করবে? শরতের খুশির আকাশে হালকা মেঘের নিরানন্দ কতটুকু?

[ক্রমশঃ।

টালিগঞ্জের ট্রাম-ডিপো।

তারই গায়ে লটকানো মস্ত বড় নিশানা : Trespassers will be prosecuted', রাস্তা থেকেই নজরে পড়ে। এরই পেছনে বিরাট এক অঞ্চল নিয়ে গড়ে উঠেছে ভারতীয় ফিল্ম-সাম্রাজ্য ; হলিউডের অনুকরণে যার নাম করা হয়েছে 'টলিউড'। একদিন এ-দেশের ছবির মানচিত্রে বোম্বাই এবং মাদ্রাজের পরিচয় ছিলো অনুল্লেখ্য। জীবনের সকল ক্ষেত্রে বাঙালী যেমন এগিয়ে ছিলো সর্বাগ্রে, ফিল্ম-তৈরীর অপটু ভূমিকাতেও প্রথম দেখা দিয়েছিলো বাঙালী পটুয়ারাই। টালিগঞ্জ ছিলো এই সেদিনও তাই মুক্তিকারের টলিউড ; একমেব এবং অদ্বিতীয়। চিত্রজীবিদের মক্কা।

অনেক উত্তেজনা আর বিপুল সম্ভাবনার স্বপ্নে আকুল হয়ে টলিউডের মরীচিকায় যেদিন প্রথম পা বাড়াবেন, সেদিন পা টলবে না কিন্তু মাথা ঘুরবে। আলেয়াকে মনে হবে আলো ; জোনাকিকে তারা : চোরাবালিকে শক্ত ভিৎ। সেদিন আর সেই সঙ্গে যে একদিন অনেক কেঁদে এবং তার চেয়ে অনেক বেশী কষ্টে এই মরীচিকার বাইরে বেরিয়ে এসে প্রাণভরে নেবেন মুক্তির নিঃশ্বাস, সেদিনও চোখের ওপর জ্বলজ্বল করে উঠবে ট্রাম কোম্পানীর নিশানা ; Trespassers will be prosecuted !

সত্যিই তাই। ভারতীয় ছায়াচিত্র-জগতের রামরাজ্যে যারা জ্ঞানী এবং যারা গুণী তারাই চিরকাল trespasser বলে গণ্য। প্রতিভা, পরিশ্রম আর বিদ্যার ক্ষেত্রে যারা নগণ্য তারাই এখানে সংখ্যায় অগণন। সেই অসুরদের হাতে চিত্রশিল্পের চিরকালের আরাধ্যা দেবী ভারতী বন্দিনী ; তার অশ্রুত কান্না কখনও কখনও কোনও-কোনও গুণীর কানে গিয়ে তাকে পথ ভুলিয়ে নিয়ে আসে বটে এখানে, কিন্তু অশোক-কাননে বন্দিনী সীতার ভাগ্যে ঘটে না কোনও অঘটন ; অহল্যার পাষাণে সঞ্চারিত হয় না প্রাণ ; বারুদশূন্য দেশলায়ের কাঠি আগুন দেয় না ঘষলেও। শুধু কয়েকদিনের মধ্যেই যে যায় তারই হয় আশ্চর্য রূপান্তর। মুখের ওপর ওঠে মুখোস : আসলের পরিবর্তে মেক-আপ ; নিজে না খেলে প্লে-ব্যাক। সেই পুরাতন প্রবাদ নূতন করে সত্য হয়। লঙ্কায় যে-যায় সে-ই হয় রাবণ।

বাহান্নপীঠের অন্যতম হচ্ছে কালীঘাট। মায়ের কড়ে আঙুল পড়েছিলো যে মাটিতে সেই মাটি এখন বহু মানুষের প্রণামে পবিত্র ; বহু অমানুষের ধর্মের নামে অর্থ অপহরণের লীলাক্ষেত্র। কলকাতার সম্পূর্ণ ইতিবৃত্তের আজও পুরো আবিষ্কার হয়নি সম্ভব ; কিন্তু কলকাতার খ্যাত-অখ্যাত গলি-রাজপথের, ব্যবসাকেন্দ্রের, আদালত আর কারাগারের, বাজার, বারনারী পল্লী, শ্মশান কিংবা গোরস্থানের উৎপত্তির নিশ্চয়ই আছে ইতিহাস। কিন্তু টালিগঞ্জেই কেন গড়ে উঠল ছায়াচিত্রের মায়ালোক তা' রিসার্চ-ষ্টুডেন্টের অনুসন্ধানের বিষয় না হতে পারে, কিন্তু তা' রসিকের কৌতূহলের খোরাক হতে পারে অনায়াসেই।

সে ইতিহাস না উল্টিয়েও বলতে পারি স্থান নির্বাচনে কোনও ভুল হয় নি। আধুনিকতম উপনগর জামসেদপুর টাটার কারখানার ভিত্তিস্থাপনের পরামর্শ দিয়েছিলেন একজন বাঙ্গালী ! তাঁর নাম ৺প্রমথনাথ বসু। কয়েকজন শিক্ষিত লোকের কাছে ছাড়া সে নামের কোনও অর্থ নেই আর কারুর কাছে আজ। তার বদলে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে যে, তার যে অভাবই থাক, অর্থের



নীলকণ্ঠ

অভাব গেছে মিটে ; টাটার নামেই এই জায়গা আজ লোকমুখে টাটানগর। ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্মে বিচিত্র হরফে খোদাই করা জামসেদপুর হয়ে গেছে মিথ্যে। সেই সত্য যা রচিবে তুমি ; কবি ঠিক বলেননি। কবির কল্পনা নয়, মিণ্টের মুদ্রা যা রচনা করবে শুধু তারই মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে অর্থ। যা অর্থপূর্ণ তাই সত্য ; যা 'সত্য' তা' আজ অর্থহীন।

টালিগঞ্জের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড জুড়ে টলিউডের অধিষ্ঠান। শহর থেকে দূরে ; কিন্তু অনেক দূরে নয় ; অনতিদূরেই। ট্রাম আছে ; বাস আছে দোরগোড়া পর্যন্ত। অন্দরমহল অব্দি গেছে সাইকেল-রিক্সা। গাড়ী না থাকলেও যারা ভীড়ের সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করতে নারাজ তাদের জন্যে আছে প্রাইভেট ট্যাক্সী। ময়দানব, এক যুধিষ্ঠিরের জন্যে, একটি মাত্র ইন্দ্রপুরী বানাতেই নিজেকে ক্ষয় করেছেন পুরো। আধুনিক ছায়া-দানবরা এখানে একাধিক ইন্দ্রপুরী গড়ে তোলবার পরেও এখনও অক্ষয়বটের মত নিজের মহিমায় গরীয়ান। মর্তলোকের এই ইন্দ্রপুরীতে চন্দ্র-সূর্য বায়ু-বরুণদেরই আধিপত্য। এখানেও উর্বশী মেনকা রম্ভার নেই অভাব ; দেব-দৈত্যে দিনরাতের লড়াই। শুধু এ-রাজ্যে মানুষ নেই একজনও। কিংবা থাকলেও মানুষের কোন মর্যাদা নেই এখানে।

দিনকে এরা সত্যিই রাত করতে পারে ; রাতকে দিন। কাহিনীতে রাতের বর্ণনা যেখানে তার ছবি নেওয়া চলছে দিনে। 'দিনের' ছবি উঠছে রাতে। Make-believe-art-এর ধর্মই তাই। ন্যুট হামসুন লিখেছিলেন Growth of the Soil, পৃথিবীর মহত্তম উপন্যাসের একটি। আর একটি লিখতে পারতেন ;

এই অপুন্যস্পৃষ্ট ভূমিতে যদি গিয়ে পড়ত স্থামসুনের প্রতিভা-সম্পৃক্ত চোখ, তবে জন্ম নিত 'Growth of the Foil'।

জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে Failure হচ্ছে Success-এর Pillar; শুধু ফিল্মের ক্ষেত্রে নয়। এখানে একেকটি Success হচ্ছে ভবিষ্যতের অবধারিত Failure-এর একেকটি Pillar. রেসের মাঠের মত। প্রথম বাজী মেরেই চিরকালের মত শীকার হওয়া। মরীচিকার মত; দূরের থেকে মনে হয় জল; কাছে গেলেই ধূ-ধূ বালি; তৃষ্ণা মেটে না, বাড়ে। 'চিচিং ফাঁক' বললে ঢোকবার দরজা একবার খুলে বন্ধ হয়ে যায়; চিচিং ফাঁক বললে সেই বন্ধ দরজা কিন্তু আর খোলে না; বেরুবার করে দেয় না রাস্তা। সারা জীবন এই গোলকধাঁধায় ঘুরে কেউ পায় না এখান থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ।

রঙ্গমঞ্চের দিন গেছে; এখন হচ্ছে মঞ্চরঙ্গের যুগ। রূপালী পর্দায় অতি নাটকীয় অভিনয় দেখলে আগে মন্তব্য করা হত; মঞ্চঘেঁসা অভিনয়। আজ মঞ্চের ওপর লোকে দেখতে চাইছে ফিল্ম আর্টিষ্টকেই। মন্তব্য দূরে থাক, মৃদু স্বগতোক্তিও শোনা যাচ্ছে না কারুর; মাইক-নির্ভর কণ্ঠের অপটুতাকেও থিয়েটারে মেনে নেওয়া হয়েছে অমায়িক ভদ্রতায় নয় শুধু, যেন এই হওয়া উচিত, এই রকম সোচ্চারো ঘোষণায়। বিংশ শতাব্দীর অব্যক্ত বেদনার সব চেয়ে বড় বাহক যে সিনেমাই হবে, এ এক রকম স্বতঃসিদ্ধ; কারণ যে যুগে ইমোশানের চেয়ে বড় হয়েছে মোশন. সে-যুগের যথার্থ প্রতিচ্ছবি হবে যে মোশন পিকচার, এ এমন বিচিত্র কী?

টলিউডের উদ্দেশ্যে যেদিন পা বাড়িয়েছিলাম সেদিন নিশ্চয়ই পাঁজিতে লেখা ছিলো: যাত্রা অশুভ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কালো টাকা শেষ হয় নি তখনও। টলিউডে ডবল শিফটে কাজ চলছে;. দিনে রাতে। এক-একজন আর্টিষ্ট ক্ষেপ মারছে এখান থেকে সেখানে; এ-ষ্টুডিও থেকে ও-ষ্টুডিওতে। টলিউডের বাইরেও গড়ে উঠেছে ষ্টুডিও; দক্ষিণেশ্বরে; ব্যারাকপুরে, পার্ক সার্কাসে। ষ্টুডিও-ভাড়া বেড়েছে দু'গুণের ওপর। আর্টিষ্টদের দৈনিক হার অসম্ভব। ফিল্ম পাওয়া সহজ নয়। তবু অমিত উৎসাহে নতুন-নতুন প্রযোজকেরা এসে দাঁড়িয়েছে ভীড় করে। বাঁধ ভেঙ্গে বেনো জল, খাল কেটে তারাই এনেছে কুমীর।

ট্রাম থেকে নেমে দাঁড়ালাম, সাইকেল-রিক্সা নেই একটিও। প্রাইভেট ট্যাক্সীর ষ্ট্যাণ্ডের বাইরে কি কারণে কে জানে, দাঁড়িয়ে আছে একটি মাত্র প্রাইভেট ট্যাক্সী, তাতেই উঠে বসলাম। ড্রাইভার বোধ হয় বসে-বসেই ঝিমোচ্ছিলো। গাড়ীটা নড়ে চড়ে উঠতেই সে পেছন ফিরে আমার দিকে তাকালো। তাকিয়ে হাসলো। টলিউডে প্রাইভেট ট্যাক্সীর ড্রাইভারের ঠোঁটেও ফিল্মষ্টারের হাসি। অবাক হই নি। শুধু ভাবতে চেষ্টা করছিলাম এ-জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণ অপরিচিত আমি, কার হাসির অনুকরণ করছে সে?

একটা-দুটো করে অনেক কথাই হলো। তারপর একসময়ে ফস্ করে জিজ্ঞেস করে বসেছি: হ্যাঁ-হে তোমার জামা-কাপড় দেখছি খুব দামী, এ-গাড়ী কি তোমার নিজের?

না, ষ্টুডিওর। আমি চাকরী করি!—জবাব দিয়েছে সেই অত্যন্ত সৌখিন ড্রাইভার।

তাহলে ত' তোমাকে বেশ ভালোই দেয় হে!—প্রশ্ন করি।

আজ্ঞে হ্যাঁ! মাসে বেশ কয়েক হাজার টাকা!—উত্তর হয়।

বল কি? ষ্টুডিওর গাড়ীর ড্রাইভার, তারও মাইনে হাজার?

হ্যাঁ! অবশ্য সেই সঙ্গে আমি কোম্পানীর ছবির ডিরেক্টর এবং আর্টিষ্টও কি না!

ষ্টুডিওর ভিতর গাড়ী ঢুকিয়ে আমার বেরুবার দরজা খুলে দিয়ে সরে দাঁড়ায় ড্রাইভার। তার পর তার কথা শেষ করে আমার হাঁ-হয়ে যাওয়া মুখের ওপর: আমার নাম, প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া। তারপর সে আবার হাসে। কারুর অনুকরণ নয় সে হাসি; সে-হাসিরই অনুকরণ করে সবাই।

পরলোকগত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া ছিলেন রাজকুমার। রাজার ছেলেরা যেমন হয় তেমন ছিলেন না সৌভাগ্যবশতঃ। জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে অগ্রণী হবার ক্ষমতা ছিলো পর্য্যাপ্ত; দুঃসাহস ছিলো দুর্দমনীয়। খেলাধূলা থেকে লেখাপড়ায় সমান সাফল্যের পরিচয় দিতে পারতেন, শুধু তাই নিয়ে থাকলে। রাজনীতিতে হতে পারতেন চাণক্য। তবুও একদিন এ-সব বাদ দিয়ে ছায়াচিত্রকে জড়িয়ে ধরতে চাইলেন কায়মনোবাক্যে। রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পত্র চাইলেন বিদেশে শিক্ষানবীশীর জন্যে। রবীন্দ্রনাথ নাকি বলেছিলেন যে, যদি কাজ করতে চান প্রমথেশ সত্যি-সত্যি, তাহলে একেবারে নীচু থেকে সুরু করাই ভালো। এ-কথাও বললেন যে, রবীন্দ্রনাথ নিজে-অবশ্য জীবনে কাজের মত কাজ কিছু জানলেন না, কিন্তু এটুকু জেনেছেন যে কোন কাজ একেবারে গোড়া থেকে না জানলে আগাগোড়া সম্পূর্ণ জানা হয় না কিছুতেই।

ভারতীয় ছায়াচিত্রে প্রমথেশের প্রতিভা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলো। সাফল্য-ব্যর্থতা, আনন্দ-বেদনা, পাওয়া না পাওয়া সব মিলিয়ে তবু যেন মনে হয় প্রমথেশ যেন কোথায় সব কিছু থেকে নির্লিপ্ত ছিলেন। যাঁরা বলেন প্রমথেশ অকালে গেছেন, তাঁরা ভুল বলেন, ছায়াচিত্রের সাজ্ঘাতিক ব্যবসা প্রবণতায় বিক্ষুব্ধ হয়েই তিনি সরে গেলেন; বেঁচে থাকলেও বোধ হয় এর থেকে শত হস্ত দূরে থাকতেন প্রমথেশ। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সেদিনকার একমাত্র প্রতিভাবান পুরুষ প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়ার ছবি তৈরী করাটাও ছিলো স্পোর্টস। তাঁর এ-রাজ্যে প্রবেশ, প্রবেশ মাত্রই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ এবং প্রস্থান সবই এত আকস্মিক, অভাবিত এবং অলোক-সামান্য যে মনে হয় সবটাই বুঝি ছায়াচিত্রের মতই কোনও ভোজবাজী! এ যেন কোনও রাজার ছেলের Roman Holiday!

টলিউডের রাস্তায় যত রিক্সাওলা অথবা চা-ওলা সবাই প্রায় পাকা ফিল্ম-জার্ণালিষ্ট! ফিল্মের এমন কোনও খবর নেই যার খবর রাখে না তারা; এমন কোনও ফিল্মষ্টার নেই যার হাঁড়ির কথা না জানে এরা। এবং মনে মনে সকলেই সেই দুরাশা পোষণ করে যে একদিন তারাও একটা 'চান্স' পাবে; পড়ে যাবে কোনও নীতিন বসু কি শান্তারামের চোখে আর ঘুরে যাবে জীবনের চাকা; চাকার নীচে থেকে উঠে আসবে ওপরে। দু'চাকার গাড়ী টানবে না; চার চাকার গাড়ী চাপবে। 'Desire of the moth for the Star' নয় আজ আর! Desire of the mammoth for the film star!

টলিউডের রাস্তায় চোখে পড়ে আরও একটি বস্তু। লোক চলাচলের রাস্তা যেখানে গিয়ে ঠেকেছে ষ্টুডিওর দোরগোড়ায় সেখানে লেখা আছে ; SOUND STUDIO ! Silence Please ! বাহুল্য হয়েছে একথা লেখা। কারণ সত্যিই সত্যিকারের জীবনের কথা এখানে এসে Silent হয়ে গেছে। ভারতীয় ছায়াচিত্রে কথার-শেষ নেই, কিন্তু তার একটিও জীবনের কথা নয় ; ভারতীয় ছায়াচিত্রে পাত্রপাত্রীর নেই অভাব : কিন্তু তার একজনও আমাদের দেখা সত্যিকারের মানুষ নয় ! তাই ষ্টুডিওর বাইরের যে অসংখ্য মানুষের আনাগোনা তাদের পদধ্বনি যেমন ষ্টুডিওর দরজায় এসে থেমে গেছে ; তেমনি থেমে আছে হৃৎপিণ্ডের ধ্বক-ধ্বক ধ্বনি চলচ্চিত্রের ছায়াবয়বে।

আরব্যোপন্যাসের রঙীন স্বপ্নাবেশ ঘিরে আছে রূপালী পর্দা। গোধূলির অস্পষ্টতা তার সর্বাঙ্গ ঘিরে সৃষ্টি করেছে কুহেলী ; রূপকথার রাজপুত্র আর রাজকন্যার কাহিনীই একমাত্র ছবির গল্প। ভাবলে অবাক হতে হয় যে সবাক হবার অনেক, অনেক বছর বাদেও আজও আমাদের দেশের ছবি আমাদের হাসি-কান্নায়, আনন্দ-বেদনায় নির্বাক ! যেদিন ছবি সত্যি-সত্যি নির্বাক ছিলো সেদিন Silence ছিলো গোল্ডেন ; কথা বলতে শুরু করেছে যেদিন থেকে আমাদের ছবি সেদিন থেকেই সে বাজে কথা বলতে শুরু করেছে। সংলাপ নয় প্রলাপ ! আকাশবাণীতে Talk বলে যে বস্তুর নামে আজও লেকচার শোনানো হয় এ-ও হয়েছে তেমনি ; না-Talk না জীবনের নাটক !

রবি ঠাকুরের ভাষা ধার করে তাই বাংলা চলচ্চিত্রকে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে : 'তুমি কি কেবলি ছবি ?' সত্যিই তাই। বাংলা ফিল্ম শুধু 'ছবি'-ই। না কি ভুল বললাম ? বাংলা ছবি শুধু 'ছবি' নয় ; তার চেয়ে কিছু বেশী ; 'জল ছবি।' অবাস্তব দুঃখের অর্থহীন চোখের জলের ছবি। প্রেম আর বিরহ ; এর বাইরে যেন মানুষের আর কোনও দায় নেই ; নেই বুঝি আর কোনও দায়িত্ব। পরীদের বিপথে চালনা করাকে এ-রাজ্যে বলা হয়ে থাকে পরিচালনা। underground music-কেই ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিক ; বিদেশী ছবি থেকে না বলে দৃশ্য-অনুবাদকে বলা হয় ক্যামেরা সেন্স ; এক ছিলিম খেয়ে তবেই যা লেখা যেতে পারে তাকেই বলা হয় film story ! আর ? আর,—সব মিলিয়ে যে-চিত্র এক পা-ও চলে না তাকেই বাংলা করে বলা হয়, 'চলচ্চিত্র।'

দুই

রূপকথার রাজ্য এই ফিল্ম ষ্টুডিওর ভেতরে পা দিয়েই কিন্তু বোঝা যায় এর সবটাই কিছু রূপকথা নয় ; এখানে যারা কাজ করতে আসে তাদের সাফল্য ব্যর্থতার আশা-আশঙ্কার, বঞ্চনা আর স্বার্থত্যাগের অপরূপ কথাই এর প্রাণের কথা। ফিল্ম ষ্টুডিওর সমস্ত বিভাগেই একদল আছে যারা নামে assistant, আসলে ass ! সত্যিই গাধা। কারণ এদেরই পিঠে সমস্ত বোঝা ; বোঝার ওপর পরিচালকের বাড়ীর ফায়-ফরমাস হলো শাকের আঁটি। জীবিকার যে কোন ক্ষেত্রে কর্তার মাইনের সঙ্গে ডেপুটি কর্তার আয়ের তফাৎ আছে কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাৎ নেই। আই-জি আর ডি-আইজিতে, পি-এম-জি আর এ-পি-এম-জিতে, এ্যাকাউন্টেণ্ট আর ডেপুটি একাউন্টেণ্ট জেনারেল, সকলের মধ্যেই মাইনের পার্থক্যে ভারসাম্য আছে। নেই শুধু ফিল্মের ডাইরেক্টর আর এ্যাসিষ্টেণ্টে। চিত্র কিংবা সঙ্গীত পরিচালক, শিল্প নির্দেশক আর আলোকচিত্রকর কারুরই সঙ্গে তার সহকারীর জীবিকার এবং সেই সঙ্গেই জীবন-যাত্রার কোন তুলনা হয় না। চিত্র পরিচালক যেখানে একখানা বাংলা ছবি করতে বিশ হাজার পায় সেখানে তার প্রথম সহকারীর মাসিক উপায় হচ্ছে বেশি হলে দু'শো, খুব সাঙ্ঘাতিক রকম বেশি হলে তিনশো। এই উপায় চলে ছবির পরমায়ুকাল পর্যন্ত ; অর্থাৎ নতুন পরিচালক হলে তিন-চার মাস, নিউ থিয়েটার্সের ষ্ট্যাম্প দাগা থাকলে পরিচালকের পিঠে, এক বছর।

হাসবেন না কথাটা পড়ে ; নিউ থিয়েটার্স—আর সেই যুগে ভারতীয় ছায়াচিত্র-জগতের পরমপুরুষ শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার যখনই তাঁর কোম্পানীর কোনও ডিরেক্টরকে জিজ্ঞেস করতেন ; ছবির আর বাকী কত ? অমনি জবাব আসতো : আর তিন দিন। তিন দিন মানে আরও তিন মাস। যতদিন প্রোডিউসারের হাড়-মাস এতটুকুও বাকী আছে চিবিয়ে খাবার ততদিন চলছে সেই তিন দিনের জের। এই যে বিখ্যাত বাকী তিন দিন ;—অর্থাৎ তিন মাস, এই সময়টা যে কাজ হয় তার নাম প্যাচ ওয়ার্ক। আসলে প্যাঁচের কাজ। ছবি শেষ হয়ে গেলেই ত' পরিচালকেরও দফা শেষ। কাজেই দফায়-দফায় চলে প্যাচ ওয়ার্ক। ছবির উপসংহারের আগেই প্রোডিউসার সংহার-পর্ব সমাপ্ত।

ছোট-বড়-সেজো-মেজো কোন পরিচালকেরই এ-গুণে ঘাট নেই। আশী দিন এক নাগাড়ে শুটিং করবার পর এক লেখক-পরিচালক অবশেষে তাঁর প্রযোজককে জানান যে তুমি ত' ভাই ঘরের লোক ; তোমার কাছে লুকিয়ে লাভ কী ? এবারে আসল গল্পটা আরম্ভ করতে হয়।

আশী বছরেও কারুর বুদ্ধি হয় না : আবার কারুর আশী দিনেই হয় আক্কেল গুড়ুম।

ছায়াচিত্র-জগতের প্রতি যেন কোন অদৃশ্য মহাশক্তি বিপুল বিরূপ। ম্যাডান কোম্পানী চিত্রজগতের মানচিত্রে একদিন বিস্তার করেছিলো নিজেদের আসমুদ্র হিমাচল। তারপর একদিন শূন্যে মিলিয়ে গেছে হাউয়ের মতো তাদের জ্বলে ওঠা। টিম-টিম করছে এখন তাদের এখানে-ওখানে দরজা খুলে রাখা, খেলো দুটি-একটি হাউসের স্মৃতি। নিউ থিয়েটার্সের দিগ্বিজয় এখনও অতীতের কঙ্কাল হয় নি, কিন্তু হাতী যাদেরকে পিঠে সওয়ার করে বেরিয়েছিলো একদিন তারাই হাতীকে দ'য়ে মজিয়েছে আবার একদিন। নিজেরা অবশ্য এখনও বাজারে চালু আছে ওই হাতী দেখিয়েই ! মরা হাতী যে আজও লাখ টাকা। চিত্ররাজ্য এক বিচিত্র রাজ্য ! এখানে আজ যার জয়-জয়গান ; কালই হয়ত তার ৺বিজয়ার ভাসান।

মাঝে মাঝেই মনে হয় সবই বুঝি কপালের মহিমায় ! কিন্তু তা নয়। ফিল্ম, শেয়ার মার্কেট, রেস এই ত্রহস্পর্শে মানুষ আজ রাজা, কাল ফকির হতে বাধ্য ! এখানে ছপ্পড় ফুঁড়ে টাকা পড়ে ঠিক। কিন্তু তারপরে ভোজবাজীর মতো মিলিয়ে যে যায় সমস্ত বৈভব, তা-ও ঠিক।

পথের ধারে ভিক্ষে করে একজন। তাকে পয়সা দিতে গেলেই সে বলে : আগে আমাকে এক থাপ্পড় দাও তবে আমি এক পয়সা নেব। এরকম অদ্ভুত কথা শুনে জানতেই হয় তার কারণ। কারণ

জানবার পর অবশ্য বোঝা যায় তার বক্তব্য অদ্ভুতও নয়; অকারণেও নয়। এক সাধুর সঙ্গে ছিলো সাত বস্তা মোহর সাতটি গাধার পিঠে। এই ভিখারী এক সময়ে তার শরণাপন্ন হয়। ফলে তিনি সব তাকে দিয়ে দেন; তাছাড়া দেন একটি আয়না। তার দিকে এক চোখ বন্ধ করে তাকালে এই সসাগরা পৃথিবীর সমস্ত ঐশ্বর্য দেখতে পাওয়া যায়। এবং চাওয়া মাত্র পাওয়া যায় তা'। কিন্তু দু'চোখ খুলে দেখলেই সর্বনাশ!

ভিখারী হ'ল সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর। সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর কিন্তু মনে রাখলো না সাধুর মানা; দু'চোখ খুলে দেখতে গেলো আয়নায় আরও কী দেখা যায়। সসাগরা পৃথিবীর সম্রাট আবার মুহূর্তের মধ্যে হলো পথের ভিখারী।

রাস্তার ধারে কাউকে ভিক্ষে করতে দেখলেই আমার মনে পড়ে এই গল্প; আর মনে-মনে একটা প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা জাগে; ইচ্ছে করে জানতে কোনও সময়ে এই ভিখারী ছবির প্রোডিউসার ছিলো না ত'?

সত্যিই, প্রত্যেক ভারতীয় ছবির বিখ্যাত পরিচালকদের লোকে যাই বলে ডাকুক, আসলে তাদের সকলের একটি 'ডাক' নাম আছে। এক ডাকে চেনবার সেই নাম হলো 'বাঁশ'। নতুন ছবির কন্ট্রাক্ট সই করবার সময়েই তারা বোধ হয় সবাই মনে মনে প্রযোজকের উদ্দেশ্যে বলে: বাঁশ দেব কী?

কিন্তু ass চিরকাল assই থাকে। assistantরা যতদিন assistant থাকে ততদিন সেই গাধা হয়েই থাকতে হয়। প্রোডিউসার-বধ কাব্যে তাদের কোনও লাভের অংশ নেই। তারা শুধু গালাগাল খেয়েই খালাস; আর কখনও একেবারেই না-পাওয়া; না হলে মাইনে দেরীতে পাওয়াই তাদের একমাত্র ভাগ্যফল।

এই সব এ্যাসিসটেন্টদের মধ্যে শিক্ষিত ছেলে আছে; সত্যিকারের গল্প লিখতে পারে এমন কলমও। তারা ছায়াচিত্রকে ভালো করবে এই উটোপিয়া মাথায় নিয়ে আসে। প্রথম প্রথম তাদের সে আদর্শ অনেক কষ্ট সহ্যও করায়। তাদের মাথার পোকার সুবিধে নিয়ে তাদের মাথার ওপর যারা থাকে তারা নির্বিবাদে এদের অনেক ভাবনা-চিন্তার ফল ছবিতে নিজের বলে চালিয়ে দেয়। অনেক সহকারীর মাথায় পা দিয়ে অনেক অযোগ্য অপদার্থ এ লাইনে দিব্যি নিজের সোনার সংসার গুছিয়ে নেয়। এ-লাইনের ইতিহাসই হলো তাই।

ডলারের দেশে যেমন অভাব নেই দরিদ্রের; লাখ লাখ টাকা নিয়ে যেখানে ছিনিমিনি খেলা চলছে সেই চলচ্চিত্রের ব্যবসাতেও তেমনিমাত্র কয়েক জনেরই শুধু গ্যাবাডিন গাড়ী আর, গয়নার গ্ল্যামার; বাকী কারুরই পেটে পুরো ভাত নেই। পৃথিবীর সকল প্রান্তে যা ঘটেছে এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি। অনেক লোকের পেটের-ভাত মেরে কয়েকজনেরই কেবল চাল মারা।

চলচ্চিত্র-রাজ্যের ওপর জগতের যিনি চলচ্চিত্রকার, তাঁর অভিশাপ আছে, অনেকেরই এমন সন্দেহের কথা এর আগেই লিখেছি; কিন্তু তা নয়। আসলে এতো অনায়াসে এখানে এতো অর্থ এতো অল্প লোকের হাতে এতো অল্প সময়ের মধ্যে এসে পড়ে যে তারই ফলে যা অনর্থ হবার তা হয়। একজন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক মাসে দেড় হাজার টাকা রোজগার করেন খেয়ে পরে বই কিনে বিশ্ববিদ্যালয়কে লাখ লাখ টাকা দিয়ে যান; দিয়ে যেতে পারেন কারণ অর্থের মূল্য তিনি বোঝেন। কিন্তু একটু রাঙা মুলো ধরণের চেহারা হলেই যদি হাজার টাকা হাতে আসতে থাকে তবে আবার তা' হাত থেকে উড়ে যাওয়ারই কথা। জানি অভিনয় করতে কি বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচালক হ'তেও ক্ষমতা দরকার হয় কিন্তু তার আর্থিক মূল্য যদি এতো বেশি হয় তবে তা' ক্ষতির কারণ হ'তে বাধ্য। পঞ্চাশ টাকা যার যোগ্যতা তার পাঁচশো করে আসতে থাকলেই সে ফুলতে থাকে। ফুলতে ফুলতে ফেটে যায়। ফানুষের বেলাতে যা; মানুষের বেলাতেও তাই যে!

অনেক চোখের জলে একজন নাট্যকারের যে কথা ক'টি আজও সিক্ত, তা'হলো 'দেহপট সনে নট সকলি হারায়'! কিন্তু বাংলা ফিলমের অভিজ্ঞতা থাকলে একথা সেই অমর নাট্যকার কিছুতেই বলতে পারতেন না। এখানে দেহপট নষ্ট হ'তে থাকে যত, অভিনেতার নায়ক হবার এবং অভিনেত্রীর নায়িকা হবার সুযোগ স্পষ্ট হতে থাকে তত! pot যত জালা হতে থাকে ততই তার দাপট বাড়ে। বাংলা ষ্টেজে তার পরিচয় নেই এমন নয়, কিন্তু বাংলা হিন্দী ছবিতে তাই হলো পার্মানেন্ট ফিচার। এবং দর্শকের পার্মানেন্ট ডিসকমফিচার। যে-নায়িকা আর যে নায়ক যত স্থূল তাকে নিয়ে তত হুলুস্থুল!

কিন্তু এ হলো এ-রাজ্যের এক দিক; একমাত্র দিক নয়। দশাননে যার বর্ণনা অসম্ভব সেই চিত্ররাজ্যের বিচিত্র মহাভারত কোথা থেকে সুরু এবং কোথায় সারা করা যায় চট করে তা' বলা শক্ত। রূপালী পর্দায় ছায়াছবির কাহিনীতে যতই ভ্যারাইটির অভাব হ'ক, রূপালী পর্দার অন্তরালে যারা এই রাজ্যের অধীশ্বর আর যারা এই রাজ্যের প্রজা তাদের প্রত্যেক দিনের জীবনে আর যারই অভাব থাক, বৈচিত্র্যের অভাব অনুভূত হয় না কখনই। রূপালী পর্দায় যে বাংলা ছবির প্রতিফলন তা' প্রায়ই রবিবারের ষ্টেটসম্যান পত্রিকায় classified বিজ্ঞাপনের পাতার মতো; অর্থাৎ আগাগোড়া তার সর্বাঙ্গে situation wanted-এরই শুধু বিজ্ঞাপন! কিন্তু সিচুয়েশানের অভাব নেই পর্দার অন্তরালে আছে যারা তাদের জীবনে। তাদের জীবন নিয়ে যদি কোনও ছবি তৈরী হতো, তাহলেই শুধু জানা যেতো যে ছবির জন্যে আর যারই অভাব থাক গল্পের অভাব নেই।

ফিল্ম লাইনের যারা পাণ্ডা তাদের মধ্যে 'টাইপের' অভাব নেই। কাঠের নয় রক্তমাংসের হরফ একেকটি। কিন্তু এখন যাঁর কথা বলছি তিনি কোনও সাধারণ টাইপ নন; তিনি হচ্ছেন এ লাইনের লাইনো টাইপ। আমি কিনয় বাবুর কথা বলছি। আজ্ঞে হ্যাঁ! হাঁ করে থাকবার মতো কিছু বলি নি। ভদ্রলোকের অরিজিন্তল অথবা এবরিজিন্তল নাম একটা কিছু ছিল নিশ্চয়ই। সে হ'লো স্মরণাতীত কালের কথা। সবাই সে নাম ভুলে গিয়ে তার নতুন নাম দিয়েছে কিনয় বাবু। সেই নামই মেনে নিয়েছেন তিনি নিজেও। কিনয় বাবু বলে ডাকলেই তিনি বলেন: বললুন! (উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষার মারাত্মক দায়ে তিনি 'ও'-র বদলে 'অ' ব্যবহার করেন। যথা: গোরুকে তিনি বলেন গরু।)

কিনয় বাবু নামের নিশ্চয়ই ইতিহাস আছে। সেই ইতিহাস এই কথাই বলে যে একদিন এই কিনয় বাবু গল্পলেখক হিসেবে ঢুকেছিলেন এ-রাজ্যে। আজ তিনি অরিজিন্যাল গল্পলেখক; পরের গল্পের চিত্ররূপ দাতা; নিজের গল্পের চিত্রনাট্যরূপদাতা ও পরিচালক, দুই-ই। কখনও কখনও কাজ না থাকলে অগত্যা প্রযোজকও বটে! অর্থাৎ 'তিনি কী নয়?' এই প্রশ্নের গর্ভ থেকেই প্রসব হয়েছে আজকের সেই চালু নামটি, 'কিনয়'।

কিনয় বাবু কখনও শুধু কথা বলেন না; সর্বদাই 'ডায়ালগ' দেন! উপমায় যেমন কালিদাস; কথায় তেমনি কিনয়! ঠিক কথায় নয়; সংলাপে। প্রত্যেকটি সংলাপ এককেটি হীরার টুকরো। একদিন একজন তাঁকে জিজ্ঞেস করেছে কোন্ সময়ে গেলে তাঁর সুবিধে হয় কথা-বলার? কিনয় বাবু বলেছেন: সন্ধ্যেয়! দর্শনার্থী ফের বলেছে: সন্ধ্যেবেলায় সারাদিন স্যুটিংএর পর আপনি ক্লান্ত থাকবেন না? 'না', জবাব করেছেন কিনয় বাবু; তারপর ছেড়েছেন স্বভাবসিদ্ধ উচ্চারণে: কর্ম থেকে কর্মান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করারই অপর নাম ত' বিশ্রাম। সে শুনেছিলো সে তক্ষণে শুয়ে পড়েছে লম্বা হয়ে!

ডিমওলা টাকার তাগাদা করছিলো কিনয় বাবুর কাছে। তাগাদা করে ভুল করেছিলো। কিন্তু সে-কথা তার মাথায় একেবারেই ঢোকবার নয়। একবার ঢুকলে অবশ্য আর বেরুবার নয়। ডিমওলাকে কিনয় জিজ্ঞেস করেন: ডিমের সার্থকতা কিসে বলত? ডিমওলা তা' জানবে কোথা থেকে? কাজেই সে চুপ করে থাকে। তখন কিনয় বলেন: ডিমের সার্থকতা হচ্ছে তা' দেওয়ায়; আমি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে দেশের আদর্শের ডিমে তা দিচ্ছি! আমার কাছে সামান্য টাকার জন্যে তুই তাগাদা করিস? ছি!

ডিমওলা সেই যে পাকিস্থানে পালালো আজও তার আর দেখা নেই। তবু কখনও-কখনও গ্রীকের সঙ্গে গ্রীকের দেখা হয়ে যায় বৈ কি। তখনই জমে রগড়। ষাঁড়ের সঙ্গে ষাঁড়ের লড়াই চরম উপভোগ্য হয় বিনা-প্রদর্শনীর কারণে। 'বার্ণার্ড শ'' বোঝাচ্ছেন একজনকে কিনয় অনেকক্ষণ। পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো আরেক ধুরন্ধর। সওয়া ঘণ্টার ওপর বার্ণার্ড শ' শুনবার পর আর সওয়া গেলো না। সে সবাইকে শুনিয়ে কিনয়কে ধমকালো: আর কতক্ষণ বার্ণার্ড শ চলবে? এদিকে তোমার এম-এল-শ'র যে দরজা বন্ধ হয়ে যাবে।

কিনয়ের কথা সেই প্রথম বন্ধ।

কিন্তু ওই কথাটির মধ্যেই চলচ্চিত্র রাজ্যের সমস্ত কথাই বলা হয়ে গেছে। বাস্তবিকই ফিল্ম ওয়ার্ল্ড'ই একমাত্র জায়গা যেখানে যথার্থই মুড়ি-মিছরীর একদর। এই একমাত্র স্থান যেখানে বার্ণার্ড শ আর M. L. Shaw-তে কোনও তফাৎ নেই। সত্যিই নেই; বিশ্বাস করুন। [ক্রমশঃ।

আশ্চর্য্য এই চোখ!

আপনার চোখের মতো অন্য কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিই আলোতে অতখানি সাড়া দেয় না। অন্ধকারে চোখের এই সাড়া দেবার ক্ষমতা লক্ষগুণ বেড়ে যায় এবং একটি মোমবাতির আলোর হাজার ভাগেরও কম ক্ষীণ মৃদু আভায় আভাস আপনি দেখতে পাবেন। খুব ঝলমলে উজ্জ্বল আলোতেও আপনি দেখতে পাবেন; এক বিলিয়ন বা লক্ষ কোটি মোমবাতির আলোর চেয়েও উজ্জ্বল আলোতে আপনি দেখতে পাবেন।

আপনি তারার আলো দেখেন। কিন্তু সব চাইতে কাছের তারাটির দূরত্ব কত জানেন? ২৪ বিলিয়ান মাইল অর্থাৎ দশ লক্ষ × দশ লক্ষ × চব্বিশ মাইল।

চোখের সাহায্যে আপনি পৃথিবী সম্পর্কে কতটুকু জানতে পারেন? কেউ কেউ বলেন, দশ ভাগের ন' ভাগ মাত্র। কিন্তু খুঁটিনাটি সমস্ত কিছুই যদি ধরা হয়, তবে এই জানার পরিমাণ কত হয় বলুন তো?

মনে করুন, চোখ বন্ধ করে আপনাকে অপরিচিত কোন ঘরে রাখা হলো। তার পর আপনাকে কেউ সেই ঘরের বর্ণনা দিতে চেষ্টা করল। যদি সে অনেকক্ষণ ধ'রে বর্ণনা করতে থাকে, তাহ'লে মোটামুটি প্রায় সমস্ত কিছুই উল্লেখ করে যাবে। কিন্তু সব কী উল্লেখ করতে পারবে? না,—ছোট-খাট অনেক কিছুই বাদ যাবে তার, —ধরুন দেওয়ালের কাগজের ছোট দাগটার কথা বলতে ভুলে যাবে সে। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, আমাদের দৃষ্টির অত্যন্ত দ্রুতগতি এবং আমাদের শরীরের অন্যান্য অংগ-প্রত্যাংগের কাজের সংগে এর যোগ খুব নিবিড়।

আলো কোথেকে আসে? বিভিন্ন রকম—আছে: তাপ, আলো, রঞ্জনরশ্মি। এদের মধ্যে তফাৎ যা তা হলো দৈর্ঘ্যের, বহুদূরপ্রসারী, রঞ্জনরশ্মি খুব বেশী দূর যায় না। আলোর তরঙ্গ বলতে বুঝি তাকেই, যা আমাদের চোখে সাড়া দেয়। যে আলো আমরা দেখি এক ইঞ্চি জায়গায় তার চল্লিশ থেকে ষাট হাজার তরঙ্গ (Waves) সৃষ্টি হয়ে থাকে।

দর্শনীয় বস্তুর ছবি নেত্রমুকুর বা lens-এ প্রতিফলিত হ'য়ে নেত্রগোলকের (eyeball) পেছনের পর্দাতে গিয়ে পড়ে। এই পর্দাকে বলে অক্ষিপট বা retina. অক্ষিপট অনেকটা কার্পেটের মতো, অনেকগুলি ছোট-ছোট কোষ বা cell-এর সমন্বয়ে তৈরী। এই কোষগুলি আলো দেখলেই সাড়া দেয়। প্রত্যেকটি অক্ষিপটে এ-রকম ক্ষেত্র কোটি কোষ রয়েছে।

দু' ধরণের কোষ রয়েছে অক্ষিপটে। এদের একটিকে বলে rod অপরটিকে cone, কেন না, অণুবীক্ষণযন্ত্র বা microscope-এ তাদের অনেকটা rod এবং cone-এর মতোই দেখায়। উভয় জাতীয় কোষই খুব আলো-সচেতন, কিন্তু এদের কাজের ধরণে একটু তফাৎ আছে।

'রড'গুলো সাধারণ ভাবে আলোর অস্তিত্ব অনুভব করতে ব্যবহৃত হয়। অল্প আলোয় এরা 'কোণ-সেলে'র চাইতে বেশী সাড়া দিয়ে

থাকে। রাত্রিবেলা দেখার কাজে 'কোণ' ব্যবহৃত হয়। এই যে আপনি এ লেখাটা পড়ছেন, এও 'কোণে'র সাহায্যেই।

যে পাখি রাত্রিবেলা ওড়ে বা রাত্রি জাগে তাদের অক্ষিপটের প্রায় পুরোটাই 'রড-সেল'-এ তৈরী। দিনের আলোয় বাজপাখির দৃষ্টি খুব প্রখর, কারণ তাদের অক্ষিপট প্রধানত 'কোণ-সেল'-এ তৈরী।

'কোণে'র প্রায় বিশগুণ 'রড' আমাদের অক্ষিপটে বর্তমান। প্রায় অক্ষিপটের প্রচুর সংখ্যক 'রড' রয়েছে! কিন্তু চোখের কেন্দ্রস্থলের চোখের তারা বা তারারন্ধ্রের pupil ঠিক পেছনে কোনো 'রড' নেই। কেন্দ্রস্থলে একটি ছোট গর্ত মতন আছে, একে বলে 'fovea centralis' এই 'fovea centralis'-এর ভেতর এবং আশে-পাশে কতগুলি ঘন-সন্নিবদ্ধ 'কোণ-সেল' রয়েছে। চোখের এই অংশটিতেই আপনার দৃষ্টিশক্তি সব চাইতে প্রখর।

আপনি এই পুরো পাতাটা একসঙ্গে চট্ ক'রে দেখতে পাচ্ছেন। কিন্তু যখন পড়তে যাচ্ছেন, তখন একসঙ্গে দু'টো কি তিনটির বেশী শব্দ পড়তে পাচ্ছেন না। একটু আগে যাঁর কথা বলেছি, আপনার চোখের মাঝখানকার সেই গোলাকার অংশের বাইরে আপনি অন্যান্য ছাপা অক্ষরগুলো ভালো ক'রে আর দেখতে পাচ্ছেন না।

প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন এই চোখের এই কেন্দ্রাংশের সাধারণত সাহায্যে আটক অক্ষরের কোন শব্দ কিংবা 'এই' 'যে' 'সে' 'তার' প্রভৃতি অল্প অক্ষরের ছোট-ছোট কয়েকটি শব্দ একবারে পড়া যায়। বেশীর ভাগ সাধারণ বইয়ের এক একটি পংক্তিতে সাধারণত দশটা বা বারো-চোদ্দটি পূর্বোক্ত, 'এই' 'যে' 'সে' প্রভৃতি ছোট-ছোট কয়েকটি শব্দের বেশী থাকে না।

• যে সব পাঠক খুব তাড়াতাড়ি পড়তে অভ্যস্ত, প্রত্যেকটি শব্দ তারা আর দেখে পড়ে না। প্রত্যেক পংক্তিতে যদি বারোটা শব্দ থাকে, ধীর পাঠকের দৃষ্টি হয়তো একটা থেকে আরেকটা শব্দে যাওয়ার জন্যে, ধরুন, দশ বার লাফ দিয়ে যাবে। কিন্তু দ্রুত পাঠকের দৃষ্টি সেখানে তিন কি চার বার লাফ দেবে। অর্থাৎ প্রতিটি লাফে তারা তিন-চারটি শব্দ একসংগে দেখে এবং পড়ে নিচ্ছে। একটা শব্দ সে যখন সোজাসুজি দেখছে, তখন সে তার পাশের আরও দু-তিনটি শব্দের মোটামুটি চেহারা খুব স্পষ্ট না হলেও, দেখে নিচ্ছে। যদি সে শব্দগুলি চেনা-চেনা ঠেকে তবে তার দৃষ্টি ঐ শব্দগুলি ডিঙিয়ে চলে যাবে, থামবে না একটুও।

আলো-সচেতন 'রড সেল'গুলিতে visul purple বা rhodopsin নামে এক রকম জিনিস আছে। অন্ধকারে এই রং rhodopsin-এর রং purple বা এর ওপর যখন আলো পড়ে, তখন এর রং প্রথমে হলদে এবং তার পর বর্ণহীন হ'য়ে যায়। দিনের উজ্জ্বল আলোয় 'রড সেলে' 'রোডোপসিন' খুব কম থাকে, কিন্তু অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিমাণ বাড়তে থাকে, এবং অন্ধকারে সামান্যতম আলোতেও 'রড সেলগুলি' যথারীতি সাড়া দিয়ে থাকে।

মনে করুন, রৌদ্রোজ্জ্বল কোনো দিনে আপনি সিনেমা দেখতে গেছেন। যেই রোদ্দুর থেকে আপনি 'সিনেমা হলে' ঢুকলেন, তখন আপনি কিছুই দেখতে পেলেন না। আপনার 'সিটে' বসতে গিয়ে হয়তো কারোর কোলেই ব'সে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে আপনার দৃষ্টিশক্তি ঠিক হয়ে এলো এবং আপনি আবার সব ভালো ক'রে দেখতে পেলেন।

অনেকে মনে করেন, চোখের তারা বড়ো হয়ে যায় বলেই অন্ধকারে দেখতে পাওয়া যায়। তারা বড়ো হয় বটে, কিন্তু তা-ও হতে দু'-এক সেকেণ্ড সময় লাগে। তা' না হলে তো আপনি আলো থেকে অন্ধকার ঘরে ঢোকবার মুহূর্তেই সব স্পষ্ট দেখতে পেতেন। চোখের তারা বড়ো হওয়ার সংগে আরো একটা কাজ হয় চোখের মধ্যে। সেটি হলো rhodopsin বেড়ে যাওয়া। এই rhodopsin আস্তে আস্তে বাড়তে থাকে। ধরুন, সিনেমায় আপনার সিট খুঁজে নিতে পাঁচ মিনিট সময় লাগলো, এর মানে এই পাঁচ মিনিটে অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার পরিমাণ যত rhodopsin আপনার চোখের কোণগুলিতে এসেছে। এই rhodopsin পূর্ণ পরিমাণে আসতে আধ ঘণ্টা আন্দাজ সময় লাগে।

চোখের দৃষ্টির গতি কত দ্রুত হ'তে পারে?

আলোর মতো আমাদের দৃষ্টিও এক সেকেণ্ডে ১৮৬,০০০ মাইল পর্যন্ত যেতে পারে। অন্ধকারে দৃষ্টির গতি কম হয়ে যায়। অন্ধকারে কোন জিনিস ভালো ক'রে দেখতে আধ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। বিজ্ঞানীরা এটা প্রমাণ করেছেন এ-ভাবে:

কোনো লোককে একটা অন্ধকার ঘরে বসিয়ে দেওয়া হলো। ঘরের এক জায়গায় একটি ছোট উজ্জ্বল আলো ফেলা হলো। তার পর সেই আলোর উজ্জ্বল্য ক্রমশ: কমিয়ে দেওয়া হতে লাগলো এবং শেষ পর্যন্ত সামান্য একটু আলোর আভাস রাখা হলো মাত্র। প্রথম বার সেই উজ্জ্বল আলো থেকে শেষে একেবারে আলোর ম্লান আভাসটুকু দেখতে পাবার মতো দৃষ্টিশক্তি অর্জন করতে লোকটির তিরিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে। একটি উজ্জ্বল আলোর ঝলকানি আপনি একটি সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ অংশ সময়ের মধ্যে দেখে নিতে পারেন, কিন্তু সেই ঝলকানির একটি আলো-আলো আভাস সেই সময়ের পরেও বহুক্ষণ থাকবে।

বিমানের চালক ও পরিদর্শকদের পর্দায় কোন জায়গার ছবি ভেসে উঠবার সংগে সংগেই দেখে বুঝে নিতে হয়, কোন জায়গা সেটা। কোনো ছবি এক সেকেণ্ডের একের পঞ্চাশভাগ সময়ে যদি চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তবে তা অনায়াসেই চেনা যায়।

আমাদের চোখ বা দৃষ্টি খুব তাড়াতাড়ি ঘোরে। যদি না কোনো কিছুর ওপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করি, তবে তা' এক সেকেণ্ডের দশ ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যেও স্থির থাকে না। যদি আমরা দৃষ্টিকে নির্দিষ্ট কোনো কিছুর ওপর নিবদ্ধ করে রাখবার চেষ্টা করি, তবে সেই দৃষ্টিকে আমরা বড়ো জোর দু'সেকেণ্ড আড়াই সেকেণ্ড স্থির রাখতে পারি এবং ঐ সময়ের পর আবার দৃষ্টির বিবর্তন সুরু হয়। একটা কিছু থেকে আরেকটা কিছুতে আমাদের দৃষ্টি সরে যেতে এক সেকেণ্ডের একের পঞ্চাশভাগ সময় লাগে। আমাদের চোখের উপলব্ধি মস্তিষ্কে (brain) এত কম সময়ে গিয়ে পৌছায় যে, তার কোনো রকম হিসাব প্রায় অসম্ভব।

হাতের কৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে যাদুকররা বলে থাকেন, চোখের চাইতে হাতের গতি দ্রুত, এটা কিন্তু ভুল। চোখের গতি হাতের চাইতে অনেক—অনেক বেশি। যাদুকরদের হাতের দ্রুতগতি আপনাদের চোখে পড়তে পারে এবং তাকে ধরতেও পারবেন, কিন্তু চোখের গতি আপনার পক্ষে ধরা অসম্ভব!

দুইটি বিচিত্র জীবন-কাহিনী

শ্রীনগেন্দ্রকুমার গুহরায়

প্রকাশচন্দ্র রায় মহারাজা প্রতাপাদিত্যের বংশের সন্তান। তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে বহরমপুরে (মুর্শিদাবাদ জেলা) সহরে—পিতার কর্মস্থলে। প্রকাশচন্দ্রের পিতা প্রাণকালী রায় সেখানে কালেকটারীতে কাজ করিতেন। "পরোপকার ও শুদ্ধাচারের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন।" প্রকাশচন্দ্রের বয়স যখন ষোল বৎসর, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের বাড়ী চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত শ্রীপুর গ্রামে। পূর্বপুরুষের জমিদারীর বেশীর ভাগই হস্তচ্যুত হইয়া যায়; প্রাণকালী রায়ের সময়েও কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল।

বিদ্যাশিক্ষার্থে প্রকাশচন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। হেয়ার স্কুল হইতে ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এফ. এ. (বর্তমানের আই. এ.) পড়িবার জন্য তিনি আবার বহরমপুরে গেলেন। কলেজে অধ্যয়ন কালে আঠার বৎসর বয়সে তাঁহার বিবাহ হইল স্বগ্রামের কুলীন জমিদার বিপিনবিহারী বসুর দশ বৎসর বয়সের কন্যা অঘোরকামিনীর সঙ্গে। তখন ছিল বাল্যবিবাহ সমর্থনের ও স্ত্রী-শিক্ষা বিরোধিতার যুগ। প্রকাশচন্দ্র বিবাহের পরে এফ. এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বহরমপুর কলেজেই বি. এ. পড়িতে থাকেন। কিন্তু সংসারে বিষয়-বিত্ত লইয়া ভ্রাতৃবিরোধ চলিতে থাকায় তাঁহার পক্ষে বি. এ. পরীক্ষা পাশ করা সম্ভব হয় নাই। সাংসারিক বিবাদ, অশান্তি, অভাবাদির মধ্য দিয়া পরমেশ্বর যেন অঘোরকামিনীকে নিজ হাতে গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল কি মে মাসে অর্থাৎ ১২৬৩ সালের বৈশাখ মাসে। তাঁহার পিতৃকুল এবং স্বামিকুল—উভয় কুলই ছিল বিত্তবান ও সুখী। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ভাগ্য-দোষে বালিকা-বধূকে পড়িতে হইল দারিদ্র্য, দুঃখ-কষ্ট ও দুশ্চিন্তার অগ্নিকুণ্ডে। স্বর্ণ যেমন অনলে দগ্ধ হইয়া কালিমা-মুক্ত হয়, অঘোরকামিনীও তেমনই খাঁটি সোনা হইয়া অর্থাৎ হিন্দু পরিবারের আদর্শ গৃহিণীরূপে নিজেকে গড়িয়া লইয়া বাহির হইলেন। করুণাময় পরমেশ্বর যেন নিজ হাতে তাঁহাকে সেই অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া তাঁহার ঈশ্বর-নির্ভরতা, শ্রমশীলতা, ধৈর্য্য, আত্মসংযম, সহিষ্ণুতা, সহৃদয়তা ইত্যাদি আদর্শ-গৃহিণীর উপযোগী গুণাবলী পরিস্ফুট করিয়া দিলেন। উত্তর কালে এই সমুদয় গুণই তাঁহার অধ্যাত্ম-সাধনায়, সমাজ-সেবায় ও পরোপকার-ব্রত পালনে সহায়ক হইয়াছিল।

বালিকা-বধূ থাকা কালে একবার অঘোরকামিনী স্বগ্রামের কোন আত্মীয়ের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে গেলেন। আহারের সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, যাঁহারা উৎকৃষ্ট সাড়ী অলঙ্কারাদিতে ভূষিত হইয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের আদর-যত্ন হইতেছে যথেষ্ট। আর যাঁহাদের বেশ-ভূষা সাধারণ, তাঁহাদের কোন প্রকার সমাদর হইতেছে না। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ধনী-দরিদ্র বলিয়া ব্যবহারের বৈষম্যে তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, দরিদ্র বলিয়া ওইরূপ অন্যায় ব্যবহার তিনি কখনও করিবেন না। সেই সংকল্প তিনি জীবনে কোন দিন ভঙ্গ করেন নাই।

স্বগ্রামের কয়েকটি সমবয়সী নব-দীক্ষিত ব্রাহ্ম-বন্ধুর সংসর্গে আসার ফলে প্রকাশচন্দ্রের ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকর্ষণ জন্মিল। ভাবী কালের সেই ধর্মবন্ধুদের মধ্যে ছিলেন—হেয়ার ও হিন্দুস্কুলের ভাবী শিক্ষক কেদারনাথ রায়, আবহবিদ্যা-বিষয়ক করণের ভাবী প্রধান কর্ণিক (পরে রায় সাহেব) ফণীন্দ্রমোহন বসু ও পটলডাঙ্গার কবিরাজ পঞ্চানন ঘোষ কবিরত্ন। ওই বন্ধুদের সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"আমাদের গ্রামের সেই বন্ধুদের সঙ্গে আমার প্রীতি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। যত বার দেশে যাইতাম, ইঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিতাম। এই সময়ে কেদার প্রচারক হইবেন বলিয়া শ্রীপুরে গমন করেন। তাঁহার উৎসাহ, উদ্যম, ব্যাকুলতা, ফণীর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, পঞ্চাননের সরলতা আমার অত্যন্ত সহায় হইয়াছিল। পঞ্চানন আমার সঙ্গ প্রায় ছাড়িতেন না। দুই জনে প্রায়ই নদী-তীরে ভ্রমণ করিতাম। তিনি গান করিতেন, আমার তাহা বড় ভাল লাগিত। আমাকে ফিরাইবার জন্য সকলেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কোথা হইতে দেবতা যেন ইঁহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিলেন।"

ওই উদ্ধৃতি দিয়াছি প্রকাশচন্দ্রের রচিত "অঘোর-প্রকাশ" নামক গ্রন্থ হইতে। বাংলা ভাষায় রচিত ইহা একখানি জীবনী-গ্রন্থ। সাধু পতি সাধ্বী পত্নীর দেহাবসানের পরে তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে বর্ণনা করিয়াছেন প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী ভাষায় সেই পুণ্য জীবন-কাহিনী—যাহাতে অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে চরিতকারেরও পূত আত্মকথা। প্রকাশচন্দ্র গ্রন্থের 'উদ্বোধন'এর আরম্ভেই লিখিয়াছেন :—

"তোমার দেহত্যাগের পর ত্রিশ দিনের দিন তোমার সঙ্গে যে কথোপকথন হয়, তাহাতে তুমি বলিয়াছিলে, শুদ্ধাচার, শুদ্ধ চিন্তা, শুদ্ধ ব্যবহার না হইলে তোমার সঙ্গে আর অধিক মিলন হইবার সম্ভাবনা নাই। আরও বলিয়াছিলে, তোমার মত না হইলে উন্নত মিলনের ভূমিতে উপনীত হইতে পারিব না।

"সেই দিন হইতে তোমার মত হইবার জন্য আরও ব্যাকুল হইলাম। আবার সেই দিন হইতে, কি জানি কেন, তোমার গুণ বর্ণনা করিতে লাগিলাম। তাহাতেই এই জীবনীর সূত্রপাত। কত সময়ে তোমার গুণ বর্ণনা করিতে গিয়া আমি তন্ময় হইয়া গিয়াছি। দেহে থাকিতে তুমি মিলিত জীবনের এই কাহিনী শুনিতে কত ভালবাসিতে। কত বার পত্রে সে কাহিনী তোমার কাছে বর্ণনা করিয়াছি। আজ তুমি আমার কত নিকটে। এস, দু'জনে আবার চিরপরিচিত সেই পবিত্র কাহিনীর আলোচনা করি।"

মানব-জীবনের উন্নতি-অবনতির ব্যাপারে দেখা যায় যে, সঙ্গ-গুণে কিংবা সঙ্গ-দোষে মানুষের কিরূপ পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। সৎসঙ্গ লাভ করা মানুষের পরম সৌভাগ্য। সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন বলিয়াই উত্তর কালে প্রকাশচন্দ্র ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন, সহধর্মিণীর জীবন এবং পুত্র-কন্যাগণের জীবন গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। স্বামি-স্ত্রী উভয়েই

ব্রাহ্মসমাজে এবং অপর সমাজেও পাইয়াছিলেন শ্রদ্ধার আসন। এই পরিবার 'অঘোর-পরিবার' নামে খ্যাত ছিল।

পতি-পত্নী দুই জনের জীবনই গঠিত হইয়াছে দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটন এবং নানাবিধ বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া। প্রকাশচন্দ্র ওকালতি পড়িয়া উকিল হইয়া প্রচুর অর্থ উপার্জন করিবেন, এইরূপ আশা মনে মনে পোষণ করিতেন। কিন্তু স্বগ্রামবাসী উকিল হরি দত্ত মহাশয় যখন বলিলেন "আইন ব্যবসায়ে বিবেক ঠিক রাখা যায় না," তখন তিনি সে আশা ছাড়িয়া দিলেন। প্রকাশচন্দ্র কিছু কাল পোষ্ট অফিসে অস্থায়ী পদে নিযুক্ত থাকিয়া কাজ করেন। সেই পদের কার্য্য-কাল শেষ হইয়া যাওয়ায় তিনি কলিকাতায় এক বন্ধুর ছাপাখানায় অংশীদার হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। কিন্তু নিজের খাওয়া-পরার খরচ ছাড়া আর কোন টাকা নিতে পারিতেন না; যেহেতু তাঁহার প্রাপ্য বাকী টাকা মূলধনে জমা হইত। সুতরাং বাড়ীতে স্ত্রী এবং দুইটি শিশুকন্যার ভরণ-পোষণের জন্য কোন টাকা পাঠান তাঁহার পক্ষে সম্ভব হয় নাই।

প্রকাশচন্দ্রের স্ত্রীকে কন্যা দুইটি সহ থাকিতে হইয়াছিল সেজ দাদার উপার্জনের উপর নির্ভর করিয়া বৎসরাধিক কাল। তৎকালে দুইটি সন্তান পালন ব্যতীতও কুলবধূর সমুদয় কাজ, চিঁড়ে কোটা, গরুর জাব কাটা, এ সকলই তাঁহাকে করিতে হইত। সকালে উঠিয়া বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এ সকল নিত্য কর্ম ছিল। স্বামী পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণের জন্য টাকা পাঠাইতে অক্ষম হইলে গ্রামাঞ্চলে ওইরূপ অবস্থায় কুলবধূকে পরিবারের সংকীর্ণমনা মহিলাদের মুখে যে সকল অপ্রিয় মন্তব্য দিবা-রাত্রি শুনিতে হয়, অঘোরকামিনীকেও তাহা শুনিতে হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সহজাত ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার গুণে তিনি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইতেন না। প্রকাশচন্দ্র সহধর্মিণীর ওই দুরবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি বন্ধুর সম্মতি লইয়া ছাপাখানার কাজ ছাড়িয়া দেন এবং অন্য কাজের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন।



প্রকাশচন্দ্র রায়

প্রকাশচন্দ্রের ধর্মবন্ধু পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তৎকালে চব্বিশ পরগণা জেলার হরিনাভি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কাজ করিতেন। তিনি সেই স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিবারের সহিত তিনিও সপরিবারে বাস করিতেন। উভয় পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত হৃদ্যতা ও প্রীতির ভাব জন্মিল। অতঃপর বিহারের মতিহারীতে দুর্ভিক্ষের রিলিফ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের সরকারী কাজ পাইয়া প্রকাশচন্দ্র তথায় চলিয়া যান। সততা ও কর্মদক্ষতার ফলে তাঁহার পদোন্নতি হইল। তিনি আবগারী ইনস্পেক্টরের পদ পাইলেন। সরকারী চাকরিতে প্রথমে পূর্বোক্ত দুইটি কাজে তাঁহার কাটিয়া গেল প্রায় নয় বৎসর। ওই দুইটি পদেই তাঁহার অসৎ ও অবৈধ উপায়ে নিরাপদে প্রচুর অর্থ উপার্জনের সুযোগ-সুবিধা ছিল।

কিন্তু প্রকাশচন্দ্রের মতো ধর্মপ্রাণ, সমাজ-হিতৈষী, লোকসেবক ও আদর্শবাদী যুবকের মনে ঐরূপ লালসা ক্ষণেকের জন্যও স্থান পায় নাই। কার্য্য-কালের নয় বৎসর অতীত না হইতেই তিনি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেকটরের পদে নিযুক্ত হইয়া (১৮৮৪ খৃঃ জুলাই) পুরস্কৃত হইলেন।

সেকালে উচ্চ শ্রেণীর ভদ্রবংশীয় মেয়েদেরও লেখাপড়া শিখানো হইত না। হিন্দু সমাজ এতটা অনগ্রসর ছিল যে, স্ত্রী-শিক্ষা নিন্দনীয় বলিয়া গণ্য হইত। অঘোরকামিনীও নিরক্ষরা ছিলেন। কিন্তু স্বামীর চেষ্টায় এবং নিজের আগ্রহ ও অধ্যবসায়ের গুণে তিনি ভবিষ্যতে কালোপযোগী শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। প্রকাশচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর হইতে নিজে শয়নের পূর্বে প্রায় প্রতি দিনই সহধর্মিণীকে লেখাপড়া শিখাইতেন। উভয়েরই লেখাপড়ার কার্য্যটি ছিল নিত্য কার্য্যের মধ্যে। অঘোরকামিনী আরও ভালো করিয়া লেখাপড়া শিখিতে এবং বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনার কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পরিণত বয়সে (৩৬) মিস্ থোবরন্ নামক এক জন মহীয়সী খৃষ্টান মহিলার পরিচালিত লক্ষ্ণৌ নগরের উইমেনস্ কলেজে ভর্তি হইলেন। একই উদ্দেশ্যে সঙ্গে লইয়া গেলেন তাঁহার যুবতী কন্যা দুইটিকে। সেখানে কলেজের ছাত্রাবাসে নয় মাস (১৮৯১ খৃঃ) থাকিয়া তাঁহারা শিক্ষালাভ করেন। স্বামীর কর্মস্থল বিহারে ফিরিয়া আসিয়া অঘোরকামিনী তাঁহার কন্যা দুইটির এবং স্বামীর সহযোগিতায় বাঁকিপুরে (পাটনায়) একটি ছাত্রীনিবাসসমন্বিত বালিকা বিদ্যালয় পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তিনি বাংলা ভালো করিয়া শিখিয়াছিলেন, এবং হিন্দী ও ইংরেজী ভাষা মোটামুটি শিখিয়াছিলেন।

সেকালে যাঁহারা ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিতেন, হিন্দু সমাজ এবং আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে তাঁহারা লাঞ্ছনা পাইতেন যথেষ্ট। অঘোরকামিনী ধর্ম-সাধনার পথে স্বামীর পদানুবর্তন করিয়া প্রকৃত সহধর্মিণী হইলেন। সেইজন্য স্বামীর অপেক্ষা তাঁহাকে কম লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয় নাই। কিন্তু তাহাতে তিনি বিচলিত হইলেন না।

কন্যা দুইটির পরে তাঁহাদের তিনটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অঘোর-পরিবারে পুত্র-কন্যাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এমনই সুষ্ঠু ছিল যে, পুত্রকন্যা সকলেই সুশিক্ষা পাইয়া দেশ, জাতি ও সমাজের সেবার উপযোগী হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছেন। ঈশ্বরানুরাগ, স্বধর্মনিষ্ঠা, সততা, পরোপকার, উদারতা ইত্যাদি সদ্‌গুণ তাঁহাদের পারিবারিক বৈশিষ্ট্য। প্রকাশচন্দ্র ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হইলেও অঘোর-পরিবারে ধন সঞ্চয় হয় নাই। কেন না, স্বামি-স্ত্রী দুই জনই জন্মিয়াছিলেন প্রশস্ত হৃদয় লইয়া। তাঁহাদের পরিবার পাঁচটি সন্তানকে লইয়া সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে সীমাবদ্ধ ছিল না। বিস্তৃত ও প্রসারিত ছিল অঘোর-পরিবারের পরিধি—যেখানে আত্মীয়ে অনাত্মীয়ে স্বজনে-পরজনে কোন প্রভেদ কখনও দেখা যায় নাই, এবং



অঘোরকামিনী

যাহার মধ্যে আশ্রয় পাইয়াছে বহু রুগ্ন, বিপন্ন, শোকার্ত, দীন-দুঃখী ও অনাথ নরনারী। "অঘোর-প্রকাশ" গ্রন্থ হইতে এই সম্পর্কে উদ্ধৃতি দিতেছি। তাঁহাদের দ্বিতীয় সন্তানটির বয়স যখন এগার বৎসর, তখন (১৮৮৩ খৃঃ আগষ্ট মাসে) তিনি গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বাঁচিবার আশা কম ছিল। যাহা হউক, পরমেশ্বরের কৃপায় তিনি রক্ষা পাইলেন। ইহার দিন কয়েক পরেই তাঁহাদের ধর্মবন্ধু পরেশ চট্টোপাধ্যায়ের একটি সন্তানের কলেরা হইল। সন্তানটির সেবা-চিকিৎসার কি ব্যবস্থা হইয়াছিল, সেই বিষয়ে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"ইহার কয়েক দিন পরে ভাই পরেশের দ্বিতীয় সন্তান কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। যে গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতে-ছিলেন সেখানে থাকিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম। তাই তুমি তাঁকে নিজ বাটীতে বাহিরের ঘরে আনিলে ও সেবা করিতে লাগিলে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বড় কন্যাটিরও কলেরা হইল। তখন তুমি বড় কন্যাটিকে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলে। নিজের শিশু সন্তানটিকে অন্য বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলে। সমুদয় সেবার ভার আপনার স্কন্ধে লইলে। অনেক পরিশ্রম ও যত্নের পরে দু'টি সন্তানই ভাল হইয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, তুমি কিরূপ স্থির ভাবে এরূপ বিপদের সময় সমুদয় কর্তব্য সম্পন্ন করিতে পার। এই সকল কার্য্য করিবার সময় আমাকে কিছু বলিয়া দিতে হইত না। তুমি নিজেই সমুদয় মীমাংসা করিতে, ও যাহা যাহা প্রয়োজন, করিয়া যাইতে।"

নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাবে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে সেবাব্রত পালনের ঘটনা অঘোরকামিনীর জীবনে অনেক রহিয়াছে। আর একটি ঘটনার যে বিবরণ প্রকাশচন্দ্র লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা এই :—

"একবার একটা সার্কাস পার্টি বাঁকিপুরে আইসে। তাহাদের মধ্যে একজন টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হন। তাঁহার পীড়া সংক্রামক বলিয়া তাঁহাকে কেহ স্থান দিতে চাহে নাই। তুমি তাঁহাকে নিজ গৃহে আনয়ন করিলে; ঔষধ, পথ্য দিয়া ও যথাবিহিত সেবা করিয়া নীরোগ করিলে; এবং স্বদেশে পাঠাইয়া দিলে। যুবা তোমার সেবায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, তুমি দেহত্যাগ করিয়াছ, তখন কাঁদিয়া ফেলিলেন।"

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম সমাজের স্বনামখ্যাত প্রচারক ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ওই সাধ্বী মহিলার "নিষ্ঠা ও বৈরাগ্য এবং শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিবার জন্য ব্যাকুলতা দেখিয়া" তাঁহাকে "মৈত্রেয়ী" নাম দিয়াছিলেন। ওই সমাজের আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সাধু অঘোরনাথ, প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, উড়িষ্যার মধুসূদন রাও প্রমুখ বিশিষ্ট নায়কগণের স্নেহাশিস লাভে ধন্য হইয়াছিলেন অঘোরপ্রকাশ। কেশবচন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য সজ্জনেরা পাটনায় তাঁহাদের বাড়ীতে আসিয়া আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অঘোরপ্রকাশের সর্বকনিষ্ঠ সন্তানের জন্মের পরে তাঁহারা সংকল্প গ্রহণ করিলেন যে, তাঁহাদের আর সন্তান হইবে না। সংকল্প গ্রহণের হেতু সম্পর্কে প্রকাশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্মসাধনের ব্যাঘাত হয়, তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর নিকট রাখিয়া যাইতে হয়; কিন্তু অতি শিশু সন্তানকে তো রাখিয়া যাওয়া যায় না! তা' ছাড়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে গর্ভস্থ সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, একথা সদাই বলিতে। এই বার তাই আমরা সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, আর সন্তান হইবে না।"...

ব্রতচারী দম্পতি সেই কঠোর দুঃসাধ্য ব্রত পালন করিয়া গিয়াছেন পরম নিষ্ঠার সহিত মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত। তখনও তাঁহারা যৌবন-সীমান্ত অতিক্রম করেন নাই। তৎকালে পতির বয়স ছিল ৩৪ বৎসর, আর পত্নীর বয়স ছিল ২৬ বৎসর। একালে দুইটি গৃহী সাধক-সাধিকার ধর্মার্থ সেই মহাব্রত পালন আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতেছে—সেকালে প্রাচীন ভারতের তপোবনে ঋষি ও ঋষি-পত্নীর ব্রতপূত সংযম-নিয়মিত জীবনের কথা। সাধিকা দেবলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন (১৮৯৬ খৃঃ ১৫ই জুন) প্রায় ৪০ বৎসর বয়সে। ইহার প্রায় পনর বৎসর পরে সাধকের জীবনাবসান হইয়াছে পাটনার নয়াটোলা অঞ্চলে নিজ বাস-ভবনে। গৃহের যে প্রকোষ্ঠ প্রকাশচন্দ্রের সাধ্বী-পত্নীর পুণ্য-স্মৃতিতে পবিত্র, সেখানেই তাঁহার অন্তিম শয্যা রচিত হইয়াছিল। রাজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণান্তে যে এগার বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন, তাহা বিশ্রাম-সুখের মধ্য দিয়া কাটান নাই। নিজের সাধনা ব্যতীত তিনি ধর্মবন্ধুদের আধ্যাত্মিক জীবনের তত্ত্ব লইতেন এবং কখনও কখনও তাঁহাদের বাড়ীতে যাইয়া অল্প কালের জন্য থাকিতেন; আত্মীয়-স্বজনের খোঁজ খবর নিতেন এবং অভাবগ্রস্ত ও দুর্গত প্রতিবেশীদের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন। পাটনাতেই তিনি স্থায়ী ভাবে থাকিতেন এবং তথা হইতে সময়ে সময়ে ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিতেন। পুণ্যবতী ভার্য্যার চিতাভস্মাধার তাঁহাদের নয়াটোলার বাড়ীতে প্রোথিত আছে, পুণ্যবান স্বামীর অন্তিমকালীন বাসনা পূরণার্থ তাঁহার চিতাভস্মও ওই আধারে রাখিয়াই প্রোথিত হইয়াছে। অঘোরকামিনীর স্থাপিত ও পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়টি পরিচালনার ভার লইয়াছেন বিহার সরকার। ওই শিক্ষায়তনে এখন স্কুল এবং কলেজ দুই-ই চলিতেছে।

যাঁহাদের পূত চরিত-কথা কীর্তন করিলাম, তাঁহাদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান হইলেন ভারত-বিশ্রুত জননায়ক পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়।

অঘোর-প্রকাশের মতো দম্পতি বর্তমান যুগে দুর্লভ বলিলে কিছু মাত্র অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহাদের হৃদয়, মত ও পথের এমনই মিল যে, দুই জনকে অভিন্ন-হৃদয়, অভিন্ন-মত এবং অভিন্ন-পন্থী বলিয়া নিঃসঙ্কোচে বিশেষিত করা যাইতে পারে। গৌরীশঙ্কর বা সীতারামের ন্যায় অঘোর-প্রকাশের পারস্পরিক অনুরাগ ছিল পবিত্র ও গভীর। পরমেশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য দুইটি প্রাণী একাত্মা হইয়া যেন জীবন-নাট্যমঞ্চে বাজিতেন একতন্ত্রীরূপে। সেই একতন্ত্রীতে ঝঙ্কৃত হইত একই তান, গীত হইত একই গান।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

সকালে উঠে চিত্রলেখা দেখে যে, প্রাত্যহিক নিয়মের বিপরীত যোগী তখনও ঘুমিয়ে আছে। তার নিজেরও সমস্ত শরীরে জ্বালা ও মাথায় ব্যথা, সারা রাত সে ভীষণ খারাপ স্বপ্ন দেখেছে—নর্তকী বাইরে এসে দাঁড়ায়।

সূর্যোদয়ের সংগে সংগে বাতাসে চারি দিক থেকে কলরব ভেসে আসে, কিন্তু নব-বিকশিত কুঁড়ির গন্ধে বাতাসের গতি যেন মন্থর হয়ে পড়েছে। নর্তকী বাইরে এসে দেখে যে বটগাছের নীচে বসে বিশালদেব আরাধনা করছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে ভাবে। যোগীর কাছে আর থাকা উচিত হবে কি না? কিন্তু তখন যাবেই বা কোথায়? কোন মুখে সে বীজগুপ্তের সামনে এসে দাঁড়াবে? বীজগুপ্তই বা কি তাকে আবার গ্রহণ করবে? এ-সব প্রশ্নের উত্তর সে নিজে ঠিক করতে পারলে না। এগিয়ে এসে বিশালদেবের কাছে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পরে চোখ খুলতেই বিশালদেব দেখে যে সম্মুখে চিত্রলেখা দাঁড়িয়ে। তাকে দেখে সে অভিবাদন করে, "দেবি! নমস্কার।"

"নমস্কার!" বলেই নর্তকী থেমে যায়।

"দেবী কি আমাকে কিছু বলবেন?"

"হ্যাঁ, আর যা বলতে এসেছি তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তার আগে তোমাকে আমার কাছে একটা প্রতিজ্ঞা করতে হবে যে আমার কথাগুলো যদি তুমি স্বীকার না করো তাহ'লে অপরকে কখনও বলতে পারবে না। যদি এ প্রতিজ্ঞা করতে পারো, তাহলে আমি আমার কথা বলব।"

"আমি প্রতিজ্ঞা করছি।"

"তাহ'লে শোন! আমার মনে হয় যে আমি এখানে এসে ভুল করেছি, উপরে উঠবার জন্য আমি এখানে এসেছিলাম কিন্তু এখন দেখছি যে, এখান থেকে উপরে ওঠা অসম্ভব; নীচেই নেমে যেতে হবে।"

বিশালদেব একটু হেসে বলে, "বুঝতে পেরেছো?"

তার হাসিতে যে ব্যংগ ছিল তা নর্তকী বেশ বুঝতে পারে, সে রেগে জ্বলে ওঠে, "তুমি হাসছ, কারণ তুমি আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছ না। তুমি আমাকে সেদিন রাতে যোগীর সংগে দেখেছিলে। তোমাকে স্পষ্ট করেই বলছি যে, যে কাজের জন্য এখানে এসেছিলাম তা' করতে পারছি না। এখানে আসবার পর যখন নিজের দিকে তাকালাম তখন বুঝতে পারলাম যে, এখানে এসে আমি ভুল করেছি। এখানে এসে আমি নিজেকে নীচে নামিয়ে ফেলেছি, কিন্তু আর বেশী নামতে আমি প্রস্তুত নই। সংগে সংগে যোগী কুমারগিরিকেও নীচে নামিয়ে ফেলেছি এবং এ রকম কাজ সত্যিই এক মহাপাপ। বল, এই পাপ কাজ থেকে মুক্তি পাবার জন্য তুমি আমাকে সাহায্য করবে?"

"হ্যাঁ, সাহায্য করতে আমি প্রস্তুত।"

"ধন্যবাদ, আচ্ছা, বিশালদেব! তুমি আর্য্য বীজগুপ্তের গৃহ চেনো?"

"হ্যাঁ।"

"তার গৃহে শ্বেতাংক নামে একটি যুবক আছে, তাকে নিশ্চয় জানো? তার কাছে গিয়ে বল যে আমি তার সংগে একবার দেখা করতে চাই।"



[উপন্যাস]

শ্রীভগবতীচরণ বর্মা

"বেশ, তাই যাব।"

ঠিক ঐ সময় কুমারগিরি কুটিরের বাইরে এসে উপস্থিত হ'ন। তাঁকে দেখতেই দু' জনা চুপ হয়ে যায়, অপরাধীর মত মাথা নত করে যোগী তাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ তিন জনাই চুপ, শেষে নিস্তব্ধতা ভংগ করে যোগী বলে, "আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, আমার ভারী অন্যায় হয়ে গেছে।"

এই বলে যোগী এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে ওখান থেকে চলে যায়। বিশালদেবের বড় আশ্চর্য্য লাগে, যোগীর মুখে এক অদ্ভুত পরিবর্তনও সে লক্ষ্য করে। সে নর্তকীকে জিজ্ঞেস করে, "দেবি, আজ গুরুদেবকে কেমন যেন অসুস্থ মনে হচ্ছে।"

"হুঁ, গুরুদেব অসুস্থ! আর তাঁর অসুস্থতার কারণ আমার এখানে উপস্থিতি। বিশালদেব, তোমায় আমাকে সাহায্য করতেই হবে, আমার নিজের জন্য না হলেও অন্ততঃ তোমার গুরুদেবের জন্য।"

"আমি নিশ্চয় সাহায্য করব। আজই সেনাপতি বীজগুপ্তের গৃহে যাব।"

কুমারগিরি সেদিন সান্ধ্যবেলা কুটিরের বাইরে বাইরে কাটালেন।

এদিকে সন্ধ্যাবেলায় পাটলিপুত্র থেকে ফিরে এসে বিশালদেব জানায়, "দেবি, আর্য্য বীজগুপ্ত তীর্থ পর্য্যটনে কাশী গিয়েছেন!"

এই খবর শুনে চিত্রলেখা হতাশ হয়ে বিশালদেবকে জিজ্ঞেস করে, "বিশালদেব, তা'হলে এখন উপায়?"

"দেবি, আমি আমাকে বুঝতে পারছি না।"

"তুমিও কিছু ঠিক করতে পারছ না, আমিও কি করব বুঝতে পারছি না, এ চিঠির বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতে পারে?" দিগন্তের পানে তাকিয়ে সে কিছু খুঁজে বার করবার চেষ্টা করে, "সত্যি এ চিঠির বিড়ম্বনা, হয়ত আমার পাপের ফল। একটি আশ্রয় ছিল তাও নিজেই পরিত্যাগ করে এসেছি, কিন্তু কেন? বোধ হয় এখানে জ্ঞানলাভের জন্য। কিন্তু এই কি সেই জ্ঞানলাভ করা? ভগবান যদি আমাকে জ্ঞানই দেন তাহলে এ সব কেন হ'ল? বিশালদেব! তুমি কিছুই করতে পার না, গুরুদেব কিছু করতে পারেন না, আমিও কিছু করতে পারি না, বোধ হয় স্বয়ং ভগবানও কিছু করতে পারেন না। যা হবার তা হবেই, কে তাকে আটকাতে পারে?" পাগলের মত নর্ত্তকীর চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করে ওঠে, শান্ত মুখশ্রী বিকৃত হয়ে ওঠে, উচ্ছ্বাসে কাঁপতে থাকে।

চিত্রলেখার এই রূপ দেখে বিশালদেব ঘাবড়িয়ে গিয়ে বলে, "দেবি, তুমি আবার তোমার পুরাতন জীবনে ফিরে যেতে পার না?"

নর্ত্তকী হেসে বলে, "তুমি কি বলছ বিশালদেব! পিছনে ফিরে যাব?"

"ক্ষতি কি?"

"না, তুমি মূর্খের মত কথা বলছ। আমি সম্মুখে এগিয়ে এসেছি পিছনে ফেরবার জন্য নয়। পিছনে যাওয়া কাপুরুষতা ও প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত। পৃথিবীতে কে পিছনে যেতে পারে এবং আজ পর্য্যন্ত কে-ই বা পিছনে যেতে পেরেছে? সম্মুখের দিকে এক এক মুহূর্ত্ত করে এগিয়ে গিয়ে মানব মৃত্যুকে বরণ করে, যদি সে পিছনে যেতে পারত তাহলে তো সে অমর হয়ে যেত। সম্মুখে এগিয়ে যাওয়াই তো পৃথিবীর নিয়ম, সে এগিয়ে যাওয়া পাপের দিকেই হ'ক বা পুণ্যের দিকে, বুঝতে পারলে?" এই কথাগুলো বলে নর্ত্তকী চলে যায়। বিশালদেব এই প্রতিভাময়ী নারীর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

কিছু দূরে এগিয়ে এসে চিত্রলেখা দেখে যে, যোগী কুমারগিরি লতাকুঞ্জে বসে। যোগী নর্ত্তকীকে দেখে উঠে দাঁড়ায়, নর্ত্তকী জিজ্ঞেস করে, "আজ সারা দিন গুরুদেব যে কুটিরে গেলেন না?"

"নর্ত্তকী, তুমি তো জান যে আমার পক্ষে এখন কুটিরে যাওয়া অসম্ভব?"

"তাহলে কি উপায়?"

"উপায়, হ্যাঁ, উপায় একটা আছে, আর সে উপায় করা কেবল তোমার দ্বারাই সম্ভব। আমি এখন সাকারের পূজায় বিশ্বাস করেছি কিন্তু তোমার সাহায্য ছাড়া সে পূজা তো করতে পারব না।"

"সাকারের উপাসনা ভুল।"

"সাকারের উপাসনা ঠিক, না ভুল, এ তুমি নির্ণয় করতে পার না নর্ত্তকী! তুমি আমার শিষ্যা, তোমার কর্ত্তব্য আমার কথা শোনা" বলতে বলতে যোগী দাঁড়িয়ে পড়ে।

এবারে নর্ত্তকী ভয় পায় না, কোন রকম ইতস্ততঃ না করে দৃঢ়তার সংগে বলে, "যোগী, এটা ভুলে যেও না যে, যে নারী তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে এক অসহায় নয় যে তাকে তুমি শাসন করতে পার। তুমি মনে করছ যে তুমি আমাকে দীক্ষা দিয়েছ কিন্তু এ তোমার ভ্রম, তুমি নিজেকেই প্রবঞ্চনা করছ। তুমি কা'কে আদেশ করছ? তুমি কি জানো না যে, যে নারীর ওপর তুমি আধিপত্য বিস্তার করতে চা'চ্ছ তার দাস তুমি নিজে?"

হতাশ ভাবে কুমারগিরি বসে পড়ে, করুণ স্বরে বলে, "নর্ত্তকী! আমি তোমাকে ভালবাসি।"

চিত্রলেখা হেসে ওঠে, "আমি জানি যে তুমি আমাকে ভালবাস কিন্তু আমি তো তোমাকে ভালবাসি না? তোমার ওপর আধিপত্য করবার বাসনা আমার হয়েছিল আর তা'তে বোধ হয় আমি জয়ীও হয়েছি। কিন্তু তা'তে কি আসে-যায়? পুরুষের ওপর আধিপত্য করবার ইচ্ছা নারীর ভালবাসার পরিচায়ক নয়, প্রকৃতি নারীকে শাসন করবার জন্য সৃষ্টি করে নি। শাসিত হবার জন্য, আত্মসমর্পণ করবার জন্য নারী সৃষ্ট হয়েছে। নিজের থেকে দুর্ব্বল পুরুষকে নারী ভালবাসে না, যে পুরুষের ওপর আধিপত্য করবার অধিকার সে পায় সে পুরুষ তার কাছ থেকে ভালবাসা পেতে পারে না। আপন অস্তিত্ব প্রেমিকের অস্তিত্বের ভিতর বিসর্জন দেওয়া ও নিজেকে সমর্পণ করাই নারীজীবনের চরম সার্থকতা। তাই নারী সেই পুরুষকে ভালবাসে যে তার ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। পুরুষের প্রেম হ'ল আধিপত্য বিস্তার করা, নারীর প্রেম হ'ল নিজেকে পুরুষের কাছে সমর্পণ করা। কিন্তু এখানে আমি স্বামিনী, তুমি দাস। এখানে আমি তোমাকে জয় করেছি, তুমি আত্মসমর্পণ করেছ। কোন্ শক্তিতে তুমি আমার ভালবাসা পেতে চাও?"

যোগী চুপচাপ নর্ত্তকীর কথাগুলো শুনে যায়। সে যা কিছু বলে সবই ঠিক। সে নিজের দুর্ব্বলতা বেশ অনুভব করে। আপন পরাজয়ের বিকৃত রূপ দেখে চমকিয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে সে উঠে দাঁড়ায়। তার মুখের চেহারা বদলিয়ে যায়, চোখে আবার এক নতুন দীপ্তি দেখা যায়, "তুমি ঠিকই বলছ, আমি তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করেছি, আমি যে তোমার চেয়ে দুর্ব্বল তার প্রমাণ হয়ে গেছে। ভগবান তোমাকে দিয়ে আমার অহঙ্কার ভেংগে দিয়েছে, আপন শ্রেষ্ঠত্ব যে কতটুকু তা-ও বুঝতে পেরেছি। আমি ঠিক করে ফেলেছি এবার কি করব! আমি তোমাকে জয় করব—ভালবাসার জন্য নয়, শুধু তোমাকে জয় করবার জন্য নিজেকে পতনের মুখ থেকে বাঁচবার জন্য। তুমি বিশ্বাস কর, ভবিষ্যতে কুমারগিরিকে আর এত দুর্ব্বল দেখতে পাবে না।" নর্ত্তকী গম্ভীর হয়ে বলে, "এই কাজে আমি গুরুদেবকে সাহায্য করতে চাই।"

"বেশ, কিন্তু কি ভাবে?"

"আমি গুরুদেবের আশ্রম ছাড়তে চাই। আমি বুঝতে পারছি যে গুরুদেবের পথে আমি বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। এরকম ভাবে থাকা আমার পক্ষে পাপ।"

"না, সে অসম্ভব, নর্ত্তকী! তুমি আমার আশ্রম ছেড়ে যেতে পার না। যদি তুমিই চলে যাও তাহলে আমি জয় করব কা'কে? তোমাকে আমার সংগে থাকতে হবে।"

"যোগী, তোমার আমাকে জয় করতে হবে না, তোমার নিজেকে জয় করতে হবে। আমি জানি যে যত দিন আমি এখানে থাকব নিজেকে জয় করা তোমার পক্ষে অসম্ভব। আমার চলে যাওয়াই তোমার মংগল।"

যোগীর মুখ লাল হয়ে ওঠে, "না, তোমাকে আমার সংগে থাকতে হবে। তুমি আমাকে খুব দুর্বল ভাবছ? কিন্তু তুমি চলে গেলে আমার মনে যখন কোন দ্বন্দ্বই থাকবে না তখন নিজেকে কি ভাবে জয় করব? নিজেকে জয় করবার জন্য একটা আধার তো চাই? ঈশ্বর তোমাকে সেই আধার করে আমার কাছে পাঠিয়েছেন। আমি এত দিন সফল হই নি, কিন্তু অসাফল্য আমার জীবনে থাকতে পারে না, আমি যত দিন সম্পূর্ণ সফল না হতে পারি তত দিন তোমাকে যেতে দেব না।"

"যেতে দেবে না? তুমি কি আমাকে আটকাতে পারো?"

"না, তোমাকে আমি আটকাতে পারি না, জগতের কোন ব্যক্তিই তোমাকে আটকাতে পারে না। দুর্বলের পক্ষে সবলকে আটকান একেবারে অসম্ভব! আমি শুধু তোমার কাছে অনুরোধ করতে পারি, নিবেদন করতে পারি, মিনতি করতে পারি। এ তুমি নিশ্চয় জানবে যে তুমি আজ আমাকে এতটা নামিয়ে এনেছ।"

"আমি তোমাকে নামিয়েছি, তুমি নিজেই তো নিজেকেই নামিয়ে এনেছ। কিন্তু, হাঁ, তোমার পতনের জন্য আমি অবশ্য কিছুটা দায়ী।"

"বেশ, তোমার কথাই মানলাম। আমি নিজেই আমার অধঃপতনের জন্য দায়ী, আবার নিজেই নিজেকে ওপরে ওঠাতে পারি। কিন্তু তুমি যদি আমার পতনের জন্য কিছুটা দায়ী হও, তাহলে আমাকে উঠবার জন্য সাহায্য করা তোমার উচিৎ নয় কি?"

নর্ত্তকী যোগীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, "হ্যাঁ, তোমার কথা ঠিক!"

"তাহলে তুমি আমার প্রার্থনা স্বীকার করছ? আমার সাধনায় সিদ্ধিলাভের জন্য তুমি নিশ্চয় আমার কাছে কিছু দিন থাকবে?"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নর্ত্তকী জিজ্ঞেস করে, "যোগী, কত সময় তোমার প্রয়োজন?"

"সময়ের কথা জিজ্ঞেস করছ? কিন্তু যদি জয় করতে পারি তাহলে আমার কাছে থাকতে আপত্তি কেন? যদি বিজয়ী হই তাহলে বুঝব যে আমার পথ ঠিক আছে, আর তখন তোমার পথ বেছে নিতে পারবে।"

"না—আমি তোমার পথে চলতে পারব না। এখন আমি এখানে থাকছি—যখন যাবার ইচ্ছে হবে তোমাকে জানাব, তখন তুমি আমাকে কোন বাধা দিতে পারবে না।"

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

বীজগুপ্ত না চাইলেও চিত্রলেখা তার জীবন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল, ওদিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে যশোধরা তার জীবনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সেনাপতি মনে মনে হাসে ও ভাবে যে, যশোধরা ও চিত্রলেখার এই আসা ও যাওয়া সত্যিই তার জীবনের এক গভীর সমস্যা!

কাশীর কলরব-মুখরিত প্রাংগণে সে নিজেকে ভুলে থাকতে চেয়েছিল কিন্তু তা সম্ভব হ'ল না। ছায়াচিত্রের মত তার মানসপটে চিত্রলেখার ছবির স্থান যশোধরা এসে অধিকার করে নেয়। দুঃখের বেদনা সুখের আলোড়নে পরিবর্ত্তিত হয়ে যায়।

প্রায় এক সপ্তাহ হ'ল বীজগুপ্ত ও তার সংগীরা কাশীতে এসেছে। সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কাল, সবাই বসে কাশীনগরীর সুন্দর দৃশ্যাবলীর ওপর আপনাপন মন্তব্য করে চলেছে।

আর্য্যশ্রেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় বলেন, "কাশী আমার এত ভাল লেগেছে যে, ইচ্ছে হচ্ছে এখানেই বাস করি। কিন্তু কি করব, আমি যে নিরুপায়, এখনও সাংসারিক জালে আমি যে জড়িয়ে আছি।" এই বলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে মৃত্যুঞ্জয় বীজগুপ্তের দিকে তাকাল।

মৃত্যুঞ্জয়ের কথার অর্থ বুঝতে পারে নি, এরকম ভাব দেখিয়ে, বীজগুপ্ত বলে, "আর্য্য, ভোগী ও যোগী, অনুরাগী ও বৈরাগী অথবা গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীর ভেতর প্রভেদ খুব কম, আর থাকলেও সে-প্রভেদ প্রায় না থাকার সমান। আর্য্যের হয়ত আমার কথায় বিশ্বাস না হতেও পারে এবং শুনে আশ্চর্য্য হতে পারেন কিন্তু আমি যা বলছি তা সর্বথা সত্য।"

শ্বেতাংক এক বিরাট সুযোগ পেলে। মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষ সমর্থন করে সে বলে, "সত্য যে কি, তা কি কখনও জানা যায়? অনুকূল পরিস্থিতির অপর নামকেই আমরা সত্য বলে অভিহিত করে থাকি এবং এই পরিস্থিতি সর্বদা এক থাকে না।"

"বৎস শ্বেতাংক, তুমি যা বলেছ তা ঠিক বটে কিন্তু যে প্রশ্ন এখন আমাদের সামনে, তার সমাধান তো তোমার এই উত্তরে করা যায় না? আর্য্য বীজগুপ্ত! আপনি যদি আপনার বক্তব্য আরও একটু স্পষ্ট করে বলেন।"

শ্বেতাংকের অনুচিত উত্তরে বীজগুপ্তের আশ্চর্য্য লাগে, সে শুষ্কস্বরে বলে, "এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কি বলব? বাস্তবিক মানব কখন বৈরাগী হতে পারে না। কারণ, বৈরাগ্য মানেই মৃত্যু। সাধারণতঃ যাকে বৈরাগ্য বলা হয় সেটা হ'ল অনুরাগের কেন্দ্র—পরিবর্ত্তনের অপর নাম। অনুরাগের ভেতর থাকে চাওয়া-পাওয়ার অদম্য আকাঙ্ক্ষা এবং বৈরাগ্যে থাকে তৃপ্তি ও পূর্ণতা।" সেনাপতি যশোধরার দিকে তাকায়, যশোধরাও কৃতজ্ঞভরা দৃষ্টিতে সেনাপতিকে দেখে।

কিছুক্ষণ সবাই নিস্তব্ধ থাকে—সেই নিস্তব্ধতাকে এক প্রাণশূন্যতা, বিষাদময় ছায়া ঘিরে ফেলে। শ্বেতাংক ছাড়া কেউই কিছু বুঝতে পারে না, সে সত্যিই অনুচিত কথা বলে ফেলেছিল—বীজগুপ্তের যুক্তিকে খণ্ডন করে সে অপরাধ করেছিল, তার মনে এর জন্য পশ্চাত্তাপও হচ্ছিল।

শ্বেতাংকের মনের ভাব বুঝতে পেরে নিস্তব্ধতা ভংগ করে যশোধরা বলে, "আর্য্য বীজগুপ্ত! সেখানে কত দিন থাকবার ইচ্ছা আছে?"

"এখনও কিছু ঠিক করি নি। কখনও মনে হয় পাটলিপুত্রে ফিরে যাই, আবার পরক্ষণেই এখানে আরও কিছু দিন থাকবার বাসনা হয়; আর্য্য, আপনি এখানে কত দিন থাকবার ইচ্ছা করেন?"

মৃত্যুঞ্জয় কন্যার দিকে তাকিয়ে বলেন, "এখানে থাকা-না-থাকা আমার ইচ্ছের উপর নির্ভর করে না। যশোধরার ইচ্ছেতে আমি এখানে এসেছি, আমার যাওয়াও তার-ই ইচ্ছের ওপর নির্ভর করে।"

পিতার কথা শুনে যশোধরা হাসে—সেই হাসিতে কে যেন ইন্দ্রজাল ছড়িয়ে দিয়েছে, আজ প্রথম বার বীজগুপ্ত যশোধরার অনুপম সৌন্দর্য্যকে দেখে ও তার দিকে একদৃষ্টি তাকিয়ে থাকে। যশোধরাও অপলক নেত্রে বীজগুপ্তের দিকে তাকিয়ে থাকে!

শ্বেতাংকের পক্ষে এই দৃশ্য অসহ্য বলে মনে হয়; "প্রভুর কি আজ নগর ভ্রমণে যাবার ইচ্ছে নেই?"

বীজগুপ্ত চমকিয়ে উঠে মৃত্যুঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করে, "হাঁ, ওঃ হাঁ, আর্য্য, আপনি কি নগর ভ্রমণে যাবেন?"

"না, আজ আর বেরুতে ইচ্ছে করছে না।"

শ্বেতাংক যশোধরাকে জিজ্ঞেস করে, "দেবী যশোধরা, তোমার কি ইচ্ছে?"

যশোধরা হেসে বলে, "এখানে বসে থেকেই বা কি করব?"

বীজগুপ্ত বলে, "আমারও সে রকম যেতে ইচ্ছে করছে না।"

যশোধরা সেনাপতিকে জিজ্ঞাসা করে, "আর্য্য, তাহলে শ্বেতাংকের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিন?"

আপন ইচ্ছার বিরুদ্ধে বীজগুপ্তকে বলতে হয়, "নিশ্চয়-ই"। যশোধরা শ্বেতাংকের সংগে চলে যায়।

সেনাপতি মৃত্যুঞ্জয়কে বলে, "আর্য্য, কাশীতে আপনি যজ্ঞ করবেন বলছিলেন, এখন কি সে ইচ্ছের পরিবর্ত্তন করেছেন?"

আর্য্যশ্রেষ্ঠ হেসে বলেন, "হ্যাঁ, কিছু দিনের জন্য সে ইচ্ছার পরিবর্ত্তন করেছি। আর্য্য বীজগুপ্ত! একটা কথা বুঝতে পারছি না, আচ্ছা, যজ্ঞ থেকে বলি দেবার অনুষ্ঠানটুকু বাদ দেওয়া যায় না?"

বীজগুপ্ত হেসে বলে, "কেন, আর্য্য কি বৌদ্ধ ভিক্ষুকের দলভুক্ত হয়ে গেলেন না কি?"

"এতে আশ্চর্য্য হবার কি আছে? এত রক্তপাতে কি লাভ হয়? রক্তপাত ধর্মে শুধু মলিনতাই এনে দেয়। গৌতম বুদ্ধ যা কিছু বলেছেন তার ভেতর তথ্য নিশ্চয় আছে।"

সেনাপতি ধীরে বলে, "হ্যাঁ, তার ভেতর সত্য আছে।"

কিছুক্ষণ দু'জনা চুপ থাকে। সেনাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, "আর্য্য, এখানে বসে থাকতে আর ভাল লাগছে না, যদি নগরে বেড়িয়ে আসি তাহলে কি আপনার কোন আপত্তি আছে?"

"আমি বলেছিলাম যে যাবার খুব ইচ্ছে নেই, আপত্তির তো কোন কথা বলি নি! যদি তুমি যেতে চাও তাহলে আমিও যেতে প্রস্তুত।"

রথ দ্বারেই ছিল, দু'জনাই বেরিয়ে পড়ে।

নগরের কোলাহল থেকে বাইরে গংগার দিকে মৃত্যুঞ্জয় রথ চালিয়ে দেন। গংগার তীরে নৌকা প্রস্তুত ছিল—বীজগুপ্ত দেখলে যে একটি নৌকায় শ্বেতাংক ও যশোধরা চড়ছে। যশোধরা শ্বেতাংককে বলে, "দেখ, পিতার সংগে আর্য্য বীজগুপ্ত আসছেন।"

শ্বেতাংক ঘুরে দেখে—রথ থেমে যায়—বীজগুপ্ত ও মৃত্যুঞ্জয় রথ থেকে নামেন। বীজগুপ্তের আসা শ্বেতাংকের ভাল লাগে না।

সে ধীরে বলে ওঠে, "চুলোয় যাক, যত সব।" কিন্তু যশোধরা সেই কথাগুলো শুনে ফেলে।

যশোধরা গম্ভীর হয়ে বলে, "আর্য্য শ্বেতাংক! জীবনে সংযমের প্রয়োজন হয়।"

যশোধরার এই গম্ভীর উক্তিতে শ্বেতাংক লজ্জা পায়, তবুও বলে, "দেবি! সংযম ও প্রেম একে অপরের বিরোধী।"

মৃত্যুঞ্জয় ও বীজগুপ্ত ততক্ষণ কাছে এসে পড়েছে।

শ্বেতাংকের চেহারায় তখনও রাগের ভাব সম্পূর্ণ দূর হয় নি। বীজগুপ্ত শ্বেতাংকের মনোভাব বুঝতে পেরে বলে, "শ্বেতাংক! তোমরা চলে আসবার পর ওখানে একলা বসে থাকতে আমাদের ভাল লাগল না, তাই আমরাও চলে এলাম।"

শুষ্ক হাসি হেসে শ্বেতাংক উত্তর দেয়, "আমি তো প্রভুকে প্রথমেই আসবার জন্য বলেছিলাম।"

সকলে নৌকায় গিয়ে বসে, নৌকা গংগার বুকে বেগে চলতে শুরু করে। গংগার চারি দিকে নৌকা ভেসে চলেছে, কোনটায় গান হচ্ছে, কোনটায় বাজনা বাজছে, আবার কোনটায় যাত্রীরা গল্প করছে, আর মাঝে মাঝে হেসে উঠছে।

যশোধরা বলে, "আর্য্য শ্বেতাংক! তোমার কাশী বেশী ভাল লাগে না পাটলিপুত্র?"

কিছুক্ষণ চিন্তা করে শ্বেতাংক বলে, "আমার তো পাটলিপুত্র বেশী ভাল লাগে। কেন না পাটলিপুত্রের ঐশ্বর্য্য কাশীতে পাওয়া যায় না। কাশী শুধু শিক্ষার কেন্দ্র।"

"আর্য্য বীজগুপ্ত! আর তোমার?"

"আমার আজকাল কাশী বেশী ভাল লাগে।"

যশোধরা আবার জিজ্ঞেস করে, "আজকাল কেন?"

"দেবী যশোধরা! অবস্থার আনুকূল্যে এক একটি স্থান এক এক সময়ে ভাল লাগে। আমরা কোন বিশেষ স্থানকে পছন্দ করি না, স্থান তো শুধু জড় পদার্থ। আমরা পরিস্থিতিকে পছন্দ করি, কারণ পরিস্থিতির সংগেই আমাদের পরিচয় হয়। যেখানে আমাদের জন্ম হয় ও লালিত-পালিত হই, সেই স্থান আমাদের বেশী ভাল লাগে। সেই স্থানে থাকতে থাকতে কত জনার সংগে আমাদের বন্ধুত্ব হয়। আমাদের জীবন জড়-পদার্থের দ্বারা তৈরী নয়, চেতনার দ্বারা এবং যে ব্যক্তিদের সম্পর্কে আমরা আসি তাদের দ্বারাই আমাদের জীবন গড়ে ওঠে। তাই এটা খুব স্বাভাবিক যে, আমার পাটলিপুত্র ভাল লাগবে। কিন্তু একই পরিস্থিতি সবাইকে সর্বদা আনন্দ দিতে পারে না, আমাদের স্বভাব পরিবর্ত্তন চায়, আমাদের পরিবর্ত্তনশীল স্বভাবের জন্যই পরিস্থিতি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সেই নতুন পরিস্থিতি আমাদের তত দিন ভাল লাগে যত দিন, সেই পরিবর্ত্তনে আমরা পূর্ণ সন্তোষ লাভ না করি। কাশীতে এখনও আমার মন সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারে নি, তাই এখনও পর্য্যন্ত কাশী আমার কাছে বেশী প্রিয়।"

যশোধরা হেসে বলে, "আর্য্য! আপনার মধ্যে এক অদ্ভুত প্রতিভা আছে, আপনার যুক্তিকে কেউ খণ্ডন করতে পারে না।...... আর্য্য শ্বেতাংক! জ্ঞান তর্কের বস্তু নয়, আর্য্য বীজগুপ্তের কাছে আপনি সাবধানে থাকবেন।"

শ্বেতাংক বলে, "দেবি! আমি আর্য্য বীজগুপ্তের গুরুভাই, তাঁহলে কি নিজের গুরুদেব মহাপ্রভু রত্নাম্বরের কাছেও সাবধানে থাকব?"

যশোধরা ইতস্ততঃ করে বলে, "এর উত্তর দেওয়া অবশ্য আমার পক্ষে অসম্ভব!"

বীজগুপ্ত বলে, "তা কেন হবে না, নিশ্চয় তা সম্ভব। যে কথা উচিত মনে কর, তা উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ করছ কেন?"

"না, সঙ্কোচের কোন প্রশ্ন নয় আর্য্য বীজগুপ্ত! আপনার সম্বন্ধে সব কিছু বলতে পারি, কারণ আপনার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, আমার ও আপনার মধ্যে কোন প্রভেদ দেখতে পাই না—কিন্তু মহাপ্রভু রত্নাম্বর এক অন্য শ্রেণীর মানব।"

দু'জনা দু'জনার দিকে তাকায়। যশোধরার দৃষ্টিতে লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই নেই। তার চোখে নিশ্চল ভাব, স্পষ্টতা ও আনন্দের আবেশ। বীজগুপ্তের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের স্রোত বয়ে যায়, বুক কেঁপে ওঠে, সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চ দেখা দেয়। বীজগুপ্ত দেখে

যে, শ্বেতাংক তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে বুঝতে পারে যে, শ্বেতাংক তার মনের কথা বুঝে ফেলেছে—বীজগুপ্তের নিজের এবং শ্বেতাংকের ওপর ভয়ানক রাগ হয়।

"শ্বেতাংক!"

"প্রভু!"

সামলিয়ে নিয়ে বীজগুপ্ত বলে, "না—কিছু না, ও: হ্যাঁ—আমরা এখানে কত দিন হ'ল এসেছি?"

শ্বেতাংক বুঝতে পারলে যে, বীজগুপ্ত যা বলতে গিয়েছিল, তা বলে নি। সে দিন গু'ণে বলে, "আট দিন। প্রভু!"

বীজগুপ্ত আস্তে বলে, এত আস্তে যে, শুধু শ্বেতাংকই শুনতে পায়, "তাহলে এখন পাটলিপুত্রে ফিরে যাওয়া উচিত। চিত্রলেখাকে ভোলা আমার পক্ষে অসম্ভব—পাটলিপুত্রে ফিরে যাবার আয়োজন কর।"

বীজগুপ্তের মনের এই হঠাৎ পরিবর্ত্তনে শ্বেতাংক খুশীই হয়—কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় ও যশোধরা দু'জনারই আশ্চর্য্য লাগে। মৃত্যুঞ্জয় বললেন, "সত্যি সত্যিই কি আর্য্য বীজগুপ্ত ফিরে যাবার ইচ্ছে করছেন?"

"আর্য্য মৃত্যুঞ্জয়! আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার একটি বিরাট দোষ হচ্ছে যে, প্রেরণার দাস আমি। আমি নিজেই জানি না যে, এক ঘণ্টা পরে কি করব? এ সময় হঠাৎ পাটলিপুত্রের কথা মনে পড়ে গেল। কাশী যেন অসহ্য হয়ে উঠছে। এখন আর এক মুহূর্ত্তও কাশীতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না!"

যশোধরা জিজ্ঞেস করে, "তাহলে কবে যাবেন? আমাদেরও যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রেরণাবশে কাজ করবার সময় অপরের সুখ-সুবিধার ওপর চিন্তা করাও কর্ত্তব্য।"

সেনাপতি লজ্জা পেয়ে বলে, "দেবি! তুমি ঠিক বলছ! আমাকে ক্ষমা কোর। বিশ্বাস করো তোমার সুখ ও সুবিধা আমার কাছে অনেক বড়। যেদিন তুমি উচিত বিবেচনা করবে সেদিন যাব।"

"না, আর্য্য বীজগুপ্ত! তোমার তো কোন অসুবিধে নেই, আমি এমনি বলছিলাম! আপনার যদি কষ্ট না হয় কালকের মধ্যেই আমার যাবার ব্যবস্থা করে নিতে পারব। কিছু জিনিষপত্র কেনবার আছে, কাল সকালে আর্য্য শ্বেতাংককে সংগে নিয়ে সেই সব জিনিষ কিনে নেব।"

উনবিংশ পরিচ্ছেদ

নিজের কথা ভেবে বীজগুপ্তের বড় অদ্ভুত লাগে। সে চায়নি কিন্তু তবুও যশোধরার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছে এবং বোধ হয় তাকে গ্রহণও করে ফেলত, যদি শ্বেতাংকের মুখের ভাব তাকে সেদিন সাবধান করে না দিত।

দুঃখ ভুলবার জন্য, মানসিক দ্বন্দ্বকে জয় করবার জন্য সে কাশীতে এসেছিল। পাটলিপুত্রে থাকবার সময় চিত্রলেখার কাছাকাছি এবং নিজের অতুল ঐশ্বর্য্যের মাঝখানে থেকে তার পক্ষে শান্তি পাওয়া অসম্ভব। এই ভেবে সে পাটলিপুত্র থেকে চলে আসে—বৈরাগ্য-চিন্তাই তাকে কাশীতে টেনে আনে! লক্ষ্য-হীন পথিকের মত সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

'লক্ষ্য-হীন পথিকের' কথা মনে আসতেই তার সমস্ত চিন্তাধারা বদলিয়ে যায়। কোন ব্যক্তি কি লক্ষ্যহীন হ'তে পারে কিম্বা লক্ষ্যহীন হওয়া কি কোন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব? হয়ত তাই। বীজগুপ্তের সব যেন কেমন গোলমাল হয়ে যায়। আর একটা প্রশ্ন তার মনে জাগে, 'আচ্ছা, মানুষের কি সত্যিই কোন লক্ষ্য আছে? কেউ কি বলতে পারে যে সে কি করবার জন্য পৃথিবীতে এসেছে, সে কি করতে চায় বা সে কি করবে। না, তা সে কখনও বলতে পারে না। মানুষ পরিস্থিতির দাস, পরিস্থিতির ইংগিতে তাকে চলতে হয়, তার নিজস্ব কোন লক্ষ্য নেই। এক অদৃশ্য শক্তি প্রত্যেককে পরিচালিত করে, মানুষের নিজের ইচ্ছার কোন মূল্যই নেই। মানুষ স্বাবলম্বী নয়, সে নিজে কিছু করতে পারে না, সে শুধু যন্ত্র-মাত্র।'

চারি দিক নিস্তব্ধ, বীজগুপ্ত ঘুমোতে পারে না, কেবল ভাবে আর ভাবে। আমি কাল পাটলিপুত্র ফিরে যাচ্ছি, কিন্তু কেন? চিত্রলেখার সংগে মিলনের উদ্দেশ্যে না তাকে কাছে টেনে আনবার জন্য? তার এটুকু বিশ্বাস আছে যে সে যদি জোর করে তাহলে চিত্রলেখা আপত্তি করবে না। না, এখন চিত্রলেখার কাছে যাব না আর যাবই বা কেন? তাকে কি আমি ছেড়ে দিয়েছি? না, সে তো নিজেই আমাকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সে ছেড়ে দিলেই বা কেন? বোধ হয় বিধির বিধান, তাই। যদি বিধির এই বিধান হয় তাহলে তে তা অবশ্যম্ভাবী! তবে দুঃখই বা কিসের? চিত্রলেখা গেছে যাক! আমি আমার নিজের জীবনকে নষ্ট করি কেন?······'ত্যাগ ও বিরহে জীবন কি নষ্ট হয়ে যায়? দুঃখ কি জীবনের এক অংশ নয়? ভাগ্যে কি সুখ নিয়েই সবাই পৃথিবীতে আসে? সুখের মত দুঃখেরও মহত্ত্ব আছে। অতএব দুঃখ সহ্য করাই যাক—ত্যাগের পথই বেছে নিই! এখন আমার শুধু কর্ত্তব্য করা উচিত—কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কি!···'

বীজগুপ্ত উঠে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল পান করে, হাতে-মুখে জল দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে।···'আমার কর্ত্তব্য কি, কাজ করবার জন্য আমার জন্ম হয়েছে। আমার কর্ত্তব্য হ'ল গার্হস্থ্য জীবন গ্রহণ করা ও আপন বংশ বৃদ্ধি করা। এর জন্য বিবাহ করা আমার প্রয়োজন। ভগবানের কি এই ইচ্ছে? হয়তো এইজন্য চিত্রলেখা আমার জীবন থেকে চলে গেছে। তাহলে বিবাহ করি এবং গার্হস্থ্য জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি। বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্রীও রয়েছে। যশোধরা—হ্যাঁ যশোধরা চিত্রলেখার চেয়ে কিছু কম সুন্দরী নয়। 'যশোধরাকে কি বিবাহ করতেই হবে? যশোধরা সত্যিই রত্ন—পবিত্রতার প্রতিমা! যশোধরার ভেতর যখন সবই নারীসুলভ গুণ আছে তখন তাকেই পত্নীরূপে গ্রহণ করি। কিন্তু একবার আমি যশোধরাকে প্রত্যাখ্যান করেছি। এখন কোন মুখে মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াব? হয়তো মহাসেনাপতি এখন আর তাঁর কন্যাকে আমার হাতে তুলে দিতে রাজী হবেন না'······'না, এ একেবারে অসম্ভব। এখন আমি যশোধরাকে বিবাহ করার কথা ভাবতেই পারি না। চিত্রলেখাই আমার জীবনের একমাত্র নারী।'

সেনাপতি বেশ বুঝতে পারে যে ঘুম আর তার আসবে না। আকাশে চাঁদ ভেসে বেড়াচ্ছে—সেনাপতি ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। ভোর হ'তে এখনও প্রায় দুই প্রহর বাকী—বীজগুপ্ত গঙ্গার দিকে চলতে আরম্ভ করে।

গঙ্গাতীরে এসে দেখে যে, কয়েক জন বসে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা কইছে—সে তাদের এক পাশে এসে বসে পড়ে।

ঐ স্থানে তিন জন পরস্পর আলোচনা করে চলেছে। ঐ সময় যে ব্যক্তি কথা বলছিল তার বয়স প্রায় সত্তর বছর। সে বেশ ভদ্র কিন্তু বয়সের দরুণ গালের মাংস কুঁচকে গেছে। তার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছিল যে, সে একজন সন্ন্যাসী। বাকী দু' জন বয়সে তার চেয়ে ছোট। তার ডান দিকে পাতলা মতন যে যুবকটি বসেছিল তার বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। তার আকৃতি মাঝারি গোছের কিন্তু মুখে গভীর চিন্তারেখা। আর সন্ন্যাসীর বাঁ দিকে যে বসেছিল তার বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। লম্বা ও ঘন দাড়ী এবং চুলেও পাক ধরেছে।

সন্ন্যাসী বলে, "এখন সন্ন্যাস নেবার বয়স তোমার হয় নি, যাও, গৃহে গিয়ে নিজের কর্ত্তব্য কর ও পিতার আদেশ পালন কর।"

যুবকটি সন্ন্যাসীর পা জড়িয়ে ধরে, "প্রভু, আমি আপনার আশ্রয় নিয়েছি; আমায় সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করুন। জীবনে কোন বস্তুর প্রতি আমার আসক্তি নেই। সংসারে থাকতে হলে কোন একটা উদ্দেশ্যের প্রয়োজন হয়। আমার যখন একবার বৈরাগ্য এসেছে, এখন সংসারে থাকার অর্থ হ'ল নিজের আত্মাকে হত্যা করা। সংসারে আমি কিছুতেই শান্তি পাব না। আপনি আমার পিতাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন যে এই দু' বছর আমার পক্ষে কি রকম বেদনাদায়ক ছিল।"

প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বলে, "বুঝলাম, কিন্তু তুমি তো আমার কথাও শুনছ না! বৎস, প্রেম এক মিথ্যা কল্পনা। নারী ও পুরুষের সম্বন্ধ শুধু সংসারেই সম্ভব হয়—সংসারের বাইরে তাদের দু' জনার ভিন্ন আত্মা। এ জগতে স্ত্রী ও পুরুষের ভেতর আত্মার ঐক্য থাকতে পারে না। আত্মাকে নিবিড় ভাবে পাওয়াকেই তো প্রেম বলে। কিন্তু সে এমন কিছু মূল্যবান নয়, সে সম্বন্ধ ভেঙ্গেও যেতে পারে। এবং সে সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেলে দুঃখ পাওয়া কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষে শোভনীয় নয়। তোমার কর্ত্তব্য বিবাহ করা—বিবাহ না করে তুমি আপন কর্ত্তব্যে বিমুখ হচ্ছ।"

"কেন প্রভু, আপনি কেন এ কথা বলছেন?"

"শোন। নারী অবলা। একজন অবলাকে আশ্রয় দেওয়া প্রত্যেক পুরুষের কর্ত্তব্য। বিবাহ দ্বারাই পুরুষ অবলা নারীকে আশ্রয় দেয়। যদি পুরুষ কোন নারীকে আশ্রয় না দেয় তাহলে নারীর কি ভয়ানক শোচনীয় অবস্থা হবে, একবার ভেবে দেখ তো? অপর দিকে পুরুষের পথেও নানা রকম বাধা-বিঘ্ন এসে উপস্থিত হবে। তুমি বিবাহ না করে যদি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করবার চিন্তা কর, তাহলে আমি বলব যে তুমি কাপুরুষ, একজন অবলা নারীকে আশ্রয় দেবার তোমার যে কর্ত্তব্য, তুমি সে কর্ত্তব্য সম্পাদন করছ না।"

"কিন্তু প্রভু! আমি যে ভোগ-বিলাসকে ত্যাগ ও তপস্যার আগুনে পরীক্ষা করতে যাচ্ছি, এটা তো কাপুরুষতা নয়?"

সন্ন্যাসী হেসে বলে, "কিন্তু তুমি তপস্যার আগুনে পরীক্ষা দিতে যাচ্ছ কেন? সে শুধু এই জন্য যে যাকে তুমি ভালবেসেছিলে সে তোমার জীবন থেকে চলে গিয়েছে। কিন্তু তোমার এ তপস্যা বৃথা, এ এক রকম আত্মহত্যা করা। এ তপস্যার কোন লক্ষ্য নেই, বৃথাই তুমি তোমার আত্মাকে কষ্ট দিতে যাচ্ছ।"

যুবক সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা রেখে বলে, "মহাপ্রভু, আপনি যা বলবেন তাই করব।" যুবক এই বলে আপন পিতার সঙ্গে চলে যায়।

বীজগুপ্ত সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে। সন্ন্যাসী মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করে, "তুমিও কি সন্ন্যাস গ্রহণ করতে চাও?"

"না, এখনও সন্ন্যাস গ্রহণ করবার কিছু ঠিক করি নি। আপনার কথা শুনে খুব ভাল লাগল, তাই এখানে বসে পড়লাম।" সন্ন্যাসী হেসে বলে, "অতি উত্তম! কিন্তু যে ব্যক্তি এত রাত্রে গঙ্গাতটে আসতে পারে এবং যে ব্যক্তি কোন সাধু বা ভিখারী নয়, তুমি কি বলতে চাও যে কোন উদ্বিগ্নতা তাকে পীড়ন করে নি, সে এমনিই চলে এসেছে? না, এ আমি মানতে পারলাম না।"

বীজগুপ্ত বলে, "আপনার অনুমান ঠিক! আমি এক বিরাট উদ্বিগ্নতার মাঝখান দিয়ে চলেছি—আপনার কথাগুলো শুনে আমার সমস্যার প্রকৃত রূপও দেখতে পেলাম। আমি এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করতে পারি?"

—"নিশ্চয়"

"আপনি এখনি বলছিলেন যে, অসফল প্রেমেতে সাংসারিক জীবনকে ত্যাগ করা কোন যুবকের পক্ষে আত্মহত্যা করবার সমান কিন্তু মানব-জীবনে প্রেমের স্মৃতির প্রভাব যে থাকবে এ কি স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নয়? দুঃখকে চেপে রাখা অথবা তার প্রকৃত রূপকে কৃত্রিম উপায় দ্বারা ভুলে যেতে চেষ্টা করা কি আত্মাকে হত্যা করা নয়?" সন্ন্যাসী কিছুক্ষণ মৌন থেকে বলে, "হ্যাঁ, তুমি যা বলছ সবই ঠিক। কিন্তু সময় হলে দুঃখ নিজেই দূর হয়ে যায়, প্রত্যেক পুরুষের স্বভাব এক রকম হয় না এবং এই বিভিন্নতার জন্য এক একজন পুরুষকে দুঃখ, এক এক সময় পীড়া পর্য্যন্ত দেয়। কৃত্রিম উপায়ে সে দুঃখকে দূর করা অপ্রাকৃতিক, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রেখো যে অপ্রাকৃতিক সব কিছু কাজের দ্বারা আত্মাকে হত্যা করা হয় না। আমরা কৃত্রিমতাকে এত বেশী পছন্দ করি যে সে এখন নিজেই প্রাকৃতিক হয়ে গেছে। এই যে আমরা কাপড় পরে দেহ ঢেকে রাখি এ-ও অপ্রাকৃতিক, যে খাদ্য গ্রহণ করি সে খাদ্যও অপ্রাকৃতিক, ভোগ-বিলাস, সুখ-ঐশ্বর্য্য সব কিছুই প্রকৃতিগত নয়। প্রাকৃতিক জীবন এক ভারস্বরূপ, সেই জীবনে স্পন্দন আনবার জন্যই তো মানুষ খেলাধুলা, আমোদ-উৎসব, নাচ-গান ইত্যাদির সৃষ্টি করেছে। কৃত্রিম উপায়ে দুঃখকে দূর করার মধ্যে আত্মাকে কখনই হত্যা করা হয় না। কেন না, এ অপ্রাকৃতিক হলেও স্বাভাবিক।"

বীজগুপ্ত উঠে দাঁড়ায়, "ধন্যবাদ, আপনি আমার জীবনের এক বিরাট প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছেন। আপনার কথা শুনে আমি আমার জীবনের কর্ত্তব্য ঠিক করে ফেলতে পেরেছি। আচ্ছা, এবার বিদায় দিন।"

তখন ভোরের বাতাস বইতে আরম্ভ করেছে, পূব-আকাশে আলোর রেখা ফুটে উঠেছে এবং পাখীরা উড়ে বেড়াতে শুরু করে দিয়েছে। বীজগুপ্ত ফিরে এসে শুয়ে পড়ে।

যখন তার ঘুম ভাঙল তখন প্রায় দ্বিপ্রহর। শ্বেতাংকের সঙ্গে যশোধরা প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কিনতে বাজারে চলে গেছে। সেনাপতির একা-একা বসে ভাল লাগে না, কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘুরে

বেড়ায়, তার পর মৃত্যুঞ্জয়ের কাছে যায়। মৃত্যুঞ্জয় তাকে আসতে দেখে বলেন, "আর্য্য বীজগুপ্ত, আজ আপনি অনেক দেরী করে উঠেছেন, রাতে কি ভাল ভাবে ঘুম হয় নি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, সারা রাত চিন্তা করছিলাম, একটুও ঘুমাতে পারি নি।"

"কি চিন্তা করছিলেন?"

"ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে ভাবছিলাম।"

মৃত্যুঞ্জয় একটু হাসলেন, "জীবন থেকে চিত্রলেখা চলে যাবার পর ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে চিন্তা করা খুবই স্বাভাবিক। আর্য্য বীজগুপ্ত! কিছু ঠিক করতে পারলেন?"

মৃত্যুঞ্জয়ের হাসিতে বিদ্রূপ ছিল, বীজগুপ্ত রাগে জ্বলে ওঠে।···"না, এখনও কিছু ঠিক করতে পারি নি কিন্তু খুব শীঘ্রই একটা কিছু ঠিক করতে হবে।"

"আমি জানি যে তুমি কি করবে। আমি মানুষের স্বভাব ও প্রবৃত্তি আজ-কাল কিছু কিছু বুঝতে পেরেছি।"

বীজগুপ্ত কথা ঘুরিয়ে বলে, "আর্য্য! আপনি বোধ হয় আপনার লোকজনদের যাবার ব্যবস্থা করে ফেলতে বলেছেন?"

"হ্যাঁ, এবং শ্বেতাংকের মারফৎ আপনার দাস-দাসীদেরও আদেশ দিয়েছি।"

"ভালই করেছেন।"

হঠাৎ বাইরে থেকে যশোধরার কণ্ঠস্বর শোনা যায়। "আর্য্য শ্বেতাংক! যদি পিতা এই মুক্তার মালা পছন্দ না করেন তাহলে তোমাকে ফেরত দিয়ে আসতে হবে—তোমারই কথার ওপর আমি এটা কিনতে রাজী হয়েছি।···বলতে বলতে যশোধরার ঘরের ভেতর প্রবেশ করে।

বীজগুপ্তকে দেখে বলে, "আর্য্য বীজগুপ্ত! আপনি ঘুমাচ্ছিলেন, আর দেখুন, আমি কত জিনিষ নিয়ে এসেছি আপনি কিছু জিনিষ কিনলেন না?"

"আমার কোন জিনিষের প্রয়োজন নেই।"

"প্রয়োজন তো আমারও ছিল না কিন্তু কাশী থেকে ফেরবার সময় সবাইর জন্য কিছু উপহার তো নিয়ে যেতে হবে?"

এই বলে যশোধরা জিনিষপত্রগুলো খুলতে আরম্ভ করে দেয়। মুক্তার মালাটা বীজগুপ্তের হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করে "বলুন তো এটা কেমন হয়েছে?"

"সুন্দর! কিন্তু নিশ্চয় খুব দামী!"

"হ্যাঁ, এটা আমি এখনও কিনি নি, শুধু পিতাকে দেখাবার জন্য এনেছি।"

মৃত্যুঞ্জয় মালাটি হাতে নিয়ে বলেন, "যদি, তোমার ইচ্ছে হয় তাহলে নিশ্চয় নেবে।"

যশোধরা অন্যান্য জিনিষগুলো দেখায়। সবই পছন্দ হয়ে যায়। বীজগুপ্ত শ্বেতাংককে জিজ্ঞেস করে, "তুমি কিছু নিলে না?"

"প্রভুকে কিছু জিজ্ঞেস করে যাই নি, তা ছাড়া কোন জিনিষের প্রয়োজনও ছিল না।"

"না, তা হবে না। তোমার নিজের জন্য কিছু নিতে হবে। চল, আমিও যাই। দেবী যশোধরা! তোমার যদি কষ্ট না হয় আবার একবার নগরে যাবে! জিনিষ পছন্দ করতে তোমার সাহায্য দরকার।"

"হ্যাঁ, যেতে পারি—তবে খাবার পর। এখন খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।"

ভোজন শেষ হলে বীজগুপ্ত মৃত্যুঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করে "আর্য্য, আপনিও চলুন না?"

"না, আমাকে আর টানবেন না, এখন বয়স হয়ে গেছে। নগরের কোলাহল আমার ভাল লাগে না।"

শ্বেতাংক ও যশোধরাকে সংগে নিয়ে বীজগুপ্ত বাজারের দিকে রওনা হয়। প্রথমে তিন জন এক জহুরীর দোকানে থামে। বীজগুপ্ত ও শ্বেতাংক হীরার আংটি কেনে। সামনে একটা খুব দামী মোতির হার ছিল, যশোধরা সেই দিকে নিবিষ্ট মনে দেখছিল। বীজগুপ্ত সেই হারটি বার করতে বলে, "দেবী যশোধরা! এ হারটা কেমন?"

"খুব সুন্দর! আমি আগে এটা দেখি নি, নতুবা মুক্তার মালা না নিয়ে এটাই নিতাম। আর্য্য শ্বেতাংক, এ সব আপনার জন্যে হ'ল!"

জহুরীর কাছ থেকে হারটি নিয়ে বীজগুপ্ত যশোধরার গলায় পরিয়ে দেয়, "দেবি! এটা আমার উপহার, তুমি গ্রহণ কর।"

বীজগুপ্তের হাতের স্পর্শে যশোধরার সারা শরীর কেঁপে ওঠে! হারটি খুলতে খুলতে বলে, "আর্য্য! আমি আমার পিতার অনুমতি ছাড়া এ হার নিতে অসমর্থ।"

সেনাপতি হারটি নিয়ে বলে, "কিন্তু দেবি, এ হার গ্রহণ করতে তোমার কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়, কিন্তু তবুও পিতার অনুমতির কথা যে বলছিলে, তা-ও নিয়ে নেওয়া উচিত।"

[ক্রমশঃ।

অনুবাদক—অমল সরকার



অমরেন্দ্র ঘোষ

সহরতলীর একটা বাড়ি, অনেকগুলো খোপ খোপ ঘর। মাঝখানে একটি 'কমন' প্রাঙ্গণ। এত দিন বেশ নিরালাই ছিল, হঠাৎ একজোড়া স্বামি-স্ত্রী এসে সব লণ্ডভণ্ড করে দিল।

আগের ভাড়াটেরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে একটা সপ্তাহ যেতে না যেতেই। দু'-একজন ভাবছে, এবার পালাতে পারলে বাঁচি! উঃ, কি সাংঘাতিক লোক!

হ্যাঁ সাংঘাতিক বই কি! যে মুহূর্তে এরা এই বাড়িতে এসে উঠেছে, সেই মুহূর্তেই নাটক শুরু হয়েছে। মাত্র মিনিট পাঁচেক দেরি হয়েছিল বাড়িওয়ালার দারোয়ান এসে পৌছতে। স্বামীটি ঘড়ি দেখে, স্ত্রীকে বললে, আর দাঁড়ান যায় না। সাঁড়াশীটা দাও তো?

স্ত্রী কাঁপতে কাঁপতে একখানা সাঁড়াশী বার করে দিলে সঙ্গের লটবহর খুঁজে।

স্বামীটি মড় মড় করে ভেঙে ফেললে তালাসমেত দরজার কড়া একটা। সুমুখে প্রশস্ত উঠান। সোরগোলে সকলে বেরিয়ে এল ঘর ছেড়ে। কেউ ভাবলে, মহিষাসুর, কেউ বললে, না রে জাম্বুবান।

সেই থেকে একটা আতংক থমথম করছে বাড়ীময়।

বাড়ীর অন্যান্য সবাই নিরীহ ছা-পোষা কেরাণী। গিন্নী এবং বড় সাহেবের মেজাজ ছাড়া, মেজাজ দেখেনি। তাও ইদানীং কমে এসেছে। প্রথম জন ভেজাল খেয়ে চ্যাব-চ্যাব বিয়িয়ে হামেসাই স্বরভঙ্গে ভুগছেন। আর একজন এই প্রতিযোগিতার বাজারে বিশ্বাস করতে পারছেন না সহ-অস্তিত্বের নীতির ওপর। কালা কোটিপতিরা নাকি বড্ড কোণঠাসা করে ধরেছে স্বাধীনতার পর।

এত দিন কোনো নতুন ভাড়াটে এলে সবাই এগিয়ে এসেছে। পরিচয়-পর্বটা যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি শেষ করে দলে টেনে নিয়েছে। এবার ঘটনা দাঁড়ায় উলটো। সবাই ইচ্ছা করেই এড়িয়ে চলে এই ব্যক্তিটিকে।

কিন্তু কৌতূহল এমন জিনিষ যে, চুপ করে বসে থাকতে দেয় না মানুষকে—বিশেষ করে সন্ধ্যার পর এই কেরাণী বাবু ক'টিকে। যেন চিমটি কাটে ফাজিল ছেলে-মেয়ের মত। সন্ধ্যার অন্ধকারে তারা গা ঢাকা দিয়ে ললিত মিত্রের ঘরে একত্র হয়। আগে সবাই বসত উঠানে। এখন তা আর সাহস হয় না। যদি একখানা আস্ত ইট এসে পড়ে!

ললিত মিত্রের পরিবার এখানে নেই। ছেলে-মেয়েরাও গেছে তার সঙ্গে চেঞ্জে। অতএব গু-মূত কাচবার ঝামেলা নেই। প্রচুর অবকাশ। তিনি ফ্যানটা খুলে দেন সহাস্যমুখে।—বসুন, হাওয়া খান। তারপর বলুন আজকার আবহাওয়ার সংবাদ।

দেখেছেন লোকটার সাহস?—অজিত আরম্ভ করে।

নিশীথ বাধা দেয়। বল যে সাহস নয়, দুঃসাহস। তালাটা মড়মড় করে ভাঙলে। বাড়িওয়ালা যদি ট্রেসপাসার বলে কেস করে দেয়?

মনোহর বাবু টাকটায় হাত বুলিয়ে বলেন, দিলে ভালই হয়। আচ্ছা শিক্ষা হয়ে যাবে। আমি নিশ্চয় সাক্ষী দেব ওর বিরুদ্ধে।

ললিত মিত্র জিজ্ঞাসা করেন, হঠাৎ আপনি এতটা ক্ষেপলেন কেন? সবে ক'দিন মাত্র এসে তো পা দিয়েছে এ বাড়িতে।

দিলে কি হয়। যার স্বরূপ যা, মুহূর্তে ধরা পড়ে।—মনোহর বাবু চুপ করার আগে এইটুকুই শুধু বলেন, এই সাত সাত বছর এ বাড়িতে আছি, কিন্তু কেউ কখনো—

নিশীথ অসমাপ্ত বাক্যটা সমাপ্ত করে, বৌদিকে চোখ মারেনি। হয়ত মেরেছে, আপনি জানতে পারেন নি।

ললিত মিত্র মন্তব্য করেন, ভেরি ব্যাড—জাম্বুবানের এই কর্ম?

না মশাই তা নয়। জানেন তো মেয়েদের এবং পুরুষদের কলের মাঝখানে উঁচু পার্টিশান ক্রিস্ক্রস টিউব ওয়েলের পাইপ একটা।

এদিকটায় টিপলে ওদিকের সাপ্লাই কমে যায়। আপিস যাবার মুখে আমি একটু জোর জোর পাম্প করছি—জাম্বুবান এসে হাজির।

অজিত বলে, জাম্বুবানই বটে! যেমন লোমশ তেমনি লম্বা-চওড়া। অমন রত্ন কিষ্কিন্ধ্যা ছাড়া হয় না।

জিতেন জিজ্ঞাসা করে, বলতে পারেন মিত্তির মশাই, বেটা কি করে?

'তা জানব কি করে? তবে এমন কিছু করলে এ সতের টাকার ব্যারাকে এসে মাথা গোঁজে না। ভিতর ফাঁকা যার, শত্রুও বেশি তার।

জাম্বুবানকে দেখেছিস? যেমন ডাইনি বুড়ির মত লিকলিকে দেখতে তেমনি মেজাজখানা খিটখিটে।

নিশীথ বলে, মিসেস জাম্বুবানের কোনো হিতাহিত জ্ঞান নেই। মিসেসটিই ওকে চালায়।

অজিত বলে, মেজাজটা তো আর দেখা যায় না—এর মধ্যে তুই টের পেলি কি করে?

অনুমানে।

নিশীথ বলে, সাবাস! আমি ভেবেছিলাম, অনুভবে।

মনোহর বাবু তাঁর কথা শেষ না করতে পারায় বিরক্ত হয়েছেন যথেষ্ট। তবু তিনি উপভোগ না করে পারেন না নিশীথ ও অজিতের বক্তব্য।

নিশীথ আবার বলে, তোর প্রতিভা আছে অজিত! কেরাণীগিরি করে, এমন মহৎ প্রতিভার অধিকারী খুব কম লোকেই হয়েছে।

থবেটের মত থাকবি! নইলে এ অধিকার তোরও জন্মাত।

কি করে? একটু পথ বাতলে দে না ভাই?—নিশীথ অজিতের হাত দু'খানা জড়িয়ে ধরে। জীবনভোর কত উপচারে পুজো করলাম, নানা-মানা হাসনা-হেনা, লারে-লাপ্পা—কোন উপঢৌকনেই কাজ হ'ল না।—চির যৌবন মুখঝামটা লেগেই আছে। প্রথম দিয়েছে এক কলেজের বান্ধবী, এখন তিনিই হয়েছেন গৃহিণী। তুই তো জানিস নে, আজ অতি দুঃখে খুলে বলছি, আমাদের লভ ম্যারেজ।

অজিত একখানা সেন্টপার্সেন্ট গাম্ভীর্যের ভঙ্গি করে জিজ্ঞাসা করে, বৎস! কিবা তব প্রার্থনা?

একটু যশস্বী হতে চাই, একটু অনুমানে বুঝতে চাই,—আর অনুভবে নয়। বিয়ের আগে অনেক বক্ষলগ্ন করে বুঝেছি, বিয়ের পরে তা ধ্রুব সত্য নয়।

আর কাঁদিস নে, তোকে আমি এলেমও দেব, যশস্বী করে ছাড়বই ছাড়ব। অনুমানে সব কিছু বুঝতে হলে কালই তুই এই বইখানা পড়ে এ সভায় আসবি।

এখানা যে ক্রাইম ড্রামা।

মূর্খ ও-খানাই এ যুগের বাইবেল—বিশেষ করে এখন এ-বাড়ির।

সকলে একটু হতভম্ব হয়ে যায়। ললিত মিত্র অজিতকে একটা সিগারেট কেটে আধখানা অফার করে বলেন, ভায়া একটু খুলে বলো, যদি আমাদেরও কোনো সুরাহা হয়—তার পর মনোহর বাবুর দিকে ফিরে করজোড় করে বলেন, আশা করি আপনি অফেন্স নেবেন না। আপনিও আমাদের কম সাসপেন্স-এ ঝুলিয়ে রাখেন নি।

ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে অজিত বলে, জাম্বুবানকে নিশীথের এখন ফলো করতে হবে এক জন পাকা গোয়েন্দার মত। ওর গতিবিধি লক্ষ্য করতে হবে রোজ। ডাইরি রাখতে হবে চুটিয়ে। তার পর জাম্বুবান জব্দ। তার পর যশ। পারবি?

কিসের যেন শব্দ শোনা যায় বাইরে। নিশীথের মুখ শুকিয়ে যায়। সে বলে, না।

অজিত চট করে ষ্টাইলের মাথায়, অনেকটা গোয়েন্দাগিরির পোজে সিগারেটটা নিবিয়ে ফেলে বাইরেটা ঘুরে দেখে যায়।—কেউ নয়। এখন পারবি?

নিশীথ বলে, আমার যশস্বী হয়ে কাজ নেই। বেঘোরে হয়ত জাম্বুবানের হাতে প্রাণটা যাবে।

এবার মুখ শুকিয়ে যায় অজিতের। আজীবন যে ক্রাইম ড্রামা পড়ে এসেছে, তবু কাল তাকে নতুন করে কিছু বানিয়ে নিতে হবে। এখন তাদের লাইব্রেরীতে সে সব মূল্যবান বই থাকলে হয়।

ললিত মিত্র বলেন, তা হলে আগামী কাল থেকে নতুন কিছু শুনছি?

অজিত বলে, নিশ্চয়।

তার পর সভাটা খানিক ঝিমিয়ে পড়ে। দুটো-চারটে সিগ্রেট বিড়ি পোড়ে। বাজে কথা হয় কয়েকটা। এবার মনোহর বাবু মনে মনে অত্যন্ত চটে যান, তিনি বলেন, তোমরা বস, আমি উঠি।

ললিত মিত্র বলেন, সে কি? অমন ইনটারেষ্টিং ঘটনাটা শোনাই যে বাকি? তার পর জাম্বুবান আপনাকে কি বললে?

আপনাদের তো কারুর তেমন উৎসাহ নেই আর বলে লাভ কি?

এতক্ষণ ধরে এই বুঝলেন! হায় রে। তা' হলে আর এত গোয়েন্দা স্পাইর তোড়জোড় কি জন্য? অজিত, মিছামিছি তোমার আর লাইফটা রিস্ক করে লাভ নেই।

মনোহর বাবু বসে পড়েন।—জাম্বুবান কি বললে জানো?

অজিত বলে, আপনি না বললে কি করে জানব বলুন? আমরা তো আর অন্তর্যামী নই?

বললে, আপনি অমন আপত্তিজনক ভাবে প্যাম্প করবেন না?—আমি পুরান টেনেন্ট ভিতরে ভিতরে রেগে গেলাম, কিন্তু ধীরে-সুস্থে জিজ্ঞাসা করলাম, কেন?

জাম্বুবান উত্তর দিলে, ওতে আমার স্ত্রীর ভয়ানক অসুবিধা হয়।

সকলে চাপা হাসিতে একসঙ্গে ভেঙে পড়ে। এমন যে অজিত সে ভাবলে, এক্ষেত্রে আমি ও মিষ্টার জাম্বুবানকে সাপোর্ট করি। সত্যিই মিসেসের অসুবিধা হয়। দেখেন না তার স্বাস্থ্য?

সেদিন ওখানেই যবনিকা পড়ে।

পরদিন ললিত মিত্রের বৌ এসে হাজির হন কাচ্চাবাচ্চা সমেত। ট্যাঁ-ট্যাঁ শব্দে ঘরখানা মুখর। আজ আর সভা করার জায়গা নেই। সকলের মন আই-ঢাই করছে। প্রথম চোঁয়াঢেকুর ওঠার জোগাড়! আগের মত উঠানেও বসার জো নেই। কারণ হামেশাই জাম্বুবান ওখান দিয়ে হেলেদুলে চলাফেরা করে। কখনো দু' বালতি জল আনে। কখনো বা এক ডালা ঘুঁটে। সময় সময় হাঁক ছাড়ে, সরে যান, তারে কাপড় মেলে দেব।

আজ দু'-একটা বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু একত্র না হইলে যেমন বলা যাচ্ছে না, তেমনি শোনা যাচ্ছে না কিছু।

এক কাজ করো অজিত—মনোহর বাবু বলেন, একেবারে বাড়ির

বাইরে চলো—ঐ ফাঁকা মাঠটায়। বেশ নিরিবিলি বসা যাবে পুব দিকের গাছটার তল ঘেঁষে।

তাই চলুন। আমি সবাইকে ইসারা করে আসি।

আচ্ছা যাও।

একে একে নিঃশব্দে সবাই এসে হাজির হয়। ললিত মিত্র আসেন সকলের পিছনে। কারণ, তার কাছা টেনে ধরেছিল টেঁপি, বাবা গো কোথায় যাও বলে।

তৃপ্তি দাস কাল কথা বলে নি। শান্ত-শিষ্ট মানুষ, ছিল চুপচাপ। ভেবেছিল ঝড়ের ঝাপটা ওর গায়ে লাগবে না—ও থাকবে নিরপেক্ষ হয়ে। কিন্তু কোল্ড-ওয়ারের যুগে তা যে সম্ভব নয় বেচারী জানত না।

একটু সৌখীন মানুষ তৃপ্তি দাস। এই টানাটানির বাজারেও কিছু ফুলের চারা কিনে এই রুক্ষ উঠানের মাঝখানে কয়েকটা সুন্দর ফুল ফুটিয়েছে। যখন সে বাগানটুকুর কাছ দিয়ে যায় সুগন্ধে তার প্রাণ ম-ম করে ওঠে।

তৃপ্তি দাস আজ প্রথম আর্জি পেশ করে। শুনেছেন, জাম্বুবান বলে কি না এ জুলুমী চলবে না—দশ জনার উঠানে কেউ একা ফুল ফোটাতে পারবে না।

মনোহর বাবু জিজ্ঞাসা করেন, মিসেসটি তখন কি বললে?

ঘোমটার ভিতর থেকে টিপে-টিপে হাসলে। মনে করেন ওর অনুমোদন ছাড়া কি জাম্বুবান নাচে?

নিশীথ বলে, এতক্ষণে সত্যি সত্যি ওদের জন্য সিম্প্যাথি হচ্ছে আমার। হায় হতভাগ্য!

সকলে নিশীথের মুখের দিকে সবিস্ময়ে তাকায়। অজিত জিজ্ঞাসা করে, কি বললি?

না তোদের বিপক্ষে কিছু বলছিলাম না। আমি দালালও নই। তবে কি জানিস, যারা ফুলকে ভালবাসতে জানে না, তারা অভিশপ্ত পাষণ্ড। সেই জন্যই বিধাতা ওদের ঘরে একটি ছেলে-মেয়েও দেন নি।

কে যেন বলে, বেশ করেছে। দিলে হয়ত গলা টিপে মেরে আর এক জনকে ফাঁসী কাঠে লটকাত।

মনোহর বাবু বলেন, এ সব কথায় আসল কাজ কিছু হবে না। এতে শুধু জব্দ হওয়ার নজির। জব্দ করার উপায় বলো।

কেউ কিছু নির্দেশ দিতে পারে না। তপ্ত কড়াইটা যেন জুড়িয়ে যেতে থাকে।

ললিত মিত্র বলেন, এবার তা' হলে অজিত, তোমার রিপোর্ট দাখিল করো।

অজিত বলে, সকলে মন দিয়ে শুনুন—একটা মস্ত বড় ক্লু পেয়েছি আমি। ভাল ভাবে, সুস্থ মাথায় হ্যাণ্ডেল করতে পারলে এক চালেই বাজি মাৎ।

ক্লু-টা কি?

সকলে এসে অজিতকে আরো ঘিরে ধরে। অন্ধকার ঝ'ড়ো সমুদ্রে ওরা যেন একটা লাইফ-বয়ার সন্ধান পায়।

লোকটা দাগী চোর। হাতে-নাতে ধরতে পারলে আর কথা নেই।

কি করে জানলে?—ললিত মিত্রই জিজ্ঞাসা করেন।

রাত তিনটা থেকে ফলো করো জাম্বুবান বাজারের সেরা মালটাই কেনে না!

নিশীথ জিজ্ঞাসা করে, তবে কি হাত সাফাই করেই চালের কাজ সারে? ধন্য!

চালটাই কি সেরা সামগ্রী হল তোর মতে? সাধে বলে গবেট। চালের সের আট আনা আর মাছের সের সাড়ে তিন টাকা। সেই মাছই ও সেরে সেরে খায়। তুমি আমি মাছ রোজ এক পো কিনতে পারিনে। কিন্তু ও পয়সা দিয়ে কেনে না।

সত্যি?

তবে কি এতো রাত জেগে না জেনে মিথ্যা বলছি? তোদের উপকার করতে নেই।

ওরে অজিত, তুই একটুকুতেই চটে যাস কেন বল ত? পরোপকার করাটা এত সহজ নয়। দেখিস নে আমাদের এম-পিরা কত কষ্ট করে এয়ারোপ্লেনে চড়ে লাইফ রিস্ক করে, তবে না ইলেকসনে জেতেন। এমনি-এমনি আর পরের উপকার হয় না।

এ সব কথায় অজিত কান না দিয়ে বলে, জাম্বুবানের একটি চমৎকার সিল্কের থলে আছে, আর একটা ছিপ। যত রাজ্যের পুকুরের মাছ ধরে আনে। এক দিন হাতে-নাতে ধরতে পারলে হয়। তার পরই পাড়ার সবাই মিলে জব্বর ধোলাই। বেটার স্টেডি ইনকাম নেই, আপিস কাছারী করে না—তবু দেখেছ রোয়াব!

ললিত মিত্র বলেন, তুমি কি ঠিক দেখেছ মাছ চুরি করতে?

নিশ্চয়। কালই ভোর না হতে জানতে পারবেন সব।

যে যার ঘরে গিয়ে উদগ্রীব হয়ে থাকে। প্রথম রাত্রে উত্তেজনায় ঘুম আসে না। দুঃখের বিষয় ভোর রাত্রেও কারুরই সেদিন ঘুম ভাঙে না। এমন যে অজিত, তারও। শেষ রাত্তিরে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে কি না।

দিনটা কোনো প্রকারে কেটে যায়। সন্ধ্যার একটু আগে সুরু হয় একেবারে নতুন উৎপাত। বাড়ির ওপরের সব ছেলে-মেয়ের না কি জাম্বুবানের ঘরে নিমন্ত্রণ। সকলে ভয়ে অস্থির। কিন্তু প্রত্যাখ্যান করার মতও সাহস নেই কারুর। ডিটেকটিভ অজিত এখনো বাড়ি এসে পৌঁছায় নি।

ছেলে-মেয়েদের ছেড়ে দিয়ে কেউ ঘরে তিষ্ঠোতে পারে না। একে একে সবাই জাম্বুবানের দোরগোড়ায় গিয়ে হাজির।

জাম্বুবান সাদা দাঁত বার করে বলে, ভয় নেই, বিষ খাওয়াব না, এ ঘরে আজ বাল-গোপালের পুজো।

স্ত্রী স্বহস্তে অতি পরিপাটি করে ফুল দিয়ে সবাইকে সাজায় প্রথম। তার পর খেতে দেয় রাজসিক অনুষ্ঠানে। মিসেসের শুকনা মুখে যেন মা যশোদার প্রতিবিম্ব।

সবাই আর একটু লক্ষ্য করে দেখে, সিল্কের থলেটার কাছে যেটা দাঁড় করান সেটা ছিপ নয়—ফুলতোলা আঁকশি।



অঙ্গরোগ

বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য্য

এই জায়গাটা—

ঠিক!

চার নম্বর খিদিরপুর ডকের 'কী' লাইনে চমকে থমকে দাঁড়ালাম। কোনো চিহ্ন নেই! এর ওপর দিয়ে তারপর থেকে আজ পর্যন্ত কতো শত কথা, হয়ে গিয়েছে রকম বে-রকমের ;—কাজের জাতা ঘ'ষে-মুছে নতুন ক'রে দিয়েছে জায়গাটা। পুরোনকে মুছে দেয়ার নতুনত্ব। বোঝার উপায় নেই। অথচ এখানটা চোখ পড়লেই ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে মনের মধ্যে, ভেসে ওঠে রামচাঁদের বীভৎস ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত মুখখানার সঙ্গে সঙ্গে ওর সুখ-দুঃখের সাংসারিক ঘটনা আর জীবন-সংগ্রামের কথা, দুঃখ-দুর্দশা আর অশান্তির কথা, ভক্তিপ্রণতা ব্রীড়াবনতা প্রেম-মমতাময়ী স্ত্রীর কথা, স্নেহময়ী মায়ের কথা।

ঠিক এমনি এক স্তব্ধ দুপুরে আমাকে শুনিয়ে গিয়েছিল রামচাঁদ। বিমুগ্ধ একনিষ্ঠ শিল্পী শ্রোতা পেয়ে উজাড় ক'রে দিয়ে গিয়েছিল মনের পাত্র, আমার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের আধারে—মনের ওপর তলায়।

বাধ্য হ'য়েই দেশ ছেড়েছিল ছেচল্লিশে—

খুলনার লকপুর গ্রাম থেকে কোলকাতা ডকের লকগেটের এলাকা ঠিক সোজা রাস্তা নয়, সহজও নয়। কিন্তু কী করবে রামচাঁদ? ঐ গায়ে-গতরে খেটে বাঁচার 'তাগিদ! বাঙ্গালী নিম্ন-বিত্তদের টিকে থাকার সংগ্রাম—। তাইতো অরণ্য ছেড়ে নগর: মুক্তি থেকে বন্ধনের জটিল বন্ধনীতে।

বারে বারেই সহরের বিনিময়ে, ইট-কাঠ-লোহার, ঝুটা-সভ্যতা বন্ধক দিয়ে অরণ্য চেয়েছে সে। পায় নি। পায় না কেউ। নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ার গল্পের মতো বাঁচার সংগ্রামে, দাসত্বের নিগড়ে আষ্টে-পৃষ্ঠে অক্টোপাস বাঁধনে বাঁধা পড়ে গেল রামচাঁদ। প্রথম্ চোদ্দ নম্বর কারখানায় ঠিকে কাজ—। সূর্য্য-শ্রম: উদয়-অস্ত। এ কোথায় এলো সে? এলো কোথায়? কেন এলো? কেন? কেন—?

দিন-রাত কালো রঙ-লাগানো তুলির মতো কারখানায় চিমনীর মাথায় এক টুকরো কালো ধোঁয়ার তুলি লেগে থাকে। লেগেই আছে! আর সারা দিন সেটা আকাশ-ইজেলে কী এক ভয়াবহ শয়তানী ছবি এঁকে চলেছে অবিরাম—অবিশ্রাম; অসংবদ্ধ অসম্পূর্ণ।

নিষ্কলঙ্ক আকাশকে পার্থিব সভ্যতার কলঙ্কে কলঙ্কিত করার ব্যর্থ চেষ্টা। জলে স্লেটের লেখা মুছে যাওয়ার মতো হাওয়ার কী এক যাদুতে প্রতিক্ষণেই মুছে মুছে যাচ্ছে সেই বিরূপ-বিপুল কালির ছোঁয়াচ। এই চলেছে—

ওদিকে ডকের জলাধারে রাজহাঁসের মতো ধীর মন্থর গতিতে তর-তর করে জল কেটে-কেটে বিশাল বিশাল জাহাজের যাওয়া-আসা। সঙ্গে রাজহাঁসের বাচ্চাদের মতোই সামনে-পেছনে দু'খানা ট্যাগলঞ্চ জাহাজের হাত ধরে খিদে পেলে বাচ্চা ছেলেমেয়েদের তাদের মাকে রান্নাঘরের দিকে টেনে-টেনে নিয়ে যাওয়ার মতো পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে সদাসর্বদা।

ব্যবসা-বাণিজ্য কাজকর্মের তীব্র স্বর ক'লকাতার আবহাওয়ায়। এখানের হাওয়ায় নাকি টাকা-ছড়ানো। নিতে জানলেই হ'লো। নিতে জানলেই নেয়া যায় না কিন্তু। রামচাঁদ বুঝেছে হাড়ে-হাড়ে। কী করলে উপার্জন হয় জানে সে, কিন্তু সেইটে করতে পারার সুযোগ, সুবিধে সুপারিশ কিছু নেই তার—কিচ্ছু না। তবু, ধ'রে প'ড়ে থাকার জন্যেই নগণ্য পারিশ্রমিকে কারখানায় ঠিকে কাজ নিয়েছে সে। আশা, শক্ত হাতে ঝাঁটা ধরতে পারলেই তলোয়ার ধরা যাবে এক দিন। মন কিন্তু বাঁধা বাড়ীর সঙ্গে। চিঠিপত্রেরই যোগসূত্র নয় শুধু। আরো কিছু। বনলতা। পূর্ণিমার চাঁদের মতো সিঁদুর টিপ কপালে। লালপাড় মোটা শাড়ী। মিষ্টি-মিষ্টি মুখ, নম্র বিনয়ী বেঁটে-খাটো, গাঁটা-গোঁট্টা গোলগাল। মা'র পেছু পেছু ঘুরঘুর করছে সব সময়—বেশি সময়ই অন্যমনস্ক হ'য়ে যাচ্ছে পশ্চিম নীল কার্পেটা আকাশের দিকে চেয়ে। কোনখানটা কোলকাতা? কেমন শহর?—কোথায়?—কতো দূরে? —কী করছে সে—?

আর এখানে আর এক আকাশ। যতো দূরে দৃষ্টি দাও মানুষের ভবিষ্যতের মতো ধোঁয়া ধোঁয়া,—আবছা আবছা।

সুদূর দিগন্ত দিয়ে গড়া বিপুল এক নীলাভ বেলুনকে কে যেন ধোঁয়া দিয়ে দিয়ে ওপর দিকে মহাশূন্যে তুলে দিতে চায়। সে যেন অর্থ-সমাজ-রাজনীতি বাণিজ্যিক উচ্চারোহণ,—আভিজাত্য দম্ভ আর উচ্চাশার আকাশাতীত অন্ত্যাকাশ চারণ।

—বিরাট পাগলামী।—

দুঃখ এই যে, কোলকাতার এই আভিজাত্যের দম্ভ তার সকল আশ্রিতকে নিয়ে নয়। এ যেন বিরাট এক একান্নবর্তী পরিবারে উপার্জনভেদে ভিন্নাচরণের ভাঙনের ইঙ্গিত। শ্রেণী আর বিত্তভেদে মানমর্যাদা, সুখসুবিধের পার্থক্য। সম্পদশালীদের দুঃস্থ আত্মীয়ের মতোই নিম্নমধ্যবিত্তরা, তারও নীচে শ্রমিকশ্রেণী। প্রতিকার প্রতিবিধানহীন অবস্থা।

রামচাঁদ স্থায়ী আর সুবিধের চাকরি পাবে কোত্থেকে? তার যে বংশমর্যাদা, শিক্ষা আর সুপারিশের জোর নেই! পেছনে কী রুই-কাতলা খুঁটি আছে তার? তবে? দেড় টাকা রোজের ঠিকে-কাজ,

ছাড়া গতি কি? কতো ক্ষুদ্র আশা! একটা চলনসই স্থায়ী চাকরি—একশো' টাকার মতো। বেশি তো চায় না! মাকে আর স্ত্রীকে নিয়ে আসবে। একটা ঘর কেটে দু'খানা করতে জানে সে। তাতেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সন্তুষ্টির সোনা ঝিক-মিক করবে তার মুখে-চোখে। তাও হয় না। এতো ক্ষুদ্র ইচ্ছাপূরণেও পর্বত-বাধা। অবাক পৃথিবী!

তবু সে আয়েসী নয়। জানে শক্ত মুঠিতে হাল ধরতে হয়। যতোই কৃত্রিম জগৎ আর প্লাষ্টিক সমাজ হোক না, অকৃত্রিম একনিষ্ঠতার মূল্য আছে। নিজের দশটা আঙুলের ওপর আস্থা পুরোপুরি। কিন্তু কোথায় বিশ্বাসের মূল্য? মাঝে মাঝে, এলিয়ে-পড়া মুহূর্তে ভাবে সে। সে'ও তো কায়িক পরিশ্রমের পূজারী। তবে ধাক্কা কেন প্রতি পদে পদে? কেন ধাক্কা?

চোদ্দ নম্বর কারখানার লোহা-গালাই কাজ নাকি তার 'কম্ম' নয়। বড়মিস্ত্রি বিশ্বেশ্বর রবিদাস বিধিমতে ঐ কথাই বোঝাতে চেষ্টা করেছে। হিম্মৎ নেই বাঙ্গালীর। বিমারে পড়ে যাবে। তার ওপর যদি একটু খুঁত পাওয়া গেল তো, রক্ষে নেই—তিলকে তাল! ঘর যাও! ইয়ে তুমলোগোঁকা তাগদসে নেহি হোগা।

অন্ত কাউকে এমন ক'রে তো বলে না, এমন খুঁতে। ওরা ভাবে এতো দিন ওদের একচেটিয়া কাজে বাঙ্গালীরা অনেক উন্নত-মস্তিষ্ক নিয়ে এসে ওদের নস্যাৎ করে দিতে এসেছে। তাই বোধ হয়, ও গেলে আর এক জন মুলকীকে অনায়াসেই আনা যাবে, ফোরম্যানকে বুঝিয়ে। হয়তো ঠিকই, ওরা ছাড়বে কেন নিজের কোণ? জীবন-সংগ্রামে লড়বার পেশার যে কোণ ভাগে প'ড়েছে ও-দের, ছাড়বে কেন তা?

অফিসকা কাম দেখো ভাইয়া! পিওন-চাপরাশীকা কাম ঠিক হোগা; মালুম?

দুর্মূল্য উপদেশ।

ওখানকার শক্ত মাটিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা গেল কই? জোয়ারের আবর্জনার মতো তাকে প্রতি ঘাট থেকে জল ঠেইয়ে-ঠেইয়ে হটিয়ে দেয় সকলে আঘাটার দিকে। উপায়?

মরিয়া হয়ে কয়লা-ডকে চাকরি নিল সে। ঠিকে। দু'টাকা চার আনা রোজ। শেষে শুধু অধ্যবসায়ের জোরেই বলতে হবে, হলো স্যাটখালাসী। সব জায়গায় এক কথা। এ বাঙ্গালীর 'কম্ম' নয়। ওদেরি বা দোষ কি? বাঙ্গালীরাই উপদেশ দিয়ে বসে।

তুমি এ পারবে না।

কেউ আবার ধমক দেয়।

—কুলি-ধাওড় নাকি তুমি? ভদ্র চেহারা! এ পাপের ভোগ কেন? এ যে জাতের অপমান!

এ-সবের বিরুদ্ধে বুকের রক্ত দিতেও প্রস্তুত রামচাঁদ। জীবিকা নির্বাহ আবার অসম্মান! নিজের জীবিকা সংগ্রহ করতে পারাটাই এক বিরাট সম্মান,—অসৎ উপায় ছাড়া সে যেমন করেই হোক। সারা দিনের শেষে কয়লা-মাখা অবস্থায় স্নান সারতে সারতে ভাবে সে! কুলি-ধাওড়!

উপদেশ তো খুব। দিক না কেউ সেই ভদ্র কাজ। সে মুরোদ নেই। জাতের ঠুনকো মান-অপমানের নিকুচি করেছে। খেতে না পেয়ে ভিক্ষে করা, শুকিয়ে শুকিয়ে রোগে ধ'রে, জাত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটা খুব সম্মানের, না?

যতো সব বাকসর্বস্ব অকেজোর দল!

না, কোনো কথা নয়, ঐ কাজই করবে সে।

স্যাটখালাসী।

তাই ভালো।

ওয়াগন থেকে ঢালা কয়লা এক লোহার ফ্রেম-পথে প্রায় জলের ধারে চলে আসে। সেই ফ্রেমটাকেই 'স্যুট' বলে। তার এ দিকের শেষে একটা লোহার ডালা। সেইটের দেখাশোনা করার কাজ। ডালাটা খুলে দিলেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসবে কয়লা। সেখান থেকে ঝুড়িতে বা ক্রেণে-লাগানো টবে বোঝাই হয়ে সোজা জাহাজে উঠবে কয়লা। ডালা খোলা-বন্ধ, তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার ওপর। কালি-ঝুলি লাগে; বিকেলে চেনা যায় না তাকে। তা হোক।

হোক বললেই আর হয় কই?

এক দিনের ছোট্ট একটা ঘটনায় রামচাঁদের হয়-টা নয় হ'য়ে গেল হঠাৎ। যতো নষ্টের গোড়া ঐ বউ!

চাকরীতে প্রায় প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে মাকে আর স্ত্রীকে নিয়ে এলো ও ভূকৈলাস রোডের বস্তিতে ঘর ঠিক ক'রে।

কী খুশী বউটা! আহা, গ্রামের বাইরে কখনও পা দেয়নি!

রামচাঁদের আসন্ন স্থায়ী সঙ্গ যতো না আনন্দ দিল, তার চেয়ে অনেক অনেক আনন্দ দিল বাইরে বেরুনোয়। চোখে-মুখে চাপতে ব্যর্থ চেষ্টা করা খুশি টস্-টস্ করে উপচে উঠল যেন। রামচাঁদ মাকে ফাঁকি দিয়ে-দিয়ে বার বার বউটার আনন্দোজ্জ্বল মুখখানা দেখতে দেখতে এলো সারা পথ।

কতো প্রশ্ন, কতো কৌতূহল, কী অবাক হয়ে যাওয়া! বিব্রত করল রামচাঁদকেই। এমন সব প্রশ্ন করতে লাগল, যার উত্তর রামচাঁদের ভাঁড়ারে নেই। অথচ জানি না ব'লে খাটোও হওয়া যায় না। বউটার যে অগাধ ভক্তি-বিশ্বাস ওর ওপর। আজে-বাজে বুঝিয়ে, এড়িয়ে-মেড়িয়ে রেহাই পেলো কোনো ক্রমে।

কলকাতা দেখে তাজ্জব!

এখানে থাকবে ওরা? কী সৌভাগ্য! এতো বড় শহরের বাসিন্দা? এ যে ভাবাও যায়নি? আনন্দে, গর্বে, স্বামিসোহাগে ফুলে ফুলে উঠেছিল বনলতা। সে রাতের মতো রাত আর আসেনি রামচাঁদের জীবনে। ফুলশয্যার রাতে অপরিচয়ের লজ্জা, আর মেয়েদের স্বাভাবিক অসুবিধে ছিল। আজ তো আর তা নেই? এখন চিনেছে স্বামীকে। নিজের অধিকারের এলাকা নিয়েছে বুঝে। কতোটা এগোতে পারে জানে। বন্যার মতো আদরে-সোহাগে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল রামচাঁদকে। শেষের দিকে বিব্রত, ভীত পরিশ্রান্তই হয়েছিল রামচাঁদ,—অতখানি প্রাণশক্তির কাছে নিজেকে নিঃস্বই মনে হয়েছিল যেন।

পরের দিন যথারীতি কাজ। কে জানতো সেদিনের রাতে ঐ সমস্ত উবে যাবে? বিকেলে তাড়াতাড়ি কাজ থেকে ফিরে বাসার দরজায় কড়া নেড়ে একটু অপেক্ষা করতে হয়েছিল ওকে।

মা গো ও-ও!—

দরজা খুলেই চীৎকার ক'রে পড়ে গিয়েছিল বনলতা। একেবারে অচৈতন্য।

আরে, আমি—আমি !

আর আমি ! ততক্ষণে যা হবার হয়ে গেছে। রামচাদ তো আর ভেবে দেখছে না, তাকে কী রকম দেখতে হয়েছে। কয়লা-মাখা সর্বাঙ্গের ওপর সাদা দাঁতের হাসি আর অস্বাভাবিক মনে হওয়া, সাদা সাদা চোখ। এ রূপ তো বনলতার পরিচিত নয় ! নিদারুণ প্রথম আঘাত বনলতার। মৃত্যু হয়নি এই যথেষ্ট।

জলটল দিয়ে জ্ঞান ফিরল বনলতার। ঘরে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল রামচাদ,—বোঝালো—সাহস দিল। বনলতা শুধু উদাস বিষণ্ণ দৃষ্টিতে জানলার বাইরে চেয়ে থাকলো তো চেয়েই থাকলো !

রাত্রে শুধু জিজ্ঞেস করল—তুমি কী কাজ কর ?

সমস্ত বলল রামচাদ। একটা টানা নিঃশ্বেস নিল বউ।

এই চাকরী তুমি কেন নিলে গো ? ও-কি ভদ্রলোকের কাজ ? আমি যে,—আমি যে কতো বড় ক'রে ভেবে বসে আছি। দেশের কতো লোককে বলেছি অফিসের বাবু তুমি ! এক্টু ফুঁপিয়ে উঠল বনলতা।

আরো বড় নিঃশ্বেস নিল রামচাদ। এ ব্যাপারে নির্মম বাঙ্গালী সমাজ। সহানুভূতি তারিফের বালাই নেই স্ত্রীর কাছেও। শ্রদ্ধা পাবে না শ্রমিক-স্বামী বরং উপবাস চাইবে স্ত্রী তথাকথিত সম্মান নিয়ে। আশ্চর্য ! অফিসের বাবু না হলে জাত হিসেবে বাঙ্গালীর অপমান ভিখিরী হলেও যা হবে না। অবাক !

অনেক বোঝালো রামচাদ। না পেলে কী করবে ? তাদের তো আর উপোস করিয়ে রাখতে পারে না। ছুনিয়াটা পাল্টে যাচ্ছে। লোক বাড়ছে—বাড়ছে প্রতিযোগিতা। শুধু পাখার তলার কাজ মুষ্টিমেয়ের জন্যে। সেখানেও শিক্ষার প্রতিযোগিতা। সহজ নয়। হাতে-কলমে গায়ে-গতরে কাজের ছুনিয়া এটা। সাধারণ মিস্ত্রি-মজুরে বাবুজীবনের চেয়ে বেশি উপার্জন ; এখন এই নিয়ম। বোঝো !

কী বুঝল বনলতা সেইটেই বোঝা গেল না। শুধু নিঃশ্বেস ফেলল আর কথা একেবারে প্রায় বন্ধ ক'রে দিল সে। যা বলল তা ঐ বিষয়েই নয়। শেষে রামচাদই মত পাল্টালো। বনলতার মুখে মিষ্টি হাসির ফুল ফোটাতে, চোখে আলো জ্বালাতে আর বুকে বাতাস বওয়াতে কয়লার কাজ সে ত্যাগ করবে ঠিক করল চূড়ান্তভাবেই।

অনেক ধরা-করা—কাঠ-খড়—হাত-কচলানো। কিছু হয় না। ভাগ্যিস অফিসের সতীশ বাবু ছিলেন। ইউনিয়ন কর্মী। কতো তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি আর আলাপ-সালাপ। সকলেই মান্য করে, ভক্তি শ্রদ্ধা ভালোবাসা উজাড় ক'রে দেয়। আর কতো সাধারণ চালচলন। অত বড় ঘরের ছেলে বোঝে কে ? এক দিন ছুটি ক'রে বিকেলে এসে ভাঙ্গা পাথরের গেলাসে বনলতার তৈরী চা তারিফ ক'রে খেয়ে গেলেন। কী আনন্দ বনলতার ! কেউ তো এমন ক'রে বলেনি এ কথা ! রান্নার প্রশংসার মতো আনন্দ খুব অল্পই পায় মেয়েরা। পাশের ঘর থেকে শুনে ঠোঁটে হাসির প্রলেপ বুলিয়ে চলে এসেছে বনলতা। শাশুড়ির দৃষ্টি এড়ায় নি—।

—হাস কেন বৌমা ?

ঠোঁটের হাসির তুলির ওপর অন্য এক তুলির পোঁছ। লজ্জায় প'ড়ে গেছে সে।

—আজ চা নাকি খুব ভালো হয়েছে।

—হবে না কেন ? যেমন যেমন বলি করলেই হবে। আমি আজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখেছি বলেই না—

প্রশংসার ভাগীদার,—পুত্রবধূ শাশুড়ির স্বাভাবিক মানসিক দ্বন্দ্ব—শাশ্বত স্নায়ুযুদ্ধ—।

সেই সতীশ বাবুকে সমস্ত নিবেদন করে বসল রামচাদ।

—আমার কাজটা পাল্টে দিন বাবু ! শেষে কাতর অনুনয়, বউ বড় দিক করছে। এই আপনি এলেন তাই ভালো চা করল; আমাকে ঐ ব্যাপারের পর থেকে কোনো দিন চা ক'রে দেয়নি।

হা-হা ক'রে হাসলেন সতীশ বাবু।

—এমন কথা ? তাহ'লে তো ব্যবস্থা একটা করতেই হয়। অন্তত ভালো চায়ের মুখ চেয়েও !

কয়েক দিন মাত্র। করিৎকর্মা লোক সতীশ বাবু। তবু যেন মুখ ভার। কিছু হলো না বোধ হয়। রামচাদের জিজ্ঞেস করতে—না, শুনতে ভয়। তবু যতোক্ষণ আশায় আশায় থাকা যায়। খাবার ছুটির শেষের দিকে অফিসের আশে-পাশে সতীশ বাবুর সামনে দিয়ে ঘোরাফেরা করল কয়েক বার ওঁর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে।

জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই হতাশ হতে হবে। লটারির ড্রইং-লিস্ট নিজের টিকিটের নম্বর ডিপ্লম খোঁজার সময়ের মতো দুরু-দুরু বুক। শেষে সতীশ বাবুই ডাক দিলেন। সেই মুখ বেঁকানো। হয় নি নিশ্চয়ই। তবু জিজ্ঞেস—একেবারে ভেঙে যাওয়ার অবস্থায়।

হয়েছে একটা—তবে পারবে কি ? সতীশ বাবুর বেশ বিলম্বিত লয়ের বাক্য।

খুব পারব বাবু ! না শুনেই বলে বসল রামচাদ।

বড় বিপদজনক কাজ—

এর থেকে খারাপ কাজ কি হতে পারে ? রামচাদ তো খুঁজে পায় না।

কি এমন কাজ বাবু যে এর থেকেও বিপদজনক ? এ যে ঘরে-বাইরে বিপদ বাধিয়েছি। আমার পরিবারের মন ভাঙাটা যদি দেখতেন—

জাহাজের রঙ করার একটা কাজ জোগাড় হ'তে পারে। ওদের সাহেবকে বলেছি। সে রাজী। চিপিং পেণ্টিং দেখেছ তো ? ঐ জাহাজের গায়ে ঝুলে ঝুলে রঙ চটাতে হবে আবার লাগাতে হবে। তিন টাকা রোজ। দেখো ঐ সঙ্গে যদি পরিবারের মনের কালো রঙটা চটিয়ে লাল গোলাপী রঙ ধরাতে পারো। হাসলেন সতীশ বাবু।

খুব পারব। রঙ করা অভ্যেস আছে আমার। উৎসাহ-মুখর হয়ে উঠল রামচাদ।

এটা তবু একটু ভদ্র কাজ। বাঙ্গালীয়ানার ছোঁয়াচ লাগানো। ওর মা-স্ত্রীর মনের মত হয়তো নয়। তবু বাঙালীর কাজ। রঙ করা। জাতশিল্পী ওরা। ওর এই কাজের মধ্যে দিয়ে অন্তত: কিছুটা না-মেটা খিদের উপশম হবে। উপযুক্ত জাতিগত জীবিকাও। ওর পূর্ব পুরুষেরা প্রতিমা গড়ত, করত অঙ্গরাগ। কী রঙের খেলা দেখিয়ে দিত তারা। কতো রঙ-বেরঙের ঠাকুর,—পুতুল। ছেলেবেলায় রামচাদ তার কাকাকে গ্রামের বারোয়ারী তলায় দুর্গা প্রতিমা গড়তে দেখেছে। কার্তিকের গোঁফের সূক্ষ্ম টান দিয়ে তুলি হাতে তন্ময় হয়ে

বসে থাকতে দেখেছে কাকাকে। নিজের স্মৃতিতে নিজেই মুগ্ধ। আজ এই ক'বছরের মধ্যেই অতি জ্যামিতিক নিয়মেই যেন দিন চলেছে পাল্টে। লাফ দিয়ে দিয়ে তার পরিবর্তন। নদীর ব'য়ে-যাওয়া জলস্রোতের নতুন নতুন তীরভূমি দেখার মতো দিন এগিয়ে চলেছে—কী এক সর্বজ্ঞানবিজ্ঞান সমন্বয়ের সিন্ধুতে মিশতে কে জানে!—

আজ আগের দেবতাদের পাশে মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়েছে আর এক দেবতা—যন্ত্রদেবতা। প্রতিদিন উচ্চ থেকে উচ্চতর হচ্ছে তার বিজয়োদ্ধত শির। এ যুগের প্রকৃত ভাত-কাপড়ের দেবতা কল-কারখানা, ইঞ্জিন-জাহাজ। তাই জাহাজে রঙ দিয়ে তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপর আর এক বাড়তি দেবতার রঙ করছি মনে ক'রে আত্মপ্রসাদ পাবে রামচাঁদ। কাজ নেবে সে। এ ভালোই হলো, পরোক্ষে জাত-কর্মই পেলে সে।

আমি করব বাবু! আপনি ঠিক ক'রে দেন হুজুর!

সতীশ বাবুর পা ছুঁলো সে আবেগ উত্তেজনায়।

হা-হা ক'রে উঠলেন সতীশ বাবু।

কর কি? বলছি তো হবে! সোমবার থেকে লেগে যাবে। চল আমার সঙ্গে।

কাজ ঠিক হয়ে গেল সেই রাত্রেই।

সোমবারে নতুন অফিসে নাম লেখানো সাত সকালে বড় সাহেবের চিঠি নিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে কাজে। একটা ছোটদলের সঙ্গে কয়েকটা টুকরো-টুকরো যন্ত্রপাতি রঙের টিন, দড়ি, তক্তা, ছেনি, বাটালি জাতীয় জিনিসপত্র নিয়ে যাত্রা হলো শুরু। মন্দ নয় তো! যেন আর এক নতুন অধ্যায়। কারখানার ভূমিকা আর কয়লা-ডকের প্রথম পরিচ্ছেদের পর কর্মজীবন—উপন্যাসের পরবর্তী পরিচ্ছেদ—পরিচ্ছদও।

বেশ উৎসাহ বোধ হলো রামচাঁদের। অনেক-অনেক হালকা কাজ। কী ব্যস্ত ডক। এ জাহাজটা না হয় অপেক্ষমান! কিন্তু ন' নম্বর থেকে এক নম্বর পর্যন্ত প্রত্যেক বার্থের জাহাজ বেদম কাজ ক'রে চলেছে মরিয়া হ'য়ে।

ঝন্-ঝন্, কড়্-কড়্, গুড়-গুড়—দুম-দুম। কতো কতো শব্দ! জলশক্তি চালিত ক্রেণ চলেছে হুস্ হুস সর সর ঝন ঝন সুরে গান গেয়ে গেয়ে। পাখিরা যেমন তাদের বাচ্ছাদের খাওয়ায় ঠোঁটে ক'রে ব'য়ে আনা খাবার, তেমনি ডকের 'কী-সাইড' থেকে রপ্তানী দ্রব্য মুখে ক'রে তুলে নিয়ে জাহাজের খোলের মধ্যে কতো সন্তর্পণে নামিয়ে দিচ্ছে ক্রেণগুলো শুঁড় নামিয়ে নামিয়ে জিরাফের মতো, সারসের মতো।

জাহাজটা যেন বিরাট এক নীড়। তার মধ্যে অসংখ্য বাচ্ছা পাখী যেন লালাভ মুখ হাঁ করে খাবারের জন্যে কিচ-কিচ করছে আর মা-পাখী ক্রেণ জুগিয়ে চলেছে তো চলেছেই। তুলে আনা আর জুগিয়ে যাওয়া। সত্যিই। জাহাজের ফলকার ভেতরের কর্মরত পোর্টাররা একটু দেরী হলেই তাড়া লাগায় মালের জন্যে, ব্যঙ্গ করে ক্রেণ ড্রাইভারকে—শো গিয়া ক্যা?

ওপর থেকে দেশলাইয়ের বাক্সর মতো ক্রেণম্যানের চৌকো খুপরি থেকে পালটা জবাব আসে—যাওকো গুতা খোড়াই!

রামচাঁদ অবাক। এই রকম অবাক হয়েছিলো কোল ডকে যন্ত্রে কয়লা বোঝাই দেখে—মেকানাইজড্ বার্থে। আপনি বোঝাই হয় কয়লা—কন্ভেয়ার বেল্ট না কি যেন বলে তাকে। ঘুরতে ঘুরতে টন টন কয়লা উগরে দেয় জাহাজের মধ্যে; জলপ্রপাতের অবিরাম জল গড়িয়ে পড়ার মতো কয়লাপ্রপাত। যন্ত্রকে কি না করাচ্ছে মানুষ! সার্কাসের পোষা হাতীর মতো হুকুম তামিল করিয়ে নিচ্ছে। রামচাঁদের হঠাৎ মনে হ'লো জাহাজগুলো যেন এক একটা বকরাক্ষসের মতো জলদৈত্য। এসে দাঁড়িয়েছে। কোলকাতা শহরকে তার ক্ষুধা মতো খাবার জোগাতে হবে নিয়মিত। যতোক্ষণ না উদর পূর্তি হয়, নিস্তার নেই—জোগাতেই হবে।

—তা বাপধনের চোখের রঙ কি জাহাজে ধরবে বাপ?

কানের কাছে বিদ্রূপাত্মক স্নেহের সুরে চমক ভাঙ্গলো রামচাঁদের। অপ্রস্তুত।

এবার কাজ-কর্মে হাত দাও! দেখা তো অনেক হলো।

একটা হাতে-পায়ের নীল-নীল জটপাকানো পাকানো শির বারকরা বুড়ো ওকে হুঁসিয়ারী দিলো—। রামচাঁদ চেয়ে দেখলো ওকে। গলার মাংস ঝোলা, গণ্ডকম্বলের মতো কোঁচকানো থলথলে। মাথায় ফিরফিরে অস্বাস্থ্যকর রুক্ষচুল। বঙ্কু মিস্ত্রি। ওর নাম শুনেছে এই মাত্র। কথাবার্তার ওস্তাদ। হ্যাঁ, এই যে আরম্ভ করি! রামচাঁদ ওর চিন্তাভাবনাকে মনের এক পাশে জড়ো ক'রে রাখল।

—তোমাকে কাজ করতে ব'লে বিরক্ত কি সাধে করলুম ভাই! পেয়াদা করালো। আমার ওপর ভার পড়েছে তোমাকে এক ঘণ্টায় কেলোয়াং ক'রে দিতে হবে। না হ'লে সর্দার এসে সর্দারী করবেন। তার ওপর সুপারভাইজার বাবু এলে তো রক্ষে নেই? কাজের জোগাড় যন্ত্র করতে করতে আবার বলল—তোমার মতো রঙীন চোখের চাওনি বুলিয়ে যদি জাহাজে রঙ করা যেতো রে ভাই! তাহলে এই তিরিশ বছরে হাড়-মাস এক হয়ে যেতো না বোধ হয়।

—আপনি ত্রিশ বছর এই কাজ করছেন বঙ্কুদা'?

রামচাঁদ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল বঙ্কুকে। যেন এক ঐতিহাসিক আবিষ্কার পরীক্ষা করছে কাল নির্ণয়ের জন্যে। পঞ্চাশ বছরের কাল-ঝড় সহ্য করা এক বিপর্যস্ত দেহদুর্গ।

তা করতে হয়েছে বৈ কি। মনের সমস্ত রসকস্ রঙ ক'রে বুলিয়ে বুলিয়ে দিয়েছি হাজার হাজার জাহাজে। নিজে নিঃস্ব হয়ে গেছি আজ। তবু এইটুকু আনন্দের ভাই যে, আমার বুরুশের পোঁছ সারা পৃথিবীর বন্দরে বন্দরে, সমুদ্রে সমুদ্রে আলো জেলে দিয়েছে। নীল সমুদ্রের ওপর আমার রঙ-করা জাহাজ পদ্মের মতো ফুটে উঠেছে। এ'তেই আত্মপ্রসাদ।

রামচাঁদ এক মুহূর্তে বঙ্কুর অন্তরটা দেখতে পেলো। লেখাপড়া জানা লোক'ণ কবি। সুযোগ পেলে হয়তো মহাভারতের কাশী-রামের মতো কবিতা ফলাতে পারতো। বাজে খরচ হয়ে গেল হয়তো।

—নে ভাই নে, জলদি কর! তাড়ার চাবুক লাগলো বঙ্কুদা'। সকলে তক্তা-দড়িতে দোলনা ঝুলিয়ে ফেললো 'বেশ কয়েকটা—জাহাজের গা বেয়ে। কাজ আরম্ভ হয়ে গেল যেন কি এক অদৃশ্য সুইচের চাপে।

ঠক্‌ঠক্—ঠকাঠক, ঠকাঠক।

ঝরণার মতো দিন গড়িয়ে পড়ল এক সময় সন্ধ্যের অন্ধকার-অন্ধকার খাদে। সারা দিনের কাজ আর তার বিচিত্র অভিজ্ঞতায় ভরপুর হয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল রামচাঁদ হন-হন ক'রে। কাল থেকে আবার খুশি আছে বৌ। চাকরি পাল্টেছে যেন ওর নিজেরই। মানের আর সম্মানের কাজ। সমস্ত রাত আজ ও উজাড় ক'রে তুলে ধরার মুখের কাছে সুস্বাদু পানীয়ের মতো—। রামচাঁদের সারা শরীরের শিহরণের ঢেউ ব'য়ে গেল কাল্পনিক আগামী রাত্রি যাপনে। তবু একাজও কি ঠিক মেনে নিতে পেরেছে বনলতা? না। যেন আপোষ ক'রে নিয়েছে কোনো ক্রমে। মন সায় দেয় নি পুরোপুরি। মন্দের ভালো ভাব।

কী ভীড় রাস্তায়! এই সময়টা আর সকালে এমনিই হয়। ডকগেট থেকে ট্রামডিপো ছাড়িয়ে বাবুবাজারের সীমা পর্য্যন্ত অদ্ভুত। অসংখ্য পানের দোকান আর সস্তা নোংরা মুসলমানী হোটেল। রেস্তোঁরাও আছে তেমনি। কী নোংরা। কী নোংরা! রাস্তার ধারে ধারে সব সময়েই কাদা-কাদা। বিকেলের রাস্তা-ধোয়া জল আর পানের পিকে বিচিত্র রঙ-বেরঙ। বিড়ি-সিগারেটের টুকরো, খালি প্যাকেট—ছেঁড়া কাগজ, ছাই, ডাষ্টবিনে নোংরা। আর ভূকৈলাস রোড? কহতব্য নয়—কহতব্য নয়! সস্তা নোংরা খাবারের দোকান; অপরিষ্কার—পচা-ধ্বসা বাড়ী-ঘর, দোকান-পাট—মানুষ-জন। দমবন্ধ করা পরিবেশ।

একটু সুবিধে হ'লে এ পাড়ায় থাকছে কে? ব'য়ে গেছে থাকতে! বৌটা ঠিকই বলেছিলো প্রথম দিন।—মেয়োগ্যো! এর নাম নাকি শহর। কাজ নেই আমার অমন শহরে। এঁদোপড়া গেরামও ভালো। ঢের ভালো! আর কী রকম ক'রে ঘাড় নেড়েছিলো বউ—যা ওই পারে শুধু। আর হাত। বেটা সব মেয়েরাই একই ভাবে নাড়ে—কোনো কিছুকে ধিক্কার দেবার সময়। নিখুঁত। রামচাঁদ ভালো ক'রে লক্ষ্য করেছে যে।

বাসা।

কড়া নেড়ে দাঁড়াতে হয় না রামচাঁদকে। তৈরী আছে বউ—উন্মুখ হ'য়ে। বাড়িতে ঘড়ি না থাকলে কি হয়! আকাশের আলো আর লোক-জনের বাড়ি ফেরা দেখে ঠিক সময় ঠাওর করে। রোয়াকের রোদ দেখে ঠিক ব'লে দেবে কখন দেড়টা বেজেছে, তা ডকের সাইরেণ-বাঁশী শুনুক আর না-ই শুনুক।

কড়াক্ ক'রে একটি বার কড়া নাড়ার ওয়াস্তা। বৌয়ের হালকা পায়ের শব্দ শুনতে পেলো রামচাঁদ। দরজাটা হাট হ'য়ে খুলে গেল শব্দ ক'রে। সে-শব্দকে ছাপিয়ে উঠল আর এক শব্দ, বৌয়ের আবার সেই রকম আর্তনাদ—মাগো-ওও! তার পর আরো গুরুতর শব্দ—গুরুভার দেহ-পতনের। বউ আবার অচৈতন্য। দৌড়ে গিয়ে ধরার অবকাশ পেলো না রামচাঁদ। ছোটার গতিবেগ সামলাতে না পেরে মাড়িয়ে ফেললো ওর নরম দেহটাকে।

—কী হ'লো বৌমা? ও মা কী হ'লো! মা ছুটে এলেন।

—কী হ'য়েছে, কিছুই তো বুঝছি না! আবার কেন এমন হ'লো?

মা সামনে এসে থমকে দাঁড়ালেন। কী রকম ক'রে চাইলেন যেন। আঁতকে শিউরে উঠলেন।

—এ কী চেহারা করেছ রামু?

সব পরিষ্কার। সেদিন বউ জ্ঞান হারিয়েছিলো ওর কালি-মাখা মুখ দেখে। আজ ওর খেত্তি-খেত্তি ছোপ-ধরা রঙ-মাখা মুখ দেখে আরো ভয় পেয়েছে। বুঝতে পারে নি রামচাঁদ। মনেই ছিল না ওর যে সর্বাঙ্গে সাদা রঙে নতুন অঙ্গরাগ হয়েছে ওর। এতো দিন তবু কালো রঙে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো বউ। আজ এই প্রায়ান্ধকারে হঠাৎ এমন উল্টো রঙে ফলও উল্টোই হ'লো। বিচিত্র অভিজ্ঞতা!

জল-টল দেয়া তদ্বির-তদারকে জ্ঞান-টান মাথায় উঠলো। জ্ঞান-ফেরা বউ প্রথম সনিঃশ্বেস হালকা 'মা' শব্দ উচ্চারণ করল একটা টান দিয়ে। জমে-থাকা নিঃশ্বেস বেরিয়ে গেল ঐ শব্দের অনুকরণে।

—তুই আগে স'রে যা বাবা সামনে থেকে—মা সাবধান করলেন। কী সব্বনেশে চাকরি বাবা তোর! জলজ্যান্ত মানুষটা কাটা গাছের মতো আছড়ে পড়ে!

সেদিন রাতেও বৌকে বোঝাতে পারেনি ও। আদর ক'রে কাছে পারেনি টানতে। সেই যে ওপাশ ফিরলো! আর কী ফোঁপানী!

যে বউ টিনের এক সরু দেয়ালের পার্শ্বে ও ঘরে শুয়ে থাকা শাশুড়ি শুনতে পাবে ব'লে ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলতেও সংকোচ করতো,—যাকে আদর-টাদরও নিঃশব্দেই করতে হ'তো পাশের ঘরের জন্য—সেই বউ আজ কেঁদে ককিয়ে উঠলো!—কোনো কথা শুনবে না।

—কেন, কেন? আমার কপালেই এমন কাজ জুটলো ভগবান! ঐ কথাই!—

পরদিন মনটা মেঘ-মেঘ। ইচ্ছে নেই কাজে। শুধু পরিত্রাণের, এ বিদকুটে কাজ থেকে রেহাইয়ের চিন্তা,—মুখের চিন্তা,—বউয়ের মুখে হাসি ফোটাবার সুখ।

এক এক সময় দ্বিতীয় মনে, অবচেতনে, নিজের ক্ষতি জেনেও কোনো কিছু অশুভ ও একান্ত ভাবে চেয়ে সর্বনাশ ডেকে আনে মানুষ। অশুভ চাওয়া যে কী এক যোগাযোগে ঠিক মিলে যায়! বাক্‌সিদ্ধের মতো অল্পবিস্তর চিন্তাসিদ্ধ প্রায় প্রত্যেক মানুষই, বিশেষ ক'রে অশুভের বেলায়। রামচাঁদের পরিত্রাণও মিললো। কিন্তু বড়ো বীভৎস, বড় মর্মন্তুদ পরিত্রাণ।

আওয়াজ—আর আওয়াজ!

বিচিত্র-বিমিশ্র-বিভিন্ন। খ্যাঁচ-খ্যাঁচ—খ্যাঁস-খ্যাঁস শব্দে বিরাট বিরাট টিনের চামচে ক'রে 'ম্যাঙ্গানীজ ওর' তোলা হচ্ছে সামনের জাহাজের জন্য লোহার টবে। সেই টব ক্রেণের আঙটায় লাগিয়ে তুলে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে জাহাজের খোলে—একেবারে সেই 'লোয়ার হোল্ডে'। হুড়ুস শব্দ সেখানে নির্দিষ্ট বিরতির পর। কথাবার্তা।—ক্রেণ চলার হুস্-হুস্, ঝন-ঝন শব্দ। ডেরিকের গলা ঘড়ঘড়ানি। আর ঝেঁপে আসা বৃষ্টির মতো সমস্তকে ছাপিয়ে আশ-পাশে বান ডাকানো রঙ চটানোর শব্দ—ঠক্ ঠক্—ঠকা ঠক্—ঠক্‌ঠক্—ঘট্ ঘট্। তাল রেখে রেখে—লয় মেনে শব্দের প্রলয় ঘটানো।

—কী বাপ? মন কয়লা ক'রে এসেছ কেন তাই শুনি! আমার বৌমা কী কথা বলেনি? মুখে গোবর লাগিয়ে অন্ধকার ক'রে দিয়েছে, না বাপের বাড়ি দেখিয়েছে?

বন্ধু! এর মধ্যেও রসিকতা হয়। হাসি মস্করা আনন্দ। মানুষ সব পারে।

—চুপ ক'রে থাকলে তো চলবে না ভাই! থকতে দোব কেন? আমার যে কাজের ক্ষতি তাতে। সময় নষ্টও! যতোক্ষণ চুপ ক'রে থাকবে মন বসবে না! তা'ছাড়া আজ সবেমাত্র তোমার স্বাধীন কাজ সুরু। চটপট না করলে যে রিপোর্ট খারাপ যাবে।

রামচাঁদ সমস্ত শরীরের জোর দিয়ে দিয়ে রঙ চটাতে থাকে, নিজে চটে তার চেয়েও বেশি।

কী হয়েছে রামু? আমায়ও বলবে না ভাই?

এবার পরাজয়!—

কী আর হবে বড়দা', বউ এ কাজ পছন্দ করছে না। কাল রঙমাখা মূর্তি দেখে ভিরমি গেলো। তার পর সারা রাত সে কী কান্না!

ও অমন হয়। আমার বউ করেনি? এ কাজ কোনো মেয়েছেলে পছন্দ করতে পারে? না করাই উচিত। তবে কী জানো স'য়ে যায়—স—ব সয়ে যায়! বৌমারও যাবে। লেগে থাকো।

বেশিক্ষণ লেগে থাকে নি রামচাঁদ—

পাবার ছুটিতে শুধু একবার আমার ওখানে এসেছিলো সুপারিশের জন্যে। আমি নাকি রাজা লোক আর মাটির মানুষ। আমার কাছেই দুঃখ নিবেদন ক'রে এসেছিলো ঘ্যানঘেনিয়ে। আশ্বাস দিয়েছিলাম—আশাও। সে আশ্বাস পূরণ হওয়ার জন্যে যতোক্ষণ শ্বাস থাকার প্রয়োজন ছিল তা থাকেনি।—

সর্বনাশ ঘটে গেলো অন্যমনস্কতায়—

দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে দিয়েছিলো,—শীগগির শীগগির ফিরতে হবে একেবারে স্নান সেরে। কিন্তু হাতের সঙ্গে তাল রাখেনি মন। অতি শারীরিক উৎসাহে রঙ চটাতে গিয়ে দড়ি থেকে তক্তাটা একপেশে হয়ে ঝুলে গেল হঠাৎ। টাল সামলাতে পারলো না ও। আর বেটাল হওয়া শরীরের সমস্ত বোঝাটায় উল্টে গেল তক্তাখানা। সজোরে ষাট ফুট ওপর থেকে, স্প্রিং বোর্ড থেকে জলে ডাইভ দেবার মতো কয়েক পাক খেয়ে মাথা নিচু করে পড়ল রামচাঁদ পাথর বাঁধানো বার্থে। বার্থ যেখানে শেষ হয়ে খাড়া জলে নেমে গেছে সেই কিনারে ওর মাথাটা লাগল। দোমালা নারকোল ফাটার মতো শব্দ। ফিন্‌কি রক্ত। প্রত্যক্ষদর্শীরা হতভম্ব! ওর শরীরের ভারে কিনারা থেকে আর এক পাক খেয়ে জলে গিয়ে পড়ল জাহাজ আর বার্থের সঙ্কীর্ণ ব্যবধানে। তলিয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে সীসের মতো। রক্তে লাল হয়ে গেল জল। অজস্র বুদ্‌বুদ্‌ উঠল কিছুক্ষণ —তাজা রক্তের বুদ্‌বুদ্‌! আর কিছু না।—

হৈ-চৈ উঠল। হাঁ-হাঁ করে দৌড়ে এলো লোক-লস্কর।

এ্যাক্সিডেন্ট!!—

আগুন-খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল তড়িৎ গতিতে। দৌড়ে এলো সবাই হাতের কাজ ফেলে। ওদের সুপারভাইজার ডকের এ, এস, প্রবেশনার আমিও।

জলের তলায় লাস।—তিন ডাইভারদের হিমসিম ডুব সাঁতারে হদিস মিললো লাসের। দেহ উঠল। বনলতার কণ্ঠের মুক্তো—

মুক্তপ্রাণ!!—

কী দৃশ্য!!!—

সব রক্ত দগ-দগ করছে সারা মুখ-চোখে। জমে জমে গেছে। থেঁতলে বীভৎস কদাকার হয়েছে মুখ। জলে ডোবায় আর রক্তপাতে ফ্যাকাসে সিঁটনো দেহ।

মৃদু আর্তনাদের সুরে জনগুঞ্জন শোনা গেল।

আহা রে!!—

ইস্‌স্‌!!!

—Oh Christ!!!

লেবার সুপারভাইজার অতিকায় উড সায়েবও আঁতকে উঠলেন। আর এই সমস্ত শব্দতরঙ্গকে ছাপিয়ে আকাশ-ফাটানো এক চীৎকার এগিয়ে এলো বামাকণ্ঠের। দু'হাতে পাগলের মতো ভীড় ঠেলে ঠেলে অন্দরমহলের অসূর্যম্পশ্যা বনলতা কান্নায় ভেঙে ঝাঁপিয়ে পড়ল রামচাঁদের বুকের ওপর। মুখের ওপর মুখ ঘষতে ঘষতে কী যেন বলতে বলতে হা হা করে ডুকরে ডুকরে সমস্ত দেহের দমকে দমকে যন্ত্রণা ছড়িয়ে দিলো আকাশে-বাতাসে—জনতার দৃষ্টি আর মনের ওপর। কে যেন খবর দিয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। আর লজ্জাবনতা বনলতা—গ্রাম্য বাঙ্গালীর শাশ্বত সংস্কার ছুটে বেরিয়ে এসেছে সমস্ত কিছু জলাঞ্জলি দিয়ে।—

—এ কি করলে গো-ও-ও-ও?—এ রঙ চাইনি আমি!!!—

এই সেই বনলতা!—

ঘরের চড়ুই, পায়রা, টিকটিকির ড্যাবড্যাবে চাউনির জন্যে যে দুপুরে রামচাঁদকে কাছে ঘেঁষতে দিতো না!—

ওকে সহজে ছাড়ানো যায়নি মৃতদেহটা থেকে। হিমসিম খেয়ে গিয়েছিলো সবাই।—পরে ডাক্তারী রিপোর্টে জানা গিয়েছিলো, বনলতার ডান হাতের কনুইয়ের হাড় স'রে গিয়েছিলো জোরে আঁকড়ে থাকা অবস্থায় ছাড়িয়ে আনায়। এতো জোর কোথা থেকে পেয়েছিলো তা ওই জানে না!

এই জায়গাটা!—ঠিক!!—চার নম্বর খিদিরপুর ডকের "কী লাইনে থমকে চমক ভাঙলো আমার। না, কোনো চিহ্নই নেই! কতো শত কাজের স্বাক্ষর ধুয়ে-মুছে নতুন করে দিয়েছে জায়গাটা!

গিরি, কি শুধাও হে সমাচার।
বলিতে সে স্বপন না সরে বচন;
খেদে পোড়ে মন বহে অশ্রুধার,
নিশীথে যেমন ভেবে উমাধন,
অনেক আয়েসে মুদেছি নয়ন,
অমনি স্বপনে করি দরশন।

—হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

রূপালী পর্দার কাহিনী

আঠারো শ' পঁচাশী সালের অক্টোবরের একটি সকালে একুশ নম্বর রু কলিনকোর্টের রান্নাঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে কফির পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন ম্যাদাম লুবে আর প্রতীক্ষিত চোখে লক্ষ্য করছেন আর একটি বর্ষা-ম্লান বিষণ্ণ-উদাস সকালের ক্রমাগমন। আর বিরক্ত দীর্ঘশ্বাসে স্বগতোক্তি করেন, কি জায়গাই না এই মন্টমার্ট্রে!—উক্তির সঙ্গে দোল খেয়ে যায়, তাঁর গাল দু'টো।

পেয়ালা-হাতে কিছুক্ষণ স্তব্ধ-নিথর দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি, বৃষ্টির ছাঁট-লাগা সার্সিতে অনিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। তারপর কফির পেয়ালায় শেষ চুমুকটি দিয়ে বিষণ্ণ ভাবে পায়ে-পায়ে এক কুশানের কাছে এগিয়ে যান, গা এলিয়ে দেন তার ওপর, এবং ঘুমিয়ে পড়েন কিছুক্ষণের মধ্যেই।

ঘুম যখন ভাঙল, বৃষ্টি তখন থেমে গেছে। শুধু বাড়ির ছাঁচ বেয়ে জল পড়ছে টিপ-টিপ। তা' ছাড়া আকাশও পরিষ্কার হ'য়ে গেছে, দেখা দিয়েছে নির্মল নীলিমা। ম্যাদাম লুবে এমন সময় গাড়ি আসার শব্দ শুনতে পান। জানালার পর্দা সরিয়ে দেখলেন, রবার-বাঁটের একটি ছোট ছড়িতে ভর দিয়ে গাড়ি থেকে নামছেন এক ভদ্রলোক। কালো দাড়ি, মাথায় ফেল্টের টুপি, পরনে ওভারকোট।

নিঃসঙ্গ জীবনের একমাত্র প্রিয়সঙ্গী বেড়ালকে বললেন, দ্যাখ মিমি, কি অদ্ভুত একটা বেঁটে লোক আসছে এ দিকে! তারপর এগিয়ে এসে দরজা খুলে বললেন ভদ্রলোককে, আসুন ভেতরে।

টুপি খুলে যথারীতি সৌজন্য দেখালেন আগন্তুক ভদ্রলোক। ম্যাদাম লুবে দেখলেন তাঁর চুল ছোট, এবং দেখলেন তা এক দিকে বেশ পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো।

আচ্ছা আপনি বাইরে যে "ষ্টুডিও-ঘরের" বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, তা কি এখন দেখানো আপনার পক্ষে সুবিধা হবে? ভদ্রলোক বললেন।

নিশ্চয়ই। কিন্তু সে ঘর তো চারতলায়, আর সিঁড়িগুলো বেশ খাড়াই, কিছুটা দুঃখিত স্বরে বলেন ম্যাদাম লুবে।

একটা সন্দেহজনক দৃষ্টি মেলে, তারপর দু' হাতে স্কার্টটাকে ধরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকেন লুবে, তাঁকে অনুসরণ করতে থাকেন আগন্তুক। সিঁড়ির হাতল ধরে আর ছড়ির সাহায্যে ছোট-ছোট পায়ের তুলনায় ভারী শরীরটাকে ঠেলে নিয়ে এক এক ক'রে সিঁড়ি ভাঙতে থাকেন লুবের অনুসারী, চার ফুট লম্বা নবীন আগন্তুক।

চারতলায় পৌঁছে হাঁপাতে থাকেন ভদ্রলোক। গালে দেখা দেয় ঘামের আভাস। ক্লান্তি-মাখা মৃদু হাসি ছড়িয়ে বলেন, আপনি ঠিকই বলেছেন সিঁড়িগুলো খুবই খাড়াই। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছে বললেন, বাব্বাঃ এ যেন আল্পস পর্বতারোহণ, তাই না?

ম্যাদাম লুবে দেখলেন, সুন্দর দাঁত ভদ্রলোকের; অস্বাভাবিক রকমের বড় বড় বাদামি চোখ, আশ্চর্য ছেলেমানুষি মাখানো। দাড়ি থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম ভদ্রলোককে খুব অল্পবয়স্ক মনে হল। আপনি কি এক জন চিত্রশিল্পী? সন্দেহের সুরে প্রশ্ন করেন, ম্যাদাম লুবে।

না, এখনও হইনি। এখন মাত্র এক জন আর্টের ছাত্র—

মুলা রূজ

মূল লেখক : পিয়ের লা মুর

হেসে বলেন। অধ্যাপক করমোনের 'অ্যাটেলিয়ারে' এই সবে তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করলাম। সাঁলোর জন্যে ছবি আঁকা শুরু করেছি, তাই আমার একটা ষ্টুডিও দরকার।

আপাদমস্তক তাঁকে এক বার দেখে নিলেন লুবে। মনে মনে ভাবলেন, সর্বনাশ! আবার এক আর্টিষ্ট! তবু ভাবলেন, না এ হয়তো অন্য আর্টিষ্টদের মতো নয়; বেশ অল্পবয়স্ক আর ছোট-খাট দেখতে, আর কথাবার্তাতেও বেশ ভদ্রই মনে হচ্ছে; চমৎকার চোখ দু'টি। না, এ বোধ হয় কোন রকম গোলমাল করবে না। চাবি ঘুরিয়ে ঘরের দরজা খুললেন লুবে।

আঃ! আনন্দ-উদ্বেল দীর্ঘায়ত স্বরে বলে উঠলেন, সত্যি একটা ষ্টুডিও বটে!

কয়েক সেকেণ্ড মুগ্ধ-বিস্ময়ে হাঁ করে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে ভদ্রলোকটি। চেয়ে থাকে ঘরের দিকে—বিরাট খালি ঘর, পাণ্ডু-ধূসর দেয়াল, ঘরের মাঝখানে বড় মতো একটা ষ্টোভ, আর ঘরের ছাদ-ছোঁয়া উঁচু-উঁচু জানালা। সাগ্রহে ঘরের ভেতর ঢোকে তারপর, দেখে নেয় ঘরের চার পাশটা।

কি সুন্দর জায়গা! আনন্দে বলে লোকটি, পরিষ্কার দিনে নোতরডাম দেখা যাবে। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো কয়েকটা সরু সিঁড়ি উঠে গেছে লোহার রেলিং-দেওয়া একটা ব্যালকনির দিকে, বললে, ওপরটা কি দেখতে পারি?

বাঁ-দিকে আপনার শোবার ঘর, সেই সরু সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় লুবে বললেন ভদ্রলোককে। নিচে থেকে লুবে দেখলেন, ভদ্রলোক মাঝে মাঝে সেই ঘর দেখছেন আর বলছেন, বাঃ চমৎকার! বেশ চমৎকার।

আরেকটি দরজা খুলে ভদ্রলোকটি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলে, আরে এ যে দেখি স্নানের ঘর, চমৎকার!

হ্যাঁ। বাড়িটা সুরুচিসম্পন্ন বড়লোকদের জন্যেই তৈরি করা হয়েছিল, মনটমার্টের তথাকথিত আজে-বাজে লোকের জন্যে নয়। তবে একটা কথা, এ স্নানের ঘর কিন্তু আপনার কাজে আসবে না, এর আগে যে আর্টিষ্ট এ-ঘরে ভাড়া থাকতেন, তিনি ঘরের নর্দমা ও অন্যত্র চূর্ণবালি ফেলতেন, যার ফলে এ-স্নানের ঘর বর্তমানে অচল। তবে ঐ করিডরের শেষে আরেকটা স্নানের ঘর আছে, এবং এটা ঠিক না হওয়া পর্যন্ত আপনি ওটা ব্যবহার করতে পারেন। দু'টো স্নানের ঘরেরই স্নানের গামলা কিন্তু খারাপ হয়ে গেছে, আপনার যদি ইচ্ছা হয়, আমি এদের একটা ঠিক করে দেব'খন—শেষ কথাটি লুবে এমন ভাবে বললেন যে তাতে মনে হল সুরুচিসম্পন্ন বড়লোকরা স্নান বড় একটা করেন না।

না না তেমন তাড়া নেই, খুশি-খুশি মুখে বললেন ভদ্রলোক। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকেন তিনি। মৃদু-মন্দ পায়ে এবং কষ্টের সঙ্গে। উদ্বেগে লুবে দেখতে থাকেন ছোট ছড়ির সাহায্যে তাঁর সশ্রম নিম্নাবতরণ। মনে মনে ভাবেন, কোন দিন না লোকটা হোঁচট খেয়ে মাথা-টাথা ভাঙে!···

নিচে নেমে এসে লোকটি বলে, ঘরটা আমি ভাড়া নেব। তা, এর ভাড়া কত দিতে হবে?

এক বছরের জন্যে?

হ্যাঁ।

চার'শ কুড়ি ফ্রাঙ্ক।—ব'লে লুবে ভদ্রলোকের প্রতিবাদের উত্তর এবং দরাদরির জন্যে মনে-মনে প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় তাঁকে আশ্চর্য করে দিয়ে লোকটি বললে, ঠিক আছে আমি তাই দেব। তা'হলে বলুন কবে থেকে আমি আসছি?

এত চট্ করে রাজি হ'য়ে যাবেন ভদ্রলোক, এটা কখনো ভাবতে পারেন নি। আনন্দে তিনি মিমি নামে তাঁর বেড়ালটিকে চেয়ার থেকে ফেলে দিলেন, তার পর তাকে মাটিতে ঠিক ক'রে বসালেন। বললেন, যখন খুশি আপনি আসতে পারেন। কিন্তু আমাকে খাতায় আগে আপনার নাম-ধাম সমস্ত লিখতে হবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর লেজার-খাতা পেলেন। চোখে চশমা এঁটে টেবিলে খাতা নিয়ে বসলেন। ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে সোৎসাহে বললেন, আপনার নামটা আগে বলুন। খাতার পাতার ওপর কলমটা ধ'রেই বললেন, বুঝতেই পারছেন এ সমস্ত পুলিশের খাতিরেই করতে হচ্ছে। তারা খুঁটিনাটি সমস্ত কিছু জানতে চায়।

তা তো ঠিকই। তা আমার নাম লিখুন, টুলো। মানে হেনরি দ্য টুলো···

আজ্ঞে আমি তো আপনার জন্মস্থান জিজ্ঞেস করছি, না। আমি শুধু আপনার নামটা জানতে চাইছি।

তা তো জানি। কিন্তু টুলোই যে আমার নাম।

কলম রেখে লুবে বললেন, টুলো তো লোকের নাম নয়! শহরের নাম শান্ত-ধীর কণ্ঠস্বরে একটা তীক্ষ্ণতা মিশিয়ে বললেন। কেউ নিজের নাম প্যারি অথবা মার্সাই রাখে কী? তা যাক, আপনার নামটা বলুন। কলম তুলে অপেক্ষা করেন লুবে।

প্রতিবাদের সুরে বলেন ভদ্রলোক, বললাম তো আমার নাম টুলো, আর কী বলব?

আপনি দেখি আমার সঙ্গে রসিকতা করছেন, ঠোঁটে দৃঢ়তা এনে বলেন লুবে, আমার কিছু বলার নেই, আপনি যদি নেপোলিয়ন অথবা জোয়ান অব আর্ক বলে নিজের পরিচয় দিতে চান, কিন্তু পুলিশ তো তা শুনবে না? শক্ত করে কলম ধরে থাকেন তিনি।

তা যাক, এখন বলুন আপনার নাম, ধাম কোথায়, কবে জন্মেছিলেন—সমস্ত কিছুই।

আস্তে আস্তে বলতে থাকেন ভদ্রলোক, নাম হেনরি মেরি রেমণ্ড দ্য টুলো লোত্রেক-মনফা। জন্ম অ্যালবিতে। জন্ম-সন ২৪শে নভেম্বর, ১৮৬৪ সাল।

অন্যান্য দিনের মতো সে দিনও ম্যাদাম লুবে যথারীতি রান্না করলেন, একাই খাওয়া-দাওয়া সারলেন, মিমির সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, সিঁড়ি ঘর-দোর পরিষ্কার করলেন, ভাড়াটেদের ভাড়ার কথা মনে করিয়ে দিলেন, আরশোলা মাড়িয়ে চললেন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে, বিকেলের দিকে তেলের বাতিটা জ্বালালেন এবং এটা-ওটা টুকিটাকিতে ভর্তি চেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়লেন।

আবার দ্বিতীয় বার শুনলেন একটা গাড়ি এগিয়ে আসার শব্দ। আবার জানালার পর্দা সরিয়ে অন্ধকার-পথে আড়চোখে দেখলেন এগিয়ে আসা গাড়িটাকে। অবাক হ'য়ে গেলেন। এ তো সাধারণ গাড়ি নয়। এর গাড়োয়ানও সাধারণ গাড়োয়ানের মতো ফিতে-লাগানো টুপি, সাদা আলখাল্লা আর বুট জুতো পরে নি। এ যে

দেখি নিজস্ব পারিবারিক ল্যাণ্ডো গাড়ি। কিন্তু এ পৃথিবীতে কে এমন আছে!

অতীব উত্তেজনার সঙ্গে তিনি দেখলেন দরজা বন্ধ, গাড়িটা এসে তাঁরই বাড়ির সামনে দাঁড়াল। উর্দিপরা গাড়োয়ান নেমে এসে দরজা খুলে দিল। ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন ক্ষীণাঙ্গী এক মহিলা। ধূসর রঙের মাথায় চুল তাঁর। গাড়োয়ানের সঙ্গে মহিলা কি যেন কথাবার্তা বললেন, অনুসন্ধিৎসু চোখে চাইলেন বাড়িটার দিকে এবং তারপর এগিয়ে আসেন বাড়ি ঢোকার পথটিতে।

ম্যাদাম লুবে অভ্যর্থনা করলেন। যথারীতি সৌজন্যের সঙ্গে বলেন, হ্যাঁ আমিই, হ্যাঁ এইটিই—তা আমি কি আপনার কোন উপকার করতে পারি?

আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে আমার, নিম্ন স্বরে বলেন আগন্তুক মহিলা।

ম্যাদাম লুবে আঁচ করতে পারেন কিছুটা। সাধারণ কালো রঙের পোষাক-পরা বিশিষ্টা আগন্তুকাকে পেছনে কুশন-দেওয়া আরাম-কেদারায় বসতে অনুরোধ করলেন। তারপর নিজেও বসলেন, কোলের ওপর হাত রেখে, অপেক্ষা করতে লাগলেন তাঁর কথার জন্যে।

আমার ছেলে বলল যে, সকাল বেলা না কি সে একটা ঘর ভাড়া করেছে এখানে।

আপনার ছেলে! বিস্ময়-বিস্ফারিত ম্যাদাম লুবে বলেন, আপনার ছেলে, মানে সেই বেঁটে অদ্ভুত লোকটি? অসতর্ক মুহূর্তে শেষ কথাটি বেরিয়ে যাওয়ায় সঙ্কুচিত লুবে বললেন, মাপ করবেন, আমি ঠিক তা বলতে চাই নি।

ভদ্রমহিলার ঠোঁট কেমন যেন বিবর্ণ হ'য়ে গেল। দুঃখের নিবিড়তায় বিমর্ষ-ম্লান হ'য়ে গেল তাঁর মুখ। হ্যাঁ, সেই আমার ছেলে। ছেলেবেলায় তার দু'টো পা-ই ভেঙে যায়।

বাতির আলোর নিস্তব্ধতায় ভদ্রমহিলা হেনরীর গল্প করেন লুবেকে। হেনরির রহস্যময় রোগের কথা, পা মচকে-যাওয়া আর তা কেটে ফেলার কথা, জ্বরের তীব্রতা আর নিদারুণ ব্যথা-বেদনার কথা, একে একে সবই বলেন তিনি। ম্যাদাম লুবে মাঝে-মাঝে সমবেদনা-সূচক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন।

এ জন্যেই আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি—বলেন আগন্তুক মহিলা, দয়া ক'রে একটু নজর রাখবেন ওর ওপর। যদি কিছু হয়, যদি পায়ে চোট-টোট লাগে, তবে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেবেন।

কিছু ভাববেন না আপনি, কেঁদে ওঠেন ম্যাদাম লুবে, বড় এক রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছে। তারপর বলেন, আমার ছেলের মতোই আমি ওর দেখাশুনা করব। ওর ষ্টুডিও যাতে সব সময় পরিপাটি পরিচ্ছন্ন ও গরম থাকে এবং ঠাণ্ডার সময় যাতে ওর গায়ে কোট থাকে, সে-সব দিকে আমার দৃষ্টি থাকবে। ওর সমস্ত কিছুই আমি দেখাশুনা করব। আর আমি বলব না আপনি এসেছিলেন। আমি জানি এই বয়সে ওরা কি ধরণের হয়।

বাড়ি-ঢোকার পথ দিয়ে তিনি হেনরির মাকে বাইরে এগিয়ে দিতে গেলেন। যেতে-যেতে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ওর আসল নামটা বলবেন কী? ও বললে, ওর নাম টুলো, কিন্তু আমার মনে হয় ও আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিল। এ নিয়ে ওর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল কিছু।

হ্যাঁ, ওর নাম টুলো। ওর বাবার নাম কাউণ্ট আলফাঁস দ্য টুলোলেত্রেক।

কাউণ্ট! ওঃ তাহলে কাউণ্ট!

কিছুটা বিরক্ত হয়ে ভদ্রমহিলা বলেন, হ্যাঁ, তবে ও কাউণ্ট লেখে না। সে যাক, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার।

কিছুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন উভয়েই। তারপর হাত বাড়িয়ে ধন্যবাদ জানিয়ে কাউণ্টেস বিদায় গ্রহণ করেন।

অপস্রিয়মান ল্যাণ্ডো গাড়িটার দিকে চেয়ে থাকেন ম্যাদাম লুবে। রাত্রি নিবিড় হয়ে আসে। কুয়াশাচ্ছন্ন আঁধারেও এখানে-ওখানে জানালাগুলো আলোয় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দূরে গার-দ্যু-নর্ড ষ্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে-পড়া রেলগাড়ি আহত জন্তুর মতো একটা ডাক ছেড়ে চলে গেল। বড় বড় শহরের বিষণ্ণতা যেন সমগ্র প্যারি শহরটার ওপর ঝুলে পড়েছে।

কিছু দিন পরে রু কলিনকোর্ট পাড়ার লোকেরা একটা অস্বাভাবিক রকম শবযাত্রায় সচকিত হ'য়ে উঠল।

পরিশ্রান্ত অশ্বতরবাহিত একটা গাড়িতে চলেছে কতকগুলি চুপড়ি, ধামা, বাক্স-পেটরা ইত্যাদি, তিনটি ইজেল, একটা ড্রয়িং-টেবিল, একটা লম্বা মই, এবং এটা-ওটা অন্যান্য নানান জিনিসপত্র। এসব জিনিসপত্রের মধ্যে আছে একটা ভেনাস-দ্য-মিলোর একটা মূর্তি-ছাঁচ, গাড়িতে লম্বা ক'রে শোয়ানো, মনে হচ্ছে যেন একটা শব প্রাণ ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। গাড়োয়ানের গদিতে বসা কোঁকড়ানো দাড়িওয়ালা বিরাট লোকটি চাবুক মারছে বাহককে, সস্তা চুটকি গান গাইছে আর মাঝে-মাঝে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে জানালায় দাঁড়ানো গণিকাদের সঙ্গে মনটমার্ট্রে সুলভ ইয়ার্কি মারছে। গাড়ির পেছনে নানান ধরণের অঙ্গভঙ্গি করতে করতে চলেছে চার জন অপরিচ্ছন্ন যুবক। পরনে নোংরা জামা-কাপড় আর টাই। ম্যাদাম লুবে তাঁর বাইরের ঘরের জানালা থেকে দেখেই চিনলেন এই আর্টিষ্টদের। এদের সঙ্গে ছিলেন তাঁর নতুন ভাড়াটে, হেনরি দ্য টুলো লেত্রেক। ত্বরিতপদে আসছিলেন তিনি।

একুশ নম্বর বাড়িতে এসে ছাত্র আর্টিষ্টরা দড়ি-দড়া খুলে গাড়ি থেকে আসবাবপত্র নামাল আর ব্যস্ত-সমস্ত হেনরি বাইরের ঘরে তাদের তুলতে তৎপর হল।

লুবের সঙ্গে দেখা হতেই হেনরি মাথার টুপি খুলে অভিবাদন জানালো, আমি পেশাদারি ঠিকে মজুর পেলাম না, আমার বন্ধুরাই সাহায্য করতে এগিয়ে এল। আপনি কিছু ভাববেন না। আমরা ধীরে সুস্থে সব ঠিক করে নিচ্ছি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা বাড়ি এদের পদধ্বনির চাঞ্চল্যে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি হৈচৈ আর গানে মুখর হয়ে উঠল। পিঠে করে আসবাবপত্রগুলো নিয়ে উঠে যেতে লাগল চারতলায়। এ, ওকে ডাকে, চেঁচায়, হৈ-চৈ করে, একটা গোলমাল বেধে যায় সারা বাড়িতে।

ষ্টুডিওঘরে ক্লান্ত হেনরি হাঁপাচ্ছে, উত্তেজনায় অস্বাভাবিক পায়ে ঘুরছে ঘরময়, নির্দেশ দিচ্ছে বন্ধুদের। মাঝে মাঝে সাগ্রহে তাদের সাহায্য করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পেরে উঠছে না।

যুবকেরা একে একে ষ্টুডিওতে জিনিসপত্র নিয়ে আসে, নামিয়ে রাখে যথাস্থানে, কাজ শেষ হলে পর কেউ মেজেতে হাত-পা ছড়িয়ে কেউ বা কৌচে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে।

ভেনাস-দু-মিলোর ছাঁচ হাতে র‍্যাচো বলে, এই হচ্ছে শেষ জিনিস, আর কিছু নেই। এর ওজন কমসে-কম এক টন হবে। কি সুন্দর, পেশী! আশ্চর্য! আনবার সময় আমি ভালো ক'রে লক্ষ্য করছিলাম সমস্ত আক··

এই সাহায্য করার জন্তে তোমাদের ধন্যবাদ, হেনরি বলেন।

খুব জল তেষ্টা পেয়েছে, গ্রেনিয়ার বলে ওঠে।

নিচে গাড়ি রয়েছে, র‍্যাচো বলে, ফেরার পথে আমি তোমাদের লা মুভেলে নামিয়ে দিতে পারি।

র‍্যাচোর প্রস্তাবে খুশি হ'য়ে সকলে উঠে দাঁড়াল। টুপি পরে নিয়ে যেতে উদ্যত হল।—তোমরা যাও এখন, আমি তোমাদের সঙ্গে পরে দেখা করব, হেনরি বললো।

তাদের চলে যাওয়ার ভারী পদশব্দ শোনা গেল সিঁড়িতে। ক্রমে তাদের কণ্ঠস্বরও মিলিয়ে এল। নিস্তব্ধ হয়ে এল এলোমেলো অগোছালো ঘর। কৌচের এক প্রান্তে ব'সে হেনরী, দেয়ালে টাঙানো ক্যানভাসগুলি, একটার ওপর একটা চাপানো চেয়ার আর ইজেল, মই আর কোণায় রাখা ভেনাস দু মিলোর প্রতিমূর্তির ওপর এক বার স্মিতপ্রসন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নিল।

নিজস্ব ষ্টুডিও এখন। শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণই নিজস্ব একটা ষ্টুডিও হলো তার। এখানে সে সুখেই থাকবে। বুঝতে পারছে, বেশ বুঝতে পারছে। এই হলো তার জীবনের সুরু! এর পর যখন প্রতিকৃতিশিল্পী Portraitist) হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছিল, তখনও হেনরী একটি দিনের জন্তেও বিরাট ষ্টেভ বসানো, বড় বড় জানালা দেওয়া আর ব্যাল্কনি লাগানো শোবার ঘর আর বাথরুম-ওয়ালা প্রকাণ্ড এই ঘরটিকে ভোলে নি।

মৃদু হাসি-হাসি মুখেই কৌচ থেকে উঠে টুপি আর ওভার-কোট প'রে আস্তে দরজা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে গেল হেনরী। যাবার মুখে আরেক বার প্রসন্ন দৃষ্টি বুলিয়ে নিলে পুরো ঘরটার ওপর।

দেখলে ঘরের গ্যাসবাতিগুলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছেন লুব। সত্যি, অদ্ভুত ভালো লোক এই মাদাম লুব। বাতি জ্বালিয়ে দিয়েছেন, নইলে আছাড় খেয়ে মাথা ভাঙতো তার।—মনে মনে লুবের বুদ্ধির তারিফ করে হেনরী। সত্যি, এখানে সে সুখেই থাকবে।

রাত্রির খাবার সময় পেরিয়ে গেছে, এমন সময় র‍্যাচোর সঙ্গে হেনরী এলো রেষ্টুরেণ্টে। লী তাম্বুরিণ রেষ্টুরেণ্টে তখন প্রায় খালি হ'য়ে এসেছে। এক জন লোক আর একটি সুন্দরী মেয়ে শুধু বসে। লোকটি ব'সে ব'সে আপেল খাচ্ছে আর শিয়াস্তির বোতলে ঠেকান দিয়ে রেখে খবরের কাগজ পড়ছে। মেয়েটি সুপ খাচ্ছে। ভেতর থেকে রান্নার আর মসলার গন্ধ আসছে, বেশ একটা অদ্ভুত আব-হাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে। পেছনের বারান্দা থেকে থালা-বাসন ধোয়ার টুংটাং শব্দ আসছে।

হেনরী আর র‍্যাচো দু'জনে চেয়ারে বসল। খাবার খেল। কিছুক্ষণ পরে আপেল খাচ্ছিল যে, সেই ভদ্রলোক কাগজটি বগলে ক'রে নিয়ে চলে গেল।

মেয়েটি তার টেবিলে ব'সে সিগারেট খাচ্ছে, হেনরী চেয়ে থাকে তার দিকে, তার হাতের নড়াচড়া, তার অলস ঠোঁটের মৃদু-মাধুর্য্য আর সিগারেটের ধোঁয়া-বেরোনো চঞ্চল নাসারন্ধ্রের দিকে চেয়ে থাকে। গ্যাসের আলোয় মেয়েটির মুখে একটা নম্রতা ফুটে উঠেছে, তার চুলগুলো উজ্জ্বল সোনালী রং ধারণ করেছে।

সাঁলোর ছবির জন্তে তুমি কোনো বিষয় ঠিক করেছ কি? র‍্যাচো হঠাৎ প্রশ্ন করে।

প্রথমে আমি বাইবেল থেকে বিষয় নির্বাচন করব ভেবেছিলাম, যেমন ধরো, আব্রাহামের পুত্রোৎসর্গ বা মুসার পাথর ভাঙা। কিন্তু মুস্কিল কি, সে সব বিষয় আঁকা খুব শক্ত।

ঠিক বলেছ, র‍্যাচো বলে, অনেক কিছু লাগবেও।

আইকেরাস তোমার কেমন মনে হয়? জানো তো, আইকেরাস গোলকধাঁধা থেকে পালিয়ে গিয়ে মোমের পাখা লাগিয়ে উড়বার চেষ্টা করে ছিল। Triangular composition-এর পক্ষে বিষয়টা খুব ভালো। আমি ওকে একটা বকের ওপর উড়তে যাওয়ার ভঙ্গিতে ডানা-মেলা অবস্থায় দেখাবো।

আমি ঠিক জানি না, অসমর্থনের সুরে র‍্যাচো বলে, আইকেরাসের কথা কেউ শোনেনি। ভেনাস কিংবা ডায়ানার ছবি আঁকো না কেন? বেশ ভালো হবে কিন্তু। লুভারে চলে যাও, একটা বুচার (Boucher) নকল ক'রে কিছু অদল-বদল ক'রে দাও, তা'হলেই হ'য়ে যাবে।

সাঁলোর ছবির জন্তে কোন কোন বিষয় আঁকা যায়, এ নিয়ে তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনা চলছে, এমন সময় র‍্যাচো দেখল হেনরী অন্যমনস্ক হ'য়ে কি যেন দেখছে। কি হে, কি দেখছ? র‍্যাচো বলল।

রেষ্টুরেণ্টে যে মেয়েটি বসে সিগারেট খাচ্ছিল, তার দিকে র‍্যাচোর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে হেনরী আস্তে আস্তে বলল, বেশ মুখশ্রী মেয়েটির, না। কি মনে হয় তোমার? মেয়েটির ঘাড়ের কাছে কেমন সুন্দর সবুজ আলোর ছায়া পড়েছে দেখ?

মেয়েটি বুঝল, ওকে নিয়েই কথা হচ্ছে। প্লেটে অবশিষ্ট সিগারেটের অংশটুকু নিবিয়ে, কাঁধের জামাটা (boa) প'রে নিলো আর দামটা চুকিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কি ব্যাপার বলো দেখি, সন্দিগ্ধ সুরে প্রশ্ন করে র‍্যাচো।

কিছু না। বলছিলাম, মেয়েটির বেশ মুখশ্রী। এইটুকু শুধু। ওকে নিয়ে আঁকা চলতে পারে। কারুর কারুর মুখ কোলের মতো, কারুর বা জানালার সার্সির মতো স্বচ্ছ-সুন্দর। যাদের মুখে তুমি দেখতে পাও অনেক কিছু। সে যাক। তুমি এই খানিকক্ষণ আগে আবার আইকেরাসের কথা তুলছিলে না?

তুমি নিজে থেকে মুস্কিলে পড়তে চাইছ দেখছি—কঠিন দৃষ্টি মেলে রুক্ষ স্বরে বলে র‍্যাচো— কোন দুঃখে তুমি যে এই মেয়েটির ছবি আঁকতে চাইছ জানি না। ওর ঘাড়ের কাছটায় সবুজ ছায়া ছিল ব'লে আর ওর মুখ সার্সির মতো স্বচ্ছ-সুন্দর ব'লে?

আমি তা' বলিনি, আমি বলছিলাম—

আরে চুপ করো, আমাকে বলতে দাও। আচ্ছা ধরলাম, তুমি মেয়েটির ছবি আঁকলে, কিন্তু তার পর তা' নিয়ে কি করবে? বিক্রী

করবে? কার কাছে? দেখাবে? কোথায়? মনটমার্ট্রের একটি রূপবিলাসিনীর ছবি কে নেবে শুনি?

কেউ হয়তো নেবে না জানি, কিন্তু এ জন্যেই তো আঁকতে আনন্দ বেশী। 'জ্যাম চোর ছেলে' বা 'ছুটন্ত ঘোড়া' চাইতে এর ছবি আঁকাতে আনন্দ বেশী নয় কি? এমন কি আইকেরাসের চেয়েও? শুধু আনন্দের জন্যে, ছবির মধ্যে দিয়ে কিছু বলতে চাইবার আনন্দের জন্যে কি তুমি ছবি আঁকোনি? আমার মনে আছে ছেলেবেলায় আমি অনবরত মার ছবি আঁকতাম, ছবি আঁকার জন্যে কষ্ট দিয়েছি অনেককে?

আর এখন? সাক্ষীকে ফাঁদে ফেলবার চেষ্টারত উকিলের মতো সাংঘাতিক রকমের শান্ত কণ্ঠে বললো র‍্যাচো, এখন তুমি আর ছবি আঁকতে চাও না, তাই না?

না, আমি চাই না। বিরক্তি ধরে গেছে তোমাদের ওই সব একঘেয়ে ভেনাস আর ডায়ানার ছবিতে, বিরক্তি ধ'রে গেছে ছায়ামাত্রেই পাটল রং (Umber) দিতে। সব সময়েই যে triangular coposition করতে হবে, তার কি মানে আছে? আমি যা চাই, তা' আমি আঁকতে পারবো না কেন? ছায়া আঁকতে নীল বা সবুজ রং ব্যবহার করতে পারবো না কেন, যদি নীল বা সবুজ ছায়া আমার চোখে পড়ে। কেন তা' আঁকতে পারবো না?

কারণ তা তুমি পারো না।—র‍্যাচো বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে ওঠে, করমোন যা চায় তোমাকে তাই আঁকতে হবে, সে যে ভাবে তোমাকে আঁকতে বলবে সে ভাবেই তোমাকে আঁকতে হবে, আর তা' না হ'লে তুমি কখন সাঁলোতে ঢুকতেই পাবে না, আর সাঁলোতে ঢুকতে না পেলে আর্টিষ্ট হবার আশা তোমাকে জলাঞ্জলি দিতে হবে।

পরের দিন হেনরী রুক্রোজেলে পের টাঙ্গের দোকান থেকে রং পত্তর আর আট-ফুট লম্বা এবং প্রায় ঐ রকমই চওড়া এক ক্যানভাস কিনে আনল। তিন দিন পরে সাঁলোর জন্যে ছবি আঁকা শুরু করলো—'আইকেরাসের ওড়ার চেষ্টা।'

ছবি আঁকার দিন থেকে আইকেরাসের প্রেতাত্মা যেন অহরহ হেনরীকে অনুসরণ করতে লাগলো। আইকেরাসের ওপরই তো নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ, তার সমস্ত জীবন। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে অ্যাগোষ্টিনাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে রু কলিজকোর্টের দিকে পা বাড়ায়, শ্রান্ত অবসন্ন দেহে নিজের ষ্টুডিওতে প্রবেশ করল কিন্তু তার পর আবার সম্মোহিত ভাবে রং-তুলি নিয়ে ছবি-আঁকায় অভিনিবিষ্ট হ'য়ে পড়ল।

এমনি ক'রে দিন যায়। ধৈর্য ধ'রে ছবি আঁকতে থাকে হেনরী। আট ফুট উঁচু ক্যানভাসের জন্যে ব্যবহৃত মই বেয়ে ওপরে ওঠে আর নামে। প্রথম প্রথম ছায়া আঁকতে পটেল রং ব্যবহার করে। আরো রং লাগায় ছবির এখানে-ওখানে। সাটিনের ফিতের মতো দেখাচ্ছে তুলির ঘন রঙের টানগুলো। টানগুলো যেন কাঁপছে। তবু এক এক সময় তার খারাপ লাগে। কবে শেষ হবে ঐ বোকা লোকটার মুখ আর তার শুষ্ক-উদাস চোখ দুটো; শেষ হবে তার টানা নাক আর টকটকে লাল কান দুটো? আর ঐ অদ্ভুত অবাস্তব মোমের পাখা দু'টো? ঐ ফুলে-ওঠা পেশীগুলো? ঐ বিরাট বুক? রূঢ় ভাবেই মনে পড়ল র‍্যাচোর সতর্কবাণী, দাঁতে দাঁত চেপে কাজ করে যেতে লাগলো, আইকেরাসের মাথামের রং-এর মতো শরীরের প্রতিটি ইঞ্চি ভালো হওয়া চাই। রং-এর প্রত্যেকটি কাজ, তুলির প্রত্যেকটি টান, প্রত্যেকটি ছায়া তাকে ভালো ভাবে আঁকতে হবে।

তবু ভালো লাগে না সব সময়। বিদ্রোহ করে ওঠে মন। ইচ্ছার দৃঢ়তা সত্ত্বেও নেমে আসে ক্যানভাসের মই বেয়ে, অন্য একটা ইজেলে আর একটা ছোট ক্যানভাস লাগায়। ছবি আঁকে। মনটমার্ট্রের দৃশ্য। রু কলিনকোর্টের পথে এক ধোপানী, হাতে একটা বাস্কেট। অথবা পথে কিংবা কাফের কোন রূপজীবিনীর মুখ। অথবা আগের দিন রাত্রে গোলমালে ভর্তি কুখ্যাত বাজে নাচ-বাড়ি লা-এলিতে দেখা ক্যান-ক্যান নাচের ছবি। এতে কিন্তু কমে আসে তার ক্লান্তি, অবসন্নতা। নতুন উৎসাহ নতুন শক্তি অর্জন করে। আশ্চর্য ভাবে ফিরে পায় পূর্বের সাবলীলতা, স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ, আনন্দ। আইকেরাসের ছবি আঁকা প্রায় বুঝি শেষ হয়ে যায়।

অবসন্ন মনে এমনি একদিন বিকেলে একটা ছোট ক্যান ক্যান নাচের ছবি আঁকছে এমন সময় তার দরজায় করাঘাত হলো। দরজা খুলতেই ঢুকলো বাবা। ম্যাদাম লুবে তাঁকে দেখে স'রে পড়লেন।

তোমার মার মুখে শুনলাম তুমি না কি একটা ষ্টুডিও ভাড়া করেছ? কি রকম জায়গায় তুমি ষ্টুডিও করেছ তাই দেখতে এলাম—বললেন হেনরীর বাবা। বগলে তাঁর সোনার বাঁট-দেওয়া ছড়ি। হাত দুটো পেছনে। না, খুব খারাপ নয়। বাড়িটা পুরনো বটে, তা' মনটমার্ট্রের সব বাড়িই তো প্রায় এ রকম।

জানালার কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দেখলেন বাইরের দৃশ্য। তার পর বললেন, বাঃ চমৎকার দৃশ্য! পরিচ্ছন্ন দিনে তো তুমি নোতরদাম দেখতে পাও। না, এখানে তুমি তোমার হৃদয় যা চায়, তাই পাবে। স্বচ্ছন্দেই থাকবে। ছোটবেলা থেকেই আঁকার দিক থেকে খুব ঝোঁক তোমার। ঘোড়া-টোড়া ইত্যাদি ভালো ক'রে আঁকবার মতো একজন শিল্পী হতে পারো তুমি।

বাবার এ কথায় হেনরী স্বভাবতঃই আহত হলো। চেয়ে থাকে বাবার দিকে। সেই সিল্কের টুপি, সেই জামা-কাপড়, প্রায় আর সব ঠিক থাকলেও বাবার চেহারায় কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। বয়সের পরিবর্তনের চেয়েও গভীর এ পরিবর্তন। দৈহিক নয়, অন্য ধরণের। অদ্ভুত একটা অনমনীয়তার ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর মধ্যে, চোখে দেখা দিয়েছে কেমন একটা গোঁয়ার্তুমির বা ক্লান্তির ভাব। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কথা শোনাও যায়। বেচারা বাবা, কোথায় তাঁর ছেলে তাঁর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবে, লোরিতে হরিণ শিকার করবে, আর কি না—

—ওপরে একটা শোবার আর একটা স্নানের ঘর আছে দেখবে বাবা?

হেনরীর এ-কথা এড়িয়ে অসমাপ্ত আইকেরিয়াসের ছবির দিকে ছড়ি দেখিয়ে প্রশ্ন করেন তিনি, ওটা কি?

সাঁলোর জন্যে ও ছবিটা আঁকছি।

দুটো মজার ডানা লাগিয়ে মাটিতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লোকটা কি করছে?

লোকটার বাবা ডাডেলাস ওর জন্যে দুটো মোমের ডানা তৈরি করে দিয়েছিল, যাতে নাকি ও সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে পারে"।

কিন্তু সূর্যের খুব কাছ দিয়ে যাওয়াতে ওর ডানার মোম গলে যায়, ফলে সমুদ্রে ডুবে ও মারা যায়। ওটা হচ্ছে একটা পুরোনো গ্রীক গল্প।

এমনও বোকাও থাকে পৃথিবীতে, ছবির কাছ থেকে সরে এসে কাঁধ তুলে অবহেলার ভঙ্গিতে বলেন হেনরীর বাবা। তা যাক আমি এখন যাচ্ছি। তুমি আরামে আছ দেখে খুশি হলাম।

দরজার কাছে যাওয়ার সময় তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো ইজেলের গায় একটি ছবির দিকে। ছবিটির দিকে সরে গেলেন তিনি, পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন ঘূর্ণীর মত পেটিকোট আর পদাঘাতের জন্যে উন্মত্ত পা-আঁকা এই ছবিটিকে।

এই সব বাজে ছবি আঁকছ জানতে পারলে তোমার মা সত্যি দুঃখিত হবেন। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মন্তব্য করলেন তিনি।

কাঁধ তুলে তারপর দরজার দিকে পা বাড়ালেন। এতে কিছু এসে যায় না, কিছুতেই কিছু এসে যায় না। দরজার সামনে মুহূর্তের জন্যে মুখোমুখি হলেন দু'জনে—যেন দু'জনের মধ্যে পার্থক্যের পরিখার ওপর সেতুবন্ধের প্রচেষ্টা।

কাউন্টই প্রথম ফিরলেন গুডবাই, হেনরী।

'গুডবাই, দেখা করতে আসার জন্যে ধন্যবাদ বাবা।'

কাউন্ট কোন উত্তর দিলেন না। সিঁড়ির ওপর থেকে হেনরী দেখতে লাগল একটা একটা সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে তার বাবা চলে গেলেন।

খৃসমাসের ছুটি শেষ হ'লো। হেনরী আবার মনোনিবেশ করলো আইকেরাস আঁকাতে। শুরু হ'লো ঘটনাবিরল, উদ্বেগ-বিহীন, সহিষ্ণু ছাত্র-জীবন।

সকালবেলায় সে যথাকর্তব্য ছবি নিয়ে বসলো। কুঁজোর মত ঝুঁকে পড়ল ছবির ক্যানভাসের দিকে। 'ডায়েনা এ্যাট দি বাথ' ছবিটি আঁকার জন্যে কঠিন শ্রম স্বীকার করছে সে। রক্ত-রঙের মিশ্রণ সামঞ্জস্য, অবয়বের সুঠাম ভঙ্গিমা, বিভিন্ন রঙের ভারসাম্য লক্ষ্য করছিল। দেখছিল মডেলের প্ল্যাটফর্মে নগ্ন ঋজু জুলিয়ার প্রতিটিকে।

অধৈর্য ভাবে চৌকিতে হেলান দিয়ে ছবিটি পরীক্ষা করতে লাগল। গ্রহগুলির গায় লাগাতে হবে আর একটু পিঙ্গল বা হাতটায় আর একটু তুলিকা লেপনের প্রয়োজন···তুলি বোলানর কি শেষ আছে? করমোন এর ওপর এত বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন কেন? তিনি ত' এক জন বিজ্ঞ লোক, তবে এই অবিমৃষ্যকারী ক্ষুদ্রতা কেন? তিনি মাইকেল এঞ্জেলো, গ্রেসৌ, হ্যালস, এবং ভেলাসকোয়েজের অনুকরণে চিত্র সাধনা করেছেন, তিনি কি জানেন না মহৎ শিল্পী ও অপরূপ রূপলাবণ্য কখনো ক্ষুদ্র নয়? তা সত্ত্বেও গত কালই তিনি নগ্নচিত্র আঁকার বিপক্ষে চিৎকার করছিলেন!

সত্যি কি তিনি এই ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাসী? নিশ্চয়ই মনে হয়, তাঁর ব্যবহারই এর প্রমাণ। এক সপ্তাহ আগে এক জন ছাত্র লাল রঙের সঙ্গে বেগুনি রঙ মেশানোর জন্যে তিনি যে কাণ্ড করলেন,—যেন মহাপ্রলয়ের শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে এসেছে। 'ইমপ্রেশানিজম। তোমাদের আমি বলেছি আমার ক্লাশে ইমপ্রেশানিজম আমি কখনই সহ্য করব না। বোধ হয় তোমরা ভুলে গেছ যে আমি 'সাঁলো জুরির' এক জন ছাত্র।'

একটি পরিষ্কার তুলি বেছে নিয়ে হেনরী তার লোম নিজের হাতের তালুতে বুলিয়ে নরম করে নিল। রঙদানির বাদামী রঙের বুদ্‌বুদের মধ্যে তুলি ডুবিয়ে তারপর শুরু হল কানভ্যাসের গায় সাবধানী রেখার একঘেয়ে কারুকার্য্য।

তার মন আবার চিন্তায় ডুবে গেলো। মনে হতে লাগলো অপেক্ষা করে আছে এ'র জন্যে, মনে পড়ল আরও একটি সন্ধ্যা কাটবে তার শুধু তুলি বোলানর একঘেয়েমির বিবমিষায় তারি পা ঝিঁ-ঝিঁ করতে লাগল।

এই প্রতিক্রিয়ার বিপ্লব বেশ চমকপ্রদ। আজ তার হ'লো কি? সুরু থেকেই সে জানে আইকেরাস একটি মূর্তিমান বিরক্তি, কিন্তু এ-ও সে জানে এই হ'লো সাঁলোর সিংহদ্বার, সুতরাং এ পর্ব শেষ করতেই হবে। তবে এই আকস্মিক বিতৃষ্ণা কেন, কেন এই শিল্পি-সুলভ মেজাজ? তার বন্ধুরাও এ পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে। কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কিন্তু 'কিছু একটা' কি?

জুলি! গোপন পাপের মতো একটি করুণ কোমল নাম—যা তার বন্ধুকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তার মস্তিষ্কের রন্ধ্রে যেন শুনতে পেল—ধীরে ধীরে সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন করে ফেললো। এই হ'লো ব্যাপার তাহ'লে। যে দিন লুকাস তাকে লা এলিতে নিয়ে এসেছিল, সেই সন্ধ্যার পর থেকে মুহূর্তের জন্য সে শান্তি পায় নি।

সহসা সে যেন মূর্তিমতী হ'য়ে সামনে এসে দাঁড়াল—শ্রীময়ী, তন্বী। চুনট-লাগান ঢেউ-খেলানো টুপি, কালো ছিট স্বচ্ছ সাদা হাওয়ার মত মুখাবরণ আর কণ্ঠঘেরা ফারের আচ্ছাদন—যা লুকাস খৃসমাসে তাকে উপহার দিয়েছে।

অনুশোচনা তার পূর্বে যাই থাক, মুখের রেখায়-রেখায় এখন তা মুখর নয়। সে নিশ্চয়ই এখন আর তাকে চপেটাঘাত করতে চায় না। না নিশ্চয়ই না। সে ঐ সাধারণ সুন্দর নরম্যান নায়কটির প্রেমে মগ্ন—সে তার অঙ্গভঙ্গী প্রতিটি কটাক্ষ, টেবিলের তলা দিয়ে প্রেমাস্পদের হাত ধরার চেষ্টার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। রোমাঞ্চকর বটে—তবে জনসাধারণের চোখ যেখানে আড়ি পেতে আছে, সেখানে এই অবৈধ প্রণয়-লীলা কিছুটা অশোভন; হৃদয় আর ইন্দ্রিয়ের কাছে রুচিশীলা তরুণীর এই লজ্জাহীন পূর্ণ আত্মসমর্পণ। লুকাস যথার্থ বলেছিল যে, চুম্বনের মাধ্যমে নারী পায় অনেক কিছুই।

চোরের মত সে কল্পিত-মূর্তির ওপর চোখ বুলিয়ে নিল। এ একটা বিচিত্র-নতুন অনুভূতি, সুখেরও বটে দুঃখেরও বটে—সুন্দরী তরুণীর এই গোপন অনুধ্যান যে নারী-অন্তরে এত কাছে, তবু নক্ষত্রের মতোই অধরা সুদূর। এর পর থেকেই তার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল।

সে-রাত্রেই যখন আবার সে ঘরে ফিরেছিল, সেই নারী আবার দেখা দিল। অবশ্য এবার স্বপ্নলোকে—কিন্তু সে স্বপ্ন জাগ্রত-জীবনের মতো যেন সত্য।

যখন ঘুম ভাঙল তার হৃদস্পন্দন হচ্ছে, অনুভূতির সূক্ষ্ম শিরায় কি গভীর সুখপ্রবাহ, একটা সম্পূর্ণ সুস্থতায় সর্বাঙ্গ ছেয়ে আছে যেন। তার পা দু'টো যেন আর ব্যথা দিচ্ছে না।

প্রতি রাত্রেই চলল এই দৃশ্যের পুনরভিনয়। দিনের বেলাতেও সেই নারী তার ছায়াসঙ্গিনী। অপরের কাছে সে অদৃশ্য—তার কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। এত সত্য যে, মনে হয় আইকেরাসের পটভূমিকায় মসৃণ আঁধার থেকে সে যেন হাসছে। ম্যাদাম লুবে যখন পাঠ করেন কিংবা যখন বন্ধুরা তর্ক-বিতর্ক করে বা পরস্পরের মুখে সিগারেটের ধূম উদ্গিরণ করে তখন সে তাকে জ্বালাতন করে। কখনও কখনও হয়ে ওঠে রসোচ্ছল—লীলাময়ী। আর কখনও কখনও অসহ্য নম্রশান্ত। কখনও বা মূর্তিমতী নিষ্ঠুরতা!

চিন্তাচারণা বন্ধ করে সে আবার ছবিতে মনোনিবেশ করলো। বাঃ বেশ হয়েছে! 'বাম বাহুটা দস্তানার মতো দেখাচ্ছে। করমোন নিশ্চয়ই এটা পছন্দ করত। আর ঐ গ্রহচ্ছায়াগুলির রূপ কি সুন্দর খুলেছে। ঐ কঠিন বাদামী মৃত্তিকা···

তার মন দুর্নিবার আকর্ষণে ফিরে এলো জুলির চিন্তায়। সে যেন তার মনের মাধুরী মিশিয়ে গড়া। কবিদের কবিতা রচনার বাসন্তী লগ্নে যে সুন্দরী নায়িকা তাদের পেছনে আলতো পায়ে এসে দাঁড়ায় .সে যেন তাদেরই সহচরী। তার দেহহীন কামনার লাবণ্য-বিলাস যেন এই জুলির মধ্যে মূর্তি ধরেছে।

প্রয়োজন একটি নারীর কপোল-কল্পিতা নয়, রক্তমাংসে গড়া এক নারী আর তার প্রেমের গভীরে মগ্ন হওয়া। অতি সহজ।

-কত নারীর সঙ্গে সরীসৃপের মত দিন যাপন করছে। সুলভ মেয়েরা যারা চায় ভালবাসতে ও ভালোবাসা পেতে, একটু কৃপাকণা লাভের জন্য আর ভালো রেস্তোঁরায় আহারের জন্য যারা ক্ষুধার্ত; এ সব পাওয়ার পরও তারা হ'য়ে ওঠে অর্থগৃধ্নু। এসব মেয়েদের পাওয়ার জন্যে কঠিন সমস্যা নেই।

এক সন্ধ্যায় যখন এই তীব্র চিন্তার দংশন অসহ্য হ'য়ে উঠল সে ব্রেসারী মনসির দিকে রওনা হলো।

উপস্থিত হ'য়ে সে বুঝল ঠিক জায়গায় সে এসেছে। উজ্জ্বল আর মুখর এই কাফে। একের পর এক উপস্থিত অতিথিদের টেবিলে চর্ব্ব চোষ্য লেহ্য পেয় সরবরাহ হয়ে চলেছে। পরিচিত মুখ নেই। এখানে ওখানে সবখানেই মেয়েদের ভিড়—যেন নারী-সভা। কিন্তু কে হতে পারে তার সঙ্গিনী? ঐ সবুজবসনা তন্বী কিংবা ঐ ফুর্তিবাজ মেয়েটো যার হাসির দমকে কাঁচুলি ছিঁড়ে যাবে মনে হচ্ছে? অবশ্য যে হোক হলেই হলো।

অ্যাবসিনথের গ্লাসে এক চামচ চিনি মিশিয়ে সে পান করল। ভালো করে গলেনি বলে পানীয় তৈলাক্ত ও ঘন লাগল।

আর একটা এ্যাবসিনথ—পাশ দিয়ে যে চাকরটা যাচ্ছিল তাকে জানাল সে।

তীব্র উত্তেজনায় তার চেয়ারটা কাঁপছিল; টেবিলের মার্বেল যেন বরফের মত গলে যাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে মানুষগুলোর মুখ যেন থরথর করে কেঁপে উঠছিল আর স্বচ্ছ কাচের মধ্যে গ্যাসের আলো যেন জ্বলজ্বলে হলুদ রঙের বলের মত! তার নিজেকে অসাধারণ হাল্কা আর মুক্ত মনে হচ্ছিল। পঙ্গু—কে পঙ্গু? সে ইচ্ছা করলে টেবিলের ওপর দিয়ে এই মুহূর্তে লাফ দিতে পারে। আইকারাসের মতো উড়ে যেতে পারে শূন্যে! সে যেন অমিত শক্তিবান! তার বিরুদ্ধে একটা অন্যায় কথা—একটু শ্লেষাত্মক হাসির জন্যে সে এখনি উপযুক্ত শিক্ষা দিতে পারে।

একটি মেয়ে এসে তার পরের টেবিলে বসল। বেশ খুশি-খুশি ভাব। ঠোঁটের রঙ উজ্জ্বল রক্তিম—তবে মুখখান চটাওঠা পুতুলের মতো। পায়ের ওপর পায়ের চিক দিয়ে বসে একটা সিগারেট ধরাল। লম্বা কালো চামড়ার ব্যাগের মধ্যে থেকে বের করল একটা নীল চিঠি। হেনরী লক্ষ্য করতে লাগল—নিঃশব্দে উচ্চারিত শব্দানুসারে। মেয়েটির ঠোঁটের নানারূপ ভঙ্গিমা যদিও ধোঁয়ার আড়ালে আধখানা মুখ তার অস্পষ্ট।

তার দিকে ঝুঁকে পড়ল হেনরী, ফিস-ফিস ক'রে বললে, শুনছেন, আপনি আমার সঙ্গে পান করতে রাজি হবেন।

চোখ তুলে দৃষ্টিপাত করলো মেয়েটি—দেখতে পাচ্ছেন না আমি ব্যস্ত? আপনার মত যদি আমার মুখের চেহারা হত আর ঐ রকম বিশ্রী ছোট পা থাকত, তাহলে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম।— মেয়েটি পুনর্বার চিঠিতে মনঃসংযোগ করল।

কথাগুলো হেনরীর মধ্যে ইলেকট্রিক শকের মত বেদনা সঞ্চার করে গেলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো সে মুমূর্ষুপ্রায়। দু'চোখ মুদ্রিত করল সে। তা'হলে সত্যি···একটা অতি সাধারণ মেয়েও তাকে চায় না। কোন নারীই তাকে কোন দিন কামনা করবে না। সে সব সময়ই একলা থাকবে—একা—চিরদিন!

চোখের পাতা তুলল সে। মেয়েটি অন্য একটা টেবিলে সরে গেছে। ছড়িটা হাতে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়লো। [ক্রমশঃ।

অনুবাদক : কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ও শ্যামাপ্রসাদ দে।

আসবেই

অশোক ভট্টাচার্য

আসবেই। দিন ঘুরে আসবেই
পথ-ঘাট মাঠ-বন
আমাদের মরু-মন
বর্ষার বর্ষণে ভাসবেই।

জাগবেই। প্রাণ ফের জাগবেই
ঐ মরা গাছটায়
মুক্তির ঝাপটায়
চিক্কণ পাতা শাখা ঢাকবেই।

আসবেই। প্রিয়া ঘরে আসবেই
পথ চিনে বিদ্যুতে
জল দিতে এ-মরুতে
আমাকে আবার ভালো বাসবেই।


নিম তৈল থেকে
বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে
প্রস্তুত সুগন্ধি
মার্গো সোপের প্রচুর
ফেনা যেমন
নির্মলকর তেমনি
জীবাণুনাশক।
মার্গো সোপ দেহের
কান্তি উজ্জ্বল করে।
কোমল ত্বকের
পক্ষেও ব্যবহার করা
সম্পূর্ণ নিরাপদ।
স্নানের সময়
ব্যবহার করতে ভুলবেন না
MARGO
SOAP
HYGIENIC TOILET SOAP
মার্গো
সোপ
ক্যালকাটা কেমিক্যাল
কোম্পানি লিমিটেড
কলিকাতা
CMC-5 BEN



মৃতের মায়া

শোভা চৌধুরী

পোষ্টমর্টেম ঘরে যাবার আগে সামনে টেবিলে প্রসারিত পুলিশ রিপোর্টটার প্রতি ডাক্তার এক বার তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলেন তাঁর হাসপাতালের ঘরে বসে। পোষ্টমর্টেম ঘরটা দূরে,—আকাশে মেঘ জমেছে, বোধ হয় বৃষ্টি নামবে,···রিপোর্টটার কতকাংশ ছিল এই রকম—"মৃতা রমণী এই শহরেরই বাসিন্দা পৌরোহিত্য-ব্যবসায়ী গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর মাতৃপিতৃহীনা ভাগিনেয়ী। প্রায় বছরখানেক পূর্ব্বে দশ-বারো মাইল দূরবর্ত্তী বিলাসপুর গ্রামে ইহার বিবাহ হয়। স্বামী বেকার ও নেশাখোর, সেজন্য ভরণপোষণে অক্ষম হওয়ায় রমণী উদরান্নের জন্য স্থানীয় জমিদার-ভবনে চাকুরী গ্রহণে বাধ্য হয়—এই পর্য্যন্ত জ না গিয়াছে, ইহার পরের সঠিক বিবরণের জন্য আরও অনুসন্ধান চলিতেছে। ইহার স্বামী ও কয়েক জন প্রতিবেশীর এজাহারে জানা যায় যে, ঘটনার দিন রাত্রে যখন রমণী বাড়ী ফির তখন ইহার পশ্চাতে এক জন প্রতিবেশী স্বয়ং জমিদারকে আসিতে দেখিয়াছে, তবে মনে হয় ইহার স্বামীই প্রত্যক্ষ দর্শক, জমিদারের ভয়ে সে কিছু বলিতে পারিতেছে না, পরে নিশ্চয় সবই প্রকাশ হইবে। এখন কি কারণে রমণীর অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটিল তাহাই নির্দ্ধারণ জন্য. ইত্যাদি"···ছোট শহর···তার শেষ প্রান্তে মরা নদীর ঠিক পাড়ের পরেই কতগুলো বনঝাউ আর আশশেওড়ার ঝোপে ঘেরা, পাকা দেয়ালে টিনের ছাউনী ফেলা সহস্র ফাটল ও শেওলায় ভরা কবে কোন্ মান্ধাতার আমলে তৈরী লাস-কাটা ঘর।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা ··বাইরে বাদল—আকাশের চোখ ফেটে নেমেছে অশ্রুবন্যা।

ভিতরে ঘরের মাঝখানে পাতা সাদা পাথরের টেবিলটার ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ দেহ, শুভ্র শির হাসপাতালের প্রবীণ ডাক্তার, ইউক্যালিপটাস-মাখা রুমালখানা নাকের উপরে চাপা, ··অন্য পাশে আকণ্ঠ নেশায় চুর আরক্ত চক্ষু একটা জোয়ান মেথর, টেবিলের কোণের দিকে রাখা একটা টিমটিমে হ্যারিকেনের আলো।

টেবিলের উপরে শোওয়ান আছে বছর আঠার-উনিশ বয়সের এক স্ত্রীলোকের মৃতদেহ।

পরনে তার পাড়-ওঠা স্থানে স্থানে রক্তের ছোপধরা একটা ময়লা শাড়ী, একবোঝা কুঞ্চিত রুক্ষ চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়েছে মাথাটার চার পাশে। সরু সীঁথিটার প্রান্তে ম্লান সিন্দুরচিহ্ন, বাঁ হাতখানা ঝুলে পড়েছে টেবিলের পাশ ঘেঁষে, মৃদু আলো পড়ে তাতে চক্‌চক্‌ করছে একখানা সবুজ কাচের চুড়ী আর একখানা লোহা; তার পাশেই একটা কাটা ক্ষতচিহ্ন কালো রক্ত জমে রয়েছে, ঠোঁটের স্বল্প ফাঁকে একটু দেখা যায় সাদা দাঁতগুলো, সম্পূর্ণ খোলা নিথর চোখ দু'টোয় ঘোলাটে বিবর্ণতা। তিরিশ বছরের কর্ম্মাভ্যস্ত বিচক্ষণ ডাক্তার এক বার নিজের রেখা-বহুল কপালটা রুমাল দিয়ে মুছে নিয়ে মেথরটার পানে চান,···সে ত্বরিত হাতে মৃতদেহের কাপড়টা টেনে সরিয়ে দিয়ে মেঝের উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাতে তুলে নেয় অপারেশন ছুরীটা, তার পর নীরব, নিঃশব্দ ডাক্তারের অঙ্গুলী সঙ্কেতে সে দ্রুত হস্তসঞ্চারে মৃতের দেহ একে একে ছিন্ন করে যায়,···গলা বুক···পেট···"আঃ, আস্তে ডাক্তার, আস্তে···ওখানটায় ছুরীটা চালাও তোমার একটু সাবধানে···"

ডাক্তারের চকিত দৃষ্টি ভেজানো দোরের পানে পড়ে,···কার,··· কার এ মায়াতুর সকরুণ কণ্ঠস্বর? নেই, দোরের কাছে কেউ তো নেই! মেথরটার মুখের পানে দৃষ্টি পড়ে, সে কি কিছু শোনে নি? সে তো তেমনিই ভাবলেশহীন মুখে নিজের কাজে ব্যস্ত, তবে? বিস্মিত দৃষ্টি ফিরে আসে বিবর্ণ মৃতের মুখের উপরে, কই না, ঈষৎ ফাঁক নীল ওষ্ঠাধরে তার তো তেমনি নিঃশব্দতা! এবার দৃষ্টি আপনি নিবদ্ধ হয়ে নিশ্চল হয়ে যায় মৃত রমণীর স্তিমিত চোখের তারায়,··· "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডাক্তার, আমি ট্যারা। কিন্তু মাত্র উনিশটি বছরের জীবন আমার, তার মাঝে, তার মাঝে···উঃ ছুরীটা তোমার একটু আস্তে চালাও, সইবারও তো শক্তি থাকা চাই! কত,···কত আমি সইলাম জান? এস, সরে এস আমার আরও কাছে,··· মস্ত তিনটে মাঠের ওপারে, আকাশের কোল ঘেঁষে ওই যে গাঁ-খানা, ওইটেই বিলাসপুর। ওখানের জমিদারবংশ অখণ্ড প্রতাপে জমিদারী চালাচ্ছে আজ চোদ্দ পুরুষ ধোরে। তাদের শাসন কৌশলে দিন হয় রাত, রাত্রি নামে দিনের আলোকে আড়াল করে; কাহিনী তাদের দশখানা গাঁয়ের লোকের কানে-কানে ফেরে, মুখে শব্দ পায় না মূর্ত্তিহীন আতঙ্কে।

"এই গাঁয়ে এলাম আমি, সে প্রায় এক বছর আগে। কেমন করে? বলছি,···আমার গরীব বাবার হঠাৎ মৃত্যুর পরে, আমার নিঃস্ব বিধবা মা আমায় কোলে নিয়ে আশ্রয় নিলে এই শহরে আমার এক দূর সম্পর্কের মামার ঘরে।

"ক্রমে আমি বড় হলাম, দেহ উঠল ভরে, মায়ের আমার সুখের খাওয়া চোখের ঘুম ঘুচলো, তবু বাড় আমার একটুও থামল না।

"ভগবান সদয় হলেন, রূপ কিছু ছিল, তারই জোরে সরকারী ডাক্তারের স্ত্রীর নজরে আমি পড়লাম, তাঁর শিক্ষিত, সুশ্রী ছেলের পাত্রী হিসেবে তিনি আমায় মনোনীত করলেন। কিন্তু বিয়ে হ'ল না···তাঁর ডাক্তার স্বামীর আমায় পছন্দ হ'ল না, আমি নিঃস্ব বিধবার মেয়ে, একটি কানাকড়িও তাঁর প্রাপ্য হবে না, তাঁর শিক্ষিত ছেলের মূল্য হিসেবে। কিন্তু ও কথা দিয়ে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেন না, বললেন,···চন্দ্রে কলঙ্কের মত আমারও রূপের ত্রুটি, আমি একটু ট্যারা।

"হতাশায় ভেঙ্গে মা শয্যা নিল, আমি ধরণীকে দ্বিধা হওয়ার প্রার্থনা জানালাম।

"কিন্তু বিয়ে আমার হয়েই গেল, আমার আশ্রয়দাত্রী মামীরই এক দূর সম্পর্কের ভাইপোর সঙ্গে। মামী বললেন··যদিও গাঁজা,

গুলি. সিদ্ধি কিছু খায় বলে গাঁয়ের হিংসুটে লোকগুলো মিথ্যে বদনাম দেয়, কিন্তু তাতে কি ? আর সত্যি যদি কিছু খেয়েই থাকে, সে তো আর পরের পয়সায় খায় না ? দস্তুর মত জায়গা, জমি, বাড়ী সবই আছে, কেবল গোছান যত্ন করার লোক নেই বলেই হালে-ডালে ঘোরে, নইলে ভাইপো তার···

“মা সেই যে শুলো আর উঠল না, কাজেই স্বামীর ঘরে তখনই আসা হ'ল না,···ছ' মাস পরে দু' ফোঁটা চোখের জলে মাকে ওপারে বিদায় দিয়ে আমি চলে এলাম স্বামীর ঘরে, বিলাসপুরে।

“দিন কতক থেকেই দেখলাম, বুঝলাম,···আমার স্বামীর বিষয় সম্পত্তির কাহিনী সবই গল্পকথা, হয় ত কোন দিন ছিল, কিন্তু আজ তার কোন চিহ্নই নেই। মাত্র দু'খানা মাটির কুঁড়ে ছাড়া, সবই গেছে তার আটত্রিশ বছর বয়সের নেশার খোরাক ও উদরান্ন জোগাতে।

“এখন দু'টো পেট চলে কেমন ক'রে ? স্বামী তো নিশ্চিন্ত !

“কিছু দিন চলল ধার করে, চেয়ে চিন্তে, কিন্তু নিত্যি অভাব দেয় কে ? দু'দিন পরে ভিক্ষা, ধার, আর কিছুই মিললো না।

“আগে আমার শ্বশুর ছিলেন এই গাঁয়েরই পুরোহিত,···তাঁর যজমানদের কাছে আমি অনুরোধ জানালাম তাঁর কাজটা স্বামীকে দিতে। দু'-তিন ঘর রাজি হ'ল দয়া করে, অনেকেই কথাটা কানে নিলে না,···নেশাখোর, মুখখু, ও পুজোর জানে কি।

“স্বচ্ছন্দে নেই হোক, আধপেটা খেয়ে কাটল আরও কিছু দিন, মুস্কিল বাধল নেশার খরচ নিয়ে,···মা আমায় কিছুই দিতে পারেনি বিয়ের সময়, শুধু দিয়েছিল আধ ভরিটাক সোনার একটা আংটি। মায়ের স্মৃতি, বিপদের দিনের সম্বল, তাই সেটা লুকিয়ে রেখেছিলাম। কিন্তু পারলাম না, বার করে দিতে এক দিন হলই, জবরদস্তি বা উৎপীড়িত হয়ে নয়, অনুনয়ের ক্লান্তিতে।

“আংটি বেচার টাকা শেষ হতেই স্বামী ফিরতে লাগল ভিন্ন-ভিন্ন গাঁয়ে নেশার চেষ্টায়, পুরুতগিরি রইল পড়ে,···যারা কাজ দিয়েছিল দয়া করে, তারা অন্য পুরুত ডাকলে।

“সেদিন তিন দিন আগে থেকে পেটে কিছু আমার পড়ে নি, এক মুঠো করে কলমী শাকসেদ্ধ খেয়ে কাটছে দিন।

“সন্ধ্যে তখনও জ্বালা হয়নি, তেল নেই। কাপড়টা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছি মাটির দাওয়াটায়। দেখি, প্রায় তের দিন পরে স্বামী ফিরল ঘরে, চোখ দু'টো যেন জবাফুল,···পাশ কাটিয়ে ঘরে ঢুকে ছেঁড়া মাদুরটা টেনে পেতে শুয়ে পড়ল মুড়ি দিয়ে।

“খালি পেটে হয়ত নেশার মাত্রা ছাড়িয়েছে ! কথা আমি কই নি, অনর্থক বলে।

“ঘুমোই নি···পেটে তখন পাক দিচ্ছে খিদেয়, ঘুম কি আসে ? রাত সামান্য তন্দ্রা এসেছিল, ঘরে যেন গোঙানর শব্দ,···উঠলাম, ঘরে দেখি জ্বরে একেবারে গা পুড়ছে অজ্ঞান, অচেতন। পেটে তখন আমারও অসহ্য যন্ত্রণা, সে যন্ত্রণা তোমরা বুঝবে না, না চাইতে যাদের মুখের কাছে খাবার জমে তারা তা কোনও দিন বোঝে নি, বুঝবেও না।

“কোথায় যাই,···ওই রুগ্ন লোকটার মুখে কি পথ্য দিই ?

“পায়ে তখন আমার চলার শক্তি ছিল না, তবু উঠলাম,···ওই অসহায় রোগাতুর লোকটার মুখের পানে চেয়ে এই এক বছরে এত দুঃখ অভাবেও যা কোন দিন করিনি, আমি আজ হঠাৎ তাই করে ফেললাম। চললাম, অল্প দূরেই জমিদারদের খিড়কী দোরের পানে, কিছু ভিক্ষার আশায়।

“ওদের অনেক কাহিনী এই এক বছরে আমি শুনেছি গাঁয়ের লোকের মুখে···সবগুলো অবশ্য বিশ্বাস করতে পারিনি যদিও, তবু ওদের ঘরে যাইও নি কোন দিন, ভয়ে নয়, ঘৃণায়। রোজ সন্ধ্যায় ওদের বৈঠকখানার হৈ-হুল্লোড় কিছু কিছু শুনতে পাই, কিন্তু জমিদারকে দেখি নি কোন দিন, শুনেছি তিনি বয়সে নবীন।

“এলাম বটে, কিন্তু জানতাম না জমিদারের দোরে ভিক্ষুকের প্রবেশ-পথ সহজ নয়,···অনেক ঝি, চাকরের হাত এড়িয়ে গেলাম জমিদার-পত্নীর কাছে, বয়সে তিনি আমার চেয়ে সামান্যই বড়। সাহস করে জানালাম আমার দুঃখ অভাব, কিছু কাজ, কিম্বা সামান্য কিছু সাহায্য চাইলাম।

“উত্তর পেলাম,···তাঁকে না জানিয়ে সরকার কিম্বা অতিথিশালার ভাঁড়ারীকে জানান উচিত ছিল, তাঁর কাছে পর্য্যন্ত এগোবার সাহস কে আমায় দিয়েছে ?

“নিরাশায় অচল পা টা টেনে ফিরলাম,···হাসিও আসে,···হায় রে স্বর্ণবাহী গাধা, নিরুপায় দেখি আমার চেয়েও বেশী, দীনকে একমুঠো দেবার শক্তিও মনে সঞ্চয় রাখনি !

“ঘর ছেড়ে দালানে নেমেই থমকে দাঁড়াতে হয়,···সামনেই আসছে এক সুবেশ যুবক।

“দ্রুত ছেঁড়া কাপড়টা টেনে মুখ ঢাকলাম,···কিন্তু সেই চকিত

দৃষ্টিপাতেই তার চোখে কি আমি দেখলাম। চিনলাম, ইনিই জমিদার, বিলাসপুরের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা।

"পরদিন বাড়ীর পাশের এক মুড়িওলী দয়া করে দু'টি মুড়ি দিলে, স্বামীকে সে ক'টি খাওয়ালাম, জ্বরটা তার তখন কমেছে, কিন্তু ছাড়েনি। নিজের জন্তে আজও কতগুলো শাক সেদ্ধ করে সবেমাত্র কোলের কাছে নিয়ে বসেছি, এল জমিদারবাড়ীর এক ঝি,...অনেক ভণিতা করে জানালে যে, আজই সন্ধ্যে থেকে আমি জমিদার-বাড়ীর প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের পুজোর জোগাড়ের কাজ পেলাম, মাসে মাইনে পাব দশ টাকা, রোজ আধ সের করে চাল, তা'ছাড়া নৈবিদ্যির কিছু ভাগ।

"মহামহিম জমিদারের কানে গেছে আমার আবেদন, তাই এ দয়া।

"চার দিন উপবাসের পর,...বুঝতেই পারছ আমার তখনকার মনের কথা। দয়ালু জমিদারবংশের জন্ত ভগবানের কাছে চাইলাম একান্ত কল্যাণ। স্বামীকে বললাম না কিছু...অপদার্থ বলে অবহেলা করে নয়,...বিশ্বাস কর, ভাল ওকে নেই বাসি, তবু তবু ওই নিরীহ, অকর্ম্মণ্য মানুষটার উপরে একটুখানি করুণা আমার ছিলই। জানালাম না শুধু ও কোন দিন আমার জন্ত একবিন্দুও ভাবে নি, ভাবার প্রয়োজনও বোধ করে নি, তাই ওকে কোন কিছু জানাবার আমার অভ্যেসই নষ্ট হয়ে গেছে, তাই।

"সন্ধ্যের কিছু আগে, ওর মধ্যেই কম ছেঁড়া-কাপড়টা পরে নিয়ে আমি গেলাম ঠাকুরবাড়ীতে, আমায় কাজ বুঝিয়ে দেওয়া হল।

"যদিও ক'দিনের নিটাল উপোসে মাথা টলছে, পা দু'টো কাঁপছে তবু আসন্ন খাবার আশায়, ভবিষ্যতের সংস্থানের ভরসায় অনেকখানি শক্তি যেন আমি ফিরে পাচ্ছিলাম।

পুরোহিত পূজো সেরে বিদায় নিলেন সন্ধ্যার কিছু পরে, আমার ভাগের প্রসাদের থালাটা হাতে নিয়ে উঠতে যাব—মন্দিরের দোরগোড়ায় দেখলাম, আমার কাল বিকেলে দেখা সেই...আর চোখে তার,...উঃ, সেই দৃষ্টি! ভয়ে, বিস্ময়ে মাথার কাপড় টানতে ভুললাম,—মাথার ঝিমঝিম আওয়াজের সঙ্গে কানে আসতে লাগল" অপরিচিত কণ্ঠে আমার ভবিষ্যৎ রাণীগিরির স্বপ্ন-সম্ভাবনা যা মাত্র নির্ভর করছে আমার সামান্য একটি "হ্যাঁ"এর ওপোরে।

"রাতটা ভেবে দেখার সুযোগ চাইলাম,—দোর ছেড়ে সরে গেল, পায়ের শব্দ শুনলাম দূরে। মাথা তখন আমার ঝিমোচ্ছে মাতালের মত, সমস্ত শরীর আড়ষ্ট, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য সবই একাকার, চিন্তা অস্থির,—তবু স্থির আমি একটা করলাম, নিশ্চিত বুঝেছি এদেশ আমায় ছাড়তেই হবে, কিন্তু পাথেয়? তাও সংগ্রহ হ'ল। ভয় আর তখন আমার মনে একটুও নেই, আমি খুলে নিলাম ঠাকুরের গলার স্বর্ণ কণ্ঠমালা,...যে কাজ হয়ত কোন দিন আমার স্বপ্নেও ছিল না, নিরুপায়ে আজ তাই করলাম,...জান, আমি চুরি করলাম। চোখে যে জল আসতে চায়।...না, না, আমার অপমানিত মনুষ্যত্বের সাক্ষী থাক, হে মন্দিরের লুণ্ঠিত দেবতা।

"মন্দিরের শেকল টেনে প্রসাদের থালা হাতে নামলাম আমি অন্ধকার পথে,...পিছনে মনে হ'ল যেন কিসের শব্দ,...কিছু না, ও নিশ্চয় আমার গরম মাথার ভয়ার্ত্ত ভ্রান্তি। ঘরের দোরে উঠে ভুল ভাঙল,—ফিরতেই দেখলাম হ্যাঁ, অন্ত কেউ নয়,...নিজে,...ও আড়াল থেকে দেখেছে আমার চুরি, বুঝেছে আমি পালাব, তাই অনুসরণ করেছে,...কাল পর্যন্ত চিন্তার সুযোগও আমায় দেবে না, আমায় এক্ষুণিই বেছে নিতে হবে ওর অঙ্কশয্যা, কিম্বা জেলের দরজা।

"ওর শক্ত হাতের মুঠির চাপে আমার হাতে কাচের চুড়ি কেটে বসে,—চোখে অসহায় অন্ধকার, শুকনো গলায় আমার একটুও শব্দ ফুটল না। তার পর? জানি না কি আমি করেছি, হয়ত...হয়ত ছুঁড়ে মেরেছিলাম প্রসাদের থালাখানা,...ঝনঝন আওয়াজের সঙ্গে আমি স্পষ্ট দেখেছি ওর কপালে রক্তধারা, কি যেন শব্দ, কে যেন আসছে, কোথায়, কত দূরে?

"ছুটল ও,...আমি লুটিয়ে পড়লাম মাটিতে মুখ থুবড়ে, আমার পেটে ওর মর্ম্মান্তিক পদাঘাতে তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা ও চিৎকার তুলে। স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে দেখলাম, টলতে টলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল আমার রুগ্ন স্বামী,...হয়ত চেঁচিয়ে উঠেছিল, এল আরও, আরও অনেক লোক,...

"নেশার ঘোরে নারীহত্যাকারী বলে ধরা পড়ল আমার হতভাগ্য স্বামী, কিন্তু...

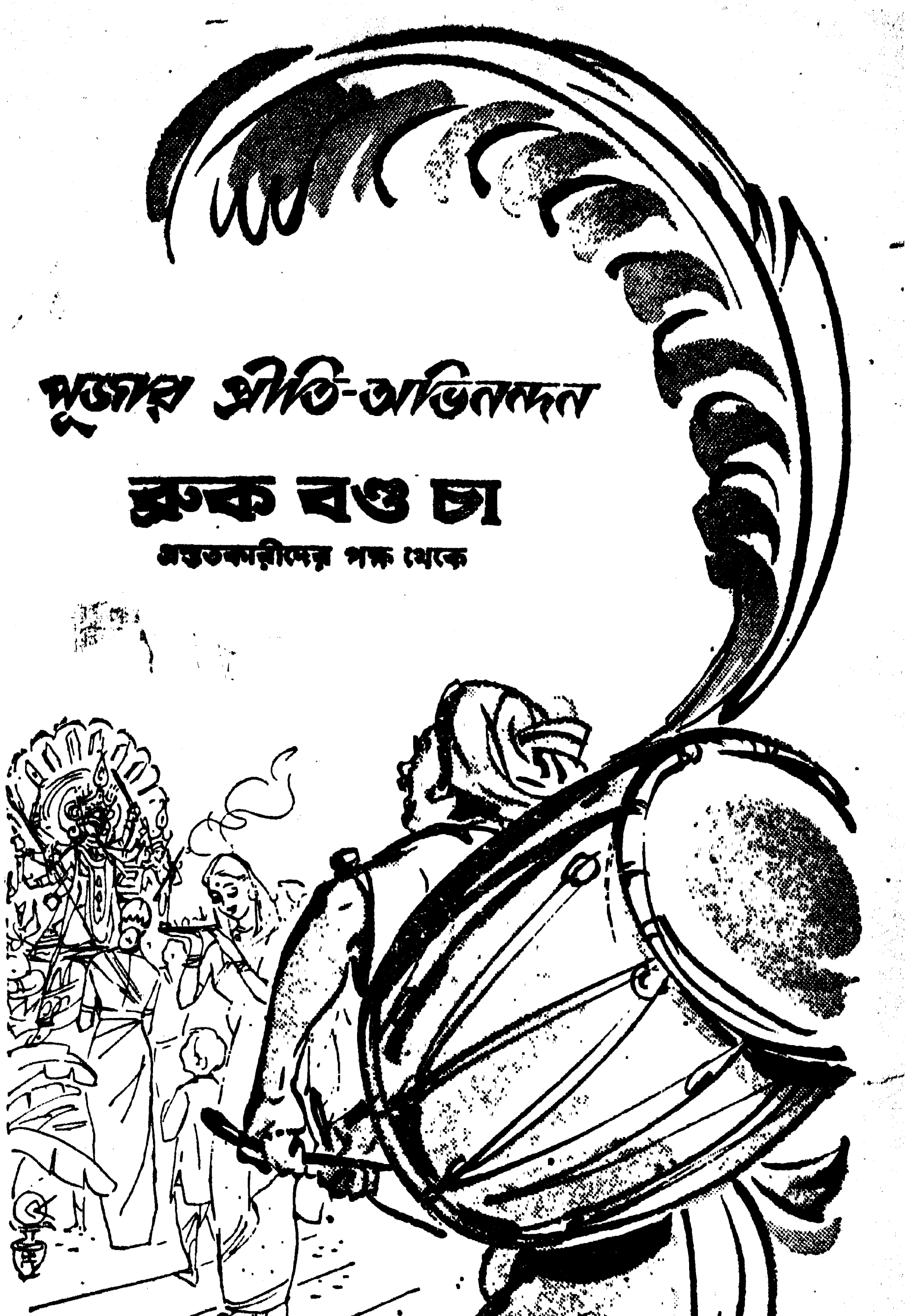
"নাক, মুখ, সর্ব্বদেহ নিংড়ে আমার বেরিয়ে আসছে উত্তপ্ত রক্তধারা, নদীর স্রোতের মত মাটি ভিজিয়ে,...উঃ, অন্নহীন মানুষের দেহে এত রক্তও থাকে!

"চোখে নামল রাত্রির অন্ধকার, এবার মিলল বিশ্রাম,...আস্তে, আস্তে আমি ঘুমোলাম, আঃ, ছুরীটা তোমার ওখানে আর নেই" বা চালালে ডাক্তার,...তোমার চোখে আমার দেহের কিছুই তো অজানা নেই,...যে নিরপরাধ রক্তপিণ্ড পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করল না... সকলের অজান্তে যে ঘুমিয়ে পড়ল আমারই অঙ্গের অন্ধকারে, তোমার কঠিন ছুরীর ঘায়ে তার শান্ত ঘুম আর নেই বা ভাঙালে। যদি,... যদি সেদিন ট্যারা বলে উপেক্ষা আমায় না করতে, তা হলে আমিই হতাম তোমার কুললক্ষ্মী, পুত্রবধূ...আর সে জানে, হয়ত...হয়ত আমার পেটের ওই দুর্ভাগাই হোতে পারত তোমার বংশের ভবিষ্যৎ বংশধর।"

"কাম্ সাফ হোগিয়া, সার?"

মেথরটা হাতের ছুরী নামিয়ে রাখে।

নির্ব্বাক ডাক্তার উদ্‌ভ্রান্ত চোখে এক বার তার মুখের পানে চেয়ে, হাতের রুমালে চোখ দু'টো মুছে নেন।


পূজার প্রীতি-অভিনন্দন
ব্রুক বণ্ড চা
প্রস্তুতকারীদের পক্ষ থেকে
BB 142



অভিজাত

নীলিমা সেন

ব্রেকফাষ্ট খাচ্ছিল জনসন সাহেব। সুন্দর ঝলমলে সকাল। অকস্মাৎ সামনের বাড়ীর মেমসাহেবের খাপসুরৎ আয়া একটা চাবুক এনে এলোপাথাড়ি মারতে সুরু করলো ওকে। সেই আয়া—সুন্দরী, রূপসী—রূপকথার রাজকন্যার মতো মিষ্টি। যাকে ঐ লম্বামুখো জনসন সাহেব এক চড়ে কাঁদিয়েছিলো এক দিন। অবশ্য ডেকেছিলো ও মেয়েটাকে—কিন্তু সে তো এরকম রণরঙ্গিণী মূর্তিতে নয়?

সাড়া পড়ে গেলো চতুর্দিকে। আস্পর্ধা! একটা নগণ্য আয়া কি না চাবকাচ্ছে এত বড় গভর্ণমেন্ট অফিসারকে। মার খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে গেলো সাহেবের মুখ। পাড়ার লোকে পুলিশের কাছে সঁপে দিলো মেয়েটাকে। ধরিয়ে দেবার সময় সাহেব বললো—'তোর যা খুসী বলিস পুলিশকে—পুলিশ আমার কিছু করতে পারবে না।"

মার খাওয়ার কারণ জানে জনসন সাহেব। চাবুকের আড়ালে আছে একটি কাহিনী, উনি ছাড়া আর এক জন জানে—সে ঐ সামনের বাড়ীর মেমসাহেবের মিষ্টি আয়া।

পুলিশের সঙ্গে যেতে যেতে মেয়েটা বললো—"সরম নেই? ঐ মার খাওয়া মুখ নিয়ে লোকের সামনে বেরোতে সরম লাগে না? জোয়ান মরদ আওরতের হাতে মার খেয়ে পুলিশ ডাকতে গেলো?—হি হি করে হাসলো ও—লাল ঠোঁটের ফাঁকে মুক্তোর মতো দাঁত।

রুক্মিণীর রূপ আছে। পাঁচটা লোক দেখলে বলবে হ্যাঁ, রূপসী বটে। টকটকে রং, সকালের রোদের মতো সোনালী আর পরিচ্ছন্ন; একপিঠ চুল—অরণ্যের মতো। আর শরীরটি যেন বর্ষার বন্যা। চোখের মণিদুটো—স্বচ্ছ কালো পাথর। এত রূপ সত্বেও পড়শীরা আড়ালে বদনাম দেয়—বলে, শয়তানীর পেটে পেটে কেবলই মতলব!

অনেক ফুলের গন্ধ শুঁকে বেড়ানোই নাকি ওর বিলাস। বিয়ে হয়েছে সম্প্রতি। সে স্বামী নাকি ওর ঘরের। আর বাইরের পাঁচটা বন্ধু-বান্ধব না রাখলে কি মজা পাওয়া যায়?

অকারণে হাসে দাঁত বার করে—রাঙা ঠোঁট কামড়ে মোটা ননদিনীকে কলা দেখিয়ে একপাক ঘুরে নেয়, বলে—"তোর রূপ থাকলে তোকেও ডাকতো সকলে।"

না হয় রূপই নেই লছমীর—না হয় রুক্মিণীর মতো হাতের একটা ইশারায় পারে না দুনিয়াকে বশ করতে—তাই বলে কি এমন করেই হেনস্তা করতে হয়? ভাইয়ের বিয়েতে কত সাধ-আহ্লাদ করে বৌ এনেছে। রূপ দেখে সবাই বলেছে—পছন্দ আছে লছমীর; যেমন রাজপুত্তুরের মতো ভাই—তেমনি ডালিম-দানার মতো বৌ এনেছে। জিনিষই বা কিছু কি কম দিয়েছে? নিজের যা কিছু ছিলো—মোটা হাঁসুলী, গোছাখানেক মল, হাতের কঙ্কণ—সবই তো দিয়েছে। তা'ছাড়া মায়ের আমলের পুরোনো ফুলকাটা বেনারসী শাড়ী—রেশমী ঘাগরা। তবু সাধ মেটেনি! নিজে পছন্দ করে চাঁদনী চক থেকে এনেছে রঙিন্ সাটিন প্লাষ্টিকের জুতো। মেমসাহেবের বাড়ীর আয়া যে বৌ, তাকে তো আর খালি পায়ে রাখা যায় না! পাউডার, স্নো, ক্রীম, এগুলোরও কোনো ত্রুটি রাখেনি লছমী।

এই ত্রিশ বছর বয়সের সমস্ত সঞ্চিত অর্থ সে সব ঢেলেছে ভাইয়ের বিয়েতে! পড়শীদের খাইয়েছে অনেক পুরী আর লাড্ডু। খরচা কি কম? তবু সুখ পেয়েছে। বৌ এসেছে ঘর-আলো-করা, বিজলী বাতিকে হার মানায়। আর হবে নাই বা কেন? মেমসাহেবের বাড়ীর ঘষা-মাজা ফিটফাট আয়া সে। কেতাদুরস্ত। অভ্যর্থনা করতে জানে পাঁচটা ভদ্রলোককে। দু'-চারটে ইংরিজিও বলতে পারে সময়ে-অসময়ে। জানে আদব-কায়দা। বইও দু'-চারখানা পড়ে ফেলেছে এই বয়সে। লছমীকে তুলসীদাসের দোঁহা শোনার জন্যে আর ভগবান পাণ্ডের দ্বারস্থ হতে হয় না।

কিন্তু কেমন যেন জ্বলে মরে লছমী। কত আদরের বৌ। সে কি না দিবা-রাত্র উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে রঙীন পাখীর মতো! সকলকেই তো পরিশ্রম করে খেতে হয়; কার বাপের পাঁচটা জমিদারী আছে? খেটে-খুটে রোজগার করা পয়সার ওপর একটু মায়া-মমতা থাকবে তো? সবই কি কড়াই ভাজার মতো এক নিশ্বাসে উড়িয়ে দিতে হয় ঘাগরা আর চোলি কিনে? ভাই একাই বা কত পেরে ওঠে। সংসারের খরচ কুরে ক'টা টাকাই বা ওঠে বাজার? এমন অবস্থায় কি না হরদম মোতির মালা আর সখের জিনিষ? মানুষের আপদ-বিপদ আছে, রোগ-শোক আছে—ভাবতে হবে সে-সব কথা। সব ভাবনা কি কেবল লছমীর জন্যেই?

মুখে ফুলের মতো হাসি—কিন্তু মনে জিলিপীর প্যাঁচ। অভিযোগের অন্ত নেই। পড়শীর কাছে মনের দুঃখে বলে—

"সংসারের কুটোটি নাড়ে না। কেবল বিবি সেজে সায়েবদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলে। আহা! কি মেমসায়েবী ঢং যে জানে আজকালকার মেয়েরা!—ভাইটাও যেন ভেড়া বনে গেছে—বউ যে ওদিকে চুর্ণি উড়িয়ে চোলি দেখিয়ে, ছোকরা অফিসারদের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করছে—সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই।"

অভিযোগ আর কত করা যায়! মনের মধ্যে গুমরে ওঠে বেদনা। ঈর্ষা মাথা নাড়ে; রূপ থাকলে আজ লছমীও তার শূন্য জীবন রঙে-রসে ভরাতে পারতো। তিন বছর হলো বিধবা হয়েছে লছমী। আর বিয়ে হয়নি—ভালো ঘরে এতো বড়ো মেয়ে নিতে চাইছে না। বিয়ের কথা ছেড়েই দিয়েছে লছমী। কিন্তু চেহারার জৌলুস থাকলে অনেক কিছুই পারতো আজ। মনে যখন বসন্ত আসে, তখন কি পারতো না ছোকরাগুলোর দিকে হাসিমুখে চাইতে? স্বামীর কথা ভুলেই গেছে। —'বেটা শয়তান।' মনে মনে গাল দেয়। যেন শুধু মারবার জন্যেই বিয়ে করেছিল। দিন রাত মদে চুর হয়ে থাকতো। স্বামী কি জিনিষ বুঝতেই পারে নি। আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে ও।' রঙীন ঘাগরা পরে দু'চারটে গানের কলি গাইতে গাইতে হঠাৎ মনে পড়ে যায়—ও বিধবা। মনটা যেন বিধবা হয়নি।

রুক্মিণীর মতো বাইরে ঘুরতে ইচ্ছে করে। হিংসে হিলহিল করে শরীরের মধ্যে, ফর্সা লম্বামুখো সায়েবটা যখন অকারণেই খানিকটা কথা বলে যায় রুক্মিণীর সঙ্গে। যখন ওর বয়স ছিলো তখন তো কই এমন সব মজা পায় নি লছমী? দুনিয়াটাই কি একা রুক্মিণীর? রূপ, রস, গন্ধ সব?

পৃথিবীটাকে হাতের মুঠোয় রাখতে কষ্ট নেই কিছু—রুক্মিণী তাই বলে। সারা দিন মেমসাহেবের বেবী দেখে। স্নান করায়, পোষাক পরায়, প্যারাম্বুলেটারে বসিয়ে ঘুরে বেড়ায় অফিসারস্ কোয়ার্টার্সের সামনের সবুজ মসৃণ লনের ওপর। দুপুরে সায়েবদের লাঞ্চ হয়ে গেলে বাবুর্চির কাছ থেকে এটা-সেটা ভালো জিনিষ ব্যাগে ভরে নেয়, তার পর বেবীকে টা-টা বলে বাড়ী যায়। আবার বিকেলে এগোয় নিজের কাজে। বৈকালিক প্রসাধনটা একটু জমকালো রকমেরই করে। ঠোঁটে হালকা লিপষ্টিক দিতে ভোলে না—পরিচ্ছন্ন ঘাগরা চুমকীর কাজ করা—পিঠকাটা চোলি আর ফুরফুরে ওড়না আলগোছে ফেলে রাখে কাঁধের ওপর—বেণীতে লাগায় রূপোর ফুল—পায়ে মেমসাহেবের দেওয়া পুরোনো জুতো।

কুলোর ওপর বাজরা নিয়ে বসে থাকে লছমী। চোখের পলক পড়ে না। অস্বীকার করবে কি করে? সাজলে মানায় রুক্মিণীকে। ঘরের মধ্যে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গলায় মোতির হার পরতে পরতে রুক্মিণী আড়-চোখে চায় ওর দিকে। বিরক্তিকর চাউনি কেমন! সহ্য হয় না লছমীর। যেন কৃপা করছে। কুলোটা নামিয়ে রেখে বলে—"আরে কেয়া রে!"

কি বিব্রত, কি অসহ্য অবস্থা! হো-হো করে হেসে ওঠে রুক্মিণী। গান গেয়ে ওঠে—"ছোড় গেয়া বালাম।"

'আঃ চুপ রে'। চেঁচিয়ে উঠলো লছমী। বিশ্রী লাগে। ছোট্ট প্লাষ্টিকের ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে রুক্মিণী বললো—'বা বা ব্ল্যাকশিপ'—তার পর ছুটে রুক্মিনী বাড়ী থেকে বেরিয়ে যায়।

চোখে জল আসে। কি সুখেরই জীবন! বাজরা বেছে, গেঁহু পিষে, আর চাপাটি বানিয়েই জীবন গেল। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে—জল ভরা, চা বানানো—গাই দেখা, ঘাস কাটা, দুধ দোহা; দুপুরে খানা বানানো—সবই ওর হাতে। অবশ্য রুক্মিণীও সাহায্য করে সময় মতো। তবু সবই তো লছমীর। এর চেয়ে পরের বাড়ী কাজ করা ভালো। একটা চাকরীও ছাই যদি পাওয়া যায়। বিধবা হয়েছে বলে হীরালালের সহানুভূতি একটু বেশী ওর ওপর। বলে তুই ঘরে থাক—আমরা কাজ করবো। রোজগারও করে মোটা রকম।

সায়েবদের আপিসের পিওন হীরালাল। হিন্দী জানে, উর্দ্দু জানে, ইংরেজীও জানে। তার বৌ তো হাল আমলের ফ্যাশন-দুরস্ত হবেই। হিংসে করে কি হবে! কাজ করে পয়সা আনে, খরচা তো করবেই। যুক্তি দিয়ে বিচার করে লছমী। বাপের ভিটের মাটির বাড়ী ভেঙ্গে পাকা-কোঠা তুলেছে হীরালাল—ভাড়াটে বসিয়েছে দু'-পাঁচ ঘর। এ ছাড়া ক্ষেত-খামার। ঘরে বিজলী বাতিও আছে। ওদের সমাজে অভিজাত বলে নাম আছে হীরালালের।

এত বড় সম্পত্তি, খাবার লোক কই? কি হবে পরের বাড়ী কাম করে? এই একলার জীবন লছমীর, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যাবে। হীরালালের সংসার গুছিয়ে দিতে দিতে সময় পালিয়ে যাবে ফুরুৎ করে। কিন্তু রুক্মিণীর মতো উড়ন্ত হতে ইচ্ছে করে! এই রকম মোটা হয়ে স্থুল হয়ে ঘরের কোণে বেঁচে থাকা নয়! আনন্দ করে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে বেঁচে থাকা।

রুক্মিণীর দেওয়া পেষ্ট্রিটা মুখে একটু করে ভেঙ্গে দিতে দিতে লছমী বলেই ফেলে—"বেশ আছিস্ তুই—ভালো ভালো জিনিষ ঘরে আনতে পারিস্। আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দে বৌ—একা-একা এরকম আর ভালো লাগে না।"

সশব্দে হাসে রুক্মিণী—"কাজ তুই করবি কি করে—তোর সাজতেই তো এক ঘণ্টা।"—একটু থেকে আবার বলে—"ঘরের কাজ তাহলে করবে কে বল—? গাই দেখা, ক্ষেতের তদারক?"

"হয়ে যাবে কোনরকমে"—মিনতি করে লছমী। পাশের বাড়ীর মুনকির মাএর কাছে শুনেছে যে, সেই লম্বামুখো সাহেবের বাড়ী কাজ খালি আছে। তার মেমসাহেব বাপের বাড়ী গেছে বিলেতে, এখন ঘর দেখার লোক দরকার।

—"ভালো ঘরের মেয়েরা যেখানে-সেখানে কাজ করে না রে—আমি নেহাৎ অনেক দিন আছি ওখানে, মায়া পড়ে গেছে—নয়তো কবে ছেড়ে দিতাম।"—রুক্মিণী ভাবলো একটু—আহা বিধবা! বলে—"এখন আমার জানা কোনো কাজ নেই। দেখব তোর জন্যে। চল্ খানা বানাই।"—এগিয়ে গেলো ও রান্নাঘরের দিকে।

হাল ছাড়ে না লছমী। আটা পাকাতে থাকে। লক্ষ্য করে রুক্মিণীর মুখের দিকে। নাঃ বেশ খুশীই তো। ম্রিয়মাণ হতে দেখা যায় না ঐ মুখটাকে কখনও। অভিজাত পরিবারের বৌ এমনিই হতে হয়। ভাবে লছমী।

এক সময় বলে ফেলে—"তোর মেমসায়েবের বাড়ীর সামনের কোয়ার্টারে কাজ খালি আছে—সেটাই জোগাড় করে দে না হয়।"

—"কি বললি? না—না—ও বাড়ীতে তোকে দিতে পারবো না। একেই সে বদ্‌মাস, তার ওপর বাড়ীতে কোনো মেয়ে নেই।" রুক্মিণী দৃঢ়স্বরে জবাব দিলো। জনসন সায়েবকে রুক্মিণী ভালোই চেনে। ওর কাছে যায় নি বলে এক চড় মেরেছিল একদিন। প্রতিশোধ একদিন নেবে রুক্মিণী। লছমীর ওপর আন্তরিকতা আছে বলেই এতো আপত্তি। রুক্মিণীর নামে বদ্‌নাম দেয় সকলেই; কিন্তু ও নিজে জানে কতখানি সচেতন নিজের সম্মান সম্বন্ধে। বড়ঘরের মেয়ে এবং বৌ, তাকে নিজের সম্মান নিজেকেই রক্ষা করে চলতে হয়। চোখে সুর্মা দিয়ে অনেক ছোক্‌রাকেই ঘায়েল করতে পারে—কিন্তু রুক্মিণীর অহংকার অনেক উঁচু। লছমীর মতো দুর্বল মেয়েকে কিছুতেই পরের বাড়ী চাকরী করতে দেওয়া যায় না।

কথাটা চাপা পড়ে গেলো। মনঃক্ষুণ্ণ হলো লছমী। ছলছলে চোখে চাপাটি পাকাতে লাগলো। ভাবলো, কি শয়তানী আর কত বড় হিংসুটে বৌটা—খরচপত্তর করে একটা অশান্তিই এনে জুটিয়েছে লছমী। লছমী না থাকলে ও পেতো নাকি হীরালালকে? কোনো কৃতজ্ঞতাই জানে না—ছিঃ। গজরাতে থাকে মনের মধ্যে।

কিন্তু রুক্মিণী আটকালেই বা কি। চাকরী পেলো লছমী। হাসি-হাসি মুখে মুনকির মাকে বললো—"ও না দিলো তো বয়েই গেলো। রূপ আছে বলে এতো সর্দারী বরদাস্ত হয় না।"

মুনকির মা পাল্টা হাসি দিয়ে প্রশংসা করলো—"তাহলে খাওয়াবি তো ভালো-মন্দ সাহেবীখানা"—

—"হ্যাঁ, সে আর বলতে"—উথলে-ওঠা দুধের মতো তরঙ্গ তোলে লছমী ওর মোটা শরীরে।

প্রথমে গম্ভীর হলো রুক্মিণী। হীরালালও যেন ক্ষুব্ধ। দু'দিন বাদে দেখে শুনে না হয় আর একটা বিয়েই দিয়ে দিতো—কি দরকার ছিল আয়াগিরি করার? উড়িয়ে দিলো রুক্মিণী—"যদি ও আমোদ পায়, চাকরী করে করুক না। দু'দিন বাদে ছেড়ে দেবে সখ মিটে গেলে—কখনও তো করে নি!" থেমে যায় হীরালাল।

অনেক সাজগোজ আর ফ্যাশন করতে সুরু করলো লছমী। আর শিখলো বিলিতী সায়েবদের মতো ড্রিঙ্ক করতে। ভোর না হতে চলে যায়—কখন ফেরে না ফেরে ঠিক নেই। একটা অল্পবয়েসী সায়েব যে ওকে আদর করে ঘরে ডেকেছে—তাতেই ধন্য ও। অনেক রাতে ফেরে, ওড়নার তলায় হুইস্কির বোতল নিয়ে। নেশা ধরে গেছে। অদ্ভুত নেশা! দেহে-মনে আগুন লাগানোর নেশা। ত্রিশ বছর বয়স উদ্দাম হয়ে উঠেছে সৌভাগ্যের ভারে।

ভোর থেকে উঠে সংসারের কাজ সেরে রুক্মিণী চাকরী করতে যায়। রাত্রে ফিরেও অনেক কাজ। মেজাজ খারাপ লাগে মাঝে মাঝে—লছমীর সাহায্য পেলে ভালো লাগে। ফিরতে রাত হয় লছমীর। বিরক্তি সত্বেও হাসিমুখে অভ্যর্থনা করে লছমীকে। মিটি-মিটি চোখে ওর দিকে তাকিয়ে ভাবে—হ্যাংলা।

হাসি ওর মিলিয়ে গেলো যেদিন দেখলো, লছমী ঘরে গিয়ে হুইস্কির বোতল খুলছে।

—"কি রে, সাহেবের ক্যাবিনেট থেকে চুরি করেছিস নাকি ?"—শুধোয় ও।

ক্যাবিনেট জিনিষটা কি জানে না লছমী।

—"সায়েব দিয়েছে।" আচ্ছন্ন হয়ে জবাব দিলো লছমী।

"একটা দামী বোতল তোকে দিয়েছে—বললেই হলো ?" ধমকে উঠলো রুক্মিণী। এসবের মূল্য এবং পরিচয় সব জানে রুক্মিণী। অনেক দিন মেমসায়েবের কাছে থেকে সব নখদর্পণে এসে গেছে।

—"যা বেরো"—লছমী বলে—কাচের গ্লাসে ঢালতে থাকে রঙীন জিনিষটা।

—"কি করছিস তুই—সবটা খাবি নাকি ? অন্ততঃ জল দে খানিকটা ওতে।" রুক্মিণীর বুকের মধ্যে ঢিপ-ঢিপ করে। ও জানে মাতাল হওয়া কাকে বলে।

—"যা যা শেখাস্ নি আমাকে"—অপ্রকৃতিস্থ লছমী। চুপ মেরে গেলো রুক্মিণী। ওদের পরিবারে এরকম একটা ব্যাপার যেন জানাজানি না হয়। নীচে নেমে যাচ্ছে লছমী। ওড়না উড়িয়ে কটাক্ষ বিলোনো নয় ; এ যেন তলিয়ে যাওয়া ! একেই বলে অধঃপতন। ভাবলো রুক্মিণী। নিজেকে দায়ী মনে হতে লাগলো। একটা বোকা মেয়েকে রক্ষা করাই ওর কর্ত্তব্য ছিলো।

—"তোর এতো দেরী হয় কেন বাড়ী ফিরতে ? কি এত কাজ করিস ? বল তুই ?"—প্রশ্ন করে রুক্মিণী।

—"অনেক কাজ—বাসন ধুই—বাজার করি—চেয়ার টেবিল ঝাড়ি, বাবুর্চিকে সাহায্য করি—এই সব"—বিব্রত হয়ে বলে লছমী।

—"তাই এতো দেরী—আর সে সবের জন্যে বুঝি সায়েব তোকে বোতল বোতল মদ খাওয়ায় ?" দুষ্টুমী হাসিতে বলে রুক্মিণী। —"তুই কাল থেকে আর ও বাড়ীতে যাবি না—বুঝলি ? তুই ঠিক থাকছিস না"—স্পষ্টই বলে ও পুনর্ব্বার।

—"কি ! কি বললি ! যাবো—একশো বার যাবো"—রাগে ফেটে পড়ে লছমী।—"হিংসুটে কোথাকার ! আমি দু'পয়সা রোজগার করছি তা তোর সহ্য হয় না ?"

—"আমার বলার তাই বললাম। পয়সার দরকার হলে হীরালালের কাছে চেয়ে নিবি। ঐ বদমাস সায়েবটার কাছ থেকে নাই বা নিলি ?"—শান্ত স্বরে বললো রুক্মিণী।

ভেসে যাচ্ছে লছমী। মদ কি আর ওদের জাতে খায় না কেউ ? খায়। কিন্তু তারা সব কুলি-মজুরদের মেয়ে বৌ-রা। ভদ্দরলোকের মেয়েরা মদ খেয়ে মাতাল হয় না। দোষ ঐ সাহেবটার। চড় হজম করেনি রুক্মিণী। আপেলের মতো সুন্দর গাল লাল হয়ে জ্বলে উঠেছিল।

ভাবভঙ্গী বিলকুল বদলে গিয়েছে লছমীর। নিজেকে হারিয়ে ফেলা ভাব যেন। চুপি চুপি এক দিন রুক্মিণীকে বললো—"শোন সাহেব আমাকে বিয়ে করবে বলেছে। বিলেত নিয়ে যাবে।" ওড়নার তলা থেকে একটা বোতল বার করে বলে, "খুশী হয়ে নিজেই দিয়েছে এটা—বাড়ী ফিরে খেতে বলেছে।"

—"বিয়ে করবি ? সাহেব না সাহেবের বাবুর্চিকে ? কি বলছিস তুই ? নাকি তুই-ই সায়েবকে বিয়ে করতে চেয়েছিস ?"—বিস্ময়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেলো রুক্মিণী।

—অবশ্য আমি চেয়েছি।

—কেন, কেন—তোর সরম নেই ? বদমাস বিলিতি কুকুরটাকে, তুই ভদ্দর পরিবারের মেয়ে হয়ে বিয়ে করতে চাইলি ? সরম নেই !—সপ্তমে চেঁচিয়ে উঠলো রুক্মিণী। রান্নাঘরের উনুনের আঁচে রক্তিম হয়ে উঠেছে ওর মুখটা। সেদিকে এক বার তাকিয়ে লছমীর কি রকম অসহায় লাগে। কত ক্ষুদ্র, কত তুচ্ছ আর সস্তা মনে হয় নিজেকে। দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে বললো—"বিয়ে না করলে চলবে না রে"—

দপ করে নিবে গেলো রুক্মিণী। আর চেঁচানো যায় না। শেষ হয়ে গেছে সব বলার অবসর। গলা বন্ধ হয়ে যায় ভয়ে—এর পর মুখ দেখাবে কি করে লোকের কাছে ?

—"কি করলি তুই রে লছমী ? মুখে চুণ-কালি মাখালি ?" চুপ করে থাকে দু'জনে অনেকক্ষণ। লছমীর অবস্থাটা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করে। বিজলী-বাতিওয়ালা কোঠা ওদের ; সমাজে ওরা এ্যারিষ্টোক্র্যাট ! সব নষ্ট হলো—মান, প্রতিপত্তি।

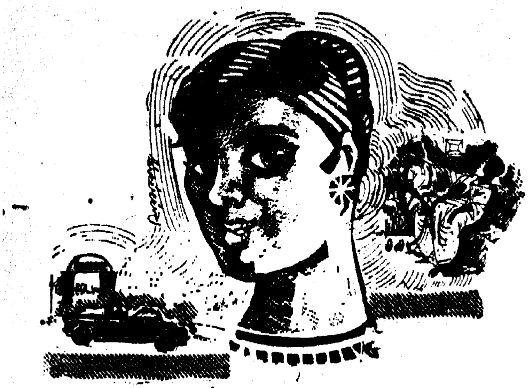
—"যা ঘরে যা এখন। সাহেব যদি তোকে সত্যি বিয়ে করে তাহলে আমি নিজে তোর বিয়ে দেবো দেখিস।" হাসলো রুক্মিণী। ওর চেয়ে বয়সে বড় মেয়েটিকে কত ছোটো লাগে। রুক্মিণী ছাড়া কে-ই বা আছে ওকে দেখার ?

পরদিন ভোরবেলা চা বানিয়ে ডাকতে গেলো লছমীকে। দরজাটা আলগা করেই বন্ধ ; ঢুকে পড়লো রুক্মিণী। খানিকক্ষণ স্থির চোখে চেয়ে রইলো। মোটা পাওয়ারের আলোটা দিনের বেলাতেও জ্বলছে। খাটিয়ার ওপর লছমী শুয়ে আছে আরামের ভঙ্গীতে। মুখের ওপর মাছি বসছে ভ্রুক্ষেপ নেই। মাটিতে হুইস্কির বোতল আর কাচের গ্লাস টুকরো হয়ে গড়াচ্ছে। নিশ্বাস দ্রুত চলতে লাগলো রুক্মিণীর। এক বার ঠেলা দিলো লছমীকে—জাগলো না। গায়ে হাত দিলো—ঠাণ্ডা হিম।

—বাঃ বাঃ সায়েব—চালাক বেশ। বেশ বিয়ে করেছ। একেবারে জন্মের মতো বিলেত পাঠিয়েছ। মনে মনে উচ্চারণ করে রুক্মিণী। দু'জনকে একসঙ্গে কাবার। হুঁ ! হুইস্কির সঙ্গে কি মিশিয়ে দিয়েছ আদর করে—এঁ্যা। দাঁড়াও মজা টের পাওয়াচ্ছি। আমাদের ভদ্দর ঘরে কি কালিটাই মাখালে ! তোমার ও লাল মুখ আমি নীল করে ছেড়ে দেবো—দাঁড়াও। শরীরের মধ্যে ওর রক্তকণিকাগুলো উত্তাল হয়ে উঠেছে—রাগে, শোকে, উত্তেজনায় !—"হীরালাল—ও হীরালাল—কোথায় আছ এসো শীগ্গির—মরেছে লছমী মরেছে"—চীৎকার করে উঠলো রুক্মিণী—সমস্ত শক্তি দিয়ে, গলার শির ফুলিয়ে, আকাশ কাঁপিয়ে। ওর চীৎকারে নিমেষের মধ্যে তৈরী হলো একটি জনতা, লছমীর খাটিয়া ঘিরে। কান্নাকাটি—হৈ-চৈ।...

শোবার ঘরের দেওয়ালে হীরালালের চাবুকটা ঝোলান ছিল। সেটা এক ঝটকায় টেনে নিলো রুক্মিণী। চেঁচাক ওরা যত পারে। ও কিন্তু চেঁচাবে না—এ কাহিনীর শেষ ওকে করতেই হবে—ছেড়ে দেবে না কিছুতেই। বিদ্যুতের মতো ছিটকে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো বাজারমুখো জনসন সায়েবের কোয়ার্টারের দিকে।

পদ্মার ডাক



শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য্য

দিল্লীর এত বড় একটা কলেজ চালালে কি হবে? কমল সেন ভদ্রলোকটি একেবারে কাছা-ছাড়া। বাজারে ছাট কিনতে গিয়ে খান পাঁচেক শাড়ী এনে হাজির। তার কোনোখানা ছেঁড়া, কোনোখানা রঙ কাঁচা, কোনোখানা এতই সূক্ষ্ম, যা ব্যবহার করতে ভদ্রমণীর সরমে বাজে।

শুধু তাই নয়। তার আবার তারিফ করতে হবে।

গৃহিণী রমার কাজ বাড়ে। দোকানে গিয়ে সেগুলো ফেরত দিয়ে আসতে হয়। অন্তত চক্ষুলজ্জার খাতিরেও একখানা শাড়ী কিনতে হয়। মাসের শেষে যত বাজে খরচ।

এই তো সেদিন কোথেকে খবর পেয়ে কমল ছুটলেন গোল মার্কেটে ইলিশ মাছ কিনতে। বেলা দেড়টার সময় তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল কলেজ-কম্পাউণ্ডে। অধ্যাপক কমল সেন নতুন কলেজ বিল্ডিং-এর তদারক করছেন।

তবুও তাঁর তারিফ করতে হবে!

সেদিন সকালের দিকে রমা একটু ব্যস্ত ছিল। মেয়ে শীলার মর্নিং কলেজ। জামা-জুতো পরে কমল সেন গাড়ীতে উঠে বসলেন। গাড়ীর আওয়াজ শুনে রমা ছুটে যায়।

লোকটার কাণ্ড দেখো তো! 'আরে যাচ্ছো কোথায়? এদিকে টেবিলে ব্রেকফাষ্ট সাজানো।'

আকাশ থেকে পড়েন কমল সেন। 'বল কি? এই ত খেলাম, আবার কেন?'

রমার তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয়—খাওয়াটা আজ সকালে হয়নি। হয়েছে গত কাল রাতে। উপায়ান্তর না দেখে আবার টেবিলে বসতে হয়। বয়স হলে কি হবে? কমল একটি পক্বিণত-বয়স্ক শিশু।

রমার হাতে না পড়লে ওঁর জীবনটা যে কি হত, সেটা শ্রীমতী অন্তত হাজার বার তাঁকে শুনিয়েছে। আজ-কাল শোনাতে লজ্জা করে। শীলা বড় হয়েছে।

কথাটা কিন্তু নেহাৎ মিথ্যে নয়। এ-হেন শিশু-শিক্ষক, কেমন করে যে রমার ছায়াঘন স্নিগ্ধ আড়ালটুকু ছাড়া তাঁর ছন্নছাড়া জীবনটা চালাত, সে বিষয়ে ভাবতে বসলে এখনও কমল সেনের সর্বশরীর কাঁটা দিয়ে ওঠে। তিনি আর ভাবতে পারেন না—তার থেকে শ'এর ড্রামা সেকস্‌পীয়ারের টাইল পড়ানো ঢের সহজ। চিন্তার বোঝা সংসারের সব কাজের ভারের মতন রমার ঘাড়ে চাপিয়ে কমল নিশ্চিন্ত চিত্তে বই-এর ক্ষুদ্র অক্ষরগুলোর ওপর মন দেন।

তাঁর নিজের ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ উল্টো।

তাঁর মতে এ ভূমণ্ডলে তাঁর মতন নিখুঁত সংসারী মেলা দায়। তাঁর প্রতিটি ভুল কাজের তারিফ না হলে শিশুর মতন মুখখানা বেজার করে তিনি তাঁর অতি প্রিয় চেয়ারখানায় শুয়ে পড়েন। রমা, শীলা সকলে গিয়ে তার পর হাজার বার করে গিয়ে তাঁর ভুল কাজের তারিফ করে। তাদের গিয়ে মন ভুলিয়ে খুশী করতে হয়। এ ব্যাপার আজকের নয়। চন্দ্র-সূর্যের মতনই পুরোনো। দিল্লীর সুধী-মহলে এ খবর কে না জানেন?

আজকের ব্যাপারখানায় তাজ্জব না মেনে থাকার উপায় নেই। আজ অধ্যাপক সেন এমন একখানা আশ্চর্য তাক-লাগানো কাণ্ড করে ফেলেছেন, যা করতে গিয়ে দিল্লীর বাঘা-বাঘা সংসারীরাও মাথা হেঁট করেন। এ বেজায় গরমেও অধ্যাপক একটি চাকর জোগাড় করেছেন। তারিফ না করে উপায় নেই।

দিল্লী রাজা-বাদশার দেশ। সেখানে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে চাকর সেখানে জোটে না। গরমে মারা যাবার ভয়ে পৈত্রিক প্রাণখানা পকেটে পুরে তারা পাহাড়ে পালায়। চাকরটা যাবার পর থেকে ক'দিন ধরে রমার সত্যিই ভারী কষ্ট হচ্ছিল। অনেকেই চাকরের কথা বলেছেন। অধ্যাপক সেনও কেমন করে যেন সে খবরখানা সংগ্রহ করে ফেলেছেন। এ-সব খবর সাধারণত: তিনি রাখেন না। এটা হোমের ডিপার্টমেণ্ট। রমাই সেখানে সর্বময়ী কর্ত্রী।

আজকের ব্যাপার যেন অবিশ্বাস্য!

অধ্যাপক কোথেকে চাকর আনলেন?

ব্যাপারখানা এতই আশ্চর্যজনক যে সহজে কেউ বিশ্বাস করতেই চাইছিলেন না। কিন্তু বিশ্বাস না করে উপায় নেই। ঐ যে একটি জলজ্যান্ত আস্ত মানুষ সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই নতুন চাকর!

অতি-পরিচিত আত্মজনকে দূর থেকে টেনে এনেছেন, এমনি সুরে অধ্যাপক আহ্লাদে আটখানা হয়ে গেট থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আরে দেখো দেখো, কা'কে নিয়ে এসেছি?'

রমা এসে অবাক ভাবে বুড়োর দিকে তাকায়। দাড়ি-গোঁফে মুখখানা একটা ছোটোখাটো সুন্দরবন-এর স্যাম্পেল! মাথায় কাঁচা-পাকা চুলের অসংলগ্ন ঘন বনানী।

চুপি চুপি রমা স্বামীর কানে কানে গিয়ে বললে, 'চিনতে পারলাম না ত'।

'আরে চিনবে কি? এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কে কা'কে চিনতে পেরেছে? বলি, এই পঁচিশ বছর ধরে রোজ দিবা-যামিনী দেখে তুমি আমাকেও কি চিনতে পেরেছো?'

মহান্ দার্শনিক প্রশ্ন ছেড়ে অধ্যাপক বলেন, 'ডাকো ডাকো শীলাকে ডাকো। সুন্দরীকে ডাকো। আমি ছাড়া এ সব কাজ কখনও চলে? ডাকো ডাকো।'

সুন্দরী ঘরের রাঁধুনী। বহু দিন ধরে আছে। বাড়ীর মেয়ের মতনই হয়ে গেছে।

শীলা আসে। সুন্দরী আসে।

অধ্যাপক সেন বল্লেন, 'বল দেখি, কে ?'

বৃদ্ধের চোখ দুটো যেন কেমন কেমন। শীলা মার চোখের দিকে তাকায়, সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে। সুন্দরী কোনো কালে মুখরা ছিল। বুদ্ধিমতী মেয়ে। অদৃষ্টের দোষে অপরের সেবায় আজ অন্ন সংস্থান করছে।

মুখে আঁচলের খুট দিয়ে খিল-খিল করে হাসতে হাসতে দোলায়মান লতার মতন হেলতে-দুলতে বাড়ীর ভিতর ছুটে গেল সুন্দরী। যাবার সময়ে শুধু বলে গেল, 'যত কাণ্ড! কোত্থেকে একটা চাকর ধরে এনে তাকে নিয়েও তামাসা। কোন্ চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়েছে দে[illegible] ত ?'

সুন্দরী ঠিকই ধরেছে। লোকটি নতুন চাকর। তাকে কাজে বহাল করা হয়েছে। সবাই অবাক ভাবে অধ্যাপকের দিকে তাকালো। সবার মনে শুধু একই প্রশ্ন—অধ্যাপক লোকটাকে কোত্থেকে ধরে আনলেন ? চোর-ডাকাত নয় তো আবার ?

ইণ্টারভিউ নিতে অধ্যাপক চিরদিনই এক্সপার্ট।

নতুন চাকরের নাম বিপিন।

অধ্যাপক বললেন, 'আমার কাজ সব সিষ্টেম মেনে চলে। নাম্বার ওয়ান কথা হল, আপনার চাকরী হয়ে গেছে। নাম্বার টু, এবার আপনি বলতে পারেন আপনি কি কি কাজ জানেন। এদের একটু শুনিয়ে দিন ত'।

শীলা ত' হেসেই খুন !

চাকরকে আপনি ? এখন কাজটাও তার হয়ে করে দিতে হবে না ত ?

বিপিন নিশ্চুপ।

রমা জিজ্ঞাসা করলে, 'বাসন মাজতে পারো বাবা ?'

বিপিন বিনীত ভাবে জানালো, সে পারে না।

'বাজার করতে ?'

বিপিন জানালো, সে জানে না।

—'গাড়ী চালাতে ?'

বিপিন বলে, 'আজ্ঞে না।'

অধ্যাপক বলে উঠলেন, 'ও গাড়ী চালাবে কেন ? ও করবে গিয়ে ঘরের কাজ। কি-বলো হে ? চুপ করে কেন ? বলি ক'দিন খাও নি ?'

রমা বললে, 'ঘর-দোর পরিষ্কার করতে জানো ?'

ফিক করে গোঁফের ফাঁক দিয়ে হেসে বৃদ্ধ জানাল, সে জানে।

শীলা মেয়েটা দুষ্টু। টিপ্পনি কাটার সুযোগ ছাড়ে না। 'ছবি টবি সাফ করতে জানো—না ভেঙ্গে ?'

বিপিন সে প্রশ্নের কোনো জবাব দেয় না।

বিপিনের কাজ হয়ে গেল। তাকে রাখতেই হবে। পণ্ডিত স্বামী চাকর খুঁজে এনেছেন। রমা তাকে তাড়াবে কি করে ? তা'ছাড়া সে পথ কোথায় ? ঐ ত সামনেই রয়েছে ইজিচেয়ার।

শীলা বলে, 'লোকটার কিন্তু যাই বল মা, ভাগ্য ভাল। কেমন লোকটির কাছে এসে জুটেছে।'

বিপিনের মাইনে নির্ধারিত হল মাসিক সাত টাকা। চেয়ার টেবিল পরিষ্কারের কাজে এর বেশী আর কত হবে ?

দুই

তিন দিনে যদি কেউ সাতটা কাপ, পাঁচটা ডিশ, দুটো কেটলী ভাঙ্গে, তাকে রাখা যায় ?

সুন্দরী এসে রমাকে বলে, 'ওকে রেখে কি হবে ? যদি নেহাৎ বেশীই হয়ে থাকে টাকা, রাস্তার গরীব ভিখিরীদের দিলেই ত হয়।'

রমা বলে, 'আহা সুন্দর, তুই জানিস না ও কত অসহায়। দেখিস না কেমন ভাবে তাকায়। তা'ছাড়া তুই কি ভাবিস ও রাস্তার গরীবদের থেকে উপরে ? এ বাড়ীতেই ওর ভাত বাঁধা, নইলে ভেবে দেখ বিশ্ব-ভুবন ওলট-পালট হলেও যে লোকটির সেদিকে খেয়াল থাকে না ও এসে তার হাতেই বা পড়ল কি করে ?'

সুন্দরী কিন্তু মানে না। সে হাইকোর্ট ছেড়ে সুপ্রীম কোর্টে ছোটে। অধ্যাপকের কাছে হাউমাউ করে পাঁচটার সাথে দশটা জুড়ে দিয়ে ভাঙ্গা কাপ-ডিসের লিষ্টি পেশ করে। করেই এক মুহূর্ত দেরী না করে বলে, 'এই দশ বছরের চাকরীতে সে নিজে কখনও কিছু ভেঙ্গেছে ? সাহেবের মনে পড়ে ?'

অধ্যাপক বই থেকে মাথা তুলে বলেন, 'আহা সুন্দরী এত দিন তো ভাঙ্গোনি। আজ না হয় দশটা কাপ ফেলেছো। তাতে কি হয়েছে ? কাঁদবার কি আছে ?'

আকাশ থেকে পড়ে সুন্দরী জানায়, 'কাপ আমি ভাঙ্গতে যাব কেন ? ভেঙ্গেছে ঐ নতুন চাকর বুড়ো বেটা বিপিন। তিন দিনে তেইশটা।'

অত্যন্ত বিচলিত হয়ে অধ্যাপক গৃহিণীকে ডাকেন, কন্যাকে ডাকেন, বিপিনকে ডাকেন, কোর্ট বসে।

অধ্যাপক বলেন, 'বিপিন, তুমি তিন মাসে তেইশটা ছবি ভেঙ্গেছো ? এ তো ভালো কথা নয় ?'

বিপিন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

'হাঁ করে দেখছো কি। বলি কিছু মগজে যাচ্ছে ?'

সুন্দরী স্মরণ করিয়ে দেয়, 'আজ্ঞে না সাহেব, ছবি নয় কাপ। তিন মাসে নয়, তিন দিনে। তিন মাসে কি ও ঘরের কিছু আস্ত রাখবে ?'

অধ্যাপক বলেন, 'শোনো বিপিন, আমি তোমায় হুকুম দিচ্ছি, তুমি কখনও কোনো কাপ-ডিস ছোঁবে না। ও তুমি রাখতে জানো না। সব ভেঙ্গে ফেলবে। তোমাকে যে কাপে চা দেওয়া হবে দু'হাত দিয়ে ধরে চা-টুকু খেয়ে এই সুন্দরীর হাতে দেবে। ও-ই সব ধুয়ে-মেজে রাখবে। বাস, যাও। যা বললাম তাই করবে। কক্ষনো এদিক-ওদিক না হয়।'

রাগে টঙ হয়ে সুন্দরী মুখখানা পাকা টমেটোর মতন রাঙা করে চলে যায়। শীলা মার দিকে তাকিয়ে খিল-খিল করে হেসে ওঠে।

অধ্যাপক বই-এর পৃষ্ঠা উলটোতে উলটোতে বলেন, 'হুঁ বাবা, আমার সাথে চালাকি ? তিরিশ বছর ধরে ছেলে চরাচ্ছি। বলে কি না কাপ ভাঙবো। ভাঙ্গো দিকিনি এবার বাপধন।'

অধ্যাপক পরম তৃপ্তির সাথে বই-এর পৃষ্ঠায় নিজেকে ডুবিয়ে দেন। ঠিক কথাই ত'। তাঁর মতন সংসারী বুদ্ধি ক'টা লোকের আছে ?

তিন

বিপিন ঘরখানা কিন্তু সত্যিই সুন্দর সাজিয়ে রাখে। দেয়ালের ক্যালেণ্ডার পোর্ট্রেটগুলো নামিয়ে পরিষ্কার করে। আবার তুলে রাখে। তুলে রাখার সময়ে কিন্তু আগের মতন রাখে না। উল্টো-পাল্টা করে পট পরিবর্তন করে। অবাক কাণ্ড ! ছবিগুলো আগের চেয়ে ভালোই দেখায়।

শীলার শিল্পি-মন। তার আঁকা ছবিও আছে। বলে, 'বাঃ বেশ সাজাও তো তুমি। আমার ঘরখানা একটু সাজিয়ে দেবে ?'

বিপিন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

শীলার ঘরখানা ছোট্ট। ঘরে দু' আলমারি-বোঝাই বই। ছবি আর ছবি। ছোট টেবিলটার ওপর ছবি আঁকার সাজ সরঞ্জাম— রঙ, তুলি। বড় অগোছালো।

বিপিন ঘর সাজাতে যায়।

ছোটো টেবিলটার কাছে গিয়ে বিপিন তুলিগুলো নাড়াচাড়া করে। ব্যাটা যেন দু'চোখ দিয়ে গিলছে ওগুলো।

বাড়ীখানা মাথায় তুলে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে শীলা ছুটে আসে।

'আরে কর কি ? কর কি ? ও-সব ছবি আঁকার দামী জিনিষ, ছুঁতে নেই। কি বিপদ ? দেখো দিকিন !'

বুড়ো বিপিন দ্বিধায় জড়িত পদে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

শীলা বলে, 'কি বিপদ ! আরে ও বিপিন ! বললাম ঘর ঠিক কর। আবার ছুটছো কোথায় ? লোকটা দেখি একটা আস্ত গাড়ল। শোনো ঐ কোণের ছবিগুলো আর এই টেবিলের রঙ-তুলি ছাড়া বাকী সব এক্ষুণি বসে বসে পরিষ্কার করে ফেলো দেকিনি। ভালো করে। জল দিয়ে। বলি কানে যাচ্ছে কথা ? হাঁদা গঙ্গারাম কোথাকার !'

বলেই মনে হয়, না বকলেই ভালো হত। আহা বুড়ো বেচারা ! কেউ নেই হয়ত ওর এ দুনিয়ায়।

তক্ষুণি আবার ডাকে, 'এই বিপিন শোনো।'

বিপিন মাটির সাথে মাথা মিশিয়ে এসে হাত জোড় করে দাঁড়ায়। ওর রকম-সকম দেখে বেদনার ভিতরও শীলার হাসি পায়।

বলে, 'অমনি করে দাঁড়ায় না কি ? বকেছি বলে আবার রাগ ? ওগুলো কি জিনিষ জানো ? ওগুলোকে তুলি বলে। ওগুলোতে রঙ মেখে ছবি আঁকে। বুঝলে ? ওর মধ্যে আবার সবগুলো এ দেশে পাওয়াও যায় না। বিলেত বলে অনেক দূরে সাহেবদের একটা দেশ আছে। সেখান থেকে আনা। ভয়ানক দামী জিনিষ। বুঝলে ? ভালো করে কাজ করো। ঐ তুলি দিয়ে তোমার একখানা ছবি—'

বিপিন লোকটা একটা আস্ত গবেট। সব কথাতেই ড্যাবা-ড্যাবা ভাসা চোখে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

মনিবকন্যা ওর ছবি এঁকে দেবে বলে ওর বিশেষ কোনো উৎসাহ এসেছে বলে মনে হল না। কথাগুলো ওর কানে গেছে কি না কে জানে ? লোকটা বধির নয় তো ?

শীলা চঞ্চলা। ওর অত-শত ধৈর্য্য নেই। ঘরখানা পরিষ্কারের কড়া হুকুম দিয়ে সে কনট সার্কাসে আর্ট কলেজের দিকে বেরিয়ে পড়ে।

চলতে চলতে একটা কথা কিন্তু শীলার মনে ঘুরপাক খায়। ক'দিন থেকে এ জিনিষটা ওর মনে ঘুরছে। লোকটা যখন প্রাঙ্গণ-প্রান্তে ছোট বাগানে দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে, তখন তাকে ভারী সুন্দর দেখায় ! মনে হয় যেন বুদ্ধের সত্য-সন্ধানী মনটা কোন্ অজানা দেশে উড়ে বেড়াচ্ছে। বৃদ্ধ যেন আপনাতে আপনি নেই। শিল্পিমনে দোলা দেয়। ইচ্ছে হয়, তুলি আর রঙ নিয়ে বসতে।

সত্যি সত্যি বুদ্ধের একখানা ছবি আঁকলে কেমন হয় ?

চার

শব্দ শুনে রমা ছুটে আসে—'ইস্ !'

টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আলমারির একখানা কাচও আর আস্তো নেই। বইগুলো ভেজা-কার্পেটের চারি দিকে বস্তা-ছেঁড়া আলুর মতন ছড়িয়ে পড়েছে। ভিজে সেগুলো আমসত্ব হয়েছে। কার্পেটখানার ওপর দিয়ে গঙ্গা-যমুনা বয়ে যাচ্ছে।

রমা তাড়াতাড়ি বইগুলো সরাল।

বিপিন অপরাধীর মতন মাথাটা হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর একটু হেঁট করার চেষ্টা করলে ওর সমস্ত গলাটাই মাটিতে ছিঁড়ে পড়বে।

হেড অফিসে রিপোর্ট যায়। বলাই বাহুল্য, খবরটা সুন্দরীই বহন করে। শীলা যখন ঘরে প্রবেশ করে ততক্ষণে ফুলবেঞ্চ কোর্ট বসে গেছে।

অধ্যাপক বিপিনকে প্রশ্ন করেন, 'ওহে বিপিন, তোমার আবার এই বই পড়ার সখ হল কবে থেকে ? এঁ্যা ? বলি, পড়বে ত' পড়। সমস্ত বই ঘাঁটবার দরকারটা কি ছিল শুনি ?'

সুন্দরী চেঁচিয়ে উঠলো, 'আহা বই পড়ছিল কে বললে ? অত মুরোদ কৈ ?'

'ঐ যে বললে বইগুলো ফেলে দিয়েছে সব। শোনো হে বিপিন, বাংলা রামায়ণ একখানা চাও তো কিনে দেব। ও সব ইংরিজী বই তুমি কিছুই বুঝবে না। শোনো সুন্দর, যা দেখছি এখন থেকে রোজ সকাল-সন্ধ্যে বইগুলো তোমাকেই পরিষ্কার করতে হবে। বিপিন বই-এর কোনো কদর বোঝে না। উল্টোপাল্টা করে রাখলে আবার আমার মুস্কিল। তুমি বিপিন, ও সব বই-এর কাছ দিয়েও ঘেঁষবে না। আমার সাথে চালাকিটি চলবে না বাপু! তিরিশ বছর ছেলে চরাচ্ছি। বই ছিঁড়বে ? সেটি আর চলবে না।'

সাত টাকা মাইনের অত সাধের চাকরীটা গিয়ে গিয়েও বেঁচে যায়। বিপিনের ধড়ে প্রাণ আসে।

সুন্দরী রাঙা মুখখানা হাঁড়ির মতন করে নিজের ডিপার্টমেণ্টে ফিরে যায়। মনে মনে সঙ্কল্প করে, জড়ভরত বুড়োকে এক দিন আচ্ছা করে জব্দ না করি ত তার নারী-জন্মই বৃথা।

পাঁচ

ক'দিন থেকে শীলার নিঃশ্বাসটুকু ফেলার সময় নেই। সাতটি বছর ধরে নাগাড়ে ছবি আঁকার পর দিল্লীর শিল্পমন্দিরে তার শিল্পের প্রথম প্রদর্শনী, দিন-রাত আজকাল সে ছবি এঁকে চলেছে।

বৃদ্ধ বিপিনের কাজ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফাঁক পেলেই সে শীলার ছোট্ট ঘরে ঢুকে পড়ে।

শীলার ভালোই লাগে। সঙ্গিবিহীন ক্লান্ত দিনগুলোতে এ বৃদ্ধই সর্বক্ষণ তার পাশে পরমভক্তের মতন বসে থাকে। যৌবনচঞ্চল নারীমনে নিজের শিল্পকৃতিতে শীলারও যে সামান্য একটু গর্ব বোধ হয় না, তা কে বলতে পারে ?

প্রদর্শনীর দিন শীলা বিপি-কে একটা তুলি কিনে দেবে বলেছে। বিপিনের তাতে কোন বিশেষ উৎসাহ এসেছে বলে মনে হয় না। লোকটা একটা জড়ভরত।

আজকাল শীলার তুলিগুলো সে মাঝে মাঝে পরিষ্কার করে দেয়। ছবিগুলো যত্ন করে শীলার নির্দেশ মতন ঝেড়ে-পুঁছে রাখে।

প্রদর্শনীর কাজে শিল্পগুরুর সাথে শীলা দুটো দিন বাইরে বাইরেই কাটাল। বৃদ্ধ বিপিনের কোনো কাজ নেই।

সকাল বেলা এসে শীলা বিপিনকে ডেকে পাঠায়। তার ঘরে কে ঢুকেছিল ?

ভয়ে জড়সড় হয়ে বিপিন বলির পাঁঠার মতন কাঁপতে থাকে। সুন্দরী ছুটে এসে জানায়, দু'দিন ধরে সর্বক্ষণ বুড়ো ও ঘরখানা জোঁকের মতন আঁকড়ে পড়েছিল। ঘরের কোনো কাজ সে করেনি। এমন চাকর দূর করে দেওয়াই মঙ্গলজনক।

শীলার সর্বশরীর হিম হয়ে গেল।

—এঁ্যা দু'দিন দু'রাত এ ঘরে ছিল ? ছবিগুলো যে সব এই ঘরেই ছিল। পাগল ছবিগুলো ছিঁড়ে ফেলেনি ত' ? কালি-টালি ঢালে নি ত ?

যাক বাবা ! হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ছবিগুলো ঠিকই আছে। ছোঁয়নি কেউ। একটা জিনিষ শীলা লক্ষ্য করল। এ ক'দিন ধ্যান-সমাহিত আচ্ছন্নতার ভিতরই ছবিগুলো সে এঁকে গেছে। ছবিগুলো এক বারও ভালো করে দেখার সুযোগ পায় নি। আজ হঠাৎ ছবিগুলো দেখে যেন বিশ্বাসই হয় না ছবিগুলো তার নিজেরই আঁকা ! সে এত সুন্দর ছবি আঁকতে শিখলো কবে ? নিজের আঁকা ছবিগুলোর দিকে

নিজেই মুগ্ধ নয়নে দাঁড়িয়ে রইল। ঘরে প্রবেশের অপরাধে বিপিনের ওপর তার যে ক্রোধ জেগেছিল তা নিমেষে জল হয়ে গেল।

বিপিনকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবার কথা উঠলেই বেচারার বেদনাহত মুখখানা কালো আঁধারে ঢেকে যায়। ভয়ে তার শুষ্ক মুখ ম্লান হয়ে যায়। বিপিন বড় অসহায়।

শীলা বিপিনকে আশ্বাস দিয়ে বলে, তাকে কেউ কখনও তাড়াবে না। বিপিনকে শিশুর মতন সান্ত্বনা দেয়। স্বীয় প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করে। তাকে সে নিশ্চয়ই তুলি কিনে দেবে। উৎসাহ-আতিশয্যে আরও বলে ফেলে, বিপিনকে সে ছবি আঁকাও শিখিয়ে দেবে।

বৃদ্ধের নিঃস্ব নির্লিপ্ততা, তার সরল স্নিগ্ধ উপস্থিতির ভিতরই যেন কোন অপরূপ সৌন্দর্য লুকোনো আছে। বৃদ্ধের জীবন-রহস্য শীলার শিল্পিমনে প্রায়ই একটা মৃদু আলোড়ন জাগায়। কোত্থেকে পেলো এ শিশুর মতন শুভ্র অপরূপ রূপ?

ছয়

নিরালা বাংলোতে সুন্দরী আর বিপিন ছাড়া কেউ ছিল না।

বহু দিন পর মনের একটা অতৃপ্ত বাসনাকে রূপ দেবার এ সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে সুন্দরীর মন সেদিন খুশীতে ভরে ছিল।

ডান হাতে বেতের ছড়িখানা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিপিনকে সে বড় কড়াইখানা জোরে ঘষবার নির্দেশ দিচ্ছিল। একপাঁজা বাসন এই মাত্র সে বিপিনকে দিয়ে মাজিয়ে নিয়েছে। বিপিন এ কাজ কখনও করে নি। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ছড়ি দিয়ে শপাং-শপাং করে ঘা মেরে সুন্দরী বলল, 'বড় সুখ না? বাড়ীর তৃণটুকু ছিঁড়ে ভিন্ করে রাখবেন না। কেবল খাওয়া-দাওয়া আর মৌজ। তাড়াতাড়ি সব পরিষ্কার কর বুড়ো, পাজি, নইলে চাবুক মেরে টাঙিয়ে রাখব।'

সন্ধ্যার পর সেদিন একটু তাড়াতাড়িই রমা ফিরে এসেছে। শরীরটা তার যেন কেমন কেমন করছিল। বিপিনকে ঘরে না দেখে সুন্দরীর কাছে খবর নিলে। শুনে বললে, 'বলিস কি সুন্দরী? বিপিন মাতলামো করছে? কোথায়? চল্ দেখি।'

গিয়ে দেখলেন, গৃহকোণে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে হাপুস নয়নে বিপিন বসে কাঁদছে। সাথে সাথে দু'হাত দিয়ে নিজের বুকে আঘাত করে চলেছে।

রমা বিপিনের হাত ধরে তুললে। বললে, 'ও দাগ কিসের, ওর গায়ে সুন্দর?'

'—দাগ? মদ খেয়ে আবার গাছে চড়বার সখ হয়েছিল যে মা! ধুম্ করে পড়ে গেল। আমি ত তুলে এনে রাখলাম এখানে। হাজারো হলেও একটা মানুষ ত। তাকে অমন করে সামনে দাঁড়িয়ে মরতে দেখি কি করে?'

বিপিনের হাত দু'খানা তখনও তার বুকে আঘাত করে চলেছে।

রমা ডাক্তার ডাকতে পাঠালে। মাতাল হলেও লোকটা মানুষ ত'।

সাত

ইস্!

হঠাৎ শীলার সমস্ত মনোযোগ খান-খান হয়ে ভেঙ্গে গেল। এতক্ষণ সে মন-প্রাণ ঢেলে হিমালয়ের ছবিখানা শেষ করছিল। নীলের সাথে শাদা মিশিয়ে আঁচড় মারতেই পিছন থেকে শব্দটা হল। সবুজ রঙটা ফুরিয়ে গেছে।

পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলো, একটা ছায়া যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শীলার আজকাল চারি দিকে বেশ নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

অধ্যাপক হন্তদন্ত হয়ে গাড়ী থেকে নামলেন। ঘরে ঢুকেই রমাকে ডাকলেন। কন্যাকে ডাকলেন।

—'বিপিন ঘরে আছে ত? দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দাও ত।'

অধ্যাপকের সব কাজেই যেন একটু বাড়াবাড়ি। শীলা এসে পাশে দাঁড়ায়। রমা কুশনে বসে। অধ্যাপক আবার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করেন, 'বিপিন আছে ত ঘরে?'

সবাই জানায় 'হাঁ।'

'শোনো ব্যাপারখানা। আমি আগেই জানতাম এমন কিছু ঘটবে। তিরিশ বছর ধরে ছেলে চরাচ্ছি। বাবা, আমার সাথে চালাকি?'

'শোনো এই খবরের কাগজ কি লিখছে, শীলা পড়ো তো একটু জোরে জোরে।'

শীলা পড়ল: দেশ বিভাগের পর থেকে জগদ্বিখ্যাত শিল্পী মনীষী সেনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। পূর্ব-বাংলার নিভৃত পল্লীর কুটীর থেকে টেনে আনার পর থেকেই তাঁর কি রকম অস্বাভাবিক স্মৃতি বিভ্রান্তির লক্ষণ দেখা যায়। উভয় বাংলাতেই তাঁর শিষ্যবৃন্দ তাঁর এ অবস্থায় নিরুদ্দেশে বিশেষ উদ্বিগ্ন। শিল্পীর মনোবিকারের কোনো বিশেষ লক্ষণ নেই। বিশেষ বেদনা পেলে তিনি মাঝে মাঝে নিজ বুকে করাঘাত করেন। তা'ছাড়া মাঝে মাঝে পদ্মার ঢেউকে উদ্দেশ্য করেও বিড়-বিড় করেন। পদ্মার বর্ণনা করলে শিল্পী নিজ বুকে করাঘাত করেন।

রমার বুকের ভিতর ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

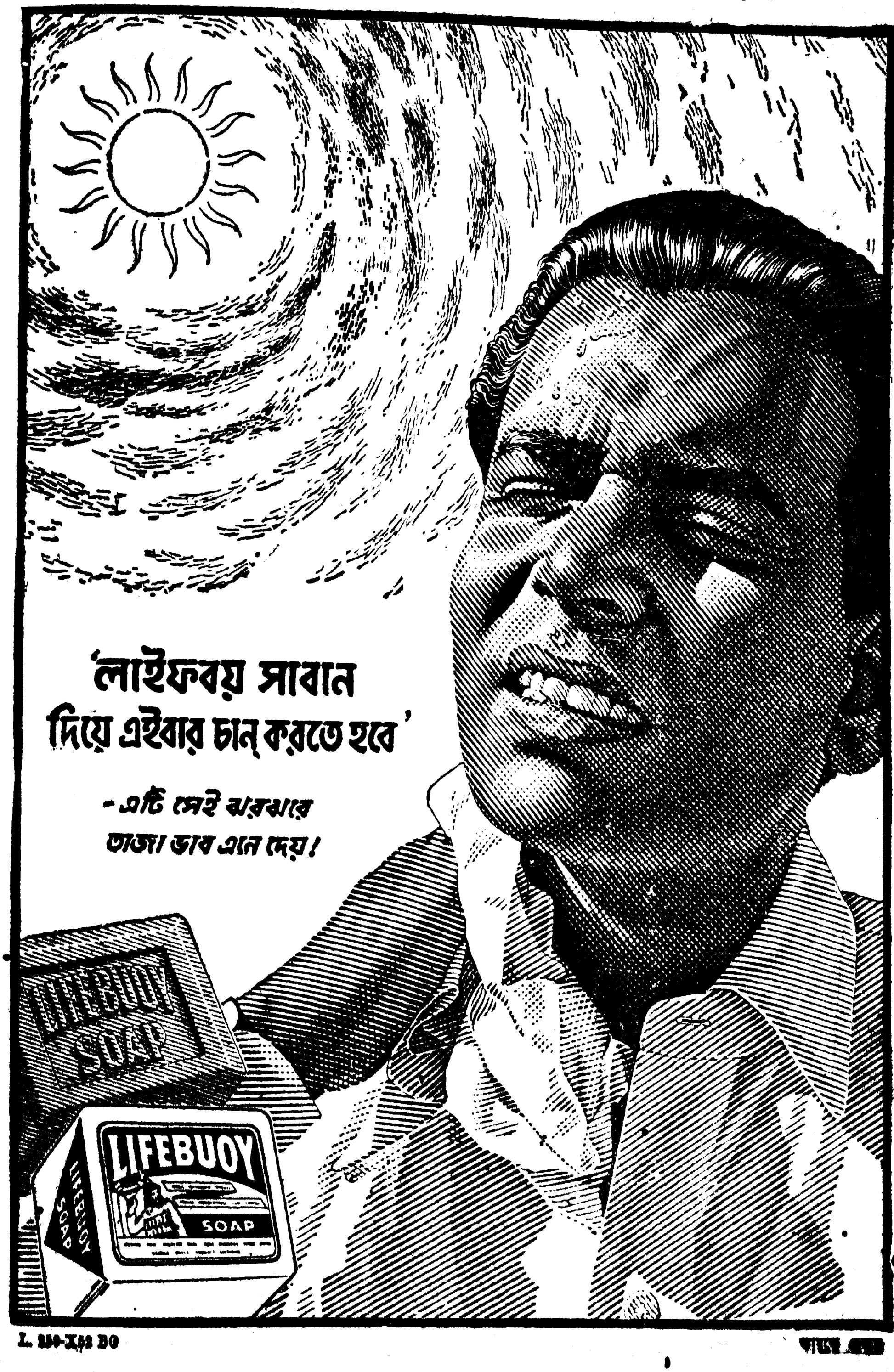
শীলার মনে হঠাৎ প্রশ্ন জাগলো। শিল্পগুরু তাঁকে সেদিন বলেছিলেন—কোনো ঐশ্বরিক শক্তি না থাকলে এত অল্প বয়সে তাঁর মতন কেউ ছবি আঁকতে পারে না।

শীলা বললে, 'তোমার কি মনে সন্দেহ হয় বাবা? তা'হলে এত বড় গুণী নিজের নাম মিথ্যে বলবে কেন?'

—'কি বিপদ? ও কখন বলল ওর নাম বিপিন? লোকটা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে নিজের বুক চাপড়াচ্ছিল। কাছে যেতেই চুপ করে গেল। হাজারো বার নাম জিজ্ঞাসা করলাম। কোনো জবাব নেই। একটা কিছু বলে ডাকতে হবে তো? মুখের কাছে নামটা এলো।। বললাম, ওহে বিপিন, চলো আমার সাথে। বিপিন ত আমার দেওয়া নাম।'

অধ্যাপক নিজে গিয়ে বিপিনকে ধরে নিয়ে এলেন। স্তব্ধ ঘর কাঁপিয়ে অধ্যাপক চেঁচিয়ে বললেন, 'জানো মনীষী সেন, জানো তুমি পদ্মার বান ডেকেছে? জানো সে-ঢেউ কতদূর ছুঁয়েছে এসে, মনে পড়ে পদ্মার ডাক?'

বিপিনের হাত দু'খানা যন্ত্রচালিতের মতন ওপরে উঠলো। ধীরে ধীরে করযুগল শিল্পীর বেদনাবিধুর বক্ষ স্পর্শ করল। বিপিনের করাঘাত আপন বক্ষস্পন্দন কাঁপিয়ে তুলল। অধ্যাপক মহান্ শিল্পীর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়লেন।


'লাইফবয় সাবান
দিয়ে এইবার চান্ করতে হবে'
-এটি সেই ঝরঝরে
তাজা ভাব এনে দেয়!
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP
LIFEBUOY
SOAP



—বিবেকানন্দ-স্তোত্র—

সুমণি মিত্র

৩১

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ···
বীরাণামেব করতলগতা মুক্তিঃ
ন পুনঃ কাপুরুষাণাম্।"*

*   *   *

তা'বোলে কি 'কৃপা' বোলে কোনো কথা নেই?
আছে নিশ্চয়ই।
বৌদ্ধ কিংবা বুদ্ধদেব যে যাই বলুন,
স্বামিজী তাঁদের কেউ নন্।—

"Lord!
How difficult it is
For man to believe in Thee
And Thy mercies!
Shiva! Shiva!

Not a drop will be in the Ocean,
Not a twig in the deepest forest
Not a crumb
In the house of the god of wealth,
If the Lord is not merciful.
Streams will be in the desert
And the begger will have plenty
If He wills it.
He seeth the sparrow's fall.*

৩২

তবে তাঁর 'কৃপা' তুমি যদি পেতে চাও,
হৃদয়-রক্ত কিছু অগ্রিম দাও।
'কৃপা' মানে কাকতালে বিনা চেষ্টায়
রাতারাতি উড়ে-আসা রাজত্ব নয়।
ঠাকুরের সংজ্ঞাটা শুনে রাখো তবে,—
'কৃ' মানে—করো, আর 'পা' মানে—পাবে!

*   *   *

পাখি কি উড়তে পারে একটা ডানায়?
এক দাঁড়ে নৌকো কি নদী পার হয়?
'চেষ্টা'র পালে চাই 'কৃপা'র বাতাস,
তবেই তো লক্ষ্যেতে পৌঁছোনো যায়।
কাঁচির যে দুটো ফলা, সবাই তা' জেনে
কাগজটা কাটো দুটো একত্রে এনে।
'কৃপা' ও 'পুরুষকার' একত্র হোলে
তবেই এ-মায়া-দড়ি কেটে ফ্যালা চলে।

*   *   *

'চেষ্টা'র আর কিছু না-হোলেও ভাই
'চেষ্টা'র দৈন্যটা বুঝে নেওয়া যায়।
'চেষ্টা'য় হয় না যে, 'কৃপা'তেই সব,
'চেষ্টা' কোরেই সেটা বোঝা সম্ভব।
'কৃপা'র মহিমা যদি বুঝে নিতে চাও,
এই বেলা 'চেষ্টা'র পাল তুলে দাও।
চেষ্টা-বিমুখ হোয়ে 'কৃপা' চায় যারা
হয় ক্লীব, ভণ্ড বা নাস্তিক তারা।

৩৩

স্বামিজীর 'কৃপাবাদ' আরো একরোখা,
বিবেকের কশাঘাতে কালঘাম ছোটা!
স্বামিজীর সংজ্ঞাটা শুনে মনে হয়
'কৃপা'টা 'পুরুষকার' ছাড়া কিছু নয়।
'কৃপা'র ব্যথাটা তবে ঐ শুনে রাখো,
ও-কথাটা নিয়ে আর খেলা কোরোনাকো!

---

* "দুর্বলে এ-আত্মা লাভ কোরতে পারে না···যারা বীর, মুক্তি তাদেরই করতলগত, কাপুরুষদের নয়।"

* "হে প্রভু! মানুষের পক্ষে তোমার ওপর এবং তোমার কৃপার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা কত কঠিন! শিব! শিব! ঈশ্বরের যদি কৃপাদৃষ্টি না থাকে, তবে মহা সমুদ্রেও এক ফোঁটা জলও থাকে না, গভীর অরণ্যে এক টুকরো কাঠও পাবে না, আর কুবেরের ভাণ্ডারে এক মুঠো অন্নও মেলে না। আর তাঁর ইচ্ছে হোলেই মরুভূমিতেও স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হয়, ভিক্ষুকেরও প্রচুর ঐশ্বর্য জুটে যায়। সামান্য একটা চড়ুই পাখী কোথায় গিয়ে পড়ছে—তা-ও তিনি দেখতে পান।"—পত্রাবলী (পৃঃ ১১৯)।

"I may have had Divine help—
True,
But Oh,
The pound of blood
Every bit of Divine help
Has been to me !!" *

অতএব 'কৃপা' চেয়ে পোড়োনা ফাঁপরে,
'কৃপা'টা চাওয়ার আগে ভেবো ভালো কোরে!
স্বামিজীর 'কৃপাবাদ' শুনে ভয় হয়!
হাত-পা সেঁ[illegible]য় যেন পেটের তলায়!
তবু তিনি বোলেছেন সাঁচ্চা কথাই,
'কৃপা' হোলো 'চেষ্টা'র ফলাফলটাই।
যখন আপদ এসে পথ আটকায়,
জীবন মুষড়ে পড়ে দারুণ ব্যথায়,
জান্তব জীবনের অভিশাপগুলো
মনের আকাশ থেকে চুরী করে আলো,
বেঁচে থেকে বেড়ে উঠি—সে ইচ্ছে নেই,
হাত-পা গুটিয়ে আসে, দুঃখে ঝিমোই,
হতাশার চোরাবালি মনটাকে টানে,
মনে হয় এই বুঝি জীবনটা থামে,
তখনো আসেনা 'কৃপা' কুসমস্তরে;
তখনো তা' পেতে হয় 'চেষ্টা'রই জোরে।
ঐ শোনো এ-ব্যাপারে উনি কি বলেন,
নিজের জীবনে তিনি কি ভাবে চলেন,—

"Many times
I have been in the jaws of death,
Starving, footsore, and weary;
I would sink down under a tree,
And life would seem ebbing away;
But at last
The mind reverted to the idea:
'Assert thy strength...
Regain thy lost empire!'
And I would rise up,
Reinvigorated,
And here am I living to day.

Thus,
Whenever darkness comes,
Assert the reality
And everything adverse must vanish.
Mountain-high though the difficu'ties appear,
Terrible and gloomy though all things seem,...
Fear not—it is banished.
Crush it, and it vanishes.
Stamp upon it and it dies. *

৩৪

'দেশ-কাল ও নিমিত্তে' আছো যতকাল,
ততদিন 'কৃপা'টাও conditional. †
এ তিনের পরপারে পা বাড়াবে যেই,
'কৃপা'র সর্ত বোলে কোনোকিছু নেই।
তাই বা কি কোরে বোলি, সেখানেতো ভাই
'কার্য ও কারণে'র নেইকো বালাই।
সেখানে যে জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হোয়ে যায়,
কে কা'কে কোরবে কৃপা বলোতো আমায়?
কৃপা পেতে অন্তত: দুজন তো চাই।
একা হোলে ওঠেনাকো 'কৃপা' কথাটাই।

* * *

অতএব স্বামিজীরই সংজ্ঞাটা মানো,
পয়সাটা দিয়ে তবে সিগারেট টানো।
দু'ইঞ্চি 'কৃপা' যদি চাও তুমি, তবে
অন্তত: দু'শো গজ হেঁটে যেতে হবে!
যার মনে যে-ক-কোঁটা 'কৃপা' পেতে সাধ,
অগ্রিম দিতে হবে তত 'pound blood'

* * *

মোটমাট যে-কথাটা বাজারেতে চলে,—
'কৃপা'র সর্ত নেই,—মূর্খে তা বলে!

"Help thyself out of thyself,
None else can help thee, friend.
Thou alone art thy greatest enemy,
Thou alone art thy greatest friend." ‡

---

* "দৈবকৃপা সত্যিই হয়তো আমি পেয়েছি; কিন্তু উঃ! এর প্রত্যেকটি বিন্দুর জন্যে আমাকে কি পরিমাণেই না রক্তমোক্ষণ কারতে হোয়েছে!"—পত্রাবলী (৩১৬ পৃঃ)

* "অনাহারে, রুগ্নপায়ে এবং ক্লান্তিতে কতোবার আমায় মৃত্যুর কবলে পোড়তে হোয়েছে; মনে হোয়েছে—কোনো গাছতলায় গিয়ে মরে পোড়ে থাকি, প্রাণটা এই বুঝি বেরিয়ে গ্যালো। শেষটায় মন মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো,—'আত্মশক্তিকে জাগাও, হৃত-রাজ্য পুনরুদ্ধার করো!' ব্যাস অমনি আমি নোতুন শক্তিতে খাড়া হোয়ে দাঁড়িয়েছি, আর এই ছাখো, সেই আমিই আজ সশরীরে বেঁচে।"

সুতরাং যখনই জীবনে এইরকম অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, নিজের আত্মশক্তিকে জাগাও, তাহোলেই দেখবে বিপদ কেটে যাবে।

ঝঞ্ঝাট পাহাড়-প্রমাণ হোক, সবকিছু বীভৎস এবং তমসাচ্ছন্ন বোলে মনে হোক, খবরদার ভয় পেয়োনা—তাহোলেই সে পালিয়ে যাবে। গুঁড়িয়ে ফ্যালো, তাহোলেই সে গা-ঢাকা দেবে। পদাঘাত করো—তাহোলেই দেখবে সে শেষ হোয়ে গ্যাছে।"

—*Realisation And Its Methods.*

† সর্তাধীন।

‡ তুমি নিজেই নিজেকে কৃপা করো দেখি। তাছাড়া আর কেউ তোমায় সাহায্য কোরতে পারে না। কেননা, তুমি নিজেই হোচ্ছো তোমার চরম শত্রু, তুমি নিজেই হোচ্ছো তোমার পরমবন্ধু।

—*Realisation And Its Methods.*

৩৫

ছেলেবেলা থেকে আমি
নিজেকে যেটুকু জানি,
তার বেশি জানি না নিজেকে।
না-জানা এ-আমিটার
দু-একটা ঘটনার
উপহার দেবো সংক্ষেপে।

সারাদিন হেসে-খেলে
রাত্তিরে ঘুম পেলে
যখনি বুঁজেছি আমি চোখ,
জ্যোতির কণিকা এসে
আমার কপাল ঘেঁষে
নিয়মিত ভাখা দিতো রোজ।

বিন্দুটা ক্রমাগত
কেঁপে-কেঁপে বড়ো হোতো,
আমি ছাড়া জানতো না কেউ।
বিপুল স্নেহের মত
মুখে-চোখে ফেটে যেতো,
ঠিক যেন কুয়াসার ঢেউ!

পুলকের হাওয়া ঢুকে
নাড়া দিতো সারা বুকে,
তালে তালে প্রচণ্ড দোল্!
স্নেহের আঘাতে তার
মনের গুটোনো পাল
রোমাঞ্চে খুলে যেতো রোজ!

জ্যোতির কুয়াসাগুলো
ঠিক যেন পেঁজা তুলো
আলোতে চুবিয়ে দিয়ে শেষে,
চেতনাকে চুরী কোরে
চুপি চুপি নিঃসাড়ে
নিয়ে যেতো সুপ্তির দেশে!

তারপর বড় হোয়ে
মনটাকে জড়ো কোরে
ধ্যানেতে বুঁজছি যেই চোখ,
অমনি অন্ধকারে
জ্যোতিটা বিদ্যাকারে
নিয়মিত ভাখা দিতো রোজ!

তখন কি অত বুঝি?
মনে হোতো সোজাসুজি
একমনে চোখ বোঁজে যারা,
সকলে আমারই মত
মাঝে মাঝে অন্তত:
নিশ্চয়ই জ্যোতি ভাখে তারা।

যে-ছেলেরা করে ধ্যান
একদিন শুধোলাম—
'তোমরা কি জ্যোতি ভাখো কেউ?'
উত্তরে তারা বলে—
'এ-যাবৎ কোনোকালে
জ্যোতি-টোতি দেখিনি তো কেউ।'

আরো পরে কাছে ডেকে
ঠাকুর আমাকে দেখে
সস্নেহে বললেন—'শোন,
বলতো আমাকে দেখি
জ্যোতি-টোতি দেখিস কি?'
'হ্যাঁ' বলাতে ভারী খুশি হন।

বোঝালেন মোটামুটি
'ধ্যানে যারা ভাখে জ্যোতি
তারা হোলো আজন্মধ্যানী।
ধ্যানেতে সিদ্ধ যারা
জ্যোতি শুধু ভাখে তারা,
তুই যে দেখবি—আমি জানি।'

৩৬

যাই হোক, মোটামুটি বোঝা গেল এটা।
স্বয়ং ঠাকুরই এর বোঝালেন তাৎপর্যটা।

* * * *

ছেলেবেলাকার
আর-এক ব্যাপার
এখনো আমার মনে
আসা-যাওয়া করে বার বার।
এটা যেন আরো গোলমেলে;
যতই বুঝতে যাই
ততই প্রশ্ন ওঠে ঠেলে!
যাকে বোলি, নীরব সবাই।
আমিই বুঝিনি ঠিক,
অতএব কি কোরে বোঝাই!
তবু সব ব্যাপারটা খুলে বলা ভালো,
তোমাদের কেউ যদি
এ-আঁধারে দিতে পারো আলো।

ছেলেবেলা থেকে,
কোনো বাড়ি, জায়গা বা কোনো লোক দেখে
মনে হয় আমি
বহুকাল আগে থেকে
সবকিছু জানি।
যদিও তাদের আমি এ-জীবনে দেখিনি কখনো!

বেশ তবে এইভাবে শোনো,—
এই তো তোমার সাথে প্রথম আলাপ,
তবু যেন মনে হয় আজ,
এর ও আগে আরও একদিন,
ঠিক এই বেশে
তোমাকে দেখেছি আমি
আজকের এই পরিবেশে।
এখন যা' কথা হোলো তোমাতে আমাতে,
আগেকার সেই দেখাটাতে
এইখানে, এইভাবে, এই কথা বোলেছি দুজনে।
হঠাৎ না-বোলে কোয়ে সেই ছবি ভেসে ওঠে মনে!

এই তো প্রথম আসা তোমাদের বাড়ি,
বাড়িতে ঢোকার আগে বোলে দিতে পারি—
কোথায় ক'খানা ঘর, কোথায় কি পাবো,
অন্দরে যেতে হোলে কোন্ পথে যাবো,
বাড়িটার খুঁটিনাটি, গোপন ঠিকানা
মনে হয় বহুকাল আগে থেকে জানা। *
বলোতো এমন হয় কেন?
ভেবে ভেবে আজো এর
পাইনিকো সমাধান কোনো।
ব্যাপারটা ভারী উৎপেতে!
শাস্ত্রের বুলিতেও
পারিনিকো গোঁজামিল দিতে।
ও-জীবনে যা দেখেছি, একি তারই স্মৃতি?
তোমরা বোলবে তাই ঠিকই,
আমিও যে ভাবিনি তা নয়,
তবুও মেটেনা সংশয়।

আমি জানি বটে—
একবার যা ঘটেছে
অন্যজন্মে ফের তাই ঘটে।
তবু যেন মেনে নিতে বাধে।
তোমাদের 'জন্মান্তর-বাদে'
সমাধান পাইনিকো কিছু,
মনে হয় ব্যাপারটা
তারও চেয়ে আরো বেশি কিছু।

* * *

অনেক ভাবার পর শেষে
জীবনের শেষ ধাপে এসে
যতদূর মনে হয় এই,—
নিজের জীবন-নাট্য
গতজন্মে দেখেছি নিশ্চয়ই।
তাই এ-জীবনে
যে বাড়ি বা যাকে দেখি, যখন, যেখানে,
তক্ষুণি মনে হয়—এ কি!
একে যেন আরও কবে কোথায় দেখেছি!
সবই যেন চেনা-চেনা লাগে!
আসলে দেখেছি তাকে
অগ্রিম জন্মের আগে।

তার মানে এই
এ-জীবনে যার সাথে
মাখামাখি কোরতে হবেই,
কে জানে কি ভাবে,
তাদেরই দেখেছি আমি
কাঁকতালে আসার আগেই।
তারই স্মৃতি অন্তরে আজীবন থাকে জাগ্রত;
একবার দেখে অন্তত:
খুঁটিনাটি মনে পড়ে সব।
আমার এ-ঘটনায়
এইটাই যথার্থ খুব সম্ভব।

৩৭

মনে-প্রাণে জীবনকে নাট্য ভাবে যারা,
দুদিনের ধাপ্পাবাজী দেখে যারা হাসে,
নিজেকে সজাগ রেখে
পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চটিতে
মনকে শিকেয় তুলে
অভিনয়ে যারা ওস্তাদ,
জীবন্মুক্ত সেই অভিনেতা
'রিহার্স্যাল্' ভুলে যাবে
—তা কখনো হয়?

[ক্রমশঃ।

* ঠাকুরের মহাসমাধির পর স্বামিজী একদিন মাষ্টার মশাইকে বোলেছিলেন,—"প্রথম প্রথম যখন (দক্ষিণেশ্বরে) যাই, তখন একদিন (ঠাকুর) ভাবে বোল্লেন, তুই এসেছিস্! তারপর বোল্লেন, তুই কি একটা জ্যোতি দেখতে পাস্? আমি বল্লাম, আজ্ঞে হ্যাঁ। ঘুমোবার আগে কপালের কাছে কি যেন একটা জ্যোতি ঘুরতে থাকে।··আর একটা দেখেছি, এক একটি জায়গা, জিনিস্ বা মানুষ দেখলে, বোধ হয় যেন আগে জন্মান্তরে দেখেছি। যেন চেনা-চেনা। **Amherst Street**-এ যখন শরতের (স্বামী সারদানন্দ) বাড়িতে গেলাম, শরৎকে একবারে বোল্লাম, ঐ বাড়ি যেন আমার সব জানা! বাড়ির ভেতরের পথগুলি ঘরগুলি, যেন অনেকদিনের চেনা-চেনা।"
— কথামৃত—৩য় ভাগ (৩৩০) পৃঃ)।



[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ডি. এচ. লরেন্স

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলা পল মরফিয়ার বড়িগুলি সব একসঙ্গে মিশিয়ে গুঁড়ো করল। অ্যানি বলল, 'করছ কি তুমি?'

'কিছু নয়। রাত্রের খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে দেব এই গুঁড়ো।'

দু'জনেই হেসে উঠল, যেন দু'টি শিশু কোন দুষ্টুমির মতলব আঁটছে। ভয়ে তাদের মন আচ্ছন্ন, তার মধ্যে এইটুকু বুদ্ধি যেন অবশিষ্ট রয়েছে।

রাত্রে আজ নার্স আসে নি। পল একটা ফিডিং-কাপে গরম দুধ নিয়ে উপরে গেল। তখন রাত ন'টা।

মাকে বিছানায় বালিশ-গাদা করে বসিয়ে পল ফিডিং কাপটা ধরল দু'টি ঠোঁটের ফাঁকে। এই দু'টি ঠোঁটকে পল প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসত এক দিন। মা এক চুমুক দুধ মুখে নিলেন, তারপর বড় বড় চোখ ক'রে চাইলেন পলের মুখের দিকে। মুখ বাঁকিয়ে বললেন, 'এ যে বেজায় তেতো, পল!'

পল স্থির-নেত্রে চাইল মায়ের দিকে। বলল, 'এ একটা নতুন ঘুমের ওষুধ, ডাক্তার দিয়ে গেলেন তোমার জন্যে। এতে সকাল বেলায় আর তেমন অবসাদ লাগবে না।'

'আহা, তাই যেন হয়।' মা শিশুর মত সহজে মেনে নিলেন ওর কথা। চুমুক দিয়ে আরো খানিকটা দুধ খেয়ে ফেললেন। বললেন, 'না, এ যে বিচ্ছিরি লাগছে রে!'

পল দেখলে মায়ের শীর্ণ আঙুলগুলি পেয়ালার গায়ে সঞ্চালিত হচ্ছে, ঠোঁট দু'টি কেমন কেঁপে-কেঁপে উঠছে।

সে বলল, 'আমি জানি মা! আমিও মুখে দিয়েছিলুম একটু। খেয়ে নাও, তারপর ভালো দুধ এনে দেব আর একটু।'

'তাই দিও বাবা।' মা চুমুক দিয়ে দুধটুকু টেনে নিতে লাগলেন। শিশুর মত পলের কথায় অবাধ্য হলেন না তিনি। পল ভাবতে লাগল মা কি সব কিছু বুঝে ফেলেছেন। দেখল অতি কষ্টে দুধটুকু গলা দিয়ে নামাচ্ছেন মা, রোগে ভুগে গলাটি তাঁর বিশীর্ণ হয়ে উঠেছে। তারপর আর একটু দুধ আনতে গেল নীচে। পেয়ালার নীচে। ওষুধের গুঁড়ো একটুও নেই।

পলকে দেখে এ্যানি ফিস-ফিস ক'রে জিজ্ঞেস করল, 'খেয়েছেন ত'?'

'হ্যাঁ। বলছিলেন তেতো লাগে।'

'তবেই হ'ল।' এ্যানি মুখ টিপে হেসে উঠল।

'আমি বললুম এ একটা নতুন ওষুধ।—শোন, দুধটা কোথায়?'

দু'জনে একসঙ্গে গেল উপরে। মা বললেন, 'আজ নার্স এলো না কেন আমাকে শুইয়ে দিয়ে যেতে?'

এ্যানি বলল, 'ও বলে গেছে আজ গান-বাজনা শুনতে যাবে।'

'তাই নাকি?'

এক মিনিট কারো মুখেই কথা ফুটল না। মিসেস মোরেল দুধটুকু চুমুক দিয়ে গিলে ফেললেন। এ্যানির দিকে চেয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, 'জানো, আজকের ওষুধটা ভারী তেতো আর বিচ্ছিরি।'

'তাই বুঝি? কী করবে মা, সইতেই হবে।'

গভীর ক্লান্তিতে মায়ের দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল আবার। পল নাড়ী দেখল, নাড়ী খুব এঁকে-বেঁকে চলেছে।

এ্যানি বলল, 'এসো আমরাই শুইয়ে দিই তোমাকে। নার্সের আসতে আজ অনেক রাত হবে।'

'তাই করো। দেখ দু'জনে চেষ্টা ক'রে।'

ওরা দু'জনে বিছানার কাপড়-চোপড় ভাঁজ করতে লাগল। পল দেখল, মা ঠিক একটি ছোট মেয়ের মত শুয়ে আছেন ফ্ল্যানেলের জামা পরে। তাড়াতাড়ি বিছানার এক পাশে ঠিক করে মাকে সেদিকে রেখে অন্য দিকটা ঠিক করল, তারপর চাদরটা পায়ের উপর টেনে দিয়ে ঢেকে দিল ওঁকে। আস্তে আস্তে মায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে পল বলল, 'এই ত' হয়ে গেল। এবার লক্ষ্মীটির মত ঘুমিয়ে পড়।'

মা বললেন, 'হ্যাঁ, বেশ হয়েছে। আমি ত' ভাবতে পারিনি তোমরা এত ভালো পারবে।' তারপর কুঁকড়ি-সুঁকড়ি হয়ে হাতের উপর গাল রেখে ফিরে শুলেন। পল মায়ের চুল কাঁধের উপর থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁকে চুম্বন করল। বলল, 'এবার ঘুমোও মা!'

'হ্যাঁ, ঘুমোব।' মা নিঃসংশয় হয়েছেন ওর কথায়। বললেন, 'শুভরাত্রি।'

ওরা বাতি নিবিয়ে দিয়ে চলে গেল। নিস্তব্ধ হয়ে গেল ঘরখানা। মোরেল শুয়ে পড়েছে। নার্স তখনও আসেনি। এ্যানি আর পল এগারোটার সময় এলো দেখতে। দেখল মা ঘুমোচ্ছেন, বরাবর ওষুধ খেয়ে যেমন ঘুমোন তেমনি। শুধু মুখখানা একটু হাঁ হয়ে রয়েছে।

পল বলল, 'জেগে থাকব আমরা।'

এ্যানি বলল, 'কেন? আমি বরাবর যেমন শুই, আজও শুয়ে থাকব। যদি রাত্রে জেগে ওঠেন।'

'তাই করো। যদি কিছু খারাপ দেখ, আমাকে ডেকো।'

'ডাকব।'

আরও কিছুক্ষণ ঘরের আগুনের সামনে বসে রইল দু'জনে। বাইরে রাত্রি ক্রমশঃ দীর্ঘতর হচ্ছে, অন্ধকার গাঢ় হয়ে উঠছে, তুষার ঝরছে অনবরত। ওরা দু'জনে যেন সেই ঘুমন্ত জগতের মধ্যে একাকী জেগে রয়েছে। অবশেষে পল উঠে পড়ল, পাশের ঘরে গিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিল, ঘুমিয়েও পড়ল তৎক্ষণাৎ। শুধু মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। তারপর ঘুম এলো চোখ জড়িয়ে। কতক্ষণ

ঘুমিয়েছিল ঠিক মনে নেই, হঠাৎ এ্যানির চাপা গলার ডাক শুনে পল ধড়মড় ক'রে জেগে উঠল। দেখল, এ্যানি ঘুমের পোশাক পরেই ছুটে এসেছে, বাতি জ্বালাতেও সময় পায়নি। পল বলল, 'কী?'

—'এসো! দেখবে এসো।'

চুপি চুপি বিছানা ছেড়ে পল পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকল। রোগিণীর ঘরে একটুখানি গ্যাসের আলো জ্বলছিল। পল দেখল, মা তেমনি হাতের উপর গাল রেখে গুড়িসুড়ি হয়ে শুয়ে আছেন। শুধু মুখের হাঁ-টি আরও যেন বড় হয়েছে, আর শ্বাস টানছে অতি কষ্টে, অনেকক্ষণ পর পর প্রতিবার শ্বাস টানার সঙ্গে সঙ্গে ঘড় ঘড় করে আওয়াজ উঠছে। ফিস-ফিস করে বলল, 'যেতে বসেছেন ত'।'

—'হ্যাঁ।'

—'কতক্ষণ হ'ল এমন হয়েছে?'

—'জানি না। এইমাত্র আমার ঘুম ভাঙল।'

এ্যানি তাড়াতাড়ি একটা পোষাক পরে নিল। পলও কম্বল জড়ালো গায়ে। রাত তখন তিনটে। পল আগুনটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে জ্বালিয়ে তুলল। বসে বসে অপেক্ষা করতে লাগল দু'জনে। এক একবার ঘড়-ঘড় শব্দে শ্বাস টেনে নিচ্ছেন আবার কিছুক্ষণ পরে ছাড়ছেন। এবার একটা বড়ো রকমের ফাঁক। তারপর দু'জনেই চমকে উঠল। আবার শ্বাস টানার ঘড়-ঘড় আওয়াজ হচ্ছে। পল ভালো ক'রে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে দেখতে লাগল। এ্যানি বললে, 'উঃ, কী যন্ত্রণা!'

আবার দু'জনে নিরুপায় প্রতীক্ষায় বসে রাত কাটাতে লাগল। শ্বাস টানার এই শব্দ অনেকক্ষণ পর পর সারা বাড়িময় সাড়া জাগিয়ে তুলেছে। মিঃ মোরেল তার ঘরে ঘুমে অচেতন। পল আর এ্যানি ঘাড় গুঁজে নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। প্রতি মুহূর্তে মনে হতে লাগল, এই বুঝি শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়! তবু ফিরে ফিরে সেই ঘড়-ঘড় শব্দ। পল আবার উঠে গিয়ে ভালো করে দেখে এলো। বলল, 'কে জানে? হয়ত এমনি করেও আরো কত দিন বেঁচে থাকবেন।'

কথা বলতে কারুই ইচ্ছে করছিল না। পল জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে রইল। দেখল, বাগানে বরফের অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এ্যানিকে বলল, 'তুমি আমার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ো। আমি জেগে থাকব।'

এ্যানি বলল, 'কেন, আমিও থাকি না এখানে?'

—'না। তোমার থাকার দরকার নেই।'

কিছুক্ষণ পরে এ্যানি ঘর ছেড়ে চলে গেলে পল একাই বসে রইল। কম্বলখানা ভালো ক'রে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মায়ের বিছানার সামনে বসে সে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কী ভীষণ দেখাচ্ছে, মুখের নীচেটা যেন ভিতরের দিকে ঢুকে গিয়েছে। এক-একবার মনে হচ্ছে এই বুঝি শেষ নিঃশ্বাস। এই ভয়ঙ্কর প্রতীক্ষা আর সহ্য হয় না। তবু আবার তাকে কাঁপিয়ে সজোরে নিঃশ্বাস পড়ে। আবার পল আগুনটাকে নাড়াচাড়া দিয়ে জ্বালায়। শব্দ যেন না হয়, মা যেন জেগে না ওঠেন। এমনি ক'রে মুহূর্তগুলো সার বেঁধে চলতে থাকে। রাতের পালা ফুরিয়ে আসে। প্রত্যেক বার মায়ের নিঃশ্বাস পতনের শব্দে তার বুক মোচড় দিয়ে ওঠে, তারপর—ক্রমশঃ সেই তীব্র যন্ত্রণাও তার তীব্রতা হারিয়ে ফেলে। পলের চেতনা ক্ষীণ হয়ে আসে।

ভোর রাত্রে মোরেল জাগল। মোজা-জুতো পরে, শার্ট গায়ে এসে ঘরে ঢুকল। পল বলল, 'চুপ!'

মোরেল থমকে দাঁড়াল। নিরুপায়ের মত সভয়ে একবার চাইলে ছেলের দিকে। বলল, 'আজকের দিনটা বাড়িতেই থাকি, কি বল?'

—'না! তুমি কাজে যাও। উনি কাল অবধিও টিঁকে থাকবেন।'

—'আমার কিন্তু কেমন কেমন মনে হচ্ছে।'

—'ও কিছু নয়। আমার কথা শোন, কাজে যাও।'

মোরেল ভয়ে ভয়ে আর একবার চাইল স্ত্রীর দিকে। ছেলের কথা অবহেলা করতে পারল না। পল দেখল, লোকটা আজ মোজার ফিতেটা এঁটে দিতেও ভুলে গেছে।

আরও আধ ঘণ্টা এমনি ক'রে কাটল! তারপর পল নীচে গেল চা খেতে। ফিরে এসে বসেছে, তখন মোরেল খনির জামাকাপড় পরে এলো আবার। বলল, 'আমি যাব তা'হলে?'

—'হ্যাঁ, যাও।'

কয়েক মিনিট পরেই বরফের উপর দিয়ে ওর ভারী বুটের চলার শব্দ পলের কানে এলো। খনির মজুররা দল বেঁধে কাজে চলেছে, তারা এ-ওকে ডাকাডাকি করছে, সেই শব্দ দূর থেকে ভেসে আসে। এ দিকে সেই ভয়ঙ্কর শ্বাস টানার আওয়াজ, এর যেন আর বিরাম নেই। দূরে বরফের ওপারে লোহার কারখানার বাঁশী বাজছে। কয়লার খনিতেও মজুরদের ডাকার আওয়াজ হচ্ছে, কোনটা কাছে, কোনটা অনেক দূরে। তারপর সব শব্দ থেমে গেল। পল আরও কয়লা চড়িয়ে দিল আগুনে। চারি দিকের নীরবতাকে ভেদ করে কানে বাজতে লাগল শুধু শ্বাস টানার শব্দ। মায়ের মুখের কোন পরিবর্তন নেই। পল খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে বাইরের দিকে চাইল। এখনও আলো ফোটেনি। হয়ত একটুমাত্র আলোর রেখা দেখা দিয়েছে। বরফে হয়ত আকাশের রঙ ধরেছে। পল খড়খড়ি তুলে, দিয়ে পোশাকটা পরে নিল। তারপর বোতল থেকে খানিকটা ব্রাণ্ডি ঢেলে নিয়ে খেয়ে ফেলল। বাইরে বরফের বুকে সত্যিই নীল রঙের ছোঁয়া লেগেছে। রাস্তা দিয়ে ক্যাঁচর-ক্যাঁচর করে চলেছে একটা গরুর গাড়ি। রোদ উঠছে একটু-একটু ক'রে। লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে আবার। ঘুমন্ত পৃথিবী আবার জেগে উঠেছে। পল গ্যাসের আলো নিবিয়ে দিল। ঘরে তখনও অন্ধকার, তবু অভ্যস্ত চোখ ব'লে পলের মাকে দেখতে কোন অসুবিধা ছিল না। একই রকম রয়েছেন মা, সেই একই ধরণের শ্বাস টানার শব্দ উঠছে আর পড়ছে। কী করবে পল? একরাশ কাপড় এনে ওঁর বুকে চেপে ধরলে ওই ভয়ঙ্কর শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হবে কি? পল ভালো ক'রে চেয়ে দেখল। এ ত' তার মা নয়—কোন দিক দিয়েই এ তার মা নয়। এর বুকে এক বোঝা কাপড়-জামা চাপিয়ে যদি দেওয়া যায়···

হঠাৎ ঘরের দরজা খুলে গেল! এ্যানি ঘরে ঢুকল, জিজ্ঞাসু চোখে চাইল পলের দিকে। পল ধীর ভাবে বলল, 'একই রকম।'

দু'জনে ফিস-ফিস করে কথা বলল এক মিনিট। তার পর নীচে গিয়ে সকাল বেলার খাবার খেতে বসল। তখন আটটা বাজতে কুড়ি মিনিট বাকী। এ্যানির চোখ-মুখ বসে গেছে। সে বলল, কী ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে? আমার ত' ভয়ই করছে দেখতে!'

পল মাথা নেড়ে সায় দিল। এ্যানি বলল, 'ওই রকম চেহারা হয়ে যদি বেঁচে থাকেন তা'হলে ?'

পল বলল, 'চা খেয়ে নাও একটু।'

আবার উপরে গেল দু'জনে। একটু পরে প্রতিবেশীরা এসে ভয়ে-ভয়ে জিজ্ঞেস করতে সুরু করল, 'কেমন আছেন উনি ? কেমন আছেন তোমার মা ?'

কোন পরিবর্ত্তন আর নেই। তেমনি হাতের উপর গাল রেখে শুয়ে আছেন, মুখটা সম্পূর্ণ খুলে রয়েছে, আর তেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের বীভৎস শব্দ।

বেলা দশটায় নার্স এলো। দেখে তারও চক্ষুস্থির। পল বলল, 'দেখুন আপনি, এমন হয়ে আরও ক'দিন বাঁচবেন।'

'না, না, মিষ্টার মোরেল। এ হতে পারে না।'

একটু চুপচাপ। তারপর নার্স আবার ভেবে আক্ষেপ করে উঠল, 'কী সর্ব্বনাশ ! এমন যে শক্ত উনি কে ভেবেছিল ? আপনি এখন নীচে যান ত' মিষ্টার মোরেল।'

বেলা যখন প্রায় এগারোটা, তখন পল দোতলা ছেড়ে নীচে নামল। কিছুক্ষণ গিয়ে বসে রইল পাশের বাড়িতে। এ্যানিও নীচের তলায়। দোতলায় শুধু আর্থার আর নার্স। পল হাতের উপর মুখ রেখে চুপচাপ বসেছিল। হঠাৎ এ্যানি ছুটতে-ছুটতে এলো, অঙ্গিনা পেরিয়ে প্রায় পাগলের মত চেঁচাতে চেঁচাতে ছুটে এলো, 'পল পল, সব শেষ হয়ে গেছে !'

চক্ষের নিমেষে পল ছুটে এলো ও-বাড়ি থেকে একেবারে নিজেদের দোতলায়। মা তেমনি গুড়ি-সুড়ি হয়ে নিস্পন্দের মত শুয়ে রয়েছেন। মুখখানা ঠিক তেমনিই হাতের উপর। নার্স একখানা রুমাল দিয়ে পুঁছিয়ে দিচ্ছিল মুখখানা। সবাই শয্যা থেকে কয়েক পা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। পল একেবারে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল শয্যার পাশে, মায়ের মুখে মুখ রেখে দুই বাহু দিয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল, বার বার কানের কাছে বলতে লাগল, 'মা গো, মা—সোনা আমার !'

তার পর তার কানে এলো পেছন থেকে নার্স কাঁদছে আর বলছে 'এই ভালো হ'ল মিষ্টার মোরেল ! যন্ত্রণার চেয়ে এ ঢের ভালো।'

পল যখন মায়ের ঈষৎ উষ্ণ সদ্যমৃত দেহ থেকে মুখ তুলল, তখন আর কোন দিকে না চেয়ে সোজাসুজি সে চলে গেল নীচু তলায়। গিয়ে জুতোয় কালি মাখাতে সুরু করল।

কত কাজ এখন। চিঠিপত্র লেখা, এখানে-ওখানে দৌড়ান। ডাক্তার এসে একবার দেখলেন। সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, 'আহা, কী যন্ত্রণাটাই পেয়েছেন বেচারী ! তা মিষ্টার মোরেল, আপনি ছ'টার সময় আমার দোকানে গিয়ে সার্টিফিকেটটা নিয়ে আসবেন।'

বাপ বাড়ি ফিরে এলো চারটের সময়। চুপচাপ বাড়িতে ঢুকে সে খাবার-টেবিলে গিয়ে বসল। মিনি খাবার সাজিয়ে দিল ঝটপট্। ক্লান্ত হয়ে মোরেল হাত ঝুলিয়ে দিল চেয়ারের দু'পাশে। সামনে নরম শালগম, তার প্রিয় খাবার। পল মনে মনে আশ্চর্য্য হ'ল।

এতক্ষণ হয়ে গেছে, কেউ ওকে বলে নি। শেষ পর্য্যন্ত সে নিজেই জিজ্ঞেস করল, 'জানালার খড়খড়িগুলোর দিকে চেয়ে দেখেছেন আজ? দেখেছেন বন্ধ যে?'

মোরেল চম্‌কে চাইল। বলল, 'না। কেন? ও কি নেই?'

—'না।'

—'কখন হ'ল?'

—'আজ দুপুরের একটু আগে।'

—'হুঁ।'

মোরেল এক মুহূর্ত্ত নিস্পন্দ হয়ে বসে রইল। তারপর খেতে সুরু করল, যেন কোন কিছু হয় নি। বিনা বাক্যব্যয়ে শালগমগুলিকে সে খেয়ে নিল। তারপর গা ধুয়ে দোতলায় গেল পোশাক বদলাতে। দেখল, ওর ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ।

নীচে নেমে এলে এ্যানি বলল, 'মাকে দেখে এলে, বাবা?'

'না।' ব'লে মোরেল খানিকক্ষণ পরে বেরিয়ে গেল। এ্যানি চলে গেল তার নিজের বাড়িতে। পল ঘুরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। পাদ্রী, পুরুত, ডাক্তার, শববাহক প্রভৃতি সবাইকে খবর দিতে হ'ল। বাড়ি ফিরল রাত আটটায়। শববাহক বলেছে একটু পরেই শবাধারের মাপ নিতে আসবে। বাড়ি একেবারে ফাঁকা, শুধু দোতলায় মায়ের দেহ। পল একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে উপরে উঠল।

এতদিন যে ঘরে সর্ব্বদা আগুন জ্বালা থাকত, আজ সে ঘর একেবারে ঠাণ্ডা। ফুলদানি, শিশি, বোতল, পেয়ালা পিরিচ—রোগীর ঘরের সব সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সব কেমন রুক্ষ, শ্রীহীন বলে মনে হয়। মা শুয়ে আছেন শয্যার উপর। পায়ের কাছে চাদরটি ঈষৎ তোলা, দেখে মনে হয় যেন ঢেউ-খেলানো শাদা তুষার—ঠিক তেমনি নিস্পন্দ, নিঃসাড়। মা শুয়ে আছেন ঘুমন্ত রাজকন্যার মত। মোমবাতিটি হাতে নিয়ে পল ঝুঁকে পড়ে তাঁকে দেখতে লাগল—যেন একটি মেয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার প্রেমের স্বপ্ন দেখছে। মুখটা একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে, মনে হয় যেন সারা জীবন আঘাতের পর আঘাতে তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। কিন্তু চোখে, ভুরুতে, কপালে, কোথায়ও বিন্দুমাত্র কালিমা নেই, জীবনের স্পর্শও যেন এদের লাগেনি। আবার পলের চোখে পড়ল মায়ের ভুরু দু'টি, দেখল ছোট্ট নাকটি এক পাশে একটু হেলে পড়েছে। যৌবন যেন ফিরে এসেছে মায়ের। কেবল চুলগুলি মাঝে মাঝে রূপোলী কপালের পাশ থেকে উঁচু হয়ে উঠে গেছে, আর ছোট্ট দু'টি বেণী কাঁধের পাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। এখুনি যেন জেগে উঠে বসবেন মা, এখুনি চোখ খুলে চাইবেন। এখনও মা তাকে ছেড়ে যান নি। পল গভীর আবেগ ভরে মায়ের মুখে চুম্বন করল। কিন্তু এ যে হিমের স্পর্শ! আতঙ্কে পল দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। মায়ের দিকে চেয়ে তার মন হু-হু করে উঠল, কেমন ক'রে তাঁকে ছেড়ে সে বাঁচবে! কিছুতেই সে যেতে দেবে না মাকে। কিছুতেই নয়। পল মায়ের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কপালের পাশটিও হিমের মত ঠাণ্ডা। মুখখানা নির্ব্বাক্, এই আচমকা আঘাতে ওঁর বিস্ময়ের যেন সীমা নেই। পল মেঝের উপর বসে পড়ে ডেকে উঠল, 'মা, মা গো!'

শববাহকেরা যখন এলো তখনও পল মায়ের পাশে বসে। বাহকদের সবাই কমবয়সী, পলের সহপাঠী। তারা ধীরে ধীরে সসম্মানে পলের মায়ের দেহ স্পর্শ করল। পল মায়ের দেহ কাউকে দেখতে দিতে চায় নি। এ্যানি আর সে দু'জনে সযত্নে আগলে রইল মাকে। প্রতিবেশীরা দেখতে এসে ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেল।

আরও কিছুক্ষণ পরে পল বাড়ি থেকে বেরিয়ে এক বন্ধুর বাড়ি গিয়ে তাস খেলতে বসল। যখন ফিরল তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। বাপ বিছানা ছেড়ে উঠে এলো ওর আসার শব্দ শুনে। অনুযোগের সুরে বলল, 'এত দেরি করে এলে তুমি? আমি ত' ভাবলুম আর বুঝি এলেই না।'

পল বলল, 'তুমি জেগে বসে রয়েছ কেন? আমি ত' ভাবিও নি তুমি জেগে বসে থাকবে?'

মোরেলকে উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে। যে লোকটি কোনদিন কাউকে ভয় করেনি, আজ একা বাড়িতে একটি মৃতদেহের সান্নিধ্যে থাকবার ভয়ে সে ঘুমতে পারছে না। পল ব্যাপারটা বুঝতে পারল। বলল, 'আমি ভুলে গিয়েছিলুম বাবা! তুমি যে একা বাড়িতে রয়েছ, সে কথা মনেই ছিল না আমার।'

মোরেল বলল, 'কিছু খাবে ত'?'

'না, খাব না আমি।'

'তা কি হয়? বসো, তোমার জন্যে দুধটুকু গরম করে রেখে দিয়েছি। আলমারী থেকে নিয়ে এসো।'

পল দুধ এনে খেয়ে ফেলল। বলল, 'কাল আমাকে নটিংহামে যেতেই হবে।' আর একটু বসে থেকে মোরেল শুতে গেল। স্ত্রীর ঘরের বন্ধ দরজার পাশ দিয়ে হন্‌হন করে পার হয়ে গেল, নিজের ঘরের দরজা রাখল খুলে। একটু পরে পলও এলো উপরে। বরাবরের মত আজও পল-মা'কে রাত্রির বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গেল। ঘরটি ঠাণ্ডা, অন্ধকার। পল ভাবল, ঘরের আগুনটা এখনই নিবিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। এখনও মা হয়ত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তাঁর যৌবনের স্বপ্ন ফিরে ফিরে দেখছেন। এই ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সারা শরীর যে হিম হয়ে যাবে!

সকালবেলা মোরেলের সাহস ফিরে এলো। নীচে এ্যানির সাড়া পাওয়া যাচ্ছে, সিঁড়িতে পলের কাশির আওয়াজ শুনে মোরেলের হারানো সাহস জেগে উঠল আবার। দরজা খুলে সে স্ত্রী যেখানে শুয়ে আছে, সেই অন্ধকার ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। প্রদোষের আলোকে দেখল, শুভ্র বস্ত্রে ঢাকা একটি মূর্ত্তি, কিন্তু মুখোমুখি যেতে তার সাহস হ'ল না। দেখে মোরেল কেমন হকচকিয়ে গেল। তার সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অবশ হয়ে এলো, কোন মতে ঘর ছেড়ে বাইরে পালিয়ে এসে সে বাঁচল। আর কোন দিন ফিরেও গেল না। এ ক'মাস মোরেল এক দিনের জন্যেও স্ত্রীর মুখের দিকে মুখ তুলে চাইতে পারেনি। আজ মনে হ'ল, ও যেন আবার তার ক'নে বৌটি হয়ে ফিরে এসেছে।

সকালে খাবার টেবিলে বসে এ্যানি ফস্ ক'রে জিজ্ঞেস করে বসল, 'তুমি মাকে দেখতে গিয়েছিলে, বাবা?'

—'গিয়েছিলুম।'

—'কী সুন্দর, দেখেছ?'

—'হুঁ।'

আর বেশী দেরি না করে মোরেল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল।

পলকে নানা কাজে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। নটিংহামে গিয়ে ক্লারার সঙ্গে দেখা হ'ল। দু'জনে চা খেতে গেল একটা দোকানে। সেখানে

দু'জনেই মন খুলে কথাবার্ত্তা বলল আজ। পল যে মায়ের মৃত্যুকে খুব বেশী শোকাবহ বলে গ্রহণ করেনি, এতে ক্লারা মনে মনে সান্ত্বনা পেল।

তারপর শবযাত্রায় যোগ দিতে আত্মীয়-স্বজন দলে দলে আসতে লাগল। তখন ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়াল সামাজিক, ছেলে-মেয়েরাও সকলের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হ'ল। নিজেদের চিন্তা-ভাবনাগুলোকে আপাততঃ বিসর্জ্জন দিতে হ'ল তাদের। যখন শবাধার বহন করে নিয়ে যাওয়া হ'ল, সে সময়টা উঠল তুমুল ঝড়বৃষ্টি। রাস্তার ভিজে মাটি চকচক করে উঠছে, শাদা ফুলগুলো জলে ভিজে একাকার। এ্যানি পলের হাত ধরে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগল। নীচে উইলিয়মের জীর্ণ শবাধারের একটি কোণ চোখে পড়ল তার। 'ওক্' কাঠের তৈরী নতুন কফিনটিও আস্তে আস্তে মাটির গর্ভে নেমে গেল। মায়ের সব চিহ্ন আজ থেকে অবলুপ্ত। বৃষ্টির ধারা কবরটির উপর অবিরল ঝরে পড়ছে। সব লোকজন সারি সারি ছাতামাথায় বাড়ি ফিরে এলো, শুধু মুষলধারে বৃষ্টি পড়ে সেই বিজন সমাধিক্ষেত্রটি ক্রমাগত ভিজে যেতে লাগল।

বাড়ি গিয়ে পল সব বন্ধু-বান্ধবদের পানীয় বিতরণ করল। মোরেল রান্নাঘরে বসে স্ত্রীর বাপের বাড়ির লোকদের সঙ্গে অপেক্ষা করছে আর বলছে, কী চমৎকার মেয়েই না ও ছিল! স্ত্রীর জন্যে যথাসাধ্য সে করেছে, স্ত্রীর মুখের জন্যে সারাজীবন সে খেটেছে, সে দিক দিয়ে নিজেকে অনুযোগ দেবার তার কিছু নেই। শেষ সময়েও যথেষ্ট করে দিয়েছে সে। শাদা রুমালটি বের করে মোরেল চোখ মুছল। বার বারই শুধু বলতে লাগল, না—স্ত্রীর জন্য সে যথাসাধ্য করেছে, নিজের উপর দোষারোপ করবার মত সে কোন দিন কিছু করেনি।

এমনি করেই মোরেল স্ত্রীর বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করছিল। সোজাসুজি একটা জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষ হিসাবে স্ত্রীকে দেখবার চেষ্টা সে কোন দিন করেনি, আজও করতে পারল না। নিজের মনের গভীরতম প্রদেশে সে একবারও ফিরে চাইল না। বসে বসে শুধু সস্তা কাঁদুনি গাইতে লাগল। শুনে পলের মন ঘৃণায় রী-রী করে উঠল। ভাবল, এমনি করে ও মদের দোকানেও গেয়ে গেয়ে বেড়াবে। কিন্তু মুখে যাই বলুক, মোরেলের মনে মনে গভীর ভাঙনের খেলা চলছিল। একদিন বিকেলবেলা ঘুম থেকে মোরেল উঠল ধড়মড়িয়ে, মুখের সব রক্ত তার শুকিয়ে গেছে, বলল, 'আমি স্বপ্ন দেখছিলুম—দেখছিলুম, তোমার মাকে।'

পল বলল, 'তাই নাকি। আমিও দেখি মাঝে মাঝে, ঠিক যেমনটি ছিলেন তেমনি দিব্যি ফুটফুটে চেহারা। একটুও ত' কোথাও পরিবর্ত্তন দেখিনি।'

কিন্তু মোরেল ভয়ে গুটিসুটি মেরে আগুনের সামনে গিয়ে বসে রইল।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যায়। দিনগুলো যায় যেন ঘুমের মধ্যে দিয়ে, পুরোপুরি তাদের ধরা-ছোঁয়া যায় না। বেদনার তার অতি সামান্যই অবশিষ্ট রয়েছে, সবই কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। এরই মধ্যে মাঝে মাঝে একটু যেন স্বস্তির ভাব জাগে, তা হলেও বেশীর ভাগ সময়ই কাটে একটা ধূ-ধূ রিক্ততা বুকে নিয়ে। পল উদভ্রান্তের মত এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। আজ ক'মাস হ'ল, মায়ের অবস্থা খারাপ হবার পর থেকেই পল আর ক্লারার সঙ্গে আগের মত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতে পারেনি। তার কানে ক্লারার বাণী যেন আর সাড়া জাগায় না, ক্লারা যেন অনেক দূরে তার থেকে। ডয়েসের সঙ্গে ক্লারার দেখা হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু দু' জনের ব্যবধান এত দিনে এক বিন্দুও কমেনি। এরা তিন জনে যেন অদৃশ্য নিয়তির টানে দিশেহারা হয়ে ভেসে চলেছে।

ডয়েস সেরে উঠছিল খুব আস্তে আস্তে। বড়দিনের পর্ব্বের সময় ডয়েস ছিল স্কেগনেস-এর স্বাস্থ্যনিবাসে; তখন তার শরীর প্রায় সুস্থ হয়ে এসেছে। পল কয়েক দিনের জন্যে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিল, বাপ ছিল শেফিল্ডে এ্যানির কাছে। এ দিকে ডয়েস-এর স্বাস্থ্যনিবাসে থাকবার মেয়াদ ফুরিয়ে গেল। সে উঠে এল পলের আস্তানায়। এই দু'টি লোকের মধ্যে এত বড় ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও এরা কী করে যেন পরস্পারের উপর নির্ভর করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল।

খৃষ্টমাস-এর দু' দিন পরে পল নটিংহাম-এ ফিরে যাবে। আগের দিন সন্ধ্যায় আগুনের সামনে বসে চুরুট মুখে নিয়ে ডয়েসের সঙ্গে পল গল্প করছিল। বলল, 'তোমাকে বলেছি বোধ হয়, ক্লারা কাল আসছে। কাল দিনটা থাকবে এখানে।'

ডয়েস চমকে চাইল। বলল, 'হ্যাঁ, বলেছিলে বটে।' শুনে ডয়েস যেন এতটুক হয়ে গেল। নিরুপায়ের মত বলল, 'তাই বলেছ বুঝি?' তার পর ফট্ করে দাঁড়িয়ে উঠে পলের গ্লাসটার দিকে হাত বাড়াল। পল বলল, 'দাঁড়াও আমি ভরে দিচ্ছি।' বলে সেও উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুমি বসে থাকো।'

ডয়েস বারণ শুনলো না। তার হাত কাঁপছে, তবু সে মদ ঢালতে লাগল। জিজ্ঞেস করল, 'কখন আসছে?'

পল বলল, 'তার দরকার নেই। অত সকালে তোমায় উঠতে হবে না।'

—'কেন? সকালে ওঠা ভালো আমার পক্ষে। তাতে শরীর সেরে উঠেছে বলে মনে হয়।'

—'সেরে উঠেছে বই কি, আর একটু সেরে উঠলেই হ'ল।'

—'হ্যাঁ, হ্যাঁ, জানি আমি সেরে উঠেছি।' ডয়েস বলল মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে।

পল বলল, 'লিওনার্ড' বলছিল শেফিল্ডেই তোমার কাজের যোগাড় করে দিতে পারবে।'

ডয়েস আবার চাইল ওর দিকে। ওর মতে সায় না দিয়ে তার যেন আর উপায় নেই। পল বলল, 'আবার নতুন ক'রে সব শুরু করা। ভাবতেও যেন কেমন লাগে। তা'হলেও তুমি অনেক ভালো আছ। আমার অবস্থা আরও জটিল।'

'কোন দিক দিয়ে শুনি?'

'তা জানি না। জানবার উপায়ও নেই। আমি যেন একটা অন্ধকার গোলকধাঁধার মধ্যে পথ হাতড়ে বেড়াচ্ছি, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে, বেরিয়ে আসবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।'

ডয়েস সায় দিল ওর কথায়। বলল, 'জানি আমি। সবই বুঝি। তা'হলেও শেষ পর্য্যন্ত দেখো সব ঠিক হয়ে যাবে।' সান্ত্বনার সুর ওর কথায়।

পল বলল, 'হয়ত হবে।'

ডয়েস বেপরোয়ার মত পাইপটা মাটিতে ঠুকল দু'একবার। বলল, 'তুমি আর কতটুকু কষ্ট পেয়েছ? ঢের ঢের বেশী ভুগেছি আমি।' [ক্রমশঃ

অনুবাদক—শ্রীবিশু মুখোপাধ্যায় ও শ্রীধীরেশ ভট্টাচার্য্য



পক্ষধর মিশ্র

সম্প্রতি একটি সংবাদে পৃথিবীর বিজ্ঞানী-মহলে নতুন করে জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। আগামী বছরের কোন সময়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করবেন। মহাকাশের বুকে চন্দ্রের এক প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হবে।

মহাশূন্যের বুকে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন, মানুষের মহাকাশ বিজয়ের চেষ্টার প্রথম সাফল্য। একটি বিশেষ কক্ষপথে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে এই উপগ্রহ বিভিন্ন প্রকার পর্য্যবেক্ষণের মাধ্যমে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সম্প্রসারিত করবে। এই ভাবে প্রথমে মানুষ মহাশূন্যের সঙ্গে পরিচিত হবে, তার পর তার শূন্যযান যাত্রা করবে চন্দ্রে, মঙ্গলে ও অন্যান্য গ্রহে-উপগ্রহে। মহাশূন্যযান সমূহকে জ্বালানী সরবরাহও এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলির অন্যতম প্রধান কাজ। স্টেপ রকেটের সাহায্যে এদের সজোরে ছুঁড়ে দেওয়া হবে মহাকাশের বুকে; কক্ষপথে পৌঁছে দিয়ে রকেটগুলির দায়িত্ব হবে সারা, তারা খসে পড়বে আর নতুন উপগ্রহ আপন পথে সুরু করবে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে। মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই,—সে মনে করে, এক দিন এই ভাবেই স্থাপিত মহাকাশের এক বিরাট উপগ্রহ থেকে গ্রহান্তরে অনেক সহজে যাত্রা করা হয়তো সম্ভব হবে। পৃথিবী থেকে মহাশূন্যের যে কোন অঞ্চলের দূরত্বের তুলনায় আবহাওয়া মণ্ডলের পরিধি খুবই কম হওয়া সত্ত্বেও, মহাকাশযাত্রীর এই সামান্য অংশটুকু পরিভ্রমণ করতেই সব চেয়ে বেশী সামর্থ্য ব্যয় হয়। তাই অনেকেরই ধারণা, উপগ্রহ থেকে যাত্রা করলে মানুষ অনেক সহজে গ্রহান্তরে উপস্থিত হতে পারবে। বিরাট কৃত্রিম উপগ্রহ কবে নির্মাণ করে কার্য্যকরী করা সম্ভব হবে জানি না। তবে কক্ষপথে আবর্ত্তনশীল, ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপগ্রহ যে অতি শীঘ্রই মহাকাশে স্থাপন করা হবে, এ বিষয়ে আজকের বিজ্ঞানী মহল স্থিরনিশ্চিত।

বিজ্ঞানী দল কৃত্রিম উপগ্রহের একটি চমৎকার নক্সা করেছেন। উপগ্রহটিতে কর্মচারী থাকবে ২৪ জন, এবং এদের এক বছরের খাবার, বাতাস, জল ইত্যাদি অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তুসমূহ নিয়ে মোট ওজন হবে ৭০ টন। উপগ্রহটির মধ্যস্থলে প্রায় ২০০ ফিট ব্যাসার্দ্ধের একটি গোলাকার আয়না থাকবে। আয়নাটি সূর্য্যালোক থেকে উত্তাপ সংগ্রহ করবে এবং সেই উত্তাপ পরিবর্ত্তিত হবে বিদ্যুৎ শক্তিতে। সেখানে মাধ্যাকর্ষণের বিহীন এক অভিনব পরিস্থিতির হবে উদ্ভব যার সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের পরিচয় নেই, তাই উপগ্রহটিকে তার নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘূরপাক খাইয়ে কৃত্রিম মাধ্যাকর্ষণযুক্ত এক পরিবেশও রচনা করা হবে। বর্ত্তমানে এই উপগ্রহের প্রধান কাজ পর্য্যবেক্ষণ করা,—মহাকাশ ও পৃথিবী এই উভয় দিকই তার দৃষ্টির সামনে থাকবে। উপগ্রহটি থেকে সর্ব্বদাই কম কোরেও অর্দ্ধেক পৃথিবী যাবে দেখা, আর মহাকাশ তো মাথার উপরেই। পৃথিবী থেকে মহাশূন্য পর্য্যবেক্ষণের অসুবিধা অনেক, আবহাওয়া মণ্ডলের আবরণ নানা প্রকার ভুলভ্রান্তি সৃষ্টি করে, তাই কৃত্রিম উপগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত পর্য্যবেক্ষণ-মন্দির বহু প্রকার অজানা রহস্যের সন্ধান দেবে। ঐ পর্য্যবেক্ষণ—মন্দিরের কাছে মহাজাগতিক রশ্মির রহস্য-ভাণ্ডার হবে উদ্ঘাটিত, সূর্য্যালোক ও অন্যান্য রশ্মিসমূহের যে সব অংশ আবহাওয়া মণ্ডলের ঘন আবরণ ঠেলে পৃথিবীর বুকে পৌঁছোতে পারে না, মানুষ তাদের পরিচয় পাবে।

সংবাদ সরবরাহের প্রয়োজনে টেলিভিসনের গুরুত্ব খুবই বেশী কিন্তু ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য এর প্রচারের সীমানা খুবই ছোট। টেলিভিসনের মাধ্যমে সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করতে চাইলে মাত্র ৫০ মাইল অন্তর অন্তর এর পুনরাবৃত্তিকারক সাজসরঞ্জাম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এর খরচও বেশী, তা'ছাড়া এর সাহায্যে খুব দূরে সংবাদ বহন করে নিয়ে যাওয়া সহজ কাজ নয়। টেলিভিসনের সংবাদ সমুদ্র পার করে অন্য দেশে নিয়ে যাওয়া তো দুর্লঙ্ঘ্য মনে হয়। কিন্তু কৃত্রিম উপগ্রহের বুকে একটি মাত্র প্রেরণ-যন্ত্র স্থাপন করলে প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবীতে টেলিভিসন সংবাদ প্রেরণ করা যাবে। অনেক বিজ্ঞানীর মতে বিষুব-রেখার উপর কোন কক্ষপথে ১২০ ডিগ্রী অন্তর তিনটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে, একটিতে প্রেরক-যন্ত্র এবং অন্য দুটিতে পুনরাবৃত্তিকারক যন্ত্র বসিয়ে সারা দুনিয়ার টেলিভিসন সংবাদ প্রেরণ করা অনায়াসেই সম্ভব। এর ফলে আর্থিক দিক দিয়ে মানবসভ্যতা কতোখানি লাভবান হবে, তা কল্পনা করে দেখুন। দুনিয়ার বুকে একযোগে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব হলে লক্ষ লক্ষ রেডিয়ো এবং টেলিগ্রাফ বার্তা প্রেরণের কেন্দ্র যাবে উঠে; কোটি-কোটি গজ তার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতির ঘটবে সাশ্রয়। অবশ্য কাজটা যে খুব সহজ হবে তা নয়, প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে উচ্চাকাশের আয়নমণ্ডলের রীতি ও প্রকৃতি বিষয়ে গবেষণা চালিয়েই এই কল্পনার সম্ভাব্য সাফল্যের হদিশ মানুষ পাবে। সঠিক ভাবে টেলিভিসন সংবাদ প্রেরণের জন্য, উপগ্রহটির এক বার আবর্ত্তনের সময়,—নিজ অক্ষে পৃথিবীর একবার ঘূর্ণনের সময়ের সঙ্গে ঠিক এক হওয়া প্রয়োজন। হিসাব করে দেখা গিয়েছে, ভূপৃষ্ঠের ২২০০০ মাইল উর্দ্ধের কক্ষপথে যদি কৃত্রিম উপগ্রহটি স্থাপন করা যায় তাহ'লে মোটামুটি উভয় আবর্ত্তনেরই সময় এক রকম হবে।

● ● ● ●

আর দেরি নেই—১৯৫৭ সালের যে কোন সময়ে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা মহাশূন্যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করবেন। ফ্লোরিডার একটি অঞ্চলে টেপা হবে বোতাম আর তার সঙ্গে বিজ্ঞানীদের পরিকল্পনার পথ অনুসরণ করে মহাকাশের বুকে স্থাপিত হবে মানুষে-গড়া উপগ্রহ। সোবিয়েত দেশেও বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী পিটার ক্যাপিটজার নেতৃত্বে কৃত্রিম উপগ্রহ নির্মাণ ও স্থাপনের চেষ্টা করা হচ্ছে, কিন্তু তাঁদের কার্যকলাপের সঠিক কিছু সংবাদ এখনও প্রকাশিত হয় নি। আমাদের মার্কিণী চন্দ্রের ব্যাস হবে ২ ফুটের কাছাকাছি, ওজনও খুব বেশী নয়। পৃথিবীর বুকে একে অক্লেশে আপনি কাঁধে করে নিয়ে বেড়াতে পারবেন, কিন্তু মহাকাশের কক্ষপথে স্থাপন করবার জন্য প্রয়োজন হবে অসাধারণ ক্ষমতাশালী রকেটের।

বিরাট এই ষ্টেপ রকেট—নাম ভ্যানগার্ড, নাকের ডগায় ছোট উপগ্রহটিকে বেঁধে নিয়ে প্রচণ্ড তিনটি রকেট ছুটে সে পরিকল্পিত কক্ষপথে পৌঁছে যাবে। তিন ষ্টেজ এই রকেটের,—প্রথম রকেটটিই সব চেয়ে শক্তিশালী। এর জ্বালানী হলো এ্যালকোহল আর পেট্রোলের একটি সংমিশ্রণ, উচ্চাকাশে নির্ব্বিবাদে দহনক্রিয়া চালাবার জন্য, সঙ্গেই একটি অক্সিজেনের আধার বহন করে নিয়ে যাওয়া হবে। ঘণ্টায় ৩—৪ হাজার মাইল গতিবেগে যাত্রা করে প্রায় ৩০—৪০ হাজার মাইল উঁচুতে প্রথম রকেটটির কাজ হবে শেষ। মূল ষ্টেজ রকেটের দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে তখন ঝাঁপ দেবে মহাসমুদ্রে, সুরু হবে দ্বিতীয় রকেটটির কার্য্যকলাপ। ইতিমধ্যেই উপগ্রহটির পথ চক্রবালের দিকে হেলে পড়েছে। দ্বিতীয় পর্য্যায়ের রকেটটি যাত্রা করবে ঘণ্টায় ১১ হাজার মাইল গতিবেগে, এর জ্বালানী হবে হাইড্রাজিন ও নাইট্রিক এ্যাসিডের একটি সংমিশ্রণ এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩০০ মাইল উঁচুতে, তৃতীয় পর্য্যায়ের রকেটের হাতে উপগ্রহটির দায়িত্বভার দিয়ে সে খসে পড়বে। কোন কঠিন বিস্ফোরকের দহনক্রিয়ার সাহায্যে ষ্টেজ রকেটটির তৃতীয় পর্য্যায়ের যাত্রা হবে সুরু, গতিবেগ ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল ; পরিকল্পিত কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহটিকে পৌঁছে দিয়ে নিজে সে হারিয়ে যাবে মহাশূন্যে।—এই বিরাট পরিকল্পনাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য আমেরিকার নৌবিভাগীয় গবেষণা-মন্দিরের বিজ্ঞানিবৃন্দ আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টার অন্যতম পরিচালক বিজ্ঞানী মিল্টন রোজেন কিন্তু সাফল্যের বিষয়ে দৃঢ়নিশ্চিত নন। শেষ পর্য্যায়ের গতিবেগের উপরেই সব কিছু নির্ভর করছে। গতিবেগ জোরে হলে উপগ্রহটি মহাকাশে হারিয়ে যাবে,—আস্তে হলে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসতে গিয়ে আবহাওয়া মণ্ডলের ঘর্ষণে পুড়ে হয়ে যাবে ছাই। আমেরিকার ন্যাশনাল অ্যাকাডামি অফ সায়েন্সেস্ তাই ১২টি ভ্যানগার্ড রকেট নির্ম্মাণ করতে চান—১২ বারের চেষ্টায়, আশা করা যায় মানুষ একাধিক উপগ্রহ স্থাপন করতে সমর্থ হবে।

মহাকাশের কৃত্রিম উপগ্রহকে সারা দুনিয়া থেকে পর্য্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বিশেষ ভাবে নির্ম্মিত যন্ত্রসমূহ ঐ উপগ্রহের উচ্চতা, অবস্থিতি, গতি ও কক্ষপথ নির্দ্ধারণে তৎপর হবে। উপগ্রহটির মধ্যে অবস্থিত স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রসমূহ প্রেরণ করবে বেতার-তরঙ্গ, যার সাহায্যে মহাকাশের বহু অজানা তথ্যের আমরা সন্ধান পাব। উপগ্রহটি হারিয়ে যাবারও ভয় আছে, তাই সমগ্র বিশ্বের বহু প্রতিষ্ঠান ও সখের আকাশ-পর্য্যবেক্ষণকারীরা এর দিকে বিশেষ নজর রাখবেন। ভারতবর্ষের অমৃতসহর, দিল্লী, পুণা, কোদাইকানাল ও দেরাদুন থেকে পর্য্যবেক্ষণ চালান হবে। সূর্য্যাস্তের ঠিক পরেই, সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোতে অতি সাধারণ দূরবীণের সাহায্যেই এই কৃত্রিম উপগ্রহ দেখা যাবে, বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রখর দৃষ্টিসম্পন্ন কোন কোন লোকের পক্ষে খালি চোখেই একে দেখা সম্ভব হতে পারে।

প্রাচীন চন্দ্রের ঈর্ষার কারণ হয়ে মানুষে-গড়া এই ক্ষুদ্র চন্দ্র আকাশের মাঝে কতো দিন বিরাজ করবে তা সঠিক ভাবে বলা কঠিন। সব কিছুই নির্ভর করছে কক্ষপথের আবহাওয়ার ঘনত্বের

উপর। ঘনত্ব বেশী হলে, আবহাওয়ার ঘর্ষণে গতিবেগ তাড়াতাড়ি কমে যাবে এবং উপগ্রহটি পড়বে খসে। পরিকল্পনা মতো ঠিক ভাবে কাজ হলে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, প্রায় এক বছর ধরে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে অবস্থান করবে। অবস্থানের সময় গণনা করেই কক্ষপথের আবহাওয়ার ঘনত্ব পরিমাপ করা সম্ভব হবে।

বিরাট উপগ্রহ যা মহাশূন্যযানকে জ্বালানী সরবরাহ করবে; যার মধ্যে নির্ম্মিত হবে মহাকাশ পর্য্যবেক্ষণের বিশাল মন্দির—তার পথ-প্রদর্শক হলো এই ক্ষুদ্র কৃত্রিম শূন্যচারী দেহ। এর সাহায্যে আমরা পৃথিবীর প্রকৃত আকারের পাব সঠিক পরিচয়। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের ঘনত্ব বিভিন্ন প্রকার, বিজ্ঞানীরা আশা করেন মহাকাশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থানের সময় উপগ্রহটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ পরিমাপ করে, ভূপৃষ্ঠের নানা অঞ্চলের ঘনত্ব হিসাব করা যাবে।

প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি, অতি সাধারণ ভাবে প্রাথমিক পর্য্যবেক্ষণ সুরু করে, মানুষকে মহাবিশ্ব রহস্যের এক অতুলনীয় জ্ঞানভাণ্ডারের সন্ধান দেবে।

জেমস্ ওয়াট

গল্প আছে,—ছোট ছেলে জেমস ওয়াট ঘুম ভেঙ্গে দেখলো উনুনের উপর কেটলীতে জল গরম হচ্ছে আর গরম জলের বাষ্পের ধাক্কায় কেটলীর ঢাকনিটা বারে বারে উঠছে নড়ে। কৌতূহলী ছেলে মাকে প্রশ্ন করে,—'মা, কেটলীর ঢাকাটা নড়ছে কেন? কি আছে এর মধ্যে?' বাষ্পশক্তির কথা তখনকার দিনে জানা ছিল না, তাই মা উত্তর দিলেন এর মধ্যে শয়তান লুকিয়ে আছে।

এই ছোট্ট ছেলেই ভবিষ্যৎ জীবনে বাষ্পশক্তির স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন,—মানব-সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে এই মহামঙ্গলদায়ক আবিষ্কার সূচনা করে এক নতুন যুগের। এই শক্তির কৃপায় মানুষ জলেতে লাভ করে বাষ্পীয় পোত, স্থলেতে চলে ইঞ্জিন—পৃথিবীর দূরত্বের সীমানা আসে সঙ্কুচিত হয়ে।

১৭৩৬ সালের, ১৯শে জানুয়ারী বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট, স্কটল্যাণ্ডের 'গ্রীননকে' জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি যন্ত্রপাতী ও কলকব্জার ব্যবহারে অসাধারণ নিপুণ ছিলেন এবং ইস্কুলেতে গণিত ও জ্যামিতির সেরা ছাত্র বলে তার খুবই সুনাম ছিল। স্কুল থেকে পাশ করে বার হয়ে আসার পর তিনি ব্যবসা সংক্রান্ত পড়াশুনার জন্য লণ্ডনে আসেন। ছেলেবেলা থেকেই জেমস ওয়াটের স্বাস্থ্য ছিল খুবই খারাপ, তাই লণ্ডনের কুয়াসাচ্ছন্ন আবহাওয়া তাঁর সহ্য হল না, তিনি গ্লাসগোতে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

গ্লাসগোতে তিনি যন্ত্রনির্ম্মাতার ব্যবসা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর কর্ম্মশালার মধ্যেই বাষ্পশক্তি নিয়ে সুরু হলো গবেষণা। কি করে বাষ্পশক্তিকে কাজে লাগিয়ে অব্যাহত গতিসৃষ্টি করা যায় তাই ওয়াটের একমাত্র সাধনা ছিল। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত তিনি অবিচ্ছিন্ন কাজ পাওয়ার মতো একটি বাষ্পীয় ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করতে সমর্থ হলেন। কিছু দিনের মধ্যে জেমস ওয়াটের প্রদর্শিত এই পথ অনুসরণ করে অন্যান্য বিজ্ঞানীরা রেলওয়ে ইঞ্জিন নির্ম্মাণ করেন। বিজ্ঞানী ওয়াট অত্যন্ত উত্তপ্ত বাষ্পের প্রকৃতি ও গুণাগুণ বিষয়ক গবেষণাও করেছিলেন।

যন্ত্রনির্ম্মাতারূপে ওয়াটের বিজ্ঞান-জগতে অন্যান্য দানও খুবই উল্লেখযোগ্য। তিনি নানাপ্রকার গ্যাস প্রস্তুত করবার জন্য বহু রকম কাচের যন্ত্রপাতীর নক্সা করেন। তরল পদার্থের 'স্পেসিফিক গ্রাভিটি' পরিমাপ করার একটি যন্ত্রের উদ্ভাবনও তাঁর অন্যতম কাজ।

ব্যক্তিগত জীবনে বিজ্ঞানী ওয়াট অত্যন্ত বন্ধু-বৎসল ও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোক ছিলেন। পরিণত বয়সে তিনি নিজের কীর্ত্তি-কাহিনী সকলকে গল্প করতেন,—কথা বলতেন খুবই বেশী। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর যথেষ্ট দখল ছিল, এবং সকলেই তাঁকে জ্ঞানসমুদ্ররূপে অভিহিত করতো। বিবাহ করেছিলেন দু'বার, ছ'জন পুত্র-কন্যার মধ্যে চার জনই অল্পবয়সে মারা যায়।

বাষ্পীয় মহাশক্তি ব্যবহারের প্রথম পথপ্রদর্শক, নব্য বিজ্ঞানের অন্যতম পথিকৃৎ বিজ্ঞানী জেমস ওয়াট ৮৩ বৎসর বয়সে, বার্মিংহ্যাম সহরে ১৮১৯ সালের ১৯শে আগষ্ট পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পরে তাঁকে হ্যাণ্ডসওয়ার্থের গীর্জ্জায় কবর দেওয়া হয়।



রেনোয়ার
ফেস পাউডার

আটটি বিভিন্ন রং

ভারতে একমাত্র সরবরাহকারী

লাক্‌মে — টাটার একটি প্রতিষ্ঠান

জাতীয়তায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অজয়েন্দুনারায়ণ রায়

এখন হ'তে পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছর আগে রামেন্দ্রসুন্দর মনে ক'রলেন সুধীজনদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করা যাক, কেমন ভাবে আমরা—সাহিত্যিকরা সকলে মিলিত হ'তে পারি এক স্থানে। পরামর্শ ক'রে স্থির হ'লো পূর্ণিমা সম্মেলন করার। সে কালের যত বড়-বড় সাহিত্যিক সকলেই একমত হ'লেন পূর্ণিমা-সম্মেলন অনুষ্ঠানে একত্র হ'য়ে সাহিত্য চর্চ্চা ক'রতে।

স্থির হ'লো, এই পূর্ণিমা সম্মেলন হবে পর্য্যায়ক্রমে এক-এক সাহিত্যিকের বাড়ীতে এক-এক পূর্ণিমায়। সাহিত্যচর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গীত, পাঠ ইত্যাদিও হবে সম্মেলনে। এই মিলনের সম্বন্ধে আলোচনা-সভা হ'লো তাঁরই বাড়ীতে। সে কি উৎসাহ সে দিনের! এই মিলনের জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতেন রামেন্দ্রসুন্দর। কত রকমের কত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা হ'তো সম্মেলনে। সারা বাংলায় মনীষীরা মুগ্ধচিত্তে শুনতেন রামেন্দ্রসুন্দরের বাণী।

সম্মেলনের শুভারম্ভ হ'লো দ্বিজেন্দ্রলাল রায় মহাশয়ের বাড়ীতে সর্ব্ব-প্রথমে। তার পর ক্রমশঃ চলতে লাগলো একে একে এক-এক জন সাহিত্যরথীর বাড়ী। উৎসাহের সীমা থাকতো না ত্রিবেদী মহাশয়ের। খুবই দুঃখিত হ'তেন উপস্থিত হ'তে না পেরে কোনো সম্মেলনে, যখন দেশের বাড়ীতে থাকতেন, পূজা কিংবা গ্রীষ্মের দীর্ঘ অবকাশে।

এই সব সম্মেলনে শুনতে পাওয়া যেত, দেশজননীর প্রতি রামেন্দ্রসুন্দরের সুগভীর অনুরাগের উচ্ছ্বসিত বাণী। ভাবোন্মাদ রামেন্দ্রসুন্দরের চক্ষুর্দ্বয় দীপ্ত হয়ে উঠতো দেশমাতৃকার গৌরবের কথা ব'লতে ব'লতে। মুগ্ধ-বিস্ময়ে সমবেত সুধীগণ উপভোগ ক'রতেন তাঁর দেশপ্রেমের গভীরতা।

তিনি ব'লতেন—আমার ভিতরটা সময় সময় জ্বালা করে ওঠে ঐ বিদেশীদের শিক্ষা গ্রহণ ক'রতে। প্রাচ্য দেশের শ্বেত-শতদল-বাসিনী বীণা-পুস্তকধারিণী স্মেরাননা বাগ্‌দেবীকে ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত ক'রে ইজিচেয়ারশায়িনী গাউনবুট-পরিহিতা পাউডার-লাঞ্ছিতা বিলাতী সরস্বতীকে তাঁর স্থানে বসানর জন্য। বিদেশীর নিকট শিক্ষা গ্রহণে আপত্তি কিছু নাই, কিন্তু আমার মাতৃভাষার ঊর্দ্ধে কাউকে স্থান দিতে আমি রাজি নই।

এক দিন বললেন রামেন্দ্রসুন্দর—ত্রেতাযুগে স্বর্ণলঙ্কার বেলাভূমিতে পদার্পণ ক'রে সুগ্রীব পরিচালিত সেনাগণের মনে যে যুদ্ধোৎসাহের উন্মাদনা এসেছিল, বোধ হয় তারই সঙ্গে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর বিদ্বৎ-সমাজের এই নবীন উৎসাহের তুলনা হ'তে পারে। আবার আর একটা দিকও দেখতে হবে। বর্ত্তমানে হিন্দুয়ানী রূপ বিকট দশাননের কবল হ'তেও ভারতমাতাকে উদ্ধার করতে হবে। ইংরেজ প্রভুরা এরই মধ্যে আর তেমন চাকরি দিতে পারছেন না আমাদের এই বাঙলা দেশের লোকদিগকে। এর ফল কিন্তু এই বিদেশী শাসকগণকে হাড়ে-হাড়ে পেতে হবে। এখন আমাদের দরকার হ'য়েছে দেশের জনশক্তির জাগরণ। তারা বুঝতে শিখুক আমরা পরাধীন। হয়তো কেউ কেউ ময়ূরপুচ্ছধারী হবেন, জানি।

বিশ্বকবি ব'লেছেন—রামেন্দ্রসুন্দর, তোমার সব সুন্দর। তা হ'লেও আমরা বিচার ক'রে দেখেছি দু'টো জিনিষ ছাড়া রামেন্দ্রসুন্দরের বাণী সব সুন্দর। একটা তাঁর স্বাস্থ্য আর একটা তাঁর হস্তাক্ষর! এ দুটো জিনিষ তাঁর সুন্দর কেউই ব'লতে পারবেন না। যখন ইস্কুল কলেজে প'ড়তেন, মাষ্টার-পণ্ডিতরা ব'লতেন কী লিখলে এসে শুনিয়ে দিয়ে যাও। কেউ কেউ বলতেন, তোমার এ দেব-অক্ষর প'ড়বে কে? ধীর শান্ত হ'য়ে নীরবে শুনতেন তিনি এই সব মন্তব্য।

কান্দীর ইস্কুলে পড়বার সময়ও বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্রকে মাঝে মাঝে অনুপস্থিত থাকতে দেখে মাষ্টার মহাশয়রা প্রশ্ন ক'রতেন—ক'দিন দেখা নাই কেন তোমার? অন্য ছাত্ররাই জবাব দিতেন, ওর শরীর ভাল ছিল না সার; অসুখ তার লেগেই থাকতো।

রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ তখন রামেন্দ্রসুন্দর। বাড়ী আসেন পুজোর ছুটিতে। সহোদর দুর্গাদাস আর খুড়তুতো ভাই নীলকমলকে ডেকে না নিয়ে কখন অন্দরে খেতে যেতেন না। যদি শুনতেন ভাইরা বাড়ীতে নাই, কোথাও গিয়েছে, তা হ'লে বই নিয়ে ব'সতেন প'ড়তে।

একবার তিন ভাই খেতে ব'সেছেন একসাথে। দুধের বাটি তুলতে গিয়ে হাত থেকে প'ড়ে গেলে বাটি, দুধ ও সর গড়িয়ে প'ড়লো মাটিতে। ভাই দু'জন, বাড়ীর অন্যান্য লোক দেখে অবাক। রামেন্দ্র বাবু কাঁপছেন। একটু পরেই শুয়ে প'ড়লেন খাবার জিনিষের উপরেই। জল-বাতাস কিছুক্ষণ দেওয়ার পর একটু সুস্থ হ'লেন। ব'ললেন—ভাই, খুবই দুর্ব্বলতা অনুভব করছি আমি। তোমরা নিয়ে চলো আমাকে শোবার ঘরে! বলা মাত্র সকলে মিলে তাঁকে উঠিয়ে নিয়ে চ'ললেন শোবার ঘরে। তখন তিনি ব'লে চ'লেছেন—নিয়ে যেতে পারবে ত' এত বড় লাশ?

বাবু-দাদা, আপনি কি পারবেন নিজে হেঁটে যেতে?

না ভাই আমার সব শরীর কাঁপছে। আর এক বার প'ড়ে গেলে প্যারালেসিস হবে।

নিজের বিছানায় শোওয়ানর পর মাকে ব'ললেন—মা, সকলকে ব'লে দাও, আমার অসুখের কথা বাইরে কেউ যেন প্রকাশ না করে।

কেন ব'লবো না রাম?

তা'তে উপকার কিছু কী হবে? বরং জ্বালিয়ে মারবে আমাকে। কৈফিয়ৎ দিতে দিতে প্রাণান্ত হবে আমার।

সে কথা কি শোনে কেউ? ক্রমে ক্রমে র'টে গেল, খেতে ব'সে রামেন্দ্র বাবুর মূর্চ্ছা হ'য়েছিল। মনে হ'য়েছিল অনেকের, ও মূর্চ্ছা বুঝি আর ভাঙবে না। এমনি অতিরঞ্জিত হ'য়েই কথা ছড়িয়ে পড়ে সাধারণতঃ।

দেখতে দেখতে লোকে লোকারণ্য বাড়ী। সকলেই দেখা ক'রতে চায় রাম বাবুর সঙ্গে। কবিবর ঠিকই ব'লেছেন—সর্ব্বজন-প্রিয় তুমি। বহু আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব আসতে লাগলেন তাঁর শয্যাপার্শ্বে।

এক সময় ব'ললেন—হোলো। দেখলে!! এ পরিপাক করা কি সোজা কথা! আমাদের চন্দ্রপ্রভার মামা তিন ক্রোশ

গিয়ে মরার খবর দিয়ে আসতো ঠিক ভাত খাবার আগেই, জানো ত? তার হলাডিবিক্ত হু'চার জন কি আর নাই?

আবার সেই হাসি-পরিহাস রামেন্দ্রসুন্দরের। ব'ললেন—আমার এই রকম মাথা ঘুরতো পি-আর-এস্ পরীক্ষা দেবার আগে। এত দূর হ'লে পরীক্ষাই দিতে পারতাম না আমি।

কয়েক মাস পরের কথা। রামেন্দ্রসুন্দর তখন তাঁর কর্মস্থল কলিকাতায়। সহসা এক দিন আবার তাঁর কলিক পেন দেখা গেল। বেদনা এত অসহ্য যে তাঁকে কলেজ যাওয়া বন্ধ ক'রতে হ'লো। যখন বেদনা অত্যন্ত অসহ্য হ'য়ে উঠে, তখন ডাকেন মাকে। তিনি এসে পেটে-পিঠে হাত বুলিয়ে দেন। মাথায় ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রে দিয়ে ঘুম পাড়ান। অসুখ একটু বেশী উঠলেই মাকে ডাক পড়ে। যখন যন্ত্রণা অসহ্য হয়, বলেন—আমার বংশের কেউ এত দিন বাঁচেনি। আমি ত পাঁচের কোঠা শেষ ক'রতে চলেছি! তিনের ঘরের প্রথম দিকেই পিতা-পিতামহ চ'লে গিয়েছেন।

মা বিরক্ত হ'য়ে ব'লতেন—তুই কী পাগল হ'য়েছিস্? পরমায়ুর কথা কী কেউ ব'লতে পারে? তাঁদের পরমায়ু ছিল না, তাঁদেরকে যেতে হ'য়েছে। তাই ব'লে কী বংশের সকলকেই ঐ বয়সে যেতে হবে? পাগলামি করিস্ নে, চুপ ক'রে সুস্থ হ'য়ে ঘুমো।

শশব্যস্ত হয়ে ব'লতেন—ভুল হ'য়েছে মা, তুমি আছো ভুলে গিয়েছিলাম। খামোখা আমি ডাকি মা তোমাকেই। তোমাদের কাছে সান্ত্বনা পাবো ব'লে।

একটু বেশি অসুখ হ'লেই ডাক পড়ে তাঁর ভগিনীদেরকেও যখন গ্রামের বাড়ীতে থাকেন। কাছেই বাড়ী কি না। তাঁরা কাছে এলে লেখাপড়া ভুলে কেবল চলে ছেলেবেলাকার নানা গল্প। একটা কথার যদি ভুল আছে! ভগিনীদের না পেলে অজ্ঞান শিশুদের নিয়ে প'ড়তেন। তখন জ্ঞান-তপস্বী রামেন্দ্রসুন্দরের প্রশান্ত গাম্ভীর্য কোন্ সুদূরে চ'লে যেত। শিশুর সারল্য ফুটে উঠতো মুখে। আত্মহারা হ'য়ে শিশুদের সঙ্গে করতেন হাস্য-পরিহাস।

শিশুদের না পেলে অল্পবুদ্ধি মেয়েছেলেদের নিয়ে তাদেরই সঙ্গে চলতো নানা আলোচনা, কেউ জিজ্ঞেস ক'রলে ব'লতেন, আনন্দ পাই আমি।

বাঙলা ১৩২১ সালে যখন রামেন্দ্র বাবুকে সাহিত্য পরিষৎ-মন্দিরে নিয়ে এসে তাঁর পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে অভিনন্দন দেওয়া হ'লো, তখন তিনি বলেছিলেন এ রকম অভিনন্দন নেওয়া ব্রাহ্মণের সাজে না। জরা তখন তাঁকে আক্রমণ ক'রেছে ভালো ভাবেই। অভিনন্দন-পত্র পাওয়ার পর তিনি যে উত্তর দিবেন তা লিখে আনলেও দুর্ব্বলদেহে তাঁর পক্ষে সেটা নিজে পড়া সম্ভব হ'লো না। ভাই দুর্গাদাসকে দিলেন পাঠ ক'রতে।

তুলোট কাগজে কবিগুরুর স্বহস্তলিখিত অনুকরণীয় ঐতিহাসিক অভিনন্দন-পত্র; শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পকলায় অনবদ্য নিদর্শনে তাকে সমৃদ্ধ ক'রেছেন। কবিগুরুর সুমধুর কণ্ঠে সূচীপতন শব্দ বিরহিত সভায় মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের সমাবেশে ধ্বনিত হ'লো সে অভিনন্দন-বাণী। সে পরিবেশ বর্ণনা করা সম্ভব নহে। পাঠ ক'রে শান্তগম্ভীর কবিগুরু স্মিত হাস্যে প্রদান ক'রলেন সুরক্তম রামেন্দ্রসুন্দরের হস্তে সেই অভিনন্দন-পত্র। মস্তকে স্পর্শ ক'রে গ্রহণ ক'রলেন তিনি সেই ঐতিহাসিক অভিনন্দন-পত্র।

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হ'তে রজতপত্রে উৎকীর্ণ আশীর্ব্বাণী স্বয়ং পাঠ ক'রে মনোরম আধারে সেখানি প্রদান কর'লেন এবং সাহিত্য পরিষৎ তাঁর সাহিত্য সাধনার কৃতিত্বের জন্য প্রদান ক'রলেন সোনার দোয়াত-কলম সুদৃশ্য আধারে। মস্তকে স্পর্শ ক'রে সসম্ভ্রমে গ্রহণ করলেন সেগুলি আচার্য্য ত্রিবেদী মহাশয়।

এই ভাবে বাঙলার পণ্ডিত-সমাজ তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভাকে নানা উপঢৌকন দিয়ে ক'রেছিলেন অভিনন্দিত।

যাঁকে উপঢৌকন দিয়ে সম্মানিত করা হ'তে লাগল, তিনি তখন রোগশয্যায়। বললেন—আমার এ সব সহ্য হয় না, এখন ত ভুগতে হবেই। শূকরীবিষ্ঠা কি সহ্য হয় ব্রাহ্মণের? এ সম্মান নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়, বার বার ব'লেছি এ কথা। কে শোনে সে কথা! আমার বন্ধু-বান্ধব সম্মানী লোক যাঁরা দিচ্ছেন এই সব উপহার, প্রত্যাখ্যান ক'রে তাঁদেরকে ত' অপমানিত করার মত, স্পর্দ্ধা বা দুঃসাহস আমার নাই? অবনত মস্তকে গ্রহণ ক'রতে হ'চ্ছে সবই অনিচ্ছাসত্ত্বেও।

ভাই দুর্গাদাসকে বললেন—আমার অসুখে তোমরা আসুরিক চিকিৎসা করাবে না। যদি বা দিন কতক বাঁচতাম, তা হ'লে তাও বাঁচবো না।

দুর্গাদাস বাবু বললেন—আসুরিক চিকিৎসা কা'কে ব'লছেন বাবুদাদা?

কেন? তোমরা ভুলে যাও না কি? আমি তো ব'লেছি এ্যালোপাথি মতকে। যত উন্নতিই ক'রে থাক্, ও মত আমি মানিও না, সহ্যও হয় না আমার।

সার নীলরতনের মত ডাক্তার কিছু জানেন না ব'লতে চান?

বড় ডাক্তারের নাম ব'লে ভয় দেখিও না। আমি ওষুধ খাবো আমার ছেলেবেলাকার ডাক্তার ছোট বাবা যা দিতেন, সেই ঠাণ্ডা ওষুধ হোমিওপ্যাথি।

না বাবুদাদা, আপনাকে নীলরতন বাবুর ওষুধ খেতেই হবে, আর তিনি যা' ব'লবেন শুনতেও হবে।

নীলরতন বাবু এসে রোগীকে দেখলেন, ঔষধের ব্যবস্থাও দিলেন। বললেন—আপনি একটু অসুখ কমিয়ে নিয়ে অন্য ওষুধ খান না, আমার আপত্তি নেই। আর একটা কথা, আপনাকে এখন কিছু দিন নিয়ম মেনে চ'লতে হবে। আপনি এখন কয়েক মাস পড়াশুনো ক'রতে পাবেন না। তা না হ'লে আমরা আপনাকে ভরসা দিতে পারবো না।

ভ্রাতা দুর্গাদাস ও বাড়ীর অন্যান্য সকলেই ভেবে আকুল ডাক্তার বাবুর কথা শুনে। সকলে একমত হ'য়ে জোর ক'রে তাঁর পড়াশুনা বন্ধ ক'রলেন। এতে তিনি খুব বিরক্ত হ'য়ে বললেন—কী ডাক্তারের ব্যবস্থা আমি জানিনে। আমার ধাতই জানেন না। পড়াশুনো আমার বন্ধ ক'রলে হাঁপিয়ে উঠবো। দেশের চন্দ্র বাবু ডাক্তার কাকাই এঁর চেয়ে ঢের ভাল। জলে না থাকলে কখনো মাছ বাঁচে!

তাঁর এ কথায় সায় দিলেন না কেউ। চিন্তাকুল আত্মীয়-স্বজনগণ তখন তাঁর আরোগ্যের জন্ত ব্যাকুল। বর্ণে বর্ণে ডাক্তারের আদেশ পালন জন্ত সকলেই সচেষ্ট।

তিন-চার দিন এই ভাবে থাকার পর সকলেই দেখলেন, তাঁর অসুখ ক্রমশঃ বৃদ্ধির দিকে। অবস্থা এমন খারাপ হ'লো যে সকলে শঙ্কিত হ'য়ে পড়লেন। তখুনি লোক পাঠান হ'লো লব্ধপ্রতিষ্ঠ হোমিওপ্যাথ ডাঃ ডি, এন, রায়ের কাছে। অল্পক্ষণ মধ্যে তিনি এসে উপস্থিত হ'লেন রোগীর পার্শ্বে। রোগীকে ও আত্মীয়-স্বজনগণকে বহু প্রশ্ন ক'রে ঔষধ নির্ব্বাচন ক'রলেন। ত্রিবেদী মহাশয় প্রফুল্লচিত্তে তাঁর দেওয়া ঔষধ খেলেন। রাশি রাশি বই এনে রাখা হ'লো রোগীর মাথার কাছে। মন তাঁর আনন্দে ভ'রে উঠলো। দু'-এক দিনেই দেখা গেল রোগ কমের দিকে। ব'ললেন হাসতে হাসতে রামেন্দ্র বাবু—ডাক এলে কী কোনো ডাক্তার রক্ষা ক'রতে পারে?

নীলরতন বাবু নিত্য আসেন তাঁর ওষুধ না খাওয়া হ'লেও। বিছানায় রাশীকৃত বই দেখেই ব'ললেন, এ সব কী? নিতান্তই যদি বই না প'ড়ে থাকা অসম্ভব মনে করেন লাইট রিডিং বুক দু'-একখানা দেবেন। এ সব জটিল তত্ত্বপূর্ণ বই এখন দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। তিনি ব'ললেন—আপনারা বুঝতে পারছেন না, ইনি এক চিত্র রোগী। ক'দিন ধ'রে দেখছি ত। বুঝতে পেরেছি যদিও যে এঁকে রাখতে হবে গভীর জলধি মধ্যে নানা বই-এর। কিন্তু ঐ রকম দুর্ব্বল দেহ-মন মস্তিষ্কের পক্ষে সেটা ত' লঘুপাক হবে না? আফিঙখোরকে আফিঙ না দিলে মারা যায়; এঁর অবস্থা ত ঠিক তাই। দিতে হবে, কিন্তু মাত্রা ক্রমশঃ কমাতে চেষ্টা ক'রবেন।

বহু বন্ধুবান্ধব আসেন ত্রিবেদী মহাশয়কে দেখতে। এক দিন তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু অবিনাশচন্দ্র বসু এসে উপস্থিত। বসু ও ত্রিবেদী একই বছরে পি-আর-এস পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রজীবনের সেই বন্ধুবরকে পেয়ে ত্রিবেদী মহাশয়ের মন আনন্দে পূর্ণ। কিন্তু হরিষে বিষাদ হলো শেষ পর্য্যন্ত। স্তূপীকৃত পুস্তক দেখেই অবিনাশ বাবু ব'ললেন—রামেন্দ্র, এ সব কী? এতো বই কেন তোমার কাছে? ডাক্তার নিষেধ ক'রেছেন না, এখন বেশী পড়াশুনো ক'রতে? ডাকলেন চীৎকার করেই—দুর্গাদাস—ও দুর্গাদাস!

দুর্গাদাস বাবু আসতেই বললেন—সরিয়ে নাও এ সব বই এখুনি। বই পড়া এখন চ'লবে না।

রামেন্দ্র বাবু ব'ললেন—অবিনাশ, তুমি কী আমাকে মেরে ফেলতে চাও? বই না হ'লে আমি বাঁচবো মনে করো?

কী যে বলো রামেন্দ্র! একটু সুস্থ হও, তার পর ত কেউ বারণ ক'রবে না তোমাকে প'ড়তে?

তুমি কী বন্ধ ক'রতে চাও আমার পড়াশুনো?

হাঁ, এখন দিন কতক ও সব বন্ধ রাখতেই হবে।

তোমার ও কথা আমি শুনবো না অবিনাশ!

তার মানে? শুনতেই হবে। দুর্গাদাস বাবু নিকটেই ছিলেন, আদেশের স্বরে ব'ললেন—সরিয়ে ফেল বইগুলো।

না, সরিও না দুর্গাদাস! শুনো না ওর কথা।

শুনবে না আমার কথা! ব'ললেই হ'লো! সব বই আলমারিতে রেখে আলমারির চাবি আমাকে দাও। ওর কথা এখন কেউ শুনবে না। যখন বুঝবো বই দিলে আর ক্ষতি হবে না, আমি এসে বই বের ক'রে দেবো। সরাও বই। আলমারিতে রেখে সব আলমারির চাবি আমাকে দাও।

বেশ তাই করো। আলমারির কাচ ভেঙে বই বের ক'রে নেবো আমি, এ তুমি ঠিক জেনো অবিনাশ!

কী ভীষণ লোক তুমি রামেন্দ্র! পারবার জো নেই তোমাকে! চিরদিনের একগুঁয়ে লোক তুমি। কে পারবে তোমার গোঁ ফেরাতে!

দুই বন্ধুতে অনেকক্ষণ ধরে এই বাগ-বিতণ্ডা চ'ললো। পরাস্ত হ'লেন অবিনাশ বাবু। দুঃখিত হ'য়ে ব'ললেন—এটা ভালো হ'চ্ছে না রামেন্দ্র!

দেখ অবিনাশ, নীলরতন বাবু বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন আমার বই পড়া। অসুখ বেড়ে গেল। তখন তিনিই আবার বলতে বাধ্য হন কিছু কিছু বই দেবেন। এ রোগী ঠিক আফিঙখোরের মত। আফিঙ না পেলে আফিঙখোরের যে অবস্থা হয় এঁরও ঠিক তাই। তুমি ত জানো ভাই, বই না প'ড়ে কি কোনও আলোচনা না ক'রে থাকতে পারি না এক মুহূর্ত।

নিরুপায় অবিনাশ বাবু আর বেশী কিছু না ব'লে অন্য প্রসঙ্গ নিয়ে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ক'য়ে বিদায় নিলেন। প্রায়ই আসতেন তিনি বন্ধুর রোগ-শয্যার পার্শ্বে, কিন্তু পড়াশুনোর কথা নিয়ে আর কোনো দিন কিছুই বলেন নি।

বই থাকলো রোগীর কাছে। আরম্ভ ক'রলেন গভীর চিন্তা। অমূল্য রত্নরাজি তখন থেকেই বের হ'তে লাগলো।

দেশের সুধীজন দেখেন, বেদান্তের দুরূহ তত্ত্বকথা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বাঙলা অক্ষরে।

হাজার অসুখ হ'লেও কেউ কখনো দেখেনি বৃথা সময় নষ্ট ক'রতে। হয় প'ড়ছেন, না হয় লিখছেন। না হয় আলোচনা ক'রছেন মনের সাথে। তখন বাহ্যজ্ঞানশূন্য সেই জ্ঞান-তপস্বী। পাশ দিয়ে অতি অন্যায় ক'রে চলেছে কেউ, কোনো জ্ঞান নাই। ছেলেরা দৌরাত্ম্য করছে, হট্টগোল করছে, কে দেখে! ভাতের থালি নিয়ে মা ডাকছেন—কে শোনে! অন্য জগতে তখন তিনি!

মা তখন ব'লতেন—ও স্বভাব রামের চিরদিনের। ও কি আর বদলায়?

পদ্ম-মা ব'লতেন—রামের মাথায় লেখাপড়ার ভূত চাপলে ওর জ্ঞান থাকে না। তখন খেয়ে মনে থাকে না, আবার খেতে চায়। মুখ ধুয়ে এসে আবার আঁচাবার জল চায়। অনেক সময় কাজের কথা ব'লে দেখেছি আমরা, কিছুই ও মনে রাখতে পারে না। কিছু বললে ওর উত্তর কেবল হাঁ হুঁ; সর্ব্বদা কী যে ভাবে জানি না! কিছু বললে হাঁ-হুঁ বলে বটে, কিন্তু কানে যায় না কোনো কথা। পরে জিজ্ঞেস ক'রলে বলে—কৈ কিছু ত বলোনি! হাজার মাথাঘোরা রোগ হ'লেও ঐ লেখাপড়া নিয়েই থাকতে ভালবাসে ও চিরদিন। এ তার ছোটবেলাকার অভ্যাস।

কখন কখন দেখা যেত বালক রামেন্দ্রসুন্দর দাঁড়িয়ে আছেন, হয় গাছের দিকে, নয় গরু-বাছুরের দিকে চেয়ে। নাওয়া-খাওয়ার খেয়াল নেই। বয়স তখন তাঁর দশ বছরও পার হয়নি। অবশেষে ধ'রে আনা হ'লো তাঁকে। জিজ্ঞেস ক'রলেন কেও—কি দেখছিলি ওখানে ওভাবে? বালক নির্ব্বাক্। অনেক জিজ্ঞাসার পর উত্তর


দেখুন!
অর্দ্ধেকটা
সানলাইট
সাবানেই এ সব
কাচা হয়েছে !
সানলাইটের ফেনার আধিক্যই এর কারণ!
SUNLIGHT
SOAP
সানলাইট
সাবান
দিয়ে কাচলে কাপড়জামা সাদা ও উজ্জ্বল হয়।
S. 242-X52 BG
ভারতে প্রস্তুত

আসে—গাছের পাতাগুলোর রঙ অমন সবজে হয় কেন, তাই ভাবছিলাম। প্রশ্নকর্ত্রী বলেন, আমরা ব'লতে পারবো না, তোর বাবাকে জিজ্ঞেস করিস্। দশ বছরের সরল বালক জিজ্ঞেস করেন তার বাবাকে উত্তরের আশায়। বাবা গম্ভীর হ'য়ে বলেন—তুই লেখাপড়া শিখে নিজেই জেনে নিবি।

গরুর কাছে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ধ'রে আনেন মা। প্রশ্ন করেন—হাঁ রে রাম, তুই এতক্ষণ গরুর দিকে চেয়ে কী দেখছিলি? নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাকে বালক। অনেক জেদ করায় বলেন—কাল গরুর বাছুরটা মারা গিয়েছে, তার ছালটা ছাড়িয়ে নিয়েছে দেখেছি মুচিরা। গাইটা দুঃখ করে কি-না, তাই দেখছিলাম।

আচ্ছা বুড়োর মত কথা তোর রাম!

বুড়োর মত কী বল না মা!

দুপুরে শুয়ে আছি। খুব গরম, গাছের পাতাটি পর্য্যন্ত নড়ে না। কোথা হ'তে এসে পা টিপতে ব'সেছে রাম। কিছুক্ষণ পরে বললাম—যা তুই খেলা করগে এখন। উঠতেই চায় না। অনেক বলার পর শুনলাম—মায়ের পদসেবা ক'রছি, বিরক্ত ক'রছো কেন আমাকে। ছোট ছেলের ঐ রকম বুড়োমি কথায় সকলে হেসে বাঁচে না।

আমরা জিজ্ঞেস ক'রলাম—হাঁ দিদিমা, মামার বাবাও কি ঐ রকম ছিলেন?

একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ব'ললেন—ঠিক বাবার মতই ছেলে। তখন ইংরেজের দাপটে সকলে ভয়ে কাতর। তখন তোদের দাদু ইংরেজদিগে পায় তো এক চোটে কাটে। ওর বাবাই ত ওকে স্বদেশী ক'রেছে। ওরা যেন পাগলের বংশ! ইংরেজের নাম শুনলেই খেপে যায়। হাড়ে চটা ছিলেন রামের বাবা। তিনি আবার তোদের কর্তাবাবা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণের বন্ধু ছিলেন কি না। যখন ইংরেজের উপর খড়গহস্ত হ'য়ে উঠতেন, তখন থামিয়ে দিতেন রাজাই তাঁকে। ব'লতেন—হাজার ব'লেও এখন কিছুই ক'রতে পারবে না, কেন মাথা খারাপ করো? সে রাগ এমন হ'তো যে তখন তোদের নতুন দালান তাঁর গলার আওয়াজে যেন ভেঙে প'ড়তো। কত দিন দেখেছি রাত্রে না ঘুমিয়ে ছাদে ছাদে বেড়াতেন। মুখে কী সব ব'লতেন ঐ ইংরেজদের সম্বন্ধে। ঠিক ঐ রকম আমার রামও হ'য়েছে।

কী রকম হ'য়েছেন মামা, বলুন না দিদিমা!

আরম্ভ করলেন পদ্ম-মা—ক'লকাতা থেকে এলো রাম, সে বারও দেখলাম ঠিক তার বাবার মত পাগল। তোদের হয়তো মনে নাই, বিলিতি কাপড় দেখলেই ছিঁড়ে দেয়। সকলকে নিয়ে বলে—তোমরা প্রতিজ্ঞা করো—আর বিদেশী জিনিষ ছোঁব না। জাতিভেদ মানবো না। মিথ্যা আমরা ব'লবো না। ঐ ধারা পাগলামির কথা শুনে তোদের কর্তামা ডেকে পাঠালেন নিজের জামাইকে। তিনি ব'ললেন—হাঁ বাবা রাম, তোমরা কি পারবে ইংরেজকে? কেন মিছেমিছি লাগতে যাচ্ছ ওদের সঙ্গে? কিছুই ক'রতে পারবে না। কেবল শত্রু হবে ওদের।

রাম শুনে ব'ললো তার বাবার মত—আমরা ইংরেজকে চাই না। ওদের ভাষায় বই প'ড়ে পাস করেছি, অনেক কিছু জ্ঞানও অর্জ্জন ক'রেছি, তবু আমি চাই আমার মাতৃভাষার উন্নতি। আমার দেশের মানুষদের উন্নতি। ওদের হাওয়াও অপবিত্র। ওদের বেশভূষায় সজ্জিত হ'তেও আমি ঘৃণা বোধ করি। আমার যা নিজের, আমার যা পিতৃপুরুষের, আমার যা চিরজীবনের ধ্যানের, আমি তাই চাই। আমার বাড়ী আজ আপনাকে এক বার যেতে হবে মা, আপনার সামনেই সমাধি ক'রবো ইংরেজদের, দেখবেন। তিনি জিজ্ঞেস ক'রলেন—সে কী বাবা রাম? উত্তরে ব'ললো—আজ গ্রামের সমস্ত লোকের বিলিতি কাপড় পুড়িয়ে দেবো সভা ক'রে। সকলকে প্রতিজ্ঞা করাবো—জীবনে আর তারা কেউ বিলিতি কাপড় প'রবে না, স্পর্শ ক'রবে না। ওদের ল্যাঙ্কশায়রে আগুন ধরিয়ে দেবো আজ। কোটি কোটি টাকা এদেশ থেকে লুঠে নিয়ে যাওয়া বের ক'রবো। তখন তার শাশুড়ী আর কিছু ব'লতে সাহস ক'রলে না জামাই-এর ভাবভঙ্গী দেখে। আট বছর বয়সের ছেলেকে তার বাবা কানে বীজমন্ত্র দিয়ে গিয়েছিলেন—পারিস ত বড় হ'য়ে তুই ইংরেজকে তাড়াস দেশ থেকে। ওদের জল অশুদ্ধ, বাতাসে শুচিতা নাই, ঐ অসুর জাতি মহাপাতকী। ওরা শিকড় গাড়ছে আমার দেশের মাটিতে, উৎপাটিত ক'রতে হবে সে শিকড়। এই সব মন্ত্র যে ও পেয়েছে ওর বাবার কাছেই। রাম আমার আরও কত কী ক'রতে পারতো, যদি তার শরীর ভালো থাকতো। কিছু ক'রলেই ওর অসুখ। একটা না একটা রোগ লেগেই আছে। তার মনের বলের একটা কথা বলি—খুব রোগের যাতনায় ছটফট করছে। আমি যদি জিজ্ঞেস করি—ভয় হচ্ছে রাম? তখন বলে—ভয় আমার কখনো দেখেছ মা? আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দাও, সব সেরে যাবে। তোমার ছেলেকে কি তুমি এখনো চেননি মা? আমি দিব্য চোখে দেখতে পাচ্ছি মা, তোমার কাজ শেষ না ক'রে আমার কিছু হবে না। বেশী বয়স হ'লেও সেই আগেকার মতো কথা রামের।

১৩২৫ সাল। ভাই দুর্গাদাস এসে ব'ললেন—বাবু-দাদা, মায়ের শরীর রোগে জীর্ণ হয়েছে। তিনি বোধ হয় আর বেশী দিন বাঁচবেন না। এক বার তাঁকে সব তীর্থ ঘুরিয়ে আনলে হয় না?

মা নিজের মুখে যদি ব'লে থাকেন, তবে কালবিলম্ব না ক'রে নিয়ে যাও। কিন্তু মাকে ঘুরিয়ে বাড়ী নিয়ে আসতে হবে দুর্গাদাস! বেঁচে আছি কেবল মায়ের কাজ ক'রবো ব'লেই। আমার কিন্তু এ সময় এক বার যাওয়া উচিত ছিল, পারলাম না কেবল গিরিজার অসুখের জন্য।

বাবু-দাদার এতোগুলো কথা শুনে কেমন যেন লাগলো দুর্গাদাস বাবুর। এক বার চেয়ে দেখলেন তাঁর মুখের দিকে। তখুনি রামেন্দ্র বাবু তিন হাজার আটশো টাকা দিলেন মা আর তাঁর দলবলের তীর্থ-ভ্রমণের জন্য। টাকা দিয়ে ব'ললেন—শোনো দুর্গাদাস, মাকে আমার ঘুরিয়ে আনা চাই। আমিও যেতাম সঙ্গে, যদি আমার শরীর ভাল থাকতো। তা' ছাড়া আর এক বড় বাধা—গিরিজার এই অসুখ। তোমরা যেখানে যখন থাকবে দু'চার দিন আগে হ'তে আমাকে যেন জানাবে।

একই কথা বার বার ব'লতে দেখে দুর্গাদাস বাবু তাঁর বাবু-দাদার দিকে চেয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। কেমন যেন হ'য়ে গেলেন!

শোন ভাই, আমি এক বার মাত্র গিয়েছিলাম কাশীধাম, সেই ছোট

বেলায়। গয়াতেও গিয়েছিলাম পিতৃকার্য্য ক'রবার জন্য। পিতৃকার্য্য ক'রে সে কী আনন্দ! বোঝাতে পারবো না তোমাকে। চোখের জল কেমন ভাবে পড়ছিল, বলার নয়। আমি হয়তো থাকবো না মায়ের কাজ করতে গয়াধামে, তুমি তখন সেটা দেখবে। সেই সময় দেখেছিলাম বোধ গয়া, ঐ গয়া হ'তেই গিয়ে। আর এক বার গিয়েছিলাম পুরীধাম, এই আমার তীর্থ করা। তীর্থ আমাকে টানে না।

ভাই ব'ললেন—আপনি যে জ্ঞানতীর্থে বাস ক'রছেন বাবু-দাদা, আপনার আবার তীর্থ কী?

দুঃখের বোঝা নিয়ে এলেন দুর্গাদাস বাবু জেমো, মাকে তীর্থ দর্শনে নিয়ে যাবার জন্য। রওনাও হ'লেন সদলে সকলে তীর্থ দেখাবার জন্য মাকে।

মাত্র এক মাস কয়েক দিন হ'য়েছে, তাঁরা তখন পৌঁছেছেন হরিদ্বার। তার পেলেন সেখানে—গিরিজার অসুখ বেশি, চ'লে এস।

তার পেয়েই দুর্গাদাস বাবুর মাথা ঘুরে গেল। তাঁর ভাবনা—আমার বাবু-দাদাকে কে এখন দেখবে? তিনি ত' অসহায় হ'য়ে প'ড়বেন, ভাল-মন্দ কিছু হ'লে আমরা পৌঁছবার আগে!

কালবিলম্ব না ক'রে টিকিট কেটে সকলে রওনা হ'লেন ক'লকাতার দিকে। ভয়ে ভয়ে আসছেন, হাওড়া পৌঁছেও, কী না জানি শুনবেন বাসায়! পথে আসতে-আসতে বাসার কাছাকাছি হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রে জানতে পারেন না কিছু, এমন কি পাশের বাড়ীতেও। কেউ খবর রাখে না। দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তে উঠলেন বাড়ী। গিয়ে দেখেন, তখনও বেঁচে আছে গিরিজা। ডাক্তাররা ঠিক ক'রতে পারেন নি রোগ। ক্রমশঃ শেষ অবস্থা হ'য়ে আসছে রোগিণীর। দুর্গাদাস বাবু ব'ললেন—বাবু-দাদা, অনেক ত দেখলেন, এক বার দিন কতক আমাকে দেখতে দেন।

তুমি কেন অপদস্থ হবে ভাই! এ রোগ সারবার নয়।

তবু নাছোড়বান্দা হ'য়ে ব'ললেন—আমি এক বার নেড়ে-চেড়ে দেখবো বাবু-দাদা।

কুইনাইন ছিল ব্রহ্মাস্ত্র দুর্গাদাস বাবুর। তিনি জানতেন, এমন কোন জ্বর নাই যা কুইনাইনের কথা শোনে না। দিন কতক বেশী মাত্রায় কুইনাইন দিয়ে অপ্রস্তুত হ'লেন দুর্গাদাস বাবু, গিরিজার তখন রক্তবমির লক্ষণ দেখা গেল। হাল ছেড়ে দিলেন সাহসী দুর্গাদাস বাবুও।

রামেন্দ্র বাবু তখন ডাকলেন আবার হোমিওপ্যাথ উনিয়ন সাহেবকে। ব'ললেন—সাহেবকে ডাকতাম না, ডি, এল্, রায় অসুস্থ ব'লেই ডাকতে হ'লো এঁকে।

কথা বের হয় অতি গভীর থেকে খোনা সুরে গিরিজার।

কন্যাসবল পুত্রহীন পিতা সর্ব্বদা ব'সে থাকেন কন্যার রোগ-শয্যার পাশে। নিজের কোঁচা খুলে চোখ মুছিয়ে দেন রোগপাণ্ডুর ছোট কন্যার। কন্যাও চেয়ে থাকে বাবার মুখের দিকে অনিমিষ নয়নে। হয়তো ভাবে—কী ক'রে গেলাম আমার অমন বাবার! কেবল তাঁকে দুঃখই দিয়ে গেলাম!

মানুষ জন না থাকলে ব'সতেন পাখা হাতে। অন্য কেউ দেখতে পেলে ছুটে এসে কেড়ে নিত তাঁর হাত থেকে পাখা।

যখন চরম অবস্থা ঘনিয়ে এল গিরিজার, তখন দুই চোখ চক্-চক্ ক'রছে রামেন্দ্রসুন্দরের। আর্ত্ত স্বরে ব'ললেন—এই শেষ বয়সে আমার উপর সব ভার প'ড়লো ছেলে-মেয়ে নাবালক এতগুলোর! আমি ত সব ভারই নেবো! প'ড়লো ইন্দুপ্রভা তোমার উপরই!

স্ত্রী ইন্দুপ্রভা ব'ললেন—এ আমার উপর ভার প'ড়বে না, বুঝবো গিরিজা আমার একা একশো হ'য়ে এসেছে আমার কাছে। আমি সব ভার নিলাম। তবে ব'লছি তুমি এখন কিছু দিন বাঁচো।

গিরিজার সব শেষ! তখন ধ'রে রাখা যায় না রামেন্দ্র বাবুকে। শোকে বিহ্বল রামেন্দ্রসুন্দরের কণ্ঠে বিষাদোক্তি!

শাস্ত্রী মহাশয়, সুরেন্দ্রনাথ, গুরুদাস বাবু এসে দেখেন রামেন্দ্র বাবু শোকে কাতর, ক্রন্দন ক'রছেন সাধারণ মানুষের মতো। তখন তাঁরা ব'ললেন এক বাক্যে—তোমার এমন ধারা শোক ভাল দেখায় না রামেন্দ্র বাবু!

উত্তর দিলেন—আমি যে মানুষ রাম! পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্র কী কম দুঃখ ক'রে গিয়েছেন!

শোক-তাপ প্রশমিত হ'লে ভাই দুর্গাদাস এসে ব'ললেন—এবার মাকে নিয়ে যাই লক্ষ্মীজনার্দনের কাছে। তাঁরও ত শেষ অবস্থা!

এক বার চেয়ে ব'ললেন—বাড়ী দিয়ে যাবে? বেশ, যাও। কিন্তু আমি ব'লছি, এখনও প্রকৃতি দেবী বলি চাইছেন।

বিস্মিত হয়ে ব'ললেন—কিসের বলি বাবু-দাদা!

তৎক্ষণাৎ ব'ললেন—আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবন-মরণের সাথীকে, আমার প্রত্যক্ষ দেবতাকেও বোধ হয় এবার হারাবো!

তাঁর জন্য ভাববেন না বাবু-দাদা, তাঁর বয়স হ'য়েছে। আমরা তাঁর কাজ ক'রে যাবো, এ ত আমাদের ভাগ্য।

মুখে কথা নাই রামেন্দ্র বাবুর। দৃষ্টি উদাস। আস্তে আস্তে বের হ'য়ে গেলেন দুর্গাদাস বাবু।

মা ও দুর্গাদাস বাবু বাড়ী যাওয়ার পর আর এক মানুষ রামেন্দ্রসুন্দর! সব দুঃখ বেদনা ভুলে পুঁথি কাগজ নিয়ে ব'সলেন তপস্যায়। কে তখন পায় তাঁকে!

এই সময় তাঁকে ডেকে পাঠালেন সার আশুতোষ। তিনি ব'লে পাঠালেন—আমি অসুস্থ। আমার যাবার সামর্থ্য নাই। শুনেই আশুতোষ স্বয়ং এসে উপস্থিত রামেন্দ্রসুন্দরের কাছে। সংবাদ দিলেন—তোমার চিরজীবনের স্বপ্ন সফল হ'য়েছে রামেন্দ্র! এম, এ তে বাঙলা ভাষাকে স্থান দেওয়া সমর্থন ক'রেছে গভর্ণমেণ্ট। বহু দিন থেকেই তুমি ব'লতে সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষাতে স্থান দিতে হবে মাতৃভাষাকে। মনে ক'রতাম, এও তোমার এক পাগলামি! ভাবতাম এ-ও কি সম্ভব?

শুনে ভাবে অভিভূত রামেন্দ্রসুন্দর। জিজ্ঞেস ক'রলেন—এখন আমার কর্ত্তব্য কী বলুন?

সেই জন্যই ত আসা তোমার কাছে।

নিভৃতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা হ'লো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুই মহারথীর।

আলোচনা শেষ ক'রে চ'লেন আশুতোষ প্রফুল্ল মুখে। অপেক্ষমান সকলে কী কথাবার্তা হ'লো এতক্ষণ ধ'রে, জানতে চাওয়াতে ব'ললেন—এখনও তোমাদের শোনবার সময় হয়নি।

প্রায়ই নিয়ে যেতেন অসুস্থ রামেন্দ্রসুন্দরকে ঘোড়ার গাড়ী পাঠিয়ে আশুতোষ তাঁর গৃহে। নানা কথাবার্তা চ'লতে লাগলো, কী সিলেবাস হবে বাঙলার এম,-এ তে।

সার আশুতোষ এক দিন বললেন—তোমাকে কয়েকটা লেকচার দিতে হবে ইউনিভারসিটিতে। শুনেই যান রামেন্দ্রসুন্দর। কথা নাই কিছু মুখে!

১৩২৫ সালের ফাল্গুন মাসে জ্বর দেখা দিল রামেন্দ্রসুন্দরের। তার কিছু দিন পর হ'তে মূত্ররোগ প্রবল হ'য়ে উঠলো। সর্ব্ব শরীর ফুলে উঠলো। চৈত্র মাসের প্রথম দিকেই উত্থানশক্তি রহিত হ'য়ে প'ড়লেন।

শঙ্কাতুর বিদ্বজ্জন ক'লকাতা সহরের একে একে এসে দেখা ক'রে যান। তিনি সেই অবস্থাতেও সহাস্য মুখে মধুর ভাষায় আলাপ আলোচনা করেন তাঁদের সঙ্গে। নিশ্চিন্ত, নির্ব্বিকার, নির্ভয় তিনি। আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকায় বিচলিত দেখা যায়নি কোনও দিন আচার্য্য ত্রিবেদীকে!

এই সময় এক প্রসিদ্ধ কবিরাজ এলেন এক দিন। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন—আপনি নাকি দেশের দিকে যেতে চান? এ অবস্থায় আপনার ত' যাওয়া হ'তে পারে না?

শুনেই বললেন—আমার কিন্তু যাওয়া চাই-ই। আমার মা মৃত্যুশয্যায়। আমি তাঁর শেষ কাজ ক'রতে যাবো হারান বাবু! এতে আমার যত ক্ষতিই হোক, মেনে নেবো।

এক বাক্যে হারান কবিরাজকে সমর্থন করে সমাগত সাহিত্যিকরা বললেন—আপনি আমাদের জাতীয় সম্পদ। কবিরাজ মহাশয়ের কথা শুনতে হবে আপনাকে।

হাসলেন মাত্র নীরবে রামেন্দ্রসুন্দর।

সকলেই বুঝলেন, কথার নড়চড় হবে না তাঁর কোনও মতেই।

বাড়ী এসে যখন ঢুকলেন রামেন্দ্রসুন্দর, তখন জেমোকান্দীর লোক অবাক্ তাঁকে দেখে। বুঝলেন তাঁরা জেমোকান্দী কেন, সারা দেশ এবার রামহারা হবে। রোগজীর্ণ দেহ দেখে দুশ্চিন্তা হ'লো সকলেরই। তিনি যে ছিলেন সর্ব্বজনপ্রিয়। তাঁর বিয়োগ যে অসহনীয় সকলেরই।

গৃহ-চিকিৎসক চন্দ্র বাবু এসে তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে কইতে ব'ললেন—রাম, মায়ের কাজ তোমার নিজে করা হবে না এই শরীর নিয়ে। ভাইকে অনুমতি দিয়ে করিয়ে নাও।

গভীর দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—তা' হয় না কাকা! এই কাজ করবার জন্যই যে আমি এখনও বেঁচে আছি।

আরও সব আত্মীয়-স্বজনও বললেন—এ অবস্থায় কাজ করা ঠিক হবে না আপনার।

কে শোনে সে কথা! রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর মায়ের পারলৌকিক ক্রিয়ার প্রধান অংশ নিজে সম্পাদন ক'রে আদেশ দিলেন ভাই দুর্গাদাসকে সম্পূর্ণ ক'রতে।

ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে প্রাণ খুলে কাঁদলেন রামেন্দ্রসুন্দর। সংবাদ পেয়ে বাড়ীশুদ্ধ লোক এসে হাজির। কেউ কিছু ব'লতে পারে না, নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো সকলে।

রামেন্দ্রসুন্দর ব'ললেন—এবারে আমার মহাভারতের শেষ পর্ব্ব। তখন তিনি স্থির শান্ত। তোমরা যাও, ব্যবস্থা করগে লোকজন খাওয়াবার।

মাতৃশ্রাদ্ধ সমাপ্তির পর থেকেই দেখা গেল রামেন্দ্র বাবুর শরীর যেন আরও ভেঙে প'ড়তে লাগলো। চিকিৎসার জন্য আনানো হ'লো কান্দী হাসপাতালের ডাক্তার বাবুকে। তখন তিনি ব'ললেন—জানাই ত। হোমিওপ্যাথি মতে ছাড়া কোনো ওষুধ আমি খাবো না। কিছুতেই বুঝান যায় না তাঁকে। তাঁর সেই এক কথা। নিত্য আসেন, দেখে যান ডাক্তার বাবু। ঔষধ কিন্তু খান না এক দাগও তিনি।

নিরুপায় হ'য়ে সকলেই ধ'রলেন, ভাল কবিরাজ আছেন কান্দীতে। তাঁর ঔষধ ব্যবহার করবেন ত? মৌন থেকে সম্মতি দেখালেন।

এলেন কবিরাজ। নানা জাতীয় ঔষধ দেন। এক দিন ব'ললেন তাঁর ভগিনীদিগকে—এলো মাসকাবারের সব জিনিষ? এখন তোমরা গুঁড়ো ক'রতে না হয় ছেঁচতে লেগে যাও।

কেন, আপনি যে ব'ললেন কবিরাজ আনাও।

হেসে বললেন—এত অসুখেও আমার ঠিক আছে? তোমরা ভুল বলছো। তোমাদের আগ্রহ দেখে আমি চুপ করেছিলাম মাত্র।

[ক্রমশঃ।

অঘোর প্রকাশ

(স্বর্গীয়া দেবী অঘোরকামিনী রায়ের জীবন-কাহিনী)

স্বর্গত প্রকাশচন্দ্র রায়

তৃতীয় খণ্ড—গৃহস্থবৈরাগিণী

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মনের প্রসার

মতিহারী থাকিতেই আমরা ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে জীবন যাপন করিতে শিখিতেছিলাম। এবার সেই জীবন নানা দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। আর ঘরের মধ্যে জীবনকে আবদ্ধ করিয়া রাখা সম্ভব রহিল না। বুঝিলাম, বাহিরের জনসমাজের সেবা না করিলে ঘরের ধর্ম্মও ঠিক থাকে না; আর বাহিরের জগৎ দেখিয়া মনটা বড় না হইলে, ভাল লোকের সঙ্গে মিশিয়া আত্মা উন্নত না হইলে, ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করা যায় না। তুমিও ইহা বুঝিতে লাগিলে, তাই এ সময় হইতে আমাদের চেষ্টা হইল যে, কিসে আমাদের জীবন, বিশেষতঃ তোমার জীবন, সংসারের সীমা ছাড়াইয়া বাহিরে গিয়া ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

তোমার ধর্ম্মজীবন কিরূপ দাঁড়াইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিতাম না। দীক্ষাগুরু ভাল পাইয়াছিলে সত্য; মতিহারীতে উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলে তাহাও সত্য; কিন্তু এ শিক্ষা পাকা কি না তাহা জানিতাম না। নিত্য উপাসনা করিতে শিখিয়াছিলে, কিন্তু সমবেত মণ্ডলী কাহাকে বলে তাহা তখনও জানিতে না। বন্ধু উমাচরণ ঘটক, তোমার ভাইঝি-জামাই রামলাল এবং শিবনাথ, এই কয়েক জনের সঙ্গে তোমার আলাপ হইয়াছিল। বাহিরের জগৎ দেখিয়া মনের যে প্রসার হয়, তাহা তোমার তখনও হয় নাই। ব্রাহ্ম-ব্রাহ্মিকারা কিরূপ তাহা বিশেষ জানিতে না। ভাল ভাল আত্মার সংস্পর্শে আত্মার যে উন্নতি হয় তাহাও তোমার হয় নাই। যখন দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্রের জন্ম হয়, তখন মিঃ কে এন রায়, ভিন্নদেশের লোক হইয়াও কিরূপে ভাইয়ের মত ব্যবহার করিতে হয়, তাহা দেখাইলেন? তাঁহার স্ত্রী স্বর্গীয়া দেবী সৌদামিনী দেখাইলেন, কিরূপে নিরাশ্রয়জনকে আশ্রয় দিতে হয়, আপনার কোলে টানিয়া লইতে হয়। তোমার মন ইহাতে খুলিয়া গেল। তুমি বুঝিলে যে আমাদের অজানিত কত শ্রেষ্ঠ মনুষ্যরত্ন আছেন, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ হওয়া আবশ্যক। তাই এখন হইতে আপন সংসারের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরে কি আছে দেখিবার ইচ্ছা হইল; আমিও সেই ইচ্ছা পোষণ করিতে লাগিলাম। এত দিন তুমি পল্লীগ্রামের পুরনারীর মতই বাস করিতে; বিদ্যাশিক্ষাও এমন কিছু হয় নাই যে তাহাতে তোমার অজ্ঞান-অন্ধকার শীঘ্রই দূর হইবে। জ্ঞানের অভাব দূর করা প্রয়োজন, কিন্তু কি উপায়ে হয়? ধর্ম্মে ও জ্ঞানে উন্নত ভাল ভাল লোকের সঙ্গে আলাপ হইলে, তাঁহাদের প্রসঙ্গ শুনিলে, তাঁহাদের উপাসনায় যোগ দিলে সে আঁধার অল্পে অল্পে চলিয়া যাইতে পারে। তাহাই হইতে লাগিল। যেমন যেমন ভাল ভাল লোকের সহিত তোমার পরিচয় করিয়া দিতে লাগিলাম, তোমার অজ্ঞান-আঁধার দূর হইতে লাগিল। তোমার উৎসাহ দেখিয়া আমার আনন্দ আর ধরিত না; আমারও উৎসাহ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। নারীসুলভ লজ্জা ও ভয় থাকিতে যথার্থ উন্নতি হয় না; ক্রমে ক্রমে এই লজ্জা ও ভয় অতিক্রম করিতে লাগিলে। তোমার সাহস বাড়িতেছে, আর অন্য লোকের সঙ্গে মিশিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী তুমি শিখিতেছ, দেখিয়া আমারও সাহস বাড়িল। তোমার গুণে আমারও বন্ধুসংখ্যা বাড়িয়া চলিল। এই বাহিরের প্রসার, আমাদের পারিবারিক দৈনিক উপাসনার ভাবকে গভীর করিতে লাগিল। ভাবগুলি উন্নত হইতে লাগিল। শ্রীযুক্ত হরিসুন্দর বসু মহাশয়ের ভাল উপাসনার সুখ্যাতি শুনিয়া তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হইলে।

তুমি এইরূপ বাহিরে মিশিতে লাগিলে। আমার জীবনে বাহিরে মিশিবার একটি উপায় ছিল, তাহা তোমার সব সময় হইয়া উঠিত না। মফঃস্বলে গিয়া আমি কত ভাল ভাল লোকের সঙ্গ পাইতাম, কত স্থানে কত শিক্ষা সংগ্রহ করিলাম। যখন তুমি আমার সঙ্গে যাইতে পারিতে না, তখন সে সকলের অংশ তোমাকে দিবার জন্য ব্যাকুল হইতাম। এই সময়ের এক বারকার কয়েকখানি পত্র তাহা প্রকাশ করিবে।

"৫।১।৮০। আজ এখন জাহানাবাদে। রাত্রি ৯টা বাজিয়াছে। এই আহার করিয়া আসিলাম। এখানে একটি সুন্দর বাঙ্গালা আছে, ইহাতে প্যারী বাবু থাকেন। তাঁহার পরিবার এখানে; তিনি আজ বাসায় নাই। ভবুয়ায় গিয়াছেন। এখানে আসিয়া আমি যে আহার করিব সে কথা বলিতেও হয় নাই। প্যারী বাবুর স্ত্রী আপনা হইতেই পুরী, তরকারী, বেগুন ভাজা ও দুধ প্রস্তুত করিয়াছেন। প্যারী বাবুর সঙ্গে যে আমার আলাপ আছে তাহা বোধ হয় তিনি জানেনও না। এমন অবস্থায় যত্ন করা সহজ নয়। তুমি কি পার? স্বামীর অপরিচিত বন্ধুকে যত্ন করা সকলের দ্বারা হইয়া উঠে না। দুই একজন নারী (ব্রাহ্মিকা) জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান যে অভ্যাগত ব্যক্তির সঙ্গে বাটীর কর্ত্তার আলাপ আছে কি না? ইনি তাহাও করেন নাই। তাই এত প্রশংসা করিতেছি।"

এই পত্রের মধ্যে "তুমি কি পার" ইহা কেন বলিয়াছিলাম, তাহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলে। হয় তো এই আখ্যায়িকা পাঠ করিয়া আরও ভাল করিয়া অতিথি-সৎকার করিতে শিখিয়াছিলে।

"১২ জানুয়ারী ১৮৮০। আজ প্রাতে উঠিয়া শোণে স্নান করিতে গিয়াছিলাম। বড় নদী দেখিলে মন বড়ই প্রশান্ত হয়; তাহার আর কোন সন্দেহ নাই। বালির তটে বসিয়া স্নানান্তে উপাসনা করিলাম। এক নূতন ভাব হইল। ধূ ধূ করিতেছে বালির চড়া; তাহারই মধ্যে অনন্ত ঈশ্বরের পূজা করা কিছু সামান্য ব্যাপার নহে। ফিরিয়া আসিবার সময় অনেক উপলখণ্ড কুড়াইয়া

আনিলাম। এক টুকরা পাথর পাইয়াছি, তাহার দ্বারা এই স্থানের স্মরণার্থ একটি আংটি করিয়া লইব।"

বালির তটে অনন্তের পূজার কথা বলিয়া তোমার লোভ বাড়াইয়া দিলাম। আংটির কথা আমি বলিয়াছিলাম মাত্র; তুমিই তাহা কার্য্যে পরিণত করিলে, এবং পাথরের উপর "অ প্র" লিখাইয়া রাখিলে। এ দুটি অক্ষরের অর্থ কি এখন আর তাহা বলিতে হইবে না। এ জীবনীই তাহার পরিচয়।

এক দিকে আমি যেমন তোমার মনের প্রসার কিসে হইবে তাহার জন্য ব্যস্ত হইতাম, আবার তুমিও সদাই ভাবিতে, কিসে আমার কর্ম্মজীবন সরস থাকিবে, কর্ম্মশ্রান্ত আত্মা বল লাভ করিবে। তাই ২০শে জানুয়ারী ১৮৮০ আমাকে পত্রে লিখিয়াছ, "ভাই, আজ সন্ধ্যার সময় তোমার ভবুয়ার পত্রখানি পাইলাম। আজ বৈকালে হরিসুন্দর বাবু আসিয়াছেন। তিনি কালকার সকালের গাড়িতে কলিকাতায় যাইবেন। তুমি কি যাইবে না? যদি ২৩শে তুমি বাঁকিপুর এস, তবে কেমন করিয়াই বা ছুটি লইবে, আর কেমন করিয়াই বা যাইবে? শনিবারে উৎসব। তবে কি তুমি যাইবে না? তোমার যদি না যাওয়া হয়, তবে আমার বড় মনঃকষ্ট হইবে। তাই এত করিয়া বলিতেছি। যদি ২১।২২শে এখানে আস, তবে গতি বাবুকে বলিয়া সাহেবের কাছে ছুটি লইয়া ২৩শের ডাকগাড়িতে যাইতে পার। যাহা ভাল হয় করিও; হরির (ঈশ্বর লিখিতে হরি লিখিয়াছি), ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আজ তোমাকে দেখিতে বড়ই ইচ্ছা করিতেছে। গতকল্য বড় ভাল উপাসনা হইয়াছিল। তোমার শরীর মন কেমন? শীঘ্র লিখিও। যত শীঘ্র পার আসিতে চেষ্টা করিও। ২১।২২শে আসিও। কেমন, তাই তো?"

এই সময়ে দ্বিতীয় পুত্র সাধনচন্দ্রের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক মহাশয়দিগের সঙ্গে তোমার পরিচয় হইল। তাঁহাদের এবং অন্যান্য ধর্ম্মবন্ধুদের সঙ্গে উপাসনা করিয়া আমরা এসময় অনেক উপকৃত হইয়াছিলাম। শ্রদ্ধেয় প্রতাপ বাবু মহাশয় উপদেশে শিশুচরিত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন। শিশু সুখী, কারণ সে দুর্ব্বল, সে নির্ভর করিতে জানে। রোগী দুর্ব্বল, অথচ সুখী নয়। গৃহহীন পথের ভিখারী নিরাশ্রয় বটে, কিন্তু সুখী নয়। ক্রীতদাস নির্ভরশীল, তবু সুখী নয়, কারণ ইহারা সকলেই আপন আপন অবস্থা হইতে উদ্ধার পাইতে চায়। আমরা যদি জগজ্জননীর উপরে শিশুর মত নির্ভর করিতে পারি, তবে সুখী হইব। তাঁহার উপদেশ খুব ভাল লাগিয়াছিল। তখন বাঁকিপুরে অন্য ব্রাহ্ম কেহ ছিলেন না। কয়েকটি হিন্দু বন্ধু এ উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বাজনা হয় নাই বলিয়া শ্রদ্ধেয় মহাশয় অনুযোগ করিলেন। বলিলেন, সকল জাতকর্ম্মেই ধুমধাম করা উচিত, কেন না কেহ তো জানে না সন্তান ভবিষ্যতে কোন্ মহৎকার্য্যে নিযুক্ত হইবে।

দেবী সৌদামিনীর সঙ্গে তুমি কখনও কখনও গাড়ী করিয়া বেড়াইতে যাইতে এবং তাহাতে তোমার শরীর ও মনের বিশেষ উপকার হইত। জ্ঞান লাভের দ্বিতীয় উপায় ভিন্ন ভিন্ন দেশ দেখা। এক দিন তোমার নিকট ডুমরাওনের জঙ্গলের বর্ণনা করিলাম এবং তথায় যাইবার প্রস্তাব করিলাম। তুমি আনন্দে সম্মতি দিলে। দিন কয়েক পূর্ব্বে ট্রেণে মধ্যম শ্রেণীর স্ত্রীলোক যাত্রীদিগের জন্য একটি স্বতন্ত্র কামরা নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। রেলওয়ে ষ্টেশনে গিয়া প্রস্তাব করিলাম সুবোধচন্দ্রকে লইয়া তুমি সেই স্বতন্ত্র কামরায় যাও। প্রথম প্রথম এ প্রস্তাবে ভয় পাইয়াছিলে। বঙ্গনারীর পক্ষে একাকী স্বতন্ত্র কামরায় যাওয়া কি সহজ? কিন্তু আমার কথা রাখিবার জন্য একাকী যাইতে সম্মত হইলে। আমিও প্রতি ষ্টেশনে নামিয়া তোমাকে দেখিতে লাগিলাম। ক্রমে তোমার সাহস বাড়িল ও প্রকৃতিস্থ হইলে। এইরূপে একাকী পথ চলিতে প্রথম শিক্ষা পাইলে। ইহার পর একাকী ভ্রমণ করিতে আর কখনও ভয় পাও নাই। সন্ধ্যার পর ডুমরাওন পৌছিলাম। সেখানে গাড়ী পাওয়া যায় না। পালকিও পাওয়া যায় না। এক্কা পাওয়া যায়। তুমি তাহাতেই যাইতে স্বীকার করিলে। আমি নিজেই হাঁকাইলাম। কিছু দিন পূর্ব্বে আচার্য্য কেশবচন্দ্র সদলে ডুমরাওনের বনটিতে উপাসনা করিয়াছিলেন। আমরাও ঐ বনে উপাসনা করিলাম। জঙ্গল দেখিয়া তোমার মন উন্নত হইল, আমিও পরম সুখী হইলাম। প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতি-নাথকে দেখিয়া আমরা পরমানন্দিত হইলাম।

বাহিরে আসিয়া তোমার মনের স্বাধীন ভাব বাড়িতে লাগিল, সাহস বাড়িতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির অধিকার বিষয়ে নারীজীবনের আদর্শ বিষয়ে, চিন্তার স্রোত খুলিয়া যাইতে লাগিল। যতই তুমি বাহিরের জগৎ দেখিতে লাগিলে, ততই বুঝিতে পারিলে, এদেশে নারীর অবস্থা কত হীন এবং তাঁহার উন্নতির পথে পদে পদে কত বাধা—ততই তোমার মনে ক্লেশও হইতে লাগিল। ১৮৮১ সালে তুমি যখন গয়াতে গিয়াছিলে, সেখানকার উৎসবে যোগ দিয়া, সকলের উৎসাহ ও প্রমত্ত ভাব দেখিয়া, নারীদিগের জন্য তোমার এই বেদনা আরও জাগিয়া উঠিল। উৎসবান্তে সকলে শ্যামাচরণ বাবুর বাটীর প্রাঙ্গণে সঙ্কীর্ত্তন করিতেছিলেন। তুমি আর থাকিতে পারিলে না। তুমি দেখিলে, কেবল পুরুষেরাই এইরূপে সমবেত ভাবে হরিগুণ কীর্ত্তন করেন। নারীদের ভাগ্যে তাহা হয় না। তুমি তখন উপরের বারান্দা হইতে উচ্চৈঃস্বরে প্রার্থনা করিলে, "ভগবান, তোমার পুত্র সন্তানদের জন্য এত করিলে, ভালই হইল; তোমার কন্যাদের জন্য কি করিলে? তাহাদের মুখপানে কে চাহিবে? তাহাদের উন্নতি কিরূপে হইবে?" উপাসনা, সঙ্কীর্ত্তন আলোচনা প্রভৃতি যাহা কিছু পুরুষেরা করিতেন, তোমার মনে হইত যে নারীদেরও তাহা করা আবশ্যক, ও তাহা করিবার সুযোগ পাওয়া আবশ্যক। আর যথার্থ কথাও তো তাই। বিধাতা একই ধাতুতে নারীর ও পুরুষের আত্মাকে গড়িয়াছেন, ভিন্ন নিয়ম কিরূপে হইতে পারে? অধিকারে বড় ছোট কিরূপে হইতে পারে? যখন সামাজিক উপাসনায় আচার্য্য বলিতেন, "আমরা দণ্ডায়মান হইয়া প্রার্থনা করি," তখন কোন নারীই উঠিতেন না; কিন্তু তুমি আপনাকে সমাজের এক জন লোক মনে করিতে, এবং প্রত্যেক সামাজিক উপাসনায় সাধারণ প্রার্থনার সময় পুরুষদের সঙ্গে দাঁড়াইয়া প্রার্থনা করিতে। এজন্য তোমাকে অনেক নিন্দা ও ভৎর্সনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তুমি তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিতে না।

তোমার ঐ দিনের করুণ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া সকলেরই মন তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইল। শ্রদ্ধেয় প্রচারক কেদার বাবু মহাশয় তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সাধু অঘোরনাথ তখন গয়ার সেই দলে ছিলেন। তিনি তোমাকে পূর্ব্বেই ভাল


·SANFORIZED·
SHRUNK FABRIC

সিতেন, এখন সে আত্মীয়তা আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গয়ায় থাকিতে থাকিতেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার মাতা স্বর্গে গিয়াছেন। তিনি বলিলেন, বাঁকিপুরে তোমার বাটীতে গিয়া [জ]ের মাতৃশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবেন। তাঁহার এই আত্মীয়তা প্রকাশে আমরা কতই কৃতার্থ অনুভব করিলাম। বাঁকিপুরে আসিয়া তিনি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন সেই ভাবে সুশৃঙ্খলরূপে তুমি শ্রাদ্ধের সব কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিলে।

শ্রদ্ধেয় সাধু অঘোরনাথের প্রভাব আমাদের জীবনে ক্রমশঃ অধিক কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ সাধুপুরুষ ছিলেন। যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্ম যেন তাঁহাতে সমান ভাবে অবস্থিতি করিতেছিল। আমাদের বড় সাধ হইতেছিল যে তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের জীবন গড়িব। মনের এই সাধ তখনও কোনও সঙ্কল্পের আকারে প্রকাশ করি নাই। কিন্তু মনের ভিতর ইহার ক্রিয়া দৃঢ় ভাবে হইতে লাগিল।

এই বৎসর ১লা জুন হইতে বাড়ীতে একটি নূতন নিয়ম প্রবর্ত্তন হইল। তুমি প্রতি মাসে স্বামীর বেতনের টাকা অগ্রে গৃহদেবালয়ে ঈশ্বরচরণে নিবেদন করিয়া তাহার পরে ব্যয় করিতে লাগিলে। বালক-বালিকা সকলেই বুঝিতে লাগিল যে, ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত একটি পয়সাও ব্যয় করিতে নাই। এই ব্রত রক্ষার জন্য পরে তোমাকে বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে আমার কনিষ্ঠ প্রবোধ তাঁহার পরিবার লইয়া বাঁকিপুরে উপস্থিত হইলেন। এতগুলি পরিবার লইয়া দেবী সৌদামিনীদের সঙ্গে একত্রে থাকিলে তাঁহাদের অসুবিধার সম্ভাবনা। কিন্তু তাঁহাদের ভালবাসা অতিক্রম করা কঠিন বলিয়া আরো কিছু দিন থাকিতে হইল। অবশেষে ১৮৮১ সালের শেষ ভাগে অন্য বাড়ীতে উঠিয়া গেলাম।

আবার তোমার গৃহিণীর কার্য্য আরম্ভ হইল। এই বার দেখিলাম, তুমি কেমন সুশৃঙ্খলার সহিত গৃহকর্ম্ম করিতে পার, আবার কত যত্নের সহিত দৈনিক ধর্ম্ম সাধনটুকুকেও ধরিয়া থাক। এ বাড়ীতে আসিয়াই পৃথক্ উপাসনার ঘর নির্দ্দিষ্ট করা হইল। প্রতিদিন দেবালয়ে বসিয়া ভক্তিভরে আমার সঙ্গে মিলিয়া প্রাণেশ্বরের চরণপূজা করিতে। তোমার নিষ্ঠা আমার কত সাহায্য করিত। এক দিনকার কথা বেশ মনে আছে, চিরকাল মনে থাকিবে। সেদিন সকালে আমার উপাসনা ভাল হয় নাই। মন অশান্ত হইয়াছিল। তাই সন্ধ্যার সময় তুমি অনুরোধ করিলে, আবার উপাসনা হউক। তোমার সেই অনুরোধের ফল কি হইয়াছিল, তাহা আমার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম। "উপাসনা সরস হইল না। সন্ধ্যার সময় স্ত্রীর অনুরোধে উপাসনা-ঘরে বসিলাম, ও মহা উপকার পাইলাম। প্রাণ ভিজিয়া গেল।" এরূপ না হইলে কি সংসারে চলিতে পারিতাম? এইরূপে তুমি যে আমাকে কত দিন আধ্যাত্মিক কত বিপদ হইতে বাঁচাইয়াছ, তাহা বলিতে পারি না। আমার মন শুষ্ক হইলে তুমি আমার মুখ দেখিয়াই তাহা বুঝিতে পারিতে ও কিসে সে শুষ্কতা যায় তাহার চেষ্টা করিতে।

এক জন শ্রদ্ধেয় বন্ধু পীড়িত হইয়া এই সময়ে কয়েক দিন আমাদের বাটীতে ছিলেন। তোমার সেবা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া তিনি একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। উপাসনার সময় তোমাকে মা ভগবতী বলিলেন, কন্যা দু'টিকে লক্ষ্মী ও সরস্বতী বলিলেন, পুত্র দু'টিকে কার্ত্তিক ও গণেশ আখ্যা দিলেন। এত প্রশংসা আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু তুমি তাঁহার মনে এক আশ্চর্য্য ভাব জাগাইয়া দিয়াছিলে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি চলিয়া গেলে তোমার অপূর্ণতার বিষয়ে তোমার সঙ্গে আলাপ করিলাম; কারণ কেবল প্রশংসা লাভ করিলে মানুষের ক্ষতি হয়।

নবম পরিচ্ছেদ

তপস্যার আরম্ভ

১লা জুলাই ১৮৮২ তোমার তৃতীয় পুত্র বিধানচন্দ্রের জন্ম হয়। তখন তোমার বয়স ২৬ বৎসর। এই আমাদের শেষ সন্তান। অনেকগুলি সন্তান হইলে যে নারীর ধর্ম্মসাধনের ব্যাঘাত হয়, তাহা তুমি বুঝিয়াছিলে। সমাজে যাইতে হইলে সন্তানকে ঘুম পাড়াইয়া দাসীর নিকট রাখিয়া যাইতে; কিন্তু অতি শিশু সন্তানকে তো রাখিয়া যাওয়া যায় না। তা ছাড়া ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে গর্ভস্থ সন্তান সাধনের আরও ব্যাঘাত করে, এ কথা সদাই বলিতে। এই বার তাই আমরা দু'জনে সন্তান ক্রোড়ে লইয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর সন্তান হইবে না। কিছুকাল পরে যখন এই সন্তানের নামকরণ উপলক্ষে শ্রদ্ধেয় প্রচারক ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় আসিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে আমরা দু'জনে ছয় মাসের জন্য আত্মিক ব্রত গ্রহণ করিলাম; প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, এই ছ মাস শরীরের সম্পর্ক থাকিবে না। সন্তানের মাথায় হাত দিয়া এ প্রতিজ্ঞা শক্ত করা হইল। কত ভয়ে ভয়ে তখন এই ব্রত গ্রহণ করিতেছিলাম! কত কম্পিত হৃদয়ে শ্রদ্ধেয় প্রচারক মহাশয়ের কাছে এ সঙ্কল্পের কথা প্রকাশ করিয়াছিলাম! কিন্তু ভগবান সহায় হইয়া দেখাইয়া দিলেন, তিনি দুর্ব্বল মানুষের দ্বারা কি আশ্চর্য্য কার্য্য করাইয়া লইতে পারেন।

নবসংহিতায় আছে, এক সপ্তাহের জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিবে। এক সপ্তাহ ব্রত পালন আমাদের বিশেষ শক্ত বোধ হইল না। আমরা প্রকৃতিকে একেবারে শাসনাধীনে আনিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলাম। সাধু অঘোরনাথের সহিত আলাপের পর অনেক বার ইহার অনুরূপ সঙ্কল্প করিয়াছি, কিন্তু হারিয়া গিয়াছি। এক মাস দুই মাস তিন মাস বেশ ভাল গেল, আমার প্রতিজ্ঞার বল চূর্ণ হইয়া গেল। এইরূপ কত বার হইয়াছে। তোমার ও আমার দুর্ব্বলতা আমরা দু'জনেই অবগত ছিলাম। তাই ভয়ে ভয়ে এবারও ছয় মাসের জন্যই ব্রত গ্রহণ করিলাম। সাক্ষী রহিলেন কেবল ভগবান ও ত্রৈলোক্য বাবু মহাশয়।

* * * *

দেবি, তুমি কি এখন তোমার দেহের জীবনের এ সকল সংগ্রাম স্মরণ কর? তুমি এখানকার তরঙ্গের পরপারে গিয়াছ, আমি এখনও রহিয়াছি। এখানকার সুদীর্ঘ জীবনে যে কষ্ট বহন করিয়াছিলে, তাহা কি মনে পড়ে? তোমার জীবন-কাহিনী বলিতে বলিতে এ জীবনের সে সব কথা বলিতে হইবে; যত উত্থান-পতন হইয়াছে, যত আশা ও যত ব্রহ্মকৃপা লাভ করিয়াছি,-সকলেরই সাক্ষ্য দিয়া যাইব। তোমাকে সম্বোধন করিয়া যখন বলি, তখন যেমন মুক্তপ্রাণে বলিতে পারি,

এমন আর কখনও পারি না। দেবি, তোমার উচ্চ স্থান হইতে, শুদ্ধ অবস্থা হইতে, আমাকে আশীর্ব্বাদ কর, বলিতে বলিতে যেন আমি আরও উচ্চে উঠিয়া যাইতে পারি।

* * * *

ঐ ছয় মাসের পাঁচ মাস অতীত হইলে মাঘ মাস উপস্থিত হইল। আমরা কলিকাতার উৎসবে যাইব, স্থির হইল। আমি বলিলাম, তুমি আমার পূর্ব্বে যাত্রা করিয়া, এক বার পিত্রালয় হইয়া, তার পর কলিকাতায় এস। তোমার একাকী দেশে যাইতে ইচ্ছা ছিল না। আমার অনুরোধে অবশেষে স্বীকৃত হইলে। পিত্রালয়ে অধিক দিন থাকিবার সময়ও ছিল না। তিন দিন পরেই মাতাকে বলিলে, "কলিকাতায় যাব।" উদ্দেশ্য এই যে, কলিকাতায় গিয়া বাসস্থান ঠিক করিবে ও আমার জন্য অপেক্ষা করিবে। মাতা বলিলেন, "অনেক দিন পরে আসিয়াছ, আর কিছু দিন থাকিয়া তবে যাইও।" বেণী দাদা ভয় দেখাইলেন, "যাইবে কিরূপে? আমি নৌকার বন্দোবস্ত না করিয়া দিলে তো যাইতে পারিবে না।" তুমি কিছু না বলিয়া কন্যা সুধাকে ডাকিয়া বলিলে, "কাপড় গুছাও।" জিজ্ঞাসা করাতে বলিলে, "নৌকা কোথায় পাওয়া যায় তাহা তো আমি জানি; আমি নিজেই করিয়া লইব।" তোমার মাতা তোমাকে চিনিতেন। তিনি বলিলেন, "বেণী, আপত্তি করিও না, নৌকা আনিয়া দাও।" তখন নৌকা আসিল। তুমি কলিকাতায় চলিয়া আসিলে, বাসা লইলে। কয়েক দিন পরে আমিও সেখানে আসিয়া জুটিলাম।

তুমি দেশ হইতে ভাল নারিকেল আনিয়া আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দিয়াছিলে, তাহা পাইয়া তিনি বড়ই আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। যাহাতে উৎসবের সব অনুষ্ঠানগুলিতে তুমি উপস্থিত থাকিতে পার, তাহার জন্য তুমি অনেক যত্ন করিতে। স্বীয় শৃঙ্খলাগুণে তুমি সন্তানাদির আহার সমাপন করিয়া প্রতিদিন সকালে ৮টার মধ্যেই প্রস্তুত হইয়া আচার্য্য মহাশয়ের গৃহে দৈনিক উপাসনা স্থানে চলিয়া যাইতে। অনেক দিন তোমাকে চেষ্টা করিয়া প্রবেশদ্বার খোলাইয়া লইতে হইত, অনেক দিন ভাল স্থান পাইতে না, তবু তোমার উপাসনার অনুরাগ কমে নাই। তোমার অনুরাগ দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইতেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "নূতন যে মেয়েটি আসিয়াছে, তাহার কাছে তোমরা উপাসনায় অনুরাগ শিক্ষা কর।" তুমি উপাসনার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত থাকিতে। কেহ কেহ উপাসনা প্রায় শেষ হইবার সময় (নাম পাঠের সময়) আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইহা দেখিয়া তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে। উৎসবের পূর্ব্বে নববৃন্দাবন নাটকের অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছিলে। নাটক অভিনয় দেখা তোমার এই প্রথম এবং এই শেষ।

ব্রাহ্মিকাদিগের উৎসব শান্তিকুটীরের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে হইয়াছিল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র উপাসনা করিলেন। এমন সমবেত নারীমণ্ডলী তো আর জীবনে দেখ নাই। যাহা কল্পনা স্বপ্ন ছিল তাই স্বচক্ষে দেখিলে; সকলে যখন প্রার্থনা করিলেন, তুমিও প্রার্থনা করিলে, কিন্তু তাহাতে তোমার মনের আশ মিটিল না। তুমি আবেগ সম্বরণ করিতে পারিলে না। তুমি আর এক বার প্রার্থনা করিলে। মনে প্রার্থনার বেগ আসিলে প্রার্থনা করিতে দেশকাল তোমার কোন বাধা দিতে পারিত না। এক উপাসনায় এক জনের দুই বার প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া অনেকে অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

উৎসবান্তে বিদায়ের সময় আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলে। প্রণাম করিয়া তুমি বলিলে, "ভুলিবেন না!" আচার্য্য বলিলেন, "আর কি ভোলা যায়?" নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে ভোলেন নাই, কেন না তাঁহার ভাবে, তাঁহার তেজে অনুপ্রাণিত হইয়া তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের কাজ করিয়াছিলে। তাঁহার মত তোমারও কাজ করিতে করিতেই মহাপ্রয়াণ হইয়াছিল।

* * * *

আত্মিক মিলনব্রতের ছয় মাস উৎসবের মধ্যেই শেষ হইল। এই দিনের জন্য তুমিও প্রতীক্ষা করিতেছিলে, আমিও প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। দেবপ্রেরণায় এই দিন সকালের উপাসনার পরে আমরা দু'জনে সঙ্কল্প করিলাম, এই ব্রতই আজীবন পালন করিব। অনন্ত আত্মিক মিলনের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইলাম। উৎসবের প্রবাহে থাকিয়া তখন আমরা এই ব্রত গ্রহণের জন্য কিছুই ক্লেশ অনুভব করিলাম না।

* * * *

দেবি! উৎসবের পরে এবার যখন বাঁকিপুরে ফিরিয়া আসিলাম, তখন কত বড় পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে! অনন্তকালের জন্য আত্মিক মিলনব্রত লইয়াছি; যেন নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছি! উৎসবের প্রবাহ তো প্রতিদিন থাকে না, কিন্তু জীবনের সংগ্রামভার প্রতিদিনই বহন করিতে হয়। এবারকার দৈনিক জীবন কত নূতন বোধ হইতে লাগিল!

মধ্যে মধ্যে তুমি ম্লান হইতে। মলিন মুখ দেখিলেই আমার মনে হইত, বোধ হয় তোমার মনের উপর অধিক চাপ দেওয়া হইতেছে। বন্ধুরাও সেই কথা বলিতে লাগিলেন। সুতরাং তোমার জন্য আধ্যাত্মিক আহার সংগ্রহ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যেখানে যাহা ভাল পাইতাম, একান্ত হৃদয়ে তোমাকে উপহার দিতে লাগিলাম। মনের ক্ষোভ ক্রমশঃ দূর হইতে লাগিল। ভক্তচরিত পাঠ, সাধুসঙ্গ সম্ভোগ সকাল সন্ধ্যায় নাম গান করা, খুব ভোরে উঠিয়া আলোচনা করা, এ সকলই আরম্ভ হইল। আর শেষজীবন পর্য্যন্ত ইহাতেই তোমাকে সন্তুষ্ট রাখিত।

নিশা অবসানে তুমি মনের ভার ও দুঃখ সকলই আমাকে বলিতে। কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, আমার সাধ্যমত তাহা বলিয়া দিতাম। যখন বুঝিতে পারিতাম না, দু'জনে মিলিয়া প্রার্থনা করিতাম। উভয়েই সমান দুর্ব্বল; উভয়েরই জন্য সংগ্রাম সমান কঠিন হইয়াছিল। কিন্তু পরস্পরের সাহায্যে ধীরে-ধীরে শরীরের অধিকার অতিক্রম করিতে লাগিলাম!

এইরূপে তুমি সমুদয় শারীরিক অভাব ক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিলে, এবং সেবার ধর্ম্মে অঙ্গ ঢালিয়া দিতে লাগিলে। সন্তানদিগকে ভালবাসিতে, কিন্তু আমার মনে হয়, আমার প্রতি ভালবাসা বাড়িতে লাগিল। তুমিও জানিতে, আমার শরীরের অভাব হইলে

কেবল স্বর্গীয় খাদ্যে তোমার সে অভাব দূর হইতে পারিবে। কত বার সংসারপথে চলিয়া মন ক্লান্ত হইলে তুমি বলিয়াছ, "চল, একবার গাড়ী করিয়া বেড়াইয়া আসি।" অল্পেতেই তুমি সফলযত্ন হইতে। প্রসন্ন চিত্তে আবার দৈনিক পরিশ্রমে নিযুক্ত হইতে। যখন আমার শারীরিক ভাব অধিক জাগরিত হইয়া উঠিত, নিজগুণে তুমি মহাব্রতের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে; এবং মায়ের মত আমাকে রক্ষা করিতে।

এ সময়ে আমাদের মনের আগুন কিরূপে জ্বলিত, কে নির্ব্বাণ করিত, কোথা হইতে শান্তিসলিলে অভিষিক্ত হইতাম, ও নূতন উৎসাহের সহিত আবার দু'জনাই চলিতাম, তাহা কেহই জানিতে পারিত না। না জানিবার কারণও ছিল। কাহাকেও এ ব্রতের কথা জানাই নাই। যদি ব্রত ভঙ্গ হয়, সমুদয় নষ্ট হইবে, হাস্যাস্পদ হইব, এ ভয় ছিল। তখনকার চোখের জলের কথা কেবল তুমি আমি জানিতাম, আর ভগবান জানিতেন।

এই এক সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে তোমার আত্মার শক্তি যেন নানা দিক দিয়া ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। ইহার পূর্ব্বে তুমি কখনও নিজে উপাসনার কাজ কর নাই। এখন হইতে অনেক সময় তুমিই উপাসনা করিতে, আমি যোগ দিতাম। প্রাণে সংগ্রাম ছিল, আকুলতা ছিল, তাই তোমার সজীব উপাসনা দু'জনকেই অতি সরস রাখিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঁকিপুরে আসিয়া আমাদের চেষ্টা হইল যে, কিসে আমাদের জীবন ঘরের সীমা অতিক্রম করিয়া বাহিরেও ব্যাপ্তি হইয়া পড়ে। এখন তোমার আত্মা এত জাগিয়া উঠিল যে, তাহার সকল আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কিসে হইবে সেজন্য আমাকেও ব্যস্ত হইতে হইল। পরসেবার জন্য তুমি অধিক ব্যাকুল হইতে লাগিলে। দেখিলাম, যতই অন্যকে ভালবাসিতে পারা যায়, শুদ্ধতার পথও ততই সহজ হয়। তুমিও তাহা বুঝিলে। তাই ক্রমে অন্যের বাটীতে গিয়া পারিবারিক উপাসনায় সাহায্য করিতে লাগিলে। এই সময় হইতে রাজপথ দিয়া হাঁটিয়া চলিতে আরম্ভ করিলে। প্রতিদিন রাজপথ দিয়া হাটিয়া ভাই পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপাসনা করিতে যাইতে।

এইরূপে জীবনের সংগ্রাম চলিল, সেবাও চলিল। ব্রহ্মকৃপায় আমরা দু'জনে অগ্রসর হইতে লাগিলাম, কে আগে কে পশ্চাতে তাহা সব সময় স্থির করিতে পারিতাম না। এই সময়ে ব্রহ্মকৃপাতেই আর একটি নূতন পরীক্ষা আসিল, এবং প্রমাণ করিয়া দিয়া গেল যে, তুমি বিশ্বাসে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ১৮৮৩ সালের আগষ্ট মাসে তোমার দ্বিতীয়া কন্যা সরোজিনীর জ্বর হয়। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন এগার বৎসর মাত্র। ভাই পরেশনাথ চিকিৎসা করিতেছিলেন। প্রথম প্রথম রোগের উপশম না হইয়া বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। এক দিন খুব বাড়িল, অবস্থা খারাপ হইল। প্রাতঃকালে ভাই পরেশ বলিলেন, "বিপদের আশঙ্কা আছে, আজ আফিস যাইবেন না।" আমি আফিসে গেলাম না, বাড়ীতেই রহিলাম। বিকালবেলা অবস্থা আরও খারাপ হইল। ইউরীমিয়া হইয়া উদর স্ফীত হইল। আরও দুই জন ডাক্তার আসিলেন। ঔষধ প্রয়োগে স্ফীত উদর কমিয়া গেল বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নাড়ীও বসিয়া গেল। সন্ধ্যার সময় হইতে ঘর্ম হইতে লাগিল। রাত্রি ১১টার সময় আর জীবনের আশা রহিল না।

সরোজিনীর কোন শেষ ইচ্ছা আছে কি না, আমার মাতা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সরোজিনীর জন্য নূতন সোনার হার গড়ান হইয়াছিল, সরোজিনী তাহাই চাহিয়া লইলেন। কিছুক্ষণ পরে হার ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন, "রাখিয়া দাও, ছোট ভাইরা পরিবে।" এই কথা শুনিয়া আমার চক্ষে জল আসিল। তুমি কোথায় ছিলে, আমার সেই চক্ষের জল দেখিবামাত্র আসিয়া আমাকে সঙ্কেত করিলে; প্রাঙ্গণে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিলে, "তুমি গৃহকর্ত্তা, তুমি যদি এ সময়ে একটু দুর্ব্বলতা দেখাও, সকলে হাল ছাড়িয়া দিবে, কন্যার প্রতি কর্ত্তব্য আর করা হইবে না।" তার পর আমাকে ডাকিয়া উপাসনার ঘরে লইয়া গেলে। তাই দেখিয়া ভাই পরেশও সেখানে গিয়া বসিলেন। আমরা সকলেই ছোট ছোট প্রার্থনা করিলাম। আমার মন খুব ভাল হইল। আবার কন্যার পার্শ্বে গিয়া সেবা করিতে লাগিলাম। দেবি! এই দিনের তোমার ঐ ইঙ্গিতের কথা আমার চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। সেদিন আমরা কত বার উপাসনাগৃহে গিয়াছিলাম, কত বার প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা গণনা করিয়া রাখিলে ভাল হইত।

লোকে চিকিৎসক পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছিল। তুমি স্থির ভাবে সকলের কথাই শুনিয়া যাইতেছিলে, কিন্তু চঞ্চল হইতেছিলে না। অবশেষে কয়েক দিন পরে সরোজিনী আরোগ্য লাভ করিলেন। তোমার বিশ্বাসের জয় হইল। তোমার বিশ্বাস দেখিয়া আমাদের সকলেরই বিশ্বাস বাড়িল।

ইহার কয়েক দিন পরে ভাই পরেশের দ্বিতীয় সন্তান কলেরা রোগে আক্রান্ত হইলেন। যে গৃহে তিনি অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেখানে থাকিলে বাঁচিবার সম্ভাবনা কম, তাই তুমি তাঁহাকে নিজ বাটীতে বাহিরের ঘরে আনিলে ও সেবা করিতে লাগিলে। দেখিতে দেখিতে তাঁহার বড় কন্যাটিরও কলেরা হইল। তখন তুমি বড় কন্যাটিকে বাটীর ভিতরে লইয়া গেলে; নিজের শিশু সন্তানটিকে অন্য বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলে। সমুদয় সেবার ভার আপনার স্কন্ধে লইলে। অনেক পরিশ্রম ও যত্নের পরে দু'টি সন্তানই ভাল হইয়া উঠিলেন। আমি দেখিলাম, তুমি কিরূপ স্থির ভাবে এরূপ বিপদের সময় সমুদয় কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পার। এই সকল কার্য্য করিবার সময় আমাকে কিছু বলিয়া দিতে হইত না। তুমি নিজেই সমুদয় মীমাংসা করিতে, ও যাহা যাহা প্রয়োজন, করিয়া যাইতে। ভাই পরেশ এবং ভগিনী মহালক্ষ্মী এই সূত্রে চিরদিনের জন্য আমাদের আপনার হইয়া গেলেন।

এইরূপে তুমি সকলকে আপনার করিয়া লইয়া চলিলে। তোমার দ্রুতগতি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। এই তো সবে তপস্যার আরম্ভ হইল। এই ব্রতপালন, এই পরসেবার কাজ, ক্রমশঃ জীবনকে অধিকার করিয়া ফেলিতে লাগিল। যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই সংগ্রাম ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই আবার পরসেবার জন্য নিত্য নব নব আহ্বান আসিতে লাগিল; বিশ্বাসের পরীক্ষাও কঠিন হইতে কঠিনতর হইতে লাগিল। ক্রমে তোমার সকল সুখ ছাড়িতে হইল, বেশভূষা চলিয়া গেল, মস্তকের কেশ পর্য্যন্ত উৎসর্গীকৃত হইল; অর্থ, গৃহ কিছুই আপনার রহিল না। কিন্তু সে কথা পরে বলিব।

[ক্রমশঃ।

বাজি

সতীদেবী মুখোপাধ্যায়

রোজকার মত সেদিনও ওরা বেড়িয়ে ফিরছিল পান্থাবারি রোড দিয়ে। ষ্টেশনের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা নীচের দিকে নেমে গেছে যেন কোন অতলের দিকে!

জ্যোতি, রতি আর সুমিত্রা। সুমিত্রা ওদের বন্ধু।

সুমিত্রা আনমনে পথ চলছিল, হঠাৎ জ্যোতির কনুয়ের ধাক্কা খেয়ে চমকে ফিরে তাকালে। জ্যোতি ফিসফিসিয়ে বললে, ঐ দেখ সুমিত্রা, সেই লোকটা।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখলে, জন তিন-চার যুবক ওপরের রাস্তা ধরে নেমে আসছে—দৃষ্টি তাদের ওদের দিকে।

সুমিত্রা গভীর বিরাগ ভরে লক্ষ্য করলে, যুবক ক'টি ক'দিন ধরেই যেন ওদের লক্ষ্য করে বেড়াচ্ছে।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত করে মৃদু ধমকের সংগে সুমিত্রা বললে, চলে আয় তাড়াতাড়ি।

রতি বললে, তোমরা এগোও দিদি, আমি একটা জিনিষ কিনে এখুনি আসছি।

পেনসিল কিনে রতি দ্রুত পদে পথ চলছে। একটি যুবক এগিয়ে এসে বললে, আচ্ছা খুকী, বলতে পারো ডাঃ বোস কোথায় থাকেন? ম ষ্টিভেটের কোন্ জায়গায়?

রতি বিস্মিত হয়ে বললে, ডাঃ বোস? কই তাঁকে তো চিনি না? ডাঃ সেন, ডাঃ কুমার আর ডাঃ হালদার, এই তো ক'জনকে জানি।

রতি কথা শেষ করেই পা বাড়ালো। যুবকটি ব্যস্ত ভাবে বললে, নেই? তবে বোধ হয় আমারই ভুল হয়েছে। তোমরা বুঝি এদিকে থাকো?

রতি বললে, হ্যাঁ পান্থাবারি রোডে আমরা থাকি, আর সুমিত্রাদি' থাকে বর্দ্ধমান রোডে।

সুমিত্রাদি'? কে তিনি?

রতি পেনসিলটা দুলিয়ে নিয়ে একটু হেসে বললে, সুমিত্রাদি'কে চেনেন না? ঐ যে চলে গেল, বেশ লম্বা ফর্সামত, ঐ তো সুমিত্রাদি'। আমি যাই, দেরী হলে দিদি রাগ করবে।

যুবকটি বললে, বেশ তো চল না। আমিও সংগে যাই তোমাদের, বাড়ী দেখে আসবো। বেশ সপ্রতিভ ভাবেই বললে সে।

অপরিচিত যুবকের তাদের পরিচয় জানবার আগ্রহ বেশ সন্দেহজনক, কিন্তু রতির বোঝবার মত বয়স হয়নি। যুবকের সুন্দর কান্তি মিষ্ট কথায় তার বালিকা-চিত্ত খুসী হয়েছিল। কাজেই সহজ সরল ভাবেই তাকে আমন্ত্রণ জানালে।

পথে যেতে যেতে অভিজিৎ আস্তে আস্তে অনেক কথাই জেনে নিলে। দশ মিনিট চলার পর দূরে একটা ছোট দোতলা বাড়ী দেখিয়ে রতি বললে, ঐ যে আমাদের বাড়ী।

অভিজিৎ একটু ইতস্ততঃ করে বললে, আর তোমার সুমিত্রাদি'র বাড়ী?

—ঐ যে পাহাড়ের ওপরে ঝাউগাছের আড়ালে।

বাড়ীর কাছে এসে রতি বললে, আসুন না ভেতরে, দিদিরা দেখলে কি ভীষণ অবাক হবে।

অভিজিৎ উৎসাহিত হয়ে তার পিছু-পিছু বারান্দায় উঠে এল। রতির সাড়া পেয়ে ভেতর থেকে সুমিত্রা বললে, এত দেরী হোল কেন? আবার বুঝি শিবুদের বাড়ী গিয়েছিলে?

—না সুমিত্রাদি', আমি তো ঠিক তোমাদের পিছু-পিছু এসেছি।

—বাঃ, বেশ তো মিথ্যে বলতে শিখেছো! এর জন্যে তোমাকে শাস্তি—বলতে বলতে দরজার নীলাভ পর্দাটা সরিয়ে বারান্দায় একটি পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালো। চিনতে তার এক মুহূর্ত্তও দেরী হোল না।

অভিজিৎ জোড় হাতে দু' পা এগিয়ে নম্র ভাবে বললে, দেরীর জন্যে শাস্তিটা বোধ হয় আমারই পাওয়া উচিত।

সুমিত্রা কুণ্ঠিতমুখে কিছু বলবার আগেই রতি বললে—বাঃ, বাইরেই দাঁড়িয়ে থাকবেন?

সুমিত্রা পরদা তুলে ধরে সরে দাঁড়াতে অভিজিৎ প্রবেশ করলে। ওখান থেকে হোটেলে ফিরলো অভিজিৎ পরিপূর্ণ হৃদয়ে।

বন্ধুরা পিঠ চাপড়ে বললে, বাহাদুর ছেলে! তার পর বল কি করলি?

অভিজিৎ মৃদু হেসে বললে, আলাপ হয়েছে ওদের সংগে।

—আহা, সে তো আমরা জানি। কিন্তু নাম-ধাম সব কিছু জেনেছিস কি না, সেটা বল?

—নাম সুমিত্রা, ধাম বর্দ্ধমান রোড, বাবা এখানকার ডি, এফ ও। তাঁর নাম ডি, এন, ব্যানার্জী। কেমন, হোয়েছে তো? এবার টাকা বার কর।

বন্ধুর দল সমস্বরে বললে, হোল আর কই?

—বাঃ বাজি ফেলেছিলি, বাজি জিতেছি, এখন লক্ষ্মী ছেলের মত টাকা বার করো।

—আরে দাঁড়া, এই বিদেশে এসে তোকে যদি টাকা দিয়ে ফেলি, তবে খরচ চলবে কি করে যাদু।

—ও-সব চলবে না সমীর। বাজি ফেলবার সময় মনে ছিল না?

অমর রবীন বললে আরে অত ব্যস্ত কেন। বাজির টাকা আমরা তিন জনে দোব, কাজেই কলকাতায় ফিরে চল, তারপর দিতে কতক্ষণ। নাও, আর বাজে কথা নয়, কাল ভোরে আবার দার্জিলিঙ যেতে হবে। ৭টায় ট্রেণ, খেয়াল থাকে যেন।

পরদিন ভোরে অমর, সমীর, রবীন প্রস্তুত হয়ে বিস্ময়ের সংগে দেখলে··অভিজিৎ তখনও বিছানায় শুয়ে।

এই অভি, এখনও বিছানা আঁকড়ে পড়ে আছিস? ট্রেণ ফেল হবে যে?

অভিজিৎ যন্ত্রণাকাতর স্বরে বললে, ভীষণ পেটে যন্ত্রণা,—

সে কি! কোথায়? কখন থেকে আরম্ভ হয়েছে? এতক্ষণ বলিস নি কেন? ইডিয়েট কোথাকার!

সকলে নানা প্রশ্নে ওকে ব্যস্ত করে তুললেও সে ওদের আগ্রহকে আমল না দিয়ে বললে, তোরা অত ঘাবড়াচ্ছিস কেন? একটু পরেই কমে যাবে। যা তোরা রওনা হয়ে পড়।

—বাঃ! আমরা যাবো মানে? তোকে এই অবস্থায় ফেলে কেউ যেতে পারে না কি?

অভিজিৎ অসহিষ্ণু ভাবে বললে, সামান্য পেটের যন্ত্রণার জন্যে তোদের যাওয়া বন্ধ কোরবো—আমি এত স্বার্থপর নই।

অমর বললে, একটা দিন পেছিয়ে গেলে কোন ক্ষতি নেই। কাল চার জনে একসংগে যাবো।

এবার অভিজিৎ উঠে বসে বললে, বেশ চল তবে, আমিও যাই।

ওদিকে গিন্নিকে বলা আছে—না গেলে সে কতখানি বিপদগ্রস্ত হবে, সে খেয়াল আছে ?

সমীর বললে, আর তুই পেটে যন্ত্রণা নিয়ে যাবি, তার পর ওখানে লোভীর মত যা-তা খেয়ে আবার কি হাঙ্গামা বাধাবি ? আচ্ছা তুই তবে চুপচাপ শুয়ে থাক, আমরা বেরিয়ে পড়ি। তুই যেন যা-খুসী খেয়ে ফেলিসনে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে অভিজিৎ আবার শুয়ে পড়লো। বালিসে মুখ ঢেকে বললে, আজ সারা দিন স্রেফ জলের ওপর।

জানালা দিয়ে ওদের অপস্রয়মান মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে ওর মুখে কৌতুকের হাসি ফুটে উঠলো। হোটেলের বয় ঘরে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসা করলে, চিয়া লে আঁউ ? (চা আনি ?)

ক্ষিপ্রহস্তে গালে সাবান ঘষতে ঘষতে অভিজিৎ চা আনতে বললে।

ওরা চলে যাবার আধ ঘণ্টা পরে অভিজিৎকে দেখা গেল পাঙ্খাবারি রোড ধরে চলতে। সেপ্টেম্বর মাসের আকাশ, পরিষ্কার, দূরে বহু দূরে শিলিগুড়ি ষ্টেশন আবছা দেখা যাচ্ছে। সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে অগণিত ছোট-ছোট নদী বয়ে চলছে। গতি তাদের বোঝা যায় না। শুধু সূর্যের আলো পড়ে রূপোর সূতোর মত চিক-চিক করে তাদের অস্তিত্বকে জানিয়ে দিচ্ছে।

এধারে নেপালের সীমান্তরেখা, পাহাড় আর সমতল ভূমির মিলন কেন্দ্র অভিজিৎ মুগ্ধ হয়ে দেখলে। আরও দূরের দিকে চোখ ফিরিয়ে পাহাড়গুলির শেষ সীমান্তে এসে চোখ যেন আটকে গেল। রূপোর পাতে মোড়া পাহাড়কে কাঞ্চনজঙ্ঘা বলে চিনতে তার একটুও ভুল হোল না।

বহুক্ষণ এই দিকে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে ছিল। হঠাৎ পিছন ফিরে দেখে, দূরে সুমিত্রা চলে যাচ্ছে। এক বার ভাবলে প্রায় ছুটে যায়, কিন্তু সেটা নেহাৎ অশোভন হবে বলে, একদৃষ্টে ওর গমন-পথের দিকে তাকিয়ে রইলো ঠোঁট কামড়ে। নিজের ওপর গভীর বিরক্তিতে মন ভরে গেল।

বিকেলে কিসের আকর্ষণে আবার সে এল। এবার আর ভুল নয়। রতিদের বাড়ীর কাছে পৌঁছে দেখলে, ওরা বেড়াতে যাচ্ছে। সুসজ্জিতা সুমিত্রার পানে সে বার বার তাকালো। ওর সমস্ত শরীরে যে সলজ্জ ভঙ্গী ছিল তা সত্যিই অপূর্ব্ব !

জ্যোতি ওকে বেড়াবার সংগী হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে সে সাগ্রহে সম্মত হোল। পথ চলতে চলতে সুমিত্রা মৃদু স্বরে জ্যোতিকে বললে—এটা কি ঠিক হোল ? অচেনা—

ওর কথায় বাধা দিয়ে জ্যোতি হেসে বললে তেমনি ভাবে, অচেনাকেই তো চিনতে হয় সু !

পেছন থেকে অভিজিৎ বললে, দু'জনে সব কথা শেষ করে ফেললেন ! এ অভাগার জন্যে কিছু রাখলেন না ? সুমিত্রা উজ্জ্বল চোখে এক বার তাকাল—জ্যোতি বললে, মা ভৈঃ ! আমাদের অফুরন্ত ভাণ্ডার !

সমস্ত বিকেল ওদের সংগে বেড়িয়ে সন্ধ্যার পর অভিজিৎ হোটেলে ফিরে এল। সমীররা এখনও আসে নি। ওদের কথা আজ এক বারও মনে পড়েনি। সুমিত্রা ! সমস্ত প্রাণ-মন কেবলই ঐ একটি নামের কথাই ভেবেছে। তাকে দেখতে চেয়েছে।

—কি রে কেমন আছিস ? কি খেলি আজ ? হুড়মুড় করে ঘরে প্রবেশ করতে করতে ওরা প্রশ্ন করলে।

অভিজিৎ অবাক হয়ে বললে, কি খাবো মানে? হোটেলে যা হয়েছিল তাই খেয়েছি।

সমীর ওর দিকে তাকিয়ে কি যেন বোঝবার চেষ্টা করছিল, এবার হো-হো শব্দে হেসে উঠলো।

বাঃ ব্রাদার! বেশ চাল চেলেছো তো? একটুও সন্দেহ হয় নি!

এবার অভিজিতের মনে পড়লো, সকালে এদের কাছে পেটের যন্ত্রণার অভিনয় করেছিল। মনে মনে জিভ কেটে বললে, আরে দূর। সে কখন সেরে গেছে।

সমীর আবার হেসে বললে, আসল কথাটা ধরে ফেলেছি, আর মিথ্যে বলে লাভ কি?

অভিজিৎ এবার হেসে ফেললে, ঠিক ধরেছিস। বাজি জিততে গিয়ে মনটাকে বাজি ফেলেছি।

সমীর মৃদু হেসে বললে, ও-পক্ষের খবর কি?

অভিজিৎ দৃষ্টি নত করে বললে, জানি না।

—ক্ষণেক দর্শনেই গভীর প্রেম! সত্যি প্রেম তো? না আজ-কালকার হাওয়া অনুযায়ী খানিকটা সোডার ভসভসানির মত?

অভিজিৎ মৃদু কণ্ঠে বললে, আমাকে কি তাই মনে হয়?

সমীর ওর হাতটা চেপে ধরে বললে, দেখি চেষ্টা করে। তবে কর্তার মেজাজের কথা ভাবলে এগোবার সাহস থাকে না।

পরদিন অভিজিৎ একাই বেরুলো পাত্থাবারি রোডের উদ্দেশে। আনন্দে কণ্ঠ গুনগুনিয়ে উঠলো, 'এত দিন যে বসেছিলেম পথ চেয়ে আর কাল গুণে, দেখা পেলেম ফাল্গুনে•••'

নজরে পোড়লো সুমিত্রা কলেজে চলেছে। সংগে আর তিন-চার জন তরুণী থাকায় অভিজিৎ কথা বললে না। দূর থেকে তার পানে তাকিয়ে রইলো মুগ্ধ ভক্তের মত।

সুমিত্রাও তাকে দেখলে, কিন্তু কিছু বললে না।

এত দিন এত রকমের পুরুষ সে দেখেছে, মেলমেশাও করেছে, কিন্তু তার কুমারী মনে এতটুকু ছায়াপাত হয় নি। কিন্তু অভিজিৎকে দেখামাত্র তাকে যেন বড় পরিচিত, বড় প্রিয় মনে হয়েছিল। নিজেকে সংযত করতে চেয়েছিল, কিন্তু অবাধ্য মন, তার শাসন মানতে রাজী নয়। অভিজিৎকে ভাবতে চায়, দেখতে চায় বার বার।

বিকেলে চাঁদমারি মাঠে বসে নিজের নির্বুদ্ধিতার কথাই ভাবছিল সুমিত্রা। এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মুখ ফিরিয়েই সাপ দেখার মত চমকে উঠলো। অভিজিৎ! তাকে ফিরে তাকাতে দেখে অভিজিৎ বললে, খুব কি বিরক্তি বাড়ালুম?

—না, না, সে কি! সুমিত্রা নিজেকে যেন অসহায় বোধ করছিল। অভিজিৎ একটু দূরে বসে বললে, চা-বাগান দেখবো বলে এদিকে এসেছিলুম—কিন্তু এভাবে একা বসে আছেন—

—কিছুই না, এমনি মাঝে মাঝে এখানে বসে থাকতে ভাল লাগে।

অভিজিৎ একটু ইতস্ততঃ করে বললে, বন্ধুদের সংগে বাজি ফেলে আলাপ করেছি—জানি না আমাকে আপনি—মানে আপনারা কি ভাবে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু আমার মনে হয়, ভাগ্যে বাজি ফেলেছিলুম তাই আজ আমার ইয়ে—আপনাদের সংগে পরিচয় হোল—

সুমিত্রা মৃদু হেসে বললে, শুনেছি কলকাতার লোকেরা বাকপটু হয়, আজ সেটা প্রত্যক্ষ করলুম।

অভিজিতের পৌরুষ আহত হোল। ম্লান ভাবে বললে, আমাকে কেবল বাকপটু বলেই জানলেন?

সুমিত্রা দূরের পানে তাকিয়ে বললে, দু'দিনে মানুষের আর কত পরিচয় পাওয়া যায় বলুন?

অভিজিৎ প্রতিবাদের সুরে বললে, আমার কিন্তু একটি মানুষকে চিনতে দু'ঘণ্টাই যথেষ্ট মনে হয়। আমি তো আপনাকে দেখেছি, আর চিনেছি, তার জন্যে আর কোন পরিশ্রম করতে হয় নি।

—তাহলে সেটা আপনার অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা বলতে হবে। আমরা স্বভাবদুর্ব্বল, আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ; তাই বোধ হয় মানুষ চিনতে আমাদের এত সময় লাগে।

অভিজিৎ বললে, এটা আপনার মনের কথা নয়, কেবল তর্কের খাতিরে বলছেন। সত্যি কি না বলুন?

সুমিত্রা বললে, বাজি রেখে আলাপ করেছেন, আবার কি বাজি রেখে মনের কথাটাও জানতে চান?

—ছিঃ ছিঃ, এ-সব কি বলছেন? বাজি রেখে আলাপ করেছি, তা সত্যি, কিন্তু বাজিতেই তার পরিসমাপ্তি ঘটে নি, আজ যে অনেক দূর এগিয়ে গেছি।

অভিজিতের গভীর স্বর সুমিত্রার মনে দোলা দিলেও সে আমল দিলে না। মাঠে ছেলেরা খেলছিল, সে দিকে দৃষ্টি রেখে বললে, চলুন বাড়ী ফেরা যাক।

অভিজিৎ মিনতির সংগে বললে, আর একটু বসুন না?

সুমিত্রা ওর চোখের দিকে তাকাতে পারছিল না। পাছে কোন দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তাই অন্য দিকেই দৃষ্টি রেখে বললে,—বাবার দার্জ্জিলিং থেকে ফেরার সময় হোল, আমাকে না দেখলে ব্যস্ত হবেন।

সমস্ত পথ সুমিত্রা কেমন গম্ভীর হয়ে রইলো। অভিজিৎও সাহস করলে না কোন কথা বলতে।

হোটেলে ফিরতেই বন্ধুরা হৈ-চৈ করে উঠলো। সকলের হাত এড়িয়ে অভিজিৎ শুয়ে পোড়লো। ভাবতে চেষ্টা করলে কেন এমন হয়? পরদিন সকালে বেড়াতে যাবার আগেই অভিজিতের নামে টেলিগ্রাফ এল, শীগ্গির ফেরার জন্যে।

—কি ব্যাপার? ভয়ে সকলেরই মুখ শুকিয়ে গেল। তাড়াতাড়ি জিনিষ গুছিয়ে নিয়ে ট্যাক্সি ঠিক করে ফেললে। ঐ ফাঁকে অভিজিৎ ভাবলে, এক বার দেখা করে এলে হয় না? কিন্তু এখন তা হয় কেমন কোরে? কলেজে গেছে সে—রাগে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে। সকালেই বেরুলে দেখা হোত কিন্তু সে কথা অভিজিৎ ভুলে গেল কি কোরে? ওর সঙ্গে দেখা না করে যাওয়া! এত বড় ভুল করলে সে কেন? জ্যোতিদের বাড়ী গিয়ে আজই চলে যেতে হচ্ছে বলে বিদায় নিয়ে এল অভিজিৎ। যাত্রার সময় এগিয়ে এল। লোকজনের চিৎকার, ট্রেণের হিস-হিস শব্দ সব কিছু ছাপিয়ে একটি নাম কেবল তার মনের মাঝে ফুটে রইলো, সুমিত্রা! সুমিত্রা!

অন্যমনস্ক ভাবে তাকিয়েছিল অভিজিৎ। তার দৃষ্টির সামনে ফুটে উঠলো সুমিত্রা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সে। তার কল্পনা কি বাস্তবে রূপ নিলে?

তার বিস্মিত দৃষ্টির সামনে এসে দাঁড়াল সুমিত্রা। অভিজিৎ রুদ্ধ স্বরে বললে, তুমি এসেছো?

সুমিত্রা তার সেই উজ্জ্বল নেত্র অভিজিতের মুখের ওপর তুলে ধরে বললে, না এসে পারলুম না।


প্রাচীন ও আধুনিক
মতে অনুমোদিত
লিলি
বার্লি
LILY
BRAND
PEARL
BARLEY
LILY BARLEY MILLS LIMITED
খাদ্যপ্রাণযুক্ত
খাদ্য, পথ্য ও পানীয়
LILY
BARLEY
FOR INFANTS & INVALIDS
লিলি বার্লি মিলস্ প্রাইভেট লিঃ
কলিকাতা-৪



লণ্ডনে শিশুপালন ও শিশুশিক্ষা

বাণী দাশগুপ্তা

শিশু আগমন যেমন চিরনূতন তেমনি চিরপুরাতন। শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হয় তখন সে থাকে নিষ্পাপ। এই ফুলের মত শিশুকে চরিত্রে ও স্বাস্থ্যে গড়ে-তোলা একটি বিরাট দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য। এ কাজ শুধু পরিবারের একার নয়, সরকারেরও সমান দায়িত্ব আছে। কারণ এই শিশুই হয়ে উঠবে দেশের নাগরিক। এ সত্য ক'টি দেশ উপলব্ধি ক'রতে পারে বা ক'টি পরিবার বুঝতে পারে?

শিশু রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ইংলণ্ড অনেক দেশের চাইতে অনেক অগ্রণী।

সন্তানসম্ভাবনা হ'লে প্রত্যেক ভবিষ্যৎ মাকে পুষ্টিকর খাদ্য, ফলের রস খেতে হয়। কিন্তু সকলেই কি এ খরচ বহন ক'রতে সক্ষম হয়? তাই সরকার থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, অল্প দামে ফলের রস, দুধ যাতে গর্ভবতী মেয়েরা পেতে পারে। শিশু জন্মাবার পর থেকে শিশুর দুধের জন্য কার্ড বানাতে হয় ফুড-অফিসে গিয়ে। এতে অর্দ্ধেক দামে দুধ ও বিনা পয়সায় কডলিভার তেল পাওয়া যায়।

এখানে চিকিৎসার ব্যয় সরকার বহন করে—অর্থাৎ free medical aid সকলেই পেয়ে থাকেন। শিশুদের জন্য লণ্ডনে বহু হাসপাতাল আছে, কেবলমাত্র শিশু-রোগী ভিন্ন কাহাকেও সেখানে রাখা হয় না। শিশু-রোগীদের মনোরঞ্জনের জন্য নানা বন্দোবস্ত আছে এই সব হাসপাতালে। রাসেল স্কোয়ারের কাছে কুইনস্ পার্কের পাশে এক বিরাট শিশু-হাসপাতাল আছে—ইউরোপে এর খুব নাম।

সন্তান পালনের জন্য সরকার বাপ-মাকে সাহায্য করে থাকেন। কোন মা ময়লা বা কুৎসিত পোষাকে শিশুকে বেড়াতে নিয়ে যায় না, প্রথমতঃ সরকারের সাহায্য বন্ধ হওয়ার ভয়, দ্বিতীয়তঃ বদনামের ভয়। আর ছোট শিশুকে, যার নিজেকে সামলাবার বয়স হয়নি, মা বা বাবার অসাবধানতায়, রাস্তায় একা দেখলে পুলিস তাকে নিয়ে যায় এবং মা-বাবাকে কোর্টে জবাবদিহি করতে হয়। শিশুর প্রতি অবহেলা সরকার সহ্য করতে পার না।

শিশু যখন বড় হয়ে ওঠে এবং যখন তার স্কুলে যাওয়ার বয়স হয় তখনও সরকারের প্রকৃত দৃষ্টি শিথিল হয় না। লণ্ডনে সম্প্রতি শিক্ষা-বিভাগ থেকে নানা রকমের প্রাইভেট স্কুলে কি প্রকারের শিক্ষা দেওয়া হয়, সেই সেই বিষয় তদন্ত সুরু হয়েছে।

দেখা গিয়েছে সারে (Surrey) জিলায় ৩০০ প্রাইভেট স্কুলে ২০,০০০ ছাত্র পড়ে তার মধ্যে ৫২টি স্কুলে ৩০০০ ছাত্র প্রকৃত শিক্ষা পায় না। বহু বাবা-মা সরকারী স্কুলে সন্তান না পাঠিয়ে প্রাইভেট স্কুলে বেশী মাইনে দিয়ে পাঠায়, এই ধারণায় যে সরকারী স্কুল অপেক্ষা প্রাইভেট স্কুলে যত্ন নেওয়া হয় বেশী। ব্রিটেনে প্রায় ৫০০০ প্রাইভেট স্কুল আছে। বহু বেকার রোজগারের অন্য পন্থা না দেখে স্কুল খুলে বসে, এই ধরণের স্কুলে শিক্ষকরা নিজেরাও জানেন না কি ভাবে শিক্ষা দিলে শিশু-মন সুন্দর ভাবে গড়ে উঠবে। যদিও এই ধরণের প্রাইভেট স্কুলের মধ্যে অনেক ভাল স্কুলও আছে—তবে তার সংখ্যা অতি অল্প। এই জন্য শিক্ষা-বিভাগ ১৯৪৪ সালের Education act অনুযায়ী এ পন্থা অবলম্বন করবার চেষ্টা ক'রেছে—যে প্রত্যেক শিক্ষককে শিক্ষকতা করবার জন্য লাইসেন্স নিতে হবে, যেমন ডাক্তারদের নিতে হয়। সেখানে প্রাথমিক বা বেসিক শিক্ষার জন্য, বাবা-মাকে পয়সা খরচ করতে হয় না সন্তানের জন্য, অবশ্য সরকারী স্কুলে পাঠালে।

সরকার সম্প্রতি লক্ষ্য করেছেন যে, বহু বাবা-মা স্কুলে যায় এমন ছেলে-মেয়েকে দিয়ে সংসারের নানা কাজে সাহায্য ক'রতে বাধ্য করেন। এতে ফল এই হয় ছেলেমেয়েরা বাড়ীতে পড়বার সুযোগ ও সুবিধা পায় না। অনেক সময় দেখা যায় বাড়ীর বড় মেয়েকে শিশু ভাই-বোনদের দেখাশোনা করতে হয়। কারণ মা অন্য সাংসারিক কাজে ব্যস্ত থাকেন। সরকার এই দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বাপ-মাকে এই বিষয় সতর্ক করা হয়।

আর একটা বিষয়ে সরকার খুব সজাগ, সে হচ্ছে শিশুকে বাবা-মা নিষ্ঠুর ভাবে মারধর ক'রতে পারবে না।

লণ্ডনে থাকাকালীন বহু কেস দেখেছি, কোথাও তিন বৎসরের শিশুকে নিষ্ঠুর ভাবে মারবার জন্য বাবার তিন মাস জেল হয়ে গেল। কোথাও মাকে জরিমানা দিতে হ'ল, শিশুকে বহুক্ষণ পেরামবুলেটারে রাস্তায় ফেলে রেখে কেনাকাটায় সময় কাটাবার জন্য।

সন্তান মানুষ করতে হলে শিক্ষা দিতেই হবে, শাসন ক'রতেই হবে, কিন্তু যখন শিক্ষা দিতে নিষ্ঠুর হ'য়ে পড়ে বাপ-মা, তখনই তাহাদিগকে আইনের কবলে পড়তে হয়।

যে মাকে জীবিকা অর্জনের জন্য কাজে যেতে হয় অথবা শারীরিক অসুস্থ, এইরূপ মায়েদের সন্তান রাখবারও জায়গা আছে। লণ্ডনে বহু ডে নার্সারি (Day nursery) আছে সেখানে এক মাসের শিশু থেকে চার বৎসরের শিশু পর্য্যন্ত রাখা হয় এই সব ডে নার্সারিতে অনেক অবিবাহিত মায়ের সন্তানও রাখা হয়। এখানে বহু দক্ষ ও অভিজ্ঞ নার্স আছেন। সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা পাঁচটা তিরিশ মিনিট পর্য্যন্ত শিশুরা নার্সদের তত্ত্বাবধানে নার্সারিতে থাকে। আর এই

নার্সারিতে শিশুদের সময়মত খাওয়ান, ঘুম পাড়ান সব নার্সরাই ক'রে থাকে। চার বৎসরের বড় ছেলে-মেয়েকে নার্সারি স্কুলে দেওয়া হয়। এই স্কুলে সকালে দুধ ও দুপুরের খাওয়া পায় শিশুরা। এখানে পড়া ও খেলাধূলা করার পর যাতে শিশুরা খানিক সময় ঘুমাতে পারে সে বিষয়ে স্কুল কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আছে।

লণ্ডনে অধিকাংশ স্কুলে তিন প্রকারের শ্রেণী ভাগ আছে, ছেলে বা মেয়ের বয়স অনুযায়ী তাদের ক্লাসে ভর্ত্তি করা হয়। প্রথম শ্রেণী হ'চ্ছে চার বৎসর থেকে আট বৎসরের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য—তাদের সারা বৎসরের লেখাপড়া ও উন্নতির মাত্রা দেখে—এর মধ্যেই বিভিন্ন শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়, আট বৎসর বয়সের পর ছাত্র-ছাত্রীকে জুনিয়ার ক্লাসে নেওয়া হয়, এবং এখানে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন সেকসনে পড়ে। জুনিয়ার ক্লাসে যে সব ছাত্র বা ছাত্রী কয়েক বৎসর থেকেও যদি কোন রকম উন্নতি দেখাতে না পারে,তবে তাদের জন্ত এক ধরণের স্কুল যা Problem childদের জন্য আছে সেখানে পাঠান হয়। এই স্কুলে স্মরণশক্তি-হীন, বুদ্ধিহীন ছেলে-মেয়েদের নানা উপায় শিক্ষা দেওয়া হয়। আর ষোল বৎসর পর্য্যন্ত যে সব ছাত্র বা ছাত্রী বুদ্ধির পরিচয় দেখাতে পারে তাদের হাই স্কুলের পরীক্ষায় বসবার অনুমতি দেওয়া হয়। হাইস্কুল পরীক্ষার পর কিশোর বা কিশোরী বিশেষ বিশেষ লাইনে শিক্ষা গ্রহণ করে। যারা অত্যন্ত মেধাবী তারা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য।

কোনারক

উৎপলা দাশগুপ্ত

তাজ, অজন্তা, এলোরা এবং উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলি থেকে আমাদের পুরাতন সংস্কৃতি ও সভ্যতার একটা সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। প্রিয়জনের স্মৃতি কালজয়ী করা এবং দেবমাহাত্ম্য প্রচার করাই নির্মাতাদের উদ্দেশ্য ছিল, এবং এই স্মৃতিস্তম্ভ ও মন্দিরকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্য-শিল্পের হয়েছে চরম উৎকর্ষলাভ এবং শিল্পীর ধ্যান ও ধারণার পরম প্রকাশ। মন্দিরগুলি আমাদের সভ্যতা ও কৃষ্টির বাহক ও ধারক। উড়িষ্যায় কোনারক এমনই একটি মন্দির। ভারতীয় ভাস্কর্য্য-শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে মন্দিরটির খ্যাতি আছে।

অন্যান্য রাজ্যগুলির তুলনায় বর্ত্তমানে দরিদ্র ও অনগ্রসর হলেও উড়িষ্যার অতীত ছিল গৌরবময়। শিল্প-সমৃদ্ধ সে যুগের পরিচয় বহন করে আজও দাঁড়িয়ে আছে উদয়গিরি খণ্ডগিরির গুহাগুলি। খৃষ্টপূর্ব কালের ঐ গিরিগুহাগুলি নির্ম্মিত হয়েছিল খারবেলের রাজত্বকালে, যদিও ঐতিহাসিকদের মধ্যে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। উদয়গিরি, খণ্ডগিরির চমৎকার বর্ণনা পাওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামে'।

উড়িষ্যা দেউলের দেশ। মন্দিরের সংখ্যা অজস্র, পুরীর জগন্নাথ-মন্দির তার মধ্যমণি, খ্যাতি তার আসমুদ্র-হিমাচল। জগন্নাথদেবের রথযাত্রার সময় এখানে জনসমাগম হয় সর্বপ্রদেশ থেকে, বাসের যোগ্য এবং অযোগ্য সব স্থানই ভরে যায় দূরাগত তীর্থযাত্রীতে। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ-মন্দিরের খ্যাতিও কম নয়। ভক্তজন পুরী এবং ভুবনেশ্বরে আসেন প্রণাম নিবেদনে, কিন্তু আবেদন তাদের কাছে পুরীরই অধিকতর। ভুবনেশ্বরকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন সৌন্দর্য্য-পিপাসুরা—তার মন্দিরগাত্রের কারুকার্য্যের জন্য। কিন্তু কোনারক-মন্দিরের কারুকার্য্য ও প্রস্তর-সজ্জা ভুবনেশ্বরকেও লজ্জা দেয়। এ প্রসঙ্গে ফার্গুসনের রচনাংশ উদ্ধারযোগ্য—"It (Konarak) surpasses, however, both these (Puri & Bhubaneswar) in lavish richness of detail, so much so, indeed, that perhaps I do not exaggerate when I say that it is, for its size, the most richly ornamented building, externally at last, in the whole world."

এই 'grandest achievement of the Eastern School of architecture.' দেখতে কোনারক যেতে হয় পুরী অথবা ভুবনেশ্বর থেকে। পুরী থেকে কোনারকের দূরত্ব মাত্র একুশ মাইল। সে পথে যেতে হয় গরুর গাড়ীতে চেপে। সারা রাত গাড়ীতে কাটিয়ে সূর্যোদয় মুহূর্তে পৌঁছান যায় কোনারকে। Bus-এ যেতে হলে দূরত্ব ছিয়াল্লিশ মাইল, পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে এই পথটুকু অতিক্রমণে। রাস্তার দুরবস্থার জন্য Bus-এ অসম্ভব ঝাঁকুনি, শরীরের অবস্থা কাহিল।

ঔষধ সেবনের পূর্বে নির্দেশ আছে শিশি ঝাঁকিয়ে নেবার, কোনারক গমনে ব্যবস্থা আছে যাত্রীদের Bus-এ পুরে 'shake the bottle' করার। আমি গিয়েছিলাম bus-এ তখন তো জানতাম না যে গতির যুগে ভ্রমণের এমন দুর্গতি হতে পারে! সহযাত্রীদের মধ্যে কয়েক জন ছিলেন বিদেশী—আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জাপানের। বেশির ভাগই ছাত্র ভারতে পড়তে এসেছেন বৃত্তি নিয়ে। ভারতবর্ষে Tourist traffic-এর হাল দেখে তারা ঝাল ঝাড়ছিলেন আমাদের উপর। বিরক্তির সঞ্চার করলেও তাদের উক্তির সত্যতা অস্বীকার করা যায় না। দুঃখ এবং লজ্জা অনুভব করেছিলুম।

কিন্তু ভ্রমণের লাঞ্ছনা ও পথের দুঃসহ কষ্ট সব ভুলে যেতে হয় কোনারকের মন্দির দর্শনে। পাষাণগাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে সুষমা, শিল্পীর মানস শতদল এই মন্দিরটি যেন আলোকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি। মন্দিরটির সর্বত্র কারুকার্য্যমণ্ডিত। এর সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। বর্ণনা ভাষাতীত। বিদেশী সহযাত্রীরাও মন্দিরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে হয়ে স্বীকার করলেন The journey, atrocious through, is worth taking.

মন্দিরটির বর্ণনা প্রসঙ্গে ব্রাউন (P. Brown) লিখেছেন—"Few buildings can boast of such an unrestrained abundance of plastic decorotiones as this vast structure, every portion of the exterior being moulded and chiselled in the form of abstract geometrical ornament, conventional foliage, mythical animals. Fabulous beings half human with half serpent coils, figures satanic and figures devine, of every conceivable motif and subject known to the Indian mind and in a technique which ranges from patterns cut with minute precision of a cames to powerfully modelled groups of calasaal size".

গঙ্গাবংশের রাজা নরসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মন্দিরটি নির্মিত হয়। চল্লিশ কোটি টাকা ব্যয়ে বারো শত শিল্পীর ষোল বছর অক্লান্ত সাধনায় স্থাপিত হয়েছিল সূর্য্যের প্রতি নিবেদিত এই মন্দির। মন্দিরটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল বালি পাথর (sand stone) মাকড়া পাথ (laterite) ও মুগনী পাথর (chlorite)। মন্দিরটির স্থাপত্য ও মন্দিরগাত্রের কারুকার্য্য দর্শক-জনের বিস্ময় উদ্রেক করে। বর্তমানে মন্দিরটির ভগ্নদশা। বিগ্রহহীন এই মন্দিরটির ভগ্নাবস্থা থেকেই সহজেই অনুমান করা যায় এর বিগত দিনের সৌষ্ঠব। সূর্য্যের বাহন সপ্তাশ্ববাহিত রথ। আজকের বিকৃতি সত্বেও মন্দিরটির রথের আকৃতি বোঝা যায়। চব্বিশটি চাকা একটি বৎসরের প্রতীক—বারোটি শুক্লপক্ষ এবং বারোটি কৃষ্ণপক্ষ। সপ্তাশ্বের সাতটি রশ্মি সাতবারের (সোম মঙ্গল) ইত্যাদির প্রতীক।

মন্দিরটির ভগ্নাবস্থার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কবে কি করে মন্দিরটির বিভিন্ন অংশ ধ্বংস হল সে বিষয়ে নানা মুনির নানা মত। ষোড়শ শতাব্দীতে আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীতে বর্ণনা আছে কোনারক-মন্দিরের। তখন দৈনিক আট বার ভোগ হত। প্রতি বৎসর মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে বসত মেলা, হত অজস্র জনসমাগম। সুতরাং দেখা যায় যে, নির্মাণের পর তিন শত বৎসর পর্যন্ত মন্দিরটি অক্ষত ছিল। অনুমান করা কঠিন নয় যে, তখন সমারোহের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে সবিতা-বন্দনা। ভেঙে যাবার পর মন্দিরটি পরিত্যক্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে সেদিনের সমারোহ। এই ভাঙনের কারণ সম্বন্ধে কেউ-বা বজ্রপাত কেউ-বা ভূমিকম্পকে দায়ী করেছেন। কেউ-বা বলেছেন মন্দিরের ভিত্তি ছিল যে বালি সেই বালি ধ্বসে যাওয়ায় মন্দিরটি ভেঙে পড়ে। এ প্রসঙ্গে প্রচলিত সংবাদও প্রণিধানযোগ্য—এর পেছনে অবশ্য কোন ঐতিহাসিক স্বীকৃতি নেই। বঙ্গোপসাগরে যে সব অর্ণবপোত যাতায়াত করত তাদের নাবিকদের দিক-নির্ণয়ে সহায়ক করত সমুদ্রতীরে অবস্থিত পুরী এবং কোনারকের মন্দির। White pagoda, Black pagoda নামে যথাক্রমে অভিহিত মন্দির দু'টি। কোনারক মন্দিরের উচ্চশৃঙ্গে কলসের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল একটি বৃহৎ চুম্বকখণ্ড। ঐ চুম্বকের আকর্ষণে মন্দিরের উচ্চভাগে সুকৌশলে বিন্যস্ত ছিল লৌহ-কড়িগুলি। শুধু লৌহ-কড়িগুলি নয়, সে চুম্বকে আকৃষ্ট হোত দূরগামী অর্ণবপোতগুলি। পর্তুগীজ নাবিকদের একখানি জাহাজ ঐ চুম্বকের আকর্ষণে হটাৎ তটে এসে ধাক্কা খেয়ে চুরমার হল এক দিন। কামানের গোলা দিয়ে তারা মন্দিরটি ভেঙে দিয়ে প্রতিশোধ নিল। ধ্বংস হল মন্দিরের চূড়া এবং সর্বোচ্চভাগে স্থাপিত চুম্বকখণ্ডটি। স্থাপনার কৌশল নষ্ট হয়ে, যেতে লৌহকড়িগুলিও ভেঙে পড়ল। সেগুলি আজও মন্দির-প্রাঙ্গণে

সজ্জিত আছে। অন্ত প্রবাদটি কালাপাহাড় সম্বন্ধে। হিন্দুদের দেবদেবী এবং মন্দির ধ্বংস করবার অসম্ভব ক্ষমতা ও অক্লান্ত অধ্যবসায় ছিল সে বিধর্মীর। সে ক্ষমতা অকৃপণ ভাবে প্রয়োগও করেছিলেন তিনি। কিন্তু কালাপাহাড়ের উদ্দীপ্ত রোষে ভেঙ্গে পড়েছে অনেক মন্দির, হয়েছে অনেক বিগ্রহের নিগ্রহ। লোকালয় থেকে অনেক দূরে নিভৃত স্থানে স্থাপিত হলেও কোনারক-মন্দিরের সৌন্দর্য্যের কাহিনী কালাপাহাড়ের কান এড়ায় নি। তাই কোনারকও তাকে এড়াতে পারেনি। মন্দিরের উচ্চতা নেমে গেল দু'শ সাতাশ থেকে একশ' ত্রিশ ফিট। ভেঙে পড়ল মন্দিরগাত্রের অনেকাংশ। কাল এবং কালাপাহাড়ের প্রভাব এড়িয়ে আজও সে মন্দির দর্শকজনের বিস্ময় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ভাইসরয় ছিলেন লর্ড কার্জন। সে কাল কু-শাসনে কলঙ্কিত। কিন্তু অন্তত একটি সুকাজের জন্য তিনি সমস্ত ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা দাবী করতে পারেন; তারই সময় পাশ হয়েছিল Ancient Monument Presentation act—কোনারক মন্দির সে Actএর অন্তর্ভূত। আরম্ভ হল সংস্কার কার্য্য। ভাঙ্গন বন্ধ করবার জন্য মন্দিরাভ্যন্তরস্থ ঘরটি বালি ও পাথর দিয়ে ভরে দেওয়া হয়েছে। খনন সুরু হল ১৯০১ সালে। মন্দিরের নিম্নাংশ বালুকামুক্ত হল। বালুকাগর্ভ থেকে উদ্ধার করা হল অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি। ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধারপ্রাপ্ত মূর্তিগুলি স্থাপন করবার জন্য ১৯১৪—১৫ সালে কোনারক-মন্দিরের নিকটে নির্মিত হয়েছে একটি মিউজিয়ম। মিউজিয়মটির স্থানীয় নাম নবগ্রহের মন্দির। অবশ্য সূর্য্য, চন্দ্র, বৃহস্পতি প্রভৃতি নবগ্রহ ব্যতীত অন্যান্য মূর্তিও সেখানে আছে—যথা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্তি। চতুর্ভুজ গণেশ মূর্ত্তি, সীতার বিবাহ দৃশ্য ইত্যাদি। মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্তিগুলির মধ্যে নীলাভ মুগনী পাথরের দ্বিভুজ সত্যনারায়ণ মূর্তিটি দর্শকজনের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দুই পার্শ্বে মৃণাল পদ্মদ্বয়; বামহস্তে বরমুদ্রা, দক্ষিণে শূল, কটিতে কটিবন্ধ এবং কণ্ঠে মালা ও যজ্ঞোপবীত।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি তিনটি অংশে বিভক্ত। বিমান (অর্থাৎ যেখানে বিগ্রহ স্থাপিত হয়) জগমোহন ও নাটামন্দির।

কোনারক-মন্দিরের বিমানটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। জগমোহন থেকে নাট্যমন্দিরের দূরত্ব ত্রিশ ফিট। ছাদহীন নাট্যমন্দিরটিও অপরূপ কারুকার্য্য-মণ্ডিত। কলাকৌশলের তারতম্য থেকে বিচার করে অনেকে অনুমান করেন যে, মন্দির নির্মাণের বহু পরে নাট্য-মন্দিরটি সংযোজিত। জগমোহন ও নাট্য-মন্দিরের মধ্যবর্তীস্থলে স্থাপিত ছিল অরুণ-স্তম্ভ—সূর্য্যসারথি অরুণের নামে উৎসর্গীকৃত। মহারাষ্ট্রীয়ের শাসনকালে স্তম্ভটি স্থানান্তরিত হল পুরীতে, স্থাপিত হল মন্দির-সম্মুখে সিংহ-দ্বারে। সে স্তম্ভ আজও বর্ত্তমান।

দেউলের ভগ্নস্তূপের মধ্য দিয়ে উপরে উঠবার সিঁড়ি। সতর্ক পদক্ষেপে সকলে উপরে উঠে গেলাম—সত্তর আশী ফুট পর্য্যন্ত। উপর থেকে সমতলভূমির দৃশ্যটি মনোরম। চারিদিকে বালির পাহাড় ও ঝাউয়ের বীথি। অনতিদূরে সাগরের জলধারা। ঝাউয়ের মর্মর ও সাগরের কলকণ্ঠ যেন অবিশ্রাম গেয়ে চলেছে সূর্য্যবন্দনা।

মন্দির প্রদক্ষিণ করে নেমে এলাম। দেখলাম মন্দির-সংলগ্ন একটি মঠ আছে, সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের। শ্রান্ত দর্শকজনের ক্লান্তি বিনোদনের জন্য, আছে ছোট একটা রেষ্ট-হাউস। এবার ফিরে যাবার পালা, অর্থাৎ আবার সেই ভ্রমণের বিভীষিকা। জেনে খুসী হলাম যে, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার থেকে সাতাশ লক্ষ টাকা মঞ্জুর হয়েছে রাস্তাটি সংস্কারের জন্য। মন্থর পদক্ষেপে বালিয়াড়ির উপর দিয়ে এগিয়ে গেলাম বাসের দিকে। পিছনে পড়ে রইল ছন্দে, লালিত্যে, সৌন্দর্য্যে ও প্রস্তরবিন্যাসে অনির্বচনীয় কোনার্ক মন্দির। উড়িষ্যা তথা ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন!

গান্ধীজী সম্বন্ধে শ' কি বলেছিলেন

অনু বন্দ্যোপাধ্যায়

কয়েকটি মূল বিষয়ে গান্ধীর সঙ্গে শ'য়ের অমিল থাকলেও এবং তাঁরা দু'জন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভাবধারা ও আবহাওয়ায় মানুষ হওয়া মনীষী হলেও, এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মতামতের আশ্চর্য্য রকম মিল ছিল। বার্ণার্ড শ' তাঁর কালাপাহাড়ী মন নিয়ে মানুষের তৈরী বহু আইন-কানুন, সমাজ-ব্যবস্থা, নীতি, আচার অভ্যাসকে বেপরোয়া ভাবে নিন্দে করে গেছেন। কিন্তু গান্ধীর প্রতি তাঁর যে কত গভীর শ্রদ্ধা ও সস্নেহ অনুভূতি ছিল, তা' তাঁর গান্ধী-সংক্রান্ত সকল আলাপ-আলোচনা ও উক্তির মধ্যে ফুটে ওঠে। শ' তাঁর নাটকে কল্পিত এমন একটি আদর্শ মানুষের বর্ণনা দিয়েছেন যাঁর চরিত্রে আধ্যাত্মিক আদর্শ ও যথার্থ বিদ্রোহী মতবাদের মিলন ঘটেছে। সেই দার্শনিক মানুষটি ধ্যান-মননের দ্বারা বিশ্বের অন্তর্নিহিত ইচ্ছাটি খুঁজতে চেষ্টা করেন, সেই ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করার জন্য পথ খোঁজেন

এবং জীবনে সে ইচ্ছাকে স্বীকার করে নেবার উদ্দেশ্যে সমগ্র কর্মশক্তি প্রয়োগ করেন।' তিনি অনুভব করেন যে, জগতে একটি বৃহত্তর শক্তি আছে যার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারাতেই তাঁর আনন্দ ও গৌরব। শ'য়ের মতে যে রকম অর্থনীতিবিদ্ রাষ্ট্রনায়ক মহামানব জাতির মুখপাত্র হবার যোগ্য। গান্ধী অনেকাংশে সেই ধাঁচের লোকগুরু ছিলেন। গান্ধীই একমাত্র মানুষ যাঁকে কচিৎ কদাচিৎ ব্যঙ্গ করলেও শ' খুব তারিফ করতেন, এমন কি তাঁর পক্ষ সমর্থনও করতেন।

বিলেতে ব্যারিষ্টারী পড়তে গিয়ে ১১ বছর বয়সে গান্ধী যখন বিখ্যাত "পলম্যল গেজেট" নিয়মিত পড়তে শুরু করেন, তখনই তিনি লেখক-সমালোচক শ'য়ের নাম শুনে থাকবেন। কারণ ঐ পত্রিকার সঙ্গে শ'য়ের যোগ ছিল। শ' যে কবে প্রথম গান্ধীর নাম শোনেন বা তাঁর প্রতি অনুরাগী হন, তার কোনও হদিশ মেলে না। তবে এক বার শ' কথায় কথায় বলেছিলেন যে, "গান্ধীকে মাথা পাগলা বললে গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু কালাআদমী বললে আপত্তি জানান; আমাকেও বদরসিকতাপ্রিয় বললে আমি ঘোরতর আপত্তি জানাই।" এ শুনে মনে হয় যে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় সাহেবরা গান্ধীকে কালো চামড়ার মানুষ বলে যে নির্য্যাতন অসম্মান করেছিল তার গ্লানি শ'য়ের মন থেকে মুছে যায় নি, তিনি গান্ধীর পরাধীনতার ব্যথা কত দুর্বহ, তা' বুঝতেন। তা'ছাড়া ১১০৬ সালে মিশরের দীনশাওয়াইবাসীর উপরে রাজার জাত ইংরেজ যে নির্মম অত্যাচার করেছিল, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন "জন্ বুলস আদার আইল্যাণ্ড" নাটকের ভূমিকায়। তার দু'চার বছর আগে পরে ঐ আফ্রিকাতেই ভারতীয়দের যে ভাবে মারধর কয়েদ করা চলছিল, তা নিশ্চয় শ'য়ের অজানা ছিল না।

১ গান্ধী যখন গোলটেবিল বৈঠকের জন্য ১১৩১ সালে বিলেতে গিয়েছিলেন তখন শ'য়ের সঙ্গে গান্ধীর প্রথম ও শেষ সাক্ষাৎ ঘটে। শ' বলতেন "আমার এবং গান্ধীর মতো মানুষদের ২৫ বছরে এক বার দেখা হলেই চলে।" সেই প্রথম মিলনের ব্যাখ্যা করে শ' বলেছিলেন "আমি গিয়ে দেখি গান্ধী দরবার করে বিরাট একটি গদী-আঁটা ঘেরাটোপমোড়া চেয়ারে বসে আছেন। ফরাসের ওপর তাঁর অভ্যস্ত বসবার আসন খালি পড়ে আছে। আমি শুধোলুম 'মিঃ গান্ধী, আপনি কি দেশের বাড়ীতে যেমন ভাবে বসেন তেমন ভাবে মাটিতে বসবেন না?' তিনি স্মিত হেসে মাটিতে নেমে পা মুড়ে বসলেন; আমিও তাই ক'রলুম। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব জমে উঠল। বন্ধুত্ব পাতাবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে একত্রে পা মুড়ে বসা। আমি বললুম, 'আমি আপনার সম্বন্ধে কিছু খোঁজখবর রাখি আর মনে করি যে আমরা দু'জনে একজাতের পরমাত্মীয় মানুষ। আমরা জগতের খুব ছোট একটা দলের লোক।' ঘন্টাখানেক ধরে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার পর আবার প্রশ্ন করলুম, এই 'গোলটেবিল বৈঠক আপনার ধৈর্য্য নষ্ট করে না?' গান্ধী জবাব দিলেন 'ওঃ, এ কাজের জন্য অপরিসীম ধৈর্য্য লাগে। সব ব্যাপারটাই ধাপ্পাবাজি কি না।' অবশেষে আমি বিদায় নিতে চাওয়ামাত্র গান্ধী জানতে চাইলেন আমি কেমন করে ফিরব। ট্যাক্সি ডেকে নেবার কথা কানেই তুললেন না। উপরন্তু আমার জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দিলেন। তিনি আমাকে মস্ত মোটর হাঁকিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিলেন তিনি শুনলুম এক রাজপুত্তুর। অশেষ ধন্যবাদ জানালুম, বকশিস দিতে গিয়ে বেকুব হই নি বলে ভাগ্যকেও ধন্যবাদ দিলুম।"

শ'কে প্রশ্ন করা হ'ল, "গান্ধীর সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা হ'ল বলুন"? শ' উত্তর দিলেন, "গান্ধীর সম্বন্ধে ধারণা? বলে কি বোঝাব! এ তো কাউকে হিমালয় দেখে কেমন লাগল তা বোঝাতে বলার মতোই অদ্ভুত প্রস্তাব।" এক বন্ধুকে বললেন, "তুমি কখনও গান্ধীকে কারো বক্তব্য শুনতে দেখেছ? সে এক শিক্ষাপ্রদ দৃশ্য। উনি অন্যের মত খণ্ডন করার জন্য তো শোনেন না, তাকে বোঝার জন্য শোনেন। আমার তো কৈ মনে পড়ে না এমন সহৃদয় শ্রোতা আর কখনও দেখেছি। মনে পড়ে বাল্যকালে একটা সুড়ঙ্গের মধ্যে গিয়ে নিজের নাম ধ'রে জোরে হাঁক ছাড়লুম। প্রতিধ্বনিটা ফিরে আসত। লক্ষ্য করেছিলুম যে, খানিকটা চেঁচাবার পর যতই গলা চড়াতুম, প্রতিধ্বনি ততই অস্পষ্ট হয়ে পড়ত। তখন শিখলুম যে সব কিছুর বেশী মাঝে ফিরে যাবার একটা মাত্রা আছে, তা ছাড়িয়ে গেলে লোকসান ঘটে। গান্ধীর কাছে জোর গলার দাবী না করে ফিসফিস্ ক'রে কথা বললেই যথেষ্ট ফল পাওয়া যায়। ভারতীয়রা ওঁর মৌন আবেদন থেকে ঠিক ততখানি বাণী পেয়েছে যতখানি পেয়েছে ওঁর আদেশ নির্দেশ থেকে। কিন্তু আমি নীরব থাকলে কে আমাকে গ্রাহ্য করবে?"

গান্ধীর কাছে নতি স্বীকার করে শ' নিজেকে বলতেন, পশ্চিমদেশের ক্ষুদে মহাত্মা। গান্ধী কেমন করে বসেন, মৌন থাকেন বা নিয়মিত সুতো কাটেন কি না শ' এ-সব খুঁটিনাটির খোঁজ রাখতেন।

শ'য়ের এক বাতিক ছিল যে, প্রত্যহ অন্তত দু'ঘণ্টা লিখবেন, যখন বয়সটা নব্বুইয়ের কোঠায় পৌঁছেছিল তখনও। এক জন ভয়ে ভয়ে বলেছিল, "আপনি তো ও কাজ করতে বাধ্য নন।" শ' চটপট জবাব দিলেন "তা নই, গান্ধীও তো সুতো কাটতে বাধ্য নন, তবু তিনি তা করেন।"

আরো অনেক বার কখনও বা দম্ভভরে কখনও বা অন্যমনস্ক ভাবে শ' নিজের সঙ্গে গান্ধীর তুলনা করে ফেলতেন। একদা বলেছিলেন, "গান্ধী আর আমি দু'জনেই খুব অসাধারণ মানুষ এই হিসেবে যে, আমরা অত্যন্ত দূরদর্শী, আমাদের মনের বিস্তার ব্যাপক, তবে মাঝে মাঝে মূর্খেরা ভীড় করে তার গণ্ডী ছোট করে দেয়। পথ দেখানোই আমাদের ব্রত, কিন্তু নিধিরাম সর্দারদের আবার এসব সঙ্কেতের দিকে চোখ থাকে না। আমরা দু'জনে খুবই বিনয়ী, যদিও সেই বিনম্রতাকে খ্যাতির আড়ালে ঢেকে রাখি। গান্ধীও আমার মতো ছবি তোলার জন্য ব্যস্ত নন, তবু এই এক জনকে বাদ দিলে বোধ হয় ওঁরই সবচেয়ে বেশী ছবি তোলা হয়েছে।" এ তো গেল নকল বিনয়। এই সাম্যবাদী-সমাজবাদী মানুষটি স্বীকার করতেন যে "সব মানুষের ভোটে নির্বাচিত অমানুষের দ্বারা রাজ্যশাসন আমার পছন্দ নয়। একটা কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র কখনও জোড়াতালি দেওয়া অদ্ভুত শাসনতন্ত্র দিয়ে গড়ে তোলা যায় না। আমি মহাত্মাদের শাসনই পছন্দ করি। এই ইংরেজি ভাষায় মহাত্মার কোনও প্রতিশব্দ নেই, আমি অতিমানব বলে একটা কথা খাড়া করেছি, কিন্তু ঠাট্টার ছলে ছাড়া কে আমাকে অতিমানব শ' বলতে রাজী আছে বল? আমি ধর্মকথা বললে লোকে ভাবে আমার ভীমরতি হয়েছে।"

মৃত্যুর কয়েক বছর আগে, গত মহাযুদ্ধের সময়, যখন গান্ধী ইংরেজ ও তার জুটিদের দলে যোগ দিতে নারাজ ছিলেন, তখন কেউ কেউ তাঁরও মস্তিষ্ক হয়েছে ভেবেছিল। স্যার ফিরোজ খাঁ নূন তো গান্ধীকে জাপানভক্ত সাব্যস্ত করে তাঁকে নেতাগিরি ছেড়ে জওহরলালের ওপর কর্তৃত্ব ন্যস্ত করতে বলেছিলেন! শ' শুনে গান্ধীর হয়ে লড়তে এগিয়ে এসে বললেন, "গান্ধীর রাজনীতির চাল সাবেক কালের হতে পারে, তাঁর কলাকৌশল রদবদল করাও দরকার হতে পারে, কিন্তু তার রণনীতি ঠিক আছে। আর উনি কিসের থেকে অবসর নেবেন শুনি? ওঁকে তো আপনা হ'তে স্বেচ্ছায় লোকে কর্তামি করার অধিকার দিয়েছে, উনি তো আইন মারফৎ কর্তা সাজেন নি। মহাত্মার পক্ষে কোনও দায়ই হাত ফের করা চলে না। নেতৃত্ব তো একডেলা তামাক নয় যে এক জনের হাত থেকে আর এক জনের হাতে চালান হয়ে যাবে।"

এ ঘটনার আরো বছর দুই আগে, ১৯৪৩ সালে, অমনই দৃঢ়তা ও বন্ধুতার সুরে শ' গান্ধীর ব্রিটিশ শাসনের বিরোধিতা সমর্থন করেছিলেন এই বলে যে, "যারা কখনও দুরস্ত হবে না এমন কয়েকটি একরোখা দক্ষিণপন্থীর বুদ্ধি শুনে গান্ধীকে বন্দী করে ব্রিটিশ সরকার পরম মূর্খতার পরিচয় দিয়েছে। বিনাসর্তে, কোনও রকম কূটচালের কথা না ভেবে রাজার গান্ধীকে মুক্ত করে দেওয়া উচিত, সঙ্গে সঙ্গে নিজের মন্ত্রীদের বুদ্ধিহীনতা ও ক্ষেপামির জন্য মাফ চাওয়া দরকার। ···গান্ধীর চেয়ে বেশী প্রিয় জননায়ক কে আছে? আমার তো মনে হয় ছ'টি মানুষও ওঁকে বোঝে না তবু লোকনেতা হবেন তাই তাদের বশীভূত করার অলৌকিক শক্তি নিয়ে উনি এসেছেন।"

মানুষ গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কেও শ'য়ের কৌতূহল ছিল; তাঁর নব্বই বছর বয়স কালে, যখন গান্ধীর ছেলে দেবদাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তখন সাগ্রহে জিগ্যেস করেছিলেন "তোমার বাবার খবর কি বল? জগতে তিনিই আর একটিমাত্র প্রাণবান্ মানুষ। তিনি দেখছি তোমাকে ডোরচেষ্টারের কেতাদুরস্ত পল্লীতে থাকতে দেন, ওয়েষ্ট এণ্ডের ভদ্র পোষাকও পরতে দেন। আচ্ছা, উনি বাবা হিসেবে কেমন মানুষ ছিলেন, ভাল তো?···আর উনি 'সারমন্ অন্ দি মাউন্ট' ছাড়া আর কিছু পড়েছেন কি? জীবিত কোনও লেখকের কোনও বই? অবশ্য ভাল জীবিত লেখক তেমন কে আর আছে।" বলা বাহুল্য, গান্ধী ওঁর লেখা পড়েছেন কি না শ'য়ের জানার সখ হয়েছিল। নিজের নবতিতম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ওঁর যে জীবনকথার প্রথম দু'খানা উপহার-সংখ্যা এসেছিল তার একটা রেখে অন্যটা গান্ধীজীকে দেবার জন্য দেবদাসকে দিয়েছিলেন।

দেবদাসের কাছে গান্ধীও শ'য়ের মতো দু'শো বছর বাঁচতে চান শুনে শ' বলে উঠলেন "তা' উনি যদি অমন উপোস চালিয়ে যান, নিশ্চয় বাঁচবেন, কারণ উপোস তো শুধু কম খরচায় বাঁচার বুদ্ধির বা প্রায়শ্চিত্ত সাধনের অঙ্গ নয়, এ যে শরীর ঠিক রাখার ওষুধ। আমি অনেক সময় ওঁর এই যন্ত্রটার কথা সবার কাছে ফাঁস করে দিতে চেয়েছিলুম। অবশ্য মাত্রা ঠিক না রাখলে অতিভোজনের মতো এটাও মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তা তোমার বাবা তো গোঁড়া নন, তাঁর বেহিসেবী কিছু করার ধাত নয়। তাঁর সুবিচারের ওপর নির্ভর করা যায়।"

শেষ বয়সে শ' তাঁর দৃষ্টিশক্তি ও চলৎশক্তি কমে যাচ্ছে বলে নালিশ করতেন, অথচ এক বার এক প্রতিবেশিনীর বাড়ী গিয়ে তাঁর আঁকা গান্ধীর প্রতিকৃতির দিকে কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে চেয়ে থেকে তিনি এমন জোর চাপে লম্বা লম্বা পা ফেলে গোধূলির আবছা আলোয় চলে গেলেন যে, মনে হ'ল ওঁর সামনে যেন যুগ-যুগান্তরের দোর খুলে গেছে। আর একদিন আঁধারে পথ চলেছেন, হঠাৎ এক মোটরের জোরাল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে দিল, শ' বললেন, "গান্ধী 'প্রেমল জ্যোতি', ভজনটির ভক্ত বলেন তা নিশ্চয় মোটরের এই আলো দেখে বলেন নি। গান্ধী কলকব্জার বিরোধী অথচ ইংলণ্ডে নির্মিত মোটর ব্যবহার করতেন। আমার মতো উনিও নানা উল্টো-পাল্টা মতের কথা বলেন। তফাৎ এই যে ওঁর প্রিয় ইংরেজি ভজন হচ্ছে

'ঘন তমসার মাঝে হে প্রেমের জ্যোতি
আমারে দেখাও তুমি পথ
(আমি) গৃহ হতে দূরাগত, নামিছে আঁধার রাত্রি
যাচি তব আলোকের রথ।'

আর আমার প্রিয় গান হচ্ছে—

'নরকের ঘণ্টা ঐ বাজে ঢঙ-ঢঙ
তব লাগি নহে মোর তরে
(হে মরণ) কোথা তব শূলাঘাত, বেদনার রঙ
রে কবর, তোর জয়ে কেবা ডরে?'

মৃত্যু বা দুঃখবেদনা শ'কে অন্য মানুষের মত বিচলিত করত না।

১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ করে ফেরার পথে একটি মেয়ে দৌড়ে এসে তাঁকে খবর দিল যে, গান্ধীকে খুন করা হয়েছে। তিনি নীরবে বাড়ীতে ঢুকে গেলেন। তারপর সুরু হ'ল কাগজওলাদের তাগিদ—বাণী চাই। শ' অসহায় ভাবে বললেন, "আমি কি বলি বল দেখি? তোমরা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনন্দন জানিয়েছ, যা 'গুলীর ঘায়ে শহীদ না হয়েও গান্ধীর অমর হওয়ার অধিকার ছিল' বা 'সন্তব্যক্তিদের বাঁচার অধিকার আছে'। সব ক'টাই অচল হ'ল। শেষে বলে উঠলেন "ভাল হওয়া বিপজ্জনক। তাঁর জীবনের মেয়াদ কমানো হয় নি বরং অতি দীর্ঘকালব্যাপী করা হয়েছে।...মৃত্যু গান্ধীকে তাঁর ভরা যৌবনে যখন তিনি সার্থকতা ও শক্তির চরমশীর্ষে উঠেছিলেন তখন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। আমার মনে হয়, এর একটা বিশেষ তাৎপর্য্য ও সঙ্গতি আছে। যখন এক জন একটা মহৎ কিছু সাধন করে তখন তাকে গুলী করে কিম্বা আরো ভাল উপায়ে বেদনাহীন ভাবে চিরনিদ্রায় শায়িত করা উচিত। এমন করেই এক জন পরম পুরুষ (যীশু) প্রাণ দিয়াছিলেন।"

মেয়েদের পুতুলখেলা

শ্রীনীলিকা ঘোষ

প্রত্যেক বাঙ্গালী পরিবারের ছোট-ছোট মেয়েরা পুতুল-খেলা করে। বাংলা দেশের মেয়েরা তো খেলেই, বাংলার বাইরে আমি যত জায়গায় গিয়েছি, সেখানেও দেখেছি, বাঙ্গালী মেয়েরা পুতুল-খেলা করে। স্বর্গীয় কবি নবীনচন্দ্র সেন তাঁর "কুরুক্ষেত্র" কাব্যগ্রন্থে অভিমন্যু-উত্তরার বর্ণনা প্রসঙ্গে পুতুলখেলার উল্লেখ করেছেন।

মেয়েরা চার বছর বয়স থেকে আরম্ভ করে প্রায় এগারো-বারো বছর পর্য্যন্ত পুতুল খেলে। দৈনন্দিন জীবনে মেয়েরা তাদের মা-দিদি-বৌদিদের যা করতে দেখে, পুতুল নিয়ে তারা সে রকম খেলা করে। একটা বাক্সে পুতুলের শোবার ঘর তৈরী হয়, আর একটা বাক্স রাখে পুতুলের কাপড় রাখবার জন্যে। পুতুলখেলার বাক্সের এত প্রয়োজন বলেই অনেক সময় আমাদের দরকার হলেও বাড়ীতে কাগজের বাক্স খুঁজে পাই না। হয়তো বাড়ীতে এক জনের নতুন জুতো এসেছে, কি কাপড়, কিংবা ঔষধ ইত্যাদি, জিনিষ আসতে না আসতেই বাড়ীর ছোট মেয়েরা এসে হাজির এবং কে আগে বাক্সটি হস্তগত করবে, তাই নিয়ে চলে ঝগড়া। যাক, ঝগড়া মিটিয়ে সে বাক্সটি তো এক জনকে দেওয়া গেল। একটু পরেই পাশের ঘরে টেবিলের তলায়, অথবা বারান্দায় গিয়ে দেখা যায়, নতুন বাক্সটিতে সাজিয়ে-গুজিয়ে সুন্দর পুতুলের ঘর করা হয়েছে, এবং বর আর বৌ গল্পে মত্ত হয়ে আছে, সে দৃশ্যও দেখতে পাওয়া যায়।

একসঙ্গে দু'তিনটি মেয়ে নিজস্ব পুতুল নিয়ে খেলা করতে বসে। হয়তো বাক্স খুলে আরম্ভ হয় তাদের পুতুল স্নান করাবার পালা। বর-বৌকে স্নান করিয়ে তার পর করায় বাচ্চাকে, যেমন দেখে মাকে ভাই-বোনকে করাতে ঠিক তারই হুবহু অনুকরণ করে। স্নানের পর হয়তো সুন্দর জামা-কাপড় পরিয়ে আরম্ভ হয় পুতুলের খাবার পালা। বাচ্চাকে ঠিক তেমনি করে কোলে রেখে ঝিনুক দিয়ে দুধ খাওয়ায়, যেমন করে তাদের মা, দিদি, বৌদিরা বাচ্চাদের খাইয়ে থাকেন। খাবার পালা শেষ করে একটু ঘুমিয়ে উঠেই পুতুলের বিকালে বেড়াবার সময় হয়। প্রত্যেকে এক একটি কাগজের বাক্সকে মোটর গাড়ী করে নেয়। তার পর মোটরে ক'রে সুন্দর কাপড় পরিয়ে তারা পুতুল নিয়ে এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ীতে বেড়াতে যায়। এক-এক বাড়ীতে গিয়ে মেয়েরা পুতুলের সুখ-দুঃখের কথাবার্ত্তা নিজেরাই বলতে থাকে,—যেমন ক'রে তাদের মা-দিদিরা পাড়া-প্রতিবেশীর সঙ্গে ব'লে থাকেন।

আমার মনে হয়, এই পুতুলখেলার জন্যেই বাংলা দেশের মেয়েরা তাড়াতাড়ি পেকে যায় এবং অল্প বয়সে সংসারের আওতায় এসে পড়ে। ছেলেরা কিন্তু ছোটবেলায়ও পুতুল খেলে না। তারা দৌড়াদৌড়ি, ছুটাছুটি, লাফালাফি, বল খেলা, মার্ব্বেল খেলা ইত্যাদি খেলতে ভালবাসে। তাদের মনের ঝোঁকই ঐ রকম খেলার দিকে। সেইজন্যে দেখা যায়, মেয়েরা যখন সংসারের সব কিছু বোঝে, একই বয়সের ছেলেরা তখন হয়তো কিছুই বোঝে না। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন যে, পুতুলখেলার মধ্য দিয়েই মেয়েরা সংসারের কাজ শেখে। এ ধারণা একেবারে ভুল। কারণ আজ-কাল প্রায় মেয়ের মা-ই চান যে মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ ক'রে যখন কলেজে পড়বে, তখন তার বিয়ে দেবেন। কিন্তু অনেক মেয়ের মা হয়তো যোগ্য পাত্র না পেয়ে মেয়েকে আরো পড়াতে থাকেন এবং বয়সও বাড়তে থাকে। কাজেই এত দিনে মেয়েরা এমনিতেই সংসারের কাজকর্ম্ম শেখে। আমাদের বাঙ্গালী মেয়েদের মতো অন্যান্য দেশের মেয়েরা এত অল্পেতেই পেকে যায় ব'লে মনে হয় না।

আমার বাবার কাছে গল্প শুনেছি যে, প্রথম রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপানের ছেলে-মেয়েরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করতো। তারা দুর্গ তৈরী করতো এবং দু'টো দল গ'ড়ে নিত। দুর্গ দখল করবার জন্যে তারা প্রাণপণে যুদ্ধ চালাতো। বাবা আমাদের পরিবারে পুতুল খেলা তু'লে দিয়ে আমার বোনদের মধ্যে এই রকম যুদ্ধখেলার প্রচলন করতে চেষ্টা করেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে, কয়েক বছর আগের কথা। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল, আমার বোনরা যখন পুতুল নিয়ে খেলতে বসতো, তখনই বাবা তাদের খেলা বন্ধ করতেন। তারপর তাদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলা করতে শিখিয়ে দিতেন। তার পর তিনি তাদের আর একটি খেলা খেলতে উপদেশ দিতেন। সেটা হচ্ছে স্কুল-স্কুল খেলা। যেমন এক জন সাজতো শিক্ষয়িত্রী আর অন্যরা ছাত্রী। শিক্ষয়িত্রী বড়দের পায়ের হিলতোলা জুতো প'রে এক হাতে ছাতা নিয়ে এবং অন্য হাতে ব্যাগ নিয়ে শিক্ষয়িত্রীর ঢঙে হেঁটে তাদের তৈরী স্কুলে গিয়ে বসতো। হাতের ব্যাগ হয়তো অনেক সময় আমাকে খবরের কাগজ দিয়ে তৈরী ক'রে দিতে হতো। কেউ মুখে ঢং-ঢং ক'রে ঘণ্টার মত বাজাত এবং ছাত্রীরা সব ক্লাশে হাজির হতো। তার পর সুরু হতো পড়া নেবার পালা। কেউ হয়তো পড়া পারতো, এবং কেউ হয়তো পড়া না পে'রে শাস্তি পেত। আবার টিফিনের ছুটিও দেওয়া হ'তো। এইরকম ক'রে তাদের খেলা চলতো।

আমার মনে হয়, প্রত্যেক মা-বাবারই মেয়েদের পুতুলখেলা থেকে নিবৃত্ত ক'রে এই রকম সব খেলার প্রচলন করা উচিত।

টাকা/আনা/পাই

জ্যোতির্ময় রায়

বিশু। আজ রাতেই লোক পাঠিয়ে দিল নাকি?

(বলে বিশু এক-পা এগিয়ে দাঁড়ায় সেদিকে, সঙ্গে ভোলাও। একটু পরেই সেদিক দিয়ে আসে স্যুটপরা দু'জন ভদ্রলোক, সঙ্গে চাপরাশী।)

বিশু। কা'কে চাই?

প্রতিনিধি। এখানে মৃগাঙ্ক বাবু থাকেন?

(বিশু ও ভোলা উভয়েই হাত গুটিয়ে আর এক-পা এগিয়ে আসে।)

বিশু। [পেছনে ঘরের দিকে এক বার দেখে নিয়ে] হ্যাঁ থাকেন, কেন কি হবে তাকে দিয়ে?

সহকারী। আ-হা-হা, আপনারা অমন রুখে আসছেন কেন?

বিশু। রুখে আসবো না, বলুন কি দরকার?

ভোলা। বলুন।

প্রতিনিধি। কি মুস্কিল! সারা দিন ওর ঠিকানা আমরা খোঁজ করেছি, শেষে জানতে পারলাম এখানে থাকেন। আরে মশাই, ওরই ভালোর জন্যে ওর সঙ্গে আমার দেখা হওয়া দরকার।

(বিষয়টা না বুঝতে পারার মত ভাব নিয়ে বিশু-ভোলার দৃষ্টি-বিনিময় হয়, ভোলা বিজ্ঞের মতো ইসারায় বিশ্বাস করতে নিষেধ করে।)

বিশু। [আগন্তুকদের লক্ষ্য করে] ও সব ভালো-ফালো আমরা বুঝি না, কি দরকার আগে আমাকে বলতে হবে।

সহকারী। 'দে আর এ্যাডামন্ট'—বলুন—।

বিশু। হ্যাঁ বলুন।

প্রতিনিধি। ওর সঙ্গে টাকাকড়ি সম্পর্কে একটু কথা আছে।

বিশু। ধার করেছে, তা' এখন দিতে পারবে না, আমি জানি ওর কাছে কিছু নেই। এখন যেতে পারেন। [বিদায় করার ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে দু'পা এগিয়ে যায় উল্টো দিকে]

প্রতিনিধি। কি বিপদ! [অসহিষ্ণুতার সঙ্গে] ধার করেন নি, অনেকগুলো টাকা পেয়েছেন।

বিশু। [ক্রোধের সুরের জের টেনে] মৃগাঙ্ক বাবুকে চাই—টাকা পেয়েছেন। [হঠাৎ কথাটার মর্ম উদ্ধার করার ভাব নিয়ে] কি—কি টাকা পেয়েছেন, কোথায় টাকা—কতো?

ভোলা। [হতভম্ব ভাব নিয়ে] টাকা পেয়েছেন? কেমন করে পেলেন?

প্রতিনিধি। তা ওর সঙ্গে দেখা হলেই বলবো।

বিশু। কত—কত টাকা?

প্রতিনিধি। এই ধরুন লাখ দুই—

ভোলা। লাখ দুই—[বলতে বলতে বসে পড়ে]

বিশু। [অর্ধ-উচ্চারিত অবস্থায়, বিস্ফারিত চোখে] লা-খ দু-ই টাকা!

প্রতিনিধি। আহা, আপনারা অমন করছেন কেন, টাকাটা তো আর আপনারা পান নি!

বিশু। ও হ্যাঁ-হ্যাঁ, দাদা পেয়েছে—[হঠাৎ নৈকট্য উপলব্ধি করে সোৎসাহে] তা আমাদের দাদা—দাদা তো পেয়েছে।

প্রতিনিধি। শুনুন, হঠাৎ টাকা পাওয়ার খবরটা অনেকে সামলাতে পারে না, তা মৃগাঙ্ক বাবু কি একটু নার্ভাস টাইপ—আই মীন—

বিশু। [হাত তুলে] 'মীন' করতে হবে না, ইংরেজী বুঝি। না না নার্ভাস-টার্ভাস নয় দিন-রাত কতো ঝামেলা সামলাচ্ছে। [সাদর অভ্যর্থনায়] আসুন—আপনারা আসুন—দাদা—দাদা—বলতে বলতে ছুটে যায় ঘরের দিকে। ডাক শুনে দরজা খুলে মৃগাঙ্ক বেরিয়ে আসে। তার পাশ দিয়ে বিশু, ভোলা দ্রুত ঘরে ঢুকে ভেতর থেকে চেয়ার দু'টো তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসতে থাকে।

মৃগাঙ্ক। কি—কি হলো কি?

রচনা। [আতঙ্কিত অবস্থায়] কি হয়েছে বিশু?

বিশু। না না, ভয় পাবার কিছু নেই, ভালো খবর। বৌদি আপনি দরজার কাছটায় বসুন।

(চেয়ার দুটো এনে বসিয়ে দেয় দাওয়ার সামনে।)

বিশু। আসুন স্যর, বসুন। [মৃগাঙ্ককে দেখিয়ে] এই মৃগাঙ্ক বাবু। এই ভোলা, দাদাকে মোড়াটা দে।

(প্রতিনিধি ও সহকারী বসে।)

প্রতিনিধি। অ—আপনি মৃগাঙ্ক মজুমদার?

মৃগাঙ্ক। আজ্ঞে হ্যাঁ।

প্রতিনিধি। আচ্ছা কয়েক মাস আগে বিলিতি কোন লটারীর টিকিট আপনি কিনেছিলেন?

মৃগাঙ্ক। লটারীর টিকিট—হ্যাঁ-হ্যাঁ কিনেছিলাম। কেন বলুন তো?

প্রতিনিধি। সেটা আছে তো আপনার কাছে?

মৃগাঙ্ক। [খোঁজার উদ্দেশে উঠে স্মরণ করতে চেষ্টা করে] ওটা—ওটা—

প্রতিনিধি।—হ্যাঁ ওই নাম্বারে কিছু টাকা উঠেছে।

মৃগাঙ্ক। টাকা—টাকা উঠেছে! রচনা আমার সেই সাদা থলেটা—ওরই মধ্যে নোটবুকে—

রচনা। [ব্যতিব্যস্ত হয়ে] আমি আনছি থলেটা, তুমি বসো, ছুটে ভেতরে গিয়ে থলেটা এনে তুলে দেয় মৃগাঙ্কের হাতে। মৃগাঙ্ক থলেটা উপুড় করে ভেতর থেকে সবকিছু ঢেলে দেয়।

[illegible]। [জিনিসগুলো দু'হাতে ঘেঁটে] কই নোটবুক তো এতে নেই! [হতাশার সুরে] এ কি থাকে—

[illegible]। অ—ওই ছোট নোটবুকটা তো? ওটা তো আমি সুটকেসে রেখেছি—মনেই ছিলো না।

(ছুটে ভেতরে চলে যায়।)

[illegible]। আঃ কিছু যদি মনে থাকে—[নিজেই উঠে যায় ভেতরে। একটু পরে নোটবই-এর পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে বেরিয়ে আসে।] না—না—আমার যা কপাল এ কি থাকবে! আরেঃ এই যে পেয়েছি, দেখুন তো—

প্রতিনিধি। [টিকিটটা নিয়ে দেখে] হ্যাঁ এটাই। রাখুন যত্ন করে, এখন আপনি একটু শান্ত হয়ে বসুন তো।

(মৃগাঙ্ক স্বপ্নাবিষ্টের মতো বসে। ইতিমধ্যে বস্তির এক পাশে বেশ একটি ছোটোখাটো ভিড় জমে গেছে, তার মধ্যে আশপাশের দু'-একটি সম্ভ্রান্ত যুবককে দেখা যায়। বিশু হাতের ইশারায় ভিড়টাকে একটু চেপে দিয়ে আসে।)

প্রতিনিধি। calm yourself—বেশ শান্ত হয়ে শুনুন, উত্তেজিত হবেন না। আপনি অনেকগুলো টাকা পেয়েছেন।

মৃগাঙ্ক। কতো?

বিশু। দুই লাখ দাদা—দুই লাখ—

প্রতিনিধি। আঃ আপনি চুপ করুন না।

বিশু। আরে না—দাদা নার্ভাস-টার্ভাস নয়, বলুন আপনি—কেমন দাদা?

মৃগাঙ্ক। [বিহ্বলের মতো তাকিয়ে] দু'ই লাখ—বচনা দু'ই লাখ, [প্রতিনিধিকে লক্ষ্য করে] ঠিক জানেন আপনি?

প্রতিনিধি। আপনি শান্ত হয়ে শুনুন, আমি বলছি, ওটা দু' লাখ না হয়ে তার চেয়ে বেশীও তো হতে পারে।

মৃগাঙ্ক। [ঝুঁকে পড়ে] তার চেয়েও বেশী—কতো?

প্রতিনিধি। [একটু মুচকে হেসে, সময় নিয়ে, শান্ত কণ্ঠে] ধরুন যদি বলি চার লাখ টাকারও বেশী?

মৃগাঙ্ক। [মোড়া থেকে উঠে পড়ে] চার লাখেরও বেশী—চার লাখেরও বেশী [হাত মুচড়ে চুল টেনে উত্তেজিত ভাবে এদিক ওদিক ঘুরে] ঠিক করে বলুন, আমি কত পেয়েছি—বলুন—বলুন—

প্রতিনিধি। বলছি, আপনি এতো বেশী নার্ভাস হয়ে পড়লে তো বলা যাবে না, একটু স্থির হতে চেষ্টা করুন।

মৃগাঙ্ক। আমি মোটেই অস্থির হইনি, আপনি বলুন [হাত মোচড়াতে মোচড়াতে] আমি মোটেই অস্থির হইনি [হাত মোচড়ানোটা অস্থিরতার লক্ষণ, এটা খেয়াল হতেই ছেড়ে দিয়ে

মোড়ায় বসে পড়ে দ্রুত পা নাচাতে থাকে, সেটা লক্ষ্য পড়াতে তাও থামিয়ে দেয়] আমি—আমি খুব শান্ত আছি, বলুন—

প্রতিনিধি। [আবার একটু লক্ষ্য করে] আপনি চার লাখের অনেক—অনেক বেশী পেয়েছেন [বলে আবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মৃগাঙ্কের দিকে তাকিয়ে থাকে। এদিকে দেখা যায় ভোলা এক পাশে বসে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।]

বিশু। ও কি কাঁদছিস কেন?

ভোলা। লাখ লাখ টাকা, কতো টাকা রে বিশু?

বিশু। তা আমিই কি জানি, যাঃ—

মৃগাঙ্ক। চুপ করে থাকবেন না, বলুন।

প্রতিনিধি। আপনি মোট দশ লাখ টাকা পেয়েছেন।

মৃগাঙ্ক। দশ লাখ—[ঝটকা দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মুহূর্তে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠে।]

রচনা। [ভীত স্বরে] ওগো তুমি এমন করো না, স্থির হও।

[বলে মৃগাঙ্ককে সামলাতে গিয়ে নিজেই অস্থির হয়ে মাটিতে বসে পড়ে]

বিশু। বৌদি—বৌদি—[বলে ছুটে পাখা হাতে এগিয়ে যায়] ভোলা শীগগির বিনুদি'কে ডাক।

মৃগাঙ্ক। [স্বপ্নাবিষ্টের মতো] দশ লাখ—রচনা—রচনা—বিশু তোর বৌদিকে সুস্থ কর [আবার বসে পড়ে এক দৃষ্টিতে একটুক্ষণ প্রতিনিধির দিকে তাকিয়ে থাকে। চোখে জল, মুখে বিকৃত হাসি] সত্যি আমি এতো টাকা পেয়েছি!

(প্রতিনিধি ঘাড় নেড়ে জানায়, হ্যাঁ। মৃগাঙ্ক উঠে পড়ে, আবার পায়চারী করতে করতে হেসে ওঠে)

মৃগাঙ্ক। অবাক কাণ্ড! মাথা নয়, গুণ নয়, মুরুব্বি নয়, রাতারাতি একটা ঘোড়া আমাকে বড়লোক করে দিলে!

[ইতিমধ্যে দেখা যায় বিনুদি' এসে হাওয়া করতে থাকে রচনাকে]

মৃগাঙ্ক। [প্রতিনিধিকে] জানেন কাল পর্যন্ত বাজারের টাকাটা আমার পকেটে ছিলো না। [নিজের মনে] আজ—আজ আই এ্যম্ এ রীচ ম্যান।

প্রতিনিধি। আচ্ছা আজ আমি এখন যাই, কাল আসবো, আপনি একটু স্থির হতে চেষ্টা করুন।

মৃগাঙ্ক। না না আমি ঠিকই আছি, যাবেন না, শুনুন—আচ্ছা আমি ইচ্ছে করলেই কাল একটা গাড়ী কিনতে পারি—খুব দামী গাড়ী—এই ধরুন—দূর ছাই কোনো দামী গাড়ীর নামও তো জানি না!

প্রতিনিধি। [হেসে] হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি পারেন বৈ কি। একটা কেন চারটে পারেন, আচ্ছা এখন আসি নমস্কার।

মৃগাঙ্ক। [অন্যমনস্ক ভাবে] হ্যাঁ আসুন—[পিছু ডেকে] শুনুন, কাল ঠিক আসছেন তো?

প্রতিনিধি। নিশ্চয়ই।

[বলে সহকারী ও চাপরাশী সহ প্রতিনিধি বেরিয়ে যায়]

মৃগাঙ্ক। রচনা—রচনা নাউ উই হ্যাভ এনাফ মানি, এনাফ টু বার্ণ, প্রচুর—প্রচুর টাকার মালিক আমরা আজ। আর তিলে তিলে ক্ষয়ে যেতে হবে না তোমাকে। [পায়চারী করে] আজ ইচ্ছে করলেই আমি সব কিনতে পারি—বাড়ী, গাড়ি, পোষাক। স্বাস্থ্য, সম্মান সব—সব—শুধু কিনতে পারার ক্ষমতার অভাবে—এই তিরিশ বছর বয়সে আমি শুকিয়ে বেঁকিয়ে যেন বুড়ো হয়ে গেছি—এবার দিন আসছে—এক দিন ষাট বছরে পৃথিবীময় উড়ে বেড়িয়েও বলতে পারবো, আই এ্যম এ ইয়ং ম্যান অব সিক্সটি—আমি ষাট বছরের যুবক।

(বিশু এসে মৃগাঙ্ককে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলে)

বিশু। একটু ঠাণ্ডা হয়ে বসো তো।

বিনুদি'। [রচনার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে] কইসি না, এমন রাজরাণীর মতো বউ, ভাইগ্য না ফিরা পারে!

বিশু। ভোলা আয়তো খবরটা চাউর করে আসি।

(ভোলা ও বিশু বেরিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক একটা চেয়ারে অপরটার ওপর পা তুলে দিয়ে নাচাতে নাচাতে আপন মনে বলে—)

মৃগাঙ্ক। বাঃ এ-ও যেন আলাদীনের প্রদীপ, হঠাৎ বাদশা বনে গেলাম! পারিপার্শ্বিক ভুলে একটু যেন অপ্রকৃতিস্থের মতো বাদশাহী ভঙ্গীতে হাঁক দেয়—

মৃগাঙ্ক। কই হ্যয়—?

(হঠাৎ দেখা যায় পাশের ভীড় থেকে স্যুটপরা একটি ভদ্রলোক এগিয়ে আসে।)

লোকটি। [কাছে এসে সবিনয়ে] ডাকলেন?

মৃগাঙ্ক। [সবিস্ময়ে] কে আপনি?

লোকটি। আপনার 'নেবার', কাছেই থাকি।

মৃগাঙ্ক। অ, তা আমি ডাকলাম আর আপনি চলে এলেন?

লোকটি। না, যদি আপনার কোন দরকারে লাগি।

মৃগাঙ্ক। ও বেশ—বেশ—[একটু ভেবে নিয়ে] পঞ্চাশটা টাকা ধার দিতে পারেন?

লোকটি। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই [পকেট থেকে টাকা বার করে টেবিলের ওপর রেখে দেয়] নিন স্যার, এখানে সামান্য শ'খানেক টাকা আছে।

মৃগাঙ্ক। [বিস্ফারিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে] চাইলাম আর দিয়ে দিলেন?

লোকটি। কি যে বলেন স্যর, আপনার কাছে থাকা তো ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে থাকা।

মৃগাঙ্ক। কিন্তু এখনও তো টাকা পাই নি?

লোকটি। পাবেন—সব খোঁজই আমরা রাখি। আচ্ছা আমি এখন যেতে পারি?

মৃগাঙ্ক। আসুন—[লোকটি যাবার জন্যে পা বাড়ালে, আবার ডাকে] শুনুন [লোকটি ফিরে আসে] আচ্ছা আপনি চলে যাবার পর আবার যদি আমি ডাকি, ঠিক এমনি কেউ আসবে?

লোকটি। না না আর কাউকে ডাকবার আপনার দরকার কি? কাল সকালেই এসে দেখা করবো আমি। আমি স্যর এক জন নামকরা ব্রোকার। বাড়ী—গাড়ী—যা বলুন না কেন, মুখের কথা পড়তে না পড়তে সব ব্যবস্থা করে দেবো—আচ্ছা আসি।

মৃগাঙ্ক। [অন্যমনস্ক ভাবে] আসুন।

লোকটি। [ভীড় লক্ষ্য করে] এই—তোমরা সব যাও তো এখন, এখানে আর ভিড় করো না, ওঁকে একটু শান্ত হতে দাও—যাও—যাও—

(ভিড় সরিয়ে নিজেও বেরিয়ে যায়। মৃগাঙ্ক চেয়ার ছেড়ে উঠে বার দুই পায়চারী করে এগিয়ে যায় রচনার কাছে। কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্কের মত তার মাথায় হাত বুলিয়ে আবার ফিরে আসে।)

মৃগাঙ্ক। অদ্ভুত আমাদের এই সমাজ! ভাগ্যের মত এক প্রচণ্ড ভাঁড়ের হাতে ছেড়ে রেখেছে অসংখ্য ক্ষমতা। জ্ঞান নয়, গুণ নয়, একটা ঘোড়া—জাষ্ট এ হর্স—যাক্ যাক্ আমি তো বেঁচে গেলাম [আরও বার দুই পায়চারী করে তাকায় বস্তির ঘরটার দিকে, তার পর ধীরে ধীরে মুখ তুলে দৃষ্টিটা সামনের দিকে ছড়িয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মত] সবার আগে চাই থাকবার মত একটা বাড়ী।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(সময় সকাল। মৃগাঙ্কের নতুন বাড়ীর লবি। লবির পিছন দিকে ডান পাশে ওপরে ওঠার চওড়া সিঁড়িটা পাক খেয়ে উঠে গেছে। সিঁড়ির পর ডানধার ঘেঁষে পর পর দুটো দরজা, তারই সামনেটা ম্যানেজারের অফিস-ঘর। উল্টো দিকে সামনের চওড়া দরজাটা লবিতে প্রবেশের প্রধান পথ, তার খানিকটা দূরেই বিশুদের ঘরের দরজা। বিশুর কামরা ছাড়িয়ে ভেতরের দিকে চলে গেছে করিডর। লবির মাঝখানে পুরু কার্পেটে সোফা সেটি ও সেণ্টার টেবিল। স্যুট-পরিহিত বিশু ও ভোলা বেরিয়ে আসে তাদের ঘর থেকে।)

বিশু। নাঃ, দাদার মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়েছে, বুঝলি ভোলা? আচ্ছা, জোরজার করে এগুলো কি পরিয়ে দিল বলতো?

ভোলা। [আহ্লাদের ভাব নিয়ে] কিন্তু যাই বলিস বিশু, প্যাণ্ট-কোটটা পরলে মেজাজটা কিন্তু বেশ একটু [খুব একটা গম্ভীর মুখভাব করে] উঁ—[সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বিশুর দিকে তাকায়।]

বিশু। যা যাঃ, আর মেজাজ গরম করতে হবে না [গলা একটু নামিয়ে, সাবধান করার ভঙ্গীতে] মনে রাখিস এ-সব আমাদের নয় [হাত দিয়ে দেখিয়ে] এর মধ্যে থাকবি যেমন করে মানুষ পরের বাড়ীতে থাকে, বুঝলি!

(ভোলা বিজ্ঞের মতো মাথা থুতনি উঁচিয়ে নামিয়ে বোঝার ভঙ্গী করে। এমন সময় অফিসঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে কেতাদুরস্ত সাহেবী পোষাকে ম্যানেজার মিঃ চৌধুরী। সঙ্গে জামাই মিঃ সেন। এদের এগিয়ে আসতে দেখে ভোলা বিশুর দিকে তাকিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বলে—)

ভোলা। ম্যানেজার।

বিশু। [একটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে] চল্ ওখানটায় বসি। বিশু ভোলা গিয়ে কৌচে বসে। ম্যানেজার ও মিঃ সেন এগিয়ে আসতে আসতে—

মিঃ সেন। সত্যি মিঃ চৌধুরী, আপনাকে যে এখানে এসে দেখতে পাবো, এ ছিলো আমার কল্পনার বাইরে—ইট ওয়াজ বিঅণ্ড মাই ইমাজিনেশন! যোগাযোগটা হলো কি করে?

মিঃ চৌধুরী। [ভারী গলায়, ভারী চালে] খুবই হঠাৎ—যে রিপ্রেজেণ্টিটিভের মারফৎ উনি টাকাটা পেলেন সে আমার বিশেষ বন্ধু। হঠাৎ এতগুলো টাকা ম্যানেজ করা—তার ওপর বাড়ী কেনা থেকে সুরু করে বড় বড় লেন-দেন তো রয়েছে—এসবের জন্যে বেশ খানিকটা এক্সপীয়ারেন্স দরকার তো। [মৃদু হেসে] বন্ধু সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিলেন আমার ঘাড়ে—এই আর কি।

মিঃ সেন। [ঈর্ষায় মুখ কালো করে] তাহলে সব কিছু ম্যানেজ করার ভার আপনারই ওপর?

মিঃ চৌধুরী। ও—ইয়েস্।

মিঃ সেন। তা বেশ, আপনার পরিচয়ের সূত্রটাও তো কম নয়? [প্রসঙ্গ পরিবর্তনের ভাব নিয়ে] হ্যাঁ, আপনি তাহলে বলছেন, আমার পক্ষে দেখা করা এখুন ঠিক হবে না?

মিঃ চৌধুরী। আমার তো তাই মনে হয়! অবশ্যি আপনাদের ও-বাড়ী সম্পর্কে আমাকে খুব বেশী কিছু যে বলেছেন তা নয়—যেটুকু শুনেছি তাই থেকে আমার যা ইম্প্রেশন হয়েছে, তাতে মনে হয় আরও কয়েকটা দিন ছেড়ে দেওয়াই ভালো।

মিঃ সেন। রাইট-ও—আই অ্যাকসেপ্ট ইয়র এ্যাডভাইস্। আচ্ছা, চলি তাহলে—চীয়ারিও।

(হিল ঠুকে বেরিয়ে যায় মিঃ সেন! ম্যানেজার তার নিষ্ক্রমণের দিকে একটু তাকিয়ে থাকে। একটা কাজের উদ্দেশে বেরিয়ে যায় উল্টোদিকের করিডর দিয়ে। ভোলা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসে। এমন সময় সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে মৃগাঙ্ক। মাটিতে লোটাচ্ছে কোঁচা, গায়ে পাঞ্জাবী, হাতে সিগারেটের টিন।)

[ক্রমশঃ।

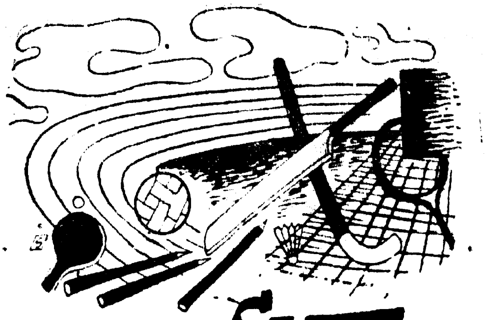
এবারে মনের দিকে

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

মনোময় আভা নিয়ে তবে
এবারে সোনার মেয়ে হবে?
এত সব কী হবে, কী হবে?

হৃদয় রয়েছে ভ'রে
রূপময় অবসরে;
হারাবে তারেই তুমি শেষে?

মন দেয়া-নেয়া শুনি
পাঠালে তারেই নিরুদ্দেশে!
এবারে মনের দিকে চাও, সুনয়নি!



খেলাধূলা

অলিম্পিক প্রসঙ্গ

আসন্ন অলিম্পিকের জন্য প্রতি বারই কিছু না কিছু সংবাদ বসুমতীর পাতায় আপনারা পাচ্ছেন, এবারও তার একটা মোটামুটি আলোচনা করব। ষোড়শ অলিম্পিকে দেশ-বিদেশ থেকে অতিথিরা জড় হবেন। শহরের হোটেল, রেস্তোরাঁতে স্থান সঙ্কুলান হবে না। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রায় বিশ হাজার দর্শক আসবেন মেলবোর্ণে অষ্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আর প্রায় দশ হাজার মত অতিথি সাগরপারের।

অলিম্পিক গ্রামে মাত্র ৬ হাজার এ্যাথলীটের স্থান সঙ্কুলান হবে। তাই অলিম্পিকের কর্তৃপক্ষরা শহরের বিভিন্ন বাড়ীর দু'-একটি ঘর ভাড়া করে রেখেছেন। হোটেলের মত এখানেও খরচ খরচা করে থাকা চলবে।

অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নের ভার আছে অলিম্পিক সিভিক কমিটির উপর। অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নের দিকে সম্পূর্ণ ভাবে নজর রাখার জন্য এঁরা নানান ব্যবস্থা করেছেন। রাস্তা ঘাটে আলো দেওয়া হয়েছে। ছোট-ছোট নগরগুলিকে সুন্দর ভাবে সাজানো হয়েছে, গাইড, অনুসন্ধান-অফিস পর্য্যন্ত আছে। যাতে কোন দেশের অতিথিদের কোন রকম অসুবিধা ভোগ করতে না হয়।

বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর দর্শকদের জন্য বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন দেশের রোটারী ক্লাবের সদস্যরা থাকবেন মেলবোর্ণ রোটারী ক্লাবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের টুরিষ্ট অর্গানাইজেসন, জাহাজ, বিমান, পরিবহন-সংস্থা প্রভৃতির নিকট হইতে অলিম্পিক সিভিক-কমিটির নিকট প্রায় দুই লক্ষ আবেদন প্রেরিত হইয়াছে।

১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাস থেকে ষোড়শ অলিম্পিকের টিকিট বিক্রয় আরম্ভ হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে। অষ্ট্রেলিয়ায় আরম্ভ হয়েছে ১৬ই মে থেকে। ষোড়শ অলিম্পিকে আনুমানিক ·১৩ লক্ষ টিকিট বিক্রয় হবে বলে অলিম্পিক কর্তৃপক্ষরা মনে করেন।

মেলবোর্ণ ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামে প্রায় এক লক্ষ দশ হাজার দর্শকের স্থান সঙ্কুলান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। ইহার মধ্যে প্রায় ৬০ হাজার আসন রিজার্ভ। দূরাগত দর্শকদের জন্য ১৯৫৬ সালের জুন মাস পর্য্যন্ত খোলা ছিল।

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি বিমান-পরিবহন সংস্থা মেলবোর্ণের সংগে সরাসরি যোগাযোগের ব্যবস্থা করেছেন। উৎসাহী দর্শকরা যাতে দু'-তিন দিনের মধ্যে পৌঁছতে পারেন সেদিকে বিমান-পরিবহন কর্তৃপক্ষরা বিশেষ ভাবে নজর রেখেছেন। এবার অলিম্পিকে সবচেয়ে বেশী টিকিট কিনেছে নিউজীল্যাণ্ডের অধিবাসীরা। ২৪ হাজার। এবারের মত অলিম্পিক প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করলাম।

ফুটবল

জাতীয় ফুটবল প্রসঙ্গ :—ত্রিবান্দ্রামে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে হায়দ্রাবাদ রাজ্য ফুটবল দল। এ বিষয়ে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হায়দ্রাবাদ রাজ্য দল সর্বপ্রথম জাতীয় ফুটবল বিজয়ীর পুরস্কার "সন্তোষ ট্রফি" লাভ করলো।

জাতীয় ফুটবল অনুষ্ঠানের এবার ছিল ত্রয়োদশ পর্য্যায়। এর আগে ১২বার খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ১১বার বাংলা দল ফাইনালে উন্নীত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে এবং এই বার নিয়ে বাংলা দল ফ্যাইনালে উঠতে পারেনি। তার আগেই বিদায় গ্রহণ করেছে।

এবারের সন্তোষ ট্রফি-র খেলায় বাংলা দল যে ভাবে অগ্রসর হচ্ছিল তাতে অনেকেই আশা পোষণ করেছিলেন। প্রথম খেলায় মধ্য ভারতকে ৮-০ গোলে, দ্বিতীয় খেলায় রাজস্থানকে ১২-০ গোলে পরাজিত করে জাতীয় ফুটবলে গোলসংখ্যার একটি নূতন রেকর্ড করলো। কিন্তু সেমিফ্যাইনালে বাংলাকে মহীশূরের কাছে ১-০ গোলে পরাজিত হতে হ'ল।

বাংলা দলের যে শক্তি সে শক্তি নিয়ে মহীশূর দলের কাছে হার স্বীকার ক্রীড়ামোদী মাত্রেই মনঃপূত হয়নি। এই পরাজয়ের মূলে অনেকগুলি কারণ আছে : ফুটবল কর্তৃপক্ষদের দূরদর্শিতার অভাব। শুধু তাই নয়, পলিটিক্সের এক নূতন চাল। এবারে এক জন কোন নির্দ্দিষ্ট খেলোয়াড়ের উপর অধিনায়কত্ব দেওয়া হয় নি। মেওয়ালালকে হঠাৎ সেমি-ফ্যাইনালে কেন বসান হল, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এবারে জাতীয় ফুটবলে ১৮টি রাজ্য অংশগ্রহণ করেছিল। হায়দ্রাবাদ দল এবার বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

আন্তঃজেলা ফুটবল প্রসঙ্গ

চন্দননগরে অনুষ্ঠিত মজুমদার মেমোরিয়াল কাপ আন্তঃজেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার ফ্যাইনালে চন্দননগর জেলা দল বর্দ্ধমানকে ২—০ গোলে পরাজিত করে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে।

আন্তঃজেলা ফুটবল বেশী দিন আরম্ভ হয় নি। ১৯৪৭ সালে আই, এফ, এর তত্ত্বাবধানে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। বিখ্যাত ক্রীড়াবিদ্ দুঃখীরাম মজুমদারের স্মৃতিরক্ষার্থে আই, এফ-এর হাতে এরিয়ান ক্লাব একটি কাপ প্রদান করেন। ১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত আই, এফ-এ কর্তৃপক্ষ এই খেলা পরিচালনা করেন। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ জেলা স্পোর্টস এই ভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৬ সালে হাওড়া জেলার সম্পাদক কালী রায় বিজিতদের পুরস্কার হিসাবে তাপস মেমোরিয়াল কাপ প্রদান করেন। ইতিপূর্বে বিজিত দলকে কোন পুরস্কার দেওয়া হোত না। এবারের আন্তঃজেলা ফুটবল খেলায় চন্দননগরের খেলোয়াড়দের খেলা দেখে দর্শকরা সত্যি খুসী হয়েছেন।


ডালডা
আমার পক্ষে ভালো!
স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ডালডায় ভিটামিন রয়েছে
আমাদের সকলের শরীরের জন্য যে প্রয়োজনীয় শক্তিদায়ী তাজা স্নেহপদার্থের প্রয়োজন, ডালডা বনস্পতি তা যোগায়,—আর ডালডায় ভিটামিন 'এ' এবং ডি'ও আছে।
সব সময়েই নিরাপদ কারণ ইহা বিশুদ্ধ!
যে স্নেহ পদার্থ আপনি খান তা সম্পূর্ণ নিরাপদ হওয়া দরকার—রোগউৎপত্তিকর কোনরকম বীজাণু বা নোংরা জিনিষ তাতে থাকলে চলবেনা; উদ্ভিদজাত বিশুদ্ধ তাজা তেল থেকে ডালডা তৈরী হয় এবং বায়ুরোধক শীল করা টিনে প্যাক করা থাকে বলে ডালডা বনস্পতি সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ।
ডালডা মার্কা
বনস্পতি
দিয়ে রান্না করুন
সকলের সুবিধার জন্য ১/২ পাঃ, ১ পাঃ, ২ পাঃ, ৫ পাঃ, ও ১০ প্যাউণ্ড টিনে বিক্রয় হয়।
DALDA
ডালডা
শুধু রান্নার জন্যই ভালো নয়-পুষ্টিকরও বটে!

ক্রিকেট ও এম, সি, সি

ক্রিকেট খেলার সুরু যে কেমন করে হয়েছিল, তার জন্মরহস্য যে কি, তার সঠিক কোন ধারাবাহিক ইতিহাস খুঁজে পাওয়া যায়নি। যত দূর জানা যায়, ইংলণ্ডে ক্রিকেটের জন্ম। কেউ কেউ বলেন এই খেলাটি ফ্রান্সের 'কর্কেট' খেলা থেকে সৃষ্টি। স্ট্রাট নামে একজন বিশেষজ্ঞ এই খেলার সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে বলেছেন প্রাচীন কালে যে "ক্লাব বল" ছিল তাই থেকে এই খেলার সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোন নিয়মে "ক্লাব বল" খেলা হত তা জানা যায় নি। তবে ঐতিহাসিকদের মতে ১৩৪৪ সালেরও কিছু পূর্ব্বে ক্রিকেট খেলার সুরু।

১৪৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ এডওয়ার্ড যখন ইংলণ্ডের রাজা তখন তিনি ক্রিকেট খেলাকে আইন করে তুলে দিলেন। তার পর এই আইনের কঠোরতা কমে গেল। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দ থেকে আবার ক্রিকেট খেলার সুরু হয়। ১৬৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলার তেমন উন্নতি লক্ষ্য করা যায় নি।

ক্রিকেট খেলা যখন প্রথম সৃষ্টি হয় তখন কোন উইকেট পুঁতে খেলা হোত না। যেখানে খেলা হত সেখানে গোল করে গর্ত করে নেওয়া হোত। গোলের মধ্যে বল পড়ে গেলে খেলোয়াড় আউট হয়ে যেতো। তারপর দু'টি উইকেট দিয়ে খেলা হোত। সেটা আনুমানিক ১৭০০ খৃষ্টাব্দে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে তিনটি ষ্টাম্প পুঁতে খেলা আরম্ভ হয়।

প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক খেলা আরম্ভ হয় ১৭২৮ খৃঃ কেণ্ট এবং সারের বিরুদ্ধে। ১৭৪৪ খৃঃ লণ্ডন ক্রিকেট ক্লাব খেলার কিছু নূতন আইন প্রবর্তন করেন। ১৭৫৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ক্রিকেট খেলার যে ষ্টাম্পগুলি ব্যবহার হোত তার মাপ ছিল ২২″ × ৬″ ইঞ্চি। ১৮১৭ খৃঃ ২৭″ × ৮″ ইঞ্চি করে উইকেটে দুটো বেল লাগানোর নিয়ম চালু হয়।

ক্রিকেট খেলাকে জনসাধারণের নিকট প্রচার ও উৎসাহ উদ্দীপনার জন্য ইংলণ্ডের মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবের দান সর্ব্বাধিক। মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবই বর্তমানে সমস্ত পৃথিবীর ক্রিকেট খেলার নিয়ামক-সংস্থা। এই মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবের প্রথম নাম ছিল আর্টিলারী গ্রাউণ্ড ক্লাব। ১৭৮০ খৃঃ আর্টিলারী গ্রাউণ্ড ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হোল "হোয়াইট কনডুইট ক্রিকেট ক্লাব" এবং ১৭৮৭ খৃঃ থেকে এই নাম পরিবর্তন করে রাখা হোল মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব।

১৭৫৫ খৃঃ ক্রিকেট খেলার আইন পরিবর্তন করে নূতন আইন করা হয়। ১৭৮৮ খৃঃ মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাব ক্রিকেট খেলার নূতন আইন তৈরী করেন, সেই আইনেই বর্তমানে ক্রিকেট খেলা পরিচালিত হয়।

১৭৭৪ খৃঃ ক্রিকেট খেলার বলের ওজন ৫$\frac{১}{২}$ আউন্স থেকে ৫$\frac{৩}{৪}$ আউন্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হয়। এবং খেলার ব্যাট ৪$\frac{১}{৪}$″ ইঞ্চির বেশী চওড়া হবে না বলে স্থির হয়। ১৭৭৫ খৃঃ ক্রিকেট খেলার পিচ ২২ গজ লম্বা হবে বলে আইন তৈরী হয়।

ইংলণ্ড ক্রিকেট খেলার জনক। ইংলণ্ডের মাটিতে অষ্ট্রেলিয়া যখন ৭ রাণে ইংলণ্ডকে প্রথম পরাজিত করে, তখন ইংলণ্ডের স্পোর্টস্ টাইমসে কালো বর্ডার দিয়ে শোকবার্তা ছাপা হয়। তারপর লর্ড ডার্ণলের নেতৃত্বে ইংলণ্ড যখন লুপ্তগৌরব ফিরে পেল, তখন অষ্ট্রেলিয়ার মহিলারা যে ষ্টাম্প পুড়িয়ে একটি ছাইভর্তি পাত্র উপহার দেন লর্ড ডার্ণলেকে, সেই পাত্রটি মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবে সযত্নে রক্ষিত হয়ে হয়ে আছে। মেরিলীবোর্ণ ক্রিকেট ক্লাবের ইহা একটি অমূল্য সম্পদ।

এনক আর্ডেন

(লর্ড টেনিশন)

বালুলাঞ্ছিত বেলাভূমি পরে পীত উপল
ঢেউগুলি তাতে দিত যে দোল।
কিছু দূরে তার পথ চলে গেছে তার উপর
জেলেরা সবাই বেঁধেছে ঘর।
বসন্ত যবে ধরার বুকেতে আসে নামি,
হাসিয়া উঠিত বনভূমি।
রূপ তার হত অপরূপ যবে শিশুরা সব
বুকে করে যেত কাকলী রব।
এই অপরূপ তটখানি যে একশ' বছর আগে,
জেগেছিল তিনটি শিশুর হৃদয় রক্তরাগে।
এনি ছিল ছোট্ট মেয়ে পদ্মফুলের মত।
ফিলিপ-এনক দুই সাথীতে খেলত অবিরত।
এই জলধির বুকের মাঝে হারায় পিতা-মাতা
এনক একাই উঠল বেড়ে মূর্ত্ত সরলতা।
ফিলিপ ছিল বড়ঘরের একমাত্র ছেলে।
খেলত তারা তিন জনেতে মিলে।
বাড়ী-বাড়ী খেলত যখন কর্ত্রী হত এনি
এনক হত কর্ত্তা কোনও দিনই
মাঝে মাঝে ফিলিপ যখন চাইত তাহার পদ,
তখনই যে ঘটতো পরমাদ।
বলত এনক এনি আমার দেবো নাক তোরে,
ফিলিপেরি নীল চোখটি উঠত জলে ভরে।
সাথীর দুঃখে কাঁদত এনি বলত তখন তারে
দুই জনেতেই পাবে তোমরা মোরে।
ধীরে ধীরে বহু কাটিল বছর
নব জীবনের আতশুকর
তাহাদের মাঝে বাঁধি নিল ঘর
কৈশোর কেটে গেল।
সবে-ফুটে-ওঠা পূত দুটি মনে
একটি হৃদয় স্থাপিলা যতনে,

তিনটি হৃদয় কোন এক ক্ষণে
　　রিক্ত করিয়া দিল।
এনক তাহার মনের বারতা
ব্যক্ত করিয়া পেল সফলতা
ফিলিপ তাহার মনের কথাটি
　　রাখিল সঙ্গোপনে।

চিরন্তনী সে পুরনারী মন,
বীর এনকেরে করিল বরণ,
ফিলিপের তরে রেখেছিল এনি
　　স্নেহ-সুধারাশি মনে।

এনি জানিত না আপনার মন
কোন নবপথে আহরিছে ধন
চির পরিচিতে নূতন করিয়া
　　চিনিতে চাহেনি কেহ।

খেলার নেশায় শৈশব হতে
তিনটি হৃদয় ছিল যে গো মেতে
ভাবে নাই কেহ খেলাঘর ছেড়ে
　　বাঁধিতে হইবে গেহ।

ঋতুরাজ যবে গ্রাম বনানীতে খেলিবার তরে আসি
বনভূমিটির শ্যামল আননে ফুটায়ে তুলিল হাসি
প্রকৃতির সেই উৎসব দিনে নরনারী হল সাথী
বন-উৎসবে মাতিয়া তাহারা কাটাল দিবস-রাতি।
এমনি একটি গোধূলিবেলায় এনকের সাথে এনি
বনমাঝে বসি অজানা কি সুখে হারাল মুখের বাণী।
নয়নেতে জ্বলে চিরপবিত্র প্রেমহোমাগ্নি-শিখা,
তাহারই আলোকে পড়িল দু'জনে কি হিয়ায় লিখা,
ফিলিপ আসিল কিছু পরে (তার পিতার ব্যাধির তরে);
দেখিল তাহার সাথী দুই জন গাছতলে কিছু দূরে।
অপূর্ব সেই মিলনমূর্ত্তি পূর্ণ সুখের ছবি
তাহারই মাঝেতে পড়িল নিজের কঠিন ভাগ্যলিপি।
সারা জীবনের অতৃপ্ত আশা বুকের মাঝারে ভরি
সবার আড়ালে বেদনা বহিয়া সেথা হতে গেল সরি।
সে-ও জানিল না যার তরে প্রেমে পূর্ণ তাহার প্রাণ
সারা জীবনের সুখ নিঃশেষে কাহারে করেছে দান।
　　শুভ রবে জয় বার্ত্তা রটে
এনকের সাথে এনির মিলন স্বর্গের সুধাসাগর-তটে
উভয়ের প্রেমে সুখে ভরা দিন কাটলো সুখে
এল এক শিশু এনির বুকে।
সুখে ভরা সেই পাঁচটি বছর অমূল্য ধনে পূর্ণ করা
বর্ণনা তার বাক্যহারা।

সুখে ভরা সেই নীলাকাশ পরে কাল-ঝড় দিলো দেখা
নিঠুর প্রকৃতি সুষমার পরে আঁকিল গ্রহণ লিখা
একটি পায়ের সাথেতে এনক হারালে তাহার সব
সুখ উজ্জ্বল প্রিয়ার ও-মুখ শিশুদের কলরব
দুঃখ দৈন্য শতগুণ হয়ে এনকের বুকে বাজে
সুখী করিবারে আনিয়া এনিকে ফেলিল দুখের মাঝে।
　　অনেক দিনের পর
দুখের আকাশ দীর্ণ করে হাসলো রবির কর
কাজ পেয়েছে এনক এবার দিবে সুদূর দেশে পাড়ি
সুখের আলোয় ভাগ্য জিনে ফিরবে তাহার তরি
কুসুম সম কোমল এনি পাচ্ছে বড় ভয়
বোঝায় এনক ক'দিন শুধু ভয়ের কিছু নয়।
　　অশ্রুতে ভরা ক্লান্ত এনির মুখ
ছেড়ে তাদের যেতে দূরে শঙ্কাভরে পূর্ণ তাহার বুক।

*　*　*　*

মাসের পরে মাস চলে যায় দিনের পরে দিন
এনক আসার দিন চলে যায় আশা হল ক্ষীণ
দশটি বছর গেল কেটে ঝড় ঝাপটায় ভরি
কেমন করে তার মাঝেতে বাঁচবে জীবনতরী
ভগবানের কোলে দিয়ে রুগ্ন শিশুটিরে
চোখের জলে বুক ভাসিয়ে এনি এল ঘরে।
ফিলিপের সে ভালোবাসায় ভরা কোমল মন
দুঃখ দেখে প্রিয়তমার বিঁধছো অনুক্ষণ।
আজকে এল ভীরু পায়ে বহুদিনের পরে
এনির কাছে শঙ্কাভরে পরিচিত ঘরে
বললো তাকে, বন্ধু আমি তোমার তা তো মানো?
এনকেরও বন্ধু আমি তাও তো তুমি জানো
আজকে শুধু একটু দয়া চাইছি তোমার কাছে—
এনি বলে গরীব আমি দেবার কি আর আছে?
ধনী তোমায় দেবার মত, বুঝি না ত আমি।
উত্তরে তার বলে ফিলিপ, আমার কাছে তুমি
গ্রহণ কর টাকা কিছু ফিরলে এনক ঘরে
সবটাই সে ফিরিয়ে দেবে মোরে।
বললো এনি, দেবো টাকা সেটাই কি আর সব?
তার পিছনে তোমার দয়া করবো অনুভব।
মনে মনে ফিলিপ ভাবে যার অভাবে মোর
দৈন্যভরা দীর্ঘ জীবন ভোর
কৃতজ্ঞতার বাণীটুক এনির অজানিতে
দিলো ব্যথা নীরব হৃদয়টিতে।

　　এনকেরই ছোট ছোট ছেলে
স্বর্গ যেন পেত ফিরে ফিলিপকে যে পেলে
এনক ছিল তাদের কাছে সুদূর পথিক একা
ভোরের আলোয় বারেক যাদের দেখা!
ছোট্ট মনের ভালোবাসা উচ্ছ্বসিত যেটা
অজানিতে লুটে ফিলিপ জয় করলো সেটা॥

বসন্তের এক সাঁঝের বেলায় বনভোজনের যাত্রা শুরু
ফিলিপ যেন তাতে আসে বলে গেলো তারা

যেতে যেতে ক্লান্ত এনি পথে রইল বসে
ফিলিপ স্যাথে বসলো এনির পাশে।
সেই গাছেরই তলে
যার স্মৃতি আজ দু'জনকারই মনের মাঝে জ্বলে।
মিথ্যা আশায় ক্লান্ত এনির মুখ
দেখে ব্যাথায় পূর্ণ হল ফিলিপেরই বুক
বললো, গেলো দশটি বছর আসবে কি সে আর
এই শিশুদের করলে অনাথ বাড়বে কি সুখ তার ?
ব্যথায় ভরা নীরবতার ক্ষণ
শেষ ও চলা যাতে সমান বিড়ম্বনার ধন
বিদায়-বেলায় বললো তারে এত দিনের সঞ্চিত সেই কথা
নীরব হিয়ার গুঞ্জরিত ব্যথা।
সুখের আলোয় পূর্ণ যখন ছিল এনির মন
ফিলিপ তারে পূজতো অনুক্ষণ
একটি মানুষ রিক্ত ব্যাথায় ভরা হৃদয় লয়ে
সেই কথা আজ বারে বারে আনছিল মন বয়ে
সরিয়ে দেওয়া সহজ সে তো নয়
কিন্তু এনক ব্যাপ্ত হয়ে আছে হৃদয়ময়।
কাটলো কিছু দিন
কালো মেঘে ভরা আকাশ আশায় আলোহীন
যে কথায় আছে সারা মন ভরে
বাহির হইতে চায় বারে বারে
অভিমান আর কত দিন তারে
ধরিয়া রাখিতে পারে ?
এনির হতাশা তারে বাধা দেয়
আবরিয়া রাখে যা বলিতে চায়
এমনি করিয়া দিন চলে যায়
দুর্ব্বল করে তারে
এনি বলে তারে, আর ক'টা দিন
দয়া ক'রে দাও জানি আশাহীন
বলেছে ফিলিপ, প্রতীক্ষা মোর
শাশ্বত কালের তরে ;
আমি বাঁধা রব চিরকাল তরে
তুমি নহ বাঁধা শুধু বলো মোরে
আসিলে সময় যুগ-যুগান্তে
আসিবে আমার ঘরে।
নেই জোর যার সে চাওয়ার মাঝে
তার চেয়ে জোর আর কার আছে
মূক আবেদনে ছেয়ে গেছে মন
দাবী তার কম নয়,
ছোট শিশুদের মুখপানে চেয়ে
মনের দ্বন্দ্ব মনে চাকা দিয়ে
হৃদয়ে অশ্রু মুখে হাসি নিয়ে
করিল সে পরিণয়।
এনকের কথা আগের চেয়েও বেশী করে পড়ে মনে
করে নাড়াচাড়া নীরবে নিভৃতে গোপনে সঙ্গোপনে

কেটে যায় দিন এল এক শিশু দেবের আশীষ সম
দুটি কচি বাহু দিয়া সে বাঁধন তার শোভা অনুপম
সে অমিয়া লভি এনির দহনে ঝরিল শান্তিজল
সে কলকণ্ঠে ডুবিল দোঁহার অতীতের হলাহল।

* * * *

ভাগ্যের ক্রুর অট্টহাস্য নামে এনকের পরে
মৃত্যুর চেয়ে কঠোর শাস্তি রহিল তাহার তরে
ঝঞ্ঝায় যবে মরণের কোলে সঙ্গীরা চলে যায়
একটি দ্বীপেতে দশটি বছর কাটালো এনক হায়!
তার পরে বহু ক্লেশে
ফিরিল এনক বহু দিন পরে তার চিরপ্রিয় দেশে
দেশে গিয়ে আগে রুদ্ধ নিশ্বাসে ছুটিল নিজের ঘরে
কেহ নাই তায় হতাশ বাতাস হাহাকার করে মরে
কাছে এক জন বৃদ্ধার ঘরে এনক উঠিল গিয়া
চিনিল না কেহ বেদনা-দৈন্য গেছে দেহে ছাপ দিয়া
ভাঙ্গা মন লয়ে চলে না শরীর হতাশায় বেদনাতে
শুনিল এনির সকল খবর বৃদ্ধার কাছ হতে।
বেঁচে আছে তার তরে আনন্দ, হারানর তরে ব্যথা
বেদনানন্দে খেলে আলো-ছায়া সে কী বোঝাবার কথা ?
জানতো এনক জানালে এনিকে ফিরে পাবে নিশ্চয়
কিন্তু তাহারে দারিদ্রে টেনে আনিতে কি প্রাণ চায় ?
সে যে প্রিয় তার প্রিয়ারে ছাড়িবে প্রিয়ারই সুখের তরে
নিজের জীবন উপাড়িয়া দিবে হাসিমুখে অকাতরে।
প্রাণ শুধু আজ চায়
বারেকের তরে তার সুখ হেরি করে নিতে সঞ্চয়।
দীর্ঘ দৈন্য পূর্ণ হতাশা সহ্য করার তরে
তারি তরে আজ চলিল এনক এনি-ফিলিপের ঘরে।
বাগানের কাছে আড়লে দাঁড়ায়ে নিলো দেখি প্রাণ ভরি
এনি ও ফিলিপ লয়ে শিশুগণে পূর্ণ সুখের তরী
হৃদয়ের ধন ফেলি
ব্যথা ভরা মনে সবার আড়ালে এনক আসিল চলি।
মরণের তরে হৃদয় উজাড়ি করিলো সে আহ্বান
নিঠুর ভাগ্য এত দিন পরে করিলো দৃষ্টিদান
মৃত্যু নিকট প্রায়
দিলো সেই দিন বৃদ্ধার কাছে আপনার পরিচয়
বলিলো তাহারে, শেষ সাধ মোর, মোর মরণের পর
দেখায়ো আমার আত্মজগণে এই দেহখানি মোর
এনিকে ডেকো না আঘাত পাবে সে কুসুম-কোমল মনে
বোলো শুধু তারে আজো ভালোবাসি যেমন বিয়ের দিনে
ছিল সে যখন মোর একান্ত ঠিক সেদিনেরই মত
হিয়া মোর আজো ক্লান্তি বিহীন তাহারই পূজায় রত
ফিলিপেরে দিও অন্তর ভরা প্রীতি ও আশীর্ব্বাণী
প্রিয়ারে আমার করেছে সে সুখী তাই তার কাছে ঋণী
হারালো মুখের ভাষা
তৃপ্ত হৃদয়ে বুকে নিলো টেনে মেহার্ত পূর্ণাশা।

অনুবাদিকা—শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়।



কেনা কাটা

বনস্পতি-শিল্প ও ভারত

এ যুগে বনস্পতি বলতে শোধিত উদ্ভিদজাত তেল (ভেজিটেবল্ অয়েল) বা উদ্ভিজ্জ খাদ্যোপাদানকেই বুঝায়। বাজারে অবশ্যি যে-সব বনস্পতি দেখতে পাওয়া যায়, সাধারণ লোকের কাছে সেগুলো একরূপ উদ্ভিজ্জ 'ঘি' বলেই চালু। কি করে এইটি এদেশে হাজির হলো—কি কি উপাদানে কি ভাবে এর সৃষ্টি, নিশ্চয়ই জানবার বিষয়। সত্যি, আজ ঘরে-ঘরে এসে বনস্পতি এমন ভাবে ঢুকেছে, যার জন্যে এতৎ সম্পর্কে পর্য্যালোচনা আরও বিশেষ ভাবে হওয়া দরকার।

শরীর-বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, আমাদের দৈহিক বল ও পুষ্টির জন্যে শুধু চাল, গম, ডাল—এ কয়টি হলেই হয় না, আরও কতকগুলো অপরিহার্য্য উপাদান চাই। অপর দিকে এ খাদ্যোপাদানগুলো সমন্বয়যুক্ত হতে হবে এবং সুষম বা সমন্বয়যুক্ত খাদ্য-তালিকারই অন্তর্ভুক্ত একটি হচ্ছে স্নেহপদার্থ। বনস্পতি এমনি একটি খাদ্য বলে দাবী করা হয়, যাতে নাকি যথেষ্ট শক্তিদায়ী তাজা স্নেহপদার্থ রয়েছে।

আমাদের এই দেশে বনস্পতির আবির্ভাব হয়েছে, সে আর কত বৎসর? লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্যেই হোক্, কি অন্য যে কোন কারণেই হোক্—দেশে ক্রমশঃ অভাব দেখা দিতে লাগলো তেল, ঘি, মাখন ইত্যাদি স্নেহ পদার্থের। বনস্পতি এই সুযোগেই মনে হয় নিজের বৈশিষ্ট্যের দাবী নিয়ে হাজির হলো বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় এই ভারতেও। প্রথমে বিদেশ থেকেই এইটি আমদানী হতে থাকে এখানে, কিন্তু এখন বহু দেশীয় কোম্পানী একে নিয়ে আরম্ভ করেছেন কাজ-কারবার। ফলতঃ এক্ষণে বনস্পতি ভারতের একটি মস্ত বড় শিল্পে পরিণত হয়েছে—এর পেছনে নিয়োজিত রয়েছে প্রচুর মূলধন ও উদ্যম।

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খাদ্যোপযোগী যে কোন তেল থেকেই তৈরী হতে পারে বনস্পতি। কিন্তু সাধারণতঃ এইটি তৈরী হয় অপরাপর দেশের ন্যায় এই দেশেও বাদাম-তেল থেকে। বাদাম তেল পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় এবং মূল্যও অপেক্ষাকৃত কম—সেইজন্য বনস্পতি উৎপাদনের জন্যে বিশেষ ভাবে বেছে নেওয়া হয়েছে এইটিকেই। বাদাম-তেল ছাড়াও তিল-তেল ও তুলার বীজের তেল ব্যবহার করতে দেওয়া হয় বনস্পতি উৎপাদনে। বিশেষ করে ভারতে তৈরী বনস্পতিতে রিফাইন করা (শোধিত) তিল-তেল থাকতেই হবে শতকরা পাঁচ ভাগ।

বনস্পতি উৎপাদন ব্যাপারে কয়েকটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এর ভিতর প্রথমেই বলতে পারা যায়, যে-তেল দিয়ে বনস্পতি হবে—সেটাকে রিফাইন বা শোধিত করে নিতে হয় ভাল রকম। তারপর তেলের জলীয় অংশটি নিষ্কাশন করে নিতে হয় অর্থাৎ জমিয়ে নিতে হয় তেলটাকে রাসায়নিক ব্যবস্থায়। এইটি হয়ে গেলে গ্যাস বা বাষ্প প্রয়োগের মাধ্যমে তেলের স্বাভাবিক গন্ধটা দূরীভূত করা হয় এবং এর পরই ওতে সংযুক্ত করতে হয় আবশ্যক ভিটামিন (প্রধানতঃ ভিটামিন 'এ' এবং ক্ষেত্রবিশেষে ভিটামিন 'এ' ও 'ডি' দু'টিই)। এই কাজটি যখন হয়ে গেলো, তখন হিম-প্রয়োগে তেলটাকে দানাবদ্ধ-করণের ব্যবস্থা হয়—যেমন দানা-দানা থাকে ঘিয়-এর ভিতর।

অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর বনস্পতি সর্ব্বপ্রথম আমদানী হয় ভারতে। অব্যাহত প্রচারকার্য্যের ফলে কয়েক বছর মধ্যেই এর জনপ্রিয়তা কিছুটা বেড়ে যায়। ১৯৩০ সালে তাই বাইরের আমদানী সত্ত্বেও ভারতে স্থাপিত হলো প্রথম বনস্পতি কারখানা। ক্রমে দেশীয় বনস্পতির চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলে এবং দেশী কোম্পানীগুলোর পক্ষে সে চাহিদা মেটানও কঠিন হল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে বনস্পতির চাহিদা ও উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় আশাতীতরূপে। তখন বনস্পতির জন্য, সৈন্যবাহিনীগুলোর বিরাট বিরাট অর্ডার আসতে থাকে এবং ঘি, ইত্যাদির মূল্য এরূপ মাত্রায় চড়ে যায় যে, জনসাধারণের একটি বিরাট অংশ বনস্পতি দিয়েই তাদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে ব্যস্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে চাহিদার সঙ্গে সঙ্গে বনস্পতি উৎপাদনও বৃদ্ধি পায় শতকরা ৫০ ভাগ—১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল—যুদ্ধকালীন এ ক'টি বৎসরেই।

খাদ্যোপাদান হিসাবে বনস্পতি আজ বাজার ছেয়ে ফেলেছে, এ চোখেই দেখতে পাওয়া যায়। এর সঠিক গুণাগুণ সম্পর্কে লোকের মনে যদিও প্রশ্নের অবসান হয় নি, এইটিকে যেন বাদ দিয়ে এদিনে চলছে না। যেমন করেই হোক—প্রতিটি গৃহে, প্রতিটি পরিবারে বনস্পতি বহু দিনই অনুপ্রবেশ করেছে। মিষ্টান্ন বা খাবারের দোকানগুলোতেই বনস্পতির ব্যবহার সব চেয়ে বেশী। সর্ব্বোপরি উৎসব-অনুষ্ঠানাদিতেও দেখা যায়—দু' দশ জন লোক খাওয়াতে হলেই সেখানে সকলের আগে ডাক পড়েছে কোন না কোন মার্কা বনস্পতির।

ভারতে বনস্পতি-শিল্পের অগ্রগতি যে অব্যাহত গতিতে হয়ে চলেছে, উৎপাদনের হিসাবের তালিকা পর্য্যালোচনা করলেও তা পরিদৃষ্ট হয়। ১৯৩০ সালে যেখানে মাত্র ২৯৮ টন বনস্পতি তৈরী হ'ল, সেখানে এই পরিমাণ বেড়ে ১৯৩৯ সালে অর্থাৎ যুদ্ধ আরম্ভের বছরে হয়ে যায় ৫২ হাজার ৩১ টন। এই ভাবে ভারতে বনস্পতির উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৪৬ সালে ১ লক্ষ

৪২ হাজার ৮৩৬ টন হয়ে দাঁড়ায়। তবে ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ স্বাধীনতার বৎসরে ৪৫ হাজার টনের মতো বনস্পতি উৎপাদন হ্রাস পেয়ে যায়, অবশ্য ঘটনাচক্রে। তার পর আবার ১৯৪৮ সালের হিসাবেই দেখা যায়, উৎপাদন বেড়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ ২৭ হাজার ৬৬৪ টন। গত বৎসর দেশীয় প্রচেষ্টাতেই উৎপাদন সম্ভব হয়েছে ২ লক্ষ ৬০ হাজার ৩৩০ টন বনস্পতি।

ভারতে ও ভারতের বাইরে আজকের দিনে বনস্পতি ব্যবহার মাথা-পিছু কি পরিমাণ চলেছে, আর ঘি-মাখনই বা কতটা, এরও একটি হিসাব জানতে পারা যায়। ভারতের কথাই প্রথম যদি বলি —এখানে গড়পড়তা মাথা-পিছু বনস্পতি ব্যবহার দেখানো হয়েছে ১·৬ পাউণ্ড, আর মাখন-ঘি ২·৪ পাউণ্ড। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, কানাডা প্রভৃতি দেশে এই তুলনায় বনস্পতির ব্যবহার অনেক বেশী। উক্ত তিনটি রাষ্ট্রে বনস্পতি ব্যবহার করা হচ্ছে মাথা-পিছু যথাক্রমে ১৮·৪, ২৬·৯ ও ১৬·৫ পাউণ্ড এবং মাখন-ঘি ৮·৭, ১৩·১ ও ২০·৯ পাউণ্ড। বনস্পতির ব্যবহার বোধ হয় সবচেয়ে বেশী হল্যাণ্ড আর ডেনমার্কে। এই দেশ দু'টোতে মাথাপিছু মাখন-ঘি যেখানে ব্যবহৃত হচ্ছে ৬·২ ও ১৮·৫ পাউণ্ড সে-ক্ষেত্রে বনস্পতির ব্যবহার ৪০·৮ ও ৪০·১ পাউণ্ড বলে জানা যায়।

বনস্পতি-শিল্পকে কেন্দ্র করে প্রায় ৫০টি কারখানা এখন কর্ম্মব্যস্ত আছে ভারতেই। এই কারখানাগুলোর বার্ষিক মোট উৎপাদনের ক্ষমতা ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন বলে দাবী করা হয়। বনস্পতির উপর সরকারী দৃষ্টি যেটুকু আছে, তা পর্য্যাপ্ত কি-না, প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে সরকার-নির্দ্দিষ্ট উন্নত মান অনুসারেই এইটি তৈরী করবার কথা। এতে যে তিল-তেল মেশাবার নির্দ্দেশ সরকারের রয়েছে, উদ্দেশ্য— অন্য কোন খাদ্যোপাদানের সঙ্গে বনস্পতি ভেজাল দেওয়া যদি হ'ল, তিল-তেল থাকায় ধরে ফেলা যাবে। সরকারী নিয়ন্ত্রণ অনুসারেই এই উদ্ভিজ্জ খাদ্যোপাদানটি আবশ্যক ভিটামিন সংযুক্ত করারও ব্যবস্থা হয়েছে কিছুকাল যাবৎ। এই সব সত্ত্বেও সরকার যদি বিভিন্ন মার্কা বনস্পতির নিরাপদ ব্যবহার বিষয়ে খোলাখুলি ঘোষণা ও প্রচারকার্য্য করতেন, তা হ'লে অল্প আয়-সম্পন্ন দেশবাসীর প্রভূত উপকার হতো বলেই বিশ্বাস।

অল্প খরচায় ব্যবসা—কুটিরশিল্প

গলিতে, বারান্দায়, বাড়ীর উঠানে কিংবা একটু ফাঁকা জায়গায় খেলা চলে ব্যাডমিণ্টন। দরকার দুটি কিংবা চারটি ব্যাট বা র‍্যাকেট আর একটি বল বা সাটেল কক, আর একটা জালেরও দরকার হয়। আলোর ব্যবস্থা থাকলে রাত্রেও এ-খেলা চলে মাঠে, বড় হলঘরের মধ্যে বা ছাদে।

কয়েক বৎসরের মধ্যে কি ভাবে এ খেলার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে আমাদের দেশে সেটা জানা যায় শীতকালে প্রত্যেক পাড়ায় পাড়ায় ৪।৫ বৎসরের ছেলেমেয়ে থেকে ২৫।৩০ বৎসরের যুবকের হাতে র‍্যাকেটের ছড়াছড়ি দেখলে। আর মরসুমে আন্তর্জ্জাতিক খেলোয়াড়দের আনাগোণা এবং বড় বড় প্রতিযোগিতায় দর্শকদের প্রাচুর্য্য দেখলে সহজেই অনুমান করা যায়, দিন দিন এই খেলার জনপ্রিয়তা কি ভাবে বাড়ছে।

মরসুমে এই খেলার বিভিন্ন সরঞ্জামের চাহিদার উপর নজর রাখলে এটুকু বোঝা যায় যে, কুটীরশিল্প হিসাবে এই সব জিনিষ তৈরী করলে এর প্রচুর কাটতি সম্ভব।

প্রথম জিনিষটি অর্থাৎ সাটেল কক্ তলার দিকে একটুকরো গোলাকার কর্ক লাগান। এর ব্যাস ১ ইঞ্চি, লম্বাও ১ ইঞ্চি। এর গা-টা এক খণ্ড ভেড়ার চামড়া দিয়ে ঢাকা এবং চামড়াটা আঠা দিয়ে বেশ করে ওর সাথে আটকান। তারপর দামী স্যাটল কক হলে এই কর্কের উপরটা এক টুকরো সাদা কিংবা লাল কাপড় দিয়ে আটকান। কর্কের উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র করে পালকগুলি সাইজ করে কেটে ঐ ছিদ্রের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। ভাল দামী সাটলে কক্ হলে ১৫।১৬টি সাদা হাঁসের পালক থাকে আর কম দামের হলে সংখ্যায় পালক কম ত হবেই আর সাদা কাল পালক হলেও ক্ষতি নেই। আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, বলের পালকগুলি লম্বায় হবে ২৷ ইঞ্চি আর পালকের উপরিভাগের ব্যাসটাও হবে ২৷ ইঞ্চি আর ওর ওজনটা হবে ৭৩ থেকে ৮৫ গ্রেণ। এটা ম্যাচ বলের মাপ। তার পর কর্ক ও পালকের সংযোগস্থলে একটা রঙ্গিন ফিতা আটকান থাকে এবং তার একটু উপরে একটা মোটা সুতা পালকগুলিকে পেঁচিয়ে থাকে। কিন্তু এত সহজ মনে হলেও তৈরী করবার কৌশলটা রপ্ত থাকা চাই। অন্যথা এর দাম বেশী পড়ে যাবে আর দেখতেও সুদৃশ্য হবে না। প্রথমতঃ কর্কগুলি ঐ সাইজমত বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, দাম ৬৲ টাকা থেকে ৮৲ টাকা গ্রোস। শিল্পীর প্রথম কাজটি কর্কের উপর পালক বসাবার ছিদ্র করা। ওটা সরকালী কি ছোট Borer দিয়েও করা চলে কিন্তু তাতে সময় বেশী পড়ে যাবে এবং ঠিকমত হবে না আর পালকগুলি বসাবার সময় লাইন ঠিক থাকবে না। এর জন্য বৈদ্যুতিক যন্ত্র আছে। ওর সাহায্যে অতি অল্প শ্রমে ঘণ্টায় প্রায় হাজারটা ছিদ্র করে নেওয়া যায়। খরচটাও পড়বে কম এবং জিনিসগুলিও হবে নিখুঁত। যন্ত্রটার দাম ১৫০৲ টাকা— ২০০৲ টাকার মধ্যে পড়ে এবং ২।৩ দিন চেষ্টা করলে একজন শিল্পী এতে কাজ করতে পারেন। তার পর কর্কের গায়ে ভেড়ার চামড়া এঁটে দেওয়া—এই চামড়াটা কানপুর থেকে ট্যান হয়ে আসে এবং বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীটে পাওয়া যায়। দামটা ছোট-বড় টুকরো হিসাবে ৩৲ টাকা থেকে ৬৲ টাকা। কাঠের ছাঁচ আছে যাতে ঠিক কর্কের মাপ মত ঐরূপ ছিদ্র করা থাকে। চামড়ার টুকরাটি ঐ ছিদ্রের উপর রেখে একটা লৌহদণ্ড (যার শেষটা ঠিক কর্কের মত গোলাকার) দিয়ে ঐ গর্তের মধ্যে চাপ দিলে ঠিক সাইজ মত চামড়াটি হয়ে গেল। উপরটা অসমান থাকলে কাঁচি দিয়ে কেটে গঁদের বা জিলেটিন আটা দিয়ে কর্কের গায়ে আটকিয়ে দিলে কর্কের প্রাথমিক কাজটা শেষ হল। পালকগুলিকে মাপ মত অর্থাৎ ২½" ইঞ্চি চাই উপরে আর প্রায় ½" ইঞ্চি থাকবে কর্কের ভিতরে, এই ভাবে কাটতে হবে। শিল্পীর হাত ঠিক হলে বিড়ির পাতা কাটার মত অতি দ্রুত এই পালক কাটা হয়ে থাকে। পালকগুলি ছিদ্রের মধ্যে পোরার সঙ্গে সুনিপুণ হাত চাই। একটা পালকের সাথে আর একটির মিল থাকা চাই। রঙটি ঠিক আছে কিনা, সরু পালকের সাথে মোটা পালক খাপ খাবে কিনা এসব দিকে প্রখর দৃষ্টি রাখতে হবে। এর উপরই কর্কের দাম নির্ভর করবে। তারপর জিলেটিন আটা দিয়ে পালকগুলি কর্কের মধ্যে আটকান এবং পাশে সূতা দিয়ে আটকালেই কর্কের কাজটি শেষ হল।

পালকগুলি হাঁস এবং মুরগীর। অন্য কোন পালকে এটা ভাল হয় না। কলিকাতার নিউ মার্কেটে এগুলি পাওয়া যায়। দাম :—

কাল মুরগীর পালক হাজার	।৵০—৸০
কাল হাঁসের " "	১৲—১।০
সাদা মুরগী " "	৩৲—৪৲
সাদা হাঁস " "	৮৲—১৪৲

হাঁস মুরগীর পালকের কথা আমরা চিন্তা করে দেখি না কিন্তু এর দাম কত দেখুন! জিলোটিন আঠা, শিরিষ, সুতো কলকাতার বড়বাজারে কিনলে একটু সস্তায় পাওয়া যায়। কর্কগুলি আসে পর্তুগাল থেকে এবং পাওয়া যায় রাধাবাজারে। পর্তুগালের সাথে আমাদের মন কষাকষি চলছে, তার জন্য কর্কের দাম একটু বেড়ে গেছে।

দুটি মেয়ে এক দিনে ৮ ঘণ্টা কাজ করলে ৫০টি দামী বল অনায়াসে তৈরী করতে পারেন, যদি ছিদ্র করা কর্ক হাতে থাকে। দামী ম্যাচবলের দাম প্রায় ১।৵০, সমস্ত জিনিষের মূল্যতালিকা থেকে এর লাভ-লোকসানটা একবার খতিয়ে দেখুন। অবসর সময়ে গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাও এ কাজটা সহজেই করে কিছুটা অর্থোপার্জন করতে পারেন। সরকারী খেলনা শিল্প বিভাগ আপনাকে এ কাজটা হাতে-কলমে শিখিয়ে দিতে পারেন আর তৈরী মাল মোটেই পড়ে থাকে না। খেলার জিনিসপত্র বিক্রেতারা পূর্বে বায়না দিয়েও এগুলি সংগ্রহ করে থাকেন।

তারপর জিনিসটা র‍্যাকেট। ওর ফ্রেমটি তৈরী হয়ে আসে মীরাট ও জলন্ধর থেকে। কাঠটা তুঁত গাছের, যে তুঁত গাছ আমাদের রেশমশিল্পের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আর আঁতটা যেটা গরু-মোষের শিরা বলে পরিচিত ওটাও আসে ঐ দেশ থেকে। বুননীটা হয় এখানে। মজুরী নেওয়া হয় ১৲ প্রতি র‍্যাকেটে।

আমার শেষ কথা, কাঁচামালের জন্য অন্য দেশের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কর্ক গাছের চাষ করতে হবে আমাদের এখানে এবং পশ্চিম বাংলার কৃষিবিদ্‌দের এদিকে নজর দেওয়া অবশ্য কর্তব্য। আর তুঁত গাছ যখন আমাদের দেশে হয়, তখন ফ্রেমটাও এখানেও তৈরী করা সম্ভব।

—দীপিকা সরকার

টুকিটাকি

১৯৫৫-৫৬ সালে সুয়েজের পথে ভারতে পণ্যদ্রব্য আমদানী হইয়াছে প্রায় ৪৬২ কোটি টাকার এবং ভারত হইতে রপ্তানি হইয়াছে ৩১৩ কোটি টাকার। * * ঔষধপত্র অনুষঙ্গ শিল্প সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ভারত সরকার সরকারী ও বেসরকারী ব্যক্তিগণকে লইয়া গঠিত একটি দলকে সোভিয়েট রাশিয়ায় পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই দলটি ইতালী পূর্ব ও পশ্চিম জার্মাণী এবং সুইজারল্যাণ্ডও পরিভ্রমণ করিলেন। * * ভারতে যন্ত্রপাতির চাহিদা পরিমাপ করিতে এবং জাপান হইতে তাহা সরবরাহ করিবার সম্ভাবনা সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য ১৭ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি জাপানী শিল্প ও মেসিনারী মিশন ভারতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছেন। শীঘ্রই এক জাহাজ-ভর্তি জাপানী যন্ত্রপাতি ভারতে আসিয়া পৌঁছাইবে * * ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স কর্পোরেশন ১৯৫৫ সালের ১লা এপ্রিল হইতে চলতি বৎসরের ২৭শে আগষ্টের মধ্যে বেসরকারী উদ্যোগসমূহকে ৬ কোটি ৯১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ঋণ দান অনুমোদন করিয়াছেন। ইহার মধ্যে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৯৮ হাজার ৫২১ টাকা ইতিমধ্যেই বিলি করা হইয়াছে। * * পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক গঠিত ষ্টাডি গ্রুপ কর্তৃক সংগৃহীত হিসাব মতে ১৯৫৫ সালের শেষে ভারতে আনুমানিক ৫,৫০,০০০ জন শিক্ষিত বেকার ছিল। ইহার মধ্যে গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ১,২৬,০০০ আণ্ডার গ্র্যাজুয়েটের সংখ্যা ৫১০০০ জন, বাকী সব ম্যাট্রিকুলেট। * * বেসরকারী উদ্যোগে মালবাহী গাড়ী নির্মাণের জন্য ইতিপূর্বে যে তিনটি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছিল তাহা ছাড়া আরও চারটি প্রতিষ্ঠানকে নূতন লাইসেন্স মঞ্জুর করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। এই কারখানা চারিটি মাদ্রাজ, ভরতপুর, কানপুর ও বেরিলীতে স্থাপিত হইবে। প্রতিটি কারখানায় বৎসরে এক হাজার ওয়াগন নির্মিত হইবে। আশা করা যায়, পরবর্তী তিন বৎসরে এই উৎপাদনের পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাইবে। * * গোয়ালিয়রে সম্প্রতি হেভী ইলেকট্রিকালস (প্রাইভেট) লিমিটেড নামে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী রেজেষ্ট্রী বদ্ধ হইয়াছে। ইহার মালিক সম্পূর্ণভাবে ভারত সরকার। এই কোম্পানীটি সরকারের হেভী ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেণ্ট পরিকল্পনার নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার ভার গ্রহণ করিবে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৩০ কোটি টাকা। এই কারখানাটি ভূপালে স্থাপিত হইবে। * * প্রতি বৎসর আনুমানিক, ১৫ কোটি টাকার ঔষধপত্র ১৫ কোটি টাকার রঙ ও ২০ কোটি টাকার রসায়ন বিদেশ হইতে ভারতে আমদানী করা হয়। * * ভারত সরকার বৎসরে ৫০ টন চশমার কাচ উৎপাদনক্ষম একটি কারখানা স্থাপনের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

ছোটদের আসর



ছাত্রজীবন

সন্ধ্যা বসাক

ছাত্রগণই দেশের ভবিষ্যৎ। আজ যাহারা ছাত্র কাল তাহারাই হইবে দেশের কর্ণধার। সমাজের এবং সংসারের গুরুদায়িত্ব তাহাদের উপরই অর্পিত হইবে। তাহাদের উপরই সমাজের কল্যাণ এবং দেশের উন্নতি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং ছাত্রদিগের শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। আর এই শিক্ষালাভ করিবার যথাযথ সময়ই হইল 'ছাত্রজীবন'।

প্রাচীন ভারতে অধ্যয়নই ছিল তপস্যা। ভোগবিলাস বর্জ্জিত পুণ্য তপোবনে ছাত্রগণের ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইত। প্রাচীন ভারতের আর্য্য ঋষিগণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, ভোগবিলাস অধ্যয়নের পরিপন্থী। সেই জন্য তাঁহারা ছাত্রদিগকে ভোগবিলাস হইতে বিরত থাকিয়া আত্মসংযম পূর্ব্বক অধ্যয়নে রত থাকিবার জন্য উপদেশ দিতেন। প্রাচীন ভারতের ছাত্রদিগের এই কঠোর সাধনা তাহাদের চরিত্র গঠনের সহায়ক ছিল এবং ইহা তাহাদিগকে ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী পরিপূর্ণ মানব ও গৃহী করিয়া তুলিত।

প্রাচীন কালে নগরের কোলাহল হইতে দূরে আশ্রমের শান্ত পরিবেশে ও তপশ্চর্য্যার অনুকূল যে শিক্ষার নিকেতনগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের আদর্শ ছিল ভিন্ন। কালের প্রবল বন্যায় অন্যান্য প্রাচীন আদর্শের মত ছাত্রজীবনের সেই পুরাতন আদর্শও আজ অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য এবং আদর্শ এখন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে শুধু জ্ঞানের জন্যই জ্ঞান অর্জ্জন করা হইত। জ্ঞানার্জ্জনের কোন পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে জীবনের ধারা নানা জটিলতায় ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। আজকাল অর্থ উপার্জ্জনই জ্ঞানার্জ্জনের উদ্দেশ্য হওয়াতে পরীক্ষায় পাশ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য হইয়াছে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, শিক্ষক এবং অভিভাবক উভয়েই পরীক্ষায় পাশ করার উপরই গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। ছাত্রগণের চরিত্রের গঠন হইতেছে কি না সে বিষয়ে উভয়েই উদাসীন। প্রাচীন কালের জ্ঞানার্জ্জনের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে :

"কোথায় মুক্ত গগনতলে গুরুকে ঘিরিয়া শিষ্যগণের উদাত্ত কণ্ঠে বেদপাঠ। আর কোথায় জনাকীর্ণ নগরীর ধূলিমলিন ক্ষুদ্র কক্ষে ভগ্নস্বাস্থ্য রুক্ষকেশ যুবকের পরীক্ষা পাশের জন্য নিশি জাগরণ!"

শিক্ষাব্রতী ছাত্রগণের দায়িত্বও প্রচুর। তাঁহারাই দেশের আশা ও ভরসার কেন্দ্রস্থল। ছাত্রেরা যে পড়াশুনা ছাড়াও সমাজের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য সর্ব্বদা আপ্রাণ চেষ্টা করিবে, অর্থাৎ সমাজসেবায় নিয়োজিত থাকিবে, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। আবার ছাত্রদের মধ্যেই রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ এবং উন্মাদনা দেখা যায়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস পাঠ করিলেও দেখা যায় যে ; এই ছাত্রসমাজই এক দিন বিদেশী শোষকদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিল। ফাঁসীর মঞ্চে ছাত্রগণই জীবনের জয়গান গাহিয়া গিয়াছে। সুতরাং যদিও আজ ভারতবর্ষ স্বাধীন, কিন্তু তবুও বর্ত্তমান কালের ছাত্রদিগকে পূর্ব্বগতদের আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া পথ চলিতে হইবে। বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণকে রাজনীতি সম্বন্ধে সজাগ থাকিতে হইবে। তাহা হইলে পরিণত বয়সে রাষ্ট্র চালনার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া তাহারা সমাজসেবার আদর্শ ও স্বপ্নকে সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে। তবে ছাত্রগণকে ভুলিয়া যাইলে চলিবে না যে, জীবনের এই স্বল্প অংশ ছাত্রজীবনকে ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হয়। সুতরাং ইহাই হইল ভবিষ্যৎ জীবনের বীজ বপনের সময়। যেমন বীজ বপন করিবে, তেমন ফল লাভ করিবে।

একটি মায়ের চোখের জল

(বিদেশী উপকথা)

শ্রীমতী ছবি মুখোপাধ্যায়

আজ তোমাদের কাছে একটি দুঃখিনী মায়ের কাহিনী বলছি। অবশ্য, এই দুঃখিনী মায়ের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় না দিলে, তোমাদের গল্প শুনতে অসুবিধে হবে বলেই পরিচয়টা দিচ্ছি। থীবজ নামে একটি রাজ্য ছিল। সেই রাজ্যের যিনি রাজা, তাঁর একটি মাত্র মেয়ে। এ্যানটিওপিকে দেবতা জিউস বিয়ে করেন, এবং তাঁর দু'টি ছেলে হয়। কিন্তু এ্যানটিওপির ছেলেরা ঐ থীবজ রাজ্য পায় না। লাইকাস নামে আর একটি লোক ঐ রাজ্য অধিকার করে বসে থাকে। তবে এ্যামফাই-অন্ যখন জানলে তার মাকে লাইকাস্ রাজ্যচ্যুত করে সিংহাসন অধিকার করেছে, সে তখন তার রাখাল বাহিনী নিয়ে রাজ্য আক্রমণ করলে এবং পরস্বাপহারী লাইকাসকে হত্যা করে মহারাজের রাজ্য অধিকার করলে। অবশ্য আমি সংক্ষেপে যতটুকু বলা প্রয়োজন সেইটুকুই বললাম। কেন না, আমাদের কাহিনী এ্যামফাই-অনের রাজ্য অধিকার সম্বন্ধে নয়। সুতরাং যাকে নিয়ে গল্পটা আমাদের, তার বিষয় নিয়েই এখন আলোচনা করছি। লাইকাসকে হত্যা করে অবশেষে এ্যামফাই-অন্ থীবজ রাজ্যের রাজা হল। তাকে হিরমীজ একটি বীণা উপহার দেয় এবং সেই বীণাটি এতই চমৎকার সে বাজাত যে, সারা থীবজ রাজ্য এ্যামফাই-অনের ঐ সঙ্গীতের মধ্যে যেন আবদ্ধ হয়ে থাকত। এমন কি, পাথরও শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গীতের যাদুমন্ত্রে এ্যামফাই-অনের কাছে এগিয়ে আসত আজ্ঞামত। কিন্তু সেই এ্যামফাই-অনের সন্তানেরা হঠাৎ দেবতার ক্রোধে পড়ে অভিশপ্ত এবং চিরদুঃখী হল।

রাজা এ্যামফাই-অন্ বিয়ে করে অভিশপ্ত ট্যানট্যালাসের মেয়ে

নাইওবীকে। অবশ্য, এই ট্যান্ট্যালাস জীউসেরই একটি ছেলে। কিন্তু কোন একটা গর্হিত কাজের জন্য ট্যান্টালাস অভিশপ্ত হয় এবং চিরদিন সে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে। নাইওবী হ'ল তার মেয়ে।

বিয়ের পর নাইওবীর সুন্দর এবং শ্রেষ্ঠ সাতটি ছেলে ও সাতটি মেয়ে হল। এমন সুসন্তান প্রসব করার জন্য, রাণী নাইওবীর মনে এতই গর্ব্ব হয় যে, সে দেবী লীটোকে পর্য্যন্ত অপমান করার সাহস করলে। অর্থাৎ লীটোর একটি যমজ সন্তান ছাড়া আর সন্তান ছিল না বলে, নাইওবী তাকে উপহাস করলে তার নিজের সন্তানসংখ্যা দেখিয়ে। কিন্তু লীটোর এই যমজ সন্তান ছিল দেবতা অ্যাপলো এবং দেবী আরতিমিস্। অতঃপর অপমানিতা মা এই দাম্ভিকা রাণী নাইওবীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার জন্য সে তার সন্তান দু'টিকে আহ্বান করলে।

"এই যথেষ্ট! অভিযোগ করাটা কিন্তু শাস্তিকে দেরি করিয়ে দেয়!" বলে এ্যাপোলো তার মায়ের অশ্রুপূর্ণ কাহিনী ঐ খানেই সংক্ষিপ্ত করে দেয়।

গাঢ় ঝড়ো মেঘ জড়িয়ে দুই ভাই-বোন উড়ে চলে থীবস্ পরিদর্শন করতে। এই সময় রাণী নাইওবীর সাত ছেলে নগর-প্রাচীরের বাইরে রঙ্গভূমিতে সকলে মিলে রথের প্রতিযোগিতা, মল্লযুদ্ধ এবং নানা রকম খেলার ভিতর দিয়ে তারা ব্যায়াম চর্চ্চা করছিল। কিন্তু এদিকে যে, আকাশপথে অপমানিতা মায়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য, দু'টি দেব-দেবী তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করছে এটা নাইও-বীর ছেলেরা মোটেই টের পেল না। অবশ্য দেবতার তূণ থেকে একটা ঝন্-ঝন্ শব্দ যদি না উঠত তাহলে, একেবারেই ব্যাপারটা তারা জানতে পারত না। কিন্তু ততক্ষণে আকাশ থেকে ছুটে-আসা একটা তীর বড় ছেলেটির বক্ষোদেশ বিদ্ধ করেছে, এবং একটা কাতরোক্তি পর্য্যন্ত না করে ছেলেটি ঘোড়াগুলোর পায়ের কাছে পড়ে গেল।

এই দৃশ্য দেখে দ্বিতীয় ছেলেটি তাড়াতাড়ি পালাবার উদ্দেশ্যে তার রথটা সে যদিও ঘোরাল, কিন্তু পালাতে সক্ষম হ'ল না! এ্যাপলোর নির্ভুল লক্ষ্য তাকেও আহত করলে। সুতরাং এই ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ ভাই তারাও একটি তীরে দু'জনে একোঁড়-ওকোঁড় হয়ে বিদ্ধ হ'ল। তখন তাদের ঐ মৃতদেহগুলো মাটি থেকে তোলার জন্য পঞ্চম আর ষষ্ঠ ভাই ছুটি দৌড়ে গেল, যদিও মৃতদেহগুলো তারা জড়িয়ে ধরার অনেক পূর্ব্বেই দু'জনে ঐখানে তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল।

শুধু বেঁচে রইল ছোট ছেলেটি। লম্বা-লম্বা চুল, সুন্দর মুখের একটি কচি ছেলে! ছেলেটি কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারছে না। এখন এই ক্রুদ্ধ দেবতার সম্মুখে তার কি করা উচিত? অতঃপর সে তখন ঐ স্থানে হাঁটু গেড়ে বসে, দেবতার কাছে করুণা ভিক্ষা করলে। কিন্তু সেই মারাত্মক নিশানা ইতিমধ্যে যেন তার বুকে ডানা মেলে উড়ে এল! আকস্মিক এই হত্যাকাণ্ডের কথা নগরের চতুর্দ্দিকে দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল। ছেলেদের এই ভাবে হারানোর জন্য হতাশ মনে রাজা আত্মহত্যা করলে। আর রাণী নাইওবী, পক্ষিণী যেমন তার ছানাগুলোকে ডানার তলায় আড়াল করে রাখে, ঠিক যেন তেমনি করেই সে তার চতুর্দ্দিকে ভয়চকিত মেয়ে সাতটিকে ঘিরে নিয়ে ছুটে গেল, যে মাঠে তার সাত ছেলে, লীটোর বেদীর চার পাশে প্রাণহীন অবস্থায় দেহ এলিয়ে পড়ে আছে সেইখানে।

সন্তানদের এই মৃত্যুদৃশ্য দেখে, নাইওবীর মুখ থেকে দুঃখ অপেক্ষা ক্রোধের উচ্চ বাক্য ছুটে বেরিয়ে আসে। যে দেবতারা তাদের মায়ের প্রতিহিংসা তার উপর এই ভাবে নিয়েছে তাদের দিকে মাথাটা উঁচু করে সে বলে উঠল "বিজয়িনী নিষ্ঠুরা লীটো তবু আমি তোমাকে এখনও সন্তানসংখ্যায় অতিক্রম করেছি!" এই কথার উত্তরে শুধু আরতিমিসের ধনুক টংকার শব্দ তুললে, এবং নাইবীর বড় মেয়েটি যখন তার নিহত ভাইদের উপর পড়ে শোকে চুল ছিঁড়ছিল ঠিক সেই মুহূর্ত্তে সেও ঐখানে তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল। পরে দ্বিতীয় মেয়েটি তীক্ষ্ণ চিৎকার করে দুই হাতে বুকটা চেপে ধরল। কিন্তু তাকে তুলে ধরতে যে সাহায্য করত সেই তৃতীয় বোনটিও একটি অদৃশ্য তীরে বিদ্ধ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

একের পর এক যখন এই ভাবে অদৃশ্য তীরে সব মেয়ে ক'টি মাটিতে পড়ে যেতে আরম্ভ করলে, তখন ছোট মেয়েটি ভয়ে আতঙ্কে তার মাকে আঁকড়ে ধরলে। রাণী নাইওবীর মনে এখন আর সন্তানগর্ব্ব নেই! দুই চোখ দিয়ে ঝর-ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়ছে! ভিখারিণীর মত প্রার্থনার ভঙ্গিতে সে দুই হাত বাড়িয়ে বললে, "এতগুলি সন্তানের মধ্যে অন্ততঃ একটি আমার রাখো।" নাইওবী যখন এই প্রার্থনা জানাল; তখন করুণাহীনা আরতিমিসের শেষ তীরটা মায়ের বুকে লুকিয়ে থাকা শিশুকে আঘাত করলে।

রাণী নাইওবী দেহে যদিও কোন আঘাত পেল না তবু সন্তানের শোকে হঠাৎ সে প্রাণহীন হয়ে পড়ে গেল। শোক তার হৃদয় বিদীর্ণ করেছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হয়ে পড়েছে, দৃষ্টি স্থির রক্তহীন। কিন্তু চোখের জল তার আর বন্ধ হ'ল না! দুঃখ তাকে পাথরে পরিণত করে ফেলেছে!

কথিত আছে যে, নাইওবীর মূর্ত্তির উপর যখন সূর্য্যের প্রখর তাপ কিংবা চাঁদের স্নিগ্ধ কিরণ পড়ে, সে তখন কাঁদে। অর্থাৎ ঐ সন্তানগর্ব্বে নাইওবী ঈর্ষান্বিত দেবতাদের বিরুদ্ধে গর্ব্ব দেখিয়েছে, সেই সন্তানের জন্য সে এখনও কাঁদে। কান্নার আর শেষ নেই! আজও রাণী নাইওবী কাঁদছে! এই গল্প থেকে নিশ্চয়ই তোমরা বুঝতে পারছ যে, মানুষ গর্ব্ব করলে কত দুঃখ তাকে সহ্য করতে হয়; সুতরাং কোন জিনিষেরই গর্ব্ব করতে নেই।

নাচ গান বাজনা



গম্ভীরা গান

শ্রীজয়দেব রায়

শিবের গানের এদেশে তিনটি বিভিন্ন ধারা আছে—গাজন গান, নীলের গান ও গম্ভীরা গান। গাজন ও গম্ভীরা গানের মধ্যেও আবার দুইটি ভাগ আছে—শিবের গাজন ও ধর্মের গাজন। 'গাজন' কথাটির উৎপত্তি সম্ভবত 'গর্জন' হইতে—প্রাচীন কালে গাজন উৎসব ছিল যোদ্ধাদের রণোৎসব। ভক্তদের তাণ্ডব গর্জন হইতেই উৎসবের নাম গাজন হইয়াছে।

সেকালে বাঙলার রাজাদের সৈন্যবাহিনীকে পরিপুষ্ট করিত অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর যোদ্ধা-তীরন্দাজরা; হাডী, মুচি, ডোম, বাগদী সৈন্যরাই ছিল এ দেশের সামরিক শক্তি। গাজন উৎসব ছিল এই পাইক-বরকন্দাজদের সামরিক কুচকাওয়াজ বা 'প্যারেড'রই অঙ্গ। তাহারা এই সময়ে নানা প্রকার বীরত্বব্যঞ্জক ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করিত, যুদ্ধের মহড়া দিত।

গাজনের সঙ্গে জড়িত আগুনে ঝাঁপ দেওয়া, কাঁটা-ঝাঁপ, তরবারি ও খাঁড়া-নৃত্য প্রভৃতি তাহাদের ধৈর্য ও সহনশীলতার (Endurance and Reliability) পরীক্ষা।

গাজন উৎসবে সমবেত ভক্তদের জাত-বিচার, গোত্রভেদ প্রভৃতি নাই, যোদ্ধাদের মধ্যে তাহা থাকিলে সামরিক শৃঙ্খলার অভাব ঘটে। পণ্ডিতেরা সেই জন্য মনে করেন যে, বিভিন্ন জাতের যোদ্ধাদের সামরিক প্রয়োজনে একত্র পানাহার করিতে হইত। ইহার ফলে যাহাতে তাহাদের মনে কোনরূপ কুণ্ঠাবোধের উদয় না হয়, সে জন্য একটি আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া সকলকে একই সম্প্রদায়ভুক্ত করিয়া লওয়া হইত—গাজন ও গম্ভীরা ছিল সেই প্রকার অনুষ্ঠান। ধ্বংসের দেবতা শিবের ভক্তরা ইহাতে গ্রহণ করিত ভ্রাতৃত্ববোধের সঙ্কল্প, সেই সঙ্গে সঙ্কল্প গ্রহণ করিত শত্রু নিধনের।

গাজনের সঙ্গে যে সঙের শোভাযাত্রার ব্যবস্থা আছে, তাহাও এই মিলনোৎসবেরই অঙ্গ। ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর উচ্চ বর্ণের জাতিগুলির সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করিবার জন্যই গাজন যজ্ঞের শেষে এই শোভাযাত্রা বাহির হইত। বৌদ্ধ পালরাজাদের আমলে হিন্দুধর্মের বিকৃতির প্রতি কটাক্ষ করিবার উদ্দেশ্যেই প্রথম প্রথম এই শ্রেণীর সঙ বাহির হইত, রাজভয়ে ব্রাহ্মণরা আপত্তি করিতে পারে নাই। তাহার পর হইতে সেই ধারাই চলিয়া আসিতেছে।

বর্ষশেষের বাঙালীর এই উৎসব দেশের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ ধরিয়াছে—বর্ধমানে ধর্মপূজা, পূর্ববঙ্গে নীলপূজা, মেদিনীপুরে আহী যাত্রা এবং উত্তরবঙ্গে গম্ভীরা। তাহার মধ্যে গম্ভীরা গান প্রধানত মালদহ জেলায় বহুল প্রচারিত। গম্ভীরা সুর ললিত-গীতের উপযোগী নয়, গম্ভীরা বা শিবের নটতাণ্ডব রূপটির প্রকটনার উপযুক্ত গম্ভীর সুর বিজড়িত আছে গম্ভীরা গানে। 'গম্ভীরা' গাজনের শিবেরই নাম।

এই উৎসবের শুরু হয় চৈত্র-সংক্রান্তির দিন, কিন্তু চলে প্রায় জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত। গম্ভীরা উৎসবের কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে—যেমন, ঘটভরা বা উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠান, ছোটতামাসা বা নানাপ্রকার কসরত, বড়তামাসা ও তাহার সঙ্গে জড়িত মুখোসনৃত্য, বোলাই দিবস প্রভৃতি। বোলাই দিবসেই গম্ভীরা গানের আসর বসে।

বড়তামাসার মুখোসনৃত্য একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। এই শ্রেণীর মুখোসনৃত্য বাঙলা দেশে আর কোথাও দেখা যায় না। এই গম্ভীরা নৃত্যের দুইটি শ্রেণী আছে, এক শ্রেণীর নৃত্য, যেমন পরী, টাপা প্রভৃতিতে তেমন কোন বৈচিত্র্য নাই। কিন্তু কালী, নৃসিংহ, রাবণ প্রভৃতি নৃত্যে রণতাণ্ডব প্রকাশিত হইয়াছে। এই নৃত্যের সঙ্গে দেশের আদি ও অকৃত্রিম বাদ্যযন্ত্র ঢাক ও কাঁসিই সাধারণত বাজান হয়।

গম্ভীরা সুরে উদাত্ততার সঙ্গে ব্যাকুলতা বিজড়িত আছে। সাধারণত দেশের বিশিষ্ট গীতিধারা রামপ্রসাদী, বাউল ও কীর্তনের সংমিশ্রণে একটি বিচিত্র গীতি-রীতি অনুযায়ী গম্ভীরা সুর সৃষ্টি হইয়াছে। কবির গানের আসরের ন্যায় গম্ভীরা গানের আসরেও গায়করা নিজে নিজেই উপযোগী গান রচনা করিয়া গাহিয়া থাকে, তাহার ফলে গানের সুরে কারুকার্য অপেক্ষা আবৃত্তির ভঙ্গীটিই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

গম্ভীরা গানের পালাকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া গাওয়া হয়—বন্দনা, পালা, টপ্পা, বারোইয়ারী বা খবরাখবর ও সালতালামী, ধুয়া, মজামারা বা রঙ্গরসিকতা, আলকাফ ও খেমটা।

গম্ভীরা গানের বিশেষজ্ঞ শ্রীতারাপদ লাহিড়ী এ সম্পর্কে বলিয়াছিলেন—"অধিকারীর পরামর্শ অনুযায়ী রচিত গানকে উপলক্ষ্য করে তাঁরা গানের আসরেই নিজস্ব উপস্থিত বুদ্ধি অনুযায়ী কথাবার্তা বলেন ও রঙ্গরস করেন। এতে শিল্পীর প্রতিভা বিকাশে বিশেষ সহায়তা হয়, বিশেষ ব্যঙ্গ-কৌতুকে যিনি সুনাম অর্জন করেন তাঁর নামেই প্রধানত দলের সুনাম প্রচারিত হয়।"

কীর্তনের দলের ন্যায় এক এক জন খ্যাতনামা গায়ক এক একটি দলের অধিকারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে সুনাম ছিল গঙ্গাধর মণ্ডল, হরিমোহন কুণ্ডু, ধনকৃষ্ণ অধিকারী, গোপালচন্দ্র, ধরণী শেঠ, সুফি মহম্মদ, রাধা বাবিক, হরিবোলা প্রভৃতি। তাঁহাদেরই প্রচেষ্টায় বাঙলাদেশের এই অতি সাধারণ লোকসঙ্গীত সারা ভারতের

রাজনীতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। লোকশিক্ষা দান ও সমাজ সচেতনা সৃষ্টি করা এই উভয়বিধ কার্যে গম্ভীরাগান নিয়োজিত হইয়াছিল। এমন কি, শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকারকে আইন করিয়া এই শ্রেণীর গানের প্রচলন বন্ধ করিতে হয়।

গম্ভীরা গানের উৎস প্রাচীন শিবের গীত হইতে। 'শিবের গীত' বাঙলাদেশের সংস্কৃতির অন্যতম অঙ্গরূপে চিরকাল গণ্য হইয়া আসিয়াছে। মহাপ্রভু স্বয়ং এ গানের রস আস্বাদন করিতেন। শ্রীবৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন—

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডমরু বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইল শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে।
শঙ্করের গুণ শুনি প্রভু বিশ্বম্ভর।
হইলা শঙ্কর মূর্তি দিব্য জটাধর॥

বাঙলাদেশের সুপ্রাচীন গ্রন্থ রমাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ'। বৌদ্ধ পালরাজা দ্বিতীয় ধর্মপালের আমলে আনুমানিক দশম শতাব্দীর শেষার্ধে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল। আধুনিক পণ্ডিতেরা অবশ্য রমাই পণ্ডিতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। তাহা সত্ত্বেও তাঁহাকে বঙ্গসাহিত্যের আদিতম কবি বলিয়া গণ্য করা যায়। তাঁহার কাব্যেই শিব নায়করূপে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

শূন্যপুরাণের শিব নিজেই চাষী। সমব্যথী কৃষক তাঁহাকে চাষবাস সম্পর্কে উপদেশ দিতেছে—

তিল সরিষা চাষ করে গোঁসাই ধরি তব পায়।
কত না মাখিবে গোসাঁই বিভূতিগুলা গায়॥
মুগ বাটলা আর চষিহ ইখু চাষ।
তবে হবেক গোসাঁই পঞ্চামর্তর আশ॥
সকল চাষ চষ পরভু আর কুইও কলা।
সকল দব্ব পাই যেন ধর্মপূজার বেলা॥

আত্মভোলা উপাস্যের অভাব বেদনায় ব্যথিত ভক্তদের অন্তরের পূজা তিনি পাইয়া থাকেন। এমন কি, শিব তাহাদের এত অন্তরঙ্গ যে, তাঁহারই পূজার সামগ্রী তাঁহাকেই সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

রমাই পণ্ডিতের এই শিবই কৃষকদের নিজেদের রচিত গানে তাঁরও আপন জন হইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন—

ক্ষেতে বসি কৃষাণে ঈশান বলে ভাল।
চারি দণ্ডে চৌদিকে চৌরস করে চাল॥
আড়ি ধরে ধারে ধারে ধরাইল ধান।
হাঁটু গাড়ি ঈশানেতে আরম্ভে নিড়ান॥
বারটি বারঠে চেকুড়ার ঝড়াউড়ি।
গুন্দামুখি পাতি মোরে পুতে যায় হুড়ি॥
দলদুর্বা শোলা শ্যামা ত্রিশিরা কেশুর।
গড় গড় না না খড় উপাড়ে প্রচুর॥
থরথর খুঁজিয়া খড়ের ভাঙ্গে ঘাড়।
কুলি করি থাইল ধান্যের ধরে ঝাড়॥
কিতা জুড়ে ভিতা বেড়ে মাঝে গিয়া রয়।
উলট-পালট করে রায় পাঁচ ছয়॥

এইরূপে সেই কিতা সারে চটপট।
কিতা নিড়াইয়া ভীম চলে সট সট॥
বাদ নাহি বাঘ যেন বসি থাকে বুড়া।
সার্ধ ঘামে আরে উঠে শত শত কুড়া॥

ভীম হইল শিবের অনুচর। এই হইল কর্মের দেবতার ঘর্মাক্ত পূজা! জীবনের সঙ্গে জীবনেশ্বরের এইরূপ অন্তরের যোগ অশ্রুতপূর্ব। উত্তরবঙ্গের গম্ভীরা গানের এই সর্বত্যাগী শিবই বলিতে পারেন—

হাসিয়ে হর বলছে শুন হে শঙ্করি
আমি কড়ার ভিখারী ত্রিপুরারি শঙ্খ পাব কোথা॥
আমার সম্বল সিদ্ধি ঝুলি আর বাঘের ছালা।
এক ডম্বরু হাতে শিঙ্গা গলায়ে হাড়ের মালা॥
আমি তেল বিনে ভস্ম মাখি, অন্নাভাবে সিদ্ধি।
বস্ত্রাভাবে বাঘছাল কোমরেতে বান্ধি॥

দরিদ্র বঙ্গবাসীর কাছে দেবতার এই রূপটিই তো সুপরিচিত হইবে! তাই তো কৃষক শ্রমজীবীরা তাঁহাকে গঞ্জনা দিয়া বলে—

বোড়াই ধান ভাই লাগ্যাছে।
বুড়া ক্যান্ বা দৌড়া আয়্যাচে॥
(বুঝি) পুশে কৈলাসে যায় দেখ্যা বুড়া লাজা সাটাং দিয়্যাছে।
থাঙ্গবোং নামহ্যা আয়্যাছে॥
বুড়ায় মোটকির মতন প্যাটটা, মাথাং কতই গহন ভ্যাপটা
ফের ফোয়্যা আছে ন্যাঙটা, বুড়া কতই ক্যাকম ধর্যাছে।

এবার দিন বারত কতো খাট্যা করছু আলুয়া উসনা চালট্যা
বুড়া এমনি যে ভাই পাললঠ্যা দেখ্যা খাইতে আয়ল লুঠ্যা।
মন হয় করি ছড়ক্যা পিট্যা।
যানা যে ভাগে লক্ষ্মী গিয়্যাছে।
যারা চাকরি বাকরি কর‍্যা ব্যাড়ায় ভাগ-বিভাগে ঘুর‍্যা
তারথে ধরগা না তুই ত্যারা।
তোকে খাওয়াবে প্যাট ভোর‍্যা তারা ম্যাগাই টাকা উর‍্যাছে।

"বোড়া ধান লাগানো হয়েছে আর কৈলাস থেকে বুড়ো শিব তুমি ছুটে এসে জুটেছ? সারা বছর কত পরিশ্রম ক'রে যে ফসল পেয়েছি তাতে তুমি ভাগ বসাতে চাও? তোমাকে মেরে তাড়াবো। তার চেয়ে শহর বাজারে যারা চাকরি ক'রে, তাদের কাছে যাও না কেন, তারা তোমাকে পেট ভ'রে খেতে দেবে, তাদের অনেক টাকা আছে।"

শিবকে লইয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিবার প্রথা বাঙলা সাহিত্যে সুপ্রাচীন। ময়নামতীর গান হইতেই তাহার সূত্রপাত; তাহাতে আছে—

কচু বাড়ি দিআ বুড়া শিব জাএ পলাইআ।
হোল ব্যাঙের মতন মএনা নিগাএ নেদিআ।

তাঁহার কুচনী-বিহার, পার্বতীর সঙ্গে বিবাদ, সাংসারিক বিড়ম্বনা প্রভৃতি লইয়া মার্জিত কবিরাও বহু গান রচনা করিয়াছেন। পল্লী কবিরা দুর্গার মুখে তাঁহাকে তীব্রতর ভাবায় গান দিয়াছেন—

দেবতা হয়ে কেবা করে শ্মশান বসতি।
দেবতা হয়ে কেবা মাখে ভূষণ বিভূতি।
দেবতা হয়ে কেবা যায় কুচনীর পাড়া।
দেবতা হয়ে কেবা হয় পরনারী-হরা।
থাকরে ধুচনীর পুত কুচনীর মাথা খেয়ে।
ক্রোধ ক'রে যাব কাল দু'টি বাছাকে লয়ে।

উমাসঙ্গীতের নবোঢ়া উমার সঙ্গে এই মুখরা শিবজায়ার কত পার্থক্য!

গম্ভীরা গানের মাধ্যমে নিপীড়িত ভক্তমণ্ডলীর সমাজ সচেতনা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। শিব হইলেন চাষী গৃহস্থের গৃহদেবতা, তাঁহার কাছেই তাহারা নিজেদের সারা বৎসরের দুঃখ-লাঞ্ছনার বিবরণী পেশ করে, অভাব-অভিযোগ জানায়; সকাতরে প্রার্থনা করে প্রতিকারের, যাচঞা করে তাঁহার অভয় মন্ত্রের—

(এবারে) অনাবৃষ্টি কইর‍্যা সৃষ্টি
মাটি কইরল্যা নষ্ট হে,
বৃষ্টি থাকতে কষ্ট কইর‍্যা মিষ্টি কথায় তুষ্ট হে।

দুঃখ-কষ্টের জন্য ভক্তরা নিষ্ক্রিয় শিবকেই দায়ী করিতেছে।

প্যাটেতে ভাত নাই, ও শিব গোলাতে নাই ধান,
কি দিয়া বাঁচাব ও শিব ছেল্যাপিল্যার জান।
ও বুড়া শিব, দয়া করো।
পরনে নেতা নাই ও শিব, বরজে নাই পান।
কি দিয়া রাখিব ও শিব মাইয়া লোকের মান।
ও বোকা শিব, দয়া করো।

এ শ্রেণীর গানে কেবল নিজেদের লাঞ্ছনার দুঃখই নাই, সেই সঙ্গে সমগ্র জাতির অবনতির জন্য আক্ষেপও আছে—

শিব হে, বুঝি বাঙ্গালী আর মানুষ হ'ল না।
শি-ই-ব-অ-হে।

পল্লী কবিরা দ্বেষ-হিংসা হইতে মুক্ত নন, তাই অনেক গম্ভীর গানের মধ্যে শ্রেণীবিদ্বেষের সুরটি নগ্নভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে—

শিব হে, সিদ্ধিতে বেশ দম দিয়ে গাঁজা টেনে
আছ ভালই সুখে;
(এদিকে) কারও লেংটি, আবার বা কেউ
মটর গাড়ি হাঁকে;
দুঃখ হয় তাই, জানাই তোমার লীলা দেখে।

বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে গাজনের সঙ্গে 'নীলার বারোমাসী' নামক একটি বিশেষ শ্রেণীর গান প্রচলিত আছে। সারা চৈত্র মাসে বুড়ো শিবের গাজন গানের সঙ্গে ভক্তেরা এই শ্রেণীর গান গাহে—

কি করবে শিব মা-বাপ কি কর বসিআ।
কার খাইলা পান গুআ কারে দিলা বিহা।
বার মা বছরের নীলা তের বছর নহে।
না জানি আপদ নীলা কারে স্বামী কহে।
হাতে লইল লাউআ লাঠি কান্ধে আলক ছাতি।
ধীরে ধীরে চলিল বুঢ়া জামাই চাইত বুলি।
কাডেক্কন আইসস রে বেটা কড়ে তোমার ঘর।
কি নাম তোর বাপের, মায়ের কি নাম, সদাগর।

কথিত আছে, লীলাবতী বা নীলা নামে একটি সতী তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীকে শিবের কৃপায় খুঁজিয়া পাইয়াছিল। আজও পল্লীর কন্যা-বধূরা ব্রত উপবাস করিয়া সেই পুণ্যবতীকে স্মরণ করে।

রেকর্ড পরিচয়

এবার পূজায় অনেক ভালো ভালো রেকর্ড বেরিয়েছে, গায়ক-গায়িকাও সব বাছা বাছা, বাংলার প্রায় সব সেরা শিল্পীই এতে অংশ গ্রহণ করেছেন। নিম্নে আমরা সংক্ষেপে পরিচয় বিবৃত করছি:

হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস

P 11931—কুমার শচীন দেববর্মণ—"মন দিল না বঁধু" ও "তুমি আর নেই সে তুমি" বহু প্রতীক্ষিত বিশিষ্ট আধুনিক গান। **N 82711**—শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় "আনন্দধারা বহিছে ভুবনে" ও "আমি মায়ের সাগর পাড়ি দেব"—অতুলনীয় রবীন্দ্র সংগীত। **N 82712**—শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ—"পদ্মকলি সকাল খোঁজে" এবং "পলাশডাঙ্গার পলাশবনে"—আধুনিক। সুন্দর। **N 82713**—কুমারী আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়—"নাচে নাচে পুতুল নাচে" ও "বিদেশিনী কাদের রাণী" ছড়া ও আধুনিক। **N 82714**—শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র "অবেলায় যদি এসেছ আমার বনে" ও "কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা"—মনের মত রবীন্দ্র সংগীত। **N 82715**—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়—"সোনার হাতে সোনার কাঁকণ" এবং "এলো বরষা যে সহসা" আধুনিক। চমৎকার। **N 82716**—শ্যামল মিত্র "ওই ঝিরি ঝিরি পিয়ালের কুঞ্জে" ও "তুমি বারে বারে শুধু"—অপরূপ মাধুর্যমণ্ডিত আধুনিক।



ছবি পাঠানোর সময়ে ছবির পেছনে নাম, ঠিকানা ও বিষয়বস্তু লিখতে ভুলবেন না।]



বধূ

—মীরেণ অধিকারী

চিতোর দুর্গ

—যতীন্দ্রনাথ পাল





প্রতিমূর্তি (মৃন্ময়) —কুমারী সুলেখা ঘোষাল নির্মিত



৮ : ধান্য-রোপণ

—রামকিঙ্কর সিংহ



ভোরবেলা —মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

দুপুর বেলা —সুধীন রায়



N 82717—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় "ওগো কন্যা" ও "কাজল নদীর জলে"—বড় চমৎকার। N 82718—শ্রীমতী উৎপলা সেন "পাখী আজ কোন সুরে গায়" ও "ময়ূরপঙ্খী ভেসে যায়" আধুনিক। N 82719—কুমারী বাণী ঘোষাল "মেখলা বরণ মেয়ে" এবং "যে ফুল বিদায় পথে"—চমৎকার। N 82720—ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও তপতী ঘোষ—"পুজোর বাজার"—মজার ঘটনা, হাসির হাট। N 76038-39—'একদিন রাত্রে' চিত্রের গান। মান্না দের কণ্ঠে "এই দুনিয়া ভাই", সন্ধ্যা মুখার্জীর কণ্ঠে "জাগো মোহন প্রীতম"।

কলম্বিয়া

GE 24803—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়—"আর কত রহিব" এবং "তোমার আমার কারো" আন্তরিক আবেদনময় চমৎকার আধুনিক গান। G E 24804—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় "এই রাত ওই চাঁদ" এবং "বাঁশী বুঝি আর নাম জানে না"—আধুনিক। G E 24805—শ্রীমতী প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় "ভোর হোল দোর খোল" ও "কঙ্কাবতীর কাঁকণ বাজে"—দু'টিই ভালো আধুনিক গান। G E 24806—কুমারী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় "না মিটিতে মনোসাধ" এবং "বৃথা প্রবোধ দিস্ না" চমৎকার কীর্তন। G E 24807—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য "চেয়েছি তোমায়" ও বিদায় নিতে কি এলে"—হৃদ্য সংগীত। G E 24808—পান্নালাল ভট্টাচার্য "আমার সাধনা না মিটিল" ও "মা তোর কত রঙ্গ দেখবো বল"—ভক্তিমূলক শ্যামা সংগীত। G E 24809—দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় "কান্নাহাসির দোল দোলানো" এবং "যদি হায়, জীবন পুরণ নাই হল"—রবীন্দ্র সংগীত। G E 24810—কুমারী গায়ত্রী বসু "পলাশ বনতল" এবং "দূরে পাহাড় যেন কত"—আধুনিক। G E 24811—শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় "ইলশে গুঁড়ি" ও "ঐ মৌরী ফুলের ক্ষেত"—আধুনিক। G E 30340—গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে 'সূর্যমুখী' চিত্রের গান—"আকাশের অস্তরাগে" ও "আর যে পারি না সহিতে"। G E 30341—'সূর্য্যমুখী' চিত্রের গান—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে "ও বাঁশীতে ডাকে সে" ও "আমার সূর্য্যমুখী"। G E 30342—গীতশ্রী কুমারী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে—"শ্রীরাম কহেন সীতা" ও "আমার সূর্য্যমুখী"।

সাঙ্গীতিক

ভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতা সমিতির পরিচালনায় ভারতীয় সঙ্গীত প্রতিযোগিতার তৃতীয় বর্ষের অনুষ্ঠান গত ১ই আগষ্ট হইতে ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মোট পনের দিনে ষোলটি অধিবেশনে সমাপ্ত হয়। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গীতাচার্য শ্রীসত্য কঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সমিতির সভাপতি শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু সহ-সম্পাদক শ্রীনিতাই ভট্টাচার্য ভাষণ দেন। এই বৎসরে মোট আড়াই শত (বিষয় অনুসারে এক সহস্রের উপর) প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন। বাংলার বিভিন্ন স্থান হইতেও বহু প্রতিযোগীর সমাবেশ হয়। প্রতিদিনের অনুষ্ঠানে বহু জনসমাগমে প্রতিযোগিতা স্থল "শোভাবাজার রাজবাটী" এবং তৎসংলগ্ন স্থান মুখরিত হইয়া উঠে। * * আমেরিকার দু'জন বিখ্যাত গীতশিল্পীকে শীঘ্রই কলকাতায় দেখা যাবে। এঁরা স্বামি-স্ত্রী। (ইউজিন লিষ্ট) পিয়ানো বাজান, স্ত্রী (ক্যারল গ্লেন) সুরবিস্তার করেন বেহালাতে। আগামী ১লা অক্টোবর নিউ এম্পায়ার প্রেক্ষাগৃহে রাত্রি ৯-১৫তে এঁদের ঐক্যতান শোনা যাবে। ভারতের অন্যান্য বড়ো শহরেও এঁদের ঐক্যতান অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হবে। কলকাতার অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন এ্যামেরিকান ন্যাশনাল থিয়েটার এ্যাকাডেমি ও ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস। পাশ্চাত্ত্য সংগীতানুরাগীদের পক্ষে এই গীতানুষ্ঠান বড়ো রকমের আকর্ষণ * * তানসেন বিষ্ণুদিগম্বর বৃত্তির জন্য কলকাতায় ডিসেম্বরের মাঝামাঝি অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স ট্রাষ্টের উদ্যোগে এক নিখিল ভারত সংগীত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার বিষয়: কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত (দিলরুবা, বেহালা ও সারেঙ্গী)। যাঁরা প্রথম স্থান অধিকার করবেন তাঁদের প্রত্যেককে ১১০০ টাকার বৃত্তি দেওয়া হবে। এই বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্য জে ভি. পাথের (৮২, রাজা রাজবল্লভ ষ্ট্রীট, কলকাতা) কাছে পাওয়া যাবে। * * গ্রামোফোন ব্যবসায়ী মেসার্স ব্রিটানিয়া টকিং মেসিন্ কোম্পানীর ধর্মতলা ষ্ট্রীটে নূতন শো-রুমের উদ্বোধনের সংবাদে কলিকাতার সঙ্গীতানুরাগী ব্যক্তিগণ আনন্দিত হইবেন।

সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য বেতার অনুষ্ঠান -

১লা আশ্বিন—সুপ্রভা সরকার—গীত ও আধুনিক। ২রা—কমলা বসু—রবীন্দ্র-সংগীত, সবিতা দে—গীটার। ৩রা—শ্যামল মিত্র—আধুনিক। ৪ঠা—সতীনাথ মুখোপাধ্যায়—আধুনিক, কিশোরী দত্ত—গীটার। ৫ই—উৎপলা সেন—আধুনিক। ৬ই—দেবব্রত বিশ্বাস—রবীন্দ্র-সংগীত। ৭ই—সুনীলকুমার ঘোষ—রবীন্দ্র-সংগীত, শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়—স্বরোদ। ৮ই—শ্যামল গুহ—রবীন্দ্র-সংগীত, মহম্মদ দবীর খাঁ—বীণা। ১০ই—পণ্ডিত মণিরাম ও পণ্ডিত যশরাজ—খেয়াল, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী—সেতার। ১১ই—আলি আহম্মদ খাঁ—সেতার। ১২ই—গীতা সেন—অতুলপ্রসাদের গান ও রবীন্দ্র-সংগীত। ১৪ই—পূরবী দত্ত—রবীন্দ্র-সংগীত, সাজ্জাদ হোসেন ও সম্প্রদায়—সানাই। ১৭ই—মহিষাসুরমর্দিনী—সুর না ও প্রযোজনা—বাণীকুমার, সংগীত—পংকজকুমার মল্লিক, গ্রন্থনা—বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রবীন্দ্র-সংগীত। ২০শে—নীলিমা সেন—রবীন্দ্র-সংগীত। ২১শে—সন্তোষ সেনগুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত ও অতুলপ্রসাদের গান। ২৩শে—রবীন্দ্র-সংগীত—রবীন্দ্রমোহন বসু। ২৪শে—সুনীলরঞ্জন বসু—গীটার, অদিতি সেনগুপ্ত—রবীন্দ্র-সংগীত। ২৫শে—অমিয় অধিকারী—গীটার, সবিতা সিংহ—রবীন্দ্র-সংগীত। ২৬শে—কে, সি, দে—কীর্তন।

সাহিত্য পরিচয়

বাঙলা শিশুসাহিত্য প্রসঙ্গে

[মাসিক বসুমতীতে যে-কোন বিষয়ের লেখা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কি ধরণের প্রভাব বিস্তার করে এবং কি ধরণের প্রক্রিয়া দেখা দেয়, সঙ্গের উদ্ধৃতিটি সেই কথাই প্রমাণ করে। গত সংখ্যায় আমরা বাঙলা শিশু-সাহিত্যের হাল কি হয়েছে, সেই সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা ক'রেছিলাম। এই লেখার উল্লেখে যুগান্তর পত্রিকার জনপ্রিয় লেখক 'এককলমী'কে পত্র দিয়েছিলেন জনৈকা অনুরাগিণী পাঠিকা। তদুত্তরে 'ইতস্ততঃ' বিভাগে 'এককলমী' অর্থাৎ শ্রীপরিমল গোস্বামী সম্প্রতি যা লিখেছিলেন তার সবই উদ্ধৃত করা হয়েছে। —স]

"ন্যাশনাল লাইব্রেরী। আলিপুর ঠিকানা থেকে শ্রীমতী মালা চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—

আপনার কাছে আমার নিবেদন এই যে, আপনি শিশুসাহিত্য নিয়ে কিছু লিখুন, কারণ শিশুসাহিত্যের সত্যই দুঃসময় এসেছে, নইলে আর লোকে লেখকদের গালাগালি দেবে কেন? সেদিন মাসিক বসুমতীতে শিশুসাহিত্যের দুর্গতি পড়লাম। আপনার কাছে অনুরোধ, আপনি এ নিয়ে কিছু লিখুন।

* * * *

মাসিক বসুমতীর লেখাটি আমি পড়েছি, বর্তমান শিশুসাহিত্যের দুর্গতি নিয়ে এমন ভাল লেখা ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। ব্যঙ্গ সময়োচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। শিশুসাহিত্য সম্পর্কে আমার দু'একটি মাত্র কথা শুধু বলবার আছে। আমি ছোটবেলায় বঙ্গের রূপকথা নামক একখানা বই পড়েছিলাম, অদ্ভুত ভাল লেগেছিল। তারও আগে হাসিরাশি, রাঙাছবি। তারও আগে রবীন্দ্রনাথের 'নদী' (তখন পৃথক বই ছিল) আগাগোড়া মুখস্থ করেছিলাম। আগের দিনের জন্মভূমিতে প্রকাশিত ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বীরবালার গল্প শুনতাম বৃদ্ধাদের কাছে।

* * * *

প্রথমতঃ হাসিরাশি বা ঐ জাতীয় অন্য বই, (যার প্রায় সবই ইংরেজী বইয়ের অনুকরণে লেখা) সেগুলোর ছন্দ ও বিষয়বস্তু মিলে মনকে সহজে খুশি করত। হারাধনের দশটি ছেলে বা যমজ ভাই, (সবই ইংরেজী ছড়ার অনুকরণে) রচনা খুব পাকা হাতের, অনুকরণও সার্থক। ছন্দ ও বিষয়বস্তুর অদ্ভুত মিলন ঘটেছিল ঐ সব বইয়ের গল্পগুলিতে। কতকগুলো সম্পূর্ণ ছোট গল্পের চেহারা। দ্বিতীয়তঃ 'নদী' বই। 'ওরে তোরা কি জানিস কেউ, জলে কেন ওঠে এত ঢেউ।'—দিয়ে তার আরম্ভ। আবাল্য নদী দেখায় অভ্যস্ত চোখে 'নদী' কবিতার সৌন্দর্য উপভোগ করা এবং তাকে সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা কিছুমাত্র কঠিন মনে হয়নি। উৎপত্তি থেকে সমুদ্রে এসে নিজেকে সমর্পণ করা—নদীর এ পথ ধ'রে শিশুমনও এগিয়ে চলত দু'ধারের ছবি দেখতে দেখতে। আজ তা স্বপ্নের মতো মনে হয়।

* * * *

বাকী রইল বীরবালার গল্প, আর রূপকথা। বীরবালার গল্প এ গল্প ছোটদের জন্য লেখা হয়নি, কিন্তু যে মন থেকে এ গল্পের সৃষ্টি সে মনটি রূপকথা যুগের মনের মতোই স্নিগ্ধ সরল ও উদার কৌতুকপ্রিয়। তাই এ জাতীয় গল্পে ছোট-বড় ভেদ নেই। আর যে রূপকথার গল্প পড়েছিলাম, তা যে-সব রূপকথা বংশ বংশ ধরে বাংলার ছোটরা এবং বড়রা শুনে আসছে, সেই সব পরিচিত গল্পই। অ্যারাবিয়ান নাইটস-এর কিছু কিছু গল্পও ছেলেবেলায় পড়েছি। সেও সেকেলে গল্প।

* * * *

রূপকথা সম্পর্কে এই কথাটি জানা দরকার যে, যখন রূপকথার সৃষ্টি হয়েছিল তখনকার দিনে ও-ছাড়া অন্য গল্প রচনা সম্ভব ছিল না, এবং রূপকথার কোনো গল্পই বিশেষ ক'রে শিশুদের জন্য রচিত হয়নি, সবার জন্য রচিত হয়েছিল। সকল মানুষের কল্পনা তখন ওতে আশ্রয় লাভ ক'রে তৃপ্ত হত। তখন রাজার জাঁক ছিল কল্পনাতীত, সাধারণ লোক ছিল অত্যন্ত দুঃখী। তাই দুঃখী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন ঘটত হঠাৎ এবং তা শুনে দুঃখী মানুষের, সাধারণ মানুষের মন খুব কল্পনায় মেতে উঠত। সে সব গল্পে চাতুর্য খুব ছিল না, ছিল সহজ সরলতা এবং স্বচ্ছন্দ গতি। তখন যেমন মন ছিল, গল্পও রচিত হয়েছিল তেমনি।

* * * *

কিন্তু আজকের দিনে মানুষের মনের বদল হয়েছে। কালের বদল হয়েছে। রাজার জাঁক নেই, এখন সকল মানুষের সমান অধিকার। এবং সে চেতনা জনসাধারণের মনে অনেক শতাব্দী ধ'রে জেগেছে। মানুষ পৃথিবীর দিকে দিকে অভিযান চালিয়েছে, উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু, অরণ্য পর্বত, সমুদ্র কোথাও তার অভিযান সীমিত নয়। মানুষ আকাশে উঠেছে, আরও দূরে বায়ুমণ্ডলের বাইরে গ্রহান্তরে যাবার স্বপ্ন দেখছে। মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র এখন অনেক পিছিয়ে পড়েছে। তাই এ যুগের রূপকথার চেহারা হওয়া উচিত এ যুগের মতন। প্রাচীন রূপকথা প্রাচীন কালের মনের সৃষ্টি। সে মন ছিল শিশুর মতন সরল। তাই প্রাচীন রূপকথা আজও এ যুগের শিশুর মন ভোলায়,—ভোলায় না শুধু 'ইমিটেশন' রূপকথা। যা

আজকের যে কোনো অপরিণত বয়স্ক ছেলেরাও রচনা করছে। ইমিটেশন রূপকথা রূপকথাই নয়। রূপকথা সৃষ্টির মন না পেলে কি তা সৃষ্টি করা যায়? আজকের লেখক-লেখিকা চট ক'রে কলম নিয়ে বসে এক যে ছিল রাজপুত্র বা রাজকন্যা দিয়ে গল্প শুরু করেন বটে, কিন্তু তা হয় রূপকথার বিকার। সে সৃষ্টি হয় বীভৎস রূপকথা। এ যুগের ছোট-বড় কারো কাছেই তা চিত্তাকর্ষক হয় না।

* * *

অন্তর অন্তরকে স্পর্শ করে চিরদিন। তাই অন্তরের যোগে লেখা প্রাচীন রূপকথা আজও সবারই মন ভোলায়। আর ঠিক এই কারণেই দায়িত্বজ্ঞানহীন ব্যবসাদার লেখকের ইমিটেশন রূপকথা কারোরই মন ভোলায় না। তা ভিন্ন শিশু-সাহিত্য নিতান্তই পাঁচ বছর বয়সের জন্য লেখাকে বলা উচিত, তার চেয়ে বড় যারা তারা ধীরে ধীরে সব লেখাই পড়তে পারে। মহৎ সাহিত্যে যা কিছু আছে তা থেকে সংক্ষিপ্ত আকারের বই বয়স ও বুদ্ধি ভেদে সবই পর পর পড়তে পারে। কিন্তু ছোটদের পাঠ্য সাহিত্যের যে নামই দেওয়া হোক তা যেন নিষ্ঠাবান এবং শ্রদ্ধেয় লেখকের লেখা হয়। বিশেষ করে শিশু-সাহিত্য লিখব ব'লে যে সব লেখক প্ল্যান ক'রে রূপকথা লেখে বা ঐ রকম কৃত্রিম অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লেখে, সে সব লেখা সাহিত্য ক্ষেত্র থেকে দূর ক'রে দেওয়া উচিত। কেন না শিশু-সাহিত্য হোক বা যৌবন-সাহিত্য হোক বা বৃদ্ধ-সাহিত্য হোক, তা প্রথমতঃ সাহিত্য হওয়া চাই। কিন্তু সাধারণতঃ লোকের ধারণা যে শিশু-সাহিত্য 'সাহিত্য' বিচারের বাইরে। উদ্ভট যা কিছু লেখা হবে তাই শিশু-সাহিত্য। এই ধারণা থেকেই শিশু-সাহিত্য নামক একটি ব্যভিচার সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে।

* * *

শিশু-সাহিত্য কিছু কিছু হাতে পড়ে। দেখেছি উল্টে-পাল্টেই। যদি শিশুদের জন্য বিজ্ঞানের কথা লেখা হয়, তাতে বিজ্ঞান সম্পর্কে দায়িত্বের পরিচয় দেখিনি। যদি সাধারণ জ্ঞানের বই লেখা হয় তাতে তথ্য সংগ্রহে দায়িত্ব দেখিনি। এখন কোনো বিষয়ে অধিকারী অনধিকারী ভেদ ঘুচে গেছে। তাই যাঁরা এ নিয়ে চিন্তা করেন তাঁরা বিচলিত হন।"

আমাদের সমালোচনার উত্তর

মধ্যে মধ্যে বাংলা দেশের সাহিত্য সাহিত্যিক ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমরা যে সমালোচনা করে থাকি, তার ফলাফল সাধারণতঃ ভালই হয় দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ অবশ্য আমাদের সমালোচনার উদ্দেশ্যকে বিকৃত করে থাকেন এবং কদর্থ করতেও কুণ্ঠিত হন না। আমরা অবশ্য তাতে বিচলিত হইনি, হবও না। কারণ, কোন সমালোচনাতে কোন কালেই সর্বশ্রেণীর লোককে সন্তুষ্ট করা যায় না। আমরা গঠনমূলক উদ্দেশ্য

নিয়েই সমালোচনা করে থাকি। সবই মন্দ এবং সবই রসাতলে যাচ্ছে, এমন কথায় আমরা বিশ্বাস করি না। কিন্তু একথাও আমরা স্বীকার করি না যে বিকার ও বিকৃত উপসর্গকে প্রশ্রয় দিতে হবে এবং দিলে কল্যাণ হবে। বাংলা শিশুসাহিত্যে যে বিকার ও বিকৃতি কিছু কাল ধরে দেখা দিয়েছে, তা অবিলম্বে নির্মূল করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি। আমরা তাই শিশুসাহিত্য সম্বন্ধে দুর্মর সমালোচনা করেছি এবং ইচ্ছা আছে ভবিষ্যতে দৃষ্টান্ত দিয়ে করব। আমাদের সমালোচনার তাৎপর্য যে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বুঝতে পেরেছেন, তার প্রমাণ গত ৭ই অক্টোবর তারিখের রবিবারের 'যুগান্তর' পত্রিকায় 'এককলমীর' মন্তব্য। মন্তব্যটি আমরা এখানে স্বতন্ত্র ভাবে উদ্ধৃত করে দিলাম।

গত 'আষাঢ়' সংখ্যায় আমরা 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী' সম্বন্ধে যে সমালোচনা করেছিলাম, গ্রন্থাগারাধ্যক্ষ শ্রীকেশবন তার উত্তরে যে পত্র লিখেছেন, 'ভাদ্র' সংখ্যার 'পাঠক-পাঠিকার চিঠি' বিভাগে তা আমরা প্রকাশ করেছি। শ্রীকেশবন আমাদের সমালোচনার অর্থ ও উদ্দেশ্য যে সঠিক ভাবে বুঝতে পেরেছেন, তার জন্য তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে তিনি যে সব প্রস্তাব করেছেন, তা অত্যন্ত সুচিন্তিত ও যুক্তিসঙ্গত বলে আমরা মনে করি।

গত 'শ্রাবণ' সংখ্যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' সম্পর্কে আমরা যে মন্তব্য করেছিলাম, তা রীতিমত কঠোর হওয়া সত্ত্বেও, পরিষদের অন্যতম কর্মকর্তা শ্রীসজনীকান্ত দাস আমাদের ভুল বোঝেননি। পরিষদের কর্মীদের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা আছে এবং পরিষদের প্রতি যে আন্তরিক সহানুভূতি আছে, একথা বুঝেই তিনি 'ভাদ্র' সংখ্যার 'শনিবারের চিঠির' সংবাদ-সাহিত্যে সাহিত্য-পরিষৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। আলোচনাটি প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লিখিত না হলেও, পরোক্ষে আমাদের সমালোচনারই উত্তর। উত্তরে আমরা সন্তুষ্ট হয়েছি, কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারিনি। পরিষদের কাজে সর্বোপায়ে সাহায্যের জন্য, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আবেদন উদ্ধৃত করে শ্রীসজনীকান্ত দাস যে পুনরাবেদন করেছেন, আমরা তা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। বাংলা দেশের প্রত্যেক বাঙালীর কাছে আমরাও আবেদন করছি, বাংলার অন্যতম জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সাহিত্য পরিষৎকে তাঁরা অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখুন।

উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক বই

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

ছোট গল্প আর উপন্যাসের লেখক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাঙলা দেশে সুপরিচিত। এই সার্থক কথাশিল্পীর গ্রন্থাবলী দেশবাসীকে উপহার দিয়েছেন বসুমতী সাহিত্য মন্দির। শিল্পীর সার্থকতা সেখানেই, যেখানে মানুষের হৃদয়কে জয় করলো তাঁর সৃষ্টি। এই লেখকের অনবদ্য রচনাশৈলী ও লিপিচাতুর্য্য পাঠকসমাজকে বিমুগ্ধ করেছে অনেক দিন আগেই। বিভূতিভূষণ প্রধানতঃ Humorist, হাস্যরস পরিবেশনে ও বিদ্রূপাত্মক রচনায় এ যাবৎ তিনি যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। লেখকের লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহজ সরল, সুমিষ্ট সাবলীল ভাষা। তাঁর প্রতিটি রচনায়, প্রতিটি গ্রন্থে এই বৈশিষ্ট্যের ছাপ বর্তমান। গ্রন্থাবলীতে সন্নিবিষ্ট 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' গ্রন্থমালা লেখকের বিখ্যাত trilogy এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। এই সঙ্গে পাওয়া যাবে 'বসন্তে' ও 'দৈনন্দিন' এই দুই বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রায় পাঁচ শত পৃষ্ঠার এই গ্রন্থাবলীর প্রতিটি পৃষ্ঠায় রসিক বিভূতিভূষণের প্রতিভা আর মননশীলতার অপূর্ব্ব প্রকাশ দেখা যায়। বসুমতী সাহিত্য মন্দির। কলিকাতা-১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

বাঙলার গীতকার

বিগত কয়েক বছরে সঙ্গীতের নানা বিষয়ে বেশ কয়েকটি লেখায় খ্যাতি অর্জন করেছেন রাজ্যেশ্বর মিত্র। বাঙলা সাহিত্যে সঙ্গীত বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ বহুপূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েছে। এখানে সেই সব বইয়ের নামোল্লেখ সম্ভব নয়। মোদ্দা কথা, সঙ্গীতশাস্ত্র বাঙলা ভাষায় অলিখিত নেই—যদিও অধিকাংশ ভাল বই বর্তমানে আর পাওয়া যায় না। বিখ্যাত গীতকারদের জীবনীও অনেকে বিভিন্ন জীবনী-কোষে সংযোজিত করেছেন। তবুও লেখকের আলোচ্য বইখানি আমাদের যথেষ্ট তৃপ্তি দিয়েছে। রামপ্রসাদ, রামনিধি, দাশরথি, গোপাল উড়ে থেকে নজরুল, হিমাংশুকুমার ও গিরিজাশঙ্করের পর্য্যন্ত জীবনী ও গান সম্পর্কে প্রত্যেকটি আলোচনাই সুখপাঠ্য হয়েছে। মিত্রালয়। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

আরাবল্লীর আড়ালে

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী সুলেখিকা। তাঁর লেখায় যেমন আছে সাহিত্য-রসসৃষ্টির সার্থক চেষ্টা, তেমনি আছে অনুসন্ধিৎসু মনের জ্ঞান-অন্বেষণের তিয়াষ—যা সচরাচর দেখা যায় না। রাজপুতানার পটভূমিকায় লেখা "আরাবল্লীর আড়ালে" ইতিহাসের বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ। গ্রন্থস্থিত 'আরাবল্লীর আড়ালে,' 'খুশনজরজী' ও 'লালজী সাহেব' বিভিন্ন সময়ে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয় ইতিপূর্ব্বে। এগুলি ছাড়া আছে সুমেরু রায়, শেঠানীজী ও মাজীসাহেব। গল্পের আস্বাদ-দান কাহিনীর চমৎকারিত্বে আর সহজ কথায় ইতিহাস ব্যক্ত করার চেষ্টা লেখিকার প্রশংসনীয়। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দেড় টাকা।

পূর্ণপাত্র

ছোট গল্প এবং উপন্যাস রচনায় সমান দক্ষ শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর সাম্প্রতিক গল্পগ্রন্থ 'পূর্ণপাত্র' কয়েকটি মুখরোচক গল্পের সমষ্টি। লেখিকা ব্যঙ্গমিশ্রিত ও শ্লেষাত্মক হাসির গল্প লেখায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। বাঙলা দেশের ঘরোয়া পরিবেশ থেকে গল্পের উপকরণ জোগাড় করার দুরূহ ব্রতটি লেখিকার একচেটিয়া। এই কারণেই আশাপূর্ণা বাঙলার ঘরে ঘরে এত বেশী প্রিয়। 'পূর্ণপাত্র' গ্রন্থে সর্ব্বসমেত যোলটি গল্প একত্রিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই উন্নত পর্য্যায়ের গল্প হিসাবে উৎরেছে। এই গ্রন্থটির যাবতীয় স্বত্ব লেখিকা দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডারে দান করেছেন, অর্থাৎ গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ উক্ত ভাণ্ডার সংগ্রহ করবেন। বাঙলা দেশের লেখকদের জন্য যখন একটি পৃথক 'দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডার' প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন তখন লেখিকার এই বদান্যতা প্রশংসার্হ বলতে হবে। গ্রন্থটির বহু প্রচার বাঞ্ছনীয়। দরিদ্র-বান্ধব ভাণ্ডার। ৬৫/২ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

খেলাঘর ও বাসকসজ্জিকা

মাসিক বসুমতীর সম্পাদক শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক-লিখিত তু'খানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। খেলাঘর (উপন্যাস) এবং বাসকসজ্জিকা (গল্পগ্রন্থ) এই তুই গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের মন্তব্য প্রকাশ না ক'রে আমরা ভিন্ন সহযোগীর সমালোচনাংশ উদ্ধৃত করছি। 'খেলাঘর' সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা বলছেন—"যুদ্ধ-পরবর্তী কালের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য পাঠক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। এই বৈশিষ্ট্য হ'ল, নিত্যনূতন বিষয়বস্তুকে গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করার আগ্রহ।...আলোচ্য উপন্যাস "খেলাঘর"-এর লেখকের মধ্যেও এই উৎসাহ প্রশংসনীয় ভাবে অবস্থিত। ইতিপূর্ব্বে সামন্ততন্ত্রের ঐশ্বর্য্যময় সমাজের ক্রমিক অধঃপতনের কাহিনীকে চিত্রিত করেছেন তিনি; কখনও বা ফিরে গেছেন বিস্মৃতপ্রায় ঐতিহাসিক যুগের সমাজ পরিবেশে। আলোচ্য গ্রন্থটি কিন্তু সম্পূর্ণ আধুনিক নগর-কেন্দ্রিক জীবনের একটি বেদনাময় ভগ্নাংশের উপন্যাস রূপ। ভার্জিনিয়া উলফ বর্ত্তমান কালকে সাহিত্যের খণ্ডপ্রতিভার যুগ বলে অভিহিত করেছেন। "খেলাঘর" উপন্যাসেও এই খণ্ড-প্রতিভার সুন্দর ও সার্থক পরিচয় মেলে ঘরোয়া পরিবেশের বিভিন্ন বর্ণনায়, চরিত্রের শান্ত ম্লান রূপসৃষ্টিতে, শহর প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে। বিশেষ ক'রে কলকাতার জানালা থেকে দেখা বৃষ্টির যে ছবিটি লেখক এঁকেছেন, তা আধুনিক সাহিত্যে দুর্ল'ভ'ব'ললেও অত্যুক্তি হবে না।"

...'বাসকসজ্জিকা' সম্পর্কে আনন্দবাজার পত্রিকা বলছেন, "আরেকখানি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ প্রাণতোষ ঘটকের 'বাসকসজ্জিকা'। লেখক যদিও উপন্যাস রচনা করেই পাঠক মহলে পরিচিত, তবু এই সঙ্কলন থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তিনি প্রকৃতপক্ষে ছোট গল্প রচনায় সিদ্ধহস্ত।...তাঁর গল্পের ভাষা হৃদয়গ্রাহী ও ব্যঞ্জনাময়। এবং সূক্ষ্মরসের পরিবেশন পরিমিতির ফলে অধিকাংশ গল্পই একটি উন্নত পর্য্যায়ে পৌঁছেচে। "উলুখড়" "পঙ্গপাল," "বাসকসজ্জিকা," "সাধিকার অভিসার" ও "মুক্তাভস্ম" গল্পগুলি বিশেষত্বের দাবী রাখে।" যুগান্তর বলেন, "ছোট গল্পের ক্ষেত্রে লেখকের মননশীলতা, দৃষ্টিভঙ্গী, ও বাচনভঙ্গীতে নূতনত্ব আছে।...ভাষা ঝরঝরে, বর্ণনা হৃদয়গ্রাহী ও গল্পের পরিণতি চমকপ্রদ হয়েছে।" প্রকাশক যথাক্রমে সাহিত্য ভবন, ২১ মহর্ষি দেবেন্দ্র রোড, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা। মিত্র ও ঘোষ, ২০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য চার টাকা।

নায়ক-নায়িকা

শারদীয়া পূজার প্রাক্কালে বাঙলায় যে সব উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে সুনীল ঘোষের 'নায়ক-নায়িকা' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্ব্বে লেখকের যে ক'খানি উপন্যাস বেরিয়েছে, সেগুলি গুরুতর সমস্যাবহুল বলা যায়। সদ্য-প্রকাশিত নায়ক-নায়িকা তার ব্যতিক্রম। এ উপন্যাস মূলতঃ ব্যঙ্গরসাশ্রিত—যদিও সেই ব্যঙ্গ কখনো বিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়নি। এ উপন্যাসের নায়ক একজন তরুণ সাহিত্যিক—তিনি খুঁজতে বেরিয়েছেন তাঁর ভাবী উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা। সেই অনুসন্ধান পর্ব্বে যে সব বিভিন্ন টাইপ চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলেছে তাঁরাই এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী। এই উপন্যাসের মালতী সিং, পঞ্চানন সিকদার, সুনয়নী চৌধুরী, আলীদা, ইভা ব্যানার্জ্জী প্রভৃতি চরিত্রগুলি দীর্ঘকাল মনে থাকার মত। রচনার গুণে উপন্যাসটি গোড়া থেকে শেষ অবধি পাঠককে মুগ্ধ করে রাখে। শ্রীঅন্নদা মুন্সী অঙ্কিত প্রচ্ছদটি বিশেষ প্রশংসনীয়। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ন্যাশনাল পাবলিশার্স। ১৪৫ বি সাউথ সিঁথি রোড। কলিকাতা—২। বিক্রয়কেন্দ্র: পুঁথিঘর, ৩২ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা ৬। দাম—সাড়ে তিন টাকা।

বেগম-বাহার লেন

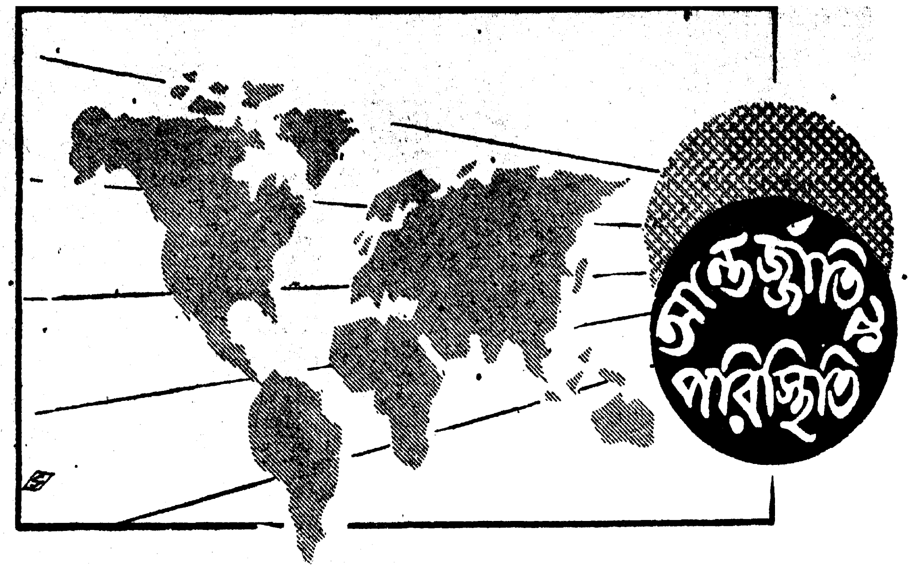
আলোচ্য গ্রন্থের লেখক মাসিক বসুমতীর পাঠকগোষ্ঠীর কাছে অপরিচিত নয়। বাঙলা সাহিত্যের চিরাচরিত বাঙালী নায়ক নায়িকা ছাড়াও যে আমাদের দেশে ও সমাজে ভিন্নজাতির মানুষ থাকতে পারে, সাহিত্যে এ কথাটি সপ্রমাণ করেন শরৎচন্দ্র। 'পথের দাবী'তে অসংখ্য বিদেশীর নাম খুঁজে পাওয়া যায়। 'বেগম-বাহার লেন' ঠিক ছক-কাটা বাঙলা উপন্যাস নয়, বরং কিছু যেন ব্যতিক্রম। কলকাতার ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের সুখ-দুঃখ, প্রেম-ভালবাসা, হাসি-কান্না আর তাদের নানা সমস্যায় লেখক অভিজ্ঞ। নগরকেন্দ্রিক উপন্যাস হিসাবে এই বইটি খুবই চমকপ্রদ। লেখক বারীন্দ্রনাথ দাশের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। শিল্পী খালেদ চৌধুরীর প্রচ্ছদপট আকর্ষণীয়। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক কালীশ মুখোপাধ্যায় শুধু সুসম্পাদক নন, তিনি সুলেখকও বটে। 'আমার সেই ছোট্ট গ্রামখানি' উপন্যাসটি বাঙলা দেশের আলেখ্য বললে অত্যুক্তি করা হয় না। ঘরোয়া পরিবেশে লেখা বিভিন্ন চরিত্রের ঘাত প্রতিঘাতে উপন্যাসটির কোথাও জড়তা নেই, বরং লেখকের দরদী মনের সূক্ষ্ম তুলিকায় আমাদের দেশ ও দেশবাসী জীবন্ত রূপ পেয়েছে! পার্থ, মা, হেলেন, মৈইমুদ্দিন মিঞা, মেজকাকীমা, উপেনদা, বড়দি, ছোড়দি, পীরসাহেব, গণেশ ঘোষ বিধু বাবু, করিমুদ্দিন প্রভৃতি চরিত্রগুলি আমাদের কাছে আদপেই অপরিচিত নয়। বর্ত্তমানে বাঙলা দ্বিখণ্ডিত হ'লেও লেখকের এ উপন্যাস এই কথাই প্রমাণ করে যে, তুই বাঙলার যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ আছে সাহিত্যের আঙিনায়। লেখক পূব বাঙলাকে চিত্রিত করেছেন অপূর্ব্ব লিপিকুশলতার সঙ্গে। আমরা আশা করি, এই উপন্যাসটি নিশ্চয়ই জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করবে। পার্থের আত্মকাহিনী যে সকলের জীবনকথা। রূপমঞ্চ প্রকাশিকা। ৮১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য পাঁচ টাকা।

জনপ্রিয় বই—পুনর্মুদ্রণ

বাঙলা সাহিত্যের পাঠক এবং পাঠিকার সংখ্যা যে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়ে চলেছে, বাঙলা বইয়ের পুনর্মুদ্রণের সংখ্যা দেখলেই বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য পুনর্মুদ্রণের মধ্যে অনেকগুলি বইয়ের নাম করতে হয়। যথা, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌরীফুল (গল্পগ্রন্থ) এবং মুখোস ও মুখশ্রী (গল্পগ্রন্থ) সুমথনাথ ঘোষের সুদূরের পিয়াসী (উপন্যাস) এবং জটিল (গল্পগ্রন্থ); নীলকণ্ঠের চিত্র ও বিচিত্র। পুনর্মুদ্রণ সাধারণ কোন বইয়ের জনপ্রিয়তার নিরীখ মাত্র, কিন্তু এতে এও প্রমাণিত হয় যে ভাল বইয়ের ভাল বিক্রী হ'তে কোন বাধা নেই।



আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ সমস্যা—

প্রায় তিন মাস হইতে চলিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক মাত্র সুয়েজ খাল সমস্যাই গুরুত্বপূর্ণ প্রধান স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। গত ২৭শে জুলাই (১৯৫৬) মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল কোম্পানী রাষ্ট্রায়ত্ত করার ঘোষণা করার পর হইতে বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক মিশরের বিরুদ্ধে অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন, বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক প্রস্তুতি, সুয়েজ খাল সম্পর্কে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্ত রাষ্ট্রের যুক্ত ঘোষণা, দ্বাবিংশতি রাষ্ট্রের সুয়েজ সম্মেলন, মেন্জিস মিশনের কায়রো সফর এবং অষ্টাদশ রাষ্ট্রের সুয়েজ সম্মেলনে সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের সমিতি গঠনের সিদ্ধান্তের ভিতর দিয়া এক দিকে যেমন সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠিত হইয়াছে আর এক দিকে তেমনি বৃটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ সমস্যা নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। বৃটেন ও ফ্রান্স অতি দ্রুত নিজেদের পছন্দমত রূপে সুয়েজ সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহা সম্ভব হয় নাই। বৃটেন ও ফ্রান্সের রণহুঙ্কার মিশরকে নত করিতে অসমর্থ হইয়াছে। অষ্টাদশ শক্তির সম্মেলন হইতে যে ঘোষণা প্রকাশ করা হয় তাহাতে সুয়েজ সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপনের সম্ভাবনার পথও খোলা রাখা হয়। কিন্তু কখন এবং কি অবস্থায় উহা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করা হইবে সে-সম্পর্কে কিছুই বলা হয় নাই। এই দিক দিয়া বিবেচনা করিলে সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠিত হওয়ার পূর্ব্বেই বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ সমস্যা উত্থাপন অনেকটা আকস্মিক বলিয়াই অনেকের কাছে মনে হইয়াছে। দ্বিতীয় সুয়েজ সম্মেলন ২১শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) সমাপ্ত হয় এবং ২৩শে সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় যে, বৃটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ সমস্যা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের জন্য উক্ত পরিষদের সভাপতিকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দুই দিন আগেই হউক আর দুই দিন পরেই হউক, সুয়েজ সমস্যা যে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত হইবেই, সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ কাহারও ছিল না। ইহাও সকলেরই একরূপ জানা কথা ছিল যে, সুয়েজ খালকে আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিতে প্রথম সুয়েজ সম্মেলনে অষ্টাদশ রাষ্ট্রের অনুমোদিত পরিকল্পনা নিরাপত্তা পরিষদের অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত হইলে রাশিয়া উহাতে ভেটো প্রদান করিবে। যাহা ঘটিবে বলিয়া সকলেই জানিতেন, নিরাপত্তা পরিষদে তাহাই ঘটিয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের যে অংশে সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার জন্য অষ্টাদশ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুমোদনের কথা ছিল, রাশিয়া ভেটো প্রদান করায় প্রস্তাবের সেই অংশটি অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে। যে-ছয়টি নীতি-সম্পর্কে বৃটেন, ফ্রান্স এবং মিশর একমত হইয়াছে প্রস্তাবের অপর অংশে সেইগুলি অনুমোদনের জন্য সন্নিবেশিত করা হয়। প্রস্তাবের এই অংশটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিবে, ইহা জানিয়াই বৃটেন ও ফ্রান্স সুয়েজখাল আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল। ইহাতে বৃটেন ও ফ্রান্সের নৈরাশ্য কিছু মাত্র হইয়াছে কি না তাহা অবশ্য অনুমান করা সম্ভব নয়। কিন্তু রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ না করিলেই যে সুয়েজ খাল সমস্যার সমাধান খুব সহজ হইয়া যাইত, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই।

রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ না করিলে সুয়েজ খাল আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে আনিবার প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদে অনুমোদিত হইত। কিন্তু তারপর কি হইত? গত ৮ই অক্টোবর (১৯৫৬) নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ মাহমুদ ফৌজী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন যে, সুয়েজ খালের আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব মিশর অগ্রাহ্য করিতেছে। আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব নিরাপত্তা পরিষদ অনুমোদন করিলেও মিশর তাহা মানিতে রাজী না হইলে সামরিক শক্তি প্রয়োগে সুয়েজ খাল দখলের চেষ্টা করা হইত কি? এইরূপ কোন অভিপ্রায় এই প্রস্তাব উত্থাপনের মূলে

বৃটেন ও ফ্রান্সের ছিল কি? বৃটেন ও ফ্রান্সের এই অভিপ্রায়ে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুমোদন ছিল কি?

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের কোন্ পরিচ্ছেদ অনুসারে বৃটেন ও ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ সমস্যা উত্থাপন করিয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। গত ২৩ সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) মার্কিণ রাষ্ট্রসচিব মিঃ ডালেস টেলিভিশান সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, সুয়েজ সমস্যা সমাধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সনদের ৪০নং ধারার সুযোগ গ্রহণ করা যাইতে পারে। এই ধারাটি সনদের সপ্তম পরিচ্ছেদের অন্তর্গত। এই ধারায় বলা হইয়াছে যে, শান্তি বিপন্ন হইয়াছে কি না কিম্বা আক্রমণের আশঙ্কা আছে কি না তাহা নির্দ্ধারণের পূর্ব্বে অথবা ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ (sanctions) সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্ব্বে নিরাপত্তা পরিষদ যেরূপ প্রয়োজন বা বাঞ্ছনীয় মনে করেন, সেইরূপ সাময়িক ব্যবস্থা মানিয়া চলিবার জন্য সংশ্লিষ্ট পক্ষদিগকে নির্দ্দেশ দিতে পারেন। উক্ত সপ্তম পরিচ্ছেদের ৪১নং ও ৪২নং ধারায় স্থলপথ, জলপথ ও বিমানপথে ব্যবস্থা গ্রহণের অথবা অবরোধের বিধান রহিয়াছে। ১৯৫০ সালের জুলাই মাসে উত্তর-কোরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্ব্বে নিরাপত্তা পরিষদ পূর্ব্বাবস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাহার প্রতি নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন। ঐ সময় রাশিয়া নিরাপত্তা পরিষদ সাময়িক ভাবে বর্জন করিয়াছিল বলিয়া ভেটোর সম্মুখীন হইতে হয় নাই। মিশর ঐ সময় নিরাপত্তা পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিল, কিন্তু কোন পক্ষেই ভোট দেয় নাই। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ডাঃ মহম্মদ ফৌজীই ঐ সময় নিরাপত্তা পরিষদে মিশরের প্রতিনিধি ছিলেন। বৃটেন ও ফ্রান্স সনদের সপ্তম পরিচ্ছেদ অনুসারে নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ সমস্যা উত্থাপন করিয়া থাকিলে এবং রাশিয়া ভোট প্রদান না করিলে সুয়েজ খাল লইয়া দ্বিতীয় কোরিয়া যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় ছিল না। রাশিয়ার ভেটো আর একটি কোরিয়া যুদ্ধের আশঙ্কা নিরোধ করিয়াছে, একথা নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায়। কিন্তু রাশিয়ার ভেটো দিবে জানিয়াও বৃটেন ও ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ সমস্যা উত্থাপন করিল কেন, এই প্রশ্নটি বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। এ সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে মেঞ্জিস মিশনের ব্যর্থতার পর হইতে সুরু করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় সুয়েজ সম্মেলন

কায়রো আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পরই বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এবং ফরাসী প্রধান মন্ত্রী লণ্ডনে মিলিত হইয়া পরবর্ত্তী কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরবর্ত্তী পন্থা সম্বন্ধে তাঁহারা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য মিত্রশক্তিবর্গের সহিতও সংযোগ স্থাপন করেন। তাঁহাদের যুক্ত ঘোষণায় বলা যে, পরবর্ত্তী পন্থা সম্বন্ধে তাঁহারা একমত হইয়াছেন। পরবর্ত্তী পন্থা কি, ঘোষণায় তাহা বলা হয় নাই বটে, কিন্তু উহার পরদিন ১২ই সেপ্টেম্বর কমন্স সভায় স্যার এণ্টনী ইডেন এই পন্থার কথা ঘোষণা করেন। সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠন করাই এই পন্থা। বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী কমন্স সভায় জানান যে, সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ যাতায়াতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য 'ব্যবহারকারী সমিতি' গঠন সম্পর্কে বৃটেন, ফ্রান্স ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একমত হইয়াছেন। তিনি বলেন, কর্ণেল নাসের যদি এই সমিতির সহিত সহযোগিতা করিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তিনি ১৮৮৮ সালের কনষ্টাণ্টিনোপল চুক্তি ভঙ্গের জন্য দায়ী হইবেন। এই সমিতির কি কি ক্ষমতা থাকিবে তাহাও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, এই সমিতি খালের শুল্ক আদায় করিবে, পাইলট নিযুক্ত করিবে, মিশরকে তাহার প্রাপ্য প্রদান করিবে এবং জাহাজ যাতায়াতের সুব্যবস্থার জন্য দায়ী থাকিবে। স্যার এণ্টনী ইডেন তাঁহার বক্তৃতায় সুয়েজ সমস্যাকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনাবলীর অনুরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। অর্থাৎ যে সকল ঘটনা বিশ্বকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে টানিয়া আনিয়াছিল তাঁহার দৃষ্টিতে সুয়েজ সমস্যা তাহারই অনুরূপ। তিনি আরও বলেন যে, এই সমস্যা বিপুল আকার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে সম্ভব হইলে আন্তর্জ্জাতিক অভিমতের চাপ দ্বারা এবং যদি সম্ভব না হয় তবে অন্য পন্থায় আক্রমণ রোধ করিতে হইবে এবং উহাই হইবে বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁহার উক্তির মধ্যে সামরিক শক্তি প্রয়োগের যে হুমকী রহিয়াছে তাহার গুরুত্ব উপেক্ষার বিষয় ছিল না। বস্তুতঃ, খাল ব্যবহারকারী সমিতি সামরিক শক্তি প্রয়োগের প্রথম পাদক্ষেপ বলিয়া আশঙ্কা করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। মিঃ গেইটস্কেলের 'a highly provocative step' এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর 'grave risk of conflict' উক্তির মধ্যে এই আশঙ্কাই প্রকাশিত হইয়াছে।

শেষ পর্য্যন্ত বৃটিশ শ্রমিক দলের চাপে পড়িয়া বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সুয়েজ সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জে উত্থাপন করিতে রাজী হন। কমন্স সভায় বিতর্কের উত্তর দান প্রসঙ্গে ১৩ই সেপ্টেম্বর তিনি জানান যে, জরুরী অবস্থা উপস্থিত না হইলে শক্তি প্রয়োগের পূর্ব্বে নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উপস্থাপিত হইবে। স্যার এণ্টনী ইডেন যে নিতান্ত অনিচ্ছার সহিতই এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয় সর্ত্ত সাপেক্ষে। তাঁহার উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, জরুরী অবস্থা দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদের মতামত না লইয়াই শক্তি প্রয়োগে তাঁহার অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলী এইরূপ জরুরী অবস্থা সৃষ্টির সুযোগ দেয় নাই। প্রথমতঃ ১৩ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সাংবাদিক-সম্মেলনে মিঃ ডালেস বলেন যে, প্রস্তাবিত খাল ব্যবহারকারী সমিতির কর্তৃত্বাধীনে প্রেরিত জাহাজ সুয়েজ খাল দিয়া যাইতে দিতে মিশর অস্বীকার করিলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করিবে না। দ্বিতীয়তঃ, সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতিকে এই ভাবে রূপান্তরিত করা হয় যে শক্তি প্রয়োগের সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় সুয়েজ সম্মেলনে শক্তি প্রয়োগ সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, খাল ব্যবহারকারী সমিতি মিঃ ডালেসেরই কল্পনাপ্রসূত।

প্রথম সুয়েজ সম্মেলনে যে ১৮টি রাষ্ট্র সুয়েজ খালের আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া গত ১৯শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) লণ্ডনে দ্বিতীয় সুয়েজ সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং এই সম্মেলন সমাপ্ত হয় ২১শে সেপ্টেম্বর। রাশিয়া, ভারত, সিংহল এবং ইন্দোনেশিয়া এই চারটি রাষ্ট্র আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করে নাই। তাহাদিগকে এই সম্মেলনে আমন্ত্রণ করা হয় নাই। সম্মেলনের

প্রথ... ...নেই মিঃ ডালেস সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠনের পরিক...না উত্থাপন করেন। বৃটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এই প্রস্তাবের উদ্যোক্তা। ব্যবহারকারী সমিতি গঠনের ছয় দফা-স...িত প্রস্তাবের ব্যাখ্যা করিয়া মিঃ ডালেস বলেন যে, বর্ত্তমান যোগাযোগ ব্যবস্থা বজায় রাখাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। প্রস্তাবিত সমিতির উদ্দেশ্য মিশরের উপর বলপ্রয়োগ নহে। এই সম্মেলনে একটি বিষয় লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, প্রথম সম্মেলনে যাঁহারা আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সমর্থন করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি রাষ্ট্র ব্যবহারকারী সমিতি সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে। সুইডেন, স্পেন ও ইরাণের প্রতিনিধি মিশরের সহিত আরও আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। পাকিস্তানের প্রতিনিধি মিঃ ফিরোজ খাঁ নূন বলেন যে, ব্যবহারকারী সমিতি গঠনের প্রস্তাবের সহিত পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট থাকিতে পারে না। এই মতভেদের প্রতিক্রিয়া সম্মেলনের ফলাফলের মধ্যেই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। সম্মেলনে সুয়েজ খাল ব্যবহারকারীদের সমিতি গঠনের ঘোষণা অনুমোদিত হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রতিনিধিদিগকে এই পরিকল্পনায় স্বাক্ষর করিতে অনুরোধ করা হয় নাই। কারণ, অনেককেই তাঁহাদের গবর্ণমেণ্ট বা পার্লামেণ্টের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

দ্বিতীয় সুয়েজ সম্মেলন হইতে তিনটি দলীল প্রকাশিত হইয়াছে :—(১) সাধারণ ইস্তাহার, (২) খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠনের ঘোষণা এবং (৩) সম্মেলনের চেয়ারম্যানের নিকট মিঃ ডালেসের পত্র। সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতিকে সশস্ত্র আক্রমণের উপায় হিসাবে ব্যবহার করা হইবে, এই আশঙ্কা সম্মেলনের ঘোষণা হইতে কতকটা যে প্রশমিত হইয়াছে, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে না। প্রথমতঃ সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ যাওয়ার মাশুল ব্যবহারকারী সমিতিকে দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ এই সমিতি এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন যাহাতে সুয়েজ খাল সমস্যার অস্থায়ী ভাবে কিম্বা স্থায়ী ভাবে সমাধান হইতে পারে। কি ভাবে সমিতি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তাহা কিছুই বলা হয় নাই। তবে এই সমিতি বৃটেন ও ফ্রান্সের সামরিক শক্তির সহযোগিতায় জোর করিয়া সুয়েজ খাল দিয়া জাহাজ চালাইবার চেষ্টা করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায় যে পরিত্যক্ত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। সম্মেলনের ঘোষণায় সুয়েজ সমস্যা নিরাপত্তা-পরিষদে উত্থাপনের পথও খোলা রাখা হয়।

খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠন

গত ১লা অক্টোবর (১৯৫৬) লণ্ডনে খাল-ব্যবহারকারী সমিতির উদ্বোধনের জন্য অষ্টাদশ রাষ্ট্র-সম্মেলন আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বেই বৃটেন ও ফ্রান্স সুয়েজ খালের প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করে। অতঃপর মিশরও সরকারী ভাবে নিরাপত্তা পরিষদে অভিযোগ উপস্থিত করে যে, মিশরের বিরুদ্ধে বৃটেন ও ফ্রান্স এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে যাহাতে আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইয়াছে।

সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠনের জন্য আহুত সম্মেলনের প্রথম বৈঠকেই সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী সমিতি গঠিত হইয়াছে। নিম্নলিখিত দেশগুলি এই সমিতিতে যোগদান করিয়াছে—অষ্ট্রেলিয়া, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, পশ্চিম-জার্ম্মাণী, ইরাণ, ইটালী, নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড, পর্ত্তুগাল, স্পেন, সুইডেন, নরওয়ে, তুরস্ক, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেন। ৫ই অক্টোবর সুয়েজ খাল ব্যবহারকারী পঞ্চদশ রাষ্ট্রের সমিতির কাউন্সিলের অধিবেশন সমাপ্ত হয়। ঐ দিন সমিতির কার্য্যপরিচালক সমিতি গঠিত হয়। এই কার্য্যপরিচালক সমিতিতে আছে, বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, নরওয়ে, ইটালী ও ইরাণ। খাল ব্যবহারকারী সমিতি যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের জোট, তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

নিরাপত্তা পরিষদের পরে

নিরাপত্তা পরিষদে বৃটেন ও ফ্রান্স যে-প্রস্তাব উত্থাপন করে তাহার অনেকটা পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। প্রথমতঃ, প্রস্তাবের যে অংশে সুয়েজ খাল রাষ্ট্রায়ত্ত করায় মিশরের নিন্দা করা হয় তাহার স্থানে বৃটেন, ফ্রান্স ও মিশরের মতৈক্যের ভিত্তিতে গৃহীত ছয়টি নীতি স্থানপ্রাপ্ত হয়। ইহা যে একটা উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন তাহাতে সন্দেহ নাই। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং মিঃ কৃষ্ণ মেননের উপস্থিতি বৃটেন, ফ্রান্স ও মিশরের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর মধ্যে ঘরোয়া আলোচনার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত ছয়টি নীতি সম্পর্কে তাঁহারা একমত হন :—(১) কোনরূপ প্রকাশ্য বা গোপন বৈষম্য না করিয়া সুয়েজ খাল দিয়া অবাধে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা থাকিবে, (২) মিশরের সার্ব্বভৌমত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে, (৩) সুয়েজ খাল পরিচালন যে-কোন দেশের

রাজনীতি হইতে মুক্ত থাকিবে, (৪) মিশর ও খাল ব্যবহারকারীদের মধ্যে চুক্তি দ্বারা খালের মাশুল স্থির করা হইবে, (৫) আদায়ীকৃত অর্থের উপযুক্ত অংশ খালের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হইবে এবং (৬) সুয়েজ খাল কোম্পানী এবং মিশর গবর্ণমেণ্টের মধ্যে যে সকল বিরোধ অমীমাংসিত থাকিবে সেগুলি সালিশী দ্বারা মীমাংসা করা হইবে। মিশরের নিন্দার পরিবর্ত্তে উক্ত ছয়টি প্রস্তাবের প্রথম অংশে স্থান প্রাপ্ত হয়। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে আছে সুয়েজ খালকে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্বাধীনে আনিবার জন্য অষ্টাদশ রাষ্ট্রের পরিকল্পনা। প্রস্তাবের এই অংশ সম্পর্কে ইরাণ একটি সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করে। উহাতে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ছয়টি নীতি কার্য্যকরী করিবার জন্য মিশরও প্রস্তাব উত্থাপন করিতে পারে, ইহাও স্বীকৃত হইতেছে। বৃটেন এই সংশোধন প্রস্তাব গ্রহণ করে। প্রস্তাবের উভয় অংশ সম্পর্কে ভোটের ফলাফল আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করিয়াছে। কাজেই অতঃপর বৃটেন ও ফ্রান্স কি করিবে, ইহাই এখন প্রধান প্রশ্ন। ছয়টি নীতি কার্য্যকরী করিবার পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই একমাত্র পথ, একথা স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ আন্তর্জ্জাতিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব দ্বারা ছয়টি নীতির দ্বিতীয় নীতিটি অর্থাৎ মিশরের সার্ব্বভৌমত্বের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার নীতি লঙ্ঘিত হইয়াছে। ইরাণের সংশোধন প্রস্তাব বৃটেন গ্রহণ করায় পশ্চিমী শক্তিবর্গও ইহা স্বীকার করিতেছেন যে, আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও ছয়টি নীতি কার্য্যকরী করিবার অন্য পথও আছে। আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের অনুকূলে নিরাপত্তা পরিষদে নয়টি ভোট হইয়াছে, একথা সত্য। কিন্তু ইহা দ্বারা বিশ্বের জনমত উহার অনুকূল তাহা বুঝা যায় না। আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব আন্তর্জ্জাতিক জনমতের নৈতিক সমর্থন লাভ করিয়াছে, ইহাও মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে নিরাপত্তা পরিষদে সুয়েজ সমস্যা উত্থাপিত হওয়ায় প্রথমতঃ লাভ হইয়াছে যে, যুদ্ধের আশঙ্কা হ্রাস পাইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, মীমাংসার জন্য নূতন আলোচনার পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। বৃটেন ও ফ্রান্সের দিক হইতে উহা 'tactical retreat' ছাড়া আর হয়ত কিছু নয়। কিন্তু সুয়েজ খাল দিয়া অবাধে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করাই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে আলাপ-আলোচনার পথে মীমাংসা করা কঠিন হইবে না। এ সম্পর্কে ভারতের প্রস্তাব বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। পশ্চিমী শক্তিবর্গ যদি আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুতে সন্তুষ্ট না হন, তাহা হইলে শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসা হওয়া কোন দিনই সম্ভব হইবে না।

নেহরুজীর সৌদী আরব সফর—

গত ২৪শে সেপ্টেম্বর হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) পর্য্যন্ত ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সৌদী আরব ভ্রমণ যে প্রকৃত পক্ষে 'রিটার্ণ ভিজিট' তাহাতে সন্দেহ নাই। গত বৎসর নবেম্বর মাসে সৌদী আরবের রাজা সৌদ বিন আব্দুল আজিজ আল্ সৌদ ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ১৩ই ডিসেম্বর (১৯৫৫) তিনি ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। নেহরুজীর সৌদী আরব ভ্রমণ 'রিটার্ণ ভিজিট' হইলেও উহার আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। তাঁহার রিয়াধে পৌঁছিবার পূর্ব্বে সেখানে মিশরের প্রেসিডেণ্ট কর্ণেল নাসের সৌদী আরবের রাজা এবং সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট কোয়াটলীর মধ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা-বৈঠক হয়। নেহরুজীর যুগোশ্লাভিয়া ভ্রমণের সময় ব্রিওনীতে কর্ণেল নাসেরের সহিত তাঁহার আলোচনা হইয়াছিল। কিন্তু রিয়াধে কর্ণেল নাসেরের সহিত নেহরুজীর সাক্ষাৎকারের কোন ব্যবস্থা করা হয় নাই।

ইসলাম ধর্ম্মের উৎপত্তি স্থান সৌদী আরব বিশ্বের সমস্ত মুসলমানের দৃষ্টিতে সর্ব্বাপেক্ষা পবিত্র স্থান। সৌদী আরবেই হজরত মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা এবং সমাধিস্থান মদিনা অবস্থিত। লোহিত সাগরের উপকূলে জেদ্দা অবস্থিত। আরবরা বলে যে, ইভের জন্ম এইখানেই হয়, এইখানেই প্রথম মানব আদম ভগবানের আদেশ অমান্য করিয়া জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে। সোভিয়েট রাশিয়াই ১৯২৬ সালে সর্ব্বপ্রথম ইবন সৌদকে হেজ্জাজের রাজা হিসাবে স্বীকার করিয়া লয়। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়া সৌদী আরবকে অস্ত্রশস্ত্র ও টেক্‌নিক্যাল সাহায্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সৌদী আরবের রাজা সেই সাহায্য গ্রহণ করিতে রাজী হন নাই। তৈল সৌদী আরবের প্রধান সম্পদ। ১৯৩৩ সালের ও ১৯৩৯ সালের চুক্তি অনুযায়ী মার্কিণ তৈল কোম্পানীগুলি যৌথ ভাবে এই সম্পদ আহরণ করিয়া থাকে। এই তৈল হইতে সৌদী আরব বৎসরে ৫ কোটি পাউণ্ডেরও অধিক রাজস্ব পাইয়া থাকে। সৌদী আরবের উত্তরে ইরাক ও জর্ডান অবস্থিত। এই দুইটিই বৃটিশ স্বার্থের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। বৎসরের প্রথম ভাগে জর্ডানে যে হাঙ্গামা হইয়া গেল এবং যাহার পরিণামে গ্লাবপাশা বিতাড়িত হইলেন, তাহার মূলে সৌদী আরবের অর্থ সাহায্য রহিয়াছে বলিয়া বৃটেন অভিযোগ করিয়াছে। বুরাইমি লইয়া বৃটেনের সহিত সৌদী আরবের বিরোধটাও অনেক দিনের।

সৌদী আরবের রাজা তাঁহার প্রধান মন্ত্রী রাজকুমার ফৈজলকে বান্দুং সম্মেলনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারত ভ্রমণে আসিয়া সৌদী আরবের রাজা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করেন। সৌদী আরব বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে নাই। ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে মিশরের সহিত সৌদী আরবের এক সামরিক চুক্তি হয় এবং এই চুক্তিতে ঘোষণা করা হয় যে, এই দুইটি দেশের সেনাবাহিনী

দেশ আক্রান্ত হইলে উভয় দেশই আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে। এই চুক্তির কয়েক দিন পরে বৃটিশ পরিচালিত ট্রুকিয়াল ওমান বাহিনী বুরাইমি দখল করে। গত মার্চ্চ মাসে (১৯৫৬) সৌদী আরবের রাজা কায়রোতে মিশর ও সিরিয়ার প্রেসিডেন্টের সহিত এক বৈঠকে মিলিত হন এবং মিশরের নেতৃত্বাধীনে যৌথ সামরিক কম্যাণ্ড গঠন সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়। ইয়েমেনও চুক্তিতে যোগদান করিয়াছে।

সুয়েজ সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে নেহরুজীর সৌদী আরব ভ্রমণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সৌদী আরব সফরান্তে ২৮শে সেপ্টেম্বর শ্রীনেহরু এবং সৌদী আরবের রাজা এক যুক্ত ইস্তাহারে এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, মিশরের সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না করিয়া এবং অবাধ আন্তর্জ্জাতিক জলপথ হিসাবে সুয়েজ খাল ব্যবহারের কোন অসুবিধা না ঘটাইয়া সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার দ্বারা সুয়েজ সমস্যার মীমাংসা সম্ভব। সুয়েজ সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হওয়া যেমন ভারত, তেমনি সৌদী আরব উভয়েরই একান্ত প্রয়োজন। বিরোধের ফলে সুয়েজ খাল অবরুদ্ধ হইলে ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিলে গত মার্চ্চ মাসের চুক্তি অনুযায়ী সৌদী আরবেরও উহাতে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা রহিয়াছে। সৌদী আরবের তৈল সুয়েজ খালপথে রপ্তানি হয়। ইউরোপ হইতে সৌদী আরব যে-সকল পণ্য আমদানী করে তাহাও আসিয়া থাকে সুয়েজ খালের পথে।

ইরাক ব্যতীত অন্যান্য আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সম্প্রতি একটা ঐক্যবদ্ধ অবস্থা দেখা দিয়াছে। উহা কতখানি দৃঢ়, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। তা ছাড়া প্রত্যেক আরব রাষ্ট্রেরও নিজস্ব সমস্যা আছে। এই সমস্যা জনগণের দারিদ্র্যের সমস্যা। এই সকল বিষয় সম্পর্কে সৌদী আরবের রাজার সহিত নেহরুজীর আলোচনা হইয়াছে কি না, ইস্তাহার হইতে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। উভয়ের মধ্যে আলোচনা যে শুধু আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে হইয়াছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না। পশ্চিম এশিয়ায় ইসরাইল-আরব সম্পর্ক এক গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করিয়াছে। সৌদী আরব ও মিশর সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী হইলেও ইসরাইল রাষ্ট্রের সহিত সহাবস্থান তাহারা পছন্দ করে না। ইস্তাহারে আরব-ইসরাইল সম্পর্ক সম্বন্ধে কোন কথা নাই। কিন্তু ইসরাইল রাষ্ট্র সম্পর্কেও নেহরুজী ও সৌদী আরবের রাজার মধ্যে আলোচনা হইয়াছে, এইরূপ মনে করিলে হয়ত ভুল হইবে না।

জর্ডান-ইস্রাইল সংঘর্ষ—

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সুয়েজ খাল সমস্যা যখন আশঙ্কা-পূর্ণ গুরুত্ব লাভ করিয়াছে সেই সময় ইসরাইল-জর্ডান সীমান্তে সংঘর্ষ বাধিয়া থাকে ক্ষুদ্র ব্যাপার বলিয়া উপেক্ষা করা চলে না। মধ্যপ্রাচ্যে পশ্চিমী শক্তিবর্গের নীতির সহিত এই ইস্রাইল-জর্ডান সীমান্তের সাম্প্রতিক সংঘর্ষাবলীর সম্পর্কটা হয়ত বুঝিয়া উঠা সহজ নয়। কিন্তু আরব-ইস্রাইল সীমান্তের সংঘর্ষটা নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা, একথা বলিয়া ইসরাইল-জর্ডান সীমান্তের সাম্প্রতিক সংঘর্ষগুলির গুরুত্ব লাঘব করা অসম্ভব। গত মার্চ্চ এপ্রিল মাসে গাজা অঞ্চলে আরব-ইসরাইল সংঘর্ষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারশিল্ডের চেষ্টায় সাময়িক ভাবে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু তিন মাস পার হইতে না হইতেই গত জুলাই মাসে জর্ডান সীমান্তে যুদ্ধাশঙ্কার ধ্বনি উত্থিত হয়। ইসরাইল সৈন্য সমাবেশ করিতেছে, এই গুজব রটনার ফলেই এই যুদ্ধাশঙ্কা সৃষ্টি হইয়াছিল। পরে দেখা গেল ইসরাইল কর্ত্তৃক সৈন্য সমাবেশের গুজব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কিন্তু গত সেপ্টেম্বর (১৯৫৬) মাসে এবং বর্ত্তমান অক্টোবর মাসে ইসরাইল-জর্ডান সীমান্তে যে কয়েকটি সংঘর্ষ ঘটে তাহাতে আবার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা দেখা গিয়াছে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে ১০ই ও ১২ই তারিখে সংঘর্ষ ঘটে। তারপর সংঘর্ষ হয় সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে। গত ২৩শে সেপ্টেম্বর জর্ডানসৈন্যের গুলীতে চারি জন ইসরাইলী পুরাতত্ত্ববিদ নিহত ও ১৭ জন আহত হয়। ইসরাইল উহার পাল্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অতঃপর ১১ই অক্টোবর (১৯৫৬) ইসরাইল-জর্ডান সীমান্তে গুরুতর সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে। অনেকে মনে করেন ১৯৪৮ সালের প্যালেষ্টাইন যুদ্ধের পর এত তীব্র সংঘর্ষ আর হয় নাই। এই সকল সংঘর্ষের বিবরণ দেওয়া এখানে নিষ্প্রয়োজন।

উভয় পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে পাল্টা অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে। ইহার মধ্যে নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু উল্লিখিত সংঘর্ষের ফলে এবার এক নূতন ঘটনা ঘটিয়াছে, জর্ডান ১৯৪৭ সালের সন্ধি অনুযায়ী ইরাকের নিকট সাহায্য চাহিয়াছে এবং ইরাকও সাড়া দিতে বিলম্ব করে নাই। ইরাক বাগদাদ চুক্তির

অন্ততম সদস্য। জর্ডানকে এই চুক্তিতে জড়াইতে বৃটেন যে চেষ্টা করে তাহার ফলে জর্ডানে গুরুতর সংঘর্ষ বাধিয়া উঠে এবং উহার পরিণামে জর্ডানের রাজা আরব লিজিয়নের বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল গ্লাব পাশাকে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হন। জর্ডানের বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করা আর হয় নাই। কিন্তু বৃটেনের সহিত জর্ডানের চুক্তি বজায় রাখা হইয়াছে। ইরাকের নিকট জর্ডানের সামরিক সাহায্য চাওয়ার মূলে বৃটেনের কোন হাত আছে কিনা তাহা অবশ্য কিছুই জানা যাইতেছে না। মিশরের সংবাদপত্রগুলিতে এই অভিযোগ করা হইয়াছে যে, ইহা জর্ডানকে ইরাকের প্রভাবাধীনে আনিবার প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। জর্ডান যদি একবার ইরাকের প্রভাবাধীনে আসে তাহা হইলে বাগদাদ চুক্তিতে জর্ডানের যোগদান যে অনিবার্য্যই শুধু হইয়া উঠিবে তাহাই শুধু নয়, উহার পরিণাম আরও সুদূরপ্রসারী হওয়ার সম্ভাবনা। ইরাকের নিকট জর্ডানের সামরিক সাহায্য চাওয়ার ব্যাপারে বৃটেনের মনোভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার বিষয়। ইসরাইলের প্রতিশোধ লওয়ার প্রচেষ্টাকেই শুধু বৃটেন তীব্রভাষায় নিন্দা করে নাই, বৃটেন ইস্রাইলকে ইহাও বুঝাইতে চাহিয়াছে যে, জর্ডানে ইরাকী সৈন্যের উপস্থিতি stabilizing force'-এর কাজ করিবে। অর্থাৎ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার কাজ করিবে। বৃটেনের এই ধরণের উক্তির তাৎপর্য্য বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

ইস্রাইল গবর্ণমেণ্ট মনে করেন যে, জর্ডানে ইরাকী সৈন্য প্রবেশ করিলে ১৯৪৯ সালের জর্ডান-ইসরাইল যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘিত হইবে। ইস্রাইল গবর্ণমেণ্টের এই ধারণা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই। ইরাকী সৈন্য জর্ডানে প্রবেশ করিলে যে ১৯৪৯ সালের জর্ডান ইসরাইল যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘিত হইবে না বৃটেন তাহা নিঃসন্দেহরূপে বুঝাইতে পারে নাই। সেই জন্যই বৃটেনের পররাষ্ট্র দপ্তর ইসরাইলকে সতর্ক করিয়া দিয়া জানাইয়াছে যে, ইরাকী সৈন্য জর্ডানে প্রবেশ করিলে ঐ অঞ্চলে স্থিতাবস্থার যে-পরিবর্ত্তন হইবে ইস্রাইল তাহার বিরোধিতা করিলে বৃটেন ইসরাইলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে। এই ব্যবস্থা অবলম্বন ইসরাইলের বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই নয়। ইরাকী সৈন্য জর্ডানে প্রবেশ করিলে জর্ডান ইসরাইল যুদ্ধবিরতি চুক্তি লঙ্ঘিত হইবে বলিয়াই শুধু ইসরাইল মনে করে না,

ইসরাইলের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ারও আশঙ্কা করে। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, এ্যাংলো-জর্ডান চুক্তি অনুযায়ী আম্মান, মাফ্রাক এবং আকাবায় বৃটিশ বিমানঘাঁটি রহিয়াছে এবং আকাবায় কিছু সংখ্যক বৃটিশ স্থলসৈন্যও রহিয়াছে। এই চুক্তিতে দেশরক্ষা সম্পর্কে বৃটেন ও জর্ডানের মধ্যে আলোচনা করার কথা আছে।

জর্ডান ইরাকের নিকট সামরিক সাহায্য চাওয়ায় ইসরাইল যে শুধু শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নয়, জর্ডানের সম্মুখেও সমস্যা দেখা দিয়াছে। জর্ডানে ইরাকের সমর্থক লোক অবশ্যই আছে কিন্তু মিশরের সমর্থকদেরই প্রাধান্য। মিশরের সমর্থকরা জর্ডানে ইরাকী সৈন্যের উপস্থিতি সমর্থন করে না। ইরাকী সৈন্য জর্ডানে প্রবেশ করিলে জর্ডানের ভিতরেই হাঙ্গামা বাধিবার আশঙ্কা আছে। সাধারণ নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে কোন গোলমাল জর্ডানের রাজাও চাহেন না। তা ছাড়াও আর একটা সমস্যা আছে। ইরাক এই সর্ত্তে সামরিক সাহায্য দিতে চায় যে, ইরাকী ও জর্ডানের সৈন্য লইয়া সম্মিলিত বাহিনী তো গঠন করিতে হইবেই, উহার অধিনায়কও যৌথ হইলে চলিবে না, অধিনায়ক হইবেন একজন। এই অধিনায়ক যে একজন ইরাকী হইবেন, ইহা মনে করিলে ভুল হইবে। ইহাও একটা বড় কম সমস্যা নয়। এই সমস্যার কোন সমাধান হইয়াছে কিনা তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। তবে এইরূপ স্থির হইয়াছে যে, বর্ত্তমানে ইরাকী সৈন্য জর্ডানে প্রবেশ না করিয়া জর্ডান-সীমান্তের নিকটে অবস্থান করিবে এবং ইস্রাইল আক্রমণ করিলেই সাহায্য দানের জন্য প্রস্তুত থাকিবে।

জর্ডানের রাজা ইরাকের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন কেন, ইহা সত্যই ভাবিবার বিষয়। বৃটিশের অনুপ্রেরণা থাকা অসম্ভব নয়। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে বলিয়া মনে হয়। গ্লাবপাশাকে বরখাস্ত করিবার পরই মিশর সিরিয়া এবং সৌদী আরব জর্ডানকে অর্থনৈতিক সাহায্য দিতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু জর্ডানের রাজা তাহাতে সম্মত হন নাই। তিনি এই যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন যে, ইহা আরব জগতের এক অংশের সাহায্য মাত্র, তিনি সমগ্র আরব জগতের সাহায্য চাহেন। জর্ডানের রাজার মনে এইরূপ আশঙ্কা থাকা খুবই স্বাভাবিক যে, তাঁহার ভাগ্যেও মিশরের রাজার অবস্থা ঘটিতে পারে। এই আশঙ্কা নিরোধ করিবার চেষ্টাই তিনি করিতেছেন। ইরাকী সাহায্য গ্রহণ তাহার পরিণাম[illegible] না তাহা বলা সহজ নয়। কিন্তু ইরাকী সাহায্য গ্রহণের পরিণাম[illegible] জর্ডান ইরাকের তাঁবেদারে পরিণত হওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়। এদিকে ইস্রাইলের আক্রমণের আশঙ্কার ধুয়া তুলিয়া বেশ একটা সামরিক আয়োজন সুরু হইয়া গিয়াছে। আবার আরব-ইসরাইল যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। আরব রাষ্ট্রগুলি ইস্রাইল রাষ্ট্রের অস্তিত্বই সহ্য করিতে অনিচ্ছুক, একথা বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখা আবশ্যক। সুয়েজ খাল লইয়া সঙ্কট এখনও কাটে নাই। ইহার উপর আরব-ইসরাইল যুদ্ধের আশঙ্কা। এই যুদ্ধ বাধিয়া উঠিলে সুয়েজ খালের ব্যাপারে উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে তাহাও উপেক্ষার বিষয় নয়।

সেরেৎসি খামার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন—

প্রায় ছয় বৎসর পরে বৃটেনের টোরী গবর্ণমেণ্ট মিঃ সেরেৎসি



প্রদান করিয়াছেন। শ্রমিকদল ক্ষমতা পাইলে তাঁহাকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হইবে, শ্রমিকদল কর্ত্তৃক এই প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর টোরী গবর্ণমেণ্ট উল্লিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করার বিশেষ কোন তাৎপর্য্য আছে বলিয়া মনে হয় না। বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টই মিঃ সেরেৎসি খামাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছিলেন, সে-কথাও আমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক। তিনি একজন বৃটিশ মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, ইহা-ই তাঁহার একমাত্র অপরাধ। এ কথা অবশ্য বলা হইয়াছে যে, তিনি যদি এক জন সাধারণ নাগরিক হইতেন তাহা হইলে কোন প্রশ্ন উঠিত না। যেহেতু তিনি একজন সর্দ্দার, সেই জন্যই সমস্যা দেখা দেয়। এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করা সম্ভব হয় নাই। মিঃ সেরেৎসি খামার কাকা এই বিবাহের বিরোধী ছিলেন। সর্দ্দারের আসন গ্রহণ করার মতলবেই তিনি উহার বিরোধিতা করেন। কিন্তু মিঃ সেরেৎসির সমর্থক দল এমন অবস্থার সৃষ্টি করে যে, তাঁহার কাকাকেও অবশেষে বেচুয়ানাল্যাণ্ড হইতে বহিষ্কৃত করিতে হয়। একথা খুবই সত্য যে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ নীতিকে তুষ্ট করিবার জন্যই বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্ট সেরেৎসির নির্ব্বাসনের আদেশ দিয়াছিলেন।

অবস্থা শান্ত হওয়ার পর সেরেৎসির কাকা শেকেডিকে বেচুয়ানাল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে শেকেডিও রাজী হইয়াছেন যে, সেরেৎসি যদি সাধারণ নাগরিক হিসাবে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তাহা হইলে তাঁহার আপত্তি নাই। সেরেৎসিও ইহাতে রাজী হইয়াছেন। তিনি সাধারণ নাগরিক হিসাবেই বেচুয়ানাল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন বটে, কিন্তু সর্দ্দারের মর্য্যাদা অপেক্ষাও তাঁহার [illegible] অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি আবার সর্দ্দারের পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন, এই সম্ভাবনাও লোপ পায় নাই। বৃটিশ শ্রমিক দলের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, সেরেৎসি সর্দ্দারের কাজে প্রতিষ্ঠিত হইবেন কি না তাহা উপজাতীয় গোটলা বা এসেম্বেলীর উপর নির্ভর করিবে। উপজাতীয় এসেম্বেলী কর্ত্তৃক আবার তাঁহাকে সর্দ্দারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সেরেৎসির প্রত্যাবর্ত্তনে দক্ষিণ আফ্রিকা যে ক্রুদ্ধ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহে অনুমান করিতে পারা যায়।

হংকংয়ে হাঙ্গামা—

সুদূর প্রাচ্য বৃটিশ উপনিবেশ হংকংয়ে গত ১০ই ও ১১ই অক্টোবর (১৯৫৬) দুই দিন ধরিয়া চিয়াংপন্থী চীনা এবং প্রজাতন্ত্রী চীনাদের মধ্যে যে-রূপ সংঘর্ষ হইয়া গেল তাহাতে প্রজাতন্ত্রী চীন গবর্ণমেণ্টের উদ্বিগ্ন ও অসন্তুষ্ট হওয়া খুব স্বাভাবিক। এই হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়া বৃটেন ও প্রজাতন্ত্রী চীনের সম্পর্কের মধ্যে দেখা দিবার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়। বান্দুং সম্মেলনের প্রাক্কালে এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার নেশন্যালের কাশ্মীর প্রিন্সেস নামক বিমানখানি কম্যুনিষ্ট সাংবাদিকদিগকে বহন করিয়া হংকং হইতে জাকার্তা যাওয়ার পথে সারওয়াক উপকূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তদন্তের ফলে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে যে, হংকংয়ের কৈটাক বিমান ঘাঁটিতেই বিমানখনিতে উহাকে ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল। একজন চীয়াংপন্থী চীনা উহার জন্য দায়ী। এ প্রসঙ্গে ইহা-ও উল্লেখযোগ্য যে, বিমানখানি দুর্ঘটনায় পতিত হইতে পারে এ সম্পর্কে পিকিং সরকার হংকং সরকারকে সতর্কও করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। হংকং কুয়োমিন্টাং এজেন্টদের দ্বারা ভরপুর, এই অভিযোগ প্রজাতন্ত্রী চীন গবর্ণমেণ্ট অনেক বার করিয়াছেন। তাহারা যাহা খুশী তাহাই করিতেছে পুলিশ কোন বাধা দেয় না, এই অভিযোগও করা হইয়াছে। চীয়াংপন্থী চীনারা হংকং হইতে চীনের মূল ভূখণ্ডের বিরুদ্ধে কার্য্যকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, প্রজাতন্ত্রী চীন সরকার অনেক বার এই অভিযোগ করিয়াছেন। কিন্তু হংকং সরকার এই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মোটেই কান দেন না।

চিয়াংপন্থী চীনাদের সম্পর্কে হংকং গবর্ণমেণ্ট যে যথেষ্ট পরিমাণে উদার নীতি গ্রহণ করিয়াছেন, একথা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু চীনের মূল ভূখণ্ড হইতে কত সংখ্যক চীনা হংকংয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করা আছে। গত ফেব্রুয়ারী মাসে অস্থায়ী ভাবে এই নির্দ্দেশ তুলিয়া দেওয়া হয়। সম্প্রতি পুনরায় এই নির্দ্দেশ বহাল করা হইয়াছে। এ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, গত ফেব্রুয়ারী হইতে ছয় মাসের মধ্যে মূল ভূখণ্ড হইতে যে সকল চীনা হংকংয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের শতকরা ৮০ জনই আর চীনে ফিরিয়া যায় নাই। হংকং যাহাতে কম্যুনিষ্ট চীনাদের সংখ্যাধিক্য ঘটিতে না পারে তাহার জন্যই যে এই বাধা-নিষেধ তাহাতেও সন্দেহ নাই। হংকংয়ের এই হাঙ্গামা সম্পর্কে চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই গত ১৪ই অক্টোবর (১৯৫৬) পিকিংয়ে বিদেশী সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন যে, "হংকংয়ে প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রভাব দুর্ব্বল করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষ তথায় চীয়াংপন্থীদের ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক হাঙ্গামা ঐ উদ্দেশ্য ছাড়াইয়া গিয়াছে। হাঙ্গামায় চীনা এবং বিদেশী উভয়েই লুণ্ঠিত হইয়াছে।" বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের বিবরণে এই হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য কম্যুনিষ্টদিগকেই দায়ী করা হইয়াছে। মিঃ চৌ এন লাই উহাকে আজগুবি বলিয়া মনে করেন। আজই হউক আর দুই দিন পরেই হউক, হংকংয়ের চীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রশ্ন উঠিবেই। হংকংয়ের চীনের অন্তর্ভুক্তি ঠেকাইয়া রাখিতে হইলে চিয়াংপন্থী চীনারাই বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহায় হইবে। এই জন্যই হংকংয়ে চিয়াংপন্থী চীনাদের সম্পর্কে উহার নীতি গৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু হংকংয়ে প্রজাতন্ত্রী চীনবিরোধী কার্য্যকলাপ যদি বৃদ্ধি পায় তবে হংকংয়ের চীনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রশ্ন আসন্ন হইয়াই উঠিবে।

১৯শে অক্টোবর, ১৯৫৬।



র ঙ্গ প ট



ক্লার্ক গেবল্‌স্ কে ?

টাকা না কি মানুষের প্রকৃতি একেবারে বিপরীত করে তোলে। অহঙ্কার ও মদগর্ব্ব সেই সময়ে অসম্ভব প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মনে। কর্ত্তব্যবোধ, সহানুভূতিতে পড়ে জলাঞ্জলি। সকলের বেলাতেই কিন্তু এ রকম হয় না, ব্যতিক্রমও আছেন বৈ কি কেউ কেউ। বিশ্বখ্যাত ক্লার্ক গেবলস্ তাঁদেরই অন্যতম। জীবনের অর্দ্ধ-শতাব্দী অতিক্রম করে গিয়েও নায়কের ভূমিকায় আজও যাঁর অপরিসীম অভিনয় বিমুগ্ধ করে দর্শকচিত্তকে—মানুষের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রতি সেই জনপ্রিয় শিল্পীটি অত্যন্ত সচেতন। আজও এই বয়েসেও ইনি 'রাজা' নামে অভিহিত। 'দি কিং অফ হলিউড' বললে এঁকে ছাড়া অন্য কাউকে বোঝায় বলে মনে হয় না। জনপ্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করেও অত্যন্ত সাদাসিদে, নিরহঙ্কারী, ও পরোপকারী মানুষ ক্লার্ক গেবলস্। একদা ভ্যান জনসন যখন অসম্ভব জনপ্রিয় অর্থাৎ যখন তিনি এক মাসে পঁচিশ হাজার করে জনগণের প্রশংসিত পত্র পেয়ে থাকতেন (১৯৪৩) তিনিও যেখানে এই মানুষটিকে দেখতেন সর্ব্বাগ্রে 'রাজা'কে জানাতেন তাঁর সানন্দ অভিবাদন। এমনই ব্যক্তিত্ববান্ নট হলিউডের 'রাজা'। হলিউডের কুৎসা রটানোর শেষ নেই, কিন্তু আজ অবধি কেউ গেবলসের নামে কিছু রটাতে সাহসী হন নি, তাঁর পারিশ্রমিক প্রতি সপ্তাহে সাড়ে সাত হাজার ডলার (১৯৫০)। ইনিই একমাত্র অভিনেতা যিনি এক একটি ছবিতে কাজ করে চার মাস করে বেতন-সহ বিশ্রামের অনুমতি পান। প্রত্যেক ষ্টুডিওর কাজের সময় ছুটী হলে, পাঁচটার পর গেবলসকে কোনও ষ্টুডিওয় কর্মরত অবস্থায় দেখা যাবে না। আগেই বলেছি, ক্লার্ক পরোপকারী বিশ্ববন্দিত নায়ক হয়েও সেখানে তিনি সাধারণ কর্মচারীদের সুবিধার্থে এটা-ওটা করে দিয়ে থাকেন, তাদের মোটর মেরামত পর্য্যন্ত। ক্লার্ক শিকারপ্রিয় মানুষের সঙ্গ ... তে অত্যন্ত ভালবাসেন, ভ্রমণেও পান অপার আনন্দ।

যুদ্ধের সময় ক্লার্ককে সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করতে অনুরোধ করলেন কর্ত্তৃপক্ষ ... দের দল। বিমান বাহিনীর প্রধান জেনারেল হ্যাপ আর্ণল্ডের সঙ্গে পরামর্শ করে যোগ দিলেন বিমান বাহিনীতে (১৯৪২)। ৪১ বছর বয়সে ক্লার্ক ছাত্রত্ব গ্রহণ করে সসম্মানে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পেলেন দায়িত্বপূর্ণ পদ।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চতুর্থ পক্ষে ক্লার্ক বিয়ে করলেন ভূতপূর্ব লেডী য়্যাসলিকে—গেবলস্‌ও এঁর চতুর্থ স্বামী। এঁর বর্তমান বয়েস ৪৭ চলছে। প্রথম স্বামী ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস্ (সিনিয়ার) দ্বিতীয় লর্ড য়্যাসলি, তৃতীয় য়্যালডার্লি ব্যারণ ষ্ট্যানলি। তবে এই সময়ে অনেকেই আশা করেছিলেন ক্লার্কের সঙ্গে বিবাহ হবে অভিনেত্রী সিলভিয়া ষ্ট্যানলির। গেবলসের পিতৃভূমি ক্যাডিস্ (ওহিও) জন্ম ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে।

র‍্যামন নোভারো, কনরাড নাগেল, জন গিলবার্ট প্রমুখ শিল্পিবৃন্দ যেদিন আলো করেছিলেন চলচ্চিত্রের ভাগ্যাকাশ, সেদিন দেখা দিয়েছিলেন ক্লার্ক গেবলস্। আজ বহু বৎসর অতিবাহিত হয়ে গেছে, ঘটে গেছে অসংখ্য ঘটনা, মানুষ গেবলসের বয়েসেরও হয়েছে বহু পরিবর্ত্তন কিন্তু শিল্পী গেবলস্ আজও ঠিক তেমনটিই আছেন, যেমনটি তিনি ছিলেন তাঁর আবির্ভাবের প্রথম লগ্নে।

পুত্রবধূ

মায়াকে কথা দিয়ে শুক্লার সঙ্গে মেলামেশা করবার জন্তে মায়ার মা ভবানীর কাছে নরেন যতটা অপ্রিয় না হয়েছিল তার চতুর্গুণ অপ্রিয় হয়ে উঠেছিল শুক্লা··· মুখোপাধ্যায়-বংশীয় বধূ ভবানীর কাছে নরেনের সঙ্গে মেলামেশার জন্তে। সেই শুক্লাকেই বিয়ে করে বসল দিলীপ, ভবানীর একমাত্র ছেলে—বহু আশার আধার মুখোপাধ্যায়-বংশের কুলপ্রদীপ। ভবানী বলতে চান ছেলে তাঁর, তিনি তার গর্ভধারিণী, বুকের রক্ত দিয়ে তাকে গড়ে তুলেছেন, রুগ্নাবস্থায় তার পাশে রাতের পর রাত ধরে সেবা করে গেছেন—সুতরাং সেই ছেলের বউ তিনিই পছন্দ করবেন। কিন্তু তা হ'ল না—একেই নরেনের ব্যাপারে শুক্লার প্রতি তাঁর মন বিষিয়ে ছিল তার উপর আরো বিষিয়ে গেল নিজের ছেলের ব্যাপারে। এরি মধ্যে দিলীপের বন্ধু সুব্রতর অনুরোধে শুক্লাই নরেনকে বাধ্য করিয়েছে, মায়াকে বিবাহ করতে। দিলীপের বিবাহ হ'ল কিন্তু দিলীপকে করতে হোল গৃহত্যাগ। দিলীপ ও শুক্লা ক্রমে অথৈ সাগরে পড়ল। দু'জনেই আশৈশব সুখে লালিত পালিত, কষ্টের মুখোমুখি কখনও হয় নি। শেষকালে ভবানী শরীরে প্রয়োজন হোল রক্তের—শুক্লা দিল সেই রক্ত—ফলে দিলীপের শুক্লায় ভুল বোঝাবুঝি। সর্বশেষে নরেনের প্রচেষ্টায় ... সঙ্গে সকলের পুনর্মিলন।

ছবির পরিচালনায় অনেকগুলি খুঁত পাওয়া যায়—একেক জায়গায় নাটকীয় ধারা অত্যন্ত ব্যাহত হয়েছে, ছবির গতি যেখানে শিথিল হয়ে গেছে—থেকে থেকে আবার একেকটি জায়গা এমন ভারাক্রান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে যা বিরক্ত এনে তোলে দর্শকচিত্তে। পাকলডাঙা কলকাতা শহর নয়, সুতরাং সেখানে প্রকাশ্য মেলায় একটি আধুনিকা মেয়েকে নরেনের সঙ্গে ওই রকম ভঙ্গীতে চলাফেরা করতে ও কথাবার্ত্তা বলতে দেখে কারো নজর পড়ল না—কেউ ভ্রুক্ষেপও করল না সেদিকে? সকলেরই তো একটা না একটা হিল্লে হ'ল—বেচারী সুব্রত ও বেচারী সীতার কি হ'ল? পশ্চাৎপটগুলি অত্যন্ত কাঁচা হাতের স্বাক্ষর বহন করছে। অনুপকুমারকে নামানোর প্রয়োজন কি ছিল? যদিও নামানো হ'ল তো তাঁকে দিয়ে কি আর কিছু করিয়ে নেওয়া যেত না?

মুখোপাধ্যায়-বংশীয় বধূ নিষ্ঠাবতী বিধবা ভবানীর হাতে 'কিউটেক্স' অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগে। চিত্ত বাবু! দয়া করে একটু দেখে-শুনে কাজ করুন। বাঙলার ছায়াছবি নিয়ে এ রকম ছিনিমিনি খেলবার অধিকার আপনার নেই। দিলীপ কি করে জানল যে টাকা তার মা পাঠিয়েছেন—মায়াই যে পাঠায় নি, এ রকম অভ্রান্ত ধারণা সে কোথা থেকে করল?

অভিনয়াংশে বাঙলা ছবিতে বহু দিন বাদে দেখা দিলেন মালা দেবী, সুখের বিষয়, এ অভিনয় তাঁর সার্থকতায় ভরপুর, দুটি ধরণের চরিত্র যে নিখুঁতভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তা সত্যিই প্রশংসার যোগ্য। মালা দেবীকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এঁর কাছে সকলেই নিষ্প্রভ—এমন কি নায়ক উত্তমকুমার পর্য্যন্ত। স্নেহময় রসপ্রিয় দাদুর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাস, ভবানীর ভূমিকায় চন্দ্রা দেবী, তা ছাড়া আশীষ মুখোপাধ্যায়, শুভেন মুখোপাধ্যায়, জীবেন বসু প্রভৃতি সু-অভিনয়ই করেছেন। তবে অভিনয়ের নামে যে কতটা ন্যাকামি ও ছেলেখেলা করা যেতে পারে আর অভিনয়ের নামে কতখানি চূণকালি মাখানো যেতে পারে ঐ বিরাট শিল্পের মুখে তার নজীর রেখে গেলেন অভিনেত্রী সবিতা চট্টোপাধ্যায়।

অপরাজিত

দিক্‌পাল [illegible] বিভূতিভূষণের 'অপরাজিত' অপরাজিতই রয়ে গেছে সত্যজিৎ রায়ের কাছে। বহু আলোচিত 'অপরাজিত' ছবিখানি দেখে এই সমাধানেই আসা যায়। তবে ছায়াছবি হিসেবে এর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যায় না এবং আনন্দের সঙ্গেই ঘোষণা করা যেতে পারে যে, এর চিত্রমূল্যের পরিমাণ প্রচুর। সর্বজয়ার মৃত্যু, দাদুর আশীর্বাদ প্রত্যাখ্যান ও অপুর মনসাপোতা ত্যাগ—অনির্ণীত ভবিষ্যতের দিকে অপু এগিয়ে চলেছে আত্মজনহীন অবস্থায়—এখানেই ছবির শেষ—কিন্তু মূল অপরাজিতের এ তো অর্ধাংশ মাত্র, লীলা কোথায়? কাজল কই? অপুর ভালোবাসা—পরে আর একটি মেয়েকে বিবাহ—পত্নীবিয়োগ—সন্তানের প্রতি আকর্ষণ, সে সব একেবারেই বাদ দেওয়া হয়েছে (হয়তো বাকী অর্ধাংশটুকু নিয়ে সত্যজিৎ বাবু আর একটি ছবি তৈরী করতে পারেন)। ছায়াছবি [illegible] র চিত্রনাট্য ছবিটির সাফল্যের পথে অনেকখানি সহায়তা [illegible] বেশ ঝরঝরে ছবি—ছবির গতিতে আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা একটা চোখে পড়ে না। বারাণসীর অনেক বাস্তব চিত্র উপহার দিয়েছেন সত্যজিৎ বাবু। কয়েকটি জায়গায় বর্ণনায় ঘটনা একটু বেশী হয়ে যাওয়ায় সে জায়গাগুলি একটু ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে। এ ছাড়া বালক অপু কোঁচা লুটোচ্ছে, এক হাতে নারায়ণ-শিলা অন্য হাতে জিনিষপত্র, আস্তে আস্তে চলেছে গ্রাম্যপথ দিয়ে, হেডমাষ্টারের গরু তাড়ানো, ছাইভস্ম মেখে, কুলো বেঁধে অপুর ম্যাজিকান সাজা, সদাসর্বদা যে কোন ক্ষেত্রে অপুর গ্লোবটি আঁকড়ে রাখা, বিভিন্ন জায়গায় কাবলীওয়ালাদের চীনেম্যানদের সংলাপ ছবিটিকে যে রকম [illegible] করে তুলেছে তেমনই 'ম্যানেজ করে নিয়েছি দু'টাকা [illegible] দিয়ে' সংলাপটি জুড়ে বা দুঃখ-দুর্দিনের নিশীথ রাতের [illegible] দীপশিখাস্বরূপ যে দাদুর কৃপায় অপুরা নিষ্কৃতি পেল, [illegible] থেকে সেই দাদুর আশীর্বাদটুকু প্রত্যাখ্যান করা—[illegible] যে কতখানি বিপন্ন করেছে তা বলবার নয়।

বিভূতিভূষণের অপু বিদেশে থাকলেও মায়ের প্রতি তার অসীম আকর্ষণ কিন্তু সত্যজিৎ রায়ের অপু যেন মাকে ন' মাসে ছ' মাসে দু'-এক খানা চিঠি লেখে নেহাৎ লিখতে হয় বলে, কালে-ভদ্রে দেশে যাওয়াও যেন দায়ে ঠেলা গোছের, বাড়ীতে নিজের মায়ের সঙ্গে তার সংলাপের অংশগুলিও যেন কর্কশ, রুক্ষ, আন্তরিকতা-বিহীন। সঙ্গীতে রবিশঙ্কর পূর্ব সুনাম ঠিক অব্যাহত রাখতে পারেননি, ছবির পরিচালনার সঙ্গে, চিত্রগ্রহণের সঙ্গে, অভিনয়ের সঙ্গে সঙ্গীত তাল রাখতে পারে নি। যেন ঝিমিয়ে পড়েছে! অভিনয়াংশ ছবিটির একটি বড় সম্পদ। প্রত্যেকটি শিল্পী কি প্রধান কি অপ্রধান ভূমিকায়, কি খ্যাতনামা কি অখ্যাত প্রত্যেকে চমৎকার অভিনয় করেছেন, তাঁদের সকলকেই প্রাণখোলা অভিনন্দন জানাচ্ছি। সত্যজিৎ বাবুর ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টা সার্থকতায় ভরপুর হোক, এই কামনাই করি।

শুক্রবারের বেতারনাট্য

৫ই আশ্বিন-কবি, কাহিনী তারাশঙ্কর, পরিচালনা শৈলজানন্দ। রূপায়ণে—প্রশান্তকুমার, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ দত্ত, শঙ্করপ্রসাদ ঘটক, হরিচরণ মুখোপাধ্যায়, অনুভা গুপ্তা, নমিতা সেনগুপ্তা, নমিতা দেবী, সুষমা ঘোষ, স্বপ্না সাহা, শান্তা ঘোষ। গানে—তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ** ১২ই আশ্বিন—উত্তরা, কাহিনী, মহেন্দ্র গুপ্ত, পরিচালনা শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে—অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, সিধু গাঙ্গুলী, সন্তোষ সিংহ, মিহির ভট্টাচার্য, প্রেমাংশু বসু, মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, পতিতপাবন মুখোপাধ্যায়, কমল মজুমদার, অসিত মিত্র সঞ্জীব দে, বনানী চৌধুরী, অলকা দেবী, কেতকী দেবী, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায়। ** ১৯এ আশ্বিন—দূরভাষিণী কাহিনী নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নাট্যরূপ অনিলকুমার চট্টোপাধ্যায়, পরিচালনা শ্রীধর ভট্টাচার্য। রূপায়ণে শুভেন মুখোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন চক্রবর্তী, সত্যদেব চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার মিত্র, সাধনা রায়চৌধুরী, প্রতিমা দাশগুপ্তা, জয়শ্রী সেন। ** ২৬এ আশ্বিন—আনন্দমঠ, কাহিনী, সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র, নাট্যরূপ ও পরিচালনা বাণীকুমার। রূপায়ণে—বীরেশ্বর সেন, রামকৃষ্ণ রায়চৌধুরী, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন মুখোপাধ্যায়, হরিপ্রসাদ দাস, কালীপদ চক্রবর্তী, মিণ্টু চক্রবর্তী, অনুভা গুপ্তা, উষা চট্টোপাধ্যায়, তনিমা ঘটক ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

অনেক কাল আগে নিউ থিয়েটার্স উপহার দিয়েছিলো শরৎচন্দ্রের রচনা 'বড় দিদি।' বর্তমানে সেই কাহিনীর পুনর্চিত্রায়ণে হাত দিয়েছেন শরৎ বাণীচিত্রম। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন সুসাহিত্যিক নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীতে অনিল বাগচী. আলোকচিত্র ও পরিচালনায় অজয় কর। অভিনয়ে দেখা দেবেন ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, পাহাড়ী সান্যাল, ছায়া দেবী, উত্তমকুমার, প্রশান্তকুমার, জীবেন বসু, মঞ্জু দে, তপতী ঘোষ, দীপ্তি রায়, মেনকা দেবী প্রভৃতি। ··· প্রেমেন্দ্র, বসুমার পরিকল্পিত ও রচিত মধুমালতীর পরিচালনা করেছেন নীরেন

লাহিড়ী, সঙ্গীতে কমল দাশগুপ্ত—রূপ দিচ্ছেন জহর গাঙ্গুলী, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, অভি ভট্টাচার্য, বসন্ত চৌধুরী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, কাবেরী বসু, নমিতা সিংহ ও সঙ্গীতাচার্য কৃষ্ণচন্দ্র দে।···'প্রিয়' ছবির কাহিনী লিখেছেন বিজয় গুপ্ত, পরিচালনা করছেন সলিল সেন—ক্যামেরায় অনিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সঙ্গীতে রাজেন সরকার। অভিনয় করছেন ছবি বিশ্বাস, রবীন মজুমদার, অসিতবরণ, অনিল চট্টোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সুমালা চট্টোপাধ্যায়।··· বাঙলা চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রধান সঙ্গীত পরিচালক রাইচাঁদ বড়ালকে আবার পাওয়া যাবে নীলাচলে মহাপ্রভু চিত্রে। কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত এই চিত্রে রূপ দিচ্ছেন অহীন্দ্র চৌধুরী, ছবি বিশ্বাস, ধীরাজ ভট্টাচার্য, কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, নীতীশ মুখোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর মল্লিক, বীরেশ্বর সেন, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, মলিনা দেবী, সুমিত্রা দেবী, দীপ্তি রায়, শিখারাণী বাগ, সুরুচি সেনগুপ্তা প্রভৃতি, নায়কের ভূমিকায় দেখা দিচ্ছেন নবাগত অসীমকুমার।···খ্যাতিলব্ধা সাহিত্যিকা প্রতিভা বসুর 'একতারা' পরিচালনা করছেন হীরেন বসু। সঙ্গীতে অনুপম ঘটক। রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস,কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবীরকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় মলিনা দেবী, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়।···প্রতিভা বসুরই আরেকটি কাহিনী 'মাধবীর জন্য' চলচ্চিত্রায়িত করছেন নীতীন বসু। এতেও সঙ্গীত পরিচালনা করছেন রাইচাঁদ বড়াল। রূপ দিচ্ছেন ছবি বিশ্বাস, আশীষকুমার, তুলসী লাহিড়ী, প্রণতি ঘোষ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়।···দেবকীকুমারের আগামী অবদান আশাপূর্ণা দেবীর 'নবজন্ম' ক্যামেরায় খ্যাতিমান চিত্রকর বিভু চক্রবর্তী [illegible] ঘোষ। অভিনয়ে থাকছেন জহর গাঙ্গুলী, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, ভূপেন চক্রবর্তী, তুলসী লাহিড়ী, তুলসী চক্রবর্তী অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, নিভাননী দেবী, মিতা চট্টোপাধ্যায়।··· প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প 'হারজিৎ'। পরিচালনা করছেন মানু সেন। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর। রূপারোপে দেখা যাবে—পাহাড়ী সান্যাল, কমল [illegible]কুমার, বসন্ত চৌধুরী, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, জীবেন বসু, তরুণকুমার, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, তুলসী চক্রবর্তী, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, অনীতা গুহ, স্বাগতা চক্রবর্তী, সুজাতা দেবী প্রভৃতি।···উত্তমকুমারের সঙ্গে সুচিত্রা সেন এবং সেই সঙ্গে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও দেবযানীকে নায়িকারূপে দেখা যাবে তাসের ঘর ছবিতে। পরিচালনা করছেন মঙ্গল চক্রবর্তী। সুর দিচ্ছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অন্যান্যাংশে থাকছেন জহর গাঙ্গুলী, রবীন মজুমদার, মিহির ভট্টাচার্য্য, তরুণকুমার, ডাঃ হরেন, চন্দ্রা দেবী, পদ্মা দেবী, বাণী গাঙ্গুলী, রমা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেফালী নায়েক প্রভৃতি।

চলচ্চিত্রশিল্প-শিল্পী, কারিগর ও শ্রমিক

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়

(সম্পাদক, সারা ভারত সিনেমা-কর্মচারী ফেডারেশান)

ভারতবর্ষে চলচ্চিত্র-শিল্পের বয়স এখনও অর্ধ-শতাব্দী পূর্ণ হয়নি এবং পূর্ণাঙ্গ শিল্প হিসাবে আজও এদেশে চলচ্চিত্র-শিল্পের ব্যাপকতর ক্ষেত্র সামনে পড়ে রয়েছে। বিজ্ঞানের অধুনাতম আবিষ্কারকে ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগাবার জাতির জ্ঞান ও শিল্পবোধকে তার সাহায্যে সমৃদ্ধ করবার ক[illegible] চলচ্চিত্র-শিল্পের উপযোগিতা আজ সর্বথা স্বীকৃত। আমাদের [illegible] সরকার ও জনসাধারণও ক্রমেই এই সুলভ এবং সব থেকে প্রমোদশিল্পের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উ[illegible] এটা আশার কথা। তাই এই শিল্প সম্পর্কে এই [illegible] সাম্রাজ্যবাদী শাস[illegible]ষণের দিন থেকে শুরু করে আ[illegible] যে লক্ষাধিক নরনারী আপন শ্রম সেবা, সৌকর্য্য ও দিয়ে বর্তমান স্তরে উন্নীত করেছেন, তাঁদের সম্পর্কে [illegible] ও রাষ্ট্রকে গভীর ভা[illegible] ভাবতে হবে।

চলচ্চিত্র-শিল্পের জগতে ভারতের স্থান সম্ভবত তৃতীয় অথ[illegible] এবং শিল্প হিসাবে ভারতে এই শিল্পের স্থান পঞ্চম অথ[illegible] জাগতিক ক্ষেত্রে এই শিল্প ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা রাশিয়া, গ্রেট ব্রিটেন ও জাপান। সারা ভারতে সি[illegible] প্রায় ৩৬০০, গ্রেট ব্রিটেনে আছে ৩৫০০, আমেরিকাতে এবং সোভিয়েট রাশিয়াতে আছে ১৬,৭০০। চলচ্চিত্র সংখ্যার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের স্থান সম্ভবত আমেরিকা ও পরেই। ভারতবর্ষে গড়পড়তা বছরে ২৫০টি পূর্ণাঙ্গ চিত্র হয়—১৯৫৫ সালে সর্ব্বোচ্চ সংখ্যায় পূর্ণাঙ্গ চিত্র নির্মিত সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২৯১।

আমেরিকাতে প্রতি ষ্টুডিওতে বছরে [illegible] হয়, আর এ দেশে একটা ষ্টুডিওতে বছরে ৪।৫ টার বেশী হতে পারে না। আমেরিকাতে ১টি বড় ষ্টুডিওতে সবসমেত ষ্টেজ আছে ১৬০টি, আর ভারতে সবসমেত ৬০টি ষ্টুডিওতে সাউণ্ডষ্টেজ আছে ১৪০টি। আকারে ও উপকরণে আজও সাউণ্ড ষ্টেজগুলো বেশ পিছনে পড়ে রয়েছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার সংগে তুলনাতেও ভারতের সাউণ্ড অসম্পূর্ণতা ও অপ্রতুলতা খুবই চোখে পড়ে। অবশ্য সংখ্যায় বা যে ধরণের ছবি আমাদের দেশে তৈরী হয়, তাতে সাউণ্ড ষ্টেজেই আমাদের কাজ চলে যেতে পারে, কিন্তু শিল্পের টেকনিকে এবং বৈজ্ঞানিক সৌকর্য্যে যে উন্নতি প্রতিদিন হচ্ছে, সেই বিচারে আমাদের ষ্টুডিওগুলির যন্ত্র খুবই অপর্যাপ্ত এবং অনুন্নত। কাঁচা ফিল্ম-এর ব্যাপ[illegible] পরনির্ভরশীলতা ভারতীয় চলচ্চিত্র-শিল্পের অগ্রগতির পা[illegible] একটা বড় অন্তরায়। মহীশূর রাজ্য সরকার কাঁচা ফিল্ম [illegible] কিছুটা উদ্যোগী হয়েছিলেন বলে প্রচার হয়েছিল কিন্তু আজ [illegible] বোধ হয় ফলপ্রসূ হয়নি। ২১ থেকে ২২ কোটি ফুট কাঁচা ফি[illegible] আমাদের দেশের চিত্রশিল্পে প্রয়োজন হয় আর তার জন্যে আমা[illegible] দেশ থেকে কয়েক কোটি টাকা বিদেশে রপ্তানী হয়ে যাচ্ছে, এই টাকা এই দেশে থাকলে এই টাকাটা এই দেশের চিত্রশিল্পে পুনর্নিয়োজিত [illegible] এই শিল্পের আর্থিক দুর্গতি বহুল পরিমাণে লাঘব হতে পারে। চলচ্চিত্র-শিল্পের আর্থিক অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কে কিছু প্রয়োজন। যে হিসাব পাওয়া যায়, তা থেকে বলা যেতে [illegible] যে, এই শিল্পে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ আজ প্রায় [illegible] টাকাতে দাঁড়িয়েছে। তার মধ্যে ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী [illegible] নিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৮ কোটি টাকা, সিনেমা-গৃহে [illegible]


লাকমে
ট্যালকাম
পাউডার
সতেজ রাখে
লাকমে — টাটার একটি শিল্পোদ্যম
LKM.148 BE

...র ভারত সরকার কি প্রতিকার ... অবলম্বন করিতে চাচ্ছেন, ... দেশবাসীকে খোলাখুলি ভাবে জানাইলেই এই উদ্বেগের নিরসন ... পারে।" —আনন্দবাজার পত্রিকা

মাত্র একটি লড়াই বাকী

"কেল্লা আমরা প্রায় মারিয়া আনিয়াছি। এখন দারিদ্র্যটুকু ... করিতে পারিলে কেল্লা ফতে। নওগাঁর জনসভায় দাঁড়াইয়া নেহরু আমাদের উপদেশ দিয়াছেন, 'ছোটখাটো বিষয়ে শক্তিক্ষয় ... করিয়া দারিদ্র্যের ... লড়ো।' ঠিকই ত বলিয়াছেন শ্রীনেহরু। ...কারীর বিরুদ্ধে, ছাঁটাইয়ের বিরুদ্ধে, অন্নবস্ত্রের অভাবের বিরুদ্ধে, ...ত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অগ্নিমূল্যতার বিরুদ্ধে, বন্যা ও মহামারীর ...রুদ্ধে লড়াই করিয়া আমরা বৃথাই শক্তিক্ষয় করিতেছি। ...র চরমপ্রাজ্ঞ মহানায়ক প্রধানমন্ত্রী আমাদের ডাক দিয়াছেন ..., আমরা ...ই সব ছোটোখাটো লড়াই বন্ধ করিয়া দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করি। যদি কেহ ... মত প্রশ্ন করিয়া বসেন, কি করিলে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা হইবে? ...বে হয়, প্রশ্নকারীর নির্বুদ্ধিতায় স্তম্ভিত হইয়া একেবারেই কোন জবাব দিবেন না, না হয় বলিবেন, 'পাঁচসালা পরিকল্পনার জয়ধ্বনি করো, নীরব বিপ্লবের কথা সরবে ঘোষণা করো, জয়ধ্বনি করো পণ্ডিত নেহরুর।' দেখিবে দারিদ্র্যের মেঘ হুহু করিয়া কাটিয়া যাইতেছে।" —স্বাধীনতা

মাইক

"সেদিন এক চা পার্টিতে গিয়াছিলাম। পাশে বসিয়াছিলেন এক বৃদ্ধা মেমসাহেব। ভদ্রমহিলা সন্দেশের সদ্ব্যবহার বেশ ভালভাবে করিতেছিলেন। আমি ... করিয়াছি দেখিয়া বলিলেন— ... দেশের সন্দেশ ... ! বলিলাম—আপনি বোধ হয় চন্দ্রপুলি খান নাই, দেখিবেন উহা আরও ভাল। বার দুই-তিন চন্দ্রপুলি আওড়াইয়া বলিলেন—কি করিয়া কথাটা মনে রাখিব? বলিলাম—মনে রাখিবেন Moon এবং Pulley; ধরুন, আপনি একটা গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছেন, আপনাকে ... কপিকল (Pulley) দিয়া তোলা হইতেছে এবং আপনি চাঁদের (Moon) দিকে তাকাইয়া উঠিতেছেন। মেমসাহেব হাসিয়া বলিলেন—তুমি কি ছুটিতে কোথাও যাইবে? বলিলাম—যাইব।—কোথায়?—রাঁচী, খুব ভাল জায়গা।—বেশ বেশ, আমরাও প্রতি বছর এই সময় বাহিরে চলিয়া যাই, এবার ... সময় মাইকের জালায় কলিকাতায় তিষ্ঠানো অসম্ভব, বাহিরে যাইতেই হয়। মনটা একেবারে খারাপ হইয়া গেল। আমরা বিশ্বশান্তির দাবীতে সভা, মিছিল, গানবাজনাতে যেমন উৎসাহী, ঘরের ও প্রতিবেশীর ... শান্তি হরণেও তেমনি। বিদেশীরা আমাদের এই কাণ্ড কি চোখে দেখে? একটা দেশের সভ্যতার পরিচয় তার শ্রেষ্ঠ লোকের দ্বারা নয়, ... প্রকৃত পরিচয় তার সাধারণ লোকের, রাস্তার ... ব্যবহার।" —যুগবাণী (কলিকাতা)

বন্যায় বীরভূমের ক্ষয়-ক্ষতি

"...র্গতের ক্ষুধার অন্নে সম্পূর্ণ উদর পূরণ করিতে পারেন নাই ... গ্রামবাসিগণের আজ এমন অবস্থা যে গ্রাম ... জুড়ি দিতে পারে না। সমস্ত ... যায় পুইশাকের গাছও পর্য্যন্ত নাই। ব্যঞ্জনহীন অন্ন, বানডোবা কচু সিদ্ধ এবং ডালনা নামক লবণযুক্ত তরল পদার্থ দিয়া কোনরূপ ইহায় জঠরাগ্নি কিছুটা শান্ত করে। যে সব গরু বাছুর বাঁচিয়াছে তাহাদের খাদ্য নাই, আশ্রয় নাই। সিঙ্গি ইউনিয়নের অবস্থাও পাচশোয়া ইউনিয়নের প্রায় অনুরূপ। সুবৃহৎ সিঙ্গি ও না...না গ্রামের বার আনা ধ্বংস হইয়াছে। সনসাত গ্রামখানির সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। বাকী ইকুধারা, মহাদেবপুর, বড়ডিহা, অ...ধরা, ভবানীপুর, বেলারা, মঙ্গোল প্রভৃতি গ্রামগুলি ধ্বংস হইয়াছে। ...পুর এবং ...পুর ইউনিয়নের কয়েকটি গ্রাম বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। এবং সিয়ান ইউনিয়নের ডিহিপাড়া ও বৈ...থপুর গ্রামের অনেক ঘর ভূমিসাৎ হইয়াছে। ক্যানেলের জলে এই গ্রাম দুইটির ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ। জয়দেব কেন্দুলী ইউনিয়ন বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। ভুবনেশ্বর ও আকাশ্যা গ্রাম সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। সুগড় জনুবাজার জয়দেব, কেন্দুলী ও টিকরবেতা গ্রামও ধ্বংসপ্রায়। জয়দেবের সিদ্ধাসনের মন্দিরটি ধ্বংসপ্রায়"। —বীরভূম বাণী।

আর্ত্তত্রাণে দাম্ভিকতা

"এ কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, মানুষের জন্যই সরকার, নচেৎ তাহার প্রয়োজন ছিল না। এখন মানুষ যেখানে মরিতে বসিয়াছে, সর্ব্বস্ব দিয়া তাহাকে বাঁচাইতে হইবে। ইহা সরকারের নিকট কৃপাভিক্ষা নহে—চরম কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাহাদের সচেতন করা। সরকারী অর্থভাণ্ডার জনসাধারণের রক্তজল করা কর হইতেই পুষ্ট হইয়াছে, তাই তাহাদের সঞ্চিত অর্থ তাহার বিপদের দিনে অত্যন্ত বিচারের সহিত বণ্টন করিতে হইবে। যে দল দেশের শাসনযন্ত্র চালাইতেছেন, জনসাধারণের নিকট হইতে ইতিমধ্যেই তাহাদের বিরুদ্ধে আর্ত্তসেবার দাম্ভিকতার অভিযোগ আসিতেছে। ভারতের খাদ্যমন্ত্রী অবশ্য দলাদলি বর্জ্জনের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু বণ্টনের ভার পশ্চিমবাংলার স্বনামধন্য খাদ্য তথা সাহায্যমন্ত্রীর উপর এবং ইতিমধ্যেই তাহাতে দুর্লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আমরা পশ্চিমবাংলার এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে সমস্ত দলাদলি বিসর্জ্জন দিয়া আর্ত্তসেবায় আত্মনিয়োগ করিতে কংগ্রেস তথা সরকারের নিকট পুনরায় আবেদন জানাইতেছি এবং যুবক সমাজকে অগ্রসর হইয়া সাহায্য কার্য্যে যাহাতে অনাচার না হয়, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে আহ্বান করিতেছি।" —দামোদর (বর্দ্ধমান)।

হাহাকার

"মহকুমার চারি দিক হইতে তীব্র অভাব-অভিযোগের সংবাদ আসিতেছে। অধিকাংশ পত্রগুলি করুণ এবং মর্ম্মান্তিক। প্রায় প্রত্যেক পত্রেরই সারমর্ম্ম যে, অন্নাভাবে শতকরা ১৬।১৭ জন অনাহারে অর্দ্ধাহারে কাল কাটাইতেছে। ঝাড়গ্রাম থানার চন্দ্রী, আগুইবনি জামবনী থানার চিচড়া বিনপুর থানার ৭নং ইউনিয়নের নেতাই, সাহেবশাহী, ডাইনটিক্রী এবং ২নং ইউনিয়ান ও নয়াগ্রাম শাকরাইল গোপীবল্লভপুর থানার প্রায় অধিকাংশ ইউনিয়নে হইতে প্রত্যহই এইরূপ পত্র আসিতেছে। সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক এবং দ্রুত না হইলে অনেকে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে। আমরা সরকারের নিকট আবেদন করিতেছি, যাহাতে প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিয়া যথাযথ ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হয়।" —নির্ভীক (ঝাড়গ্রাম)


সর্দির ফার্স্ট এড্ শিখল রাজু!
স্যার, আমার ভীষণ সর্দি হয়েছে। মা তাই কাল বনভোজনে যেতে মানা করেছেন। বলছেন, আমার একার জন্যে তাহলে সকলের আনন্দ মাটি হয়ে যাবে।
কী যে বাজে কথা বলো রাজু! দাঁড়াও সর্দির হাত থেকে রেহাই পাবার ফার্স্ট এড্ শিখিয়ে দি
দেখছ, এই ভিকস ভেপোরাব-এর শিশি—এটা সবসময় আমার ফার্স্ট এডের ঝুলিতে থাকে। এই নাও তোমার মা'কে ব'লো আজ রাত্তিরে যেন এই ওষুধটা তোমার বুকে, গলায়, পিঠে একটুখানি মালিশ করে দেন।
বাঁচালেন স্যার।
সেই রাত্রেই শোবার সময় এই অদ্ভুত শক্তি- শালী ওষুধটি রাজুর বুকে, গলায় ও পিঠে মালিশ করে দিলেন। আশ্চর্য গুণ ভিকস ভেপোরাব-এর—সঙ্গে সঙ্গে রাজুর সর্দি সেরে যেতে লাগল।
ভিকস ভেপোরাব সর্দিতে
১ মালিশ করার সঙ্গে
হল ভিকস ভেপোরাব-এর
ব্যথা ভাল হয়ে গেল, হাঁক ছেড়ে বাঁচল
২ সেই সঙ্গে ভিকস ভেপোরাব-এর ভেষজ বাষ্প শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে সারা রাত গ্রহণ করল ঘুমন্ত রাজু। সর্দির এক ভীষণ শত্রু ভিকস ভেপোরাব-এর এই উগ্র আবেশী গন্ধ, তারই ফলে রাজুর বন্ধ নাক পরিষ্কার হয়ে গেল, বন্ধ হল তার গলার খুসখুসানি, সর্দির হাত থেকেও রেহাই পেল।
মধ্য দিয়ে
শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে
ভিকস ভেপোরাব
আমার সর্দি ভালো করে দিয়েছে!
সর্দির সেরা ওষুধ
ভিকস
বুকে, পিঠে
গলায়
VICKS
ভিকস ভেপোরাব একটি ট্রেড মার্ক